বৈশাখ—১৩৬১

খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ব্রহ্মবিদ্যা ও সাধন চতুষ্টয়

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

(১)

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সংকেতটি হইল—অথাতো । ব্রহ্মের স্বরূপ কি—তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান হাই ব্রহ্মবিদ্যার গোড়ার কথা। সাধারণ াহায্যে যে সব প্রাকৃত বিষয়কে অধিগত করা যায় র শক্তি এই ব্রহ্ম বস্তুকে বুঝাইবার পক্ষে নিরর্থক, র অতীত বস্তু হইল ব্রহ্ম। যত বড়ই তীক্ষ্ণধী ক তিনি হউন না কেন, মেধা, বুদ্ধি, intellect, মানসগোচর বস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ।

াতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

র্ক দ্বারাও সেই পারমার্থিক সত্যের সন্ধান করা ম্ভব নয়।

তর্ক প্রতিষ্ঠানাদপি। ব্রঃ সূঃ ২।১।১১।

র্শাস্ত্রের কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নাই। কপিল ৎ মনস্বী ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে তুলনা, analogy বা syllogism-এর স্থান নাই, এজন্য বাদরায়ণ বলিতেছেন যে বেদ শাশ্বত ও অপৌরুষেয় এবং শ্রুতিই একমাত্র ব্রহ্মের প্রমাণ। ব্রহ্মের অস্তিত্ব, উহার স্বরূপ, জীবের মোক্ষ, পরলোক—এই সব তুরীয়, transcendental, ব্যাপারে মানুষের মেধা, বুদ্ধি, চিন্তা নিঃসন্দেহ হইতে পারে না, এজন্য জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর সেই শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে শ্রুতি-ই প্রমাণ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, কেহ কি এই বিদ্যা কোনওকালে কোনওরূপে কোনও আয়াসের সাহায্যে জানিতে পারিবে না?—ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত কয়েকটি জিনিসের সাধনা করিতে হইবে যাহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার মধ্যে নাই, থাকিতে পারে না। এমন একটা গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা অন্তত হওয়া চাই, নচেৎ ব্রহ্মবিদ্যার ভূমিকে

খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বেদান্ত শাস্ত্রটিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে পথ নির্দেশ করা হইয়াছে; গবেষক ছাত্র অথবা পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে যেমন বেদান্ত শাস্ত্রটি বাগাড়ম্বর বা নিছক ফাঁকা কথার সমষ্টিমাত্র লক্ষিত হয়, তাহা মোটেই নয়, ইহাতে আরও সারবান তথ্য আছে যাহার উপলব্ধি সাধন-গ্রাহ্য।

আমরা প্রথমেই দেখিতেছি এই দৃশ্যমান জগৎ; জগতের আড়ালে কি বস্তু আছে প্রত্যক্ষ নয়। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় এই তিন লক্ষণ, এজন্য জগৎ অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্ম শাশ্বত সত্তা। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মই জগতের মূল।—

—জন্মাদ্যস্য যতঃ।

জগৎস্রষ্টা বা জগতের কারণ হিসাবে জগত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ধারণা করা বহু সাধন সাপেক্ষ। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন:

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" তৈঃ উঃ ।২।১

এই স্বরূপলক্ষণের উপলব্ধি মানুষের ধারণার উপর নির্ভর করে না। সেই সদবস্তুর উপর, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই উপর নির্ভর করে। অপরোক্ষ অনুভূতি বা অনুভব জ্ঞান হইতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। ব্রহ্মের লক্ষণ কি, তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত আছে:

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"

যাঁহা হইতে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হইতেছে এবং বিনাশ সময়ে যাঁহাতে গমন করে ও যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, সেই শোনা হইতে আসিবে ব্রহ্ম বিষয়ে চিন্তা ও শেষে প্রগাঢ় ধ্যান। সাধক হইতে হইবে। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ যদি সাধকের না জন্মায় তবে ব্রহ্মবিদ্যা দুঃসাধ্য হইবে। প্রথমে শ্রবণ। বেদান্ত বলিতেছেন—তত্ত্বমসি এই মহাবাক্য সম্বন্ধে যাঁহার প্রকৃত ধারণা হইয়াছে—সেরূপ কোন গুরুর কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শুনিলে ফল ভালই হয়। কঠোপনিষদের কথায় যম নচিকেতাকে বলিতেছেন:

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তা, ন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥১।২।৯

হে প্রিয়তম, তোমার যে সুবুদ্ধি হইয়াছে, তাহা তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইনি সাক্ষাৎকার-যোগ্য হন। হে নচিকেতা, তোমার বস্তুতই পরমার্থ বিষয়ে ধারণা হইয়াছে। তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই যেন আমাদের নিকট আসে।

বেদান্তশাস্ত্রটিকে আত্মোপলব্ধির উপায় ও বলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জন করিতে হইলে যে প্রাথমিক গুণপণার—meritsএর প্রয়োজন হয়, যাহার সাহায্যে অমরত্বের পথে জীবনকে চালিত করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে বলা হয় "সাধন-চতুষ্টয়"। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে ব্রহ্মের ধারণা সহজোপলব্ধিসাপেক্ষ হইবে। উক্ত সাধনের চারিটি পাদ বা সোপান। অমরত্বের পথে চলিবার মানসিক প্রস্তুতি হইল—(১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, (৩) ষট্‌সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব। অল্প কথায় ইহাদের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বা সহজকথায় বিবেক, যাহার সাহায্যে নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের পার্থক্য বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়, বৈরাগ্য। ইহা হইতে আসে—ইহকাল ও পরকালের সুখ ও নিজ কর্মফলের ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা। তৃতীয়, ষট্‌সম্পত্তি বা শমদমাদি ছয় গুণ সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় এবং চতুর্থত, মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষের অভিলাষ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের শারীরকভাষ্যে ও বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের শ্রীভাষ্যে এই সাধন চতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। উহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নয়। সাধনপথের ইহা বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, এবং অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই অনুরূপ সাধনপ্রণালী ধর্মপথের সহায়ক, উন্নতি বিধায়ক ও শোভাবর্ধকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই চতুর্বিধ সাধনায় সিদ্ধ হইলে তবে সাধক ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবেশাধিকার—passport—লাভ করিবেন, নচেৎ নহে। পথও সুগম নয়; সাধকের কাছে পথটি ক্ষুরধারার মত বিপদসংকুল, অল্প অসাবধানতায় পতন অনিবার্য।

এ সম্বন্ধে প্রথম প্রয়োজন বিবেক। বাস্তব অবাস্তব, প্রাকৃত অপ্রাকৃত, নিত্যানিত্য, শাশ্বতাশাশ্বত বস্তুর প্রভেদ যাহা—তাহা নির্ণীত হয় 'বিবেক' নামক বৃত্তি অথবা শক্তির সাহায্যে। বৌদ্ধ অষ্টমহাপন্থের প্রথম সোপান যে 'সম্যক্-দৃষ্টি' তাহার সহিত বিবেকের সামঞ্জস্য আছে। সাধক যতক্ষণ না নিত্যানিত্যের মধ্যে বৈষম্য কোথায় হৃদয়ংগম করিতে পারেন ততক্ষণ নিত্যই যে মৃগ্য তাহা বোধগম্য হইবে না। নিত্যের জ্ঞান হইল ব্রহ্মবিদ্যা। অতএব, সাধকের আপ্রাণ চেষ্টা হইবে প্রাকৃত বস্তুর অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানগম্য অনিত্য বস্তু হইতে নিত্য বস্তুকে আবিষ্কার করা। শুধু মুখে বলিলে হইবে না, "হাঁ, হাঁ, বুঝিতেছি, আত্মা অমর, অপর যা-কিছু নশ্বর, অথবা, ভগবানই নিত্য, জগত অনিত্য"। এরূপ বুলি বলিলে বিবেকের উদয় হয় না। বাক্যে কোন ফল হয় না। চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি—perception—তবেই আসল বিবেক আসে। আচার্য শংকরের মতে জ্ঞানের দ্বার তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিবাক্য।

এখন নিত্যানিত্য সম্বন্ধে কথা এই যে, নিত্য যাহা তাহা সর্বস্থানে বর্তমান, সর্বকালে বিদ্যমান ও সর্ববস্তুতে অনুস্যূত। প্রদীপের নিমগ্নপ্রায় শিখা হইতে হিমগিরির কালজয়ী শিখর, কিংবা প্রজাপতির ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে শতবর্ষব্যাপী মানুষের আয়ুষ্কাল প্রভৃতির আলোচনা করিলে দুইটি দিক উপলব্ধি হয়। একটি হইল অমূর্ত কোন এক বস্তু—যাহা নিত্য ও শাশ্বত এবং অপর সব-কিছু ক্ষণিক ও নিয়ত পরিবর্তনশীল জাগতিক রূপ। শাশ্বত সত্তা যাহা তাহা সর্বকালেই বিদ্যমান আছেন—

—ত্রৈকালিকাস্থবাধ্যত্বম। ব্রঃ সূঃ

এই সত্তা অতীতে বর্তমান ছিলেন, বর্তমানে আছেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন—

—কালত্রয়সত্তাবৎ। ব্রঃ সূঃ

নিত্য বস্তু আজ আছে কাল নাই, এরূপ হইতে পারে না; জগৎ অনিত্য, যেহেতু জাগতিক বস্তু সমুদয় পরিবর্তনশীল।

"All in a state of perpetual flux.".

এই সব বস্তু পরিণামী—they never are, but always

গ্রীসীয় দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন :

— Panta Pai. —

শংকর বলিতেছেন :

"নহি নিত্যং কেনচিৎ আরভ্যতে,
লোকে যদ্ আরব্ধং তদ্ অনিত্যম।"

—নিত্য যাহা তাহার আরম্ভ নাই এবং যাহার আরম্ভ আছে তাহা অনিত্য। যাহা কিছু আছে সবই পরিবর্ত-প্রবাহে ডুবিয়া আছে। সব কিছুই সৎ নয়, অসৎও নয়, যেহেতু কার্যকারণ সম্বন্ধ বরাবর আছে।

যিনি নিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চান তাঁকে নিত্যের সহিত যুক্ত হইতে হইবে, বা নিত্য ও নিজের অভেদত্ব বুঝিতে হইবে। এজন্য সাধকের দৃষ্টি প্রতি দৃষ্ট বস্তুতে নিত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে। বাহ্যজগতে প্রকৃতি-রাজ্যের শাশ্বত নিয়ম ও পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, যেটি বিজ্ঞানের উপজীব্য। সেইরূপ আন্তর্জগতে নিয়ত পরিবর্তনশীল অনুভূতির (sensations) সহিত সেই অনুভূতির সাক্ষীস্বরূপ অনুভূতির প্রকট-কর্তার প্রভেদ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, সাধকের বোধ ও সেই বোধের কর্তা এবং সাধকের চিন্তা ও সেই চিন্তার আশ্রয়ী কর্তার [যিনি সেই বোধ ও চিন্তাকে অহরহ আলোকিত করিতেছেন সেই সাক্ষী (awareness)] ইহাদের মধ্যে বৈলক্ষণ্য বুঝিতে হইবে। জিনিসটা একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। তোমার মধ্যে 'আমি' ভাবটা আছে, তাহা তুমি অনুভব করিতে পার। অনুভবই এই ভাবটিকে প্রকাশ করিতেছে। এই অনুভব মাত্র [অহংভাবের প্রকাশক] সাক্ষিচৈতন্যই তোমার স্বরূপ। 'আমি' একটা বিশেষ ভাব ; কিন্তু তাহার প্রকাশক সাক্ষী হইল নির্বিশেষ। সাক্ষী নির্লিপ্ত—সাক্ষ্য বা প্রকাশ্য অহংকারের সহিত সে মিশিয়া নাই, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অতএব অহংটাকে জড় বলা যাইতে পারে, আর এই জড়ের প্রকাশক যে সাক্ষী তাহা চৈতন্য মাত্র। সেই তুমি বা তোমার স্বরূপ—এজন্য তুমি চিৎ।

ব্যক্তিগত অহং [জড়] ও শাশ্বত অহং [চিৎ]কে বা সাক্ষীকে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তি ইহার ঠিক বিপরীতটি করিয়া থাকে। সে বস্তুতে বস্তুতে পার্থক্য স্বতঃই আনিয়া থাকে এবং জীবনের

বাহ্যিকরূপে [জড়] মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জাতির গৌরব, ধর্মের গৌরব, বর্ণের গৌরব, এই সবের গর্ব তাহার আছে; ধন-মান-বিদ্যা-ধীশক্তির গর্ব সে করিয়া থাকে; কিন্তু এই সহজ কথাটা ধরিতে পারে না যে জাতি-ধর্ম-বিদ্যা প্রভৃতি অস্থায়ী গুণ বা অবস্থা, যেগুলির সময়ের সংগে সংগে বিলোপ হইবে। ক্ষণিকের সংগে নিজেকে অভিন্ন করায় সে অনিত্যের সংগে জড়িয়ে পড়ে এবং মরণের পথেই অগ্রসর হয়। অমর হইয়াও মৃত্যু হইতে মৃত্যুর পথেই সে অবিরাম চলিতে থাকে। উপনিষদের কথায় এই সব ব্যক্তি হইল "আত্মহন"। কারণ, শাশ্বত সত্তাকে ধরিবার পরিবর্তে ইহারা জাগতিক প্রবহমান রূপকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং স্বয়ং অমৃতের অধিকারী হইয়াও মৃত্যু হইতে মৃত্যুর গর্ভে অনবরত নিমজ্জিত হয়। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন:

> ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
> অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
> পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে। ১।২।৬

সংসারে আসক্তচিত্ত ও ধনাদিমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক সম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না। কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক নাই—এইরূপ মনে করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হইতেছে।

ইহার বিপরীত ভাব বিবেক। মাঝে মাঝে ধ্যান করিয়া কোন ফল নাই, মাঝে মাঝে দার্শনিকত্ব জাগাইয়া তুলিয়া কোন লাভ নাই, অহরহ ঐ বিবেকভাব অনুশীলন করিতে করিতে অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে যে অধীরতা আসে, গংগার তীরে শান্তিপূর্ণ চিন্তা করিতে করিতে যে প্রসন্নতা আসে, শান্তিবিঘ্নিত পরিস্থিতির মধ্যে অথবা আনন্দদায়িনী কথকতার মধ্যে থাকিয়া আনন্দ উপভোগের মধ্যে অথবা সাধুসন্ন্যাসীর সংগে বাক্যালাপ প্রসংগে যে চিত্তের প্রগাঢ়তা ও তন্ময়তা আসে তাহার মধ্যেও সর্বদা বিবেককে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

(৩)

ইহার পরেই আসিবে বৈরাগ্য। "বৈরাগ্য" কথাটি শুনিলেই একটি বিশিষ্ট ছবি মনে ফুটিয়া উঠে, সেটি সংসারে প্রগাঢ় অনাসক্তির। যথা, কৌপীনধারী বা সন্ন্যাসী হইতে হইবে—যাহার সর্বাংগ ভস্মলেপিত, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত ও মস্তক জটাজালবিলম্বিত। কাহারও বৈরাগ্য হইয়াছে শুনিলেই মনে হয় যেন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সংসার সম্বন্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যাহাতে স্ত্রীপুত্র-পরিবার ত্যাগ করিতে হইবে এবং শ্মশানে মশানে বিচরণ করিতে হইবে বা সুদূর বিন্ধ্যগিরি অথবা হিমালয়ের কোন নিভৃত গুহায় আশ্রয় লইতে হইবে। বৈরাগ্যের অর্থ ইহা নয় যে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে; বৈরাগ্য নির্দেশ করে না—কর্তব্য ও দায়িত্বকে পরিত্যাগ করিতে। "বৈরাগ্য" অর্থে সংসারে অনাসক্তি হওয়া—detachment of the world এবং আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম করিয়া যাওয়া। এই অনাসক্তভাব নিরুদ্বেগ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর থাকিতে পারে এবং কর্মব্যস্ত গৃহীরও থাকিতে পারে।

সাধক অতঃপর নিত্যানিত্য বিচার হইতে পরিবর্তনশীল তথা মরণশীল জাগতিক বস্তু হইতে নিজেকে বিমুখী রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তাহার মানে ইহা নয় যে সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যাকর্তব্য হইতে নিজেকে তফাতে রাখা। অত সোজা নয়। কারণ, মানুষের মন হইল সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল ও খেয়ালি এবং যেখানেই যাওয়া যাক না আকাশের রূপ বদলায়, কিন্তু মন সংগে সংগে যায়। জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণাময় বা ন্যক্কারজনক দুঃখের বিষয় লইয়া অনর্থক ভাবনা করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ সুখকর ও আনন্দদায়ক দিকও জীবনের আছে। পূতিগন্ধময় নর্দমা যেমন জগতের অংশ, সুমহান মহাসাগরও জগতের অংশ। এজন্য, মন্দ অথবা বিরক্তিকর জাগতিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলেও, ঐ সব চিন্তা হইতে সুফল কিছুই হয় না। মানসিক সাম্যই গীতা-উক্ত যোগের সারবস্তু। গলিত শব বা ঐ জাতীয় মর্মান্তিক দৃশ্যের চিন্তা হইতে বৈরাগ্য আসে না, আসল বৈরাগ্য আসে অনিত্য ক্ষণভংগুর বস্তু লক্ষ্য করিয়া যখন অনাসক্তির উদ্রেক হয়—সে বস্তু আনন্দদায়কই হউক অথবা যন্ত্রণাদায়কই হউক। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং অরুচিকর বা যাতনাদায়ক ব্যাপারের প্রতি একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ভাব থাকে। বৈরাগী ব্যক্তি মনে করেন যে, সুখদুঃখ উভয় মনোভাবই জাগতিক

অভিব্যক্তির স্রোতের মুখে কোন না কোন উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার অন্তরকে সেই সুখদুঃখের দ্বারা আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট হইতে দেন না। সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত তিনি একীভূত হইয়া যান, যেজন্য সুখ ও দুঃখের বোধ তাঁহার কাছে সমানই প্রতীয়মান হয় এবং জীবনের নানারূপ অভিজ্ঞতা তাঁহার উপর দিয়া যেন চলিয়া যায় কতকটা চলচ্চিত্রের ছবির মত। সকল ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছেন, শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কোনটিতেও লিপ্ত ও মুগ্ধ হইতেছেন না।

মনের এই নির্লিপ্ততা অতীব প্রয়োজনীয়। গিরিগুহায় বাস ও শ্মশানে মশানে বিচরণ হইতে যতটা এই নির্লিপ্ততা আসিবার সম্ভাবনা, তদধিক সম্ভাবনা আছে সংসারের মধ্যে থাকিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য কর্ম করিয়া। একটু বিস্তারিতভাবে বলি। যখন দেখা যায় যে জীবনে তৃপ্তিদায়িনী অভিজ্ঞতা জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে তখন সেই তৃপ্তিকে আলিংগন ও মরিয়া হইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রলোভন বা স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁহাকে দমন করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, অরুচিকর অভিজ্ঞতার কবলে পড়িলেও তিনি ভয়ে আড়ষ্ট, সংকুচিত হইবেন না। এইরূপ পন্থা অনবরত অভ্যাস করিতে করিতে জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাপে ধাপে আগাইয়া দিবে এবং ক্রমশঃ সাফল্যলাভ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে সুখদুঃখ বিষয়ে নির্লিপ্ততা জন্মিবে, যেটির পরিণতি ঘটিবে বৈরাগ্যে।

ইহার পরই আবশ্যকীয় শক্তি হইতেছে ষটসম্পত্তি। ইহাদের নাম শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। ইহারা একটি অভ্যাসের পর্যায়ের মধ্যে, একই গ্রুপ। ইহারা বিভিন্ন মানসিক দমন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বিভিন্ন অংশ, যাহাদের অভ্যাস হইতে সাধক সাধনমার্গে যথেষ্ট উন্নীত হইতে সমর্থ হইবেন। "শম" অর্থে মনের স্থৈর্য। ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিতে হইলে প্রথমে মনের শান্ত ভাব প্রয়োজনীয়। মনই ইন্দ্রিয়প্রধান; এজন্য মনকে যদি শাসনে না রাখা যায় তবে পৃথক পৃথক ভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা শক্ত হইয়া পড়ে, যেমন মৌচাকের মৌরাণীকে উড়াইয়া দিয়া মৌমাছির ঝাঁককে আয়ত্ব করিতে যাওয়া দুরূহ। মৌরাণীকে যদি স্থিরভাবে বসিতে দেওয়া যায় তবেই ঝাঁকটি স্থির হইয়া বসিবে ও আয়ত্বাধীনে আসিবে। "দম" অর্থে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। "নিগ্রহ" অর্থে ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তির নানাপ্রকার কঠোরতাসাধন নয়—যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অসাড়তা বা মৃত্যু হইতে পারে—ইহার অর্থ ন্যায়সংগত (rational) উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন। কোন প্রবল ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কঠোরতাবলে ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ, কিন্তু ধর্মজীবনের উন্নয়নে ঐরূপ পন্থা ভুল পন্থা। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির কোনওরূপ ক্ষতি করা বা উহাদিগকে দুর্বল করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য, কারণ অনুভূতি ও চেতনার স্তরে আত্মা ক্রিয়া করিয়া থাকেন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে। সাংখ্য বলিতেছেন যে, আত্মার উদ্দেশ্যকে সফল করিতে দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে; ভক্তিপথের পথিক বলিয়া থাকেন যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি শুধু ভোগের জন্যই হয় নাই, ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যেও হইয়াছে। এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে মনের বশীভূত করা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক প্রবণতা হইল এরূপ বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হওয়া—যাহা সুখাবহ বা তৃপ্তিদায়ক। এই প্রবণতাকে দমন করা কর্তব্য এবং জ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত মনে যতটুকু ক্রিয়া প্রয়োজন ততটুকু ক্রিয়া মনের থাকা উচিত।

তারপরের প্রয়োজন হইল 'উপরতি'। ইহার অর্থ 'রতি' হইতে মনকে গুটাইয়া আনা। মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইলেও আর একটি ধাপ আগাইতে হইবে। এখন ভোগবাসনার পরিবেশ হইতে মনকে দৃঢ়রূপে দূরে রাখিতে হইবে। কার্যে ও চিন্তায় ভোগের বিষয় যেন সাধকের মনে স্থান পাইতে না পারে এরূপ ভাব আনিতে হইবে। ইহাই উপরতি। সেবার আদর্শ লইয়া পরমতত্ত্বের প্রতি মনে দাস্যভাব আনিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জীবের অন্তরেই বাস করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেবায় পরমানন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

ইহার পরবর্তী প্রয়োজন 'তিতিক্ষা'। সুখ ও দুঃখকে সমানে সহ্য করিবার ক্ষমতা হইল এই শক্তি। সাধক পূর্বোক্ত 'উপরতি'তে সিদ্ধিলাভ করায় সাধকের মন হইতে ভোগের বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু, জগতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বিষয় ব্যতীত দুঃখজনক, অসুখকর, নিরানন্দময়

জিনিসের অভাব নাই; যথা, শীতাতপ, লাভালাভ, বন্ধুত্ব শত্রুতা, সম্মান অসম্মান প্রভৃতি পরস্পর-বিপরীত যুগল বস্তুগুলি—pairs of opposites—বস্ত্রের টানা প'ড়েনের মত প্রতি মানুষের অভিজ্ঞতায় অনুস্যূত রহিয়াছে। সাধারণ ব্যক্তি এই পরস্পর-বিরোধী যুগলের মধ্যে যেটি সুখকর, তৃপ্তিকর ও আনন্দদায়ক সেইটিকে পাইবার জন্য লোলুপ হয়, অপরটি বর্জন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অবিদ্যা বা অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, প্রকৃতি-রাজ্যে যেখানে বেগ, যেখানে প্রাণের চাঞ্চল্য, যেখানে জীবনের সাড়া, সেখানেই এই পরস্পর বিপরীত শক্তি-যুগল দেখা দিবে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বত্র বিদ্যমান; এজন্য উক্ত যুগলবৈপরীত্য নাই এরূপ জীবন আশা করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। প্রকৃতির এই দ্বৈতভাব সাধককে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং নিজের মধ্যে যেটি অপরিবর্তন-শীল, গতিহীন ও স্থাণু পদার্থ আছে, যেটি বৈপরীত্যহীন সেটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে সাধক শান্ত-নিস্পৃহতার সহিত লক্ষ্য করিবেন—সৃষ্টির জোয়ার-ভাঁটা, তাঁহার নিজের নিয়ত পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাজাত আনন্দ-নৈরাশ্য, সুখ-দুঃখ হইতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির উৎপত্তিবিলয়, উত্থানপতন প্রভৃতি। সাধক যখনই উপলব্ধি করিবেন যে শীতোষ্ণাদির কিছুই পারমার্থিক নয় তখনই তিতিক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। শীতাতপে ঔদাসীন্য দেখাইয়া যে stoic সম্প্রদায় তিতিক্ষা অভ্যাস করিতেন তাহাতে প্রকৃত তিতিক্ষা জন্মায় না। আসল তিতিক্ষা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিতিক্ষালব্ধ সাধক জাগতিক ধ্বংসলীলার মধ্যেও নিজেকে অটল রাখিতে পারিবেন, কিন্তু stoic তিতিক্ষাবাদী ধ্বংসের স্রোতে ভাসিয়া যাইবেন।

(৪)

তাহার পর, পঞ্চম সম্পত্তি হইল "শ্রদ্ধা" বা বিশ্বাস। ইহার সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন মতের ধর্মধ্বজীরা (creed-mongers) চান যে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মপুস্তক বর্ণিত মতে অন্ধ-বিশ্বাস করিতে হইবে, অথবা কোন গুরু বা পয়গম্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অথবা কোন বিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রতি অন্ধবিশ্বাস আনিতে হইবে।

এই জাতীয় বিশ্বাস পুরুষানুক্রমে অর্জিত হইতে পারে, বা বিশিষ্ট অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়া সৃষ্ট হইতে পারে, বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত মতামত হইতে পারে, কিন্তু সবই কুসংস্কারাচ্ছাদিত। কারণ, প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিশ্বাস মাত্রই কুসংস্কার। ঘটনাকে না দেখিয়া বা নিজের কোন অংগকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া এই সব বিশ্বাসকে মান্য করা যাইতে পারে। আবার, কুসংস্কারের যমজ সহোদর হইল ধর্মোন্মত্ততা। যদি দেখি যে কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও স্বমতে আনিবার জন্য জোর খাটাইতেছে বা ভগবানের প্রতি এক বিশিষ্ট প্রকাশ্য বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেছে তবে নিশ্চিত বুঝিব যে তাহার নিজের বিশ্বাস দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং অপরের মনে কোন বিপরীত বিশ্বাসেরমূলে কুঠার হানিতে যাওয়া মানে—তাহার নিজের হৃদয় মধ্যে নানা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রকৃত "শ্রদ্ধা" কাহাকে বলে? আত্মার মধ্যে যে সত্য আছে যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের ক্ষীণ প্রতিফলন যদি সাধকের মনেপ্রাণে উদয় হয় তবেই শ্রদ্ধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাবতীয় জ্ঞানই আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত আছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তি আছে—যে আনন্দ আছে—তাহা বাহ্যিক দেহ ও ব্যক্তিত্বের আবরণে আবৃত থাকে, সেইরূপ মগজের ক্ষুদ্র ও সীমিত শক্তি নিবন্ধন সেই জ্ঞানও আবৃত থাকে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে যে সুখের আস্বাদ আমরা পাই বা আমাদের জীবনে যে শক্তি আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা আত্মার সুখ ও শক্তির তুলনায় কতটুকু! অতএব, ইহা সত্য যে, আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা আত্মার নিজস্ব জ্ঞানেরই কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, যদিও সে জ্ঞান আসিতেছে বাস্তব সীমাবন্ধন হেতু আবরণের মধ্য দিয়া।

এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় সত্যের সংজ্ঞা (intuition) রূপে। নানাপ্রকার অভিমত ও সংস্কার-প্রসূত জ্ঞানের স্তূপ হইতে সাধক সংজ্ঞাগুলিকে পরিশ্রুত করিয়া লইবেন, যেমন রাজহংস অম্বুমধ্য হইতে ক্ষীরটিকেই বাছাই করিয়া লয়। প্রকৃত সংজ্ঞাকে সহজাত সংস্কার ও লুকান বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

[illegible] পূর্ব পূর্ব সাধনায় যখন সম্পূর্ণ [illegible] অভ্যাসের বশে আসিয়াছে এবং মন সংযত ও শান্ত হইয়াছে এবং বিভ্রান্তকারী বাসনার দুষ্ট আহ্বান মূক হইয়া গিয়াছে, তখন বলিতে পারা যায় যে পথটি সুগম হইয়াছে। হৃদিকন্দরের সংজ্ঞা-প্রদর্শিত আলোকবর্তিকাই সাধকের পথকে আলোকিত করিয়া দিবে। যদি আলোক বদ্ধ হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয় নাই, এজন্য প্রগাঢ় সাধন আবশ্যক। এই ব্যাপারে, গুরু, ধর্মপুস্তক, যৌগিক অভিজ্ঞতা বা যোগজ দৃষ্টি কোন উপকারে আসে না; কারণ, যাহার নিজের অন্তর দীপটি জ্বলে নাই তাহাকে চির অন্ধকারে থাকিতেই হইবে, যদিও তাহার চারিদিকে আলোকের অনন্ত দীপ্তি শোভা পাইতেছে।

অতএব, শ্রদ্ধার দুইটি ধাপ। প্রথম ধাপে, চিত্তকে, হৃদয়কে, মনকে শোধন করিতে হইবে, যাহাতে সংজ্ঞার আলোক প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে, উক্ত আলোক ভিন্ন অপর যাহা কিছু সেগুলিকে গৌণরূপে গণ্য করিতে প্রযত্ন করিতে হইবে। সাধকও এই আলোকের মধ্যে কোন ধর্মগত ঐতিহ্য বা কোন সামাজিক ব্যবহার বা কোন অনুভূতির প্রাধান্য বা কোন বুদ্ধিবৃত্তিজাত অভিমত আসিতে পাইবে না। অত্যন্ত মিট্‌মিটে তারাটির দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পথ চলিতে চলিতে দেখা যাইবে যে উহার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে এবং পরিণামে জ্ঞানের অনন্ত আলোকে পৌছান সুসাধ্য হইবে—যে আলোকের ঔজ্জ্বল্য কোটী সূর্যকে হীনপ্রভ করে।

ষট্‌সম্পত্তির সর্বশেষ সম্পত্তি হইল 'সমাধান', অর্থাৎ মানসিক সাম্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন:

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীতা ২।৪৮

এস্থলে 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' অর্থে মানসিক সাম্যই সূচিত হইতেছে। তাৎপর্য এই যে, ফলসিদ্ধি হইলে যে আনন্দ হয় এবং ফল অসিদ্ধ হইলে যে বিষাদ উপস্থিত হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য কর্ম করিতেছি এই মনে করিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহার পরবর্তী একটি শ্লোকে গীতা বলিতেছেন যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সমতাবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্মফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার জন্য কর্মানুষ্ঠান করিবে। ফলের কামনা ত্যাগ সহজে হয় না। যতদিন পর্যন্ত বুদ্ধির শুদ্ধি না হয় অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা [illegible] শোধিত না হয় ততদিন ফলের কামনা থাকে। বুদ্ধি [illegible] ফল-কামনার দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া [illegible] অবস্থিতি করে তখনই বুদ্ধি সমাহিত হইয়া যোগ লা[illegible] এইরূপ হইলে সাধকেব সাত্ত্বিকীবুদ্ধি জন্মিয়াছে বুঝিতে হই[illegible] গীতা তাঁহাকে "স্থিতপ্রজ্ঞ" এই অভিধান দিয়াছেন। [illegible] অষ্টপথেব মধ্যে যে 'সমাধি'র বিষয় উক্ত আছে তাহা[illegible] সহিত 'সমাধান' তুলিত হইতে পারে। অর্থাৎ স্থিতপ্র[illegible] অবস্থায় চিত্ত বাসনা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ দুঃখকে [illegible] সমতুল্য জ্ঞানে আত্মার সান্নিধ্যে আসিয়া সাম্যভাব প্রা[illegible] হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির 'সমাধি' সম্বন্ধে ধারণা অন্তরূপ [illegible] সাধনা অর্থে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া বুঝায়, যদ্দরু[illegible] সাধক পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসাড় হইয়া পড়েন এবং য[illegible] তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা শরীরকে বিদ্ধ করা যায় তবে সাধকের অনুভূ[illegible] একেবারে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ভাবমূর্চ্ছার অব[illegible] হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন অর্থ আছে কি না বু[illegible] যায় না। আসল সমাধি যাহা তাহা অন্যপ্রকারের। এ[illegible] অবস্থায় জীবাত্মা [Self] পরমাত্মার [Atman.] সান্নি[illegible] আসেন, যখন মন সাম্যাবস্থায় থাকিয়া এরূপ দশাপ্রাপ্ত হ[illegible] যে সর্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মার সেবায় জীবাত্মা সদা[illegible] উন্মুখ হইয়া থাকেন। এই যে সমাধির কথা বলিলাম—তা[illegible] কি সক্রিয় অবস্থায় কি ধ্যানাবস্থায় উভয় অবস্থায়ই সমা[illegible] বর্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু লৌকিক সমাধি বোধ হ[illegible] গিরিগুহা ও জংগলের ব্যাপার; বাহ্য শান্তির উপর নির্ভ[illegible] করে যে সমাধান তাহা অসম্পূর্ণ। ইহাকে এরূপ উন্নী[illegible] করিতে হইবে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় অশান্ত চঞ্চ[illegible] পরিস্থিতির মধ্যেও সাধককে শান্তিময় অরণ্যাশ্রমেপ্রা[illegible] নির্বিকার, নির্লিপ্ত, শান্তসুস্থ অবস্থা আনিতে হইবে। এরূ[illegible] সম্ভব হইলে 'সমাধান' সম্পত্তিটি অর্জিত হইয়াছে বুঝি[illegible] হইবে।

(৫)

চতুর্থ ও শেষ সাধন হইল মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলা[illegible] করিবার বাসনা। মুখ্যত, মুমুক্ষুত্ব কোন বিশেষ গুণ ন[illegible] যেমন পূর্বোক্ত বিবেক, বৈরাগ্য ও ষটসম্পত্তি বিশেষ বি[illegible] গুণ, merits; যেগুলিকে অর্জন করিতে হইবে ও উহা[illegible] পূর্ণতা বা উৎকর্ষ আনিতে হইবে। মুমুক্ষুত্ব হইল এব[illegible]

[মা]নসিক ভাব বা অবস্থা, যেটি অপর তিনটি পর-পর সাধনের [স]ঙ্গে অবিরাম বর্তমান থাকিয়া প্রতিটি প্রযত্নে শক্তি [যো]গাইয়া থাকে। সাধকের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলিতেছে [যা]হাতে কর্মপ্রেরণা যোগাইতেছে এই মুমুক্ষুত্ব; অর্থাৎ [স]কল প্রচেষ্টার আদি ও অন্ত এইখানেই। শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অনেকে কৃচ্ছ্রসাধনকে জীবনপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'অন্তবত্তু ফলং তেষাম'; এই সব ফল [ক্ষ]ণিক। অনন্ত, শাশ্বত, তত্ত্বমসি ভিন্ন কিছুই নিত্য নয়। [য]তক্ষণ পর্যন্ত জীব তাহার নিজস্ব "অহং"কে আঁকড়াইয়া [থা]কে ততক্ষণ এই সীমাহীন দুঃখপারাবারের জোয়ার ভাঁটায় [তা]হাকে ঘুরিতে হইবে ও দুঃখভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ [য]তক্ষণ পর্যন্ত জীব তাহার নকল সত্ত্বা অথবা ব্যক্তিত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে—যেমন রাজা কি দাস, সাধু কি পাপী, ইত্যাদি।

বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ গীতা ২।৭১, ২।৭২

অর্থাৎ, সংযম প্রভৃতি সাধনার শেষ কথা নয়, যিনি "আপ্তকাম" অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনার উপরে অবস্থিত তিনিই শান্তির অধিকারী; ইহাই মুক্তির ভূমি। কামনার বন্ধনে যখন জীব আর জড়ায়ে থাকে না তখনই "স্থিতপ্রজ্ঞ" অবস্থা, ব্রাহ্মীস্থিতি। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ যে নিবাণ তাহা লাভ করেন। বিবেক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক শাশ্বতকে নিবিড়ভাবে ধরিয়া রাখিবার যে প্রযত্ন করিতেছেন তাহা মুমুক্ষুত্বের প্রাথমিক অবস্থা। সেই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে তখন—যখন আত্মভাবের মিট্‌মিটে প্রদীপ পূর্ণাত্মার সৌরকিরণে ডুবিয়া যায়, তখন আসে একটা বিরাম। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নদীটি তখন তীরহীন সাগরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

বন্ধন হইতে মুক্তি, ইহাই কাম্য। যতক্ষণ মানুষ দাসত্ব শৃংখলে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে কিছুই করিতে পারে না, প্রতিমুহূর্তে শৃংখল তাহার কার্যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে। মুক্তি ভিন্ন কিছুই করিবার নাই। আবার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া এইটি চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না; শুধু মুক্তি হইতে কিছু ফল হয় না; মুক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় পরবর্তী ব্যবহারের উপর। কোন ব্যক্তি মুক্ত হইয়া আলস্য-বশত আরাম-রৌদ্র উপভোগ করিতে পারে। অপর ব্যক্তি মুক্তাবস্থায় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। উভয় ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বহু; কিন্তু উভয়ের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সমানই। কেহ কেহ (যথা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা) বলিয়া থাকেন, "মুক্তি আমি চাহি না, আমি শুধু ভগবানের সেবা করিতে চাহি।" ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মুক্তি তুমি না চাহিলেও প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবার অধিকারী মুক্ত না হইলে হওয়া যায় না। যদি কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আবেদন করে যে সে তোমার ভৃত্য হইতে চায় এবং যদি তুমি দেখ যে সে অজ্ঞ, লোভী, অসাধু এবং কাজের অযোগ্য তবে তাহার আবেদন তুমি নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করিবে; কিন্তু যদি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে কোন কাজে বাহাল কর, তবে তাহার ভুলচুক গলদাদি সংশোধন করিতে তোমার যথেষ্ট সময়ের অপব্যবহার হইবে এবং তাহার অসাধুতার জন্য সতর্কও থাকিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম যে, চাহিলেই ভগবানের দাসত্বপদ পাওয়া যায় না; কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। বাসনা, কামনা, ক্রোধ, লোভ, অজ্ঞতা, অহংকার যতক্ষণ অন্তরে থাকিবে ততক্ষণ ভগবৎ সেবা করিবার অযোগ্য হইবে। ভগবানের সেবক হইতে হইলে মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার;—ক্রোধ, লোভ, মোহাদি শত্রুর শৃংখল হইতে মুক্তিলাভ অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ রিপুরাজ কাম ও বাসনা হইতে। তাহার পরের কথা হইল এই যে, মুক্তিলাভ করিবার পর কি করিতে হইবে। কিম্ অতঃপরম্?

—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তঃ ভজন্তে।

মুক্ত হইয়া ভগবদ্ লীলায় যে রূপের সৃষ্টি হইবে তাহার সাহায্যে অরূপের [ব্রহ্মের] সেবা করা। এই অরূপের মহিমময় আলোকে তখন চিৎ অচিৎ নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে!

দার্শনিক

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

অশোক কিছুতেই মন পেল না বিনতার।

অশোক জানে সংসারে জোর করে কারুর মন পাওয়া যায় না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? অশোক তাই বিনতাকে অনেকবার অনুরোধ ক'রেছে তার অমন ঔদাস্যে আবৃত থাকার কারণ জানবার জন্য—কিন্তু বিনতা প্রতিবারই স্বামীর মুখের উপর নির্ব্বাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে আড়াল ক'রে নিয়েছে। দুঃখে অপমানে আর একটা নিদারুণ গ্লানিতে তখন সারামন ছেয়ে গেছে অশোকের।

কিন্তু এই অসহনীয়তাকে মনের মধ্যে সহ্য করে নিয়ে শান্ত মনেই বাইরের কর্ম্মপ্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হয় অশোককে। নিজের মনের অশান্তি বাইরের কোন কাজে ফুটে উঠ্‌লে চলবে কেন তা'র! বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সে—ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে দেশ আর জাতি গড়ে-তোলার দায়িত্ব আছে তার।

আট বছর আগে অশোক বিয়ে ক'রেছে বিনতাকে। বছর চার পাঁচেকের একটী মাত্র বুক-জোড়া ছেলে অলোক। ছোট্ট সংসার। সেই ছোট্ট সংসারের ভেতরের এবং বাইরের সব কাজেই নিপুণতার ছোঁয়া থাকে বিনতার। কিন্তু অশোকের কাছে সে-কাজগুলো সবই মেসিন থেকে বেরিয়ে আসার মত মনে হয়। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও অশোক যেন ঐ কাজের মধ্যে বিনতার মনের এতটুকু ছোঁয়া পায় না। অথচ বিনতার মনের জন্যই তৃষ্ণার্ত্ত অশোক—তার কাজের জন্য নয়। কাজ সে পেতে পারে টাকার বিনিময়ে।

মফঃস্বল কলেজের ছাত্রী বিনতা। কো-এডুকেশন কলেজ। যে কয়েকটী মেয়ে পড়ত, তা'দের নাম-ঠিকানা থাকত ছেলেদের মুখস্ত। মেয়েরাও সে-খবর রাখত। কলেজের এই মেয়েরা যখন রাস্তায় বেরোত, আধুনিক ইউরোপীয় প্রগতির একটা উৎসারিত বন্যায় যেন সারা পথ হঠাৎ প্লাবিত হ'য়ে যেত।

বিনতাকে কিন্তু এদের দলে টানা যায় না। বইয়ের প্রতি ছিল তা'র একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, পরোপকারের ব্রত উদ্‌যাপনও এই সঙ্গে চলত। সে বছরে বর্ষাটা বেশ জাঁকিয়ে এলো। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলো তো একেই বিলের মধ্যে, তরে উপর প্রবল বর্ষা! যা'দের বাড়ী বেশ উঁচুতে, জল এসে দাঁড়িয়েছিল তা'দেরও ঘরের কোণে কোণে। সহরের আশেপাশের জলে-ডোবা গ্রামগুলোর লোকেরা বাড়ীঘর ছেড়ে শুধু প্রাণ নিয়ে চলে এসেছিল এই সহরে। দেখতে দেখতে সহর ভরে গেল লোকে। রাস্তাগুলো হ'য়ে গেল ডাষ্টবিন্, হাওয়ায় মিশে গেল দুর্গন্ধ। বিনতা তখন কিছুতেই পড়াশুনা নিয়ে থাক্‌তে পারল না। মন তা'র কেঁদে উঠ্‌ল বর্ষা-পীড়িতদের জন্য—মানুষের কষ্টের জন্য।

কলেজের অনুমতি নিয়ে ছাত্রেরা এগিয়ে এলো ঐ বিপদে ওদের সাহায্য করতে। বিনতাও হ'ল একজন স্বেচ্ছাসেবিকা। তখন বিনতার বয়েস আর কত—সতের হবে। অথচ এই বয়েসেই ওর মনে নারীজাতির স্বভাব-সুলভ দয়ামায়া যেন সবটুকু জমা হ'য়েছিল।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিক্ষা করে, পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টিভিক্ষা তুলে এবং কোর্ট-কাছারীতে চেয়ে চিন্তে স্বেচ্ছাসেবকেরা যা' যোগাড় করল তা' দিয়ে বিপদে-পড়া লোকদের ওরা চার পাঁচদিন খাইয়েছিল। তারপর জলটা টান্ দিতে জেগে উঠল যা'র যা'র বাড়ীঘর। স্বেচ্ছা-সেবকেরাই তখন ওদের বাড়ীঘর মেরামত করে দিয়ে এলো বাস করার উপযুক্ত করে।

কিন্তু বিপদে-পড়া লোকদের তা'দের বাড়ীতে রেখে এসেই স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেনি, ওদেরকে আরও কিছু সাহায্য যা'তে করা যায় তা'র জন্য ব্যবস্থা করল কলকাতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি ফুটবল দলের

খেলার এবং স্থানীয় সব ক্লাবগুলোর মিলেমিশে থিয়েটার। অভিনয় হ'ল শরৎচন্দ্রের—'দেবদাস'।

অভিনয়ের রাত। লোকে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে প্যাণ্ডেল। সমস্ত শ্রেণীর টিকেট বিক্রি শেষ। তবুও লোক আস্‌ছে—ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে থিয়েটার করছে তা' দেখতে।

অভিনয় হ'ল অপূর্ব এবং রসগ্রহীতার দিক থেকে মানুষের মনে তা' ছাপ রেখে যাবার মতোই। শরৎচন্দ্রের কল্পনার যে নায়ক-নায়িকা তাঁ'র দেবদাস বইখানির পাতার মধ্যে লুকিয়েছিল তা'রা যেন সত্যি সত্যি দেহে প্রাণ নিয়ে বইখানির উপযুক্ত মূল্য দিতে নেমে এসেছিল ঐ রঙ্গমঞ্চে। অভিনয় শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু দর্শকদের কাছে মনে হতে লাগল ওটা যেন অভিনয় নয়—বাস্তব! খাঁটি বাস্তব!!

পার্ব্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বিনতা। দেবদাসের ভূমিকায় নেমেছিল কমল চট্টোপাধ্যায়, আর চন্দ্রমুখী হ'য়েছিল হাস্নুহেনা। ওদের জীবনে এই প্রথম অভিনয় করা—তবুও নিঁখুত অভিনয় ওরা করল নেহাৎ-ই মনের জোরে।—মনের জোরেই ওরা অভিনয়ে নৈপুণ্য দেখাল, দেখাল শিল্পে নিজেদের মৌলিকত্ব।

আজ সে-ক্লাব নেই, আছে ইতিহাস। ছাত্রছাত্রীরা এবং বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যরা কে কোথায় ছড়িয়ে প'ড়েছে সংসারের আবর্ত্তে! কিন্তু সেই সম্মিলিত ক্লাবের অশরীরী অস্তিত্ব, সেই অভিনয়ের কথা আজও লোকের মুখে মুখে। আজও তা'রা মনে করে দেবদাসের মৃত্যুর পূর্ব্বের দৃশ্যটি। দেবদাসের ভূমিকায় কমলের সেই প্রেম-পিপাসায় কাতর কণ্ঠে, কত কষ্টে উচ্চারিত কত করুণ কথা কয়েকটি, "ঐ···ঐ পার্ব্বতী আমায় ডাক্‌ছে দেবদা' বলে! ছেড়ে দে···ছেড়ে দে আমাকে!! আমি যাব পার্ব্বতীর কাছে, আমি তা'কে কথা দিয়েছি। সে যে আমাকে অন্ততঃ একটি দিন সেবা করবে।"

যা'রা অভিনয় দেখেছিল, তা'দের মধ্যে কেউ কেউ এখনও ভুলতে পারেনি পার্ব্বতীর ভূমিকায় বিনতার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস, দেবদাসের মৃতদেহের কাছে গিয়ে বিনতার অভিনয়ের চরম নৈপুণ্য যা' শুধুমাত্র কয়েকটি কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল, "দেবদা! দেবদা··আমার!! তুমি তো শুধু আমার দেবদাই নও—তুমি যে আমার দেবতা।"

দর্শকদের মধ্য থেকে উপঢৌকনের মা[illegible] শুধু [illegible] দিল না।

অভিনয় শেষে দৈনন্দিন জীবনে যেন সেই অভিনয়ের সুরই বাস্তবে রূপ নিল তা'দের দুজনের মধ্যে। কেমন একটা দুরন্ত লজ্জায় বিনতা বহুদিন কমলের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। পথ চলতে দূর থেকে কমলকে দেখ্‌তে পেয়েই ঘুর-পথ ধরে চলে গেছে সে। কিন্তু বিনতা ঘুর-পথে হেঁটে যে কমলকে এড়িয়ে গেছে সেই কমলই আবার বিনতার মনে জেগে উঠেছে তা'র অবসর সময়ে। বিনতার মনে কমলের এই অবস্থিতির কথা অবশ্য কমলও কয়েকদিনের মধ্যেই জান্‌তে পেরেছিল—মন তখন খুশীতে ভরে গিয়েছিল কমলের। কত সম্পদে সে তখন নিজেকে ধনী মনে করেছিল—চোখে ফুটে উঠেছিল বিনতার নূতন রূপ—নূতন চেহারা!

কিন্তু অলক্ষ্যে নিয়তি ঠিক বসে আছে। বনানীতে বসন্ত বারোমাস থাকে না। বিনতার বিয়ে হ'য়ে গেল অশোকের সঙ্গে। ব্যথায় মুচ্‌ড়ে পড়ল কমল। বিয়েটা অভিশাপ বলে মনে হ'ল বিনতার। বিনতাকে বিয়ে ক'রে সুখী হ'তেই চেয়েছিল অশোক, কিন্তু সে সুখ বুঝি অদৃষ্টে ঘট্‌লো না।

অথচ ব্যথা নিয়ে বসে নেই কেউ। দুঃখকে ভুলবার সামগ্রী কমলের আছে। দুঃখকে ভুলবার পথ সে বেছে নিল খুবই তাড়াতাড়ি—কাব্যচর্চ্চা। কলেজে পড়ার সময় কিছু কিছু কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল কমলের। সে ছিল কলেজ ম্যাগাজীনের সম্পাদক। প্রত্যেক সংখ্যাতে তা'র লেখা যে কবিতা বেরিয়েছে তা সত্যিই কবিতা, অধ্যাপকেরাও সুখ্যাতি করেছে তা'র কাব্য-প্রতিভার। দুঃখের আঘাতে আজ তা'র মন ভরপুর। সে-বোঝা থেকে নিজের মনকে ভারমুক্ত না করলেই যে নয়, তাই আবার নূতন ক'রে তা'র কাব্য সাধনা—নিজের মানসিক রোগে নূতন ওষুধ। দুঃখই যে কবিতার স্পর্শমণি।

অশোক কবি নয়, সাহিত্যিকও নয়। সে দার্শনিক। মাত্র বাইশ বছর বয়েসে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হ'য়েছে সে। সেই বছরেই বিয়ে করে বিনতাকে। চোখে তখন অশোকের রঙিন নেশা। তখন বিনতার এতটুকু ছোঁয়া পেতে তার সারা দেহ সজাগ হ'য়ে থাকত, তার

মন বিনতার এক ঝলক হাসির জন্য বরণডালা নিয়ে এগিয়ে থাকত। কিন্তু সে-বরণডালার পঞ্চপ্রদীপের আলোতে বিনতার মুখের কালিমা এতটুকু দূর হয়নি—এতটুকু হাসি ফোটেনি।

প্রথম প্রথম অশোক ভেবেছিল, ওটা হয়তো বিনতার লজ্জা; কিছুদিন গেলেই লজ্জার আবরণ দূরে চলে যাবে। কিন্তু দিন যতোই যেতে লাগল ততোই দেখা গেল দার্শনিকেরই হিসাবের ভুল, মনস্তাত্ত্বিক সে নয়।

দার্শনিক হ'লেও অশোক মানুষ। মানুষের মতো আশা আকাঙ্ক্ষা তা'র ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সে-আশায় আঘাত পেয়ে পেয়ে অশোকের জীবনে স্বামী-অশোকের হ'য়ে গেছে মৃত্যু, আর দার্শনিক-অশোক তখন বেঁচে থাকতে চাইল পাকা ডুবুরী হ'য়ে দর্শন সমুদ্রে।

পূজাসংখ্যা একই ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ বেরোল অশোকের এবং কবিতা বেরোল কমলের। অশোকের প্রবন্ধ 'পুরুষের জীবনে নারী' আর কমলের কবিতা 'অশ্রু যেন ঝরে'। বিনতার চোখে কোনটাই বাদ গেল না। ওদের দু'জনার লেখা যে বিনতাকেই কেন্দ্র করে সেটুকু বুঝতেও দেরী হ'ল না বিনতার। কবিতার মারফতে কমল হাজার হাজার পাঠকপাঠিকাকে সাক্ষী রেখে অনুরোধ ক'রেছে তা'কে—"বারেক আসিও মম সমাধি উপরে, মোরে স্মরি এক ফোঁটা অশ্রু যেন ঝরে"।

প্রতি-উত্তর দেবার জন্য বিনতা ব্যাকুল হ'য়ে উঠল কিন্তু কোন্ ভাষায়? প্রতি-উত্তর যে না দিলেই নয়। ছোট বয়েসে বিনতা ছবি আঁকতে পারত। বিনতা ঠিক করল, কমলের একখানি ছবি এঁকে সে পাঠিয়ে দেবে কমলকে। সে-ছবিখানি হবে নিখুঁত, কাছে বসে চোখে দেখে আঁকা ছবির মতোই। কবি কমল কি তাতেও বুঝতে পারবে না যে, বিনতা দূরে থেকেও তা'কে ঠিক দেখছে—দেখছে অবিকল বাইরের চোখে শুধু নয়—মনের চোখ দিয়েও।

একমনে বসে কমলের ছবিখানি আঁকছিল বিনতা।

দুপুর বেলা।

বাসায় ফিরে আসার অনেক আগেই আজ অশোক ফিরল। শরীরটা তার ভালো নয়। তার আগমনবার্ত্তা জানতেও পারেনি বিনতা। হঠাৎ অশোকের কি খেয়াল হ'ল চোরের মতো চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকতে। জুতোর নীচে ক্রেপ্ লাগান—শব্দ হয় না একটুও। বিনতা মেঝেতে বসে একমনেই আঁকছিল ছবি? অশোক যে পেছন থেকে তা'র ছবি আঁকা দেখছে সেদিকে খেয়াল নেই তা'র মোটেই—যেন মহাসাধনায় লিপ্ত।

—তুমি এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পার, তা তো এতদিনে একটীবারও আমাকে বলোনি বিনতা?

—চমকে উঠল বিনতা! ছবি আঁকা কাগজখানি তাড়াতাড়ি মুচ্‌ড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে টান্ হ'য়ে বসল সে। কি বলবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে পেন্‌সিল্‌টাকে কামড়াতে লাগল আস্তে আস্তে। পরে বল্ল, "কি আর এমন আঁক্‌তে পারি যে তোমাকে বলব"।

—বারে! তাজা মানুষকে একেবারে ফাঁকি দিচ্ছ। তা'ছাড়া কিছু দেখে যে আঁকছিলে তাও নয়।—বোধহয় নিজের মন থেকে তোমার নিজের মনেরই দা'য়ে—ওটা কম কৃতিত্বের কথা নয় বিনতা।

—দুপুর বেলা ঘুমুতে চেষ্টা করেছি ঘুম এলো না। হাতের কাছে কোন ভাল বই-ও পেলাম না যে পড়ব। কি আর তখন করি—পেন্‌সিল্‌টা নিয়ে তাই খানিক হিজিবিজি—

—তাই বটে! আঁকছিলে হিজিবিজি কিন্তু শেষে সেই হিজিবিজি থেকে উঁকি দিয়ে উঠল একটা যুবক। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে আবার বলতে সুরু করল অশোক, "এমনই হয় বিনতা! এটাই প্রকৃতির নিয়ম! মানুষ যা' প্রাণপণে গোপন রাখতে চায় তাই মানুষের অবচেতন মনের দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসে"।

—কি যে হেঁয়ালীতে কথা বল তুমি! তোমাদের দার্শনিকদের ঐ বড় দোষ। সোজাভাবে কোনদিন কোন কথা বলতে চাও না। তা যাক্। তুমি আজ এত সকাল সকাল চলে এলে কেন?—শরীর খারাপ করেনি তো?

—সকাল সকাল চলে এসেছি বলেই তো তোমার আর একটা গুণের পরিচয় পেলাম, আর পেলাম আমার এতদিনের জিজ্ঞাসার উত্তর।—বলেই হেসে ফেলল অশোক। মুখের হাসিটা শেষে চোখে নিয়ে আবার সুরু করল বলতে, "এতে তোমার লজ্জারই বা কি আছে? বিংশ শতাব্দীর মেয়ে, কলেজে পড়েছো—ছেলেদের সঙ্গে মিশে

থিয়েটারও করেছো।—সে-দীর্ঘদিনের মেলামেশার একটু ছাপ তোমার মনে থাকবে না এটাই বা কেমন কথা? তুমি তো মানুষ—নারী; পাথর তো নও যে এতটুকু দাগ পড়বে না" ?

* * * * *

বিনতা ভেবেছিল এই নিয়ে হয়তো অশোক মাঝে মাঝে তাকে বাঁকা কথা শোনাবে। এখন মনে করে, শোনানোই ভাল ছিল। কিন্তু অশোক সে-পথে হাঁটেনি। দিনের পরে দিন বছরের পর বছর চলে গেল, তবুও অশোক কমলের ঐ ছবির কথা আর কোনদিন তোলেনি। ও-সব নিয়ে ভাববার অবসর অশোকের কোথায়? বিনতাকে না পেয়ে সে মন দিয়েছে অধ্যাপনায়। ছাত্রের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী পড়ে সে। ফলও পেয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হ'য়েছে। 'ভারতীয় দর্শন' সম্বন্ধে থিসিস্ লিখে ডক্টরেট্ পেয়েছে কয়েকমাস আগে। নাম ছড়িয়ে পড়েছে অশোকের চারদিকে—ছাত্রদের মুখে মুখে তার অধ্যাপনা আর পাণ্ডিত্যের জয় গান। লোক আস্‌ছেই তা'র কাছে। লোক আস্‌ছে তাকে বিভিন্ন সভায় বেদান্ত ও উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ জানাতে। ছাত্রেরা সব সময়ই ঘিরে থাকতে চায় তা'কে, পেতে চায় তা'র পবিত্র সান্নিধ্য। তারা কামনা করে অশোকের দীর্ঘজীবন।

দেয়ালে অশোকের ফোটোর কাছে টানানো আছে অশোকের মানপত্রগুলো। অলোক পড়ে ঐ মানপত্র। অলোক শুধু পড়েই অর্থ বুঝ্‌তে পারে না, সব অর্থ বুঝিয়ে দেয় বিনতা। আনন্দে কানায় কানায় ভরে ওঠে অলোক, তাকায় একবার অশোকের ফোটোর দিকে, আবার তাকায় বিনতার মুখের পানে।

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে বিনতার অলোকের ঐ তাকান দেখে। জিজ্ঞেস্ করে বিনতা, "তুই অমন করে কি দেখ্‌ছিস্ খোকা?"

—দেখ্‌ছি?—হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেয় অলোক।—আমি বাবার মতো বড় হব মা।—আমাকে তুমি বাবার মতো বড় ক'রে দেবেজে?

হাস্‌ল বিনতাও। তাড়াতাড়ি অলোককে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চুমু খেল তা'র মুখে। বল্ল, হ্যাঁ বাবা! নিশ্চয়ই বড় হবে। বাবার মতোই নাম করবে তুমি।

ছেলেকে মানুষ করে মা। কিন্তু অলোককে তা'র বাবার মতো ক'রে গড়বে কে? গড়া তো উচিত বিনতার। এ দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য তো তা'রই। কথাটা ভাবিয়ে তোলে বিনতাকে। শুধু ভাবিয়ে তোলাই নয়, প্রায় পাগল ক'রে দেয় তা'কে। কত এলোমেলো কথা, কত সামঞ্জস্যহীন ভাবনা-ধারা এবং বিগত জীবনের কত ছবি ভেসে উঠল তখন তা'র মনে। বিনতা জোরে সরিয়ে দিল সেই ভাবনার রাশিকে। অলোকের বড় হওয়ার আশা যেন একেবারে মুছে দিল বিনতার বিগত জীবনকে। হঠাৎ চোখের সাম্‌নে উঁকি দিতে চাইল কমল। সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে একবার চীৎকার ক'রে উঠল বিনতা: তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক, যদি কখনও আমার শুভ কামনা করে থাক, তবে দোহাই কমলদা! তুমি ভুলে যাও আমাকে। আমার ব্যর্থ নারীজীবনকে মাতৃত্বের মহান আসনে বসিয়ে সার্থক করে তুলতে দাও—আমাকে সত্যিকারের মা হ'তে দাও।

পরক্ষণেই বিনতা আবার প্রশ্ন করে নিজেকে, যে স্ত্রী তা'র স্বামীকে নিজের মনের মন্দিরে বসাতে পারেনি তা'র ছেলে কি কখনও মানুষ হয়? স্বামীকে ফাঁকি দিলে ছেলেও কি মাকে ফাঁকি দেবে না?

উত্তরে বিনতার চোখের সাম্‌নে ভেসে আসে অশোক। চম্‌কে উঠ্‌ল বিনতা। লজ্জায়, আর অন্তর পুরুষের অভিঘাতে নিজের মধ্যে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল সে।

দেয়ালে অশোকের ফোটোর নীচে টানানো মানপত্রগুলি বিনতা প্রায়ই এসে ঘুরে ফিরে পড়ে। পড়ে: "তোমার জীবন শুধু তোমারই জীবন নয়, উহা আমাদের দেশের জীবন, দশের জীবন। তুমি সুস্থ দেহে, পরমশান্তিতে দীর্ঘজীবন লাভ কর—দেশ উপকৃত হ'ক। সোনার জলে লেখা মানপত্রে ঐ বাছা বাছা ভারী ভারী কথাগুলো যেন রক্তচক্ষু করে কৈফিয়ৎ চায় বিনতার—দেশের জন্য যা'র দীর্ঘজীবন দরকার, দেশের উন্নতির জন্য যা'র মনে পরম শান্তি দরকার সে-শান্তি কি অশোকের আছে?

উত্তর দিতে অক্ষমা বিনতা মানপত্রের উপর থেকে নিজের চোখ দু'টীকে তুলে ধরে অশোকের ফোটোর দিকে,

তাকিয়ে থাকে অপরাধীর দৃষ্টি নিয়ে। ছোট করে বলে, “না, সে-শাস্তি তোমার মনে নেই। আমিই দিইনি তোমাকে সে-শাস্তি। আমিই বঞ্চিত করেছি তোমার হৃদয়কে। অপরাধিনী আমি। আমার সে-অপরাধ শুধু তোমার কাছেই নয়, সারা দেশের কাছে। এত বড় অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি তুমি আমাকে দাও, কিন্তু তুমি ক্ষমা ক’র না। তোমার ক্ষমা সইবার ক্ষমতা আমার নেই।”

কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিনতা তা’র চোখদুটী মোছে। জোর করে মনে জোর এনে আবার বলতে সুরু করে, “অন্য স্বামী হ’লে কত কেলেঙ্কারীই না জানি করতো ঐ ছবি নিয়ে। ঐ ছবি জোর ক’রে ছিনিয়ে নিত নিশ্চয়ই। কিন্তু কি অদ্ভুত লোক তুমি! তা’ও ক’রলে না। তুমি দোষ চাপালে যুগের আবহাওয়ার উপর। তা’ ছাড়া কি অভাবনীয় যুক্তি তোমার! আমার কুমারী জীবন নাকি তোমার দেখ্‌বার নয়—বিচার্য্যও নয়” !!

বিনতা আরও এগিয়ে যায় দেয়ালের কাছে অশোকের ফোটোর ঠিক পায়ের নীচে। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে অশোকের ফোটোতে। পেছন দিক দিয়ে তখন ঘরে ঢুক্‌ছে অশোক, হাতে এক ব্যাগ বই। হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস্ করে অশোক, “আজ আবার তুমি প্রণাম করছ কা’কে বিনতা?”

বিনতা অবাক। পেছনে তাকিয়ে দেখে—অশোক। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আরক্তিম হ’য়ে উঠল তার মুখখানি।

বিনতার ইচ্ছা হচ্ছিল দীপ্ত গলায় বলেঃ সে প্রণাম করছিল তা’র জীবন-দেবতাকে। তা’র সারা দেহও ঐ কথাটী বলতে উন্মুখ হ’য়েছিল, কিন্তু শত চেষ্টা ক’রেও সেটুকু সে মুখে আনতে পারল না।—লজ্জা এসে বাধা দিল তাকে। নূতন চেহারা তখন ফুটে উঠল তা’র। মুখে চাপা হাসি, হরিণ চোখে কি মধুর চঞ্চলতা—কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে অশোককে নিয়ে যাবার স্বচ্ছ আহ্বান।

অশোকের কাছে হাসি মুখেই এগিয়ে গেল বিনতা। তাড়াতাড়ি তা’র হাত থেকে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে রেখে দিল পড়ার টেবিলে। নিজের হাতেই খুলে দিল অশোকের জুতোর ফিতা।

অশোকের চোখে বিনতার এই ভাব, এই হাসিভরা মুখ, চোখের এমন মায়ামাখা চাহনী—সবই যেন কেমন লাগ্‌ছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন বিনতার এই হাসিতে অশোকের মনে অশোককুঞ্জ ফুটে উঠতো, বিনতার একটু চোখের ইঙ্গিতে তার ভরা মনে বিদ্যুৎ খেলে যেতো, কিন্তু আজ অশোক সে প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে। সংসারে সে এখন আশাবাদী নয়, নয় দুঃখবাদী। সাংসারিক সুধা এবং বিষ এক চুমুকে পান ক’রে নূতন এক আদর্শে রচনা ক’রেছে তা’র নিজের জীবন-দর্শন। তবুও অশোক কাছে ডাকল বিনতাকে। পড়ল বিনতার নীরবতায় আচ্ছন্ন ক্ষমা চাওয়ার ভাষা। ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি অশোক। সাদরে বিনতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্ল, “তোমাকে আমি কত ভালবাসি বিনতা! কোন অপরাধই কি আমার এ ভালবাসার কাছে ক্ষমা না পেয়ে পারে?

উত্তরে কিন্তু বিনতার মুখে আর একটি কথাও প্রকাশ পেল না। তা’র সারা মুখখানি তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছেয়ে গেছে।

সে যদি আসিত আজ

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

সে যদি আসিত আজ এই রাতে ছায়ার মতন,
হঠাৎ কম্পিত-পদে ঝিঁঝি ডাকা মোর আঙিনায়;
দুরু দুরু ভীরু বুকে যদি সে দাঁড়ায়ে বাতায়নে
ডাকিত আমার নামে মৃদুসুরে শঙ্কিত গলায়।
প্রদীপ জ্বালায়ে ঘরে দ্বার খুলি তার মুখ চেয়ে
অপলক চেয়ে রই, চেয়ে রই, শুধু চেয়ে রই,
ভাষা নাই কারও মুখে, হঠাৎ সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে,
বুকে মোর ভীরু মুখে, মূক মুখে, সে অবুঝ মেয়ে।

সে যদি আসিত আজ, ঘুম ভাঙা এই আধ রাতে,
হঠাৎ আলোর রেখা ঘন আঁধারের বুক চিরে,
কেঁদে কেঁদে ভেঙে পড়ে যতবার ডাকি নাম ধরে
অনেক দিনের ব্যথা চোখ দিয়ে পড়ে ঝরি ঝরি।

প্রতিভা-পরিচিতি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'বহুমুখী প্রতিভা' কথাটি আমরা একাধিক মনীষীদের প্রতি প্রযুক্ত হ'তে শুনেছি, জীবনের নানাক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় লাভ ক'রে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাপ্লুত হয়েছি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁর প্রতিভা বহুমুখিতায় আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী......কর্ম্মনৈপুণ্যে, জ্ঞানে গুণে এবং বহু বিষয়ে

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান ক'রে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি পৃথিবীর "বিস্ময়কর মানব" বলে অভিহিত হয়েছেন।

বিজ্ঞান ও শিল্পের নানাক্ষেত্রে অপরিসীম তাঁর দান। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর জোড়া ছিল না বললেই হয়। নক্সা-অঙ্কন শিল্পেও তিনি তখনকার দিনের সবচেয়ে দক্ষ কারিগররূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ভাস্কর, স্থপতি, যন্ত্রশিল্পী, পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রথম পথিকৃত—এতগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্ব্বজন-স্বীকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করতে একমাত্র দা ভিঞ্চি ছাড়া অন্য কারুর নাম ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

* * *

"ইতালীয় পুনরভ্যুত্থানের" উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালে ভিঞ্চি নামক পার্ব্বত্য নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অ্যান্টনিও দা ভিঞ্চির এক রক্ষিতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর শৈশবকালেই তাঁর মা তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যান। শিশুকাল থেকে বালক দা ভিঞ্চি পিতার সদাসতর্ক প্রহরায় মানুষ হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি লেখাপড়ায় বিস্ময়জনক মেধার পরিচয় দেন। অতি অল্পবয়সেই গণিতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে শিক্ষকগণ চমৎকৃত হন। সেই সঙ্গে তিনি বাঁশী বাজাতেও শিখেছিলেন চমৎকার। বাঁশীতে গৎ এবং সুর নিজেই যোজনা করতেন। বাঁশী বাজানোর প্রতিযোগিতায় অনেক বড় ওস্তাদও তাঁর কাছে হার মেনেছিল। বাঁশীর চেয়েও ভালবাসতেন ছবি আর নক্সা। রং আর তুলি নিয়ে স্নানাহার ভুলে যেতেন। দিনের পর দিন বিবিধ রকমের ছবি আর নক্সা আঁকতেন এবং ছাঁচ গড়তেন।

নানা বিষয়ে বালকের অনন্যসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখে তাঁর বাবা তখনকারদিনের বিখ্যাত শিল্পী ভেরোশিওর হাতে তাঁর শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন। অল্পদিনেই দা ভিঞ্চি চিত্রশিল্পীরূপে দেশজোড়া নৈপুণ্য এবং খ্যাতিলাভ করলেন। প্রথম জীবনে আঁকা তাঁর প্রায় সব ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে!

* * *

নিত্য-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা শুধুমাত্র চিত্রাঙ্কন-শিল্পেই আবদ্ধ রইল না। অদম্য তাঁর জ্ঞানপিপাসা। সারা পৃথিবীর জ্ঞানসমুদ্র তিনি যেন আকণ্ঠ পান করতে চান। ছবির মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলো-ছায়ার সমন্বয় ঘটাবার কৌশল জানবার জন্যে দা ভিঞ্চি আলোক-বিজ্ঞান রপ্ত করলেন। তত্ত্বানুসন্ধানের শেষ নেই। চিত্র এবং ভাস্কর্য্য-শিল্পের মধ্যে উন্নতিসাধনের জন্যে তিনি শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান, শারীর

বিজ্ঞান এর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অতি অল্প লোকেই এ-সব বিজ্ঞানের চর্চ্চা করত। একটি মানুষ এতগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শিক্ষকদের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করছেন—এতথ্য সত্যিই যেন গল্পকথা বলে মনে হয়। একটি নোট-বইতে তিনি তাঁর অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন অনুসন্ধানী মনের গবেষণামূলক বক্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই নোট-বই অনেকদিন পর্য্যন্ত অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই খাতার উদ্ধার সাধন করা হয় এবং দেখা যায় আজকের বিজ্ঞানের অনেক কথা তিন চার শ' বছর আগেই দা ভিঞ্চি বলে গিয়েছেন।

* * *

১৪৮২ সালে দা ভিঞ্চি মিলান-এ গমন করেন এবং সেখানকার অধিপতি লুডোভিকো সফোর্জার কাছে কাজে নিযুক্ত হয়ে সেই দেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। প্রথমেই সামরিক বিজ্ঞানে তিনি ন'টি নূতন এবং মৌলিক পরিকল্পনা সংযোজিত করে লুডোভিকোর সমর বিভাগকে নূতন করে সজ্জিত করেন। লুডোভিকোর দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনটি তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট হল। সকল সভা-সমিতিতে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে লাগলেন। রাজসভার সকল অনুষ্ঠান তাঁর নির্দ্দেশমত পরিচালিত হতে লাগল। সেই সব অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি নাটক, উপাখ্যান, গান এবং রূপক-কাব্য রচনা করতে লাগলেন। মিলান-এ দা ভিঞ্চির প্রতিপত্তি আর জনপ্রিয়তার অবধি রইল না।

১৪৮৫ সালে ভয়ঙ্কর প্লেগে মিলান যখন উজাড় হল, তখন বহু বিনিদ্র রজনীর নিরলস সাধনায় তিনি সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা-মণ্ডিত নগর-স্বাস্থ্যসংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত এক বিরাট নকসা প্রণয়ন করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে মিলান সহর নূতন ক'রে গড়া হল। একটা গোটা জনপদকে নূতন ভাবে নূতন পদ্ধতিতে পুনর্নির্ম্মাণের দুরূহ কাজের ফাঁকেও নূতন নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করবার সময় পেয়েছিলেন তিনি। মিলানে বসে দা ভিঞ্চি জ্যামিতি, জ্যোতি-বিজ্ঞান, স্থিতি-বিজ্ঞান এবং গতি-বিজ্ঞানের যে-গবেষণা করেছিলেন তার যথার্থ মূল্য আজ নিরূপিত হয়েছে।

১৪৯৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি নানাভাবে শিল্প ও বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব্ব মননশীলতাকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ১৪৯৪ সালে সমগ্র লম্বার্ড্ উপত্যকায় কৃষিকার্য্য, জলসেচন ও জল-সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে তিনি যে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, তার নিখুঁত পদ্ধতি আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিককেও রীতিমত বিস্মিত করে দিয়েছে। ঐ বছর তিনি জড় ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছবি আঁকার কাজেও সমানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে একটি ম্যাডোনার ছবি শেষ হয়েছিল। ঐ বছরেই তিনি তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি "The last supper" (শেষ-ভোজ) আঁকা শুরু করেন। এক কনভেণ্ট এর দেওয়ালে ছবিটি আঁকা হয়। কালের কবলে পতিত হয়ে চিত্রখানি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। ক্যাভেলিয়র ক্যাভেনাগি নামক এক শিল্পী বহু যত্নে ছবিখানির ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানগুলি সংশোধন করেন। লাষ্ট্ সাপার-কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রগুলির মধ্যে গণ্য করা হয়।

* * *

১৫০০ সালে দা ভিঞ্চি নিজের বাসভূমি ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। নূতন বিদ্যা শেখবার সখ হল তাঁর। ভূগোল-পাঠে নিমগ্ন হলেন। সেই সঙ্গে চলল পূর্ত্ত-বিদ্যার চর্চ্চা। ১৫০২ সালে সীজর বোর্জ্জিয়ার কাছে কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই রাজ্যের প্রধান পূর্ত্ত-বিদরূপে মধ্য-ইতালী পরিভ্রমণ ক'রে যে ছ'খানি বিরাট মানচিত্র প্রস্তুত করেন, সেগুলি উইণ্ডসর প্রাসাদে রক্ষিত আছে। সেই মানচিত্রগুলি কার্টোগ্রাফীর (মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা) উৎকৃষ্টতম নিদর্শনরূপে আজো স্বীকৃত।

তারপর ভূগোল তাঁকে অধিকার করল। স্নানাহার ভুলে, রং আর তুলির কথা বিস্মৃত হ'য়ে পড়তে লাগলেন ভূগোলের বই। যেখানে যত বই ছিল, যত মানচিত্র ছিল, সব শেষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখাও চলল অবিরাম। কৃষ্ণসাগর এবং ক্যাসপিয়ন সাগরের প্রবাহ আর জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করলেন। দেশের মধ্যে খাল কেটে কেমন ক'রে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করা যায় সে-সম্বন্ধে বহু তথ্য-সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। আরও নানা বিষয়ে নানা লেখা লিখলেন। দুকূল প্লাবিত ক'রে প্রবল

জলস্রোত যেমন সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে তেমনি ধাবিত হয়েছিল তাঁর বিরাট প্রতিভা নিত্য নব জ্ঞানের অন্বেষণে, বৃহত্তর জীবনের পথে।

সেই সময়, তাঁর দেশে তাঁর সমসাময়িক আর একজন প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন। তাঁর নাম মিকালেঞ্জেলো। তাঁর সঙ্গে দা ভিঞ্চির বনিবনা ছিল না। মিকালেঞ্জেলোর স্বভাব ছিল উগ্র। ভাষা ছিল কটু। সুযোগ পেলেই তিনি দা ভিঞ্চিকে উপহাসের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন। কিন্তু সে-সব কথায় কান দেবার সময় কোথায় দা ভিঞ্চির? নূতন নূতন বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জনের সাধনায় তিনি যেন ডুবে আছেন অতল সমুদ্রের গর্ভে, সংসারের কল-কোলাহল থেকে অনেক দূরে।

* * *

মোনা লিসা

কিছুদিন পরে ফ্লোরেন্সের এক গির্জ্জার দেওয়াল এবং বেদী চিত্রিত করবার কাজ পেলেন তিনি। ফিলিপিনো শিল্পী নামে অন্য এক শিল্পীকে সেই কাজ দেওয়া হোয়েছিল, কিন্তু দা ভিঞ্চি সে-কাজের ভার নিতে সম্মত আছেন জেনে ফিলিপিনো সানন্দে সরে দাঁড়ালেন।

গির্জ্জার দেওয়ালে দা ভিঞ্চি এক ম্যাডোনার ছবি আঁকলেন। শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে। অপূর্ব সেই মাতৃমুখের অভিব্যঞ্জনা। কিন্তু সে ছবি শেষ হয়নি। সে কাজ সম্পূর্ণ না করেই তিনি তাঁর আর-একখানি অসমাপ্ত ছবি শেষ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মনের মধ্যে যখন যে প্রেরণা আসতো দা ভিঞ্চি তার আহ্বানে সাড়া দিতেন জগৎ-সংসার ভুলে গিয়ে, বিস্মৃত হতেন অন্য সব দায়িত্ব, অন্য সকল কাজের তাগিদ। এই ছিল তাঁর চিরদিনের স্বভাব। গির্জ্জার কর্তৃপক্ষ হতাশ এবং অনন্যোপায় হ'য়ে আবার ফিলিপিনোকেই ডেকে এনে কাজে লাগালেন।

যে-ছবি শেষ করবার প্রেরণায় দা ভিঞ্চি গির্জ্জার কাজ ছেড়ে চলে আসেন, সে-ছবির নাম "মোনা লিসা।" ১৫০৬ সালে তিনি সেই চিত্রের অঙ্কনকার্য্য সমাপ্ত করেন। এই অতি-বিখ্যাত চিত্রটি পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য। এই ছবিতে আঁকা সুন্দরী রমণীর বাঁকা ঠোঁটের দুজ্ঞেয় হাসির অভিব্যক্তি যুগে যুগে চিত্র-সমালোচক ও চিত্র-রসিকদের বিভ্রান্ত করেছে, সেই হাসির অর্থ নিরূপণ করেছেন নানা সমঝদার নানাভাবে। এই চিত্র নিয়ে যত আলোচনা আর গবেষণা হয়েছে তেমন আর কোন ছবি নিয়েই হয়নি আজো পর্য্যন্ত। কথিত আছে, এই ছবির মডেল বা নায়িকা ছিলেন মাদাম লিসা নামে অপরূপ
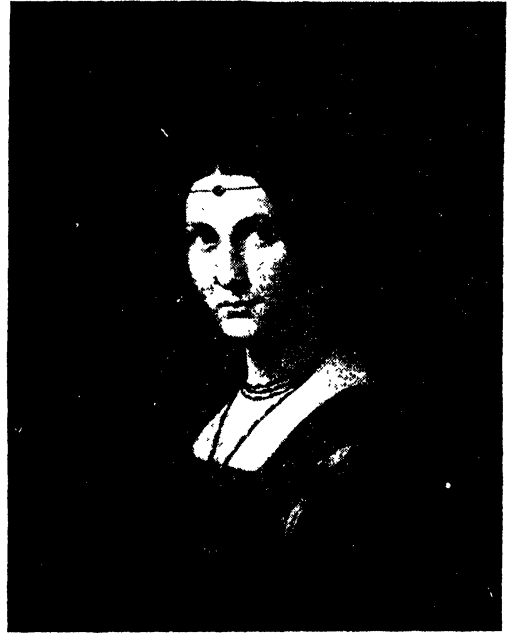
লা বেলি ফেরোনিয়ার

রূপবতী এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহিণী। তাঁর স্বামী ফ্রানসেস্‌কো দেল্ গিওকন্ডো চামড়ার ব্যবসায়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। মাদাম লিসা একাকিনী দা ভিঞ্চির স্টুডিয়োয় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সামনে বসে থাকতেন আর শিল্পী তন্ময় চিত্তে তাঁর সেই অপরূপ মুখচ্ছবি রেখায় রেখায় ক্যানভাসের উপর ফুটিয়ে তুলতেন।

* * *

"মোনা লিসা" শেষ করবার পর দা ভিঞ্চি দেশের নানা ধর্ম্ম-মন্দিরের দেওয়ালে নানা ছবি এঁকেছিলেন। সেগুলিও তাঁর প্রতিভার উৎকৃষ্ট স্বাক্ষর রূপে পরিগণিত। তাঁর আর-একটি বিখ্যাত প্রাচীর-চিত্রের নাম **Virgin of the Rocks.**

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন ফরাসী দেশে। প্রথম ফ্রান্সিসের অনুরোধে তিনি ১৫১২ সালে ফরাসী রাজসভার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ক্লাউ নগরের এক দুর্গ-সদৃশ প্রাসাদে অবসর-জীবন যাপন করেন। ১৫১৯ সালের মে মাসে সেইখানেই তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত জীবনে দা ভিঞ্চি যে-কাজে হাত দিয়েছেন সেই কাজই সোনার মত দামী হয়ে উঠেছে। মাতৃভাষায় যে গদ্য তিনি প্রবর্ত্তন করে গেছেন তার মূল্য কম নয়। চমৎকার লিখতে পারতেন তিনি। ভাষার উপর অসাধারণ দখল ছিল তাঁর। তাঁর সময়কালে বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীতে আর-কেউ ছিল না। শিল্পীরূপে মিকালেঞ্জেলো প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমান ছিলেন তিনি।—অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে অনেক বড়। এরোপ্লেন আবিষ্কারের বহু বছর আগেই তিনি উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরী করেছিলেন। জলস্থিতি বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন তিনিই করে গেছেন। Camera Obscura-র উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। আবার এদিকে দর্শন-শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি সামান্য ছিল না।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন, যাকে বলে, আদর্শ পুরুষ। অ্যাপোলোর সুন্দর চেহারা। সুগঠিত দেহের মাংসপেশীতে অমিত বল। প্রিয়ভাষী, বন্ধুবৎসল, উপচীকীর্ষু এবং দয়াশীল। জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না তাঁর। বন্ধু সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথাটি ইংরাজীতে ভারী সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে—"There can be only one summary of Leonardo Da Vinci, that almost perfect example of the civilized mind wedded to a healthy body: He was the Complete Man."

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

প্রকৃতি

দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য জগতের ব্যাখ্যা করা। ত্রিবিধ প্রমাণের বর্ণনা করিয়া সাংখ্য জগতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাংখ্য মতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে প্রকৃতি হইতে। প্রকৃতি অথবা ইংরেজি Nature শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সাংখ্যের প্রকৃতি তাহা নহে। এই প্রকৃতি কি?

সাংখ্যদর্শনের মতে জগৎ কেহ সৃষ্টি করে নাই; জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে এক অব্যক্ত উৎস হইতে। সেই উৎসের নাম প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত নহে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত নহে, তাহাই অব্যক্ত। প্রকাশিত না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অনুমান-গম্য। প্রকৃতি শব্দের অর্থ যাহা বিশিষ্ট প্রকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। ("প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ"—বাচস্পতি। প্রকার-বিশেষেণ পরিণমতে ইত্যর্থঃ-ন্যায়পঞ্চানন।) জগৎ-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া জগতের উৎসের নাম প্রকৃতি। প্রধান শব্দের অর্থ যাহা কর্ত্তৃক জগৎ যথাযথ স্থাপিত হয়। ("প্রকর্ষেণ ধীয়তে, যথাযথং স্থাপ্যতে ইতি যাবৎ জগৎ অনেন ইতি ব্যুৎপত্তিঃ" —ন্যায়পঞ্চানন।) এই প্রকৃতি অন্য কিছুর কার্য্য নহে, ইহার কোনও কারণ নাই, কোনও মূল নাই, ইহা অমূল। "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং"—সাংখ্য সূত্র ১।৬৭। ইহা নিত্য স্বয়ম্ভু (causa sui)—নিজেই নিজের কারণ, অনাদি। এই জন্য ইহাকে মূল প্রকৃতি বলে। অব্যক্ত হইলেও ইহার অস্তিত্ব যে আছে, যুক্তি দ্বারা তাহা জানা যায়। অতি দূরে বা অতি নিকটে অবস্থিত ও অতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। কোনও বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে দৃষ্টির ব্যাঘাতক কিছু যদি থাকে (যেমন প্রাচীরাদি) তাহা হইলে সে বস্তুও দর্শনগোচর হয়-না। ইন্দ্রিয় বিকলতা ও অন্যমনস্কতাবশতঃ বস্তুর জ্ঞান হয় না। যখন এক বস্তু কর্ত্তৃক অন্য বস্তু অভিভূত হয় (যেমন তারকাদিগের জ্যোতিঃ সূর্য্য কিরণ কর্ত্তৃক অভিভূত হয়) তখনও অভিভূত বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আবার সমানাভিহার হইলে, অর্থাৎ একপ্রকার বহু বস্তু একত্র মিশ্রিত হইলে, জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়; কেননা এইরূপ মিশ্রিত দ্রব্যদিগের মধ্যে কোনও একটিকে ধরিতে পারা যায় না।

অতি দূরাৎ, সামীপ্যাৎ, ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ, মনোঽনবস্থানাৎ,
সৌক্ষ্ম্যাৎ, ব্যবধানাৎ, অভিভবাৎ সমানাভিহারাৎ চ॥

সৌক্ষ্মাৎ তদনুপলব্ধিঃ না ভাবাৎ, কার্য্যতঃ তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ॥

সাংকা ৭-৮

প্রকৃতি অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নহে। তাহার কার্য্য হইতে তাহার উপলব্ধি হয়। মহৎ প্রভৃতি (পরে ব্যাখ্যাত প্রকৃতিরই কার্য্য। তাহারা প্রকৃতির সরূপও বটে, বিরূপও বটে।

নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা সাংখ্য প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন (১) এই জগৎ কার্য্য (অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্ভূত)। কার্য্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে থাকে। সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল। জগৎ যদি সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহার উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। কেননা যাহা নাই, তাহা অসৎ। অসৎ জগৎকে 'সৎ' করা, অর্থাৎ তাহাকে অস্তিত্ব দান করা সম্ভবপর হইত না। জগতের সূক্ষ্ম কারণই প্রকৃতি।

(২) উপাদান ব্যতীত কার্য্য হয় না। সৎ উপাদান হইতেই কার্য্য সম্ভবপর। সুতরাং যে উপাদান হইতে জগৎ উদ্ভূত, তাহা জগতের উদ্ভবের পূর্ব্বে ছিল। তাহাই প্রকৃতি।

(৩) যদি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বস্তুর উদ্ভবই সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং জগতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার উদ্ভবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান কোনও বস্তু হইতে। সেই বস্তুই প্রকৃতি।

(৪) যাহা শক্য, তাহার উৎপাদনে যাহা সমর্থ, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়। সুতরাং জগতের উৎপাদনে যাহা সমর্থ ছিল, তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতিই জগৎ উৎপাদনে সমর্থ বস্তু।

(৫) কার্য্যের স্বরূপ কারণ হইতে অভিন্ন। জগৎ-রূপ কার্য্য সৎ, তাহার কারণ প্রকৃতিও সৎ।

(৬) ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ,
কারণ-কার্য্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য।

জগতে বহু বস্তু আছে। তাহারা ভেদযুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন। এই সকল বিভিন্ন বস্তু পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ! এই সকল পরিমিত বস্তু এক অপরিমিত কারণ হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে। সেই কারণই প্রকৃতি। আবার জাগতিক বস্তু সকল পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সমতা আছে (সকলই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণ বিশিষ্ট) এই সমন্বয় হইতে তাহারা যে এক মূল কারণ হইতে উদ্ভূত, তাহা অনুমিত হয়। তৃতীয়তঃ প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয় শক্তি হইতে। সুতরাং এই অসংখ্য বস্তুসমন্বিত জগৎ এক অপরিমেয় শক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহাও অনুমান করা যায়। চতুর্থতঃ কার্য্য ও তাহার কারণের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য বস্তু কারণ হইতে বিভক্ত হইয়া পৃথক রূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই জগৎ-রূপ কার্য্য তাহার উৎপাদনে সমর্থ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। পরিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কার্য্য বস্তু কারণ বস্তুর সহিত অবিভক্ত ভাবে মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে সমগ্র বিশ্বের এক অব্যক্ত কারণ আছে, যাহা হইতে জগৎ ব্যক্ত হয়, এবং পরিণামে যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্ত ভাবে তন্মধ্যে অবস্থিতি করে। সেই অব্যক্ত কারণই প্রকৃতি।

জাগতিক সকল পদার্থই—

হেতুমৎ, অনিত্যং, অব্যাপি সক্রিয়ং
অনেকং আশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং, পরতন্ত্রং, ব্যক্তং,
বিপরীতং অব্যক্তং।

(সাং কা—১০)

ব্যক্ত পদার্থ হেতুমৎ অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্ভূত। তাহা অনিত্য, অব্যাপি অর্থাৎ পরিমিত স্থান ব্যাপী, সদাক্রিয়াশীল, অনেক অর্থাৎ বহু-সংখ্যক স্বকীয় কারণের আশ্রিত ও তাহার চিহ্ন সাবয়ব অর্থাৎ দেশ অথবা কালব্যাপী অঙ্গযুক্ত এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ অন্যের অধীন অব্যক্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহার কোনও কারণ নাই তাহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, কারণহীন নিরবয়ব, ও স্বতন্ত্র। ইহা প্রকৃতির নেতিবাচক বর্ণনা পাতঞ্জল দর্শনের ২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে তাহাকে "নিঃসত্তাসত্তং

নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্তং, অলিঙ্গং" বলা হইয়াছে। যাহার সত্তাও নাই অসত্তাও নাই, তাহাই নিঃসত্তা-সত্ত। যাহা সৎও নহে অসৎও নহে, তাহা নিঃসদসৎ। যাহা অসৎ নহে, তাহাই নিরসৎ। তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত, তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ তাহা কাহারও লিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যরূপ চিহ্ন নহে। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় একটি উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে উদ্দেশ্য হইতেছে পুরুষের অর্থসাধন। অব্যক্ত অবস্থাও পুরুষার্থ সাধক হইলেও, সে অবস্থায় প্রকৃতির কোনও কার্য্যই থাকে না। কোন কার্য্য থাকে না বলিয়া তাহা নিঃসত্তা কিন্তু তাহা অভাব পদার্থ নহে। তাই নিঃসত্তা-সত্ত ও নিঃসদসৎ। তাহা যে অস্তিত্ববিহীন নহে, তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য আবার তাহাকে নিরসৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রকৃতির স্বরূপ বোঝা যায় না। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে আছে সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। (সাংসূ-১।৬৯)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণ ময়ী, কিন্তু প্রলয়াবস্থায় —জগতের উদ্‌ভবের পূর্ব্বে ও জগতের লয়ের পরে—এই তিনগুণের কোনও কার্য্য থাকে না। তখন তাহারা পরস্পরের কার্য্যের প্রতিরোধ করে মাত্র। তখন তাহাদের অন্যূন ও অনতিরিক্ত অবস্থা ; তখন তাহারা কেহ ন্যূন, কেহ অধিক হইয়া পরস্পর সংহত থাকে না, এবং তাহাদের কোনও কার্য্যও হয় না। * সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলিতে কি বুঝায়, এবং তাহাদের সাম্যাবস্থাই বা কাহাকে বলে এখন আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি না হইলে প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয় না। কেন এই বিচ্যুতি হয়, তাহারও আমরা অনুসন্ধান করিব।

ত্রিগুণ

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে তাহা হইতে যে সকল পদার্থ উদ্‌ভূত হয়, তাহারা সকলই এই তিন গুণান্বিত প্রকৃতির বিকার। গুণ শব্দের অর্থ কি? বৈশেষিক দর্শনের মতে সপ্ত পদার্থের মধ্যে গুণ একটি পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ। ইহাদের মধ্যে গুণ দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্য হইতে বিচ্যুত গুণের অস্তিত্ব নাই। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কি এইরূপ গুণ? জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই তিন গুণ বর্ত্তমান। এই সকল বস্তু ও প্রকৃতি কি গুণদিগের আশ্রয় স্থান? বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন "সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকাঃ গুণাঃ, সংযোগ-বিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্ত্বাচ্চ। অত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষ-পশু-বন্ধক-ত্রিগুণাত্মক-মহদাদি রজ্জু-নির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।" (সাংখ্য-সূত্রের ১।৬১ সূত্রের ভাষ্য) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বৈশেষিক দর্শনের গুণ নহে, কেননা তাহাদের সংযোগ ও বিভাগ আছে। লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মও আছে। এই শাস্ত্রে এবং শ্রুতি প্রভৃতিতে 'গুণ' শব্দ পুরুষের উপকরণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষরূপ পশুর বন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জুর নির্ম্মাতা অর্থে গুণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।" বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই অর্থই যে ঠিক তাহা গুণদিগের বিভিন্ন ধর্ম্মের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি হয়। "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্, চলম্ অবষ্টম্ভকঞ্চ রজঃ, গুরু বরণকমেব তমঃ"। এই সূত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর বিভিন্ন গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যদি বৈশেষিক গুণ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আবার গুণের বর্ণনা সম্ভবপর হইত না। গুণের আবার গুণ কি? সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য। (Substance) কিন্তু তাহারা এক একটি মাত্র নহে। সত্ত্ব একটি মাত্র দ্রব্য নহে, রজঃ একটি দ্রব্য নহে' তমঃও একটি নহে। অসংখ্য সত্ত্ব, অসংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমঃ আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শ্রেণীর দ্রব্যের সাধারণ নাম। এই তিন শ্রেণীর অসংখ্য বস্তুর সমবায় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, যখন তাহাদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন সেই সাম্যাবস্থাপন্ন সমবায়কে বলে প্রকৃতি। এই সাম্যাবস্থা প্রলয়ের অবস্থা। তাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। যে তিন গুণের অবিরাম ক্রিয়া হইতে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার জ্ঞান আমাদের নাই। কিরূপে সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু সাম্যাবস্থায়

* "আসীৎ ইদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম্ অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" মনু সংহিতায় বর্ণিত এই অবস্থাই প্রকৃতির অবস্থা।

সত্ত্বদিগের, রজঃদিগের ও তমঃদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। তাহাদের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম হইতে তাহারা বিচ্যুত হয় না। তাহাদের পরস্পরের শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই তাহাদের কোনও ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। এই পারস্পরিক প্রতিরোধের প্রণালী কি, তাহা আমরা অবগত নহি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত অবলম্বন করিয়া আমরা এক প্রলয়াবস্থার কল্পনা করিতে পারি। জগতের উপাদান পরমাণু। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ-রূপ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তাড়িতকণার সমবায়ে পরমাণু গঠিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রোটন সংখ্যা ও ইলেক্‌ট্রণ সংখ্যা সমান। অনেক পরমাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাহাদের প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণগণ তেজঃরূপে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। (Radiations)। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন সূর্য্যের মধ্যে পরমাণুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার ফলেই তাহা হইতে তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। কল্পনা করা যাইতে পারে এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের যাবতীয় পরমাণু এইভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ গণ স্বাতন্ত্র্যও বিসর্জন দিয়া নির্বিশেষ প্রৈতিরূপে অনন্ত আকাশে বিক্ষিপ্ত হইবে। তখন তাহাদের দ্বারা আর কোনও কার্য্য হইবে না। এই অবস্থাই প্রলয়। প্রৈতির (Energy) এই অসংবদ্ধ অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার কোনও কার্য্যই থাকিবে না। যদি কোনও কারণে—সর্ব্বশক্তিমান কোনও পুরুষের ইচ্ছাবশতঃই হউক অথবা কোনও আকস্মিক কারণবশতঃই হউক, প্রৈতি এই অসংহত অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি আবার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণের উদ্‌ভব করিতে পারে, তবেই পুনরায় সৃষ্টির সম্ভব হইবে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন একদিকে যেমন প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণের ধ্বংস হইতেছে, তেমনি অসীম বিশ্বের এক দূরতম প্রদেশে হয়তো নূতন প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। প্রলয়ে বিশ্বের সমগ্র প্রৈতি প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইলেও, তাহা নিষ্ক্রিয়, তাহার কার্য্য ক্ষমতা অন্তর্হিত। তাহার মধ্যে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ একত্র থাকিলেও তাহাদের মিলন হয় না, মিলিত হইয়া তাহারা এক বস্তুতে পরিণত হয় না। পরস্পরের উপর তাহারা ক্রিয়াশীল। কিন্তু পরস্পরের অভিভব ভিন্ন অন্য ক্রিয়া তাহাদের হয় না।

প্রকৃতি এবং গুণদিগের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানিনা। সৃষ্টির মধ্যে আমরা গুণের কার্য্য দেখিতে পাই, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই আমরা জানিতে পারিনা। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে ষষ্টিতন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

গুণাণাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি
যৎতু দৃষ্টিপথম্ প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্।

গুণদিগের পরমরূপ দৃষ্টিপথে পড়ে না। দৃষ্টিপথে যাহা পড়ে তাহা মায়ার মতো, তুচ্ছ।

এখানে যাহা দৃষ্টিপথে পড়ে, তাহাকে "মায়া" বলা হয় নাই—"মায়া ইব" অর্থাৎ "মায়ার মতো", "যেন মায়া" ইহাই বলা হইয়াছে। কেননা তাহারা সকলই বিনাশশীল।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যাহা গুণ বা ধর্ম্ম তাহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা কি?

প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ প্রীতি-অপ্রীতি-বিষাদাত্মক, তাহারা প্রকাশশীল, প্রবৃত্তিশীল (ক্রিয়াশীল) ও নিয়মশীল (সংযমনশীল)। ইহারা সকলেই অন্যোন্যাভিভব বৃত্তি, অন্যোন্যাশ্রয় বৃত্তি, অন্যোন্যজনন বৃত্তি এবং অন্যোন্য-মিথুন-বৃত্তি।

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টং উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।

সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত। রজঃ উপষ্টম্ভক অর্থাৎ অবসাদনাশী এবং চল অর্থাৎ চঞ্চল বা পরিণামশীল। তমঃ গুরু অর্থাৎ জড়ত্ব বা আলস্যজনক, এবং আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও সকলে মিলিত হইয়া অর্থসাধন (পুরুষার্থ সাধন করে), যেমন প্রদীপের বর্ত্তি (সলিতা) ও তৈল ও অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশরূপ উদ্দেশ্য সাধন করে।

উপরিউক্ত দুইটি কারিকা হইতে পাওয়া গেল, সত্ত্ব প্রকাশিত হয় প্রীতি ও প্রকাশে, এবং তাহা লঘু।—আমাদের অন্তরে যে প্রীতিভাব (সুখ) উৎপন্ন হয় তাহা যেমন, তেমনি কোনও বস্তু যে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হয়, তাহাও সত্ত্বগুণ হইতেই হয়। লঘুত্বও সত্ত্বের একটি গুণ। লঘুত্ব গুরুত্বের বিরোধী। বস্তুর লঘুত্ব সত্ত্বগুণেরই কার্য্য। অগ্নিশিখা যে উর্দ্ধগামী তাহার কারণ অগ্নির মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য। বায়ু যে তির্য্যকগামী, তাহার কারণও বায়ুর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য। ইন্দ্রিয়দিগের পটুতাও (ত্বরিতবোধজননশক্তি) সত্ত্বগুণের আধিক্যজাত। তমঃ গুরু বলিয়া তাহার ফল মন্দতাজনক।

আবার রজঃর লক্ষণ অপ্রীতি (দুঃখ), অবসাদনাশ ও চঞ্চলতা। তাহা ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল। সত্ত্ব ও তমঃ স্বতঃ নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বকীয় কার্য্যসাধনে অসমর্থ। তাহারা রজঃ কর্ত্তৃক উত্তম্ভিত (উত্থাপিত) হইয়া অবসাদ হইতে নিবর্ত্তিত এবং স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। রজঃ স্বয়ং চঞ্চল অথবা স্পন্দনশীল। সে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তাই সত্ত্ব ও তমঃকে চালিত করে। তমঃর সহচর বলিয়াই সত্ত্ব ও রজঃ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবৎ হয়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ অবিনাভাবে সম্বদ্ধ। ইহাদের কেহই অন্য দুইটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কার্য্য-প্রবৃত্তি রজঃর প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়।

তমঃ গুরুঃ আবরক ও সংযমনশীল। সত্ত্ব লঘু, তমঃ তাহার বিপরীত গুরু। সত্ত্ব প্রকাশশীল তমঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। সত্ত্ব ও রজঃর কার্য্য তমঃ নিয়ন্ত্রিত করে, এইজন্য তমঃ নিয়ামক বা সংযমনশীল। যখন পুরুষের প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক হয়, তখন তমঃর প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধক বৃত্তি শমিত হয়। অশ্ব স্বভাবতঃ চঞ্চল, কিন্তু রথীর প্রয়োজনানুসারে কখনও সারথিকর্ত্তৃক অশ্বরথচালনে নিযুক্ত হয়, আবার কখনও সংযত হয়। সেইরূপ প্রবৃত্তিশীল রজোগুণও যখন পুরুষের প্রয়োজন না থাকে, তখন তমোগুণাবৃত হইয়া নিশ্চল অবস্থান করে। এই জন্যই তমঃকে নিয়ামক বলা হইয়াছে। (ন্যায়পঞ্চাননের টীকা)। সত্ত্ব ও রজঃ ক্রিয়া এইভাবে তমঃ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। (ক্রমশঃ)

শিক্ষামন্দির হ'তে ধর্ম্মের নির্ব্বাসন

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী

গত বৎসর বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রথম পাতাতেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা মধ্য-শিক্ষা-কমিশনের তদন্তের ঠিক পূর্ব্বে সত্যই সময়োপযোগী হয়েছিল। শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা বলেছেন তাতে সত্যই ভাববার কথা আছে। আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় হ'তে ধর্ম্মশিক্ষার নির্ব্বাসন হ'বে এটা বিস্ময়ের কথা। বরং অনেকেই আশা করেছিলেন যে, সকল শিক্ষার মূলে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে। দেড় বছরের অধিককাল অপেক্ষা করেও দেখলাম—কেহ এ বিষয়ে আর কিছু বললেন না। এই নিস্তব্ধতা তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়টা মেনে নেওয়া অথবা তার প্রতি গতানুগতিক ঔদাসীন্য বুঝাচ্ছে ঠিক করা কঠিন। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া উচিত মনে করে আরও দু'চার কথা বলবার চেষ্টা করছি।

যা আমাদিগকে ধারণ করবে, যাকে অবলম্বন না করলে আমরা বাঁচার মত বাঁচতে পারি না, মনুষ্যপদবাচ্য হ'তে পারি না, সেই জিনিষটা বাদ দিয়ে কি করে শিক্ষা সম্ভবপর বুঝা কঠিন। শিক্ষা আমাদিগকে জীবনের পথে এগিয়ে দেবে, শরীর, মন, বুদ্ধি সব কিছুরই বিস্তার করে দিবে. কিন্তু সেই শিক্ষার ভিত যদি কাঁচা, কম-জোর হয়, তার উপর কোনো পাকা, স্থায়ী জিনিষ গড়ে উঠতে পারে না। ফলে আজকাল সমাজের সকল স্তরেই যে দুরবস্থা, দুর্নীতি দেখা দিয়েছে তা ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতির অনিবার্য্য পরিণতি মাত্র। সরকারি, বে-সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যে মধ্যে যে সব চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিগুলির মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে চাকরি বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে উচ্চস্থান লাভ করেছেন। সরকার শিশু-গণতন্ত্রকে জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ভাল করে গড়ে তোলার জন্য নানা পরিকল্পনা ক'রছেন, বহু কমিশন নিয়োগ ক'রছেন; কিন্তু আসল জিনিষ শিক্ষার পরিকল্পনা ঠিকমত না হ'লে আর কোনও জিনিষ ঠিকভাবে গড়ে উঠবে না। যত বড়, যত উঁচু সৌধ তৈয়ারি হোক না কেন. তা হেলে পড়বে বা একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তাদের রাষ্ট্রনায়করা সকলের আগে শিক্ষাবিধিকেই ভেঙ্গে গ'ড়েছিলেন।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কারণ বলা হয় যে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে নানা ধর্ম্মের লোক থাকায় রাষ্ট্রকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ থাকতে হ'বে। কিন্তু 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' আর 'ধর্ম্মহীন' এক কথা নয়। রাষ্ট্র বা সরকার পাকিস্থানের মত ধর্ম্মের ভিত্তিতে গড়া হবে না, কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি স্কুল কলেজে বা অন্যত্র পক্ষপাত দেখাবেন না—ইহা সুন্দর কথা। কিন্তু তা ব'লে রাষ্ট্রের বা অন্ততঃ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও ধর্ম্মশিক্ষার ভিত্তি থাকবে না ইহা যৌক্তিক মনে হয় না। যদি একথা সত্য হ'ত, তা হ'লে এই রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ গত বছর দিল্লীতে অন্ধশিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে বলতেন না যে—"ভারতে আজ মর্য্যাদার অভাব নাই। অভাব শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির; এই দুইটি জিনিষই জাতিগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অতএব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিত্তোন্নয়নের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হ'বে। শিক্ষকগণ শুধু জ্ঞানদান করলে চলবে না, ছাত্রদের চিত্ত ও চরিত্র গঠনেও মনোযোগ দিতে হ'বে। এমনভাবে শিক্ষা দিতে হ'বে যার ফলে ছাত্রদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং উহা তাদের জীবনের পরিধি বিস্তার করে।" রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদও বারাণসীধামে একথা আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি মনে করেন যে "জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে বিশেষ সঙ্গতি থাকা অত্যাবশ্যক। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের জন্য বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকা চাই। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্ম আছে সত্য এবং সেজন্য কোন ধর্মবিশেষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের গোড়ায় এমন কতকগুলি নৈতিক বা মূল সত্য ও মান আছে যার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এবং সেজন্য সেগুলিকে অবলম্বন করে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা অনায়াসে করা যেতে পারে।"

ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হ'লে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে উঠবে এ আশঙ্কা অমূলক। কোনও শিক্ষকের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকে, তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, তাঁর সেই মনোবৃত্তি ছাত্রদের মধ্যে এখনও নানারকমে সংক্রামিত করতে পারেন। বরং ধর্ম্মশিক্ষার সুব্যবস্থা থাকলে ছাত্ররা নিজেরা বিভিন্ন ধর্মের উদার মত ও নীতি উপদেশ জানতে পারবে, যার ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তাদের মধ্যে সহজে প্রবেশ নাও করতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা যখন দেখবে যে তাদের পবিত্র কোরাণ বা পবিত্র বাইবেলের উপদেশও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছাত্রদের শেখান হ'চ্ছে—তখন তারাও হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত বা গীতার কথা শুনতে বা জানতে ক্রমশঃ আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং ঐ সকল গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হবে। এইভাবের ধর্ম্মশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা না বাড়িয়ে বরং তাকে কমাবার সহায়তা করবে। সরকার শুধু সাম্প্রদায়িকতা কেন, তাঁদের নীতি অনুসারে প্রাদেশিকতা দমন করার জন্যও সর্ব্বদাই সচেষ্ট; কিন্তু ফলে প্রাদেশিকতা কমেছে [illegible]

এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এত শীঘ্র স্বীকার করার প্রয়োজন হ'ত না। মানভূম ও সিংভূম বাংলার মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছে তা শীঘ্রই মেনে নিতেই হবে সন্দেহ নাই। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধি দমন করার জন্য ধর্ম্মশিক্ষা বন্ধ করাই প্রকৃত বিধান মনে করা নিশ্চিত ভুল।

সকল ধর্ম্মের মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপদেশ খুবই সমীচীন। শ্রীরমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতার ঐরূপ একটি শ্লোকের কথা বলেছেন। তাতে কর্ম্মের ফলের দিকে নজর না দিতে বলা হয়েছে। কোরাণেও প্রায় এইভাবের কথা আছে—'ইন্না ল্লাহা লা এ জিউ আজরাল মোহ্ সেনিল'। যেখান হ'তে উপরিউক্ত শ্লোকটি রমেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত ক'রেছেন সেই দ্বিতীয় অধ্যায়েই কিছু পূর্ব্বে "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়া-জয়ৌ" অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ, লাভ বা ক্ষতি, জয় বা পরাজয় সমান মনে করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার উপদেশ দেওয়া আছে। এবং আবার একটু পরেই মুণির লক্ষণ বলা হয়েছে, তিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখেতেও তাঁর তেমন স্পৃহা নাই—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

বনী ইসরায়িল-এও ঠিক এই রকম কথা পাওয়া যায়। 'মুসলেম সন্তান! দুঃখ সুখ, জয় পরাজয়, লাভ ও ক্ষতির বিচার করতে গেলে তোমার দ্বারা কোনো কাজ হবে না। অতএব তুমি নিশ্চিন্তভাবে কাজ করে যাও, ভবিষ্যতে তুমি ফল পাবেই। যদিও বা ফল না পাও তাও তোমার মঙ্গল জন্য জানবে।' গীতার ন্যায় অমূল্য গ্রন্থে ঐরূপ সার্ব্বজনীন উপদেশ আরও অনেক আছে এবং তার অনুরূপ কথা অন্য ধর্ম্মের মূল গ্রন্থেও পাওয়া যাবে সন্দেহ নাই।

'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্'—সত্যভিন্ন বলবে না, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পথ ত্যাগ করবে না, যাতে তোমার কল্যাণ তা হ'তে বিচলিত হ'বে না।

আবার—'মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব, আচার্য্যদেবোভব, অতিথি-দেবোভব'—মাতার সেবাপরায়ণ হও, পিতার সেবাপরায়ণ হও, গুরুর সেবাপরায়ণ হও, অতিথির সেবাপরায়ণ হও।'

উপনিষদের এই সকল বাণী সকল দেশে সকল ধর্ম্মের লোকের নিকট আদর পাবে। কারণ কোনও সদ্ধর্ম্মে, এসবের বিরোধী অনুশাসন থাকতে পারে না। সত্যপরায়ণ হওয়া সম্বন্ধে কোরাণে অনেক জায়গায় উপদেশ আছে। 'পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণাম অবলোকন কর' (সুরা আনাম-১১)। '...শেষ বিচারের দিন সত্যবাদীদের সততা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হ'বে' (সুরা মায়েদা-১১৮)। 'আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদী হও' (সুরা তাওবা-১১৮)। মহাত্মা গান্ধী কোরাণের যে অংশটি...ভোরে পড়তেন সেই আয়েতে আছে—'হে খোদা, আমাকে সত্য হ'তে বিচলিত কোরে

না, সর্ব্বদা সত্যের উপর লয়ে যেও' ('রাব্বী আথ্‌রেজ্‌নি মথয়াজা ।)।

...হ'তে বিচলিত না হওয়ার সম্বন্ধে প্রমাণ অনাবশ্যক, প্রচুর পাওয়া যাবে। নিজের কুশলপথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য কোরাণ উপদেশ দিচ্ছেন—'এম্‌সি সবিলা রোসদে ওলা তত্তাবেউ গোতওয়া তিম্‌ সয়তান' (যে পথে চললে তোমার মঙ্গল হ'তে পারে সে পথেই চলবে; যে পথে চললে তোমার অনিষ্ট হ'তে পারে সে পথ সয়তানের পথ)।

পিতামাতার সেবা করার জন্য কোরাণ বহু জায়গায় আদেশ দিয়েছেন। প্রথমেই সুরা বকরে—'ও বিল্‌ওয়ালেদাইনে রহমাসা' অর্থাৎ বাপমার মঙ্গল করবে। ১৫ মেজারায় (পাঠে) আছে—'ওলা তাকুল্‌ লাহুমা উফ্‌ফিন ও কুল আল্লাহুম্মা আরজাম হুমা, কামা রাব্বেয়ানী সগিরা' অর্থাৎ 'হে মোহাম্মদ, তোমার শিষ্যদিগকে বলে দাও যে যদি কারও পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের উপর অসন্তুষ্ট হ'ন, সন্তানদের উচিত পিতামাতার প্রতি রাগ করে উফ্‌ শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করা। বরং বলবে—'হে খোদা, আমার পিতামাতার এমন ভাবে আমার কোলে পালন করান যেমন তাঁরা আমায় শিশুবেলায় পালন করেছিলেন।' বনি ইস্‌রায়েল, ২৩ আয়াতেও আছে—'পিতামাতার সহিত সদাচরণ কোরো, যদি তাঁদের কেহ অথবা উভয়েই বুড়ো হয়ে পড়েন তাঁদিগকে ধমক দিওনা অথবা উহ্‌ শব্দটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ কোরো না, বরং তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতি ও সম্মান দেখিয়ে কথা বলবে।

ইসলামধর্ম্মে অতিথিসেবা একটি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কোরাণে কয়েক জায়গায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এব্রাহিম অতিথির পাতে ভাত না দিয়ে কোনোদিন খেতেন না। একদিন এমন হ'ল যে সমস্ত দিন কোনো অতিথি এল না। অবশেষে বেলা আন্দাজ চারটার সময় এক আশীবছরের বুড়ো লোক আসায় তাকে খেতে দিলেন। কিন্তু সেই বুড়ো খাওয়া আরম্ভ করার আগে 'বিসমিল্লা' অর্থাৎ খোদার নাম না নেওয়ায় এব্রাহিম রেগে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই সময় ভগবানের বাণী শোনা গেল—'এব্রাহিম করলে কি? সারাজীবনের পুণ্য নষ্ট করে ফেললে! আমি ঐ বুড়োকে আশী-বছর অন্ন জুগিয়ে আসছি আর তুমি এক বেলাও সহ্য করতে পারলে না?' এব্রাহিম তখন ছুটে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে অতিথিকে ফিরিয়ে এনে খাওয়ালেন। ইসলামধর্ম্মের জন্মস্থান আরবদেশের অতিথিসৎকার প্রসিদ্ধ; পিতৃহন্তাকে নিজ বাড়ীতে পেয়েও অতিথি ব'লে প্রতিশোধ না নিয়ে সমস্ত রাত তার সেবা করে সকালে ঘোড়া দিয়ে তাকে চলে যেতে বলার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। আর্য্য ঋষিগণের অনুশাসন হ'তে কিছুই প্রভেদ নাই—তাঁরা নানা জায়গায় নানা ভাবে বলেছেন—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যা-মাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

গাছকে কাটতে এলেও সে যেমন তার ছেদকের মাথার উপর থেকে ছায়া সরিয়ে নেয় না, তেমনি গৃহস্থ শত্রুকেও ঘরে পেলে তার অতিথির উপযুক্ত সেবাযত্ন করবে।

'প্রতিবাসীকে ভালবাসবে' এ উপদেশ হিন্দুশাস্ত্র যেমন দেন, বাইবেল ও তেমনি 'Love they neighbour as thyself' (নিজের মত প্রতিবেশীকে ভালবাস) বহু জায়গায় বলেছেন। ইসলাম শাস্ত্রেও হজরত রসুলের আদেশ যে কাফের বা অমুসলমান প্রতিবেশীর প্রতিও প্রত্যেক মুসলমানের হক (কর্ত্তব্য) আছে। এই ভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মের পুস্তক হ'তে সংগ্রহ করলে সম্পূর্ণ মিল বা সামঞ্জস্য আছে এমন সার্ব্বজনীন বহু নৈতিক উপদেশ পাওয়া যাবে। একবারে মিল না হলেও অসুবিধা হ'বে না। অন্যের ধর্মের মধ্যে যদি নতুন ভাল উপদেশ পাওয়া যায় তাকে নিতে কোনও আপত্তি হ'বে না। যদি ছাত্র আগে হ'তে বুঝে থাকে যে তার ধর্ম্মের ভাল কথাও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সহপাঠীকে শেখান হচ্ছে।

অনেকের ধারণা মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মত উদার নয়, তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এত শীঘ্র গোলমাল লাগে। গোলমালের প্রকৃত কারণ কি তা এখানে আলোচনা করতে চাই না। তাদের ধর্ম্মগ্রন্থে কি আছে মাত্র তাহাই ব'লব। কোরাণের কুলিয়া নামক ৩১ সংখ্যক সুরাতে ভগবান্‌ বলেছেন—'হে মোহাম্মদ! তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বলবে যে তুমি কাহারও ধর্ম্মকে নিন্দা করার জন্য পয়গম্বর হ'য়ে আস নাই, তুমি খোদার সংবাদবাহক মাত্র। ('মা আলায় রসুল ইল্লাল বালাগ'); তাঁর সংবাদ তাঁর লোকদিগকে পৌঁছিয়ে দিবে; তারা সেই সংবাদমত চলুক বা না চলুক, তুমি তার জন্য দায়ী নও! ধর্ম্মকে নিন্দা করা ইসলামের বিধি নয়।' কাফেরুণ সুরাতেও আছে—'হে মোহাম্মদ! বল, হে অবিশ্বাসীগণ! আমি যার উপাসনা করি না, তুমি তার উপাসনা কর, এবং আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসক নও। তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করব না, কিংবা আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসনা করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।'

ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে দেশের বা রাষ্ট্রের কি অকল্যাণ হ'চ্ছে তা আপাতদৃষ্টিতে অনেকে দেখতে পান না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেই ক্রমে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হ'য়ে উঠেছে, সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং জীবন সংগ্রামেও কেন আজকাল এত অকৃতকার্য্য হচ্ছে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। বাংলার ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক কি হঠাৎ এত খারাপ হ'য়ে গেল! তা নয়, আসল কারণ, ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যাঁরা শিখাবেন এবং যারা শিখবে তাদের মধ্যে অন্তরের সংযোগ নাই—পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ছাত্রসমাজের কতকটা যান্ত্রিক যোগ মাত্র ঘটে থাকে। তাই প্রকৃত বিদ্যা বা জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, বাহ্যিক সম্বন্ধমাত্রের ফলে অন্তর উদ্ভাসিত হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ায় পূর্ব্বের মত আনন্দ পায় না, তাদের মধ্যে 'অধ্যয়নং তপঃ' এ অনুভূতি থাকে না।

এর পরিণতি দেখা যায় পরীক্ষায় শতকরা সত্তর পঁচাত্তর জনের অসাফল্যে এবং অতি সহজেই গুরুর বিরুদ্ধে ছাত্রের বিদ্রোহে—যাকে দমন করতে হয় গুলি-গোলায়। হায়! হিন্দুস্থানের আজ কি শোচনীয়

অবস্থা। যেখানে গুরুর জন্য শিষ্য তার সর্বস্ব দিতে পারত আজ সেখানে গুরুকে আশ্রয় নিতে হয় পুলিশী ফৌজের। চিরদিন ধর্মবলে বলীয়ান্ আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস।

সকল বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় বাগ্‌দেবীর মন্দির—এ মন্দিরের দীপশিখার জ্যোতি, এর পূজার ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে, পবিত্র আনন্দ দেবে যতদূর শোনা যাবে এর পূজার সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি এবং এর পূজারীরা এর আরাধনার নির্মাল্য বিলিয়ে দেবে দেশদেশান্তরে। এ দেবালয়ের পুরোহিতরা ত্যাগব্রতী ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, রামনাথের গৈরিক-পতাকাবাহী; উপাসকরা আরুণি, উপমন্যু, বেদ, একলব্য প্রভৃতির বংশধর। এ সব বাণী-নিকেতনের শিষ্যদের মন ত শুধু সাদা কাগজ নয় যে দেবীর লেখনীর কালীর আখরে সব কিছুই তাতে আঁকা হ'য়ে যাবে। এদের হৃদয়ে ভারতের যুগযুগান্তরের সাধনায় পাওয়া আলো ঘুমিয়ে থাকে। সত্যিকার নিষ্ঠাভক্তি থাকলে নির্লোভ গুরুর পুত্রস্নেহবৎ অসামান্য কৃপা তাকে জাগিয়ে তোলে, গুরুর জ্ঞানের জ্যোতির সঙ্গে তার হয় অপূর্ব্ব মিলন। কিন্তু আজ ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুকরণে হ'য়েছে সব বিপরীত। শুধু মূল্যের বিনিময়ে প্রাণহীন দেওয়া-নেওয়া—তার ভিতে নাই 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—এই ভগবদ্ বাণীহত বিশ্বাস ও তার অনুভূতি, নাই পবিত্র প্রীতি ও সহানুভূতির সোনার কাঠির পরশ। তাই আজ গুরুশিষ্যের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও বিরোধ, এত কৃত্রিমতা ও অসাধুতা, এত অসাফল্য ও নৈরাশ্য—দেশ জোড়া এত হাহাকার।

দেশপ্রেমিক কর্ম্মযোগীসাধক বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল এই বাণীই উদাত্তস্বরে ব'লে গিয়েছেন। বিশ্বভারতীর উপাসক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই কথা ছন্দে, সুরে ও প্রবন্ধে নানা ভাবে শুনিয়ে দেশবাসীকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন এবং নবভারতের সাধক মহাত্মাজীও এই নীতির সাধনার জীবন আহুতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এমন জড় যে এখনও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' রয়েছি। আমাদের ও আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের 'কাণের ভিতর পশিলেও' এ সকল মহাবাণী বহুদিন পরাধীনতার পাষাণ-চাপা মর্ম্মে এখনও সাড়া জাগাতে পারে নাই।

এ সকল কথা মেনে নিলেও, আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী থাকায় রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা গুরুতর সমস্যা মনে হ'তে পারে। যাঁদের উপর এ কাজের ভার পড়তে পারে তাঁরা সেটা সহজ মনে না করতে পারেন, কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতেই হ'বে; নতুবা রাষ্ট্রের কল্যাণ সুদূর-পরাহত। সাম্প্রদায়িকতার ভাব নাই এ খ্যাতি আছে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এমন উদার মনীষীদের দ্বারা নৈতিক শিক্ষাধারা তৈরী করাতে হবে, যার মধ্যে প্রধানতঃ থাকবে উপদেশে ভরা সুন্দর সুন্দর গল্প ও কাহিনী, দেশে বিদেশে যাঁরা সৎজীবন যাপন ক'রে বড় হয়েছেন বা যাঁরা সাধুসন্ত তাঁদের জীবনী কথা। কি প্রণালীতে সকল বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হবে সেটা হবে প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষা কেন্দ্রে—প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর স্তর পর্য্যন্ত। এ ছাড়া ভ্রাম্যমান উপদেশকের বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি এবং সুনির্ব্বাচিত উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা ও দরকার। এ সকলের ব্যয়ভার যদি আজ সরকারের সম্পূর্ণ বহন করার ক্ষমতা না থাকে, সেই অজুহাতে ব্যবস্থা বন্ধ করা উচিত নয়: বরং বিদ্যালয়গুলিকে আংশিক ভার নিতে বলাও ভাল।

সম্প্রতি যে মধ্যশিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার সদস্যরা এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টী এড়িয়ে না যেয়ে এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করলে তাঁদের দেশব্যাপী সফর ও পরিশ্রম সার্থক হ'ত। তাঁদের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দেখ্‌লাম যে এ বিষয়ে তাঁরা প্রথম হ'তে 'ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম্ম শিক্ষা অসম্ভব' ধ'রেই কাজে নেমেছেন। আর পাঁচ-সাত-দশ মিনিটে পাঁচ-সাতজনের অভিমত জানা বা যুক্তি শোনা কতদূর সম্ভবপর সকলেই বুঝবেন। ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা এই উপদেশ দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেছেন যে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজের পর অভিভাবক ও পরিচালকগণের মত নিয়ে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হ'লে আপত্তি নাই। তবে কোনও ধর্ম্ম বিশেষের ছাত্রছাত্রীকে কেবল তাদের ধর্ম্মের কথাই বলতে হবে—ঐ নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। যার যা খুসী হ'চ্ছে তাতে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে মাত্র, ঐ উপদেশে বরং জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শিক্ষা মন্দিরে ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক ও নায়কদের নিকট ধর্ম্মের আদর কতটা হ'বে তা সহজেই অনুমেয়। কমিশন যে রিপোর্টই পেশ করুন, রাষ্ট্রনায়করা যে নীতিই অনুসরণ করুন না কেন, এই গোড়ার গলদ দূর না হ'লে সব কমিশন নিয়োগ, সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'বে সন্দেহ নাই। শিক্ষা পরিকল্পনামাত্রের গোড়ায় ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বীজমন্ত্র দেওয়া ভিত্তি স্থাপন ভিন্ন—

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়',

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল

"সঙ্গীতের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি কি এবং তাহাদের সংখ্যা কত তাহা সামান্যভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন, কেন না এই শ্রুতির জ্ঞান না হইলে আর্য্য সঙ্গীত সম্যকভাবে আয়ত্ত করা যায় না। আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতির প্রয়োজন এত অধিক যে তাহার সম্যক জ্ঞান না থাকিলে আর্য্য সঙ্গীত শিক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শ্রুতির জ্ঞান সম্যক্ আয়ত্ত হইলে রাগ ও রাগিণী আপনা হইতেই মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে। এই জ্ঞানাভাব-হেতু অধুনা আর্য্য সঙ্গীতের এত দুরবস্থা শ্রুতি জ্ঞান সম্যক্ লাভ করিতে হইলে কালজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ খণ্ডকালের ক্রীড়া সঙ্গীতে যে পরিমাণে অনুভূয়মান অন্য কোন বিষয়ে তত নহে। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে কাল বিনা সঙ্গীত হয় না। ইহা সকলেরই জানা আছে যে ঠিক ঠিক কালিক নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত স্পন্দন বর্ত্তমান না থাকিলে সঙ্গীতের ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। Second possesses the musical quality only if their frequency is rigidly regular otherwise it is mere noise.

সুতরাং কালজ্ঞান ভিন্ন আর্য্য সঙ্গীতের ক্রিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কাল হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তি এবং কাল জ্ঞান ভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষা করা বাতুলতা মাত্র। সেইজন্য কালের সহিত শ্রুতি কিরূপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাহাই এই প্রবন্ধে বিশদ-ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মহাভারতের উপাখ্যানে উল্লেখ আছে—যে দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে মর্ত্তলোকে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকালে কহিলেন, "গোলকে গিয়া দেখিলাম যে আচার্য্য বৃহস্পতি নারায়ণকে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।"

ঘড়ির পেণ্ডুলামের-গতি লক্ষ্য করিলেই স্থিতি ও গতির সম্মিলনকারী অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইহাই স্পন্দনের কারণ এবং স্পন্দন হইতে শব্দের উৎপত্তি। শব্দ হইতে বাক্ যাহা বৃহস্পতি নির্দ্দেশ করে।

ইহা সকলেরই জানা আছে যে ভৌতিক অণুর গতি ভিন্ন ধ্বনি নাই। সাধারণতঃ বায়ুর অণুগুলি ধ্বনিকে বহন করে এবং সেই অণুগুলির গন্তব্য স্থানের দিকে সদাই আগু পিছু স্পন্দন হয় যাহার কারণে বায়ুমণ্ডলে ক্ষণিক এবং দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। এই ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা হইতে বাক্যের উৎপত্তি। তাই দেবগুরু বৃহস্পতির প্রদক্ষিণ।

বাচস্পতি বৃহস্পতি হইল বৈখরীশক্তি এবং বিষ্ণু হইল প্রাণশক্তি। বিষ্ণু—বিষ্+ণুক্ ক। বিষ্ অর্থে ব্যাপ্ত। যিনি ব্যাপ্ত হয়েন। প্রাণেরই ব্যাপ্তি হয়। আত্মার প্রাণশক্তি প্রভাবে বৈখরী ধ্বনির উৎপত্তি। প্রাণশক্তিই বাক্‌শক্তিকে পরিচালনা করে। ইহা একটু কালচক্র অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। গতিরূপ মকর রাশি এবং স্থিতিরূপ কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে বসু নক্ষত্র ধ্বনিষ্ঠা অবস্থিত।

কালচক্রে যাহা মকর ও কুম্ভরাশি তাহা কালরূপ শনিগ্রহের গৃহ। ধনু ও মীন রাশি তাহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। তাহারা হইল বৃহস্পতির কক্ষ। শনির গৃহে শ্রবণ কার্য্যের নক্ষত্র শ্রবণা যাহার দেবতা নারায়ণ এবং বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি অর্থাৎ বৈখরী শক্তি। আত্ম চেষ্টার তীব্র কষাঘাত কণ্ঠনালীতে মৃদু আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়ন হেতু যে মৃদু ধ্বনি নির্গত হয় তাহা কেবলমাত্র ধ্বনি বিশেষ। এই যে সঙ্গীত ধ্বনি যাহা শ্রবণে শ্রুত হইতে পারে তাহাই হইল শ্রুতি। কারণ শ্রুতি হইল শ্রু+ক্তি ণ। শ্রু অর্থে শুনা। অর্থাৎ স্বরাবয়ব। সূক্ষ্ম স্বর বিশেষ। "শ্রূয়তে সা শ্রুতি।"

এই স্বরোতপত্তির প্রথমাবস্থায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাহাই শ্রুতি। মহাকবি মাঘ বলিয়াছেন—

"শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভ কারয়বঃ শব্দ বিশেষঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতি হইল স্বরের আরম্ভকারী শব্দ বিশেষ।

নারদী শিক্ষা বলেন—

"যথাপ্সু চরতাং মার্গো মীনানং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গণাং তদ্বত্ স্বরাগতা শ্রুতি ॥"

অর্থাৎ মৎস্য যখন জলে চলে তাহাদের মার্গ যেমন উপলব্ধি করা যায় না এবং আকাশে উড্ডীন বিহঙ্গেরও যেমন মার্গ বোঝা যায় না সেইরূপ স্বরান্তর্গত শ্রুতিও বোঝা যায় না।

সঙ্গীত দর্শন বলেন—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদো অনুরণনং বিনা
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতিমর্তা ॥"

অর্থাৎ অনুরণন বিনা যে ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় তাহাই শ্রুতি। বিভিন্ন শ্রুতির সংখ্যা দ্বাবিংশ—যাহা শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা।

অনুপসঙ্গীত রত্নাকর বলেন—

"শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।"

অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে ধ্বনি তাহাই শ্রুতি।

অনুপসঙ্গীত বিলাস বলেন—

"প্রথম তন্ত্রয়ামাহতায়াং যা ধ্বনিরুৎপদ্যত সা শ্রুতি।"

অর্থাৎ তন্ত্রে প্রথম আঘাত হেতু যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই শ্রুতি।

এই সকল হইতে দেখা যায় যে অনুরণন রহিত শ্রবনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে ধ্বনি উৎপাদিত হয় তাহাই শ্রুতি। এবং তাহাদের সংখ্যা দ্বাবিংশ।

ইহা একটু বিশ্লেষন করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ধ্বনির প্রথমাবস্থায় কণ্ঠে কম্পন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয় না। সবে তাহার আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়ন ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া সংযত হইয়া ছন্দোযুক্ত কম্পনে পরিণত হইয়া যে নির্গত ধ্বনি কালিক অবস্থা হেতু মনোরঞ্জন করে তাহা স্বর নামে অভিহিত হয়। "স্বতঃ রঞ্জক্তি সা স্বরঃ।"

"স্বয়ং যো রাজতে নাদ স স্বর পরিকীর্ত্তিত।"

শৃঙ্গাহার—

অর্থাৎ যে স্বয়ং ধ্বনিকে রঞ্জন করে তাহাই স্বর।

সঙ্গীতের স্বর কালিক নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত বায়ুর স্থায়ী স্পন্দনের দ্বারা ঘটিত হয়। এই স্পন্দন আমাদের কর্ণরন্ধ্রে বায়ুকে কম্পন করিলে আমরা স্বর অনুভব করি। এই কম্পনের সংখ্যা অধিক হইলে স্বর তার স্বর হয়। মন্দ হইলে মন্দ্র হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে দুইটী বিভিন্ন স্বরের মিশ্রণে সুখানুভব বা দুঃখানুভব ঘটিতে পারে। কোন এক স্বরের কম্পন সংখ্যা যখন অপর কোন স্বরের দ্বিগুণিত হয় তখন স্বর দুইটী সুখানুভবের সহিত একেবারে এক হইয়া মিশিয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটী স্বরের মধ্যে আর্য্যগণ বলেন পার্থক্য অনুভবযোগ্য ২২টী শ্রুতি আছে। তাহারা যথা—

"তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী
রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী. ক্রোধা, বজ্রিকা,
প্রসারিণী, মার্জ্জনী, প্রীতি, ক্ষিতি, রক্তা,
সন্দিপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী
রম্যা, উগ্রা ও ক্ষোভিণী ॥"

সুশ্রাব্য স্বর বাহির হইবার পুর্ব্বে কণ্ঠ হইতে মৃদু শব্দ উত্থিত হয় এবং ক্রমে তাহা পুষ্টিলাভ করিয়া সংযত ভাব অবধারণ করিয়া সুষ্ঠু ছন্দোযুক্ত ধ্বনিতে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমস্ত কাকলি ধ্বনি বিমুক্ত হইয়া সুশ্রাব্যরূপে নির্গত হয় এবং ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম স্বর ষড়্জ। এবং এই যে স্বর সমূহ নির্গত হয় ইহারও একটি ক্রমিক রীতি আছে। যথা সঙ্গীতদর্পণ বলেন—

"হৃদিমন্দ্রো গলে মধ্যো মূর্দ্ধিতার ইতি ক্রমাৎ।
দ্বিগুণঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বস্মাদয় স্যদুত্তরোত্তরঃ ॥
এবং শরীর বীণায়াং দারব্যাস্ত বিপর্য্যয়ঃ ॥"

অর্থাৎ হৃদি মন্দ্রো, কণ্ঠে মধ্য ও মস্তকে তার। এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ হয়। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য, মধ্যের দ্বিগুণ তার। মন্দ্রস্থানের স্বর সপ্তক মধ্যস্থানের দ্বিগুণিত হইবে এবং মধ্যস্থানের স্বর সপ্তক তার স্থানে দ্বিগুণিত হইবে। এই সমস্তই শরীর বীণায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ কণ্ঠ সঙ্গীতে এই সমস্ত হয়। যন্ত্রে শ্রুতির বিলাস অন্য প্রকার।

এই শ্রুতি সকলের সংখ্যা হইল ২২ এবং কালচক্রে শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যাও হইল ২২। এইখানে রবি থাকিলে বাক্‌দেবীর পূজা। দেবী সরস্বতীর সহিত শ্রবণা নক্ষত্রের সম্বন্ধ "সঙ্গীতের উৎপত্তি" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

স্বর স্থাপন নিমিত্ত শ্রুতি বণ্টনী সম্বন্ধে সঙ্গীতবিলাস বলেন—

"চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চ চতুঃশ্রুতি।
চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চ যথাক্রমম্ ॥"

অর্থাৎ—৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২

সঙ্গীতরত্নাবলী বলেন—

"চতশ্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে ॥"

অর্থাৎ পঞ্চম, ষড়্জ ও মধ্যমে চারিটী করিয়া শ্রুতি, ধৈবত ও ঋষভে তিনটী করিয়া শ্রুতি এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটী করিয়া শ্রুতি।

এইভাবে স্বর সপ্তকে ২২টী শ্রুতি সকলকে বণ্টন করিতে হইবে।

সঙ্গীতদর্পণ বলেন—

"তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দাছন্দোবত্যস্ত ষড়্জগাঃ।
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা চর্ষভে স্থিতাঃ ॥
রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাথে প্রসারিণী।
প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাং শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ ॥
ক্ষিতি রক্তা চ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে ॥
মন্তন্তী রোহিণী রম্যোত্যেতা ধৈবত সংশ্রয়াঃ।
উগ্রা চ ক্ষোভিনীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতি ॥"

অর্থাৎ তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী এই চারিটি শ্রুতি ষড়্জ স্বরে বসাইতে হইবে। দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা এই তিনটী শ্রুতি গান্ধারে বসিবে। বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী এই চারিটী শ্রুতিকে মধ্যমে বসাইতে হইবে। ক্ষিতি, রক্তা, সন্দিপনী ও আলাপিনী এই চারিটী শ্রুতি পঞ্চমে বসিবে। মদন্তী, রোহিণী ও রম্যা এই তিনটী শ্রুতি ধৈবতে বসিবে এবং উগ্রা ও ক্ষোভিনী এই দুইটী শ্রুতি নিষাদে থাকিবে। এইভাবে ৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২ একুনে মোট ২২টী শ্রুতি সপ্তস্বরে বণ্টন করিতে হইবে।

এই শ্রুতি ও স্বর স্থাপনা লইয়া বিশেষ মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ শ্রুতির আদ্যে স্বর স্থাপনা করিতে বলেন আবার কেহ বা স্বরসমূহ শ্রুতির অন্তে বসাইতে বলেন। কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই এবং ইহা লইয়া সুধী সমাজে বিশেষ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে! এই সকল মতদ্বৈধ হেতু এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কালজ্ঞান ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। আর্য্যদিগের কালচক্র সহায়ে কালজ্ঞান ভিন্ন কোন আর্য্যশাস্ত্র বোঝা যায় না। এই কালজ্ঞানের অভাব হেতু এত মতদ্বৈধ। সঙ্গীতে পণ্ডিতগণ আমাদের বৈদিক কালচক্রে কি নির্দ্দেশ করেন তাহা বুঝিতে প্রয়াসী হন নাই। কালজ্ঞান সহায়ে বুঝিতে চেষ্টা করিলে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না ও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। সেই হেতু কালচক্রের সাহায্য পাওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

কালচক্রে মেষরাশি অবস্থিত প্রথম নক্ষত্র হইল অশ্বিনী। অশ্বিনী হইল সংজ্ঞা সুত। সংজ্ঞা উৎপন্ন না হইলে স্বর শ্রুত হইয়াছে বলা যায় না। সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি হইল তীব্রা। তীব্রা কথাটী তীব্ ধাতু

হইতে উৎপন্ন। তীব্ অর্থে স্থূল হওয়া। প্রাণের বিকাশ নিমিত্ত স্থূল হইয়া বৈখরী বাকের উৎপত্তি। ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি।

দ্বিতীয় নক্ষত্র হইল ভরণী। ইহার দেবতা যম-যাহা সংযমনী শক্তি নির্দ্দেশ করে। প্রাণ বায়ুর সংযমন ভিন্ন স্বরোৎপত্তি হয় না। দ্বিতীয় শ্রুতি হইল কুমুদ্বতী। কু অর্থে পৃথিবী, শরীর। যাহা সংযমন হেতু দেহকে মুদ্ অর্থাৎ হৃষ্ট করে তাহাই কুমুদ। ইহাই হইল সঙ্গীতের দ্বিতীয় শ্রুতি।

তৃতীয় নক্ষত্র হইল কৃত্তিকা। ইহার দেবতা অগ্নি। সংযমন হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যাহা ধ্বনির মৃদুগতি দান করে তাহাই তৃতীয় শ্রুতি মন্দা। ইহা সকলেরই জানা আছে যে কালরূপী শনিগ্রহের অপর একটী নাম মন্দা। তৃতীয় নক্ষত্রের উদয়কালে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মস্তকোপরি বিদ্যমান থাকে। ইহা চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র এবং চন্দ্রই মন।

বৃষরাশিস্থ চতুর্থ নক্ষত্র হইল রোহিণী যাহা আরোহন ও অবরোহন ক্ষমতা প্রদান করে। রোহিণীর দেবতা হইল প্রজাপতি যাহা বিশেষ করিয়া প্রজনন করায় বীজ রোপণ নিমিত্ত। ইহাও চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র। চন্দ্র আহ্লাদ কারক। তাই চতুর্থ শ্রুতি হইল ছন্দোবতী। ছন্দঃ শব্দটী চন্দ্ আহ্লাদিত করা বা ছন্দ্ আচ্ছাদন করা পূর্ব্বক অচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। শ্রবনমননে যাহা প্রীতিপদ তাহাই ছন্দ।

পঞ্চম নক্ষত্র হইল মৃগশিরা। ইহার দেবতা হইল চন্দ্র। মৃগশিরা মার্গ ও দয়া নির্দ্দেশ করে। মার্গ সঙ্গীতে পঞ্চম শ্রুতি হইল দয়াবতী।

ষষ্ঠ নক্ষত্র হইল আর্দ্রা। ইহা মিথুন রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল রুদ্র। যাহা পীড়াদায়ক হইতে পারে। যখন পীড়া হইতে ত্রাণ করিয়া আনন্দ দায়ক ও প্রীতিকারক হইয়া তর্পিত করে তখনই ষষ্ঠ শ্রুতি রঞ্জনী। রঞ্জ অর্থে রং করা।

সপ্তম নক্ষত্র হইল পুনর্ব্বসু। ইহার দেবতা হইল অদিতি। ইহা মিথুন রাশিতে অবস্থিত হেতু রমন ক্রিয়ার জ্ঞাপক। সপ্তম শ্রুতি হইল রতিকা। রম্+ক্তি করিয়া রতি কথাটী উৎপন্ন।

অষ্টম নক্ষত্র পুষ্যা কর্কট রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল বাচস্পতি। অন্তঃজ্ঞানের নিমিত্ত ধ্বনির পুষ্টি। জ্ঞান দেবতা রুদ্র। অষ্টম শ্রুতি হই রৌদ্রী।

নবম নক্ষত্র হইল অশ্লেষা। ইহাও কর্কট রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা সর্প। নবম শ্রুতি হইল ক্রোধা। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্প কথাটী সৃপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ হইল সরে সরে যাওয়া। এইখানেই ধ্বনির শ্লিষ্ট গতির উপর লক্ষ্য হইল।

দশম নক্ষত্র হইল মঘা। ইহা সিংহ রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা পিতৃগণ। বেদে ইন্দ্রই পিতা এবং ইন্দ্রের একটী নাম মঘবন্। ইন্দ্রের অস্ত্র হইল বজ্র। বজ্র কথাটী বজ্ ধাতু অর্থে গমন করা+রক্। ইহা গতি নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বপুরুষের যাহাদের গতি ঘটিয়াছে তাহারাই পিতৃগণ। এইখানেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ ধরিয়া গতির নির্ণয়। তাই দশম

একাদশ নক্ষত্র হইল পূর্ব্ব ফাল্গুনী। ইহাও সিংহ রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল ভগ। ইহা বাচস্পতি বৃহস্পতির জন্ম নক্ষত্র। ইহাও বিস্তার, প্রসারণ, গমন নির্গমন নির্দ্দেশ করে। ভগ অর্থে ওষ্ঠও বোঝায়। রবের প্রসার নিমিত্ত একাদশ শ্রুতির নাম হইল প্রসারিণী।

দ্বাদশ নক্ষত্র হইল উত্তর ফাল্গুনী ইহার দেবতা অর্য্যমা। যাহার নিকট অর্ঘ্য যাচ্ঞা করে। অর্য্যমা পিতৃপতি ও কালধর—তর্পণ হেতু তৃপ্তি দান করে, ভোগ উৎপন্ন করে তাহাই অর্য্যমা। দ্বাদশ শ্রুতির নাম প্রীতি।

ত্রয়োদশ নক্ষত্র হস্তা। ইহা কন্যারাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল সবিতৃ। রব যখন প্রসবিত হইয়া পরিষ্কৃত ও শোভিত হয় তখনই ত্রয়োদশ শ্রুতি মার্জ্জনী। মার্জ্জনা অর্থে শোধন ও মৃদঙ্গ ধ্বনি।

চতুর্দ্দশ নক্ষত্র হইল চিত্রা। দেবতা ত্বষ্টা। যাহা ক্ষয় করিয়া বিচিত্রতার উৎপাদক তাহাই ত্বষ্টা। ইহাই বিশ্বকর্ম্মার ক্রিয়া। চতুর্দ্দশ শ্রুতি হইল ক্ষিতি। ক্ষিতি কথাটী ক্ষি ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্ষি অর্থে ক্ষয় বা বাস করা। এইখানেই বিচিত্রতার উদয়।

পঞ্চদশ নক্ষত্র হইল স্বাতী। ইহা তুলারাশিতে অবস্থিত। স্বয়মেব আচরক্তি ইতি স্বাতী। ইহার দেবতা বায়ু। বায়ুভুক্ত ধ্বনি যখন মধুর সুশ্রাব্য হইয়া আসক্ত ও অনুরক্ত করে তখনই পঞ্চদশ শ্রুতি রক্তা। রক্তা কথাটী রনজ্ ধাতু অর্থে রঞ্জন কথা হইতে সিদ্ধ।

ষোড়শ নক্ষত্র হইল রাধা। যাহা আসক্তি হেতু উদ্দীপনা ঘটায়। ষোড়শ শ্রুতির নাম হইল সন্দিপনী। এইখানেই ভাবের উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। রাধা নক্ষত্র কালচক্রে রবি অর্থাৎ রবের জন্ম নক্ষত্র। ভাবের উদ্দীপনা ব্যতীত কোন রবই সঙ্গীতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না। রবি হইতেই রবের বিচার।

সপ্তদশ নক্ষত্র হইল অনুরাধা। ইহা বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল মিত্র। যাহা বিশেষ করিয়া পরিচয় প্রদান করে। মিত্র কথাটী মিদ্ ধাতু অর্থে স্নেহ করা হইতে উৎপন্ন। সপ্তদশ শ্রুতি হইল আলাপিনী। আলাপ কথাটী লপ্ ধাতু অর্থে ভাষণ ও কথন হইতে উৎপন্ন। অনুরাধা নক্ষত্রও রবির জন্ম নক্ষত্র।

অষ্টাদশ নক্ষত্র হইল জ্যেষ্ঠা। ইহাও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা ইন্দ্র। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতি নিমিত্ত মনকে মত্ত করে তাহাই অষ্টাদশ শ্রুতি মদন্তী। মদ্ ধাতু অর্থে মত্ত করা।

ঊনবিংশ নক্ষত্র হইল মূলা। ইহা ধনু রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা নিঋতি। যাহার নিশ্চয়রূপে বন্ধন করিবার ক্ষমতা থাকে তাহাই নিঋতি। শ্রুতির রোপন, আরোহন ও অবরোহন হেতুই এই বন্ধন ঘটে। ঊনবিংশ শ্রুতি হইল রোহিনী।

বিংশ নক্ষত্র হইল পূর্ব্বাষাড়া। ইহাও ধনু রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা তোয়। যাহা বিস্তার শক্তি নির্দ্দেশ করে। বিস্তার হেতুই বিংশ শ্রুতি রমনযোগ্য হইয়া রম্যা নাম লাভ করে। বিস্তারেই প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য স্থূল পদ্মের নাম রম্যা। রম্যা রাত্রিকেও বুঝায়। রমন যোগ্য কালই রাত্রি।

একবিংশ নক্ষত্র হইল উত্তরাষাড়া। ইহার দেবতা বিশ্বদেব যাহা

প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান করে। এই কারণেই একবিংশ শ্রুতির নাম উগ্রা যাহার তীব্রতা ও প্রখরতা হেতু বিশেষ করিয়া প্রবেশশক্তিলাভ করে।

দ্বাবিংশ নক্ষত্রের নাম শ্রবণা। ইহা মকর রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা বিষ্ণু, যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বোঝায়। দ্বাবিংশ শ্রুতি হইল ক্ষোভিনী। ক্ষোভিও অর্থে চালিত, আন্দোলিত, ধর্ষিত ইত্যাদি। ইহার শক্তিতেই ভাবের অন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে।

আর্য্য সঙ্গীতে দ্বাবিংশ শ্রুতির সহিত কালচক্রের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝান হইল। এই শ্রুতি অবলম্বনেই আর্য্য সঙ্গীতে ভাব ও রসের বিকাশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সঙ্গীতের স্বর নির্গত হইবার একটি ক্রমিক রীতি আছে। হৃদয়ে মন্দ্র, কণ্ঠে মধ্য ও মস্তকে তার এবং তাহারা পরস্পরের দ্বিগুণিত হয়। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য ও মধ্যের দ্বিগুণতার। স্থান ভেদে এই যে অতি মন্দ্রাদি নাদভেদ ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই "গুণ" শব্দের অর্থ কি? শাস্ত্রকারগণ কি সঙ্গীতের ধ্বনির স্পন্দনের সংখ্যার তারতম্য বলিতেছেন। তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রকার গ্রাহ্য এই সূত্রের কোন অর্থই নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। কারণ এই সকলই শ্রুতি-স্বর সপ্তক-গ্রাম মূর্চ্ছনা ইত্যাদির বিজ্ঞানের উপর এই সুর সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। "গুণ" অর্থে যাহা গুণিত, অভ্যস্ত হইয়া থাকে তাহাই গুণ। কোন বস্তু আশ্রিত গুণ নহে। "গুণৈরিতি গুণ্যতে অভ্যস্যতে ইতি গুণাঃ" অর্থাৎ যাহা গুণিত হয় তাহাকে গুণ কহে। অভ্যাস শব্দের অর্থ হইতেছে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করণ। অতএব দেখা যায় এখানে গুণ অর্থে ধ্বনির প্রকৃতি ভূত কম্পন, স্পন্দন বা রণনের সংখ্যা জ্ঞাপক।

নাভিদেশে ধ্বনিত অতি মন্দ্র যে নাদ তাহাই দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয় কন্দরে অনুমন্দ্র স্থানে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এইরূপ কণ্ঠে, শীর্ষে উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত হইয়া যথাক্রমে মন্দ্র, মধ্য, তার, অতিতার এবং তার তীব্র ধ্বনি আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সাধারণ সঙ্গীতেও মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য ও মধ্যের দ্বিগুণ তার হইবে। এইরূপ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ স্পন্দন ক্রমে যে নাদ সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোন তাত্ত্বিক ভেদ নাই। নিম্ন ভূমিতে বা স্থানে গ্রহীত যে স্থায়ীস্বর তাহাই দ্বিগুণিত হইয়া উচ্চভূমিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই ধ্বনি সকল বায়ুর ক্রিয়া। শাস্ত্র যথা—সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

> "ন—কারং প্রাণনামানাং দ—কারং অনলং বিদুঃ।
> জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ নকার হইল প্রাণবায়ুর প্রতীক এবং দকার হইল অগ্নির প্রতীক। যখন প্রাণবায়ু সংযম হেতু তেজযুক্ত হইয়া নির্গত হইবার কালে প্রাণ ও অগ্নির সংযোগ ঘটে তখনই তাহাকে নাদ নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অগ্নিদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদর কালে বায়ু স্বরূপ কুম্ভ রাশিস্থ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মস্তকোপরি অবস্থান করে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের সপ্তমে রবের প্রতীক রবির জন্ম নক্ষত্র বিশাখা যাহার দেবতা ইন্দ্রাগ্নি।

কালচক্রে তুলা রাশির অধিপতি হইল স্বাতী নক্ষত্র। তুলা রাশি বস্তিপ্রদেশ, নিম্নদেশ ইত্যাদি স্থান নির্দ্দেশ করে। স্বাতী নক্ষত্র হইল "স্বয়মেব আচরতি"। স্বাতীনক্ষত্রের দেবতাবায়ু এবং তাহার সংখ্যা হইল ১৫। অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থিত অপান বায়ুর রণন সংখ্যা হইল ১৫। সেই বায়ু যখন দেহস্থ অনল হেতু উত্তপ্ত হয় তখন তাহার উর্দ্ধগতি হয়। এবং তাহা যখন স্বাধিষ্ঠান চক্রে আসিয়া পৌছে তখন তাহার রণন সংখ্যা ৩০ (কারণ দ্বিগুণঃ পূর্ব্বা পূর্ব্বাস্মদয়ঃ)। এবং তাহা যখন মণিপুর চক্রে উপস্থিত হয় তাহার রণন সংখ্যা ৬০। যখন অনাহত স্থানে আসিয়া পৌছে তখন রণন সংখ্যা ১২০ এবং বিশুদ্ধ স্থানে ঐ রণন সংখ্যা ২৪০ এবং আজ্ঞা চক্রে তাহার রণন সংখ্যা ৪৮০ ইত্যাদি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সপ্ত স্বরের প্রথম স্বরটীর অনুরণন সংখ্যা ২৪০ নির্দ্দেশ করেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ "দ্বিগুণঃ অষ্টমঃ" অর্থাৎ যে ধ্বনিটী যাহার দ্বিগুণ সেইটী তাহার অষ্টম (Octave)। মন্দ্রের অষ্টম মধ্য ও মধ্যের অষ্টম তার। স্থায়ীরূপে গৃহীত ধ্বনি বিশেষ হইতে দ্বিগুণিত অষ্টমটীর যে "দূরত্ব" বা "আন্তর" বা "ব্যবধান" তাহাই যথাক্রমে ষড়জাদি নিষাদান্ত স্বর সপ্তকের আবির্ভাব স্থান। সপ্তক বিশেষের অন্ত বা সপ্তমটী তন্নিম্ন ভূমির অন্তিম স্বরের উর্দ্ধ। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি (repetition)। ষড়জাদির এই আবাস ভূমিকে "স্থান" বলা হয়। অতি মন্দ্রাদি নামে প্রত্যেক বিভিন্ন স্থানে এই স্বর সপ্তকের আবির্ভাব হেতু আর্য্যসঙ্গীতে এই স্থানকে সপ্তক বলা হয়।

স্থায়ী বা গ্রহ স্বরের এই যে অষ্টম ইহা সেই স্থানীয় স্বর সমূহের বসিয়া সপ্তক বিশেষের উত্তর প্রান্তটী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। উত্তর প্রান্তীয় এই অষ্টম হইতে অধঃস্তন যে তুরীয় (চতুর্থ) ধ্বনি তাহাই "দ্ব্যর্দ্ধস্বর"। অর্থাৎ দ্বি-অর্দ্ধ স্বর। এই স্বরটীকে দ্ব্যর্দ্ধস্বর বলিবার হেতু এই যে ইহা গ্রাহ্য সপ্তকটীকে বাম ও দক্ষিণ ভেদে দুইটী অর্দ্ধের সমান অঙ্গের মধ্যবর্ত্তীরূপে বিরাজ করে। এই জন্যই এই দ্ব্যর্দ্ধস্বরের নাম হইল "মধ্যম্"। সপ্তককে দুইটী সমান অংশে বিভাজক "মধ্যম্" নামীয় এই দ্ব্যর্দ্ধস্বরের বামার্দ্ধে ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার এবং দক্ষিণার্দ্ধে পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ অবস্থিত।

বাদ্যযন্ত্রে শ্রুতি সমূহের নাম যথা—

> "নন্দনা নিষ্কলা গূঢ়া সকলা মধুরাতথা।
> ললিতে কাব্দরা ভ্রগজাতিশ্চ হ্রস্ব গীতিকা॥
> রঞ্জিকা চাপরা পূর্ণা তথা অলঙ্কারিণী মতা।
> বৈণিকা ললিতা চৈব ত্রিস্থানা সুস্বরা তথা॥
> সৌখ্যা ভাষাঙ্গিকা চাথ বর্ত্তিকা।
> ব্যাপকা ততঃ প্রসন্না সুভগা ইতি যন্ত্রজা শ্রুতয়োমতাঃ॥
> অনুপ সঙ্গীত বিলাস।

শ্রুতি কি তাহা এক কথায় বলিতে গেলে এই বলা যায় যে সুর সপ্তক মিলিত সঙ্গীতের একটী গ্রামের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি যোগ্যমাত্র ২২টী অতি অধিষ্ঠান করে এবং তাহাদের বিশেষ বণ্টন লইয়াই আর্য্য-সঙ্গীত। এই কারণে আর্য্যসঙ্গীতের গ্রাম অধুনা প্রচলিত tempered scaleএর গ্রামের সহিত বিশেষ বিভিন্ন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—The definite pitch within the octave is sruti and continuity of sound based on a definite pitch with all its harmonics is স্বর।

এই কারণেই আর্য্যসঙ্গীতে স্বরের ক্রমবিকাশ খণ্ডিত করা চলে না। Continuity of notes is a speciality in Indian music.

পুণ্যতীর্থ হালিসহর-কুমারহট্ট

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—এক—

দেড়শত বৎসর আগে ভাগীরথীর তীরে যে সকল পল্লীগ্রাম, সহর ও বন্দর ছিল তাহার ইতিহাস বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। সে বিবরণ আমরা কয়েক খানি প্রাচীন মানচিত্র হইতে জানিতে পারি। একখানি হইতেছে রেণেলের মানচিত্র (Rennel's Atlas, 1779), অপর দু'খানি হইতেছে টেসিনের বাঙ্গলার মানচিত্র (Tassin's Bengal Atlas, তৃতীয়খানি হইতেছে চার্লস জোসেফের মানচিত্র। এই মানচিত্রগুলি বিশেষরূপে মূল্যবান্, কেননা এই মানচিত্রখানিতে হুগলী নদীর দুই তীরে, সেই বেণ্ডেল হইতে গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান অট্টালিকা, মন্দির ও ঘাটের পরিচয় আছে। চার্লস জোসেফের মানচিত্রখানি প্রকৃতপক্ষে; Topographical Survey of the River Hooghly from Bandel to Garden Reach, exhibiting the Principal Buildings, Ghats, and Temples on both banks, executed in the year 1841 by Charles Joseph. দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান্ মানচিত্র খানি দেখিবার সুযোগ আমি পাই নাই। এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাই, জাতীয় পাঠাগার (National Library) তেও সন্ধান মিলে নাই। সেকালে কলিকাতা সহরের অবস্থা এবং গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের বর্ণনা—কৌতুহলের উদ্রেক করে।

শিবের গলি (রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা)

রেনেলের মানচিত্রে উল্লিখিত স্থান সমূহের পরিচয় (Rev. Mr. Long) দিয়াছেন পাদ্রী লঙ্গ সাহেব। সুন্দর ও বিচিত্রভাবে। হালিসহর সম্বন্ধে তাহাতে অনেক কথা আছে। সে সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হালিসহর ছিল, স্মৃতি শাস্ত্রের পঠন ও পাঠনের জন্য বিখ্যাত। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত বলরাম তর্কভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আসিতেন।

বলরাম তর্কভূষণ ছিলেন অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ। গঙ্গার তীরে তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন অর্থ বা দান গ্রহণ করিতেন না। এমনি ছিল তাঁহার কঠোর রীতি ও নিষ্ঠা।

গল্প আছে একবার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গা তীরে নামিয়াছেন, এমন সময় একজন কুম্ভকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল,—তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কস্ত্বং', কুম্ভকার উত্তর করিল—'কুম্ভকার অহম্'। রাজা বিস্মিত হইলেন, যে গ্রামের একজন সাধারণ কুম্ভকার, সংস্কৃত ভাষা বোঝে এবং কথা বলিতে পারে, সে গ্রামে নিশ্চয়ই সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রভাব খুব বেশী এবং পণ্ডিতের বাসস্থান। তিনি গ্রামে একটি বাজার স্থাপন করিলেন—গ্রামের নাম হইল কুমারহাট্টা বা কুমারহট্ট।

ঘোষালদের প্রতিষ্ঠিত শিবেরগলির জোড়ামন্দির (অনুমান ৭৫ বৎসর)

সেজন্যই হালিসহর কুমারহট্ট নাম সকলের কাছে পরিচিত। ঐ গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে কুমোরদের নির্ম্মিত মাটির হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে বলরাম তর্কভূষণের কথা বলিয়াছি, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম সে সময়ে দেশ বিদেশে প্রচারিত ছিল। তৎকালে হালিসহরের প্রায় প্রতি পল্লীতেই ছিল, টোলও চতুষ্পাঠি। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও সেখানে ও তাহার আশেপাশে প্রায় দ্বাদশটি চতুষ্পাঠি বা সংস্কৃত কলেজ বিদ্যমান ছিল। সিদ্ধ সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন ছিলেন বলরাম তর্কভূষণের সমসাময়িক।

সেকালে হালিসহরের বড় একটা দুর্নাম ছিল। প্রচলিত প্রবাদ ছিল—'গুপ্তিপাড়ার বাঁদর হালিসহরের তেঁদড়।' তেঁদর মানে মাতাল। আমাকে

হালিসহরবাসী বন্ধুরা বলিয়াছিলেন যে এখানকার গোরুরা পর্য্যন্ত সে সময়ে মদ খাইত ! অর্থাৎ ধেনো মদের ভাঁটিতে যাহারা মদ খাইত,তাহারা মদ খাইয়া সেই কলার পাতাগুলি যথেচ্ছা বাহিরে ফেলিয়া দিত, গোরুরা পরম আনন্দে সেই পাতা খাইয়া সন্ধ্যাবেলা টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিত এবং আবার দিনের বেলা সেই ভাটিতে গিয়া উপস্থিত হইত ; নেশার এমনি ছিল আকর্ষণ। হালিসহরবাসীরা অধিকাংশ লোকই ইতর-ভদ্র এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সকলেই সুরাপান করিতেন। লঙ সাহেব সুরাপানের এইরূপ আধিক্যের বিষয় চাপাইয়াছেন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উপর। তিনি বলেন—' Halisahar is noted for its drunkards, and particularly for drunken women, one reason
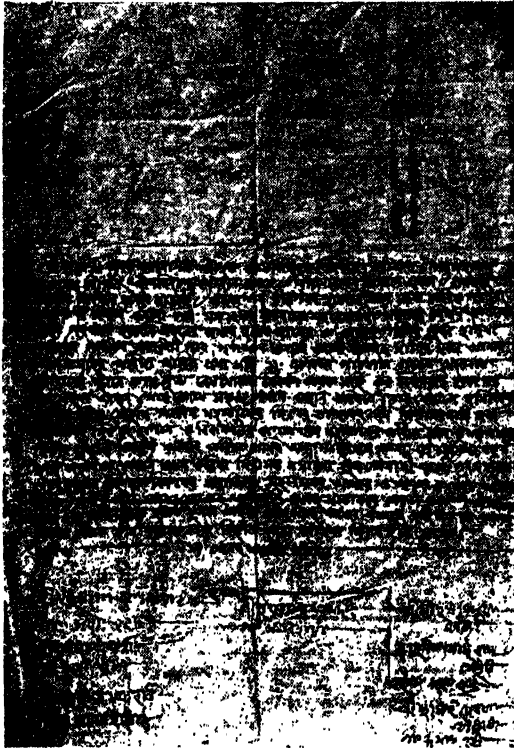
১নং দলিল

ascribed to for it is, that many Brahman from the East Bengal reside here, and follow the Tantra system which encourages drunkenness. অর্থাৎ তান্ত্রিক মতাবলম্বী পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণ এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকার ফলে—হালিসহরে সুরাপানের প্রচলন অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা আসিয়াছিলেন, তাহা সত্য হালিসহরবাসীদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বলিয়া স্বীকার করেন। লক্ষ্মীকান্তের জীবনী প্রণেতা এ, কে, রায় (A. K. Ray M. A Lakshmikanta নামক গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায়

"He invited to his domain many respectable Kaysthas of Konnagar Mitras, Dattas and Basus, experienced physicians of the Vaidy a Caste from Vikrampur and Dravidian Vedic savants and settled on them gifts of land, at Halisahar, Kanchrapara. Gariffa and Bhatpara which were then all included within Mauza Halisahar where they made their permanant abode."
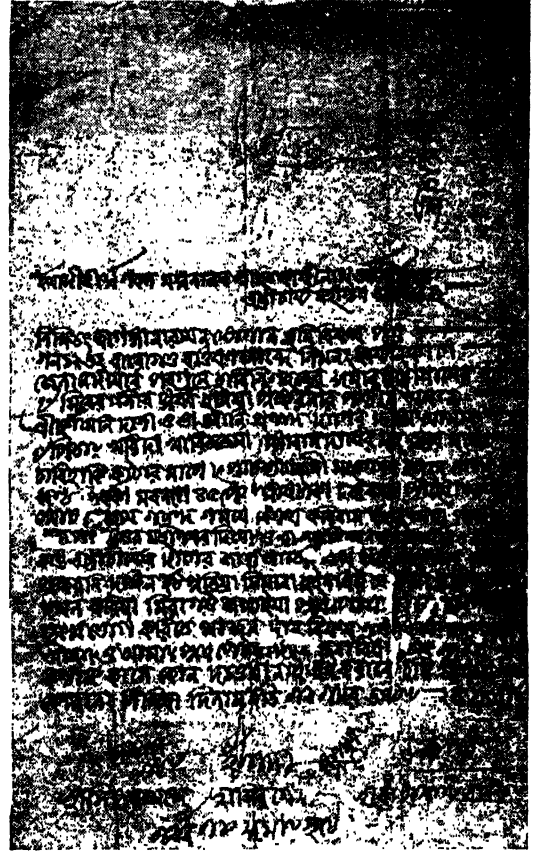
২নং দলিল

লক্ষ্মীকান্ত নানাস্থান হইতে নানাজাতি আনিয়া হালিসহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন্নগর হইতে মিত্র, দত্ত এবং বসুবংশীয় কায়স্থদের এবং বিক্রমপুর হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসক বৈদ্য-বংশীয়দের এবং দাক্ষিণাত্যের বৈদিক পণ্ডিতদের ভূমিদান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়া, গরিফা এবং ভাটপাড়া প্রভৃতি সে সময়ে মৌজা হালিসহরের অন্তর্গত ছিল, এবং সে সময়ে অনেকেই হালিসহরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

ঐ প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন :—'At Halisahar, Ramkamal Sen had his country seat ; *he was of low origin*, his father was a native doctor ; Professor Wilson patronised him employment in his printing office, afterwords in the mint, where he studied English and sanskrit, and subsequently became Assistant secretary to the Sanskrit College···Halisahar formed a Zillah last century : it has a population of about 30,000, 4000 of whom are the Bhandralok or Hindu gentry.*

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহকে 'he was of low origin. লেখা অদ্ভুত বলিতে হইবে। এই আশ্চর্য্য তত্ত্বটি কোথায় লঙ সাহেব
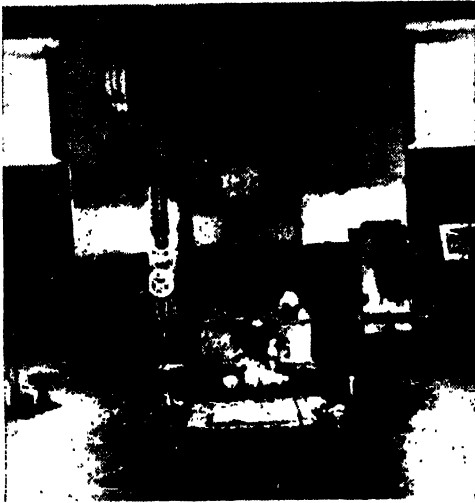
রামপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত ভবনে পূজার বেদী

পাইলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৎসমকালে এবং পরবর্ত্তী কালে রামকমল সেন মহাশয়ের জীবনী লেখকগণ এবং ব্রহ্মানন্দের জীবন আখ্যায়িকা রচয়িতাগণ কোনরূপ প্রতিবাদ বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। রামকমল সেন মহাশয় সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশীয় এবং গৌরীভা গেরীফা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখার কেহ কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের জীবন চরিত লেখকেরা তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, জনসাধারণের শিক্ষা, শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সুলভ সমাচার পত্রিকা প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে সেকালের সংবাদপত্র, সরকারী বিবরণ হইতে কেহ সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুযায়ী জীবন-চরিত লিখিত হয় নাই—এ বিষয়ে বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিবেন, তাঁহাদের কেশবচন্দ্রের জীবনীর লুপ্ত তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করিতে হইবে। কেশবচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনতার প্রদীপ্ত প্রতীক।

হালিসহরের সুরাপানের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে তুলিয়াছি। এবিষয়ে আমরা বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণী হইতে কিছু কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি (The First Report of the Bengal Temperance Society)। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড C. H. A. Dall. কলিকাতাতে প্রথম সুরাপান নিবারণী সভার কার্য্য আরম্ভ. করেন। তাঁহার উদ্যোগে কলিকাতা সহরে প্রায় ৮০০ জন ভদ্রলোক ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর এই সমিতি ব্যাপকতা লাভ করে। হালিসহরেও ১৮৬৩-১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে Fraternities of the Bengal Temperence Societyর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত

রামপ্রসাদ ও তদীয় পত্নী যশোদা দেবী (আনুমানিক পটুয়া অঙ্কিত চিত্র)

হয়। তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। স্থান-হালিসহর সম্পাদক গিরিশচন্দ্র রায় Clerk Messrs Ernesthanssen & Co. হালিসহর-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায়ের পরিচয় আমরা বিস্তারিত ভাবে পাই নাই। হালিসহর গ্রামবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারেন।

সে সময়ে "সুরাপান কি ভয়ঙ্কর" (How dreadful is drinking wine) নামে একখানি পুস্তিকা মাগুড়া Fraternityর বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশ করেন ও বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। হালিসহর Fraternity Societyর এক অধিবেশনে বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হালিসহরের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং তথায় সুরাপান নিবারণী সভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন,

* Calcutta Review Vor. VI. Pages 409-407.

হালিসহর মাদকনিবারণী সভা হইতে উহা প্রকাশিত হয়—"Which hasbeen published by the Halisahar Fraternity both the pamphlets were presented to this society for distribution. তাহা সোসাইটি হইতে বিতরিত হয়। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হালিসহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার লিখিত ও প্রচারিত হালিসহরের বিবরণ (Description of Halisahar Etc. আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই। যদি হালিসহর বাসী কাহারো নিকট বা কোন লাইব্রেরীতে উহা থাকে দেখিলে উপকৃত হইব। ১৮৬৪ সালে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয় কাজেই লঙ সাহেবের লিখিত বিবরণীর প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পরের কথা।

হালিসহর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে জেলা চব্বিশ-পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। হালিসহর, হাবেলিসহর নামে পরিচিত ছিল।

বর্ত্তমান রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডি আসনের অধিকারিণী—'গুরু মা'

আমরা এখানে যে দুইখানি দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবেন। দুখানি দলিলই জমি বিক্রয়পত্র।

শ্রীনবিনচন্দ্র ঘোষাল

সাং—কুমারহট্ট শীবেরগলি

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

ইয়াদী কির্দ্দিং সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষাল ওলদে ৺গঙ্গানারায়ণ ঘোষাল এবনে ৺রামহরি ঘোষাল সাকীনে কুমারহট্টোর ৺শীবের গলি পরগণে হাবেলি সহর জেলা চব্বিশপরগণা কস্য ভূমি বিক্রয় কবালা পত্র সন ১২৪২ সন বারোশত বিয়াল্লিস সনোব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে পরগণে হাবেলি সুহরের কুমারহট্টো শীবের গলির পূর্ব্ব হাদুয়া পুষ্কন্নির পচ্চীম এককিত্তা পার দুর্গামণি দাসীর ভবানী প্রসাদ দাষের দরুন আমার ৺পিতামহের খরিদা খারিজ জমা জমি ১।০ এক বিঘা পাচকাঠা রায়েত আওলাত মহাশয়ের স্থানে নগদ মূল্য বেন মোক্তা সিক্কাপরক সহি ৯৯ নিরানব্বই টাকা দস্তবদস্ত লইয়া আপন খোষ রেজায় সচ্ছন্দ সময়ে বাহাল তবিয়তে খোষ মেজাজে ভূমি বিক্রয় করিলাম ইহার চৌহর্দ্দি পচ্চীম মহাশয়ের দিকের তালুকের জমি সিধুদের বাটি পূর্ব্ব মহাশয়ের দিগের বাগান ও বিরুমন্দীর বাগান ও মত্র মহাশয়ের খরিদা জমি ও মহাশয়ের দিগের পুষ্কন্নি দক্ষীনে আমার খরিদা জমির আম্রগাছেরও এ খানা এই চতুসিমার পূর্ব্ব ভূমি মহাশয় আমল দখল করিয়া মিরাসত্ত জমাইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে রহ দান বিক্রয়ের সত্তাধিকারে মহাশয়ের আমার ও আমার ওয়ারিষ আনের সহিত কোন সত্তা নাই…ও কেহ দাত্তা করে সেটা ও—জমির উপর কেহ কস্মিন কালে হরকত আনে তাহার জবাবদিহি আমার এতদার্থে ভূমী বিক্রয়ের উপরের লিখিত বেবাক মূল্য বুঝিয়া লইয়া

রামপ্রসাদের স্মৃতি মন্দির

বিক্রীত কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ——১৬ সোলই ফালগুন সনিবার————

ইসাদী

শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার
সাং কুমারহট্ট	সাং কুমারহট্টো
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা	শ্রীমহেষচন্দ্র রায়চৌধুরী
সাং কুমারহট্ট	এই সাং কুমারহট্ট
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী	শ্রীনৃসিংহ দেবরায় চৌধুরী
সাং কুমারহট্টো	সাং কুমারহট্ট

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষাল

সাং কুমারহট্ট

৺ইয়াদিকীর্দ্দি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত কাশীনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশএ বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষাল ভূমি বিক্রয় পত্র—সন ১২৩২ বারোসত্ত বতিশ সনোব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা নদীয়ার পরগণে

হাবিলি সহরের কুমারহট্টে গ্রামের—৺শিবের গলির পূর্ব্ব হাতুয়া পুষ্করিণীর পশ্চীম অঞ্চলে—শ্রীদুর্গামণি দাসী ও শ্রীভবানিপ্রসাদ দাসের দরুণ আমার ৺পিতার খরিদা খারিজ জমা গঙ্গারাম দাষের মহলুম্বের মধ্যে চারি হাতি কাঠার মাপে ।• পাঁচকাঠা জমী মহাশয়ের স্থানে নগদ মূল্য সিক্কা মরলগে ৪৫ পৈতোল্লীষ টাকা দস্তবদস্ত পাইয়া আপন খোষ রেজায় সচ্ছন্দ সময়ে বিক্রয় করিলাম ইহার সিমা পশ্চীম…মহালএর দিগের ও শ্রীভবানীচরণ ভট্যাচার্য্যের ও শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্যের দিগের জাতা-আতের পূর্ব্ব মহালএ দিগের পুষ্করিণি দক্ষিণ ইটপুতিয়া সিমানা হইল এই চতুসিমা ভুমি আমল দখল করিয়া মিরাসাত্ত জম্মাইয়া পুত্র পৌত্রাদি পরম সুখে ভোগ করিতে থাকুন দান বিক্রয় সর্ব্বাধিকার মহাশএর আমার ও আমার পুত্র পৌত্রাদী ও ওয়ারিষগণের সহিত কস্মীনকালে কোন দাওয়া নাই এই করারে ভুমি বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ২৪ চৈত্র।

নিসানি সহি	ইসাদী নিসানি সহি	নিসানি সহি
শ্রীসিধুরাম দে	শ্রীসিবু	শ্রীরাধাকান্ত বণিক্

সর্ব্ব সাং কুমারহট্ট

* এ দু'খানি দলিল হইতে দুইটি বিষয় আমরা পরিষ্কারভাবে জানিতে পারি। প্রথম কথা হালিসহরের পূর্ব্ব নাম ছিল হাবিলি সহর, দ্বিতীয় হালিসহর ১২৩২ সালে, ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে ১৭২৫ সালেও নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার দশবৎসর পরবর্ত্তী দলিলে বাঙ্গলা ১২৩২ ও ইংরাজী ১৮৩৫ সালের দলিলে হাবেলি সহর পরগণা জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। এখনও হালিসহর চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত।

আমি কয়েকবার হালিসহর গিয়াছিলাম।—৭ই ডিসেম্বর ১৯৫২ (বাঙ্গলা ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ সাল) রবিবাসরের এক সভার অধিবেশনে গিয়াছিলাম এবং পরেও কয়েকবার গিয়াছি। শেষবার হালিসহর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমান গোপালচন্দ্র মজুমদার আলোকচিত্র-শিল্পীকে সহ দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিবার জন্য যাই।

হালিসহর যে এক সময় বৃহৎ ও সুন্দর বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী বা নগর ছিল তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। প্রায় কুড়িটি পাড়ায় পল্লীটি বিভক্ত। প্রথমে শিবের গলি যাই। সেখানে গ্রামের প্রাচীন, প্রৌঢ় ও বহু তরুণ বন্ধুবান্ধব ছিলেন। প্রথমেই শিবের গলি ধরিয়া চললাম। পথটির দুই পাশেই বাড়ীঘর, এপথে যাইবার সময় বামদিকে পড়িল ঘোষালদের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির। বেশীদিনের পুরাতন নয়, অনুমান ৭০।৮০ বৎসর। প্রতিষ্ঠাতার নাতিনী জীবিতা। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ আছেন। ভগ্ন জীর্ণ মন্দির। রাস্তা হইতে একটু উপরে। মন্দিরের সম্মুখে ও পশ্চাতে জঙ্গল। অযত্নে মন্দির ধ্বংসোন্মুখ। একদিন বড় আশা বুকে করিয়া যাঁহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা কোথায়? সন্ধ্যায় কেইবা আরতি দেয়, কেইবা প্রদীপ জ্বালায়। সেখান হইতে আমরা পঞ্চবটী পঞ্চমুণ্ডীর আসন সন্নিকটে আসিলাম। ছায়াশীতল পবিত্রস্থান। এখানে গ্রামের বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। লাইব্রেরীটি দেখিলাম। রামপ্রসাদের জীবনী ও পদাবলী সংক্রান্ত গ্রন্থ সংখ্যায় বেশী নাই। রামপ্রসাদের স্মৃতি মন্দিরটি গ্রামবাসীর চেষ্টা যত্নে ও উদ্যোগে গড়িয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের মধ্য প্রকোষ্ঠে পূজার বেদী। বর্ত্তমানে রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডি আসনের অধিকারিণী শুনিলাম গুরুমা। আমরা তাঁহাকে দেখি নাই।

স্বর্গত রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নী যশোদা দেবীর একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন: "কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার পত্নীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণখচিত সমুজ্জ্বল চণ্ডী মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতীর ছবি দুটি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন হালিসহর অঞ্চলটা রামপ্রসাদের স্মৃতিময়, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার বাড়ী হালিসহর কুমার পাড়া, এই স্থানটি রামপ্রসাদের গৃহ ও 'পঞ্চমুণ্ডী' হইতে অর্দ্ধ-মাইল দূরে, একপাড়া বলিলেই হয়। গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীও এক মাইলের মধ্যে এবং তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ছবি আঁকাইয়া ছিলেন। সেখানকার লোকের মুখে শুনিয়াই উক্ত পার্শ্চর ভক্তদ্বয়ের ছবি রাম-

রামপ্রসাদের ভিটা—হালিসহর—রবিবাসরের সদস্যবৃন্দ

প্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরূপ। এখন যেমন কালীমূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া অনেক সময়ে পরমহংস দেবের ছবিও তৎপার্শ্বে আঁকা হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রতিবেশী পটুয়া যে ভক্ত আঁকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নীর ছবি আঁকিবে, তাহাও তেমনি স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের পত্নী কালিকাদেবীর দর্শন পাইয়াছেন একথা কবি স্বয়ং বলিয়াছিলেন।*

আমরা দীনেশবাবু যে মূল পটটি হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সেই পটটির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সন্ধান মিলে নাই। দীনেশবাবুর পুত্রেরাও জানেন না মূল পটখানি কোথায় আছে। দীনেশবাবুর ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ও গবেষণাকারী সত্যানুসন্ধান প্রয়াসী ব্যক্তি যাঁহার নিকট হইতে পটখানি পাইয়া অবলীলাক্রমে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নী যশোদা দেবীর চিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একেবারে অলীক নহে বলিয়া আমি হালিসহর যাই, কিন্তু এ বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অবশেষে আমি এ বিষয়ের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য হালিসহর রায়মাসীরগলি নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্য গাঙ্গুলি মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন :—"আপনার নির্দ্দেশ অনুযায়ী খাসবাটির গোপেন ভট্টাচার্য্য এম-এর নিকট সংবাদ সংগ্রহের (ঐ চিত্রের বিষয়ে) চেষ্টাতেই আপনার পত্রের উত্তর দিতে কিছু দেরী হইল। গোপেন আমার সহপাঠী, আবাল্যবন্ধু কিন্তু অনেকদিন হইতেই তাহার মস্তিষ্কের কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে, সকল সময়ে পূর্ব্বাপর সাধারণ বোধ থাকে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই এবং আপনি বোধ হয় সে সংবাদ জানেন না। যাহা হউক অনেক চেষ্টায় জানিতে পারিলাম তাঁহার বাটীতে ঐ চিত্র বংশানুক্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল···তার পর তাহার সুস্থাবস্থায় এম-এ দিবার সময় প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বিষয়ে সেও কিছু গবেষণায় লিপ্ত হয় এবং তাহার অধ্যাপক ৺ডাঃ দীনেশ সেন মহাশয়ের নিকটতম ঘনিষ্ঠতার সংস্পর্শে আসে। সে সময়েই সেই ছবি সে ৺ডাক্তার দীনেশ সেন মহাশয়কে দেখায় এবং ঐ চিত্র সেই অবধি তাঁহার নিকটই থাকিয়া যায়। ঐ চিত্র যে এখন কোথায় এবং কাহার অধিকারে তাহা সে বলিতে পারে না। সম্ভব ৺দীনেশ সেন মহাশয়ের বাটীতেই আছে।" দীনেশবাবুর বাড়ীতে ইহার সন্ধান মিলে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আছে কিনা তাহাও অবগত নহি। আমরা চিত্রখানি এখানে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু এই চিত্রখানিকে রামপ্রসাদ ও তদীয় পত্নীর চিত্র বলিয়া আমার মনে হয় নাই, সেজন্যই অধুনা প্রকাশিত মৎ প্রণীত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করি নাই। এই চিত্রের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে যদি কেহ আমাকে জানান তবে উপকৃত হইব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* বৃহৎবঙ্গ প্রথমখণ্ড। সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভূমিকা। ২৷৷/। ১৩৪১।

সুগন্ধ

যামিনীমোহন কর

ললিতা মেয়েটি ভাল। দেখতে শুনতেও যেমন, কাজে কর্ম্মেও ঠিক তেমনই। স্বামী নরেন্দ্রনাথ বেশ বড় চাকরী করে। বাড়ীতে লোকজনের অভাব নেই। তবু ললিতা সংসারের অনেক কাজ নিজের হাতে করে। চাকর বাকরের কাজে তার মন ওঠে না। বিশেষ করে স্বামীর জন্য নিত্য নতুন রান্না তার করা চাই-ই। বহুদিন এমন হয়েছে যে, স্বামী অফিস থেকে ফিরেছে, তখনও ললিতা রাঁধছে। হলুদের ছোপ লাগা শাড়ী পরে এসেছে স্বামীকে চা খাওয়াতে। নরেন কতদিন বলেছে, "লতু তোমার এত খাটবার দরকার কি? লোকজন রেখে দিয়েছি কি জন্য ?"

ললিতা মৃদু হেসেছে, কিন্তু স্বামীকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবার সখ ছাড়তে পারে নি।

সেদিন দুপুরে ললিতা এক মাসিক পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, লেখা রয়েছে, "স্বামীকে সর্ব্বদা প্রেমিক হিসেবে দেখবেন। তাঁর অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার সময় সেজেগুজে থাকবেন। স্বামীরা ভালবাসেন স্ত্রীকে প্রিয়ারূপে কল্পনা করতে, সব সময় সুসজ্জিতা দেখতে। অন্যথা হলে প্রেমে ভাঁটা পড়ে।"

ললিতা চমকিত হল। তাইতো এতদিন কি ভুলটাই করছিল। রান্না ঘরে মাংস চাপান ছিল। বামুনকে সেটা নামাবার হুকুম দিয়ে স্নান করতে গেল। বামুন বিস্মিত হল।

স্নান সেরে ললিতা অপূর্ব্ব সাজসজ্জা করলে। মুখ ও কেশের প্রসাধনান্তে গায়ে ছড়িয়ে দিল স্বামীর প্রিয় সেণ্ট। স্বামীর বাড়ী ফেরার পূর্ব্বেই সুসজ্জিতা হল, ঠিক সেই নতুন বিয়ের সময়কার মত।

স্বামী এসে চেয়ারে বসতেই, ললিতা পা টিপে টিপে পিছন থেকে এসে নরেনের চোখ চেপে ধরলে। নরেন হেসে বল্লে—"হ্যাঁ গো, বুঝতে পেরেছি। আমার লতুরাণি, কি সুন্দর সুগন্ধ বেরোচ্ছে!"

ফিক করে হেসে, স্বামীর পাশে বসে সলজ্জ ভঙ্গীতে ললিতা প্রশ্ন করল—"কিসের গন্ধ বলতো দেখি ?"

নরেন উত্তর দিল,—"মাংসের। চমৎকার খোসবাই ছাড়ছে। আজ খাওয়াটা যা জমবে।"

উদ্‌গত অশ্রু চেপে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হায়রে সজ্জা, হায়রে সেণ্ট। কিছুক্ষণ পরে রোজকার বেশে সজ্জিতা হয়ে স্বামীর জন্য চা নিয়ে এল। ওদিকে মাসিক পত্রিকাটি তখন উনুনে পুড়ছে। মাংস রান্না হচ্ছে।

(রাগ-প্রধান)

মিয়ামল্লার—দাদ্‌রা

তোমার সাথে ঝড়ের রাতে প্রথম পরিচয়,
মনটী রেখে গেলে চলে সে কি গো অভিনয়।
সেদিন শ্রাবণ বাদল মুখর
ধরা দিল স্তব্ধ নীথর
বর্ষণেরি তালে তালে মনের কেকা গায়।
সেই লগনে তোমার আমার হয়েছিল দেখা
তুমি ছিলে সাথী-বিহীন্ আমি চির একা,
মুখোমুখী হলাম যেন—
কত যুগের পথ-হারানো—
দুজনারই অভিশাপের হল বুঝি ক্ষয়।

কথা—সব্যসাচী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

×   ০   ×   ×
না সা রা | সা ণ্ া পা | না সা রা | সা রা রা |
তো মা •র সা থে ০ ঝ ড়ে র রা তে ০

×   ০   ×   ০
রা রা সা | রা পা মজ্ঞা | -া -া রা | মা মা পা |
প্র থ ম প রি চয় ০ ০ ম নঁ টী • রে

× ০ × ০
সা পা পধা | র্ণা ধা পা | মা পা মজ্ঞা | -া -া মা |
খে গে লে ০ চ লে সে কি গো ০ ০ অ

× ০ × ০
রা সমা রসা | ণ্া-ধ্া না সা II মা মা পা | ণা ধা পা |
ভি ন০ ০০ ০ ০ ০ য় সে দি ন শ্রা ব ণ

× ০ × ০
পা না না | র্সর্ণা র্সা র্সা | ণা ধা না | র্সা র্রা র্রা |
বা দ ল মু০ খ র ধ রা দি ল ০ ০

× ০ × ০
রা র্সা মা | মা ধা সা | না র্সা র্রা | র্সমা র্সা সা |
স্ত ব্ ধ নী থ র ব র ষ ণে০ রি ০

× ০ × ০
না ধা ণ্া | পা পা -া | মা মণা পা | মা জ্ঞা মা |
তা লে তা ০ লে ০ ম নে র কে কা ০

× ০
রা সা ণধা | না সা সা II রা ণা ধা | ণা পা পা |
গা ০ ০০ ০ ০ য় সে ই ল গ নে ০

পা মপা ণা | পা মজ্ঞা -া | মা মা রা | সা ন্সা রসা |
তো মা০ র্ আ মা০ র্ হ য়ে ছি ল দে০ ০০

ণা ধ্া ধ্া | ন্া ন্া ন্ধ্া | ন্া -া সা | ন্া সা -া |
থা ০ তু মি ছি লে সা ০ থী বি হী ন্

ধা ধা ণা | পা ধা মা | পা -া মা | জ্ঞা -া -া II
আ মি চি র এ ০ কা ০ ০ ০ ০ ০

মা মা পা | পণা ধণা পা | পা না -া | র্সা না র্সা |
মু খো ০ মু০ ০০ খী হ লা ম্ যে ০ ন

র্রা র্সা র্রা | র্রর্মা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞর্সা র্মা র্রা | র্সনা র্সা -া |
ক ত যু গে র ০ প থ হা রা০ নো ০

ণ্ ধা ণ্ | পা পা পমা | ধপা মজ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞমা রা |
দু জ নার ই অ ভি০ শা০ পে০ র হ ল০ বু

সা নসা রসা | ণ্ধা ন্া সা |
ঝি ক্ষ০ ০০ ০০ ০ য়

নৈমিষারণ্য তীর্থ

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

উদধিশ্যামসীমা ভারতভূমির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে সকল পবিত্র তীর্থস্থান ভারতের অতীত গৌরব ও বিস্ময়কর সাধনার সাক্ষ্যরূপে এখনও ভারত-বাসীকে অনুপ্রাণিত ও বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিতেছে নৈমিষারণ্য তীর্থ তাহাদের অন্যতম।

নৈমিষারণ্য নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বরাহপুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্জয় দানবসৈন্যকে চক্র দ্বারা এক নিমিষের মধ্যেই বিনষ্ট করিয়া মুনি গৌরমুখকে বলিয়াছিলেন যে নিমিষ মধ্যে এই দানবসৈন্য এই স্থানে বিনষ্ট হওয়ায় এই অরণ্যের নাম নৈমিষারণ্য হইবে এবং এস্থানে ব্রাহ্মণগণের আবাস হইবে।

> তেন চক্রেণ তৎসৈন্যং আমুরং দৌর্জ্জয়ং ক্ষণাৎ।
> নিমিষান্তরমাত্রেণ ভস্মবদ্বহুধা কৃতং॥
> এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা
> উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলাৎ॥
> অরণ্যেঽস্মিন্ ততস্ত্বেবৎ নৈমিষারণ্য সংজ্ঞকে
> ভবিষ্যতি যথার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥

মতান্তরে, এই স্থানের প্রকৃত নাম নৈমিশারণ্য। নৈমিশ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। শিব-পুরাণান্তর্গত বায়বীয় সংহিতায় বর্ণিত আছে যে সত্যযুগে ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পৃথিবীতে কোন স্থান তপস্যার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী এবং পরমপবিত্র। তদুত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা একটি চক্র সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর অভিমুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই চক্রের নেমি যেখানে বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, উহাই তপশ্চরণের প্রকৃষ্ট স্থান, নৈমিষারণ্য।

> এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
> যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
> তৎ বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপুজিতম্॥
> ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসংকাশং চক্রং সৃষ্ট্বা মনোময়ং।
> প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ॥

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ নৈমিষ ও নৈমিষ দুই প্রকার পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার দেবীভাগবতে দেখা যায়—ঋষিগণ কলিভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে পিতামহ তাঁহাদিগকে এক মনোময় চক্র প্রদান করিয়া বলেন, "হে ঋষিগণ, তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর, যে স্থানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাই পরম পবিত্র নৈমিষ ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সে স্থানে কলি কখনও প্রবেশ করিতে পারিবে না। যতদিন সত্যযুগ উপস্থিত না হয়, ততদিন নির্ভয়ে সেই স্থানে তপশ্চর্য্যা কর। ঋষিগণ চক্রের অনুগমন করিয়া সমস্ত দেশ পরিভ্রমণান্তে তাঁহাদের সমক্ষেই বিশীর্ণনেমি হইয়া পড়িল। তদবধি সেই পুণ্যক্ষেত্রের নাম নৈমিষারণ্য। কূর্ম্ম পুরাণেও দেখিতে পাই—

> দেশং বঃ যস্মিন্ দেশে চরিষ্যথ।
> ততো মুমোচ তৎ চক্রং তে চ তৎ সহমু ব্রজন্
> তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নেমিরশীর্য্যত।
> নৈমিষং তৎ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পুজিতম্॥
> সিদ্ধ চারণ সংকীর্ণং যক্ষ গন্ধর্ব্ব সেবিতম্।
> স্থানং ভগবতঃ শম্ভোঃ এতৎ নৈমিষং উত্তমম্॥
> (৪০ অধ্যায়—ষটকুলীয়ান্ প্রতি ব্রহ্ম বাক্যম্॥

এই পবিত্র নৈমিষারণ্য বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায় অবস্থিত। লক্ষ্ণৌর পরবর্ত্তী জংশন বালামৌ হইতে একটি শাখা লাইন ধরিয়া কয়েকটি ষ্টেশন পার হইলেই নৈমিষারণ্য ষ্টেশন। পূর্ব্বে ষ্টেশনের নাম ছিল নিমসার, স্বতন্ত্র ভারতে রেলওয়ে পরিচালকবর্গ উহাকে পূর্ব্ব নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুচিত কার্য্য করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যের প্রধান গৌরব, ইহা সমস্ত ঋষিগণের বাসভূমি এবং তপঃস্থান। সত্যযুগে স্বয়ম্ভুব মনু এবং তাঁহার পত্নী শতরূপা এবং সহস্র সহস্র ঋষিগণ এখানে বহু তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখানেই কুলপতি শৌনক দশ সহস্র মুনি সমভিব্যাহারে বাস করিতেন। যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন তিনিই কুলপতি হইতেন।

> মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি পালনাৎ।
> অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ এখানে একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং নালন্দায় শীলভদ্রের ন্যায় শৌনক একজন মহাস্থবির মুনিসত্তম পরিপালক ছিলেন। মহাভারতের প্রথমেই বর্ণিত আছে যে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে জিজ্ঞাসু মুনিগণের নিকট মহাভারতের কথা শুনাইয়াছিলেন। স্বয়ং মুনি ব্যাসদেব এই স্থানে তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন এবং সমুদয় পুরাণও এই পুণ্যক্ষেত্রে রচিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে যে শৌনকাদি ঋষিগণ নিমিষ—ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে স্বর্গকামনায় সহস্র সহস্র সত্রের অনুষ্ঠান করিতেন বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে নৈমিষক্ষেত্রে গোমতী নদীতে স্নান করিলে সর্বপাপক্ষয় হয়।

কিংবদন্তী অনুসারে—নৈমিষারণ্য একটি পীঠস্থান. বিষ্ণুচক্রে কর্ত্তিত সতীদেহের অংশ (হৃদয়) এস্থানে পতিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এইরূপ লিখিয়াছেন এবং বর্ত্তমান নৈমিষারণ্যে অধিষ্ঠিত ললিতাদেবীকেই উক্ত পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু নৈমিষারণ্য যে দেবীপীঠ তাঁহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দেবীভাগবতে সতীর দেহখণ্ড পতিত হইবার ফলে ভূতলে নানা দেবীপীঠের এবং সিদ্ধপীঠের উৎপত্তির বিবরণ আছে এবং দেবীর ১০৮ রূপেরও বিবরণ আছে কিন্তু নৈমিষারণ্য বা ললিতাদেবীর নাম নাই। কালিকাপুরাণে ৭টী দেবীপীঠের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যেও নৈমিষারণ্যের নাম নাই! কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে ৫১টী পীঠস্থানের তালিকাতে অথবা জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বিবৃত ৫০টী পীঠস্থানের মধ্যেও নৈমিষারণ্যের উল্লেখ নাই। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে ৫৩টি দেবীপীঠের মধ্যে নৈমিষারণ্যের নাম নাই, পরন্তু প্রয়াগে দেবীর হস্তাঙ্গুলি পতিত হওয়ায় সেখানে ললিতাদেবী নামে পীঠের উল্লেখ আছে। দেবীর হৃদয় বৈদ্যনাথধামে পতিত হইয়াছিল বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কন্থাশ্রমে দেবীর পৃষ্ঠ, দেবীর নাম সর্ব্বাণী এবং ভৈরবের নাম নিমিষ আছে। মৎস্যপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেখা যায় দক্ষ আদ্যাশক্তি সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন্ কোন্ তীর্থে তাঁহার দর্শন মিলিবে এবং কি কি নামে তাঁহার স্তব করা যাইবে। তদুত্তরে ভগবতী সতী বলিলেন, "জগতে সর্ব্বভূতে আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইবে তথাপি সিদ্ধিকামীরা দর্শন এবং ভূতিকামীরা স্মরণ করিবার নিমিত্ত যে যে স্থানে যাইবেন তাহা এইগুলি"—এই বলিয়া তিনি প্রায় ১০৮টী নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করিলেন—তন্মধ্যে প্রয়াগে ললিতা, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানগুলিকে সেখানে পীঠস্থান আখ্যা দেওয়া হয় নাই।

সে যাহাই হউক, নৈমিষারণ্য যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই ধর্মস্থান ও ঋষিগণের অধ্যুষিত তপোভূমি, বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানস্থল এবং সংসারভাব-বিড়ম্বিত মানবের আশ্রয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রেতাযুগে স্বয়ং রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে এখানে আগমন করিয়া বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের করুণতম ব্যাপার, রামের অশ্বমেধযজ্ঞে সীতার বসুন্ধরাগর্ভে বিলীন হইবার ঘটনা এই পুণ্য নৈমিষক্ষেত্রেই সংঘটিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র তৎকালীন দিগ্বিজয়ী বীরের অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য লক্ষ্মীকে অশ্বের সহিত প্রেরণ করিয়া সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে আগমন করিয়া সেখানে পরমাদ্ভুত যজ্ঞবাট দেখিয়া অতুল প্রহর্ষ লাভ করিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৫ স্বর্গ শ্লোক ২।৩)

রামচন্দ্র সেই অশ্বমেধযজ্ঞে ধার্ম্মিক মুনিঋষিবৃন্দ, সস্ত্রীক দ্বিজাতিগণ, নরপতিগণ, শূদ্র, বৈশ্য, নট, নর্ত্তক প্রভৃতি প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করিলেন এবং গোমতী নদীতীরে নৈমিষক্ষেত্রে সুমহান যজ্ঞারম্ভ করিলেন। মহারাজ যজ্ঞে এমন সুপ্রচুর দান করিলেন যাহার তুলনা নাই। বাল্মীকির ভাষায়—

> নাশ্রৌষৎ তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলং কৃতম্
> যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ॥
> বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।
> হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানাং অথ বাসসাম্॥
> অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।
> ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥

উত্তরকাণ্ড ১০৫ সর্গ-১৫-১৭

এই পরমাদ্ভুত যজ্ঞে সশিষ্য ভগবান্ ঋষি বাল্মীকিও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সহিত লব ও কুশও আসিয়া ২৪ সহস্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ ৫ শত সর্গে বিভক্ত রামায়ণ প্রতিদিবস বিংশতিসর্গ করিয়া মধুরস্বরে গান করিতে আদিষ্ট হইলেন। রামচন্দ্রের সহিত তাহাদের তাৎপর্য্যপূর্ণ অবয়বসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া পৌরজানপদ এতই বিস্মিত হইলেন যে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—যদি এই দুইজনের অঙ্গে জটাবল্কল না থাকিত, তাহা হইলে স্বয়ং রামচন্দ্রই গান করিতেছেন বলিয়া মনে হইত:

> জটিলৌ যদি ন স্যাতাম্ ন চ বল্কধরৌ যদি।
> বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ॥

সর্গ ১০৭।১৪।

ইহাদিগকে সীতাপুত্র জানিয়া এবং সীতাকে জীবিত জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন যে সীতার আর একবার সমস্ত মুনিঋষি পৌরজানপদের সমক্ষে পরীক্ষা হউক।

> যদি শুদ্ধসমাচারা যদি না বীতকল্মষা।
> করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিং অনুমান্য মহামুনিং॥

দূত প্রেরিত হইল এবং বাল্মীকি আশ্রম হইতে সীতা আনীতা হইলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে লইয়া এই গোমতীতীরস্থ নৈমিষক্ষেত্রের যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সুব্রতা ধর্মচারিণী সীতা মিথ্যাপবাদ পরিত্যক্তা হইয়া আমার আশ্রমে বাস করিতেছে। আমি বহুবর্ষ তপস্যা করিয়াছি, যদি মৈথিলী দুষ্টা হয় তাহা হইলে আমি যেন সেই সব তপস্যার ফল হইতে বঞ্চিত হই।

> বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
> নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার বাক্যেই আমার প্রত্যয় আছে, কিন্তু সীতাশপথ দর্শন নিমিত্ত সকলে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই সীতার শুদ্ধি পরীক্ষা আবশ্যক। নতমুখী সীতা তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,

> যথাহং রাঘবাৎ অন্যং মনসাঽপি ন চিন্তয়ে।
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥১১০।১৪

ইত্যাদি বলিতে বলিতেই ভূতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল এবং ভগবতী বসুন্ধরা স্বীয় কন্যাকে বাহুদ্বারা ধারণ করিয়া

সেই সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সিংহাসন ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিয়া দেবতাগণের অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি এবং সাধুকারের মধ্যে ধীরে ধীরে রসাতলে বিলীন হইয়া গেল।

জনক-তনয়ার অন্তর্ধানপূত এই নৈমিষক্ষেত্র দর্শন করিবার জন্য বহু দিন হইতে অভিলাষ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তীর্থপিপাসু পরমভাগবত ডাঃ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয়কে সঙ্গীও পাওয়া গেল। স্থানটি মনোরম। ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের একটি শাখা স্থাপিত আছে এবং একজন বাঙ্গালী সাধু সেইস্থানে আছেন। বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে ইহা সেইজন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। সন্ন্যাসী মহারাজ অতিথিপরায়ণ এবং তাঁহার অনুচর ধ্রুব যাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং নির্লোভ।

স্থানটি ছোট এবং অরণ্যসমাকুল। দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি ষট্‌-কোণাকৃতি জলাশয়, নাম চক্রতীর্থ। ইহার মধ্য হইতে সর্ব্বদা জল উত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দুই পয়ঃপ্রণালী দিয়া অদূরে গোমতী নদীতে পতিত হইতেছে। চক্রতীর্থের জলের গভীরতা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা নানারূপ অলৌকিক কাহিনী বলে। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী গোমতী নদীর তীরে দশাশ্বমেধ ঘাট, এখনও এখানে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানীয় লোকগুলির অধিকাংশই পাণ্ডাশ্রেণীর। কিন্তু তাহারা নৈমিষারণ্যের প্রাচীন গৌরবের সন্ধান বিশেষ রাখে না। অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় তাহারা ইহাকে নিমসার করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার প্রধান মন্দির ললিতাদেবীর মন্দির। মন্দিরটির গঠনে মুসলমানী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতকের অযোধ্যার নবাবগণের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত এই সকল স্থানে মুসলমান রাজমিস্ত্রীগণের দ্বারা এই সকল মন্দির গঠিত করানো হইয়াছিল। ললিতাদেবীর মন্দিরের নিকট একটি কূপ আছে, ইহা হত্যাহরণ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এইস্থানেই সীতাদেবী পাতালপ্রবেশ করিয়াছিলেন। মন্দিরের পার্শ্বে প্রবাহিত এক নালা গোদাবরী নামে খ্যাত। হয়ত ইহা পূর্ব্বে স্রোতস্বিনী ছিল, এখন পুলিনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নালার অপর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ টিলা। স্থানীয় প্রবাদ, ইহা পাণ্ডবগণের সময়ে গঠিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ। উহার গঠন এবং স্থাপত্য চিহ্নাদি দর্শনে ইহা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর একজন অমাত্য পরে উহার উপরে একটি বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। তদবধি উহা শাহবুরুজ নামে পরিচিত। আইন-ই-আকবরীতেও ইহার উল্লেখ আছে।

গোমতীনদীর তীরে আর একটি উচ্চস্থান ব্যাসগদি বা ব্যাসের তপঃস্থান নামে বিখ্যাত। ব্যাসদেব এইস্থানে তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন এবং পুরাণাদি এইস্থানেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। স্থানটি নির্জ্জন এবং তপশ্চরণ বা গ্রন্থরচনার উপযোগী বাতাবরণ মণ্ডিত।

প্রতি অমাবস্যায়, বিশেষতঃ সোমবতী অমাবস্যায় এখানের চক্রতীর্থে স্নানযোগ হয় এবং বহুসহস্র যাত্রী আগমন করেন। তাহাদের জন্য এখানে কয়েকটি ধর্ম্মশালাও আছে, তন্মধ্যে কালী কমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালাই বৃহত্তম। চক্রতীর্থের অনতিদূরে একটি ছোট মন্দিরের নাম সূতগদ্দী এবং অন্য একটি স্থানের নাম শৌনক আশ্রম। ইহারা মহাভারত পুরাণাদি ... উশানকাদি ঋষিগণ ও সূতপুত্র সৌতির কথা মনে করাইয়া দেয়।

নৈমিষারণ্যের ছয় মাইল উত্তরে মিশ্রীকতীর্থে আর একটি অনুরূপ বৃহত্তর চক্রতীর্থ আছে। সেখানেও প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিবার জন্য বহু যাত্রী সমাগত হয়। দধীচির অস্থি উক্ত মিশ্রীকতীর্থে পতিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। নৈমিষারণ্যের দক্ষিণে গোমতীর অপর পারে বেণীগঞ্জ নামক ষ্টেশনের নিকট একটি গড়বেষ্টিত ভূমি দৃষ্ট হয়। উহাকে পুরাণোক্ত বেণরাজার প্রাসাদ ও দুর্গ বলিয়া কথিত হয়।

কলিকাতা হইতে নৈমিষারণ্য ষ্টেসনের দূরত্ব ৭০০ মাইলের কিছু বেশী এবং ভাড়াও তৃতীয় শ্রেণীতে কিঞ্চিদধিক কুড়ি টাকা। গৌড়ীয় মঠের পাকা অতিথিশালা এবং একজন বাঙ্গালী অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজের অর্থে নির্ম্মিত সুন্দর কূপ আছে। প্রাচীন ঋষিগণের অধ্যুষিত সীতাদেবীর অলৌকিক অন্তর্ধানস্থল পরম পবিত্র এই নৈমিষারণ্যে পদার্পণ করিলে ভক্ত, ঐতিহাসিক, প্রত্নরসিক সকলেই তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বর্ণ-ধূলি

অশ্বিনীকুমার

তোমার মাঝে হারিয়ে গেছে আজকে সব কাজ
নিঃস্ব হয়ে রয়েছি বসে নাইকো তাতে লাজ।

শূন্য করে নিয়েছ তুমি দিতে পূর্ণ করে,
সে আনন্দে নয়নে মোর নূতন আলো ঝরে।

তুমি যাহাই আপনি এসে নিতেছ আজ তুলি,
আবার তাহা আসিবে ফিরে হয়ে স্বর্ণ-ধূলি।

কর্মজীবনে জ্যোতিষ

জ্যোতি বাচস্পতি

কী অবস্থায় এবং কী ভাবে রবির দ্বারা নির্দিষ্ট এই আকর্ষণের ইতর বিশেষ হয়, তা বলার আগে, আরও কতকগুলি বিষয় বলা দরকার। তার মধ্যে প্রথম রবি কোন্ গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হলে বা অন্যরকম সম্বন্ধ করলে কোন্ কোন্ কাজের দিকে জাতকের স্বাভাবিক আকর্ষণ বা সহজ পটুত্ব দেখা যেতে পারে, তা নিচে লেখা হল।

রবি যদি চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহ'লে জাতকের আকর্ষণ হবে সেই সব কাজের দিকে যার মধ্যে কমবেশী বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন শীলতা আছে। যে সব কাজের সঙ্গে জনসাধারণের সংস্রব আছে, যাতে দশ-জনের চোখের সামনে আসতে হয়, সেই সব কাজ তাঁর ভাল লাগে। যাতে নিজের ইচ্ছামত কাজে প্রবৃত্ত ও কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়, সেই ধরণের কাজের দিকেই তাঁর বেশী ঝোঁক হয়। যে সব কাজের সঙ্গে জনহিত অথবা সমাজ সংস্কারের যোগ আছে যাতে তাঁর সহানু-ভূতি ও নেতৃত্বের কামনা দুইই চরিতার্থ হ'তে পারে সেই সব কাজের দিকেই তাঁর মন ছোটে বেশী। একটানা একঘেয়ে ধরণের কাজ তাঁর ভাল লাগে না। গঠনমূলক কাজ তিনি পছন্দ করেন।

রবি যদি মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহ'লে জাতক আকৃষ্ট হবেন সেই সব কাজের দিকে যাতে শক্তি ও সাহস দরকার এবং যাতে উত্তেজনার খোরাক আছে। তিনি চান সেই ধরণের কাজ যাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত ক'রে কিম্বা বিপদের আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে গৌরব লাভ করা যায়। যে কাজে অপরের মাথার উপর থেকে তাদের শাসন ও পরিচালনা করা যায় তাও তাঁর ভাল লাগে। যে সব কাজে সংকট উপস্থিত হ'লে এগিয়ে যেতে হয় এবং হাতে হাতে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় সেদিকেও তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন। এক্সিকিউটিভ ধরণের কাজই তাঁর বেশী পছন্দ। যে কাজে আগুন ও অস্ত্রশস্ত্রের দরকার তাতেও তাঁর পটুত্ব প্রকাশ পেতে পারে। আসলে তিনি চাইবেন বিপদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জয় করে, তাঁর শক্তি ও সাহস জাহির করতে। সে শক্তি সাহস দৈহিকই হোক্ আর নৈতিক বা মানসিকই হোক্।

রবি যদি বুধের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে জাতক আকৃষ্ট হবেন সেই সব কাজের দিকে বেশী যাতে বিদ্যা ও বুদ্ধিকৌশল প্রকাশের অবসর আছে। যাতে খুঁটিনাটির দিকে খুব বেশী লক্ষ্য রাখতে হয় এবং যুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হয় সেই সব কাজের দিকে তাঁর একটা আকর্ষণ লক্ষিত হবে। একক কাজ করার চেয়ে অপরের সহযোগিতায় এবং অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে তাঁর ভাল লাগবে। যে সব কাজ রুটিন-মাফিক করা যায় এবং যার খুঁটিনাটির ধরা-বাঁধা নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে তার দিকেও তাঁর একটা আকর্ষণ থাকবে। যাতে বাগ্মিতার সংস্রব আছে কিংবা যাতে লেখাপড়া বা হাতের কাজে মাথা খাটাতে হয় সেই সব কাজের দিকেও তাঁর অন্তরের টান দেখা যেতে পারে। খুব ভারী পরিশ্রমের কাজ তাঁর রুচিকর নয় লঘু ধরণের ছোট কাজ যা নিয়মমাফিক করতে হয় যাতে অপরের সহযোগিতা ও উপদেশ পাওয়া যায় এবং যাতে বিদ্যা বা মস্তিষ্কের শক্তির পরিচয় দিতে হয় সেই সব কাজের দিকেই তাঁর আকর্ষণ হবে বেশী।

রবি যদি বৃহস্পতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে সেই সব কাজ জাতকের ভাল লাগবে যাতে বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। যাতে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে খাটানো যায় এবং সংগঠন শক্তির পরিচয় দিতে হয় সেই প্রকৃতির কাজের দিকেও তাঁর একটা আকর্ষণ দেখা যেতে পারে। সাধারণতঃ যেখানে উপদেশ দেওয়ার অবসর আছে কিম্বা যেখানে তাঁর মন্ত্রণা, নির্দেশ বা বিধান কাজে পরিণত করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কাজ করার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক থাকবে। তিনি চাইবেন সেই প্রকৃতির কাজ যাতে খুঁটিনাটির চেয়ে সমগ্রতার দিকে, ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় বেশী। যে কাজে একটা আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং যাতে উচ্চতর সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তাও তাঁর কাম্য হবে। যে সব কাজে সমষ্টিগত ভাবে সমাজকে উন্নত করা যায় তা

সে আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েই হোক, জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক দিয়েই হোক, বা বাহ্যিক রীতিনীতির দিক দিয়েই হোক সেই সব কাজের দিকে তিনি খুব বেশী আকৃষ্ট হবেন। মোটের উপর তিনি চাইবেন সেই কাজ যাতে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামাজিকতা এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ আছে।

রবি যদি শুক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে জাতক সেই সব কাজ ভালবাসবেন যাতে মার্জিত রুচি, সুশৃঙ্খল নীতি, সৌন্দর্যবোধ ও সঙ্গতি জ্ঞান আবশ্যক। যাতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিতে হয় সে সব কাজ ও তাঁর ভাল লাগে। যে সব কাজে সামাজিকতা ও শিষ্ট ব্যবহার আবশ্যক, তার দিকে ও তিনি একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। যেকোন প্রয়োগ শিল্প বা প্রযুক্ত বিজ্ঞানের দিকে তার যেমন একটা আকর্ষণ থাকতে পারে তেমনি যা দিয়ে অপরকে আনন্দ দেওয়া যায় সেই সব কলার দিকেও তিনি আকৃষ্ট হতে পারেন। যে কাজে দু'দিক বিচার ক'রে একটা সুশৃঙ্খল কর্মধারা ঠিক করতে হয় তার দিকেও তাঁর মন টানে। তিনি ভারী পরিশ্রমের নীরস কাজ পছন্দ করেন না। যে কাজ আনন্দের সঙ্গে করা যায় এবং যাতে বুদ্ধি-কৌশল ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে বেশী ফল পাওয়া যায়, সেই ধরণের কাজই তাঁর কাম্য। তিনি চাইবেন এমন কাজ যাতে উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় দেওয়া যায় এবং যাতে এমন একটা কিছু গড়ে তোলা যায় যার ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে কিম্বা যা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মাধ্যমে আনন্দ বিতরণ করতে পারে।

রবি যদি শনির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে জাতকের ঝোঁক হবে সেই সব কাজের দিকে বেশী যাতে দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিতে হ'য়। যে সব কাজে গভীর ও নির্বিষ্ট অধ্যয়ন এবং ধীর ও স্থির প্রযোজনা আবশ্যক সেই সব কাজ তাঁর পছন্দ। যে কাজ নির্দিষ্ট ধারায় একই ভাবে চলে এবং যার মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম তার দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি কাজের মধ্যে অনিশ্চয়তা পছন্দ করেন না, তিনি চান সেই রকম কাজ করতে যা নির্দিষ্ট ধারায় বরাবর চলে আসছে। যে সব কাজে দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় তার জন্য দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় দিতে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না। বস্তুতঃ যে সব ভারী ও দুরূহ কাজ ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে সিদ্ধ করতে হয় তাদের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হন বেশী। যে কাজে অপরের হস্তক্ষেপের অবসর নেই এবং যা নিজের দায়িত্বে একান্ত মনে করা চলে সেইরকম কাজ করতে পেলে তিনি খুসী হন।

রবি যদি রাহুর সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে জাতক পছন্দ করবেন সেই সব কাজ যাতে নিয়ম বা শৃঙ্খলার খুব বেশী কড়াকড়ি নেই এবং যা কতকটা নিজের খেয়াল-খুসী মত করা চলে। যে সব কাজের সঙ্গে স্পেকুলেটিভ ব্যাপারে কোন সংশ্রব আছে অথবা যাতে কর্মধারার বা কর্মক্ষেত্রের ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হয় সেই সব কাজ তাঁকে আকর্ষণ [illegible] বেশী। যে সব কাজে ঘোরাফেরা দরকার হয় এবং যাতে অবাঞ্ছনীয় উপায়ে বা কূটনীতির প্রয়োগ করে কর্ম সিদ্ধির বাধা নেই তার দিকেও তিনি আকৃষ্ট হতে পারেন। ধীর-স্থিরভাবে কাজ করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তিনি সাধারণতঃ এরকম কাজ চান যাতে ব্যস্ততা ও গতিশীলতার পরিচয় দিতে হয়। যে কাজে বাইরের একটা আড়ম্বর বা জাঁকজমকের অভিব্যক্তি আছে সে ধরণের কাজ না হলে তাঁর মন তৃপ্ত হয় না। মোটের উপর তিনি চান সেই সব কাজ করতে যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে অপরের সামনে জাহির করতে পারেন যে ভাবেই হোক্।

রবি যদি কেতু যুক্ত হয়, তাহ'লে জাতকের ভাল লাগবে সেই সব কাজ যাতে ডিপ্লোমেসি দরকার বা গোপনীয়তা প্রয়োজন। যে সব কাজ নির্জন স্থানে বা গোপনে অনুষ্ঠিত হয় এবং যাতে নিজেকে আড়ালে রেখে কাজ করা চলে সেই সব কাজের দিকে তাঁর একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব। যাতে গুপ্ত তথ্য সম্বলিত হিসাব-নিকাশ কিংবা পরিসংখ্যানের সংশ্রব আছে সেই সব কাজ নিজে মাথার উপর থেকে অপরকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় তার উপর তার ঝোঁক একটু বেশী মাত্রায় দেখা যেতে পারে। বহু অধীনস্থ ব্যক্তি বা শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে থেকে সর্দারী করার পটুত্ব তার মধ্যে যথেষ্ট আছে। এবং যাতে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির আনুগত্য পাওয়া যায় সে সব কাজও তাঁর প্রিয় হয়। খুব আড়ম্বর তিনি পছন্দ করেন না। যে সব কাজে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় সেই সব কাজের তিনি পক্ষপাতী।

রবি যদি প্রজাপতি যুক্ত হয় তাহ'লে জাতক সেই সব কাজের দিকে ঝুঁকবেন যাতে কমবেশী অভিনবত্ব বা অসাধারণত্ব আছে এবং যাতে মৌলিকতার পরিচয় দেবার অবসর পাওয়া যায়। যে সব কাজ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যে সব কাজে পুরান কর্মধারা সংস্কার ক'রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করার সম্ভাবনা আছে তার দিকে তিনি প্রায়ই আকৃষ্ট হন। তাছাড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সংসদ, পরিষদ ইত্যাদির সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সংশ্রব আছে সে সব কাজও তিনি পছন্দ করেন। একভাবে নির্দিষ্ট ধারায় কাজ করতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি চান কাজের মধ্যে অগ্রগতির আভাষ। সাধারণতঃ নির্জনে বা একক কাজ করার চেয়ে তাঁর সঙ্গে একমতাবলম্বী সহযোগী নিয়ে কাজ করা তাঁর পছন্দ। সে সব কাজে প্রাকৃতিক শক্তিকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে কাজে লাগান হয়, তার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক দেখা যেতে পারে।

রবি যদি বরুণ যুক্ত হয় তাহ'লে জাতক চাইবেন সেই সব কাজ করতে যাতে অন্য লোকের দৃষ্টি নিজের উপর আকর্ষণ করা যায় এবং যার সঙ্গে বিচিত্র ও রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের কোন রকম যোগ আছে। যে সব কাজে কমবেশী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হয় এবং যাতে যুক্তির চেয়ে প্রেরণার অবসর বেশী সেই সব কাজ তাঁকে সহজেই আকর্ষণ ক'রে। যে কাজের মধ্যে কমবেশী আনন্দের খোরাক পাওয়া যায় এবং যে কাজ আগাগোড়া ধরাবাঁধা নিয়মে চলে না তার দিকে তিনি আকৃষ্ট হন বেশী। নতুন নতুন উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ—যে সব কাজ লোকে অদ্ভুত বা বিচিত্র মনে করে এবং যা নিজের খুশী বা খেয়াল মত-করা চলে সেই সব

কাজ তাঁর ভাল লাগে। একভাবে একটানা কাজ তাঁর ভাল লাগে না। তাঁর কাজের মধ্যে নিত্য নতুনত্ব থাকলেই তিনি খুসী হন।

রবি যদি রুদ্র যুক্ত হয় তাহ'লে জাতকের ভাল লাগবে সেই সব কাজ যাতে কোনরকম অসাধারণত্ব আছে এবং যাতে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়। যে সব কাজ নিজের ভাবে একক করা যায় এবং সহযোগীই হোক্ বা নিয়োগকর্তাই হোক্ কারোই যাতে হস্তক্ষেপের অবসর না থাকে সেই সব কাজের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হন বেশী। যে কাজ নির্জনে আত্মসমাহিত হ'য়ে করা যায় তার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। জনতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হ'লে তিনি চাইবেন সেই ধরণের কাজ যাতে তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সকলের সামনে প্রকট হয়। যে কাজে ভাব বা কর্মধারা প্রবর্তন ক'রে নিজের সংগঠন শক্তির পরিচয় দেওয়া যায় তার দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ লক্ষিত হবে। লঘু ও সাময়িক কাজের চেয়ে যে সব কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং যার ফল সুদূরপ্রসারী তার দিকেই তিনি ঝুঁকবেন বেশী। মোটকথা যাতে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির সম্ভাবনা আছে সেই সব কাজ তাঁর বেশী প্রিয়।

উপরে যা লেখা হ'ল গ্রহগুলি রবির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অন্য রকম সম্বন্ধ করলেও ঐ একই রকম ফল হ'তে পারে। অর্থাৎ রবির সঙ্গে গ্রহটির যদি ক্ষেত্র-বিনিময় হয়, কিম্বা রবি যে গ্রহের ক্ষেত্রে আছে তার দ্বারা দৃষ্ট হয় অথবা রবি ও গ্রহটি যদি পরস্পরকে দেখে তাহ'লেও যোগের মতই ফল কল্পনা করা যায়। তাছাড়া রবির সঙ্গে কোন গ্রহের-প্রেক্ষা থাকলেও ঐ ফলই হ'য়ে থাকে।

জীবন ও আমি

অনিরুদ্ধ

(১)

জীবন বহিয়া যায় অসীমের পানে
বিদ্যুতের গতি তার।
নক্ষত্রের গানে
শ্রম, শ্রান্তি ভুলি সব ধায় অনিবার।
দুর্ব্বল মানব আমি, পিছে পড়ে থাকি;
মোরে সাথে লয়ে যেতে বারে বারে ডাকি,
ডাকি আর ছুটে চলি পশ্চাতে তাহার।
সে কভু চাহে না ফিরি।
নির্ম্মম, নিষ্কাম,
দুর্নিবার অন্ধবেগে ধায় অবিরাম।......
কালের তোরণদ্বার তাহার সম্মুখে
খুলে যায় ধীরে।
আকাশের গ্রহ তারা
আলো ধরে পথ 'পরে তার। জাগে সাড়া
অসীমায় তাহারে আশ্রয় দিতে বুকে—
গোধূলির রাঙা রাগে মাতিয়া সে চলে;
মোদের দূরত্ব বেড়ে ওঠে পলে পলে।

(২)

ভগবান, দিলে যদি এত করিবার,
সময় দিলে না কেন, ক্ষমতা করার?
কাল বিন্দু কালস্রোতে লীন হয় ত্বরা;
প্রভাতের সুর মেলে নিশীথের স্বনে;
মাসে মাসে সাজি নব ঋতু-আভরণে
কক্ষপথে অগ্রসর হয় বসুন্ধরা—

শুধু আমি পড়ে থাকি সকলের পিছে
ধরণীর এক কোণে বহুদূরে, নীচে,
দুর্ব্বল, অক্ষম বরি' অজ্ঞান নিশাকে।
মোর আশাদীপ-স্নেহ হয় নিঃশেষিত,
জীবনের দীপ তাও হবে নির্ব্বাপিত
অজানা মুহূর্ত্তে কোন।—
দূর মোরে ডাকে·

অসমাপ্ত কর্ম্ম এবে সকলি তেয়াগী,
পথ নিতে হবে মোরে সুদূরের লাগি।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরিহর গ্রামের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখানে বাড়ী করিয়াছিলেন—বড় যোগীন, ম্যাট্রিক পাশ করিয়া একটা সওদাগরী আপিসে চাকুরী করে, ছোট মহিম পাটকলে স্পিনিং বাবু। হরিহরের স্ত্রী বাঁচিয়া আছেন তবে অত্যন্ত বৃদ্ধা। মহিম ও যোগীন বহুদিন পৃথগন্ন হইয়াছে—যোগীনের সন্তানাদিও বেশী, উপার্জ্জনও কম, উপরি পাওনাও নাই, কাজেই অবস্থা খারাপ, বৃদ্ধা মাতা তাহার ভাগেই পড়িয়াছেন। মহিমের মাহিনা যাহাই হৌক, উপরি পাওনা যথেষ্ট, সংসারে লোকও কম, কাজেই অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন।

হরিহর বাঁচিয়া থাকিতেই দুই ভাইয়ে মধ্যে বনিবনাও ছিল না, বিবাহ ও সন্তানাদি হইবার পর দুই বধূর মাঝে বহুদিন বহু অশোভন ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ছেলেকে বেশী দিয়াছে, দামী জামা পরাইয়াছে, মাছের মাথা দিয়াছে ইত্যাদি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া স্বার্থান্ধ ও স্নেহান্ধ দুইটি স্ত্রীলোকের ঝগড়া একই জঠরে লালিত দুই ভাইকে পৃথক করিয়া দিয়াছিল। হরিহরের মৃত্যুর পরে বাড়ীর মাঝখান দিয়া দেয়াল উঠিয়াছে,—যোগীনের ঘরে চলে চিরদারিদ্রের সঙ্গে অবিশ্রাম সংগ্রাম। তাহার ছেলেমেয়েরা শীতের দিনে খালি পায়ে, ছেড়া জামা পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মহিম-মহিষী তাহা দেখিয়া হাসেন এবং নিজের ছেলেকে সাজাইয়া খেলিতে পাঠাইয়া দেন। ওদিকে চলে যোগীন-মহিষীর দুর্ভাগ্যের ক্রন্দন—এঘরে বাজে রেডিও, রাঁধুনী চা করিয়া আনে, মহিমের স্ত্রী চা পান করিতে করিতে রেডিও শুনেন।

এরা মতি ঠাকুরের বংশধর, গোপাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র।

মহিম কল হইতে বাহির হইয়া পানের দোকান হইতে পান খান—সাইকেলের সিটের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, কুলি কামিনদের সহিত, কখনও বা সর্দ্দারদের সহিত কথা বলেন। সেদিনও তেমনি কথা কহিতেছিলেন—সর্দ্দারকে টিকিট ভাঙ্গাইবার জন্য লোক সংগ্রহ প্রভৃতি করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময় সুন্দরী আসিয়া হঠাৎ তাহাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মহিম অবাক হইয়া গেল—এমন সুন্দরী মেয়েটি কে? কেনই বা তাহাকে প্রণাম করিল?

সুন্দরী কহিল—বাবু, আপনার নাম শুনে এলাম, আপনি কলে একটা কাজ না দিলে উপোস করে ম'রতে হবে—

—কতদিন এসেছিস্? তোর মানুষ কে? কোথায় থাকিস—

—অল্প কদিন এসেছি বাবু—মানুষের নাম বদ্রী।

—সে কি করে—

—কিছুই করে না। কাজ পায় নি—তাকে নয় আমাকে কাজ না দিলে—

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কথা কয়েকটি বলিয়া আবেদন করা উচিত ছিল তাহা হইলেই দয়া হইতে পারিত কিন্তু সুন্দরী কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মহিম এ হাসি চিনিতেন—সুন্দরীও এরূপ হাসিতে অভ্যস্ত। মহিম কহিল—কোথা থাকিস্?

—ঐ বাবু বাগান বস্তিতে, এ হপ্তায় কাজ না দিলে উপোস করতে হবে—

মহিম কহিল,—সর্দ্দারনীকে একবার বল গিয়ে। সর্দ্দার, সর্দ্দারনীকে দেখা করতে বলিস্ ত। সেও ত বাবু বাগানেই থাকে—

সুন্দরী হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ হুজুর—আমি তাকে বলেছি কিন্তু আপনার হুকুম না হলে ত হয় না—বাবু—

আচ্ছা—দেখবো, চাকরী ত মুখের কথা নয় চটকলের চাকুরী একটু কঠিন, বুঝলি—

—হুজুর একবার পায়ের ধুলো দিলে দেখ্‌তেন কি কষ্টে আছি—

—তোর আবার কষ্ট কিরে সুন্দরী—এমন চেহারা থাক্‌তে—

—বাবু—

—আচ্ছা—দেখ্‌বো—পরে দেখা করিস্—বদ্রী কোথায় ?

—ঘরকেই আছে—আপনার কাছে যাবে ?

—হ্যাঁ—রবিবার—সকালে যায় যেন—

মহিম সাইকেলে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কুলির সর্দ্দার সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—হ্যাঁ, তোর চাকুরী হবে—বাবুকে কিছু দে, নইলে—

সুন্দরী কহিল—কি দেবো ? কিছুই ত নেই—

সর্দ্দার পরিহাস করিল—সবইত আছে—টাকায় কি হবে—বাবু বড় ভাল লোক, টাকার ভুখী নয়—

সুন্দরী সবই জানিত এবং সবই বুঝিল। এসব কাজ সে পূর্ব্বে বহু করিয়াছে।

মাসের শেষ—

যোগীন প্রবল মাথা ধরা ও জ্বর লইয়া আফিস্ হইতে ফিরিলেন। ঘরে বাজারের পয়সা নাই, এখন অসুস্থ হইলে চিকিৎসারও উপায় নাই—মুদি দোকান, ডাক্তারখানায় যথেষ্ট দেনা পূর্ব্ব হইতেই হইয়া আছে—

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—

যোগীন জ্বর ও মাথা ধরার জন্যে ছটফট্ করিতেছে। বৃদ্ধামাতা মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতেছিলেন—পাশে মহিমের ঘরের রেডিওটা তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল—তাহার শুষ্ক শব্দ যোগীনের মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ীর আঘাত করিতেছিল—গৃহিণী বুভুক্ষু ছেলেমেয়েদিগকে ধমকাইতে-ছিলেন, তাহারা চিৎকার করিতেছে—উনুনের ধোঁয়া ঘরের মাঝে ঢুকিয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত করিতেছিল। চারিপাশের এই গোলমালের মধ্যে যোগীন প্রাণপণে দাঁত কামড়াইয়া পড়িয়া তীব্র মাথার বেদনা ভোগ করিতেছেন।

মাতা প্রশ্ন করিলেন—খুব কষ্ট হ'চ্ছে বাবা—যোগীন—

—উঃ মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে যেন, আর ঐ রেডিওটা যেন মাথায় হাতুড়ী মারছে—একটু আস্তে বাজানো যায় না—

দুই ভাইএর পৈতৃক বাড়ীর মাঝে সীমানার দেওয়াল তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তবুও সেই দেয়ালের গায়ে একটা দরজা ছিল—কখনও কখনও খোলা হইত। বৃদ্ধমাতা সেই দরজাটা খুলিয়া মহিমের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন। মহিমের স্ত্রী টেবিলে চা'র পেয়ালা রাখিয়া হাতে কি যেন বুনিতেছিলেন এবং আনমনে বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন—

মাতা ডাকিলেন—বৌমা ! বৌমা—

বধুমাতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আগমনে বিশেষ প্রীত হইলেন এমন নয়, তবে শুষ্ক 'আসুন' বলিয়া একটা আসন আগাইয়া দিলেন।

—বসবো না বৌমা, যোগীন জ্বর আর মাথা ধরা নিয়ে এসেছে আফিস্ থেকে—

বৌমা নীরবে শুনিতেছিলেন—শাশুড়ী নীরব হওয়ায় কহিলেন—আজকাল জ্বর জারি হচ্ছে—

—খুব মাথা ধরেছে, গোলমালে মাথায় যেন হাতুড়ী পিট্‌ছে—রেডিওটা একটু আস্তে করে দাও, তার বড় কষ্ট হ'চ্ছে—

বৌমা অবাক হইয়া কহিলেন—রেডিওর গান শুন্‌লে মাথা ধরা বাড়ে এমন ত শুনিনি।

—সে ত তাই ব'ল্‌ছে—

—আমি না হয় বন্ধ করলাম, কিন্তু অন্য কোন ভাড়াটে যদি থাক্‌তো তাদের কি বন্ধ করতে বল্‌তে পারতেন ?

—তা হ'লে কি আর বলা যেত ? সে ত সত্যিই—তবে খুব কষ্ট হচ্ছে কিনা তার তাই—

বৌমা রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন—বন্ধ করে রাখ্‌তেই যদি হয় তবে এ বালাই কেনা কেন ?

—বন্ধ ক'রো না—আস্তে আস্তে বাজাও, তাতে ক্ষতি কি ?

বৌমা রেডিও খুলিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন—একটু চা করতে ব'লবো ?

—না।—

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিম আসিয়া পড়িল। মহিম মাতাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল এবং স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া ভীত ভাবে প্রশ্ন করিল—কি হ'য়েছে—

মাতা ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে মহিম নীরবে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল। মাতা কহিলেন—যোগীনের

হাতে একটা পয়সা নেই, বাজার দেনায় অস্থির, কাল ডাক্তার ডাকার উপায় নেই, মাসের শেষ। ডাক্তার ত দেখাতে হবে—

মহিম উপেক্ষার সহিত কহিল—ও একটু জ্বর হ'য়েছে. . সেরে যাবে—ডাক্তার কি হবে—

—আফিস্ কামাই হবে, দু'দিন রোগে শুয়ে থাকারও ত উপায় নেই, এমনি পোড়া চাকরী, তুই—কিছু ধার দে, কাল রবীন ডাক্তারকে ডাকি—

—ঐ কথাটাই ত তোমরা ভুলে যাও, মাসের শেষ ত আমারও বটে—

—তবুও তোর ত উপরি পাওনা কিছু আছে—ওর ত তাও নেই—

—উপরী খরচাও আছে—ঠাকুর, চাকর, ঝি, মাষ্টার, রেডিওর দোকান, এসব ত দিতে হয়। সেকরার দোকানেই মাসে পঞ্চাশটাকা দিতে হয়—

—তবুও, ভাই থাক্‌তে দাদার চিকিৎসে হবে না, এক মায়ের পেটের ভাই—এতটুকু দয়ামায়া কি থাকতে নেই মহিম, রোগে পড়েছে—

—আমিও ত তাই ভাবি মা, এক মায়ের পেটের ভাই নিজের ছেলেকে মশারীর মাঝে বসিয়ে সন্দেশ খাইয়েছে আর ভাইএর ছেলেকে শুক্‌নো মুড়ি দিয়েছে খেতে—এই বা সম্ভব হয় কি করে ?

—ও কথা তুই বিশ্বাস করিস্ মহিম—নিজে চোখে না দেখ্‌লে একথা কি বিশ্বাস করা যায়—ও কথা তুই বিশ্বাস করিস্ নে। ওদের পানে একবার তাকিয়ে দেখ—

—কে আর কার পানে তাকায় বল—আমার অভাবটা তুমিও ত দেখছ না মা! দেনা শুধ্‌তে শুধ্‌তে হাড় কালি হয়ে গেল—উদয়াস্ত খেটেও ত দুঃখ যায় না—

মাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—ভাই ভাইকে এত দূর করিয়া দিতে পারে—মানুষ এমন স্বার্থপরও হইতে পারে! মাতা সাশ্রু নেত্রে উঠিয়া আসিলেন—বৌমা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া মহিমকে কহিলেন—রেডিও ফেরৎ দিয়ে এস—

—কেন ?

—যদি বাজানোই না যায় তবে ও ঘরে রেখে কি আমি ধূনো দেব—

আর শুনিতে সাহস হইল না—মাতা তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া বড়ছেলের আঙ্গিনায় আসিয়া দরজা দিয়া দিলেন।

মহিম দয়ালু ব্যক্তি, টাকার জন্যেই সবকিছু করেন না—অতএব সুন্দরীর কলে চাকুরী হইয়াছে; সে হাজিরা দিয়া চলিয়া আসে, বিশেষ কিছু করিতে হয় না, শনিবারে টিকিট ভাঙ্গাইয়া হপ্তা আনে তাহাতেই তাহাদের চলে—বদ্রী চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিতেছিল। মহিম তাহাকেও ভরসা দিয়াছেন। অন্য কলেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

সুন্দরী কিরূপ দুরবস্থার মধ্যে বাবু বাগান বস্তিতে আছে তাহা সচক্ষে দেখিবার জন্যও মহিম দুই একদিন সেখানে গিয়াছিলেন। সুন্দরী যথাসাধ্য আপ্যায়িত করিয়াছে—বদ্রী পান করে, তাহার জন্য তিনি কিছু দিয়াছেনও—

কল্পতরু মহিমের খ্যাতি আছে—সর্দ্দার কয়েকজন তাহার বিশেষ অনুগত। বেশী টিকেট যাহা ভাঙ্গান হয়, তাহার লভ্যাংশ তিনি সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেন, অতএব সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধায় চোখে দেখে—

শনিবারে মহিমের ফিরিতে একটু রাত্রি হয়—সারা সপ্তাহ পরিশ্রমের পর সেদিন বন্ধু বান্ধব সহ তিনি একটু সিনেমা দেখিতে যান। তাহার স্ত্রী এইরূপই জানেন, এবং শনিবার ফিরিয়াই সাধারণতঃ শুইয়া পড়েন কেন ? তাহা তাহার স্ত্রী একেবারে না জানেন এমন নয়।

শুক্রবার হইতে মহিমের বছর তিনের ছেলেটির জ্বর হইয়াছে—জ্বর খুব বেশী, অচৈতন্যের মত পড়িয়া আছে। রাত্রে মহিম কয়েকবার উঠিয়া দেখিল—জ্বর একটুও কমে নাই। সকালে ৬৷৷৹ টায় কলের বাঁশী বাজে তখন হাজিরা দিতেই হয়, তাহা নইলে আর কলে প্রবেশ করা যায় না। কলের প্রথম বাঁশী বাজে ৬ টায়। মহিম তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতেছিল—আজ শনিবার কলে যাইতেই হইবে—হপ্তার দিন।

স্ত্রী কহিলেন,—ছেলেটার এত জ্বর, আমার ত বড্ড ভয় হ'চ্ছে। কলে না গেলে হয় না ?

—আজ শনিবার। না গেলে হবে কি করে? ভয় নেই ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাচ্ছি, দেখে গিয়ে অষুধ পাঠিয়ে দেবে—

—তবুও, অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছে, চোখও মেলছে না—

—কলের চাকুরী—এখন ত ছেলের পানে চেয়ে কাঁদবার সময় নেই, চাকুরী থাকে না। ম'রলেও ত কাঁদবার অবসর নেই—চাকুরী গেলে ত সবই যাবে—

স্ত্রী বাদানুবাদ করিলেন না, মহিম সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় কহিল—ভয় নেই, ডাক্তার সব ব্যবস্থা করবে। আমি থেকে কি ক'রবো? আমি ত ডাক্তার নই, আমি থেকে কি হবে—ব্যস্ত হ'য়ো না।

মহিম চলিয়া গেল—স্ত্রী অচৈতন্য ছেলেটার পানে চাহিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন। সারাটা দিন এই অজ্ঞান ছেলেকে লইয়া একাকী কাটাইতে হইবে—এমনই পোড়া চাকুরী, যে পুত্রের অসুখেও কামাই করিবার উপায় নাই—কি পরাধীন জীবন!

মহিম রেডিও, সোনার গহনা, সাইকেল, সিনেমার মোহে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে বহুদিন আগে—হরিহরও এমনি করিয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া চাকুরীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, আজ সেকথা ভাবিয়া লাভ নাই। এই জন্যই গোপালপুর ত্যাগ করিয়া তিনি এখানে বাড়ী করিয়াছিলেন—

যোগীন জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছেন—অর্থাভাবে ডাক্তার ডাকা হয় নাই। স্ত্রী নীরবে রান্না করিতেছিলেন—মাতা শিয়রে বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন। কেহ আসিয়া প্রশ্ন করে নাই কি হইয়াছে, কেহ জিজ্ঞাসা করে করে নাই, ডাক্তার ডাকা হয় নাই কেন? সকলেই কলে, অফিসে, কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছে—অক্ষম স্ত্রীলোকগুলি নীরবে কাঁদিতেছে মাত্র।

শিল্পাঞ্চলের ক্ষুদ্র সহর—এখানে প্রতিবেশী নাই। যুগযুগান্তর পাশাপাশি বাস করিয়াও কেহ প্রতিবেশী হয় না, সমাজ গড়িয়া উঠে না, পরস্পরের প্রতি কোন কর্ত্তব্য গড়িয়া উঠে না। কলের বাঁশী, ৮টা ৩৫, ন'টা পনর'র গাড়ী লইয়া জীবন, কলের চাকার মত নিয়মিত ঘুরে, কাহারও দিকে চাহিবার অবসর নাই, কর্ত্তব্যও নাই, চাকুরী, ভোজন ও প্রজননের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ জীবন—'ভাল ত?' প্রশ্ন করার মাঝেই এখানকার প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। অর্থের ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার এখানে গগনস্পর্শী, অজ্ঞানতার অন্ধকার গাঢ়তম, তামসিকতার উচ্ছৃঙ্খল লীলাভূমি। সেই জন্যই যোগীনের মাতার অশ্রু, মহিমের স্ত্রীর অশ্রুর প্রতি এখানে চরম ঔদাসিন্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা অসহায়, একান্তই অসহায় ভাবে অশ্রু-মোচন করেন—কেহ প্রশ্ন করে না, চোখে জল কেন?

মহিম দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন ছেলেটি সেইরূপই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ডাক্তার দেখিয়া গিয়া ঔষধ পাঠাইয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন ভয় নাই, সম্ভবতঃ ঘাম বাহির হইবে। মহিম দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে বাহির হইতেছিল। স্ত্রী প্রশ্ন করিল, আবার বেরুবে নাকি?

মহিম কহিল—শনিবার, আজ না বেরুলে সামনের সপ্তাহে খাবো কি?

স্ত্রী কথাটা বুঝিলেন—মাহিনা সামান্যই, তাহা মাসের প্রথমেই সেকরা ও রেডিওর কিস্তি দিতে ফুরাইয়া যায়, শনিবারের উপরিটা না সংগ্রহ করিলে উপায় নাই—ডাক্তার ও ঔষধের খরচ আছে।

স্ত্রী কহিলেন—কাজ হয়ে গেলেই ফিরে এসো, একা একা বড় ভয় করে—একটা কথা কইছে না, চোখ মেলে তাকাচ্ছে না—স্ত্রীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

—এক্ষুণি আসবো—

মহিম বাহির হইয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিলেন। ডাক্তার কহিলেন—ঘাম জ্বরে অমন হয় ওতে ভাবনার কিছু নেই, মাথায় আইস্ ব্যাগ দিন, জ্বরটা কমবে।

মহিম বরফ কিনিয়া বাড়ীতে দিয়া আসিলেন।

কিন্তু শনিবার—সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে উপরি পাওনাটা এখনি আদায় করিতে হইবে, নচেৎ মদের দোকানে সবই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মহিম তাড়াতাড়ি টাকাগুলি আদায় করিয়া লইলেন এবং শনিবারের অবশ্য করণীয় কারণটুকুও গ্রহণ করিলেন। কারণ-পানের সঙ্গে সঙ্গেই মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—সুন্দরী আজ সন্ধ্যায় যাইতে বলিয়াছে, চাকুরির জন্য সে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছে। প্রলোভন ও একটা জৈব উন্মাদনা তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল—

দ্রব্যগুণে মনের অবস্থা অত্যন্ত অনুভূতিশীল হইয়াছে।

বাবু বাগান বস্তি অন্ধকারময়, পুরুষেরা তাড়ি ও মদের দোকানে গিয়াছে, মেয়েরা বাড়ীতে আছে, কেহবা নাই—কেহবা গৃহেই বসিয়া দ্রব্যগুণে গান আরম্ভ করিয়াছে। সমাজ-বন্ধনহীন এই বস্তি—আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, কাবুল আরাকাণ সমস্ত দেশের প্রতিনিধি এই বস্তিতে বাস করে, বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা—

মহিম সন্ধ্যার পরে ধীরে ধীরে বস্তিতে প্রবেশ করিল—একটি মেয়ে বারান্দায় বসিয়া গান করিতে করিতে রুটি সেঁকিতেছিল। সে কহিল—বাবু যে! বসুন বাবু—আসুন—

মহিম জবাব দিলেন না, ধীরে ধীরে সুন্দরীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দরজায় তালাবন্ধ। ব্যর্থতায় দুঃখে ও ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন—পাশের কুঠরীর একটি মেয়ে কোমরে হাত দিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—কি বাবু? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই ব্যঙ্গের হাসি মহিমকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মহিম প্রশ্ন করিল—সুন্দরী কোথা? বস্রী কোথা?

মেয়েটি কহিল—ছোট সাহেবের কুঠীতে গেছে ওরা—টোমাস্ সাহেব আর্দ্দালী পাঠিয়েছিল—

সমস্তই সুপরিষ্কার হইয়া গেল—টমাস্ সাহেব তাহাদের সেক্সনের বড়কর্ত্তা, বলিবার কিছুই নাই। মহিম দুঃখে অভিমানে ও ক্রোধে দাঁড়াইয়া রহিলেন—

মন দ্রুত ভাবিতে লাগিল—কি অকৃতজ্ঞ এই পৃথিবী, পঞ্চাশটা টাকা ছাড়িয়া দিয়া তিনি সুন্দরীর চাকুরী দিয়াছেন, তাহা ছাড়াও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা না হইলে পথে পথে কাটাইতে হইত, আর আজ সে আহ্বান করিয়া ফিরাইয়া দিল। দ্রব্যগুণে মনটা অত্যন্ত বিষাদার্ত্ত হইয়া উঠিল মহিমের—চোখের কোণে দুঃখ ও ক্ষোভের অশ্রু জমা হইয়া উঠিল—

মেয়েটা কহিল—আসুন বাবু, আমার গরীবের ওখানে বসবেন। ফিরে যাবেন কেন? মেয়েটি তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়াই ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। মহিমের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মহিম অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর পানে চাহিয়া কেবল নিজেকে ধিক্কার দিলেন—আর কোনদিন কাহারও উপকার করিবেন না।

চোখের কোণ হইতে ব্যর্থতার অশ্রু রুমালে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

মহিমের স্ত্রী অচৈতন্য ছেলেটাকে কোলে লইয়া বসিয়া ছিলেন। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপাইয়াও জ্বর ৪°৫ ডিক্রির কম হইতেছে না—ছেলেটা মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে। একাকী বাড়ীর মাঝে বসিয়া অসহায়ের মত কেবল অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছেন, আর ঘন ঘন দরজার পানে চাহিতেছেন মহিম আসে কিনা। মাঝে মাঝে ছেলেটা যেন হাত পা কেমন করিতেছে—

তিনি ডাকিলেন—বাবা, বাবা, খোকোন—

খোকোন চোখ মেলিল না। একবার যেন চমকাইয়া উঠিল মাত্র—

অসহায়ের মত মহিমের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন—বাবা, বাবাগো—চোখ মেলে তাকা একবার—

টেবিলের উপর রহিয়াছে রেডিও—হাতে সোনার ১৬টি চুড়ি, কাঁচের আলমারী ভর্ত্তি কত কাপড় জামা, তাহারা আজ কোন সান্ত্বনাই দিতেছে না—

যোগীন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছেন—মা, মা, আর বাঁচবো না—আর নয়—

মাতা শিয়রে বসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন—যোগীন, যোগীন, অমন ক'রছিস্ কেন? কি হ'য়েছে, বল যোগীন—

যোগীন 'উঃ' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মাতা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে চোখের জল ফেলিতেছেন। মানুষ এমন অনুদার—বিনা চিকিৎসায় যোগীন মরিতে বসিয়াছে অথচ মহিম এতটুকু দিয়া সাহায্য করিল না। এক মাতৃজঠরে তাদের জন্ম, একই স্তন্যপান করিয়া লালিত—অথচ স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দ্বারা আজ এতই দূর হইয়াছে। হরিহরের স্ত্রী রোগাক্রান্ত পুত্রকে কোলে লইয়া তাই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন—

কক্ষান্তরে যোগীন পত্নী রাঁধিয়া শুধু ফেনা ভাত ছেলেদের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন তাহারা খাইবে না বলিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া আছে। সামান্য যাহা ধারে পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে ঔষধ আসিয়াছে কিন্তু বাজার

হয় নাই। যোগীনের স্ত্রী ছেলেদের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—হায় হায়, ভগবান ছেলেমেয়েদের পেটের ভাতও জুটাইলেন না, সোনার ছেলেমেয়ে, এত আদরের ছেলেমেয়ে শুধু ভাত কেমন করিয়া খাইবে—

অবোধ শিশুগুলি কিছুই না বুঝিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল—শুধু ভাত খাব কি ক'রে, তুমি আর কিছু রাঁধো না—

যোগীন পত্নী হলুদ তৈল কালি অবলুপ্ত শাড়ীর আঁচল দিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া একবার আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন—উঃ ভগবান।

যোগীন রোগের ঘোরে কহিল—উঃ—

মহিমের স্ত্রী ছেলে কোলে করিয়া কহিলেন—হায় ভগবান প্রাণটা ভিক্ষা দাও—নিঠুর ভগবান—বাছাকে মার্জ্জনা কর—

ঘরে ঘরে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া গিয়াছে—

হরিহর একদিন গোপাল ঠাকুরের চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া দিয়া তাহার মুখের ধান কয়টি বিক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়া এই বাড়ী করিয়াছিলেন। নতুন শিক্ষার দম্ভে, বড় হইবার স্বার্থবুদ্ধিতে হরিহর স্নেহ মমতাউদারতায় দেবতুল্য গোপালকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিহর সেদিন শিল্পাঞ্চলের জৌলুস্, শহরের কাঞ্চন ও কৌলিন্যের মোহে স্বজনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন গোপাল অভিযোগ করেন নাই, নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া পরম সহিষ্ণুতা ও উদারতার সঙ্গে তাহাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—ওরা সুখে থাক্। কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, সত্য হইয়া রহিয়াছে শুধু চোখের জল—আজ হরিহরের ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইয়াছে অশ্রুর বন্যা। আপনার কর্ম্মফল ও মোহান্ধ জীবনে ডাকিয়া আনিয়াছে এই অপরিসীম ব্যর্থতা ও দৈন্য, এই প্রবহমান অশ্রুর বন্যা কতদিনে কত সুদূরে যাইয়া বিলুপ্ত হইবে তাহা কে জানে! এরা দিতে শিখে নাই, তাই জগতে কিছুই পায় নাই—একান্ত একাকী অসহায় জীবনে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে।

এরা ভগবতী চাটুয্যের গোপালপুরের অধিবাসী।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কমলা-নির্বাসন

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

দুর্বাসা-রোষে লুকালো কমলা অতল সিন্ধুতলে
শ্রীহীন অমরা মলিনা বসুন্ধরা
দৈন্য-কাতর অমর ও নর ভাসিল চোখের জলে
আসিল নিত্য বেদনা-পরম্পরা।
সহিতে পারে না দেবতা-দানব-মানব-ভুজংগম
ইন্দিরাহীন অসুন্দরের খেলা
সহিতে পারে না বিটপি-গুল্ম-লতিকা-বিহংগম
বিশ্বব্যাপিণী লক্ষ্মীর অবহেলা।
নন্দনে আর চিরসুন্দর মন্দার নাহি ফুটে
পতিত-পত্র শীর্ণ স্বর্গ-তরু!
আনন্দহীন ইন্দ্র-সভায় অপ্সরা নাহি জুটে,
যৌবন-বন পুড়িয়া হয়েছে মরু।

গলিতদন্ত বিলোল-চর্ম কাঁদিছে পঞ্চশর
উদক শূন্য অলকানন্দা তীরে
জরায় মলিন বসন্ত-তণুর হেরিয়া রূপান্তর
ভাসিছে সতত ব্যথার নেত্রনীরে।
যক্ষরাজের ভাণ্ডারে আজ মিলেনা কপর্দক,
অন্নপূর্ণা অন্ন মাগিয়া ফিরে
রত্নাকরের অভিধান আজ হয়েছে অসার্থক
শুধু কংকাল জলধির তল ঘিরে।
সব লাঞ্ছনা, ব্যথা-বঞ্চনা করিয়া অপহৃত
ক্ষীরদ সিন্ধু কে করিবে মন্থন?
ছিন্ন করিয়া সাগর আড়াল কে তুলিবে অমৃত
কে ঘুচাবে আজ কমলা-নির্বাসন?

কর্ম-অর্ঘ্য

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভগবান ভাব-গ্রাহী। প্রকৃত মনোভাব গোপন ক'রে এজগতে সাম্রাজ্য-লাভ সম্ভবপর কিন্তু আধ্যাত্মিক ভূমিতে পতন-অভ্যুত্থান-পথের একমাত্র যান-বাহন মনোরথ। নির্বিরোধ স্পষ্ট ভাবের অবাধ গতি সর্বত্র—স্বর্গ, মর্ত রসাতলে। ভাবের বাহন ভাষার সঙ্গে অর্থ যেমন সম্পৃক্ত, ভাবের সঙ্গে উচ্চারিত বাক্যের সে সম্বন্ধ সব দিন আমাদের থাকে না। মিথ্যা ও ভণ্ডামীর বাহন ভাষা। মনোভাব গোপনের সহায়ক বৃথা বাক্য।

ভাব ও বাক্যের ঐক্য চিত্ত-শুদ্ধির উপায়, ভাব যদি শুদ্ধ হয়। তাই ঋষিদের শিক্ষা—মন্ত্রজপ। শ্রীমহাপ্রভু নাম জপকে মুক্তির সোপান নির্ণয় করেছিলেন। নামে ও ভাবে মিলে ভক্তকে গোলকধামের পথে পৌঁছে দেবার এ উপায় সরল। প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং সত্যানুরাগ।

ভাব জগদীশ্বরের উপলব্ধির সোপান। ভাবকে একমুখ না করলে সংসারের তুচ্ছ স্বার্থের নিত্য সংগ্রামেও সাফল্য সুদূরপরাহত। সাংসারিক কার্যে সিদ্ধিলাভ ক'রে মানুষ যখন বোঝে সে সিদ্ধির অসারতা তখন স্বতঃই তার অন্তরাত্মা চায় ক্ষণিক হাসি ক্ষণিক তুষ্টির অশাশ্বত ক্ষেত্রের অন্তরালে পৌঁছতে। চিরন্তন শান্তি লাভ করতে গেলে একমাত্র চির-শান্তিময়, সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর, সর্বত্র পাণিপাদ-অক্ষি-শিরোমুখ ভগবানের উপলব্ধি প্রয়োজন। সে সিদ্ধির অনুসন্ধান পথে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—শরণ।

যারা হিন্দু কৃষ্টিকে বহু দেবতা আরাধনা, বহু ঈশ্বর পূজা, বা পৌত্তলিকতা ব'লে উপেক্ষা করে, তারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করলে, বহু দেবতা বা মূর্তি পূজার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। হয়তো তেমন সন্দেহ অর্জুনেরও চিত্তের কোনো নিভৃত গুহায় বিদ্যমান ছিল। তাই বিরাট বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমেই তিনি বলে উঠলেন যেন রহস্য সমাধানের সুরে—তোমার দেবদেহে সকল দেবতা, সকল ভূতসঙ্ঘ, সকল ঋষি, উরগ প্রভৃতি দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুধাবন করলে বোঝা যায় তিনি ভগবানকে বহু দেবতার পূজায় পাবার চেষ্টাকে বৃথা সাধনা বলেন নি। ত্রিগুণ প্রকৃতিবিকসিত বহুভাবে নব নব ভঙ্গিতে। সেই সব খণ্ড বিভূতিকে এক এক দেবতা পরিকল্পনা করা হয়। ব্রহ্ম এক। অবশ্য প্রকৃত মোক্ষ-পথ পরব্রহ্মের সম্যক অখণ্ড উপলব্ধি। যুদ্ধকেও তো তিনি কুকর্ম বলেন নি—কারণ জগতে ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন সত্য ও সমাজকে ধর্মপথে সংরক্ষণের জন্য। যুদ্ধ নিষ্ঠুরতা। কিন্তু সে নিষ্ঠুরতায় চিত্ত-সন্নিবিষ্ট না করে ভগবানের শরণ নিলে নিষ্কাম যুদ্ধকর্ম অবিধেয় বিবেচিত হবে না। কারণ জগদীশ্বরের চিন্তায় নিষ্ঠুরতা দম্ভ, দর্প, লোভ বা স্পর্দ্ধা সমস্তই লোপ পায়। তাঁর উপদেশ—"তাই সর্বকালে আমাকে অনুসরণ কর আর যুদ্ধ কর। মন এবং বুদ্ধি আমাকে সমর্পিত হ'লে নিঃসন্দেহ আমাকেই পাবে।"*

পূজা বা যাগ যজ্ঞে লাভের চিন্তা বা কামনার প্রেরণা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে সাবধান করেছেন। সকল ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে মাত্র পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ না করলে চরম শান্তি অসম্ভব। এমন কি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধেও তিনি সতর্কতার বাণী শুনিয়েছেন। দেবযাজী প্রার্থনা-অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করে। যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গতি প্রার্থনা করলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু সে তো অনন্ত স্বর্গ নয়। সে স্বর্গ দেবাশ্রিত দিব্যভূমি। দেবতা শব্দ দ্যোতনার্থ। সে দ্যুতির উপলব্ধি অনন্ত আনন্দের পূর্ণ চেতনা হ'তে বিভিন্ন। তাই ভগবান বলেছেন—"যে বেদবিদ্গণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-পূর্বক আমার পূজা করেন, তাঁরা পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং উত্তম দিব্য-সুখভোগ করেন।†

---

* তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম ॥ ৮।৭

† ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ঠা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান দিবি দেব ভোগান ॥ ৯।২০

ভগবান ভাবগ্রাহী। স্বর্গলাভের কামনায় বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড নির্দেশিত যাগযজ্ঞের ফলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু সে স্বর্গ কামনার স্বর্গ। প্রার্থনাকে আমিত্বের উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ভোগের লোভ থাকে ভগবান স্বর্গভোগের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে ভোগ শাশ্বত হয় না, কারণ সংকল্পে অনন্তকালের মোক্ষের আস্বাদনের অভাব। আমাদের সকল পূজানুষ্ঠানের প্রায় ঐ গতি। ফল শ্রুতি সাংসারিক লাভের প্রতিশ্রুতি। না হইবেই বা কেন সাফল্য লাভ? সৃষ্টি তাঁর লীলা। সৃষ্টির সকল উপকরণ তো একেবারে মোক্ষকামী নয়। তাঁরই ইচ্ছা এ সৃষ্টির ধারা। অনন্তকাল তাঁকে ভুলে থাকবে জীব এ লীলা তাঁর নয়। আবর্তন, বিবর্তন, পতন ও অভ্যুত্থান সে লীলার রূপ। বন্ধন ও মোচন নটরাজের নৃত্যছন্দের তাল। তাই মানুষের প্রাণে জাগে আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ব-সংসারে ইষ্ট ভোগের কামনা। অথচ সে বোঝে সকল সৃষ্টির মূলে যিনি বিদ্যমান, তাঁর কৃপা অতিক্রম ক'রে সাফল্য সুলভ নয়।

এই অনুভূতিই আমাদের অল্প-পরিসর পরিণাম যাচিজ্ঞার মূলের কথা। সংসার-সুখ ও স্বর্গ-সুখ উভয়ই সুখ-চিত্রের প্রচ্ছদপটে থাকে ক্ষুদ্র চেতনার। ভোগের রূপ মিশ্র। ডাকাত কালীপূজা ক'রে পরস্বাপহরণ ও নরহত্যা করে বহুস্থলে। ব্যবসায়ী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে লাভের, যার অনিবার্য্য পরিণাম অন্যের ক্ষতি। এমন পূজার তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করলে এক কথা মনে জাগে। মানুষে তার মনন-শক্তি কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রে। ভগবানের খণ্ড-বিভূতি স্মরণ ক'রে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত আস্তিক্য-বুদ্ধির সঙ্কেত।

অবশ্য নাস্তিক বুদ্ধি হ'তে কামনা সিদ্ধির লোভ প্রণোদিত আস্তিক্য-বুদ্ধি ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যায় মানব-জাতিকে।

সকাম পূজা ও প্রার্থনার পুণ্যে লব্ধ সাংসারিক সাফল্য নব নব কামনার সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু ধীরে ধীরে দুটা উপলব্ধির অভিব্যক্তি নিশ্চিত। প্রথম—ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু এবং অন্তঃসারশূন্য সাংসারিক সাফল্য স্বল্পকালের ভোগের বিধায়ক। এ বিচারে মানুষের উপলব্ধি হয় সত্যের। ভগবানের শরণ নিলে পাওয়া যায় সব যা চাওয়া যায়। কিন্তু যা চাওয়া যায় তার সার বস্তু যদি না স্থায়ী হয়, সত্যের ঢাকা মুখ উদ্ঘাটনের সহায়ক না হয়, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির শাশ্বত উপায় না হয়, তাহলে এমন কিছু উপহার প্রার্থনা করা উচিত যা নূতন অতৃপ্তির জন্মভূমি নয়।

কি নামে পূজা হ'ল, কোন্ মন্ত্রে হ'ল তাঁর আরাধনা, সেকথা অবিবেচ্য—যদি মন চায় ঈশ্বরকে। এ শিক্ষা ভারতের। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অতি সরল সহজ ভাষায় সে সত্য বুঝিয়েছেন। ভক্তের প্রাণের ভক্তিকে জগদীশ্বর পোষণ করেন—স্বার্থ-মুখ হ'তে ফিরিয়ে ভক্তিকে সত্য-পথে পরিচালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

"যারা ভক্তিযুক্ত হ'য়ে শ্রদ্ধায় অন্য দেবতাকেও পূজা করে, কৌন্তেয়, অবিধিপূর্বক হলেও তারা আমাকেই পূজা করে।"

কারণ?

"আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। যারা আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না তারা প্রত্যাবর্তন করে। *

ভগবানলাভই অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। শুদ্ধ শ্রদ্ধা মনকে আপ্লুত করে ভক্তিতে। লৌকিক শ্রদ্ধা যে ভাবে বিকশিত হয় সে বিকাশও মুক্তির সোপান। পৃথিবীতে যাকে ভক্তি করি তাকে ফুল দিই, মাল্য চন্দন ভূষিত করি, নিজের রুচির অনুরূপ আগর্ঘে পরিতুষ্ট করি। মানস-পূজা ক্রমশঃ আয়ত্ত হয়। ধ্যানাবস্থিগত হয় সাধনার ফলে।

সে অবস্থায় বিশ্ব-জগতের সকল হিল্লোল, সমস্ত সত্ত্বা, প্রত্যেক চেতনা ঘনীভূত হয় আনন্দে। ভক্ত উপভোগ করে ঈশ্বরানুভূতির বিমল আনন্দ-স্পন্দন। কিন্তু সে অবস্থা তো একদিনে আসে না। পূর্ব-জন্মের পুণ্য ইহজগতে অনুষ্ঠিত পবিত্র কর্মের সঙ্গে যুক্ত না হ'লে বিমল চেতনা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"বহু জন্ম ব্যতিক্রম করে জ্ঞানীভক্ত সমস্ত জগতই বাসুদেব, এই জ্ঞানে আমাকে লাভ করে। কিন্তু সে মহাত্মা অতি দুর্লভ।" †

---

* যেহপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যাবিধি পূর্বকম।
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চবন্তি তে।৯।২৩।২৪

† বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।৮।১৯

পুনরাবর্তন শেষ হয় তাঁকে লাভ করলে। আর তাঁকে লাভ করা সম্ভব সারা-বিশ্বের চেতনা নিজস্ব করলে। মানুষ ক্রমশঃ আপনাকে বিস্তার করে সারা-বিশ্বে, নিজের অতি-ক্ষুদ্র-আমিত্বের গহ্বর হ'তে আপনাকে তুলে নিয়ে। স্বর্গ লাভ করলেও ভোগের শেষ হয় না, যদি স্বর্গ লাভের মূলে থাকে ভোগের বাসনা। যাগ-যজ্ঞ করে লোকে সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে তো ভগবান লাভ নয়। সে স্বর্গ অশাশ্বত। তাই গীতা বলেছেন—তেমন ধর্মের মূল গতায়াত। *

তবে কি যাগ-যজ্ঞ বা পূজাবিধি নিষ্প্রয়োজন? কখনই নয়। তারা যে মনকে পবিত্র করবার উপায়। বিশ্ব-প্রাণতার আনন্দ লাভ করে প্রাণ ইষ্টদেবের পূজার মাধ্যমে। মন্ত্র-শক্তি মাত্র প্রতিরোধক নয়, মনকে মন্ত্রে সন্নিবিষ্ট রেখে অন্য ভাবকে প্রবেশের অবকাশ না দেবার উপায় নয়। নাম স্মরণ করিয়ে দেয় নামের অধীশ্বরকে—তাই নামজপ মুক্তির পথ। মন্ত্র অনুপ্রাণিত করে চিত্তকে। যে আদর্শ লাভের জন্য মন্ত্রের সাধনা সে আদর্শকে হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে মন্ত্রশক্তি। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। তাঁর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য অর্পণ করলে সে অর্ঘ্য গ্রহণ করেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একথা ব্যক্ত করেছেন।

"যিনি আমাকে পত্র, পুষ্প বা জল ভক্তিভরে অর্পণ করেন, শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির সেই ভক্তিদ্বারা প্রদত্ত উপহার আমি গ্রহণ করি।" †

যে দেয় সে নিবেদনের সময় তাঁকে ভাবে, তাঁর সান্নিধ্য কল্পনা করে, পরে উপলব্ধি করে। সুতরাং নিবেদন ধ্যানের অবস্থা, শুদ্ধির উপায়। যোগ-শাস্ত্র মতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ ঈশ্বর প্রণিধানের উপায়। আমরা যদি এ-বাণী মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখি যে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা আমাদের তুচ্ছ ফল মূল পাতা ও জল তিনি গ্রহণ করেন, যদি ভক্তি থাকে অর্ঘ্যের মূলে, তাহলে পূজা হয় শুদ্ধ ও সার্থক।

কেবল পূজার আসনে কেন? সদা লৌকিক কর্মে কেন তাঁকে নিকটে রাখি না, সঙ্গী করি না, ভাগীদার বোধ করি না? কেবল মাত্র সকাল সন্ধ্যা পূজায় তো পূর্ণ-বিশুদ্ধি লাভ হয় না। কর্মকে অর্ঘ্য করলে সদা জাগরিত থাকে মন তাঁর মন্দিরে। এ সঙ্কেত শ্রীকৃষ্ণের।

"তুমি যা কর, যা ভোজন কর, যা তপস্যা কর, তা আমাকে সমর্পণ কর।" *

ভক্তির এ-উচ্চ অবস্থা। কারণ চরম ভক্তি আত্ম-সমর্পণ তাঁর অনন্ত সত্তায়। কর্ম, ভোজন, যাগ, দান, তপস্যা তাঁর নৈবেদ্য। একটু ধীরভাবে বুঝলে এ বাণীর অন্তর্নিহিত শিক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এমন নিস্পৃহ কামনা-গন্ধ-হীন ভগবদ্ উপলব্ধি মোক্ষের উচ্চ সোপান। তাতে লাভের লোভ নাই, শুভাশুভের হিসাব নাই—মাত্র আছে সৃষ্ট ও স্রষ্টার নিবিড় ঐকান্তিক সম্বন্ধের চেতনা। এর ফলও বর্ণিত হয়েছে।

"এইরূপে শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন হ'তে মুক্ত হও। বিমুক্ত হ'য়ে কর্মফল ত্যাগরূপ যোগযুক্ত হ'য়ে আমাকে প্রাপ্ত হও।" †

কর্মের শুভাশুভ ফলে নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে কর্ম করতেই হবে, মাত্র এই অনুপ্রেরণায় নিষ্কাম কর্ম করবার উপদেশ প্রথমেই দিয়েছেন ভগবান শিষ্য-সখা অর্জুনকে। নিষ্কাম কর্ম সরল হয় যখন কর্মকে আমরা ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্তব্য কর্ম ভাবি। তার উপর যখন প্রত্যেক কর্মে এমন কি পান-ভোজনের ও কর্মের ফল নিবেদন করি তাঁকে, তখন আরও সহজ-সাধ্য হয় জ্ঞানের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম। এ-সহায়তা শক্তির রূপ ধারণ করে যখন মনের পট-ভূমিতে আশার বাণী, আশ্বাসের সান্ত্বনা এবং শান্তির প্রেরণা থাকে। বিশ্বাসে শুভাশুভ ফলের লাভ ও ক্ষতির বিপরীত চিন্তা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁকে সকল কর্মের সহায় করলে, কর্ম-জীবনের কঠোরতা লোপ পায়। জগত তাঁর লীলা-ভূমি। মানুষের এ কর্ম-ভূমি। কর্মত্যাগ তাঁর অভিপ্রেত নয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ী ধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ।৯।২১।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

* যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম।

† শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ
সংন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।

মানসে ও কর্মে পূজার জন্য প্রয়োজন হয় না ধূপ ধুনা, নৈবেদ্য বা শঙ্খ-ধ্বনি। মনের বেদীতে তাঁকে অধিষ্ঠিত করে নিত্য কর্মের দ্বারা তাঁর পূজা বিশিষ্ট পূজা। যজ্ঞাহুতি জ্বলতে পারে সদাই, ঊষা ও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলতে পারে দিবারাত্রি। তাই কবি বড় দরদের ভাষায় গেয়েছিলেন—

যত দিতে চাও কাজ দিও যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল-জঞ্জাল গুলিতে।
বাঁধিও আমায় যত খুসি ডোরে
মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে
ধূলায় রাখিও পবিত্র করে তোমার চরণ ধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে তোমারে দিওনা ভুলিতে।

মানুষ যখন বুঝে তাঁর শুদ্ধতা, কর্ম তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে সে কর্ম অশুদ্ধতো হতে পারে না। প্রাণে শ্রদ্ধা থাকলে কর্ত্তব্যকে ভাব্‌তে পারা যায় তাঁর কর্ম। সেই ভাবনাই হবে কর্ম নির্বাচনের মান—যার ফলে অশুদ্ধ অশুভ কর্মকে কর্ত্তব্য বিবেচিত হবে না।

যে কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করতে হবে সে কাজ কুৎসিৎ হলে ভক্তি কোথায় তাঁর পবিত্রতায়! তাই যে কাজ কর আমাকে দাও—এ-নির্দেশ ধীর হয়ে বুঝলে হৃদয়ঙ্গম হয় এর অন্তর্নিহিত নীতি। জীবহিংসা, কপটতা, লুণ্ঠন বা ভণ্ডামি হ'তে বিশ্বাসী ভক্তকে বিরত থাকতেই হবে—কারণ এসব কর্মতো সে মানুষ নিবেদন করতে পারবে না শুদ্ধ নিত্য অনন্তকে। বাসনা পাপ-মুখ হলে তাকে আপনি মুখ ঢাকতে হবে তার কাছে যার জীবনের ব্রত—যা করব ঈশ্বরকে সমর্পণ করব। ভগবানকে মানলে বুঝতে হবে তাঁর অস্তিত্ব সর্ব্বভূতে। সুতরাং পরের ক্ষতি অসম্ভব। যা কর আমায় দাও—এ নীতি জীবন পথের আলোক-বর্ত্তিকা হলে শুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

অশন সম্বন্ধেও ঐ কথা। যা ভোজন করব—তা তাঁকে অর্পণ করতে হবে—এ নির্দেশ মনের পটভূমিতে থাকলে—অন্যায় উপায়ে লাভ করা অর্থে ভোজ্য সংগ্রহ বন্ধ হবে। জীবহিংসা ও সুরাদি পানে দেহের পুষ্টি সাধন হতে বিরত হবে বিশ্বাসী। সংসারে এ-নীতি প্রবর্ত্তিত হলে মঙ্গল অনিবার্য্য।

এ নীতি অনুসরণ করলে পূজা ও তপস্যাও হবে পবিত্র। পুণ্যের দম্ভ বিকৃত করে মানুষের স্বভাব। যা তপস্যা কর আমাকে অর্পণ কর, এ নীতি শুদ্ধ ও শক্তিমান করবে তপস্বীকে, তাকে নিকটে আনবে আরাধ্যের বেদী পাদপীঠের। মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির উদ্দেশে আসুরিক পূজা হবে বন্ধ—ফল অর্পণ করতে হলে তাঁকে। ভগবান অন্যত্র বলেছেন—মৎকর্মকৃত হও।

পূজা, যাগ যজ্ঞ মানুষের বিশুদ্ধির হোমাগ্নি। তারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার পুণ্য-ধামে যাত্রার পথে। মন স্থির হলে হৃদয় আপনিই হবে পূজার পীট। তখন বাহ্যিক উপকরণ প্রয়োজন হবে না শুদ্ধির।

সর্ব্ব-দেবতার এক একটি বিভূতির পূজা হতে তাঁর পূর্ণতার উপলব্ধি জ্যোতির্ময় করে মনকে। তখন ভেদ বুদ্ধি লোপ পায়—দুঃখ পায় দুঃখ—আনন্দের ঝরণা ধারা পবিত্র করে জ্ঞানবান কর্মী ভক্তকে।

শ্রীগীতা শিক্ষা দিয়েছেন—যাঁহা হতে সকল ভূতের প্রবৃত্তির উদ্ভব, যিনি এই বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত, মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁকে অর্চ্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে। *

নিষ্কাম কর্মের অর্ঘ্য বিশ্বনিয়ন্তার পূজার বেদীতে ভক্তি ভরে অর্পিত হলে মানব ব্যষ্টি ও সমষ্টি মোক্ষ পথে অগ্রগামী হয়।

* যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।১৮।৪৬

কাশ্যমীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙ্গলো, মিষ্টি সোণালী রোদে আকাশ চকচক কোরছে, কিন্তু সামনের কাল-মেঘলায় ঘেরা শ্যামল সমতল ভূমিতে এবং হ্রদের নিথর কালো জলে যেন তখনও নিদ্রালসা নিশীথিনী তার অনাবৃত সৌন্দর্য্য নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে শুয়ে আছে, সূর্য্যালোকের সজীবতা তাকে তখনও সজাগ সচেতন কোরে তোলেনি। কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী শ্রান্ত প্রহরীর মত লজ্জাহারী সূর্য্যের স্পর্শ থেকে তাঁকে আড়াল

পহলগাম উপত্যকা

কোরে রেখেছে। নৌকার বাইরে এসে দাঁড়ালাম, নীচে স্বচ্ছজলের ভেতর অনেকখানি দেখা যাচ্ছে—তার মধ্যে ছোট ছোট মাছের ছুটোছুটি, বহু সজীব সবুজ গুল্মলতার ঘেষাঘেঁষি, একধারে বহুদূর বিস্তৃত ডালের নিশ্চল স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশি কুয়াশার কোলে মিলিয়ে গেছে। পায়ের নীচের জল থেকে শীতের সকালে হু হু কোরে ধোঁয়া ওঠে, সেই ধোঁয়ায় সৃষ্টি করে কুয়াশা সামনে শঙ্করাচিয়া পাহাড়ের ওপর মহালয়ের মন্দির স্বর্ণাভ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত—যেন স্বয়ং ধ্যানগম্ভীর মহাদেব; মাথায় তাঁর চন্দ্রকলার দীপ্তি। আশে পাশের ঠাণ্ডা হাওয়া সঞ্জীবনীর সজীবতা বহন কোরে সঞ্চরণশীল—নৌগৃহে থাকার প্রধান সুবিধা সহরের রাস্তা ঘাটের
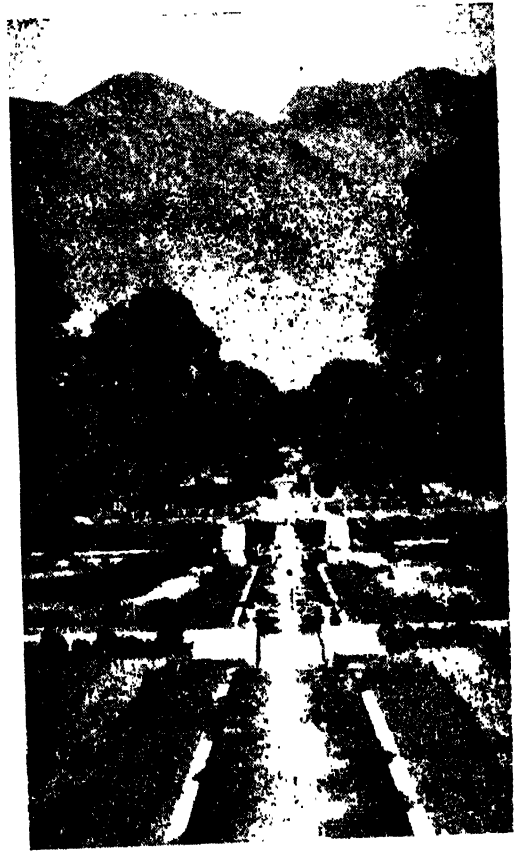
জেনানামহল থেকে নিশাদবাগের দৃশ্য

ধুলির মালিন্য থেকে দূরে থাকা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত রস নিরবিচ্ছিন্নভাবে আকণ্ঠ পান করা। সহরের হোটেলে বাস কোরে

সত্যকার কাশ্মীরকে ঠিকমত দেখা যায় না, পরে হোটেলে বাস কোরে এ অভিজ্ঞতা আমরা লাভ কোরেছিলাম।

ক্রমে দিনমণির দীপ্তির সঙ্গে সুরু হোলো কর্মকোলাহল—সামনের পীচ বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তা "ঝরাসিং বুলেভার্দে" টাঙ্গা, মোটর, লরীর ছুটোছুটি দাপাদাপি, সামনের খালে ছোট বড় নৌকা, শীকার যাতায়াত কোরতে

শালিমার বাগ

নিশাদবাগের নির্ঝরিণী শ্রেণী

লাগলো ; সব্জীওয়ালা, ফুলওয়ালা, কেকওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, দর্জি, ধোপা, ফটোগ্রাফার, শালওয়ালা, কাঠের কাজের ব্যাপারী ; কে নয় ? এটা যেন একটা ভিন্ন জগৎ। সহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কি বা প্রয়োজন ? সহরের সব রকমের ব্যাপারীই যাচ্ছে তাদের পণ্য নিয়ে এই সব জল পথ দিয়ে চোখে চোখ পোড়লে ত কথাই নাই, না পোড়লেও ক্ষতি নাই ; ডেকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কোরে অতি বিনয়ের সঙ্গে সেলাম কোরে কেউবা "জয় হিন্দ" বলে আলাপ জমিয়ে উঠে আসবে তার পণ্যের পসরা নিয়ে আপনার নৌকায়। প্রয়োজন নেই বলে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান কোরলেও রেহাই নাই ; নাই বা থাকলো আপনার প্রয়োজন দেখতে ত কোন দোষ নাই। কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছেন, দেখুন না কাশ্মীরের সামগ্রী ; পছন্দ যদি কিছু নাই হয় তাতেই বা কি ; সে খুসী হোয়ে চোলে যাবে। কিন্তু একবার তার পণ্য পেড়ে বোসলে, কাশ্মীরী ব্যবসাদারদের সৌজন্য এবং বাকচাতুর্যের প্রভাব এড়িয়ে কিছু না কেনা বড় কঠিন ব্যাপার। তারা যেটার দাম বলবে ২০৲ টাকা, শেষে দেখবেন সেটা ৮।১০৲ টাকায় নয়ত ৫৲ টাকাতেই কিনে বসেছেন।

নারী ও পুরুষ দেখতে যেমন সুশ্রী তেমনি সৌজন্য এদের। অবশ্য বেশভূষায় আচার আচরণে এরা বড় নোংরা ; কিন্তু তার কারণটাও জানলে মন বিরূপ না হোয়ে ব্যথিতই হোয়ে ওঠে। কাশ্মীরী ব্যবসাদাররা ঠগ্ বোলে দুর্নাম অর্জ্জন কোরেছ ; স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশই যৌন ব্যাধিতে ভোগে স্নান করে কালে কস্মিনে। কিন্তু বদনাম কুড়িয়েছে বোধহয় বাধ্য হোয়ে। অধিকাংশ কাশ্মীরী অত্যন্ত দরিদ্র। ডোগরা রাজবংশের আমলে এখানে সম্পত্তির মালিক ছিল অধিকাংশই হিন্দু, মুসলমানরা ছিল শুধু ক্ষেত-মজুর নয় দিন-মজুর। তারা বছরের পর বছর ক্ষেতে চাষ কোরত, কিন্তু তাতে কোনও সত্ব তাদের ছিল না। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯৫ জন গ্রাম্য চাষী—তারা থাকে গ্রামে. অভাবে অনটনে তাদের দিন চলে। সহরের বড় চাকরী ও ব্যবসা মূলতঃ হিন্দুদের হাতে—তারা শিক্ষিত, ধূর্ত্ত, রাজঅনুগৃহীত ও রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষিত,

তাদের বাদ দিয়ে আর যারা ব্যবসা করে তারাই হোল এই সব ছোট খাট ব্যবসায়ী—যারা শীকারায় চোড়ে শীকার করে—কাশ্মীরীরা ত তাদের খরিদ্দার নয়, তাই তাদের উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হোল কাশ্মীরের ভ্রমণকারীর দল—যারা এখানে খরচ কোরতেই এসেছে এবং যাদের অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া সহজ। এই ব্যবসার জীবনকালও খুব সংক্ষিপ্ত, যতদিন ভ্রমণকারীর দল থাকবে ততদিন। কাজেই অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে ব্যবসা কোরে পরিবার প্রতিপালন কোরতে হোলো ঠকান ছাড়া পথ কৈ? কিন্তু বর্ত্তমান সরকার সেন্ট্রাল মার্কেট এবং "এম্পোরিয়াম" কোরে এখন প্রত্যেক জিনিষের দামের একটা মোটামুটি মাপকাঠি ধার্য্য কোরে দেওয়ায় ভ্রমণকারীদের ঠকবার ভয় অনেকটা কম। শীকারায় ফেরিওয়ালার কাছ থেকে অথবা বাজারে কিছু কেনার আগে এই দু'জায়গায় দাম দর দেখে শুনে এলে বেশী ঠকবার ভয় থাকে না।

এদের কুৎসিৎ ব্যাধির জন্যে দায়ী এদের অজ্ঞতা এবং কিছু পরিমাণে বিদেশীর দল। কাশ্মীরী সুন্দরীদের অসাধারণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হোয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে বিদেশীর দল এখানে এসেছে শত্রুরূপে বন্ধুভাবে, পর্য্যটক হিসেবে। কাশ্মীরের ওপর বরাবর চোলেছে বর্ব্বর শত্রু সৈন্যের আক্রমণ ও উৎপীড়ন—তার ফলে সমাজ জীবন হোয়েছে বারবার বিপর্য্যস্ত, এর ওপর দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার আবর্ত্তে বর্ত্তমান চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুযোগ এরা পায় নাই। গ্রামে আজও জল পড়া, জড়ি বড়ি কবজ দৈব দিয়েই সব রোগের চিকৎসা হয়, কাজেই বংশানুক্রমিক ধারায় যৌন-ব্যাধি আজ ব্যাপক হোয়ে ছড়িয়ে গেছে। অবশ্য একথা বলা দরকার যে আজকের দিনেও কাশ্মীরী মেয়েদের—কি হিন্দু কি মুসলমান—লজ্জা-শীলতা, শালীনতাবোধ, পর্দ্দা ইত্যাদি দেখে মনে হয় কাশ্মীরী সুন্দরীরা বিদেশীর দৃষ্টি থেকে সজাগ ভাবে সন্ত্রস্ত হোয়ে দূরেই থাকার চেষ্টা করে; বিদেশীর সামনে নিজেদের প্রচার করার চেষ্টা এদের বেশভূষায় চালচলনে, ইঙ্গিতে ইসারায় একান্তই দুর্লভ। রাস্তাঘাটে বেশ বয়স্কা ছাড়া কমবয়সী মেয়ে চোখেই পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ তাঁরা আপনার সামনে পড়ে গেলে ক্ষিপ্র হাতে মাথার ঘোমটা টেনে দেবে, নয়ত দ্রুত আত্মগোপন কোরবে। অবশ্য ইদানীং শ্রীনগরে মেয়েদের স্কুল ও কলেজ হোয়েছে—কাজেই সালোয়ার, কুর্ত্তা, গ্যারারা বা শাড়ী শোভিতা কলেজী আধুনিকাদের কাউকে কাউকে সহরের পথে ঘাটে পথিকের চোখ ঝলসাতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণ মানুষের বাইরের ও বেশের মালিন্যের জন্য দায়ী—দারিদ্র্য এবং আবহাওয়া। পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ার আর্থিক স্বাচ্ছল্য অধিকাংশেরই নেই; তার ওপর এখানের দারুণ শীত বছরের প্রায় ৮ মাস প্রত্যেককে রাখে ঘরে বন্দী কোরে। প্রায় ৮ মাস সেখানে স্নান করা সম্ভব নয়, বাকী ৪ মাস স্নান কোরে তাদের লাভ কি? শ্রীনগরের আবহাওয়ার উত্তাপের হিসেবটা এখানে দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিদেশীদেরও এটা কাজে লাগবে।

	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	মধ্যমান
১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী—	১৫°—	৪৫°—	৩৫°
১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ্চ—	২০°—	৫০°—	৪০°
১৫ই মার্চ্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল—	৩০°—	৬৫°—	৪৮°
১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে—	৩৫°—	৮০°—	৫৫°
১৫ই মে থেকে ১৫ই জুন—	৪৫°—	৮৫°—	৬৫°
১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই—	৫০°—	৯৫°—	৭৫°
১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট—	৫৫°—	৯০°—	৮০°
১৫ই আগষ্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর—	৪৫°—	৮৫°—	৭০°
১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর—	৪৫°—	৭০°—	৬০°
১৫ই অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বর—	৩৫°—	৬০°—	৫০°
১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর—	২৫°—	৫০°—	৪৫°

পাহাড়ের দিক থেকে নিশাদবাগ

ডিসেম্বর থেকে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রায় ৩॥০ মাস সমস্ত কাশ্মীর-উপত্যকা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, মার্চ্চে বরফ গলে ও এপ্রিল পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইতে থাকে; মে মাসের আবহাওয়া আনে উষ্ণতা; বেড়াবার পক্ষে মে জুন ভাল সময়। জুন থেকে আগষ্ট হোল এখানের গ্রীষ্মকাল; তখন অবস্থাপন্নরা গুলমার্গ, পহলগাম প্রভৃতি আরো উঁচু সহরে গিয়ে গরম থেকে বাঁচেন। কাশ্মীরীরা ঠাণ্ডায়

থাকতে অত্যন্ত বোলে এই গরমেই ত্রাহি ডাক ছাড়ে, জুলাই আগষ্টে খাটিয়া বার কোরে ছাদে ফুটপাথে শোয়—আর গরমে আইঢাই করে। বৈশাখ মাসে নিসাদবাগে একটী বৈশাখী মেলা বসে। শ্রাবণে তুষার তীর্থ অমরনাথ যাত্রার সময় (শ্রাবণী পূর্ণিমা) কারণ তখন চারিদিকের উচু পাহাড়ের মাথার বরফ গলে। এই সময় শ্রীনগরে সরকারী এবং সেণ্ট্রাল মার্কেট প্রদর্শনী (state exhibition) খোলা হয় এবং তা খোলা থাকে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত। সেপ্টেম্বর ও প্রথম অক্টোবর হোল কাশ্মীর বেড়াবার সব চেয়ে ভাল সময়।

জুলাই আগষ্টের বৃষ্টির ফলে বর্ষাস্নাতা সুন্দরী কাশ্মীর তখন পূর্ণযৌবনা, দিকে দিকে ফুল, ফল ও ফসলের প্রাণস্পন্দন, আকাশ থাকে মেঘ মুক্ত, বায়ু নির্ম্মল, বিভিন্ন বাগানের বুকে তখন বর্ণ বৈচিত্র্যের ফুলঝারি, পাহাড়ী অধিত্যকাগুলির সবুজ সমতলভূমিতে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে আপন খেয়াল খুসীমত রচনা করেন নানা বনফুলের বীথিকা; গাছে গাছে সরস সুপক্ক আপেল, বাগুগোসা, নাসপাতি, বেদানা, আখরোট, নির্ম্মল হাওয়া তখন শীত ও গ্রীষ্মের সব তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা ত্যাগ কোরে বিদেশী অতিথিকে সাদরে সম্ভাষণ জানায়।

অক্টোবরের শেষাশেষি ঠাণ্ডা পড়ে, নভেম্বরের শেষে বা প্রথম ডিসেম্বরে তা তুষারপাতে পরিণতি লাভ করে। বরফ বিলাসী বিদেশীরা তখন গুলমার্গ প্রভৃতি উঁচু সহরে স্কী (ski) খেলতে যান। তুষারাচ্ছন্ন এতখানি সমতলভুমি ভারতের অন্যত্র দুর্লভ—তাই শীতের খেলার জন্য এবং পাহাড়ী বরফে বেড়ানর জন্যে (trukking শীতের কাশ্মীর বিদেশীদের বিলাস ভূমি। শীতের সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ চেনার পাতা লালচে হোতে সুরু করে; মাঠের ঘাস, পাপনারের শ্রেণী বিবর্ণ, বিপত্র হোতে থাকে। নভেম্বরে চেনার পাতা একেবারে লাল হোয়ে ওঠে, এদেশের কবির ভাষায় বলে চেনারের গাছে তখন আগুন লাগে। আর এমনি লাল আগুনের হোলিখেলা চলে তখন পামপুরের কুঙ্কুমের ক্ষেতে। কুঙ্কুম কুসুমগুলি পরিপক্ক হোয়ে এই সময় ছড়িয়ে থাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মাঠের বুক জুড়ে।

প্রথম দিনটা পথের ক্লান্তি কাটাতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নুতনত্বে মশগুল হোতে, আর প্রথম হেঁসেল পাতার হাঙ্গামা পোয়াতেই কেটে গেল, পরদিন ভোরে উঠে গরম সুটের ওপর ওভার কোট চাপিয়েও কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পোড়লাম সঙ্করা চরিয়ার দিকে, শীকারা থেকে ডাঙ্গায় নেমেই সামনে একটা টাঙ্গা পাওয়া গেল। এদিকের টাঙ্গাগুলি মোটামুটী ভাল, অনেকগুলি বেশ ভালই। পশ্চিমে সবার চেয়ে লাহোরের টাঙ্গার খ্যাতি ছিল বোধহয় তাদেরই কেউ কেউ এখন ছিটকে এসেছে। শঙ্করা চারিয়া পাহাড়ের পাদমূলে বেশ খানিকটা ঘন বসতি—বলা বাহুল্য সবাই মুসলমান। এদের কবরস্থান গ্রামের সীমানা থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমে পাহাড়ের ওপরের খানিকটা পর্য্যন্ত এসেছে, এই অঞ্চল থেকে হরিপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সহরই "প্রবরপুরা" বা আদি শ্রীনগর, বসতি ছাড়িয়ে এসেই পাহাড়ে উঠবার রাস্তা, গাড়ী থেকে নেমে দেখি ভাঙ্গানী নাই, টাঙ্গাওয়ালার কাছেও নাই। অত ভোরে অন্যত্র ভাঙ্গানী পাওয়া সম্ভব নয়। গাড়োয়ান বোল্লে সে টাকা ভাঙ্গিয়ে বাকী আট আনা যেখানে আমরা তার গাড়ীতে উঠেছিলাম সেখানের পেট্রল পাম্প-ওয়ালার কাছে রেখে দেবে, পয়সা নিয়ে সে পালাতে পারে না—কারণ সে ঐ জায়গারই লোক। বলা বাহুল্য বাকী পয়সা পেট্রলপাম্পে সে কখনও জমা দেয় নাই। শঙ্করা চারিয়া পাহাড়টী একহাজার ফুট উঁচু। এতে উঠবার তিনটী রাস্তা আছে, দুর্গানাগ, আইডগাজীও গাগরী বলে এর দিক থেকে। আমরা করণসিং বুলেভার্ড দিয়ে গিয়ে সাধারণ প্রচলিত রাস্তা দিয়ে উঠলাম। প্রথম খানিকটা বাঁ দিকে অনেকখানি কবরস্থান, প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো চড়াই কোরতে। পথ প্রশস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে পায়ে চলা 'পাকদণ্ডী' বা সোজা পথও আছে। এই পথগুলি দেখতে বেশ সোজা, কিন্তু অনভ্যস্তর কাছে-বিশেষ সজ্জিতা পায়ের পক্ষে বিষম বিপজ্জনক। পূর্ব্বে মন্দির থেকে নীচে পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে আলো ছিল—সন্ধ্যায় তা যখন জ্বলতো দূর থেকে মনে হোতো আলোর একছড়া মালা। এই আলোকসজ্জার ব্যয় বহন কোরতেন মহীসুরের মহারাজা। যুদ্ধের সময় থেকে এ আলোকসজ্জা বন্ধ করা হোয়েছে শুনলাম। এখন শুধু মন্দিরের মাথার চূড়ায় একটী আলো জ্বলে বহুদূর থেকে দেখা যায় তার দীপ্তি। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটুখানি সমতল জায়গা, দুএকটা গাছ আছে, পুজারীর একটী ছোট ঘর আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরের পাথর বাঁধান আটকোনা অঙ্গনে উঠতে হয়। তার পর আরও ৫।৬টী ধাপ উঠে মন্দির। পাহাড়ের উপর থেকে একদিকে প্রায় সারা শ্রীনগর চোখে পড়ে, অন্য দিকে ডাল হ্রদ, হ্রদের তীরে ভূতপূর্ব্ব মহারাজার আধুনিকতম প্রাসাদ। চারদিকের সমতলের মাঝে হাজার ফুট উঁচু থেকে সহর ও বিতস্তার বাঁক পেরিয়ে দৃষ্টি চলে যায় দিকচক্রবালে সবুজ সমতলভূমি, তার বুকে বিসর্পিল বিতস্তা ও তার শাখাপ্রশাখা আকাশের কোল ঘেঁষা। 'মহাদেব' পাহাড়ের পা ছুয়ে পড়ে আছে ডালের নিথর স্বচ্ছ জলরাশি একখানা বিরাট আয়নার মত, চতুর্দ্দিকের শোভা তার বুকে বিম্বিত হোয়ে দ্বিগুণিত হোয়ে ওঠে, ওপরে নীল আকাশ যেন নির্ম্মল, চারিদিকে ঝকঝকে রোদ, কিন্তু কোনখানে নীচের সমতলভূমি একখানা পাতলা মেঘ বা কুয়াসার মসলিনে ঢাকা। পোড়ে আবছা দেখা যায়, আবার মেঘ সরে গেলে তা স্পষ্ট হোয়ে ওঠে।

শ্রীনগরী সহরের প্রায় সব জায়গা থেকেই পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরটীকে দেখা যায়—মনে হয় স্বয়ং শঙ্কর সদা জাগ্রত শাস্ত্রীর মত সহরটীর ওপরে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। 'শঙ্করাচার্য্য' নামের স্থানীয় উচ্চারণে এর নাম আজ "শঙ্করাচারিয়া", বৌদ্ধ নাস্তিকতা রোধ কোরে বৈদিক ও শৈব মত প্রচার কোরে যখন শঙ্করাচার্য্য ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন তখন সংস্কৃত সাহিত্যের একটা প্রধান পীঠস্থান এই কাশ্মীরেও তাকে আসতে হয় (৯ম শতাব্দীতে)।

ক্রমশঃ

সাহিত্যের ভাষা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমরা অনেকেই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, তোমাদের পাঠ্য পুস্তকে থাকে নানা রচনা, তোমরা তা পড়ে জ্ঞানের একটি সোপান থেকে আর একটি সোপানে উঠে আনন্দলাভ করো, তোমাদেরও ইচ্ছে হয় কিছু লিখ্‌তে, সাহিত্য ও কাব্য সাধনা কর্‌তে তাই তোমাদের কাছে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

যে ভাষাতেই প্রবন্ধ গল্প, কবিতা ও গ্রন্থ রচিত হোক্ না কেন, তা যদি সহজবোধ্য না হয়, তাহোলে সে রচনা হৃদয়গ্রাহী হয় না, আর সকলের মনেও সম্যক্‌ভাবে রেখা-পাত করে না। যেখানে রচনা জ্যামিতিক উপপাদ্যের মত দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে, সেখানে অনুভূতির পক্ষে কঠিনতাই আসে। বোধহয় তোমরা লক্ষ্য করেছ, এদানীং রচনায় সহজ-ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার রীতি ক্রমেই লোপ পাচ্ছে, শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যেও। আধুনিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা বা গ্রন্থ পড়্‌লে তোমরা দেখ্‌তে পাবে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সোজা কথাকে এমন জটিল করে বলা হচ্ছে, যাতে করে বিশেষ মস্তিষ্ক চালনা ও চিন্তা করে, তবে সে কথা বুঝ্‌তে হয়। এক শ্রেণীর লেখক বলেন, ভাব যখন প্রগাঢ় হয়, তখন তা সহজভাবে প্রকাশ করা যায় না। তোমরা বোধ হয় জানো, লোকের মনে তাক্‌লাগানোর জন্যে অনেকে আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে বাহাদুরী নে'ন। যা হোক, রচনার ভাষা নিয়ে নানাদেশে নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৃটিশ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক জে, বি, প্রিস্‌টলি তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'ডিলাইট' গ্রন্থে যা মন্তব্য করেছেন তাই তোমাদের কাছে বল্‌ছি—সরল সহজভাবে লেখ্য রীতিরই তিনি পক্ষপাতী—সবার ঊর্দ্ধে তাঁর রচনাকে সহজ পাঠ ও বোধগম্য কর্‌তে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন, আর তাতেই পান আনন্দ।

তিনি বলেছেন :

"জনৈক নবীন সমালোচকের সঙ্গে বহুক্ষণ কথা হোলো, ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ আন্তরিকতা আছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আছে আমার শ্রদ্ধা, তাঁর সাহিত্যিকতা কিন্তু আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান নয়। তিনি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"আপনাকে বুঝ্‌তে পারিনে। আপনার রচনার চেয়ে আপনার বাচন ভঙ্গী জটিলতর—তীক্ষ্ণ কূট। আপনার লেখা সর্ব্বদাই আমার কাছে খুব সোজা বোধ হয়।" উত্তর দিলাম—"বছরের পর বছর ধরে—আমি আমার রচনাকে সরল কর্‌বার চেষ্টা করেই আস্‌ছি। আপনার কাছে যেটা দোষাবহ, আমার কাছে সেটা গুণবাচক।

আমার সঙ্গে তাঁর কালের আকাশ পাতাল প্রভেদ। তিনি আর তাঁর সময়ের লেখকরা, যাঁরা তিরিশ সালের আগেই পরিপক্কতা লাভ করেছেন, সাহিত্যকে দুর্ব্বোধ্য কর্‌বারই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। জনমনের সঙ্গে সংযোগ রেখে সাহিত্যকে জনপ্রিয়তা করে তোলার বিরুদ্ধেই তাঁদের যুগ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছে। তাঁরা চান না জন সমাজের ভাবের আদান প্রদানের অংশ গ্রহণ কর্‌তে। যে সব লেখা

দুর্বোধ্য, সেগুলো তাঁদের গুপ্তদলীয় চক্রের সাঙ্কেতিকতা। তাঁদের কাছে উৎকৃষ্ট লেখক হচ্ছেন তিনিই, যাঁর লেখা পড়্‌বার সময় পাঠকের মনে বেশ কসরৎ কর্‌তে হবে আর পাঠক পড়তে পড়্‌তে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠ্‌বে। লেখায় চাতুর্য্যের মাত্রাধিক্য ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবাতিশয্য থাক্‌লে, তবেই তা তাঁদের কাছে সমাদৃত। রাজনৈতিক বিজ্ঞপ্রধানের মত যে সব কবি কবিতা রচনা কর্‌বেন, তাঁরাই পাবেন প্রশংসা। রাজার শয্যার পার্শ্বে যে সব রাজনৈতিক মন্ত্রণা-কুশলী বিশেষজ্ঞ আহূত হ'ন, তাঁদের মত বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ সাহিত্য-সমালোচকেরাই পাবেন সমাদর। তাঁরা বলেন, সত্যিকারের গ্রন্থকার, শিল্পী কখন জনমনকে খুসী কর্‌বার জন্যে, ভাড়াটিয়া সাহিত্যিকের মত, হবেন না—তাঁরা প্রথম কিছু সরল চিন্তাধারা ও ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে সুরু করেছেন লিখ্‌তে কিন্তু উত্তরোত্তর ভাব অনুভাবের প্রকাশ ভঙ্গিমাকে ভাষায় জটিল করে তুলে এগিয়ে চলেছেন নির্ব্বোধদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার জন্যে। ফলে ভাবের অভিব্যক্তিতে দুরূহতারই চাহিদা হয়েছে। সাহিত্যে কোন কিছু বলার ভঙ্গিমায় দারুণ মোচড় দেওয়া, দুরূহ কষ্টসাধ্য করা, আর গূঢ়ার্থ রাখা এই সবই তাঁদের মনের গহন গুহায় জেগে উঠেছে। অবশ্য এসব কথার মধ্যে কূটপ্রশ্নে হতবুদ্ধি করবার মত কিছুই নেই। এখানে তাঁদের মতবাদ ভ্রান্তিমূলক,—এই কথাই তাঁদের অগ্রজরা অন্তরে পোষণ করেন। তাঁরা আধুনিকদের ঔদ্ধত্যকে, সঙ্কীর্ণতাকে, দোষ দিয়ে থাকেন, তাদের আন্তরিকতার শূন্যতাকে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আমার জন্ম। উনিশ শো চোদ্দ সালের আগের দিনগুলো ছিল আমার কাছে অত্যন্ত অঙ্কন যোগ্য। ঠিকই হোক, আর ভুলই হোক, জনতাকে ভয় করিনি কোন দিন। জনমন থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলাম না, আজও নয়। অন্তর্মুখীনতার নামান্তরই আমার কাছে আর্ট বা শিল্প নয়। গোঁজামিল প্রকাশ-ভঙ্গিমা আমাদের সময়ে ছিল না। আজকের দিনের এই সব তরুণের মতই আমিও একজন মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কাঁচের প্রাচীরের ব্যবধান আছে আমার ও আমার কাছের কলকারখানা, দোকান ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জনমণ্ডলীর মধ্যে, একথা আমি ভাবিনে, বোধও করি নে। আমার ভাব অনুভাব, আমার চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে, তাদের ও এই সব বোধশক্তির কোন পার্থক্য নেই। এই জন্যেই ব্যাপকভাবে আমি তাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের পথরচনাকেই শ্রেয় মনে করি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছে করেই আমার রচনায় এনেছি সরলতা—জটিলতাকে করেছি বর্জ্জন।

আমার রচনার বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, আমি এমনভাবে লিখি যা উচ্চৈঃস্বরে পড়লে শত শত লোক শুনে এক মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারবে, আর আমার ভাগ্যেও এরকম শোনাবার দিন বহুবার এসেছে। কূটজালে জড়িয়ে ভাবের জটিলতার আশ্রয় নেওয়ার ভাণ আমার নেই—লেখায় আমি আমার নিজের থেকেও সরলতর করে তুলি শব্দবিন্যাসে, পাঠককে কত সরল করে লেখার মাধ্যমে বল্‌তে পারি এই চেষ্টা নিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করি, আর এজন্যে নিজেই ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠি। অবশ্য যারা তাদের মস্তিষ্কের কসরৎ কর্‌তে চায় একটা শক্ত কিছু ভাঙ্‌বার জন্যে, তারা যতই চতুর হোক্ না কেন, আমাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারেনি, একথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। মস্তিষ্ককেন্দ্রের দুর্বোধ্য ক্রিয়াশীলতাই সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের অভিব্যক্তি, এসব বক্তব্য কিন্তু আমার হৃদয়গ্রাহ্য নয়। দাবা খেলার চাল দেওয়ার ওপর চাল দিয়ে সমস্যার সমাধান করে ঘুঁটি চালনার কলাকৌশলের মত কোন কৌশল প্রয়োগ করে সাহিত্য সৃষ্টির তারিফ করুনগে আধুনিক সমালোচকরা, তাতে কিছু এসে যায় না, আমি এ শ্রেণীর ঝুঁটো সমালোচকের বাহবা চাইনে, আর এরা আমার খরিদ্দারও নয়, এদের নজরে ধরানোর জন্যেও আমার কলম ধরা নয় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে—এদের কাছেও আমি আমার মাল বিকোতে চাইনে। কিন্তু যদি কারও মনে ধরে থাকে আমার সচেষ্ট সাধনার দান আর আমার রচনা-শৈলীর সারল্য, তাহোলে সে যেন আমার মত সরল সহজ করেই লেখে তার নিজের জন্যে। সরল করে লেখা এখন আমার কাছে খুব সহজ হয়ে গেছে, তারও কারণ আছে। বছরের পর বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করেছি আমার এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত কর্‌তে।

আমি এখনও দাবী কর্‌তে পারিনে যে, এমন গদ্য রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছি যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সহজ সরল প্রবর্ত্তনাজনক বাণী, আর আমার কাছে হয়েছে আমার সাধনার সর্ব্বোত্তম বিকাশ, তবে যা হয়েছে আর যতটুকু হয়েছে, তাও একাধিক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায়। আমার

তরুণ বন্ধুকে বোধ হয় এসব কথাই বিস্ময়ান্বিত ও বিভ্রান্ত করেছে—এই তরুণ সমালোচক বোধ হয় আমার কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁর মতবাদের পক্ষে বিরুদ্ধতা আর পেয়েছেন মনের ভাবধারার সম্পূর্ণ পার্থক্যের অভিব্যক্তি।

সারল্যের অভ্যাস রাখ্‌লে হারজিতের সংসারে জয়ী হওয়ার শক্তি অর্জ্জন করা যায়। মিঃ জি জুং-এর জন্মতিথিতে ব্যোমযানে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করতে গিয়েছিলাম। তাঁর লেখা ও ব্যক্তিত্বের ওপর আছে আমার প্রগাঢ় প্রশংসা আর শ্রদ্ধা। বারো তেরো মিনিটের মধ্যে জুংকে পরিষ্কার ভাবে যা বলেছি, তা সাধারণ শ্রোতার পক্ষে বুঝ্‌তে একটুও কষ্ট হয়নি, এর ভেতরই বেশ মজা করা গেছে। বন্ধুরা বললেন, তা কখন হয়, মনস্তাত্বিকরাও ঠিক তাই বললেন। কিন্তু আমি জোর গলায় বল্‌ছি তা সম্ভব হয়েছে। এটা কিছু কঠিন কাজ বটে, তবে এ ব্যাপার যখন শেষ করে বন্ধু-মিলনের পর বিদায় নিলাম, তখন আমার কাছে বোধ হোলো যেন প্রস্তরের মধ্যে মধু আছে, যাতে পেলাম আনন্দের আস্বাদন।”

এর পর তোমাদের মতামত কি?—রচনার প্রাঞ্জলতা-না-জটিলতা কোনটা?

এমনি করেই পথ চলি

স্বপনবুড়ো

এম্‌নি করেই পায়ে-পায়ে পথ চলি—
বিঘ্ন বাধা যাবো রে ভাই সব দলি!
উঠুক রে ঝড়, জাগুক তুফান—
অগ্রগতির গাইবো রে গান
মাথার ওপর আকাশ ভাঙে, গাঙ্‌ ডাকে ভাই ছল্‌ছলি—
এম্‌নি করেই পথ চলি!

জোয়ার জলের তালে-তালে ভাসিয়ে দেবো নাও
শক্ত হাতে হাল ধরেছি, যতই আসুক বাও!
অমানিশার রাত্রি শেষে
উঠ্‌বে অরুণ মধুর হেসে!
পথের নেশায় উচ্চ আশা জাগ্‌ছে মনে চঞ্চলি।
এম্‌নি করেই পথ চলি।

হাসির নালিশ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিনের কথা।

হরিশপুর গ্রামে বাস করত একজন চাষী। চাষী-পরিবারটির অবস্থা অবশ্য বিশেষ ভাল ছিল না—দিন-আনি দিন-খাই গোছের—কিন্তু মনে তাদের ছিল অফুরন্ত আনন্দ!···

চাষীর বাড়ীর গায়েই ছিল একজন খুব বড়লোকের বাড়ী। বড়লোকটি গ্রামের লোকজনের সঙ্গে মোটেই মিশ্‌ত না! তার ছেলে-মেয়েরাও তেমনি! চাষীর ছেলে-মেয়েরা যখন রাস্তায় বা খোলা-মাঠে চেঁচামেচি ক'রে ছুটোছুটি খেলা করতো, তারা তখন দরজা জানালা বন্ধ করে বাড়ীর ভিতরেই থাকত। মাঝে মাঝে শুধু দোতলার জানলা খুলে চাষীর ছেলে-মেয়েদের হুটোপাটি—হৈ-হল্লা চেয়ে চেয়ে দেখতো।

বড়লোকটির বাড়ীতে প্রায়ই কালিয়া পোলাও প্রভৃতি দামী দামী খাবার রান্না হ'ত—আর সেই সব রান্নার সময় ঘি-মশলার জিবে-জল-আসা চমৎকার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এসে চাষীর ছেলে-মেয়েদের নাকে লাগ্‌ত! বেচারারা তো কখনও সে রকমের খাবার খেতে পায় না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁকেই আশ মেটাত!

কিন্তু ভাল খেতে পাক্‌ আর নাই পাক্‌ চাষীর ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল—কারণ তারা রোজই খোলা হাওয়ায় খেলা করত—নদীর জলে সাঁতার কেটে স্নান করত—আবার হয়ত, খেলতে যাবার আগে এক হাত ল'ড়েই নিলে নিজেদের ভিতর! আর ছিল তাদের হাসি—একটুতেই তা'রা হেসে কুটি কুটি হ'ত—সে হাসি এমন ছোঁয়াচে যে সামনে দিয়ে যারাই যেত দাঁড়িয়ে পড়ত আর তাদের হাসিতে যোগ দিত।

হাসিই তাদের ছিল একমাত্র সম্পদ। মা বাপ ছেলে মেয়ে—বাড়ীর সকলের মুখেই লেগে থাকত হাসি! হাসির খোরাকও তাদের ছিল নানা রকমের!—চাষী সেবার মেলা থেকে একটা আরসি কিনেছিল—সেটা টাঙানো

থাক্‌ত শোবার ঘরে ;—একদিন দেখা গেল, কাজের ফাঁকে চাষী সেই আরশির সামনে দাঁড়িয়ে একমনে মুখভঙ্গী কর্‌ছে—কখনও বা দাঁত খিঁচুচ্ছে !—দু' ছেলে আর মেয়ে দেখতে পেয়ে পা টিপে-টিপে গিয়ে হাস্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছে—মা-ও রান্নাঘর থেকে কখন এসে হাসিতে যোগ দিয়েছে—শেষকালে বাপের চমক ভাঙ্‌তে সে-ও আরম্ভ করে দিলে হাসি ! খানিকক্ষণ ধরে সারা বাড়ীটাই যেন হাসিতে ফেটে পড়তে লাগল।

আবার একদিন, ছোট ছেলেটা থ'লেতে ক'রে কি যেন নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌ল ! মনে হ'ল নারকোল, রুটি বা এই রকমের কিছু খাবার জিনিষ আছে। অন্য ছেলে-মেয়ে দুটোও খাবার লোভে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর এল। ছোট ছেলেটা কোন কথা না বলে মার কোলেই সেটা রেখে দিলে। ছেলেমেয়েগুলি মা'কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—মা-ও আস্তে আস্তে থ'লের মুখটা খুল্‌লে। অমনি তার মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড কালো হুলো বেড়াল বেরিয়ে পড়্‌ল এবং রান্নাঘরের চারদিকে ম্যাও-ম্যাও ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। মা ছোট ছেলেটাকে মারবার জন্য ঘুষি উঁচিয়ে তাকে তাড়া করলে—কিন্তু ঘটিতে পা বেধে গেল পড়ে !—আর তারপর আরম্ভ হ'ল হাসি—ছেলেমেয়েগুলি হাস্‌তে হাস্‌তে বেঁকে গেল—বাপ-ও সেই সময় এসে সব দেখে শুনে এত জোরে হাসতে আরম্ভ করলে যে বাড়ীতে লোক জমে গেল এবং সেই ধনী লোকটির বাড়ী ছাড়া সব বাড়ীর লোকই সে হাসিতে যোগ দিলে।

এইভাবে দিন কাট্‌ছিল। ক্রমে দেখা গেল বড়লোকটির ছেলেমেয়েরা হ'য়ে যাচ্ছে রোগা আর রক্তশূন্য, আর চাষীর ছেলেমেয়েরা হচ্ছে জোয়ান—প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর ! এদের মুখচোখ উজ্জ্বল—গাল যেন লাল্‌চে—আর ওদের ফ্যাকাসে—মলিন। বড়লোকটি প্রথমে রাত্রে কাশতে আরম্ভ করেছিল—তারপর দিনরাতই কাশ্‌ত। তারপর তার বউ-ও কাশ্‌তে আরম্ভ করলে এবং তার ছেলেমেয়েদেরও পরে পরে কাশি সুরু হ'ল ! রাত্রে তারা যখন সকলে এক সঙ্গে কাশ্‌ত, তখন মনে হ'ত কোথায় এক পাল কুকুর ডাকছে।

কিন্তু বড়লোকের বাড়ী নবাবী রান্নার বিরাম ছিল না ! গন্ধ থেকেই সেটা বোঝা যেত ! একদিন বড়লোকটি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে যেন রাগতভাবে চাষার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর সশব্দে জানালা বন্ধ করে দিলে। সেইদিন থেকে সে তার বাড়ীর সব জানলা দরজা বন্ধ করে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেমেয়েগুলিকে আর দেখা যেত না—শুধু রান্নার গন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ভেসে আস্‌ত।

একদিন সকালে একজন চৌকিদার এসে কাজীর আদালতের এক পরোয়ানা চাষাকে দিলে—সেই বড়লোকটি তার নামে নালিশ করেছে ! চাষী বেচারা সেটাকে নিয়ে গাঁয়ের মোড়লের কাছে দেখাতে গেল—নালিশটা কিসের। মোড়ল বললে—নালিশটা এই যে চাষা নাকি অনেক বছর ধ'রে ঐ বড়লোকটির সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সারবস্তু চুরি ক'রে আস্‌ছে।

চাষা আর কি করে ! দিনের-দিন—নাগরীর ভিতর থেকে তার ছেঁড়া কোটটি বার করে ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিলে—আর সামনের বাড়ীর বন্ধুর কাছ থেকে এক জোড়া চটি জুতো ধার করে প'রে নিয়ে আদালতে গিয়ে হাজির হ'ল। সঙ্গে বউ ছেলেমেয়েরাও গেল। তখনও আদালত বসে নি। চাষী বস্‌ল একটা টুলে, আর দেয়ালের কাছে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল—তার ওপর বস্‌ল তার বউ আর ছেলেমেয়েরা।

ধনী লোকটি তারপর এল। দেখা গেল, ইতিমধ্যে সে যেন বেশ বুড়ো আর রোগা হয়ে গেছে—তার মুখের চারিদিকে গভীর রেখা প'ড়েছে। তার উকীলও সঙ্গে ছিল। অনেক দর্শক এসেও আদালত ঘরে ভিড় ক'রেছিল। এই সময় কাজী সাহেব এলেন। চাষা ও তার ছেলেমেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—আবার বসে পড়্‌ল। কাজি সাহেব একটা উঁচু আসনে বসেছিলেন। আদালতের অন্য কাজ সারতে একটু সময় গেল তারপর চাষার দিকে তাকিয়ে কাজি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি কোন উকীল আছে ?

চাষা বল্‌লে—আমার উকীলের দরকার নেই, হুজুর।

কাজি তখন ধনীর উকীলকে বল্‌লেন—আরম্ভ কর।

উকীল চট্‌ করে দাঁড়িয়ে চাষার দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—

—তুমি স্বীকার কর কি কর না যে ফরিয়াদীর খাদ্য-দ্রব্যের সারাংশ তুমি বরাবর চুরি ক'রে আস্‌ছ ?

চাষা বললে—আমি স্বীকার করি না।

—আচ্ছা, তুমি স্বীকার কর কি কর না যে যখন ফরিয়াদীর রাঁধুনীরা পোলাও, মাংস বা অন্যান্য বিয়ের খাবার তৈরী করত তখন তুমি আর তোমার পরিবারের সকলে জানালার বাইরে থেকে তার সুগন্ধ শুঁকতে?

—একথা আমি স্বীকার করি।

—তুমি স্বীকার কর কি কর না যে যখন ফরিয়াদী আর তার ছেলেমেয়েরা রোগা এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল তখন তুমি আর তোমার ছেলেমেয়েরা বেশ ফর্সা আর মোটাসোটা হ'য়ে উঠছিলে?

—হ্যাঁ, স্বীকার করি।

—তার কারণ কি বল তাহ'লে?

চাষা উঠে দাঁড়াল এবং চিন্তান্বিতভাবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে আদালতের মেঝেয় একটু পায়চারী করলে তারপর কাজিসাহেবকে উদ্দেশ ক'রে বললে—

—আমি ফরিয়াদীর ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছা করি।

কাজি ফরিয়াদীর ছেলেমেয়েদের আনতে হুকুম করলেন।

তারা লাজুকের মত এল। দর্শকরা তাদের রোগা ও একেবারে ফ্যাকাসে চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে গেল। তারা নীরবে এসে মুখ তুলে না চেয়ে একটা বেঞ্চিতে ব'সে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

চাষা প্রথমে কিছু বলতে পারলে না। সে দাঁড়িয়ে তা'দের খানিকক্ষণ দেখলে। তারপর বললে—আমি ফরিয়াদীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।

কাজি বললেন—বেশ, কর।

চাষা তখন ধনীলোকটিকে বললে—তুমি কি এই দাবী করছ যে তোমার বাড়ীতে তোমার রাঁধুনীরা যখন খাবার তৈরী করত তখন জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকে আমরা তার সারাংশ চুরি করেছি এবং তার ফলেই আমাদের মনে জেগেছে ফুরতির হাসি আর তোমার পরিবারের সকলে হ'য়েছে মন্-মরা?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—বেশ, তাহ'লে এখনই তা'র দাম দিয়ে দিচ্ছি।

চাষা এই কথা ব'লে তার ছেলেমেয়েরা যে বেঞ্চিতে বসেছিল সেখানে গেল এবং ছোট ছেলের হাত থেকে মুড়ি খাবার সরাটা নিয়ে পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বা'র ক'রে তাতে রাখলে। তার বউও একমুঠো রেজকী সরাটায় ফেললে। বড় ছেলেটার কাছেও যা দু'চারটে পয়সা ছিল, সে তাইতে দিলে।

চাষা তখন বললে—আমি কি একটুখানি পাশের কামরাটায় যেতে পারি?

কাজি বললেন—যেতে পার, যদি তোমার তাই ইচ্ছে হয়।

কাজি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে পয়সার সরা হাতে ক'রে চাষা পাশের ঘরে গেল। মাঝের দরজাটা খোলাই থাকল।

পয়সা নাড়াচাড়ার মিষ্টি টুং টাং আওয়াজ আদালত-কক্ষ থেকে শোনা যেতে লাগল। দর্শকরা বিস্মিতভাবে সেই শব্দের দিকে মুখ ক'রে রইল। চাষা শীঘ্রই ওঘর থেকে চ'লে এসে ফরিয়াদীর সামনে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞেস করলে—

—শুনেছ?

—কি শুনেছি?

—পয়সার শব্দ—যখন আমি সরা নাড়াচ্ছিলুম—পয়সার মিষ্টি ঝনঝনি—যা'তে মনে আনন্দ হয়?

—হ্যাঁ।

—ব্যস, তবে তো তুমি তোমার খাদ্যদ্রব্যের সারাংশের দাম পেয়ে গে'ছ।

ধনী বেচারা কি বলবার জন্য হাঁ করলে কিন্তু বলবার আগেই ধপ্ ক'রে মেঝেয় ব'সে পড়ল। তার উকীল তাড়াতাড়ি তাকে ধরতে গেল।

কাজি সাহেবও এই সময় ছড়ি ঠুকে বললেন—মকর্দ্দমা খারিজ।

চাষা তখন বুক ফুলিয়ে আদালত-কক্ষে বেড়াতে লাগল। কাজি তখন তার উঁচু আসন থেকে নেমে এসে তার পিঠ চাপড়ে একটু হেসে তা'কে চাপা-গলায় বললেন—আমার চাচা, বুঝলে, হাসতে হাসতেই মারা গেছলেন।

চাষা তখন বিনীতভাবে কাজিকে বললেন—হুজুর কি আমার ছেলেমেয়েদের হাসি শুনতে চান্?

কাজি বললেন—আপত্তি কি?

চাষা তখন ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললে—শুনলে তো তোমরা?……

মেয়েটাই প্রথমে আরম্ভ করলে হাসি—তারপর ছেলে দুটো আর চাষা নিজে, শেষকালে দর্শকরাও সেই হাসিতে যোগ দিলে! সে কি হাসির ঘটা! পেট চেপে ধ'রে এঁকে বেঁকে সবাই হাসতে লাগল! আর, সবাকার হাসি ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল কাজিসাহেবের উচ্চ হাসি।

বীরবালা জোয়ান অব্ আর্ক

শ্রীহরিপদ গুহ

পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়—প্রায় সব দেশেই এমন সব বীর নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে একটুও কুণ্ঠিত হন নি। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেহ বিষ পান করে বিধর্ম্মীর হাত থেকে নারীর লজ্জা ও সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করেছেন। সেই সব বীর ললনাগণের মধ্যে ফরাসী দেশের জোয়ান অব্ আর্ক অন্যতম।

ফরাসী দেশে লরেন প্রদেশের ডোমরামী নামক এক গণ্ডগ্রামে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে জোয়ানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক। তাঁর নাম জেকুস। তিনি চাষ আবাদ করে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করতেন। জেকুস ছিলেন মূর্খ। তাঁর লেখাপড়া কর্‌বার কোন সুযোগ-সুবিধা হয় নি; কারণ, সেই সময়ে ইউরোপে বিদ্যা-চর্চ্চার বিশেষ প্রচলন ছিল না। জোয়ানের মাতার নাম ছিল—ইসাবো, তিনিও স্বামীর মতই নিরক্ষরা ছিলেন। বিদ্যালাভে বঞ্চিতা হলেও তিনি অনেক সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সু-গৃহিণী। তাঁর নিপুণ হস্তের বন্দোবস্তে সে গৃহে কোন অভাব-অনটন ছিল না।

যাঁর মাতা পিতা অশিক্ষিত তাঁদের সন্তানের লেখা-পড়ার সুযোগ বড় একটা হয় না। জোয়ানের অদৃষ্টেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। লেখাপড়া না জেনেও নারীজাতি যে সমাজে স্মরণীয়া ও বরণীয়া হতে পারে জোয়ানই তার জলন্ত প্রমাণ। জগতের ইতিহাসে তাঁর নাম আজ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

বাল্যকালে জোয়ান খুব শক্তিশালিনী, দুষ্টমতি ও চপলা ছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁর সম বয়সী বালক বালিকাদের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করতেন। নয় দশ বৎসর বয়সের পর তাঁর হঠাৎ পরিবর্ত্তন সুরু হল। চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে এলো শান্ত স্বভাব। তিনি মধুর ভাষিণী হলেন। তাঁর প্রীতি ও ভালবাসায় এবং অক্লান্ত সেবায় পল্লীবাসীরা মুগ্ধ হয়ে গেল। এখন তিনি গৃহ-কর্ম্মে মাতাকেও অনেক সাহায্য করতে লাগলেন। মাতার কাছ থেকে তিনি অনেক সূচি কার্য্য শিখেছিলেন।

জন-কোলাহল তাঁর ভাল লাগ্‌ত না। অবসর পেলেই তিনি বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদীতীরে, মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক সময় তিনি পাহাড়ে নির্জ্জন ছায়ায় বসে মনের আনন্দে গান গাইতেন। সেই সুরলহরী বায়ু হিল্লোলে বহু দূর পর্য্যন্ত ভেসে যেত। অনেকে সেই সুধা কণ্ঠ শোনবার জন্য আড়ালে লুকিয়ে থাকৃত। তাঁর সঙ্গীতে এমন মাদকতা ছিল—যারা শুন্‌ত একেবারে মোহিত হয়ে যেত। তিনি তখন এতই তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর কোন হুঁস্ থাকৃত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভাবে কেটে যেত। অনেক সময় বাড়ী ফির্‌তে গভীর রাত হয়ে যেত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ-লাবণ্য ও কমনীয়তা বাড়তে লাগ্‌ল। তাঁর সৌন্দর্য্য এবং কোমল স্বভাবের জন্যে গাঁয়ের এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অনেক যুবক তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থী ছিল। অনেক ধনীর সন্তানও এঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু জোয়ান ছিলেন নির্ব্বিকার। তাঁদের কাকুতি-মিনতিতে তিনি কান দেন নি।

তিনি তখন যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কাছে ভোগ বাসনা বা কোন লালসা আস্‌তে পারে না। তখন তিনি ভগবানের জয়গানে মাতোয়ারা। এক এক সময় তিনি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে বাহ্যিক জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকৃত না।

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরীর মৃত্যুর পর তাঁর ছয় মাসের শিশুপুত্র ষষ্ঠ হেনরী রাজা বলে ঘোষিত হলেন। তাঁর কাকা বেডফোর্ড প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাতে লাগলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর ষষ্ঠ হেনরীই ফ্রান্সের রাজা বলে গণ্য হলেন; অপরদিকে সপ্তম চার্লস নিজেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

এই নিয়ে বিবাদ সুরু হল। অনেকদিন থেকেই ফ্রান্সে

রাজ-সিংহাসন নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে মনো-মালিন্য চল্‌ছিল। সপ্তম চার্লস কিছুতেই ফ্রান্সের সিংহাসন হেনরীকে ছাড়বেন না, ইংরেজরাও নাছোড়বান্দা। কোন পক্ষই হট্‌বার পাত্র নন।

কাজেই যুদ্ধ বেধে উঠল। কখন ইংরেজদের জয়, কখনও চার্লসের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। ইংরেজরা বেগতিক দেখে অবশেষে বারগেন্‌ডির ফিলিপের সহায়তা নিতে বাধ্য হন। ফিলিপের সাহায্য পেয়ে ইংরেজগণ জয়লাভ কর্‌তে লাগলেন।

বার বার পরাজিত হয়ে চার্লস হতাশ হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে ইংরেজরা উত্তর ফ্রান্স দখল করে নিল।

যখন যুদ্ধের রণভেরী বাজছে, তখন জোয়ানের বয়স পনের ষোল বৎসর মাত্র। পূর্ব্বেই বলেছি, তাঁদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। পিতার কষ্ট একটু লাঘব করবার জন্যে জোয়ান মেষ চরাবার ভার নিয়েছিলেন। বনের মধ্যে, পাহাড়ের ধারে তিনি মেষের দল নিয়ে চরাতে যেতেন।

সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের কথা। যুদ্ধের কথা শুন্‌তে জোয়ানের খুব ভাল লাগ্‌ত। তাদের কাছ থেকে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনে তার মনটা ব্যথায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ত। যুদ্ধের বর্ণনা, বীরগণের যুদ্ধ-কৌশল ও আত্মত্যাগের কথা শুনে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠত। একাকী নির্জ্জন স্থানে বসে তিনি যুদ্ধের কথাই ভাবতেন। এক এক সময় তিনি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, দু' একটা মেষ হারিয়ে গেলও তিনি তা লক্ষ্য করতেন না। তিনি শুধু ভাবতেন—কেন দেশ বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের দুর্দ্দশা কেন হয়? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এই রকম চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল—তিনিই সে দেশের মুক্তিদাত্রী! প্রাণের ভেতর যে যে ভবিষ্যৎ বাণী তিনি শুনতে পেলেন, সেই বাণীই তাঁকে নব নব প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে লাগ্‌ল। এই চিন্তাই তাঁকে একেবারে উন্মাদিনী করে দিলে। তিনি আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন। সর্ব্বদাই মনে মনে কি ভাবেন! সেই সময়ে তাঁর চোখের কাছে সব কিছু লোপ পেয়ে যায়।

এক এক সময় জোয়ানের মনে হত—তিনি সামান্যা একজন পল্লী-বালিকা। তাঁর না আছে শক্তি, না আছে সৈন্য বল, না আছে অর্থ, কী করে তিনি দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই তিনি হতাশ হয়ে পড়্‌তেন। যখনই হতাশা আস্‌ত, তিনি নির্জ্জনে বসে দেশের মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাতেন। সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন তাঁর অন্তর হতে বলে উঠ্‌ত—তুমিই দেশের মুক্তিদাত্রী!

জোয়ানের আকুল প্রার্থনা ও নীরব অশ্রু ভগবানকে বিচলিত করেছিল। একদিন জোয়ান নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখ্‌লেন যে, ভগবান তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন—'জোয়ান, তোর ভয় নেই, তোর আকুল ক্রন্দন ও দেশপ্রীতির জন্যে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুই দেশের মুক্তির ভার গ্রহণ কর্। তোর দ্বারাই দেশের মুক্তি হবে।' এমন সময় তাঁর সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে দেখ্‌লেন—ঊষার অরুণ আলো ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা সকলকে বল্‌লেন, কিন্তু তখনও কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করে নি।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ উত্তর ফ্রান্স জয় করে অরলিয়েন্স আক্রমণ করেছে। দেশে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এই সময়ে জোয়ান আর স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন তিনি রাজদরবারে গিয়ে হাজির হয়ে চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে অভিলাষী হলেন। হঠাৎ একজন ষোড়শী নারীকে রাজদরবারে দেখে সভাসদ্‌গণ অবাক্ হয়ে গেলেন। কেহ মনে করলেন—পাগল, কেহ মনে কর্‌লেন—গুপ্তচর। তাঁরা তাকে ঘিরে নানা প্রশ্নে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুল্‌লেন। তারপর তাঁরা যখন তাঁর অভিলাষ জানলেন, তখন না হেসে পার্‌লেন না!

দেশের এই দুঃসময়ে একজন বালিকার মুখে বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাণী শুনে অনেকের ধমনীই নেচে উঠ্‌ল; এক আশার আলো যেন তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গিয়ে চার্লসকে সংবাদ দিয়ে এলেন।

খবরটা পেয়ে রাজা প্রথমে বেশ একটু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন! কিন্তু মন্ত্রীর পরামর্শে একটু শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন।

বালিকা উন্মাদিনী কি না দেখ্‌বার জন্যে তিনি প্রথম ডাক্তার দ্বারা তাঁর পরীক্ষা করালেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় যখন তিনি উন্মাদিনী বলে প্রমাণিত হলেন না, তখন চার্লস তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

প্রথম দর্শনেই জোয়ান রাজাকে অভিবাদন করে বল্‌লেন—'আপনিই ফ্রান্সের প্রকৃত রাজা, আপনাকে সিংহাসনে বসাতে ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন!'

রাজা চার্লস্ তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শুনে তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করলেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন একটু কুটো পেলে তাকে আঁকড়ে ধর্‌তে চায়, চার্লসও তেমনই বীরবালার কথা বিশ্বাস করে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন।

অরলিয়েন্স দখল কর্‌বার জন্যে তিনি জোয়ানকে পাঁচ সহস্র সৈন্য দিলেন। এই পাঁচ হাজার সৈন্য পেয়ে জোয়ানের হৃদয় নেচে উঠ্‌ল। তিনি নারীর সাজ পরিত্যাগ করে পুরুষের বেশে সজ্জিত হলেন। মুক্ত অসি হস্তে সৈন্যদের পরিচালনা কর্‌তে কর্‌তে তিনি বীরদর্পে অরলিয়েন্সের দিকে অগ্রসর হলেন।

জোয়ান স্বাস্থ্যবতী এবং শক্তিশালিনী ছিলেনই কিন্তু পুরুষের পোষাকে তাঁকে আরো বলিষ্ঠা ও শক্তিশালিনী দেখাচ্ছিল।

তাঁর সৌম্য দর্শন, দীপ্তিপূর্ণ চোখ, মুখের প্রশান্ত হাসি, বাহুর অসীম শক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসই তাঁকে সৈন্য পরিচালনায় সাহায্য করেছিল।

সৈন্যগণ তাঁকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। অন্তর তাঁকে ভালবাস্‌ত। তাঁর আদেশ পালন কর্‌তে কেহ অবহেলা কর্‌ত না। তাঁর প্রত্যেকটি কথাই ছিল গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ এবং মধুর। তাঁর অমৃত-বাণী দ্বারা সৈন্যগণ উৎসাহিত হয়ে বীরদর্পে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছিল।

একজন অশিক্ষিতা ষোড়শী পল্লীবালা কি করে সৈন্য পরিচালনা করে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, এখনকার দিনে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ভগবানে অটল বিশ্বাস ও দেশপ্রীতি তাঁর সমস্ত শক্তিকে দেশের মুক্তির জন্যে উৎসর্গ কর্‌তে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সব চেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস জন্মালে মানুষ যেকোন দুঃসাধ্য কাজ সাধন কর্‌তে পারে। জোয়ান এই বিশ্বাসের জোরেই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইংরেজ সৈন্যগণের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হতে সাহসী হয়েছিলেন।

এই যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বার পক্ষে জোয়ানের কোন আশাই ছিল না। শুধু তাঁর অসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও সৈন্য-পরিচালনার গুণেই তিনি ফ্রান্সের ভাগ্য জয়শ্রীমণ্ডিত কর্‌তে পেরেছিলেন।

ইংরেজরা পরাজিত হয়ে অরলিয়েন্স থেকে পালিয়ে গেল। তখন জোয়ান অভিষেক করে সপ্তম চার্লসের মাথায় ফরাসীর রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। সকলে তখন জোয়ানকে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগল।

চার্লসের অনুগ্রহে জোয়ানদের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হলো।

উত্তর ফ্রান্স ইংরেজদের অধীনে রইলো। চার্লস দক্ষিণ ফ্রান্সের রাজা হলেন। ইংরেজরা জোয়ানের কাছে হেরে গিয়ে নূতন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগ্‌ল। জোয়ানও যুদ্ধে জয়ী হয়ে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে উত্তর ফ্রান্স আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে তাঁর রক্ত তখন নেচে উঠেছে। তাঁর অভয় বাণী দিয়ে তিনি সৈন্যদের মনে সাহস আর হৃদয়ে বল আনছিলেন।

ঘোর যুদ্ধ চলেছে। ফরাসী সৈন্যেরা যে যুদ্ধে জয়লাভ করবে তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ জোয়ান আহত হয়ে পড়ায় সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

জোয়ান ইংরেজের হাতে বন্দিনী হলেন। তাঁর উপর ইংরেজরা এমনই চটেছিল যে কারারুদ্ধ করে তাঁর প্রতি অনেক অত্যাচার সুরু করল। প্রায় এক বৎসর পর ফরাসী ও ইংরেজ বিচারকগণের সম্মুখে তাঁর বিচার হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু এমনই তাঁর ভাগ্যলিপি যে, তিনি পুরুষের পোষাক পরিধান করেছিলেন বলে, ইংরেজগণ তখনই তাঁকে আবার ধৃত করলো।

তাঁর বিচারের নামে যে প্রহসনের সৃষ্টি ক'রেছিল তাতে তিনি ডাইনী বলে সাব্যস্ত হন। জলন্ত আগুনে তাঁকে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দেওয়া হয়।

ইতিহাসের পাতায় এ কলঙ্ক চির-স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৪৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তাঁকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে বীরের মত হাসি মুখেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।

মরেও তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুলিশপাণি সুরঙ্গমার অপেক্ষায় দ্বার খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহার ধৈর্য্য যখন সীমা অতিক্রম করিতেছে তখন দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শোনা গেল। কুলিশপাণি সাগ্রহে উঠিয়া আগাইয়া আসিল, কিন্তু দ্বারপ্রান্তে সুরঙ্গমাকে দেখিতে পাইল না। পাইল কিরাতবেশী দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ব্যক্তিকে, তাহার পর তাহার নজরে পড়িল ছায়ার অন্ধকারে একটি নারীমূর্ত্তিও রহিয়াছে।

"কে আপনারা"

পুরুষটি উত্তর দিলেন।

"আমরা নাগদম্পতী। আমার নাম চিত্রক, ইনি চিত্রিকা। আপনার নাম কি কুলিশপাণি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আপনাকে একটি সংবাদ দিতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন নিবেদন করি। আপনার হিতার্থেই এসেছি আমরা। আপনারা রাজা রাজড়া লোক, তাই সংস্কৃত-বহুল শব্দ ব্যবহার করছি। সহজ চলতি ভাষাতেই আমরা অভ্যস্ত"

"সহজ চলতি ভাষাতেই বলুন। কি সংবাদ—?"

"আপনি কি সুরঙ্গমাকে নিয়ে ভাগতে চান ?"

প্রশ্ন শুনিয়া কুলিশপাণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর একবার ভাল করিয়া সেই কিরাতবেশী বিরাট পুরুষের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। ইহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু এই অপরিচিত লোকটি তাহার এই গোপন কথাটি জানিল কি করিয়া ? সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য কেহ তো একথা জানে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটির কাছে সত্য-স্বীকার করা সমীচীনও নহে। সুন্দরানন্দের কানে গেলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া স্থির করিল অকপটে উত্তর দেওয়া উচিত হইবে না। বলিল—"আপনার সংবাদটি অদ্ভুত। কোথা থেকে শুনলেন ?"

"আপনারই মুখ থেকে"

"আমার মুখ থেকে! কি রকম ?"

"কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরঙ্গমাকে বলছিলেন—কাছেই আমার ঘোড়া বাঁধা আছে চল তোমাকে নিয়ে পালাই—তখন চিত্রিকা আপনার খুব কাছেই ছিল। স্বকর্ণে সে আপনার কথাগুলি শুনেছে"

কুলিশপাণি চিত্রিকার দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ সে ভাল করিয়া তাহাকে দেখে নাই ; চিত্রিকাকে দেখিয়া খানিকক্ষণের জন্য বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল মানবীতে এত রূপ সম্ভবে না। চিত্রিকা আনত নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কুলিশপাণির মনে হইল—মেয়েটি যেন তাহার মনের কথা টের পাইয়াছে। তাই একটু জবাবদিহির সুরেই যেন বলিল, "সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের কখনও দেখেছি বলে' তো মনে হচ্ছে না"

পুরুষটিই পুনরায় উত্তর দিলেন।

"না, দেখেন নি। যেরূপে আমাদের দেখছেন নিজেদের সেরূপ আমরাও কখনও দেখিনি। সেকথা যাক। যা বলছিলাম, চিত্রিকা স্বকর্ণে আপনার কথাগুলি শুনেছে। আপনি যখন সুরঙ্গমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ও যদিও আপনার খুব কাছেই ছিল, তবু দেখেন নি, কারণ দেখা সম্ভব ছিল না। ও তখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় একটা গর্ত্তে ঢুকেছিল—"

কুলিশপাণির দেহে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে বিস্ফারিত নয়নে চিত্রিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সত্যই মনে হইতে লাগিল যে বুসনে চিত্রিকার দেহ

আবৃত রহিয়াছে তাহা যেন সর্প-চর্ম্মের মতোই চিক্কণ ও চিত্র-বিচিত্র।

পুরুষটি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গোড়াতেই তো বলেছি আমরা নাগদম্পতী। মহাদেবের বরে আমরা যে কোনও রূপ ধারণ করতে সমর্থ। তাই মনুষ্যবেশে আপনার কাছে এসেছি। আপনার ভালর জন্যই এসেছি। আমরা আপনার হিতৈষী। আপনি অকপটে আমাদের সব কথা বলতে পারেন। আপনার যাতে অনিষ্ট হয় সেরকম কাজ কখনও আমরা করব না—"

কুলিশপাণি জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া পড়িল।

"মহাদেব আমার কুলদেবতা। আপনারা যখন তাঁর বরে বলীয়ান, তখন আপনাদের অবিদিত কিছু নেই। আমার মনের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এ অবস্থায় কি করব উপদেশ দিন"

পুরুষটি হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই তো এসেছি। চিত্রিকা যখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় গর্ত্তে ঢুকেছিল, আমি তখন অন্যত্র একটা গেছো-ব্যাঙের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সময় শুনতে পেলাম—সুরঙ্গমা চার্ব্বাকের সঙ্গে পালাবে পরামর্শ করছে"

"চার্ব্বাকের সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। যে চার্ব্বাক পর্ব্বতকন্যা ধারামতীর সর্ব্বনাশ করেছে সেই সুরঙ্গমাকে নিয়ে পালাবার তালে আছে !"

"চার্ব্বাক কোথায় ?"

"এই বনেই আছে কোথাও নিশ্চয়। এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না"

"আপনি এ খবর শুনলেন কোথা"

"আমি যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার কানে এল সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে বলছে—আপনি যদি আমাকে আমার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দেন, আমি আপনার কাছেই যাব। চার্ব্বাক দেখলাম তাতেই রাজি। তার কিছুক্ষণ পরে চিত্রিকার সঙ্গে দেখা হল, চিত্রিকা বললে—তুমি নাকি সুরঙ্গমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সরে' পড়তে চাও। সুরঙ্গমাও নিমরাজি-গোছ হয়েছে। তখন আমাদের মনে হল চার্ব্বাকের খবরটা তোমাকে বলে যাওয়া নিজেদের লোক। খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম, এখন তুমি যা ব্যবস্থা করবার কর।"

কুলিশপাণি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কটি-নিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "চার্ব্বাক যদি এ বনে কোথাও থাকে তাহলে আগামী কল্য তাকে আর সূর্য্যোদয় দেখতে হবে না। আজ রাত্রিই তার জীবনের শেষ রাত্রি। নাগদম্পতি, আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না জীবনে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—"

কুলিশপাণি পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল—"সত্যই আশীর্ব্বাদ করুন আমাকে। সুরঙ্গমাকে না পেলে জীবন আমার মরুভূমি হয়ে যাবে"

পুরুষটি স্মিতমুখে কুলিশপাণির দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করি না কাউকে"

"কেন"

"ফলে না"

কুলিশপাণি এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই।

বলিল, "কি ফলে তাহলে"

"তা-ও জানি না"

"কিছু উপদেশ দিন অন্ততঃ। তাতেও আমার অনেক উপকার হবে। আপনারা শিবের বর পেয়েছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন"

"ওটা ভুল ধারণা। কেউ অসাধ্য সাধন করতে পারে না। আগে উপদেশ দিতাম, কিন্তু এখন তা-ও আর দিই না"

"কেন"

"দিলে কেউ শোনে না"

"আমি শুনব"

"শুনবে ?"

"শুনব"

"তাহলে একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। হ্যাংলামি কোরো না। করলে শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় না কোনও—"

বাহিরে একটা পেচক কর্কশশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুরুষটি বলিল, "ডাক এসেছে। এবার আমর

"কার ডাক"

কুলিশপাণি এ প্রশ্নের আর উত্তর পাইল না। কারণ নাগদম্পতী সহসা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরঙ্গমার জন্য অপেক্ষা করিবে, না চার্ব্বাকের সন্ধানে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবে—তাহা স্থির করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় লাগিল। অবশেষে সুরঙ্গমার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করাই তাহার সঙ্গত মনে হইল। একটি বেত্রাসন বাহির করিয়া বাহিরে বারান্দায় সে উপবেশন করিয়া কিরাতবেশী নাগ-দম্পতীর রহস্যময় আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। দেব-দেবী মাহাত্ম্যে কুলিশপাণির অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাদেবের কৃপা হইলে সর্প যে ইচ্ছানুসারে যে কোনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে ইহা তাহার নিকট মোটেই বিস্ময়জনক মনে হয় নাই। সে ভাবিতেছিল এই নাগদম্পতী এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া যে উপদেশ তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে দিয়া গেলেন সে উপদেশের তাৎপর্য্য কি! চার্ব্বাককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবার যে বাসনা তাহার মনে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি অন্যায়, না অসঙ্গত? ওই ধূর্ত্ত লোকটার ওই তো উচিত শাস্তি। আবার তাহার মনে হইল, ব্রহ্মহত্যা করাটা উচিত হইবে কি? ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু এই মহাপাপের স্বপক্ষে যুক্তিসংগ্রহ করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। প্রথমত তাহার মনে হইল ওই বিবেকহীন ব্যাভিচারী লোকটা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ও চণ্ডালেরও অধম। দ্বিতীয়ত মনে হইল—সে তো হত্যা করিবে না, দণ্ডবিধান করিবে। সুন্দরানন্দের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে অধিকার তাহার আছে। দুষ্টের দমন তাহার কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও সে কিন্তু মনে মনে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ওই সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত পুরুষ তাচ্ছিল্যভরে চলিত ভাষায় তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গেল তাহার কি অর্থ হইতে পারে! চার্ব্বাককে হত্যা করিলে কি দেব-রোষে পতিত হইতে হইবে? কিন্তু··· সহসা তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। একটি সঞ্চরমান বর্ত্তিকা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আর সন্দেহ রহিল না, কুলিশপাণি বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমাই আসিতেছে। সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরও একটু পরে শোনা গেল। "আপনি জেগে আছেন না কি"

"দেখতেই তো পাচ্ছ। শুধু জেগে নেই, অধীর আগ্রহে জেগে আছি। তারপর কি ঠিক করলে, বল। যাবে আমার সঙ্গে?"

"যাওয়ার আর দরকার হবে না। মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করতে চাইছেন না। সুতরাং আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে আর নিজেকে বিপন্ন করতে হবে না। আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। আপনি যে আমার মতো একজন সামান্যা নর্ত্তকীর জন্য এতটা করতে রাজি হয়েছিলেন, এর জন্য আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।···"

সুরঙ্গমা বর্ত্তিকাটি বারান্দায় রাখিয়াছিল। বর্ত্তিকালোকে কুলিশপাণি সুরঙ্গমার পূর্ণশ্রী দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ অন্ধকারের পটভূমিকায় এই তন্বী রূপসীকে পুনরায় সে যে মহিমায় অলঙ্কৃত দেখিল তাহাতে তাহার বিবেক আবার নব মোহে আচ্ছন্ন হইল, শুভাশুভ জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া গেল, তাহার সমস্ত চেতনায় একটি বাসনাই শিখার মতো উন্মুখ হইয়া উঠিল—সুরঙ্গমাকে চাই। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখে কোনও কথা সরিল না। যখন সরিল তখন সে বলিল, "আমি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা চাই নি সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম"

সুরঙ্গমা হাসিয়া বলিল—"এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি। আমার দেহটা হয়তো আপনাকে দিতে পারি —তা-ও সুন্দরানন্দের অনুমতি নিয়ে তা দিতে হবে, কারণ আমার এই দেহটা তাঁরই সম্পত্তি—কিন্তু আপনি যা চাইছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নিজেরও নেই। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দাতা এবং গ্রহীতার অনেকদিনের মেলা-মেশার ফলে হয় আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার কথা"

কুলিশপাণি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া কেবল উষ্ণশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সে বর্ত্তিকাটি তুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

"তুমি যা যুক্তিযুক্ত তাই সহজ ভাবে বলেছ। তোমার বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তা বলতে পারছি না, তা যুক্তিযুক্তও নয়। আমার অব্যক্ত কথা তুমি বুঝতে পারবে কি না জানি না। আমি একটি কথা কেবল জানতে চাই, আশা করি সত্য উত্তর পাব"

"বলুন—"

"চার্বাক কি এখানে এসেছেন ?"

"এসেছেন"

"কোথায় আছেন"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "তা জানতে চাইছেন কেন"

"কর্ত্তব্যের জন্য। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন তাকে বন্দী করতে"

"বন্দী করবার দরকার হবে না আর। সুন্দরানন্দ সব কথা শোনার পর ক্ষমা করেছেন তাঁকে। আপনি সম্ভবত একটু পরেই কুমারের নূতন আদেশ পাবেন"

কুলিশপাণি যেন আকাশ হইতে পড়িল। "চার্ব্বাককে কুমার ক্ষমা করেছেন ? তুমি এ কথা শুনলে কোথা থেকে"

"কুমারেরই মুখ থেকে"

"চার্ব্বাকের কথা উঠল কি প্রসঙ্গে ?"

"প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। চার্ব্বাক আমারই মাধ্যমে ক্ষমার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন"

"তোমার সঙ্গে চার্ব্বাকের দেখা হয়েছে তাহলে"

"হয়েছে বই কি"

"চার্ব্বাক কোথায় আছে"

সুরঙ্গমা পুনরায় মৌন হইয়া গেল। তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন সেনাপতি। আমি মহর্ষি চার্ব্বাককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাঁর অবস্থান গোপন রাখব"

"এ রকম অন্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থ ?" কুলিশপাণির কণ্ঠস্বরে কঠোরতার আভাস পাইয়া সুরঙ্গমার মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"পুরুষদের সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে চিরকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। ওটা আমার দুর্ব্বলতা। অনেক বড় বড় রথী-মহারথীরা আমার এ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেছেন আশা করি আপনিও করবেন"

সুরঙ্গমার এই তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি শুনিয়া কুলিশপাণি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল সুরঙ্গমার এ দুর্ব্বলতা না থাকিলে তাহার অবস্থা কি হইত ? যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া সে উত্তর দিল !

"তোমার মতো রূপসীদের চিরকালই সাত খুন মাপ। এ নিয়ে আমি মাথাই ঘামাতাম না, কিন্তু একটু আগে যে সাংঘাতিক সংবাদটি আমি শুনেছি তাতে সত্যিই একটু বিচলিত হয়েছি"

"কি সংবাদ"

"সংবাদটি বলবার আগে আমি একটি অনুরোধ করব। অকপটে বোলো সংবাদটি সত্য কি না"

"এ অনুরোধ করার দরকার ছিল না সেনাপতি। রূঢ় সত্যের উপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাই আমি মিথ্যাচরণ করতে পারি না। করলেও সে মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। বলুন, আপনি কি সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়েছেন ?"

"শুনলাম তুমি চার্ব্বাককে নাকি বলেছ 'আপনি যদি আমাকে আমার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দেন তাহলে আমি আপনার কাছে যাব'। আর চার্ব্বাক তাতে না কি রাজিও হয়েছে"

সুরঙ্গমা একটু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে-মুখে সে বিস্ময় প্রতিভাত হইল না। সহজভাবে হাসিয়া সে বলিল, "যা শুনেছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, সংবাদটি আপনি পেলেন কি করে'"

"তোমরা যখন আলাপ করছিলে তখন যিনি তা আড়াল থেকে শুনেছিলেন তিনিই আমাকে বলে গেলেন"

সুরঙ্গমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ঠিকই বলে গেছেন তিনি"

"জানতে পারি কি—চার্ব্বাক তোমাকে কি মূল্য দিতে চান ?"

"আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবেন"

"সত্যি ?"

"বলেছেন দেবেন। শেষ পর্য্যন্ত দেবেন কি না জানি না"

কুলিশপাণি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহসা সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে সে সম্বিত ফিরিয়া পাইল।

"ভোর হয়ে এল বোধ হয়। এবার আমি যাই।"

"কোথা যাচ্ছ"

"নিজের ঘরে। ঘুমুব এখন"

সুরঙ্গমা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে কুলিশপাণি চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বর্ত্তিকালোক যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল তখন সে-ও ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহারও ঘুম পাইয়াছিল।

নাগ-দম্পতী পেচক-দম্পতীতে রূপান্তরিত হইয়া একটি সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের শাখায় তৃতীয় একটি পেচকের ভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল।

তৃতীয় পেচক শুদ্ধ ভাষায় বলিতেছিল, "হে পিতামহ, তুমি আর বাণী নিজেদের আনন্দে মত্ত হইয়া সৃষ্টির পর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। সে সৃষ্টি বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের এই সুমহতী সৃষ্টিকে বিধৃত করিবার জন্য আমিও নিজেকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে, তোমাদের সৃষ্টিও রূপ হইতে রূপান্তরে বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানব-কবিরা অনন্ত বিশেষণে ভূষিত করিয়া সে সৃষ্টিকে সর্ব্ব-প্রকার সম্ভাব্যতার সীমা-রেখা পার করিয়া দিয়াছেন। তোমাদেরও খেয়াল নাই, তোমরা সৃষ্টির আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমার মনে হয় এইবার তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি আর নিজেকে কত প্রসারিত করিব"

তৃতীয় পেচক নীরব হইল। নীরব হইবামাত্র একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দ্দিক যেন নিমজ্জিত হইয়া গেল। মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে সৃষ্টি সত্যই অবলুপ্ত হইয়া গেল বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বহুবিধ অরণ্য শব্দ—ঝিল্লীধ্বনি, বৃক্ষমর্ম্মর, শ্বাপদের চীৎকার—সে নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। কোটি কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

প্রথম পেচক বলিল, "মহাকাল, শুদ্ধ ভাষায় উচ্চারিত তোমার বক্তব্য শুনলাম, এইবার আমার বক্তব্য শোন। নূতন সৃষ্টি বহুকাল পূর্ব্বেই থেমে গেছে। কিন্তু সেই পুরাতন সৃষ্টির যে সব ফ্যাকড়া বেরিয়েছে, আর শ্রীমতী বাণী তা যেমনভাবে ব্যক্ত করছেন তাতে আমারই তাক লেগে যাচ্ছে। চার্ব্বাক যে শিখর সেন হয়ে যাবে, কালকূট যে কুলিশপাণি বা কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হবে এতো কল্পনা করিনি আমি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখছি—হচ্ছে, অবিশ্বাস করবারও উপায় নেই। তুমি আর একটু বাড়—"

তৃতীয় পেচক। আমি অসমর্থ—

প্রথম পেচক। চেষ্টা কর—ওই তো—

তৃতীয় পেচকের দেহায়তন ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা বিশাল মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল প্রাবৃটের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ জলধরকে বিদীর্ণ করিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎমালা মুহুর্মুহুঃ অন্ধকারকে শিহরিত করিয়া তুলিল। বজ্রগর্জ্জনে দশদিক চমকিত হইল।

প্রথম পেচক। [দ্বিতীয় পেচককে] ময়শার কাণ্ডটা দেখেছ! ও ভেবেছিল আমাকে হকচকিয়ে দেবে। কিন্তু ওর ধাপ্পায় ভোলবার ছেলে নই আমি। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল—আমার সৃষ্টিকে তুমি বিধৃত করনি—ধ্বংস করেছ, কল্পনায় বিষ্ণুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে কথা বলেওছিলাম একদিন—কিন্তু—

দ্বিতীয় পেচক। কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৃথক নন। একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ওঁরা—

প্রথম পেচক। ঠিকই শুনেছ প্রেয়সি।

দ্বিতীয় পেচক। তাহলে আবার ওদের গাল দিচ্ছেন কেন! ওতে তো নিজেকেই গাল দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম পেচক। নিজেকে গাল দিতেও বেশ লাগে মাঝে মাঝে। ওকে যখন ভাল লাগে, যখন মনে হয় যে ও আমারই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ, তখন ওকে মহেশ্বর, পঞ্চানন বলে সুখ পাই, আবার ওকে যখন শত্রু মনে করি তখন ওকে ময়শা, পেঁচো বলতে বেশ লাগে। দুটো ব্যাপারেই বেশ রস আছে! রসই আসল। বাস্তবেও রস

আছে, স্বপ্নেও রস আছে। যেখান থেকেই হোক রসাস্বাদন করাই হ'ল লক্ষ্য, তাতেই আনন্দ। ময়শাকে মনের আনন্দে বেশ গাল দিচ্ছিলাম হঠাৎ তুমি রস-ভঙ্গ করে' দিলে—এখন কি করা যায় বল তো—

দ্বিতীয় পেচক। [হাসিয়া] তা কি আর আমাকে বলে' দিতে হবে ?

প্রথম পেচক। তোমার থ্যাবড়া মুখে বাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসিটি মন্দ লাগছে না। এদিকে একটু সরে' বসলেই তো ভাল হয়।"

পেচকদম্পতী পরস্পরের চঞ্চু চুম্বনে রত হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশে যে ভয়ঙ্কর ঘনঘটা চরাচরকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইল, জ্যোৎস্না-কিরণে কানন-কান্তার পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

প্রথম পেচক। [সহসা] একটা খবর জান ?

দ্বিতীয় পেচক। কি ?

প্রথম পেচক। কুলিশপাণিকে আমরা ভুলিয়েছি, কিন্তু চার্ব্বাককে পারি নি। ও চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখে হতভম্ব হয়েছিল, কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নি। ওই দেখ, ঘর থেকে বেরিয়ে ও চলে যাচ্ছে—! লোকটা খাঁটি লোক।

সেই পর্ণকুটীরে চতুরাননের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব চার্ব্বাককে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিদারুণ ভয়ের আঘাতেই তাহার মোহগ্রস্ত মন প্রকৃতিস্থও হইল। সে বুঝিতে পারিল কত নীচে সে নামিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, একটা নর্ত্তকীর প্রেমে পড়িয়া সে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল! ওই নর্ত্তকী একটু আগে ভোজবাজির সহায়তায় তাহাকে যে ব্রহ্মামূর্ত্তি দর্শন করাইল, আর একটু হইলে সে তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপনও করিত। ছি, ছি, ছি—দার্শনিক চার্ব্বাকের এ কি শোচনীয় অধঃপতন! একটা ভোজবাজিকে সে সত্য বলিয়া মনে করিল! ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা গেল! নীলোৎপলা তাহাকে অদ্ভুত একটা সুরাপান করাইয়া অদ্ভুত স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছিল। সুরঙ্গমা এ কি করিল। তাহার সমস্ত যুক্তিকে মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া তাহার শবদেহের উপর নৃত্য করিবে এই অস্বাভাবিক বাসনা তাহাকে পাইয়া বসিল কেন, আর সে-ই বা সে বাসনাকে প্রশ্রয় দিল কোন বুদ্ধিতে!

…অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার পর স্থির করিল—মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে হইবে। রূপসী সুরঙ্গমাকে লাভ করিতে পারিলে তাহার পৌরুষ সার্থক হইত, কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল্যে সে সার্থকতা লাভ করা অর্থহীন। সে সুরঙ্গমাকে জয় করিতে চাহিয়াছিল; কিছুতেই তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন চলিয়া যাওয়াই ভাল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুটীর ত্যাগ করিল। স্থির করিল, যত শীঘ্র সম্ভব সে এই বনস্থলী ত্যাগ করিবে। অন্ধকারে অরণ্যপথে তাহার গতি দ্রুত হইল না, কিন্তু তথাপি ত্বরিত চরণেই সে পথ অতিবাহন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে তাহাকে অরণ্যেই রাত্রিবাস করিতে হইবে। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নহে। সম্মুখেই শাখাপত্রবহুল একটি বৃক্ষ ছিল। তাহাতেই সে আরোহণ করিল।

প্রথম পেচক। নাটক আর একটু পরে জমবে।

দ্বিতীয় পেচক। সুরঙ্গমা আসছে বুঝি ?

প্রথম পেচক। ওই যে। শুধু আসছে না, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে ও আকুল হয়ে উঠেছে। ঘোরতর কিছু একটা ঘটবে।

দ্বিতীয় পেচক। ওদিকে শিখর আর অবন্ধনার ব্যাপারও ঘোরতর হয়ে উঠছে নিশ্চয়।

প্রথম পেচক। নিশ্চয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এই হচ্ছে। প্রথমে ফিকে, তারপর ঘোর, তারপর ঘোরতর। চল ওদের খবর নিয়ে আসা যাক, সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে খুঁজে বার করুক ততক্ষণ—

পেচক-দম্পতী উড়িয়া গেল।

একটু পরেই দেখা গেল, সুরঙ্গমা বর্ত্তিকা হস্তে চার্ব্বাককে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার প্রদীপ্ত-নয়নে স্ফুরিত-অধরে দোদুল্যমান কৃষ্ণবেণীর নিবিড়তায় চিরন্তনী নারীর কৌতূহল মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। (ক্রমশঃ)

আলিবর্দ্দী খাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ আকবর শাহার সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ (বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা) সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শোভা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। এই সময় থেকে নবাব সিরাজদ্দৌলার আমল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ সাম্রাজ্যের একটি সুবারূপে গণ্য হয় এবং বিহার ও উড়িষ্যা এই সুবারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যে এত বড় জনাকীর্ণ সুবা আর দ্বিতীয় ছিল না। কাজেই বেছে বেছে বাদশাহকে এমন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে এখানে সুবেদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে হোত, যিনি অন্ততঃ দশ বিশ হাজারী মনসবদার, সামাজিক খ্যাতিমান এবং প্রদেশ শাসন করবার মত অভিজ্ঞতা যাঁর আছে। এই জন্যেই বাঙলার সুবেদার নির্ব্বাচিত করবার সময় সম্রাটকেও হিমসিম খেতে হোত। প্রথম প্রথম মহারাজ মানসিংহ ও টোডরমলকে বাঙলার সুবেদারী করতে পাঠিয়ে বিচক্ষণ বাদশাহ আকবর ভালভাবেই গোড়াপত্তন করেছিলেন। মানসিংহের শৌর্য্যে পাঠানশক্তি চূর্ণ হয়ে যায়, দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। তারপর মহারাজ টোডরমল সুবেদার হয়ে এসে বাঙলার সুসন্তান তাহিরপুরাধিপতি মহারাজ কংসনারায়ণের সহায়তায় সুবে বাঙলার জমিজমার বন্দোবস্ত করে রাজাপ্রজা উভয় পক্ষেরই অশেষ কল্যাণসাধন করেন। এই দুই বিচক্ষণ সুবেদারের শাসননৈপুণ্যে বঙ্গদেশে মোগল শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। এঁদের পর একে একে দিল্লী থেকে শাসনশক্তিসম্পন্ন মনসবদারেরাই সম্রাট-প্রতিনিধিরূপে বঙ্গদেশে সুবেদার হয়ে আসেন এবং তাঁরা নবাব উপাধি গ্রহণ করতে থাকেন। পাঠান আমলে বাঙলার শাসকগণ ছিলেন স্বাধীন এবং তাঁদের উপাধি ছিল সোলতান। মোগল আমলে সুবে বাংলার নবাবদের ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমক এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অন্যান্য দেশের পর্য্যটকরা বাঙলার নবাব ও নবাবীর প্রভাব এবং খানদানি ব্যাপার দেখে চমকে যেতেন। মোগলবাদশাহদের যে পর্য্যন্ত প্রচণ্ড দপদপা ছিল, তৎকালে নিয়মিতরূপে সুবেদার বদল হোত; এক সুবেদারের কার্য্যকাল শেষ হলে আর এক সুবেদার দিল্লী থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে বাঙলায় আসতেন; নিয়মমত কিস্তিতে কিস্তিতে রাজস্ব দিল্লীতে ইর্শাল করতেন। ঠিক মত রাজস্ব আসছে, আর দেশের লোক সুখশান্তিতে বাস করছে—এই দুটো খবরের উপর বাদশাহের বিশেষ লক্ষ্য থাকত। এ দুটো বজায় রেখে সুবেদার যতই সুখভোগ করুন, তাঁর রাজধানীকে বেহেস্ত বানিয়ে ফূর্ত্তি চালাতে থাকুন, সেদিকে বাদশাহ ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

এ-পর্য্যন্ত ঢাকাই ছিল সুবে-বাঙলার রাজধানী। কিন্তু ঔরংজীব বাদশাহের আমলেই এর পরিবর্ত্তন ঘটে। বাদশাহের পৌত্র আজিমওসান তখন সুবেদার হয়ে ঢাকায় এসেছেন। বাদশাহ খবর পেলেন, তিনি দরাজ হাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নামে এক অতি দক্ষ ব্যক্তি তখন রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা—তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সবই আলমগীর বাদশাহের কাছে। সুতরাং বাদশাহ নিজের অমিতব্যয়ী পৌত্রের চেয়ে তাঁকেই বেশী বিশ্বাস করতেন। বাদশাহ এই সময় এই মর্ম্মে এক ফরমান পাঠালেন যে, এখন থেকে সাহাজাদা আজিমওসান দেশরক্ষা ও শাসনাদি ব্যাপার নিয়েই থাকবেন। তাঁর পদবী হলো—নবাব-নাজিম। আর মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন। তাঁর উপাধি থাকলো—নবাব দেওয়ান। এঁর মঞ্জুরী ভিন্ন সুবেদার আজিমওসান কোন কিছু ব্যয়বরাদ্দ করতে পারবেন না।

এই ব্যবস্থার ফলে সাহাজাদা আজিমওসান দারুণ অসুবিধায় পড়লেন। জলের মত তিনি টাকা খরচ করেন; প্রয়োজন হলেই টাকা তাঁর চাইই। কিন্তু দেওয়ানের কাছে টাকার জন্য রোকা পাঠালেই তিনি তার পিছনে 'জাঁহাপনার হুকুম নাই' লিখে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সাহাজাদা ক্রোধে জ্বলে উঠেন। এর পর মুর্শিদকুলি খাঁ খবর পেলেন যে সাহাজাদা ক্রোধে অধৈর্য্য হয়ে তাঁকে হত্যা করবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হয়ে বাদশাহকে জানালেন যে, জাঁহাপনার হুকুম মত কাজ করায় বান্দার জীবন-সংশয় উপস্থিত। এ অবস্থায় এক জায়গায় দুই দফ্তর রেখে শান্তির সঙ্গে কাজ চালান অসম্ভব।

এই আর্জীর সঙ্গে তাঁর সেরেস্তা-পত্তনের জন্য নূতন একটি স্থান ও তার নক্সা এঁকে বাদশাহের কাছে দাখিল করে জানালেন যে, সব দিক দিয়ে এই জায়গাটির উপযোগিতা খুব বেশী। বিশেষতঃ দেশের এখন যে অবস্থা, তাতে এই স্থানে যদি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার ফলও আশানুরূপ হবে। স্থানটি তৎকালে পরিচিত মুকশাদাবাদ।

বাদশাহ মুর্শিদকুলি খাঁর আর্জি ও নূতন স্থানটির নক্সা দেখে প্রীতই হলেন। মুর্শিদকে তিনি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন, উভয়ের চিন্তা ও পরিকল্পনা একই পথে চলে। বাদশাহের হুকুমে তলে তলে পরিবর্ত্তনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সুবে বাঙলার রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের দপ্তর মুকশাদাবাদে স্থানান্তরিত হবে বাদশাহ আলমগীরের মর্জি অনুসারে—এই সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষিত হলো। সাহাজাদা আজিমওসান ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে বাদশাহকে লিখলেন, কিন্তু বাদশাহ ততোধিক ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিলেন—এ পরিবর্ত্তনের জন্য তুমিই দায়ী; তোমারই স্পর্দ্ধা ও দৌরাত্ম্যের জন্য নাজিমী দফ্তর মুকশাদাবাদে স্থানান্তরিত করবার হুকুম আমি দিয়েছি।

নূতন নগরী নির্ম্মাণকালের মধ্যেই মুর্শিদকুলি খাঁর ভাগ্যরেখা আরও উজ্জ্বল হতে থাকে; তাঁর কর্ম্মপথের অন্তরায়গুলিও ক্রমে ক্রমে অপসৃত হয়। সেই সুযোগে তিনি মুকশাদাবাদ নগরীকে নিজ নামানুসারে

মুরশিদাবাদে পরিণত করলেন। নির্ম্মাণ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ও আয়ব্যয় বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট দফ্‌তরগুলি একে একে মহানগরী ঢাকা থেকে নবনগরী মুরশিদাবাদে এসে প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর, নগরী যখন রাজধানীর উপযুক্ত হর্ম্ম্য, গড় ও উদ্যানমালায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, সেই সময় সুবে-বাঙলার সুবেদার সাহাজাদা আজিমওসান বাদশাহের আহ্বানে দক্ষিণাপথের স্কন্ধাবারে যাত্রা করলেন; এদিকে বাদশাহ প্রদত্ত ফরমানের বলে মুরশিদকুলিখাঁ নির্ঝঞ্ঝাটে মুরশিদাবাদের সুবেদারী গদীতে আসীন হলেন। (১৭১২-১৭২৫ খৃঃ অঃ) সেই থেকে সুবে-বাঙলার রাজধানীরূপে মুরশিদাবাদের নাম সারা দুনিয়ায় জাহির হয়ে গেল।

নবাব মুরশিদকুলিখাঁর শাসনকালেই সাহাজাদা আজিমওসানের পুত্র ও বাদশাহ ঔরংজেবের প্রপৌত্র সম্রাট ফরোখশিয়ার দিল্লীর মসনদে বসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করবার জন্য কতকগুলি বিশেষ স্বত্ব প্রদান করেন। পরবর্ত্তী যুগে সেই সকল স্বত্বসম্পর্কে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার মনোমালিন্য ঘটে। পক্ষান্তরে এই নবাব মুরশিদকুলিখাঁর আমল থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে নবাববংশধরগণ সুবেদাররূপে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে অভিষিক্ত হতে থাকেন। অপুত্রক নবাব মুরশিদকুলিখাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন মুরশিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। বিচক্ষণ দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বিলাসে মগ্ন থাকতেন। তা'হলেও সহৃদয় ও প্রজাবৎসল বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। মুক্তহস্তে এই নবাব দান করতেন, নানা সদনুষ্ঠানের সহায়ক ছিলেন। আর দেওয়ান যশোবন্ত রায় এমন দক্ষতার সঙ্গে নবাব মুরশিদকুলিখাঁর শৌর্য্য, আর সহৃদয় নবাব সুজাউদ্দীনের ঔদার্য্য অবলম্বনে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কোটি কোটি প্রজার সুখশান্তি বিধানে সমর্থ ছিলেন যে, এই নবাবের আমল সুবা-বাঙলার 'স্বর্ণযুগ' বলে গণ্য হয়েছিল। সুবেদার নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে দেশে টাকায় আট মণ চাল বিকাত। রাজধানী ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় তিনি ঢাকার একটি ফটক বন্ধ করে, তার উপরে সগর্ব্বে এই ইস্তাহার খোদাই করে দিয়ে যান যে, এই হারে চালের দর নামাতে না পারলে এই দরজা কোন নবাব খুলতে পারবেন না, খুললে অভিশপ্ত হবেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রস্থানের পর চালের দর পুনরায় চড়তে থাকে। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দীনের শাসনকালের দ্বিতীয় বর্ষেই দেওয়ান যশোবন্ত রায় চালের দর পুনরায় টাকায় আটমণে নামিয়ে নবাব সায়েস্তা খাঁর রুদ্ধ দেউড়ী রীতিমত ঘটা করে খুলে দেন। তিনটি বিশাল প্রদেশ, তার মধ্যে কত রাজা, জমিদার, সরদার, আমীর-ওমরাহ, বিভিন্নপ্রকৃতির কত লোক; দরবারেও কত প্রকৃতির কত কর্ম্মচারী, নীচমনা কত কুচক্রী, ওদিকে ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, আর্ম্মাণী, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকবৃন্দ—কিন্তু দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের নিরপেক্ষ শাসননীতি ও অপ্রতিহত শান্ত প্রতাপের নিকট সকলেই নতশির। নবাব সুজার শান্তিময় শাসনকালে কোন বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কুচক্রান্তের কাহিনী শোনা যায় নাই। অথচ এই নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর তরুণ পুত্র নবাব মুরশিদকুলিখাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সরফরাজখাঁ মসনদে আরোহণ করেই দেখলেন যে, কুচক্রী মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত! তার কারণ, সাম্রাজ্য তরণীর হালখানি যিনি দৃঢ়হস্তে ধরেছিলেন, সেই মহামন্ত্রী চাণক্যের মত বিজ্ঞ রাজনীতিক যশোবন্ত রায় তখন ইহলোকে নেই।

নবাব সুজাউদ্দীনের সরকারে যাঁরা এক একটি দপ্তরের ভার নিয়ে পদস্থ রাজপুরুষরূপে আমীর ওমরাহদের মত বাহাল তবিয়তে বসবাস করতেন, দরবারে যাঁদের যথেষ্ট মানসম্ভ্রম, নবাব এবং দেওয়ানের সঙ্গেও বিশেষ দহরম মহরম—তাঁদের অধিকাংশই মীর্জ্জা গোষ্ঠীর লোক। হাজী আহম্মদ এই গোষ্ঠীর কর্ত্তা। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জ্জা মহম্মদ আলি এই সময় দিল্লী সহরে বাদশাহের পিলখানার (হাতীশালা) তদারক করেন। দিল্লীর বাদশাহের হাতীশালাও এক বিরাট ব্যাপার—হাজার হাজার হাতী সেখানে থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তির উপরেই তার তত্ত্বাবধানের ভার থাকে। কিন্তু এই মহম্মদ আলি এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তি, যিনি সেনাচালনা করতে জানেন, রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; শাসন কার্য্যেও যাঁর আসক্তি প্রচুর! আশাবাদী তিনি এবং ভাগ্য-দেবতাও তাঁর অনুকূল। মীর্জ্জা মহম্মদ আলি ভ্রাতার আহ্বানে ভাগ্য-পরীক্ষার আশায় রাজধানী মুরশিবাদে উপনীত হলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মহম্মদ তখন নবাব দরবারে প্রতিষ্ঠাপন্ন। বিচক্ষণ মন্ত্রী যশোবন্ত রায় সে সময় পরলোকগমন করেছেন। নবাব সুজাউদ্দীন হাজী মহম্মদের উপরেই দেওয়ানের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হাজি আহম্মদ অনুজকে নবাবের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। এই অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির সহিত আলাপ করে নবাব সুজাউদ্দীন অত্যন্ত প্রীত হলেন; একে ত তিনি দেওয়ান সাহেবের সহোদর ভাই, তার উপর অত্যন্ত বাকপটু ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এঁর সঙ্গে আলাপ করে পরলোকগত উজীর যশোবন্ত রায়ের কথা নবাবের মনে পড়ে। নবাবের সুনজরে কেউ একবার পড়লেই তাঁর কিসমৎ ফিরে যায়; মীর্জ্জা মহম্মদের কিসমতও সুপ্রসন্ন হলো। নবাব সুজাউদ্দীন তাঁকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করে 'আলিবর্দ্দী' উপাধি দিলেন। এই সময় থেকেই মীর্জ্জা মহম্মদ আলি নবাবদত্ত উপাধি লাভ করে আলিবর্দ্দী খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হোলেন।

মুরশিদাবাদ দরবারে তখন মীর্জ্জা সাহেবদের বিপুল প্রতিপত্তি এবং বোলবোলাও। মীর্জ্জা হাজি আহম্মদ স্বয়ং প্রধান উজীর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জ্জা মহম্মদ রেজা প্রধান বক্সী, (নবাব সরকারের সমগ্র বাহিনীর বেতন দিবার কর্ত্তা) দ্বিতীয় পুত্র মীর্জ্জা আগা মহম্মদ রঙ্গপুরের ফৌজদার এবং তৃতীয় পুত্র মীর্জ্জা মহম্মদ হাসিম রাজধানীর প্রধান কোতোয়াল ও রাজধানী রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক। কিন্তু আলিবর্দ্দীর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর এঁদের পূর্বনাম পরিবর্ত্তিত হয়। রেজা হন নিবাইস বা নেওয়াজেস, আগা হন সৈয়দ আহম্মদ এবং হাসিম হন জৈনুদ্দীন (সিরাজদ্দৌলার পিতা)।

নবাবদত্ত উপাধি ও ফৌজদারের পদলাভ করার পর আলিবর্দ্দী

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিন পুত্রের সঙ্গে নিজের তিন কন্যার বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তাবন্ধনকে আরও দৃঢ় করলেন। আলিবর্দ্দী-বেগম খয়রুন্নেসার গর্ভে ঘসেটী, ময়মুনা ও আমীনা—এই তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিন ভগিনীই অসামান্য রূপবতী ও বিদুষী ছিলেন।

রাজমহলের ফৌজদার হয়ে আলিবর্দ্দী খুব সুনাম অর্জন করলেন। বছর কয়েক ফৌজদাররূপে কাজ করবার পর পুনরায় তাঁর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হলো। সেটা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই বছরের এক শুভদিনে আলিবর্দ্দীর কন্যা আমীনাবেগম এক সুদর্শন পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এইদিনই নবাব সুজাউদ্দীনের কাছ থেকে আলিবর্দ্দী এক ফরমান পেলেন; আলিবর্দ্দীর কার্য্যে প্রসন্ন হয়ে নবাব তাঁকে বিহারের সহ-শাসনকর্ত্তা (ডিপুটি গবর্ণর) নিযুক্ত করেছেন—এই সম্পর্কেই উক্ত ফরমান। আলিবর্দ্দী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত এই সম্মানজনক পদপ্রাপ্তির জন্য। তিনি বললেন, তাঁর এই সৌভাগ্য বহন করে এনেছে সদ্যোজাত দৌহিত্র—আমীনার গর্ভজাত পুত্র। এইদিন থেকেই এই দৌহিত্র হলেন আলিবর্দ্দীর প্রাণতুল্য প্রিয়, নয়নের মণি—ইনিই অদূর ভবিষ্যতে সাহাজাদা সিরাজদ্দৌলা নামে বিখ্যাত হন। জন্মোৎসবের আনন্দময় পরিবেশের মধ্যেই আলিবর্দ্দী এই শিশুকে তাঁর পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করলেন।

নবাব সুজাউদ্দীনের নির্দ্দেশমত আলিবর্দ্দী শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে রাজমহল থেকে আজিমাবাদের প্রাসাদে উপনীত হলেন। সেখানে তাঁর বসবাসের উপযুক্ত আরামদায়ক ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। নবাব তাঁকে আরও জানালেন যে, আজিমাবাদে এক বিশেষ দরবারে নবাব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আলিবর্দ্দীকে শাসনকর্ত্তার সনদ দেবেন। খুব শীঘ্রই তিনি আজিমবাদে রওনা হচ্ছেন।

আলিবর্দ্দী বুঝলেন, অদৃষ্ট তাঁর চারদিক দিয়েই প্রসন্ন হয়ে তাঁকে কর্মোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি এই সময় নিজের বংশমর্য্যাদাকেও সবার সমক্ষে সম্ভ্রমমূলক করবার উদ্দেশ্যে যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, প্রত্যেককেই আজিমাবাদে আহ্বান করলেন। ওদিকে যথাসময় অমাত্যবর্গ নিয়ে নবাব সুজাউদ্দীনও আজিমাবাদে এলেন। জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল দরবারে তিনি আলিবর্দ্দীকে শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করে সেই সঙ্গে সযত্নে দিল্লী দরবার থেকে আনীত 'মহাবতজঙ্গ' উপাধি, পাঁচ হাজারী মনসবদারীর সনদ, ঝালরদার রূপার পালকী, আশাসোঁটা সহ সামরিক বাদ্যকারদল (ব্যাণ্ড) এবং একলক্ষ আসরফি তাঁকে খেলাৎ দিলেন।

নবাব সুজাউদ্দীনের দরবারে আরও দুইজন ওমরাহ বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। এঁদের একজন হচ্ছেন ইরিচ খাঁ। বাদশাহ ফরোখশিয়ারের দরবারে এঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল; বাদশাহের অভিভাবক-স্বরূপ প্রতাপশালী সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গেও ইরিচ খাঁ সাহেবের খুব মাখামাখি ভাব ছিল। তাঁদের পতনের পর দিল্লীতে যখন অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা ঘটে, সেই সময় ইরিচ খাঁ বাহাদুর সদলবলে ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙলার রাজধানী মুরশিদাবাদে উপনীত হন। দেওয়ান যশোবন্ত রায় এঁকে সেনাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। নবাব সুজাউদ্দীনও খাঁ বাহাদুরকে সাদরে গ্রহণ করেন। উজীর হাজী সাহেব এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রবীণ বীরপুরুষের প্রতি কিন্তু প্রসন্ন ছিলেন না। মনে মনে এঁকে ঈর্ষা করতেন—নিজের স্বার্থের অন্তরায় অনুমান করে। কিন্তু নবাবকে এঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত থাকতেন।

আর এক ওমরাহ হচ্ছেন—আতাউল্লা খাঁ। ইনিও দিল্লীর বাদশাহী দরবারে প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ হয়ে ইরিচ খাঁর মতই বাঙলার রাজধানী মুরশিদাবাদে উপনীত হন। নবাব পরিবারের সঙ্গে দূর সম্পর্কে আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করে ইনি নবাব বাহাদুরের আত্মীয়রূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন এঁকেও সুনজরে দেখতেন এবং আত্মীয়ের অনুরূপ মর্য্যাদাদানেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। ইনিও সুযোগ বুঝে নবাবের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ স্থানীয় হয়ে ওঠেন।

উজীর হাজি আহম্মদ বুঝেছিলেন যে, এই লোকটিকেও হাতে রাখা উচিত। তিনি তখন কৌশল করে নিজের বিধবা কন্যা বাবেয়া বেগমের সঙ্গে আতাউল্লা সাহেবের সাদির বন্ধন পরিয়ে দিয়ে তাঁকে আপনার করে নেন। নবাব সুজাউদ্দীনও প্রসন্ন মনে এই বিবাহের সমর্থন করেন এবং বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর ধনরত্ন নবদম্পতিকে উপহার দেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হলো। তাঁর তরুণ পুত্র সরফরাজ খাঁ মুরশিদাবাদের মসনদে নবাব হয়ে বসলেন। সিরাজদ্দৌলার মতই তিনিও তরুণ বয়সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসকরূপে মসনদে আরোহণ করেন। তরুণ নবাবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রবীণ অমাত্যবর্গ ও দরবারীদের চিত্তবিক্ষোভের উপলক্ষ হলো। দুর্ভাগ্য নবাবের অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় উপলব্ধি করতে পারেননি যে, তাঁর জনপ্রিয় মহাপ্রাণ পিতার পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্তকারীদের স্বার্থের চক্র তাঁকে পরিবেষ্টন করে ঘূর্ণিত হচ্ছে। উজীর মিরজাফরের মতই উজীর হাজি আহম্মদ জগৎশেঠ প্রমুখ প্রধানদের হস্তগত করে সে চক্র চালনা করছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে তাঁরই তিন পুত্র ও আত্মীয়বর্গ অধিষ্ঠিত। ওদিকে নবাবের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরই পরামর্শে আলিবর্দ্দী খাঁ দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারে এক ক্রোর টাকা নজরাণা প্রদানের সর্ত্তে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী পদ প্রার্থনা করেন এবং সেই সঙ্গে এ প্রস্তাবও থাকে যে, নজরাণা ছাড়া সুবে বাঙলার বার্ষিক রাজস্ব যথারীতিই তিনি ইর্শাল করবেন…তার পরিমাণও এক ক্রোর কয়েক লাখ টাকা। এইসঙ্গে অস্ত্রবলে অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল নবাব সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করে মসনদ দখল করবার হুকুমনামা পাবারও আর্জী থাকে।

এই কয় বছরে শাসনকর্ত্তারূপে আজিমাবাদের উপর প্রভুত্ব করে আলিবর্দ্দী বিপুল প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হন। প্রথম প্রথম তিনি নামে সহ-শাসনকর্ত্তা থাকেন বটে, কিন্তু পরে পুরোপুরি ভাবেই শাসকের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হয়। সহৃদয় নবাব সুজাউদ্দীন নিজেই দিল্লী দরবারে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অদ্ভুতকর্ম্মা লোকটির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে দেন। সুতরাং সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরই আলিবর্দ্দীর আবেদন দিল্লীর দরবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে

মুরশিদাবাদ দরবার থেকে উজীর হাজী সাহেব, জগৎশেঠ এবং অন্যান্য পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের অধিকাংশই নবীন নবাব সরফরাজখাঁর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রজাপীড়ন সম্পর্কে এমন সব সাংঘাতিক অভিযোগ পেশ করেছেন যে, দেশের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এরূপ প্রকৃতির এক তরুণ যুবার উপর সুবে বাঙলার মত বিশাল রাজ্যের শাসনভার অর্পণ কিছুতেই সমীচীন নয় বলেই দিল্লীর দরবারস্থ মনীষীরা সাব্যস্ত করলেন। বিশেষত, মারাঠা শক্তি তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, বাদশাহের দুর্ব্বল শাসন পাশ থেকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, বাদশাহী তোষাখানায় অর্থাভাব, চারদিকে বিশৃঙ্খলা ; এ অবস্থায় আলিবর্দ্দীখাঁর মত জবরদস্ত ও দক্ষ ব্যক্তির প্রস্তাবই তাঁরা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন। দুর্ভাগ্য অসহায় বিপথগামী তরুণ নবাবকে সংযত বা বাধ্য করবার মত কোন ব্যবস্থাই দিল্লীর মহামহা মাতব্বর দরবারীদের মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হলো না। টাকা, টাকা, তাঁদের চাই টাকা ; ভাবী নবাব তখনই হাতে হাতে নগদ এক ক্রোড় টাকা নজরাণা দিতে প্রস্তুত, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাঙলার রাজস্বগুজারীর প্রতিশ্রুতি !

ইরিচখাঁর মুখে এই চক্রান্তের কথা নবাব সরফরাজখাঁ জানতে পেরে সক্রোধে তখনই রণসজ্জার হুকুম দিলেন। তাঁর সমস্ত ক্রোধ পড়ল আলিবর্দ্দী খাঁ উপর। এত বড় আস্পর্দ্ধা তার—পিতার মেহেরবাণীতে যে লোক পাটনার শাসনকর্ত্তা হয়েছে, এখন বাঙলার নবাবীর উপর তাঁর লোভ ! তাড়াতাড়ি সৈন্য সজ্জা করেই তিনি আলিবর্দ্দীকে শাস্তি দেবার জন্য পাটনা বা আজিমাবাদ অভিমুখে ধাবিত হলেন ! কিন্তু কৌশলী আলিবর্দ্দী তার আগেই আটঘাট বেঁধে তাঁর ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে গেরিয়ায় পরিখা-বেষ্টিত শিবির স্থাপিত করে নবাবের প্রতীক্ষা করছিলেন। নবাবই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হলেন এবং সিরাজের মতই চক্রান্তকারীদের খপ্পরে পড়লেন। অবিশ্যি, তাঁকে প্রকৃতই ভালবাসতেন যে কয়জন কর্ম্মচারী, তাঁরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আলিবর্দ্দীকে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিলেন—ইতিহাসে তাঁদের কাহিনী অমর হয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রেই নবাব সরফরাজ খাঁ হত হলেন, বিজয়ী আলিবর্দ্দী বাঙলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতিরূপে নবাব উপাধি নিয়ে মুরশিদাবাদের মসনদে আরোহণ করলেন।

নবাব হয়েই আলিবর্দ্দী ভেবেছিলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব এবং কোনও না কোন সূত্রে সম্পর্ক-সূত্রযুক্ত আত্মীয়স্বজনকে বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তিনি দিল্লী, সাহাজাহানাবাদ, রাজমহল ও আজিমাবাদ (পাটনা) এর কর্ম্মজীবনে যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কর্ম্মদক্ষতা ও সাধুতার জন্য যাঁদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন তিনি, তাঁদের অধিকাংশকেই আহ্বান করে এনে কোনও না কোন উচ্চপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথম যৌবনে আলিবর্দ্দীর কেরাণী জীবনে এবং পরে তাঁর শাসক জীবনে যাঁরাই সহকর্ম্মী বা কর্ম্মসূত্রে সামাজিক জীবনে তাঁর অন্তরঙ্গ বা প্রিয়পাত্র হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, নবাব হয়েই বন্ধুবৎসল আলিবর্দ্দী তাঁদের প্রত্যেককেই স্মরণ করলেন। ফলে, বন্ধুবৎসল নবাবের সৌজন্যে তাঁরাও ভাগ্যবানরূপে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এমনি, আত্মীয়দেরও তিনি বড় বড় পদে নিযুক্ত করে তাঁদের কিসমৎ ফিরিয়ে দিলেন।

ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাউদ্দীনের আত্মীয় ও অন্যতম সেনানী ইরিচ খাঁ এবং পার্শ্বচর আতাউল্লার কথা আগেই বলা হয়েছে। ইরিচ খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁর স্বপক্ষে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর এক পুত্র হত হন এবং তিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন। তিনি এতদিন রাজধানীর একাংশে নবাব সুজাউদ্দীন দত্ত জায়গীর অবলম্বন করে তাঁর নিজস্ব আবাসভবনেই সপরিবার সন্দিগ্ধ অবস্থায় কাল যাপন করছিলেন। কিন্তু সুস্থ হবার পর নবাব আলিবর্দ্দী তাঞ্জাম পাঠিয়ে তাঁকে দরবারে আনিয়ে সর্ব্বসমক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন : যে সব বিশ্বস্ত নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সাহচর্য্যে আমি এই মসনদের মুখ উজ্জ্বল করতে চাই, আপনিও তাঁদের মধ্যে একজন কৃতী ব্যক্তি। আপনাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না। নবাব সুজাউদ্দীন প্রদত্ত জায়গীর আপনি উপভোগ করতে থাকুন, সেই সঙ্গে নূতন দায়িত্বও কিছু গ্রহণ করুন। রাজধানী রক্ষার ভার আপনার উপর অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এ ছাড়াও সাহাজাদাদের অভিভাবক স্বরূপ হয়ে আপনি তাঁদের দেখাশোনা করবেন। দরবারে আপনার জন্য বিশিষ্ট স্থান আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি।

নবাবের নির্দ্দেশে জনৈক বক্সী তৎক্ষণাৎ প্রথম পংক্তির বিশিষ্ট আসনে ইরিচ খাঁকে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে বসিয়ে দিলেন। তিনি এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। পরক্ষণে তিনিও আসন থেকে উঠে সসম্ভ্রমে নবাবকে কুর্ণিশ করে যথারীতি নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করলেন।

নবাব আলিবর্দ্দীর এক বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন, তাঁর নাম শাহ্ খানুম। এই ভগিনীকে আলিবর্দ্দী অত্যন্ত স্নেহ করতেন। নবাব হবার পর মীরজাফর আলিবর্দ্দীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। নিয়তির নির্ব্বন্ধে এই ভাগ্যান্বেষী প্রিয়দর্শন দরিদ্র যুবার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি দেখে নবাব অভিভূত হন। আতাউল্লাই মীরজাফরকে নবাব-সকাশে এনে তাঁহার জন্য সুপারিস করেন। আতাউল্লাকে নবাব আলিবর্দ্দী আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করে নিয়ে তাঁকেও সামরিক দপ্তরের একটি দায়িত্বপূর্ণ শাখার ভার প্রদান করেছিলেন। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ হাজি মহম্মদের কন্যাকে বিবাহ করে ইনি নবাবেরও আত্মীয় হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সুপারিশে বেকার যুবা মীরজাফর আলির ভাগ্য ফিরে গেল। নবাব তাঁর ভগিনী প্রিয় শাহ খানুমকে মীরজাফরের হাতে অর্পণ করে সুসজ্জিত প্রাসাদ সমন্বিত এক আয়কর জাইগীর যৌতুক দিলেন। এই জাইগীর ও প্রাসাদ "জাফরগঞ্জের কুঠী" নামে বিখ্যাত। এই প্রাসাদেই শাহ্ খানুমের গর্ভে তাঁর পুত্র মীরণ জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রাসাদেই ভবিষ্যতে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল রচিত হয় এবং বন্দী সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্যও এই প্রাসাদ কুখ্যাত ! মসনদে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন করে নবাব আলিবর্দ্দী এই ভেবে মনে মনে খুসি হন যে, এইসব প্রতিভাবান কর্ম্মী ব্যক্তিগণকে দরদ দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন পরিয়ে দিয়ে তিনি নবাবী মসনদকে নিষ্কণ্টক করলেন, এর পর কোন গোলযোগ ঘটবে না—দরদীরা সকলেই আপৎকালে প্রাণপণে নবাবী মসনদকে রক্ষা করবেন। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নিয়তি তখন হাসছিলেন—সে হাসির রেখা কেউ তখন লক্ষ্য করে নাই।

লিখন-বিলাসী শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে-শিবপুরে থাকতেন। সেই সময় বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুনীতিবাবুর সেই প্রথম সাক্ষাৎ।

সুনীতিবাবুর মামার বাড়ী শিবপুরে। তাই শিবপুরের অনেকেই তাঁর বিশেষ পরিচিত। শিবপুর-নিবাসী উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ধ্রুবকুমার পাল এবং ঐ কলেজেরই রসায়নের অধ্যাপক পান্নালাল মুখোপাধ্যায় এঁরা সুনীতিবাবুর যেমন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তেমনি আবার শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী বলে এঁরা শরৎচন্দ্রেরও খুব স্নেহভাজন ছিলেন। সুনীতিবাবুর এই দুই বন্ধুই সেদিন তাঁকে শরৎচন্দ্রের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুনীতিবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রথম দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—তাঁর লেখার খাতা দেখলুম, মুক্তোর মত ঝরঝরে লেখা; তিনি লিখন-বিলাসী ছিলেন, চমৎকার দামী রুলটানা কাগজের খাতা, আর দামী ঝরণা কলম।*

শুধু সুনীতিবাবুই নয়, শরৎচন্দ্রের আরও অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও তাঁর এই লিখন-বিলাসের কথা উল্লেখ করেছেন। সত্যই শরৎচন্দ্রকে যাঁরা লিখতে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, তিনি কিরূপ লিখন-বিলাসী ছিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল ভাবে লিখবার জন্য তাঁর যেমন একটা সযত্ন চেষ্টা ছিল, তেমনি লিখবার জন্য ভাল কাগজ এবং ভাল কলমের উপরও তাঁর একটা প্রবল সখ ছিল। ভাল কাগজে ছাড়া তিনি আদৌ লিখতে পারতেন না। তাই তিনি সাধারণতঃ "নিউম্যান" থেকে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন দামী কাগজ আনাতেন এবং সেই কাগজেই লিখতেন।

শরৎচন্দ্রের এই সখের কথা জেনে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে মাঝে দামী কাগজ ও দামী কলম কিনে তাঁকে উপহার দিতেন। শরৎচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবদের এই উপহার অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করতেন। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বেতালার জমিদার শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় একবার শরৎচন্দ্রকে কাগজ উপহার দিলে, শরৎচন্দ্র তখন ১৩৩৮ সালের ২২শে ফাল্গুন তারিখের এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন—তোমার দেওয়া M.ss. লেখবার কাগজগুলি চমৎকার হয়েছে। খুব আনন্দিত হয়েছি।

"বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্র তাঁর "পথের দাবী" উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখতে আরম্ভ করলে, বঙ্গবাণীর স্বত্বাধিকারী শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে লিখবার জন্য ভাল কাগজ ও একটি দামী ফাউন্‌টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন। রমাপ্রসাদবাবুও নিউম্যান থেকেই ভাল রুলটানা কাগজ কিনে, ঐ নিউম্যানকে দিয়েই ফুলস্কেপ সাইজ করে কাটিয়ে তার উপর শরৎচন্দ্রের মনোগ্রাম ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মনোগ্রাম ছিল—একটি শীসসুদ্ধ ডাব এবং সেই ডাবের মধ্যে 'শরৎ' লেখা। এই ধরণের মনোগ্রাম করার কথা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—শরতের অর্থাৎ শরৎ ঋতুর ডাব খুব উপাদেয় এবং ঐ সময় মেলেও প্রচুর। তাই আমিও যখন শরৎ, সেইজন্যে এই ডাবকেই আমার মনোগ্রাম হিসাবে নিয়েছি।—শরৎচন্দ্র অনেক সময়ই তাঁর উপন্যাস লেখার কাগজে এবং চিঠি লেখার প্যাডে এই মনোগ্রাম ব্যবহার করতেন।

বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র এবং তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, আজও যা পাওয়া যায়, তা দেখে বেশ বোঝা যায় যে তিনি কিরূপ দামী কাগজে লিখতেন! এগুলি আজও তার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

কাগজের ন্যায় কলমের উপরও শরৎচন্দ্রের সমান সখ ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রায় কুড়ি বাইশটা দামী দামী ফাউন্‌টেন পেন ছিল। কেউ কোন নতুন ভাল ফাউন্‌টেন পেনের কথা বললে, শরৎচন্দ্র তখনই তাই কিনতেন। তবে তিনি

* শরৎ-প্রসঙ্গ—শারদীয় দেশ পত্রিকা, ১৩৫৮

খুব সূক্ষ্ম নিব পছন্দ করতেন এবং সেই সূক্ষ্ম নিবে লিখতে ভালবাসতেন। পথের দাবী লিখবার সময় রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রকে যে কলমটি উপহার দিয়েছিলেন, তার নিব খুব সূক্ষ্ম হলেও শরৎচন্দ্র রমাপ্রসাদবাবুকে তখন বলেছিলেন—নিবটা আরো সরু হ'লে ভাল হ'ত।

শরৎচন্দ্রের কথামত বঙ্গবাণীর অন্যতম কর্মকর্তা শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী একদিন যে দোকান থেকে কলমটি কেনা হয়েছিল, সেই নিউম্যানের দোকানেই আরো সূক্ষ্ম দেখে নিব আনতে যান। কুমুদবাবু গেলে, নিউম্যানের কর্তৃপক্ষ বলেন, এর চেয়ে সূক্ষ্ম নিব আর এখানে নেই, আরও সূক্ষ্ম নিব নিতে হ'লে আমেরিকা থেকে আনাতে হবে। পরে রমাপ্রসাদবাবুর নির্দেশ মত কুমুদবাবু নিউম্যানকে আমেরিকা থেকেই সূক্ষ্মতম নিব আনাতে বললে, নিউম্যান কলমটা আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সূক্ষ্ম নিব এনে দেন। শরৎচন্দ্র সেই নিব পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের যেমন অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন ছিল, তেমনি লিখবার সময়ও একসঙ্গে অনেকগুলি করে নিয়ে লিখতে বসতেন এবং যখন যেটা ইচ্ছা যেত, তখন সেটা ব্যবহার করতেন।

শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস লিখবার সময় তাঁর কাছে একবার গিয়েছিলেন। সেদিনকার সেই সময়কার কথা উল্লেখ করে উপেনবাবু তাঁর "স্মৃতি-কথা" গ্রন্থে লিখেছেন—দেখলাম আট দশটা ফাউন্টেন পেন ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। কোনটার নিব তীক্ষ্ণ, কোনটার তীক্ষ্ণতর, কোনটা বা ততোধিক তীক্ষ্ণ; কোনটায় ব্লু-ব্ল্যাক কালি, কোনটায় বেগুনে, কোনটা সবুজ রঙের।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এতগুলো কলম একসঙ্গে বার করে কি কর শরৎ?"

মৃদু হেসে শরৎ বললে—"ও আমার একটা শখ। যখন যেটা ভাল লাগে, তখন সেটায় লিখি।"

"এখন কোনটায় লিখছিলে?"

একটা কলম তুলে ধরে শরৎ বললে—"এইটেতে।"

শরৎচন্দ্র নিজে যেমন প্রচুর কলম কিনতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কলম উপহার পেলে যেমন খুব খুশি হতেন, তেমনি তিনিও তাঁর প্রিয়জনদের কলম উপহার দিতে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন যে, তাঁর কাছে উপহার দিতে কলমের চেয়ে ভাল জিনিষ আর ছিল না। এই কলম উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি রেঙ্গুন থেকে ১০-৫-১৩ তারিখের এক পত্রে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা ক'রে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেচি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

উপরের চিঠির—পুঁটু এবং বুড়ি হলেন, যথাক্রমে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর ভগ্নী নিরুপমা দেবী। এঁরা উভয়েই শরৎচন্দ্রের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। এঁরা এই কলম ছাড়া শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে আরও একবার কলম উপহার পেয়েছিলেন। সেই কলমের কথা উল্লেখ করে বিভূতিবাবু তাঁর 'আমার শরৎ-দা' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা।……সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটী Fountain penএর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন 'দিদি' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিছু যশ অর্জন করিয়াছেন, আমিও তখন "স্বেচ্ছাচারী" লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। শরৎদা যে কোথায়, তাহাও যেন তখন আমাদের তেমন স্মরণেই ছিল না। এমন সময় আমার নামে একটি একেবারে সোনার কলম, নিরুপমার নামেও একটা waterman। আমি ত উহা পাইয়া অবাক! এত দামী কলম লইয়া কি করিব?

"আছে সেটা চোরের ভাগ্যে"—এই মনে করিয়া দাদাকে পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন—"বেশ করেছি দিইছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে।" যেমন অদ্ভুত

বেয়াড়া মানুষ, তেমনি তাঁহার হুকুম। আমি উহা ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিলাম যে—এ তো একটা গহনা, এ দিয়ে কখনো লেখা যায়! আপনি যা দিয়ে লেখেন তাই একটা পাঠাবেন—বাস্ আর কোথায় যাইব—আর একটা রূপায় মোড়া প্রকাণ্ড লেখনীর বংশদণ্ডাঘাত। *

এইভাবে শরৎচন্দ্র নিজে যেমন দামী কলম ব্যবহার করতেন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদেরও তেমনি তিনি দামী দামী কলম উপহার দিতেন।

শরৎচন্দ্রকে দামী কাগজ ও দামী কলম ব্যবহার করা সম্বন্ধে কেউ কিছু বললে, তিনি বলতেন—কাগজ কলমই আমার জীবিকার উপায়, তাই আমি সবচেয়ে দামী কাগজে ও দামী কলমে লিখি। আর তা ছাড়া ভাল কাগজ ও ভাল কলম না হ'লে আমার লেখাই বেরোয় না।

শরৎচন্দ্রের এই লিখন-বিলাসের অভ্যাসটিকে বিশ্ব-বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'র লিখন-অভ্যাসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র যেমন ভাল কাগজ না হলে লিখতে পারতেন না, বার্ণার্ড শ'ও তেমনি একটা বিশেষ ধরণের কাগজেই লিখতে পছন্দ করতেন। তিনি লিখতেন ফিকে সবুজ কাগজের প্যাডে। এই ফিকে সবুজ রংটাই ছিল, তাঁর প্রিয় রং। শরৎচন্দ্রের ন্যায় বার্ণার্ড শ'ও একেবারে পাঁচ ছ'টি ফাউন্টেন পেন নিয়ে লিখতে বসতেন এবং যখন যেটায় লিখতে ইচ্ছা যেত, তখন সেটায় লিখতেন। একসঙ্গে সবগুলো কলম কাছে না থাকলে, তাঁর লেখাই বেরুত না।

বার্ণার্ড শ' আদৌ তাড়াতাড়ি লিখতেন না। তাড়াতাড়ি লিখলে ভাল সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না—এই ছিল তাঁর ধারণা। শরৎচন্দ্রও এই মত পোষণ করতেন এবং তিনিও কখন তাড়াতাড়ি লিখতেন না। শরৎচন্দ্র নিজেই যে শুধু তাড়াতাড়ি লিখতেন না, তা নয়; এই তাড়াতাড়ি না লিখবার জন্য তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদেরও উপদেশ দিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীআশালতা সিংহের দ্রুত লেখার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে একবার এক পত্রে লিখে-ছিলেন—ওকে অত তাড়াতাড়ি লিখতে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর কোয়ালিফিকেশন, লেখকের নয়।

দেশ বিদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এক একজন এক এক পরিবেশ ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি করে গেছেন। যেমন—কারো কারো বিশেষ কোন অভ্যাস ও পরিবেশের মধ্যে না বসলে আদৌ লেখা বেরুত না। কেউ নির্জনতা ভিন্ন কিছুই লিখতে পারতেন না, আবার কেউবা কোলাহলের মধ্যে থেকেও দিব্যি সাহিত্য সৃষ্টি করে যেতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—কবি ইয়েট্স লিখবার আগে সাবান দিয়ে হাত মুখ ভাল করে না ধুয়ে লিখতে পারতেন না। বলজাক পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন না পরলে লেখার প্রেরণা পেতেন না। তেমনি আবার চার্লস ডিকেন্স রাস্তায় বসে অনায়াসেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন, ভিক্টর হিউগো-ও রাস্তার ধারে কাফেতে বসে বসে উপন্যাস লিখেছেন।

কবি মাইকেল একই সঙ্গে চারখানা পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থ রচনার ধরণটা ছিল এইরূপ—একটা বড় ঘরের চার কোণে চারজন শ্রুতিলেখককে বসাতেন। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর পৃথক পৃথক বইয়ের শ্রুতিলিখন নিতেন। মাইকেল ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে এক একজনকে একটা একটা করে বই বলে যেতেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ থিয়েটারে কোন ভূমিকায় অবতরণ করে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পেতেন, সেই সময়ের মধ্যেও তিনি নাটক রচনা করতে পারতেন। একবার তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের ভূমিকায় নেমে এইভাবে দুখানি নাটিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেবার ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, সেদিন ছিল রবিবার, প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে মিনার্ভা থিয়েটারের নন্তিবাবু (নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব) গিরিশবাবুকে বলেন, আগামী রবিবারে আপনার একটা নতুন নাটিকা অভিনয় করাতে পারলে ভাল হ'ত। গিরিশবাবু শুনে বললেন—বেশ, কাগজ কলম নিয়ে এস, আজই তাহলে লিখে দিচ্ছি। না হলে আবার রিহারস্যালই বা হবে কবে?—গিরিশবাবুর হুকুম হতেই সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম এবং গিরিশবাবুর লেখকও এসে গেলেন। (গিরিশবাবু নিজে কখনও লিখতেন না; তিনি বলে যেতেন অপরে

* ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

লিখতেন) তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয় নির্বাচন করে রচনা আরম্ভ করলেন।

গিরিশবাবুর এই দিনকার এই রচনার প্রসঙ্গে তাঁর জীবনী-লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

তিনি একবার অভিনয় করিতে রঙ্গমঞ্চে গমন করেন, আবার আসিয়া বই লিখিতে বসেন। একজন হুঁসিয়ার লোককে নিয়োগ করা হইল—সে যেন তাঁহার অভিনয়-কাল উপস্থিত হইলেই যথাসময়ে আসিয়া তাঁহাকে খবর দেয়। এইরূপে অভিনয়ের অবসরে গীতিনাট্যখানি রচিত হইয়া গেল। অভিনয়ান্তে ষ্টেজে বসিয়া এই গীতিনাট্যের আটাশখানি গান বাঁধিয়া দিয়া চুণীলালবাবুকে বলিলেন, "ইচ্ছা করো, আর একখানি নক্সা আজই লিখিয়া দিতে পারি।" চুণীবাবু সাগ্রহে সম্মতি জানাইলে তিনি সেই রাত্রেই "Charitable Dispensary" নামক আর একখানি পঞ্চরং লিখিয়া দিয়া বাটী আসিলেন। সপ্তাহ মধ্যেই নাচ-গান ও রিহারস্যাল সম্পূর্ণ হইয়া রবিবারে "মণিহরণ" প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। "Charitable Dispensary" পরে অভিনীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পাণ্ডুলিপিখানি থিয়েটার হইতেই হারাইয়া যায়। (গিরিশচন্দ্র—পৃঃ ৪৫৭-৮)

শুধু এই নয়—গিরিশবাবু নাটক লিখতে বসলে কিরূপ যে বিভোর হয়ে যেতেন, এখানে তার একটা চমৎকার উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল। গিরিশবাবুর নাটকের শ্রুতি-লেখকদের মধ্যে তাঁর জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন অন্যতম। গিরিশবাবুর পাণ্ডব-গৌরব নাটকের এইরূপ লেখক ছিলেন অবিনাশবাবু। এই পাণ্ডব-গৌরব রচনার সময়কার কথায় অবিনাশবাবু লিখেছেন—

'পাণ্ডব-গৌরব' যখন লেখা হয়-রাত্রি জাগরণে অনভ্যাসবশতঃ লিখিতে লিখিতে আমার সময়ে সময়ে বিষম নিদ্রাকর্ষণ হইত। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। আমিও বিশেষ লজ্জিত হইতাম। এমনই করিয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত চলিল। চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বাধা অতিশয় বিরক্তিকর হইবে বুঝিয়া আমি সে রাত্রে লিখিবার সময়ে উপর্যুপরি তিনচার বাটী চা পান করিলাম। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। যখন চতুর্থ অঙ্ক লেখা শেষ হইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আজ এই পর্যন্ত থাক্। তুমি শোওগে।" শোব কি, তখন আমার মনে হইতেছে যে, মহানিদ্রা ব্যতীত এ চক্ষে আর ঘুম আসিবে না। তাঁহাকে বলিলাম,—"আমার চক্ষে আদৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?" শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"বেশ, আমি প্রস্তুত, আমার সব সাজান রহিয়াছে। তুমি পারলেই হ'ল, লিখিতে চাও—লেখ।" পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। নাটক সমাপ্ত হইল। সর্বশেষ সঙ্গীত "হের হর মনমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে!" গানখানির —প্রথম তিনছত্র সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া তিনি বলিলেন,—"থাক, আজ এই পর্যন্ত। গানগুলি সব কাল বেঁধে দেব। তুমি দোর-জানালাগুলো খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।" দরজা-জানালা খুলিয়া দেখি—বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে, ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি—বেলা তখন ৮টা। (গিরিশচন্দ্র—পৃঃ ৪৪৭-৮)

কবি কীট্স ও রবীন্দ্রনাথ—এঁরা দিবস ও রাত্রির যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ পাল্কীতে, বোটে, ট্রেণে, জাহাজে সর্বত্রই কবিতা লিখতে পারতেন। কীট্স সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি যে শার্ট পরতেন তার হাতার ইস্ত্রি কড়া থাকত, সঙ্গে কাগজ না থাকলে তিনি শার্টের হাতার কড়া ইস্ত্রিতে কবিতা লিখে রাখতেন।

শরৎচন্দ্র কিন্তু এঁদের মত যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায় লিখতে পারতেন না। সাধারণতঃ তাঁর লেখার একটা সময় ছিল এবং একটা বিশেষ পরিবেশ ছাড়াও তিনি লিখতে পারতেন না। রেঙ্গুনে চাকরী করতে করতে যখন তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, তখন তিনি সাধারণতঃ রাত্রে পড়তেন এবং সকালের দিকে ঘণ্টা দুই করে লিখতেন। তখন তিনি লেখার চেয়ে পড়তেনই বেশি। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র ২৮-৩-১৩ তারিখের এক পত্রে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখেছিলেন—আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র সাহিত্যকেই যখন একমাত্র জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন অবশ্য

অনেকটা সময় তাঁকে এই সাহিত্য রচনায় দিতে হয়েছিল। তবে তিনি বিকালে ও সন্ধ্যার ঠিক পরে একরূপ লিখতেনই না। এই সময়টায় তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দাবা খেলে, গল্পগুজব করে অথবা বেড়িয়ে কাটাতেন। সকালে ও রাত্রেই ছিল তাঁর লেখার প্রশস্ত সময়।

সকল সময়েই শরৎচন্দ্রের ছিল অবারিত দ্বার। তাই লোকজন সব সময়েই তাঁর কাছে যেতে পারত। এই অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক সময়ও নষ্ট হ'ত। এদিক থেকে বার্ণার্ড শ' ছিলেন কিন্তু এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। তিনি সকালে যখন তাঁর বাগানের ছোট ঘরটিতে বসে লিখতেন, তখন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। এমন কি স্বয়ং রাজাও যদি দেখা করতে যেতেন, তাঁকেও তিনি দেখা দিতেন না।

শরৎচন্দ্র নির্জনতা ছাড়া লিখতে পারতেন না। লেখার সময় তাঁর ঘরের মধ্যে বা তাঁর সামনে কেউ থাকলে তাঁর লেখায় বড় অসুবিধা হ'ত। তাঁর লেখার জন্য আলাদা ঘর ছিল এবং সেখানে বসেই তিনি লিখতেন। শরৎচন্দ্র নতুন জায়গায় গিয়ে অনুকূল পরিবেশ না হ'লে সহজে বড় একটা লিখতে পারতেন না। শরৎচন্দ্র একবার কাশীতে গিয়ে ২।১ মাস ছিলেন। সেখানে অনেক চেষ্টা করেও তিনি আদৌ লিখতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি তখন তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—একছত্র লেখা বার হয় না একি বিশ্রী দেশ। গত ৩।৪ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি, আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি। এমন মনে হচ্ছে বুঝিবা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে—কে জানে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়ার টেবিলের চেয়ে পাটি বা গদিতে বসে ছোট্ট জলচৌকিতে লিখতে ভালবাসতেন, শরৎচন্দ্র কিন্তু চেয়ার-টেবিলে, ইজিচেয়ারে, ফরাসে বসে সকল অবস্থাতেই লিখতেন। ইজিচেয়ারে বসে লিখবার জন্য তিনি টেবিলের বদলে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড বা "দাঁড়" করিয়ে তাতে একটা হাতদেড়েক লম্বা ও হাতখানেক চওড়া পিতলের মোটা পাত বসিয়ে নিয়েছিলেন। দাঁড়টায় ঘন ঘন খাঁজ কাটা ছিল এবং তাতে স্ক্রু লাগিয়ে এমন ব্যবস্থা করা ছিল যে ইচ্ছামত ওঠানো নামানো যেত।

ফরাসে বসে লিখবার জন্য ডেস্কের ন্যায় তাঁর একটা ছোট টেবিল ছিল। তাতে প্যাড রেখে তিনি লিখতেন। শরৎচন্দ্রের এই ফরাসে বসে লেখার কথা-প্রসঙ্গে শৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—ফরাসের উপর ছিল, হাত দেড়েক লম্বা, অনুপাতে চওড়া, বর্ডারে দামী মেহগনী কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুরবাড়ি মার্কা হাত-টেবিল। তার উপর ছিল দাদার লিখবার প্যাড। একটা ডাবের উপর "শরৎ" এই কথাটি এমবস্ করা। লেখবার প্যাড মরক্কো দিয়ে বাঁধানো। হাত-টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড্—সেটারও চারপাশে মরক্কো দিয়ে বাঁধানো। দাদার লিখবার জিনিষগুলি এতই দামী ছিল। সেই হাত-টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজনখানেক নানা আকারের ও নানা ছাঁদের ফাউনটেন পেন, পার্কার হতে ওয়াটারম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউনটেন পেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে দুটো এন্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গানের মত মাথা উঁচু করে থাকত ফাউনটেন পেন হোলডার।

শরৎচন্দ্র যখন লিখতে বসতেন, তখন অনেক সময়েই গড়গড়ার নলটা তাঁর বাঁ হাতে ধরা থাকত। নলটি মুখে দিয়ে ধূমপান করতে করতে তিনি চিন্তা করতেন, তারপর সেই চিন্তাকে তিনি ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্নভাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে কাগজের বুকে লিখে যেতেন।

লিখবার সময় তামাক টানতে টানতে ত বটেই, তাছাড়া অনেক সময় তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেও চিন্তা করতেন। আবার কখন কখন চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতেও লেখা সম্বন্ধে ভাবতেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবে ভেবেচিন্তে লিখতেন বলেই, তাঁর লেখায় কাটাকুটি আদৌ থাকত না। দামী কাগজ ও দামী কলমে লেখা যেমন তাঁর সখ ছিল, তেমনি কাটাকুটিহীন, পরিচ্ছন্ন ও মুক্তার মত ঝরঝরে করে লিখতেই তিনি ভালবাসতেন। তাই কাগজ, কলম পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সবদিক থেকেই শরৎচন্দ্রের লেখায় একটা মস্তবড় বিলাস ছিল।

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

ভারতীয় নারীর নবজাগরণ

শ্রীমতী সুখলতা রাও বি-এ

বিগত যুগের বরেণ্যা ভারতীয় নারী চরিত্রগৌরবে নিষ্ঠা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় আপন আপন জীবনের মহত্তম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে নারীর জীবনে নব আদর্শ, জগতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র, নূতন পথ ও নূতন মত। ভারতের বহু প্রাচীন সংস্কার, রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার লৌহকবাট উন্মুক্ত করিয়া আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান পাইয়াছেন বিংশ শতাব্দীর নারী। দৃষ্টি উন্মিলীত হইল, হৃদয় নব আশার আলোতে উদ্ভাসিত হইল—সেই আলোকে অন্তর্লোকে প্রতিভাত হইল ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানব-জীবন—ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা প্রতি মানুষেরই কর্ত্তব্য—জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধনে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। প্রাচীনকালের সামাজিক শাসনে, বিধিনিষেধের বন্ধনে, জগতের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, শিক্ষালাভে বঞ্চিত গৃহকোণে অবরুদ্ধা নারী-হৃদয় নূতনভাবে আত্মোপলব্ধির চেতনায় জাগরিত হইল।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষের সহিত সমান অধিকারের দাবী জানাইয়া পাশ্চাত্য জগতের নারীগণ দলবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারী গত যুগের পুরাতন প্রথা ও আচার বিচার সংস্কারপূর্ব্বক যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রথম সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক ভারতীয় পুরুষ ইংরেজী প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন। এতদ্দারা পরিবারস্থ অশিক্ষিত নারীদিগের সহিত আচার ব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষায় বিভেদ সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময় নব-চেতনার উদ্বুদ্ধ কতিপয় সমাজ-সংস্কারক পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মনীতি সংস্কার পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে নবরূপ দানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন "না জাগিলে আজ ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।" সেই যুগে কতিপয় ব্যক্তিত্ববতী মহিলা এই সমাজসংস্কারক ও পরিবারস্থ প্রগতিবাদী গৃহকর্ত্তাদিগের সহায়তায় শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং নূতন ভারতের সমাজ গঠনে সাহায্য করিবার জন্য নারীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মচেতনাবোধে নবজাগ্রত নারীগণ ধীরে ধীরে নব নব কর্ত্তব্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নয়, কিন্তু একনিষ্ঠভাবে ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে চালাইতে একদিন ভারতীয় নারী পুরুষদের সহিত সমানভাবে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। নারীশিক্ষার প্রচলন ব্যাপক-ভাবে আরম্ভ হইল। নেতৃস্থানীয়া নারীগণ সম্মিলিতভাবে সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া দেশের সাধারণ নারীদিগকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেকালের পথঘাটের বহু অসুবিধা ছিল, গৃহপরিবারের বহুবিধ বাধানিষেধ ছিল—পুরুষ সহচর বিনা যাতায়াতে মহিলাগণ অনভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্ভীক চিত্তে বহু মহিলা এই আমন্ত্রণে একত্রিত হইলেন। দেশের বহু কল্যাণকর কার্য্যের সহিত বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার কার্য্যে তাঁহারা ব্রতী হইলেন। সনাতনপন্থীগণ বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন—বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়া পত্র-পত্রিকাতে প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীবনের মহত্তম বিকাশ ও পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য মহিলাগণের প্রচেষ্টা নিরস্ত হইল না। বহু সমালোচনার পর "মর্যাদাআইন" জারী হইয়া বাল্যবিবাহ 'বেআইনী' বলিয়া ঘোষিত হইল। অবরোধ-প্রথাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। এই আন্দোলনে ভারতের প্রগতিপন্থী পুরুষগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

দুইশত বৎসরের শোষিত ও নিপীড়িত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর উদাত্ত আহ্বানে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু নারী যোগ দিয়াছিলেন। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দেশসেবিকা নারীগণ দুঃখবরণ করিলেন, কারাবরণে প্রস্তুত হইলেন—সকল ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হইলেন—বহু অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিলেন—কতজন জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ভারতীয় নারীর মুক্তিসংগ্রাম সর্ব্বজনবিদিত।

নারীর অন্তর্লোকে অনির্ব্বাণ দীপ জ্বলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে নারীকল্যাণপ্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে দেশে স্থাপিত হইল। মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রৌঢ়শিক্ষা প্রচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে নারী কর্ম্মীগণ ব্রতী হইলেন। দরিদ্র পরিবারগুলির উন্নতিকল্পে নানা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রয়াস চলিতে লাগিল। সেবাব্রতী নারীগণ নব উদ্যমে গ্রামে গ্রামে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিলেন! আর্ত্ত, পীড়িত রুগ্ন মাতা ও শিশুদিগের সেবা করিয়া ধন্য হইলেন! দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে দেশ যখন বিপন্ন, সেই সময় তাঁহারা অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত, দুঃস্থ ও অসহায় নরনারীর পার্শ্বে স্থান লইয়াছিলেন। উদ্বাস্তু বিপন্নজনের সাহায্যার্থে এই সেবিকাগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস্তুহারা নারী ও শিশুদিগকে স্থান দিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে বহু কল্যাণকর কার্য্যে ভারতীয় নারীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা দেশ ও সমাজের জনমনকে আকৃষ্ট করিল। শুধু তাহাই নহে, রাজনীতিক্ষেত্রেও নারী সম্মানের স্থান অধিকার করিলেন। অত্যন্ত গৌরবের কথা এই যে, মিলিত জাতিসঙ্ঘের সভানেত্রীরূপে ভারতীয় নারী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নির্ব্বাচিত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বহু নারী আজ সংসারের দায়িত্ব গ্রহণে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী, বেসরকারী বহু কার্য্যে, কর্ম্মরতা শত শত ভারতীয় নারীকে দেখা যায়। রেলওয়ে ও ডাকবিভাগে, চিকিৎসাক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগেও অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিতা বহু নারী আজ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে, গৃহপরিবারে সুদক্ষা গৃহিণীরূপে, জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদিগের কল্যাণী ও বুদ্ধিমতী জননীরূপে, সমাজসেবিকারূপে, সাহিত্য-রচয়িত্রীরূপে, ভারতীয় নারীর শক্তি ও প্রতিভা জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। আজ নারীর জীবনে নূতন প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়াছে—আনন্দের ও মুক্তির আহ্বানে দিকে দিকে বিভিন্ন কর্ম্মপ্রবাহে আপনাদিগের দায়িত্ব ভার অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিতেছেন। ভারতের নবজাগ্রত নারীদিগকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানাইয়া বলি!

"জ্বালো নব জীবনের নির্ম্মল দীপিকা,
মর্ত্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা
আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।"

ভজন-সংগীতে মহিলা ভক্ত-কবিদের দান

শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য

মীরাবাইএর ভজনের সংগে পরিচয় নাই, এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আকবরের রাজকীয় ঐশ্বর্যে যখন উত্তর-ভারত ঝলসিত, মীরাবাইএর ভক্তিরস-মধুর সংগীতে তখন রাজপুতানা ও বৃন্দাবনের চতুর্দিক মুখরিত হইয়াছিল। মীরাবাই যে শুধু মধুর সংগীতের রচয়িত্রী ও সুগায়িকা ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সাধনা শক্তি ও ঐশ্বর্য ছিল অসামান্য। লালদাস বাবাজী রচিত ভক্তমালে বর্ণিত আছে, সম্রাট আকবর তানসেনের সঙ্গে ছদ্মবেশে বৈষ্ণব সাজিয়া রাণী মীরার গান শুনিয়াছিলেন। কিন্তু একথা গোপন রহিল না। তাঁহার স্বামী মেবারের রাণা কুম্ভ ইহাতে ক্রোধান্বিত হইলেন—

"পাতসা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা,
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিলা মানা ॥
বধূ ভ্রষ্টা বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার নিঞা ॥
বাইজীর উপরে গিয়া অস্ত্র যে হানিল।
কাটিবারে থাকু কাজ অংগে না ফুটিল ॥
বিষ আদি খাওয়াইল কিছুই না হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয়।"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

এই কাহিনীটিকে আজগুবি গল্প বলিয়া অনেকে উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু মীরাবাইএর রচিত কয়েকটি গানেও এই অত্যাচারের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

মৈঁ গোবিন্দ গুণ গাণা।
রাজা রুঠৈ নগরী রাখৈ হরি রুঠ্যাঁ কেই জানা ॥
রাণা ভেজা জহর প্যালা ইমরিত করি পীজানা।
ডবিয়াঁমে ভেজ্যাজ ভুজংগম সালিগ্রাম কর জানা।
মীরা তো অব প্রেম দেওয়ানী সাঁওলিয়া বর পানা ॥

তারপর—

পিয়াজী ম্হাঁরে নৈনোঁ আগে রহজ্যো জী।
নৈনোঁ আগে রহজ্যো ম্হাঁনে
ভুল মত জজ্যো জী।
ভৌ সাগর মেঁ বহী জাত হুঁ,
গো ম্হারী মুঠ লীজ্যো জী।
রাণাজী ভেজা বিষকা প্যালা
সো ইমরিত কর দীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
মিল বিছুড়ন মত কীজ্যো জী ॥

ভক্তি-বিশ্বাস ও প্রেমে মীরাবাই কতদূর শক্তিশালিনী ছিলেন এই দুটি গানই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। তাঁহার রচিত গানের অধিক পরিচয় দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মীরাবাইএর সময়ের [illegible] একশত বৎসরের মধ্যে আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রা[illegible]জস্থানে আরও দুইজন [illegible] তাঁহারা হইলেন ডেহরা গাঁও-সম্ভূতা সহজোবাই ও দয়াবাই। দুইজনে ছিলেন ব্রহ্মচারিণী ও মহাত্মা চরণদাসজীর শিষ্যা। দুইজনে একত্রে সাধনা করিয়াছিলেন ও গুরুদেবের রচিত সঙ্গী[ত] প্রবুদ্ধ হইয়া নিজেরাও প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন। তাঁহা[রা] উভয়েই চরণদাসজীর দিল্লীস্থিত সৎসঙ্গে অবস্থান করিতে ও গুরুসেবায় নিরত ছিলেন। গুরুমহিমা বিষয়ে দুইজনে[র] পদ রহিয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

গুরুমহিমা—সহজোবাই—

রাম তজুঁ পৈ গুরু ন বিসারুঁ।
গুরুকে সম হরিকো ন নিহারুঁ ॥
হরিনে জন্ম দিয়ো জগমাহীঁ।
গুরুনে আওয়াগওন ছুটাহীঁ ॥
হরিনে পাচ চোর দিয়ে সাথা।
গুরুনে লই ছুটায় অনাথা ॥
হরিনে কুটঁব-জাল মেঁ গেরী।
গুরুনে কাটী মমতা বেরী ॥
হরিনে রোগ ভোগ উরঝায়ৌ।
গুরু জোগী কর সবৈঁ ছুটায়ৌ ॥
হরিনে কর্ম ভর্ম ভরমায়ৌ।
গুরুনে আতমরূপ লখায়ৌ ॥
হরিনে মোসুঁ আপ ছিপায়ৌ।
গুরু দীপক দৈ তাহি দিখায়ৌ ॥
ফির হরি বংধ মুক্তি গতি লায়ে।
গুরুনে সব হী ভর্ম মিটায়ে ॥
চরণদাস পর তন মন ওয়ারুঁ।
গুরু ন তজুঁ হরিকুঁ তজি ডারুঁ ॥

গুরু মহিমাকা অংগ—দয়াবাই

চরণদাস গুরু দেবজূ ব্রহ্মরূপ সুখধাম।
তাপহরণ সব সুখকরণ, দয়া করত পরণাম ॥
অংধ কূপ জগ মেঁ পড়ী, দয়া করম সে আয়।
বূড়ত লই নিকাসি করি, গুরু গুণ জ্ঞান গহায় ॥
শতগুরু সম কোই হৈ নহীঁ, ইয়া জগমেঁ দাতার।
দেত দান উপদেশ সোঁ করৈঁ জীও ভব পার ॥
মনসা বাচা করি দয়া, গুরু চরণোঁ চিত লাও।
জগ সমুদ্র কে তরণকুঁ নাহিন আন উপাও ॥

সতগুরু ব্রহ্ম স্বরূপ হৈঁ মানুষ ভাব মত জান।
দেহভাব মানৈঁ দয়া, তে হৈঁ পশু সমান॥

দয়াবাই গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছেন। সহজোবাই হরির উর্দ্ধে গুরুর স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পরমসংত কবীর রচিত,

"হরি কে রুত জীও জাত রসাতল, গুরু তেহি লেত উবারী।
হরিসে গুণ হৈ অধিক গুরুকে, দেখো হৃদয় বিচারী॥"
(কবীর-ভজন-রত্নাবলী)

এই পদের প্রভাব বিলক্ষণ স্পষ্ট। কবীর দুই ছত্রে যাহা বলিয়াছেন, সহজোবাই অষ্টাদশ চরণে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুরু মহিমা, বৈরাগ্য, নাম, প্রেম, সাধুমহিমা প্রভৃতি তদ্‌রচিত অনেক দোহা বেলভেডিয়ার প্রেস এলাহাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত "সহজোবাইকী বাণী" নামক সংগ্রহ-মালায় প্রথম প্রকাশিত হয়। "দয়াবাইকী বাণী"ও বেলভেডিয়ার প্রেসের অমূল্য সংগ্রহ। রাজস্থানে জন্ম হইলেও সহজোবাই ও দয়াবাইএর পদগুলিতে মীরাবাইএর চেয়ে কবীরের প্রভাবই বেশী। দয়াবাই গুরুর মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া অনাহত নাদযোগ-অভ্যাসে নিজের কতদূর উর্দ্ধগতি হইয়াছিল তাহার আভাসও দিয়াছেন—

চরণদাস গুরু কৃপাতেঁ মনু ওয়াঁ ভয়ো অপংগ।
সুনত নাদ অনহদ দয়া, আঠো জাম অভংগ॥
জহাঁ কাল অরু জ্বাল নহি, সীত উষ্ন নহি বীর।
দয়া পরসি নিজ ধাম কুঁ মায়া ভেদ গংভীর॥

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে তথা বৃন্দাবনে ভক্তি প্রেমের প্রবাহ বহিয়াছিল। সেই ভক্তি-প্রবাহ-ধ্বনি বনীঠনী, প্রতাপবালা, যুগলপ্রিয়া, মঞ্জুকেশী, রামপ্রিয়া, রাণী রূপ কুঁওরী প্রভৃতি মহিলা সন্তের সঙ্গীতে ধরা দিয়াছে। কে কোথায় কখন জন্মিয়াছিলেন, কাহার কিবা পরিচয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। মাত্র প্রতাপবালার ভনিতা থেকে বুঝা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ছিল জাম। তারপর বনীঠনী, প্রতাপবালা, যুগলপ্রিয়া, রাণী রূপ কুঁওরী বৃন্দাবনবাসিনী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। তন্মধ্যে যুগলপ্রিয়ার সাধনাক্ষেত্র যে শ্রীবৃন্দাবনধামেই ছিল তাঁহার রচিত ভজন থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি গাহিয়াছেন—

বৃংদাবন অব জায় রহুঁগী,
বিপতি ন সপনেহুঁ জহাঁ লহুঁগী।

এই কয়জন সাধিকা-রচিত ভজনগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। মঞ্জুকেশী, প্রতাপবালা ও রামপ্রিয়ার রচনায় রামভক্তিমূলক ভজন, আর বনীঠনী, যুগলপ্রিয়াও রূপ কুওঁরীর রচনায় রাধা-কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক ভজন অধিক স্থান পাইয়াছে। মঞ্জুকেশী বুঝিতে পারিয়াছিলেন রামভজন বিনা সুগতি নাই। তাঁহার কণ্ঠে তাই রাম-নাম-ধ্বনির ঝংকার—

দ্বারে রহো, মন।
রামভজন বিনু সুগতি নহীঁ হৈ গাঁঠ আঠ দৃঢ় পারে রহো।
অবিশ্বাস করি দূর সর্বথা, এক ভরোসা ধারে রহো॥
সদা খিন্নপ্রিয় সিয়-রঘুনন্দন, জানি দর্প সব ডারে রহো।
'কেশী' রামনাম কী ধ্বনিপ্রিয়, একতার গুংজারে রহো॥"

জামসুতা প্রতাপবালা রামবিষয়ক সঙ্গীত করিলেও শ্যাম যে রাম থেকে অভিন্ন তাহা তিনি অনুভব করিতেন। তাই সংগীতেও রাম ও শ্যামকে একত্রে ভজন করিয়াছেন—

লগন মহারী লাগী চতুরভুজ রাম।
শ্যাম সনেহী জীওন হমেরী ঔরন সে কিয়া কাম।
নৈন নিহারুঁ পল ন বিসারুঁ, সুমিরুঁ নিসদিন শ্যাম॥
হরি সুমিরণ সে সব দুখ হোওয়ে, মন পাওয়ৈ বিসরাম।
তন মন ধন ন্যোছাত্তর কীজৈ, কহত দুলারী জাম॥

রামপ্রিয়ার রামভজন মধুর ও অনুপ্রাসমুখর—

জব কিং কি নী ধুনি কান পরী রী।
লখ ললচায় লখন সোঁ লালন হঁসি যহ বাত কহীরী।
মানহু মান মহান মহাদল কৈ দুন্দুভিকী সান চলীরী॥
বিশ্ব বিজয় অব কীন্হ চাহত মম দৃঢ়তা লখি ভাজি চলীরী॥
রামপ্রিয়াকে রামললাকো আজু ললী মন ছীনি চলী-রী॥

যুগলপ্রিয়া শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীযমুনা সকলের কাছে বৃন্দাবনে বাস প্রার্থনা করিতেন। তদ্‌রচিত শ্রীরাধা প্রার্থনা সঙ্গীতটি বড়ই করুণ ও মধুর।

জয় রাধে, শ্রীকুংজ বিহারিণী
বেগহি শ্রীব্রজবাস দীজিয়ে।

বেলী চিটপ জমুন জল ঔ রজ,
সংত সংগ রংগ ভীজিয়ে॥
বহু দুখ সহ্যো সহোঁ অব কবলোঁ
অভয়-সবনি সোঁ কীজিয়ে।
সরণাগতকী লাজ আপকো,
কৃপা কর তো জীজিয়ে॥
জো কুছ চুক পরী হৈ অবলোঁ
সো সব ছমা করীজিয়ে।
জুগলপ্রিয়া অনুচরী আপকী
বিনয় শ্রবণ সুনি লীজিয়ে॥"

ধনীঠনী আপন মনভাবন নন্দদুলালকে সৌদা করিয়া পাইয়াছেন—

মৈ আপনো মনভাওন লীনোঁ।
ইন লোগনকো কগা কীনোঁ মন দৈ মোল লিয়োরী সজনী।
রত্ন অমোলক নন্দদুলারো নওল লাল রংগ ভীনোঁ॥
কহা ভয়ো সবকে মুখ মোরে মৈঁ পায়ো পীও প্রবীনোঁ।
রসিকবিহারী প্যারো প্রীতম সির বিধনা লিখ দীনোঁ॥

রাণী রূপ কুঙরী কোন স্থানের রাণী ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু ভক্তিজগতের যে তিনি রাণী তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভজন থেকে অনুভূত হইবে।

"অব মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি লীজে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি কহিকে জগমেঁ সাধু সমাগম কীজে॥
কৃষ্ণ নামকী মালা লেকে কৃষ্ণনাম চীত দীজে।
কৃষ্ণ নাম অমৃত রস রসনা তৃষাবন্ত হো পীজে॥
কৃষ্ণ নাম হৈ সার জগতমেঁ কৃষ্ণহেতু তন ছীজে।
রূপ কুঙরী ধরি ধ্যান কৃষ্ণকো কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি লীজে॥"

মধ্যযুগের এই কয়টি নারী ভক্তিসাধনায় যে কতদূর উর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহাদের রচিত ভজনমালায় সুস্পষ্ট বিদ্যমান। গার্গী মৈত্রেয়ীর পরে সে ভারতে ভক্তিমতী নারীর অভাব হয় নাই, অধ্যাত্মসাধনায় ও নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে নহে, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন বলিয়াই বিশ্বাস।

'টেব্‌ল্ ক্লথ'

এস্ বানু

বর্ত্তমান যুগে গৃহ সজ্জিত ক'রতে নিত্য নব-নব ডিজাইনে অনুসন্ধান হয়—কাজটা সহজই হউক আর কঠিনই হউক এখানে টেব্‌ল ক্লথের যে নমুনাটি দিলাম, তা সহজ সর মধ্যে দেখ্‌তে সুন্দর হবে এবং এটা সূচী-শিল্পীদের পছ হ'লে আমার শ্রম সার্থক হবে।

টেব্‌লের মাপ মত ঘন নীল পপ্লিন নিন। কো দিকে দুই দিকে ৩" ইঞ্চি পরিমিত কাপড় রেখে গে করে কেটে বা'র ক'রে নিন্। বা'র করা টুক্‌রা মাপ মত সাদা পপ্লিন কেটে নিন্। সাদা গোল কাপড়ট চারদিক চিকণ করে টেকে নিন্। টেব্‌ল্ ক্লথের কা অংশের ধার গুলো চিকণ করে টেকে নিন। এ একখণ্ড 'নিউজ পেপার' ডবল করে নিয়ে (শক্ত কর জন্য) তার উপর টেব্‌ল ক্লথের কাটা অংশটি বড় করে টেকে নিন্। তারপর সাদা গোল কাপড়টা টে ক্লথের কাটা অংশটার ভিতর বসিয়ে—সেটিও টেকে নি সাদা কাপড়ে এবং নীল কাপড়ের মাঝামাঝি ফাঁক্ থাক্ ক্রুচেড্ (সাদা) সুতো দিয়ে সাদা কাপড়টা টেব্‌ল্ ক্ল সঙ্গে বিডিং ষ্টীচ্ দিয়ে জুড়ে দিন্। এর পর নিউজ পেপা খুলে ফেলুন। এখন সাদা কাপড়টুকুর উপর হাল্কা সুতো দিয়ে অবিন্যস্ত ছোট ছোট কয়েকটি ফুল দিন। যাঁরা একটু চাকচিক্য ক'রতে চান তাঁরা হলুদ এবং কালো সুতোর এক একটি এক এক রঙের করে দিন। কিম্বা যাঁরা একটু বেশী আধুনিকা তঁ ফুলগুলো স্রেফ্ সাদা সুতো দিয়ে করে দিন।

ঠিক এভাবে অন্য তিন দিক করুন এবং মাঝখা একটি করতে পারেন। তারপর টেব্‌ল্ ক্লথের চার দি ১" ইঞ্চি চওড়া করে মুড়ে হেম করুন। দেখ্‌বেন চার দিকটায় সাদা কাপড়ের বর্ডার দিয়ে—জিনিস মাধুর্য্য নষ্ট করবেন না।

সাদা কাপড়টা গোল করে না কেটে অন্য আকৃতি

কাটতে পারেন, যেমন—বরফি আকৃতি কিম্বা ধরুন কোণের চারটা তারা আকৃতি এবং মাঝেরটা একটা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। এই নিয়মে বেড্‌কভারও করতে পারেন।

[আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিতা মহিলাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাঁরা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই "মেয়েদের কথা" বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আলোচনা সঙ্গত মনে হলে সাদরে পত্রস্থ করা হবে। রচনা পাঠাবার সময় উপরে "মেয়েদের কথা" লিখতে ভুলবেন না। রচনা যথাসম্ভব ছোট করে লিখে পাঠাবেন।—(ভাঃ সঃ)]

*　　*　　*

১। এ দেশের মেয়েদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক যে সব অভাব অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও উন্নতির উপায় নির্দেশ।

২। এ দেশের মেয়েদের বিবিধ অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে যে সব আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত তার আলোচনা এবং মেয়েদের স্বার্থের বিরোধী যে সব আইন-কানুন আ[ছে] তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

৩। ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে নারীর অধিকা[র] রক্ষা ও স্বার্থের অনুকূল কি কি বিধিবিধান প্রচলিত আ[ছে] সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৪। পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন উন্নতির জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তার যথাসম্ভব খবর।

৫। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, সাংস্কৃতি[ক] অনুশীলন এবং শিল্পকলা প্রভৃতির পরিচয়।

৬। মাতৃত্ব, শিশুমঙ্গল, শিশু-শিক্ষা, সন্তান পা[লন] ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনা।

৭। সমাজ সেবা ও নারী কল্যাণ (Social servic[e] & Womens welfare) সংক্রান্ত কাজ কর্মের বিবরণ।

৮। সংসার, পরিবার ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে চিন্তা[শীল] আলোচনা।

৯। মেয়েরা কোথায় কোন্ বিষয়ে কি কৃতিত্ব প্রদ[র্শন] করে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের বিবরণ, (সম্ভব হলে সচি[ত্র] [খেলাধূলা, নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ও এর অন্তর্গত]।

১০। মেয়েদের উন্নতি ও প্রগতি সম্বন্ধে অল্প কথ[ায়] লেখা প্রস্তাবাদি গ্রাহ্য হবে।

স্মরণোৎসব

প্রভাময়ী মিত্র

অশ্রু শুষ্ক আয়ত আঁখিতে ব্যাথায় বহ্নি ঠিকরি যায়,
জননী বঙ্গ ডাকিছে বৎস শূন্য বক্ষে ফিরিয়া আয়।
আজো অকথিত রয়ে' গেছে যাহা শুনাও সে বাণী
জাতির কানে
ত্যাগ মন্ত্রের দীক্ষা তোমার সঞ্চার কর সবার প্রাণে।
সঞ্জীবনী সে পরশ আভাসে মৃত জাতি সেও জাগিবে মানি
অমৃত ধারায় ভস্মের স্তূপে জীবন প্রবাহ বহিবে জানি।
মধুমাস আসে সমারোহে তারি হাসে শিহরণ
বিশ্বের বুকে,
স্মরণোৎসব ওগো যুবরাজ হিয়া কম্পিত গভীর দুখে।

কাঙাল বাঙ্‌লা কি রচিবে আজ—কোন্ উপচার পূজার ল[াগি]
শিহর শীর্ণ দীর্ণ হৃদয়ে দিবস রজনী রয়েছে জাগি।
রিক্ত দু'খানি কঙ্কাল ক'রে দূর্ব্বায় রচে দূর্ব্বার রাখি
জন্ম-মরণ-সিন্ধুর পারে কোথায় বন্ধু ফিরিছে ডাকি।
বঙ্গমায়ের অঙ্কের নিধি হৃদি বল্লভ ফিরিয়া আয়,
নিঙাড়ি রক্ত শত হৃদয়ের পাদ্য যোগায় তোমারি পায়।
পূর্ণ-কুম্ভে ভরিয়া এনেছে শত বরষের পুণ্য-নীর,
দাঁড়াও আসিয়া অঙ্গনে তব যম জয়ী মহাজাতির বীর।
গঙ্গাসাগরে জেগেছে জোয়ার বঙ্গের হিয়া উথলি যায়,
রিক্তা জননী সর্ব্বহারা যে—ভাঙা বুকে তার ফিরিয়া আয়
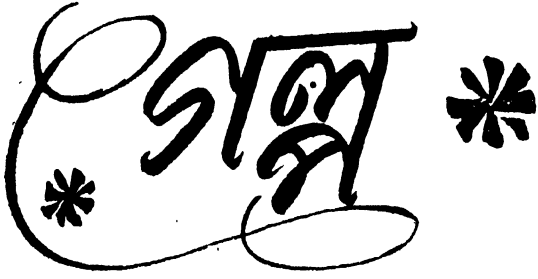
অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন

স্নুরুচি সেনগুপ্তা

কবে আমি জন্মেছিলাম সেকথা আমার মনে থাক্‌বার কথা নয়। অতি বৃদ্ধেরাও বল্‌তে পারেন না, এতই বয়স হ'য়েছে আমার! ঝুরি মূলগুলোর দিকে তাকালেই সেকথা তোমরা বিশ্বাস ক'র্‌বে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত ঘটনা ঘট্‌তে দেখ্‌ছি চোখের উপর, সব কি আর মনে রাখ্‌তে পারি? তবু দু'একটি ঘটনা যেন কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে।

গ্রামখানা ক'ল্‌কাতার কাছেই। ডেলি প্যাসেঞ্জারী ক'রে ক'লকাতায় গিয়ে কাজ করা যায় ব'লে অন্য গাঁয়ের মত সব লোক গাঁ ছেড়ে সহরে চ'লে যায় নি। তাই গ্রামখানায় শ্রী আছে। একটা স্কুল আছে, দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে একটা। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে নদীর তীর ঘেঁষে আমার বাস। চোখ খুলে তাকালেই নদীর রূপালী রোমাঞ্চিত উদার বক্ষ চোখে পড়ে, কানে আসে নদীর কুলু কুলু কাকলী।

গ্রামের যাতায়াতের পথ বেশীর ভাগ আমার তলা দিয়ে নয়তো আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় অল্পক্ষণের জন্য হ'লেও আমার ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম করে ওরা। আমি তখন পাতা নেড়ে নেড়ে একটু হাওয়া করি, ওদের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যায় ক্লান্তি দূর হয়। ভারী ভালো লাগে আমার।

নদী থেকে জল নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে ভরা কলসীর জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বৌ-ঝিয়েরা হেঁটে যায় আমার তলা দিয়ে, স্নান ক'রে উঠে ভিজে কাপড়ের জলে আমার নীচেকার শুষ্ক মাটি ভিজিয়ে কত সুখদুঃখের কথা বল্‌তে বল্‌তে ওরা যার যার পথে চ'লে যায়। নদীর তীরে মাল বোঝাই কত নৌকা এসে লাগে, সন্ধ্যার পরে সারি সারি নৌকার আলোর ছায়াগুলো তারার মত ফুটে ওঠে নদীর বুকে। মাঝিরা গান গায় কখনো বাউলের সুর কখনো রামপ্রসাদী। কান পেতে আমি শুনি।

আমার প্রশস্ত ছায়ায় সকালে বিকালে ছোট ছেলে-মেয়ের দল খেলা করে। জয়-পরাজয়, বাদ-বিসম্বাদ, আড়ি-ভাব এই সব নিয়ে শিশুকণ্ঠের সে কী কোলাহল! এই সময়টার জন্য আমি প্রতীক্ষা ক'রে থাকি। বর্ষা নাম্‌লে যেদিন ওরা খেল্‌তে আসে না, সেদিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে সিক্ত দেহে পাতা কাঁপিয়ে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

সকলেই যখন ছুটাছুটি ক'রে খেলে; আট বছরের মেয়ে টুনু তখন দূরে দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখে। একটী ছোট্ট ভাইকে কোলে নিয়ে আর গোটা দুই ভাই বোনের হাত ধ'রে সে খেলা দেখ্‌তে আসে। ওদের রেখে সে খেলতে পারে না, দাঁড়িয়ে খেলা দেখে, ছোট্ট একটু হাততালি দিয়ে, একটু সমর্থনের হাসি হেসে বিজেতাকে সমর্থন জানায়। সেলাই-করা জীর্ণ রং-চটা সাড়ীখানাকে সোডার জলে কেচে যথাসাধ্য পরিপাটি ক'রে সে পরে; চুল উল্‌টিয়ে আঁটসাঁট ক'রে বেঁধে দেন মা, কপালে একটী কাঁচপোকার টিপ, কানে যথাসাধ্য হাল্‌কা দুটি মাক্‌ড়ি, হাতে দু'গাছি লাল রবারের চুড়ি। ভাই বোন গুলিকেও তেমনি ক'রে জোড়া তালি দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসে সে। কোনোদিন বা খেলুড়েদের আন্তরিক আহ্বানে কোলের ভাইটাকে নামিয়ে দিয়ে সে খেল্‌তে আসে, কিন্তু দিদির কক্ষচ্যুত হ'য়ে রুগ্ন-শীর্ণ ভাইটা তারস্বরে চ্যাঁচায়, বড় দুটো হয়তো মারামারি সুরু করে, খেলা ফেলে তাদের কাছে ছুটে আসে টুনু।

খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোনো দিন হয়তো তার সময়ের জ্ঞান থাকে না, সন্ধ্যে হ'য়ে আসে। রেগে আগুন হ'য়ে ছুটে আসেন মা, ঠাস্ ঠাস্ ক'রে মেয়ের পিঠে চড় বসিয়ে দেন কয়েকটা। বুড়ো মেয়ের যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে,

খেলা পেলে আর কোনো হুঁস্ নেই! ছেলেটার দুধ খাবার সময় গেছে, মেয়েটার সর্দ্দি ছল্‌ছল্ করছে, এই ঠাণ্ডা লেগে কালই হয়তো জ্বর আস্‌বে। এসব কোনো জ্ঞান নেই বুড়ো ধিঙ্গি মেয়ের! সংসারের কোনো কাজে নেই, কেবল খেলা! খেলার শেষ বাজিটা কে জেতে না দেখেই ম্লান-মুখে টুনু মায়ের সঙ্গে বাড়ী চ'লে যায়।

সকালে উঠে ঘুম-ভাঙ্গা-চোখে একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে টুনু মুদীর দোকানে যায়। দু'চার পয়সা ক'রে নিয়ে আসে মুড়ী-মুড়কী-নুন-তেল-চিনি-চা-শুক্‌নো লঙ্কা। ছোট একটা কলসী নিয়ে নদী থেকে জল আনে বার বার ক'রে, কাপড় কেচে আনে বাল্‌তি ভ'রে।

কোনো দিন ওরই বয়সী কোনো মেয়ে বলে, জমীদারের হাতী এসেছে ঐ বাগানে, মট্ মট্ ক'রে কলাগাছ ভেঙ্গে খাচ্ছে, চল্‌না ভাই টুনু, একবার দেখে আসি।

টুনু বলে 'আমি যেতে পার্‌ব না ভাই। ছোট ভাইয়ের জ্বর, মা তাকে ছেড়ে উঠ্‌তে পারেন না, জল নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি আমাকে ভাত চড়াতে হবে। দেরি হ'লে মা বড় ব'ক্‌বেন।' ভাঙ্গা শ্লেটের উপর ছেঁড়া বই রেখে মেয়েরা পাঠশালায় যায়; এক বোঝা বাসন মেজে নিয়ে তখন বাড়ী ফেরে টুনু। ওরা বলে, তুই আজও পাঠশালায় যাবিনে টুনু? আজ যে পরীক্ষা। গত বারের পরীক্ষায় তো তুই প্রথম হ'য়েছিলি, এবার পরীক্ষা দিবিনে'। গুরুমশায় বলেন, এত কামাই ক'রলে তিনি নাম কাটিয়ে দেবেন।

ম্লান মুখে টুনু বলে 'লেখাপড়া করতে আমার বড় ভালো লাগে ভাই, কিন্তু ভাই বোনের একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। মা একা ক'দিক সাম্‌লাবেন? বাবাকে ভাত দিতে হয় সকাল সাতটায়, কাজেই ওদের নিয়ে না থাক্‌লে মা কাজ করতে পারেন না। স্কুলে যাব কেমন করে বল্? হাঁদু আমার বই ছিঁড়ে দিয়েছে, শ্লেট ভেঙ্গে দিয়েছে খাঁদু। বাবা বলেন, এত ভাঙ্গলে ছিঁড়লে তিনি আর কিনে দিতে পারবেন না। গুরুমশাইকে তুই বলিস্ তিনি যেন আমার নামটা না কাটেন। এম্‌নি ক'রে সেই আট বছরের মেয়েটি হয়ে ওঠে ষোলো বছরের। ছেঁড়া সাড়ীর সঙ্গে সে এখন একটা ছেঁড়া সেমিজ পরে, খোঁপাটী হ'য়ে উঠেছে একটা বড় মৌচাকের মত। বর্ষা ধোয়া লতিকার মত শ্যামতনু চিক্কণ হ'য়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে লজ্জার আভাস, গাল দুটো যখন তখন একটু লাল হ'য়ে ওঠে। মাথায় তেল মেখে হাতে গামছা আর কলসী কাঁখে নিয়ে স্নানের পথে মা উদ্বেগ প্রকাশ করেন বান্ধবীদের কাছে—মেয়ে যেন দিন দিন তাল গাছ হ'য়ে উঠ্‌ছে, তার দিকে চাইলে মুখে ভাত রোচে না, কোথায় কতদিনে যে ওকে বিদেয় করতে পারব? তাই ভাবি, মেয়ে যেন শত্তুরেরও না হয়।

একদা যখন আমার সর্ব্বাঙ্গে নতুন সবুজের ঝল্‌মলানি নেমেছে, সেই সময় শুন্‌তে পেলাম টুনুর বিয়ে। গ্রামেরই দক্ষিণ পাড়ার নিত্যানন্দ ঘোষালের ছেলে জীবানন্দের সঙ্গে। গ্রামের মাইনর স্কুল পর্য্যন্ত প'ড়ে গ্রামেই সে একটা মুদীর দোকান খুলে ব'সেছে। আয় মন্দ নয়। একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবার, শ্বশুরের মা পর্য্যন্ত পৌত্রবধূর মুখ দেখ্‌বার জন্য বেঁচে ব'সে আছেন। মেয়ের মা দশজনের কাছে বল্লেন, 'বড্ড্ ভাবনা হ'য়েছিল মেয়ে নিয়ে, এমন ঘরের কোণে জামাই ব'সে আছে, একবারও তো ভাবিনি। আমার বেশী আশা নেই, মোটা ভাত কাপড়ে শাঁখা সিঁদুরে বেঁচে থাক্‌লেই সুখ—'

বিয়ের আগে ভাই বোনকে কোলে নিয়ে টুনু হয় তো কতবার গেছে সে বাড়ীতে, সওদা আন্‌তে গেছে দোকানে, তবু কনে বউ হ'য়ে আজ সে সেখানে চ'লেছে পাল্‌কীতে চড়ে।

যেতে হবে আস্তিকালের বস্তি বুড়ী এই বটতলা দিয়েই। পাল্‌কীর দরজা খোলা ছিল; টুনু আজ সস্তা একখানা ক্রেপ বেনারসী পরেছে। হাতে লাল শাঁখা, আর তামার পাতে সোনাবাঁধানো তিন গাছা ক'রে চুড়ি; গলায় সরু একগাছা বিছে হার, আর কানে অপেক্ষাকৃত বড় দুটি মাক্‌ড়ি! এরি মধ্যে নাক বিঁধিয়ে একটা নাকছাবিও সে পরেছে! সিঁথিতে আর কপালে সিঁন্দুর, পায়ে আল্‌তা। কেঁদে ওর চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। যত জানাশোনা থাক্ না কেন, শ্বশুরবাড়ী যেতে মেয়েরা কাঁদেই।

দিন চ'লে যায়। আগের মতই টুনু আবার কলসী নিয়ে নদীর ঘাটে আসে। কিন্তু কলসীটা আর আগের মত ছোট নয়। কারণ সিঁথিতে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা পরে, লালপাড় সাড়ীর আঁচলে এক ঝোপা চাবি বেঁধে টুনু এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'য়েছে, তাই তার কলসীটাও বেশ বড় হ'য়েছে।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে ওর সমবয়সী বউরা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, তোর বরের কথা একটু বল্‌না ভাই টুনু!' ঘোমটার ভিতরে টুনু ফিক্ ক'রে একটু হাসে'—গালটা তার গোলাপী হ'য়ে ওঠে, ভোমরার মত কালো দুটো চোখে লজ্জার বিদ্যুৎ খেলে যায়। নতুন জীবনের যে আনন্দ তার বুক ভ'রে উপ্‌চে পড়্‌ছে, এরা বোধ হয় তেমন আনন্দের আস্বাদ কোনো দিন পায় নি। সমুদ্র মন্থনে যেমন সুধা উঠে এসেছিল, এদের সঙ্গে বলাবলি ক'রলে তার সুখের-সায়রেও হয়তো মধুরতম সুধা উঠে আস্‌বে। কিন্তু সে রসনা সংযত করে ভীতভাবে বলে' 'না ভাই, সঙ্গে পিস্-শাশুড়ী রয়েছেন, কারো সঙ্গে কথা কইতে দেখলে বড় রাগ ক'রবেন।

তারপর একটি একটি ক'রে তার কোল ভ'রে উঠ্‌তে থাকে। একান্নবর্ত্তী পরিবার, জন্ম-মৃত্যু-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন-পৈতে একটা না একটা লেগেই আছে, আয় কম, ব্যয় বেশী, সারাদিন খাটুনি। চোখের দৃষ্টিতে তার নিত্য ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে। গ্রামে থিয়েটার পার্টি এসেছে সঙ্গিনীরা জানায়, অনুরোধ করে সঙ্গে যেতে—কিন্তু দেখতে যাবার তার সময় কই, তা ছাড়া এ সব সুখ-বিলাসের জন্য টাকা চাইলে স্বামী বড় রাগ করেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সংসার চালাতে পারেন না। সংসার তো ছোট নয়।

কেটে যায় বছরের পর বছর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টুনুর কালো চুলের গোছা ধূসর হ'য়ে আসে, শ্লথ হ'য়ে আসে কর্ম্মের গতি, সুঠাম দেহে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়ে। অনেক বেলায় যখন মাথায় তেল মেখে কাঁখে কলসী আর হাতে একটু সাজি মাটি নিয়ে সে নদীর ঘাটে নাইতে আসে, তখন মনে হয় সে বড় ক্লান্ত। সাজিমাটি টুকু হাতে পায়ে বুলিয়ে হেঁসেলের তেল কালি তুলে ফেলে ঘড়াটা জলে ভাসিয়ে সে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে ডুব দিয়ে ওঠে। সমবয়সী আরো দু'চার জন গৃহিণীও তখন নাইতে আসে, তারা ডেকে দুটো কথা বলতে দু'চারটি মুখরোচক কথা শুনতে চায়। কিন্তু স্বামীর দোকান থেকে আসবার সময় হ'য়েছে, এসে বাড়া ভাত না পেলে তিনি বড় রাগ করেন। তা ছাড়া বড় বৌমার আঁতুড় প'ড়েছে, জামাই ষষ্ঠীতে এসেছে বড় জামাই। গাদা করা গোবর প'ড়ে আছে গোয়ালে ঘুঁটে দিতে হবে, বর্ষা প'ড়্‌ল ব'লে। বাড়ীতে কত কাজ, গল্প করবার সময় কোথায়? কারো একটু ত্রুটি হ'লে কি আর রক্ষা আছে নাকি?

সেবার গাঁয়ে কলেরার মহামারী লাগল। মধুর হরিনাম ভয়াবহ হ'য়ে কানে আসতে থাকে রাতদিন। সেদিন গভীর রাত্রিতে হরিধ্বনি দিয়ে এই বুড়ো বট্‌তলা দিয়েই কার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল ঠিক্ ঠাহর কর্‌তে পারলাম না। ঠাহর হ'ল পরদিন।

হাতের শাঁখা ভেঙ্গে সিঁথির সিঁদুর মুছে থান প'রে বিধবা হ'য়েছে টুনু।

এখন আর তাকে টুনু বল্‌লে মানায় না, সে এখন নোটনের মা, বোটনের ঠাকুমা, খোটনের দিদিমা। টুনু যখন টুনু ছিল, তখনও দিন কেটেছে, ঠাকুমা দিদিমা হয়েও দিন কাটে। পাড়ার কোনো বর্ষীয়সী রমণী বলে 'চলনা নোটনের মা ক'লকাতায় গিয়ে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে কালীদর্শন ক'রে আসি—খুব বড় যোগ পড়েছে—'

বিরাট সংসারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নোটনের মা, 'রোগ, ভোগ অভাব অনটন—তার উপর এসব ব'ল্‌লে ছেলেরা রাগ ক'র্‌বে।'

ভিন্ পাড়ায় রামায়ণ পাঠ হ'চ্ছে, কেউ হয়তো যাবার জন্য তাকে প্রলোভন দেখায়—কিন্তু কোনোদিন যা' হয়নি, আজও তা' হয়না।

নদীর ঘাটে কেউ প্রশ্ন করে—'নাৎজামাই কেমন হ'ল নোটনের মা?'

নোটনের মার পিঠ বেঁকে দাঁত পড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। ঝুঁকে প'ড়ে বলে 'কে? হরির মা বুঝি? তা' যেয়ো বাছা একদিন, সব ব'ল্‌ব। মেয়ের বিয়ের জন্য বৌমা মানৎ ক'রেছিলেন, আজ নারাণ পূজো হবে। জল নিয়ে যেতে দেরি হ'লে বৌমা রাগ ক'র্‌বেন। এখন তো কথা ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

পূর্ণ কলসীটা অনেক কষ্টে কাঁখে তুলে নেয় সে।

শুধু একজন নয়, আমার বুকের মধ্যে এম্‌নি কত শত টুনুর অখ্যাত ইতিহাস অশ্রুজলের অক্ষরে লেখা আছে, সে খবর তো কেউ রাখে না।

হাসি
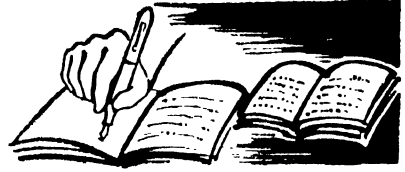
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রুশ গল্প : লেখক : লিয়োনিদ আন্দ্রীভ্)

১

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা···সে আসবেই···আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই! আমি তার প্রতীক্ষা করছি অধীর প্রতীক্ষা! গায়ে ওভারকোট···গলার দিকে শুধু একটা বোতাম আঁটা—বাতাসে লটপট করছে! আমার এতটুকু শীত করছে না! ঘরে অনেক লোক··তারা যেন মানুষ নয়! আমি বসে বসে তার ধ্যান করছি!·চারদিনের পরিচয়··চারদিনেই তাকে কি-ভালোই বেসেছি! মনে হয়···আমার বয়স তরুণ···কিন্তু আমার হৃদয়···এই বয়সেই কি-সম্পদ-ঐশ্বর্য্যে ভরে উঠেছে।·অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত নই! তবু এ। আর বসে থাকতে পারলুম না··· পায়চারি সুরু করলুম।

পৌনে সাতটা। শীত করছে···ওভারকোটের আরো ছুটো বোতাম আঁটলুম! ঘরে মেয়ে-পুরুষ বিস্তর··মেয়েদের উপর চোখ বুলোচ্ছি··কাকেও মনে হলো না, সুশ্রী·দেখবার মতো! ভয়ানক প্যাচপেচি·ওদেরো স্তাবক রয়েছে সঙ্গে। আশ্চর্য্য হলুম! হায় রে মানুষের রুচি!···

সাতটা বাজতে পাচ মিনিট···মন কাণায়-কাণায় ভরে রয়েছে। সাতটা বাজতে ছুমিনিট বাকি···বুকের মধ্যে যেন বরফ জমছে! ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো··· একটা নিশ্বাস চাপতে পারলুম না! বুঝলুম, না, সে আর এলো না!

সাড়ে আটটা···আমি যেন আর আমাতে নেই!··হতাশার ভারে পৃথিবী মনে হচ্ছে শূন্য···বেবাক শূন্য! ওভারকোটের সব-কটা বোতাম এঁটেছি···কলারটা তুলে গলা ঢেকেছি। বেশ ঠাণ্ডা···দাঁতে দাঁত লাগছে! পথের দিকে অগ্রসর হলুম। যেভাবে যাচ্ছিলুম···দেখলে লোকে ভাববে, অনাথ-আশ্রমে থাকি···সর্বহারা, হতভাগা···যেন সেই অনাথ-আশ্রমে আবার ফিরে চলেছি!

এ অবস্থা শুধু তার জন্য! পিশাচিনী···রাক্ষসী! না, না, এ-কথা মনে করা আমার অন্যায়! হয়তো বেচারী আসতে পারছে না! বাড়ীতে শাসন···নিষেধ আছে! হয়তো অসুখ করেছে! মনে হলো, মারা গেল না তো? পথে কোনো এ্যাক্সিডেন্ট!··যে দিন-কাল···বিচিত্র নয়!

২

এক সহপাঠী বলেছিল—এঞ্জেলাও ওখানে আসছে আজ রাত্রে!·কথাটা সে তামাসা করে বা নিব করে বলেনি, নিশ্চয়! এঞ্জেলার জন্য আমার মন এমন· তাকে আমি···এ-কথা সহপাঠী জানে না তো। তার ও-কথায় আমি শুধু বলেছিলুম—ও···তাই নাকি? অর্থাৎ পোলোজভদের বাড়ীতে ঈভনিং-পার্টি··ওদের বাড়ী আমি কখনো যাইনি। সহপাঠীর ও-কথা শুনে আমি পণ করলুম—যেমন করে হোক, পোলোজভদের ও-পার্টিতে আমাকে যেতে হবে। কিন্তু কি করে যাই?··

বিকেলে বন্ধু-বান্ধবদের বললুম—আজ খৃষ্ট-মাস ঈভ··· আমোদের রাত···চলো, আজ আমরা যে-যে-বাড়ীতে পার্টির ব্যবস্থা আছে, সে সব বাড়ীতে যাই।

—কিন্তু কি বলে ঢুকবো সে-সব পার্টিতে?

—কেন? সাজসজ্জা করে সোজা ঢুকে পড়া!··· কাছাকাছি কোন্ বাড়ীতে পার্টি?

কে বলে উঠলো পোলোজভদের ওখানে।

—তাহলে সেই বাড়ী থেকে সুরু করা যাক—পালা··· আমাদের এ্যাডভেঞ্চার!

সকলের কি জয়োল্লাস! চমৎকার আইডিয়া আমার··· খাশা! বেশ, তাই হোক! যার কাছে নগদ টাকাকড়ি যা ছিল, তখনি টেবিলে ঢেলে জড়ো করা হলো। টাকার অঙ্ক মোটা—সে টাকা নিয়ে সকলে ছুটলুম পোষাকের দোকানে। সেখান থেকে রকমারি পোষাক কতক কিনে, কতক ভাড়া করে সকলে বিনোদবেশে সেজে ছটার আগেই হল্লা করে বেরিয়ে পড়লুম।

আমি একটা কালো রঙের পোষাক নিলুম। আমার চুল-দাড়ি এগুলো বানিয়ে ফেললুম স্পেনের ওমরাও ক্লাশের ছাঁদে! পোষাকটা ছিল বেতর-লম্বা···তার মধ্যে আমি যেন ঢুকে গেলুম—বালিশের বড় ওয়াড়ের মধ্যে যেমন বালিশ ঢোকানো হয়, তেমনি! দোকানদার বললে—ক্লাউনের ঝুমঝুমি দেবো একটা? শিউরে উঠলুম ক্লাউন!

দোকানী বললে—কিম্বা ডাকাতের সর্দ্দারের সাজ? তেমনি টুপি, আর একখানা ছোরা?

ছোরা! আমার মনের ভাব তখন যেরকম···মনে হলো, ছোরা মানাবে ভালো। দোকানী দেখালো ডাকাতের পোষাক কিন্তু বহুকালের পুরোনো পোষাক···রদ্দি হয়ে এসেছে! পছন্দ হলো না। আরো কটা পোষাক দেখালো—কোনোটা পছন্দ হয় না! বন্ধুরা দিচ্ছে তাড়া—আরে, একটা বেছে নাও! ওটা নয়—ওটা নয়, এই করেই তো বেলা ফুরিয়ে ফেললে! নাও·নাও···চটপট। শেষে এক বুড়া চীনার পোষাক হলো পছন্দ···দোকানীকে বললুম—এই চীনা পোষাকটা দাও।

চীনা পোষাক পরলুম—সেই সঙ্গে মুখে মুখোশ!··· একটা কিম্ভুত-গোছ মুখোশ মিললো! মুখোশের সে মুখ···তেমন অদ্ভুত মুখ কখনো দেখিনি! বীভৎস হলেও ওরিজিনাল!

দোকান থেকে বেরুবার সময় সকলে পণ গ্রহণ করলুম—যাই ঘটুক, মুখের মুখোশ আমরা কখনো খুলবো না··· কিছুতে না।

সত্য পণ করে সকলে বেরুলুম।

আমার সে-মুখোশ···ওঃ, পথে চলা দায় হলো! পথে বেশ ভিড়···ভিড়ের মানুষ-জন আমাকে দেখে শুধু হাসে না—গায়ে পড়ে ধাক্কা দেয়—চিমটি কাটে! অসহ্য!··· এমনি ভাবে চলেছি। পথের লোকজনের যেন কোনো কাজ নেই! আমাকে পেয়ে তারা কৃশমাসের সব-কিছু ভুলে গেছে, কিছুতে আমার সঙ্গ ছাড়ে না! যত এগুই, তারা পুরু হয়ে এসে জোটে···এবং আমার উপরেই তাদের ঝোঁক।···

অবশেষে পোলোজভদের বাড়ী···সেখানে ঢুকতেই দেখি, সে···আমার বাঞ্ছিতা এঞ্জেলা! তখন মনের মধ্যে যা হতে লাগলো—নিজের উপর রাগ, দুঃখ, অভিমান···

কোনোমতে এঞ্জেলার পাশে এসে চুপি-চুপি তাকে বললুম—আমি···আমি।

তার চোখের কালো তারা দুটি ধীরে ধীরে ফিরলো আমার দিকে! সে দৃষ্টিতে রাজ্যের বিস্ময়! তার পর সে হো-হো করে হেসে উঠলো—আমি··· এ আমি। হা-হা-হা-হা!

অট্টহাসি! এঞ্জেলা বললে—সন্ধ্যার সময় আসোনি কেন?

বলেই হাসি—হা-হা হো হো হাসি! সে হাসি আর থামে না!

আমি বললুম—আমি···আমি বড় ক্লান্ত···যদি · যদি··· তুমি···

আমার কথা তার কাণেও গেল না। সে হাসছে হাসছে···হাসছে—হেসে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়বে যেন!

আমি বললুম—তোমার হলো কি? এত হাসছো!

—তুমি! সত্যি···এ তুমি? কোনোমতে হাসি থামিয়ে এঞ্জেলা বললে—এ কি কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছে তোমাকে! সঙকেও টেক্কা দেছ।

এ-কথায় আমি যেন ভেঙ্গে-তুমড়ে পড়লুম! দুঃখ হলো···রাগ হলো। আমি বললুম—এমন করে হাসতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? মুখোশ দেখে হাসছো—পোষাক দেখে হাসছো! কিন্তু এ মুখোশের নীচে যে-মুখ, পোষাকের নীচে যে হৃদয়, তোমার জন্য কতখানি আকুল! তোমাকে দেখবো বলে শুধু এ-পোষাকে এখানে এসেছি··· বিনা-নিমন্ত্রণে ভদ্র সাজে কি করে আসি?···তাই···তাই··· শুধু তোমার জন্য!···কদিনের কথায় যে-আশা তুমি আমার মনে জাগিয়ে তুলেছো···এমন নিষ্ঠুরের মতো···

এঞ্জেলা শুনলো আমার কথা, বললে—বড় আয়নার

সামনে এসে একবার ছাখো কি চেহারা করে এসেছো! কি ভয়ানক মুখোশ মুখে এঁটেছো!···

হলঘরের একদিকে প্রকাণ্ড দেয়াল-আয়না। সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সাজপোশাকে নিজের চেহারা যা হয়েছে! দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারলুম না! অট্টহাস্যে ফেটে পড়লুম একেবারে! এঞ্জেলাও হাসছিল। আমার রাগ হলো। বেশ পরুষ কণ্ঠে বলে উঠলুম—হাসছো যে।

এ কথায় তার ঠোঁটের হাসি গেল উবে! এঞ্জেলা নীরব। তার হুচোখে মেঘের মলিন ছায়া যেন!···আমি তখন সময় পেয়ে মৃদুকণ্ঠে উৎসারিত করে দিলুম আমার মনের গভীর আবেগ···আমার প্রাণের ভালোবাসা। নির্লজ্জের মতো বললুম—আশায় আশায় বাঁচা আমার পক্ষে অসম্ভব! আমি এক-মিনিট তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না···এঞ্জেলা-বিহনে আমার পৃথিবী শূন্য অন্ধকারের কুপ যেন!

এঞ্জেলা নিঃশব্দে আমার সব কথা শুনলে। আমি লক্ষ্য করলুম এঞ্জেলার চোখের দৃষ্টিতে আলো আর ছায়া—ছায়া আর আলোর চকিত উদয়াস্ত-লীলা।···ফুলের মতো মুখ! তারার মতো দৃষ্টি চোখে! তার অপলক দৃষ্টি আমার উপর-নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে আমার মনের মধ্যে জোয়ারের স্রোত! সে স্রোতে বুকের মধ্যে যত কথা ছিল, যত আশা···যত বাসনা···উল্লাসে উচ্ছল হয়ে উৎসারিত হচ্ছে!···

আমি চুপ করলুম। এঞ্জেলা তখনো আমার পানে চেয়ে আছে। আবেগ-ভরে তার একখানা হাত আমি ধরলুম চেপে—গদ্গদকণ্ঠে ডাকলুম—এঞ্জেলা—

ধীরে ধীরে হাতখানা টেনে নিয়ে এঞ্জেলা বললে—না। না। একি পাগলামি আপনার। না,না—এ হতে পারে না!

তার পর এঞ্জেলা ধীরে ধীরে চলে গেল। আমি পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে···নিস্পন্দ···নিথর। দেখলুম—যায়—চলে যায়···ঐ এঞ্জেলা!

জন্মের মতোই গেল? বুকখানা হা-হা করে উঠলো। মনে হলো, কিশোরীর হৃদয় জয় করার জন্য এ-কি উদ্ভট উপায় তোর···

এঞ্জেলাকে দেখলুম—পাঁচজনের সঙ্গে তার কত হাসি গল্প···এক দিব্য-সাজপোষাকপরা তরুণকে উদ্যত বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করে তার নৃত্য-রঙ্গ

আমি পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে··· দেখছি···দেখছি···দেখছি!

অনেক রাত্রে সদলে হোষ্টেলে ফিরছি···একজন বন্ধু বলে উঠলো আমাকে উদ্দেশ করে—তোমারই আজ জিত্ হে! যে উদ্ভুট্টে পোষাক পরে উদয় হয়েছিলে পার্টিতে··সকলে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। সকলের মুখে একটি কথা—ফ্যান্সি-ড্রেশের প্রাইজ তোমাকে দেবে, ঠিক হয়েছে!

মুখোশখানা রাগে আমি টেনে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করছি··বন্ধু বললে—আরে···ওটা ছিঁড়চো কেন? পাগল হয়েছো! আরে ছাখো···ছাখো···এর চোখে জল! আশ্চর্য্য!

আয়োজন

সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত

কাননে ফুল তোমার মালা গাঁথে
বীজন করে মলয় সমীরণ
তোমার আগমনের কামনাতে
মাটির বুকে সবুজ আলিম্পন।
নদীর ধারা তোমার গান গায়
সে গান বাজে কত না ঝরণায়,
সাগরে তার ঐক্যতানের সাথে
না জানি কেন ভরে নিখিলমন।

মৌন আকাশ তোমার ধ্যানে হারা
ঐ'ত দেখি নীল অসীমের মাঝে
দিবসরাতি আলোছায়ার ধারা
সংগীতে তার নূপুর তব বাজে।
তোমার পূজা শ্যামল বনতলে
আরতি তব রাতের তারাদলে,
সকল খেলায় সকল লীলায়
তোমার-ভরে চলিছে আয়োজন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেকেণ্ডারী বোর্ড—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে—নূতন আইনে অনন্যকর্ম্মা ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং নূতন সিণ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পরেই হইয়া গিয়াছে। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি পরীক্ষায় কণ্ট্রোলারের বিভাগের যে অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা একান্ত পরিতাপের বিষয় :—

(১) মাধ্যমিক পরীক্ষায়—কমার্শাল জিওগ্রাফির পরীক্ষাপত্রে ১০টি প্রশ্ন ছিল ; কিন্তু "যে কোন ৬টির উত্তর লিখিতে হইবে" এই নির্দ্দেশ পরীক্ষাপত্রে মুদ্রিত হয় নাই। অথচ প্রশ্নকারী, মডারেটার, সহকারী কণ্ট্রোলার ও ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই !

(২) ঝাড়গ্রামে কৃষির মাধ্যমিক পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু ৮ই মার্চ্চের পূর্ব্বে পরীক্ষার কার্য্যক্রম জানান হয় নাই। শেষে ভাইস-চ্যান্সেলার পরীক্ষা এক সপ্তাহের জন্য পিছাইয়া দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন।

(৩) অন্যান্য বারের মত এবারও নাকি একাধিক প্রশ্ন পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছিল।

এই সকল ত্রুটিতে পরীক্ষার্থীদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল ত্রুটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, তাহা কি অপরাধী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে আদায় করা যায় না ? এই সকল ত্রুটির জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যদি কোনরূপ দণ্ডমূলক ব্যবস্থা করা না হয়, তবে কি ভবিষ্যতে এইরূপ ব্যাপার সংঘটন নিবারণের কোন উপায় হইতে পারিবে ? নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগকে এ বিষয়ে কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—ইহাই আমাদিগের অভিমত। হয়ত কোন কোন লোককে বিদায় দেওয়া ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আজ আমরা কেবল কণ্ট্রোলারের বিভাগের ত্রুটির তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম। অন্যান্য বিভাগেও ত্রুটির অভাব নাই। প্রয়োজনাতিরিক্তসংখ্যক কর্ম্মচারীর নিয়োগেই কি দায়িত্বজ্ঞানের অভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারলাঘবের ও শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ও ব্যয়বহুল বোর্ড রচনা করিয়া সে পরীক্ষার ভার সেই বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বস্তি[র নি]শ্বাস ফেলিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত লোককে রে[ভিনিউ] বিভাগ হইতে আনিয়া তাহার কার্য্যভার প্রদান করা হইয়াছে। সে বোর্ডের পরীক্ষাপত্রে নির্দ্দেশদান করা হইয়াছে—"তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে"—অথচ প্রশ্নপত্রে দুইটির অধিক প্রশ্ন নাই ! দুইটি প্রশ্নের মধ্যে তিনটির উত্তর প্রদান যে ইন্দ্রজালেও সম্ভব হইতে পারে না, তা[হা] বোর্ডের মোটা মাহিয়ানার চাকরীয়াদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। পরদিন সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয়, ঐ বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগের সম্ব[ন্ধে] বোর্ড সুবিবেচনা করিবেন ! কিন্তু যাঁহাদিগের বিবেচনার অভাবে ঐরূ[প] ভুল হওয়ায় পরীক্ষার্থীদিগের ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কি স্ব স্ব প[দে] প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পরিতৃপ্ত করা হইবে ? না—তাঁহাদিগের বেতন বৃ[দ্ধি] করিয়া পুরস্কার প্রদান করা হইবে ? পরীক্ষার প্রশ্ন সুশোভন হইয়া[ছে] কি না—নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষার্থীদিগ[কে] "বরযাত্রী ঠকানর" ব্যবস্থা হইয়াছে কি না—সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধা[ন] প্রয়োজন। পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক পরীক্ষার্থীর ভাগ্য লইয়া ছিনিমি[নি] খেলা যাহারা করিতে পারে তাহাদিগের বহিষ্কারই প্রয়োজন কি না, তা[হা] যদি বিবেচনা করা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বোর্ড (বিশ্ববিদ্যালয়ের মত) ভুলেরই আদর ও অপরাধীর অপরাধ সমর্থন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানা আছে। কিছুদিন হই[তে] শুনা যায়, প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন পূর্ব্বে জানিতে পারা যায়। অথচ কেন এম[ন] হয়—সেজন্য কে বা কাহারা দায়ী সে বিষয়ে আবশ্যক অনুসন্ধান হয় নাই।

এই সঙ্গে আরও কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আমরা প্রয়োজন মনে করি :—

(১) কমলা লেকচার প্রভৃতি লেকচারের জন্য লেকচারার নিয়োগে অযথা বিলম্বে লেকচার প্রতিষ্ঠাতৃগণের সদুদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে।

(২) কোন কোন দান ("এনডাউমেণ্ট") কি ভাবে ব্যবহৃত হই[বে] তাহার নিয়ম আজও রচিত হয় নাই। তাহাতেও অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে।

(৩) "খয়রা অধ্যাপকের" (কৃষির) কাজ কি হইতেছে ? ঐ প[দে] প্রথম নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং নানা কার[ণে] তিনি ভারত ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ) তিনিই অধ্যাপ[ক] ছিলেন ; অথচ তাঁহার কোন অবদানের উল্লেখ করা যায় না। ১৯৩[১] খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ (মার্চ্চ মাস) পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য ছিল। সে[ই] সময়ের বেতনের টাকা কি সঞ্চিত রহিয়াছে ? ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীপবিত্রকুমার সেন ঐ পদে নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি গবেষ[ণা] করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই—ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার স্থানলাভ [ও] তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। দেখা যাইতেছে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা [...]

করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা অপব্যয় কি না, কে বলিবে?

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হইয়াছে, তাহার প্রতিও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব মনে করিয়া এ বার তাহাতে বিরত রহিলাম।

আসামে ভাষা-সমস্যা—

বিহার সরকার যেমন বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলেও হিন্দী প্রচলন জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—ভারত সরকারের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান সমিতি গঠনের পরে আসাম সরকার তেমনই আসামে আসামী ভাষা প্রদেশের ভাষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আসামে বহু ভাষা প্রচলিত। সমগ্র আসাম রাজ্যে আসামী ভাষাভাষীদিগের সংখ্যা বাঙ্গালা ভাষাভাষীদিগের সংখ্যাপেক্ষা অধিক নহে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্য যে সকল ভাষা ব্যবহার করে, সে সকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আসাম সরকার কাছাড় জিলা সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাভাষী বলিয়া স্বীকৃতির পরে, তথায় কাঁচা পাট্টা, জমাবন্দী প্রভৃতির "ফরমে" আসামী ভাষা ব্যবহার করায় লোকের নানারূপ অসুবিধা সৃষ্টি করা হইতেছে। আসামী ভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ সময়ে রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়াকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহার পরে আসামী ভাষার উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা যখন প্রদেশের একমাত্র বা প্রধান ভাষা নহে, তখন তাহাই অন্য ভাষাভাষীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যে ভারতীয় সংবিধানের নির্দ্ধারণবিরোধী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে অবস্থায় আসাম সরকার যে সহসা আসামীকেই তথায় রাজ্যের ভাষা করিবার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শিলচর উকীল সমিতি আসাম সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কি ভারত সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইবেন?

শিক্ষক-বিক্ষোভের পরে বিদ্যার্থি-বিক্ষোভ—

শিক্ষক-বিক্ষোভ যেভাবে নিবারিত বা নিঃশেষ হইয়াছে, তাহা কোন পক্ষেরই গৌরব বৃদ্ধি করে নাই। সরকার শিক্ষকদিগের অভাবহেতু, ধর্ম্মঘটে অবিচলিত থাকিতে অক্ষমতার সুযোগ লইয়াছেন এবং দর-কশাকশিতে যে "বাজারে" মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সরকারের পক্ষে গৌরব-জনক নহে। আবার এই ব্যাপারেও শিক্ষা-সচিব যে প্রধান-সচিবের পশ্চাতে অদৃশ্য ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিক্ষক-বিক্ষোভের পরে যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে, তাহা কেবল দুঃখের বিষয়ই নহে—আশঙ্কার বিষয়ও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় পরীক্ষাপত্রে ত্রুটিতে ও প্রশ্ন কঠিন হইয়াছে বা পাঠ্যাতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাগার ত্যাগ করিয়া যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয়। আর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম দিনের প্রশ্নে ত্রুটির সুযোগ লইয়া কলিকাতায় কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ও তাহাদিগের সঙ্গীরা দ্বিতীয় দিন কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া—বিশেষ যে সকল কেন্দ্রে পরীক্ষার্থিনীরা পরীক্ষা দিতেছিল, সেই সকলের কোন কোনটিতে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়া, যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ছাত্রদিগের সঙ্গে কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত মিশিয়া তাহা করিয়াছে। সেই জন্য ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রতিবাদ করিবার অধিকারের অপব্যবহার—অন্যান্য অপব্যবহারেরই মত, নিন্দনীয়। ছাত্রগণই দেশের ভবিষ্যৎ আশা। তাহারা যদি তাহাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় বা উপেক্ষা করে, তবে ফলে দেশে জাতির উন্নতির পথ বিঘ্ন-কঙ্কর-কণ্টকিত হইবার সম্ভাবনা। ছাত্রদিগের সঙ্গত অভিযোগের কারণ দূর করা প্রয়োজন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কারণে অকারণে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া কথনই সমর্থনযোগ্য নহে।

হস্ত-চালিত তাঁত রক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "হাতের তাঁত সপ্তাহ" উদ্যাপন ও হাতের তাঁতের কাপড়ের প্রদর্শনী করিয়া পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা "গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল"—সেচনের মতই মনে হইবে। কারণ, সরকার কাপড়ের কলের সহিত, হাতের তাঁতের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেশের এই বিরাট কুটীর শিল্পকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গে হাতের তাঁতে কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহা বার্ণিয়ার লিখিয়াছিলেন। বার্ণিয়ার সাহজাহানের রাজত্বকালের শেষে এ দেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় যত কাপড় উৎপন্ন হয়, তত পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় না; বহু বিদেশী বণিক ঐ কাপড়ের ব্যবসার জন্যই বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। ইংরেজ স্বদেশে আইন করিয়া ভারতীয় কাপড়ের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া তবে স্বদেশে তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলশন মন্তব্য করিয়াছেন—আইনের সাহায্যে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ না করিলে ইংলণ্ডে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা ভারতের হাতের তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না।

এ দেশে রাজা হইয়া ইংরেজ কি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা ফরবেশ ওয়াটশন প্রণীত—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত—পুস্তকে পাই। তখন ভারতে হাতের তাঁতে প্রস্তুত ৭ শত প্রকার বস্ত্রের নমুনা ১৮খানি নমুনা-সংগ্রহে রক্ষা করিয়া তাহা ইংলণ্ডের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের অনুকরণ জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। ভূমিকায় যাহা লিখিত তাহাতেই ইংরেজের উদ্দেশ্য সপ্রকাশ :—

"Specimens of all the important Textile Manu-

factures of India……have been collected in eighteen large volumes of which twenty sets have been prepared…The eighteen volumes, forming one set, contain 700 specimens……"

বলা হয়, ভারতের অধিবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। তাহারা অধিক কাপড় ব্যবহার করে না বটে, কিন্তু তবুও যাহা ব্যবহার করে তাহা সরবরাহ করাও যে কোন বস্ত্রোৎপাদক জাতির পক্ষে কষ্টসাধ্য। ইহা স্মরণ রাখিয়া ইংলণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে ভারতবাসীর ব্যবহারোপযোগী নানারূপ কাপড় উৎপন্ন করিতে প্ররোচিত করা হয়। কোন্ জাতীর বস্ত্র কিরূপ কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা ঐ পুস্তকে চিত্রের সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কিরূপ চেষ্টায় ইংরেজ ভারতের এই শিল্পের বিনাশসাধনের উপায় করিয়াছিল, তাহা না বুঝিলে কিরূপে ইহাকে মরণাহত অবস্থা হইতে রক্ষা করা যায় তাহা বুঝা যাইবে না। অথচ হাতের তাঁতে আজও এ দেশে কৃষিকার্য্যের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে।

কেবল বক্তৃতার দ্বারা ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। জর্জ্জ বার্ডউড বহুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত ভারতীয় নরনারীকে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন কখন এ দেশের তাঁতের কাপড় ত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের কাপড় ব্যবহার না করেন। তখনও এ দেশে কাপড়ের কল অধিক হয় নাই। তাহার পরে—এ দেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পী হ্যাভেল হাতের তাঁত-শিল্প রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সরকারের অবলম্বিত নীতির ফলে সে উপদেশ ও সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তাঁত শিল্প ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় যদি আন্তরিকতার লেশমাত্র থাকে, তবে তাঁহাদিগকে নীতি-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। চীন নিয়ম করিয়াছে—যেরূপ সূতা হাতের তাঁতে ব্যবহৃত হইবে, সেইরূপ সূতা কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না—হাতের তাঁতের সহিত কাপড়ের কলের অসম প্রতিযোগিতা হইতে পারিবে না। সরকার পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন কি? ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র সম্বন্ধে নিত্যনূতন নীতি প্রবর্ত্তনের কম ফল হইয়াছে। বিশেষ সূতা সরবরাহ অসঙ্গতরূপে নিয়ন্ত্রণ করায় তন্তুবায়গণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। এখনও অব্যবস্থার অবসান হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থান হইতে বহু তন্তুবায় পরিবার দেশবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। সরকারের সুব্যবস্থা থাকিলে তাঁহারা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার ও শিল্পকৌশলের সদ্ব্যবহার করিয়া হাতের তাঁত শিল্পকে নূতন রূপ দিতে পারিতেন। তাঁহারা সরকারের—আন্তরিক চেষ্টার অভাবে—তাহা করিতে পারেন নাই। এখন সরকার যাহা করিতেছেন, তাহা দোলের সময় আবীর খেলার পিচকারী লইয়া দাবানল নির্ব্বাণের চেষ্টার মতই হাস্যোদ্দীপক।

সরকারী অব্যবস্থায় হাতের তাঁত শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবার পূর্ব্বে দুর্গা পূজার প্রাক্কালে রাজবলহাটের শ্রীজহরলাল ভড় প্রমুখ তন্তুবায়দিগের উদ্যোগে কলিকাতায় তাঁতের কাপড়ের প্রদর্শনী হইত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শান্তিপুরের তন্তুবায়কুলে জাত সচিব আজিজুল হকও তাহার উৎসাহদাতা ছিলেন।

বর্ত্তমানে যদি সমবায় পদ্ধতিতে আবশ্যক সূতা সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারের কোন কোন অনুগৃহীত ব্যক্তিকে সূতা বণ্টন করিয়া লাভবান হইবার সুযোগ দান না করা হয়—আর বুখারেষ্টে সে দেশের সরকার হাতের তাঁতের কাপড় বিক্রয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে হাতের তাঁত শিল্পে আবার বহু তন্তুবায়ের অর্থার্জ্জন ও হাতের তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা করিয়া বহুলোকের পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হইতে পারে। নহিলে নহে।

চেষ্টা করিলে আবার শান্তিপুর, রাজবলহাট, আটপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁত শিল্প লাভজনক হইতে পারে এবং নূতন নূতন স্থানেও সমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সে কাজ কেবল বক্তৃতায় হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও এককালে সমৃদ্ধ শিল্প ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া—দেশে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি নিবারণের জন্য কয় বৎসরে কি চেষ্টা করিয়াছেন? আজ যদি "হাতের তাঁত সপ্তাহ" করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে তাহারা ঈশপের উপকথার খাদ্যে বঞ্চিত অশ্বেরই মত বলিবে—ডলাই মলাই কম কর—অধিক খাদ্য দাও। আপনার প্রশংসার জন্য প্রচারকার্য্য কম করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি আন্তরিকতা সহকারে এই শিল্পের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভারতে বিদেশী অধিকার—

গল্প আছে, পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহ একদিন ইংরেজ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের মানচিত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে অংশ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত তাহা কি? তাহা ইংরেজের অধিকৃত শুনিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সব লাল হো যায়গা"—অর্থাৎ সমগ্র ভারত ইংরেজের অধিকৃত হইবে। প্রায় তাহাই হইয়াছিল—"রাজোয়াড়া" অর্থাৎ যে অংশকে সামন্ত রাজাদিগের রাজ্য বলা হইত, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজের অধীন ছিল। কিন্তু তখনও ভারতে ইংরেজাতিরিক্ত কয়টি য়ুরোপীয় দেশের সামান্য সামান্য রাজ্য ছিল। ভারতে বাণিজ্যের লোভে পর্ত্তুগিজ, ফরাসী প্রভৃতি ইংরেজেরই মত আসিয়াছিল এবং তাহারা পরস্পরের সহিত শত্রুতা করিতেও ত্রুটি করে নাই। ভারতে ফরাসীদিগের কিছু কিছু "অধিকার" ছিল—যথা বাঙ্গালায় চন্দননগর, মাদ্রাজে পণ্ডিচেরী প্রভৃতি; তেমনই মাদ্রাজে পর্ত্তুগিজদিগের গোয়া—প্রভৃতি। এই সকল স্থানে—ইংরেজের আমলেও—বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে নানা অসুবিধা ঘটিত। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির জন্য ইংরেজ সরকার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। আজ স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশে বিদেশীর এইরূপ

ব্যয়ের বহর-এইরূপ। আবার ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা বলিতেছেন, প্রত্যেক নেতার মাসিক ৯ শত টাকা ও দৈনিক ভাতা ৫০ টাকা ধার্য্য করা হউক। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"এলোমেলো ক'রে দে, মা,"—ইত্যাদি।

মানভূম ও "টুসু"—

মানভূমে "টুসু" সত্যাগ্রহীদিগকে সরকার (বিহার) যেরূপে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। গত ২০শে চৈত্র এক সভায় ভূতপূর্ব্ব সচিব শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সভায় বলা হইয়াছে, বিহার সরকার সত্যাগ্রহীদিগের সম্বন্ধে—আইনের নামে—যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যে কোন সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জার কারণ। কিন্তু যে ব্যবহারে লজ্জা লজ্জা পাইয়া আত্মগোপন করে, তাহার সম্বন্ধে কি বলা যায়?

বৈদেশিকী

পূর্ব্ব পাকিস্তান—

পূর্ব্ব পাকিস্তানে নির্ব্বাচনে যাহা হইয়াছে, তাহাতে শরৎচন্দ্র বসুর শেষ মন্তব্য মনে পড়ে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টা ৪০ মিনিটের সময় তিনি শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে তিনি ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের উদ্দেশে আবেদন জানাইয়া বলিয়াছিলেন:—

পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে সমৃদ্ধ হউক—কিন্তু উভয় বঙ্গের অধিবাসীদিগের মঙ্গলের জন্য—পূর্ব্ববঙ্গ ভারত যুনিয়নের মধ্যে থাকুক—সেই রাষ্ট্রে উন্নতি লাভ করুক, কারণ পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী অভিন্ন—তাহারা "are integral to each other—each other's bone of bone and flesh of flesh."

তিনি দেশ বিভাগের পরিবর্ত্তন না করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন?

পূর্ব্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানের প্রধান অংশ। কিন্তু যে সকল মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—তাহারা প্রায় সকলেই অবাঙ্গালী। সেই জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব্ব-পাকিস্তান তাহার প্রাপ্য পায় নাই—পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীরা পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তির স্বৈরাচার ভোগ করিয়া আসিয়াছে—আর্থিক ও রাজনীতিক দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। তাহার অনিবার্য্য ফল ফলিতেছে। ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তিরা যেমন দেশ বিভাগের জন্য ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তেমনই দেশবিভাগের পরেও বিদেশীর দলাদলিতে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় লিয়াকৎ আলীর হত্যা। সে হত্যার রহস্যভেদ আজও হয় নাই। লিয়াকৎ আলী যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার হত্যার পরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধান পদ প্রদান করা হয়। কিন্তু ঈশপের উপকথার ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, নাজিমুদ্দীনের সেই দুর্দ্দশা ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার পরে ক্ষমতা পাইয়াছেন—পূর্ব্ব পাকিস্তানের মহম্মদ আলী—বাঙ্গালী। নাজীমুদ্দীন যেমন ইংরেজের পক্ষপাতী, মহম্মদ আলী তেমনই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী। মহম্মদ আলী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি করিয়াছেন।

যাঁহারা পাকিস্তানের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহজেই মনে হয়—নাজিমুদ্দীন ও মহম্মদ আলী কেহই নায়কত্বের দাবী করিতে পারেন না—প্রকৃত ক্ষমতা সামরিক নেতৃকেন্দ্রে।

পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার প্রথম প্রমাণ—ভাষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রকট হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান স্থানে ও জনে বড় হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিয়া—অধিবাসীদিগকে মাতৃভাষা ত্যাগ করাইয়া উর্দ্দুভাষাভাষী করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ফলে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত তরুণরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ভারত সরকারের নিশ্চেষ্টতায় বিহার সরকার মানভূমে বাঙ্গালার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালায় যাহা হয় নাই—পূর্ব্ববঙ্গে তাহাই হয়—বাঙ্গালী মুসলমানরা জীবন দিয়া মাতৃভাষার বিলোপ-সাধন-চেষ্টা ব্যর্থ করে—আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। ভাষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে জয়ী পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা আপনাদিগের অধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হ'ন। তাহার ফল—নির্ব্বাচনে সপ্রকাশ হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রে কংগ্রেসের যেরূপ প্রভাব, পাকিস্তানে মসলেম লীগের সেইরূপ প্রভাব ছিল—ভারতে যেমন সরকার ও কংগ্রেস অভিন্ন, পাকিস্তানে তেমনই সরকার ও মসলেম লীগ অভিন্ন ছিল। ভারতে যেমন কংগ্রেস লোকপ্রিয়তা হারাইয়াছে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে তেমনই মসলেম লীগ লোকের সমর্থন হারাইয়াছিল। ভারতের, বিশেষ পশ্চিম বঙ্গের, নির্ব্বাচন-ফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় সকল কেন্দ্রে কংগ্রেসী প্রার্থীরা মোট ভোটের অল্প অংশ পাইলেও অকংগ্রেসীরা নানা দলে বিভক্ত থাকায় তাঁহাদিগের ভোট অধিক হইলেও কংগ্রেসীরা—তাঁহাদিগের বিভাগহেতু—জয়ী হইয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের কর্ম্মীরা, বোধ হয়, পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের জয়ের কারণ লক্ষ্য করিয়া অকংগ্রেসীদিগের পরাজয়ের কারণ বর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন—

একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। ফলে—পূর্ব্ব পাকিস্তানের নির্ব্বাচনে মসলেম লীগ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ব পাকিস্তানে জয়ী হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা—কেন্দ্রী সরকারের পরিবর্ত্তন দাবী করিতেছেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কর্ম্মীরা তরুণ হইলেও যাঁহাকে নেতা করিয়াছেন, তিনি তরুণ নহেন। নেতা ফজলুল হকের বয়স ৮২ বৎসর। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের লোক (বরিশাল জিলায় চাখার গ্রাম) হইলেও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী করিলেও প্রথমে যেমন, শেষেও তেমনই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তিনি একাধিকবার অবিভক্ত বাঙ্গালায় সচিবত্ব করিয়াছিলেন এবং প্রদেশ বিভাগের পরে পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের এডভোকেট-জেনারেল হইয়া ঢাকায় থাকিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্ববঙ্গে বহাল রাখিবেন, উভয় বঙ্গে লোকের যাতায়াতের যে "ভিসা" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তুলিয়া দিবেন এবং উভয় বঙ্গে ব্যবসার সুবিধা করিবেন। আর তাঁহার ও তাঁহার দলের মত এই যে, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ব্যাপার ও অর্থব্যবস্থা ব্যতীত সকল বিষয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তান স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবে—তাহার কার্য্যে পশ্চিম পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কার্য্যকালে এই কার্য্যতালিকা কতদূর সম্পন্ন করা যাইবে, তাহা এখন বলা যায় না। তবে ইহার কতকাংশ কার্য্যকরী হইলেও ভাল।

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার সচিবসঙ্ঘে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু ২ জন সচিব লইবেন। কিন্তু প্রথম দফায়—সচিবসঙ্ঘ গঠনকালে—২ জন হিন্দু সচিবের নাম দিতে পারে নাই। তাহা দিলে ভাল হইত।

পূর্ব্ববঙ্গ লবণ, কয়লা, কাপড় ও লৌহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল এবং পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের পাট প্রয়োজন। উভয় বঙ্গই ইহা অনুভব করিতেছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের নির্ব্বাচনের ফল এইরূপ—

মুসলমান আসন			আসন সংখ্যা
যুক্তফ্রণ্ট (মসলেম লীগ বিরোধী সম্মিলিত দল)		...	২১৫
মসলেম লীগ	...	...	৯
স্বতন্ত্র	...	...	১২
খিলাফৎ-এ-রব্বানী	...	...	১
সংখ্যালঘু আসন—			
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রণ্ট	...	...	১০
পাকিস্তান কংগ্রেস	...	...	২৪
গণতন্ত্র দল	...	...	২
কম্যুনিষ্ট	...	...	৫
তপশীলী সঙ্ঘ	...	...	২৭
খৃষ্টান	...	...	১
বৌদ্ধ	...	...	২
স্বতন্ত্র (বর্ণহিন্দু)	...	...	১
	মোট	...	৩০১

মিষ্টার ফজলুল হক প্রথমে ৪ জন সচিবের নাম দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব বিভাগ এটির ভার লইয়াছেন, আর—

(১) আবু হোসেন সরকার—বিচার, চিকিৎসা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

(২) আসরফউদ্দীন চৌধুরী—অসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ

(৩) আজিজুল হক—শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রমিক ও শিল্প

বিভাগের সচিব হইয়াছেন।

সচিবরা বাঙ্গলা ভাষায় আনুগত্যের শপথ লিখিয়াছেন।

কিন্তু সচিবসঙ্ঘের সদস্যনির্ব্বাচনে সকলের তুষ্টি ঘটে নাই। যে ছাত্রদলের সাহায্য ব্যতীত যুক্তফ্রণ্টের ব্যাপক জয় হইতে পারিত না, সেই দলের মত—সচিব নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষতার পরিবর্ত্তে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে; কারণ, সচিবদিগের মধ্যে একজন মিষ্টার ফজলুল হকের আত্মীয়। তবে তিনি উপযুক্ত কি না, তাহা বলা হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ব পাকিস্তানে নির্ব্বাচনের ফল আগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে ও করিবে। পশ্চিম পাকিস্তানে ও ভারতে মুসলমানদিগের মধ্যে নির্ব্বাচনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, তাহা কেবল ভারতীয়গণই নহেন—অন্যান্য দেশ যে লক্ষ্য করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। পাকিস্তান সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে সামরিক চুক্তি করিয়াছে, যুক্তফ্রণ্ট তাহা সমর্থন করেন না। সে সম্বন্ধে কি হয়, বলা যায় না। কাশ্মীর-সমস্যার জটিলতা বর্দ্ধিতই হইয়াছে। সে বিষয়ে মীমাংসার কোন আন্তরিক চেষ্টা পাকিস্তানের পক্ষ হইতে হইবে কি?

হাইড্রোজেন বোমা—

আমেরিকার সরকার হাইড্রোজেন বোমা সম্বন্ধে পরীক্ষায় বিরত হইতে অসম্মত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী—শ্যামাপ্রসাদ যখন শেখ আবদুল্লার বিধানে কাশ্মীরে বন্দী, তখন ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেকোৎসবে যাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বোমা পরীক্ষায় ইংলণ্ড ও তাঁহার আপত্তি অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিতেছেন, এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে মহাসাগরে যে বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তাব আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে—বায়ু অনুকূল থাকিলে—কিছু তেজস্ক্রিয় ছাই কলিকাতা অঞ্চলের উপর উড়িয়া আসিতে পারে। অবশ্য ভারতে যদি ছাই পড়ে তাহাতে হয়ত আমেরিকার ইষ্টাপত্তি নাই—বিশেষ, ভারত দুর্ব্বল। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারত সরকার কি করিবেন? তাঁহার প্রতিবাদ উপেক্ষিত হইলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন? ভারত সরকার আমেরিকার নিকট হইতে যেরূপ আর্থিক ও বিশেষজ্ঞ সাহায্য গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনচেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কি—এই ব্যাপারে কোনরূপ
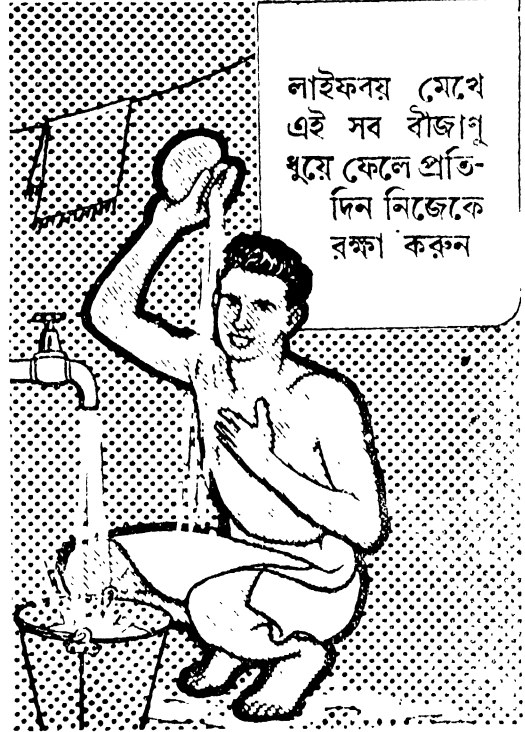
লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
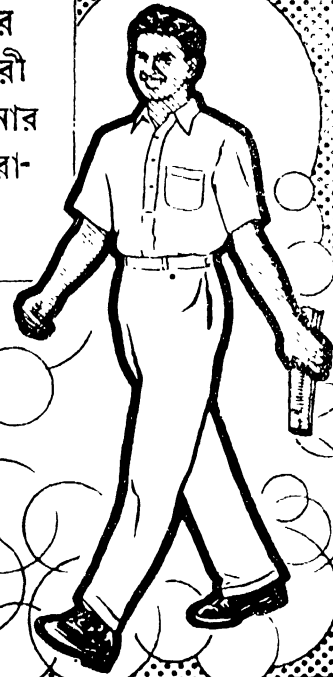
ভারতে প্রস্তুত L. 246-X52 BG

ইতিপূর্ব্বে এই নাটকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল। চিত্র-নাট্যে মূল নাটকের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কাহিনীটি আবেদন-বহুল। বাস্তবতার অভাব। ফলে, জায়গায় জায়গায় অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আবেদন যেখানে দর্শকদের আপ্লুত করিয়া তোলে, সেখানে কতটুকু স্বাভাবিক এবং কতটুকু অস্বাভাবিক এ বিচার করিবার অবসর থাকে না। গল্পটি একদিকে যেমন অত্যন্ত ঘরোয়া, অপর দিকে তেমনি সিদ্ধরস-সমন্বিত। মিন্টুর যখন মস্তিষ্কবিকৃতি হইল তাহার পর নমিতার আবির্ভাব অবশ্য খুবই নাটকীয়, কিন্তু এই নমিতা শেষ পর্য্যন্ত কোন নাটকীয় ঘটনায় পৌঁছাইতে পারেন নাই। ফলে, চরিত্রটি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই চরিত্রের সাহায্যে নাটকে আরো নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করা যাইত। নাটকের শেষাংশে পাগল হওয়া ও সারিয়া যাওয়া যেভাবে দেখান হইয়াছে তাহা কারুণ্যের ছাপে ভরপুর হইলেও নাটকীয় ঘটনার পরিপন্থী নয়—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। নিমন্ত্রণের দৃশ্য শুধু অস্বাভাবিক নয়—হাসির খোরাক যোগানর জন্য এ একটি উদ্ভট কল্পনা। আলোচ্য চিত্রের এত খানি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিব 'শুভদা' দাম্পত্য প্রণয়ের একটি মধুর কাহিনী। সুন্দর ও ঝরঝরে ছবি। পরিচালক মিন্টু পুত্র-সম্ভবা বুঝানর জন্য অতি সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। মালঞ্চের বৃন্তলগ্ন পুষ্পের সহিত তার মনের ভাব প্রকাশের সমন্বয় সাধন করিয়া পরিচালক শ্রীহিতি বসু মধুর কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিচালনা, সম্পাদনার কাজ সুন্দর হইয়াছে। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণ যথাযথ। অভিনয়ের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে মায়া মুখার্জ্জির কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি হাসিকান্নার অভিনয়ে সমভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। মিন্টুর ভূমিকায় শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিক অধ্যাপকের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের রূপসজ্জার প্রতি দৃষ্টিদান করা উচিত ছিল। নমিতার ভূমিকায় নমিতা সেনগুপ্তা যেটুকু সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। জীবেন বসুর উপেন ও সুপ্রভা মুখার্জ্জির মায়ের ভূমিকায় সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। বিকাশ রায়ের অধ্যাপক সুধাংশু ও গৃহী সুধাংশুর মধ্যে রূপদানের পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই বিষয় সমতা রক্ষা করা উচিত ছিল।

* * * *

শ্রীমতী মিত্র বি-এ—সম্প্রতি ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে চিত্র-শিল্পক্ষেত্রে

শ্রীমতী মিত্র বি এ

যোগদান করিয়াছেন। সানরাইজ পিকচার্স-এর 'কল্যাণী' চিত্রে ইঁহাকে একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে। আমরা এই নবাগতা উচ্চশিক্ষিতা শিল্পীর সাফল্য কামনা করি।

* * * *

১৯৫৩ সালে কোন্ দেশে কতগুলি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি উৎপাদিত হইয়াছে তাহা ইউনেস্কোর সংখ্যাতথ্য বিভাগের প্রচার পত্র হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশ ও ছবির সংখ্যা প্রকাশ করা হইল।—

প্রথম যুক্তরাষ্ট্র—৩৬৮
দ্বিতীয় জাপান—২৬১
তৃতীয় ভারত—২৩৩
চতুর্থ ইতালী—১৪৮
পঞ্চম যুক্তরাজ্য—১২৭
ষষ্ঠ ফ্রান্স—১০৪
সপ্তম জার্ম্মানী—৮২
অষ্টম মেক্সিকো—৭৮

* * * *

সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকের শততম অভিনয় রজনীর উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নট্ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শিল্পী, নাট্যকার ও মঞ্চের সমস্ত কর্ম্মীবৃন্দকে পুরস্কৃত করেন।

* * *

১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত, লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব-ভারতীয় সঙ্গীত-বিশারদ (বি, মিউজ্) পরীক্ষায়, কলিকাতাস্থ শাখা আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমান অরুণকুমার দত্ত প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান ও বাঙলা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান লাভ করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমান অরুণকুমার ১৯৫০ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত-মধ্যমা পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ইণ্টার-কলেজিয়েট সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর কৃতিত্ব লাভ করেন। ইনি একাধিক বাণীচিত্রে সহকারী সঙ্গীত-পরিচালকরূপে কাজ করিয়াছেন।

* * * *

কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর চেয়ারম্যান শ্রী পি, ভি, রাজমান্না সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে জানাইয়াছেন যে, আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর উদ্যোগে নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে এই সঙ্গে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হইবে। নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত এই সভার আয়োজন করিবেন। একাডেমীর প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নাটক ছাড়াও নৃত্য, চলচ্চিত্র ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কেও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইবে। গত ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তোলা তিনখানি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রকে পুরস্কৃত করা হইবে। এইভাবে প্রতিবছরেই একখানি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হইবে। নৃত্য এবং নাটকের জন্য ও প্রতি বছর তিনটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত শ্রীরাজমান্না জানান যে, দিল্লীতে যে জাতীয় নাট্যশালা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রীয় সরকার তজ্জন্য সহযোগিতাদানে এবং পাঁচলাখ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিতে সত্তর লক্ষ টাকা খরচ হইবে। ইতিমধ্যে নাটক সম্পর্কে অনুশীলন করার কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পঁচাত্তর হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। একাডেমীর অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে আছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের প্রচলিত রাগ-রাগিণীর তুলনামূলক বিচার ও জনসঙ্গীত রচনা করা এবং নূতন পদ্ধতিতে এমন স্বরলিপি রচনা করা যাহা সারা ভারতে অতি সহজেই চলিতে পারে। একাডেমীর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সত্যই সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। আমরা কেন্দ্রের কার্য্যকারিতা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে উদ্‌গ্রীব আছি।

শ্যামলীর শততম অভিনয় উৎসবের সভাপতি প্রধান-নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী তাঁহার ভাষণ প্রদান করিতেছেন, পশ্চাতে দণ্ডায়মান নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযোগেশ গুপ্ত ও নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

* * * *

বোম্বাই-এর চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতীসুমিত্রা দেবী আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে একাধিক চিত্রে কাজ করিতেছেন। সুমিত্রা দেবীর সাফল্যে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সুমিত্রা দেবী

ফটোতে পরিয়ে দিই ! (মালা দুইটি লইয়া) খোকা আজ বিয়ে ক'রে ঘরে বৌ আনছে। আজ যদি মা-বাবা বেঁচে থাকতেন, কতো সুখী হতেন। হাঁ ভোলাদা, আজ এ সব কাজকর্ম যাঁদের করবার কথা, তাঁরা চলে গেছেন স্বর্গে। পড়ে রয়েছি তুমি আর আমি। সব সামলাতে পারবোতো ?

ভোলা ॥ তা স্বর্গে গেলে কি হবে—। ওদের আশীর্বাদ রয়েছে তো। তুমি কিছু ভেবোনা দিদিমণি। ও আমরা ঠিক চালিয়ে নোবো।

ভোলা একটি টুল আগাইয়া দিলে তাহাতে চড়িয়া উমা ফটো দুইটিতে মালা পরাইতে লাগল। ভোলা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল

বৃদ্ধ ॥ ফুলের মালা আমাদের গলায় পরাচ্ছে উমা।

বৃদ্ধা ॥ বিধবা হয়ে আসা অবধি আমাদের দু-জনের জন্মদিনে আমাদের গলায় মালা-পরানোর এই উৎসব—এ উমাই শুরু করেছে।

বৃদ্ধ ॥ জীবনে কোনো সুখই তো তুমি পাওনি মা। বাপের সংসারে এসে যেটুকু শান্তি পেয়েছিলে, আজ তুমি তাও হারাবে। তোর দিকে আমি তাকাতে পারছিনা মা !

বৃদ্ধা ॥ (বৃদ্ধের প্রতি) এ সবই তোমার পাপের ফল।

ইতিমধ্যে উমা মালা পরানো শেষ করিয়া টুল হইতে নামিল

উমা ॥ (ফটোর দিকে চাহিয়া যুক্তকরে) শুনেছি, বাড়ীতে যখন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে, পূর্ব্বপুরুষরা তখন উপস্থিত হন। আজ আমার খোকন—ভাইয়ের বিয়ে। নিশ্চয়ই তোমরা এখানে এসেছ। অলক্ষ্যে থাকলেও আশীর্বাদ করো, বৌ নিয়ে আমার খোকন-ভাই যেন সুখী হয়—এ সংসারে যেন আবার চাঁদের হাট বসে।

উমা যুক্ত-করে প্রণাম করিল

ভোলা ॥ হাঁ কর্ত্তা-বাবু—হাঁ কর্ত্তী-মা—খোকন যেন আমাদের সুখী হয়।

ভোলাও যুক্ত করে প্রণাম করিল। উমা ধূপ ধুনা দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল

উমা ॥ হাঁ ভোলাদা, কাল রাতে বিয়ের সময় তুমি তো ছিলে। এ বিয়েতে খোকনকে খুব খুসী দেখলে তো ?

ভোলা ॥ ডগমগ। ডগমগ—খুসীতে ডগমগ।

উমা ॥ (ভোলার কাছে গিয়া চুপি চুপি) আমা ভয় কি জান ভোলাদা ? খোকন উল্কাকে বিয়ে করবা জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। জানতো !

ভোলা ॥ সে দোষ ওই উল্কার। এতো আমি এক বার ব লেছি—ওই উল্কাই খোকনকে তাতিয়েছিল।

উমা ॥ (ফটোর দিকে তাকাইয়া) কিন্তু সে দি আমি বন্ধ ক'রেছি ! কিছু অন্যায় ক'রেছি বাবা ? ও উল্কাকে তুমিই একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে বাড়িতে এ মানুষ ক'রেছিলে। ব'লেছিলে—জাত-কুলের ঠিক নেই কোন্ এক অনাথা মেয়ে। সেই মেয়ের সঙ্গে আমাদে খোকনের বিয়ে হ'তে পারে কখনও ? তোমরা যদি বেঁ থাকতে—বিয়ে দিতে ? কখনও না।

বৃদ্ধা ॥ না, না, না, কখনও না। তখন জানতাম ব'লেই ও মেয়েকে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলাম। সংসারের কলঙ্ক ওই মেয়ে। সর্বনাশী ওই মেয়ে। আজ খোকনের সর্ব্বনাশ ক'রবে। ওকে তাড়িয়ে দে তাড়িয়ে দে।

বৃদ্ধ ॥ চুপ। ওরা শুনবে।

বৃদ্ধা ॥ কই শুনছে ! যদি শুনতো তবে তো বেঁ যেত, খোকন আমার বেঁচে যেত। ওরা আমাদের দেখছে না, শুনছে না, শুধুই আমি কেঁদে মরছি।

বৃদ্ধ ॥ থামো, থামো। শোন ওরা কি ব'লছে।

ইতিমধ্যে উমার ধূপ ধুনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে

উমা ॥ একথা ঠিক ভোলাদা, উল্কার রূপের তুলন নেই। বুদ্ধি-শুদ্ধিও খুব। কিন্তু আর তো কোন পরিচয় নেই তার। আর, যে বৌ আমরা ঘরে আনছি, নামেও যেমন লক্ষ্মী গুণেও লক্ষ্মী। নামকরা বড় ঘরের মেয়ে লেখা-পড়ায়, গান-বাজনায়, বেথুন কলেজে ফার্ষ্ট। সুন্দরী অবশ্য উল্কার মত নয়। কিন্তু রূপ ধুয়ে তো আর জল খাব না। কি বল ভোলা দা ?

ভোলা ॥ তা নয়তো কি দিদিমনি। কর্ত্তাবাবু পুণ্যের সংসারে মা-লক্ষ্মী এলেন। এইটেই হ'ল গিয়ে বড় কথা।

বৃদ্ধা ॥ পুণ্যের সংসার। পুণ্যের সংসার !! পুণ্যের

সংসারই যদি হ'ত—তাহ'লে ওই কালনাগিনী এ বাড়ীতে ঠাঁই পেত না।

উল্কা ও তাহার বান্ধবী রত্নার প্রবেশ। উভয়ের হস্তে মালা গাঁথিবার ফুল ও সরঞ্জাম

উমা॥ একি উল্কা! বর-কনে আসার সময় হয়ে এলো, এখনও তোমাদের মালা গাঁথা হয়নি?

উল্কা॥ একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না দিদি। তাই এই ঘরটায় এলাম। ভেবো না দিদি, রত্না আর আমি দুজনে হাতাহাতি করে এখনি মালা গেঁথে ফেলচি।

উমা॥ তুমি এসো ভোলাদা। গোল-বারান্দায় তুমি চা-জলখাবার দাও গিয়ে। আমি বরণের আয়োজন দেখছি।

উমা ও ভোলার প্রস্থান। উল্কা ও রত্না মালা গাঁথিতে বসিল

বৃদ্ধা॥ কিগো, মুখ ফিরিয়ে কেন? ভালো ক'রে চেয়ে দেখ—তোমার বিষবৃক্ষে আজ কী ফুলটি ফুটেছে!

বৃদ্ধ॥ ফুল—ফুলই! ফুলের কী দোষ। দোষ ওরও নয়, ওর মারও নয়—দোষ আমার!

রত্না॥ (মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) ওঃ! খুব হাত চালাচ্ছিস্ তো! আমি ভেবেছিলাম, গিয়ে দেখব তুই কাঁদতে বসেছিস্।

উল্কা॥ জীবনে কোনোদিন কাঁদিনি। কাঁদবার মেয়ে আমি নই।

রত্না॥ কিন্তু ভাই, আমি বলছি—আমার বুকের ধন যদি কেউ এমনি করে ছিনিয়ে নিতো, আমি সইতে পারতাম না।

উল্কা॥ লক্ষ্মীদেবীর কথা বলছো? না, তাঁর কী দোষ? তাঁর কোনো দোষ নেই।

রত্না॥ বুঝেছি—ব্যথাটা কোথায় বুঝেছি। আচ্ছা, তোর কাছেই তো একবার শুনেছিলাম, যে যত বাধাই দিক্, রমেনবাবু তোকে বিয়ে করবেনই।

উল্কা॥ বলেছিলেন। আমি তোমাকে মিথ্যা বলিনি রত্না!

রত্না॥ মিথ্যা বলেছেন তবে তিনি। অথবা সত্যিই বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা রাখার সাহস হ'লো না। কথাটা হয়ে দাঁড়াল মিথ্যা। এরা পুরুষ নয় ভাই, কাপুরুষ। বরং বলবো তুই বেঁচে গেছিস্।

উল্কা॥ (হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল) উঃ!

রত্না॥ কী হ'ল?

উল্কা॥ ছুঁচটা আঙুলে ফুটে গেছে।

রত্না॥ কই—দেখি, দেখি। ইস্।

উল্কা॥ (রত্নাকে ঠেলিয়া দিয়া) সরে যা। রক্ত দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে।

বৃদ্ধ॥ ইস্! রক্ত বেরিয়েছে।

বৃদ্ধা॥ আমি জানি—আমি জানি—রক্তারক্তি আজ কিছু একটা হবেই!

রত্না॥ চল্—চল্—একটু আইডিন্ দিয়ে দিই।

উল্কা॥ না, না, এ আর কি হয়েছে—বরং ভালোই হলো। ফুলগুলো আমার রক্তে রাঙা হয়ে গেল। রক্ত আমি ভারী ভালোবাসি।

রত্না॥ তুই বলছিস্ কী উল্কা! রক্তটাতো এখনও বন্ধ হ'লো না।

উল্কা॥ রক্ত কোনদিন খেয়েছিস্? এই দ্যাখ—আমি খাচ্ছি।

ক্ষতস্থানটি চুষিতে লাগিল

রত্না॥ রাক্ষসী!

নেপথ্য হইতে শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল

রত্না॥ শাঁখ বাজছে। বর-কনে বুঝি এসে গেছে।

উল্কা॥ তুই যা। (রত্নার হস্তস্থিত মালা গ্রহণ করিয়া) ওটা তো হয়ে গেছে। এটা আমি শেষ করে আসছি।

রত্নার প্রস্থান

উল্কা দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে কান পাতিয়া মাঙ্গলিক ধ্বনিসমূহ শুনিতে লাগিল

বৃদ্ধ॥ উল্কা, শোন্ মা—শোন্—

বৃদ্ধা॥ ও খুন করবে, খুন—দেখে নিও, ও খুন করবে! তৈরী হচ্ছে।

বৃদ্ধ॥ শোন্ মা, খোকনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না—হতে পারে না।

বৃদ্ধা॥ সে কথা আজ বলে লাভ কি? আজ হয়তো তুমি বুঝছো, পাপ মানুষ করে লুকিয়ে, কিন্তু সে পাপ

চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তার বিষময় ফল ফলবেই। ওর চোখ-মুখ দেখে বুঝছো না, খোকনকে ও আজ খুন করবে।

বৃদ্ধ॥ না, না, ঐ দেখ—ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, ঐ তো মালা গাথা শেষ করলো। হ্যাঁ মা, যে কথা আমি জীবনে কাউকে বলতে পারিনি—বলিনি, আজ তোমাকে আমি বলছি, খোকন্ আর তুমি—দুজনেই আমার সন্তান।

বৃদ্ধা॥ আজ আর একথা কাকে বলছো? কে শুনছে? আমি তোমার স্ত্রী—আমার কাছে যে কথা কখনও তুমি বলোনি, সে কথা জগতের কেউ আজ শুনতে পাবে না। ঐ দ্যাখো, ও চলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ॥ কিন্তু মুখে ওর হাসি ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধা॥ হাঁা সেই হাসি—বাজ পড়বার আগে বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে।

মালা লইয়া উল্কা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেখানে রমেন ও লক্ষ্মী বর-কনে সাজে সজ্জিত অবস্থায় বিধবা দিদি উমা কর্তৃক আনীত হইল। উল্কা চমকাইয়া উঠিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল

উমা॥ (ফটো দুখানি দেখাইয়া লক্ষ্মীর প্রতি) ঐ আমাদের বাবা, আর ঐ আমাদের মা। আজ এই পরম দিনে ওঁরা কেউ বেঁচে নেই।

রমেন॥ না দিদি, বেঁচে নেই একথা বলো না। ঠাকুর বলেছেন—মৃত্যু হওয়া মানে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। ওঁরা দুজনেই আমাদের জীবনে বেঁচে আছেন।··· হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে ওঁরা আমাদের দেখছেন—আশীর্ব্বাদ করছেন। (লক্ষ্মীর প্রতি) এসো আমরা প্রণাম করি।

উভয়ে প্রণাম করিল

উমা॥ এইবার এসো গোল-বারান্দায় এসো। সবাই নূতন বৌয়ের গান শুনবে বলে বসে আছে।

রমেন॥ আজকে ওকে রেহাই দাও দিদি। বাপের বাড়ী ছেড়ে আসতে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গে গেছে।

লক্ষ্মী॥ না দিদি। তবে হাঁা, আজ আমাকে রেহাই দিন, বরং আজ আর কেউ গাইবে, আর আমি শুনব।

রমেন॥ উল্কা, তুমি যাও না ভাই। আজকের রাতটা manage কর।

উমা॥ দুধের স্বাদ তো ঘোলে মিটবে না ভাই। যেতে হবে তোমাকেই। এসো না—ভয় কি? তুমি কথা কইলেই সে ওদের কাছে গান হয়ে দাঁড়াবে। চল—চল—

রমেন॥ হ্যাঁ, চল। ওদের কাছে তোমাকে নিয়ে এর আগেই আমার যাওয়া উচিত ছিল।

লক্ষ্মীকে লইয়া উমা ও রমেনের প্রস্থান। উল্কার মনে হইল, তাহাকে এমন অপমান আর কখনও কেহ করে নাই। কিন্তু এ আঘাতে সে ভাঙিয়া পড়িল না। বরং দলিতা ফণিনীর মতো সে তাহাদের গমন-পথের দিকে দৃঢ়সংবদ্ধওষ্ঠে তাকাইয়া কী ভাবিতে লাগিল

বৃদ্ধা॥ দেখেছো, মেয়েটার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। কিন্তু আমি বলবো উমা ঠিকই করেছে। বরং বলবো, আজ এই শুভদিনে ঐ অলুক্ষণে মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

বৃদ্ধ॥ না, না, বরং শুভদিনেই কারোর মনে আঘাত দিতে নেই। এ দিনে কারোর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া ভাল নয়।

রমেনের পুনঃ প্রবেশ

রমেন॥ কী! খুব মেজাজ দেখানো হচ্ছে যে!

উল্কা॥ মানে?

রমেন॥ কেন তুমি এলে না আমাদের সঙ্গে? আজকের দিনে গোমড়ামুখে কেন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে দূরে দূরে?

উল্কা॥ তবে কি আমাকে নাচতে হ'বে আজ?

রমেন॥ আলবাৎ হবে।··এ বিয়ে আমি চাইনি। এ বিয়ে যে চেয়েছিল, সে তুমি।

উল্কা॥ বেশ তো। তাই বলে আমাকে ধেই ধেই করে নাচতে হবে আজ, এমন কোন কথা ছিল কি রমেনদা?

রমেন॥ নাচতে তুমি পারবে না—কাঁদতেই তোমাকে হবে, এ আমি জানতাম। দিদি যখন বললো—পথ থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে বিয়ে করা চলে না, আমি তা' মানিনি। বাড়ী থেকে সবিয়ে নিয়ে বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম তোমাকে আমি। কিন্তু তুমি তাতে রাজী হওনি।
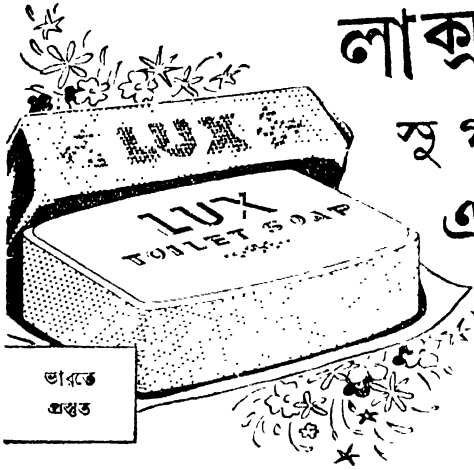
উল্কা॥ হ্যাঁ, হইনি। তোমার বাবা আমাকে এ সংসারে ঠাঁই দিয়েছিলেন—সে সংসার ভেঙে দেবার মতো নেমকহারামী আমি করতে পারি না রমেনদা—একথা আমি তোমাকে কতোবার বলবো! জীবনে কি শুধু প্রেমটাই বড় হবে? কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছু নেই?

রমেন॥ কৃতজ্ঞতা—কৃতজ্ঞতা! আমার বাবার সংসার না ভেঙে আমার জীবনকে চুরমার করে দেওয়া—এই তোমার কৃতজ্ঞতা!

উল্কা॥ তোমার জীবন আমি চুরমার করিনি রমেনদা। আমি তোমাকে বিয়ে করতেই বলেছি।

রমেন॥ হ্যা, সে বিয়ে আমি করেছি—শুধু দেখতে—শুধু বুঝতে—তুমি কতো বড়ো পাষাণ। যে আঘাত তুমি আমাকে হেনেছো, সেই আঘাত সুদে-আসলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি আজ। মুখ ভার করে বসে থাকলে চলবে না। আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে। নতুন বোয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের খেলা দেখে তোমাকে হাসতে হবে, নাচতে হবে। আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে—এসো—

উল্কা॥ আমি যাবো না। আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

রমেন॥ সে আমি জানি না। তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

উল্কা॥ বেশ, যাবো। দুজনেই যাবো একসঙ্গে—চিরতরে।

রমেন॥ চিরতরে! মানে?

উল্কা॥ কেন? মনে নেই? তোমাতে-আমাতে যখন বিয়ে হ'তে পারে না জানা গেল, একদিন রাত্রে তুমিই তো বলেছিলে—এসো উল্কা, বিষ খাই—চিরমিলনের পথে যাই।

রমেন॥ বলেছিলাম। কিন্তু সেদিন তুমি রাজী হওনি। পরে আমি ভেবে দেখলাম, মরা অতো সোজা নয়।

উল্কা॥ কিন্তু এখন দেখছি বাঁচাও অতো সোজা নয়।

রমেন॥ কি বললে! উল্কা, এ তুমি কি বললে?

লক্ষ্মীকে লইয়া উমার পুনঃ প্রবেশ

উমা॥ যা ভেবেছিলাম তাই।

রমেন॥ হ্যাঁ দিদি, তাই। খুব লোককে মালা গাঁথবার ভার দিয়েছো। আমি এসে তাড়া দিয়ে তবে মালা-গাঁথা শেষ করিয়েছি।

উমা॥ বেশ করেছো। এখন এই নাও ভাই, তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। (উল্কার প্রতি) এই কাজের দিনে সবচেয়ে বেশী অকাজ করছো তুমি উল্কা।

উল্কা॥ অকাজ! কী আর এমন অকাজ করেছি।… কিছু না করেও যখন বদনাম কিনছি, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে—এমন কিছু করতে হবে—

উমা॥ আর যা-ই কর, লোক হাসিও না উল্কা।

উমার প্রস্থান

লক্ষ্মী॥ উল্কা—চমৎকার নাম তো!

রমেন॥ এই—এই ছাখো! উল্কার সঙ্গে তোমার এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। উল্কা—আমার বোন না হলেও—বোনের চেয়েও বেশী। একসঙ্গে খেলা-ধূলো করে মানুষ হয়েছি।

লক্ষ্মী উল্কাকে প্রণাম করিতে গেল

বৃদ্ধ॥ লক্ষ্মী—মা আমার সত্যি লক্ষ্মী!

বৃদ্ধা॥ কিন্তু ও মেয়েটি অলক্ষ্মী। ওর কাছে যাওয়া কেন?

উল্কা॥ (লক্ষ্মীকে) না ভাই, আমাকে তোমায় প্রণাম করতে হবে না।

উল্কা হস্তস্থিত মালাটি লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিল

বৃদ্ধা॥ পাপীয়সী ঐ ফুলের তলে সাপ লুকিয়ে রাখেনি তো।

বৃদ্ধ॥ পাপী আমি, পাপীয়সী ওর মা—মেয়েটার কি দোষ?

বৃদ্ধা॥ থামো। দোষ ওর রক্তের।

লক্ষ্মী॥ (মালাটি দেখিতে দেখিতে) কী সুন্দর!

রমেন॥ কী সুন্দর তোমায় মানিয়েছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী॥ এ হ'ল গিয়ে আমার ধার করা রূপ। (উল্কাকে দেখাইয়া) রূপের মহাজন তোমার সামনে।

রমেন॥ হলো তো! এতো বড়ো প্রশংসা তুমি আমার কাছেও কোনোদিন পাওনি উল্কা। ওগো মহাজন, ইতরজনের ভাগ্যে মিষ্টান্ন বরাদ্দ থাকে। আর কিছু না হোক্ চট্ করে দু গ্লাস সরবৎ খাইয়ে দাও দেখি।

উল্কা ॥ বোসো—আনছি।

উল্কার প্রস্থান

বৃদ্ধা ॥ (আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া) বিষ দেবে—এই সরবতেই ও বিষ দেবে।

রমেন ॥ (লক্ষ্মীকে) ও:—তুমি ঘেমে উঠেছ। আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

টেবল পাখাটা খুলিয়া দিতে গেল

বৃদ্ধা ॥ (চীৎকার করিয়া) খোকন—খোকন খবরদার—ওর সরবৎ তোরা খাবিনে।

বৃদ্ধ ॥ না, না, উল্কা অতোটা নীচ হতে পারে না।

বৃদ্ধা ॥ কেন পারে না? যারা সমাজের এতোটা নীচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে।

রমেন ॥ পাখাটার কী ব্যাপার! লাইট্ জ্বলছে, অথচ পাখাটা চলছে না!

লাঠি হস্তে ভোলার প্রবেশ

রমেন ॥ এই যে ভোলাদা। (তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া) লাঠি! ব্যাপার কী বলোতো?

ভোলা ॥ সেঁকো বিষেই যদি ইঁদুর মরতো, তবে শালারা ভদ্দর লোক বলতাম। লাঠিই ওদের একমাত্র ওষুধ। কই? কোথায় ইঁদুর?

ইতস্ততঃ লাঠি লইয়া চারিদিকে ইঁদুর খুঁজিতে লাগিল

লক্ষ্মী ॥ ইঁদুর! কোথায়?

রমেন ॥ তাই তো—ব্যাপার কী? ব্যাপার কি ভোলাদা?

ভোলা ॥ আজ ক'দিন ইঁদুরের উৎপাত ভীষণ বেড়েচে সত্যি। সব ঘরের যত জঞ্জাল আজ আমি নিজে হাতে সাফ করেছি। শুধু এই ভয়ে যে, বৌমা যেন ভয় না পায়। তাও রক্ষে নেই! আজ এই শুভ দিনে বৌমার গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল।

রমেন ॥ বৌয়ের গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল! কখন ভোলাদা? (লক্ষ্মীকে) কি গো, কখন?

লক্ষ্মী ॥ ব্যাপার কি? ধেড়ে ইঁদুর—লাফিয়ে গেল—আমার গায়ের ওপর দিয়ে! কখন?

ভোলা ॥ বাঃ! যায়নি? তবে যে—উল্কা আমার বাক্স থেকে ইঁদুর মারা সেঁকো বিষের পুরিয়া নিয়ে ছুটে এলো—খাবারে মিশিয়ে এ ঘরে ছড়িয়ে দিতে! ইঁদুর মারতে!

রমেন ॥ কই? কখন?

লক্ষ্মী ॥ কোথায় ইঁদুর?

রমেন ॥ না, না, তোমার সংগে ঠাট্টা করেছে। উল্কা আনতে গেছে সরবৎ, আমাদের জন্যে!

ভোলা ॥ আনতে গেছে সরবৎ?

ভোলা কি যেন ভাবিতে লাগিল

লক্ষ্মী ॥ কিন্তু এ কী রকম ঠাট্টা?

লক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল

রমেন ॥ তাই তো! আর সরবৎ আনতেই বা এতো দেরী কেন?

রমেন পথের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল

বৃদ্ধা ॥ বুঝেছি—আমি বুঝেছি—ইঁদুরের নাম করে বিষ নিয়ে তা মেশাচ্ছে ঐ সরবৎএ। (চীৎকার করিয়া) তোরা বুঝিস নি। আমি বুঝেছি। খবরদার। ওর দেওয়া সরবৎ তোরা খাবিনে। খবরদার—খবরদার!

বৃদ্ধ ॥ সে কী এতো নীচে নামবে? এতো নীচে!

বৃদ্ধা ॥ যারা সমাজের এতোটা নীচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে—ও সব পারে।

একটি ট্রেতে দুই গ্লাস সরবৎ লইয়া হাসিমুখে উল্কার প্রবেশ। সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল

বৃদ্ধা ॥ রাক্ষুসী? সর্বনাশী? তোর মনে এই ছিল—তোর মনে এই ছিল!

উল্কা ট্রেটি লইয়া রমেন ও লক্ষ্মীর সম্মুখে ধরিল

ভোলা ॥ খবরদার খোকন, খবরদার!

বৃদ্ধ ॥ (উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া) শোন্—শোন্ মা উল্কা! এদ্দিন কাউকে বলতে পারিনি—আজ বলছি—তোর আর খোকনের মা আলাদা হলেও বাপ হচ্ছি আমি। বিয়ে তোদের হয় না—বিয়ে তোদের হয় না।

বৃদ্ধা ॥ কে শুনছে? সে কথা আজ কে শুনছে?

উল্কা ॥ (রমেন ও লক্ষ্মীর প্রতি) কি—নেবে না?

ভোলা ॥ ইঁদুর—ইঁদুর! হাঃ—হাঃ—হাঃ ইঁদুর মারবার নাম করে সেই বিষে সরবৎ করে মানুষ মারতে এসেছিস্?

উল্কা স্তম্ভিত হইল—লক্ষ্মী এবং রমেনও

উল্কা ॥ বিষের সরবৎ দিচ্ছি আমি ?

বৃদ্ধা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা নয় তো কি ? আমাদের চোখে ধূলো দেবে কে ? আমরা স্পষ্ট দেখছি।

বৃদ্ধ ॥ না, না, বিষ তুমি দিতে পারো না উল্কা। খোকন তোমার ভাই, তোমরা দুজনেই আমার সন্তান।

উল্কা ॥ (সগাস্যে রমেনকে) তোমাকে আমি বিষ দিতে পারি ? তোমার বিশ্বাস হয় রমেনদা ? বেশ, তবে খেও না।

গ্লাসশুদ্ধ ট্রেটি টেবিলে রাখিয়া উল্কার প্রস্থান

রমেন ॥ না, না, সে কী কথা ! তুমি দেবে বিষ !

রমেন একটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া সরবৎ পান করিতে লাগিল। লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও ভোলা যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—

—সর্ব্বনাশ !

রমেন ॥ (পান শেষ করিয়া) বিষ নয়, অমৃত। (লক্ষ্মীর প্রতি) লক্ষ্মী, তুমি হয়তো খেতে ভয় পাচ্ছো। কিন্তু কিছু ভয় নেই। ও মেয়েটাকে আমি জানি। আমার ভয় হচ্ছে ওর জন্যে। আমি ওকে দেখে আসছি।

রমেনের প্রস্থান

বৃদ্ধ ॥ দেখলে তো, আমরা মিছেই ভয় করেছিলাম। বিষ ও দিতে পারে না। নেমকহারামী ও করবে না—ও আমার মেয়ে।

বৃদ্ধা ॥ তোমার মেয়ে বলেই ও নেমকহারামী করবে। তুমি আমার সঙ্গে নেমকহারামী করোনি ?

লক্ষ্মী ॥ (প্রস্থানোদ্যত ভোলাকে) দাঁড়াও। আমিও যাবো।

ভোলা ॥ না, না, আমি এখনি আসছি। বিষটা কোথায় ফেললে দেখে আসছি।

ছুটিয়া রমেনের প্রবেশ

রমেন ॥ ভোলাদা—ডাক্তার—ডাক্তার—শীগ্‌গীর ডাক্তার ডেকে আনো। বিষ খেয়েছে উল্কা। এসো লক্ষ্মী, আর বোধ হয় ওকে বাঁচাতে পারবো না।

সকলের ব্যস্তভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান

বৃদ্ধ ॥ উল্কা আত্মহত্যা করেছে !

বৃদ্ধা ॥ ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে ! বাপ-মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

বৃদ্ধ ॥ সন্তানের বিবাহ আর সন্তানের মৃত্যু—দিবাচক্ষে একযোগে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলাম আমরা। মিথ্যা হলো না। পুত্রের হলো বিবাহ—কন্যার হলো মৃত্যু !!

বৃদ্ধা ॥ পাপের হলো প্রায়শ্চিত্ত !...আজ তোমার মুক্তি !!

. যবনিকা

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

আবেলার্দ ও এলয়শার পত্রাবলী

[গত ফাল্গুন সংখ্যায় ভারতবর্ষে আবেলার্দকে লেখা এলয়শার পত্রখানি শেষ হয়েছিল। এবার সেই পত্রের উত্তরে আবেলার্দ এলয়শাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই পত্রখানি মুদ্রিত হল]

পত্রারম্ভে কোনও প্রীতিসম্ভাষণের পরিবর্তে লেখা ছিল :—

"To Heloise, his best beloved sister in Christ, Abelard her brother in him."

"খৃষ্টে সমর্পিত প্রাণ তার গরিয়সী প্রিয়তমা ভগ্নী এলয়শাকে, তার ধর্মানুগামী ভাই আবেলার্দ।"

সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে ভগবানের চরণে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে আমি তোমাকে উৎসাহ বা সান্ত্বনার বাণী দিয়ে কোনও পত্র লিখিনি একথা সত্য, কিন্তু একে তুমি আমার অবহেলা বলে মনে কোরনা। বরং জেনো যে, তোমার সুমতির উপর আমার চিরদিনের অবিচলিত বিশ্বাসই এর প্রকৃত কারণ। আমি একথা ভাবতেই পারিনি যে, মানব জীবনে প্রয়োজনীয় যা-কিছু শক্তি ও সাহস দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় যার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, তার পক্ষে তুচ্ছ সান্ত্বনা ও উৎসাহবাণীগুলোর কোনও আবশ্যকতা আছে! কারণ, যে তার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যে এবং স্বীয় জীবনাদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত মতিকে সুশিক্ষা প্রদানে সুপথ নির্দেশ করতে পারে, ভীরু ও বিমর্ষ আত্মাকে প্রফুল্ল ও আশান্বিত করে তুলতে পারে এবং মনমরা নিরুৎসাহ চিত্তকে সঞ্জীবিত ও প্রাণময় করতে পারে সে কি কারও সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে?

তুমি তো বহুদিন আগে হতেই, যখন মঠাধিকারিণীর অধীনে আশ্রমের আশ্রিতাদের মধ্যেই একজন হয়ে ছিলে, তখন থেকেই তো এধরণের কঠোর নিয়ম পালনে সুনির্দিষ্ট ভাবে অভ্যস্ত হয়েছিলে। আর এখনও যদি তুমি তোমার আশ্রম-পালিতা কন্যাদের জন্য তেমনিই যত্ন নাও, যেমন তুমি সেদিন তোমার ধর্মানুগামী ভগ্নীদের জন্য নিয়েছিলে, আমার বিশ্বাস সেইটুকুই যথেষ্ট হবে এবং সেক্ষেত্রে আমার আদেশ উপদেশ বা অনুরোধ একেবারেই বাহুল্য বলে মনে করি। তবে তুমি যদি তোমার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ এ ব্যাপারে অন্যমত পোষণ কর এবং ভগবান সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে তুমি আমার শিক্ষকতা এবং লিখিত ধর্মোপদেশের প্রয়োজন-বোধ করো তবে সে সম্বন্ধে সর্বশেষ আমাকে জানিও, যাতে আমি তোমাকে ঈশ্বরের নিকট নির্দিষ্ট পথের সন্ধান পেয়ে, সঠিক উত্তর দিতে পারি।

ভগবানকে আমি ধন্যবাদ জানাই, যিনি তোমার অন্তরের নিভৃত অন্তস্তলে আমার সতত অতি-ভয়াবহ বিপদের আতঙ্ক জাগিয়ে তুলে তোমাকে আমার দুঃখের অংশভাগিনী করে তুলেছেন। তোমার ঐকান্তিক প্রার্থনাতেই প্রসন্ন হ'য়ে করুণাময় ভগবান আমাকে রক্ষা করছেন এবং শয়তান আমাদের পদতলে দৃঢ় নিষ্পেষিত হ'চ্ছে। তুমি পত্রবাহক মারফৎ মুখে মুখে যে 'স্তবগাথা' খানি সত্বর আমাকে পাঠাতে বলেছ, সেখানি তুমি যে সোদরা-প্রতিমের জন্য চেয়েছ সে বোনটি একদিন পৃথিবীতে আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয় ছিল এবং আজ সে খৃষ্টেসমর্পিতপ্রাণ হ'য়ে আমার কাছে পরম প্রিয়তমা হ'য়ে উঠেছে। পত্রপাঠ আমি সে স্তবগাথাখানি পাঠালুম। তুমি এ বইখানি পেলে আমার জীবনের অসংখ্য স্খলন-পতনের জন্য এবং আমি প্রতিদিন আমার উপর যে বিপদ আসন্ন বুঝে সতত শঙ্কিত সে জন্যও, অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট তোমার ত্যাগের অঞ্জলি উপহার দিয়ে কায়মনে প্রার্থনা কোরো।

বস্তুতঃপক্ষে ভগবানের কাছে ও ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের কাছে একান্ত নির্ভরশীল ভগবৎবিশ্বাসীদের প্রার্থনার যে কত বেশি মূল্য এবং কত উচ্চে যে তার স্থান তা আমরা জানি। বিশেষতঃ, সেই সকল ভক্তিমতী নারীর প্রতি ভগবৎ কৃপা সকলের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়, যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করেন। আর, সেই সব পতিব্রতা পত্নীর প্রতিও তাঁর দয়া অপরিসীম, যারা তাদের প্রিয়তম স্বামীদের মঙ্গলকামনায় সর্বান্তঃকরণে ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানান। আমরা প্রতিদিন এর কত দৃষ্টান্তই না প্রত্যক্ষ করি। তাঁদের সযত্ন ও সাগ্রহ প্রার্থনা শ্রবণ করে আমাদের ধর্মগুরু যাঁরা, তাঁরা আমাদের দিবারাত্রি অবিরাম ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে উপদেশ দেন। ধর্মগ্রন্থে এই রকম লেখা আছে যে, ভগবান মোজেসকে বলছেন "আমাকে একলা থাকতে দাও, যাতে আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'তে পারে।" জেরিমিয়া লিখেছেন "যথার্থই তিনি বলেন, তোমরা এই লোকগুলির জন্য আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আমার কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি কোরো না।" এই কথাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সাধু সন্তগণের প্রার্থনার প্রভাব সম্বন্ধে ভগবান বে-পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করেছেন যে, এ যেন তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধাবেগের মুখে কাজাই লাগিয়ে বলগা টেনে ধ'রে! এমন কি তাঁকে সেই প্রবল প্রার্থনার বল প্রয়োগে দোষী ও অপরাধীদের অন্যায়ের গুরুত্ব অনুসারে তাদের প্রতি যতটা ক্রুদ্ধ ও কঠোর হওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল

না হ'তেই বাধ্য করে। ফলে ন্যায় বিচার অনুসারে স্বভাবতঃ যার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তার শুভার্থীদের কাতর প্রার্থনায় সে কঠোর দণ্ড মোলায়েম হ'য়ে যায় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সেই প্রার্থনার জোর যেন ভগবানের হাত দুখানিকে সবলে চেপে ধরে।

ভগবানের লীলা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে "এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই ইচ্ছা মাত্র সৃষ্ট হয়েছে।" সেই সঙ্গে সেখানে এমন কথারও উল্লেখ দেখি যে তিনি কোন কোন লোকের কি কি শাস্তি পাওয়া উচিত তাও ঘোষণা করেছেন, কিন্তু প্রার্থনার পবিত্র প্রভাবে বাধা পেয়ে যে দণ্ড তিনি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন তা সংবরণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন। সুতরাং তুমি প্রার্থনার অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে অবহিত থেকো। আমরা যদি যথাযথভাবে তাঁর আদেশ মতো প্রার্থনা করে যাই, তা'হলে, ত্রিকালজ্ঞ সাধুকে তিনি যে প্রার্থনাটি করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছিলেন, তথাচ সাধু সেই প্রার্থনাই ক'রে যেমন প্রার্থিত বস্তু লাভ করেছিল, তেমনি আমাদের প্রার্থনাও পূর্ণ হবে জেনো। অপর একজন ত্রিকালজ্ঞ সাধু ঈশ্বরকে ডেকে বলেছেন—"প্রভু! যখনি আমাদের অধঃপতন দেখে তোমার ক্রোধের উদয় হবে, তখনি তুমি তোমার অপার করুণার কথাটাও স্মরণ কোরো।"

এই মাটির পৃথিবীর যাঁরা তথাকথিত রাজা—তাঁরা শ্রবণ করুক একাগ্র মনোযোগ দিয়ে এ কথাগুলি। কারণ, মাঝে মাঝে তাঁরা এমন সব আইন রচনা করেন এবং এমন সব আদেশ ঘোষণা করেন যা ন্যায় ধর্মের পরিবর্তে তাঁদের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিরই জয় ঘোষণা করে। তাঁদের অন্তরে যদি কখনো দয়ার উদ্রেক হয় তাঁরা লজ্জায় আরক্তিম হ'য়ে ওঠেন। যে আদেশ তাঁরা একবার কোনও অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারণ ক'রে ফেলেন, পরে তার অযৌক্তিকতা বুঝলেও তাঁরা মিথ্যাচারের ভয়ে সে দণ্ডাদেশ আর প্রত্যাহার করেন না। কিন্তু অন্য অনেক ব্যাপারে প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁদের কথারও ঠিক নেই, কাজেরও ঠিক নেই! আমার বলা উচিত ছিল যে তাদের প্রকৃতপক্ষে 'যেফ্‌থা'র সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে ব্যক্তি নির্বোধের মতো যা অঙ্গীকার করেছিল সেই প্রতিশ্রুতিই অধিকতর নির্বোধের মতো পালন করতে গিয়ে নিজের পরম প্রিয়কেও হত্যা করেছিল।

এই সব বিষয় আশা করি তোমাকে এবং তোমার আশ্রমের পূতচরিতা ভগ্নীগণকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় অধিকতর বিশ্বাসী ক'রে তুলবে। তারপর, এই যে তোমাদের খাতিরে ভগবানের দয়ায়—যার প্রধান সাক্ষী ছিলেন শ্রীমৎপল স্বয়ং—স্ত্রীলোকগণ তাদের মৃত প্রিয় পরিজনদের পর্যন্ত জীবন ফিরে পেয়েছিল, প্রার্থনা কোরো তাঁর কাছে—তিনি যেন আমাকে কৃপা ক'রে জীবিত রাখেন।

তোমার আশ্রমের কথা না-হয় আমি ছেড়েই দিচ্ছি, সেখানে অসংখ্য পূতচরিতা কুমারী ও বিধবার অজস্র শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ত ভগবানের চরণে নিবেদিত হ'চ্ছে, আমাকে তুমি একা তোমার কাছে, শুধু তোমারই কাছে আসতে দাও, যার ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় এবং যে ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে আমার জন্য—এ বিশ্বাস আমার সুদৃঢ়। আমি তাকেই বিশেষ করে অনুরোধ করবো যে আমার এই নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ে, আমি যখন অদৃষ্টের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে ক্লান্ত ও অবসন্ন, তখন আমার জন্য সে যেন যতটুকু করা তার সাধ্যায়ত্ত সেটুকু করতে দ্বিধা না-করে। তোমার প্রার্থনার সময় সর্বদা তাকে স্মরণ কোরো যে একান্তভাবে তোমারই।

তুমি তো জানো প্রিয়তম, একদিন তোমাদের আশ্রমে আমার উপস্থিতি কত বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রকাশ্যভাবেই তো পূর্বে তোমরা আমার জন্য আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করতে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা প্রায় প্রতি প্রহরেই ভগবানের কাছে বিশেষভাবে মিনতি জানিয়ে আমার জন্য এই প্রার্থনা সঙ্গীত নিবেদনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে—"হে ভগবান, একজন হতভাগাকে তোমার কৃপার যোগ্য মনে ক'রে তোমার দাসীরা তোমার চরণে তার জন্য শরণ নিতে সমবেত হয়েছে, তোমাকে তারা কাতরভাবে অনুরোধ করছে তাকে সকল দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবার জন্য এবং তোমার দাসীদের কাছে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে দেবার জন্য।"

কিন্তু, যদি ভগবান আমাকে আমার শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই শেষ পর্যন্ত স্থির করেন এবং তারা যদি আমাকে হত্যা করাই উচিত বলে মনে করে, অথবা তোমার নিকট হ'তে দূরে যেখানকালে যদি আমার এ দেহ মানুষমাত্রেরই রক্ত মাংসের শরীরের যে শেষ পরিণাম সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, তবে আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল যে, আমার সে মৃত দেহ যেখানেই পড়ে থাক—সমাধি গর্ভে থাক, বা বাইরে পথের ধূলায় গড়াগড়ি যাক, সে দেহ যেন তোমাদের সমাধিভূমিতে তুলে নিয়ে আসা হয়, যেখানে, আমার ধর্মকন্যারা অথবা খৃষ্টেসমর্পিতপ্রাণ আমার ভগ্নীরা প্রতিদিন সর্বক্ষণ আমার সেই কবরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা পাঠাতে অনুপ্রাণিত হবে। সহস্র অপরাধের গহন অরণ্যে পরিত্যক্ত আমার রোরুদ্যমান আত্মার জন্য, যে-আত্মা যথোপযুক্ত ভাবে উৎসর্গিত হয়েছে 'প্যারাক্লিট' অর্থাৎ যেটি তার একমাত্র সান্ত্বনার স্থান এবং যে স্থান তাঁরই নামে মনোনীত ও নির্দিষ্ট হ'য়েছিল, সেই প্যারাক্লিট ভিন্ন তার জন্য আর অন্য কোনও স্থানই আমি নিরাপদ ও কল্যাণকর বলে মনে করি না। তা ছাড়া, একথাও আমি মনে করি যে একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী খৃষ্টানের সমাধি ভক্তিমতী নারীদের সমাধি ক্ষেত্র অপেক্ষা আর কোনও উপযুক্ততর স্থানে হ'তে পারে না।

আমার শেষ প্রার্থনা তোমার কাছে এই যে, আমি আর কিছুই চাইনা, কেবল, তুমি যেমন আমার শারীরিক বিপদের আশংকায় বর্তমানে সর্বদাই কষ্ট পাচ্ছ, তেমনি তুমি তখন আমার আত্মার কল্যাণ কামনায় সেই রকমই ব্যাকুল হয়ে নিয়ত প্রার্থনা করবে। আজ যেমন একটি জীবন্ত প্রাণীর প্রতি ভালবাসায় ও তার শুভাশুভ চিন্তায় তোমার মন অস্থির, সেদিন তেমনি একটি মৃত আত্মার প্রতি তোমার সুগভীর প্রেম তার মুক্তির জন্য যেন বিশেষভাবে প্রার্থনা করে। তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিদায় নিলুম, বিদায় নিলুম তোমার ধর্মভগ্নীদের কাছেও তাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করে। তুমি দীর্ঘ জীবনী হও। প্রভু খৃষ্টের নিকট প্রার্থনা কালে আমার কথাও একটু তুমি স্মরণ কোরো—এই তোমার কাছে আমার শেষ মিনতি।......

এলয়শাকে লেখা আবেলার্দের পত্র এইখানে শেষ হয়েছে।

পত্রগুলি ফরাসী সাহিত্যে অক্ষয় হ'য়ে আছে। নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য তার অপরিমিত ত্যাগ স্বীকারের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্ব-সাহিত্যে অতি অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।

—পনেরো—

"Esta faca não Corta—"

ভুল—ভুল করেছিলেন সোমদেব। মহাকালীর নামে যে দীক্ষা নিতে পারে—নিষ্ঠুর কঠিন রক্তপাতে যার বুক কাঁপে না—দেশ জোড়া আগুন জ্বালিয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যার মনে—রাজশেখর শ্রেষ্ঠী সে-দলের লোক নয়! ভীরু, দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন। বিধর্মী নবাবের পরম অনুগত হয়ে শুধু তার সেবা করতে পারে, ক্রীতদাসের মতো বসে থাকতে পারে করযোড়ে। সোমদেব ভুল করেছিলেন।

কিন্তু আশা ছাড়লে চলবেনা। আবার নতুন করে হিন্দুর রাজত্ব গড়তে হবে—আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ব্রাহ্মণের অধিকার। শুধু হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করলেই সে-অধিকার এসে পড়বেনা মুঠোর মধ্যে। কিন্তু তারও তো প্রস্তুতি চাই। দেশের শক্তিহীন ক্ষত্রিয়দের আবার জাগাতে হবে—যুদ্ধের জন্যে সশস্ত্র করে তুলতে হবে তাদের! সেজন্যে চাই শ্রেষ্ঠীর কোষাগার। ক্ষত্রিয়ের কর্মশক্তির পেছনে চাই বৈশ্যের অর্থ—আর সকলের ওপরে চাই ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক।

রাজশেখর শ্রেষ্ঠীকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না সোমদেব। তার মেয়ে সুপর্ণা পাগল হয়ে গেছে। কী হয়েছে তাতে? কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখেই একটা মেয়ের যদি মস্তিষ্কে বিকার ঘটে, তার জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়াও অবান্তর মনে করেন সোমদেব। রক্তের বন্যা যদি কোনোদিন দেশময় বয়ে যায়—তা হলে সে-স্রোতে অনেক সুপর্ণাকেই ভেসে যেতে হবে।

তবু বিশ্বাসঘাতক রাখশেখর পরের দিনই নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছে নিজের অপরাধ। তার সঙ্গে সঙ্গে নবাব খোদা বক্স খাঁ বন্দী করেছে তাকে। সময় মতো পালাতে পেরেছেন বলে রক্ষা পেয়েছেন সোমদেব, নইলে কী পরিণাম যে তাঁর ঘটত সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

চুলোয় যাক রাজশেখর। তার সংবাদ জানবার জন্যে আজ কোনো কৌতূহল নেই সোমদেবের। আজো সে বন্দী, অথবা নবাবের জল্লাদের হাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে কিনা সে খবরও তিনি পাননি। রাজশেখরের পরিণতি যাই-ই ঘটুক, সেজন্যে অপেক্ষা করলে চলবেনা সোমদেবের।

কিন্তু শুধু রাজশেখর শ্রেষ্ঠীই বা কেন? আজ প্রায় চার বছর ধরে সোমদেব এই যে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কতটুকু সাড়া তিনি পেয়েছেন? দেশের যারা ভূস্বামী, তাদের অধিকাংশই বিধর্মী শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। তাদের কাছ থেকে সহযোগিতার আশা নেই—আছে শত্রুতার সম্ভাবনা। যে-দুচারজনকে তিনি নিজের কথা বোঝাতে পেরেছেন, তাদেরও কেউ আগ্ বাড়িয়ে এসে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত নয়। সবাই বলেছে, আমরা কী করতে পারি—আরো দশজনকে যোগাড় করে আনুন।

তবু হাল ছাড়েননি সোমদেব—ছাড়তে পারেন না। সময় এগিয়ে আসছে—অনুকূল হয়ে আসছে হাওয়া। সাসারামের পাঠান শের খাঁ বাঘের মতোই গর্জে উঠেছে। তার গর্জনে কাঁপছে দিল্লীর মস্‌নদ। আবার লড়াই বাধছে মোগল-পাঠানে। ষাঁড়ের শত্রু এবার বাঘে মারবে—

মাঝখান দিয়ে হিন্দু ফিরে আসবে নিজের অধিকারে। এ অবধারিত—চোখের সামনেই সেই ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছেন সোমদেব। শুধু সুযোগটা গ্রহণ করবার মতো প্রস্তুতি থাকা চাই!

আর না হলে? না হলে চতুর্থ পক্ষের আসন্ন ছায়া স্পষ্টই সঞ্চারিত হচ্ছে আকাশে। বিদেশী ক্রীশ্চানের দল। দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এমন করে যারা এ-দেশে এসে পৌঁছেচে এত সহজেই তারা ফিরে যাবেনা। এ পদসঞ্চার অশুভ—এর সমাপ্তি দিল্লীর সিংহাসনে।

এত জেনে, এত বুঝেও এখনো কতখানি এগোতে পেরেছেন সোমদেব? ক্রুদ্ধ একটা কাঁকড়া বিছের মতো নিজের বিষের জ্বালায় জ্বলছেন সর্বক্ষণ—নিজেকেই জর্জরিত করছেন দংশনে দংশনে। কখনো কখনো মনে হয় আরো কয়েকটা নরবলি চাই—নইলে হয়তো মহাকালীকে জাগানো যাবেনা!

তাঁর উত্তেজনা সংপ্রতি বেড়ে উঠেছে আর একটা কারণে। তা হল খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়ানো বৈষ্ণবের দল।

নবদ্বীপের এক চৈতন্যের কথা শুনেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই শোনা পর্যন্তই। চৈতন্যের প্রভাব দেশে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই তাঁর ছিলনা। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মন্দিরে অথবা তাঁর নিজের অরণ্য-আশ্রয়ে সংকীর্তনের কোনো সুরই কোনোদিন পৌঁছুতে পারেনি। মাঝে মাঝে যেটুকু কানে আসত, তাতে মনে হয়েছিল ও একটা পাগলের খেয়ালের ব্যাপার—সাধারণ মানুষ দু-চারদিন নাচানাচি করেই ও-সমস্ত ভুলে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর চুপ করে থাকা চলেনা। এ আর এক শত্রু। দেশের মানুষকে নির্বীর্য করে ফেলার আর একটা চক্রান্ত। এদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

সংশয় এনে দিয়েছে মালিনী। আপাতত যে কেশব শর্মার বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরই স্ত্রী।

প্রতিদিনের মতো সকালে এসে মালিনী তাঁকে প্রণাম করল। কিন্তু তখনই চলে গেলনা—কেমন দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে।

সোমদেব প্রসন্ন মুখে বললেন, কিছু বলবার আছে মা?

মালিনী বললে, দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে ছিল আপনাকে। যদি অভয় দেন।

—ভয়ের কী আছে মা? যখন যা মনে আসবে অসংকোচে জিজ্ঞাসা করো। দ্বিধার কোনো কারণ নেই। বসো—কী বলবে বলো।

সোমদেবের আসন থেকে কিছু দূরে মাটিতে বসে পড়ল মালিনী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, মহাপ্রভু সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন?

—মহাপ্রভু? এমন একটা মহাপ্রভু আবার কে এল?—সোমদেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

—চৈতন্য? সেই পাগলটা?—সোমদেবের রক্ত চোখে বিরক্তির জ্বালা ঝিলিক দিয়ে উঠল: সে আবার মহাপ্রভু হল কেমন করে?

সংকুচিত হয়ে মালিনী বললে, লোকে তাই বলে।

—অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীই নিজেকে মহাত্মা বলে পরিচয় দেয়, তাই বলে বুদ্ধিমান লোকে কখনো তাদের মহাপুরুষ ভেবে পূজো দেয়না।

মালিনী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

—গৌড়ে কী হয়ে গেছে তা শুনেছেন? নবাবের দুজন প্রধান উজীর—

সোমদেব বাধা দিলেন: এ ঘটনা এমন নতুন কিছু নয়, যার জন্যে এতখানি বিস্মিত হতে হবে। এর আগেও অনেক মূর্খ এই সব সাধু-সন্ন্যাসীর ভাঁওতায় ভুলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

—কিন্তু গুরুদেব—মালিনী দ্বিধাজড়িত গলায় বললে—যাঁরা চৈতন্যকে দেখেছেন তাঁরা বলেন তিনি সহজ মানুষ নন। তাঁর কাছে যে যায়, সেই তাঁর কাছে মাথা নত করে। আশ্চর্য শক্তি আছে তাঁর।

সোমদেবের রক্ত চোখে এবার ক্রোধ ঝলসে উঠল: ও শক্তির নাম সম্মোহন-বিদ্যা। ওটা অনার্য প্রক্রিয়া—ওকে অভিচার বলে।

—তাঁর কণ্ঠের গান নাকি অপূর্ব।

—অনেক নর্তকীর কণ্ঠই অপূর্ব। তুমি কি বলতে চাও তারাও মহাপুরুষ?

বিষণ্ণ মুখে মালিনী বললে, কিন্তু তা হলে লোকে এমন

করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? কেন বৈষ্ণবের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন?

—তার কারণ, লোকের দুর্বুদ্ধি হয়েছে বলে। তার কারণ, দেশে নিদান-অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে। কাপুরুষেরাই শক্তির সাধনা করতে ভয় পায়। তারাই বলে, অহিংসার মতো ধর্ম নেই। ওটা দুর্বলের আত্মতৃপ্তি।

— গুরুদেব!

সোমদেব বললেন, একটা কথায় তোমায় স্পষ্ট করে বোঝাতে চাই মা। যখনি এই দুর্বলের অহিংসা ধর্ম দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তখনি তার পরিণামে এসেছে সর্বনাশ। একদিন বুদ্ধ এনেছিল এই ক্লীবতার বন্যা—মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছিল জাতির—সেই পথ দিয়ে দেশে পাঠান এল। আজ আবার যখন উপযুক্ত সময় এসেছে, যখন মোগল-পাঠানের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবার হিন্দুর মাথা তুলবার সময় এসেছে—তখন দুষ্টগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে এই বৈষ্ণবের দল। যাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া উচিত ছিল, তাদের হাতে দিয়েছে খোল-করতাল। দেশশুদ্ধ এই বীর্যহীনের দল যখন গলা ফাটিয়ে অহিংসার জয়গান গাইবে, তখন সেই অবসরে ক্রীশ্চান এসে রাজা হয়ে বসবে। তাই দেশের মঙ্গলের জন্যেই এই ফোঁটা-তিলকওলাদের ধরে প্রহার করা উচিত—নিপাত করলেও পাপ নেই!

গুরুদেবের ভয়ঙ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বাড়াবার সাহস পেলনা মালিনী। আরো কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে সামনে থেকে উঠে চলে গেল। সেই চলে-যাওয়াটা সোমদেবের ভালো লাগলনা।

তিক্ততাকে চরম করে তুলল কেশব এসে।

—গুরুদেব, আপনি কি মনে করেন না দেশে আজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রয়োজন আছে?

—প্রয়োজন!—সোমদেব সরোষে বললেন, আজ ওদেরই সকলের আগে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া উচিত।

—কেন? —শিষ্য হয়েও নৈয়ায়িক কেশব তর্ক করতে ভয় পেল না: আমার তো মনে হয়, ঠিক এই মুহূর্তে সমন্বয়ের যে-পথ চৈতন্য নিয়েছেন, তার চাইতে মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারত না।

—যথা?—অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো জানতে চাইলেন সোমদেব।

—আজ দেশের এত লোক কেন ইস্লাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, এ-সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন কি?

তেম্নি রুদ্ধ ক্রোধে সোমদেব বললেন, ভাববার মতে কিছুই নেই। বিধর্মীরা তলোয়ার দেখিয়ে, মুখে গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জোর করে মুসলমান করেছে তাদের।

—এটা আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

—অর্থাৎ? কী বলতে চাও, স্পষ্ট বলো।

কেশব ইতস্তত করতে লাগল: গুরুদেব যদি ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেন, তবেই দুচারটে কথা বলতে পারি। কিন্তু উত্তেজিত হলে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই চলেনা।

সোমদেব একবার ওষ্ঠ দংশন করলেন—যেন প্রাণপণে আত্মসংযম করতে চাইলেন। দেখাই যাক, কেশবের দৌড় কতখানি। দেখাই যাক, তার মূর্খতা এবং অন্ধত্ব কতদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে।

—আমি উত্তেজিত হবো না। তুমি বলে যেতে পারো।

কেশব বললে, দেশের বৌদ্ধদের প্রতি আমরা সুবিচার করিনি।

—যারা বেদ-বিদ্বেষী, তাদের সম্বন্ধে সুবিচারের প্রশ্ন ওঠে না।

—কিন্তু অত্যাচারের প্রশ্নটা ওঠে বইকি। দিনের পর দিন তাদের যে-ভাবে দলন করা হয়েছে, যে-ভাবে তাদের ওপর নির্বিচারে উৎপীড়ন চালানো হয়েছে, তারই ফল আমরা পাচ্ছি গুরুদেব। আজ ইস্লাম তাদের আশ্রয় দিচ্ছে—সে আশ্রয় তারা কেন গ্রহণ করবে না? আত্মরক্ষার জন্যেই এ পথ তাদের নিতে হয়েছে।

—তুমি কি বলতে চাও বৌদ্ধদের মাথায় তুলে পূজো করতে হবে?

—আমি কিছুই বলতে চাইনে গুরুদেব। আমি শুধু আজ যা ঘটছে তার কারণটাই বিশ্লেষণ করতে চাইছি।

আবার নীচের ঠোঁটে দাঁতগুলো চেপে ধরলেন সোমদেব আবার আত্মসংযম করতে চাইলেন। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, বেশ, বলে যাও।

—তারপরে যারা নীচ জাতি, তারাও আমাদের কাছে

লাঞ্ছনা আর অপমানই পেয়ে এসেছে এতকাল। অস্পৃশ্য বলে যাদের ছায়া আমরা মাড়াইনি—ইস্‌লাম তাদের ধর্ম মন্দিরে ওঠবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রভু—এই কারণেই আজ দেশে মুসলমান বাড়ছে। শুধু তলোয়ারের ভয়ে নয়, শুধু গো-মাংসের জন্যেও নয়।

—বুঝলাম। অর্থাৎ চণ্ডাল এবং রাঢ়দেরও আজ কোলে টেনে নিতে হবে।

—ওই রকম একটা কোনো উপায় ভেবে দেখতে হবে গুরুদেব। নইলে হিন্দুই আর থাকবে না—হিন্দুর সাম্রাজ্য তো দূরের কথা।

রুক্ষ ব্যঙ্গের একটা তিক্ত হাসি সোমদেবের মুখে ফুটে উঠল: তোমার ন্যায়শাস্ত্র পড়াটা দেখছি মিথ্যে হয়নি কেশব। তার অর্থ, তুমি বলতে চাও—আজ একটি সর্বজনীন ধর্ম দরকার? যেমন বুদ্ধ দাঁড়িয়েছিল জাতির বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে—সেই রকম?

—কারো বিরুদ্ধেই নয় গুরুদেব, কারো সঙ্গে শত্রুতা করেই নয়। আজ ইস্‌লাম যেমন সমস্ত মানুষকে স্বীকার করে নিয়ে একটা উদার ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি ঔদার্যও আমাদের দরকার।

—তোমাদের চৈতন্যও বুঝি তাই করছে?'

—আমার সেই কথাই মনে হয় গুরুদেব।

—চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ—সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে?

কেশব থতমত খেয়ে গেল: আলিঙ্গন না হোক, অন্তত কিছুটা উদারতার প্রয়োজন কি দেখা দেয়নি?

—কিন্তু এতদিনের ধর্ম? পিতৃ-পিতামহের সংস্কার?

—কিছু যাবে, কিছু থাকবে। সেই তো ভালো গুরুদেব। সম্পূর্ণ সর্বনাশ হওয়ার আগে অর্ধেক ত্যাগটাই কি বিধেয় নয়? সব রাখতে গিয়ে সব হারানোর চাইতে কিছু দিয়ে বাকীটা বাঁচানোর চেষ্টাই তো প্রাজ্ঞের লক্ষণ।

কেশবের দিকে এবার কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে রাখলেন সোমদেব। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। দুটি আরক্তিম চোখ জেগে রইল দুটো পঞ্চমুখী জবার মতো—তাতে ক্রোধের উত্তাপ নেই, আছে ঘৃণার প্রদাহ। অল্প অল্প হাওয়ায় মাথার জটাগুলো দুলতে লাগল—যেন ছোবল মারবার আগে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে একদল বিষধর সাপ।

তারপর তিক্ত গম্ভীর গলায় সোমদেব বললেন, ধর্ম, সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যুটাও গৌরবের কেশব। বৈষ্ণবের ধর্মহীন ভণ্ডামির আড়ালে আত্মরক্ষা না করে দেশশুদ্ধ লোক মুসলমান হয়ে যাক কেশব, তাই আমি চাই।

—কিন্তু গুরুদেব, চৈতন্যদেবকে আপনি দেখেননি।—অত্যন্ত সংহত মনে হল কেশবকে।

—আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।

—আমি তাঁকে দেখেছি।—তেমনি স্থির শান্ত ভঙ্গি কেশবের।

—তাতে আমার কিছু যায় আসেনা।

কেশব দু হাত যোড় করলে: আমাকে ক্ষমা করবেন। চৈতন্যদেবকে আমার মহাপ্রভু বলেই মনে হয়েছে—তাঁকে ধর্মহীন ভণ্ড বলে ভাবতে পারিনি।

দুর্নিবার ক্রোধে সোমদেব স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলতে গিয়েও মাত্র কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই আর খুঁজে পেলেন না।

—তোমাকে আমি মহাশক্তির মন্ত্রই দিয়েছিলাম কেশব। আমার প্রতিজ্ঞার কথা তুমি জানো।

—জানি।—কেশবের স্বর আবার ক্ষীণ হয়ে এল। কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছে সে।

—কীর্তন গাইবার বাসনা যদি প্রবল হয়ে থাকে, দু চারদিন পরে সে সখ মেটালেও কোনো ক্ষতি নেই। তুমি নৈয়ায়িক—তর্ক করবার রীতিও তোমার জানা আছে। এ কথা মানি। কিন্তু সে তর্কের চাইতে কাজের প্রয়োজনটাই এখন সব চেয়ে বেশি।

—আপনি আশীর্বাদ করুন—হঠাৎ সোমদেবের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে গেল কেশব—ঠিক যেমন ভাবে উঠে গিয়েছিল মালিনী।

কিন্তু সেই থেকে একটা গভীর সন্দেহে সংকীর্ণ হয়ে আছেন সোমদেব। কোথাও যেন একটা দাঁড়াবার মতো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। হাল তিনি ছাড়তে চান না—কিন্তু হালই ছেড়ে যেতে চাইছে হাত থেকে। একটার পর একটা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আবর্তের পরে আবর্ত। সংশয়ের পরে সংশয়।

কাদের জাগাতে চাইছেন সোমদেব? কে জাগবে?

অসহ্য অন্তর্জ্বালায় তিনি ভাবতে লাগলেন—নিজেদের পরিণামকে এরা নিজেরা ডেকে আনতে চাইছে—এদের পথ দেখাচ্ছে অন্ধদৃষ্টি নিয়তি। হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। হয় দুর্বল, নয় দাসানুদাস। হয় পলাতক, নইলে তার্কিক।

তবু—তবু! সুযোগ মাত্র একবারই আসে। আসে বহুদিন ধরে লগ্ন গণনার পরে—আসে বহু প্রতীক্ষার আর অধীরতার অবসানে। সেই সুযোগকে হাতে পেয়ে দূরে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত নন তিনি।

বাধা যত ভেবেছিলেন, তা তার চাইতে ঢের বেশি। কেশব সেখানে আর একটা নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কিন্তু একা কতদিক সামলাবেন তিনি? শুধু হাল ধরাই তো নয়! পাল তুলতে হবে—নৌকোর তলার ছিদ্র দিয়ে যে জল উঠছে, রুখতে হবে তারও সম্ভাবনা। মুসলমান—খ্রীশ্চান - তারও পরে বৈষ্ণব!

উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালেন সোমদেব। বাইরে একটা বিরাট পিপুল গাছের বিশাল ছায়া—তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশে বৃশ্চিক রাশির আগ্নেয় পুচ্ছ। এই অন্ধকার—ওই অগ্নি-সংকেত! এই দুইয়ে মিলে কোনো কথা কি বলতে চায় তাঁর কাছে? দিতে চায় কোনো নতুন ইঙ্গিত?

অকস্মাৎ খরবেগে উল্কা ঝরল একটা। অতিরিক্ত উজ্জ্বল—অস্বাভাবিক বড়ো। আকাশের অনেকখানি আলো হয়ে গেল—যেন বিদ্যুতের চমকে পিপুলগাছের ছায়ামূর্তিটা পর্যন্ত একবার চকিত হয়ে উঠল।

ওই উল্কার সঙ্গে তাঁর জীবনের কি কোনো মিল আছে? অমনি উজ্জ্বল আত্মদাহী তাঁর বিকাশ, আর অন্ধকারের শূন্যতায় ওই ভাবেই তাঁর পরিনির্বাণ?

উত্তর পেলেন না। শুধু পিপুল গাছের পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হল।

* * * *

ভোর বেলায় একটা উৎকট অস্বাভাবিক কোলাহলে উঠে বসলেন সোমদেব। তখনো ব্রাহ্মমুহূর্ত আসেনি—জানালার বাইরে আকাশে ভোরের রঙ্ ধরেনি। শুকতারা তখনো ঘুমন্ত—তখনো পাখিদের চোখ থেকে পাকা ফল আর নতুন শাবকের স্বপ্ন মুছে যায়নি।

উঠে বসলেন সোমদেব। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কীর্তন হচ্ছে—বৈষ্ণবের কীর্তন! এই কেশব পণ্ডিতের বাড়িতে!

কিন্তু শুধু তো কীর্তন নয়! সে-যেন বহু কণ্ঠের উতরোল্ কান্না! যেন বুকফাটা আর্তনাদ!

"কী কহসি, কী পুছসি শুন পিয় সজনী,
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী!
নয়নক নিঁদ গই, বয়নক হাস—
সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—"

ক্ষিপ্র উত্তেজনায় বেরিয়ে এলেন সোমদেব। এসে দাঁড়ালেন কেশবের প্রাঙ্গণে।

না—এ স্বপ্ন নয়! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবার কোনো হেতুই নেই কোথাও!

উন্মত্তের মতো একদল মানুষ খোল-করতাল বাজিয়ে তাণ্ডব নাচছে প্রাঙ্গণের মধ্যে। দু চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে তাদের। আট দশ জন অচেতন হয়ে পড়ে আছে—মালিনী তাদের একজন।

বিমূঢ় ভাবটা কাটতে সময় লাগল না সোমদেবের। তার পরেই ক্রুদ্ধ বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈষ্ণবদের মধ্যে। ঠিক মাঝখানেই ছিল কেশব—এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চেপে ধরলেন।

—কী হচ্ছে কেশব? কী এ?

কেশব তাকালো। তাকালো যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে। জলে তার দু চোখ আবছা হয়ে গেছে।

—এর অর্থ কী, কেশব?

—পরম দুঃসংবাদ আছে প্রভু!—কান্নায় অবরুদ্ধ গলায় কেশব বললে, নীলাচলে চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেছেন!

—তাতে তোমার কী?—নির্মমভাবে দাঁতে দাঁত ঘষলেন সোমদেব: তাতে তোমার কী কেশব? নির্বোধ, তুমি মহাশক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত—

—না—না!—কেশব আর্তনাদ করে উঠল: আমি বৈষ্ণব।

—তবে চেপে রেখেছিলে কেন একথা? আগে বললে তোমার ঘরে আমি জলগ্রহণ করতাম না!—

সোমদেব হাঁপাতে লাগলেন : আর আমার দীক্ষা? তোমার গুরুমন্ত্র? তার কী হয়েছে?

—কৃষ্ণের নামে আমি গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি!—কেশবের মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল।

—কৃষ্ণ! গঙ্গাজল!

বিশাল শরীরের আসুরিক শক্তি দিয়ে সোমদেব দূরে ছুঁড়ে দিলেন কেশবকে। কেশব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—আর উঠল না! অথচ—এর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও হল না বৈষ্ণবদের ভেতরে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নির্বিকার তারা গেয়ে চলল :

'সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—'

শুধু সেই ছুটন্ত উল্‌কাটার মতোই বাইরের প্রায়ান্ধকারে ছিটকে পড়লেন সোমদেব। চলতে লাগলেন দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে। কিছু হবে না—কিছুই না! শুধু নিজেকেই তিলে তিলে তিনি দাহন করবেন—আগুন জ্বালাতে পারবেন না—বুকের ভেতরে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ছাই জমে উঠবে।

কতদিন পরে—কত বৎসর পরে কেউ জানে না—সোমদেবের রক্তাক্ত চোখ বেয়ে আজ ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল!

ক্রমশঃ
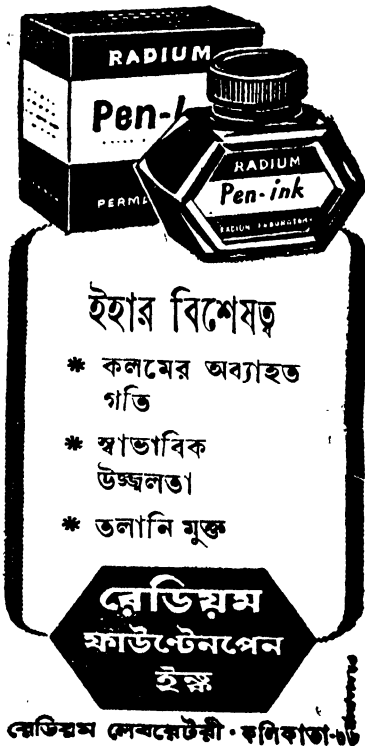
রাজ্য পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব—

গত ১০ই এপ্রিল বর্দ্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মিলনে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রস্তাবে রাজ্য পুনর্গঠন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—"এই সম্মেলন ভারতের রাজ্য সীমা পুনর্নিধারণ কমিশন নিয়োগ করার জন্য ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছে। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, বৃটীশ আমলে কোনও যুক্তি বা নীতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমানা নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই কারণেই নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে বাঙ্গালা দেশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে বার বার খণ্ডিত হইয়াছে। বিপ্লবী বাংলাকে শাস্তি দিবার ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ সরকার এরূপ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পরাধীনতার সময় বাংলার উপর এই অত্যাচারের কোনও প্রতিকার হয় নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথমবার সুচিন্তিতভাবে রাজ্য-সীমানা পুনর্নিধারণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্মেলন সেই জন্য আনন্দের সহিত আশা করিতেছে যে বাঙ্গালার উপর এতকাল যে অবিচার চলিতেছিল, এইবার তাহার প্রতীকার হইবে এবং খণ্ডিত পীড়িত পশ্চিম বাংলার আয়তন বৃদ্ধি পাইবে। সেই কারণে এই সম্মিলন পশ্চিম বাংলার ভিতরের তথা বাহিরের বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণকে আবেদন জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যেন নির্ভীকভাবে অত্যাচারের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের ন্যায্য দাবী ব্যাপকভাবে ও স্পষ্ট কণ্ঠে কমিশনের নিকট আগামী ২৫শে মে তারিখের মধ্যে পাঠাইয়া দেন। এই কমিশনের সামনে যদি তাঁহারা তাঁহাদের দাবী পেশ করিতে ইতস্তত করেন, তাহা হইলে বহুকাল আর তাঁহাদের দাবী বিবেচিত হইবার কোনও সুযোগ ও সম্ভাবনাই থাকিবে না।

প্রস্তাবটি শুধু সময়োপযোগী হয় নাই—সকল দিক দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রস্তাব লিখিত হওয়ায় ইহা সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গবাসী সকল লোক এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার চেষ্টায় ত্রুটি করিবেন না।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ শালা—

নৈহাটীর নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পৈতৃক বসতবাটীর যে বৈঠকখানা অংশে বসিয়া লিখিতেন তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী ও কোবিদ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা গ্রহণ করিয়া তথায় ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কয়েক সহস্র টাকা ব্যয়ে সরকার ঐ গৃহ সংস্কার করিয়াছেন ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়া কমিটীর উপর উহার পরিচালন ভার প্রদান করিয়াছেন—(১) বারাকপুরের এস-ডি-ও শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য সভাপতি (২) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক (৩) শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন—যুগ্ম সম্পাদক (৪) শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী (৫) শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (৬) শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল (৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন প্রতিনিধি (৮) জেলা শিক্ষা পরিদর্শক। সম্প্রতি আসবাব পত্র ও গৃহ ক্রয়ের জন্য কমিটীকে ২ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি যাহাতে ঋষি বঙ্কিমের নামের মর্য্যাদা রক্ষা করে, তাহার ব্যবস্থায় বাঙ্গালী মাত্রেই অবহিত হওয়া কর্তব্য। সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিলেও জনগণের সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ ব্যতীত ঐ প্রতিষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ববঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা—

পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট দল জয়ী হওয়ায় মিঃ এ-কে ফজলল হক সেই দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—৩রা এপ্রিল নূতন মন্ত্রি-সভার নিম্নলিখিত ৪জন শপথ গ্রহণ করিয়াছেন—(১) মিঃ এ-কে-ফজলল হক (২) প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ

সম্পাদক মিঃ আসরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী (৩) মিঃ সৈয়দ আজিজল হক—এডভোকেট ও মিঃ ফজলল হকের আত্মীয় (৪) মিঃ আবু হোসেন সরকার। পূর্ববঙ্গের গভর্ণর মিঃ চৌধুরী খালিকুজ্জমানের নিকট সকলে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। ৪জনই বাঙ্গালাতে শপথ পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। নির্বাচনে লীগদল ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ায় এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হইল। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সহিত পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক মধুর হইলেই মঙ্গলের কথা।

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ সরকার—

কলিকাতায় খ্যাতনামা অধ্যাপক ও দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৩শে চৈত্র মঙ্গলবার শেষ রাত্রে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে যশোহর জেলার লোহাগড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৯ সালে এম-এ পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—১৯২০ সালে তিনি পি-এচ্-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি ইটালীতে যাইয়া তথায় ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কাশীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন—তাঁহার বিধবা পত্নী যশোহরের স্বর্গত নেতা যদুনাথ মজুমদারের কন্যা।

জয়রামবাটীতে সারদা দেবীর মূর্তি—

গত ২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার জয়রামবাটী গ্রামে (বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইতে ২৮ মাইল দূরে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী মাতা সারদামণির শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে মায়ের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঐ দিন তথায় ২৫ হাজার দর্শক ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়,মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও উৎযোগে যোগদান করিয়াছিলেন। সুদূর পল্লীগ্রামে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার ফলে ঐ অঞ্চল ক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

বাঙালীর সম্মান লাভ—

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী দক্ষিণ আমেরিকাস্থ ভেনিজুয়েলার অন্তর্গত ক্যারাকাস্ নগরে হেলাড়ো ক্লাবের নব প্রতিষ্ঠিত কারখানায় তিন বৎসরের জন্য আইসক্রীম প্রস্তুত বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুজ এবং গৌরীপুর ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যাদবপুর কলেজ হইতে অনার্স পাইয়া

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ প্রথম স্থান অধিকার করেন। সুখ্যাতির সহিত ইনি বহুকাল ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম ফ্যাক্টারীর চীফ কেমিষ্টের পদে কার্য করিতেছেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজএ ভেনিজুয়েলা যাত্রা করিয়াছেন। ম্যাগনেলিয়া কোম্পানীর বর্তমান মালিক সদাশয় শ্রীযুত ব্রিজমোহন মাঙ্গেনেরিয়ার সাহায্যে তাঁহার এই সম্মানজনক পদে যোগদান করা সম্ভব হইয়াছে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ৩রা মে হইতে হুগলী, চুঁচড়া, বাঁশবেড়িয়া, হালিসহর, কাঁচরাপাড়া ও নৈহাটি এলাকা হইতে রেশনিং প্রথা তুলিয়া দিয়া খোলা বাজারে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

চাউলের দর যাহাতে অযথা বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট ঐ সব অঞ্চলে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার ব্যবস্থা করিবেন। সকল রেশন এলাকার লোকই প্রতি সপ্তাহে ১ সের ৫ ছটাক ছাড়াও অতিরিক্ত ৩ সের ১৫ ছটাক চাউল প্রকাশ্য বাজার হইতে ক্রয় করিতে পারিবেন। উহা কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে কার্য্যত রেশন ব্যবস্থার বিলোপ ও বিনিয়ন্ত্রণ। অবশ্য আগামী নভেম্বর মাসে পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন বিবেচনা করা হইবে।

বিমান বহরের অধ্যক্ষ পদে বাঙ্গালী—

গত ১লা এপ্রিল শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ভারতীয় বিমান বহরের সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও প্রধান-সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া এয়ার মার্শালের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এয়ার মার্শাল মিঃ জি-ই-গীবস্ ১৯৫১ সাল হইতে ভারতীয় বিমান বহরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন—সুব্রত এই পদে

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম ভারতীয় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় কলিকাতায় জন্মগ্রহণ ও শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২৯ সালে প্রথম ইংলণ্ডে যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। ১৯৪৮ সাল হইতে তিনি চিফ অফ্ এয়ার ষ্টাফ পদে কাজ করিতেছিলেন। একজন বাঙ্গালীর এই কৃতিত্ব লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

সাহিত্য সম্মেলন—

গুড্ ফ্রাইডের অবকাশে মাদ্রাজের আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন হইতেছে, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব পি-ই-এন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে 'বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস পি-ই-এন প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে সুচিন্তিত নিবন্ধ রচনা ও পাঠের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকেই আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কবি মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ২৩শে এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইবেন। বাঙালী এবং বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন প্রত্যেক বাঙালীই চিন্তান্বিত। এ বিষয়ে বাংলার সবত্রই এখন আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি নরেন্দ্রবাবুর আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে নূতন আলোক দেখিতে পাইব।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির জাতীয়-সম্পত্তি—

গত ৩ঠা এপ্রিল রবিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ৯২তম জন্মোৎসব সভায় বক্তৃতা দানকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভাপাল শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে শুধু ভারতের নানা স্থান হইতে নহে, বিশ্বের নানা স্থান হইতে বহু তীর্থযাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। তথায় সর্বদাই ভিড় লাগিয়া থাকে। ঐ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ স্থানটি উপযুক্ত মর্যাদার সহিত রক্ষা না করিয়া উহা ব্যবসার স্থানে পরিণত করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকের কর্তব্য—ঐ স্থানটি একটি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহার উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। আমরা শৈলকুমারবাবুর এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার মত ব্যক্তি মনোযোগী হইলে ঐ কার্য্য অতি সত্বর সম্পাদিত হইবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জিট্রফি ফাইনাল ঃ

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত চলতি বছরের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইদল ৮ উইকেটে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান হোলকার দলকে হারিয়ে রঞ্জিট্রফি জয়ী হয়েছে। উভয়দলের মধ্যে শতরাণ করার কৃতিত্ব লাভ করেন বোম্বাইদলের রোসী মোদী—রাণসংখ্যা ১৪১। তারপরই উল্লেখযোগ্য রাণ এম কে মন্ত্রী (বোম্বাই) ৯১ এবং হোলকারদলের পক্ষে সি টি সারভাতে ৮২, কে রঙ্গনেকার ৫৪ এবং জগদল ৫৩। মানকাদ উভয়দলের মধ্যে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন—দুই ইনিংসে মোট ১২৬ রাণে ৭ উইকেট। হোলকারদলের পক্ষে সারভাতে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন—প্রথম ইনিংসে ৮২ রাণ করেন এবং বোম্বাইদলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬১ রাণে ৫টা উইকেট পান। এই নিয়ে বোম্বাইদল ৭বার রঞ্জিট্রফি জয়লাভ করলো এবং রাণার্স-আপ হয়েছে একবার—১৯৪৮ সালে হোলকারদলের কাছে ফাইনালে পরাজিত হয়ে। রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব বোম্বাই দলেরই।

হোলকার ঃ ২৯২ (সারভাতে ৮২; রঙ্গনেকার ৫৪। গুপ্তে ৯৫ রাণে ৩ এবং মানকাদ ৬৫ রাণে ৩ উইঃ) ও ১৯৩ (জগদল ৫৩; মুস্তাকআলী ৪৭। মানকাদ ৬১ রাণে ৪ এবং শঙ্কর ৬০ রাণে ৩ উইঃ)

বোম্বাই ঃ ৩৭৬ (মোদী ১৪১; মন্ত্রী ৯১। সারভাতে ৭৬ রাণে ৪ এবং গাইকোয়াদ ১৩৫ রাণে ৩ উইঃ) ও ৮৯ (২ উইকেটে। আপ্তে ৩৪ নট আউট)

ভারতীয় হকিদলের মালয় সফর ঃ

বলবীর সিংয়ের নেতৃত্ব ভারতীয় হকিদল মালয় সফরে মোট ১৬টি খেলায় যোগদান করে এবং সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে স্বদেশে ফিরেছে। ষোলটি খেলায় ভারতীয় হকিদল বিপক্ষদলগুলিকে ১২১টি গোল দেয় এবং গোল খায় মাত্র ৭টি। এই দলের অধিনায়ক এবং বিগত অলিম্পিক খেলোয়াড় বলবীর সিং একাই ৪৫টি গোল দিয়ে দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক গোল করার সম্মান লাভ করেন।
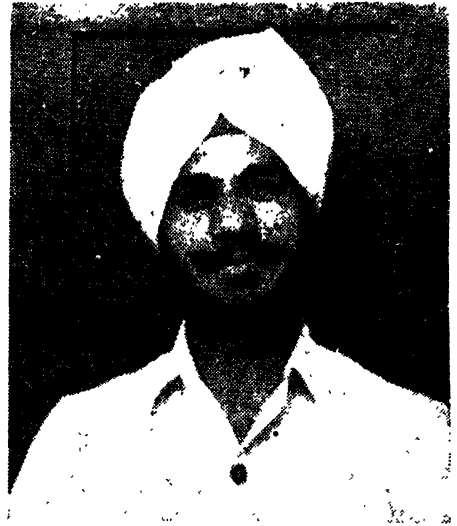
বলবীর সিং (মালয় সফরে ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক (৪৫টি) গোল দেন

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

১৯৫৪ সালের অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বার্ষিক বাচ চালনা প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ৪½ লেংথে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়দলকে পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতার দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে অক্সফোর্ডের সময় নিয়েছে ২০ মিঃ ২৩ সেঃ। গত ২৫ বছরের প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ডের এই পঞ্চম জয়।

ওলালকট (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

উভয়দলের মধ্যে এই বাচ চালনা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮২৯ সালে। ঐ সময় থেকে এ পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে ৫৪ বার এবং অক্সফোর্ড ৪৫ বার। মাত্র একবার, ১৮৭৭ সালে প্রতিযোগিতা অমীমাংসিত থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাঁচ বছর কোন প্রতিযোগিতাই হয়নি। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ছয়টি প্রতিযোগিতা হয় সেগুলিকে সরকারী ফলাফলের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। টেম্স নদীর ওপর পুটনি থেকে মর্টলেক পর্য্যন্ত ৪ মাইল ৩৫৭ গজ দূরত্ব নিয়ে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচার করলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালীন প্রতিযোগিতাগুলির ফলাফল ধরলে দেখা যায়, গত ৯ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪) কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে ৬ বার এবং অক্সফোর্ড ৩ বার। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ—পৃথিবীর অতি প্রাচীন এবং খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুই দলের বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কেবল ইংলণ্ডের ক্রীড়ামহলেই সীমাবদ্ধ নয়। যে সব কারণে এই প্রতিযোগিতাটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে প্রভূত মর্য্যাদা লাভ করেছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল, 'অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বোট রেস' খাঁটি অ-পেশাদার প্রতিযোগিতা। ক্রীড়ামহলে পেশাদার এবং অ-পেশাদার এই দুইয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ নিয়ে কত বাক্ বিতণ্ডা চলছে—আন্তর্জাতিক ভিত্তির ওপর এই দুইয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা আজও নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতা যে অ-পেশাদার প্রতিযোগিতা সে সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁরা এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন তাঁরা হ'লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—তাঁরা যে অ-পেশাদার এমন কি প্রতিযোগিতাটিও যে খাঁটি অ-পেশাদার তার প্রমাণ হ'ল, এই প্রতিযোগিতায় কোন দলকেই ট্রফি, এমন কি সার্টিফিকেট দিয়েও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা নেই। এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষ মহলের পক্ষ থেকে দর্শকদের কাছ থেকে কোন রকম দর্শনী আদায়ও করা হয় না।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টেষ্ট ঃ

এবার ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট ক্রিকেট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেল। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে প্রথম দুটি খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়, তৃতীয় এবং ৫ম টেষ্টে ইংলণ্ড জয়ী হয় এবং চতুর্থ টেষ্ট অমীমাংসিত যায়। ফলে টেষ্ট সিরিজটি ড্র যায়। ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয় ১৯২৮ সালে। এই দুই দেশের টেষ্ট খেলার ফলাফল বর্ত্তমানে এই রকম দাঁড়িয়েছে—মোট খেলা ৩০, ইংলণ্ডের জয় ১১, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১০, খেলা ড্র ৯। 'রাবার' লাভের ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে—ইংলণ্ডের জয় ৩, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ এবং সিরিজ ড্র ২ বার।

পোর্ট অফ্ স্পেনে অনুষ্ঠিত ৪র্থ টেষ্ট খেলা ড্র গেছে।

১ম ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬৮১ রাণ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ৫৫৮ রান, টেষ্ট ব্রিজ, ১৯৩০।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৬৮১ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

উইকস ২০৬, ওরেল ১৬৭, ওয়ালকট ১২৪, এ্যাটকিন্সন্ ৭৪।) ও ২১২ (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওরেল ৫৬, ওয়ালকট ৫১ নট আউট এবং এ্যাটকিন্সন ৫৩ নট আউট)

ইংলণ্ড : ৫৩৭ (মে ১৩৫, কম্পটন ১৩৩, গ্রেভনী ৯২। কিং ৯৭ রাণে ২ এবং ওয়ালকট ৫২ রাণে ৩ উইঃ) ও ৯৮ (৩ উইকেটে)

কিংষ্টোনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৯ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজ ড্র করেছে। ৬ দিনের খেলা পঞ্চম দিনের খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগেই শেষ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ১৩৯ (ওয়ালকট ৫০। বেল্লী ৩৪ রাণে ৭ উঃ) ও ৩৪৬ (ওয়ালকট ১১৬; ষ্টলমেয়ার ৬৪)

ইংলণ্ড : ৪১৪ (হাটন ২০৫; ওয়ার্ডলে ৬৬। সোবার্স ৭৫ রাণে ৪ উঃ) ও ৭২ (১ উইঃ)

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ১১জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬ জন এবং ইংলণ্ডের ৫ জন। সর্ব্বোচ্চ

এভার্টন উইকস (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

রাণ করেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওয়ালকট ২২০ রাণ—২ টেষ্টের ১ম ইনিংসে। তিনজন খেলোয়াড় ডবল সেঞ্চুরি করেন—২২০ ওয়ালকট, ২০৬ উইকস (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ২০৫ হাটন (ইংলণ্ড)।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা :

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত পুরুষদের জাতীয় হকি প্রতি যোগিতায় দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাবদল ·১ গো গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেসদলকে হারিয়ে রঙ্গস্বামী ক জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনালের শেষ সময়ে পাঞ্জ গোল দিলে খেলাটী ১-১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দি খেলায় পাঞ্জাবদল খেলার আরম্ভ থেকেই আক্রমণ চালি খেলে এবং বিশ্রাম সময়ে পাঞ্জাবদল ২-০ গোলে অগ্রগ থাকে। বিশ্রামের পরই সার্ভিসেসদল অল্প সময়ের ম ২টি গোল শোধ দেয়—ফলাফল দাঁড়ায় ২-২। পাঞ্

খেলার শেষের দিকে বিজয়সূচক গোল করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৩ সালের ফাইনালে সার্ভিসেসদল ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়েছিল। এই নিয়ে প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ৭বার জয়ী হ'ল—এত বেশীবার কোন দলই চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়নি। তাছাড়া উপর্যুপরি ৩বার (১৯৪৯-৫১) চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে পাঞ্জাব রেকর্ড করেছে। পাঞ্জাব রাণার্স-আপও হয়েছে ৪বার। আলোচ্য বছরে ১৯৫২ সালের চ্যাম্পিয়ান বাংলাদল ০-৩ গোলে পাঞ্জাব-দলের কাছে পরাজিত হয়।

নিউজিল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা টেষ্ট ম্যাচ ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যাণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেট সিরিজের পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪-০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' সম্মান লাভ করেছে। একটি টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। বিগত ২৩ বছর পরে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজ দেশে প্রথম টেষ্ট সিরিজ খেলে এই প্রথম 'রাবার' লাভ করলো। শেষ 'রাবার' লাভ করেছিলো, ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে ঐ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম টেষ্ট ম্যাচে ২৮ রানে ইংলণ্ড হারিয়ে দেয় এবং বাকি ৩টি টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউ অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে পর চারবার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কুহকিনীর ফাঁদ" (২য় সং)—২৲

পুষ্পলতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "নীলিমার অশ্রু" (২য় সং)—৩৷৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নিষ্কৃতি" (২৫শ সং)—১৷৹

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (২৯শ সং)—২৷৹

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অদৃষ্টের পরিহাস"—৷৷৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জীবন-সাথী"—২৲

শশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "আনন্দ-ভবনে মোহন"—২৲, "মোহন ও শিশু যুবরাজ"—২৲, "বায়ুসেবনে স্বপন"—

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রণীত উপন্যাস "বিদ্রোহী"— ৩৲৹

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "ছায়া"—১৷৹

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ"

শ্রীশৈলেশ্বর সেন প্রণীত উপন্যাস "ধনিকের মেয়ে"—৩৲

শ্রীআনন্দ প্রণীত উপন্যাস "দৃষ্টিধারা"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

জ্যৈষ্ঠ

ভারতবর্ষ

১৩৬১

এই বলেই সবাই 'কোকোলা'কে অভিনন্দন জানায়। স্বপ্নালু সুরভি, সূক্ষ্ম সংমিশ্রন, বিশুদ্ধ উপাদান প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে সকলের চিত্ত জয় করেছে 'কোকোলা'। তাই আজ 'কোকোলা' ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশ তৈল।

বোতলের মুখ 'এ্যালু-ক্যাপসুল' দিয়ে মোড়া, আর ক্যাপসুলের উপর আমাদের কোম্পানীর 'মনোগ্রাম' অঙ্কিত আছে।

COCOLA
কোকোলা
JEWEL OF INDIA PERFUME CO.
CALCUTTA

ক্রয়কালে জাল বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বোতল খুলে দেখে নেবেন ইহা আপনাদের সেই চির-পরিচিত সুগন্ধযুক্ত আসল জিনিষ কিনা। জালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায়।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম
কলিকাতা-৩৪

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১

দ্বিতীয় খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভারতীয় সাধনার ইঙ্গিত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরকালের মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন হচ্চে—কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম—কে সে সমবর্ত্ততাগ্রে, সব কিছুর অগ্রে যিনি—অমৃত যাঁহার ছায়া, যাঁর ছায়া মহান্ মরণ। হিরণ্যগর্ভের হিরণ্ময় দ্যুতি কি তাঁরই প্রকাশ, সবিতার কবিতা কি তাঁরই আবেশ। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে—সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের মনে জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় এই প্রশ্ন নানারূপে জেগেছে, চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনারূপে—কে সে দেবতা, কোন সে শক্তি, কি সে ছন্দ। পশ্চিম সাগরতীরে নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে জিজ্ঞাসা করেছে—কে তুমি, কোথায় তুমি, কোন পথ গ্রাহ্য, কোন পথ বাহ্য। হয়ত মেলেনি উত্তর, হয়ত মনগড়া উত্তর মিলেছে। দিনের তপ্ত আলোয়, রাত্রির সূচীভেদ্য ঘনান্ধকারে, সংসারের মোহমাদকতার মধ্যে আবার ঘর ছাড়ার শশ্মানে বসে সে জানতে চেয়েছে বুঝতে চেয়েছে এই মূল সমস্যাকে, জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে, কর্ম্মদীপ্তি দিয়ে, ভক্তিযোগ দিয়ে। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগ পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মাঝ দিয়ে এই অতি মৌলিক সমস্যার রথ চলেছে—একে অবজ্ঞা করা যায়, Hypostalised sensation in the pit of the stomach বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হয় না। মানুষ পিতৃবীর্যে মাতৃগর্ভে জন্মায়, চোখ মেলে, হাসে কাঁদে গায়, আহার নিদ্রা রতি আরতিতে সময় কাটায়, আবার একদিন তার সমস্ত জীবকোষ শিথিল হয়ে আসে, শ্লথবৃন্ত ফলের মত সে টুপ করে পড়ে মিলিয়ে যায় মহাকালের বিরাম সমুদ্রতটে। তবু এই যাওয়া আসা, চাওয়া পাওয়া, দেওয়া নেওয়ার মাঝে তার মনে জাগে অনন্ত-পিপাসা, অনন্ত জিজ্ঞাসা—অথাতো—কে তুমি, কি তুমি, দেখা দাও দেখা দাও—জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে—

> অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষু পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্
>
> জ্যোক পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তম্ অনুমতে মৃড়য়া ন স্বস্তি

প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দাও—দেখে দেখে আমার তৃপ্তি নেই, আবার আমি দেখবো, উচ্চরন্ত সূর্য্যকে আমি দেখবো। এই সেই মানুষ যে জীবিকার উত্তেজনায় খাদ্য অন্বেষণে হিংস্র হয়েছে, ঘুরেছে বনে অরণ্যে; আদিম প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তবু তার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে সে করেছে জীবনের সন্ধান, সে মেতেছে প্রকাশের লীলায়, উন্মোচনের খেলায়। অরণি কাষ্ঠ থেকে সে খুঁজেছে আগুন, গুহাগুম্ফার গাত্রে আঁচড় কেটে এঁকেছে হিজিবিজি, তারা বিভাসিত রাত্রে আকাশের দিকে

চেয়ে সে বলেছে তুমিই কি সেই। সে বুঝতে চেয়েছে যা তার সীমার মধ্যে, আর যা তার সীমার বাইরে। সব কালের সব মানুষের মনেই এই দ্বৈতের দোলা লাগে। তার আছে আশা, আকাঙ্ক্ষা, কাম কামনা, তিক্ততা লুব্ধতা, গৃধ্নুতা, ভয় ভালবাসা মোহ আবার আনন্দে বিধৃত চেতনা, অপরিমেয় মন। সে সাড়া দিতে চায় রূপে অরূপে, রূপকে প্রতীকে, ভোগে ত্যাগে, ব্যক্তে অব্যক্তে। এই যুগলের অভিসারেই মানুষ বেরিয়েছে তার মানসীকে নিয়ে, মৃণ্ময়ী মনের এই চিন্ময়ী-গতি, যাযাবরী বৃত্তি। সে ছুটেছে জ্ঞানীর কাছে, সে জুটেছে গুরুর দুয়ারে, সে গেছে বিদ্বজ্জন সভায়, শিক্ষার মন্দিরে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণ শালায় বিপুল কর্ম্মের ক্ষেত্রে, আবার ভক্তি গদগদ অশ্রুসিক্ত আঁখিতে সে নামিয়ে দিয়েছে নিজেকে এক রহস্যঘন প্রাণারামের পায়ের তলায়, কখনো বলেছে, 'শরণ লইলাম', কখনো বলেছে 'অংগণ ছীন্ ব্যাকুলভঙ্গ, মুখ পিয় পিয় বাণী হে' (সুরদাস) গঙ্গ ক্ষীণ হোল মুখে শুধু প্রিয় প্রিয় বাণী—আবার বলেছে ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বীর্য্যা, তুমি জাগো ছন্দে সুরে হে অসুর দলনী—এসো তুমি শুধু শক্তিরূপে নয়, ক্ষান্তিরূপে শান্তিরূপে শ্রদ্ধারূপে। একদিন সে বলে—দাও দাও সব দাও, রূপ দাও জয় দাও, যশ দাও, এমন কি ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীং —আবার একদিন সে বলে, নাও, নাও, আবার সব নাও।

যুগ যুগ কেটে যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে মানুষ চলে, শত শত শতঘ্নী সে আবিষ্কার করে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার জয় উন্মাদনার অগগতি। দেশে দেশে সৃষ্টির ধারা, 'চিন্তার রূপ বদলায়, সংস্কৃতির হয় রূপান্তর। নতুন মত, নতুন রীতি, নতুন আঙ্গিক—চলার পথে ভিড় জমায়। আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে নবনব রূপে রূপায়িতা চঞ্চলা নদীর মত সে উপলাহত হয়ে মৃত্যু তীর্থের দিকে এগিয়ে চলে। তবু তার মনে সেই প্রশ্ন থেকে যায়, দ্বিধা জাগে। তারই মাঝে যুগে যুগে দেশে দেশে সাধকভক্ত সন্ত মহাজ্ঞানী মহাজনরা এসেছেন, বলেছেন—মাভৈঃ, তোমরা বিচলিত হয়ো না, তিনি যে দিয়ে গেছেন মহান প্রতিশ্রুতি, আমি আসবো আমি আসবো, সম্ভবামি যুগে যুগে—আমরা জেনেছি সে কথা—বেদাহমেতং তমসার পারে সেই জ্যোতির্ম্ময় পথ তিমিরহরণ আদিত্যবরণ যেখানে বসে, তোমরাও দেখো—অপাবৃণুর সাধনা করো। Hear oh! Israil, The Lord our God is one Lord and thou shall Love thy Lord' শুনতে পাচ্ছ না—Ave Maria, Ave Maria,—Devoutly the priests at the altars are singing—Make your orisons the vespers are ringing. ঐতো 'অহুর মজদা'—Ye who to flame and the light make obeisance, bend low where the blue torches are glowing. সে বলেছে—প্রভু তুমি কি আমাদের ত্যাগ করেছো—Eli Eli Lama Sabakthani'. সে আবার বলেছে—প্রণাম তোমায় 'ওঁ নমো ভগবতে অরহতো তসস্ বুদ্ধায় গুরবে ধর্ম্মায় তরণে,সজ্জায় মহত্তমায় চ। স্মরণ করেছে সেই বিসমিল্লা হের রাহমান্‌এর রহিম আল্লাহো আকবরকে 'From mosque and minar the muezzius are calling, pour forth your praises O chosen of Islam, suiftly the shadows of the sunset are falling." অন্তরা বল্লে'—সুহ বা সুহ বা সুহ বা সুহ (লল্লাদেবী) তিনিই সেই তিনি সেই 'এক ওঁকার সতিনাম করতা পুরখু। মহানের স্মরণ ও শরণ নিয়েও কিন্তু তার সংশয় যায় না বারে বারে, প্রাচীনকালের চৈনিক জ্ঞানীর অনুসরণে সে জিজ্ঞাসা করে—প্রভু আমি কি অগ্রসর হয়েছি, আমার কি পূর্ণত্ব লাভ হয়েছে। লাওসে যেকথা বলেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই জীবনের ছন্দ যে একই সূত্রে গ্রথিত—রহস্যের আধার (অব্যক্ত) ও রহস্যের প্রকাশ (ব্যক্ত) দুইই যে এক। মোট কথা কর্ত্তার ভূত নাড়েও না, ছাড়েও না।

আজকের দিনের মানুষের মনেও সেই এক প্রশ্ন—সেও চায় এই বিচিত্রের, এই অপরূপের, এই অনন্তের রহস্যভেদ। পূর্ব্বগামীদের মত সে হয়ত অশ্রদ্ধা করে না, কিন্তু সে চায় বিচার বিশ্লেষণগ্রাহ্য একটা সুষ্ঠু জীবনবেদ। সে চায় আইনষ্টাইনের ভাষায় "we try to find our way through the maze of observed facts to follow logically from our concept of reality······without belief in the inner harmony of our world, there could be no science. This belief is and always will remain the fundamental motive for all scientific creation." ইলেকট্রণ প্রোটন্ আইসোট্রণ অনুপরমাণুর ঘূর্ণীর রহস্যমধ্যে সেই ছন্দকে (Harmony) ধরবার জন্য শুধু অতীন্দ্রীয়বাদী মরমী ভগবদবিশ্বাসীই ছোটেনা, বৈজ্ঞানিকও অতন্দ্র রাত্রি যাপন করেন। জানি বৈজ্ঞানিকরা সজ্ঞানে একথা স্বীকার করবেন না। কিন্তু তাদের চিন্তার ধারাতেও মহাকবের মহাকালে বাঁধা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছে The universe looks more like a great thought than a great machine (জীনস্)। এতদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছিল যে দেশ কাল ও বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা এবং দেশও কাল বস্তুর আধার। বিজ্ঞানের দৃষ্টিসূত্র ছিল কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (causality) ও প্রকৃতির নিয়মানুগত্য (uniformity of nature)। আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কাল ও বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই,দেশ এবং কাল আধারও নহে আধেয়ও নহে Time and spaceare not containers nor are they contents—they are variants. তাহারা বস্তুর অবধারণমাত্র, কারণ বস্তুর কোন মৌলিক গুণ (primary qualities) নাই। হাইসেনবার্গ শ্রডিঙ্গার (Heisenberg-schrodinger) বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না, তাঁরা দেখলেন শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গমালা (waves of probability) আধারবিহীন বৈদ্যুতিক ভরণের সমষ্টি। ঝড় উঠলো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক মহলে। কাল যে প্রবহমান, কাল যে ক্রমসঞ্চয়ী (Enduring) তাই কালের (Time space continuum) এর উপরে যে শক্তি নৃত্য করছেন—কালং কলয়তি যা সা—মহাকালস্য কলণাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা —সেই তমসাবৃতা ঘোররবা মহাপ্রকৃতির (Primordial Nature

এর স্বরূপকে যে যেদিক দিয়ে চিনতে পারে সেই ধন্য। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বেত্তা জ্ঞাতারাও সেই জ্যোতির্ময় পথযাত্রী সাধকদের সমগোত্রীয়। ত্বং ধ্যায়ন্ জননী জড়চেতা অপি কবি—এই মহাপ্রকৃতির অপার অগাধ রহস্যকে ধ্যান করে মূঢ়ও কবিত্বশক্তি পায়। তাই এই প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকেরও—প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপ কি, শক্তির লীলা, তার ব্যাপ্তি কোন পথে—শেষ পর্য্যন্ত একে mathematical symbolই বলি, প্রেমের লীলাই বলি বা শক্তির খেলাই বলি—এহ বাহ্য আগে কহ আর।

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে যুগে যুগে এই অভীপ্সা নানারূপ নিয়েছে, নানা ছন্দ ধরেছে। সে স্বীকার করেছে, আবার অস্বীকারও করেছে, নানাভাবে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে। বিশ্বের দরবারে বোধ হয় অন্য কোন দেশ নাই যেখানে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এতো ব্যাপক ও এতো বিভিন্নভাবে হয়েছে। ভারতবর্ষের সাধক শিল্পী মনীষি মহান্ কবিস্রষ্টারা এই মানসের অন্তহীন সরস তীর্থযাত্রায় আজও চলেছেন। এই মহামানবের সাগরতীরে এই পরমলাভের আকুতি এক চরমরূপ নিয়ে যুগে যুগে অপরূপ হয়ে উঠেছে। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে কন্যা-কুমারিকা থেকে বদরিকা, দ্বারকা থেকে পরশুরাম ক্ষেত্রে যুগ যুগ বাহি এই যাত্রা। 'অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।' তাই তার শত বৈচিত্র্য শত বিভেদ শত বিবাদের মধ্যেও জেগেছে এক ঐক্যের সুর। সব পথ এসে মিশে গেছে সেই কমলপাণি ভারতাত্মার পদতলে। "It is India bringing a new Divine Symbol: not the cross but the lotus." আমরা মুখে বলি বটে যে ভারতবর্ষ চেয়েছিল সেই পরমকে, অক্ষরকে যিনি সকল বিশ্লেষণের চরমরূপ, যিনি ক্ষরিত হন না, যার রূপ থেকে রূপে যাওয়াই (Becoming) ই স্বভাব, কিন্তু সন্দেহ যায় না এই সত্য অখণ্ড কিনা। এই সংশয়ও উপস্থিত হয় যে—এই জিজ্ঞাসা একটা পরিশ্রান্ত জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পরিচয়—না ব্যবহারিক জগতের দায়িত্ব ছেড়ে পলায়নী মনোবৃত্তি। অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো বোধির এই পঙ্ক্তি বাণী শুধু মুখে বললেই এই অখণ্ড অদ্বয়ের সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। জীবনের প্রতি পর্ব্বে এই ছন্দকে রূপায়িত করতে পারলেই তবে উন্মুখী মন গ্রহণযোগ্য হবে—অতিমানসের অবতরণ সহজ হবে, 'অবিভক্ত যিনি তিনিই ভূতে ভূতে বিভক্ত গীতার এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন, 'এই যে তিনিই জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে—উপনিষদের এই বাণী সার্থক হবে। জীবের কাছে বিশ্ব ধরা দিয়েছে প্রাণরূপে। প্রাণ শক্তিরই তরঙ্গ বিচ্ছুরণ, যে রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার অন্তরালে তারই প্রকাশ। সেই প্রকাশকে যদি বুঝতে চাও তবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয় স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে' নীতিবাদীর কাম ক্রোধ লোভ বর্জ্জনে নয়, অধ্যাত্মবাদীর অতিন্দ্রিয় সন্ধানে নয়, লীলাবাদীর ভাবঘন রসালুতায় নয়, সব কিছু মতের সব কিছু পথের এক সমন্বয় সন্ধানী রসায়নে। সব মিলিয়েই মানুষের সাধনা, সব নিয়েই তার ভোগ, সব দিয়েই তার ত্যাগ। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

"A gaint ignorance surrounds his lore."
"The Light his soul has brought his mind has lost
All he has learned is soon again in doubt
A Sun to him seems the shadow of his thoughts
Then all is shadow again and nothing is true"
(Savitri, Part I Book III Canto IV)

ব্যক্তিগতভাবে শিব বিষ্ণু কালী প্রভৃতি দেবদেবীতে যাঁরা বিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাসী মনকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই—কারণ সেই এক অদ্বিতীয় সত্যকেই নানা প্রতীকে রূপকে তাঁরা দেখেছেন। কিন্তু বিশ্বাসী মন না নিয়েও এই মহান সত্যের যে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণও আমাদের সাধনার পদ্ধতিতে রয়িয়াছে। ভারতের ঐতিহ্যের এই যে মত-সহিষ্ণুতা, উদারত্ব, গ্রহিষ্ণুতা সেটা যেন আমরা না ভুলি। সে কোন আদর্শকেই বর্জ্জন করেনি, অর্জ্জন করবার চেষ্টা করেছে—আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—সবাই এসো—যত মত তত পথ। আধুনিক মন, শিক্ষিত মন, তথাকথিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, ঘটনার পারম্পর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত rational mind অনেক ত্রুটি খুঁজে পাবে—যা আপাতদৃষ্টিতে সত্য ও সঙ্গত বলেই মনে হবে। তাই সত্যদ্রষ্টারা সত্যকে অন্যদিক দিয়ে উদ্ঘাটিত করিবার নানা পন্থা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নাও 'বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতো 'মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম' বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক্, মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোক্—ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতুমাম্ অবতুবক্তারম্ আমাকে রক্ষা করো—বিপদে মোরে রক্ষা করো এ কথা নয়—রক্ষা করো অসত্য থেকে অনৃত থেকে। আমাদের মন্ত্র এক হোক, সংকল্প এক হোক 'সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ তবেই আমরা অনপেক্ষ শুচি দক্ষ গতব্যথ নষ্টমোহ সন্দেহহীন হবো, বলতে পারবো—তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি, বলমসি বলং ময়ি ধেহি, ও জোহস্যোজো ময়ি ধেহি, মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি, সহোহসি সহো ময়ি ধেহি—তুমি তেজ, তুমি বল, তুমি বীর্য্য, তুমি ওজঃ, তুমি অন্যায় দ্রোহী আমাকে তেজস্বী কর, বীর্য্যবান্ কর, বলবান কর, ওজস্বী কর, অন্যায়-দ্রোহী কর।' তবেই, ত এই রোদনভরা জীবনের শেষে রাতি রোদয়িতীতি রাত্রির পারে হবে জ্যোতির্ম্ময়ের আবির্ভাব। তাই উষাকে তাঁরা রূপক করে নিলেন জীবনের উন্মেষ বলে অপূর্ব্ব কবিত্বের মধ্যে।

'তিমির দুয়ার খোলো এস এস নীরব চরণে'

প্রতিটি ভোরে আলোর পর্দ্দা যেমন খোলে তেমনি জীবনের প্রতি ছন্দেও এই আলোর সাধনা চলছে—আলো আলো, আরো আলো। হয়ত তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির রহস্যের পিছনে রহস্যের দেবতাকে—যিনি অগ্নিতে যিনি জলে যিনি সকল ভুবনতলে—যার খবর, পায়ের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—শুন ত নহ কী ধুন কি খবর, প্রতি মুহূর্ত্তে! একে Pantheismই বলি, panentheismই বলি—এ হচ্ছে চিরন্তন মানবমনের রসঘন রহস্যঘন আকুতি। তদেব রম্যং রুচিরং

নবং নবং তদেব শশ্বমনসো মহোৎসবং—রম্য তিনি, নূতন তিনি নিতুই নূতন, মানুষের মনের নিত্য মহোৎসব

বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর

ঋত মানে শুধু সত্য নয়, ঋ মানে চলাও। জগৎ মায়া নয়, মিথ্যা নয়। মায়া বলি কাকে—অসীম বিশাল সত্যকে সীমার রেখায় মিত করে নাম ও রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই মায়া। মাতা ভূমি পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ—আমি পৃথিবীর সন্তান, আমি মহীদাস—হইনা ইতরার পুত্র, তাতে কি—চলতে চলতে যে শ্রান্ত হয় তার যে শ্রীর অন্ত থাকে না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বললেন—ঘুমিয়ে থাকাটাই হোল কলিকাল, জাগলেই দ্বাপর, উঠে দাঁড়ানোটাই ত্রেতা, এগিয়ে চলাটাই সত্যযুগ। চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি ওঁমধু, ওঁমধু ওঁমধু—ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়ম্। অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়মধ্যাত্মং···ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব্বং (বৃহদারণ্যক)।···সেই পুরুষ কে, যিনি হৃদয়পুরে শয়ন করে আছেন—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি, আবার তিনি পুর—অগ্রগমনে। অর্থাৎ এগিয়ে চলো। এই যে মন্ত্র, এই যে তন্ত্র, এই যে তত্ত্বকথা যেখানে মধুমৎ পার্থিবং রজঃ-এর সঙ্গে একাসনে বসেছেন মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, যে চেতনায় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ এক হয়ে যায় তার সঙ্গে আজকের জীবনের বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ কোথায়। তাই এই মধুমন্ত্র শ্রাদ্ধ দিনের মন্ত্র, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতকে আবাহন, মৃত্যুকে আমরা মানিনা—কারণ সমস্ত বিশ্বকে আমার মধুময় করে নিয়েছি এবং সেই মধুর মধ্যে জরা নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই। আথর্ব্বণও সেই স্বপ্ন দেখতেন। সমানী প্রপা সহ বোহন্নভাগ সমানে যোক্তে সহ বা যুনজ্মি" হে বিশ্বমানব তোমাদের পানীয়শালা এক হোক্—তোমাদের অন্নভাগ সমান হউক—সমান ব্রতে ব্রতী হও, একই দেবতার যজ্ঞ কর, সায়ং ও প্রাতঃকালে একই সুমিলনের মন্ত্রে তোমাদের মিলন হোক্। এর চেয়ে বড় সাম্যের কথা কোন ইতিহাসে শাস্ত্রে লিখিত আছে? তর্পণের মন্ত্র মধ্যেও আর এক প্রস্তুতির বীজ। পিতা ও মাতা যাদের সঙ্গে অতি নিকট দৈহিক সম্বন্ধ—তাদের নিয়েই সূত্রপাত হলো শিক্ষার, তারপর পিতামহ মাতামহ, পিতামহী মাতামহী ক্রমশই গণ্ডী বাড়ে—বাড়তে বাড়তে অতীত কুল কোটিনা সপ্ত দ্বীপ নিবাসিনাং স্থাবর অস্থাবর আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত জগতকে আপনার করে নিবার এই যে পুণ্যময় সাধনা এর তুলনা কোথায়। আচ্ছা ভগবান আছেন কি নেই এই নিয়ে মাথা ঘামাতে চাওনা তুমি, বেশ। বুদ্ধদেব বললেন—নিয়ে এসো সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যগ্ সংকল্প, সম্যগ্ কর্ম্মান্ত, সম্যগ্ জীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যগ্ স্মৃতি, সম্যগ্ সমাধি—এই শীলের অনুশীলনেই ফুটে উঠবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা, আত্মদীপ হবে মানুষ, পাবে বহুকল্পদুর্লভা বোধি, জেগে উঠবে সমন্বয়সন্ধানী সমাজ চেতনা, জীবননীতির নির্দ্দেশ। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করো, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, সচ্চেন অলীকবাদিনং,—সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে। জৈনতীর্থংকররাও মূলতঃ সেই কথা বললেন। তরণের পথ অর্থাৎ এই ভবনদীতে জন্মজরামরণকে জয় করবার পথ তারা দেখিয়ে দিলেন। প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করেছেন। জৈনাচার্য্য মহাবীর অবসর্পিনীর শেষ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ নেমিনাথ প্রভৃতি এঁর পূর্ব্ববর্তী। ইঁহাদের মতে দুঃসম দুঃসম যুগ চলছে,—তাই মানুষকে গ্রহণ করতে হবে অহিংসাব্রত, অসত্য ত্যাগ ব্রত, অদত্তাদান ব্রত, ও অপরিগ্রহ ব্রত, হতে হবে অনাগরিক—'ঈষা' ও এষণায় সব বিষয়ে সংযত হতে হবে। আবার এই সেদিনও বেদান্ত কেশরীর গর্জ্জন শুনেছি "Stand up, Assert yourself, Proclaim the God within you, Donot deny Him···Truth is is Stregthening Truth is purity···Faith, faith, faith in ourselves. Do you feel that millions and millions have become next door neighbours to brutes. Do you feel that millions are starving today Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Has it made you almost mad?···The first of all worship is the worship of the Virat, of those all around us—ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য যো বৈ ভূমা তৎ সুখম, নাল্পে সুখমস্তি—সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগতো শিবা। এই যে শিব তিনি কে? সিদ্ধান্তবাদীরা বলবেন—পতি পশু ও পাশ নিয়েই তিনি। কেলতি ওণ্ডে কেলতি পিণ্ডে—নটেশ ক্রীড়া করছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে, আবার আছেন এই হৃদপিণ্ডে—পুরি শেতে—হৃদয়পুরে মাঝে তাঁর নৃত্য চলছে। বিবশ বিশ্ব চেতনায় জাগছে, লীন হচ্চে। তিনি পশুর অর্থাৎ জীবদের অষ্টপাশমুক্ত করছেন তাইত তিনি পশুপতি। সবিকল্প জ্ঞান নির্ব্বিকল্প হয়ে মিশছে গিয়ে শিবানুভবে—শিব এব কেবলং—কেবল শিব, কেবল কল্যাণ। ঐতিহাসিক বলবেন—মহেঞ্জদড়ায় দেখেছি আমরা নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগীশ্বর এক অনার্য্য দেবতাকে, যজুর্ব্বেদীয় শতরুদ্রীয় স্তোত্রে দেখেছি এক বঞ্চক ও তস্করের দেবতাকে, মহাভারতে দেখেছি এক উগ্রতপা ঘোরতপা দিগবাস নগ্নবাসকে, দেখেছি শিশ্নদেববাদীদের, যোনিপূজকদের। আসলে তিনি বিভিন্নযুগের বিভিন্ন মনের মিলনে কল্পনায় রূপায়িত একটি Syncretic deity, কিন্তু ভাবুকের চিন্তায় রসিকের আলপনায় তিনিই চিদানন্দময় তিনিই নেদিষ্ঠ, দ্রবিষ্ঠ, ক্ষোদিষ্ঠ, মহিষ্ঠ, বর্ষিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, বহুলরজস প্রবলতমস গুণ ও সীমা উল্লঙ্ঘন করে শিবশান্ত নিরঞ্জন নিবাত নিষ্কম্প—তাই নীলকণ্ঠ হন শ্রীকণ্ঠ, বিষ হয় অমৃত। তার পঞ্চক্রিয়া, তাঁর অষ্টাদশ মূর্ত্তি তাঁর মতার্থে নানা সম্প্রদায় যেমন শ্রীল কুলিশের নেতৃত্বে পাশুপত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

পিছনে পিছনেই তান্ত্রিকেরা এলেন—বললেন, শিব—বিশ্বের সমস্ত দুঃখ

দুর্দ্দশা, সমস্ত বিষ কণ্ঠস্থ ক'রে নিলেও শক্তিহীন হলেই তিনি নিষ্ক্রিয় —জল স্থির থাকলেও জল, হেলে দুললেও জল—শিব আর শক্তি অভিন্ন। আর সেই ভয়ঙ্করীরই আর এক রূপ শঙ্করী—অসি আর বাঁশী, আলো আর অন্ধকার, জীবন আর সত্য এরা থাকে পাশাপাশি। মায়ের হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ডের পাশেই যে দেখি বর ও অভয়। তিনি যে সৌম্যাতি-সৌম্যা আবার রুদ্রাণী। সেই আদ্যা মহাশক্তির (Primordial Nature) প্রলয়কালীন তমোগুণপ্রধানা প্রমত্ত যে রূপ তাকেই কল্পনা করা হয়েছে মহাকালীরূপে। শিব বা কল্যাণের স্পর্শে যখন তিনি সংযত হয়ে আসছেন তখন রজোগুণপ্রধানা মূর্ত্তিতে তিনি মহা লক্ষ্মী, সত্ত্বগুণ প্রধানা মূর্ত্তিতে তাকেই কল্পনা করলাম মহাসরস্বতী বা কৌষিকী মূর্ত্তিতে, ত্রিগুণাত্মিকায় তিনিই মহেশ্বরী। সাধকের অনুভূতিতে চেতনার স্তরে স্তরে এই শক্তির কল্পনা, লীলার বেদনা স্ফূর্ত্ত হয় মূর্ত্ত হয় রূপনেয়—সবই ভাবরূপ অধিকার ভেদে। যারা ভাবেন দেবদেবীর কল্পনাতে আমাদের সনাতন মন শুধু অহেতুকী পুতুলখেলা করেছে তাদের এই সত্যটি জানা উচিত। এই শক্তিই স্বপ্নরূপে বুদ্ধি থেকে সুরু করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলমান শক্তিমান করে রেখেছে। যোগশাস্ত্র মতে যোগ কর্ম্মসু কৌশলম—আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত তার ক্রিয়া। তন্ত্রতে এই হলো কুণ্ডলিনী। এই শক্তিই বিশ্বরূপা, বিশ্বজন্মা। এঁকেই গীতা বলেছেন যে ইনি সলিলে রস, অনলে তেজ, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, মানুষে পৌরুষ —ইনিই পুষ্ণামি চৌষধীঃ' 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাম দেহমাশ্রিত!) এই শক্তিই সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী- কর্ম্ম জ্ঞান ও আনন্দের প্রস্রবণ। তান্ত্রিকতা বলিতেই আমাদের মনে কদাচারের ছায়া জাগে কিন্তু পঞ্চমকার সাধনার আসল তাৎপর্য্য বুঝিলে তবে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ধরা যায়। সত্য বটে—নানা কদাচার অনাচার এই সাধনার সঙ্গে বিশেষ করে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অধোগতির দিনে জড়িয়ে গিয়ে এই অপাপবিদ্ধ শিবসিদ্ধ আগম যামলতন্ত্রের বিশুদ্ধ পদ্ধতিকে ম্লান করে দিয়েছে, কিন্তু আসলে তন্ত্রকার বলেছেন শক্তি দ্বারাই মুক্তি—অভীঃ হও—কিছুতে বিচলিত হয়োনা। অতিক্রম করে চলে যাও যত কিছু বীভৎসতা কুৎসিতা ক্লেদ গ্লানি—বিভীষিকা লোভ ভয় দূরে পালিয়ে গিয়ে নয়—নিজেকে শোধিত করে—শুধু ছোট ছোট রক্তমাংসের লোভ নয়, দেহটা বিগ্রহ, একেই শোধন করে নাও। রূপান্তরিত হোক তোমার সত্তা যাতে জীবনের গূঢ়তম মজ্জায়, রক্তে তন্তে তন্ত্রীতে শিরায় তার অন্তরতম প্রদেশে প্রকৃতির যে লীলা চলছে শক্তির যে উন্মাদনা, তাকে এমন সীমিত রূপায়িত করো যে সে শক্তি যেন বলদর্পিত না হয় ভোগমত্ত না হয়, লোভী লালসাতুর না হয়। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরও লোভ—আত্মপ্রবঞ্চনা আত্মঅবিশ্বাসের ভয়ও দূর হবে। আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলো, তাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করো—অন্তরে শাক্ত হও, বাইরে শৈব, সভায় বৈষ্ণব তবেই ত তুমি কৌল। তন্ত্রের শেষ উল্লাস সেইখানে।

বৈষ্ণবরাও এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শক্তির তিনরূপ, সে সৃজন করে, সে ধারণ করে, সে সংহার করে। কিন্তু মানুষ চায় আনন্দ, প্রেম, ভালবাসা। ভয় পেলে স্ত্রী গিয়ে লুকোয় স্বামীর বুকে, ছেলে গিয়ে লুকোয় মায়ের কোলে—যে আশ্রয় দেয় তারই কাছে লোকে যায়। বৈষ্ণবী শক্তি ধারিকাশক্তি, পালিকাশক্তি, নারায়ণীশক্তি অর্থাৎ সমষ্টিগত নরের অয়নী বা আশ্রয়-স্বরূপিণী। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে বললেন—সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত। এই শক্তি বলছে আমাকে জানাই তোমার কাজ নয়, তোমাকে জানাও আমার কাজ। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে তাইতো আমি এসেছি এ ভবে—এ হচ্ছে মদীয়া রতি কিন্তু তোমার মাঝেও আমার লীলা হবে—এ হচ্ছে তদীয়া রতি। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে শুধু আমিই বেড়াবোনা—আমার সেই আকুলতা ব্যাকুলতা যদি সত্য হয় তাহলে তোমাকে আসতেই হবে, এই লুকোচুরির খেলায় যোগ দিতেই হবে। কবীরের ভাষায় বলতে গেলে তিন্‌কে হৃদিমে সিরিরাম বসে সেই প্রাণারাম যিনি রমন করছেন আমার হৃদয় মাঝে, সেই হরি যিনি হরণ করছেন শুধু আমার পাপ তাপ দুঃখ দুর্ভোগ নয় আমার মনটিও, সেই কৃষ্ণ যিনি আকর্ষণ করছেন সদাই, চলত গোপি প্রেম সোঁপি। তাই তো এত আনন্দ—এই আনন্দ যদি আকাশে না থাকতো—এরই ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে তিনি পড়েন—এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি না বটে, কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, ঘরদুয়ার কাজকর্ম্ম সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তৈত্তেরীয় উপনিষদ এই সত্যটিকে অপরূপভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন তার ক্রমবিকাশের পন্থা দেখিয়ে। আমাদের এই দেহ আমাদের এই জড়জীবন যে চায় বেঁচে থাকতে রূপরসগন্ধস্পর্শের সীমার মধ্যে সেও তো তারই বিকাশ। তাই অন্নময় আত্মাকে ছেড়ে আমাদের চলবে না, চলতে পারে না; সকলেরই চাই অন্ন তাই অন্নকে বহু করতে হবে—কিন্তু তারও অন্তরে রয়েছেন এক প্রাণময় আত্মা যে দুলছে কাঁপছে 'এজতি' বিশ্বপ্রাণের দোলার সঙ্গে, তারও অন্তরে আছেন এক মনোময় আত্মা রসময় মানসলোকের যিনি প্রতীক, তাঁরও অন্তরে আছেন এক বিজ্ঞানময় আত্মা, বিশেষরূপে বিপুলভাবে ব্যাপক বিশ্ব জুড়ে যে জ্ঞান, তারও অন্তরে আছেন এক আনন্দময় আত্মা এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এই আনন্দযজ্ঞে সকলেরই নিমন্ত্রণ। এই আনন্দেই সব সার্থকতা যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকংততঃ। এই যে সৎচিৎ আনন্দময় সত্তা একেও সকলেই সমানভাবে দেখেন না, কারণ এর রূপ অনন্ত, ভাব অনন্ত, গুণ অনন্ত। সাধ্বের সীমায় তিনি স্তর, অধিকার ও ভাব ভেদে প্রকাশিত হোন, যেমন মল্লদের কাছে তিনি অশনি, স্ত্রীদের কাছে ললনানিষ্ঠ নাগরনারায়ণ মূর্ত্তিমান স্মর, ভোজপতির কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু, জ্ঞানীর কাছে বিরাট, যোগীর কাছে পরমতত্ত্ব। যেখানে যতটুকু বিভূতি আছে ততটুকুই তার প্রকাশ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্নান সেরে মহাপ্রভু বসে আছেন, রায় রামানন্দ এসে হাজির। প্রভু বল্লেন—সাধ্যনির্ণয় কি, রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি

হয়—বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন, বিষ্ণুর আরাধনা ইত্যাদি—

প্রভু বল্লেন—এহ বাহ্য আগে কহ আর

রায় বল্লেন—গীতার নবম অধ্যায়ে বলেছে কৃষ্ণে কর্ম্মসমর্পণ—

যৎ করোসি যদশ্নাসি……

প্রভুর মনঃপূত হোল না—আগে কহ আর

প্রভু মাথা নাড়েন

আচ্ছা, ভক্তি প্রধর্ম্মহারিণী, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি—

ব্রহ্মভূতো প্রসন্নাত্মা নো শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি

প্রভু বল্লেন—এও নয়

আচ্ছা—জ্ঞানবর্জ্জিতা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যখন আর নেই—

প্রভুর টনক নড়ে—এহো হয়, আগে কহ আর

আচ্ছা, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম বাৎসল্যপ্রেম—

প্রভু বলেন—হাঁ। এ উত্তম, কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছলো কান্তাপ্রেমে—'প্রেমা চিন্দীপদীপনম্ মহাভাবে—জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—সমস্ত অনুভূতি পরম রহস্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে চিন্তাহীন ভাবনাহীন উদ্বেগহীন "শান্তম" এর অবস্থা যেখানে শক্তি ভুক্তি মুক্তির উপরে তিনি যে নিরুপাধিক নিরূপদ্রব। রসহেব্যায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি। যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হৈল মন কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।

এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি
কত ভালোবেসেছিনু আমি
অনন্ত রহস্য তার উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে করি দিল একাকার
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব্ব অমৃতে।

তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধনার রূপ আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের চিন্তার ধারায় রসের কল্পনায় নানা স্রোত এসে মিশেছে। কিন্তু সবেরই মিলিত রসায়ন ঐ একই স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের, ভালবাসার মৈত্রীর। মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্কও সেই পর্য্যায়ের।—

ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে প্রাগ্-আর্য্য যুগের কিরাত নিষাদ দ্রাবিড় সভ্যতা লুপ্ত ত হয় নাই—বরং তাদের দর্শন তাদের চিন্তা আর্য্য সংস্কৃতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যেমন করিয়া অসুর বা ইরাণীয়দের চিন্তা যাঁরা ছিলেন 'অসু' বা প্রাণবাদী। ঋগ্বেদের যুগে আমরা পেলাম প্রকৃতিকে ঘিরে শুধু প্রথম মানব মনের উচ্ছাস বা গোষ্ঠী-জীবনের প্রতিচ্ছবি নয় মূল রহস্যকে ধরবার, জানবার চেষ্টাও। ইন্দ্র বরুণ প্রজাপতি অর্যমা অগ্নিকে নয়, বিশ্বকর্মা, রুদ্র, পুরুষ, দেবতাকেও, নার দিয়া সূক্তে প্রকটিত হলো নতুন দার্শনিক মত—সৎ ও নেই, অসৎ ও নেই—দিনও নয়, রাত্রি নয়, অন্তরীক্ষও নয়, আকাশও নয়, মৃত্যু ও না অমৃত ও না। তার পরের ব্রাহ্মণের যুগে একদিকে ক্রিয়াকাণ্ড আচার আচমন, পর্জ্জন্য, মঘবান্, বায়ু, পৃথিবী, রয়ির পূজা, অগ্নিমন্থন, উদ্গীথোপাসনা আবার অন্যদিকে অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, শ্রেয় প্রেয়ের বিচার, যিনি এক, অবর্ণ—তাঁরই স্মরণ ও মনন। কিন্তু তারই ভিতর ফুটে উঠেছে অপ্রমত্ত হয়ে বিষয় সেবার দৃষ্টান্ত এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ নন—ক্ষত্রিয়। রাজর্ষি জনক উপদেশ দিচ্ছেন কাদের—না ব্রহ্মবিৎ শুকদেবকে, সোমশুষ্মকে, যাজ্ঞবল্ক্যকে, শ্বেতকেতুর পিতা রাজা প্রবাহণ জৈবলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, উদ্দালক আরুণির গুরু হচ্ছেন নৃপতি চিত্র গাঙ্গায়ণি, গর্গ বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে পাঠ নিচ্ছেন। পরের যুগে শ্রুতি পেরিয়ে স্মৃতি যখন এলো, পুরাণে লিপিবদ্ধ হলো ইতিকথা, তখনো নানা কাহিনীতে রামায়ণে মহাভারতে ভাগবতে আখ্যানে ব্যাখ্যাত হলো সেই আদর্শের ধারা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাবে সন্ন্যাসবাদ আরো দৃঢ় হলেও প্রেমের অহিংসার মৈত্রীর সঙ্গে মিশে শুষ্ককাষ্ঠ সরস তরুবরে পরিণত হয়েছিল এবং তার প্রধান রস জুগিয়েছিল শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত—আর দুটি একটি বিরাট চরিত্র যেমন ভগবান তথাগত আর শ্রীকৃষ্ণ—শুধু যোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নয়, মানুষ শ্রীকৃষ্ণ, মানুষ রাম, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, সীতাপতি রাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যুগে যুগে এই সব প্রভাবের মধ্যেই ভারতবর্ষ নানা আঘাত প্রতিঘাতে নিজেকে সংহত করে নিয়েছিল। গ্রীক্ হেলিওডোরাস হলেন পরম বৈষ্ণব। ঐতিহাসিক যুগেও এর দুইটি বড় প্রমাণ দেখেছি। ইসলাম এসেছে, প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্ছে তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য নিয়ে, রাজশক্তির মহিমা নিয়ে ভোগশক্তির উপকরণ জুগিয়ে। সত্য সনাতন নীলকণ্ঠ ভারতাত্মা তাকে বর্জ্জন করলেন না, নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে নতুন রূপে অবতীর্ণ হলেন। সারা ভারতবর্ষে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে এক অপূর্ব্ব প্রেমের মন্ত্র বয়ে গেলো—এলেন বৈষ্ণবাচার্য্যরা শুধু দক্ষিণে গুর্জ্জরে, আসামে বাংলায় নয়, দেশের সর্ব্বত্র, এলেন শ্রীগৌরাঙ্গ দেব এক ফুটন্ত ফাল্গুন পূর্ণিমায় "চৌদ্দ শত সাতশক মাসে সে ফাল্গুন, পৌর্ণমাসির সন্ধ্যাক্ষণে হইল শুভক্ষণ।" আবার যেদিন ইংরাজ এ'লো, এলো প্রতীচির দুর্ব্বার স্রোত সেদিনও নিদ্রিত ভারতাত্মা নারায়ণী সেনা পাঠিয়ে দিলেন, ভারত পথ পথিকদের, রামমোহন যার পথিকৃৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যার মধ্যমণি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব "who took the kingdom of heaven by storm" এবং শ্রীবিবেকানন্দ যার শুধু বই পড়ে টলষ্টয় বলেছিলেন যে এ যুগের মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর চেয়ে ঊর্দ্ধে উঠেছে কিনা সন্দেহ।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ত আজকাল পরশুর। আমরা পেয়েছি মহাত্মাজীকে, রবীন্দ্রনাথকে ও মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দকে ও আরো বহু সাধক তপস্বী কবিকে। আজকের যুগের পূর্ণযোগীই বলেছেন একজন বা কয়েকজন মানুষ বিশ্ব সমস্যার চরম সমাধান করবে সেইটেই যথেষ্ট নয়, বিশ্বমানব ও হবে অমৃতের অধিকারী, চেতনার স্তরে স্তরে ভাগবতী শক্তি ও

আলোর অবতরণ চাই সত্তার রূপান্তর, সেইজন্য চাই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গ্রহিষ্ণু করা। সেই গ্রহণের সব চেয়ে বড় পন্থা—আত্মসমর্পণ।

আজকের দিনে এই প্রার্থনাই সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা যে ভারতবর্ষের এই সত্যকার বাণীই যেন জয়যুক্ত হয়—সে বাণী সকলের, সে বাণী বিশ্বের, সে বাণী কাহাকেও দূরে রাখেনা, বর্জন করে না সবাইকে ডেকে বলে আয়ন্তু—আচণ্ডালে ধরি দিবি কোল—শৃণ্বন্তু—শোনো, আমি জেনেছি বেদাহমেতং সাতাশং প্রাণ, প্রাণ তুমি সংস্কারমুক্ত হও। এই বাণীর মহাসাগরে যুক্ত হয়েছেন সব দেশের সব মনীষীরাই সবার পরশে পবিত্র করা এই তীর্থনীর। এই বাণী জগদ্ধিতায় মন্ত্র উচ্চারণ করে যে গভীরতম সত্তায় যুগযুগ ধরে ক্রিয়া করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় "দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই—সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন—যাহা বিরাট যাহা বৃহৎ, যাহা উদার তাহারই জয় হইবে, আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি আস্ফালন করিতেছি আমরা বর্ষে বর্ষে

মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা

এই বিরাটের ভূমিকায়, ভূমার সাধনায়, প্রেমের তপস্যায়, কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, সম্প্রদায় নেই, এই সাধনা যেন আমাদের কর্ম্ম-বিমুখ না করে, রাজসিকতায় মত্ত না করে, তামসিকতায় লিপ্ত না করে, সাত্ত্বিকতায় অহঙ্কৃত না করে। ভারতের সেই চিরন্তনী প্রকৃতিকে যেন আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, বিচার করে গ্রহণ করতে পারি, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি, শক্তি দিয়ে ধারণ করতে পারি, কর্ম্ম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে পারি, নতুন করে রূপায়িত করতে পারি। এই সাধনার যেখানে যেটুকু প্রকাশ বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীতেই হোক্ বা তপস্বীর আশ্রমেই হোক, সাহিত্যে গানে হোক, হাসিতে কান্নাতে হোক, কাজে কর্ম্মে হোক, তাকেই যেন আমরা সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পারি সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা দীনতা নীচতার ঊর্দ্ধে উঠে। কবিগুরুর কথাতেই যাহা প্রতিদিন গড়িতেছে, ভাঙিতেছে যাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক বিরোধ বিদ্বেষের অন্ত নেই যেখানে মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্য, সে সমস্তকেই যেন আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ দিনে ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি। শুধু যে প্রেম যে শক্তি আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্য সম্বলরূপে ধ্বনিত হচ্ছে সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে জয়ে পরাজয়ে, যা আমাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করছে, আজ নির্ম্মল চিত্তে তাকেই যেন উপলব্ধি করতে পারি—সর্ব্বমানবের পরি-প্রেক্ষণিকায়, কর্ম্মসিদ্ধিমতী সাধনায়, চলৎশক্তিমতী কল্পনায়, জ্ঞানের তপস্যায়, জনসেবার আত্মনিবেদনে, যে নিবেদন কর্ম্মত্যাগে নয়, সাধুকর্ম্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, শুধু রাগদ্বেষবর্জ্জনে নয়, সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। স্বর্গ বুঝি না, মুক্তি চাই না, শুধু এই দুঃখকষ্টের সংসারে অভাব অনশনের দিনে মহাপুরুষদের দেওয়া আদর্শকে যেন গ্রহণ করতে পারি, তাদের প্রেমকে যেন সন্দেহ না করি, যে প্রেম নিরঞ্জন, যে প্রেম উদ্ধশিখ, যে প্রেম লালসার ক্লেদ হতে মুক্ত, হোমাগ্নিপূত। সার্থক হয়নি আমার দিনের বেলার আলো, বন্ধ্যা হয়েছে সন্ধ্যানীড়ের প্রদীপ দেওয়া, রাত্রির শুক্লতাও বুঝি ব্যর্থ হয়। দিনে দিনে মায়ার পেছনে ঘুরেছি, ছায়াকে পেয়েছি, কায়াকে বুঝেছি—পথ জানিনে আলো নেই, ভিতর বাহির কালোয় কালো—শুধু চরণশব্দ বরণ করে যেন চলতে পারি। এক পাও যদি চলতে পারি তাহলেও আমার সকল কাঁটা গোলাপ হয়ে ধন্য হবে—মানুষের মধ্যেই তোমার চরম প্রকাশ—সেই মানুষের কাছেই আমার মাথা নত হোক—চোখের জলে পায়ের ধূলো মুছে যাক্—বন্ধুর পথ বেয়ে এসে বন্ধুর রথ থামুক্। যেমন এসেছিলো মীরার কাছে মীরাকো প্রভু গিরি ধার নাগর সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত আত্মবিশ্বাসের পারে দে—"মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে একেবারে"—প্রেমের ঐক্যের সার্থকতায়—জেগে উঠুক এই অমৃতময় অনুভূতি—তাহলেই আমাদের ভোগ ত্যাগ হবে অভাব ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি রসময় হবে—আমার সমস্ত নাও, সমস্ত ঘুচিয়ে দাও তবেই তোমার সমস্ত পাবো—মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে। এই সাধনার মূল পদ্ধতি কোন যোগ যাগ মন্ত্র তন্ত্র নয়—আচার বিচার বাহ্যানুষ্ঠান নয়, একটি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন,—প্রেম যেখানে ফুটে উঠবে প্রণাম হয়ে। •

একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
ঘন শ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন পড়ে থাক তব ভবন দ্বারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালীগঞ্জের প্রশস্ত রাস্তার উপরে বিরাট বাড়ী, সামনে একটু স্থানে কয়েকটি মরসুমী ফুলের গাছ। মালী, দারোয়ান ঠাকুর চাকর লইয়া সংসার বড়ই—। অশোক সাহেব বাড়ী হইতে বাড়ীর নক্সা করাইয়া এই বাড়ী তুলিয়াছিলেন, লোকে দেখিয়া তারিফ করিয়াছে। বাড়ীর প্রান্তে গ্যারেজ—মোটর থাকে। জ্যেষ্ঠ কমল মোটর করিয়া আফিস যান—আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়,—চাঁদমোহনের ব্যবসা দিনে দিনে বাড়িয়াছে। বাঙালীদের মধ্যে ধনী বলিয়া একটা সম্মান আছে—

অশোকের স্ত্রীর শরীর খারাপ, ব্লাডপ্রেসার সহ হৃদযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য। উপর নীচে করিতে পারেন না। তিনি শুইয়া ছিলেন—শরীরটা অত্যন্ত খারাপ। কাঞ্চনকুমার আসিয়া কহিল—আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দাও ত—

—কেন ?

—কাজ আছে—

—কি কাজ ?

—খেলে হেরে গেছি তাই দিতে হবে।

—কি ? আবার তাস খেলেছিস্—

—হ্যাঁ, ও ছাড়া আমি কিছুতেই আনন্দ পাইনে—

মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন—শরীর ভাল নেই, ওসব টাকা আমি দেব না—

—দেবে না মানে ? আমি মান-ইজ্জত সব খোয়াবো ? পঞ্চাশটা টাকার জন্যে—

—ও সম্মান রাখবার দরকার নেই—আমাকে বকিও না—

—টাকা দিতেই হবে—দেবে না কেন ? টাকার অভাব নেই ত—

—আছে বৈ কি ? ব্যবসা মন্দা হ'য়েছে, জাহাজ পৌছে গেছে মাল খালাস ক'রতে হবে, মাসে মাসে বিলের টাকা পাঠাতে হচ্ছে এখন ওসব হবে না—কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে, আর বকিও না—

—তোমাদের ছেলে যখন, তখন আমার দরকার যা তা দিতেই হবে। যে বাপ-মার ছেলেকে মানুষ ক'রবার ক্ষমতা নেই, কর্ত্তব্যপালন করবার ক্ষমতা নেই—তাদের ছেলে হয় কেন ?

মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন—এই সব শিখেছ বুঝি কলেজে। তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই, আমি নড়তে পারছি নে, বুকের মধ্যে কাঁপছে—সেদিকে তাকানোও তোমার কর্ত্তব্য নয়—না ? মানুষের ছেলে হয় এই জন্যেই—

উত্তেজিতভাবে কথা কয়েকটি বলিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন—একটা আচ্ছন্নতা যেন সহসা অচৈতন্য করিয়া ফেলিল—কাঞ্চন বিরস মুখে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে গেল—মাতার কি হইয়াছে, কেন সহসা এমনিভাবে শুইয়া পড়িলেন তাহা প্রশ্নও করিল না।

নীলা প্রাসাধন শেষ করিয়া আসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্তভাবে বারাণ্ডায় অপেক্ষমান কাঞ্চনকে প্রশ্ন করিল—মা'র কি হ'য়েছে রে ?

কাঞ্চন জবাব দিল—টাকা চাইলে যা হয় তাই,—শরীর খারাপ হয়ে কথা ব'লতে পারছেন না—

নীলা কহিল—রোজ রোজ ফ্লাস খেলে হারলে কে এত টাকা দেবে—খেলিস্ কেন ? খেলিস্ ত একদিনও জিত্‌তে নেই—

নীলা ঘরের মাঝে যাইয়া ডাকিল—মা—

মাতা চক্ষু মেলিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কোথায় যাবি—

—পার্টিতে, ফিরপোয় আজ মিঃ লোহিয়া পার্টি—

—শরীরটা বড্ড খারাপ হ'য়েছে, মনে হচ্ছে বুকের ধুক্‌ধুকি থেমে যাবে, আজ আর যাস্ নে কোথায়ও—

—তা কি হয় মা, আমার জন্যেই পার্টি। এত কষ্টে মোটর ড্রাইভিং শিখালে, আজ গাড়ী পছন্দ করতে যাবো—না গেলে ত হয় না মা।

মা নীরবভাবে চাহিয়া রহিলেন। নীলা হাসিয়া কহিল—

তুমি বড্ড দুষ্টু, আজ মিঃ লোহিয়ার পার্টির দিনে শরীরটা খারাপ করে বস্‌লে ?

নীলা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল—তোমার শরীরটাও বড্ড দুষ্টুমি করে, আমার সঙ্গে। যেদিনই এনগেজমেণ্ট থাকে সেইদিনই বিকল হ'য়ে পড়ে—না ?

মাতা চক্ষু মুদিয়াই রহিলেন—বুকের মাঝে হৃৎযন্ত্রটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। নীলা কহিল—একটু ভাল বোধ করছো মা ? ঐ ও'ষুধটা খাও—

নীলা টেবিলে রক্ষিত একটা ঔষধ একমাত্রা খাওয়াইয়া দিয়া বিছানায় বসিল। আস্তে আস্তে কহিল—এ হার্ট টনিকটা অব্যর্থ—শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে—

নীচে রাস্তার পাশে ষ্টুডিবেকারের বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজিল—এ হর্ণ সকলেরই সুপরিচিত। মিঃ লোহিয়ার গাড়ীর ডাক্—নীলাকে ডাকিতেছে।

নীলা কহিল—ঐ যে ! মিঃ লোহিয়া নিতে এসেছেন। দুষ্টুমি ক'রো না মা, কেমন ? আমি—চট্ করে ফিরে আস্‌বো। চুপ করে শুয়ে থাকো—কেমন ? আসি—

মাতা চোখ মেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিলেন, নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এক্ষুণি আস্‌বো—পার্টির পরেই। ক্রিমকলার অষ্টিন একখানা দেবে বলেছে—তোমাকে নিয়ে রোজ বেড়িয়ে আসবো—

—কে দেবে ?

—লোহিয়া, আমাকে উপহার দেবে—আমাকে খুব ভালবাসে কিনা ? জন্মদিনে গাড়ীখানা প্রেসেণ্ট করবে, আজকে পছন্দ ক'রে রেখে আস্‌বো—লোহিয়া দাঁড়িয়ে আছে, আসি।

নীলা উঁচু হিলের খট্ খট্ শব্দ করিয়া, হাতের রঙীণ ব্যাগটা দোলাইয়া চলিয়া গেল। নীচে ষ্টুডিবেকার গাড়ী গ্যাস নির্গমনের শব্দ করিয়া প্রস্থান করিল—

মাতা দরজার পানে চাহিয়া নীরবে নীলার প্রস্থান দেখিলেন—

মাতা দ্বিতলের ঘরে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন—মাথা ঘুরিতেছে, বুকের মধ্যে হৃৎযন্ত্রটা অনিয়মিত আঘাত করিতেছে—যে কোন সময় হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে। টেবিলে রক্ষিত একটা টাইমপিস্ টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছে—মাতা চাহিয়া দেখিলেন—সাড়ে ন'টা—

সন্ধ্যা হইতে একান্ত একাকী শুইয়া আছেন—কেহ ঔষধ দেয় নাই, কেহ প্রশ্ন করে নাই কেমন আছ ? চাকর যথা-সময়ে চা লইয়া আসিয়াছিল, তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন—

অকস্মাৎ তাঁহার ভয় হইল যদি এখনই মৃত্যু হয়—পুত্র কন্যা কেহ নাই, কেহ জল দিবে না—ঔষধটুকু আগাইয়া দিবার কেহ নাই। ঝি চাকর ঠাকুর নীচের ঘরে রাঁধিতেছে। পুত্রবধূ রেডিও খুলিয়া দিয়া গান শুনিতেছে—নীলা গিয়াছে মিঃ লোহিয়ার সহিত পার্টিতে—কাঞ্চন টাকা না পাইয়া অভিমানে চলিয়া গিয়াছে। কমল ফিরিবে রাত্রি দশটায়—

কি নিঃসঙ্গ, একক জীবন। পুত্র কন্যা পরিজনের মাঝে কি অসহায় একাকীত্ব ? তাহার প্রতি কেহ চাহিল না—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিল না—চলিয়া গেল আপনার কাজে—আপনার আনন্দে। মাতার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—যদি মরিয়া যান তবে কেহই দেখিবে না—পথের ভিখারীর মত একাকী নিঃশব্দে মরণকে বরণ করিতে হইবে···ওদের সম্পর্ক টাকার সঙ্গে—কাঞ্চন টাকা পায় নাই তাই নাই, কমল টাকা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছে, নীলা গিয়াছে মোটর গাড়ীর পিছনে—একাকী মাতা পড়িয়া আছেন পিছনে—অভিজাত অট্টালিকায় সুসজ্জিত দ্বিতলের কক্ষে। প্রাচুর্য্যের মাঝে এত দৈন্য, পরিজনবর্গের মধ্যে এমন একাকীত্ব কেমন করিয়া আসিল ? তাহারই মত প্রত্যেকটি প্রাণী আপনার চারিদেওয়ালের মাঝে বন্দী—নিসঙ্গ, স্নেহমমতাহীন জীবন ! মাতা তাই চোখের জল ফেলিতেছিলেন—

কমল ফিরিল দশটায়—আফিস হইতে ক্লাব, ক্লাব হইতে বাড়ীতে। চাকর সংবাদ দিল—মায়ের শরীরটা আজ একটু বেশী খারাপ হইয়াছে। কমল বিরক্ত হইয়া কহিল—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে এখন এই অসুখের তাল আমি দেব—নীলা কোথায় ? কাঞ্চনই বা কোথায়—তারা একটু মাকে দেখতে পারে না—

জামা কাপড় ছাড়িয়া কমল মায়ের দিকে যাইতেছিল, স্ত্রী কহিল—কি খাবে ? কফি, না কোকো, না ওভালটিন ? একটু খেয়ে যাও—

—আগে শুনে আসি—

—বারমেসে রোগী, ব্যস্ত হওয়ার কি আছে ?

—তুমি একটু কাফি কর, আসি—

কমল আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল—কি হ'য়েছে মা ? প্রেসার বেড়েছে—

মাতা চক্ষু মেলিয়া কহিলেন—তেমন কিছু না, আমার অসুখ ত লেগেই আছে, যা তুই একটু জিরো গিয়ে—

—অষুধ খেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ নীলা দিয়ে গেছে—অষুধে আর কি ক'রবে বাবা, শরীর ত ভেঙ্গেই গেছে—

মাতা আর কিছু বলিলেন না, কমলও তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মাতা জানিতেন ঔষধে এ রোগ আর ভাল হইবে না—মনের মাঝে একটা না-পাওয়ার বেদনা, একটা ব্যর্থতার বিষাদ নিরন্তর উৎপীড়ন করিতেছে। স্নেহের শ্রদ্ধার প্রলেপে তাহা শীতল না হইলে রক্তের চাপ বাড়িয়াই যাইবে—হৃদযন্ত্রও বিকল হইবে—

নীলার জন্মদিনে মিঃ লোহিয়া ক্রীম রংএর একখানা অষ্টিন গাড়ী উপহার দিয়াছেন—মূল্য তাহার অনেক। মিঃ লোহিয়া বাঙ্গালী নহে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী, কমলের সহিত পরিচয়সূত্রে নীলার সহিত পরিচয়—পরিচয় ধীরে ধীরে নৈকট্যে পরিণত হইয়াছে। মিঃ লোহিয়া বিবাহিত, নীলাকে একেবারে ভগিনীর মত দেখেন—

ভগবতী চাটুয্যের বংশের এই কুমারী কন্যাকে মিঃ লোহিয়া কেন এই গাড়ী উপহার দিলেন, কেনই বা নীলা তাহা গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা নীলা তাহার ষ্ট ডিবেকার চড়িয়া পার্টিতে গিয়াছে তাহা লইয়া কেহ কোন প্রশ্ন করে নাই—সকলের নিকটই সেটা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছে এবং কমল, কাঞ্চন ও মাতা সকলেই নীলার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে। এমন একখানা গাড়ী যে মেয়ে উপার্জ্জন করিতে পারে সে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী। অতএব জন্মদিনে লোহিয়াকে সকলে বারবার ধন্যবাদ দিয়াছেন, লোহিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—সামান্য উপহার গ্রহণ করেছেন বলেই আমি সুখী—আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। নীলার জন্মদিন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে।

নীলা যেদিন নতুন অষ্টিন লইয়া কলেজে গেল সেদিন সহপাঠিনী ও সহপাঠী সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল এবং অনেকেই সশ্রদ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। সহপাঠিনী বেলা প্রশ্ন করিল—গাড়ী কিনেছিস্ নাকি ? ড্রাইভিং শিখ্‌লি কবে ?

নীলা হাসিয়া কহিল—ড্রাইভিং শিখেছিলাম আগেই, তাই জন্মদিনে এটা উপহার দিলে। ভালই, দাদার গাড়ীর জন্য আর অপেক্ষা ক'রতে হবে না। নীলা এমন ভাবে উত্তর দিল যেন এ ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ, গাড়ী কেনাটা এমন বিস্ময়ের বিষয় কিছু নয়।

ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট বয়, শৈবাল গাঙ্গুলী নতুন অষ্টিন খানার দিকে চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। নীলা কহিল—চিন্‌তে পারছেন না, বুঝি !

—আপনাকে চিন্‌তে পারিনি এটা একটা প্রশ্নই হল না, তবে গাড়ীটা চিন্‌তে পারিনি। এখন বুঝলাম ওটা আপনারই—হঠাৎ গাড়ী কিন্‌লেন যে !

—জন্মদিনের উপহার—তিনদিনে ড্রাইভিং শিখেছি তাই—

—তিনদিনে ড্রাইভিং শিখেছেন, ও তাই কাগজে এত এ্যাকসিডেন্টের সংবাদ পাচ্ছি।

শৈবাল গাঙ্গুলীর বাবা সরকারী বড় রাজকর্ম্মচারী, নিজেও ভাল ছেলে, কাজেই সহপাঠিনীদের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। নীলার মোটর আজ তাহাকে শৈবালের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল—

নীলা কহিল—চলুন না আজ, দেখাব কি রকম ফার্ষ্ট ক্লাস ড্রাইভ করি।

—আজ নয় কাল—

—কেন ?

আজ মোটা রকম একটা লাইফ্ ইনসিওর করি, কাল আপনার মোটরে যাবো।

পরিহাসে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রেরা বলা আরম্ভ করিল—চল্ চল্, অষ্টিন এসেছে। মোটরের কৌলিন্যে নীলার এতদিনে এই মহলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটল—

কাঞ্চন কহিল—দিদি, তোর গাড়ীটা নিয়ে যাবো আজ—

—কেন ?

—রাণুকে বলেছি, আমাদের অষ্টিনের কথা, না গেলে মান থাক্‌বে না।

—আমি যে বেরুব—

—চল্‌ একসঙ্গে যাই, রাণুকে তুলে নিয়ে আস্‌বো, তার পর মেট্রোতে নামিয়ে দিয়ে তুই চলে যাবি। রাণুর মা গাড়ী দেখ্‌তে চেয়েছে—

কাঞ্চন দিদির অর্জ্জিত গাড়ী দেখাইয়া রাণুর মায়ের নিকট নিজের কৌলিন্য সুপ্রতিষ্ঠ করিতে চায়। নীলা বুদ্ধিমতী সে কথাটার সমস্তই বুঝিয়াছিল, সে কহিল রাণুরা আবার মোটর কি দেখ্‌বে—ওদের ত তিনপুরুষেও গাড়ী নেই—

—না থাক্‌, আমি গল্প করেছি ত, গাড়ী না নিয়ে গেলে রাণু বেরোবে না।

—আচ্ছা যা, আমি নিয়ে যাবো—

ওদিকে কমল সস্ত্রীক বাহির হইয়া যায় নিজের মোটরে—সিনেমায় যাইবে। মাতা দ্বিতলের কক্ষ হইতে দেখেন—

সেদিন দ্বিপ্রহরে মাতার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল আজ বোধ হয় আর বাঁচিবেন না—হৃদযন্ত্রটা মাঝে মাঝে যেন থামিয়া যাইতে চায়। নীলা জানিত পথ্য সেবন করিয়া মাতা এমন করিয়াছেন। তাই সে আসিয়া মাথার নিকটে বিছানায় বসিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল—এই ত এখন বেশ ভাল হ'য়েছ মনে হচ্ছে—ভাল বোধ কচ্ছ না মা ?

মা কিছু বলিলেন না, অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে চোখ দুইটি মেলিয়া তিনি একবার চাহিলেন মাত্র—

নীলা কহিল—আজ যেন শরীরটা দুষ্টুমি না করে মা—ক'লকাতার বাইরে মিঃ লোহিয়ার বাগানে আজ পিকনিক আছে—অষ্টিন নিয়ে যেতে হবে তার বিশেষ অনুরোধ—ফিরতে দশটা হবে হয়ত—

মাতা সংক্ষেপে কহিলেন—আজ আর বাঁচবো না—মনে হয় মা। তোরাও কাছে থাকবিনে ?

—ও তোমার ম্যানিয়া মা, তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে, অনেক সবল। কাঞ্চনকে বলে যাচ্ছি, সে বাড়ীতে থাকবে—কোন কিছু হবে না।

—না গেলে হয় না রে ?

—তাকি হয় মা, সেদিন দশ হাজার টাকার অষ্টিনটা দিলে, আজই যদি পিকনিকে না যাই কি ভাববে বল ত ? একটা কৃতজ্ঞতাও আছে—

মাতা ভাবিলেন—কৃতজ্ঞতা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার প্রতি, রুগ্ন মাতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য কোন কৃতজ্ঞতাই কি আর অবশিষ্ট নাই ?

নীলা পুনরায় মাথায় হাত দিয়া কহিল—কিছু হয়নি মা, তুমি ভেবে ভেবে ওরকম মনে হ'চ্ছে। একটু চুপ করে একা একা শুয়ে থাকো, ঘুমোও ভাল লাগবে—

নীলা উত্তরের অপেক্ষা করিল না, নিজের ঘরে গিয়া ধীরে ধীরে প্রসাধন শেষ করিল। তাহার পর রঙীণ ব্যাগটা গোছাইয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অষ্টিন ষ্টার্টের শব্দ পাওয়া গেল—বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজাইয়া গাড়ী গেটের বাহির হইয়া গেল।

মাতা চোখ বুজিয়া সবই শুনিলেন—বুকের মাঝে অসহ্য একটা নৈরাশ্য ও বেদনা যেন হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া মুচড়াইয়া দিল। চোখ দুইটি জ্বালা করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল—অশ্রুর বন্যায় বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল—

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে--

নীচে চাকরটা দুম দুম করিয়া শিলের উপর হলুদ গুঁড়া করিতেছে—শব্দটা বৃহৎ ও মর্ম্মভেদী হইয়া মাতার কানে প্রবেশ করিতেছে—মাথার মধ্যে শব্দটা যেন হাতুড়ী মারিতেছে—পাশে বৌমার ঘরে মৃদুস্বরে রেডিও চলিতেছে—নাকি সুরে কে যেন গান করিতেছে। টেবিলের উপর টাইমপিস্‌টা চলিতেছে—টিক্‌ টিক্‌—সুস্পষ্ট—সময়ের নির্দ্দেশ দিতেছে—নীরব সন্ধ্যা, এতক্ষণে হয়ত রাস্তায় বাতি জ্বলিল।

মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল—এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় কেন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ঘিরিতেছে না—এই দুর্ব্বহ জীবন ও অপরিসীম নিঃসঙ্গতা হইতে কেন মুক্তি দিতেছে না—

মাতা অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন—অভিমান মৃত্যুর উপর ;—মৃত্যু কেন তাহার কালো অজ্ঞান যবনিকা দিয়া তাহার নিষ্পিষ্ট অন্তরকে ঘিরিয়া দিতেছে না—

পুত্র কন্যা থাকিতেও শিয়রে কেহ দাঁড়াইয়া নাই—ব্যাকুলভাবে কেহই অপেক্ষা করিতেছে না। দেয়ালের রঙীণ ছবিটা কেবল তাহার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আপনার জন আজ পর হইয়া গিয়াছে—তাহারা ছুটিয়াছে বিলাস ব্যসন সম্পদের পিছনে। স্নেহ মমতা কৃতজ্ঞতা ত্যাগ সব কিছুকে পিছনে ফেলিয়া—এই ত জগৎ—

চাঁদমোহন বড় লোক হইবার জন্য আসিয়াছিলেন শহরে—গ্রামকে শোষণ করিয়া আনিয়াছিলেন নিজের ভাগ্যকে ফিরাইয়া প্রভুত ধন উপার্জ্জনের জন্য—অন্য কাহারও কথা তিনি ভাবেন নাই—সেই আত্মকেন্দ্রিকতা আজ নীলা ও কাঞ্চনকে মাতার পার্শ্ব হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। মাতা নিষ্ফল অভিমানে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিতেছেন—মরণ শরণ দাও—এ নিঃসঙ্গ জীবনকে দীর্ঘতর করিয়া আর দুর্ভাগ্যকে দুর্ব্বহ করিও না—চোখের জলে মূল্যবান বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে—

শেরশাহের রচিত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড—ভারতের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিচঢালা মসৃণ সুন্দর—তাহার পাশে পাশে বিরাট কারখানায় গগনচুম্বী চিমনি—ভারতের পবিত্র সুন্দর নীলাকাশ ধূম মলিন করিয়া তুলিয়াছে। কারখানায় কাজ করে কতশত হরিহর, আদুরী, সরোজের বংশধর, মালিক তাহার চাঁদমোহনের বংশধরগণ। গোপালপুর ছাড়িয়া এরা আসিয়াছিল, নূতনের মোহে, অর্থের মোহে। সরকারের উৎসাহে হইবে আরও কত কারখানা, রচিত হইবে কত চিমনী—নীলাকাশ ধূমমলিন হইবে। গোপালপুর ছাড়িয়া আসিবে বাগদী বাউরী ডোমেরা—সুন্দরী, সরোজ, সুমীরা এখানের বাতাস করিয়া তুলিবে ক্লেদাক্ত—যোগীন মহিম, নীলার মাতার ন্যায় অশ্রুর বন্যা বহাইবে কত মাতা, কত পুত্র কন্যা। জগৎ আগাইবে—হৃদয় পিছাইবে—প্রাচুর্য আসিবে মনের দৈন্য লইয়া, সম্পদ আসিবে ঔদ্ধত্য লইয়া, অকল্যাণ আসিবে কল্যাণের বেশে—আমরা চলিয়াছি'—আমরা চলিব নিরুদ্দিষ্ট পিচঢালা রাস্তা দিয়া—বেগে, বিপুল গতিতে—রামলক্ষণ সীতা সাবিত্রীর দেওয়া ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট উদার আত্মত্যাগে পুষ্ট শান্ত সুন্দর পবিত্র সমাজে জন্মিয়াছে মহিম, যোগীন, নীলা, কাঞ্চন—তাহারা ছুটিয়াছে মোটরে—পিছনে জমিয়া উঠিতেছে অশ্রু সায়র—

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া ছুটিয়াছে নীলার অষ্টিন, পিছনে লোহিয়ার ষ্টুডিবেকার, পেট্রোলের ধোঁয়ায়, চাকার ধুলায় বাতাস হইয়াছে মলিন। ওরা ছুটিয়াছে পিক্‌নিক্ করিতে—পিছনে ঝরিতেছে মাতার অশ্রু—ধরিত্রীর অশ্রু—

পিচঢালা রাস্তায় নীলার মোটর চলিতেছে দ্রুত, নীলা হাঁকাইতেছে মোটর, পথচারীকে সচকিত করিয়া গ্রামবাসীকে বিস্মিত করিয়া। পাশে রহিয়াছে তাহার রঙীণ ভ্যানিটী ব্যাগ—তাহাতে আছে টাকা—

গোপালপুর ছাড়িয়া এরা কোথায় যাইতেছে কেহ বলিতে পারেন? পিছনে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে শ্যামলা সুন্দরী স্নেহময়ী উদার বসুন্ধরা।

সমাপ্ত

গান

প্রফুল্ল দত্ত

রুদ্ধ গৃহে বাঁধবি কে আমায়,
ওরে আয় আয় আয়।
বাঁধন ছেঁড়া পাগল আমি
মন যে হ'ল বাহির-গামী,
বিশ্ব মোরে ডাকছে ইসারায়—
ওরে আয় আয় আয়॥
বাণীর বীণা বেজে সুদূর বনে—
করুণ সুরে কাঁদায় সংগোপনে,
দেখতে তোরা পাবিনে কেউ
হৃদয় মাঝে বহে কি ঢেউ—
গর্জিয়া মোর প্রাণের কিনারায়—
ওরে আয় আয় আয়॥
বাঁধন ভেঙ্গে কোন্ অতিথি আজ
পরশ দিল মরমে সে নিলাজ;
ঘুচিল যত সরম বাধা
পরাণ খুলে তাইতো কাঁদা,
ব্যাকুল হয়ে তাহার ঠিকানায়—
ওরে আয় আয় আয়॥

পুণ্যতীর্থ হালিসহর-কুমারহট্ট

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—দুই—

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশের সকলেই শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্ ছিলেন।

বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় 'মধ্যস্থ' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেন। তাহার (Regi-tered No 81 of 1873) এই পত্রের ২য় ভাগ ১২৮০, আশী বৎসর পূর্ব্বে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে দোষ-গুণ বিচার করিয়া শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক নিমতা নিবাসী একজন ভদ্রলোক সমালোচনা করেন, তাহাতে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে

বরেন্দ্র গলির শিবমন্দির

ঠাকুরদাসবাবু লিখিয়াছিলেন :—"প্রধান কবির একটি লক্ষণ অসাধারণ স্বাধীনতা, কিন্তু ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ভারত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হইয়া উহাতে অনেকাংশে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণার্থে আমরা সকলকে তাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অন্নদামঙ্গলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক মিথ্যা প্রশংসা করিয়া ভারত আপনার যে কত লঘুচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় রামপ্রসাদ ঐ প্রকার দোষে দূষিত নহেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একজন সভাসদ করিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকারে উহাতে রামপ্রসাদের সম্মতি লওয়াইতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য দ্বারা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, উপরোক্ত দুইজন কবির মধ্যে কাহার উচ্চতর মন ছিল। যাহা হউক এ বিষয়ে আর তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই। যাহাতে রামপ্রসাদের গ্রন্থ সকল কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পায় তাহা আমাদের এক্ষণে চেষ্টা করা উচিত। এজন্য আমরা সকল সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া রামপ্রসাদের কাব্য-কলাপ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে এবং যাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই—সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিয়া নির্ভুল করনান্তর উত্তম কাগজে এবং উত্তম

বরেন্দ্র পাড়ার খোদিত লিপি সংযুক্ত ভগ্ন শিবমন্দির

অক্ষরে মুদ্রিত করেন, করিলে দেশের কি পর্য্যন্ত হিত সাধন না হইবে, তাহা আমরা একাননে ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আর কিছুকাল এই মহাকবির গ্রন্থসকল ভুল করিয়া বটতলার ছাপাখানার মুদ্রিত হয়, আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতেছি, বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নহারা হইবে।"

'মধ্যস্থ' সম্পাদক মনোমোহন বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—"ঠাকুরদাসবাবু মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, আমরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তাঁহার পদাবলী যিনি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই এই মতের পোষক হইবেন

সন্দেহ নাই। পদাবলীর ভাব দ্বিতল ও ত্রিতল বিশিষ্ট অত্যুচ্চমণি প্রাসাদবৎ যেরূপ ভাষায় বিভাসিত, সেরূপ ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে অন্য কাহারো সাধ্য নাই—অনেকে চেষ্টা করিয়া বিফলও হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের সেই শ্রেষ্ঠতা কেবল ভক্তিরসে ও গীতি-কাব্যে। তাঁহার রচনার তেজস্বিতা দেখিয়া এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনীর রণ-রূপ-বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, তিনি যদি বীররসের কোনো কাব্য লিখিতেন, তবে তাহাও অত্যুৎকৃষ্ট হইত। যাহা হউক তাঁহার সহিত ভারতচন্দ্র ও কবি-কঙ্কণের ঠিক তুলনা হওয়া দুঘট। ইনি এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা অন্য রসে শ্রেষ্ঠ। (মধ্যস্থ পত্র—১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা।)

আমরা ধীরে ধীরে আসিলাম চারিটি মন্দিরের পার্শ্বে। মন্দিরের অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। এই মন্দির কয়টি বারেন্দ্র গলির প্রবেশ পথেরই অনতিদূরে অবস্থিত। সম্মুখে বড় রাস্তার ওপারে গঙ্গা। এখানের লিপি আছে তাহা পাঠ করিতে পারি নাই—তবে যতটুকু নিম্নদেশ হইতে পড়িতে পারিলাম, তাহাতে উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের হইবে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। গ্রামের বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও তরুণেরা মহা উৎসাহের সহিত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন—ফোটোগ্রাফে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার গাঙ্গুলি ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত গ্রামের তরুণগণ এবং একটু লক্ষ্য করিলে মন্দির মধ্যে যোগেশ-বাবুর পার্শ্বে আমার চিত্রও রহিয়াছে। তাহাও দেখিতে পাইবেন।

যে মন্দিরটির ঊর্দ্ধভাগে বাঙ্গালা হরফে খোদিত লিপিটি রহিয়াছে, সে মন্দিরটির উপরে অর্থাৎ ভগ্নপ্রায় চূড়ায় এবং চারি পাশে জঙ্গল। যদি ইহা সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের এই দিকে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ বর্ত্তমান মন্দিরের অধিকারীরা যদি গ্রামবাসীর হস্তে ও সংরক্ষণের ভার অর্পণ করেন, তাহা

মন্দির গাত্রের পোড়া ইটের মূর্তি

বরেন্দ্র গলির ৪ মন্দিরের একটি—

(প্রভাত নলিনী দেবী)

মন্দির দুইটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে। গাছপালা ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। দুইটি মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অতি সুন্দর কারুকার্য্য। সেকালের সামাজিক ও লৌকিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে ঐতিহাসিক শতস্মৃতি। সেকালের পর্ত্তুগীসদের তরোয়াল হাতে লড়াই, কোথাও সেকালের রণতরী, কীর্ত্তনলীলা, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা, শোভাযাত্রা, শিকার, বিচারসভা, অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী ও পুরুষের পোষাক, সাজসজ্জা প্রভৃতি আছে। জাহাজের চিত্রটি অতি সুন্দর। সেকালের দস্যুডাকাত, হারমাদ, অশ্ব, বরাহ প্রভৃতি জীব-জন্তুর অতি সুন্দরভাবে। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরসমূহে পোড়ামাটীর (Terracottas) এসমুদয় ইষ্টক ফলক দেখিতে পাই। বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের গায়ে তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। একটি মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগে যে খোদিত হইলেও হয়ত রক্ষা পাইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ এইভাবেই ধ্বংসের পথে যাইতেছে।

সেখান হইতে আসিলাম বৈদ্যপাড়ার ঘাটে। এখানে গঙ্গার পাড় অতি উচ্চ। ঘাটের উপর দুইটি মন্দির। মন্দির দুইটি কে কবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু কাহিনীতেই পরিণত হইয়াছে। মন্দির দুইটির সরু পাত্‌লা ইট এবং গঠন ভঙ্গিমা, বাঙ্গলার নিজস্ব মন্দির নির্ম্মাণ পদ্ধতির অনুরূপ। একজন ভদ্রলোক গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—এ গ্রামে বিক্রমপুর হইতে আগত একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য চিকিৎসক ছিলেন, একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন—একখানি বিরাট বজ্‌রা এবং অনেক লোকজন। জানিতে পারিলেন মহিষাদলের রাজ-বংশীয় এক যুবক গুরুতর রোগে পীড়িত, কলিকাতা কিংবা অন্য কোন স্থানের চিকিৎসকই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই। কবিরাজ

মহাশয় রোগী দেখিতে চাহিলে রাজমাতা সাদরে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসক মহাশয়—প্রথমে রোগী দেখিলেন, তারপর বলিলেন—'মা, আমি ইহাকে ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া দিব। তবে রোগীসহ আপনাদের এ সময়টা এখানেই বাস করিতে হইবে। রাণী রাজী হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা গুণে রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিল। কবিরাজ মহাশয়কে রাণী প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন—গঙ্গার তীরে যে রোগী দেখিয়াছি তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না। পরে রাণীর একান্ত অনুরোধে দুইটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সর্পসঙ্কুল এই পরিত্যক্ত মন্দির মধ্যে প্রবেশ ভীতিজনক, এই মন্দির দুইটিতেও অনেক পোড়া মাটির ফলকের মূর্ত্তি আছে। অরক্ষিত এই মন্দির গাত্র হইতে অনেকেই খোদিত

বৈদ্য পাড়ার ঘাটের নবরত্ন মন্দির

ইষ্টকাদি লইয়া যায়। যিনি মন্দিরের এই ইতিহাস বলিলেন, তিনিও বৈদ্যবংশীয়। কে এই কবিরাজ ছিলেন তাঁহার নাম ও পরিচয় আমি জানিতে পারি নাই।

কার্ত্তিক মাস। হেমন্তের শীতাভ রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইবার আমরা আসিলাম ঈশ্বরপুরীর মঠের কাছে। সম্মুখেই চৈতন্যডোবা। শ্রীঈশ্বরপুরীর বাসস্থান ছিল কুমার-হট্ট। "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপাল প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গোপালের জন্য কর্পূর ও চন্দন সংগ্রহ ব্যপদেশে পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। যাত্রা পথে তিনি বাঙ্গালাদেশে আসিলেন। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন বাঙ্গালীকে—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে, শ্রীঈশ্বর পুরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরের অধিবাসী হইলেও মাঝে মাঝে নবদ্বীপ আসিয়া বাস করিতেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস ছিল চট্টগ্রামে, তাঁহারও নবদ্বীপ যাতায়াত ছিল। ইঁহারা গৃহী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিবাস কুমারহট্ট। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকটই তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে মহাপ্রভু কুমারহস্ত বা কুমার হট্ট দর্শন করেন।

প্রভু বোলে কুমারহস্তেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
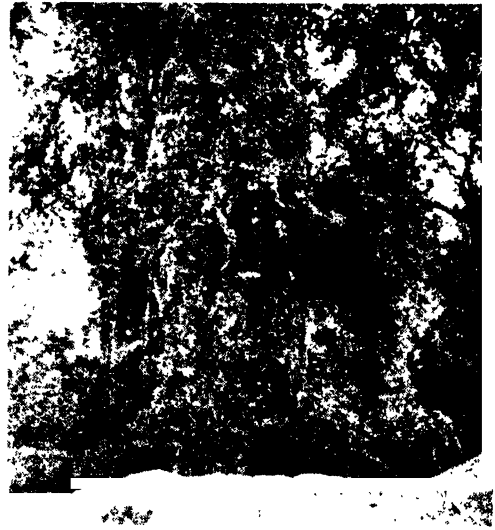
বৈদ্যপাড়ার ঘাটের মন্দির

সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোর জীবনধন প্রাণ॥

* * * *

প্রভু বোলে গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হইলে ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥

বর্ত্তমান ঈশ্বরপুরীর মঠটি ঢাকার এক বৈষ্ণবভক্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন মঠের সেবায়েৎ ও ঢাকাবাসী একজন ভক্ত বৈষ্ণব। তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়া গেল। 'মঠটিতে' বিগ্রহ স্থাপিত। অতিথিশালা আছে। ভক্ত বৈষ্ণবগণ সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করেন। স্থানটি বেশ মনোরম। সম্মুখে বেশ বড় প্রাঙ্গণ। ফুলে-ফলে সুশোভিত উদ্যান

মুখেই চৈতন্য ডোবা—সোপানাবলী শোভিত, নানা গাছ ইত্যাদিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ঢাকার বৈষ্ণব মোহান্ত কি ভাবে কেমন করিয়া আসিয়া ঈশ্বরপুরীর এই মঠের মোহান্ত হইলেন তাহা আশ্চর্য্য দিতে হইবে।

আমরা মল্লিকবাগে ঘুরিয়া আসিলাম। চারিদিকে আম গাছ ও নানা বৃক্ষ। কথিত আছে পূর্ব্বে মল্লিকবাগ একটি সুবৃহৎ উদ্যান ছিল। ক্রমে ক্রমে গাছপালা কাটিয়া জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহার করায় স্থানটির প্রাচীন শোভা ও সৌন্দর্য্য নাই। তিন গম্বুজওয়ালা একটি মস্‌জিদ আছে। পাঠান-স্থাপত্য রীতিতে নির্ম্মিত। বেশ বৃহদাকার। বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ভিতরের প্রাচীর সংলগ্ন একটি শিলালেখ আছে। ছবিতে তাহা ভালরূপ উঠে নাই। জনপ্রবাদ মল্লিক-কাসিম নামক একজন নির্ব্বাসিত পাঠানের সমাধি এখানে আছে। মল্লিক এ জায়গাটি বাঁশবেড়িয়ার বিপরীত দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। বিখ্যাত কমল সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা অভিধানের ভূমিকায় মল্লিকবাগ
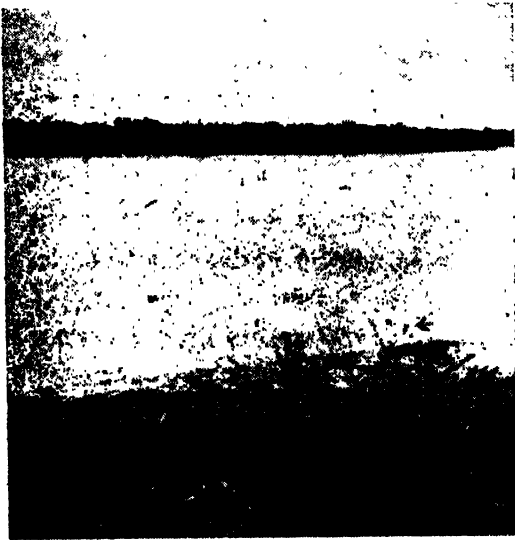
শিবের গলির মাঠ

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"The Mussalman invaders of the west of Hindustan, who afterwards established themselves on the throne of Delhi., considered the country (Bengal) to be Dajakh, or an infernal region, and whenever any of the Amirs or courtiers were found guilty of Capital crimes, and the rank of the individuals did not permit their being beheaded, while policy at the sametime rendered their removal necessary, they were banished to Bengal. Of those individuals banished to Bengal, one named Mullik Kassim, had his residence immediately west of Hugly, where there is a Haut or market, still held. which goes by his name. Ahmid Beg was another person of that description ; his estate is still in existence, opposite to Bansbaria ; and there are a Haut, Gunge. or mart, and a Khal or creek with a mansion opposite to Hugly, which is called "Mr. Beg Ka Gur". These lands were given on a kind of Military tenure ; as the Government of the Afghans in Bengal, bore a close resemblance to the feudal system of the Goths. The air and water of that part of Bengal were then considered so bad as to lead almost to the certain death of the criminal. The whole of Malikbag was formerly a large garden but the trees have been cut down for fuel. অর্থাৎ সেকালে দিল্লীর সম্রাটেরা বাঙ্গালাদেশকে নরক সদৃশ জঘন্য স্থান বলিয়া মনে করিতেন। তাই নাম দিয়াছিলেন 'দাজক' (নরক)। যদি দরবারের কোন আমির ওমরাহ কোন গুরুতর অপরাধ করিতেন তবে তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। প্রাণদণ্ড না দিয়া—নির্ব্বাসিত করার রীতি ছিল। মল্লিক কাশিম নামে একজন আমীর এইভাবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য বাঙ্গালাদেশে নির্ব্বাসিত হইয়া আসেন এবং এখানে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন তাহা মীরবেগ কা গেড়র' নামে পরিচিত ছিল। তাঁহার নির্ম্মিত উদ্যান ইত্যাদিই মল্লিকবাগ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেএখানে পূর্ব্ব পাকিস্থানের অনেক উদ্বাস্তু আসিয়া বসবাস করিতেছেন। দিগন্ত—বিস্তৃত বিশাল ভূমি পড়িয়া আছে, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী পথ ঘাট ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে এখানে একটি সুন্দর উপনিবেশ বা নগর গড়িয়া উঠিতে পারিত।

আমরা বেলা শেষে গঙ্গার তীরের পথে, যেখানে রামপ্রসাদের তিরোভাব হইয়াছিল, শিবের গলির সেই ঘাটে আসিলাম। একটি বিরাট বট বৃক্ষ, সেই স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে কালীর মন্দির। উহার সংস্কার চলিতেছিল। যাঁহাদের এই মন্দির তাঁহারা হালিসহরের অধিবাসী কিন্তু কলিকাতা প্রবাসী। বৈদ্যপাড়ার ঘাটের উপরই মন্দির, নাটমন্দির ও ভৈরবের মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গঙ্গানদীর দৃশ্য অতি মনোরম। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি প্রায় দশটায় কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম।

যাঁহারা হালিসহর বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া আসিবেন :—হাজিনগরের রাস্তার উপর ছোট কালীমন্দির ও পীরতলা, খাসবাটীতে হালদারদের জোড়া শিবমন্দির, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির ও শিবমন্দির, ভট্টাচার্য্যদের জোড়া শিবমন্দির, বলিদাঘাটায় সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির ও শিবমন্দির, বৈদ্যপাড়ার পঞ্চমুণ্ডী—জোড়া শিবমন্দির (ধ্বংশ প্রায়), পণ্ডিতবাড়ীর শিবমন্দির, বারেন্দ্র গলির প্রাচীন চারিটি শিবমন্দির, শিবের গলিতে—ঘোষালদের জোড়া শিবমন্দির, বুড়ো শিবমন্দির, বুড়োশিবের মন্দির, রামপ্রসাদের ভিটা ও পঞ্চবটী (ত্রিবটী) ঠাকুর পাড়ায়—পাঠক ঠাকুরদের শিবমন্দির, ঘোষাল-পাড়ায় শীতলামন্দির, রামসীতার গলিতে—গঙ্গার ধারে কালীমন্দির, শিব-মন্দির ও নারায়ণের আখড়া, কাঁসারী পাড়াতে—পঞ্চানন্দের মন্দির, চৌধুরী পাড়াতে—সাবর্ণ চৌধুরীদের দোলতলা, বাজার পাড়াতে (বর্ত্তমানে) নিগমানন্দ স্বামীর মঠ, সরকার পাড়াতে—ঈশ্বরপুরীর ভিটা ও কৃষ্ণজিউর মন্দির, রথতলাতে জগন্নাথ বা গোবিন্দমন্দির। বাগ গ্রামে—পীরতলা।

আমার প্রবন্ধ মধ্যে যে সমুদয় চিত্র দেওয়া হইল তাহার মধ্যে দু'তিনখানি রবিবাসরের সদস্য প্রভাত হালদার গৃহীত, বাকীগুলি গোপাল মজুমদার কর্ত্তৃক গৃহীত। স্থানাভাবে ঈশ্বর পুরীর মঠ, মল্লিক বাগের মসজিদ, পঞ্চবটি প্রভৃতির ছবি দেওয়া হইল না। ঈশ্বরপুরীর মঠের বর্ত্তমান ছবি ও পঞ্চবটির ছবি মৎপ্রণীত সাধক কবি রামপ্রসাদ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

শারদ-পূর্ণিমার তাজ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাত দশটা হবে—আপার ইণ্ডিয়া এক্‌স্‌প্রেসের প্রতীক্ষায় এলাহাবাদ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেডিংএর উপর বসে মধুর একটি চিন্তায় মশ্‌গুল হয়ে রয়েছি। চিন্তার জাল ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে :

গাড়ীটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই একখানি ফাঁকা কামরা দেখে—বিছানাটা তাড়াতাড়ি পেতে নেব বাঙ্কের উপর, তলাতেও বিছানা পেতে জায়গা দখল করতে হবে অর্দ্ধাঙ্গিনীর জন্য। একবার সটান শুয়ে পড়ে চোখ বুজতে পারলে—রাত্রির মত কেউ ওঁকে বিরক্ত করবে না। তারপর লম্বা ঘুমে রাত কাবার হবে। সকালে চোখ মেলব যেখানে—সেটা বড় ষ্টেশন হলে এক পেয়ালা গরম চা (মতান্তরে জল) গলাধঃকরণ করে বিছানাটা হোল্ডঅলের মধ্যে গুটিয়ে নেব, তারপর বেলা আটটা আন্দাজ নামব টুণ্ডলায়। সেখান থেকে গাড়ী বদল করে একেবারে আগ্রায়। বেলা তখন দশটা বাজবে। সময়টা ভাল। চট্‌পট্ কোথাও একটু স্থান সংগ্রহ করে স্নান আহার সেরে নেব। ভাবনা নেই, সঙ্গে রয়েছে ষ্টোভ, কিছু বাসন, গুঁড়ো মশলা। কাঁচা বাজার কিছু জোগাড় করলে—রাজকীয় না হোক—আহারটা সন্তোষজনক হবেই। তারপর আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আগ্রাদুর্গ দেখতে বার হব। একখানি টাঙ্গা নেব ফুরণে। কেল্লা দেখিয়ে পৌঁছে দেবে তাজমহলে ; সেখানে খানিকটা তার শোভা নিরীক্ষণ করে সটান ফিরে আসব বাসায়। সন্ধ্যার পর আর রান্নার হাঙ্গামা করব না—বাজার থেকে পুরী-মিঠাই-রাবড়ী প্রভৃতি কিনে নিলেই চলবে। বিদেশে, বিশেষ করে বাদশাহী-শহরে, রাজভোগের একটু নমুনা যদি রসনাকে সংগ্রহ করে না দিতে পারি তো এতদূর আসার কিই-বা সার্থকতা !

তারপর দিন সকালে বাকী দর্শনীয় স্থানগুলি দেখব ; দয়ালবাগ, সেকেন্দ্রা, ইৎমিৎউদ্দৌলা, সম্ভব হলে—ফতেপুর সিক্রি……

ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রামত এসেছিল হয়তো, প্রথমতঃ প্রখর-আলোর প্রহারে—পরে ইঞ্জিনের গর্জ্জনে সে ভাবটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম—ভাল জায়গা পাবার জন্য রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।……মধ্যম শ্রেণীর একটি প্রকাণ্ড কামরায় উঠে দেখি অঢেল জায়গা। নীচে উপরে যেখানে খুসি ইচ্ছামত হাত পা মেলে শুয়ে পড়, কেউ নেই শাসন করতে। চেয়ে দেখলাম এধার ওধার, ভয় হল। আমরা ছাড়া আর চারজন মাত্র যাত্রী রয়েছেন এখানে—মালপত্রের সংক্ষিপ্ত ভাব দেখে বোঝা গেল ওঁরা অদূরের যাত্রী—মাঝরাতেই কোথাও নামবেন। হায়রে, এত অঢেল জায়গা পেয়েও দুশ্চিন্তা ঘুচল না ঘুমের মিষ্টি কোলে ঠাঁই পাওয়া যে দুরাশা তা বুঝতে পারলাম। ট্রেণ-কামরায় জাগন্ত যাত্রীকে ফকির করে দেওয়ার কাহিনী প্রায়ই সংবাদপত্রে বার হয়, ঘুমন্ত যাত্রী পেলে তো ওদের পোয়াবারো, রাতটা আমাকে দেখছি জেগেই কাটাতে হবে।

জেগেই কাটছিল—এগারোটা, বারোটা, একটা। এক একটা ষ্টেশন আসে আর ঘটাং করে দরজা খুলে কেউ-না-কেউ বার হয়, ফিরে আসে। দোর গোড়ায় গোলমাল, চেঁচামেচি অর্থাৎ আলাপ প্রলাপ চলতে থাকে। কথাবার্ত্তায় জানা গেল এঁরা সব ক'জনই রেলে কাজ করেন—রিলিভিং ষ্টাফ্। এঁরা ছুটি-মঞ্জুর লোকের বদলি হয়ে চলেছেন। এঁরা না পৌঁছানো পর্য্যন্ত ষ্টেশনের মানুষ—ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, গুড্‌স ক্লার্ক, টিকেট কলেকটার—যাঁদেরই ছুটি মঞ্জুর হয়েছে,—কেউ স্থান ত্যাগ করতে পারবেন না। ছুটি মঞ্জুর হয়ে আসে হেড আপিস থেকে অর্থাৎ ঘটনাস্থল থেকে…দু'তিনশো মাইল দূরের ডিভিশন্যাল আপিস থেকে। সেটা সময়-সাপেক্ষ বলে বেশ কিছু-দিন আগে ভাগে দরখাস্ত দাখিল করতে হয়।… হয়তো বৈশাখে মেয়ের বিয়ে—ফেব্রুয়ারীতে আবেদনপত্র দেওয়া হল। ছুটি মঞ্জুর হল হয়তো দু'মাস বাদে—কিন্তু বদলী পৌঁছতে মেয়ের বিয়ের তারিখ—দু'বার পিছিয়ে না দিয়ে গত্যন্তর নাই ; প্রথম বৈশাখের লগ্ন শেষ জ্যৈষ্ঠে পৌঁছল, যাহোক করে বিয়েটা চুকল তবু। কিন্তু পিতৃমাতৃ-দায়ে তো এত হিসাব কষা চলে না, তাই বদলি আসার আগেই ষ্টেশনের অস্থায়ী বাসায় দায়মুক্তির ব্যবস্থা করতে হয়। এঁদের জবানীতে একটি রাম প্রসাদী গানের পদাংশ সংগীত হলে ব্যাপারটা যেন সহজবোধ্য হয় :

> চাকরি-গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত,
> চোখ ঢাকা এক প্রাণীর মত।

আমি কিন্তু আধবোজা চোখে রাতের প্রহর গুণেই চলেছি।

আশ্চর্য্য এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণ ! রাত্রিকাল বলে সাবধানে চলছে—পথ দেখে দেখে। আবার থামল যদি তো নড়বার নামটি নেই। এমনি করে রাত যখন গভীর হল—নিদ্রাদেবী আমার সতর্ক দৃষ্টির উপর ছলনার সূক্ষ্ম আবরণ বিছিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বপ্নের টুকরো মনের গভীর থেকে উঠে আসতে লাগল।…চলতে চলতে যেন এক অন্তহীন রসাতলের মাঝখানে এসে থামলাম। থেমেছি তো—থেমেই আছি, কোথাও গতির স্পন্দন মাত্র নাই। আর চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এমন অন্ধকার—যার মধ্যে জড় ও চেতন বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতিও ডুব দিয়েছেন, উপরের আকাশ মুছে গেছে, শব্দ-সমুদ্রের তূষ্ণীভাব পাথরের মত চেপে বসেছে বুকের উপর। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে রসাতল নড়ে উঠল, কোথা থেকে মেঘগর্জ্জনের মত শব্দের স্রোত হু-হু করে ছুটে এল।

এ বাবুজী—উঠিয়ে—জল্‌দি উঠিয়ে। দুসরা কামরে পর যাইয়ে—গাড়ী হট্ এক্‌সেল হুয়া—।

অর্থাৎ গাড়ীর চাকায় আগুন জ্বলছে!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। সামনেই কালো ওভারকোট গায়ে এক মূর্ত্তি—। ওঁর কালো ওভারকোটের উপর পিতলের জ্বলজ্বলে বোতামগুলো পর্য্যন্ত যেন তারস্বরে চীৎকার করছে,—কামরা বদল কর—জলদি কামরা বদল কর।

অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ঠেলা মেরে তুললাম। কোনমতে বিছানাটীকে আয়ত্ত করে অন্য কামরায় এসে উঠলাম। কে জানে সেটা কোন ষ্টেশন? প্ল্যাট্‌ফরমের স্বল্পতৈল বাতিগুলি কখন নিভে গেছে, দিক্-প্রান্তরের পাতলা অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে একটা টিনের ছাউনি শুধু দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কামরার যাত্রীরা এই গভীর রাত্রিতে কৌতূহল বহন করে প্ল্যাট্‌ফরমে ছোটাছুটি করা নিরর্থক জেনেই শুয়ে বসে তন্দ্রায় নিদ্রায় নীরবে প্রতীক্ষা করছে প্রভাতের। শ্রম-কাতর ইঞ্জিনের দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না কোনদিক থেকে।

ঘণ্টা দুই অক্লান্ত চেষ্টা করে আগুন-জ্বলা গাড়ীখানাকে পৃথক করে ইঞ্জিন ফিরে এল যথাস্থানে। গাড়ী গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হল।

শীঘ্রই প্রভাত হল। পথে দু-একটী ছোটখাটো ষ্টেশনে গাড়ী থামল, কিন্তু চা বা কোন ভেণ্ডারের দেখা নেই। তারা জানে এমন অসময়ে কোন গাড়ী ষ্টেশনে আসে না, তাই সন্ধ্যাবেলার গরম চা'কে বার বার গরম করে গলা ফাটিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারি করার উৎসাহ তাদের দেখা গেল না। হিসাব করে দেখলাম, টুণ্ডলা থেকে যে গাড়ী আগ্রায় যায়—বেলা সাড়ে আটটায় তার সঙ্গে ইনি কোনমতেই সংযোগ-সাধন করতে পারবেন না।

কিন্তু দিনের আলো দেখে সাবধানী এক্‌সপ্রেস একটু দৌড়ানোর ঝোঁক দেখালে। দেরির সময়টা কমিয়ে দু'ঘণ্টাকে দাঁড় করালে এক ঘণ্টায়। আর পঞ্চাশ মাইলে কি এক ঘণ্টা কমবে না? তাহলে এলাহাবাদ ষ্টেশনে বসে যে মধুর চিন্তার জাল বুনেছিলাম—তার অনেকখানিই সার্থক হয়ে যাবে!

যোগাযোগটা হল অপ্রত্যাশিত। টুণ্ডলার সংযোগরক্ষাকারী গাড়ীখানি দশ মিনিট দেরী করে ছাড়ল—এক্‌সপ্রেসও আর একটু সময় পুরিয়ে দিলে, সুতরাং যথাসময়ে বেলা দশটায় আগ্রায় পৌছলাম।

যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছেও কাল রাত্রির চিন্তার জের টানা গেল না—এইটিই আশ্চর্য্য।

অন্যবারে দেখেছি হোটেলের মার্কামারা টুপি মাথায় দিয়ে যাত্রী সংগ্রাহকরা ষ্টেশনে যাত্রী পাকড়াও করতে আসে, কত সুমধুর বচন বিন্যাস করে তাদের মন ভেজায়—আহারে রাজভোগের এবং শয়নে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন দেখিয়ে পাছু পাছু ঘোরে, আজ তাদের প্রায় চোখেই পড়ল না। যা দু' একজনকে দেখলাম—তারা কাছে এসে নিস্পৃহ কণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করল—কোথায় উঠব আমরা? কিন্তু তাদের হোটেলই যে প্রবাসীজনের আদর্শ আশ্রয়-স্থল এবং সেইখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা আছে এ কথা একবারও উচ্চার করলে না। বেশ একটু আশ্চর্য্য হলাম।

ষ্টেশনে লোকও নামল অতিরিক্ত। বাইরের টাঙ্গা, মোটর, সাইকেল রিক্সা সব প্রায় ভাড়া হয়ে গেল। আমরাও যথেষ্ট দক্ষিণা দিয়ে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করলাম। একজন বাঙ্গালী, ইনিও আগ্রা-দর্শনার্থী—আমাদের সঙ্গী হলেন।

টাঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাব?

সঙ্গী বলল, ধরমশালা। আগ্রা কিল্লার কাছে যে ধরমশালা আছে—

টাঙ্গাওয়ালা জানালে—সেখানকার তিনটি ধর্ম্মশালাই ভর্ত্তি, কোথা জায়গা নেই।

সঙ্গী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, না থাকে জায়গা—ঘ ভাড়া করব। কি বলেন? শেষটা আমার পানে চেয়ে সমর্থন আদায়ের ভঙ্গিতে বললেন।

টাঙ্গাওয়ালা জানালে—ঘর ভাড়াও মিলবে কিনা সন্দেহ!

হোটেল? মরীয়া হয়ে বললাম!

সেখানে তো বিলকুল ভর্ত্তি হয়ে গেছে। কাল বহুৎ আদমি এসেছে তো। তবে ফাষ্ট কিলাসে জায়গা থাকতে পারে। তা সেইখানে কি উঠবেন? আমাদের বেশবাস দেখে টাঙ্গাওয়ালার মনে একটু সন্দেহ জেগেছিল হয়তো।

কোথাও জায়গা নেই শুনে—আমাদের মনেও ব্যাপারটী কেমন যে অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছিল। এত বড় শহর আগ্রা—কত হোটেল ধর্ম্মশালা আছে, ভাড়া দেবার জন্য আছে অগুন্তি ঘর—তার কোথা আশ্রয় পাব না? এখান থেকে যাত্রীরা মথুরা বৃন্দাবনে যায়, ঝাঁ উজ্জয়িনী যায়, জয়পুর পুষ্কর হয়ে দ্বারকা প্রভাস যায়। ইতিপূর্বে দ্বারকা যাবার পথে এখানে দু'দিন বিশ্রাম করেছিলাম, রান্না-খাওয় শোয়ার জন্য চমৎকার ঘর পেয়েছিলাম। আর টাঙ্গাওয়ালা আজ কিন ভয় দেখাচ্ছে ঘর পাব না বলে! এ সব কি বিশ্বাস করবার কথা সুতরাং চালাও গাড়ী আগ্রা-কেল্লা বরাবর, ধর্ম্মশালা কিংবা ভাড়ার ঘ জোগাড় করে নেবই।

টাঙ্গায় করে দশটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত ঘুরলাম। এক ধর্ম্মশাল থেকে আর এক ধর্ম্মশালায়, এক ভাড়া-বাড়ী থেকে আর এক ভাড়া বাড়ীতে—কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। হোটেলে শুধু মাত্র উচ্চ শ্রেণীর কামরা খালি আছে জেনে—ওদিকে চেষ্টা করিনি। কারণ সেখানে যাবার জন্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসিনি। সেখানে ঘর ভাড়া পাওয়ার মাশুল গুণতে গেলে—ফিরে যাবার রাস্তাখরচে টান ধরবে সুতরাং ফিরে চল কালীবাড়ীর দিকে। তিন মাইল রাস্তা উজিয়ে তবে কালীবাড়ী। বেশ খোলা-মেলা জায়গা; দু'পাশে যাত্রীর জন্য ছোট ছোট খানকয়েক ঘর—মাঝখানে প্রশস্ত উঠান।

পুরোহিতকে প্রণাম করে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম।

তিনি বললেন, কি করব বলুন—একখানি ঘরও খালি নেই তো একটু থেমে বললেন, বাইরের যাত্রী তো কেউ থাকেন না এখানে—

আমারই আত্মীয়জন রয়েছেন। সংসার এখন বড় হয়েছে—তাই দু'খানি ঘরে কুলোয় না। তবে কাছেই একটী ধর্ম্মশালা আছে—চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ওখানে নিশ্চয় ঘর পাবেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেইখানেই আশ্রয় পেলাম। আশ্রয় পেয়েই কৌতূহল-নিবৃত্তি মানসে ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধায়ক পিয়ারীলাল বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত বড় শহরে এমনটী হবে তা তো ভাবিনি একবারও। ব্যাপার কি বলুন তো?

বশিষ্ঠ হেসে বললেন, কারণ আজ কোজাগরি পূর্ণিমা।

কোজাগরি পূর্ণিমা! ছেলেবেলায় এই ধবধবে জ্যোৎস্নাভরা রাতে দু'চোখের পাতা এক করিনি—মনে পড়ল। সারা বছরে আর একটিমাত্র রাত এমনি জাগরণে কাটাবার ব্যবস্থা করেছেন পঞ্জিকাকার। শিবচতুর্দ্দশীর রাত। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি যত অন্ধকার মাথাই হোক—পৃথিবীর মানুষ তারই মধ্যে পায় মহৎ জীবনের সন্ধান—অফুরন্ত আলোর আভাস। এখন শারদ-পূর্ণিমার কথাই বলা যাক। এই রাতও কি পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়ে মানুষের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয়? না, সৌন্দর্য্যের চৈতন্য তাকে নিদ্রার জড়ত্ব পরিহার করিয়ে অন্য এক ভুবনে উত্তীর্ণ করে দেয়? হাঁ—আগ্রার এই শারদ-পূর্ণিমা দেশ-বিদেশের শিল্পী মানুষকে—সৌন্দর্য্য-পূজারী মানুষকে—কবি ও ভাবুক মানুষকে—ডাক পাঠিয়ে দেয়। ছুটে আসে হাজার হাজার মানুষ সৌন্দর্য্যের রঙ্গ-শালায়—তাজের বিশাল অঙ্গনে।

আজ রাত্রিতে এখানে বসবে অপরূপ এক মেলা সারারাত ধরে চলবে তার উৎসব। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হবে তাজের বিশাল অঙ্গনে—লক্ষ লক্ষ দৃষ্টির দূরবীণ দিয়ে নিরীক্ষণ করবে তাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—তার মিনার গম্বুজ—পাথরের লতাফুলের কারুশিল্প—সমাধি-সৌধের দ্বার-দেশে উৎকীর্ণ কোরাণের আয়াতের—অক্ষর-সংযোজন-নৈপুণ্য। সন্ধ্যার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে—যমুনার মাথায় তাজের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে—প্রকাণ্ড একখানি রৌপ্য থালার মত ভাস্বর নীল আকাশে সে যেন বয়ে আনবে সৌন্দর্য্য লোকের আশীর্ব্বাদী। পৃথিবীর কঠিন বস্তুর উপর ঢেলে দেবে সেই আশীর্ব্বাদী তরল কোমল আলোর ধারায়। নদীর জলে গলে গলে পড়বে জ্যোৎস্নার রৌপ্যরূপ, জলে প্রতিবিম্বিত হবে পূর্ণচন্দ্র, স্রোতহীন যমুনার তাজ-দেহলীতে বন্দী হয়ে স্থির-সৌন্দর্য্য কল্পলোকে উধাও করে দেবে মানুষের মন—সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষের মন। রাত্রির প্রহর যতই বাড়তে থাকবে—চাঁদ যমুনা-সিনান সেরে উঠে আসবে আকাশের মাঝখানে। নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র—উজ্জ্বল চাঁদ। তাজের মিনারে মিনারে চুম্বন রেখা আঁকবে চন্দ্রিকার কোমল অধর দিয়ে। অনুরাগ-উজ্জল স্পর্শ পেয়ে জলে উঠবে তাজের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—গম্বুজ-মিনার-অলিন্দ-জাফ্‌রি লতাফুলের শিল্প—অক্ষর-মালিকা-অলঙ্কৃত প্রবেশ পথটি পর্য্যন্ত। ঝক্ ঝক্ করে উঠবে তাজ। চিরবিরহী তার কামনার স্বপ্নশয্যা ছেড়ে ঊর্দ্ধপানে চেয়ে বলবে:

ভুলি নাই—ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।

এ বুঝি সেই নিকষিত হেম যার আলিম্পন সমুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি লক্ষ লক্ষ চক্ষুকে—লুব্ধ মুগ্ধ—শ্রদ্ধাসম্ভ্রম বিগলিত করে দেবে। এক কথায় রাত্রি ন'টা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত—মধ্যগগনের চাঁদ যখন তাজের সারা দেহে পূর্ণ-কিরণজাল প্রসারিত করবে—তখন বিদ্যুৎ-আলোকদীপ্ত স্বর্ণালঙ্কারের মতই জ্বল জ্বল করে উঠবে তাজ। কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল নয়—আদিত্যবর্ণ পরমপুরুষের হিরণ্য বর্ণানুরঞ্জিত দৃষ্টির মতই উজ্জ্বল, অকলঙ্ক—অতুলন।

যে কোন পূর্ণিমার রাত্রিতে এত দুর্লভ-দর্শন সৌন্দর্য্য-পসরা নিয়ে কি জেগে ওঠে তাজ? মধ্য রাত্রির চাঁদের সুধায় অন্তরের সুধাভাণ্ডার উৎসারিত করে ভুবনকে সম্মোহিত আর মানুষের সৃষ্টিকে করে সম্মানিত? না, অন্য কোন পূর্ণিমা এভাবে জাগাতে পারে না তাজকে, তাকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে না রূপ-মন্দিরের ভাবঘন বিগ্রহের চিন্ময় পরিমণ্ডলে। অন্য পূর্ণিমায়-আকাশ থাকে না এমন সুনীল, প্রকৃতি থাকে না এত প্রশান্ত, নাতিশীতোষ্ণ ঋতু দাক্ষিণ্য থাকে না এমন অবারিত, মানুষের মনও থাকে না রূপলোক থেকে ভাবলোকে যাতায়াতের উপযোগী; বস্তু থেকে ঐশ্বর্য্যে এবং চিন্তা-তন্ময়তার পরিপ্রেক্ষিতে এতটাই সংবেদনশীল। শুধু এই একটি দিন—কোজাগর-পূর্ণিমার রাত—তাজ আর পূর্ণিমা—মানুষের সৃষ্টি আর ঈশ্বরের রচনা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে এই অপরূপ শোভা দর্শন করতে—এই জ্যোতিতে ভরে নিতে অন্তর।

লক্ষ মানুষই দেখলাম- তাজের বিরাট অঙ্গন ছেয়ে রয়েছে। শুধু ভারতবর্ষের মানুষ নয়—পৃথিবীর বহু দূর দূরান্তর থেকে—দুই গোলার্দ্ধে যত রাজ্য আছে—সব রাজ্য থেকে এসেছে তারা। এসেছে চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, শ্যাম, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইরাণ, তুরস্ক- কোথা থেকে আসেনি—সৌন্দর্য্য-পূজারী মানুষ? তারা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পূর্ণচন্দ্র-সমুদ্ভাসিত তাজের প্রজ্জ্বলন্ত দেহ-মন্দিরের পানে। দু'চোখ ভরে পান করছে সুধা ধারা—সর্ব্বাঙ্গে সুধাপান-জনিত আনন্দের লেখা। তারা সমস্ত বৃত্তি একীভূত করে সেই কথাই কি শুনছে:

> জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
> প্রেয়সীরে—যে নামে ডাকিতে ধীরে—
> সেই কানে কানে-ডাকা রেখে গেলে এইখানে
> অনন্তের কানে।

যে মধুর গোপন কথা একদিন সম্রাটের ওষ্ঠচ্যুত হয়ে অনন্তের শ্রবণ-পথে অন্তর্হিত হয়েছিল তাকে কি অনন্তের গোপন অন্তর-কক্ষ থেকে আহরণ করবার জন্য লক্ষ মানুষ এমন উন্মাদ হয়ে ছুটে এসেছে জ্যোৎস্না-পরিমার্জ্জিত ভুবনে অদ্বিতীয় এই সমাধি সৌধ প্রাঙ্গণে?

মর্ম্মর মূর্তি

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাটিকা)

অত্যন্ত কৃপণ, বৃদ্ধ মহাজন শীতলবাবু তাঁর বৈঠকখানায় বসে হিসেবের খাতা দেখছেন, আর গড়গড়া টানছেন। শীতলবাবুর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেছে বৈঠকখানাটি, দুইই সমান রিক্ত ও পরিচ্ছন্নতাবিহীন। রোগা চেহারা, টাকপড়া মাথা, নিকেলের চসমা কোনোরকমে নাকের উপর ঝুলে আছে। শোনা যায়, তিনি যথেষ্ট অর্থশালী, কিন্তু কোনো-ভাবে ধরাছোঁয়া দেন না। নীচু, ছোট একটি তক্তপোষের উপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে বসে একটি কাঠের বাক্সে মূলধন রেখে খরিদ্দারদের ভাঙ্গা বেঞ্চিটিতে বসিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকার কারবার করেন তিনি।

বিকেলবেলা, কয়েকজোড়া জুতোর শব্দ পেয়ে চসমার উপর দিয়ে চেয়ে দেখলেন, কয়েকজন ছাত্র ঢুকছে। শ্যামল, মিলন, স্বপন ও আশীষ প্রবেশ করে নমস্কার করল

শীতল। (ঘাড় নেড়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে) কি চাই তোমাদের? কোথা থেকে আসছ সব?

স্বপন। আমরা এখানকার কলেজের ছাত্র; আপনার কাছে একটা নিবেদন নিয়ে এসেছি।

শীতল। কি নিবেদন?

স্বপন। আমরা এই সহরের মাঝখানে একটা মর্মর মূর্তি স্থাপন করতে চাই।

শীতল। মর্মর মূর্তি? পাথরের মূর্তি বলছ তো?

আশীষ। আজ্ঞে হাঁ।

শীতল। কিন্তু তাতে তো বহু টাকার দরকার?

বলে গড়গড়া টানতে লাগলেন

স্বপন। তা দরকার বৈকি। এই ধরুন, সাধারণ একটা আবক্ষ মূর্তি করতে গেলেও হাজার পঁচিশেক পড়ে যেতে পারে।

শীতল। (বিস্ফারিত নয়নে) বল কি হে!

মিলন। তিরিশ হাজার পড়াও আশ্চর্য নয়।

শীতল। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? টাকাগুলো কি খোলামকুচি হে? একটা পাথরের মূর্তির পেছনে শুধু শুধু এতগুলো টাকা বরবাদ করতে চাচ্ছ!

মিলন। তাছাড়া আমরা ভাবছি, সেই সঙ্গে একটু পার্ক ধরণেরও করে দেওয়া হবে; আরও কয়েক হাজার টাকা বেশী পড়বে, কিন্তু তাতে সহরের সকলের বিশেষ করে বৃদ্ধদেরও ছেলেমেয়েদের, স্বাস্থ্যের পক্ষে কত উপকার হবে বলুন তো।

আশীষ। সহরটা আমাদের ধুলোয় ভর্তি, বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলা বেড়াবার বা বসবার একটু জায়গা কোথাও নেই।

শ্যামল। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে একটু পার্ক থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

শীতল। বড় বড় মতলব তো ভাজছ, এত টাকা পাবে কোথায়! এ সব ফন্দী তোমাদের মাথায় কে দিলে বল দেখি।

স্বপন। আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এ কাজে এগোচ্ছি, কেউ কিছু বলেনি আমাদের।

শীতল। সহরের কোন মাতব্বর তোমাদের পেছনে নেই?

স্বপন। এখনও কাউকে বলা হয়নি। একটা কমিটি তৈরি করব আমরা, সেইজন্যে,—সহরের একজন ধনী ও মানী লোক আপনি—আপনার কাছেই প্রথমে এসেছি—

শীতল। আমাকে কি করতে হবে?

শ্যামল। আপনাকে আমাদের কমিটির সভাপতি হতে হবে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে, আমরা আপনার পিছনে থাকব।

শীতল। (বিদ্রূপকুঞ্চিত মুখে) তা একরকম মন্দ বলনি। যেখানকার যা কিছু মালপত্র আনিয়ে কাজকর্ম সমাধা করে পাওনাদারদিগকে এই শর্মাকে দেখিয়ে সরে পড় আর কি।

মিলন। আমাদের আপনি এত খেলো ভাবছেন!

শীতল। দিনকাল ভাবিয়েছে বাবা, আমি কি ভাবি! কোনো রকমে কায়ক্লেশে দুদশ টাকা নেড়ে চেড়ে খাই, তোমরা সকলে আমাকে টাকার গাছ ভেবেছ, বল এখন কি করতে হবে।

স্বপন। আমাদের পার্কসমেত মর্মর মূর্তি বসাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হবে, তার অর্ধেক অর্থাৎ পঁচিশ হাজার টাকা আপনাকে দিতে হবে।

শীতল। (আকাশ থেকে পড়ে) অ্যাঁ! বল কি! পাগল না উন্মাদ তোমরা? যাও, যাও, চলে যাও। বাজে বকিয়ো না আমাকে। পঁচিশ হাজার! নেশাভাঙ্গ করে এসেছ বুঝি?

আশীষ। আমরা কলেজের ছাত্র—এই রকম কথা বললে আমাদের অপমান করা হয় জানেন?

শীতল। জানি জানি, খুব জানি। পঁচিশ হাজার! পঁচিশ হাজার আধলা দেখেছ কখনও? পঁচিশ হাজার টাকা! যাও যাও, কেটে পড়, বিরক্ত কোরোনা।

মিলন। আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন! এটা কি ভাল হচ্ছে আপনার?

শীতল। ভাল কি মন্দ—খুব জানি আমি। সরে পড়। যত সব জুটেছে—

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন

স্বপন। চলে আয় সব। আপনি যে আমাদের এই ভাবে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করলেন না, এটা কিছুদিনের ভিতরেই বুঝতে পারবেন।

শীতল। খুব বুঝতে পারব, যাও এখন।

স্বপন। চলে আয় সব।

সকলে যাবার উপক্রম করল

শীতল। হাঁ হাঁ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি তোমাদের। কোন ভাগ্যবানের মূর্তিটি তোমরা স্থাপন করতে যাচ্ছ শুনি। তিনি কোথাকার নন্দদুলাল,—এখানের না বাইরের?

স্বপন। আপনি টাকা দিচ্ছেন না, আর সে সব কথা জেনে লাভ কি হবে আপনার?

শীতল। তবু শুনি না, শুনতে তো ইচ্ছে হয়, তোমাদের মতন ছেলেরা কাকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

স্বপন। শুনবেন তাহলে?

শীতল। শুনব বৈকি।

স্বপন। আমরা আপনার মূর্তিই স্থাপন করবার প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম।

শীতল। (নিজের শ্রবণশক্তির উপর বিশ্বাস করতে না পেরে) অ্যাঁ, কি বললে? আবার বলতো।

স্বপন। আমরা আপনার মূর্তিই স্থাপন করতে চাই, এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলুম।

শীতল। (হতভম্ব হয়ে) আ—আ—আমার মূর্তি?

আশীষ। হ্যাঁ, আপনারই মূর্তি।

শীতলবাবুর মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন তিনি। যে তক্তপোষে বসে কাজ করছিলেন সে তক্তপোষেই বসে পড়লেন, আশীষ তাড়াতাড়ি একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে বাতাস করতে লাগল

স্বপন। একটু জল আনব?

শীতল। থাক, কিছু করতে হবে না।

মিলন। মনে হচ্ছে, আপনি যেন একটু অসুস্থবোধ করছেন। বাড়ীর কাউকে ডাকলে হত।

শীতল। না না, কাউকে ডাকতে হবে না, কিছুই হয়নি আমার।

স্বপন। আমরা যদি আপনাকে বিরক্ত করে থাকি, তাহলে আমাদের মাফ করবেন।

আশীষ। আপনার ব্লাডপ্রেসার আছে বলে জানতুম না আমরা। আমাদের ত্রুটি নেবেন না।

মিলন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মানুষের জীবন সদাই চঞ্চল।

শ্যামল। পদ্মপত্রে জলের মত চঞ্চল।

আশীষ। ধনিক শ্রমিকের প্রীতির মত চঞ্চল।

শীতল। (বিরক্তমুখে) হাঁ হে ফাজিল ছোকরা, বালকের মত চঞ্চল।

শীতলবাবুর প্রৌঢ় ভৃত্য রাম কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করল

শীতল। রাম!

রাম। আজ্ঞে।

শীতল। এতক্ষণে কলকে পাল্টাবার সময় হল?

রাম। একটু দেরী হয়ে গেল আজ্ঞে।

কলকে পাশে গুড়গুড়ি এগিয়ে দিলে

শীতল। (দুচারটান দিয়ে) এদের দেখছ?

রাম। আজ্ঞে—এঁরা?

শীতল। এরা এখানকার কলেজের ছেলে, সহরে একটা পার্ক করতে চায়, শুধু তাই নয়, তাতে আবার একটা পাথরের মূর্তি বসাতে চায়।

রাম। সে তো খুব ভাল হবে বাবু—ঠিক কলকেতার মত। তা মূর্তিটা কার হবে আজ্ঞে? চেরমেনবাবুর নাকি?

শ্যামল। চেয়ারম্যানবাবু ছাড়া কি সহরে আর ভাল লোক নেই?

রাম। নেই কেন, তবে কিনা—

স্বপন। আমরা এঁরই একটা মূর্তি বসাবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু উনি রাজী হচ্ছেন না।

রাম। (বিগলিত হয়ে) আমাদের বাবুর মূর্তি?

আশীষ। হাঁ।

রাম। (অতি আনন্দে) আহা হা, কি সুন্দর হবে তাহলে! রোজ সকাল বিকেল গিয়ে আমি গড় করে আসব আজ্ঞে।

শীতল। আ মরণ! বেঁচে থাকতে গড় হল না, মরলে করবে!

রাম। বাপ পিতেমোর পিতি মরলেই তো ভক্তিছেদ্দা হয় আজ্ঞে।

শীতল। আর ভক্তিছেদ্দায় কাজ নেই। কত টাকা পড়বে জানিস, কমসে কম পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওরা বলছে' আপনি পঁচিশ হাজার দেন।

রাম। তা দিয়ে দেন আজ্ঞে, আপনার অমন কত পঁচিশ হাজার আছে—একটা ভাল কাজ হবে যখন।

শীতল। বদ্ধ পাগল একটা! পঁচিশ হাজার পয়সা নয় রে উল্লুক, পঁচিশ হাজার টাকা।

রাম। আজ্ঞে, তা তো বুঝছি। কিন্তু আপনার ছেলেপিলে নাতিপুতি নেই যখন, টাকা জমা করে রেখে আর কি করবেন, সৎকাজে বিলিয়ে দেন।

শীতল। যা যা, তুই তোর নিজের কাজে যা, যত সব ফটফটানি তোর!

রাম। কিন্তু দেখো, বাবাধনেরা, তোমরা যদি আমাদের বাবুর মূর্তি তৈরি করাও তো এমন টাকমাথা দাড়ি গোঁফে ভর্তি মুখ করলে চলবে না, বেশ ভালটি করে করতে হবে কিন্তু, দেখলে যেন ভক্তিছেদ্দা হয়।

শীতল। আরে মোলো যা, কোথায় কি তার ঠিক নেই, আর মূর্তি ভাল করতে হবে। তোমরা, বাবা, কেন ওর কথায় কান দিচ্ছ, ওটা একটা আহাম্মক। আমি টাকাপয়সাও দিতে পারব না, আমারও মূর্তিও চাই না। সহরে অনেক বড় ধনী আছে, তাদের কাউকে ধরোগে।

মিলন। সহরে অনেক ধনী থাকতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের পছন্দ আপনাকে।

রাম। (হেসে ফেলে) গিন্নীমাকে যা বলি, তা মিছে নয় দেখছি। লোকে যা বলে বলুক, ওই দাড়ি গোঁফে ভর্তি টাকমাথা মুখই আমাদের লাখটাকা, বড় পয়মন্ত।

শ্যামল। আপনি তো টাকা দেবেন না, তাহলে আমরা আসি।

শীতল। এস।

আশীষ। কিন্তু আপনার শরীরটা বেশ ভাল নয় মনে হচ্ছে, একটু যত্নে থাকবেন।

মিলন। মানুষের জীবন সর্বদাই চঞ্চল।

আশীষ। হাঁসের পালকের উপর জলের মত চঞ্চল।

শ্যামল। ধনী দাতার মর্জির মত চঞ্চল।

শীতল। হাঁ হে, বালকের মত চঞ্চল। হাঁ বাবা চঞ্চল দল, একবার তোমাদের নামগুলি শুনি।

স্বপন। নাম নিয়ে কি করবেন? প্রিন্সিপ্যালকে জানাবেন?

শীতল। না না, তা কেন জানাব! কাজে লাগতে পারে তো? একটু লিখে রাখি।

স্বপন। লিখুন তাহলে। (শীতল লিখতে লাগলেন) এক, শ্যামল ঘোষ; দুই, মিলন সরকার; তিন, আশীষ রায়; চার, স্বপন মিত্র।

রাম। আহা, যেমনি সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর নাম সব।

শীতল। এবার যাও তোমরা। আমি একটি পয়সাও দেব না, টাকাগুলো তো খোলামকুচি নয়।

শ্যামল। হাঁ, খোলামকুচিগুলো ইনকামট্যাক্সকমিশনারের কাজে লাগবে, হিসেব করে রাখবেন।

শীতল। তার মানে ?

শ্যামল। তার মানে, গেল বছর ধানচালের ব্ল্যাকমার্কেটে যে প্রচুর খোলামকুচি আপনি জমা করেছেন, সেগুলো মাটীর তৈরী কিনা, সেটা ইনকামট্যাক্স কমিশনার একবার পরীক্ষা করে দেখবেন। আমাদের শ দুই তিন ছাত্র সেজন্যে তাঁকে আবেদন জানাবে।

শীতল। (ক্রোধে অস্থির হয়ে) তার মানে—তার মানে তোমরা কয়েকজন বদমাইস ছেলে আমার নামে ইনকামট্যাক্স কমিশনারের কাছে নালিশ করবে, এই তো ?

স্বপন। তা যা বলেন !

শীতল। (উঠে দাঁড়িয়ে) যাও, বেরিয়ে যাও, এখনি বেরিয়ে যাও। যা পার করগে যাও তোমরা। ভয় দেখান ! একটি পয়সাও দেব না আমি, কত ভয় দেখাতে পার দেখাও।

রাম। আহা, করেন কি, রাগ করছেন কেন এত ! ওদের উপর কি রাগ করতে আছে ! ছেলেমানুষ সব।

শীতল। ছেলেমানুষ—পাকা মানুষ ! রাগ করবে না, আদর করবে !

শ্যামল। আচ্ছা নমস্কার, আসি আমরা। কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না।

শীতল। খুব বুঝি আমি, যাও, যাও।

হঠাৎ ঠং করে শব্দ হওয়াতে শীতলবাবু চমকে চেয়ে দেখলেন, বিকেলবেলা কাজ করতে করতে একটু ঘুম এসে গেছল তাঁর, ফরসীটা তাঁর হাত থেকে পিকদানীর উপর পড়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই, এদিক ওদিক চারদিক তাকিয়ে জোরে ডাকলেন

রাম ! রাম ! রাম !

ভিতর থেকে উত্তর এল, যাই আজ্ঞে

তামাক দিয়ে যা।

একটু পরেই কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করল রাম ; গড়গড়ায় বসিয়ে বাবুকে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল

শীতল। (কিছুক্ষণ চুপচাপ গুড়গুড়ি টেনে) রাম !

রাম। আজ্ঞে।

শীতল। আমাকে কি কারা খুঁজতে এসেছিল ?

রাম কই তো কাউকে আসতে দেখিনি।

এমন সময় বাইরের দরজার সামনে তিনটি যুবককে দেখা গেল, বয়স সব ১৮।১৯

১ম যুবক। আসতে পারি কি ?

শীতল। এস এস।

যুবকরা প্রবেশ করল

১ম যুবক। আমরা এখানকার কলেজের ছাত্র। আসছে শুক্রবার বিকেল চারটের সময় আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপিত হবে, আপনাকে অনুগ্রহ করে যেতে হবে।

নিমন্ত্রণপত্র দিলে

শীতল। ও, আচ্ছা বেশ, দেখব চেষ্টা করে।

২য় ছাত্র। না চেষ্টা করা নয়, যেতেই হবে আপনাকে। আপনারা সব সহরের মানী লোক, আপনারা গিয়ে যদি না আমাদের উৎসাহিত করেন তো করবে কে ?

রাম। তা তো বটেই। যাওয়া দরকার বাবু আপনার।

শীতল। (কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে) কিন্তু এ সব তোমাদের কলেজের ব্যাপার ; এতে আমার মত অল্পজ্ঞান লোককে নিয়ে তোমাদের কি কাজ হবে বলতো বাবা।

৩য় ছাত্র। দেখুন, সরস্বতীর প্রসাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকেও যেমনি আমাদের দরকার, লক্ষ্মীর প্রসাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকেও আমাদের তেমনি দরকার। কোন বড় কাজই একমাত্র বিদ্বানদের দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না, ধনবানদেরও চাই।

১ম ছাত্র। এ যেন গরুর গাড়ীর দুটো চাকা, একটা না থাকলে অচল।

শীতল। (মুগ্ধ হয়ে) লেখাপড়া শিখেছ, কথাবার্তা তোমাদের বড় সুন্দর। বড় আনন্দ হল তোমাদের দেখে।

রাম। যেমনি সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা।

২য় ছাত্র। যাবেন তো ঠিক !

শীতল। আচ্ছা আচ্ছা যাব আমি।

১ম ছাত্র। নমস্কার, আসি এখন।

শীতল। (দাঁড়িয়ে উঠে) আসবে ? একটু বসবে না ?

৩য় ছাত্র। আমাদের এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে, বসবার সময় নেই।

শীতল। তাহলে আর উপায় কি।

১ম ছাত্র। আসি।

ছাত্ররা যাবার জন্যে এগোল

শীতল। (হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে) হাঁ বাবা, তোমাদের নামগুলি জানতে বড় ইচ্ছে করছে।

১ম ছাত্র। আমার নাম, রঞ্জিত বসু, এর নাম, সুহাস দে, আর একজনের নাম তপন সেন।

শীতল। (পুনরাবৃত্তি করে) রঞ্জিত বসু, সুহাস দে, তপন সেন। কি সুন্দর নাম।

রাম। যেমনি ছেলে তেমনি নাম।

শীতল। এস বাবা, এস।

ছেলেরা বেরিয়ে গেল। তাদের যাত্রাপথের দিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন শীতলবাবু। তারপর যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে

রাম, কিছুই যে ছেলেদের হাতে দেওয়া হল না, কত খরচপত্র তাদের। যাও তো দৌড়ে একবার—

বলে ব্যস্ত হয়ে কাঠের বাক্স খুলে এটা ওটা নেড়ে একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে

এটা দিয়ে এস, বোলো, আমি কিছু চাঁদা দিলুম তাদের।

রাম। (ইতস্তত করে) চাঁদা? চাঁদা তো চাইলে না আপনার কাছে ওরা। দিতে গেলে আবার কিছু মনে করবে না তো?

শীতল। তা আশ্চর্য নয়,—যে অভিমানী আজকালকার ছেলেরা। কিন্তু—আশ্চর্য, কিছুই সাহায্য চাইলে না, শুধু এল আর চলে গেল।

রাম। আপনি সেই থেকে কি যেন ভাবছেন বাবু।

শীতল। ভাবছি? না না, ভাবব আর কি! ভাববার আমার কিই বা আছে! তবে কিনা—আশ্চর্য, (অন্যমনস্ক-ভাবে) বালকের মত চঞ্চল। (আবার একটু ব্যস্ততা প্রকাশ করে) আচ্ছা রাম, নামগুলো কি বললে বল দেখি) শ্যামল বসু, রঞ্জিত মিত্র আর আশীষ সেন—না?

রাম। আমার বড় ভুলো মন, মনে নেই বাবু।

শীতল। ভুলো মন, না?

ব্যস্ত হয়ে কাঠের বাক্সের ভিতর থেকে আধুলি, সিকি, টাকার তোড়া-গুলো নামিয়ে ছোট ছোট কি সব কাগজ দেখতে লাগলেন

হাঁ হাঁ, লিখে রাখলুম না নামগুলো? কই তো খুঁজে পাচ্ছি না।

রাম। কোথায় আবার লিখে রাখলেন? লিখে রাখেননি তো কিছু।

শীতল। লিখিনি? তা হবে। শ্যামল মিত্র, রঞ্জিত সেন, আশীষ বসু—না? ঠিক আর কি করে থাকবে, বুড়ো হয়েছি, সর্বদাই অস্থির, বালকের মত চঞ্চল।

ধীরে ধীরে পর্দা নামল

সীমানা

শ্রীতারক ঘোষ

এই চেতনার সীমানা হারিয়ে গেছে।
কোথায়-যে আদি, কোথায়-যে শেষ,
কোথায়-যে তার চির-উৎসার—
কী-যে উদ্দেশ—তার তো ঠিকানা নেই॥

জানি সত্তায় অফুরান তেজ নেই।
তবু এ দেহের শিরায় শিরায়
তরল আগুন ফুলে ফুলে ওঠে।
অসীম তাপের উৎস কোথায় আছে॥

সৃষ্টির স্রোতে একফোঁটা আলো আমি।
তবু এ প্রাণের অ-সহ আবেগে
সূর্যের মতো নিজেকে ছড়াই।—
দাখো সূর্যের ছোঁয়া এসে লাগে প্রাণে॥

সীমার বাঁধনে বাঁধা এতটুকু আমি।
মনের সীমানা পেরিয়ে পেরিয়ে
তবু চেতনার একী বিস্ফার!
ভেঙে বুঝি যাবে দেহটার আবরণ

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

পরস্পরের অভিভব করা গুণত্রয়ের স্বভাব। তাহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি অন্য দুই গুণের বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের বৃত্তি প্রকাশ বা জ্ঞানের আবির্ভাবের সময় রজঃ ও তমঃর বৃত্তি অভিভূত থাকে; রজোগুণের বৃত্তি চেষ্টার আবিভাবের সময় সত্ত্ব ও তমঃর বৃত্তি অভিভূত থাকে; এবং যখন তমঃর জড়তা আবির্ভূত হয়, তখন সত্ত্ব ও রজঃর প্রকাশ ও প্রবৃত্তি অভিভূত থাকে।

অভিভূত থাকে বটে, কিন্তু অন্য দুই গুণকে আশ্রয় না করিয়া কোনও গুণই কার্য্য করিতে পারে না। কোনও গুণই অন্য দুইটিকে বর্জ্জন করিয়া কোনও কার্য্য করিতে সক্ষম নহে।

গুণগণ পরস্পরকে পরিণামিত করে। এক গুণ হইতে অন্য গুণ উৎপন্ন হয় না। ব্যক্ত বস্তুর মতো গুণগণ "হেতুমৎ" অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্‌ভূত নহে। কিন্তু প্রত্যেক গুণের যে পরিণাম হয়, তাহা অন্য গুণকর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। সত্ত্বগুণের পরিণাম যে জ্ঞান, তাহা রজোগুণকর্ত্তৃক তমোগুণের জড়তাকে বিদুরিত করিবার ফল। এই রূপেই গুণগণ পরস্পরকে পরিণামিত করে।

গুণগণ পরস্পরের সহচর, তাহারা অবিনাভাববর্ত্তী। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন থাকিতে পারে না। রজো-গুণের মিথুন (সহচর) সত্ত্ব, সত্ত্ব গুণের মিথুন রজঃ, আবার সত্ত্ব ও রজঃ উভয়ে তমোগুণের মিথুন। সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েরই মিথুন রজঃ। এই তিন গুণ প্রথমে কখন মিলিত হইল, তাহা কেহ জানে না। তাহাদের বিয়োগও উপলব্ধ হয় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক, শুদ্ধ রাজসিক, শুদ্ধ তামসিক কিছু নাই। প্রত্যেক কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আছে। তবে কোনওটিতে বেশী, কোনওটিতে কম পরিমাণে। সত্ত্ব-প্রধান জ্ঞানের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা তমোগুণের ফল। তাহার পরিণাম অর্থাৎ জ্ঞান অগ্রসর হইতে হইতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা রজোগুণের ফল। কোন জ্ঞানই স্থির অথবা সম্পূর্ণ জড়তাহীন নহে। অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ গুণদিগের অসংযুক্ত অবস্থা হইতে সংযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তিও যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাহাদিগকে বিযুক্ত অবস্থাতেও পাওয়া যায় না।

ত্রিগুণের ব্যাখ্যা করিতে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার Positive Science of the Hindus প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "প্রত্যেক সমুৎপাদ (phenomenon) ত্রিবিধ মৌলিক উপাদানদ্বারা গঠিত—বুদ্ধিগ্রাহ্য সার (intelligible essence), প্রৈতি (energy) ও ভর (mass)। যাহা দ্বারা কোনও বস্তু বুদ্ধির নিকট আপনাকে প্রকাশিত করে, তাহাই তাহার সার। বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে (সমষ্টিবুদ্ধির মধ্যে) এমন কিছুই নাই, যাহা এই প্রকারে প্রকাশিত হয় না। সার তিন উপাদানের মধ্যে একটি মাত্র। ইহার ভরও নাই, ভারও নাই। ইহা কিছুকে বাধাও দেয় না, নিজে কোনও কর্ম্মও করিতে পারে না। বস্তুর সারই সত্ত্ব। ইহার পরে তমঃ—ভর, নিশ্চেষ্টতা, জড় উপাদান। ইহা যেমন গতির, তেমনি সচেতন পরিচিন্তনেরও (conscious reflection) বাধা উৎপাদন করে। কিন্তু বুদ্ধি-উপাদান (Intelligence stuff) এবং জড় উপাদান কোনও কার্য্য করিতে পারে না এবং স্বতঃ কিছু উৎপাদন-চেষ্টাও ইহাদের নাই। রজঃই সমস্ত কার্য্য করে—রজঃই প্রৈতি-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব। রজঃ জড়ের বাধা জয় করে এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা সরবরাহ করে।"

স্বকীয় গ্রন্থে ডাঃ শীলের উপরোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন *, অনেকের নিকট ডাঃ শীলের এই ব্যাখ্যা সাংখ্যের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হইবে না; সাংখ্যের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্তু সাংখ্যের ভাষ্য ও টীকাদিগের মধ্যে যদিও ঠিক এইভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ব্যাখ্যাত হয় নাই, তথাপি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা দ্রব্য, সত্ত্ব প্রকাশক, রজঃ উপষ্টম্ভক এবং তমঃ নিয়ামক ও বরণক, ত্রিগুণের এই বর্ণনাকে

* Indian Philosophy Vol. II- Page 264, note

আধুনিক শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিতে ডাঃ শীলের ব্যাখ্যা সাহায্য করিতে পারে।

প্রত্যেক বস্তুই, তাহা ভৌতিক হউক অথবা আধ্যাত্মিক হউক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন উপাদানে গঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক ভৌতিক বস্তুর মূল-উপাদান পরমাণু অথবা তন্মধ্যস্থ প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনদিগের বিভিন্ন সংখ্যায় সমবায়দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণু গঠিত। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের যে সমবায়, তাহা তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সমবায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য, এবং তাহারা যে সংযোগ ও বিভাগ-যোগ্য, ইহা আমরা পাইয়াছি। সুতরাং তাহাদিগকে অতি সূক্ষ্ম কণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কণা কিন্তু জড়কণা নহে—particles of matter নহে। তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। এইটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে প্রত্যেক শ্রেণীর বস্তুতে সূক্ষ্মকণাসকল বিভিন্ন পরিমাণে—বিভিন্ন সংখ্যায়—সমবেত হয় এবং প্রত্যেক গুণের পরিমাণ অনুসারে বস্তুর ধর্ম্মের বিভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে অচ্ছতার (transparency) পরিমাণ-ভেদ আছে যাহার অচ্ছতা অধিক, তাহার মধ্যে সত্ত্বের পরিমাণ অধিক। আধ্যাত্মিক বস্তু সকলই ভৌতিক বস্তু হইতে অচ্ছতর। তাহাদের মধ্যে সত্ত্বের পরিমাণ আরও বেশী। ভৌতিক বস্তুদিগের মতো আধ্যাত্মিক সকল বস্তুর মধ্যে বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাবাবেগ সকলের মধ্যে সত্ত্ব,, রজঃ ও তমঃ বিভিন্ন পরিমাণে বর্ত্তমান। যেমন কোনও কোনও ভৌতিক বস্তুর মধ্যে রজোগুণের আধিক্য, তেমনি ইচ্ছার মধ্যে। জ্ঞানের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, মোহের মধ্যে তমোগুণের। পুরুষই একমাত্র বস্তু যাহার মধ্যে গুণের অস্তিত্ব নাই।

গুণত্রয়ের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় যুক্তি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের "পরম রূপ" আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহাদের ধর্ম্ম ও লক্ষণসকল সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারি না, তাহারা যে বাস্তবিকই আছে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ কি?

আধুনিক বিজ্ঞানে বিবিধ শ্রেণীর জড়দ্রব্যের বিশ্লেষণ করিয়া জড়জগতের মৌলিক উপাদান-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে বহু প্রকারের পরমাণু দ্বারা জড়জগৎ নির্ম্মিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমাণুগণও যে মৌলিক পদার্থ নহে, তাহা পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রোটন, ইলেকট্রণ, নিউট্রণ, পজিট্রণনামা তাড়িত-কণা সকল এখন উহাদের মূল উপাদান বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ কোনও রাসায়নিক অথবা তাদৃশ অন্য কোনও রূপ বিশ্লেষণ দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বাহ্য ও আন্তর জগতের রূপের ও গুণের বিশ্লেষণ করিয়া এই তিন গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরমাণুকে তাঁহারা নিত্য ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করেন নাই। (সাং সূ ৫।৮৭-৮৮)

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শ ইহাদের বিষয়। ইহারা হয় সুখকর, নতুবা দুঃখকর অথবা মোহকর (অর্থাৎ উদাসীন)। সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহকে মৌলিক গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জগৎকে সর্ব্ববৈশিষ্ট্যবর্জ্জিতরূপে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যে যদি এক এক করিয়া তাহা হইতে সমস্ত গুণ নিষ্কাশিত (abstract) করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকে গতি, জড়তা ও সত্তা। সত্তা বা অস্তিত্ব সর্ব্ববস্তু-সাধারণ সামান্য। সকল বস্তুই সত্তাবান্। সত্তার সহিত অন্যান্য গুণের সংযোগ হইলে অবিশেষ হইতে বিশেষের উদ্ভব হয়। অবশ্য বিশেষত্ববর্জ্জিত কিছুই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। না হইলেও সর্ব্ববৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত এক অবস্থার কল্পনা করা যায়। বৈশিষ্ট্যবর্জিত অবস্থাই শুদ্ধ সত্ত্ব। সতের ভাবই সত্ত্ব। সৎ শব্দ অস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আবার যাহা সৎ, তাহার সত্তা নির্ভর করে জ্ঞানে তাহার প্রকাশের উপর। যাহার অস্তিত্ব জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না তাহা নাই—অন্ততঃ তাহা আছে, মনে করিবার কারণ নাই। তার পরে বস্তুর জড়তা—বৈজ্ঞানিকগণ জড়তাকে (inertia) বা ভরকে (mens) জড়ের মৌলিক লক্ষণ বলিয়াছেন। বস্তুসকল স্বভাবতঃ নিশ্চেষ্ট; কিন্তু যদি একবার তাহাতে গতি সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে গতিরোধক কিছু না থাকিলে তাহা অনবরত চলিতে

থাকিবে। জগতের সর্ব্বত্রই গতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে জগতের মধ্যে গতির জনক কিছু প্রকৃতির মধ্যে আছে, ইহা অনুমান করা যায়। যাহা জড়তার উৎপাদক তাহাই তমঃ। যাহা জড়তার নিবর্ত্তক তাহাই রজঃ। রজঃ যেমন জড়তা দূর করে, তেমনি সত্বকে মলিনও করে। এই জন্যই তাহার নাম রজঃ। রজঃ শব্দের অর্থ ধূলি, যাহা অন্য দ্রব্য মলিন করে। তমঃ শব্দের অর্থ অন্ধকার। এই শব্দবাচ্যগুণ মুখ্যতঃ অবসাদ বা নিশ্চেষ্টতা-ব্যঞ্জক হইলেও, ইহা সত্ব ও রজঃকে আবরণ করিয়া তাহাদের প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ইহার নাম তমঃ।

বাহ্য ভৌতিক জগতে প্রকাশবত্তা, ক্রিয়াবত্তা এবং নিশ্চেষ্টতা এই তিন ধর্ম্ম প্রত্যেক বস্তুরই আছে, ইহা আমরা দেখিতে পাইলাম। অন্তর্জগতেও যত ভাব আছে, তাহাও এই তিন ধর্ম্মযুক্ত। জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, তেমনি তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, এবং তাহা কখনও সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া তাহার প্রতিবন্ধকও আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। হর্ষ, শোক ও মোহ, দয়া, দ্বেষ ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ভাবই ঐ তিন ধর্ম্মযুক্ত। সুতরাং বলা যায় সমস্ত অস্তিত্ববান পদার্থেরই—সমস্ত ভাবপদার্থেরই—প্রকাশবত্তা, ক্রিয়াবত্তা এবং নিশ্চেষ্টতা এই তিন ধর্ম্ম আছে। এই তিন ধর্ম্ম পরস্পরের বিরোধী। সুতরাং তাহারা একই মূল পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় প্রত্যেক ভাব-পদার্থের তিন উপাদান আছে—এক উপাদান প্রকাশক, দ্বিতীয় উপাদান চেষ্টাজনক এবং তৃতীয় উপাদান নিশ্চেষ্টতাজনক। যে উপাদান প্রকাশক সাংখ্যকার তাহাকে সত্ব বলিয়াছেন; যে উপাদান চেষ্টাজনক তাহাকে বলিয়াছেন রজঃ এবং যে উপাদান নিশ্চেষ্টতাজনক তাহাকে বলিয়াছেন তমঃ।

আমরা দেখিতে পাই যাহা প্রকাশক তাহা প্রীতি অথবা সুখজনক, যাহা চেষ্টাজনক তাহা দুঃখেরও জনক, এবং যাহা নিশ্চেষ্টতাজনক তাহা মোহ অথবা ঔদাসীন্যজনক। তাই সাংখ্যকার জগতের তিন উপাদান স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন নামে বিশেষিত করিয়াছেন এবং সত্বকে বলিয়াছেন প্রীত্যাত্মক (সুখস্বরূপ), রজঃকে বলিয়াছেন অপ্রীত্যাত্মক (দুঃখ-স্বরূপ) এবং তমঃকে বলিয়াছেন বিষাদাত্মক (মোহ-স্বরূপ) এবং প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম (সংযমন) যথাক্রমে তাহাদের স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (সাং কা—১২)।

ভৌতিক স্থূল পদার্থের দুইটি ধর্ম্ম প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—ভর (Mass) এবং প্রৈতি (Energy)। কিন্তু তাহাদের প্রকাশশীলতা ও জ্ঞানে প্রকাশিত হইবার শক্যতা ও একটু চিন্তা করিলেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আমাদের মনঃ প্রত্যেক জড়বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম।—ইহাই জড়ের প্রকাশকত্বের প্রমাণ। অন্তর্জগতে এই প্রকাশকত্ব যে পরিমাণে বর্ত্তমান, বাহ্যজগতে অবশ্য তাহার পরিমাণ অনেক কম। অন্তর্জগতে তমঃ গুণ অপেক্ষাকৃত কম। মনঃ অতিশয় চঞ্চল এবং চিন্তায় যাহা প্রতিবিম্বিত হয় তাহা সীমাবদ্ধ। সত্ব ও রজঃ গুণের প্রভাবে যাবতীয় বাহ্যবস্তুই চিন্তায় প্রকাশিত হইতে পারিত। কেন পারে না? তাহার কারণ মনের মধ্যে সত্ব ও রজঃ গুণের বিরোধী এক শক্তি। সেই শক্তিই তমঃ। আমাদের পরিজ্ঞাত সকল বস্তুই যে সর্ব্বদা আমাদের মনের সম্মুখে থাকে না, চেষ্টা করিয়া স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া যে তাহাদিগকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, তাহার কারণও এই তমঃ। সুতরাং ভৌতিক ও মানসিক সকল পদার্থই ত্রিগুণান্বিত। সকলেই ত্রিগুণ হইতে উদ্ভূত।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ, যাহা হইতে ভৌতিক জগৎ ও মনোজগৎ উভয়ই উদ্ভূত হয়, তাহা কি ভৌতিক পদার্থ, অথবা মানসিক পদার্থ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের 'পরম রূপ' কি, তাহা আমরা জানি না। পরে আমরা দেখিতে পাইব প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্ত হয় মহৎ অথবা বুদ্ধিরূপে। মহৎ হইতেই ভৌতিক ও মানসিক যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং ভৌতিক পদার্থনিচয়, বিজ্ঞান যাহাকে জড়বস্তু বলে, তাহা নহে। মনোজগৎ ও ভৌতিক জগতের মধ্যে আত্যন্তিক বিসদৃশতাও নাই। একই মূল উপাদানে উভয় জগৎ নির্ম্মিত। ভৌতিক জগৎ মনোজগৎ অপেক্ষা স্থূলতর, এই প্রভেদ উভয় জগতের মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মনঃ ও বুদ্ধি বলিতে পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা বুঝায়, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহা বুঝায় না। সাংখ্যশাস্ত্রে মনঃ ও বুদ্ধি অচেতন। পরে আমরা ইহার আলোচনা করিব। কিন্তু অচেতন হইলেও চেতন পুরুষের "ঈক্ষা" বশতঃ বুদ্ধি সচেতনের গুণ প্রাপ্ত হয় এবং এই সচেতনত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধি হইতেই পরিণামে যখন পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়, তখন ভৌতিক জগৎ যে মনঃ ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ নহে, তাহা নিশ্চিত। সাংখ্যদর্শন জড়বাদী নহে।

পশ্চিম বাংলায় পল্লীশিক্ষা সমস্যা

শ্রীঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

আজকের দিনে স্বাধীন ভারতকে নতুন করে, সুন্দর করে গড়ে তুলবার বাসনা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীর মনেই জাগছে। শ্রীসম্পদে গরীয়ান্, দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মহীয়ান্ এক সম্পূর্ণ নতুন ভারতের স্বপ্ন আজ আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীই দেখছি। তাই অসীম সম্ভাবনাময় অনাগত ভবিষ্যতের পানে আমরা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি। জানি না কবে আমাদের 'মধুর স্বপন' বাস্তবে রূপায়িত হবে। আজকের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community development Project) প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় সূচিত হচ্ছে দেশ-নায়কদের অশেষ জনকল্যাণ কামনা। এই সব জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা সংস্কারের ও কিছু কিছু চেষ্টা চলছে। কিন্তু সব পরিকল্পনাই কল্পনাবিলাসমাত্রে পর্যবসিত হবে, যদি না সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়া যায়। সেইজন্যই ব্যাপক জনশিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে না পারলে ভালো ফসলের আশা দুরাশামাত্র। আজ আমাদের দেশে শিক্ষার চাহিদা নেই, কারণ শিক্ষার দাবী জানাবে কারা? আজ দেশের অগণিত জনগণ নিদারুণ দৈন্য, অভাব ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত—রোগ, ব্যাধি, ও স্বাস্থ্য-হীনতায় জর্জর—কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে নবীন জীবনের নব আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্ফুরণ। তবেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া জেগে উঠবে। দেশের মুষ্টিমেয় শহরবাসীরা কিছু কিছু শিক্ষার আলোক পেলেও পশ্চিম বাংলার অগণিত গ্রাম আজও "যে তিমিরে সেই তিমিরেই"। কবি বলেছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"—

দেশের আপামর সকলের মনে জাগাতে হবে শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ—সকলকে বোঝাতে হবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তারা যেন বুঝতে শেখে শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার—যা' থেকে আজও তারা বঞ্চিত। তবেই তো দেশের জনসাধারণ—যারা আজও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে আছে—মানুষের মতো বাঁচতে চাইবে—করবে শিক্ষার দাবী। আজকের দিনে শুধু আমাদের অন্ন বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হলেই চলবে না। 'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।' এই কঠিন অন্নবস্ত্র সংকটের দিনে জাতির দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ও বিকার ঘটেছে। নানা সমস্যাসংকুল জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডই যেন ভেঙে গিয়েছে। তাই আজ সমগ্র জাতি দেহে মনে পঙ্গু ও ক্ষীণবল হ'তে বসেছে। আজকের দিনে জাতির জীবনকে সুস্থ, সবল, সতেজ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে—চাই শিক্ষা, চাই সাধনা, চাই ত্যাগ ও সেবা। আজও আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক শিক্ষার আলোক থেকে—তাদের জন্মগত অধিকার থেকে—বঞ্চিত। এখনও পশ্চিম বাংলার শতকরা ২৫জন লোকও লিখনপঠনক্ষম কিনা সন্দেহ। আমাদের এই ভয়াবহ জাতীয় কলংক দূর করতে আজ তাই দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীরই বদ্ধপরিকর হওয়া দরকার। দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিরাট ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুদূর-প্রসারী সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন দেশের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃত গলদ। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন—"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।—বল-মূর্খ—ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বহুদিন আগে এই সত্য উপলব্ধি করে বলেছেন—

'অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছো যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।"

আজকের দিনে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে একান্তই শহরকেন্দ্রিক। যাঁরা শহরবাসী—দেশের অসংখ্য গ্রামগুলির সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই—তাঁরা অনেকেই গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একরকম সম্পূর্ণ অজ্ঞ বললেই হয়। আজও পশ্চিম বাংলার পল্লীগ্রামগুলিই তার শহরগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু তবুও শিক্ষিত শহরবাসীরা পল্লীর হিতাহিত ভালোমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন। আজ বাংলার পল্লী জীবনের উৎসটিই যেন শুকিয়ে গিয়েছে। বাংলার পল্লী আজ শ্রীহীন, সম্পদহীন—হৃত গৌরব, হতস্বাস্থ্য। তা'র অতীত শ্রী ও সমৃদ্ধির কথা যেন আজ গল্পের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন বাংলার অনেক গ্রামই অতুল শ্রী, স্বাস্থ্য ও সম্পদের আকর। আজ সেগুলি অতীত দিনের বিগত বৈভবের ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হ'য়েছে। এখনও অনেক গ্রামে বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও সুনিপুণ কারুকার্য-খচিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাংলার পুরোণো দিনের হারাণো ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাংলার অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রামই আজ বিগতশ্রী—অশেষ দারিদ্র্যনিপীড়িত—ম্যালেরিয়া ও মহামারী-বিধ্বস্ত। বাংলার গ্রামগুলি এখন অস্বাস্থ্যকর খানা ডোবা, পচা পুকুর ও ঘন নিবিড় ঝোপ্ জংগলে পূর্ণ। গ্রামের শতকরা আশীজন লোক কৃষিজীবী।বা কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উপায় বা অবলম্বন। সেই বাংলার কৃষকের আজ অশেষ দুর্গতি। সে আজ নিঃস্ব, নিরন্ন,—

অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন—ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগজীর্ণ—অজ্ঞান কুসংস্কার তমসাচ্ছন্ন। গ্রামে ভালো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অতি বিরল। গ্রামবাসীদের তাই শিক্ষার জন্য যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে শহরে। শহরের আবহাওয়ায় গ্রামের লোক আস্তে আস্তে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলে। শহরে শিক্ষিত গ্রামবাসী ক্রমে শ্রমবিমুখও হয়ে ওঠে—শহরের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে পড়ে বিলাসব্যসনাসক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশঃ গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাদের ঘোর অনাসক্তি ও বিতৃষ্ণা জন্মানোও বিচিত্র নয়। এই রকম করে, তারা সুবিধা পেলেই শহরবাসী হয়ে যায়! গ্রামে অন্নসংস্থানের পথটিও সুগম নয়। তাই ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদির জন্যে বহু গ্রামবাসীদের বাধ্য হয়েই অনেক সময়ে শহরে বাস করতে হয়। তারা স্বভাবতঃই শহরের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করবারও কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে—যেগুলি আজও দূরীভূত হয় নি। অনেক গ্রামেই ভালো রাস্তাঘাট নেই—যানবাহনেরও তেমন সুবিধা নেই। পল্লীগ্রামে শহরের সুবিধাযুক্ত বাসগৃহেরও বিশেষ অভাব। সেখানে শিক্ষিত চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রাদি পাওয়াও দুষ্কর। অনেক গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও ব্যবস্থা নেই। এই সব কারণে শহরের শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীরা অনেক সময়ে গ্রামে বাস করতে চান না। সুতরাং শিক্ষাকে গ্রাম-কেন্দ্রিক করতে হলে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের গ্রামগুলির উন্নতি সাধন করা দরকার। গ্রামবাসীদের নিজ নিজ গ্রামের প্রতিই আকৃষ্ট করতে হবে। গ্রামে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে, গ্রামের অবস্থা উন্নত হলে, পল্লীবাসীদের আর শিক্ষার জন্যে, অন্নসংস্থানের জন্যে, চিকিৎসার জন্যে শহরে যেতে হবে না। বলা বাহুল্য, গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বতোভাবে পল্লীপরিবেশের উপযোগী করেই গড়ে তুলতে হবে। পল্লীর শিক্ষায়তনগুলি গ্রামেই অবস্থিত হওয়া দরকার, যাতে গ্রামবাসীদের গ্রাম ছেড়ে শিক্ষার জন্যে শহরে যেতে না হয়। এই কারণেই পল্লী-উন্নয়নের সঙ্গে পল্লী-শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার না হলে কোনও পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। আবার পল্লীগ্রামগুলির সম্যক্ উন্নতি সাধিত না হলে গ্রামবাসীদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সকল পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনার পুরোভাগে শিক্ষাকেই স্থান দিতে হবে। গ্রামবাসীদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা গ্রামে বাস করে গ্রামের ও নিজেদের বৃত্তির সর্ববিধ উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। বহুদিন পূর্বে ডেনমার্কে মনীষী Grundtvig তাঁর দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধির প্রতিবাদ করে People's collegeএর প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে—শিক্ষিত গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই প্রকার শিক্ষা যে ছেলেমেয়েদের জীবনে কখনই কার্যকরী হতে পারে না সে সত্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীও এই সত্য উপলব্ধি করেই কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই গ্রামপ্রধান ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আজও আমাদের দেশে পল্লী-শিক্ষা বিশেষ অবহেলিত। শহরের কয়েকটি ভালো ভালো সুপরিচালিত আধুনিক শিক্ষাদান প্রণালী-সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখেই আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। এখনও পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ পল্লী-অঞ্চলই—এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলার গ্রামগুলিও শিক্ষায় বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষায়—অতিশয় অনগ্রসর! এখন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে যেমন তেমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই। আজকের দিনে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা চলছে। ব্যয়-সংকোচের উদ্দেশ্যে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সহশিক্ষারও প্রবর্তন করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশে বহুদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রতিবন্ধকের জন্যে পরিকল্পনা এতদিনেও কার্যে পরিণত হতে পারে নি। এখনও বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাব্রতীদের ও শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদের এই কাজে অগ্রসর হতে হচ্ছে। দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য সর্বাগ্রে উপযুক্ত জনমত গঠন করতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন ব্যাপক জনশিক্ষা। দেশের অগণিত জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার না হলে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদাও সম্ভব হবে না। এই দরিদ্র দেশে অজ্ঞ, অশিক্ষিত অভিভাবকগণ স্বভাবতঃই চাইবে তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষায় বৃথা সময় নষ্ট না করে তাদের নিজেদের কাজেই সাহায্য করে। সুতরাং আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা বা জনশিক্ষারও বহুল এবং ব্যাপক ব্যবস্থা করা দরকার।

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শহরের ও গ্রামের শিক্ষায়তনগুলির জন্য একই পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে। এটিও দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি মস্তো বড়ো ত্রুটি বা গলদ। গ্রামেরও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামেরও শহরের অবস্থা ও পরিবেশেও অনেক প্রভেদ। সুতরাং গ্রামেরও শহরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষারও প্রকারভেদ হওয়া উচিত। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনানুযায়ীই নির্ধারিত হওয়া দরকার। কাজেই শহরের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে যে পাঠ্যক্রম উপযোগী তা কখনই গ্রামের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে পরীক্ষার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের চরম ও পরম কাম্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েরও মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েদের ডিগ্রী লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়া কারুর পক্ষে সরকারী চাকুরী পাওয়াও সম্ভব নয়। এই রকম করে প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলিকে পুঁথিগত বিদ্যার্জনের উপরেই বেশী জোর দেওয়ার ফলে ছেলেমেয়েরা ক্রমে কায়িক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত

এবং হাতের কাজেও অপটু হয়ে পড়ে। গ্রামের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়বে না। সুতরাং বিদ্যালয়ে অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হবে না। এতে করে পরবর্তী জীবনে তাদের পক্ষে নিজ পারিবেশ ও নিজ সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাও কঠিন হয়ে পড়বে। গ্রামের অনেক দরিদ্র অশিক্ষিত অভিভাবকেরই ধারণা স্কুলে পড়লে ছেলেমেয়েরা বিলাস-প্রিয় এবং শ্রমবিমুখ হয়ে যাবে। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। তাছাড়া গ্রামের সবাই যদি শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার বা সরকারী চাকুরে হয়, তবে দেশের কৃষিকার্য ও শিল্প পরিচালনার ভার কার উপর থাকবে? সুতরাং বর্তমানের কেতাবী শিক্ষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ ত্রুটি যে—প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতির কোনও মিল বা সম্বন্ধ নেই। শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তর বা ধাপ পরস্পর সুসম্বন্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং এমন একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়া দরকার যার একটি ধাপের সঙ্গে আর একটি ধাপের সম্পূর্ণ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকবে। এতে করে ছেলেমেয়েরা একটি ধাপ অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হলে তাদের কোনও রকম অসুবিধায় পড়তে হবে না। অথচ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রত্যেকটি স্তর বা ধাপই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। পল্লী-শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময়ে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কারের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে এখন পর্যন্ত শিক্ষার মানের বিশেষ উন্নতি সম্ভবপর হয় নি। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভাব। এই অভাবই আজকের দিনে পল্লী-শিক্ষা বিস্তারের এবং পল্লীগ্রামে অবস্থিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে। হয়তো বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সংখ্যাই শিক্ষার উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।" আজ কোনও পল্লী-শিক্ষা পরিকল্পনাই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারবে না যতদিন পযন্ত না এই শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্যার সমাধান হয়। শিক্ষক যদি বা পাওয়া যায় উপযুক্ত শিক্ষিকা পাওয়া আরও কঠিন। শহরের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকশিক্ষিকাগণ গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে কাজ করতে একান্তই অনিচ্ছুক। অনেক সময়ে গ্রামে অল্পবয়স্কা মেয়েদের উপযুক্ত থাকবার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। নানাকারণে তাদের পক্ষে অভিভাবকহীন হয়ে গ্রামে বাস করাও নিরাপদ নয়। শহরবাসী ও শহরে শিক্ষিত শিক্ষকশিক্ষিকারা যদি বা নিতান্ত অভাবে পড়ে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে কাজ নেন, শহরে ভালো কাজ পেলেই তাঁরা চলে যান। গ্রাম্য জীবনে বা পরিবেশে তাঁরা আদৌ অভ্যস্ত নন! গ্রামে তাঁরা কোনও সঙ্গসুখ বা আকর্ষণও খুঁজে পান না। এই রকম করে বারবার শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিবর্তনের ফলে অথবা উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষিকার অভাবে গ্রামের বিদ্যালয়গুলির কাজের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং সেগুলির উন্নতিও হতে পারে না। পল্লী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাসম্ভব গ্রাম থেকেই নিলে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষিকা পাওয়া যাবে কি করে। গ্রামের ছেলেমেয়েদেরই আস্তে আস্তে এই কাজের উপযোগী করে তৈরী করে নিতে হবে। তাদের পক্ষে গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রামে বাস করা মোটেই কঠিন হবে না। গ্রামের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ও সমস্যাগুলির সম্বন্ধে ও তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকবে। গ্রামের শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলিও গ্রামে অবস্থিত হওয়া দরকার। নতুবা এই শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, কারণ এইখানেই গ্রামের ভাবী শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে কলমে শেখাতে হবে কি করে তাঁরা গ্রামের ছেলেমেয়ে-দের শিক্ষা দেবেন—আদর্শ গ্রামের পরিবেশের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে। বলা বাহুল্য, গ্রাম্য অর্থনীতি (rural economy) ও গ্রামের সমাজ-বিজ্ঞান (rural civics) এই ভাবী শিক্ষকশিক্ষিকাদের অবশ্যপাঠ্য বিষয় হবে।

দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা—সত্যিকার মানুষ গড়ে তোলাই যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আজকের দিনে আমরা সেকথা ভুলতে বসেছি। পল্লী শিক্ষার ও তাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ; গ্রামবাসীদের আদর্শ গ্রাম্য জীবন যাত্রার উপযোগী করে গড়ে তোলা। যে শিক্ষার সঙ্গে গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই তা একবারেই নিরর্থক। তারা বা তাদের অভিভাবকেরা এই রকম শিক্ষার কোনও উদ্দেশ্য বা সার্থকতা আদৌ বুঝতে পারে না। আজকের দিনে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েরা যে কেতাবী শিক্ষা পাচ্ছে তা তাদের পরবর্তী জীবনে বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। এইজন্যেই শিক্ষাবিধি জনপ্রিয় হতে তো পারছেই না—এর ব্যাপক বিস্তারও সম্ভবপর হচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধী এই প্রকার শিক্ষার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করেই কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বহুদিন আগেই জন ডিউই (John Dewey) প্রমুখ বিশিষ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর "রাশিয়ার চিঠিতে" আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে রাশিয়ার আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করে বলেছেন—

"শুধু যন্ত্রে কোনও কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্চে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবন-যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাক যন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান্ করে তুলচে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি।

এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়—

এদের শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে।"

সুতরাং শিক্ষাকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করলে আমরা কখনই তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারবো না। ছেলেমেয়েদের হয়তো বিদ্বান্ করে তুলতে পারবো, কিন্তু তাদের সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তুলতে পারবো না। আজকের দিনে দেশের অগণিত গ্রামগুলির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হলে—সেইগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে হলে আমাদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ও পল্লীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে আদর্শ গ্রামবাসী গড়ে তোলা। সুতরাং আদর্শ পল্লীর উন্নততর জীবনযাত্রার সঙ্গে পল্লীশিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা নতুন আদর্শে রচিত পল্লী-পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে গ্রামে থেকেই গ্রামের উন্নতি করতে চেষ্টা করবে। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়েই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হবে। তাদের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে। এককথায় তাদের শিক্ষা হবে জীবনকেন্দ্রিক—ইংরিজিতে যাকে বলা হয়—learning by living তারা সেই শিক্ষাই পাবে। এই শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হবে না—হবে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। ছেলেমেয়েরা হাতে কলমে কাজ করে তার মধ্যে দিয়েই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিখবে। তবেই শিক্ষা তাদের জীবনে স্থায়ী ও কার্যকরী হতে পারবে এবং তাদের অভিভাবকেরাও এই রকম শিক্ষার সার্থকতা ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবেন। আজকের দিনে আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে এইরূপ শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে যে সর্বপ্রথম উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকশিক্ষিকার প্রয়োজন সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পল্লীশিক্ষায়তনগুলির জন্য কিরূপ পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হবে। পল্লীবিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম যে গ্রামের পরিবেশ ও সামাজিক জীবনের উপযোগী করে প্রস্তুত করা দরকার একথা বলা বাহুল্যমাত্র। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে পল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখানে তা আলোচনা করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাতে বলা হয়েছে—"Where feasible, the subjects of study should be related to or grow out of the Practical work-life of the pupil"—অর্থাৎ যেখানে সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাদের পাঠ্যবিষয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে বা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজের মাধ্যমেই তাদের পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হবে। তারা যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে তার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক। তাদের পরিবেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে—ভূগোল, ভূবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে। তারা তাদের চারিদিকে যে সব গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায় তাদের মধ্যে দিয়েই তারা উদ্ভিদজগত ও জীবজগতের সঙ্গে পরিচিত হবে। এইরকম করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তারা জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করবে। দৈনন্দিন জীবনে তারা যে প্রাকৃতিক রহস্যগুলির ভেদ করতে অহরহ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বোধ করে তাদের সেই সমস্যাগুলির সমাধান করেই তাদের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান দিতে হবে। বর্তমান যুগই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুগ। সুতরাং এ যুগে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখেই মানুষকে জ্ঞানের পথে এগোতে হবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অশেষ অজ্ঞতা দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। ছেলে মেয়েরা যে গ্রামে বাস করে তার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্বন্ধেও তাদের মোটামুটি জ্ঞান দিতে হবে এবং সেই জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তাদের ইতিহাসের জ্ঞানের গোড়াপত্তন হবে। ক্রমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে। ছেলেমেয়েরা ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের ও পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে। তাদের প্রতিদিনকার জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী তাদের কিছু কিছু গণিত ও হিসাবাদিও শিক্ষা দিতে হবে। যথাসম্ভব ব্যবহারিক প্রণালীতেই বাস্তব সমস্যার মাধ্যমেই তারা অঙ্কের নিয়মগুলি শিখবে। মাতৃভাষায় লিখিত ভালো ভালো সাহিত্য পুস্তকও তাদের কিছু কিছু পড়তে দিতে হবে। এমনি করে তাদের স্বদেশের সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে। তারা গ্রামের শাসন-তন্ত্র ও দেশের সাধারণ শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানবে। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে দেশের স্বায়ত্তশাসন প্রণালীটিকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করতে হবে। তবেই ছেলেমেয়েদের দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। বলা বাহুল্য পল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সকল পাঠ্য বিষয়ই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে তার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহজ নয়। ইংরিজি শিক্ষার বাহন হওয়াতে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে বিদ্যা মুষ্টিমেয় বিদ্বানের সম্পত্তিই হয়ে আছে—জনসাধারণের সম্পত্তি হতে পারে নি। বর্তমানে পল্লী-বিদ্যালয়গুলিতে, বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে দৈহিক শিক্ষা বা শরীরচর্চা শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। অনেক স্থলে গ্রামে স্থানীয় বালক বিদ্যালয়ের গৃহেই সকালে বালিকা বিদ্যালয়-গুলির কাজ হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে অনেক সময়েই সময়ের অভাবে ও উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে ব্যায়াম চর্চা সম্ভব হয় না। পল্লী-বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যায়াম চর্চা শিক্ষা দেওয়া দরকার। নতুবা শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য রাখা উচিত। সুস্থ দেহেই সুস্থ মন সম্ভব হয়, একথা ভুললে চলবে না।

আদর্শ গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রেখেই পল্লী-বিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতি পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের মধ্যেই রূপায়িত হয়ে উঠবে একটি আদর্শ গ্রাম ও তার সমাজ। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে একেই 'School Village' বা বিদ্যালয় গ্রাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক বছর আগে আসানসোলের উপান্তে অবস্থিত 'উষাগ্রামে' ডাক্তার উইলিয়মস ও তার পত্নী তাঁদের পরিচালিত বালক ও বালিকা বিদ্যালয় দু'টিকে একটি আদর্শ গ্রামের রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন বিদ্যালয় দুটিকে একটি আদর্শ সমাজ কেন্দ্রে পরিণত করতে। সেই সময়ে তাঁদের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরিকল্পিত পল্লী-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও তেমনি হবে ছোট আকারে এক একটি আদর্শ গ্রামের সমাজ। এদের মধ্যে দিয়েই ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে সমাজ-সেবা, সামাজিকতা ও সমাজের প্রতি কর্তব্য—শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়ে নয়, নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দিয়ে—তাদের প্রতিদিনকার আচরণের মাধ্যমে। ছাত্রছাত্রীদের দিয়েই বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর, বাগান, পুকুর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার করাতে হবে। তারা নিজেদের কাজগুলি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে নিজেরাই করবে—পরের উপর নির্ভর করতে শিখবে না। এই রকম শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তারা শিখবে শ্রমের মর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতা। এইরূপে তারা কর্মতৎপর ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। শৃঙ্খলা, সময়নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহযোগিতাও শিখবে। গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, পুকুরের পানা পরিষ্কার করা, বনজংগল কাটা ইত্যাদি গ্রামসেবার কাজও ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা নিয়মিত করানো দরকার। এমনি করে তাদের মধ্যে সমাজ-চেতনা ও নাগরিকতা বোধ (civic sense) জাগবে। তারা শিখবে সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ব্যষ্টির ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিতে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনেরও ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের পঞ্চায়েতের উপরেই তাদের ছোটোখাটো অপরাধগুলির বিচারের ভার থাকবে। তার মধ্যে দিয়েই তারা শিখবে সততা, সমদর্শিতা, ন্যায়-পরায়ণতা ইত্যাদি। এই উপায়ে বিদ্যালয়ের নিত্যকার কাজের মধ্যে দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হবে। তারা গ্রামের উপযুক্ত নাগরিক ও সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। এই পল্লী বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েরা শুধু লেখাপড়াই শিখবে না, তাদের যথেষ্ট কাজও করতে দিতে হবে। প্রত্যেক মেয়েকেই শিখতে হবে শিশুপালন, শিশু-পরিচর্যা ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে সুমাতা ও সুগৃহিণী হতে পারে। কৃষি-বিজ্ঞান, কৃষিকার্যের জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা ও যত্ন ইত্যাদি প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই শিখতে হবে। এই সঙ্গে তাদের বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষাও কিছু কিছু দিতে হবে—যেমন তাঁত বোনা, সুতো কাটা, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, কুমোর ও কামারের কাজ ইত্যাদি। দেশের পুরোণো পল্লীশিল্পগুলিও চর্চা ও উৎসাহের অভাবে আজ প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এইগুলি পুনরুজ্জীবিত হওয়া খুবই দরকার। বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষা দেবার সময়ে ঐ বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিও ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে করে তারা যুক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে সক্ষম হয়। তাদের খানিকটা সময় কাজ করতে দিতে হবে, খানিকটা সময় তারা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। এইজন্যে তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিলে ভালো হয়। তাহলে একদল যখন কাজ করবে, অন্যদল তখন পড়াশুনা করতে পারে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে চাষের সময়ে ছেলেমেয়েরা ক্ষেতে কাজ করবারও যথেষ্ট সময় পাবে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরিকল্পিত পল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষাপদ্ধতির যথেষ্ট মিল বা সাদৃশ্য আছে। উচ্চতর পল্লীশিক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য এবং পল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করবার জন্যে পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হওয়া দরকার। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে পল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সুপারিশগুলি করা হয়েছে সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই রিপোর্টে পল্লী মাধ্যমিক শিক্ষার যে সুচিন্তিত পরিকল্পনাটি করা হয়েছে তাকে অবিলম্বে একটি বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে পরিকল্পনাটি আংশিকভাবে কার্যে পরিণত করবার চেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের, বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনও খুব কম। বিদ্যালয়ের এই সংখ্যাল্পতাও ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকদের উদ্যম ও উৎসাহে কোনও কোনও অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে—বিশেষতঃ যে সব স্থানে পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি হয়েছে এবং উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সেইখানেই বালিকা বিদ্যালয়ের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হয়তো ১০।১৫ মাইলের মধ্যেও একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নেই। আবার কোনও কোনও স্থানে কাছাকাছি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে অবাঞ্ছনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহবিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রাম্য দলাদলির তো কথাই নেই। এটিও যে বর্তমানে পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার উন্নতির একটি মস্তো বড়ো বাধা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিদ্যালয়গুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী অবস্থিত হওয়া উচিত। এগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হলে ছেলে-মেয়েদের যাওয়া আসা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রামের রাস্তাঘাটও ভালো নয়—উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থাও অনেক সময়ে সম্ভব হয় না, আর হলেও তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এই সব কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রতি মাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যয়সংকোচের জন্যে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়াতেও কোনও আপত্তি নেই। বর্তমানে গ্রামে উপযুক্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অভাবে কোনও কোনও বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও আংশিক

দেশে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের শিক্ষারও সমুচিত আয়োজন ও ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ডেনমার্কের people's collegeএর মতো কতোগুলি প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশেও গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের বয়স্ক শিক্ষার একজন অধিনায়ক Sir Richard Livingstone এই people's collegeগুলি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি বলেছেন—The only great successful experiment is educating the masses" অর্থাৎ জনশিক্ষার সর্বোত্তম পরীক্ষা যা সব চেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা হুবহু নকল করা সব সময়ে বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলির অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা ও পরিবেশের অনেক প্রভেদ। কোনও বিদেশী শিক্ষা যুক্তি বিচার না করে আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে গেলে অনেকক্ষেত্রেই তা ফলপ্রসূ না হয়ে ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে আমাদের চোখ কান বন্ধ করে বসে থাকলে চলবে না। বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রগতি সম্বন্ধে আমাদের সর্বদাই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে, যাতে সেই ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলির যেটুকু গ্রহণ করা দরকার সেইটুকু নিতে পারি। আজকের দিনে আমাদের আর গতানুগতিক নিয়মে বাঁধাধরা পথে চললেই হবে না। কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—অকুতোভয়ে, পূর্ণ উদ্যমে—নতুন আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে। কবির ভাষায় বলি—

> "আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
> স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই।"

আজ দেশের সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন—নিঃস্বার্থ কর্মীর। আর চাই দেশসেবা ও জাতিগঠনের উদার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষক শিক্ষিকা—যাঁরা শিক্ষা দেবার যন্ত্রবিশেষ নন, সত্যিকার মানুষ।

ভাবে সহশিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের এইরূপ ক্ষেত্রে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেই এই ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়েছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয়। এইজন্য পল্লী অঞ্চলে উপযুক্তসংখ্যক আবাসিক বালক ও বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করতে পারবে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে—এই আবাসিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে ১৫০ থেকে ২০০ জন ছেলেমেয়ের পড়বার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রামের আদর্শ গৃহ ও রাস্তাঘাটের পরিকল্পনানুযায়ী এই বিদ্যালয়গুলির গৃহ ও রাস্তা ইত্যাদি তৈরী হবে, যাতে করে সেইগুলির মধ্যে দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে একটি আদর্শ গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। এই রকম করে তাদের মনে নিজ নিজ গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করবার বাসনাও জাগবে। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একত্র বাস করবার সুযোগ পাবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুরাকালের গুরুশিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও গড়ে উঠবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হবে যাতে ছেলেমেয়েরা গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে গ্রাম্যজীবনের প্রতি আকৃষ্টই হবে। ডেনমার্কের people's collegeগুলিও এই রকম আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের গ্রামের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলি যথেষ্ট পরিমাণে জমি নিয়ে স্থাপিত হওয়া দরকার, যাতে সেইগুলিই হয়ে উঠতে পারে এক একটি ছোটোখাটো গ্রাম। বিদ্যালয় গৃহের সংলগ্ন থাকবে প্রশস্ত খেলার মাঠ, ছাত্রাবাস, কারখানা, বাগান, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি। বিদ্যালয় গৃহগুলি যথাসম্ভব স্থানীয় সস্তা মালমসলায় এবং স্থানীয় লোকদের দ্বারাই নির্মিত হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং ছাত্রছাত্রীরাও যথাসম্ভব এইগুলি নির্মাণে সাহায্য করবেন।

গুরু

সুধীর কাব্যশ্রী

শিশুর অঙ্কুর প্রাণে দিই মুক্ত বায়ু
দিই মনে নবালোক নাশি অন্ধকার,
সঞ্জীবিত চিত্ত লয়ে বাড়ে ক্রমে আয়ু
হতে চলে মহীরুহ পরিপূর্ণতায়।
মহাব্রতে ব্রতী হয়ে করেছি সৃজন
যুগে যুগে মহারথী সর্বগুণাধার,
দ্বাপরে গড়েছি কৃষ্ণ সাজি সন্দীপন
গড়েছি ত্রেতায় রাম দরদী প্রজার।
যেবা দিল মোক্ষ-মন্ত্র দেশ দেশান্তর
পড়েছে নিমাই সে ও ছাত্রবেশে টোলে,
গড়ি মোরা রবি গান্ধী সুভাষ জহর
শিক্ষা দিয়ে অন্তরের স্নেহময় কোলে,
মোরা গুরু শিষ্যদের করি আশীর্বাদ,
সাধনা তাদের পাক্ সিদ্ধির-প্রসাদ॥

প্রাচীন মিশরে ধর্ম-চিন্তার ধারা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন মিশরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত পরিচয় হয় পিরামিড ও সমাধি-মন্দিরে। মিউজিয়ামে মিশরের যে-সব জিনিস রাখা আছে তাও সমাধি থেকেই উদ্ধার করা। আমরা কোন রাজপ্রাসাদ, হর্ম্য বা প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই না। গৃহ-নির্মাণের কাজে কাঠ বা কাচা অর্থাৎ রৌদ্রে শুকানো ইটের ব্যবহার হত, সেগুলি সব ধ্বংস পেয়েছে। পক্ষান্তরে পিরামিড ও সমাধি-মন্দিরগুলি যেন কোন কালে ধ্বংস না হয়, এমনি পাকা রকমে পাথর দিয়ে বা পাহাড় কেটে তৈরি। ভাবটি ছিল যেন এইরূপ: মানুষের ঐহিক জীবন ক্ষণস্থায়ী, তার বাসগৃহের বিলোপ হলে ক্ষতি নেই—কিন্তু পারত্রিক বাসস্থানকে চিরস্থায়ী করা চাই, কেন না অনন্তকাল ধরে মৃত ব্যক্তি সেখানেই বসবাস করবে। কিন্তু এমনি ধারা কল্পনার সঙ্গে মিশরীয় ধর্ম-চিন্তার সঙ্গতির অভাব অনেক স্থলেই দেখা যায়। অবশ্য, তিন হাজার বছরের চিন্তাধারায় পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার প্রত্যাশা নিরর্থক। মিশরের ধর্মের ইতিহাসে এমন কোন দর্শনের আবির্ভাব হয় নি—যাতে করে মূলতত্ত্বের বিপরীত ভাবগুলির বর্জন অথবা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা চলে। তাই এখানে কোন ধর্মতত্ত্বের ধারাবাহিক আলোচনা সম্ভব নয়। মিশরের নিসর্গ-প্রকৃতি ও মানবীয়-পরিবেশ যুগে যুগে যে সব চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গ তুলে দিয়েছিল মানুষের মনে, তারই আলোকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক (physical and spiritual) বিষয়ে তাদের ধারণাগুলিকে মোটামুটি ভাবে বিচার করতে হবে। দর্শনের যুক্তিতর্ক সঙ্গতি-অসঙ্গতি আপাতত শিকায় তুলে রাখাই সঙ্গত।

ধর্মই মিশরীয় সংস্কৃতির জীবন। 'টোটেম' থেকে সুরু করে' সুমহান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সব রকম বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম। মিশরীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে মিশরের প্রকৃতি, বিশেষ করে মিশরের নীল নদী আর সূর্যের দিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। তটভূমিকে জলসিক্ত করে' নদী জীবনের সঞ্চার করে থাকে, সেখানে জন্মে শস্য। প্রতি বছর নীল নদীর জীবনে জন্ম মৃত্যুর আবর্তন দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃষ্ণার্ত দুটি তীরের মধ্যবর্তী শীর্ণা নদীর জলধারা মন্দ হয়ে আসে। প্রাণহীন উপত্যকা-ভূমির অজস্র ধূলারাশি রৌদ্রতপ্ত বাতাসে উড়ে মরু বালুকার সঙ্গে মিশে গিয়ে দিগন্ত অন্ধকার করে দেয়। সারা দেশ হয় তখন মৃত্যুর রাজ্য, সজীব শ্যামলতার চিহ্নমাত্র কোথাও থাকে না। তারপর দেখা যায় জীবনের তড়িৎ স্পন্দন। পাহাড়ের বরফ-গলা জল দ্রুত নেমে এসে নদীকে স্ফীত করে তোলে, খরস্রোত বয়ে যায় উদ্দাম বেগে দুকূল ভাসিয়ে। পরিশেষে জল যখন ধীরে ধীরে নেমে যায়, কৃষিক্ষেত্রের উপর উর্বর এক প্রস্ত পুরু মাটির স্তর জমা করে', মানুষ তখন প্রচণ্ড তাপের মৃতকল্প জড়তা ঝেড়ে ফেলে মহা উল্লাসে চাষের কাজে মন দেয়, জীবনের বীজ বপন করে—আর তখনই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের জয়-দুন্দুভি বেজে ওঠে। বৃষ্টিপাত তেমন নেই এদেশে, মনে হয় নদীর জল যেন জীবনদায়িনী সুধারূপে ভূগর্ভ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। পাতাল থেকে জল ওঠার অনুরূপ আর একটি আজগুবি কল্পনা করতে বাধে নি মিশরীদের। তারা সত্যই বিশ্বাস করতো, নীলাকাশের অন্তরালে আছে আর একটি নীল নদী, যা থেকে জল বর্ষণ হয় সকল দেশে।

নদীর উত্থান পতনের সঙ্গে জীবন-মরণের এই যে বিচিত্র লীলা—যা একটি বার্ষিক ব্যাপার, সূর্যদেবের উদয়াস্তকে সেই জীবন মরণ নাটকেরই একটি নিত্য নৈমিত্তিক অভিনয় রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পূর্বাচলে সূর্যের নবজন্ম প্রতিদিন ঘটে, তরুহীন মরুদেশের নির্মেঘ আকাশে পলে পলে তার তেজের বৃদ্ধি ও হ্রাসকে অনুভব করা যায়, সায়াহ্নে অস্তাচলে সূর্যকে ডুবে যেতে মানুষ নিয়তই দেখে থাকে। মিশরীয় কল্পনা সূর্যের এই পর্যটনকে সেখানকার মানুষের নিজেদের ভ্রমণের মত করেই মানসপটে চিত্রিত করেছিল। অর্থাৎ মিশরীয়রা যেমন নৌকায় ভ্রমণ করে, সূর্যও তেমন কোন দ্যুলোকের সমুদ্র বা স্বর্গীয় নীল নদীর বক্ষের ওপরে তরী ভাসিয়ে যাত্রা করেছেন। কিন্তু সূর্যের এই নৌ-ভ্রমণ মিশরবাসীদের কাছে শুধু কবির কল্পনামাত্র নয়—মানুষের ভ্রমণের মতই তা যথার্থ ও বাস্তব, এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে মিশরের অনেক প্যাপিরাস ও শিলালিপির বর্ণনায় ও চিত্রের অঙ্কনে। বিবরণে দেখা যায়, বজরার মাঝখানে আছে একটি কামরা, তার মধ্যে সূর্যদেব বসে বা দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝি হাল ধরে আছে, আর সেখানে বসেছে দেবগণের বৈঠক। বার ঘণ্টা ভ্রমণের পর আলোর রাজ্য পেরিয়ে গিয়ে নৌকা প্রবেশ করে অন্ধকারের রাজ্যে, সেখানেও ভাসতে ভাসতে যায় নদীর স্রোতে। সূর্যদেবের এই যাত্রাপথ মনুষ্যজীবনের প্রতীক বলেই মনে করেছে মিশরীরা। জন্মের পর মানুষ আলোর রাজ্যে পথ চলে, শ্রান্ত হয়ে মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে, সূর্যের জীবনও ঠিক তেমনি ধারা।

এই কল্পনাটি হাথর-সেকেটের (Hathor-Sekhet) উপাখ্যানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সূর্যদেবের দাহিকা-শক্তি হাথর-সেকেট দেবী, রুদ্র তেজের প্রতীক। "সূর্যদেব রে (Re) স্বয়ম্ভু, দেবতা ও মানবের অধীশ্বর। মানুষেরা একত্র হয়ে সূর্যদেবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বললে,—ঐ দ্যাখো, রে হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। তার অস্থি রূপায় পরিবর্তিত হয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়েছে সোণা, চুলগুলি হয়েছে রঙিণ পাথর (lapis lazuli)। [ব্যঙ্গোক্তির ভাষা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হয়!] এই কথা শুনে সূর্যদেব ক্রুদ্ধ হয়ে দেবসভার আহ্বান করলেন। দেবতাদের উপদেশ মত বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করবার জন্য নিজের চক্ষু-রূপিণী হাথর-সেকেট দেবীকে পাঠালেন তিনি। পৃথিবীতে এসে হাথর

মানবজাতিকে বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন···কিন্তু মানবজাতি নির্মূল হল না, তার কারণ সূর্যদেব রে'র মনে মানুষের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়েছিল।···তখন তিনি হাথর-সেকেট দেবীকে মদ্যপান করিয়ে মাতাল করবার ব্যবস্থা করে' মানবজাতিকে রক্ষা করলেন। তিনি মানুষের অকৃতজ্ঞতায় বিরক্ত হয়েছিলেন, আর এখন তাদের শাসনকর্তা রূপে থাকতে চাইলেন না। এদিকে মানুষ অনুতাপ করতে লাগলো। সূর্যদেব রে দয়াপরবশ হয়ে তাদের তখন ক্ষমা করলেন এবং নিজের শক্তির পরিবর্ত-স্বরূপ আপন তরুণ পুত্রকে প্রভু ও রাজা করে রেখে এলেন।"* ফারাওরা ছিলেন 'রে-র পুত্র' (Son of Re)—আমরা তা পূর্বে দেখেছি। এমন কি, রাণী হাটসেপসুটকে ও আমন রে'র পুত্রী বলে নিজেকে প্রচার করতে হয়েছিল। এই কাহিনীটিতে নৃপতি সূর্যপুত্র হলেন কেমন করে', সেই বৃত্তান্তটি সবিস্তারে বলা হয়েছে।

ধর্মের সঙ্গে 'মিথ' (myth) বা পুরাণ-কথার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, মিথের স্বরূপ না জানলে ধর্মকে বোঝা যায় না। প্রাচীন ধর্ম ছিল কতগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের (rites) সমষ্টি, আর অনুষ্ঠানগুলি পুরাণ-কাহিনীরই ব্যবহারিক রূপ বা আবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে প্রঃ মলিনৌস্কি (Malinowski) বলেন, "Myth is not merely a story told, but a reality lived···believed to have once happened in the primeaval times. and continuing ever since to influence the world and human destinies." অর্থাৎ 'মিথ' শুধু একটি আখ্যায়িকা নয়, বাস্তব জীবনেরই সত্য-রূপ, যে-সত্য জীবন যাপন করেছে মানুষ আদিকালে এবং যা এখনও জগতকে ও মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টির আদিকালে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল, যেমন জমির উর্বরতা-বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদনের জন্য দেবতার ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান—সেই ব্যাপারগুলি নিয়ে রচিত নাটকের পুনরভিনয়ের নামই 'মিথ' বা পুরাণ-কথা। রূপকের ভাষায় যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে কাহিনীতে, নাটকের ভঙ্গীতে সেই ঘটনার বা অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করলে আগেকার মতই উর্বরতার সৃষ্টি, শস্য উৎপাদন প্রভৃতি ফললাভ করা যায়—এই বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকেই 'মিথ'-এর উৎপত্তি। অনুষ্ঠান প্রভৃতির রূপ বদলায়, কালক্রমে সেগুলি নষ্টও হয়ে যায়, কিন্তু 'মিথ' টিকে থাকে আখ্যায়িকা রূপে, এবং 'মিথ'-এর ধ্বংস নেই বলেই, যুগে যুগে দৈব অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণ সম্ভব হয়। দেবতাদের কাজের অনুকরণ দ্বারা ইষ্টলাভের কল্পনা যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে, mythopoeic logic অর্থাৎ পুরাণ-কাব্যের যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে সাদৃশ্য বা সমত্বকে একত্বেরই নামান্তররূপে গ্রহণ করা হয়েছে (similarity and identity merge)—অর্থাৎ, 'কোন জিনিসের মত হওয়া' আর সেই 'জিনিসটি হওয়া' একই কথা। আমাদের বৈদিক গ্রন্থেও সমত্বের একত্ব ভাবকে স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে দেখা যায়। অনুকরণ দ্বারা ইষ্ট ফল লাভের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে কৌষিতকী উপনিষদে: "দৈবীমাবৃতমাবর্তে আদিত্যস্য আবৃতমন্বাবর্তে ইতি দক্ষিণং বাহুং অন্বাবর্ততে।" অর্থাৎ—"আমি তোমার দৈবী সঞ্চরণ ক্রিয়ার অনুকরণ করি, এই বলিয়া দক্ষিণ বাহু ঘুরাইবে।" কায দ্বারা দেবতার সমত্ব, তার মানে সঙ্গে একত্ব লাভ করলে মানুষ তার শক্তির অধিকারীও হতে পারে—ভাবার্থ টা এইরূপ।

'মিথ'-এর উৎপত্তির ভিন্নরূপ কারণও নির্দেশ করেছেন পণ্ডিতেরা; সেটি হল এই যে, 'মিথ' কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বা রাজার জীবন-চরিত। এই মতবাদের সর্ব প্রথম প্রবর্তক খৃ পূ চতুর্থ শতাব্দের গ্রীক দার্শনিক ইউহেমেরাস (Euhemerus)। তিনি বলেছিলেন, "ইতিহাসই 'মিথ'-এর ছদ্মরূপ ধারণ করেছে" ("Myth is history in disguise")। তার মতে দেবতারা সুদূর অতীতের মহাকর্মী কৃতী মানুষ, যাদের পুরুষকার ও উদ্যম গণ কল্পনায় শাখাপল্লবিত হয়ে আখ্যায়িকা-রূপে দেখা দিয়েছে। এই মতের সমর্থনে প্রঃ হোকার্ট (Hocart) আর একধাপ অগ্রসর হয়ে বললেন, "জগতের প্রাচীনতম ধর্মই হল এই বিশ্বাস যে, রাজা মহতী দেবতা। দেবতার পূজা যে রাজ-পূজার আগে আরম্ভ হয়েছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। সম্ভবতঃ রাজাকে বাদ দিয়ে দেবতা ছিল না কোনকালে, আবার দেবতাকে বাদ দিয়ে রাজাও ছিল না (Perhaps there were never any gods without kings or kings without gods)।

'মিথ'-এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের কথা বলা হল, সত্যাসত্য বিচার করবার জন্য নয়। সত্য সম্ভবতঃ উভয় মতবাদেই আছে যদিও পুরোপুরিভাবে কোনটিতেই নেই। মিশরীয় ধর্মের মেরুদণ্ড 'অসিরিস মিথ' (Osiris Myth)। 'মিথ'-এর মূল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হলে ধর্মকে বোঝার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। অসিরিস ছিলেন আদি-যুগের কোন রাজা, সম্ভবত উত্তর মিশরের অববাহিকা অঞ্চলের। পৃথিবীর দেবতা 'গেব' (Geb) তার পিতা, আর আকাশ-দেবী 'নুট' (Nut) তার মাতা, কাহিনীতে এইরূপ বলা হয়েছে। প্রথমেই অসিরিসকে দেখা যায় সংস্কৃতির প্রবর্তক রূপে, যবাদি শস্য কিরূপে উৎপাদন করতে হয় মিশরীয়দের সে-শিক্ষা তিনিই দিয়েছিলেন। জন-মানবকে কৃষিকর্মে শিক্ষা দানের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অসিরিসের একটি ভ্রাতা ছিল, সে একজন শয়তান প্রকৃতির মানুষ—নাম 'সেট' (Set)। ভ্রাতার প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি দেখে এই শয়তানটি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। অসিরিস যেমনি মিশরে ফিরলো, অমনি ছল চাতুরি ক'রে সেট তাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে ভরে সেটিকে নদীর জলে ফেলে দিলে। অসিরিসের পত্নী আইসিস (Isis) শোকার্তা হয়ে সারা দেশ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে যে-বাক্সটির মধ্যে অসিরিস আবদ্ধ ছিলেন সেই বাক্সটি ভাসতে ভাসতে সিরিয়ার বিবলাস (Byblus) নামক নগরে গিয়ে ঠেকলো, আর সেখানে একটি মায়া-তরু গজিয়ে উঠলো বাক্সটিকে পরিবৃত করে'। সে-দেশের রাজার দৃষ্টি যখন গাছের দিকে পড়লো, তিনি তখন গাছটি কেটে তাই দিয়ে তৈরি করলেন প্রাসাদের

* Weidemann: Realm of the Egyptian Dead.

একটি স্তম্ভ। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে আইসিস গেলেন সেখানে। কিছুকালে রাজ পরিবারে শুশ্রূষাকারিণী রূপে থেকে তিনি সেই স্তম্ভটিকে নিয়ে মিশরে ফিরলেন। আইসিস তার পুত্র হোরাস (Horus)-কে রেখে গিয়েছিলেন মিশরে, ফিরে এসে তার সন্ধান না পেয়ে আবার খোঁজে বেরুলেন। ইতিমধ্যে শয়তান সেট সেই বাক্সটিকে হাত করেছিল এবং তাই থেকে অসিরিসের দেহ বের করে সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলো, তারপর সেই টুকরোগুলিকে মিশরের নানাস্থানে পুঁতে দিল।

এখানে মিশরের একটি অতি-প্রাচীন প্রথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার একটু আভাসও রয়েছে অসিরিস কাহিনীর মধ্যে। অন্যান্য অনেক আদিম মানবের মত প্রাচীন মিশরবাসীরাও তাদের রাজার রাজত্ব কাল নির্দিষ্ট করে সীমা বেঁধে দিয়েছিল। রাজত্বকাল ত্রিশ বছর পূর্ণ হলে রাজাকে বধ করা হত, অথবা তাকে সিংহাসন চ্যুত করে' তার আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর উৎসব বেশ ঘটা করে' সম্পন্ন করা হত, তাকে নিয়ে একটি শোভা-যাত্রা বের করে, মিশরের একটি প্রধানতম দেবতা হয়েছিলেন অসিরিস —কৃষির দেবতা। পাথরে খোদাই-করা বা চিত্রাঙ্কিত যে প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় অসিরিসের, তাতে তিনি রয়েছেন শায়িত, আর তার দেহ দিয়ে যবের চারা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। যে-ভাবে তার দেহের খণ্ডিত অংশগুলিকে নানা স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা আবাদি জমির ওপর শস্য বীজ ছড়ানোরই ইঙ্গিত করে। তা ছাড়া অসিরিস কাহিনী নীল নদীর জীবন-দায়িনী শক্তিরই প্রতীক। তটভূমিকে প্লাবিত করে' রাশি রাশি কর্দম ভাসিয়ে নিয়ে আসে নীল নদীর খর স্রোত, যেমন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অসিরিসের বাক্সটিকে, তারপর শীর্ণতোয়া নদী প্রবাহ যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন উপকূলে পলি মাটিকে ফেলে রেখে যায় সেই বাক্সটির মতই এবং সেই মাটি থেকেই কাহিনীর যাদু-গাছের মত শস্য চারা গজিয়ে ওঠে। নীল নদীর হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে অসিরিসের জীবন-কাহিনীর এই অদ্ভুত সাদৃশ্যকে আকস্মিক বলা যায় না। সৃজন-শক্তি অসিরিস আর সংহার-শক্তি সেট—সৃষ্টি ও ধ্বংস, উর্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব, সঞ্জীবন ও ক্লান্তি, জীবন ও মৃত্যু, এই দুইটি শুভ ও অশুভ শক্তির বিরোধই কাহিনীটির মধ্যে পরিস্ফুট। এ-ছাড়া চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গেও উপাখ্যানটিকে জড়ানো হয়েছে। অসিরিস পুত্র হোরাসের প্রতীক এই শশিকলা। পিতার জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে যে-কলা ক্ষয় হয়েছিল হোরাসের, শশিকলাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিদিন সেই ক্ষয়ই পূরণ হয়ে থাকে।

জীবন-কালে অসিরিস ছিলেন জীবন্ত মানুষের রাজা, মরণের পর হলেন তিনি মৃতের রাজা (King of the Dead)। মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে পুনরুজ্জীবনের (resurrection) অঙ্কুর, মৃতের দেবতা অসিরিসকে তাই জীবন-দেবতা রূপেই দেখতে হয়। শবাধারের পাশেই একটি নকল শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করতো মিশরীরা এই বিশ্বাস করে— মৃত্যুর পর অসিরিসের দেহ থেকে গজিয়ে উঠেছিল শস্যের চারা, মৃত ব্যক্তিও যেন তেমনি পুনর্জীবন লাভ করে। সূর্যপুত্র ফারাওরা মৃত্যুর পর মৃতের দেবতা অসিরিস হতেন, মিশরীয় সভ্যতার আদি পর্বে এই বিশিষ্ট সম্মান ফারাও ছাড়া আর কেউ লাভ করতেন না। কিন্তু কাল-ক্রমে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল, তখন সকল মৃত ব্যক্তিই 'অসিরিসত্ব' প্রাপ্ত হত। নিশীথ রাত্রের সূর্য্যদেবতাই অসিরিস, সমাধি-মন্দিরগুলি তারই রাজ্য মধ্যে অবস্থিত—রাজাদের সমাধি-মন্দিরের প্রবেশপথের শীর্ষে অঙ্কিত আছে সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডল (Sun's disc)। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্যসমূহে ও চিত্রাঙ্কনে দেখা যায় মৃতের রাজ্য, যেখানে নিশীথ রাত্রের সূর্য দরিয়ায় তরী বেয়ে চলেছেন নবজীবন লাভ করবার জন্য। অদ্ভুত বিভীষিকাপূর্ণ কল্পনার খেলা রয়েছে ছবিগুলির মধ্যে —নানা রকমের অপদেবতার প্রতিমূর্তি আঁকা, মানুষের পশুর অথবা মরুভূমির ত্রাসরূপী সর্পের। অর্ধ-মানব অর্ধ-জন্তুর প্রতিকৃতিও দেখা যায় এই দানবকুলের মধ্যে। ছবির সঙ্গে প্রত্যেক দানবেরই নাম লেখা রয়েছে—কেউ বা সূর্য-দেবতার বন্ধু, অধিকাংশ মারাত্মকরূপেই শত্রুভাবাপন্ন। এই শত্রুদলীয় অপদেবতাদের মাথায় আছেন 'আপোপিস' (Apopis) নামে সর্পরাজ—আঁধারের দেবতা (Power of Darkness)—সূর্যদেবতাকে ধ্বংস করবার জন্য তার পথ রোধ করে' দাঁড়িয়ে। তারপর চলে সংগ্রাম। প্রতিবার সূর্যদেবের বন্ধুদের হাতে পরাজিত হন আঁধারের শক্তি, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে, খণ্ডিতও করা হয়, কিন্তু তার বিনাশ নেই। সর্পরাজ আবার ফণা তুলে আলো তাপ ও জীবনের দেবতাকে দংশন করতে ছুটে যায়— চূড়ান্ত পরাজয় তার কখনও হয় না। অনেক দেশেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, গ্রহণ দেখা যায় তখনই যখন কোন সর্প বা দানব সূর্যদেবকে গ্রাস করে—যেমন রাহুগ্রস্ত সূর্য, আর সেই সময় হৈ হল্লা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সূর্য্যকে দানবের কবল থেকে মুক্ত করবার প্রথা রয়েছে। মিশরীয় কল্পনায়, সূর্যের ওপর দানবের আক্রমণ কেবল গ্রহণ-কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রতিনিয়ত সেই আক্রমণ চলছে নিশীথ রাত্রে পাতালপুরীর অন্ধকারে। এই প্রসঙ্গে এ-কথারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাইবেলে ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের আর জরথুষ্ট্র ধর্মের শুভঙ্কর দেবতার সঙ্গে অশুভ শক্তির বিরোধ-কল্পনার অগ্রদূত বলেই মনে হয়, সূর্যদেবের সঙ্গে সর্পরাজের দ্বন্দ্বের এই মিশরীয় চিত্রকে।

সূর্যদেব ও অসিরিসের জীবন-সঙ্গীতের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা মানুষের জীবন। 'শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতেব শস্যমিবা জায়তে পুনঃ' (কঠোপনিষৎ),—অর্থাৎ, "মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে"। মানুষকে অসিরিসের জীবনের পুনরভিনয় করতে হয়, তাই মৃত ব্যক্তির জীবনযাত্রার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে মিশরীরা জীবন্ত মানবের সমান, হয়ত বা তার চেয়ে বেশি। মৃতের জীবন বিষয়ে যে-সব কথা বহুযুগ ধরে লিখে গেছেন মিশরীরা প্যাপিরাসে বা সমাধির ওপর, সেই লিখনগুলি সংকলন করে কয়েকটি গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়েছে—যেমন 'আম-দুয়াত-গ্রন্থ' (Book of Amduat), 'ফটকের গ্রন্থ' (Book of the Gates) এবং 'মৃতের গ্রন্থ' (Book of the Dead)। পরলোক বা অধোজগতের (under world) বিবরণ আছে বলে প্রথম গ্রন্থটির নাম 'আম-দুয়াত গ্রন্থ'। দ্বিতীয়টির নাম 'ফটকের গ্রন্থ' দেওয়া হয়েছে

এই জন্য যে, পরলোকে প্রত্যেকটি "ঘণ্টার ব্যবধানের' (Hour-space) মধ্যে একটি করে ফটক আছে, মৃতকে সেই ফটকের ভেতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে 'মৃতের গ্রন্থ'ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দুই হাজার প্যাপিরাসের তাড়ায় লিখিত এই বইখানির বিষয় ও বিবরণ নানা সমাধি মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নানাবিধ মন্ত্র ও ফরমূলার সমাবেশ রয়েছে এই গ্রন্থে, মৃতের জীবনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করবার জন্য। অধিকাংশই পিরামিড-কালের রচনা, কতগুলি রচনা তারও পুরাণো। রচনাটি প্রজ্ঞার দেবতা থট্-(Thoth)-এর—এমন কি হাতের লেখাও সেই দেবতারই, এই ছিল মিশরীদের বিশ্বাস। মৃতের রাজ্যে মানুষের অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মৃত্যুর পর সকল মানুষই 'অসিরিসত্ব' প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটার সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, কর্ম নির্বিশেষে সুকৃতি ও দুষ্কৃতিকারী সকলেই যদি পরলোকে 'অসিরিসত্ব' লাভের অধিকারী হয়, তাহলে ন্যায়নিষ্ঠা বা ঋতের আদর্শকে রক্ষা করা যায় না। তাই 'অসিরিসত্ব' লাভ করবে সুকৃতিকারী, দুষ্কৃতিকারী নয়—এই ব্যবস্থাই করতে হয়। একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে, দেব সভায় মৃত মানুষের চরিত্রকে ওজন করে' বিচার। মৃত্যুর রাজ্যে মৃতের চরিত্রের বিচার—যে-দৃশ্যটি ছবিতে আঁকা রয়েছে, তারই বিস্তারিত বর্ণনা 'মৃতের গ্রন্থে' পাওয়া যায়। মৃতের যাত্রাপথ পশ্চিমদিকে প্রসারিত—সূর্য যেখানে অস্ত যান, সেই মরু-সিন্ধুর পরপারে চিরতৃপ্তির অমর নিকেতন। পায়ে হাঁটা পথ, নৌকা পথ—হিংস্র জন্তু শ্বাপদ ব্যালনক্র যাত্রাকে করে বিঘ্নসঙ্কুল। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে 'দুই-সত্যের সভাগৃহে' (Hall of the Double Truth) গিয়ে পৌঁছায় সে। সেখানে অসিরিস বসে আছেন সিংহাসনের ওপর, দেবগণ পরিবৃত হয়ে। শেয়াল-মুখো দেবতা 'আনুবিস' (Anubis) পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন মৃত ব্যক্তিকে অসিরিসের দরবারে। ধর্মাধিকরণে মহা-বিচারকের কাছে মৃতের আত্মা হয়ত বা এমনিভাবেই করুণা ভিক্ষা করে:

> কালকৃৎ তুমি দেব! বসতি তোমার জীবনের মর্মমাঝে, পুত্র আমি,
> আমার পাপের ভার দেখে তুমি নত শির, লজ্জায় ম্লান, দুঃখে কাতর।
> শান্তি দাও ওগো শান্তি দাও—ধুয়ে ফেল পাপরাশি।
> তোমার আমার মাঝে ব্যবধান চূর্ণ হোক।

অসিরিসের দরবারে এমনি অনুতাপ করে' মৃতের আত্মার চিত্তশুদ্ধির দরকার হয়। আর যদি সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা অনুতাপ না করে, তাহলে তাকে ৪২টি পাপের নাম করে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করতে হয়। ইতিহাসে মানুষের নীতিজ্ঞান বোধ করি সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল এই ঘোষণাটিতে:

> "হে পরম ঈশ্বর, সত্যের ও ন্যায়ের প্রভু, তোমাকে প্রণাম। তোমার কাছে এসেছি প্রভু সত্যকে বহন করে···আমি কোন ব্যক্তির প্রতি অবিচার করিনি, দরিদ্রের ওপর অত্যাচার করি নি···আমি স্বাধীন মানুষকে তার ইচ্ছার অতিরিক্ত শ্রম জোর করে করাই নি···কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করিনি, দেবতার অনভিপ্রেত কোন কাজ করি নি···ইত্যাদি···আমি পবিত্র, আমি পবিত্র।"

এই সত্যপাঠ যাচাই করেন জ্ঞানের দেবতা থট (Thoth) এবং অসিরিস পুত্র হোরাস (Horus)। মৃতের হৃদপিণ্ড দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হয়, একটি পাল্লায় ন্যায়ের প্রতীক (symbol of justice)-কে রেখে। তারপর ফলাফল ঘোষণা করেন থট। শাস্তি বা পুরস্কারের বিশেষ বর্ণনা নেই 'মৃতের গ্রন্থে'। শাস্তির বিষয় এই মাত্র বলা হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীকে কোন ভক্ষকের (Devourer) কাছে দেওয়া হয়, তাকে ধ্বংস করবার জন্য।

'ফটকের গ্রন্থে'ও এই বিচার দৃশ্যের বর্ণনা আছে, কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। পরলোকে নানা ফটকের মধ্য দিয়ে বিচার কামরায় ঢুকতে হয়। এই বিচার কামরার সংলগ্ন দুটি দ্বার দিয়ে স্বর্গ ও নরককুণ্ডে প্রবেশ করা যায়। পুণ্যাত্মারা 'আলু'-নামক (Field of Aalu) স্বর্গধামে গিয়ে মনের আনন্দে শস্য ক্ষেত্র চাষ করে, আর পাপাত্মাদের নরককুণ্ডে পাঠিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়, জ্বলন্ত আগুনে অথবা গভীর সমুদ্রে তাদের নিক্ষেপ করা হবে বলে। এই সব কথা চিত্রে আমরা পাই ইহাদিগের 'শেষ বিচার দিনে'র (Day of Judgment) পূর্বাভাস, আর ইতালীয় কবি দান্তের (Dante) নরক-কল্পনা। পুণ্যাত্মাদের 'আ-লু' বা স্বর্গকে কল্পনা করা হয়েছে 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' নদী উপত্যকারূপে, সেখানে দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করেন মৃত ব্যক্তিরা, স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন। অতি প্রাচীনকালের লেখায় স্বর্গের অবস্থান উত্তরায়ণেই নির্দেশ করা হয়েছিল, যেখানে রয়েছে ধ্রুবতারা স্থির অচঞ্চল। কিন্তু কালক্রমে অসিরিস-পন্থীরা পশ্চিমদিকে সূর্যের অস্তাচল অভিমুখে মৃতের যাত্রাপথ বলে ধরে নিয়ে ত্রিদিবের স্থান করে দিয়েছিলেন অধোজগতে এই ভরসায় যে সেখানে সূর্যের সান্নিধ্যে অমিত তেজপ্রভাবে মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার—মিশরীদের এই বিশ্বাস সার্বজনীন হয়ে ওঠে নি। পরলোকে একই গতি পুণ্যবান ও পাপীর, এই বিশ্বাসটিরও প্রচলন ছিল। মৃত্যুর পরপারে মহাশূন্য রয়েছে মুখব্যাদান করে,' সেখানে সুখ-দুঃখের স্থান নেই, হয়ত বা দেহের সঙ্গে আত্মাও ধ্বংস পায়, আধুনিক জগতে এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে নীতিজ্ঞানের কোন রকম বিরোধ না থাকারই কথা। অর্থাৎ কর্মের ফল-স্বরূপ পরলোকে শাস্তিভোগ ও পুরস্কার লাভ যারা বিশ্বাস করেন না, তাদের পক্ষেও নৈতিক জীবনের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করা বিচিত্র নয়, অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে কর্মফলে বিশ্বাসের অভাব থেকে 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এমনি একটি উৎকট চার্বাক-দর্শন বা 'এপিকিউরিয়ানিজম্'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আত্মম্ভরী দর্শনেরই সাক্ষাত পাই আমরা মিশরের কোন পরলোকগতা পত্নীর স্বামীর উদ্দেশে উপদেশ ছলে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যে: "হে আমার সাথী, আমার স্বামী, পান আহার বন্ধ কর না, মদিরা পানে

মাতাল হয়ে থেকো, স্ত্রীসঙ্গ আনন্দ কিছুই যেন ছেড়ো না। পশ্চিম দেশে মৃতের যে বাসভূমি রয়েছে সেখানে আছে শুধু নিদ্রা আর অন্ধকার।···সেখানে 'মামি'রূপে যারা ঘুমিয়ে থাকে, কখনও জেগে ওঠে না তারা, সঙ্গীদের দেখে না, পিতা মাতাকেও দেখে না। স্ত্রী-পুত্রের জন্য তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয় না। পৃথিবীতে সকলেই জীবন-বারি পান করে থাকে, কিন্তু আমি চির-তৃষা অনুভব করি···জল কাছেই আছে, আমি তা পান করতে পারি না। নদীতীরে এমন একটু মৃদু-মন্দ বাতাস নেই যা আমার হৃদয়কে জুড়িয়ে দিতে পারে। যে-দেবতা এ-রাজ্য শাসন করেন তার নাম 'পূর্ণ মৃত্যু' (Total Death)। তার আহ্বানে মানুষ আসে তার কাছে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তিনি দেবতা ও মানবের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন না। তার চোখে বড় ছোট সকলেই সমান। তাকে যে মানুষ ভালবাসে তার প্রতিও তিনি কোন অনুগ্রহ করেন না। তিনি মার কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যান। কেউ এই দেবতার উপাসনা করে না, তিনি উপাসকবৃন্দের ওপরও সদয় নন। যে তাকে নৈবেদ্য সাজিয়ে অর্ঘ্য-দান করে তার দিকে তিনি ফিরেও তাকান না।"

মিশরীরা মৃতের মামিকে নানা বসনভূষণে সাজাতো এমন করে যে দেখে মনে হয় যেন—ও-সব সাজ সজ্জার উদ্যোগ মামিটিরই মহাযাত্রার জন্য। আসলে কিন্তু মহাযাত্রায় চলেছে মামি নয়, আর একটি জিনিস যা দেখতে মৃত ব্যক্তিরই মত। আদিম-জাতিদের মধ্যে দ্বৈত-সত্তায় (double personality) বিশ্বাসের চলন আছে—একটি কায়ারূপ, অপরটি ছায়ারূপ। মিশরীরা মৃত্যু-লোকের মানুষটিকে কল্পনা করেছে আদিম-জাতির সেই ছায়ারূপেরই মত। এই ছায়ারূপের নাম 'কা' (Ka)—মানুষের জীবনকালে থাকে দেহের সাথী হয়ে, মরণে দেহ ছেড়ে যায় মৃত্যু-লোকে। একদিকে 'কা'ই মানুষের অজর অমর অংশ, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'-রূপী জীবাত্মারই মত। অপরদিকে 'কা'কে কল্পনা করা হয়েছে ব্যক্তির ইষ্টদেবতা রূপে। বাহু প্রসারিত করে তিনিই ব্যক্তিকে রক্ষা করেন (guardian spirit with protecting wings)। আবার দেখা যায়, সেই জীবাত্মা 'কা'ই হয়েছেন মৃত্যুলোকের অসিরিস। জীবন-দেবতা তিনি মৃত্যুর অন্ধকার থেকে নিয়ে যান জীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। অসিরিসই 'রে' বা সূর্য, তখন সূর্যস্থিত পুরুষকেই 'কা' বলে কল্পনা করতে পারা যায়—'যো সাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি' (ঈশোপনিষদ্)। ছবিতে দেখা যায়, পক্ষী বা ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্য-রূপী 'কা' রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, রাজা করেন তার পূজা, আর 'কা' করেন রাজাকে আশীর্বাদ। মানুষের মত প্রত্যেক দেবতারও নিজ নিজ একটি 'কা' আছে। মেমফিসের নগর-দেবতা 'টা' (Ptah)-এর মন্দির শুধু 'টা'এরই ছিল না, সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল "'টা'-এর কা এর দুর্গ" (Fortress of the Ka of Ptah)। মানুষের এই 'দ্বৈত সত্তা'য় বিশ্বাস নানা কারণে হয়েছে, যেমন স্বপ্ন ও ছায়া-দর্শন। এখানে কিন্তু আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়,—সেটি হল, 'কা'র সঙ্গে অসিরিসের সমীকরণ। অর্থাৎ, যিনি 'কা' তিনিই অসিরিস। দ্বৈত-সত্তায় আদিম বিশ্বাসের ক্ষীণ ধারাটি অসিরিস মিথের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন জীবন্ত, কেমন আবেগ-চঞ্চল করে তুলেছে ধারণার প্রবাহকে, তা-ই লক্ষ্য করবার বিষয়। ছায়ারূপ আর এখন মামির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পিরামিডের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, সে যায় মহাযাত্রায়, অসিরিসত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুলোক পাড়ি দেয়।

একটি অদ্ভুত ধরণের মিশরীয় কল্পনার উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। পুণ্যবান্ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সারা জীবন স্বর্গ ভূমিতে (Fields of Aalu) আবদ্ধ থাকতে হয় না। সে যদি কখনো ক্লান্তি বোধ করে তাহলে পৃথিবীর কোন প্রিয় স্থানে ফিরেও আসতে পারে। ইচ্ছা করলে সে কোন জীবের দেহ ধারণ করতে পারে—যেমন সারস, চড়ুই, সর্প, কুমীর। আত্মার এই পুনরাবর্তন বা দেহান্তর গ্রহণের সঙ্গে ভারতীয় জন্মান্তরবাদের প্রভেদ আছে। জন্মান্তরবাদ কর্মের শাশ্বত নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুণ্য কর্মের ফলে জীব স্বর্গলোকে গিয়ে সুখ-ভোগ করে, আর যখন তার সুকৃতির নির্ধারিত পরিমাণ ভোগ-সুখ ফুরিয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করে সে,—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা)। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে কুৎসিৎ কর্ম করেছে, তারা শীঘ্র কুৎসিৎ জন্মলাভ করে, যেমন কুকুর-যোনি বা শূকর যোনি—'য ইহ কপূয়াচরণা অভ্যাসে হ যত্তে কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন, শ্ব যোনিং বা শূকর যোনিং বা'। মিশরীয় পুনরাবর্তন বা জন্মান্তর কল্পনায় এমনি কোনরূপ আত্ম-শুদ্ধির ব্যবস্থা নেই। বস্তুত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন বা জীবের দেহধারণ আত্মার একটি বিশেষ অধিকার, আর সেই অধিকার লাভ করে কেবল তারাই যারা যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন কিম্বা অসিরিসের বিচারে যাদের ন্যায়নিষ্ঠ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ব্যালনক শ্বাপদের দেহ ধারণ করে তড়িদ্গতি যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব হয় তাদের, প্রভূত বলশালী হয় তারা। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জীব জন্তুর দেহধারীর গোপন দৃষ্টিপাত অন্যের অলক্ষ্যে নানা বিষয় লক্ষ্য করতে পারে। এই সব সুবিধার কল্পনাই মতবাদটির সৃষ্টি করেছিল। তবে জন্মান্তর ব্যাপার নিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও মিশরের সুবিধাবাদী কল্পনার মধ্যে বিরাট প্রভেদ সত্ত্বেও এ-কথা মনে করা আদৌ অসঙ্গত নয় যে মৃত ব্যক্তির পুনরাবর্তন ও দেহধারণের কল্পনা যেমন মিশরে দেখা দিয়েছিল, তেমনই কোন আদিম ভাবই ভারতীয় জন্মান্তরবাদের অগ্রদূত।

অসিরিসের ভগ্নী ও স্ত্রী আইসিস (Isis)। স্বামীর প্রতি ভালবাসা, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর প্রেম দিয়ে জয় করেছিলেন তিনি মৃত্যুকে। শক্তি-রূপিনী তিনি, নীলনদীর তটভূমির উর্বরতা শক্তি তিনি, আইসিস রূপী নীল-নদীর স্পর্শে যে ভূমি ওঠে শ্যামল হয়ে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের সৃজনী-শক্তি তিনি। সেই শক্তিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে, প্রাণী জগতকে, আর সন্তানের রক্ষক মাতৃ স্নেহকে। ভারতের যেমন কালী করালী দুর্গা, ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরীয়ায় যেমন ইসতার (Ishtar), গ্রীসে যেমন ডিমিটার (Demeter), রোমে যেমন সিরিস (Ceres)—মিশরের ও শক্তিদেবী তেমনি আইসিস। সৃজন-শক্তির মূলাধার মাতৃত্বের প্রতীকরূপেই মিশরীরা তাকে পরম শ্রদ্ধা ভরে পূজা করতো। শীতকালে তার শিশু পুত্র হোরাসের

মন্দিরে পূজা অর্চনা হতো, হোরাসকে তিনি দৈব বলে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। মায়ের কোলে শিশুর স্তন্যপান, আইসিস ও হোরাসের এই যুগ্ম-মূর্তি এবং আনুষঙ্গিক দার্শনিক কবি-কল্পনা খৃষ্টীয় ধর্মভাবকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এমন কি, মাতা মেরী ও যিশুর চিত্রে সেই মিশরীয় কল্পনাকেই প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। প্রাচীন কালের খৃষ্টানেরা মিশরের সেই দেব-মাতা ও দেব শিশুর মূর্তিকে রীতিমত পূজা করতেন।

দেবতার সংখ্যা মিশরে যত, ভারত ও রোম ছাড়া আর কোথাও তত অধিক দেখা যায় না। উদ্ভিদ বা প্রাণী এমন বস্তু নেই বললেই হয়, মিশরীরা যা পবিত্র মনে করে নি। জলহস্তী, কুমীর, বাজপক্ষী, হাঁস, ছাগল, কুকুর, চড়ুইপাখী, শিয়াল, সাপ—সকলেই ছিল কোন না কোন দেবতার বাহরূপ বা প্রতীক। যেমন, হাঁস বা মেষরূপী 'আমন', বৃষরূপী 'রে' বা 'অসিরিস', কুমীররূপী 'সেবেক', বাজপক্ষী-রূপী 'হোরাস', 'গাভী-রূপী 'হাথর', বানর-রূপী 'থট'। থটকে দেখেছি আমরা প্রজ্ঞার দেবতা রূপে—তিনি আবার চন্দ্র দেবতাও বটেন। স্ত্রীলোককে উৎসর্গ করা হত বৃষরূপী অসিরিসের যৌন-সম্ভোগের জন্য। প্রসিদ্ধ রোমান লেখক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, মিশরে 'মেনডিস' নামক স্থানে অতি-সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ধর্মের ছাগের যৌন সংযোগ ঘটানো হ'ত। প্রজননের প্রতীক ছাগ ও বৃষ, অসিরিসের অবতার তারা, তাই বিশেষরূপে পূজিত হত এই দুটি প্রাণী। অসিরিস মূর্তির প্রধান অঙ্গই ছিল পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ। ত্রিলিঙ্গ বিশিষ্ট অসিরিস মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরুতো মিশরীরা, কখনও বা মেয়েরাই মূর্তিটিকে বহন করতো এবং সেই সঙ্গে স্বভাব-ক্রিয়ার যান্ত্রিক অনুকরণ করা হতো সূত্রের সাহায্যে। নানারূপ অদ্ভুত উপায়ে লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা দেখা যায় মিশরে। লিঙ্গ পূজার চিহ্ন চিত্রে ও পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। হাতলযুক্ত 'ক্রস'কে (*Crux ansata*) দেখতে পাই আমরা যৌন মিথুন ও সতেজ জীবনের প্রতীক রূপে। এই মিশরীয় প্রতীকের সঙ্গে আমাদের শিব-লিঙ্গের সাদৃশ্য আছে, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। লিঙ্গ পূজার অধ্যাত্মতত্ব, মিশরে যেমন ভারতেও তেমনি চলে এসেছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম মিশরীয় অসিরিস-পন্থীদের লিঙ্গ পূজার 'ক্রস'কেই নীতি ও রুচির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়ে যিশুর পবিত্র ক্রসে রূপান্তরিত করেছেন, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ত্রিমূর্তির কল্পনা দেখা যায় মিশরে অসিরিস, আইসিস ও হোরাসকে নিয়ে। পরবর্তীকালে রে আমন ও টা-কে একই সর্বশক্তিমান দেবতার তিনটি রূপ বলে কল্পনা করা হত। এ ছাড়া ক্ষুদ্র গণদেবতাও ছিলেন—যেমন শেয়ালমুখো আনুবিস (Anubis), শু (Shu), টেফনাট (Tefnut), নেফথিস (Nephthys), নুট (Nut) ইত্যাদি। গণদেবতার মধ্যে জীবজন্তুর প্রাচুর্য গোষ্ঠী-'টোটেমের' কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে আদিকালের 'টোটেম'-ধর্মকে মিশর কোন দিন বর্জন করে নি। যুগে যুগে নূতন ভাব সমষ্টি এসে সেই পুরাণো ধর্মের ওপরই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। পেট্রি (Petris) তার Religion and Conscience of Ancient Egypt গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, মিশরের ইন্দ্রজাল ছিল আদিবাসীদের আদিম ধর্ম, অসিরিস এসেছে লিবিয়া থেকে, বিশ্ব-শক্তির আধার সূর্যের উপাসনা আমদানি করা হয়েছে মেসোপটেমিয়া থেকে, এবং নৃপতিদের রাজশক্তিই দেবতাকে অনুরূপ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী করে তুলেছে। ধর্ম যেখানে নানা স্থানের নানা ভাবের সমষ্টি, চিন্তার অসঙ্গতি ও ভাবের বিরোধ সেখানে অনিবার্য, যদিও সেই সব ভাবগত বিরোধের মীমাংসার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় না। মিশরীয় ধর্মচিন্তায় ঠিক এমনি ধরণের বিরোধ, বৈষম্য এবং নূতনকে পুরাণোর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার রক্ষণশীল মনোভাবের উল্লেখ করে মিশরতত্ত্ববিদ্ উইদ্‌ম্যান (Weidemann) প্রশ্ন করেছেন: "We may ask how it was possible for the Egyptian at one and the same time to believe all those contradictory doctrines; to hold that after death he would dwell in the gloomy regions of the underworld and he would travel the heavens with the sun that he would till the grounds in the fields of the blessed, that his soul would Fly to heaven in the likeness of a bird---etc etc." অর্থাৎ কতগুলি পরস্পর-বিরোধী তত্ব-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব হল কিরূপে মিশরীয়দের যেমন, মৃত্যুর পর অন্ধকার পাতালপুরীতে বসবাস আবার সূর্যের সঙ্গে স্বর্গলোকে ভ্রমণ; স্বর্গের ভূমিতে চাষবাস,, পক্ষীর রূপ ধরে আকাশে উড়ে যাওয়া ইত্যাদি। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে আমরা শুধু এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হতে চাই যে, জগতে কেবল ধর্ম নয়, সংস্কৃতির যাবতীয় বস্তুই আমরা লাভ করেছি দেশী ও বিদেশী ভাবধারার সংমিশ্রণ থেকে এবং সাংস্কৃতিক জগতে ভাবান্তরের প্রভাব দেখা যায় যত, সঙ্গতি বা যুক্তি বিচারের অবকাশ ততখানি নেই।

বহু দেবতার আসন রচনা করা হয়েছে মিশরীয় ধর্মে, তত্বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করলে নানারূপ অসঙ্গতিও দেখা যায় সত্য, যেমন দেবতাকে আঁকা হয়েছে কখনো মানুষ, কখনো বা বাজপক্ষী রূপে, রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে কখনো সূর্য তারা রূপে, কখনো বা বৃষ কুমীর সিংহ রূপে—রূপক ছলে নয়, জীবজন্তুর মূল প্রকৃতি-(Essence)কে অবলম্বন করে'। দেবতা, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, বিশ্বজগৎ, সাধারণ যুক্তি বিচারে সকলেরই রূপ স্বতন্ত্র, প্রকৃতিও ভিন্ন—যেমন, রাজাকে মানুষ রূপেই দেখতে হয়, সূর্য বা বৃষরূপে বর্ণনা অসত্য। কিন্তু সর্বভূতের এই সব বাহ্য রূপের অন্তরালে একটি ঐক্য সূত্রের সন্ধান করেছিল মিশরীরা, তাই জড় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বৈচিত্র্য কেবল একটি মাত্র সত্বার ধারাবাহিকতা বা বিকার, এমনি কল্পনাই তাদের মনে জেগেছিল। রামধনুর সাতটি রং একই বর্ণের বিকার, পরস্পরের মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নেই—অবস্থা বিশেষে এক বর্ণ আর একটি বর্ণে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে মানুষ ও দেবতার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা চলে না, 'দেবতা হয় তখন অমর-মানব আর মানুষ হয় মর-দেবতা'।

এই জন্যই ফারাওকে দেবতার প্রতিরূপ বলে ধারণা করতে কল্পনা কখনো বাধা পায় নি। জগতের বিভিন্ন বস্তুর সমীকরণ প্রচেষ্টায় মিশরীয় চিন্তা মূলবস্তুর একত্ব (consubstantiality) কল্পনা করেছিল, এই তত্ত্বটিকে একেশ্বরবাদ (Monotheism) বলেই অনেক মিশর-তত্ত্ববিদ্ অভিহিত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে যথেষ্ট। মূল সত্বাটি যে কোন আত্মিক বস্তু এই অনুভূতিটি তেমন সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নি মিশরীয় চিন্তাধারায়, যেমন করেছিল ভারতে উপনিষদের গভীর তত্ত্বসমূহের মধ্যে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মূল সত্ত্বার বিষয় বলা হয়েছে এইরূপ: 'স য এষ অনিমা ঐতদাত্ম্যং ইদম্ সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা।' অর্থাৎ, এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল সত্বা তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, সেই আত্মাই রয়েছেন সর্ববস্তুর মধ্যে। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—'একমেবা-দ্বিতীয়ং'—সর্বভূতের অন্তরাত্মা বা প্রকাশক, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' একেশ্বরবাদের এরূপ কল্পনা 'ধর্মভ্রষ্ট রাজা' ইখনাটনের পূর্বে মিশরীয় চিত্তে বড় একটা সজাগ হয়ে ওঠে নি। এইরূপ একেশ্বরবাদের স্থলে বরঞ্চ এক বস্তুবাদই' (Monophysiticism) যেন অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মিশরের দর্শন ও ধর্ম চিন্তায়—অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী এবং বস্তু কোন মৌলিক পদার্থের বিকার মাত্র।

কিন্তু 'এক বস্তুবাদ' বা মৌলিক-পদার্থ কল্পনা যেমনই হোক, দেবগণ যে প্রকৃতি-শক্তিপুঞ্জেরই নামান্তর, তার সুস্পষ্ট আভাস আছে হোরাস দেবের উদ্দেশে একটি স্তব কীর্তনের মধ্যে। খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে রচিত এই স্তবগান—স্তবটিতে প্লাবনের প্রাচীন কাহিনীর (Deluge Legend) ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে: "তোমার প্লাবনোচ্ছ্বাস ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত, তোমার মুখ-নিসৃত বারিরাশি ঝর ঝর শব্দে মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত হয়। সব দেশে আছে হোরাসের জল। হে হোরাস, তুমি সকল জলমগ্ন হয়ে যেত, তুমি যদি না প্লাবনকে আনতে তোমার কর্তৃত্বাধীনে। জল প্রবাহিত হয় তোমার নির্দিষ্ট পথে। গতি-পথের যে প্রণালী নির্ধারিত করে দিয়েছ তুমি, জলের এমন সাধ্য নেই যে সেই পথটি ছেড়ে অন্য পথে গমন করে।" হোরাসের এই কল্পনায় জড়-প্রকৃতির অন্তরালে আমরা একটি আত্মিক সত্বা বা প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাই—যে শক্তি প্রকৃতিকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে। অসিরিস, আইসিস ও হোরাসকে নিয়ে মিশরীয় ত্রিমূর্তির (Trinity) একত্ব কল্পনার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এই তিন দেবতা একই বিশ্ব-শক্তির তিনটি রূপ। প্রকৃতির নিয়ন্তা হোরাস যিনি, জীবন-দেবতা অসিরিসও তিনিই—আর উর্বরা শক্তিরূপিণী আইসিস উভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও অভিন্ন। অন্তত এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত একেশ্বরবাদ মিশরী কল্পনার আয়ত্বের মধ্যে এসেছে।

মৃতদার

শ্রীকালিদাস রায়

যৌবনে তার পত্নী বিগত, জীবন করিছে ধূ ধূ,
তরুণী ভার্য্যা রাখিয়া গিয়াছে সন্তান দুটি শুধু।
সন্তান দুটি পালিত হয়েছে ছোট পিসীমার কোলে।
তাহাদের প্রতি অযত্ন হবে ব'লে
বিবাহ করে নি আর।
হৃদয়েই পোষে, করে না প্রকাশ গভীর দুঃখ তার।
শ্রদ্ধা কিংবা দরদ তাহার প্রতি
দেখি না কাহারো। চায়নাক সেও, অর্জ্জনে রয় ব্রতী।

কবিতার প্রতি অনুরাগ তার নাই,
অথচ আমার কবিতায় দেখি তাহারি রয়েছে ঠাঁই।
আত্মীয় বহু আছে
কারো তরে মোর হৃদয় কি কাঁদিয়াছে?
আমার আত্মীয়তা
চায় নি যেজন তারি তরে মোর হৃদয়ে গুমরে ব্যথা।

কখনো তাহারে কাতর দেখি না, কভু নয় ম্রিয়মাণ,
জানি না পেয়েছে বিধাতার কোন সান্ত্বনাঘন দান!
বেদনা তাহার পোষে
নিশিদিন বুঝি গভীর মর্ম্মকোষে,
শীর্ণ করিয়া তাই তার দেহ, হৃদয়শোণিত শোষে।
নিভৃত নিশীথে শরশয়নের 'পরে
হয়ত তাহার নয়নে অশ্রু ঝরে।
মহৎ তাহার প্রাণ
মোর সাথে তার সব দিকে ব্যবধান।
একনিষ্ঠ সে প্রণয়মন্ত্র জপে শুধু মনে প্রাণে
আমি ছাড়া তবু কেউ তাকি আর জানে?
তারি কথা ভাবি কত দিন, কত রাত,
দেখা হ'লে তার মাথায় বুলাই হাত।
তাহারি লাগিয়া কী গূঢ় বেদনা পুষি আমি অন্তরে,
বুঝে না সে, তার প্রত্যাশা নাহি করে।
ছন্দ বাঁধনে অক্ষয় করি তবু আজি রাখিলাম
তাহার কথাটি। হয় তো সে এর বুঝিবে না—
কোন' দাম।

পরিচালক—উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অসীম, এর দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে, যার অর্থ হচ্ছে কার্য্যসাধনের ইচ্ছা থাকলে একটা না একটা উপায় হবেই। জগতে যাঁরা খুব বড় হয়েছেন তাঁরা সকলেই অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্ত করেছেন। এই শক্তি জীবনে প্রয়োগ করে তাঁরা মানুষের মত মানুষ হয়েছেন। এর জন্যে তাঁরা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, ফলে কোন বাধাবিঘ্নই তাঁদের পথ রোধ করতে পারে নি। তোমরাও তাঁদের আদর্শ অবলম্বন করে আর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই শক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করতে পারো। ইচ্ছাশক্তির মূলসূত্র হচ্ছে—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।'

এর অমোঘ প্রভাবের কথা পৃথিবীর বহু মহাপুরুষ আমাদের শুনিয়েছেন, এঁদের মধ্যে কয়েকজনের বাণী তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। চৈনিক মহাপুরুষ কনফুসিয়াস বলেছেন—'একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষকে পরাজিত করা কঠিন নয়। কিন্তু একটি কৃষকের দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ মনকে পরাজিত করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব—'

বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক এপিক্টেটাস বলেছেন—'কুস্তির আখড়ায় বালক লড়তে লড়তে মাটিতে পড়ে গেলে, আবার তাকে তুলে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়,—এই ভাবে নিত্য ওঠাপড়া করতে করতে শেষে সে শক্তিশালী পালোয়ান হয়। আমাদেরও জীবনে ঐ ভাবে কাজ করা উচিত, প্রথমবারে কোন কাজে সফল না হোলে নিশ্চেষ্ট হয়ে আমরা যেন নিরাশার স্রোতে ভেসে না যাই। এজন্যে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। বাসনা থাকলে, সিদ্ধিলাভ হবেই। তোমরা তোমাদের চেষ্টায় অবহেলা বা ঔদাস্য প্রকাশ করলে, একেবারে অধঃপাতে যাবে—উত্থান-পতন ভাঙা-গড়া সবই মানুষের নিজের ভেতরকার ব্যাপার—'

গেটে বলেছেন—'যার সুদৃঢ় ইচ্ছা আছে, সে পৃথিবীকে তার নিজের মত ছাঁচে গড়তে পারে—'

মহাকবি মিলটন বলেছেন—'তোমাকে পূর্ণরূপ দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেছেন—অপরিবর্ত্তনশীল করে নয়, তোমাকে তিনি সৎ করেছেন কিন্তু একে রক্ষা করার ভার তিনি দিয়েছেন তোমার ওপর—তোমার স্বাধীন মনের ইচ্ছা আর মানস প্রকৃতির ওপরই তা নির্ভরশীল, এই ইচ্ছা ক্রূর অদৃষ্টের দ্বারা কিম্বা কঠোর প্রয়োজনের দ্বারা অতিশাসিত নয়—'

ভূতপূর্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রপতি স্বর্গত রুজভেল্ট বক্তৃতা প্রসঙ্গে কোন সময়ে বলেছিলেন—'অনায়াসলব্ধ সুখের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে, আমি বলতে চাই সেই জীবন সম্বন্ধে—যা অক্লান্ত পরিশ্রম, ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, আর দুঃখ ক্লেশ সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে শেষে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করে। এদের জীবনের কথাই প্রচার করে যাবো। সহজভাবে আরাম আর শান্তি যারা চায়, তাদের এরূপ সাফল্য হয় না। তিক্ত পরিশ্রমে দারুণ কষ্টে বিঘ্ন বিপদে যারা সঙ্কুচিত হয় না তাদের

অভূতপূর্ব্ব চরম সাফল্য এই সবের ভেতর দিয়ে যখন আসে, তখনই ইচ্ছে হয় তাদের কথা জগতে প্রচার করতে, তাদের গান শুনাতে—'

অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে দৈব, অদৃষ্ট, যোগাযোগ সব কিছুই প্রতিহত হয়। ইচ্ছা একাই মহতী। সমুদ্রের সন্ধানে যেমন নদ নদী বেগবতী ইচ্ছায় তাড়িত হয়ে ছুটে চলেছে, তারা কোন বাধা মানে না—তাদের দুরন্ত গতিকেও প্রতিরোধ করা যায় না। প্রাত্যহিক সূর্য্যোদয়কে কোন বাধাবিপত্তি রোধ করতে পারে না—সূর্য্যকিরণকে ঢেকে রাখ্‌তে পারে মাত্র।

প্রত্যেক সৎ আত্মারই লক্ষ্য থাকে মহৎ জীবন অবলম্বন করার দিকে—সহস্র বিঘ্নবিপদ একে লক্ষ্যভ্রষ্ট কর্‌তে পারে না। সেই মানুষই ভাগ্যবান যার অন্তরে আছে শুভ সঙ্কল্প ও বাসনা। তার লক্ষ্য কখন সহস্র দুর্ব্বিপাকেও হারিয়ে যায় না। মানুষের ওপর ইচ্ছাশক্তির এমনই অমোঘ প্রভাব যে, মৃত্যুকেও ক্ষণকালের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কবি বলেছেন......'Why even Death stands still and waits an hour sometimes, itself for such a will.' ইচ্ছা মৃত্যুকে সাময়িকভাবে গতি রোধ করে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

নেপোলিয়ান একস্থানে বলেছেন—'ঘটনার কথা বল্‌ছ! আমিই ঘটনা সৃষ্টি করি—'

এমার্সন একস্থানে বলেছেন—'অদৃষ্টের লৌহ কঠিন সূত্রগুলির ওপর বিশ্বাস করে আমরা রূঢ় হয়ে উঠি আর আত্মবিসর্জ্জন দিই, নিজের জীবনরক্ষার জন্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই নে। একখানা বই, পাথরে গড়া মানুষের অর্দ্ধেক আকৃতি বা একটা কোন লোকের নাম, স্নায়ুর ওপর দিয়ে যখন স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, তখন আমাদের হঠাৎ বিশ্বাস হয় ইচ্ছাশক্তির অমোঘ প্রভাবের ওপর! নবোত্থমপ্রসূত দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যতীত কোন রকম ব্যক্তিগত তেজ বা কোন মহৎশক্তির প্রকাশ হয়েছে এক্ষেত্রে, এরূপ কথা শুনিনি—'

বাক্‌সটন বলেছেন—'যতই আমি বেঁচে থাকৃছি দীর্ঘদিন ধরে, ততই আমার অভিজ্ঞতার ফলে সুনিশ্চিত হচ্ছি এই ভেবে যে, সবল ও দুর্ব্বল, মহৎ ও নগণ্যের মধ্যে ব্যবধান প্রভৃতির মূলে আছে একটা অমোঘ কার্য্যকরী শক্তি—অদম্য সঙ্কল্প—নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য, আর তার ফলে হয় মৃত্যু না হয় জয়। ইচ্ছাশক্তির এমনই গুণ যে, এ পৃথিবীতে সে সবই সম্ভব করতে পারে—এ ছাড়া দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণীর পক্ষে নিছক প্রতিভা, ঘটনার পরিবেশ বা সুযোগের মাধ্যমে মানুষ হওয়া অসম্ভব—'

ডিজ্‌রেলি বলেছেন 'আমি জয়ী হ'তে পারি '

সব কিছু বাধাবিঘ্ন অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারেন এই কথাই উনি বলেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—'...কোন্ পুরুষ, কোন্ অলস শ্রম-কাতর মানুষ কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, রহিয়া, সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া মানুষ হইতে হয়'।

কবিবর হেমচন্দ্র বলেছেন—'সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা, রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।' ইতিহাসের পূর্ণ স্বাক্ষর লাভ করে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে। তোমরা বোধহয় জানো বহু সাধকের, বহুবীরের আর বহু মনীষীর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সমন্বয়ের ফলে এটি সম্ভব হোতে পেরেছে। সহস্র সমস্যাকণ্টকিত পথে পদচারণা করেও স্বাধীনতার উপাসকগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ন নি, বা পিছু হটে আসেন নি। দিনের পর দিন ধরে তাঁরা লৌহ আঘাত সহ্য করেছেন তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ কর্‌বার জন্যে, কোনদিন কর্ত্তব্যচ্যুত হ'য়ে প্রাণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা হারান নি। আজ তাঁরা পৃথিবীতে যে কীর্ত্তি স্থাপিত করেছেন, তা কোনদিন নিষ্প্রভ হবে না।

প্রথমে কি ভাবে ইচ্ছা শক্তি অর্জ্জন করতে হয় তোমাদের কাছে সেই কথাটি এখানে বলেই আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি। রবিবার ভিন্ন প্রত্যেক দিনে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুশীলন করা চাই-ই। প্রথম দিনে তোমাদের যা ভালো লাগে এমন বাছাই করা শব্দ বা পদ যোজনা করে সারিবদ্ধ ভাবে কয়েক পংক্তি লিখ্‌বে। দ্বিতীয় দিনে তোমাদের কাছে যে সব বাণী, বিবৃতি বা রচনা ইচ্ছাশক্তি লাভ করার অনুকূলে প্রকাশিত হয়েছে আর এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে, সেগুলি বারে বারে স্মরণ ও পুনরাবৃত্তি কর্‌বে। তৃতীয় দিনে পঞ্চাশটি কথার সাহায্যে এমন একজনের সম্বন্ধে রচনা লিখ্‌বে যিনি অদম্য

ইচ্ছাশক্তির আনুকূল্যে পৃথিবীতে বড় হয়েছেন। চতুর্থ দিনে পঞ্চাশটি কথায় লিখে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে ইচ্ছাশক্তি কি। পঞ্চম দিনে পরদিন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কি করবে তা নিজেকে আদেশ করে লিখবে। ষষ্ঠ দিনে লিখবে পরবর্ত্তী বৎসরে এইদিনে পাঁচটি কাজ কি কি করবে। এইভাবে অভ্যাস করলে তোমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পাবে, আর এরই জোরে তোমরা উত্তরকালে মানুষের মত মানুষ হয়ে চির বরণীয় ও স্মরণীয় হ'তে পারবে—স্বাধীন ভারতও তোমাদের গৌরবে গৌরবান্বিত হবে।

রূপকথার রাজকন্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,—
কেন নাহি ধরা দাও ?··· লজ্জায় ?···শঙ্কায় ?
রূপ-সায়রের জল
তটে তটে উচ্ছল,
তোমার নূপুর-ঝরা মণি সেথা চমকায় ?
কোথা তব পথখানি ?
শুকতারা বলে—"জানি",
তনুর সুবাস কাঁপে আজো নিশিগন্ধায়,
আজো তব চুম্বনে
ফুল ফোটে বনে বনে,
চরণের রেখা আঁকা আজো ভুঁই-চম্পায় !

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,
তুমি চিরযৌবনা, তুমি চিরতন্বী ;
অস্ত-সায়র-পারে
কোথা যাও অভিসারে
গোধূলির মেঘে জ্বালি' কামনার বহ্নি ?
কাহার পরশ লাগি'
সারারাত ছিলে জাগি',
কোন্ পথে খোয়াইলে হীরকের কঙ্কন ?
গজমতি মালাটিরে
ছুঁড়ে ফেলে নদীনীরে,
কোন্ ঘাটে খুলে দিলে কবরীর বন্ধন ?

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,
পাতালপুরীর খাটে আজো নিদ্ যাও কি ?
নাগিনীর নিঃশ্বাসে
তনু নীল হ'য়ে আসে,
ঘুমভাঙ্গা-যৌবনে চোখ মেলে চাও কি ?
স্বপ্নের মধুমাসে
কে যেন শিয়রে আসে,
আজো কারো চুম্বন-তাপ ঠোঁটে পাও কি ?
তন্দ্রার ঘোরে-ঘোরে
কা'রে বাঁধ বাহুডোরে ?
তোমার মনের কথা তাহারে শুনাও কি ?

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,
রূপ দেখে চাঁদ বুঝি থামে নভোবর্ম্মে ?
চেয়ে তব মুখপানে
বিস্ময়ে অভিমানে
ভাবে মনে, তার মত এ কে এল মর্ত্ত্যে ?
নীলপরী লালপরী
কা'রে নিয়ে আসে মরি !
যামিনী উতলা হো'ল কা'র মধু'পর্শে ?
কণ্ঠের মালাখানি
ঘুমঘোরে খুলে আনি'
গোপনে পরালে কা'রে তনুভরা হর্ষে ?

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,
মুকুতার শতনরী গেল পথে ছিঁড়ে কি ?
সে-মুকুতা চিনে' চিনে'
ফাগুন-গোধূলি দিনে
রাজার দুলাল আসে সাগরের তীরে কি ?
কোন্ পূর্ণিমা রাতে
রাখি' হাত তা'র হাতে
গেয়েছ তোমার গান বেদনার মীড়ে কি ?
মদির বাতাস এসে
দোল দিয়ে তব কেশে
ঝরাল মালতী ফুল তনু তা'র ঘিরে কি ?

ওগো রাজকন্যে,
ওগো রাজকন্যে,
'আজো কি ফেনার বুকে ভাস রূপ-সায়রে ?
ঝিঁঝিঁ-ডাকা মাঝরাতে
ফুলফোটা জোছনাতে
উঠে এসে কেশবতি, দাঁড়াও কি শিয়রে ?
কল্পনা-বন্দিনী,
কৈশোর-সঙ্গিনী,
তন্দ্রার-ঘোরে-পাওয়া তুমি মধুমালা রে,
মানসীর রূপ ধরি'
নেমে এস সুন্দরি,
শেষ কি হয় নি ছায়াপথে দীপজ্বালা রে ?

চালিয়াৎ

নরেন চক্রবর্ত্তী

অর্জ্জুনকে চেন ? না না মহাভারতের অর্জ্জুন নয়, অর্জ্জুন মুখুয্যে, সনাতন মুখুয্যের ছেলে। লম্বা শুঁট্‌কো রুক্ষু চেহারা, বয়স আন্দাজ কুড়ি বাইশ। সকালে খবরের কাগজ পড়ছি অর্জ্জুন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বল্‌লে—কেমন আছেন কাকাবাবু! পাড়া সম্বন্ধে আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকে।

আরে, ভেদো তুই ? (অর্জ্জুনের ডাক নাম ভেদো) কোথায় ছিলি এতদিন ? তোর বাপ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, পুলিশে খবর দেওয়া হলো, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, চারদিকে লোক ছুটোছুটি করলে দু'মাস ধরে—তোর কোন পাত্তাই নেই, ব্যাপার কি বল্‌তো ?

ভেদো ধপাস্ করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বল্‌লে —কাল রাত্তিরে ফিরেচি, কিন্তু খবর কি করে দেব বলুন, যে বিপদে পড়েছিলুম—

আমি তো অবাক্, বল্‌লুম সে কিরে! কি বিপদ ? তা বিপদে পড়ে থাকিস্ যদি, বাড়ীতে একটা খবর দিলে তো—

অসম্ভব, কাকাব্বাবু অসম্ভব—বলে একটা কল্পিত আশঙ্কায় ভেদো চারিদিক চেয়ে যেন শিউরে উঠ্‌লো। চেয়ারটাকে আরো একটু সাম্‌নের দিকে টেনে এনে বল্‌লে—আপনাকে সব ঘটনা খুলেই বলি। আপনি যেন বাবাকে গল্প করবেন না, তিনি যা ভীতু। আমি একদল নরখাদক মানুষের পাল্লায় পড়েছিলুম। আমি তো হাঁ— বলিস্ কিরে কোথায় ?

সুন্দরবনের জঙ্গলে !

সুন্দরবনের জঙ্গলে ? সেখানে কোনো বুনো মানুষ আছে বলে তো শুনি নি। 'মানুষ কতটুকু খবরই বা পায় বলুন, এযে আমার সাক্ষাত পরিচয়' বলে ভেদো বল্‌তে সুরু করলে—প্রায় মাস দুই আগে, ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখ্‌বো বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, হঠাৎ বন্ধু চণ্ডী পালের সঙ্গে পথে দেখা। আমাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো— আরে ভেদো তুই ! ওঃ ভগবান তোকে পাঠিয়ে দিয়েচেন রে। আজই আমরা যাচ্ছি সুন্দরবনের দিকে শিকারে, চ তুই আমাদের সঙ্গে, তুই সঙ্গে থাক্‌লে আর আমাদের পায় কে ? Big game এ তো আর তোর জোড়া নেই।

কথাটা বলে ভেদো একটু দম্ নেবার জন্যে থেমে আমার

দিকে চেয়ে রইলো। আমি একটু অবাক হয়েই বল্লুম—তুই আবার বন্দুক ধরতে শিখ্লি কবে ?

ভেদোর মুখে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি। বল্লে—ছেলেবেলা থেকে। প্রায় বয়স যখন আমায় চোদ্দ পনের তখন থেকেই বন্দুক ছোঁড়া বেশ ভালভাবেই শিখেছি। বড় মামা মস্ত শিকারী কিনা !···শিকারী শিকারের গল্প পেলেই মেতে ওঠে, রইলো সিনেমা দেখা—রইলো বাড়ী আসা। এক কাপড়েই ছুট্‌লুম বন্ধুর সঙ্গে। বাড়ীতে এলুম না, বাবা ভীতু লোক, পাছে বাধা দেন, পথ থেকেই একটা পোষ্ট কার্ড লিখে খবরটা বাড়ীতে জানিয়ে দিয়েছিলুম, শুনলুম সে চিঠি বাড়ীতে যায় নি। আজকাল পোষ্ট অফিসের যা ব্যবস্থা—দেশ স্বাধীন হয়েচে না ছাই···হ্যাঁ, তারপর বিকেলের দিকে ষ্টিমার লঞ্চে রওনা হলুম সুন্দরবনের পথে। রাত এগারোটা আন্দাজ আমরা লঞ্চ থামালুম সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে। সঙ্গে ছিল রুটী, মাখন আর ডিম। তাই খেয়ে নিয়ে আমরা কি করা যাবে চিন্তা করচি এমন সময় একটা ভীষণ আওয়াজে লঞ্চটাকে যেন কাঁপিয়ে তুল্লে। সঙ্গীরা তো ভয়ে কাঠ। আমি তাড়াতাড়ি ডবল ব্যারেলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম, সঙ্গীদের বল্লুম—বুঝেছিস্ এটা কার আওয়াজ ! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লম্বায় অন্তত হাত পনের হবে আমি বলে দিলুম। তোরা থাক্ লঞ্চে, আমি বাঘটাকে এখুনি মেরে আনচি।

চণ্ডী বল্লে—এখন থাক্ ভাই ভেদো, একটা হরিণ টরিণ বরং মারা যাবে, অত বড় বাঘের দিকে নজর দিস্ নি।

আমার রাগ হলো, বল্লুম—এত ভয় তো সুন্দরবনে শিকারে এসেচিস্ কেন ? খালের ধারে কাদা খোঁচা মারলেই পারতিস্। ঘাবড়াস্ নি, তোরা একটু অপেক্ষা কর্—আমি এখনই বাঘটাকে নিয়ে আসি—বলেই বন্দুক নিয়ে আমি ডাঙায় লাফিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ডাক্। ডাক অনুসরণ করে কিছুদূর যেতেই দেখি সাম্‌নে মূর্ত্তিমান দাঁড়িয়ে আমারই দিকে চেয়ে। হ্যাঁ, একটা বাঘের মতো বাঘ বটে। লম্বায়—যা বলেছিলুম—প্রায় হাত পনের। চোখ দুটো তো নয়, যেন দু' মাল্‌সা আগুন ! মারলুম গুলি সেই চোখ তাক্ করে। গড়াম করে আওয়াজ—আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের ওপর। কিন্তু তার পড়বার সময়কার বিরাট চিৎকারটাই বাড়ালে যতো গণ্ডগোল। বাঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাণে এলো কতকগুলো লোকের উত্তেজিত একটা ধ্বনি। কি আশ্চর্য্য, এই ঘোর জঙ্গলে এত রাত্রে এত লোকের স্বর কি করে কাণে এল ! তবে কি কোন শিকারের একটা বড় দল এখানে এসেচে বাঘটাকে মারবার জন্যে ! মনে একটু আনন্দ যে না হলো তা নয়—যাক্ এদের হাত ফস্কে বাঘটা আমার হাতেই শেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। বাঘটাকে লঞ্চে নিয়ে আসবার জন্যে যেমন কাঁধে তুলেচি অমনি দেখি প্রায় জন পঁচিশ বুনো লোক যেন হাওয়ার ভেতর দিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ফেলেচে। হাতে তাদের ধনুক তীর, পরণে পাতার তৈরী নেংটী, গা-ময় উল্কি আঁকা, বিরাট চেহারা। কিন্তু চোখে তাদের বিস্ময় বেশ ফুটে উঠেচে দেখলুম। আমাকে ঘিরে তারা নাচতে আরম্ভ করে দিলে, আর তাদের ভাষায় গান গাইতে লাগ্‌লো—গানের ভাষাটা অনেকটা বাংলা ভাষার মতো—কিন্তু বোঝা যায় না। গানের দুটো লাইন এখনও আমার মনে আছে—

বাসাল্ বাসাল্ বাসাল্ ইভারে
মএন য়োজান্ লোথক ইনারে—
বাচো বাঁচো

ভাষাতো তাদের বুঝতে পাচ্ছি না, যত জিজ্ঞাসা করি কি বল্‌চো, তোমরা নাচ্‌চো কেন ? তারা ততই গান গায়, নাচে আর বাঘটার দিকে হাত দিয়ে দেখায়। আমি তো হতভম্ব। নাচ গান শেষ হতে তাদের সর্দ্দার অন্য লোকগুলোকে কি বল্লে, অম্‌নি সবাই মিলে আমাকে কাঁধে নিয়ে বনের মধ্যে ছুটতে লাগ্‌লো। দুটো জংলীর কাঁধে আমি, আমার কাঁধে পনের হাত লম্বা মরা বাঘটা, আর ডান হাতে বন্দুক। তারা এসে থাম্‌লো একটা উঁচু বেদীর মতো জায়গার সাম্‌নে এবং আমাকে সেই বেদীটার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাঘটাকে আমার কাঁধ থেকে তুলে নিলে। তারপর পাশেই একটা বিরাট আগুনের চুল্লী জ্বেলে জানোয়ারটাকে ঝল্‌সাতে লাগ্‌লো। আমারো তখন দারুণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে—কিন্তু কি খাই—আর কারেই বা বলি—এদের কথাও বুঝি না। মনে মনে ভয়ও হচ্ছে না যে তা নয়, তবু মনে হলো যেন বাঘটাকে মেরেচি বলে এরা আমাকে

খুব তারিফ করচে, আর ওই গানের সময় যে একটা কথা বলেছিল 'বাঁচো বাচো,' সেটা বোধ হয় আমাকেই লক্ষ্য করে। যাহ'ক, ইসারায় ওদের সর্দ্দারকে বোঝালুম যে আমার ক্ষিদে পেয়েচে। সর্দ্দার বুঝলো এবং তখনই তার ইঙ্গিতে একটা লোক খানিকটা ঝল্‌সানো বাঘের মাংস আমাকে এনে দিলে। দারুণ ক্ষিদে—পেটের জ্বালায় তাই খানিকটা খেয়ে ফেললুম। লাগলো কিন্তু মন্দ নয়, একটু সোঁদা সোঁদা গন্ধ এই যা। তারপর তারা সবাই মিলে ঝল্‌সানো বাঘটাকে খেয়ে ফেললে—আবার তাদের নাচ—আবার তাদের গান—

তাব দে তুই লেখাএ
রদেমাআ লেখাএ
থাকো থাকো
বাচো বাচো

দারুণ পরিশ্রমের পর পেটে কিছু পড়েচে, ঘুমে শরীর তখন আমার ভেঙে পড়চে।··· ··তখন অনেকখানি বেলা হয়েচে, রোদে জঙ্গলের কাঠগুলোতে যেন ফাট্ ধরেচে—আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ চাইতেই দেখি সর্দ্দার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, হাতে তার কিছু বুনো ফল আর একটা জানোয়ারের মাথার খুলিতে অনেকটা দুধ। আমাকে জাগতে দেখেই সর্দ্দার বল্লে—'খা'। বারে, এ ত বেশ স্পষ্ট বাংলা—আমাদেরই ভাষা। তখন আমি সর্দ্দারকে বল্লুম—আমাকে এখানে এনেচ কেন? আমাকে সবাই মিলে পাহারাই বা দিচ্ছ কেন? আমাকে ছেড়ে দাও, ষ্টীম-লঞ্চে আমার বন্ধুরা সব ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু আমার কথা সর্দ্দার বুঝ্‌লো না। অনেকবার ইসারা করে বোঝাতে সর্দ্দার বল্লে—তুই রদেমাআ তাবাদ, তোকে নিবড়ছা। কিছুই বুঝ্‌লুম না। তারা আমাকে কেবল পাহারা দেয়, পালাতেও পারি না। এম্‌নি ভাবে দিন যায়—মাস গেল, দু মাসে পড়লো আমি এই জংলীদের মধ্যে বাস করচি। এখন এদের ভাষা আমি ধরে ফেলেচি। এক অক্ষর দু' অক্ষরের কথা এরা আমাদের মতনই বলে কিন্তু তিন অক্ষরের কথা হলেই কথাটা উল্‌টে দেয়—অথচ ভাষা এদের বাংলা। সুন্দরবন তো বাংলাই। এদের ধারণা আমাদের কাছে ভগবানের মন্ত্রপূত অস্ত্র আছে, আমি কোন দেবতা, তাই অত বড় বাঘ দেখামাত্র মারতে পেরেচি। আমাকে ধরে রাখতে পারলে এদের কোন বিপদ-আপদ হবে না—অভাব হবে না।···

দিন তো কাটে এইভাবে—খাই পশুর মাংস ঝল্‌সানো, নদীর লোণা জল, গাছের ফল আর দুধ—শুই সেই বেদীটার ওপর খোলা জায়গায়। একদিন দেখি সর্দ্দার একটা মানুষের হাত ঝল্‌সানো আমার সাম্‌নে এনে হাজির! আমি তো অবাক্—তাই তো এরা মানুষের মাংসও তাহলে খায়! সর্দ্দার ওদের ভাষায় বল্লে—একটা মানুষ হরিণ মারতে এসেছিল বনে, আমরা তাকে মেরে এনেচি তোমার জন্যে! আজ আমাদের মহা পরব—নরমাংস খাবো।

সর্ব্বনাশ, বলে কি। নরমাংস খাওয়া এদের মহা-পর্ব্বের দিন! তাহলে তো যেদিন কোন আহার জুটবে না আমাকে মেরেই মহাপরব করতে পারে! ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলুম না, আনন্দ দেখিয়ে সেই নরমাংসই খানিকটা খেলুম—ভালো লাগলো না তেমন—জাতভায়ের মাংস তো। সেই থেকে সুযোগ খুঁজতে লাগলুম পালাবার জন্যে। সুযোগও মিল্‌লো—সেই রাত্রিতেই দেখিনা প্রচুর নেশা করে জংলীগুলো ঘুমে অচেতন, আমি পা টিপে টিপে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম! খানিকদূর এসেই ছুট্। তার পর ছুট্ আর ছুট্—এইভাবে সাত দিন সাত রাত—পেটে কিছু নেই, খালি ছুট্···

হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে ভাদু লাফিয়ে উঠ্‌লো। ওঃ আট্টা বাজে! আমাকে এখনই কাকাবাবু একবার পুলিশ কমিশনরের কাছে যেতে হবে, সাড়ে আটটায় engagement আছে, তিনি নিজ মুখে জংলীদের কথা শুনতে চান—আচ্ছা চল্লুম—বলেই একরকম ছুটে ঘর থেকে ভেদো বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি উল্‌টো পথ দিয়ে ভেদোর বাবা সনাতন বাজার করে ফিরচে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—ভেদোটা তোমার কাছে বসেছিল না দাদা! আমি বল্লুম—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি পুলিস কমিশনরের কাছে ছুটলো। কোথায় ছিল বলতো এতদিন? ঘটনা যা বল্লে—

সনাতন বল্লে—থাক্‌বে কোন চুলোয় হতভাগা। তার দিদিমার কাছে কাশীতে। তা যাবি যা—বলে যা না বাপু আমাদের···আর বল্‌বেই বা কোন্ মুখে বল দাদা—তার মা'র বাক্স থেকে পঞ্চাশটা টাকা চুরি করে পালিয়েছিল যে।

রাশিয়ায় শিক্ষা-বিস্তার পদ্ধতি

অশোককুমার গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ কালে রাশিয়ায় ব্যাপক আকারে শিক্ষা বিস্তার লক্ষ্য করে লিখেছিলেন :—

"আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা. এত কাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়"।

* জারের আমলে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করাটা কেবলমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দরিদ্র জন-সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার কোন সুযোগই পেত না। রুশ বিপ্লবের পর যখন অত্যাচারী জীবের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জন সাধারণ দেশের সর্বেসর্বা হয়ে বোসল তখন থেকে দেশকে প্রকৃত উন্নত করবার জন্য, দেশের কিশোর-কিশোরীদের মানুষ করে গড়ে তুলবার জন্য জাতি ধর্ম্ম, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বিদ্যাশিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে একান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের মত এ দেশে স্কুলগুলোকে এরা কেবল মাত্র বই পড়ে পাশ কোরবার কারখানা বলে মনে করে না। এ দেশের স্কুলগুলো প্রকৃত মানুষ তৈরী কোরবার এক একটি পবিত্র আশ্রম। এই সকল স্কুলের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়—যাতে করে ভবিষ্যতে রুশীয় সমাজে তারা এক একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে পরিগণিত হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকারের সুসন্তান করে গড়ে তুলবার জন্য এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলেছে।

দেশের ঐশ্বর্য্যে সকলের সমান অধিকার বিদ্যালয়ে এই নীতি অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পরিচালনা করা হয়। এখানকার স্কুলে আর একটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা। শৈশব থেকেই এই কথাটা তাদের কানে মন্ত্রের মত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা শিশুকাল থেকেই সব্ব বিষয়ে নিজেদের ওপর নির্ভর করতে শেখে এবং ভালো-মন্দ বিচার বোধ অতি সহজেই জাগ্রত হয়। একটি উদাহরণ থেকেই এই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া গিয়েছিলেন তখন সেখানে একদিন এক অভ্যর্থনা সভায় একটি মেয়ে তাঁকে বলেছিল :—

"আমরা নিজেদের নিজেরা চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি। যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য্য।" আর একটি স্কুলের মেয়ে বলেছিল "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি তাহোলে যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোট ছেলেমেয়েরা বড় ছেলে-মেয়েদের মত নেয়। এটাই আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের বিধি। বিদ্যালয়ে আমরা এই বিধিরই চর্চ্চা করে থাকি।"

এর থেকে বোঝা যায় এদের স্কুলের শিক্ষা কেবল বই মুখস্থর মাঝেই আটকে থাকেনি, চরিত্র গঠনেও অনেকখানি সাহায্য করেছে।

শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয় এখানকার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি দেবার বিধি নেই। কাউকে অপরাধী করাটাই শাস্তি বলে বিবেচিত হয়।

এখানকার শিক্ষা পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হোলো বই এবং শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা যা শেখে, সেগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সাধারণকে জানাবার জন্য, সাধারণের মাঝে গিয়ে সেগুলো তাদের জানিয়ে আসতে হয়। একে বলা হয় সজীব সংবাদপত্র। এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে দেশের সর্ব্বত্র অজ্ঞতা দূর করবার চেষ্টায় তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

ছেলেদের প্রতিদিনের কার্য্যপদ্ধতি এমন সুন্দর করে শিক্ষার ভেতর দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে তার এতটুকু নড়চড় হবার জো নেই। সকাল সাতটায় তারা বিছানা থেকে ওঠে এবং পনের মিনিট ধরে চলে তাদের ব্যায়াম, প্রাতরাশ ইত্যাদি। আটটার সময় ক্লাস বসে এবং একটার সময় তারা কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পায় আহার এবং বিশ্রাম কোরবার জন্য। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। রবিবার বোলে এদেশে কিছু নেই। প্রতিটি পঞ্চম দিন ছুটি বলে বিবেচিত হয়।

এখানকার ছেলে-মেয়েদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'পাইওনীয়র' অর্থাৎ অভিযাত্রী। সেই পাইওনীয়রের কড়া নির্দ্দেশ হোলো প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য নিয়মিত ব্যায়াম এবং খেলাধূলো করে সুস্থ রাখতে হবে। ছেলেমেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে গিয়ে নানা রকম খেলাধূলো, যেমন ভ্রমণ, দৌড়, বাগান তৈরী, নৃত্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে নাটক, ছবি-আঁকা, সঙ্গীত, বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েদের ক্ষমতা এবং প্রতিভা অনুসারে তারা তা গ্রহণ করে। প্রতিটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এ লেখা আছে 'একটি ছেলেকেও যেন অবহেলা করা না হয়'। পাইওনীয়রের আর একটি নির্দ্দেশ হোলো দেশকে আন্তরিক ভালবাসা এবং শত্রুকে ঘৃণা করা। দেশের গৌরবময় বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করে—এবং নানা রকম গল্প ও ছবি-ছড়ার ভিতর দিয়ে এই জিনিষটা শৈশব থেকেই তাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করা হয়।

* জার—রাশিয়ার রাজ বংশ। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে রাশিয়ায় জার বংশের অবসান ঘটে।

বিরাট দেশ এই রাশিয়া। গোটা দেশটাকে ভালো ভাবে জানবার জন্য সরকার অনেক টাকা খরচ করে দেশের ছেলে-মেয়েদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সে পথকে সুগম করে দিয়েছে। স্কুল বন্ধ হলেই সহরের পাইওনীয়ররা চলে যায় গ্রামে, আর গ্রামের পাইওনীয়ররা আসে সহরে। গ্রাম এবং সহরের খালি স্কুলগুলোতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবেই বিশাল দেশের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় গভীর ও মধুর হয়ে ওঠে।

এখানকার শিশুপদ্ধতির আর একটি সুন্দর দিক হোলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা। এতে করে যে বিষয়টা পড়ছে সে বিষয়টা মনের মাঝে চিত্রিত হয়ে ওঠে এবং ছবির হাতও পেকে যায়। পড়া লেখা এবং ছবি আঁকা দু'কাজই এক সঙ্গে হয়। এখানকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গল্প ও জীবজন্তুর কথা, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই পড়তে দেওয়া হয়। ডিটেক্‌টিভ্ এবং চুরি-ডাকাতির বই পড়তে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

রাশিয়ার সব সহর ও গ্রামেই ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি করে জাতীয় প্রতিষ্ঠান (পাইওনীয়র) আছে। ছোটদের মনকে উন্নত করবার জন্য এবং তাদের নানাবিধ কল্যাণ কামনায় সরকারী শিশুসাহিত্য প্রকাশ ভবন থেকে বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বই রাশিয়ার নানাকেন্দ্রে পাঠান হয়। এদের জন্য ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও আছে। এম্নিভাবেই রাশিয়ায় শিক্ষা-বিস্তারের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে।

বর্ত্তমান জগৎ

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

সভ্য জগতের পানে চাহি আজ যবে,
মনে ভাবি সভ্যতার এই যদি রূপ,
অসভ্যতা, [illegible]তা কারে আর কবে,
কোথা আর পঙ্কিলতা, আবর্জ্জনা-স্তূপ ?

ধনবাদ একদিকে, অন্যদিকে আর
মূর্ত্তিমান দরিদ্রতা ক্রমবর্দ্ধমান,
অন্তহীন ক্ষুধা শুধু সদা লালসার
নিয়ত ওদিকে চেষ্টা বাঁচার আপ্রাণ।

শোষণ, লুণ্ঠন চলে অবিরাম গতি,
বাধা, দ্বিধা, লজ্জা, ভয় কিছু নাহি লেশ,
রাক্ষসী বুভুক্ষা রাজে, তীক্ষ্ণ ক্ষয়, ক্ষতি—
দয়া নাই, স্নেহ নাই—আছে তিক্ত শ্লেষ।

অতৃপ্ত সম্ভোগ শুধু দেখি একধারে,
বিলাসের স্রোতে ভাসে নিত্য আত্মহারা,
প্রয়োজনটুকু মত কেহ পাইবারে
দিনের পরেতে দিন কেঁদে হয় সারা।

মুষ্টিমেয় কূটচক্রী সারা ধরিত্রীর
শান্তি, সুখ সুকৌশলে করিছে হরণ,
বলদর্পী চায় সদা সকলেরই শির
লয় যেন তারই পায় অকুণ্ঠ শরণ।

সৃজন প্রেরণা আজ কিছুমাত্র নাই,
ধ্বংসের প্রমত্ত স্পৃহা বেড়ে শুধু চলে,
দুর্ব্বলে রক্ষার ভাণ করে সর্ব্বদাই,
স্বার্থের পূজারী মিথ্যা মুখে শুধু বলে।

আদিম যুগের সেই লোভী হিংস্র মন
কিছুমাত্র নূতনত্বে করে নি গ্রহণ,
আজো তা'র সীমাশূন্য শুধু আকিঞ্চন,
শিক্ষা, কৃষ্টি কোন্ কাজে আসিবে কখন ?

সাম্য-মৈত্রী সমস্বরে হতেছে কীর্ত্তিত,
সাথে সাথে বেড়ে চলে রণ-সজ্জা-সাজ,
পৃথ্বী যেন মৃত্যু-ভয়ে সতত শঙ্কিত,
শান্তি ও প্রেমের একী অভিনয় আজ।

আবার রোমান হরফ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ *

(প্রতিবাদ)

"কয়েকজন সুধী ব্যক্তির মস্তিষ্কে কীট প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার আলোড়ন সৃষ্টি" করে, এই কথার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেল গত মাঘ মাসের (১৩৬০) 'ভারতবর্ষে' উপরোক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত এক শ্লেষাত্মক প্রবন্ধে। লেখক শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ কলিকাতার একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। তাঁহার নিকট হইতে লোকে যাহা কিছু আশা করিতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে আদৌ নাই। আছে শুধু কটূক্তি, বক্রোক্তি, খোকা-ভুলানো যুক্তি। ভারতবর্ষের লিপি-সমস্যা লইয়া যে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এত সহজে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার এই চেষ্টা "উদ্ভট ও অসঙ্গত পরিকল্পনা" ছাড়া আর কিছু নহে।

জ্যোতির্ময় বাবু এই মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন যে, রোমান হরফের আন্দোলন অঙ্কুরেই মারা গিয়াছে। সুতরাং এখন আবার ইহার কিছু প্রচার দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার এ কথা অজানা নাই যে চিন্তা জগতে সত্যের সন্ধান করিতে করিতে এমন এক একটা উপলব্ধি আসে যাহা ক্রমে প্রবল হইয়া বিরুদ্ধবাদীদের গ্রাস করিয়া ফেলে। ভারতের জাতীয়তা-বোধ সুপুষ্ট করিতে হইলে যে লিপি সরলীকরণ ও একীকরণ প্রয়োজন এবং তাহা একমাত্র আন্তর্জাতিক রোমক লিপি গ্রহণেই সম্ভব, এই উপলব্ধি ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে মাত্র দু'একজন লোকের মাথায় আসিয়াছিল, আর আজ সারা ভারতে দু'এক লক্ষ লোক এই সংস্কারের পক্ষে যুক্তি ছড়াইয়া নীরবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। তিনি একটু খবর লইলেই ইহার সত্যতা জানিতে পারিবেন। আর যদিই বা রোমান হরফের প্রচারে ঢিলা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও এই বিষয়-বস্তুর যুক্তিবত্তা খণ্ডিত হয় না। রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া কত মহাপ্রাণ মনীষী ভারতে জাতিভেদ প্রথা লোপ করিতে চাহিয়াছিল ; অথচ আজও তাহা প্রবল আছে। সেই কারণে জাতিভেদ প্রথা ভাল এমন যুক্তি পণ্ডাহীন পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ দেখাইবেন না নিশ্চয়ই।

"বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে.........এরূপ চমৎকার বর্ণমালা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" ভাল কথা। "পাশ্চাত্য মনীষি"দের সার্টিফিকেট আছে বলিয়াই এ কথা সত্য—তাহা মানি না। ইংরেজি বর্ণমালা শিক্ষার সুযোগ যাহার হইয়াছে সেই ইহা বোঝে। কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে তাঁহার মত বহু পণ্ডিতেও ভুল করেন যে বর্ণমালা ও লিপি এক জিনিষ নহে। ইংলণ্ড এবং তুর্কীর বর্ণমালা পৃথক কিন্তু, বাংলা এবং বিহারের বর্ণমালা এক, কিন্তু লিপি পৃথক। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতের বর্ণমালা যতই "সুসঙ্গত, স্বসম্পূর্ণ এবং বিজ্ঞান-সম্মত" হউক না কেন, তাহার লিপির পার্থক্য প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াইয়া এক বিরাট উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে এবং গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিতেছে ; অথচ বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির কোনটাই যোগ্যতায় রোমক লিপির পাশে দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং সর্ব-ভারতীয় হইবার শক্তি রাখে না। আজ এই সত্যটুকু সকলকে উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি শুধু মাত্র বাংলা লইয়াই আমরা চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি তবে এই প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন উঠে না। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গি ত্যাগ করিলে ভুলিবার অবকাশ থাকিবে না।

প্রাচীন সংস্কারের মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকা মৃত্যুর লক্ষণ। কোন জাতি শুধু মাত্র প্রাচীনের দিকে তাকাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যদি কোন কৃষ্টি বা ঐতিহ্য বিশ্ব-মানবের মহামিলন-যজ্ঞে অন্তরায় সৃষ্টি করে তবে তাহা লইয়া মাতামাতি করিয়া লাভ নাই। প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণিক অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের বর্ণমালা যোজনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ভারতীয় বর্ণমালা সর্বাঙ্গসুন্দর, তাহা অনাগত ভবিষ্যতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অপরিবর্তনীয় থাকিবে, এমন কথা বিশেষ জোরের বলা নিছক গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক অহমিকা ছাড়া আর কিছু নহে। ভারতবর্ষ ভবিষ্যৎ মানব-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়া যদি জগতের জন্য তাহার বর্ণমালার নব-রূপ দান করে, এবং রোমক অক্ষরের ত্রুটি সংস্কারের পর তাহাকে সহজতর আকারে গ্রহণ করে, তবে তাহার মেধার নূতন পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। ভবিষ্যতের জন্য কিছু দান করিতে না পারিলে জগৎ সভায় কেবল প্রাচীনত্ব লইয়া আসন স্থায়ী হইবে না।

একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া আমার উক্ত কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। আমাদের বর্ণমালা উন্নততর করিবার প্রয়োজন আছে। যথা স্বর-বর্ণে খাঁটি স্বরগুলি মাত্র রাখিতে হইবে, তাহা—অ, আ, অ্যা ই, উ, এ, ও। এই প্রত্যেক স্বর-বর্ণই হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে পারে, এবং নিত্য হইয়া থাকে। তাহার জন্য পৃথক হরফ লেখা বা শেখার দরকার হয় না। মাত্র একটি accent দ্বারা তাহাদের পার্থক্য বর্তমান রাখা চলিতে পারে। এ কথা ভুল যে কেবল ই এবং উ এই দুই স্বর দীর্ঘ হইবে। মাদ্রাজে এ এবং ও র হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপ আছে। অ এবং আ দুইটি পৃথক স্বর, দ্বিতীয়টি প্রথমের দীর্ঘ স্বর নহে, যদিও হিন্দীতে উচ্চারণ সেইরূপ শেখানো হয়। 'অ্যা' একটি পৃথক স্বর আমাদের নাই, তাহা নূতন হরফে সংযোজিত করিতে হইবে। ঐ (অই) এবং ঔ (অউ) মৌলিক স্বরবর্ণ নহে, সংযুক্ত বর্ণ। বর্ণমালায় ইহাদের স্থান দিতে চাহিলে

* কর্ম-সচিব—রোমক-লিপি-সমিতি, ২৯।১এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা—৬

ইএ, ওআ, আই প্রভৃতির দাবি উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাহা হইলে অনর্থক বর্ণমালা ভারাক্রান্ত করিয়া নূতন শিক্ষার্থীদের কষ্ট বাড়াইয়া তোলা হয়, তাহাতে ব্যাপক জন-শিক্ষার প্রচার ব্যাহত হয়। ঋ, ৯ এই বর্ণগুলি এখনো কেন শিশুদের শেখানো হয়, তাহার কোন যুক্তি পাই না। এগুলি আদৌ স্বরবর্ণ নহে।

আশা করি এই উদাহরণ দ্বারা আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। ব্যঞ্জন বর্ণমালারও অনুরূপ সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে তাহা বিস্তৃত উল্লেখ করিলাম না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে ভারতীয় বর্ণমালা যতই আদরের হউক না কেন, তাহার কালোপযোগী পরিবর্তন সাধন আবশ্যক। ইহার উচ্চারণ-বিধি, ক্রম, মৌলিক সংজ্ঞা নির্ণয়, লিপির গঠন-ভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। এবং শুধু সর্ব-ভারতীয় নয়, বিশ্বজনীনং পরিপ্রেক্ষিতে লিপি একীকরণের প্রশ্নটি শীঘ্রই সমাধান করিতে হইবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র হইতে শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মণীষীদের ধ্যান ও বাণী এই কথারই সমর্থন করিতেছে। পাঠকগণ, অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।

জ্যোতির্ময়বাবু আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহার লেখাটি "ভাস্করীয় পরিহাস নয়।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ইহা "ভাস্করীয়" পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি নাকি বহু য়ুরোপীয় লোকের সহিত "দিবারাত্র বসবাস করিয়া উহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সর্বপ্রকার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া" অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে ইংরেজি বর্ণমালার দোষে উহাদের উচ্চারণ "আধ-আধ" অর্থাৎ কিনা শিশুসুলভ। তাহাদের নাকি জিহ্বার জড়তা অমার্জিত। আমরা জানি তাঁহার মত আরও অনেক ভারতবাসী য়ুরোপীয় "আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সঙ্গে দিবারাত্র বসবাস" করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যও লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু কেহ এমন অমূল্য যুক্তি প্রদর্শন করিবার ধৃষ্টতা রাখেন না। কে না জানে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের কণ্ঠস্বরে বিভিন্নতা আসে। ভারতবাসী আমরা অনেকেই "বৈজ্ঞানিক" বর্ণমালায় মানুষ হইয়াও জার্মান বা ইংরেজের মত তাহাদের ভাষা উচ্চারণ করিতে পারি না। আমাদের এক বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও কলিকাতাবাসী ও নোয়াখালি-বাসী পরস্পরের কথা বোঝা ত দূরের কথা, উচ্চারণ-ভঙ্গি নকল করিতেও পারি না। সুতরাং জ্যোতির্ময়বাবুর আবিষ্কার—"ও বওদা গায়ী ভান, চুপতি কয়ে দায়িয়ে কেন ?" প্রভৃতি কথাগুলি ভুতুড়ে যুক্তি। আমি ভূত দেখি নাই, কিন্তু যাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারা বলে, ভূতের নাকি পা পিছন দিকে ফিরানো, তাহারা পিছনেই চলে। কথাটা আংশিক সত্য হইতে পারে। কারণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ভূতের কেমন করিয়া আসিবে ?

তারপরে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বহু দেশ ইংরেজি (?) বর্ণমালা গ্রহণের "এই হীনতা স্বীকার করে নাই।" কথাটা বিচার-সাপেক্ষ। আজ আমরা দেখিতেছি, য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র রোমান লিপির আধিপত্য। রাশিয়ার বর্ণমালা পৃথক হইলেও গোটা সোবিয়েৎ দেশের লিপি রোমান লিপিরই অনুরূপ ; মাত্র দু'চারিটা অক্ষর সামান্য ঘুরাইয়া লওয়া হইয়াছে ; তাহাতে লিখন ও শিক্ষণ কার্যে সমানে রোমক লিপির মত সুবিধাগুলি আছে। মহামতি স্তালিন ত' ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন যে একদিন আসিবেই যখন সকল জাতি নিজ নিজ স্বার্থে বিশ্বময় এক ভাষা, এক লিপি প্রবর্তন করিতে চাহিবে। হয়তো সেদিন বেশীদূর নয়। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে জার্মানীতে রোমক লিপির "আলঙ্কারিক ধাঁজ" পরিত্যাগ করিয়া তাহার সরল রূপ প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা জ্যোতির্ময়বাবু নিশ্চয়ই জানেন। গ্রীসের ধর্মযাজকগণ কিছু কিছু প্রাচীন গ্রীক লিপিতে লেখা পছন্দ করেন। কিন্তু সরকারী কাজ ও লেখাপড়া চলে আন্তর্জাতিক রোমক লিপিতে। মিশর বাদে সারা আফ্রিকা মহাদেশে যাহা কিছু লেখাপড়ার চর্চা ও সরকারী কাজ চলিতেছে, সবই রোমক লিপিতে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে। এসিয়ায় "জাপান তাহার বর্ণমালা পরিবর্তন করে নাই" বলিয়া তিনি উৎফুল্ল। ঠিক কেন করে নাই আমরা বলিতে পারি না, তবে জাপানে বহু-লিপি সমস্যা নাই। জাপানে য়ুরোপীয় একটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করা হইয়াছে- এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাহা কিছু হয় রোমান অক্ষরেয় মারফতে। মঙ্গোলিয়া রোমন লিপি (অর্থাৎ সোবিয়েৎ বর্ণমালা) লইয়াছে। কোরিয়ায় উচ্চ-শিক্ষা চলে রোমন বর্ণমালায়। চীনের লোকায়ত্ত সরকার একটি কমিটি করিয়া আন্তর্জাতিক রোমান হরফ তাহাদের ভাষায় লওয়া যায় কিনা আলোচনা করিতেছেন। সেখানে বিজ্ঞানে শিক্ষা রোমান হরফের মাধ্যমেই চলে। সকলেই জানে যে তুর্কী রোমান হরফ প্রবর্তন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইহার দ্বারা "হীনতা স্বীকার" করা হইল মনে করে নাই। তাহারা তাহাদের দেশের নিরক্ষরতা দূর করিয়া আনিয়াছে এবং আলেম্ ও উলেমাদের হাত হইতে জাতিকে রক্ষা করিয়াছে। ইস্রাইল লেবানন ও সিরিয়ায় রোমান অক্ষরের আধিপত্য। ইরাণে উচ্চ-শিক্ষা চলে রোমান বর্ণমালায়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্থানীয় ভাষায় রোমান হরফে লেখা-পড়া শেখান হয় এবং সরকারী কাজ চলে। ভিয়েট-নাম, লাওস, টং কিং, কম্বোদিয়া, কোচিন চায়না এই সব দেশে একমাত্র রোমক লিপি চলে। ইন্দোনেসিয়ার অসংখ্য দ্বীপমালায় রোমান হরফের রাজত্ব। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড তাসমানিয়ায় রোমান বর্ণমালায় সকল কাজ হয়। ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সিংহল সর্বত্র উচ্চ-শিক্ষা রোমান হরফে চলে। ভারত ও পাকিস্তান মধ্যে আজও বিজ্ঞান, উচ্চ-শিক্ষা, সরকারী ও সওদাগরী কাজ সব জায়গায় রোমান ছাড়া গতি নাই। "হীনতা" দূরে থাকুক, আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি ভারতবর্ষ যদি রোমান হরফের রূপ সংশোধিত করিয়া তাহার মাধ্যমে এক ডজন ভারতীয় ভাষা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করে, সারা দুনিয়ায় অচিরে এক-মাত্র লিপি চলিতে বাধ্য। সে দিন নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে সুবিবেচনা ও গৌরবের দিন হইবে, এবং "ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ অবদানে" বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

ভারতবর্ষের অগণিত মনস্বী নানাভাবে আন্তর্জাতিক রোমান হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। যে কেহ আমাদের কার্যালয়ে আসিলে তাহার অনুমান পাইতে পারেন। কিন্তু কেহই ইংরেজি বর্ণমালা গ্রহণ

করার কথা বলেন নাই। জ্যোতির্ময়বাবু যে একথা জানেন না এমন বিশ্বাস করি না। অথচ তিনি পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য লিখিতেছেন, "ইংরেজি বর্ণমালার অসুবিধা অনেক আছে" এবং কষ্ট-কল্পিত নানা গোলমালের কথা তুলিয়াছেন। কে না জানে, ইংরেজি বর্ণগুলি বা শব্দগুলির উচ্চারণের কোন মাথা-মুণ্ড স্থির নাই? ইংরেজি ভাষা সে দিক দিয়া অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, তাহা আমাদের দেশে শিশুরাও জানে। তিনি একটু মন দিয়া আমাদের কথা শুনিলে এ যুক্তি তুলিতে সাহস পাইতেন না। আমরা বরাবর বলি, অ-আ, ক-খ, ইত্যাদির ক্রম আমাদের দেশের রীতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া চলিবে; কেবলমাত্র লেখার প্রতীকগুলি রোমান ছাঁচের গ্রহণ করা হইবে। এবং দু'চারটা বর্ণ যাহা রোমান লিপিতে পাওয়া যায় না সেগুলি ঐ লিপির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এবং তাহার সহজ গতি অব্যাহত রাখিয়া সর্বসম্মত উপায়ে সাজাইয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক (রোমানের অনুকূল) বিশেষজ্ঞ কমিটির উপর দেওয়া উচিত ইহাই আমাদের অভিমত।

"টেলিফোনের বই খুলিয়া মুখার্জি বাহির করিতে গলদ-ঘর্ম হইতে হয় কেন?" জ্যোতির্ময়বাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহার সহজ উত্তর এই যে দুই শত বৎসর রোমান হরফ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াও আমরা উহা হইতে সার গ্রহণ করিতে পারি নাই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিযুক্ত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি এ বিষয়ে সুপারিশ করা সত্ত্বেও তাহা সাধারণকে জানানো হয় নাই এবং রোমান হরফ দেশীয় ভাষায় প্রয়োগের একটা নির্দিষ্ট রীতি এখনো বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। কারণ জানা যায়—ভারত সরকার নাকি ইহা চাহেন না। ইংরেজি technique লিখিতে কেহ যদি teknik লেখে, পরীক্ষায় নম্বর কাটা যায়; 'ভট্টাচার্য' লিখিতে গিয়া কোন ছেলে 'বটচাজ্জি' লিখিলে ক্লাসে প্রমোশন পাইতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'বিজয়নগরম্, কে ভিজিয়ানাগ্রাম' লিখিলে আনন্দ বাজারের সম্পাদককেও চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা যায় না! Samiti এবং Samity একই দিনে একই পাতায় অমৃত বাজারে চলে; গালি দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ আপত্তিও করে না! সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে একটা কঠোর নির্দেশের অভাবে টেলিফোন গাইডে বা সর্বত্র যে উদ্ভট বা যা'-ইচ্ছে-তাই বানান ব্যবহার করা হয়, তাহা লইয়া একটা যুক্তি প্রয়োগ করাটা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, দ্রুত গতির যুগ। মানুষের জানিবার বিষয় বাড়িয়াছে, গোটা পৃথিবী সঙ্কুচিত হইয়া দেখা দিয়াছে। পড়া, লেখা, শেখা, ছাপা, টাইপ করার সুবিধার জন্যই রোমান হরফ চাই। কোন ছেলে যদি দুই বৎসরে দেশী লিপিতে লেখা-পড়া শেখে, তবে দেশের এই বিরাট নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হইবে না। ছয় মাসের মধ্যে পড়িতে পারা চাই। তাহা একমাত্র আমাদের প্রস্তাবিত সহজীকৃত ইন্দো-রোমান বর্ণমালায় হইতে পারে। "স্বদেশ ও ধর্মের প্রতি মানুষের একটা মজ্জাগত আকর্ষণ ও মমতা আছে।" সত্য কথা। কিন্তু এই মমতা যদি পদে পদে কোন জাতির অগ্রগতিতে বাধা জন্মায় তবে সেই মিথ্যা মোহ ত্যাগ করিতে আপত্তি কি? লিপি ভাষা প্রকাশের একটা অবলম্বন বিশেষ, একটা অস্ত্র স্বরূপ। ছেনি-হাতুড়ির সহিত একটা শিল্প-সৃষ্টির যে সম্বন্ধ, লিপির সহিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। লিপি যত উৎকৃষ্ট হইবে, ভাষা তত সহজে কাগজের উপর ফোটান যাইবে। বিদেশী কোন অস্ত্র ব্যবহার করিলে শিল্প-সৃষ্টি দূষিত হয় না। তেমনি লিপির প্রতীকগুলি বিদেশী হইলেই কোন ভাষার মাধুর্য বা প্রাণ-শক্তি ক্ষুন্ন হয় না। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে লিপি উন্নত ধরণের করিয়া যে কোন দেশ অতি দ্রুত শিক্ষার প্রসারলাভ করিয়াছে। বিদেশ হইতে কোন উন্নত পদ্ধতি লইলে আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। য়ুরোপ আমাদের গণনা-পদ্ধতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে; তাহার ফলে তাহাদের জাতীয় ঐতিহ্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ দশমিক প্রণালীর মাধ্যমে তাহারা গণিত শাস্ত্রকে অনেক উচ্চ-স্তরে টানিয়া লইতে পারিয়াছে। রোমান হরফ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করার ফলে তাহাদের আত্ম-সম্মান বোধ আহত হয় নাই। এ কথা সত্য যে রোমক লিপি গ্রহণ করিলে অনেক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ ভারতীয় ভাষায় প্রবেশলাভ করিবে। তাহাতে আমাদের একটা বিরাট সমস্যা সমাধান হইয়া যাইবে এবং শব্দ-সম্ভার সমৃদ্ধ হইবে। ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কি আছে? আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আজ ভারতে যে সব লিপি প্রচলিত, তাহার মধ্যে কোনটাতেই পানিনি, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, চরক, সুশ্রুত বা কালিদাস লিখিতেন না।

জ্যোতির্ময়বাবু বলিতে চান, সব লিপি একাকার করিবার যুক্তি ভাল নয়; জটিলতা ত' একেবারে মন্দ জিনিস নয়, বৈচিত্র্যই ত' জগতের নিয়ম। কথাটা বেশ রসালো বটে। সেইজন্যই বোধ হয় ভারতের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকমের ওজন ও মাপ-কাটি বজায় রাখা ভারত সরকারের কর্ণধারগণের (ধনিক শ্রেণীর) ইচ্ছা! তবে কেন তিনি ভারতের সর্বাঙ্গসুন্দর বর্ণমালা জগৎ গ্রহণ করিলে খুশী হইতেন? দশমিক গণনা সর্বত্র না চলিয়া যদি য়ুরোপে প্রাচীন রোমান গণনা আজও চলিত, যে কোন অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিতের নিশ্চয়ই ভাল লাগিত। জাগতিক পঞ্জিকা এক নিয়মে না রাখিয়া যদি কোথাও খৃষ্টাব্দ, কোথাও চৈতন্যাব্দ, কোথাও স্তালিনাব্দ, কোথাও ১৮ মাসে বছর, কোথাও ১০ দিনে সপ্তাহ, কোথাও ২১ ঘণ্টায় দিন, কোথাও ১০০ মিনিটে ঘণ্টা প্রভৃতি থাকিত, সে বৈচিত্র্য ভাবিতে মন্দ কি? একটা Morse Code না মানিয়া যদি নাগরী-পদ্ধতিতে ভারত সরকারের রাষ্ট্র-দূতকে বিভিন্ন দেশে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তবে দুনিয়াময় নিশ্চয়ই ভারতের উদ্ভাবনা শক্তির বাহবা পড়িত! আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ছাত্রকে ভরি, মাষা, রতি প্রভৃতি এককের মাধ্যমে ল্যাবরেটারীতে কাজ করিতে দিলে ক্ষতি কি ছিল? কিন্তু এরূপ অবস্থা অলস, কল্পনাবিলাসী লোকেরই কাম্য। আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় খেলাকে আয়ত্বে আনা, তাহার মধ্যেও যে নিয়মের

রাজত্ব আছে তাহা বুঝিয়া নানা প্রতিষ্ঠা করাটাই মানব সভ্যতার ধারা। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে হইলে খানিকটা ব্রড-গেজ রেলে, খানিকটা মিটার-গেজ লাইনে, খানিকটা নৌকায়, খানিকটা ট্যাক্সিতে, খানিকটা বা গরুর গাড়ীতে যাওয়া কোন কোন ভাবুক ধনীর দুলালের ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু কর্ম-প্রিয় কোন জাতি এরূপ বিচিত্রতা দূর করিতে কৃতসংকল্প হয়। শিল্প-কলায় বৈচিত্র্য আনন্দ দান করে; কিন্তু কাজের সময় জটিল বিভেদ অবসাদ আনে। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ জটিলতায় বিভিন্নতায় বিরক্ত হয়। কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া মুখস্ত করিতে করিতে কত ছাত্র লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহার হিসাব কেহ রাখে কি? যুক্তাক্ষর শিখিতে না পারিয়া বা বিভিন্ন দেশের অক্ষর পড়িতে না পারিয়া কত লোক শিক্ষায় ক্ষান্ত হয় তাহা জানা আছে কি?

জ্যোতির্ময়বাবু বাংলা সাহিত্যের পরলোকগত ধুরন্ধরগণের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে ইঁহারা কেহই রোমক লিপি প্রবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। একথা ভুলিব কেন যে সেইসব মহারথিগণের সমসাময়িক ভারতবর্ষে লিপি সহজ করিবার বা বিভিন্ন লিপি এক করিবার এরূপ একটা জীবন্ত প্রশ্ন উঠে নাই। উঠিলে তাঁহাদের কি মত হইত বলা কঠিন। তাহা ছাড়া কোন সাহিত্যিক যত বড়ই হউক না কেন, সব ব্যাপারে নির্ভুল মত প্রকাশ করিতে পারেন না এবং সাহিত্যিক হইলেই মানবদরদী হন না। প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাও সীমাবদ্ধ। অতীতে এই সব সাহিত্যিক কিছু বলেন নাই, এই কারণে লিপির পরিবর্তন চলিতে পারে না এ যুক্তি পণ্ডিতের নয়। জ্যোতির্ময়বাবু নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁহার এই তালিকার মধ্যে অনেকে বাংলার জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। অথচ তিনি নিজে জাতিভেদের পক্ষে মত পোষণ করেন কেন?

রোমক লিপি প্রবর্তনের পক্ষে যে সব যুক্তি আমরা দেখাইয়া থাকি, তাহার সব আলোচনা এই প্রবন্ধে আর করিলাম না। অন্যত্র অনেক স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; এবং জ্যোতির্ময় বাবু সে সব কথা খণ্ডন করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। যেটুকু করিয়াছেন তাহার উত্তর দিয়াছি। আবার নূতন কথা তুলিতে তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহার উত্তর দিতে রাজি আছি। যদি দু'চার জন পাঠক এইটুকু পড়িয়া আমাদের রোমক-লিপি-সমিতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাবান বা ইহা জানিতে আগ্রহশীল হন তবে কৃতার্থ হইব।

(প্রতিবাদের উত্তর)

গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার আবার রোমান হরফ নামক প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সেঠ। 'ভারতবর্ষ'—সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে এই প্রতিবাদ-সম্পর্কে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি। আমার বক্তব্য যাহা, তাহা মূল প্রবন্ধেই বলিয়াছি। প্রতিবাদের অনেক কথার উত্তর পাঠকবর্গ মূল প্রবন্ধেই পাইবেন।

ফণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'তাঁহার নিকট হইতে লোকে যাহা কিছু আশা করিতে পারে, তাহা এই প্রবন্ধে আদৌ নাই'। আমাকে কিন্তু বহু কৃতবিদ্য পাঠক বলিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মনের কথাই বলিয়াছি।

ফণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'দু'এক লক্ষ লোক এই সংস্কারের পক্ষে যুক্তি ছড়াইয়া নীরবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।' আমার বিশ্বাস কোটি কোটি লোকে ইহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিবে।

ফণীন্দ্রবাবু জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। জাতি কথাটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গের, যাহারা এক ভাষায় কথা বলে, তাহাদিগকে একজাতি বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে উপজাতি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহার সহিত রোমান হরফ-গ্রহণের তুলনা হইতে পারে না। রোমান হরফ গ্রহণ করিলেই ইংরেজ এবং বাঙালী একজাতি হইয়া যাইবে না।

ফণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী ত্যাগ করিলে বাঙালীর আর মাথা তুলিবার অবকাশ থাকিবে না।' আমার মতে সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ সাধন না করিলে বাঙালী বাঁচিবে না। সর্ব-ভারতীয় মনোবৃত্তি বর্ধার ফলেই সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্সের প্রশ্নের উত্তর হিন্দীতে দিবার নির্দেশ পৃথিবীর সাইকলজির ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

বাংলা বর্ণমালার সংস্কারসাধনে আমি আপত্তি করি নাই। আমার মূল প্রবন্ধেই সেকথা বলিয়াছি। এই বিষয়ে যোগেশ রায় মহাশয়ের পরিকল্পনা এবং মুদ্রণের টাইপের সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধেও আমার পূর্ণ সম্মতি জানাইয়াছি।

ইংরেজদের বিবিধ শব্দোচ্চারণশক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক কম ইহা আমার সুস্পষ্ট ধারণা। তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণমালাও ইহার একটি কারণ হইতে পারে। আমি ফরাসী এবং জার্মাণ শিক্ষকের নিকট কিছুদিন সখ্যভাষা ও উচ্চারণের পাঠ লইয়াছিলেন। তখন আমি খুব ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছি, আমরা যত সহজে উহাদের উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে পারি, উহারা তত সহজে আমাদের কণ্ঠস্বরগুলি আয়ত্ত করিতে পারে না। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ফণীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ-পত্রের শিরোনামায় দেখিতেছি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শুধু এক লিপি নহে, এক ভাষাও। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি? বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিতে এক লিপি সত্ত্বেও এক ভাষা কেন হইতেছে না? ইহাদিগকে প্রগতিশীল দেশ বলিয়াই আমাদের ধারণা। ইহারা নিশ্চয়ই আমার মত পশ্চাৎ-পদ অনুসারী ভুত নহে। এ দেশগুলি অনায়াসে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিবেশী ভাষা ইংরেজি, ফরাসী বা জার্মানের নিকট আত্ম বলিদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া ভুত হইয়া বসিয়া আছে।

ফণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সিংহল, সর্বত্র উচ্চ-শিক্ষা রোমান হরফে চলে।' শুধু রোমান হরফে নয়, ইংরেজি ভাষাতেই বলে। সে তো আমাদের দেশেও চলিতেছে। তাছাড়া নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালার ঐতিহ্য সকল দেশের সমান নয়। ভাষা বা বর্ণমালা সম্পর্কে ভুটান যাহা করিবে, বাংলাদেশকেও কি তাহাই করিতে হইবে? যে সকল দেশের

নাম ফণীন্দ্রবাবু করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই ভাষা ও লিপি এবং সাহিত্য কি আমাদের মত উন্নত ?

ফণীন্দ্রবাবু বর্ণমালাকে একটা শিল্পের ছেনীহাতুড়ীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভাষার সহিত বর্ণমালার সম্পর্ক আরো অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

ফণীন্দ্রবাবু সময়ের পরিমাপ, কড়া-গণ্ডা-লিখনরীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমিও মানি। কিন্তু ভাষা ও বর্ণমালা উচ্চশ্রেণীর বিষয় নহে। ভাষা ও বর্ণমালার সহিত আমাদের পারিবারিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্ক অতি গভীর। এ সম্পর্কে সের-পাউণ্ড-টাকা-ডলারের সম্পর্ক নয়।

আমি প্রবন্ধে কয়েকজন স্বর্গত মনীষীর নাম করিয়াছিলাম। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে কি করিতেন, সে সম্বন্ধে গবেষণা করি নাই। আমি শুধু বলিতে চাহিয়াছি, যে ঐ সকল মনীষীরা যে রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিকৃত করিতে কেহই সম্মত হইবেন না। জাতিভেদ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত সম্পর্কে ফণীন্দ্রবাবু একটু ভুল করিয়াছেন। জাতিভেদ আমি মানি, কারণ না মানিতে হইলে যে মনোবল আবশ্যক তাহা আমার নাই। তবে আমি ইহার স্বপক্ষে মত পোষণ করি না। যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি।

আমার ধারণা, যদি কেহ বর্তমান বাংলা বর্ণমালা কোনদিন শিক্ষা না করিয়া শুধু রোমান বর্ণমালায় বাংলা পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার পাঠ এই ধরণের হওয়া অসম্ভব নয়—

অ্যামার ম্যাটা নাটা কেয়ার ডাও হে টোম্যার
কার্যাণ ঢালার টেল।...

অথবা

রাগাপাটি র‍্যাগাভা রেজার‍্যাম
পাটিটা প্যাভানা শিটার‍্যাম।
মোডলা প্যারাশ্যানা রেজার‍্যাম
পাটিটা প্যাভানা শিটার‍্যাম।
আইজোয়ারেল্লা টিয়ার ন্যাম
ন্যাবকো সামাটি দে ভ্যাগ্যাবান
রেজার‍্যাম জে শিটার‍্যাম
পাটিটা প্যাভানা শিটারাম।

ফোনেটিক গহনা পরাইলে একটু ছিরি ফিরিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বাংলা উচ্চারণ হইবে কি না, সন্দেহ। দাঁতে কাঁকর চিবাইতে চিবাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারপর গীতাঞ্জলির পাড়ায় পাড়ায় যদি কাঁকরের সমারোহ আরম্ভ হয়, তাহা হইলেই তো সর্বনাশ !

একটা সান্ত্বনা আছে। বৃদ্ধ হইয়াছি। রবীন্দ্র বঙ্কিমের সাহিত্যের নানা মনোহর রোমীয় রূপ অবলোকন করিয়া প্রাণমন শীতল করিবার সুযোগলাভ করিবার পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করিতে পারিব।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু

ভাগবত পুরাণ কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যের নিদর্শন পাই শ্রীচৈতন্য যুগ থেকে। তার আগে অবশ্য একটি ভাগবত পুরাণ রচিত হয়েছিল। তা হ'চ্ছে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

অধুনাপ্রাপ্ত গোবিন্দমঙ্গলের একটি পুঁথি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করবো। কবি 'দ্বিজ কবিচন্দ্র বিরচিত গোবিন্দমঙ্গলের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ খণ্ড।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আমরা 'দ্বিজ কবিচন্দ্র' সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর অবগত আছি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক 'কবিচন্দ্রের' দেখা মেলে। মল্লরাজ দরবারের সভা-কবিদের উপাধি 'কবিচন্দ্র'। কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যসংক্রান্ত একজন কবিচন্দ্রের সন্ধান মিলে। ইনি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। এই কবিচন্দ্রই বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ দেবের (১৭১২-৪৮) সভাকবি। তিনি বিভিন্ন পালায় বিভক্ত একটি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি সম্বন্ধে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ছিল মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। মল্লভূমের অন্তর্গত লেগোর (অধুনা কোতুল-পুর থানার অন্তর্গত) নিকটবর্ত্তী পানুয়াগ্রামে তাঁর বাস ছিল। তাঁর ভণিতায় পাওয়া যায়—

"চক্রবর্ত্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্যপুত্র শ্রীকবিশঙ্কর।"
"দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥"

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী গোপাল সিংহের পিতা রঘুনাথ সিংহের রাজ্যকালে (১৭০২-১২) একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ রচনা করেন। অধুনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকাংশ বিশেষতঃ অঙ্গদের রায়বার ও তরণী-সেন বধ কবিচন্দ্রের রচিত। মহারাজ গোপালসিংহদেবের আদেশে তিনি "ভারত পাঁচালী" ও রচনা করেন। এ সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ
যার কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ !
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র্য সবাকার মান্য,
পরম দেবতা সদা মানেন শ্রীচৈতন্য।
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে।
তারপর মহারাজা দিয়া ভুমি দান
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে করিয়া ভাবনা
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা।"

প্রধানত ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করে কবিচন্দ্র ভাগবতামৃত রচনা করেন। গুণরাজ খান কৃত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মত কবিচন্দ্র ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ভাগবত বহির্ভূত কতকগুলি নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন, যেমন, 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'কৃষ্ণকালী', ইত্যাদি। বিস্তৃতভাবে রামলীলার বণনা করেছেন। এই পালা রচনায় কবি 'বিদগ্ধমাধব', 'চৈতন্যচরিতামৃত', গীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন।

আলোচ্য পুঁথির আকৃতি ও প্রকৃতি সমকালীন অন্যান্য পুঁথির অনুরূপ। পাতা আটটি। প্রত্যেক পাতার দুদিকেই লেখা। পুরাণো ধরণের তুলট কাগজ দুভাঁজ করা। হস্তলিপি একজনের। পৃষ্ঠাগণনা একদিকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা অপর দিকে /০ ৵০ ৶০ প্রভৃতি অভিজ্ঞান দিয়ে নির্ণীত। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে আড়াআড়িভাবে "দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ" কথাটি লেখা আছে। পুঁথির শেষে এই কয়টি কথা আছে—

"কবিচন্দ্র গাইলেন ব্যাসের আদেসে।
তিনলোক পবিত্র হইল জাহার পরসে॥

ইতি বস্ত্রহরণ সোমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো দোষ নাস্তিকং। * * *। ভিমস্বামী রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ * পঠনার্থে শ্রীভাগবত কুণ্ডু (১) সাংগোগড়া সন ১২৩১ সাল—তারিখ ৩ কার্ত্তীক সোমবার তিনি দ্বাদসি বেলা * * প্রহরে পুস্তক সাঙ্গ হইল। ইতি * * *।"

১২৩১ সাল অর্থাৎ ১৮২৪ খৃঃ অব্দে পুঁথিটি অনুলিখিত হয়। এর অক্ষর পংক্তি আমার সংগৃহীত অপর পুঁথি ১৮১১ খৃঃ অব্দে অনুলিখিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুরূপ।

মল্লরাজ বীরহাম্বীর সর্ব্বপ্রথম শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা নেন। মল্লভূমে এই বৈষ্ণবতার ঢেউ চরমে উঠেছিল মহারাজ গোপাল সিংহ দেবের সময়। তিনি আদেশ প্রচার করেছিলেন তাঁর রাজ্যে হরিনাম কীর্ত্তন না করে কেউ জলগ্রহণ করতে পারবেন না। সেই বাধ্যতা-মূলক হরিনাম করা থেকেই 'গোপালের বেগার সারা' প্রবাদের উদ্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আলোচ্য পুঁথিটির কোথাও শ্রীচৈতন্য বা বৈষ্ণব-পরিকরদের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থ সুরু হয়েছে :—"শ্রীশ্রীহরে কৃষ্ণঃ॥ দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ লিখতে।
বৈসম্পায়ন বলে সুন জন্মেঞ্জয়।
মহাভারতের কথা সভাপর্ব্বেকয়॥"

যুধিষ্ঠির সুন্দরপুরী নির্মাণ করে সভায় বসে আছেন। নানাদেশ থেকে রাজারা এসে তাঁকে অভিবাদন করছেন। সপারিষদ দুর্য্যোধনও এলেন। তিনি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখে দুঃখিত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। তাঁর মাতুল শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পুত্র দুর্য্যোধনের অন্তর বেদনার কথা বলে পাণ্ডব দমনের পরামর্শ চাইলেন। শেষে শকুনিই পরামর্শ দিলেন—

"শকুনি বলেন আমি এই যুক্তি বলি।
পোন করি যুধিষ্ঠির সঙ্গে পাসা খেলি॥
মোর পিতা গন্ধার আছিল বলবান।
তার অস্তি আনি পাসা করহ নির্ম্মাণ॥
জে দান মাগিব তাহে পড়িব সে দান।
সর্ব্বস্ব জিনিতে পারি কহি বিদ্যমান॥"

বিদুর এ প্রবৃত্তির নিন্দা করে এ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। কপট পাশায় যুধিষ্ঠির সব হেরে গেলেন। এমন কি পঞ্চভাই নিজেরাও বাঁধা পড়লেন দুর্য্যোধনের কাছে। দান রাখার মত আর কিছুই নাই।

"এমন সময়ে ডাক্যা বলে দুস্বাসন।
এখন আছয়ে বাকি অমূল রতন॥
দ্রোপদি আছয়ে রাজার পরম সুন্দরী।
রূপে গুণে অনুপাম জেন বিদ্যাধরি॥
সভা মধ্যে অপমান খেলা নাহি ছাড়ে।
অবশেষে দ্রৌপদিকে যুধিষ্ঠির এড়ে॥"

দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভায় আনার জন্যে গেলেন। দ্রৌপদী মহা চিন্তায় পড়লেন। কবি এ অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

"ভিস্মদেব আদি করি আছেন সেখানে।
এমন সভাকে আমি জাইব কেমনে॥
বড়ই কাতর হইল দ্রোপদনন্দিনী।
ব্রাগ্রের সম্মুখে জেন পড়িল হরিণি॥
দ্রোপদির অঙ্গে যেন খাইল তক্ষকে।
দাহুরি পড়িল জেন ভুজঙ্গের মুখে॥"

সভা মধ্যে অপমানিত ও ক্রন্দমান দ্রৌপদীকে তার সতীত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করে দুর্য্যোধন কুবাক্য বললে দৌপদীও সময়োচিত উত্তর দিলেন। কথা প্রসঙ্গে দুর্য্যোধন কৃষ্ণের প্রতি কটুক্তি করলে দ্রৌপদী জাম্বকীর উপাখ্যান বলে কৃষ্ণের গুণগান করলেন। পরিশেষে কাতরস্বরে গোবিন্দের দয়া ভিক্ষা করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আকুল আবেদন জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে এসে পৌছলেন। শেষের দিকে আনুষঙ্গিকভাবে

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কারণ ও উদ্ধার বর্ণিত হয়েছে। শেষটুকু কবির ভাষাতেই বলা যাক।

"গোবিন্দ বলেন তুমি না কান্দহ আর।
তোমার কান্দনে বুক বিদরে আমার॥
কোনকালে বস্ত্র কারে দিয়াছিলে দান।
মনে করি কহ দেখি এই বিদ্যমান॥
দ্রোপদি বলেন প্রভু বলিযে তোমারে।
একদিন গিয়াছিলাম স্নান করিবারে॥
গঙ্গাতে করয়ে তপ এক উদাসিন।
জলের হিল্লোলে তার ভাসিল কপিন॥
উলঙ্গ হইয়া তিহো উঠিতে না পারে।
আপনার আচল চিরিয়া দিলাম তারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া তবে বলে তপোবন।
সহস্র সহস্র গুণে পাইবে বসন॥
গোবিন্দ বলেন চিন্তা না করিহ তুমি।
তোমার লাগিয়া বস্ত্র ব্যাপি হব আমি॥
হেন কালে বস্ত্র ধরি টানে দুস্বাসন।
রাসি রাসি অঙ্গের বস্ত্র হইল তখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র দ্রোপদির আছয়ে নিকটে।
জত টানে তত বাড়ে বস্ত্র নাহি টুটে॥
বিচিত্র বিচিত্র কত বেরায় বসন।
দেখি চমৎকার হইল রাজা দুর্জ্জোধন॥
ভিস্ম দ্রোণ সকুনি আদি বির জত ছিল।
রাসি রাসি বস্ত্র দেখি চমৎকার হৈল॥
এমন সোময়ে দেখ দৈবের ঘটন।
দুর্জ্জোধনের ঘরে অগ্নি লাগিল ততক্ষণ॥
গান্ধারি আছিলা দুর্জ্জোধনের জননি।
পরিত্রাহি ডাকে ঘরে লাগিল আগুনি॥
কি হল কি হইল বলি ডাকে নারিগণ।
উলঙ্গ হইয়া সভে ফেলিল বসন॥
দুর্জ্জোধনের নারি আদি জত নারি ছিল।
উলঙ্গ হইয়া সভে বাহির হইল॥
সভা মধ্যে বসি ছিল জত রাজাগণ।
পাইল বড়ই লজ্জা রাজা দুর্জ্জোধন॥
দেখ দেখ বলি রাজা ভিমসেনে বলে।
এমন আশ্চর্য্য নাহি শুনি কোন কালে
একে তো রসিক ভিম তাহে রস পাইল।
স্ত্রীগণের মধ্যে গিয়া নাচিতে লাগিল॥
হাত তুলি নাচে ভিম দেয় করতালি।
নকুল সহদেব নাচে হরি হরি বলি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা বলে সর্ব্বজন।
আ * * * সখা কৃষ্ণ দৈবকি নন্দন॥
দ্রোপদিকে রক্ষা করি দেবনারায়ণ।
গোড়ুরে চাপিয়া গেলা বৈকুণ্ট ভুবন॥
বৈসম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
পরের কারণে মন্দ আপনার হয়॥
* * * করি নিন্দা করে জেই জন।
মরিলে অবিস্যি তার নরকে গমন॥
জন্মেজয় শুনিঞা এ সব বিবরণ।
পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ সজল বিলচন॥
কবিচন্দ্র গাইলেন ব্যাসের আদেসে।
তিন লোক পবিত্র হইল জাহার পরসে॥"

আগেই বলেছি কবিচন্দ্র একটি ভারত পাঁচালীও রচনা করেন। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে সভাপর্ব খণ্ড এই ভারত পাঁচালীর অন্তর্গত। আলোচ্য পুঁথিটি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ খণ্ড এবং প্রারম্ভে আছে "মহাভারতের কথা সভাপর্ব্বে কয়"। কিন্তু এছাড়া পুঁথির অন্য কোথাও 'মহাভারত' বা 'ভারত কথা' নাই। সর্বত্রই গোবিন্দ মঙ্গলের উল্লেখ আছে। যেমন

সকুনি চলিল সঙ্গে মন্ত্রি দুস্বসন।
গোবিন্দ মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র কন॥"

বিষয়বস্তু ও বর্ণনা-ভঙ্গি ভারত পাঁচালীর অনুরূপ। কিন্তু গোবিন্দ মঙ্গলের উল্লেখে বিষয়টি জটিল হয়ে গেছে। যাই হোক পুঁথির অনুরূপ আমিও এই কাব্যটিকে গোবিন্দ মঙ্গল বল্‌বো।

কবিচন্দ্র রচিত ভাগবতের বিভিন্ন পালা একত্রিত করে ১৩৪৯ সালে কবির দৌহিত্রবংশের উত্তর পুরুষ মাখন লাল মুখোপাধ্যায় 'কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত' প্রকাশ করেন। এই ভাগবতামৃতই গোবিন্দমঙ্গল নামে পরিচিত। অনেকের সন্দেহ হয় 'ভাগবতামৃত' রচয়িতা 'কবিচন্দ্র' ও 'গোবিন্দ মঙ্গলের' কবিচন্দ্রের অভিনবত্বে। কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মল্লভূম ও মেদিনীপুর অঞ্চলে একাধিক গোবিন্দ মঙ্গল রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে দুঃখী শ্যামদাসের ও রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর গোবিন্দ-মঙ্গল উল্লেখযোগ্য। তবে সমসাময়িক এক কবি 'শিবায়ণ' প্রণেতা রামকৃষ্ণ রায় 'কবিচন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করলেও শ্যামদাস ও রামেশ্বর ঐ উপাধি নিয়েছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং নতুন কিছু আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা আলোচ্য পুথির রচয়িতা হিসাবে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকেই ধরবো।

লেখক তাঁর উত্তর পুরুষ।

মুনশী বাড়ি

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

পূজার ছুটি। যেমন গরম, তেমনি বৃষ্টি। শরতের রঙ্গমঞ্চে যেন গ্রীষ্ম ও বর্ষার মান অভিমানের পালা।

সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে লোকের ভিড়। তার ওপর আবার লাইন বেঁধে সাইকেল রিক্শার মিছিল। প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে কান ঝালা পালা।

চক্রবর্তী স্টোর্সের সামনে উদ্‌বাস্তু জমিদার ও কবি কিশোরীবাবুর সংগে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম—কি মশাই। বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে ?

কিশোরীবাবু আমতা আমতা ক'রে বললেন—হ্যাঁ, হয়েছে। তবে—

—'তবে' কোন ? গ্রাম পছন্দ হয়নি বুঝি ?

—চল্লিশ বছর একটানা গ্রামে কাটিয়েছি। গ্রামে না থাকলে কি জমিদারি রাখা যায় ? গ্রাম আমার ভালোই লাগে। কিন্তু বাড়িটা—

—বাড়ির আবার কি ?

—সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

—কি রকম ?

—বলতে সময় লাগবে। চলুন আপনার বাসায় যাই। কোন কাজ নেই তো ?

কাজ একটু ছিল। থাকলে কি হবে ? আকাশে জমেছে মেঘ, আর মনে জেগেছে কৌতূহল। গল্প শোনবার এমন সময় কি মেলে ! বললাম—আসুন আসুন, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

কিশোরীবাবুকে বৈঠকখানায় বসিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করলাম। বৃষ্টি এল। এক পেয়ালা চা খেয়ে কিশোরীবাবু বলতে আরম্ভ করলেন :—

আপনার কথামতো ১নম্বর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মুখুজ্যে মশাইকে বাড়ির জন্য লিখেছিলাম। মাস দেড়েক আগে তিনি জানালেন—আমাদের গ্রামের মুনশী বাড়িটি আপনার উপযোগী। বাড়িও বড়, জায়গাও অনেক। বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে, ওয়ারিসানের সন্ধান কেউ জানে না। কোন হাঙ্গামা হবে না। আপনি এসে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবেন। গ্রামের সকলের সংগে আলোচনা করেছি, কারও কিন্তু আপত্তি নেই। বরং তাঁরা খুশীই হবেন আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবার এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে। তাঁরা আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু বর্তমানে বাড়িটি বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বন-জংগল পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। স্থানে স্থানে সংস্কার না করলেও চলবে না। আমার মনে হয় এসব কাজে আপনার বেশ খরচ হবে। আপনি যদি একদিন এসে দেখেশুনে মত দেন, তাহলে আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত করতে পারি।

মজুমদার মশাই, আপনি তো জানেন মামাদের বৃহৎ পরিবার। চারখানি ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছি। কষ্টের সীমা নেই। ফাঁকা জায়গায় থাকা চিরকালের অভ্যাস। শহরে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই মুখুজ্যে মশাইকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখলাম :—কাজ আরম্ভ করুন। সুবিধা-মতো কোন সময় গিয়ে দেখে আসব।

গত রবিবার দুপুরে ভাইপো বিশ্বনাথকে সংগে নিয়ে মুখুজ্যে মশায়ের গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম, গ্রামবাসীর ব্যবহার মধুর। ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখলাম। মুনশী বাড়ি এককালে সত্যিই জমকালো ছিল, এখন ভগ্নদশা। সেকালের গাঁথনি—আজও বেশ মজবুত রয়েছে। জায়গায় জায়গায় পঙ্কের কাজ দেখে অবাক্ হতে হয়। এমন চমৎকার ইমারতে

টাকা খরচ সার্থক বইকি। আলাপ-পরিচয়ে কথাবার্তায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেদিন ফেরা আর সম্ভব নয়। মুনশী বাড়ির একতলার পরিষ্কার-করা কলিফেরানো ঘরটিতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম।

মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে যখন শুলাম তখন দশটা। নিস্তব্ধ গ্রাম। থমথমে রাত্রি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘুম আসে না নতুন জায়গায়। ভাবি নিজের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা। কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসেছি! জীবনের অপরাহ্ণ বেলাটা যে এমন ছন্নছাড়াভাবে কাটাতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। দেশ বিভাগের ফলেই তো এই দুর্দশা। চোখের নিমেষে সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। মনে হলে ব্যথায় বুক ফেটে যায়। ভাবি এ বাড়ির মালিকদের কথা! কত শৌখিন লোক ছিলেন মুনশীরা! এঁদের সংসারেও নিশ্চয় এসেছে বিপর্যয়। নইলে এমন প্রাসাদের এই পরিণতি! কোন্ ঊর্মিমুখর পারাবারে ভেঙেছে এঁদের জীবনের ভংগুর ভেলা কে জানে! জ্ঞানী যাঁরা জীবনটা হয়তো তাঁদের কাছে শুধু মায়ার খেলা, নিছক হাসির ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা মরমী তাঁদের কাছে জীবনটা বড় দুঃখের, কানায় কানায় ভরা!

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় হারিকেন নিভে যায়। অজগর অন্ধকার গ্রাস করে ঘরখানাকে। বিশ্বনাথ অঘোরে ঘুমোয়—থেকে থেকে তার নাক ডাকে। আমার গা ছম ছম করে। চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করি। মনে হল কে যেন কথা বলছে। সভয়ে চোখ খুলি। জমাট অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবু ভেসে আসে নারী-কণ্ঠের ধ্বনি। উৎকর্ণ হয়ে শুনি—শোন বাবা, তোমরা এসেছ ব'লে আমার ভারি আনন্দ হয়েছে। এখানে বাস কর, তোমাদের মঙ্গল হবে।

সেই নিশীথ নির্জনে অশরীরী বাণী সারা দেহে রোমাঞ্চ আনে। ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি—কে আপনি? দুপুর রাতে বিদেশী ভদ্রলোককে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? দয়া ক'রে চলে যান এখান থেকে।

স্নেহ মধুর স্বরে বলেন অপরিচিতা—ভয় কি বাবা? আমার অতিথি তোমরা। তোমাদের কোন অকল্যাণ হবে না। আমার পরিচয় জানতে চাও? বলতে আপত্তি নেই। শুনতে ভালো লাগবে কি?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব'লে ফেলি—শুনব বই কি, বলুন।

অশরীরিণী সুরু করেন তাঁর কাহিনী :—

*   *   *   *

আমার বয়স সত্তর। অভিজ্ঞতাও কম নয়। উন্নতি অবনতি, হাসি-কান্না—সংসারের কত রূপান্তরই না দেখলাম! পশ্চিম বাংলার এই অখ্যাত পল্লীর অনেকখানি অনাড়ম্বর ইতিহাস আমি ধ'রে রেখেছি। এর বিভিন্ন যুগগুলো চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে। মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কিন্তু আমি তো মানুষ নই। মানুষ হলে হয়তো একটা জয়ন্তী হ'ত। আমি ভাঙা বাড়ি—প্রাণহীন ইঁট-পাথরের মেলা। আমার সুখ-দুঃখ কেই বা জানে? আর ক'জনই বা বোঝে! অর্থহীন অস্তিত্বের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি মহাকালের প্রান্তরে।

এক সময় আমার সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরদেশী পথিক চলার পথে আমাকে দেখে স্থপতির কৌশল ও গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা না ক'রে পারেনি। এখন বৃদ্ধেরা আমার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। অতীত গৌরবের ছায়া তাঁদের অন্তরে আনে করুণ অনুভূতি। শিশুদের দৃষ্টিতে জাগে কখনও কৌতূহল, কখনও ভয়। মহিলারা কানাকানি করেন—আমি হানাবাড়ি, গহন রাতে আমার মাঝে লীলা করে দেহহীনের দল। সব দেখি, সব শুনি, সব সহ্য করি। অদৃষ্টের কী পরিহাস!

আমার প্রথম মনিব হরিচরণ মুনশী। সুন্দর চেহারা, মাথার চুল পাকা, মুখে প্রশান্ত হাসি। গরীবের ছেলে—ভাগ্য-পরীক্ষায় গিয়েছিলেন বিদেশে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরে বর্মায় কাঠের কারবার গড়ে তোলেন। প্রবাসে জন্মভূমিকে ভোলেন নি। শেষ বয়সে বিপুল অর্থের মালিক হয়ে ফিরে আসেন দেশে। তার র শুভ দিনে হয় আমার ভিত্তি স্থাপন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে কী সমারোহ! সিং দরজায় মঙ্গল ঘট, দেবদারু পাতায় মোড়া তোরণ, অংগনে আলপনা, বারাণসী বুনোর আশাবরীর আলাপ। জীবন-প্রভাতের সে স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

আমার ওপর মুনশী মশায়ের কত মমতা! আমার কোন অযত্নই তাঁর প্রাণে সয় না। দৃষ্টি তাঁর সজাগ।

কোথাও আবর্জনা বা অপরিচ্ছন্নতা দেখলে অস্থির হয়ে ওঠেন। সহধর্মিণী মন্দাকিনীরও স্নেহের অভাব নেই। ভোরে উঠে ধুয়ে মুছে আমাকে তকতকে ঝকঝকে ক'রে রাখেন। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে ধুনো দেওয়া, সজোরে শাঁখ বাজানো, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালা—তাঁর নিত্য কর্ম। ছেলেমেয়েরা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কলকাতা থেকে আমার কোলে ফিরে এলে তাদের প্রাণে লাগে উদার আকাশের রঙ, মুক্ত আলোর স্পর্শ।

সরমার ক্ষুদ্র জীবনের সংগে আমার দীর্ঘ জীবনের বিষাদ-মলিন ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। মুনশী মশায়ের বড় আদরের মেয়ে সরমা। কাঁচা সোনার রঙ, কোঁকড়া চুল, দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। যেমন শান্ত স্বভাব তেমনি মিষ্টি কথা। মানুষের দুঃখ দেখলে করুণায় ভরে ওঠে তার কোমল হৃদয়। অন্ধ-আতুর এলে ছুটে গিয়ে ভিক্ষে দেয়। সে থাকে আপন মনে—কলরব থেকে দূরে। ছাদে নিরালায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে দেখে পল্লী-প্রকৃতির রূপ—বনানীর শ্যামলিমা, তটিনীর হাসিভরা ঢেউ। ভোগ-বিলাসে নেই তার মোহ, ধরার ধূলির ঊর্দ্ধে সে।

অভাবনীয় দুর্ঘটনা। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় সরমা ছাদের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে। বহু চেষ্টাতেও তার জ্ঞান ফেরে না। কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যু হয়। অবিরাম কান্নার রোল। শোক-কাতর মুনশী মশাই শয্যাশায়ী। মাস-চারেকের মধ্যে তিনিও সংসার ছেড়ে যান। মৃত্যুর পর মৃত্যু। আঘাতের পর আঘাত। কেউ বলেন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে, কেউ বলেন বাড়ির বাস তুলে দিতে। মন্দাকিনী দেবীর মাথার ঠিক নেই। ধারণা ক'রে বসেন আমি অপয়া। তাঁর দোষ কি! গ্রামের বর্ষীয়সীরা বার বার এই ইঙ্গিত করেন। তাঁদের চোখে ভীতি-বিহ্বলতা, কণ্ঠে সহানুভূতির সুর। বুকভরা বেদনা নিয়ে সাধের ঘর ছেড়ে মন্দাকিনী দেবী কলকাতা রওনা হন। আমার দরজায় তালা পড়ে। আমি বন্দিনী হই।

দু বছর পরে। দরজায় গাড়ি দাঁড়ায়। মুনশী মশায়ের বড় ছেলে সরোজকে দেখি। কী যে আনন্দ বলতে পারি নে। একটার পর একটা ঘর খোলা হয়। আলো-বাতাস বহন করে আনে দেবতার আশিস্। সরোজ খাট আলমারি টেবিল চেয়ার জড়ো করে নিচের চাতালে। তারপর গাড়ি বোঝাই ক'রে পাঠায় চাকুন্দির ঘাটে। শুনি সব কলকাতা যাবে জলপথে। সরোজ কালীঘাটে কারবার ফেঁদেছে। জিনিসপত্র নেবার জন্যই তার আসা। হপ্তাখানেক থেকে দরজায় চাবি দিয়ে সে কলকাতা চলে যায়। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

পাঁচ বছর কাটে। কালবৈশাখীর ঝড়ে ইস্কুল ঘরের খড়ের চাল উড়ে যায়। ভারি মুশকিল। মুরব্বীরা স্থির করেন যতদিন ইস্কুল ঘর মেরামত না হচ্ছে ততদিন মুনশী-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসবে। মুনশীদের কুলপুরোহিত বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ছোটেন কলকাতায়। সরোজকে অবস্থা বুঝিয়ে চাবি নিয়ে আসেন। মজুর লাগিয়ে সাফ করা হলে ঠাকুর দালানে ক্লাস বসে। ছেলেমেয়েদের পড়া, ঝগড়া, নালিশ, হুটোপাটি করা, খিড়কি-বাগানে পেয়ারা গাছে চড়া—সর্বত্র জীবনের সাড়া। মানুষের আনাগোনায় দূরে সরে যায় নিশাচর পশুপাখীর দল। ইস্কুল ঘরে ইস্কুল বসে ছ'মাস বাদে। আবার সেই বিজনতা।

আরও সাত বছর যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। সংবাদ আসে বৃন্দাবনে মন্দাকিনী দেবী দেহরক্ষা করেছেন, আর ভায়ে ভায়ে ঝগড়া ক'রে ব্যবসা তুলে দিয়ে সরোজ ও বিরাজ গা-ঢাকা দিয়েছে। বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর মালিকের প্রতিনিধি। তাঁকে কিছু প্রণামী দিয়ে বংশী মোড়ল ঠাকুর দালানে কাপড়ের দোকান খোলে। আমার মন্দ লাগে না। মোড়ল সারাদিন দোকান আগলে ব'সে থাকে। লোকজন আসে যায়। যখন খদ্দেরের ভিড় থাকে না তখন মোড়ল তামাক খায় আর সরকারের সংগে খোশগল্প করে।

বিশ্বসমরের অবসান—অসহযোগ আন্দোলন—বিদেশী বর্জনের হিড়িক। মোড়ল ভারি হুঁশিয়ার—তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলে বিলিতী কাপড়ের কারবার। ইস্কুল কলেজ ছেড়ে গ্রামের ছেলেরা পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। শ্যাম পণ্ডিত তাদের নেতা। বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ধর্ম কামারকে ডেকে বৈঠকখানার কুলুপ খুলে দেন। সমিতির আপিস বসে। হাতে লেখা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গ্রামবার্তা' বার হয়। উৎসাহপূর্ণ আবহাওয়া। সুখ আমার কপালে সয়না বেশীদিন। প্রগতিমূলক প্রচেষ্টার ওপর থানার দারোগাবাবুর নজর পড়তেই ছেলেদের জেল, আর সমিতির দফা রফা।

বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর পৃথিবীর মায়া কাটান। কেউ দৃষ্টি দেয়না আমার দিকে। সদর দরজা খোলা। উঠানে জংগল, চণ্ডীমণ্ডপে খসে'পড়া চুন বালির স্তূপ, চৌকাটে খড়খড়িতে উই, বাইরের দেয়ালে গাছ। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনা, জীবজন্তু আড্ডা গাড়ে। রাত্রির অন্ধকারে প্যাচার ডাক শুনে শিউরে উঠি, চামচিকেগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যেন আমার রক্ত চুষে খায়। দুঃখের কি শেষ আছে। পিছনে বাস করে কিন্তু নাপিত। তার মাটির ঘরের পানে চেয়ে দুঃখ আরও বেড়ে যায়। হিংসার উদ্রেক হয় মনে। চারিধারে নির্মলতার ছাপ। কেমন লক্ষ্মীশ্রী সংসারে! নাপিত বউ কাজ করে, আর সোনার চাঁদ ছেলে খেলা করে জামরুল গাছের নিচে। তুলসীতলায় যখন মাটির পিদিমটি জ্বলে তখন তার স্নিগ্ধ রূপের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সন্ধ্যা তারা। কী অপূর্ব শুভদৃষ্টি! ভাবি কেন আমি ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যাইনে, কেন আমার সকল জ্বালার অবসান হয়না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। জাপানী বোমা পড়ে কলকাতায়। একদিন ম্যালেরিয়ার ভয়ে শহরে পালিয়েছিল মানুষ। তারাই বোমার ভয়ে পালিয়ে আসে। এমনি ভাগ্যচক্র! খালি বাড়িগুলো একদম ভরতি। গ্রামের এ ছবি বহুদিন দেখিনি। পিতৃপুরুষের আশ্রয় যাদের রয়েছে তারা সবাই ফেরে—কেবল আমার মনিবদেরই দেখা নেই। বাংলা মুলুক ছেড়ে তারা কোথায় গিয়েছে ভগবানই জানেন। সতীলক্ষ্মীর অন্তর্ধানে সোনার সংসার এইভাবেই ছারখার হয়ে যায়।

দারুণ দুঃসংবাদ। বাংলা দেশ পাকিস্থান হয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীর মুখে আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের ছায়া। নগরপোতার বহু আড়তদার হবিবুল্লা আমাদের হাটে আসে। হাটতলায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে ভাইকে বলে—দ্যাখ্ নছিরুদ্দি, পাকিস্থান হলে এ বাড়ি আমি নিয়ে মোকাম বানাব।

কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায় কতকগুলো মুসলমান ছোকরা—বোধ হয় লীগের পাণ্ডা। তারা এগিয়ে এসে বলে—কি ভাবছ মিঞা সাহেব, ও সব মতলব ভালো নয়। ওখানে তোমার মোকাম বানানো চলবে না, মক্তব বসবে।

চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায়।

বাংলা বিভাগের পর। হবিবুল্লা নাসিরুদ্দিনের দল পাকিস্থানে পালায়। পূর্ব পাকিস্থান থেকে হাজারে হাজারে হিন্দু পরিবার চলে আসে পশ্চিম বাংলায়। শেয়ালদা ও হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে শরণার্থীর ভিড়। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। জেলা কংগ্রেসের কর্তারা গ্রামের প্রবীণদের সংগে যোগাযোগ করেন। আমার মনে লাগে আশার কুহক। রাত্রিদিন প্রার্থনা করি—হে ঈশ্বর, নেতাদের শুভবুদ্ধি দাও। আমাদের গ্রামের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরাও। আমার দরজা তো খোলাই রয়েছে। উদ্‌বাস্তুরা অনেকেই আশ্রয় পেতে পারে এখানে।

কত লোক আসে খবর নিতে, কিন্তু কেউ বসবাস করতে চায় না। প্রত্যেকেই আপত্তি জানায় জায়গাটা রেল লাইন থেকে দূরে। নিবিড় নিরাশায় ডুবে যাই। বৃথাই ব'সে থাকা আসন পেতে। অতিথির পায়ের ধূলো কোনদিনই পড়বে না। পাণ্ডববর্জিত দেশ একেই বলে। উদ্‌বাস্তুরাও যাকে উপেক্ষা করে সে বাসস্থান নয়, শ্মশান।

অমৃতের ঘর কি অশ্রুসাগরের পারে? শবরীর প্রতীক্ষা কি সফল হবে? ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাদের। তোমরা সর্বহারার পর্যায়ে পড় না, তোমাদের হাতে তো নগদ পয়সা আছে। এখানে সানন্দে বাস কর। দোল দুর্গোৎসব কর। ধূপধুনো পুড়ুক, শাঁকঘণ্টা বাজুক, আমার সাধু মনিবের সাধের ভিটায় আবার স্বর্ণপুরী গড়ে উঠুক। পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর, অহল্যাকে উদ্ধার কর। আবার তিমির রাত্রি আনুক উজ্জ্বল প্রভাত।

* * * *

কায়াহীনার কণ্ঠ মিলিয়ে যায় কাতর আবেদন জানিয়ে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসি। পূর্ব দিগন্তে ফুটে ওঠে ঊষার আলো। বাতাসে ভেসে আসে বনবৈতালিকের বন্দনা। গৃহদেবতাকে প্রণতি জানাই প্রত্যূষের প্রথম শুভক্ষণে।

কিশোরীবাবু চুপ করলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—আশ্চর্য নয় কি মজুমদার মশাই? রাতের অভিজ্ঞতা আদ্যোপান্ত বলেছি বিশ্বনাথকে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করেনা। তার মতে ওটা আমার স্বপ্নরাজ্যের এভারেস্ট অভিযান। আপনি কি মনে করেন? এ মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, না প্রেততত্ত্বের ব্যাপার? বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। এখন উঠি। ভেবে দেখবেন মুনশী বাড়িতে আমার যাওয়া উচিত কি না।

কিশোরীবাবু বিদায় নিলেন। বর্ষণক্লান্ত রাতে বৈঠকখানায় একা ব'সে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। মানুষের কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হয়! বিশ্বচরাচর এক বিরাট প্রহেলিকা। হয়তো জড়বস্তুরও স্বতন্ত্র জীবন আছে। হয়তো ইঁট কাঠ চুন সুরকির অন্তরালে আছে আত্মা। হয়তো আমাদের বাসগৃহ মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। বিস্ময়ের বহু বিচিত্র দ্বার খুলে দিয়েছে বিজ্ঞান। আণবিক বোমার যুগে সম্ভব অসম্ভবের ভেদাভেদ খব বেশী আছে কি? আমাদের অভিজ্ঞতার পরিমিত পরিধির বাইরে রয়েছে যে বিপুল অধ্যাত্ম জগৎ, তার রহস্যও হয়তো অচিরে উদ্‌ঘাটিত হবে।

থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধী-সম্পদ যে কয়েকজন মহানুভব বৈদেশিক মনীষী চরমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া ভারতবর্ষীয়ের নিকট তথা বিশ্বের সুধীসমাজে সত্যনিষ্ঠা ও দরদের সহিত প্রকট করিয়া গিয়াছেন, থিওডোর গোল্ডষ্টুকর তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাঁহাকে আজ আমরা প্রায় ভুলিয়াছি, কিন্তু মধুসূদন তাঁহার নামে একটি অপূর্ব "সনেট" রচনা করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

"মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্যদলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ-সুধা, সাধু! লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মন্থনে।
পণ্ডিত কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হ'তে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃসম কবি-কুল-মণি।
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?"

মধুসূদন তাঁহাকে বলিলেন "সাধু", "পণ্ডিত-কুলের পতি"; বঙ্কিম বলিয়াছেন "আচার্য্য"। তাঁহার কর্ম্মজীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দেখা যায় এই চিরকুমার বহু ভাষাবিদ হৃদয়বান সুপণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া তাঁহার বেদ, উপনিষদ, বিচিত্র আচার, সংস্কার, দর্শন, শাস্ত্র ও ঋষিগণের একনিষ্ঠ সাধনার ফলস্বরূপ শ্রুতি-সাহিত্য প্রভৃতির যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতাকে বিপুল গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইংরাজ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে

ইয়োরোপ ও আমেরিকার কতগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে তথ্য নিরাকরণের দ্বারা দুইপ্রকার মতবাদ সৃষ্টি করেন। একপ্রকার মত এই যে এদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন নহে, প্রাচীন গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু অধিকাংশ কাল্পনিক বা রূপক, রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ, মহাভারত অনৈতিহাসিক, পাণ্ডবেরা কবি কল্পনামাত্র ইত্যাদি; এই মতের প্রাবল্যে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী তদনুবর্ত্তী হন—সুবিখ্যাত পণ্ডিত Weber সাহেব এই মতের প্রবর্ত্তক; তিনি বেদ ছাপাইয়াছেন এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে বহু গ্রীক লাটিন ফরাসী ও সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন।

বিরুদ্ধ মতের সমর্থক বঙ্কিমবাবু অপূর্ব্ব প্রতিভার বলে Weber ও ঐ মতাবলম্বী বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতবাদ খণ্ডন করিবার সময়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্ম্মনির অরণ্যবাসী বর্ব্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি-আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল।"

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা পাণিনি সূত্র হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই পাণিনির অভ্যুদয়কাল থিওডোর গোল্ডষ্টুকর তাঁহার নিম্নলিখিত পুস্তকে নির্ণীত ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—

পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয় নাই। "According to the views expressed in the work entitled Panini his Place in Sanskrit Liturature: London 1861, it is probable that Panini lived before Sakyamuni, the founder of the Buddhist religion whose death took place about 543 B. C." প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য, যে কোলব্রুক, উইলসন, এলফিনষ্টোন, উইলফোর্ড প্রভৃতি মনীষীরাও এ বিষয়ে একমত এবং ধারণা করেন যে 14th century B. C. তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল।

গোল্ডষ্টুকর হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন কয়েকটি বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বিষয় বস্তুর অনুবাদ ও অনুশীলন (সংস্কৃত হইতে ইংরাজী) সম্পন্ন করিয়া হিন্দুজাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। অপ্রাচীন কয়েকটি বিষয়ের রচনাও করিয়াছেন। কয়েকটি নিবন্ধের উল্লেখ করিতেছি।

"কেমব্রীজ এনসাইকোপিডিয়াতে" নিবন্ধগুলি রক্ষিত হইয়াছে। বেদ, গঙ্গানদী, ভারতবর্ষ, ইন্দ্র, জৈনগণ, কালিদাস, কাম বা কামদেব, লক্ষ্মী, মনু, ন্যায়, ওম্, পাণিনি, পরাশর, পতঞ্জলী, প্রজাপতি, প্রজ্ঞাপারমিতা, রাহু, রুদ্র, শকুন্তলা, শঙ্করাচার্য্য, শিব, সোম, শ্রাদ্ধ, তন্ত্র, উমা, উপনিষদ, পুনর্জ্জন্ম, বেদান্ত, নির্ব্বাণ, বিষ্ণু, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, যম, যোগ ইত্যাদি।

"ভারতীয় পুরোহিত" নামক নিবন্ধে গোল্ডষ্টুকর বলিতেছেন—

"ইঁহারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির লোক। একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার পুরোহিত হইবার। কারণ, বেদ ও কল্পসূত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, সৎ শুদ্ধচিত্ত, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সুদক্ষ, শিক্ষিত ব্রাহ্মণই এই কার্য্যের উপযুক্ত। অজ্ঞতা বা মূঢ়তা, ভ্রান্তি বা অক্ষমতা পুরোহিতকে ইহজীবনে ও পরবর্ত্তী জীবনে শোচনীয়ভাবে নিরয়গামী করিবে।"

শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"দুষ্ট পুরোহিতগুলোকে দূর করে দাও।"

'বৈষ্ণব' নিবন্ধে গোল্ডষ্টুকর বলিতেছেন—

"বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ইতিহাসের বিবর্তনের সহিত সম্প্রদায়ের গঠনের পরিবর্তন; "আনন্দগিরি"কৃত 'শঙ্করদিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত বৈষ্ণবদিগের সহিত কিম্বা উইলসন সাহেবের 'Sketch of the Religious Sects of the Hindu's' নামক পুস্তকে বর্ণিত বৈষ্ণবদিগের সহিত এযুগের বৈষ্ণবদিগের মিল নাই। তারপর কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে—যথা, রামানুজ, রামাবৎ, কবীরপন্থী, বল্লভাচার্যীয় (বা রুদ্র-সম্প্রদায়ী) মাধ্বাচার্যীয়, বাংলার বৈষ্ণব (শ্রীচৈতন্যের ভক্ত) প্রভৃতি। অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে এই নিবন্ধটি পূর্ণ।

সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

থিওডোর গোল্ডষ্টুকর জর্ম্মণির (প্রসিয়ার) কনিগ্সবর্গে জন্মগ্রহণ করেন ১৮২১ সালের ১৮ই জানুয়ারী;—১৮২৯-৩৬ (৮ বৎসর) কাটে ঐ নগরের গ্রামার স্কুলে—হেডমাষ্টার ষ্ট্রুভ ও এলেনসনের তত্ত্বাবধানে। পিতা মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, মাতাও সুশিক্ষিতা। ১৮৩৬ সালে কনিগ্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া অধ্যাপক ফন্ বোলেনের নিকট সংস্কৃত, অধ্যাপক রোসেনক্রান্সের নিকট দর্শন, ও শুবের্যাদের নিকট ইতিহাস এবং লোবেকের নিকট ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ও দর্শন তাঁহাকে সমধিক আকৃষ্ট করে এবং উক্ত বিষয়ের অধ্যাপক দুইজন তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। তৎপরে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ভারতীয় সাহিত্য পাঠকালে সুপণ্ডিত লাসেন সাহেবের নিকট সংস্কৃত চর্চ্চা করেন। তারপর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ১৮৪০ সালে কনিগ্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডকটরেট" উপাধিলাভ করেন। পরবৎসর তাঁহার প্রাক্তন অধ্যাপক রোসেন ক্রান্সকে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক সংস্কৃত দার্শনিক নাটকের অনুবাদ উপহার দিয়া বহু সমাদর লাভ করেন। যেমন শিষ্য তেমন গুরু; পরবৎসর ঐ অনুবাদ গুরুর লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাসহ গুরুর চেষ্টায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গুরুর উৎসাহে গোল্ডষ্টুকর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যাপনা করিবার জন্য প্রসিয়ার রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে প্রার্থনা "সরকারি দপ্তরখানায়" রিপোর্টের জন্য নামঞ্জুর হয়।

১৮৪২ সালে গোল্ডষ্টুকর প্যারিসে গিয়া বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইউজীন বর্ণুফ মহোদয়ের নিকট তিন বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। প্যারিসে থাকাকালে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডের লাইব্রেরী হইতে হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণামূলক গ্রন্থাদি পাঠের সুবিধা পান এবং "মহাভারতের সমালোচনা" প্রভৃতির পথে অগ্রসর হন। তারপর প্যারিস হইতে বার্লিন; তাঁহার বিদ্যাবত্তা, চরিত্র-মাধুর্য্য ও ছাত্রসুলভ শিক্ষাপ্রবৃত্তির কথা আলেকজাণ্ডার হম্বোল্ট সাহেবের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া সপ্রশংস মন্তব্য সরকারি দপ্তরে লিপিবদ্ধ করেন।

কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক নির্ভীকতা, সংসারে নির্লিপ্ততা ও রাজনীতিক আবর্ত্ত হইতে আত্মরক্ষার বাসনার জন্য সরকার হইতে তাঁহার উপর বার্লিনবাস ত্যাগ করিবার আদেশ হয়। দেড়মাস পরে এই অদ্ভুত আদেশ প্রত্যাহৃত হইলেও তিনি আর ফিরিতে ইচ্ছুক না হইয়া কিছুদিন পট্সডামে, পরে বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হোরেস উইলসনের আমন্ত্রণে ইংলণ্ডে অবস্থান করেন এবং লণ্ডন ও অকস্ফোর্ডের গ্রন্থাগারে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের সাহিত্য-মন্দিরে ও উইলসন সাহেবের সান্নিধ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ, পুঁথি প্রভৃতির আলোচনার অবসর পাইয়া অন্তরের বাসনা পূর্ণ করেন।

তারপর ১৮৫২ সালের মে মাসে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অবৈতনিক অধ্যাপক হইয়া উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণীতে পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিতে থাকেন। বড় বড় সভা ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও কর্ণধাররূপে তিনি শিক্ষার বিস্তারে প্রভূত পরিশ্রম করেন। ইংলণ্ডের সেণ্ট জর্জ স্কোয়ারে প্রিমরোজ হিল্ নামক তাঁহার বাসভবনে বিদেশ হইতে প্রাচ্যদেশ বিষয়ে জ্ঞানলাভেচ্ছু বহু পণ্ডিত আগমন করিতেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বা রাজনীতির চাঞ্চল্য তাঁহার ক্ষুদ্র পাঠগৃহটিকে বিপর্য্যস্ত করে নাই। তিনি "লিবারেল" দলভুক্ত ছিলেন—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

হিন্দু আইন সম্বন্ধে প্রিভিকাউন্সিলের জজেরা প্রয়োজন মতো তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, কঠিন সমস্যার শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেন। দেশব্যাপী সম্মান তাঁহার স্বাভাবিক সারল্যকে বিচলিত করে নাই। অবসর পাইলেই তিনি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে ও সূচীপত্র সংকলনে ব্যস্ত থাকিতেন; সামাজিকতা বা বাহিরের সহিত অধিক মেলামেশার পক্ষপাতি ছিলেন না। সমালোচক হিসাবে অত্যন্ত কঠিন ছিলেন। প্রত্যেক রচনাকে নিখুঁত করিবার চেষ্টার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা "Sanskrit—English Dictionary" (London 1856-64) ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা "Panini: his place in Sanskrit Literature" Preface to "Manava Kalpa-sutra" London 1861। তাঁহার রচনা নিখুঁত করিবার চেষ্টার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

India Officeএ রক্ষিত "Sanaskrit Lexicon" তাঁহার সূচীপত্র সন্নিবেশের (Indices) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদের শঙ্করকৃত মাধবাচার্য্যের মীমাংসা-দর্শনের ব্যাখ্যানুশীলনী "Jaminiya-nyaya-mata-vistara" তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়, কিন্তু শেষাংশ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ৩ দিনের জ্বরে অকস্মাৎ ৬ই মার্চ্চ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। অনেক দিন পরে অধ্যাপক কাওয়েল সাহেব ঐ অংশ সম্পূর্ণ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণায় সততা, ত্রুটি ও ঋণ স্বীকারে সৎসাহস, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী, জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে নিরপেক্ষতা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরকে জগৎবরেণ্য করিয়াছে। মনীষী স্যর যদুনাথ সরকার সার্থক গবেষকের এইরূপ সংজ্ঞাই দিয়াছেন।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে

বলিয়াছেন—"তিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে মনের সহিত ভালবাসিতেন।" গোল্ডষ্টুকার সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কিন্তু দুইজনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। "শকুন্তলা" উভয়েরই আরাধ্য। গোল্ডষ্টুকার "শকুন্তলা" নিবন্ধে উচ্ছ্বাসহীনভাবে মহাভারতীয় আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শকুন্তলা যজুর্ব্বেদের "জলবালা"; ঐ নামীয় নাটকের দুইটি প্রকরণ আছে—একটি প্রাচীন, অন্যটি আধুনিক; শেষোক্ত রূপটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, পরে ফরাসী ভাষায় প্যারিসে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে (A. L. Chizyর অনুবাদ); পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাওএল সাহেবের তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের দ্বারা ১৮৬০ এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। প্রাচীন রূপটি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. O. Boehtlingk ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ হার্টফোর্ড হইতে ১৮৫৩, তৎপরে বোম্বাই ইন্দুপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্র হইতে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত প্রকাশিত করে। প্রথম ইংরাজী অনুবাদে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়মস্ জোন্স "শকুন্তলা" সুবিখ্যাত করেন; তৎপরে মনিয়ার উইলিয়মস্ ১৮৫৩ সালে আর এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ব্যতীত জার্ম্মাণ, ইতালিয়, ড্যানিশ এবং আরও কয়েকটি ভাষায় "শকুন্তলা" অনূদিত হয়। Stuttgardএর অধ্যাপক Egnast Meyn কৃত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ অনুবাদ উৎকৃষ্ট বলিয়া গোল্ডষ্টুকার অভিমত প্রকাশ করে। বোধহয়, গোল্ডষ্টুকারের ঐ প্রকার গবেষণার পর, ম্যাক্সমূলার শকুন্তলা শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক এই দুই মনীষীর নিকট ভারতবর্ষ একান্তভাবে ঋণী।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ ও ভজনস্থলী সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট এক মহাপবিত্র তীর্থস্থান। শ্রীহরিদাস কি জাতি ছিলেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কেমন করিয়া এই মঠ উদ্ধার হইয়া বর্ত্তমান পরিচালনায় আসিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত যে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম।

শ্রীহরিদাস ব্রাহ্মণ কি যবন—এ লইয়া বহু তর্ক, আলোচনা—বহু প্রবন্ধে বহু গ্রন্থে হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি এখানে আর কোন আলোচনা করিতে চাহিনা। যে কুলেই তাঁর জন্ম হউক, শ্রীহরিদাস যে জাতই হউন—আমাদের নিকট তিনি পরম পূজনীয়, শ্রদ্ধেয়—কারণ তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু। তবে তাঁর জাত সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

> "হীন কুলে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
> হীন কার্য্যে রত মুই অধম পামর॥"

তাছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান, সকলকেই তিনি হরি ভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন—সেখানে হিন্দু, মুসলমান, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি কোন কিছুরই পার্থক্য ছিল না।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যখন বাংলাদেশে শ্রীনাম প্রেমের বন্যা বহে নাই তখন হইতেই শ্রীহরিদাস সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের নামরসাস্বাদনে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ১৪০৭ শকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এর অনেক পরে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পাষণ্ডী উদ্ধার লীলায় যখন বাংলায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি হরিনাম ও হরিভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে যবন হরিদাস পরে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"ভক্তদিগ্‌দর্শনী" নামক তালিকানুসারে ১৩৭১ শকে মার্গশীর্ষমা[illegible] যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার নিকটে "বূঢ়ন" গ্রামে শ্রীহরিদাস জ[illegible] গ্রহণ করেন। শ্রীহরিদাস কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, বিব[illegible] হইয়াছিল কিনা প্রভৃতি বাল্য ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রামাণ্য বিশেষ কে[illegible] খবরই জানা যায় নাই। তাহার পরের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা যা[illegible] সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীহরিদাসের ওপর দিয়া অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এমন কি তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টাও হইয়াছে, কিন্তু সম[illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্ত সাধক শ্রীহরিদাস তাঁহার সাধনার প[illegible] অগ্রসর হইয়াছেন।

রামচন্দ্রখান নামে একজন ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড শ্রীহরিদাসকে অপমানি[illegible] করিবার ও তাহার দুর্নাম রটাইবার জন্য এক বারাঙ্গনাকে নিযুক্ত করেন বারাঙ্গনা সাজসজ্জা করিয়া রাত্রিকালে শ্রীহরিদাসের ভজনাশ্রমে উপস্থি[illegible] হইয়া নানা প্রলোভন দেখাইয়া নানারূপ ভাবভঙ্গির দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

> "তোমায় করিব অঙ্গীকার।
> সংখ্যা নাম কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
> তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
> নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥"
>
> —শ্রী চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

পর পর তিনদিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর বারাঙ্গনার ম[illegible] পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং নিজের ঘৃণিত কাজের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল ও সমস্ত ঘটনা বলিয়া ক্ষমা চাহিল। অবশেষে শ্রীহরিদাসে[illegible]

আদেশ মত সেই বারাঙ্গনা নিজের ধন সম্পত্তি সমস্ত দান করিয়া দিয়া শ্রীহরিদাসের ভজনাশ্রমে বসিয়া নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তারপর শ্রীহরিদাস ভজনাশ্রম ত্যাগ করিয়া শান্তিপুর চলিয়া যান। পরে সেই বারাঙ্গনা পরম বৈষ্ণবী নামে খ্যাত হইলেন।

"বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
—শ্রী চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

শ্রীহরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে এক "গোফায়" বাস করিতে লাগিলেন। নামপ্রচারের জন্য সারাদিন হরিনাম করিয়া, ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহাতেই দিনাতিপাত করিতেন। শ্রীহরিদাস এইভাবে কিছুদিন গঙ্গা তীরে বাস করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীসীতানাথ ও শ্রীহরিদাসের আকুল প্রার্থনায় ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কেল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।"

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে অতঃপর শ্রীহরিদাস বসবাস করিতে লাগিলেন। "গ্রন্থ হইতে জানা যায় যবন হরিদাস, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হওয়ায় তাহাকে কাজির নিকট বহু লাঞ্ছনা, অপমান ভোগ করিতে হইয়াছে, নিদারুণ বেত্রাঘাতে সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি বাইসবাজারে কোড়া খাইয়াও শ্রীহরিদাস বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

কোড়া খাইয়াও প্রহারকারীদের প্রেম দান করিতে তিনি পশ্চাদপদ হন নাই। কুচক্রী কাজিদের হাত হইতে ভগবৎ কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীহরিদাস পুনরায় ফুলিয়ায় আসিয়া নাম সুরু করেন। ফুলিয়ায় শ্রীহরিদাসের আশ্রমে একটী মহানাগ সর্প থাকিত। সর্পের ভয়ে সকলেই ভয় পাইতে লাগিল এবং শ্রীহরিদাসকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। শ্রীহরিদাস সকলকে বলিলেন যে আগামীকাল হয় সর্প না হয় আমি এস্থান ত্যাগ করিব। পরদিন শ্রীহরিদাস সকলকে লইয়া নাম আরম্ভ করিলেন। একটু পরেই বৃহদাকার এক সর্প আশ্রম হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যেমন—

—"গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার পবেশে।
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥"

এইরূপ কত যে অলৌকিক ঘটনা শ্রীহরিদাসের জীবনে ঘটিয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তখনও শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীহরিদাস নামপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ফুলিয়া গ্রামে আজও শ্রীহরিদাসের সেই ভজনস্থলী প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছে।

শ্রীনাম প্রেম প্রচার কার্য্যে আদিসপ্তগ্রামে থাকাকালীন শ্রীহরিদাস বালক শ্রীরঘুনাথ দাসকে কৃপা করেন। পরে এই বালক রঘুনাথ শ্রীষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীদাসগোস্বামী নামে অভিহিত হন।

যখন শ্রীহরিদাস শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেইসময় শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া দিবারাত্র নাম-সংকীর্ত্তনে বিভোর হইয়াছেন এবং সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত শুনিয়া শ্রীহরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। নবদ্বীপ কীর্ত্তন আনন্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিল—

—"নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইল নিজবাস॥
শুনিল বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর।
ধাইয়া আইলা সব আনন্দ প্রচুর॥"

এইরূপে শ্রীহরিদাস শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত প্রায় সম্বৎসর কাল নবদ্বীপে বসবাস করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীগৌরচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যান। শ্রীহরিদাসও তাঁর অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া আচার্য্যপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা করেন। সেখানে যাইয়া তাঁহার দীনতা অত্যন্তরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের দৈন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীহরিদাসের জন্য শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট একটী টোটা ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিয়া সেখানে শ্রীহরিদাসকে থাকিতে আদেশ দেন। এই সময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রত্যহ প্রত্যূষে শ্রীজগন্নাথের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া শ্রীহরিদাসের নিকট আসিতেন। শ্রীহরিদাস প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে করিতেন। বাগানে কোন ভজনকুটীর না থাকায় তিনি রৌদ্র বৃষ্টিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথের দাঁতনকাটী আনিয়া পুঁতিয়া দেন। পরে সেই দাঁতনকাটী প্রকাণ্ড একটী বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। ইহাতে তাঁহার ক্লেশ নিবারণ হয়। অদ্যাপিও সেই বৃক্ষ সেই স্থানে বিদ্যমান আছে এবং সিদ্ধ বকুল নামে খ্যাত।

নীলাচলে বহু ঘটনার ভিতর দিয়া শ্রীহরিদাসের সময়ও দিন কাটিতে লাগিল। কেহ বলেন, সেই সময় হইতে নির্য্যান পর্য্যন্ত শ্রীহরিদাস নীলাচলেই ছিলেন। প্রত্যহ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রসাদ তিনি পাইতেন। এদিকে প্রভুর শ্রীগম্ভীরার মধ্যে বিরহ প্রলাপ ও দিব্য উন্মাদ অবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোবিন্দ প্রভুর প্রসাদ লইয়া যথারীতি শ্রীহরিদাসকে দিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, তিনি শয়ন করিয়া অতি ধীরে ধীরে নাম করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ পাইতে ডাকিলে তিনি জানাইলেন যে সেদিন লঙ্ঘন করিবেন। অতঃপর একরঞ্চ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার নিজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পরদিন শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের টোটায় আসিয়া কুশলাদি প্রশ্নের পর বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছ এখন সংখ্যা অল্প কর। তোমার সিদ্ধ দেহ, অতএব কঠোর সাধনে এত আগ্রহ কেন?

হরিদাস উত্তরে বলিলেন, "প্রভু আমায় অনেক কৃপা করিয়াছ, অনেক দয়া করিয়াছ, একটা নিবেদন যেন তোমার লীলা সংবরণের

আগে আমি এই দেহ ত্যাগ করিতে পারি। কারণ আমি জানিয়াছি তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমার যতেক সুখ সব তোমা লইয়া।
তোমার উচিত নহি যাবে আমারে ছাড়িয়া॥"

ইহাতে শ্রীহরিদাস অত্যন্ত কাকুতি করিয়া প্রভুকে জানাইলেন—

—"মোর শিরমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটীভক্ত হয়॥
আমাসম যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মরিলে জগতের কৈছে হানি হইল?"

তখন প্রভু শ্রীহরিদাসকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু নিরস্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন—"হরিদাস তুমি যাহা চাহিবে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ সে প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।"

তারপর ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে নীলাচলে (পুরীধামে) সেই বকুলতলায় শ্রীহরিদাস ভীষ্মের ন্যায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। শ্রীহরিদাসের এই নির্য্যান জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্রীহরিদাস যেভাবে চাহিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবেই তাঁহার লীলা সংবরণ হইয়াছিল—

—"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তকভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্য্যাণ' সবার হইল স্মরণ॥"

—শ্রী, চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমানন্দে শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত তনু অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক ভজনকুটীরের অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ মহাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অতঃপর শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত তনু বিমানে করিয়া সমুদ্র তীরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রভু সহস্তে তাঁহাকে সমুদ্রে স্নান করাইলেন, বালুখনন করিয়া গর্ত্ত করিয়া সমাধি দিলেন এবং সমাধির উপর বালুকার পিণ্ড বাঁধাইলেন এবং নিজে সিংহদ্বারে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়া শ্রীহরিদাসের মহা মহোৎসব করিলেন। নীলাচলে (পুরীতে) আজও হরিদাসের সমাধি প্রভৃতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠের সেবা লইয়া পরে নানারূপ মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হইয়া অনেকের হাত পরিবর্ত্তন হইয়া অবশেষে বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমৎরামদাসবাবাজী মহাশয়ের হাতে আসিয়া সেবার ভার পড়ে। কি ভাবে তাঁহার হাতে আসিল সেই কাহিনী বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

...অনেকদিন আগের কথা। পুরীর বড়বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস রথের সময় সেবার পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী শ্রীগোপাললাল শীলের স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী দাসীও রথে সেবার পুরী গিয়াছেন। বড় বাবাজী মহারাজ পুরীতে আছেন জানিয়া শীলগিন্নি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। দুই এক কথার পর বড় বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন।"

এসব ঘটনার পরেও কিছুদিন কেটে গেল। তার অনেকদিন পরের কথা—তখন শ্রীহরিদাসের পুরীর মঠের সেবা লইয়া নানা গণ্ডগোল চলিতেছে। সেই সময়কার সেবাইত টাকার বিনিময়ে জনৈক মুসলমানের হাতে সেই মঠ দেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মহাপবিত্র তীর্থস্থান ব্যক্তিবিশেষের হাতে যাইলে ভীষণ অসুবিধা হইবে এবং বৈষ্ণবগণ এক অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন ভাবিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী এই মঠের সেবার ভার গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সেবাইত টাকা ছাড়া কিছুতেই মঠের অধিকার দিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু টাকা কোথায়—টাকার চেষ্টায় শ্রীমদ বাবাজী পাগলের মত ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন। টাকার যোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন হতাশ হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় কলিকাতার শীলগিন্নি শ্রীমতী কুমুদিনীদাসী তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শ্রীমদবাবাজী মহারাজ সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অন্দর বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং দাদা বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

অপরিচিতা ধনীর কুলবধূর এইরূপ আচরণে বাবাজী মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। পরে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠিলেন।

বাবাজী মহাশয়কে শীলগিন্নি বলিলেন যে বড় বাবাজী মহারাজ স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন—পুরীর শ্রীহরিদাসের মঠ রক্ষার জন্যে রাম চেষ্টা করছে তুমি তোমার রামদাকে ডেকে মঠ রক্ষার ব্যবস্থা কর। স্বপ্নে এই আদেশ পেয়ে অবধি আপনাকে খুঁজছি—আজ আপনাকে পেয়েছি। কত টাকা লাগবে বলুন আমি দিচ্ছি। যেমন করেই হউক মঠ রক্ষা করিতেই হবে। তবে এখানে হবে না, রথের সময় পুরী গিয়ে এই কাজ শেষ করতে হবে।

তারপর রথের সময় শিলগিন্নী পুরীতে গেলেন। বাড়ীর সকলকে রথ দেখতে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমদ রামদাস বাবাজীকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিন হাজার টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, দাদা, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের ব্যবস্থা করুন।

এইভাবে শ্রীমদ রামদাসবাবাজী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পুরীর মঠ উদ্ধারও রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই অবধি সেই মঠের সেবা তিনিই চালাইয়া আসিয়াছেন। তিনি চেষ্টা না করিলে হয়ত এই মঠ অন্য কাহারও হস্তে চলিয়া যাইত এবং চিরতরে আমরা হয়ত এই পবিত্র তীর্থস্থান হইতে বঞ্চিত থাকতাম। কাজেই শ্রীহরিদাসের মঠের সহিত শ্রীমদ্ রামদাসবাবাজী মহারাজের নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তাই শ্রীহরিদাসের মঠের কথা উঠিলেই তাঁর কথা স্মরণ হয়।

শ্রীমদ্‌বাবাজী মহারাজের নিকট হইতেই একদিন এই সব ঘটনার কথা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, নচেৎ হয়ত কোনদিনই কেউ এসব জানতে পারতেন না।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট ফুলিয়ায় শ্রীহরিদাসের ভজনস্থলী, পুরীতে সিদ্ধবকুল, শ্রীহরিদাসের সমাধি প্রভৃতি মহাপবিত্র তীর্থস্থান এবং আজও যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে ও সেবা চলিয়া আসিতেছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনগর থেকে ৭৪ মাইল দূরে দুর্গম পাহাড়ের কোলে সারদা দেবীর মন্দির ও সারদা গ্রাম। সোপুর থেকে বাসে হান্দোয়ারা দিয়ে বা সোজা 'ট্রেগাম' গিয়ে সেখান থেকে (৩০ মাইল) হেঁটে ২½ মাইল দূর লোদ্রোয়াণা যেতে হয়। লোদ্রোয়াণা থেকে ঘোড়া, কুলী বা ডাণ্ডী, খাণ্ডীর ব্যবস্থা কোরে পাহাড়ী রাস্তা চড়াই কোরে উধনিয়াল হোয়ে সারদা যেতে হয়। ১৯৩০ সালে আমি এখানে গিয়েছিলাম, এবার সোপুর গিয়ে শুনলাম—সারদা পোড়েছে পাকিস্থানের কবলে ; সেখানের কোন খবর এখানে আর আসে

শীতের গুলমার্গে স্কী খেলা

না। সেখানের পণ্ডিতরা বেঁচে কেউ নেই বোলেই এ ধারের লোকের বিশ্বাস—এ অঞ্চলের কেউ আর পাকিস্থানের এলাকায় যাবার সাহস রাখে না। সেদিন ও যা ছিল এক, আজ তা সম্পূর্ণ পৃথক, পরস্পরের মহাশত্রু। সারদায় একটা জনশ্রুতি ১৯৩০ সালে শুনেছিলাম, হয়ত এখন যেতে পারলেও শোনা যেত।

কাশ্মীরের মধ্যে সারদা তীর্থ একটী মহাপীঠ ; এই পীঠস্থানের পণ্ডিতদের পরাজিত কোরে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরে স্বমত প্রতিষ্ঠা কোরতে সক্ষম হন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য যখন সারদা দেবীর মন্দিরে ঢুকতে যান, তখন দেবী তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে নিষেধ করেন কারণ তিনি অপবিত্র। সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে যখন শ্রীশঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র শেখার উদ্দেশ্যে এক মৃত মহারাজার দেহের মধ্যে নিজের আত্মা সঞ্চালিত কোরে সেই দেহের মধ্য দিয়ে পার্থিব ভোগ ও নারীসঙ্গ করেন তখন তাঁর আত্মা অপবিত্র হোয়েছিল ; অতএব তিনি মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নন ; এই ছিল দেবীর বক্তব্য। আত্মা অপবিত্র হয় কিনা, আত্মা ভোগ করে কিনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যাখ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনদিন ক্রমাগত বিচার চলে এবং শেষে দেবী সারদা শঙ্করাচার্য্যের কাছে পরাজিত হোয়ে তাঁকে

লিদর উপত্যকা

মন্দির প্রবেশে ও পূজায় অনুমতি দেন। এই থেকেই বোঝা যাবে শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদের কি উচ্চ ধারণা ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের এই মন্দিরে শিব মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং পরে তাঁর নামানুসারে এই পাহাড় ও শিবের নাম হয় শঙ্করাচার্য্য বা শঙ্করাচারিয়া।

এই মন্দির কিন্তু প্রথম তৈরী হয় প্রায় ২৪০০ বছর পূর্ব্বে খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতকে রাজা গোপাদিত্যের আমলে। (খৃঃপূঃ, ৩৬৮-৩০০) তার নামানুসারেই বোধ হয় এই পর্ব্বতের তৎকালীন নাম ছিল গোপালাদ্রি

বা "গোপা পর্ব্বত"। তিনি এখানে জ্যেষ্ঠেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তারপর খৃঃ পূঃ ২০০ শতকে মহারাজ অশোকের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-সম্রাট জালুকা বৌদ্ধ-বিহার হিসাবে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান। বৌদ্ধ স্তুপের স্থাপত্য কৌশলে এই আটকোনা মন্দির নির্ম্মিত হয়। শঙ্করাচার্য্য এখানে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কোরে শৈবমত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তখন থেকে এই পাহাড় ও মন্দিরের দেবতার নাম-করণ তাঁর নামেই হয়। তার পর মুসলমান আমলে এখানের মূর্ত্তি খণ্ডিত হয়। পূর্ব্বের মূর্ত্তির মাত্র পায়ের সামান্য অংশ এখনও বেদীতে রাখা আছে, বাকী অংশ বোধ হয় বিগ্রহ-দ্বেষী মুসলমান আমলে ধূলিতে বিলীন হোয়েছে। বর্ত্তমানে মন্দিরের অধিষ্ঠিত বিরাট বাণ-লিঙ্গ শিব মহারাজা প্রতাপ সিংহের প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৫।৬ ফিট লম্বা এতবড় বাণলিঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে। পূজার জল নীচে থেকেই আসে, কারণ ত্রিভুজাকৃতি এই পাহাড়টীর মাথায় কোন জলাধার বা ঝর্ণা নাই, পূজারী সন্ধ্যার আরতি শেষে নীচে নেমে যায়, রাত্রে কেউ এ জায়গায় থাকে না। মন্দিরের বিরাট পাথরের খণ্ডগুলি

তুষারমণ্ডিত গুলমার্গ

অতীতকালে কি ভাবে এই পাহাড়ের মাথায় তোলা হোয়েছিল ভাবলে মনে বিস্ময় জাগে। মন্দির থেকে নামতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। ফেরার পথে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে গিয়ে আমায় বেশ নাকাল হোতে হোয়েছিল। একটী প্রকাণ্ড পাথর পাকদণ্ডীর সঙ্কীর্ণ পথ আগলে দাঁড়িয়ে, তার গায়ে শুধু মাত্র একটা পা রাখার মত খাঁজ কাটা, পাথরটাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে একটা পা খাঁজে রেখে, অন্য পা সামনের প্রশস্ততর পথে দিয়ে পার হোতে হয়, যদিও এখন এ রাস্তাটার রেখা রোয়েছে, তবু মনে হোল বর্ত্তমানে এটা পরিত্যক্ত। অনেকখানি নেমে এসে সেই পাথরের বাধা দেখে আবার ফিরে চড়াই কোরে চওড়া রাস্তা ধোরতে মন চাইল না। আমার স্ত্রীর পায়ে শ্লিপার ছিল; সে দুটো খুলে ছুঁড়ে পাথরের ওধারে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে তিনি ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেলেন। আমার পায়ে ছিল মোটা চামড়ার 'সু' ও মোজা। জুতো খোলার হাঙ্গামা না কোরে আমি সেই পাথরের খাঁজে জুতো সমেত পা দিয়ে পার হোতে গেলাম, শক্ত পাথরে শক্ত জুতো গেল পিছলে; পায়ের তলায় প্রায় এক দেড়শ ফিট নীচে আর একটা রাস্তা। পোড়লে অতল গহ্বরে নিশ্চিহ্ন না হোক, হাড়গোড় চূর্ণ হবার পক্ষে তা যথেষ্ট, কাজেই প্রাণ ভয়ে সেই পাথর আঁকড়ে ধরে অতি-কষ্টে আবার সজুতো পাকে পুনস্থাপন কোরে একটা ফাঁড়ার হাত থেকে সেদিন বাঁচলাম, সহরের বুকের আর একটী পবিত্র পাহাড় হরিপর্ব্বত। উচ্চতায় এটী শঙ্করাচারিয়ার চেয়ে কম, কিন্তু ইতিহাস এরও কম নয়, এর উচ্চতা ৫০০ ফিট, একাধারে সহর, অন্য ধারে ডাল হ্রদ। এইটাই পৌরাণিক কাহিনীর জলোদ্ভব দৈত্যকে বধের জন্য সারিকা রূপিণী পার্ব্বতী প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড। আজও এর ওপর সারিকা ভগবতীর মন্দির আছে। সম্রাট আকবর চাক বংশের শেষ সুলতান ইয়াকুবখানের কাছ থেকে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর জয় কোরে নেন এবং এই পাহাড়ের ঢালু গায়ের ওপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। আজও সে দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাহাড়টীর উত্তর ও পশ্চিমে দেখা যায়। দুর্গের মধ্যে একটী আখরোট বাগান, শুকনো জলাধার এবং বন্দীশালা আছে। এই বন্দী-শালায় কাশ্মীরের সেদিনের ভাগ্যনিয়ন্তা সের-ই-কাশ্মীর সেখ আবদুল্লা মহারাজের আমলে বন্দী-জীবন যাপন করেন। মহারাজা শ্রীনগরে এলে
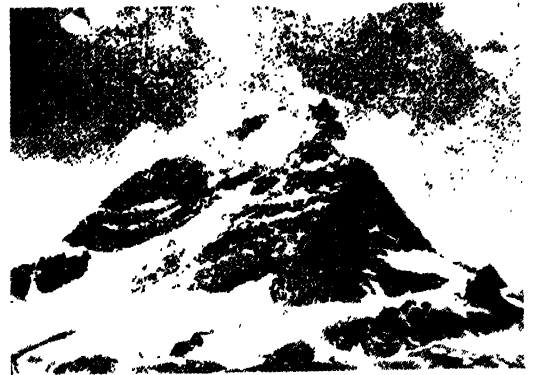
কোলাই পর্বতশৃঙ্গ

এই দুর্গ থেকে তোপধ্বনি কোরে তা জানান হোত। শুধু রামনবমী ও মহানবমীর দিন (দুর্গা পূজার) এর দ্বার সকলের জন্য মুক্ত, এর মধ্যে যেতে হলে ভিজিটারিষ্ট ব্যুরো থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়। পাহাড়টী দুটী স্তরে বিভক্ত, উত্তরে দুর্গ এবং পশ্চিম স্তরে সারিকা ভগবতীর মন্দির। কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য বিবর্ত্তনের সঙ্গে এই পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে গড়ে উঠেছে মুসলমানের মসজিদ মকদুমসা এবং বিখ্যাত ফকির আখুনমুল্লা সা'র বা শেখ মদিন সাহেবের কবর; পূর্ব্ব গায়ে দুর্গের কাঠি দরজার কাছে শিখদের গুরুদ্বার—অর্জ্জুনদেবের স্মৃতিপূত মন্দির ছাটি পাদসাহী।

হিন্দুদের বিশ্বাস দেবী ভগবতীর সঙ্গে সব দেবতাই এই পর্ব্বতে বাস করেন, তাই অনেক ভক্ত সমস্ত পাহাড়টী পরিক্রমা করেন। হরিপর্ব্বতের গায়ে শুধু হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের ধর্ম্মের ইতিহাসই নাই —এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি কি ভাবে মিশে গেছে মন্দির ও মসজিদের স্থাপত্য কলার কৌশলে তা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের মসজিদে বা ইসলামী স্থাপত্যে যে মুসলমানী মিনারের বাহুল্য

দেখা যায়, এখানের স্থাপত্য তার চিহ্ন নাই। হিন্দু মন্দিরের চারকোনা মন্দির ভিত্তির অনুকরণে এবং সেই ঢঙেই গড়ে উঠেছে এখানের অধিকাংশ মুসলমানী মসজিদ ও কবর। এর আর একটা কারণ বোধ হয় এই কাশ্মীরের প্রাচীন মুসলমানী কীর্ত্তির আরও যা ছড়িয়ে আছে, তা সমদর্শী সুলতান জৈন-উল-আবদীনের আমলের অথবা মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের সময়কার, মুসলমান সংস্কৃতির উগ্রতার চেয়ে সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য, এঁদের কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল—তাই হিন্দু স্থাপত্যের কারুকলা ও কৌশল মসজিদে সমাধিতে এঁরা প্রয়োগ কোরতে দ্বিধা করেন নি। তা ছাড়া সহস্রাধিক বৎসর ধোরে হিন্দু সংস্কৃতি ও আদর্শের মধ্যে বাস করার ফলে এ দেশীয় কারিগর বা পরিকল্পনাবিদদের পক্ষে পরবর্ত্তীকালেও হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব এড়ান সম্ভব হয় নাই। শুধু হরিপর্ব্বতেই নয় কাশ্মীরের বিখ্যাত মসজিদ "শা হামদান" এবং জুম্মা মসজিদেও এই হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ আলি হামদানী বা "শা হামদান" একজন উদারমতাবলম্বী ফকির। তৈমুরলঙ্গের

গুলমার্গের গলফ্ ময়দান

অত্যাচারের ভয়ে মধ্য-এশিয়া থেকে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে পালিয়ে তিনি কাশ্মীরে আসেন। গুণগ্রাহী সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁকে সমাদরে স্থান দেন এবং এই ফকিরের স্মৃতি সৌধ হিসাবে সম্পূর্ণভাবে কাঠের তৈরী এই চতুষ্কোণ মসজিদটী বিতস্তার তীরে তিনিই নির্ম্মাণ করান। কেউ কেউ বলেন ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে তৈরী, সেক্ষেত্রে সা হামদান নিশ্চয় ১৩৮০ খৃঃ অব্দের আগে এখানে আসেন। এই মসজিদে বিতস্তা থেকে উঠতে জলের ওপরেই মসজিদের ভিত্তির গায়ে আছেন "মহাকালী"। আজও হিন্দুরা সিন্দুর-লেপিত এই মহাকালী মূর্ত্তির পূজা করেন। পূর্ব্বে এই মসজিদের স্থানে ছিল কালীশ্বরীর মন্দির, কোন সুলতান এটা ভেঙ্গে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন কোরেছেন তা সঠিক জানতে পারি নাই। এখনও এই মসজিদের প্রাঙ্গণের মধ্যে কালীর নামে ঝরণা আছে। এজন্য হিন্দুরা আজও মসজিদের ভেতরে এই ঝরণায় যায়, মসজিদের ভিতর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির ভাঙ্গা টুকরো দেখা যায়। ইন—উল—আবদীন পরে এই মসজিদ সংস্কার ও কিছু অংশ সংযোজন করেন। সা হামদানের কথা মনে হোলেই মনে পড়ে তাঁর সমসাময়িক হিন্দু সন্ন্যাসিনী লালেশ্বরীকে। ১৩৬০ কি ১৩৭০ খৃঃ অব্দে এই যোগিনী জন্মগ্রহণ করেন কাশ্মীরের এক সমৃদ্ধ সংসারে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অনাসক্ত সন্ন্যাসিনী। সংসারের মায়ায় বাঁধতে বাপ, মা বিবাহ দেন, কিন্তু এমন উদাসিনী দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্ভব নয়। শ্বশুর, শাশুড়ী এমন কি স্বামীও এই পূজার্চ্চনাপরায়ণা উন্মাদ সন্ন্যাসিনীর উপর বিরক্ত হোয়ে তাকে সংসার ধর্ম্মে সচেতন করবার জন্যে মারধোরও আরম্ভ কোরলেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে একদিন লালেশ্বরী গৃহত্যাগ কোরলেন এবং কাশ্মীরের পাহাড়ে প্রান্তরে গ্রামে সহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আরাধ্য দেবতার অনুসন্ধানে। শেষে শৈবযোগী সিদ্ধবের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। লালেশ্বরী শুধু যোগিনী ছিলেন না, তিনি ছিলেন
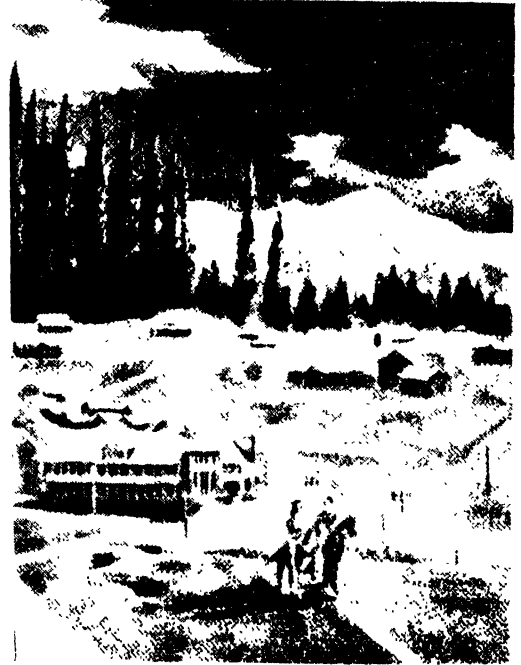
শীতের গুলমার্গ

সিদ্ধ কবি, ধর্ম্ম ও যোগের মূল তথ্যগুলি তিনি সহজ ভাষায়, গ্রাম্য উপমায় সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন, যা আজও কাশ্মীরের লোকসঙ্গীতের একটা প্রধান অংশ। যোগের পথে তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান কোরে "পরমশিব"কে পাবার উপায় বোলে গেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও গানে। হিন্দু ধর্ম্মের এই উদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তিনি তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমান সকলের হৃদয় জয় কোরে ছিলেন, সা হামদানের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তার শ্রদ্ধা ছিল। কাশ্মীরবাসী এই ভ্রাম্যমান যোগিনীকে আদর কোরে নাম দিয়েছিল "লালদেব" জ্ঞানী লালা অথবা লালা অরিকা।

জুম্মা মসজিদের ভিত্তি যদিও মহা-হিন্দু-দ্বেষী সুলতান সিকান্দার

১৩৯৮ সালে স্থাপন করেন, এই বিরাট মসজিদ শেষ করেন জৈন-উল আবেদীন ১৫০৪ সালে। এই মসজিদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সুলতান আবেদীন যথেষ্ট সম্পত্তিও দান করেন, জুম্মা মসজিদের চারিধারে দেওয়ালের মাঝে মাঝে মিনার থাকলেও, এর চতুষ্কোণ আকার, থাম, কড়ি ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। জুম্মা মসজিদ ও এখানের অন্যতম দ্রষ্টব্য—কাশ্মীরের বৃহত্তম মসজিদ হিসাবে। কয়েকবারই প্রকৃতিক বিপর্য্যয়ে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। কিছুদিন আগেও শুনলাম প্রায় ৯ লক্ষ টাকা লেগেছে শুধু এর সংস্কারে। কাশ্মীরে সেখ আব্দুল্লার পরিচালিত গণআন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জুম্মা মসজিদের স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত।

গোলাপ বাগ

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এবারকার প্রাদেশিক সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য—পুরাণ প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান নগরীতে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। বর্দ্ধমান শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নয়—পুরাণের অতি প্রাচীন কাহিনীর মধ্যেও রহিয়াছে বর্দ্ধমানের কথা। এ সকল কথার বহুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা। সম্প্রতি কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা কংগ্রেস কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাঢ়ের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এক সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাধা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের যে ইতিহাস ছিল সুপ্ত-মগ্ন, শ্রীদেবশর্ম্মার লেখনীতে তাহাই মূর্ত্ত ও সজীব হইয়া প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বিগত স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে। বিস্মৃত স্মৃতি চিত্তপটে জাগিয়া উঠিয়াছে অতীতকে মুখর করিয়া! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কংগ্রেস ছিল রাষ্ট্রাধীনতা হইতে মুক্ত হইবার অগ্রসাধক। ঘটনা চক্রের পরিবর্ত্তনে রাষ্ট্রক্ষমতাসম্পন্ন কংগ্রেসের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিহাসের নজীর বলিয়া থাকে—ইহাই চলমান বিশ্বের নিয়ম নীতি।

দামোদরপ্লাবিত পৌরাণিক সুক্ষ ভূমিতে, জৈনতীর্থ বর্দ্ধমানে, বৌদ্ধবাদ অধ্যুষিত লাঢ় খণ্ডে, তন্ত্র ও বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মে অবগাহিত রাঢ়বঙ্গে কংগ্রেস অধিবেশন বেশ কতকটা গুরুত্বের ইঙ্গিত দিয়াছে। তাহা হইতেছে—ভাষা ও বৃহত্তম বঙ্গের বাসভূমি-সমস্যার আলোচনা।

সাহিত্যের পীঠ-স্থান রাঢ়বঙ্গ। নবযুগের জাগৃতি মন্ত্রের উদ্গাতা এই বর্দ্ধমান। ইহার প্রতি ধূলিকণায়, মৃত্তিকা জঠরে রহিয়াছে বহুবিস্মৃত ইতিহাসের কথা কাহিনী। বলিতেছিলাম গোলাপ বাগের কথা। মফঃস্বল বাংলায় গোলাপ বাগের মত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, এমন রম্যোদ্যান ছিল না বলিলেই চলে। গোলাপ বাগিচা হইতে উদ্যানটির নামকরণ হইয়াছে। উদ্যানে শুধু পুষ্পের সমারোহই ছিল না—ইহার অন্যতম দ্রষ্টব্য ছিল চিড়িয়াখানা। বহু জীবজন্তু, পশুপক্ষী, সরীসৃপ গোলাপী-বাগিচার শোভা সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

গোলাপ-বাগ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোদাপল্লীর পার্শ্বে অবস্থিত। মধ্যযুগের প্রাক্কালে ও মধ্যযুগে ঐ অঞ্চল মুসলমান অধিকারে ছিল। পাঠানগণ গোদার হিন্দুরাজাকে পরাজিত করিয়া গোদা অধিকার করে। অতঃপর ঐ পল্লী বর্দ্ধমান রাজের অধিকারভুক্ত হয়।

গোলাপ বাগকে পুষ্প সৌন্দর্য্যে যে রমণীয় রূপে রূপায়িত করিয়াছিল তাহার নাম রামদাস। রামদাস রাজা রামমোহনের বাগানের সাধের মালি ছিল। এই রামদাসের সুনিপুণতায় শান্তিনিকেতনের পুষ্পবাগিচা সৃষ্টি হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামদাসকে শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত করেন। পরে বর্দ্ধমান-রাজের বিশেষ অনুরোধে রামদাস গোলাপ-বাগের কার্য্যভার গ্রহণ করে। গোলাপবাগ ও দিলখুসার দিলখুসী করা বাগিচার স্রষ্টা এই রামদাস। রামদাসের হাতে গড়া কৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অমরার কাননে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল।

ক্ষীয়মান বর্দ্ধমান রাজবংশের মধ্যে মহতাব চন্দ ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সৌন্দর্য্য নগরী বর্দ্ধমান গড়িয়া উঠে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মহতাব চন্দ স্বহস্তে রাজকার্য্য গ্রহণ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তখন গভর্ণর জেনারেল। এই সময়েই ইতিহাসখ্যাত জাল প্রতাপ চন্দের ঘটনা সংঘটিত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ এই কালের কথা। সিপাহী বিদ্রোহও ইহার কয়েকবৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

বর্দ্ধমান রাজবাটী, দারুল বাহার (দিলখোসা—গোলাপবাগ), মহাতাবচন্দের অমর কীর্ত্তি। পশ্চিম বাংলার বৃহৎ পুষ্করিণী কৃষ্ণসাগর, রাণীসাগর ও শ্যামসাগরের খনন কার্য্য মহাতাবচন্দের উৎসাহেই সম্পন্ন হয়। বনবীথিকা, সুপ্রশস্ত রাজপথ, বালিকা-বিদ্যালয় মহাতাবচন্দের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিদর্শন। চারিদিকে দীর্ঘ পরিখাবেষ্টিত দিলখুসাবাগ ভারতীয় সৌন্দর্য্য সাধনার এক গরীয়ান কীর্ত্তি। পশুশালাও মনোহর উদ্যান এবং মিউজিয়ম গোলাপবাগের গৌরবকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বর্দ্ধমান রাজের পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি গোলাপবাগেও রাজপ্রাসাদে প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আজ গোলাপবাগ সরকারের তত্ত্বাবধানে। দশবৎসর পূর্ব্বে সহরের পশ্চিম প্রান্তে—যে রমণীয় উদ্যান নাগরিক জীবনের একটানা-ক্লান্তি অপনোদন করিত, আজ সেখানে ভগ্ন-স্তূপের শ্মশান শয্যা রচিত হইয়াছে। যে স্থান ও যে বংশ ইতিহাসের সুপ্রাচীন ধারাকে বক্ষেধারণ করিয়াছিল গৃহদেবতার ন্যায়, কীর্ত্তির সেই স্মৃতি কাল তরঙ্গে জলবুদবুদের মত মিলাইয়া গেল—আর ঐশ্বর্য্য ও ইতিহাসের শ্মশান-বক্ষে হইয়া গেল ঐতিহ্যময় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন।

সুন্দরের রূপ

শ্রীমদন ঘোষ

সুন্দরের রূপ কি রকম জান? কোন্ বেশে সুন্দর এসে ধরা দেয় বলতে পার কেউ?

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। থোপা থোপা কালো মেঘ ঢেকে ফেলেছে সারা আকাশটাকে গাঢ় অন্ধকারের চাদরে, বিদ্যুৎ ছিনিমিনি খেলে যাচ্ছে এপার ওপার। বৃষ্টি এল বলে। ঝড় উঠেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ধূলো বালি উড়িয়ে। নীড়হারা কাক চিল মহা আতঙ্কে ভিড় জমিয়েছে ন্যাড়া তালগাছটার মাথার অনেকখানি ওপরে।

পাশের বাড়ির জটি বুড়ি আমসত্ত্ব আর আচার সামলাতে ব্যস্ত। বিন্দে পিসী বেরিয়েছে গরু খুঁজতে আকুল হয়ে। দুদ্দাড় আওয়াজ তুলে জানালা কপাট পড়ছে। বিশৃঙ্খলা অট্টহাসি হাসছে হোঃ হোঃ হোঃ।...

সুন্দরের দামাল মূর্ত্তি দেখেছ কি?

তামাটে আকাশে রোদ উঠেছে। আগুন ছুটে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। তিন্ তিন্ বাতাস কাঁপছে মাটির কাছাকাছি। জলের চিহ্ন নেই একফোঁটা কোথাও। খাল বিল আশ্রয় নিচ্ছে বাতাসে। রাস্তার পিচ পচে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত পথিক ধুঁকছে পথের শ্রমে। কাক-পক্ষী নিরুদ্দেশ কোথায় কে জানে। তৃষ্ণার্ত্ত চিলের কাতর ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছে দূর বাতাস থেকে। রুদ্র বৈশাখের বাতাস বইছে সর্ব্বাঙ্গ ঝলসে দিয়ে।...

দেখেছ কি সুন্দরের রুদ্র রূপ?

নীল জল মিতালি পাতিয়েছে ঢালু আকাশটার সঙ্গে। একটা স্পষ্ট নীল রেখায় তারা হয়েছে আলিঙ্গনাবদ্ধ। সেখানে ঢেউ নেই, রোষ নেই, 'ক্ষোভ নেই, ক্রোধ নেই,— শান্তি, পরম শান্তি বিরাজ করছে অখণ্ড সত্তা নিয়ে। এপারে চলেছে ঢেউয়ের মাতামাতি। দাপাদাপি করতে করতে জল ছুটে আসছে মাথায় শ্বেত উষ্ণীষ চাপিয়ে; ভেঙ্গে পড়ছে তীরে এসে খান খান শত টুকরোয়, পাতলা এক পরদা জল বিছিয়ে দিচ্ছে বালুকা বেলায়। ছোট ছোট ফাঁকগুলোতে বুদ্‌বুদ্ উঠছে বুদ্ বুদ্ বুদ্।

এলোমেলো বাতাসে সাগর হয়ে উঠেছে তরঙ্গ ক্ষুব্ধ। ওপারের নীল রেখাটা মুখ লুকিয়েছে সাদা কুয়াশার আড়ালে। রুদ্ধ আক্রোশে ঢেউগুলি ফুলে ফুলে উঠছে। আঘাত হানছে বার বার কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে। টলমল টলমল করছে সারা সাগরের জল। উপছে পড়ে ধরিত্রী ভাসিয়ে নিয়ে গেল বলে। মানুষের বুকে জাগছে ত্রাস। রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রার্থনা জানাচ্ছে মহাশক্তির কাছে।...

দেখেছ কি সুন্দরের ভৈরব রূপ?

পাহাড়ের চূড়াগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে দূর চক্রবালে। কোথায় কোন্ দেশে কে জানে। ঢেউয়ের পর ঢেউ, আবার ঢেউ। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। সারি সারি সুশৃঙ্খলভাবে চলে গেছে বরাবর দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে। মেঘ জমেছে কোন কোনটার মাথায় পুঞ্জে পুঞ্জে। নিরলস মেঘ কোথাও আটকে আছে হাল্‌কা বাতাসে। নীল কুয়াশা পাতলা জাল বিছিয়ে রেখেছে সামনে, পিছনে, এপাশে, ওপাশে। পাহাড়ের গা বেয়ে জলের পথ নেমে গেছে সবুজিমার বুক চিরে। লাফিয়ে পড়েছে নীচের উপত্যকায়। উচ্ছল নদী বয়ে চলেছে উপর থেকে নীচে লাফিয়ে, ছুটে দুকূল মন্ত্রমুগ্ধ করে।

সবুজিমা ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের আপাদচূড়া। ছোট বড় শালের বন আর পাইন এনে দিয়েছে বনশ্রী। কলরব নেই কোথাও একটুও।...

দেখেছ কি সুন্দরের শান্ত, সমাহিত রূপ?

নির্মেঘ আকাশে খেলে বেড়াচ্ছে রোদের সতেজ কিরণ। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ, মনোরম। পাখীরা কলরব করছে অশ্রান্ত। ফুল ফুটেছে অকৃপণভাবে অজস্র। বাতাস সুগন্ধি। রাতে চাঁদের আলো মিষ্টি।

মানুষের মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে। হাসি হাসছে তারা সারা অন্তর দিয়ে। বসন্ত এসেছে।..

দেখেছ কি সুন্দরের উচ্ছল রূপ?

নাট্যকার শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কলকাতায় বৌবাজারে "আনন্দ-পরিষদ" নামে তখন একটা নামকরা সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় ছিল। এঁরা সেই সময় শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, দেবদাস, পণ্ডিত মশাই প্রভৃতি উপন্যাসগুলিকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করেছিলেন, আর অভিনয়ের দিক থেকেও এঁরা যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এইভাবে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসকে মঞ্চস্থ করে "আনন্দ-পরিষদ"ই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে দেখিয়ে দেন যে, শরৎ-সাহিত্যে কি পর্যাপ্ত পরিমাণে নাটকীয় উপাদান রয়েছে।

এই সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় "আনন্দ-পরিষদের" অভিনয়-সাফল্য দেখে কলকাতার পেশাদার রঙ্গালয়গুলিরও তখন এদিকে দৃষ্টি পড়ে। এঁদের মধ্যে "স্টার থিয়েটার"ই সবার আগে শরৎচন্দ্রের একখানি উপন্যাসকে মঞ্চস্থ করেন। সেই উপন্যাসখানি হ'ল বিরাজ-বৌ। তখন বিরাজ-বৌএর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "স্টার থিয়েটার" ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট তারিখে সর্বপ্রথম বিরাজ-বৌ অভিনয় করেছিলেন।

কি সৌখীন আর কি পেশাদার—উভয় নাট্যসম্প্রদায়ই এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলিকে অপরের দ্বারায় নাটক করিয়ে নিচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে পারেন, একথা কেউ তখনও চিন্তা করেন নি। এ সম্বন্ধে যিনি প্রথম চিন্তা করেছিলেন, তিনি হলেন বাঙ্গলা দেশের রঙ্গমঞ্চের অন্যতম সংস্কারক ও নবতম উচ্চাঙ্গ-অভিনয়-আদর্শের স্রষ্টা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরবাবুই প্রথম শরৎচন্দ্রকে তাঁর একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ করে দেবার কথা বলেন। শিশিরবাবুর আগ্রহে শরৎচন্দ্র তাঁর "দেনাপাওনা" উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্তরিত করে দেন। দেনাপাওনা নাটকে রূপান্তরিত হলে তখন এর নাম হয় "ষোড়শী"।

শিশিরবাবুর অধিনায়কত্বে তাঁর "নাট্যমন্দির" রঙ্গমঞ্চে ১৩৩৪ সালের ২১শে শ্রাবণ তারিখে প্রথম ষোড়শীর অভিনয় হয়। ষোড়শীর অভিনয় এত সাফল্যলাভ করেছিল যে, তখন একাদিক্রমে বহুরাত্রি ধরে এই ষোড়শীর অভিনয় চলেছিল। জীবানন্দের ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরবাবুর অভিনয় ছিল সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সু-অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র সেই সময় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে রস-সাহিত্যস্রষ্টা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"...শিশিরের অভিনয় দেখেছেন—কি চমৎকার করে!...বই যা হোক্। অভিনয় বড় ভালো হয়।" শ্রীরাধারাণী দেবীকেও ঐ সময় তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন—"বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।...অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে।...তারই বাহাদুরি।"

সত্যই শিশিরবাবুর যত্ন ও প্রচেষ্টায় এবং তাঁর অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার গুণেই ষোড়শী তখন এতখানি সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্টার থিয়েটার যখন বিরাজ-বৌ অভিনয় করেছিলেন, তখন তাঁরা তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই তাঁরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে আর নাটক করে অভিনয় করতে সাহস করেন নি। কিন্তু নাট্যমন্দিরে ষোড়শীর অভিনয়-সাফল্য দেখে তাঁরা শরৎচন্দ্রের আর একখানি উপন্যাসকে মঞ্চস্থ করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা এবার পল্লী-সমাজকে নাটক করে অভিনয় করলেন।

এই সময় আর্ট থিয়েটার লিমিটেড নামে কলকাতায় আর একটি নামকরা থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোগী ও ডিরেক্টর ছিলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু ও তাঁর পুস্তকের প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। আর্ট থিয়েটার শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ অভিনয় করবেন ঠিক হ'লে, শরৎচন্দ্র পল্লী-সমাজকে নাটক করে এই নাটকের নাম দেন "রমা"। ১৩৩৫ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে "রমা" সর্বপ্রথম আর্ট থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়।

এর কিছুদিন পরে শিশিরবাবু আবার তাঁর নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের রচিত এই রমা নাটকেরই অভিনয় করেছিলেন।

"দেনাপাওনা" ও "পল্লী-সমাজ" ছাড়া শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর আর একখানি মাত্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সে উপন্যাসটি হ'ল "দত্তা"। দত্তা নাটকে পরিণত হলে তখন নাটকটির নাম হয় "বিজয়া"। হরিদাসবাবু তাঁদের আর্ট থিয়েটারের জন্য শরৎচন্দ্রকে দিয়ে দত্তার নাট্যরূপ করিয়ে নিয়েছিলেন। দত্তার নাট্যরূপ দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্র হঠাৎ অসুখে পড়ে যান, তাই নাটক করে দিতে কিছুদিন দেরিও করেন। ফলে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে কিছুদিনের জন্য অভিনেতাদের বসিয়ে মাইনে পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই সব কথার উল্লেখ করে হরিদাসবাবুকে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—"গত বুধবার আমার জ্বর হয়, আজ আটদিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি। রোজ বেলা তিনটেয় আসে, যায় রাত্রি দশটায়। ডাক্তারদের বিশ্বাস লিভারঘটিত। সুতরাং আরও ক'দিন যে ভুগবো কোন নিশ্চয়তা নেই। ওঁরা আশা করেন আর ২।৩ দিন, কিন্তু আমার নিজের সে ভরসা নেই।

আপনি দত্তার অভিনয় সত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এতদিনে শেষাশেষি করে আনতাম।···

অথচ আপনাদের বিলম্ব হলে (অর্থাৎ বিজয়ার আশায়) বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্ছে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারি নে। অথচ সমস্ত বইটাই একরকম তৈরি করা আছে শুধু একটু অদল বদল বা অল্প-স্বল্প লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুলবো। কিছুদিন পূর্বে যদি এ মতলব করতেন, ভাবনাই ছিল না।"

স্টার থিয়েটার এই সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্ট থিয়েটার ঐ বাড়ী ১০ বছরের জন্য লীজ নিয়ে তাতে তাঁদের অভিনয় করে আসছিলেন। শরৎচন্দ্র বিজয়া নাটক করে দিতে দেরি করছেন, আর্ট থিয়েটার বিজয়া অভিনয়ের আশায় অভিনেতাদের বসিয়ে মাইনে পর্যন্ত দিচ্ছেন, এমন সময় আর্ট থিয়েটার স্টার থিয়েটারের যে বাড়ী লীজ নিয়েছিলেন, তাঁদের লীজ গেল ফুরিয়ে। লীজ শেষ হয়ে গেলে তাঁরা আবার নতুন করে লীজ নিতে গেলেন, কিন্তু আর লীজ পেলেন না। ফলে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক বিজয়া নাটকও আর অভিনয় হল না। তবে হরিদাসবাবু নিজেই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বিজয়ার অভিনয় সত্ব কিনে রেখে দিলেন।

আর্ট থিয়েটার স্টার থিয়েটারের ঐ বাড়ী আর লীজ না পেলে এবার শিশিরকুমার ভাদুড়ী ঐ বাড়ী লীজ নিলেন। শিশিরবাবু হরিদাসবাবুর কাছ থেকে বিজয়ার অভিনয় সত্ব নিয়ে এই মঞ্চেই তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক বিজয়া অভিনয় করেছিলেন। ১৩৪১ সালে ৬ই পৌষ শিশিরবাবুর সম্প্রদায় কর্তৃকই বিজয়া সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। শিশির-বাবু এই সময়েই শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ উপন্যাসকে নাটক করেও অভিনয় করেছিলেন।

এইভাবে শরৎচন্দ্র শিশিরবাবুর আগ্রহে তাঁর দেনাপাওনা এবং হরিদাসবাবুর আগ্রহে পল্লী-সমাজ ও দত্তা উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ ছাড়া অপর অনেকের দ্বারা তাঁর বহু গল্প-উপন্যাস নাট্যরূপ পেয়ে অভিনীত হলেও, তিনি নিজে তাঁর আর কোনও উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন নি।

শরৎচন্দ্র তাঁর তিনখানি উপন্যাসকে মাত্র নাটক করলেও তিনি পৃথকভাবে কোন নাটক লেখেন নি। অথচ ছেলেবেলা থেকেই নাটক রচনার দিকে না হলেও অভিনয়ের দিকে শরৎচন্দ্রের একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি যখন যুবক ছিলেন, তখন একজন ভাল অভিনেতা হিসাবে তিনি ভাগলপুরে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। আর শুধু অভিনেতাই নয়, সেই সময় তিনি একটা থিয়েটারের দলের শিক্ষক এবং প্রযোজকও ছিলেন। তাই অভিনয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নিজেরই একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমতঃ অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তার উপর তাঁর মতন অসাধারণ প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক যদি নাটক রচনায় হাত দিতেন, তাহলে তাঁর হাত থেকে ভাল নাটকই বেরুত ব'লে আশা করা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া ছাড়া (তাও অপরের আগ্রহে) আর কোনও নাটকই রচনা করলেন না। শরৎচন্দ্র কেন যে নাটক রচনায় হাত দেন নি, এ সম্বন্ধে নাচঘর-সম্পাদক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলে, তার উত্তরে শরৎচন্দ্র পশুপতিবাবুকে লিখেছিলেন—

"তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখিনে কেন ?···

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে,

আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তাহলেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না, কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলি নে। উপন্যাস লিখলে মাসিক-পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না। অন্ততঃ হয় নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় অ্যাকশন (action) কম—দর্শক নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানি নে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু রকমের হতে পারে :—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ··আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই ; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না।"

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি থেকে দেখা যায় যে, নাটক রচনার কলা-কৌশল শরৎচন্দ্রের বেশ জানাই ছিল। আর নাটক রচনায় হাত দিলে এদিকেও যে তিনি কিছুটা সাফল্যলাভ করতে পারতেন, এ বিষয়েও তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। তবুও নাটক রচনা না করা সম্বন্ধে তিনি যে কারণগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলিও একেবারে মিথ্যা নয়। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র জানা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই চরম হাইকোর্ট।" কথাটা অতি সত্য। কর্তৃপক্ষ অর্থ প্রাপ্তির অজুহাতে তাঁদের নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচি অনুযায়ী মূল নাটকের উপর কলম চালাতে আদৌ ইতস্ততঃ করেন না। নতুন সাধারণ শ্রেণীর লেখকদের কাছে এঁদের উপদেশ হয়ত অনেকখানি মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু প্রতিভাশালী লেখকরা অসঙ্গত হ'লে এঁদের কথা শুনতে যাবেন কেন? তবে এই দিক থেকে শরৎচন্দ্রের বেলায় এই ধরণের কোন প্রশ্ন হয়ত উঠত না। কেননা তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার বেলায় ত দেখা গেছে, তাঁকে কিছু বলা ত দূরের কথা, বরং সেক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষেরই আগ্রহ ছিল বেশি।

শরৎচন্দ্র আর একটি কথা বলেছেন, "শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ?" এ কথাটা আজকের দিনে ততটা প্রযোজ্য না হ'লেও শরৎচন্দ্র যে সময়ের কথা বলেছেন, তখন একথা বিশেষভাবেই বলা চলত। তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করতেন (মেয়েদের কথা ত বাদই) সমাজ তাঁদের মোটেই ভাল চোখে দেখত না। অথচ এঁদেরই অভিনয় দেখে লোকে হাসত ও কাঁদত এবং কত না আনন্দ পেত!

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে জনসাধারণের এই বিরূপ ভাবকে যিনি অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হন, তিনি হলেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চ-শিক্ষিত, কলেজের অধ্যাপক শিশিরবাবু যেদিন রঙ্গমঞ্চের

'স্বতন্ত্র'-সম্পাদক শ্রীখাসা সুব্বা রাও-এর আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

সুবিখ্যাত সমালোচক শ্রীজি-ভেনুকটাচলম্ এম-পির আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

বিখ   নৃত্যশিল্পী শ্রীভাস্কর

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে—শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

সংস্কারের ব্রত নিয়ে এ পথে পা দিলেন, সেদিন বাঙ্গলা-দেশের জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এই শিশিরবাবুর সঙ্গে দু একজন শিক্ষিতা মহিলাও এ পথে এসেছিলেন। এঁদেরই চেষ্টায় রঙ্গমঞ্চের যেমন অনেকখানি উন্নতি হ'ল, তেমনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে জন-সাধারণের বিরূপভাবও অনেকটা কেটে গেল।

শরৎচন্দ্র "শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ ?" বলে অভিযোগ করলেও, তিনি যদি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে তিনি অনায়াসেই শিশিরবাবু ও তাঁর সম্প্রদায়কে পেতে পারতেন।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র এই সব অভিযোগ করলেও তিনি তাঁর তিনখানি মাত্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া ছাড়া, কেন যে আর কোনও নাটক রচনা করলেন না, তা বলা কঠিন। হয়ত তাঁর অপর যে যুক্তি, উপন্যাস লিখলে "মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন" এবং উপন্যাসের জন্য প্রকাশকের অভাব হয় না, এই সব কারণেই তিনি গল্প-উপন্যাস লেখার পথ থেকে অন্যত্র সরে যান নি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত করা তিনখানি নাটক থেকেই বেশ জানা যায় যে, নাটক রচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কারণ—শরৎচন্দ্রের নাটক ষোড়শী, রমা ও বিজয়া এগুলি উপন্যাসে রূপান্তরিত হলেও নাটকগুলি কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে নিকৃষ্ট হয় নি। বরং নাটকগুলি উপন্যাসের চেয়ে আরও বাস্তবধর্মী হয়েছে। ঘটনা বা চরিত্র প্রভৃতি পরিস্ফুট করবার জন্য উপন্যাসের ন্যায় নাটকে যে অবান্তরের বা অতি-কথনের স্থান নেই, শরৎচন্দ্র এ কথা বহুলাংশেই মেনে চলেছেন। শরৎচন্দ্রের তিনখানি নাটকের মধ্যে ষোড়শী শ্রেষ্ঠ। এর গঠন-কৌশল পুরোপুরিভাবেই নাটকোচিত। এই নাটকে যেমন উপন্যাসের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বাদ দেওয়া বা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে আবার উপন্যাসে নেই এমনও দু একটা ঘটনা নাটকে দেওয়া হয়েছে। এই নাটকখানির গতি যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনি এর মধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্যও প্রচুর রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই ষোড়শী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে, শরৎচন্দ্র একখানা ষোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ষোড়শী পড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—"তোমার ষোড়শী পেয়েছি।··· আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।"

শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর তিনখানি উপন্যাসকে মাত্র নাটক করলেও তাঁর আরও বহু গল্প-উপন্যাস অপরের দ্বারা নাট্যরূপ পেয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর শুধু মঞ্চতেই নয়, তাঁর সমস্ত গল্প-উপন্যাসই একের পর এক করে পর্দায়ও রূপায়িত হচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যেমন শরৎচন্দ্রকে দিয়ে প্রথম নাটক লিখিয়েছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের কাহিনীকেও তিনিই প্রথম পর্দায় রূপ দিয়েছিলেন। তখন নির্বাক চিত্রের যুগ। সেই যুগে তিনি শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো" গল্পটিকে সিনেমায় রূপ দিয়েছিলেন। তারপর সেই নির্বাক যুগেই শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, স্বামী, চরিত্রহীন প্রভৃতি একে একে পর্দায় দেখা দিয়েছিল। পরে সবাক চিত্র আরম্ভ হলে নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা, পল্লী-সমাজ, দেবদাস, বিজয়া, গৃহদাহ উপন্যাসগুলিকে সিনেমায় তোলেন। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া অপরাপর চিত্র প্রতিষ্ঠানও তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসকে চিত্রে রূপ দেন। আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর সকল কাহিনীই চিত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। তাই তাঁর যে সব কাহিনী অনেকদিন আগে সিনেমায় হয়ে গেছে, সেগুলিও আবার নতুন করে পর্দায় উঠছে। শরৎচন্দ্রের সমস্ত গল্প-উপন্যাসই প্রচুর নাট্যরসসমৃদ্ধ বলেই মঞ্চে ও চিত্রে এতখানি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে।

এই দিক থেকে বাঙ্গলা দেশের রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্র-শিল্প যে শরৎচন্দ্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী একথা বলা যেতে পারে। কারণ তাঁর গল্প-উপন্যাস এ দেশের নাট্যশালা ও চিত্র শিল্পকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। শরৎচন্দ্রের এই দানের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন—"শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংশ্রবে আসার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে।"

অহিংসার বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অহিংসা চিরদিন ভারতের বাণী। গৃহস্থের নৈতিক জীবনের মূল-মন্ত্র অহিংসা। শান্তি ও স্বস্তির প্রার্থনায় চিত্তশুদ্ধির বিধান বৈদিক যুগের। ঋগ্বেদের স্বস্তি বচন আজিও পবিত্র করে আমাদের পূজা-গৃহ, যজ্ঞভূমি এবং প্রার্থনা মন্দির।

"হে বহু প্রশংসিত ইন্দ্র, আমাদের মঙ্গল করুন। অখিল জ্ঞানবান পূষা, আমাদের স্বস্তি করুন। যাঁর অস্ত্র অহিংসিত সেই গরুড় আমাদের স্বস্তি করুন। বৃহস্পতি আমাদের স্বস্তি বিধান করুন।(১) এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নির্দেশে মনোনিবেশ করলে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি বৈদিক আদর্শ। সমাজে কল্যাণ হয় পৃথিবীর অভাব মোচনে, জ্ঞানে এবং অহিংসায়।

"হে দেবগণ আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বিষয় শুনি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন চক্ষের দ্বারা মঙ্গলময় বস্তু দর্শন করতে পারি। তোমাদের স্তব ক'রে আমরা যেন স্থির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে দেবতা-নির্দিষ্ট আয়ু লাভ করতে পারি।"

বলা বাহুল্য নিন্দা, বৃথা স্তুতি বা হিংসাত্মক অশুভ বাক্যের উত্তেজনা হ'তে কর্ণকে অব্যাহত রাখাই জীবনের আদর্শ। চক্ষু সম্বন্ধেও ঐ শুভ-নীতি। জিঘাংসায় হতাহত, রোগী বা দুঃখভোগী দৃষ্টি পথে অবাঞ্ছনীয়। দানে ও সেবায় দীনতা ও ক্লেশের অরুন্তুদ দৃশ্য প্রতিরোধ করা বৈধ নীতি। চক্ষে ক্লেশ-তপ্তকে দেখতে হবে না অহিংসা ও সেবাব্রত গ্রহণ করলে। অনাচার ও অত্যাচারে জীবের স্বাস্থ্যহানি অনভিপ্রেত। শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের আদি ভূমি।

ঋগ্বেদের মন্ত্র মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অদিতি প্রভৃতি দ্যোতন শক্তির নিকট মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছে—"চন্দ্র ও সূর্য্যের মত আমরা যেন মঙ্গলের সহিত পথ চলিতে পারি। আমরা যেন ইষ্টদাতা অহিংসক পরিচিত বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারি।(২)

জ্ঞানের পথ, সত্যের পথ, শশী সূর্য্যের আলোক-ধোয়া পথ। সে পথে অন্ধকার নাই। সে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল পথ নিয়ে যায় অহিংসার কল্যাণে জীবের অন্তরে বিদ্যমান পরিচিত অনন্ত সত্যে। আঁধার তাকে ঘিরে রাখে। বিস্মৃতি ও ভ্রান্তি দূর হয় জ্যোৎস্নাস্নাত পথ হতে, জ্ঞান-রবিকরোজ্জ্বল দীপ্ত চিত্তমার্গ হ'তে। কিন্তু ভ্রমণের পথে অহিংসা আয়ত্ত করা সূক্ষ্ম নীতি। শান্তিই চরম-সাধ্য সাধনার।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের শান্তি পাঠের শুভ ছন্দও আমাদের চিত্তে আনে শান্তির বাণী। দ্যুলোক শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, জল শান্তি, ওষধি শান্তি, বনস্পতি শান্তি, দেবলোক শান্তি, পরব্রহ্মে যে শান্তি বিরাজিত সে শান্তি আমার হ'ক।(৩) যে ধাম আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি, সেথায় বিরাজ করে শান্তি।

বলা হয়েছে—আমারে এরূপ দৃঢ় কর, যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমি যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি, আমরা যেন বন্ধুভাবে পরস্পরকে দর্শন করি।(৪)

বলা বাহুল্য, মৈত্রী ও বৈরিতা একই মনে একত্র বাস করতে পারে না। ভারতের দর্শন বুঝলে প্রতীয়মান হয় যে সত্যের যে সাধনা নির্দেশ করেছে আর্য্য-দর্শন, তার সহজ পরিণাম বিশ্ব-মৈত্রী। মাত্র সকল জীব নয়, জল, স্থল, মরুত, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

---

১ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। ১।৮৯।৬।৮

তারপর মন্ত্র আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদর্শের।

২ স্বস্তিপন্থামনুচরেম সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি।৫।৫১।১৫।

৩ দ্যৌঃশান্তিরন্তরীক্ষ শান্তি! পৃথিবী শান্তিরাপো শান্তি বোষধয়ঃ শান্তি! বনস্পতয়ঃ শান্তি। সর্ব্বং শান্তি শান্তিরেব শান্তি। মা মা শান্তিরেধি।

৪ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য, মা চক্ষুষো সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্ মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষ্যামহে।

তাই বৈরিতা নিজের সঙ্গে আত্ম-ঘাতী বৈরিতা। জীব-হত্যা আত্ম-হত্যা।

প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত, দেবী-সূক্ত প্রভৃতি সকল শ্রুতিই বিশ্বের নিবিড় একতার বাণী প্রচার করেছে। সৃষ্টির বিভেদকে ফুটিয়ে তুলে মানুষ চরম সত্য-পথ হারিয়ে আপনাকে পথহারা পথিক করেছে জীবনের যাত্রা পথে। শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদ ও পুরাণের সত্যার্থে মনকে প্রতিষ্ঠিত করলে, অন্তঃকরণ সত্যের অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। বিভেদের শত সহস্র ভ্রান্ত-পথ সৃজন করেছে মানব মনের ভ্রান্তি। আমি মাত্র অপর একটি বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করব। তা হ'তে সপ্রমাণ হবে প্রাচীন ঋষি তপোবনের মুক্ত আকাশতলে মুক্ত বাতাসে শান্তি অহিংসা এবং বিশ্বের প্রত্যক্ষ একাত্মভূতিকে কি শুভ বন্দনা করেছেন। তাঁরা আনন্দের অমৃত-ধারায় বিশ্বকে স্নান-পূত করবার প্রেরণা অনুভব করতেন।

—"পৃথিবী শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জল-সমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি। এই সব শান্তি দ্বারা যাহা এখানে ঘোর, যাহা এখানে ক্রুর, যাহা এখানে পাপ, তাহা আমরা শান্ত করি, তাহা শান্ত হউক, তাহা কল্যাণ হউক, সমস্তই আমাদের শুভ হউক।"(৫)

এই পবিত্র মন্ত্র অনুধাবন করলে অহিংসার বাণী হবে মূর্ত্ত। পৃথিবীতে যা কিছু আমরা ঘোর আঁধার রূপে অনুভব বা পরিকল্পনা করি, তার উচ্ছেদ হয় শান্তিতে, বৈরিতায় নয়। ক্রুরতা সৃষ্টির এক ধারা। ঋজুতা মুক্তির পথ, যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ক্রুর তাকে প্রশমিত করবার সরল পথ হিংসামার্গ নয়। কারণ হিংসার প্রতিক্রিয়া হিংসা। আর্য-ধর্মের নির্দেশ—শান্তির দ্বারা বাঁকাকে সরল করতে হবে। শান্তি লাভ হবে জল স্থল মরুদ্ব্যোম ও তেজে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বের শান্ত প্রসন্নতা হ'তে। পাপ পুণ্য সম্বন্ধ-বাচক। যা মুক্তির পথে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধক তা পাপ। যে পথ অগ্রগতির বাহন, নিয়ামক ও পথ-প্রদর্শক সে আচরণ পুণ্য। কিন্তু পাপের প্রতি হিংসাও পাপ। তার সাথে হিংস্র সংগ্রামে বল ক্ষয়ে হিংসা অসুরের হয় বিজয়। পাপ-নিবৃত্তি সম্ভব শান্তিতে।

তাই ব্যোমপথ মুখরিত হ'ল শ্রুতির বাণীতে। যাহা ঘোর, যাহা ক্রুর, তাহা পাপ, তাকে শান্ত কর। তাহ'লে বিশ্বের সকল শক্তি, সকল ছন্দ, সকল স্পন্দন হবে শান্ত, কল্যাণকর এবং শুভ। তাই শুক্ল যজুর্বেদ মানুষকে আহ্বান করেছিল আপনার মাঝে তেজ, বীর্য, বল, শক্তি, মানসিক তেজ ও প্রভাবকে উদ্বুদ্ধ করতে, কারণ তারা তাঁর উপাধি। ব্রহ্ম সবার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। পশুবল বা হিংসার স্থান নাই আর্য-কৃষ্টিতে।

ব্রহ্ম স্ব-প্রকাশ। অপরের নিঃশেষে তাঁর প্রকাশ নয়। তাঁর প্রকাশ হয় বাণী এবং মন একত্র সন্নিবিষ্ট হলে। সে পথ উপনিষদ নির্দেশ করছেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিঘ্ন নিরাকরণের জন্য বলা হয়—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। দেহ, মন, বাক্য একত্র সন্নিবেশিত হলে মন্ত্র সফল হয়—আবিরাবির্ম এধি—হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার মধ্যে প্রকাশ পাও।

আর্য-শাস্ত্র সর্বত্র পোষণ করেছে অহিংসার নীতি। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-মার্গে মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে—মাত্র নীতি বর্ণনায় নয়, রস পরিবেশনে। ভক্তি জাগায় জীবের মর্মস্থলের সুপ্ত আনন্দ চেতনা। অগ্নির মত শুদ্ধ করে ভক্তি মানুষের প্রাণ, দহনে নয় জ্যোতিতে। কিন্তু আত্ম-নিবেদন সেই নর-নারীর পক্ষে সরল, যে আপনাকে শুদ্ধ করেছে অহিংস এবং নির্বৈর জীবন যাপনে। ভগবানের নাম, শরণ ও স্মরণ শুদ্ধ করে জীবকে নিঃসন্দেহ। কিন্তু হিংসা-কলুষিত মন তো ডাকার মতো ডাকতে পারে না। তাই ভগবান বলেছেন—আমি পদ-রেণুর দ্বারা সমস্ত জগৎকে নিত্য পবিত্র করিয়া নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শন মুনির অনুগমন করি।(৬)

---

৫ পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তির্দ্যৌ শান্তিরাপ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তি র্বনস্পতয় শান্তি বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তি সর্ব্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ। তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রুরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ। (অথর্ব্ববেদ ১৯।৯।১৪।)

৬ নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রি রেণুভিঃ।
ভাগবত একাদশ স্কন্দ।১৪।১৬

একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে নির্বৈর সমদর্শী হ'লে, তিনি তাঁর পদরেণুতে পবিত্র করেন আমাদের চিত্ত-বৃন্দাবন। সে পবিত্র ধূলার এক অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রজকণা পুলক শিহরণে জীবকে আনন্দ-ধামের সমাচার প্রদান করে। সে অবস্থা উদ্ধবকে বলেছেন ভগবান।

আমার কথা স্মরণে যার বাক্য গদগদ হয়, চিত্ত হয় দ্রবীভূত, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন বা লজ্জাশূন্য হ'য়ে গান গায় নৃত্য করে—আমার এমন ভক্তি-প্রাণ ব্যক্তি ত্রি-ভুবন পবিত্র করে।(৭)

তাই ভারত জানে ভক্তের ভগবান। ভক্তিমান পারে না অপরকে পর ভাবতে। সমদর্শী না হলে ভক্তিরস প্রাণে ঘন হয় না। হিংসার দৃষ্টি অসম-দৃষ্টি।

বলা বাহুল্য সংস্কৃত, পালি বা ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্য-কাননে বিচরণ করবার সময় এ বাণী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। শকুন্তলার মৃগ-প্রীতি, তরু-লতা, চক্রবাক্ চক্রবাকী প্রভৃতির সহিত মিত্রতা আনন্দের উৎস। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ নাটকে নায়ক জিমূতবাহন সর্পদের প্রাণরক্ষার মানসে হয়েছিলেন গরুড়ের বধ্য। শেষে গৌরীর কৃপায় অমৃত স্পর্শ এই বোধিসত্ত্বকে প্রাণ দিলে। রঘুবংশে সিংহের নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন মহারাজা দিলীপ।

হিতোপদেশে ভণ্ড পশুও বলেছিল—স্বচ্ছন্দ-বন-জাত শাকেও যা পূর্ণ হয় এমন দগ্ধ উদরের জন্য (জীব-হিংসা) মহা পাপ কে করতে চায়?

দর্শন শাস্ত্র এ বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন দৃঢ়তার সাথে। যম-নিয়ম প্রভৃতি ব্যতিরেকে চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ অসম্ভব। সংযমের প্রথম সাধনা অহিংসা। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ সংযম।(৮)

আমি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার কথা পরে বলব। আজ—অন্য দুই একটি উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

জিন তীর্থঙ্করদের অহিংসা পরম ধর্ম নীতি সুবিদিত। আনুষ্ঠানিক বৈদিক ধর্ম হতে তাঁদের উপদেশ বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও, অহিংসা মন্ত্রের সাধক ও প্রচারক ছিলেন তাঁরা সবাই।

ভগবান বুদ্ধ শান্তি, অহিংসা, মৈত্রী ও করুণাকে লোক ধর্মের বিভিন্ন বিধির সঙ্গে মিলিয়েছেন। ধর্মপদের এ বিষয়ে প্রধান শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন—

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়
অবৈরে যে শান্তি লভে সেই ধর্ম কয়।(৯)

ধর্মপদের আর একটী শ্লোক বলে—প্রাণ-হিংসার দ্বারা আর্য-পদ লাভ হয় না। সব প্রাণীর প্রতি অহিংস হলে তবে আর্যত্ব লাভ হয়।

গৌতম বুদ্ধ নিজ শ্রমণগণকে সদা অহিংসায় মগ্ন থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বলা হয়েছে—তাঁদের দিবা-রাত্র অহিংসায় হবে রত মন।(১০)

বৌদ্ধ পঞ্চশীলের প্রথম শীল—আমি প্রাণাতিপাত হতে বিরাম শিক্ষাপদ সম্পাদন করব।(১১)

মেত্তসুত্তের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ দিব রবীন্দ্রনাথের ভাষায়।

"মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়া ভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রীভাব অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।"

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণ সম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃ-সম্মিলন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ত্রয়োদশ

---

৭ বাক্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
কদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতেচ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।১১।১৪।২৪

৮ অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাহপরিগ্রহঃ যমাঃ। পাতঞ্জল সাধনপাদ।৩০।

৯ নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

১০ যেসং দিবা বা রত্তো চ অহিংসায় লগ্ন।

১১ পাণাতিপাতা বেরামনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি

অনুশাসনে বলেছিলেন—অবিদিত দেশ-বিজয়ের সময় হত্যা, মৃত্যু ও বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী। দেবপ্রিয় সে সকলকে আরও শোকাবহ মনে করেন এই জন্য যে তথাকার বাসিন্দা—ব্রাহ্মণ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ধার্মিক ও গৃহস্থবর্গ যাঁহারা মাতা, পিতা ও গুরু-শুশ্রূষায় রত, যাঁহারা মিত্র, সহায়, দাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার সম্পন্ন, যাঁহারা দৃঢ় ভক্তিযুক্ত, তাঁহারা তথায় ক্ষতি, ধ্বংশ ও প্রিয়জনবিরহ ভোগ করেন। · কোনো ধর্মাবলম্বীই ইহাতে সুখী নহেন।··· দেবপ্রিয় ইচ্ছা করেন—সর্বজীবই নিরাপদ ও সংযমী হউক এবং শান্তি ও আনন্দে কালযাপন করুক।"

বলা বাহুল্য এ উদার-নীতি ভারতের সকল শাস্ত্র মন্থনের ফল। সত্য ও অহিংসার নীতিকে পুষ্ট ক'রে সম্রাট অশোক সারা বিশ্বকে বুদ্ধ-নীতি-সুধা পান করবার অবকাশ দিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে অহিংসার বাণী শাশ্বত বাণী। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন পর্যালোচনা করলে এই কথাই স্ব-প্রমাণ হয়। প্রভু যীশু বলেছিলেন—যাঁরা শান্তির প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাই আশিস-ধন্য, কারণ তাঁদেরই ঈশ্বরের সন্তান বলা হবে।(১২)

১২ Blessed are the peace makers for they shall be called the Children of God.

হজরত মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের নাম—ইসলাম, যার অর্থ—শান্তির ধর্ম।

ভারতবর্ষের ধর্মমত বুঝলে জীবনে অহিংসার শ্রেষ্ঠতা বোঝা সহজ। ভেদজ্ঞান জন্মে জগদীশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধির অভাবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সরল ভাষায় বুঝিয়েছেন এই মহান নীতি।

"ঈশ্বর সকলকার ভিতর আছেন, কিন্তু সকলে তাঁর ভিতর নাই, এজন্যই লোকের এত দুঃখ।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—ভারতের দান ধর্ম। দান ও তত্ত্বকে শোণিত প্রবাহের উপর দিয়ে বহন করলে হয় না।···উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষ-ভরে শান্ত-ভাবে আগমন করিয়া থাকে, আর তাহাই বরাবর হইয়াছে।

এ বিষয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—ভারত চিরদিনই মানবতার জন্য প্রাণ-ধারণ করে আছে আপনার জন্য নয়। তাকে মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে মানব-জাতির জন্য, নিজের জন্য নয়।

যে কোন মহাপুরুষের বাণী ও আচরণ প্রমাণ করে যে এদেশে শান্তি ও অহিংসা জীবনের মূল সূত্র। আজিও মনের জোরে তথাকথিত সভ্যজাতি অহিংসার পোষক হতে পারে এবং উদার-ছন্দে পরমানন্দে বল্‌তে পারে—

"বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব"
"মা মা হিংসী।"

বৈশাখ

আশা দেবী

প্রাণের শ্মশানে এসে দাঁড়াইল ধূসর বৈশাখ।
উদাস-বিভ্রান্ত দিঠি—রক্ত আঁখি অশ্রুকণাহীন
অসহ্য শোকের জ্বালা নির্বাক রয়েছে মর্ম্মলীন
হরিৎ শ্যামল পদ্ম সে আগুনে পুড়ে হল খাক।
আতপ্ত নিশ্বাস ছোটে তার দিকে দিকে, ছোটে জ্বরাতুর—
উচ্চকিত তালদণ্ডে মুহুর্মুহুঃ ধ্বজা তার কাঁপে
জলস্রোতা বৈতরণী বয়ে যায় নিঃশব্দ বিলাপে—

বৈশাখ এনেছে বয়ে শব দেহ আপন ধূসর।
প্রাণের শ্মশানে এসে দাঁড়ায়েছে শ্মশান-চণ্ডাল
নিঃসঙ্গ একক মূর্তি—একা হাতে সাজাইবে চিতা
মুখাগ্নির বহ্নি পাত্র মধ্য-নভে জ্বলিছে সবিতা
অঙ্গারে ঢালিবে জল দূর প্রান্তে স্তব্ধ মহাকাল।
শেষ কৃত্য অবসানে দেখিবে সে বেদনা বিধুর।
দিনান্তের রক্তরাগে জাগে তার বধূর সিঁদূর।

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

নতুন শাসনতন্ত্রে নারী

অশোকা গুপ্তা

(বিধানসভায় ও সরকার পরিচালনায়)

ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে নারী বিধানসভাতে ও সরকার-পরিচালনাতে কতটা অধিকার লাভ করেছেন এটাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় আমাদের নূতনত্ব কি হোল একথা বুঝতে হোলে আগেই বুঝতে হয় যে পুরাতন ব্যবস্থায় আমাদের অবস্থা কি ছিল। কাজে-কাজেই নতুন শাসনতন্ত্র যখন আজ দেশে চালু হল, তখন সেটা চল্ হবার আগে দেশে মেয়েদের কি অধিকার ছিল সেটা একটু আলোচনা করে নেবার দরকার আছে মনে করি।

বহুযুগ আগেকার কথা বলব না, এই বিংশ শতাব্দীতেই আমরা যে প্রগতির পথে এগিয়েছি বলে মনে করি সেই সময়ের কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে মেয়েদের স্থান রাষ্ট্রে ও স্ব স্ব সমাজে কি অবস্থায় এখনও রয়েছে।

এই প্রগতির যুগেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারতে মেয়েরা কতটা অধিকার অর্জ্জন করেছিলেন, প্রথমে সেটাই আলোচনা করে দেখা যাক। তাঁদের সে অধিকার প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমতঃ ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে আইন সভায় মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসনে মেয়েরা নির্ব্বাচিত হয়ে আসতে পারতেন। যেমন ধরুন, বাংলার আইন সভায় ২৫০ জনের আইন সভায় চারজন মেয়ে আসতে পারতেন। অবশ্য সাধারণ আসনেও নির্ব্বাচিত হয়ে আসতে তাঁদের বাধা ছিল না। আর ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে পাঠাবার ক্ষমতা পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শুধু তাঁদেরই ছিল যাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে খাজনা দিতেন, কিম্বা সরকারকে ইনকম্ ট্যাক্স দিতেন। এ বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের একরকম সমানই ভোটাধিকার ছিল বলা যায়। যদিও মেয়েরা সাধারণভাবেই সম্পত্তির অধিকারিণী না হওয়ায় খুব অল্পসংখ্যক মেয়েরাই এই ভোটাধিকার ভোগ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এই বিংশ শতাব্দীতেই চাকুরীর ক্ষেত্র বা জীবিকার্জ্জনের সকল ক্ষেত্র মেয়েদের জন্যে খোলা ছিল না এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা ধীরে ধীরে কিছু কিছু সুযোগ পেলেও পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার পান নি। এমন কি একই কাজ করলেও অনেক সময়ে মেয়েরা পুরুষের সমান বেতন পেতেন না। মহিলা শ্রমিকও অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে কম মজুরী পাচ্ছিলেন।

তৃতীয়তঃ পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকার ছিল না, মৌলিক অধিকার পাবার পরও এখনও তা' নেই। কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের ক্ষমতা এই সেদিনও সীমাবদ্ধ ছিল।

তারপর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মেয়েদের গত বিশ বছরের অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথমতঃ যদিও ইদানীং কালে লেখাপড়া শিখতে মেয়েদের বিশেষ সামাজিক বাধা ছিল না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক বাধা বিঘ্ন ছিল অনেক। সে সব বিঘ্ন এখনও থাকবে যদি না বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাল্য বিবাহ কমে এলেও ১৪ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ একেবারে বন্ধ হয় নি, বরং গ্রামাঞ্চলে সকলের সম্মতি ও অনুমোদন ক্রমেই এখনও তা হয়ে থাকে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ বা সংস্কারমূলক অন্যান্য পরিবর্ত্তনের কথা ত উঠতেই পারে নি। কাজেই সামাজিক চেতনা ও শুভবুদ্ধি এখনও আমাদের হয় নি এবং মেয়েরা সংস্কারের গণ্ডীতে ও সামাজিক বিধান ও রীতি-নীতিতে এখনও

জড়িয়ে আছেন যদিও সে রীতিনীতি ও বিধান তাদের নিজেদের হাতে গড়া নয়, কিন্তু তাকে মেনে চলতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় এখন হঠাৎ নতুন শাসনতন্ত্রে মেয়েরা একরকম বিনা চেষ্টা ও বিনা আন্দোলনেই অনেকটা মৌলিক অধিকার পেয়ে গেলেন—সেটা পাবার জন্য অন্যান্য দেশে মেয়েদের যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবে আগেই বলে রাখি যে রাষ্ট্র পরিচালনায় এই সুযোগ ও অধিকার যা' আমরা মেয়েরা আজ পেলাম, তা' সামাজিক সুযোগ ও অধিকারের সঙ্গে খাপ খেল কি না সেটাও বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে।

নূতন শাসনতন্ত্রে প্রথমতঃ আমরা পেলাম নাগরিক অধিকার অর্থাৎ যাকে বলা হয় ভোটের অধিকার। এটা পাবার মানে হল এই যে আমরা যেমন চাইব তেমন লোক ব্যবস্থাপক সভার জন্যে দাঁড় করাতে পারব ও নির্ব্বাচনের সময় আমাদের নিজেদের অভিমত অনুসারে ভোট দিয়ে নিজেদের মনোমত লোক নির্ব্বাচন করবার চেষ্টা করতে পারব। অবশ্য এই অধিকার স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই। যাঁরই একুশ বছর বয়স হয়েছে তাঁরই ভোটের অধিকার হয়েছে। কিন্তু আমাদের মেয়েদের দিক থেকে এ একটা নতুন অধিকার—যা' আগে এমন ব্যাপকভাবে সর্ব্বস্তরে সর্ব্বশ্রেণীতে মেয়েরা পান নি। বলা বাহুল্য এত বড় অধিকার পাওয়াতে নারী-সমাজের দায়িত্বও অনেক গুণ বেড়ে গেছে, যে দায়িত্ব বুঝে কাজ করবার জন্যে সকলকেই এখন অবহিত হতে হবে।

পুরুষের মুখে—"তোমরা মেয়েমানুষ তোমরা কি বোঝ", কিম্বা মেয়েরা নিজেরা ভাল মানুষের মত—"আমরা মেয়েমানুষ, আর কি বলব" এই কথা শোনা ও বলার দিন আর নেই। এই যে একটা মস্ত বড় অধিকার, নাগরিক অধিকার—যেটা আমরা অতি সহজেই পেলাম, এর প্রয়োগ একটা গুরুদায়িত্বের ব্যাপার। "সেটা নারী-মাত্রেরই আজ ভাল করে বোঝা দরকার। আমাদের মেয়েদের দেখতে হবে যে সততা, সেবা ও চরিত্রগুণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন ও শ্রদ্ধেয়া, যাঁরা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যাঁরা মেয়েদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সচেতন তাঁদের হাতেই যেন দেশের শাসনভার যায়। যে সুযোগ আজ বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে বয়স্ক নারীর হাতেও এসেছে, সে সুবিধায় ভেবেচিন্তে সুবিবেচনাপ্রসূত প্রয়োগের ফলাফলের দ্বারাই বিচার হবে যে আমরা এই গুরুদায়িত্ব ও অধিকার পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছি কিনা। আমরা যেন স্রোতের টানে ভেসে না যাই।

এটা গেল নাগরিক হিসাবে বিধানসভায় আমাদের কি ভাবে নির্ব্বাচন করে পাঠান উচিত সে সম্বন্ধে। এবার বলি বিধানসভায় যে সব নারী নির্ব্বাচিত হয়ে যাবেন তাঁদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর আগেও নারী-সমাজের অবস্থা কি ছিল ও বিধানসভায় নারী কি ভাবে যেতে পারতেন সে সম্বন্ধে গোড়াতেই বলেছি। তখন সংরক্ষিত আসনে তুলোয় ঢাকা কাবুলী আঙুরের মত বিধানসভা ও আইনসভায় ২১৩টী মহিলা বসতেন এবং বলা বাহুল্য বিধান-রচনা বা আইন-রচনায় তাঁদের একজন দুজনের মতামতে কিছুই এসে যেত না। কিন্তু এখন নতুন শাসনতন্ত্রে যে অধিকার জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে তাতে ইচ্ছা করলে প্রত্যেক আসনের জন্যই নির্ব্বাচকমণ্ডলী উপযুক্ত নারীকে মনোনীত করতে পারেন. অথবা যাকে ইচ্ছা তাঁকে নির্ব্বাচনও করতে পারেন, বাধা কিছুই নেই। কাজেই যতসংখ্যক নারী (সারা ভারতের মধ্যে) বর্ত্তমানে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অগ্রসর হচ্ছেন তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় অগ্রসর হলেও ক্ষতি ছিল না, বরং নারী-সমাজের পক্ষে সেটা কল্যাণকর হ'ত বলেই মনে হয়। এঁদের মধ্যে যারা নির্ব্বাচিত হবেন তাঁদের গুরুদায়িত্ব হবে আইন রচনার, সরকার পরিচালনার এবং দেশের উন্নতি ও প্রগতিমূলক সকল রকম পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করবার। এ দায়িত্ব গ্রহণ করবার মত শিক্ষায়, দীক্ষায়, কর্ম্মক্ষমতায় চরিত্রবলে ও অভিজ্ঞতায় সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলার অভাব আজকাল আমাদের দেশে নেই সেকথা দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনাদের বোঝাতে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবুও যে সব মহীয়সী মহিলা যেমন স্বর্গগতা माননীয়া সরোজিনী নাইডু, শ্রদ্ধেয়া স্বর্গগতা সরলাদেবী চৌধুরাণী, শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, বীরনারী মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়েদেদার ও সর্ব্বকনিষ্ঠা পূর্ণিমা ব্যানার্জ্জি ও আরও কতজনে রাজনীতিক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেদের শক্তি ও চরিত্রগুলি যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন ও দেশের

অগ্রগতির পথে যে দান রেখে গেছেন তা'র মূল্য কম নয় তা' সকলেই স্বীকার করবেন। আমার সমাজসেবার ক্ষেত্রেও স্বর্গগতা শ্রদ্ধেয়া সরলা রায় (মিসেস পি কে রায়) কুমুদিনী বসু• ও মাননীয়া লেডী অবলা বসু প্রভৃতির কথা আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। সুতরাং যে দেশের বিগত যুগেই এতজন মহীয়সী মহিলাকে রাজনৈতিক ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে পাওয়া গেল, সে দেশের স্বাধীন অবস্থায় যে সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলার অভাব হবে তা' বোধ হয় না। সকল দিক ভেবে দেখলে ও ভাবী ভারতের নব নব পরিকল্পনায় নারী ও শিশু যে স্থান অধিকার করবে সেকথা চিন্তা করলে, বিধানসভায় ও প্রাদেশিক আইনসভায় যে উপযুক্ত মহিলা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়া খুবই উচিত, তা' প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন।

বিধানসভায় নারী নির্ব্বাচিত হলে তিনি কি ভাবে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন এটা অনেকে বুঝতে চান। নারী কি পুরুষ যিনিই নির্ব্বাচিত হোন না কেন, বিধানসভায় তিনি যে কোনও দলে বা স্বাধীনভাবে থাকতে পারেন। যদি জয়ী প্রধানদল অর্থাৎ যাঁরা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করবেন যে দল থেকে তিনি নির্ব্বাচিত হন, তবে তিনি সরকার পরিচালনার দলের নীতি কি হবে সে বিষয়ে দলের সভায় মতামত প্রকাশ করতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভেবেচিন্তে মতামত দেওয়ার ফলে দলের দৃষ্টিভঙ্গী পর্য্যন্ত সময় সময় বদলে যেতে পারে। তারপর নির্ব্বাচিত বা নির্ব্বাচিতা পুরুষ বা নারী মন্ত্রিমণ্ডলীতেও নির্ব্বাচিত হতে পারেন। তখন ত সরকারী কাজ একরকম স্বহস্তেই করতে হয় বলা যায়। আর যদি অন্য ছোটদল থেকে বা স্বাধীনভাবে কেউ নির্ব্বাচিত হন, তবে তিনি আইনসভায় আইন রচনার সময়ে নিজের সংশোধন প্রস্তাব দিয়ে বা ভোট দিয়ে সরকারী নীতির মোড় ফেরাতে পারেন। আইনসভায় পুরুষ বা নারী নির্ব্বাচিত হয়ে গেলে এইভাবেই সরকার পরিচালনায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। এই অধিকার এমন ব্যাপকভাবে পাওয়া মেয়েদের পক্ষে নতুন, তবু একথা বলতে আমাদের সঙ্কোচ নেই এবং গর্ব্বের সঙ্গে বলা যায় এই দায়িত্ব পালন করবার যোগ্য নারীর অভাবও আজ দেশে নেই। যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা ও বৈষম্যমূলক রীতি নীতি ও আইন দূর করে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেবেন—এমন সজাগ নারীও ভারতের নারী সমাজে এখন কম নয়।

বিধানসভায় থেকে সরকার পরিচালনায় কি ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে, তা' বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সরকার পরিচালনার আর একদিক আছে। সেটা হল শাসনযন্ত্র পরিচালনার দিক, যাকে ইংরাজীতে administrative side বলা হয়। আগের দিনে ঠাট্টা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে জুতো মোজা পরে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবে এবং "পদীপিসী গাউন পরে হাইকোর্টে রায় দেবে"। এখনও এসব ছড়া পড়লে হাসিই পায়, কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় প্রথম ধারাতেই যে বলা হোল যে এখন থেকে ভারতে সকল নাগরিক স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও সমান অধিকার ভোগ করবেন, তা থেকে দাঁড়াল কিন্তু সত্যিই ঐ যে—জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হ'তেও নারীর এখন আর কোনও বাধা রইল না। পঞ্চদশ (খ) ধারাতে একথা পরিষ্কার করেই বলা হচ্ছে যে ভারতের সকল নাগরিক জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে মেয়েরা তার মধ্যে আছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে একই রকম সুখ সুবিধা ভোগ করবেন। কাজে কাজেই সরকার পরিচালনার সরকারী চাকুরীর দিক থেকে বা নানান্ অর্থকরী বা কারিগরী শিক্ষার সুযোগের দিক থেকে মেয়েদের আর পিছিয়ে থাকতে হবে না। উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকলে সমাজের যে কোনও স্তরের মহিলা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়ে যোগ্য স্থান অধিকার করতে পারলে ছোট বড় হাকিম, কেরাণী, উকীল-ব্যারিষ্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হ'য়ে সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে জীবিকার্জ্জন করতে পারবেন। মন্ত্রী হিসাবে, গভর্ণর হিসাবে, আইনসভায় বিতর্কে, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীতে আমাদেরই বর্ত্তমানকালের নেতৃস্থানীয়া বহু নারী দক্ষতা ও সুনাম অর্জ্জন করেছেন। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রেও যে মহিলাগণ সে সুনাম রক্ষা করতে পারবেন সে বিশ্বাস আমরা রাখি।

সকল কথা বলার পরও একটা কথা রয়ে যায়—সেটা হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। নূতন শাসনতন্ত্র আজ নারীসমাজকে বিধানসভাতে ও সরকার পরিচালনায় যত

ক্ষমতাই দিক, সে ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে করতে গেলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দরকার। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত কতকগুলি কুরীতি ও আইনগত বাধা নির্মূল না হলে মেয়েরা তাঁদের এই নতুন শাসনতন্ত্রে পাওয়া অধিকারের পূর্ণ সুযোগ পাবেন না। এদের মধ্যে প্রধান হল (১) মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারের অভাব ও শিক্ষার সুযোগের অভাব—যার প্রতিকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া হতে পারে না, (২) অল্প বয়সে বিবাহ—যার ফলে মা ও সন্তান আমাদের ভাবী নাগরিক উভয়েরই স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বিহ জীবনযাপন, (৩) আর তৃতীয়তঃ কন্যা হিসাবে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃতি, যা' না থাকায় নতুন শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের ধারাটিই একরকম অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

নারী সমাজের আজভাব বার কথা এই—বুঝতে হবে যে একাজ নরনারী নির্ব্বিশেষে তাঁরাই করতে পারবেন যাঁরা বিধানসভায় কিম্বা সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক আইনের প্রচলনের চেষ্টা করেছেন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক সমস্যাকে দেখছেন। নারীকে সজাগ হয়ে বুঝতে হবে যে নারীর সমস্যা নারীর দ্বারাই সমাধান হ'তে পারে ও বিধানসভায় সরকার পরিচালনায় ও সকল সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুশিক্ষিতা নারীই তার পিছিয়ে পড়ে থাকা মা-বোনদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ও তাদের কথা বলতে পারে।

ভারতীয় নারীর পতিভক্তির আদর্শ

শ্রীউমা সান্যাল

প্রাচীন যুগের ভারতীয় নারীর পতিভক্তির আদর্শ যেমন মহান্ তেমনই বিস্ময়কর ছিল। সে দিনের সেই যুগ-বরণীয়া মহীয়সী নারীগণের কথা স্মরণ করলে আজও আমাদের মন অপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। সেই সব পতিব্রতা নারীগণের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজমহিষী ও রাজনন্দিনী সীতার পতিভক্তি বাস্তবিকই অনন্য-সাধারণ। চিরদিন রাজ-ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত অসূর্য্যম্পশ্যা নারী তাঁর প্রিয়তম দয়িতের সঙ্গে বনে অনুগামী,—রামচন্দ্র তাঁকে বোঝাচ্ছেন বিপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে কত হিংস্র জন্তু, কত রাক্ষস আছে সেখানে সীতার মত কুসুমকোমলা নারীর স্থান নেই, তিনি পিতৃ সত্য পালনের জন্য দায়ী তাই তাঁকে যেতে হবে কিন্তু সীতা কেন এমন ভীষণ বিপদ বরণ করবেন। এর উত্তরে পতিব্রতা নারীর কি সুন্দর তেজদৃপ্ত উত্তর—অরণ্যে ভীষণ বিপদ তিনি জানেন কিন্তু তিনি ত অসহায় নন, তার সঙ্গে ত তাঁর পরাক্রমশালী স্বামী আছেন, তবে তিনি কাকে ভয় করবেন? রামচন্দ্র যদি অরণ্যে তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করতে না পারবেন তবে ত তিনি "কাপুরুষ"—বীর নামের অযোগ্য। সীতার উত্তরে রামচন্দ্র পরাস্ত। তখনও তিনি তাঁকে বোঝালেন,—সীতাকে সঙ্গে রাখা এবং রক্ষা করা তাঁর ধর্ম্ম বটে কিন্তু সীতার মত সুখী ও কোমলা নারী বনের কষ্ট সহ্য করতে পারবে—কি? "কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকমল।" এঁর উত্তরে পতিব্রতা নারীর কি প্রেমময়ী উত্তর,—কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয়ে তাঁর চরণদ্বয় রক্তাক্ত হলেও তিনি কোন কষ্টই অনুভব করবেন না,—রামচন্দ্রের পাশে থাকলে সে রক্তে তিনি চন্দন অনুলেপনের সুখ পাবেন। এমন পতিব্রতা প্রেমময়ী নারী কি এ যুগে সম্ভব। সীতার সমগ্র জীবনই পতিভক্তির চরম নিদর্শন। নিষ্ঠুর রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করলেও পাতাল-প্রবেশের কালে সীতা প্রার্থনা করলেন—যেন পরজন্মেও তিনি রামচন্দ্রকেই স্বামী-রূপে লাভ করেন। কি অপূর্ব্ব নিষ্ঠা। ধন্য সেই কবি যিনি গেয়েছেন—

"প্রণমি তোমারে আমি, ধরণীর মানসী দুহিতা,
রাজর্ষির সাধনার তপোমূর্ত্তি, তুমি শুচিস্মিতা।
বিদেহ নন্দিনী তুমি, দেহাতীত অরূপের রূপ
রূপান্বিতা নারীরূপে—নিষ্পাপের আদর্শ স্বরূপ।
আদর্শকে মূর্ত্ত করি ফুটাইয়েছ নারীর মহিমা,
চিরন্তন যুগবক্ষে জাগায়েছ অপূর্ব্ব গরিমা।

তারপর সাবিত্রী! রূপে গুণে অসামান্যা রাজদুহিতা সাবিত্রী—যৌবনে সমাগতা—রাজা চিন্তায় পড়লেন,—এমন যে সর্ব্বগুণসম্পন্না—দুহিতা—তাকে কার হস্তে সমর্পণ করবেন। কে সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজপুত্র যিনি সাবিত্রীর স্বামী হবেন। কেউই যে নিজেকে সাবিত্রীর উপযুক্ত মনে ক'রে তার পানি প্রার্থনা করতে এলনা। তবে কি উপায় হবে! তবে কি কন্যা অপরিণীতাই থেকে যাবে। এ সমস্যার সমাধান করলেন সাবিত্রী নিজে। তিনি বললেন তিনি নিজেই যাবেন তাঁর জাতির অনুসন্ধানে। শত সখী সমভিব্যাহারে সাবিত্রী চললেন পতির অনুসন্ধানে। গভীর অরণ্যে কে ওই সুদর্শনকান্তি তরুণ তাপস—স্কন্ধে বিলম্বিত কাষ্ঠ ভার—কে ওই যুবক। ওই কি নয়—সাবিত্রীর চিত্তহরা—যুগ যুগান্তের প্রিয়তম দয়িত! সাবিত্রী-সখীদের বললেন, সখীগণ ফিরে চলো রাজভবনে, আমি আমার দয়িতের সন্ধান পেয়েছি। সখীরা বললেন, কে এই তাপস খোঁজ না নিয়েই মনস্থির করলে কন্যা? সাবিত্রী বললেন, তাঁপস যেই হোক্ উনিই আমার স্বামী। দর্শনমাত্রেই আমি আমার সকল সত্তা ওই তাপসের

পায়েই নিবেদন করেছি। হিন্দু নারী কখনও দ্বিচারিণী হয় না। সাবিত্রী প্রাসাদে ফিরে এলেন। নৃপতি অশ্বসেন শুনলেন সব সমাচার। তাপসের পরিচয় পেলেন—হৃতরাজ্য অন্ধ দ্যুমৎসেনের একমাত্র পুত্র ওই বনচারী তাপস সত্যবান। নারদের মুখে আরও শুনলেন, সত্যবান অল্পায়ু, আর একটি বৎসর পরমায়ু তার, রাজা সাবিত্রীকে জানালেন, তিনি তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু পতিব্রতা সাবিত্রীর একই উত্তর,—অল্পায়ু হোন আর রাজ্যহীনই হোন, সত্যবানই তাঁর স্বামী। নিরুপায় পিতা সত্যবানের হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করলেন। কি অপূর্ব্ব আত্ম ত্যাগ! কি অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও পতিভক্তি সতীর কোল থেকে গতপ্রাণ স্বামীর প্রাণ বায়ুটুকু ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না যমরাজ, সাবিত্রীর অপূর্ব্ব পতিভক্তির কাছে যমরাজ পরাস্ত হয়ে ফিরে গেলেন। এ কাহিনী কি আর কোথাও আছে? আর কোনও দেশের পুরাণ রচেছে কি এমন গাঁথা? ধন্য সতী সাবিত্রী। ধন্য ভারত! ধন্য তার নারীর আদর্শ!

তারপর রাজমহিষী গান্ধারী।

> জন্মান্ধ নৃমণি তুমি এ বারতা পেয়ে
> দূতমুখে, অন্ধা হ'ল গান্ধার কিঙ্করী
> আজি হ'তে।

স্বামী যে সুখে বঞ্চিত—স্ত্রী হয়ে তিনি সে সুখ ভোগ করবেন কেমন করে, তাই গান্ধারী স্বইচ্ছায় অন্ধত্বকে বরণ করেছিলেন। রাজমহিষী গান্ধারীও আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তারপর পাণ্ডব জননী কুন্তী, অনন্ত-যৌবনা রাজ-মহিষী কুন্তী স্বামীর ইচ্ছায় একাধিকমে বরণ করেছিলেন ধর্ম্ম পবন ও ইন্দ্রকে। কুন্তী ব্যাভিচারিণী নয়। কুন্তী মহাসতী, স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করাই যে সতীর ধর্ম্ম, তাই ত শাস্ত্রকারে বা বলেছেন—

> অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী মন্দোদরীস্তথা:
> পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং।

আরও কত আলোচনা করব! এমনি আরও বহু মহীয়সী ছিলেন যাদের পতিভক্তির কাহিনী আজও সমগ্র বিশ্বের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় হয়ে আছে। অনেক আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হয়ত আমার প্রবন্ধ পড়ে নাক্ শিট্‌কোবেন—কারণ আজকাল অনেকের মতে "পতি পরম গুরু"না হয়ে পতি পরম গরু হলেই ভাল ছিল, কিন্তু আমি আদর্শবাদী তাই প্রাচীন যুগের মহীয়সীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করছি।

আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিতা মহিলাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাঁরা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই "মেয়েদের কথা" বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আলোচনা সঙ্গত কি মনে হলে সাদরে পত্রস্থ করা হবে। রচনা পাঠাবার সময় উপরের "মেয়েদের কথা" লিখতে ভুলবেন না। রচনা যথাসম্ভব ছোট করে লিখে পাঠাবেন।—(ভাঃ সঃ)

* * *

১। এ দেশের মেয়েদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক যে সব অভাব অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও উন্নতির উপায় নির্দেশ।

২। এ দেশের মেয়েদের বিবিধ অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে যে সব আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত তার আলোচনা এবং মেয়েদের স্বার্থের বিরোধী যে সব আইন-কানুন আছে তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

৩। ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে নারীর অধিকার-রক্ষা ও স্বার্থের অনুকূল কি কি বিধিবিধান প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৪। পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তার যথাসম্ভব খবর।

৫। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং শিল্পকলা প্রভৃতির পরিচয়।

৬। মাতৃত্ব, শিশুমঙ্গল, শিশু-শিক্ষা, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনা।

৭। সমাজ সেবা ও নারী কল্যাণ (Social service & Womens welfare) সংক্রান্ত কাজকর্মের বিবরণ।

৮। সংসার, পরিবার ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা।

৯। মেয়েরা কোথায় কোন্ বিষয়ে কি কৃতিত্ব প্রদর্শন করে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের বিবরণ, (সম্ভব হলে সচিত্র) [খেলাধূলা, নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ও এর অন্তর্গত]।

১০। মেয়েদের উন্নতি ও প্রগতি সম্বন্ধে অল্প কথায় লেখা প্রস্তাবাদি গ্রাহ্য হবে।

ভক্তি সঙ্গীত

আমার পথের কাঁটা তুলে তোমার আসার পথে রাখি,
নেবার বেলায় দুহাত বাড়াই, দেবার বেলায় ফিরাই আঁখি।
আর সবারি কথা ভাবি,
মেটাতে চাই সবার দাবী,
তোমার বেলায় কেবল আমি জীবন ভ'রে দিলাম ফাঁকি।

আমার নেওয়ার নিক্তি দিয়ে তোমার দেওয়া ওজন করি,
আমার মনের খাদ মিশিয়ে তোমার কথার মূল্য ধরি।
শত্রুজয়ী মন্ত্র তোমার,
জপে না ত চিত্ত আমার,
প্রতিঘাতের ভয়ে আমি অরির হাতেই পরাই রাখী।

পূর্ণ ক'রে দেবে ব'লে আমার জীবন-পাত্রখানি,
রিক্ত ক'রে শুদ্ধ কর, ধন্য কর, হে কল্যাণী॥
এবার তোমার চরণ-ময়ূখ,
সকল ভয়ের আঁধার হরুক,
এ অবুঝে বুঝাও, মাগো, আর ত আমি নই একাকী।

কথা ঃ অরুণা দেবী স্থর ঃ দিলীপকুমারের একটি গান থেকে নেওয়া স্বরলিপি ঃ সাহানা দেবী

II সা সা ঋজ্ঞা | ঋা জ্ঞা -া | পা পা দণা | দা পা -া |
আ মা -র প থে র কাঁ টা - তু লে -

র্সা র্সা ঋ´জ্ঞা | ঋ´া র্সা -া | সা ঋা মা | পা দর্সা -া
তো মা -র্ আ সা র্ প থে - রা খি- -

র্সা র্সা ঋ´জ্ঞা | ঋ´া র্সা -া | সজ্ঞা জ্ঞা -া | ঋা সা জ্ঞ´া
নে বা -র্ বে লা য় দু- হা ত্ বা ড়া ˙ই

জ্ঞ´া ঋ´া র্সা | ণা দা পা | মা জ্ঞা মজ্ঞা | ঋা সা -া | II
দে বা র্ বে লা য় ফি রা -ই আঁ খি -

{ পা -া ণা | পা ণা মা | মা ণদা ণদা | ণা র্সা -া |
আ র্ স বা রি - ক থা- - ভা বি -
এ বা র্ তো মা র্ চ র- ণ্ ম য়ূ খ্

ঋ´া র্সা ণা | দা পা মা | জ্ঞা সা র্সা | ণা দা -া | }
মে টা - তে চা ই স বা র্ দা বী -
স ক ল্ ভ য়ে র্ আঁ ধা র্ হ রু ক্

মা ণা -া | পা ণা -া | দা র্সা -া | ণঋ´া ঋ´া -া |
তো মা র্ বে লা য় কে ব ল্ আ- মি -
এ অ - বু ঝে - বু ঝা ও মা- গো -

র্সা র্সা ঋ´জ্ঞা | ঋ´া স´া -া | ণস´া দণা স´জ্ঞা | ঋ´া স´া -া |
জী ব -ন্ ভ' রে - দি - লা - -ম্ ফাঁ কি -
আ র্ ত - আ মি - নই এ- - - কা কী -

জ্ঞ´া জ্ঞ´া জ্ঞ´া | ঋ´া স´া -া | সজ্ঞা জ্ঞা -া | ঋা সা জ্ঞ´া |
নে বা র্ বে লা য়্ দু - হা ত্ বা ড়া ই
নে বা র বে লা য়্ দু - হা ত্ বা ড়া ই

জ্ঞ´া ঋ´া স´া | ণা দা পা | মা জ্ঞা মজ্ঞা | ঋা সা -া | IIII
দে বা র্ বে লা য় ফি রা -ই আঁ খি -
দে বা র্ বে লা য় ফি রা -ই আঁ খি -

স´া স´া -া | দণা ণা -া | পদা -া দা | মপা পা -া |
আ মা র্ নেও য়া র্ নি- কৃ তি দি- য়ে -
পূ র্ ণ ক'- রে - দে- বে - ব- লে -

জ্ঞমা মা -া | জ্ঞরা জ্ঞা -া | মা জ্ঞরা জ্ঞা | ঋা সা -া |
তো- মা র্ দেও য়া - ও জ - ন্ ক রি -
আ - মা র্ জী- ব ন্ পা - এ টি রে -

সা ঋা জ্ঞা | মা সা মজ্ঞা | মা পা দা | ণা মা পদা |
আ মা র ম নে র খা দ মি শি য়ে য়ে
রি - ক্ত ক' রে - শু - দ্ধ ক র -

পা দা ণা | র্সা পা ণা | র্সা র্সঋা মজ্ঞা | ঋা সা সা |
তো মা র্ ক থা র্ মূ ল্য - - - ধ রি -
ধ - ন্য ক র - ছে ক - - - ন্যা নী -

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা

সুশীলকুমার গুপ্ত

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকগুলির অন্যতম। এই হিসেবে সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের বেশীর ভাগ জায়গা গদ্যে ও অল্প কয়েক জায়গা পদ্যে লেখা। পাঁচটি অঙ্কে এই নাটকটির বিস্তৃতি। সিরাজের সিংহাসন লাভে নাটকের সুরু এবং তাঁর সমাধি মন্দিরে নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা ঐতিহাসিক নাটক হলেও এখানে সিরাজের ব্যক্তি-চরিত্রের ইতিহাসই প্রধান রূপলাভ করেছে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকায় সিরাজের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখান হয়েছে।

ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে Aristotle বলেছেন—He (a tragic hero) falls from a position of lofty eminence; and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of frailty.

তিনি আবার বলেছেন—

A man not pre-eminently virtuous and just, whose misfortune however is brought upon him not by vice and depravity but by some error of judgement.

Bradley বলেছেন—

No mere suffering or misfortune, no suffering that does not spring in great part from human agency, and in some degree from the agency of the sufferer, is tragic, however pitiful it may be.

সিরাজের চরিত্র যে উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত এ সহজেই বোধ যায়। সিরাজের ট্রাজেডি এনেছে তাঁর স্বভাবের দ্বারা সৃষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত মন এবং এই হচ্ছে human agency. শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে মাতামহী আলিবর্দ্দী-বেগমের উপদেশে মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে ক্ষমা করার চারিত্রিক দুর্ব্বলতা সিরাজকে এক নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। গ্রীক ট্রাজেডির নিয়তির শাসন (Nemesis) তাঁকে ধ্বংসের শেষ সীমায় নিয়ে যায় নি। করিম চাচার কয়েকটি কথায় সিরাজের চরিত্রের শিথিলতার দিকটি সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের দশম গর্ভাঙ্কে করিম চাচা বলছে—

চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াদপি হয়েছে কি? বেকুব নবাব, নবাবীই

জানে না ; কারুর গর্দানা নেবার হুকুম দেয় না—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুট ব'ল্‌তে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ করে, টাকা আদায় করে! টাকা ভাঙ্‌লে মাপ, শত্রুতা করলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।

শাসকের কঠোরতা সিরাজের চরিত্রে নেই। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রায়-দুর্লভকে করিম চাচা বলেছে—

কাল্‌কের ছোঁড়া, মাতামহর আদরে আদরেই বেড়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছক্কাবাজির মধ্যে এখনো সেঁধোয় নাই। রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে—এই দু'নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজ্‌তে বসেছে।

কিন্তু human agency, error of judgment বা great error of frailty এর জন্যে নায়কের পতন হলেও ট্রাজেডির নায়ক যে পরিমাণে মহৎ সেই পরিমাণে তার ট্রাজেডি করুণ ও সার্থক।

Bradley বলেছেন—

The tragedy in which the hero is, as we say, a goodman is more tragic than that in which he is, as we say, a bad man. The more spiritual value, the more tragedy in conflicts and waste.

এখন দেখা যাক সিরাজের good করবার এবং lofty eminence দেবার জন্যে নাট্যকার সিরাজকে কিভাবে চিত্রিত করেছেন।

ইতিহাসের সিরাজ দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, পরনারী-অপহরণকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং বিলাসী। কিন্তু নাট্যকার সে কলঙ্কময় চরিত্রের সিরাজের ছবি আঁকেন নি। তিনি বলেছেন—বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে......শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকদের নিকট ঋণী।

নাট্যকার সিরাজকে রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল নবাব হিসেবে চিত্রিত করতে যত্নবান হয়েছেন। সিরাজ প্রজাবৎসল, পরহিতৈষী, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষী ও মনে প্রাণে দেশভক্ত। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে জহরাকে করিম চাচা বলেছে—

সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব।

সিরাজ বারবার ঘোষণা করেছেন—যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই।......কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙলার দুশমন্‌। এ শুধু ঘোষণা নয়, স্বাধীনতাকামী মানবের মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ, দেশপ্রেমের তরবারিক ঝঞ্ঝনা। সিরাজের কণ্ঠে শুনি—

বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রু জ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।

এই কথাগুলির মধ্যে সিরাজের উদাত্ত কণ্ঠের মেঘমন্দ্রধ্বনি শতাব্দীর আকাশের প্রান্ত থেকে আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়।

সিরাজের ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ এই নাটকের অন্যতম motive force. স্বাধীনতা-কামী নরনারীর আশা আকাঙ্ক্ষা সিরাজের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এই motiveটির মধ্যে universality এর স্পর্শ আছে সন্দেহ নেই। সিরাজের পতনের সঙ্গে একটা জাতির স্বাধীনতাহরণের প্রশ্ন জড়িত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সিরাজের চরিত্রে tragic element ছিল। কিন্তু নাটকটি তবুও tragic না হয়ে কেন করুণরসাত্মক হয়ে গেছে দেখা যাক।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যেতে পারে সিরাজদ্দৌলা নাটকের ট্রাজেডির পরিকল্পনায় ট্রাজেডির প্রধান লক্ষণ নায়কের অন্তর-জগতের দ্বন্দ্বের প্রকাশ নেই। একদিকে সেনাপতি মীরজাফর, রাজারাজবল্লভ ও অন্যান্য অমাত্যবর্গের শঠতা দূর করার চেষ্টা, অপরদিকে মাতামহী আলিবর্দী—বেগমের উপদেশ—'মার্জ্জনার সম উচ্চ নাহি রাজনীতি'—রক্ষা করার প্রয়াস সিরাজের চরিত্রে কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব অন্তরের গভীর স্তরে নেমে যায়নি। করুণরসাত্মক নাটকে একটা—আহা, আহা—ভাব থাকে। কিন্তু ট্রাজেডির মধ্যে হায়, হায়—ভাব, আর এই হায়, হায় ভাব অন্তরের গভীরতম স্তরের।

প্রতিনায়ক হিসেবে মীরজাফরের চরিত্র ভালভাবে চিত্রিত হয় নি। জহরার চরিত্রের মধ্যে ট্রাজেডির element ছিল। স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পর কার্য্যের নিষ্ফলতার অনুভূতির মধ্যে ট্রাজেডির স্পর্শ আছে। জহরার চরিত্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের যোগ অল্প। পঞ্চম অঙ্কে জহরার উক্তি—

নারীর পতি সর্ব্বস্ব, পতি সার, পতি স্বর্গ, পতি ধর্ম্ম, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর তোমরা স্বার্থপর।

কিন্তু হোসেনের চরিত্রের আদর্শ এমন ছিল না যার জন্যে জহরা প্রতিহিংসার প্রতিমূর্ত্তি হতে পারে। জহরার চরিত্রে রোমীয় যুদ্ধের দেবী Bellonaএর ছায়াপাত হয়েছে। তার সঙ্গে Macbethএর Three witchesএর সাদৃশ্য আছে।

ঘসেটি বেগমের চরিত্র অতিরঞ্জিত। কিন্তু করিমচাচার হাস্যরস নাটকের করুণ রসকে কিছুটা উজ্জ্বল করেছে। এখানে নাট্যকার Shakespeareএর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। গ্রীক ট্রাজেডিতে হাস্যরসের স্থান নেই। করিমচাচার হাস্যরস পরিবেশনের মধ্যে নাটকের বহির্দ্বন্দ্বের স্বরূপ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আশেপাশের চরিত্রগুলির সঙ্গে করিমচাচার চরিত্রের বিশেষ যোগ নেই। তাছাড়া জহরার চরিত্রের মত করিমচাচার চরিত্রও অনৈতিহাসিক। কিন্তু অনৈতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টিতেই দোষ নেই, কেননা Aristotle বলেছেন—

It is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen according to the law of probability and necessity.

সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহারে নাট্যকারের স্বাধীনতা থাকে ; কিন্তু এখানে নাট্যকার সেই সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করতে পারেন নি। অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলি নাটককে ভারাক্রান্তই করে তুলেছে। নাটকের ঘটনা ও দ্বন্দ্বের অধীনে চরিত্রগুলি চালিত হয় নি। এখানে নাটকের গুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কেননা Galsworthy বলেছেন—

A dramatist who hangs his plot on characters instead of hanging characters on plot Commits a Cardinal mistake.

এ ছাড়াও এই নাটকে Compactness নেই। ঘটনার ঐক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নি।

এই সমস্ত কারণে এই নাটকটি সার্থক ট্রাজেডির মত যথাযথ ভাবে pityএর উদ্রেক করে না। টিকটি pathetic হয়েছে কিন্তু সার্থক ট্রাজেডি হয় নি।

প্রতিভা-পরিচিতি

হেন্‌রি আর্ভিং

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে স্যর হেন্‌রি আর্ভিং নিঃসন্দেহে অন্যতম। শেক্সপীয়রের সৃজিত চরিত্রগুলির রূপদানে, বিশেষ করে হ্যামলেট চরিত্রের অভিনয়ে, আর্ভিং যে অসামান্য রসবোধ এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা বিরল।

কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকগণ বিদ্রূপের হাততালি আর শিস্ দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতো! মাঝে মাঝে তারা ম্যানেজারকে গিয়ে বলত—"মশায়, আর্ভিং নামে ওই ঢ্যাঙা আর গোমড়া-মুখো লোকটার চেয়ে ভাল অভিনেতা আপনার দলে কি আর কেউ নেই? ওই লোকটাকে দেখলে আমাদের গা জ্বলে। ওকে আর নামাবেন না।"

মঞ্চ-জগতে প্রবেশ ক'রে প্রথম আট বছর আর্ভিংকে যে উপেক্ষা আর অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল তার ধাক্কায় অন্য কেউ হলে হয়ত সে-জগত থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আর্ভিং-এর উচ্চাশা ছিল অদম্য। শত দুঃখ আর লাঞ্ছনার মধ্যেও প্রাণের ভিতরকার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপটি তিনি নির্ব্বাপিত হতে দেন নি। অভিনয়-শিল্পে স্থায়ী খ্যাতি তাঁকে অর্জ্জন করতেই হবে, শ্রেষ্ঠ সম্মান তাঁর চাই—এই ছিল তাঁর পণ। জীবনের দুরূহ পথে সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে দুশ্চর সাধনা করে যাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন হেন্‌রি আর্ভিং তাঁদের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য। আর্ভিং-এর সমগ্র জীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রবাহ। শেষ মুহূর্ত্তেও সে-সংগ্রামের প্রয়োজন শেষ হয় নি।

* * * *

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী সমারসেট্ জনপদে তাঁর জন্ম। ছেলে-বেলায় তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁর বাবা মা তাঁকে লণ্ডনে না রেখে কর্ণোয়ালে এক মাসির কাছে রেখেছিলেন। খুব ছেলেবেলা থেকেই নাটক আর অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে যে-কোন ঘটনায় কিছুমাত্র নাটকীয়তার সম্ভাবনা আছে সেখানেই আর্ভিং কর্ম্মতৎপরতায় চঞ্চল হয়েছেন এবং তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। কর্ণোয়ালে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এক বৃদ্ধার কাছে ভুত-প্রেতের গল্প শুনতেন। তিনি ভয় না পেলেও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সেই সব গল্প শুনে রীতিমতো ভয় পেত। একদিন তিনি এক মজার কাণ্ড করলেন। ভুত হোয়ে রোজার ঘাড়ে চাপলেন। কয়েক-জন সঙ্গী নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভুতের মতো কালো পোষাক, কিম্ভুত-কিমাকার টুপী আর মুখোস প'রে সেই বুড়ির জানলায় গিয়ে উঁকি দিতে লাগলেন। ভুতের গল্প বলে ছেলেদের দাঁত কপাটি লাগিয়ে যে-বুড়ি খুব আনন্দ পেতো, ঘরের পাশে সেই সব প্রেতের মূর্ত্তি দেখে তার নিজের দাঁত-কপাটি লেগে গেল!

তেরো বছর বয়সে তিনি বাবা-মার কাছে গেলেন এবং এক আপিসে সামান্য বেয়ারার কাজে ভর্ত্তি হয়ে সামান্য কিছু রোজগার ক'রে বাবা-মাকে সাহায্য করতে লাগলেন। তখন থেকে দুটি নেশা তাঁকে অধিকার করেছিল। এক, বই কেনা। দুই, থিয়েটার দেখা। ছোট ছেলের থিয়েটার দেখা তখনকার দিনে কোন ভদ্র বাপ মা পছন্দ করতেন না।

সার হেন্‌রি আর্ভিং

তাই আর্ভিং একাকী থিয়েটার দেখতে গিয়ে বিষম তিরস্কৃত হয়েছিলেন। ক্রমে যখন প্রকাশ পেল যে তিনি নটরূপে রঙ্গমঞ্চে যোগদান করতে চান তখন আতঙ্ক আর আলোচনার অন্ত রইল না। তাঁর মা তো রীতিমতো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ব'সে গেলেন, যাতে তাঁর ছেলে নরকে না যায়!

এদিকে স্থানীয় রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ আর পরিচালক আর্ভিং-এর আবৃত্তি আর অভিব্যক্তির উৎকর্ষে আকৃষ্ট হোয়েছিলেন। সেই রঙ্গমঞ্চের প্রধান নট উইলিয়ম হস্‌কিন্‌স্ তাঁর আবৃত্তি শুনতে খুব ভালবাসতেন। আর্ভিংও তাঁকে গুরুর মত ভক্তি করতেন। স্যামুয়েল ফেল্‌ফ্‌স্ ছিলেন সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। হস্‌কিন্‌স্ তাঁকে একদিন তাঁর প্রিয় শিষ্যের আবৃত্তি

শোনালেন। আবৃত্তি শুনে স্যামুয়েল ফেল্‌প্‌স্‌ খুবই তারিফ করলেন। কিন্তু যে পেশায় কোন স্থায়িত্ব বা স্থিরতা নেই সে-রকম পেশা গ্রহণ করা নিরাপদ নয়, এই অভিমতের দ্বারা তিনি আর্ভিং-কে নটের বৃত্তি গ্রহণে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু দমবার পাত্র নন হেন্‌রি আর্ভিং। জীবনের পথ তিনি বেছে নিয়েছেন, নিভৃত সাধনা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। লণ্ডনের দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবার মতো সাহস তখনো তিনি সঞ্চয় করতে পারেন নি। তাই এক ভ্রাম্যমান থিয়েটার-দলে যোগ দিয়ে মফঃস্বলের নানা ছোট বড় ষ্টেশনে অভিনয় ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। নাম কেনা দূরে থাকুক,

বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্যের কতকগুলি বিশেষ ভূমিকার রূপসজ্জায়

দু'তিনবার এমন কাণ্ড করলেন যাতে দর্শকরা চীৎকার করে শিস্ দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করল, ম্যানেজার তাঁর ওপর রেগে আগুন হলেন। প্রথম জীবনে অত্যন্ত মঞ্চ-ভীরু ছিলেন তিনি। ষ্টেজে প্রবেশ করে পা কাঁপতো, গলা শুকিয়ে যেতো, পার্ট ভুলে যেতেন বেবাক। একবার এক সহ-অভিনেতার প্রশ্নের উত্তর ভুলে গিয়ে ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলেন। দু'একবার আমতা আমতা ক'রে অবশেষে বলে উঠ্‌লেন—"এখানে নয় বন্ধু, এখানে নয়, বাজারের মধ্যে এসো। সেখানে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।" নাটক-বহির্ভূত এই কথাগুলি বলেই তিনি ষ্টেজ থেকে চম্পট দিলেন। তাঁর সহ-অভিনেতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম জীবনে এমনি ধারা বিড়ম্বনা ঘটেছিল একাধিকবার।

এই ভীরু নার্ভাস অভিনেতার পক্ষে লণ্ডনকে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্ত দুরাশা নয়? আর্ভিং নিজেই নিজের শক্তি সম্বন্ধে সন্ধিহান হলেন। উপলব্ধি করলেন, তাঁর অনন্যসাধারণ আবৃত্তি-ক্ষমতাও যেন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে! তাঁর চেয়ে অনেক নিম্ন-শ্রেণীর অভিনেতা তাঁর চোখের সামনেই তাঁর চেয়ে অনেক বড় হোয়ে গেল, কত নাম হল তাদের, বড় বড় অংশ তারা অভিনয় করতে লাগল, আর তিনি পড়ে রইলেন নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায়, ছোট ছোট ভূমিকায় মাঝে মাঝে সাফল্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু কোন চমক লাগাতে পারলেন না, না কর্তৃপক্ষের মনে, না দর্শকের মনে।

* * * *

সুদীর্ঘ দশ বছর এমনি ক'রে কাটলো। মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত নাটকের মহৎ চরিত্র অভিনয় ক'রে যিনি দর্শকচিত্ত জয় করতে চেয়েছিলেন তাঁকে বাধ্য হ'য়ে পেটের দায়ে ছোট ছোট চুটকি ভূমিকা অভিনয় ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে হল। কখনো বা ভাঁড়ের ভূমিকা, কখনো বা সয়তানের ভূমিকা! এক সীন, দু' সীনের পাট! সামান্য মাহিনা আর নিম্নশ্রেণীর রাহা খরচ। কোথায় গেল প্রাণের সেই আকুল কামনা, সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করবার সেই বহু বিনিদ্র রজনীর গোপন সাধনা? জীবন সম্বন্ধে হতাশ হলেন আর্ভিং। সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠল।

দিগন্তবিস্তীর্ণ নিরাশার অন্ধকারের মধ্যেও আর্ভিং-এর শিল্পী-মন একেবারে ভেঙে পড়ে নি এবং সেই মন সক্রিয় ছিল বলেই একদিন যে সুযোগ এলো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন শুনি। কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রেন্-ভ্রমণের সময় রেলের কামরায় আর্ভিং এক বিচিত্র-চরিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসেন। এক কামরায় দুটি মাত্র যাত্রী। আলাপ হওয়া স্বাভাবিক। হাত-পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে আর্ভিংএর সহযাত্রী কথা আরম্ভ করলেন। সাড়ম্বরে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি নাকি একজন বড়দরের ফরাসী ভূম্যধিকারী। মস্তবড় জমিদারী ছিল। এখন অবিশ্যি পড়তি দশা। তাহলেও মরা হাতি লাখ টাকা। জীবনের নানা রঙীন ঘটনা বিবৃত করলেন রীতিমতো নাটকীয় ভঙ্গিতে। আর্ভিংকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি ভাগ্যক্রমে একজন অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন।

অনুসন্ধিৎসু এবং পর্য্যবেক্ষণশীল মন নিয়ে আর্ভিং যাত্রীটির বাচন-ভঙ্গী, হাত পা নাড়া, চোখের ওঠানামা, ভুরু কোঁচকানো, আর ঠোঁটের বাঁকা রেখা—এক কথায় লোকটির আচরণ আর কথার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছিলেন, আর মনের মধ্যে তাদের ছাঁচ তুলে নিচ্ছিলেন। একটি বিশেষ টাইপ চরিত্র। এই চরিত্রটিকে যদি কোনদিন কোন ভূমিকার মধ্যে রূপায়িত করা যায় তো একটা চরিত্রসৃষ্টি হয় বটে! অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ উপস্থিত হল। Two Roses নামক নাটকে নায়ক ডিগ্‌বি গ্রাণ্ট-এর ভূমিকা অভিনয় করবার জন্যে তিনি নির্ব্বাচিত হলেন। ডিগ্‌বি গ্রাণ্ট একটি বিকৃত এবং বিচিত্র টাইপ চরিত্র।

লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় মিস্ এলেন টেরী

সেই চরিত্রাভিনয়ে অদৃষ্টপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আর্ভিং ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে দর্শকদের পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়ে দিলেন। তাঁর অভিনয়ে ডিগবি গ্রাণ্ট যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। সেই চরিত্রের রূপদানে আর্ভিং স্মরণ করেছিলেন ট্রেনের সেই লোকটিকে। তার প্রত্যেকটি বাক্য আর অঙ্গচালনা দিয়ে নিজের চরিত্রটিকে তৈরী করেছিলেন। ফলে শুধু স্বাভাবিকই হয়নি সে-অভিনয়, উচ্চাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টির মহিমায় তা ভাস্বর এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

সাফল্য লাভ করলেন এতদিন পরে, পেলেন অগণিত দর্শকের অকুণ্ঠ

অভিনন্দন। কিন্তু পরিতৃপ্তি পেলেন না। কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করছে। আর্ভিং বুঝলেন, এ খ্যাতির স্থায়িত্ব নেই। নীচ-মনা, ভণ্ড এবং কুচক্রী ভূমিকার অভিনয় যতই ভাল হোক, সমাজ তাকে বেশীদিন মনে রাখে না। যে-ভূমিকায় কোন মহৎ আদর্শ নেই তা দর্শকদের চিত্তে চিরদিনের স্থান লাভ করতে পারে না। সুতরাং এ-পথে নয়। শেক্সপীয়র! তোমার জন্যে আর্ভিং-এর সাধনা কি কোন দিন রূপলাভ করবে না? আর্ভিং বুঝলেন, নিজের সম্পূর্ণ অধীনে কোন রঙ্গমঞ্চ না থাকলে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ কোনদিনই সম্ভব হবে না। অসাধারণ চরিত্রবল আর সাহস ছিল মনে। একাদিক্রমে তিনশ' রাত্রি ডিগবি গ্রাণ্টরূপে মঞ্চাবতরণ করবার পর তিনি সেই থিয়েটারের কাজে ইস্তফা দিয়ে এক অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের গতিপথে ছুটলেন।

সেই সময় মিঃ বেটম্যান নামে এক ভদ্রলোক লণ্ডনের লাইসিয়ম থিয়েটার ইজারা নিয়েছিলেন। লাইসিয়ম চালানোর খরচ বিস্তর। শ্বেতহস্তীর মতো সেই রঙ্গমঞ্চ বেটম্যানকে বিব্রত ক'রে তুলেছিল। আর্ভিং তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর থিয়েটারে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডিগবি গ্রাণ্ট-এর অভিনেতারূপে তাঁর তখন খুবই নাম-ডাক। বেটম্যান সহজেই রাজী হলেন। সর্ত্ত হল, প্রথম সুযোগেই আর্ভিং নিজের পরিচালনায় শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করবেন। খ্যাতি অর্জ্জনের শেষ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

লাইসিয়ম কিন্তু চলল না। লালবাতি জ্বলে আর কি! বেটম্যান নোটিশ দিলেন। অকূল পাথার! সেই সময় একদিন আর্ভিং এক নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেটম্যানের ঘরে ঢুকলেন। লিওপোল্ড্ লুইস নামে এক অখ্যাতনামা নাট্যকার একটি ফরাসী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। নাটকের নাম The Bells। আর্ভিং বললেন, এই নাটকের অভিনয় করে তিনি লাইসিয়মকে বাঁচাবেন। হাসলেন বেটম্যান। সেই নাটকের খ্যাতি তাঁর অজানা ছিল না। বললেন—"নায়কের ভূমিকা অভিনয় করবে কে?" আর্ভিং বললেন—"আমি করব।" "তুমি?" আবার হাসলেন বেটম্যান।

সেই নাটকের নায়ক এক নগরপাল। এক শীতের রাত্রে টাকার লোভে সেই নগরপাল এক ইহুদিকে হত্যা করে, তারপর সারা জীবন ধ'রে ইহুদির গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি শুনে পাগলের মতো জীবন কাটায়। কঠিন চরিত্র, নানা সংঘাতে জটিল। সেই চরিত্র অভিনয় করবে আর্ভিং! কিন্তু আর্ভিংও নাছোড়বান্দা! অবশেষে নাটকখানার রিহারস্যাল শুরু হল। থিয়েটারের মালিক নাটকের প্রতি বিরূপ, অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তেমন মন দিয়ে রিহারস্যাল দেয় না। জঘন্য প্রতিকূল অবস্থা। সেই অবস্থায় আর্ভিং অদম্য উৎসাহে নগরপাল ম্যাথিয়াসকে রূপায়িত করবার সাধনায় মগ্ন হলেন। আত্মপ্রত্যয় আর দৃঢ়বিশ্বাসে উদ্দীপিত হয়েছেন তিনি। মঞ্চাভিনয়ে নূতন যুগের সূচনা করবেন তিনি ম্যাথিয়াসের মাধ্যমে।

মন্থর গতিতে মহলা চলল। এদিকে দুঃসংবাদ এলো, প্যারিসে সেই নাটকের অভিনয় চরম অসাফল্য লাভ করেছে। আর্ভিং খোঁজ নিলেন, ট্যালিয়েঁ নামে যে ফরাসী অভিনেতা ম্যাথিয়াসের ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর অভিনয় কেমন হয়েছে। যখন শুনলেন যে ট্যালিয়েঁর সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর অভিনয়-ধারার বিস্তর ফারাক, তখন মনে মনে উল্লসিত হলেন আর্ভিং। আসল ম্যাথিয়াস তাহলে এখনো জীবন্ত হয় নি। আর্ভিং তাকে জীবন্ত করবেন।

কিছুদিন পরে "দি বেল্‌স্" মঞ্চস্থ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের অভিনয়-জগতে যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা ব'য়ে গেল। আর্ভিংএর অভিনয়ে স্তম্ভিত হল সবাই। পনেরো বছরের সাধনা সফল হল। যুগান্তকারী শ্রেষ্ঠ নটরূপে আর্ভিং স্বীকৃতি লাভ করলেন। নাট্যজগতে হেনরি আর্ভিং-এর ম্যাথিয়াস অভিনয়-শিল্পের চরম উৎকর্ষ রূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করল। অনেক অভিনয় করেছেন তিনি, লোকে তাদের মনে রেখেছে—কি না রেখেছে তার প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর সময়কার দর্শকবৃন্দ তাঁর ম্যাথিয়াসকে কোনদিন ভোলেনি। পাঁচশত রাত্রির পরেও বহু অনুরোধ-রজনীতে তাঁকে ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হোতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, স্বর্গীয় নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "The bells" অবলম্বনে "শঙ্খধ্বনি" নাম দিয়ে একটি নাটক রচনা করেন এবং নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার প্রায় বিশ বছর আগে সেই নাটকের অভিনয়ে নগরপালের ভূমিকায় অনন্যসাধারণ রসসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন।

সফল হলেন আর্ভিং। তৃপ্ত হলেন। লাইসিয়মের পরিচালনার ভার নিজের হাতে নিয়ে শেক্সপীয়রের নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। সেই সময় রঙ্গজগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মিস এলেন টেরির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সংস্থাপিত হল। দু'জনে মিলে পর পর শেক্সপীয়র-এর নাটকগুলি অভিনয় ক'রে ইংলণ্ডের রঙ্গজগতে অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করলেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে উভয়ে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিনয়ের প্রতিটি আসর দর্শকে পরিপূর্ণ থাকতো। সে সময় দেশের রসিক সমাজে তাঁদের সম্মান আর জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না। আর্ভিং নাইট উপাধিতে ভূষিত হলেন। একজন নটের পক্ষে এ সম্মান একান্ত দুর্লভ ছিল তখনকার দিনে।

এক এক রাত্রে দু'জনে এমন প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ অভিভূত নিস্পন্দ হয়ে গেছে। হ্যামলেটের অভিনয়ের সময় হ্যামলেটরূপে আর্ভিং যে দৃশ্যে ওফেলিয়াকে ভর্ৎসনা করছেন সেই দৃশ্যে এক রাত্রে দর্শকবৃন্দ এমন অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল যে তারা একযোগে সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয় দেখছিল সে-খেয়াল পর্য্যন্ত তাদের ছিল না।

*　　*　　*　　*

যশ পেলেন প্রচুর। কিন্তু সংগ্রামের শেষ হল না। উপর্য্যুপরি কয়েকটা বিপর্য্যয়ে ভেঙে পড়লেন আর্ভিং। ১৮৯৮ সনে তিনি লাইসিয়ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

তারপর সাত বছর ধ'রে হৃতভাগ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি দেশের নানা স্থানে অভিনয় ক'রে বেড়ালেন। ১৯০৫ সালে ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে এক দীর্ঘ সফরে বেরুলেন। ১৩ই অক্টোবর ব্র্যাড্‌ফোর্ডে টেনিসনের রচিত "বেকেট" নামক নাটকে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করলেন। নাটকের শেষ লাইনে বেকেট বলছেন—"তোমার হাতে, হে ঈশ্বর, তোমার হাতে আজ নিজেকে সঁপে দিলাম।"

গভীর আবেগে সেই শেষ কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে মঞ্চের উপরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন আর্ভিং। সেই তাঁর শেষ কথা! সেই রাত্রেই তিনি মারা গেলেন। অগণিত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর করতালির ধ্বনি শেষ মুহূর্ত্তে এই কান ভ'রে শুনেছিলেন তিনি। জীবন-সংগ্রামে অর্থ-সৌভাগ্য তিনি লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু দেশবাসী যশের ও সম্মানের রত্নখচিত রাজমুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল এবং সেই পরম-ঈপ্সিত সার্থকতার অনুভূতি নিয়ে হেনরি আর্ভিং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।
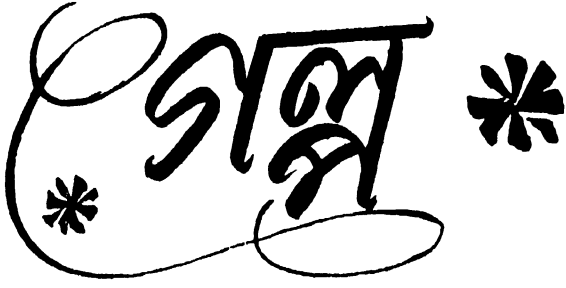
মঞ্জুর

শ্রীভোলানাথ গুপ্ত

নীরেন সামান্য একজন কর্ম্মচারী মাত্র। ছোট দুটি ছেলে আর স্ত্রী—এই তার সংসার। তার স্ত্রীর নাম অমলা। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অমলা, তাই স্বামীর কষ্ট সে বোঝে। প্রাণপণ চেষ্টা করে নীরেনের সামান্য আয়ের মধ্যে সংসার চালিয়ে নিতে। পরিশ্রম তার কর্ম্মশক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। নীরেন মাঝে মাঝে বলে, অত খাট কেন অমলা? গরীব হলেও দেহটা মানুষের; তার শক্তিরও একটা সীমা আছে।

অমলা হাসবার চেষ্টা করে বলে, কই এমন আর কিই বা খাটি। ছেলেদের দু'চারটে জামা প্যান্ট ময়লা হয়েছিল তাই কেচে দিলাম। আর বাসন বলতেও ওই কটা মাত্র জিনিষ।

নীরেন তর্ক করে না। কিন্তু দুশ্চিন্তায় তার মনে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অমলার স্বাস্থ্যও শেষে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তার দৃষ্টির দীপ্তি হয়ে আসে নিষ্প্রভ; কিন্তু তবুও সে খাটে। ছেলেদের শরীরের যত্ন নেয়, স্বামীকে সুখী করবার চেষ্টা করে। তার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়তে থাকে। নীরেন সাধ্যমত চিকিৎসা করায়, কিন্তু ডাক্তারের দৃষ্টিতে ও ললাটে দুশ্চিন্তার ভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বার বার মাথা নেড়ে বলেন, 'বিশ্রাম চাই, সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

ডাক্তারের কথায় অমলার দৃষ্টিতে দুঃখের হাসি ফুটে ওঠে। সে ভাবে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে ভগবান তাকে পাঠান নি। মধ্যবিত্তের সংসারে পরিশ্রমই আছে, বিশ্রামের অবকাশ নেই।

একদিন ডাক্তার স্পষ্টই বলে গেলেন—হাসপাতালে দেবার চেষ্টা করুন। এ রোগের চিকিৎসা বাড়ীতে সম্ভব নয়—অত পয়সা আপনি পাবেন কোথায়? বাধ্য হয়ে নীরেন শেষে হাসপাতালের দরজায় কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। 'ইন্‌চার্জ্জ' বললেন 'সীট নেই।'

অনেক করে বলার পর তিনি বললেন, সীট হতে পারে যদি কোন বড় সরকারী-কর্ম্মচারীর সুপারিশ জোগাড় করতে পারেন। নীরেন সামান্য একজন কেরাণী। বড় সরকারী-কর্ম্মচারীর নাগাল তার আয়ত্তের বাইরে। তাই তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

এদিকে অমলার অবস্থাও দ্রুত মন্দের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে 'ইন্-চার্জ্জ' একদিন বললেন, এক কাজ করুন। একটা দরখাস্ত লিখে রেখে যান, যদি কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেন ত সীট্ পেতে পারেন! নীরেন নিজেকে ধন্য মনে করলে। দরখাস্তটা টেবিলের একধারে রেখে 'ইন্-চার্জ্জ' বললেন—রোজ একবার করে খবর নিয়ে যাবেন। মঞ্জুর হলেই জানাব। নীরেনের পক্ষে সংসারের কাজ ফেলে সকালে খবর নেওয়া সম্ভব হত না। কাজেই অফিস-ফেরতা রোজ একবার করে খবর নিত। কিন্তু প্রত্যহ সেই একই জবাব শুনত, 'এখনও হয়নি।'

নীরেনের পথ চেয়ে অমলা সময় গুণত। রোজই আশা করত আজ হয়ত সুখবর পাবে। কিন্তু নীরেনের দৃষ্টিতে কোন আশার আভাষই সে খুঁজে পেত না। ক্লান্ত স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকত। 'মানুষের জীবনে কেন এত কষ্ট? এ প্রশ্নের জবাব অমলা খুঁজে পায় না। তবু সে জানে—এমনি কষ্টই মানুষের জীবনে আসা সম্ভব, যদি মানুষ মানুষের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

রাত্রির নৈরাশ্য আলোর সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। পরদিন ঠিক নিয়মমতই সংসারের কাজ সেরে নীরেন অফিসে যায়। ফেরবার পথে সংবাদটুকুর আশায় যন্ত্রচালিতের মত হাসপাতালের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। যদি মঞ্জুর হয়ে থাকে! ছেলেদের অসহায় কচি মুখের দিকে চেয়ে অমলা স্বামীর অপেক্ষা করে। ভাবে এ নিয়ম মানুষের, একদিন

এর অবসান ঘটবেই। অন্যায়ের বনিয়াদ কখনও স্থায়ী হতে পারে না—ন্যায়ের প্রয়োজনে তার পতন সুনিশ্চিত।

হাসপাতালের দরোয়ানটাও নীরেনকে চিনে নিয়েছিল। শেষে সেও একদিন বললে—'হিঁয়াকা এ্যসই হাল্ হায় বাবুজী। আপ্ আউর মাত্ আইয়ে।'

নীরেন তবুও যায়। এ তার জীবন মরণ সমস্যা। হাসপাতালের দরোয়ান তার কতটুকুই বা জানে! সে কি বুঝবে ওই সামান্য একটু কৃপার আশায় কতজন পথ চেয়ে আছে! কর্ত্তৃপক্ষের অবসরের চেয়ে জীবনের অবসর অল্প। তাই কর্ত্তৃপক্ষ দরখাস্ত মঞ্জুর করবার আগেই অমলার ছুটী মঞ্জুর হয়ে গেল! পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিলে। মৃত্যুর আগে সে নালিশ জানিয়ে গেল।—সে নালিশ নিজের জন্য নয়, অসহায় দুটি ছেলের হয়ে সে নালিশ জানিয়ে গেল পৃথিবীর কাছে, তার অবিচারের বিরুদ্ধে।

অমলার মৃত্যুর প্রায় দিন দশেক পরে অফিস থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ একদিন হাসপাতালের 'ইন্-চার্জ্জের' সঙ্গে নীরেনের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আর এলেন না মশাই, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল। আপনাদের মোটেই দায়িত্ব জ্ঞান নেই।'

নীরেনের হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়ে গেল। কিন্তু সে ভাব দমন করে ম্লান একটু হেসে সে বললে—'কিন্তু আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হবার আগেই সে রুগীর ছুটী মঞ্জুর হয়ে গেল ডাক্তারবাবু।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরেনের দিকে তাকালেন।

নীরেন বললে, 'রুগী তার আগেই মারা গেছে।'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। তার পর অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—'কি অন্যায়! এর কোন মার্জ্জনা নেই।'

ভদ্রলোকের মন্তব্য শুনে নীরেন শুধু এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে, কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে আজ তার কর্ম্মচারীর মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে বিশ্বাস করে যে, অমলার স্বপ্ন একদিন সার্থক হবে—পৃথিবী থেকে অন্যায়কে একদিন মানুষের প্রয়োজনেই বিদায় নিতে হবে। সেই হবে পৃথিবীর প্রথম প্রভাত!

প্রতিবিম্ব

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রে কি ভাঁটা পড়ে? অশ্রান্ত জোয়ার উৎসারিত
উদ্‌ভ্রান্ত উত্তাল ঢেউ সংখ্যাহীন পর্বতপ্রমাণ,
শান্ত সে কদাচ কভু, অশান্ত মুহূর্তে উদ্বেলিত
দুরান্তের পথে পথে চলে তার অশ্রান্ত সন্ধান।
অনন্ত গভীরে তার মণি মুক্তা প্রবাল ছড়ান,
তবু কোন্ রত্নলোভে উন্মত্ত আবেগে ছুটে চলে,
বিশ্বের বিস্ময় কা'র বেদনায় সমুদ্র গড়ান
মর্মান্তিক আলোড়নে আকাশ দিগন্তে পড়ে' গলে'।
বিরাম বিশ্রাম নাই প্রমত্ত গর্জ্জনে চতুর্দিক
সচকিত সর্বক্ষণ; অর্থ তার কেহ নাহি জানে,
তবু হে আকাশ, কেন চেয়ে আছ সদা নির্ণিমিখ
জলোচ্ছ্বাস বাষ্প হয়ে অবিরাম ওঠে তোমা পানে।
হে আকাশ, মহাকাশ, সমুদ্র সে বক্ষের পাথারে
অনায়াস ভঙ্গিমায় তোমার বক্ষের ছায়া ধরে,
ইন্দ্রধনু সপ্তবর্ণ, কালো মেঘে শ্রাবণ আঁধারে
সমুদ্র তোমার নিত্য আসঙ্গ লিপ্সায় ধরা পড়ে।
আজও এই সমুদ্রের এ বক্ষের নিতল অতলে
কি অশান্ত আলোড়ন, অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গিমা,
আমি জানি থরে থরে অজস্র মাণিক সেথা জ্বলে
এ বক্ষের জলোচ্ছ্বাসে ভাঙ্গে গড়ে রূপ তরঙ্গিমা।
কোথায় সমুদ্র আমি, কোন উর্ধ্বে আমার আকাশ
এ বক্ষের রূঢ় কক্ষে মণিরত্ন ধূলিবিমলিন,
নিশ্চিহ্ন ধূসর স্মৃতি আমারে করিছে পরিহাস,
আমার প্রবাল দ্বীপে দীপশিখা হয়ে আসে ক্ষীণ।
তবু ক্ষীণ আশা জাগে, কোনও এক কাল বৈশাখীতে
অপসৃত খণ্ড মেঘ রচিবে অখণ্ড অবকাশ,
প্রশান্ত আকাশ এক হয়ত বা পাইব দেখিতে
সমস্ত শূন্যতা মোর ভরি দিবে সেই যে আকাশ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতীয় সাহিত্য—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাম্য—"একটা নতুন কিছু কর।" সম্প্রতি অন্নমালাইএ (মাদ্রাজ) এক সাহিত্যিক সম্মিলনে, তিনি ভারতীয় সাহিত্যিকদিগকে "ভারতীয় সাহিত্য" সৃষ্টি করিতে আহ্বান করিয়াছেন। হয়ত সে জন্য ভারত সরকারের কিছু অর্থও ব্যয়িত হইবে। কিন্তু "ভারতীয় সাহিত্য" বলিলে কি বুঝিতে হইবে? জওহরলাল বলিয়াছেন, তিনি জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ, মনোভাবে মুসলমান। তিনি কি তবে হিন্দু সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য ও মুসলমানের সাহিত্য—এই তিনের অস্বাভাবিক সমন্বয়ে এক সাহিত্য রচনার স্বপ্ন দেখিতেছেন? সে সাহিত্য কি? জওহরলাল কি মনে করেন, কোন রাষ্ট্রনায়ক ইচ্ছামত সাহিত্য সৃষ্টি করাইতে পারেন। একটি গল্প আছে, আমেরিকার কোন হঠাৎ-ধনী ইংলণ্ডে আসিয়া তথায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণাস্তৃত প্রাঙ্গণ ("লন") দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যত ব্যয়ই কেন হউক না, তিনি সেইরূপ প্রাঙ্গণ করিবেন। কিরূপে তাহা করা যায় জিজ্ঞাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ প্রধান মালীকে ডাকিয়া সে কথা বলিলে মালী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"দুই শত বৎসর ঘাস কাটুন আর রোলার টানুন—তবে ফল পাইতে পারিবেন।" সাহিত্য জাতির সংস্কৃতির ফলে অনুশীলনের দ্বারা সৃষ্ট, এ জাতির ভাবধারায় পুষ্ট হয়। কাহারও আদেশে বা নির্দ্দেশে সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে, ভারতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির কথা বলিয়া জওহরলাল হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই—না পারিবার কারণ সহজে অনুমেয়। ভারতের তপোবনে বৈদিক যুগে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দীর সাধনায় ও অনুশীলনে—কালোপযোগী পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা যাহারা বুঝিতে অক্ষম তাহাদিগের সেই অক্ষমতার জন্য তাহারা কৃপার পাত্র। কিন্তু যাহারা তাহা না বুঝিয়া ঔদ্ধত্যবশে নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে তাহারা যে রাষ্ট্রে পরিচালন ক্ষমতা লাভ করেন, সে রাষ্ট্রের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য।

জওহরলাল ভারতীয় সাহিত্য নামক "বাবুর্চ্চিখানার ফলার" পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ চেষ্টা "ব্যাস-কাশী" রচনার মতই হইবে। কারণ, ভারতীয় সাহিত্য ভারতবাসীর সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহাকে অন্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চোরা-বালুতে সৌধ রচনার মতই ব্যর্থ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের লোক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য অর্থব্যয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং সে জন্য নাকি কোন কোন ব্যক্তিকে ভারও দিয়াছেন। সে বাবদে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে এবং আরও কত ব্যয়িত হইবে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে আমরা আশা করি, লোক-সাহিত্যের সহিত যাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের একান্ত অভাব সেই প্রধান-সচিব মনে করেন না যে, বাঙ্গালার লোক-সাহিত্যের গবেষণার জন্য জাপানে বা চীনে বা কামাস্কাট্‌কায় গমন প্রয়োজন। লোক-সাহিত্যের সহিত প্রবন্ধের বা উপন্যাসের সম্বন্ধ কি ও কিরূপ, তাহাও বিবেচনার বিষয় নহে কি? লোক-সাহিত্য লোকের আন্তরিক কামনাকে আশ্রয় করিয়া যেমন বিকশিত হয়, তেমনই সমসাময়িক অবস্থায় ও ঘটনায়ও তাহা প্রস্ফুটিত হইতে পারে। শেষোক্ত কারণে সে সাহিত্যে সামাজিক—এমন কি রাজনীতিক ইতিহাসের উপকরণে পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালার লোক-সাহিত্যে পলাশির যুদ্ধের, নীল বিদ্রোহের, বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সে সকল সংগ্রহের উপযুক্ত বটে, কিন্তু সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা সকলের থাকে না; কারণ, সেজন্য যে আন্তরিক দরদের প্রয়োজন, তাহা দুর্লভ। সে অবস্থায় অর্থব্যয় হইলেও শিব গড়িতে অন্য কিছুর গঠন হইতে পারে।

যে রাজা ক্ষমতাগর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্য কি জওহরলাল জানেন না?

নূতন ঋণ—

ভারত সরকার আবার ঋণের জন্য ভাণ্ড লইয়া লোকের দ্বারস্থ হইয়াছেন। এ বার ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্য বাক্যবিশারদ প্রধান মন্ত্রী জওহরলালের প্রয়োজন হইয়াছে। উদ্দেশ্য—ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ। ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় প্রথমে যেরূপ ধার্য্য করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। সুতরাং পরিকল্পনা সম্বন্ধে লোকের আস্থার মূল যদি শিথিল হয়, তবে লোককে সে জন্য দোষী বলা সঙ্গত হইবে না। সকলেই জানেন, দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা হইতে সিঁদরীর সারের কারখানা পর্য্যন্ত বহু পরিকল্পনায় যেমন, পশ্চিমবঙ্গে পরিবাহন-পরিকল্পনা হইতে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ পরিকল্পনা পর্য্যন্ত—নানা পরিকল্পনায় বহু অর্থের অপব্যয় হইয়াছে এবং সে জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহাদিগকে দণ্ড দান করা হয় নাই। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে—দামোদর পরিকল্পনায় কোণারে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করায় এক কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা—অপব্যয়িত হইয়াছে। কে বা কাহারা ইহার জন্য দায়ী? যাহারা দায়ী তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ অর্থ

আদায়ের অবশ্যই কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে কি?

ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে যে ঋণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, সকল ক্ষেত্রে তাহা পাওয়া যায় নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, বাজার তাঁহারা বুঝেন নাই। সেই জন্যই কি অর্থ-মন্ত্রী বলিয়াছেন—বাজেটে ঘাটতিই ভাল? বাজেটে ঘাটতি হইলে তাহা ঋণের দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। কিন্তু যদি ঋণ পাওয়া না যায়, তবে অবস্থা কি হয়? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি পরিশোধ্য হয়, তবে রাষ্ট্রের শক্তি কত দিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে? চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে যেদিন অচল হইবে, সেদিন হয়ত যাঁহারা বিচার-বিবেচনা না করিয়া রাষ্ট্রের স্কন্ধে ঋণভার ন্যস্ত করিয়া "ভেসে নাও দু'দিন বই ত নয়"—নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—তাঁহারা সচিবসঙ্ঘে বা ইহলোকে থাকিবেন না—কিন্তু দেশবাসী কি তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে অভিসম্পাতই করিবে না?

পরিকল্পনাগুলি কত দিনে রূপ গ্রহণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে যে সন্দেহের অবকাশ নাই, এমনও নহে এবং সম্পূর্ণ হইলে সে সব যে লাভজনক হইবে, এমনও বলা যায় না।

ঋণ কেবল স্বদেশেই গৃহীত হইতেছে না—বিদেশের নিকটও সাহায্য গৃহীত হইতেছে এবং বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করায় মিশরের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষ বিদেশী বিশেষজ্ঞের, যন্ত্রপাতির ও আর্থিক সাহায্য লইয়া যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, সে সকলে যে, আন্তর্জাতিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, বাধা পড়িতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। দেশে যদি অর্থের, যোগ্যতার ও উপকরণের অভাব দূর করিবার চেষ্টা—পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে করা হয়, তবেই সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, নহিলে "ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না"—হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

ঋণের উপর ঋণ পুঞ্জীভূত করা সমীচীন নহে। ফরাসী নাট্যকার মোলেয়ারের কৃপণের ভাণ্ডারীর উক্তি সমীচীন—প্রভূত অর্থ পাইলে যে কেহ ভাল ভোজের ব্যবস্থা করিতে পারে, যে অর্থ না পাইলেও ভাল ভোজের ব্যবস্থা করিতে পারে, সে-ই প্রশংসনীয়।

আমরা আশা করি, সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার প্রয়োজন ব্যতীত—"আশার ছলনে ভুলি" ঋণ বৃদ্ধি করিবেন না।

সমবায় সমিতি—

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশে সরকার আইন করিয়া সমবায় সমিতির প্রবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রসডেল সহরে কয় জন শ্রমিক সমবায় নীতিতে পণ্য ক্রয় করিয়া আপনারা তাহা কিনিয়া লাভবান হয়। সেই সমিতির ক্রমোন্নতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং তাহার পরে নানা ক্ষেত্রে সমবায় নীতিতে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেনমার্কে—সমবায় পদ্ধতিতে শিল্প প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং বহুদিন সমবায় নীতির সাফল্য লক্ষ্য করিবার জন্য লোক ডেনমার্কের আদর্শ গ্রহণ করিত। কিন্তু জার্ম্মানী নানা দিকে ঐ নীতির প্রবর্ত্তনে এত সাফল্যলাভ করে যে, ইংলণ্ডের সরকার কাহিল নামক এক ব্যক্তিকে জার্ম্মানীতে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত সমবায় পদ্ধতি অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ অর্থাৎ রিপোর্ট পাঠ করিলে এই নীতি সুপ্রযুক্ত হইলে কিরূপ শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আয়র্লণ্ড দরিদ্র দেশ। তাহার অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে সার হোরেস প্লাংকেট প্রমুখ ব্যক্তিরা সমবায় নীতিতে কুটীর শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়া যে সাফল্য লাভ করেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, সমবায় নীতি সুপ্রযুক্ত হইলে সর্ব্বত্র—বিশেষ যে দরিদ্র দেশে মূলধন সুলভ নহে সেইরূপ দেশে—সহজে লোকের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

আজ পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে সমবায় নীতি সমাদৃত।

এ দেশে এই নীতি প্রবর্ত্তনের ইতিহাস আমরা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। আজ যখন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় "জয়ন্তী" উৎসব হইতেছে, তখন স্মরণ করা কর্ত্তব্য—প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ পুণায় কৃষি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তখন লর্ড কিম্বারলী ভারত-সচিব। তিনি ঐ পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করা নিষিদ্ধ করেন; কারণ, উহাতে যেরূপ সরকারী সাহায্য দিতে হয়, তাহা প্রদান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। প্রায় ঐ সময়ে সার রেমণ্ড ওয়েষ্ট আর একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহাও সরকারের সমর্থন বা অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। ইহার পরে মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার ভূমি ও কৃষি সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা রচনার ভার সার ফ্রেডরিক নিকলসনকে দেন। তিনি য়ুরোপে সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইলেও তাহার মত কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডুপার্ণে ফ্রান্স ও ইটালী দুইটি দেশে সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া "People's Bank for Northern India" নামক মনোজ্ঞ ও মূল্যবান তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন।

লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া এ দেশে আসিয়া লক্ষ্য করেন, ইংরেজ সরকারের আইনে মহাজন অর্থাৎ উত্তমর্ণ নালিশ করিয়া ঋণগ্রস্ত কৃষককে তাহার জমীতে বঞ্চিত করিয়া—ভূমিশূন্য বেকারে পরিণত করিতেছে। অবস্থা দিন দিন আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। সেই অবস্থার পূর্ব্বে যে সকল রিপোর্টের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকলে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তিনি রিপোর্ট লেখকদিগকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তাহার ফলে নূতন আইন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ ও পরবৎসর অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিধিবদ্ধ হয়।

সে আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বলা হয়, আইনের উদ্দেশ্য লোককে দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন করা ও স্বাবলম্বী করা। আইন বিধিবদ্ধ

হইলে লর্ড কার্জ্জন বলেন—সরকার তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, এখন দেশের লোককে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে অনেকে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও কয় জন সরকারী কর্ম্মচারীর প্রচার-কার্য্যের ও আন্তরিকতার ফলে—ইহা সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কৃষিতে সমবায় নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে সুফললাভের আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন ?—

"If the system of co-operation can be introduced and utilised to the full, I see a great and glorious future for the agricultural interests of the country."

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্দ্ধশতাব্দী কালে সমবায় পদ্ধতিতে আমরা আশানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারি নাই। সরকারের সতর্কতার অভাব, লোকের শিক্ষার দৈন্য ও দুর্নীতি তাহার কারণ। বিশেষ ভারত বিভক্ত ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কয় বৎসর বাঙ্গালায় সরকারের সমবায় বিভাগ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের খাসমহল হইয়াছিল এবং সেই সময়ে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানে লোকের আস্থা নষ্ট হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি, উটজ শিল্প, ভাণ্ডার প্রভৃতির উন্নতির জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

গত ১০ হইতে ২০ বৎসরে নানাস্থানে—বিশেষ পশ্চিম বঙ্গে নিবার্য্য কারণে বহু সমবায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি যেমন দুঃখের বিষয়, তেমনই ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে সকল স্থানে উপযুক্ত ও দুর্নীতিবর্জ্জিত কর্ম্মীর অভাব হয় নাই, সেই সকল স্থানেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে সমবায় নীতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় প্রকট হয়। সেই শক্তি সুপ্রযুক্ত করা প্রয়োজন।

আমরা গত অর্দ্ধ শতাব্দীর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সরকারের সমবায় বিভাগের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং সে বিভাগের সহিত জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত না হইলে ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। যে স্থানেই দুর্নীতি লক্ষিত হইবে, সেই স্থানেই কঠোরভাবে প্রতীকারের ও দণ্ডদানের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। সরকারের সমবায় বিভাগ যদি দপ্তরখানায় আপনার কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না রাখিয়া জনগণের সহিত সংযোগ রক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে উপযুক্ত কর্ম্মীর সন্ধান পাইতে পারেন এবং সেইরূপ কর্ম্মীর সহযোগে আন্তরিকতা সহকারে কাজ করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারেন তবেই কাজ হইবে। বিদেশী সরকারের পক্ষে তাহা হয়ত সহজসাধ্য ছিল না; কিন্তু স্বদেশী সরকার যদি বিদেশী সরকারের দৌর্ব্বল্য ও অসুবিধা অতিক্রম করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কিরূপে তাঁহাদিগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবেন ? দেশের লোক আজ সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছে। উত্তর লাভের অধিকারও আমাদিগের আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কার্য্যান্তরে দিল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে কোন কোন পত্রে প্রকাশিত হয়, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম বঙ্গের প্রধান-সচিবের "ব্যাস-কাশী" কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রী সরকারের নিকট করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে মোট ব্যয় ২ কোটি টাকা হইবে। সংবাদটি ভিত্তিহীন হইলেও ইহা সত্য যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান-সচিব কোন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার ব্যর্থ কল্পনার কেন্দ্র কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব যে করেন নাই, এমন নহে। কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনেও তাহাতে লোককে বাসজন্য আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত হইলে জনহীন প্রান্তরে কিছু লোকের বাস হইতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত করার বিষয় আমরা বারান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বলা যায়, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার স্থানাভাব ঘটিয়াছে।

আপাততঃ কয়টি বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের বিবেচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে :—

(১) নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগের অভিনয়াদিতে বাধা আছে। অথচ একদল ছাত্রছাত্রী দাবী করিতেছেন, তাঁহারা একত্র নাটকাভিনয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহেই—"বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ জন্য" করিবেন। অবশ্য অভিনয় এক বা দুই দিন হইলেও সে জন্য অনেক দিন তালিম দিতে হইবে এবং সে সময়েও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে একত্র থাকিতে হইবে। যদি ছাত্র ও ছাত্রীরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অভিনয় করেন, তবে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ আইনের নিষেধ শিথিল করিতে পারেন। এই অবস্থায় তাঁহারা আইনের নির্দ্দেশ মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ অভিনয় নিষিদ্ধ করিবেন কি না, তাহাই বিবেচ্য।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান নিয়োগের সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার চাকরীর আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে ইংরেজী অধ্যাপনা করিতেন; কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে বাঙ্গালা বিভাগের কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স নাকি নানা স্থানে নানারূপ লিখিত হইয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যে বয়স লিখিত আছে, তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই অধ্যাপক তাঁহার কার্য্যকালে কি অবদানে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, তাহাই এখন বিবেচনার বিষয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি, অনেকের মত এই যে, দীনেশচন্দ্র সেনের পরে যাঁহারা ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও কার্য্যে বাঙ্গালা সাহিত্য পুষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরববৃদ্ধি হয় নাই। দীনেশবাবুর পরে যিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল—নানা কারণে, ঐ পদে ছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ কালেই তাঁহার নিয়োগের নিন্দা

করিয়াছিলেন। হয়ত যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হয়ত সে কারণ দলগত ; কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ও দলমুক্ত ছিল না—এখনও আছে কি না, বলিতে পারি না। অবশেষে—তিনি বিদায় লইলে—বর্ত্তমান অধ্যাপকের নিয়োগ। ইনি এবার সিনেট ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিচালন সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। ইনি যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের গৌরব বিধানে সচেষ্ট, এমনও বলা যায় না। কারণ, ইঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের পদের তালিকা দীর্ঘ। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ও গৌরব বিবেচনা করিয়া যোগ্যতার আদর করিবেন।

(৩) কেন্দ্রী সরকার ১২টি চাকরীতে প্রতিযোগী পরীক্ষায় চাকুরীয়া নিযুক্ত করেন। সে সকল পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কেন আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে না, তাহা বিবেচনার জন্য ভাইস-চান্সেলার ছাত্রদিগের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কোন বিশেষ অসুবিধা থাকে, তবে তাহা দূর করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থাবলম্বনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রয়োজন হইলে তিনি হয়ত সে জন্য স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিতে পারেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদিগের নিকট হইতে যে এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, এমন বলা যায় না। সম্ভবতঃ—অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করেন নাই ; হয়ত তাঁহারা আপনাদিগের ত্রুটি স্বীকার করিতে চাহেন না। অথচ একদিন কেন্দ্রী সরকারের চাকরীতে বাঙ্গালীর সমধিক আদর ছিল। আমরা আশা করি, ভাইস-চান্সেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা পালনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) এ বার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে যাহা দেখা গিছে ; তাহাতে ভবিষ্যতে ভুলত্রুটি বর্জ্জনের জন্য কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ?

কংগ্রেস সম্মিলন—

বর্দ্ধমানে কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। "গোলাব-বাগে" অধিবেশন-স্থান হওয়ায় কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গল্প আছে, কোন সাহিত্যিক বর্দ্ধমানে যাইয়া "পঞ্চানন্দের" (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) দর্শনপ্রার্থী হইলে, তিনি প্রথমেই আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করেন—"গোলাপ বাগ দেখেছেন ?" তিনি "না" বলিলে ইন্দ্রনাথবাবু বলেন, "আমাকে দিয়া আরম্ভ করলেন ?" তাহার কারণ "গোলাপ বাগে" মহারাজার চিড়িয়াখানা ছিল। আজ "গোলাপ বাগে" সম্মিলন লইয়া রসিকতার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, বর্দ্ধমানের জমীদার মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব কংগ্রেসী ছাড়ে বর্দ্ধমান হইতে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া পরাভবের পরে—জমীদারী প্রথা বিলোপের পূর্ব্বে—বহু সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন—"গোলাপবাগ" সে সকলের অন্যতম। উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ভারমুক্ত করিয়াছেন। সরকার ও কংগ্রেস এখন একই মুদ্রার "এ পিঠ ও পিঠ।"

বর্দ্ধমানে এই সম্মিলনে দেশে উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই। তাহা যে হইবে না, তাহা কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনেই অনুমান করিতে পারা গিয়াছিল।

মামুলী প্রস্তাব অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। সে সকলের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় ; কারণ, অনেকগুলি কেবল সদিচ্ছার বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে—যতদিন কার্য্যে পরিণত না হয়, ততদিন সে সকলের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না।

সম্মিলনে প্রদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় দুইটি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল :—

ফরাক্কায় বাঁধ।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করিবার দাবী।

এই বিষয়দ্বয়ের অনেক আলোচনা ইহার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকার বা প্রধানসচিব কেন্দ্রী সরকারের নিকট যে ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের যুক্তি ও উক্তি উপেক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করেন না :—

(১) ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ

(২) বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান

(৩) রেল পুনর্ব্বিন্যাস

(৪) দুর্গাপুরে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা

ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব স্বয়ং বার বার ইহা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দিল্লীতে গিয়া দাবী পেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

বিহারের মানভূম প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ এবং পূর্ণিয়ার কতকাংশ বঙ্গভাষাভাষী। পশ্চিমবঙ্গ ঐ সকল দাবী করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। বিহার ঐ সকল স্থানে কিরূপে হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং সে চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামও জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নায়ক একদিন—অসতর্কভাবে—বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাহিনী লইয়া ঐ সকল অঞ্চলে অভিযান করিবেন। অবশ্য তিনি তাহা করেন নাই। ব্যবস্থা পরিষদে ঐ সকল অঞ্চল দাবীর প্রস্তাব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রধান-সচিব প্রস্তাব করান—ধানবাদ ও জামসেদপুর অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান—বাদ দিয়া মানভূমের অবশিষ্ট অংশ মাত্র পশ্চিববঙ্গকে দেওয়া হউক—অধিকারের হিসাবে নহে, পশ্চিমবঙ্গের স্থানাভাব হেতু। সে প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই।

রেল পুনর্ব্বিন্যাসে প্রতিবাদ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের প্রধান-সচিব যখন প্রস্তাব করেন, কলিকাতা কেন্দ্র পূর্ব্ববৎ রক্ষা করা হউক, তখন গোরক্ষপুরের সমর্থকগণ হাসিয়াছিলেন—বাঙ্গলার দাবী !

সরকারের ইস্পাতের কারখানা দুর্গাপুরে স্থাপিত করা হউক, এই প্রস্তাব লইয়াও প্রধান-সচিব দিল্লীতে গিয়াছিলেন। হইয়াছে—

"যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে।"

শুনিয়াছি, দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থীর শোচনীয় পরাভবে কেন্দ্রী সরকার বলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও রাষ্ট্রে প্রভাব—ঐ নির্ব্বাচনফলেই সপ্রকাশ। অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ সরকার যেমন—পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসও তেমনই জনগণসমর্থিত বলা যায় না। আমরা সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু সরকার যদি কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লোকের মনোভাব কিরূপ হওয়া অনিবার্য্য ?

দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণে বর্দ্ধমান জিলার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে, ইহাই বলা হইতেছে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ক্ষমতা কিরূপ? দেখা গিয়াছে, কোণারেই প্রায় দেড় কোটি টাকা অপব্যয়িত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে দামোদর পরিকল্পনার ব্যয় এইরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

কেন্দ্রী সরকার……	৪,৪৯,২৬,৭০৩	টাকা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার…	১১,৩৭,৮৮,৬২১	„
বিহার সরকার……	২,১২,৮১,৬৪৬	„

গত ২২শে এপ্রিল বিহারের ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীনগরনাথ সিংহ বলিয়াছেন, যথাকালে অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ে কাজ না হওয়ায় দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় লোকের আস্থা নষ্ট হইতেছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, যাঁহাদিগের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহারা অযোগ্য ও শিথিল-প্রযত্ন। ইঁহারা কাহারা? ইঁহারা স্বদেশী কি বিদেশী? যে পশ্চিমবঙ্গকে বর্ত্তমান বৎসরে ১১ কোটি টাকায়ও অধিক দিতে হইবে, সেই পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তব্যের স্বরূপ কি? বিহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, পূর্ব্বে ব্যক্ত করা হয়, দামোদরের জল নিয়ন্ত্রিত হইলে বিহারে ২ লক্ষ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইতে পারিবে, এখন দেখা যাইতেছে, মাত্র ১০ হাজার একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে! যদি ইহাই সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের জল পাওয়া যাইবে ত? সার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছিলেন, দামোদরের নিম্নাংশের কূলে যাহাদিগের বাস, জলে তাহাদিগেরই প্রথম ও প্রধান অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিমাণ অর্থ দিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রভুত্ব সেই অনুপাতে হওয়াই সঙ্গত। তাহা হইয়াছে কি?

আজ পশ্চিমবঙ্গের লোক এই প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার উত্তর দিবেন কি?

উড়িষ্যা-বিহার-পশ্চিমবঙ্গ—

বিহার পশ্চিমবঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া যে ভারত রাষ্ট্রের ঐক্যে বিপন্ন করিতে পারে এমন আশঙ্কার ও যে অবকাশ নাই, এমন নহে। বিহার যে দিক হইতেই কেন সাহায্য প্রাপ্ত হউক না, পশ্চিমবঙ্গ যে প্রতিহিংসা-পরবশ হইতে পারে, ইহা ভুলিয়া যাওয়া রাজনীতিক দূরদর্শনের পরিচায়ক নহে। পশ্চিমবঙ্গ বিহারীদিগের জন্য অবশ্যই "ডমিসাইল সার্টিফিকেট" ব্যবস্থা করিতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী চাকরীতে বাঙ্গালীর অধিকার প্রথম বিবেচ্য, এমন বলিতে পারে। বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষী সকলকে হিন্দী ভাষা-ভাষী করিবার যে চেষ্টায় বিহারী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও উৎসাহ দিয়াছেন, তাহার প্রতীকারে যে বাঙ্গালী হিন্দী ভাষার প্রচলনে বাধা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানরা বাঙ্গালা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়া দেখাইয়াছেন। মানভূম জিলায় টুসু আন্দোলনে যে ভাব সপ্রকাশ এবং সে আন্দোলন দমিত করিবার জন্য যে হীন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অপমানজনক এবং বাঙ্গালীর পক্ষে সে অপমানের প্রতীকার-পর হওয়া অসঙ্গত নহে। যে কংগ্রেস বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বাঙ্গালার দাবী—ইংরেজ শাসন কালে—স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই দাবী অস্বীকার করিয়া কি বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কলিপ্ত হইতেছেন না? ইহাই কি "সত্যমেব জয়তে"র নিদর্শন?

বিহার কেবল যে বাঙ্গালার সম্বন্ধে স্বীকৃত দাবী অস্বীকার করিতেছে এবং কংগ্রেস-কার্য্যে বিহারের পক্ষাবলম্বন করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিতেছে, তাহাই নহে; বিহারকে সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান প্রদান করায় উড়িষ্যা তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপে প্রতিবাদ করিতেছে। ঐ দুইটি ক্ষুদ্র স্থান উড়িষ্যাভুক্ত ছিল এবং দুইটিতে উড়িয়া ভাষাভাষীর তুলনায় হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যাও অল্প। অথচ কেন্দ্রী সরকার ঐ দুইটিকে বিহারভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে উড়িষ্যায় যে অসন্তোষের অগ্নি প্রধূমিত হইতেছে, তাহা যদি লেলিহান শিখা বিস্তার করে, তবে তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হইতে পারে। উড়িষ্যায় আন্দোলন ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রবল হইতেছে।

খাস বিহারে মিথিলা তাহার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে। মৈথিলী হিন্দী নহে—বাঙ্গলারই মত স্বতন্ত্র ভাষা। মৈথিল নেতারা দেখাইয়াছেন, বিহার সরকারের চাকরী প্রভৃতিতে মৈথিলীরা তাঁহাদিগের সংখ্যানুরূপ অধিকারে বঞ্চিত। মিথিলা তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা রক্ষা করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া উন্নতিলাভ করিতে আগ্রহশীল। সে জন্য মৈথিলরা আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন—বিক্ষোভও দেখাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণীর প্রান্তরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আগমন-পথে মিথিলার প্রতিনিধিরা পুলিসের দ্বারা আটক হওয়ায় মিথিলার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। কৈফিয়ৎ যাহাই কেন দেওয়া হউক না, মিথিলার জননায়কগণ কিছুতেই মনে করিতে পারেন না—কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে ঐ কাজ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে বিহারে আটক না করিয়া যে বাঙ্গালায় প্রবেশের পরে আটক করা হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহারী সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার মত আত্মসম্মানজ্ঞান দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের কেন্দ্রী সরকারের আনুগত্য যত প্রবলই কেন হউক না, তাহা

প্রশংসনীয় বলা যায় না। কেন্দ্রী সরকার সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এক সময় এক প্রদেশ ছিল। এখন বাঙ্গালা বিভক্ত—তাহার একাংশ ভিন্নরাষ্ট্রভুক্ত, বিহার উড়িষ্যা আর এক প্রদেশ নহে—দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। এইরূপ অবস্থায়ও যে বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তাহাই কি ভারত রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক? কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? বিহারই যে অনৈক্যের কেন্দ্র তাহা পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা অনুভব করিতেছে। কেন্দ্রী সরকারের কি তাহা অনুমান করিবার যোগ্যতাও নাই।

কেন্দ্রী সরকারের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রের পরিচয় দিতেছেন, তিনি অত্যন্ত নিরীহভাব দেখাইয়া বলিয়াছেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন ত আলোচনা করিয়া মিটাইয়া লইলেই হয়। বিষয়টি তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা যে হইতেছে না, সে জন্য কেন্দ্রী সরকারের দায়িত্ব কি নাই?

ভারত রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যদি অনৈক্য প্রবল হয়, তবে তাহা কাহাদিগের আনন্দের কারণ হইবে, আশা করি, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি কেন্দ্রী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আছে। মীমাংসা যদি ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা সন্তোষজনক ও স্থায়ী হইতে পারে। কেন্দ্রী সরকার কি সেই ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি অবলম্বন করিবেন? প্রীতি যে স্থানে প্রকৃত নহে, তথায় তাহার দৃঢ়তা আশা করা যায় না।

বিদেশী শাসনের চিহ্ন—

কলিকাতায় গড়ের মাঠে কতকগুলি বিদেশী (ইংরেজ) শাসকের মূর্ত্তি আছে। সেগুলি ভারতে ইংরেজ শাসনের চিহ্ন। তবে সেগুলি ইতিহাস-বিরুদ্ধ নহে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন, সেগুলিকে গড়ের মাঠ অর্থাৎ সকলের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরাইয়া—হয় কোন একটি প্রত্নাগারের মত স্থানে রক্ষা করা হউক, নহেত যাঁহাদিগের মূর্ত্তি তাঁহাদিগের দেশে—তাঁহাদিগের জিলায় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। দাসত্বের চিহ্ন মানুষ রাখিতে স্বতঃই বিমুখ হয়। মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫ বৎসরে স্থির করিতে পারিতেছেন না! কিন্তু ভারতে ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য বিদেশের শাসনের চিহ্নও আছে। হেমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

> "মমভাগ্যদোষে মম নেতৃগণ
> কক্ষ বক্ষ ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
> করিয়া আমার দুর্গ নিকেতন
> রাখিল মহীতে কলঙ্ক-মণ্ডিত।"

দিল্লীতে কুতব মিনার ও লাল কেল্লা, আগ্রায় তাজমহল ও দুর্গ—এ সবও বিদেশীর শাসন-চিহ্ন—ভারতের দাসত্বের প্রতীক। এগুলিও কি ভূমিসাৎ করা হইবে? আর হিন্দুর যে সকল মন্দির ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিজেতৃগণ নষ্ট বা কলুষিত করিয়া সে সকলের উপর আপনাদিগের ধর্ম্মাগার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, সে সকল কি আবার হিন্দুদিগকে ব্যবহার জন্য প্রদান করা হইবে?

বর্ত্তমানে ভারতের শাসনভার যাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাঁহারা এ বিষয়ে কি বলেন? কেবল কি ইংরেজদিগের মূর্ত্তিগুলিই অপসারিত করিলে যথেষ্ট হইবে?

কাশ্মীর সমস্যা—"শিরে সংক্রান্তি"—

কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান কোথায়? শেখ আবদুল্লা একদিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আজ তিনি কোথায়? তাঁহার সময়ে যেমন—এখনও তেমনই—বলা হইয়াছে, কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে কোন্ কাশ্মীর। কাশ্মীরের খাস কাশ্মীর, জম্মু ও লাডক ৩টি অংশ ব্যতীত সবই পাকিস্তানের হস্তগত হইয়াছে এবং প্রকাশ, গিলগিটে আমেরিকা ঘাঁটি রচনা করিতেছে—পাছে রাশিয়া অগ্রসর হয়। এই অবস্থায়ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী মহম্মদ আলী হুঙ্কার দিতেছেন, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান ব্যতীত ভারত রাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে। এই সমস্যা কিরূপ? পণ্ডিত জওহরলাল যে কাশ্মীরের ব্যাপারে বিদেশী-শাসিত জাতিসঙ্ঘের চরণে শরণ লইয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এখন তিনি যদি বলেন, কাশ্মীরের যে সামান্য অংশ এখনও পাকিস্তান-কবলিত হয় নাই, তাহা বিনা গণভোটে ভারতভুক্ত হইতে পারে এবং জাতিসঙ্ঘের নির্দ্ধারণ হয়—গণভোট ব্যতীত তাহা হইবে না, তবে ভারত সরকার কি করিবেন? যদি গণভোট গৃহীত হয়, তবে কি কাশ্মীর, জম্মু, লাডক তিন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে তাহা গৃহীত হইবে? না—এক সঙ্গে ভোট বিবেচিত হইবে? কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশ কি পাকিস্তানেরই থাকিয়া যাইবে? মহম্মদ আলির কথার অর্থ এই যে, কাশ্মীরের যে অংশ এখনও পাকিস্তানভুক্ত হয় নাই, তাহাও পাকিস্তানকে দিতে হইবে। সে বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কি? ভারত সরকার আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা যেমন পাকিস্তানও তেমনই "উড়ায় হেসে" করিয়াছেন। কাশ্মীরের জন্য ভারত সরকার কত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য কি পাইয়াছেন, তাহা কি ভারত সরকার দেশবাসীকে বলিবেন? কি কারণে জওহরলাল যুদ্ধবিরতির নির্দ্দেশ দিয়া জাতি-সঙ্ঘের মধ্যস্থতা চাহিয়াছিলেন, তাহা এক দিন তাঁহাকে বলিতেই হইবে। শেখ আবদুল্লার মত বিশ্বাসঘাতককে তিনি কেন প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা তিনি শ্যামাপ্রসাদকে বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র জাতি যখন তাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কি তিনি তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিবেন? তাহা সম্ভব নহে। তিনি যদি ভুল করিয়া থাকেন, বা যদি তাঁহার ভুল স্বীকার করিবার মত সৎসাহসও থাকে, তবে হয়ত তাঁহার ভাগ্যে হইবে—

> "Since he miscalled the
> Morning Star

Nor man, ner fiend has fallen
so far."

কাশ্মীরে ভারতের অধিকার লইয়া যে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ বাধিতে পারে, এমন আশঙ্কাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ যে যুদ্ধ—জয় নিশ্চিত জানিয়াও—জওহরলাল বর্জ্জন করিয়া জাতিসঙ্ঘের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, হয়ত সেই যুদ্ধই অনিবার্য্য হইবে এবং তাহার জন্য যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহার শেষ কোথায় তাহা কে বলিবে? যদি তাহাই হয়, তবে কি সে জন্য জওহরলালের যুদ্ধবিরতির নির্দ্ধারণই দায়ী মনে করিতে হইবে না?

বাজেটে পরিবর্ত্তন—

সরকারের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বাজেট রচনা করা ও তাহা প্রকাশ করিবার পরে তাহাতে অবিচলিত থাকাই সঙ্গত এবং তাহাই নিয়ম। কিন্তু ভারত সরকার সেই সাধারণ নিয়মও রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কৃত্রিম রেশমের উপর শুল্ক একরূপ ধার্য্য করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন তাহার প্রমাণ। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ব্যবসার বাজারে কিরূপ খেলায় কত লাভক্ষতি হইতে পারে তাহা সরকারের অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সরকারের এই ব্যবহারে মনে হয় "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।" হয় ভারত সরকার আবশ্যক বিবেচনা না করিয়াই প্রথমে শুল্ক ধার্য্য করিয়াছিলেন, নহেত তাঁহারা কোন অপ্রকাশ্য কারণে নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, নহেত বুঝিয়াছেন - ভুল করিয়াছিলেন এবং ভুলের ফল ভয়াবহ হইবে। যে কারণেই কেন পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকুক না, পরিবর্ত্তনে সরকারের সম্ভ্রমহানি হইয়াছে এবং সরকারের নির্দ্ধারণে লোকের আস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সরকার কি বলিবেন, যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত তাহার ঔষধ দিবার স্থান কোথায়? অন্য কোন দেশে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে অর্থ-সচিবের অবস্থা কিরূপ হইবে?

ভারতে বিদেশীর অধিকার—

ভারত রাষ্ট্রে বিদেশীর অধিকৃত অংশগুলিতে বিক্ষোভ প্রবল হইতেছে। বিক্ষোভের প্রাবল্য ফ্রান্সের অধিকৃত পণ্ডিচেরীতেই সর্ব্বাধিক। পণ্ডিচেরীতে বিক্ষোভ মধ্যে মধ্যে হয়—এ বার তাহা পণ্ডিচেরীর অধিবাসীদিগের ভারতভুক্তির জন্য আগ্রহে এত প্রবল হইয়াছে যে, কতকগুলি গ্রাম ফরাসী সরকারের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা ভারতভুক্ত হইতে চাহিলেও ভারত সরকার সরাসরি তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম হয়ত ভারত সরকার মানিবেন। কিন্তু মানুষ মনে করে—যেমন—

"better rot beneath the sod
Than be tru to Church and State
While we are doubly false to God."

তেমনই মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন সে নিয়ম মানে না। কারণ নিয়ম মানুষের সৃষ্ট।

পণ্ডিচেরীর মত চন্দননগরও ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহা এখন ভারতভুক্ত—হুগলী জিলার একটি স্বতন্ত্র মহকুমায় পরিণত হইতেছে।

পর্টুগালের অধিকৃত গোয়ায় বিক্ষোভ প্রবল হইতেছে। পর্টুগাল তথায় সৈন্য-সমাবেশও করিতেছে।

উভয় স্থানেই যাঁহারা ভারতভুক্তির জন্য আগ্রহশীল তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয় স্থানেই স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন, ভারত সরকারের বহু ত্রুটি—ভারতভুক্তিতে অধিবাসীরা সুখী হইবে না। কিন্তু তাঁহারা মানুষের স্বাধীনতাপ্রিয়তার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন না যে—

(১) দেশ দরিদ্র ও ত্রুটিপূর্ণ হইলেও তাহার অধিবাসীরা যখন স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন তাহারা বৃহৎ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পরাধীনতার গ্লানি, সুশাসনের জন্যও, সহ্য করিতে পারে না।

(২) সুশাসনও কখন স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা সময় নানা স্থানে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমেরিকায় ও আয়ার্লণ্ডে ইহাই দেখা গিয়াছে।

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের আশ্রম সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিতেছে। তাহার বিশেষ কারণ—আশ্রম-মাতৃকা ফরাসী নারী। তিনি বিবৃতি দিয়াছেন, আশ্রম রাজনীতি বর্জ্জন করেন—মানুষের আত্মিক উন্নতির তুলনায় রাজনৈতিক ব্যাপার তুচ্ছ। সেই কারণে আশ্রমিকগণ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। অরবিন্দ পণ্ডিচেরীর ভারতভুক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার রাজনীতিক স্বপ্ন—ভারত—এক, স্বাধীন, অবিভাজ্য এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষ বিভক্ত করিয়া যখন ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্ট হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—এ কি স্বাধীনতা? ইহা ভগ্ন! ইহার প্রতীকার হইবেই। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে ভারতের এই ঐক্য দেখিয়াছিলেন, কি না—কে বলিবে?

বিদেশীর অধিকৃত মাহে সীমান্তেও চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে।

ভারত সরকার এই অবস্থায়—ভারতভুক্তিকামীদিগের সক্রিয় সমর্থন করিবেন কি না এবং করিলে কিরূপে করিবেন, তাহা বিশেষ বিবেচ্য।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল বলিতেছেন—স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতে বিদেশীর অধিকৃত স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু সকলেই জানেন—তাঁহার "bark is worse than his bite". এবং সেই জন্যই—বিশেষ কাশ্মীরের ব্যাপারে তাঁহার ব্যবহারের পরে—তাঁহার উক্তিতে কেহই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।—The bang of the Leputan big drums is always heard in the sesquipedalion sentences of his gaseous utterances. কিন্তু সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যে আজ বিদেশীর অধিকার সমূহের ভারতভুক্তি চাহিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবের প্রথম অভিব্যক্তি চন্দননগরে হইয়াছিল এবং সে অভিব্যক্তি সাফল্য-সমুজ্জলই হইয়াছে। যে কারণে সামন্ত রাজ্যগুলিকে ভারতীয় অধিকারে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই কারণেই বিদেশীদিগের অধিকৃত অংশগুলি ভারতভুক্ত করা প্রয়োজন। সে প্রয়োজন ভারত রাষ্ট্রের (বিভক্ত হইলেও) স্বায়ত্ত-শাসনলাভের মুহূর্ত্ত

হইতেই অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কায় ভারত সরকার আজও সে বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য উপায় অবলম্বন করেন নাই। অথচ উপায় অবলম্বন না করিলেও আর চলিতে পারে না। অর্থনৈতিক বয়কট বা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে যদি মীমাংসার পথ গৃহীত হয়, তবে হয়ত সাফল্য লাভ হইতে পারে। আমরা আশা করি, জওহরলাল অবিমৃষ্যকারিতাহেতু কাশ্মীরে যে ভুল করিয়াছেন, ফ্রান্সের ও পর্টুগালের অধিকৃত ভারতীয় স্থানগুলি সম্বন্ধে সে ভুল করিবেন না—তিনি করিতে চাহিলে ভারতবাসী তাঁহাকে—নিয়মতান্ত্রিক ভাবে—তাহা করিতে দিবেন না। তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতির মোহ যেন ভারতের অকল্যাণের কারণ না হয়।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর স্বায়ত্তশাসনাধিকার লুপ্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহার কারণ রাজনীতিক, যেহেতু—

(১) হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতারা তাহাতে কংগ্রেসী প্রাধান্যের অবসান—ভোটের দ্বারা—ঘটাইয়াছেন।

(২) কংগ্রেসী প্রাধান্যে যিনি ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তা ছিলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রিয়পাত্র এবং তাঁহাকে ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি করা হইয়াছে।

যে ত্রিবেদী নামক "আই, সি, এস" অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশন সরকার কুক্ষিগত থাকিবার সময়ে, তাহার পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় যাঁহার কীর্ত্তি কাহারও অবিদিত নাই—পারিবারিক দুর্ঘটনার পরে—তাঁহাকেই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালক নিযুক্ত করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকের সন্দেহের কারণ দৃঢ় করিয়াছেন। অবশ্য সরকার ক্ষমতা হরণের কতকগুলি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঈপের উপকথার নেকড়ে বাঘও ভেড়ার শাবকটিকে "আত্মসাৎ" করিবার পূর্ব্বে কারণ দশাইয়াছিল—জল ঘোলা করার অভিযোগ। কিন্তু হাওড়ায় যে আজও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার কারণ কি? হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী—কলিকাতা কর্পোরেশনের পরে—পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটী। তাহার ক্ষমতা লোপ করায় যে অনেকের মনে হইবে—

"গঠন ভাঙ্গিতে পারে, আছে নানা খল;
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে—সে বড় বিরল।"

তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ—

চলতি কথায় আছে—"কুড়ে গরুর ভিন্ন ডহর।" নানা প্রদেশে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহা বহাল রাখা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বলা হয়, "আর ভয় নাই! নিয়ন্ত্রণ রহিত হয়-হয়।" কার্য্যকালে কিন্তু কিছুই হয় না। কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল—কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী, বাঁশবেড়িয়া ও হুগলী-চুঁচুড়া—কেন্দ্র ৫টিতে ৩রা মে হইতে নিয়ন্ত্রণ রহিত করা হইবে। কিন্তু ২৬শে এপ্রিল ঘোষণা করা হইয়াছে চাউলের মূল্য লক্ষ্য করিয়া সরকার সে ঘোষণা বাতিল করিতেছেন। অর্থাৎ সরকার কয় দিনের মধ্যেই আপনাদিগের নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র লজ্জানুভব করেন নাই। এই লজ্জাজয়নৈপুণ্য ইতঃপূর্ব্বেও লক্ষিত হইয়াছে—ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনে পরাভূত প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে এবং নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীমতী রেণুকা রায়কে সচিবসঙ্ঘে গ্রহণ তাহার প্রমাণ। কলিকাতায় ব্যবসায়ীদিগকে নিয়মাধীনে চাউল বিক্রয়ের অধিকার দিয়া তাঁহারা চাউল ক্রয় করিবার পরে—সে অধিকার প্রত্যাহার করায় যে অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, চারিদিকে তাহার ব্যাপ্তি লক্ষিত হইতেছে। অবশ্য যদি নিয়ন্ত্রণ রহিত হয়, তবে ত—হইবে "Othello's occupation is gone" দল বজায় রাখা ইত্যাদির প্রয়োজন কি নিয়ন্ত্রণ বর্জ্জনে প্রধান বাধা হইতেছে? পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কি নিয়ন্ত্রণ প্রথা সহ্য করিতে থাকিবে?

বিহারে বাঙ্গালা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিহার সরকারের নূতন ব্যবস্থায় স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। বিহার সরকার যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান মঞ্জুর করিয়া বিশেষ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার পরে বিহারে বাঙ্গালীদিগের আর বলিবার কিছু থাকিতে পারে না, তাহা যে মিথ্যা হরেন্দ্রনাথ তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাতৃভাষায় ছাত্রকে শিক্ষালাভের আন্দোলন নূতন নহে। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে সেই আন্দোলন প্রবল হয় এবং সেই জন্য ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কেন্দ্রী শিক্ষা পরামর্শ সমিতির নির্দ্ধারণ—প্রথম পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল) পর্য্যন্ত ছাত্রের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার থাকিবে। বিহার সরকার সেই নির্দ্ধারণ মান্য না করিয়া তাহার বিরোধিতাই করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য উদার মনোভাবের পরিচায়ক না বলিয়া সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলাই সঙ্গত। বিহার সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়েও হিন্দীতে ছাত্রকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহা উদারতা নহে—সঙ্কীর্ণতা। বাঙ্গালার সরকার কি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-সমূহে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীর হিন্দীশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে নিষেধ করিবেন?

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড—

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কলিকাতায় একটি হাঙ্গামার জন্য সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত করিয়া বহু ছাত্রছাত্রীর যে নিবার্য্য

ক্ষতি করিয়াছেন, আমরা মনে করি, সে জন্য বোর্ডের কর্ম্মচারীদিগকে দণ্ডদান করা সঙ্গত। তাঁহারা কেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিনা-দোষে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কাহার দোষে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল হইয়াছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যে সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সেই সমিতির সিদ্ধান্তের সংবাদ কিরূপে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তাহা লইয়া বোর্ড চঞ্চল হইয়াছেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রশ্নপত্রগুলিও ত্রুটিশূন্য করিতে পারেন নাই! বোর্ডের সভাপতির ও সম্পাদকের দায়িত্ব কি বিবেচিত হইয়াছে? তাঁহারা কি এখনও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন? আজ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ও তাহাদিগের অভিভাবকগণ তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এ কথা কি সত্য যে, অনুসন্ধান সমিতি বোর্ডের সভাপতিকে আরও তৎপর হইয়া বোর্ডের কার্য্য পরিচালিত করিতে বলিয়াছেন? কোন লোকই কোন কাজে অপরিহার্য্য হইতে পারে না—এই সত্য স্মরণ রাখিয়া কাজ করা এবং অপরাধীকে দণ্ডদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের যাঁহারা কর্ম্মচারী তাঁহারা কখনই এই নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে থাকিতে পারেন না।

বৈদেশিকী

পাকিস্তান—

পাকিস্তানের পূর্ব্বাংশে নির্ব্বাচনে মসলেম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ফজলুল হক প্রধান সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন। সচিবসঙ্ঘ এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই এবং কোন হিন্দুকে এখনও তাহাতে গ্রহণ করা হয় নাই। ইতোমধ্যে ফজলুল হক করাচী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন, সংবাদ শুভ। অবশ্য তিনি সে বিষয়ে আর কিছু বলেন নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলেম লীগের পরাভবে কেহ কেহ অনেক আশাই করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য করিবার বিষয়:—

(১) ফজলুল হকের সহকর্ম্মী শহিদ সুরাবর্দ্দী পাক-আমেরিকা চুক্তি সম্বন্ধে সুর পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার দল ঐ চুক্তির নিন্দা করিয়াছিলেন। এখন সুরাবর্দ্দী বলিতেছেন, চুক্তিতে নিন্দার কিছু নাই। তবে তিনি এখনও সে বিষয়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলীর মত চুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা-কীর্ত্তন করেন নাই। শহিদ সুরাবর্দ্দীর পূর্ব্ব-পরিচয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইবেন না।

(২) যাঁহারা বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পাকিস্তান আর আপনাকে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিবে না, তাঁহাদিগের প্রতিবাদ আসিয়াছে অপ্রত্যাশিত দিক হইতে। সচিব আসরফ উদ্দীন চৌধুরী বলিয়াছেন—প্রকৃত ইসলাম রাষ্ট্র গঠিত করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। তবে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা সরিয়াতী শাসনই চাহেন কি না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

ফজলুল হকের নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে এক সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। করাচী গমনের ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ফজলুল হক দমদমে অবতরণ করেন নাই। তাহার পরে—১৭ই বৈশাখ তিনি কয় দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তিনি উভয় বঙ্গের মধ্যে যে সকল কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল দূর করিতে সচেষ্ট হইবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সে সকলের অপসারণ তাঁহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে না—পূর্ব্ববঙ্গের জনগণ যদি অপসারণ সমর্থন করে তবেই তাঁহার পক্ষে প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব হইবে—নহিলে নহে। কারণ, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাঁহাকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। তবে তিনি চেষ্টা করিলে যে ব্যর্থকাম হইবেন, এমন মনে হয় না; কারণ, যে সম্প্রদায় কতকগুলি স্বার্থপর লোকের উত্তেজনায় ও প্ররোচনায়, "মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান" বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা—বাঙ্গালী মুসলমানরা—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিক্ত ফলের আস্বাদ পাইতেছে ও পাইতেছে এবং সেই জন্যই ফজলুল হক বিপুল ভোটের আধিক্যে মসলেম লীগকে পরাভূত করিতে পারিয়াছেন। কাপড়, কয়লা, লৌহ, লবণ প্রভৃতি পাকিস্তানে দুর্ম্মূল্য এবং ভারত সরকার উদার না হইলে দুষ্প্রাপ্য হইত। আবার পশ্চিমবঙ্গকে বাধ্য হইয়া ধানের জমীতে পাটের চাষ করিতে হইতেছে! সুতরাং হয়ত বলা যাইবে—

"We have travelled from widely different points through the valley of disillusion and disappointment to meet at last by the unifying waters of a common suffering."

কিন্তু মিলনের কাজও যে সহজসাধ্য হইবে না ও হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিয়া ও মনে রাখিয়া কাজ না করিলে চেষ্টা সফল হইবে না। যে দল গর্ব্ব করিয়া বলেন—অহিংসার পথে ভারত বিনা-রক্তপাতে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করেন—এই স্বায়ত্ত-শাসন দেশ বিভক্ত করিয়া হইয়াছে এবং তাহার পরে যে রক্তপাত, গৃহদাহ, নারী-নির্য্যাতন, সম্পত্তি-নাশ প্রভৃতি হইয়াছে—তাহার কথা স্মরণ করিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কি ইহারও অধিক মূল্য দিতে হইত?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে যে মসলেম লীগ-সরকার কায়েম হইয়াছিল, তাহার—হিন্দুদিগের সম্বন্ধে—ব্যবহার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের স্বীকৃতি, সে সরকারের উদ্দেশ্য—হিন্দুদিগকে পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করা।

যে সকল হিন্দু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—যাহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অব্যবস্থায় শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে, কাশীপুরের পাট-গুদামে, বিহারের অব্যবস্থা-পঙ্কিল শিবিরে ও উড়িষ্যার অপরিচিত স্থানে বহু স্বজন হারাইয়াছে, তাহারা কি সহজে—সাহস করিয়া—পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে আগ্রহ করিবে? যাহারা ফিরিয়া যাইবে, তাহারা কি আর তথায় পূর্ব্বের পরিচিত পরিবেশ পাইবে? তাহাদিগকে কি আগ্নেয়-গিরির উপর বাসের অবস্থায় বাস করিতেছি, মনে করিতে হইবে না?

বিশ্বাস বহুদিনের ব্যবহারে সঞ্জাত হয়, কিন্তু তাহা নষ্ট করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। যে বিশ্বাস গিয়াছে, তাহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে বিলম্ব হইবে। কিন্তু যদি আন্তরিক চেষ্টা থাকে, তবে কালের ভেষজে ঘটনার ক্ষত দূর হইবে। আপাততঃ যদি "ভিসার" বিলোপে উভয় বঙ্গে গতায়াত সহজসাধ্য হয়; "পাসপোর্ট" প্রয়োজন কি না বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়; সংবাদপত্র, পুস্তক, শিক্ষার উপকরণ, ঔষধ প্রভৃতির অবাধ আমদানী-রপ্তানী করা হয়; ব্যবসার পথে বাধা যথাসম্ভব দূর করা হয় এবং তাহার পরে উভয় পক্ষের পরামর্শে আবশ্যক ব্যবস্থা হয়—তবে যে সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যে স্থানে ঘৃণার শর বিদ্ধ হইয়াছে, তথায় সম্প্রীতি সংস্থাপন সহজসাধ্য নহে।

যে মধ্যবিত্ত ও ধনীরা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া না যাইলে অন্য হিন্দুরা ফিরিতে সাহস পাইবেন না। ধন, প্রাণ ও মান—এই তিনের নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে। সেই জন্যই আমরা মনে করি—ফজলুল হকের ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের কার্য্য সহজসাধ্য হইবে না। তবে কাহারও আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হয় না। সেই জন্যই আশার অবকাশ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রধান বন্ধন—বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদিগের চেষ্টায় পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়াছে। ইহা সাম্প্রদায়িক ভাষা নহে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়!—

(১) পশ্চিমবঙ্গে নানা দলের দ্বারা কংগ্রেসী দলের অপসারণ যে দলাদলির জন্য সম্ভব হইতেছে না বুঝিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরা একযোগে কাজ করিয়া মসলেমলীগ সরকারের পরাভব ঘটাইয়াছেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তনে বাধা দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানে মুসলমান তরুণরা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রাখিবার জন্য প্রাণ দিয়াছে।

এখন যদি উভয় বঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকারদ্বয় উভয় বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের সম্মিলনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমধিক মনোযোগী হ'ন, তবে ভাল হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই—

(১) কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রথমে সম্মানিত করিয়াছিল।

(২) যদুনাথ সরকারের সাহায্যে বাঙ্গালার মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ এ বার বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন-ব্যবস্থা করিতে পারে।

আজ পূর্ব্ব পাকিস্থানে সচিবসঙ্ঘ-পরিবর্ত্তনে উভয় বঙ্গে হিন্দুদিগের মনে নূতন আশার উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু সে আশা আশঙ্কামুক্ত নহে। তাহা আশঙ্কামুক্ত করাই এখন প্রথম ও প্রধান কাজ। ফজলুল হকের সচিবসঙ্ঘ যদি তাহার ভিত্তিপতন করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি উভয় বঙ্গের বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

কাজ সহজসাধ্য নহে—কিন্তু ইহার আরম্ভও গৌরবজনক—ইহার সাফল্য স্বল্প হইলেও বাঞ্ছনীয়।

প্রধান-মন্ত্রী সম্মিলন—

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার রাষ্ট্রসমূহের প্রধান মন্ত্রীরা সিংহলে এক সম্মিলনে মিলিত হইয়া গত ২৮শে এপ্রিল হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত চারি দিন নানা সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। ইন্দোচীনের অশান্ত অবস্থা, কম্যুনিজমের প্রসার, ঔপনিবেশিক শাসন—এই সকলও তাঁহাদিগের আলোচ্য ছিল।

আজ স্বতঃই শরৎচন্দ্র বসুর কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে কাকাজু ওকাকুরা লিখিয়াছিলেন—এশিয়া এক। এশিয়ার ঐক্যেই যে তাহার আত্মরক্ষার ও পৃথিবীর কল্যাণের বীজ নিহিত, তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার উক্তি আবশ্যক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তবে তাহার পরে শরৎচন্দ্র বসু সেই মত বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইশেখকে—বৃটিশেরই মত—সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁহার ভুল দেখাইয়াছিলেন।

কি ভাবে শ্বেতাঙ্গরা এশিয়ার নানা দেশে শাসন বা শোষণ করিত তাহার উল্লেখে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জ্জনও বলিয়াছিলেন:—কোন কোন স্থানে স্থানীয় সরকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শোষণ কার্য্য পরিচালিত করেন:—

"দেশের সরকার অক্ষুণ্ণ রাখা হয়—But commercial exploitation and political influence are regarded as the peculiar right of the interested Power.

কিন্তু এশিয়া আজ আর সুপ্ত বা সুপ্তপ্রায় নহে। সে জাগিয়াছে। সে তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া প্রতীকার-তৎপর হইয়াছে। এই সময় এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ও পরস্পরের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ-সংরক্ষণ জন্য চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়, তবে তাহা শক্তিরই সহায় হইবে। কম্যুনিজমকে বাধা প্রদান আর সম্ভব কি না, তাহা বলা দুষ্কর; বিশেষ চীনকে বাদ দিয়া ব্যবস্থা—অবশ্য অনাক্রমণ চুক্তি ব্যতীত—সহজসাধ্য

হইবে না। উপনিবেশিক শাসনের অবসান প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। সেই শাসনই এশিয়ার অভিসম্পাত হইয়াছে—সর্ব্বাংশে অকল্যাণের কারণ হইয়াছে। ইন্দোচীনের ব্যাপারে যুদ্ধ-বিরতি লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে সুফল ফলিবে, এমন আশা আমরা করিতেছি।

বিশ্বে শান্তির প্রয়োজন যত অধিকই হউক না কেন—যত কাম্যই কেন হউক না—তাহার জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার ও শক্তির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সকলের শাসন-প্রণালী একরূপ নহে। তাহারাও যদি কতকগুলি বিষয়ে একমত হইয়া কাজ করিতে পারে, তবে তাহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগের সমবেত চেষ্টার সাফল্য যে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রকেও এই প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করিয়া একমত করিতে পারিবে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। কলম্বো সম্মিলনের গুরুত্ব সেই জন্য তাহার ফল দেখিয়া বিচার না করিয়া সম্ভাবনা দেখিয়া বিচার করিলে ভাল হয়।

এই সম্মিলনে যে সকল রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে যদি মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা যদি একযোগে কাজ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই যে যথেষ্ট সুফল ফলিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জেনেভা সম্মিলন—

জেনেভায় য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—শান্তির ভিত্তি দৃঢ় করা। মুখে যতই কেন শান্তির কথা বলা হউক না, সকলেই বুঝিতেছেন—অবস্থা যেরূপ তাহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাবমেরিণের ও বোমার (সাধারণ) ব্যবহার আরম্ভ হয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বোমার ব্যবহার; তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয়, তবে বহু দেশ নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ জার্ম্মানীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন, জার্ম্মানী বিজ্ঞানকে মৃত্যুর ও ধ্বংসের মুখে যুক্ত করিয়াছে। কিন্তু আজ? ইংলণ্ড আজ সকল বিষয়ে পশ্চাতে। কিন্তু আমেরিকা ও রাশিয়া—কে কত শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত করিতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই সকল বোমার শক্তি-পরীক্ষাও যে বিপজ্জনক তাহা বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার ব্যবহারে ভারতকেও আপত্তি জানাইতে হইয়াছে; কিন্তু সে আপত্তি কেহ কর্ণপাতের উপযুক্ত মনে করে নাই। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব কিরূপে—কোথায় হইবে, কেহ বলিতে পারে না। তবে দেখা যাইতেছে, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত আমেরিকা কেবল যে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছে, তাহাই নহে; সে রাশিয়ার মতবাদ-ব্যাপ্তি নিবারণ করিতেই সমধিক আগ্রহশীল ও ব্যস্ত। কিন্তু কম্যুনিজমের বিস্তাররোধ তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। চীনে আমেরিকা ও ইংলণ্ড (সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নেহরুও) ধনিকবাদের বন্ধু চিয়াং কাইসেককে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়াছিলেন—সে সাহায্য ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত সরকার চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারত সরকার কম্যুনিষ্ট চীনের অধীন তিব্বতের সহিতও চুক্তি করিয়াছেন। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও আমেরিকা চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক থাকিলেও জেনেভায়—কোরিয়ায় মীমাংসা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে চীনকে বাদ দিতে পারেন নাই, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং তাহাতে অবস্থার গতি বুঝিতে পারা যায়—হয়ত অনুমান করাও যায়।

জেনেভায় থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রী—কলম্বোয় এশিয়ার প্রধান মন্ত্রীদিগের মত—ইন্দোচীনে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব না করিলেও তথায় ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। সম্মিলনে এশিয়ার কোন রাজ্য বিভক্ত করার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের মূলে কি আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুখে শান্তির কথা বলিলে সুফল হইবে না সত্য, কিন্তু প্রয়োজন বুঝিয়া যে সকল পক্ষই শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে সম্মত, তাহাও মন্দের ভাল।

য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের ও আমেরিকার বিদেশ শাসন না হইলেও শোষণের কামনা যদি সংযত হয়, তবেই মঙ্গল। কারণ, শোষণ ও শাসনেরই মত সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই শোষণই প্রয়োজনে শাসন হয়।

মিশর—

মিশরের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে অশান্তির অভিনয়ে যবনিকাপাত হয় নাই। দেখা যাইতেছে সেনাবলের সহিত অন্যদলের সামঞ্জস্যসাধন হইতেছে না। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। মিশরের জনগণ স্বাধীনতা চাহিতেছিল—বিদেশীর প্রভুত্বে তাহারা জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহারা নামমাত্র স্বদেশী রাজার শাসনও ঘৃণ্য মনে করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় জাগরণের দ্বারা তথায় রাজাকে দূর করা হয় নাই—সে কাজ সেনাবলের চালকের দ্বারা হইয়াছিল। তাহার পরে নানারূপ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে। কিন্তু দিন পর দিন যদি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তবে দেশে শান্তির স্থান যেমন অশান্তি অধিকার করিবে তেমনই দিকে দিকে সমাজদ্রোহী স্বার্থ-অন্ধ ব্যক্তিরা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। মিশরের গণজাগরণ এখনও প্রকৃত পথ বাছিয়া লইতে পারে নাই বলিয়াই কি তাহার এই দশা?

২০শে বৈশাখ, ১৩৬১

ঝুটা ও আসল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(ফরাশী গল্প ঃ লেখক ঃ গীঁদ্য মোপাসাঁ)

মেয়েটি বয়সে কিশোরী···দেখতে সুশ্রী···ম্যশিয়েঁ লাতেঁ তাকে প্রথম দেখে পাড়ার এ্যাসিষ্টাণ্ট-চীফের বাড়ীতে এক পার্টিতে। লাতেঁর বয়স তরুণ···মেয়েটি সুশ্রী·· প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা এবং ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ।

মেয়েটির বাপ কোন্ গ্রামে ডাক্তারী করতেন। ক-মাস আগে মারা গেছেন। মেয়েকে নিয়ে বিধবা মা আসেন পারিতে···জানাশুনা বাড়ীতে মেয়েকে নিয়ে ঘোরেন-ফেরেন—মেয়ের যাতে ভালো একটি পাত্র জোটে। গরীব মানুষ—কিন্তু মান-সম্ভ্রম-বোধ আছে···ইজ্জৎ আছে···ভারী নিরীহ শান্ত-শিষ্ট মানুষ।

মেয়েটি যাকে বলে, কুলবধূ! লজ্জা-সরম-ধর্ম্মভয়··· বেশ। দেখতেও ভালো। তরুণ বয়সে ছেলেরা যেমন মানসী বধূর স্বপ্ন দেখে—মেয়েটি অবিকল তাই! চমৎকার তার গড়ন—মুখ চোখ নাক যেন শিল্পীর হাতে তৈরী! মনে মলা নেই—চোখের দৃষ্টিতে চমৎকার সারল্য। মেয়েটিকে যে দেখতো, সেই বলতো, এ মেয়েকে যে বিয়ে করবে—সে নিশ্চয় তপস্যা করছে!

ম্যশিয়েঁ লাতেঁ এ মেয়েকে বিবাহ করে ভাবলো, তার জন্ম সার্থক·· সংসার হবে সুখের!

হলো তাই! চাকরি করে সামান্য টাকা মাহিনা পায় লাতেঁ···মাহিনার টাকাগুলি এনে স্ত্রীর হাতে দেয়—স্ত্রী সেই টাকায় এমন গুছিয়ে সংসার করে—কোথাও এতটুকু অভাব নেই—অভিযোগ নেই! তার উপর কি পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে ঘর সাজানো। আসবাবপত্র কিছু নেই! অথচ ঐ মাহিনার টাকাতেই স্ত্রী সব গুছিয়ে নেয়! স্বামীর কাছে কোনো বিষয়ে বায়না করে না। স্বামীর মতে মত—স্বামীর সুখে সুখ। সকলে বলে, সুখের সংসার।

কিছুদিন পর···লাতেঁ দেখলো, স্ত্রীর থিয়েটার-দেখার ঝোঁক খুব। থিয়েটারে নতুন বই খোলা হলে প্রথম-অভিনয়-রাত্রে স্ত্রীকে যেতেই হবে থিয়েটার দেখতে। লাতেঁ প্রথম প্রথম আগ্রহ করে নিয়ে যেতো—কিন্তু পরে তার ভালো লাগে না! থিয়েটার দেখতে চাও···ন-মাসে ছ-মাসে একবার যাও! তা নয়, নিয়ম করে প্রত্যেকটাতে প্রত্যেকখানা নাটক-নাটিকার অভিনয় দেখা!

পাড়ায় কজন বড় বড় অফিসারের বাস। তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে বৌয়ের খুব ভাব। তাঁরা এসে বক্সের-টিকিট দিয়ে যান বৌকে···বৌ বলে স্বামীকে—পয়সা খরচ নেই! তো মানুষ ভালোবেসে টিকিট দিচ্ছে—বক্সের-টিকিট—চলো, দুজনে দেখে আসি। এ-কথায় স্বামী না বলতে পারে না। স্ত্রীর সঙ্গে থিয়েটারে যায়—বক্সে বসে থিয়েটার দেখে।

কিন্তু নিজের যাতে রুচি নেই···যাকে ভালোবাসি, তার রুচি মেনে মানুষ কতকাল এমন কাজ করতে পারে! লাতেঁ শেষে যায় না—বলে, না আমার ভালো লাগে না! তা ছাড়া দরকারী কাজ আছে! তুমি যাও। বৌকে একা যেতে হয়—বৌ একা যায়।

বৌয়ের আর এক সখ—যত ঝুটো জড়োয়া গহনা কেনে। লাতেঁ বলে—আমরা যে-দরের মানুষ—তেমনি থাকা উচিত। তোমার গায়ে এত জড়োয়া···পাঁচজনে হাসে না, ভাবো?

বৌ বলে—আহা, কি-বা এর দাম! এ সব নকল মুক্তো···নকল হীরে···নকল পান্নার জিনিষ।

আবার গরম প'ড়লো—
গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হ'চ্ছে কি ?
ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 247-X 52 BG
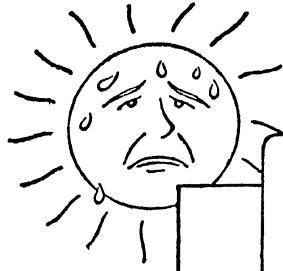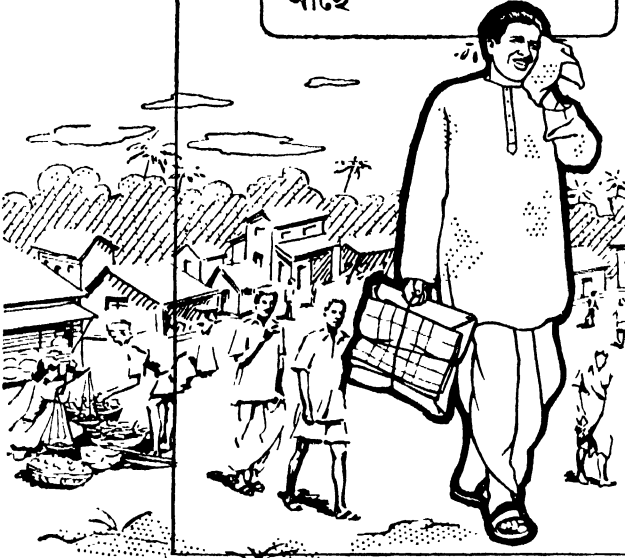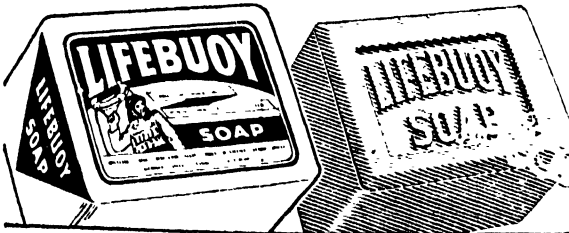
লাতেঁ বলে—এগুলো মানুষ পয়সা দিয়ে কেনে না··· পয়সা নষ্ট। ধরো, কখনো যদি বেচতে যাও—কি দাম পাবে ?

বৌয়ের মুখ হয় মলিন—চোখ হয় সজল। বৌ করুণ চোখে চায় স্বামীর পানে···স্বামীর মন ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে! সত্যি এ তার অন্যায়। বিয়ে করে দাসী-বাঁদী আনেনি ঘরে—বৌয়ের গহনার সখ-সাধ! স্বামীর সে-সাধ মেটাবার সামর্থ্য নেই—সেজন্য এতটুকু অনুযোগ না তুলে ঝুটো মতি-চুণীর-গহনা গায়ে দিয়ে যদি সুখ পায়। না—লাতেঁ বুকে জড়িয়ে ধরে বৌকে···তার মুখে চুমা দিয়ে বলে—না, না, পরো গো, তোমার গহনা পরো—আমি কিছু বলবো না আর। সত্যি, আমার হাতে যদি না পড়তে—বড় ঘরে তোমার বিয়ে হবার কথা—বড় ঘরে পড়লে সত্যিকারের চুণী-পান্না-হীরে-মুক্তোর গহনা পরতে পেতে—তাতে গহনাগুলোও সার্থক হতো···তোমারো হতো সুখ।

অভিমান-ভরে দুচোখ জলে ভরিয়ে বৌ বলে—যাও! তোমার এ ভারী অন্যায় কথা কিন্তু!···এমন কথা কখনো বলো যদি আবার···

—না, না, বলবো না—কক্‌খনো না। বৌকে বুকে চেপে ধরে লাতেঁ।

এমনি করে দিন কাটে। ভালোই কাটে। সুখে কাটে! লাতেঁর স্ত্রীভাগ্যের কত কথা লোকে বলে। বলে—রূপে গুণে লক্ষ্মী তোমার বৌ!

কিন্তু কি যে হলো···ভাগ্যে এ সুখ সহ্য হলো না। একদিন রাত্রে বৌ গিয়েছিল থিয়েটারে অপেরার অভিনয় দেখতে—ফিরতে কি করে ঠাণ্ডা লাগলো···সেই রাত্রেই ভয়ানক জ্বর—কাসি সর্দ্দি বুকে বেদনা। লাতেঁর দুচোখ উঠলো কপালে। ডাক্তার—চিকিৎসা···যতখানি সামর্থ্য, করলো। কিন্তু সব মিথ্যা করে আট দিনের দিন বৌ জন্মের মতো চোখ বুজলো।

পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল! আলো বাতাস···চক্ষের পলকে গেল উবে! পৃথিবীর এত রূপ, এত শোভা-মাধুরী—সব পাথর হয়ে গেল! লাতেঁ ওঠে না, বসে না··· বেরোয় না—স্ত্রীর সেই পালঙ্কে পড়ে আছে··· দুচোখে জলের ধারা··· মনে হাজার-সুখের স্মৃতির কণা···ফুলের গন্ধের মতো ভেসে বেড়ায়!

কিন্তু কাল···মরণজয়ী কাল···দুঃখহরা কাল···তার স্পর্শে আবার সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

লাতেঁ অফিসে যায়···কাজে মন বসে না। অফিসের মালিক ভালোবাসেন। তাঁর মনে দরদ আছে, মমতা আছে, তিনি বলেন—কাজ না হয় করো না লাতেঁ—মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্য অফিসে এসে বসো। পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচ রকম কথা কইতে কইতে মনের এ ভাব কাটবে। তবু—মানে, তোমার যা গেছে···

মালিকের কণ্ঠ বেদনায় দরদে গাঢ় হয়ে ওঠে!

দিন যায়···কিন্তু সেদিনের তুলনায়···এ কি দিন! যে-মাহিনার টাকায় বৌ অমন রাজা-সংসার গড়ে তুলেছিল—সবদিকে লক্ষ্মীশ্রী জাগিয়ে তুলেছিল—কোনো-দিকে এতটুকু অভাব নয়, অভিযোগ নয়···সংসারের কোথাও এতটুকু টুটা-ফাটা চোখে পড়েনি···এখন লাতেঁর হাতে সেই টাকায় কিছুতে কুলোয় না! এটা আনতে ওটা আনা হয় না! ভালো খাওয়া-দাওয়া তখন ছিল নিত্যকার ব্যাপার—এখন যাতা খেয়েও আয়ে কুলোয় না! জামা কাপড় ছিঁড়চে আবার নতুন জামা-কাপড় আনবে—তার পয়সা কোথায়? অথচ আগে এই টাকাতেই···

নিশ্বাস ফেলে লাতেঁ বলে—লক্ষ্মী···লক্ষ্মী···লক্ষ্মী··· আজ আমি লক্ষ্মীকে হারিয়ে লক্ষ্মীছাড়া···

ধার-দেনা হচ্ছে···সংসারের নিত্য-খরচে এ সব দেনা। শেষে এমন, এ ধার শোধ না করতে পারলে কোথাও আর ধার মিলবে না! উপায়?

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছে···হঠাৎ মনে হলো, একরাশ ঝুটো জড়োয়ার জিনিষ আছে মজুত···সেগুলো বেচে খানেক টাকাও হতে পারে তো! তাই করা যাক।

বেশ ভারী একটা মুক্তার মালা পকেটে ফেলে পরের দিন লাতেঁ বেরুলো···জহুরীর দোকানে যাবে। খানিক গিয়ে প্রথমেই বড় দোকান। লাতেঁ সে দোকানে ঢুকলো। মালিকের সঙ্গে দেখা। মালিকের হাতে মুক্তার নেকলেশ ছড়া দিয়ে লাতেঁ বললে—দেখুন তো—এটার দাম কত হতে পারে! মানে, এমনি যাচাই করতে এসেছি।

মালিক নিলে নেকলশ—তার দুচোখ এত বড় ··দেখে দেখে মালিক বললে—বেচবেন ?

—যদি বেচি ? কত দিতে পারেন ?

আবার নেড়েচেড়ে দেখে-শুনে মালিক বললে—দশ···না, বারো হাজার টাকা দিতে পারি।

লাতেঁ চমকে উঠলো ! বলে কি ! ঝুটো মুক্তোর এত দাম ! এ জানে, না ! নকলে-আসলে তফাৎ বোঝে না। কি মনে হলো, নেকলেশটা নিয়ে লাতেঁ বেরুলো দোকান থেকে।

তার পর দূরে···আর এক দোকান···আরো বড় দোকান। লাতেঁ গিয়ে মালিককে দেখালো—বললে—দেখুন তো, এটা কত টাকা দাম দিয়ে নিতে পারেন ?

মালিক নিলেন নেকলেশ হাতে···দেখে বললেন—ও · এ নেকলেশ · এ তো আমার দোকানের জিনিষ !

বললে কম্পিত কণ্ঠে লাতেঁ—কত দাম হবে ?

—এর ?···আমি পনেরো হাজার টাকা দামে এই নেকলেশটা বেচেছিলাম, এর জন্য দিতে পারি·· বলে' ভদ্রলোক কপাল কুঁচকোলেন—নেড়ে-চেড়ে বললেন—তেরো··· না, চোদ্দ হাজার দিতে পারি।

—কিন্তু · লাতেঁ যেন থ ! কোনোমতে বললে—কিন্তু এ মুক্তোগুলো আসল ? ঝুটো নকল মুক্তো নয় ?

—ঝুটো ! নকল ! মালিক বললেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন ? আপনার নাম ?

লাতেঁ বললে—আমার নাম লাতেঁ—মিনিষ্টার অফ দী ইনটিরিয়রের অফিসে আমি কাজ করি। আমি থাকি ২৬ নম্বর রুয়ে ভ্য মার্টার্স-এ।

মালিক তখনি দোকানের মোটা খাতা টেনে বার করলেন—বার করে খাতার পাতাগুলো উল্টে দেখলেন। একটা এনট্রিতে হাত দিয়ে তিনি দেখালেন—এই দেখুন এনট্রি···২৬ নম্বর রুয়ে ভ্য মার্টার্সএ মাদাম লাতেঁকে পাঠানো হয়েছিল···১৮৭৬ সাল ২০ জুলাই তারিখ।

মালিক তাকালেন লাতেঁর দিকে···লাতেঁর অপলক দৃষ্টি মালিকের মুখে নিবদ্ধ। কারো মুখে কথা নেই !

শেষে মালিক বললেন—এটা একদিনের জন্য আমার কাছে রেখে যেতে পারেন ? আমি অবশ্য রসিদ দেবো। মানে, তাহলে ভালো করে দেখে দাম বলতে পারবো।

—নিশ্চয়। আপনি রেখে ভালো করে দেখুন।

মালিক নেকলেশটা নিয়ে পাকা রসিদ দিলেন · লাতেঁ রসিদ পকেটে ফেলে দোকান থেকে বেরুলো।

পাগলের মতো এপথে ওপথে ঘুরলো—মনের মধ্যে যেন ভীমরুল আর বোলতা উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ! এত দামের গহনা তার স্ত্রী কি করে কিনলো ? এ টাকার স্বপ্নও তারা দেখেনি কোনোদিন। কেউ তাকে উপহার দিয়েছিল ? কিন্তু কে দেবে এত টাকা দামের গহনা ? কেন·· দেবে ? কখন দেবে ?···

মাথার মধ্যে মুহুর্মুহুঃ যেন বাজের হুঙ্কার। পৃথিবী দুলছে পায়ের নীচে। চোখে সব কেমন ঝাপ্‌শা হয়ে আসে !··· তার পর কখন ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী ফিরেছে ফিরে খাওয়া নয়, দাওয়া নয়···বিছানায় দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়েছে··· খেয়াল নেই।

পরের দিন সকালে উঠে অফিস যাবার উদ্যোগ·· মনের মধ্যে যা হচ্ছে···এ মন নিয়ে কাজ করা শক্ত ! কেবলি মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন তার পানে সকৌতুকে চেয়ে আছে · যেন বলছে, কি বলছে···মনে হতে রগ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। তার পর মনে হলো, আরো ঝুটো মতি-পান্নার গহনা আছে·· অনেকগুলো। সবগুলো বার করে রুমালে বাঁধলো—বেঁধে পকেটে ফেলে লাতেঁ চললো সেই জহুরীর দোকানে।

জহুরী বললে—হ্যাঁ···সাড়ে চোদ্দ হাজার দেবো ও নেকলেশের জন্য। আপনিই তো মাদামের ওয়ারীশন। ছেলে মেয়ে নেই ?

—না।

—একটা এফিডেভিট সহি করা শুধু···আমরা ব্যবস্থা করবো—তার খরচও আমরা দেবো।

লাতেঁ বললে—আরো কতকগুলো আছে।

সেগুলো মালিককে দেখানো হলো। দেখে যাচাই করে দর-দাম কষে মালিক বললেন—নেকলেশের জন্য সাড়ে চোদ্দ আর বাকিগুলোর জন্য তিন হাজার—সবশুদ্ধ সাড়ে সতেরো হাজার···দেখুন, যদি রাজী থাকেন ?

—রাজী···রাজী···এখনি রাজী !

এফিডেভিট হলো এবং গহনাগুলো দিয়ে নগদ সাড়ে

সতেরো হাজার টাকা পকেটে ফেলে লতোঁ যখন দোকান থেকে বেরুলো, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। খিদে যা পেয়েছে···মনে হচ্ছে, গাছ-পাথর পেলে তাও খায়!···

জহুরীর দোকানের সামনে বড় হোটেল। লাতেঁ গিয়ে হোটেলে ঢুকলো···সরেশ খানা—সরেশ সুয়ার অর্ডার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস। মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা করে লাতেঁ বললে—আমি আর চাকরি করবো না, স্যর··· পদত্যাগপত্র দাখিল করছি। মানে, আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন। আমাকে তিনি দিয়ে গেছেন নগদ সাড়ে সতেরো হাজার টাকা। এত টাকা···একা মানুষ···চাকরির কি আর দরকার!

মিনিষ্টার হাসলেন, বললেন—হুঁ···বেশ।

তার পর আমোদ আর প্রমোদ···থিয়েটার···পার্টি··· হোটেল···

যে-থিয়েটারে কখনো যেতে চাইতো না, এখন নিত্য সেই থিয়েটারে যায় লাতেঁ···ত্ব-চারজন সঙ্গিনীও ঠিক জোটে। থিয়েটার ভাঙ্গলে কোনো নাইট-ক্লাব···সেখানে সারা রাত হৈ-হল্লা!

তার পর আরো ছ-মাস! লাতেঁ আবার বিবাহ করলো। দ্বিতীয়-পক্ষটি ভালো···লজ্জা-সরম আছে··· থিয়েটার দেখার বাতিক নেই—গহনারও সখ তেমন নেই! পেটটাকেই সর্ব্বস্ব বলে জানে! আর কি মেজাজ! ছুতো খুঁজতে হয় না! নিজে থেকে লক্ষ ছুতো বানিয়ে সব সময়ে লাতেঁর সঙ্গে ঝগড়া! বাড়ী যেন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন!·· ঘরে লাতেঁ তিষ্ঠুতে পারে না—দ্বিতীয়-পক্ষের মেজাজের জন্য তার মনে সুখ নেই এক তিল!

শেষ

মরীচিকা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

মোর জীবনে তোমার আসা এমনি কি গো মরুর মায়া?
মেঘের ফাঁকে ক্ষণিক আলো—আবার নামে আঁধার ছায়া!
এমনি করেই চলবে কি গো তোমার আসার অলীক মায়া?
সাঁঝ-আকাশে যখন ফোটে তারার ডালি,
আমি তখন মোর কুটিরে প্রদীপ জালি।
মনের কোণে গভীর ব্যথা,
মরম-মাঝে কতই কথা,
না-বলারি বেদন নিয়ে আর কতদিন রইব হায়,
আসবে যদি এসোই তবে নিরাশা মোর হৃদয় ছায়।
মনে তোমার প'ড়ছে নাকো, সেই সে-দিনের সোনার সাঁঝ?
জীবন-পথে আসলে পরি' কল্পলোকের রঙীন্ সাজ;
আমায় তুমি বল্‌লে হেসে,
কতই গভীর ভালোবেসে
'আসবো আবার, বন্ধু আমার, দাও গো তুমি বিদায় আজ'
বিদায় দিনু, প'ড়ছে মনে সেই সে-দিনের সোনার সাঁঝ।
নাই বা তুমি এলে, জানি তুমি আস্‌বে না,
আশার বাণী মেলে বাঁশী তোমার বাজবে না।
রইব তোমার পথটি চেয়ে,
আঁধার যখন নামবে ছেয়ে,
সেই আঁধারে মিলিয়ে যাব জীবন-প্রদীপ জলবে না,
বাঁশী তোমার বাজবে যখন, বন্ধু তখন রইবে না।

"গণদেবতা"

হাসিরাশি দেবী

কাঠ কেটে আর লোহা পিটে পিটে দিবারাত,—
মানুষ তোমার যে রথ গড়াল' জগন্নাথ
সে রথ চ'লেছে অরণ্য আর
গিরিগহ্বর—
পিছন ফেলে,—
তুমি দেখ শুধু চক্ষু মেলি।

তুমি দেখ শুধু পলক বিহীন মেলিয়া আঁখি,
পথের উপরে কারা ভিড় করে তোমারে ডাকি!
কারা যেন কাঁদে! কারা যেন করে আর্ত্তনাদ!—
সংখ্যা অতীত কাদের শুষ্ক-শীর্ণ হাত
প্রার্থনা করে বিচার তোমার বারম্বার,—
রথ ছুটে চলে দুর্নিবার।
রথের চাকায়
ওরা পিষে যায়,—
রক্তের স্রোতে পাথর ডোবে,
শকুনীর দল ব'সে রয় তবু কাঁটার ঝোপে,
হিংসা কুটীল দৃষ্টি তাদের কাদের লাগি
দিবারাত্রির সতর্কতায় র'য়েছে জাগি,
তুমি কি জান না? তুমি কি জান না কারা তোমায়-
বার বার তোলে পূজার বেদীতে?—বিচার চায়?

লাক্স টয়লেট সাবান
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য

সৌন্দর্য্য বাড়াবার সুখবর! এখন আপনি বিশুদ্ধ, সাদা লাক্স টয়লেট সাবান এক বিশেষ বড় সাইজে পাবেন! এ সেই সুগন্ধি সাবান যা চিত্র-তারকারা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন—সেই রেশমের মত কোমল ফেনা আর মনোহর সুবাস এতে পাবেন! এখনই বড় সাইজের লাক্স টয়লেট সাবান কিনুন!

যেমন সাদা, তেমন বিশুদ্ধ আর সুগন্ধি

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 424-X52 BG

পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

শ্রীমতী পিক্‌চার্স প্রযোজিত অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের নব-বিধান' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি কাহিনীই সিদ্ধরস-সমন্বিত। তদুপরি তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী সংলাপ সহজেই মানুষের মনকে উদ্বেলিত করে। এ ছাড়া ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য ত আছেই।—কাজে কাজেই এতগুলি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রায় অধিকাংশ

নববিধানে ঊষার ভূমিকায় শ্রীমতী কানন দেবী (সাধারণ বেশে)

ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রযোজক ও চিত্রপ্রতিষ্ঠান তাঁহার অমরকাহিনীগুলির প্রতি আকৃষ্ট। এমন কি শরৎচন্দ্রের একই কাহিনীগুলি একাধিক-বার চিত্রে রূপায়িত হইতেছে। শরৎ-সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে, যে গভীর মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—চিত্রে ও নাট্যে সে বিশ্লেষণের যদিও স্থান নাই কিন্তু তার প্রভাবের স্পর্শে নাটকীয় চরিত্রগুলি সহজেই জীবন্ত হইয়া ওঠে। শরৎ-সাহিত্যের ইহাই হইল—অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা যে চরিত্রগুলি রাস্তাঘাটে ও সংসারের বহুবিধ কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যেও সে চরিত্রগুলি দেখিতে পাই। তাই, শরৎ-সাহিত্য আমাদের নিকট এত স্পষ্ট! সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—'World is a stage, men and women are mere players.'

"নববিধান" চিত্রে শ্রীমতী মঞ্জু দে

ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

অর্থাৎ পৃথিবীটি একটি নাট-মঞ্চ, আর পৃথিবীর নরনারীরা সে নাট-মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রী। সংসারের এই নিত্যকার অভিনয়ের মাঝেই শরৎ-সাহিত্যের সজীব চরিত্রগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই বলিয়াই—শরৎ-সাহিত্য এমন মধুর। 'নব-বিধান' এই মধুরতম সাহিত্যের অন্যতম সার্থক-সৃষ্টি। শ্রীমতী পিকচার্স কাহিনীর প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পরিণতির দিকে যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া চিত্র-নাট্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনরূপ মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়া সহজ ও

সরলভাবেই গল্পটি বিবৃত করা হইয়াছে। আলোচ্য গল্পের নায়ক শৈলেশ যেমন দুর্ব্বলচেতা—অপরদিকে নায়িকা উমারও চাওয়া-পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। কাজেকাজেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে বিরোধ, যে সংঘাত সাধারণতঃ দর্শকেরা আশা করেন, তেমনতর নাটকীয় সংঘাতের কোন স্থান নাই। কিন্তু উভয়ের প্রতি উভয়ের আছে অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রেম। যে প্রেম কেবলমাত্র অভিমানের সুরে ধ্বনিত হইয়া মানুষের মনকে আপ্লুত করিয়া তোলে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে কাগজে-কলমে ইহার বিশ্লেষণ করার যে সুযোগ আছে, অভিনয়ের দিক হইতে কিন্তু সে সুযোগ নাই।

শরৎচন্দ্রের "নববিধান" চিত্রের প্রধান ভূমিকায় কমল মিত্র
ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

এই দুইটী প্রধান চরিত্রে কমল মিত্র ও শ্রীমতী কানন দেবী যে কেবলমাত্র যথাযথ রূপদান করিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁদের প্রতিটী দৃশ্যে চলা-বলা হাবভাবে অভিমানের সুরটি সার্থকরূপে ধ্বনিত হওয়ায় দর্শকদের বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। এ ছাড়া জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, মঞ্জু দে ও শ্রীমান্ বিভু চরিত্রানুগ অভিনয়ের দ্বারা সমগ্র চিত্রটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পরিচালক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য তাঁহার কাজে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী কানন দেবী ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গানটীর সুর বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্তের নিকট আমরা যতখানি আশা করিয়াছিলাম, ততোধিক নিরাশ হইয়াছি। প্রতিপদে যেখানে অভিমান-সিঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, সেখানে বিলেতী-নোটেশান সমন্বিত সুর আমাদের কানকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণের কাজ—যথাযথ। টাইটেল বা পরিচয় লিখিতে কয়েকটি ভুল বানান বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

* * * *

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁপাডাঙার বৌ' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে গল্পটি কোন সাময়িক পত্রিকায় 'মণ্ডলবাড়ী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও পরিচালক শ্রীনির্ম্মল দে তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ফলে, মধ্যে মধ্যে কাহিনীর গতি ব্যাহত হইয়াছে। সেতাপ ও মহতাপ দুই ভাই। চাষী-গৃহস্থ। বড়ভাই-এর স্ত্রী যখন সংসারে আসেন, তখন ছোট ভাইটীর বয়স খুবই কম। সংসারে পদার্পণ করিয়াই বড় ভায়ের স্ত্রী এই ছোট ভাইটীর মায়ের স্থান পূর্ণ করেন। তার পরের ঘটনাগুলি সিদ্ধরসে ভরপুর। শরৎচন্দ্রের 'বামের সুমতিতে' যে রস-গ্রহণে তৃপ্তিলাভ করা যায়, আলোচ্য কাহিনীতেও সে রসের ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু ছোট যখন বড় হইল তখন গ্রামের লোকেরা বড় ভাইয়ের স্ত্রীর এ বাৎসল্য স্নেহকে অত্যন্ত জঘন্য রূপ দিয়া প্রচার করিতে লাগিল। যখন ঘটনা এইখানে পৌছায় তখন দর্শকেরা স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া পড়েন। এই একটীমাত্র কারণেই কাহিনীর মূল-সূত্রটি ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বড় ভাই যখন তাঁর ভুল বুঝিতে পারেন ও মৃত্যু-পথযাত্রী স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনেন, সেখানে দর্শক ভরপুর হইয়া ওঠেন। গল্পের কাঠামো যথেষ্ট শক্ত থাকা সত্ত্বেও চিত্র-নাট্য রচনার দুর্ব্বলতার জন্য কাহিনীর আবেদন সাময়িকভাবে মনে রেখাপাত করিলেও—পরিপূর্ণ রেখাপাত করিতে সক্ষম হয় নাই। মাঝে মাঝে অহেতুক দীর্ঘ বহির্দৃশ্যগুলি (Out-door shots) পারস্পরিক ঘটনা-প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। শেষ দৃশ্যের মিলন ঘটানর প্রচেষ্টা, কতকটা যেন জোর করিয়াই করা হইয়াছে।

শ্রীমতী অনুভা গুপ্তার অভিনয় অত্যন্ত সংযত এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। ছবির যান্ত্রিক দিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

* * * * *

কেন্দ্রীয় নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত একাডেমীর সম্পাদিকা শ্রীমতী নির্ম্মলা যোশীকে গত ২০শে এপ্রিল 'রূপ-মঞ্চ' কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। কেন্দ্রীয় একাডেমীর অন্যতম সদস্য নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত, শ্রীমতী যোশীর সহিত সাংবাদিকদের পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীমতী যোশী একাডেমীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাংবাদিকদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাংলার লোক-নৃত্য, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনকল্পে এবং বাংলায় একাডেমী সংগঠনের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী যোশী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

ছবির সংগঠনকারীদের প্রতি

পরিচালক ও তাঁর গোষ্ঠী ঃ

প্রযোজক ছবি তোলার জন্য পরিচালক নির্ব্বাচন করেন। পরিচালক আবার নির্ব্বাচন করেন, তাঁর গোষ্ঠী বা ইউনিট্। এই ইউনিটে পরিচালক ছাড়া সাধারণতঃ এই কয়জন সহকারী থাকেন যথা ঃ—১ম সহকারী, যিনি Shot division বা চিত্র-গ্রহণের ভাগ অনুযায়ী ক্যামেরা, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ও আলো-করার কাজে তদারক করবেন; ২য় সহকারী—যিনি Dialouge বা সংলাপ পড়াবেন; ৩য় সহকারী Continuity man বা ধারা রক্ষক। যাঁর কাজ হবে—কোন্‌টার পর কোন্ শট্ নেওয়া গেল তার Footage কত ইত্যাদির হিসাব রাখা এবং ৪র্থ সহকারী Clapper Boy অর্থাৎ যিনি চিত্র গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে ক্ল্যাপষ্টিক্ দেবেন এবং এই ক্ল্যাপষ্টীকের নির্দ্দেশানুসারে চিত্র-সম্পাদক তাঁর চিত্র সম্পাদনার কাজ সুরু করবেন। সহকারীদের উপরোক্ত সমস্ত কাজের তদারক করা এবং ত্রুটী বিচ্যুতির দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে কাজ করার দায়িত্ব পরিচালকের। সহকারীদের ভুল যদি পরিচালকের চক্ষু এড়িয়ে যায়, তাহলে সেই ভুল সংশোধন করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়—ব্যয়-সাপেক্ষ। মনে করুন, একজন শিল্পী একটী প্রদীপ হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবেন। একদিন সুটিং হোল, একঘর থেকে প্রদীপ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। তার মাস খানেক বাদে হয়ত অন্য ঘরের সেট্ পড়্‌ল। এই সেটে প্রদীপ হাতে যে শিল্পী ঢুকবেন তাঁকে সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবার দায়িত্ব ধারা-রক্ষকের। শিল্পী আগের দিন কি জামা কাপড় পরেছিলেন, কোন্ হাতে প্রদীপটী ধরেছিলেন ইত্যাদি—সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় ধারা-রক্ষককে লিখে রাখতে হবে এবং শিল্পীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই হোল পরিচালক গোষ্ঠীর মোটামুটি কাজ ও দায়িত্বের কথা। এই পরিচালক ও তাঁর গোষ্ঠী নির্ব্বাচনেব পর, গল্প নির্ব্বাচন ও চিত্র-নাট্য রচনার পালা।

গল্প ও চিত্র-নাট্য ঃ

বাড়ী তৈরী করতে গেলে যেমন ভাল জমি কিনে বাড়ী তৈরী করতে হয়, তেমনি ছবি তৈরীর কাজে ভাল জমি অর্থাৎ ভাল গল্প কেনার দরকার। আমাদের দেশের প্রযোজকেরা প্রলুব্ধ হয়ে অনেকক্ষেত্রেই এই ভুল করে থাকেন। অমুক প্রোডিউসার অমুক ধরণের গল্প কিনে, বেশ কিছু পেলেন! সুতরাং ঐ ধরণেরই একটা কিছু করা যাক্। অনেক সময় মোহ-বশে আমরা এই রকম ভুল করে বসি। গল্পে নূতন কিছু থাকলেই যে দর্শকদের আকৃষ্ট করে—এ ধারণা ভুল। দর্শকদের আকৃষ্ট করে তখন, যখন কাহিনীর সঙ্গে, শিল্পীদের যথাযথ অভিনয় এবং পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু জমি যদি পুকুর বোঁজান হয় অর্থাৎ কাহিনী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহলে যত ভাল অভিনয় বা পরিবেশ সৃষ্টি করা যাক্ না কেন, তা দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পারে না। আবার অতি সামান্য ঘটনা চিত্র-নাট্য রচনার গুণে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। কিন্তু পারম্পরিক ঘটনা-বৈচিত্র্য না থাকলে হাল্কা কাহিনীকে দাঁড় করান শক্ত। কাহিনী নির্ব্বাচনে দূরদৃষ্টি না থাকলে পরিচালনা ও যান্ত্রিক কাজ যতই ভাল হোক্ না কেন, ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না। গল্প নির্ব্বাচন এই ভাবে করা উচিত—সকলে পৃথক ভাবে গল্পটি পড়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করে খামের মধ্যে পুরে রাখা এবং একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে বসে প্রত্যেকের মতামত পাঠ করা। যদি দেখা যায়, অনেকেই একমত হয়েছেন, তখন সেই গল্প নির্ব্বাচন করে চিত্র-নাট্য রচনার

কাজে হাত দেওয়া উচিত। এভাবে গল্প নির্ব্বাচনেও হয়ত ভুল হতে পারে—কিন্তু প্রযোজক ও পরিচালকের দায়িত্ব এতে যেমন অনেকখানি কমে যায়, অপর দিকে তেমনি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত ও আলোচনার ফলে গল্পের ভাল ও মন্দ দিকটা ধরা পড়ে। গল্প নির্ব্বাচনের পর চিত্র-নাট্য রচনার পালা। ছবির এই কাজটী যদি সুষ্ঠু-ভাবে করা না হয়, তাহলে প্রতিপদে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমাদের দেশে দেখা যায়—চিত্র-নাট্য রচনায় যে সময় ব্যয়িত হয়, তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয়—ষ্টুডিও ফ্লোরে। সুটীং-এর কাজে। কিন্তু অন্য দেশে সুটিং-এ যে সময় ব্যয়িত হয়, তায় চেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয়—চিত্র-নাট্য রচনার কাজে। অর্থাৎ ছ'মাস কাল যদি চিত্র-নাট্য রচনায় ব্যয় করা হয়, তাহলে দু'মাসের মধ্যেই সুটিং শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চিত্র-নাট্যই ছবির কাজের একমাত্র অবলম্বন; যার ওপর ছবির ভালমন্দ নির্ভর করছে। চিত্র-নাট্য রচনা শেষ হলে তখন ক্যামেরা-ম্যান,শব্দ-ধারক,চিত্র-সম্পাদক, শিল্প-নির্দ্দেশক, পরিচালক ও তাঁর গোষ্ঠী একত্রে বসে আলোচনা করা উচিত। এই একত্রে আলোচনার ফলে, কাজের যেমন সুবিধা হয়, অন্যদিকে তেমনি Understanding বা পারস্পরিক যোগসূত্রের ফলে কাজটিও সোজা এবং সরল হয়ে আসে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিল্প-নির্দ্দেশক ও চিত্র-সম্পাদক ঃ

চিত্র-নাট্য রচনার পর আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-নির্দ্দেশক বা চিত্র-সম্পাদকের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন করি না। সাধারণতঃ সুটিং-এর মাত্র কয়েকদিন আগে শিল্প-নির্দ্দেশককে ডেকে অমুক ধরণের একটা ঘর বা অমুক ধরণের একটা পথ ইত্যাদি তৈরী করার নির্দ্দেশ দিয়ে Plan বা নক্সা দেবার জন্যে বলি। কিন্তু শিল্প-নির্দ্দেশককে যদি আগাগোড়া কাহিনীটি জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কেননা চিত্র-নাট্যে কোন্ চরিত্র কি ভাবে চিত্রিত হয়েছে তা তিনি জানতে পারেন। ফলে, সেট্ তৈরী ছাড়াও আসবাব্ ইত্যাদি—সাজানোর কাজেও তাঁর পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। ছবি

পুষ্পস্তবক হস্তে সাংবাদিকদের সহিত কেন্দ্রীয় নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত একাডেমীর সম্পাদিকা শ্রীমতী নির্ম্মলা যোশী ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

তৈরীর কাজে শিল্প-নির্দ্দেশকের দায়িত্বও সমধিক। কেন না, যথাযোগ্য শিল্প নির্দ্দেশনা না হলে ছবির মান অনেকখানি কমে যায়। এরপর সম্পাদকের কথা বিশেষ-ভাবে এসে পড়ে। কেন না, ছবির ভালমন্দ সব কিছুই এঁর ওপর নির্ভর করে। পরিচালক দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তাঁর কল্পনাকে চিত্রে রূপায়িত করে থাকেন এবং সম্পাদক-পরিচালকের এই কল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্যে বিভিন্নদিনে তোলা ছবিগুলিকে পর পর সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেন। রান্নার যত ভাল উপকরণই দেওয়া যাক্ না কেন, পাচক যদি ভাল না হয়, তাহলে খাদ্য যেমন অখাদ্য হয়ে ওঠে, তেমনি ছবির কাজে পরিচালক যত কেরামতিই দেখান না কেন, সম্পাদক যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হন, তাহলে ছবির ভবিষ্যৎ কখনই ভাল হতে পারে না।

ছবির নির্ম্মাণ বা সংগঠন কাজে যে যে বিভাগীয় কর্ম্মিদের কথা উল্লেখ করলাম তাঁদের সকলকে নিয়ে মিলেমিশে ছবি তৈরী করতে পারলে একটা ভাল ছবি নির্ম্মাণ করা সহজসাধ্য হতে পারে।

ষোলো

"Os senhores estão em sua Casa"

উজীর, আল্‌ফা হাসানী আর সুলতান গিয়াসুদ্দীন মামুদ তিনজনেই শুম্ভিত হয়ে রইলেন। সেই আশ্চর্য অদ্ভুত মূর্তি আবার বললে, আলাউদ্দিন ফিরোজের রক্ত এখনো তোমার দু হাতে—এখনো দু চোখে রক্তের বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ তুমি। আরো রক্ত ঝরাতে চাও কেন?

মামুদ শা নিজেকে খানিকটা সংযত করলেন এবার। স্থির গলায় বললেন, ফিরোজের হত্যার জন্যে সব সময়ে আপনি আমায় দায়ী করেন দরবেশ। কিন্তু আপনিই বলুন, গৌড়ের তখ্‌তে আমার কি ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না?

—তা হয়তো ছিল। কিন্তু কবি-শিল্পী ফিরোজকে যে-ভাবে তুমি হত্যা করিয়েছ—

—কবি-শিল্পী!—মামুদ মুখ বিকৃত করলেন: পৌত্তলিক কাফেরের বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা নিয়ে যার সময় কাটত, গৌড়ের সিংহাসনে বসবার যোগ্য সে নয় দরবেশ! তাই তাকে সরাতে হয়েছে।

—কিন্তু দেশ জুড়ে তুমি শত্রু সৃষ্টি করছ মামুদ। এ রক্তের ঋণ তোমায়ও শোধ করতে হবে।

মামুদ হেসে উঠলেন: যারা আমার ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়ে ফিরোজকে সিংহাসন দিয়েছিল, তাদের চক্রান্ত রোধ করার শক্তি আমার আছে।

—তোমার দাদা? নসরৎ শা?—দরবেশ বললেন, যার রক্তে হোসেন শার কবর রাঙা হয়ে গিয়েছিল, তার কথা মনে আছে আবদুল বদর?

—আমি আর আবদুল বদর নই দরবেশ, আমি এখন মামুদ শা।—মামুদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল: তা ছাড়া নসরৎ শাও আমি নই।

দরবেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপরে।

—ভুল তুমি অনেক করেছ মামুদ। কিন্তু যা হয়ে গেছে সে-কথা থাক। নতুন ভুলের পাপ আর তুমি বাড়িয়োনা। দূতের প্রাণ নেওয়া ধর্মের বিরোধী। তা ছাড়া ক্রীশ্চানদের ক্ষেপিয়ে দিলেও তার পরিণাম শুভ হবে না তোমার পক্ষে। ওরা নতুন শক্তি—পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে পড়েছে—ভবিষ্যৎ ওদেরই সম্মুখে। ওদের সঙ্গে তুমি বন্ধুতা করো মামুদ।

—আপনার প্রথম উপদেশ আমি রাখলাম দরবেশ। ক্রীশ্চান দূতদের গায়ে হাত আমি দেব না। কিন্তু—মামুদ শা বিকৃত মুখে বললেন: বন্ধুত্ব করব কতগুলো ডাকাতের সঙ্গে! সমুদ্রে যারা লুঠতরাজ করে বেড়ায়, তাদের দেব দেশকে লুঠ-পাট করার সুযোগ! অসম্ভব দরবেশ—ও আদেশ আমি মানতে পারব না!

—ইলিয়াস-শাহী বংশে সর্বনাশের মেঘ নেমেছে—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দরবেশ—পরক্ষণেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই মিলিয়ে গেলেন যেন।

আবার কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। সুলতানই স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—ওই খ্রীস্টান দূতদের এখনি বন্দী করুন—তারপরে ঠাণ্ডী-গারদে পাঠিয়ে দিন। আর চট্টগ্রামে এখনি খবর পাঠান ওদের দলবল শুদ্ধু সকলকে যেন আটক করা হয়। দরবেশ বারণ করেছেন, আল্‌ফু খাঁও বারণ করছেন। তাঁদের কথা আমি রাখব—বিনা বিচারে আমি রক্তপাত ঘটাব না। কিন্তু আমার দেশের সমুদ্রে যারা ডাকাতি করে বেড়ায়, গৌড়-বাংলার প্রজাদের সম্পত্তি আর জীবন যাদের হাতে বিপন্ন, শাস্তি তাদের আমি দেবই।

—কিন্তু সুলতান—আল্‌ফা হাসানী একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন : ওরা সাধারণ জীব নয়। কালিকটে, গোয়ায়—

মামুদ শা বাধা দিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, একটা জিনিস ক্রীশ্চানদের এখনো বুঝতে বাকী আছে আল্‌ফু খাঁ। গৌড় আর কালিকট এক নয়। গৌড়ের সঙ্গে যদি ওরা শক্তি পরীক্ষা করতে চায় তো করুক। কিন্তু সে পরীক্ষা খুব সুখের হবে না ওদের কাছে।

আল্‌ফা হাসানী হয়তো আরো কিছু বলতেন, হয়তো উজীরেরও আরো কিছু বলবার ছিল। কিন্তু এবার অধৈর্যভাবে হাত নাড়লেন মামুদ শা।

—এইবার আপনারা আসুন তা হলে। আর উজীর সাহেব, পর্তুগিজ দূতদের এখুনি আপনি বন্দী করবেন—যান, দেরী না হয়—

দু জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মামুদ শা ক্লান্তদৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শান্তি নেই কোথাও। যেদিন আমীর ওমরাহদের চক্রান্তের ফলে নসরৎ শার সিংহাসনের ন্যায্য দাবী থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন—সেদিনও শান্তি ছিল না, আজো নেই। গলার জোরে তিনি অস্বীকার করেন, কিন্তু মনের কাছে আত্মবঞ্চনার উপায় কোথায়! চোখ বুজলেই দেখতে পান—আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্তমাখা দেহ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে—দু চোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জেলে যেন তাঁকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে!

কিন্তু না—এ সময়ে তাঁর হাল ছাড়লে চলবে না, বিন্দুমাত্র দুর্বল হতে দেওয়া যাবে না মনকে। বড় দুর্দিনে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে এসে বসেছেন। আকাশে সত্যিই মেঘ ঘনিয়েছে—একটা প্রকাণ্ড কালো ঈগলের মতো ছোঁ দিয়ে পড়তে চাইছে ইলিয়াস শাহী বংশের ওপর। এদিকে ক্রীশ্চান—ওদিকে হুমায়ুন—মাঝখানে পাঠান শের খাঁ। চোট্‌ খাওয়া বাঘ শের এবার দাঁড়িয়েছে বীরবিক্রমে, একটা চরম নিষ্পত্তি না করে থামবে না। তার মাঝখানে গৌড়ের ইতিহাস কোন্ পথ ধরে যে এগিয়ে যাবে—কোন্ ঝড়ের মধ্য দিয়ে কোন্ মাঠে সে পৌছুবে, কে বলতে পারে সে-কথা!

কিন্তু স্থির অটল হয়ে থাকতে হবে মামুদ শাকে। তাঁর দুর্বল হলে চলবে না। সিংহাসনের পথ চিরদিনই রক্ত দিয়ে আঁকা—নসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছে।

চিন্তায় পীড়িত ক্লান্ত পায়ে মামুদ শা ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় আজেভেদো তাকিয়ে ছিলেন তাঁর বিশ্রামাগারের জানালা দিয়ে। মাথার ওপর নীলকান্ত আকাশ—গৌড়ের আকাশ। আশ্চর্য স্নিগ্ধ সেই নীলবর্ণের ওপর টুকরো টুকরো শাদা মেঘের প্রসন্নতা। দূরের গঙ্গায় নৌকোর পাল। আম-জামের ইতস্তত শ্যামলতার ঊর্ধ্বে মাথা তুলে রয়েছে কতগুলো মস্‌জিদের চূড়ো—আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে বার-দুয়ারীর পাষাণ মূর্তি—আর সকলের ওপরে মেটে রঙের ফিরোজ মিনার। এই 'বেঙ্গালা'র রাজধানী। আকাশে নীলা, রৌদ্রে সোনা, ঘাসে পাতায় পান্না—দিকে দিকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

এরই স্বপ্ন কালিকট পার হয়ে—সিংহল-মালদ্বীপ ছাড়িয়ে—কত দূরে-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে! কত জল্পনা করেছেন আল্‌বুকার্ক—কত বিনিদ্র রাতে সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় এরই ঘ্রাণ প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে টেনে নিয়েছেন ডা-গামা! কবে আসবে সেই দিন—যখন এখানকার অপর্যাপ্ত সম্ভারে ভরে উঠবে লিস্‌বোঁয়ার রত্নকোষ, কবে মুরদের মিনার ছাড়িয়ে সগৌরবে দাঁড়াবে ইগ্রেঝা, কবে—

দরজায় ঘা পড়ল।

চিন্তার সুর কেটে গেল। চমকে উঠে আজেভেদো বললেন, কে?

—মহামান্য গৌড়ের সুলতান আমাদের পাঠিয়েছেন—বাইরে থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

আজেভেদো এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত রেক্সোনাকে
আপনার জন্য এই
যাদুটি করতে দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার
গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে
ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে
দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ,
কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময়
হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিল*যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
BLENDED WITH CADYL
Rexona
BLENDED WITH CADYL
RP. 121-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

তাঁর চোখে স্বপ্ন—'বেঙ্গালা'র নির্মল-নীল আকাশের নিবিড় মায়া।

—কী চাই ?

—সুলতানের হুকুমে আমরা পর্তুগীজ দূতকে বন্দী করতে এসেছি।

একটি আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল স্বপ্ন—যেন প্রকাণ্ড একটা ধাতুপাত্র ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কোথাও।

রুদ্ধশ্বাসে আজেভেদো বললেন, কেন ?

—সুলতান বলেছেন, পর্তুগীজ লুটেরাদের যোগ্য জায়গা হচ্ছে কারাগার।—সম্মুখের মুর সেনাধ্যক্ষ জবাব দিলে কঠিন শান্ত গলায়।

বিদ্যুৎবেগে কোমরের তলোয়ারে হাত দিতে চাইলেন আজেভেদো। কিন্তু তার আর সময় ছিল না। তার আগেই আট দশটা বল্লমের ফলা উদ্যত হয়েছে তাঁর দিকে। হিংস্র চোখ থেকে একবার বিষ-বর্ষণ করে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে ধরলেন আজেভেদো। তেম্‌নি রুদ্ধ গলায় বললেন, বেশ, আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

গৌড়ের নীল আকাশের স্বপ্ন একরাশ পোড়া ছাইয়ের মতোই কালো হয়ে গেল।

* * * *

কিন্তু কতদিন আর এমন করে বসে থাকা যায় অনিশ্চিত আশঙ্কায় ? ডি-মেলো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি থেকে দীর্ঘ পথ পোর্টো পেকেনো—মাঝখানে কত নদী, কত অরণ্য পার হয়ে যেতে হবে কে জানে! অনুমতি নিশ্চয় পাওয়া যাবে—চট্টগ্রামের নবাব সে ভরসা দিয়েছেন। কিন্তু কবে আসবে গৌড়ের অনুমতি—কবে ফিরে আসবেন আজেভেদো—কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া এই মুরদের মতিগতিও আন্দাজ করা শক্ত। শেষ পর্যন্ত—

চাকারিয়ার সে অভিজ্ঞতা ডি-মেলো ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি খোদা বক্স খাঁকে। সেই বীভৎস অধ্যায়টা বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে তীরের ফলার মতো। জেণ্টুরা গঞ্জালোকে বলি দিয়েছে। গঞ্জালো! সেই কিশোর সুন্দর মুখখানা যেন আজো প্রতিহিংসার হাত ছানি দেয় ডি-মেলোকে। সন্ধি নয়—চুক্তি নয়, ইচ্ছে করে বিরাট নৌবহর নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন চাকারিয়া—মাতামুহুরী নদীর জল কেঁপে ওঠে তাঁর কামানের গর্জনে—তারপর—

নুনো-ডি-কুন্‌হার আদেশ—তাই আসতে হয়েছে। নইলে তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই 'বেঙ্গলোর' ওপর। এর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত। এর চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতা!

মনের ঠিক এই অবস্থাতে এল ক্রিস্টোভাম।

—একটা কথা ছিল ক্যাপিটান।

—বলো।

—গৌড়ের সুলতানের অনুমতি পেলেও এখানে ব্যবসা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—কেন ?

কুঞ্চিত ললাটে ক্রিস্টোভাম বললে, এদের শুল্কের পরিমাণ শুনেছেন ?

শুকনো গলায় ডি-মেলো বললেন, শুনেছি।

—বন্দরের শুল্ক মিটিয়ে কী লাভ থাকবে আমাদের? কিছুই না।

—আমরা নবাবের কাছে অনুমতি চাইব—বিরসভাবে ডি-মেলো বললেন, যাতে শুল্কের হার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়।

—সে ভরসা নেই। বরং আরো কিছু বাড়িয়ে বসবে কিনা কেউ বলতে পারে না। মুর বণিকেরা যা শুল্ক দেয় আমাদের দিতে হবে তার দ্বিগুণ। তাই যদি হয়—এত দূর থেকে, এত কষ্ট করে এসেও কিছুই লাভ করতে পারব না আমরা। সোনা নিতে এসেছিলাম এখানে, মুঠো মুঠো ধূলোই নিয়ে যেতে হবে তার বদলে।

—হুঁ!—ডি-মেলো চুপ করে রইলেন।

—একটা উপায় আছে—বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে কাছে এগিয়ে এল ক্রিস্টোভাম। চুপি চুপি বললে, একটা উপায় আছে ক্যাপিটান।

—কী উপায় ?

ক্রিস্টোভাম তেম্‌নি নিচু গলায় বলে চলল, ক্যাপিটানের অনুমতি পাওয়ার আগেই আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আশা করি, ক্যাপিটানের আপত্তি হবে না। যেমন শয়তান এই মুরেরা—তেম্‌নি ব্যবহারই করা উচিত এদের সঙ্গে।

—খুলে বলো কথাটা—ডি-মেলো অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—বন্দরের 'গুয়াজিলের' কিছু লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলেছি। ওদের ঘুষ দিলেই চুপি চুপি কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে দেওয়া যাবে। গোপনে কেনা-কাটাও করা যাবে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু কাজটা খুব অন্যায় হবে ক্রিস্টোভাম।

—মুরেরাই বা কোন্ ন্যায় ব্যবহারটা করছে আমাদের সঙ্গে?

—তা বটে!—মেঘমেদুর মুখে চুপ করে রইলেন ডি-মেলো। ঠিক কথা। কাদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি বজায় রাখবেন ডি-মেলো? চাকারিয়ার অভিজ্ঞতা কি এত সহজেই ভুলে যাবার?

—তা ছাড়া এও ভেবে দেখুন—ক্রিস্টোভাম আবার আরম্ভ করল: গৌড়ের থেকে কবে অনুমতি আসবে ঠিক নেই। ততদিন কি এভাবে আমরা বসে থাকব? বিশেষ করে 'বেঙ্গলা'র মস্‌লিন দেখে তো মাথা ঠিক রাখাই শক্ত। তারপর যদি অনুমতি নাই-ই আসে? এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যাবে? ক্যাপিটান আর দ্বিধা করবেন না। অনুমতি দিন—আমরা সব ব্যবস্থা করছি।

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন ডি-মেলো। তারপরে বললেন, অনুমতি দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ওরা টের পায়—

—কেউ টের পাবেনা। এই মুর-কর্মচারীরা ঘুষ পেলেই খুশি।

—বেশ, তবে তাই করো।

হাঁ, যা পারা যায়, কুড়িয়ে নেওয়া যাক। এদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি নয়—এ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে ফেললেন ডি-মেলো।

তারপর যখন রাত নামল, নিকষ কালো হয়ে গেল কর্ণফুলীর জল, এক একটি করে নিভে যেতে লাগল বন্দরের আলো—আর প্রহরীদের চোখ ক্লান্ত ঘুমে জড়িয়ে এল, তখন দুটি একটি করে নৌকো এসে লাগল পর্তুগীজ বহরের গায়ে। প্রেত মূর্তির মতো কতগুলো মানুষের ছায়া ওঠা-নামা করতে লাগল জাহাজ থেকে। ভারে ভারে জিনিস উঠল, নেমে গেল ভারে ভারে।

আর ডি-মেলো মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন 'বেঙ্গালার' মস্‌লিন—সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল—যেন চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। তার পঞ্চাশ গজ হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যায়। আশ্চর্য রঙের খেলা তার ওপরে, অপরূপ তার কারুকার্য। রোমের সুন্দরীরা এই মস্‌লিনের জন্যে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতেন—এ তবে স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়!

আরো দেখলেন ডি-মেলো। যেন সোনার সুতো দিয়ে গড়া পাটের কাপড়। তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝলসে ওঠে! দেখলেন অপূর্ব হাতীর দাঁতের কাজ—সূক্ষ্মতম শিল্প-নিপুণতার এমন তুলনা বুঝি কোথাও নেই। সকলের ওপরে রয়েছে মণিমুক্তা-বসানো সোনার অলঙ্কার—এ ঐশ্বর্য শুধু লিস্‌বোয়ার অন্তঃপুরেই বুঝি মানায়!

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই ভাবে। কর্ণফুলীর জলে অমাবস্যার পালা শেষ হয়ে গিয়ে যখন চাঁদের আলো ফুটল, তখনো। সেই আলো-আঁধারিতেও নিয়মিত চলতে লাগল ছায়া-ছায়া নৌকো, আর দলে দলে ছায়া মূর্তির আনাগোনা। আজেভেদো আর তাঁর দলবল যখন আলো-বাতাসবর্জিত ঠাণ্ডা গারদে বন্দী হয়ে তিক্ত ক্ষোভে অভিসম্পাত দিচ্ছেন—আর ঝড়ের বেগে লাল ঘোড়ার পিঠে যখন মামুদ শার ফরমান নিয়ে গৌড়ের দূত ছুটে আসছে চট্টগ্রামের পথে, তখনো হাতীর দাঁতের কাজ আর মস্‌লিনের মোহে মগ্ন হয়ে আছেন অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো।

তারপর একদিন দলবল নিয়ে বন্দরের গুয়াজিল এসে উঠলেন সান রাফাএল্ জাহাজে।

ডি-মেলো আর তাঁর সঙ্গীরা চকিত হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকের হাত গিয়ে পড়ল কোমরের তলোয়ারে। নিশীথ রাত্রের গোপন ব্যাপারটা কি জানাজানি হয়ে গেছে? তাই তাঁদের বন্দী করার জন্যেই কি গুয়াজিলের এই আবির্ভাব?

কিন্তু ডি-মেলোকে বিস্মিত করে গুয়াজিল তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

—সুখবর আছে ক্যাপিটান। গৌড়ের অনুমতি এসেছে।

—অনুমতি এসেছে?—আনন্দে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ডি-মেলো: সুলতান মামুদ শা আমাদের অনুমতি দিয়েছেন?

—দিয়েছেন।—হাসি মুখে গুয়াজিল মাথা নাড়লেন।

—কিন্তু আমার দূত তুরাতে আজেভেদো তো এখনো ফেরেননি।

—তাঁর খবরও এসেছে। তিনি আপাতত সুলতানের অতিথি। পরম আনন্দে তাঁর দিন কাটছে।—গুয়াজিলের হাসিটা আরো বিকীর্ণ হয়ে পড়ল: সুলতান ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা আরো নিবিড় করার জন্যে ক্যাপিটানকেও গৌড়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আনন্দে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু যে অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা আমাদের ওপরে চাপানো হয়েছে—তার—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুয়াজিল বললেন, সে-ব্যবস্থাও হয়েছে। সুলতান অবিবেচক নন। তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন, তাঁর রাজ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবেনা। আরব বণিকদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে, পর্তুগীজ ক্যাপিটানও তা পাবেন।

মুহূর্তের জন্যে একবার ক্রিস্টোভামের দিকে তাকালেন ডি-মেলো। ক্রিস্টোভাম মাথা নিচু করল। একটা গোপন অপরাধের অনুতাপ একসঙ্গেই অনুভব করলেন দুজনে।

গুয়াজিল বলে চললেন, কাল দরবারে নবাব সুলতানের ফরমান তুলে দেবেন ক্যাপিটানের হাতে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ক্রীশ্চানদের অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য আমিই লাভ করেছি। সুতরাং আমি ক্যাপিটান এবং তাঁর সমস্ত সেনানী আর নাবিকদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আশা করি, সে-নিমন্ত্রণ ক্যাপিটান গ্রহণ করবেন।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ডি-মেলো বললেন, সানন্দে।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে গুয়াজিল নেমে গেলেন।

এতদিনের স্বপ্ন আর আশা তবে সফল হয়েছে! এইবারে প্রসন্ন হবেন নুনো-ডি-কুন্হা, চলবে অবাধ বাণিজ্য, ভারতের স্বর্ণপুরী 'বেঙ্গালা' এবার তার রত্নভাণ্ডার খুলে দেবে লিস্‌বোঁয়ার স্বর্ণকোষের উদ্দেশ্যে! আনন্দে আবেগে বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন ডি-মেলো। অভিশপ্ত 'বেঙ্গালা'কে এই মুহূর্তে আর তাঁর খারাপ লাগছে না—এমন কি, গঙ্গালোকে হত্যার অপরাধও বুঝি তিনি ক্ষমা করতে পারেন এখন!

সন্ধ্যায় বিরাট ভোজসভা বসল গুয়াজিলের বাড়ির প্রাঙ্গণে।

চারদিকে অসংখ্য আলোর সমারোহ—মাঝখানে বিশাল আয়োজন। এত বিচিত্র, এত সুস্বাদু খাদ্য পর্তুগীজেরা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সুরার দাক্ষিণ্যে ক্রমেই তারা মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। আনন্দে আর কোলাহলে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ।

ডি-মেলোর সঙ্গে এক সঙ্গেই খেতে বসেছিলেন গুয়াজিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

—মাপ করবেন ক্যাপিটান। আমি একটু অসুস্থ বোধ করছি।

—কী হল আপনার?

—পেটে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডি-মেলো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন গুয়াজিল।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবিত ঘটনা ঘটল একটা।

প্রাঙ্গণের চারদিকে উঁচু বারান্দা। তারই ওপর থেকে কার মেঘমন্দ্র ধ্বনি শোনা গেল: লুটের মাল গৌড়ের সুলতানকে ভেট্ পাঠাবার দুঃসাহসের জন্যে, বন্দরের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার জন্যে সুলতানের আদেশে সমস্ত ক্রীশ্চানদের বন্দী করা হল!

তীর বেগে খাদ্য আর মদ ফেলে উঠে দাঁড়াল পর্তুগীজেরা। মদের নেশা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। আর নিজের কানকে ভুল শুনেছেন ভেবে, যেখানে ছিলেন সেইখানেই অসাড় বসে রইলেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো।

আবার সেই মেঘমন্দ্র স্বর শোনা গেল: ক্রীশ্চানেরা বন্দী। যদি নিজেদের ভালো চান, তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করুন।

কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ কেউ করলনা। সবেগে তলোয়ার খুলে উঠে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, সেই সঙ্গে আরো চল্লিশ-খানা তলোয়ার ঝকঝক করে উঠল চারদিকের প্রখর আলোতে।

আর তৎক্ষণাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল শত শত মুর সৈন্য। চারদিকের উঁচু বারান্দা থেকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পর্তুগীজদের ওপর।

আনন্দ-কোলাহলের পালা শেষ হল আর্তনাদে, হিংস্র গর্জনে, তলোয়ারের ঝলকে। রক্তে আর মৃত্যুতে একাকার হয়ে গেল ভোজসভা। দশ জন পর্তুগীজ প্রাণ দিল দেখতে দেখতে। ক্রিস্টোভামের ছিন্ন মুণ্ডটা তিন হাত দূরে ছিট্‌কে চলে গেল।

রক্তাক্ত দেহে, বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো: আর নয়—আমরা আত্মসমর্পণ করছি!

তার পরের দিন ত্রিশ জন আহত সৈন্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে ডি-মেলো যাত্রা করলেন গৌড়ে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে নয়—আরো একবার অন্ধকার কারাগারে আজেভেদোর সঙ্গে সুলতানের বিচার গ্রহণ করবার জন্যে।
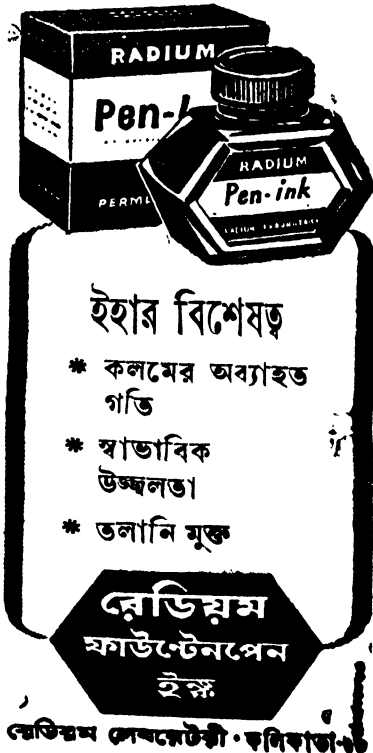
চাকারিয়া শুধু 'বেঙ্গালাতেই' নেই—সারা বাংলা দেশই তবে চাকারিয়া! (ক্রমশঃ)

বিশ্বসাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

"PEN" a world Association of
Poets, Editors, Novelists,
Play-wrights, Essayists."

এঁদের আদ্য-অক্ষর নিয়ে এই P.E.N. নামকরণ।" 'পি-ই-এন' উপরোক্ত লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর নানা দেশে আজ এর বাহান্নটি শাখা বিস্তৃত হয়েছে। ইং ১৯২১ সালে শ্রীমতী ডসনস্কট পৃথিবীর সমস্ত লেখক লেখিকাকে একই আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লণ্ডনে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুবনবিদিত লেখক স্বর্গগত জন গল্স্ওয়ার্দি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। তারপর, একে একে এইচ, জি, ওয়েলস্, যুল রম্যাঁ, মরিস মেতারলিঙ্ক্, প্রভৃতি বিশ্বশ্রুত লেখকেরা এর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। বর্তমানে সুলেখক চার্লস মর্গ্যান এর কর্ণধার। পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ 'P.E.N. Club' বলা হয়। প্রতি বৎসর পৃথিবীর এক এক দেশে সারাবিশ্বের লেখক লেখিকার সাতদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। উদ্দেশ্য পৃথিবীর সকল লেখক লেখিকাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব পূর্ণ পরিচয় ও সৌহার্দ স্থাপন, বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা, অবাধ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় এবং লেখনীর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা।

ভারতবর্ষে এই 'পি-ই-এন' প্রতিষ্ঠান ইং ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ের শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া স্থাপন করেন। ভারতের নানাদেশের লেখক লেখিকারা এর সদস্য। ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তারপর, ভারত কোকিল সরোজিনী নাইডু। উপস্থিত দর্শনসাগর শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর সভাপতি এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও ভি, এস, মেনন এর সহ-সভাপতি।" এই ভারতীয় পি ই-এন প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারত একটি মহাদেশ বলে এবং এখানে নানা ভাষায় বিবিধ সাহিত্য সংরচিত হ'য়েছে বলে ভারতের নানা প্রদেশে আবার এর একাধিক উপশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলি সবই বোম্বাইয়ের মূল ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানেরই অন্তর্গত। পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের যে পরামর্শ সভা আছে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রায় সব ক'জন প্রতিনিধিই তার মধ্যে আছেন।

সরোজিনী নাইডু

এই ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠান ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যিকগণকে একটা জাতীয় ঐক্যে আবদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছেন প্রথম থেকেই। এঁরা প্রতিমাসে ইংরাজিতে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যার নাম 'ইণ্ডিয়ান পি-ই-এন'। ভারতের নানা প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় যে সব বই প্রতিমাসে প্রকাশিত হ'চ্ছে এর মধ্যে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনা থাকে। এঁরা ভারতীয় নানা ভাষার সাহিত্য-পরিচয় সম্বলিত অনেকগুলি গ্রন্থমালা প্রকাশ করে ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। এ ছাড়া প্রতিমাসেই প্রায় বোম্বাইয়ে সদস্যগণের একটি সাহিত্যালোচনা সভা আহ্বান করেন এঁরা। উপশাখাগুলিও মাঝে

মাঝে-বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক সাহিত্যালোচনা সভার অনুষ্ঠান করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বিশ্ব লেখক প্রতিষ্ঠানের মতো এঁরা প্রতিবৎসর এখানে এক একটি 'সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলন' আহ্বান করতে পারেন না বটে, কারণ এদেশের সাহিত্যিকেরা ওদেশের লেখকদের মতো ধনী বা আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে অবস্থিত নন, তবে মাঝে মাঝে শিক্ষিত সজ্জনগণের বদান্যতার গুণে 'সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন' এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

যে কোনও ভারতীয় সাহিত্যসেবী এই ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠান—যেটি পৃথিবীর আন্তর্জাতিক লেখকদের পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, এর সদস্য হতে পারেন। অবশ্য মূল প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক-সমিতি যদি তাঁকে 'সদস্য' হবার উপযোগী বলে অনুমোদন করেন। নচেৎ, তিনি হবেন 'বন্ধু'! পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানে দু'রকম সদস্য নেওয়া হয়। সাহিত্য-স্রষ্টারা হ'ন 'P.E.N. Member' আর সাহিত্য রসিকেরা হন 'P.E.N. Friend. বাংলাদেশে যে P.E.N. Club-এর শাখা আছে এই প্রবন্ধ লেখক ও মহিলা-কবি রাধারাণী দেবী বর্তমানে তার পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। যে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণ এই

শ্রীজহরলাল নেহরু

পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক লেখক প্রতিষ্ঠানটির সদস্য হতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা এখানে পত্র লিখলে P.E.N. প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিবরণ জানতে পাবেন। 'আর্য সঙ্ঘ', মালাবার হিল, বোম্বাই—৬ এই ঠিকানায় পত্র দিলেও ভারতীয় মূল প্রতিষ্ঠান 'পি-ই-এন' সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদই তাঁদের দেবেন।

এবার 'সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন' বসেছিল দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশস্থ আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ও পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী সদস্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রী সি, পি, রামস্বামী আয়ার মহাশয়ের সৌজন্যে ও বদান্যতায় সেখানে এই বিরাট সম্মেলন অতি সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মাদ্রাজের নানা প্রদেশের ১১৭ জন প্রতিনিধিই সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশি। মাদ্রাজের পরই বোম্বাইকে ধরা যেতে পারে। এঁদের প্রতিনিধি সংখ্যা ২৭জন। তারপর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ১৭ জন। বাংলা থেকে ১০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে আন্নামালাই পর্যন্ত পৌঁছেচেন বাংলাদেশ থেকে লেখক একাই! সকলে যদি আসতেন তাহ'লে মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের পরই তৃতীয় স্থান অধিকার করতো বাংলা দেশ। আন্নামালাই নগরের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ সম্মেলন তাঁদের ঘরেই বসেছিল। বাকি প্রতিনিধিদের সংখ্যাছিল এইরূপ—হায়দ্রাবাদ—৭, নিউদিল্লী—৬, উড়িষ্যা—৪, আসাম—৩, পাঞ্জাব—৫, উত্তরপ্রদেশ—৫, বিহার—১, মধ্যপ্রদেশ—৩, গুজরাট—১, আর্কট—১, মহারাষ্ট্র—১, মহীশূর—১, বরোদা—১, পণ্ডিচারী—১, মালাবার—১।

ভারতের বাইরে, পৃথিবীর নানাপ্রদেশের লেখকদের বাহান্নটি পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র জাপানের তিনজন প্রতিনিধি—উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত জুও তাকামি, ও, কাজুয়ো দান এবং জাপানের প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক শ্রীযুক্ত মশাতোষ মারামাৎসু। সিংহল থেকে এসেছিলেন শ্রীকে, গণেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী থেকে মাত্র দু'জন প্রতিনিধি-জনাব জালালুদ্দীন আহম্মদ, ইনি পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত পি-ই-এনের অবৈতনিক সম্পাদক

সি. পি. রামস্বামী আয়ার
(ভাইস-চ্যান্সেলার—আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়)

এবং জনাব মীর্জা হাসান আস্কারী, ইনিও পাকিস্তান পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের জনৈক সদস্য।

গত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ইংরাজী ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, এই তিনদিন আন্নামালাই নগরস্থ আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব-ভারতীয় লেখকদের এই মহাসম্মেলন বসেছিল। এই সঙ্গে একটি পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়ের উপর ভার ছিল "বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়বার। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উপর ভার ছিল "স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়বার। ইনি যেতে পারেন নি

এবং প্রবন্ধও পাঠাতে পারেন নি। শ্রীযুক্তা লীলা রায় প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং নিজে যেতে পারলেন না বলে সেটি সম্মেলনে পাঠ করার জন্য আমার উপর ভার দিয়েছিলেন। আমার নিজের উপর ভার ছিল "বাংলা সাহিত্যের উপর রামায়ণের প্রভাব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ব।

আমি ১২ই এপ্রিল ৪-৫০-এর মান্দ্রাজ মেলে রওনা হ'য়ে ১৪ই সকালে মান্দ্রাজে পৌছাই। মান্দ্রাজে আমাদের এক বন্ধু শ্রীযুক্ত গণেশ আয়ার ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে হাজির ছিলেন। রাত্রের ট্রেণে চিদম্বরম যাবার গাড়ীতে বার্থ রিজার্ভ করিয়ে চলে গেলাম গণেশ আয়ারের সঙ্গে তাঁর ব্রডওয়ে ষ্ট্রীটের আস্তানায়। সেইখানে স্নানাহার ও সারাদিন বিশ্রাম ক'রে রাত্রি দশটা পাঁচের ট্রেণে চিদম্বরম রওনা হয়ে গেলুম।

১৫ই এপ্রিল বেলা সাতটা পনেরোয় চিদম্বরম পৌছবার কথা, কিন্তু লেট হ'যে বেলা আটটার পর পৌছল। আজকাল কোনও ট্রেণই সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছায় না। মান্দ্রাজ মেলও সেদিন ৩৫ মিনিট লেটে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে ঢুকেছিল। চিদাম্বরম্ ষ্টেশনে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বোম্বাই পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বামী জম্বুনাথন্ এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীরামানুজচারী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। মালপত্র সহ আমাদের নিয়ে তাঁরা "আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়" লেখা একখানি বাসে তুলে দিলেন।
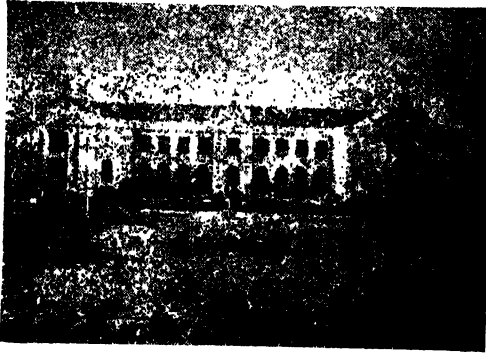
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ)

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের "ত্রিবাঙ্কুর ছাত্রাবাসে" আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য এক একখানি পৃথক ঘর রাখা হয়েছে দেখলুম। প্রতি ঘরে নেয়ারের খাটিয়া, টেবিল চেয়ার, একটি পানীয় জলের পাত্র, কাচের গ্লাস, কাপড় জামা রাখবার আনলা। ঘরের দরজায় একপ্রস্থ নূতন তালা চাবী। তেরাত্রি বাসের পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হ'য়েছিল। প্রত্যেক প্রতিনিধির নাম ঠিকানা লেখা এক একখানি পরিচয় পত্র ঘরে ঘরে প্রবেশ দ্বারের উপর আঁটা ছিল। ঘরগুলিতে নম্বর লাগানো। আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল ছাত্রাবাসের দ্বিতলের উপর ৬নং কামরা। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত। আমি দ্বিতলে উঠে আবিষ্কার করলুম যে কক্ষ-সংলগ্ন কোনও বাথরুম ত নেইই, এমন কি দ্বিতলের অধিবাসীদের জন্য দ্বিতলে কোনও স্নানাগারও নেই! শুনে আমি সত্বর ঘর বদল ক'রে একতলার '২৬নং ঘরে এসে উঠলুম।

১৫ই তারিখে প্রতিনিধি সংখ্যা অল্প ছিল বলে ওঁরা একটি মাত্র 'কিচেন্' খুলেছিলেন আমাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে। সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গেষ্ট হাউসে'। ত্রিবাঙ্কুর ছাত্রাবাস থেকে একটু দূরে। ওঁরা মোটরকার এনে আমাদের ক'জনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা দু'রকম ছিল। আমিষ ও নিরামিষ। আমি আমিষের তালিকায় নাম লিখিয়েছিলুম। কিন্তু যখন শুনলুম যে যাঁরা আমিষাশী তাঁদের প্রত্যহ এই গেষ্ট হাউসে এসে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজন, বৈকালীন চা ও জলযোগ এবং রাত্রের আহার করতে হবে, আমি আর কালবিলম্ব না করে আমিষের তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে নিরামিষের তালিকায় ভর্তি হলুম। এর ফলে আমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। ত্রিবাঙ্কুর ছাত্রাবাসের নিজস্ব 'কীচেন' খুলবে, সুতরাং বসন্ত বাড়ীতেই খানা মিলবে। দুঃখের বিষয় এদেশের অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। স্বেচ্ছাসেবকেরা অনেক অনুরোধ

রাজা শ্রীআন্নামালাই চেটিয়ার (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা)

করলেন, কেন আপনি নিরামিষ খেয়ে কষ্ট করবেন। চলুন আপনার সীট বদলে আমরা 'গেষ্ট-হাউসে' করে দিই। কিন্তু আমি তখন সব মোটঘাট খুলে দিব্যি সেখানে গুছিয়ে নিয়ে বসেছি। আর কে ওঠে? বিশেষ, আজ যা' নিরামিষ খাওয়ার পরিচয় পেয়েছি তাতে খুশীই হয়েছি। টাট্কা জুঁই ফুলের মতো সাদা সরু চালের ভাত, তাতে খানিকটা গরম গাওয়া ঘী, ডাল, ভাজাভুজি, গোটা দুই তিন সুস্বাদু তরকারী, চাটনী, অম্বল, বাদামের পায়েস, পরমান্ন, মিষ্টান্ন, রসম্ ও পাপর ভাজা। লঙ্কার ঝাল খুবই পরিমিত। কষ্টদায়ক না হওয়ায় বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যেত। রাত্রে আমি ভাত খাইনা বলায়, গরম পুরী ভেজে দিত। আমি চা বা কফি কিছুই খেতাম না বলে রোজ সকালে ইদ্লি, দোশে, ডালপুরী, কলা, মিষ্টান্ন ও চিনি সহ একগ্লাস উৎকৃষ্ট দুধ

দেওয়া হত। মিষ্টান্ন রোজই বদলে বদলে নূতন রকম ব্যবস্থা করা হত। ভোজন পর্বটা ভালই হ'ত। ছাত্রাবাসের সামনেই রাস্তার ধারে ডাব বিক্রী হ'ত। বেশ বড় কচি ডাব, দাম মাত্র দু' আনায় একটি। মুখশুদ্ধির জন্য পান এরা নিজেরা বানিয়ে খান। পানের খিলিকে এরা বলে "বিড়া।"

১৫ই তারিখটা হৈ হৈ করেই কেটে গেল। আমি পূর্বে একাধিকবার এই দক্ষিণভারত বেড়িয়ে গেছি। চিদম্বরম্ ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় আমার দেখা। এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণভারতের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত ও বিবিধ প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি মানুষের কল্পনাতীত প্রচুর দানের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এই মহানুভব দাতার নাম হল ডাঃ রাজা সার্ আন্নামালাই চেটিয়ার। ইনি পরলোকে। এঁরই নামে এস্থানের নামকরণ হয়েছিল "আন্নামালাই নগর"। বর্তমানে ভূতপূর্ব রাজার উপযুক্ত পুত্র রাজা সার এম-এ মুথিয়া চেটিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইনি একদিন লেখক সম্মেলনের সমস্ত প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচ্য কাননে' (Oriental Gardens) বিবিধ ফল, কেক ও মিষ্টান্ন সহ এক বিরাট চা পানের বৈঠকে আপ্যায়িত করেছিলেন। নিজে সর্বক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন, নমস্কার ও হাস্যালাপে প্রত্যেককে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

প্রাচীন 'চিদম্বরম' জনপদের অতি সন্নিকটেই এই বিশ্ববিদ্যালয়। 'চিদম্বরম' নটরাজ শিবের মন্দিরের জন্য বহু বিখ্যাত। প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম সাধনা ও শিল্প-কলা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃতির জন্যও চিদম্বরম গৌরব ও গর্বের অধিকারী। নটরাজ শিবের মূর্তি আজ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েছে। দেশ দেশান্তরের যাত্রীরা দেখতে আসেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতি দিল্লীর ভারত-নায়কেরাও এবার সম্মেলনে এসে নটরাজ শিবের দর্শন আশায় চিদম্বরম্ মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে দেড়শ' মাইল দূরে চিদম্বরমের কোলে দক্ষিণ ভারতের এই গর্বের ও গৌরবের শিক্ষা-মন্দির। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫০ একর অর্থাৎ প্রায় ১৬৫০ বিঘা জমী জুড়ে নির্মিত হয়েছে। 'আন্নামালাই নগর' এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব জনপদ। রাস্তা, ঘাট, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, জলের কল, ড্রেন, গ্যাস, থানাপুলিস সবই আছে এই নব নগরে। আর আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেল, রেস্তোরাঁ, গেষ্ট হাউস, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের অবসর বিনোদনের ক্লাব, লাইব্রেরী, মহিলাদের বৈঠক অর্থাৎ অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের স্ত্রী কন্যা ভগ্নী প্রভৃতি পুরনারীদের মেলামেশার আড্ডা। তাঁদের সন্তানসন্ততিদের জন্য নার্সারী স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার স্কুল প্রভৃতিও আছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। শহরের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে পল্লীর শ্যামশ্রী এর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকায় এই নির্জন শান্তিপূর্ণ স্থানটি বড়ই মনোরম ও প্রীতিকর। সকলপ্রকার জ্ঞানানুশীলন, গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার পক্ষে এমন অনুকুল স্থান অতি অল্পই দেখা যায়।

প্রতিনিধিরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলেন। কেউ কেউ ছুটলেন চিদম্বরম শিব দর্শনে মহাদেব নটরাজের মন্দিরে। আমার এ দু'টিই দেখা বলে আমি আর অকারণ শরীরকে ক্লান্ত করতে কোথাও গেলুম না। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনও নিজেকে নানা দিকে বিস্তৃত করছে। ইঞ্জিনীয়ারিং, মেক্যানিকাল, টেকনিক্যাল, আর্কিটেক্চারাল্, কৃষি-শিল্প বিভাগ, রম্যকলা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, গীতবাদ্য, নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদিও শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সমাজ-মঙ্গল ও পল্লীজীবনের নাগরিক কর্তব্য, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র প্রভৃতি শিক্ষার নানা দিকে এঁরা হাত দিয়েছেন। মধ্য শিক্ষোত্তর বর্ষকাল স্থায়ী একটি সাধারণ শিক্ষার মান উন্নতিকর ব্যবস্থাও এঁরা শুরু করেছেন। শিক্ষার এই নূতন
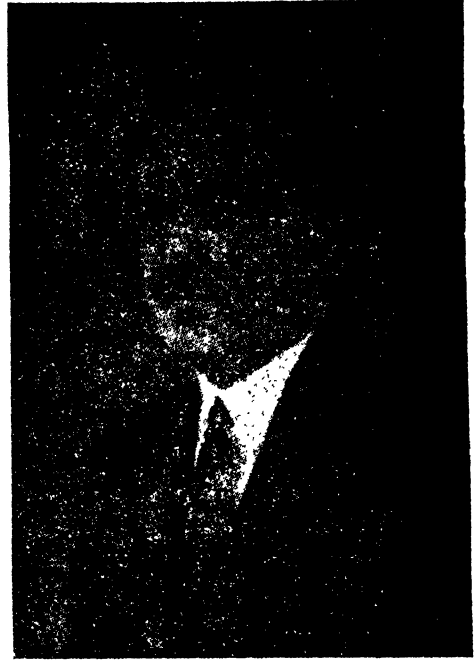
রাজা শ্রীমথিয়া চেটিয়ার (মুখ্য চ্যান্সেলার)

অগ্রগতির সুযোগ এখানে অনেক ছাত্রই গ্রহণ করছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখে বোঝা যায় দক্ষিণ ভারতের উচ্চ শিক্ষালাভের অদম্য স্পৃহা!

এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিরাট শিক্ষামন্দিরের মধ্যে এবার 'সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলনের' আয়োজন হওয়ায়, অনুকুল পরিবেশ ও যোগ্য পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়ায় সম্মেলনটি সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে বলেই সকলে উচ্চআশা পোষণ করছিলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তা' হয় নি। মানুষ ভাবে এক, কিন্তু ঘটনাচক্র নিয়ে যায় তাকে অন্য দিকে। কেমন করে তা' ঘটলো আগামীবারে বিশদভাবে জানাবো।

(আগামীবারে সমাপ্য)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]
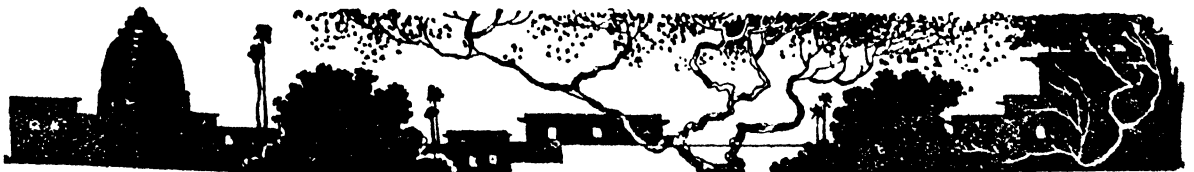
রঙ্গমা বর্ত্তিকাহস্তে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে চার্ব্বাককেই ন্ধান করিতেছিল। জালবদ্ধ শিকার জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন রিলে ব্যাধের যে মনোভাব হয় সুরঙ্গমার সেরূপ মনোভাব য় নাই। চার্ব্বাক চলিয়া যাক ইহাই সে মনে মনে কামনা রিতেছিল। যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া এই জ্ঞানী পণ্ডিতের বন-নাশ করিবার বাসনাও তাহার ছিল না, সে কেবল রীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহার জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণ পর্য্যন্ত ্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। অর্থাৎ দার্শনিকের অনমনীয় বেকের সহিত কামনার দ্বন্দ্বে কামনাই জয়ী হয় কি না। াহার পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। যিনি যজ্ঞবিরোধী, যিনি রলোকে বিশ্বাস করেন না, ইহলোকের সুখ-ভোগই যাঁহার কমাত্র কাম্য, তিনি একজন নটীর মোহে পড়িয়া যজ্ঞে বনাহুতি দিতেই সম্মত হইয়াছিলেন শেষে। তাঁহার সহায় মুখচ্ছবিটা সুরঙ্গমার মানসপটে বারম্বার ফুটিয়া ঠতেছিল। বিজয়িনীর আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ হইয়া সে ই মানব-পশুটাকে লইয়া একটু খেলা করিবে ভাবিয়াছিল, লা করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এ কি ল! লোকটা সহসা অন্তর্দ্ধান করিল কেন? কোথায় ল! কুলিশপাণির কবলে পড়িল না কি! চার্ব্বাকের টুকু পরিচয় সুরঙ্গমা পাইয়াছিল তাহাতে তিনি যে চ্ছায় চলিয়া যাইবেন একথা সুরঙ্গমা ভাবিতেই পারিতে-ল না। একবার প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলে সহজে আত্মস্থ য়া যায় না—ইহাই সুরঙ্গমার অভিজ্ঞতা। তবে একথাও ্য যে চার্ব্বাকের মতো কোনও মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে তাহার মে পড়ে নাই। তাহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া যে ক্তি এত সহজে পলায়ন করিতে পারে সে নিঃসন্দেহে াধারণ ব্যক্তি। এ সম্ভাবনা সুরঙ্গমাকে আরও কৌতূহলী রিয়া তুলিয়াছিল। সত্যটা কি জানিবার জন্য তাই াকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে। একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলে জেই সে বুঝিতে পারিত তাহার এ কৌতূহলের মূলে আছে হার অহঙ্কার। তাহাকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবে ন পুরুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা অসম্ভব তাহার পক্ষে। র্ষি চার্ব্বাকের মধ্যে সে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কি না াই যাচাই করিবার জন্য তাহার আকুলতা, তাই সে বর্ত্তিকাহস্তে অন্ধকারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়াও কিন্তু সে চার্ব্বাকের দেখা পাইল না। হতাশ চিত্তেই ফিরিতেছিল এমন সময় দেখিতে পাইল চার্ব্বাক একটি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে। সুরঙ্গমা দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া চার্ব্বাক তাহারই দিকে দ্রুতপদে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

"ও, সুরঙ্গমা তুমি! আমি ভাবছিলাম বুঝি আর কেউ"

"আপনি কোথা গিয়েছিলেন! আমি আপনাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

সুরঙ্গমা বর্ত্তিকাটি ভূমিতে স্থাপন করিল।

"আমি তোমার আশা ত্যাগ করে' চলে যাব ঠিক করেছি। ওই গাছের উপর উঠেছিলাম—অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে'। ঠিক করেছিলাম ভোরেই বন ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা, মনে হল। মনে হল এমন ভাবে যদি পালিয়ে যাই তোমার ধারণা হবে আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছি। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে দিতে চাই না। তাই ঠিক করেছি কুমার সুন্দরানন্দের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা বলে' আত্মসমর্পণ করব। তা ছাড়া আমি সত্যাশ্রয়ী, চিরকাল সত্যকেই সন্ধান করবার চেষ্টা করছি, প্রাণভয়ে সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হব না। আমাকে সুন্দরানন্দের কাছে নিয়ে চল"

"কুমার তো আপনাকে ক্ষমা করেছেন"

"আমি তাঁর কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না একথা জানবার পরও ক্ষমা করেছেন?"

"আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করবেন কেন তিনি!"

"কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলে' গেলে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। ভোজবাজির সহায়তায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে মূর্ত্তও করে' তুললে তুমি আমার সামনে। ক্ষণিকের জন্য আমি বিহ্বলও হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে ঘোর কেটে যেতে দেরিও হয় নি আমার—"

"এ সব কি বলছেন আপনি! আমি তো আপনার কাছে আসি নি—"

"তুমি সুন্দরী, ছলনাই তোমার ভূষণ। আমি তোমার উপর রাগ করছি না। কিন্তু আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই!"

"আপনি ভুল করছেন মহর্ষি। সত্যিই আমি আপনার কাছে আসি নি। আমার অপেক্ষায় বসে' বসে' আপনি হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। সেই তন্দ্রার ঘোরে সম্ভবত স্বপ্ন দেখেছেন আপনি—"

"তুমি যখন বলছ তখন তাই ঠিক। আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা আমি জেগেই ছিলাম। যাক, এখন ওসব আলোচনা করে' লাভই বা কি! কুমার সুন্দরানন্দের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তিনি আমার সম্বন্ধে যা ঠিক করবেন তাই আমি মেনে নেব"

"আপনি আশা করি, যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে এখনও প্রস্তুত আছেন?"

"না। স্বেচ্ছায় আমি যূপকাষ্ঠে আর গলা বাড়িয়ে দেব না। তবে কুমার যদি জোর করে' আমাকে বধ করেন সে আলাদা কথা।"

"কিন্তু একটু আগে তো আপনি প্রস্তুত ছিলেন"

"সেজন্য আমি লজ্জিত। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছিল"

চার্ব্বাক ও সুরঙ্গমা কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

চার্ব্বাক সহসা বলিল, "আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি সুরঙ্গমা। এখনও চাই—"

"কিন্তু—"

সুরঙ্গমা আর কিছু বলিতে পারিল না। অঞ্চলপ্রান্ত তুলিয়া নয়ন দুইটি আবৃত করিল।

"কাঁদছ না কি—!"

সুরঙ্গমা মুখ হইতে অঞ্চলপ্রান্ত সরাইয়া দিল। চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল সত্যই তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র।

"কাঁদছ কেন সুরঙ্গমা হঠাৎ"

"হঠাৎ নয়, চিরকালই কাঁদছি। কান্নার উপর হাসির যে মুখোশটা পরে' থাকি সেটা মাঝে মাঝে সরে যায়। এখন গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে প্রকৃত প্রেমিকের দর্শন পেয়েছি, কারণ আমাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আপনি, কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যা, সব ভুল—"

চার্ব্বাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিকই ধরেছ, সব মিথ্যা, সব ভুল। আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখ বুঝতে পারবে, সব সত্য সব ঠিক। সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন"

"বুঝতে পারছি না আপনার কথা। আমি মূর্খ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন"

আমি তোমার জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম—মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে যজ্ঞীয় বলি রূপে মনোনীত করবেন না, আমার শরীরে অনেক খুঁত আছে! এখন অকপটে স্বীকার করছি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতে পারব, হয়তো তোমাকে নিয়ে চলে যেতেও পারব এ দুরাশা আমার হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও মনে হয়েছিল মহর্ষি পর্ব্বত যজ্ঞীয় বলিরূপে আমাকে মনোনীত না করলেও তাঁর কন্যার প্রণয়ীরূপে আমার জীবনান্ত ঘটাতে পারেন। তাই তোমাকে সুন্দরানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলাম জানতে যে তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা। আমার এ বিশ্বাসও ছিল তুমি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু তুমি যখন ফিরে এসে বললে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না, অদ্ভুত ভোজবাজি দেখিয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেও তুমি যখন হাজির করলে আমার সামনে—"

সুরঙ্গমা আবার প্রতিবাদ করিল।

"বিশ্বাস করুন মহর্ষি, আমি ওসব কিছুই করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ওটা। কুমার আপনাকে ক্ষমা করেছেন এই কথাটা বলবার জন্য আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন?"

"হ্যাঁ। আর একটি সুসংবাদও আছে—মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে বলির পশুরূপে নির্ব্বাচন করেন নি। যজ্ঞের জন্য একটি কিরাত বালককে কিনে আনা হয়েছে—"

"ও—"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমার তাহলে তো আর কুমারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, গোপনতারও প্রয়োজন নেই। কোথাও রাতটা কাটিয়ে সকালেই ফিরে যাব"

সুরঙ্গমার মুখটা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"আমাকে ফেলে চলে যাবেন?"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে? যদি যাও আমি কৃতার্থ হব"

"রাজনর্ত্তকীকে এমন ভাবে হরণ করে' নিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ?"

"তোমার জন্য বিপদ বরণ করতেও আমি প্রস্তুত"

"চলুন তাহলে ভেবে দেখি"

"কোথা যাব"

"আমার সঙ্গে আসুন"

"কোথা নিয়ে যাচ্ছ আগে বল"

"আমার শয়নকক্ষে"

একটু

হিমালয় বোকে পারফিউম

আপনাকে আরও মোহময় ক'রে তুলবে

HIMALAYA BOUQUET Perfume

সুগন্ধের মাধুর্য্যে অনুপম এই পারফিউম্ গুণে অতি স্নিগ্ধ ও মনোহর। সৌখিন ও রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই হিমালয় বোকে পারফিউমের কদর জানেন।

আর একটি সুষ্ঠু ইয়ার্ডলি সৃষ্টি

HB. 23-50 BG

ইয়ার্ডলি কোং, লিঃ লণ্ডনের তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

"সেখানে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো—"

"বিপদ বরণ করতে তো আপনি প্রস্তুত!"

"কুমার কোথা আছেন?"

"তিনি নিজের ঘরে আছেন। আমার ঘরে তিনি যদি এসেও পড়েন আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নেই"

"চল—"

সুরঙ্গমা ভূমি হইতে বর্ত্তিকাটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। চার্ব্বাক তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই।

হঠাৎ সুরঙ্গমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সিংহটা গর্জ্জন করিতেছে। একটু থামিয়া পুনরায় গর্জ্জন হইল। গর্জ্জনের পর গর্জ্জন হইতে লাগিল। তাহার পর চতুর্দ্দিক নীরব হইয়া গেল। সুরঙ্গমা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চার্ব্বাক অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। সিংহের প্রচণ্ড গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক পুনরায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গর্জ্জন হইল, মনে হইল যেন দুইটা সিংহ ডাকিতেছে। পর পর দুইটা ডাক দুই রকম। সুরঙ্গমার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মিম্মির সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া ওই পুরুষ-সিংহকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন, সিংহিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া ওই প্রবল-প্রতাপ বলিষ্ঠ পশুরাজ বন্দী হইয়াছিল। মিম্মির কি পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে? সুরঙ্গমা দ্রুতপদে মিম্মিরের গৃহের দিকে আগাইয়া গেল। দেখিল তাঁহার ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। পুনরায় গর্জ্জন হইল। পর পর দুইবার—একটা আহ্বান আর একটা উত্তর। সুরঙ্গমা বাহির হইয়াছিল কুমারের সন্ধানে। যে নূতন ক্রীড়নকটি লইয়া খেলা করিতে তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন সেটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল। নিদ্রামগ্ন দুর্দ্ধর্ষ চার্ব্বাককে দূর হইতে দেখাইবার জন্য সে কুমারকে ডাকিতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সিংহের গর্জ্জনে সে ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিম্মির লোকটা পাগল না কি! মিম্মিরের শূন্যকক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুরঙ্গমা আবার বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া সুন্দরানন্দের গৃহের উদ্দেশেই আবার পদচালনা করিল সে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। কাননের পক্ষীকুল সহসা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। তাহার পর আবার থামিয়া গেল।

...কুমার সুন্দরানন্দের গৃহের সম্মুখে একটী শিবিকা দেখিয়া সুরঙ্গমা বিস্মিত হইল। শিবিকায় কে আসিল? ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরঙ্গমা আরও বিস্মিত হইল। দেখিল একটি বিগত-যৌবনা রমণী কুমারের সহিত আলাপ করিতেছে। তাহার নয়নে অশ্রু। সুরঙ্গমাকে দেখিয়া সে নীরব হইল এবং অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

কুমার হাসিয়া বলিলেন—"এই যে সুরঙ্গমাও এসে পড়েছ দেখছি। ভাল সময়েই এসেছ, বস"

সুরঙ্গমা একটি আসনে উপবেশন করিয়া নবাগতার দিকে কয়েকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুমার তাহার পরিচয় দিলেন।

"এই ভদ্রমহিলা জানি না কি করে' খবর পেয়েছেন যে আমি 'যজ্ঞে জোর করে' একটি নারী বলিদান দিচ্ছি। উনি এ খবরও পেয়েছেন যদি অন্য কোনও নারী আমার এ যজ্ঞে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে প্রথম নারীটি অব্যাহতি পাবে। সেজন্য উনি নিজেকে যূপকাষ্ঠে সমর্পণ করতে এসেছেন এবং আমাকে অনুরোধ করছেন প্রথমা নারীটিকে মুক্তি দিতে"

সুরঙ্গমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কুমার সুরঙ্গমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই সেই নারী যিনি যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে চাইছিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত এঁকে মনোনীত করেন নি। কোনও নারীকেই তিনি নির্ব্বাচন করবেন না। অন্য ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আপনি পথশ্রান্ত হয়েছেন নিশ্চয়, একটু বিশ্রাম করুন। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার দ্বারা আপনার যদি কোনও উপকার হয় তা আমি নিশ্চয় করব।"

এইবার মহিলাটি সুন্দরানন্দের মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি মহৎ নই, আমি অতি নগণ্য, সামান্যা রূপজীবী মাত্র। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার যজ্ঞের কথা শুনলাম। তখন মনে হল আমার এই তুচ্ছ জীবন যজ্ঞে সমর্পণ করলে যদি কোনও নিরীহ রমণীর প্রাণরক্ষা হয় তাহলে তাই করা উচিত। সেইজন্যই আমি এসেছি। আমার জীবনে সুখের লেশমাত্র নেই, অনেক সন্ধান করেও সুখের নাগাল আমি পাই নি, তাই আমি জীবন-বিসর্জ্জন করতে চাই, আমাকে মহৎ বলে মহত্ত্বের অপমান করবেন না। আমি মহৎ নই, হতভাগিনী।"

কুমার একবার বিচলিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন"

"হর্ষ-নীড় গ্রাম থেকে"

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কি"

"নীলোৎপলা"

কুমার বলিলেন, "বেশ, আপনি যতদিন খুশী আমার কাছে থাকুন। আপনি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব"

যে ভৃত্যটি বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল সুন্দরানন্দ তাহাকে আদেশ দিলেন নীলোৎপলার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। প্রণাম করিয়া নীলোৎপলা ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেল।

কুমার সুরঙ্গমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবাই প্রাণ বিসর্জ্জন করতে চায়। কেবল চার্ব্বাক নয়, নীলোৎপলাও। মহর্ষি কোথায় এখন ?"

"আমার শয়নকক্ষে দেখবেন চলুন"

"সেখানে কি করছেন তিনি ? প্রাণ-বিসর্জ্জন দেবার মহড়া দিচ্ছেন না কি"

"না, ঘুমুচ্ছেন। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ঘুম হয় নি মহর্ষির"

"সত্যি কি তোমার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন উনি ?"

"হয়েছিলেন, এখন কিন্তু মত পরিবর্ত্তন করেছেন। বলছেন মোহগ্রস্ত হয়ে উনি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন বলে লজ্জিত"

"এখন মোহমুক্ত হ'য়েছেন বুঝি"

"না, মোহমুক্ত হবার বাসনাই ওঁর নেই। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ উনি আর করবেন না। আমি সুলভ নই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ফিরে যেতে চাইছিলেন, আমি জোর করে' ওঁকে ফিরিয়ে এনেছি"

"কেন"

"আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। এতক্ষণে লোকটিকে ভাল লেগেছে—"

কুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কেন লেগেছে বুঝেছি"

"কেন বলুন তো" —সুরঙ্গমা নয়নে হাসি বিকসিত করিতে লাগিল।

"তুমি যে দুর্ল্লভ—এই সত্যটা ওঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে বলে"

"আমি দুর্ল্লভ একথা আপনিও বলবেন ?"

"সত্যি কথা বললে তাই বলতে হয়। আমি যে তোমাকে লাভ করেছি তা ঠিক জানি না এখনও।"

সুরঙ্গমা উঠিয়া আসিয়া সুন্দরানন্দের কণ্ঠলগ্না হইল।

"জানেন, নিশ্চয় জানেন। বলুন জানেন—"

সুন্দরানন্দের অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই হাসিকে সুরঙ্গমার বড় ভয়। এই হাসি নীরব ভাষায় যেন বলে—আমাকে চেন না ? আমি পুরুষ। আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছি, যে কোনও মুহূর্ত্তে চলে' যেতে পারি।

"বলুন—"

"যা অনেকদিন থেকে জান, তা আবার নতন করে' শুনতে চাইছ কেন। তার চেয়ে চল, তোমার নূতন প্রণয়ীটির সঙ্গে আলাপ করে' আসি"

"প্রণয়ী বলছেন কেন। খেলনা বলুন। আপনিই তো দিয়েছেন"

"বেশ খেলনাই। চল আলাপ করি। একটু কিন্তু ভয় ভয় করছে"

"কেন"

"লোকটি শুনেছি অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিত লোকের কাছে কি বলতে কি বলে ফেলব—"

"আপনি কুমার সুন্দরানন্দ। আপনি যা বলবেন তাই সুন্দর, যা করবেন তাই আনন্দজনক"

সুরঙ্গমা আবেগভরে তাঁহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। তাহার পর উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া কুমার দেখিলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী জিমূতক দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। গতিরোধ করিতে হইল। মন্ত্রী মহাশয় প্রায় ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কুমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সিংহটা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। মিম্মির কাছের একটা ঝোপে ছিলেন। সিংহের কবলে পড়েছেন তিনি। সিংহটা তাঁকে এতক্ষণ নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো করে' ফেলেছে। আমাদের ভয় হচ্ছে আর কিছু না করে। অনেকে এ খবর জানেই না। বিশ্বনাথ নামে কর্ম্মচারীটি ছুটে এসে খবরটি দিলে আমাকে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি তীক্ষ্ণমুখ ছোরা এবং ধনুর্ব্বাণ সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সুরঙ্গমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া বলিলেন, "তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। সাহসও আছে। তুমিই চল আমার সঙ্গে। মন্ত্রী মশায় আপনি এখানে থাকুন"

"কোথা যাচ্ছেন আপনারা ! হঠকারিতা করবেন না। মনে রাখবেন এ কস্তুরী মৃগ নয়, সিংহ—"

কুমারের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিল।

বলিলেন, "রাখব"

সিংহের খাঁচার নিকট গিয়া দেখা গেল খাঁচাটি সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছে, একটা গাছের গুঁড়ি হেলিয়া পড়িয়াছে।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি বলিল, "একটু আগে উনি সিংহটাকে সেই রকম শব্দ করে উত্তেজিত করছিলেন, আমি নিজে শুনেছি"

নিকটে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল।

সুন্দরানন্দ বলিলেন, "চল এইটেতে ওঠা যাক। দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়"

গাছে উঠিয়াই বীভৎস দৃশ্যটি সুন্দরানন্দ দেখিতে পাইলেন। গাছের নীচেই একটি ঝোপের ধারে বসিয়া সিংহটি মিম্মিরকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, "আমি তীর ছুঁড়ব ?"

"না, দরকার হলে পরে ছুঁড়ো—"

এই কথা বলিয়া কুমার বৃক্ষশিখর হইতে বিদ্যুৎবেগে লম্ফ দিয়া সিংহের উপর গিয়া পড়িলেন এবং প্রকাণ্ড ছোরাটি তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বসাইয়া দিলেন। সিংহের গর্জ্জনের সহিত সুরঙ্গমার চীৎকারও মিশিল, কারণ সুরঙ্গমাও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সুন্দরানন্দ লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন সিংহের পিঠের উপর, সুরঙ্গমা পড়িল তাহার ব্যায়ত মুখের সম্মুখে। সুন্দরানন্দ যদি ত্বরিত গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সুরঙ্গমাকে সরাইয়া না লইতেন সুরঙ্গমারও সেদিন মৃত্যু হইত। ছোরার আঘাতে সিংহের মেরুদণ্ড এবং হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে গর্জ্জন করিতেছিল বটে কিন্তু উঠিতে পারিতেছিল না। কুমার সুরঙ্গমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইলেন, সুরঙ্গমার মৃণাল বাহু কুমারের বলিষ্ঠ গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। সুরঙ্গমা কাঁপিতেছিল। কুমার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। "কাঁদছ না কি—"

"না"

সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের বুকে মুখ লুকাইয়াছিল।

"কই দেখি—"

সুরঙ্গমা কুমারের মুখের দিকে চাহিল। কুমার দেখিলেন তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র, কিন্তু মুখে হাসি। সিংহ পুনরায় একটা গর্জ্জন করিয়া নীরব হইল।

কুমার বলিলেন, "চল আগে তোমার নূতন খেলনাটা দেখে আসি। তারপর মির্শ্বিরের শেষকৃত্য করা যাবে"

(ক্রমশঃ)

রাত্রি মধুর হোক

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নম্র-চক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুন জাগে
ক্রৌঞ্চ-মিথুন ভুলেছে আজিকে শোক ;
তোমার আমার মৌনতা নিয়ে
রাত্রি মধুর হোক !
আরাবল্লীর গিরি-প্রান্তরে দিন—
দিন-কুরঙ্গ আত্মশোষক নয়,
প্রাসাদ-চূড়ায় রাজকন্যার
হৃদয় কী নির্ভয় ?
শোণিত-প্লাবন মেঘে-মেঘে তোলে ঢেউ
জানতো সে যারা, হেথা নেই আজ কেউ,
আকাশেতে নয়—বাতাসে ভৈরবীর
মন্থর-নিঃশ্বাস,
রহস্য ঘন প্রাণের প্রান্তে
গোলাপের নির্যাস !
ভাসা-ভাসা আর টানা-টানা চোখে লোল
লোল গভস্তি জ্যোৎস্নায় ঝলমল,
বুকের নিভৃতে মায়া গেল নাকি
মাংসল-উৎপল !
দিবস-শেষের স্বর্ণ আভায় লিখে
জোনাকী প্রহর হারালো কী দিকে দিকে,
ফুলঝুরি-বাস চিকন চুলের রাশি—
নিরঙ্গ তবু নির্যাম নির্মোক !
ক্রৌঞ্চ বঁধূর এই নিমেষেকেই
রাত্রি মধুর হোক ॥

সংস্কৃত চর্চ্চার পুনপ্রবর্ত্তন প্রয়োজন—

সর্দার কে-এম-পানিকর সুপণ্ডিত দেশ-সেবক। সম্প্রতি তিনি রাজ্যসীমা পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য। গত ২রা মে লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত সংস্কৃত পরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল স্থানের সকল রাজ্যের লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমাদর করে। বর্তমানে দেশের সর্বত্র সংস্কৃত শিক্ষার পুনপ্রবর্তন প্রয়োজন—তবেই আমরা দেশের জাতীয় ঐতিহ্য বুঝিতে ও শিখিতে পারিব। এ কথা সত্য যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে ভারতের গৌরব-কাহিনী জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্যের প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত জাতীয়তা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন। দেশের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগীবৃন্দ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিলে দেশ সত্বর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

দিল্লী প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর সম্মান—

দিল্লীর 'জয়পুর হাউস' নামক বিরাট গৃহে গত ২৯শে মার্চ উপ-রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ আধুনিক শিল্পের জাতীয় সংগ্রহশালার উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে অমৃত সের গিলের ৩০খানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৩ সালের জুলাই হইতে শিল্প-সংগ্রহ একত্র করা হয়। তথায় ভাস্কর্য্যেরও একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ উহার পরিচালক। বিভিন্ন স্থানের ৩৭জন ভাস্করের ৬৬টি মূর্তি তথায় রাখা হইয়াছে। ভাস্কর্য্য সংগ্রহে নিম্নলিখিত সংগ্রহগুলি পুরস্কার লাভ করিয়াছে—প্রথম পুরস্কার—এক হাজার টাকা, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ব্রোঞ্জনির্মিত—"শ্রমের জয়"। দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫০ টাকা—শ্রীশংখ চৌধুরীর লাইম-ষ্টোনের "প্রসাধন"। তৃতীয় পুরস্কার—৫শত টাকা—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর প্লাষ্টারের "মস্তক"। চতুর্থ পুরস্কার—৪শত টাকা—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর প্লাষ্টারের "শীতের আগমন"। পঞ্চম পুরস্কার—৩৫০ টাকা—শ্রীরামকিঙ্করের প্লাষ্টারের "চিত্র-ভাস্কর্য্য"। ষষ্ঠ পুরস্কার—৩০০ টাকা—শ্রীধনরাজ ভগতের ধাতু-খণ্ডে—"দণ্ডায়মান নারী" প্রভৃতি। শ্রীদেবীপ্রসাদ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ—তিনটি পুরস্কার লাভ করিয়া শুধু তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দান করেন নাই—তাঁহার এই অবদান বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। আমরা শ্রীদেবীপ্রসাদের এই সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং এই শিল্পী, ভাস্কর, সাহিত্যিক—নানা গুণান্বিত এই বাঙ্গালীর দীর্ঘজীবন এবং উত্তরোত্তর অধিক সাফল্য কামনা করি।

গোয়াবাগানে বস্তী উন্নয়ন—

গত ১লা বৈশাখ কলিকাতা ১৯ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে বস্তী উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্যামলাল বিদ্যামন্দিরের দারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সহধর্মিণী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ করেন। কাউন্সিলার শ্রীপান্নালাল দাস বিদ্যালয় সম্পর্কে সভায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীবঙ্কীচরণ দাস পঠিত বিবরণে দেখা যায় যে বস্তীর কর্মীদের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ঐ বস্তীটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শরীরচর্চা, রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহারা অন্যের সাহায্য না লইয়াই নিজেদের উন্নতিবিধানে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা বস্তীবাসীদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি এবং বিশ্বাস করি, সর্বত্র এই আত্মনির্ভরতা অনুকৃত হইবে।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লীতে সম্বর্দ্ধিত—

দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধিত করেন। দিল্লী কালীবাড়ি ক্লাব, বেঙ্গলী ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। গত ৩রা এপ্রিল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁহাদের 'দরবারী-কানড়া' রাগের আলাপ ও ধ্রুপদ, 'নায়েকী-কানড়া' রাগের ধামার এবং অন্যান্য রাগের ধ্রুপদ, সমগ্র ভারতের বেতার শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বাঙলায় স্বনামধন্য গায়ক কবি যদু ভট্ট রচিত 'বাহার' রাগের বিখ্যাত ধ্রুপদ "আজু বহত বসন্ত পবন" গানটি বিশেষ করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষক হয়। তানসেন প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত ধারার ইঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউ দিল্লী কালিবাড়ি ক্লাবে, দিল্লীর বাঙ্গালী-সমাজ কর্তৃক সঙ্গীত

নায়ক মহাশয় ও রমেশচন্দ্রকে অভিনন্দন দান করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীবিজন মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করেন। সঙ্গীতনায়ক মহাশয় ও রমেশবাবু তাঁহাদের সুললিত সঙ্গীতে অসংখ্য শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করেন। শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে রমেশবাবু উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। দিল্লীর অন্যান্য বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গীতাদি হয়।

অমরেন্দ্র ঘোষের সম্বর্দ্ধনা –

বিগত ৪ঠা এপ্রিল ২২ লেক রোডে চারুচন্দ্র কলেজ হলে সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষকে খাদ্য-দপ্তরের কর্ম্মচারী ও গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ এক বিদায় সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব নাতিদীর্ঘ লিখিত ভাষণে শ্রীযুক্ত ঘোষের পূর্ব্ব বাংলার আঞ্চলিক সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে ইচ্ছা ছিল মুসলমান চরিত্র উপন্যাসের উপকরণ করেন, কিন্তু তাহা বাস্তব রূপদান করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারীর মত কাশেম-কনকপুরের কবি-তে সে কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। আমরাও শ্রীযুক্ত ঘোষের দীর্ঘ কর্ম্মময়-জীবন কামনা করি।

কলিকাতায় নূতন চক্ষু হাসপাতাল—

খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ এম-এন চট্টোপাধ্যায় গত ১৯৩৯ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করার সময় ৮টি পুত্র ও ৮টি কন্যা থাকা সত্ত্বেও ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি চক্ষু হাসপাতালের জন্য দান করিয়া যান। গত ১লা বৈশাখ কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের সম্মুখে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিরাট বাসভবনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নূতন হাসপাতালের উদ্বোধন করিয়াছেন। তথায় ২০টি শয্যা, একটি কেবিন লইয়া আন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগ সমন্বিত হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। তথায় শুধু চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থাই থাকিবে। ক্রমে তথায় চক্ষুরোগ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে। উদ্বোধন কালে ডাক্তার রায় বলিয়াছেন—ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন - কিন্তু তিনি যে এত অধিক অর্থ উপার্জন করিতেন ও এত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, সে পরিচয় তিনি জানিতেন না। এই নূতন হাসপাতালের দ্বারা বহু চক্ষুরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু অন্য প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া পুনরায় কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই কংগ্রেস পক্ষীয় এবং গত ২ বৎসরও ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই লইয়া পর পর তিন বার তাঁহারা নির্বাচিত হইলেন—ইতিপূর্বে আর কেহ পর পর তিন বার নির্বাচিত হন নাই।

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু এম-এল-এ নির্বাচিত—

২৪ পরগণা বীজপুর কেন্দ্রের এম-এল-এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় পরলোকগমন করায় তাঁহার স্থানে কংগ্রেস প্রার্থী খ্যাতনামা সমাজ-সেবিকা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু সকল দলের প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া এম-এল-এ নির্বাচিতা হইয়াছেন। ডাঃ বসু শ্রমিক মঙ্গল আন্দোলনের নেত্রী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

দেশ বিদেশের সৌখীন মৎস্য প্রদর্শনী—

গত ১৬ই হইতে ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৫ দিন কলিকাতা ৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে—শ্রীবলাইলাল চন্দ্রের দেশ-বিদেশের সৌখীন মৎস্য প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রথম দিনে মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এত অধিক আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট মৎস্যের সমাবেশ একত্র প্রায়ই দেখা যায় না। চন্দ্র মহাশয়ের এই সংগ্রহশালা তাহার নিষ্ঠার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা দেশের লোকের মনে মৎস্য চাষে উৎসাহ হইলেই মঙ্গলের কথা।

ভ্রম সংশোধন—

গত বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত 'পুণ্যতীর্থ হালিসহর কুমারহট্ট' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"বর্তমানে রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডি আসনের অধিকারিণী শুনিলাম গুরুমা।" হালিসহর গুড়উইল ফ্রেটারমিটির সম্পাদক, স্থানীয় খ্যাতনামা অধিবাসী, শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের জানাইয়াছেন —"যোগেন্দ্রবাবুর ঐ উক্তি ঠিক নহে। রামপ্রসাদের স্মৃতিভবন, পঞ্চবটী ও তৎসংলগ্ন জমীর অধিকারী হালিসহর গুড়উইল ফ্রেটারমিটি। উক্ত গুরুমা তাহার মালিক নহেন।"

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ব টেবল টেনিস ঃ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষদের সিঙ্গলস : ইচিরো ওগিমুরা (জাপান) ২১-৭, ২১-২, ১৮-২১, ২১-১০ পয়েণ্টে টাগে ফ্লিসবার্গকে (সুইডেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিসেস এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া) ২১-১৪, ১৪-২১, ২১-১৭, ২১-৯ পয়েণ্টে মিস ইয়োশিও তানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : ভি হারাঙ্গাজো এবং জেড ডোলিনার (যুগোশ্লাভিয়া) ২১-১৫, ২১-১১, ২১-১০ পয়েণ্টে এম হগ্নেয়ার (ফ্রান্স) এবং ভি বার্ণাকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : রোজালিণ্ড এবং ডায়না রো (ইংলণ্ড) ১৯-২১, ২১-১০, ২১-১৯, ২২-২০ পয়েণ্টে এনি হেডন এবং ক্যাথলীন বেষ্টকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : আইভ্যান এণ্ড্রিয়াডিজ (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং জি এফ গারভাই (হাঙ্গেরী) ২১-১৭, ১৯-২১, ২১-১৫, ২৩-২১ পয়েণ্টে জে তোমিতা এবং মিস এফ্ ইওচিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ (সোয়েথলিং কাপ) : জাপান

মহিলা বিভাগ (করবিলন কাপ) : জাপান

ইংলণ্ডের ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত ২১তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে জাপান দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। পুরুষদের দলগত বিভাগের খেলাগুলিতে জাপান কোন দেশের কাছে হার স্বীকার করেনি। প্রতিযোগিতার আটাশ বছরের ইতিহাসে একমাত্র জাপানই প্রথম অপরাজয় অবস্থায় সোয়েথলিং কাপ পেল। এ ছাড়া একই বছরে সোয়েথলিং কাপ (পুরুষ বিভাগে) এবং করবিলন কাপ (মহিলা বিভাগে) পেয়ে—১৯৩৭ সালে আমেরিকা কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত একই বছরে এই দুটি কাপ পাওয়ার রেকর্ডের সমান অংশীদার হয়েছে। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডবলসের ফাইনালে জাপান পুরুষদের সিঙ্গলসে জয়ী হয়েছে এবং অপর দুটি বিভাগে রাণার্স-আপ হয়েছে। জাপানের এ সাফল্য অভূতপূর্ব ঘটনা হিসাবে গণ্য করা যায়। এই নিয়ে জাপান মাত্র দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় যোগদান করলো—ইউরোপে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম যোগদান। জাপান বিশ্বটেবল টেনিস খেলায় প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায়। প্রথম যোগদানের বছরেই জাপান মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে করবিলন কাপ পায় এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসের ফাইনালে জয়ী হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে জাপানই কেবল বিশ্বটেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ করেছে। ১৯৫৩ সালে জাপান বিশ্বটেবল টেনিস খেলায় যোগদান করেনি। আলোচ্য বছরের সিঙ্গলস ফাইনালে জাপানের ওগিমুরা এবং সুইডেনের ফ্লিসবার্গ উভয়ই স্পঞ্জ ব্যাট ব্যবহার করেন। ওগিমুরা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বয়স মাত্র ২১। ফ্লিসবার্গের বয়স ওগিমুরার দ্বিগুণ এবং খেলার অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি একজন প্রবীণ খেলোয়াড়। কিন্তু মাত্র ২৯ মিনিটের খেলায় তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়। ওগিমুরার সাফল্যে 'পেন হোল্ডার গ্রিপ'-এর উপযোগিতা পুনরায় সমর্থিত হ'ল। কলম ধরার মত ব্যাট ধরার পদ্ধতির নাম 'পেন হোল্ডার গ্রিপ'। পদ্ধতির ক্রমবিকাশের স্রোতে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস মহলে এই পদ্ধতি অনেক কাল আগেই বাতিল হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের বিশ্বটেবল টেনিস খেলায় জাপানের সাটো সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়ে অধুনালুপ্তপ্রায় 'পেন হোল্ডার গ্রিপ' পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণ করেন।

১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্যের প

রুমানিয়ার মহিলা খেলোয়াড় এঞ্জেলিকা রোজিন্থর সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবার নিয়ে তিনি পর পর পাঁচ বছর মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হ'লেন। তিনি ছাড়া হাঙ্গেরীর মেডনিয়ানসজেকি ১৯২৬-৩০ পর্য্যন্ত মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হ'য়ে উপর্য্যুপরি অধিকবার চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রথম রেকর্ড করেছিলেন।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল হিসাবে উল্লেখযোগ্য—জাপানের ইচিরো ওগিমুরার কাছে গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান সিডোর পরাজয়, খেলার ২য় রাউণ্ডে চেক্ খেলোয়াড়দের কাছে গত বছরের মিক্সড ডবলস চ্যাম্পিয়ান সিডো এবং এঞ্জেলিকা রোজিন্থর পরাজয় এবং মহিলাদের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের কুমারী ইয়োশিকো তানাকার কাছে অষ্ট্রেলিয়ার মিস ওয়ার্টসের পরাজয়।

আলোচ্য বছরের খেলায় ভারতবর্ষ দলগত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের 'বি' গ্রুপে ৯টী দলের মধ্যে ৪র্থ স্থান পায়—জয় ৫ এবং হার ৩। এবং মহিলা বিভাগের 'সি' গ্রুপে ৬টি দলের মধ্যে ৩য় স্থান লাভ করে—জয় ৩ এবং হার ৩। পুরুষ বিভাগের তিনটি খেলায় ভারতবর্ষ হার স্বীকার করে 'বি' গ্রুপের বিজয়ী দেশ এবং সোয়েথলিং কাপ জয়ী জাপান, 'বি' গ্রুপের রাণার্স-আপ হাঙ্গেরী এবং রুমানিয়ার কাছে। ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন—মহিলাদের সিঙ্গলসের ৩য় রাউণ্ডে পর্য্যন্ত মিস সুলতানা, পুরুষদের সিঙ্গলসের ৪র্থ রাউণ্ডে পর্য্যন্ত যতীন ব্যাস এবং মিক্সড ডবলসের ৩য় রাউণ্ড পর্য্যন্ত থ্যাকার্সি এবং মিস পারাণ্ডে।

নিখিল ভারত নৌবাইচ প্রতিযোগিতা ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এ বছরের নিখিল ভারত নৌবাইচ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

উইলিংডন কাপ : বিজয়ী—করাচী বোট ক্লাব-এ : রাণার্স-আপ ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব।

ম্যাকনীল স্কালস : বিজয়ী—লেক ক্লাব-বি।

ভেনেবলস বাউল : বিজয়ী—বোম্বাই জিমখানা : রাণার্স-আপ ক্যালকাটা লেক ক্লাব-বি।

হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগ খেলার প্রথম বিভাগে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর ক্লাব এ বছরও লীগ জয়ী হয়েছে। রাণার্স-আপ হয়েছে কাষ্টমস ক্লাব। লীগ খেলার মাঝামাঝি সময়ে ভবানীপুর, কাষ্টমস, মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল-এই চারটি ক্লাবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এ সময়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পয়েণ্ট ছিল ১৮, ৯টা খেলায়। তখনও কোন খেলায় হার ছিল না বা কোন গোল খায় নি। দশম খেলায় মোহনবাগানের কাছে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম হার স্বীকার করে এবং লীগের খেলায় প্রথম গোল খায়। এর পর আরও কয়েকটা খেলায় হার হওয়াতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ৪র্থ স্থান লাভ করে। ফলে শেষের দিকের খেলায় ভবানীপুর, মোহনবাগান এবং কাষ্টমস ক্লাবের মধ্যে যে কোন একদলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়; কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব লীগের ৮ম স্থান অধিকারী পাঞ্জাব স্পোর্টসের কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়ে, লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লা থেকে পেছনে পড়ে যায় এবং কাষ্টমসের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে তাদেরও সুযোগ নষ্ট করে। মোহনবাগান এবং কাষ্টমস দল এ ভাবে পয়েণ্ট নষ্ট করায় ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আর কোন বাধা রইলো না। অনেকে ভেবেছিলেন, লীগের শেষ খেলা ভবানীপুর-মোহনবাগানের খেলার ওপরই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। কিন্তু তার আগেই ভবানীপুর লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রয়োজনীয় পয়েণ্ট পেয়ে যায়।

লীগ তালিকায় প্রথম চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ভবানীপুর	১৮	১৬	১	১	৩৩	৩	৩৩
কাষ্টমস	১৮	১৪	৩	১	৩৬	৭	৩১
মোহনবাগান	১৮	১২	৫	১	৩৯	৫	২৯
ইষ্টবেঙ্গল	১৮	১২	১	৫	২৮	১২	২৫

মহিলাদের জাতীয় হকি খেলা ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ৩—০ গোলে মহারাষ্ট্রদলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

ইংলিংস ফুটবল ঃ

১ম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান—উলভার হাম্টন।

এফ এ কাপ : বিজয়ী-ওয়েষ্ট ব্রুমউইচ অলবিয়ন-৩
রানার্স-আপ-প্রেসটন নর্থ এণ্ড-২

ভারতবর্ষ

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

কবি আমীর খুসরোর প্রেমকাব্য

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

দেবলা দেবী ছিলেন গুর্জর রাজপুতবংশে পরম রূপসী রাজকন্যা।

তার প্রেম ও তার প্রতি প্রেম নিয়ে অমরকাব্য 'ইশকিয়া' রচনা করেছিলেন আমীর খুসরো। খুসরো একদিন সুলতান আলাউদ্দিনের বড় ছেলে খিজর খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন শাহজাদা দেবল রাণীর প্রতি তার প্রেম সম্বন্ধে একটি কাব্য লিখতে অনুরোধ করেন। যুবরাজ হৃদয়ের আবেগ নিজেই ভাল করে লিখে রেখেছিলেন। কবি খুসরো সেটিকে কাব্য-ছন্দে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

শাহজাদার আত্মপ্রেমকাহিনী পড়তে পড়তে কবি দেখলেন যে তার মধ্যে বেশীর ভাগ শব্দই হচ্ছে হিন্দি। হিন্দির তখন শৈশব চলছে। তবু কবি স্বীকার করলেন যে একটু ভেবে চিন্তে বিচার করলে দেখা যাবে যে হিন্দি ভাষা ফারসীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ফারসীতে শব্দের ঐশ্বর্য্য খুব বেশী ছিল না। আরবী যথেষ্ট পরিমাণে না মেশালে চলত না। কিন্তু কবির মতে হিন্দি আরবীর মতই পুষ্ট ভাষা ছিল; এর নিজের ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতি ভাল করেই ছিল। তিনি লিখেছেন যে হিন্দির এই গুণ-গানে তার নিজের ভাই বেরাদররা আপত্তি করবে। কিন্তু, কবির মতে যে গঙ্গা আর হিন্দুস্থান দেখেনি, সেই নীল আর তাইগ্রিস নদী নিয়ে অহঙ্কার করবে। "যে বাগানে শুধু চীনের পাপিয়া দেখেছে সে কি করে জানবে হিন্দুস্থানের বুলবুল কি ?...... যে খোরাসানী প্রত্যেক হিন্দুকেই বোকা মনে করে সে পানকেও ঘাসের চেয়ে বেশী দাম দেবে না।... এবং যদি কেউ পক্ষপাতী হয়ে কথা বলতে চায় সে নিশ্চয়ই আমার (হিন্দুস্থানের) আমকে (বিদেশী) ডুমুরের নীচে স্থান দেবে।...তোমাদের হিন্দুস্থানকে স্বর্গস্থান হিসাবে দেখা উচিত।"

আমীর খুসরো হিন্দিতেও কবিতা লিখতেন। আর হিন্দি ও ফার্সী মিশিয়ে যে নতুন উর্দ্দু ভাষা তৈরী হচ্ছিল তার গোড়া পত্তন করে গিয়েছিলেন। জানতেন একদিন

এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই এ ভাষার চল হবে, আর কাজ চালাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীতে খুব কম কবিই খুসরোর মত এত বেশী কবিতা লিখে গিয়েছেন। কাব্য-প্রতিভার জন্য তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল বুলবুল-ই-হিন্দ। তার মত কবির লেখনী নতুন গড়ে-উঠা হিন্দির ঐশ্বর্য্য যে কত বাড়িয়েছে তা বলা যায় না।

খুসরো তার নতুন ভাষাতে যে সহজ সরল ঢঙ এনে দিলেন, তার ফলে হিন্দি সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার, রূপক সমাস এসবের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। মনের কথা মুখের সহজ ভাষায় প্রকাশ পেল। হিয়া ভরা দরদ দিয়ে তিনি লিখলেন,—

সখী, পিয়াকো জো মৈ ন দেখুঁ
তো কৈ সে কাটুঁ অঁধেরী রতিয়াঁ।

যেন রাজেন্দ্রনন্দিনী শ্রীরাধার বিরহ আমাদের গাঁয়ের কোণের পল্লীবালার মধ্যে রূপ পেয়ে গেল।

এমনি সহজ সরল আবেগে খুসরো লিখলেন—

গোরী সোয়ে সেজ পর, মুখ পর ডারে কেস
চল খুসরো ঘর আপনে, রৈন ভই চহুঁ দেস।

আলাউদ্দিনের বিজয়বাহিনী তখন অক্টোপাসের বাহুর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ জয়ের নেশার সঙ্গে মিশেছে ধনরত্ন লুটের লোভ। তার আগের সুলতান একবার এমন লুটের সামগ্রী পেয়েছিলেন যে তার সৈন্যরা সে ধনরত্নের বোঝার ভারে দিনে এক মাইলের বেশী চলতে পারে নি। দক্ষিণ দেশে মাত্র একটা রাজ্য জয় করেই আলাউদ্দিন এত ঐশ্বর্য্য পেলেন যে তা একটা পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী ছিল। কবি প্রার্থনা করলেন যেন এই ভাগ্যবান রাজা "দিল্লীতে বসে থেকেই শুধু চোখের ভুরুর নাচনেই মালাবার দেশ ও সমুদ্রগুলি লুট করতে পারেন।"

মসনদ পাবার অল্প কিছু দিন পরেই আলাউদ্দিন গুজরাট আর সোমনাথ জয় করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। রাজা কর্ণরায়ের সমস্ত মণিমাণিকা, স্ত্রীপরিবার শত্রুর হাতে ধরা পড়ল। সে সবই সুলতানের কাছে ভেট হিসাবে এল। তার মধ্যে ছিলেন কমলা দেবী, যার রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন তাকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিলেন।

কমলা দেবীর দুই মেয়ে ছিল। দুটিই কর্ণরায়ের সঙ্গে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বড়টি রাস্তায় মারা যায়, আর ছোটটি, দেবলা দেবী, বাপের সঙ্গেই পালিয়ে বেঁচে রইলেন।

এদিকে মাতৃস্নেহে অন্ধ কমলা দেবী মেয়েকে ছাড়া বাঁচা শক্ত মনে করলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে ধরলেন যে মেয়েকে তার কাছে এনে দিতে হবে। আলাউদ্দিন তখন একেবারে কমলা দেবীর হাতের মুঠোয়। তার উপর এমন একটা প্রস্তাবে কোন্ পাঠানের না মন নেচে উঠবে?

আবার সাজল বিরাট সৈন্যদল। ভয় পেয়ে কর্ণরায় গুজরাট ছেড়ে মেয়ে ও সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় চাইতে গেলেন দেওগিরের (দেবগিরি, দৌলতাবাদ) রায়-রায়ান রামদেবের কাছে। রায়-রায়ান দেবলা দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজপুত রাজার কাছে এমন প্রস্তাব নূতন নয়। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু রাজকন্যা নিরাপদ আশ্রয় পাবার আগেই পাঠান সেনা এসে হানা দিল। একটা তীরের ঘায়ে দেবলা দেবীর ঘোড়া গেল খোঁড়া হয়ে, আর তিনি ধরা পড়ে দিল্লীতে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেলেন।

এদিকে শাহজাদা খিজর খানের বয়স হল দশ। ফুটফুটে বালককে দেখতে একেবারে ঠিক কমলা দেবীর ভাইয়ের মত। সুলতান চাইলেন দুজনের বিয়ে দিতে। কমলা দেবীরও আপত্তি ছিল না, কারণ খিজর খানের দিকে তার খুব টান হয়ে গিয়েছিল। দুটি বালকবালিকা একসঙ্গে হেসে খেলে বাড়তে বাড়তে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল। দুটি গোলাপের ঝাড় বাগানে সুখে বিকশিত হল, তারা পরস্পরের সুরভিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করে খুশীতে ভরে গেল। দুটি বাতি রাতে চাঁদোয়ার তলায় জ্বলে উঠল, তারা পরস্পরের জ্বলে উঠা ভান করে নিল। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসুক ছিল তারা শেষ পর্য্যন্ত মিলে গেল, যদিও তাদের চোখ আর অন্তর আলাদা ছিল, দুটি দেহ এক্ হয়ে গেল।

কিন্তু হায়, প্রেমের পথ এত মসৃণ নয়।

খিজর খানের মার এই বিয়েতে মত হল না। তিনি চান তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয়। ভাই আলপ খানেরও তাড়াতাড়ি এই শুভকর্ম সারার ইচ্ছা।

কারণ শুধু যে তুর্কীর সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে বন্ধ হবে তা নয়, খিজর খানেরই যে পরে সুলতান হবার কথা।

অতএব রাজনীতি এসে প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে আলাদা করে দেওয়া হল। আলাদা ঘরে তাদের থাকতে হবে। তবুও তারা লুকিয়ে দেখা শোনা করতে লাগলেন, আর চারজন করে সখা-সখী তাদের গোপন প্রণয়বার্তা নিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগল। যে প্রেম মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, তা ডালপালা মেলে চারার রূপ নিয়ে ফুঁড়ে বের হল।

সুলতানা এবার ঠিক করলেন যে দেবলাকে খিজরের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক করা হল যে লালপ্রাসাদে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুলতানের নিজের হারেমে। সে খবর পেয়ে খিজর খান্ পাগলের মত হয়ে গেলেন। নিজের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেললেন, দুঃখ সহ্য করবার শক্তি রইল না। শেষ পর্য্যন্ত ছেলে পাগল হয়ে যাবে এই ভয়ে সুলতানা তার মতলব বদলালেন। আস্তে আস্তে রাজপুত্র প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন, আর একদিন গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করলেন। ভাবের আবেগে সেদিন তারা শুধু আত্মহারা নয়—জ্ঞানহারাও হয়ে গেলেন। বাজপাখীর মত দৃষ্টি থাকে তুর্কী নারীর। সুলতানার নজর এড়াল না।

আবার হুকুম হল লালপ্রাসাদের হারেমে যেতে হবে দেবলাকে। এবার যেতে হবেই। কোন ওজর আপত্তিতে ফল হবে না। যাবার পথে একবার ক্ষণেকের দেখা হল দুজনে। রাজপুত্র রাজকন্যাকে দিলেন নিজের চুলের একটি গোছা স্মরণচিহ্ন হিসাবে, আর পেলেন রাজকন্যার চাপা ফুলের মত আঙ্গুলের আংটি।

মনে রেখো, রেখো মনে।

সংসারে এর চেয়ে বড় কাতর মিনতি আর কিছু নেই।

হায় রাজপুত্রদের এ সংসারে নিজের মনের মত বিয়ে করার কোন স্বাধীনতাই নেই। রাজতক্তে বসে বা বসবার ইচ্ছা থাকলে হৃদয়ের হিসাব কষা চলবে না। সেই ত্রেতা-যুগের রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের খিজির খান —মায় এই শতকের ডিউক অব উইণ্ডসর পর্য্যন্ত।

মামা আলপ খানের মেয়ের সঙ্গে খিজর খানের বিয়ে হয়ে গেল। সে যুগের রাজপুত্রের বিয়ের উৎসবে তামাসার সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। বিজয়-তোরণ ত তৈরী হলই। সে তো মামুলী ব্যাপার। নাচ, গান, দেওয়ালী, ভানুমতীর খেল —সে না হল তার তুলনা নেই। মায় দড়ি দাঁড় করিয়ে তার উপর নাচা পর্য্যন্ত। যে রোপ-ওয়াকিং এখন একবার দেখাতে পারলে গোটা আমেরিকাকে গোড়ালীর উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে ফেলা সম্ভব হত এই আজকের মায়াহীন বিজ্ঞানের জগতেও। "যাদুকর জলের মত একটা তরোয়ালকে গিলে ফেললে—যেন খুব তেষ্টা পেয়ে একজন সরবৎ খেয়ে ফেলছে। সে নাকের ভেতর দিয়ে একটা ছোরা বিঁধিয়ে দিল। ছোট ছোট কাঠের ছোট শরীরের ভিতর থেকে বড় বড় শরীর বের হতে লাগল। একটা জানালার ভিতর দিয়ে একটা হাতীকে, আর একটা ছুঁচের ভিতর থেকে একটা উটকে বের করা হল। বহুরূপীরা অনেক রকম ঠগবাজী দেখাল। কখনো দেবদূত, কখনো রাক্ষসের চেহারা তারা ধারণ করল।...... তারা এমন মন-গলান গান করল যে মনে হল যে কোন মানুষ মারা যাচ্ছে, আর তার খানিক পরে আবার বেচে উঠল।"

এমনি জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে ত শাহজাদার বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে দেবলার দিন কাটে কি করে? তিনি অনেক অনুযোগ করে চিঠি লিখলেন, কিন্তু যা উত্তরে পেলেন তাকে অসহায়ের অজুহাত ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? দুজনেই দুঃখে ব্যাকুল হয়ে অসহায়ের সহায় সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

শেষ পর্য্যন্ত সুলতানার মন গলল। মুসলমান শাস্ত্রে চারটি স্ত্রী রাখা যায় এটা যখন তাকে বোঝান হল, তিনি দেবলার সঙ্গে খিজরের বিয়েতে রাজী হলেন। আর আলাউদ্দিন ত আগেই মত দিয়ে রেখেছিলেন। লালপ্রাসাদ থেকে আনিয়ে দেবলার বিয়ে দেওয়া হল। এবার এত আনন্দ হল যে কবি লিখলেন—

সুলতানা সুখী অতি হরষে
ধমনীতে বেগে খুন নাচে
পরণে গহনা সব সরমে
হিয়া যেন চুনী সেজে আছে।
দুটি আঁখি হরষেতে ভরি
চকমকি' ফুটে উঠে সুখে,

দুটি কানে মুক্তো লহরী
হেসে ওঠে যেন টুকটুকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। এই দুই নিরীহ দম্পতীর প্রেমেও ছিল কারো অভিশাপ। এত ভালবাসা ও বিরহ সহ্য করার পর মিলন হল, কিন্তু সুখ হল না।

সীমাহীন শারীরিক অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে আলাউদ্দিনের স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়, আর মানসিক শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। তার পেয়ারের ক্রীতদাস মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। খিজর খান্ বাপের সেরে ওঠার জন্যে মানৎ করে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সুলতান একটু সেরে উঠলেন আর শাহজাদারও পায়ে পড়ল ফোস্কা। অনুচররা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘোড়ায় চড়াল, আর রং চড়িয়ে খারাপভাবে এই অবিবেচনার ব্যাখ্যা বাপের কাছে করল মালিক কাফুর। সুলতানের অপমান করেছেন শাহজাদা। সত্যি কথা বলতে কি—তার আরোগ্য হওয়াই চান না তার সুযোগ্য পুত্র।

ব্যস্।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের শালা আর ছেলের শ্বশুর আলাপ খানের গোল গদান। তারপর ছেলের কাছে গেল নির্মম চিঠি—আমার দেওয়া রাজপুত্র, 'দরবাম' জয়ধ্বজা, হাতী, ঘোড়া, মোটমাট যত খেলাৎ পেয়েছ সবদাও পত্রপাঠ ফিরিয়ে, আর আবার হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আমার সামনে হাজির পর্য্যন্ত হয়ো না। থাক নির্বাসনে গঙ্গার ওপারে পাহাড়ী তরাইয়ে শুধু শিকার আর জংলী পশুদের নিয়ে।

এই ফরমান পাঠান হল সবচেয়ে কদাকার এক দূতকে দিয়ে। চোখের জলে ভাঙ্গা বুক নিয়ে শাহজাদা সব খেলাৎ ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে তিনি বিনা হুকুমেই মরণোন্মুখ বাপের কাছে ফিরে এলেন। পিতা মার্জনা করলেন, কিন্তু রাজা মালিক কাফুরের ফন্দীতে অন্ধ হয়ে নিজে সেরে না উঠা পর্য্যন্ত খিজর খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। তার মা মালিকা-ই-জাহানকে লালপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক হল যে যেন "একটা আত্মা দু টুকরো হয়ে গেল।" কাফুরকে দিয়ে সুলতান শুধু শপথ করালেন যে শাহজাদার প্রাণহানির চেষ্টা যেন না করা হয়। এর বেশী আর কিছু করার মত মানসিক শক্তিও দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের মধ্যে বাকী ছিল না। শুধু ছিল একটা ভারী হৃদয়, আর আহত আত্মা।

আমীর খুসরো ছবির মত ভাষা দিয়ে সুলতানের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। শাহানশাহ হয়ে গিয়েছিলেন "নিম-জান বা জান্লুরগম" অর্থাৎ বেদনায় ভরা শরীরে প্রায় আধমরা, আর "মান্দ নিম্ ই জান্ দরহম্" অর্থাৎ দু টুকরো করে কাটা শরীরের মত।

সেইখানে, সেই শত ঐতিহাসিক হত্যার স্মৃতি আর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঘেরা গোয়ালিয়র দুর্গে দেবলরাণী নিজে যেচে এই দুঃখময় কারাবাসের সঙ্গী ও সান্ত্বনা হয়ে স্বামীর সঙ্গে রইলেন।

আলাউদ্দিনের আর বেশীদিন বাকী ছিল না। তার মৃত্যুর পর চটপট করে কাফুর সুলতানের একটা উইল বের করে সবাইকে দেখিয়ে পাঁচ বছর বয়সের সব চেয়ে ছোট শাহজাদাকে মসনদে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়রে একজন অনুচরকে পাঠিয়ে যার সুলতান হওয়া উচিত ছিল সেই খিজরখানকে অন্ধ করে দিল।

কবি দুঃখ করে লিখছেন—

ব্যথা যাহা পেত সুর্মা পরশ মাখিতে
এ হেন দুঃখ কেমনে সহে সে আঁখিতে?
নার্গিস ফুলী আঁখি হ'তে খুন নিকালে,
সরাব উলটি করে যেন পাড় মাতালে।

কিন্তু আলাউদ্দীনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেস হল না। কাফুর অবশ্য নিজেই অল্প দিনের মধ্যে খুন হয়ে যায়, আর তার প্রতি খিজরখানের অভিশাপ সফল হয়। তবু তিনি এত বড় শত্রুর হত্যার খবরেও দুঃখিত হয়ে ধুলোতে মাথা ঘষে ঘষে শুধু নিজের কষ্টের জন্য, শত্রুর জন্যেও চোখের জল ফেলেছিলেন। আমীর খুসরোর এই বর্ণনা পড়ে সংস্কৃত কবিতার কথা মনে পড়ে—

বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী-
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা।

এর পর খিজরের ছোট এক ভাই কুতুবুদ্দিন সব চেয়ে

ছোট ভাই সুলতানকে বন্দী করে ফেলে নিজে তখ্‌তে সেই দাদাকে হুকুম করলেন, দেবলাদেবীকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিতে।

খিজরখান, অন্ধ অসহায় খিজরখান এই সঙ্কটের সময়ে য মনের জোর দেখিয়েছিলেন তা আরো আগেই দেখান উচিত ছিল। মাথা উঁচু করে অন্ধদৃষ্টিতে বিশ্বের বিষ আর সাহস ঢেলে তিনি বললেন—

যতদিন আমার প্রেয়সী আমার কাছে আছে, বরং আমার মাথা কাটা যাবে সেও ভাল, আমি তাকে ছেড়ে দিব না।

আর দেবলাদেবী? তাঁর কি উত্তর হয়েছিল তা সেই অলিখিত পুরাকাল থেকে আজো সব হিন্দুনারী নিজের মর্মে মর্মে জানেন।

কুতবুদ্দিন অন্ধ দাদা ও অসহায় বৌদিদির এই স্পর্দ্ধার শাস্তি দিতে দেরী করল না। তার নিজেরই জীবনের উপর একটা ষড়যন্ত্র—যাতে তার বন্দী ও অন্ধ ভাইদের কোন হাতই ছিল না—ব্যর্থ হওয়ার পর সে ভাবল যে এবার সিংহাসনের আর কোন দাবীদারের সম্ভাবনাও রাখা ঠিক হবে না। বিপদের জড় মেরে দেওয়াই ভাল। তাই সে নিজের দেহরক্ষীদের সর্দারকে (শিল্লেদার) গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দিল তিনটি ভাইকেই হত্যা করবার জন্য।

ঘাতকরা ঢুকল বন্দীর ঘরে। অন্ধের শেষ সহায় বাল্যের প্রণয়িনী, কৈশোরের পত্নী, বন্দীদশায় সঙ্গিনী দেবলাদেবী দুটি হাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। ওগো তোমায় মারতে দেব না, তোমায় আমার অচল অসহায় এই হাত দুটি আড়াল করে রাখবে সব বিপদ, সব আঘাতের হাত থেকে। ওগো, ওগো, আমার যে এই হাত দুটি ছাড়া আর কোন বর্মই নেই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য।

দেবলাদেবীর সেই সুন্দর বাহু দুটি ঘাতকের তরোয়ালের আঘাতে স্বামীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেটে মাটিতে পড়ে গেল। যে হাত দুটি চার হাত এক হয়ে যাবার পর স্বামীর কাছ ছাড়া হয়নি কখনো।

কিন্তু রক্তের ডাক এখনো শেষ হয়নি। কুতবুদ্দিন নিজেও অসচ্চরিত্রতার শেষ সীমায় এসে এক নীচ বংশের ততোধিক নীচ পেয়ারের ক্রীতদাসকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রিয়পাত্র খসরুখানই শেষ পর্য্যন্ত কুতবুদ্দিনকে এক রাত্রিতে নিজে গুপ্তহত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খিজরখানের হত্যার পর দেবলাদেবীকে কুতবুদ্দিনের হারেমে নিয়ে আসা হয় জোর করে। আর পরে গুপ্তঘাতক সুলতান খসরুখান পর্য্যন্ত তাকে দখল করে। ঐতিহাসিক বরণী এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে এই নারীত্বের যেন এমনভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর অধম মৃত্যু না হয়ে থাকে।

কিন্তু অমর প্রেম?

যে প্রেমের গাথা কবিতা যুগে যুগে এসেছেন, যার মহিমা আমাদের দেয় আশা, দেয় ভাষা, দেয় সান্ত্বনা সেই প্রেমের কি এই হল শেষ পরিণাম?

খিজর খানের হত্যার পর তার আত্মা যেন দেবলাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। ইহলোকে যারা সব দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়েও একসঙ্গে ছিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ টেনে আনতে পারে নি। তাই ত দেবল রাণী বলেছিলেন—

> পরাণের প্রাণ ওগো পরাণ আমার
> তব তরে বিসর্জ্জিনু জীবন সংসার।
> শুধু তোমারই লাগি তাজেছি আত্মারে
> ভুলো না আমার প্রেম ভুলো না আমারে।
> যেথাই আমার রক্ত পড়িয়াছে মিতে
> প্রেমসম দুর্বাদল গজাবে নিভৃতে।
> খুঁজে দেখো মোর রক্তে রাঙা মাটী সনে
> সৃজিবে রঙীণ ধাতু প্রেম রসায়নে।

এইটুকু বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের নেই আর কোন সম্বল। দূর্বাঘাস ছাড়া নেই কোন মনে করানর মত ধন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কর্ণসুবর্ণ

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বজ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিল। দেখিল সংঘের সকলেই জাগিয়া উঠিয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মণিপদ্ম হাসিমুখে তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

দুইজনে সংঘের বাহিরে আসিল। বজ্র বলিল—'ভাই, এবার তবে যাই। যদি এ-পথে ফিরি আবার দেখা হবে।'

মণিপদ্ম প্রশ্ন করিল—'কবে ফিরবেন?'

বজ্র বলিল—'তা জানিনা। তুমি সংঘেই থাকবে তো?'

মণিপদ্ম একমুখ হাসিয়া বলিল—'হয়তো থাকব না। আর্য শীলভদ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, বলেছেন আমাকে নালন্দায় নিয়ে যাবেন।'

'সে কবে?'

'আর্য শীলভদ্র সমতট থেকে ফিরে এলে।'

বজ্র দেখিল, মণিপদ্মের মুখে চোখে উচ্ছলিত আনন্দ। সে জিজ্ঞাসা করিল—'নালন্দায় গিয়ে কি হবে? সেখানে কি তুমি অন্য কাজ করবে?'

মণিপদ্ম বলিল—'না, এখানে যে-কাজ করছি সেখানেও তাই করব। কিন্তু সে যে নালন্দা—মহাতীর্থ! ভদন্ত শীলভদ্র ছাড়াও কত জ্ঞানী মহাপুরুষ, কত সিদ্ধ—অর্হৎ আছেন। তাঁদের সেবা করে আমি ধন্য হব।'

মণিপদ্মের উদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিয়া বজ্রের অন্তর ক্ষণেকের জন্য টল্‌মল্ করিয়া উঠিল। মণিপদ্ম যে-পথে চলিয়াছে তাহা কেমন পথ, কোন্ আনন্দঘন শান্তিনিকেতনে তাহার শেষ? আর বজ্র যে-পথে পা বাড়াইয়াছে তাহারই বা সমাপ্তি কোথায়?

দুইজন বিপরীত পথের যাত্রী সংঘের সম্মুখে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তারপর বজ্র কর্ণসুবর্ণের পথ ধরিল।

* * * *

কর্ণসুবর্ণ নগর একদিকে ভাগীরথী ও অন্যদিকে ময়ূরাক্ষী—ময়ূরীর সম্মিলিত ধারার দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাই তাহার আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায়; উত্তরে প্রশস্ত, দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্গমস্থলে কোণের আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ প্রাকার স্থলপথে নগরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

ত্রিকোণ স্থানটি আয়তনে বড় কম নয়, তাহার মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বাস। তাহা ছাড়া প্রাকার পরিখার বাহিরেও বহুলোকের বসতি। দক্ষিণে মৌরীর পরপারে যাহারা বাস করে তাহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক, নগরে ফল ফুল শাক-পত্র যোগান দেওয়া তাহাদের জীবিকা।

কর্ণসুবর্ণ নূতন নগর; মথুরা বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন নয়। তাহার পথগুলি ঋজু, গলিঘুঁজি বেশী নাই। পথের দুই ধারে নানা বর্ণের চূর্ণলিপ্ত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ; গৃহচূড়ায় ধাতুকলস। পথে পথে বহু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য মঠ। নগরের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপথ গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে। পথের পূর্ব ধারে অসংখ্য ছোটবড় ঘাট, স্নান ঘাট, খেয়া ঘাট, বন্দর। পথের অপর পাশে ধনী নাগরিক ও রাজপুরুষদিগের তুঙ্গশীর্ষ প্রাসাদ। এই পথ দক্ষিণদিকে যেখানে শেষ হইয়াছে সেই নদীরচিত কোণের উপর দুর্গাকৃতি রাজ অট্টালিকা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শশাঙ্কদেব গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া এই জলদুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তারপর দুর্গের ছায়াতলে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাগীরথী-তীরস্থ অগণ্য ঘাটের মধ্যে একটি ঘাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—নাম হাতীঘাট। একশত রাজহস্তী এই ঘাটে একসঙ্গে স্নান করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহাই নগরের বন্দর। ঘাটের সম্মুখে গভীর জলে বহু সমুদ্রগামী তরণী বাঁধা, তাহাদের উর্ধ্বোত্থিত গুণবৃক্ষ শরবনের ন্যায় জলপ্রান্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে। বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র। আবার সাধারণ

নগরবাসীর ইহা হট্টও বটে। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কদলী কুষ্মাণ্ড অলাবু; মুড়ি চালভাজা পর্পট তিলখণ্ড; ফুল মালা কর্পূর চন্দন—কোনও বস্তুরই এখানে অপ্রতুল নাই। অপরাহ্ণে বায়ুসেবনেচ্ছু নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয়; তখন বহুবিস্তীর্ণ ঘাটে তিল ফেলিবার ঠাঁই থাকেনা। গান, পঞ্চালিকার নাচ, অহিতুণ্ডিকের সাপ খেলানো, মায়াবীর ইন্দ্রজাল; সব মিলিয়া ঘাট গম্‌গম্‌ করিতে থাকে।

বজ্র যেদিন প্রাতঃকালে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া উপনীত হইল সেদিন নবারুণ কিরণে নগর ঝলমল করিতেছিল। চারিদিকে নবজাগ্রত নগরের কর্ম-চাঞ্চল্য, গো-রথ অশ্বরথ চল্লরিকা ঝম্পানের ছুটাছুটি। দেব-দেউলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। স্নানার্থীরা ঘাটের দিকে চলিয়াছে, পূজার্থীরা মন্দিরে যাইতেছে; করণেরা তাম্বূলচর্বণ করিতে করিতে অধিকরণে চলিয়াছে। পথে পদচারিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, দুই চারিটি নারীও দেখা যায়। পুরুষদের মাথায় উষ্ণীষ নাই, তৈলসিক্ত কেশ কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে। সেকালে বাঙ্গালীর চুলের আদর বড় বেশী ছিল; পাছে কেশকলাপের শোভা ঢাকা পড়ে, তাই তাহারা মাথায় কোনও প্রকার আবরণ দিতনা। কেবল যাহারা রাজপুরুষ বা সৈনিক তাহারা মাথায় পাগ পরিত।

বজ্র চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখ শান্ত, উত্তেজনার কোনও চিহ্ন নাই; মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায়না যে তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে। সে পূর্বে কখনও নগর দেখে নাই; গ্রামে থাকিতে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত নগর কিরূপ! কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহার কল্পনা বামন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এই কর্ণসুবর্ণ নগর! এই আমার পিতৃপিতামহের লীলাভূমি!—

জন্মান্তরের প্রীতিস্মৃতির ন্যায় কর্ণসুবর্ণ-নগর তাহার নাড়ীতে টান দিল, দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিপরীত-মুখী মনোবৃত্তি যেন নিভৃতে থাকিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল—বিম্ব দেখিয়া ভুলিও না, জলবিম্বের ভিতরে কিছু নাই, বুদ্বুদ কাটিলে কিছুই থাকেনা—সাবধান! সতর্ক হও!

লক্ষ্যহীন মোহাক্রান্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র এক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুভব করিল তাহার উদর শূন্য। ভাণ্ডারে থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো রহিয়াছে দধি, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, মোয়া খাঁড় পিঠা পুলি। মিষ্টগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বহু রক্ত-পীত বরলা আসিয়া জুটিয়াছে। নগ্নদেহ মোদক বসিয়া বৃহৎ কটাহে রসবড়া ভাজিতেছে।

বজ্র ময়রার দোকানে প্রবেশ করিল। কোমর হইতে কয়েকটি কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতুমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল—'আমার কাছে এই আছে। এতে যা খাবার হয় আমাকে দাও।'

ময়রা দেখিল বিপুলকায় আগন্তুক কানসোনার লোক নয়, বিদেশী। সে পুত্রকে ডাকিয়া ভিয়ানে বসাইল, নিজে উঠিয়া গিয়া চত্বরের উপর পিঁড়ি পাতিয়া বজ্রকে বসিতে দিল। তারপর তাহার দোকানে যত প্রকার মিষ্টান্ন ছিল একে একে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেকালে বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না; বিশেষত সম্প্রতি বহির্বাণিজ্যে মন্দা পড়ায় দেশজাত সকল বস্তুই সুলভ হইয়াছিল। সোনা-রূপারই অভাব হইয়াছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হয় নাই।

ময়রা যত দিল বজ্র তত আহার করিল। আহার করিতে করিতে সে দেখিল একটি লোক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। লোকটি তালপত্রের ন্যায় কৃশ কিন্তু সাজসজ্জার পারিপাট্য অতি অদ্ভুত। পরিধানে সূক্ষ্ম মল্লের ধৌতি ও উত্তরীয়, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। হাতের নখ দীর্ঘ ও ত্রিকোণ করিয়া কাটা, তদুপরি আলতার প্রলেপ। অধরও অলক্তরাগে রঞ্জিত, কানে শঙ্খের কর্ণফুল। বৃশ্চিকপুচ্ছের ন্যায় বক্র একজোড়া গোঁফ। চক্ষু দুটি গোল, তাহার উপর ভ্রূযুগল আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় চক্রীকৃত।

বজ্র এরূপ বিচিত্র জীব কখনও দেখে নাই। সে জানিত না কর্ণসুবর্ণের রসিক ও বিলাসী নাগরিকেরা এইরূপ বেশভূষা করিয়া নাগরবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সেও কৌতূহলী হইয়া লোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ চলিবার পর লোকটি উঠিয়া আসিয়া বজ্রের পাশে বসিল এবং আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিল। তাহার কাঁকড়া বিছার ন্যায় গোঁফ নাড়িতে লাগিল। তারপর সে বিস্ময়-কৌতুক-ভরা মিহি সুরে হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল—'তুমি তো দেখছি একটি পিণ্ডবীর হে! দোকান প্রায় শেষ করে এনেছ, এবার কি ময়রাকে ধরে কামড় দেবে নাকি?'

বজ্র উত্তর দিল না, আপন মনে আহার করিতে লাগিল। লোকটি তাহার উরু ও বাহুর পেশী টিপিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—'হুঁ, একেবারে সাক্ষাৎ মধ্যম পাণ্ডব, যাকে বলে নরপুঙ্গব। তুমি তো কানসোনার লোক নয় বাপু। নাম কি? নিবাস কোথায়?'

বজ্র এবারও উত্তর দিল না। লোকটি তখন তাহার পঞ্জরে অঙ্গুলির একটা খোঁচা দিয়া বলিল—'আরে কথা কও না যে। তুমি বংগাল নাকি হে? বলি, কোন্ সুন্দরী-বৃক্ষ থেকে নেমে এলে!'

ভাগীরথীর পূর্বপারে বংগাল দেশ। তথাকার ভাষার বিকৃতি লইয়া গৌড়ীয় নগর-বিলাসীদের মধ্যে ব্যঙ্গ-পরিহাস চলিত।

বজ্র দেখিল, লোকটি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। সে ডান হাতে আহার করিতে করিতে বাঁ হাত দিয়া লোকটির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। পাট-কাঠির মত হাতের হাড় বজ্রের মুঠির মধ্যে মট্ মট্ করিয়া উঠিল। লোকটি মিহি গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'আরে আরে, কর কি! উহুহু—ছাড় ছাড়, হাত ভেঙ্গে গেলে কাব্য লিখব কি করে?'

বজ্র হাত ছাড়িল না, মুঠি একটু শিথিল করিল মাত্র। নির্লিপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'নাম কি?'

লোকটি দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'নাম? আমার নাম বিম্বাধর—কবি বিম্বাধর। এবার ছেড়ে দাও বাবা, বাড়ী যাই।'

বজ্র প্রশ্ন করিল—'কবি বিম্বাধর কাকে বলে?'

বিম্বাধর বলিল—'কবি বিম্বাধর বুঝলে না? তুমি দেখছি একেবারেই—' না না, তুমি ভারি সজ্জন। তা—আমার নাম বিম্বাধর কিনা, তার ওপর আমি কবি, কাব্য লিখি—তাই লোকে আমাকে কবি বিম্বাধর বলে। বুঝলে?'

বজ্রের আহার সমাধা হইয়াছিল, সে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। বলিল—'বুঝলাম না। কাব্য কী?'

বিম্বাধর হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার ধনুরাকৃতি ভ্রূযুগল আরও গোল হইয়া গেল। শেষে সে বলিল—'কাব্য কাকে বলে জান না! মেঘদূত পড়নি? নৈষধ পড়নি? বল কি, হে, তুমি যে অবাক করলে! কাব্য—কাব্য-রসের কথা—শ্লোক—কশ্চিৎ কান্তা—শৃঙ্গার রস—'

কিন্তু কাব্য কী তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সকলের কর্ম নয়, বিম্বাধর কবি হইয়াও তাহা বুঝাইতে পারিল না। বজ্রেরও বুঝিবার দুর্নিবার আগ্রহ ছিলনা, সে বিম্বাধরের হাত ধরিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া বলিল—'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি নতুন লোক, তুমি আমাকে কানসোনা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।'

বিম্বাধর বড় ফাঁপরে পড়িল। সে স্বভাবত লঘুপ্রকৃতি ও রঙ্গপ্রিয়; বজ্রকে মোদকালয়ে আহার করিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল ভোজনপটু গ্রামীণটাকে লইয়া দুদণ্ড রগড় করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু রগড় করিতে গিয়া অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বিপরীত, গ্রামীণটাই তাহাকে বানর-নাচ নাচাইতেছে। তাহার বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া যে পলায়ন করিবে সে উপায় নাই, যেমন দৈত্যের মত চেহারা, জোরও তেমনি।

বিম্বাধর মনে মনে পলায়নের ফন্দি খুঁজিতেছে, এমন সময় রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বজ্র সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, একটি চতুর্দোলা আসিতেছে। চারিজন অসুরাকৃতি বাহক দোলা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিতেছে। দোলার সম্মুখে পশ্চাতে কয়েক-জন বংশীবাদক মিঠা সুরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। একটি দাসী সোনার থালায় পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া দোলার পাশে পাশে যাইতেছে।

চতুর্দোলা কাছে আসিতে লাগিল। চতুর্দোলার আসনে দুকূল বস্ত্রের বেষ্টনীমধ্যে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু অনেকখানি অনুমান করা যায়; মনে হয় যেন শীত-প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণকমল ফুটিয়া আছে। যে দাসীটি পাশে পাশে চলিয়াছে সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া অন্তরালবর্তিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছে। দাসীটি লোলযৌবনা, দেহের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, কিন্তু সে রূপসী। তাহার নাম কুহু। কুহু শুধু রূপসী নয়, চটুলা ছলনাময়ী রতি-রস-চতুরা—

কিন্তু কুহুর কথা পরে হইবে।

চতুর্দোলা বজ্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সহসা তাহার আবরণ উন্মোচিত হইল। যিনি এতক্ষণ অচ্ছাভ তিরস্করিণীর অন্তরালে রহস্যময়ী হইয়া ছিলেন বজ্র তাঁহাকে মুখোমুখি

দেখিতে পাইল। অত্যুগ্র আলোকে মানুষের যেমন চোখ ঝলসিয়া যায়, বজ্রেরও তেমনি চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

দোলার পর্দা দুই হাতে সরাইয়া রমণী তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, চক্ষুতারকা নিশ্চল, স্তনপট্ট অল্প স্খলিত, দেহভঙ্গীতে মদালসতার সহিত প্রগল্‌ভতা মিশিয়াছে। রমণী নব-যুবতী নয়, প্রগাঢ়যৌবনা; তন্বী নয়, পরিপূর্ণাঙ্গী; গায়ের রঙ দুধে-আলতা, আলতার ভাগ কিছু বেশী। চক্ষু দুটি হরিণায়ত, কিন্তু দৃষ্টিতে তীব্রতা মাখানো, অধর পক্ক-বিম্বফলের ন্যায় সুপুষ্ট ও গাঢ় রক্তবর্ণ, আবার নবপল্লবের ন্যায় কোমল। সব মিলিয়া মুখখানি অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়াও মুখে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ু-শোণিতে আগুন ধরাইয়া দেয়, বুকে উন্মাদনার সৃষ্টি করে—

নারী নয়, ললৎ-শিখা লালসার বহ্নি।

বজ্র চাহিয়া রহিল, দোলা তাহার সম্মুখ দিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। রমণী কিন্তু একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি অস্ফুটস্বরে দাসীকে কিছু বলিলেন; অমনি দাসী ঘাড় ফিরাইয়া বজ্রের দিকে চাহিল।

দাসীর চোখে বিজলী খেলিয়া গেল; সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর দেখিতে দেখিতে দোলা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। বাঁশীর রেশও ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

কবি বিম্বাধর এতক্ষণ শিকলে বাঁধা পাখীর ন্যায় ছটফট্‌ করিতেছিল এবং বজ্রের মুঠি হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন বজ্র তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিয়া উঠিল, 'দেখলে তো? কানসোনায় আর কিছু দেখবার নেই। এবার হাতটি ছেড়ে দাও, বাড়ী গিয়ে শ্লোক লিখি। মাথায় পদ্য এসেছে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'দোলায় যিনি গেলেন—উনি কে?'

বিম্বাধর বলিল—'হায় হতভাগ্য, তাও জান না! রাণী—রাণী, গৌড়ের রাজমহিষী দেবী শিখরিণী।'

রাণী! হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মনে পড়িল তাহার মায়ের মুখ। না, এ রাণী বয়সে তরুণী বটে, কিন্তু তাহার মায়ের মত সুন্দর নয়। রঙ্গনা রাজহংসী, আর শিখরিণী চক্রবাকী, উভয়ের তুলনা হয়না।

উপরন্তু রাণীর হাবভাব যেন নির্লজ্জতার সূচক! কিন্তু কিছুই বলা যায়না, রাণীদের পক্ষে এইরূপ হাবভাবই হয়তো স্বাভাবিক। বজ্র অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী, নগরের রীতিনীতি আচার-আচরণ কী বুঝিবে?

বজ্রের চিন্তায় বাধা দিয়া বিম্বাধর বলিল…'ভ্রাতঃ চাতক, তুমি যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলে। তা আমার হাত মোচন করে হতভম্ব হলেই পার। হাতে যে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গেল!'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'রাণী কোথায় গেলেন?'

বিম্বাধর বলিল—'মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। ঐ যে চতুষ্পয়ের ওপারে প্রকাণ্ড মন্দির—কামেশ্বর শিবের মন্দির—রাণী ওখানে প্রায়ই পূজা দিতে যান। তা তুমিও যাও না, দেবমন্দিরে যেতে কারুর মানা নেই! যাও যাও, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।'

বিম্বাধরের বক্রোক্তি না বুঝিয়া বজ্র বলিল—'না, আমার অন্য কাজ কাছে।'

বিম্বাধর আনন্দিত হইয়া বলিল—'বেশ বেশ। তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই, বিলম্বে কার্যহানি। তুমি নিজের কাজে যাও, আমিও বাড়ী গিয়ে শ্লোকটা লিখে ফেলি। তা এবার হস্তটি উন্মোচন কর।'

বজ্র বলিল—'উন্মোচন করতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি এখানে কিছু চিনিনা, আমাকে একটি স্বর্ণকারের দোকান দেখিয়ে দিতে হবে।'

বিম্বাধর অমনি উৎকর্ণ হইল। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বজ্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—'স্বর্ণকারের দোকান! সোনাদানা কিনবে নাকি?'

বজ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—'কিনব না।—দেখিয়ে দিতে পারবে?'

বিম্বাধর বজ্রের বাহুতে তাগা-বাঁধা লক্ষ্য করিয়াছিল, সোৎসাহে বলিল—'পারব না। সোনা বিক্রি করবে বুঝি! এতক্ষণ বলনি কেন? এস এস, এই যে কাছেই স্যাকরার বাড়ী—'

বজ্র বিম্বাধরের হাত ছাড়িয়া দিল। বিম্বাধরের পলায়ন-স্পৃহা আর ছিল না; যেখানে সোনারূপার গন্ধ আছে সেখান হইতে কবি বিম্বাধরকে মারিয়া তাড়ানো যায় না।

এতক্ষণ সে বজ্রকে কপর্দকহীন গ্রামীন মনে করিয়াছিল বলিয়াই পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এখন জোঁকের মত তাহার গায়ে জুড়িয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নাগর বৃত্ত

সকল বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে জলৌকা-জাতীয় এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কোনও কর্ম করে না, নিঃসাড়ে পরের রক্ত-শোষণ করিয়া উদরপূর্তি করে। কবি বিম্বাধর সেই শ্রেণীর লোক। সে রঙ্গ-রসিক ও বাক্‌পটু, ধনী ব্যক্তিদের অশ্লীল কবিতা ও গল্প শুনাইয়া কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। চাটুকার্য ও বিদূষক-বৃত্তি ছিল তাহার জীবিকা। অর্থের জন্য কোনও নিকৃষ্ট কার্য করিতে সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

বজ্রের মধ্যে শাঁস আছে বুঝিয়া বিম্বাধর পরম আগ্রহে তাহাকে স্বর্ণকারের গৃহে লইয়া চলিল। বেশী দূর যাইতে হইল না, ঐ পথেরই কয়েকখানা বাড়ী পরে এক স্বর্ণকারের গৃহ। বিম্বাধর বজ্রকে সেখানে উপস্থিত করিয়া স্বর্ণকারকে বলিল—'ওহে অক্রূর, এই নাও, এক বিদেশী ভদ্র তোমার সঙ্গে ব্যাপার করতে চান।'

অক্রূরদাস পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি, শান্ত মন্থর প্রকৃতি। সে প্রাতঃকালে নিজ কর্মকক্ষে বসিয়া দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সোনায় সোহাগা দিয়া পিত্তলের নালিকা দ্বারা প্রদীপ শিখা ফুঁ দিয়া দিয়া সোনা গলাইতেছিল। বজ্র ও বিম্বাধরকে সে সমাদর করিয়া বসাইল।

বজ্র প্রগণ্ড হইতে প্রথমে শীলভদ্রের বস্ত্রবন্ধন মোচন করিল, তারপর অঙ্গদ খুলিয়া অক্রূরদাসকে দিল। বলিল—'এই অঙ্গদ থেকে এক মাসা কেটে নিয়ে তার দাম দাও।'

অক্রূর অঙ্গদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। পাথরের মত ভারী সুন্দর গঠন অঙ্গদ দেখিয়া বিম্বাধরের জিহ্বা লালায়িত হইয়াছিল, সে সংহত-স্বরে বলিল—'সোনা নাকি?'

অক্রূরদাস অঙ্গদ হইতে চক্ষু তুলিয়া বজ্রের পানে চাহিল, বলিল—'হ্যাঁ সোনা।—এ অঙ্গদ আপনি কোথায় পেলেন?'

অক্রূরের প্রশ্নের মধ্যে বিপজ্জনক কণ্টক আছে অনুভব করিয়া বজ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিল—উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তুমি সোনা কিনতে রাজি থাক তো বল, নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা করি।'

অক্রূর বলিল—'রাজি আছি। আপনি যদি গোটা অঙ্গদটা বিক্রয় করেন আমি কিনতে রাজি আছি।'

বজ্র বলিল—'না, কেবল এক মাসা সোনা বিক্রি করব।'

অক্রূর বলিল,—'ভাল। এমন সুন্দর অঙ্গদ কাটতে কিন্তু মায়া হচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে কানসোনাতে এক কারুকর ছিলেন, তাঁর হাতের কাজ আমি চিনি। এ অঙ্গদ তাঁরই রচনা। তিনি ছিলেন শশাঙ্কদেবের রাজ-কারুকর।'

বজ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'তা হবে। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে এই অঙ্গদ লাভ করেছিলেন।'

'গোটা অঙ্গদ আপনি বিক্রি করবেন না?'

'না।'

অক্রূর তখন অতি সাবধানে এক মাসা সোনা কাটিয়া লইল, অঙ্গদের শিল্পশোভা ক্ষুণ্ণ হইল না। তারপর হিসাব করিয়া সোনার মূল্য কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা, কিছু দ্রক্ষ ও কপর্দক বজ্রকে দিল।

মূল্য পাইয়া বজ্র গাত্রোত্থান করিলে অক্রূর সবিনয়ে বলিল—'আবার যদি সোনা বিক্রি করেন আমার কাছে আসবেন, আমি উচিত মূল্য দেব। আর যদি গোটা অঙ্গদ বিক্রি করেন আমি বেশী মূল্য দেব।'

'ভাল' বলিয়া বজ্র বাহির হইল। বিম্বাধর তাহার সঙ্গে চলিল।

দুইজনে রাজপথে নামিয়া একদিকে চলিল। বজ্র বিম্বাধরের দিকে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'কৈ, তুমি কবিতা লিখতে যাবে না?'

বিম্বাধর বলিল—'কবিতা! হাঁ হাঁ, লিখতে হবে বটে।—তা, তুমি এখন কোনদিকে যাবে?'

বজ্র বলিল—'এবার একটা বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে। কানসোনায় দু'চার দিন থাকব স্থির করেছি। কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায় বলতে পার?'

বিম্বাধর বজ্রের বাহুর সহিত বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া বলিল—'বন্ধু যার গাঁটে কড়ি আছে তার আবার বাসস্থানের চিন্তা! চল, তোমাকে ভাল বাসস্থানে নিয়ে যাব। পান

ভোজন সব পাবে। ভাল কথা, তোমার নাম তো বললে না।'

একটু চিন্তা করিয়া বজ্র বলিল—'আমার নাম মধুমথন।'

বিম্বাধর বলিল—'বন্ধু মধুমথন, তোমার দেশ কোথায় ?'

বজ্র বলিল—'উত্তরে, মৌরী নদীর তীরে।'

'তুমি যে বংগাল নও তা তোমার কথা শুনেই বুঝেছি। —তা কি কাজে কানসোনায় এসেছ ?'

'কাজ কিছু নেই, ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

'বেশ বেশ। ভ্রমণ-রমণের এই তো বয়স। চল, তোমাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাই।'

উৎফুল্ল বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া উত্তর দিকে চলিল।

এই সময় আবার বংশীরব শুনা গেল! রাণী শিখরিণী পূজা দিয়া ফিরিতেছেন; আন্দোলিকার পাশে দাসী কুহু বিক্রমে যাইতেছে। বজ্রের কাছাকাছি আসিয়া আবার দোলার দুকূল-আচ্ছাদন উঠিয়া গেল; রাণী শিখরিণীর তপ্ত-তীব্র চক্ষু দুটি যুগ্মতীরের ন্যায় বজ্রকে বিদ্ধ করিল। বজ্র কিন্তু একবার চক্ষু তুলিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, আর ওদিকে তাকাইল না।

দোলা দক্ষিণে রাজপুরীর দিকে চলিয়া গেল। বজ্র ও বিম্বাধর বিপরীত মুখে চলিল। তাহারা জানিতে পারিল না, দোলা কিছুদূর যাইবার পর রাণী শিখরিণী কুহুকে চোখের ইসারা করিলেন; কুহু অমনি দোলার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বজ্রের পিছু লইল। চাঁপা রঙের উত্তরীয়টি মাথার উপর টানিয়া একটু আড়-ঘোমটা দিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে বজ্রের অনুসরণ করিল।

বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া এপথ ওপথ ঘুরিয়া শেষে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক জনবিরল পাটকে উপস্থিত হইল। পথটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, গৃহগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ। পথের শেষ প্রান্তে নগর-প্রাকারের কাছে একটি মদিরা ভবন।

মদিরা-ভবনে দিনের পূর্বাহ্ণে গ্রাহকের ভিড় ছিল না, শৌণ্ডিক মেঝেয় বসিয়া পিঁড়ির উপর ছক কাটিয়া এক প্রতিবেশীর সহিত কড়ি চালিতেছিল। মদিরা-ভবনটি শুধু পানশালা নয়, অড্‌ঢ খেলার আড্ডাও বটে, আবার বহিরাগত পথিকের চটি। সম্মুখের ঘরটি বড়, আশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠুরী আছে।

শৌণ্ডিক লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্কদেহ, বিরলদন্ত বিম্বাধর ও বজ্র প্রবেশ করিলে সে স্বভাব-রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া চাহিল। বিম্বাধর বলিল—'বটেশ্বর, তোমার জন্য গ্রাহক এনেছি। ইনি কানসোনায় নূতন এসেছেন, কিছুদিন থাকবেন। তাই তোমার আড্ডায় নিয়ে এলাম।'

বটেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, বজ্রকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বিম্বাধরের পানে চক্ষু ফিরাইল। বিম্বাধর একটু ঘাড় নাড়িল। তখন বটেশ্বর পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, জাঁতার ঘর্ঘর শব্দের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘষা-ঘষা গলায় বলিল—'আসতে আজ্ঞা হোক। আমার ঘর আপনার ঘর, যতদিন ইচ্ছা থাকুন।'

বজ্র একটি রৌপ্যমুদ্রা বটেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল—'এতে কতদিন চলবে ?'

সসম্ভ্রমে মুদ্রা কপালে ঠেকাইয়া বটেশ্বর বলিল—'এক মাস। স্বতন্ত্র ঘর পাবেন, তাছাড়া পান আহার শয়ন সেবা।'

বটেশ্বর বজ্রকে লইয়া গিয়া একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইল। প্রকোষ্ঠটি গৃহের এক প্রান্তে, বাহিরে যাইবার স্বতন্ত্র দ্বার আছে। আকারে ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বজ্র কক্ষটি মনোনীত করিল। তখন বটেশ্বর ভৃত্য ডাকিয়া মেঝের উপর উত্তম শয্যা পাতিয়া দিল, জলের নূতন কলস ভরিয়া ঘরের এক কোণে রাখিল, দীপদণ্ডের শীর্ষে তৈলপূর্ণ প্রদীপ আনিয়া অন্য কোণে রাখিল। ব্যবস্থা দেখিয়া বজ্র প্রীত হইল।

বিম্বাধর বলিল—'ভাই মধুমথন, চিন্তা কোরো না, তুমি সুখে থাকবে। বটেশ্বর পাকা সহিআর, ওর বাপের নাম ঘটেশ্বর, ঠাকুর্দার নাম মণ্ডেশ্বর—ওরা তিন পুরুষে আড্ডাধারী। তোমার কোনও অযত্ন হবে না, যখন যা চাইবে হাতের কাছে পাবে। এমন কি—'বলিয়া অর্থপূর্ণ-ভাবে চোখ টিপিল।

বিম্বাধরের সরস ইঙ্গিত বজ্র বোধহয় বুঝিল না, সে বলিল—'ভাল।'

বিম্বাধর বলিল—'এখন তবে চললাম। কিন্তু আবার আসব। তুমি নূতন মানুষ, নগরের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে তো।'

বিম্বাধর যে আবার আসিবে, তাহার এত সহৃদয়তা নিঃস্বার্থ নয়, তাহা বজ্র বুঝিয়াছিল। সে একটু হাসিল।

তারপর বিম্বাধর গমনোদ্যত হইলে সে বলিল—'একটা কথা। কানসোনার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এক ব্রাহ্মণ থাকেন—নাম কোদণ্ড মিশ্র। তাঁকে চেন কি?'

বিম্বাধর বলিল—'বামুন? চালকলা? তার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?'

বজ্র বলিল—'প্রয়োজন নেই। পুরানো পরিচয় আছে।'

বিম্বাধর মাথা নাড়িল—'কোদণ্ড মিশ্র? কৈ না, কখনও নাম শুনি নি। বটেশ্বর, তুমি চেনো?'

বটেশ্বর বলিল—'না। ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা আমার আড্ডায় পায়ের ধূলো দেন না, চিনব কি করে?'

অতঃপর বিম্বাধর আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় হইল।

মদিরা-ভবনের বাহিরে একটি গাছের আড়ালে কুহু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল বিম্বাধর চলিয়া গেল, কিন্তু বজ্র বাহির হইল না। কুহু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু বজ্র আসিল না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল। বজ্র কোথায় থাকে এইটুকুই আপাতত তাহার জানার প্রয়োজন ছিল।

* * *

বজ্রের নাগরিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। কর্মহীন অলস দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

মদিরা-ভবনের পিছনে অনতিদূরে ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর মিলিত স্রোত বহিয়া গিয়াছে, নদীর ধারে ধারে প্রশস্ত বাঁধ। দুই চারিটি ঘাটও আছে, কিন্তু ঘাটের কোনও শোভা নাই। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া স্বল্পতোয়া নদীতে বড় কেহ স্নান করিতে আসে না।

বজ্র মাঝে মাঝে নির্জন বাঁধে গিয়া বসিত। মৌরীর খাত আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। সে বেতসগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৌরী নদী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বাঁধের উপর দিয়া সে নগরসীমা পার হইয়া ময়ূরাক্ষী ও মৌরীর সঙ্গমস্থলে যাইত, মৌরীর উপল-বিকীর্ণ তীরে হাঁটু গাড়িয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিত। মৌরীর জলের চির-পরিচিত স্বাদ মুখে বড় মিষ্ট লাগিত। গ্রামের জন্য হঠাৎ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

কিন্তু তবু সে কর্ণসুবর্ণের মায়া কাটাইয়া বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যহ তাহার মনে হইত, কেন এই নির্বান্ধব পুরীতে পড়িয়া আছি? পিতার সংবাদ পাইয়াছি, তিনি জীবিত নাই; তবে এখানে থাকিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যাই, যেখানে মা আছেন গুঞ্জা আছে সেই স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া যাই!—কিন্তু তবু সে যাইতে পারিত না; কর্ণসুবর্ণ নগর অদৃশ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিত।

কবি বিম্বাধর প্রথমে ঘন ঘন আসিত। বজ্রকে লইয়া সে রাজপুরী দেখাইল, নাটকের অভিনয় দেখাইল, বিদগ্ধ-স্ত্রীর নৃত্যগীত শুনাইল, নানাভাবে তাহাকে আমোদ-প্রমোদে আসক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বজ্রের ললিত-বণিতার প্রতি লোভ নাই, মদ্যপানে আসক্তি নাই, দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগ নাই। এরূপ অরসিক অসামাজিক মানুষের পিছনে কতদিন ঘুরিয়া বেড়ানো যায়! বিম্বাধর আসা যাওয়া কমাইয়া দিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ করিতে পারিল না। বজ্রের বাহুতে পাথরের মত ভারী অঙ্গদটির কথা সে ভুলিতে পারে নাই।

বটেশ্বরের মদিরা ভবনে বজ্রের অশন বসনের কোনও অসুবিধা ছিল না। অপরাহ্নে মদিরা ভবনে যখন জন-সমাগম হইত, মদ্যপায়ীরা সুরাভাণ্ডসহ ভর্জিত পর্পট ও ইল্লীশমৎস্য লইয়া বসিত, দ্যূত-ব্যসনীরা হৈহল্লা করিয়া কড়ি চালিত ও বিতণ্ডা করিত, তখন বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কখনও পথে পথান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কদাচ প্রাকারে উঠিয়া ইতস্তত বিচরণ করিত। প্রাকারে রক্ষী নাই, সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কিছু দেখে না, নগর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নগর রক্ষার কথা কেহ চিন্তা করে না। সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন।

বজ্র দুই একবার রাজপুরীর দিকেও গিয়াছিল। প্রাকার-বেষ্টিত বিশালপুরী; তোরণ দ্বারে দুই চারিজন প্রহরী আছে বটে কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে, যে-সকল নরনারী তোরণপথে যাতায়াত করিতেছে তাহাদের সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতেছে। বজ্র পথে দাঁড়াইয়া ভীমকান্ত দুর্গপ্রাসাদ নিরীক্ষণ করিত আর ভাবিত—এই গড় আমার পিতামহ গড়িয়াছিলেন—আমার পিতা এই

গড় রক্ষা করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন! নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

অধিকাংশ দিন বজ্র হাতীঘাটে গিয়া বসিত। সায়ংকালে হাতীঘাট বিচিত্র জনসমাবেশে মুখর ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিত। পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ; কেহ স্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ বায়ু সেবনের জন্য। কদাচিৎ রাজার হাতী স্নানের জন্য ঘাটে আনীত হইত। হাতীরা গভীর জলে জলক্রীড়া করিত, শুঁড়ে জল ভরিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইত।

নানা লোকের নানা কথা বজ্রের কানে আসিত। বেশীর ভাগ জল্পনা ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাইতেছে, কেহ আর পণ্য লইয়া সমুদ্রে যাইতে সাহস করে না। রাজা ও রাণী সম্বন্ধে কেহ কেহ শ্লেষপূর্ণ বক্রোক্তি করিত। বজ্র এই সব কথা শুনিত এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিত।

ঘাটে বাঁধা সমুদ্রতরীগুলিও বজ্র লক্ষ্য করিত। দিনের পর দিন বিপুলকায় বহিত্রগুলি ঘাটে পড়িয়া আছে; মাঝি-মাল্লা নাই, গুণবৃক্ষে পাল নাই। উত্তর হইতে দুই চারিটি বাণিজ্যপোত আসে বটে কিন্তু তাহারা আবার উত্তরে ফিরিয়া যায়, সমুদ্রের দিকে যায় না।

এই ভাবে ঘাটে বসিয়া বজ্রের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অন্ধকার নামিয়া আসিলে ঘাটের জনসংঘ ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইত। বজ্র শূন্য ঘাট হইতে ফিরিয়া চলিত।

ক্রমশঃ

প্রাচীন মিশরে শিল্প-সৃষ্টি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

কেউ যদি বলেন, মিশরের ইতিহাস প্রধানত শিল্পেরই কাহিনী, যে-শিল্প ধর্মকে কেন্দ্র করে', পরলোককে জড়িয়ে ধরে' প্রস্তর সৌধ, প্রস্তর মূর্তি, কারুকর্ম ও চিত্রাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাহলে তার সেই বর্ণনা অসত্য হবে না। হিকসেসদের আক্রমণের পূর্বে যুদ্ধ বিগ্রহ মিশরে দেখা দেয় নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পৃথক অবস্থান শিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছিল মিশরীদের। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই এমন উন্নত ধরণের শিল্প-সৃষ্টি দেখতে পাই আমরা সেখানে, যার বিরাটত্ব শৈলী ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তারপর সাম্রাজ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলে যখন ধনরত্ন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, তখন আবার সৃষ্টি কার্যে নূতন উদ্যম দেখা দিয়েছিল, প্রাচীনকালের বিরাট সৌধ ও বিশাল মূর্তি নির্মাণ পর্বের পুনরভিনয় আরম্ভ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অন্যদেশে প্রগতিকে যেমন ধাপের পর ধাপ বেয়ে উঠতে দেখা যায়, মিশরে তেমনটি ঘটে নি। অকস্মাৎ বিরাট নির্মাণ কার্যগুলির মুখো-মুখী দাঁড়িয়ে প্রগতি যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ্যা (architecture)।
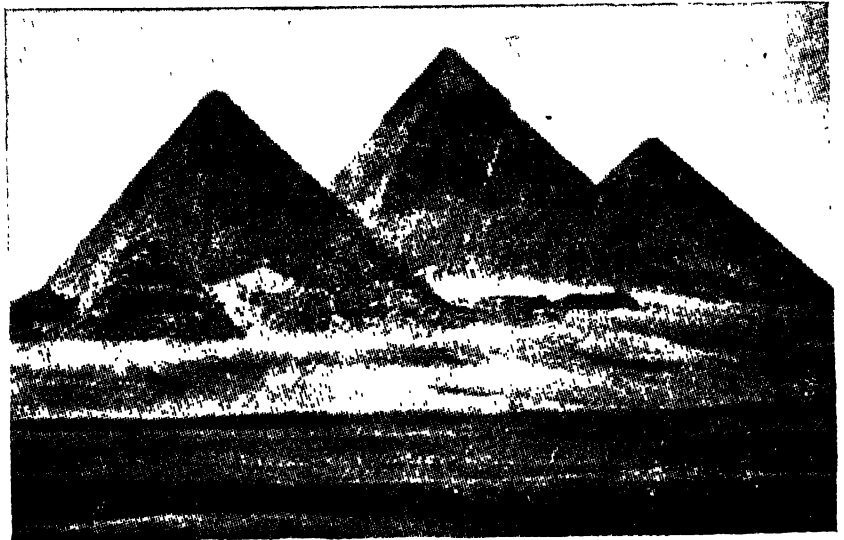
তিনটি পিরামিড (গিজে)

আকারের সৌষ্ঠবে ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রভাবে এই শিল্পের রূপ-সৃষ্টি স্বভাবত চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া স্থপতির নির্মাণকার্যের ব্যবহারিক

মূল্যও আছে। প্রাচীন রাজ্যে এই শিল্প কিরূপে পিরামিডগুলিকে গড়ে তুলেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। খাফরুর 'স্পিন্‌কসে'র (Sphinx) সংলগ্ন যে-মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল তার হলের দেয়ালে ছাদের নীচে তেরছা ধরণের কাটা জানালা (clerestroy windows) রয়েছে, তেমনি তেরছা জানালার ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোমের সৌধ-নির্মাণ কার্যে দেখা দিয়েছিল। পরিশেষে এই স্থাপত্য পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল খৃষ্টানদের গীর্জায় 'ব্যাসিলিকা' নামক হলের মূল অংশটিতে (the nave of the Christian basilica Church)। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপে খৃষ্টানদের 'ক্যাথিড্রেল' দেখা যায় আমাদের দেশে অজন্তা ইলোরা প্রভৃতি স্থানে। জগতে গুহা-শিল্পের প্রারম্ভ সামন্তযুগের মিশরে। তখন পিরামিড তৈরি না করে অভিজাতবর্গ পাহাড় কেটে গুহা সমাধি মন্দির (cliff tombs) নির্মাণ করতেন, এবং সেখানেই শবাধারে তাদের মামিকে রাখা হত। মধ্যম রাজ্যের দ্বাদশ বংশীয় নৃপতিদের সময় বেনি-হাসান (Beni Hasan) নামক স্থানে 'আমেনির সমাধি' (Tomb of Ameni) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে সমাধি-কক্ষ। গোলাকৃতি থামগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়। হাওয়ারার মন্দিরে একটি গোলক-ধাঁধা (Labyrinth of Hawara) আছে, সেটি তৈরী

স্ফিনকস্ (গিজে)

হাইপোস্টাইল হল (কারনাক)

(cathedral) বা গীর্জাগুলির স্থাপত্যের পরিকল্পনা ৩১০০ বছর আগেকার ফারাও খাফরুর সেই হলের আদর্শেই রচনা করা হয়েছিল।

পিরামিড যুগের আদর্শ কিন্তু মিশরে স্থায়ী হয়নি। এক শতাব্দীর মধ্যেই মিশরীদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌষ্ঠববোধ হলের বড় বড় চৌকা থামের পরিবর্তে সুদৃশ্য, লম্বা, গোল স্তম্ভ এবং তার ওপর চূড়া (capital) নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এরূপ গোল থামের শ্রেণী মিশরে খৃ পূ ২৮শ শতাব্দী থেকেই নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে কখনও এই ধরণের থাম পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয়নি। সামন্ত-যুগে মন্দির নির্মাণ করা হত পাথর দিয়ে নয়, পাহাড় কেটে, যেমন

করেছিলেন তৃতীয় আমেন এপ-হাট। গোলক-ধাঁধার করিডরটি নানা রকম পাথর দিয়ে গাঁথা ছিল, নির্মাণ কৌশল এমনই চমৎকার যে তাই দেখে অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস।

সাম্রাজ্য যুগের কীর্তির অবশেষগুলির অধিকাংশই রয়েছে রাজধানী থিবিস (Thebes) নগরে ও তারই নিকটবর্তী কারনাক (Karnak) ও লাকসার (Luxor) নামক স্থানে। কায়রো থেকে ৪০০ মাইল দক্ষিণে নীল নদীর তীরে থিবিসের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—বিস্তৃত

গোরস্থানের ও বিরাট মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ। গিজে (Gizeh)-র দিগন্তপ্রসারী গোরস্থানে আমরা পেয়েছি পিরামিড-যুগে মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয়, তেমনি সাম্রাজ্য-কালের সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে হয় থিবিস, কারনাক, লাকসার ও আমরণা থেকে। কীর্তি-সৌধগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান কারনাকের ভুবনবিখ্যাত বিশাল মন্দির। মন্দিরের খিড়কি দরজা থেকে নদীতীরে সদর দেয়াল পর্যন্ত ½ মাইল। মন্দিরের এই বিস্তৃতি দুই হাজার বছর ধরে' প্রসারের ফল—প্রাচীনতম অংশ মধ্যম রাজ্যের রাজাদের আমলে তৈরি, আর সর্বশেষ নির্মাণ কার্য হয়েছিল গ্রীক রাজা টোলেমিদের (Ptolemy) কালে। মন্দিরের মধ্যস্থলে রাণী হাটসেপসুটের ওবেলিস্ক (obelisk) স্তম্ভ। পূর্বে এখানে রাণীর আরও একটি ওবেলিস্ক ছিল। তারপর দেখা যায়, স্তম্ভযুক্ত বিরাট হলঘর, যার নাম 'কারনাকের হইপোষ্টাইল হল' (Hypostyle Hall of Karnak)। এই হলের প্রাচীর গাত্রে সাম্রাজ্য কালের বড় বড় যুদ্ধের দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে (bas-reliefs)। সারি সারি গোলাকৃতি বিরাট স্তম্ভ, প্রত্যেকটির উপরিভাগের চূড়াদেশে (capital) একশ জন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সমুখের প্রকাণ্ড প্রাচীর থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দুই সারি 'মেষের বা স্ফিংকসের এভিনিউ' (Avenue of Rams or sphinxes)। এই 'মেষের এভিনিউ'র বাঁ দিকে ছিল একটি পবিত্র হ্রদ (sacred lake)। এখন সেটি একটি এঁদো পুকুরে পরিণত হয়েছে। নদীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত পর্বত-সমাধিগুলিতে (cliff tombs) সাম্রাজ্য যুগের রাজা ও অভিজাত কুলের ব্যক্তিরা শায়িত রয়েছেন।

দ্বিতীয় রামেসিসের মূর্তি (লাকসার)

স্তম্ভযুক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লাকসার, দের-এল-বাহেরি (Der-el-Bahri) প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। দের-এল-বাহেরিতে রাণী হাটসেপসুটের বিশাল স্তম্ভ-শ্রেণী (Colonnades) ছাড়াও রয়েছে 'রামেসিয়াম' (Ramesseum), 'রামেসিয়াম' দ্বিতীয় রামেসিস্ (Rameses II) নির্মাণ করেছিলেন তার স্থপতি ও ক্রীতদাসদের সাহায্যে। বিরাট আকৃতির প্রস্তরমূর্তি (Colossal statues) ও সুবিশাল স্তম্ভশ্রেণীর একটি অরণ্যভূমি বললেও হয় রামেসিয়ামকে।
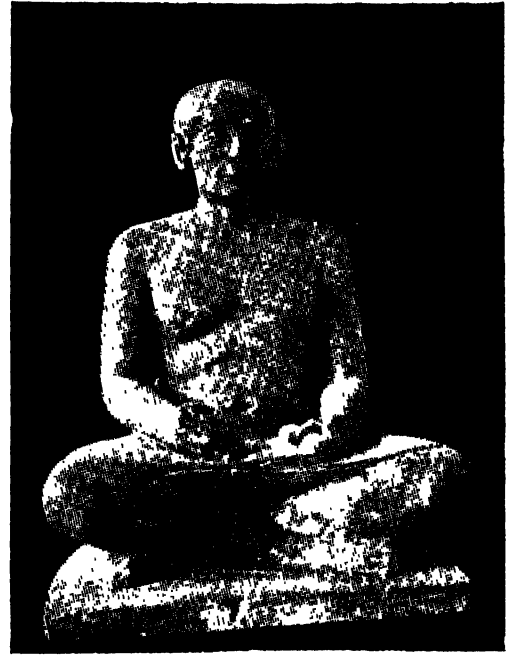
লেখক (scribe) (লুভার)

সারি সারি মূর্তি, সবগুলিই রামেসিসের। ইখনাটনের রাজধানী আমরনা—প্রাচীন নাম 'আখেটেটন'—খনন করে রাজপ্রাসাদ ও গৃহ-প্রাচীরের নিম্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন ভাস্করের কর্মশালাও উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে পাওয়া গেছে ভাস্কর্যের অনেকগুলি সুন্দর নমুনা, যা সে-যুগের শিল্প বিষয়ে জ্ঞানকে গভীরতর করেছে। নগরের পিছন দিকে পাহাড়ের শ্রেণী, সেখানে ইখনাটনের অনুগত ব্যক্তিদের সমাধি। স্মরণ থাকতে পারে, পুরোহিতদের পীঠস্থান থিবিস নগর ছেড়ে দিয়ে আমরনায় রাজধানী নির্মাণ করেছিলেম ইখনাটন এবং তার মৃত্যুর পর রাজধানী আবার যেমন থিবিসে স্থানান্তরিত হল, আমরনাও সেই সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাহাড়ের সমাধি মন্দিরগুলির (Amarna chapels) গাত্রে সেই বিস্তৃত শহরটির জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি অঙ্কি

সুন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে—আর আছে সেখানে ইখনাটনের অবিস্মরণীয় স্তোত্রগুলি দেয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ।

মিশরের স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, ভাস্কর্যও তেমনি উচ্চাঙ্গের। ইতিহাসের প্রবেশ দ্বারে সর্বপ্রথম চোখে পড়ে সেই বিরাট 'স্ফিংকস্,' মুখটি তার রাজা খাফরুর আর দেহটি সিংহের, রাজার অমিত শক্তির পরিব্যঞ্জক। মেমেলুকদের কামানের গোলায় নাকের ডগাটি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও—সেই মূর্তিটিতে যে-শক্তি ও গাম্ভীর্য পরিস্ফুট, যে-স্থৈর্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা বিরাজমান, এবং সর্বোপরি যে-সূক্ষ্ম অব্যক্ত হাসির রেখা রহস্যের একটি যবনিকা টেনে দিয়েছে মুখের ওপর—তাই দেখে অনেক মনীষী মনে করেন, ওটি শুধু একটা পাথরে-গড়া প্রতিমূর্তি মাত্র নয়, ওর মধ্যে একটি গোপন

সম্রাটবংশের স্বামী-স্ত্রী (বার্লিন)

রহস্যের আভাস ফুটে উঠেছে, 'যে-রহস্যের সাড়া পাওয়া যায় সর্বত্র, কিন্তু পূর্ণ বিকাশ হয় নি কোথাও' ("It seeks to give expression to a secret hinted at everywhere but no where fully manifested"—Edward Caird)। এমনি রহস্যের আভাস দিয়েছেন ইতালীয় শিল্পী লিওনার্ডো-দা-ভিন্সি (Leonardo-da-Vinci) তার বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসা'য় (Mona Lisa)। স্ফিনকসকে মোনা-লিসার প্রস্তর সংস্করণ বলা যেতে পারে।

কায়রো মিউজিয়মে খাফরুর একটি প্রস্তর মূর্তি আছে, পিছন দিকে স্কন্ধের ওপর বসে বাজপক্ষীরূপী হোরাস পক্ষপুট দিয়ে তাকে রক্ষা করছেন। ভাস্কর্যের এমন নিপুণ সৃষ্টি সত্যই বিরল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কালের কোন চিহ্নই পড়ে নি এই মূর্তিটির ওপর। সে-যুগের প্রধান শিল্পীরাই ছিলেন মূর্তিনির্মাতা। মূর্তি তৈরি হত পাথর বা কাষ্ঠ দিয়ে, তারপর রং করা হত। চোখ দুটিতে বসানো স্বচ্ছ স্ফটিক যেন জীবনের রশ্মি ঠিকরে বের করে। ভাস্কর্যের ইতিহাস তখন সবে সুরু হয়েছে, কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে এমন জীবন্ত মূর্তি-সব তৈরি করা হয়েছিল যার তুলনা কোন যুগেই বড় একটা পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি পাথরে তৈরি, অপরটি দারু মূর্তি। প্রস্তর মূর্তিটি একজন লেখকের (scribe)—লুভার মিউজিয়মে রক্ষিত। লেখক আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, নগ্ন দেহে, কোলের ওপর প্যাপিরাস রেখে কলম দিয়ে লিখতে উদ্যত, আর একটি অতিরিক্ত কলম রয়েছে কানে গোঁজা। দেখলেই মনে হয়, লোকটি বিশেষ

ইখনাটন ও নেফেরটেটি

পরিশ্রমী, হিসাব নিকাশ না কি একটা রচনা নিয়ে খুবই চিন্তা করছেন। কাষ্ঠ মূর্তিটি কায়রো মিউজিয়মে রয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে,—'সেখ-এল-বেলেদ' (Sheikh-el-Beled), অর্থাৎ গ্রামের প্রধান। আসলে, সে প্রধান নয়, মজুরদের পর্যবেক্ষক। পরিপুষ্ট দেহ, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, প্রভুত্বের নিদর্শন। বুর্জিয় শ্রেণীর মানুষের মতই স্থূল কটিদেশ, হাসি হাসি ফুলো-ফুলো মুখ—যেন নিজের পদ মর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। মাথায় টাক, কটিবাস অবিন্যস্তভাবে জড়ানো। সেই আদি যুগে, উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও পরিধেয় ছিল কটিবাস, ঊর্ধভাগ নগ্নই থাকতো, পদদ্বয় পাদুকা-বিহীন। কাষ্ঠ-নির্মিত হলেও সৌভাগ্যক্রমে মূর্তিটির সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ বজায় আছে। কী নিপুণ হস্তেই না সেই সরল মানবতার সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাসপেরো (Maspero) বলেন,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের যদি কোনো

প্রদর্শনী খোলা হয় তবে মিশরীয় শিল্পের সম্মান রক্ষার জন্য আমি এই মূর্তিটিকে প্রতিনিধিরূপে স্থান দেব সেখানে "(If some exhibition of the world's masterpieces were to be inaugurated I should choose this work to uphold the honour of Egytian Art.")।

প্রাচীন রাজ্যের শিল্পী হাস্য-রস বর্জিত নয়। একটি শুঁড়ি (beer-brewer) আর বামন নেমহেটেপ (Dwarf Knemhetep)-এর বিখ্যাত মূর্তি দুটিতে হাস্য রস সৃজন করা হয়েছে যথেষ্ঠ। এ-কথা সত্য যে প্রথম দিকটায় এ-যুগের শিল্প ছিল স্থূল ও অমার্জিত। কতিপয় নির্দিষ্ট রীতিনীতি (convention) শৈলীকে সারা যুগ ধরে বেঁধে রেখেছিল, তার নড় চড় বড় হয় নি। যেমন, বিভিন্ন ব্যক্তির দেহের স্বাভাবিক গঠনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একই প্রণালী মত সকল দেহকেই এক রকম করে নির্মাণ করা, সকল নারীকে যুবতী আর সকল রাজাকে বলিষ্ঠ পুরুষ করে সৃষ্টি করা, আর মূর্তি এমনভাবে তৈরি করা যেন দেহ ও চক্ষু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেখা যায়। কিন্তু এত সব বাঁধা-ধরা নিয়ম সত্ত্বেও, সে যুগের শিল্পীর শক্তি ও কল্পনার গভীরতা সূক্ষ্ম জীবন্ত রূপ-রেখায় সৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করতে ত্রুটি করে নি। বস্তুতঃ লেখক ও সেখ মূর্তির ক্ষেত্রে রীতি-পদ্ধতির ব্যতিক্রমই দেখা গেছে। সামন্ত যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ভাস্কর্যের অধোগতি চলেছিল, তার কারণ—ধর্মের রক্ষণশীল মনোভাব শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মূর্তির প্রয়োজন হত মন্দিরে ও সমাধিক্ষেত্রে যেখানে ছিল পুরোহিতের প্রাধান্য। মূর্তিকে রূপদানের রীতি নীতিগুলি পুরোহিতদের চাপে বিশেষ করে মেনে চলতে হত, শিল্পীর স্বাধীনতার অবকাশ বড় একটা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাদশ বংশীয় নৃপতি নেবহটেপ-রা (Nebhotep-Ra)-র রাজত্বকালে শিল্পের যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছিল। রাজ-শিল্পী ছিলেন তখন মারটিসেন (Martisen)। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখে গেছেন, "এক দক্ষ শিল্পী ছিলাম আমি। জীবন্ত রূপের ছবি আঁকতে হলে, প্রতিটি অঙ্গের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন, আমার সেই জ্ঞান আছে। পুরুষের চলে বেড়াবার সময়কার মূর্তি আর নারীর গতি ভঙ্গী, উভয়ই আমার জানা ছিল। জল-হস্তী শীকারের সময় অস্ত্র-ক্ষেপনের ভঙ্গী আমি জানি। দৌড়াবার কালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমাও আমার অজানা নেই।" দ্বাদশ-বংশীয় পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের শাসনকালে শিল্প যেন নূতন উদ্যমে আবার জেগে উঠে পুরানো দক্ষতা কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিল, যেমন দেখা যায় তৃতীয় আমেন এম-হেট ও সেনুসার্টদের মূর্তিগুলিতে। কিন্তু হিকসোসদের আক্রমণের ফলে দেশ যেমন পরাধীন হয়েছিল, শিল্প সৃষ্টির উদ্দীপনাও তখন আর রইলো না। আর এক দফা অধঃপতন দেখা দিল সেই সঙ্গে, বস্তুতঃ শিল্প একরকম অন্তর্ধানই করেছিল।

শিল্পের দ্বিতীয় পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল অষ্টাদশ-বংশীয় নৃপতিদের রাজত্ব-কালে। রাণী হাটসেপসুট, কতিপয় থাটমোস, কয়েকজন আমেনহটেপ এবং পরিশেষে ইখনাটনের আমলে শিল্প যে-উন্নতির পর্যায়ে উঠেছিল, তারই জের টেনে গিয়েছিলেন উনবিংশবংশীয় রামেসিসেরা। সাম্রাজ্যের নানা স্থান থেকে ধন-দৌলতের অজস্র সমাগম রাজপ্রাসাদ ও দেউলগুলির সৌষ্ঠব বর্ধন আর শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছিল। হাটসেপসুটের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্তি রয়েছে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়মে। তৃতীয়

সারিবদ্ধ স্ফিনকসের রাজপথ। কারনক।

থাটমোসের বিরাট প্রতিমূর্তি আর আবু সেমবেল নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় রামেসিসের ৭৫ ফুট উচ্চ গগনস্পর্শী প্রস্তর মূর্তিগুলি যেন খাফরুর বিখ্যাত স্ফিংক্সের সঙ্গে আড়া-আড়ি আরম্ভ করেছিল। কায়রো মিউজিয়মে তৃতীয় থাটমোসের একটি পাথরের 'বাষ্ট' আছে। ভাস্কর্য যে-কতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে-যুগের মিশরে তা বোঝা যায় এই থেকে যে, 'বাষ্টে'র মুখের ছাঁদের সঙ্গে থাটমোসের মমির মুখাকৃতির অবিকল মিল রয়েছে। তৃতীয় আমেনহটেপের একটি স্ফিংকস্ মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। লুভার মিউজিয়মে ইখনাটনের উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি অপরূপ শিল্প মাধুর্যের প্রতীক। ইখনাটনের পত্নী নেফ্রেটেটির (Nefretete) মূর্তিগুলিও জীবন্ত সৌষ্ঠবের প্রতিচ্ছবি। বস্তুত ইখনাটনের সময়ে পুরানো বাঁধা-ধরা রীতিগুলি বর্জন করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল স্বভাব-ধর্মী শিল্প-শৈলীর (Naturalism) প্রবর্তন হয়েছিল। সেই বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত দেখতে পাই আমরা মন্দির গাত্রে রামেসিসের

প্রিয় যুদ্ধ-দৃশ্যগুলিতে। দ্বিতীয় রামেসিসের অর্ঘ দানে রত অর্ধশয়ান মূর্তিটির ভঙ্গী অতুলনীয়। টুরিনে রক্ষিত আছে আর একটি বিখ্যাত প্রস্তর মূর্তি এই নৃপতির। পরিচ্ছদ সাধারণ রকমের, কোন জাঁক-জমক নেই— রামেসিসের যৌবনের প্রতিমূর্তি। কেবল মনুষ্য মূর্তি নয়, পশু মূর্তি নির্মাণেও শিল্পীর দক্ষতা ও নৈপুণ্য অসাধারণ। দেব-এল বেহরির 'ভাবগ্রস্ত গাভী' মূর্তি (meditative cow) শিল্প সৌকর্যে গ্রীক ও রোমান শিল্পের সমকক্ষ।

দ্বিতীয় রামেসিসের পর থেকে শিল্প আবার গতানুগতিক পথ ধরে' অধোদিকেই চলেছিল। কিন্তু মিশরীয় ইতিহাসে পূর্বে যেমন ঘটেছে, দীর্ঘ-কাল পরে আবার শিল্পের পুনর্জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন কালের সরল স্বভাব নিষ্ঠাকে শিল্পের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল 'সেইট রাজা'দের (Saite Kings) আমলে, কিন্তু এই প্রচেষ্টাই ছিল নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ উজ্জ্বলতা—কেন না এর পরেই মিশরের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েছিল। সে-সময়ের শিল্পের একটি নমুনা—বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত মনটুমিহাইটের (Montumi-hait) উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি। ব্রঞ্জের মূর্তি নির্মাণ কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, লেডি-টিকোসেট (Lady Tekoschet)-এর ব্রঞ্জ মূর্তিটি দেখলে তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। শিল্প যখন এমনি করে আবার তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছিল, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লো পারসিকেরা

থিবিস—উশের হাটের দেয়াল চিত্র

বাঘ যেমন পড়ে মেষপালের ওপর, এবং সমগ্র দেশটিকে দখল করে প্রভু শক্তির দাপটে সৃজনের উৎস-মুখকে দিলে বন্ধ করে—আর শিল্পও সেই সঙ্গে চিরদিনের তরে পাথর-চাপা পড়লো।

পাথরকে পুরোপুরি কেটে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি (figure in the round) ও 'বাষ্ট' (bust) প্রস্তুত ছাড়াও পাথর খোদাই করে' নানা রকম চিত্র ফুটিয়ে তোলার কায়দাকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিল মিশরীরা। এ-রকম প্রস্তর শিল্পের নাম 'বাস রিলিফ' (bas relief)। এই শিল্পটি খাঁটি ভাস্কর্য ও খাঁটি চিত্রাঙ্কনের মাঝামাঝি। লোহিতসাগরে রাণী হাটসেপ-সুটের পুনট (সোমালিল্যাণ্ড) অঞ্চলে নৌ-অভিযান যা পূর্বে বলা হয়েছে, তারই প্রতিকৃতি খোদাই করা রয়েছে দের এল-বেহরির দেয়ালের গায়ে। পাল তোলা জাহাজ দাঁড় বেয়ে চলেছে, সমুদ্রের জলে নানাবিধ জল জন্তু,—যেমন পুরুভুজ কাঁকড়া প্রভৃতি। কারনাকে 'হাইপোষ্টাইল হলের বাইরে ১৭০ ফিট লম্বা দৃশ্যাবলী খোদাই করা রয়েছে পাথরের ওপর। তার মধ্যে একটি দৃশ্যে ফারাওকে দেখা যায় অশ্বযুক্ত 'রথে চড়ে' ধনুর্বাণ হস্তে যুদ্ধ করতে। সাম্রাজ্য যুগের এই চিত্রটিতে অশ্বযুক্ত রথের প্রথম আবির্ভাব, যে অশ্ব ও রথকে মিশরদেশে এনেছিল হিকসোসরা। ঘোড়ার প্রতিমূর্তি জীবন্ত, নিপুণভাবে খোদাই করা। ছবির মতই নানাবর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছিল এই খোদাই কাযটিকে।

গ্রীক রাজা টোলেমিদের (Ptolemies) রাজত্বের পূর্বে মিশরীয় শিল্পে চিত্রাঙ্কনের কোন স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা হয় নি। চিত্রাঙ্কন ছিল তখন স্থাপত্য ভাস্কর্য ও খোদাই কাযের আনুষঙ্গিক শিল্প। প্রস্তর-শিল্পীর হাতুড়ি ও বাটালি যে খাঁজ রেখে যায় পাথরের ওপর চিত্রশিল্পী তাই ভরাট করে তোলে রং দিয়ে। কিন্তু এমন ধারা পরিপূরক ও আনুষঙ্গিক শিল্প হলেও চিত্রাঙ্কন ব্যাপক ভাবেই চলেছিল সর্বত্র। মূর্তি, পাথরের খোদাই কাজ, দেউলের দেয়াল সবই চিত্রিত করা হত। চিত্রের স্থায়িত্ব কাল অল্প, তা সত্ত্বেও চিত্রিত আলেখ্যের অনেকগুলি নমুনা এখনো টিকে আছে মিশরে। 'পিরামিড যুগের শিল্প' প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রাচীন রাজ্যের নানা ছবির কথা বলা হয়েছে। তখনকার অধিকাংশ ছবি সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দৃশ্যাবলী, যা থেকে সমাজ জীবনের অনেক বিষয় জানতে পেরেছি আমরা। মধ্যম রাজ্যের 'আমেনি-সমাধি' (Tombs of Ameni) ও বেনি-হাসানের দেয়াল চিত্রে অনেক পশু-, পক্ষীর ছবি আছে, যেমন 'হরিণ ও কৃষক' 'বিড়ালের ওঁৎ পাতা' (Cat watching the prey)—সেগুলি গতিশীল ও জীবন্ত। আমেনির সমাধি-গাত্রে কুস্তীরত মল্লগণের একটি সমষ্টি চিত্র সত্যই উপভোগ্য। বর্ণের বিন্যাস কৌশল ও রেখাগুলির কলা-সৌষ্ঠব এমনই বিচিত্র যে ছবিটির তুলনা করা চলে শুধু গ্রীক মৃৎপাত্রে যে-চিত্রাঙ্কন (vas-painting) দেখা যায়, তারই সঙ্গে।

চিত্র-শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যের যুগে। স্বচ্ছন্দজাত বনফুলের মত বর্ণশোভায় যেন মাতোয়ারা করে' তুলেছে এ-যুগের শিল্প। শিল্পী তখন রামধনুর সবকটি বর্ণের বিন্যাসকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে, তাই সে রং-এর নানারকম খেলা দেখাতে উন্মুখ। গৃহ,

প্রাসাদ, মন্দির সমাধি যেখানেই আছে দেয়াল আর ছাদের সিলিং সেখানেই বর্ণোজ্জ্বল জীবন্ত ছবি এঁকে ভরে' দিয়েছে সে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নীলাকাশে উড়ন্ত পাখী, সন্তরণশীল মাছ, বনের পশু। রং-করা মেঝেটিকে দেখা যায় যেন স্বচ্ছ সরোবর, ছাদের সিলিংটি যেন নক্ষত্র-খচিত আকাশ। 'নাচ-ওয়ালী', 'নৌকায় পাখী শিকার' প্রভৃতি ছবি শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও শৈলীর মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়। পাথর-খোদাই কালে যেমন, চিত্রাঙ্কনেও তেমনি রেখা-টানগুলি খুবই নিপুণ, কিন্তু রচনায় ত্রুটি দেখা যায়। সমষ্টি-চিত্রে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধটি যেমন ফুটে ওঠা দরকার, মিশরীয় শিল্পে সেই যোগাযোগের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে আঁকা, পরস্পর সম্পর্ক-শূন্য। পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বলে কোন বস্তুই নেই আলেখ্যগুলিতে। দূর নিকটের ব্যবধানের দিকে শিল্পের দৃষ্টি অন্ধ, আর রীতি-নীতির (convention) বাঁধন দিয়ে শৈলীকে যেমন গোড়া থেকে আটক করে রাখা হয়েছিল, সেই বন্ধন থেকেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। যেমন, নারীমূর্তি চিত্রিত করবার রীতি ছিল শ্বেত বর্ণে, আর পুরুষের মূর্তি অঙ্কনে লাল রং ব্যবহার করা হত। কিন্তু এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও শিল্প-সৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের সজীব, জীবন্ত প্রকৃতিরই প্রতিরূপ—রূপ-রেখার মাধুর্যে, বর্ণোচ্ছ্বাসের ছটায় অতুলনীয়।

এই ত গেল প্রধান শিল্পগুলির কথা। তা ছাড়াও যে সব কারিগরি শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলির নির্মাণ নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য পিরামিড যুগ থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সমানে ধাপ রেখে চলেছিল। পিরামিড যুগের আলোচনায় বয়ন, ছুতারের কাজ, কুমারের কাজ, অলঙ্কার নির্মাণ প্রভৃতি অনেক কারিগরি শিল্পের কথা বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যযুগের কারিগরি শিল্পের নমুনাগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে পিরামিড যুগের শিল্পধারাই চলে এসেছে সুদীর্ঘ দুই সহস্র বছর পর্যন্ত। শিল্প এখন শুধু পরিপুষ্টি লাভ করেছে, নানা সাজসজ্জায় পরিশোভিত হয়েছে। তাঁতিদের বোনা গালিচা, পর্দা, আসনের ওপর নানা রংএর বাহারে কারুকার্য দেখা যায়। সেই জিনিসগুলি সিরিয়ায় রপ্তানি হত। আজিও সিরিয়ায় ঐ নমুনার বোনা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। টুটেন খামেন (Tuten khamen)-এর সমাধিগর্ভে সোনারূপায় মোড়া সুন্দর কাজ-করা কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার প্রভৃতি তৈজস পাওয়া গেছে, সেগুলি মিশরীয় ভোগবিলাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিচিত্র কারুকার্য করা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং প্রস্তরভাণ্ড শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

সারা প্রাচীন জগতে যেমন মিশরেও তেমনি—আর্ট ছিল ধর্মেরই সহচর। আর্ট স্বয়ংপূর্ণ—অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প (Art for Arts sake) এই ভাবটি সে-যুগে বোধ করি কোথাও জেগে ওঠে নি। রাজ্যের ও ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে আর্টেরও উন্নতি দেখা দিয়েছে। রাজ্যের সম্পদ শিল্পকে পরিপুষ্ট করেছে, আর ধর্ম জুগিয়েছে তার প্রেরণা, ভাব ও লক্ষ্য। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের এই যোগাযোগের ফল অবিমিশ্র শুভ হয় নি। গাঁটছড়ার বাঁধ নানা রকম বাঁধা ধরা পদ্ধতি (Convention) দিয়ে শৈলীকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, আর সেজন্য স্বতস্ফূর্ত স্বাধীনতার মধ্যে শিল্প কখনও মুঞ্জরিত হতে পারে নি মিশরে। তাই জাতি যখন স্বধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছে, জাতীয় শিল্পের সজীবতাও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।

এক কথায় মিশরীদের 'প্রাচীনকালের আমেরিকান' বলা যেতে পারে। আমেরিকানদের মতই আকারের বিরাটত্ব, বিশাল পরিকল্পনা তাদের চিত্ত আকর্ষণ করতো। পরিশ্রমী ও কর্মী ছিল তারা, তাই প্রস্তরশিল্প মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ ব্যাপারে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে ইতিহাসের চরম রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত স্থল মিশর। কালের প্রভাবে পরিবর্তন মিশরেও ঘটেছে এবং যতই পরিবর্তন ঘটেছে, ততই দেখা গেছে,—মিশর যে কে-সে।

শ্রীমতী

প্রভাময়ী মিত্র

প্রশান্ত নলিন নেত্রে সুগভীর দৃষ্টি,
কোন বিধাতায় তুমি মায়াভরা সৃষ্টি ?
শিহরায় সারা তনু চমকায় হিয়া,
কোন শ্যামলের তুমি আলো করা 'পিয়া'।
চির বন্দী সুনিবিড় বাহুর বন্ধনে,
ছন্দে গীতে সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে।

মধুমাধবের বুকে কৈশোরের মায়া—
সেই বৃন্দাবন-ঘন-নীপ-বন ছায়া।
ধীর ধারা নীলনীর ঘিরে ব্রজভূমি,
উজান বহিয়া ফিরে তীর তট চুমি।
কাজল মেঘের তলে বাদল বাতাসে
ব্যাকুল বিরহী হিয়া কাহার আভাসে।

কে সঁপেছে নিঃশেষে আরাধনা ভার
কে তোমারে দিতে পারে বিনিময় তার !

কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

বর্ত্তমান বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা অন্নসমস্যা। এ সমস্যা এখন বড়ই প্রখর হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু এ সমস্যা এদেশে বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে। খাদ্যের প্রাচুর্য্য কোনদিনই এ দেশে ছিল না। খাদ্যসমস্যা এই শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে সবচেয়ে বিচলিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহার সম্বন্ধে আজ দুই কথা বলিতে চাই। আজ অন্নাভাবের দিনে সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে। আজ যে 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানে সরকার বহুব্যয় করিতেছেন এবং মাথা ঘামাইতেছেন, এই মহাপুরুষ ত্রিশ বছর আগে সেই অভিযান সুরু করিয়াছিলেন এবং কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এই নিবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

এই মহাপুরুষের নাম রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে তাঁহার জন্ম। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যার বিশিষ্ট ছাত্ররূপে তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রথম কৃষিবিভাগের চাকুরি গ্রহণ করেন তারপর ক্রমে নিজের ঐকান্তিক কর্ম্মনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের বলে কৃষিবিভাগের উচ্চতম পদে আরূঢ় হন। কেবল যদি তিনি সরকারী চাকুরি করিয়া নিজের ধনমান বৃদ্ধি করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইত না। এমন শত শত বাঙ্গালী আনুগত্য ও বিদ্যাবত্তার বলে উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়া নিজের পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের মন হইতে কোন বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। রাজেশ্বরবাবু সে শ্রেণীর সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন না। তাঁহার রাজসেবার অর্থ ছিল দেশসেবা। সরকারী চাকরী করিয়া কি ভাবে দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করা যায়—রাজসেবা ও দেশসেবায় যে বিরোধ নাই, রাজেশ্বরবাবু সারা জীবনের সাধনায় তাহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি দেশের কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য কি কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার সারস্বত ভাণ্ডারে এইগুলি অমূল্য সম্পদ। সবগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কৃষি-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড কৃষির মূলনীতি, কৃষি-বিজ্ঞান ২য় খণ্ড—(ফসল সর্জ্জা ও ফল) নামক গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞান ৩য় খণ্ড—(গোপালন) গ্রন্থখানিও সত্বর প্রকাশিত হইবে। গোপালন পুস্তকখানিতে গোপ্রজনন ও গোধনের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গোপালন কৃষিরই অঙ্গ। এই গ্রন্থগুলিতে কৃষিবিদ্যার সারতত্ত্ব যেমন উপনিবদ্ধ আছে, তেমনি সেই তত্ত্ব কতটা এদেশের পক্ষে উপযোগী তাহারও আলোচনা আছে। বঙ্গভাষায় ইহার পূর্ব্বে এইরূপ পুস্তক আর রচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। অতএব ইহা আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।

তিনি এই গ্রন্থগুলিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন কৃষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও সেগুলির মূল্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইংরাজিশিক্ষিত নগরবাসীদের সঙ্গে কৃষির কোন যোগ নাই—পল্লী গৃহস্থদের সঙ্গেই কৃষির যোগাযোগ। সেজন্য লেখক বইগুলি ইংরাজিতে না লিখিয়া বাংলায় লিখিয়াছেন। ইহাতে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিরও একটি প্রধান অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

কেবল কৃষিবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই এই বইগুলিতে আলোচিত হয় নাই—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগেরও নির্দ্দেশ ও উপদেশ এইগুলিতে উপনিবদ্ধ আছে। এমন ভঙ্গীতে ও ভাষায় গ্রন্থগুলি রচিত যে অল্পশিক্ষিত কৃষিজীবীদেরও বুঝিতে অসুবিধা হয় না। প্রাচীন পদ্ধতি হইতে ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া কেমন করিয়া কৃষিকার্য্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে এই গ্রন্থগুলিতে সে কথাও আলোচিত হইয়াছে বেশ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্য রাজেশ্বরবাবু তাঁহার অন্য সব বইগুলি এবং অনেক অন্যান্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতী পুত্র স্বর্গত রমেশচন্দ্র সেগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র নিজে সুলেখক ছিলেন এবং কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তিনি পিতার সাহচর্য্যে ও উপদেশে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতার মূল্যবান পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে রাজেশ্বরবাবুর পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সকল বিদ্যার শিক্ষা দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির বাংলায় শিক্ষাদানে অসুবিধা আছে বলিয়া কোন কোন শিক্ষাব্রতী মনে করেন, কৃষিবিজ্ঞানের পক্ষে সে অসুবিধা রাজেশ্বরবাবু দূর করিয়াছেন। কেবল তিনি প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলি রচনা করিয়া যান নাই, কৃষিবিজ্ঞানের পুস্তক রচনার আদর্শ ও ধারারও তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং কৃষিবিজ্ঞান রচনার ভাষার ও পারিভাষিক শব্দগুলিরও তিনি প্রবর্ত্তক। তাঁহার পুস্তক প্রকাশের পর এখন এ বিষয়ে পুস্তক রচনা অনেক সহজ হইয়াছে।

রাজেশ্বরবাবু কেবল গ্রন্থ রচনার দ্বারাই কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেন নাই তিনি কৃষিবিভাগের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহুবিধ নূতন যন্ত্রপাতি, ফসল বাড়াইবার জন্য, ভূমির উর্ব্বরতা সাধনের জন্য ও কৃষিকার্য্যে ব্যয়সংক্ষেপের জন্য নানাবিধ কৌশল ও উপায়েরও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি এক প্রকারের উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—এই লাঙ্গলে চাষ করায় চাষীদের ব্যয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই লাঙ্গলের

কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

নাম "রাজেশ্বর হল"। এই ব্যাপারে তিনি সরকারী সাহায্য পান নাই। তিনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় এই লাঙ্গল চালাইতে পারিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চাকরির অঙ্গীভূত কাজ ছিল না। কৃষকদের সুবিধার জন্যই তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হন।

রাজেশ্বরবাবু কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে আজীবন গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফল তিনি চাষীদের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রাণপাত শ্রম স্বীকারও করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলায় আদর্শ সরকারী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র দেশে সুপরিণত বীজরক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে চাষীদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানিয়া তাঁহাদের উপদেশ দিতেন এবং সে উপদেশে তাহারা লাভবান হইত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তিনি জানিতেন দেশের জমিদারদের সহায়তা ছাড়া প্রজাদের কৃষিকার্য্যকে প্রগতির পথে লইয়া যাওয়া যায় না। চাষীরা চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করিয়া যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। নূতন কোন পদ্ধতি তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। সেজন্য তিনি উন্নত পদ্ধতির ছোট ছোট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় জমিদারদের উৎসাহিত করিতেন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে আশাতীত সুফল প্রসব দেখিয়া সাধারণ প্রজাদের মনে দ্বিধা সঙ্কোচ দূর হইত। তাহারাও উন্নত পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত হইত।

প্রথম বিশ্বমহাসমরের সময় যখন পাটের দর খুব মন্দা, বিদেশে রপ্তানির সুযোগ বন্ধ, তখন কলে যেসব ছালা বস্তা চট তৈরী হইত সবই যুদ্ধের জন্য দখল করা হইত। এদেশে ব্যবহারের জন্য ছালা, চট ইত্যাদি পাওয়া যাইত না। তখন রাজেশ্বরবাবু পাটচাষীদের পাট হইতে সূতা ও দড়ি পাকাইয়া, তাঁহার পরিকল্পিত তাঁতে চট বুনিতে এবং তাহা হইতে ছালা চট ইত্যাদি তৈরী করিতে উৎসাহিত করেন। এজন্য পাটচাষীদের সরকারী সহায়তারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইভাবে চাষের উন্নতির জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল পাট শিল্প নয়, অন্যান্য কুটীর শিল্পের প্রচলনের ও উন্নতির জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে কাকিয়া বোম্বাই পাট, চিনসুরা গ্রীণ পাট প্রভৃতির চাষের প্রচলন হইয়াছিল।

আলুর বীজের অভাবে আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষে কাহারও উৎসাহ ছিল না। তিনি দার্জ্জিলিঙের আলুচাষী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া হাজার হাজার মণ আলুর বীজ অল্প ব্যয়ে আনাইয়া দেন। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষের বিস্তার হয়।

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে ছোট ছোট পুস্তিকা ও ইস্তাহার ছাপিয়া তিনি চাষীদের মধ্যে বিলি করেন। সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে 'কৃষিকথা' নামে একখানি মাসিকপত্র তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে প্রকাশিত হয় এবং তিনি নিজে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য এবং দেশের কৃষির অবস্থা লইয়া আলোচনার জন্য তিনি কৃষি-সম্মেলনের প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল সম্মেলনে চাষীরা, সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং শিক্ষিত জনসাধারণ যোগদান করিতেন।

দেশের বহুস্থলে তিনি কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীগুলি কেবল কর্ত্তৃপক্ষের ও বিদেশীয় কৃষিতত্ত্বজ্ঞদের প্রশংসা অর্জ্জন করে নাই, দেশের চাষীরাও ইহাতে উপকৃত হইয়াছে। উৎকৃষ্টতর ফলফসল উৎপাদনের জন্য ইহাতে চাষীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

গবাদি পশুর উন্নতির জন্য তিনি সুপ্রজননের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি গবাদিপশু গণনাকার্য্য (Cattle Census) যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি দেশের কৃষিরাজ্যে একটা আকস্মিক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করেন নাই। বিদেশীয় কৃষিপদ্ধতি রাতারাতি এদেশে চালাইবার চেষ্টাও করেন নাই। সভ্যজাতির উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এদেশে চালানো সম্ভব নয় বলিয়া কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না, এই মত পোষণ করিয়া তিনি অন্যান্য কৃষিতত্ত্ববিদদের মত নিষ্ক্রিয় থাকেন নাই। যে পদ্ধতিতে চিরকাল এদেশে চাষীরা চাষ আবাদ

কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

করিয়া থাকে, সেই পদ্ধতির মূল কাঠামোটা বজায় রাখিয়া তিনি যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিনা আয়াসে বিনা খরচে যে সকল সার গ্রামে পাওয়া যায় সে সকল সারের, বৃদ্ধি, রক্ষা ও সঞ্চয়ের জন্য তিনি গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করিতেন। ধৈঞ্চা গাছ জমিতে লাগাইয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ও পচা পুকুরের পাঁক প্রচুর পরিমাণে জমিতে দেওয়ার জন্যও তিনি উৎসাহিত করিতেন। শেষোক্ত ব্যবস্থায় সেঁচের পুকুরগুলি গভীরতর হইত এবং সেগুলিতে শীতকালেও জল থাকিত। তিনি জানিতেন যে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের সংগতি এদেশের কৃষকদের নাই। তাহা ছাড়া, যেভাবে এদেশের মাঠে জমি ভাগ করা ও ছড়ানো, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ লাঙ্গল ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রচলিত লাঙ্গলেরই তিনি যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করেন।

আমি পূর্ব্বে তাঁহার রচিত যে পুস্তকগুলির কথা বলিয়াছি সেগুলিতে কৃষির মূলতত্ত্ব যেমন আলোচিত হইয়াছে, তেমনি বঙ্গদেশে সেই তত্ত্ব কতটা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে সে কথাও বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, বৃষ্টিপাত, ঋতু পরিবর্ত্তন, জলবায়ু, ভূমিসংস্থান, ভূমিস্বত্ব, বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা, সরকারের মনোভাব ইত্যাদি নানা দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাংলাদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গ্রন্থগুলি রচিত। সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশন কৃষিবিদ্যা অন্যতম পঠনীয় বিষয় বলিয়া নূতন পাঠ্যসূচীতে নির্দ্দেশ করিয়াছে। ঐ পুস্তকগুলি তাহাতে বিশেষ কাজে লাগিবে আশা করা যায়। কৃষিবিদ্যার ছাত্রদের এইগুলি পাঠ্য হইতে পারিবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা বাংলাভাষায় কৃষিবিদ্যার পুস্তক রচনা করিবেন, রাজেশ্বরবাবু তাঁহাদের গুরুস্থানীয়। বর্ত্তমানযুগে যাহারা চাষী, কেবল তাহাদেরই চাষ উপজীবিকা হইয়া থাকিবে না। যে কোন ব্যক্তি চাষকে উপজীবিকা করিতে পারে। দেশের বহু শিক্ষিত লোককেও বাধ্য হইয়া চাষে নামিতে হইবে। কিন্তু চাষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে চাষের দিকে মনোযোগ কাহারও আকৃষ্ট হয় না, চাষে প্রবৃত্তিও জন্মে না।

রাজেশ্বরবাবুর পুস্তকগুলি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়িয়া দেখা উচিত। তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। এইগুলি হইতে চাষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিলে অনেকের চাষে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এবং চাষই তাহাদের উপজীবিকা হইয়া উঠিতে পারে। কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া হিসাব করিয়া চাষ করিলে চাকুরির চেয়ে চাষ ঢের ভালো, বিশেষতঃ ফলফসল আনাজের যেরূপ মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে সকলেরই এদিকে অল্পবিস্তর মন দেওয়া উচিত।

বর্ত্তমান অন্নকষ্টের দিনে শিক্ষিত লোকদের চাষে মন দিলে দেশে ফসলের পরিমাণ বাড়িবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়। বাঙ্গালীর প্রধান বৃত্তি চাষ, ব্যবসায় বাঙ্গালীর ধাতে সয় না। চাকরী দিন দিন দুর্লভ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় চাকুরিয়াদের পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ মুনিষ কৃষাণ রাখিয়া চাষই করিতেন। কৃষির প্রতি অনুরাগ বাঙ্গালী মাত্রেরই রক্তে প্রচ্ছন্ন আছে। তাই বলি, শিক্ষিত লোকদেরও রাজেশ্বরবাবুর বইগুলি পড়িয়া দেখা উচিত। ঐ সকল বই পড়িয়া তাহাদের কাহারও চাষের দিকে মন গেলে তাহাতে তাহাদের এবং দেশের মঙ্গলই হইবে। তাহা ছাড়া বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে বা উঠানে, খোলা জায়গায় যাঁহারা ফল, আনাজ ইত্যাদি উৎপাদন করিতে চান তাঁহারাও উপকৃত হইবেন।

রাজেশ্বরবাবুর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। রাজেশ্বরবাবু আজ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার বয়স হইত ৭৩। তিয়াত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত লোক বাঁচিয়া আছেন। শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, কর্ম্মঠ থাকিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। আজ এই অন্নাভাবের দিনে, Grow more food অভিযানের দিনে, এই উদ্বাস্তু সমস্যার দিনে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বাংলার স্বাধীন সরকার তাঁহার কাছে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন। সরকার সাহায্য না চাহিলেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার জীবনের ব্রতই ছিল দেশবাসীর কল্যাণসাধন, বিপন্নের পরিত্রাণ, অসহায়কে আশ্রয়দান, দেশে শিক্ষাসংস্কৃতির প্রচার এবং জাতির সম্পদ বর্দ্ধন। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে তাঁহার মতন দেশব্রতী মহাপুরুষকে আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থাতেই হারাইয়াছি। তাঁহার রচিত সারগর্ভ পুস্তকগুলি বর্ত্তমান আছে, তাঁহার আদর্শ এখনো উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাঁহার অবদান দেশের কৃষি বিভাগে অঙ্গীভূত হইয়া আছে। আমরা দেশের উৎসাহী যুবকবৃন্দকে তাঁহার পথ, মত, ব্রত ও আদর্শকে অনুসরণ করিতে আহ্বান করি।

গান

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার হাত ছিলো
আমার হাতে।
একই স্বপন দুটী
নয়ন পাতে।
তখন মধুমাস,
বাতাসে ফুলবাস,
ডাকিতেছিল পাখী
তরু-শাখাতে।

কোথায় তুমি আজি?
পাইনে দেখা!
আঁধার ঘরে আমি
কাঁদি রে একা!
মেঘেরা গরজায়,
তটিনী কেঁদে যায়,
ঝরিছে বারিধারা
শ্রাবণ রাতে।

অভাবনীয়

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

আমাদের জীবনের এক একটা অধ্যায় যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয় তেমনি হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। স্বচ্ছ আকাশ ও সোনার ধানের পটভূমিকায় আশ্বিনের ছুটির সানাই আগমনীর যে আনন্দ জাগায় প্রখর পৌষের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের বিদায়-ব্যথায় তা বিলীন হয়ে যায়। বর্ষার মিলন-ঘন উচ্ছ্বাসে যে কাব্যের সূচনা হয় বসন্তের নিঃসঙ্গ নিশ্বাসে তার সমাপ্তি ঘটে। কেন এমন হয় এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিচার বুদ্ধির বাইরে। জীবন প্রবাহ এমনিভাবেই চলে। আমাদের অন্তরের নিভৃত অন্তরীক্ষে কত জ্যোতিষ্কই না আনাগোনা করে। কোথায় তাদের উদয়াচল, আর কোথায় বা অস্তাচল কিছুই জানিনে। তারা কেন আসে আর কেনই বা চলে যায় তাও বুঝিনে। তবে এটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই যে অন্তর পুলকিত আলোকিত বিকশিত হয়। আমার জীবনের এক অখ্যাত অধ্যায়ে এমনি একটি জ্যোতিষ্ক বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত করেছিল। আজ বর্ষা-মুখর রাতে সেই কাহিনীই লিখতে বসেছি।

বিশ বছর আগেকার কথা। সবে এম, এ পাস করেছি। কলেজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠাই আর ছাত্র ছাত্রী পড়াই। মফঃস্বল শহরের শ্লথ মন্থর জীবন। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের আয়োজন করে 'আলাপনী'। সেদিন 'আলাপনী'র বসন্তোৎসব। দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দিনে ফাগের ছড়াছড়ি, রাত্রে আলোর প্লাবন। একটি মেয়ে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলে। মেয়েটির নাম রত্না। রত্না কলকাতার মেয়ে। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন থেকে বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আই, এ পড়ছিল। হঠাৎ পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পড়াশুনা ছেড়ে মামার বাড়ী চলে এসেছে। এখন মামাই তার অভিভাবক। তিনি তার অপূর্ব কণ্ঠ শুনে সংগীত চর্চার ব্যবস্থা করেছেন এবং স্থির হয়েছে সে সুবিধামতো প্রাইভেটে আই, এ পরীক্ষা দেবে। রত্নার মামা নীলরতনবাবুর সংগে আলাপ হল এবং তাঁর কাছেই পেলাম এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

নীলরতনবাবু ছিলেন পুরুলিয়ার কোন এক স্কুলের হেড মাষ্টার। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। লোকটি সাহিত্যরসিক ও সংগীতানুরাগী। তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই গানের জলসা হয়। 'আলাপনী'র সভ্য হিসাবে আমিও সেখানে যাবার সুযোগ পাই। পরের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াতেই শিল্পীর আনন্দ—জীবনের ব্যাপ্তির মধ্যেই কবি, চিত্রী ও গায়কের সার্থকতা। তাই অল্প দিনের মধ্যেই নীলরতনবাবুর পরিবারের সংগে একটা সহজ আত্মীয়তা গড়ে উঠল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে নীলরতনবাবু বললেন আপনার সাহায্য পেলে রত্না আই, এ, পরীক্ষাটা দিতে পারে। যদি অনুমতি দেন তো ও মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করবে। অবশ্য আপনার সুবিধা অনুযায়ী নির্দেশ দেবেন—যে বিষয়ে কোন সংকোচ বোধ করবেন না।

তরুণ বয়স। ছেলেবেলা থেকে গান শুনতে ভালো-বাসি। তাছাড়া পড়ানোই আমার পেশা। কাজেই আমার 'না' বলার উপায় ছিল না। সেই থেকে রত্না দুচার দিন অন্তর আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া আরম্ভ করলে।

রত্নার বৈশিষ্ট্য গুণে,রূপে নয়। বর্ণ শ্যাম, মুখশ্রী সাধারণ, স্বভাব ধীর গম্ভীর। দেখে মনে হয় ছেলে মানুষ, কিন্তু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় তার মনের বয়স দেহের বয়সকে অতিক্রম করে গিয়েছে। কম কথা বলে কিন্তু ভাষার দৈন্য ভাবের পূর্ণতাই প্রমাণ করে। তার বাইরের প্রকাশ যে পরিমাণে কম, অন্তরের অনুভূতি সেই পরিমাণে বেশী। তাই গানে ও লেখাপড়ায় সে সাধারণের অনেক উপরে। রত্না আসে, জিজ্ঞাসা করে, আলোচনা করে, লিখে নেয়, লেখা দেখায়, চলে যায়। নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মের নিগড়ে তার

জীবনের ছন্দটি বাঁধা। তার অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখে মনে হয় সে যেন পরীক্ষারই প্রতিমূর্ত্তি। একদিন কি একটা কারণে আমাকে দুপুরে অনেকক্ষণ বাইরে থাকতে হয়েছিল। বাড়ী ফিরে দেখি রত্না একখানা পাঠ্য পুস্তক খুলে পড়ছে। লজ্জিত হয়ে বললাম—পরের বাড়ীতে তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। হঠাৎ এমন একটা জরুরী কাজে পড়ে গেলাম যে তোমাকে খবর দেবার সময় হল না।

'পরের বাড়ী কথাটার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ক'রে রত্না আমার পানে চেয়ে রইল—চোখে পলক নেই, মুখে কথা নেই। সেই অদ্ভুত ভাবান্তরের অর্থ খুঁজে পেলাম না। আমি কি তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি? তাকে অপমান করেছি? আঘাত দিয়েছি? ভুল বুঝেছি? মনে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। কি এক দুর্জ্ঞেয় কারণে আমাদের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেল! কি এক সূক্ষ্ম ব্যবধান আমাদের পৃথক ক'রে দিলে! নিতান্ত বেসুরো ভাবেই সেদিনের পড়াশুনার পালা শেষ হল।

তারপর রত্নার মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা গেল এক অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন। হাসি ভরা মুখ, চকিত দৃষ্টি, চঞ্চল চলাফেরা, অনর্গল কথা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা সবাক্ চিত্রের অবস্থা, ছাত্র আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর স্থান, সহ শিক্ষার দোষগুণ—আরও কত কি। সব কিছুর মধ্যেই দেখতে পেলাম রত্নার নূতন রূপ। এ যে নির্ঝরের স্বপ্নভংগ! এযে মহাসাগরের গানে প্রাণ জেগে ওঠা! ক্রমে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে ও সংগীত অনুশীলনে দেখা দিল শৈথিল্য; কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা আর রইল না। রত্না জগৎকে জানতে চায়, জীবনকে বুঝতে চায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের আদর্শ গড়তে চায়। রত্নার রূপান্তর স্বাভাবিক পরিমণ্ডল পেরিয়ে চলে গতিতে। ঋতুর দ্রুত-গতিতে। ঋতুর পর্য্যায় আসে যায়। মধুমাসের উন্মাদনার পর গ্রীষ্মের গ্লানি দুঃসহ হলেও বিচিত্রতা আনে। মানুষের মনের ঋতু পরিবর্তনেরও হয়তো তেমনি প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধনার জ্যোতির্ময় জীবনের পর মুক্ত মনের তীর্থ-যাত্রা হালকা হলেও নূতন অনুভূতি জাগায়। নীলরতনবাবুর সংগে দেখা হয়। তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে কৃতজ্ঞতা জানান। রত্নার সম্বন্ধে তিনি অনেকখানি আশা রাখেন এবং গৌরব বোধ করেন। তাঁর কাছে রত্না যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। আদর্শবাদীরা এমনিই অন্ধ হয়।

রত্না সহসা আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে। 'আলাপনী'র আসরেও তাকে দেখা যায় না। ব্যাপার কি! হয়তো সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হয়তো আরম্ভ হয়েছে অবিকল্প অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া। মানুষ আপনাকে কতটুকুই বা জানে! আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ভরে যে কাজ করে, কাল শান্ত অবসরে তার জন্য পরিতাপ করে। আজ সম্মুখের আহ্বানে স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে চলে, কাল পশ্চাতের টানে হতবুদ্ধির মতো থমকে দাঁড়ায়। মানুষের বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি। আমাদের ভিতর অজানার আকর্ষণও আছে। সংস্কারের তিরস্কারও আছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নীলরতনবাবুর বাড়ী খবর নিতে গেলাম। উদ্‌বেগকাতর মুখে তিনি বললেন—রত্না অসুস্থ। ডাক্তারের মতে শারীরিক পীড়া অপেক্ষা মানসিক উত্তেজনাই বেশী। পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

রত্নাকে দেখলাম শীতের দিনের শীর্ণ নদীর মতো—না আছে তরঙ্গলীলা, না আছে কলধ্বনি। তার পাণ্ডুর মুখ, উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক তনুর সম্মুখে নির্বাক্ হয়ে বসে রইলাম। মৌনীতে মৌনীতে ভাব বিনিময় হয় চোখের ভাষায়। রত্না বাষ্পাকুলনেত্রে ও মৃদুকণ্ঠে বললে—আজ থাক। পরে আপনাকে সব কথা বলব।

রত্নার 'সবকথা' বল হল না। সপ্তাহ যেতে না যেতেই সে চলে গেল মধুপুরে। তার সংগে সেই আমার শেষ দেখা।

রত্না আমার জীবনপথে এসেছিল সুদূরের সুগন্ধ হাওয়ার মতো। তার সৌরভময় অস্তিত্ব অনুভব করে-ছিলাম কিন্তু সে ধরাছোঁয়া দেয়নি। সে অকস্মাৎ অদৃশ্য হল দুর্বোধ রহস্যের মতো। আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম :—

"বিচলিত কেন মাধবী শাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থর থর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর।"

সাত বছর পরের কথা। কর্মস্রোতে বাংলার নানা শহরে ভেসে বেড়িয়েছি। শেষে ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন

হয়ে নিয়ে এসেছেন দেশে পাকা চাকরিতে। সংসারে প্রবেশ করেছি। গৃহিণী ঘরে এসে জেঁকে বসেছেন। এমন সময় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রত্নার একখানা চিঠি পেলাম দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকাবিদ্যালয় থেকে। চিঠিতে লেখাছিল ঃ—

* * *

এতদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হবেন। জীবনে অভাবনীয়েরও একটা স্থান নেই কি? অনেক কষ্টে জেনেছি আপনি এখন স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে লিখতে বসেছি।

যে বছর আপনাদের কাছ থেকে চলে আসি সে বছর আমার আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পরের বছর প্রাইভেটে পাস করি কলকাতায় আমার এক মাসীমার বাড়ী থেকে। দুবছরে যথা সময়ে বি-এটাও পাস করি। তার পর কিছু দিন ছদ্মনামে রেডিওতে গান করতাম আর সংবাদপত্রে 'বৈতারিক'এর সাপ্তাহিক আলোচনা পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। নিউ থিয়েটার্সের সংগে সংশ্লিষ্ট এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আমাকে সিনেমায় টানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে প্রলুব্ধ হলেও অনেক চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত আত্মীয়টিকে নিরাশ করলাম। শুধু তাই নয়, রেডিওর সংস্রবও ত্যাগ না ক'রে পারলাম না। জানিনা কোথা থেকে একটা উচ্চতর আদর্শের প্রেরণা এল। রেডিও সিনেমায় পয়সা ও প্রচার দুইই হয় স্বীকার করি। কিন্তু ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক বাড়ানো আর সকাল সন্ধ্যায় তরুণ তরুণীর আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়াই কি খুব বড় জিনিস? মঞ্চ ও চিত্রের প্রতিষ্ঠা তো ঢেউয়ের মতো—তাতে স্থায়িত্ব কোথায়? তার আনন্দ তো স্ফুলিঙ্গের আনন্দ। আজকের দিনে আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের কঠোরতর কর্তব্য ও গুরুতর দায়িত্ব নেই কি? তাই দীর্ঘ বিবেচনার পর শিক্ষাব্রতীর নিরাভরণ জীবনকে বরণ করাই স্থির ক'রে ফেললাম। গত বছর বি-টি পাস ক'রে এই শিক্ষায়তনে যোগদান করেছি। ইচ্ছা আছে কিছুদিন ছুটি নিয়ে ওয়ার্ধার নূতন শিক্ষা পরিকল্পনার সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় ক'রে আসব।

যে কথা আপনাকে আজও বলা হয় নি—জানিনা তার জন্য ঔৎসুক্য আপনার এখনও আছে কিনা। হয় তো সে দিনের স্মৃতি ঢাকা পড়েছে অনিত্যের আবর্জনার স্তূপে। সাত বছর আগে এক সিক্ত শ্রাবণ সন্ধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি তা ভুলতে পারিনি। আজ সেটা পালন করতে চলেছি নইলে যে অপরাধিনী থেকে যাব। আমার মামীমার বিদ্যার দৌড় বেশী না হলেও কলকাতার শিক্ষিত বংশের মেয়ে ব'লে অহংকার ছিল যথেষ্ট। মামাবাবু মাটির মানুষ—তাঁর কথার উপর কথা কইতেন না। গৃহের শান্তিভঙ্গের ভয়ে মামীমার মাষ্টারি নীরবে সহ্য ক'রে যেতেন। আপনার সংস্পর্শে আমার যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেটা মামীমার ভালো লাগেনি। যে কথা একদিন তিনি স্পষ্ট ক'রে আমাকে বললেন। আমি অত্যন্ত আঘাত পেলাম এবং বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিলাম। পড়াশুনা, গানবাজনা সব গেল থেমে। মামাবাবুর দৃষ্টিতে সহানুভূতি এবং ব্যবহারে বেদনা ফুটে উঠত, কিন্তু মামীমার অন্যায়ের মৃদু প্রতিবাদ করার সাহসও তাঁর দেখা গেলনা। সন্দেহের বিষাক্ত বাতাসে যে অন্তর্দাহ দেখা দিল তাতে শরীর গেল ভেঙে, পালিয়ে এলাম পিসীমার বাড়ী মধুপুরে।

আমি আপনাকে ভুল বুঝিনি এবং বিশ্বাস করি আপনিও আমাকে ভুল বোঝেননি। আপনার সান্নিধ্যে পেয়েছি অনাবিল প্রীতির পরশ। আপনাকে দিয়েছি পেলব প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের সম্পর্কে ছিল না মাটির মালিন্য। ছিল স্বর্গের সুষমা। সে সম্পর্কের গৌরব আজও অমলিন রয়েছে—হয় তো চিরদিন থাকবে। আমি আপনার ব্রত নিয়েছি—আমার পথ গিয়েছে আপনার পথে মিশে। আপনার সংগে দেখা হলে খুবই সুখী হব। পূজার ছুটিতে একবার এদিকে আসবেন কি? জানিনা আজকের 'আপনি' সেদিনের 'আপনি' আছেন কিনা। মানুষের খেয়ালী মন জীবনের গতিকে ছন্দবহুল না ক'রে পারে না। সেদিন আপনাকে যতটুকু জানতাম তারই জোরে আজ এতখানি দাবি ক'রে ফেললাম। যদি অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন।

* * *

রত্নার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর একে একে কেটে গিয়েছে আরও তেরোটি বছর। বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কত জনপদ, অস্তমিত হয়েছে কত শুকতারা। খিড়কি বাগানের আমগাছটা তেমন বড় ফল দেয় না। উত্তরের

ফাঁকা মাঠে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু উপনিবেশ। বাবার আমলের কাকাতুয়াটা পরলোকে। পরিবারের এত পুরানো বন্ধু আর কে আছে? জলংগীতে বন্যা আসে না। তার নিঃস্ব রূপ দেখে কান্না পায়! মরা নদীর কি মাধুরী আছে? যৌবনের কুসুম কানন পিছনে ফেলে প্রৌঢ়ত্বের বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। ছেলেরা বড় হয়েছে। সংসারে নিত্য নূতন সমস্যা। বাড়ীর প্ল্যান নিয়ে এঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টরের অফিসে ছুটাছুটি ক'রেছি। অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। যারা ছিল হৃদয়ের কাছাকাছি, তারা কে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে বিস্মরণের বিজন বনে। এ বয়সে সব মানুষই বোধ হয় এমনই হয়। ক-দিন ধ'রে ঘন বরষা চলেছে। বাইরে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা, অন্তরে অহেতুক বেদনার সুর। অন্যমনস্কভাবে পড়ার ঘরের আলমারির বইগুলো নাড়াচাড়া করছি। একখানা বইয়ের ভিতর পাওয়া গেল রত্নার দিল্লি থেকে লেখা সেই চিঠি। রত্নার চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু তার অনুরোধ রাখতে পারিনি। নিমেষে টুটে গেল বিশ বছরের ব্যবধান—মূর্ত হয়ে উঠল রত্নার সংগে শেষ দেখার দৃশ্য। সেদিন ছিল সজল শ্রাবণ সন্ধ্যা। আজও তাই। জলভরা আকাশের পানে চেয়ে আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। আকাশের রঙ্গশালায় মেঘ, আর পৃথিবীর রঙ্গশালায় মানুষ—এদের কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। এদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই অভাবনীয়। রত্না এখন কোথায় আছে—কেমন আছে—কোন খবরই রাখিনে। হয়তো তার সংগে আবার দেখা হবে—হয়তো হবে না। আজ শুধু তার উদ্দেশে 'মহুয়া'র কয়েকটি ছত্র স্মরণ ক'রে আমার আখ্যায়িকা শেষ করছি:—

"তোমার যা দান তাহা রহিলে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখি জলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতি তলে॥"

ভূদান-যজ্ঞ

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

ভূদান-যজ্ঞ কি? সোজা ও সরল কথায় যে ভূমিহীন দরিদ্র—সে চাষ জানে ও চাষ করতে চায় কিন্তু অন্যের জমি চাষ বা শ্রমিক বৃত্তি ছাড়া যার অন্য কোন জীবিকা নাই—তার জন্য ভূমিদান। ঈশ্বরের দান বায়ু, আলোক ও জল যেমন সকলে সমান ভাবে ভোগ করতে পারে—তাতে যেমন সকলের সমান অধিকার, তেমনি ঈশ্বরের দান ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার। কিন্তু সমাজের বহুদিনব্যাপী অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে সেই ভূমি হ'য়ে গিয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজনের আছে—অন্যজনের নাই। একজনের আছে অত্যধিক—অন্যজনের আছে নিতান্ত কম। তাই বর্তমানে ভারতের সব চাইতে বড় ও জরুরী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ভূমি সমস্যা। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর ভারতের স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করছে। ভারতের কর্ষণযোগ্য ৩০ কোটি একর ভূমির মধ্যে এক ষষ্ঠাংশ ৫ কোটি একর ভূমি যদি ভূমির বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের হাতে এসে যায় তবেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভূমিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। খাদ্য, পরিধেয়, আবাসগৃহ নির্ম্মাণের যাবতীয় দ্রব্যাদি মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক ভূমি-ক্ষুধা। ভূদান-যজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে এই ভূমি-ক্ষুধা তৃপ্ত করবার প্রচেষ্টা। ভূদান যজ্ঞ মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত ভগবানের নিকট আবেদন—"তুমি জাগ্রত হও। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। মানুষের হৃত অধিকার তাকে ফিরিয়ে দাও। ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমি দাও।" এই আবেদনে কি মানুষ সাড়া দেবে? এত বড় বিরাট সমস্যা কি এইভাবে সমাধান করা সম্ভব? ভূদান যজ্ঞের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে এই আশঙ্কা দূর হবে আশা করি।

ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের স্রষ্টা আচার্য্য বিনোবা ভাবে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে থাকতেন। অতঃপর ওয়ার্দ্ধায় ও পরে ওয়ার্দ্ধার নিকটে পাওনার গ্রামে তাঁর পরমধাম আশ্রমে থাকতেন। গত মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত করেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অহিংসা প্রয়োগের পথ অন্বেষণ করছিলেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে হায়দ্রাবাদের নিকটস্থ শিবরাম-পল্লীতে সর্ব্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন ভূমিসমস্যার ব্যাপারে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চল হিংসার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই নিয়ে তিনি অনুক্ষণ ভাবছিলেন। সম্মেলন অন্তে তিনি তেলেঙ্গানা পরিভ্রমণ করছিলেন। সেদিন ১৮ই এপ্রিল। পচমপল্লী নামক এক গ্রামের পরিজনেরা তাঁর কাছে জমি চাইল। আর তিনি সেই হরিজনদের জন্য গ্রামবাসীদের কাছে জমি চাইলেন। ৮০ একর জমির প্রয়োজন ছিল।

একজন গ্রামবাসী তাঁর কথা মেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একশত একর জমি দান করলেন। এই অপ্রত্যাশিত দানে তাঁর মনে ভূদান-যজ্ঞের কল্পনা উদয় হয়। তাঁর নিশ্চিত ধারণা হলো—ভগবান তাঁকে ভারতের ভূমি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তেলেঙ্গনা ভ্রমণে তিনি ভূদান যজ্ঞের প্রয়োগ করেন। দুমাসে বার হাজার একর জমি তিনি পেলেন। তেলেঙ্গানায় জমির মালিকেরা তৎপূর্ব্বে হিংসাবিধ্বস্ত হয়েছিল। তাই সন্দেহের অবকাশ রইলো—অন্য স্থানে যেখানে তেলেঙ্গানার পটভূমিকা নাই সেখানে এইভাবে জমি পাওয়া যাবে কিনা। এ আশঙ্কা নিরসন কল্পে অন্য প্রদেশে ভূদান যজ্ঞের পরীক্ষা করার আবশ্যকতা ছিল। সেই সুযোগও বিনোবাজী পেলেন। সে বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে দিল্লী যেতে হয়েছিল। তিনি পদব্রজে চললেন—সেখানে পৌঁছতে দুমাস লাগলো। পথে ভূদান যজ্ঞের জন্য ভূমি চাইতে চাইতে গেলেন। এই দুমাসে ১৮ হাজার একর ভূমি পেলেন। তার পরে তিনি উত্তর প্রদেশের ব্যাপকক্ষেত্রে ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত করলেন। ১০ মাসে সেখানে তিনি প্রায় চার লক্ষ একর ভূমি পেলেন। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তপ্রদেশের সেবাপুরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত সর্ব্বোদয় সম্মেলনে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সারা ভারতব্যাপী করবার এবং প্রথম কিস্তি স্বরূপ দু বৎসরে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হলো। প্রতি প্রদেশে একটী করে ভূদান যজ্ঞ কমিটী গঠন করা হলো ও সকল প্রদেশেই ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন সুরু হলো। গত ১৪ই সেপ্টেম্বরে বিনোবাজী যুক্তপ্রদেশ হতে বিহারে প্রবেশ করেছেন। বিহারের ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিহার ত্যাগ করবেন না—এই সঙ্কল্প তিনি নিয়েছেন। বিহারের চাণ্ডিলে এবৎসর সর্ব্বোদয় সম্মেলন হলো। সেখানে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে যে, ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত সারা ভারতে ৫ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ করা হবে। এযাবৎ যুক্তপ্রদেশে পৌণে পাঁচ লক্ষ একর, বিহারে সাড়ে পাঁচ লক্ষ একর এবং অন্যান্য সকল প্রদেশে সওয়া একলক্ষ একর—একুনে সারা ভারতে সাড়ে এগার লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া তিনখানি সমগ্র গ্রামও পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ গ্রামের লোকেরা তাদের সমস্ত ভূমি ভূদান যজ্ঞে দান করেছেন—যুক্তপ্রদেশের মঙ্গরোট, বিহারের সিয়ার্ডিহি এবং উড়িষ্যার মানপুর। এই সন্ন্যাসী পরিব্রাজক পদব্রজেই বরাবর ভ্রমণ করছেন—এযাবৎ পাঁচ হাজার মাইল অতিক্রম করেছেন।

ভূমি দান নূতন নয়। এতদিন লোকে ভূমিদান করে এসেছে ব্রাহ্মণকে, মন্দিরকে, মসজিদকে বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। উদ্দেশ্য—পুণ্য সঞ্চয় বা সম্পত্তি সংরক্ষা। ভূমির স্বামিত্ব বিসর্জ্জনের জন্য তথা ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান জগতে এই প্রথম। এ দানের কল্পনা পরোপকার নয়—এ দানের কল্পনা—'দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়' নীতি পালন নয়। এ দানের অর্থ—ভূমির সঙ্গতবণ্টন। 'দানং সংবিভাগঃ' অর্থাৎ সম্যক বিভাজন (সঙ্গত বণ্টন)। তাই ভূমিহীন দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে এই দানের জন্য আবেদন।

অন্যের সুখ সম্পাদনের জন্য মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি বিদ্যমান। কিন্তু তার গণ্ডী সাধারণতঃ নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূদান যজ্ঞের উদ্দেশ্য পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করা—প্রেম ও ত্যাগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। গ্রামকে—সারা সমাজকে নিজের পরিবার বলে গণ্য করতে হবে। ভূমিহীন দরিদ্রকে নিজের ষষ্ঠ সন্তান বলে গ্রহণ করতে হবে। সবই ভূমি ভগবানের (সবভূমী-ভূমি গোপালকী) অর্থাৎ ভূমি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—এই বোধ সমাজের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জাগ্রত করতে হবে। এই বিচার বিপ্লব—এই চিন্তা বিপ্লব সমাজে সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের আত্মার শক্তি—মানুষের আত্মত্যাগের শক্তি অপরিসীম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে তা সুপ্ত। কি ভাবে তা জাগ্রত হয়ে কার্য্যকরী হবে? তার উপর ভূ-দান যজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করছে।

আমাদের মধ্যে যখন এমন মানুষের আবির্ভাব হয়, অন্যের সুখ বিধানের জন্য আত্ম ত্যাগ ভিন্ন যাঁর জীবনে আর কিছু নাই, যাঁর প্রেম সর্ব্বব্যাপী হয়েছে তাঁর আহ্বানে—তাঁর দর্শনে আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ত্যাগ প্রবৃত্তি—সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়—আমাদের মধ্যে নির্ব্বাপিত আলো প্রজ্বলিত হয়। হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ তখন বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। এমন একজন মানুষ সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন—তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। এখন বিনোবাজীতে অনুরূপ বিভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। তাই লোকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাড়ে এগার লক্ষ একর ভূমি তাঁর হাতে প্রেম ভরে সঁপে দিয়েছে। সর্ব্ব শ্রেণী, সব স্তরের লোক দিয়েছে। আমাদের সমস্যার তুলনায় এ অল্প হলেও এই অল্প সময়ে এই পরিমাণ ভূমিপ্রাপ্তিতে আশ্চর্য্য বোধ হবার কথা।

সমাজে দারিদ্র্য তথা ধন বৈষম্যের উৎপত্তির মূল কোথায়? উৎপাদনের ক্ষেত্র ও উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিকত্ব যখন উৎপাদক চাষী ও উৎপাদক শিল্পীর হাত হতে অনুৎপাদক ধনিকের হাতে চলে যায় তখনই শোষণ ও দারিদ্র্যের সূত্রপাত হয়। তাই শোষণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায়—উৎপাদনের মৌলিক ক্ষেত্র ভূমিকে শ্রমিক চাষীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের সম্পদের মালিকত্ব উৎপাদক শ্রমিককে প্রত্যর্পণ করা। তার অর্থ ভূমির সম বণ্টন ও শিল্পের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন। তাই ভূ-দান যজ্ঞ অহিংস সমাজ-রচনার প্রথম পদক্ষেপ।

এ কথা সত্য যে ভূ দান যজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য হিংস্র বিপ্লব নিবারণ করা। কিন্তু যদি হিংস্র বিপ্লব ঠেকানই ভূ-দান যজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য হতো, তাহলে তা কাপুরুষতার সামিল হতো। ভূ-দান যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজে অহিংস বিপ্লব সাধন করা। এ বিপ্লব মাত্র বাহ্য নয়। এ বাহ্য ও আন্তরিক দুই-ই। অন্তরে চিন্তা-বিপ্লব ও বিচার-বিপ্লব সব ভূমি গোপালের বা সমাজের। মাত্র উৎপাদকেরই ভূমিতে অধিকার - অন্যের নয়। তাই অনুৎপাদককে বিচার বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তার কৃত অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে ভূমির স্বামীত্ব বিসর্জন দিতে হবে। এই বোধ সার্ব্বজনীন ভাবে জাগ্রত হবে। বাহ্যতঃ তাহাই কার্য্যে সাধিত হবে। হিংস্র বিপ্লবের চাইতে এ যে কত মহান তা সহজেই অনুমেয়।

ভূ-দান যজ্ঞ ভূমি বণ্টনের জন্য আইন প্রণয়নে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। বরং তা সমাজে চিন্তা বিপ্লব সাধন করে আবশ্যকীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হবে। কিন্তু ভূ-দান যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য দণ্ড শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র শক্তি নিরপেক্ষ অহিংস জন-শক্তি নির্ম্মাণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্ট করা। তাই ভূদান যজ্ঞ গ্রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধন স্বরূপ।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[গত এক বৎসর যাবৎ "ভারতবর্ষে" এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা শরৎ-চন্দ্রের বহু চিঠিপত্র আমার হাতে আসে। এই সব চিঠি থেকে শরৎ চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। এই সময়ে আমি ব্যাপকভাবে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংগ্রহে মন দিই। ফলে, কারও কারও চিঠি রক্ষা করার অভ্যাস না থাকায় শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠি নষ্ট হয়ে গেলেও, বহুলোককে লেখা শরৎচন্দ্রের অসংখ্য চিঠি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

এই সব সংগৃহীত চিঠির মধ্যে কিছু চিঠি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকাদিতে কাশিত হয়েছে, কিন্তু বহু চিঠি আজও অপ্রকাশিত রয়েছে। বিভিন্ন ত্রিকাদিতে প্রকাশিত এবং এই অপ্রকাশিত চিঠিগুলি নিয়ে "শরৎচন্দ্রের ঠিপত্র" নাম দিয়ে একটি সম্পূর্ণ পত্র-সংকলন গ্রন্থ বার করতে মনস্থ রেছি। ভারতবর্ষে বর্তমান সংখ্যা থেকেই কয়েক মাস শরৎচন্দ্রের কিছু প্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। সাধারণের বুঝবার সুবিধার ন্ত প্রত্যেক চিঠির সঙ্গে চিঠির পরিচিতি হিসাবে যথাসম্ভব পাদটীকাও ওয়া থাকবে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের একখানি প্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করা গেল। পাঠক-পাঠিকাদের বোঝবার বিধা এবং কৌতূহল মেটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পেয়ে রৎচন্দ্র এই চিঠিখানি লিখেছিলেন, আবার রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এই ঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই দুখানি চিঠিও বিশেষ ক'রে এই সঙ্গে ছাপা হ'ল। সবকখানি চিঠিরই একটা বিশেষ াহিত্য-মূল্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিখানি খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীনন্দদুলাল চৌধরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দু'খানি প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বাধিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দু'খানির নকল (রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা প্রায় সমস্ত চিঠিরই নকল থাকত) বিশ্ব-ভারতীতে রবীন্দ্র মিউজিয়ামে রয়েছে, আর মূল চিঠি দু'খানি আছে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে। শরৎচন্দ্র, তাঁকে লেখা রবীন্দ্র-নাথের কয়েকটি চিঠি উমাপ্রসাদবাবুকে রাখতে দিয়েছিলেন। উমাপ্রসাদ-বাবু সেই চিঠিগুলি যত্নসহকারেই রেখে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দু'টির নকল ১৩৫৬ সালের কার্তিক—পৌষ সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এখানে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠি দু'টি শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে রক্ষিত মূল চিঠি থেকেই নেওয়া।]

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র তাঁর "দেনা-পাওনা" উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন। নাটকে রূপান্তরিত হ'লে তখন "দেনা-পাওনা"র নাম হয় "ষোড়শী।" এই বছরই আগষ্ট মাসে ষোড়শী প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৪ সালের ২১শে শ্রাবণ নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক "নাট্য-মন্দির" রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ষোড়শী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে শরৎচন্দ্র একখানি ষোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ ষোড়শী প'ড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার ষোড়শী পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চল্‌লে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নিম্নের চিঠি খানি লেখেন —

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা কোরে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যেও বরঞ্চ টিঁকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর

মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উদ্ভব কালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ, সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয়ত, অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে,—তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি,—কিন্তু তবুও মন খুসি হয় না, অথচ এরা বলে এই ত সাহিত্য।

যোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকুই বুঝেচি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিষ বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্ত্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোন নির্দ্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্ত্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেলো তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে এই হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্ব্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু'একটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা, না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেচেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।" আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলো মেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে

পারি নে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জ্জনা করবেন। ইতি—২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আবার এই চিঠিখানি লেখেন—

ওঁ

কলকাতা

কল্যাণীয়েষু—

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্ত্তমানের ভোগ বর্ত্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য-সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্ত্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্ত্যলোকে এসেচে তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে সাপ্তাহিকে সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর—বাঁশে বাঁখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ "উপস্থিত কালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার।" সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্ত্তমানকালের একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এই ফরমাস এড়িয়ে চলা এখানকার কালে একটা বিষম সমস্যা—এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্চে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপাণি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে, বৃহৎ দেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক্ সই করেছিল আধুনিকালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথাকাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে—এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্ত্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে আমার ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এতবড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে perspectiveএর কথা বলেছি সে হচ্চে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লিগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা-কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি ১১ই মার্চ্চ ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

কবি সত্যই তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"পুলিশের কর্ম্মচারী শিখরের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমার চোখের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় অশোভন রূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চোখের দিকে চেয়ে শিখর মৃদু হেসে বললে—"অমন করে' দেখছিস কি ?"

"তোকে! তুই যে শেষটা পুলিশের লোক হয়ে উঠবি তা ভাবতেই পারি নি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে সত্যি"

শিখর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। সেই কয়েক সেকেণ্ডেই আমি তাকে আবার ফিরে পেলাম যেন, সেই কিশোর শিখরকে, যার চোখের চাহনিতে অবাক বিস্ময় আভাসিত হ'ত মাঝে মাঝে, মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে সহসা স্বপ্নলোকে পাড়ি দিতে পারত যে এক নিমেষে। আবার ফিরে আসত, মুখে অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠত, মুচকি হেসে আড়চোখে চেয়ে দেখত তার এই আকস্মিক স্বপ্ন-প্রয়াণ আমরা লক্ষ্য করেছি কি না।

আমার কথার উত্তরে সে হেসে বললে, "বাইরে হয়তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আমি বদলাই নি। যা ছিলাম ঠিক তাই আছি—"

"আমাদের কারবার বাইরেটা নিয়েই। সেইটে বদলেছে বলেই অদ্ভুত লাগছে। তোর ভিতরের একটা খবর অবশ্য পেয়েছিলাম—"

কথাটা শেষ করলাম মুচকি হেসে।

"সে খবরটাও অবশ্য খবর কিন্তু আসল খবর নয়"

"আসল খবরটা কি তাহলে"

"আসল খবর আমি উৎসুক, আমি কৌতূহলী!—"

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল সে।

"ওরে বাবা, ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠেছিস দেখছি। পুলিশের কোন ডিপার্টমেণ্টে তুই আছিস"

"আই. বি."

"আমাদের অঞ্চলে আগমন কোনও ফেরারীর উদ্দেশ্যে না কি"

"একটা কালোবাজারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি"

আমার বাসার সামনে যে বিরাট বোর্ডিং হাউসটা ছিল সেইটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "আমার পরিচয় কিন্তু কাউকে বোলো না যেন। আমাকে যে চেন তা-ও প্রকাশ কোরো না কারো কাছে। ওই বোর্ডিংয়ের তিনতলায় একটা রুম নিয়ে আমি থাকব ভাবছি। এখানে আমার নাম হবে—এস. কে. দাস, হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট। যদি আমাকে কোনও কারণে প্রয়োজন হয় ওই নামেই আমার খোঁজ কোরো। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায়" কত সামান্য কারণে মানুষের মনে আঘাত লাগে। শিখরের এই কথায় কেমন যেন আহত হলাম একটু। মনে হল যেন ওর কথায় একটা পুলিশী মনোভাব ব্যক্ত হল, একটা আদেশ যেন অনুরোধের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যাপারটা ভাল করে' বিশ্লেষণ করে' এখন বুঝছি ওটা মজ্জাগত ঈর্ষ্যারই একটা ছদ্মবেশ। শিখর যে জীবনে উন্নতি করেছে সহসা সেটা আবিষ্কার করে' আমার অনুন্নত সত্তাটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেদনাতুর করেছিল মনকে, শিখরের ব্যবহারে কোন দোষ ছিল না।

···দিন কয়েক পরেই দেখলাম ত্রিতলের একটি ঘরে শিখর এসে আড্ডা গেড়েছে। শিখরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না আমার, দূর থেকেই আমি তার গতিবিধির সব খবর রাখতাম। আমার কাছে দূরবীন্ ছিল।···

...ভক্ত যেমন নিয়মিত ভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করে আমি ঠিক তেমনি ভাবে রোজ দেখতাম আলেয়াকে। ওটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখনই হাতে কাজ থাকত না তখনই আমি দূরবীনটি নিয়ে জানলার কাছে বসতাম। এমন ভাবে বসতাম যাতে আশপাশের বাড়িতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে। আমি যে দূরবীন নিয়ে জানলার ধারে বসে আছি তা দেখতেই পেত না কেউ বাইরে থেকে। জানলার কপাট দুটো প্রায় বন্ধ থাকত, সামান্য একটু ফাঁক রাখতাম দূরবীনটির জন্য শুধু। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিছু। আলেয়াকে অবশ্য রোজ দেখতে পেতাম না। এমন অনেক দিন গেছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দেখতে পাই নি। এর ফাঁকে ফাঁকে শিখর সেনকেও দেখতাম। দিনের বেলা প্রায়ই দেখা যেত না তাকে। প্রায়ই চোখে পড়ত তালা ঝুলছে তার ঘরের সামনে। একদিন দেখতে পেলাম দোতলার একটা কোণের ঘর থেকে ছিমছাম ফিটফাট একটি মেয়ে বেরুচ্ছে। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, তার চোখে মুখে এমন একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পরদাপ্রথা উঠে গেছে আজকাল। পথে ঘাটে আজকাল অনেক রূপসী দেখা যায়, মনে হয় চেষ্টা করলে তাদের নাগালও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় ও যেন উল্কা, ওকে কোনও দিন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গটগট করে' নেবে এল দেখলাম। তারপরই দেখতে পেলাম বেশ দামী একটা মোটর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে এসে চড়তেই গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরুল সেই ঘরের বন্ধদ্বারের উপর দূরবীক্ষনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তার পর। দেখলাম দ্বারের পাশেই একটা নাম লেখা প্লেট, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিস এ. মুখার্জি—নার্স। এই এ মুখার্জি যে অবন্ধনা মুখার্জি তা কল্পনা করতে পারি নি। পারলে যে আনন্দ আমি সে কদিন উপভোগ করেছিলাম তার তীব্রতাটা যে অনেক কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করেছিলাম যে শিখর মেয়েটির সঙ্গে বেশ মেলামেশা শুরু করেছে। রাত্রে প্রায় ওর ঘরে গিয়ে বসে, অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করে দু'জনে। দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। একনিষ্ঠ প্রেমিক শিখরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে' মনে মনে বড় কুণ্ঠিত ছিলাম আমি। মনে হত বিয়ে করে' আমি যেন অনেক নেমে গেছি, আলেয়ার প্রতি অবিচার করেছি। প্রেমের জন্য গৃহত্যাগী শিখরের একনিষ্ঠতার কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করত, পীড়িতও করত। সেই শিখরকে এখন নিজের দলে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল সত্যি। মিস এ. মুখার্জি যে অবন্ধনা এ খবর পেলে আমার আনন্দ অনেকটা কমে' যেত। অবন্ধনাকে আমি চিনতে পারি নি, কারণ তাকে আমি দেখি নি কখনও। এই বোর্ডিংএ শিখরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটা আমি জেনেছি অনেক পরে। তার ডায়েরি থেকে, চন্দ্রমোহন যে ডায়েরি দিয়েছিল সে ডায়েরি থেকে নয়। এই দ্বিতীয় ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম উমেশ মামার কাছ থেকে। উমেশ মামা শিখর সেনের সহকর্ম্মী, তিনিই তার জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই ডায়েরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ডায়েরি থেকে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি।

"দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে আমাদের দেশের দার্শনিক সমাজে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন অমোঘ দৈবের কাছে পুরুষকার নিষ্প্রভ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়, শত চেষ্টা করেও মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করতে পারে না। আর একদলের মতে যা আমরা দৈব বলে' মনে করি তা আমাদের কল্পনা বিলাস মাত্র, পুরুষকার দ্বারাই মানুষ নিজের ভাগ্য গঠন করে। আমরা যে অপ্রত্যাশিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি তার কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না সত্য। কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, এর জন্যে একটা কাল্পনিক দৈবশক্তিকে খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার সুখদুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার পুরুষকারেরও ফলাফল নয়, আরও অনেকের কর্ম্মধারা আমার সুখদুঃখকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ আরও অনেক লোকের পুরুষকার আমার পুরুষকারকে কখনও আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার অজ্ঞাতসারে সফল বা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের অপ্রত্যাশিত সুখদুঃখের এ-ও একটা কারণ। এর

জন্যে দৈব নামক একটা অযৌক্তিক ব্যাপারকে আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তৃতীয় আর একদল বলেন পুরুষকারই সব। এজন্যে সেটা আমরা দৈব বলে' মনে করছি সেটা পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারের ফল। বীজ বপন করবামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফলফুল শোভিত গাছ জন্মে না, তেমনি কোনও সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরজন্ম পর্য্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এইটেকেই আমরা দৈব বলে' মনে করি।

উপরোক্ত তত্ব আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে' বিস্ময়ে কল্পনায় অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনাকে আমি ভালো বেসেছিলাম, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে, কিন্তু সে ভালবাসার যথার্থ মূল্য দেবার শক্তি ছিল না আমার। নির্য্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল আমি সভয়ে সরে' দাঁড়িয়েছিলাম। বীর্য্যবান প্রেমিকের মতো তাকে বলতে পারি নি—ভয় নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তুমি। তাই সে চলে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার ভীরুতার ফলভোগ করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আগুনে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আমি যে তাকে চেয়েছিলাম, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম—তার ফল কি এতদিনে ফলল? সেটাকে দৈবাৎ বলে' মনে হচ্ছে সেটা কি আমার পুরুষকারেরই ফল!

গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘুষ খেয়ে অনেক অন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা তাঁকে ঘুষ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন না কি এই বোর্ডিংয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। তাঁরই গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখানে এসে বাসা বেধেছি আমি। এখানে অবন্ধনার দেখা পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল। তিনতলায় একটা ঘরে আছি আমি। স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে দোতলার একটা ঘরে অবন্ধনা আছে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে। আমি নাবছিলাম, সে উঠছিল। আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। সেই দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। "শিখরদা! তুমি এখানে হঠাৎ?"

"অবু?"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যে অবন্ধনাকে চিনতাম এ ঠিক সে নয়। এর শাড়ির পারিপাট্যে, ফাঁপানো চুলের কায়দায়, এর গালের রঙে, চোখের কাজলে, এর ভ্যানিটি ব্যাগে আর সৌখীন স্যাণ্ডালে যে পরিচয় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত দামাল সেই কিশোরী অবন্ধনার কোনও মিল নেই। কিন্তু অমিলটাই আমাকে যেন পুলকিত করে' তুলেছিল ক্ষণিকের জন্য। মনে হয়েছিল সেই পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত মেয়েটা আমার নাগালের বাইরে ছিল, এই কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব হবে না। ওর পোষাক পরিচ্ছদে, ওর প্রসাধনে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ আভাসিত হচ্ছে যেন! তখন বুঝতে পারি নি যে অবন্ধনা চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার প্রশ্নে একটা শাণিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবন্ধনার চোখে।
"হ্যাঁ, আমি অবু। ঠিক অবু নই, মিস. এ. মুখার্জি"

"কি রকম?"

"তুমি এখানে এলে কি করে!"

"আমি তেতলার একটা ঘরে থাকি যে"

অবন্ধনা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল ক্ষণকাল।

"এই বোর্ডিং এর তেতলার ঘরে?"

"হ্যা—"

"কোন নম্বরে"

"বাইশ। সমস্ত ঘরটাই আমি নিয়েছি"

"কোলকাতায় কি করছ"

"চাকরি। তুমি কি করছ এখানে"

"আমিও এখানে থাকি। দোতলায় সাত নম্বরে। একেবারে কোণের ঘরটা—"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি এখানে কেন—"

"আমি নার্স হয়েছি। মিডওয়াইফারিতে প্র্যাকটিস করি।"

"ও। তা এই বোর্ডিংএ কেন।

"অন্য কোথাও ভাল বাসা পাই নি। এখানে ভালই আছি। তুমি ক'দিন এসেছ এখানে?"

"পরশু"

"কি করছ এখানে"

"চাকরি"

"কি চাকরি"

আমি যে পুলিশের লোক তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। বললাম, "মার্চেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করি"

"আমার ঘরে যাবে? এস না"

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল এখন ওর সঙ্গে ওর ঘরে গেলে ছদ্ম আবরণটা খুলে পড়বে। নিজেকে সামলাতে পারব না হয় তো।

"একটু দরকারি কাজে বেরুচ্ছি। পরে আসব এখন। দোতলায় সাত নম্বর তো?"

"সন্ধের পর এস তাহলে"

"আচ্ছা—"

ক্রমশঃ

খাদি আন্দোলন

আপ্পা সাহেব সহস্র বুদ্ধে

চরকা সঙ্ঘ এ যাবত খাদি উৎপাদন, বিক্রয়, বস্ত্র স্বাবলম্বী সৃষ্টি করা এবং খাদি উৎপাদনের প্রক্রিয়া শিক্ষাদান-আদি কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে খাদির মূলীভূত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া চরকা সঙ্ঘ মনে করে।

খাদি আজ এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে খাদির বিক্রয় হ্রাস পাইতেছে। খাদি উৎপাদনের পুঁজি ইহার ফলে আটক পড়িয়াছে এবং খাদি উৎপাদনে নিযুক্ত কারিগরদের পারিশ্রমিক পাওয়া বন্ধ হইয়াছে। বিগত ছয় মাসকাল যাবত খাদির কাটতি হ্রাস পাওয়ায় কোন কোন কেন্দ্রে খাদি উৎপাদনের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এই ভাবে উৎপাদন হ্রাস করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে প্রায় ষাট লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের খাদি দেশে জমিয়া গিয়াছে। উৎপাদন হ্রাস না করিলে মজুদ খাদির মূল্য ইহার দ্বিগুণ বা ততোধিক হইত।

অথচ গত বৎসরের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। যে সময় দেশের শাসনকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত পদস্থ নেতৃবৃন্দ চরকা সঙ্ঘ এবং দেশবাসীর নিকট বার বার খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কথা বলেন। তদনুসারে খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে খাদির কাটতি কি ভাবে হয়, এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে খাদি উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত কারিগরদের কাজ দিবার সমস্যাও আছে। কোন কোন খাদি উৎপাদন ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থা পরিদৃষ্ট হইলেও খাদির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। তামিলনাদ এবং কেরল অঞ্চলের অবস্থা এইরূপ যে চরখা সঙ্ঘ ঐ সকল অঞ্চলে বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার খাদি উৎপাদন করে এবং গত বৎসর মাদ্রাজ সরকার দ্বারা উৎপন্ন খাদির মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু খাদির বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় চরখা সঙ্ঘ এবং সরকার, উভয়কেই উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিতে হয়। কোন কোন এলাকায় সাড়ে তিন আনা হইতে চার আনা দামের সূতার গুণ্ডি (৮৫০ গজ) ছয় পয়সা দাম দিয়া ক্রয় করিবার লোক নাই। বিহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আশি হাজার কাটুনী বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বিহার খাদি সমিতিকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন কর্মীকে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে।

অতীতে খাদির চাহিদা হ্রাস পাইলে ফেরী করিয়া, খাদির হুণ্ডি বিক্রয় করিয়া এবং বিশেষ কমিশন আদি দিয়া অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। আজও সে সকল উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই সকল উপায় দ্বারা আমরা কি সমস্যার মূলে পৌঁছাইতে পারিব? বস্তুতঃ দেশে বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্বের তীব্র প্রকোপ দেখিয়া মনে হয় যে খাদির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সুতরাং বর্ত্তমানে মজুদ খাদি কোন রকমে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। খাদির উৎপাদন যতই বাড়ান হউক, তাহার কাটতি হইতে পারে। সুতরাং প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান আবিষ্কার করা। গ্রামবাসীদের গ্রামাবলম্বনের দিকে অগ্রসর করিয়া ইহার সমাধান সম্ভব। অতএব খাদি আন্দোলনের মারফত গ্রামবাসীদের এই নীতি বোঝান প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

কর্মিগণ কাটুনীদের প্রতিনিধি হইয়া এযাবত চরখা সঙ্ঘের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। কর্মীরা দেশের দূরতম গ্রামে উপস্থিত হইয়া দারিদ্র্য-পীড়িত কাটুনীদের নিকট হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া তাহার বুনাইএর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য পাওয়া ছাড়া এ কার্য্যের ফলে কাটুনীদের নিজেদের মধ্যে কোন রকম সংগঠন হয় নাই বা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার আগ্রহ অথবা বিশ্বাস ও তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই। অবস্থা এতই শোচনীয় যে আজ সহস্র সহস্র কাটুনীর জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের তরফ হইতে কোনরূপ আন্দোলন বা সাড়া শব্দ নাই।

বিশালায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরীর ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া মাত্র শ্রমিক সঙ্ঘগুলির তরফ হইতে আন্দোলন সৃষ্ট হয় এবং সরকারও তাদের দাবী সম্বন্ধে সদা জাগ্রতশীল ও সচেতন থাকেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু স্বল্পতম মজুরী রোজগারকারী লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির উদরান্নের সংস্থান আজ নষ্ট হইতেছে। ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে এ বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্ব চরখা সঙ্ঘ অনুভব করিতেছে। গ্রামস্বাবলম্বনের আদর্শ যদি গ্রামবাসীদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য মনে হয়; শুধু তাহা হইলেই তাহারা, "প্রত্যেকের জন্য গ্রামেই কর্মের সংস্থান হওয়া প্রয়োজন"—এই রূপ দাবী জানাইতে পারিবেন। নিজ গ্রামে উৎপন্ন পণ্যই আমাদের সদা সর্বদা ব্যবহার করা উচিত এই আদর্শ যদি আমরা গ্রামেগ্রামে প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে কাটুনীদের পক্ষে সদাসর্বদা কাজ পাওয়া সম্ভব হইবে। এই অবস্থায় কোন গ্রামে উৎপন্ন খাদি সেই গ্রামেই বিক্রয় করা হইবে। এই আদর্শকে কার্যান্বিত করিবার জন্য অতঃপর গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সংগঠিত হইয়া মিলজাত বস্ত্র এবং সহরে নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যের বহিষ্কার করার কথা বিবেচনা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব চরখা সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মিদের ঐ সব কাটুনীদের ঘরে ঘরে যাইয়া এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া এই আদর্শের প্রচার করিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। সরকার কর্তৃক "নিখিল ভারত খাদি বোর্ড" স্থাপনা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। খাদি উৎপাদন কার্যে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার কথাও সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু চরখা সঙ্ঘের বক্তব্য হইতেছে এই যে দেশের বেকার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বোর্ডের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সরকারকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি পালন করিতে হইবে :—

(১) কাটুনীরা প্রথমতঃ নিজ পরিবারের প্রয়োজন পূর্ত্তির জন্য সূতা কাটিবে এবং ইহার উপরন্তু তাহারা যত সূতা আনিবে, তাহা ক্রয় করিবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাহায্য দানের দৃষ্টিতে কাটুনীদের সমস্ত সূতা ক্রয় করিবার দায়িত্বও সরকারের উপর পড়িতে পারে। সরকার তাহাদের অন্য কোন কাজ দিতে সমর্থ না হইলে এই বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে।

(২) আমাদের মতে ইহার জন্য কোন না কোন উপায়ে মিলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন দেখা দিবে এবং সরকারকে ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) জাতীয় বেশরূপে যাহাতে খাদি সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, সরকারকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যাহাতে খাদিই হয়, সরকারকে তজ্জন্য নির্দ্দেশ জারী করিতে হইবে।

৪। খাদির আসল লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করিয়া খাদির সাথে সাথে অন্যান্য কুটীর শিল্পকেও সরকারী সংরক্ষণ দিতে হইবে। নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ যাহাতে কুটীর শিল্পজাত হয় সরকার তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।

উপরিউক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করার ভার যে সরকারের উপর পড়ে এ কথা আমাদের প্রচার করিতে হইবে। তবে শুধু সরকারের পক্ষে একা দেশের ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, এ সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামবাসীদের মনে গ্রাম স্বাবলম্বনের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া দরকার এবং গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও যে গ্রামবাসীদের এ ধারণা ও তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য গ্রামবাসীদের সর্ব্ববিধ উপায়ে প্রযত্ন করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই গ্রামে উৎপন্ন প্রত্যেকটি কুটীর শিল্পজাত পণ্যের কাটতি গ্রামেই হইবে ও গ্রামবাসীর প্রয়োজন পূর্ত্তির পর উদ্বৃত্ত দ্রব্য অন্যত্র প্রেরণের প্রশ্ন উঠিবে। এই ভাবে কাজ করিলে গ্রামবাসীর সংগঠনী শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং সরকার সহজে পূর্ব্বোক্ত দায়িত্ব পালন করার শক্তি খুঁজিয়া পাইবেন। সে অবস্থাতেও সরকার যদি কোন কারণে এ কাজ করিতে অনিচ্ছুক হন তবে জনসাধারণের সংগঠনী শক্তি যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অবশেষে সরকারকে নতিস্বীকার করিতে হইবে।

চরখা সঙ্ঘের খাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে গ্রামে গ্রামে এই আদর্শ প্রচার করা। ঘরে ঘরে যাইয়া খাদির উপরিউক্ত বার্ত্তা প্রচার, খাদি বস্ত্র বিক্রয়, গ্রাম সংগঠন এবং গ্রাম স্বাবলম্বনের জন্য গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজন আজ তীব্র ভাবে অনুভূত হইতেছে। এ যাবত গ্রামে উৎপন্ন খাদি সহরে বিক্রয় হইত। ভবিষ্যতেও কিছু খাদি সহরে বিক্রয় করিতে হইবে। এতদসত্ত্বেও যদি ব্যাপক ভাবে দেশে খাদি উৎপন্ন করা আমাদের লক্ষ্য হয় তবে মূলতঃ বস্ত্র স্বাবলম্বনের জন্যই খাদি উৎপন্ন করিতে হইবে এবং গ্রামবাসীদেরও গ্রামস্বাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। চরখা সঙ্ঘ যদি খাদি আন্দোলন দ্বারা এই কাজ করিতে সক্ষম হয় তবে গ্রামস্বাবলম্বনের নীতির ভিত্তিতে গ্রামরাজ্য স্থাপন করার যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত হইবে। ভূদান যজ্ঞের আন্দোলন ও স্বভাবতই ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কারণ গ্রামে যদি সকলকে কাজ দিতে হয় এবং গ্রামস্বাবলম্বন করিতে হয় তবে জমির পুনর্বণ্টন হওয়া অতীব প্রয়োজন। ভূমির পুনর্বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে যেপ্রত্যেক গ্রামবাসীকে পুরা কাজ দিবার দায়িত্বও তাঁহাদের লইতে হইবে। এই দুই নীতি গ্রামকে স্বাবলম্বনের লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে চরখা সঙ্ঘ খাদি আন্দোলন দ্বারা গ্রামে এই ভাবে কাজ করিতে অভিলাষী।

তামিলনাদ এবং কেরল প্রদেশে চরখা সঙ্ঘের তরফ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাদির কার্য্য চলে। সেখানকার অবস্থা বিশেষ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য এই আন্দোলনের সূচনা ঐ এলাকাতেই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও যথাসাধ্য এই আন্দোলনে চালান হইবে। এই বৎসরের চরখা জয়ন্তীর প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আন্দোলন শুরু হইবে। *

---

* মূল হিন্দি হইতে শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত

বাংলা ও বাঙালী সমাজ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

এতোবড় দুর্বিপাক আর দুর্দিন বাঙালী জাতির জীবনে এর পূর্বে কোনো দিন আসেনি। কোনো দিন এমন দুর্ভাগ্যের কল্পনাও করেনি বাঙালী। স্মরণীয় কালের মধ্যে বাঙালী সমাজকে এমন ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হ'য়ে জীবন সংগ্রামে কখনো অবতীর্ণ হ'তে হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হয়েছে—কতো নব নব রাজশক্তির উত্থান পতন ঘটেছে—ধর্মবিপ্লবের কতো ভয়াবহ ঝড় ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে এই বাংলার বক্ষস্থল মথিত মর্দিত ক'রে; কিন্তু তথাপি বাঙালী জাতিকে ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি কেউ - কোনো শক্তিই একে দ্বিধা বিভক্ত করতে সমর্থ হয়নি। বাঙালীর অনেকেই অবস্থার চাপে বাধ্য হ'য়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে—হিন্দু, বৌদ্ধ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে- কিন্তু সামাজিক জীবনে নানাবিধ বাধা নিষেধ আর প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা করেও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে এবং পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে বাঙালী বাঙালীয়ানার ধারা যথাযথ বজায় রাখার প্রয়াস পেয়ে এসেছে। আপন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে মন্থর জীবনধারা প্রতিবাহিত করেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এই বিবর্তনশীল জীবনায় বাঙালীর জাতীয় জীবনেও অতি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেদিন। এই বাঙালী হিন্দু মুসলমান সেদিন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল—হয়েছিল তাদেরই জাতীয়তাবোধ-শক্তিহীন স্বার্থান্ধ এবং চরিত্রহীন কতিপয় অভিজাত নেতার বিশ্বাসঘাতকতায়। সেদিন বাঙালী অতি অসহায়ভাবে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়েছিল বৃটিশ রাজশক্তির সামনে।

ভারতের ইতিহাসে, বাংলার ইতিহাসে সে এক কলঙ্কময় অধ্যায়—এক অভূতপূর্ব ঘটনা! যার পরিণতি বাংলার বুকে, গোটা ভারতের বুকে গভীর রেখাপাত ক'রে গেল। এতে শুধু রাজশক্তির পরিবর্তনই ঘটলো না, সমগ্র সমাজ-জীবনের ওপর এলো প্রচণ্ডতর আঘাত। বাংলার হিন্দু-মুসলমান যখন নিজেদের আচার-ধর্ম আর রক্ষণশীলতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ—যখন অতীত শতাব্দীর গতানুগতিক অভ্যস্ত চিন্তায় মশগুল, ঠিক সেই সময় মহাসাগরের বিপুল তরঙ্গের মতো ধেয়ে এলো য়ুরোপের বেগবান নতুন সভ্যতা। আছড়ে পড়লো বাংলার স্বচ্ছন্দগতি সমাজ-জীবনের ওপর—ভেঙে চুরে খান খান ক'রে দিতে চাইলে তাকে। বদলে দিতে চাইলে তার রূপ। বদলে দিতে চাইলে তার হাজার হাজার বছরের প্রচলিত সমাজ-সাধনার প্রথাকে, তার সংস্কৃতিকে, তার কৃষ্টিকে। এক নতুন জাতির নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'ল ভারতবর্ষ। সবিস্ময়ে শুনলে আমেরিকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা। আশ্চর্য হয়ে গেল ফরাশী বিপ্লবের কাহিনী শুনে।—রিফর্মেশন যুগের যুক্তিপন্থী কল্পনার-কুহকমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান সাধনার ইতিহাস আর জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার ভারতবাসীকে শুধু বিহ্বল ক'রে দেয়নি সেদিন—এক নবীন আদর্শে সচেতন ক'রে তুলেছিল—উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসঙ্গত ও শোভন সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু নির্জীব মনে সজীব মন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাঙালীর মন মরা নয়—বাঙালীর মন অত্যন্ত সচেতন; তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতাকে স্বীকার করার পূর্বেই—বাংলা অসংকোচে তাকে স্বাগত অভি-নন্দন জানিয়েছিল। বাঙালী নিজের প্রতিভা দ্বারা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটাবার ঐকান্তিক সাধনা গ্রহণ করেছিল। এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হ'ল তারপর। বাঙালী তার ধর্ম আর সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে এসে উপনীত হ'ল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের তোরণ দ্বারে। বাঙালী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো:

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
>
> কে বাঁচিতে চায়?
>
> দাসত্ব শৃংখল ব'ল কে পরিবে পায় রে
>
> কে পরিবে পায়?

সমগ্র ভারত বাঙালীর সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বানে চকিত হ'য়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল আন্দোলন।

বাংলায় — এই হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বাংলায় শুরু হ'ল রাজনীতিক জাতিগঠনের কাজ—জেগে উঠলো বাংলা নব জাতীয়তাবাদের নবীনতম আদর্শে। বিদেশী বণিকরাজ—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল—প্রমাদ গণেছিল বাংলার সেই দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে। কিন্তু ক্ষমতা যাদের মুঠায় আবদ্ধ— অনুগ্রহ আর নিগ্রহ করার শিক্ষা যাদের আয়ত্ত— কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কূট-কৌশল তারা নিপুণভাবেই প্রয়োগ করলে বাংলার ওপর। ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রসমাজের জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনকে ভেদ এবং অনৈক্য দিয়ে বিশিষ্ট ক'রে দেবার প্রয়াস করলে তারা কঠোর ভাবে। সমস্ত বাধা সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পাঁয়তারা ক'রে বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিলে। সে অপমান, সে বেদনার কথা বাংলা ভোলেনি।

শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে নিবিড়তম ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—যে ভ্রাতৃত্ব বোধ অন্তরে দানা বেঁধেছিল—তাকে বিভক্ত করতে পারেনি কিন্তু রাজশক্তির সুকঠোর শাসন। বিচ্ছেদের ফলে যেন তা আরো স্পষ্ট আরো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো। রাজনৈতিক চালে বাংলার মাটিকে দ্বিধা-বিভক্ত ক'রে দিলেও বাঙালীর প্রতি বাঙালীর প্রীতির সত্তাকে—অন্তরের প্রণয়কে বিচ্ছেদের আঘাতে ভেঙে দিতে পারেনি বৃটিশ। অধিকন্তু এই বিচ্ছেদে মিলনের একাগ্রতা আরো যেন বেড়ে উঠেছিল— 'বাঙালীর ঘরে যতো ভাইবোন' তাদের সকলকে এক করার সংকল্প যেন আরো কঠিন, আরো অমোঘ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজ বৃটিশ ভেদনীতির চাতুর্যে মুখ ফিরিয়ে রইলো। বাংলার সে আন্দোলনে তারা যোগ দিলে না। মুসলিম নেতাদের কতটা অংশ সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের রাজনীতি গ্রহণ করলে। ••

"ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্ব ভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়॥"

বাঙালী ক্ষুদ্র নয়—বাঙালী স্বার্থসর্বস্ব অনুদার নয়—বাঙালী সমন্বয়মুখী প্রতিভার অধিকারী। ভারত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাঙলাই। তাই বাংলাকে নিষ্পিষ্ট করার সর্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করলে বৃটিশ রাজশক্তি। বাঙালীকে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নির্বীর্য করতে পারলে অভীপ্সা অপূর্ণ থাকবে না সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজের। মর্মে মর্মে এ সত্য উপলব্ধি করেছিল তারা। বুঝেছিল ভারতে আধিপত্য স্থায়ী এবং সুদৃঢ় করতে হ'লে প্রথমে বাংলার শক্তি খর্ব করতে হবে—তাকে পঙ্গু ক'রে দিতে হবে। কিন্তু বাঙালী ইতিমধ্যেই জেগে গেছে। বাঙালীর জাতীয় নেতৃত্বও অলস হ'য়ে পড়ে নেই। তাঁরা নির্দেশ দিলেন—এই নিরক্ষর আর ধর্মমূঢ়তার দেশে শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা মানুষের মনের চোখ খুলে দিতে হবে; নচেৎ জাতীয় কল্যাণবিরোধী শক্তিগুলিকে নিস্তেজ করা সম্ভব হবে না। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙালী প্রধানরা শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে অর্থব্যয় করতে লাগলেন মুক্তহস্তে। রাজশক্তির সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা ক'রে সমগ্র বাংলায়; বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠলো বে-সরকারী বহু ইস্কুল-কলেজ। স্বার্থত্যাগী চরিত্রবান অসংখ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর ঠিক এমনই সময় জীবনমরণতুচ্ছকারী একদল যুবক—অপরিসীম শক্তি আর দুঃসাহস নিয়ে বিপ্লবের অভিযান শুরু করলেন। সংঘ সমিতি পাঠাগার এবং ব্যায়ামাগারের মধ্য দিয়ে জাতি গঠনের নতুনতর উদ্যমে মেতে উঠলেন তাঁরা। ক্রমে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র বাংলায়—সমগ্র ভারতবর্ষে। ছড়িয়ে পড়লো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, ছড়িয়ে পড়লো কৃষক মজুর বৃত্তিজীবী সমস্ত পরিবারগুলির মধ্যে। নির্ভরশীল গোলাম শ্রেণীর প্রতিকূলতার আর রাজশক্তির সমস্ত বাধা নিষেধ উপেক্ষা ক'রে দুস্তর পথে দুর্জয় যাত্রা শুরু করলেন তাঁরা। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, দারিদ্র্য অজ্ঞতা ধর্মান্ধ গোঁড়ামি—যুক্তিহীন এবং বিরুদ্ধযুক্তির আচার নিয়ম কোনো কিছুই তাঁদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর মহার্ঘশয়ার মহাজাগরণ ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রক্তাক্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান হয়ে আছে। কিন্তু স্বজাতির দুর্বুদ্ধি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে বাঙালী তার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারলে না।

বাঙালী চিরদিন আত্মভোলা জাতি। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হাসিমুখে আত্মবলী দিতে বাদে নি তার কোনোদিন। বাংলার বেহিসেবী যৌবন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করার দুরাশায় অশেষ দুঃখ বরণ করেছে—অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছে। তাকায়নি পশ্চাতে—এতোটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করেনি কোনোদিন কোনো স্বার্থত্যাগে—দেশজননীর মুক্তি সাধনায় সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে। সমস্ত সুখ সাধ মান, আরাম আয়েস পদদলিত ক'রে এগিয়ে গেছে সে চিরদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচনে।

তারপর ভারতের নেতারা আপোষ করলেন বৃটিশের সঙ্গে। বৃটিশ ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে পাকিস্তান হিন্দুস্থান দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি ক'রে শাসনদণ্ড তাদের হাতে তুলে দিতে চাইলেন। অশোভনীয় লোভাগ্রহে নেতারা হস্ত প্রসারিত করলেন এবং কোনরূপ পরিণাম চিন্তা না করেই বাংলাকে অনুরোধ করলেন—স্বাধীনতার জন্যে বাংলার দেহ খণ্ডিত করতে হবে। বাঙালী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়—বাঙালী স্বার্থপরও নয়—তাই অম্লানবদনে আত্মশরীর দ্বিধাবিভক্ত ক'রে স্বাধীনতার চরম মূল্যদান করলে বাঙালী। অর্ধ শতাব্দীর পৃথক না হওয়ার সংকল্প—মেঘনা, যমুনা, পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের অগাধ সলিলে ভাসিয়ে দিয়ে বাঙালী চোখের জলে নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'ল। ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিত্ব এবং উদগ্র পরধর্ম বিদ্বেষ বাঙালী মুসলমানদের চিত্তে আর বুদ্ধিতে বিষক্রিয়া সৃজন করলে। সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সংগীতে—সমস্তর মিলিত ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সংগ্রাম শুরু করলে।

আজ বাঙালীর বড় দুর্দিন। বাঙালীর সমাজ-সংসার ছিন্নভিন্ন—থাকার ঠাঁই নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই। বাঙালী আজ সর্বহারা পথের ভিক্ষুক—রাষ্ট্রের গলগ্রহ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধীস্থলে আজ এসে উপনীত হয়েছে বাঙালী জাতি। ভারত রাষ্ট্রের নায়কদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর ক'রে আজ বাংলার জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হ'চ্ছে। অথচ এই বাংলাই ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু—এই বাংলাই নিজের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে ভারতমাতার মুক্তির দাম দিয়েছে। বিপন্ন বাংলার সংস্কৃতি আজ পরিম্লান, ভাষা রুদ্ধকণ্ঠ। যে ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত। যে ভাষায় কাব্য সাহিত্য রচনা করে বাংলার কবি বিশ্বের সাহিত্য জগতে আলোড়ন এনেছেন—যে ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সাগ্রহ প্রচেষ্টা চলেছে সাগরপারের সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ তাঁরই জন্মভূমি ভারতবর্ষে লাঞ্ছিত উপেক্ষিত। ভারত-রাষ্ট্র-পরিচালকদের কানে বাংলার বাণী আজ পৌঁছায় না, বাঙালীর প্রার্থনা ভিক্ষুকের প্রার্থনার ন্যায় পরিত্যাজ্য।

একদা শাসন সুবিধার অজুহাতে বৃটিশ যখন বাংলার একটা অংশ বিভক্ত ক'রে বিহারের সঙ্গে মিলিত ক'রে দিয়েছিল সেদিন ভারতের জননায়করা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। বৃটিশের সে আচরণের নিন্দা করেছিলেন। বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে বাংলার স্থান বাংলাকে প্রত্যর্পণ করবেন; কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে বাংলার সেই চল্লিশ বছরের ন্যায় সঙ্গত দাবী—রাষ্ট্রনায়কগণের কাছে অযৌক্তিক—বাতুলের প্রলাপ সম উপেক্ষিত। সেদিন বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারের সকল নেতারা বাংলার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। আর আজ—ছিন্নমূল বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে বিহার সদম্ভে ঘোষণা করছেন—'বাংলার কোনো পৃথক সত্তা নেই—বাংলা ভাষা নেই—বাঙালী জাতি নেই।'—অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস!

আজ বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বাংলার ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত শঙ্কিত। একটা প্রগাঢ় অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাংলাকে গ্রাস করতে। সকলেরই মনে এক প্রশ্ন—বাংলার এই দুর্গতির শেষ কোথায়?

কিন্তু আজিকার এই দুঃখ দুর্গতি যতই আত্যন্তিক হোক না কেন—বাঙালী মরবে না, বাঙালী বাঁচবে, আবার বাঙালী-সমাজ আত্মস্থ হবে। বাংলায় আজ যোগ্যতর বলিষ্ঠ নেতা নেই। নাই থাক! কিন্তু বাংলার নেতা নেতাজীর বাণী বেঁচে আছে। নেতাজী বলেছেন: "বাঙালীকে সর্বদা এই কথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে, শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে।"—সুতরাং কর্তব্যবোধ হীনতা যেন বাঙালীর শক্তিকে লজ্জিত না করে। হতোদ্যম নৈরাশ্যে ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে বিলাপ আর দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপের অবসর এখন বাঙালীর নেই। নিজের শক্তির 'পরে নির্ভরশীল হ'য়ে বাঙালীকে দাঁড়াতে হবে—জাগতে হবে। নতুন উপনিবেশ, নতুন বসতির মধ্যে গড়ে তুলতে হবে বাঙালীর নতুন সমাজ। সত্যদ্রষ্টা বিশ্বকবি 'বাঙালী রবীন্দ্রনাথের' বাণীকে মন্ত্র ক'রে বাঙালীর নতুন পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে—

"বাংলার ঘরে যতো ভাই বোন
এক হোক, এক হোক
এক হোক হে ভগবান।"

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

দীনদয়ালের পূর্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত

জয়ন্ত ॥ তারপর ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুর হুকুমে তাজমহলটাকে গুর্খা চাকরটা যেই সরাতে গেছে, বাবা ছুটে গেলেন তাকে বাধা দিতে। অন্য গুর্খাটা তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় খুব চোট পেয়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখেন তাজমহলটা নেই। চারদিকে তাকিয়ে তাজমহল খুঁজতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা হয়ে গেল—তিনিই সম্রাট সাজাহান। ভুজংগ হচ্ছে ঔরংজীব—তার হস্তে বন্দী তিনি। আমি জাহানারা, আর তুমি দারা। উন্মাদ তিনি ছিলেন না—কিন্তু এর পর থেকেই তিনি উন্মাদ হয়েছেন।

জয়ন্ত ॥ সে তাজমহলটা ফিরে পেলে হয়তো—কোথায় সেটা ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুও ওর মূল্য বুঝেছেন। সরিয়ে ফেলেছেন। সারা হাসপাতাল আমি খুঁজেছি—পাই নি।

জয়ন্ত ॥ ভুজংগ তা হলে তা শুধু সরায় নি—চুরমার করেছে—হয়তো বা পুকুরে ফেলে দিয়েছে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল !

জয়া ॥ হতাশ হলে চলবে না, জয়ন্তবাবু। বাবা পাগল হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রকৃত ঘটনা জজ-সাহেবকে জানাতে হবে। তাঁকে বোঝাতে হবে কত বড় একটা ষড়যন্ত্রে এত বড় একটা মহৎ প্রাণ কেন আজ অকারণ নষ্ট হতে চলেছে।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু জজসাহেব তো আর পাগল ভালো করতে পারবেন না। বরং আমি কলকাতায় যাচ্ছি—এখন সবচেয়ে বড় দরকার ওঁর চিকিৎসা। কিন্তু ভয় কী জানেন, জয়াদেবী ? চিকিৎসার সময়ও হয়তো পাব না।

জয়া ॥ কেন ? কেন, বলুন তো ?

জয়ন্ত। যে কোন মুহূর্তে হয়তো শুনবেন—"পাগলটা হাসপাতালে ছিল—ভুল করে বিষ খেয়ে মারা গেছে"। বাবাকে হাসপাতালে রাখার মতলবটাই তাই।

জয়া ॥ আপনি ভাববেন না। সে আমি দেখব।

জয়ন্ত ॥ এক সময় মনে হয়েছিল, আমার জীবনে যে আপনি এলেন—সে ছিল শুধু আমার একটা খেয়াল। এখন দেখছি তা নয়। আমার জীবনে—বাবার জীবনে তোমার আবির্ভাব বিধাতার বিধান।

জয়ন্ত চলিয়া গেল

জয়া ॥ কিন্তু জানি না—জানিনা, জয়ন্তবাবু, এর শেষ কোথায় ?

দরজার বাহির হইতে যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল—"বড়দিদিমণি !"

জয়া ॥ কে ?

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির ॥ আমি যুধিষ্ঠির—আসব ?

জয়া ॥ এসো।

একটি বোঁচকা ঘাড়ে লইয়া লাঠি হাতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ। লাঠি ও বোঁচকা নামাইয়া রাখিয়া সে গড় হইয়া জয়াকে প্রণাম করিল।

যুধিষ্ঠির ॥ কর্তাদাদা চলে গেলেন, বউদিদিমণি ?

জয়া ॥ হ্যাঁ, কলকাতায় গেলেন। কিন্তু তুমিও চললে দেখছি।

যুধিষ্ঠির ॥ হ্যাঁ, দিদিমণি। ওই কলকাতায়—অধম-তারণ কলকাতায়।

জয়া ॥ কেন, যুধিষ্ঠির ? তুমি আমার কাছে থাক।

যুধিষ্ঠির ॥ আর কোন্ মুখে এখানে থাকব দিদিমণি ? চুরি করা আমার একটা বদরোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি করতাম—ধরা পড়তাম—তবু কর্তাবাবার দয়ায় মারধর হত না। অসুখটা বেড়েছে বলে আদর যেন আরো বেড়ে যেত। এখন ? এখন চুরি করব কি মারের চোটে পিলে ফাটবে। যুধিষ্ঠিরকে আর কে দেখবে, দিদিমণি ?

জয়া ॥ তা ঠিক। যে তোমাকে দেখত—সবাইকে

দেখত—সেই হয়ে গেল পাগল। (হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে) তুমি তাঁকে ভালো না করে—তাঁর ভালো হওয়া না দেখে—তাকে ছেড়ে চলে যাবে, যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির॥ তাও তো বটে! কিন্তু কোন্ সাহসে থাকি, দিদিমণি? যে বদরোগটিতে ভুগছি—ধরা পড়লে—ক্ষেমাঘেন্না কেউ তো করবে না, দিদিমণি। ধরবে আর পিলে ফাটাবে।

জয়া॥ বেশ—চলেই যেও তুমি, যুধিষ্ঠির; কিন্তু যাবার আগে—শেষ একটা চুরি করবে?

যুধিষ্ঠির॥ সে কী, দিদিমণি? তুমি আমাকে চুরি করতে বলছ?

জয়া॥ হ্যাঁ যুধিষ্ঠির, বলছি। চুরি নয়—চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যুধিষ্ঠির॥ ওটা হল গিয়ে ভারি মজার কাজ। বলুন, দিদিমণি। মরা দেহে যেন আবার প্রাণ এল। বলুন—বলুন—

জয়া॥ তোমার কর্তাবাবার বড় সাধের ধন ছিল ওই তাজমহলটা।

যুধিষ্ঠির॥ তা আর জানি না। সেদিন কত কাণ্ড হল ওটা নিয়ে! ওটা সরালাম না বলেই তো আমার জবাব হল।

জয়া॥ কর্তাবাবার ওই সাধের জিনিসটা ভুজংগবাবু লুকিয়ে রেখেছেন—চুরি করেছেন। অথচ ওটা হারিয়েই তোমার কর্তাবাবা আজ পাগল। গোটা হাসপাতাল আমি খুঁজে দেখেছি—নেই। ভুজংগবাবু হয়তো বাড়িতে সরিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির॥ না—না, সেটা তাঁর বাড়িতেও নেই।

জয়া॥ কোথায়—কোথায়, সেটা?

যুধিষ্ঠির॥ আমার এই বোঁচকায়, আবার কোথায়?

যুধিষ্ঠির বোঁচকা খুলিল। দেখা গেল, অন্যান্য অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তাজমহলটি রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাজমহলটি জয়ার হাতে দিল। জয়া তাহা আবেগে বুকে চাপিয়া ধরিল।

জয়া॥ যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!!

যুধিষ্ঠির॥ এইজন্যেই তো যাবার আগে আমার এখানে আসা। যার জন্যে আমার চাকরি গেল—আমার কর্তাবাবা পাগল হল—ভুজংগবাবুর সাধ্য কী তা গাপ করেন! উনি সরালেন বাড়িতে—আমি সরালাম বোঁচকায়। নাও—আমার কাজ ফুরোল। কর্তাবাবু ভাল হলে আমার নাম করে ওটা তাঁকে দিও। বোলো—দয়া করে এই অধমকে যেন মনে রাখেন। আসি, দিদিমণি—আমার আবার ট্রেনের সময় হল।

জয়া॥ দাঁড়াও।

জয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া জয়ার হাতে দিল।

যুধিষ্ঠির॥ তা দিচ্ছ, দিদিমণি—নিচ্ছি। কিন্তু এমন নেওয়ায় সুখ পাই না, দিদিমণি—এমনি আমার বদরোগ। তা পিলেটা যদি না ফাটে—আবার আসব।

বোঁচকা বাঁধিয়া লইয়া জয়াকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান। জয়া তাজমহলটি একটা সুটকেসের ভিতর রাখিল। ভৃত্য সনাতন আসিল।

সনাতন॥ বউদিদিমণি, আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায়। বড্ড কান্নাকাটি করছে।

জয়া॥ কে, সনাতন?

সনাতন॥ এই হাসপাতালের একজন রোগী।

জয়া॥ রোগী? এখানে কেন?

সনাতন॥ আপনার কাছে চুপি চুপি কিছু বলতে চায়।

জয়া॥ ডাকো।

সনাতন বাহিরে গিয়া অপেক্ষমান রোগী হলধরকে লইয়া আসিল।

হলধর॥ প্রণাম হই, মা। আমি হলধর—এই হাসপাতালের রোগী। ম্যালেরিয়ায় ভুগছি।

জয়া॥ কী বলবে—বল।

হলধর॥ যা বলব, তা আমার একার কথা নয়। হাসপাতালের সকল রোগীর পক্ষ থেকেই আমি বলছি মা। দয়াল ডাক্তারের হাতে দড়ি দিয়ে ভুজংগ ডাক্তার আমাদের মেরে ফেলছে—এ কি আপনি দেখেও দেখছেন না? ওষুধের টাকা—পথ্যের টাকা—সব নিজে খেয়ে, আমাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই মা?

জয়া॥ এ অঞ্চলের লোকেরা সবাই তো এ সবই দেখছে; কিন্তু কেউ তো এগিয়ে আসছে না, হলধর। কেউ যখন কিছু করছে না—আমি কী করতে পারি?

হলধর॥ তোমাকে কিছু করতে হবে না, মা। তুমি শুধু আমাদের বল—দয়াল ডাক্তার সত্যি পাগল—না, তাঁকে জোর করে পাগল করা হয়েছে।

জয়া॥ তোমরা রোগী—তোমরা অসুস্থ। এর ভেতর তোমরা এসো না, হলধর।

হলধর॥ ও! ভাবছ, মা—আমরা রোগী—আমরা অসুস্থ—আমাদের গায়ে শক্তি নেই—কেউ হয়তো উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যাই—কারো হয়তো উঠবার শক্তি নেই। কারো হয়তো এখন-তখন! কিন্তু, মা, জেনো—'মরণকামড়' বলে একটা কথা আছে—'মরণকামড়'! ওকে আমরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব!

উত্তেজনায় হলধর কাঁপিতে লাগিল

জয়া॥ ছিঃ, হলধর, তুমি থাম। দুষ্কৃতের শাস্তি দেন ভগবান—তোমার-আমার শক্তি কতটুকু! তাঁকে ডাক, হলধর—তাঁকে ডাক। এমনি মরিয়া হয়ে তাঁকে ডাকলে—দয়া তাঁর হবেই। সনাতন, ওকে রেখে এস।

সনাতন তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

জয়া॥ কী সনাতন?

সনাতন॥ ছোটকর্তা।

জয়া॥ কোথায়?

সনাতন॥ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?

জয়া॥ একটু অপেক্ষা করতে বল—আমি শাড়িটা বদলে নিই।

সনাতন চলিয়া গেল। জয়া ক্ষিপ্রতার সহিত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর সুটকেসটি রাখিয়া আলমারি বন্ধ করিল এবং নিজেই পর্দা সরাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—

জয়া॥ আসুন, ভুজংগবাবু।

ভুজংগের প্রবেশ

নমস্কার।

ভুজংগ॥ নমস্কার।

জয়া॥ বসুন।

দুইজনে দুইটি আসনে বসিল

ভুজংগ॥ হলধরকে দেখলাম। কী দুঃসাহস দেখুন—শেষকালে আপনাকে পর্যন্ত জ্বালাতন করতে এসেছে!

জয়া॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কোন প্রশ্রয় দিই নি। স্পষ্ট বলে দিয়েছি—আমি হাসপাতালের কেউ নই।

ভুজংগ॥ মিথ্যা কথা।

জয়া॥ মিথ্যা কথা?

ভুজংগ॥ মিথ্যা নয়তো কী। আজ হাসপাতালের সকলে আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

জয়া॥ কেন, বলুন দেখি?

ভুজংগ॥ দয়াল ডাক্তারের আর কিছু না থাক—উৎসাহ ছিল, উদ্দীপনা ছিল। সে উৎসাহের, সে উদ্দীপনার উৎস ছিল প্রেম—সহধর্মিণী মমতার প্রেম। মমতার মৃত্যুতে তাই গড়ে উঠল এই মমতাময়ী হাসপাতাল—প্রেমের তাজ-মহল। আজ আমার ওপর হাসপাতালের ভার পড়েছে—কিন্তু কোথায় আমার উৎসাহ—কোথায় আমার উদ্দীপনা—কোথায় আমার প্রেরণার উৎস!··· যদি তুমি দয়া না কর, জয়া।

আকস্মিক এই 'আক্রমণে' লজ্জায়, ঘৃণায় জয়া রক্তিম হইয়া উঠিল। কী বলিবে—কী করিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া ভুজংগ পুনরায় বলিতে লাগিল—

ভুজংগ॥ তুমি যদি কারো বিবাহিতা বধূ হতে—এ আশা, এ সাহস আমার হত না। এসব কথা আমার বলাও হত পাপ। আজ তোমার ওপর জয়ন্তের যে দাবি—আমার হৃদয়ের দাবি তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। (আবেগে) জয়া—জয়া—

জয়া॥ আপনি থামুন। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নি—এ কথা এক শুধু আপনিই জানেন। এখানে আর কেউ তা জানে না। আপনার এ কথা শুনলে—তারা কী ভাববে?

ভুজংগ॥ যে শুনলে ভাবনার কথা ছিল—সে আজ জগতের সব কথার বাইরে, জয়া। আর কে কী ভাববে—তার জন্যে আমি ভাবি না। তুমিও ভেবো না, জয়া।

জয়া॥ কিন্তু এও তো হতে পারে, ভুজংগবাবু, যে, দীনদয়াল চৌধুরী আবার ভাল হতে পারেন।

ভুজংগ॥ শুধু এই তোমার ভয়, জয়া ?

জয়া॥ কী অগাধ স্নেহই না তাঁর কাছে আমি পেয়েছিলাম! ভাল হয়ে যদি তিনি শোনেন—তিনি দেখেন যে, আমি—

ভুজংগ॥ আমি বলছি—ভাল হবার তাঁর কোন আশা নেই, জয়া।

জয়া॥ উন্মাদরোগের তবে কোন চিকিৎসা নেই বলুন!

ভুজংগ॥ কেন থাকবে না? চিকিৎসা আছে। কিন্তু যা দিয়ে চিকিৎসা হবে—দয়াল ডাক্তারের তা নেই।

জয়া॥ আপনি বোধহয় ওই তাজমহলটার কথা বলছেন ?

ভুজংগ॥ রূপেই তোমার মুগ্ধ ছিলাম—এখন মুগ্ধ হলাম তোমার বুদ্ধিতে।

জয়া॥ না—না, শুনুন—তাজমহলটা তো আছে।

ভুজংগ॥ আছে! কোথায় আছে ?

জয়া॥ কেন, হাসপাতালে ?

ভুজংগ॥ নেই—নেই।

জয়া॥ নেই? কেন সেদিন যে ওই গুর্খাটা—

ভুজংগ॥ গুর্খাটা—হ্যাঁ গুর্খাটা—তবে শোন জয়া। গুর্খাটা ভেবেছিল—তাজমহলটাকেই আমি সইতে পারছি না। তাই আমি সরাতে বলছি। মনিবকে খুশি করবার জন্য গুর্খাটা তাজমহলটাকে শুধু ঘর থেকে সরায় নি—পৃথিবী থেকেই সরিয়েছে—চূরমার করে ফেলেছে।

জয়া॥ (কপট আর্তনাদে) অাঁা!

ভুজংগ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই তাজমহলটা সরিয়েছিলাম বলে দয়াল ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়েছে। ফিরে পেলে আবার হয়তো ভাল হত। সে আশা আর যখন নেই—আমি কেন তোমাকে আশা করব না জয়া! বল—বল? ···না—না, চুপ করে থেকো না, জয়া। ডাক্তার বোসের রিপোর্ট পেয়ে এক মেডিকেল কমিশন আসছেন। তাতে থাকবেন ডাক্তার বোস—আরো দুজন বড় ডাক্তার সেই মেডিকেল কমিশন আজই এখানে এসে দয়াল ডাক্তারকে পরীক্ষা করবেন।

জয়া॥ আজই ?

ভুজংগ॥ হ্যাঁ, আজই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় দয়াল ডাক্তারের পরিণাম কী আমি জানি। কিন্তু আমার পরিণাম তোমার হাতে।···আমি উত্তর চাই, জয়া।

জয়া॥ উতলা হবেন না, ভুজংগবাবু। একটা তাজমহল গেছে। আর একটা তাজমহল আমরা গড়ব। চিন্তা কী ?

ভুজংগ॥ সত্যি সত্যি এ আশা তবে আমি করতে পারি ?

জয়া॥ ধৈর্য ধরুন, ভুজংগবাবু। মেডিকেল কমিশন আসছে বিকেলে। কয়েক ঘণ্টা বাদে। তাজমহল গড়তে সময় লাগে। এই কয়েক ঘণ্টা অন্তত অপেক্ষা করুন।

ভুজংগ॥ হুঁ! জীবনে অনেক মেয়ে নিয়ে খেলেছি; কিন্তু তোমার মত সুচতুরা-সুদর্শনা মেয়ে আমার জীবনে এসেছে দেখছি এই প্রথম। শোন, জয়া, তাজমহলটা চূরমার হয় নি, চুরি গেছে। কেন চুরি হয়েছে, কে চুরি করেছে, এখন বুঝছি—তোমার ওই হেঁয়ালিভরা কথায়। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় যদি আমি হারি—তাজমহল ফিরে পেয়ে সম্রাট সাজাহান যদি আবার দীনদয়াল হন—তোমার প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার কথা তাঁকে জানিয়েই বিদায় নেব। দীনদয়াল যত দয়ালই হোন—তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন না। বিদেয় হতে হবে তোমাকেও—সংগে সংগে। একবার ভেবে দেখ, জয়া, দীনদয়াল যদি সম্রাট সাজাহান রূপে বন্দী থাকেন, তাতেই বোধহয় মঙ্গল—শুধু আমার নয়, তোমারও। আচ্ছা আসি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শিল্পাচার্য্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যে দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর—সে দেশে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র খুবই প্রসারিত—একথা বলা চলে না। এ রকম পরিবেশে সে দেশে যথার্থ একজন প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর।

ইউরোপে যেমন Corotকে Father of the Landscape painter বলা হয়, সে রকম যামিনীপ্রকাশকেও আমাদের দেশের Father of the Indian landscape painter বলা চলে। বস্তুতঃ যামিনীপ্রকাশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার মত সর্ব্বাঙ্গীন স্বয়ং-সম্পূর্ণ দৃশ্যচিত্র এ দেশে কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

তুষারমৌলী কাঞ্চনজঙ্ঘা সমস্ত সৌন্দর্য্যসম্ভারসমেত তাঁহার মোহন তুলিকায় ধরা পড়িয়াছে—হিমালয়ের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভাবগম্ভীর রূপ তাঁহার তুলিকায় জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আর অশান্ত সীমাহীন পদ্মা-নদীর প্রভাত ও সন্ধ্যায় কুহেলিকাপরিপূর্ণ রূপশ্রী, তাহার বালুকাময় বেলাভূমি, মোহন স্বপ্নালোক সৃষ্টি করিয়াছে।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রে যামিনীপ্রকাশ পদ্মার যে চিত্র আঁকিয়াছেন—রসিক সমাজের কাছে তাহা বিস্মৃত হইবার কথা নয়। বস্তুতঃ কাঞ্চন-জঙ্ঘা ও পদ্মা যামিনীপ্রকাশের অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

১৮৭৬ খৃঃ ৩রা নভেম্বর যামিনীপ্রকাশ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়া-সাঁকোস্থ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গুণেন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের পিতা এবং যামিনীপ্রকাশের পিতা জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতুল। যামিনী-প্রকাশ ও অবনীন্দ্রনাথ একই বাড়ীতে একত্রে মানুষ হইয়াছিলেন। তখন কে জানিত এই দুই বিভিন্নমুখী শিল্প প্রতিভা একদিন ভারতের শিল্পাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অবস্থান করিবেন? অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের শিল্প সাধনার উদ্দেশ্য ছিল—ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন—আর যামিনী-প্রকাশের জীবনভোর সাধনা—পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অঙ্কন প্রচেষ্টা—তাহার

সর্দ্দারজী

সাধনায় শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন জগতের রূপ আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ধরা পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের ভগীরথ রাজা রবিবর্ম্মার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পপ্রবাহ প্রায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যামিনীপ্রকাশ তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে যামিনীপ্রকাশই রাজা রবিবর্ম্মার শিল্পধারার বাহক ও পরিপোষক।

বাঙ্গালী একদিন সমগ্র ভারতে সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তার সে দিন নাই। বাংলার আয়তন সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীও যেন বড়ই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে যামিনীপ্রকাশ পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টার হিসাবে সর্ব্বভারতীয় শিল্পীগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল—বাংলার সে সম্মানেরও সমাধি ঘটিল।

বাল্যকালে যামিনীপ্রকাশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যলাভের জন্য অভিভাবকেরা তাঁহাকে ঠাকুরবাবুদের পাবনার জমিদারীতে মাঝে মাঝে বোটে করিয়া ভ্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করাইতেন। এই সময় হইতেই দৃশ্য-চিত্রের দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

সমস্ত দিন বোটে বসিয়া বালক যামিনীপ্রকাশ খাতা ও রঙ্গিন পেনসিল লইয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া যাইতেন। আকাশ, নদী, হরিৎ ক্ষেত্র, দূর গ্রামের কুটীর শ্রেণী, তীরের ঘন নীল বৃক্ষরাজি বালকের মনে অপূর্ব্ব রং-এর নেশা লাগাইয়া দিত। যতক্ষণ দিনের আলো থাকিত, ততক্ষণ বালকের ছবি আঁকার কাজ বন্ধ হইত না। তাহার নিকটের গাছ-পালাগুলির গাঢ় রং ও দূরের গাছ পালাগুলি ধূসর হইতে ধূসরতর হইয়া যাইত। রং ব্যবহারের এই পরম সত্যের সন্ধান বালক বোটে বসিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই ভাবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের দৃশ্য চিত্র অঙ্কনের প্রথম পাঠের সূচনা হয়।

মেঘদূত

ঠাকুরবাড়ি হইতে পাল্কী করিয়া তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতে আসিতেন। সেখানে কামাখ্যাবাবু নামে একজন ড্রইং শিক্ষক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। দেশ-বিদেশের বড় বড় চিত্রকরদের কথা তিনি বলিতেন এবং বালক বাড়িতে যেসব ছবি আঁকিতেন স্কুলে বসিয়া তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতা জ্যোতিঃপ্রকাশ ঠাকুরবাড়ি হইতে ১৭১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে চলিয়া আসেন এবং যামিনীপ্রকাশ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলে থাকা-কালীন স্কুলের থিয়েটারের জন্য তিনি একখানি সিন আঁকিয়াছিলেন। থিয়েটার দেখিতে আসিয়া তদানীন্তন লেপটেন্যাণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি সিনখানির উপর আকৃষ্ট হয়। তিনি উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং যামিনীপ্রকাশকে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইতে উপদেশ দেন। এখান হইতে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করিয়া তিনি ১৮৯৬ সালে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন, ও, গিলার্ডি সাহেব আর্ট স্কুলের

প্রিন্সিপাল। বালকের হাতের কাজ দেখিয়া প্রিন্সিপ্যাল তাঁহাকে প্রথমেই ষ্টিল-লাইফ ক্লাশে ভর্ত্তি করিয়া নেন। কলিকাতার গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে তিনি তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপের অর্ডার পাইয়া পরম পুলকিতচিত্তে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। যখন ভারতীয় প্রতিভাশালী চিত্রকরেরা মাত্র স্বকীয়তার মোহে প্রাচীন পদ্ধতির অনুকরণ-সাধনায় ছবিতে রংএর ওয়াস

বাদল দিনে

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে পোর্ট্রেট আঁকিবার জন্য পামার নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর আসেন। তিনি মহারাজার অনেক গুলি পোর্ট্রেট করেন। তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ দুই জনেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ কিছু-দিন পরেই পোর্ট্রেট আঁকা ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু যামিনীপ্রকাশ একাদি-ক্রমে তিন বৎসর তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতে পোর্ট্রেট পেণ্টার হিসাবে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। লাইফ হইতে সিটিং নিয়া তিনি বহু কাজ এই সময় হইতেই করিতে আরম্ভ করেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমাদের দেশীয় রাজা, মহারাজাগণ সাহেবিয়ানার মাত্র প্রথম পাঠ শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মোগল আমলের সাজ পোষাক ছাড়িয়া রিজেণ্ট সাহেবদের নিকট হইতে ইউরোপীয় সাজ পোষাক, গৃহ সজ্জা, আদব কায়দা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সময়ে ঐ সব রাজ দরবার হইতে বিলাতী চিত্রকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকার

বর্ষা দিনের আলো

দিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শুধু মাত্র পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ করিয়া বিদেশী চিত্রকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা এই দেশ হইতে লইয়া গিয়াছে. তাহার খবর

আমরা কয়জন রাখি! বরোদা, পাতিয়ালা, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, নবনগর, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের রাজামহারাজাগণ নিজ নিজ প্রাসাদ ইংলণ্ডের লর্ডদের গৃহের অনুরূপ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেশের কোন এক মস্ত বড় জমিদার তাঁহার প্রাসাদখানিকে ঠিক বাকিংহাম

ভোজসভার দৃশ্য

সাজাইবার জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া সাহেব চিত্রকরদের চিত্র ক্রয় করিতে সুরু করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি দেশের জমিদার ও তৎতুল্য

রক্ত সন্ধ্যা

ব্যক্তিগণও বিলাতী শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র দিয়া তাঁহাদের গৃহ একেবারে

প্যালেসের মত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বাকিংহাম প্যালেসের কোন দেয়ালে এবং কোন কোণে কোন কোন ছবি আছে, তাহার ফটোগ্রাফ ও রঙিন প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া, বিলাতী চিত্রকরের হাতে ঐ সব বৃহদায়তন চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ছবি গুলি যদি তৃতীয় শ্রেণীরও হইত তবুও দুঃখ থাকিত না। উক্ত জমিদার এই কার্য্যে যত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার এক চতুর্থাংশ দিয়াও যদি কোন বিদেশী শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের দুই একখানি চিত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন তবে আমাদের দেশের চিত্র সম্পদ বর্দ্ধিত হইত। আসল কথা ছবির জন্য তাঁহার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না; ছিল সাহেবিয়ানাতে—সকলের উপর টেক্কা দেওয়াই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। কি করিলে ও কি বলিলে সাহেব মহলে মান, খাতির, প্রতিপত্তি বাড়িবে, কি করিলে দশজনে "মোষ্ট আপ টু ডেট" বলিবে—ইহা লইয়াই ছিল তাহাদের যত চিন্তা, যত ভাবনা। এমন কি, অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে রাজা, মহারাজা, ও জমিদারদের পুরাতন হল ঘরে বা বৈঠকখানাতে একটা করিয়া নকল ফায়ার প্লেস রাখারও রেওয়াজ হইয়াছিল। অবশ্য ফায়ার প্লেস ডেকোরেশনের ব্যবস্থাও যথারীতি ব্যয়বাহুল্যের আড়ম্বরের সহিতই সম্পন্ন হইত।

সে যাহা হউক, এই সব বিদেশী ভাগ্যান্বেষী চিত্রকরদের নিকট হইতে বা এই সব শিল্পী ব্যাঘ্রদের মুখ হইতে কিছুটা অংশ সর্ব্বপ্রথম ছিনাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিন জন বাঙ্গালী চিত্রকর। তাঁহাদের একজন শশী হেশ, একজন যামিনীপ্রকাশ এবং একজন শ্রীপুলিন কুণ্ডু।

যামিনীপ্রকাশই ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের শিল্প ক্ষেত্রে শশী হেশের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর— মৈয়মনসিংহের এক অখ্যাত পল্লীতে দীন-দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতে করিতে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া, আর্ট স্কুল, তার পর ইটালী এবং তার পর সমস্ত ইয়ুরোপ হইতে কি ভাবে তিনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা এক চমকপ্রদ কাহিনী। ড্রইংএ তাঁহার যেমন দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু, কি এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি সর্ব্বদা উদভ্রান্ত থাকিতেন যে যতখানি নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিতেন, কাজ শেষ করা পর্য্যন্ত ততখানি নিষ্ঠা আর তাঁহার বজায় থাকিত না। এজন্য দেশে তাঁহার স্থান হইল না। তিনি বিদ্যুতের মত একবার জ্বলিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেলেন।

যামিনীপ্রকাশের আবাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিন কুণ্ডু মহাশয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে বহু রাজামহারাজার দরবারে অর্থ, মান ও মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। দেশীয় চিত্রকরের আঁকা ছবি যে সাহেব-চিত্রকরের ছবি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, পুলিন কুণ্ডু মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

যামিনীপ্রকাশ রাজামহারাজাদের দরবারে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগী বিদেশী শিল্পীগণের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পক্ষে ইহা পরম গৌরবের কথা।

অবশ্য ইহাও সত্য যে বাংলা দেশের কয়জনেই বা তাঁহার ছবি দেখিয়াছে অথবা তাঁহার নাম শুনিয়াছে। যাঁহাদের ছবি কাগজে প্রকাশিত হয় তাঁহাদেরই দুই চারিজনকে লোকে চিনে। যামিনীপ্রকাশের ছবি প্রায় সবই তাঁহার ষ্টুডিও হইতেই রাজামহারাজাদের প্রাসাদে চলিয়া যাইত। এইজন্য দেশের জনসাধারণ তাঁহার ছবি দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দুই চারিখানি ছবি যাহা চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইত তাহাই মুষ্টিমেয় লোকে দেখিয়াছে মাত্র।

সম্প্রতি একাডেমি অব ফাইন আর্টের সুযোগ্যা সভানেত্রী লেডি রাণু মুখার্জ্জি যামিনীপ্রকাশের একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ একজিবিশনের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে সব রাজ দরবারে তাঁহার ছবি রহিয়াছে, এই উদ্দেশ্যে ঐ সব বহুমূল্য বৃহদায়তন ছবি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এই বিরাট তথা বহুব্যয়সাধ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে দেশের জনসাধারণ যামিনীপ্রকাশের ছবিগুলি একসঙ্গে দেখিবার

পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী

সুযোগ পাইবে। আমরা একাডেমির সভানেত্রীর এই সাধু উদ্যমকে অভিনন্দিত করিতেছি।

যামিনীপ্রকাশের বয়স যখন ২৪।২৫ বৎসর, তখন তিনি কাদম্বরীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুইখানি বিশালকায় কম্পোজিশন করেন। একখানি "শূদ্রকের রাজসভা", অপর খানি "শুকমুখে উপাখ্যান শ্রবণ।" যদি কখনো বাংলা দেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাস লেখা হয়, তবে যামিনীপ্রকাশের এই কম্পোজিশন দুইখানিকে বাংলার সর্ব্বপ্রথম সার্থক ও শক্তিশালী উদ্যম বলিয়া লেখা হইবে। "শূদ্রকের রাজসভা" ছবিখানি প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের চিত্র সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে। "উপাখ্যান

মুর্শিদাবাদের নবাবের পোর্ট্রেট
অঙ্কনরত—শিল্পাচার্য্য যামিনীপ্রকাশ

শ্রবণ" ছবিখানি শিল্পী তাঁহার গগন কাকাকে উপহার দিয়াছিলেন। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, ছবিখানিকে ধূলি মলিন অবস্থায় গগনবাবুদের সিঁড়িকোঠার তলায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। উপহারপ্রাপ্ত জিনিষ বলিয়াই বোধ হয় ছবিটির ভাগ্যে এমন দারুণ অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্য জুটিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে ছবি দুইখানির বৃহদাকার লিথো প্রতিলিপি করা হইয়াছিল, তাই দেশের লোক ছবি দুইখানি দেখিয়া আনন্দ পাইতেছে।

এই সময়েই তিনি ওয়াটার কালারে কতকগুলি ছোট ছোট কম্পোজিশন করেন ; তাহার মধ্যে "রাধাষ্টমী", 'জন্মাষ্টমী', 'বংশীধারী' প্রভৃতি কয়েকখানি ছবি আজও তাঁহার বাড়িতে রহিয়াছে। এতদিনের আঁকা ছবি, কিন্তু রং এর ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও ম্লান হয় নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সিমলার চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা "গঙ্গার ঘাট" ছবিখানি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। লেডি কার্জন ছবিখানি ক্রয় করেন। এই সময় হইতেই তিনি আভিজাত মহলে পরিচিত হন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "মেঘদূত" ছবিখানি বোম্বাই চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। নিউইয়র্ক আর্ট গ্যালারী এই বৎসরই তাঁহার দুইখানি ছবি ক্রয় করে। তাঁহার বিখ্যাত ছবি "বুদ্ধের গৃহত্যাগ" এবং "গৃহহারা" এই সময়েরই আঁকা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার হইতে ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীকে একখানি সম্মান পত্র প্রদান করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভিনিসে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী হয় তাহাতে—ভারতবর্ষ হইতে মাত্র যামিনীপ্রকাশের তিনখানি ছবি স্থান পায়। এর মধ্যে ছিল দুইখানি পদ্মা নদীর এবং একখানি কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য চিত্র।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বোম্বাই চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার "গ্রে এণ্ড গোল্ড" (শিল্পীর কন্যার প্রতিকৃতি) ছবিখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একজিবিটরূপে আদৃত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ছবিখানি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাতে যামিনীপ্রকাশ রং এর যে সামঞ্জস্য ও রং ব্যবহারের যে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃতই অনবদ্য। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, 'গ্রে' এ্যাণ্ড গোল্ড' এই দুইটি রংই ছিল সেগুলির প্রাণবস্তু। তাঁহার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' গ্রে এণ্ড গোল্ড, তাঁহার "পদ্মা" গ্রে এণ্ড গোল্ড, তাঁহার বিশালকায় হিমালয়ের ছবিও গ্রে এণ্ড গোল্ড। তাঁহার পোর্ট্রেট, তাঁহার ল্যাণ্ডস্কেপ সবই গ্রে এণ্ড গোল্ড। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার সমস্ত চিত্রই ঐ দুইটি রং এর অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহা যামিনীপ্রকাশের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

এই বছরেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাসবিহারী ঘোষের ছবি আঁকিবার অর্ডার পান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অর্ডারী কাজের ইহাই আরম্ভ।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পার্সি ব্রাউন সাহেব যামিনীপ্রকাশকে আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল রূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তদবধি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে যোগ্যতার সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে নানা রাজদরবার হইতে তাঁহার ডাক পড়িতে সুরু করে। ত্রিপুরা কোচবিহার, যোধপুর, জয়পুর, ভূপাল, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের রাজামহারাজাদের পোর্ট্রেটের কাজই তখন বেশি হইয়াছিল। কোচবিহার হইতে তিনি এক সঙ্গে আটখানি লাইফ সাইজ পূর্ণাবয়ব ছবির অর্ডার পান। তাহার মধ্যে জিতেন্দ্র-নারায়ণ ভূপবাহাদুর ও মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ছবি দুইখানি বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে এবং বর্ণ ব্যঞ্জনায় অপূর্ব্ব। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সব বৃহদাকার অয়েল পেইন্টিংগুলি তিনি মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে

শেষ করিয়া ফেলিতেন। এত বড় বড় পোর্ট্রেট, তাহাতে অসংখ্য মণিমাণিক্যযুক্ত সাজ-পোষাক, নানাপ্রকারের, নানাবর্ণের মেডেলমণ্ডিত রাজদেহ, ব্যাক-গ্রাউণ্ডে কারুকার্য্যখচিত দেয়াল ইত্যাদি, সবই যেন ভোজবাজির মত শিল্পীর তুলিকার মুখে দ্রুত পরিস্ফুট হইত। আমরা তাঁহার ছবি আঁকার সময় দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—তিনি কি হইতে কি করিতেছেন, তাহার কোন হদিস কখনো পাই নাই।

পার্সি ব্রাউন সাহেব তৎকালে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন বটে; কিন্তু আমরা কখনো তাঁহাকে কোন ক্লাসে যাইতে দেখি নাই। শুধু শুনিতাম সাহেব আছেন—এইটুকুই আনন্দ। কখনো শুনিতাম—সাহেব বাহিরে গেলেন, কখনো শুনিতাম সাহেব খাস কামরায় আছেন,—এমনকি, মাসে ২।৪ দিন ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে ছাত্রদের দেখা সাক্ষাৎই হইত না। উপরের ক্লাস দুইটী যামিনীবাবুই নিতেন। সকালে দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাদা প্যাণ্ট, সাদা কোর্ট, সাদা জুতা পরিয়া 'দেবদূতের' মত স্কুলে প্রবেশ করিতেন। অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত আমাদের—মাষ্টারমশাইকে সর্বদা মনে হইত তিনি যেন সকলের উর্দ্ধে —সকলের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত তাঁর ঘরে বসিয়া তিনি আপিসের কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। ক্লাসে মডেল বসিয়া থাকিত, আমরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মত, ছবিতে রং চাপাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। কখনো বা তাঁর' দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতাম, তিনি অফিসের ফাইল লইয়া মহা ব্যস্ত রহিয়াছেন। দুইটা বাজা মাত্রই তিনি ক্লাসে আসিয়া প্রথমে যে ছেলেটির ইজেল পাইতেন নিঃশব্দে তার রংএর পেলেট খালি হাতে তুলিয়া লইতেন। দশ মিনিটের মধ্যেই তার কাজ দুরস্ত করিয়া পরবর্ত্তী ছেলের ইজেলে যাইতেন। এই ভাবে প্রতি দিন ১০।১৫টি ছেলের ছবি মেরামত করিয়া দিয়া চারিটার সময়, তাঁহার ধবধবে সাদা রুমাল খানিতে হাত পুছিয়া চলিয়া যাইতেন। বিদ্যুত গতিতে তিনি পোর্ট্রেট মিলাইয়া যাইতেন। এ দক্ষতা যে কত দিনের সাধনার ফল এবং এ বর্ণ সামঞ্জস্য যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টির অভিব্যক্তি, আমরা তখন তার মর্ম কি বুঝিব?

পুষ্পস্তবক

গ্রে এণ্ড গোল্ড

ধনীর দুলাল ছিলেন তিনি, অদ্ভুত শিল্প প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি যত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, ভারতের

কোন চিত্রকরের ভাগ্যেই তাহা সম্ভবপর হয় নাই। আজ বাংলা দেশের যে কয়জন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর নাম আমরা জানি, সকলেই তার ছাত্র,—যামিনী রায়, অতুল বসু, সতীশ সিংহ, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বসন্ত গাঙ্গুলী, ৺প্রহ্লাদ কর্ম্মকার, ৺যোগেশ শীল, পরেশ মজুমদার, উপেন কর্ম্মকার, বসন্ত পাণ্ডা সবই তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দলে যান নাই; বা একটা নিজস্ব দল পাকাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

আমাদের দেশে যতটুকু ছবি আঁকা হইয়াছে, বাদানুবাদ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হইয়াছে তার চাইতে অনেক বেশী। তিনি ইচ্ছা করিলে এই সব সুযোগ্য শিষ্যদের নিয়া একটা দল সৃষ্টি করিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া অনায়াসে একজন মণ্ডলেশ্বর হইয়া বসিতে পারিতেন। কিন্তু সেই দিক দিয়াই তিনি যান নাই। এমন ভদ্রলোক, এমন এক কথার মানুষ, এমন সরল অমায়িক, এবং এমন অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তিস্তা

তিনি বলিতেন, "আমি কথা বা দল বা মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি যাহা বলিতে চাই তাহা ত আমার ছবিতেই প্রকাশ পাইতেছে—তাহা ভাল কি মন্দ, এদেশী কি ওদেশী তাহা আমি জানি না। শুধু এই মাত্র জানি ছবিই আমার কথা, ছবিই আমার দল।"

আমাদের শিল্পীসমাজ অতি ক্ষুদ্র হইলেও আমরা যে দল পাকাইতে কাহারও অপেক্ষা কম যাই এ কথা স্বীকার করিব না। কিন্তু এই যে একটি মানুষ; মানুষের জীবনে যাহা কিছু কাম্য সবই যাঁহাকে ভগবান অফুরন্ত ভাবে দিয়াছিলেন। তিনি এমন নিঃশব্দে, এমন সংযতভাবে অর্দ্ধ শতাব্দীর উপরে—আমাদের দেশে, আমাদেরই মতন মানুষ নিয়া কাটাইয়া গেলেন—কোন মন্ত্র বলে? তাঁহার সমালোচকেরা তাঁহাকে "সাহেব," "রাজা মহারাজাদের আর্টিস্ট," "দেশের নাড়ীর সহিত তাঁহার কোন যোগসূত্র নাই", "বিলাতী ধরণের ছবি," "ভাব শূন্য ছবি" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অবিচলিত চিত্তে—তাহা সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহারও কোন কথায়—কখনো প্রত্যুত্তর করেন নাই, নিজের ষ্টুডিওতে বসিয়া আপন মনে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

১৯২১ সালে ফাইন আর্ট সোসাইটী নামে একটী সোসাইটী আর্টস্কুলে স্থাপিত হয়। শিল্পী অতুল বসুর আগ্রহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমেই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯২২ সালে গুরুপ্রসন্ন স্কলারসিপ্ লইয়া অতুল বসু বিলাতে চলিয়া গেলে সোসাইটির সম্পূর্ণ ভার যামিনীপ্রকাশের উপরে পতিত হয়। সাত আট বৎসর এই সোসাইটী বর্ত্তমান ছিল। এই ৭।৮ বৎসর যামিনীপ্রকাশ কে কি গুরুতর পরিশ্রম ও নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া এই সোসাইটী চালু রাখিয়া ছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পৃথিবীতে কেহই বোধ হয় অজাতশত্রু নয়। না হইলে এমন মানুষেরও শত্রু দেখা দিল! তাহার অজস্র অর্থ উপার্জ্জনই প্রতিপক্ষের মর্মপীড়ার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়াছিল। সে জন্য তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ১৯২৮ খৃঃ তাঁহাকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার পক্ষে শাপে বর হইল। চাকুরী ছাড়ায়—চার বৎসরের মধ্যে তিনি রামপুরের নবাবের—প্রায় চার লক্ষ টাকা মূল্যের ছবি অঁকিবার অর্ডার পান। ছবি গুলির মধ্যে পোর্ট্রেট ল্যাণ্ডস্কেপ সবই ছিল। সেগুলি আয়তনেও যেমন বিরাট, চিত্রে উৎকর্ষতার দিক দিয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে হিমালয়ান ক্রফ্, কারশিয়াং ভ্যালি, দেয়ায় হোম ল্যাণ্ড ও নবাব পরিবারের সাত আট খানি পোর্ট্রেট—সত্যসত্যই দর্শনীয় বস্তু।

১৯২৯ খৃঃ একজন ইটালীয়ান ধনী ব্যক্তি এদেশে আসেন। যামিনীপ্রকাশের চার খানি চিত্র ক্রয় করিয়া, ইটালীর রাজা ইমানুয়েলকে উপহার দেন। রাজা ইমানুয়েল ঐ গুলি পাইয়া যামিনীপ্রকাশকে 'ক্যাভেলিয়ার' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সম্মান মাত্র কয়েক জন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে যেমন—সারজেণ্ট, সার জন কলিয়ার, সার জন রীড্, অগাষ্টস্ জন, ইত্যাদি। ভারতীয়দের মধ্যে আর কেহই ঐ সম্মানের অধিকারী হন নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা "গঙ্গার তীর" ছবি খানি পুরস্কৃত হয়। শিল্পী-জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর তিনি দারভাঙ্গার মহারাজের অনেকগুলি ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে একখানি লর্ড ও লেডি উইলিংডনের সহিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও অপর খানি একখানি ভোজ সভার ছবি, এই ছবিখানিতে পঁচিশটি পোর্ট্রেট আছে। এই ধরণের পোর্ট্রেট কম্পোজিসনের ছবি ভারতের অপর কোন চিত্র শিল্পী আঁকিয়াছেন বলিয়া জানিনা। তাঁহার শেষ বয়সের আঁকা সর্দ্দার বল্লভভাইএর ছবিতে তিনি যে উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন তাহা যথার্থই অনির্ব্বচনীয়।

তাঁহার আঁকা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দুইখানি পোর্ট্রেটের দিক দিয়া অনবদ্য। এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব, কি স্বদেশে কি বিদেশে যামিনীপ্রকাশ সর্ব্বত্রই সমানভাবে আদৃত হইয়াছেন। ভারতের এমন কোন রাজা মহারাজার প্রাসাদ নাই, যেখানে যামিনীপ্রকাশের ছবি নাই। বাংলাদেশে এমন কোন ধনীব্যক্তি নাই, যাঁহার গৃহে যামিনীপ্রকাশের ছবি নাই। এমন অক্লান্ত কর্ম্মী চিত্রশিল্পী আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও দুর্লভ।

যামিনীপ্রকাশের সংসারিক জীবন সুখের ছিল না। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র চিরকগ্ন। স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংসারে তিনি, সংসার বিরাগী উদাসীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সাত আট বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি দুরূহ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। চক্ষু রোগেও তিনি বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন। তারপর বৃদ্ধ বয়সের রোগে (Enlarged Prostrate)এ একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন ও তার দেহে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। অস্ত্রোপচারের প্রায় দুই মাস পরে ৮ই মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

রহস্যময়ী পদ্মা

আমি তাঁহার এক অকৃতী অধম ছাত্র। তিনি অয়েল-পেন্টার ছিলেন, আমি তাহা নই, তিনি সাধারণতঃ পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টার, আমি তাহাও নই। আমার অঙ্কন পদ্ধতি ভিন্ন, আমার কর্ম্মপন্থাও পৃথক। তথাপি আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজেকে যামিনীপ্রকাশের শিষ্য বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়া যাইব।

রবিবাসরে পঠিত

ময়ূরাক্ষীর শৃঙ্খল বন্ধন

শ্রীচিন্ময়কুমার রায় আই-এ-এস্

বিহারে মশান জোড়ে ক্ষুদ্র পল্লী মাঝে
সুপ্তির স্তব্ধতা ভেদি কর্ম্মধ্বনি বাজে।
ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টর করে দরাদরি
পাঞ্জাবী মাদ্রাজী আর বাঙালী বিহারী
কোল ভীল সাঁওতাল আরও কত শত
ছোট বড় নরনারী কর্ম্মে অনুরত।
প্রস্তরের আবেষ্টনে গতি অবরোধি
সযতনে বাঁধে তারা ময়ূরাক্ষী নদী
গ্রীষ্মকালে শীর্ণকায়া বরষায় স্ফীত
উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি হবে নিয়োজিত
নানা দিকে নানা ভাবে দেশের কল্যাণে
মশানজোড় মুখরিত আজি সেই গানে।

এ মহা কল্যাণ-যজ্ঞ হেরি জাগে প্রাণে
যে কথা লিখিত আছে রামায়ণ গানে
উচ্ছৃঙ্খল স্ফীত বক্ষ দমনের লাগি
শত শত নরনারী দিবানিশি জাগি
বিশ্বের কল্যাণ তরে অতীতের কালে
সমুদ্র বাঁধিয়াছিল শৃঙ্খলার জালে।
বিশ্বের কল্যাণ যজ্ঞে হইয়া প্রণত
উত্তাল তরঙ্গ করি শান্ত সমাহত
সমুদ্র করিল যবে বন্ধন স্বীকার
প্রচারিল এই বার্ত্তা বিশ্বে বারম্বার
বাহিরের আবেষ্টনী বাঁধে বারে বারে
অখণ্ড অনন্ত প্রাণে কে বাঁধিতে পারে ?

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভগবতীর জ্বর হইয়াছে—

দুই তিন দিনের মধ্যে বুকে একটু বেদনা ও শ্লেষ্মার প্রকোপ দেখা গেল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া ভগবতীকে হতচেতন করিয়া ফেলিল। শশধর ও পরিবারের সকলের মুখেই দুর্য্যোগের কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। ভগবতীর বয়স হইয়াছে, প্রবল রোগের সহিত লড়াই করিবার শক্তি আর তাহার নাই।

দিগর গ্রাম হইতে কবিরাজ আসিয়াছেন, তিনি মাথা নাড়িয়া একটু বিষণ্ণ মুখেই কহিলেন—সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে জ্বর বিকার।

ঔষধ পথ্য সবই চলিল, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ গুরুতর বিকারে পরিণত হইল এবং পরদিন সকালে হতচেতন ভগবতীর শয্যার পার্শ্বে শশধর তাহার মাতা ও পিসিমা উদ্বেগ মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—বনলতা দেয়ালের কোণ ঘেষিয়া একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে। অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা এখনও যেন অনেকটা উদাসীন। মতিঠাকুর কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া উপস্থিত হইলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মতিঠাকুর মহাশয়কে সংক্ষেপে কহিলেন—এখন সূচিকাভরণ দেওয়া ছাড়া পথ নাই।

মতিঠাকুর চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কিছু না বলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া বাহিরে আসিলেন। কবিরাজকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া জল গড়াইয়া পড়িল—ভগবতী তাঁহার অতি আপনার প্রিয়জন চিরদিনের মত বিদায় লইতে বসিয়াছে—

চণ্ডীমণ্ডপে নটবর নীলমণি প্রভৃতি সকলে কর্ত্তার সংবাদের জন্য বসিয়াছিল। তাহারা প্রশ্ন করিল—ঠাকুর মশায়, কর্ত্তা কেমন ?

মতিঠাকুর অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন—সূচিকাভরণ ব্যবস্থা করলেন ক'বরেজ মশায়।

নীলমণি বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সূচিকাভরণ কথাটার তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিয়াছিল। নব তাঁতি, গোবিন্দ প্রভৃতি পুনরায় প্রশ্ন করিল—এখন কেমন ?

মতিঠাকুর কহিলেন—নাড়ীটা কচিৎ ছিন্ন, কচিৎ ভিন্ন, এখন ভগবান যা করেন। মতিঠাকুর আর একবার অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া যেন সবল হইতে চাহিলেন কিন্তু কোনমতেই অশ্রু দমন করা যায় না। তিনি প্রবেশদ্বারে ক্ষণিক দাড়াইয়া রহিলেন—তাহার পর সারদা প্রভৃতি কয়েকজন নিঃশব্দে ঠাকুর মশায়ের পিছন পিছন অন্দরে ঢুকিল।

চণ্ডীমণ্ডপে নীলমণি কহিল—হ্যাঁ নটবরদা, কর্ত্তা কি বাঁচবেক নাই ?

নটবর জিভ কাটিয়া কহিল—সে কি ? কর্ত্তা না বাঁচলে মোরা সব ত ম'রবেক—ভগবান কি এমনি করবেক ?

ভগবতীর সংবাদ লইতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে বহু লোক সমাগম হইল। সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সংবাদের অপেক্ষা করিতেছে—

বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা গেল—বাবা, বাবা গো—

নটবর চোখে কাপড়ের খুঁট দিয়া কহিল—নীলমণি কর্ত্তা ত আর নাই রে—আর নাই—

চণ্ডীমণ্ডপে ব্যথিত কণ্ঠের একটা কলগুঞ্জন উঠিল—কর্ত্তা নাই—কর্ত্তা নাই !

সেই সময়ে শশধর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির বাড়ীর উঠানে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা গো—কোথায় গেলে গো—বাবা—

নীলমণি প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কহিল—বড়দা, বড়দা—কি হ'ল বটে ! কি হ'ল !

মতিঠাকুর মশায় ছুটিয়া আসিয়া শশধরকে বুকের মাঝে টানিয়া আনিয়া কহিলেন—বাবা কেঁদো না। জগতের গতি এই—আত্মা অমর, দেহ পুরাতন হলে আত্মা তা ত্যাগ করে নূতন দেহ গ্রহণ করে, যেমন আমরা পুরাতন বস্ত্র ফেলে নতুন বস্ত্র পরি। তুমি অধীর হয়ো না বাবা, অধীর হয়ো না। জন্ম হলেই মৃত্যু হয় ; দেহ থাকলেই ব্যাধি হয় তার জন্যে শোচনা করা ভুল—বাবা—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুব জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

সান্ত্বনা দিতে দিতে মতিঠাকুর মহাশয় নিজেই কাঁদিতে লাগিলেন—আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শশধর পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—বাবা গো, আমি কি করবো, আমি কেমন করে থাক্‌বো—

নীলমণি অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিল—বড়দা মোরা আছি ডর কি? আমরা জান দেবেক—ডর কি?

সমবেত জনতা একসঙ্গে কহিয়া উঠিল—জান দেবেক বড়দা, জান দেবেক—ডর কি?

নীলমণি কহিল—কর্ত্তা ছেড়ে চল্‌লেক বড়দা, মোরা আছি—

সমবেত জনতা কহিল—কর্ত্তা ত মোদের ধরম বাপ বড়দা—মোরা জান দেবেক—

ভগবতীর মৃত্যু সংবাদ দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়া গেল। বাগ্দী কুর্ম্মী পাড়ার কামিনরা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মোদের ধরম বাপ্‌ ম'রলেক রে!

আদুরী পাড়ায় ধান ভানিতেছিল, সে ঢেঁকি হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে ছুটিল। ভরত উঠানে বসিয়া ঝুড়ি বুনাইতেছিল। আদুরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—ভরত তু হেথা রে! কর্ত্তা চলে গেল রে—

ভরত চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কর্ত্তা সরলেক আদুরী! মোর বাপ ম'রলেক রে—মোর বাপ ম'রলেক—

ভরত সাশ্রুনেত্রে দ্রুত চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল।

গঙ্গাতীর বার ক্রোশ দূরে—

দাহ কার্য্য কোথায় হইবে তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নীলমণি কহিল—কর্ত্তার পুণ্যির দেহ মোরা গঙ্গাতীরে দেবেক। হেথা দেবেক নাই—

মতিঠাকুর কহিলেন—কিন্তু শশধর?

নটবর আগাইয়া আসিয়া কহিল—কাঁধে করে লেবেক ঠাকুর মশায়, কাঁধে করে পাল্কী করে লেবেক, গঙ্গাতীরে মোরা যাবেকই—

গঙ্গাতীরেই যাওয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের সমস্ত সবলদেহ পুরুষ খোল করতাল নিশান প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইল। গ্রামান্তের প্রজারা নিশান করতাল লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক লোক জড় হইয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কহিলেন—এত লোক যেয়ে কি হবে নীলমণি। তোমাদের অর্দ্ধেক গেলেই যথেষ্ট—নটবর তোরা আর যাস্‌ না—

নটবর কহিল—কর্ত্তার সাথে মোরা যাবেক নাই? মোরা যাবেকই।

কেহই থাকিতে সম্মত হইল না, কর্ত্তার শবানুগমন করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর, আজকার এই দুর্য্যোগে তাহারা কেহই পিছাইয়া থাকিতে পারে না। ভগবতী তাহাদের পিতৃতুল্য, তাহার শবানুগমন তাহাদের অবশ্য করণীয়।

সহস্রাধিক লোকের এক শব শোভাযাত্রা কীর্ত্তনসহ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া চণ্ডীতলার পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল সহস্রাধিক নারী—তাহাদের চোখ দিয়া অবিরল অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে—

আদুরী তাহার মায়ের কাঁধে ভর দিয়া আকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—মোরা সাতপুরুষের বাপ্‌ হারালেক রে! বাপ্‌ হারালেক।

আদুরীর কথায় সমবেত জনতা, আর একবার কাঁদিয়া উঠিল—তাহারা সকলেই যেন আজ পিতৃহারা হইয়াছে।

তিরিশ বছর পরের কথা।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। সর্পিল সড়ক গিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তের বুক চিরিয়া—কলিকাতা হইতে পেশোয়ার—তাহার আশে পাশে নীল আকাশের কোলে দেখা যায় চিম্‌নি—চিম্‌নি-নিঃসৃত কয়লার ধোঁয়া, পরিচ্ছন্ন আকাশের কোলে কলঙ্ক রেখার মত। আশে পাশে কয়লার খাদ—উপরে চক্রের আবর্ত্তন ভূগর্ভের কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে—রাস্তা দিয়া চলে গাড়ী, মোটর, পাশে পাশে ছোটে রেলগাড়ী—দেশ দেশান্তরে চলে লোকজন পণ্যদ্রব্য। দেশে নতুন বিদ্যা, নতুন ব্যবস্থা চলিয়াছে দ্রুত, সাহেবগণকে সকলে সমীহ ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইংরেজী জানা ও বলাটাই আজ শিক্ষার লক্ষণ। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আজ হইয়াছেন সংস্কারান্ধ মূর্খ।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন যাহারা তাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ গ্রামের লোক। ক্ষয়িষ্ণু ছোটলোকের পাড়ায় আছে কয়েক ঘর লোক—কতক এখানে ওখানে চলিয়া গিয়াছে, কতক গিয়াছে, কলে বা খাদে কাজ করিতে আর যাহারা রহিয়াছে তাহারা চাষ করে। যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে নীলমণির ছেলে শিবদাস, নটবরের ছেলে নিতাই, আর ভরত-আদুরীর ছেলে বলাই উল্লেখযোগ্য। বলাইএর ভগ্নি, তথা আদুরীর কনিষ্ঠা কন্যা এই সেদিন পলাশডাঙ্গায় মথুরকে সাঙ্গা করিয়া সেই গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটা ইতিহাস আছে—

ভরতের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই আদুরীর মৃত্যু হয়, তখন কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী ষোড়শী কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ। তখন স্বজাতি মোড়লগণ ব্যবস্থা দিয়া সরোজকে এই সাঙ্গার অনুমতি দেয়। সরোজ সাঙ্গার বিবাহে কাপড় জামা এবং কিছু গহনা পাইয়াছে—

বৃদ্ধপ্রায় শশধর জমিদারী দেখে, বৃদ্ধ গোপাল তাহার পুরোহিত। চাঁদমোহন ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া কলিকাতার চাকুরী করে, বেশ মোটা রোজগার। মতিঠাকুর মহাশয়ের পুত্র হরিহরও বিদেশে চাকুরী করে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে।

তাঁতি, তিলি প্রভৃতি নবশাক পাড়ার অনেকে চলিয়া গিয়াছে—কেহ কেহ এখনও আছে, দোকান, চাষ বা সামান্য পৈতৃক ব্যবসায় লইয়া। মাঝে মাঝে দুই একখানা প'ড়ো বাড়ী—কেহ বা ফৌৎ হইয়া গিয়াছে, কেহ বা শহরে বসবাস করিতেছে, গ্রামের বাড়ী পরিত্যক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। শশধরের দুই পুত্র স্কুলে পড়িতেছে—একজন শীঘ্রই এক পাশ দিয়া কলেজে প্রবেশ করিবে।

চণ্ডীমণ্ডপে আর পাশার আড্ডা বসে না। সে সময় আর কাহারও নাই, পূজার বন্ধে বা কোন কোন উৎসবে তাস প্রভৃতি খেলা হয়। ভাগবত, রামায়ণ-গান এখন আর কেহ শুনে না—এদিকে ওদিকে সখের থিয়েটার বা অপেরা শুনিতে যায়। শশধর সাবেক নিয়মেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বনলতা গৃহিণী, পূজাপার্ব্বণের কোনটি বাদ না পড়ে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য।

মাটির দেয়াল খড়ের চাল, রেড়ির তৈলের প্রদীপ নাই। এখন টিনের চাল, হ্যারিকেন লণ্ঠন ও উৎসবে গ্যাস বাতি জ্বলে।

পূজা আসিয়াছে—

চাঁদমোহন আজ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবেন। চারি ক্রোশ দূরে রেল ষ্টেশন, দুই জোড়া গাড়ী পাঠান হইয়াছে। সকলে সাতটার গাড়ীতে পৌছিবেন এবং বেলা দশটা নাগাদ গ্রামে পৌছিবেন। শশধর সকাল হইতে ব্যস্তভাবে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, ভ্রাতার খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছেন। দোতলায় দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘর তাহাদের জন্য নূতন করিয়া সাজান হইতেছে। চাঁদমোহন, তাহার কুমারী কন্যা লতিকা, পুত্র প্রভাত আসিবেন। তাহারা শহরে থাকিতে অভ্যস্ত, গ্রামে যেন কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে শশধর যত্নবান।

শশধরের পুত্র কানু ও কালো চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত যাইয়া কাকার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ভিতরে চাকর চরণ ও ঝি বিন্দুকে সব বুঝাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল। পূজায় কয়লা, কাঠ, চাউল, পাঁঠা, কাপড় প্রভৃতি বহু দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পূজার দালান ও সংলগ্ন উঠান পরিষ্কার করিতে হইবে, বোধনতলা তৈয়ারী করিতে হইবে। শশধর ব্যস্তভাবে পূজার চাকরাণ জমি ভোজী লোকজনকে খাটাইতেছেন, এমন সময় কানু আসিয়া সংবাদ দিল—কাকা আসছেন, কাকীমা, লতিকাদি, প্রভাতদা সব।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদমোহনের গাড়ী বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। তিনি তাহার দেহটাকে সযত্নে এবং ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া কহিলেন—বাবা, একি আসা যায়? দেহ আর নেই—গরুর গাড়ীতে কি মানুষে আসে।

শশধর ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কেন কষ্ট হ'য়েছে খুব?

—বাবাঃ, এত কষ্টে আর বাড়ী আসা চলে না। চাঁদমোহন শশধরের পায়ের নিকট মাথাটা একটু নোয়াইয়া কহিল—তিনদিন যাবে গায়ের ব্যথা ম'রতে—

লতিকা ও প্রভাত নামিয়া জেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বধূ মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া বাড়ির ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। শশধর ও উপস্থিত লোক সবিস্ময়ে দেখিল লতিকার পায়ে জুতা! মেয়েরা জুতা পায় দেয় বা দিতে পারে, একথা এ গ্রামে কেহ পূর্ব্বে ভাবে নাই।

চাঁদমোহনের স্ত্রী কলিকাতার না হইলেও ঐ অঞ্চলের মেয়ে। তাহার নাম কি তাহার প্রয়োজন নাই, তিনি লতার মা বা ছোটবৌ বলিয়াই সমধিক পরিচিতা। তিনি অন্দরে প্রবেশ করিয়া বনলতার পায়ের কাছে অনিচ্ছাকৃত একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন—ওঁকে একশ'বার বলি, এমন দেশে আসা বাবা আমার পোষায় না। গরুর গাড়ীতে কি মানুষে চড়ে, হাত পা সব বেদনায় বিষ হ'য়ে উঠেছে—

বনলতা কহিলেন—ও কথা ব'লতে নেই ছোট-বৌ। শ্বশুরের ভিটেয় কষ্ট করেও ত আসতে হয়। তিনি কত করেছেন আমাদের জন্যে। তা এখন জিরিয়ে নাও—সব সেরে যাবে—

লতিকা জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে গেলে বনলতা কহিল—লতা মা জুতো ছেড়ে এসো, জুতো পায় ছুঁয়ো না, ঠাকুর ঘরে যাবো—

লতা থামিয়া গেল—অর্থটা যেন এইরূপ যে জুতা ছাড়িয়া প্রণাম করিতে হইলে সে করিতে প্রস্তুত নয়। ছোট-বৌ ধমক দিয়া কহিলেন—এটা কলকাতা নয়। জুতো এখানে পরতে পাবিনে, যেখানে যেমন সেখানে তেমন ক'রতে হয়। জুতো ছেড়ে প্রণাম কর—

লতিকা জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু সে প্রণাম একান্তই শুষ্ক। বনলতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—হ্যাঁমা, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পূজোর দিন, এখন ছোঁয়া মেশা হ'য়ে যাবে—

প্রভাত কহিল—জুতো পায়ে দিয়ে ছুলেই কি জাত যায় জেঠিমা—ও সব বাজে—আমরা মানি না—

বনলতা কহিলেন—তা বাবা তোমরা না হয় মেনো না, কিন্তু পুজোর কটা দিন ত মান্‌তেই হবে।

যাহা হউক ঠাকুরের ভোগের দালান, রান্নাঘর প্রভৃতিতে জুতা না চলিলেও জুতা ব্যবহার চলিতে লাগিল। পাড়ার মেয়েরা বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—চাঁদমোহন ত মেয়েকে মেমসাহেব করিয়াছে। ছেলেরা না হয় জুতা পরুক, কিন্তু মেয়েরা কেন?

আজ ষষ্ঠীর বোধন।

গোপাল সকালে বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া দেবীর আহ্বান করিয়াছে। যথা সময়ে ঘটস্থাপন প্রভৃতি শেষ করিয়া গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছিল। শশধর আসিয়া কহিল—ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠান্তে একবার বৈঠকখানায় যাবেন।

গোপাল শুনিল, কিন্তু চণ্ডীপাঠ ত্যাগ করিয়া কোন জবাব দিল না। চণ্ডীপাঠ সমাপনান্তে গোপাল বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। শশধর ও চাঁদমোহন দুই ভাই বসিয়া কি যেন একটা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, গোপালকে দেখিয়া উভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছে। শশধর একটু বিষণ্ণ মুখে কহিল—ঠাকুরমশায়, চাঁদ বল্‌ছে তিনদিন গ্রামের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ ক'রবার দরকার নেই—আপনি কি বলেন?

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিল—কেন? হঠাৎ এ রকম হবার কারণ কি? জন্মাবধি আমরা দেখ্‌ছি পূজার তিনদিন গ্রামে কারো হাঁড়ি চড়ে না। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কর্ত্তা ত তাঁর সঙ্গে কিছুই নিয়ে যান্‌নি, তা ছাড়া চাঁদ ত কিছু রোজগার করে—তবে?

—টাকা থাকলেই সব খরচ ক'রে ফেল্‌তে হবে এমন কিছু নয়। আর সারাগ্রাম না খাওয়ালে পূজা করা যাবে না এমনও কিছু ত নয়। আমি বলছি, বরং যাদের ব'লবো তাদের ভাল করে খাওয়াবো—নতুন জিনিষ যা খায়নি কোনদিন—

গোপাল অদূরে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল—কিন্তু সারাগ্রাম আশা করে আছে। একদিন গ্রামের ইতর ভদ্র একত্র হবে, এই ত চলে আস্‌ছে—

শশধর কহিল—নবমীতে যাত্রাগানেও ওর মত নেই, পূজা অঙ্গেও ও ফন্দ কমাতে ব'লছে—শাড়ী, কাপড়, দক্ষিণা—

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিল—কেন? এ সব কেন হবে তা'ত আমি বুঝতে পারি না। কর্ত্তার সমস্ত সম্পত্তিই আছে, সবই আছে অথচ হবে না কেন?

চাঁদু কহিল—জমিদারীটা বাবা রেখে গেছেন, পরকে খাইয়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে ত নয়। আমাদের বড় হতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। সময় বদলে গেছে—এখন

কলকাতায় আমাকে একখানা বাড়ী করতে হবে, ছেলেকে পড়াতে হবে। চাষাভূষো খাইয়ে নিজের পরকাল খোয়াতে ত আমি পারবো না? নামের জন্যে হয়ত পূজাটা করা দরকার, তাই বলে বাজে লোক খাওয়াতে হবে কেন?

গোপাল কহিল—মানুষ কখনও বাজে হয় না চাঁদু। তাদের উপরেই তোমার জমিদারী, তাদের তোমাকে রক্ষা করতে হবে, খাওয়াতে হবে, তবেই তোমার জমিদারী থাকবে। কাউকে বঞ্চিত করে বড় হওয়া ত বড় হওয়া নয়, সকলকে রক্ষা করে, সকলের মঙ্গল করে বড় হওয়াই প্রকৃত বড় হওয়া।

চাঁদু হাসিয়া কহিল - ঠাকুরমশায় তাকি হয়, পাঁচশ টাকা পাঁচজনে ভাগ করলে হয় একশো, আর পাঁচশ লোকের কাছ থেকে এক টাকা করে নিলেই পাঁচশ টাকা হয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, survival of the fittest যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাকে। ব্যাং মশা খায়, সাপে ব্যাং খায়, গোসাপে সাপ খায়, মানুষে গোসাপ খায়, এমনি করে যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাক্‌বে, যার শক্তি নেই সে লোপ পায়। কাজেই শক্তি অর্জ্জন করা দরকার, আজকার শক্তি হচ্ছে ধনশক্তি, কাজেই তার অপচয় করা কি ঠিক? যে অপচয় করবে সে বেকুব—

গোপাল কহিল—কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে সমাজ-কল্যাণের শক্তিই শক্তি, আর ধনও সমাজমঙ্গলের জন্যে। তোমার শক্তি ধন বিদ্যা বুদ্ধি তোমাকে বড় করে যদি অন্যকে নিষ্পিষ্ট করে তবে সে শক্তি আসুরিক, তা দানবিক, সেটা মানুষের ধর্ম্ম নয়—আমরা শাস্ত্রে এই শিক্ষাই পেয়েছি—

চাঁদু হাসিয়া কহিল—শাস্ত্র ত ব্রাহ্মণগণেরই সৃষ্টি, তাঁরা তাঁদের সুবিধামতই বচন দিয়ে গেছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেই ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে—কেন? গরীবকে দান করলেই ত ভাল। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই ত ব্রাহ্মণকে দানের কথা বলেছেন—

গোপাল প্রতিবাদ করিলেন—তা নয় চাঁদু, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্জ্জন ক'রে, সমাজ সেবা করেন। নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানমত সমাজকল্যাণের পরামর্শ দেন, তাই—সমাজ তাকে ভরণ-পোষণ করে দানের দ্বারা—সেটা পূজানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তারা পান এবং পূজানুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের ধর্ম্ম-প্রাণতাকে রক্ষা করেন।

চাঁদু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—সেইজন্যেই ত পূজার ফর্দ্দটা অত মোটা, শাড়ী ১০, ধুতি ১২ ইত্যাদি। কিন্তু দেবতা কাপড় পরেন না—পরেন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রটা ব্রাহ্মণগণ রচিত বলেই এমনি তা বুঝ্‌তে পারেন?

গোপাল হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন, চাঁদুর এই যুক্তির বিরুদ্ধে তাহার যুক্তির অভাব ছিল না কিন্তু গোপাল তাহা বলিলেন না। তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—যে দান তিনি এতদিন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ছিল শ্রদ্ধার দান, আজ তিনি যাহা পাইবেন তাহা একান্তই অনুগ্রহের দান। অকস্মাৎ মনের মাঝে এই কথাটা যেন তীব্র দংশন করিয়া সহসা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এমন কথা গোপাল জীবনে শুনেন নাই।

চাঁদু কহিল—আপনি পূজায় যথেষ্ট পাচ্ছেন ঠাকুরমশায়, কিন্তু সমাজের কি সেবা আপনি করেন—বলুন!

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—শাস্ত্রমত সংবুদ্ধি দান করি, শাস্ত্রের কথা বলি, লোককে শাস্ত্রমত কাজ করতে বলি, এইত আমাদের সেবা!

চাঁদু কহিল—হাঁ তাই, সকলকে খাইয়ে ফতুর হওয়ার সৎপরামর্শ দাদাকে দিচ্ছেন। এমনি করলে জমিদারী কদিন থাক্‌বে—

গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আকস্মিক ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল, তিনি আবেগ ভরে কহিলেন—বাবা চাঁদু, তোমরা কেমন শিক্ষা বা কি শিক্ষা পেয়েছ জানিনা, তবে আমরা যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার বাবা বেঁচে থাক্‌তে আমার দাদা মতিঠাকুরমশায় এই যুক্তিই দিতেন, কিন্তু তাতে তার জমিদারী নষ্ট হয়নি বরং দিনে দিনে বেড়েই গিয়েছিল। তার ডাকে দশহাজার লোক প্রাণ দিত। আমার গুরু সেই মতিঠাকুরমশায়, আমি যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম, সে সময়ে এমনিই হত এতদিন তাই হ'য়েছে। তোমরা এখন যা ভাল বুঝবে তাই করবে। যে সময় এসেছে, যে সমাজ এসেছে তাতে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আর কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না—

গোপালঠাকুর গভীর বেদনা ও অসম্মানের দুঃসহ বোঝা বুকে লইয়া আরক্ত সাশ্রুনেত্রে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আজ অকস্মাৎ পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে—উদরান্নের জন্য অনুগ্রহের দান তাঁহাকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে? অত্যন্ত অশ্রদ্ধা অবহেলা ও করুণা মিশ্রিত দান তিনি কেমন করিয়া দু'হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বৌদ্ধ পুরোহিতগুলি স্তবগানের পর সুর ক'রে আবৃত্তি সুরু করলেন যাকে ইংরাজিতে বলে in cantation : সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চমকে উঠলাম—ও কি ?—প্রতি মোহান্ত এক হাতে তুলে ধরলেন আমাদের দেশের তালপাতায় লেখা চণ্ডীর মতন এক একটি বই ও বইয়ের পাতা ঝ'রে পড়তে লাগল জলপ্রপাতের মতন নিচের হাতে। একবার ডান হাত উপরে ওঠে তখন বাঁ হাত নিচে থেকে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি ধরে, যেমন যাদুকর ধরে এক হাতে অপর হাত থেকে টানা তাস—তারপরে বাঁ হাত উপরে ওঠে তখন ডান হাত ধরে নিচে থেকে। বুঝলাম এও ওদের একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। কিন্তু তারপরে যখন ওরা প্রত্যেকে ঝঙ্কার সুরু ক'রে দিল মাঙ্গ, আঙ্গ-ই, আঙ্গ-ই-ই ব'লে তখন আর পারলাম না। পিতৃদেবের গান মনে পড়ল, দিলাম "চম্পট পরিপাটি।"

মোহান্ত বন্ধুকে কিছু বললাম না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল—কেন এ ধরণের প্রাণহীন মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি তাঁরা জীইয়ে রেখেছেন। বাড়ি এসে বন্ধুবর রাজদূতকে বললাম। যে জাপানে দেখলাম দুটি জিনিষ : সৌন্দর্যপূজা অতিজীবন্ত, তথা দেবপূজা মৃত না হোক জীবন্মৃত। অথচ মনে হয় এক সময়ে এ-সব মন্ত্রপাঠের পিছনে ছিল প্রাণশক্তি—যখন অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসুর দল ভগবানকে উপাসনা করত অন্তরকে অঞ্জলি দিয়ে, বাইরের আনুষ্ঠানিক তাকে এত বড় ক'রে না দেখে। তবে এ-বিষয়ে আমার ধারণা ভুল হ'তে পারে। তাই যেন হয়। কারণ ভাবতে খারাপ লাগে—মন্দির আছে, প্রতিমা আছে, পুরোহিত আছে, মন্ত্রপাঠ আছে—নেই কেবল হৃদয়ের কোনো বালাই। ধর্ম যে আজকের দিনে অধিকাংশ চিন্তাশীল তথা সচেতন মনের কাছে অগ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে তার একটি মস্ত হেতু নিশ্চয়ই এই প্রাণহীন আবৃত্তি, গতানুগতিক মন্ত্রপাঠ, অর্থহীন পুষ্পাঞ্জলি—এক কথায় শুষ্ক লোকাচার। কিন্তু তবু বলব ভারতে এখনো ধর্ম জীবন্ত—নানা তিথিতে স্নানার্থীর ভিড়, কুম্ভমেলায় সাধুসন্তের সমাবেশ, নানা মন্দিরে নানা উৎসবে বহু ভক্তের সাগ্রহ অভিযান, তীর্থযাত্রায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারও পদব্রজে বহু কষ্টের দুরাভিসার ইত্যাদি কোন্ বাণী জ্ঞাপন করে ? সে লোকাচার বহুক্ষেত্রেই প্রাণবত্তাকে নিষ্প্রভ করলেও বহু ধর্মার্থীর অন্তরে ধর্মানুরাগ এখনো বেঁচে আছে। আমি একথা প্রমাণ করতে পারব না তবে মনে হয় কোনো চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ মানুষ যদি আজকের দিনেও নিস্পৃহভাবে চোখ চেয়ে দেখেন জাপানের ধর্মাচার ও আমাদের দেশের ধর্মানুরক্তি তাহ'লে তিনি মানবেনই মানবেন যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা শোচনীয় জীবন্মৃত—যেখানে ভারতে এই অধঃপতিত যুগেও সে আছে বেঁচে...এমন কি বাইরে

টোকিয়োর কাবুকি মিউজিয়াম

যাঁরা দেখতে অবিশ্বাসী তাঁদের মধ্যেও সবাই না হোক্ অনেকেই সত্য সাধু দেখলে মাথা নোয়ান। শক্তি ও ধনের প্রতিপত্তি অন্য দেশে যে ভাবে সমীহ পায় তার চেয়েও বেশি সমীহ পায় আমাদের দেশে খাঁটি সাধু, নির্ভেজাল ঋষি, আন্তরিক ভক্ত। জাপানে এসে যেন তার ভাব একটা নতুন চোখে দেখতে শিখলাম। মনে হ'ল শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দ নিছক দেশভক্তিবশেই এ ঘোষণা করেন নি যে ভারতের প্রাণপুরুষ আজও বিরাজ করছে তার শিল্পে নয়, কলকারখানায় নয়, বৈভবে নয়, এমন কি বুদ্ধিবাদী দর্শনের গবেষণায়ও নয়—ভারতের প্রাণপুরুষ আজও ধুক ধুক

করছে তার অন্তরাত্মানিহিত বৈরাগ্য ও ভক্তির মণিকোঠায়। য়ুরোপে মঠ-আদি প্রতিষ্ঠান জীবন্মৃত, জাপানে পূজারতি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত কিন্তু ভারতে ধর্ম আজও জীবন্ত—ভক্তি জ্ঞান ঐশীপ্রেমে শ্রদ্ধা আজও দীপ্তিময়ী না হ'লেও প্রাণের উত্তাপে সমাদৃত, বিশ্বাসের সিঞ্চনে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

* * * *

বন্ধুবর রাউফকে বললাম: জাপানী অভিনয় ও নৃত্যগীত দেখতে হবে। তিনি টোকিয়োর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতবড় থিয়েটারে একটিও আসন খালি ছিল না। তবু ওরা রাজদূতকে খাতির করল বৈ কি। চারটে স্পেশাল চেয়ার এনে সামনে বসাল। আমি, ইন্দিরা, ডাক্তার রাউফ ও নায়ার। নায়ার জাপানী জানেন ব'লে একটু সুবিধা হ'ল।

জাপানে কাবুকি অভিনেত্রী

নাটকটির নাম যুকি গুমি, মানে তুষার পরিষৎ। নাটকটির গল্প ছেলেমানুষি! জাভার স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটি অতি বাজে প্লট। অভিনয় ভালো লাগল কিন্তু তাকে য়ুরোপীয় অভিনয়ের নিপুণ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেবল আমি একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম: জাপানীরা খুব হাসে। একটি দৃশ্যে কেবলই হাসির গররা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখি ওরা কান্নাও সমান ভালোবাসে। নায়িকা কী কান্নাই কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—আর যখন তখন! আর শুধু কি নায়িকা? অমন যে পাষাণ গোয়েন্দা—যে মেরে ফেলল নায়িকাকে সে-ও কেঁদেই অস্থির! মেলোড্রামা বলতাম, যদি নাটিকাটির প্রায় গাছপালাও না নাচত। উঃ, কথায় কথায় নাচ! সঙ্গে নির্ভেজাল য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত ওরফে অর্কেস্ট্রা। জাপানী নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত য়ুরোপীয় হার্মনি—য়ুরোপীয় ঢঙের পরিচালনা—পিয়ানো বেহালা বাঁশি—সব য়ুরোপীয়। কেবল পোষাক ও ভাষা ছাড়া জাপানী কিছুই নেই এদের আধুনিক গীতিনাট্যে। বইয়ে পড়েছিলাম জাপানী সঙ্গীত ব'লে বিশেষ কিছু নেই, মানে যা আছে সে না থাকলেই জাপানের মর্যাদা বাড়ত। কিন্তু বইয়ে পড়া এক, আর চোখে দেখা আর। এ নাট্য-নৃত্যটি যে আজও য়ুরোপীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউজিকাল কমেডির তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ! অবশ্য বেশভূষার চমক, আলোর জৌলুস, দৃশ্যের নৈপুণ্য—যেমন একটি ঝড়ের দৃশ্য, সমুদ্রের ধারে—মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু কোথায় নাটকীয় সংঘাত, অভিনয়-চাতুর্য, নৃত্যগীতের বৈশিষ্ট্য? আঃ! জাপানী অভিনয় মনকে আবিষ্ট করতে পারে না। সবচেয়ে আক্ষেপ হ'ল দেখে যে জাপানী গানবাজনা ব'লে কিছুই নেই জাপানী নাট্যনৃত্যে। চোখ বুঝলে এ গানবাজনা শুনতে শুনতে মনে হয় কোনো য়ুরোপীয় শহরে ব'সে আছি। মানুষের বুদ্ধিরও হয়ত নানারকম সংস্কার আছে, হয়ত কোনো চিন্তাই পুরোপুরি স্বাধীন নয়, কিন্তু তবু একটা কথা বোধহয় বলা চলে: জগতে সব জাতির আচার, সংস্কৃতি, বেশভূষা, চালচলন, প্রকাশরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু একই ধরণের হ'লে তাতে ক'রে বিশ্বমানবের ক্ষতি বৈ লাভ নেই। তাই জাপানী গৃহসজ্জা, ভাষালাবণ্য, চিত্রকারু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যে ও সৌন্দর্যে যে-পরিমাণে মুগ্ধ হয়েছিলাম জাপানী নাট্যনৃত্যে তথা সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যহীনতায় সেই পরিমাণেই আহত হ'তে হ'ল।

ডাক্তার রাউফ তথা নায়ার বললেন, জাপানী কাবুকি নৃত্যে মিলবে যা আমি চাইছি—জাপানের জাপানিত্ব। তথাস্তু: গেলাম কাবুকি নাট্যালয়ে কাবুকি নাট্যানন্দ উপভোগ করতে।

কিন্তু ও মা! এ কী কাণ্ড! কোথায় নাটক, কোথায় সঙ্গীত, কোথায় অভিনয়! আছে শুধু দৃশ্য ও আলোর বাহার। ব্যস্‌। যেমন অসহ্য ন্যাকামি-ভরা এদের সেকেলে অভিনয়, স্বরভঙ্গি, প্রসাধন, সর্বোপরি দুঃসহ জাপানী গান ও সামিসেন বাদন—তেমনি অর্থহীন এদের নাটকীয় গল্প বা প্লট। একটি মাত্র একাঙ্কিকা নাটিকার গল্প সংক্ষেপে বলি। এক যে ছিল জাপানী কুমারী। ভালোবাসলে এক জাপানী বীরবংশীয় অভিজাতকে। প্রণয়ীর ভালোবাসা সত্য কি না পরখ ক'রে কুমারী ভেঙে ফেললেন তাদের বাড়ির একটি রঙীন রেকাবি। প্রণয়ী বিরক্ত হ'লেও ক্ষমা করলেন অসাবধান প্রণয়িনীকে। কিন্তু পরে যেই

প্রণয়িনী বললেন তিনি প্রণয়ীর প্রণয়কে পরখ করতেই রেকাবি ভেঙেছেন অম্‌নি তাকে কেটে ফেলে সাম্‌নের আঙিনায় একটি কুয়োয় কবরস্থ ক'রে ছুটলেন কোথায় লড়াই হচ্ছিল সেখানে। বীর বটে! সাবাস জোয়ান! নারীকে এক সময়ে নর হয়ত এই চোখেই দেখত—স্বেচ্ছাচারী খেয়ালের পুতুল—কিন্তু এখনো সে-ভাব কি রঙ্গমঞ্চে দেখাতে পারে কেউ?

আর একটি নাটিকারও অম্‌নিতরই প্লট্। মন থই পায় না—এরি নাম বিখ্যাত কাবুকি! এ যে উন্মাদের প্রলাপ গো! বহু চেষ্টা করলাম এসব কুলীন সেকেলে অভিনয়কে ঠিক চোখে দেখতে। কিন্তু পারলাম না। দুটি একাঙ্কিকা নাটিকা দেখে বললাম ডাক্তার রাউফকে: আর বরদাস্ত হচ্ছে না—চলুন।

আমরা যতই বড়াই করি না কেন পুরাকাহিনী নিয়ে, একটা কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে কালিদাস মিথ্যা বলেন নি: "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম"। যেমন একালেরও সব কিছুই সাধু নয়, তেমনি সেকালেরও সব কিছু প্রশংস ছিল না: কিছু পাই কিছু হারাই দিনে দিনে, কিন্তু তবু যা ছিল তাকে পুরোপুরি বজায় রাখা যায় না: অত্যাধুনিকতা আমাদের চাকে, অতীতও ডাকে। চাই দুয়ের সামঞ্জস্য-সাধন। জাপানী নাট্যনৃত্যের সর্বত্র অতীত হয়েছে কিন্তু কাবুকিতে অঙ্গীকৃত হয়েছে আধুনিকতা। অতীত অমর—মানি। কিন্তু শুধু প্রেরণায়। মানি আনন্দের একটা অংশ আছেই শাশ্বত, সনাতন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিকে হ'তেই হবে চলমান, নিত্য-পুনর্নব। জাপান আজ হয়ত একটা আদর্শ-সংকটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। য়ুরোপীয় সভ্যতা তার উপর চড়াও হ'য়ে এসেছে তাকে বদলাতে। হয়ত তার অনেক কিছু বদলাতেই হবে। অথচ জাপানে দেখি কাবুকি নৃত্যে জাপানীর কী উৎসাহ! কাবুকি জাদুঘরে গিয়েছিলাম একদিন। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে, কিছুদিন আগে জাপানীর কাবুকি-উৎসাহে ভাঁটা প'ড়েছিল কিন্তু ফের সে-উৎসাহ উজিয়ে উঠেছে। এক কথায় দুটো স্রোত তাকে ঠেলছে। একটা বলে: "ছাড়ো অতীতকে পুরোপুরি, ধাও ধাও সামনে দ্রুতগতিতে।" আর একটা বলে: "সাধু, সাবধান! সাবেকী কৌলিন্য বজায় রাখো। যা কিছু জাপানী আদর করতে শেখো। দেশের কুকুরও বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে আদরণীয়।"

আমাদের চরকা-প্রীতির সঙ্গে জাপানের কাবুকি-প্রীতির যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে কত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকও তো চরকা বলতে আত্মহারা! তেমনি ওদের। "কাবুকি! আহা মরি মরি!"—এই মনোভাব দেখলাম বহু জাপানীর মধ্যে দৃঢ়মূল। পূর্বপুরুষ-পূজাবৃত্তি নেই কার মধ্যে? কিন্তু হায় রে, যেমন কোনো পিতাই চিরদিন বাঁচেন না, বাঁচতে হ'লে জন্মগ্রহণ করেন পুত্রের মধ্যে—তেমনি অতীতকে জিইয়ে রাখা যায় না তাকে পুরোপুরি বজায় রাখতে যেয়ে। সাম্‌নের দিকে এগুনো মানেই পিছনকে খানিকটা অন্তত বিদায় দেওয়া। যা কাল ছিল তা আজ অবিকল অবিচল থাকতে পারে না। অতীতের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব, সম্ভব কেবল নবজন্ম। তাই না শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "Traditions of the past are great in their own place—that is, in the past. But that is no reason why we should go on repeating the past. A great past ought to be followed by a greater future."

টোকিয়োর জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

জাপান মস্ত জাত। জাপানী চরিত্রের গুণাবলী অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই ভরসা রাখবার পথ আছে যে জাপানী জ্ঞানী ও ভাবুকরা জাপানকে যথাযথ পথনির্দেশ দেবেন, যার ফলে যেমন অতীতের মধ্যেও তারা কারারুদ্ধ থাকতে পারবে না, তেমনি আধুনিকতাও তাকে পারবে না মোহমুগ্ধ ক'রে রাখতে।

* * * *

১৭ই জানুয়ারি টোকিয়োর বিখ্যাত কাগজ "আসাহি"-র কর্তৃপক্ষের হল ঘরে হ'ল আমার গানের সঙ্গে ইন্দিরার নৃত্য। লোক হয়েছিল

অজস্র। বহু লোক বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েই ছিল সমস্তক্ষণ। জাপানী রাজকুল, শিল্পীকুল, নানাদেশীয় রাজদূতবৃন্দ, কবি তথা উপসংস্কৃত জাপানী নরনারী ছিলেন উপস্থিত। নৃত্যগীতের শেষে বহু লোকই নিজে থেকে এসে আমাদের উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানালেন অভিনন্দন। তাই আশা করা যায় জাপান ভারতীয় নৃত্যগীতে সাড়া দিয়েছিল। এক জাপানী ইংরাজি কাগজে লিখল পরদিন: "A concert of Indian music was presented on saturday evening under the auspices of the Indian Embassy at the Asahi Building, To Lyo. The concert featured the playing and singing of Shri Dilip Kumar Roy and a display of Indian dancing by Shrimati Indira Devi. Roy sang six selections, Miss Devi dancing to three of these. Several songs were sung in English as well as in their original words, Roy explaining their moods and significance. The music, although somewhat strange to the uninitiated, was stirring and beautiful. Miss Devi danced very gracefully, conveying the meaning and mood of each song with great sktill."

জাপানে জাপানীদের মধ্যে আমাদের নৃত্যগীত এতটা সমাদর পাবে তা সত্যিই ভাবি নি, কিন্তু মনে হয় আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে তার মর্মবাণীটি হৃদয়ের আবেগের মাধ্যমে ওদের হৃদয়ের দরবারে পৌঁছেছিল যে ভাবেই হোক। নৈলে আমাদের ভক্তিসঙ্গীত বা "বন্দেমাতরম্" নৃত্যসঙ্গীত ওদের হৃদয়কে এভাবে স্পর্শ করতে পারত না কখনই।

স্পর্শ যে করেছিল তার প্রমাণ পেলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। জাপানী রাজবংশের এক অভিজাত এসেছিলেন। ইন্দিরা যখন নৃত্যবেশ পরছিল তখন তিনি এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করলে সে রাজপ্রাসাদে নাচতে রাজি আছে কি না। ইন্দিরা বলল যে আমরা পরদিনই আমেরিকান বিমানে হনোলুলু রওনা হচ্ছি, কাজেই রাজ-প্রাসাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব।

এছাড়া আরো অনেক প্রমাণ পেলাম। ফরাসী রাজদূত, আমেরিকান রাজদূতের স্ত্রী কন্যা সাগ্রহে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যে-ভাবে আমাকে ধন্যবাদ দিতে এগিয়ে এলেন তার মধ্যে শুধু লোকাচারের সুশীলতা ছাড়াও কিছু প্রকট হয়েছিল। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী নোগুচির পুত্র সস্ত্রীক এসেছিলেন তিশ মাইল মোটরে ক'রে। গান শুনে তিনি গভীর তৃপ্তি প্রকাশ করলেন।

কিন্তু এই আসরে আমি নিজে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এক বর্ষীয়সী জর্মণ মহিলার প্রশংসায়। আমি পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানটি চারটি ভাষায় গেয়েছিলাম সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি ও জর্মণ ভাষায় সব শেষে। তিনি সোচ্ছ্বাসে তারিফ করলেন আমার জর্মণ উচ্চারণের। এ-প্রশস্তিকে অবশ্য লৌকিক বলা চলতে পারত যদি না পরদিন তিনি বিশমাইল মোটরে ক'রে আসতেন বিমান ঘাঁটিতে আমাদের বিদায়সম্ভাষণ জানাতে। তাঁর এতখানি উচ্ছ্বাসে আর্দ্র হ'য়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: "এই শীতে এতদূর ধাওয়া ক'রে এলেন কেন এত কষ্ট ক'রে।" তিনি বললেন: "আপনার কাছে যা পেয়েছি তার প্রতিদান দেওয়া আমার অসাধ্য, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানানোর আর কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না।"

রোলাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল: "তোমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে যে-বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের আবেদন আছে তা সুকুমারহৃদয় সঙ্গীতরসিক মাত্রেরই হৃদয়ে অনুরণন তুলবেই তুলবে—দেখে নিও। আর এ-সঙ্গীতের প্রচার তোমাকেই করতে হবে—একথা তুমি যেন না ভোলো।" এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা এমন কি তর্কাতর্কিও করেছি এক সময়ে। পত্রেও তাঁকে লিখেছি একাধিকবার যে আমার মনে হয় না আমাদের স্বতন্ত্রপন্থী সঙ্গীতে বিদেশীরা রস পেতে পারে। কিন্তু তার পরে বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি যে তাঁর কথাই সত্য আমার ধারণাই ছিল, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি ভ্রান্ত। জাপানে বিমানঘাঁটিতে হঠাৎ একথা মনে পড়ল এই নাম-না-জানা জর্মণ মহিলার গভীর উচ্ছ্বাসোক্তিতে। মনে মনে নমস্কার করেছিলাম তখন এই অসামান্য সঙ্গীতদ্রষ্টাকে। কারণ যে কোনো উচ্চবিকশিত সঙ্গীতের শ্রোতা মিলতে পারে অনেক, কিন্তু দ্রষ্টা বিরল—সব দেশেই। তবে শুধু সঙ্গীতেই বা বলি কেন? সব কিছুতেই দৃষ্টিবর পায় কোটিতে গোটিক জন।

* * * *

টোকিয়োতে এবার যে আমেরিকান বিমানে উঠলাম তাকে বলে ডবল্-ডেকার—মানে দুতলা—জাহাজের মতন, উপর থেকে নিচে নামা যায়। আর নিচে এলে—ও মা! চমৎকার বৈঠকখানা! সেখানে ব'সে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি মহা উৎসাহ প্রকাশ করলেন আমি গায়ক শুনবামাত্র। তাঁর নামধাম দিলেন—সান ফ্রান্সিস্কোয় আমাদের আসরে যেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে না ভুলি।

জাহাজে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়—যদিও জলের আলাপী স্থলে পুনদর্শন দেন কদাচিৎ। কিন্তু এই বিমানে এক আমেরিকান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল যে ইউ-এন-ওর কাজে ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরছিল—তাকে বলা যেতে পারে এ নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত চারটেয় বিমান নামল "ওয়েক দ্বীপে"। এখানে শুধু বিমান নামে ও সেই জন্যেই কয়েকশো লোক মোতায়েন করা হয়েছে। টোকিয়োর দারুণ ঠাণ্ডার পর শেষ রাতে যখন সবাই মিলে এ দ্বীপে নামলাম তখন দেহ মন যেন জুড়িয়ে গেল স্বদেশী মলয় হাওয়ায়। শীতের দেশে হাওয়া অস্পৃশ্য। অথচ মন্দানিলের কী অপরূপ আদর! মনটা হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বাসী হ'য়ে ওঠে আর কি—মনে হ'ল যেন স্বদেশের স্পর্শ পেলাম পবনদেবের এ-পরিচিত স্নেহসম্ভাষণে। সেখানে নেমে সরবৎ খাচ্ছি এমন সময়ে সেই আমেরিকান যুবক এসে গল্প জুড়ে দিল—একথা সেকথা কত কথা! পুলকিত হ'লাম তার মুখে শুনে যে সে আমার Among the Great পড়েছে। হনোলুলুতে ও সানফ্রান্সিস্কোয় এ আমাদের খুব সমাদর তথা উপকারও করেছিল নানা ভাবে। ছেলেটি বড় অমায়িক ও ভদ্র। কিন্তু মানুষের নৈতিক ধারণা কত বদলে গেছে হঠাৎ টের পেলাম তার একটা কথায়। কথাটা সে এমন ভাবে বলেছিল যে ভারি মজা লেগেছিল। বলি।

ইন্দিরাকে কথায় কথায় সে বলল: "দেখুন! ভারতীয়রা ভারি চমৎকার লোক—কিন্তু তাদের ধরণ ধারণ একটু যেন অদ্ভুত।

"অদ্ভুত? কেন?"

"আর কেন? আমি ছিলাম একটি হিন্দুপরিবারে। সেখানে একটি তরুণীর সঙ্গে ভাব হ'ল। তাকে একদিন বললাম আমার সঙ্গে দুচারদিন কোথাও বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু সে গেল না। অদ্ভুত নয়?"

ইন্দিরা শুনে খুব হেসেছিল। কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ সে যে এতে অবাক হয়েছিল, ভাবতে আমার যেন আরো বেশি অবাক লেগেছিল। মনে জেগেছিল প্রশ্ন: "তবে কি বলব এক যুগ আর এক যুগের মনোভাবকে কখনোই বুঝতে পারে না পুরোপুরি? পুত্রকে পিতা ভালোবাসতে পারেন কিন্তু চিনতে পারেন কি? আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের চলার ছন্দ এখনো মন্দাক্রান্তাই বলব। তাই না ভাবনা। ওদেশে গিয়ে কী দেখব কে জানে? কী বলব আর ওরা কী বুঝবে?

* * * (ক্রমশঃ)

—সাত—

"Como voce esta bonito"!

মন্দির নয়—মায়ালোক।

বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতিঃর তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণুমানসী উর্বশীর মতো।

একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খদত্তের চেতনা।

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে শঙ্খমুদ্রায় পূজোর শুভ-সংকেত জানালো দেবদাসী—সংযুক্ত দশাঙ্গুলির যোগচিহ্নে কর্কট মুদ্রায় তুলল শঙ্খরব; মুক্তপাণির পুষ্পপুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে অঞ্জলি মুদ্রায় জানালো ভক্তিনত প্রণাম।

তারপর চামর হাতে নিয়ে চলতে লাগল তার ছন্দিত পদক্ষেপ।

বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল—নিষ্পাপ। শঙ্খদত্ত স্বপ্ন দেখছে। একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঙ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে সে। তার আদি নেই—সে অনন্ত।

—শ্রেষ্ঠী!

উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল। নৃত্যোৎসব শেষ হয়েছে। দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেবদাসী। একটা করুণ মূর্ছনায় ভেসে আসছে মৃদঙ্গ আর বীণার আওয়াজ। একটা বিহ্বল মাদকতায় সমস্ত মন্দির স্বপ্নাপিত।

উদ্ধব বললে, চলুন!

শরীরের কোথাও যেন কোনো ভার নেই—ধূপের ধোঁয়ার মতোই তা লঘু হয়ে গেছে। এখনো যেন একটা পদ্মের ওপরে মাথা রেখে অলস মায়ায় ভেসে চলেছে সে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পথে নামতে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল সে। রাত্রির শেষ প্রহর। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশা। নিষ্প্রাণ নির্জনতা চারদিকে—কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। মাধ্বী পান করে যে জুয়াড়ীরা পথের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজনে।

খানিক পরে উদ্ধবই জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল?

—অপূর্ব।

—দেবদাসীর যে নাচ সাধারণে দেখতে পায়, এ তা নয়।

—নাঃ!—একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—এখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই কেন, আশা করি বুঝতে পারছেন।

—হুঁ—আন্দাজ করছি।

উদ্ধব বলে চলল, সব মানুষের মন সমান নয়।

এখানেও মন্দিরের গায়ে যে-সব মিথুন মূর্তি আছে, সাধারণে তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তাই এ নাচও তাদের মনে কুভাব জাগাবে।

একবার চমকে উঠল শঙ্খদত্ত, বুকের মধ্যে শিউরে গেল একবার। তারপর জবাব দিলে, তা ঠিক।

—দেবদাসী দেবতার বধূ। তাই দেবতার কাছে তার কোন সংকোচ নেই—কোনো আবরণ নেই। নিজের দেহমন, লাজলজ্জা—সব নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েই সে ধন্য।

শঙ্খদত্ত এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে উঠল। মৃদু গলায় বললে, দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে আমি অনেক দেবদাসী দেখেছি। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

উদ্ধব বললে, সে অনেক কথা। যৌবন আসবার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার কাছে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়—তারপর গুরুর কাছে নৃত্যগীত শিখে সে দেবতাকে বন্দনা করবার অধিকার পায়।

—এরা কোথা থেকে আসে ?

—নানা ভাবে। কেউবা নিজেকে মন্দিরের কাছে দান করে দেয়—তাকে বলে দত্তা। কেউবা দেবতার পায়ে নিজেকে বিক্রী করে দেয়—সে হয় বিক্রীতা। কেউ ভক্তি করে মন্দিরের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে—সে ভক্তা। রাজা-মহারাজেরা বহুমূল্য অলঙ্কারে সাজিয়ে কাউকে মন্দিরে দান করেন—সে অলঙ্কৃতা। কেউ বেতন নিয়ে মন্দিরে নৃত্যগীত করে—সে গোপিকা। আবার যাকে অপহরণ করে এনে মন্দিরে নিবেদন করে দেওয়া হয় সে হৃতা—

শঙ্খদত্ত বললে, থাক। ও দীর্ঘ তালিকা শুনে লাভ নেই। আজ যাকে মন্দিরে দেখলাম, সে—

শঙ্খদত্তের অসমাপ্ত কথাটা তুলে নিয়ে উদ্ধব বললে, ওর নাম শম্পা। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী ও। হৃতা।

—হৃতা !—শঙ্খদত্তের বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগল যেন।

—সেই রকমই শুনেছিলাম। কেরল দেশ থেকে নাকি একদল তীর্থযাত্রী শৈশবে ওকে হরণ করে আনে, তারপর পুণ্যের আশায় সঁপে দেয় জগন্নাথের মন্দিরে। এখানকার একজন প্রধান পুরোহিত ওকে লালন-পালন করেছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ওকে শিক্ষা দিয়েছেন ললিতকলা। শম্পা এ মন্দিরের গৌরব।

গৌরব ! তা নিঃসন্দেহ। শঙ্খদত্তের চোখের সামনে অম্লান রজনীগন্ধার মতো নিষ্কলঙ্ক দেহখানি ভেসে উঠল। সুকুমার নগ্ন দেহটি সুরে-ছন্দে অতীন্দ্রিয় হয়ে গেছে—উজ্জ্বল কালো চোখে যেন স্বর্গের দীপ্তিরেখা। কিন্তু হৃতা ! কোন্ মায়ের কোল থেকে, কোন্ সুখের সংসার থেকে ওকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কে জানে ! সংসারের প্রেমে ভালোবাসায় যে সার্থক হতে পারত, তার নিষ্ফল যৌবন এখানে একটি একটি শুকনো পাপড়ির মতো ঝরে যাবে—কেউ একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবেনা।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্খদত্ত।

—যখন ওর যৌবন চলে যাবে, আর নাচতে পারবেনা, তখন ?

উদ্ধব হাসল : তখন এই মন্দির থেকেও ওকে বিদায় নিতে হবে।

—তারপর ওর চলবে কী করে ?

—যতদিন বাঁচবে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হবে মন্দির থেকে।

—ওঃ !—শঙ্খদত্ত চুপ করে গেল। তারপর চোখ তুলে দেখল, উদ্ধবের বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁচেছে দুজনে।

রাত সামান্যই বাকি—ঘুমোনোর আর চেষ্টা করলন শঙ্খদত্ত। প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল জানালার পাশে। একটু একটু করে সরে যেতে লাগল চাঁদের আলো—হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল কুয়াশার ক্ষণবৃতি। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে শুধু কানে আসতে লাগল দূরের সমুদ্র গর্জন—শীতের ম্লানতায় অনেকখানি নির্জীব হয়ে গেলেও তার আকৃতির বিরাম নেই।

দেবলোকের শূন্যপট থেকে শঙ্খদত্ত একটু একটু করে নামতে লাগল মাটিতে। তারও চোখের সামনে থেকে এখন সরে যাচ্ছে সুরের কুয়াশা—রক্তমাংসের একটি নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে। দেবদাসী নয়—একটি মানবী ; সোনার ফলেভরা চলন্ত মঞ্জরী।

হৃতা।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতের মতো শব্দটা। বুকের মধ্যে

তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলছে বার বার। কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষা সঞ্চারিত হতে লাগল শঙ্খদত্তের মনে। এই মন্দিরের ওপরে ঈর্ষা—দেবতার ওপরে ঈর্ষা। মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মন্দির—জোর করে অধিকার করেছে দেবতা। স্বেচ্ছায় আসেনি—পুণ্যকামনায় নিজেকে সঁপে দেয়নি দেবসেবায়। ও যেন দস্যুর লুঠ করা ধন।

মন্দিরের পবিত্রতা নয়—একটা সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি তার মস্তিষ্কের ভেতরে পদক্ষেপ করতে লাগল এইবার। তার দেহে-মনে মোহের ঘোর ঘনাতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর, কপালে দেখা দিতে লাগল ঘামের বিন্দু। মাত্র কিছুক্ষণ আগেকার স্বর্গীয় পরিবেশ এমন করে বদলে যাবে কে জানত সে কথা!

ওই মেয়েটিকে আর একবার অন্তত দেখা চাই—কাছে আসা চাই যেমন করে হোক। তার দক্ষিণ পাটন, তার বহর, মোগল পাঠানের আসন্ন সংঘর্ষ—করম আলীর কথাগুলো সব যেন এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নেশাটা ক্রমেই বেড়ে চলল—রক্তের মধ্যে শুরু হল অস্থির মাতলামি। জীবনের এতগুলো বৎসর শঙ্খদত্ত সযত্নে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছে, আজ সেই ব্যাধিই যেন সংক্রামিত হতে লাগল তার মধ্যে।

দেবদাসী। কিন্তু দেবতার কাছে এই দাসীত্বের ভেতর দিয়ে কী পায় সে—কতটুকুই বা পায়? এত রূপ, এত পূর্ণতা, সারা দেহে এমন আশ্চর্য ছন্দ! পাথরের বিগ্রহ কী প্রতিদান দেয় তাকে? স্বর্গের প্রেমে কতখানি পূর্ণ হয় রক্তমাংসের মানুষের জীবন?

নিদ্রাহীন রাত—উত্তেজিত স্নায়ু—বাইরে রাত্রি শেষের পিঙ্গলতা। একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমক থেকে থেকে ভেঙে পড়ছে মাথার মধ্যে। চোখের সামনে ক্রমাগত দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরীটি। বৃন্তছিন্ন। প্রাণহীন পাথরের পায়ে একটি একটি করে পাপড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়বে তার। যেদিন জরা আসবে, অক্ষমতা এসে স্পর্শ করবে শরীর, নাচের ছন্দে, মুদ্রার বিন্যাসে যেদিন প্রতিটি অঙ্গ তার দীপশিখার মতো দুলে উঠবেনা, সেইদিন—

সেইদিন তার মুক্তি। তার বিশ্রাম। ব্যর্থতার মধ্যে চিরনির্বাসন। অথচ—

শম্পা! নামটি গানের মতো কানে বাজছে। তার উজ্জ্বল রূপ একটা জ্বালার মতো ঘুরে ফিরছে রক্তে। শঙ্খদত্ত আর থাকতে পারলনা। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে, পার হল পাথরের সিঁড়ির শীতল অন্ধকার—এসে দাঁড়ালো বাইরে।

হু হু করে বইছে সমুদ্রের হাওয়া। তীর্থযাত্রীরা চলেছে স্নানের উদ্দেশে। রাজার একটা হাতী চলে গেল গলার ঘণ্টা বাজিয়ে। মন্দিরের দিক থেকে শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি।

বাংলা দেশের একদল বৈষ্ণব চলে গেল হরি-সংকীর্তন করতে করতে। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য প্রচার করেছেন এই হরি-সংকীর্তন—কিছুদিন আগেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন এই জগন্নাথধামে। বৈষ্ণবদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন, বাংলা দেশের উদ্ধারণ দত্তের মতো বণিকেরা পর্যন্ত হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছেন। উড়িষ্যাতেও নাকি চৈতন্যের অনেক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি রাজারাও নাকি—

কিন্তু বৈষ্ণবদের সম্পর্কে শঙ্খদত্তের কোনো কৌতুহল নেই। লোকগুলোকে দেখলে তার হাসিই পায়। কতগুলো পুরুষ মানুষ সমস্ত দিন আকাশে হাত তুলে নেচে নেচে বেড়ায়, কথায় কথায় মেয়েদের মতো পথের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, ও নাকি 'দশাপ্রাপ্তি।' কেমন হাসি পায় শঙ্খদত্তের। সপ্তগ্রামের পণ্ডিতেরা ঠাট্টা করেন:

'ইন্দ্রনমালা বলয়িত বাহু—
পরধন গ্রহণে সাক্ষাৎ রাহু'—

পরের পংক্তিটি অকথ্য। তারপরে আছে 'কীর্তনে পতনে মল্ল শরীর।' তাতে সন্দেহ নেই—লোকগুলোর আছড়ে পড়বার ক্ষমতা অদ্ভুত।

আর এই বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরু সোমদেব।

মাথার ওপরকার জটাগুলো যেন সাপের মতো ফণা তোলে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

—ক্লীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা করে মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।

সোমদেব। হঠাৎ ভয় পেল শঙ্খদত্ত—হঠাৎ বিভীষিকা দেখল চোখের সামনে। রাত্রের সেই মোহ মাদকতা তাকে

যেন চাবুক মারল। দেশে, সমাজে ব্রাহ্মণের লুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখছেন সোমদেব, আর সেই কাজে তাঁর সহযোগিতা করবার সংকল্প নিয়েছে সে। এই কি সেই সহযোগিতা? একটা দেবদাসীর আকর্ষণে অগ্নিপ্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো এই অস্থিরতা। সোমদেব যদি কখনো এই দুর্বলতার খবর পান, আর মুখ দর্শন করবেন না তার। হয় তো অভিশাপ দেবেন—হয় তো—

যেন একটা প্রকাণ্ড চাবুকের ঘা পড়ল পিঠে। না—আর এখানে নয়। এখান থেকে আজই নোঙর তুলতে হবে তাকে। অনেক দূরের পথ দক্ষিণ পাটন, অনেক সমুদ্র এখনো তাকে পাড়ি জমাতে হবে—এখনো তার অনেক কাজ বাকী।

ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

দল বেঁধে স্নানার্থীরা আসছে যাচ্ছে। চকিতের জন্যে মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল: আবার করম আলীর সঙ্গে দেখা হবেনা তো? লোকটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না—দেখলেই একটা অদ্ভুত ভয়ে কাতর হয়ে ওঠে। মোগল-পাঠান-খ্রীস্টান। থমথমে কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে আকাশ বাতাসে। করম আলীর মুখে চোখে তারই সংকেত। সমুদ্রে ভয়ঙ্কর কোনো ঝড় আসবার আগে যেমন এক আধটা অশুভ সিন্ধ-শকুন দেখা দেয়—সেই রকম।

স্নানের ঘাট পেরিয়ে নির্জনে বালিডাঙার ওপরে এসে দাঁড়ালো। দূরে-কাছে রাশি রাশি কেয়াবন আর কাঁটা ঝোপের অসংলগ্ন ব্যাপ্তি। জলের কাছাকাছি নুড়ি আর ঝিনুকের সারির মধ্যে বসন্তের হাওয়ায় ঝরা গাঢ় রক্ত কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো লাল কাঁকড়ার আনাগোনা। আর একটু ওপাশে সেই বালিয়াড়ীটা দেখা যাচ্ছে—যেখানে কাল সে এসে বসেছিল করম আলীর সঙ্গে।

চকিতে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে সে—তাকালো দূর সমুদ্রে। শান্ত শীতের সাগরে অল্প অল্প ঢেউ ভাঙছে—সেই ঢেউয়ের রেখার ওপারে তার বহর দাঁড়িয়ে। নীল জলে রক্তস্নান করে এখন সবে উঠে পড়েছে সূর্য, তার রক্তাভ সোনালি আলোয় বহরটাকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে।

আজই কি বহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাবে।

শঙ্খদত্ত ভ্রূকুটি করলে। বাতাসের গতি উপকূলমুখী—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। তা ছাড়া আর একটু এগোলেই কূলের কাছাকাছি আছে ডুবো-পাহাড়, তার ওপর গিয়ে পড়লে বিপদের সীমা থাকবে না। যতদূর মনে হচ্ছে, আজও বোধ হয় এখানেই থেকে যেতে হবে। যাই হোক—'কাঁড়ার'দের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে একবার।

রাত্রির ক্লান্তি আর অবসাদে জর্জরিত শরীর। নেশার রেশটা এখনো তাকে বিস্বাদ করে রেখেছে। সামনে স্নিগ্ধ নীল জলের হাতছানি। অবগাহন স্নানের প্রলোভনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

আঘাটায় স্নান করা নিরাপদ নয়। হাঙ্গরের আনাগোনা আছে—শঙ্কর মাছের চাবুকের ভয় আছে। তা ছাড়া কখনো কখনো করাত মাছেও আক্রমণ করতে পারে। তবু সমুদ্রের লোভানিটাকে দমন করতে পারল না শঙ্খদত্ত। গায়ের জামা খুলে সে নেমে পড়ল জলে।

স্নিগ্ধ জলের কবোষ্ণ আলিঙ্গনে দেহের আগুনটা নিবে এল—ছোট ছোট ঢেউয়ের লীলাস্পর্শে মুছে নিতে লাগল সঞ্চিত অবসাদের গ্লানি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে সে। পায়ের তলা দিয়ে একটা মস্ত বড় শঙ্খ খল্‌বল্ করে পালিয়ে গেল—ইতস্তত সঞ্চরণ করতে লাগল মুঠো মুঠো ঝিনুক। চিন্তাহীন—কর্মহীন নিবিড় বিরামের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল শঙ্খদত্ত।

তারপর সূর্যের রোদ যখন প্রখর হল, যখন তীক্ষ্ণ নোনা জলে চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল, তখন জল ছেড়ে উঠে পড়ল সে। অজস্র উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় আধখানা করে নিংড়ে-নেওয়া ভিজে কাপড়টা শুকিয়ে নিতে তার দেরি হলনা, তারপর মন্থর পায়ে সে ফিরে চলল উদ্ধবের বাড়ির দিকে।

অন্যমনস্কভাবে সে আসছিল—আসছিল চারদিকের মানুষগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎ কানে এল বাজনার শব্দ—সম্মিলিত নারীকণ্ঠের তীব্র মধুর গানের উচ্ছ্বাস।

তাকিয়ে দেখল, পথের দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোক। অলস কৌতূহলে কী যেন দেখছে।

শঙ্খদত্তও দাঁড়ালো। একটা বিয়ের শোভাযাত্রা আসছে।

—খুব সমারোহ দেখছি। কোনো বড়লোকের বিয়ে বুঝি ?—স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলে শঙ্খদত্ত।

—হুঁ। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার ছেলের বিয়ে—পাশ থেকে কে উত্তর দিলে।

শঙ্খদত্ত দেখতে লাগল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা আসছে। আগে আগে চলেছে বাদ্যকরের দল। মাঝখানে মঙ্গল গান গাইতে গাইতে চলেছে মেয়েরা। তাদের পিছনে সোনা-রুপোখচিত খোলা পাল্‌কিতে কিশোর বর—তার পাশে বালিকাবধূ।

শঙ্খদত্তের শিথিল দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—থমকে গেল এক জায়গায়। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আছড়ে পড়ল উচ্ছলিত রক্ত। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অলস-অসুস্থ কল্পনায় সে স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন নয়—মায়াও নয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় রাত্রের সেই রজনীগন্ধা নীলপত্রপুটে ঘেরা কেতকীর মতো ফুটে উঠেছে। নীল শাড়িপরা যে অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি দলের সকলের আগে গান গাইতে গাইতে চলেছে—সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে যার কণ্ঠহার, যার হাতের কঙ্কণ, যার কর্ণাভরণ, সে আর কেউ নয়! আর কেউ সে হতেই পারেনা।

তীব্র উত্তেজনায় সে বলে ফেলল, ওকে? নীল শাড়ী-পরা কে ও?

পাশের লোকটি জবাব দিলে, ওকে চেনো না? ও যে মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী—ও শম্পা।

শঙ্খদত্তের ঠোঁট কাঁপতে লাগল—তুফান ছুটে চলল রক্তে। কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারল না—অদ্ভুত চোখ মেলে চেয়ে রইল আনীলপত্রাবৃত কেতকীর দিকে।

—কিন্তু এখানে কেন? কেন এই শোভাযাত্রার সঙ্গে?

—বারে, তাই তো প্রথা!—যে লোকটি জবাব দিচ্ছিল, সে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শঙ্খদত্তের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক মনে হল তার। নিশ্চয় বিদেশী এবং নির্বোধ।

—প্রথা কেন?—নির্বোধের মতোই জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

লোকটি অনুকম্পার হাসি হাসল: দেবদাসী হল দেবতার বধূ। দেবতা অমর, তাই দেবদাসী চিরসধবা, তার কখনো বৈধব্য হয়না।

—ওঃ!

—তাই এই সব শুভকাজে দেবদাসীকে সমাদর করে ডেকে আনা হয়। সবাই আশা করে, দেবদাসীর মতো নববধূও চিরসধবা থাকবে—কখনো তাকে বৈধব্যের দুঃখ ভোগ করতে হবেনা।

শোভাযাত্রা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। জনতার ভিড়ে আর দেখা যাচ্ছেনা শম্পাকে। ঐকান্তিক আগ্রহে চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করেও নয়।

হঠাৎ অসুস্থের মতো অস্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করে বসল শঙ্খদত্ত।

—কোথায় থাকে ওই দেবদাসী? ওই শম্পা?

লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল।

—কোথাকার মানুষ হে তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওসব মতলব ছেড়ে দাও। বরং স্বর্গে যাওয়া সোজা—কিন্তু শম্পার কাছেও কোনোদিন পৌঁছুতে পারবেনা।

শঙ্খদত্ত কোনো জবাব দিলেনা। আস্তে আস্তে সরে গেল লোকটার পাশ থেকে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকেই পা চালালো—যেদিকে শোভাযাত্রাটা এগিয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বোল্‌শয় থিয়েটার থেকে হোটেলে ফিরে আসতেই সোভিয়েট-বন্ধু শ্রীযুত আভিটিসভের মুখে শুনলুম, আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের অন্যতম সভ্য সুপ্রসিদ্ধ চিত্রনট শ্রীযুত অশোককুমার (গঙ্গোপাধ্যায়) সেদিন ভোরের প্লেনে লণ্ডন থেকে মস্কোয় এসে পৌঁচেছেন ! শ্রীযুত মস্কোভস্কী, আভিটিসভ্‌ এবং সোভিয়েট চলচ্চিত্র-মন্ত্রিসভার আরো ক'জন প্রতিনিধি খবর পেয়ে হাজির হয়েছিলেন মস্কোয় ভ্নুকোভো (Vnukovo) এরোড্রোমে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে !

অশোককুমারের বাসের ব্যবস্থা আমাদের হোটেলে···তবে Hotel Savoy-এর দোতলার কামরা সব ভর্ত্তি থাকার দরুণ তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে তেতলায় এক সুসজ্জিত Suite !

দেশের লোকের খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। অশোককুমার সবে খাওয়া দাওয়ার পালা চুকিয়ে বিশ্রামের উদ্যোগ করছেন, গিয়ে হাজির হলুম। অজানা-বিদেশে পরিচিত-জনকে পেয়ে অশোককুমারও মহা-খুশী···ক্লান্তির কথা ভুলে সোৎসাহে তিনি গল্প আলাপে মেতে উঠলেন।

তাঁর বাসনা ছিল, লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গে মিলবেন ; তারপর একজোটে সকলে সোভিয়েট রাজ্যে এসে নামবেন ! কিন্তু লণ্ডনের 'নার্সিংহোমে' তাঁর অসুস্থা পত্নীর 'অপরেশন্‌' এবং পরিচর্য্যার ব্যবস্থাদি করতে আটকে পড়ায় মস্কোয় পৌঁছতে তাঁর বিলম্ব ঘটেছে।

মস্কোর সুপ্রশস্ত রাজপথ—গোর্কী ষ্ট্রীট। দূরে ছায়ার মতো দেখা যায়, প্রাচীন রুশীয় জার সম্রাটদের আমলের 'STATE DUMA' বা পরিষদ ভবন। অধুনা সোভিয়েট আমলের এ ভবনটি হ'চ্ছে State Historical বা রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক যাদুঘর

আলাপ-আলোচনা জমে উঠেছিল বেশ···হঠাৎ হুঁশ হ'তে ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি—রাত দুটো বাজে ! কাজেই সে-রাত্রির মত আলোচনা মুলতুবি রেখে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে এলুম। দলের অন্য সঙ্গীরা তখন নিজেদের কামরায় গাঢ় নিদ্রায় অচেতন।···অত রাতেও পথে লোক চলছে···গাড়ী চলাচল বন্ধ নয়। নীচে হোটেলের নাচ-ঘর থেকে ভেসে আসছে ওদেশী সঙ্গীতের বিচিত্র মধুর সুর ঝঙ্কার···শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো প্রত্যুষে। বিছানা ছেড়ে ঘরের বিরাট সার্শির ধারে এসে দাঁড়ালুম—মস্কো সহরের প্রভাতী দৃশ্য দেখবার মানসে। রাস্তার ওপারে পুরানো ধরণের বিরাট ছ'-সাততলা বাড়ীগুলোর পিছনে কুয়াশাঘেরা ভোরের আকাশে সবে ফুটি-ফুটি করছে উষার প্রথম আলোর রেখা ! নৈশ বিরামের পর ঘুমন্ত সহরের পথে সদ্য জেগেছে কর্ম্মচপল লোকজনের প্রাণ-হিল্লোলের সাড়া ! চোখে পড়লো, ওদেশের ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদার্নীদের চেহারা···সাদাসিধা-ছাঁটের ছাই-রঙের পোষাক পরা, পথের ধুলো-কাদার ছোঁয়াচ থেকে সে পোষাক বাঁচাবার উদ্দেশে
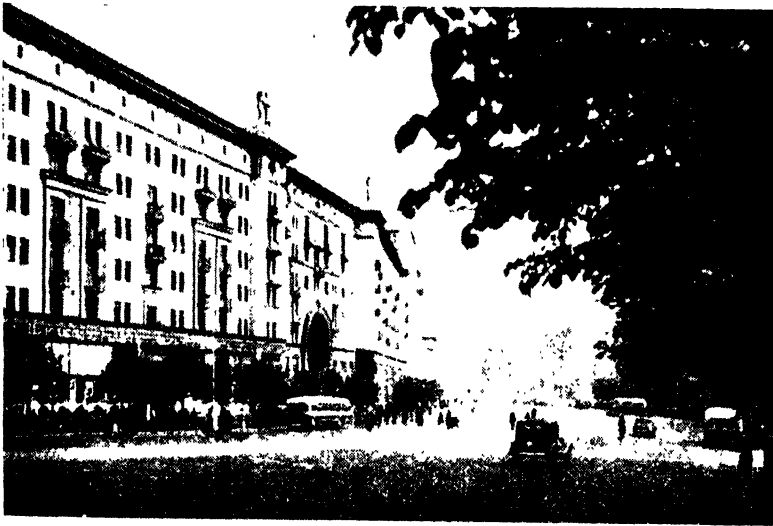
অগ্রাবরণের সামনে বাঁধা সাদা চাদরের আচ্ছাদনী। ঝাড়ুদারনীদের হাতে দড়ি, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় রুমাল বাঁধা···লম্বা হাতলওয়ালা ঝাঁটা হাতে সানন্দে সুচারুভাবে জঞ্জাল সাফ্ করে চলেছে। মুখে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, চোখে দেহে এতটুকু নোংরামি বা কদর্য্যতার ছোপ্ নেই—তাদের সাজ পোষাকে বা আচার-ব্যবহারে কোথাও। সেকালের রুশীয় 'জার'দের আমলে ওদেশের পথ ঘাটের অবস্থা ছিল যেমন বিশ্রী, তেমনি নোংরা···কিন্তু সোভিয়েট সুব্যবস্থার গুণে এখন আর তেমন নেই। আজকাল সোভিয়েট দেশের সর্ব্বত্রই সুপ্রশস্ত পথ-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে অভিনব রীতির প্রচলন হয়েছে। ওদেশের সামাজিক কানুন অনুযায়ী গ্রামের এবং সহরের প্রত্যেকটি গৃহাঙ্গন এবং বাড়ীর সামনেকার ফুটপাথ ও পথের এলাকাটুকু আবর্জ্জনাহীন এবং তক্‌তকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব গৃহের অধিবাসীদের। হয় নিজেরা পালা করে, না হয় নির্ব্বাচিত ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীদের দিয়ে তারা নিত্য নিজেদের গৃহাঙ্গন এবং বাড়ীর সুমুখের পথ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়ে রাখবেন—এই হলো নিয়ম। এ নিয়মে এতটুকু অবহেলা ঘটলে রাষ্ট্রের বিধানে অপরিচ্ছন্নতা ও গাফিলতীর অপরাধে গৃহবাসীদের দণ্ডভোগ করতে হয়। এ ব্যবস্থার ফলে, পথ ঘাট এবং বাড়ী ঘর দোর ঝক্‌ঝকে রাখার সম্বন্ধে ওদেশের বাসিন্দারা দেখলুম প্রত্যেকেই বিশেষ সচেতন। শুধু ফুটপাথ আর বাড়ীর সামনেটুকু পরিচ্ছন্ন রাখা নয়···গ্রাম এবং সহরের শড়ক আর রাজপথের জঞ্জাল আবর্জ্জনাদি সাফ্-সুতরো করার উদ্দেশ্যে ওদেশে বিশেষ ধরণের মোটর যান ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব মোটর-যানের আকৃতি আমাদের কলকাতার কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলা লরীর মত···তবে পার্থক্য এই, এ-সব গাড়ীর সামনের চাকার অগ্রভাগে রেল এঞ্জিনের Cow-Catcher Plate-এর মত সুদীর্ঘ বুরুশ আঁটা থাকে···তার সাহায্যে গাড়ী পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে পথের যা-কিছু জঞ্জাল বেমালুম ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে নিয়ে যায়। শীতকালে ওদেশের পথ যখন বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন পথের জঞ্জাল সাফ করবার এসব মোটরযানের সামনে বিচিত্র 'বুরুশ ঝাঁটার' বদলে জমি থেকে জমাট তুষারের পুঞ্জ চেঁচে ফেলবার জন্য বিশেষ ধরণের সুদীর্ঘ কোদালের পাত সংলগ্ন করা হয়। এসব ব্যবস্থা ছাড়া জলের ট্যাঙ্ক এবং 'যান্ত্রিক বুরুশ'-আঁটা 'পথ-ধোয়া' বিচিত্র এক ধরণের মোটরযানের ব্যবস্থা—পথঘাট নিত্য-নিয়মিত এমন পরিপাটিরূপে ধুয়ে সাফ হয়, সহরের কোথাও ধূলো কাদা বা জঞ্জাল আবর্জ্জনার চিহ্ন দেখা যায় না।
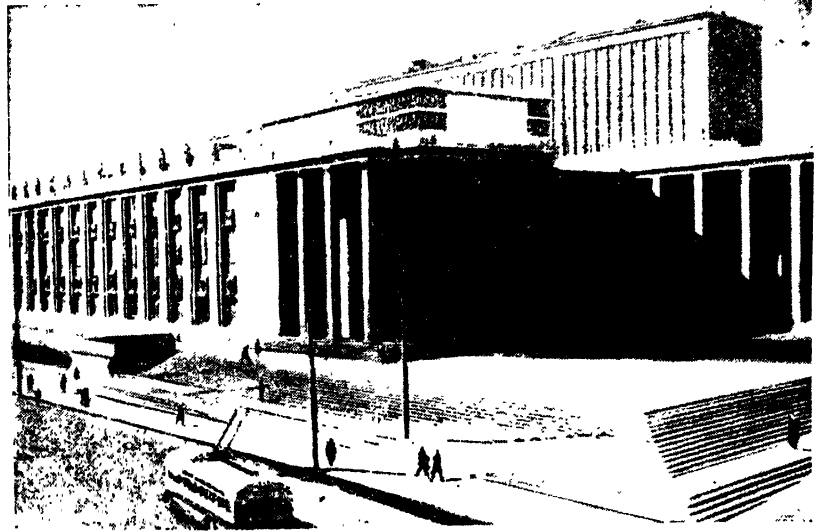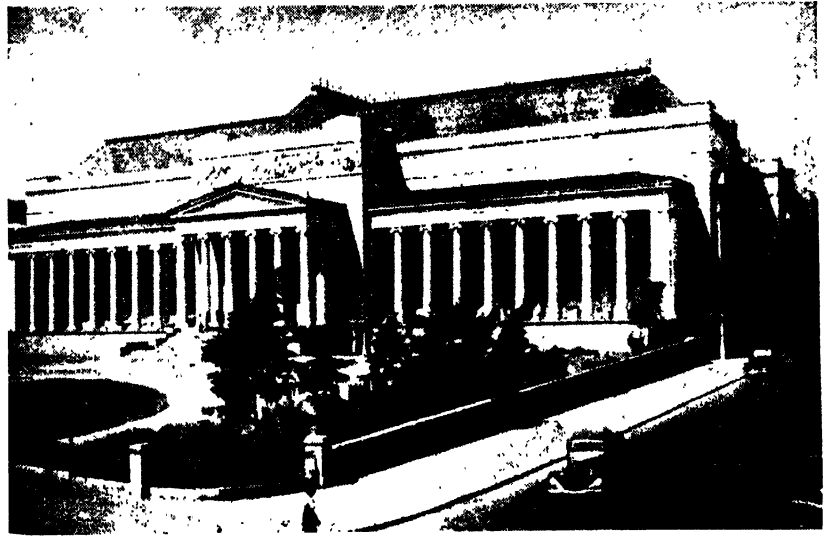
লেনিন লাইব্রেরী—মস্কো

মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ কলাশিল্প যাদুঘর—'মুসিয়ি ইজোরাজিতেলনিখ' বা Museum of Art

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট দেশের এই বিচিত্র দৃশ্যাবলী

দেখছি···পথে লোকজনের ভিড় বাড়ছে···আমাদের দেশের মতই কেউ বেরিয়েছে দৈনন্দিন কাজে, কেউ চলেছে বাজারের থলি হাতে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেউ বেরিয়েছে প্রাতর্ভ্রমণে! যাত্রী মালবাহী মোটর, লরী, ট্রলী-বাসের চলাচল সুরু হয়েছে পথে। সদ্য-জাগা সহরের চারিদিকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মচাঞ্চল্য।

পৃথিবীর পূর্ব্ব-প্রান্তে অর্থাৎ প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে, আমাদের দেশে শরতের শেষাশেষি ভোর ছ'টা নাগাদ আকাশের বুকে জাগে প্রভাতী সূর্য্যের ছটা। পশ্চিম-প্রান্তে সোভিয়েট দেশে কিন্তু সূর্য্যোদয় হয় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ···অর্থাৎ আমাদের সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে। তার কারণ, পৃথিবীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক প্রাচ্য ভূ-ভাগ থেকে পশ্চিম-উত্তর দিকে প্রতীচ্যের পানে যত এগিয়ে যাবে—সূর্য্যোদয়ের সময়ও তত পরে পেঁছিয়ে এবং সেই ভাবে দেশ-কাল-অনুসারে ঘড়ির কাঁটাকে মিলিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

ঘরের বাইরে শীতের আমেজ তখন বেশ···দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্নানাদির পালা চুকিয়ে গরম পোষাক পরে আমরা সদলে এসে জড়ো হলুম হোটেলের একতলায় খানা-কামরায়! প্রাতরাশের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত! খানা টেবিলে বসে স্থির হলো, সেদিনের ঘোরা-ঘুরি এবং দেখাশোনার প্রোগ্রাম। প্রাতরাশের পর বেরুবো মস্কো সহর পরিদর্শনে ···দুপুরে 'মূসিয়ী ইজোরাজিজেলনিখ্' (Museum of Art) বা কারুকলা-যাদুঘরে! বিকেলে সকলে যাবো পরলোকগত সোভিয়েট জননায়ক কমিউনিজ্‌মের মন্ত্রগুরু মনীষী লেনিনের সমাধি সৌধ বা Mausoleum দেখতে! সেখান থেকে হোটেলে ফিরে খানিক বিশ্রাম এবং রাতের ভোজপর্ব্ব সেরে আবার সদলে যাবো বোলশ্যই অপেরা হাউসে—'সাদ্‌কো' (Sadko) নামে সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় গীতিনাট্যের লীলাভিনয় দেখতে।

মস্কোর রাজপথ—মোজিস্কোইয়া ষ্ট্রীট

সোভিয়েট দেশের প্রত্যেক সহরে, এরোড্রামে, রেল-ষ্টেশনে এবং হোটেলে ওদেশী এবং বিদেশী পর্য্যটকদের সর্ব্ব-সুবিধার জন্য 'Intourist' নামে এক অভিনব পরিব্রজা-প্রতিষ্ঠান বা Tourist Bureauর ব্যবস্থা আছে! এঁদের কাজ পর্য্যটকদের জন্য প্রয়োজনমত যান-বাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া—টিকিট-সংগ্রহ এবং মালপত্রের ঝক্কি সামলানো, দেশের যা কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য সে-সব দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়ানো···এমনি আরো বহু খুঁটি-নাটি। বিদেশী পর্য্যটকদের পক্ষে ওদেশের কিছু বুঝতে, জানতে বা বাক্যালাপ করতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সোভিয়েট-রাজ্যের প্রত্যেকটি 'Intourist' প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, তুর্কী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী রীতিমত-শিক্ষিত বহু 'Tourist-Guide' আছেন। পর্য্যটকদের এঁরা সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে থাকেন—ওদেশের ছোট বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারে! সোভিয়েট-রাজ্যের প্রথানুযায়ী মস্কোর স্যাভয় হোটেলেও ছিল Intourist প্রতিষ্ঠানের এক অফিস! আমাদের সোভিয়েট-সহচর দোভাষী বন্ধু আনাতোলী এবং আলেকজান্দ্রোভার নির্দ্দেশে হোটেলের Intourist-প্রতিষ্ঠানের মহিলা-প্রতিনিধি অনতিবিলম্বে কলকাতার State-Bus বা রাষ্ট্রীয় পরিবাহন-বিভাগের মোটর-বাসের মত সুদৃশ্য বিরাট আরাম-প্রদ একখানি অতি-আধুনিক ওদেশী মোটর যানের বন্দোবস্ত করে দিলেন। প্রাতরাশের পর সেই মোটর-ভ্যানে চড়ে আমরা সদলে বেরুলুম সহর দেখতে। সঙ্গী হলেন দোভাষী-সহচর-বন্ধু আলেকজান্দ্রোভা, আনাতোলী এবং মস্কোর Central Documentary Films Studioর একদল news-cameraman বা সাংবাদিক চলচ্চিত্র-শিল্পী। আমাদের চিত্র গ্রহণ করাই এঁদের উদ্দেশ্য; প্রতি সপ্তাহে সোভিয়েট রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহে যে সব News-film বা সংবাদ-চিত্র দেখানো হয়, সেগুলিতে সন্নিবেশ করবেন বলেই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের দেশ-পরিক্রমার এ-সব ছবি তুলছেন! তাছাড়া শুনলুম, ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত ওদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ পরিচালক শ্রীযুত লিওনিড্ ভার্লামভ্ ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সোভিয়েট রাজ্য-পরিক্রমণের বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র একখানি Documentary Film বা তথ্য-প্রামাণ্য-চলচ্চিত্র রচনা করছেন—সেজন্য তিনিও আমাদের প্রত্যেকের চিত্র-গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন! মুস্কিলে পড়লুম আমরা···আশে-পাশে এত ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যানের ভিড় দেখে সকলে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম! কিন্তু উপায় কি!···ওদেশী চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের উদগ্র উৎসাহের তোড়ে আমাদের ওজর-আপত্তি টিকলো না।

আমাদের নিয়ে 'ইন্‌তুরিস্ত্‌'-প্রতিষ্ঠানের মোটর-বাস্ বেরুলো সহর-পরিক্রমণে ! বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা…প্রশস্ত পথ-ঘাট, বড়-বড় দোকান পাট, অফিস দপ্তর, স্কুল-কলেজ-মিউজিয়াম, লোক-জন আর যান-বাহনের ভিড় গিশ্‌গিশ্‌ করছে…কিন্তু কোথাও এতটুকু হট্টগোল বা বিশৃঙ্খলা নেই !…সুসংযত ভাব সর্ব্বত্র !

সোভিয়েট-রাষ্ট্রের রাজধানী এবং রুশীয় প্রজাতান্ত্রিক যুক্ত রাজ্যের প্রধান জন-পদ মস্কো—বয়সে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য গরিমাতেও মহান্…প্রায় আটশো বছর আগে ভিত্তি স্থাপনা করা হয়েছিল এই মহানগরীর ! সে-কালের রুশীয় 'Czar'-দের আমলে মস্কোতেই ছিল ওদেশের রাজকীয় দপ্তর, পরিষদ এবং রাজার প্রাসাদ দুর্গ ! ওদেশের প্রাচীন আমলের রাজ-ভবন এবং আধুনিক-যুগের সর্ব্বপ্রধান সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় দপ্তর হিসাবে সুবিখ্যাত, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ক্রেমলিন' দুর্গ প্রাসাদটি নির্ম্মিত হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। সে আমল থেকে বিগত ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল যাবৎ ক্রেমলিন প্রাসাদ ছিল রুশীয় 'জার'দের আবাস ভবন ; কিন্তু বল্‌শেভিক-বিপ্লবের পর সোভিয়েট আমলে এ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধান রাষ্ট্রীয় দপ্তরখানা ! সেই প্রাচীন-যুগ থেকে আধুনিক-কাল পর্য্যন্ত রাজধানী মস্কো সহরের উপর দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মোন্মাদনার কি ঝড় না বয়ে গেছে—উন্নতি অবনতির কত না তরঙ্গ… কত বিদেশী শক্রর পীড়ন অত্যাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুণ্ঠন-লালসার তাণ্ডব—তাতে বিপন্ন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহা-নগরী ! তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপ্লব, সে সব সহ্য করে আজো অক্ষত গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—প্রাচীন এবং আধুনিক আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও কলাকৃষ্টি ইতিহাসের সংমিশ্রণ সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ প্রতীক সুপ্রসিদ্ধ মস্কো সহর ! দীর্ঘকাল ধরে যুগে যুগে এমনি পুরাতন ও নবীন বহু বিচিত্র ভাবধারা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকের মস্কো এমন অভিনব অপরূপ রূপ-পরিগ্রহ করেছে—যার তুলনা মেলে না !

(ক্রমশঃ)

সদাচার

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ইংরাজি শব্দ সিভিলিজেসনের একদিন রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন সদাচার। সাধারণতঃ আমরা সিভিলাইজ্‌ড্ শব্দের অর্থ করি সভ্য। সভ্য কি তা খুব স্পষ্ট বুঝি না, বরং সদাচারের অর্থ বোধগম্য। দুটিকে মিশিয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সদাচারী মানুষই সভ্য মানুষ। সভ্যতা সদাচার।

শব্দ মনের ভাবকে রূপ দেয় নিজের জ্ঞানের আসরে এবং পরের চিত্তে। সাধারণ শব্দের বালাই নাই। জল বললে ঠিক বুঝি নিত্য ব্যবহার্য্য তরল পদার্থটিকে—ঘোলা জল জানি এমন কিছু তার সঙ্গে মেশানো যা বারির স্বচ্ছতাকে নষ্ট ক'রে তাকে করেছে আবিল। কারণ মানে বুঝি সেই যোগাযোগ, যার ফলে অন্য কিছু ঘটে। কিন্তু কারণ-বারি বল্লেই সর্ব্বনাশ। যে উত্তমরূপে কারণ-বারি শব্দের অর্থ জানে বা বোঝে তার কাছে শব্দটির রূপ ও তাৎপর্য্য স্পষ্ট ফোটে বুদ্ধির দরবারে। কিন্তু যে বোঝে না তার কাছে বুদ্ধিমান ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করলেও হয় তো কারণ-বারির স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা প্রকাশ করতে পারে না। এ-উভয়ের বোঝাবুঝি মানব মনের কর্মধারার সাধারণ প্রবাহ। কিন্তু এর বিপদ, বুঝতে গিয়ে ভুল-বোঝা অথচ বুঝেছি এ প্রত্যয়ের বশীভূত হওয়া। যে বুঝলে না সে বল্লে—তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি। কিন্তু যে না বুঝে ভাবলে বুঝেছি সে কারণ-বারির মাত্র অন্তর্নিহিত ভাবের শত্রু নয়, সে শত্রু ভাষা, ভাব ও ভাবুকের—যখন সে নিজের অপরিণতবুদ্ধি অন্যের বুদ্ধি গোচর ক'রে তার প্রতীতি জন্মায় যে তার বিবৃতি অভ্রান্ত।

পরিভাষা ও সংজ্ঞার দোষ ও গুণ ঐখানে। পারিভাষিক শব্দ যেমন চিন্তার গতি ও ভাব-বিনিময়ে সহায়তা করে, তেমনি তার মধ্যে আবিলতা থাকলে শব্দ,বিশেষ পারিভাষিক শব্দ, হয়ে দাঁড়ায় সমাজদ্রোহী। কারণ সমাজ শ্রদ্ধা করে বিশেষজ্ঞকে, যার ভাষায় ও ভাবে পরিভাষার সঞ্চয় প্রচুর। অথচ বুজরুকের কপটতার অস্ত্রাগার প্রায়ই সজ্জিত থাকে পরিভাষায়—যার অর্থ সে বোঝে না অথচ তার বিকৃত অর্থ তার স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক।

বলছিলাম সিভিলিজেসনের কথা। ও শব্দটা যদি আমরা বুঝতাম তাহলে যে দুর্গতি ও অধোগতি আমাদের

সমাজকে আজ ঘিরেছে, তার কবল হতে রক্ষা পাবার কবচের সন্ধান পেতাম। রোগের মূল না দেখে চিকিৎসা করে আনাড়ি ও হাতুড়ে চিকিৎসক। সিভিলিজেসন কি তা' বুঝলে আমরা আজ সিভিলাইজ্ড্ কিনা তা' নির্দ্ধারণ করতে পারতাম। আর যদি বুঝি যে, যে কথাটা উচ্চারণ করতেও ভয় হয় আমরা তাই অর্থাৎ আন্‌সিভিলাইজ্ড তা হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে আমূল সংস্কারের।

তাই আমি বলতে চাই যে সিভিলাইজ্ড মানুষ সভ্য মানুষ এবং সভ্য মানুষ সদাচারী মানুষ। এ হ'ল ব্যষ্টির বর্ণনা। সিভিলিজেসন কথাটি ইংরাজিতে সমষ্টি বা কোনো বিশেষ সমাজের অবস্থা বোঝাবার অভিপ্রায়েই ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বোধ হয় সিভিলিজেসন বোঝাবে জাতীয় সভ্যতাকে এবং সে সভ্যতার মান হবে দেশের জাতীয় বিধানে সদাচারের স্থান রূপ ও গতি। জাতি বা গোষ্ঠি হিসাবে যে জাতির বিধি-নিয়মে সদাচারের যেমন ব্যবস্থা সে জাতির সিভিলিজেসনের রূপ সেই স্তরের। সদাচার প্রবর্ত্তনের বিধি-ব্যবস্থা সমাজের গতি নির্ণয় করে। আর সে সমাজে সদাচারীর সম্মান, সে সমাজ উন্নত।

কিন্তু সাধারণ শব্দকোষ সিভিলিজেসন কথার অর্থ করে সেই জাতীয় --অবস্থা যে অবস্থায় কোনো জাতির কর্মধারায় শিল্প-সাহিত্য ও শিষ্ট আচরণের ব্যবস্থা স্পষ্ট। একদিন আচার নামক এক ইংরাজের হটকারিতা ও সাম্রাজ্য-মাদকতা ভারতবর্ষের বাসিন্দাকে জাতি হিসাবে অসভ্য বলে নির্দ্দেশ করেছিল। সার জন উডরফ তাঁর ইজ্ ইণ্ডিয়া সিভিলাইজ্ড্ গ্রন্থে সে অনুঝকে যেমন মুখতোড় জবাব দিয়েছিলেন, তেমনি জগতের সামনে ব্যাখ্যা করেছিলেন--- কাকে সভ্যতা বলে এবং প্রমাণ করেছিলেন যে সেই উচ্চ মানে ভারতের সভ্যতা অসাধারণ। সুতরাং সমাজ হিসাবে আমাদের সমাজ সভ্যসমাজ কিনা সে বিচার সময় নষ্ট। এ সমাজ সদাচারের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে---ধর্মশাস্ত্রে, কাব্যে, সাহিত্যে এবং মহামানবের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে সে আদর্শ অতি উচ্চ। আমাদের জীবনে আমরা মহামানব দেখেছি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধী প্রভৃতি। উপদেশমালার প্রতিধ্বনি শুনেছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের। বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত দেখেছি জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লকুমার। আজও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্শন পাচ্ছি। অতীতের কথা উঠিয়ে সভ্যতা ও সদাচারীর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আমাদের গর্ব্বিত করতে পারে, পথ দেখাতে পারে। কিন্তু সে পথে না চল্‌লে মান-চিত্রে আঁকা বিদেশের পথের মত পটেই আঁকা থাকবে সে পথরেখা।

সদাচার বোঝায় আচরণ, ব্যবহার, চালচলন। এতো মাত্র নিজের প্রতি নয়—ব্যবহার বা আচরণ বল্লে অন্যকে বোঝায়। সমাজে যাদের সঙ্গে বাস করতে হয়, তাদের সঙ্গে মেলামেশার প্রণালী আচরণ। সেই আচরণ শিষ্ট ও সাধু হলে হয় সদাচার। এই কথার বিরাট ব্যাপক অর্থ বিশ্লেষণ করলে বুঝবো সদাচারের ব্যাপারটা কি? তাই প্রথমেই নিন্দা আরম্ভ করেছিলাম সেই ভাবুক ও বক্তার যে বিশ্লেষণ না ক'রে, নিগূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝে পরিভাষা ব্যবহার করে বচনে। সে পরকে ভ্রান্ত করে নিজেকে প্রবঞ্চিত করে। সদাচারী হয় সমাজ, তবু তার জনগণের মধ্যে থাকে কদাচারী। সদাচার যেমন সমষ্টির পক্ষে শিক্ষণীয়—তেমনি কর্ত্তব্য ব্যক্তির পক্ষে সাধনা। সভ্যতাভিমান মানুষকে অসভ্য বর্ব্বর ব্যবহার হতে মুক্ত রাখতে পারে, মানুষ নিজে সদাচারী হলে। আমি সভ্য ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক বা আমি কোনো বেদান্ত মঠের সভ্য সুতরাং আমি সদাচারী—এ গর্বের শ্লোক-বাক্য অযথা, ব্যক্তি-পক্ষে।

সদাচার অপরের প্রতি শিষ্ট আচরণ। সমাজ একবার সভ্যতার চরমে উঠে আবার বর্বরতার সাগরের দিকে গড়িয়ে পড়তে পারে। বৌদ্ধ বা খৃষ্ট নীতিকে কাগজে কলমে বা বাক্য-স্রোতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে, কোনো দেশের লোক যখন দম্ভভরে ভিন্ন দেশের লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, তখন সে সভ্য দেশের ঢক্কা-নিনাদের অন্তরে থাকে বর্বরের ছন্দহারা লক্ষীছাড়া রক্ত-নেশার সুর। সে ক্ষেত্রে ছন্দ বাক্যে ও অর্থে সামঞ্জস্য হারিয়ে তাল কেটে ফেলে। সভ্যতা চোট খায়। দেশের প্রধানেরা আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। দেশকে সাধনার পথে ফিরিয়ে আনে।

প্রতি সভ্য গোষ্ঠিতে বহু অসভ্য মানব থাকে। এদের সদাচারী করবার জন্য দেশে শাসন ও শৃঙ্খলার বিধান। সে বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করে যে, সমাজ বিধান করে তার শাস্তি। সমাজ যত সভ্য হয়, চোর জুয়াচোর প্রভৃতির

সংখ্যা হয় তত হ্রাস। রামরাজ্যেও তারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অল্প।

সমাজ সভ্যতার আদর্শের দিকে যত অগ্রসর হয় প্রত্যেক প্রভাব না-ইচ্ছা-করবার বৃত্তি তত গণ্ডীর নিগড়ে বাঁধা পড়ে। তার চলাফেরা বলা-কওয়া হয় সসীম। সভ্য সমাজের উদ্দেশ্য প্রত্যেক নাগরিককে অন্যের খাম-খেয়ালী বদ-মেজাজের অত্যাচার হতে রক্ষা করা। সেথায় শিষ্ট আচরণের প্রয়োজনও কর্মক্ষেত্র। সমাজের আদর্শ উচ্চ হতে উচ্চতর হতে পারে কিন্তু সমাজ-ভুক্তরা যদি সে আদর্শ ও বিধি-নিয়মকে পুঁথিগত নীতি ভেবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ধারা ও গতি নির্দ্ধারণ করে, তাতে একের কর্ম অন্যের মম-বিদারক হওয়া সম্ভব। তেমন কর্ম-স্বাধীনতা বর্বরতার নৃত্যভূমি করে সুস্থ সমাজকে। তেমন কর্ম কদাচার - সদাচার নয়।

এটা অপ্রিয় সত্য যে আজ আমাদের সমাজে সদাচার বিপন্ন। এই ব্যক্তি-অসভ্যতা বেড়ে বেড়ে সমাজকে করবে অসভ্য! মানুষের জীবন, চক্রের পর চক্রে ঘেরা। তার কর্ত্তব্য নিশ্চয় নিজেকে ঘিরে। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব এক বিশাল বিরাট সমাজপুরুষের অঙ্গ। সারা অঙ্গে ক্ষত জন্মালে ঔষধ দেবার স্থান থাকে না।

আমাদের দেশের নীতি এই সব গণ্ডীর পর গণ্ডীর বর্ণনা দিয়েছে এবং প্রত্যেকটির প্রতি কর্ত্তব্য করতে শিখিয়েছে। প্রথম গণ্ডীতে পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব নীতি। তার পরের গণ্ডীতে আচার্য্যদেবোভব। তারপর অতিথিদেবোভব এবং শেষে বুঝতে হবে—যার দ্বারা অন্যের উৎপীড়ন হয় না এবং অন্যের কমে যার উৎপীড়ন বোধ হয় না—হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হতে যে মুক্ত সে জগদীশ্বরের প্রিয়। অন্যত্র ঈর্ষা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বর্জ্জনের উপদেশ লাভ করি।

এমন সব আদর্শ জীবন-পথের প্রতি অলিগলিতে চিহ্ন-রূপে বিরাজ করছে সামাজিক কর্ম-তালিকায়। কিন্তু আজ একি? আমরা কোন্ পথে? রবীন্দ্রনাথের বাণী আজ যেন আমাদের সবিশেষ বর্ণনা করছে—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরাজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন দ্রষ্টা, তেমনি ছিলেন দেশ-প্রেমিক। তাঁর বাক্য নিষ্ফল হতে পারে না। তিনি সেই মর্মবেদনার চিত্রে আমাদের চরমরূপ দেখেন নি। তিনি দেখেছেন পুনরুত্থানের চিত্র। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো—তিনি ভাবতেন পাপ। তাই কবি বলেছেন—"আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকার-হীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এ গড়ানে পথ থেকে স্বজাতিকে মোড় ফেরাতে পারি সমাজের প্রত্যেক হিতকামী নিজে রুকে দাঁড়িয়ে ধ্বংশের মহাসাগরের পথ রুদ্ধ করে।

আজ আমাদের কানে ধ্বনিত হক দেশের আর এক মহামানব স্বামীজির বাণী—"শ্রদ্ধাবান হ, বীর্য্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

"মহামানবেরা যা করেছেন, জাতিও তা করতে পারে এবং করলে সফল হবে। কারণ মহামানবেরা অগ্রদূত ভাবীকালের আদর্শ মানবের"—বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

একথা সত্য যে আজ কুসংসর্গ কদাচার আমাদের ব্যতিব্যস্ত করেছে। একথা প্রত্যেকে বুঝি আত্মানুসন্ধানের ফলে। তার ফলে আমরা নিজেকে এবং পরকে অভিযুক্ত করি। কিন্তু নিষ্ফল ব্যর্থতার বিভীষিকা আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। পরের কথা দূরে থাক, নিজের পরিবারের যারা অন্তর্ভুক্ত, তাদের দেখি কদাচার লীন, সদাচার হীন। কিন্তু উৎসাহ নাই, বীর্য্য নাই, কর্ত্তব্য-বোধ নাই, এ অবস্থার অন্ত করবার। সম্মুখে দেখছি ধ্বংশের অভিযান। প্রেক্ষা-গৃহের দর্শকের মত সে অভিনয়ে আমরা ক্লিষ্ট হচ্ছি। চাই একটা সংকল্প যার সিদ্ধিতে আমরা স্বজাতির স্বদেশের এবং সর্ব্বোপরি আমাদের যুগ-যুগান্তের পৈতৃক সম্পত্তির অধোগতি এবং মূঢ় অপচয় বন্ধ করতে পারি।

যে জাতি একদিন পূর্ব্বে জাপান উত্তরে সাইবেরিয়া পূর্ব্ব—দক্ষিণ ফিলিপিন বালি, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে সভ্যতা বিস্তার করেছিল, সে জাতির উত্তরাধিকারী সদাচার ভুললে জগতের ক্ষতি হবে বিস্তর।

আত্মহত্যা

(ফরাসী গল্প)

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এসসি

স্যান রোমানো! আহা কি সুন্দর স্থান, ভূস্বর্গ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। এখানে আসিলে ফ্রাউবার্টির কথাগুলি স্মরণ হয়, "পৃথিবীতে এমন কয়েকটি স্থান আছে যাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।" কিন্তু কি দুঃখের কথা, স্যান রোমানোতে আসিলে স্বর্গের সেই নিষিদ্ধ ফলের কথা মনে হয় যাহা খাইলেও বিপদ ঘটে, অথচ খাইবার লোভ সংবরণ করাও কঠিন। যে আনন্দময় শান্তি এই নগরের আকাশে বাতাসে বিরাজ করে, অনুতাপের বিষয় তাহা এখানকার আগন্তুকদের হৃদয়ে অধিকদিন স্থায়ী হয় না। দেখা যায় চতুর্দিকেই বিষণ্ণমুখ লইয়া লোকেরা বেড়াইতেছে, আর মাঝে মাঝে হেঁয়ালীর মত বলিয়া উঠিতেছে, "আহা, সাতের উপর যদি উহা চাপাইতে পারিতাম! পাজী লোকটা, দশ দশ-বারই সে জিতিল, আর একবারও আমি পারিলাম না।"

এই সমস্ত ভ্রমণকারীরা স্যান-রোমানোর রমণীয় দৃশ্যের প্রতি খুব অল্পই দৃষ্টিপাত করে। পৃথিবীকে তাহারা কুবেরের রাজত্বে পাশাখেলার ছক বলিয়া গ্রহণ করে। এখানে তাহারা ভাগ্য পরীক্ষা করিতেই যেন আসিয়াছে। আমিও কিছুদিন এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলাম। প্রথম-দিকেই বেশ কিছুটা অর্থ নষ্ট হওয়ায় মর্মাহত হইয়াছিলাম। একদিন এমন অবস্থা হইল যখন আমার নিকট অবশিষ্ট মাত্র বার টাকা অথচ হোটেলওয়ালার পাওনা পনের টাকা। সেই দিনই আমার রিভলবারটি ভালভাবে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ছয়টি গুলিই রহিয়াছে। ইহার যে কোন একটিই আমার মস্তক বিদীর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘরের জানলা খুলিয়া দিয়া আমার 'শেষ সকাল' দর্শন করিলাম। খুবই চমৎকার লাগিতেছিল—গাঢ় নীল আকাশ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আর বাতাসে-ভেসে-আসা কমলালেবুর সুমিষ্ট গন্ধ। প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হওয়ায় হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় হোটেলের দিকে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে স্থানীয় একখানি পত্রিকা কিনিলাম। দেখিলাম পত্রিকার উপরকার কাগজের চারিধার দিয়া কালো রেখা। কিসের জন্য এই শোক চিহ্ন?

প্রাতঃভোজনের সময় কাগজখানি পড়িতে লাগিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'সাপ্তাহিক আত্মহত্যা।' মনে মনে ভাবিলাম, আমার মৃত্যুর খবরও এইস্থানে প্রকাশিত হইবে। এত দুঃখ সত্ত্বেও একবার মনে হইল আমার মৃত্যুর খবরটা নিজ হস্তেই লিখিয়া পাঠাই। একটা খবর পড়িলাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে 'গতকল্য জোসুয়া জ্যাকবসন নামক একজন আমেরিকানের মৃতদেহ গাছের উপর ঝুলিতে দেখা যায়। মৃতের পকেট হইতে তিন হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।'

ভদ্রলোকের সহিত আমার ভালরকমই পরিচয় ছিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া জুয়া খেলিয়াছি এবং একই সঙ্গে সর্বস্বান্ত হইয়াছি। সেদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি তাঁহার শেষ কপর্দক হারাইলেন, আবেগের সহিত আমার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বোধহয় দেখা হইবে না। বিদায়, বন্ধু, বিদায়।" এই কথা বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত সেই আমার শেষ দেখা। তারপরই বোধহয় গলায় দড়ি লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তাঁহার পকেটে

কি করিয়া তিনটি হাজার টাকা আসিল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর কারণটি হঠাৎ আমার মাথায় আসিল। এতক্ষণ এই সহজ ব্যাপারটি চিন্তা করিতে না পারার জন্য নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ঘৃণা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। আরে এটা তো খুবই সোজা ব্যাপার। তাঁহার মৃত্যুর পর হোটেলের মালিক চুপি চুপি টাকটা তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে না যে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার জন্য তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহাতে হোটেলের দুর্নাম হইবে না, এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। ভাবিতে লাগিলাম, আচ্ছা আমি যদি ঐরূপভাবে মরিয়া যাই তাহারা কতটাকা আমার পকেটে রাখিবে। একটা মতলব সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় খেলিয়া গেল। চঞ্চল পায়ে অথচ লঘু হৃদয়ে মালিকের নিকটে গিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আপনার ঋণের টাকা সন্ধ্যার সময় দিব, অবশ্য যদি তখন বাঁচিয়া থাকি।"

"মহাশয়, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি।"

"আচ্ছা তাহা হইলে দয়া করিয়া আমায় আরও একশ টাকা ধার দিন। সন্ধ্যায় আমার টাকাটা আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশা করিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিব।"

টাকাটা লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। কি করিয়া আমার মতলব কার্যে পরিণত করিব তাহার চিন্তায় বিকালটা সমুদ্রতীরে কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যায় আমার সর্বোৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত হইয়া জুয়াখেলার স্থানে আসিলাম। আমার শেষ টাকাটা পর্যন্ত বাজী রাখিলাম, কিন্তু পূর্বের মতই হারিয়া গেলাম। হারিয়া প্রথমে উদ্বিগ্ন ও পরে রাগের ভাব দেখাইলাম। শেষে একেবারে চুপ-চাপ। একজন 'বয়' আমার নিকট আসিল, তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমি সর্বস্ব হারাইয়াছি।" সে সহানুভূতি দেখাইল এবং সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। বলিল, "যদি আপনি দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কর্তা টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।" উত্তরে জানাইলাম, "আমি যেখানে যাইব সেখানে টিকিটের প্রয়োজন নাই।" সে আমার দিকে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া বলিল, "না, না, ওকি বলিতেছেন? ঐরূপ বোকামী আপনি করিবেন না বলিয়া আমি প্রার্থনা করি।" আমি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সেই লোকটি খুবই আগ্রহের সহিত আমায় লক্ষ্য করিতেছে। রাত্রি এগারটার সময় যখন সকলে চলিয়া গেল, আমি নতমস্তকে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম।

কি সুন্দর সেই রাত্রির রূপ। চন্দ্রকিরণে বনানী উদ্ভাসিত হইতেছে এবং সাগর রজতশুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে। দূরে কোথায় বেহালা বাজিতেছে। তাহার মর্মস্পর্শী করুণ রাগিণী যেন আমার এই শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত করিতেছিল। হোটেলের পিছন দিকে যেখানে মরসুমী ফুলের একটি বড় ঝোপ আছে সেইদিকেই চলিলাম। সেখানে জলদেবীর যে সাদা পাথরের মূর্তিটা ছিল মনে হইল আমাকে দেখিয়া যেন মৃদু হাস্য করিলেন। রিভলবার হইতে দুইবার গুলি ছুঁড়িলাম। গুড়ুম, গুড়ুম শব্দে নিস্তব্ধ রজনী জাগিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটের একটি বেঞ্চিতে—আঘাত না পাই—এইরূপ সন্তর্পণে শুইয়া পড়িয়া হোটেলের মালিকের আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দূর হইতে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহা নিকটে আসিল, একটা ছায়াও যেন আমার চোখের উপর আসিয়া পড়িল।

"কি সর্বনাশ, এ যে সেই ভদ্রলোক। দু'দুটা গুলি একেবারে দেহ ভেদ করিয়া গিয়াছে।"

তারপর মালিকের গলার আওয়াজ পাইলাম, "তাড়াতাড়ি কর, এখনি লোকেরা আসিয়া পড়িবে। হতভাগারা মরিবার আর জায়গা পায় না?" এই কথা বলিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার জামার পকেটের মধ্যে যে কিছু ঢুকাইয়া দিলেন তাহা চোখ বুজিয়াও বেশ অনুভব করিলাম। হাসিতে আমার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছিল। গোঁ গোঁ আওয়াজ করিতে করিতে চোখ খুলিয়া চতুর্দিকে আশ্চর্য হইয়া তাকাইলাম। দেখিলাম হোটেলবাসীর ছোটখাট একটা জনতা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া আমার টুপি ও রিভলবার কুড়াইয়া লইয়া আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। জনতা আরও বেশী আশ্চর্য হইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। আমি অতিশয় রাগতস্বরে বলিলাম,

"একটা লোককে আপনারা কি নিশ্চিন্তে মরিতেও দিবেন না?" মালিক বলিল, "মহাশয়, এ রকম ঠাট্টার মানে কি? হোটেলের শান্তিভঙ্গের জন্ম আমি আপনাকে পুলিশে দিব।"

চাপা হাসিতে দেহ আমার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে কিন্তু আমি শান্ত স্বরে উত্তর দিলাম, "শান্তিভঙ্গ করিয়াছি আমি? বেশ তো!" এই বলিয়া আমি সেখান হইতে ধীরে ধীরে আমার ঘরে চলিয়া আসিলাম। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসির ফোয়ারা ছোটাইলাম। তারপরে আমার আত্মহত্যার বিনিময়ে অর্জিত তিন হাজার টাকা হইতে সমস্ত দেনা শোধ করিলাম এবং সেই রাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

ইহার কিছুদিন পর পর্যন্ত তাহারা টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিল। টাকা আমি দিই নাই কারণ আমার মনে হয় টাকাটা আইনতঃ আমার প্রাপ্য। আর তাহা ছাড়া একটা আত্মহত্যার মূল্য তিন হাজার টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী। এখন শুনিতে পাই এই ঘটনার পর হইতেই সগন রোমানোর সেই হোটেলে আত্মহত্যার নির্দ্ধারিত মূল্য অনেকখানি হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

ভুলি নাই *

নবনীতা দেব

ইলিনোরা ভুলি নাই তোমারে, তোমার ইতালীরে
অমলিন শ্বেতপদ্ম জেগে আছো মোর স্মৃতিনীরে
তোমার সুন্দর লিপি ঝংকারিল মোর মর্ম তার—
অকস্মাৎ খুলে গেল অবরুদ্ধ স্মৃতির দুয়ার!
স্মরণে উঠিল ভাসি' ভূমধ্য-সিন্ধুর নীলছবি—
অলিভ-বনের শীর্ষে অস্তগামী আরক্তিম রবি।
যোজন যোজনব্যাপী আদিগন্ত আঙুরের ক্ষেতে
চিকণ-সোনালী আলো ছায়াসনে নৃত্যে আছে মেতে।
গুচ্ছে গুচ্ছে সুবলিত স্ফটিকসন্নিভ দ্রাক্ষারাশি
নন্দনের প্রতিচ্ছবি মৃত্তিকায় তুলেছে উদ্ভাসি'।

ইলিনোরা, ভুলি নাই ভেনিস ফ্লোরেন্স পীসা রোম!
সুদূর শতাব্দী যেথা বাচিয়া রয়েছে ছুঁয়ে ব্যোম
ফোরামের ভগ্নস্তূপে, কলোসিয়ামের ব্যাপ্ত দেহে
মেঘচুম্বী ক্যাথিড্রালে, সুগভীর প্যান্থিয়ান গেহে।
র‍্যাফায়েল দা-ভিঞ্চির মিকেলেঞ্জেলোর স্বপ্নলোক
সার্থক করেছে প্রাণ। সার্থক করেছে এই চোখ।
ভুবন-বন্দিতা দেশ সর্বাংগ সৌন্দর্য্যে শিল্পে ছাওয়া
ভুলি নাই জ্যোৎস্নারাতে গণ্ডোলায় ভেসে চলে যাওয়া
সপ্ত শিখরের শীর্ষে চিরন্তনী রোমা মহীয়সী
ঊর্দ্ধে নীল, নিম্নে নীল, মাঝে মহা কীর্তি গরীয়সী।

তোমার কুঞ্চিত কালো কেশ মনে পড়ে ইলিনোরা।
নবনী-কোমল তনু মর্মর খোদিয়া যেন গড়া।
সুকৃষ্ণ ভ্রমর-আঁখি মেদুর-পল্লব-ঘনচ্ছায়;
নিটোল নিখুঁত দেহ সুগঠিত ভেনাসের প্রায়।
হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিধারে দূরদেশিনীরে
সখিত্বে লয়েছো বরি' ফ্লোরেন্সে আর্ণোনদ্রীতীরে।
ভুলি নাই, ভুলিব না, ভুলিবার নহো তুমি প্রিয়,—
হৃদয় ভরিয়া আছে সুধারসে অনির্ব্বচনীয়।

ইতালীর সুখস্মৃতি আমরণ রহিবে অম্লান
তোমার সৌহাদ্য মোর আনন্দের ঐশ্বর্য্য মহান্।

* ইতালীয় বান্ধবী Guarnieri Eleonora-র প্রতি

গতি ও গন্তব্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(৬)

ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার গতি ছিল সংযত ও সঙ্গত। মন্তব্যও ছিল সুনির্দিষ্ট—বিশ্বশান্তি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টির কল্যাণ-কামনাই ছিল তার লক্ষ্য। তুবড়ীর রোশনাই ক্ষণিক। তাতে চমক লাগে। স্থায়ী দীপশিক্ষা যে আলো বিতরণ করে—ফুলঝুরির কাছে কি তা আশা করা যায়? তার জ্বলুনিও যেমন তীব্র, নির্ব্বাণও তেমনি আকস্মিক।

দানবীয় যন্ত্রকৌশলে বহির্মুখী মানবমন এত বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত কেন? চাওয়া-পাওয়ার উন্মাদনায় সে তো আজ বহুবিধ স্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছে? জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে মানুষের জয়পতাকা উড়িয়েছে? তবু বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে, এ আশঙ্কার কারণ কি? সাম্যবাদীরা দায়ী করছেন ধনতন্ত্রীকে। ধনতন্ত্রীরা দায়ী করছেন সাম্যবাদীকে। তারা উভয়েই উদ্দাম যন্ত্রকৌশলী প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ধাবমান। ক্ষমতার দর্পণে নিজেদের ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখে আজ তারা দুজনাই ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠ্ছেন।

যান্ত্রিক-সভ্যতার পরিপোষক সাম্যবাদকে আমরা যতই মুখরোচক ও শান্তিপ্রদকর মনে করি—ভারতীয় প্রেমধর্ম্মের কষ্টিপাথরে ঘষলে দেখা যায়—সেও সোনা নয়, পিতল। কমরেড্রা কি বলতে পারেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতীয় যৌথ-পরিবারের আদর্শ আজ ভেঙে যাচ্ছে কেন? একান্নবর্ত্তিতার মূলে যে সাম্যবাদ নিহিত ছিল তা' আজ কোথায়? অন্ধ, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ ভাইরা একটি পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ-ভাইয়ের স্নেহশীতল মমতার আনুকুল্যে কখনই বঞ্চিত হ'ত না। বৃদ্ধ বাপ-মাও পরিত্যক্ত হ'তেন না, ছেঁড়া বিনামার মত। প্রিয়জনের কল্যাণ কামনায় গৃহলক্ষ্মীদের ত্যাগবুদ্ধিই ছিল পারিবারিক সুখ ও শান্তির উৎস। সাগর-পারের কমরেডদের সঙ্গে যারা সাম্যবাদের গাঁটছড়া বাঁধ্তে উদ্গ্রীব—মতবাদের লড়াই বাধিয়ে নির্ব্বিচার রক্ত-মোক্ষণের একটা বিরাট পরিকল্পনা, যাদের স্বপ্ন বিলাস—সহোদর ভাইবোনদের দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনে কতটুকু ত্যাগবুদ্ধির পরিচয় তারা দিয়ে থাকেন? আধুনিক সাম্যবাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক্, আদর্শ যতই উদার হোক্, ভারতীয় প্রেমধর্ম্মের বিচারে, তাকে 'ঘর জ্বালানো—পর ভুলানো' শাঠ্য-নীতি ছাড়া আর-কিছু মনে করা যায় না।

একজন তথাকথিত সাম্যবাদী হয়তো বল্বেন—সাম্যবাদের ভিত্তিতে তারা এমন এক নূতন সমাজ ও পরিবার গড়ে তুল্তে চান—যার সঙ্গে ভারতীয় ভাবাদর্শের কোন বিরোধ নেই। সেই 'নবাদর্শ-রূপায়নে'র জন্যেই তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের বর্ত্তমান ঠাণ্ডা-বুঝাপড়া ও ভবিষ্যৎ রক্তাক্ত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থবাদীরাও সন্দিগ্ধ ও ভীত। স্বাভাবিক ভাবে এই সন্দেহ আর ভয় যে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশু কারণ, সে বিষয়ে শান্তিবাদীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তাদের বিশ্বাস—বর্ত্তমান ঠাণ্ডা-লড়াই যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা সর্ব্বনাশা বহ্ন্যুৎসবে পরিণত হতে পারে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—ব্যক্তি নিয়েই পরিবার, আর পরিবার নিয়েই তো সমাজ? সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠন কি ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সহানুভূতি-সাপেক্ষ নয়? ব্যক্তি যেখানে উপেক্ষিত, গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজী সেখানে ধরা পড়বেই। সে হিসাবে সাম্যবাদের দলীয় নায়কত্ব গণতন্ত্র বিরোধী। ঘোড়ার সামনে গাড়ী রাখা, আর গাছ না বাঁচিয়ে ফলের মালিকানা দাবী করা অযৌক্তিক। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিপ্লবী সাম্যবাদীরা কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। তাদের আসুরিক চিকিৎসার ফলে রোগ সারলেও, রোগী বাঁচ্বে না—একথা নিশ্চয়। ভারতীয় দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসা ও রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়—প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিতে 'ভাগবতী বুদ্ধির' উদ্বোধন।

ভারতীয় সাম্যবাদের আদর্শ একদিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল রাম-রাজ্যে। সেই কারণেই গান্ধীজীর রামরাজ্য পরিকল্পনার মূলে ছিল অবিচলিত ভাগবতী বুদ্ধি। সত্যসন্ধ নির্লোভ রাজা পিতৃসত্য-পালনের জন্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী ছিলেন। প্রজা বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন—মর্ম্মন্তুদ আত্মনিগ্রহ সহ্য ক'রে, প্রাণাধিক প্রিয়তমাকেও পরিত্যাগ ক'রে। একটি শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্যে কোন শোকার্ত্ত পিতা যখন রামরাজ্যকে দায়ী করেছিলেন, রাজদরবারে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'নিষ্পাপ শিশুর অকাল-মৃত্যুর জন্য দায়ী ওই সিংহাসন!' শ্রীরাম তার প্রতিবাদ করতে পারেন নি। কোন্ রাষ্ট্রপতি স্বীকার ক'রে থাকেন—ব্যক্তি-জীবনের এতখানি শুভাশুভের দায়িত্ব? লক্ষ লক্ষ পথচারী উদ্বাস্তুর জীবনমরণ সমস্যা আজ হয়ে পড়েছে—সরকারী নথী-দুরন্ত প্রাণহীন পরিকল্পনার বিষয় মাত্র। সমৃদ্ধ গৃহস্থাশ্রমীকে রাস্তায় টেনে এনে মুষ্টি-ভিক্ষাদানের এই আয়োজন কার প্রয়োজনে? মৌখিক বাগাড়ম্বরে রাষ্ট্রনায়কগণ যতই সহানুভূতি প্রকাশ করুন—মনুষ্যত্বের এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার মূলে আছে কতিপয় সুবিধাভোগী ধনিকের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই ধনিকদের মনে যদি ভাগবতী-বুদ্ধির ক্ষণিক জাগরণও সম্ভব হ'ত—তাহলে উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান হতে পারত মাত্র এক দিনে।

কোথায় গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের নামে দলীয় নায়কত্বই সৃষ্টি করেছে মানবতার চরম দুর্গতি। যন্ত্রকৌশলে অতি নির্ম্মমভাবে জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্যবৃদ্ধির স্থায়ী পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে—কতিপয় ধনিকের কায়েমী স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ পাপচক্রের প্রভাবে তারাও

সুখী হতে পারছে না। ভাগবতী বুদ্ধির অভাবে তাদের মধ্যেও নগ্ন স্বার্থ-বিরোধের জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। প্রাণহীন বিজ্ঞান বুদ্ধির ঠাণ্ডা লড়াই আর কত দিন? একটা বিরাট বজ্রোৎসব আসন্ন বলেই মনে হয়।

সাম্যবাদীরা বলেন—রাষ্ট্রীয় চাপে ধনিকের সর্বস্ব আহরণ করে, সুসম ধন বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে। তা' কি সম্ভব? বরফ চাপা দিয়ে সাময়িকভাবে জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করলেও জ্বর নিজে তো কোন ব্যাধি নয়? যে মূল ব্যাধির কারণে দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটে, তার চিকিৎসা কে করবে? সুচিকিৎসক শুধু ক্যাষ্টার-অয়েলের ভরসায় থাকেন না। পৈটিক অবরোধের কারণ সন্ধান করেন। মূলব্যাধির দাওয়াই যে 'ভাগবতী বুদ্ধির সূচিকাভরণ', সাম্যবাদীরা সেইটুকু স্বীকার করলেই বোধহয় সমস্যার মীমাংসা হতে পারে।

(৭)

চিন্তানায়ক রাসেল বলেছেন—মহাত্মা গান্ধী প্রাচীনপন্থী, সুতরাং এ অচল। তার অহিংস সত্যাগ্রহের ধমকানি নাকি বাঘ ভালুকের কাছে চলে না। বৃটিশজাতির চক্ষুলজ্জা বেশী বলেই, গান্ধীজী জয়ী হয়েছেন। হতো যদি নাজী জার্মান—তাহ'লে গালা-সুরুর আগেই তারা পাল-চাপা দিত। অহিংসার মাহাত্ম্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। হয়তো রাসেলের এ মন্তব্য সত্যি। কিন্তু গান্ধীজী প্রাচীনপন্থী হলেন কিসে? দাঁতের জন্যে দাঁত, আর নখের জন্যে নখ, কি অতি আদিম বন্য নীতি নয়? শাশ্বত সত্যের বিনাশ নেই। ভাগবতী বুদ্ধির অনুশীলনে যে মৃত্যুভয়হীন আত্মিক শক্তির বিকাশ হয়—গান্ধীজী ছিলেন তারই মূর্ত্তপ্রতীক। বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্যে ভারতীয় ভাবধারার বিদ্যুৎ চমক। তাকে যদি প্রাচীন বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়—তাহলে এটম-বোমা আরও প্রাচীন—দাঁত ও নখের উৎকর্ষ মাত্র। দুর্গাকে আঁচলে বাঁধা সম্ভব হতে পারে, তবু আত্মিক শক্তিকে পালচাপা-দেওয়া সম্ভব নয়। যে দানবীয় শক্তি সে বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করতো তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তো। এ তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, তথ্যানুসন্ধী রাসেলকেও হতে হবে ভারতীয় দর্শনের দ্বারস্থ।

গান্ধীবাদের রাজনৈতিক কৃতকার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, ব্যক্তিজীবনের অশান্তি বৃদ্ধির জন্যে রাসেলও দায়ী করেছেন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে। তিনি বলেন—মানুষ শান্তিলাভ করে অভ্যাস-সমষ্টির অনুসরণে। তেল দীপালোকে যে মানুষ সুখী ছিল, বিজলীর বাতি এসে তাকে অসুখী করেছে। ট্রামবাস কেড়ে নিয়েছে পায়ে-হাঁটার সুখ। এইভাবে অভ্যাসের অনিশ্চয়তা প্রতিপদে মানুষের অসুখ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি মানুষকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করলেও তার অভাব বোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে বহুগুণ বেশী। অভ্যাসগত সুখ-সুবিধা-ভোগের স্থায়ী পথে মানুষ কখনই স্থির হয়ে দাড়াতে পারছে না। এই অস্থিরতাই তাকে গড়ে তুলছে স্বার্থবুদ্ধিতে অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল।

বৈজ্ঞানিক চাওয়া-পাওয়ার উৎকণ্ঠা একদিকে দিচ্ছে মানসিক দৈন্য বাড়িয়ে, অন্যদিকে পারছে না দৈহিক সুখ-সুবিধা বাড়াতে। রাসেলের মতে, অভ্যাসগত অনিশ্চয়তাই তার মূল কারণ। লাঠি ও তরবারির কসরতে যে বিবাদের মীমাংসা হ'ত—সেখানে আজ এসেছে বন্দুক কামান ও বোমা, বিবাদের উগ্রতাকে আরও বাড়িয়ে দেবার জন্যে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্ক্রিয়া রোগবিস্তারের সহায়ক হয়ে উঠেছে। জীবনী-শক্তিবৃদ্ধির উপায়-নির্দ্ধারণ আর ভেষজ-গুণের কেরামতি দেখানো তো এক কথা নয়? যার মৃত্যু অবধারিত—ভেষজ-গুণে তার মৃত্যু যন্ত্রণা বিলম্বিত করা কি নিরর্থক নয়?

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করে সংখ্যাতাত্ত্বিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বল্‌ছেন—মা-বসুমতী নাকি শীগগীরই দেউলে-খাতায় নাম লেখাবেন। জাগতিক খাদ্যোৎপাদনে টানাটানি পড়বে! জন্ম নিয়ন্ত্রণের আশু আবশ্যকতা রাসেলও স্বীকার করেছেন। কেন? এত দুঃখ-দৈন্যের নিপীড়নেও যাদের সংখ্যা হ্রাস হচ্ছে না, তারা কারা? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর—যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে যারা অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রা সুরু করেছেন—অস্বাভাবিকভাবে গতিবেগ বাড়িয়ে নিয়ে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অসংযমীর জীবন-যাপন করছেন—অর্থাৎ মানবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মানবের সংখ্যা হ্রাস, সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কাল্পনিক ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যান্ত্রিক-কৌশলে আমরা পেয়েছি—সমাজ বন্ধনহীন সহরে ভোগ লালসার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, আর পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন-পদ্ধতির প্রতি বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। সহরের আহার্য্য-পরিবেশনে রেস্তরাঁ, চিত্ত বিনোদনে সিনেমা, আর চলাফেরার গতিবৃদ্ধি সহায়ক ট্রাম ও বাস, আত্মনির্ভরশীল পল্লীবাসীকে সহরাভিমুখী করে তুলছে। জনসাধারণের চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি অপরিহার্য্য বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষাপতিরাও মানবমনের এ দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছেন। সহরের উপকণ্ঠে গড়ে তুলছেন—কল্‌কব্‌জার কেরামতিপূর্ণ বড় বড় কারখানা। এই যন্ত্র-কৌশলের বেদীমূলেই বলি দেওয়া হচ্ছে মেহনতী জনতার স্বাস্থ্য সুখ ও নৈতিক চরিত্র। কুটির-শিল্পে সমৃদ্ধ পল্লীগুলি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণে কখনই অশক্ত ছিল না। সহর সৃষ্টি আর যন্ত্র-কৌশলে বিলাস ব্যসনের শিল্পগুলিকে কেন্দ্রিয়-করণ-চেষ্টার মূলে ধনিকের অর্থ লালসা ছাড়া আর কি আছে? মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন—বিকেন্দ্রী-করণ বা কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবন, তাতো হ'লনা? গান্ধী-শিষ্যরা মনের নোঙর তুলতে পারলেন না। কমন ওয়েলথের গাঁটছড়া খুল্‌তে পারলেন না। আজ সারারাত নাও-বাওয়ার ব্যর্থ শ্রম স্বীকার করতে হচ্ছে—ভোরের দিকে আবার সেই 'কানাইয়ের মাকে' দেখে! সেই রূপ, সেই রস, সেই গন্ধ আর স্পর্শ যদি অব্যাহতই থাক্‌লো, তাহলে কি প্রয়োজন ছিল বৃটিশ তাড়াবার? বিদেশী মাউন্ট ব্যাটেনের গদীতে আমাদের রাজেন্দ্রপ্রসাদ বসেছেন—স্বাধীনতার এ বাল-সুলভ ধাপ্পা অচল। রাষ্ট্রপতিকে ষোল ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে, তাঁর সম্মানের তোপ-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখার জন্যেই কি গান্ধীজীর আত্ম নিগ্রহ? বাঙলার বালক ক্ষুদিরাম কি ফাঁসি কাঠে ঝুলেছিল—লক্ষ লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তুর আত্মাবমাননার এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে? এই কি গান্ধী পরিকল্পিত রাম রাজ্য?

কথকতার কথা

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ

বাংলার পল্লীশ্রী যে মহামাধুরী বহন করে সামাজিকের মনকে সরস করে রাখত তার অনেকখানি ছিল সুর, সঙ্গীত ও কথার মাধ্যমে ভগবদুপাসনায়। নদীর ধারে বাঁশের ঝাড়। তার পাশ দিয়েই গ্রামের পথ একটানা চলেছে অনেক দূর। পথ আঁকা বাঁকা কত ছন্দে ছলেছে দরদী বান্ধবীর মত। এই পথের দুধারে গ্রামের চোখজুড়ানো স্নিগ্ধশান্ত ঘনসন্নিবিষ্ট কাঁচা ঘরগুলি। মাঝে মাঝে গোয়ালে গরু খোলা জমির উপর বাছুরের ছুটাছুটি। গ্রামের একপ্রান্তে মস্ত বড় অনেকদিনের পুরানো একটা অশ্বত্থ গাছ, সেই গাছের ছায়ায় ভাঙ্গা সেকেলে ধরণের একটি ঠাকুর ঘর আর বারোয়ারীতলা। এইখানে বছরের পর বছর কত গায়ক কত কথকচূড়ামণি এসে পালা গান করেন—কথকতা করেন। তখন আশে-পাশের কত গ্রামের লোক এসে এইখানে তাদের প্রিয় হরিনাম শোনে, রামায়ণ শোনে, কৃষ্ণলীলা শোনে, তখন যে যে কি এক আনন্দের তরঙ্গ ওঠে তা বলে বুঝাবার নয়।

এখন অনেকদিন ধরে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় লোক আসে না—গান হয় না—কথকতাও শোনা যায় না। শুধু সেই পুরাণো ভাঙ্গা মন্দিরে বৃদ্ধ পূজারী বসে থাকেন—ঠাকুরের মুখ চেয়ে, আর ভাবেন মানুষের মন এমন হল কেন? তারা হরিনাম শুনতে চায় না, কথকতার আদর করে না—মেলা মহোৎসবে তাদের আগের মত আর উৎসাহ নেই। শুধু যত লোক কি কোথায় সিনেমায়—সেদিকেই ছুটে যাবে?

বেশী দিনের কথা নয়, পঁচিশ বছর আগের কথাই বলি, তখনও দেশে ভালো ভালো কথক ছিলেন যাদের মত গুণীলোক এখন আর দেখা যায় না। বাংলার পল্লীজীবন যারা রক্ষা করেছেন—রসে সঞ্জীবিত করেছেন—শুদ্ধ ভাবপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং নিত্য নব ধর্ম শিক্ষাদান করে জীবন গতিকে সহজ সরল সুস্থ রেখেছেন। সেই কীর্তনীয়া, কবির দল, কথকঠাকুর প্রভৃতি এখন বিরল দর্শন হয়েছেন। যারা ভাল গান করেন তারা সহরে, কবিরদল বিলুপ্তপ্রায়, কথক আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন যারা ভাগবত রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গে জনচিত্তে আনন্দদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রায়শঃ পাঠক বা ব্যাখ্যাতা। আগেকার দিনের মত কথকতা শুনতে চাইলেও উপায় আর নাই। এই ভাবস্রোত চলে চলে হয়তো কিছুদিনের পর সামাজিক কথকতার রস হতে একান্তভাবেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। বৈষ্ণবাচার্য প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ একবার এই কথকতা সম্বন্ধে উন্নতিবিধায়ক কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তাতে এই বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনবোধে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনেরও উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন রীতিতে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন, ভাগবত রামায়ণ সম্বন্ধে শুধু তাঁরাই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন কথকের নাম করেই কথকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলো এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। কথকেরা প্রায়শঃ কথা সম্বল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের দান খুব বেশী নয়। তবে একেবারে কোথাও কিছু নেই, এ কথা বলা তাদের প্রতি অন্যায় করা।

যে সব খ্যাতনামা কথক সহস্র সহস্র লোকের মনে কথার প্রাচুর্যে ভাবের বন্যা সৃষ্টি করেছেন—যাঁরা কবির কাব্যকে সার্থক করেছেন কণ্ঠের মাধুর্যে—যাঁরা ব্যাস বাল্মীকির বর্ণনাকে রূপ দিয়েছেন আঙ্গিক অভিনয়ে, যাঁরা পদাবলীকে মধুর ছন্দ দিয়েছেন পাঠক্রম চাতুর্যে, সেই কথকদের গৌরবকে চিরন্তন করে রাখবার মত কোনো সাহিত্য নেই কোনো ভাষা নেই কোনো অবলম্বন নেই আছে শুধু তাঁদের ছায়ামূর্তি বর্তমানের পাঠক ও ব্যাখ্যাতৃবর্গ। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও এত অল্প যে উহা লোকশিক্ষার পক্ষে মোটেই প্রচুর বলে অস্বীকার্য।

গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষর করাবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা, অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা চলেছে স্বাধীন ভারতে প্রশংসনীয়ভাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষর পরিচয়েই মানুষের জীবনছন্দে অভাব মিটে না, একথা আজ আর কারুর অজানা নেই। লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যেভাবে চাহিদার বৃদ্ধি হয়, সে কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। বৈদেশিক প্রভাব ভারতীয় মনের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সুরু করেছে। মনের সন্তোষ চুরি করে সমাজের প্রতিটি স্তরে যে একটা অসন্তোষের আগুন ছড়িয়েছে ভোগলিপ্সা সেটিকে আর চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমাজহিতকামী নেতৃবৃন্দ আজ এই ভীষণ অবস্থার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর্তে পারেন না; তার কারণ তাতে এদের নৈতিক মৃত্যু অনিবার্য, আর যুদ্ধের সাহসও তাদের নেই। কেন না, তারা জানেন এই যুদ্ধে জয়ের আশার চাইতে পরাজয়ের শংকাই অধিক। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের হাতে গ্রন্থাগার আছে, বিদ্যালয় আছে, ক্লাব সমিতি সঙ্ঘ আছে, গুপ্ত বা প্রকাশ্য আলোচনা কেন্দ্র আছে, দশজনে মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে নিজেদের হিতচিন্তার উপায় আছে, ব্যবস্থা আছে। ইহাদের সংখ্যা গ্রামে জনসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে অতি নগণ্য। এই বিরাট সমাজের মনে যদি বিষবাষ্প ছড়িয়ে যায় তাকে রুদ্ধ করে কে?

গ্রামের ঠাকুরদালান ভেঙ্গে পড়লে মেরামত হয় না, কারণ বাবুরা কলকাতায় থাকেন। পুষ্করিণী পরিষ্কার হয় না, কারণ কর্তারা নতুন ব্যবসা দিয়েছেন, এদিকে তাদের নজর নেই। বারোয়ারী উৎসব গ্রামে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ যারা মোটা চাঁদা দিতেন তারা এখন গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করছেন। কথকঠাকুর একবার করে এই গ্রামে প্রতি বছর আসতেন—এখন কয়েক বছর আর তাকে দেখা যায় না, কারণ যারা তাকে

গ্রামে আনতেন তারা এখন বালীগঞ্জে থাকেন। গ্রাম এখন অন্ধকার। পালেদের বাড়ীতে একটা মৃদঙ্গ ছিল, সেটি বাজাবার লোক নেই বলে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে আছে। খঞ্জনীর ডোরীগুলো ছিঁড়ে গেছে। একতারা আর কেউ বাজায় না, কয়েকটা এস্রাজ আসর জমিয়ে রেখেছে। তবলার চেটে খেটে শোনা যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু মৃদঙ্গের তাথৈ তাথৈ বোল আর কেউ মনে করে রাখে নি। শীলেদের বাড়ীতে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। একপাশে কাপড়ে জড়ানো কতকগুলি কি পুঁথি আছে। অনেকদিন আগে তাদের গুরুদেব যখন আসতেন, তিনি সেগুলি কখনো কখনো খুলে দেখাশুনা কর্তেন। তাতে আর কিছু না হোক্ বইগুলোর জমাটবাঁধা ধূলো কয়েকদিনের জন্য সরে যেতো। তিনি আর আসেন না গ্রামে, পুত্রটি আসেন বটে। এবেলা আসেন ওবেলা চলে যান। তার নাকি গ্রামের হাওয়া সহ্য হয় না। তিনি বই পুঁথির ধার ধারেন না। তিনি চাকরী করেন।

কথকতা হবে কোথায়? বারোয়ারীতলায় এখন অনেকদিন ধরে মাছের হাট বসে। তীরগঞ্জে তার কাছ দিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। গয়লাদের প্রশস্ত আঙ্গিনা আছে বটে তাদের ভাইদের ভেতর মতের মিল নেই। একজন বল্‌বে হোক- অমনি আর দু'জন বলবে হতে পারে না। ওসব বামুনদের লোক ঠকিয়ে নেবার ফন্দী আর চল্‌বে না। এদিকে নতুন সিনেমাতলটায় দুবার করে 'শো' নিয়মিত-ভাবেই চলেছে। একদিনও বন্ধ নেই- তাতে ক'রে প্রায়ই শোনা যায় এবাড়ী ওবাড়ী করে ছোট ছোট দু'চারটি চুরি প্রতিনিয়তই চলেছে। তাই লোকেরা বলে ঐ সিনেমার জন্যই চুরি হচ্ছে।

মাঝে মাঝে যাত্রার দল এসে পূজা বাড়ীতে বা উৎসবের আঙ্গিনায় ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষের উপাখ্যান অভিনয়ে জনসাধারণের হৃদয়ে একটা সরস সজীবভাবের উল্লাস সৃষ্টি কত্তে সমর্থ হতো এখন সে যাত্রার দল আর চলে না। তাদের পোষায় না, বুঝি সমাজ আরও উন্নত ধরণের কিছু আশা করে। সিনেমায় বাস্তব জীবনের ছবি কল্পনালোকের ছায়া দর্শন ক'রে সাময়িক তৃপ্তিলাভ হতে পারে কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা বৃদ্ধি ভিন্ন সেখানে সন্তোষের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না প্রায়শঃ। আমাদের বাড়ীর সেই প্রাচীন কথকঠাকুরকে দেখেছি। এ বাড়ীতে তাঁর পদার্পণে নতুন জীবনের সাড়া পাওয়া যেতো। গিন্নি-মায়েদের তো কথাই নেই, পাড়ার সব্বার একটা ভাবান্তর উপস্থিত হতো। সকলের মুখেই প্রশ্ন, কখন কথা সুরু হবে! সেই বৃদ্ধ কথকঠাকুর যেন একটা মস্তবড় বিস্ময়—যেন একটা মহামন্ত্র--যেন জনমোহকারী যন্ত্র। শুধু কি তাই? তিনি যেন চলন্ত শ্রদ্ধারমূর্তি। তাঁকে সম্মান করে সব্বাই। তাঁর কাছে মাথা নোয়াতে কারুর সঙ্কোচ নেই। বালক বৃদ্ধ যুবা সকল স্তরের লোকের তিনি যেন অত্যন্ত নিকটতম প্রিয় বান্ধব। তাঁর হৃদয়ে যেন সকলকার জন্য প্রশস্ত স্থান করে রাখা হয়েছে। তার কাছে যেতে কুলের কুলবধূরও সঙ্কোচ নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের তো তিনি যেন একজন খেলার সাথী। সদা হাসিমুখ কথায় কথায় ভঙ্গী বিলাস—একটি কথায় সাতটি কথা--তিনি যেন গল্পের খনি। ছেলেরা এসেই বলে দাদু একটা গল্প বলুন। ছোট মেয়েরা এসে বায়না ধরে, একটা গান করুন। বৃদ্ধেরা এসে পরমার্থ প্রশ্ন করেন আর বলেন, তোরা ছোটরা এখানে কেন? যা যা খেলা করগে। তোরা ওঁর কথার কি বুঝবি? মেয়েরা বলাবলি করে, ঠাকুরমশায় এলে তার সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বল্‌বো তার উপায় নেই। কোথা থেকে সব বুড়োর দল এসে জাঁকিয়ে বসলেন। কতক্ষণে উঠে যাবেন তার ঠিক নেই।

আমরা আর সময় পাবো কখন। এত বেলা হয়ে গেল এক্ষুণি ঠাকুর যাবেন পূজার ঘরে। পূজা সেরে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়া সেকি কম কষ্ট। আহা ঠাকুর যে কারুর জল পর্য্যন্ত নেন না। আমাদের তো গোঁসাই গুরুর কাছে দীক্ষামন্ত্র হয়েছে, হলে হবে কি? বলেছিলুম—ঠাকুর আমরা তো দীক্ষিত। জল এনে মশলা তৈরী করে দিলে দোষ কি? ঠাকুর বলেন, না মা, তোমাদের দীক্ষা তো ঠিকই হয়েছে, তবে কিনা তোমরা তো আর যথাশাস্ত্র সদাচার পালন কর না। যারা শৌচের নিয়ম মেনে চলে না গুরুর আদেশে আমি তাদের হাতে জল খাইনে। ঠাকুরের কথায় মনে দুঃখ হয়। কত বামুন আমাদের রান্না খায়, আর উনি বলেন জলও খান না। কি জানি কার কি নিয়ম। তবে এ নিয়ম আর কতদিন চল্‌বে সেইটেই ভাববার বিষয়।

এই সেদিন আমাদের পাশের বাড়ীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা দু'বছর আগে স্বামী হারিয়েছে। ছেলেমেয়ে তার কেউ নেই। কথকঠাকুরের সেবা যত্ন করে একটু ধর্ম করবে বলে এসে কত করে বল্‌লে। ঠাকুরের ঐ এক কথা আমি কারুর জল নেব না। এমন লোকও হয় এ কালে?

ঠাকুর নিরামিষ-ভোজী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আহার শুদ্ধ না হলে দেহ মন শুদ্ধ হয় না। মন শুদ্ধ না হলে কেমন করে কি হয়? শরীর আর মনই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। দেহ যদি অপবিত্র হয়, মন পবিত্র থাকে না; আর মনটা যদি অপবিত্র চিন্তা করে, শরীরকে যতই পবিত্র রাখবার চেষ্টা কর না, সে শরীরও অপবিত্র। ভাবের ঘরে চুরি হলে সব অন্ধকার।

তিনি নাকি কথকথা সুরু করবার অনেক আগে থেকেই আমিষ আহার একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই তিনি অত্যন্ত অল্পাহারী। দিনের বেলা শুধু আতপ চালের অন্ন ইষ্টদেবকে নিয়মিত-ভাবে নিবেদন করে, সেই প্রসাদ ভোজন করেন সঙ্গে দুধ ঘি হ'লেই থাকে। যে বাড়ীতে তিনি কথকতা করেন তারা তো খুব ধনীলোক। এবেলা ওবেলা ক'রে কথার আগে পরে প্রায় চার সের দুধ তাঁর পেটে যায়। আর মাঝে মাঝে দুধের সর একটু ফল সন্দেশ এগুলো তো আছেই। রাত্রে কথকঠাকুর লুচি আর দুধ খেয়েই কাটিয়ে দেন। তিনি বলেন রাত্রে পেট ভরে খেলে ভাল ঘুম হয় না, আর কণ্ঠও ভাল থাকে না। তবে লুচি একসের মিহি ময়দার হয়, সেই থেকে দু'চারখানা যা থাকে সঙ্গী ভক্তেরাও একটু আধটু প্রসাদ পায়। খুব তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েন, আর শয্যাত্যাগ করেন সকলের আগে। কখন যে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে জপ কর্তে বসে যান তা কিন্তু আমরা একদিনও টের পাই নি। সত্যিই ঠাকুরের কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়ে

নিয়মিতভাবে ভোরের বেলা শয্যাত্যাগের অভ্যাস—এ কিন্তু আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হতো। লক্ষ্য করেছি যখন তিনি শয্যায় শুয়ে পড়েছেন, অমনি তাঁর নাক ডাকা সুরু হয়েছে। গভীর ঘুম সুনিদ্রার আনন্দের তিনি অধিকারী। তাই বুঝি তাঁর শরীরে এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখে অমন কান্তি, আর কণ্ঠেও সুমধুর সংগীত। ঠাকুর তোমার অভ্যাসের জয়!

সূর্য উদয়ের সঙ্গে ধূপধুনোর গন্ধে অঙ্গিনা আমোদিত হ'য়ে উঠ্‌লে। গ্রামের সব বৃদ্ধেরা একে একে এসে আসনে বসে পড়লেন। মায়েরা এলেন। ছেলের দল ছুটাছুটি করে এসে জুটল বিস্তীর্ণ সামিয়ানার তলায়। তাদের দুরন্তপনায় কেহ কেহ বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়া কর্লেন সেখান হ'তে। তারা ছুটে গেল মাঠের দিকে। এলেন বাড়ীর বড়গিন্নি। বর্ষীয়সী প্রসন্নবদনা ক্ষৌমবাস পরিধানা। মাথায় এখনো ঘোমটা আছে টানা। যদিও লজ্জা করবার মত কোনো ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই তবু এই অহেতুক লজ্জার পরিচায়ক ঘোমটা টানা যেন সেই প্রাচীনার জীবনের উপরও এতধারিণীর এক সজীবতার প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। তার হাতে রয়েছে একটি পুষ্পপাত্র—নানা বর্ণের ফুল তাতে একপাশে একটি ছোট রূপোর বাটিতে চন্দন আর দুর্বা, তুলসী প্রভৃতি পূজার দ্রব্য। তাঁর সঙ্গিনীর হাতে আছে ভোগের জন্য বাতাসা মিষ্টি, ফল আর গেলাসে ভরা জল। পাত্রগুলি যথাস্থানে রাখা হল। বেদীর চারদিকে প্রদীপটিকে উস্কে দেওয়া হল ধুনুচিতে খানিকটা ধুনো দেওয়া হল। মায়েরা নিজের নিজের আসনে বসে পড়লেন শান্তভাবে।

নানারঙ্গের কাপড়ে তৈরী চন্দ্রাতপতলে কথকতার বেদী। এই চন্দ্রাতপটি প্রতি বছরেই এ সময়ে টাঙ্গানো হয়। অনেক দিনের পুরানো হলেও রং তেমন ঝল্‌সে যায় নি। শোনা যায় বড়গিন্নীর শাশুড়ীর বাপের বাড়ী থেকে এই চন্দ্রাতপ এসেছিল। সে অনেক দিনের কথা, সত্যি মিথ্যে হলফ্ করে বল্‌বার উপায় নেই। গিন্নি বলেন, আমি এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত দেখে আস্‌ছি এই চাঁদোয়ার তলায় বসে কথকঠাকুর কথকতা করেন। আমার শাশুড়ী যখন প্রথমবারে পুরাণ দেন তখন আমার বিয়ে হয়নি। শুনেছি এই চাঁদোয়া তখনও ছিল। চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোষের উপর গালিচা। গালিচাখানা কাশ্মীরি কিন্তু শত বর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। গেলবারে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন বড় বউমা। তিনি কথকঠাকুরের বসবার জন্য আগ্রা থেকে সুন্দর ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা গালিচার উপর দেওয়া আছে। পাশেই একটি তাকিয়া। তুলো দেখা যায়, নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে। বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে হয়েছে। সম্মুখে পুরাণ রাখবার জন্য একখানা ছোট জলচৌকী তার উপর লাল শালুর কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে। চারদিকে কোশাকুশী আর সব কুচো জিনিষপত্র রয়েছে। একখানা রেকাবের উপর একখানা নতুন গামছাও আছে। ঠাকুর সময় সময় কথার অবসরে চোখমুখ মার্জনা করেন এই গামছা দিয়ে। একটি ছোট পাত্রে আদা কুচানো, লবঙ্গ প্রভৃতিও রয়েছে। গান করতে কখনও যদি একটু লবঙ্গ গালে দিতে হয় দিতে পারেন। আমরা কিন্তু আমাদের কথকঠাকুরকে কখনো কথকতার সময় বা গানের সময় আদা লবঙ্গ গালে দিতে দেখিনি। তিনি বলেন, এটা একটা বদ্ অভ্যাস আর নিজের সাধনার উপর অবিশ্বাস। গান গাইতে হলে আদাকুচো লবঙ্গ চাই এ আবার কেমন কথা?

ঐ শোন কীর্তনের আওয়াজ। ছেলের দল ছুটল নেচে নেচে কীর্তন দলের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাঁকা পথে। ভিন্ন গ্রাম থেকে এই দলটি প্রতিদিন নগর কীর্তন করে এই বাড়ীতে আসে যে কদিন কথকতা হচ্ছে এখানে। লোকগুলি খুব ভক্ত তাই অত সকালবেলা স্নান ফোঁটা করে কীর্তন নিয়ে আসে। ঠাকুর তাদের একদিন বলে দিয়েছেন—তোমরা না এলে আমার পুরাণ সুরু হবে না। ঠিক্ সময়ে আসবে। সেই থেকে তারা নিয়মিতভাবে আসছে।

"নেচে নেচে যায় রে গোরা নিতাই প্রেমে হয়ে ভোরা"

যেমন তাদের গানের পদে সরলতা তেমন তাদের মুক্তকণ্ঠের উদাত্ত স্বর। সমগ্র গ্রামখানি তাদের এই কীর্তনের ধ্বনির সঙ্গে নেচে উঠে প্রতিদিন সকালবেলা। কেউ পুরাণ শুন্‌তে আসুক আর নাই আসুক সংকীর্তন ধ্বনি তাদের সকলের মধ্যেপুরাণারম্ভের ছবিটিকে সজীব করে দেয় ধ্বনির তরঙ্গে। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা, বেজে উঠল একসঙ্গে। সে কি তুমুল শব্দ। কীর্তনের দল আসরে প্রবেশ করেছে। এবারে পুরাণ পূজা হবে।

"এস দুটি ভাই গোউর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে……

মূল গায়ক গান ধরিলেন উচ্চকণ্ঠে —

আমি পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে। আস্‌তে হবে হে;

আখর সঙ্গে আঁখর জুটল —একা যদি আসতে নার ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর—আমার হৃদয়ে নদীয়া কর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে কি উল্লাস সে কি ধ্বনি মনে হয় যেন গৌর নিতাই নেচে নেচে এসে তখনই উদয় হলেন। মৃদঙ্গ বাদক বার দু'এক করতাল বাদককে ধমক দিয়ে ঠিক তালে বাজাবার ইঙ্গিত করছিলেন তাতে রসভঙ্গের উপক্রম হলেও শেষ পর্যন্ত আর হয় নি। কীর্তন সমাপ্ত হল।

কথকঠাকুরের পা ধুইয়ে দেওয়া হল। গিন্নিমা গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর ধীরপদবিক্ষেপে বেদীর সম্মুখে প্রণত হয়ে আসনে উঠে বসলেন। আসনের সম্মুখে প্রণাম করার মানে সকলে বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, তাই তারা ফিস্ ফিস্ করে উঠ্‌ল। প্রশ্ন, ঠাকুরমশায় আবার কাকে প্রণাম করছেন। তিনিই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ঠাকুর জানেন এই আসন আমার নয়। এই আসন ব্যাসদেবের। ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ভাবে আজ তারই মত লোকের

কাছে ব্যাখ্যা করতে বসেছি। এ ব্যাখ্যার আসনে আমার গুরুগণ যুগ-যুগান্তর ধরে বসেছেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আমি পুরাণ কথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত। সর্বপ্রথম এই আসন আমার পূজার সামগ্রী। আসন স্পর্শ করে তিনি কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পণ্ডিতেরা বলেন আসন শুদ্ধ করে আসনে বসতে হয়। কথকঠাকুরের ডানদিকে পৃথক আসনে পুঁথি নিয়ে বসলেন ধারক ঠাকুর। ইনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী। প্রথম তো মনে করেছিলাম, বুঝি উনি কথাই বলেন না। সেদিন দেখলাম তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথকঠাকুরের সঙ্গে কি এক শ্লোকের পাঠক্রম নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর করে মীমাংসা করে দিলেন তখন আমাদের সন্দেহ গেল দূর হয়ে। সকলেই সেদিন বুঝেছিল যে অল্পভাষী সেই রোগা লোকটির পেটে কত বিদ্যা।

বাংলার বাইরে কথকঠাকুরকে প্রায়শঃ ব্যাসজী ব'লে সম্মান করে। রামায়ণ কথককে রামায়ণীজীও বলে। সাধারণতঃ পুরাণ পাঠের সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করবার রীতি ছিল। দ্রব্য মূল্য বেশী হওয়ার দরুণই হউক বা শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ফলেই হউক, এখন এভাবে পাঁচ সাতজন লোককে বরণ করার উৎসাহ আর দেখতে পাওয়া যায় না। একজন নিকট প্রতিবেশী বাড়ীর পুরোহিত বা গুরুকে শ্রোতারূপে বরণ করে তার সাহায্যেই গৃহস্থের পুরাণ কথা শ্রবণের রীতি চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। কথকঠাকুর আসরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার অভিবাদন করেন—শিষ্টগণের মধ্যে এই প্রচলিত রীতি। কালের প্রভাবে যে সব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে।

পুরাণপাঠক, শ্রোতা, ধারক এরা সব সকালবেলা পুরাণের অংশ বিশেষ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—তার নাম পারায়ণ। ব্যাস, বৈশম্পায়ন, শুক, বশিষ্ঠ, যেমন প্রাচীনকালে যজ্ঞের শেষে পুরাণ কথা বলতেন শুনতেন—লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা সূত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণপাঠকের আদর্শ অনুসরণ করে সেইভাবে পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তাদের মুখের সমুচ্চারিত সেই সহজ সরল মাধুরীমাখা সংস্কৃত ছন্দে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম যুগের কাহিনীর বর্ণনা যে যে কি গাম্ভীর্য ও তাৎপর্যপরিপূর্ণ তা আর কজন হৃদয়ঙ্গম কর্তে পারে। তবু আজও শত শত নরনারী মধুর কণ্ঠের আকর্ষণে পাঠকের দিকে অপলকনেত্রে অবোধ্য সেই বাণী শ্রবণ করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। তাদের বিশ্বাস ঐ মন্ত্রকথা শ্রবণেই অশেষ মঙ্গল। শুদ্ধ হৃদয়ে তাদের এই মহত্ত্বপালনা ব্যর্থ হয়নি জীবনের পথে। শাস্ত্রশ্রবণ, পুরাণকথা, কথকতা আর কীর্তনের সুর অতি সাধারণ গৃহস্থকে করেছে নীতিবান, সত্যনিষ্ঠ, বিবেচক ও পরোপকারী। এই ধর্মানুষ্ঠানের শৃঙ্খলায় গ্রাম গ্রামান্তরের জনগণের প্রেমের বন্ধন সামাজিকতার সম্বন্ধ হয়েছে দৃঢ়তর। অখণ্ড আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করেছে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে। সাধুকথায়, গানে, ব্যবহারে যে বান্ধবতার সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থানুসন্ধান তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়নি কোনো কালে। ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল। পাঠকের পাঠ সুরু হয়েছে।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

আমায় তাড়াতাড়ি করে গ্রামান্তরে যেতে হবে তাই সেদিন আর আমার ভাগ্যে কথকতা শোনা হলো না, লোভ হল একদিন শুনতেই হবে।

হৈমন্তী

দিবাকর সেনরায়

রাত্রির নির্জনে শিশিরের টুপ্‌টাপ্ গাছেদের, ঘাসেদের বুকে—
অন্ধকার শাড়ী পরে আকাশের রাত জাগা কুয়াসার ঘেরাটোপ মুখে।
ফুলের সুবাস নিয়ে বাতাসের আনাগোনা জানালার ঝিল্‌মিল্ দিয়ে,
মন যেন উড়ে চলে আকাশের বুকে যেন স্বপ্নের পরীদের নিয়ে!
কখন যে চাঁদ ওঠে নীলিমার নীল পটে—কালো রাত সাদা হয়ে ফোটে,
পরিচিত মুখগুলো একে একে ভীড় করে—কত মুখ মনে এসে জোটে!
সে মুখেরা কথা কয়, কেউ হাসে—কেউ গায়—কেহ শুধু
চেয়ে থাকে চোখে,
কুয়াসায় ঘেরা এই আবছায়া রাতে যেন চলে গেছি স্বপনের লোকে!
রাত ক্রমে বেড়ে চলে, স্বপনের ঘোর কাটে রাতজাগা পাখীদের ডাকে—
সব মুখ মুছে গেছে—অতি পরিচিতখানি যেন কথা বলিবারে থাকে।
হোক্ তবে তাই হোক মনে মনে কথা হোক আজ এই কুয়াসার রাতে—
যে ভাষার কথা নেই—যে ভাষার লেখা নেই—সেই ভাষা বলি দু'জনাতে
কেহ আর জেগে নেই তাই আর জেগে নেই কথা উতরোল-ভয় চাতুরী
ঘুমভরা এই রাতে কেহ নিয়ে বসে নেই নিয়মের-শাসনের হাতুড়ী!
দিবসের জটিলতা সংগ্রাম যেই মন ছলনার গুণ্ঠন ঢাকে,
সেই মন খুলে থাক—সব কথা বলে যাক রাত্রির আবেশের ফাঁকে।

* * * * *

নিশীথের আয়ু ক্রমে চাঁদ চলে সীমান্তে প্রান্তিক নভে জাগে লাল—
রাত্রির স্বপ্নের মৌতাত শেষ হয়, জাগে দিন জাগে মহাকাল!
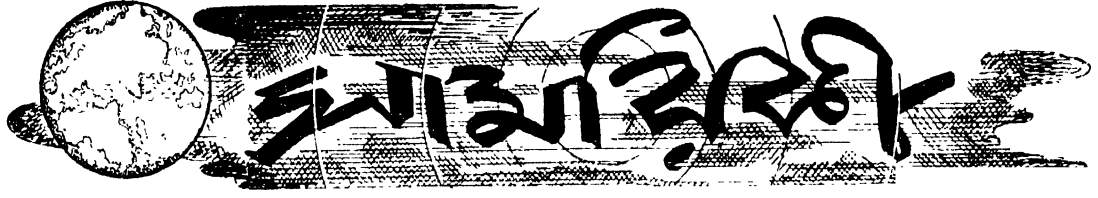
ভারতবর্ষের ৪১শ বর্ষ—

ভারতবর্ষ মাসিক পত্র গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাহার জীবনের ৪০ বর্ষ পূর্ণ করিয়া বর্তমান আষাঢ় সংখ্যায় ৪১শ বর্ষে পদার্পণ করিল। বাংলার সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাসে ভারতবর্ষের দানের কথা ভবিষ্যৎ-ঐতিহাসিকগণ স্থির করিবেন। আজ এই শুভক্ষণে আমরা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রকাশের আয়োজন করিতে করিতে—তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি সাধনোচিত ধামে যখন মহাপ্রয়াণ করেন, তখন সেই দুর্দিনে যাঁহারা ভারতবর্ষের সহায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আজ স্মরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজও ভারতবর্ষের কর্ণধাররূপে ইহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিতেছেন। স্বর্গত জলধর সেন প্রভৃতি বহু সুধী আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। এই ৪০ বৎসরের ইতিহাসে যাঁহাদের দান ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎ চরণে আমরা প্রার্থনা জানাই, যেন অতীতের মত ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষ সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ব্রতী থাকিতে সমর্থ হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

গত ৩রা এপ্রিল হইতে ২ দিন নদীয়া জেলার শান্তিপুর সাধারণ পাঠাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশশিভূষণ খান এম-এল-এ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন—অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় (বিধান পরিষদের সভাপতি) মূল সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন; কলিকাতাস্থ ন্যাশানাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি-কেশবন্ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক সম্মেলন হয়—তাহাতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও সভাপতি মহাশয় 'জাতিগঠনে পাঠাগারের ভূমিকা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে পাঠাগারের মধ্য দিয়ে বয়স্ক-শিক্ষা ও জনশিক্ষার যে বিরাট ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, এই সম্মেলনের ফলে তাহা সুপরিচালিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীনেহরু—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ইংলণ্ডে গমন করায় গত ৪ঠা জুন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মান-সূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীনেহরু ট্রিনিটি কলেজের এম-এ ও হ্যারো স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁহার এই সম্মান লাভ ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

গড়বেতায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী—

গত ২৫শে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা সহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর এক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সহরের বাহিরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভা বোধহয় এই প্রথম। ঐ অধিবেশনে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীনারায়ণ আগরওয়াল এম-পি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভূদান যজ্ঞ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে এই সভায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। মফঃস্বলে এই দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনে রাজ্যের সকল জেলার লোকের পরস্পরা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে এবং ইহা সকলকে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ভূদান যজ্ঞ ও শ্রীনেহরু—

নয়াদিল্লীতে এক সর্বদলীয় সম্মিলনে শ্রীজহর লাল নেহরু সকলকে ভূদান যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য

আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সকলের ভূদান যজ্ঞের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই বিষয়টির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কর্তব্য। ইহা কোন দল বিদেশের আন্দোলন নহে—ভূদান যজ্ঞে সকল দলের সকল কর্মীর উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে হইবে। উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ ঐ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও সভায় আচার্য্য বিনোবা ভাবের কার্য্য সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্য—

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য পাশাপাশি—উভয় রাজ্যের সংস্কৃতি প্রায় একই রূপ। বর্তমানে আসাম রাজ্যে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে। এ অবস্থায় উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহাতে প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকে, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। খ্যাতনামা সুধী-পণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কার্য্যব্যপদেশে বহু দিন আসামে বাস করিয়াছিলেন—সে সময়ে তিনি অসমীয়া সাহিত্যের সহিত সম্যক পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ তিনি 'অসমীয়া সাহিত্য' নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য মাত্র ॥০ আনা। যাঁহারা সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী, তাঁহাদের সকলের এই বইখানি পাঠ করা কর্তব্য। নানা কাজে বাঙ্গালীকে আসামে যাতায়াত করিতে হয় বা আসামে বাস করিতে হয়। সে সময়ে আসামের সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে সে দেশের লোকের সহিত মেলামেশার সুবিধা হইবে এবং কোন কোন কারণে উভয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যে মনোমালিন্যের উদ্ভব ঘটে তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সুধাংশুবাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়া জাতির উপকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

গত ১৯ই মে ৫৩টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০টি কৃষি-পরিবার ও ৩টি শিক্ষক পরিবার। মোট লোক সংখ্যা ১৬১, তন্মধ্যে ১৩৫ প্রাপ্তবয়স্ক ও ২৯ অপ্রাপ্তবয়স্ক। প্রত্যেক পরিবার ৩০ বিঘা জমি ও ২ হাজার টাকা ঋণ পাইবে। ১৯৪৯ সালের ১লা মে হইতে এ পর্য্যন্ত ৪০০ পরিবার তথায় প্রেরিত হইয়াছে। দ্বীপটির নাম সুভাষ দ্বীপ রাখারও চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘ—

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ৩৩এ, মদন মিত্র লেনে কিছুদিন পূর্বে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যিকদের এই মিলনক্ষেত্রে সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়। ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। উক্ত বিবরণীতে তিনি বলেন, "এ পর্য্যন্ত আমরা ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যিকের ৫৪টি রচনা অনুবাদ করাইয়া বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। সর্বসমেত ৪০ জন সাহিত্যিককে অন্য প্রদেশের বিভিন্ন সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতের ৫৪০০টি বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি, সংস্কৃতি পরিষদ, বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সহযোগিতা পাইতেছি। ১৭০০ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াছেন এবং আমাদের প্রেরিত সংবাদও রচনাদি প্রকাশের কার্য্যে আশাতীতভাবে সাহায্য করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত বড় বড় সহরে সঙ্ঘের ১৬টি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিক লইয়া ৫ হইতে ১৬জন (সর্বসমেত ১৬২ জন) সম্পাদকের দ্বারা কার্য্য চলিতেছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সহরেও শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং আরও সমিতি, গ্রন্থাগার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন। যে ভাবে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে "বৃহত্তর ভারত" গঠন-সংকল্প সহজসাধ্য হইবে। আমরা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইণ্ডোচীন, যাভা, তিব্বত, চীন ও অন্যদিকে আফগানিস্তান, পারশ্য, ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক ও আরবের সাহিত্যিকদের ও তথাকার প্রবাসী ভারতীয় সাহিত্যিকদের এবং সাহিত্য সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে সক্ষম হইব। অনুবাদ সাহিত্যের দিকে আমাদের বিশেষ চেষ্টা আছে। পরস্পর

বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগ সাধন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আমরা সকলেরই সহযোগিতা কামনা করি।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদকুমার সরকার একটি লৌহদণ্ড মাথায় মারিয়া বাঁকাইতেছেন। এই খেলাটি তিনি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন

আর-ডবলিউ-এ-সি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সমাজ-সেবা শিক্ষা দানের জন্য 'রিলিফ ওয়েলফেয়ার এম্বুলেন্স কোর' গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ সেখানে ৬ মাস কাল সমাজ-সেবা-শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলা হয়। গত ২১শে এপ্রিল ঐ প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছাত্রগণের এই কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার সুবোধ মিত্র, ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ছাত্রগণকে এইভাবে জন-সেবার কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্তৃপক্ষ দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

কংগ্রেস পাঠচক্র—

কলিকাতা ৫৯টি চৌরঙ্গী রোডে প্রদেশ-কংগ্রেস-ভবনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতি সভাপতিত্বে কংগ্রেস পাঠচক্রের উদ্বোধন হইয়াছে। প্রথম দিনে বিধান পরিষদের সভাপতি ডাক্তার শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা মালার প্রথম বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসকর্ম্মীদের যে সকল বিষয় জানা অবশ্য কর্তব্য, কংগ্রেস পাঠচক্রের উদ্যোগে সে সকল বিষয় জানাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এই সংস্কৃতি প্রচার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের অন্ধ বালক বালিকাদের খেলাধূলা

পুণায় শ্রীমতী রেণুকা রায়—

পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় সম্প্রতি পুনায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রীত্ব করিতে যাইয়া তাঁহার ভাষণে ভারতের মহিলা-সমস্যা সমাধানের বহু নির্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভারতের অধিকসংখ্যক নাগরিক নারী—তাঁহাদের সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীন ভারতকে উন্নত করার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৬০ জন মহিলা ভোট দিয়াছেন। তাহাদের এই জাগরণকে গঠনমূলক কাজে লাগাইতে হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য-জীবনের উন্নতির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের মহিলারা কুটীর-

শিল্পের বিস্তারের দ্বারা এই কাজে সাহায্য করিতে পারেন। এই সকল কাজে স্থানীয় নেতৃত্বকে উৎসাহ দিতে হইবে। শ্রীযুক্তা রায় নিজে বিরাট কর্মী—তিনি এ বিষয়ে কার্য্যে অগ্রণী হইলে দেশ উপকৃত হইবে।
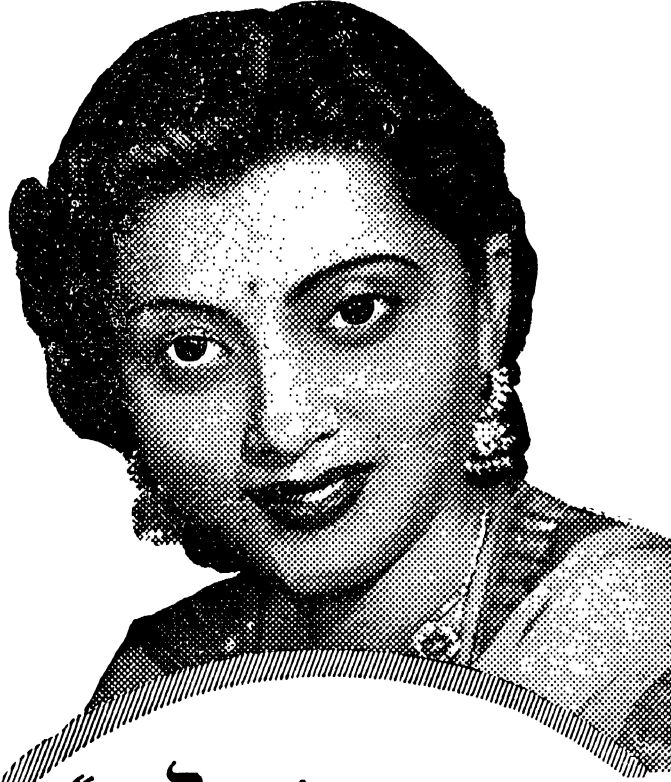
মাইকের সামনে সঙ্গীত রত অন্ধ ছাত্র—কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়

কলিকাতায় জলসরবরাহ বৃদ্ধি—

কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় জানাইয়াছেন যে সহরের জলাভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ১১টি ৬ ইঞ্চি ও ৮টি ৫ ইঞ্চি—মোট ১৯টি নলকূপ বসাইয়া ভাল জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কর্পোরেশনের কর্মকর্তাকে অবিলম্বে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা সহরের আয়তনও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লোকসংখ্যা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই দারুণ গ্রীষ্মে সহরে ভীষণ জলাভাব দেখা দিয়াছে ও ফলে কলেরা সংক্রামকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্বেই ইহার প্রতীকারে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন সত্বর এ বিষয়ে কাজ হইলে লোক উপকৃত হইবে।

পরলোকে হরিদাস মজুমদার—

খ্যাতনামা সমাজ-সেবক কর্মী, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য হরিদাস মজুমদার গত ৬ই মে কলিকাতা গীতা-ভবনে (বালীগঞ্জ) ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় সুবিখ্যাত শীল পরিবারের আইন-উপদেষ্টা ছিলেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। হিন্দু সৎকার সমিতি, অমৃত সমাজ প্রভৃতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—কিছুদিন কেশরী নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানা প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

কৃতী কৃষকদিগকে পুরস্কার দান—

পশ্চিম বঙ্গের ১৯৫২-৫৩ সালের শস্যোৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ২৫০০ টাকা বীরভূমের কৃতী কৃষক শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত হইবে। তিনি প্রতি একরে ৯০ মণ ধান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, যথাক্রমে নদীয়া জেলার চেতুগাছির শ্রীহাজারীলাল ঘোষ ও হাওড়া জেলার সোনাবাগের শ্রীউপেন্দ্রনাথ খান। তাঁহারা প্রতি একরে যথাক্রমে ৮৮ মণ ৫ সের ও ৭৬ মণ ২৪ সের ধান উৎপাদন করিয়াছেন। জেলা ভিত্তিতেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদিগকে যথাক্রমে ৩০০, ২৫০ ও ১৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই ভাবে সকল কৃষককে উৎসাহ দান করিয়া দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা প্রশংসনীয়।

খগেন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা—

২৪ পরগণা বরাহনগরনিবাসী বিপ্লবী বীর খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কয় বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভক্ত বন্ধুরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় অবহিত হন। সম্প্রতি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা সমিতির চেষ্টায় কাশীপুর শ্মশান ঘাটে তাঁহার শবদাহ স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইতেছে। শুনা যায়, তাঁহার পিতৃভূমি দক্ষিণেশ্বরে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ একটি রাস্তা তাঁহার নামে করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে একটি উপযুক্ত স্থানে তাঁহার একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে স্মৃতিরক্ষা সর্বাঙ্গ-

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণূ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানেব অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণূকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 230-50 BG
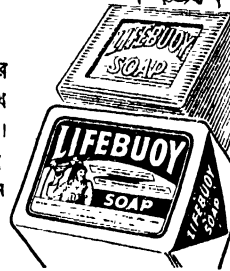
সুন্দর হয়। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা স্বাধীনতা যজ্ঞে খগেন্দ্রনাথের দানের কথা স্মরণ করিয়া এ বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনে অবহিত হইবেন।

শিয়ালদহ বিভাগ—১৩৮ মাইল (৩) বর্দ্ধমান-গয়া—২৪২ মাইল ও (৪) গয়া-মোগলসরাই—১২৬ মাইল। কমিটী কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রেণী বিভাগ ও কয়লা পরিবহনের

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যায়াম-কৌতুক

পরলোকে হেমচন্দ্র নাগ—

কলিকাতার ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডের সম্পাদক হেমচন্দ্র নাগ মহাশয় গত ১৬ই এপ্রিল ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৈমনসিংহ জেলার আকুটিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি যৌবনেই সাংবাদিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকারীরূপে তিনি 'বেঙ্গলী'তে কাজ করার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ডে যোগদান করেন। গত ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সাংবাদিক জগতে তাঁহার মত জনপ্রিয় লোকের সংখ্যা কম।

বৈদ্যুতিক ট্রেণ প্রবর্ত্তন—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কয়লা তদন্ত কমিটী নিম্নলিখিত ৪টি বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেণ প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন—(১) হাওড়া বিভাগ—১৫১ মাইল (২)

সুষ্ঠু ব্যবস্থার ও সুপারিশ করিয়াছেন। সত্বর এই সকল ব্যবস্থা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২রা এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু যথাক্রমে পুনরায় এক বৎসরের জন্য কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিরোধী দল সভায় নানাপ্রকার গণ্ডগোল করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভোটে পরাজিত হইয়া চলিয়া যান। নরেশবাবু ও পূর্ণেন্দুবাবু উভয়েই খ্যাতনামা দেশ-সেবক—কংগ্রেস দলের কর্মী—তাঁহাদের নির্বাচনে যোগ্যতারই সমাদর করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন নগর নির্ম্মাণ—

কম্যুনিটি ডেভোলপমেণ্ট প্রজেক্ট বা গ্রামে বেকার সমস্যা প্রভৃতি দূরীকরণ চেষ্টায় সহর প্রতিষ্ঠার কাজ সমগ্র ভারতে আরম্ভ হইয়াছে—পশ্চিম বাংলায় ৮টি কেন্দ্রে পূর্বেই এ

ভাবে সহর নির্মাণ কার্য্য সুরু হইয়াছিল। গত ৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সহর নির্মাণ বিভাগের ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আরও ৬টি কেন্দ্রে শীঘ্রই সহর নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রথমে বীরভূমে ৩টি, বর্দ্ধমানে ২টি এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় ১টি করিয়া কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত চাল—

এ বৎসর উড়িষ্যা রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্বের বরাদ্দ ৩২৮০০ টন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত ২০ হাজার টন চাল দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ২০ হাজার টন ধান পাইবে। উড়িষ্যায় গত বৎসরের দরুণ ২৭ হাজার টন চাউল মজুত আছে—এ বৎসরেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করিবেন। উড়িষ্যার চাউল মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনকে দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পশ্চিম বাংলার লোক কি প্রয়োজনানুরূপ চাউল পাইবে ?

পশ্চিমবঙ্গে তুলা-উৎপাদন—

১৯৫২-৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল কৃষক তুলার চাষে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া নদীয়া জেলার হিজুলী গ্রামনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী প্রথম পুরস্কার ১৫০ টাকা লাভ করিয়াছেন—তিনি প্রতি একরে ২৯ মণ ৪ সের ১২ ছটাক তুলা উৎপন্ন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের শ্রীকমলাকান্ত কর্মকার, বীরভূম বাঁকুড়ার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মেদিনীপুরের শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ ও উত্তরাঞ্চলের শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র শর্মা প্রত্যেকে ১৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। ৪ জনকে ১০০ টাকা করিয়াও পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাষ বাড়িয়া গেলেই মঙ্গলের কথা।

নূতন পালিত অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার পালিত অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার স্থলে সম্প্রতি ডাঃ বি-ডি-নাগ চৌধুরী নূতন পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ সাহা এখন বিজ্ঞান গবেষণার ভারতীয় পরিষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত আছেন।

উদ্বাস্তুগণকে ব্যবসায়-ঋণ দান—

১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম তিন মাসের পশ্চিমবঙ্গের স[illegible] ও গ্রামাঞ্চলের উদ্বাস্তুগণকে ব্যবসা ঋণ দানের জন্য কেন্দ্রী[illegible] পুনর্বাসন বিভাগ ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সহরাঞ্চলের ৬৬৩২ পরিবার ও গ্রামাঞ্চলের ৪৩২০ পরিব[illegible] উপকৃত হইবে। পশ্চিমবঙ্গে আগত ৮৮৭৪টি উদ্[illegible] পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় পুনর্বাসনের [illegible] কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ ১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম ৩ মা[illegible] ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ২৪ পরগ[illegible] জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কৃষক পরিবার স্থা[illegible] পাইবে।

কংগ্রেসের শুভেচ্ছার নিদর্শন—

বিহারের ভাগলপুর পূর্ণিয়া নির্বাচনকেন্দ্র হইতে দিল্লী লোকসভার সদস্য নির্বাচন বাতিল হওয়ায় ঐ স্থানে পুনর[illegible] নির্বাচন হইবে। কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থীই ঐ স্থানে গতব[illegible] জয়লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আচার্য জে-বি-কৃপালন[illegible] ঐ স্থান হইতে প্রার্থী হওয়ায় কংগ্রেস ঐ স্থানের মনোনী[illegible] প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনী[illegible] মত স্বদেশভক্ত নেতা কংগ্রেস দলের না হইলেও তাঁহা[illegible] বিরুদ্ধে প্রার্থী মনোনয়ন করা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বলি[illegible] মনে করেন নাই।

পল্লী উন্নয়নে জনসহযোগিতা—

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-স[illegible] ভারতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্প্রতি অনুমোদ[illegible] করিয়াছেন। উহা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভু[illegible] হইবে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১ লক্ষ ২[illegible] হাজার গ্রামে ইহার কাজ চলিবে। ইহাতে প্রায় [illegible] কোটি গ্রামবাসী উপকৃত হইবে। সম্প্রসারণ-পরিকল্পন[illegible] অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে কতকগুলি স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন কার্য্য চালান হইবে। ইহাতে সমা[illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজকে স্থায়ী পল্লী-উন্নয়নের কা[illegible] রূপান্তরিত করা হইবে। স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগি[illegible] ও উৎসাহের উপর এই কার্য্যের ব্যাপকতা নির্ভর করিবে। সরকার পক্ষ এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন [illegible] সকল স্থানের অধিবাসীদের সেই বিষয়ে অবহিত হই[illegible] হইবে ও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP

S. 204-50 BG

ভারতে বিদেশী খাদ্য—

গত ১৩ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৯৯৯০০ টন খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ দিন পর্য্যন্ত সাড়ে ৪ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে নিম্নলিখিতরূপ খাদ্য আমদানী করা হইয়াছে—গম—৭৭১০০০ টন, ময়দা—২৩৭০০ টন, চাল—৮২৬০০টন ও মিলো ৯৮২০০ টন। এ বৎসরে দেশের মধ্যে মোট ১২৭৪৪০০ টন খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয়—

গত ১লা জুন খবর পাওয়া যায়—৩৯ বৎসর বয়স্ক দার্জিলিং নিবাসী ভারতীয় শেরপা তেনজিং ও বৃটীশ অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য নিউজিল্যাণ্ডের ৩৭ বৎসর বয়স্ক মিঃ হিলারী সাফল্যের সহিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্টের উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এভারেষ্ট বিজয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয় ৩২ বৎসর পূর্বে ও এ পর্য্যন্ত ১১ বার এই অভিযান হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ পতাকা, নেপালী পতাকা, বৃটীশ পতাকা ও ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন করা হয়। তেনজিং দার্জিলিংয়ের স্থায়ী অধিবাসী ১১টি অভিযানের মধ্যে ৯টির সহিত তিনি যোগদান করেন। তাঁহার পত্নী ও ২ কন্যা আছে। বৃটীশ মহারাণী এলিজাবেথ, ভারত সরকার ও ভারতের অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তেনজিংকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মহারাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক—

গত ২রা জুন লণ্ডনে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপ কর্তৃক ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যের ৭ হাজার প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু অন্যতম। ৬শত বৎসর ধরিয়া যে সিংহাসনে ইংলণ্ডের রাজাদের এই রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়াছিল, রাণী এলিজাবেথ সেই সিংহাসনে বসিয়াই উৎসব করেন। যে গির্জায় এই উৎসব হইল, তাহাও হাজার বৎসরের পুরাতন। তাঁহার স্বামী এডিনবার্গের ডিউক মহারাণীর সঙ্গে ছিলেন—বাকিংহাম প্যালেস নামক যে গৃহে তাঁহারা বাস করেন, সেখান হইতে বিরাট মিছিলে তাঁহারা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জায় গমন করেন। বিলাতের এই প্রাচীন ধরণের উৎসব দেখিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশ হইতে হাজার হাজার লোক লণ্ডনে গিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে বিধানচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৭ই জুন মেদিনীপুরে যাইয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস, জেলা বোর্ড, পৌরসভা, জেলা স্কুল বোর্ড ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে ডাঃ রায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উত্তরে ডাঃ রায় বলিয়াছেন—কংগ্রেস সংগঠন প্রয়োজন, কংগ্রেস দল নহে—বাঁচিবার পথ—জীবনের প্রকাশ।

শ্রীযুত রাধারমণ গোস্বামী—

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় দপ্তরের তরুণ কর্মচারী শ্রীযুত রাধারমণ গোস্বামী সম্প্রতি ইস্রায়েল হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইস্রায়েল গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণ ক্রমে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোনয়ন পাইয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সেখানে যৌথ-চাষবাস ও বহিরাগত-নিবাসন সম্পর্কে অনুশীলন করিতে গিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অতিথি হিসাবে সমগ্র দেশের অসংখ্য সরকারী ও বে-

রাধারমণ গোস্বামী

সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে এবং সমবায়-কৃষিপ্রণালী ও বহিরাগত-নিবাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এদেশে সমস্যার অন্ত নাই; সমবায় কৃষির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রীযুত গোস্বামীর অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে যোগাইলে যথেষ্ট কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। শ্রীযুত গোস্বামী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ ঃ

বাঙ্গালোরে রাজেন্দ্র সিংজী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের পুরুষদের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১-০ গোলে পাঞ্জাব দলকে হারিয়ে এই প্রথম জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ পেল। ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজে ১৯৫২ সালের ফাইনালে সার্ভিসেস দল ০-১ গোলে পাঞ্জাবের কাছে হেরেছিল। এই নিয়ে সার্ভিসেস-দলের দু'বার ফাইনালে খেলা হ'ল। অপর দিকে পাঞ্জাব দল ফাইনাল খেলেছে ১০ বার—তার মধ্যে চ্যাম্পিয়নসীপ পেয়েছে ৬ বার—উপর্য্যুপরি ৩ বার—১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে। এত অধিকবার ফাইনালে খেলা, চ্যাম্পিয়ান-সীপ পাওয়া এবং উপর্য্যুপরি চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড একমাত্র পাঞ্জাবেরই। এই তিনটি বিষয়ে পাঞ্জাবের রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

আলোচ্য বছরে ১৭টি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। মাত্র ২টি দল অনুপস্থিত থাকে। সার্ভিসেস দল তাদের প্রথম খেলা কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যভারতদলের সঙ্গে খেলা ড্র করে ১-১ গোলে। দ্বিতীয় দিন ১-০ গোলে জয়ী হয়। সেমি-ফাইনালে বোম্বাইকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়। অপর দিকে পাঞ্জাব প্রথম খেলায় ২-২ গোলে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিন ১-০ গোলে জয়ী হয়। সেমি-ফাইনালে ৪-১ গোলে হায়দ্রাবাদ দলকে হারিয়ে ফাইনালে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে মিলিত হয়। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ০-৩ গোলে বোম্বাই দলের কাছে হেরে যায়। প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের পরাজয়ের কারণ, তাদের দশ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হয়েছে। খেলার ২১ মিনিটে বাংলা দলের রাইট ব্যাক রবি দাস আহত অবস্থায় মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ন আর তারপরই ৬ মিনিটের মধ্যেই বোম্বাই ২টো গোল দেয়, তৃতীয় গোল হয় খেলা ভাঙ্গার মুখোমুখি সময়ে। বাংলা দল এ পর্য্যন্ত ৫ বার ফাইনাল খেলেছে, চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৩ বার—১৯৩৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫১ সালে।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে নাগপুর ইউনাইটেডকে হারিয়ে তৃতীয় বার বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে টাটা স্পোর্টশ ক্লাব বাইটন কাপ পেয়েছে ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে। অপর দিকে নাগপুর ইউনাইটেড দলের পক্ষে বাইটন কাপের ফাইনালে এই প্রথম খেলা—মধ্যপ্রদেশ থেকে ইতিপূর্ব্বে আর কোন দল ফাইনালে ওঠে নি। টাটা স্পোর্টশ ক্লাব সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে গতবারের ফাইনাল বিজয়ী মোহন-বাগান দলকে হারিয়ে আগের বছরের পরাজয়ের শোধ নেয়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে নাগপুর ইউনাইটেড দল ১-০ গোলে ইউ পিকে হারিয়ে ফাইনালে বোম্বাই দলের সঙ্গে খেলে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি ঝড় বৃষ্টির দরুণ খেলাটি পরিত্যক্ত হয়—এই সময় টাটা ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

ইংলণ্ড সফরে অষ্ট্রেলিয়ান

ক্রিকেট দল ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল লিণ্ডসে হাসেটের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে ২০ বার ক্রিকেট সফর ক'রে গেছে। এর আগে শেষ সফর করেছে ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট ধুরন্ধর স্যর ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইংলণ্ড সফরে আসে ১৮৭৮ সালে, ডি ডবলউ গ্রেগরীর নেতৃত্বে। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম ক্রিকেট খেলতে যায় ১৮৬১ সালে—দলের অধিনায়ক ছিলেন এইচ ষ্টিফেনসন। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াতে সফর করেছে ২৫ বার। উভয় দেশের মধ্যে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয় ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ মেলবোর্নে। ইংলণ্ডের মাটিতে প্রথম টেষ্ট খেলা হয় ওভালে, ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। আগামী ১১ই জুন নটিংহামে ট্রেণ্টব্রিজ ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৫১তম টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হবে। এই খেলার আগে পর্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেষ্ট সিরিজ এবং টেষ্ট খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হ'ল—

টেষ্ট সিরিজের ফলাফল

	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট সিরিজ
ইংলণ্ডে	১০	৮	১	১৯
অষ্ট্রেলিয়াতে	৮	১১	২	২১
মোট :	১৮	১৯	৩	৪০

টেষ্ট খেলার ফলাফল

	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংলণ্ডে	২১	২০	৩০	৭১
অষ্ট্রেলিয়াতে	৩৫	৪৮	৪	৮৭
মোট :	৫৬	৬৮	৩৪	১৫৮

নটিংহামে ট্রেণ্টব্রিজ ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৮টি টেষ্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রেকর্ড

ইংলণ্ডের পক্ষে	অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে
দলগত সর্ব্বোচ্চ রান	
৬৫৮ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ); ১৯৩৮	৫০৯ রান ; ১৯৪৮
দলগত সর্ব্বনিম্ন রান	
১১২ রান ; ১৯২১	১৪৪ রান ; ১৯৩০
ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান	
২১৬*—পেণ্টার ; ১৯৩৮	২৩২—এস ম্যাকেব ; ১৯৩৮
সেঞ্চুরী সংখ্যা : ৬টি	৬টি

আলোচ্য সফরে এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল অপরাজেয় আছে। ১২টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৭টি জয় (৬টি খেলায় ইনিংস জয়), ৫টি খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী ১১টি। নীল হার্ভে করেছেন ৫টি, সর্ব্বোচ্চ রান ২০২ ; কিথ মিলার ২টি, সর্ব্বোচ্চ রান নট আউট ২২০।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাত্র ১টা সেঞ্চুরী, ১২২-কেনিয়ন।

ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ স্থান পেয়েছেন।

সিঙ্গলস—(১) ত্রিলোকনাথ শেঠ (ইউ পি), (২) অমৃতলাল দেওয়ান (দিল্লী), (৩) দেবীন্দর মোহন (বোম্বাই), (৪) মনোজ গুহ (বাংলা), (৫) হেনরী ফেরীরা (বোম্বাই), (৬) গুর প্রসাদ (পাঞ্জাব)।

ডবলস—(১) দেবীন্দর মোহন এবং হেনরী ফেরীরা (বোম্বাই), (২) এন নটেকার এবং ডি এন ধোনগাদে, (৩) অমৃতলাল দেওয়ান এবং সি এল মদন (দিল্লী)।

১৯৫৩ সালের ইংলিস ফুটবল ঃ

এফ এ কাপ—ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের ফাইনালে ব্লাকপুল ৪-৩ গোলে বোল্টন ওয়াণ্ডারাস দলকে হারিয়েছে।

প্রথম বিভাগ লীগ—আর্সেনাল (চ্যাম্পিয়ান)

মুষ্টি যুদ্ধে বিশ্ব খেতাব ঃ

ইণ্টার ন্যাশানাল বক্সিং কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত 'ইণ্টার ন্যাশানাল কমিটি' মুষ্টি যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত যোদ্ধাদের বিশ্বমুষ্টি যোদ্ধা হিসাবে অনুমোদন করেছেন।

হেভী ওয়েট—রকি মার্শিয়ানো (আমেরিকা)
লাইট হেভী ওয়েট—আর্চি মুর (আমেরিকা)
মিডল ওয়েট—খেতাব শূন্য
ওয়াল্টার ওয়েট—কিড্ গ্যাভিল্যান (কুবা)
লাইট ওয়েট—জেমস কার্টার (আমেরিকা)
ফেদার ওয়েট—স্যাণ্ডি স্যাড্লার (আমেরিকা)
ব্যানটম ওয়েট—জিমী কারুথার্স (অষ্ট্রেলিয়া)
ফ্লাই ওয়েট—ইয়োশিয়ো সিরাই (জাপান)

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ক'লকাতার ফুটবল মাঠে দর্শকদের ভীড় বেশ জমে উঠেছে। টিকিটের অপেক্ষায় মানুষের লম্বা সারির পর সারি, মাঠের ধারে পাশের গাছগুলোতে মানুষের অভিযান দেখলে স্বীকার করতেই হবে ফুটবল খেলা দেখার আকর্ষণ বেড়েছে বৈ কমেনি। কয়েক বছর ফুটবল খেলাটা এমনই দলীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খেলার মাঠের দর্শকদের ভীড় দিয়ে খেলার গুণাগুণ বিচার করা যায় না। দলের সমর্থকেরা গোঁড়ামি এবং কতকটা অভ্যাসবশে মাঠে খেলা দেখতে যান ; তাঁদের উপর খেলার ভাল-মন্দের প্রভাব যদি থাকতো তাহলে এ মরসুমে খেলার নমুনা দেখার পর মাঠে লোকে এত কায়িক পরিশ্রম সহ্য ক'রে কিম্বা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গাছে চড়ে খেলা দেখতেন না। অবস্থাপন্ন নামকরা ক্লাবগুলি বাঙ্লার বাইরে থেকে যে সব তৈরী খেলোয়াড় আমদানী করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন যা ভাল খেলছেন। পুরোনো নামকরা খেলোয়াড়দের খেলাও পড়ে গেছে, দু'একজন বাদ।

এ মরসুমে লীগের দুটি খেলায় রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর দর্শক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কালীঘাটের বিপক্ষে মোহনবাগানের গোল নাকচ করায় এবং খিদিরপুর দলের বিপক্ষে মহমেডান দলের কোন খেলোয়াড়ের উপর অফ্সাইড আইন প্রয়োগ করায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দুই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। খেলার মাঠে এই ধরণের বিক্ষোভ কোন সভ্য সমাজ অনুমোদন করে না। রেফারীর কোন ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ভার ক্লাব কর্তৃপক্ষের উপর দিলে মাঠের আবহাওয়া এ ভাবে দূষিত হয় না ; মহমেডান স্পোর্টিং দলের একশ্রেণীর সমর্থক রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করে যার ফলে কয়েকজন নিরীহ দর্শক এবং ভ্রমণবিলাসী ভদ্রলোককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হয়।

ফুটবল লীগের খেলার আলোচনায় আসা যাক্। ১০ই জুন পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগের যতগুলি খেলা হয়েছে তার ফলাফলের উপর লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স। দুই দলের সমান ১০টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট। দুই দলেরই জয় ৬টা, খেলা ড্র ৪টে, কোন খেলায় এ পর্য্যন্ত হার হয়নি। মোহনবাগান খেলা-ড্র করেছে ৪টে—কালীঘাট, এরিয়ান্স, রাজস্থান এবং ওয়াড়ীর সঙ্গে। গোল এভারেজ ভাল থাকার শীর্ষস্থান পেয়েছে।

গত বছরের লীগচ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৯টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে ২য় স্থানে আছে—জয় ৬টা, ড্র ২টো—মহমেডান স্পোর্টিং এবং ওয়াড়ীর সঙ্গে এবং হার ১টা—ভবানীপুরের কাছে ০-১ গোলে। রাজস্থান আছে ৩য় স্থানে, ৮টা খেলায় ১২ পয়েণ্ট, কোন খেলায় হার হয়নি। লীগের খেলায় এ পর্য্যন্ত তিনটি দল অপরাজেয় আছে, মোহনবাগান, এরিয়ান্স এবং রাজস্থান। লীগচ্যাম্পিয়ান-সীপের পথ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স এবং রাজস্থান এই চারটি দলেরই কাছে এখনও সমান উন্মুক্ত আছে ; প্রতি বছরের মত এবারও লীগের খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল দাঁড়িয়েছে। তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে এরিয়ান্স দল মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করেছে, মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। কালীঘাট এবং ওয়াড়ী মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে ; ইস্টবেঙ্গল ও ওয়াড়ীর খেলা ১-১ গোলে ড্র গেছে। ভবানীপুর ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে। জয়লাভ না করতে পারলেও ভাল খেলেছে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং রাজস্থানের বিপক্ষে ওয়াড়ী। রাজস্থান-স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং জর্জটেলিগ্রাফ-এরিয়ান্সের খেলা গোলশূন্য ড্র গেছে।

লীগের খেলায় প্রথম চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পঃ
মোহনবাগান	১০	৬	৪	০	১৭	৩	১৬
এরিয়ান্স	১০	৬	৪	০	১২	৪	১৬
ইস্টবেঙ্গল	৯	৬	২	১	১৪	৫	১৪
রাজস্থান	৮	৪	৪	০	৯	২	১২

১৯৫৩ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর ক্লাব

ফটো : জে কে সান্যাল

৩।৬।৫৩

সাহিত্য-সংবাদ

অনুরাধা দেবী প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "কপোত-কপোতী" (৪র্থ সং)—২৷৷০
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "প্রিয় বান্ধবী" (১৩শ সং)—৬
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যোমকেশের কাহিনী" (৩য় সং)—২৷৷০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মেজদিদি" (১৭শ সং) —১৷৷০
মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "খনা" (৩য় সং)—২
মৃণাল সেন প্রণীত "চার্লি চ্যাপলিন"—২৷৷০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "নবাব-নন্দিনী"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "ডেসপারেট লেডি"—১৷৷০
শ্রীমুরারীমোহন বিট্ প্রণীত রহস্যোপন্যাস "প্রাণ নিয়ে খেলা"—১৲
শশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহনের প্রতিকার"—২৲, "বীরমোহন"—২, "মোহন ও শ্রীরাধা"—২৲, "শান্তা আমন্ত্রণে স্বপন"—২
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মেদেশ প্রণীত উপন্যাস "রক্তপদ্ম"—২৷৷০
শ্রীমতী আশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস "বিয়ের পরে"—২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ডবল ডেকার"—৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "আগামী কাল"—২৷৷০
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত গল্প গ্রন্থ "অঙ্গার"—৩
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "বেদান্ত পরিচয়"—১।০
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "শকুন্তলা রায়"—৩
উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বন্দেমাতরম্ ও যুবক বাঙ্গালা"—।৵০
শশাঙ্ককুমার পাত্র প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "ভুখামিছিল"—৶০
রমাপতি বসু প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "শিলাগার"—২৲
শ্রীপুলিনবিহারী হালদার প্রণীত "বৈজ্ঞানিকের চক্ষে গীতা" ১ম খণ্ড—২৷৷০
শ্রীআশুতোষ মণ্ডল প্রণীত "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ"—১/০
শ্রীপবিত্রকুমার মিত্র প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "আলো ছায়া"—১৷৷০
সুজিতকুমার নাগ প্রণীত গল্প গ্রন্থ "জীবন শিল্পী"—৷৷০
রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত উপন্যাস "কুরপালা"—৪৷৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠ
শ্রাবণ—১৩৬০
একচত্বারিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
মূল্য—বার্ষিক ৭॥০
ষাণ্মাসিক ৪৲ প্রতিসংখ্যা ৷৵০
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

নতুন উপন্যাস ঃ

শ্রীভোলা সেন
প্রণীত

উপন্যাসের উপকরণ

দাম—২॥০

'—মে আই কাম্ ইন্?'—'আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' এর চেয়ে অল্প কথায় মিষ্টতর কবিতা আমার জানা নেই—মানুষের ঘরে ঢুকতে চায় মানুষ—মানুষের মনে ঢুকতে চায় মানুষের মন।

* * * *

বার্দ্ধক্যের শ্রেষ্ঠ অবদান—মেয়েদের সংকোচহীন ব্যবহার। ভাবহীন শুষ্ক ঘোলাটে দৃষ্টিতে ওরা অবিশ্বাসের কিছু দেখতে পায় না।

* * * *

সর্বনাশ! কি সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে এই সব আধুনিক তরুণ-তরুণী! ও বলে, মনের মিল নেই; এ বলে, আর কাউকে ভালবাসে!

* * * *

উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টায় যে সকল বিচিত্র পাত্র-পাত্রী ভিড় করিয়া আসিয়াছে—তাহাদেরই অভিনব পরিচয়।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী
প্রণীত

দাম—৪৲

১৯০৬-১৯০৮ সালের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত—সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব—সংশয় ও সন্দেহের মাঝখানে একটি নিপীড়িত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম অভিব্যক্তি।

বিদেশী শাসকদের কঠোর দমন-নীতির পশ্চাতে সর্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিকদের আত্মোৎসর্জনের যে অতুলনীয় ইতিহাস কালজয়ী হইয়া আছে—'দেবানন্দ' তাহারই জীবন্ত প্রকাশ।

বিদেশী সাহিত্যে এরূপ উপন্যাসের অভাব নাই ঃ

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এরূপ সার্থক প্রচেষ্টা এই প্রথম।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রণীত

পতঙ্গ

দ্বিতীয় পর্ব

দাম—২॥০

যুগে যুগে রক্তাক্ত বিপ্লবই পৃথিবীকে দিয়াছে অগ্রগতি। বিপ্লব হইয়াছে মানুষের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থান্ধ মনের বিরুদ্ধে—তাহাকে বলিয়াছে ভালবাসিতে, সেবা করিতে, ত্যাগ করিতে।

যুগে যুগে মহামানবগণের প্রেমের বাণী—ত্যাগের বাণী—মানুষের বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই পৃথিবী আজ মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন: আসুরিক শক্তির দম্ভে মানুষ আপনার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে পৃথিবীর দ্বারে।

অনাগত ভবিষ্যতে আবার আসিবে বিপ্লব—সে বিপ্লব শিখাইবে মানুষকে ভালবাসিতে, ত্যাগ করিতে। বলিবে, যাহার বাঁচিয়া থাকা কেবলমাত্র নিজের জন্য, পৃথিবীতে তাহার বাঁচিবার অধিকার নাই।

—আগত—আসন্ন—সেই বিপ্লব—

'পতঙ্গ' (দ্বিতীয় পর্ব) তাহারই কাল্পনিক ছবি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

পূর্ণকুম্ভ

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

যান্ত্রিকশক্তির ব্যবহার

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ২৫০ বছর পূর্ব্বে ইউরোপের সমগ্র দেশ খণ্ড খণ্ড গ্রামে ভাগ হইয়াছিল এবং আমেরিকা ছিল এক বৃহৎ অরণ্য। আজ এই দুই মহাদেশ শিল্পসম্ভারের রাজ্য। অন্য দেশের কাঁচা মাল এইখানে যন্ত্রদানবের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান যায়। এই দুই দেশের লোক খায় ভাল, পরে ভাল, থাকে সুখে ও আমোদ আহ্লাদের অবসর পায়।

এই সব দেশ শক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতির ও মানুষের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে, মূক প্রকৃতি মানুষের সেবায় নিজেকে অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছে। প্রচুর শক্তি আয়ত্তে আনিয়া এই দেশগুলি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া কারখানা বসাইয়া দিয়াছে। বর্তমানের শিল্পপণ্য ও জাতীয় ধনবলের উৎস এই শক্তির প্রাচুর্য্য। এই শক্তি—বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক যে কোনও রকমেরই হউক না কেন—মানুষের সাহায্যে অসংখ্য নির্ব্বাক শ্রান্তিহীন ভৃত্য সৃজন করিয়াছে।

এই শক্তির আধার প্রায় সর্ব্ব দেশেই বর্তমান। তাহাকে সন্ধান করিয়া কার্য্যে নিয়োগ করিবার ভার রাষ্ট্রের ও শিল্পের কর্ণধারদের। কিন্তু এই শক্তি দিয়া যদি কেবল কারখানা তৈয়ারী হয় তাহা হইলেই কি আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে? না, কেবল কারখানা কোন জাতির জীবনের সম্বল হইতে পারে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে তাহার কার্য্যক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। নিজের দেহের শক্তি ও সামর্থ্যের সাহায্যে মানুষ তাহার বর্তমান জীবনের সব প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম। তাহার প্রয়োজন খালি উত্তরীয় ও আতপতণ্ডুল নয়। বিরাট পরিবেশে তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহার বহু জিনিষের প্রয়োজন, বহু ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। জীবনটা একটা সংগ্রাম এবং আমৃত্যু এই সংগ্রামের বিরতি নাই। এই জন্য সমাজময় প্রস্তুতি দরকার। এটম বোমা বা এরোপ্লেন তৈয়ারীর কর্ম্মকৌশল নয়। নানা

ছোট ছোট জিনিষ দিয়া জীবনকে সুখী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চাই।

আমাদের খাদ্যের মাপ কত শক্তি জোগান দিতে পারে সেই হিসাবে হয়। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার লোকেরা প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালোরিসম্পন্ন আহার্য্য খায়। ভারতবর্ষে সেই হিসাবে আমাদের দৈনিক আহার ১৫০০ ক্যালোরির বেশী শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকই সেই জন্য ক্লান্তদেহ বা চিররুগ্ন। এই হিসাব অবশ্য এক গড় হিসাব। কারণ ভারতে কিছু পরিবার নিশ্চয়ই বিদেশীখানা বা সমতুল্য খানা খাইয়া থাকেন। আয়ুষ্কাল লোকের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সকলেই জানেন যে আমাদের গড়ে আয়ু ৩০ বৎসর এবং আমাদের দ্বিগুণ আয়ু ইউরোপ-আমেরিকার যে কোন দেশের লোকের। খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে এবং সেই হেতু সাধারণ লোকের উন্নতি তাহার আহারের রীতি তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নীতির উপর নির্ভরশীল। এই জীবনযাত্রার মান শরীরের শক্তি বাদ দিয়া যান্ত্রিক শক্তির মাথাপিছু খরচের হিসাবে মাপা যায়।

এক টন কয়লা ১০,০০০ অশ্বশক্তি বা ৭৫০০ ইলেকট্রিক ইউনিটের শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক টন কয়লা হইতে আমরা যা শক্তি পাই তাহা হইতেছে ১০০০ ইউনিট। চলতি ব্যাপারে ১০০০ ইলেকট্রিক ষ্টোভ একঘণ্টা যদি জ্বলে তাহাদের সমান উত্তাপ এক টন কয়লা হইতে পাই। দেশে দেশে আজ যান-বাহনে—কারখানায় ও ঘরের কাজে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার মাপে প্রতি দেশের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এক টন কয়লার প্রকৃত শক্তিকে মাপ করিলে আমেরিকার প্রতি লোক বৎসরে ১০ টন কয়লা খরচ করে। ইংল্যাণ্ডে ৫ টন ও সারা পৃথিবীর গড়পড়তা ২ টন। কিন্তু ভারতে ও এশিয়ার প্রায় সব দেশে এই মাপকাঠিতে মানুষ মাত্র আধ টনেরও কম কয়লার শক্তি তাহার কাজকর্ম্মের জন্য পায়। এই শক্তির মাপে উন্নত ও অনুন্নতের তফাৎ ২০ গুণ। এই শক্তির ব্যবহারে এক আমেরিকান বৎসরে ৬,৫০০ টাকা উপায় করে, ইংরেজ ৩,০০০ টাকা এবং আমরা ৩৫০ টাকা। এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দেশের লোক পরস্পর ২০ ধাপ নীচে। এই বিভেদ শক্তি-উৎপাদনের মূলে নিহিত।

ইহা হইতে মনে হইবে যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষ কতটা ব্যবহার করিতে পারে তাহার মূলে আছে আর্থিক সচ্ছলতা। এই সঙ্গে সাধারণ লোকের আর একটা ধারণা আছে যে স্বাস্থ্য ও আয়ু নির্ভর করে কেবল খাদ্যের উপর। প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চার ও সংযোগে জীবনযাত্রার নীতিতে বা রীতিতে কোন ব্যতিক্রম আনা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য-আয়ু-খাদ্য এই সবের হিসাবটা পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু সংখ্যার মাপকাঠিটা সমগ্র জীবনের অবস্থাকে সঠিক বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

আমাদের আহারের একটা সীমা আছে, যতই ভাল খাইনা কেন, আয়ুকে অসীমকালে ঠেলিবার কোন পথ বাহির হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির বিবিধ ব্যবহারে জীবনোপভোগের সম্ভার নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে। এই বিচারে সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠি দাঁড়াইয়াছে শক্তি সঞ্চারে ও তাহার প্রয়োগে। জীবনযাত্রার উন্নতি ও সমাজের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। ধনবল এই দুইয়ের যোগসূত্র এবং অধোগমন পরস্পরের সখ্য ফল।

ঘরে ঘরে আলাদীনের প্রদীপের মত নানা কাজে শক্তিকে লাগাইয়া ইউরোপের ও আমেরিকার লোকের জীবনের ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। কলের জোরে বিস্তীর্ণ ভূমিতে চাষ, সেচ, সার দেওয়া ও ফসল কাটা হইতেছে। শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উৎপন্ন খাদ্যের সংরক্ষণ ও নানা প্রকরণ তৈয়ারী হইয়া সারা বৎসরের জন্য রসদ মজুত থাকিতেছে। পরিষ্কার পরিবেশ, রোগাক্রান্ত স্থান পরিশোধন ও রোগ নিরাময়ের জন্য শক্তিশালী কারখানায় প্রস্তুত নানাবিধ ঔষধ ব্যবহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। কর্ম্মব্যস্ত দিনের পর বিশ্রাম ও চিত্ত বিনোদনের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা জীবনকে সুখী করিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে দৈনন্দিন কাজও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে কর্ম্মক্ষম লোকের অর্থের সংস্থান হইয়াছে এবং সারা দেশময় লোকের কর্ম্ম চাঞ্চল্য ও জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

নানা দিক হইতে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা ও যোজনা মিলিয়া যে নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে আমরা বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি। আমাদের চাষী যে শক্তির অধিকারী তাহার ⅘ অংশ তাহার (হাল বলদের শক্তি

সমেত) হাত-পায়ের পেশীর ও বাকী ⅔ অংশ যন্ত্র বা বিদ্যুতের আধার হইবে। সমগ্র দেশের কলকারখানায় ব্যবহৃত শক্তির খতিয়ানে এই মাথাপিছু হিসাব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের সঠিক পরিচয় নয়। চাষী নিজের ও হাল-বলদের গায়ের জোরে তাহার জীবনের প্রয়োজন মিটায়। সে আর কোন বাহিরের শক্তির সাহায্য পায় না। তাহার জীবনে অর্দ্ধাশন ও অনশন, ছিন্ন বসন ও ভূমিশয্যা এবং জীর্ণ কুটীর ছাড়া আর কিছু মিলে না। শিক্ষার আলো, রোগ হইতে মুক্তি এবং মনের আনন্দ তাহার নাই। প্রাকৃতিক শক্তি শিল্পের প্রয়োজন মিটাইতে পারে কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ফল, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অন্যদিকে সমাজের সুখী লোকদের অনাবশ্যক মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভার সৃষ্টি বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির উদ্দেশ্য নয়। যত্র তত্র ভ্রমণ, রং বেরংয়ের কাপড় বা নৃত্য গীতের মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির প্রয়োজনের চাপে বিদেশে শক্তির উদ্ভব ও ক্ষয় সূচিত হয় নাই।

প্রাকৃতিক শক্তিকে ঘরে ঘরে কাজে লাগাইতে না পারিলে কোন পাঁচসালা বন্দোবস্ত দেশের লোকের চোখে মুখে হাসি ফুটাইতে পারিবে না। গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ আমাদের চোখের সামনে মহীশূর রাজ্যে আছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার আমাদের দেশের লোকেরাই করিয়াছিলেন, ভারত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোন বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাহার বিশেষ কৃতিত্ব ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার লোক-মনোরঞ্জক রচনা লিখনে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

শিল্পের প্রয়োজনের তাগিদেই ইউরোপ-আমেরিকার শক্তির সন্ধান ও বিকাশ হইয়াছে এই কথা সত্য, কিন্তু ইহাই শক্তি-যোগের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, সেখানকার মানুষ তাহার নিজের শ্রম লাঘব করিয়াছে। যখন আমরা আমাদের দেশে শক্তি সঞ্চারের কথা বলি তখন কারখানার প্রয়োজনটাই বড় কথা নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলে আর্থিক সাধনার পথ সফল হইতে পারে বোধ হয়, কিন্তু দেহের বল বয়সের সঙ্গে কমিয়া যায় এবং তাহার উপর অসমর্থ দেহের ক্ষমতাকে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া বেশী দিন দেহকে প্রাণবন্ত রাখা যায় না, চাষের কাজে, ঘরের কাজে, যানবাহনের জন্য যান্ত্রিক শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, যে যন্ত্র নিজের দেশের মাল-মশলা দিয়া চালান যায় এই রকম শক্তি সঞ্চারই আশু প্রয়োজন। পেট্রোল-ডিজেলতেল-চালিত এঞ্জিনের যন্ত্র ব্যবহার ব্যয়সাধ্য ও মেরামতীতে অনেক দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। চিনির কলের সুরাসার, কাঠ ও কয়লা-চালিত যন্ত্র এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক শক্তিতাড়িত যন্ত্র আমাদের সহরে ও পল্লীতে জনপ্রিয় করিয়া তোলা দরকার।

যুদ্ধের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের খাদ্যশস্য বাড়াইবার তাগিদে যন্ত্রের সাহায্য নিয়া (ট্র্যাক্টর ও হারভেষ্টার) একজন চাষী তিনগুণ শক্তির অধিকারী হইয়াছে। অনেক লোককে যুদ্ধের কাজে যোগ দিবার জন্য ক্ষেত খামার ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। ১০ বছরে ট্র্যাক্টরের সংখ্যা বাড়িয়াছে চারিগুণ এবং হারভেষ্টারের (ফসল কাটা ও ঝাড়ার) সংখ্যা বাড়িয়াছে ১১ গুণ। চাষীর আয় বাড়িয়াছে—সে নিজের খাটুনীর সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে বহুগুণ বেশী জমি চাষ বা দেখাশুনা করিতে পারে। রাসায়নিক সার ও অনিষ্টকারী পোকা ও আগাছার ঔষধের সাহায্যে বিদেশের চাষীর পক্ষে দিগন্তবিস্তৃত জমিকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী ও পরিষ্কার রাখা সহজ হইয়া গিয়াছে।

চাষের উন্নতির মূলে তাই নানা যন্ত্রপাতি, বাঁধ-নালা ও ঔষধ সারের সম্ভার চাই। হিসাবে দেখা যায় ১২ টাকা চাষের উন্নতির জন্য খরচ করিতে হইলেও সেই সঙ্গে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে ১০ টাকা শিল্প-যোজনায় খরচ করা প্রয়োজন। চাষীকে প্রথমে শিখাইতে হইবে নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কম দৈহিক পরিশ্রমে কি ব্যবস্থার সাহায্যে ফসল বাড়ান যায়। নূতন জিনিষের ব্যবহারে তাহার নিজস্ব চিন্তা বুদ্ধির পরিধি নূতন দিকে প্রকাশ পাইবে। তাহার প্রয়োজনের বশে শক্তির সঞ্চার হইলে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা বিস্তার লাভ করিবে। এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সরকারী অর্থে পুষ্ট বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রচারের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা যেন আমেরিকা দেশকে উঠাইয়া আনিয়া এই দেশে বসাইতে চাই!

কোনও উন্নতি-সাধক ব্যবস্থার গোড়ার কথা হইতেছে উন্নতির কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট করা, সেই কেন্দ্রের উন্নতির সোপান ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সাজান থাকে। এই সোপান শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর যোগসাধন ও পরিপোষণের উপর কল্পিত ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর

করে। "ফসল বাড়াও" এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে কত কাজ। পুস্তিকা বিতরণ ও সচিত্র বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনী জমিতেবীজ ছড়াইতে পারে না। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে সুরু করিয়া তাহাতে জলের ব্যবস্থা, সার ও বীজ সংগ্রহ, রোপণ ও শস্য কর্তন এবং সর্ব্বশেষে শস্যের বিক্রয় ব্যবস্থা এই সব কাজে চাষীকে সাহায্য করা প্রয়োজন। এই কাজগুলি মালার ফুলের মত গাঁথিয়া দিলে জমির ফসল বাড়িতে পারে। মাঝপথে উঁকি মারিয়া ফাঁকে জোড়াতালি দিয়া এই কাজ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে গ্রামের ও ক্ষেতের মধ্যে চলাচলের রাস্তা, যানবাহনের ব্যবস্থা, পুকুর-নালা কাটান ইত্যাদিতে শক্তির প্রয়োজন। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থা করিলেই আপনা আপনি গ্রামে গ্রামে এই শক্তি ব্যবহারের জন্য গ্রামের চাষীর স্পৃহা বাড়িবে না। তাহাকে নিজের চোখের সামনে ফল না দেখাইতে পারিলে তাহার পুরাতন রীতি-নীতি সে আঁকড়াইয়া থাকিবে, সমাজের সর্বস্তরের জীবনে শক্তির প্রয়োগ শিখাইতে হইলে এবং এই শক্তির ব্যবহারে লোকের নিজস্ব সামর্থ্য ও কর্ম প্রেরণা দেশের বিত্ত বাড়াইবে।

কোন সান্ত্বনা আজিকার দিনে ভুলাবার মত নয়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর আজ অতি দুর্দিন হাল ভেঙে তরী ডোবে,
দ্বীপের রেখাও সুদূরে মিলায়ে যায়।
জীবন ঝঞ্ঝা আয়ু সমুদ্রে উন্মাদ হোলো ক্ষোভে,
রাতের ছায়ায় মানবেরা অসহায়।
ব্যথিত মানব ভবিষ্যতের পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবে, রাত্রি হবে কি শেষ!
অতীতের বাণী ছায়া মূর্ত্তির মত
রূপরেখা টেনে এসেছে বর্ত্তমানে।
সুখশান্তির কোথা পাবো নির্দ্দেশ!
দুঃস্বপনের বিভীষিকা জাগে যত ঃ
বৃদ্ধ বটের ক্রন্দন শুনি, বনস্পতিরা মৃত;
ভেঙে পড়ে জন-অরণ্যশাখা জনতা হোলো কি ভীত?

পথে প্রান্তরে পার্থিব স্মৃতি স্থবির রাত্রি মাঝে
কেন প্রেতায়িত! শঙ্কা জাগায় মনে!
ভাগ্য আকাশে চাঁদ ডুবে গেছে, তুমি নাহি মোর কাছে,
বিজলী চমকে তামসী মেঘের সনে।
অস্থির দিনে মুখোমুখি দেখা কবে,
সেদিন ছিল না ভালোবাসিবার কথা।
মন্থর ক্ষণে ক্লান্তির পাখা মেলে
কামনা বিহগ চেয়ে ছিল নীল নভে,
সেদিন কেঁপেছে হৃদি অরণ্য লতা।
লঘু চঞ্চল কুসুমের মত এলে
লাবণ্য ধারায় গাহন করিয়া ওগো মণি কুন্তলা!
যে কথা আমার ছিল বলিবার, সেদিন হয় নি বলা।

মণি কুন্তলা! প্রাণের চরে কি চোরাবালি ঘিরে রয়?
যেথায় সতত মরণের আনাগোনা।
কোন সান্ত্বনা আজিকার দিনে ভুলাবার মত নয়,
আকাশ কুসুমে মিছে প্রেম আরাধনা।
বরণ বিভায় মিলনের বিভাবরী
এসে ফিরে গেছে কত অভিমান করে!
বিরহ প্রদীপ ভগ্ন কুটীরে জ্বলে
বসে আছি একা নয়নে অশ্রু ভরি!
এত বিষাদের মাঝখানে যদি গুণ্ঠন খুলি মোরে
ইতিহাস-ছেঁড়া দলিত পত্র তলে
শুনাতে তোমার শুভ সাধনার গান!
আমার কুটীরে হয় তো হোতো গো দুঃখের অবসান।
অকথিত যত ভাবনা আমার কেন হোলো দুঃসহ
কাজল প্রহরে কোথা আছ মোরে কহ?

টান

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

মানুষের দেহে শিরা উপশিরার মত ভারতের বুক চিরে চিরে রেল লাইন কোথায় না গেছে? গেছে মহুদাকে ছুঁয়েও। মহুদা একটা ষ্টেশন।

জায়গাটা ছোট। ষ্টেশনটাও ছোট। আপ্ ডাউন মিলে চারখানা মাত্র গাড়ী। ঐ চারখানা গাড়ীর জন্যই ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় ষ্টেশন মাষ্টার মৃণালের। ডিউটীর পরে যে কারো সঙ্গে মিশবে তার যো নেই। সব অবাঙালী। নিজের মনে চাকরীর উপর একটা ঘৃণা ধরে গেছে তা'র। বনবাস! মরুবাসী!!

ভোরের ট্রেণখানা এসে থামলো ষ্টেশনে। আধ মিনিট থাকে। মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না বীথির সঙ্গে। রোগা স্বামী প্রভাসকে ধরাধরি ক'রে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

ওদের যাওয়ার কথা ছিল এই লাইনের শেষ ষ্টেশন পর্য্যন্ত। ওখানে বীথির একজন ডাক্তার আত্মীয় থাকে তা'র কাছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তা'তে ট্রেণে ছিল খুব ভিড়। তদুপরি রোগের হাতে প'ড়ে আধখানা মানুষ প্রভাস। সারাটা রাত বসে কাটিয়ে অত্যন্ত অসুস্থবোধ করতে লাগল। ট্রেণের ধকল খেয়ে খেয়ে আর কিছুতেই এগোতে চাইল না সে। বীথিকে বল্ল, আর যে পারছি না। টিকেটের মায়া ছাড়ো, নেমে পড় সাম্নের ষ্টেশনেই।

বীথি জানে প্রভাসকে। অসুবিধার শেষ সীমায় না এলে কোনদিনই নিজের এতটুকু অসুবিধার কথা সে কারোর কাছে প্রকাশ করে না। কাজেই ওরা নেমে পড়ল মহুদায়। ষ্টেশন যখন—থাকবার জায়গা একটা পাওয়া যাবেই। দু'দিন বিশ্রাম ক'রে পরে যাওয়া যাবে বাকী পথ।

ষ্টেশনের গায়ে তখন বাজার বসেছে। সব জিনিষ সস্তা! বীথি দুধ কিন্‌ল আর কিন্‌ল কিছু ফল। সঙ্গে ষ্টোভ ছিল। প্রাথমিক অসুবিধা ওদের হ'ল না, কিন্তু হতাশ হতে হ'ল পরে। কোন হোটেল নেই ওখানে। ওয়েটিং রুম যা' আছে তা' শুধু নামেই। এক বিপদ এড়াতে আর এক মহাবিপদে পড়ল বীথি।

বেলা তখন দুপুরের কোঠায়। একখানা ডাউন ট্রেণ আসার সময় হ'য়েছে তখন। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল মৃণাল। সকালের ট্রেণে নেমে ওরা তখনও ওখানে কেন জানবার জন্য ইচ্ছা হ'ল তা'র। মৃণাল এগিয়ে গেল ওদের কাছে—আপনারা এখনও এখানে?

কোথায় যাব বলুন। এখানে আমাদের জানা-চেনা কেউ নেই। কোন হোটেলও নেই যে উঠ্‌ব।—আমার কথা আমি ভাব ছি না মোটেই। বিপদ হচ্ছে ওঁকে নিয়ে, —রোগা মানুষ। বীথি বল্ল সব কথা, বল্ল ওদের মহুদায় নেমে পড়ার কারণ।

ঝরঝরে বাংলা। দু'বছর হ'ল মৃণাল মহুদায় এসেছে। বাঙালী হ'য়ে প্রায় বিহারী হ'য়ে গেছে সে। বাঙালীর মুখ দেখে না এখানে, যা দেখে ট্রেণের চলন্ত কামরায়। মনটা যেন কেমন করে উঠল মৃণালের। আঁটসাঁট করা কোটের বুকের উপরের কয়েকটা বোতাম খুলে দিয়ে একটু অনুযোগের সুরেই বল্ল সে, এ কি কথা! রোগা মানুষ নিয়ে নিরুপায় হ'য়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছেন, অথচ ষ্টেশন-মাষ্টারকে কিছু জানান নি, আশ্চর্য্য! দেখুন, এটা একটা ছোট ষ্টেশন—গ্রাম্য পরিবেশ। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে আমরা যথাসাধ্য লক্ষ্য করি।—যাক্, বেলা দুপুর! আপনারাও বাঙালী আমিও বাঙালী। অন্ততঃ বিদেশে বিভূঁয়ে বাঙালীর উপর বাঙালীর যে দাবী থাকা উচিত, সে দাবীটাও তো এখন আপনারা······

আপনাকে ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!! দেখ্‌তেই

তো পাচ্ছেন আমি রোগা মানুষ। আপনার কোয়ার্টারে গিয়ে আবার আপনাদের কোন রকম অসুবিধা ··

হেসে ফেলল মৃণাল—আমাদের অসুবিধা?—সে কিছু না। দেখ্‌বেন গোটা কোয়ার্টারটাই আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

মৃণালের কোয়ার্টারে কেটে গেল কয়েকদিন। বীথি দেখ্‌ল, আপন চেয়ে পর সত্যি ভাল।—তবুও লজ্জায় মুখে যাই যাই করলে বাধা দিত মৃণাল, এখানে কি আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা ওদের হচ্ছিলও না, বরং বেশ ছিল মৃণালের খরচে। অবিবাহিত মৃণাল থাকত চাকর শিউপূজনকে নিয়ে। শিউপূজনই তখন বাইরের কাজ শেষ ক'রে রান্না-বান্নার সব যোগাড় করে এনে হাতের উপর দিত বীথির। বীথি মন দিয়ে রান্না করত, খাওয়াত প্রভাসকে—মৃণালকে।

কিন্তু এই কি জীবন! এই জীবনই কি চেয়েছিল বীথি? ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মুখার্জ্জীর ছেলে সলিলকে ছেড়ে কবি প্রভাসকে বিয়ে করার কি এই পরিণতি? একদিন যা'র কাব্যখ্যাতি উষার আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছিল দেশময়, যা'র কাব্যের ঝঙ্কার নতুন স্পন্দন জাগিয়েছিল পাঠকের মনে—আজ সেই খ্যাত কবির এমন দুরবস্থা! প্রভাস আজ দারিদ্র্যের হাতে বন্দী! কাগজে কাগজে কত আবেদন জানান হ'য়েছিল কবিকে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া যায়নি কারোর কাছ থেকে!—প্রভাস জানতে পেরেছিল তা'। দুঃখে, অভিমানে একদিন বলেও ফেলেছিল, হায় পাঠক! তুমি শুধু ফল পেতে চাও, গাছটাকে বাচাতে চাও না।

কথাটা আর শোনেনি কেউ একমাত্র বীথি ছাড়া। শুনে দুঃখ পেয়েছিল স্ত্রী-বীথি, অন্তরালে অনেক কেঁদেছিল। প্রভাসের একজন ভক্ত পাঠিকা কলেজের ছাত্রী বীথি। কিন্তু কবির প্রতি দেশবাসীর এই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ সে একা মোচন করে কি করে?—তবুও দমল না বীথি—যা'র যতটুকু সাধ্য। স্ত্রী হিসাবে তো বটেই, কাব্যের পূজারিণী হিসাবেও তা'র কিছু কর্ত্তব্য আছে বৈ কি?

তুমি এত হতাশ হ'য়ে পড়ছ কেন—বল্ল বীথি।—আমিই তো আছি। মনে রেখ তোমার রোগ শুধু তোমারই নয়—আমারও। তোমার রোগের সব চিন্তা একান্তই আমার। তুমি মনে জোর রেখে তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে ওঠ। তুমি তো কবি! তোমার উপর দেশবাসীর এই নিঠুর ব্যবহারের চরম প্রতিশোধ তখন তুমি নিও তোমার নতনতর প্রতিভায় কাব্য লিখে।

—কথাগুলো যেন বলকারক অষুধের মত মনে হতে লাগল প্রভাসের, কাজেই কথা বলে বীথির ও-কথাগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি সে। তবুও উত্তর সে দিয়েছে বীথির দিকে অপলক্ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, বীথির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে অনেকক্ষণ চেপে রেখে।

হাতখানা প্রভাসের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেই বীথি তাকিয়েছিল জানালা দিয়ে বাইরে। আকাশ দেখা যায়। কিন্তু আকাশ কোথায়? যেন মেঘের রাজত্ব। কালো মেঘের সেকি আনাগোনা! আশ্চর্য্য! সূর্য্য যেন ও-আকাশেই নেই!—কিন্তু না, হঠাৎ এক ঝলক রোদ এসে পড়ল ওদের গায়ে। সূর্য্য উঠেছে। চারদিকে গাছের মাথায়, ঘরের চালে চালে তখন রোদের ঝিকিমিকি। সেই সকাল থেকে রাতের অন্ধকারের মত মেঘের অন্ধকারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল ওরা। রোদটা তাই লাগল খুব ভাল—ভারি মিঠা!

সূর্য্যের আলোর জীবনীশক্তিতে বীথি নতন শক্তি পেল মনে। মনে মনে বেশ খুশী হ'য়ে উঠল শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্যের কাছে মেঘের এই পরাজয়ে। মনে করল, সূর্য্যের এই জয়টা যেন তারই জীবন-যুদ্ধের জয়ের ইঙ্গিত। তাড়াতাড়ি হাতখানা প্রভাসের হাতের মুঠো থেকে বের করে নিজের বাঁ হাতের উপর জোরে আঘাত ক'রে বলে উঠল, আমি বলছি তুমি শীগ্‌গীরই ভাল হ'য়ে উঠবে।

—এত জোর তোমায় মনে?

—হাঁ্যা এতই জোর। এ জোর আমি পেলাম প্রকৃতি থেকে।

তারপর থেকে কিছুতেই দমে যায়নি বীথি। ছুটেছে পূর্ণবেগে যেন জীবন্ত-সত্যবানকে কাঁধে নিয়ে সাবিত্রী। অর্থের টানাটানিতে অসুবিধায় পড়েছে, তবুও ভীরুর মত ধিক্কার দেয়নি নিজের অদৃষ্টকে। বরং বীথি মনে করেছে কবির সেই বাণী, মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়!

আড়ালে তা'র সূর্য্য হাসে। ভয় কি! ভাবনারই

বা কি? কত আত্মীয় স্বজন রয়েছে। এই বিপদে হাত পাতলে কে না সাহার্য্য করবে তাকে?

সত্যি সত্যি সাহায্য পেয়েছে। আত্মীয়স্বজন দশজনেরই দয়ায়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পেতে প্রভাসকে রোগমুক্তির পথে এনেছে সে। এমনি করেছে, কোথাও দোষ নেই। তবুও ডাক্তারের উপদেশ, কয়েকটা মাসের জন্য বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া দরকার।

তারপরই এই যাত্রা। মহুদার।

বাবাকে চিঠি দিয়েছিল বীথি সব কথা জানিয়ে। আত্মীয়দের কাছে আর লেখা যায় না। তাঁরা এক একজনে চার পাঁচবার করে সাহায্য ক'রেছে। যে আর্থিক দুর্দিন তাতে তাঁদের কাছে আর চাইতে ভারী লজ্জা করল বীথির। বিশেষতঃ বিয়ের আগের কথাটা তা'র মনে আছে। বিয়ের আগে একদিন বীথি জোর গলায় বলেছিল, সংসারে টাকা-পয়সার কি দরকার?—চাই প্রভাসকে, কবিকে। নাই বা থাকল তা'র অর্থ, কাব্য তো থাকবে তা'র হাতে। তাই পড়বো। জীবন-পেয়ালা পূর্ণ করে কাব্যের অমৃতরস পান করব। কিন্তু আজ তা'র চোখের সামনে থেকে কল্পনার সে-রামধনু-রঙের রঙীন ছবি কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে, আঘাতে। আজ বীথি বুঝতে পেরেছে, সংসারে বন্ধুর পথে—পথ-খরচ কিছু চাই-ই।

বীথির ইচ্ছা হ'ল ওরা ওখানেই থেকে যায়। কাজ কি শেষ সময় আর একজন আত্মীয়ের কাছে ঋণী হ'তে যাওয়া, তার চেয়ে অনাত্মীয়ের কাছেই ঋণের পরিমাণটা না হয় বেশী হ'ক। তা' ছাড়া ও-জায়গাটা খুব ভালও লেগেছিল প্রভাসের। যে মহুদা মরুভূমি আর বনবাস বলে মনে হ'য়েছে মৃণালের কাছে, সেই মহুদার শ্যামশোভাই মুগ্ধ করেছিল প্রভাসকে। পাখীর ডাকে তার ঘুম ভাঙত। চোখ দু'টী মেলেই হাসাহাসি করত ফুলের সাথে। বাগানে ফুটে থাকা সেই কত জানা-অজানা ফুলের মিলিত গন্ধ, নীপের বনে মধুপের আনাগোনা, আর অদূরে মুঞ্জরীত মহুয়া শাখার নিলাজ হাতছানি এক নূতন দেশে নিয়ে যেত তাকে।

কিন্তু এই ভাললাগার সঙ্গে লজ্জাও লাগত প্রভাসের। কোন কোনদিন কিছু টাকা বীথি মৃণালের হাতে দিতে চেষ্টা করলে অসন্তুষ্ট হ'ত মৃণাল। বলত, আপনারা আমার অতিথি। তা'ছাড়া জেলের কয়েদীর মত ছিলাম আমি। আপনাদের সাহচর্য্যের মূল্যই তো আমার কাছে অনেক। আর একটা কথা: আপনারা তো যেতেই চেয়েছিলেন, আমিই যেতে দেইনি।

কথা হ'ত হাসতে হাসতে। হাসির পরে মৃণালের অনুপস্থিতিতে প্রভাস বলত বীথিকে, কা'র সাহচর্য্য বীথি? তোমার নিশ্চয়ই?

তাও এতক্ষণে বুঝলে?—ধন্য তোমার কাব্য-প্রতিভা! কিন্তু শুধু কি তাই?—আরও অনেক। আমার হাসি, আমার চোখের চাওয়া এগুলোর মূল্য তো ওর কাছে আরও অনেক বেশী—বলেই এক উচ্ছল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল বীথি।

হাসতে হাসতেই বলত প্রভাস, ভাল অভিনেত্রী তুমি। কিন্তু ভাবছি এ অভিনয় অভিনয় নয়তো?

দেড় মাসের উপর হ'ল মহুদায়। বাবার কাছ থেকে টাকার পরিবর্তে এলো চিঠি।—বাসায় তিনজনের অসুখ। অনেক টাকা লাগছে ডাক্তারে এবং অষুধ-পথ্যে। পরে চেষ্টা করে দেখবে।

বিপদ আর কাকে বলে? বীথির মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল আকাশ, আর পায়ের নীচ থেকে সরে গেল মাটী বিদেশে-বিভূঁয়ে। এমনিতে মৃণালের অনেক ব্যয় হচ্ছিল। রোগীর নিজস্ব যে কতগুলো খরচা আছে তা'র জন্য আবার মৃণালের কাছে সরাসরি হাত পাতে কি করে? সঙ্গে যা' নিয়ে এসেছিল এতদিনে ব্যয় হ'য়েছে তা'। ভরসা ছিল বাবা—কথাও দিয়েছিলেন। বাবার উপর একটা অভিমানে সারা মন ছেয়ে গেল বীথির; বাসায় তিনজনের অসুখ। সে-যে তিনজনেরই হ'ক না কেন, তাঁদের তুলনায় প্রভাস কি তা'র বাবার কাছে এত দূরের? এমন পার্থক্য তা'র বাবা কি করে দেখলেন।

প্রভাস সান্ত্বনা দেয় বীথিকে।—বলি, বেলা হ'য়েছে অনেক। রান্না করবে কখন? মৃণালবাবু যে এসে পড়বেন ডিউটী থেকে।

রান্না-বান্না এবং খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু সময় হাতে পেত বীথি। মৃণাল ঘুমাত ও-ঘরে, আর এ-ঘরে ঘুমাত প্রভাস। বীথি ঘুমাত না। ওদের এই ঘুমানোর অবসরে সে বই পড়ত। সেদিন বইতেও মন বসল না তা'র। মন খারাপ। খারাপ মন নিয়েই মনের এ্যালবামটার পাতা

একখানা একখানা করে ওল্টাতে লাগল সে। পুরানো স্মৃতির বাহক মনের এই এ্যাল্‌বাম্!

বীথিকে বিয়ে করতে না পেরে সলিল আঘাতটা পেয়েছিল খুব বেশী। সলিলের কতদিনের কত কথা সেদিন মনে পড়ল তা'র। ব্যাগ ভর্ত্তি ছিল তার টাকা, আর বুক ভর্ত্তি উচ্ছ্বাস। কিন্তু বীথি অন্য ধাতুর। টাকার লোভ এবং উচ্ছ্বাস দুটোকেই সমানভাবে ঘৃণা করেছে বীথি। কিন্তু সেদিন টাকার বড় প্রয়োজন তার। সলিলও ভুলতে পারেনি তা'কে নিশ্চয়ই—তা' মন্দই বা কি যদি সত্যি সত্যি সলিল তা'কে ভুলে গিয়ে না থাকে?

চোখের উপর থাকলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু এ একেবারে চোখের বাইরে—কাজেই বাবার লেখা 'পরে চেষ্টা করে দেখব' কথাটাতে বীথি আদৌ বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। বীথি চিঠি লিখল সলিলকে, প্রিয় মিঃ মুখার্জ্জী! প্রতিশোধ নেওয়ার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে তোমার। এ সুযোগ কি তুমি ছেড়ে দেবে?—দেবে না নিশ্চয়ই। তুমি জান হয়তো উনি অসুস্থ। এখানে চেঞ্জে এসেছি। কিছু টাকার দরকার। কলকাতা গিয়ে দেখা করব।

চিঠিখানা পড়ে ভাবনায় হাবুডুবু খেতে লাগল সলিল। মনে মনে একবার চীৎকার করে উঠল, কেন বীথিকা দেবী! সংসারে নাকি টাকার দরকার নেই?—কাব্যরস পান করেই নাকি সংসার-বৈতরণী পার হওয়া যায়? তবে আজ আর দূর থেকে আমার কাছে হাত পাতা কেন?—কিসের জন্য? লজ্জা হ'ল না অপরের কাছে হাত পাততে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সলিল। রাগের ভাবটা কেটে গিয়ে কোন্ এক দুর্ব্বলতায় যেন টান পড়ল তার! সেই বীথিকা দেবী। এক ভাবুক শিল্পীর আদরে গড়া মূর্ত্তি যেন! সত্যি আর কোন দিন বীথি টাকা চায়নি তার কাছে বরং তার দেওয়া অনেক টাকা, অনেক উপহার ফিরে এসেছে তারই কাছে। চাওয়াটাকে বরাবরই ঘৃণা করত বীথি। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! সেই বীথিই চেয়েছে। নিশ্চয়ই বড় প্রয়োজন, বড় বিপদ তার।

—তা' হ'কগে বীথির বড় প্রয়োজন—বড় বিপদ, তা'তে তা'র কি—ভাবনার মোড় ঘোরে সলিলের। টাকা সে পাঠাচ্ছে না। কিছুতেই পাঠাবে না টাকা। তা'র উপরে বীথির কিসের দাবী।

পরক্ষণেই আবার মন থেকে মুছে গেল ঐ ভাব। আবার ভাবল সলিল, বড় প্রয়োজন বীথির। বীথি চেয়েছে!!

হিসেব করা দিনের দু'দিন বাদে সলিলের টাকা পেল বীথি। আশাতীত টাকা—মহান প্রতিশোধ। রূপায় মোড়া অপমান! ও-অপমান গায় মাখল না বীথি। টাকা টাকাই—শুধু ষোল আনায় একটাকা! অলক্ষ্যে যা রইল, তার দিকে চোখ বুজেই রইল বীথি।

কিন্তু প্রভাসের মনে সলিলের ঐ পাঠান টাকা সুদসমেত দেখা দিল। মৃণালের সাথে অকারণে হাসি, সময় পেলেই গল্পগুজব করা অভিনয়ই মনে করত প্রভাস। কিন্তু সলিলের টাকা সে কিছুতেই হজম করতে পারছিল না। ব্যাপারটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে লাগল প্রভাস।

বীথি বুঝল তা'। একটা না-বলা এবং না-সহ্য করার মত দুঃখ হ'ল মনে। ইচ্ছা হ'ল সেও অভিমান করে থাকে, কিন্তু পারল না। ভয় হ'ল পাছে প্রভাসের সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হয়—শরীরের উপর তারই একটা ছায়া পড়ে। তার চেয়ে অভিমান নয়, প্রভাসের মন থেকে ভাবনার ঐ কালো মেঘখানা দূর করা একান্তই দরকার।

বীথি বল্ল প্রভাসকে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কি স্বাতন্ত্র্য হওয়া উচিত নয়? একি সাধারণ মানুষের মত স্ত্রীর উপর তোমার বিশ্রী ধারণা! ভাবতেও ঘৃণা লাগছে আমার। আচ্ছা! সোনা পুড়িয়ে না খাঁটী করা হয়? আর তোমাকে বাঁচানোর জন্য দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যে আপ্রাণ লড়াই করে চলছি তাতেও কি আমার সেই খাঁটি রূপ তোমার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না?

—পড়ছে।

—তবে তোমার মনে এমন সন্দেহ জাগে কেন? একটু চিন্তা করে দেখ দেখি, এমন কোন্ আত্মীয় বাকী আছে যা'র কাছে আবার টাকা চাইতে পারতাম—আর এই টাকা না পেলে কী উপায় হ'ত আমাদের?

বীথির কথায় যেন ভেতরে ভেতরে লজ্জা হচ্ছিল প্রভাসের। লজ্জার ভাবটা কেটে গেলে বীথির হাত

দু'খানি ধরে বল্ল, চল বেড়িয়ে আসি। এমন সুন্দর বৈকালে ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না।

দেখতে দেখতে চারমাস কেটে গেল মহুদায়। দিব্যি চেহারা তখন প্রভাসের—শীতের পরে বসন্তের আসরে গাছের মত। নূতন প্রাণশক্তিতে ভরপুর প্রভাস; তাই মাঝে মাঝে বলত বীথিকে, ধন্য আমার প্রতি তোমার ভালবাসা! ডাক্তার নয়, তুমিই ছিনিয়ে রাখলে আমাকে যমের হাত থেকে···বলতে বলতে একটু দম নিত প্রভাস। আবার সুরু করত বলতে, কিন্তু মানুষের মন বুঝলে বীথি! না বুঝে অনেক সময় অনেক ভুল বুঝেছি তোমাকে—সেজন্য আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

কতবার আর তুমি ক্ষমা চাইবে? হাসতে হাসতে জবাব দিত বীথি। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমিও বলি মানুষের মনকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি অসুখে পড়ার পর থেকে শুধু তোমাকে বাঁচাবার জন্য যে অভিনয় করে চলেছি, আর পারি না তেমন অভিনয় করে চলতে—বিবেকে লাগে। তুমি যদি সত্যি খুব ভাল হ'য়েছ বলে মনে কর তবে চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই; নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত করে শেষ করে দেই আমার এই অভিনেত্রী-জীবনকে।

প্রভাস অমত করল না বীথির কথায়, বরং খুশী হ'য়ে উঠল খুব। বীথি লক্ষ্য করল প্রভাসের চোখে মুখে ফুটে ওঠা সে খুশীর প্লাবন।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল যাওয়ার কথাটা কি ভাবে মৃণালের কাছে বলা যায় তাই নিয়ে। একটা কিছু অজুহাত দেওয়া দরকার।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার পরে কথাটা বলেই ফেল্ল বীথি, মৃণালবাবু! বাবা চিঠি লিখেছেন মার খুব অসুখ। দু'এক দিনের মধ্যেই যেতে চাই আমরা। না গেলে নয়,—অসুখের কথা তো বলা যায় না। কিন্তু দেখুন কি অদৃষ্ট! এ জায়গায় ওঁর স্বাস্থ্য বেশ অনুকূলে যাচ্ছিল, আর দু'এক মাস থাক্‌তে পারলে বেশ হ'ত কিন্তু।

মা'র অসুখ ভাল হ'লে না' হয় আবার ঘুরে আসবেন, —বল্ল মৃণাল।

* * * *

রাত্রে ঘুম নাম্‌লো না মৃণালের চোখে, মন জুড়ে এলো ভাবনা। এলোমেলো ভাবনা! ভাবল মা'র অসুখ না মিথ্যা কথা? না তা'র মনের কথা ধরা পড়ে প্রভাসের চোখে তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। আবার ভাবল মৃণাল, তা' যাক না। চেঞ্জে এসেছিল, চেঞ্জ তো হ'ল—চলে যাবে এখন, তা'তে তা'র মনেই বা এত আলোড়ন কেন? কিসের জন্য? কিন্তু···না থাক্ আর ভাবতে চাইল না মৃণাল। অথচ না চাইলে কি হবে, তবুও শরতের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত ঐ কিন্তুকে ঘিরেই ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হ'য়ে গেল তা'র। এলার্ম বেজে উঠল তখন ঘড়িতে। শেষ রাতের ট্রেণখানার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সে।

পরদিন বীথি আর প্রভাস রওনা হ'ল মহুদা থেকে। বেলা ৯টায় ট্রেন। অনেক দিন ট্রেনখানা লেট্ হয়, কিন্তু সেদিন এক মিনিটও নয়। কাঁটায় কাঁটায় এসে পৌছাল—প্ল্যাটফর্মে।

গার্ডের বাঁশী বাজল, নড়ে উঠল হাতের নীল পতাকা। মনটাও সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল মৃণালের—বীথি যাচ্ছে! ট্রেন ছেড়ে দিল। বীথি চলে গেল। কিন্তু সত্যিই কি গেল? না বাইরে থেকে বীথি তার অন্তরে এসে বাসা বাঁধ্‌লো? কায়ার বীথি ছায়ায় রূপান্তরিত হ'য়ে অক্ষয় আসন বিস্তার করলে কি তার মনে?

রামায়ণের গল্প

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, পিএচ্-ডি

সরযূর তীরে কোশলনামে বিস্তীর্ণ জনপদ। ইহা ধনধান্য ও পশুসম্পদে পূর্ণ। শালিধান ও ইক্ষুর চাষে ইহার ক্ষেত্রসকল সর্বদা শস্যশালী ছিল এবং প্রজাগণও সর্বদা হাসিমুখে দিন কাটাইত। বৈশ্য ও শূদ্রগণের পরিশ্রমে এই দেশ কৃষি ও বাণিজ্যে অতি উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে রক্ষা ও পালন করিতেন। ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন দৃপ্ত শার্দূলতুল্য বীরত্বের আধার, বাহুবলে সিংহ ও হস্তীর দর্প উৎপাটনে সমর্থ। ক্ষত্রিয়গণ প্রতি কার্যে ঋজুস্বভাব স্নেহপূর্ণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের কথা মানিয়া চলিতেন এবং রাজ্যের সর্বত্র ব্রাহ্মণদিগের অগ্রাধিকার প্রাপ্য ছিল।

এই কোশল রাজ্যেরই রাজধানী ছিল বিখ্যাত অযোধ্যা নগরী। ইহা সরযূর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহা আয়তনে দ্বাদশ সহস্র গজ দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন সহস্র। অতি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা ইহা অনেকগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। রাজপথগুলির অনেকগুলিই ছিল রথ্যা। দুই দিক হইতে রথসকল অনায়াসে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। রাস্তাগুলি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইত ও তাহাতে জল ছিটাইয়া ও ফুল ছড়াইয়া দিয়া সর্বদাই এত শোভা বৃদ্ধি করা হইত যে নগরবাসীর মন যেন জোর করিয়া রাজপথে টানিয়া আনিত। রাস্তাগুলির দুইধারে ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী। ইহার অনেকগুলিই ছিল উচ্চ অট্টালিকা। তাহাদের শিখরে ধ্বজ ও পতাকা উড্ডীন থাকিত। নানা শিল্পীদের নিবাসহেতু এই নগরী ছিল বৈদেশিকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। নানা দেশ হইতে বণিক সকল আসিয়া অযোধ্যাতে তাহাদের দোকান সকল এত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল যে তাহা দেখিতেই লোকের ভিড় জমিয়া যাইত।

শহরের মধ্যস্থলে দৃঢ়প্রাচারবেষ্টিত রাজপুরী, যেন একটি বিশাল দুর্গ। সমস্ত রাজধানীটি ঘিরিয়া মাটির প্রাচীর এবং তাহার তিন দিকে গভীর পরিখা বা খাত, জলে পূর্ণ। উত্তর দিকে সরযূ নদী নিজেই পরিখার কাজ করিত। বলা হয়, অস্ত্রবিশারদ ক্ষত্রিয়বীরগণ এই দুর্গ ও নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাহারা ছিল শব্দবেধী ও উজ্জ্বল লৌহকবচে আবৃতদেহ, অশ্ববলে ও গজবলে বলীয়ান্। কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশে জাত এবং বনায়ুপ্রদেশে উৎপন্ন বহু সুদৃঢ় অশ্ব এই নগরীর সম্পদ ছিল, এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতের অরণ্যে গৃহীত বহু হস্তীর বৃংহনে এই নগরী মুখরিত হইত। আর দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব ও বীণার ধ্বনিতে পুরবাসীদিগের বিপুল হর্ম্য সহরটিকে আনন্দে পরিপূর্ণ রাখিত। সর্বোপরি ছিল ব্রাহ্মণকণ্ঠের অপূর্ব বেদধ্বনি, যাহার শব্দে নগরীর আকাশ বাতাস হইতে সমস্ত অমঙ্গল দূরে চলিয়া যাইত এবং অগ্নিতে তাহাদের প্রদত্ত আহুতির সঙ্গে নগরবাসীদের সমস্ত অকল্যাণ দূর হইত।

* * *

এই রাজ্যের পালক ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ দশরথ। তিনি ছিলেন পৌর ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজামণ্ডলের অতি প্রিয়। তিনি যজ্ঞকারী ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া সর্বদেশে খ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল ছিল তাঁহার বশে। পুরাকালে প্রজাপতি মনু যেমন সমস্ত অন্যায় দমন করিয়া প্রজাদের ধর্মপথে থাকার বিধান করিতেন, মনুর বংশধর মহারাজ দশরথও তেমনি প্রজাদের বিনয়াধানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসনে কেহই পরের দ্রব্যে লোভ করিত না, সকলেই নিজ নিজ বিষয় সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিত। সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করে না বা স্বর্ণ অলঙ্কার ধারণ করে না এমন কোন প্রজা তাঁহার রাজ্যে বড় দেখা যাইত না। নর ও নারী সকলেই ধর্মশীল ও সুসংযত ছিল। ক্ষত্রগণ ব্রাহ্মণের পূজা করিত এবং বৈশ্য ও শূদ্রজাতি ক্ষত্রিয়ের শাসন মানিয়া চলিত।

রাজ্যশাসনের সহায়কভাবে মহারাজ দশরথের আটজন অমাত্য ছিল— ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপাল এবং সুমন্ত্র। ইহাদিগের মধ্যে সুমন্ত্রই বাল্যসহচর বলিয়া দশরথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজার সুহৃদগণের মধ্যে এবং সর্বদা তাঁহার রথের পরিচালক।

বশিষ্ঠ ও বামদেব ছিলেন দশরথের পুরোহিত ও ঋত্বিক। ইঁহাদের পরামর্শ রাজা সমস্ত বিষয়ে গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকজন মন্ত্রণাপ্রদানকারী ছিলেন— সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ মহারাজকে সব সময়ে ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং তাঁহাদের সম্মতি প্রথমে গ্রহণ করিয়া পরে অমাত্যদিগের সহিত রাজা গূঢ় পরামর্শ করিতেন। অমাত্যগণ রাজার সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিত। এই অমাত্যদের বুদ্ধিবলে কোন প্রতিবেশী নৃপতি দশরথের প্রতি শত্রুতা সাধনের কল্পনাও করিতে পারিত না, কারণ তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা চরমুখে জয়ন্ত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি অমাত্যগণ আগে হইতেই জানিতে পারিতেন। সামন্ত নৃপতিগণ তাই সর্বদা দশরথের বাধ্য ছিল। অমাত্যগণ সব সময়ে রাজকোষ পরিপূর্ণ রাখার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, যাহাতে অতি বদান্য মহারাজ দুই হাতে অর্থ বিতরণ করিয়া দিয়াও কোষাগারের কোন ন্যূনতা লক্ষ্য করিতে না পারেন। অমাত্যগণ সর্বদা ন্যায়ের অনুসরণ করিতেন এবং নিজ নিজ পুত্রদের প্রতিও দুষ্কৃতের জন্য প্রাপ্য দণ্ডবিধান করিতে কোনও ত্রুটি করিতেন না। এই অমাত্যগণ ছিলেন সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন এবং প্রজাদের সৎকার্যে উৎসাহবর্দ্ধক। এই সমস্ত অমাত্যের সহায়তায় দশরথের রাজ্য প্রজাদের রাজভক্তি ও শুভকামনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

* * *

দক্ষিণ কোশল বা কান্তার-রাজ্যের রাজকন্যা কৌশল্যা দেবীর সহিত

প্রথম যৌবনে দশরথের বিবাহ হয়। তিনি তখনও যুবরাজ মাত্র ছিলেন। ইহার অনেক পরে, রাজ্যলাভের পর, মহারাজ দশরথ কেকয়-রাজ অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। অনেকদিন ধরিয়া কৌশল্যার সন্তান লাভ না হওয়াই এই বিশেষ দ্বিতীয় বিবাহের কারণ। বিবাহের সময় অশ্বপতির নিকট দশরথকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে এই দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভজাত সন্তানেরও রাজ্যে অধিকার থাকিবে, নতুবা অশ্বপতি তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন না। একমাত্র প্রথম ও প্রধানা রাজমহিষীর গর্ভজাত সন্তানই সিংহাসনে বসিবার অধিকার থাকিত। এ ক্ষেত্রে এই নূতন নিয়ম দশরথকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল যে যদি কৌশল্যা অপুত্রক থাকেন অথবা কৌশল্যার পুত্র অপেক্ষা কৈকেয়ীর পুত্র শ্রেষ্ঠ হয় তবে কৈকেয়ী পুত্রেরও রাজ্যলাভের দাবী অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

ইহার পরে মহারাজ আরও অনেক বিবাহ করেন, কিন্তু এরূপ প্রতিশ্রুতি আর তাঁহাকে কোথাও দিতে হয় নাই। এই স্ত্রী সকলের মধ্যে পুরোহিত বামদেবের করণ-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সুমিত্রার নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। রাজাদের বিবাহের সময়ে প্রধানা রাণীর সহিত তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয়া সহচরী এবং পরিচারিকাস্থানীয়া অন্যান্য অনেক কন্যাও একই সাথে একই মণ্ডপে রাজার সহিত বিবাহিতা হইতেন। ইহারা প্রত্যেকেই রাজার স্ত্রী, কিন্তু ইঁহারা রাণী বা মহিষী আখ্যা পাইতেন না। মহারাজ দশরথের এইরূপ সাড়ে তিনশত স্ত্রী ছিল, কিন্তু মহিষী পদবাচ্য ছিলেন মাত্র তিন জন—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। অন্যান্য স্ত্রীসকল কেহ ছিলেন এই তিন প্রধানার সহচরী, কেহ বা ছিলেন তাঁহাদের সামান্য পরিচারিকা মাত্র।

: · :

এত অধিকসংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বহুদিন ধরিয়া মহারাজ দশরথের কোন পুত্র সন্তান জন্মিল না। তখন তাঁহার মনে এই ইচ্ছা হইল যে পুত্রলাভের নিমিত্ত তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। এই যজ্ঞের বহু বিঘ্ন এবং যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে না পারিলে যজ্ঞকর্তার সদ্য সদ্য বিনাশ হয়। সুতরাং দশরথ কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন। পরে বাল্যসহচর অমাত্য সুমন্ত্রকে বলিলেন, "আপনি আমার গুরু ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণসকলকে ডাকিয়া আনুন। আমি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিব"। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে রাজার আহ্বান জানাইলেন। সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ—ইঁহারা সকলেই আসিলেন। তাঁহারা রাজার প্রস্তাব শুনিয়া এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহাদের আদেশে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হইল। সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের পরামর্শে এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিকের পদে বরণ করা হইল বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে। শুনা যায় যে অঙ্গরাজ্যে বহুদিন অনাবৃষ্টি থাকায় সংসার-নির্লিপ্ত এই কিশোর ঋষিকুমারের পাদস্পর্শে দেবরাজ ইন্দ্র সে দেশে অজস্র বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করেন। তারপর অঙ্গরাজ রোমপাদ মহাসমাদরে এই ঋষিপুত্রের সহিত নিজ কন্যা শান্তাদেবীর বিবাহ দেন। রোমপাদ ছিলেন দশরথের বিশিষ্ট বন্ধু, সুতরাং দশরথের অনুরোধে তিনি স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

যজ্ঞ যাহাতে সম্যক বিধি-নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে সে বিষয়ে স্বয়ং বশিষ্ঠই সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। নানা দেশ হইতে যজ্ঞ-সামগ্রী সকল আনীত হইল। শুভলক্ষণসম্পন্ন যজ্ঞীয় অশ্ব সৈন্যপরিবৃত করিয়া বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়া আনার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং তাহার সাথে চলিলেন উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। এক বৎসর ধরিয়া এই অশ্ব স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। কেহ যদি এই অশ্ব বল প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করে, রাজসৈন্যের কর্তব্য হইবে তাহাকে পরাস্ত করিয়া অশ্বের স্বৈরগতি অব্যাহত রাখিতে। বৎসরাবধি যজ্ঞ চলিতে থাকিবে। বৎসরান্তে অশ্বকে ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় হইতে পারিবে না।

পূর্ণ চৈত্র মাসে বসন্তের সমাগমে বৎসরের প্রারম্ভ হইলে যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এদিকে ঋত্বিক প্রধান ঋষ্যশৃঙ্গ পবিত্র অগ্নি-শিখার সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজা সকল যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রচুর উপঢৌকন দশরথকে যজ্ঞার্থে প্রদান করিলেন। বহুদূর হইতে বেদবিদ ব্রাহ্মণ-সকলকেও আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল। সকলের জন্যই উত্তম বস্ত্রাবৃত বাসস্থান প্রস্তুত হইল। প্রচুর অন্ন সর্বদা বিতরণ চলিল। ভুজ্যতাং দীয়তাং শব্দে চতুর্দিক মুখরিত। কর্মান্তিক, শিল্পকর, বর্দ্ধক, খনক প্রভৃতি বিভিন্ন কুশলী শিল্পকার এই যজ্ঞের সমস্ত নির্মাণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছিল। দক্ষিণ কোশলের রাজা দশরথের শ্যালক ভানুমান্ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। আর আসিলেন রাজশ্বশুর কেকয়রাজ অশ্বপতি; কাশীর রাজা দশরথের সমবয়স্ক সুহৃৎ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন, অঙ্গেশ্বর রোমপাদ আসিলেন, আর আসিলেন প্রাচ্যদেশীয়, সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণাপথবাসী নৃপতি সকল।

ঋষ্যশৃঙ্গ যথাসময়ে প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বান করিলেন, তারপর বিভিন্ন দেবতাদের নামে অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিতে লাগিলেন। বহুশত ইষ্টকে প্রস্তুত এই যজ্ঞবেদীর পরিকোণে বিল্ব, খদির, শ্লেষ্মাতক ও দেবদারুর স্তম্ভ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। রাণী তিনজনকে যখন যজ্ঞে দীক্ষিতা হইবার জন্য আহ্বান করা হইল তখন

তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্।
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে॥

—সেই অতি প্রীতিপ্রদ কল্যাণবাক্যে তাঁহাদের মুখের শ্রী বর্দ্ধিত হওয়ায় শীতান্তে বসন্তের সমাগমে পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্তের সমাগমে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইবে। অশ্বটিকে যজ্ঞে বলি দিবার পূর্বদিন সারারাত্রি ধরিয়া স্বহস্তে অসির সাহায্যে কৌশল্যা নিজে অশ্বের রক্ষায় অনিদ্রায় কাল কাটাইলেন। সকাল বেলা হোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতা মন্ত্রধ্বনি করিয়া অশ্বের পবিত্রতা বিধান করিলে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া অশ্বটিকে বলি দেওয়া হইল। ঋত্বিক শ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বিখণ্ডিত অশ্বদেহ হইতে চন্দ্রাখ্য মেদ-খণ্ড উদ্ধৃত করিয়া সেই বপা যজ্ঞের

অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই বপার ধূমগন্ধ স্বয়ং মহারাজ আঘ্রাণ করিলেন এবং মহিষীত্রয়কেও আঘ্রাণ করাইলেন। দেহগত সমস্ত পাপ ইহাতে দূরীভূত হইলে রাজপত্নীগণ মাতৃত্বলাভ করিবার যোগ্যা হইলেন।

যজ্ঞে যখন শেষ আহুতি প্রদত্ত হইতেছিল সেই সময়ে অগ্নিশিখা আরও উজ্জ্বল করিয়া এক দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তপ্তজাম্বুনদ সদৃশ তাহার দেহের কান্তি এবং রজতনির্ম্মিত তাহার পরিচ্ছদ। দুই বাহুর মধ্যে এক মায়াময়ী দিব্যপায়সপূর্ণ কলসী বহন করিয়া দশরথকে আসিয়া বলিলেন, "যজ্ঞের এই পূর্ণ সম্পদ্‌রূপ দিব্য পায়স পত্নীদিগকে ভক্ষণের জন্য ভাগ করিয়া দাও। ইহার ফলে তাহারা পুত্রলাভে সমর্থ হইবে।" তারপর সেই দেবনির্ম্মিত পায়সভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দশরথ পায়সের অর্দ্ধেক প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। বাকী অর্দ্ধেক হইতে অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশের অর্দ্ধেক কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া কি মনে করিয়া যেন শেষ অর্দ্ধাংশ আবার সুমিত্রাকেই আনিয়া দিলেন।

মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া শেষ হইল। মহারাজ হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণ রূপ চতুর্ব্বেদীয় চারিটি যজনকারীকে রাজ্যের চতুর্দ্দিক্‌ দান করিতে গেলে তাহারা রাজ্য শাসনে নিজেদের অক্ষমতা জানাইলেন, কারণ উহা তাহাদের অধ্যয়ন ও তপস্যার পক্ষে বিঘ্নকর হইবে। রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহারা রাজসকাশে পরিবারপালনযোগ্য সামান্য অর্থের প্রার্থনা করিলে রাজা হাসিমুখে সেই অর্থ প্রদান করিলেন। দেবতারা নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ কুটীরে প্রস্থান করিলেন। নিমন্ত্রিত রাজগণও দশরথের আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইয়া বন্ধুভাবে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।

* * *

যজ্ঞ শেষ হইবার দ্বাদশ মাস পরে পুণ্য চৈত্র মাসের শুক্লানবমীতে মহারাণী কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হইল। সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ রামচন্দ্রের জন্মের সময় চন্দ্র ছিলেন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে এবং বাক্‌পতি বৃহস্পতিও তাহার সহিত এক লগ্নে অবস্থিত ছিলেন। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলকারিণী। সুতরাং এই নবজাতক যে জীবলোকের বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে সকলের মনেই সেই আশার সঞ্চার হইল। এই পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কৌশল্যা বজ্রপাণি ইন্দ্রের জননী অদিতির মতই শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইহার পরে পৌষ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে চন্দ্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকিতে থাকিতেই কৈকেয়ীর পুত্র ভরতের জন্ম হইল। জন্ম সময়ে গ্রহাদির অবস্থান দেখিয়া লগ্নাচার্য্যগণ বলিলেন যে 'দশরথের এই সন্তান অতি শুদ্ধচিত্ত ও স্থিরবুদ্ধির যুবক হইবে। পরবর্ত্তী বৎসর শ্রাবণ মাসে, রামের জন্মের সপ্তদশ মাসে, শুক্লা-প্রতিপদে অশ্লেষা নক্ষত্রে সুমিত্রা যুগ্মপুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

প্রত্যেকের জন্মের একাদশ দিন পরে স্বয়ং বশিষ্ঠ এই শিশুদের নামকরণ করিলেন। দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র কৌশল্যা তনয়ের নাম রাখা হইল রাম। পরবর্ত্তীকালে ইনিই সর্ব্বালোকের নয়নাভিরাম হইয়াছিলেন। কৈকেয়ীপুত্রের নামকরণ করা হইল ভরত, আর সুমিত্রার যমজ পুত্রদে নাম দেওয়া হইল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এই দুইজনের মধ্যে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের অগ্রজ।

* * *

অষ্টম বৎসরে গুরু বশিষ্ঠ ইহাদের বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করাইলেন। বালকগণের একাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে উপযুক্ত উপাধ্যায়ের নিকট মহারাজ স্বয়ং ইহাদের অস্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামচন্দ্রই পিতার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। রাম অস্ত্র শিক্ষায় যেন পিতার যশকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগত হইয়াছিলেন। অগ্রজকে তিনি পিতা অপেক্ষাও পূজা করিতেন এবং আত্মা অপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করিতেন। কেহ তাহাকে কোন সুমিষ্ট আহার প্রদান করিলে রামচন্দ্রকে তাহার অংশ না দিয়া নিজের ভোগে উহা লাগাইতেন না। রাম যখন অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ায় গমন করিতেন, তখন অনুজ লক্ষ্মণও ধনুক ধারণ করিয়া রামের পশ্চাদ্‌গামী হইতেন এবং সর্ব্বদা সমস্ত বিপদ হইতে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। সকলে লক্ষ্মণকে বলিত, রামচন্দ্রের "বহিঃ প্রাণ ইবাপর", দেহাতিরিক্ত অন্য একটি প্রাণ।

এইরূপে শত্রুঘ্নও ছিলেন ভরতের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। ভরতকে তিনি ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। তিনি লক্ষ্মণের সহোদর, না ভরতের সহোদর নগরবাসীজনেরও সে বিষয়ে ভ্রম হইত।

রামচন্দ্র বর্ণে ছিলেন "ইন্দীবর শ্যামঃ," নীল পদ্মের ন্যায় শ্যামল আভাযুক্ত। এ বিষয়ে ভরতও রামের তুল্য ছিলেন। শত্রুঘ্ন ইহাদের অপেক্ষা অনেক গৌর বর্ণ ছিলেন। আর লক্ষ্মণ ছিলেন সম্পূর্ণ সুবর্ণচ্ছবি—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

* * *

পনর ষোল বৎসর বয়সে বালকগণ অস্ত্রচালনায় কৃতবিদ্য হইলে একদিন অযোধ্যাপুরীতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শুভাগমন হইল। তিনি রাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বারাধ্যক্ষদিগকে বলিলেন যে রাজাকে সংবাদ দাও যে গাধির পুত্র কৌশিকবংশীয় বিশ্বামিত্র দুয়ারে, তাহার দর্শনাভিলাষী। দৌবারিকগণ সন্ত্রস্ত হইয়া রাজার নিকট ছুটিয়া গেল। রাজাও পুরোহিত বশিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া দুয়ারে আসিয়া মহর্ষিকে ভিতরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। ব্রতে হোমে কর্শিতদেহ এই সত্যসন্ধ মহর্ষির যথোচিত পূজাবিধান করিয়া নৃপতি তাহার কুশল প্রশ্ন করিলেন। ঋষিবরও তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার কল্যাণ কামনা জানাইলেন,—পুরে, কোষে, দুর্গে, জনপদে, সর্ব্বত্রই রাজার হিত কামনা করিলেন। হৃষ্টচিত্তে মহারাজ দশরথ বলিলেন, "মর্ত্তবাসী অমৃতলাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, অনাবৃষ্টির পর মেঘোদয় দেখিয়া লোকের মন যেমন আশান্বিত হয়, প্রিয়া ভার্য্যার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া অপুত্রক যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আপনার আগমনে আমাদের মনেও তেমনি

আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। আপনার সন্তোষ বিধানার্থ আমি কোন কার্য্যে নিজকে নিয়োগ করিতে পারি, জানাইলে চরিতার্থ বোধ করিব।" এই সুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি নিঃসঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন, "পূর্ণবিশ্বাসে আপনাকে আমার মনোগত ইচ্ছা জানাইতেছি, কারণ জানি আপনি নিঃসন্দেহে ইহা পূর্ণ করিবেন। সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত আমি মৌন-ব্রত অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করি। বেদীতে যজ্ঞভাণ্ড সকল আস্তীর্ণ হইলে মারীচ ও সুবাহু নামে রাক্ষসজাতীয় দুই পুরুষ রুধিরবর্ষণে যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেয়। মৌন ভঙ্গ করিয়া আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে পারিনা; তাছাড়া কাহারও প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিতে মনে বিতৃষ্ণা আসে, ব্রতচারীর মন এমনভাবেই শান্তরসে পূর্ণ থাকে। সুতরাং আপনার নিকট প্রার্থনা যে স্বীয় পুত্র কাকপক্ষের ন্যায় মার্জ্জিত কেশ-কলাপে সুশোভিত ললাট রামচন্দ্রকে আমার ব্রতরক্ষার সহায় করিয়া দিন, যাহাতে রাক্ষসগণ আমার যজ্ঞের কোন বিঘ্ন করিতে না পারে। আশা করি আমার এ প্রস্তাব আপনার মন্ত্রিগণ এবং বেদবিৎ বশিষ্ঠও অনুমোদন করিবেন।"

কিন্তু রামের বিয়োগচিন্তায় অধীর হইয়া দশরথ প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর দুঃখে ও ভয়ে বিশ্বামিত্রকে জানাইলেন, "আমার পুত্র কমললোচন রামচন্দ্রের বয়স আজিও ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। রাক্ষসদের সহিত উঁহার যুদ্ধযোগ্যতা কোথায়? আপনার যজ্ঞরক্ষার্থে অক্ষৌহিণী সেনা পরিবৃত হইয়া আমি নিজে আপনার সঙ্গে যাইব, শত শত অস্ত্রবিশারদ বীরগণ আপনার ব্রতরক্ষা কার্য্যে জীবনপণ করিয়া আত্মনিয়োগ করিবে। আপনি এমত অবস্থায় রামচন্দ্রকে লইয়া যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন না। আমার জন্ম হইতে আজ ষাট বৎসর গত হইতে চলিল। বহুদিন আমি অপুত্রক ছিলাম। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আমি পুত্রলাভে সমর্থ হইয়াছি। সর্ব্বদাই মনে আশঙ্কা, কখন পুত্রহারা হই। আপনি আপনার যজ্ঞ-পণ্ডকারীদের সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বলুন। তাহারা কিদৃশ পরাক্রমের, কে তাহাদের সহায়ক, কিভাবে তাহাদের নিরাকরণ করা সম্ভব—সমস্ত শুনিয়া আমি নিজেই যথাযোগ্য প্রতিবিধানে চেষ্টিত হইব।"

"মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই রাক্ষসাধিপতি রাবণের নাম শুনিয়াছেন," —এই বলিয়া বিশ্বামিত্র কথা আরম্ভ করিলেন। "লঙ্কায় তাহার রাজধানী এবং সমস্ত দক্ষিণাপথ তাহার শাসন মানিয়া চলে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সমস্ত শাখাপ্রশাখার উপরই তাহার কিছু না কিছু আধিপত্য আছে। তাহার অধীনস্থ দুর্দান্ত প্রাদেশিকগণ বিন্ধ্যপর্ব্বত ছাড়াইয়া আর্য্য-রাজ্যখণ্ডগুলির উপরেও অনেক সময়ে অত্যাচার চালাইয়া থাকে। সেই রাবণের অনুচর মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আমাদের আশ্রমে আসিয়াও ঋষিদের শান্তি নষ্ট করিতেছে। রামকে আশ্রমে লইয়া যাওয়া ছাড়া আমি তাহাদের অত্যাচার নিবারণের অন্য কোন উপায় দেখিতেছিনা।"

রাবণের নাম শুনিয়া স্বয়ং দশরথ ভীত হইয়া পড়িলেন। মারীচ ও সুবাহুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ-ই এই রাবণের শত্রুতা নিজের উপর টানিয়া আনা। ইহা তাঁহার সাধ্যের সম্পূর্ণ অতীত বলিয়া দশরথ বিশ্বামিত্রের নিকট নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বামিত্র অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "স্বয়ং আমাকে প্রার্থনা জানাইতে অনুরোধ করিয়া পরে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকার করা কি রঘুকুলের উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াই যদি আপনার সুখলাভ হয় তবে, হে কাকুৎস্থ, আপনি বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া সুখে থাকুন, আমি অন্যত্র গমন করি।"

ঋষির রোষে পৃথিবী পর্য্যন্ত বিচলিত হইতে পারে জানিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠ দশরথকে হিত উপদেশদানে সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "বিশ্বামিত্রের কোন যাজ্ঞা আমাদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশমাত্র। ইচ্ছা করিলে এই শম-প্রধান মহামুনি নিজেই রাক্ষসদের নিরাকরণ করিতে পারেন। রামের সাহায্যপ্রার্থনা শুধু আপনার পুত্রের প্রতি অসীম কৃপাপ্রদর্শন। অস্ত্রচালনায় রামচন্দ্র কৃতবিদ্যই হউন, অথবা তিনি নিতান্ত বালকই থাকুন, কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র যাহার মঙ্গল অনুধ্যান করিতেছেন কোন দুর্বৃত্তেরই সাধ্য হইবে না তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে রামের গমনে অনুজ্ঞা করুন।"

তারপর পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক নানা মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইলে দশরথ নির্ভয়ে রামের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাহাকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিলেন। কাকপক্ষধারী বালক লক্ষ্মণ তাহার সহযাত্রী হইলেন। গোধাচর্ম্মের অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া খড়্গ-তূণ-ধনুর্দ্ধারী সুন্দর কেশকলাপে মণ্ডিত এই রাজপুত্রদ্বয় যখন বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন তখন মনে হইল যেন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছেন। অতুল শ্রীসম্পন্ন, দীপ্তিযুক্ত চারু-বপু ভ্রাতৃদ্বয় যখন সৌন্দর্য্যে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া ঋষি-প্রদর্শিত পথে গমন করিতেছিলেন তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যেন পাবক-জাত যুগল স্কন্দদ্বয় অচিন্ত্যশক্তি স্থাণুদেবের অনুসরণ করিতেছেন।

সরযূর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অর্দ্ধযোজনের কিছু দূর বেশী পথ অতিক্রম করার পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস শুভ-সায়ংসন্ধ্যা আগত। সরযূর পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া শুচি হও।" দুই ভ্রাতা সান্ধ্যবন্দনাদি শেষ করিলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। শুচি হইয়া এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে ক্ষুৎ-পিপাসার প্রকোপ হইতে শরীর মুক্ত হয় এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও কোন শত্রুর নিকট পরাজয় সহ্য করিতে হয় না। রামচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যকীর্ত্তি ঋষির নিকট হইতে এই মন্ত্র-গ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাহার তেজ ও কান্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি শরৎকালের মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

* * *

সেই রাত্রি তিনজনে সুখে সরযূর তীরে যাপন করিয়া প্রভাত হইলে আবার পথ চলিতে প্রস্তুত হইলেন। বিশ্বামিত্র কুমারদ্বয়ের প্রাতঃ মধ্যাহ্নকালীন ও সান্ধ্য উপাসনার প্রতি সব সময়েই দৃষ্টি দিতে ছিলেন।

পুণ্য সরযূর জলে আচমন করিয়া গায়ত্রীমন্ত্রে তাহারা ঋষির উপদেশ মত দেবতার বন্দনায় যত্নবান হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাহারা সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে শান্তরসাস্পদ ঋষিদের আশ্রম দেখিয়া রামচন্দ্র প্রীতমনে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এমন সুন্দর আশ্রমে কোন্ পুণ্যবান ঋষি বাস করেন? মনে হয় বহু শত বৎসর ধরিয়া এস্থলে ঋষিদিগের বাস ছিল, আশ্রম বৃক্ষ সকল এত বর্দ্ধিত ও ছায়াযুক্ত।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এই আশ্রম কত প্রাচীন কেহই বলিতে পারে না। শুনা যায় ভগবান স্থাণু এই মহানদীর সঙ্গমস্থলে তপস্যা করিতেন। তাহারই শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় এখানে তপস্বিগণ বাস করিয়া আসিতেছেন। আমরা আজ এই শুভ আশ্রমে রাত্রিকালে আশ্রয় লইয়া প্রভাতে নদী পার হইয়া যাইব।" বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই আশ্রমবাসী ঋষিগণ পাদ্য, অর্ঘ, বন্দনাদি লইয়া অতিথিদের সমাদর করিতে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বজনপরিচিত প্রাচীন মন্ত্রদ্রষ্টা বিশ্বামিত্রের পাদবন্দনা করিয়া সকলেই তাহাকে রাম লক্ষ্মণ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তাহারা আশ্রমবাসীদের একটি কৌতূহলের বিষয় হইয়াছিলেন। এই স্থাণ্বাশ্রমে সুখে রাত্রিবাস করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত মহর্ষি প্রভাতে গঙ্গা নদী নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইলেন।

* * *

নৌকাযোগে সুন্দর সাগরগামিনী গঙ্গানদীর মধ্যস্থলে আসিয়া তিন জনেই তুমুল জলধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অতি নিকটেই সরযূ নদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই নদীদ্বয়ের জলস্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে অপূর্ব্ব জল-কল্লোলের সৃষ্টি হইয়া দুই কান প্রায় বধির করিয়া দিতে ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ কূলে আসিয়া তাহারা পদব্রজে অনেকটা দূর অতিক্রান্ত হইলেন, কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্মের বন ও মধ্যে মধ্যে বড় বড় কতকগুলি গাছ ছাড়া কোন জনমানবের বসতি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। রামচন্দ্র ইহার কারণ সম্বন্ধে মুনিবরকে প্রশ্ন করিলে বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন, "সেখানে এই বিজন বনের প্রসার দেখা যাইতেছে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে সমৃদ্ধিশালী দুই জনপদ ছিল। মলদ ও করূষ নামে এই দুই জনপদে যথারীতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত এবং স্বয়ং ইন্দ্র প্রীত হইয়া এখানে প্রভূত বর্ষণ করিতেন। শস্যশালিনী এই ভূমিখণ্ডদ্বয় রাক্ষসের অত্যাচারে আজ জনশূন্য। রাক্ষস-রাজ রাবণের প্রাদেশিক সুন্দ নামক বিখ্যাত যোদ্ধা এদেশ যখন আর্য্যবসতি শূন্য করিতেছিল তখন সে ঋষিদের কোপে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। তারপর হইতে তাহার স্ত্রী তাটকা নাম্নী রাক্ষসকন্যাই এই দেশ শাসন করিয়া আসিতেছে। তাহার অধীনস্থ রাক্ষসদিগের অত্যাচারে এ বনের নিকট দিয়াও লোকে যাতায়াত করিতে ভয় পায়।"

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই দূরে ঘোরবপু রাক্ষসসমূহের আবির্ভাব হইল। তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের খ্যাত-কীর্ত্তি সেনা-নায়িকা তাটকাকেও দেখা গেল। আর্য্যমূর্ত্তির দর্শনে রাক্ষসদিগের ক্রোধ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা প্রথমে রামাদির উপর দারুণ শিলা-বর্ষণ আরম্ভ করিল। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, মুনিকে লইয়া কোন বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় লইতে। তারপর ধনুকে শরযোজনা করিয়া তিনি রাক্ষসদের আক্রমণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন। শাণিত অস্ত্রের আঘাতে অনেকের দেহই আচ্ছন্ন হইলে রাক্ষসগণ ঋষিজ্ঞানে যাহাদিগকে হেলা করিয়াছিল শিলাবৃষ্টি ছাড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদের বধসাধনে সচেষ্ট হইল। কিন্তু রামের অস্ত্রের সামনে কেহই তিষ্টিতে পারিল না। রাক্ষসগণ পলাইতেছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র লক্ষ্মণকে লইয়া রামের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে সংহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে রামচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাটকা পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল। ইহারা প্রথমেই ঋষি বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রামের অস্ত্রপ্রভাবে ঋষির কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া তাহারা রামের প্রতিই ধাবিত হইল। রামচন্দ্রের ক্ষত্রবুদ্ধি তখনও তাহাকে স্ত্রীজনের দেহে অস্ত্রপাত করিতে বিরত রাখিল, অথচ নিজে তিনি শত্রু-অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িতেছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাহাকে যুদ্ধে স্থির উপদেশ দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীজন বলিয়া ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার উচিত হইতেছে না। সন্ধ্যার পর রাক্ষসদের যুদ্ধ শক্তি অনেক গুণ বর্দ্ধিত হয়। তখন ইহাদের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠা শক্ত হইবে। এই তাড়কা বহু সজ্জনের বিনাশ করিয়াছে, এবং একটা সমগ্র জনপদ ইহার অত্যাচারে আজ জনশূন্য। ইহাকে বধ করিতে কোনই পাপ নাই। চাতুর্বর্ণ্যের হিতার্থে ইহার শাসন আজ তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং এই অধর্ম্মচারিণীর বধ সাধন করিয়া তুমি প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যে যত্নবান হও। বৈদিক আখ্যানে রহিয়াছে যে পুরাকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা যখন পৃথিবীকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল তখন ইন্দ্র তাহার সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহর্ষি উশনার মাতা যশস্বিনী ভৃগুপত্নী যখন ইন্দ্রের বিলোপ সাধনের জন্য উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু তখন তাহাকে বধ করিয়া বিশ্বসংসার রক্ষা করেন।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "অযোধ্যায় সর্ব্বসমক্ষে পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা সব সময়ে নির্ব্বিবাদে পালন করিতে হইবে। আপনার নির্দ্দেশে বর্ত্তমান থাকায় তাই আমি—

গো ব্রাহ্মণ হিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ
করিষ্যামি ন সন্দেহ স্তাটকাবধমুত্তমম ॥

গো ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত নিঃসন্দেহে তাটকা বধরূপ ধর্ম্ম কার্য্যে চেষ্টিত হইব। এই বলিয়া রাম ধনুকের জ্যা নির্ঘোষ করিয়া তাটকার ক্রোধ বৃদ্ধি করিলেন। তখন চারিদিক হইতে তাটকার অনুচরগণ শিলাবর্ষণের দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু শরজালে এই শিলাবৃষ্টির নিরাকরণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "দেখ লক্ষ্মণ এই নিশাচরীর কি দারুণ বপু, ইহাকে শুধু দর্শন করিয়াই ভীরুদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" অতি বৃহদাকার শূল হাতে লইয়া উদ্যত-ভুজা এই রাক্ষসী যখন প্রায় রামের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন রামচন্দ্র শাণিত শরের আঘাতে ইহার বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এমত অবস্থাতেও তাটকা নানা রকম মুখভঙ্গী দ্বারা বিশ্বমিত্রকে যখন বিত্রাসিত করিতেছিল তখন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণাগ্র তীক্ষ্ণ ধার খড়্গের আঘাতে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে রাক্ষসীর দেহ যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে শুধু প্রচণ্ডতায় শত্রুকে নিষ্পিষ্ট করার আগ্রহে ধাইয়া আসিতেছিল এমন সময়ে রামের বাণ তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল।

এই দুরন্ত রাক্ষস নায়িকার বিনাশ হইলে স্বর্গে দেবগণও যেন রাম-চন্দ্রের জয়গান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র আসিয়া স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এই ঘোর বনপ্রদেশও সেই মুহূর্ত্তে যেন অভিশাপমুক্ত হইয়া হাসিমুখে অতিথি তিনজনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সেই রাত্রি তাহারা এই তাটকা বনেই যাপন করিয়া প্রভাতে উঠিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমের দিকে আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

গানে রামপ্রসাদ

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

করুণাময়ী চিরন্তনী চতুরা অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ের নিপুণ হাতে গড়ে তোলা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবন, এই অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে তাঁর জননী, এলোকেশী শ্যামা মা। শাস্ত্রকারগণ এই মহাভাবময়ী এলোকেশীকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রসাদ স্বচ্ছন্দে তাঁহার হৃদয়ের ভাব দিয়া মহাভাবময়ীকে রূপ দিয়াছেন, সেই রূপটি ধরা পড়ে সাধকের নিকট। আমরা জনসাধারণ সবক্ষেত্রে সম্যকরূপে তাহা উপলব্ধি করি না, বাস্তব রূপ দেওয়ার সঙ্কল্পও অসমসাহসিকতার কার্য। পিতৃহারা বালক মায়ের জন্য কাঁদিয়া আকুল, মা ছাড়া থাকিতে পারে না। এই অহরহ ব্যথা ক্রন্দনই করিয়াছিল প্রসাদের জীবন গীতিময়, যে গীত প্রবাহের অন্তর্নিহিত ভাবধারা রত্ন সিংহাসন হইতে জগজ্জননীকে নামাইয়া গৃহের হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। প্রসাদের লক্ষ্য ছিল গানের ভাবের প্রতি, প্রাণের উপর, কোন বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর ছিল না, গানগুলি ভাবের বিকাশ মাত্র, কোন প্রযত্নসাধ্য রচনা নহে। রঙ্গভরা রসিকচূড়ামণি রামপ্রসাদ কোনদিন কাহার কটূক্তি ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হন নাই। যার সহিত রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, "আমায় কর্ত্তা বলে", রসিকতা করিয়াছেন "লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল" আবার কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন "যার জন্যে মর ভেবে, সেই প্রেয়সী দেবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে বলে"॥ মায়ের সঙ্গেও বিচিত্র ব্যবহার। নাছোড়বান্দা বায়নাধারা অভিমানী ছেলে, এখনি মায়ের প্রতি গালি বর্ষণ করে, পরক্ষণেই মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়ে—বলে "মা আমার কি হবে মা"। জননীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"হাবাতে নিদয়া সর্ব্বনাশী তোমার কুশপুত্তল দাহন করে অশৌচান্তে কাশী চলে যাব"। আবার সেই মাকেই বলিতেছেন "আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি"। আবার দর্পভরে বলিতেছেন "আমি আপন মনে ডাকি যদি, যার ছেলে তার কোলে যাব"। স্নেহের পুতলী রামপ্রসাদ, আদরিণী শ্যামা মা তাহার সকল আব্দার অভিমান সহ্য করিয়া "সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলেকে ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

প্রসাদের কৃচ্ছ সাধনে বিস্মিত হইতে হয়। সংসারে অভাবক্লিষ্ট কষ্টবিড়ম্বিত প্রসাদ স্বয়ং ত্যাগমূর্ত্তি, কর্ত্তব্যপালনে কোনদিন অবহেলা করেন নাই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহার গৃহদ্বার হইতে কোনদিন অতিথি ফিরিয়া যায় নাই। দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া তিনি নিজ গৃহে স্বর্গের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, শুচি অশুচির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বহুত্বের মাঝে চির-একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন—শিব রাম কৃষ্ণ কালীর মানবকল্পিত সকল ভেদাভেদ ঘুচাইয়া মহাসত্যের উচ্চ অধিত্যকায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় বৃহন্নীলতন্ত্রের মহাবাক্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—"পরমাত্মৈব রামোহয়ং মহাবিষ্ণুর্মহা শিবঃ। নিরঞ্জন স্বরূপোহয়ং কৃষ্ণরূপা চ তারিণী"॥ প্রসাদের গানে—"মন করো না দ্বেষাদ্বেষি। যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥ ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী"॥ এলোকেশী নির্বিকারা ব্রহ্মশক্তি, কালী কৃষ্ণ শিব রাম নির্বিকারা ব্রহ্মশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, সাধকের প্রার্থনা অনুসারে পরমের বিক্ষেপ শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। উপনিষদ ও তন্ত্রে এই চারি মূর্ত্তিকেই স্বয়ম্ভু ও ব্যোমরূপা (কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণা ইত্যাদি) বলিয়াছেন এবং ইহা অনুভব করিয়াই "প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামেশি"।

প্রসাদের অধিকাংশ গানই স্তোত্ররূপে গণ্য। লীলা প্রসঙ্গ পুস্তকে দেখা যায় (পরমহংস)—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই সকল গান করা নিত্যপূজার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল গীত গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন—"মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না"। এখানে ইহা উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে পরমহংসদেব বেলঘরিয়ার বাগানে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত প্রথম সাক্ষাতে একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এই গানটি—"কে জানে মন কালী কেমন"। আবার একথাও পাওয়া যাইতেছে, পরমহংসদেব গানের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার সরকারকে দিবার জন্য মাষ্টারকে দিয়া বলিয়াছেন "এই সব গান (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দিবে। প্রসঙ্গত কয়েকটি গানও বদলাইয়া দেন "মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে" ইত্যাদি। বিক্রমপুরের (পূর্ব্ববঙ্গ) গৃহী সাধক রাজমোহন অধলী তর্কালঙ্কার বৈষয়িক ব্যাপারে কলিকাতা আসিয়া রামপ্রসাদের গান প্রসাদী সুরে গাহিবার রীতি শিক্ষার জন্য প্রথমে রূপদাদির রাগ রাগিনী বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি কোনদিন হালিসহর যান নাই এরূপ অনুমান যুক্তি বিরুদ্ধ হইবে।

রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহর পরগণা কুমারহট্ট গ্রাম। এই গ্রাম সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বৈষ্ণবকেন্দ্র রূপে। ঈশ্বরপুরী, ঈশান নগর, শ্রীনিবাস, শ্রীবাস, কবি কর্ণপুর প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য পারিষদ ও ভক্তগণের সহিত হালিসহরের নাম বিজড়িত। হরিনাম মূর্ত্তি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এখানে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় শাক্ত সম্প্রদায় সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে তৎপর হইয়া উঠে এবং উহার ফলে সত্যই নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পারিষদের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল! রামপ্রসাদ এ সম্পর্কে দোষীর উপরই দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের ধারণা, তাঁহার বক্তব্য বিষয় তিনি গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রামবাসী শুনিয়াছিল—"ও মন তোর ভ্রম গেল না। পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত

হরি—হর তোর এক হল না। প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে এ যে কপট উপাসনা, তুমি শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর চক্ষু থাকতে হলে কাণা"॥ এই গানে 'শক্তিতত্ত্ব' বাক্যে তিনি বামাচার সাধনা সম্পর্কীয় তন্ত্রোক্ত একটি সমগ্র পটল উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পুনরায় এই মাত্র বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আবার গাহিলেন—"মন করো না দ্বেষাদ্বেষি। ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী॥ শিব রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী। ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালী রূপে করে অসি॥ শ্মশানবাসিনী বাসী অযোধ্যা গোকুল নিবাসী"॥ রামপ্রসাদের দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না, তিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, অকপট হৃদয়ে সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের রচনায় বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবপ্রীতি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। তাঁহার উদার হৃদয়ের উদারতা সাধকের সাধনাপ্রসূত ধারণা, তিনি ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই। এই রকম অভিন্ন দেখা তাঁহার সাধনার অঙ্গ। বৈষ্ণব পদাবলীর স্থানে স্থানে যেমন তান্ত্রিক ভাব দৃষ্টিগোচর হয় তেমনই রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভাও বৈষ্ণব প্রভাব বিমুক্ত নহে। বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যের যুগ হইতে অদ্যাবধি এই সুদীর্ঘকালের মধ্য সময়ের শেষ পাদে যে সকল কবি সেই ভাব সাহিত্যের সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম রামপ্রসাদ সেন। বিদ্যাপতির "তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, সাগর লহরী সমানা ;" রামপ্রসাদের কথায় "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে"। পুনরায়, "আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙাইনু, জরা শিশু কতদিন গেলা। নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন বেলা"। রামপ্রসাদ—"প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর চিন্তে, ওমা শয়নে দাও সদ্য চিন্তে, বল মা তোরে কখন ডাকি। দিয়েছ এক মাথা চিন্তে, ওমা সদাই করি তাই চিন্তে।' * *॥ পুনরায় ঠিক একই ভাবে রামপ্রসাদের—"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না। মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে ও মন করতে চাও তাঁর উপাসনা।" অধুনা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা। মন্দির তব কি গড়িব মাগো, মন্দির তব দিগন্ত নীলিমা" প্রসাদের নৌ বিহার বর্ণনা ও ষট্‌চক্র বিষয়ক গানগুলি চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত তুলনা করা চলে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—"কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব, মোর মনে হেন লয়। তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার, হইয়াছে সবার ভয়" * *। "ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে, আমার কি আছে দোষ"॥ প্রসাদের, "ওহে নূতন নেয়ে ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥ দুকূল রহিল দূর ঘন ঘন হানিছে চিকুর ; কেমন কেমন করয়ে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া" সম্প্রতি ইহার রূপান্তর পাওয়া যাইতেছে—"ধীরে ধীরে কর পার। আমি যে অবলা নারী না জানি সাঁতার। মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার"॥ পদ পঙ্‌ক্তি চরণ প্রভৃতি বা নিছক সাহিত্য হিসাবে বিচার প্রবন্ধের বিষয় নহে। এইটুকু বলা যাইতে পারে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের ভাব ভাষা, ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্টি হয় না। আর একটি দেখুন—গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়। ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়॥ হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়। নয়ান কটাখে, বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে চায়"॥ প্রসাদের গানে—"প্রথম বয়স রাই রস রঙ্গিণী, ঝলমল ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী। রাই যে পথে পয়ান করে, মদন পলায় ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুসুম শরে"॥ এ কথাও ঠিক যে প্রসাদের ইষ্টদেবী কালী—কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কালিন্দীজল সঙ্কাশা, কালিন্দী জল পূজিতা॥ (মুণ্ডমালাতন্ত্র) এবং তাঁহার গানেও পাওয়া যাইতেছে—"ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥ পূর্ব্বে শোনিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥ রামপ্রসাদের জীবন চরিত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার শ্যাম শ্যামাকে উপযুক্ত স্থান দিতে হইবে, নতুবা জীবন চরিতের একটি মূল্যবান্ অংশ বর্জ্জিত হইবে এবং চক্ষু থাকিতে হবে কাণা। রামপ্রসাদ উদারানুমোদিত পথে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

> "জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
> কখন শঙ্কর বামে, কভু হরহৃদি পরে।
> কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী
> কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে॥ ইত্যাদি"

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে আদুরে ছেলে রামপ্রসাদ তাঁহার অভিভাবক মায়ের নিকট যত আদর পাইয়াছেন তাহার কিছুটা পরিমাণে তিনি চক্ষুশূল হইয়াছেন কয়েকজন সমালোচকের নিকট। তাঁহারা প্রসাদী গানের উপর একটা দাবী খাড়া করিতে চাহেন কয়েকটা গানে ব্যবহৃত অন্য প্রদেশের শব্দের অজুহাতে। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে আর্য্য অনার্য্য যুগ হইতে শব্দ, বাক্য, কথা, ভাষা এমন কি জাতিরও মিশ্রণ, সংমিশ্রণ, বিমিশ্রণ পরিবর্ত্তনাদি কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন শব্দাদি পশ্চিমে ব্যবহার হইয়া থাকিলে যে সেই গান গাথা পূর্ব্বেরই সম্পত্তি হইবে তাহা নহে। একটি গানে রহিয়াছে- "একৈবাহং জগৎ সর্ব্বে, দ্বিতীয়া কা মমাপরা", এ পঙ্‌ক্তিটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের হওয়ায় ইহাও কি স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ গানটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের ঋষি গাহিয়াছেন এবং "গঙ্গায়াং জ্ঞানতঃ মোক্ষ" ও "জাগরণে ভয়ং নাস্তি" গান দুইটি সংহিতাকারের রচনা। কিমধিকমিতি॥

বাক্-বিভূতি

অধ্যাপক ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

(২)

গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে বাক-বিভূতির প্রথম পল্লব প্রকাশিত হয়। স্বল্পকাল মধ্যে একাধিক মাসিক পত্রিকায় উহার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি ও সমালোচনা দৃষ্টে মনে হয় বিষয়টি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। তাই উহার দ্বিতীয় পল্লব প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ হানসেন ব্যাধিজনিত অসাড়তা দূরীকরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। সমাজ দেহের প্রতি অঙ্গে আজ যে শোচনীয় অসাড়তা ও দূষিত ক্ষত উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নিরাকরণ করা কোনও একক মানুষের সাধ্য নয়। যাহাতে দেশের সর্বস্তরে সুধীজনেরা এ বিষয়ে সমুচিত তৎপরতা অবলম্বন করেন সেই উদ্দেশ্যে আজ কয়েকজন যুগস্রষ্টা মনীষীর বাণী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক মূল জার্মাণ হইতে এগুলি পড়িলে আরও লাভবান এবং আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমার ধারণা। এই বাণীগুলি কখনও পুরাতন হইবার নয়—পরন্তু যতদিন যাইবে ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ততই প্রোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হইয়া মানবসমাজকে সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চলিতে অনুপ্রাণিত করিবে। এগুলি চিন্তাশীল বাঙালীর মনের 'সুইচ' খুলিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে সচ্চিন্তা ও সৎকর্মে প্রবৃদ্ধ করিয়া সমাজের সর্বপ্রকার গ্লানি দূর করিবার অপ্রমেয় শক্তি দান করিবে বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

Abraham Lincoln

(ডিমোক্র্যাসি)

আমি যেমন ক্রীতদাস হইতে চাই না- তেমনই প্রভু হইতেও আমার কোনও সাধ নাই। ডিমোক্র্যাসি সম্বন্ধে ধারণার মূলে আমার এই মনোভাবই বিদ্যমান। যাহা এই ধারণা হইতে বিচ্যুত এবং যে পরিমাণে বিচ্যুত তাহা ডিমোক্র্যাসি নয়।

Thomas G. Masaryk

(ডিমোক্র্যাসি)

ডিমোক্র্যাসি কেবলমাত্র এক প্রকারের শাসনতন্ত্র নয় পরন্তু ইহা মানবের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতীক—প্রকৃত পক্ষে ইহা বিশ্ব দর্শন। মানুষে মানুষে শান্তিপূর্ণ আদান প্রদান, প্রীতি এবং মানবতার বিকাশই ডিমোক্র্যাসির প্রাণস্বরূপ। সত্যিকারের ডিমোক্র্যাসি শুধু একটি সংস্থা নয়—এর কারবার জীবন্ত মানুষ লইয়া—যাহারা তাহাদের ষ্টেট এবং জাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে আস্থাবান্ এবং যাহারা একটি মৌলিক আদর্শ দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। আমাদের ডিমোক্র্যাসি কেবলমাত্র ষ্টেটের কর্মচারী এবং সেনাদলকে গতানুগতিক শিক্ষাদান করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত নয়, পরন্তু উহা দেশের সমগ্র মননশীল অধিবাসীকেই আদর্শবাদে উদবুদ্ধ করে। দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীই ষ্টেটের কৃষি-শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্মের ধারক, বাহক ও রক্ষক বলিয়া মনে করে। এই কারণেই আমাদের ডিমোক্র্যাসি সতত বিকাশশীল রিফর্ম ও বিপ্লব—আর এই বিপ্লবের কেন্দ্র হইতেছে সবল মস্তিষ্ক ও দরদ-ভরা হৃদয়।

Immanuel Kant

(স্বাধীনতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা)

একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে রাজী নই যে, কোনও একটি জাতি এখনও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির যোগ্য হয় নাই। এই নির্দেশ মানিতে হইলে স্বাধীনতা কখনও আসিতে পারে না। যেহেতু স্বাধীনতা না দিলে কেহ স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কি না তাহা বুঝা যাইবে কি প্রকারে? যাহারা বহুকাল পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ আছে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে হয়ত প্রথমে তাহারা ভুলচুক করিবে এবং বহুবিধ ক্লেশ ও অসুবিধাও ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ আত্মশক্তি বিকাশের ও অনুশীলনের সুযোগ না পাইলে সে কখনও উপযুক্ততা অর্জনে সমর্থ হইতে পারে না।

(অছি)

আলস্য এবং ভীরুতা বশতঃই মানবগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ অপরের পরিচালনা হইতে মুক্ত হইয়াও নাবালক অবস্থাতে থাকিতেই ভালবাসে। নাবালক সাজিয়া থাকা অনেকটা আরামদায়কও বটে। আমি অবশ্য ইহা কখনও প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি না যে আমি যখন খরচা জোগাইতে পারি তখন হাট-বাজার করিবার ঝক্কি অপরের ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। অধিকাংশ মানুষই (তন্মধ্যে সমুদয় স্ত্রীজাতি ত বটেই) সাবালকত্ব প্রাপ্তিকে ভীতির চক্ষে দেখে এবং সেই কারণেই অছিরা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায়। এ যেন বাড়ির গরুগুলিকে বোকা করিয়া এবং ভয় দেখাইয়া রাখা—যাহাতে তাহারা একাকী আর বাহিরে যাইবার চেষ্টা না করে। কিন্তু এই কৃত্রিম ভয় একবার ভাঙিলেই তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিতে পারে।

Johann Wolfgang Goethe

(ষ্টেট ও স্বাধীনতা)

আমরা বিভিন্ন প্রকারের শাসনতন্ত্রের বিষয় বিচার করিতে বসিয়া এই মোদ্দা কথাটি ভুলিয়া যাই যে, যে রকমের গবর্ণমেণ্টই হউক না কেন তাহার মধ্যে স্বাধীনতা এবং দাসত্ব যুগপৎ উভয় মেরুর মত অবিচ্ছেদ্যভাবে দুই প্রান্তে অবস্থিতি করে। যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা আসে, তবে জনগণ হয় তার পদানত, আর যদি জনগণের হাতে ক্ষমতা বর্তায় তবে ব্যষ্টি পড়ে অসুবিধায়। এই ব্যাপার ধাপে ধাপে চলে, যতক্ষণ না কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও স্বল্পস্থায়ী মুহূর্তে শুভ সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকদের নিকট এই ব্যাপার অপরিচিত নয় যদিও সাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন। স্বাধীনতার বাণী তখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনি যখন কোনও দল অপর দলকে পদানত করিতে চায় এবং যখন ক্ষমতা, প্রভাব ও ঐশ্বর্য এক হাত হইতে অপর হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলতঃ স্বাধীনতা গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন মন্ত্রণা, প্রকাশ্য বিপ্লবীদের যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদ চীৎকার এবং স্বৈরাচারীর সমর্থন বাক্য।—আর এই বাক্য বেশী করিয়া শোনা যায় যখন উপর্যুক্ত শ্রেণীর লোকেরা অধীন মানুষের দলকে শত্রুর বিপক্ষে লেলিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধ শক্তির নিপীড়ন হইতে তাহাদিগকে চিরতরে মুক্ত রাখিবার আশ্বাস দান করে।

(বিজাতি-বিদ্বেষ)

মোটের উপর বিজাতি বিদ্বেষ একটি আশ্চর্য বস্তু। সংস্কৃতির নিম্নতম স্তরেই এর প্রভাব সব চেয়ে বেশী। অবশ্য জাতীয় চিত্তোৎকর্ষের এমন একটি স্তর আছে যেখানে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়—যেখানে মানুষ বহুল পরিমাণে জাতীয়তার গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইরূপ স্তরে পৌঁছিলে কোনও একটি জাতি তার প্রতিবেশী জাতির সুখদুঃখকে তার আপন সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারে।

(আধুনিক যুদ্ধ)

আধুনিক যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিন উহা অসংখ্য মানবের অশান্তি সৃষ্টি করে এবং যখন শেষ হয় তখনও উহা কাহারও সুখ-শান্তির কারণ হয় না।

Johem Gottfried Herder

(জাতীয় গর্ব)

সকল প্রকার গর্বের মধ্যে জাতীয়তার গর্ব আমার কাছে সব চেয়ে বড় মূর্খতা বলিয়া মনে হয়। জাতি কি? এ যেন একটি বৃহৎ অযত্ন-বর্দ্ধিত বাগান—উপকারী উদ্ভিদ এবং আগাছাতে ভর্তি। ভুলভ্রান্তি, মূর্খতা, উৎকর্ষ-অপকর্ষবিজড়িত এই আজব বাগিচা বিনাবিচারে কে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে? আমরা সাধ্যানুসারে জাতির সম্মানের জন্য শক্তি নিয়োজিত করিব কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইহার দোষ দেখিতেও বিরত হইব না।

প্রকৃতি তাহার দান মুক্তহস্তে ছড়াইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির অভিপ্রেত এই যে, ব্যক্তির মত জাতিও সতত অপরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে এবং মনে প্রাণে স্বীকার করিবে যে কোনও একটি জাতি ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত বা অনুগৃহীত নয়। সকলকেই সমভাবে সত্যের সন্ধান করিতে হইবে যাহাতে তাহারা এই উদ্যানকে সমবেত চেষ্টায় সর্বোৎকৃষ্টরূপে রচনা করিতে পারে।

জাতীয় গৌরব মানুষকে করে বিভ্রান্ত। ইহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদিগকে আশান্বিত এবং মুগ্ধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা আমাদিগকে এমন পর্য্যায়ে লইয়া যায় যে, আমরা নিজের ছায়া ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাই না এবং নূতন কোনও ধারণা বা আদর্শ গ্রহণের আর আমাদের ক্ষমতা থাকে না। ঈশ্বর এরূপ জাতীয় গৌরব বোধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন!

Karl Mark

(জীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ)

প্রকৃতি ইতর প্রাণীদের জীবনযাত্রার একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহারা সেই সীমা কখনও অতিক্রম করে না বা অপরকে অনুকরণের প্রবৃত্তিও পোষণ করে না; পরন্তু স্থিরভাবে নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মানুষকে বিধাতা দিয়াছেন একটি সাধারণ লক্ষ্য—মনুষ্যত্ব এবং নিজেকে উন্নত করিবার প্রবৃত্তি। উপায় অনুসন্ধানের ভার বিধাতা তার নিজের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন—যাহার সাহায্যে সে জীবন সংগ্রাম চালাইতে পারে। সমাজের মধ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ভারও তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে থাকিয়া স্বকীয় কর্মপ্রভাবে সে নিজেকে এবং সমগ্র সমাজকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিতে পারে।

এই নির্বাচনভাররূপ বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টির আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু জীবনের এই পথ নির্বাচন সাতিশয় বিঘ্নসঙ্কুলও বটে। কারণ নির্বাচন ঠিকমত না হইলে জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা, এক কথায় সমগ্র জীবন বিফল ও নষ্ট হইতে পারে। এই হেতু জীবনের পথ নির্বাচন যার পর নাই বিবেচনাসাপেক্ষ এবং যুবকদের ইহা সর্বপ্রথম কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।

সর্বমানবের কল্যাণ এবং আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতাই হইবে জীবনের পথ নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। মানবকল্যাণ এবং আত্মবিকাশ এ দুটি বিরুদ্ধধর্মী নয়, পরন্তু মানব প্রকৃতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, সে নিজের জীবনের পূর্ণতা তখনই লাভ করিতে সমর্থ হয় যখন সে সর্বমানবের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিঃশেষে নিয়োজিত করে।

যখন আমরা সেই পথ নির্বাচন করিয়া লই যাহাতে আমরা সর্বান্তঃকরণে সর্বমানবের কল্যাণকল্পে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি তখন কোনও বাধাই আমাদের পথরোধ করিতে পারে না;—তখন কোনও তুচ্ছ, সীমাবদ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক সুখ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না—তখন আমাদের আনন্দ প্রতিফলিত হয় লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে—আমাদের কর্ম হয়ে ওঠে চির সজীব—অনন্ত অনাগতকালে তাহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মায়াজাল

নগর পত্তনের ঘাটে ঘাটে পরিভ্রমণ কালে বজ্র কুহুকে কয়েকবার দেখিয়াছিল। কুহুকে সে রাণীর দাসী বলিয়া চিনিত না; কারণ কুহু যখন রাণীর দোলার সহিত যাইতেছিল তখন বজ্রের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে নাই, রাণীর উগ্রোজ্জ্বল রূপশিখা তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। কুহুকে সে ভাল করিয়া দেখিল একদিন দ্বিপ্রহরে। বজ্র মৌরীর এক ঘাটের পাশে বাঁধের উপর বসিয়াছিল, ঘাটে আর কেহ ছিল না। সহসা একটি কিশলয়-শ্যামাঙ্গী যুবতী নৃত্যচটুল ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নদীর কিনারায় নামিয়া আসিলেন এবং বজ্রের দিকে একটি ক্ষিপ্র গোপন কটাক্ষপাত করিয়া বেশবাস বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে উত্তরীয়টি খসিয়া সোপান পট্টের উপর পড়িল, তারপর পড়িল কটির ধটি; তারপর যুবতী যখন কাঁচুলির গ্রন্থি খুলিতে উদ্যত হইলেন তখন বজ্র উঠিয়া রণে ভঙ্গ দিল। নগর-বিলাসিনীদের নিরংশুকা হইয়া স্নান করাই হয়তো বিধি, কিন্তু বজ্র তাহা বসিয়া দেখিতে লজ্জা বোধ করিল।

ইহার পর আরও কয়েকবার কুহুর সহিত বজ্রের সাক্ষাৎ হইল। কখনও নির্জন প্রাকারের উপর, কখনও জনবহুল রাজপথে। কুহু স্মিত-ভঙ্গুর নেত্রপাতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিত, চোখের সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিত। কথা বলিত না, রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া চলিয়া যাইত, যাইতে যাইতে পিছু ফিরিয়া আবার চোখের ইঙ্গিতে ডাকিত। কিন্তু বজ্র নাগরিক নয়, সে হয়তো কুহুর চোখের আহ্বান বুঝিতে পারিত না, কিম্বা বুঝিতে পারিলেও আহ্বান উপেক্ষা করিত।

একদিন বৈকালে কাল বৈশাখীর প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বজ্র হাতীঘাটে গিয়া দেখিল ঘাটে লোক কম, সিক্ত সোপানশ্রেণী অধিকাংশই শূন্য। বজ্র তাহার অভ্যস্ত স্থানে না বসিয়া একটি গোলাকৃতি উচ্চ চত্বরের উপর গিয়া বসিল। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলি যেখানে ভিড় করিয়া গুণবৃক্ষের অরণ্য রচনা করিয়াছে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। ঝড়ের দাপটে দুই চারিটি তরণীর আড়-কাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রজ্জু ছিঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে। একটি তরণী কাত হইয়া পড়িয়া অন্য তরণীর গুণবৃক্ষের সহিত আপন গুণবৃক্ষ আশ্লিষ্ট করিয়া বিপজ্জনক সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদিন নৌকাগুলিতে নাবিক বা দিশারু কাহাকেও দেখা যাইত না। আজ দেখা গেল কয়েকটি নৌকার পট-পত্তনের উপর নাবিকেরা কাজ করিতেছে, সম্ভবত শোধন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে। বজ্র আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল।

বজ্র যে চত্বরে উপবিষ্ট ছিল সেই চত্বরে আর একজন লোক বসিয়া ব্যাকুল চক্ষে নৌকাগুলির পানে চাহিয়া আছে, বজ্র তাহা লক্ষ্য করে নাই। লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর; দেহ এককালে স্থূল ছিল, এখন শীর্ণ ও লোলচর্ম হইয়া গিয়াছে। মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান, কিন্তু বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই; স্কন্ধের উত্তরীয়টি মলিন। দেখিলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু সম্প্রতি দুর্দশায় পড়িয়াছে।

লোকটি সহসা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল।

বজ্র চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই লোকটি যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—'ক্ষমা করুন, আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে?'

লোকটি কাতর স্বরে বলিল—'এ বছরও আমার বহিত্র সমুদ্রে যেতে পারবে না। বর্ষা এসে পড়ল, আর কবে যাবে?'

বজ্র বুঝিল, এ ব্যক্তি কোনও সমুদ্রগামী তরণীর স্বামী।

সে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল—'আপনার নৌকা সমুদ্রে যেতে পারবে না কেন ?'

লোকটি বোধহয় নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার সুযোগ পায় না, সে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিল—'আপনি দেখছি মরমী সৎপুরুষ। কানসোনায় কি নূতন এসেছেন ?'

'হাঁ। আপনি বুঝি নৌ-বণিক ?'

'হাঁ। আমার নাম বরুণ দত্ত। কিন্তু কানসোনার লোক আমাকে চারু দত্ত বলে ডাকে।' বলিয়া বরুণ দত্ত করুণ হাসিল।

বজ্র নাটকীয় শ্লেষ বুঝিল না, বলিল—'আপনার ডিঙা আছে ?'

বরুণ দত্ত অঙ্গুলি নিদেশ করিয়া বলিল—'ঐ যে ঘাটের বাঁয়ে দুটি হংসমুখী ডিঙা, ও দুটি আমার ডিঙা।'

বজ্র আবার প্রশ্ন করিল—'কিন্তু ওদের সমুদ্রে যেতে বাধা কি ?'

তখন বরুণ দত্ত তাহার দুঃখের কাহিনী বজ্রকে শুনাইল।—বরুণ দত্ত পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী। পূর্বকালে তাহাদের অনেকগুলি বহিত্র ছিল, গৌড়বঙ্গের পণ্য লইয়া বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রা করিত। দক্ষিণে সিংহল অতিক্রম করিয়া ভরুকচ্ছ যাইত, কখনও পারসীকদের দেশে যাইত। পূর্বদিকে মলয় যবদ্বীপ সুবর্ণভূমিতে যাইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে চলিয়াছে, গৌড়-বঙ্গ পুণ্ড্র-মগধের পণ্য সম্ভার দেশ দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে হঠাৎ এক নিদারুণ বাধা উপস্থিত হইল, সমুদ্রে হিংস্রিকা দেখা দিল। এতকাল সমুদ্রে জল-দস্যুর উৎপাত ছিল না, সকল দেশের বাণিজ্য-তরী স্বচ্ছন্দে সাগর বক্ষে বিচরণ করিত; এখন বনায়ু দেশের দস্যুরা সমুদ্রের পথ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিল। নিরীহ নিরস্ত্র পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া ডুবাইয়া ছারখার করিয়া দিতে লাগিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে গৌড়বঙ্গের সাগর-সম্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে ডুবিতে বসিলেন।

গত বিশ বছরে গৌড়ের নৌ-বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সিংহল ও পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। আরব জলদস্যুদের দুর্নিবার অভিযান বঙ্গোপসাগরের জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

বরুণ দত্তের সপ্তদশ ডিঙা ছিল, এখন মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে, বাকিগুলি ভরাডুবি হইয়াছে। নাবিকেরা সমুদ্রে যাইতে চায় না; নৃশংস জলদস্যুর হাতে প্রাণ দিবার জন্য কে সমুদ্রে যাইবে ? বণিকেরা বেতন দিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে চায়, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত নয়, * উচ্চ বেতনের লোভেও তাহারা নৌ-যুদ্ধে যাইতে অসম্মত। রাজশক্তি নিশ্চেষ্ট উদাসীন, রাজা থাকিয়াও নাই। বাংলার বন্দরে বন্দরে বাঙালীর নৌ-বাহিনী পঙ্কবদ্ধ হস্তিযূথের ন্যায় নিশ্চল; নদীর মোহানা পার হইয়া সাগরের নীল জলে ভাসিবার সাহস কাহারও নাই।

বরুণ দত্ত গত দুই বৎসর তাহার তরণী দুটিকে সমুদ্রে পাঠাইতে পারে নাই। এবার কয়েকজন বণিক মিলিয়া কিছু নাবিক ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল, স্থির করিয়াছিল তাহাদের তরণীগুলিকে রণ সাজে সজ্জিত করিয়া এক সঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইবে; তাহাতে জলদস্যুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা আছে। বরুণ দত্তও অতি কষ্টে কয়েকটি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু কাল বৈশাখীর ঝড়ে তাহার তরণী দুটি আহত হইয়াছে, শোধন-সংস্কার করিতে সময় লাগিবে। এদিকে বর্ষা আসন্ন, অন্য তরণীগুলি অপেক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এবারও বরুণ দত্তের নৌকা সমুদ্রে যাইতে পারিবে না।

বরুণ দত্ত যখন তাহার কাহিনী শেষ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বরুণ দত্ত বলিল—'আমার মন্দ দশা যাচ্ছে। ধন সম্পত্তি প্রায় সবই গিয়েছে; শেষ পর্যন্ত বোধহয় কিছুই থাকবে না।'

বরুণদত্ত নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিল—তাহা যে সমগ্র দেশের পক্ষেও সত্য তাহা সে জানিত না।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'অন্য নৌকাগুলি কবে যাত্রা করবে ?'

বরুণদত্ত বলিল—'পরশু ঊষাকালে। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা—সেদিন ত্রয়োদশী তিথিও আছে।'

---

* নদীতে জলযুদ্ধ করিতে নৌ-সাধনোদ্যত বাঙ্গালী পটু ছিল, কালিদাসের রঘুবংশে (৪।৩৬) তাহার প্রমাণ আছে।

'এই সময়ের মধ্যে আপনার ডিঙা প্রস্তুত হবে না ?'

'হয়তো হতে পারে। কিন্তু আর এক বিপদ ঘটেছে। যে-সব যোদ্ধা নৌকায় যেতে সম্মত হয়েছিল তারা এখন পশ্চাৎপদ হয়েছে। তারা বলছে, ভাঙা নৌকা, বর্ষাকাল এসে পড়েছে—এখন তারা যাবে না। এ বিপদ কেবল আমার নয়, অন্য নৌকায় যে-সব যোদ্ধা যাচ্ছিল তারাও গণ্ডগোল করছে।'

অতঃপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি গাঢ় হইতেছে দেখিয়া বজ্র উঠিল। হতাশ বরুণদত্ত ঘাটেই বসিয়া রহিল।

রাত্রে কর্ণসুবর্ণের পথে আলোক নাই, কদাচিৎ কোনও গৃহস্থের মুক্ত দ্বার বা গবাক্ষপথে একটু আলোর প্রভা আসিয়া রাজপথে পড়িয়াছে। রাত্রে কোনও নাগরিককে কোথাও যাইতে হইলে উল্কা জ্বালিয়া পথ চলিতে হয়। বজ্র নক্ষত্রের আলোকে অতি যত্নে পথ চিনিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল।

বটেশ্বরের মদিরাগৃহে অতিথির ভিড় কমিয়াছে, মাত্র দুই চারিজন ঝুনা খেলোয়াড় প্রদীপের মিটিমিটি আলোতে অক্ষপাট ঘিরিয়া বসিয়া খেলিতেছে এবং ভড়িত সহযোগে মদ্যপান করিতেছে। আলো বেশী নয়, ঘরের কোণে কোণে ছায়া জমিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কাহারও অসুবিধা নাই; এইরূপ আলোতেই তাহারা অভ্যস্ত।

ঘরের একটি কোণ হইতে নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন আসিতেছিল, বজ্র ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহা বন্ধ হইল। বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে যাইতে যাইতে একবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল, কোণের ছায়ান্ধকারে তিনজন লোক বসিয়া আছে, যেন ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া কোনও গুপ্তকথার আলোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত, বাকি দুইজন বটেশ্বর ও বিম্বাধর। তিন জনেই বজ্রকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যে বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তিন জনের মধ্যে বিম্বাধরই প্রথম আত্মসংবরণ করিল; ত্বরিতে উঠিয়া আসিয়া কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিল—'কি বন্ধু মধুমথন, তুমি যে দেখি নিশাচর হয়ে উঠ্‌লে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

বজ্র বলিল—'হাতীঘাটে বসেছিলাম।'

'ভাল ভাল। তা এস না, দু' পাত্র মধু পান করা যাক। বটেশ্বর অনুযোগ করছিল তুমি কিছুই পান কর না। এতে যে ওর মদিরা-ভবনের নিন্দা হবে।'

'আমার পক্ষে ভোজনই যথেষ্ট।'

'তা কি হয় ? মধুপান না করলে নাগর হওয়া যায় না। এস এস।'

'না, আজ নয়।'

বিম্বাধর একবার বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল, তারপর বলিল—'তবে থাক। কাল কিন্তু আমি আবার আসব। একটু আসব-সেবা করে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হব। কেমন ?'

বজ্র কিছু বলিল না। বিম্বাধর প্রস্থান করিলে সেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তি তখন আবার নিম্নস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা বজ্র সম্বন্ধেই গূঢ় আলোচনা করিতেছে।

দুই দণ্ড মধ্যে বজ্র আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিল। ক্রমে বটেশ্বরের মদিরাগৃহ নিঃশব্দ হইল, অতিথিরা প্রস্থান করিয়াছে। বজ্রের একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় দ্বারে খুটখুট শব্দ শুনিয়া তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ শব্দ নাই। বজ্র উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তারপর আবার বাহিরের দিকের দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। যে দ্বার দিয়া একেবারে পথে পড়া যায় সেই দ্বারে কেহ টোকা দিতেছে।

ঘরের কোণে দীপ স্তিমিত হইয়াছিল। বজ্র উঠিয়া দীপ উস্কাইয়া দিল, তারপর সন্তর্পণে দ্বারের হুড়ুক্ক খুলিল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে একটি যুবতী। রাত্রির মতই গাঢ় নীল তার বসন; এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্ত অঞ্চল দিয়া প্রদীপের শিখাটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের নিরুদ্ধ প্রভা যুবতীর বক্ষে কণ্ঠে পড়িয়াছে, মুখের নিম্নার্ধ আলোকিত করিয়াছে। বাহিরে ছায়া, ভিতরে আলো।

বজ্র কুহুকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল, সে ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই ফাঁকে কুহু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'এ কি! কে আপনি?'

কুহু মাথার গুণ্ঠন সরাইয়া বিলোল চক্ষে বজ্রের পানে চাহিল, ওষ্ঠাধর মুকুলিত করিয়া অধরে অঙ্গুলি রাখিল। তারপর ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—'আমাকে চিনতে পারছেন না।'

বজ্র দৃঢ়ভাবে নিজেকে আশ্বস্ত করিল, সাবধানে বলিল, —'বোধ হয় দু' একবার দেখেছি। আপনি কে তা জানি না।'

কুহু হাসিল। নিঃশব্দ হাসির তরল তরঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। সে কুহক-কলিত স্বরে বলিল—'আমার নাম কুহু। কিন্তু আমাকে অত সম্মান করে কথা বলবেন না। আমি সামান্যা নারী।'

কুহু প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া রাখিল, বজ্রের কাছে আসিয়া প্রগল্‌ভ হাসিয়া বলিল—'আমার পরিচয় নিলেন, কৈ নিজের পরিচয় তো দিলেন না।'

বজ্র এক পা পিছু হটিয়া বলিল—'আমার নাম—মধুমথন। কর্ণসুবর্ণে নতুন এসেছি।'

কুহু ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চোখে চাহিয়া রহিল, অর্ধস্ফুট স্বরে যেন নিজ মনেই বলিল—'মধুমথন—কি মিষ্টি নাম। আপনি যে নগরে নতুন এসেছেন তা অনেক আগেই বুঝেছি। নগরে যারা নাগর আছে আপনি তাদের মত নয়।'

কুহু পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। এদিক ওদিক চাহিয়া ঘরের কোণে জলের কুম্ভ দেখিয়া সেইদিকে গেল, ঘটিতে জল ঢালিয়া জল পান করিল। তারপর বজ্রের শয্যার এক পাশে গিয়া বসিল। কোনও সঙ্কোচ নাই, এ যেন তাহার নিজেরই ঘর।

বজ্র নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিল। গভীর রাত্রে নিভৃত শয়নকক্ষে এই প্রগল্‌ভা অভিসারিকার আকস্মিক অভিযান, এরূপ সংস্থা তাহার কল্পনাতীত। যুবতীর অভিপ্রায় সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নাই। বজ্রের কর্ণদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

সে সহসা বলিয়া উঠিল—'আমার কাছে কি চাও?' তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে উচ্চ শুনাইল।

কুহু অমনি ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল, চাপা গলায় বলিল—ছি ছি, অত জোর গলায় কি রহস্যালাপ করতে আছে? এখনি কে শুনতে পাবে। আসুন, কাছে এসে বসুন।' বলিয়া নিজের পাশে শয্যা নির্দেশ করিল।

বজ্র একটু ইতস্তত করিয়া শয্যার অন্য প্রান্তে গিয়া বসিল। কুহু তাহা দেখিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিল, বজ্রের দিকে সরিয়া আসিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিল—'আমি কী চাই তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি?'

বজ্র কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া রহিল, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'নগরে নাগরের অভাব নেই।'

কুহু বজ্রের আরও কাছে সরিয়া আসিল, চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া বলিল—'নগরে কুকুরেরও অভাব নেই, কিন্তু বনের বাঘ কটা আছে? আপনি আমার মধু-নাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।'

বজ্র পূর্ববৎ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল—'না।'

কুহুর মুখ একটু মলিন হইল। সে ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে কি আপনার ভাল লাগেনা?'

বজ্র চকিতে একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নামাইল, কথা কহিল না। কুহুর মুখে তখন আবার হাসি ফুটিল। বজ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সে অঙ্গুলি দিয়া বজ্রের বাহুর উপর মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল—'বুঝেছি। তুমি বড় কাঁচা, এখনও মনে রঙ ধরেনি—তোমার বয়স কত?'

বজ্রের মনের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে উৎফুল্ল মুখ তুলিল। নগরে আসিয়া অবধি সে যে বস্তুটির জন্য মনে মনে বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল তাহা রমণীর স্নেহময় স্পর্শ; এতক্ষণে তাহাই সে কুহুর কণ্ঠে শুনিতে পাইল। সে এক মুখ হাসিয়া বলিল—'আমার বয়স কুড়ি।'

কুহু বলিল—'আমার উনিশ। কিন্তু তবু আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক কিছু শেখাতে পারি।'

হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিটি কিন্তু নৈরাশ্য-বিদ্ধ।

'আজ আমি ফিরে চললাম। কিন্তু আবার আসব।' বলিয়া কুহু সসঙ্কেত অঙ্গুলি তুলিল।

বজ্রও উঠিল। কুহু দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি

মারিল, তারপর উদ্বিগ্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'নগর নিশুতি, পথ বড় নির্জন। আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'দুষ্ট লোকের ভয়। তুমি আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে ?'

'কোথায় তোমার ঘর ?'

'অনেক দূরে, নগরের দক্ষিণে।'

বজ্র দ্বিধায় পড়িল, ইতস্তত করিয়া বলিল—'তুমি—তোমার স্বামী—'

কুহু ফিক করিয়া হাসিল—'তোমার কি ভয় করছে নাকি ?'

'না। চল।'

কুহু সানন্দে বজ্রের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে লইয়া চলিল। বজ্র বলিল,—'পিদিম নিলে না ?'

'না, আমি অন্ধকারে পথ চিনে যেতে পারব।'

দুইজনে বাহির হইল। মসীবর্ণ রাত্রি, কেবল স্পর্শানুভূতির দ্বারা সঙ্গ পাওয়া যায়। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া রহিল; ক্রমে তাহার বাহু বজ্রের বাহুর সহিত জড়াইয়া গেল। বজ্র আপত্তি করিল না।

পথে চলিতে চলিতে দুই চারিটি কথা হইল॥

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াও, তোমার স্বামী কিছু বলেনা ?'

কুহু বলিল,—'আমার স্বামী নেই।'

অনেকক্ষণ কথা হইল না। পথ দীর্ঘ, উপরন্তু কুহু যেন ইচ্ছা করিয়াই মন্থর পদে হাঁটিতেছে।

এক সময় কুহু সহসা প্রশ্ন করিল—'তোমার ঘরে কে কে আছে ?'

'মা আছেন।'

'আর—?'

বজ্র উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কুহু মৃদুকণ্ঠে হাসিল। বলিল—থাক। ও সব জেনে আমার লাভ কি ?'

অবশেষে তাহারা নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথে আসিয়া কুহু প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। রুদ্ধ তোরণদ্বার পিছনে রাখিয়া আরও দক্ষিণে চলিল।

বজ্র বলিল—'এ কি! এ যে রাজপ্রাসাদ!'

কুহু অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'হ্যাঁ!'

প্রাকারের গায়ে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল। কুহু তাহাতে মৃদু করাঘাত করিল, বজ্রকে হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'তুমি ভিতরে আসবে না ?'

বজ্র বলিল—'তুমি কে ?'

কুহু বলিল—'আমি রাজপুরীর দাসী, অবরোধেই থাকি। আমার আলাদা ঘর আছে। একবার আসবে আমার ঘরে ?'

বজ্র শক্ত হইয়া বলিল—'না।'

ইতিমধ্যে গুপ্তদ্বার খুলিয়াছিল। কুহু বজ্রের হাত ছাড়িয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, কানে কানে বলিল—'তুমি কেমন মধুনাগর ? এত মিষ্টি আবার এত শক্ত!—বেশ, আজ থাক। কাল আমি আবার যাব—তুমি ঘরে থেকো।'

বজ্রকে ছাড়িয়া দিয়া কুহু অন্ধকার গুপ্তদ্বার পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার আবার বন্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুর

গুপ্তদ্বার যে-রমণী ভিতর হইতে খুলিয়া দিয়াছিল সে কুহুর অনুচরী। বিপুল রাজসংসারে বহু পর্যায় ভেদ; রাণীর একদল দাসী আছে, সেই দাসীদের আবার দাসী আছে, তস্য দাসী আছে। কুহু পুরী হইতে বাহির হইবার সময় নিজ অনুচরীকে গুপ্তদ্বারে বসাইয়া গিয়াছে। কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, বেশী রাত হইলে তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। অভি-সারিকার গতিবিধি অলক্ষ্যে হওয়াই বিধেয়। তাই সতর্কতা।

পুরভূমিতে প্রবেশ করিয়া কুহু অনুচরীকে বিদায় দিল; তারপর ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিল। রাজপুরী নিদ্রা‌মগ্ন, কেবল একটি ভবন হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার অস্ফুট নিক্কণ আসিতেছে—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি। বিনিদ্র রাজ-লম্পটের নৈশ নর্ম-বিলাস এখনও চলিতেছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুহু দ্রুতপদে চলিল। বিশাল অন্তঃপুরে কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ; কোথাও বা পুরীর এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইবার গোপন সুড়ঙ্গ। নিস্তব্ধ পুরী অন্ধকার, কদাচিৎ একটি দুটি

দীপ জ্বলিতেছে। এই গোলকধাঁধায় দিবাকালেও দিগ্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কুহু অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া অভ্রান্ত ভাবে উদ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে চলিল।

একটি অন্ধকার কোণে লুক্কায়িত একশ্রেণী সোপান। কুহু সোপান বাহিয়া উপরে চলিল; দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতল, ত্রিতলের পর চতুস্তল। এই চতুস্তলে একটি বৃহৎ কক্ষ, চারিদিকে মুক্ত ছাদ। কক্ষ হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ ও দীপপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হয় সমস্ত পুরীর মধ্যে এই কক্ষটি জাগিয়া আছে।

কুহু দ্বারের নিকট হইতে সন্তর্পণে উঁকি মারিল, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাণী শিখরিণী পালঙ্কে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন; দুই হাতে একটি যূথী-মাল্যের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হর্ম্যতলে ছড়াইয়া দিতেছিলেন। নিদাঘ নিশীথে তাঁহার দেহে বস্ত্রাদি অধিক নাই, একটি স্বচ্ছ নীলউর্ণা তপ্তকাঞ্চন অঙ্গে অঞ্জন রেখার ন্যায় লাগিয়া আছে। এক কিঙ্করী শিথানে দাঁড়াইয়া ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

কুহু প্রবেশ করিলে রাণী সুপ্তোত্থিতা বাঘিনীর ন্যায় দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কুহু কিঙ্করীকে চোখের ইসারা করিয়া বলিল—'তুই যা।'

কিঙ্করী পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাণী কুহুর পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন।

কুহু একটু বিকলভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আজও হল না।'

রাণী হাতের যূথীমাল্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর নত হইয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'কিন্তু দেখা হয়েছিল। কথা বলেছি।'

রাণী শয্যার উপর এক হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'কি কথা বলেছিস্?'

কুহু বলিল—'ঠারে ঠোরে যতদূর বলা যায় তা বলেছি। কিন্তু—তিনি নূতন নগরে এসেছেন, রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে রাজি নয়।'

তীক্ষ্ণ শিখর-দশন দিয়া রাণী অধর দংশন করিলেন; মনে হইল অধর কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে। ঠিক এই সময় দূর হইতে মৃদঙ্গ মঞ্জীরার মৃদু ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি—

রাণী শিখরিণীর বক্ষ বিমথিত করিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল, সুন্দর মুখ হিংসার ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ কণ্ঠে একবার অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—'পানীয় দে।'

শয্যার পাশে ভৃঙ্গারে কপিত্থ-সুরভিত শীতল পানীয় ছিল, কুহু ত্বরিতে তাহা সোনার পাত্রে ঢালিয়া রাণীর হাতে দিল। রাণী একবার তাহা অধরে স্পর্শ করিলেন, তারপর ক্রুদ্ধ হস্তসঞ্চালনে পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

ভয়ে কুহুর বুক শুকাইয়া গেল। তবু সে মুখে সাহস আনিয়া রাণীর কানে কানে বলিল—'দেবি, আপনি অধীর হবেন না। ফুলে মধু আসতে সময় লাগে। আমি কাল আবার যাব।'

উপাধানে মুখ গুঁজিয়া রাণী বলিলেন—'তুই দূর হয়ে যা।'

কুহু বলিল—'আমি যাচ্ছি, আপনি ঘুমান। আমি শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।'

কুহু প্রস্থানোদ্যতা হইলে রাণী চকিতে শয্যা হইতে মাথা তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সন্দেহে প্রখর। কুহু দ্বারের কাছে পৌঁছিলে তিনি ডাকিলেন—'কুহু শুনে যা।'

কুহু ফিরিয়া শয্যার পাশে আসিল। রাণী মর্মভেদী চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন—'তুই আজ আমার ঘরে শো।'

রাণীর মনের ভাব কুহু বুঝিল। সে মুখে হাসি আনিয়া বলিল—'এ ঘরে শোব আমার ভাগ্যি। শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিই সে বাতাস করুক।'

শয্যা-কিঙ্করী আসিয়া রাণীকে বীজন করিতে লাগিল। কুহু পঙ্খের কারুকার্যখচিত মেঝেয় শয়ন করিল। রাণী থাকিয়া থাকিয়া সশব্দ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কুহু তাহা শুনিতে শুনিতে মনে মনে রাণীকে যমালয়ে পাঠাইতে পাঠাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজার প্রমোদ ভবনে তখনও মৃদঙ্গ-মঞ্জীরা বাজিতেছে—ঝনি ঝমনি—ঝনি ঝমনি।

এইখানে রাজ অবরোধের সংস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সক্রিয় রাজশক্তি যখন স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া আত্ম-পরায়ণতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তখন বদ্ধ জলাশয়ের মত তাহাতে বিষাক্ত কীটাণু জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত পরিমণ্ডপ দূষিত করিয়া তোলে। গৌড়ের রাজ-বিহারে তাহাই হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, নিজ বীর্যবলে সমস্ত দেশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করবর্মার দেহান্তের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্মা যখন রাজা হইলেন তখন তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিলেন। যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার স্রোতে রাজধর্ম বিবেকবুদ্ধি হিতবুদ্ধি সব ভাসিয়া গেল; নবীন রাজার পৌরুষ যোষিৎ-মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। লজ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া তিনি অনঙ্গ পূজায় মত্ত হইলেন। অন্তঃপুর ভোগমন্দিরে পরিণত হইল।

রাণী শিখরিণীকে বিবাহ করিবার পর কিছুকাল অগ্নিবর্মা রাণীর রূপযৌবনের সম্মোহনে আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু ক্রমে নূতনত্বের মোহ অপগত হইলে রাজার মধুলুব্ধ চিত্ত উদ্যানসঞ্চারী চঞ্চরীকের ন্যায় অন্য পুষ্পে ধাবিত হইল। শিখরিণী অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিলেন। রাজা অন্তঃপুরের মধু নিঃশেষ করিয়া প্রমোদ ভবনে গিয়া নূতন সভানন্দিনীদের লইয়া কেলিকুঞ্জ রচনা করিলেন।

রাণী শিখরিণী অভিমানিনী রাজকন্যা, তিনি এই অবহেলা সহ্য করিবেন কেন? বিশেষত সম্ভোগতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরেও কম ছিল না। রাজার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া তিনি প্রতিহিংসার ছলে আপন যৌবন-লালসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন। মন যাহা চায় বিবেক তাহাতে বাধা দিল না। শুদ্ধান্তঃপুরে জার প্রবেশ করিল।

রাণীর প্রধানা দাসী ছিল কুহু, সে হইল দূতী। কুহু অতিশয় চতুরা, সে রাণীর জন্য নাগর সংগ্রহ করিয়া আনিত। নিজেকেও বঞ্চিত করিত না, ইচ্ছামত মনের মানুষ বাছিয়া লইত।

কদাচ রাণী মন্দিরে পূজা দিবার অছিলায় আন্দোলিকায় চড়িয়া পথে বাহির হইতেন; তখন কোনও সুদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলে তিনি কুহুকে ইঙ্গিত করিতেন। কুহু ব্যবস্থা করিত।

এইভাবে পাঁচ বছর কাটিয়াছে। একথা বেশী দিন চাপা থাকে না; নগরের রসিক সমাজে কানাঘুষা চোখ-ঠারাঠারিতে আরম্ভ হইয়া কালক্রমে প্রকাশ্য শ্লেষ-বিদ্রূপে পর্যবসিত হইয়াছে। রাণী কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। রাজ-স্বৈরিণীকে শাসন করিবারও কেহ নাই। নামমাত্র আবরণের অন্তরালে লজ্জাহীন ব্যভিচার চলিতেছিল।

বজ্রকে দেখিয়া রাণীর লিপ্সা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহুও তেমনি মজিয়াছিল। ফলে দুই সহকর্মিণী গোপনে গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্ধা কুহুর নাই, সে অতি সূক্ষ্মভাবে নিজের খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম খেলা খেলিতে কুহু বড় কুশলী।

কুহু ও শিখরিণী দুইজনেই সমান পাপিষ্ঠা, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি সমান নয়। রাণীর প্রকৃতি বাঘিনীর ন্যায় নিষ্ঠুর ও আত্মসর্বস্ব, আপন ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু কুহুর প্রকৃতি অন্য রূপ; সে অজগর সাপের মত শিকারকে প্রথমে সম্মোহিত করিয়া আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও দুই নারীই সমান মারাত্মক। বোধ হয় কুহু একটু অধিক মারাত্মক।

* * * *

কুহু গুপ্তদ্বার পথে অন্তর্হিত হইলে বজ্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। রাজপুরীর বিপুল ছায়াতল হইতে নির্গত হইয়া সে দেখিল পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র উদয় হইতেছে। আলোক অতি অস্পষ্ট হইলেও পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই।

সুপ্ত নগর, নির্জন পথ; গৃহগুলি ছায়ামূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয় এই নগর বাস্তব নগর নয়, কোনও মায়াবী মন্ত্রবলে এই অপ্রাকৃত দৃশ্য রচনা করিয়াছে; কোনও দিন ইহা জীবন্ত মানুষের কলকোলাহলে মুখরিত ছিল না, প্রভাত হইলে অলীক মায়া-কুহেলির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বজ্রের কিন্তু এই অবাস্তব পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। একাকী পথ চলিতে চলিতে সে আপন মনের বিচিত্র রঙস্বপ্নজালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিমিরাবৃত রাজপুরী; তাহার অভ্যন্তরে কুটিল দুর্গম অন্তঃপুর। কুণ্ডলিত সর্প যেন

আপন কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে; সাপের মাথার মণি ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে লুকানো আছে। কুহু এই অপূর্ব রহস্যলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, ভিতরে আহ্বান করিয়াছিল—

কুহু!—একদিক হইতে কুহু যেমন বজ্রকে আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিকর্ষণও করিয়াছিল। কুহুর রূপ-যৌবন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই, বরং কুহুর লোলুপ-প্রগল্‌ভা তাহার অন্তরে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু অপর পক্ষে কুহুর স্নেহ-তরল মর্মজ্ঞ নারীপ্রকৃতিকেও সে অবহেলা করিতে পারে নাই। কুহু যত দুষ্টই হোক তাহার প্রীতিসরস হৃদয়ের মূল্য বজ্রের কাছে অল্প নয়। কুহুকে মনের কথা বলিলে সে বুঝিবে, কুহুর সাহচর্যে তাহার প্রবাসের একাকীত্ব ঘুচিবে, মন শান্ত হইবে। কুহুকে অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন।

বজ্র যখন আপন কক্ষে ফিরিল তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দীপ নিভিয়া গিয়াছে। বজ্র অন্ধকারে কলস হইতে জল ঢালিয়া পান করিল, তারপর শয্যায় শয়ন করিল।

কাল আবার কুহু আসিবে—। ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

নাদনঘাটে পল্লী-সম্মেলন

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

বরাবরই সবাই শুনিয়া আসিতেছেন—আমাদের দেশ যখন পল্লীপ্রধান, তখন ঐ উৎসাদিতপ্রায় পল্লীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারিলে, কোনদিনই দেশের উন্নতি হইবে না।

কথাগুলি শুনিতে তো খুবই মধুর। কিন্তু কাজের সময় তো বড় একটা কাহাকে পাওয়াই যায় না। সকলেই প্রায় সহরে বসিয়া পল্লীমঙ্গলের ফাতোয়া জারি করিয়াই খালাস। আমি কালনা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী"রই সম্পাদক, সুতরাং এ দুঃখ আমার আর জানিতে বাকি নাই।

ইংরাজের আমল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি—পল্লীগুলিকে বাঁচাইয়া তোলা তো দূরের কথা, কেমন করিয়া লোকগুলার ইহকাল পরকাল ঘুচে, সেই পক্ষেই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের এ অঞ্চলে স্মরণাতীত সময় হইতে হিন্দু-মুসলমানে পরমসম্প্রীতিতে বাস করিয়া আসিতেছে—লীগ আমলে সেই প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার দুশ্চেষ্টাই কি কম হইয়াছে?

অথচ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথ নাই—পুকুরে জল নাই, গরু বাছুরের কষ্ট দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। রোগে চিকিৎসা নাই, পথ্য নাই, আছে মামলা মোকর্দ্দমা বাধাইবার ফিকিরফন্দী—লোককে জব্দ করিবার সলাপরামর্শ। কেউ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। পরশ্রীকাতরতা যেন ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে। এ ভূত তাড়াইতে না পারিলে তো আর রোগী বাঁচিবে না।

তরুণ বয়স হইতে এই সব গ্রামেই 'স্বদেশী' করিতে গিয়াছি—গ্রামবাসীর সে কি আদর-যত্ন আত্মীয়তা, কত শ্রদ্ধা ভালবাসা পাইয়াছি। জাতীয়সংগ্রাম পাকিয়া উঠিবার সময়ও গিয়া দেখিয়াছি, লুকাইয়া লুকাইয়া ভালবাসিবার আকুলতাও কম নাই—প্রকাশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছে না বলিয়া কি গভীর অনুতাপ!! আমাদের সংগ্রাম সার্থক হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, ভাত পাইবে, কাপড় পাইবে—কত কত আকাঙ্ক্ষা। নিরক্ষর নরনারীর চোখের জলে সেদিন ইংরাজের মাথাতেই অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে? জাতির জয় আগাইয়া দিয়াছে।

সংগ্রামে জয় হইল; আমরাও যে যাহার মত এলাইয়া পড়িলাম; পল্লীতে পল্লীতে আর বড় কেহ আমাদের টিকি দেখিতে পাইল না। 'যার ছিল নাড়াবুনে, সবাই হল কাঁড়নে'। আর ভলাণ্টিয়ার খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাহারা নেতাদের মুখের একটা কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইত, একটি আদেশ পালন করিতে দশ বার মাইল হাঁটিয়াও কত তৃপ্তিভরা মুখে কৃতজ্ঞতা জানাইত, আজ মাথা খুঁড়িয়াও তাহাদিগকে পল্লীতে পাঠাইতে পারি না। বিশ্ববিদিত সুভাষচন্দ্রের মত নেতাজীকে পর্যন্ত কত গ্রামে গ্রামে ঘুরানো সম্ভবপর হইয়াছে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা পাইবার পর গ্রামে যাওয়া আমরা যেন একরকম ছাড়িয়াই দিলাম।

তাই বলিয়া এক মাঘে তো আর শীত পলায় না। দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাচনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সকলেরই টনক নড়িল। কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ—যে পল্লীর ক'বছর ছায়া পর্যান্ত মাড়াই নাই, সে সব গাঁয়ে এখন ঢুকি কেমন করিয়া? অথচ যা কিছু ভোটের বস্তা, তা তো এই সব গ্রামে গ্রামেই কুড়াইতে হইবে, নতুবা গণদেবতা বাঁকিয়া বসিলে, একেবারে যে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন!!

দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া যাত্রাকরতঃ আমরা সর্ব্বপ্রথমে যেখানে সেদিন সভা করিয়াছিলাম, আজ সেই বর্দ্ধমান জেলার নাদনঘাটেই যে বিরাট পল্লী

সম্মেলন হইয়া গেল, এতদঞ্চলের তাহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এতবড় ব্যাপার শুধু নাদনঘাট কেন, অনেক বড় বড় সহর নগরেও সব সময় ঘটিয়া উঠে না।

নাদনঘাট শুধু কালনা মহকুমারই প্রাণকেন্দ্র নয়, পশ্চিমবঙ্গে চাউল ধান্যের এতবড় গঞ্জ খুব কমই আছে। বছরে লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য শস্য এই নাদনঘাটের হাটেই কেনা বেচা চলিয়াছে। ইংরাজ আমলে যুদ্ধের সময় হইতে অনেকে এখানে চোরাচালানীর সহিত জড়াইয়া পড়েন, ইহাও যেমন সত্য, সরকারী কডন ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে যে দুর্নীতি ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহাও যে অপকর্ম্মের তুল্য দায়ী, ইহাও তেমনি সত্য।

যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। এবার 'লেভি'প্রথা চালু হওয়ায় ছোট ছোট চাষীর দল স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিয়াছেন। বড় বড় রুই কাৎলার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মোটের উপর বলিতে গেলে এই নাদনঘাটই আজও এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রই হইয়া রহিয়াছে।

বিধানসভায় যিনি প্রতিনিধি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার পল্লীপ্রাণতার কথা এ অঞ্চলের পল্লীবাসীদের অনেক আগে হইতেই জানা ছিল। কলিকাতায় কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, ইহাঁরা যে পুরুষানুক্রমে জন্মভূমি পূর্ব্বস্থলী থানার উপকার করিয়া আসিতেছেন—কথাটা গ্রামবাসীদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেই জানিতেন তাই বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি যেদিনই জয়যুক্ত হইলেন, সেইদিন হইতেই গ্রামবাসীদের মনে নূতন আশা ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। মরা গাঙে যেন বাণ ডাকিল। গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্কুল, চিকিৎসালয় খুলিবার বিপুল উন্মাদনা পরিলক্ষিত হইল। খুবই সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কবিরাজ শ্রীমান্ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গ্রাম ও গ্রাম বলিয়া কথা নয়, সমগ্র থানাটিরই যাহাতে কল্যাণ হয়, দরদীপ্রাণ লইয়া তিনি তাহারই আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই অল্পদিনের মধ্যে কত গ্রামে যে পথকষ্ট জলকষ্ট চিকিৎসাকষ্ট প্রভৃতি দূরীকরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়া গিয়াছে, গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কাজে না নামিলে, কার্য্যক্ষেত্রে অসুবিধা বুঝা যায় না। বিভিন্ন ইউনিয়নবোর্ড সেই গতানুগতিক ধারায় তদ্বির-তদারক দ্বারা নিজ নিজ বোর্ডেরই সুবিধা আদায়ে তৎপর? আগে ইংরাজকে খুশী করিয়া, তারপর নেতাদের সিন্নি দিয়া, নিজ নিজ বোর্ডে কে কয়টা নলকূপ আদায় করিতে পারিলেন—ইহারই উপর প্রেসিডেণ্টবাবুদের কৃতিত্বের মান নির্দ্ধারিত হইত? সমগ্র থানাকে লক্ষ্য করিয়া সামগ্রিক উন্নতি সাধনের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কবিরাজ তর্কতীর্থ এই অভাববোধ করিয়া অনেক দিন হইতেই থানা সম্মেলন গঠনের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার মত তৎপরতা ও আগ্রহ আমাদের মধ্যে এখনও তেমন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই বলিয়াই, অনেক সময় সংকল্পমত কাজ করিতে বিলম্ব পড়িয়া যায়। তবে, কথা কি, সাধু যাহার সংকল্প, ভগবান্ তাহার সহায়? আমরা সেদিন পূর্ব্বস্থলী থানা সম্মেলনে গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

থানার অন্তর্গত সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও প্রতিনিধিবৃন্দের এমন প্রীতি সম্মেলন দেখিয়া প্রাণে কত না আশা জাগে! লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর ইঁহারাই রক্ষাকর্ত্তা। একযোগে কাজ করিলে ইঁহারা আজ সমাজের কদর্য্য রূপ পরিবর্ত্তনে যে কত সহায়তা করিতে পারেন, তাহা ভাবিলেও আনন্দ হয়। সম্মেলনে ইঁহারা আন্তরিকতারই সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা মন্ত্রীদের সম্মুখে মন খুলিয়াই বলিয়াছিলেন। একটী স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে; এখন ভগবৎকৃপায় সুশৃঙ্খলভাবে কাজ আরম্ভ হইলেই এই বিরাট পল্লীসম্মেলন চূড়ান্তভাবে সার্থক হইয়াছে—কে না বলিবে?

পল্লী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে এতৎসহ এক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় পনের কুড়ি হাজার নর-নারী বালক বৃদ্ধ শিক্ষা পাইয়াছে—আনন্দ পাইয়াছে। বর্দ্ধমানের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে আসিয়াছিলেন। কুসুমগ্রাম হইতে কয় মাইল পথে খুবই হয়রাণি ভোগ করিয়াছেন; জানিয়া আশা জাগিল—পথটি হয়ত বা সত্বর পাকা হইয়া দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুচিবে। তবে জেলা বোর্ডের যেরূপ ব্যাপার শুনিতেছি, তাহাতে ভরসা হয় না। সরকারী কৃষিশিল্পবিভাগের সহায়তার কথাও এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি কয়দিন বহুবিধ সম্মেলনের আয়োজন করিয়া নির্জীব পল্লীবাসীদের প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ৮ই হইতে ১০ই মে শনি রবি সোম—নাদনঘাটে যেন উৎসাহের বন্যা বহিয়াছিল। দূরদরান্তর গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে আসিয়া বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শনিবার ইউঃ বোর্ড সম্মেলন, রবিবার সকালে প্রদর্শনী উদ্বোধন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদিতে মাল্যদান, অপরাহ্ণে বিরাট জনসভা, পরে কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন—একটানা উৎসবের যেন বিশ্রামই নাই। শেষ দিন সোমবারে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান—ভূদান যজ্ঞ সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। পল্লী অঞ্চলে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

শনিবার অপরাহ্ণে সমুদ্রগড় ষ্টেশনে মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ আমেদকে অভ্যর্থনা করিতে সমুদ্রগড় কংগ্রেস কমিটী বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাঃ আমেদ হৃদয়বান্ ব্যক্তি, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রতা কোনদিনই তাঁহার প্রশস্ত বক্ষকে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন তাঁহার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করিতেছিলেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলাম। আস্তে আস্তে বলিলাম, সাহেব আর কেন? আমাদের সংবিধানের কথা ছাড়িয়া দিই, কাজে কি দেখি, সংখ্যালঘু সমস্যা কি আর আছে? কথাটা আমেদ সাহেবের প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল। সম্বর্দ্ধনায় উত্তর দিবার সময় দেখি তিনি ঠিক ঐ কথাটাই বলিয়া ফেলিলেন। মুসলমানেরাও লজ্জিত হইল। কি সরল মানুষ!

ঐ রাত্রেই মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় উপস্থিত হইলেন। এত সব মন্ত্রী ও নেতার সমাগম—গ্রামবাসীদের মনে কত না আশা উৎসাহ জাগিল। সব চাইতে

মুস্কিল—খগেনবাবুরই। কারণ, তাঁহারই হাতে রাজ্যের রাস্তাঘাট। পরাধীন অবস্থায় তো আর তাদৃশ হৈচৈ করিবার উপায় ছিল না—লোকগুলা অন্ধ হইয়াই পড়িয়াছিল। আজ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে সবাই চাপিয়া ধরিয়াছে। তোড়টা সম্পূর্ণরূপেই পড়িয়াছে এখন খগেনবাবুরই উপর। তিনি নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়া পড়িলেন বেজায় ফাঁসাদে। কত গ্রামের লোক যে তাঁহাকে রাস্তাঘাটের দুরবস্থার কথা জানাইল। তিনি ধীর, স্থির এবং কর্ম্মী পুরুষ। কিছুটা উপকার এ অঞ্চলের হইবেই? তবে যে দশ মাইল কাঁচা রাস্তার জন্য নাদনঘাট আজ সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, সেটুকুর কিনারা যত সত্বর হয় ততই মঙ্গল।

রবিবার অপরাহ্নে জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের ভাষণ খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কংগ্রেসের আদর্শানুগ রাজ্যগঠনে জনসাধারণের আজও যে কি বিপুল উৎসাহ, এদিনের জনসভায় তাহা ভালভাবেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। খাদ্য-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমান্ স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়জীবন সংশ্লিষ্ট ভাষণ মধ্যেই রাজ্যের খাদ্যনীতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝাইতে পারিয়াছেন। শ্রীমান্ নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমান আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এম এল-এ, শ্রীমান ব্যোমকেশ মজুমদার এম এল-এ প্রভৃতির বক্তৃতাও সেদিন জনসাধারণ যেরূপ ধীরভাবে শুনিয়াছে, তাহাতে বেশ মনে হইল লোকে এখনও কংগ্রেসের কথা শুনিতে চায়। কাজে কথায় মিলাইতে পারিলে তো মাথায় করিয়া নাচিবে।

শেষ দিনেই যত গণ্ডগোল—টাঁকে হাত পড়িবার কথা। ভূদানযজ্ঞ সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল। বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতির প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি হইলাম উহার সভাপতি, আর প্রধান অতিথি হইলেন সুহৃদ্বর শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারী মহাশয়ের বক্তৃতা এদিন খুবই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। আমিও সভাপতির অভিভাষণে হৃদয় পরিবর্ত্তনে যথাসাধ্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিনিয়োগ করিলাম। কিন্তু করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। একমাত্র কবিরাজ তর্কতীর্থ মহাশয় ছাড়া বিনোবাজীকে নিজ স্বত্ব ছাড়িয়া ভূদান করিতে কেহই সাড়া দেন নাই। তবে আমি নিরাশ হই নাই, মানুষের বুদ্ধির মধ্যে একটা আলোড়ন সুরু হইয়া গিয়াছে। ইংরাজের সাজানো গৎধরা কাঠামো বদলাইতে আর খুব বেশী দেরী হইবে না।

ভূদানবিপ্লবের ঝড় বহিবার পরই সংস্কৃতির অমৃত বর্ষণের পালা সুরু হইল। "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। আমিও ভূদানযজ্ঞশালা হইতে সভা বাহিরে আসিয়া প্রধান অতিথির আসনে বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ফণীভায়া ভাগ্যবান্ পুরুষ—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ভারতবর্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া চিরদিন ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনা করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গীয় কুলদা মল্লিক দাদার আশীর্বাদ, আর স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয়ের শুভেচ্ছা তাঁহার শিশুর মত সরল মনে সংস্কৃতির যে সুরভিকানন সাজাইয়া দিয়াছে, অভিভাষণের ভিতর দিয়া তাহারই সুগন্ধে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে আমোদিত করিয়া আসিয়াছেন। সুধী শিল্পীবৃন্দ নানাবিধ নৃত্যগীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ ও তাঁহার সহযোগীবৃন্দ এই পল্লীসম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন, সন্দেহ নাই। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

সা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

নামৈব কেবলম্

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভক্ত কবি বিজয়গুপ্ত মনসা মঙ্গল রচনা করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন:

"যতক্ষণ পড়িয়া তোমার গীত গাহি।
অন্যস্থানে যাও যদি শিবের দোহাই॥
বালক দেখিয়া যেন সুখী পিতা মাতা।
তেন মতে প্রসন্ন হইয়া শুন মোর কথা॥"

ভক্ত আবদার ধরিলেন—মা যখনই তোমার গান আমি গাহিব, তখনই তোমার আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া আমার গান শুনিতে হইবে।

মা উত্তর করিলেন—

"যথা গীত শুনি আমি তোমার রচিত।
সত্য করি কহি তথা যাইব নিশ্চিত॥"

মা কিন্তু তাঁর বর শুধু কবির প্রতিই অর্পণ করিলেন না। পরন্তু সমস্ত বিশ্ববাসী সন্তানগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বলিলেন—যেখানেই, যে কেহ, যে কোনও সময়ে, তোমার রচিত সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবে, আমি নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেখানেই আমি উপস্থিত হইব এবং গান শুনিব।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তর নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন গৌর বিরহে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ বারিহীন মীনের ন্যায় ম্রিয়মান ছিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে তাহারা পুরীধামে গমন করিয়া প্রভুকে

দর্শন করেন এবং স্বগৃহে ভদ্রলোক কাতর নিজ নিজ ভ্রমময়ী দশার কথা কাতর ভাবে প্রকাশ করেন ! প্রভু তাহাদের অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—

যথা— নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌর দেশে।
অনর্গল প্রেম-ভক্তি করিহ প্রকাশে ॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তার মধুর বচন ॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।

চৈতন্য চঃ অঃ

প্রভু বলিলেন যেখানেই ভক্তগৃহে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে, সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিবেন এবং কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য করিবেন !

স্থলদেহে অদর্শনের পরেও শ্রীপাট খেতুরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহামহোৎসবে শ্রীশ্রীগৌরপ্রভু কীর্ত্তনাঙ্গনে সর্ব্বসমক্ষে প্রকট হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ! যথা নরোত্তম বিলাসে—

"নরোত্তম মত্ত হইয়া গৌর গুণ গায়।
গণ সহ আবেশ হইল গৌর রায় ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারী স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর ॥
জগদীশ গৌরদাস আদি সবে লয়ে।
হইল সবার নয়ন গোচর হর্ষ হয়ে ॥
সবে আত্ম-বিস্মৃত হইল সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর এই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব আবার—

অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

যেখানেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সেইখানেই বৃন্দাবন। আবার বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম—প্রভুর নিত্য লীলাস্থল, প্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না। তাই—যেখানে নাম কীর্ত্তন সেখানে বৃন্দাবন ও প্রভুর আবির্ভাব ও স্থিতি।

যেখানে হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
সেখানে বৃন্দাবন ॥

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীমন্ত্রে দেবতাগণ কর্ত্তৃক নারায়ণী স্তোত্র কীর্ত্তনের পর ভগবতী বাক্য দ্বাদশ অধ্যায়ে দেবীর প্রতিজ্ঞা অনুধাবন করুন :—

"যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনেমম।
সদান তদ্ বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্রমেস্থিতম্ ॥

অর্থাৎ—আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য যথোক্ত প্রকারে অর্থাবধারণ পূর্ব্বক পঠিত হয় সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ করি না ! পরন্তু সেস্থানে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি।

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দের অনুবাদ)

মায়ের নাম যেখানে সেখানে তাঁর ধাম। সেখানেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগজ্জনের শ্রবণ জুড়াক্।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ।
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।"

রবীন্দ্রনাথ।

পূর্ণ ব্রহ্মচারী মহাবীর শ্রীহনুমানজি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন ধরাধামে রামনাম থাকিবে ততদিনই তিনি অমর দেহে মেদিনীমণ্ডলে অবস্থান করিবেন—

যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালযন্।

(রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড)

যে পর্য্যন্ত তোমার পাবনী কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া এই পৃথিবীতে থাকিব।

ভগবান রামচন্দ্র প্রাকৃত দেহ ত্যাগ করিয়া কোন যুগে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত অদ্যাপি বিদ্যমান, কারণ অদ্যাপি জগতে সর্ব্বক্ষণই রামনাম গান হইতেছে। রামনামের জোরে ভক্ত হেলায় সমুদ্র গোষ্পদবৎ উল্লঙ্ঘন করিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের সেতু বন্ধন করিয়া পার হইতে হইল ! যেখানেই রামনাম কীর্ত্তন সেখানেই ভক্ত মারুতি।

"যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃত মস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥"

যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয় সেখানে সেখানে যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক সাশ্রু নয়নে অবস্থান করেন সেই রাক্ষস বিনাশী মারুতিকে সকলে নমস্কার করুন।

তাই রামনাম আর হনুমান অবিচ্ছিন্ন। যেখানে নাম সেখানে ভগবানের ও অধিষ্ঠান—

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তে তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সেখানেই—"ভক্তের হৃদয় পানে ফুটি বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ।"

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র হরিনাম বিতরণচ্ছলে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক ভক্ত বিপ্র নিত্য গীতা

পাঠ করিতেন। তাহার পাণ্ডিত্য কিছুই ছিল না। অশুদ্ধ পাঠ করিতেন এজন্য শ্রোতৃগণ তাহাকে উপহাস করিত। কিন্তু গীতা পাঠ করিলে, তাহার ভগবদ্দর্শন হইত। তিনি সে স্থানে তীর্থ শ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনের দর্শন লাভ করিতেন।

যথা— বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে হাতে শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়ো তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার।

বিপ্র গীতা পাঠ কালে কৃষ্ণদর্শন করিতেন এবং ভগবৎসান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন।

যন্নাম শ্রুতিমাত্র তোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং
ত্যক্তা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য

যাহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জ্জনও আশু অপার সংসার সাগর পার হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম পদলাভ করেন, অতএব কৃষ্ণনাম শ্রবণ, স্মরণ, ও কীর্ত্তনই পরমপুরুষার্থ।

"কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ স্বরূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণ নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥ চৈঃ চঃ মঃ
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মা নাম নামিনাম্॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ। উহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসের বিগ্রহ স্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত।

তিনি নাম ও নামীর অভিন্নাত্মা।
নাম ও নামীর স্বরূপে কোনও ভেদ নাই।

অতএব—

"কর তাঁর নাম গান।
যতদিন দেহে রহে প্রাণ॥

তবেই মিলিবে কীর্ত্তনাঙ্গনে বৃন্দাবনধাম, আর উপলব্ধি হইবে তাঁর অধিষ্ঠান। ভাগ্যবান তাহাকে দেখিতেও পাইবেন। কিন্তু সে গান যেন হয় সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠের তরে।

পরিবর্তন

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

হাজার অশ্বের খুরের ঘায়েতে ছুটেছে রথ ঃ
বলতে পারো চল্‌বো কতো আর পুরানো পথ ?
ধূলায় ধূলায় দিগন্তে যে ঘনালো মেঘ—
ঝড়ের হাওয়ায় থাম্‌বে কি এ রথের বেগ !

পুরানো দিনের সরু পথ আজ হায় অচল—
প্রবঞ্চনার আড়াল দিয়ে করো না ছল।
মনের গতিরে বাধা দিয়ে হায় বৃথাই রাখা,
দুর্বল হাতে মর্গের ছটা যায় না ঢাকা !

পুরানো পথে বার বার মিছে পরিক্রমা,
মিথ্যে আশায় আঁধার কেবলি করেছ জমা।
পূর্বাচলের নতুন আলোক দিয়েছে সাড়া—
জীবনের পথে আঁধার ভেদিয়া চলেছে কারা !

অনেক আশায় ভর করে তুমি মরেছ ঘুরে—
দেখেছ স্বর্গ লাল হ'য়ে ঐ রয়েছে দূরে ?
জীর্ণ বাঁধন, পুরানো স্মৃতির বোঝার ভারে
ভুক্ত দেহ কঠোর ক্লান্ত পথের ধারে !

বল্গার চাপে অশ্বের গতি রেখোনা ধরে—
বন্ধ্যা জীবনে ছুটাও অশ্ব নতুন করে।

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

হনোলুলু। হনোলুলু ! কী কাণ্ড ! মনে পড়ে বাল্যকালে প্রথম যখন ভূগোল পড়ি তখন খুব মজা লাগত দুটো নাম শুনে ! যদি কালাপাণির পারে যাই, কোথায় যেতে সাধ সব আগে ? না, হনোলুলু ও মাদাগাস্কার। এসব দেশে যে মানুষ সত্যি সত্যি যেতে পারে এমন কথা কল্পনা করতে পারলেও বাস্তব ব'লে মনে হয় নি। সেই হনোলুলু ! আর কী হনোলুলু ! জর্মণ ভাষায় যাকে বলে und wie !

সত্যি কী দেশ ! গন্ধর্বলোকের কথা কানে শুনেছি চোখে দেখি নি। শুনেছি বড় বড় যোগী ধ্যানীরা না কি ধ্যানের পাখায় সে-রাজ্যে টহল দিয়ে আসেন কখনো কখনো। একদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে এও শুনেছি যে আমাদের মর্ত্ত রাজ্যে সৌন্দর্যে অনেক প্রেরণা আসে না কি গন্ধর্বলোক থেকে। ১৯২৭ সালে পল রিশার আমাকে বলেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ গন্ধর্বলোক থেকে এসেছিলেন। জানি না, এসব উক্তির মর্ম। একসময়ে হয়ত স্রেফ অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু গুরুদেবের দেহাবসানের পরে এই দুবছর ইন্দিরার মাধ্যমে এত শত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে আমার জীবনে যে অবিশ্বাসকেই এখন বেশি অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাই যদি বলি হনোলুলু দেখে মনে হয়েছিল যে গন্ধর্বলোকের ছিটেফোঁটা এদেশের গায়ে লেগেছে এ হেন জনশ্রুতিকে অবিশ্বাস করার আর তেমন জোর পাই না, তাহ'লে হয়ত খানিকটা বোঝানো হবে আমার মনোভাব, বা উচ্ছ্বাসের পরিমাণ। অবশ্য এদেশবাসীরা যে রূপে গন্ধর্ব কিন্নর তা বলছি না, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য এদেশে এমন একটা সৌন্দর্যশিখরে পৌঁচেছে যে বলতে সাধ হয় :

শ্যামলকান্তি পরম শান্তি—আনন্দ উছলিল রূপে অতুলন এ-হেন ভুবন কে কেমনে কল্পিল ! কত গাছ কত পাতা কত লতা কত ঘাস—আর সবার উপরে সবুজের সে কী অপরূপ ঝকনাই। ফুটপাথেও ঘাসের বাহার। একটি বড় রাস্তার মাঝে ফুটপাথ—নবীন তৃণাস্তৃত—দুধারে চলেছে মোটর—একদিকে মোটর সারি সারি তিনটি কলামে উধাও এমুখে, অন্যদিকে ছুটেছে—ওমুখে। একটি রাস্তায়, ভাবুন, ছয়টি কলামে মোটরের সার চলতে পারে স্বচ্ছন্দে, পাশাপাশি মাঝের ফুটপাথে দাঁড়ালে উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হয়। তবে অদৃশ্য পুলিশ দাঁড় করায় লাল আলোর তর্জনে, তখন পার হ'লে বিপদ্ কোথায় ? কিন্তু এ তো হ'ল ওদের ব্যস্ততার কথা, ধনবৈভব যানবাহনের কথা—ফিরে আমি প্রাসঙ্গিকতায়—হনোলুর নিসর্গশোভার কথা বলছিলাম না ? অয়ি ভুবন মনোমোহিনি ! সমুদ্র মিশেছে শৈলমালার সঙ্গে। যদি শুধু এইটুকু হ'ত তাহ'লে অবশ্য "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" বলা চলত না। গাছ পাতার শোভা—এও অন্যত্র দেখা যায়। সবুজ মাঠের অজস্রতা—এও মেলে

ওয়েকিকি তীরবর্তী হাওয়াইআন হোটেল—হনোলুলু

ধরাধামে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি জুড়ে দেওয়া যায় রাস্তাঘাটের একান্ত মসৃণতা তথা পরিচ্ছন্নতাই, যদি জুড়ে দেওয়া যায় মশামাছি পতঙ্গের একান্ত বিরলতা (শুনলাম সর্পাদিও নাকি এখানে নির্বংশ ?), যদি জুড়ে দিই সমুদ্রের জলের নানারূপ একই সময়ে—এখানে নীল, ওখানে সবুজ, ওখানে পাটল, ওখানে নীল লোহিত ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—

মণিমালা পরি কে সাজে গো মরি ! নিত্য-দীপালি রাগে
আকাশের তারা চেয়ে রয় স্নেহে—দেখে কি মুখ সোহাগে ?

যদি জুড়ে দেওয়া যায় সোমবৎসর এখানে চিরবসন্ত—সত্তর থেকে

পঁচাশি ডিগ্রি এখানে উত্তাপ—মধ্যাহ্ন লগ্নেও এতটুকু উত্তাপ দেহকে উদ্ব্যস্ত করে না? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—রাস্তার দুধারে বিপণিশ্রেণীর মধ্যেও চোখকে আহত করে এমন একটি দোকানও মেলে না? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—বৎসরে সব ঋতুতেই এখানে ফুলের মৌসুম থাকে? যদি নেই কোথাও? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—কিন্তু না আর থাক। পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি হ'লে আখের নষ্ট হবে যে। এক কথায় মনে হয় যে, ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্য থেকে যখন পুরাকালে নির্বাসিত হ'তেন তখন বুঝি বা এই দ্বীপটিতে এসেই লুকিয়ে থাকতেন, আর ওঁর অনুগত অনুচরবৃন্দ হারাণো রাজ্যের পত্তন ক'রত এদেশে—দেবরাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! যাক্, এবার উচ্ছ্বাস ছেড়ে বাস্তবের কোঠায় ফিরে আসি—যদিও পদ্যের পরে গদ্য—রসভঙ্গের দায়ে পড়ব হয়ত! নিরুপায়। পালা গান সুরু করলে সারা না হ'লে থামা যায় কি?

বিমান থেকে ওয়েকিকি

বিমান থেকে হনোলুলুর দৃশ্য

হনোলুলুতে পৌঁছতেই এক বণিক বন্ধু প্রকাণ্ড মোটর নিয়ে এসে হাজির। টোকিয়ো থেকে আমার এক সিন্ধুদেশ-বাসী বণিক বন্ধু এঁকে তার ক'রে দিয়েছিলেন আমাদের নাম ক'রে।

ইনি ধনী। এখানে এঁদের তিনচারটি দোকান আছে। চমৎকার বাড়ি—এদেশের স্টাইলে তৈরি ও সাজানো। যাহোক আমাদের স্বদেশীয় বণিক যে এভাবে থাকতে পারেন, ধনাগমে যে তার রুচিরও বিকাশ হয়েছে—ভাবতেও আনন্দ। সিন্ধুদেশীয় কাউকে এত ভালো স্টাইলে থাকতে দেখে নি। চমৎকার বাড়ি, চমৎকার বাগান, চমৎকার আসবাবপত্র। বারান্দার মাঝখানে লতাপাতার বিতান—সামনে সবুজ মাঠ—ওদিকে শুধু দীপকণ্ঠী শৈলবালা ঝিমমিক ঝিকমিক করছে। ইনি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন নিয়ুমানু হোটেলে।

হোটেলটি ধনীদের জন্যে। কিন্তু অচেনা জায়গায় মধ্যবিত্তদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সস্তা আবাসে যেতে মন সরল না—আরো এই জন্যে

জুড়ে দেওয়া যায় এখানে নিবাসগুলি প্রায় সর্বত্রই ছবির মতন দেখায়—প্রতি কুঞ্জে একটি ক'রে রঙিণ কুটীর—যার এপাশে গাছ, ওপাশে সবুজ ঘাস—অথচ রাস্তায় ঘাটে অজস্র ট্রাম বাস চলা সত্ত্বেও সহর প্রায় নিঃশব্দ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথেও এতটুকু ধুলোর চিহ্ন

যে ইন্দিরা ১৭ ঘণ্টা বিমানে চ'ড়ে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। দিনে সাড়ে সাত ডলার প্রত্যেকের জন্যে—শুধু ঘরভাড়া। এর সঙ্গে খাওয়া জুড়ে দিন। সবই আক্রা। একটা কোর্সের ডিনার বা লাঞ্চ অন্তত দুডলার কিনা দশটাকা। একদিন রাতে এ-হোটেলে নৃত্যগীত ছিল, সে-রাতে তিন ডলার পড়ল প্রত্যেকের। তিন দিন ছিলাম এ হোটেলে দাম নিল ষাট ডলার অর্থাৎ তিনশো টাকা—তাও অনেকগুলি ডিনার লাঞ্চ বাদ দিয়ে—মানে বন্ধুরা করেছিলেন নিমন্ত্রণ। কিন্তু জিনিস-পত্রের দরদামের কথা থাক। কলকাতায় কে না আলোচনা করে আজকাল: "ভাই আগে টাকায় মিলত চার সের দুধ, আজ আধ সের। চাল মিলত আট টাকা মণ আজ চল্লিশ টাকা—ইত্যাদি। এ-আক্ষেপের মধ্যে দুঃখের অনেক কিছু থাকলেও বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই, কেবল একটি জিনিসের দামের কথা বলি: একটি নকল খাটো বহরের রেশমের সার্ট কিনতে হ'ল এখানে—দাম নিল পাঁচ ডলার কি না পঁচিশ টাকা। তা দেবরাজের দেশে থাকতে হ'লে তার টেক্স দেবার রেস্ত না থাকলে চলবে কেন?

দ্বিতীয় দিন এখানকার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক চার্লস মুর এলেন দেখা করতে। দুর্ভাগ্যবশে সেদিন আমরা বেরিয়েছিলাম ট্যাক্সি ক'রে শহর দেখতে—কাজেই দেখা হ'ল না। তিনি লিখলেন তার পর দিন আসবেন—তাঁর মোটরে ক'রে শহর দেখাবেন আমাদের। চমৎকার মানুষ! মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তাঁর স্নেহময় ব্যবহারে। তিনি বললেন ভারতীয় দেখলেই তাঁর মন গ'লে যায়। শুনে আনন্দ হ'ল বৈ কি। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম তাঁকে: "সে আপনার নিমগুণে।"

গুণ যারই হোক মানুষটি বড় চমৎকার। যেমন বিনয়ী, তেমনি তেজস্বী, যেমন পরোপকারী তেমনি স্পষ্টবক্তা, যেমন বিদ্বান্ তেমনি প্রফুল্ল। নানাগুণের এহেন সমাবেশ খুব বেশী দেখা যায় না। মুর দর্শনের নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন কিনা ঠিক জানি না তবে দুখানি দার্শনিক বই সম্পাদন করেছেন যাকে নানা জাতের লেখকের (জাপানী, চৈনিক, ভারতীয়) প্রবন্ধ আছে। ওখানে পৌঁছতেই আমার হাতে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ দিলেন—আর্য থেকে উদ্ধৃত। আনন্দ না হ'য়ে পারে! গুরুদেব সম্বন্ধে বহু কথা ব'লে ফেললাম দরদী পেয়ে। ইন্দিরার নানান্ অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা প'ড়ে ইনি মোটেই অবিশ্বাস করেন নি। ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ইন্দিরাও কত যে সুন্দর কথা বলল গুরুদেব সম্বন্ধে!

মুর নিয়ে গেলেন হনোলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দিলেন আলাপ করিয়ে। তিনিও অতি চমৎকার লোক—ভারতের প্রতি ভক্তি অগাধ, শ্রীঅরবিন্দের লেখাও পড়েছেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, কতটা বুঝেছেন তা অবশ্য আলোচনা ক'রে ঠাহর পাবার সময় ছিল না। মুর বললেন প্রেসিডেন্টের আন্তরিক দরদ আছে ভারতের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির সম্বন্ধে।

তারপর দেখতে দেখতে এ-বিদেশী সহৃদয় ভাবুক মানুষটির সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন স্থাপিত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন তিনি কতদিনের পরিচিত। যেখানে হৃদয়ের তাপ লাগে সেখানে যে এ-ধরণের অঘটন অতি সহজেই ঘটে একথা না জানে কে? তবু প্রতি ক্ষেত্রেই যেন নতুন ক'রেই

ওয়েকিকিতে জলক্রীড়া—হনোলুলু

পাওয়া যায় এ পরম উপলব্ধিটি—যে হৃদয় যেখানে সাড়া দেয় সেখানে বাইরের বেড়াজাল তেমনি সহজেই ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, যেমন যায় সূর্যোদয়ে কুয়াশা। যেদিন আমরা সানফ্রান্সিস্কো রওনা হ'লাম আকাশপক্ষীর ডানায় আরূঢ় হ'য়ে সেদিন ইনি নিজে থেকে আমাদের নিয়ে এলেন হোটেল থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে বিমান ঘাঁটিতে। পথে দুটি ফুলের মালা কিনে পরিয়ে দিলেন আমাকে ও ইন্দিরাকে। একলাই থাকেন এ-দার্শণিক, পড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, যখন বিমান ঘাঁটিতে বিদায় নিলাম তখন মন আমাদের আর্দ্র হ'য়ে উঠল। পরিণত বয়সে ভাবের উচ্ছ্বাস সহজে জমতে পায় না—সবাই জানি, কিন্তু যেখানে জন্মায় মনে হয় কত কী! মনে হয় মানুষ এক মুহূর্তে মানুষের কত কাছেই না আসতে পারে দেশ কাল রীতি নীতি আচার বিচারের গণ্ডী পেরিয়ে! তবু মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজ প্রীতির ঐক্যসূত্র ছেড়ে আপন-পর সংস্কারকেই একান্ত

ক'রে ধরে সে কিসের মোহে কে বলবে? হয়ত যা সুন্দর তাকে বিরল ক'রে সৃষ্টি করেছেন নিখিলের নিয়ামক সুন্দরের মহিমা বাড়াতে। তবু মনের কোণে আক্ষেপ একটু জমেই যে সুন্দর যদি আরো একটু সুলভ হ'ত, মানুষের সঙ্গে মানুষের লেনদেনে যদি ঐক্যবোধের অনুভবটি আরো একটু সহজে অর্জন করা যেত!

তারপরের দিনে সেই সিন্ধুদেশীয় বণিক বন্ধুটির বাড়িতে বৈঠক হ'ল আমাদের নাম গানের। সেখানেও ফের ঐ একই সত্যকে যেন নূতন ক'রে পেলাম—এবার সঙ্গীতের সূত্রে—যে বাহিরের ব্যবধান সহজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসতে পারে নৃত্যগীতের অবদানে। আসরে মূর ও আর একটি অধ্যাপক ছিলেন, ছিলেন হাওয়াই আমেরিকা ইতালির নরনারী। ছিল একটি হিন্দুস্থানি ছাত্রও। আরো কত অতিথি। বক্তৃতা করতে হ'ল একটু—শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে, আমাদের গানের সম্বন্ধে, মীরাবাইয়ের বৈরাগ্য সম্বন্ধে, পিতৃদেবের জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে, ইন্দিরার মীরা ভজন শোনা সম্বন্ধে ইত্যাদি। গাইলাম নানা ভাষায়: সংস্কৃত, ইংরাজি, হিন্দি, জর্মন, বাংলা। সবাই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন, গৃহকর্তা অনুরোধ করলেন আর একটি ইংরাজি গান গাইতে—বললেন, আমার ইংরাজি স্বরভঙ্গি ও উচ্চারণ অনেকেরই হৃদয়কে বিশেষ স্পর্শ করেছে। খুশি হ'য়ে গাইলাম প্রথমে মীরাবাই রচিত চাকর রাখোজি'র ইন্দিরা-কৃত নব সংস্করণ হিন্দিতে ইন্দিরার নৃত্য সঙ্গীতের সঙ্গে, পরে ইংরাজিতে একা। ইন্দিরা আরো একটি গানের সঙ্গে নাচল—"কাঁপি গগনমে কুঞ্জনবনমে"—তার স্বরচিত গান এটি। এ গানটিতে নানারকম তালফের সার্গম ছিল তাই গানটি জ'মে উঠতে দেরি হ'ল না। গানের শেষে সবাই ইন্দিরার নৃত্যের সম্বন্ধে কী উৎসাহেই যে কথা বললেন! বললেন আরো কিছুদিন কেন থাকি না—এ নৃত্যগীত আরো অনেকে দেখুক না। কিন্তু আমাদের থাকা সম্ভব হ'ল না নানা কারণে। দুঃখ হ'ল বৈ কি এজন্যে। কিন্তু আনন্দও হ'ল ওদের আগ্রহ দেখে। আমাদের সঙ্গে এসেছিল সেই যে মার্কিন যুবকটি—সে তো নৃত্যগীত শুনে ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। ইউ-এন ও র সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত, নিজে বক্তা। হয়ত ওর মধ্যে দিয়ে আমাদের গানের মহিমা সম্বন্ধে কিছু জানবে বাহিরের শ্রোতা। এমনি ক'রেই তো সঙ্গীতের, কাব্যের, শিল্পের বীজ বোনা হ'য়ে থাকে—আর কার হৃদয়ে যে কোন্ বীজে ফসল ফলে কেউ কি জানে? যুবকটি পরদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করল ও বলল আমেরিকায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবেই করবে। সানফ্রান্সিস্কো ও নিউয়র্কে ওর সঙ্গে ফের দেখা হবে ভাবতে ভালো লাগল আরো এই জন্যে যে ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে যুবকটি মুগ্ধ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন আমাদের ও ভাই। কত যে ফাই ফরমাস খাটত আমাদের সানন্দে!

* * * *

(ক্রমশঃ)

অপরাহ্নে

কল্পনা দেবী

হৃদয়ে যখন জেগেছিল মধুমাস,
মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যালোকে
অন্তরের শাখা-প্রশাখা হয়েছিল আলোকিত,
নানা বিহঙ্গের কল কাকলিতে
মানসবন ছিল মুখর মধুর,
জীবন-জল-তরঙ্গ যখন উচ্ছল ধারায়
তটরেখা ছাপিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল
কত শ্যামল-প্রান্তর,
ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল,—
সীমা হ'তে সীমান্তরে—
কত অমূল্য মহাপ্রাণ,
তখন, হে সাধক, কোথায় মগ্ন ছিলে তুমি
সফল ক'রতে তোমার সাধনাকে?
কোথায় বা ছিল তোমার এই সাজি ভরা ফুলভার,
আর ডালিভরা ষোড়শোপচার?
নৈবেদ্য নিবেদনের শুভলগ্ন হয়েছে গত
বহুক্ষণ আগে,
হৃদয়-মন্দিরের দ্বারও হয়েছে রুদ্ধ,
ঘনিয়ে এসেছে অপরাহ্ণ
গোধূলির রাঙারশ্মি-পাত হয়েছে
জীবনের আঙিনায়,
ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সোপানের শ্রেণী,
প্রবেশ পথ আর ত নেই
বাধাহীন, সহজ।
ফিরিয়ে নিয়ে যাও হে পূজার্থী
তোমার ওই পুষ্প সম্ভার।
বৃথা আঘাত হেনে
জর্জরিত কোরে তুল না তোমার ওই
প্রশস্ত, রক্তিম ললাট;
এ পাষাণ বেদীর বক্ষ বিদীর্ণ কোরে
কখনও জাগবে না সুধা নির্ঝরিণী,
তরুণ অরুণ-রাগের পরশ পেয়ে
কখনও ফুল ফুটবে না—
এই কঠিন শুষ্ক
মরুমন্দির-চত্বরের শিলায় শিলায়;
মন্ত্র মুগ্ধ এ প্রতিমার সুপ্তিভঙ্গ
কখনও হবে না জেনো
তোমার ওই সোনার হাতের ছোঁওয়া লেগে;
নিঃশেষিত প্রায় প্রাণ ধারা আর কখনও
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উৎসারিত হয়ে উঠবেনা;
তোমার তৃষিত, উত্তপ্ত বক্ষের অতৃপ্ত পিয়াসা
মিটিয়ে নিতে পারবে না
আর এই ক্ষীণ-বারি-রেখার
হিমস্পর্শ দিয়ে;
বেদনা তোমার রয়ে গেল অনিবেদিত,—
অশ্রুত অকথিত রয়ে গেল তোমার মানস-প্রার্থনা॥

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গোপাল দ্বিপ্রহরে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন—

বিল্বমূলে শরতের অপরাহ্নরৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, তাল ও শালবনের মাথায় নিস্তব্ধ আলোক রশ্মি। মণ্ডপের সম্মুখে কাষ্ঠের গুড়ি জ্বলিতেছে, তাহার কম্পমান ধূম ধীরে ধীরে বায়ুস্তরে মিশিয়া যাইতেছে। ধূপ ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল সুরভিত। গোপাল উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না,—তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি যেন এক প্রলয় ভূকম্পনে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পূজান্তে তিনি যে দক্ষিণা বা দান গ্রহণ করেন তাহা কি তাঁহার প্রাপ্য নয়? ন্যায্য প্রাপ্য হউক আর নাই হউক, ভিক্ষার দান, অবহেলায় দানকে তিনি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? যে পূজায় তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না, তাহারই জন্যেই বা তিনি কিরূপে দান গ্রহণ করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে গোপাল থামিয়া গিয়াছিলেন। শশধর কখন যেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন— সম্ভবতঃ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। গোপাল মুখ তুলিতেই শশধর প্রশ্ন করিলেন —কি ঠাকুরমশায় কি?

গোপাল কহিলেন—ব'সো শশধর। কেন যেন পূজায় আমার মনঃসংযোগ হচ্ছে না। বৎসরান্তে মাকে ডাকবো কিন্তু তা'ত ঠিক পারছি না। তুমি অন্য পুরোহিত ব্যবস্থা কর, পূজা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হবে না।

শশধর ম্লানমুখে কহিলেন—সে কি ঠাকুরমশায়, আমি ত আপনাকেই পুরোহিত জানি—আমি ত কোন অপরাধ করিনি —

গোপাল কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু কেন যেন তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছিল। কহিলেন —অপরাধ নয় শশধর, আমার ভয় হ'চ্ছে, একান্ত মনে পূজা আমি যেন করতে পারবো না। পূজার অঙ্গহানি হবে, আমার তোমার সকলেরই অপরাধ হবে—

চাঁদমোহন আসিয়া কহিল—কি, ঠাকুরমশায় কি?

শশধর কহিলেন—ঠাকুরমশায় ব'লছেন, অন্য পুরোহিত দেখ্‌তে, তাঁর দ্বারা পূজা যেন সুসম্পন্ন হবে না এমনি একটা ভাবনা হ'য়েছে ওঁর…

চাঁদমোহন কহিল—কেন? পূজা অঙ্গের ফর্দ্দ ত আমি বিশেষ কিছু কাটি নি। কেবল দুখানা কাপড়, আর দুটি টাকা দক্ষিণা কেটেছি মাত্র—

গোপাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন—ফর্দ্দ কম হইতেছে বলিয়া, নেহাৎ স্বার্থের জন্যে তিনি পূজা করিবেন না একথা চাঁদমোহন ভাবিল কিরূপে? ধীরে ধীরে কহিলেন—সেজন্যে নয় চাঁদু। আমার মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না, পূজার অঙ্গহানি হবে শেষে—

—ওসব কিছু না, উৎসব এই মাত্র। পূজা তার অঙ্গ, মন্ত্র পড়লেও হয়, না পড়লেও পূজা হ'তে পারে। ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।

গোপাল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদুর কথাগুলি অত্যন্ত নতুন, কেমন যেন সূচের মত অন্তর বিদ্ধ হয়। গোপাল কহিলেন—তবে এই পূজায় লাভ কি? যদি ভক্তি, শ্রদ্ধাই না থাকে?

—পৈতৃক কাজ, তাই চল্‌ছে। অন্যথা অর্থব্যয়, তা হ'লেও উৎসব মানুষের জীবনে চাই ত! তাই পূজা-পার্ব্বণ ব্রত-প্রতিষ্ঠা।

গোপাল আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন—সত্য কথা ব'লতে কি চাঁদু, তোমার কথায় আমার বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি যেন নড়ে উঠেছে। সত্যই কি ব্রাহ্মণ দান গ্রহণের পাত্র নয়, আমরা কি সমাজ সেবার বিনিময়ে এটা পেতে পারি না? মানুষকে ভাল কথা, তার মঙ্গলের জন্যে জীবনের শিক্ষা দীক্ষা দান করে এই দান পেতে পারি না? সেটা কি একান্তই মানুষের ধর্ম্মান্ধতার সুযোগ গ্রহণ করা? এই চিন্তাটা মনের মাঝে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে চণ্ডীপাঠে মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না। নিজের কাজে নিজেকে অপরাধী মনে হ'চ্ছে, তাই বলছিলাম অন্য কেউ হয়ত সুষ্ঠুভাবে পূজা করতে পারতো—

চাঁদু মুরুব্বির মত হাসিয়া কহিল—যাক্‌গে, এখন ত পূজা করুন ওকথা পরে হবে।

গোপাল ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন।

অষ্টমী পূজা—সকাল সাত দণ্ডের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। অতি প্রত্যূষে পূজার আয়োজন হইয়াছিল এবং যথাসময়ে পূজা সমাপন হইয়াছে।

শশধর ও বনলতা মণ্ডপে অঞ্জলি দিবার জন্যে উপস্থিত হইলেন। পূজা গৃহে কেহ নাই, কেবলমাত্র গোপাল বসিয়া আছেন। উভয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন গোপাল করজোড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। গোপালকে এমনি একটা অবস্থায় দেখিয়া বনলতা ও শশধর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভাবিলেন ভক্তের ভক্তি-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া দুইজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোপাল হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলেন—মা, করুণাময়ী অপরাধ নিও না মা। আমার পাপে আমাকে শাস্তি দিও, নিরপরাধকে শাস্তি দিও না।

গোপাল একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিলেন, বনলতা দাঁড়াইয়া, তিনি প্রশ্ন করিলেন—কতক্ষণ এসেছ মা? অঞ্জলি দেবে? এস—এস—

গোপাল অঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করাইয়া দিলেন। শশধর প্রশ্ন করিল—আপনার এমন হ'য়েছে কেন ঠাকুরমশায়? আপনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল—

গোপাল কহিলেন—হ্যাঁ শশধর, সত্যই মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চল্‌ছে, পূজা করতে পারছি না। তোমাদের কল্যাণার্থে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে, আমি ত ঠিক পূজা করতে পারিনি, তাই সে অপরাধ আমার—তাই মাকে ব'লছিলাম—

শশধর কহিল,—চাঁদুর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমাদের মঙ্গল। সে কি শিক্ষা পেয়েছে জানি না, যুগেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, কিন্তু আমরা যতদিন আছি আমরা মায়ের নামেই থাক্‌বো, আমাদের যথা কর্ত্তব্য করবো—

গোপাল পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—কিন্তু—চাঁদুর এ বিদ্যাও ত মিথ্যা নয়। তা হ'লে ইংরেজ এত শক্তিমান হবে কেন? তাই মনে সন্দেহ জেগেছে, নিজে বড় হওয়াই কি সব? জগতের কল্যাণে সে ধন শক্তির ব্যয় কি অপচয়? কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র ত এ কথার সায় দেয় না—

গোপাল থামিয়া থামিয়া কহিলেন—যে দান ছিল শ্রদ্ধার, সে দান আজ হ'য়েছে উপেক্ষার, করুণার। এ দান আমি কি করে গ্রহণ করি শশধর? চাঁদু কেমন করে ভাবলে, দুখানা কাপড় আর দক্ষিণার টাকা কম হওয়ায় আমি পূজা করবো না, মানুষ মানুষকে এত ক্ষুদ্র ভাবলে কি করে? পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া কি কিছুই নেই? এ শিক্ষা আর এই সভ্যতা ত তা হ'লে দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে রক্তাক্ত করে দেবে—

গোপাল আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—মা, জগজ্জননী করুণাময়ী মা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা, ধরিত্রীকে রক্ষা কর মা।

অত্যন্ত আবেগ ভরে গোপাল মৃন্ময়ী চিন্ময়ীর পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিলেন। তাহার চক্ষুদুটিতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল শশধর ও বনলতা বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কিছুই বুঝিলেন না।

বাগদী ও বাউরী পাড়ার কতকগুলি লোক অষ্টমীর প্রাতে চণ্ডীতলায় বসিয়াছিল—অদূরে তাহাদের গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। শিবদাস নিতাই ও বলাই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মুখে একটা বিষণ্ণতা দেখা দিয়াছে। একজন কহিল—পূজা দেখতে যাবেক নাই রে?

ভরত-পুত্র বলাই কহিল– কোথা আর যাবেক, ছোটবাবু ত নেমন্ত বন্ধ করলেক—বাবা বলেছে, ঘর পুড়ে গেলে ছোটবাবুর বাপ্ ছ'মাস গোলা থেকে খাওয়া করালেক, বসন্ত সায়র করলেক—

নটবর পুত্র নিতাই বলিল—বড়কর্ত্তা কত বলা করলেক, ঠাকুর মশায় বলা করলেক কিন্তু ছোটবাবু ছাড়লেক নাই। কলকাতা বাড়ী করবেক—টাকা চাই—

নীলমণি পুত্র শিবদাস বলিল—হোথা খাওয়া করাবেক, মোদের খাওয়াবেক কেনে? মোরা যাবেক নাই। কেনে যাবে, না ডাকলে কেনে যাবেক?

সকলের মাঝেই একটা অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাই সকলে কহিল,—কেনে যাবেক, ছোটবাবু ত মোদের চাইলেক না। পূজা ত মোদের না রে।

বলাই কহিল,—বড়কর্ত্তা ত বাপের বেটা বটেক—মোদের ত বহুৎ ক'রলেক—

শিবু কহিল—পূজা ত বড়কর্ত্তার একার লয় বটে—অভিমান ক্রমশঃ রাগে পরিণত হইল, এবং আজ অকস্মাৎ ছোটবাবু যে তাহাদিগের পুরুষানুক্রমিক মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করিয়াছেন সেজন্য একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল এবং স্থির হইল তাহারা কেহ আর পূজা দেখিতে যাইবে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে বলাই চুপি চুপি গিয়া কহিল,—শিব্ নিতাই চল, নেমন্ত মোরা করে লেবেক—

—সে কি বটে—

—চল্, বসন্ত সায়রে তোগী এড়া করবেক, জাল ফেলবেক, মাছ লিয়ে ভোজ দেবেক—চল—

—কর্ত্তার সায়র বটে, মোদের জিম্মা—মাছ ধ'রবেক।

—হাঁ হাঁ, চল্। পূজার নেমন্ত করে লেবেক চল—

কিছুক্ষণ বাদে তাহাই স্থির হইল এবং বলাই এর ওখান হইতে পচুঁই পান করিয়া তাহারা জাল লইয়া বসন্ত সায়রে উপস্থিত হইল। অষ্টমী পূজার রাত্রি কেহ কোথায়ও নাই। ক্ষীণ চন্দ্র নিষ্প্রভ, কিছুক্ষণ বাদেই তোগীতে একটা বড় মাছ আটকাইয়া লাফ দিল। তিনজনে সেটাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দ্রুত গৃহে আসিয়া পৌছিল। বলাই স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল—আরে, সুমী লে কোটা কর। ভাল করে রাঁধা কর,—মোরা খাবেক—

স্ত্রী সুমীর উপর রন্ধনের ভার দিয়া তাহারা পচুঁই এর পাত্র ও মাদল লইয়া বসিল। নেশা করিতে করিতে বলাই কহিল,—আরে শিবুদা, বৌ আনা করা, মোরা লাচবেক। বলাই মাদল বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

গভীর রাত্রে নেশার ঘোরে শিবু কহিল—বেশ পূজা হলেক বটে, কোথা লাগে নেমন্ত—দূর তো ছোটবাবু—

বসন্ত সায়রের মাছ রক্ষা করাটা এতদিন তাহারা পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে পালন করিয়াছে কিন্তু আজ প্রবল অভিমানে সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহা চুরি করিয়া নেশার ঘোরে মাতলামি করিতেছে—

নবমী পূজান্তে ছোটলোক পাড়ায় সকলে শুনিল—বসন্ত সায়রের মাছ দিয়া ছোটবাবু গ্রামের সম্মানিত সকলকে কালিয়া কোর্ম্মা করিয়া খাওয়াইয়াছেন, লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কি সব নূতন নূতন খাদ্য খাওয়াইয়াছেন এ দেশের লোক তাহা পূর্ব্বে খায় নাই। তাহা দেখেও নাই। কলিকাতার নূতন জিনিস, নূতন রন্ধন পদ্ধতি ;—

ছোটলোক পাড়ায় সকলে সে গল্প শুনিল, কিন্তু কোন বিস্ময় অনুভব করিল না। তাহারা খাদ্যাদির বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে একটু কৌতূহল অনুভব করিল মাত্র।

বিজয়ার দিনে সরকার তিনকড়ি সকলকে প্রতিমা বিসর্জ্জনে যাইবার জন্য ডাকিয়া গেল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার জন্য সহস্রাধিক লোক সমবেত হইত কিন্তু আজ কেহই নাই, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সামান্য অন্যান্য জাতির লোক আছেন মাত্র কিন্তু প্রতিমা বহন করিবে কে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, শতাধিক রেড়ির তৈলের মশাল প্রস্তুত কিন্তু কেহই নাই। শশধর ও গোপাল মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। চাঁদমোহন আসিয়া কহিলেন—এখনও মালপাড়া বাগ্দীপাড়ার সব এল না কেন?

—তাই ভাবছি। শশধর ম্লানমুখে উত্তর দিলেন—

—তিনুকে ত ডাক্‌তে পাঠিয়েছি সেও ত ফিরছে না—

কিছুক্ষণ বাদেই তিনকড়ি আসিয়া সংবাদ দিল—কেহই আসিবে না।

চাঁদমোহন প্রশ্ন করিল—কেন?

তা ত' জানি না।

গোপাল কহিলেন—এ পূজা তাদেরই পূজা, এ কথা ত তারা আজ ভাবছে না—তাই আসছে না বোধ হয়। তাদের ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি—

চাঁদমোহন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—কেন? তারা আমার জমিদারীতে বসবাস করে না, 'ভিটে ছাড়া করে দেব। আচ্ছা দেখছি তাদের—যাও তিনু বল গিয়ে, যে

যে আসবে সব চার আনা করে পাবে, দেখি তাতেও আসে কিনা?

তিন্ত পুনরায় ছুটিল এবং কিছুক্ষণ বাদে জন বারো লোক লইয়া ফিরিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে -প্রতিমা বরণ করিয়া পুরবধূগণ প্রস্থান করিয়াছেন। মশাল জ্বালা হইল—প্রতিমা স্কন্ধে বারজন বেতনভুক লোক পিছনে পিছনে চলিল—সামনে চলিল মশালধারী সরকার বরকন্দাজ প্রভৃতি। শতাধিক লোক প্রতিমা লইয়া শিবসায়রে বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিল -

শিবসায়রের ঘন তালবনের নীচে উচ্চ পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া, নিতাইদের পাড়ার আবালবৃদ্ধ বনিতা দূর হইতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিল। চিরদিনের প্রথা মত মণ্ডপে যাইয়া প্রণাম করিয়া পরস্পর কোলাকুলি না করিয়া আজ তাহারা ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কোজাগরীর পরেই চাঁদমোহনকে কলিকাতা যাইতে হইবে। চাঁদমোহন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন সেজন্য অর্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, সেই জন্য তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, শশধরের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা বলা প্রয়োজন—

গোপাল ও শশধর বৈঠকখানায় কোজাগরী পূজার হিসাবপত্র করিতেছিলেন। চাঁদু আসিয়া কহিল—কি করছেন ঠাকুরমশায়?

—লক্ষ্মী পূজার ফর্দ্দটা দেখছিলাম—

চাঁদমোহন কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া কহিল—খরচপত্র কমিয়ে ফেল দাদা, সমস্ত আয় যদি পূজা পার্ব্বণেই ব্যয় হয় তবে ভবিষ্যৎটা কি থাকবে?

কথাটার সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন—কালকাতা বাড়ীটা করাই দরকার, আমার কিছু টাকা চাই তাই খরচপত্র করে বাড়ী আসা, নইলে এ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম পোষায় না—

গোপাল কহিলেন—কলকাতাতেই বসবাস করবে নাকি? তা হলে দেশে থাকবে কে?

—দাদা থাক্‌বে। ক'লকাতা না থাক্‌লে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা হবে কি করে? সেখানে দুদিক থেকে দু'পয়সা রোজগার করবার পথ আছে—

—তোমরা শিক্ষিত হ'য়েছ, তোমরা গ্রামে থেকে গ্রামের মঙ্গল করলেই দেশের মঙ্গল, কিন্তু তোমরা সব যদি শহরে যাও দেশ ত কাণা হ'য়ে যাবে—

চাঁদমোহন একটু ব্যঙ্গ করিয়াই কহিল—আপনারা রইলেন,—আপনারাও ত শিক্ষিত—

—সে শিক্ষা কি আর এ যুগে চলবে—

—কিন্তু আমাদের শিক্ষাও ত এখানে চলবে না, এখানে আপনাদের শিক্ষাই চলবে—যাক্ গে ওসব কথা ঠাকুরমশায়। আমাকে খাজনা আদায় করে কিছু দিতে হবে দাদা—

শশধর অবাক হইয়া কহিলেন—এখন কি খাজনা আদায় হয়! প্রজাদের খাবার ধানই নেই।

কিন্তু আমার দরকার, টাকা তাদের দিতেই হবে। বেচে কিনে দেবে আবার ধান-পান হ'লে কিনে নেবে—

গোপাল শান্তকণ্ঠে কহিলেন—সেটা অত্যাচার হবে চাঁদমোহন—

—কিন্তু আমার প্রয়োজনটা আগে ভাবতে হবে ত?

—জমিদার হিসাবে তোমার কর্ত্তব্য তাদের প্রতিপালন করা, সে কর্ত্তব্যটা ত ক'রতে হবে। অসময়ে খাজনা আদায় করাটা কর্ত্তব্য হবে না—

—কিন্তু প্রজারও ত কর্ত্তব্য আছে, খাজনা দেওয়াটা তাদেরও কর্ত্তব্য। তারা কি তা ক'রছে? পূজার সময় প্রতিমা নিতেও ত তারা আসেনি—

—সেটা তাদের অভিমান, নিমন্ত্রণ হয়নি—

—নিমন্ত্রণ করাটা আমার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে তাদের উপর ত নির্ভর করে না। না পারলেও খাওয়াতে হবে এত বড় মজার আব্দার? আমি খাইয়ে ফতুর হই, আর তারা নেচে কুদে আমার অপমান করুক—আসল কথা কি জানেন, আপনার টাকা আছে এই কথাটাই যথেষ্ট, তাতেই সংসারে সব হয়—টাকা থাকলেই সব—অন্য সব দয়া, মায়া, স্নেহ কর্ত্তব্য সবই টাকার খেলা। টাকা দিলে ভাল, না দিলে খারাপ এই হচ্ছে জগৎ—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তোমাদের এ চিন্তার সঙ্গে আমাদের চিন্তা মিলেনা—আর আমরা ক'দিন! তোমাদের ইচ্ছা মতই চল্‌বে। আমাদের মনে হয় স্নেহ মমতা ভালবাসা সততা এসব টাকার অনেক উর্দ্ধে, টাকার দ্বারা তা পাওয়া যায় না—সম্মানও নয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া উঠিলেন—হাসিতে একটা অবজ্ঞা ও বিক্তার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। গোপাল কোন জবাব না দিয়া প্রস্থান করিলেন। চাঁদমোহন কহিল—আমাদের সমস্ত ঘরের কথার মধ্যে ঠাকুরমশাই কেন? তিনি পূজার্চ্চনা ক'রবেন, দক্ষিণা পাবেন, ব্যস্। এসব কথা ওর কাছে কেন?

শশধর সংক্ষেপে কহিলেন—বাবার আমল থেকে চ'লে আস্‌ছে।

—কিন্তু বাবার আমল ত নেই। দিনকাল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখন খাজনা আদায়ের কি করবে—

-এখন খাজনার কথা বলাটা ত ধর্ম্ম নয়, তাই ভাবছি।

—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই গেলে। নিজেকে রক্ষা করা, বড় হওয়াই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। তুমি কিছু ব'লো না, আমি টাকা আদায় করে নিচ্ছি। টাকা কি করে আদায় করতে হয় তা আমি জানি।

শশধর কোন জবাব দিলেন না। চাঁদমোহন কহিলেন—গোঁয়াদা লোকটার নাম কি?

—কালী বাগদী—

চাঁদমোহন কালী ও সরকার তিনুকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, যাও, সমস্ত প্রজাকে—না হয় সমস্ত পাড়ার মোড়লকে কাল সকালে কাছারীতে হাজির হ'তে বলে এসো। গ্রামছাড়া অন্যান্য মৌজাও ডাক্‌বে—

কালী ও তিনু কহিল—আচ্ছা ছোটবাবু—

পরদিন সকালে কাছারী বাড়ীতে মাতব্বর প্রজা সকলে সমবেত হইল। চাঁদমোহন শশধরকে সঙ্গে লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া প্রণাম জানাইল।

পলাশডাঙ্গার গোষ্ঠ মাতব্বর কহিল—বড়কর্ত্তা, আমাদের গাঁয়ে কিছু ধান দাদন না দিলে সকলের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। গত সন দক্ষিণ মাঠের ধান পোকায় মেরে দিয়েছিল —

চাঁদমোহন কহিলেন—বড়কর্ত্তা কি? বড়বাবু বলবে—সব—

—হ্যাঁ হুজুর, বড়বাবু। আমরা ছোটনোক, কথা বলতে জানি না—

চাঁদমোহন উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন—শোনো তোমাদের ডাকা হয়েছে কেন, তাই বলি। আমি আর চার পাঁচদিন থাক্‌বো, তার মাঝে তোমরা বকেয়া সমস্ত খাজনা মিটিয়ে দেবে, আর হাল ছমাস দেবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে -

বলাই কহিল—হুজুর, ছোটবাবু, ঘরে খাবার ধান নাই, খাজনা দেবেক কেমনে? মনিব খাটা করাবেক -

—চুপ, ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। মদের ধান, বিয়ের টাকা সব জোটে, কেবল জমিদারের খাজনাটা জোটে না—যারা দেবে তারা বাধ্য প্রজা বলে ধ'রে নেব। যারা দেবে না তারা অবাধ্য বলে গণ্য হবে, এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ করে তাদের উচ্ছেদ ক'রে দেব। তাই বুঝে চল্‌বে—ধান দাদন বরাবর তোমরা চাও আমি আজ ন্যায্য টাকা চাইছি তাতে আপত্তি হবে কেন?

শিবু উঠিয়া কহিল—হুজুর মা বাপ, খাজনা চৈত মাসে মোরা শোধ করবেক, এ কার্ত্তিক মাসে কোথা পাবেক সব?

—ইচ্ছে থাক্‌লে হবে, কিন্তু অনিচ্ছা থাক্‌লে ব্যাপারটা গুরুতর হবে জেনে রেখো—

সকলে পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল—এমন অবিবেচনার আদেশ তাহারা কখনও পায় নাই তাই সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

দাদ্‌রা

এমনি করেই আঘাত আমার দিও
দিও বারে বারে—
যেন আপনারে মোর হারিয়ে যেতে পারি
ব্যথার সায়র পারে।

এলে চলার পথে ঝড়ের রাতি
যদি পথের ধারে আসন পাতি
তুমি চলবে কি গো সে পথ বেয়ে
দুঃখ অভিসারে।

তখন ছিন্ন বীণার তারে বাজবে ব্যথার গান
শেষ হবে মোর দেওয়া নেওয়ার দুঃখ অভিমান।
আমার সকল কাজের মাঝে
যেন তোমারি সুর বাজে—
তোমায় ভোলার ছলে যেন
তোমায় আনি ধরে।
শেষ হ'লো মোর দেওয়া নেওয়া
হয়নি শুধু তোমায় চাওয়া
যেন তোমায় আমি পাইনি ভেবে
ভাসি নয়নধারে।

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী স্বরলিপি—শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় এম-এ

+ ০ ১ ০
II পা সঁা র্সনা | ধর্সনা ধা পা I পা মা ধ-পা | মা গমা র-গা I
এ ম নি ক০০ রে ই আ ঘা ত আ মা০ য়

গমা মপা -া | -া -া -া I সা সা রা | সা রগা গরসা I
দি০ ও০ ০ ০ ০ ০ দি ও ০ বা রে ০০০

সরা রগা -া | -া গা গমা I মা মা মা | মা মপা পমগা I
বা০ রে০ ০ ০ যে ন০ আ প না রে মো০ ০০র

গা গা গপা | মা মা মপা I পমা গা -া | গরা সা -া I
হা রি য়ে০ যে তে ০ পা রি ০ ০ ০ ০

ধ্া সা সা | সরা সরগা গরসা I সরা রগা -া | মা মপা মগা I
ব্য থা র সা০ য়০০ ০০র পা০ রে০ ০ ০ ০ ০

+ ০ + ০
পা -া -া | ধা ধনা নধপা I পধা পর্সা র্সনা | ধপা মগা মা II
বা ০ ০ রে ০০ ০০০ বা০ ০০ ০ রে০ ০০ ০

II পা না না | র্সনা ধা পা I পা মা ধপা | মা গা রগা I
এ ম নি ক রে ই আ ঘা ত আ মা য়

মা পা -া | { -া পা পধনা I নধা পা গা | পা পা ধা I
দি ও ০ ০ এ লে০০ চ লা র প থে ০

ধ্রর্সা র্সা র্সা | র্সা ধা ধর্রর্গা I র্রর্সা -া -া | -া পা পনা I
ঝ০ ড়ে র রা ০ ০০০০ তি ০ ০ ০ য দি০

না না না | না না নর্সা I ধা না না | ধা র্সা র্সনা I
প থে র ধা রে ০ ০ আ স ন পা ০ ০

ধপা -া -া} | -া পা পা I পা না না | ধা ধনা নধপা I
তি ০ ০ ০ তু মি চ ল বে কি গো০ ০০০

পা পা ণধপা | পধা গা মা I রগা পা -া | -া পা পা I
সে প ০০থ বে য়ে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি

পা না না | ধা না ধপা I পা পা ণধা | পমা গা -া I
চ ল বে কি গো ০ সে প থ বে য়ে ০

পা পা ধপা | মা গা গমা I রা গা -া | মা মপা মগা I
দু ০ খ অ ভি ০০ সা রে ০ ০ ০ ০

পা -া -া | ধনা ণধা পা I পধা পর্সা র্সনা | ধপা মগা মা II
বা ০ ০ রে ০ ০ বা০ ০ ০ ০ রে০ ০০ ০

II পা না না | র্সনা ধা পা I পা মা পা | মা গা রগা I
এ ম নি ক রে ই আ ঘা ত আ মা য়

\+ ০ + ০
মা পা -া | -া সা সসা I সা রা রা | রা রা গা I
দি ও ০ ০ ত খন ছি ০ ন্ন বী ণা র

রা গা -া | রগা রগা রগা I মা রা গা | মা পা পা I
তা রে ০ ০ ০ ০ বা জ বে ব্য থা র

ম্মা পা -া | -া -া -া I পা না না | না না নর্সা I
গা ০ ০ ০ ০ ন শে ষ হ বে মো ০র

ধনা ধনা র্র্সা | র্সনা ধা পপা I পা ধা ধপা | মা গা মা I
দেও য়া০ ০ ০ নে ও য়ার দু ০ খ অ ভি ০

রগা -া -া | {-া পা পপা I গা পা পা | ধা র্সা র্সর্রা I
মা ০ ০ ন আ মার স ক ল কা জে ০ র

ধনা র্সা -া | -া পা পনা I না না -া | না ধনা র্রর্সা I
মা ঝে ০ ০ যে ন০ তো মা ০ রি সু০ ০র

র্সনা ধপা -া} | -া -া -া I পা পা না | ধা ধা ধনা I
বা জে ০ ০ ০ ০ তো মা য় ভো লা ০র

ণধা ধপা -া | -া পা পা I গপা পমা মা | গা রসা -া I
ছ লে ০ ০ যে ন তো০ মা য় আ নি ০

সা গা -া | -া -া -া I পা ধনা ণধা | পগা পা ধা I
ধ রে ০ ০ ০ ০ শে ০ষ হ লো মো র

র্সা র্সা র্সা | র্সা ধা ধর্সর্রর্গা I র্রর্সা -া -া | -া -া -া I
দে ও য়া নে ০ ০০০ও য়া ০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ + ০
পা না না | না না নর্সা I ধা না না | ধা র্সা র্সনা I
হ য় নি শু ধু ০০ তো মা য় চা ০ ০

ধপা -া -া | -া পা পা I পা পা না | ধা ধনা ধপা I
য়া ০ ০ ০ যে ন তো মা য় আ মি ০

পা ণা ণধা | পমা গা মা I রগা পা -া | -া পা পা I
পা ই নি ভে বে ০ ০ ০ ০ ০ যে ন

পা পা না | ধা ধনা ধপা I পা ণা ণধা | পমা গা -া I
তো মা য় আ মি ০ পা ই নি ভে বে ০

পা পা ধপা | মা গা গমা I রা গা -া | মা মপা মগা I
ভা সি ০ ন য় ০ন ধা রে ০ ০ ০ ০

পা -া -া | ধনা ণধা পা I পধা পর্সা র্সনা | ধপা মগা মা II
বা ০ ০ রে ০ ০ বা০ ০০ ০ রে০ ০০ ০

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে তন্ত্রের প্রভাব ও মূর্ত্তিরহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রত্নতত্ত্বার্ণব

উড়িষ্যায় তন্ত্র বা শৈবযুগে কেশরী রাজাদের প্রাধান্য ছিল এবং উড়িষ্যা প্রদেশে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে কেশরী বংশের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহারা ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকলাপ—যাজপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরীক্ষেত্র—এই তিন স্থানে শিব ও শাক্ত মন্দির সমূহ অজস্র অর্থব্যয়ে এই কালে নির্ম্মিত হয়। কেশরী বংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা যযাতি কেশরী যাজপুর নগর পত্তন করেন। মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দশ হাজার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ভুমিদান ও সাতটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণশাসন স্থাপিত করিয়া বৈদিক কৃষ্টি উড়িষ্যার চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের পরে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল—যাজপুর ভুবনেশ্বর ও পুরী। মাদলা পাঁজীর বর্ণনায় ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তৎকালীন অগ্নিহোত্রী ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণই অদ্যাপি উড়িষ্যা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পুরীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির চৌড় গঙ্গাদেব বা গঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক দশম শতাব্দীতে নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। চৌড় গঙ্গাদেব ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দেবের মন্দির তাহার পূর্ব্বে ভগ্ন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার অস্তিত্ব যে অতি পুরাতন তাহা গঙ্গাবংশের তাম্রপটে উল্লেখ রহিয়াছে (ইহা চতুর্থ নরসিংহ দেবের সময় খোদিত হয়)—

"প্রাসাদঃ পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কোনাম কর্ত্তুংক্ষমঃ
তস্যেত্যাদ্য নৃপৈরূপেক্ষিতময়ঃ চক্রেথ্য গঙ্গেশ্বর॥"

—অর্থাৎ যে কার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিবৃন্দ অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহা গঙ্গেশ্বর দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(গঙ্গেশ্বর বা চোড়গঙ্গা ৯৯৭ শকাব্দের নৃপতি)

জগন্নাথ দেবের মন্দির ও অন্যান্য অংশ আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল অনঙ্গ ভীমদেবের সময় (গঙ্গাবংশের পঞ্চম রাজা) ১১৯২ খৃষ্টাব্দে। পটলেশ্বর (জগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে) শিবমন্দিরের দ্বিতীয় প্রস্তরলিপি হইতে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে ভোগমণ্ডপের মন্দির এবং ভিতরের চারিদিকের প্রাচীর ১৫০০ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরুষোত্তম দেব দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অদ্য আমরা পূর্ণভাবে এই মন্দির দেখিতে পাইতেছি। স্থাপত্য ও মূর্ত্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন কালের ও উপধর্ম্মের সমন্বয়ে শ্রীমন্দির পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রধান মন্দির (বিমান) ও তৎসংলগ্ন জগমোহন মন্দির পুরাতন তাহা পূর্ব্বকালীন কারুকার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। এই দুইটী মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যাদি সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী রাজারা চূণ বালি দ্বারা আবৃত (পলাস্ত্রা) করিয়া মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও আদিম নিদর্শনগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকালের মতন অদৃশ্য করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব রাজাদিগের নির্দ্দেশমতই এই প্রণালীতে সেই যুগের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনগুলি লুপ্ত হইয়াছে। জগন্নাথ মন্দিরের ৮" ১০" আবরণ (পলাস্ত্রা) খুলিয়া ফেলিলে সেই কারুকার্য্যের নিদর্শনগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চিমদিকে বড় দেউলের উপরিভাগে যেখানে বৃহৎ নৃসিংহদেব পার্শ্বদেবতার কোটর মন্দির রহিয়াছে সেই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ২১৪ স্থানের চূণ বালির পলস্তরার আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া দেখা গিয়াছে ভুবনেশ্বর মন্দিরের মতন লতাপাতা ও নানা কারুকার্য্যে সুশোভিত এবং নানা প্রকার মূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়—যথা দশদিকপাল, অষ্টমাতৃকা প্রভৃতি।

উড়িষ্যায় তন্ত্রধর্ম্মের আধিপত্য বিষয়ে আলোচনা করিলে তন্ত্রসারের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লেখযোগ্য—"বিমলা ভৈরবী যত্র, জগন্নাথস্তু ভৈরব" —শ্লোকটী পীঠস্থান মাহাত্ম্যে রহিয়াছে। ভৈরব-ভৈরবী ভাবে পূজাপদ্ধতি, মহাপ্রসাদ নিবেদনাদির মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। উড়িষ্যা দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবের প্রমাণের অভাব নাই। নারদের আদ্যাস্তোত্র মধ্যে এই শ্লোকটী তাহার অন্যতম প্রমাণ—"রামেশ্বরী সেতুবন্ধে, বিমলা পুরুষোত্তমে, বিরজা ওড়দেশে চ (যাজপুর), কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে।" তান্ত্রিক মণ্ডলী ও মূর্ত্তিতন্ত্র অনুযায়ী শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিশাখা যন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অষ্ট পদ্মদলে অষ্ট মাতৃকা অবস্থিত, অষ্ট শম্ভু বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। একদিকে মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী—তিন কোণে, পাতালে ঈশানেশ্বর, পাতালেশ্বর, অগ্নিশ্বর, ভৈরবত্রয়—একদিকে মঙ্গলা, অন্যদিকে উত্তরাণী, মধ্যে গণপতি। শ্রীনাথাদি গুরুত্রয়ং অভ্যন্তরে অবস্থিত— ইহাই তন্ত্র স্থাপত্য বিস্তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই স্থাপত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত বিশাখা যন্ত্রে অন্ন অর্পিত হইয়া মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে অষ্টাশক্তি দ্বারা আবৃত—

(১)	অগ্নিকোণে বটমূলে	মঙ্গলা দেবী
(২)	পশ্চিমে	বিমলা দেবী
(৩)	বায়ুকোণে	সর্ব্বমঙ্গলা দেবী
(৪)	উত্তর দিকে	অর্দ্ধাশিনী দেবী
(৫)	ঈশান দিকে	লম্বা দেবী
(৬)	দক্ষিণ দিকে	কালরাত্রি দেবী
(৭)	পূর্ব্ব দিকে	মরীচিকা দেবী
(৮)	নৈঋতে	চণ্ডরূপা দেবী

এই ভীষণরূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্ব্বেদী সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে—

(উৎকল খণ্ড—চতুর্থ অধ্যায় ৫৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০)

শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগ অষ্টদিকে অষ্ট রুদ্রের দ্বারা ক্ষেত্রভূমি আবৃত। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ অষ্টপ্রকার বিভক্ত রুদ্রকে সকল দিকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং মধ্যে অবস্থিত হইলেন। (১) কপালমোচন শিব (২) কাম শিব (৩) ক্ষেত্রপাল শিব (৪) যমেশ্বর শিব (৫) মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিব (৬) বিল্বেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর শিব (৭) নীলকণ্ঠ শিব (৮) বটেশ্বর শিব—মহাদেবের এই অষ্টলিঙ্গ বিধিপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে—উৎকল খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, ৫৭-৫৯।

উড্ডীশ তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী—জগন্নাথ—মহাকালী, সুভদ্রা—মহালক্ষ্মী, বলরাম—মহাসরস্বতী। এই ত্রিমহাশক্তির বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, কাঞ্চন ও শুভ্র; সুতরাং মূর্ত্তিত্রয়ের রূপ কল্পনার সহিত ইহাও আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়া যায়। শ্রীজগন্নাথ দেবের ক্ষেত্রকে মহোদধিতীর্থে (মহাসাগর) শঙ্খক্ষেত্র নামে কথিত হয়। শঙ্খের প্রথম আবর্ত্তে—স্বর্গদ্বার শ্মশানের শ্মশানেশ্বর শিব। শঙ্খের দ্বিতীয় আবর্ত্তে—পঞ্চমুণ্ডের এক মুণ্ড পতিত হয় —এই স্থানটী ব্রহ্মকপালমোচন শিবলিঙ্গ ভাবে পূজিত হয়—এই মন্দির অতি পুরাতন। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার অপর পার্শ্বে ২০ ফিট নিম্নে ইহা অবস্থিত।

শঙ্খের তৃতীয় আবর্ত্তে—শ্রীশ্রীজগন্মাতা বিমলা দেবীর মন্দির—যাহা ভারতবর্ষে দেবীর বাহান্ন পীঠস্থানের এক প্রসিদ্ধ পীঠ, যেখানে দেবীর নাভি পতিত হইয়াছিল।

শঙ্খের নাভিদেশে—রোহিণী কুণ্ড, কল্পবট ও অর্দ্ধাশিনী দেবী বিরাজিত আছেন।

যেখানে সমুদ্র ও নদী (যে নদী শ্রীমন্দির বেষ্টন করিয়া গিয়াছে) মিলিত হইয়াছে সেখানে বালির পাহাড়ের উপর হরচণ্ডী দেবী অবস্থিত—ইহা পুরী মন্দির হইতে পশ্চিমদিকে ছয় মাইল দূরে স্থাপিত। ইনি বিশেষ জাগ্রত চণ্ডীদেবী ভাবে পূজিত—রাত্রিকালে মন্দিরের নিকট কেহ অগ্রসর হয় না। পুরোহিতরা সন্ধ্যাকালে পূজা ও ভোগাদি দিয়া চলিয়া আসেন। এখানে দেবীর বাহনস্বরূপ অনেক বিড়াল রহিয়াছে। গভীর রাত্রিতে মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সেই অগ্নি আলেয়ার মতন মধ্যে মধ্যে জ্বলিতে জ্বলিতে শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়—সেই স্থানের বাসিন্দারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া চণ্ডীদেবীকে স্বতঃই ভয়াবহ চণ্ডী নামে আখ্যা দেয়।

প্রতিদিন জগন্নাথদেবের নিজস্ব নির্ম্মাল্য মালা হরচণ্ডী দেবীকে প্রাতঃকালে বহন করিয়া আনিয়া অর্পণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। হরচণ্ডী দেবীকে বলি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং শারদীয় পূজার সময় বিশেষ উৎসব ও বলি হয়। ইঁহার খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রসিদ্ধ। এই মন্দির পুরীর রাজার নিজস্ব সম্পত্তি।

চণ্ডীদেবীর বাহন সিংহমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের সম্মুখে (পূর্ব্বদিকে) দ্বারপাল-অবস্থিত এবং এই প্রধান দরজা সিংহদ্বার নামে খ্যাত। মন্দিরের শৃঙ্গে শ্বেত ও লাল পতাকা উড্ডীয়মান হয়—শিব দুর্গার মিলনের প্রতীকস্বরূপ।

বলরাম রুদ্রমূর্ত্তি এবং চক্রেশ্বর—বারুণী, গৌরী বা কাদম্বরী মদ্যপানে যাহার চক্ষু রক্তিমাভ এবং চক্ষুদ্বয় ডিম্বাকার—ধ্যান যথা "মধুপানে সদা মত্ত, সদা ঘূর্ণিত লোচনম্।" জগন্নাথ, বলরাম উভয় মূর্ত্তিই শক্তিসংযুক্ত শিব—যথা ধ্যানে "প্রনত্তং শক্তিসংযুক্ত বাণাখ্য চ মহাপ্রভুং।"

জগন্নাথদেবের নিদর্শন সুদর্শন চক্র বাণলিঙ্গের মতন লম্বা ও শক্তি চিহ্নযুক্ত (চক্রের ন্যায় গোলাকার না)। সুভদ্রা যে কৃষ্ণভগ্নী নহেন তাহার এক প্রমাণ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা সুভদ্রাকে "জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।" "ভদ্রা ভদ্রাস্বরূপা সাধারণে এমন কি বৈষ্ণবগণও বলরাম—সুভদ্রা-সুদর্শন সংযুক্ত জগন্নাথ মূর্ত্তি চতুষ্টয়কেই সংক্ষেপে "জগন্নাথ"ই বলিয়া থাকে এবং মন্দিরকে জগন্নাথ মন্দির বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনায় বলরামই জগন্নাথ, আর জগদম্বা—কালিকা দেবী। একদিকে শুভ্র শিবমূর্ত্তি—অন্যদিকে নীল কালীমূর্ত্তি—মধ্যে শিবশক্তির মিলন আঁধার বাহুশূন্য সোনালী রংয়ের পূর্ণ লিঙ্গ-জ্যোতি।—

"ঋতং সত্যং পরব্রহ্ম পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গলম্
ঊর্দ্ধ রেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় নমো নমঃ॥"

পরম মহাশক্তি যুক্ত জগন্নাথই বিশ্বের অন্তর বাহিরে পরব্রহ্মস্বরূপ—জগন্নাথের মন্দির চক্রেশ্বরের যাঁহারা জগন্নাথ মূর্ত্তি আর কালীঘাটের কালী-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দুই মূর্ত্তিতে বহুল অংশে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। দেবী মাহাত্ম্য মন্দিরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদের মন্দির নাই—এই সব কারণে জগন্নাথকে সর্ব্বাংশে বিষ্ণুবিগ্রহ বলা চলে না। জগন্নাথ দেবের ভোগ বিমলা দেবীকে অর্পিত করা প্রতিদিন বিধান রহিয়াছে বিমলা দেবী নিয়মিত পূজার দ্বারা ভোক্তা হইলে তবে মহাপ্রসাদ হয়।—বিমলা দেবীর পৃথক ভোগ রন্ধনের ব্যবস্থা নাই—জগন্নাথ দেবকে অর্পিত ভোগই অর্পণ করা প্রথা। রামানুজ সম্প্রদায়ের ব্যবস্থানুসারে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ পৃথকভাবে রন্ধন করা হয় এবং লক্ষ্মীদেবীকে অর্পিত করা হয়—জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জগন্নাথ ও বিমলা দেবীর মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ পূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহের সন্নিকটে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ধর্ম্ম বা সারমেয় মূর্ত্তি স্থাপিত হয়—ভৈরবের বাহন স্বরূপ —তাহা পুরাতন ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দেয়। রামানুজ-পন্থীরা সেই সারমেয় মূর্ত্তিটী এক্ষণে মুক্তিমণ্ডপের পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছে। সেই সারমেয়র পূজা হয় ও নিত্য মহাপ্রসাদ অর্পণ করা ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাংস মদ্যের বিকল্পে অন্য আমিষ দ্রব্যের দ্বারা জগন্নাথদেবের প্রত্যহ পূজা হয়। মাংসের বিকল্পে মাষকলাই দালের আদা-হিং সংযুক্ত ও জায়ফল উদরং খিচুড়ি প্রধাণতঃ রৌপ্য পাত্রে প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে অর্পিত হয়—পঞ্চগুড়ির দ্বারা তিনটী অঙ্কিত তন্ত্রের যন্ত্রের উপর তিনটী খিচুড়ী অন্নের থালা স্থাপিত হইয়া পূজাদির সময় রৌপ্য বা তাম্রপাত্রে নারিকেল উদকং ঢালিয়া মহাপ্রসাদের উপর ছিটানর ব্যবস্থা রহিয়াছে—ইহা মদ্যের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়। মাস কলাইয়ের আদা হিং সংযুক্ত পিঠা প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্ত্রের বীজ মন্ত্র দ্বারা ত্রিমূর্ত্তির পূজার বিধান রহিয়াছে—বলরাম—ঐং সুভদ্রা—হ্রীং জগন্নাথ—অং। জগন্নাথদেবকে প্রতিদিন বেশের সময় সর্ব্বপ্রথমে একখানি লালচেলীর সাড়ী স্ত্রীলোকদের

মতন মুরাইয়া স্তনের উপর দিয়া আবৃত করিয়া পরিধান করাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নাকে কানে, মাথায় ফুলের গহনা দেওয়া হয়।—পূজাদি তন্ত্র-শাস্ত্রানুযায়ী হয় এবং তন্ত্রাভিজ্ঞ পূজারী দ্বারা প্রতিদিন পূজা ও হোম করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বিষ্ণুপ্রসাদকে "মহাপ্রসাদ" বলে না। এক কালিকা, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর প্রসাদী—মাংস সাধারণতঃ মহাপ্রসাদ আখ্যা পাইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে পূজার সময় "মহাপ্রসাদ মানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ" দেখিতে পাই। ঐ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মার্পিত বস্তুকে মহা-প্রসাদ বলে। অন্য দেবতার প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা প্রথা নাই।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তর হস্ত প্রক্ষালন নিষিদ্ধ। এটীও মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে আছে। যথা হস্ত প্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্য সেবনে।"—অন্য দেবতার প্রসাদ খাইয়া হস্ত ধৌত বিধি। পুরীতে নিরম্বু উপবাস বিধি নাই—ইহাও তান্ত্রিক ব্যাপার। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম্য ধর্ম্মেও এ প্রথা লক্ষিত হয়—"না চত্র ন্যাস বাহুলং নোপবাসাদি সংযম।"—স্মার্ত্তমতে একাদশীর এইরূপ মহাত্ম্য যে অন্নভোজন করিলে মহাপাপ ও একাদশী সিদ্ধ হয় না।—জগন্নাথ মন্দিরে "একাদশী" শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরে "বন্ধন" অবস্থায় রহিয়াছে। তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে "নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশ ন বিদ্যতে, নৈবাচারাদি নিয়মানোপচারশ্চ-ভূরিশঃ ন দিকাল বিচার হস্তি ন মুদ্রান্যাস সংহতি"—ইহা জগন্নাথক্ষেত্রেও ভুবনেশ্বরে বিশেষভাবে প্রতিপালিত দেখা যায়। মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে পূর্ব্ব পশ্চিম বিচার নাই, দিনে বহুবার খাওয়াও নিষিদ্ধ নহে। জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম বলা হয়—ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ইহা তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপূজা, শাক্তাদ্বৈত উপাসনা। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকভাবে পূজা করিলে কাশীতে বিশ্বনাথও ব্রহ্ম, কালীঘাটে কালিকাও ব্রহ্ম—আপন আপন ইষ্ট দেবতাও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সেই ভাবের পূজাই ব্রহ্ম উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিগ্রহের উপাদান সম্বন্ধে জগন্নাথদেবেই শুধু ব্রহ্মশব্দ যোজিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ ব্রহ্মই জগন্নাথদেব। বেদান্তের "আপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা।"—ব্রহ্মের প্রতীক। নবমন্দিরের অধিষ্টাত্রী দেবতা হস্তপদহীন বিগ্রহ স্থাপন করা ব্রহ্মের পূজাই অনুপ্রাণিত করিতেছে। "শৃণোত্য কর্ণ "জগন্নাথ মূর্ত্তির কর্ণ ত নাই, আছে কেবল বিরাট চক্ষুদ্বয়, এ বিরাট চক্ষুদ্বয় "শশীসূর্য্য নেত্রম" (গীতা) চক্ষুষি চন্দ্র সূর্য্য। (মুণ্ডক উপনিষদ) সেইজন্য সম্পূর্ণ গোলাকার—পদ্মপলাশ লোচন নহে বা পটলচেরা চক্ষু নহে। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি একবার মনস্থিরপূর্ব্বক দেখিয়া ধ্যানস্থ হইলে দেখা যায়—সেই বিরাট চক্ষুর্দ্বয় আমাদের আঁধার হৃদয় গুহা আলো করিয়া জ্বল জ্বল করিয়া চাহিয়া আছে। দারু ব্রহ্মের "পশ্যত্য চক্ষুঃ আমাদের অন্ত দৃষ্টি ফোটাইবার আধ্যাত্মিক যন্ত্র। প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—রবিচন্দ্র বিশিষ্ট দারুব্রহ্ম অবলম্বন। ক্রমে দারুনাম ঘুচিয়া যাইবে, চক্ষুরূপ যাইবে, থাকিবে শুধু পুরুষং দিব্যং—ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম। ক্ষর—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—তাঁহার লীলা দেশ, কাল ও পাত্রে নিবিদ্ধ। ক্ষর যতদিন নিজের লীলায় বিভোর থাকে, ততদিন অক্ষর শাশ্বতকে বুঝিতে পারে না। ক্ষরের জ্ঞানোদয়ে অক্ষরপরিস্ফুট হইলে ক্ষর অক্ষরকে উপলব্ধি করে; ক্ষর লীলার উর্দ্ধে সনাতন অক্ষর সত্তার পরিচয় পায়—অক্ষর আকাশের মত স্থির, নির্লিপ্ত—অথচ সর্ব্বত্র ব্যাপক। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় হইয়াছে পুরুষোত্তমে—তিনিই সনাতন, শাশ্বত, পরমসত্য, পরমাগতি। তাঁহার সত্তার প্রকৃতি স্রষ্ট, জীবস্রষ্ট। পুরুষোত্তম মানুষের শুধু নিয়ন্তা, প্রভু বিভু নহেন—তিনি অন্তর্য্যামী সাক্ষী ও পরম সখা।

ক্ষর=বলরাম, চক্ষু ঘূর্ণায়মান সেই জন্য ডিম্বাকৃতি অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বর্ণ শুভ্র—সাদা রং হইতে অন্য সাতটী রং প্রতিফলিত হইতেছে অর্থাৎ নব নব রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে।

অক্ষর=সুভদ্রা, চক্ষু ঘূর্ণায়মান কিন্তু হস্তবিহীন ও ছোট স্থির, নির্লিপ্ত —বর্ণ সুবর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপক—সৌর মণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপক।

পুরুষোত্তম=জগন্নাথ=চক্ষু গোলাকার—স্থির, সনাতন শাশ্বত, পরম সত্য, অন্তর্য্যামী—বর্ণ নীল—স্বচ্ছ, সুন্দর, মহোদধির মতন বিশাল ও পরমা গতি। অনেক দেবদেবী দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন বিরাট মূর্ত্তি—হৃদয়ে উদার ভাব আনিতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সেই মহানের ভাব স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। "তব ক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসদান্মহিমান মীশং (কঠ ৩।২০)—সেই হেতু আমরা জগন্নাথ মূর্ত্তিতে শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মমূর্ত্তি পাইলাম। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেবী পার্ব্বতীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"তদরাধানতো দেবী সর্ব্বেষাং প্রীণণং ভবেৎ"—অতএব পাঠক বা সাধক বৈষ্ণব হউক, শাক্ত হউক, শৈব হউক, তাঁর ইষ্টকে ইহার ভিতর পাইবেন। জগন্নাথাদি ত্রিমূর্ত্তির ভাব কল্পনায় বিভিন্ন ধর্ম্ম ধারায় বিভিন্নরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভক্ত তাহার আপন ভাবের দ্বারা ইহাকে ধারণা করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে সুভদ্রা (মহাযাত্রা) হইতেছেন একানাংশা এবং বলরাম ও জগন্নাথদেব হইতেছেন আবরণ দেবতা (দ্বার দেবতাদ্বয়)।

প্রতিবৎসর রথোৎসবের দুইদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের নব যৌবন দর্শন হয়। এই নব যৌবন উৎসবটী অমাবস্যার দিন হয়—অমাবস্যায় নব যৌবনের উৎসব তান্ত্রিক দেবী পূজার ধারাকেই নির্দ্দেশ করে। দীপাবলী অমাবস্যা রাত্রিতে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে দীপাবলী উৎসব হয়—শ্রীমন্দিরের উপর দীপ দেওয়া হয় ও হোমাদি হয় এবং পিতৃপক্ষের তর্পণাদি হয়। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে জগন্নাথের প্রতিনিধি শ্রীনারায়ণ সমুদ্রে বিজয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে ভগবান শঙ্করাচায্য শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।—এক্ষণেও পুরীর শঙ্করাচার্য্য মঠের সন্ন্যাসীগণ মুক্তি মণ্ডপ সভার সভাপতি ও বিধানকর্ত্তা হইয়া থাকেন। চন্দন যাত্রার সময় লোকনাথ, যমেশ্বর, কপাল মোচন, মার্কণ্ডেয়শ্বর, নীলকণ্ঠ—এই পঞ্চমহাদেবের বিজয় মূর্ত্তিরা বিজয় করেন। স্নান যাত্রার পরে অমাবস্যা-কালে নব যৌবন উৎসবের পূর্ব্বে একপক্ষকাল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না—ইহা কি দেবী মূর্ত্তির ঋতুকালের স্মারক? এই সময়েই কামরূপ কামাখ্যায় দেবীর ঋতুকালের অম্বুবাচী উৎসব হয়। পুরী রাজাদের

পুরুণানহরে (পুরী রাজার পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে) আষ্টশম্ভুলিঙ্গ ও শ্যামাকালী অতি প্রাচীনকাল হইতে গজপতি রাজাদের আরাধ্য দেবদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমনে রহিয়াছেন এবং এখনও ধুমধামে পূজা, হোম, বলি ও ভোগাদি হয়। ইহা হইতে জানা যায় তৎকালীন ক্ষত্রিয় রাজারা তান্ত্রিক ধর্ম্মালম্বী ছিলেন।

প্রাচীন ব্যক্তিরা এখনও সাক্ষী দেয় যে তাঁহাদের পিতৃপিতামহদের নিকট শুনিয়া আসিতেছেন যে শ্রীমন্দির হইতে বৈষ্ণব রাজারা তাঁহাদের রাজত্বকালে অনেক পুরাতন মূর্ত্তিসমূহ জলাশয়ে ও সমুদ্রতীরে বালুকাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া লুপ্ত করেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় সরোবর সংস্কারকালে মুগনীপাথরের সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত বৃহৎ অষ্টমাতৃকা মূর্ত্তিগুলি মার্কণ্ডেয় পাঁক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া মার্কণ্ডেয় তীরে একখানি চালা ঘরের মধ্যে রক্ষিত হয় এবং ঐ চালাঘরটী ভাঙ্গিয়া এক্ষণে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তৈল, সিন্দুর ও চূড়া গোপন করিয়া উড়িষ্যার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি কিরূপে অর্থলোভী পাণ্ডারা নষ্ট করিতেছে তাহা দেখিলে বেদনা অনুভব করিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে অশ্লীল বন্ধন—কাম কার্য্যের আতিশয্য তন্ত্রযুগের সুনির্দিষ্ট নিদর্শন। ৬৪ প্রকার কামবন্ধন রীতি উড়িষ্যার চিত্রে, পুঁথিতে ও স্থাপত্যে তন্ত্রযুগের অধঃপতনের যুগ। বৌদ্ধতান্ত্রিক, কাপালিক তান্ত্রিকদের সংসঙ্গে এবং তাহাদের দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিকৃত প্রচারের দ্বারা তন্ত্রের গুপ্ত ক্রীড়াদি মদ মাংস ও স্ত্রী সম্ভোগ ধর্ম্মের গোপনীয় অঙ্গ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কণারকে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকেই মিথুন চিত্রে বিকশিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

৺শারদীয় পূজার সময় ষোল দিন নানা প্রকার দেবী-মূর্ত্তিতে পীঠাধিশ্বরী বিমলা দেবীকে সুসজ্জিত করা হয়—সপ্তম, অষ্টম ও নবমী দিবসে গভীর নিশীথে ধুম ধামে দেবী-পূজার ব্যবস্থা আবহমান চলিয়া আসিতেছে—ছাগ মাংস ও মাছ ভোগ জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যেই রন্ধন হইয়া ভোগ দিবার রীতি রহিয়াছে এবং সেই ভোগ প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিলি হইয়া থাকে।

জগন্নাথের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন ও কালীঘাটে কালীমূর্ত্তির হৃদয় অভ্যন্তরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্থাপন তন্ত্রোক্ত অভিব্যক্তি—উভয়েই গোপনীয় ও রহস্যপূর্ণ। জগন্নাথের নব কলেবর উৎসব উপলক্ষে ক্রিয়াপদ্ধতি ও পূজাদি এবং হোম তন্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং কাকটপুরের চণ্ডী দেবীর আদেশ অনুযায়ী হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্প্রদায়ের আধিপত্য জগন্নাথ মন্দিরে সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে পুরীর রাজারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধিপত্যে আসে—বর্ত্তমানকালে ধনী রামানুজ সম্প্রদায়ের আধিপত্যে ও আয়ত্তে পুরীর রাজা ও মন্দিরের পাণ্ডারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে এবং এক্ষণে রামানুজ সম্প্রদায় তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যতা জগন্নাথদেবের মন্দিরে রাখিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন।

যে পুরুষোত্তম মহোদধিতীর্থে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিম্ববৃক্ষ মাত্র এবং ইনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে উজ্জ্বল ত্রিরত্ন—সর্ব্ব হিন্দু ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন এই ত্রিমূর্ত্তি—অনার্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। মহোদধি তীর্থে যেমন সমস্ত নদ নদী ও সর্ব্বতীর্থের জল আসিয়া মিশিয়াছে সেইরূপ দারুব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমে একধারে বিশাল বারিরাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গ নিচয়, অন্যদিকে আকাশভেদী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উড্ডীয়মান ধ্বজা—আর মধ্যে নীলাচলের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া মিশিয়াছে পঞ্চভূত এক বিশাল অখণ্ডহীন অবস্থায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সমস্তই মহানের আকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজমান—বায়ু ব্রহ্মের সীমা নাই, শব্দ ব্রহ্মের সীমা নাই, বারি ব্রহ্মের সীমা নাই, বালি ব্রহ্মের সীমা নাই, তেজোময় সৌরকরের সীমা নাই—সমস্তই অসীম, সমস্তই মহান—আর এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিরাজিত ঐ বৃহৎ দারুব্রহ্ম ও অন্নব্রহ্ম—একটী অব্যক্ত, অন্যটী ব্যক্ত—একটী সাক্ষীস্বরূপ, অন্যটী প্রাণ স্বরূপ—একটী জ্ঞান, অন্যটী ভক্তি একটী পটেনশিয়াল বা বৃক্ষশক্তি, অন্যটী কাইনেটিক বা বীজশক্তি !

নচিকেতা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

এ পৃথিবী শ্রেয় ভুলে প্রেয় নিয়ে আত্মহারা আজ,
হে কিশোর নচিকেতা, কোথা তুমি জ্ঞানের সাধক ?
সর্ব্বপ্রলোভন-জয়ী তোমার ও অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা
এখানে জাগে না আর। নির্ব্বাপিত প্রাণবহ্নিশিখা।
জীবন-রহস্য আজ মৃত্যুর আগেই ঘনীভূত,
পুঞ্জীভূত দেশে দেশে। কোথা তব শাণিত জিজ্ঞাসা ?

মৃত্যুর অন্তরে পশে জেনেছিলে রহস্য মৃত্যুর,
জীবনের মাঝে এসে জীবন-রহস্য জেনে নাও।
নচিকেতা, অমৃতের মন্ত্র জ্বলে তব জ্ঞানালোকে,
বল তবে কোন্ প্রাণে জীবিত অমর ওই প্রাণ ?
জীবনের বিনিময়ে অনির্ব্বাণ জ্ঞানের পিপাসা
এখানে কোথায় জাগে ? দিকে দিকে মিথ্যার ছলনা

নচিকেতা, জেগে ওঠো কোনোও প্রাণের পদ্মদলে।
আঁধারের অন্তরালে কতদূরে দীপ্ত-সূর্য্য জ্বলে !

শ্যামাপ্রসাদ

নরেন্দ্র দেব

তুমিও চলিয়া গেলে? দুর্ভাগা দেশের শেষ আশা—
শোষিত পীড়িত ক্লিষ্ট জনতার ছিলে মূর্ত-ভাষা।
তোমার মতের সাথে হয়ত' মিলিনি সব পথে,
তবুও দিয়েছি বন্ধু, বরমাল্য তব জয়-রথে।
মহান্ পিতার তুমি মহোত্তম মনস্বী সন্তান,
কৃতার্থ হইত দেশ শুনি তব উদাত্ত আহ্বান!
শিক্ষার মন্দির কক্ষে নিরক্ষর জাতিরে শিখাতে
অক্ষয় স্বাক্ষর যাহা রেখে গেছ' স্বর্ণাক্ষর পাতে,
তাহার তুলনা বন্ধু, ইতিহাসে বলো কোথা আছে?
বংশপরম্পরা মোরা ঋণী তাই তোমাদের কাছে।

পূবের আকাশে মেঘ ঘনায়ে উঠেছে যতবার,
ব্যাকুল হয়েছ' বন্ধু, খুঁজিয়া ফিরেছ' প্রতিকার।
দুর্ভিক্ষে বন্যায় ঝড়ে বাঁচাইতে বুভুক্ষিত দেশ,
দেখেছি তোমার সেই শ্রান্তিহীন সেবকের বেশ।
আবার দুর্দিনে যবে ভ্রাতৃরক্তে ভিজিয়াছে মাটি,
করিয়াছি পরস্পরে নৃশংসের মতো কাটাকাটি;
তোমারে দেখেছি বন্ধু, এসেছ' আত্মীয় সম সেথা,
বঙ্গের অঙ্গনে প্রিয়, অদ্বিতীয় তুমি হিন্দু-নেতা।
মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলে, ভক্ত শাক্ত হে শ্যামাপ্রসাদ!
গড়িবারে হিন্দুস্থান ছিল তব দুর্নিবার সাধ।

সে সাধ মেটেনি বন্ধু, তবু কেন গেলে চলি' তুমি?
তোমার অভাবে যে গো নিঃসন্তান হ'ল মাতৃভূমি!
সচিবের শিরস্ত্রাণ যতবার পরেছিলে মাথে,
সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল জনস্বার্থে শাসকের সাথে।
ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ড সম নিক্ষেপিয়া মন্ত্রিত্বের বেশ,
ফিরিয়া এসেছ' পুনঃ কাঁদে যেথা ধূলিম্লান দেশ।
ক্ষুধায় কাতর যেথা উপবাসী আপনার জন,
যেথা পল্লী-জননীরা বস্ত্রাভাবে অর্ধ-বিবসন;
এক বিন্দু দুগ্ধ বিনা অগণিত শিশু যেথা মরে
তাদের বেদনা বন্ধু বক্ষে তব রক্ত হ'য়ে ঝরে!

একান্ত বাঙালী তুমি। বাঙালীই ছিলে দেহে মনে ;
তবু প্রসারিত প্রীতি ভারতের প্রতি কোণে কোণে।
ভাগীরথী কূল ছাপি' সুদূর সে ঝিলমের তীর,
প্লাবিত ক'রেছে বন্ধু প্রেম-বন্যা তব সুগভীর !
নির্মল চরিত্র তুমি ; স্থির-প্রাজ্ঞ, স্বভাব-সুন্দর
দুর্দিনে ছিলে যে মিত্র, এ জাতির পরম নির্ভর !
হারায়ে তোমারে আজ, সাগর যে হারালো কিনারা,
ডুবে গেল সপ্ত-ডিঙা—সপ্তগ্রাম হ'ল সর্বহারা !
জনসঙ্ঘ,—মহাসভা,—রামরাজ্য-রাজনীতি ছল,
তুমিই একাকী ছিলে হে বিরাট ! আপনার দল।

যে সত্য অপ্রিয়, তাহা কে বলিতে চাহে স্পষ্টভাষে ?
প্রভুর বিরাগ যাহে, কহিতে তা' ভয়ত্রস্ত দাসে।
তাদের চিনিতে তুমি। করুণার পাত্র তারা তব—
আত্মস্বার্থ-সন্ধানীরা সুযোগ খুঁজেছে নিত্য নব !
কিন্তু, যারা ধনী-জন-সৌহার্দের প্রভাবে অবশ,
অন্যায় করিছে জেনে, প্রতিবাদে না-করে সাহস,
তারা যবে শিখাইতে সদাচার—রচে উপদেশ,
তুমি সেথা রুদ্ররূপে ছিঁড়েছো তাদের ছদ্মবেশ !
শাসক-সমাজে থাকি—অন্যায় যে সহে নির্বিচারে,
তব সিংহনাদ বন্ধু,—'কাপুরুষ' কহিয়াছে তারে।

তুমি ছিলে অসামান্য ! মহাভদ্র, কিন্তু ভীরু নহ,
তব তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ অপরাধী জানিত দুঃসহ।
কূট-দীল্লি-পরিষদে অসহায় হ'য়ে আজ ভাবি,—
কে শোনাবে বজ্রকণ্ঠে উপেক্ষিত বাঙালীর দাবি ?
রাষ্ট্র চক্রে শ্রেষ্ঠ যারা, তাদের দেখিলে ভ্রষ্টাচার—
কে চাহিবে কৈফিয়ৎ ? কে করিবে তীব্র তিরস্কার ?
তব দৃপ্ত দৃঢ় সত্য অগ্নিময় উজ্জ্বল ভাষণ
নিখিল ভারত চিত্তে পেতেছিল শ্রদ্ধার আসন !
তোমার দেশাত্মবোধে সংশয়ের কোথা অবকাশ ?
মৃত্যুর অমৃত-বর্ম্মে হ'ল তার আশ্চর্য প্রকাশ !

ভেবেছ কল্যাণ যাহে, যেথা সত্য জাতির মঙ্গল,
আশ্রয় করেছ তুমি দ্বিধাহীন চিত্তে সেই দল !
হেরি এই চঞ্চলতা—অবোধে হেনেছে পরিহাস ;
তারা তো জানে না বন্ধু, কী প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বাস—
তোমারে উন্মাদ সম ছুটায়েছে দ্বার হ'তে দ্বারে ?
তব স্বপ্ন, স্বাধীনতা সুখ-শান্তি বিলাবে সবারে।
লোকে বলে—তুমি কভু বরণ করোনি কারাগার,
তাই কি গো বন্দী হ'য়ে অভিমানে শোধ নিলে তার ?
এ দুঃখ ভুলিব কিসে—সিংহ আজ মরিল পিঞ্জরে !
আসমুদ্র হিমাচলে বেদনার অশ্রু-ধারা ঝরে।

রক্ষিতে হিন্দুর স্বার্থ পার্থ সম নেমেছিলে রণে,
অভয় দিয়েছ তুমি বাস্ত-হারা দুঃস্থ আর্তজনে ;
একা গিয়াছিলে ছুটি' বাঁচাইতে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর !
রাষ্ট্রীয় ভীরুতা গ্লানি ঘুচাইতে,—দুঃসাহসী বীর।
নির্বীর্য রাজ্যের তুমি মানো নাই অন্যায় আদেশ,
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়—প্রাণ দিলে শেষ।
যাহার সাধনা মুক্তি, বন্ধন-মোচন যার ব্রত,
কে পারে রাখিতে তারে বন্দী করি' নির্বোধের মতো !
সকল বন্ধন ছেদি' চলে গেলে চির-মুক্ত-প্রাণ,
হায় বন্ধু ! সারা দেশ অভিভূত—শোকে মুহ্যমান।

স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ—ধর্ম তব ছিল চিরদিন,
সাম্প্রদায়িকতা দোষে তোমারে ভেবেছে যারা হীন—
আমিও তাদেরই দলে, তব বন্ধু শ্রদ্ধা পুষ্প তুলে,
অঞ্জলি দিয়েছি তব স্বধর্ম-নিষ্ঠার পাদমূলে।
স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা চিত্ত করে বেদনা-বিধুর !
জানিতে না অহঙ্কার ; দৃপ্ত তবু বিনয়ে মধুর।
যখনি যে কাজে ভাই, ডাকিয়াছে তব দেশবাসী,
দুর্লভ সময়—তবু, এসেছো তখনি ভালবাসি।
নিজ স্বাস্থ্য, নিজ সুখ, দেশকৃত্যে করোনি বিচার।
হে তেজস্বী মহাবীর ! বাঙালীর লহ' নমস্কার !

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেই বোর্ডিংএ শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম রোজ। বস্তুত রাত্রি দশটার পর ওই আমার একমাত্র কাজ ছিল। শিখরেরও বোধহয় একমাত্র কাজ ছিল, রাত্রি দশটার পর ওর ঘরে গিয়ে গল্প করা। গল্পটা যে নিছক প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছু নয় এই মনে করে' আমি পুলকিত হতাম। আগেই বলেছি মেয়েটি অবন্ধনা জানলে পুলকের বদলে আমার মনে ঈর্ষাই জাগত। কিন্তু ওদের আলাপের সুর যেঠিক কি ছিল তা আগে টের পাইনি, এখন পাচ্ছি শিখরের ডায়েরি থেকে।

শিখর লিখছে—"এতদিন পরে অবন্ধনাকে যে আবার ফিরে পাব সত্যিই তা আমার কল্পনাতীত ছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই দিনই রাত্রে গেলাম তার ঘরে। গিয়ে দেখি সে খুব ডগমগে রঙের একটা নাইট গাউন পরে নিবিষ্টচিত্তে একটা বিলিতি সিনেমা-মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের টেবিলে একটা 'অ্যাশ ট্রে'তে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা। তাকে নার্সের বেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এই বেশে দেখে বিস্ময় সীমা অতিক্রম করল। খানিকক্ষণ আমি কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

"খুব অবাক লাগছে, না ? সত্যি আমি অনেক বদলে গেছি শিখরদা।"

"সত্যি বদলেছ। তুমি নিজের পরিচয় না দিলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না বোধহয়, এত বদলেছ"

"আমার মুখটাও খুব বদলেছে কি। দেখ তো ভাল করে'। আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। দেখতো—"

মুখটা উঁচু করে' স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখলাম মুখটা সত্যি বেশী বদলায় নি। অনেক দিন পরে চিবুকের পাশের ছোট কালো তিলটি চোখে পড়ল আবার। আর একটা কথাও মনে হল, মুখের গড়নটা বদলায় নি বটে কিন্তু রূপটা বদলেছে। তরলমতি কিশোরী সে আর নেই, পরিণতি লাভ করেছে আত্মসচেতন যুবতীতে।

"না, মুখটা বেশী বদলায় নি। মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলে চিনতে পারতাম"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন"

চেয়ারটা টেনে বসলাম। অ্যাশ ট্রেটা দেখিয়ে বললাম, "সিগারেট খায় কে। তোমার বন্ধুরা বুঝি"

"আমিই খাই। বন্ধুদের মধ্যেও খায় দু'একজন। খাবে তুমি ?"

দামী কারুকরা একটা রূপোর সিগারেট কেস সে এগিয়ে ধরল আমার দিকে। স্প্রিংটা টিপতেই ডালাটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল একটা সাপ ফণা তুলল যেন।

"তুমি সিগারেট খাও ?" মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমার।

"আমি এখন অনেক কিছুই করি। ওই দেখ"

ঘরের যে অংশটি তার প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হত সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে সে। প্রকাণ্ড একটা দামী আয়নার আশে পাশে ছোট বড় কয়েকটা শেলফে নানা আকৃতির সুদৃশ্য শিশি আর কৌটো সাজানো রয়েছে দেখলাম। "কি ওগুলো"

"স্নো, পাউডার, লোশন, লিপ্‌স্টিক, কাজল, ডিপাই-লেটরি, এসেন্স, আতর—কত কি। যে অবু আমগাছে উঠত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত, তোমার পড়ার ঘরে জানলার ধারে উঁকি দিত সে মরেছে। তার দেহটার ভিতর বাস

করছে এখন অন্য লোক। একে চিনতে তোমার দেরি হবে। হয় তো পারবেই না"

"ভিতরের আসল মানুষটা বদলায় না অত সহজে"

"বিদ্বান লোকেরা তাই বলেন শুনেছি। কিন্তু বাইরের পোষাক পরিচ্ছদে মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করে যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না"

অবন্ধনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একজন পাকা দার্শনিকও বোধহয় এমন করে' গুছিয়ে মানুষের আপাত-পরিবর্ত্তনের রহস্য বর্ণনা করতে পারত না। একথা অবশ্য বললাম না তাকে।

বললাম, "তোমাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করতে পারব। সে ভরসা আমার আছে—"

"আমার নেই"

অবন্ধনার চোখে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল সে। গম্ভীরভাবে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে' নিপুণভাবে ধরালে সেটা।

"নেই? কেন!"

"পিসেমশায়ের হাতে নির্য্যাতিত হয়ে যখন তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, যখন আমার বাইরের সব আবরণ ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারনি। তার মানে আমার আসল মানুষটাকে তুমি চিনতে পারনি, পারলে নিশ্চয়ই দিতে"

অবন্ধনার কথার বাঁধুনি দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

"চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার বাধা ছিল অনেক। তাই একটু ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার তর সইল না। নবীন ঢুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেলে। আচ্ছা, নবীন ঢুলের সঙ্গে গেলে কেন"

"কারণ ওই ঠিক আমাকে চিনেছিল"

নির্ণিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললে, "নবীন ঢুলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে খুব কুৎসা রটিয়েছ বোধহয় তোমরা"

"কুৎসা তো রটবেই"

"তোমার কি মনে হয়েছিল?"

চুপ করে' রইলাম। বড় কঠিন প্রশ্ন। অবন্ধনার চোখের পাতা পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে আমার উত্তরটা শোনবার জন্য।

"আমার? নবীন ঢুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেছ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে হ'ল"

"বিশ্বাস করলে আমি নবীন ঢুলের প্রণয়িনী হয়েছি?"

চুপ করে' রইলাম। হঠাৎ খিল খিল করে' হেসে উঠল অবন্ধনা।

"আশ্চর্য্য তোমাদের বুদ্ধি। আমি বিপদে পড়ে' যদি একা একটা নৌকো করে' নদী পার হয়ে যেতাম, তাহলেও তোমরা বোধহয় ভাবতে যে নৌকোটার সঙ্গেই আমার নিশ্চয় কিছু ঘটেছে গোপনে গোপনে!"

আমি চুপ করেই রইলাম। অবন্ধনার হাসিটাও থেমে গেল হঠাৎ। তার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সহসা অন্য কথা পাড়লে সে।

"একটু চা খাবে?"

"দোকানের চা?"

"না, আমি নিজে করে' দেব। সব ব্যবস্থা আছে আমার।"

ঘরের আর এক কোণে দেখলাম ছোট একটি টেবিলে সত্যিই সব ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি ছোট একটি ইলেকট্রিক স্টোভ পর্য্যন্ত।

অবন্ধনা চা করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর উঠে তার বিছানার ধারে যে বইয়ের শেলফটা ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ইংরেজি বইই বেশী।

"ইংরেজি পড়তে শিখেছ নাকি"

"আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি"

"ও। এত সব করলে কোথায়"

"বম্বেতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে বুঝলাম যে স্বাধীনভাবে নিজের ভরণপোষণ করবার যোগ্যতা না হলে আত্মসম্মান থাকে না, এমন কি বিয়ে করেও না। সেদিন ভাগ্যিস তুমি আমাকে আশ্রয় দাও নি শিখরদা। দিলে পরের মুখ-ঝামটা খেতে খেতেই সারা জীবনটা কাটত—"

আমি শেলফের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নাবিয়ে নাবিয়ে দেখছিলাম—কি ধরণের বই অবন্ধনা পড়ে। দেখলাম শস্তা

প্রেমের উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পই বেশী রয়েছে। নার্সিংয়ের বইও আছে দু' একখানা। বইগুলোর পিছন থেকে ছোট একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। লেবেলে লেখা রয়েছে দেখলাম—পোটেশিয়াম সায়ানাইড। ভীষণ বিষ! এ জিনিস এখানে কেন!

"পোটেশিয়াম সায়ানাইড রেখেছ কেন—"

"ওটা বার করলে কোথা থেকে"

"এই বইগুলোর পিছনে ছিল"

"একজন রোগীর জন্যে দরকার ওটা। বাজারে পায় নি সে, তাই আনিয়ে রেখেছি আমি"

"রোগীর জন্যে? এ তো ভয়ানক বিষ। কোন অসুখে লাগে সায়ানাইড"

"ডাক্তার হলে বুঝতে। ডকটর সেন প্রেসক্রাইব করেছেন একটা ক্যানসার রোগীর জন্যে। দাও—"

আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশিটা। রোগীর কথাটা যে মিথ্যে তা তার চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম শিশিটা নিয়ে আবার বইগুলোর পিছনেই রেখে দিলে সেটা। সায়ানাইড্ রেখেছে কেন? প্রশ্নটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল মনে। কিন্তু তখন তা নিয়ে আর আলোচনা করা হল না, আলোচনা করবার অবসরই দিলে না অবন্ধনা।

"চা'টা খেয়ে দেখ দিকি কেমন হল। আমি কড়া চা পছন্দ করি। তুমি?"

"আমিও"

"তাহলে ভালই লাগবে বোধ হয়। চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না দেখ"

এক চুমুক খেয়ে বললাম, "চমৎকার হয়েছে—"

সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। অবন্ধনা নিজের জন্যও বানিয়েছিল এক পেয়ালা। একটা ছোট টুলে বসে' আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল সে। চোখ দুটি থেকে অদ্ভুত একটা হাসি উপচে পড়তে লাগল।

"শিখরদা, কোথায় কি চাকরি কর তুমি"

"আমি দালালি করি। ঠিক চাকরি নয়, সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম"

"কিসের দালালি?"

"নানারকম জিনিসের। বাড়ি গাড়ি থেকে আরম্ভ করে দেশলাই ছুঁচ পর্যন্ত"

মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে বলে গেলাম। আমি যে পুলিশের গুপ্তচর এ কথাটা অবন্ধনার কাছে বলতে পারলাম না। মনে হল কথাটা শুনলে আমার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আসবে একটা। 'স্পাই'কে সবাই ঘৃণা করে এটা কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

"দালালিতে রোজকার হয় বেশ?"

"চলে' যাচ্ছে"

"বিয়ে করেছ?"

"না"

"করবে না?"

"এতদিন ঠিক করেছিলাম করব না। কিন্তু এখন ভাবছি করলেও হয়"

অবন্ধনার চোখ থেকে যে হাসির আলোটা উপচে পড়ছিল সেটা নিবে গেল হঠাৎ।

"কনে' ঠিক হয়ে আছে না কি"

"অনেক আগে থেকেই"

"কেমন মেয়েটি, কোথায় বাড়ি?"

"দেখতে ইচ্ছে করছে না কি"

"করবে না?"

"আয়নার সামনে দাঁড়াও গিয়ে তাহলে"

অবন্ধনার চোখের আলো নিবে গিয়েছিল, মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল আবার। কিন্তু জোর করে' হেসে সে বললে—

"তা আর হয় না শিখরদা"

"কি হয় না"

"আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারি না"

"কেন"

"লগ্ন বয়ে গেছে"

"পাঁজিতে বিয়ের লগ্ন কি একটাই থাকে?"

"পাঁজিতে যত লগ্নই থাক, আমার বিয়ের লগ্ন একবারই এসেছিল—আর আসবে না"

"কবে এসেছিল—"

"মনে নেই? বহুদিন আগে রাত দুপুরে? তুমি তো তখন আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে"

"আমার সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন তোমার পিসেমশাই। এসব কারণেই আমি চট্ করে' মত দিতে পারি নি তখন—"

"আমি তা জানি। আমি রাগও করছি না, কিন্তু লগ্ন ব'য়ে গেছে। তখন যা হ'তে পারত এখন তা আর হয় না।"

"হয় না কেন। তুমি আমি দুজনেই এখন স্বাধীন, আমাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই তো"

"আছে বই কি"

"কে"

"আমার বিবেক"

কথাটা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম ক্ষণকালের জন্য। নবীন ডুলের ঘটনাটা পরমুহূর্তে মনে পড়ল।

বললাম, "নবীন ডুলের সঙ্গে তোমার কি ঘটেছিল জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস কর তার জন্যে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই—"

"তোমাকেও একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। করবে কি—"

সিংহিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে' সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"কি বল"

"আজ পর্য্যন্ত যত পুরুষের সংস্রবে এসেছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মল নিষ্পাপ চরিত্র মাত্র একটি লোককেই দেখেছি সে হচ্ছে ওই নবীন ডুলে। সে ইচ্ছে করলে আমাকে নষ্ট করতে পারত কিন্তু করে নি। তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"বিশ্বাস করলাম। নবীন ডুলে কোথা এখন"

"জাহাজের খালাসী হয়ে সে চলে' গেছে"

"কবে"

"আমরা যখন বম্বে পৌঁছলাম তার মাসখানেক পরে"

"তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে' গেল"

"আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে গেল"

"কোথায়"

"এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে"

"কি করতে সেখানে"

"দাসীবৃত্তি"

"তার পর?"

"তার পর ডাক্তারবাবুর সুনজরে পড়লাম। তিনি আবিষ্কার করলেন একদিন যে 'নহি আমি সামান্যা রমণী'। তাঁরই অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলাম, নার্সগিরি শিখলাম"

অবগুন্ঠনার চোখে মুখে অদৃশ্য একটা আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠল যেন।

"লেখাপড়া তিনিই শেখালেন?"

"একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে দিলেন। অনেক কিছু করেছিলেন ভদ্রলোক আমার জন্যে। আমাকে বিয়ে পর্য্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হ'তে পারলুম না"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত ছিলেন না কি'

"স্ত্রী তাঁর আত্মহত্যা করেছিলেন"

"কেন"

"আমারই জন্য"

মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল যেন নিজের একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমার প্রশংসা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"তবু বিয়ে করলে না ভদ্রলোককে!"

"সেই জন্যেই করলাম না। আমাকে যত বোকা তোমরা ভেবেছ তত বোকা আমি নই। ততটা হৃদয়হীনও নই"

"আমি তোমাকে কোনদিনই বোকা ভাবি নি। তবে তুমি হৃদয়হীন কি না তা জানতে বাকী আছে এখনও আমার। তার পর কি হ'ল। তোমার জীবন-কাহিনী বেশ লাগছে—"

"বেশ লাগছে? যেন উপন্যাসের মতো?"

"ভাল উপন্যাসের মতো"

"আশ্চর্য্য তো"

"আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"উপন্যাসে যা তোমাদের ভাল লাগে, বাস্তব জীবনে তা কি তোমরা সইতে পার? কুন্দনন্দিনী, কিরণময়ীদের তোমরা তো দূর করে' দিয়েছ। তারা হয় মরেছে না হয় আশ্রয় নিয়েছে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। আজকাল অবশ্য সিনেমা-আকাশে তারকা হয়ে জ্বলছে অনেকে। আমিও হয়তো জ্বলতাম, কিন্তু ঠিক দামটা দিতে পারলাম না"

"কিসের দাম"

"তারকা হ'তে হ'লে যে দাম দিতে হয়"

আবার চুপ করে' গেল সে। মুচকি হেসে নির্ণিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে-ই কথা কইলে আবার।

"আচ্ছা, শিখরদা তুমি বরাবর সৎপথে চলে' ঠিক আগেকার মতো ভাল ছেলে আছ ?"

উত্তরে আমিও মুচকি হেসে চাইলাম তার দিকে। তারপর বললাম, "নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করতে নেই। আমার জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমি প্রতীক্ষা করছি"

"কার—"

"তোমার"

অবন্ধনা একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"এই সিগারেটখোর মেয়েটার ? মিছে কথা বোলো না শিখরদা। তোমাকে সত্যবাদী বলে' শ্রদ্ধা করে' এসেছি বরাবর"

"সিগারেট খেয়ে বা রং মেখে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে এটা যদি তুমি ভেবে থাক, তা'হলে আমাকে চেন নি তুমি।"

হঠাৎ অবন্ধনা খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সিগারেটটা পড়ে গেল তার ঠোঁট থেকে।

"চিনি নি ? পুরুষদের চিনতে বাকী থাকে না কি কোন মেয়ের !"

সিগারেটটা তুলে আবার টানতে লাগল।

ক্রমশঃ

জ্ঞানী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অতি সরল মানুষও জানে জ্ঞানী পণ্ডিত মাত্রই ভক্ত নয়। জ্ঞানের অধিকারী আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীকে আমরা যে শ্রদ্ধা দান করি, সে শ্রদ্ধা পায় না জ্ঞানী। জ্ঞানীর প্রাপ্য শ্রদ্ধার অন্তরে একটু ভয় থাকে। কারণ যাদের ঘিরে আধিভৌতিক ভয় তাদের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সাধারণ লোকের হতে পণ্ডিতের অধিক। বহু শাস্ত্র-জ্ঞানীরও আচরণে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে অল্প-মেধা ব্যক্তি সম্বন্ধে। বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে। কিন্তু সে বিদ্যার সহযোগী চরিত্রে যেথায় মাধুরী বা প্রেমের বিকাশ নাই, সেথায় প্রেম-পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় না।

বহুশ্রুত হ'লেই মানুষ জ্ঞানী হয় না। জ্ঞানীর পক্ষে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি চাই নিজ প্রজ্ঞার বলে। তাই বলা হয়েছে—যাঁর নিজের প্রকৃষ্ট জ্ঞান নাই, যিনি মাত্র বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন, তাড়ু যেমন সুমিষ্ট রসের আস্বাদন হ'তে বঞ্চিত কারণ সে জড় পদার্থ, তিনিও তেমনি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ হ'তে বঞ্চিত।*

* যস্য নাস্তি নিজ প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহু-শ্রুতঃ
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দরবীসুতারসাইব।

ভগবানে নিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান তিনিই জ্ঞানলাভ করেন।*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে জ্ঞানীর লক্ষণ বিবৃত করেছেন, তিনি ভক্ত। নিরস শাস্ত্রের চাপে সে পণ্ডিত চিত্তে-নিহিত প্রেমের উৎস-মুখ বন্ধ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ চার প্রকার লোকের উল্লেখ করেছেন যাঁরা তাঁকে ভজনা করেন—"হে ভারতর্ষভ অর্জ্জুন চার প্রকার সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী।

শ্রীভগবানের এ বিবৃতি হতে কটা কথা বেশ বোঝা যায়। প্রথমতঃ তিনি যে চার শ্রেণীর উপাসকের উল্লেখ করেছেন তারা প্রত্যেকেই আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বাসী না হ'লে নিশ্চয়ই বিপদের সময় তাঁরা বিভুর ভজনা করেন না। মাত্র তর্কের জন্য ঈশ্বরের কি স্বরূপ, কেমন করে তাঁর তত্ত্ব বোঝা ও বোঝানো যায়, বিভিন্ন তত্ত্বানুসন্ধানীর মতে কোথায় ভ্রম আছে, তাদের বিশিষ্টতা কি, ইত্যাদি গবেষণাকে তিনি জিজ্ঞাসা বলেন নি—যদি সে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য না হয় উপলব্ধির পথ খোঁজা

* শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

এবং নিজের জীবনের পথ নির্বাচন করা। অর্থার্থী নিজের কামনা-সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ ভজেন। ভগবানের শক্তি এবং করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে অর্থার্থী তাঁর ভজনা করেন না।

জ্ঞানী সম্বন্ধেও তিনি উপাসক জ্ঞানীকে লক্ষ্য করেছেন। যাঁর শাস্ত্রে জ্ঞান প্রভূত অথচ, যিনি অনন্ত-শক্তি অনন্ত-জ্ঞান-রূপ ভগবানের ভজনা করেন না, তেমন জ্ঞানীর কথা গীতায় উক্ত হয়নি। পাণ্ডিত্য হিসাবে চার্বাকের জ্ঞান ছিল বিশাল, কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল বিপরীত-বুদ্ধি-সাপেক্ষ। তাই বেদ-বেদান্ত নির্দিষ্ট সকল তত্ত্ব তিনি নিরস যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। সে অযুক্তি কথার মারপ্যাচ।

দ্বিতীয় কথা, যে চার শ্রেণীর উপাসকের কথা শ্রীভগবান বলেছেন তাদের কোনোটি অন্য হ'তে একেবারে বিভিন্ন নয়। এ প্রত্যেক শ্রেণী অভেদ্য গণ্ডী ঘেরা নয়। বহু জ্ঞানী ভক্ত আর্ত্ত হ'য়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা করে। জিজ্ঞাসা জ্ঞানের ভিত্তি। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বেদান্তের আদি। সুতরাং জ্ঞানী-মাত্রেই জিজ্ঞাসু। প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের বিভূতির তথ্য জানা ভক্ত জ্ঞানীর জ্ঞানের পট-ভূমি। বিশাল ভক্তি-সাহিত্যে যে সব তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর আলোচনার ফলে পরম্পরা-ক্রমে জগতে বিস্তৃতিলাভ করেছে। যে মহাভক্ত সঞ্জয় জগতকে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ শুনিয়েছেন, তিনি মহা-জ্ঞানী, মহা-জিজ্ঞাসু। জীবনের মূল তাৎপর্য্য, ভগবানের অবতরণ প্রভৃতি বহু সমস্যার অর্থের অর্থী ছিলেন সঞ্জয় এবং ব্যাসদেব। দ্রৌপদী বস্ত্র-হরণের লজ্জায় আর্ত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন। তিনিও তো ছিলেন মহা-জ্ঞানী।

তৃতীয় কথা এই চতুর্ব্বিধ উপাসক সুকৃত। কারণ প্রাণের মধ্যে যে ভগবদ্ভক্তি সুপ্ত থাকে, কেবল সুকৃতির ফলে তার জাগরণ। যে যেমন ভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবেই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

সুকৃতি বহু আয়াস, প্রভূত সংযম, ভগবানে ভক্তির ফল। এ ফল জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ। যোগ-ভ্রষ্ট যোগী সুকৃতির ফলে শ্রীমান এবং যোগীদের গৃহে জন্মলাভ করেন।

সুকৃতি না হ'লে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সার্থক হয় না। যে আলো নিবিড় এবং এক বিষয়ে নিবদ্ধ তার উদ্ভাসন ও প্রতিফলন শক্তি প্রচুর। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবিড় ঐকান্তিকতা। সুকৃত জিজ্ঞাসু জ্ঞান-দীপ্ত, সে প্রকৃত রস-পিপাসু। যিনি সকল রসের অন্তরতম রসের সার, মাত্র সেই রসে জ্ঞানীর রস-পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভবপর। সে অমৃত-রস সুকৃতির ফলেই লভ্য।

অর্থার্থী যদি সুকৃত হয় তবে তাঁর যাচিঞার অর্থ হবে পরম ধন—ঐশ্বরিক জ্ঞান। তেমন পুণ্যবানের অর্থ-কামনা সফল হ'লে পরমার্থ লাভ হয়। সাধারণ অর্থার্থী এবং সুকৃত অর্থার্থীর এই প্রভেদ। তুচ্ছ অর্থ সংগ্রহের দীনতা ও মলিনতায় বীতস্পৃহ হয়ে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তার ফলে মানুষ চায় পরমার্থ—যার বিনাশ নাই, অপচয় বা অপব্যয় নাই।

এই চতুর্ব্বিধ ভজনা-রত পুণ্যবানদের মধ্যে জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয়। কিন্তু সে প্রীতি অর্জ্জন করতে গেলে নিত্য-যুক্ত এবং এক-ভক্তি বিশিষ্ট হওয়া চাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—এই চতুর্ব্বিধ ভজনা-রত পুণ্যবানদের মধ্যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত, এক-ভক্তি বিশিষ্ট। আমি জ্ঞানীর অত্যর্থ প্রিয়। সে-ও আমার প্রিয়।* প্রকৃত জ্ঞানী তত্ত্ব-বিদ্। ভগবানের তত্ত্ব-অনুসন্ধানী জ্ঞানী পুণ্যবান। সুতরাং সে নিত্য-যুক্ত। তার নিষ্ঠা সদাই শ্রীভগবানে। প্রকৃত জ্ঞানালোকে সকল অন্ধকার বিনষ্ট হয় মনের। যার জ্ঞানের জ্যোতি প্রখর নয়, যার জ্ঞানের আলো একবার জ্বলে একবার নেভে, তার প্রাণের প্রদীপ নিত্য ভগবানের অনন্ত-রূপ প্রকাশ করে না। তার বাসনা আছে আলো জ্বালবার, কিন্তু সে তো একনিষ্ঠ নয়। তাকে কবির কথায় হতাশার সুরে গাহিতে হয়—

যতবার আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে।

অথচ সে বলে—আমার হৃদয়ে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে। কারণ সে আর্ত্ত-রূপে অর্থার্থী হয়ে জিজ্ঞাসার ফলে এ সত্যের সন্ধান পেয়েছে যে পরব্রহ্ম সবার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু সুকৃতির ফলে মাত্র সত্য জানাই তো

* চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
তেষাং জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত এক-ভক্তি র্বিশিষ্যতে
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ৭। ১৭

হয় না। চাই এক-ভক্তি, নিত্য-যোগ। লুকোচুরি খেলে গোপ-গোপিনী তাঁকে পেতো আবার হারাতো। কিন্তু সেই আরাধিতা নারী রাধিকা রাসলীলায় এক-ভক্তিতে নিত্য-যুক্ত হয়েছিল। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার যোগের সেই এক-ভক্তিই কৌশল।

শ্রীহরি তো সবার হৃদয়ে আসন পেতে বসে আছেন। সাধক জানেন মা বিরাজে সর্বঘটে। কিন্তু ভক্তি-পূত জ্ঞানের আলো না জ্বালিয়ে রাখলে জ্ঞানের মূল হারিয়ে তাতে ভক্তির সেচ-জল দেওয়া যায় না। জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন না হলে—জ্ঞানী এক-ভক্তি না হলে আবার প্রাণ-দোলে সেই নিরাশার ছন্দে—

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে তাতে নাহি ফোটে ফুল।

ডাকিয়া তোমারে এনেছি কাতরে ভাঙ্গা মন্দির দ্বারে। বিক্ষিপ্ত জ্ঞান, টুকরো ভক্তি, অশক্ত জ্ঞানীর হৃদয়, ভাঙ্গা মন্দির মাত্র।

এক-ভক্তিপরায়ণ দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে হরির ভজনা করেন। তাঁর প্রেমের ভাগীদার নাই। স্ত্রীপুত্র-পরিজন, বিশ্ব-বিজয়ের দুরাশা, কুবেরের ধনরত্ন, তাঁর শ্রদ্ধার অংশীদার হতে পারে না। কারণ সে ভক্ত জ্ঞানী। সে জানে সকল ধন, সব সম্পদ সেই অনাদি অব্যক্ত আদি কারণের অতি স্বল্পায়ু ক্ষণ ভঙ্গুর অলীক বুদ্বুদ। সে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে আপনাকে সেই অনির্বচনীয়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করে প্রেমের ফাঁসে বাঁধে। ভক্ত তখন সদাই সান্নিধ্য সুখের আনন্দ উপভোগ করে। তার আর স্মরণ করিয়ে দেবার বাহিরের স্মারক আবশ্যক হয় না। তীর্থ তার চিত্তে। সে জানে—মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা বারাণসী। সে শ্রীচরণের বেদী তার চিত্তে। সুখ দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য আত্ম-প্রকাশ করে। সে অন্তরে উপলব্ধি করে—

দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ, মৃত্যু ধরে সে মৃত্যুর রূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি নিশিদিন কাঁদি তাই।

তাই ভক্তি-ভরা প্রাণে জ্ঞানী তাঁর অসীমে প্রাণ মন লয়ে যাত্রা করে। তাঁর আলোকের ঝরণা ধারায় স্নান-পূত হয়ে।

জ্ঞানীর অতি-প্রিয় শ্রীভগবান যদি সত্য-পথ দেখান, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি যদি আমাদের মনকে প্রকৃতই উদ্ভাসিত করে তা'হলে তাঁর স্বরূপ ভিন্ন জানবার তো আর কিছু বাকী থাকে না। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ যে জগতের আধার। মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জেগে ওঠে জ্ঞানী সাধকের চিত্তে। মায়াকে এড়িয়ে গেলে যে তাঁকে পাওয়া যায়। জ্ঞানী স্পষ্ট দেখে ত্রিগুণের বুদবুদ। অলীক পৃথিবী মায়াময়। অনাদি অনন্ত চিরানন্দময় পরব্রহ্ম। সুতরাং যে প্রকৃত জ্ঞানী—তার পক্ষে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা বিভেদবর্জ্জিত। সে মায়া অতিক্রম ক'রে সত্যে পৌছায়।

তাই শ্রীভগবান বলেছেন—জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত এক-ভক্তি-পরায়ণ। সে ঈশ্বরকে জানে, তার মন অন্য বিষয়ে যুক্ত হবে কেন ?

প্রকৃত জ্ঞানী তাই নিত্য-যুক্ত। পরম পুরুষে যুক্ত হবার যে অবকাশ লাভ করেছে, তার পক্ষে অন্য বেদীতে ভক্তি নিবেদন তো অসম্ভব! কারণ যিনি একবার পূর্ণ জ্যোতির সন্ধান পেয়েছেন তাঁর পক্ষে একে ভিন্ন বস্তুতে ভক্তি অসম্ভব।

এক-ভক্তি পরায়ণ জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্তের তিনি প্রিয়। তার প্রাণ ভগবানে পূর্ণ। সে হৃদয় সিংহাসনে তো অন্যের স্থান নাই। যে জ্ঞানের আলোয় অখণ্ড জ্যোতির আভাস পেয়েছে তার কাছে তো ক্ষণিক আলোর দীপ্তি নাই। সে সীমার মাঝে অসীমকে পায়। বলে—

তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া।

তার প্রাণে অন্য আলো নাই। ভগবানের প্রেমে সমুজ্জ্বল তার প্রাণ-শক্তি। তাঁর প্রেম সর্বব্যাপী। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ আমরা তাঁর প্রেমের স্পর্শ উপভোগ করতে পারি না। তাঁর প্রিয় সবাই। কিন্তু উপলব্ধি ভেদে সে প্রিয়তা হয় ম্লান বা পরিস্ফুট। অন্তরের প্রবেশ-পথ অন্য জ্ঞানে পূর্ণ রাখলে তিনি প্রবেশ করে প্রিয়তার পরিচয় দেবেন কেমনে? সুতরাং তাঁর কৃপা, তাঁর সান্নিধ্য এবং তাঁর আনন্দের ছায়া জ্ঞানী ভক্তেরই প্রাপ্য। যখন মন মায়ায় উপহিত চৈতন্য হতে মুক্ত হয়, প্রাণে ভক্তি ছাড়া আর কোনো ভাব থাকে না, তিনি দেখা দেন। তাই তিনি বলেছেন ভক্ত আমার প্রিয়। তিনি বলেছেন—আমি

বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়ে থাকি না, আমার ভক্ত যেখানে গায়, আমি থাকি সেথায়। *

তাকে প্রিয় ভেবে নিখিলের মাঝে তাকালে উপলব্ধি হয়—

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চিরকালের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে তবে।
তোমায় জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো
মায়া নাহি কোনো ডর।
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—দেখা যেন সদা পাই।

জ্ঞানী ভক্ত সম্বন্ধে ভগবান আরও বলেছেন—চারি প্রকার ভক্তই উৎকৃষ্ট। আমার স্বরূপ। যেহেতু যে মদ্গত-চিত্ত এবং সর্বোত্তম গতি, আমাতেই তার অবস্থিতি। *

যখন সর্বের সত্তায় সাধক নিজের অস্তিত্ব নিমজ্জিত করে, তখন ভেদাভেদ লোপ পায়। বিভেদের জন্ম অজ্ঞানে।

* ন হি তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

* উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্। ৭। ১৮।

জ্ঞানের জ্যোতি যখন অজ্ঞানের অন্ধকূপে প্রবেশ ক'রে তাকে জ্বালিয়ে তোলে তখন তো জ্ঞানী ভগবানে লীন হন—তাঁর স্বরূপ হন।

কিন্তু এ অবস্থা তো একদিনে এক জন্মে হয় না। বহু জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় সর্বত্র, সকল পদার্থ, সকল ভাবই ভগবান—এমন উপলব্ধি সম্ভবপর। তাই ভগবান বল্লেন—বহু জন্ম অতিক্রম ক'রে জ্ঞানবান ভক্ত সমস্ত জগতই বাসুদেব-রূপ, আমাকে লাভ করেন। সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। *

কেমন করে ঈশ্বর দেখা যায়—জিজ্ঞাসা করেছিলেন লোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি বলেছিলেন—যেমন ক'রে যশ মান অর্থ দেখা দেয় তেমনি ক'রে। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চাই বহুদিনব্যাপী, মুষ্টিমেয় সংসারের রত্ন লাভের জন্য। সুতরাং বহু জন্মজন্মান্তর সাধনা না করলে কেমনে উপলব্ধি হবে—সর্বংখল্বিদম্ ব্রহ্ম ?

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ৭। ১৯।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

নরেন, কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌঁচেছে, কাল রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির করে রেখেচি, যদিনা আজ যাঁরা উলুবেড়েয় মামলা[1] করতে গেছেন তাঁরা এসে তাঁদের কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিতে বারোটা বাজান।

দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ তোমার ওখানেই যাব। রাস্তাটা একটু শুখুক—পালকি যেন চলতে পারে।

(১) এই মামলার কথাই উল্লেখ ক'রে শরৎচন্দ্র ঐ সময় ১৩৩৬ সালের ২০শে কার্তিক তারিখে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"পল্লীগ্রামে বাস করতে আমার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ, মামলায় জড়িয়ে civil এবং criminal,—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেবতার আর সইল না, ঘাড়ে চাপলেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্বিসহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান—কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পর ফৌজদারী।"

এই মামলায় শরৎচন্দ্র নিজে আসামী না হলেও এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী তাঁর দিদির এক দেওর মূল আসামী হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের গ্রাম সামতাবেড়ের আদালত উলুবেড়িয়ায়।

এই বইটার সম্বন্ধে যা আমার সত্যিকার অভিমত তাই নিয়ে একটু আলোচনা করব ইচ্ছে আছে, তবে সে মতামতের মূল্য আজকাল দিনে তোমরা কি দিতে পারবে? আমি তো প্রায় সাহিত্যিক দরবারে বাতিল হয়ে যাবার মতো হয়ে পড়েচি, লিখতে তো পারিই নে, লেখাও খারাপ হয়ে গেছে নিজেও বুঝতে পারচি। তবে তোমরা এখনো ভালবাসো এই যা সম্বল। বড়ো বয়সে সব শক্তিই ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এ অস্বাভাবিকও নয়। পরিতাপের বস্তুও নয়। আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। আজ রাধুকেও[১] একখানা চিঠি লিখলাম। সে আমার ওপর ভারি রাগ করে আছে, এবার যেদিন তোমাদের বাড়ী যাবো তার সঙ্গে দেখা করে আসবো। নইলে সে হয়ত রেগেই থাকবে, অভিমান পড়বে না। ইতি—২রা কার্ত্তিক ৩৬

বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

নরেন, তোমার চিঠি এবং 'লালু'র[২] প্রুফ পেয়েছি। প্রুফের উপরে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বানানের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধিত।

কয়েকটা বানান সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে— সে বানান আমি নিতে পারবো না। যাই হোক সোমবারে যাচ্চি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। সাক্ষাতে আলোচনা হবে।

একদিন একটা গল্প লিখেচি। লালুর নয়—নিজের,[৩] কিন্তু মোটেই ভাল হ'ল না। নইলে তোমার পাঠশালার জন্য দিতে পারতাম।

রাধু একটু ভালো আছে শুনে খুশি হলাম। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩৪৪

শরৎদা

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাবড়া
১৪. ৮. ২৫

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণী, আজ তোমার চিঠি নরেনের[৪] হাত থেকে পেলাম।...

আমার লেখা বেশি করে পড়ায় মেয়েদের অনেক সময়ে বিড়ম্বনা ভোগ করতেও হয়। এই যেমন আমার অভিমত প্রকারান্তরে সমর্থন করবার ফলে তোমাকে গালাগালি খেতে হ'ল। আমার নিজের ত সংস্কার বলে বড় বেশি বালাই নেই। তাই বহু সময়ে তোমাদের কথা এত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করি যে, অনেকে সইতে পারে না। এই জন্যেই বোধ হয় কোনো দুজন লোকের ধারণা আমার সম্বন্ধে এক নয়। কত অদ্ভুত দুর্নামই যে আমাকে নিয়ে প্রচারিত আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

পুরুষেরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস করে দিলাম; আবার মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো। কত মেয়ের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় আছে, তারা আমাকে আপনার লোকের চেয়েও আপনার ভাবে। তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে ত যায়ই না, বরঞ্চ সৎপথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে ত তারই খোঁজ পায়। আমাকে যদি তুমি দাদা বলেই ডাকো ত আমার লেখায় সত্যিকার দুর্নীতি কোথাও নেই এ বিশ্বাস যেন তোমার নিঃসন্দেহে থাকে।

তুমি ছেলেমানুষ, সাহিত্য নিয়েই যদি থাকো ত একটা বড় অবলম্বন পাবে। আমি মনীষী নই, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। নরেন বলছিল, অসুখে তুমি খুব ভাল সেবাশুশ্রূষা করতে পারো।

(১) রাধারাণী দেবী। ইনি নরেন্দ্র দেবের জ্যাঠামশায়ের শ্যালক কন্যা। পরে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়।

(২) "লালু" শরৎচন্দ্রের লেখা একটি গল্প। শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকে এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। গল্পটি প্রথমে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'সোনার কাঠি' নামক ছোটদের একটি বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।

(৩) এই গল্পটির নাম "বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী"। এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকের মধ্যে রয়েছে। গল্পটি নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালা" পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪) নরেন্দ্র দেব।

কলকাতায় এলে তুমি আমার কাছে এসো।···আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

শরৎদা

বাজে শিবপুর, হাবড়া
২৫. ৮. ২৫

রাধারাণী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার চোখ এবং দেহ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি পড়াশুনা বা কিছু লেখালিখি কোনটাই করিয়ো না। নরেনের কাছে শুনতে পেলাম তোমার চোখ নাকি বড় দুর্ব্বল।···

সাহিত্য ব্যাপারে তোমাকে কিম্বা তোমাদের সাহায্য করায় আমার আজও উৎসাহ আছে। একদিন ছেলেবেলায় নিরুপমা, সুরেন গঙ্গো, গিরীণ গঙ্গো প্রভৃতিকে নিয়ে আমি ছোট অখ্যাত অজ্ঞাত সাহিত্য-সভা করেছিলাম। তাই ত আজ বাঙলা সাহিত্য তাদের কাছে কত কি পাচ্চে।

তেমনি আবার একটা গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে চাই, যদি কেউ ভবিষ্যতে ভাল হয়, যদিচ তাদের কাজ চোখে দেখে যাবার আমার আর সময় হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে এসব আলোচনা করব। সাবধানে থেকো, আমি ভাল আছি।

বড়দা

কল্যাণীয়া রাধারাণী,

তোমার এইমাত্র চিঠি পেলাম। কুড়ে মানুষ তাছাড়া না থাকে হাতের কাছে চিঠির কাগজ, না থাকে খাম, না পাই খুঁজে ডাক টিকিট—নানা কারণে চিঠির জবাব দেওয়া ঘটে ওঠে না। তুমি ছোট বোন, অভিমান করতে পারো, এ ক্ষেত্রে আমারই দোষ—তোমার রাগ হবারই কথা। কিন্তু কি করি ভাই, বুড়োমানুষ সব কাজেই ত্রুটি হয়ে পড়ে।

সরসীবালা বসু নামটি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছি। তবে তাঁর কোন লেখা পড়েছি বলে ঠিক মনে হচ্ছে না। বিশেষতঃ বোধ হয় তুমি জানো না যে, নির্ব্বিচারে গল্প উপন্যাস আমি একেবারেই প্রায় পড়ি নে। আমার পড়ার বই আলাদা।

তোমাদের উপন্যাসের কল্পনা[1] ভালই। বেশ, আয়োজন কর। শেষকালে আমি যা পারি কোরব। কিন্তু আগেকার লেখার শক্তি আর আমার নেই। সবই যেন খারাপ হয়ে যায়। একদিন হয়ত লিখতে পারতাম; কিন্তু সব জিনিষেরই ত একটা শেষ আছে। সাহিত্য জীবনের শেষ বোধ করি আমার এসেছে। নরেন আমার সম্বন্ধে তোমাকে যা লিখেচে সে আর সত্যি নয়। আমি তোমাদের লেখার শেষ হলে মৌখিক উপদেশ দিয়ে (অবশ্য যদি তা তোমরা নিতে রাজী হও) যা পারি করব। লিখতে আমি বাস্তবিকই আর পারি নে। নইলে শুধু শুধু কিছু একটা অজুহাত করে তোমাদের এত বড় একটা সঙ্কল্পের গোড়াতেই নিরুদ্যম করে দিতে পারি এরকম স্বভাব আমার নয়। তাছাড়া আগে তোমাদের আরম্ভই হোক। তখন যদি দেহ ও মন সুস্থ ও সবল থাকে ত আলাদা কথা। তবে আমার জন্য তোমরা পিছিয়ে যেয়ো না।

তুমি এবারে কলকাতায় এলে[2] নরেনকে সঙ্গে নিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—২৬।১২।২৫ শিবপুর। হাবড়া

দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৬শে আশ্বিন ১৩৩২

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণি, দিন ২।৩ হল দেশের বাড়ী থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম। অনেক দিন তোমাকে পত্রাদি দিতে পারিনি।···

রাধা তুমি আমার পথের দাবী কখনো পড়েচো? ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে সূর্য্যির দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটাবে, দেশের কাজ একটুও কখনো করবে না?

আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জেনো।

বড়দা

(১) রাধারাণী দেবী প্রভৃতি কয়েকজনে মিলে একটি বারোয়ারী উপন্যাস লিখবেন ঠিক করেছিলেন। এই বারোয়ারী উপন্যাসে লিখবার জন্য রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন।

(২) রাধারাণী দেবী এই সময় গিরিডিতে ছিলেন।

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম, এর আগের চিঠির জবাব দিইনি—হবেও বা। এ বয়সে সব কথা মনে রাখাই কি সম্ভব? তা ছাড়া জানোই ত আমার কুড়েমির সীমা নেই। দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপরে সমস্ত ভুলে যাই। কিছু মনে কোরো না ভাই। যে কটাদিন আরও বেঁচে আছি, জবাব পাও বা না পাও মাঝে মাঝে সময় পেলে নিজের খবরটা দিয়ো।

শ্রীকান্ত শেষ পর্ব্বের 'রাজলক্ষ্মী' তোমার মনোমত হয়নি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছ বলেই রাগ কোরব এমনি বদমেজাজি আমি?—আমার মত শান্ত-শিষ্ট নিরীহ ব্যক্তি সহজে পাবে না।

তুমি যা লিখেছিলে আমি তখনই চিন্তা করে দেখেছিলাম। তবুও নিজের ভুলটা ঠিক ধরতে পারিনি। মতভেদ ত থাকবেই।

'শেষপ্রশ্নে' শেষ পর্য্যন্ত হয়ত অনেককেই ব্যথা দেবো, তবুও যা ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার। তার পরের কথা পরে।

ষোড়শী বইটা একবার পোড়ো। বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুসি হবে। শিশির[1] কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেছি, সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়ে ছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।

কাশীর বুড়ীমা[2] আমার মায়ের মত, দেখা করতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু এদিকে আমিও তাঁর চেয়ে কম বুড়ো নই। আর জলে জলে এ অঞ্চলের কাদার ভিতরের দুর্গম রাস্তাটি মনে হলে আর পা বাড়াবার ভরসা থাকে না। একটুখানি রাস্তাঘাট শুখলেই বোধ হয় যাবো। কিন্তু তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ত সোজা নয়। যার বয়স কম তার সঙ্গেও যেমন, যাঁর বয়স বেশি তাঁর সঙ্গেও তেমনি, এই কথাটা মনে হলেই মন যেন ছোট্ট হয়ে আসে। দুর্ভাগ্য। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—২৩শে ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের বড়দা

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধে, তোমার চিঠি এবং চিঠির মারফৎ তোমার বিজয়ার প্রণাম এসে যথাস্থানে পৌছেচে। ষোড়শী দেখে খুসি হয়েছ শুনে আমিও খুসি হোলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।···অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে।···তারই বাহাদুরি।

আমার লেখা "সাহিত্যের রীতিনীতি" পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হয়েচে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি এত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্যে বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বলত? তবুও বলচি এ কথা আমার যথার্থই মনের কথা। ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে দু ছত্র কবিতা পর্য্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য। তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে—দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক

(১) শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী।

(২) এই বুড়ীমা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কাশীর স্নেহভাজন বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রী এক জায়গায় লিখেছেন—"বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা (শরৎচন্দ্র) একবার লিখিয়াছিলেন—'বুড়ীমা দুঃখে পড়ে একদিন আমায় ছেলে বলেছিলেন—এখন কাশীতে আছেন···ঠিকানায় খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন, বালবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব মালপো তৈরী করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন।'"

শরৎচন্দ্র এই হরিদাস শাস্ত্রীর হাত দিয়ে তাঁর বুড়ীমার জন্য মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।

বুড়ীমা ছিলেন আবার নরেন্দ্র দেবের মা'র বান্ধবী। নরেন্দ্র দেবের মা এঁর সঙ্গে পাউডার পাতিয়েছিলেন। নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী তাই বুড়ীমাকে পাউডার-মা বলে ডাকতেন।

স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোঙরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধ-দলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে—বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেচে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না, ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা'তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"[১]

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখনি স্টেট্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হবে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা · আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন যায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক্ যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই? · তুমি একটু সারলে কি? জ্বর সারলো? ইতি—১০ই অক্টোবর ১৯২৭

বড়দাদা

---

(১) এখানে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিঠিটিই উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭ মা ১৩৩৩

তোমাদে.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক—পৌষ, ১৩৫৬)

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র এর একটি উত্তর লেখেন। শরৎচন্দ্রের উত্তর লেখা হলে তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চিঠিখানি পাঠাতে শরৎচন্দ্রকে একান্তভাবে নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র বন্ধুদের নিষেধ মত চিঠিখানি আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন না। শরৎচন্দ্রের সেই চিঠির খসড়াটি আজও শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে রয়েছে।

যৌতুক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(ফরাশী গল্প : গী দ্য মোপাঁসা)

মাদামোশেল জ্যাঁ কর্দিয়ের সঙ্গে সাইমন নোক্রমেঁৎ-এর বিবাহ⋯ খবর শুনে কেউ আশ্চর্য্য হলো না। সাইমন সম্ভ এটর্ণিগিরি পাশ করে ব্যবসা ফেঁদেছে! সঙ্গতিহীন। মস্ত এটর্ণি পাপিনিয়েঁ তাঁর অফিস মায় প্রাকটিশ বিক্রী করে ব্যবসা থেকে অবসর নিচ্ছেন—এবং মাদামোশেল জ্যাঁ খুব বড় লোকের মেয়ে⋯বাপের এক সন্তান⋯আদরের মেয়ে! মেয়ের বিবাহে তিনি যৌতুক যা দেবেন, তাতে ছোটখাট একটি রাজ্য কেনা যায়!

সাইমন দেখতে বেশ সুপুরুষ। স্বাস্থ্য ভালো⋯চালাক ছোকরা⋯এটর্ণিগিরিতে দুদিনে সে নাম করেছে। সাকসেশ অনিবার্য্য, সকলের বিশ্বাস। মাদামোশেলের বুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—সহুরে-সৌখীনতা তেমন রপ্ত হয়নি⋯তবে দেখতে সুশ্রী। তাছাড়া বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্য⋯এমন মেয়ের ভালো পাত্রে বিবাহ কেন না হবে?

বিবাহে কী সমারোহ! সারা পরগণা যেন টলমল করে উঠলো। বর আর কন্যাকে ঘিরে সকলের ধন্য-ধন্য রব! উপহারে উপহারে ঘরের কটা টেবিলে যেন পাহাড় জমেছে!⋯

উৎসবের পর বর এবং বধূ কদিনের জন্য কোথাও একটু ঘুরে আসবে⋯হনিমুন ট্রিপ!

বরের অমায়িক কথা-হাসি⋯বধূর আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি!⋯

গ্রামে জন্ম হলেও নোক্রমেঁৎ চাল-চলনে মোটেই গ্রাম্য নয়। চালাক-চতুর ছোকরা। সহুরে হাবভাব এমন রপ্ত করেছে দেখলে কে বলবে, গ্রামে জন্ম! ছেলেবেলা থেকেই নোক্রমেঁৎ ধৈর্য্যশীল—কোনো বিষয়ে অধীর হতে জানে না! সে বলে, সবুর করতে হয় সব বিষয়ে! সবুরে মেওয়া ফলে! জীবনকে যদি সার্থক সফল করতে চাও, সবুর করো⋯ধীরে ধীরে চলো!⋯তাহলে মনের সব বাসনা সফল করতে পারবে! ধৈর্য্য এবং অনলস সাধনা—ভগবানকে টেনে নামিয়ে আনে মানুষের হাতে⋯ভাগ্য কোন্ ছার!

বিবাহ হয়েছে চারদিন⋯চার দিনেই স্বামীর উপর মাদামের অখণ্ড ভক্তি আর শ্রদ্ধা! শয়নে-স্বপনে শুধু স্বামী আর স্বামী! আদরে-সোহাগে নোক্রমেঁৎকে আচ্ছন্ন রাখতে চায়। স্বামী বসে আছে, মাদাম এসে তার হাঁটুর উপর চেপে বসলো⋯বসে স্বামীর দুটি কাণ ধরে আবদার—চোখ বোজো⋯চোখ বুজে মুখ খোলো! স্বামী মুখ খুললো⋯খুলে চোখ করলো আধ-নিমীলিত! একটা চকোলেট স্বামীর মুখের মধ্যে পুরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে স্বামীর ঠোঁটে চুমুর পর চুমু! স্বামীকেও সোহাগ করতে হয়। সব সময়ে দুজনে মুখে মুখে বুকে বুকে⋯সারা দিন সারা রাত⋯একটি নিমেষ বিরাম নেই।

এক হপ্তা কাটলো। নোক্রমেঁৎ বললে মাদামকে—বলো যদি, চলো সামনের মঙ্গলবারে দুজনে প্যারি যাই।⋯কাজ নয়⋯কর্ম্ম নয়⋯বন্ধু নয়⋯বান্ধব নয়⋯আত্মীয়স্বজন নয়⋯দুনিয়ার বুকে শুধু তুমি আর আমি⋯কপোত-কপোতীর মত⋯প্রেমিক আর প্রেমিকা! ভালো হোটেলে থাকবো। ঘুরে ঘুরে কত কি দেখবো। থিয়েটারে যাবো—কনসার্ট-হলে যাবো, যেখানে খুশী!

শুনে মাদাম আনন্দে বিহ্বল! মাদাম বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলো যত শীগগির হয়⋯

স্বামীর ভ্রূ হলো কুঞ্চিত! স্বামী বললে—তোমাকে পেয়ে

কত সাধ আমার মনে জাগে! যদি আমার অঢেল পেসা থাকতো!

মাদাম তাকালো স্বামীর পানে—ছুচোখে অধীর দৃষ্টি!

নিশ্বাস ফেলে নোক্রমেঁৎ বললে—তোমার বাবা যদি আমাদের এ বিয়ের যৌতুকের সব টাকাগুলো এখন দিতেন!

মাদাম বললে—বাবাকে আমি কাল সকালেই গিয়ে বলবো, বলে যৌতুকের সব টাকা চেয়ে নেবো।

নোক্রমেঁৎ জড়িয়ে ধরলো মাদামের কাঁধ। তারপর সোহাগ-চুম্বনের বন্যায় মাদামকে রাঙিয়ে তুলে সে বললে—এই তো আমোদ করবার সময়···না হলে একবার প্রাকটিশ শুরু করলে···

পরের দিন বাপকে বলে বাপের কাছ থেকে মাদাম নিয়ে এলো যৌতুকের টাকা! যৌতুকের উপর বাবা আরো অনেক টাকা দিলেন—বললেন—বাইরে যাচ্ছিস সঙ্গে রাখিস্।

তার পর মঙ্গলবার প্রেমিক-প্রেমিকার প্যারি-যাত্রা শ্বশুর-শাশুড়ী ষ্টেশনে এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন।

শ্বশুর বললেন—কিন্তু ভালো করলে না নোক্রমেঁৎ অত টাকা—সব পার্শে ভরে বুক-পকেটে রাখলে!

নোক্রমেঁৎ বললে—কিছু ভাববেন না আমার অভ্যাস আছে। জানেন, আমার যা পেশা—কতবার লাখো-লাখো টাকা বয়ে নিয়ে গেছি···কত হাসপাতালের জন্য। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

ট্রেন ছাড়লো। কামরায় আরো কজন যাত্রী···মেয়ে পুরুষ যাত্রী।

মাদামের কাণের কাছে মুখ এনে ফিশ্‌ফিশ্ করে নোক্রমেঁৎ বললে—মুস্কিল হলো, কামরায় এই ভিড়··· স্মোক করতে পারছি না।

মাদাম বললে—আমারো ভালো লাগচে না এ ভিড়! তবে তোমার স্মোকিং-এর জন্য নয়! কেউ থাকতো না, শুধু আমরা ছুজনে! কেমন হতো!

আধ ঘণ্টা পরে একটা ষ্টেশন। ট্রেন থামলো।·

নোক্রমেঁৎ বললে—এখনো এক ঘণ্টার পথ! না স্মোক করতে পারছি না তোমার অধর-সুধা··

ছ'চোখে হাসির ঝিলিক—মাদাম কাটলো নোক্রমেঁৎ-এর গায়ে একটা চিমটী, বললে—ছুষ্টু!

তার পর সাঁতে নাজারে ষ্টেশন। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে! নোক্রমেঁৎ বললে মাদামকে—চলো, বুল্‌ভার্দে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি। তার পর···

মাদাম বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ছুজনে নামলো। বেডিং এবং ট্রাঙ্ক রইলো গাড়ীর কামরায়। ষ্টেশনের বাহিরে এসে নোক্রমেঁৎ বললে—খানিকটা দূরে···তা হোক! বাস আছে। বাসে চড়ে গেলে কতক্ষণ বা!

মাদাম বললে—একখানা গাড়ী নিলে কি হয়?

নোক্রমেঁৎ বললে—বাজে খরচ! এখন বিয়ে হয়েছে—সংসার। বাজে খরচ ঠিক হবে না, ডার্লিং। বাসে সামান্য খরচ। গাড়ী নিলে যাওয়া-আসায় দশ-গুণ খরচ!

মাদামের অপ্রতিভ ভাব! নিশ্বাস ফেলে মাদাম বললে—বেশ, বাসেই তা'হলে!

ঘোড়ায়-টানা মস্ত বাস চলেছে সামনে—তিন-ঘোড়ার যান। নোক্রমেঁৎ হাঁকলো—রোখো, রোখো·

বাস দাঁড়ালো! তরুণ এটর্ণি স্ত্রীকে নিয়ে উঠলো বাসে। দোতলা বাস। স্ত্রীকে নীচের তলায় খালি-সীটে বসিয়ে বললে—তুমি এখানে বসো। আমি উপরে বসবো। ছাদ খোলা। একটু স্মোক করতে যাই না হলে মরে যাবো।

মাদাম নিরুত্তর···কণ্ডাক্টর বললো বসে পড়ুন, মাদাম, বাস কতক্ষণ দাঁড়াবে?

নিরুপায়! বুকের মধ্যে যা বাজছিল··ছু চোখের পিছনে জল এসেছে ঠেলে! কিন্তু বাসে লোকজন···চোখে জল সাজে না। অভিমান করে স্বামীকে কিছু বলা—তাও হয় না। অত্যন্ত অসহায়ের মত টলতে টলতে কোনোমতে গিয়ে মাদাম বসলো নীচের তলার এক সীটে··সিঁড়ি বেয়ে নোক্রমেঁৎ টক্-টক্ করে উপরে চলে গেল। বাস চললো।

মাদামের চোখের সামনে কুয়াশার অন্ধকার··পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন কিছু নজরে পড়ে না! বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠছে অশ্রুর তরঙ্গ!

সামনের সীটে, পাশের সীটে লোক···মাঝে মাঝে বাস থামছে···আবার চলছে। এই থামা আর চলার ফাঁকে কত লোক নামছে উঠছে, মাদামের সেদিকে লক্ষ্য নাই! সে

যেন অজ্ঞান অচেতন! এক একবার চেতনা জাগছে··· তখন মনে ভাসছে একটি প্রশ্ন—এত দূর? এখনো··· এখনো···

এক-জায়গায় বাস থামলো। হুড়-হুড় করে লোক নামলো।—তার পর···

বাস আর চলে না! বাসে আর কোনো মানুষ নেই। মাদাম একা।···কেন?

কণ্ডাক্টর এলো। এসে বললে—আপনি নামবেন না?

যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া! মাদাম চমকে উঠলো। কণ্ডাক্টরের পানে তাকালো।

কণ্ডাক্টর বললে—টার্মিনাস। বাস আর যাবে না।

মাদাম বললে—বুলভাদ···আমরা বুলভাদে নামবো।

কণ্ডাক্টরের দু চোখ এত-বড়! সে বললে—বুলভাদ! সে তো অনেক আগে পাশ করে' এসেছি।

—পাশ করে' এসেছি?

—হ্যাঁ।

মাদাম উঠে দাঁড়ালো, বললে—আমার স্বামীকে যদি দয়া করে ডেকে দাও···

—আপনার স্বামীকে! তিনি কোথায় আছেন?

—কেন, বাসের উপর-তলায়।

—উপর-তলায়! কণ্ডাক্টর বললে—বাসে কেউ নেই এক আপনি ছাড়া। সকলে নেমে গেছে।

—কেউ নেই!···মাদামের পায়ের নীচে বাসখানা দুলে উঠলো যেন! মাদাম বললে—হতে পারে না। আছেন। ···একসঙ্গে দুজনে বাসে উঠেছি, যাবো বুলভাদ!··· তুমি ত্যাখো একবার···

মাদামের বুক কাঁপছে! কণ্ডাক্টরের বিরক্তি হলো। সে বললে—আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির সময় নেই! আপনি দয়া করে' নেমে যান। আমাকে রিপোর্ট করতে হবে আমার ষ্টেশনে।

স্খলিত কণ্ঠে মাদাম বললে—কিন্তু আমার স্বামী?

কণ্ডাক্টারের আপাদ-মস্তক জ্বলছে, এমন ব্যাপার সহরে এই নতুন নয়। এর আগে এমনি সাজগোজ-করা কত সুন্দরী বাসে চেপেছে···কণ্ডাক্টর বললে—এত বড় সহরে একটা স্বামী হারিয়ে গিয়ে থাকে, আর একটা খুঁজে নিন —কথাটা বলে' কণ্ডাক্টর দাঁত বার করে হাসলো।

মাদামের দু চোখে বিগলিত ধারা। মাদাম বললে— তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবারটি ত্যাখো উপর-তলায়। তাঁর হাতে এত বড় চামড়ার ব্যাগ···

কণ্ডাক্টর বললে—এত বড় ব্যাগ! ওহো···দাঁড়ান দাঁড়ান! বেশ সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এত বড় ব্যাগ···তিনি নেমে গেছেন মান্দেলিনের মোড়ে ভুলে গেছেন, আপনি বাসে আছেন···হা-হা-হা-হা···

মাদামের দুনিয়া যেন উবে অদৃশ্য হয়ে গেল! বাসে কে আছে, না আছে এ চিন্তা মন থেকে বিলুপ্ত। সীটে বসে পড়ে তাঁর কান্না, অশ্রুর বন্যা নামলো চোখে!···কণ্ডাক্টর হতবাক, সে নেমে গিয়ে ইনস্‌পেক্টরকে দিলে খবর। বললে—মহা বিপদ! এক কমবয়সী মেয়ে··· ভদ্রঘরের মেয়ে! স্বামী হারিয়ে গেছে বাস থেকে। বাসে বসে কাঁদছে!

ইনসপেক্টর এলো। এসে সব কথা শুনে উপদেশ দিলে— পুলিশে খবর দিন। এখানে বসে কাঁদলে তো স্বামীকে পাবেন না!

পথে চলেছে মাদাম··· বিহ্বল উন্মাদের দৃষ্টি! কি হয়েছে, বুঝতে পারছে না! চলেছে···শুধু চলেছে···কোথায়, জানে না! কি এখন করবে? জানে না। স্বামী···কি হলো তাঁর? মাদাম বাসে আছে—ভুলে গেলেন?···এমন ভোলা-মন হঠাৎ কেন তাঁর?

কাছে আছে দুটি ফ্রাঁ··· সম্বল। কোথায় যাবে?

হঠাৎ মনে পড়লো, বারাল···পিসতুতো ভাই বারাল। সে থাকে এই সাঁতে লজার সহরে—মিনিষ্ট্রী আর্মী-নেভিতে কি কাজ করে যেন!

পথ থেকে একখানা গাড়ী নিয়ে সেই গাড়ীতে চড়ে মাদাম এলো বারালের গৃহে। বারাল তখন অফিসে বেরুচ্ছে ···তার হাতে মোটা ব্যাগ।

গাড়ী থেকে প্রায়-লাফিয়ে নেমে পড়লো মাদাম··· রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো—আঁরি···

সে-আহ্বানে আঁরি থমকে দাঁড়ালো···বললে—জাঁ! তুমি হঠাৎ! একা!···কোথায় চলেছো?

দু-চোখে জল কণ্ঠ স্খলিত···মাদাম বললে—উঁকে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় হারিয়ে গেছেন!···আমার স্বামী।

—স্বামী হারিয়ে গেছে! কোথা থেকে হারালো?

—দোতলা বাস থেকে।

—বাস থেকে!

সাশ্রুলোচনে স্খলিত কণ্ঠে মাদাম জানালো বৃত্তান্ত।

আঁরি বললে—মনের কোনো এদিক ওদিক গ্যাখোনি তার?

—না।

—হুঁ!···সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিল?

—হ্যাঁ। বিয়ের যৌতুকের সব টাকা।

—যৌতুকের সব টাকা!

—হ্যাঁ। বলেছিলেন, পাপিনিয়েঁর অফিস কেনবার জন্য কিছু দরকার···

আঁরি কি ভাবলো! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—এখানে তাহলে কোথায় তাকে পাবে? সে তাহলে সরে পড়েছে বেলজিয়ামে।

—কি বলচো আঁরি! স্বামী···সবে বিয়ে হয়েছে।

আঁরি বললে—নিশ্চয়। তার দরকার টাকা · স্ত্রী নয়। টাকা নিয়ে ভেগেছে।

মাদাম চমকে উঠলো···বললে—তাহলে তিনি···তিনি··· তুমি বলছো···

—স্কাউণ্ড্রেল! আঁরি দিলে জবাব।

পথে ভিড় জমেছিল—এমন কম-বয়সী মেয়ে···ভদ্রঘরের মেয়ে···পথে দাঁড়িয়ে···ছু চোখে জল! মজা আছে হে!

আঁরি লক্ষ্য করলো, তার গা চিড়বিড়িয়ে উঠলো! মাদামের হাত ধরে সে ফিরলো। বাড়ীর দ্বারে করাঘাত!

চাকর দরজা খুলে দিলে।

আঁরি ঢুকলো মাদামকে নিয়ে বাড়ীতে···চাকরকে বললে—হোটেলে যা—এখনি। দুজনের মতো লাঞ্চ···এখনি নিয়ে আয়। আজ আমি অফিসে যাবো না।

শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণ

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

বাংলার ভাগ্যাকাশে আবার অশনিপাত হইয়া গেল। শ্যামাপ্রসাদ আর ইহজগতে নাই। ২৩শে জুন গভীর রাত্রে ৩-৪০ মিনিটের সময় শ্রীনগরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে সংকটকালে ভারত রক্ষা করিয়াছে। তাহার জন্য জীবনপাত ও অর্থব্যয় করিয়াছে প্রচুর। অথচ অন্যান্য রাজ্যের মত কাশ্মীর রাজ্য এখনও ভারতভুক্ত নহে, স্বতন্ত্র মর্যাদা লইয়া জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের রক্ষণাধীনে থাকিয়াও স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে। ভারতের নাগরিক তথায় অবাধে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে প্রবেশের জন্য দেশরক্ষা-বিভাগ হইতে অনুমতি-পত্র গ্রহণ করিতে হয়। বিদ্রোহী শ্যামাপ্রসাদ চাহিয়াছিলেন, এই সামঞ্জস্যবিহীন ব্যবস্থার প্রতিকার। নীতিগত কারণে তিনি এই ব্যবস্থাকে অমান্য করিয়া বিনা পারমিটে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী গত ১১ই মে তারিখে তিনি উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুই মাইল অভ্যন্তরস্থ লখিমপুরে গিয়া উপনীত হন। তথায় কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং সেখান হইতে প্রথমে তাঁহাকে জম্মুতে ও পরদিন শ্রীনগরে লইয়া যায়। ইহার পর শ্রীনগর হইতে কয়েক মাইল দূরে ডাল হ্রদের তীরে নিশাতবাগের উপরে তাঁথার ভিলা নামক এক বাংলোকে সাব জেলে পরিণত করিয়া তথায় তাঁহাকে বিনা বিচারে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন পর হইতেই নাকি শ্যামাপ্রসাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে—মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে থাকে। মৃত্যুর কয়েকদিবস পূর্বে তাঁহার শরীরে প্লুরিসির আক্রমণ প্রকাশ পায়। তাঁহার মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা এইভাবে গুরুতররূপে পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও সে সংবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীর সরকারের প্রচারিত ইস্তাহার হইতে জানা যায় যে, ২২শে জুন প্রাতে শুষ্ক প্লুরিসির আক্রমণের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সহসা বক্ষস্থলে হৃদ্‌যন্ত্রের উপরিভাগে দুই মিনিটকাল যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রক্তের চাপ হ্রাস পাইয়া সাধারণ দুর্বলতার ভাব বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসাদির পর তাঁহার অবস্থার নাকি খানিকটা উন্নতি হয়। বাংলো হইতে লইয়া গিয়া বেলা ১২টার সময়ে তাঁহাকে ভর্তি করা হয় সরকারী হাসপাতালের নার্সিং হোমে। সেখানে জনকয়েক চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করেন। পরীক্ষার পর সাব্যস্ত হয় তিনি করোনারি জাতীয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসাদির পর তাঁহাকে খানিকটা সুস্থ বলিয়া বোধ হয়। রাত্রি ৭-৩০ মিনিটে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কৌঁসুলি শ্রীত্রিবেদী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কৌঁসুলিকে তিনি কতকগুলি বিষয় লিখাইয়া দেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেন।

রাত্রি ৯টার পর হইতে পুনরায় তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। রাত্রি ১১টায় তাঁহার যন্ত্রণা এতই বৃদ্ধি পায় যে তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন—রক্তের চাপ দ্রুত হ্রাস পায়। রাত্রি ১টায় তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে যন্ত্রণা হইতে থাকে। রাত্রি ২-৩০ মিনিট সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে

অন্তিমশয়নে শ্যামাপ্রসাদ ফটো—পান্না সেন

চলিতে চলিতে রাত্রি ৩৪০ মিনিটের সময় তাঁহার নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস চিরতরে স্তব্ধ হইয়া যায়।

২৩শে জুন, মঙ্গলবার সকাল ৫-৪৫ মিনিট সময়ে শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় সর্বপ্রথম এই মৃত্যুর সংবাদ অবগত হন। শ্রীনগর হইতে ট্রাঙ্ক কলে তাঁহাকে শ্যামাপ্রসাদের পরলোকগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে সাধারণ্যে সংবাদটি প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণ তাহাদের প্রিয় নেতার এই আকস্মিক বিয়োগ-সংবাদে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া যায়। শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ বিমানযোগে কলিকাতায় আনয়নের সংবাদ শুনিয়া জনগণ উদগ্রব্যাকুলতায় তাঁহার শেষ দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে।

কলিকাতার যে সকল পথ বাহিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ লইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, অপরাহ্নকাল হইতেই সেই সকল রাজপথ ও উহার পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ দর্শনার্থী নরনারীতে পূর্ণ হইয়া যায়। শবদেহ দমদম পৌঁছিতে পূর্বনির্ধারিত সময় অপেক্ষা বহু বিলম্ব ঘটে। রাত্রি ৯টার সময় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের একখানি বিশেষ বিমান ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ লইয়া দমদম বিমান-ঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছায়। এক বিরাট জনতা পুলিশ-বেষ্টনীর বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। "বন্দেমাতরম্", "শ্যামাপ্রসাদ কী জয়" প্রভৃতি ধ্বনিতে তখন আকাশ বাতাস পূর্ণ হইয়া যায়।

ললাটে চন্দনপঙ্ক অঙ্কিত করিয়া বিমানের ভিতর হইতে লাল রেশমি চাদরে আবৃত মৃতদেহটি ষ্ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া আনা হয়। একটি খোলা ট্রাকে বহুজনপ্রদত্ত পুষ্পার্ঘ্যের শয্যায় দেহটি স্থাপন করিয়া রাত্রি ৯-৩০ মিনিট সময়ে বিমান ঘাঁটি হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা অতঃপর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ভিড় এতই অধিক হয় যে শোকযাত্রাটি শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছাইতেই রাত্রি ১টা বাজিয়া যায়। সেই গভীর রাত্রিতেও পথের দুই পার্শ্বে ও অট্টালিকাসমূহে সহস্র সহস্র নর নারী শেষ দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করিয়া শোকযাত্রাটি শেষ রাত্রে ৪-৪৫ মিনিটে শ্যামাপ্রসাদের বাসভবনে গিয়া উপনীত হয় এবং নিম্নতলার দরদালানে সাধারণের দর্শনের সুবিধার্থ শবদেহটি কয়েক ঘণ্টা রক্ষিত থাকে।

২৪শে জুন, বুধবার বেলা ১১টার সময় শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ একটি পালংকে স্থাপন করিয়া তাঁহার বাসভবন হইতে পুনরায় শোকযাত্রা বাহির হয়। নানা পথ অতিক্রমণের পর মধ্যাহ্ন ১-৪৫ মিনিটে উহা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গিয়া পৌঁছায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিসৌধের সম্মুখেই চিতাশয্যা রচিত ছিল। শ্যামাপ্রসাদের নশ্বর দেহটি তাহাতে স্থাপন করিয়া বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আনুষ্ঠানিকভাবে মুখাগ্নি সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ চিতার অগ্নি নির্বাপিত হয়। এই সময় প্রকৃতিও প্রবল বর্ষণের দ্বারা চিতায় শান্তিবারি সিঞ্চন করে। নগরীর কর্মচাঞ্চল্য এই দিনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং সহবন্দী শ্রীটেকচাঁদ শর্মা এক বিবৃতি প্রসংগে বলেন যে, সোমবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে জানান যে, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জননী আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পুত্রকে সম্ভবত আর দেখিতে পাইবেন না। ঐ দিবসই রাত্রি ১টার সময় তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার পর তিনি মাত্র কয়েকবার 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সংজ্ঞালোপের পূর্বেও মধ্য-রাত্রে সেবারতা নার্সকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"মা'র স্নেহ অতি গভীর, জগতে সে স্নেহের তুলনা হয় না। এই সময় মা আমার কাছে থাকলে ভাল হ'ত।" শ্যামাপ্রসাদের মাতৃদেবীর বর্তমান বয়স

দেশ-বরেণ্য নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চিরনিদ্রায় জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ আশুতোষ মুখার্জী রোডস্থ বাস ভবন হইতে কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে

ফটো— পান্না সেন

ডাঃ মুখার্জীর শব লওয়া শোক যাত্রার দৃশ্য

বৃত্ত চিহ্নিত অংশে শবাধার দৃশ্যমান

ফটো—পান্না সেন

৮২ বৎসর। মঙ্গলবার শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বৃদ্ধা জননীকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করেন, তখন প্রথমে তিনি কথাটি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন,—"শ্যামাকে ছেড়ে দিয়েছে?" তখন সংবাদটি পুনরায় তাঁহাকে জানান হয় এবং শুনিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বুধবার সকালে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল সান্ত্বনা জানাইতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়েন। শ্যামাপ্রসাদের শোকাতুরা জননী রাজ্যপালকে দেখিয়া বলিয়া ওঠেন, "হরেন, তুমি কি ক'রতে এসেছ? আমার ছেলেকে কি এনে দিতে পারবে? বিধান আমার ছেলের মত। ওর মত এতবড় ডাক্তার থাকতেও আমার ছেলে এইভাবে এক রকম বিনা চিকিৎসাতেই গেল। আমার ছেলের অসুখ, অথচ তা আমাকে একবার জানানও হ'ল না। আমি এর বিচার চাই।"

বাটী হইতে শেষ যাত্রার পূর্বে এক মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা হয়। শোকবিহ্বলা বৃদ্ধা জননী শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ ছাড়িতে চাহেন না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কেবলই বলিতে থাকেন, তাহার প্রাণপ্রিয় শ্যামাপ্রসাদকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। তাহার অন্যান্য পুত্রগণ তখন তাঁহাকে কোলে করিয়া অপর কক্ষে লইয়া যান। তথায় তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এইভাবেই কয়েকদিন চলিতে থাকে। কয়েকদিন ধরিয়া কেহ তাঁহাকে এক ফোঁটা জলও খাওয়াইতে পারে নাই।

পরিবারবর্গের মধ্যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ফটো—পান্না সেন

জীবন-কথা

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জননীর নাম যোগমায়া দেবী। ১৯০১ সালের জুলাই মাসে শ্যামাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের চার পুত্র,—রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ—এবং তিন কন্যা। শ্যামাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে আইনের পরীক্ষায় বি-এল্ ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে যান এবং সেখান হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী ও মেডিকেল কলেজের লেকচারার ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা সুধা দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে সুধা দেবী লোকান্তরিত হন। শ্যামাপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম অনুতোষ ও দেবতোষ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম সবিতা দেবী ও আরতি দেবী।

১৯২৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বান অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। পরে পুনরায় আইন-সভায় প্রবেশ করিয়া তিনি আইন সভার কার্যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি, আইন জ্ঞান ও বাগ্মিতার পরিচয় দেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে বৃত হওয়ার সময় তাঁহার ছিল মাত্র ৩৩ বৎসর। আর কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অপর কোনও ব্যক্তি অত অল্প বয়সে ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ লাভ করেন নাই। ১৯৩৬ সালেও তিনি পুনর্বার উক্ত পদে নির্বাচিত হন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যক্ষের পদেও এই সময় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতা তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে এবং স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি দেশের আশা ও ভরসার পাত্র হইয়া দাঁড়ান। মুসলিম লিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে হিন্দুদের ন্যায়সংগতদাবীও বিপন্ন হইতে দেখিয়া তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে তিনি যত্নবান হন এবং হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়া তিনি নির্বাচিত হন উহার ওয়ার্কিং

প্রেসিডেন্ট। এই সময় হইতেই ভারতের নানাস্থানে ব্যাপকভাবে তাঁহার সফর সুরু হয়।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙলায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে শ্যামাপ্রসাদ অর্থ-বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের ভাগলপুরে এই সময় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বিহারে তখন চলিতেছিল গভর্ণরের শাসন। বিহারে উক্ত অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ আদেশ অমান্য করিয়া অধিবেশনে যোগদানের জন্য গমন করেন। বিহারে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে আটক করা হয়।

১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবের সময় মেদিনীপুরের জনগণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ অর্থ-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক সভায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া যে আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ১৯৪৩ সালে যখন বঙ্গদেশ ইংরাজসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদই অগ্রণী হইয়া সেই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সেবার তুলনা হয় না।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালে আইনসভাসমূহের নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে শ্যামাপ্রসাদ বিনা বাধায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতালাভের পর পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীরূপে স্থানলাভ করেন। গণপরিষদের সদস্য-রূপে নূতন ভারতীয় সংবিধান রচনায় তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দুগণের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ এবং তাহার প্রতিবিধান কল্পে সম্পাদিত অপ্রসারণস্য নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে এপ্রিল মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে ভারত-সরকারের 'দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত ও সামঞ্জস্যহীন' মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের এক বিরাট জনসভায় নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। এই সময় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ 'পিপলস্ পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল সংগঠিত করিলে দেশের নানা স্থান হইতে উহা সমর্থন লাভ করে। অতঃপর বিভিন্ন দলের সমবায়ে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে দিল্লীতে তাঁহার নেতৃত্বে "নিখিল ভারত জনসংঘ" নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি হন তিনি ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার গড়ের মাঠে এ[illegible] চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহে[illegible] ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের হস্তে ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত [illegible] মহামোগ্গলায়নের পূতাস্থি অর্পণ করেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মা[illegible] তিনি মহাবোধি সোসাইটির সভাপতিরূপে সাঁচীতে উক্ত শিষ্যদ্বয়ের পূ[illegible] স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৫২ সালে প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শ্যামাপ্রসা[illegible] কলিকাতা দক্ষিণ-পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্র হইতে জনসংঘের প্রার্থী হিসা[illegible] লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। আইন-সভায় তিনি ছিলেন এ[illegible] শক্তিশালী বিরোধী দলের নেতা। তাঁহার বক্তব্যের সারবত্তা কেহ[illegible] অস্বীকার করিতে পারিত না—তাঁহার বাগ্মিতায় সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। সরকার পক্ষের উপরও তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব বিস্তৃত হইত।

শ্যামাপ্রসাদের কর্মবহুল জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রদান প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে তিনি সংযুক্ত ছিলেন তাহা[illegible] ইয়ত্তা নাই। সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া ছিলেন, সেগুলির নাম,—'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'A Phase of Indian Struggle', 'বঙ্কিম পরিচয়' (সম্পাদিত) প্রভৃতি। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থখানির প্রচার ইংরাজ সরকার কিছু দিন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ভারতভুক্ত করিবার দাবী করিয়া জম্মুর প্রজা পরিষদ যে আন্দোলন শুরু করেন, সেই আন্দোলনের সমর্থনে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে সভা শোভাযাত্রাদির ব্যবস্থা করা হয়। সরকার পক্ষ সভা শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করেন। শ্যামাপ্রসাদ চাঁদনীচকে শোভাযাত্রা সম্পর্কিত উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, জননিরাপত্তা আইনে সেজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁহাকে কিন্তু মুক্তিদান করেন।

ইহার পর কাশ্মীর সমস্যা লইয়া লোকসভায় শ্যামাপ্রসাদের সহিত প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর তীব্র বাক্‌যুদ্ধ হয় এবং উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে পত্রের আদান প্রদানও চলে। কাশ্মীরকে রক্ষা করিতে বিপুল লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও উহাকে ভারতভুক্ত না করিয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনও সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পান নাই। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ যে কোনও ভারতীয় নাগরিক পূর্ব অনুমতি না লইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তেজস্বী শ্যামাপ্রসাদ এই পারমিট ব্যবস্থা অমান্য করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া ভারত ও কাশ্মীর রাজ্যের কৃত্রিম ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে চান এবং তদনুযায়ী কার্য করেন। ইহারই ফলে গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহাকে বিনা বিচারে আবদ্ধ থাকিতে হয় এবং তাঁহার বন্দী অবস্থাতেই এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া যায়।

পুরুষসিংহ শ্যামাপ্রসাদ কখনও অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার করেন

নাই। মনুষ্যত্ব যেখানেই নির্যাতিত হইয়াছে, মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইয়াছে ক্ষুণ্ণ, উত্থিত হইয়াছে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ—সেইখানেই তিনি অনমনীয় দৃঢ়তায় তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হইয়াছেন, সেইখানেই ধ্বনিত হইয়াছে তাঁহার জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। পদমর্যাদার মোহ তাঁহার বিবেকবুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করে নাই। স্বর্গত পিতার মতই তিনি যুগপৎ কঠোরতা ও কোমলতার প্রতীক ছিলেন। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর—আবার ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত মনুষ্যের প্রতি তিনি ছিলেন কুসুমেরই মত মৃদু। তাঁহার স্থান ছিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে। তাঁহার উদার, অকপট, অমায়িক ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ করিত। তাঁহার দেশসেবা জনচিত্তে তাঁহাকে অক্ষয় অমরত্বের অধিকারী করিয়াছে। তাঁহার সমগ্র জীবন কর্ম ও কর্তব্যের অনুশীলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাশ্মীরে তাঁহার জীবনাবসান আদর্শের নিকট আত্মবলি। দধীচির মত অস্থিদান করিয়া কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির আদর্শকে তিনি জনগণমানসে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন।

আজ শ্যামাপ্রসাদ নাই। তাঁহার আকস্মিক অকাল বিয়োগে শুধু বাংলাতেই নয়—সমগ্র ভারতে স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতি আজ একান্তভাবেই নেতৃহীন হইল। সংকটের অমানিশায় আর কেহ তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইবে না। যে পরিস্থিতির মধ্যে শোচনীয়ভাবে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল—তাহারই আক্ষেপ আজ সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত না, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই। তাঁহার কৌঁসুলিকে পর্যন্ত তাঁহার সহিত একাকী সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইত না। তাঁহার গুরুতর পীড়া সম্পর্কেও রহস্যময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা উপযুক্ত হইয়াছিল কিনা, তাহা লইয়াও আজ গণচিত্তে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছে। কাশ্মীরের মত একটি অনগ্রসর অঞ্চলে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবস্থায় যে স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটি হওয়া সম্ভব, ইহাও অনুমান করা কঠিন নয়। অপ্রত্যাশিত ঔদাসীন্য ও কঠোরতার মধ্যে তাঁহার মত একজন সর্ব-ভারতীয় বরেণ্য নেতার অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের আত্মদানের পর আজ স্বাধীন ভারত সরকারেরও ভাবিবার সময় আসিয়াছে, ভারতকে তাঁহারা কোথায় লইয়া যাইতেছেন।

॥ শ্যামাপ্রসাদের অমর আত্মা শান্তিলাভ করুন ॥

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

তৃতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের অফিস ঘরে মেডিকেল কমিশন বসিয়াছে। মেডিকেল কমিশনে আছেন—ডাঃ বোস, ডাঃ গাঙ্গুলী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ চক্রবর্তী। কমিশনের সামনে পরীক্ষার জন্য দীনদয়ালকে আনা হইয়াছে। তাঁহার হাতের হাতকড়া খোলা। জয়ন্ত, জয়া ও ভুজঙ্গ উৎসুকভাবে কমিশনের অভিমত জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছেন—হাসপাতালের ট্রাস্টিগণ, কয়েকজন নার্স এবং হলধর প্রভৃতি কতিপয় রোগী। জয়া যেখানে বসিয়াছে তাহার পাশে একটি সুটকেশ রহিয়াছে। দীনদয়াল সাজাহানরূপে ভাবস্থ রহিয়াছেন। সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন।

দীনদয়াল ॥ মুঘল দরবারের সম্মানিত আমির ওমরাহ ও সভাসদগণ! বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবের হস্তে—আমি ভারত সম্রাট সাজাহান—আজ বন্দী। দুনিয়ায় এত বড় অনাচার—এত বড় অবিচার তোমরা স্বচক্ষে দেখেও নীরবে সহ্য করছো? একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে না? এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত হচ্ছে না! খোদা—দীন দুনিয়ার মালেক—তুমিও চুপ ক'রে বসে আছ? কোথায় তোমার বজ্র, কোথায় তোমার ভূমিকম্প—কোথায় তোমার জলপ্লাবন? ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—এই অভিশপ্ত পৃথিবীকে তুমি ধ্বংস কর।

জয়া ॥ বাবা! বাবা!

জয়ন্ত ॥ আপনি শান্ত হোন বাবা!

দীনদয়াল ॥ কে? জাহানারা! শান্ত হ'তে বলছিস! জীবনে এখনো তোদের লোভ! মিথ্যা আশা দারা—বৃথা আশা জাহানারা! (ভুজঙ্গকে দেখাইয়া) ঐ ঔরংজী—ও যে কত ভীষণ—কী নির্মম—কী নৃশংস—কত বড় শয়তান—তা তোরা আজও বুঝতে পারিস নি দারা, বুঝতে পারিস নি জাহানারা। নইলে পুত্র হয়ে স্নেহান্ধ পিতাকে বন্দী করে? ভ্রাতৃ রক্তের পিপাসায় উন্মাদ হয়? মাতার স্মৃতি—অক্ষয় প্রেমের পুণ্যপ্রতীক পবিত্র তাজমহল উৎসাদন করে? আজ কোথায় আমার তাজমহল?

বাতায়নের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে

যমুনার পরপারে কোথায় আমার তাজমহল? নাই—নাই—যতদূর দৃষ্টি চলে—কই? কোথায়? দেখি—(নিরীক্ষণ)।

ডাঃ বোস॥ (চেয়ারম্যানকে) হি হ্যাজ কম্‌প্লিট্‌লি গন্ অফ্ হিজ হেড্—মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের আকাশ আছে কি?

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ যে পরিবেশে উনি থাকতেন, সেই পরিবেশটি পুরোপুরি সৃষ্টি করতে পারলে—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যেত।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ সেই পরিবেশেই তো উনি রয়েছেন ডাঃ গাঙ্গুলী।

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ হ্যাঁ, সবই রয়েছে—কিন্তু তাজমহলের সেই মডেলটা—সেটা কি কোন মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না?

ভুজঙ্গ॥ বলেছি তো স্যার—সেই গুর্খাটা সেটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলেছে।

জয়া॥ কিন্তু—

ভুজঙ্গ॥ হ্যাঁ জয়াদেবী—আমি কমিশনকে সব বলেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ হ্যাঁ—আপনি বলেছেন। (জয়াকে) তবে আপনিও যদি কিছু বলতে চান বলুন।

জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় দীনদয়াল বাতায়ন হইতে পুনরায় প্রলাপ বকিতে বকিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন

দীনদয়াল॥ নেই—নেই—কোথাও তাজমহল নেই। যমুনার পরপারে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু পড়ে রয়েছে ধূসর বালুকারাশি। (চীৎকারে করিয়া উঠিলেন) কোথায় আমার তাজমহল? ওরে শয়তানের দল—ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—আমার তাজমহল আমায় ফিরিয়ে দে।

জয়া॥ (অভিনয়ের সুরে) বাবা—বাবা। কার সাধ্য তোমার তাজমহল ধ্বংস করে?

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুটকেশ হইতে তাজমহল বাহির করিয়া দীনদয়ালের সামনে ধরিল

এই নাও তোমার তাজমহল—তোমার অমর প্রেমের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল।

দীনদয়াল স্তব্ধ হইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে তাজমহলটি দেখিতে লাগিলেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিল

দীনদয়াল॥ তাই তো! সেই তাজমহল! কিন্তু তোমার হাতে কেন? (ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। হঠাৎ মাথায় হাত দিয়া) আমি পড়ে গিয়েছিলাম?

জয়া॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা—একটা গুর্খা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

দীনদয়াল॥ মনে পড়েছে। ভুজঙ্গ ওটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিল। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। গুর্খাটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু তারপর? (চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এরা কে? এখানে কেন? এ যে দেখছি ডাঃ বোস! ও—(কি যেন মনে পড়িল) হ্যাঁ—আপনিও এসেছিলেন। কিন্তু ডাঃ চক্রবর্তী? আপনি কবে ফিরেছেন? ভালো আছেন?

ডাঃ চক্রবর্তী॥ হ্যাঁ—ডাক্তার চৌধুরী। বিলেত থেকে গত সেপ্টেম্বরে ফিরেছি। আপনার অসুখের খবর পেয়ে আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

দীনদয়াল॥ হ্যাঁ—পড়ে গিয়েছিলাম—মাথায় বড্ড চোট লেগেছিল। হ্যাঁ মনে পড়ছে—আমার এখন সব মনে পড়ছে। কিন্তু আপনারা আমার হাসপাতালে পায়ের ধূলো দিয়েছেন—এ আমার কী সৌভাগ্য! জয়া মা—জয়ন্ত—ওঁদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করো।

জয়া ও জয়ন্ত সানন্দে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

ডাঃ চক্রবর্তী॥ না—না—থাক্।

দীনদয়াল॥ না-না, ডাঃ চক্রবর্তী—আপনারা যখন দয়া করে এসেছেন—আমার হাসপাতাল না দেখে কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমাকে আর দেখতে হবে না, আমি সেরে গেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ সত্যিই আপনি সেরে গেছেন। স্পষ্ট বুঝছি—একটা ষড়যন্ত্রের ফলেই আপনার এত দুর্গতি হয়েছে। যাক সে কথা—সে আমরা রিপোর্টে লিখবো। সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে। চলুন—আপনার হাসপাতাল দেখবো।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

দীনদয়াল॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গ—ভুজঙ্গ কোথায়?…ওই দেখো—হতভাগাটা কাজের সময় কোথায় সরে পড়েছে। আপনাকে বলিনি, ডাঃ বোস! সত্যিই ওর মাথায় দোষ হয়েছে। আসুন—আপনারা—আমার সঙ্গে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী॥ All's well that ends well. চলুন।

এমন সময় নার্স আসিয়া দাঁড়াইল

দীনদয়াল॥ এই যে নার্স—ভুজঙ্গ কোথায়?

নার্স॥ তিনি সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বলেছেন।

নার্স একটি খাম সামনে ধরিল

দীনদয়াল॥ মাথা খারাপ। নইলে কেউ এমন সময় চলে যায়! (তিনি না পড়িয়া খামখানা পকেটে রাখিলেন) আসুন ডাঃ চক্রবর্ত্তী—আসুন আপনারা।

দীনদয়ালের সহিত সকলে চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

দীনদয়ালের পূর্ব্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত।

জয়া॥ না জয়ন্তবাবু—তা হয় না। আপনি আজই এই ট্রেণেই কলকাতা চলে যান। ধরুন—আমার সঙ্গেই ঝগড়া করে কলকাতা চলে গেলেন। গিয়ে আজই পাঠিয়ে দিন—বিমানবাবুকে। আজ রাত্রেই আমি তার সঙ্গে চলে যেতে চাই কলকাতায়—যাতে আপনি কাল সকালেই বাবাকে টেলিগ্রামে জানাতে পারেন—আমি কলেরায় মারা গেছি।

জয়ন্ত॥ কিন্তু শুনুন জয়া দেবী—এর কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

জয়া॥ আছে—আছে। এ-মিথ্যা আর চলতে পারে না, জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত॥ কিন্তু ভেবে দেখুন—এ মিথ্যার আর কোন সাক্ষী নেই। কাজেই এ মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে আর তো কোন বাধা নেই।

জয়া॥ লোকে তাই ভাবে বটে। কিন্তু মিথ্যার সাক্ষী থাকে পদে পদে। সে সাক্ষী এখানেও আছে—ঐ ভুজঙ্গবাবু।

জয়ন্ত॥ সেদিন রাত্রে ঐ আলমারির আড়ালে লুকিয়ে ভুজঙ্গ সব শুনেছে—আপনি বলেছেন জয়া দেবী। কিন্তু সে ভুজঙ্গও আজ নেই—হাসপাতালের কয়েক হাজার টাকা চুরি ক'রে মেডিকেল-কমিশন চলে যাবার আগেই সে পালিয়েছে। এখানে আর সে জীবনেও আসবে না, জয়া দেবী।

কিন্তু॥ কিন্তু ভুজঙ্গই আমাদের মিথ্যার একমাত্র সাক্ষী নয়, জয়ন্তবাবু। সাক্ষী আমার অন্তরাত্মা। (মমতাময়ীর তৈলচিত্র দেখাইয়া) সাক্ষী আপনার সতী সাধ্বী মায়ের অমর আত্মা। না—না—জয়ন্তবাবু। এ ঘরে—এই বাড়ীতে বাপ মায়ের পুণ্য মন্দিরে—এই মিথ্যার বোঝা আমি বইতে পারবো না—এ পাপ আমি সইতে পারবো না।

জয়ন্ত॥ বেশ। তবে আর কলকাতা যাব না। এক মিথ্যা ঢাকতে নতুন মিথ্যার জালে আর আমরা জড়িয়ে পড়বো না। আসুন—আমরা বাবাকে সব খুলে বলি।

জয়া॥ (ভীতভাবে) না—না—তাও পারবো না। আমরা তাঁকে প্রতারণা করেছি—এ আঘাত তিনি সইতে পারবেন না। আপনিই একদিন বলেছিলেন—তিনি সব সইতে পারেন—সইতে পারেন না শুধু প্রবঞ্চনা—সইতে পারেন না শুধু প্রতারণা।

জয়ন্ত॥ তবে তোমাকে আমি কলেরায়ও মারতে পারবো না জয়া। তোমাকে আমি চাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বোধ হয় তোমাকেই আমি চেয়েছি। তাই বিধাতা সেদিন অমন করে ঘটিয়েছিলেন—এই অদ্ভুত যোগাযোগ। কলেরায় একবার তোমাকে মেরে ফেলে, আবার তোমাকে বাঁচাবো কি করে বাবার কাছে? অনেক বুদ্ধিই অনেকবার খাটিয়েছি—কিন্তু এ আমার বুদ্ধির বাইরে। কলেরায় মরতে চাইছো—সে কি আমার জীবনে আর তুমি আসবে না বলে জয়া?—বল—বল—

জয়া॥ (নীরব রহিল)

জয়ন্ত॥ চুপ ক'রে রইলে যে? ও! তবে এতদিন যা তুমি করেছো—সবই তোমার অভিনয়! শুধু অভিনয়! অভিনয় শেষ হয়েছে—থিয়েটার ভেঙে গেছে—অভিনেত্রী বাড়ী যাবে—সাজ-পোষাক খুলে ফেলছে—মুখের রঙ তুলে

ফেলছে। সে রঙ তুলে ফেলা—এ তো সোজা। মনে তো তার রঙ লাগেনি।

জয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জয়ন্ত! জয়ন্ত! কোথায় সে সব গেল। বউমাই বা কোথায়?" এই বলিতে বলিতে দীনদয়ালের প্রবেশ।

দীনদয়াল॥ ও! তা থাকো—থাকো। আমিই যাচ্ছি।

জয়া॥ না বাবা। আপনি একটু দাঁড়ান।

দীনদয়াল॥ কেন, কি হয়েছে? কেমন একটা থমথমে ভাব দেখছি, বউমার মুখখানা বড্ড বেশি গম্ভীর মনে হচ্ছে!

জয়ন্ত॥ উনি আজই কলকাতায় চলে যেতে চাচ্ছেন।

দীনদয়াল॥ কলকাতা দেখছি গোসাঘর হয়ে দাঁড়াল! ঝগড়াঝাঁটি হলেই কলকাতা! শুনলুম যুধিষ্ঠির কার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কলকাতা ছুটেছে। আমার উপর রাগ করে ভুজংগ কলকাতা ছুটলো। ওহো ভুজংগ কি একটা চিঠি দিয়ে গেছে—এই দেখ পকেটেই রয়ে গেছে—দেখা আর হয়নি।

খামটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিটি পড়িতে লাগিলেন

দীনদয়াল॥ "শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মানিতে হইল। আমি চিরদিনের মত চলিলাম। আপনি পুত্র-পুত্রবধূসহ সুখে শান্তিতে আপনার তাজমহলেই বাস করুন। তহবিলে কয়েক হাজার টাকা কম দেখিয়া উতলা হইবেন না। দয়া করিয়া পুলিশ হাঙ্গামাও করিবেন না। আমাকে ধরিতে গেলে আপনার পারিবারিক কলঙ্ক আমি গোপন রাখিতে পারিব না।"

দীনদয়াল থামিয়া গেলেন। জয়া ও জয়ন্তকে চাহিয়া দেখিয়া বাকি অংশ রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিলেন

দীনদয়াল॥ (জয়ন্তকে) বিয়ে করোনি?

জয়ন্ত॥ না বাবা। (জয়ন্ত মুখ নত করিল)

দীনদয়াল? গাধা! একটা অনাথা মেয়েকে বউ সাজিয়ে এনে তার সঙ্গে খেলা করছো? তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো? এতদূর অধঃপাতে গেছ তুমি? আজই এই ট্রেণে চলো কলকাতায়। এর পরেই যে লগ্ন আছে—সেই লগ্নেই হবে তোমাদের বিয়ে। না দাঁড়াও—(জয়াকে) এমন একটা হতভাগার সঙ্গে বিয়েতে তোমার মত আছে তো মা?

জয়া আসিয়া দীনদয়ালকে প্রণাম করিল। জয়ন্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

দীনদয়াল। আছে—তবে আছে। যাক—হতভাগার একটা গতি হল। বিয়ে হোক। কিন্তু দুজনের এই লক্ষণগুলো ভাল নয়—গোপন করার প্রবৃত্তি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ—অকারণ ক্রন্দন—'হিসটেরিয়া'—দুজনেই থাবে—বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে। কিন্তু আর দেরি নয়—তোমাদের বিয়ে হয়নি—এ আর আমি সইতে পারছি না। আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বিয়ে ক'রে পাগল হয়েছি—এরা বিয়ে না ক'রে পাগলামি করছে। না—না—বিয়ে যদি আজ দিতে পারি তবে কাল নয়। এখনি ট্রেণ ধরতে হবে। (বিষম তাড়ায়) চলো—চলো—

জয়া ও জয়ন্ত নতমুখে ছুটিল। পশ্চাতে ছুটিলেন দীনদয়াল

—যবনিকা পতন—

রচনাকাল: ১৮ই জুলাই—২৭শে জুলাই, ১৯৫৩
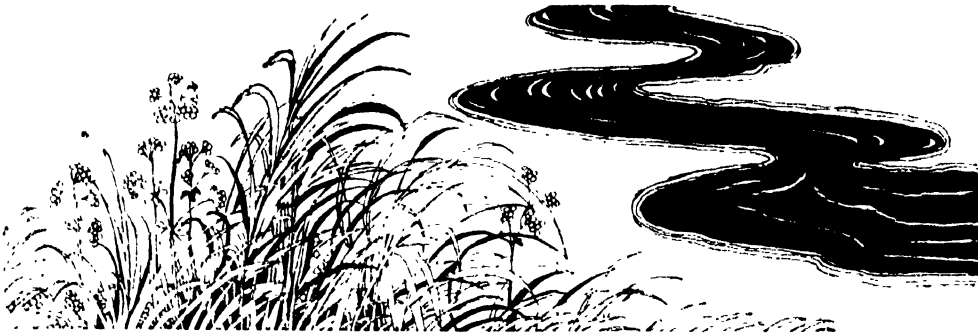
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সোভিয়েট রাজধানী প্রাচীন মস্কো সহরের সৃষ্টি আটশো-চার বছর আগে—১১৪৭ খৃষ্টাব্দে। রুশের অতীত-ইতিহাসে দেখা যায়, সেকালে রাজ্যের 'শ্লাভ' (Slav) বংশীয় আদি-রাজাদের আমলে (আধুনিক সোভিয়েট প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেণের (The Ukrainian Soviet Socialist Republic) প্রধান সহর 'কিয়েভ' (Kiev) ছিল রাজধানী। রুশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রুরিক এবং 'শ্লাভ্' বংশের আদি-রাজারা গোড়ায় ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী…তবে শৌর্য্যে বিক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত। যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সুশাসন ব্যবস্থা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন…দেশের উন্নতির দিকেও ছিল তাঁদের সজাগ দৃষ্টি! ক্রমে দেশের বাইরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক-সম্পর্ক এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসার বৃদ্ধি পাবার দরুণ খ্রীশ্চান ক্যাথলিক ধর্মমতাবলম্বী গ্রীসের সংস্পর্শে এসে, রুশ-রাজ্যের 'শ্লাভ্' রাজারা খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন…প্রজাদেরও দীক্ষিত করে তোলেন রাজার ধর্মে। এমনি করে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম ভ্লাদিমিরের রাজত্বের সময় সারা রুশে ক্যাথলিক খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হলো।

প্রাচীন ক্রেমলিন দুর্গ থেকে আধুনিক মস্কো সহরের দৃশ্য

রুশ রাজ প্রথম ভ্লাদিমিরের পরেও প্রায় সুদীর্ঘ একশো-ষাট বছর তাঁর বংশীয়েরা সগৌরবে রাজত্ব করেন, প্রত্যেকের সুশাসন-ব্যবস্থায় প্রাচীন রুশ রাজধানী তৎকালীন 'কিয়েভ্' সহরের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। পরবর্তী রুশ-রাজাদের মধ্যে সম্রাট ইয়ারোশ্লাভের (১০১৯-১০৫৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য! তিনি যে শুধু বিশিষ্ট-বিচক্ষণ, বিজ্ঞ-প্রজানুরঞ্জক ছিলেন, তা নয়—নানা বৈদেশিক-রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈবাহিক ও রাজনৈতিক-সম্পর্ক পাতিয়ে রাজ্যের এবং রাজধানী 'কিয়েভ্' সহরের গৌরব-গরিমা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সম্রাট ইয়ারোশ্লাভের আমলেই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় রাজকীয় আইন-কানুনের প্রথম প্রচলন এবং বংশ-ধারায় রাজ-সন্তানদের রাজ্যাধিকারের বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁর অবর্ত্তমানে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে রাজ-বংশীয়দের মধ্যে যাতে বিরোধ-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে, এই উদ্দেশ্যে দূরদর্শী-সম্রাট ইয়ারোশ্লাভ্ রাজ্যাভিষেকের এই শেষোক্ত বিধানটির ব্যবস্থা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর চেষ্টার ফল দাঁড়ালো বিপরীত! রুশ রাজ ইয়ারোশ্লাভের মৃত্যুর পর 'কিয়েভের' সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাধলো তুমুল বিরোধ…ভাঙ্গন ধরলো সুপ্রতিষ্ঠিত 'শ্লাভ্' রাজবংশে এবং দেশের

সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থায়। এই বিষাক্ত আত্ম-কলহের ফলে 'শ্লাভ্' রাজ বংশের উত্তরাধিকারীরা একে-একে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের প্রাচীন রাজধানী 'কিয়েভ্' ছেড়ে দূর-দূরান্তে গিয়ে রুশ-রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের নিজের রাজ্য, রাজধানী···নূতন-নূতন জনপদ! সম্রাট ইয়ারোশ্লাভের সুযোগ্য পৌত্র ভ্লাদিমির মোনো-মাকের (১১১৩-১১২৫) চেষ্টায় 'শ্লাভ্' রাজ-বংশীয়দের এই সর্বনাশা আত্মকলহের বেগ সাময়িকভাবে শান্ত হলেও, মোনোমাকের মৃত্যুর পর তাঁর বীর-পুত্র রাজা মৃষ্টিশ্লাভের (১১২৫-১১৩২) অকাল-প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সারা রুশ-জুড়ে সতেজে প্রধূমিত হ'লো 'কিয়েভের' উত্তরাধিকার নিয়ে সেই অন্তর্বিপ্লব। সে আত্মঘাতী-দ্বন্দ্বের দাপটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল রাজধানী 'কিয়েভের' সমৃদ্ধি, গৌরব, প্রতিষ্ঠা···সব কিছু!

মস্কোর সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল—আধুনিক যুগে

রাজ্যাধিকার নিয়ে এই কলহ বিপ্লবের ফলে, 'শ্লাভ্' রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীদের একটা দল 'কিয়েভ্' ছেড়ে পালিয়ে রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের প্রান্তে নূতন বসতি স্থাপন করেন। এই নূতন বসতিকে কেন্দ্র করেই পরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ভ্লাদিমির-সুজ্‌দাল্' বংশের নবীন রাজ্য। সে-রাজ্যের রাজধানী নব-নির্ম্মিত 'ভ্লাদিমির' সহর! রুশের প্রাচীন ইতিহাসে সেকালের এই উপনিবেশ-সহরটির বিশেষ-উল্লেখ আছে এবং অতীতের এই 'ভ্লাদিমির' কি ভাবে আধুনিক মস্কো মহা নগরীতেরূপান্তরিত হলো, সে কাহিনীও আমরা পাই! মস্কো সহরের আদি বিবরণ সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক-তথ্য যা মেলে, তা থেকে জানা যায়,—১১৪৭ খৃষ্টাব্দে মস্কো নদীর উপকূলে সাতটি নাতি-বৃহৎ পার্ব্বত্যটিলার উপর, রচিত এই 'ভ্লাদিমির' সহরেই তৎকালীন শাসক-সম্প্রদায় 'ভ্লাদিমির-সুজ্‌দাল্' রাজ-বংশের এক রাজা তাঁর বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীবন্ধুকে সাড়ম্বরে রাজোচিত-সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন।

নব-প্রতিষ্ঠিত 'ভ্লাদিমির-সুজ্‌দাল্' রাজ্যের শক্তি দিন দিন প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আত্মকলহের বিষে জর্জ্জরিত 'কিয়েভের' প্রাচীন 'শ্লাভ্' শাসনের পতন ঘটে। দেশের পুরোনো রাজধানীর আওতা বাইরে, নূতন উপনিবেশ-রাজ্য-পত্তনের পর 'শ্লাভ্'-সম্রাট ভ্লাদিমির মোনোমাকের পৌত্র বিজয়ী-বীর আন্দ্রেই বোগোলুভ্‌স্কী ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী-স্বজন 'কিয়েভের' শেষ-রাজা দ্বিতীয় ঈশাশ্লাভ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধ-জয়ের পর, মনের আক্রোশ মেটাতে আন্দ্রেই বোগোলুভ্‌স্কী নির্ম্মমভাবে শুধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিলোপ সাধন করলেন···'শ্লাভ্' রাজ-বংশের সমৃদ্ধ রাজধানী 'কিয়েভ'-সহর ধ্বংস করে ধূলায় মিশিয়ে দিলেন। তারপর তিনি নদীর তীরে নব-নির্ম্মিত 'ভ্লাদিমির' জন পদে এসে গড়ে তোলেন নূতন রাজধানী।

নব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ী-বীর আন্দ্রেই বোগোলুভ্‌স্কীর ভাগ্যে রাজ্য-ভোগ লেখেননি বিধাতা! সুশাসক হলেও বোগোলুভ্‌স্কী ছিলেন দারুণ স্বেচ্ছাচারী, জেদী, এক রোখা···রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে সব সময়েই শুভানুধ্যায়ী অনুচরদের মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের জিদ বজায় রেখে চলতেন। তার ফলে, বোগোলুভ্‌স্কী অচিরে প্রজাদের বিরাগভাজন হন···অমাত্যেরা গোপনে চক্রান্ত করলেন রাজার বিরুদ্ধে। সে-চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে অতর্কিতে প্রাণ হারালেন রাজা বোগোলুভ্‌স্কী!

বোগোলুভ্‌স্কীর হাতে নব-রাজধানী 'ভ্লাদিমির' সহরের উন্নতি হয়েছিল। তাঁর বাসনা ছিল—'শ্লাভ্'-রাজাদের পুরোনো রাজধানী 'কিয়েভের' চেয়েও সুন্দর, সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবেন এই নূতন রাজধানী। তাঁর আমলে 'ভ্লাদিমির' সহরে সে-যুগের স্থাপত্য-কলার ছাঁদে বহু বিচিত্র ধর্ম্ম-মন্দির, মঠ, গির্জ্জা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল—সে-সবের প্রতি-চিত্র নিদর্শন আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে আধুনিক সোভিয়েট-রাজ্যের নানা যাদুঘরে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে, প্রাচীন পুঁথির পাতায়!

আন্দ্রেই বোগোলুভ্‌স্কীর মৃত্যুর পর, সুদীর্ঘ দু'শো বছর ধরে এখানে রাজত্ব করে গেছেন তাঁর বংশধর দুর্ব্বল, হীনশক্তি একদল রাজা···ইতিহাসে তাঁদের তেমন উল্লেখ নেই। তবে এঁদেরই রাজ্যকালে ক্রমে রাজধানী 'ভ্লাদিমির' সহরের নামান্তর ঘটে। মস্কো নদীর উপকূলে অবস্থিত বলে রাজধানীর নূতন নাম হলো—মস্কো! এমনি ভাবেই গোড়া-পত্তন হয় রুশ-রাজ্যের ঐতিহাসিক জন-পদ মস্কো মহা-নগরীর!

তারপর, সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সাতশো আশী বছর ধরে সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতির ঘটনা-স্মৃতিতে-ভরা কত না স্রোত বয়ে গেছে মস্কোর উপর দিয়ে! সে-সবের চিহ্ন বুকে নিয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি-রাজনীতির অভিনব সমন্বয় রচে, প্রদীপ্ত মহিমায় সগৌরবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রাচীন এই রাজধানী!

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মোঙ্গোলিয়ার দুর্দ্ধর্ষ-বীর চেঙ্গিশ্ খানের নেতৃত্বে মধ্য-এশিয়ার পরাক্রান্ত তাতার দস্যুদের অতর্কিত-আক্রমণ এবং নির্ম্মম লুণ্ঠন-অত্যাচারের ফলে সারা রুশ-রাজ্য বিপর্য্যস্ত ও ধ্বংশগ্রস্ত হয়ে পড়ে! চেঙ্গিশ খানের মৃত্যুর পরেও তাতার-দস্যুদের উৎপীড়নের অপ্রতিহত দাপটে রুশ-বাসীদের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে! যুদ্ধে দস্যুদের হারাতে না পেরে নোভ্গোরোদের রাজা প্রসিদ্ধ রুশ বীর আলেকজান্দার নেভ্স্কীর পুত্র মস্কো-অধিপতি দানিয়েল অবশেষে প্রচুর উৎকোচ-উপঢৌকন দিয়ে লুণ্ঠন-লোলুপ তাতার-দস্যুদের সঙ্গে সন্ধি করেন, সেই সন্ধির বলে তখনকার মত মস্কোকে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

দানিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁরই বংশধর মস্কোর অধিপতি প্রথম আইভান (১৩২৮-১৩৪০)। বিদেশী-শত্রুর আক্রমণ-উপদ্রব থেকে রাজ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজধানী মস্কোতে সুদৃঢ় 'ক্রেম্লিন্' (Kremlin) দুর্গ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্রথম আইভানের পর, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে মস্কোর রাজা দিমিত্রি ডন্স্কোইয়ের রাজ্য-কালে রুশ রাজধানীর বহু উন্নতি এবং প্রতিপত্তি হয়। রাজ অমাত্যদের দলবদ্ধ করে তাঁদের সাহায্যে বীর দিমিত্রি ডন্স্কোই অত্যাচারী তাতার দলপতি মামাই খানকে যুদ্ধে হারিয়ে মস্কো-রাজধানীকে বিদেশী শত্রুর উৎপাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন! তাতার-সেনার আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য দিমিত্রি ক্রেমলিন দুর্গ প্রাসাদের চারিদিকে পাথরের যে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টনী রচনা করেছিলেন আজও তা বজায় রয়েছে। এ উৎপীড়ন অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে পরবর্ত্তীকালে রুশ-রাজ্যের বিস্তার হয় এবং মস্কো-রাজধানীরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে! এ-সব উন্নতি সত্ত্বেও, দেশের স্বার্থান্ধ সম্ভ্রান্ত-মণ্ডলী এবং রাজ-অমাত্যদের হিংসা-দ্বেষ কলহ-বিপ্লব লেগে থাকতো সব সময়ে। তার ফলে মস্কোয় শান্তি ছিলনা। এ অশান্তি চরমে ওঠে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে…রুশ 'জার্' (Czar) বংশের প্রতিষ্ঠাতা মস্কো-অধিপতি Ivan the Great বা তৃতীয় আইভানের রাজত্বের সময়—তাঁর আমল থেকেই রাজধানী মস্কোতে সিংহাসনে বসে 'জার্'-দের রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হলো! সুদক্ষ-সম্রাট তৃতীয় আইভানের আমলেই রাজধানী মস্কোর গৌরব-প্রতিপত্তি বিশেষ প্রসার লাভ করে…কৌলীন্য-মর্য্যাদায় এই প্রাচীন মহা-নগরীকে তখনকার দিনে দেশ-বিদেশের লোকেরা সশ্রদ্ধ সমাদর জানিয়ে বলতো—'তৃতীয় রোম'!

তৃতীয় আইভানের পর রাজা হন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র তৃতীয় বেসিল। বেসিলের অকাল-মৃত্যুর পর মস্কোর সিংহাসনের অধিকারী হলেন চতুর্থ আইভান্ (১৫৩৩-১৫৮৪)। রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে চতুর্থ আইভান ছিলেন নির্ম্মম কঠোর…লোকে তাই তাঁর নাম দিয়েছিল—Ivan the Terrible! এঁর রাজ্যকালে ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী মস্কো বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়! সেকালে ওদেশের প্রথানুযায়ী গ্রাম এবং সহরে সাধারণ প্রজাদের বসত-বাড়ীগুলি বেশীর ভাগই তৈরী হতো কাঠের গুঁড়ি ও তক্তা সাজিয়ে। তাছাড়া সে আমলে ওদেশে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী-ঘর বানিয়ে বাসের রীতি প্রচলিত ছিল। এর উপর, শীত প্রধান দেশ বলে আগুন পোহানোর বাতিক ছিল। কাজেই কাঠের ঘরে বাস, নিত্য আগুন লাগতো। সে-আগুনে গ্রাম-সহর, বাড়ী-ঘর সব পুড়ে ছারখার হতো। এমনি বহু অগ্নিকাণ্ড হামেশা ঘটতো তখনকার দিনে. সেজন্য দেশের ও দশের ক্ষয়-ক্ষতি হতো বিস্তর! কিন্তু উপায়ও ছিল না। দেশের সাধারণ লোকজন অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী… পরমুখাপেক্ষী…নিরক্ষর অশিক্ষিত। অবস্থাও তাদের এত দীন-হীন ছিল যে ইট-পাথরের পাকা ঘর-বাড়ী বানিয়ে বাস করার কথা ছিল স্বপ্নের অগোচর! রাজ-অমাত্য এবং বিত্তশালী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র বাস করতেন ইট পাথরে তৈরী পাকা অট্টালিকায়! তাছাড়া দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের হিড়িক লেগে থাকতো সর্ব্বদা—সেজন্য রাজারাও নিজেদের বিলাস-ব্যসন, রণ সজ্জা ও ধর্ম্ম-সাধনা ছাড়া জনগণের শিক্ষা-সভ্যতা সংস্কৃতির সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থাকতেন। তার ফলে, মস্কোর রাজ-দরবারের বাইরে জন-সাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়…শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, রুচি নেই—মন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।
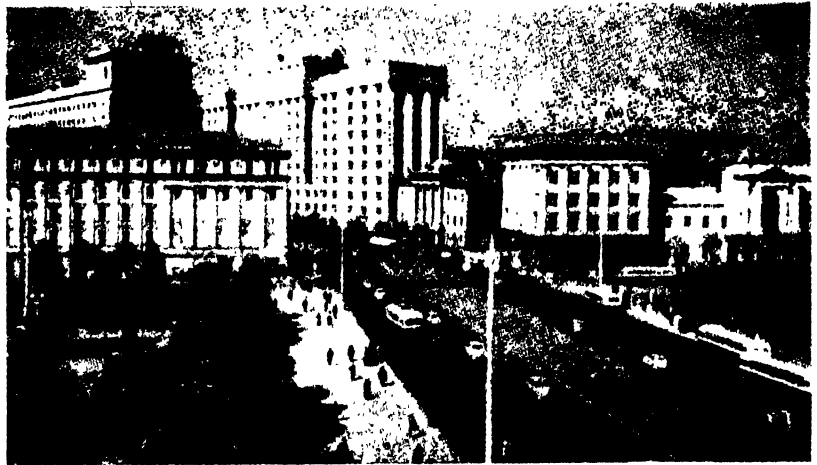
আধুনিক মস্কো শহরের একটি রাজপথ

মাত্র ষোল বছর বয়সে সিংহাসনে বসেই চতুর্থ আইভান্ ঘোষণা করলেন তিনি শুধু মস্কো-রাজবংশের উত্তরাধিকারী রাজা নন…

বিরাট রুশ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি—দেশের সার্ব্বভৌম 'জার' ('Tzar')! সেই থেকে সারা রুশ-রাজ্যের উপর 'জার'দের আধিপত্য এবং শাসনাধিকারের সূত্রপাত।

'জার' আইভানের রাজত্বকালে রাজধানী মস্কোতে তৈরী হয় প্রসিদ্ধ সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল। সুশাসক এবং ধর্মোন্মাদ হলেও 'জার' আইভান এমন নির্ম্মম ছিলেন, পাছে তাঁর অমর সৃষ্টি মস্কোর এই সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রালের চেয়ে সুন্দর কোনো গির্জ্জা ভবিষ্যতে নির্ম্মিত হয়—তাই তিনি ঐ ধর্ম্ম মন্দির গড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থপতিশিল্পীর দু'টি চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া রুশে মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা তিনিই করেন। পরে ইংলণ্ড, পোলাণ্ড, জার্ম্মানী, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্দ্য-

মস্কোর সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল—প্রাচীন আমলের

বিনিময়ের ফলে তৎকালীন ইয়োরোপের সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে মস্কোর বহু উন্নতি এবং মর্য্যাদা ও আভিজাত্য বৃদ্ধি পায় অনেকখানি।

চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর পর রাজ্যে দারুণ দুর্দ্দিন এলো, আবার ভাঙ্গন ধরলো মস্কোর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন 'শ্লাভ্' রাজবংশে... অরাজকতায় দেশ ভরে উঠলো! আইভানের অযোগ্য পুত্র 'জার' ফিদোরের (১৫৮৪-১৫৯৮) অক্ষমতার সুযোগে তাঁরই নিকট-আত্মীয় বোরিস্ গোডুনভ্ নামে এক সুদক্ষ অমাত্য প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন করে রুশ সম্রাটের পিছনে থেকে রাজকার্য্য পরিচালনা সুরু করলেন! তারপর দুর্ব্বল রাজা ফিদোরের মৃত্যু হলে বোরিস্ গোডুনভ্ দেশের প্রজা সাধারণ এবং ধর্ম্ম যাজকদের সম্মতি ও সহযোগিতায় মস্কোর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে নিজেকে 'জার' বলে ঘোষণা করলেন!

বোরিস গোডুনভের রাজ্যকালে (১৫৯৮-১৬০৫) দারুণ দুর্ভিক্ষ হলো রাজ্যে। অন্নাভাবের সঙ্গে মড়ক-মহামারীর আবির্ভাব। অরাজকতা মাত্রা বেড়ে চললো ব্যাপকভাবে...বিপ্লব, লুঠ-তরাজ, রাহাজানি অত্যাচারের বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠলো দেশের মানুষের মন। অভাব দুর্দ্দশায় উত্যক্ত হয়ে মস্কো সহর ছেড়ে সকলে দলে-দলে পালালো বনে জঙ্গলে...দুর্দ্দম 'কশাক' (Cossack) দস্যুদের আশ্রয়ে। 'কশাক্' দস্যুরা সে সময়ে সুযোগ বুঝে প্রায় অমানুষিক-লুণ্ঠন-অত্যাচারের নির্ম্মম-অভিযান চালাতো মস্কোর বুকে! সে-যুগের রাজ-দরবারের বিধানে রুশ-দেশের দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় ছিল রাজ্যের বিত্তশালী ভূম্যধিকারীদের ক্রীতদাসের সামিল...মানুষ বলে কেউ তাদের মনে করতো না। মাত্র এই একশ বিশ বছর আগে—১৮২০ সালেও মস্কোতে ক্রীতদাস-বিক্রয়ের প্রকাশ্য বাজার বসতো এবং সেখানে পণ্য-সামগ্রীর মত দাস দাসী বেচা কেনা চলতো। কৃষকদের এই শোচনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার সম্বন্ধে 'জার'-রা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দারুণ অত্যাচারী। জনসাধারণের কাছ থেকে যথেচ্ছ রাজস্ব আদায় করে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকা, আর রাজদরবারের কুচক্রী-চাটুকার আমলাদের স্বার্থান্ধ তোষামোদে মজে শাসন করাই ছিল চরম লক্ষ্য! রাজ্যের প্রজা সাধারণের মঙ্গল বা হিত সাধনার দিকে তারা দৃষ্টিমাত্র করতেন না। দরবারে ছিল যত কুচক্রী, চাটুকার আর ব্যভিচারীদের আধিপত্য। এছাড়া যথেচ্ছ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য রাজ্যের বিত্তশালী জমীদারদের সঙ্গেও 'জার'দের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে! বোরিস গোডুনভের রাজ্যকালে দারুণ অজন্মা আর দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকদের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁচেছিল বলেই অবশেষে দেশ-ব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো! সে-আগুনে ঝলসে উঠেছিল মস্কোর রাজ-দরবার...এবং সিংহাসন! 'জার' বোরিস্ গোডুনভের প্রাণপাত চেষ্টাতেও বিপ্লবের আগুন প্রশমিত হলো না...বেড়ে চললো! এমনি সঙ্কীণ মুহূর্ত্তে বোরিস গোডুনভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রুশের পরম প্রতিদ্বন্দ্বী পোলাণ্ডের রাজার সহায়তা এবং পক্ষচ্ছায়ায়পুষ্ট ডিমিট্রি নামে মস্কোর সিংহাসনের দাবীদার এক জাল-উত্তরাধিকারী! ডিমিট্রির দাবী অস্বীকার করে বোরিস্ গোডুনভ্ যুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত এবং বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-ভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিল না! এ যুদ্ধের কিছুকাল পরে অকস্মাৎ বোরিস্ গোডুনভের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

গোডুনভের মৃত্যুর পর কশাক্ এবং কৃষক প্রজাদের সমর্থনে মস্কোর সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন সেই নকল-উত্তরাধিকারী ডিমিট্রি, (১৬০৫-১৬০৬)! ডিমিট্রির রাজ্যকাল মাত্র এক বছর...কিন্তু এই এক বছরে বিদেশী পোলাণ্ড-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী ডিমিট্রি সকলের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন! শেষে বেসিল স্যুইস্কী নামে দরবারের এক বিশিষ্ট অমাত্য জাল-সম্রাট ডিমিট্রিকে হত্যার অভিপ্রায়ে সদলে প্রবেশ

করলেন ক্রেমলিন্ দুর্গে! হত্যাকারীদের আগমন-সংবাদ পেয়েই ডিমিট্রি ভয়ে প্রাসাদের জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে জখম এবং বন্দী হন! কুড়ুল, বর্শা, তলোয়ার দিয়ে জাল-রাজা ডিমিট্রির দেহ টুকরো-টুকরো করে কেটে ক্রেমলিন দুর্গের সামনে মস্কোর প্রসিদ্ধ 'লাল-সড়ক' বা Red Square এর মুক্ত প্রাঙ্গণে ফেলে রাখা হয়—দেশের লোকের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য! কথিত আছে, মস্কোর বিদ্বেষী রাজন্যবর্গের আক্রোশ এমন প্রবল হয় যে, ডিমিট্রির খণ্ডিত-দেহ দাহ করার পর সেই চিতা-ভস্ম নিয়ে কামানের খোলে পুরে তোপ্ দাগা হয়েছিল!

ডিমিট্রির পর বেসিল স্যুইস্কী চতুর্থ বেসিল নাম নিয়ে রুশ-রাজ্যের সার্বভৌম 'জার' হিসাবে মস্কোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন্! কিন্তু রাজধানী মস্কোর অবস্থা তখন খুব শোচনীয়...অরাজকতা-অত্যাচার বিপ্লব-চক্রান্ত আর উচ্ছৃঙ্খলতার বিষ-বাষ্পে সারা দেশ ছেয়ে গেছে! রাজ্যের আদি 'প্রভু' রাজা রুরিকের বংশধর বেসিল স্যুইস্কী চার বছর মাত্র রাজত্ব করেছিলেন! কিন্তু এই চার বছরেই তাঁর দুর্ভোগের সীমা ছিল না। তাঁর রাজ্যকালে রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মস্কোর উপর দিয়ে ক্রিমিয়ার নির্ম্মম তাতার, 'নীপার' নদীর উপকূলস্থ দুর্দ্ধর্ষ-বর্ব্বর 'জাপোরোগ' কশাক (Zaporog Cossacks) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী-পোলাণ্ডের রাজ-সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচার এবং লুণ্ঠন অভিযানের ঝড় বয়ে গিয়েছিল! তাছাড়া রুশ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে 'ডিমিট্রি' নামে আরো একজন নকল-দাবীদারকে খাড়া করে পোলাণ্ডের রাজা 'জার' বেসিল স্যুইস্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিলেন। সে-যুদ্ধে পোলাণ্ডের সৈন্যেরা জয়লাভ করে এবং রাজধানী মস্কো সহর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার ও ধর্ম্ম-মন্দির ট্রিনিটি চার্চ্চ ধ্বংশ করে ক্রেমলিন্ দুর্গ-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধকালে 'জার্' বেসিল স্যুইস্কীর আকস্মিক-মৃত্যুর পর, রুশ-রাজ্যের প্রধান ধর্ম্ম-গুরু হার্মোজেন নামে অশীতিপর-বৃদ্ধ দেশ-প্রেমিক নেতা বিদেশী শত্রুদের কবল থেকে রাজধানী পুনরুদ্ধারকল্পে দেশের বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে মুক্তি-আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে তুললেন। সারা-রাজ্য জুড়ে এই তীব্র বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করার অপরাধে মস্কোস্থিত পোলাণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি অবশেষে পুণ্যাত্মা-হার্মোজেনকে ক্রেমলিন্-দুর্গের এক নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখেন। ক্রেমলিনের কারা-কক্ষে নিয়ে যাবার সময় মস্কোর ঐতিহাসিক 'লাল-চত্বরে'র (Red Square) মুক্ত প্রাঙ্গণে সম্মিলিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীক-দেশপ্রেমী হার্মোজেন দীপ্ত-কণ্ঠে সকলকে শেষ-আবেদন জানিয়ে যান—দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য! অনাহারে, অযত্নে নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারা-কক্ষে রুশের অন্যতম বীর শহীদ ঋষি হার্মোজেনের প্রাণ বিয়োগ ঘটে! (ক্রমশঃ)

চিরন্তনী

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

জীবনের সারা-ক্ষণ কত ঠাঁই খুঁজি
কত কিছু করিলাম সযতনে পুঁজি;
কতটুকু এর আমি নিয়ে যাবো সাথে?
যে কেহ গিয়াছে চলি, গেছে রিক্ত হাতে।
তবু বাদ, বিসম্বাদ, তবু দ্বন্দ্ব, দ্বেষ,
হানাহানি পরস্পর ক'রে আনি ক্লেশ;
সুখের সহজ দিন করি কণ্টকিত,
দুঃখে হই ম্রিয়মাণ, ভয়ে হই ভীত।
এ ধরায় কতবারই হ'বে যাওয়া-আসা,
দিয়ে যাবো প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা,
নিয়ে যাবো সকলের প্রিয় সম্ভাষণ,
সেইটুকু পাথেয়েরি করি আকিঞ্চন।
সঞ্চিত যতই কিছু, যত কিছু বোঝা
সব ফেলে একদিন যেতে হ'বে সোজা।

পড়িছে ফাগুন প্রাতে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুসুমের মরসুমি মধুরাতে মনে তোলো আশ
স্মরণের সরোবরে অবগাহি' চাহিতে মরণ;
ঝরিল দু'খানি চোখে শাওনের অঝোর ঝরণ,
আঁধারে ভরিল সারা হৃদয়ের বিরহী আকাশ।
বন্ধদ্বারে কর হানি' সাধি' গেল বসন্ত-বাতাস,
শ্রবণে পশিল আসি' আঙিনার কুহু-কুহরণ;
কে যেন ডাকিল ভাবি' বাড়াইতে চপল চরণ
অলীক কল্পনা লাজে থমকিলে চমকি' নিরাশ।
তখন তোমার পাশে বসি' কোনো নূতন আত্মীয়
চিকণ-চিকুর চুলে ভালোবেসে বুলাল অঙ্গুলি
মোহ-মুগ্ধ-অন্ধতায় প্রেম-কথা কহি' কমনীয়;
নিরুদ্ধ কান্নার ঢেউ বক্ষে তব উছলিল দুলি'।
ব্যথায় বেপথুমতী নিদ্রাহীন রাত্রি করি ভোর
প্রভাতে পড়িছ বসি' অশ্রু-লেখা চতুর্দ্দশী মোর॥

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফ্‌বয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 230-50 BG

-আট-

"E' um pouco caro."

খোদাবক্স খাঁর মুখ দেখে কিছু অনুমান করা কঠিন। সে মুখে ভাবের বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। শুধু চোখের কোনায় ক্লান্তির কলঙ্ক রেখা—একটা উত্তাপহীন ঘুমন্ত দৃষ্টি। কাল সমস্ত রাত উদ্দাম আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি—দুটি নতুন সুন্দরী নর্তকী এসেছে তাঁর রংমহলে। খোদাবক্স খাঁর মাথার ভেতরে এখনো তাদের পেশোয়াজের ঘূর্ণি ঘুরছে, কানের মধ্যে এখনো বেজে চলেছে তাদের ঘুঙুরের আওয়াজ। বিষধর সাপের মতো তাদের হিংস্র উজ্জ্বল শরীর এখনো ফণা তুলে আছে রক্তে। খোদাবক্স খাঁ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন।

পর্তুগীজদের তাঁর পছন্দ হয় না। ওদের মিত্রতা তিনি চান না—শত্রুতাও না। দূরে আছে, দূরেই থাক। তাই যখন ডি-মেলোর জাহাজ এসে তাঁর ঘাটে লাগল, তখন তিনি সংক্ষেপেই ওদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন। বিলাসী শান্তিপ্রিয় মানুষ খোদাবক্স খাঁ—রাজনীতির চাইতে নারী-তত্ত্বই তিনি বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু উজীর জামান খাঁর জন্যেই এই বিপদে তিনি পড়েছেন।

তাঁর শত্রুর সঙ্গে বিরোধ চলছে—নিষ্পত্তি তিনি নিজেই করবেন। তার মাঝখানে এরা আবার কেন? চট্টগ্রামের বন্দর ভুল করে এখানে এসে পৌঁচেছে—বেশ তো, চট্টগ্রামের রাস্তা বাতলে দিলেই তো চুকে যায় সমস্ত। এমন কি প্রয়োজন হলে তিনি না হয় দুছত্র পরিচয়ও লিখে দিতে রাজী ছিলেন চট্টগ্রামের সুলতানকে। কিন্তু ম কিছু গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বসলেন জামান খাঁ।

—এসেই যখন পড়েছে খোদাবন্দ, তখন কাজে লাগানো যাক ওদের।

—কিন্তু উজীর সাহেব, ওদের ঘাঁটানো কি উচিত? শেষে আবার ফ্যাসাদে না পড়ি।

—আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন। খ্রীস্টানেরা হল বানিয়ার জাত। ওরা যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তা ছাড়া আখেরটাও বোঝে বিলক্ষণ। ব্যবসায় সুবিধে যদি পায়, ঠিক রাজী হয়ে যাবে।

কিন্তু রাজী হননি ডি-মেলো। ফলে, এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

খোদাবক্স খাঁ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

—যদি গোলমাল করে? যদি বহর নিয়ে আসে?

—মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করে দেব—ভাববেন না।

—কিন্তু ওরা ভালো লড়ে—ভারী ভারী কামান আছে ওদের—

—আমাদের পেছনে আছেন চাটগাঁয়ের সুলতান, আছেন গৌড়ের বাদশাহ, আছে সারা হিন্দুস্থান। ভয় নেই জনাব, ওরা ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

ঠিকই বুঝেছিলেন জামান খাঁ। সাহস যে পাবে না তারই প্রমাণ আজ কোয়েল্‌হো আর ভ্যাসকন্‌সেলসে দৌত্য। দুজন নবাগত পর্তুগীজ সেনানী এসে দাঁড়িয়েছে ডি-মেলোর মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। মুর দোভাষীর মুখে তাদের নিবেদন শুনছিলেন খোদাবক্স খাঁ।

কিন্তু শুনতে শুনতে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে। কাল রাতের রংমহলের স্মৃতি উন্মনা করে দিয়েছে তাঁকে। মাথার ভিতরে রেশমী পেশোয়াজের ঘূর্ণি; সুর্মাটানা চোখের অগ্নিবাণ; বিষাক্ত সাপের মতো কামনাতপ্ত সুঠাম শরীর; জাহান্নম আর ফির্‌দৌসের সুধা-গরল।

কিন্তু স্বপ্ন ভাঙল জামান খাঁর আহ্বানে।

—খোদাবন্দ্, ওরা মুক্তিপণ দিতে চাইছে।

—কিসের মুক্তিপণ?—চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবক্স খাঁ।

—পর্তুগীজ সেনাপতির জন্যে।

মুক্তিপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছু অর্থাগম হয়—সে তো ভালোই। এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, ততই নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।

একবার সম্পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফেলে তিনি তাকালেন পর্তুগীজদের দিকে। দুটি ঋজু দেহ মানুষ স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। কপালে সেই এক চোখ ঢাকা বাঁকা টুপি, গায়ে ডোরাকাটা বাঘের মতো আঙ্গিয়া—কোমরবন্ধে সরল দীর্ঘাকার তলোয়ার। বিনয়ের নম্রতা নিয়ে এসেছে বটে, তবু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেলেন না খোদাবক্স খাঁ। কঠিন পিঙ্গল চোখ, সে চোখে মর্মান্তিক ঘৃণা, সুস্পষ্ট জ্বালা। হঠাৎ মনে হল ডোরাদার বাঘের মতোই এ নতুন মানুষগুলো সম্পূর্ণ মানুষ নয়—ওদের অর্ধেকটা জান্তব। ওদের না খোঁচালেই হত ভালো। ওরা যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার সঙ্গে এর আগে কোনো পরিচয় তাঁর হয় নি—ভবিষ্যতেও না হলেই তিনি সুখী হবেন। কালিকটের পথ যে ভাবে রক্তে ওরা স্নান করিয়েছিল, সে কাহিনী বিভীষিকার মতো শুনেছেন খোদাবক্স খাঁ, এখানে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই তিনি খুশি হবেন।

কোয়েলহোর গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল গম গম করে: এক হাজার 'ক্রুজাডো'। *

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চোখের ইঙ্গিতে বাধা দিলেন জামান খাঁ। চাপা গলায় কী একটা জানালেন দোভাষীকে।

দোভাষী বললে, না—নবাব ওতে রাজী নন্।

পর্তুগীজেরা একবার মুখ চাওয়া-চায়ি করলে। তার পর আবার শোনা গেল কোয়েলহোর গম্ভীর স্বর: এক হাজার আর পাঁচশো ক্রুজাডো।

—না।—জামান খাঁর নির্দেশ এল।

খোদাবক্স খাঁ অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠলেন।

—অনর্থক আর গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই উজীর সাহেব। মিটিয়েই ফেলুন।

—আপনি বুঝতে পারছেন না নবাব। ওরা বানিয়ার জাত। আস্তে আস্তে দর চড়াবে।

ব্যক্তিত্বহীন খোদাবক্স খাঁ চুপ করে রইলেন। নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। নিরুপায়ভাবে আবার তলিয়ে যেতে চাইলেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে।

—না, এতেও নবাব সন্তুষ্ট নন্।

দপ করে একবার জ্বলে উঠল ভ্যাসকন্‌সেলসের চোখ, হাত চলে যেতে চাইল কোমরবন্ধের দিকে। কিন্তু পেছনেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মুর সৈনিকের দল, তাদের তলোয়ার আর বন্দুক প্রস্তুত হয়েই আছে।

যথাসাধ্য আত্মসংযম করে কোয়েলহো বললেন, দু হাজার ক্রুজাডো।

খোদাবক্স খাঁ আর থাকতে পারলেন না। ডাকলেন, জামান খাঁ?

—আপনি ব্যস্ত হবেন না নবাব। দর আরো চড়বে।

দোভাষী বললে, না, দু হাজারেও হবে না!

তামাটে চাপদাড়ির আড়ালে এবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কোয়েলহো। শয়তানির স্বরূপটা একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ; এ ভাবে হবে না, এ পথে নয়। লোভকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই বেড়ে চলবে সে—তার বিষাক্ত জাল থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই: ত্রিশ হাজার ক্রুজাডো দিলেও না।

অন্য উপায় দেখতে হবে।

অসহ্য ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—মাথার মধ্যে ফেটে পড়ছে রক্তের হিংস্র উল্লাস। অন্তত দুজনে মিলেই এই বর্বর মুরদের কাছে খ্রীস্টানের বাহুবলের পরিচয় দিতে পারেন—বুঝিয়ে দিতে পারেন আগুন নিয়ে খেলা করছে তারা।

---

* মোটামুটী এক হাজার টাকার সমান। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু আপাতত ধৈর্যহারা হয়ে লাভ নেই, সেটা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে। সময় আসুক—দেখা যাবে তখন।

দুর্বিনীত মাথাটাকে অতি কষ্টে নত করলেন কোয়েল্‌হো।

—আপাতত এর বেশি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। নবাব অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হোন।

মুর দোভাষীর কণ্ঠে এবার ব্যঙ্গবাণী বেজে উঠল: নবাব খানখানান খোদাবক্স খাঁ বিশ্বাস করেন, পর্তুগীজ ক্যাপিটানদের জাহাজগুলো বাজেয়াপ্ত করলেই এর চাইতে দশগুণ লাভবান হবেন তিনি।

বজ্রগর্ভ মেঘের মতো দুজন পর্তুগীজই স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোয়েলহো বললেন, নবাবের কত দাবী?

—পাঁচ হাজার ক্রুজাডো। এবং সেই সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনীতে পর্তুগীজদের সহায়তা।

কোয়েল্‌হো আর একবার ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর ভ্যাস্‌কন্‌সেলসকে মৃদু একটা আকর্ষণ করে বললেন, আমরা ভেবে দেখতে চাই। আশা করি, নবাব আর একদিন আমাদের সময় দেবেন।

একদিন কেন, সাতদিন সময় দিতে রাজী আছেন নবাব। তাঁর তাড়া নেই।

—বেশ তাই হবে। অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন পর্তুগীজেরা। দরবারশুদ্ধ সমস্ত লোক সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাঁদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোদাবক্স খাঁ নড়ে উঠলেন একবার।

—উজীর সাহেব, আমার ভালো লাগছে না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেই হত।

জামান খাঁ প্রাজ্ঞের হাসি হাসলেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খোদাবন্দ্‌। যা চেয়েছেন, সবই পাবেন। বলা যায় না, আরো কিছু বেশিই পাবেন হয়তো।

দরবার ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন খোদাবক্স খাঁ। একবার তাকালেন বাইরের দিকে। শীতের স্নিগ্ধ রোদে উজ্জ্বল নীলিম আকাশ। রাত আসতে আর দেরী কত? আবার কখন আলো জ্বলবে রংমহলে, আবার সারেঙ্গীতে পড়বে ছড়ের টান, নেশায় রঙীন হবে চোখের দৃষ্টি, ঘুঙুরের তালে তালে শুরু হবে খরযৌবনের আগুন বর্ষণ, বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হবে—এটা ফিরদৌস না জাহান্নাম? জাহান্নাম, না ফিরদৌস?

না, দিনের এই আলো, এই কোলাহল—এই সব বিরক্তিকর কাজ—এ খোদাবক্স খাঁর ভালো লাগে না। রাত্রিই তাঁর নিজস্ব—রংমহলই তাঁর দরবার।

কত দেরী তার? কখন আসবে সেই রাত?

সেই রাত এল।

রংমহলের উজ্জ্বল আলোয় নয়, গজলের সুরে না, সারেঙ্গীর ঝঙ্কারেও নয়। তপ্ত যৌবনের অগ্নিবৃষ্টিও নে[illegible] কোথাও। কারাগারের নিষ্ঠুর অন্ধকারের ভেতরে শীতে[illegible] হিমানী স্পর্শ আরো হিমেল্‌ হয়ে উঠতে লাগল।

বন্দী পর্তুগীজেরা কেউ কেউ ওরই মধ্যে জড়োসড়ো হ[illegible] শুয়ে পড়েছে—কেউ কেউ বা ছায়ার আড়ালে আরো [illegible] এক পুঞ্জ ছায়ার মতো বসে আছে। কোথা থেকে সে[illegible] পচা মাংসের কটু গন্ধটা তেমনি ছড়িয়ে চলেছে—প্র[illegible] প্রথম দম আটকে আনত, এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে অনেকখানি। অন্ধকারে গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকার সচল প্রা[illegible] ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—তারা ইঁদুর; বিকেলে তাঁদে[illegible] যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তারই ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে এসেছে ওরা।

এই অসহ্য অপমানিত বন্দীত্বের ভেতর ওদের মুক্ত জীবন মনে যেন হিংসার জ্বালা ধরায়। নিরুপায় ক্রোধে কে একজন একটা ইঁদুরকে সজোরে লাথি মারল, ধপ করে সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালে, তারপর আহত-যন্ত্রণা[illegible] মানুষের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল।

সেই শব্দে আত্মমগ্ন অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বুকের কাছে ঘন হয়ে আছে গঞ্জালো—একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। সেই সঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠা ঘরের অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত-অর্ধ জাগ্রত মানুষগুলোর মতো একই প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে এল? মুক্তির দূত কি এল? ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ আর কোয়েল্‌হো কি তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

কিন্তু প্রত্যাশায় ভরা দীর্ঘ দিন কেটে গেছে—তারপর এই ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে শীতক্লান্ত জর্জর রাত্রি। এখনো কোনো খবর এল না। ওদেরই বা কী হয়েছে কে বলতে পারে? হয়তো তাঁদের মতো ওরাও এখন কোনো অন্ধকার কারাগারে প্রহর গুণছে। সিল্‌ভিরাই ঠিক বুঝেছিল। মুরদের বিশ্বাস নেই।

—A luz।—কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাই বটে। আলো—একটুখানি আলো থাকলেও যেন আশার চি[illegible] থাকত। কী অদ্ভুত—অস্বাভাবিক অন্ধকার! চারদিকে যেন প্রেতাত্মাদের নিঃশব্দ কান্না বাজছে!

পেড্রোই কি ঠিক বুঝেছে? আত্মসমর্পণ করবেন? রাজী হয়ে যাবেন নবাবের প্রস্তাবে? নিজের মনের মধ্যে কথাটা আবার নতুন করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডি-মেলো। যদি সোজাসুজি হত্যার আদেশ দিত, টেনে নিয়ে যেত বধ্যভূমিতে, ডি-মেলো তা সহ্য করতে পারতেন—বীর হিস্‌পানিয়ার সন্তান মৃত্যুবরণ করতেন বীরের মতো। কিন্তু এই কারাগার অসহ্য। এর অন্ধকার, এর শীতলতা, এর কোনো অলক্ষ্য অংশ থেকে পচা মড়ার গন্ধ—স[illegible] একসঙ্গে মিশে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তাঁর স্নায়ুকে।

এ যেন তিলে তিলে মানুষকে উন্মত্ততার মধ্যে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা। না—মুরদের অনুষ্ঠানে ত্রুটি নেই কোথাও। তবু এর মধ্যেই কে গান গেয়ে উঠল। কার গলায় বেজে উঠল মাতা মেরীর নাম গান। যারা ঘুমুচ্ছিল অথবা ঘুমের ভান করছিল, নড়ে উঠল তারা—কেউ কেউ উঠেও বসল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল ডি-মেলোর মন। A luz! হ্যাঁ—আলোই পেয়েছেন তিনি। যে মাতা মেরীর নামে হিস্পানিয়ার বুক থেকে মুরদের শেষ দুর্গও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই শক্তিই এ সঙ্কটেও তাঁদের রক্ষা করবে। Conosco—Conosco—গায়ক গেয়ে চলেছে। ঠিক কথা, মেরী আমাদের সঙ্গেই আছেন—তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ হল বাইরে। চাপা গোঙানির আওয়াজ—ঝন্ ঝন্ করে তলোয়ারের ধ্বনি। গান বন্ধ করে একসঙ্গে কারাগারের সমস্ত মানুষগুলো দরজার দিকে তাকালো। আর কয়েক মুহূর্ত অনন্ত সময়ের গণ্ডী পার হয়ে প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল—ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া বিরাট দরজা দুটো।

বন্দী পর্তুগীজেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। বাইরে থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। A luz! আর সেই আলোয় চারজন পর্তুগীজের ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। কোয়েল্হো, ভ্যাসকন্সেলস্ আর সেই সঙ্গে আরো দুজন সৈনিক!

কেউ কিছু বলবার আগেই তীব্র চাপা-গর্জন এল ভ্যাস্কন্সেলসের গলা থেকে।

—চুপ! প্রহরীদের খুন করে আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। এখনি পালাতে হবে। Pronto?

—Pronto!—সমবেত স্বরে তেমনি চাপা প্রতিধ্বনি উঠল: প্রস্তুত।

—তা হলে আর দেরি নয়। এখুনি—এই মুহূর্তেই। কিন্তু একটুও শব্দ না হয়।

নিঃশব্দ পায়ে নিজেদের বুকের স্পন্দন শুনতে শুনতে সদলবলে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। দরজার সামনেই পড়ে আছে মুর প্রহরীরা—এ জীবনের মতো পাহারা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওদের। নিজেদের রক্তে স্নান করছে ওদের দেহ।

ভ্যান্কন্সেলস্ বললেন, এই পথে।

কারাগারের ঠিক পেছনেই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে একটা একাণ্ড বটগাছ পিশাচমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সেই বটগাছের ডাল থেকে সারি সারি দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচে। ওই পথ দিয়ে ওরা নেমেছে—ওই পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে সকলকে!

নিঃশব্দে দড়ি বেয়ে এক একজন উঠতে লাগল ওপরে। কিন্তু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এতগুলি মানুষের আকর্ষণে বার বার বিশ্রী শব্দ হতে লাগল গাছের ডালে—গাছের ওপর ঘুমন্ত কতগুলো কাক আচমকা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

আর ভীতি-বিহ্বল পর্তুগীজেরা দেখল, দূরে কাছের অন্ধকারে আচম্কা কতগুলো মশাল জ্বলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড চিৎকার—পালায়—পালায়—

নবাবের রক্ষীরা টের পেয়েছে!

দড়ি ধরে যারা ঝুলছিল, তারা পাথর হয়ে রইল। কোয়েলগো ভ্যান্কন্সেলসের সঙ্গে যে দু একজন প্রাচীরের ওপর উঠতে পেরেছিল, তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল!

ওদিক থেকে দুম্দাম্ করে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ এল। আর্তনাদ তুলে প্রাচীরের ওপর থেকে একজন ডি-মেলোর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এগিয়ে আসা মশালের আলোয় ডি-মেলো তার রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে চিনতে পারলেন: সে পেড্রো!

অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবশিষ্ট পর্তুগীজদের সঙ্গে ডি-মেলোও হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালাবার পথ নেই আর—আর উপায় নেই। চারদিক থেকে খোদাবক্স খাঁর সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। আর মশালের আলোয় কোতোয়ালের হাতে ঝকমক করছে নগ্ন খরধার তলোয়ার।

A luz! সে আলো নিবে গেছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে এখনো। সকলের আগেই প্রাচীরের বাইরে চলে যেতে পেরেছে গঞ্জালো। সে অন্তত মুক্তি পেয়েছে এই অসহ্য কারাগারের অমানুষিক দুঃস্বপ্ন থেকে। এর পরে তাঁদের যা হওয়ার তাই হোক।

পায়ের কাছে নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পেড্রো। বিদ্রোহী হয়েছিল—এবার তার নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ। কিন্তু তারও মুক্তি হয়ে গেছে—আর দুঃখ করবার মতো কিছুই নেই!

* * * *

মুক্তি!

গঞ্জালোও তাই ভেবেছিল হয়তো। কিন্তু বাইরে নেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রাচীরের ভেতরে যে বন্দুকের আওয়াজ চলছে—বাইরেও সে বিভীষিকা থেকে মুক্তি নেই। প্রচণ্ড কোলাহল তুলে এখানেও ছুটে আসছে নবাবের সৈন্য!

অভ্যাস বসেই যেন একবার আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় তাকালো গঞ্জালো—খুঁজতে চাইল কাছাকাছি কোথাও ডি-মেলো আছেন কিনা! কিন্তু ডি-মেলো কেন—কোয়েলহো, ভ্যান্কন্সেলসকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পরক্ষণেই পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গঞ্জালো ছুটে চলল।

হাতে একখানা তলোয়ার—একটি ছোট অস্ত্র, যা হোক

কিছু থাকলেও এমন করে ছুটে পালাত না গঞ্জালো, রুখে দাঁড়াত সিংহ-শাবকের মতো। কিন্তু কৈশোরের সমস্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও এটা সে বুঝতে পেরেছে যে ওভাবে ফিরে দাঁড়ানো মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করা। গঞ্জালো এগিয়ে চলল যথাশক্তি দ্রুত পায়ে।

অচেনা দেশ, অচেনা মাটি। কোথায় যাবে জানে না, কোথায় তার শত্রু মিত্র তাও বোঝবার ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণপক্ষের কালো অন্ধকার চারদিকে। এলোমেলো হাওয়ায় হু হু করছে দীর্ঘকায় নারিকেল বন, প্রতি পায়ে পায়ে হোঁচট লাগছে, বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে পথ আটকে যাচ্ছে বারবার। আর তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে নিষ্ঠুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এসে পড়ল—এসে পড়ল বুঝি!

কতক্ষণ ছুটেছে জানে না। প্রবল শীতের হাওয়াতেও কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে তার। পা ভেঙে আসছে—আর সে ছুটতে পারে না। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অন্যদিক দিয়ে চলে গেল—ওকে খুঁজে পায়নি। একবার থেমে দাঁড়ালো গঞ্জালো-বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে।

এতক্ষণ চারপাশে ছিল নীরন্ধ্র অন্ধকার—এইবার আলো দেখা যাচ্ছে একটা। শত্রু, না মিত্র? কিন্তু আর বিচার করার উপায় নেই গঞ্জালোর। মিত্র হলে আশ্রয় চাইবে, শত্রু হলে আত্মসমর্পণ করে বলবে, এবার আমাকে নিয়ে তোমাদের যা খুসি করো।

আলোর রেখাটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলল গঞ্জালো।

খানিকদূর যেতেই দেখা গেল আলো আসছে একটা টিলার ওপর থেকে। সেই টিলার গায়ে দুধের মতো শাদা একটি বাড়ি—তার তীক্ষ্ণাগ্র চূড়ো উঠেছে আকাশে। অনেকটা 'ইগ্রেঝা'র মতোই দেখতে। গঞ্জালো বুঝতে পারল। এর আগেও সে কিছু কিছু ও-রকম বাড়ি দেখেছে, ও আর কিছু নয়—'জেণ্টুর'দের ধর্মমন্দির।

ওখানে অন্তত আশ্রয় পাওয়া যাবে। অন্তত ওখানে নবাবের সৈন্য তার জন্যে থাবা পেতে অপেক্ষা করছে না। আশ্বাস আর আশায় ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে লাগল গঞ্জালো।

আর রাজশেখর শ্রেষ্ঠীর নতুন মন্দিরের চাতালে গুরু সোমদেব বসে ছিলেন নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে। যে তীক্ষ্ণ অন্তর্জালায় তাঁর রক্তাভ চোখ দুটো সব সময়ে জ্বলজ্বল করে, সে জ্বালা এখন নির্বাপিত। ভক্তের দৃষ্টিতে এখন ভক্তির আচ্ছন্নতা। সোমদেব যেন ধ্যানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন, মহাকালী সাক্ষাৎ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে বরাভয়, তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

দেবী বললেন, তোমার স্বপ্ন সফল হবে বৎস, যা চেয়েছ, তাই পাবে।

—আর কত দেরি মা, আর কত দেরি?—সোমদেব জিজ্ঞাসা করলেন আকুল হয়ে।

—সময় এগিয়ে আসছে তার। কিন্তু তার জন্যে পূজো চাই, চাই বলি—

বলি।

হঠাৎ কাছেই কেমন একটা শব্দ হল। চমকে চোখ চোখ মেললেন সোমদেব। সামনে যে প্রদীপের শিখাটি জোরালো হাওয়ায় নিবু নিবু হয়ে আবার দপ করে জ্বলে উঠছিল—একটা আকস্মিক দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠল সেটা। সেই আলোয় সোমদেব একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেন।

একটি কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে। তুষারশুভ্র তার গায়ের রঙ—মাথায় রক্তিম চুল। দুটি নীলাভ চোখে, সমস্ত মুখের চেহারায় ভয়ের কালো ছায়া জড়িয়ে রয়েছে। শ্রান্তিতে বড় বড় শ্বাস ফেলছে সে। সোমদেব চিনতে পারলেন: হার্মাদ!

—কী চাও তুমি এখানে?

অপরিচিত ভাষা গঞ্জালো বুঝতে পারলনা, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, সে তৃষ্ণার্ত, জল চায়: আর চায়, একটি রাতের মতো কোথাও নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সোমদেব। মনে পড়ে গেল, চাকারিয়ার নবাবের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে হার্মাদের। শুনেছিলেন, তাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে, কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছে কয়েদখানায়। তা ছাড়া আর একটু আগেই যেন দূর থেকে বন্দুকের শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

তবে তাই। বন্দী হার্মাদের একজন। পালিয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা বিচিত্র হাসিতে ভরে গেল সোমদেবের মুখ। কানের কাছে মহাকালীর আদেশ বেজে উঠছে তাঁর। চাই পূজো—চাই বলি!

চত্বর থেকে নেমে এলেন সোমদেব। প্রদীপের আলোয় তাঁর রক্তাক্ত চোখ আর সাপের মতো ফণাধরা চুলের দিকে তাকিয়ে একবার যেন পিছিয়ে যেতে চাইল গঞ্জালো। কিন্তু তার আগেই সোমদেব এগিয়ে এসে হাত ধরলেন তার।

কঠিন কর্কশ স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ক্রমশঃ

শ্যামাপ্রসাদের অকাল-প্রয়াণ—

জন্মভূমি হইতে বহু দূরে,—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবহীন পরিস্থিতির মধ্যে, বন্দীশালায়, বাঙ্গালার প্রাণপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় কৃতী সন্তান, দেশহিতে আত্ম-নিবেদিত প্রাণ পুরুষ সিংহ প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁর অকাল-বিয়োগে আজ বাঙ্গালীর শোকের সীমা নাই—সে শোক প্রকাশের ভাষা নাই, লেখনী তাহার প্রকাশে স্তম্ভিত হইয়া যায়। ৮২ বৎসরের বৃদ্ধা জননী আজ পুত্রহারা অবস্থায় কি ভাবে দিন-যাপন করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলেও অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। যে গৃহের পারিবারিক সম্বন্ধের মধুরতা যে কোন মানুষের ঈর্ষার বস্তু, যে গৃহে ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ যে কোন আগন্তুককে মুগ্ধ করিত—সেই গৃহে অনুজের পরলোক গমনে অগ্রজ বিচারপতি রমাপ্রসাদের কথা আমরা চিন্তা করিতেও বেদনা অনুভব করি। জাতির কথা ত বলিবার নহে—বাংলা দেশে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি খুব কমই আছেন, যিনি কোন না কোন কার্য্য উপলক্ষে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়াছেন এবং যাঁহারা আসিয়াছেন আজ তাঁহারা সকলেই স্বজন-বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান। শ্যামাপ্রসাদের গুণাবলীর কথা যতই মনে হয়, মন ততই অধিক পরিমাণে বিহ্বল হইয়া যায়। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা চিন্তার অতীত। মনে হয়, পরম দয়াল ভগবান তাঁহাকে সর্বগুণান্বিত করিয়া এবং অসীম কর্মশক্তি দিয়া আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফটো—ইউনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা অধিক দিন তাঁহার উপকার গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না। শৈশবে মাতৃহীন পুত্রকন্যাগণকে এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য পরিজনদিগকে এই শোকে অশ্রুমৌন সমবেদনা জানাই। আর জানাই তাঁহার অগণিত দেশবাসীকে আজ যাহারা তাঁহাদেরই মত সুহৃদ-বিরহে কাতর। শ্রীভগবানের নির্দেশ বুঝিবার মত বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের নাই—তিনি সকলকে উপযুক্ত সহন-শক্তি দান করুন—ইহাই প্রার্থনা। শ্যামাপ্রসাদ মরজগতে না থাকিয়াও অমর হইয়া থাকুন—তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্যামাপ্রসাদের নামে পথ—

গত ৩রা জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পর মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে স্থির হয়, আশুতোষ মুখার্জি রোড ও রমেশ মিত্র রোডের সংযোগ স্থল হইতে রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগ স্থলের মধ্যবর্তী রসা রোডের অংশটি শ্যামাপ্রসাদের নামে নামকরণ করা হইবে। শ্যামা-প্রসাদের কার্য্যই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে—এ সকল স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। তথাপি ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আমরা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার সময়োচিত প্রস্তাবের সমর্থন করি।

শ্রীনেহরু ও শ্যামাপ্রসাদ—

বিলাত হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্পর্কে গত ২রা জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"সম্পূর্ণ কল্পনাতীত বলিয়া ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে বেশী আঘাত পাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেক সময় তাঁহার সহিত আমার মতের মিল হয় নাই এবং সংসদে বহুবার আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছে। আমাদের মতের অমিল যতই থাকুক না কেন আমরা উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতাম ও প্রীতির চক্ষে দেখিতাম। তাঁহার মৃত্যুতে বিরাট ক্ষতি হইল। তবে সংসদই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দেশের পক্ষে যখন অনন্যসাধারণ কর্মযোগীর প্রয়োজন তখন আমাদের এই অভাব আরও বড় হইয়া দেখা দিল। আটক থাকাকালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে—ইহা খুবই দুঃখ ও বেদনাদায়ক—তাঁহার সহিত যতই বিরোধ থাকুক না কেন, কাশ্মীর সরকার এই অবস্থায় যতদূর সম্ভব তাঁহার সুখ-সুবিধা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে আঘাত পাইয়াছেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঘটনা ঘটিয়া গেলে তখন কি করা উচিত ছিল বা কি করা হয় নাই ইত্যাদি বলা সকলের পক্ষেই সহজ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলাও কি ঘটিতে যাইতেছে, তাহা কেহ সন্দেহ মাত্র করে নাই এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও তাঁহার বন্ধু উকীলের সঙ্গে দেখা করেন ও কলিকাতায় আত্মীয়স্বজনকে উৎকণ্ঠিত না হইতে বলিয়া তার প্রেরণ করেন।

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং—

দার্জিলিং জেলার অধিবাসী, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক—তেনজিং হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা

তেনজিং ফটো—ডি রতন

মাউণ্ট এভারেষ্টে আরোহণ করিয়া যে কীর্তি রক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব দান

করিবে। সাধনার দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করা যায় তেনজিংয়ের জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বহুবার বহু দল অভিযাত্রীর সঙ্গে গিরিশৃঙ্গ আরোহণ করিয়া তেনজিং যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বর্তমান অভিযানে সাফল্য দান করিয়াছে। সাফল্যই মানুষকে নূতনতর জীবন দান করে—তিনি বহু সম্মান ও অর্থ লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থায়ী কার্য্য, বাসস্থান ও জীবিকার্জনের উপায় দান করিবার জন্য নূতন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন—তাঁহাকে পর্বতারোহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা করা হইবে। তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যাও জগতে সুপরিচিতা হইলেন। তেনজিং-এর জীবন অসাধারণ অধ্যবসায়, অসামান্য কর্মশক্তি, ত্যাগস্বীকার, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের আধার। পশ্চিমবঙ্গের তরুণগণের নিকট তাহা অনুকরণের বিষয়। আমরা তেনজিং-এর সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং তাঁহার অধিকতর সাফল্য, দীর্ঘজীবন ও শান্তি কামনা করি।

পর্বতারোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—

শ্রীতেনজিং কর্তৃক গৌরীশৃঙ্গ বিজয় স্মরণীয় করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দার্জিলিং এলাকায় একটি পর্বতারোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তথায় হিমালয় পর্বতের নানা বিষয়ে মানচিত্র রক্ষা করা হইবে। পর্বতারোহণ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে সকল সরঞ্জাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা রাখা হইবে ও শ্রীতেনজিংকে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হইবে। যে স্থানে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহার নিকট বাসগৃহ নির্মাণের জন্য তেনজিংকে একখণ্ড জমীও দান করা হইবে। সভ্যতার উন্নতির সহিত হিমালয় পর্বতের সকল রত্নাদির সহিত মানুষের পরিচয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। গৌরীশৃঙ্গ বিজয় তাহারই সূচনা মাত্র।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

গত ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি ও জন্মদিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী তাঁহাকে কংগ্রেস-ভবনে (কলিকাতা—৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড) এক প্রীতি সম্মিলনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন এবং ডাক্তার রায় ঐ তোড়া কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয়ের জন্য কংগ্রেস কমিটীকে দান করেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সমগ্র দেশবাসী একমাত্র বিধানচন্দ্রের অসামান্য বুদ্ধি, অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও অপরিসীম শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। কাজেই তাঁহার জন্মদিবসে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অধিবাসী তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিয়াছে। আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি ও ভগবানের নিকট তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাক্তার রায় আবেগ পূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন, তখন তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায় ও দুই চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। তিনি শ্রদ্ধার সহিত বাংলার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির দানের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন ও সকলকে সেই পথে চলিতে উপদেশ দেন। সর্বশেষে দৃঢ়তার সহিত ডাক্তার রায় বলেন—"আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা বাঁচিবই। কিরূপে বাঁচিব?—কেবল নিজের চিন্তায় বড় হওয়া যায় না। মানুষ যতক্ষণ না দলের সহিত মিলিত হইতে পারিতেছে, স্বার্থকে পরার্থের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারিতেছে, ততদিন সে পারিবে না—বাঁচা সার্থক হইবে না। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিসম্বাদ পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান। তিনি নিজেকে গণ্ডীর বাহিরে বিস্তারিত করিয়া দিতে বলেন। তিনি বলেন—অহমিকা ত্যাগ না করিলে দলাদলির ভাব যাইবে না। তিনি বলেন—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, কিন্তু একা নহে, অন্যদের লইয়া অগ্রসর হও।

বিধান সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্তমান নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ২৩৮ এবং দিল্লী লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সংখ্যা ৩৪। অর্থাৎ প্রতি ৭টি বিধান সভা কেন্দ্র একত্র করিয়া একটি লোক সভা কেন্দ্র গঠিত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী বিধান সভার সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ২৭২ করার জন্য এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে
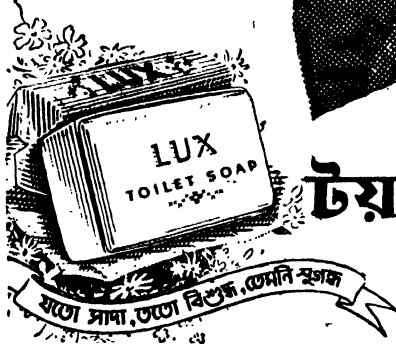
বলা হইয়াছে, লোক সভার সদস্য সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই—৭টি স্থলে প্রতি ৮টি বিধান সভা কেন্দ্র একত্র করিয়া একটি লোক সভা কেন্দ্র গঠিত হইবে। কারণ—কেন্দ্র গঠনের সময় পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ধরা হইয়াছিল ২৪৩ লক্ষ—কিন্তু ১৯৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় তাহা ২৪৮ লক্ষ। সংবিধানে আছে প্রতি ৭৫ হাজার লোক একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এখন ১ লক্ষ ২ হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। সদস্য সংখ্যা ২৭২ করা হইলেও প্রতি কেন্দ্রের লোক সংখ্যা হইবে গড়ে ৯১ হাজার। বর্তমানে কেন্দ্রগুলির আয়তন এমন যে প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বত্র গমনাগমন করা সম্ভব হয় না। সকল দিক বিবেচনা করিয়াই প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী—

গত ২৭শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা আশুতোষ কলেজ হলে কলিকাতার কলারসিক ও সাহিত্যানুরাগী নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইন্দিরা দেবীর বয়স বর্তমানে ৭৯ বৎসর ৬ মাস। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই-সি-এস এর একমাত্র কন্যা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক বীরবল—প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী। তিনি সারাজীবন ধরিয়া সঙ্গীত ও সাহিত্য আলোচনা করিতেছেন। ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থান বিজাপুরে তাঁহার জন্ম হয়। ৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিলাত যান—সিমলার অক্ল্যাণ্ড স্কুল, লরেটো ও লা মার্টিনিয়ারে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি বি-এ'তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদ্মাবতী পদক প্রাপ্ত হন। প্রথম জীবনে হিন্দী গান ও সেতার শিক্ষা করিয়া পরে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভুবনমোহিনী পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ১৮৯৯ সালে প্রমথবাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়—তিনি সাহিত্য চর্চায় প্রমথবাবুর সহকর্মী ছিলেন—'সবুজপত্র' পরিচালনায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সাল হইতে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন। আমরা এই অশীতিপর বৃদ্ধার ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার আদর্শ অনুকৃত হউক।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক'লকাতায় জার্মান ফুটবলদলের সফর

পশ্চিম জার্মানীর অফ্‌ন্‌বাচ কিকার্স ক্লাব তাদের সুদূরপ্রাচ্যের ফুটবল সফর শেষ ক'রে স্বদেশ ফেরার পথে ক'লকাতায় দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেছে। সুদূরপ্রাচ্যের খেলায় এই দলটি অপরাজেয় ছিল এবং ক'লকাতায় মোহনবাগানকে ২-০ গোলে এবং ইষ্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে তাদের সেই অপরাজেয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে গেছে। খেলায় জার্মানদল কম গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে এবং সেদিক থেকে ভারতীয়দলের হার খুব নিন্দনীয় হয়নি। কিন্তু এই গোল সংখ্যার ব্যবধান দিয়ে জার্মানদলের খেলার বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। জার্মানদলের ক্রীড়াপদ্ধতি ভারতীয়দলের থেকে অনেক বেশী উন্নত এবং দর্শনীয়। জার্মানদলের ক্রীড়াপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—গা বাঁচিয়ে খেলা,

জার্মাণির অফন্‌বাচ কিকার্স এবং মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়বৃন্দ ফটো : ভেপো বসু

জার্মাণির অফন্‌বাচ কিকার্স দলের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ফটো : ডি রতন

মাপা ছোট ছোট সর্টে নিখুঁতভাবে বল পাশ করা,আত্মরক্ষায় এবং আক্রমণ রচনায় মাথা দিয়ে বল খেলা, বল আদান-প্রদানে খেলোয়াড়দের মধ্যে নির্ভুল বোঝাপড়া,মাঠে নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁদের সৌষ্ঠবময় দৈহিক গঠন, খেলায় পর্য্যাপ্ত দম এবং তাঁদের স্থান বদল ক'রে নিখুঁত খেলা। খেলোয়াড়দের সর্টের দূরত্ব খুবই, কিন্তু অতি নিকটে গোল পেয়েও কদাচিৎ তাঁদের তীব্র সর্ট মারতে দেখা গেছে। এইখানেই তাঁদের খেলার যা দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে।

ফুটবল লীগ ঃ

ট্রামের ২য় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সহরে যে আন্দোলন চলছে তাতে সহরের যানবাহন ব্যবস্থায় এবং সাধারণ নাগরিক জীবনযাত্রায় এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাঠে নামকরা দলের ফুটবল খেলাগুলি নির্দ্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, পুলিসবাহিনী মাঠ তদারক করার কাজে হাজিরা দিতে পারছে না বলে। প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় প্রথম ৫টি দলের অবস্থান নিম্নে দেওয়া হ'ল—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	প	বি	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৬	১২	৩	১	২৮	৭	২৭
মোহনবাগান	১৬	১০	৫	১	২৫	৫	২৫
রাজস্থান	১৬	৯	৬	১	২১	১১	২৪
এরিয়ান্স	১৭	৭	৮	২	১৮	১৩	২২
ওয়াড়ী	১৮	৮	৬	৪	১৮	১১	২২

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৪৯ (হ্যাসেট ১১৫, মরিস ৬৭, মিলার ৫৫। বেডসার ৫৫ রানে ৭ উইকেট) ও **১২৩** (মরিস ৬০। বেডসার ৪৪ রানে ৭ এবং টাটারসল ২২ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ১৪৪ (হাটন ৪৩, ওয়ার্ডলে নট আউট ২৯। লিণ্ডওয়াল ৫৭ রানে ৫, হিল ৩৫ রানে ৩, ডেভিডসন ২২ রানে ২ উইঃ) ও **১২০** (১ উইকেটে। হাটন নট আউট ৬০, সিম্পসন নট আউট ২৮)

নটিংহামের ট্রেণ্টব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৪১তম টেষ্ট ক্রিকেট পর্য্যায়ের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ড জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি, বরুণদেবের কোপদৃষ্টিতে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ এবং উপযুক্ত আলো না থাকায় প্রথম দিনের খেলার অনেকটা সময় নষ্ট হয়। খেলার চতুর্থ দিন প্রবল বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভ করা সম্ভবই হয়নি। পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষদিনে দু'দলের অধিনায়কের মধ্যে খেলা আরম্ভ নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত আম্পায়ারদের মধ্যস্থতায় বেলা ৪-৩০ মিনিটে খেলা সুরু হয়,—তাও দু'ঘণ্টার জন্যে।

একমাত্র বরুণদেবের হস্তক্ষেপেই প্রথম টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'ল না। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য! ইংলণ্ড যে জয়ী হ'ত, এমন কথা ক্রিকেট খেলায় নিশ্চয় করে বলা যায় না। জয়লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ তাদের যে হাতছাড়া হ'ল একথা অনস্বীকার্য্য। ট্রেণ্টব্রীজের ক্রিকেট পীচ রান তোলার পক্ষে সহায়ক, ব্যাটসম্যানদের 'স্বর্গরাজ্য' বলা হয়। এখানে বোলাররা পীচ থেকে কোন সুবিধা পান্ না। কিন্তু আলোচ্য খেলায় ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত সুযোগ নিতে পারেননি; অপরদিকে নিষ্প্রাণ উইকেট থেকে কোন সহযোগিতা না পেয়েও বোলিং ব্যাটিংয়ের ওপর টেক্কা দিয়েছে! ইংলণ্ডের বেডসার এবং হাটন, অষ্ট্রেলিয়ার হ্যাসেট এবং মরিস—এই চারজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের মধ্যেই প্রথম টেষ্ট খেলা সীমাবদ্ধ। দুই দলেরই ফিল্ডিং উচ্চস্তরের হয়েছে, বিশেষ ক'রে ক্যাচ ধরা। দুই দলই তিনটি শক্ত 'ক্যাচ' ধরে অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছে।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৪৬ (হ্যাসেট ১০৪, হার্ভে ৫৯, ডেভিডসন ৭৬। বেডসার ১০৫ রানে ৫ ও ওয়ার্ডলে ৭৭ রানে ৪ উইঃ) ও **৩৬৮** (মিলার ১০৯, মরিস ৮৯, লিণ্ডওয়াল ৫০। ব্রাউন ৮২ রানে ৪, বেডসার ৭৭ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ৩৭২ (হাটন ১৪৫, গ্রেভনী ৭৮, কম্পটন ৫৭। লিণ্ডওয়াল ৬৬ রানে ৫ উইঃ) ও **২৮২** (৭ উইকেটে। ওয়াটসন ১০৯, বেলী ৭১)

ঐতিহ্যমণ্ডিত লর্ডস মাঠে আলোচ্য ৪১তম টেষ্ট পর্য্যায়ের ২য় টেষ্ট খেলাও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম তিনদিনে দেখা গেল খেলার অবস্থাটা দোদুল্যমান—কোন এক পক্ষের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল না

প্রথম দিন অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ছিল, দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের দিকে আবার পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ঝুঁকে তৃতীয় দিনে।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা খুব ভালই দাঁড়াল। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে ৩৬৮ রান; খেলায় জিততে হ'লে ইংলণ্ডের ৩৪৩ রান দরকার, হাতে সময় ৭ ঘণ্টার কিছু কম। সেই দিনেই ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২০ রানে, ৪০ মিনিটের খেলায়। হাটন, কেনিয়ন এবং গ্রেভনী যথাক্রমে ৫২ এবং ২ রান ক'রে কট-আউট হলেন। অষ্ট্রেলিয়ার চৌকস খেলোয়াড় কিথ মিলার ২য় ইনিংসে ১০৯ রান করেন। ইংলণ্ডের বিপক্ষে মিলারের এটা ৩য় সেঞ্চুরী এবং তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনের ৪র্থ সেঞ্চুরী।

ন্যাটা খেলোয়াড় মরিস তাঁর ৮৯ রানের মাথায় ষ্ট্যাথামের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। ষ্ট্যাথাম দৌড়ে গিয়ে চমৎকার ভাবে মরিসের ক্যাচটা ধরেন। এদিনের আর একটা উল্লেখযোগ্য ক্যাচ অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ল্যাংলির,—ঝাঁপিয়ে গ্রেভনীর তোলা বল লুফে নেওয়া।

ক্রিকেট খেলার ফলাফল কত অনিশ্চিত জেনেও খেলার শেষদিনে খেলা আরম্ভের সময় পাঁচ হাজারের মত দর্শকের খেলা দেখার উৎসাহ ছিল। পূর্ব্বদিন মাত্র ২০ রানে ইংলণ্ডের তিনটে উইকেট খোয়া গেছে—এ শোচনীয় অবস্থার পর দর্শকদের মধ্যে খেলা দেখার উৎসাহ বোধ হয় আর ছিল না। ইংলণ্ডকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে টেনে তুলেন পঞ্চম উইকেটের জুটি ওয়াটসন এবং বেলী। ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিটের খেলায় এঁদের জুটিতে ১৬৩ রান ওঠে, দলের ৭ উইকেটের ২৮২ রানের মধ্যে। ওয়াটসন ১০৯ রান করেন, টেষ্ট খেলায় এটা তাঁর ১ম সেঞ্চুরী। বেলী করেন ৭১ রান। ইংলণ্ড দলের ২৮২ রানে ৭টা উইকেট পড়ার পর ওয়ার্ডলে যখন খেলতে নামলেন তখন আর মাত্র ৪টে বল খেলার মত সময় ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইংলণ্ডের রান দাঁড়াল ২৮২, ৭ উইকেটে—অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ৬০ রান পিছনে, হাতে জমা ৩টে উইকেট।

বেডসার ২য় টেষ্টে মোট ৮টা উইকেট পান; তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৪টা, ৪৪টা টেষ্ট খেলায়। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮৬টা উইকেট—১৭টা টেষ্ট খেলায়। ১২।৭।৫৩

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "দেবানন্দ"—৪৲
শ্রীভোলা সেন প্রণীত উপন্যাস "উপন্যাসের উপকরণ"—২॥০
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "পতঙ্গ" (২য় পর্ব)—২॥০
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "তরুণী-সঙ্ঘ" (৪র্থ সং)—২৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালের মন্দিরা" (২য় সং)—৩॥০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রাচীর ও প্রান্তর" (৩য় সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (২য় পর্ব—১৪শ সং)—৩৲, "দেবদাস" (১৭শ সং)—২৲
শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "বিরাজ-বৌ" (২য় সং)—২৲, "দেবদাস"—২৲
শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" (৩য় খণ্ড)—১০৲
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "দুরাত্মার ছল"—॥০
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা-অনূদিত "টার্জন দি এপ্‌ম্যান"—১।০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মায়াবী ও কৃষ্ণা"—১॥০
শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালগ্রাস"—১৲, "মৃত্যুগরল"—১৲, "মারণ-মন্ত্র"—১॥০, "করকমলেষু"—২৲
বিমল কর প্রণীত রহস্যোপন্যাস "গ্যাস বার্ণার"—৩৲
শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নূতন পৃথিবী"—১॥০
দুর্গাপদ সিংহ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সৌরভ"—২॥০
শ্রীউমাপদ খাঁ প্রণীত নাটিকা "নেতাজির পদক্ষেপ"—১৲
প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "নির্ঝর সঙ্গীত"—৮০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠ

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রামায়ণ, মহাভারত যে পৃথিবীর যে-কোনো মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে তা' দার্শনিক কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা একবাক্যে বলে গেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলতেন: "যে-দেশে এই দুই কাব্য মুখে মুখে আপামর-সাধারণ কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্য্যন্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে অশিক্ষিত দেশ বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়।" এই দুই কাব্যে লোকহিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা" পুস্তকের ভূমিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত', প্রাচীন গ্রীসে তেমনি 'ইলিয়ড্' ছিল। আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিনা। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে ভারতবর্ষ 'রামায়ণ', 'মহাভারতে' আপনাকে বলিতে আর কিছুই বাকী রাখে নাই।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন:

"দেবতার অবতার-লীলা লইয়াই যে এ-কাব্য কেবল রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন।... মানুষ বলিয়াই রাম-চরিত্র মহিমান্বিত।"

মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাম নারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মানুষরূপে। রাবণ একজন রাক্ষস। মানুষ রাম যেমন ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, সাধু, শত্রুমিত্রে সমদর্শী আর—

গম্ভীর সাগর হেন
ধৈর্য্যে হিমাচল
বীর্য্যে বিষ্ণু
শশী হেন সৌম্য সুদর্শন ;

ক্রোধে তিনি কালাগ্নির প্রায়
ক্ষমাতে ধরণী
দানেতে কুবের,
ধর্ম্মতুল্য সত্যের নিষ্ঠায় ;—

(বালকাণ্ড, ১ সর্গ, ১৭-১৯ শ্লোক)

আর রাবণ তার বিপরীত অপগুণে আকীর্ণ। একমাত্র বাইবেলোক্ত শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে। শয়তানের সঙ্গে প্রভেদ এই যে, দশানন রাবণ, মহাপণ্ডিত হয়েও বিধাতাকে তপে তুষ্ট ক'রে এবং তাঁরই নিকট বরলাভ ক'রে বল-গর্ব্বে স্ফীত হলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বগুণাতীত ; তাঁতে পাপ বা অপাপ বর্ত্তমান থেকেও বর্ত্তায় না, তিনি তারও অতীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তা সকলকে যেমন সৃষ্টি করলেন, এই রাবণকেও সৃষ্টি করলেন। তা' ছাড়া সে আবার তাঁরই বরলাভ ক'রে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের হাতে অবধ্য রইল। সে নিজে তাতে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উঠ্‌ল যে, মানুষকে আর সে গ্রাহ্যই করলে না ; আর তাই মানুষের হাতেও সে অবধ্য থাকবার জন্যে বিধাতাপুরুষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশও করলে না। এই দুর্ব্বৃত্ত ভাবলে যে, সে এত প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে গেছে যে ক্ষুদ্র মানুষ রামকে সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু প্রকারান্তরে ব্রহ্মা অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বর মানুষ রামের হাতে প্রবল প্রতাপ রাবণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পণ ক'রে মানুষকেই বড় করলেন।

রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ডে, ৩৫ সর্গে, ১২-১৫ শ্লোকে) আছে : পিতামহ ব্রহ্মা সুর এবং অসুরের আশ্রয়ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুই পক্ষ সৃষ্টি করলেন। তার মধ্যে ধর্ম্ম, মহাত্মা অমরগণের পক্ষ এবং অধর্ম্ম, অসুর এবং রাক্ষসগণের পক্ষ।"—এখন রূপকভাবে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে মানুষকে রাবণরূপী ভীষণ ইন্দ্রিয়-বাসনার পাপ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বিধাতাপুরুষ দেখালেন যে মানুষই একমাত্র ধর্ম্ম, তাই এই বিপুল শত্রুকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই সে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাবণ পৃথিবীতে এসে 'দেব, ঋষি, যক্ষ, রক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুল্‌লে। তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবগণের অনুরোধে সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু মানুষেররূপে তাঁর চার অংশের এক অংশে জন্মালেন—রাবণ নিধনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা করতে। (সুন্দরকাণ্ডের ৫১ সর্গের ২৬-২৭ শ্লোক এবং লঙ্কাকাণ্ডের ৬০ সর্গের ৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

রাম যে বিষ্ণুর অবতার সে বিষয়ে উত্তরকাণ্ডে ১২৩ সর্গের ১০ শ্লোকে আছে রামের পুণ্যতোয়া সরযূতে দেহ-ত্যাগকালে পিতামহ ব্রহ্মা এসে তাঁকে বলচেন :

"যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশস্বিকাম্
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাকাশং সনাতনম॥

—মহাবাহু ! আপনার সেই বৈষ্ণবী (ঔপেন্দ্রী) দেহ (matter) বা সনাতন আকাশ (শুদ্ধ ব্রহ্ম) বা space এই দুই-এর যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করুন।

রামায়ণ বৈদিকযুগের সমকালীন রচনা এবং বাল্মীকি বেদবেদান্তের সকল তথ্যই অবগত ছিলেন। তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতেন :

"নাহং মন্যে সুবিদেতি নোন বেদেতি চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥

(কেনোপনিষৎ ২য় খণ্ড, ২ শ্লোক)

—আমি মনে করিনা যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানি ; আমি যে তাঁকে জানিনা এমন নহে ; জানি যে এমন নহে। 'আমি যে তাঁহাকে জানিনা এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'— এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।"

তাই দেখতে পাই রামায়ণের পরবর্ত্তী যুগের রচিত মহাভারতের মধ্যে গীতায় বর্ণিত ভগবানের বিশ্বরূপের সূচনা (লঙ্কাকাণ্ডে ১১৯ সর্গ, ১১-১৫ শ্লোকে) রামায়ণেও আছে। সীতা অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করায় রামকে দুঃখিত এবং চিন্তিত দেখে স্বর্গের দেবতারা এসে বল্লেন : "দেব, আপনি বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ, চন্দ্র সূর্য্য আপনার চক্ষু হন। আপনি ভূতগণের আদি ও অন্তে বিরাজিত সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ।" মানুষ সৃষ্টির কণা অংশমাত্র এবং নারায়ণ সৃষ্টির বাইরে ও অন্তরে, ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজমান। তাঁর সকল সৎগুণই ঐশীগুণ এবং

বিশেষভাবে রামের মধ্যে এই ঐশী অংশই অধিক রইল। মানুষের মধ্যেই এই বহুগুণসম্পন্ন নারায়ণ জন্মান, মানুষকে যুগে যুগে ত্রাণ করার জন্যে—সেই কথাই তপোবনবাসী বৈদিক যুগের ঋষিতপস্বী বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিশদভাবে দেখিয়েছেন।

রামায়ণের গোড়াতেই আছে বাল্মীকি রামায়ণ-রচনার জন্যে ঐশী প্রেরণা পেলেন। কেলিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণায় বিগলিত এবং শোকগ্রস্ত হয়ে তিনি সহসা সর্বপ্রথম শ্লোক রচনা করে বলে উঠ্‌লেন ঃ

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্‌॥

—রে নিষাদ্‌!
ক্রৌঞ্চ-মিথুন মাঝে
কামাতুর ছিল যবে
সে হেতুরে তুই
একটিরে তার করেছিস বধ
রহিবি বঞ্চিত পেতে প্রতিষ্ঠা-সম্পদ।

এই শ্লোক বা ছন্দজ্ঞান ঐশীকৃপায় লাভ করেই সেই অবিদিত সত্যকে সাধারণের সামনে নর-নারায়ণ রূপে ধ'রে দিতে এই রামায়ণীগাথা বাল্মীকি রচনা করেছিলেন। প্রথম শ্লোকবদ্ধ কবিতা রচনা ভারতবর্ষে এই ভাবে দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই করুণাই ঐশী প্রেরণা এবং এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে দেব-ভাব আনে। কি ইসাহি, কি মুসলিম, কি টোডা, কি গারো—সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই ব্যথা-ভরা ভগবৎপ্রেরণা জাগতে পারে। যে মানুষের মধ্যে এই অপূর্ব্ব ঐশীপ্রেরণা প্রবল সেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বলা হয়; এবং বাল্মীকি সেই ভগবৎ-অংশকেই মানুষ রামের মধ্যে রামায়ণে দেখিয়েছেন। তাই মানুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার করেছে ঐতিহাসিক ঘটনার মত। এর মধ্যে প্রমাদগুণোন্মু-সন্ধিৎসু কোনো ব্যক্তির স্থান নাই।

ইতিহাস

বাল্মীকিরচিত রামায়ণে বর্ণিত রামের ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হন। এ বিষয় দেশী এবং বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বহু গবেষণা করেন। সম্প্রতি ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মোহেনজোদাড়ো এবং হারাপ্‌পা প্রভৃতি প্রাগ বৈদিক দ্রাবিড়ী সভ্যতার বিষয় সিন্ধু সৈকতে আবিষ্কৃত হওয়ায় রামায়ণের এখন অন্য প্রকার ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপিত হ'তে পারে। রামায়ণ রচনার বহু যুগ পূর্ব্বে দ্রাবিড়ী সভ্যতা সিন্ধু সৈকত থেকে দক্ষিণে প্রসারিত হয়। পরবর্ত্তী ভারতবর্ষে আর্য্য অভিযানের ফলে আর্য্য এবং অনার্য্যের (দ্রাবিড়ীর) যে সংঘর্ষ ঘটে তারই উপাদান নিয়ে রামায়ণ রচিত হয়। এ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **'বঙ্গদর্শন'** পত্রিকায় (জৈষ্ঠ—১২৭৯ সালে) 'উদ্দীপনা' নামক প্রবন্ধে যা লিখেছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন ঃ

"দক্ষিণ বিজয়ই রামায়ণ যুদ্ধ। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য সন্তানেরাই বাস করিতেছিল তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।"

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি; রামচন্দ্র যে-উদ্দেশ্যেই হউক, অনার্য্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইহার সীমান্তবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয় করেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছাড়াইয়াই রাম এক জাতি দেখেন। এ-জাতি অতি প্রাচীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। (সিন্ধু সৈকতের অধুনা-আবিষ্কৃত মোহেন-জো-দাড়ো এবং হারাপ্‌পার কথাই মনে আসে—লেখক) আর্য্যেরা ইহা-দিগকে মাংসলোভী জানিয়া ঘৃণা করিতেন। (প্রবৃদ্ধ রক্ষঃ পিশিতাশদোষঃ সুন্দর কাণ্ড ৫।১০—লেখক) ও চণ্ডাল বলিয়া হেয় অভিধান দিয়াছিলেন। শ্রীরামকে স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্বও করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্র নি বন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোনো দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোনো দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়া-ছিলেন ইহাই রামায়ণের বালি বানর বধ ও সুগ্রীবের সহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দু সমাজ বহিষ্কৃত বটে। কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে।• কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধশালী। কেন না তাহারা

দাক্ষিণাত্যের আদিবাসী ; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য্য নির্ব্বাসিত জাতি নহে।

পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজী, বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা (রাক্ষসেরা) অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী নরবলি প্রতিষ্ঠাকারী অজেতক জাতির মধ্যে অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্ধারী ; বেদাচারবর্হিভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম্ম এই ; কিন্তু এগুলি গুরুতর ঘটনা। বৈদিক এক গতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, 'গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি।' কন্দমূলফলাশী বানর সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীর রসের উদ্ভাবনা ; পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের একপ্রকরণ, এই সামান্য অসভ্য জাতির সহিত নরমাংসলোভী অতি বিক্রমশালী জাতিকে একেবারে উচ্ছন্ন করা, শ্রীরামের কার্য্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জ্জনে তার স্বরে বেদ পাঠ, আচার্য্যের নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে বর্ষে একবার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যাসংলগ্ন শালতাল বনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্য করিয়াই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রভাবে আর্য্য বৈরী প্রভূত বিক্রমশালী (যে বিক্রম বর্ণন জন্য আর্য্য মুনি আর্য্য দেবতাগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন) সেই জাতিকে একবার ভারতবর্ষ সন্নিহিত দ্বীপ হইতেও নির্ম্মূল করিয়াছেন। আর্য্য সন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্ত্তি মনে করিয়া থাকে, অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ, অদ্যাপি 'রামজী' হিন্দুস্থানে একমেবা দ্বিতীয়।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়া পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয় ; রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না লইলে, কখনই মহৎকার্য্য সুসাধিত হয় না ; এবং অন্যের কর্ত্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে।......রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ বামোপ্য উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়াছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারই গুটিকতক অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাথিয়া রাখিয়া গেছেন।"

রামায়ণে ঐতিহাসিক তথ্য যাহাই থাকুক, বাল্মীকি তার মধ্যে লোক শিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতার যাবতীয় উপদেশ দিয়ে গেছেন গল্পের ছলে। মানুষই যে সত্বগুণের স্বভাবত অধিকারী সেই কথা (লঙ্কা কাণ্ডে ৮৭ সর্গে ১৯ শ্লোকে) বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বলচেন :

"কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্ম্মণাম।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্॥

—আমি ক্রূর কর্ম্মা রক্ষকুলে জন্মেছি বটে কিন্তু তোমার মত আমার মন কখনই নিদারুণ আভিচারিক অথবা অধর্মে অনুরক্ত নয়।

রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে দেখি (অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনগমনকালের বর্ণনায়)......রাম তাঁর পূজ্যপাদ পিতা দশরথ সমীপে উপনীত হয়ে দূর থেকে তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রথমে প্রণাম করলেন, পরে পিতার নিকটে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তখন পুত্রবৎসল দশরথ স্নেহভরে পুত্রের হাত ধরে তুলে নিয়ে শির ঘ্রাণ করে নিজের আসনের একপাশে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পেলাম, পিতা-পুত্রের মধুর সম্বন্ধ এবং শোভন অভ্যর্থনার একটি আদর্শ। পুনরায় অযোধ্যাকাণ্ডের একস্থলে দেখেছি,... রাম লক্ষ্মণকে উপদেশ দিচ্ছেন ; "আমরা জনপূর্ণ বা নির্জ্জন বনে যেরূপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্ব্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা মাঝখানে এবং আমি সবার পশ্চাতে যাব।" অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গে আছে...গুহরাজের সঙ্গে মিলনের পর ভাগীরথী তীরে নৌকা * পার হবার কালে রাম লক্ষ্মণকে

* রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের দ্ব্যশীতিতমসর্গে দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকদের কথা এবং অর্ণবপোতের সমুদ্র যাত্রার কথা আছে—লেখক।

বলছেন ;—"ভাই লক্ষ্মণ ! আজ থেকে আলস্য ত্যাগ করতে হ'বে ; আনন্দ সীতাকে দিতে হবে এবং লঙ্কা রক্ষা করতে হবে।" উপরোক্ত ব্যাপারগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানোর প্রথা উরোপের সভ্যতার আমদানী (গত দেড় শত বৎসর) হওয়ার ফলে আমাদের দেশের লোকে শেখেনি—পুরাকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। নারীদের প্রতি রামের কর্তব্যজ্ঞানের দৃষ্টান্ত অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে· ····রাম বনে গিয়ে সুমন্ত্র সারথিকে অযোধ্যায় ফেরবারকালে বলেছিলেন, "অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পূজনীয় পিতা মহারাজ দশরথকে আমার প্রণাম দেবে, আর অন্তঃপুরবাসিনীদের নমস্কার ও কুশল মঙ্গল জানাবে। পরিশেষে বিশেষ ভাবে বলেছিলেন :

মাতারে আমার জানায়ে প্রণাম
শুভবার্ত্তা দিয়া কহিও তাঁহারে
ধর্ম্মপথে হেথা আমি রয়েছি অচল।
তুমি দেবি ! ধর্ম্মশীলা !
পিতার চরণ মানিবে দেবতা হেন।
অন্য মাতাদের প্রতি মান অভিমান যেন
রাখিও না মনে।
পিতা হ'তে কৈকেয়ী দেবীরে
কোনোমতে ভাবিও না ন্যূন বলি তুমি।
রাজধর্ম্ম মানি, নৃপ ভরতেরে সদা
রাজযোগ্য কোরো সমাদর।
নৃপগণ বয়ঃজ্যেষ্ঠ যদিও না হন
তবু তাঁরা মাননীয়।

এর মধ্যে রামের ঔদার্য্যের বিশেষ পরিচয় বাল্মীকি দিলেন। রাম তাঁর জননীকে নারীসুলভ দুর্বলতা বা চঞ্চলতাজনিত কার্য্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এরূপ উপদেশাত্মক কথা সুমন্ত্রকে দিয়ে তাঁর নিকট ব'লে পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে মাকে সাদরে এরূপ উপদেশাত্মক কথা জানাতে পারে এবং সেটাকে প্রগলভ্‌তা (বা উচিতবাগীশগিরি) বলা যায় না। এইরূপ বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে নরনারীর কর্তব্যজ্ঞানের বিষয় বহু উপদেশ বাল্মীকির রামায়ণে আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনো উপদেশই শুধু কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য শুষ্কভাবে দিলে জনসাধারণের গ্রহণীয় হয় না। উপকথা বা আখ্যান অবলম্বনে মনোজ্ঞভাবে উপদেশ পরিবেষণ করলে তবে সকলের কাছে উপাদেয় হয়ে ওঠে এবং মনের মধ্যে চিরস্থায়ী হ'তে পারে। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেই রামচরিতমানস রচনা ক'রে গেছেন ; রামের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু আখ্যান যোগে,যা এখন ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব দিচ্চে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ থেকে নিয়ে চৈতন্য,রামমোহন, রামকৃষ্ণ,বিবেকানন্দ,রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি নরচন্দ্রমার অভাব নাই।

পূর্বেই বলেছি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।" তার সঠিক পরিচয় দিতে গেলে একটি রামায়ণের মতই বিরাট গ্রন্থ লিখতে হয়। সুতরাং কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা এই ভূমিকায় বলব, যাতে পরবর্তী সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কিছু সাহায্য হয়।

যুদ্ধকৌশল এবং রাষ্ট্রনীতির বিষয় অনেক তথ্যই রামায়ণে আছে। লঙ্কাকাণ্ডে (৫ম সর্গ, ১০১-১০২ শ্লোকে) আছে·· ···

মহাবাহু রাম মহার্ণব সন্নিহিত হ'লে সুগ্রীবকে সৈন্য সন্নিবেশের আদেশ দিয়ে বলচেন ;—"বানরপুঙ্গব ! এই সমুদ্রের বেলাভূমিতেই সেনাশিবির স্থাপন কর, কেননা সমুদ্রপার হবার উপায় বিষয় মন্ত্রণার কাল এখন উপস্থিত হয়েছে। কোনো সেনাপতিই যেন তাঁর সেনাদের ছেড়ে অন্যত্র কোথাও না যান। কেননা অজ্ঞাত (গুপ্ত) রক্ষ-চরের ভয় আছে। এই কারণ মহাবল বীর বানরগণ সেনা-সন্নিবেশ বহির্ভাগে পর্য্যটন দ্বারা তাদের ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করুক। লঙ্কাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের গোড়াতে (১০—১২ শ্লোকে) আছে ;···· সীতা-অন্বেষণকালে রাম নীল বানর সেনাপতিকে বলচেন ; দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথিমধ্যে ফলমূল পানীয় বিষ দ্বারা দূষিত ক'রে রাখতে পারে। তুমি সেই সব থেকে সৈন্যদের সাবধান রাখবে। আর বানরেরা উল্লম্ফন দিয়ে বৃক্ষে আরোহণ ক'রে উঁচু থেকে সন্ধান নেবে—বনদুর্গ বা বনে কোথায় কোথায় শত্রুসেনা সন্নিবেশিত আছে। আমাদের সেনামধ্যে যারা বৃদ্ধ বা দুর্বল তাদের কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আর আনবে না।"

রামায়ণ বর্ণিত রাজনীতির মধ্যে, সাম (সাম্যতা), দান (উপহারাদি), দণ্ড (শাসন) এবং ভেদ (দলাদলি করিয়ে দেওয়া) * এই চার উপায় আছে রাজাশাসনের। সীতা অন্বেষণে বানর সৈন্যেরা সুগ্রীবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে

* ইংরাজেরা যে ভাবে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি চিরকালের জন্য করে দিয়ে গেছে।

সীতাকে খুঁজে না পেয়ে যখন ফিরচে, তখন (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড ৫৪ সর্গের গোড়ায় আছে) ময়দানবের মায়ায় রচা একটি বিলের মধ্যে এক তপস্বিনীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বালিপুত্র অঙ্গদ মোহবশে সুগ্রীবের কার্য্যপালনে পরাঙ্মুখ হলেন। তিনি সেই বিলে নির্বাসিত হয়ে থাকতে চাইলেন। হনুমান তখন বাকচাতুর্য্যের দ্বারা প্রথমে বানরদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করলেন। পরে বানরগণ অনৈক্য মত হয়েছে দেখে তিনি দণ্ডবিধান অনুযায়ী ভীতি-জনক নানা কথা ব'লে অঙ্গদকে স্বকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং বিপথ থেকে রক্ষা করলেন।

লঙ্কাকাণ্ডেতেই আছে, মানুষের তেজ বৃদ্ধির জন্য ক্রোধ অবলম্বন করবার পরামর্শ দিচ্ছেন সুগ্রীব রামকে সীতা-অন্বেষণ কালে। রামকে হতাশ এবং ম্রিয়মান দেখে তিনি বলচেন—"রাঘব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, ক্রোধ অবলম্বন করুন। ক্রোধবিহীন ক্ষত্রিয়কে শত্রুরা বন্ধনাদি ক্লেশ দ্বারা নিশ্চেষ্ট করে। কিন্তু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ স্বভাব হ'লে সকলেই তাকে ভয় পায়।

মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা-বিধি সম্বন্ধে (লঙ্কাকাণ্ডের ৭ম সর্গ, ৬-১৫ শ্লোকে) আছে :···মহাপ্রাজ্ঞ রাবণ লঙ্কায় হনুমানের আগমন এবং তাঁর কীর্ত্তিকলাপ দেখে, বলচেন ;—"পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার পুরুষ বর্তমান। আমি তাদের গুণ এবং দোষ বর্ণন করচি : যে পুরুষ, নির্ণয়-সক্ষম মন্ত্রিদের সঙ্গে কিম্বা সমসুখদুঃখভোগী মিত্র বা বান্ধবদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এবং দৈবসহায়ে কার্য্যারম্ভে যত্নপর হয় তাকেই পণ্ডিতে 'উত্তমপুরুষ' বলেন। আর যে ব্যক্তি নিজেই ধর্ম এবং অর্থের বিচার দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তিনি মধ্যম, আর যিনি 'আমিই নিজে এ কাজ সাধন করিতে পারি', এই বোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে তাহা উপেক্ষা করে, তাকে অধম পুরুষ বলে। এই ভাবে মন্ত্রীদেরও মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে যে তিনটি শ্রেণী আছে তারও উল্লেখ রাবণ করেচেন।

এইরূপে রাজনীতি এবং যুদ্ধনীতি বিষয় লঙ্কাকাণ্ডের ৯ম সর্গে (৭-১২ শ্লোকে) আছে·· বিভীষণ বলচেন ; "সাম, দান, ভেদ তিন উপায় দ্বারা যে-কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তা' নীতিজ্ঞেরা বিক্রমের দ্বারা সমাধা করার বিধান দেন।" বিভীষণ (লঙ্কাকাণ্ড ১৯ সর্গ, ২২ শ্লোকে) বলচেন ;—"যে মন্ত্রী বিবেচনাপূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এবং নিজের বল, বীর্য্য, ক্ষয় এবং বৃদ্ধির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হ'য়ে প্রভূত কল্যাণার্থ উপদেশ দেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।" রাবণ বিভীষণ-বাক্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বলচেন ;—(লঙ্কাকাণ্ড, ১৬ সর্গ, ২-৩ শ্লোক) "বরং শত্রু কিম্বা ক্রুর সর্পের সঙ্গে একত্র বাস করা ভাল, তবু নাম-মাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী এইরূপ মিত্রের সঙ্গে বাস করা কদাচ সমীচীন নয়।" রাবণ আরো বলচেন :—বিভীষণ! আমি জ্ঞাতিদের চরিত্র জানি ; সর্ব্বদাই জ্ঞাতিদের বিপদ উপস্থিত হ'লে অন্যান্য জ্ঞাতিদের আনন্দ হয়।" এবিষয় রাবণ আরো বিস্তারিতভাবে বলচেন ;—"আমি শুনেচি বহুকাল গত হ'ল, কতকগুলি হাতী পদ্মবনে বিচরণ করতে করতে হাতীধরার জন্য পাশ হস্তে গজারোহণে আগত ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বলে 'আমরা আগুন, পাশ বা অন্যান্য শস্ত্রকে দেখে ভয় পাই না। কিন্তু স্বার্থপর জ্ঞাতিদের দেখে অত্যন্ত ভয় হয়, কেননা, এরাই হাতীধরাদের কাছে আমাদের বন্ধন করার উপায় ক'রে দেয়, এবিষয় কোনোই সন্দেহ নাই। (হাতী দিয়ে হাতী ধরার 'খেদা' যে রামায়ণী যুগেও ছিল, তা' এ থেকে প্রমাণ হয়)।

যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের লোক মিত্রভাবে উপস্থিত হ'লে তাকে সন্দেহের চক্ষে যে দেখতে হয় তার বিষয়ও লঙ্কাকাণ্ডের ১৭ সর্গে (২২ ২৯ শ্লোকে) আছে। রাবণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে বিভীষণ রামের নিকট যখন উপস্থিত হলেন, তখন সুগ্রীব তাঁকে আসতে দেখে রামকে নীতিবাক্য বলচেন ;—"রাম, বোধহয় রাক্ষসরাজ চর পাঠিয়েছেন—ইনি বেশ বুদ্ধিমান রাক্ষস, আমাদের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে পরস্পরের মধ্যে ভেদ জন্মাবার চেষ্টা করবে, কিম্বা কালক্রমে সবাইকার মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেবার পর সুযোগ বুঝে নিজেই আমাদের বিনষ্ট করবে।

মিত্রের জন্যে কাজ করার বিষয় হনুমান সুগ্রীবকে রামের কাছ থেকে বালিরাজ্য পাবার পর যা বলেচেন (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, একোনত্রিংশ সর্গ, ১৫-১৬ শ্লোক) তা প্রণিধানযোগ্য।

"যে হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্য্যেষু বর্ত্ততে।
স কৃত্বা মহতাঽপ্যর্থান্ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে॥
তদিদং মিত্রকার্য্যং নো কালাতীতমরিন্দম্।
ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্॥

-- যিনি নিজের কাজ ত্যাগ করে উৎসাহের সহিত মিত্রের কার্য্য সম্পাদন না করেন, তাঁর বহুবিধ বিপদ হয় ; আর যিনি কার্য্যোচিত নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম ক'রে বন্ধুর কাজ করার চেষ্টা করেন তিনি মহৎ কাজ করলেও মিত্রের কাজ করা হয় না।

ক্রমশঃ

কবি শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার বাল্মীকি রামায়ণের যে পদ্যানুবাদ করেছেন তারই ভূমিকা।—সম্পাদক

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বজ্রহরণ

কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্বে বজ্র সেই যা কয়েকবার জয়নাগের নাম শুনিয়াছিল, নগরে আসিয়া আর শুনিতে পায় নাই; তাহাদের গোপন তৎপরতার কোনও চিহ্নও তাহার চোখে পড়ে নাই। ষড়্‌যন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে ঘনীভূত হইতেছে, জয়নাগ বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গৌড়রাজ্য করায়ত্ত করিবার কৌশল করিতেছেন বজ্র তাহার কিছুই জানিত না। এমন কি শৌণ্ডিক বটেশ্বর ও কবি বিম্বাধর যে এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে তাহাও সে সন্দেহ করে নাই।

মক্ষিকা যেমন দুষ্টব্রণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বটেশ্বর ও বিম্বাধর তেমনি অবৈধ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত, তা সে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই হোক, আর অসহায় ব্যক্তির ধনভার লাঘব করাই হোক। ইহাদের ন্যায় বিকৃতচরিত্র মানুষ কোনও দেশে কোনও কালে বিরল নয়; ইহারা সিধা পথে চলিতে পারে না, প্রকৃতির বক্রতা বশতঃ কর্কটের ন্যায় বক্রপথে চলে এবং আপন অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যের মারাত্মক অনিষ্ট করিতে পরাঙ্‌মুখ হয় না। বজ্রের প্রতি ইহাদের আচরণ এই মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত।

বজ্রের সোনার অঙ্গদটি দেখিয়া বিম্বাধরের লোভ হইয়াছিল। কিন্তু একাকী বজ্রের অঙ্গ হইতে অঙ্গদ অপহরণ করিবার দুঃসাহস তাহার ছিল না, তাই সে বটেশ্বরকে এই কর্মে অংশীদার লইয়াছিল। দুইজনে পরামর্শ করিয়াছিল অঙ্গদটি হস্তগত হইলে ভাগাভাগি করিয়া লইবে। বজ্র নগরে আগন্তুক, তাহাকে মাদক দ্বারা হতচেতন করিয়া অঙ্গদ অপহরণ করিলে অধিক গণ্ডগোলের ভয় নাই। কিন্তু সে অতিশয় বলবান, মাদক-প্রভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে যে কী কাণ্ড করিবে কিছুই বলা যায় না। ব্যাপারটা জানাজানি হইলে শৌণ্ডিকের দুর্নাম হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বটেশ্বর ও বিম্বাধর মন্ত্রণা করিয়া এমন ফন্দি বাহির করিয়াছিল যাহাতে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

ভাগ্যবশে বজ্রের প্রকৃত পরিচয় তাহারা জানিতে পারে নাই, জানিলে নিশ্চয় বজ্রের প্রাণসংশয় হইত। বটেশ্বর ও বিম্বাধর জয়নাগ কিম্বা অগ্নিবর্মার নিকট যদি এই সংবাদ বিক্রয় করিত তারপর বজ্রকে একদিনও বাঁচিতে হইত না। কিন্তু বজ্রকে দেখিয়া কর্ণসুবর্ণে কেহই চিনিতে পারে নাই; তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে এমন মানুষ কর্ণসুবর্ণে অল্পই ছিল। যে দুই চারিজন প্রৌঢ় বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা উহা আকস্মিক সাদৃশ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মানবদেবের যে পুত্র থাকিতে পারে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

সে রাত্রে কুহুকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পর বজ্র বিলম্বে নিদ্রা গিয়াছিল, পরদিন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সূর্যদেব দ্বারের ছিদ্রপথে কিরণের তীর নিক্ষেপ করিতেছেন।

প্রত্যহ উষাকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়া বজ্রের অভ্যাস হইয়াছিল; ঘাটে ভিড় হইবার পূর্বেই সে গিয়া স্নান করিত, শীতল জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিত, তারপর ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজ দেরী হইয়া গিয়াছে। বজ্র নিকটে মৌরীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিল।

বজ্র যখন স্নান করিয়া ফিরিল তখন বটেশ্বর মদিরাগৃহের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল। বজ্র প্রবেশ করিলে লোকটির সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বজ্র চিনিল, রাঙামাটির মঠের সম্মুখে সারসপক্ষীর মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া যাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়াছিল সেই জয়নাগ দলের লোক। লোকটিও তাহাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু যেন চিনিতে পারে নাই

এমনি ভাণ করিয়া বটেশ্বরের সহিত আরও দুই একটা কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

অতঃপর সারসপক্ষী ও জয়নাগের চিন্তা বজ্রের মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বটেশ্বর তাহাকে প্রাতঃকালীন জলপান আনিয়া দিল। আহার করিতে করিতে বজ্র উৎসুক মনে ভাবিতে লাগিল—আজ রাত্রে কুহু আসিবে—কুহুকে সে গুঞ্জার কথা বলিবে—হয়তো নিজের সত্য পরিচয়ও দিবে—

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে বিম্বাধর আসিল। বজ্র মধ্যাহ্নের খর তাপে শয্যায় শয়ন করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিম্বাধর ও বটেশ্বর এক ভাণ্ড মদিরা লইয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইল। বিম্বাধর বলিল—'বন্ধু, ওঠো, জাগো, জীবন মধুময় কর।'

বজ্র উঠিয়া বসিল—'কী এ?'

বিম্বাধর বলিল—'সুধা—সুধা। কানসোনায় এমন বস্তু আর পাবে না। দু'পাত্র খেলেই উড়তে ইচ্ছে করবে।'

বজ্র হাসিয়া বলিল—'আমার ওড়বার ইচ্ছে নেই।'

বিম্বাধর ও বটেশ্বর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। কবি বিম্বাধর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিকশিত করিয়া বলিল—'ভ্রাতঃ মধুমথন, জীবন অনিত্য, সুখস্বপ্নের ন্যায় ভঙ্গুর; তাকে বুভুক্ষু-পিপাসিত করে রেখ না। এস, যৌবনের যজ্ঞাগ্নিতে সোমরসের আহুতি দাও—স্বাহা স্বাহা—' বলিয়া নিজেই একপাত্র ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল।

বজ্র তথাপি ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বিম্বাধর গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিল—'ছি বন্ধু, তুমি একজন দিগ্বিজয়ী পিণ্ডবীর, একা ময়রার দোকান উজাড় করে দিতে পার, তুমি এই ক্ষুদ্র সুধাভাণ্ড দেখে ভয় পাচ্ছ!—কোথায় তোমার দেশ? সে দেশে কি কেউ খেজুরের রস খায় না? তোমরা কি মৎস্য, কেবল জল খেয়ে বেঁচে থাক?'

এই ভাবে ধিক্কৃত হইয়া বজ্র একপাত্র ঢালিয়া পান করিল। মদিরা অতি সুস্বাদু, পাত্র শেষ করিয়া বজ্র বটেশ্বরকে বলিল—'তুমি খাবে না?'

বটেশ্বর জিভ্ কাটিল। বিম্বাধর বলিল—'ময়রা কি মোদক খায়? স্বজাতি ভক্ষণ হবে যে! এস, আর এক পাত্র।'

উভয়ে আর এক পাত্র ঢালিয়া একসঙ্গে পান করিল। বজ্র বলিল—'কৈ, ওড়ার ইচ্ছা হচ্ছে না তো?'

'হবে হবে। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উই পোকার পাখনা গজায়? এস, আর এক পাত্র হোক।'

আর এক পাত্র হইল। এই সময় বটেশ্বরের ভৃত্য ভর্জিত মৎস্যাণ্ড আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। অবদংশ সংযোগে মদিরা আরও মুখরোচক হইয়া উঠিল।

বিম্বাধর তখন নানা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে পঠদ্দশায় বিদ্যালাভের ব্যপদেশে কাশ্মীর গিয়াছিল; তথাকার যুবতীরা কিরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও অতিথিবৎসলা তাহারই সরস কাহিনী শুনাইতে লাগিল। কাহিনীগুলি পবিত্র নয়, কিন্তু প্রচুর হাস্যরসের সিঞ্চনে কিঞ্চিৎ শোধিত হইয়াছে।

এই ভাবে সুধাভাণ্ডটি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিল। বজ্র বেশ একটি লঘু উৎফুল্লতা অনুভব করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কিন্তু নেশার ঘোরে অচিরাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণই তাহার নাই। বরং কবি বিম্বাধরের চক্ষু ঢুলুঢুলু হইয়া আসিয়াছে, কথা জড়াইয়া যাইতেছে। বটেশ্বর পাশে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ চলিলে বিম্বাধরই মাটি লইবে, বজ্রের কিছু হইবে না। বটেশ্বরের দৃঢ় ধারণা জন্মিল বজ্র পাকা মদ্যপ, এতদিন ছলনা করিতেছিল।

এইখানে, বিম্বাধর ও বটেশ্বর যে ফন্দি আঁটিয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না, এই মহাবাক্য ছিল তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। বজ্রের অঙ্গদ চুরি করিতে হইবে। কিন্তু তারপর আত্ম-রক্ষার উপায় কি? এক, বজ্রকে বিষ-প্রয়োগ করা; মরা মানুষ গণ্ডগোল করে না। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, মৃতদেহ লইয়া নূতন সমস্যার উদয় হয়। মদিরা গৃহে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে শৌণ্ডিকের বধ-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। মৃতদেহ চুপি চুপি স্থানান্তরিত করা বটেশ্বর ও বিম্বাধরের কর্ম নয়, আরও লোক চাই। তাহাতে জানাজানি হইবে, মন্ত্র গুপ্তি থাকিবে না।

বটেশ্বর ও বিম্বাধর বড় চিন্তায় পড়িয়াছে এমন সময় পানশালায় এক শ্রেষ্ঠী আসিল। শ্রেষ্ঠীর নাম ভূরিবসু। সে ধনবান ব্যক্তি, এরূপ সাধারণ মদিরাগৃহে কখনও পদার্পণ

করে না; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে। বিম্বাধর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ভূরিবসুর কয়েকখানি বাণিজ্য তরী আছে। তাহারা সমুদ্রে যাইবে, তাহাদের আরব জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য জলযোদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ভূরিবসু জলসৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, প্রচুর বেতনের লোভেও কেহ যাইতে চায় না।

সিধা পথে বিকল হইয়া ভূরিবসু বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বটেশ্বর পানশালায় নানা জাতীয় লোকের যাতায়াত; মদ্যপান করিয়া কেহ কেহ পানশালাতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। অবৈধ উপায়ে লোক সংগ্রহের এমন স্থান আর নাই। ভূরিবসু আসিয়া বটেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিল—তুমি আমার নৌকায় জীবন্ত মানুষ পৌঁছাইয়া দাও, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এক নিষ্ক পুরস্কার দিব। কাণা খোঁড়া বিকলাঙ্গ লইব না। প্রয়োজন হইলে আমার নাবিকেরা তোমাকে সাহায্য করিবে।

বটেশ্বর দেখিল, এই সুযোগ। বজ্রের অঙ্গদটিও হস্তগত হইবে, উপরন্তু এক নিষ্ক পুরস্কার! পরামর্শে স্থির হইল, ভূরিবসুর বহিত্র যেদিন সমুদ্রে যাইবে তাহার পূর্বদিন অপরাহ্নে বজ্রকে সুরাপান করাইয়া অজ্ঞান করিবার চেষ্টা করা হইবে; সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে গভীর রাত্রে নাবিকদের সাহায্যে বটেশ্বর তাহাকে ভূরিবসুর তরণীতে আনিবে। কিন্তু বজ্র সুরাপান করিতে সম্মত না হইতে পারে। তখন তাহাকে ছলচ্ছুতায় ভুলাইয়া তরণীতে লইয়া যাইতে হইবে। একবার তরণীতে পদার্পণ করিলে তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া খোলের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা সহজ হইবে। পরদিন প্রাতে তরণী সমুদ্র যাত্রা করিবে, দুই দিন পরে অকুল সমুদ্রে পৌঁছিবে। তখন বজ্রকে ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, সে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না; তখন প্রাণের দায়ে তাহাকে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

এই উপায়ে অন্যান্য পানশালা হইতে আরও কয়েকজন হতভাগ্যকে বহিত্রে লইয়া গিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাল প্রত্যূষে বহিত্র সমুদ্র যাত্রা করিবে। সুতরাং আজই বজ্রকে হরণ করা চাই।

কিন্তু সুরা ভাণ্ড শেষ; বজ্র অটল হইয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করিতেছে। যেন তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতেছে। বটেশ্বর প্রমাদ গণিল।

বিম্বাধর তখন মেঘদূত আবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে—‘বিদ্যুদ্বন্তং বণিত ললিতা—ললিত বণিতা—’

বটেশ্বর বাধা দিয়া বলিল—‘ভাই বিম্বাধর, আমাকে এবার উঠ্‌তে হবে। হাতীঘাটে কাজ আছে।’

হাতীঘাটে শব্দটা বটেশ্বর এমন তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারণ করিল যে বিম্বাধরের কানে বিঁধিল। সে সচকিত হইয়া বজ্রকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, বলিল—‘আরে তাই তো, বেলা যে পড়ে এসেছে। চল, আমাকেও হাতীঘাটে যেতে হবে। তা বন্ধু মধুমথন, তুমি একা থাকবে? তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে, আমোদ করা যাবে।’

বজ্র প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাতীঘাটে গিয়া থাকে, আজ না যাইবার কোনও কারণ নাই। একবার মনে হইল, রাত্রে কুহু আসিবে। কিন্তু কুহু আসিবে অনেক রাত্রে, তাহার জন্য এখন হইতে ঘরে বসিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। সে উঠিয়া বলিল—‘চল।’

হাতীঘাটে বিপুল জনসম্বাধ; রথ-দোলের ভিড়। আগের দিন ঝড় বৃষ্টিতে কেহ আসিতে পারে নাই, আজ তাই ভিড় বেশী। বহু নাগরিক ছোট ছোট ডিঙিতে চড়িয়া নদী বক্ষে জলবিহার করিতেছে। ধীবরেরা জেলেডিঙিতে ইল্লীশ মৎস্য ধরিতেছে। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলিতেও জন-সমাগম হইয়াছে; যে বহিত্রগুলি কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মাল-বোঝাই নৌকা ঘাট হইতে গিয়া বহিত্রের গায়ে ভিড়িতেছে, নৌকা হইতে বহিত্রে মাল উঠিতেছে, শূন্য নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আবার মাল লইতেছে।

বজ্র, বিম্বাধর ও বটেশ্বর ভিড়ের মধ্যে না গিয়া ঘাটের এক কিনারায় উপস্থিত হইল। এখানে কয়েকটি ডিঙি রহিয়াছে, ডিঙিতে মাল বোঝাই হইতেছে। একজন সম্ভ্রান্ত-দর্শন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। বিম্বাধর তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল—‘এই যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়, কুশল তো?’ চোখে চোখে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী ভূরিবসুকে বজ্র গত রাত্রে বটেশ্বর ও বিম্বাধরের সহিত মদিরাগৃহের অন্ধকার কোণে মন্ত্রণা করিতে

দেখিয়াছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিল না। শ্রেষ্ঠী বলিল—'আপনাদের কুশল তো ?'

বিম্বাধর বলিল—'এ পর্যন্ত কুশল। নগরে এক নূতন বন্ধু এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

ভূরিবসু সহাস্যমুখে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'ভাল ভাল। তা চলুন না নদীবক্ষে বিচরণ করবেন। আমার ডিঙি রয়েছে।—'

বিম্বাধর বজ্রকে বলিল—'কি বল বন্ধু ? গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাটের দৃশ্য তুমি বোধহয় দেখ নি। অপূর্ব দৃশ্য। দেখবে ?'

বজ্রের কোনই আপত্তি নাই। চারিজনে একটি শূন্য ডিঙিতে চড়িয়া বসিল, মাঝি-কাণ্ডারী ডিঙি ছাড়িয়া দিল।

গঙ্গার বুক আবার ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়াছে। তরঙ্গগুলি বেশ বড় বড়, তাহাদের উত্থান পতনের একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দে নাচিতে নাচিতে ডিঙি গঙ্গার বুকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

নদী হইতে ঘাটের দৃশ্য সত্যই মনোরম। তার উপর মন্দ মন্দ বাতাস দিতেছে; অন্য ডিঙিগুলি আশেপাশে ঘুরিতেছে। নাগরিকদের ডিঙি হইতে উচ্চ হাস্যের কাকলি, সঙ্গীতের মূর্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। বজ্র মনের মধ্যে মোহ-মদির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বিম্বাধর বজ্রের কানের কাছে বিড়্ বিড়্ করিয়া কিছু বলিতেছে, বজ্র কতক শুনিতেছে কতক শুনিতেছে না। বটেশ্বর জেলে ডিঙি হইতে কয়েকটি সডিম্ব ইল্লীশ মৎস্য ক্রয় করিল; মাছগুলি ডিঙির খোলের মধ্যে রাজপুত্রের মত শুইয়া আছে। সবই যেন একটা সুখ স্বপ্নের ছিন্নাংশ, আনন্দদায়ক কিন্তু অর্থহীন।

সূর্য নগরীর পরপারে অস্ত গেল, নিদাঘের দ্রুত সন্ধ্যা যেন ধূমল পাখা মেলিয়া ছুটিয়া আসিল। ঘাটের জনমর্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, নদীবক্ষের তরণীগুলিও ঘাটে ফিরিল। নগরীর মন্দিরগুলি হইতে দূরাগত মৃদুস্বনে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-বাজিয়া উঠিল।

ষড়্যন্ত্রকারীরা এই ছায়াম্লান গোধূলি লগ্নের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ভূরিবসুর সঙ্কেত পাইয়া কাণ্ডারী পুঞ্জীভূত বহিত্রগুলির দিকে ডিঙির মুখ ফিরাইল। সেখানেও নাবিকদের কর্মতৎপরতা শান্ত হইয়াছে। ডিঙি আসিয়া একটি হাঙ্গর মুখ বহিত্রের পাশে ভিড়িল।

ডিঙি হইতে বহিত্রের পটপত্তন খানিকটা উচ্চ। প্রথমে ভূরিবসু বহিত্রে উঠিল। কয়েকজন নাবিক গুণবৃক্ষ ঘিরিয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের হস্তসঙ্কেতে কাছে ডাকিয়া নিম্নস্বরে উপদেশ দিল, তারপর ডিঙির দিকে গলা বাড়াইয়া বলিল—'কি বন্ধু, তোমরাও বহিত্রে উঠ্‌বে না কি? এস না, আমার মণিভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট আসব আছে, আস্বাদ করে যাও।'

ডিঙি হইতে বিম্বাধর সোৎসাহে বলিল,—'নিশ্চয় নিশ্চয়। কি বল মধুমথন ?'

মধুমথন মুণ্ডটি আন্দোলিত করিয়া হাস্যবিম্বিত মুখে বলিল—'নিশ্চয়।'

তিন জনে একে একে বহিত্রে উঠিল। ডিঙির কাণ্ডারী বহিত্রের গলবাহিকায় ডিঙি বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর চক্ষের পলকে নানাবিধ ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একজন নাবিক পিছন হইতে বজ্রের গলায় দড়ি জড়াইয়া টান দিল। অতর্কিত আকর্ষণে বজ্র চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা পাটাতনের কাঠের উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল তখন তাহার মন হইতে মাদকজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর হইয়াছে। সে অনুভব করিল একজন লোক তাহার মস্তকের উপর বসিয়া তাহার বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এবং আরও কয়েকজন তাহার হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

মস্তকের উপর বসিয়া যিনি অঙ্গদ উন্মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন তিনি কবি বিম্বাধর। বজ্র বাহুর এক প্রবল আস্ফালনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু নাবিকেরা প্রস্তুত ছিল, এক সঙ্গে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া আবার তাহাকে ধরাশায়ী করিল। বিম্বাধর দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার একটা আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, মস্তকও অক্ষত ছিল না।

বহিত্রের উপর এ এক বিচিত্র দৃশ্য। সন্ধ্যার ছায়া

রাত্রির অন্ধকারে পর্যবসিত হইতেছে, সেই ঘনায়মান প্রদোষে পটপত্তনের উপর যেন এক পাল তরক্ষুর সহিত এক বন্য বৃষের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু হস্তপদবিশিষ্ট একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, গড়াইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে। কিন্তু শব্দ অধিক হইতেছে না। কেবল বজ্রের অবরুদ্ধ গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কবি বিম্বাধরের কাঁচা খেউড় শুনা যাইতেছে।

এতগুলা লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিতে করিতে বজ্রের দেহের শক্তি ক্রমশ বাড়িতেছে; যে-সুরা তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাই যেন মত্তহস্তীর বল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নাবিকেরা একে একে তাহার পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাতের স্বাদ পাইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া ভূরিবসু ও বটেশ্বর সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বজ্র প্রবল বেগে নিজ দেহ আবর্তিত করিয়া অবশিষ্ট নাবিকদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল, হিংস্র প্রজ্বলিত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিল। কিন্তু নিকটে কেহ নাই, বিম্বাধর জাঙ্গসাহায্যে পলায়ন করিয়াছে। বজ্রের কণ্ঠ হইতে একটা উন্মত্ত হর্ষধ্বনি বাহির হইল। সে বহিত্রের কিনারায় গিয়া অন্ধকার জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলে ছুটিয়া গিয়া বহিত্রের কিনারায় দাঁড়াইল। কিন্তু বজ্রকে আর দেখিতে পাইল না।

বিম্বাধর তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—'ধাঃ, অঙ্গদটা গেল। বেনের পো, এমন লড়াক এনে দিলাম, ধরে রাখতে পারলে না?'

ক্রুদ্ধ ভূরিবসু বলিল—'আমি মানুষ চেয়েছিলাম, দৈত্য চাইনি।'

বিম্বাধর বলিল—'তুমি একটা মানুষ চেয়েছিলে, আমি দশটা মানুষ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের পুরস্কার! কথা ছিল বুহিত্তে পৌঁছে দিলেই—'

ভূরিবসু কুটিল ভঙ্গীতে দন্ত বাহির করিয়া বলিল—'পুরস্কার নেবে—বটে? পুরস্কার!'

বটেশ্বর ধূর্ত লোক, সে, দেখিল এ সময় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ করিলে বিপদ আছে। সে তাড়াতাড়ি বলিল—'না না, পুরস্কার কিসের? চল বিম্বাধর, আমরা ফিরে যাই—'

ভূরিবসু অট্টহাস্য করিয়া বলিল—'ফিরে যাবে! এই যে ফেরাচ্ছি।—ওরে, এ দুটোকে ধর্, খোলের মধ্যে বেঁধে রাখ। নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। ওদেরই নিয়ে যাব।'

বিম্বাধর আর্তনাদ করিয়া উঠিল; বটেশ্বর জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নাবিকের দল তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং দড়ি ধরিয়া খোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল।

বিম্বাধর বধ্যভূমিতে নীয়মান শূকরের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল—আমাকে ছেড়ে দাও—আমি যাব না—আমি লড়াই করতে পারব না—'

তাহারা আপন কুটিলতার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জলে স্থলে

জলে লাফাইয়া পড়িয়া বজ্র ডুবিয়া গেল। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত ডুব সাঁতার কাটিয়া সে মাথা ঝাড়া দিয়া ভাসিয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকার, তীর দেখা যায় না; কেবল গঙ্গার খরস্রোত দুর্বার বেগে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বজ্রের দেহে সামান্য দুইচারিটা আঁচড় লাগিয়াছিল, মাথার আঘাতও গুরুতর নয়। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা বাক্যাতীত বিস্ময় জাগিয়া ছিল। কী হইল? উহারা হঠাৎ এমন ব্যবহার করিল কেন? উহারা কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল? কিন্তু কেন? অঙ্গদের জন্য?

বজ্র হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিল—অঙ্গদ যথাস্থানে আছে, উহারা কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

গঙ্গার বুকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পশ্চাতে তাহাকে ধরিবার জন্য ডিঙা আসিতেছে না, আসিলে দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইত। বজ্র ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছন দিকে নগরের দুই চারিটা মিটিমিটি আলো দূর হইতে ক্রমশ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে।

বজ্র আর সাঁতার কাটিতেছিল না, কেবল জলের উপর গা ভাসাইয়া ছিল। তাহার মনে হইল স্রোতের টান আরও বাড়িতেছে; অজ্ঞাতসারে স্রোতের আকর্ষণ তাহাকে নদীর মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এ ভাবে ভাসিয়া চলিলে সে কোথায় ভাসিয়া চলিবে তাহার স্থিরতা নাই।

হয়তো সুন্দরীবনে গিয়া পৌঁছিবে, হয়তো সমুদ্রে গিয়া পড়িবে—সমুদ্র কতদূরে তাহা সে জানিত না।

বজ্র আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল, ডান দিকের তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। তীর কিন্তু অদৃশ্য, এমন কি তীরাহত জলের কলধ্বনি পর্যন্ত শুনা যায় না।

এইভাবে অন্ধের মত অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর স্রোতের বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইল। বজ্র বুঝিল—সে স্রোত কাটাইয়া তির্যক ভাবে তীরের দিকে আসিতেছে। তারপরই অকস্মাৎ সে এক নূতন কল্লোলধ্বনি শুনিতে পাইল; তাহার চারিদিকে উতরোল তরঙ্গ সংঘাত যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বজ্র ভাল সাঁতার জানে, দেহে শক্তিও অসীম; সে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাথা জাগাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ আবার স্রোতের মত্ততা শান্ত হইয়া গেল। বজ্রের চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত সে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া আসিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ বজ্র নিস্তরঙ্গ জলে ভাসিয়া চলিল। তারপর সহসা একটি আলোকের বিন্দু তাহার চোখে পড়িল। ডান দিকে, কিছু সম্মুখে—আলোকবিন্দুটি যেন ঊর্ধ্ব হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বজ্র আর চিন্তা করিল না, শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ রক্তাভ বিন্দুটির দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

ক্রমে সেই ক্ষীণ দীপালোকে তীরের একটি অংশ তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রশস্ত ঘাট নয়, শীর্ণ একশ্রেণী সোপান উচ্চ পাড় হইতে জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। একটি কিশোরী মেয়ে প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মেয়েটির বয়স দশ-এগারো বছর; গায়ের রঙ্ কোমল কালো। মুখে কৌতুক আগ্রহ ভীরুতা মেশা একটি ভাব। সে একাকিনী ঘাটে আসিয়াছে, জলে প্রদীপ ভাসাইয়া নিজের সৌভাগ্য গণনা করিবে।

মেয়েটি নিম্নতম পৈঠায় আসিয়া বসিল, প্রদীপ পাশে রাখিল, আঙ্গুল জলে ডুবাইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিল। তারপর সহসা জলে আলোড়নের শব্দ শুনিয়া ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বাক্-নিঃসরণের ক্ষমতা রহিল না, হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তিও রহিত হইল।

প্রথমে একটা শাদা মানুষের মুখ, তারপর একটা প্রকাণ্ড শরীর আসিয়া ঘাটে ঠেকিল। বজ্র জলে নিমজ্জিত পৈঠার উপর উঠিয়া বসিল। মেয়েটি অনড় অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বজ্র তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল, সে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'ভয় পেও না।'

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিশোরীর মনের অসাড় ভাব বোধহয় একটু কাটিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

বজ্র বলিল—'হাতীঘাটে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাসতে ভাসতে এসেছি।'

এবার কিশোরীর সাহস আর একটু বাড়িল, সে অধরের স্ফুরণ সংযত করিয়া কৌতূহলী চক্ষে বজ্রকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বজ্রের প্রগণ্ডে অঙ্গদটি তাহার চোখে পড়িল। অঙ্গদের বস্ত্রাবরণ সাঁতার কাটিবার সময় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'এখান থেকে কানসোনায় ফিরে যাবার পথ আছে?'

কিশোরী মাথা নাড়িল—'না।'

'পথ নেই!'

কিশোরী বলিল—'ময়ূরাক্ষী পার হয়ে কানসোনায় যেতে হয়। এখন খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।'

বজ্র চিন্তা করিল। কানসোনায় ফিরিয়া গিয়াই বা লাভ কি?—কুহু আসিবে, আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তা যাক্।

'এখানে কাছাকাছি বসতি আছে? তুমি এখানে থাকো?'

'হাঁ।'

'তোমার ঘরে কে কে আছে?'

'শুধু আমি আর আয়ি বুড়ী। আর কেউ না?'

'পুরুষ নেই?'

'না।'

'তোমাদের চলে কি করে ?'

'কানসোনায় শাক-পাতা কলা-মূলো বিক্রি করি।'

'আমাকে আজ রাত্রে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে ? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

'আমি জানিনা, আয়ি বুড়ি জানে।'

'বেশ, আমাকে আয়ি বুড়ির কাছে নিয়ে চল।'

'আচ্ছা।'

কিশোরী এতক্ষণ কথা কহিতে কহিতে অঙ্গদটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল, এখন আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার তাগা কি সোনার ?'

বজ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'হাঁ।'

কিশোরীর মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে বজ্রের মুখের পানে চাহিল ; তারপর প্রদীপ তুলিয়া লইয়া বলিল—'এস।'

তাহার মনের সমস্ত ভয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কিশোরী একদিকে চলিল ; বজ্র সিক্ত বস্ত্রে তাহার পশ্চাতে চলিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রিটা কোনও ক্রমে কাটাইয়া কালই সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। কর্ণসুবর্ণে আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। নাগরিক জীবন তাহার জন্য নয়, সে বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইবে। মা'র কাছে, গুঞ্জার কাছে ফিরিয়া যাইবে।

আশ্চর্য এই যে বিম্বাধর বা বটেশ্বরের প্রতি সে বিশেষ ক্রোধ অনুভব করিল না। প্রথমে নাবিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তখন বিম্বাধর বা বটেশ্বরকে হাতের কাছে পাইলে বোধকরি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এখন তাহার মনে সামান্য তিক্ততা ভিন্ন আর কিছু নাই। সর্প দংশন করে, বাঘ-ভালুক উদরের দায়ে জীবহিংসা করে ; ইহা তাহাদের স্বভাব। ক্রোধ করিয়া লাভ কি ? তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলেই হইল।

অল্প কিছুদূর চলিবার পর কিশোরী বজ্রকে লইয়া একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাটির কুটির, খড়ের চাল। আশেপাশে আরও কয়েকটি কুটির রহিয়াছে তাহা আবছায়া-ভাবে অনুমান করা যায়।

দ্বারের পাশে প্রদীপ রাখিয়া কিশোরী বলিল—'তুমি বোসো, আমি আয়িকে ডাক্‌ছি।'

বজ্র ভিজা কাপড়ে দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া রহিল, কিশোরী ভিতরে গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধার স্বর শুনা গেল—'ওলো গঙ্গা, তুই এলি ! কোথায় গিছ্‌লি বল্‌ দেখি !'—

তারপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হইল। বুড়ি বাহিরে আসিল। বজ্রকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—'ওমা, এ যে সোনার কার্তিক ! এস, বাছা, এস। হাতীঘাটে জলে পড়ে গিছলে ! খুব বেঁচে গেছ, বাছা, ভগবান রক্ষে করেছেন। তা আজ রাত্তিরটা আমার দাওয়ায় থাকো, কাঙ্গালের শাক-ভাত খাও।—ওরে গঙ্গা, শুকনো কাপড় এনে দে, পাটি পেতে দে।'

গঙ্গা শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, দাওয়ায় পাটি পাতিয়া দিল। বজ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া পাটিতে লম্বা হইল ; ক্লান্তির সহিত একটি পরম নিশ্চিন্ততা তাহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

দণ্ড দুই তিন পরে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন গঙ্গা তাহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে বলিতেছে—'ওঠো, ভাত হয়েছে, খাবে চল।'

বজ্র ঘুমভরা চোখে উঠিয়া গিয়া খাইতে বসিল। কুটিরের একটিমাত্র ঘরে পিঁড়ি পাতিয়া আসন করা হইয়াছে ; সম্মুখে কলাপাতায় স্তূপীকৃত ভাত। গরম ভাতে ঘিয়ের ছিটা ; ব্যঞ্জনের মধ্যে ও-বেলার শাকচচ্চড়ি, কচু-ডাঁটার ঘণ্ট, সরিষা-বাটা দিয়া ইল্লীশ মাছের ঝাল ও কাসুন্দী। খাইতে খাইতে বজ্রের বেতসগ্রাম ও মায়ের রান্না মনে পড়িয়া গেল।

আয়ি বুড়ি একটু বেশী কথা বলে, সে নানা অসংলগ্ন কথা বলিয়া চলিল। তারপর বজ্রের আহার যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সে বলিল—'ঘরে অতিথ্‌ আসা তো গেরস্তর ভাগ্যি। তা বাছা, আমার এমন পোড়া কপাল, ঘরে কি ভাল বিছানা আছে ! তুমি বড় ঘরের ছেলে, খাট-পালঙ্কে শোয়া অভ্যেস, তুমি কি আমার কাঁথা-কানিতে শুয়ে ঘুমতে পারবে ?'

বজ্র বলিল—'খুব পারব আয়ি। আমি তোমাদেরই মত গাঁয়ের মানুষ। আমার কোনও কষ্ট হবেনা।'

বুড়ি বলিল—'তা বললে শুনব কেন বাছা। তোমার যে সোনার অঙ্গ। আহা, গায়ের রঙ্ যেন মলমলে বাঁধা খাঁড়ি মসুর! তাই ভাবছিলাম কি, কোদণ্ড ঠাকুরকে গিয়ে বলি, তিনিই নাহয় আজ রাত্তিরটা তোমায় ঘরে ঠাঁই দিন।'

বজ্র চমকিয়া মুখ তুলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর! তিনি কে?'

বুড়ি বলিল—'বামুন গো। আগে মস্ত লোক ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে তাই আমাদের মত চাষী-মালীদের মধ্যে আছেন। তাঁকেই বলি গিয়ে, তিনি একলা মানুষ, তোমাকে ঘরে থাকতে দিতে পারবেন। আমার এখানে তো দাওয়ায় পড়ে থাকতে হবে।'

বজ্র ভাবিতে লাগিল। ইনি কি সেই কোদণ্ড মিশ্র যাঁহার কথা শীলভদ্র বলিয়াছিলেন? তাহার পিতামহ শশাঙ্কদেবের সচিব!……কাল প্রাতে বজ্র গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, তৎপূর্বে পিতামহের সচিবকে একবার দেখিয়া যাইবে না?—

আহার সমাধা করিয়া বজ্র বলিল—'বেশ, তিনি যদি আমাকে থাকতে দেন, তাঁর ঘরেই থাকব।' ক্রমশঃ

স্মৃতিরেখা—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করি। দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে আমি একমাত্র অধ্যাপক ছিলাম। ১৯০২ সালে যখন আমি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করি বা তাহার এক বৎসর পরে, সুরেন্দ্রনাথ আমার ছাত্র হইলেন। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে অদ্ভুত প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে সময়ে আমার ছাত্র ছিলেন, সে সময়ে সে প্রতিভার কোন পরিচয় পাই নাই। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে যখন তিনি বি-এ পরীক্ষা দিলেন, তখন তিনি ফেল হইবেন, এ কথা ভাবি নাই। ঐ সময়ে তাঁহার হাতের লেখা খুব খারাপ ছিল। হইতে পারে তাঁহার হাতের লেখার দোষে তিনি দর্শনে পাশ নম্বর রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পর বৎসর তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে পরীক্ষায় উপস্থিত হ'ন এবং বি-এ পাশ করেন, অবশ্য Pass Course এ।

এম-এ পরীক্ষা দিবার সময়েও তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই। তবে অবশ্য আত্মবিশ্বাস চিরদিনই তাঁর মধ্যে দেখিয়াছি। পরে তিনি সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'ন এবং উভয় পরীক্ষায় Second class এ পাশ করেন। এই দুই পরীক্ষায় তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব থাকিলেও, প্রতিভার বিকাশ তখনও হইয়াছিল বলা যায় না। তিনি সংস্কৃতে যেবার এম-এ পরীক্ষা দিলেন, সেবারে হরিনাথ দে ও গণনাথ সেন প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

শেষে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই সময় তিনি কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময়ে বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। তিনি দাশগুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনিই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের আলাপ করাইয়া দেন। মহারাজের বদান্যতা সর্বজনবিদিত। ইনি প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা দিয়া দাশগুপ্তের পুস্তক কিনিবার সাহায্য করেন। এই হইতে দাশগুপ্তের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কাশিমবাজারের সাহায্য প্রায় ২২ বৎসর, কি তারও অধিককাল পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল।

লর্ড লিটনের চেষ্টায় ও মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর অনুগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন এবং কেম্ব্রিজে দুই বৎসর থাকিয়া পড়াশুনা করেন। সেখান হইতে ডক্টরেট লাভ করিয়া তিনি এদেশে আসেন এবং অল্পদিনেই তাঁহার প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বাড়িয়া উঠে। এদেশে আসিয়াও তিনি Ph.D. উপাধি লাভ করেন। মাসে মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া পাইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এদেশে যত লাইব্রেরী আছে তদপেক্ষা বৃহত্তর একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলেন। প্রচুর গ্রন্থের উপকরণ পাইয়া তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি এই কাজে তাঁহার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ এবং বাল্যকালে যে প্রতিভা দেখা গিয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে বিকশিত হয়। তিনি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি অনেক দর্শনের পুস্তক লিখিয়াছেন। বাংলায়ও তিনি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানি সুদীর্ঘ—"অধ্যাপক" এই গল্পটি তিনি আমার নিকট করিয়াছিলেন এবং গল্প লেখার আমার কিছু অভ্যাস আছে জানিয়া আমাকেই বলিয়াছিলেন এই গল্প লিখিতে। আর কাহাকেও বলিয়াছিলেন কিনা জানিনা। শেষে আমি যখন অসমর্থ হইলাম, তখন তিনি নিজেই লিখিলেন।

তাহার জীবন সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, এত হয়ত আর কেহ জানেন না। আমি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। একবার

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতের দর্শন সম্মেলন হয়। আমি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের খরচে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গেলাম। ঐ সময় আর একজন প্রফেসর ছিলেন, তাঁর নাম প্রভুদত্ত শাস্ত্রী। গভর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে কোনরূপ প্রশ্রয় না পেয়ে তিনি বাড়ী যাইবার জন্য ছুটি নইলেন। কিন্তু লাহোর না গিয়া তিনি একেবারে সোজা বোম্বাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে আমরা দুজন যখন প্রতিনিধি হিসাবে গিয়াছি, তখন তিনি না গেলে খারাপ দেখায়। তিনি নিজে খরচ করিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত ছুটিলেন। সে সময়ে আমি দর্শন বিভাগের Senior Professor অর্থাৎ Head of the Department. আর সুরেন্দ্রনাথ এবং ডাঃ শাস্ত্রী যদিও ইঁহারা দুজনেই I.E.S. হইলেও তাঁহারা আমার সহকারী মাত্র। এটা কেবল প্রসঙ্গত বলিলাম। আমি বোম্বাইয়ে যে দার্শনিক কংগ্রেস হয়, তাহার এক শাখার সভাপতি হইয়াছিলাম এবং সুরেন্দ্রনাথ অন্য শাখার। মূল সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ। ইহা ১৯২৭ সালের কথা। মূল সভাপতির বক্তৃতা এবং আমাদের বক্তৃতা একই আসরে হইল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ না লিখিয়া উপস্থিত বক্তৃতা করিলেন। যেমন তাঁহার ভাষা, তেমনি তাঁহার ওজস্বিতা। আমি বলিলাম যে, "এবার ম'লে মাদ্রাজী হব"। সুরেন্দ্রনাথ চটিয়া গেলেন, "কি এমন বক্তৃতা যাহার জন্য আপনি জন্মান্তরে মাদ্রাজী হ'তে চাহিতেছেন?" ছাত্রের নিকট এরূপ তিরস্কার লাভ করিয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম। পরদিন সংবাদপত্রে যখন রিপোর্ট বাহির হইল, তাহাতে রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা এক কলমের কম ছাপানো হইয়াছে। কিন্তু আমার বক্তৃতা দুখানি কাগজে সাড়ে তিন কলম জুড়িয়া ছাপানো হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই দেখলেন ত', স্যার?" আমি বলিলাম, "ইহাতে গর্ব্বের কিছুই নাই। আমার বক্তৃতা লেখা এবং টাইপ করা; সুতরাং তাহা ত' বেশী হবেই।" সুরেন্দ্রনাথ আমার এ যুক্তি মানিলেন না। তাহার অন্তরে বঙ্গদেশের গৌরব অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল।

আমরা সেবার বোম্বাই হইতে পুণায় গেলাম। সেখানে আমি ও সুরেন্দ্রনাথ Dr. Belvalkar এর গৃহে অতিথি হলাম। তিনি হলেন Women's University র সর্ব্বেসর্ব্বা। বোম্বাই হতে পুণার রাস্তাটি পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পুণায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পুণায় মহামতি গোখলে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Ferguson College দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। সে সাধ আমার সম্পূর্ণ হইল না। কিন্তু আরেকটি ব্যাপারে ঐ কলেজে গমন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সেখানে ডাঃ দাশগুপ্ত Bergson & Intuition সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন এবং আমি সেই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে আহূত হলাম। ইহাতে অবশ্য আমার Ferguson College দেখা ঠিক হইল না, তথাপি ঐ কলেজের সহিত যেটুকু পরিচয় হইল, তাহাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কলেজের হলে তিনটি গ্যালারি ছিল। তার প্রথমটিতে অর্থাৎ নীচের তলায় প্রায় একশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এরূপ দৃশ্য কলিকাতায় বড় একটা ঘটে না। বক্তা যত বড়ই হউন, শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা কোন সভাতেই খুব বেশী হয়ত ৪০।৫০টির অধিক দেখি নাই। এই সব মহিলা মনোযোগ সহকারে এক ঘণ্টাব্যাপী দার্শনিক বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাও সুন্দর হইয়াছিল।

Dr. Belvelkar এর বাড়ীতে তাঁহার দুই কন্যা কর্ত্তৃক হারমোনিয়াম সহযোগে জয়দেবের গীতগোবিন্দ শুনিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। কন্যা দুইটির বয়ঃক্রম একজনের ১১ এবং অপরজনের ৯। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া সুন্দরভাবে জয়দেবের গান করিলেন। প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে গিয়া এরূপভাবে বাঙালী কবি জয়দেবের গান শুনিতে পাইব এরূপ আশা করি নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবির গান শুনিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম ফার্গুসন কলেজে বাঙালী দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার সমাদর দেখিয়া সেরূপ খুসী হইয়াছিলাম।

আমি বিলাতে গিয়া প্রথমে Imperial Hotel এ ছিলাম। সেখানে তখন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মিলনে (Congress of world Faiths) আহূত হয়ে সুরেন্দ্রনাথও লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে তখন যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, আমি তার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রতিভাবান দার্শনিক; উভয়েই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দেশে বিদেশে উভয়ের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বধর্ম্ম সভায় (Congress of world Faiths) বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে একজন তাঁহাকে লিখেছিলেন (বোধ হয় Mr. Spalding) যে যদি শুধু রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতার জন্য ধর্ম্মসম্মিলন আহূত হইত তাহা হইলেও এ সম্মিলন ব্যর্থ হইয়াছে একথা বলা যাইত না। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা ১৯৩৬ সালে যে মহাসম্মিলন হয় তাকে সার্থক করে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথও এই মহাসভায় একদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে লিখিত বক্তৃতা। আমিও সেদিন Botanical Theatre এ "ইসলাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলাম। কিন্তু আমার বক্তৃতা মৌখিক ছিল এবং একজন মুসলমান সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমার বক্তৃতার সুরেন্দ্রনাথ খুবই সুখ্যাতি করেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার আমি সেরূপ সুখ্যাতি করিতে পারি নাই। তার কারণ আর কিছুই নয়। তিনি Mike এর সামনে দাঁড়াইয়া বেশী উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা করিলেন। আমি বস্তুতঃ তাঁর বক্তৃতার একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথ যখন পুনঃ পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তখন শেষটায় আমি বলিলাম "সুরেন্দ্র, তুমি কি Mike এর সামনে আর কখনও বক্তৃতা কর নাই?" তিনি বলিলেন "না স্যার, কেন বলুন ত?" আমি বলিলাম "Mike এর কাছে অত চীৎকার করিলে লোকের শুনিবার পক্ষে বাধা হয়।"

কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বুঝিতে না পারিলেও আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই; কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতাটি "Creative Emergence" আমাকে পূর্ব্বেই দেখিতে দিয়াছিলেন। সেসময় আমি বলিয়াছিলাম যে বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। বিষয়বস্তুও ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বক্তৃতার সময়ে উহা কেহ ভাল করিয়া শুনিতেই পায় নাই। পরে উহা "ভারতবর্ষীয় দার্শনিক চিন্তাধারার" মধ্যে ছাপান হইয়াছে। বিলাতে এই দুই দার্শনিক প্রবর উপস্থিত থাকাতে উভয়ের তুলনামূলক সমালোচনা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। আমার মনে হয় বিলাতের দার্শনিক মহলে বিশেষতঃ Cambridgeএ সুরেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। রাধাকৃষ্ণণ যতই বড় হউন সুরেন্দ্রনাথের মান ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই।

একদিন তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল, Londonএর mind clubএর একটি মিটিংএ। অল্পসংখ্যক শ্রোতাই উপস্থিত ছিলেন। আমি সুরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে সেখানে যাইতে পারিয়াছিলাম। Lord Samuel (এখন Sir Herbert Samuel) সভাপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রনীতির গ্রন্থকার Mr. Muirhead তার সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথকে পরিচিত করিবার জন্য তিনি বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দাশগুপ্ত ভারতীয় বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। He is the greatest living philosopher of India.

এইরূপভাবে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়াতে আমার মনে আনন্দের অবধি ছিল না এবং আমি এই কথা কয়টি আজ প্রকাশ করিতে পারিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

তিনি Whiteheadএর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। Oxford and Cambridgeএর মধ্যে চিরদিন একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সুরেন্দ্রনাথ Cambridgeএর ছাত্র। সেইজন্য বোধ হয় Cambridgeএর অধ্যাপকরা সুরেন্দ্রনাথকে বেশী প্রাধান্য দেন। রাধাকৃষ্ণণের পুস্তকগুলি অনেক সময় সরল ও সহজবোধ্য নয়। সেই জন্য Cambridgeএর লোকেরা তাঁকে বেশী পছন্দ করেন না।

যাহা হউক, আমি বিলাত থাকাকালে রাধাকৃষ্ণণ এবং সুরেন্দ্রনাথ উভয়ের নিকট হইতেই অত্যন্ত সমাদরপূর্ণ ও সদয় ব্যবহার পাইয়াছি। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা Sir Francis Younghusbandএর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তারই অনুরোধে আমি Islam সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। Sir Abdul Quader ছিলেন প্রধান বক্তা এবং আমি ছিলাম তার প্রধান সমালোচক। এই প্রসঙ্গে Sir Abdulএর আতিথেয়তা সম্বন্ধেও আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার বক্তৃতার পর তিনি তাহার বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।

Sir Francisএর নিকট আমার আরও কৃতজ্ঞতা আছে। কারণ তিনি আমাকে Totterham Court church এ বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেখানে গিয়া দেখি Hallটি পরিপূর্ণ। আমাদের দেশের এবং আমার সুপরিচিত মিঃ ভূপেন সেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় বিলাতে ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য। আমার সে বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন Dr. Belden ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। পরে Beldenএর কাছে আমার বক্তৃতার সুখ্যাতি শুনে Sir Francis আমাকে পাবলিক লেকচার দেবার জন্যে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ আমাকে ৪।৫ দিন পরে কেম্ব্রিজ যাইতে হইয়াছিল। সেখানে যে British Empire Universities Conference হইয়াছিল আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। কাজেই যখন Sir Francis আমাকে পাবলিক লেকচার দেবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন সে অনুরোধ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে আমি দিন কয়েকের জন্যে কেম্ব্রিজ গিয়াছিলাম। সেবার সুরেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। একদিন আমাকে লইয়া সুরেন্দ্রনাথ সকালবেলায় Trinity Collegeএর রন্ধনশালায় (Kitchen) গিয়া খবর দিয়া আসিলেন যে আমরা সন্ধ্যাবেলায় কলেজ হলে আহার করিব। এই Kitchen জিনিসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রত্যেক ইউনিভারসিটি কলেজে এক একটি kitchen আছে। সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা একত্র ভোজন করেন। এই সমবেত ভোজন একটি দেখিবার জিনিস। আমাদের দেশের লোকেদের মত "সরলভাবে জীবন ধারণ ও উচ্চ চিন্তা" উহাদের দেশে কোথাও দেখিলাম না। আমাদের দেশের মত Pice Hotel এ বা চিঁড়া-মুড়ি চর্ব্বণ করিয়া কাহাকেও লেখাপড়া করিতে হয় না। সেখানে যে ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়া ভোজন করেন উহা একটি বিরাট ব্যাপার। পাঁচ শত কি ছয় শত ছাত্র ও অধ্যাপক ভোজনের আগে ভগবানকে স্মরণ করে আহারে প্রবৃত্ত হন। Trinity College Hallটি বেশ বড়। সেখানে খানিকটা জায়গায় যে উঁচু Platform আছে, আমরা তাহার উপর বসিয়াছিলাম, আর ছাত্রেরা নীচে বসিয়া আহার করেন। তাহাদের জন্য লম্বা, লম্বা সারিতে আসনের ব্যবস্থা আছে। আমি সুরেন্দ্রনাথের অতিথি হিসাবে এই collegeএর সমবেত ভোজনে স্থান পাইয়াছিলাম এবং অধ্যাপকদের সঙ্গেই উচ্চ platfromএ বসিয়াছিলাম। ঐ সমবেত ভোজনে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা প্রায়ই গাউন পরিয়া আহার করিতে বসিয়াছিলেন, আমাদের কিন্তু গাউন পরিতে হয় নাই। তবে একত্র ভোজনের পূর্ব্বে যে ভগবানকে স্মরণ করা হয়, তাহাতে যোগদান করিতে ভুলি নাই।

ভোজনান্তে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন Senior professor ও আরও দু তিনজন আমাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। যে ঘরে আমরা বসিলাম, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের Combination Room অর্থাৎ যে ঘরে মদ্যপান ও ধূমপান উভয়েই চলে। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে বিভিন্ন পাত্রে বিয়ার, শেরী ও ক্ল্যারেট রক্ষিত ছিল। অধ্যাপকেরা আমাদের মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি ত ও রসে বঞ্চিত। মনে করিলাম সুরেন্দ্রনাথই হয়ত আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকদের প্রতি সৌজন্য দেখাইবেন। কিন্তু আমি দেখিলাম তিনিও আমার মত এই সব স্পর্শ করিলেন না। বলা বাহুল্য যে ইহাতে

অধ্যাপকপ্রবরেরা খুসী হইতে পারিলেন না। যে দেশের যে রীতি অর্থাৎ মদ্যপান তাহা পালন না করিলে নিমন্ত্রণকারীর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, কয়েকজন আমাদের তৃপ্তির জন্য সিগার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উহাতেও আমরা অক্ষমতা জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলাম। তখন অধ্যাপকেরা কি করেন? অবশেষে একজন অধ্যাপক পকেট হইতে একটি নস্যের কৌটা বাহির করিলেন। কিন্তু আমি সে বিষয়েও অচল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তখন বোধ হয় কিছু নস্য অভ্যাস করিতেছিলেন। সেদিন তিনিই মান রক্ষা করিলেন দুই, তিন টিপ নস্য লইয়া। তার ফলে সেখানে যে হাঁচির সমারোহ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপভোগ করিবার জিনিষ। শেষ পর্য্যন্ত হাঁচিতে হাঁচিতে সুরেন্দ্রনাথের influenza পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

বিলাতে থাকাকালে সুরেন্দ্রনাথের যে সাহায্য পাইয়াছি তাহা কখনও ভুলিবার নয়। আমার কিঞ্চিৎ অসুবিধাও তিনি করিয়াছিলেন। Denmarkএ Copenhagen নগরীতে যে Linguistic congress হইয়াছিল তাহাতে আমার যোগদান করিবার কথা ছিল। এই congress ডেনমার্কের রাজা কর্ত্তৃক উদ্বোধন হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যোগদান করিতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে আমার যাওয়া ঘটিল না। তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করিয়া। তাঁহার সেই সাহায্য আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বিশেষতঃ cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় করিয়া দেওয়া এবং কলেজের সভাতে যোগদান করিবার সুযোগ পাওয়া এসবই সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনই অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সেই অসুস্থ শরীরে কি করিয়া এত বই লিখিলেন তাহা ভাবিলে আমি বিস্মিত হই। তাঁহার Blood pressure প্রবল ছিল। তাহার উপর বোধ হয় বহুমূত্র রোগ প্রভৃতিও ধরিয়াছিল। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কিরূপে এত পরিশ্রম করিতেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। কবিরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার সর্বপ্রকার ঔষধের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি শুনিয়াছি তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক মূল্যবান ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

বর্ত্তমান ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

বিলাতের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। এতদিন এদের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বইতে এবং অনেকের মুখে শুনেছিলাম। এবার বিলাতে গিয়ে এই বিষয়ে কয়েকটি জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে আমি এদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছি।

বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থেকে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক এবং এই পনের বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়তে পায়। এমন কি যে সব শিশুদের অভিভাবকদের বই কিনে দেবার সঙ্গতি নেই, তারা স্কুল থেকে বইপত্রও পেয়ে থাকে। এছাড়া দুপুরের খাবারটি স্কুলেই দেওয়া হয়। এই খাবারটি যে পুষ্টিকর একথা বলাই বাহুল্য। এর মধ্যে থাকে, স্যুপ, মাংসের স্যাণ্ডুইচ্, এবং যাহোক্ এক রকম পুডিং, আর ছোট্ট এক বোতল দুধ। তা'হলে দেখুন, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও কতটা নজর আছে। এই খাবারটার জন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে প্রতিদিন প্রায় সাত আনা করে দিতে হয়, কিন্তু যে-খাবার তারা স্কুল থেকে পায়, তা' অবশ্য সাত আনার চেয়ে বেশী দাম বলতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, কোনও বাড়ী থেকে চারটি ভাই বোন একই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে, তারা এই সুবিধাটী পায়, বড়টির জন্য সাত আনা, দ্বিতীয়টীর জন্য ছয় আনা, তৃতীয়টীর জন্য পাঁচ আনা এবং চতুর্থটির জন্য চার আনা দিলেই হয়। আবার যদি এমন হয়, কোন শিশুর মা বাবার প্রত্যহ এই খাবারের পয়সা দেবার মত সঙ্গতি না থাকে, তাহলে স্কুল থেকে তাকে বিনা খরচে এই খাবারটী দেওয়া হয়, অবশ্য এই সম্বন্ধে সেই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ভালভাবে খবর নিয়ে তবে এই ব্যবস্থা করে থাকেন। যদি কোন শিশুর বাড়ী থেকে বিদ্যালয় দূরে হয়, এবং তার জন্য তাকে বাসে কিম্বা টিউবে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয় এবং তার সে ভাড়া দেবার মত সামর্থ্য না থাকে, তবে এই যাতায়াত খরচও বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়। অন্য এ ব্যাপারও কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দিয়ে থাকেন। তবে বিলাতে মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই উপার্জ্জন করে থাকেন, সুতরাং তাঁদের শিশুদের এ সকল খরচ দেবার মত অবস্থা থাকে।

বিলাতে প্রত্যেক এলাকায় এই রকম সরকারী বিদ্যালয় আছে। আমরা লণ্ডনের কাছাকাছি কয়েকটী গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই সব গ্রামেও ছোট ছোট বিদ্যালয় দেখে এসেছি। বড় ভাল লাগল এদের শিশুশিক্ষার ধারা দেখে। জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে তা এদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখলে, বেশ অনুভব করা যায়। তাই ছোট ছোট শিশুদের নানা রকম খেলার ভিতর দিয়ে এঁরা লেখাপড়া শেখাতে সুরু করেন। তার জন্য যে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা

রয়েছে দেখে আমাদেরই লোভ হয়, তা' ছোট ছোট শিশুদের তো আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তারা সেই সব খেলনার মধ্য দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখে এবং সংখ্যা গুণতে শেখে ফেলে খুব শীগগিরই। এই জন্যই পড়া তাদের কাছে প্রথম থেকে বিভীষিকা হয়ে ওঠে না, আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এঁরা সব থেকে ভাল মনে করেন।

এ তো গেল লেখাপড়া শেখার ব্যাপার। এ ছাড়া স্কুলে তাদের নানা রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকে। প্রায় প্রতি স্কুলেই একটু করে খোলা জায়গায় এদের নানা রকম খেলা করার ব্যবস্থা আছে। কিছুক্ষণ পড়ার পর তারা মাঝে মাঝে ছুটি পায় খেলা করার জন্য, এতে তাদের মানসিক বিশ্রামও হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাদের নিয়ে বেড়াতে যান। এই সব ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য শিক্ষয়িত্রীরাই থাকেন অধিকাংশ স্কুলেই। কত জায়গায় দেখেছি, ট্রেণে দল বেঁধে বাচ্চারা বেড়াতে চলেছে। বিলাতের চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি ঐ রকম একদল বাচ্চা, এক রকমের ইউনিফর্ম পরা, ভারী ভাল লাগছিল দেখতে। একেই ওদের স্বাভাবিক রং ফর্সা, তার উপর এত সুন্দর স্বাস্থ্য যে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, শিশুগুলি যেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এর পাশেই নিজেদের দেশের দুর্ব্বল শীর্ণ শিশুদের কথা মনে করে মন আপনা থেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। এরা অবাধে ছুটাছুটি করে, খেলা করে, দুষ্টুমি করে, সঙ্গের শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেকের উপর নজর রাখেন।

এই সব শিশুদের স্কুল থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলাদা চার্ট থাকে। সাধারণতঃ শিশুরা দাঁত নিয়ে নানারকমভাবে ভোগে, সেইজন্য প্রত্যেক স্কুলে দাঁতের ডাক্তার থাকেন এবং নিয়মিত বাচ্চাদের দাঁত পরীক্ষা ও চিকিৎসা করেন। ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার থাকেন। নিয়মিত শিশুদে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যার যে বিষয়ে ত্রুটি থাকে, সেটা তার বাড়ি অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। শুধু জানিয়ে দিয়েই এঁরা চুপচা থাকেন না, তার সেই বিষয় চিকিৎসার জন্য কোথায় গেলে এবং ভাবে সুবিধা হবে তারও ব্যবস্থা অনেক সময়ে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষই ক থাকেন। এই সব দেখে বেশ বোঝা যায় যে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে এবং প্রত্যে শিক্ষয়িত্রীকে কতটা দায়িত্ব নিয়ে এই সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হয়।

আমাদের পরিচিত একটি বন্ধু তিনি এই লাইনে বেশ অনেক দি কাজ করছেন ওদেশে। তাঁর মুখে শুনেছি যে, এই কাজে তাঁকে বে পরিশ্রম করতে হয়েছে। যেমন, তিনি বলেন যে—শুধু বাচ্চাদের করিয়েই ছুটি হয় না তাঁদের, বাচ্চাদের দুপুরের খাবার সময়টিতে তদারক করতে হয়। কোন বাচ্চা দুষ্টুমি করে খেলো না, কোন বাচ্চা টেবিলে বসে কথা বলছে কিন্তু খাচ্ছে না, এই সব সামলানো এবং কি ভাবে তারা পরিচ্ছন্নভাবে খাবে এও শিখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য কাজটি প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রীকে সপ্তাহে একদিন করে ভার নিতে হয় এর জন্য তাঁদের বেশ সময় দিতে হয় এবং সতর্ক থাকতে হয়। সুতরা দেখা যাচ্ছে যে এখানে শিক্ষয়িত্রীরা প্রতিটি শিশুর উপর আলাদা নিয়ে থাকেন, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সব বিষয়েই। এই থেকে বো যায় যে, শিশুদের স্থান ওদেশে সকলের উপরে কারণ—তারাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের সব কিছুই যেন এদের শিক্ষাধারা মারফতে পূর্ণ হতে চলেছে।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সানফ্রান্সিস্কো

সানফ্রান্সিস্কো পৌছলাম আমার জন্মদিনে ২২শে জানুয়ারি। বৈদেহী মীরার স্বর করল আশীর্বাদ: "যেন কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছু না চাও।" তবে কোথায় কৃষ্ণ, আর কোথায় সানফ্রান্সিস্কো! মন প্রায় উদাস হ'য়ে আসে আর কি এমন সময়ে চোখে পড়ল বিমানঘাটিতে বেড়ার বাইরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর স্নেহভাজন শ্রীমান হরিদাস চৌধুরী, তজ্জায়া বীণা, ডাক্তার স্পীগেলবার্গ দম্পতি ও মিস টাইবার্গ। স্পীগেলবার্গ আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলেন মাত্র দুদিনের জন্য, তাঁর সঙ্গে সেই থেকে পত্রালাপ চালিয়ে এসেছি বটে কিন্তু তাঁর মুখ আমার মনে ছিল না। যাই হোক হরিদাসের কাছে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়ে তাঁকে এমন ভাব দেখালাম যেন আমি তাঁকে ঠিক তেমনি সহজে চিনে নিয়েছি যেমন তিনি আমাকে। মিস টাইবার্গকে চিনতে বেগ পেতে হয় নি কেননা আশ্রমে ইনি কিছুদিন ছিলেন। আনন্দ-সম্ভাষণ সারা হ'ে আমি ও ইন্দিরা আরূঢ় হলাম স্পীগেলবার্গীয় মোটরে, হরিদাস ও বী —টাইবার্গীয় মোটরে। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। এক নিগ্রো ভারবা আমাদের পাঁচ ছয়টি ভারি বাক্স এমন অবলীলাক্রমে তুলে নিল দুটি হা —দুমণেরও বেশি ওজন—যে আশ্চর্য না হ'লে তার উপর অবিচা করা হ'ত।

বলবই এবার আশ্চর্য হওয়া সম্বন্ধে দুএকটি দার্শনিক কথা— থাকে কপালে।

জগতে মানুষ রকমারি—না জানে কে? কিন্তু যদি বলি—এক বাড়িয়েই হয়ত—যে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়: একদল যার আশ্চর্য হবার মতন কিছু দেখলেই আশ্চর্য হয় অনমুতপ্ত ভাবে, এ একদল যারা কোনো কিছু দেখেই "আশ্চর্য হয়েছি" কবুল করতে চায় না

এই দ্বিতীয় দলের মনোভাব এই যে "আশ্চর্য হয়েছি" বলা হ'ল "হার মেনেছি" বলার সামিল। আমার মনে হয় এরা জীবনের একটি প্রধান রস থেকে বঞ্চিত হয়। এডগার অ্যালেন পো বলতেন "It is a happiness to wonder." একথায় আমার মন সাড়া দিয়েছে আশৈশব। তাই পাঠক-পাঠিকা দয়া ক'রে অন্তত ক্ষমা করবেন যখন আমার এ-ও-তা নানা কিছুতেই আশ্চর্য হওয়ার অকপটোক্তিতে তাঁরা সাড়া দিতে পারবেন না। হাসেন হাসুন—ইংরাজি সান্ত্বনা-পুরাণ বলেন: he wins who laughs last—কিন্তু রাগ যেন না করেন এই মিনতি। এই ধরুন না কেন, হনোলুলুতে দেখলাম ট্রাম চলছে কখনো বা নিচে লাইনে গড়িয়ে উপরে তার বিনা, কখনো বা উপরে তারের সঙ্গে আঁকশির যোগসূত্র আছে কিন্তু নিচে ট্রামের লাইনের চিহ্নও নেই। দেখে ভারি আশ্চর্য হ'লাম। সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছতে না পৌঁছতে আশ্চর্য হলাম আরো কত কিছুতে! বলব?

পয়লা নম্বর বলেছি: ঐ নিগ্রো ভারবাহীর আশ্চর্য বলিষ্ঠতা, মাথা ব্যবহার না ক'রে দেহের নানা স্থানে নানা বিন্যাসে পাঁচ ছয়টি ভারি বাক্স বগলদাবায় ক'রে অবলীলাক্রমে মাটিতে স্থাপন।

দোসরা: ভোর সাতটায় এঞ্জেলবাগীয় মোটরে হু হু ক'রে উধাও হ'তে হ'তে—ও মা! এ কী কাণ্ড! পথে চলেছে বায়ুবেগে অজস্র মোটর কিন্তু একটিও পথিকের দেখা নেই!! সত্যি বলছি সারা পথে প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম মাত্র দুটি পথিক যারা চলমান ব্রজবাবুর জুড়ি ক'রে (টীকা—পদব্রজে)! পরে অবশ্য পথিক বেরোয় অনেক, কিন্তু ভাবুন ভোর সাতটা থেকে আটটার মধ্যে প্রায় বিশ মাইল পথে মোটর যদি দেখে থাকি কম ক'রে চার পাঁচ হাজার, পথিক দেখেছি বড় জোর চারটি কি পাঁচটি! হবেন না আশ্চর্য না-ই হ'লেন। আমি হবই আশ্চর্য—তা আমাকে আপনারা যত ইকেন না পাড়াগেঁয়ে ভাবুন।

সানফ্রান্সিস্কো-অকল্যাণ্ড-উপসাগরের সেতু। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৮॥ সাড়ে আট মাইলেরও বেশি

তেসরা: অবাক্! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা এই উঁচু, এই নিচু—আর যে কী নিচু! জ্যামিতিতে পড়েছিলাম খাড়া হ'ল নব্বই ডিগ্রি। এ-ঢালু প্রায় বিশ পঁচিশ ডিগ্রিরও বেশি হবে. জায়গায় জায়গায় অঙ্গ শিহরিত হয় হু-শ্ ক'রে উঠেই সে কী দারুণ ভ-শ্ ক'রে নামা! পাঠক বলবেন হেসে: "বাঃ, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বুঝলে না—সানফ্রান্সিস্কো রাজধানী শৈলচারিণী—পাহাড় কেটে পথ বানানো।" মানি। কিন্তু ভাবুন কী অজস্র ও বিশাল পথ কাটতে হয়েছে! আর শুধু কি পথ কাটা, দাদা? সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গ। ইংলণ্ডে সুড়ঙ্গ কেটে ট্রেনের পথ করা হয়েছে দেখে যথারীতি আশ্চর্য হয়েছিলাম ১৯১৯ সালে। এও সেখানে দেখেছি যে "উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর।" কিন্তু এখানে দেখলাম:

তেসরা নম্বরের বিস্ময়: বিরাট ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গের যুগলবাহার এপাশের সুড়ঙ্গে চলে মোটর একদিকে, ওপাশে অন্যদিকে। আর প্রতি সুড়ঙ্গেরই উপরে সে কী মসৃণ বাঁধানো ডোম—মাঝে লম্বা সাদা আলো। সারা সুড়ঙ্গ যেন মনে হয় দিনের আলোয় হাসছে। এত বড় সুড়ঙ্গে এত আলো দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন তবে জেনে রাখুন—দেখলে হয় আশ্চর্য হ'তেন আমার মতন, নয় আশ্চর্য না হ'য়ে ব্যাখ্যা করতেন যেমন বৈজ্ঞানিক রামধনু দেখে ব্যাখ্যা করে: "ও আর আশ্চর্য কী—ডিফ্রাক্শন—বেগুনি, অতি নীল, নীল, হরিৎ, পীত, কমলা, লাল ইত্যাদি।" সবই জানি দাদা, কিন্তু তবু হংকং-এর কাছে এই চিরপরিচিত রামধনু দেখেও হয়েছিলাম ফের অবাক। কারণ সে সময়ে রামধনু শুধু যে নিচে ছিল তাই নয়—আমাদের আকাশ পক্ষী যেন চলেছিল তার বক্ষ ভেদ ক'রে। এহেন দৃশ্য হয়ত বিমানে আরো অনেকেই একাধিক বার দেখে থাকবেন। কিন্তু আমি দেখেছিলাম মাত্র একবার—৮ই জানুয়ারি। ভালোই হ'ল সলজ্জে এ সব নানান্ আশ্চর্য হওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম। ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষ পাঠক-পাঠিকা যখন পড়বেন তখন বলবেন হেসে: "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কী সরল, ওরফে অজ্ঞ!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাদের অশরীরী আত্মা তখন পোপের ভাষায় সান্ত্বনা আহরণ করবে:
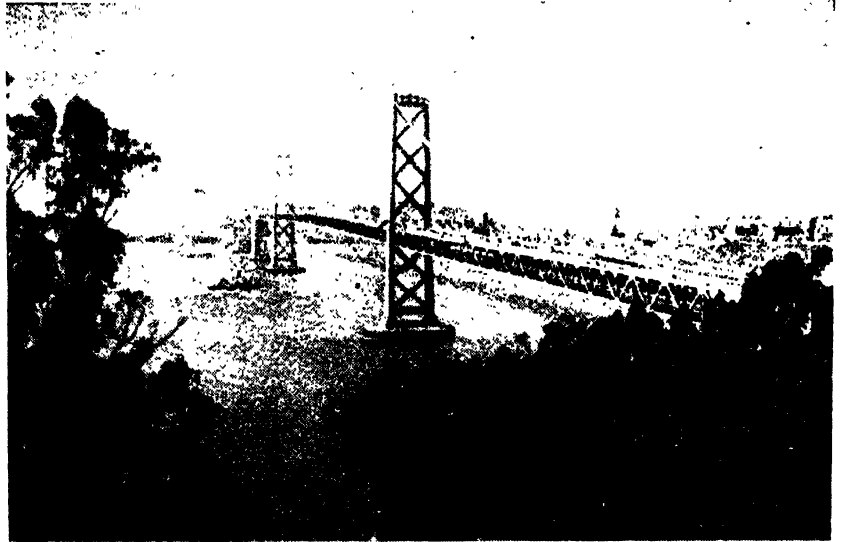
We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser children will, too, think us so!

* * * *

"আমেরিকান আকাডেমি অফ এশিয়ান স্টাডীস্" গৃহে নিয়ে গেলেন স্পীগেলবার্গ দম্পতী। বলতে ভুলেছি শ্রীমৎ স্পীগেলবার্গ মোটরে চালালেন রসনা, শ্রীমতী—কেবল মোটর। আমেরিকায় মোটর চালানো যে কী বস্তু আমাদের দেশ থেকে কল্পনা করা শক্ত। যদিচ কোথাও পুলিশের চিহ্ন নেই, কিন্তু মোড়ে মোড়ে অটোমেটিক লাল নীল পীত বাতি জ্ব'লে উঠছে ঘড়ি ঘড়ি—একটার পর একটা। সেই অনুসারে গাড়ি চালাতে হয়। এ ছাড়া কতবার যে মোটর দাঁড় করাতে হয় সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার দরুণ। ডাক্তার স্পীগেলবার্গ হঠাৎ গাড়ির মধ্যে এক ম্যাপ খুললেন। "কী ব্যাপার?" "দেখছি শর্টকাটের রাস্তা।" "কাটটা" 'শর্ট' হ'ল বটে কিন্তু সময় লাগল "লং"। কারণ আকাডেমিতে পৌঁছে দেখি ঘোরানো রাস্তায় এসে হরিদাস দম্পতী আমাদের আগে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন। যাক্।

ওখানে আকাডেমির সিংহলী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বুঝি মালালাশেখর। আর একটি অধ্যাপক বুঝি শ্যামদেশের। আর একজন—কি যেন পড়ান: ত্রিপিটক, না কোরাণ, না জেন্দাবেস্তা, ভুলে গেছি।
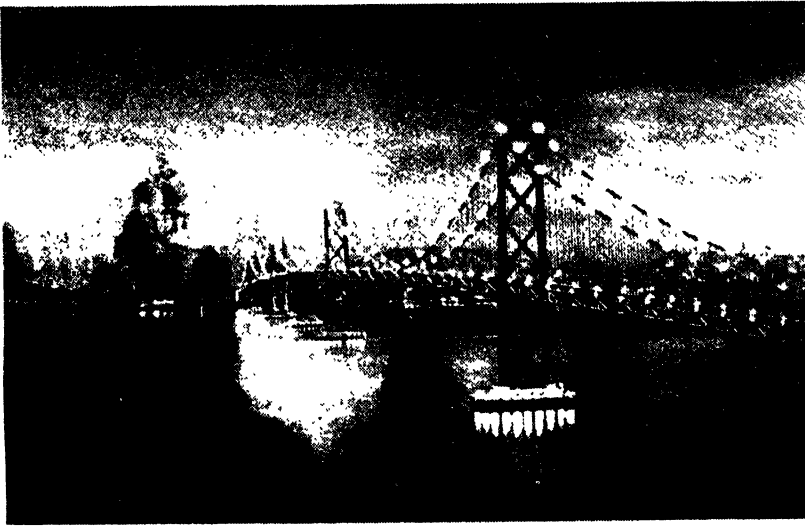
সানফ্রান্সিস্কো অকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু। রাতের দৃশ্য

* * * *

ভারতীয় কনসালের ওখান থেকে এলেন সেক্রেটারি "লাল": "কী করতে পারি আমরা? দেশ থেকে চিঠি এসেছে আপনাদের দেখাশুনো করা আমাদের কর্তব্য"—ইত্যাদি। "লাল" অতি সজ্জন, মঞ্জুবাক্। বললাম: "কনসালের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বলব।"—"ডুটোর সময়?"—"খাসা কথা। মিস টাইবার্গের সঙ্গিনীর ওখানে ভোজন সমাধা ক'রেই হাজির হব।"

মিস টাইবার্গ থাকেন একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস ডার্লিং-এর দুটি বড় বড় ছেলে। বিধবা হ'য়ে তিনি একাই থাকেন, পিয়ানো বাজান। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'তে হ'ল। খাওয়ার পরে এল এক চমৎকার বর্তুলাকার প্রকাণ্ড কেক। তার উপরে চকোলেট অক্ষরে লেখা Happy birth day to Dilip কেকটি আমার সামনে পেশ ক'রেই গান ধরলেন দুটি মহিলা: "Happy happy birth day to Dilip!" মনটা ভ'রে উঠল। শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল: মা বোন আমাদের কোথায় নেই? বিদেশে এই আন্তরিক স্নেহস্পর্শ—প্রায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে উঠি আর কি!

খাওয়া শেষ হ'লে মিসেস ডার্লিং বললেন: "আপনারা যদি চান তো আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন।" মিস টাইবার্গ তাঁর ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়ে একটি ছোট ঘরে থাকবেন—ইত্যাদি। কিন্তু এ-ব্যবস্থায় আমরা রাজি হ'লাম না। কনসাল হুসেন সাহেবের ওখানে গিয়ে বললাম: "সব আগে চাই একটা মাথা গুঁজবার জায়গা—খুব বেশি আভিজাত্য বরদাস্ত হবে না আমাদের। চলনসৈ গোছের আরামে থাকতে পারলেই হবে।" হুসেন সাহেব অতি মিষ্টভাষী। বললেন "স্যর সি পি রামস্বামীকে যে হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলাম তাদের চার্জ খুব বেশি নয়।" লাল নিয়ে গেলেন সেই হোটেলে—হোটেল স্টুয়ার্ট। দুটি ঘর পাশাপাশি—মাঝে একটি স্নানের ঘর। চমৎকার ব্যবস্থা। ঘর ভাড়া মাথা পিছু সাড়ে তিন ডলার। দুটি ঘরে দিন সাত ডলার অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ টাকা। খাওয়া-দাওয়া আলাদা। এই ব্যবস্থাই এখানে চালু হয়েছে।

এখানকার হোটেল বা সাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার কথা বলি—কারণ ব্যবস্থাটি খুবই ভালো লাগল। আমেরিকা যন্ত্রপ্রধান দেশ। মানুষের করণীয় তথা সাধনীয় কাজ যতটা পারে নাকচ করে এরা যন্ত্রের দৌলতে। ফলে গ'ড়ে উঠেছে কাফেটারিয়া। হোটেলে পরিচারক তথা পরিবেষকের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হয় ব'লে এই ব্যবস্থার উদ্ভাবনা। এতে পরিবেষক নেই আছে খাদ্যদাতা খুড়ি, দাত্রী। কি রকম—বলি। কাফেটারিয়ার ভোজনালয়ে এসে প্রত্যেককে এক একটি সুন্দর ট্রে হাতিয়ে তার উপর দরকার মতন কাঁটা ছুরি চামচ ন্যাপকিন পাশ থেকে গিয়ে পরিবেষকদের সামনে দাঁড়াতে হয়। খাবার অজস্র—সাজানো থরে থরে। শুধু বলার অপেক্ষা অমুক ডিম, মাছ মাংস, অমুক রুটি, অমুক সালাড, অমুক পাই, ফলের রস, কেক, স্যাণ্ডউইচ—পরিশেষে কফি কিম্বা চা। ওপাশে দণ্ডায়মানা খাদ্যদাত্রী নক্ষত্রবেগে ট্রের উপর বাঞ্ছিত খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে দেন। ট্রে চলে রেলের উপর শাঁ শাঁ ক'রে—পরের কাউন্টারে ক্যাশিয়ার মহিলা—তিনি খাবার দেখেই বিল

মন—তৎক্ষণাৎ নগদ বিদায়। কী ক'রে এঁরা একটি চকিত কটাক্ষে খাদ্যসম্ভারের মূল্য নির্ধারণ করেন ভাবতে ধাঁধা লাগত। ফের সেই অবাক হওয়া! যাক্। প্রাতরাশ আমাদের পড়ত এক ডলার ক'রে। লাঞ্চ বা ডিনার দেড় ডলার ক'রে।

এ ব্যবস্থায় সুবিধা এত যে মন ভারি আরাম বোধ করল। কী খাবার চাই খাদ্যতালিকা দেখে ঠাহর করতে হয় না চোখে দেখে চেয়ে নিতে হয়। ক'নের নাম বা বংশ পরিচয় শুনে বিবাহ করা এক ও কনের রূপগুণের পরিচয় পেয়ে আংটি বদল করা আর। এতক্ষণে বুঝলেন কি "কাফেটারিয়া" কী বস্তু?

কিন্তু যেটা সবচেয়ে অভিভূত করে সেটা হ'ল এদের দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য। যে কোনো হোটেল রেস্টরাতে খাদ্যসম্ভার বহুবিধ ও অজস্র। রেশনিং কী বস্তু এরা শুধু খবরের কাগজেই পড়েছে ও সম্ভবত হেসেছে আত্মপ্রসাদের হাসি—যেমন আমরা হাসি যখন শুনি কোনো পাশ্চাত্য মহিলাকে বলতে (এ আমার স্বকর্ণে শোনা): "ঠোঁটে আলতা না দিয়ে বেরুনো আর নগ্ন হ'য়ে বেরুনো সমার্থক।" অত্যাস্যো নাতিরিচ্যতে।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা গেলাম আকাডেমিতে। দেখলাম হরিদাস তার ক্লাসে পড়াচ্ছে। বলল: "বাংলা শেখাচ্ছে" পরে স্পীগেলবার্গ নিয়ে গেলেন তার সংস্কৃত ক্লাসে। আমাকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ধ'রে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন আমার গুণপনা সম্বন্ধে। পরে বললেন আমাকে সংস্কৃত আবৃত্তি কিছু শোনাতে। ওদের হাতে ছিল গীতা। আমার মুখস্থ ছিল একাদশ অধ্যায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অনেকগুলি শ্লোক স্মৃতি থেকে আবৃত্তি ক'রে শোনালাম: "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে…" একটু গেয়ে শোনালাম: "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা…সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।" ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে গীতা খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে শুনতে লাগল। পরে আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে। বললাম: "অনেকে ভুল ক'রে বলে থাকেন সংস্কৃত আমাদের দেশে মৃত ভাষা। এ ধারণাকে ভুল বলছি এই জন্যে যে সংস্কৃত ভাষা এখনো ভারতের সংস্কৃতিকে শুধু যে ধারণ ক'রে আছে তাই নয়—প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিকতা সম্ভব মনোবৃত্তির একমাত্র জীবন্ত প্রতিষেধক এই অপরূপ অতি-প্রাদেশিক দেবভাষা। ভারতের অন্তরাত্মার মণিকোঠায় প্রবেশ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার চাবির দরকার। ভারতের পরমতম ঐতিহ্যের তথা আধ্যাত্মিকতার ধারয়িত্রী আগে সংস্কৃত ভাষা। তাই না শ্রীঅরবিন্দকে যৌবনে বিলেত থেকে ফিরে এসে সব আগে শিখতে হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা।"

ওরা প্রশ্ন করলে গীতা সম্বন্ধে। আমি বললাম: "গীতা আমাদের কাছে তেমনি আদরণীয় যেমন খৃশ্চানের কাছে বাইবেল্। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আজো অনেক প্রেরণা পেয়ে থাকি গীতার বাণী থেকে। আমাদের জীবনে নিত্যনিয়ত যে রকমারি আদর্শ সঙ্ঘাত দেখা দেয় তার প্রত্যক্ষ সমাধান আমরা পেয়ে থাকি গীতার বিধান থেকে। অর্জুন গীতায় স্থান নিয়েছেন বিশ্বমানবের, শ্রীকৃষ্ণ দেবমানবের তথা জগদ্গুরুর। মানুষ যুগে যুগে বহুবিধ প্রশ্ন পেশ করেছে বিধাতার দরবারে। গীতা তার একটি জীবন্ত সাক্ষ্য। ভগবানের বাণী মানুষের কাছে নানা সময়েই মনে হয় স্বতোবিরোধী—যেমন অর্জুনের মনে হয়েছিল যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে মিনতির সুরে বলেছিলেন:

বিমান হতে সান্‌ফ্রান্সিস্কো ওকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু এবং নগর
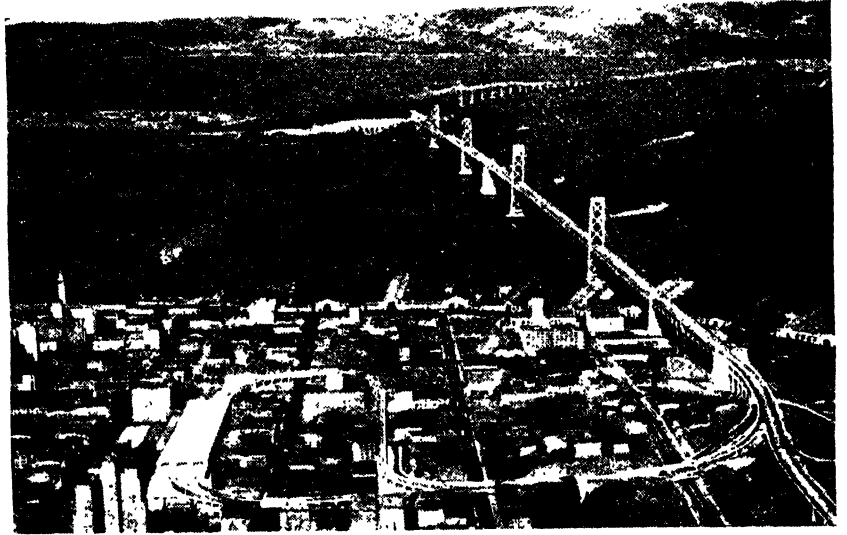
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেব বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।

অর্থাৎ প্রভু, আর উল্টো পাল্টা কথা ব'লে বিপাকে ফেলো না আমার বুদ্ধিকে। বলো সোজাসুজি কী করলে উত্তীর্ণ হব ভ্রান্তি থেকে শান্তির শ্রেয়োলোকে।" ব'লে শেষে বললাম: "একটু চোখ চেয়ে দেখলে দেখা যাবে আজো এ-প্রশ্নের নিত্য নবজন্ম হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর মনেও—তাকে ছুটতে হচ্ছে সমাধানের জন্যে কৃষ্ণের কাছে না হোক—(তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর জুড়ি মিলবে কোথায়?)—সদ্গুরুর কাছে, ঋষিকল্প জ্ঞানীর কাছে, নিরভিমান আত্মবিৎ-এর কাছে।"

আমার বক্তৃতা শেষে ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাসিত মুখে আমাকে নানা প্রশ্ন সুরু করল—আমি সাধ্যমত উত্তর দিতে লাগলাম। ফলে স্পীগেলবর্গের সংস্কৃত ক্লাসে জেগে উঠল এক বিচিত্র উৎসাহের সাড়া। ভালো লাগল দেখে যে, আমাদের দেশের আপ্তবাক্য সম্বন্ধে এ-দূর

বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। এ-বিদেশে আমি এসেছি হয়ত এই বিশ্বাসটির স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ পেতে যে সরল আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বললে সবাই না হোক কেউ কেউ অন্তত সাড়া দেয়, ভক্তিভাবের অনুপ্রেরণায় গান করলে কয়েকটি হৃদয় অন্তত ভাষা, লোকাচার ও সভ্যতার ভেদ সত্ত্বেও আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এ নিয়ে নানা তর্কের অবতারণা করা যেতে পারে অবশ্য—(এমন কোন্ উক্তি আছে যা নিয়ে তর্ক করা না চলে ?)—কিন্তু সব তর্কাতর্কির অন্তেও একটি প্রত্যয় মানবহৃদয়ে বোধকরি আজও তেমনি জেগে আছে : যে হৃদয়ের একটি গভীর অনুভব থেকে মানুষ ভেদবুদ্ধির বাধা ডিঙিয়ে অন্য মানুষের কাছাকাছি আসতে পারে।

একবার স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ পেলাম পর দিন বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরির বাড়িতে ভজন গান ও নামকীর্তন ক'রে। এখানে একটি ছোট দলের সঙ্গে আলাপ হ'ল—হরিদাসই তাদের নিয়ে এল—যারা চাইছে

শীলরক্—সানফ্রান্সিস্কো

একটি শ্রীঅরবিন্দ বাণীমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। এদের মধ্যে দুতিনটি লোকের সঙ্গে গেলাম হরিদাসের ওখানে। হরিদাস থাকে রুডল্ফ্ শেফার নামে চমৎকার শিল্পাধ্যক্ষের সঙ্গে। এখানে শিল্পকলা সম্বন্ধে নানারকম চর্চা হয়। বাড়িটি বড়, ক্লাসও হয় নানা ঘরে, দুতিনটি ঘরে থাকেন অধ্যক্ষ ও হরিদাস গৃহিণী বীণাকে নিয়ে। সেখানে মাঝে মাঝে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে বক্তৃতা দেয়, মাঝে মাঝে ধ্যানচক্র বসে। আমি গেলাম ভজন শোনাতে। গাইলাম মীরা ভজন—ইন্দিরার শ্রুতিলব্ধ—"তু লাগে জা হরী হরী"—(প্রেমাঞ্জলি ১৮০ পৃঃ) এর মৎকৃত বাংলা অনুবাদ ও সব শেষে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে "নামকীর্তন। অনেকদিন বাদে বিদেশে নামকীর্তন করতে পেয়ে মন ভ'রে উঠল। শ্রাতৃবর্গ সোচ্ছ্বাসে সাড়া দিলেন। একটি মার্কিণ মহিলা, একটি ইহুদ ভদ্রলোক ও শিল্পাধ্যক্ষ শেফার এমন কম্প্রকণ্ঠে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন যে মনে হ'ল তাঁদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোথাও বা একটু কাঁপন জেগে থাকবে। শেফার বললেন : "যখন ইচ্ছা আমার এখানে আসবেন। আমার গৃহদ্বার আপনার জন্যে খোলা রইল।" ঠিক হ'ল ইন্দিরার নাচের মহলা এখানেই হবে। ভাবনায় পড়েছিলাম এ বিদেশে মহলা দেওয়া যায় কোথায় ? সংকটতারণ ক'রে দিলেন সমাধান। মীরার কথা মনে পড়ল : "তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখো। বিপাকে ফেলবার জন্যে প্রভু তোমাকে এতদূরে টেনে আনেন নি—বলছি আমি।" জয়হোক মীরার দৈববাণীর !

* *

হঠাৎ এলেন এক পিয়ানো-বাদক ও সুরকার—লস এঞ্জেলস্ থেকে। আমাদের কথা শুনেছিলেন। এসেই বললেন তিনি চান আমাদের শোনাতে তাঁর পিয়ানোতে-তোলা ভারতীয় রাগরাগিনী। লোকটি দেখতে বেশ ভারিক্কি, কথাবার্তাও খুব নরম। কিন্তু কোথায় একটা আত্মাভিমান আছে যার নাম দেওয়া না গেলেও নামের হদিশ পাওয়া যায়। তাই আমাদের রাগ ভালো ক'রে না আয়ত্ত ক'রেই শোনাতে এত আগ্রহ—বাহবার লোভ। তবে যখন বললেন : আমি মনে প্রাণে ভারতীয়, এদেশে জন্মেছি কেন, কে জানে ?—তখন মনের কোণে একটা দরদ বোধ করলাম। এখানে ভারতীয় কয়েকটি শিল্পী নিয়ে ইনি কন্সার্ট আদি দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা—আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেই। ভাবটা—আমি তোমাদের গ'ড়ে পিটে নেব আমাদের সভার জন্যে। একলা চললে তোমরা নাগাল পাবে না সাফল্যের, কিন্তু আমার সহযোগী হ'তে না হ'তে পাবে বাহবা। আমি বললাম শান্তসুরেই : "আমরা আমেরিকার জনসভায় বাহবা পেতে আসি নি—তবে আমাদের যা আদর্শ তার সঙ্গে মিলালে একটা কন্সার্ট দিতে পারি।" তারপর অনেক কথা হ'ল। তিনি তাঁর প্রোগ্রাম দেখালেন। বোঝা গেল ভারত থেকে (যেমন এদেশে প্রায়ই হয়) বাজে কয়েকজন শিল্পী এসে বুঝিয়েছে তারা ভারতীয় নৃত্যগীতের শিখরসঞ্চারী। বললাম তাঁকে : "বন্ধু ! আপনার প্রচেষ্টা তথা অমায়িকতার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু ইন্দিরা ও আমি অজ্ঞাতকুলশীল মন্দশিল্পিযশঃ প্রার্থীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাম কিনতে রাজি নই। যদি আমরা যেটুক যতদূর পর্যন্ত দিতে পারি আপনাদের আমেরিকান হাটে পুরোদামে না বিকোয় তবে সস্তা দরে বিকিয়ে চতুর বণিক উপাধি পেলে আমরা হব ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ। আদর্শের ক্ষেত্রে কানা মামার চেয়ে নেই মামাই

ভালো।" ভদ্রলোক শুনে একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে ইন্দিরার নৃত্য দেখে সুর তাঁর আরো বদলে গেল। বললেন: "না না—বাজে শিল্পীর সঙ্গে আপনারা মিশবেন কেন? আমি বলি কি—আমি কয়েকটি নৃত্যগীত দেব—আপনারা যে আসরে তারকাশিল্পীর মতন ভাবের নৃত্যগীত দিন।" বললাম মনে মনে: পথে এসো দাদা। প্রকাশ্যে: "আচ্ছা ভেবে জবাব দেব।" দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

* * *

একটি পার্টিতে গেলাম—খাস আমেরিকান পার্টি যাকে বলে। উঃ, সে কী কাণ্ড! কত যে নরনারী—আর প্রত্যেকেই এসে যে কী অজস্র কথা উদ্গীরণ করেন! কত হোমরাও চোমরাও সংবাদ নিলেন আমাদের—করলেন কতই সমাদর! "নাম শুনেছি—অসুন একদিন আমাদের ওখানে।"…ইত্যাদি।

কিন্তু যাব কোথায়? এধরণের পার্টিতে? সবাই কথা কইছে সবার সঙ্গে, অথচ কারুর কথাই কারুর কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করছে না। হট্টগোল এখানকার বাদী সুর। সর্বোপরি, যুবক যুবতী পান করছে রকমারি সোমরস। আর সে কি পান ব'লে পান! একজন এমন পান করলেন যে একটি গ্রামোফোন বাজছিল মাইক্রোফোন সমেত সেই মাইক্রোফোনটির উপর ঢ'লে পড়লেন, মাইক্রোফোন অচল! এহেন পার্টির সুরে নমস্কার। পিতৃদেবের বাণী স্মরণ ক'রে "বুঝিবা এমন শ্রেয়: মানে মানে পলায়নম্" বল্‌তে বলতে গান না গেয়ে গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধুবর শেফারের মোটরে চম্পট।

* * *

বালাই

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাটিকা)

আইনসভার সদস্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষের বৈঠকখানা। আসবাবপত্র প্রায় নতুন, কারণ শ্রীমতী এইবারই প্রথম নির্বাচিতা হয়েছেন। ভালভাবেই সাজান বৈঠকখানাটি। দেশনেতা তিনচারজনের বড় ছবি দেয়ালে। আর একটি বড় এনলার্জড্ ফটো শ্রীমতীর পিতার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেয়ালঘড়িতে ৭টা দেখা যাচ্ছে। ঈষৎ ময়লা পাৎলুন ও ছেঁড়া হাফসার্টপরা এক ভদ্রলোক একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রোগা, চুল উসকোখুসকো। এ ঘরে কেমন যেন বেমানান হলেও তিনি কোনকিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে পায়ের উপর পা দিয়ে বিড়ি টানছেন। এমন সময় বাইরের দরজা দিয়ে একজন সুবেশ ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়ীর চাকর প্রবেশ করল ও তাঁকে 'বসুন, আমি খবর দিচ্ছি' বলে ভিতরের দিকের দরজার সুদৃশ্য পর্দা ঠেলে অন্দরে গেল। উপবিষ্ট ভদ্রলোক, অর্থাৎ রতনবাবু, এ ব্যাপারটার প্রতি দৃকপাত না করে বিড়ি টেনে চলতে লাগলেন। নবাগত ভদ্রলোক, অর্থাৎ গৌতমবাবু, বয়স প্রায় চল্লিশ, এঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিড়ি টানা শেষ হলে সেটা ছাইদানীতে ফেলে রতনবাবু এঁর দিকে মুখ ফেরালেন।

রতন। (অল্প একটু সময় চেয়ে থেকে) আপনি কি অ্যাসেমব্লী মেম্বার, না অফিসার?

গৌতম। (প্রশ্নে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে) আমি শ্রীমতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

রতন। (সমান হেলাচ্ছলে) তা তো বুঝছি। আইনসভার এক মাথা উনি, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন না তো কি আর ওঁর চাকরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন! যা মেজাজ মশাই, কি বলে বসে দেখুন। আচমকা বড়লোক হওয়ার কাণ্ডই আলাদা।

গৌতম। (কিছুটা বিস্মিত) আপনি—আপনি কে?

রতন। (সামান্য হেসে) আমি? একজন নগণ্য লোক মশাই, আর খোঁজ নিয়ে লজ্জা দেন কেন! তবে এই ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে অনেক দিন থেকে জানাশোনা আর কি, বুঝছেন না?

গৌতম একদৃষ্টে চেয়ে রইল

মফস্বলী লোক মশাই, কথায় ত্রুটী নেবেন না—আপনারা মানী লোক।

গৌতম। না না, তা নয়। তাহলে আপনি কি ওঁর কোন আত্মীয়টাত্মীয় বা—

রতন। (অন্যমনস্ক ভাবে) আত্মীয়? হাসালেন আপনি। (সামলে নিয়ে) ভবঘুরে, একটা বেকার

মশাই। বাড়ী ছিল কুষ্টিয়ায়; পাকিস্তানে পড়ে গিয়ে বড় বিপাকে পড়েছি।

গৌতম। আপনার ফ্যামিলি নেই? ফ্যামিলি কোথা?

রতন। সবই আছে, আবার কিছুই নেই। আর বলেন কেন দুঃখের কথা, সে এক ইতিহাস। কিন্তু আপনার কথা তো শোনা হচ্ছে না। আপনি কি অ্যাসেমব্লী মেম্বার নাকি? ডেমো না কেমো—কোন দলের?

গৌতম। (হাসিমুখে) কোন দলের হলে ভাল হয়?

রতন। যে দলেরই হন, দেশটাকে ভাল করে চালান। মানুষকে খেতে পরতে দেন, একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে দেন।

এমন সময় ভিতর দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না, বয়স ত্রিশ বত্রিশ; দোহারা চেহারা, অল্প ফরসা, মুখটি সুঠাম না হলেও ভাল। ঈষৎ বেঁটে। সজ্জায় আভিজাত্য রয়েছে, রিমলেশ চশমায় ইলেকট্রিক আলো পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে শ্রীমতীর মুখখানি খুব বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে।

জ্যোৎস্না। এ সময় যে? কোথা থেকে ফিরছেন নাকি?

গৌতম। হাঁ, ডেপুটী মিনিস্টার চিত্রা বোসের বাড়ীতে গেছলুম।

জ্যোৎস্না। দেখা হল?

জ্যোৎস্না বসল

গৌতম। হাঁ।

জ্যোৎস্না। (রতনের প্রতি) ঘোষ, তুমি একটু বাইরে ঘুরে এসনা।

রতন। (এতক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে ছিল; কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে) ও,—হ্যাঁ, এই যে যাই।

কিন্তু উঠবার লক্ষণ না দেখিয়ে একটা বিড়ি ধরাতে গেল

জ্যোৎস্না। বিড়ির গন্ধ মোটে সহ্য করতে পারিনা।

গৌতম সিগারেট কেস বার করে রতনের সামনে ধরতে সে একটা তুলে নিয়ে ধরালে

আশ্চর্য্য লাগে আমার বাবার কথা ভাবলে। কোন কিছুতেই নেশা ছিল না তাঁর, এমন কি পান শুদ্ধু খেতেন না।

রতন। (সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়াটা উপরের দিকে ছেড়ে) হুঁ, কেবলমাত্র তামাক পাতা মুখে রাখতেন।

গৌতম সবিস্ময়ে রতনের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার দিকে মুখ ফেরাতে জ্যোৎস্না নিজের মাথায় একটা আঙ্গুল ঠুকে জানাল যে ওর মাথা খারাপ।

জ্যোৎস্না। তারপর চিত্রার সঙ্গে কি কথা হল বলুন।

গৌতম। খুব উপমন্ত্রী পেয়েছেন যাহোক! কোন একটা সাহায্যে আসেন না। আরে আমরা পাটির লোক, আমরা যদি কিছু সুযোগসুবিধে না পাই তো পাটিতে থাকার মানে? বললুম, মিশরে যে কালচারাল ডেলিগেশনটা যাচ্ছে, তাতে আমাকে যাতে নেওয়া হয়, তার একটু চেষ্টা করবেন। বলে কিনা, চিফ মিনিস্টারকে বলুন গিয়ে।

জ্যোৎস্না। একেবারে একটা অপদার্থকে ডেপুটী মিনিস্টার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মতামত কিছু নেই, সাহস নেই, নেহাৎ মুখচোরা। তার চেয়ে গেরস্থালী করলি না কেন বাপু, অ্যাসেমব্লীতে এলি কেন?

রতন। পুত্রকন্যা নেই বলে।

জ্যোৎস্না। (রুক্ষস্বরে) তুমি একটু বাইরে যাবে?

রতন। এই যে যাই।

উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না

গৌতম। আপনাকে কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি একবার চিফ মিনিস্টারকে দিল্লীতে প্রাইমমিনিস্টারকে টেলিফোনে আমার কথাটা বলতে বলুন। মিশর সম্বন্ধে আমার কত লেখা কাগজে বেরিয়েছে, দেখেছেন তো? তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমার পড়াশোনা প্রচুর। ধরুন, সেখানকার কালচারাল মিটিংএ আমার বক্তৃতা দেশের সুনাম বাড়াবে তো?

জ্যোৎস্না। আচ্ছা দেখি, চিফ মিনিস্টারকে বলে যদি কিছু করতে পারি। তবে সেণ্ট্রালের কর্ত্তারা যে আমাদের অনুরোধ রক্ষে করবেন, তা তো মনে হয় না। আমাদের চিত্রা যে নিজেকে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ভাবে; বলে কি জানেন, এসব ঘরের রাজনীতি আর ভাল লাগে না, কোন এমব্যাসী টেমব্যাসী হলে ভাল হত।

গৌতম। বললেন না কেন যে আর এমব্যাসীতে কাজ নেই, গৃহবাসী হও,—যে যোগ্যতা তোমার! দেখুন,

সত্যিকার গুণের আদর নেই। না হলে আপনাকে না নিয়ে কি আর ঐ অপদার্থ টাকে নেয়!

জ্যোৎস্না। কত কষ্ট করেই যে জীবনে এগিয়েছি গৌতমবাবু! না হলে ধরুন, গ্রামের এক সাধারণ ব্যবসায়ীর মেয়ে আমি—

রতন। (কথার মাঝেই) কুষ্টিয়া থেকে তিন মাইল দূরে রঞ্জনপুর গ্রামের এক মুদীখানার মালিক—

জ্যোৎস্না। (অত্যন্ত কুপিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে) বাইরে যাবে কিনা তুমি? যত সব—যাও!

রতন। যাচ্ছি, যাচ্ছি।

বলে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গৌতম। লোকটা কে বলুন তো।

জ্যোৎস্না। কিছু বলেছে নাকি আপনাকে?

গৌতম। এমনি জিজ্ঞেস করছিল, কি করি না করি। আপনার কেউ হয় নাকি?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতি। সম্প্রতি মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।

গৌতম। স্ত্রী বেঁচে আছে তো?

জ্যোৎস্না। কে জানে? ওর ব্যাপার ভাল জানি না। এখানে এসে যখন তখন জ্বালাতন করে। কি আর করি বলুন। বসুন, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

গৌতম। বলে আসতে হবে কেন? ডাক দেন না চাকরটাকে।

জ্যোৎস্না। রান্নাঘরে হয়তো সব কটাতে আড্ডা জমিয়েছে, ডাকলে কি শুনতে পাবে!

গৌতম। খুব পাবে। বলুন না কি নাম। আমি ডাকছি।

জ্যোৎস্না। (একটু জোরে) সুজিত!

গৌতম। বড় অভিজাত নাম তো। (একটু জোরে) কই হে সুজিত!

২০।২২ বৎসরের চাকর প্রবেশ করল

জ্যোৎস্না। দুকাপ চা নিয়ে এস, আর চারখানা কেক। ঝি কোথায়?

চাকর। ভেতরে আছে।

জ্যোৎস্না। আমাকে না বলে চলে যায় না যেন, বলে দিও।

চাকর। আচ্ছা।

গৌতম। বাবারে, ঝি, চাকর, ঠাকুর, বড় এসট্যাব্লিশ-মেণ্ট! ভাগ্য কি রকম দেখতে হবে তো। কিন্তু একা একা লাগে না আপনার?

জ্যোৎস্না। একা আর কোথায়! এক পিসীমা আছেন, আর মাঝে মাঝে দুচারজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হচ্ছেই।

গৌতম। বড়দরের লোক হয়েছেন একটা, আর আত্মীয়স্বজন আসবে না! বড় হলেন এটা দেখাবেন তা হলে কাকে? তবু তো আসল আত্মীয়স্বজনের বালাইই নেই। আমরা তো তাদের ভয়েই সর্বদা পালাই পালাই করছি।

চাকর কেক চা দিয়ে গেল। জ্যোৎস্না গৌতমকে কেক চা এগিয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না। দেখুন কেকটা আবার ভাল কিনা। সব সময় তো নিজে কিনতে বেরোবার সময় পাই না।

গৌতম। (একটু খেয়ে) ভালই তো দেখছি। রান্না-বান্না নিশ্চয় ভুলে গেছেন?

জ্যোৎস্না। না না, ভুলে যাব কেন! স্কুলে পড়াবার সময় আট বছর দুবেলা নিজে রেঁধে এসেছি, আর রান্না ভুলে যাব! কত কষ্ট যে জীবনে সহ্য করেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।

গৌতম। কিন্তু দেখুন, আপনার কাছে আপনার জীবনের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু আসল গল্পটাই শোনা হয়নি।

জ্যোৎস্না। আসল গল্প? সেটা আবার কি?

গৌতম। (হাসিমুখে) সেটা হচ্ছে এই যে আপনার নাম যা, তাই আকাশে দেখে আপনার মন খারাপ করার গল্প।

জ্যোৎস্না। (হেসে ফেলে) আমার প্রেমে-পড়ার গল্প বলছেন?

গৌতম। প্রেম ও বিবাহ—দুয়েরই বলছি।

জ্যোৎস্না। দেখুন, বরাবরই আমরা খেটে-খাওয়া বা

মেহনতী মানুষ, আমাদের আর প্রেমে পড়া বা চাঁদের আলো দেখার সময় কোথা বলুন। তাছাড়া (পিতার ফটোর দিকে চেয়ে) বাবার শাসন বড় কড়া ছিল, শুধু মানসিক ব্যাপারেই নয়, সাংসারিক ব্যাপারেও ছিল খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; তাই স্কুলের পড়া শেষ করতে না করতেই দিলেন আমার বিয়ে।

গৌতম। হ্যাঁ, কলেজে পড়তে গিয়ে কলিজায় না ঘা লাগান, তারই ব্যবস্থা করলেন আর কি। তারপর তাঁর কথা বলুন।

জ্যোৎস্না। কার কথা।

গৌতম। নায়ক যিনি, তাঁর কথা।

জ্যোৎস্না। তাঁর কথা বিশেষ বলবার নেই ; বিয়ের একবছরের মধ্যেই অর্থাৎ কলেজে আমার ফার্স্ট ইয়ারেই, কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

গৌতম। (সবিস্ময়ে) সে কি! কি অসুখে মারা পড়লেন ?

জ্যোৎস্না। মারা পড়েন নি। হাওয়া হয়ে গেলেন।

গৌতম। তার মানে ?

এমন সময় ভিতরে কি একটা ঝন ঝন করে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল ; সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের কলরব।

জ্যোৎস্না। (ব্যস্ত হয়ে উঠে) আসছি দাঁড়ান ; দেখে আসি কি হল। এসে বলছি।

ভিতরে গেল

গৌতম। (মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) আশ্চর্য্য !

বাইরের দিকের দরজার পর্দা ঠেলে সন্তর্পণে প্রবেশ করল রতনবাবু।

রতন। (ঈষৎ চাপা স্বরে) কিছুই আশ্চর্য্য নয় মশাই, সব বলছি আপনাকে।

গৌতম। (আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে) আপনি ? আপনি সব জানেন ?

রতন। ঘরের লোক, জানব না আবার ? বলেন কি আপনি ! বার করুন তো একটা দেখি।

গৌতম সিগারেট কেস এগিয়ে দিলে। একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে জোরে একটা টান দিলে।

বসি তাহলে মশাই ; ওঁর এখন ফিরতে দশমিনিট। ঠাকুর ঝির সঙ্গে গিন্নীর ঝগড়া এক মিনিটে মেটে না।

গৌতম। তারপর ?

রতন। তারপর মশাই, পূজনীয় পিতা বলতে তো অস্থির দেখছেন ; (আড়চোখে ফটোর দিকে তাকিয়ে) কিন্তু লোকটি অতি বিতিকিচ্ছিরি স্বভাবের ছিল মশাই, যেমনি খেঁকী, তেমনি হাড়কেপ্পন। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মা মারা যায় ; তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই বুড়ো পাশের গ্রামের একটা আই-এ ফেল ছেলেকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দেয়।

গৌতম। আই-এ ফেল ? আপনি চেনেন নাকি ?

রতন। চিনি না আবার! শুধু তাকে নয়, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বন্ধুবান্ধব, সবাইকেই চিনি।

গৌতম। ভদ্রলোক এখন কোথায় ?

রতন। ওই যে আপনাকে বলছিলেন না, হাওয়া হয়ে গেলেন। আসলে ওঁর বাপবুড়োই তাকে হাওয়া করালে। গরীবের ছেলে, বাবা মা নেই, মামার বাড়ীতে থেকে কাজ-কর্মের চেষ্টা করছিল ; নিজের ব্যবসায়ে বসাবে বলে আশা দিয়ে বিয়ে দিলে, আর বাড়ীতেও রাখলে। তারপর মাস কতক যেতে না যেতেই এমন গঞ্জনা সুরু করল মশাই, যে বলব কি দুঃখের কথা, ছেলেটা কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল।

গৌতম। তারপর ?

রতন। (সিগারেটে জোরে একটান দিয়ে) তারপর পুরুষ মানুষ তো সে, সটান হাজির হল গিয়ে বর্মায়।

গৌতম। বর্মায় ? বলেন কি !

রতন। আর বলি কি ! জোগাড়ও করলে একটা চাকরী, বছর কতক চুপচাপ কাটিয়ে দিলে।

গৌতম। তা ইনি একবার খোঁজ করলেন না, হাজার হোক স্বামী তো !

রতন। রেখে দেন স্বামী ! দরকার ছিল সিঁদুরে, স্বামীকে নয়, বুড়ো অমন বেহিসেবী কাজ করে না। তারপর ইনি আই এ. বি.এ. পাশ করলেন, মাষ্টারী করে রীতিমত দুপয়সা করতে লাগলেন মশাই ; সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি। স্বামীচিন্তা করবার সময় কোথা ! বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে মশাই, তা তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন।

গৌতম। তা বটে।

রতন। তারপর বছর আট কাটিয়ে কঠিন অসুখে

পড়ল ভদ্রলোক; আট মাস শয্যাশায়ী। চাকরী গেল। অসহায় হয়ে ফিরে এল, আত্মীয়স্বজন পরিচিত কেউ এতটুক সাহায্য করলে না, অবশেষে ক্ষুধার্ত নাচার হয়ে স্ত্রীর দ্বারস্থ হল। চিনতে পারলেও অভাগা দেখে উনি স্বীকার করতে চাইলেন না তাকে; এমন কি মাসিক যে কিছু অর্থসাহায্য করবেন, তাতেও রাজী হলেন না। কি করে চলে তার বলতে পারেন? বয়েস পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে, শরীর মন ভাঙ্গা, কি করে এখন সে বলুন দেখি।

গৌতম। (সমবেদনায়) সত্যি বড় দুঃখের কথা।

রতন। (গৌতমের কাছে এগিয়ে প্রায় তাঁর হাত ধরে) আপনি তো একজন অ্যাসেমব্লী মেম্বার, মহাশয় লোক, দয়া করে একটা চাকরী জুটিয়ে দেবেন আমাকে?

গৌতম। (বিস্ময়ে) আপনাকে?—চাকরী?

রতন। (রুদ্ধস্বরে) হ্যাঁ। বড় অভাবে পড়ে গেছি স্যার, ডেপুটী মিনিষ্টার চিত্রা বোসকে একটু বলবেন আমার হয়ে? যে কোন জায়গায় একটা চাকরী, শুধু কলকাতায় না। ঐ যে মিশরে যাবেন বলছিলেন, ওখানেও যেতে রাজী আছি আমি। জাপানে, আফ্রিকায়—যেখানে বলেন; শুধু কলকাতায় নয়,—চোখের সামনে আর পড়তে চাই না আমি।

মাথা নীচু করল

গৌতম। (ব্যথিত হয়ে) ওঁকেই একটু ধরুন না—আপনি ওঁর কি রকম আত্মীয় বলছিলেন যেন?

রতন। (মুখ তুলে) আত্মীয় বলছিলেন? বললেন না, বেকার অভাগা একটা, চাকরী চাইছে? জানেন, জীবন সুরু করেছিলুম এক মুদীর দোকানে, এখন শেষও করে আনছি আর এক মুদীর দোকানে; সেই দোকানে পড়ে থাকি আর তার খাতা লিখি, দুবেলা জোটে না। দয়া করবেন আমাকে একটু?

গৌতম। আপনি ওঁকেই বলুন, ভাল করে ধরুন।

রতন। ওঁকে বলে কিছু হবে না, ওঁর দুচক্ষের বিষ আমি।

গৌতম। কেন, আপনি কি করেছেন ওঁর?

রতন। সর্বনাশ করেছি, জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছি।

গৌতম। (বিস্মিত হয়ে) ওঁর জীবন নষ্ট করেছেন? কি করে?

রতন। (আবেগে গৌতমের দুহাত ধরে) ওঁর স্বামী হয়ে।

গৌতম। (যেন আকাশ থেকে পড়ে) ওঁর স্বামী আপনি?

রতন। হাঁ।

গৌতম। সর্বনাশ।

যবনিকা

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

সুস্নিগ্ধ সৌরভ তুমি গৌরাঙ্গের প্রেম-কোকনদে
বিশ্ববন্দ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রণতি জানাই তব পদে।
বৈষ্ণব কবির দল তব বল্লভের কত গান
শত ছন্দে গেয়ে গেল। তোমারে দিল না শুধু স্থান
তাহাদের কাব্য কুঞ্জে! গুঞ্জরিল বিরহ-ভ্রমর
গোপন গম্ভীরা-মাঝে; করি গেল তাহারে অমর
চৈতন্য-চরিতামৃতে খ্যাতিমান কবিরাজ কবি।
রাধিকার অশ্রু দিয়া আঁকিল সে গৌরাঙ্গের ছবি।

অপার-বিরহ-সিন্ধু-তটে বসি দূর নদীয়ায়
আমরণ কাঁদিল সে দেখিল না তারে শুধু হায়!
নবোদ্ভিন্ন যৌবনের আগমনে যার অকস্মাৎ
স্বপ্নে-গড়া প্রেম সৌধ একেবারে হল ধূলিসাৎ
এ জীবনে মিলাইল প্রিয় সঙ্গে মিলনের আশা
অকরুণ কবিকণ্ঠে তার লাগি জুটিল না ভাষা!
বৃন্দাবন-বিলাসিনী-রাধা-ভাব করি অঙ্গীকার
বিস্মৃত তবে কি হরি মহা প্রেম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার?

প্রেমের ভিখারী হয়ে তবে তার এ কি আচরণ?
এ রহস্য-যবনিকা কে করিয়া দিবে উন্মোচন?

অরণ্য-স্মৃতি

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ

১

ঠক্ ঠকাঠক চলেছে কাঠুরিয়াদের কুড়োল। শাল বন এখন নিস্তব্ধ নয়। এ জায়গায় শালবনের সে গাম্ভীর্য্য নেই। নেই তার সেই রহস্যপূর্ণ সম্মোহনী সৌন্দর্য্য। এমন কি সভ্য মানুষের অত্যাচারে সে হারিয়ে ফেলেছে তার রোমাঞ্চকর ভাব, যা' সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখলে গা ছমছমানি ভাবের উদয় হয়। মনে হয়—না জানি জীবজগতের কত রহস্য আছে গা ঢাকা দিয়ে ঐ আকাশচুম্বী শালবনের মধ্যে। এই সব না জানা রহস্য ছেলেবেলাকার সংস্কারের সঙ্গে মিশে একটা ভীতির ভাব জাগায় সহুরে লোকের মনে। আর পুলক আনে তা'দের, যারা বনকে ভালবাসতে শিখেছে। বনের সৌন্দর্য্য তখনই ফুটে যখন মানুষের সভ্যতা তাকে সত্যিকারের বন করে রাখে, তার মধ্যে যখন মানুষ অনধিকার প্রবেশ না করে। এমনি ধারা প্রকৃতির নিজস্ব যা', তা'কে বিকৃত করে চলেছে সভ্য মানুষের দল। শুধু আজ নয়, শতাব্দীকাল ধরে। বর্ত্তমান-কালের সভ্যতা মানুষকে করে তুলেছে একান্ত স্বার্থপর। তার আরামের জন্য সে প্রকৃতির বুকে ছুরি হানতেও ত্রুটি করে না। সহস্র যুগ আগে যখন মানুষ ছিল পর্ব্বত গুহাবাসী, যখন তারা খেত ফলমূল শাকপাতা তখন তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা ছিল কিনা জানি না, বোধহয় ছিল না, কিন্তু যখন তাদেরই একশ্রেণী প্রকৃতির উপাসনায় ব্যস্ত, তখন তাদের মধ্যের আর একদল নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সেই সৌন্দর্য্য নাশের চেষ্টায় ব্যস্ত হচ্ছে। অদ্ভুত আমরা—এই সভ্য মানুষ।

বনের মধ্যে চলেছে কাঠুরিয়া কুলিদের নিষ্ঠুর কুড়োল। ঠক্ ঠকা ঠক্—টিম্বার ডিপোতে নির্দ্ধারিত দিনে ঠিকা মত কাঠ পৌঁছিয়ে দিতেই হবে ঠিকাদারকে। তার কি বিশ্রাম আছে?

এই রকম ঠিকাদারদের কুলিদের কুড়োলে মুখরিত এক শাল জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে ছোট' ছবির মত একটী রেল ষ্টেশন। ষ্টেশনের আশেপাশে বসতির মধ্যে কেবল দু' একটি দোকানঘর, আর আদিবাসী কুলিদের লম্বা লম্বা চালা। অল্প দূরে একটা মদ চোলাই করার ভাঁটি আছে। সন্ধ্যার পর ওখানকার ঐ সব আদিবাসী কুলিরা মেয়ে পুরুষে মিলে মহুয়ার মদ খায়। ষ্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে 'ফরেষ্ট রেঞ্জার' সাহেবের কোয়াটার। প্রায় ততদূর পর্য্যন্ত এক মানুষ উঁচু পথের দুই পাশে শাল গাছের গুঁড়ি সাজান রয়েছে থাকে থাকে।

সন্ধ্যের মুখে আমাদের ট্রেণটী গিয়ে প্ল্যাটফর্মহীন ষ্টেশনে এসে লাগলো। আমাদের গন্তব্য 'পিণ্ড-ঝরিয়া'। এই পিণ্ড ঝরিয়া নামে যেমন কাব্যের আমেজ পাওয়া যায়, তেমনি ঐ নামের উৎপত্তির মধ্যেও এক প্রেমিক প্রেমিকার করুণ কাহিনী আছে।

প্রায় পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর আগে পিণ্ড নামে কর্ক জাতের বাইশ তেইশ বছরের এক যুবক গাঁয়ে বাস করত। তাদের অভাব ছিল না কিছুর। স্বল্প ক্ষেত খামারের জমি ছিল, আর গরুমহিষ করেছিল চল্লিশ বেয়াল্লিশটী। সেই হলেই সে যুগে ঐ রকমের বুনো গাঁয়ে রাজার হালে থাকতে পারা যেত। তার বাবা ছিল গাঁয়ের 'মোকদ্দম' অর্থাৎ মোড়ল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনতে হ'ত তাঁকে। বিচারকের সঙ্গে বসে গাঁয়ের অপরাধের বিচার করত সে। এদের সামাজিক বন্ধন কোন সভ্যজাতির সঙ্গে মেলে না। একেবারে লোহার বাঁধনে বাঁধা। একটু ত্রুটি হলেই কঠিন সাজা।

পিণ্ড ছিল তার বাবার একমাত্র ছেলে। মাঝে কিছুদিন সে দেশে ছিল না। নিজে রোজগার করবার জন্য সে বছর তিনেকের জন্যে এক চা বাগানে চলে গিয়েছিল। ফিরে দেখে তাঁর দুঃখে তার বাবা অন্ধপ্রায় হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে তার বাবা মারা গেল। তখন বাবার সব দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়ল। ছোট ছোট দু'টী বোনকে পুষতে হ'ত। যাই হ'ক, খাওয়া পরার অভাব হ'ল না তাদের।

কিছুদিন বাদে গাঁয়ের 'গোঁড়' জাতির কুলিরা এসে 'ডেরা' করলে। পাশের বন সরকার থেকে কাটান হ'বে। 'গোঁড়' কুলিরা স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে মিশে কাজ করে ও তা'রা যখন জঙ্গলে যায় কাজ করতে তখন নিজেদের সংসার সব সময়েই সঙ্গে রাখে। সেই গোঁড় কুলিদের মধ্যে একজনের ষোল, সতের বৎসরের একটা মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার ঝরি বা ঝরিয়া।

সে সময়ে বনের সেই অংশে সরকারী বন-সংরক্ষণ বিভাগ গরুর গাড়ী চলাচলের জন্যে পাকা রাস্তা তৈরী করছিলেন। ঝরিয়ার মা সেই রাস্তা তৈরীর কাজে থাকত, আর তার বাবা থাকত গাছ কাটার কাজে। ঝরিয়া প্রায় সব সময়েই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত গান গেয়ে গেয়ে। অবশ্য মাঝে মাঝে তার মায়ের কাজেও সাহায্য করত। পিণ্ডর ছিল এক বাঁশের বাঁশী। সে অবসর কাটাত বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে। সকাল হ'লেই গরু মহিষগুলিকে চরতে দিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের উপর বসে বাঁশী বাজাত প্রায় সারাটা দিন।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়— একদিন দেখা গেল পিণ্ডর সঙ্গে ঝরিয়ার বেশ ভাব হয়েছে। এই ভাব ক্রমে ভালবাসায় দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের এই মিলনের মধ্যে যে বাধা ছিল না তা নয়। ঝরিয়ারা ছিল গোঁড় জাতির। তারা কর্কদের হীন পর্য্যায়ের মনে করে। তাই এই মিলনের মধ্যে ঝরিয়ার মায়ের ও বাবার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাই তাদের মিলন হ'ত গোপনে। পিণ্ডর বাড়ীতে ঝরিয়াকে বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না।

সকালের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঝরিয়ার মা ও বাবা দুপুরবেলা অনেকক্ষণ দিবানিদ্রা দিত। ঐ সময়টায় ছিল ঝরিয়ার একমাত্র পিছুর সঙ্গে দেখা করার সময়। পিছু করত কি; জঙ্গলে ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গায় পাহাড়ী পাথরে বসে বাঁশী বাজাত। বাঁশীর শব্দ শুনলেই ঝরিয়া সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। দিন যায় দু'জনের কত কি মধুর আলাপ হয়। ভবিষ্যতের কত রঙিন ছবি তারা আঁকে দু'জনে। কিন্তু বিধি বাম যদি হয় মানুষে কি করতে পারে।

সেই জঙ্গলে কিছুদিন ধরে এক মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব সুরু হ'ল। দিনের পর দিন যায়, একের পর এক গ্রামবাসীরা বাঘের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হ'ল। বহু লোক বাঘের পেটে গেল। বহু শিকারী সাহেব দিবারাত্রি চেষ্টা করতে ত্রুটি করলেন না। কিন্তু দু'তিন বছর সেই বাঘ সমানে মানুষ খেয়ে চলল!

এরই মধ্যে একদিনের ঘটনা। দুপুরবেলা ঝরিয়া রান্না-বান্না করে মা ও বাবাকে খাইয়ে তারা যখন শুয়ে পড়ল, তখন ঝরিয়া কান খাড়া ক'রে বাঁশীর রব শুনবার আশায় কুলিচালার অদূরে মাঠের মাঝে অপেক্ষা করছিল। ঠিক সময়েই বাঁশীর শব্দ তার কানে এসে বাজল। সেও আপন প্রিয়ের সঙ্গে মিলবার জন্যে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি বনের দিকে চলল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবার যখন অল্প দূর আছে হঠাৎ বাঁশী থেমে গেল। তারপর সে পিছুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। পিছু বললে "আঃ কর কি, পেছনে টান কেন?" ঝরিয়া অবাক হল। পিছু কার সঙ্গে কথা কইছে। সে কিছু বুঝে উঠতে পারলে না। ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেখলে পিছু সেথায় নেই। খানিক এদিক ওদিক দেখলে। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগল। উত্তর নেই। আবার ডাকলে। বন নিঝুম, কোন সাড়া পেলে না। ঝরিয়া পাগলের মত কুঁড়েতে ফিরে এল। সমবয়সের দু'একটী সখিকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললে, তারা সবাই ঝরিয়ার সঙ্গে বনে দেখতে গেল—পিছু গেল কোথায়? সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই খাল করে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলে মাটিতে একটা কিছু ভারি জিনিষ ঘসটিয়ে নিয়ে যাবার দাগ পড়ে রয়েছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না কারও যে পিছু মানুষখেকোর মুখে প্রাণ দিয়েছে। তারা অনেক দূর সেই ঘস্‌টান দাগ দেখে দেখে বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলো। শেষে এক স্থানে পিছুর রক্তমাখা কাপড় পড়ে থাকতে দেখলে তারা। ঝরিয়া ঐ পর্য্যন্ত সখিদের সঙ্গেই ছিল, এখন সে হঠাৎ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বনের মধ্যে পাগলের মত পিছুকে ডাকতে ডাকতে কোথায় অদৃশ্য হ'ল। অন্যেরা আর তার পিছনে যেতে সাহস পেলে না। কাছেই কোথাও মানুষখেকো রয়েছে ওৎপেতে। তারা সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝরিয়াকে ডাকতে লাগল। যখন ঝরিয়া ফিরল না তখন তারাই ফিরে এল। সেই থেকে ঝরিয়াও আর ফেরে নি। শোনা যায়, গভীর রাতে এখনও মাঝে মধ্যে নাকি সেইখানে অশরীরী ঝরিয়ার কান্না, আর শোনা যায় পিছুর নাম ধরে তার সেই মর্ম্মন্তুদ ডাক। যাক, এসব অশরীরী আলোচনা আমাদের নয়।

* * * *

রেল ষ্টেশন থেকে এই পিছু-ঝরিয়া প্রায় দশ মাইল। ষ্টেশন থেকে গন্তব্য স্থানে পঁহুছবার একমাত্র উপায় ঠিকাদারদের ট্রাকে করে অথবা গো-শকটে। আমাদের উদ্দেশ্য ঐ পিছু-ঝরিয়ার আশে পাশে শিকার করা। বাঘের উৎপাত সে স্থানে যথেষ্ট আছে, তাই আমাদের আরও সেথায় যাবার জন্য প্রলুব্ধ করছিল।

যখন ষ্টেশনে ট্রেন পঁহুছাল তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য্য ঢলে পড়লেও অস্ত যান নি। বনের মধ্যে কুলিদের একঘেয়ে কুড়োলের শব্দ ঠক্ ঠকাঠক্ শুনা যাচ্ছে, আর দু'পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর প্রকাণ্ড এক একটী শাল গাছ কান ঝালাপালা করা মড়্ মড়্ শব্দে ধরাশায়ী হচ্ছে। ঐ সব গাছ যদি কথা কইতে পারত তবে কতদিনের ইতিহাস মানুষ তাদের কাছ থেকেই শুনত। এক একটী প্রায় তিনশ' চারশ' বছরের পুরান।

ষ্টেশনে পঁহুছেই আমাদের কোন যান পাওয়া সম্ভব হ'ল না। নিজেদের গাড়ী ও পথে খারাপ হ'য়ে যাওয়াতে এই বিপদ। চালককে কল ঠিক করে পরে একেবারে পিছু-ঝরিয়ার বাংলোয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হ'য়েছে। ট্রেণ থেকে আমরা সাতজন ষ্টেশনে নামলাম। আমরা ছাড়া এই ছোট ষ্টেশনটীতে মাত্র দু'টী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নামল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় একটী মারাঠী ভদ্রলোক। আমাদের পরদেশী দেখে যথেষ্ট ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখালেন। নিজের আপিস ঘরটীতে আমাদের বসতে বলে বললেন, তিনি আমাদের গন্তব্য স্থানে পাঠাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা সেই চিন্তা করছেন। এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্প একটু বাদেই ফিরে এসে সংবাদ দিলেন সেইদিন আমাদের আর যাওয়া সম্ভব হবে না, তবে শেষ রাতে প্রায় সাড়ে চারটের সময় একটা ট্রাক খালি যাবে, সেই ট্রাকে ইচ্ছা করলে আমরা যেতে পারি। তথাস্তু বলে আমরা প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করতে লাগলাম।

সন্ধ্যের দিকে শীত বাড়তে লাগল। তখন ডিসেম্বর মাস। জঙ্গলের মধ্যে কুলিদের কুড়োলের শব্দ বন্ধ হল এবং সেই ঠক্ ঠকাঠক্ শব্দের পরিবর্ত্তে কুলিদের কুঁড়েতে ফিরতে ফিরতে মেয়েদের ও পুরুষের একসঙ্গে গান শুনা যেতে লাগলো। সূর্য্যের অস্ত যাওয়ার পরে তা'ও থেমে গেল। আশে পাশে সব নিশ্চুপ নিঝুম, কেবল একটা শান্টিং ইঞ্জিন কতকগুলো শাল কাঠের গুঁড়ি বোঝাই মালগাড়ীতে হুস্ হুস্ করে ঠেলাঠেলি করছে তাই শুনতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর রাতের মধ্যে অনেক দুঃখ কপালে আছে, যদি না ভাল আশ্রয় পাই। ষ্টেশনটীতে যাত্রীদের কোন বিশ্রামাগার নেই বলাই বাহুল্য। ছোট ষ্টেসনের যাত্রী বা কত? সেদিন জ্যোৎস্না প্রথম রাত্রি থেকেই ছিল। দিনের আলো নিবতে নিবতে চাঁদের মৃদু আলো ছায়া প্ল্যাটফর্মের গাছগুলির এবং অন্য যেখানে যা' কিছু ছিল তার উপর পড়েছে, এমন সময় ষ্টেশনের লৌহ ফটক পার হ'য়ে এক পশ্চিমা ভদ্রলোক আমাদের দিকেই আসতে লাগলেন। এরই মধ্যে গায়ে গরম কাপড় চোপড় অনেক চড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। তাতেও হাড়ে কাঁপুনি লাগছে। ক্রমে ভদ্রলোকটী আমাদের কাছে এসে

আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি সেখানে মুদির দোকান করেন ও স্থানীয় মদের ভাঁটিটাও তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন আমরা শিকারীর দল কিনা, পথে আটকে পড়ায় অনেক অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই ইত্যাদি। তিনি সেই সময় আমাদের তাঁর দোকানে চা ও জলযোগের জন্য সাথে নিয়ে চল্লেন। ষ্টেশনের পাশেই তাঁর ছোট দোকান ঘর ও তার ভিতরে একটী কুঠরী আছে সেখানে ফরাস বিছিয়ে তার উপর আমাদের চা ও তার সঙ্গে কিছু ভাজাভুজি ও পুরী, বেশ গরম গরম্ পরিবেশন করলেন। অবশ্য চোখের পলকে তার সদ্ব্যবহার হয়ে গেল। সারাদিন ট্রেণে ঝাঁকি খেতে খেতে আসা হয়েছে, এছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার সুবিধা হয়নি।

সেই কুঠরীটা এতই ছোট যে সেখানে আমাদের সকলকে শুয়ে রাত কাটাবার স্থান হবে না বুঝে শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে কি ভাবে এবং কোথায় থাকার সুবিধা হবে। তিনি ষ্টেশনে মালপত্র রাখবার জন্যে একটী টিনের 'সেড্' ছিল তারই খানিকটা পর্দ্দা দিয়ে ঘিরে দেবেন বললেন। অগত্যা তাই করা হ'ল। বাইরের চেয়ে ঐ 'সেডের' মধ্যে শীত কোনও অংশে কম বলে ত মনে হল না। বাইরে জ্যোৎস্নায় জঙ্গল ও পাহাড়ের দৃশ্য কি চমৎকারই না দেখাচ্ছিল। শেষে স্থির করা হ'ল ঐ সেডের ভিতর অপেক্ষা উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে খব করে ধুনি জ্বালাবার মত আগুন জ্বালিয়ে আশে পাশে শুয়ে রাত্রে কাটান যাবে। বুনো দেশে শুকনো কাঠের অভাব নেই। আমাদের দু'জন চাকর গিয়ে সারারাত জ্বালাবার পক্ষে যথেষ্ট হ'বে সেইমত শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনলে। আমরা সবাই খুব আগুন জ্বালিয়ে তার আশে পাশে বসে গা গরম করতে লাগলাম।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান আরও নিশ্চুপ হয়ে গেল। রেল লাইনের ওপারের জঙ্গল থেকে দু'একটী বন্য নিশাচর পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। একবার একটু দূর থেকে "ঢ্যাঙ্ক" "ঢ্যাঙ্ক" বার দুই তিন একটা সাম্বর হরিণের ডাকও শুনতে পেলাম। ওরা সাধারণতঃ বাঘ কি চিতাবাঘ দেখে ভয় পেলে ঐ রকম ডাকে। এছাড়া সেই সান্টিং ইঞ্জিনটার একঘেয়ে 'শোঁ' 'শোঁ' শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ওটা এখন আর চলাচলি করছে না, সাইডিংএর এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটানা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছে।

রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ চাঁদের আলোয় দেখলাম একটী লোক কালো ওভারকোটে ও কাল্‌চে রঙের একটা আলোয়ানে দেহটাকে যতটা সম্ভব আবৃত করে লোহার ফটক পার হয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। তার হাতে কি যেন একটা লম্বা মত জিনিষ ঝুলতে দেখলাম। আমাদের দিকেই আসছে। কাছে আসতে চিনতে পারলাম সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকই বটে। হাতে করে একটা টিফিন কেরিয়ারে আরও কিছু পুরী আর ভাজি নিয়ে এসেছেন। আমরা তার অল্পপূর্ব্বেই পেট পুরে পুরী আর ভাজির সদ্ব্যবহার করে এসেছিলাম। এখন আবার এই শীতের রাতে কষ্ট করে ওসব তাঁর না নিয়ে এলেও চলত! কিন্তু কি আর বলি, অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেগুলি গ্রহণ করা হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কিছু মুখেও দিলাম সবাই। খাওয়ার পর্ব্ব মিটতেই উনি আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বলে গেলেন, শেষ রাতে ট্রাক ছাড়বার পূর্ব্বে এসে আমাদের জাগিয়ে তুলবেন।

আমরা আমাদের চারদিকে চারটী বড় বড় ধুনি জ্বেলেছিলাম। সেই জায়গাটা তাই বেশ একটু গরমও হয়েছিল। মাঝে হোল্ড অল্ খুলে বিছানা বিছান গেল সকলের। শুয়েছি আপাদ মস্তক ঢেকে, আর অমনি চোখ যেন বুজে এল ঘুমে। একটা মালগাড়ী ষ্টেশনে না থেমে গুড়মুড় করে চলে গেল। এ ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের বিরক্ত করে নি। আগুন জ্বালার চট্‌পট্ শব্দ, আর দূরে সেই ইঞ্জিনটার একটানা শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম কিছু বুঝতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে যাঁদের ঘুমোতে দেরী হয়েছিল তারা বললে রাতে নাকি আরও একবার সাম্বর হরিণের ডাক শুনেছে। আর একবার একটা শেয়ালের ভয় পাওয়া সেই "ফেউ" "ফেউ" চীৎকারও নাকি তারা শুনেছে। এই দু'টো ডাকের সঙ্গেই বাঘের সংস্রব রয়েছে এই রকম প্রবাদ। অবশ্য সাম্বর হরিণের ডাকের সঙ্গে বাঘ বা চিতাবাঘের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে সেটা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু শেয়ালের এই "ফেউ" "ফেউ" ডাক ওরা যে কোন কারণে ভয় পেলেই ডাকে। সে ভয় পাবার কারণ বাঘ বা চিতাবাঘ হ'তেও পারে, আবার অন্য কোন কারণও হ'তে পারে।

জানিনে তখন ঘড়িতে কটা বেজেছে। ভীষণ শীত। আগুনও প্রায় নিবে এসেছে। হঠাৎ একজনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। দেখলাম আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটী ডাকছেন আমাদের। তিনি বললেন—ভোর হতে চলেছে, প্রায় সাড়ে চারটে বাজে, ট্রাকও ছাড়বার জন্যে তৈরী, শীঘ্র বেরিয়ে পড়তে হ'বে। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে জিনিষপত্র গোছগাছ করে ষ্টেশনের বাইরে এসে কুলির খোঁজ করা গেল। এ ষ্টেশনে দু' তিনটীর বেশী কুলি নেই; তারাও আবার ট্রেণের সময় মত ষ্টেশনে আসে। সব সময় তাদের থাকবার দরকার করে না। সঙ্গে কিছু লটবহর ছিল তাই সেগুলোর গতি কি হ'বে চিন্তা করছিলাম। এতেও সাহায্য পেলাম সেই পশ্চিমা বন্ধুটীর কাছ থেকে। তিনি তাঁর দোকান থেকে একটী লোক পাঠিয়ে দিলেন দু' তিনজন গাছ-কাটা কুলিদের ধরে আনবার জন্যে। সে প্রায় মিনিট পনের পরে তিনজনকে নিয়ে ফিরে এল। এদিকে ট্রাক ছাড়বে 'হর্ণ' দিচ্ছে। কুলিরা প্রত্যেকে দশ আনা করে নিলে ও জিনিষপত্র ট্রাকে তুলে দিলে।

তখন চাঁদ অস্ত গেছে, আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। শীতে হাড়ে শুদ্ধ কাপুনি লাগাচ্ছে। আমরা মুড়ি সুড়ি দিয়ে ট্রাকের মধ্যে বসলাম। ট্রাকও কান ঝালাপালা করা একঘেয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে ছুটে চলেছে। পথের দু'দিকে কেবল শাল বন। অস্পষ্ট আলোতে তা'ও ভাল করে বোঝা যায় না। এক স্থানে সামনে একটা নদী পড়ল। নদী অর্থাৎ সারাটাই বালি, মাঝে মাঝে কেবল পাঁচ সাত গজ চওড়া জলের স্রোত ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর প্রস্থ প্রায় দু'শ গজ হবে।

ধ্রুপদ

খাম্বাজ—তেওরা

তেরো অন্ত কোঈ ন পাওএ
যোগী ঋষি মুনি জন
নিতহি নিরজন বৈয়ঠে ধ্যান লগাওএ।
বেদ বিধান তু আ গুণ গান
প্রগট কীয়ো সব শকতি-মান
ধন ধন তুঁহি অলস নিরঞ্জন
তুমসে সব দুখ জাওএ॥
কোঈ কহত তুঁহি নর রূপ ধর
গোলক সে আয়ে ধরণী পর
তুঁহি অবতার হয়ে সবকো আচরজ দেখওএ,
গোপেশ চাহত তেরো শরণ
ক্যায়সে পাওএ তো জগজীবন
কৃপা কীজে অব তাকো বতাওএ॥

গীত-সম্রাট ডাঃ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—রচিত ঃ স্বরলিপি—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
গা মা | পা ধা | র্সা -া ণা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা | গা মা |
তে ০ রো ০ অ - ন্ত কো ০ ঈ ন পা০ ও এ যো গী

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ধা পা | মা গা রা | সা -া | -া -া | সা সা গা | সা গা | মা পা |
ঋ ষি মু নি জ ন - - - নি ত হি নি র জ ন

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
ধণা মা পা | র্সা না | র্রা র্সা | ণা -া ধা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা :॥
বৈ০ য় ঠে ধ্যা ০ ন ল গা ও এ কো ০ ঈ ন পা০ ও এ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
{গা মা মা | ণা ধা | পা ধা | না না র্সা | না র্সা | -া র্সা | পা র্সা না |
বে ০ দ বি ধা ০ ন তু আ গু ণ গা - ন প্র গ ট

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
র্সা না | র্সা র্রা | র্সা না র্সা | ণা -া | ধা -া} | ধা ণা ধা | পা মা | গা গা |
কী য়ো স ব শ ক তি মা - ন - ধ ন ধ ন তুঁ হি অ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
গা মা ধা | না র্সা | র্সা র্সা | পা র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা | র্সণা -া ধা |
ল খ নি র ং গু ন তু ম সে স ব দু খ জা ও এ

২ ৩ ১´
ধা মা | পা ধা | পমা মা গা ||
কো ং ঈ ন পাং ও এ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১
{পা র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা | র্সা র্সা ধা | র্সা ণা | ধা ধা | গা মা পা |
কো ঈ ক হ ত তুঁ হি ন র ক্ল ং প ধ র গো ল ক

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
ধা পা | র্সা ণা | ধা ধা পা | গা পা | মা গা } | সা সা -া | মা মা |
সে আ ং য়ে ধ র ণী ং ং প র তুঁ হি - অ ব

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
গা মা | ণা পা ধা | না -া | র্সা -া | পা র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা |
তা ং র ং ং হো - য়ে - স ব কো অ চ র জ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
র্সা ণা র্সা | ণা -া | ধা -া | {গা মা মা | ণা ধা | পা ধা | না র্সা না |
দে খা ং ও - এ - গো পে শ চা ং হ ত তে ং রো

২ ৩ ১´ ১ ৩ ১´ ২
র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্মা র্গা | র্রা -া | র্সা -া | র্সা না র্সা | ণা -া |
চ ব ণ - ক্যা য় সে পা - ও এ হো জ গ জী -

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ধা ধা } | ধা ণা ধা | পা মা | গা গা | মা ধা পা | ধা ণা | র্রা র্সা |
ব ন ক্ষ পা কী ং জে অ ব তা ং ং কো ং ং ব

১´ ২ ৩ ১´
ণা -া ধা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা ||
তা ও এ কো ং ঈ ন পাং ও এ

একটু সিঁদুর

শ্রীসত্যেন সিংহ

কাল বাপের বাড়ী এসেছে নির্ম্মলা ওর তিন বছরের ছেলে আলোককে নিয়ে। আজ পাড়ায় পুরনো সইদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পরিপাটি করে চুল বেঁধে আয়নার সামনে সিঁদুর পরতে যাচ্ছিল। মাথার কাপড়টা টেনে রূপোর সিঁদুর কৌটাটা খুলে আঙ্গুলের ডগায় একটু সিঁদুর তুলেছে সে, এমন সময় —

এমন সময় কি ?

কেন জানি ওর সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো, সেই কাঁপুনিতে আঙ্গুলের সিঁদুরটুকু মাটির নিকানো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো। ওর বুকটা ধড়াস করে উঠলো—কেন এমন হোল ? স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ? দ্বিতীয় বার সিঁদুর তোলবার কথা ভুলে সে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত আয়নাটার দিকে চেয়ে রইল—আর চেয়ে রইল ওর সাদা সিঁথিটার দিকে। সত্যই সিঁথিটা একেবারে সাদা, লাল সিঁদুরের একটুও আভাষ নেই তাতে। আজ খুব ভাল করে মাথা ঘষেছিল নির্ম্মলা। কালো মসৃণ চুলের ফাঁকে ফাঁকে মাথাটা একেবারে ধব্‌ধব্‌ কচ্ছে, আর সিঁদুরের তেজে ক্ষয় পেয়ে পেয়ে সিঁথিটাও বেশ প্রশস্ত। ওর দিদি বিমলার সিঁথিটা এমনি সাদা—ওমা! সিঁদুর না থাকায় কেমন উদাস আর রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। মুখের সমস্ত টল্‌টলে কমনীয়তাটুকু এক মুহূর্ত্তে কোথায় উবে গেছে। বিমলা আজ চার বছর বিধবা হয়েছে। চার বছর হোল বিয়ে হয়েছে নির্ম্মলার। তার তো সবে বাইশ বছর বয়স, সে তো পূর্ণ যুবতী। তার কথা ছেড়ে দিলেও ওর বুড়ি মাকে সিঁদুর পরেন বলে ছাব্বিশ বছরের দিদি বিমলার চেয়েও সুন্দর দেখায়—কেমন জম্‌জমাট মনে হয়।

ভর দুপুরবেলা। বাড়ীর মধ্যে একেবারে চুপচাপ। মায়ের সঙ্গে আলোক ঘুমুচ্ছে, দিদি গিয়েছে অহল্যাদের বাড়ী। হঠাৎ নির্ম্মলার মনে পড়ল সিঁদুর না পরে বসে বসে এমন করে ভাবা হয়তো অলুক্ষণে ব্যাপার—তাছাড়া কেনই বা ওর হাত থেকে এমন করে সিঁদুর পড়ে গেল ? সিঁদুর হাতে তুলেই ক্ষণিকের জন্য ও যেন দেখল ওর মুখের পাশে স্বামী অজয়ের মুখখানি ভেসে উঠেছে। কেমন ম্লান আর আর্ত্তবেদনায় ভরা সে মুখ। অথচ তার স্বামীর মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি।

যত সব দুর্ব্বলতা। একদিন স্বামীর কাছ ছাড়া হয়েই অন্তরে কাতর হয়ে পড়েছে। বকুল ফুল, গঙ্গাজল শুনলে কি বলবে তাকে—এমনিতেই যা চিঠিতে লেখে। বিয়ের পর চার বছর স্বামীর কাছ ছাড়া হয়নি—সেই কেবল অষ্টমঙ্গলার দিন এসেছিল তাও জোড়ে। সে সময় মা, দিদি অন্ততঃ একমাস থাকবার জন্যও বলেছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে নিজে কিছু মুখ ফুটে বলতে না পেরে নির্ম্মলাকে দিয়েই নির্লজ্জার মত বললেন—দূর দেশে চাকুরি নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে অনেক অসুবিধা আর হুট্ করে ছুটিও পাওয়া যাবে না যে এসে নিয়ে যাবেন। মাকে অবশ্য নির্ম্মলা সে কথা বলতে পারেনি—দিদি বিমলাকেই বলেছিল। এবার মা বার বার জোর করে লিখলেন—কোনদিন হুট্ করে মরে যাব, নির্ম্মলাকে আর দেখতেও পাব না—তাছাড়া নাতী হয়েছে—আমার প্রথম নাতী, তিন বছরের হোল ; আমি কত সাধ করে বসে আছি তাকে দেখব বলে। বাবা পর্য্যন্ত লিখলেন—জামাইকে বলে একবার চলে আয় মা, তোর মা কান্নাকাটি সুরু করেছেন আজকাল। বিমলা দিদি তো কটু কথাই লিখে বসলো—হতভাগী স্বামী যেন আর কারুর হয় না। তবু কি আসা হোত—না ঐ অসহায় মানুষটিকে ছেড়ে তারই আসতে ইচ্ছে করতো—শেষে বাবা একদিন নিজেই গিয়ে হাজির হলেন। অজয় নিজে ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। চোখ দুটি তাঁর ছলছল কচ্ছিল। বার

থার নির্ম্মলার মুখের দিকে চাইছিলেন আর আলোককে বুকে তুলে চুমু খাচ্ছিলেন। ঠিক গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলার মনে হয়েছিল অজয়কে একা এই দূর দেশে ফেলে সে পালিয়ে যাচ্ছে। কেমন উদাস আর অসহায়ভাবে তখনো গাড়ীর জানালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। শাড়ীর আঁচলে নিজের ভিজে ভিজে চোখ দুটো মুছে ফেলছিল সে, আর যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় জানালায় ঝুঁকে পড়ে তাঁর মূর্তিটা দেখবার চেষ্টা কচ্ছিল। ধীরে ধীরে সব অস্পষ্ট হয়ে গেল—গাড়ীটা বাঁক ফিরে দুপাশে গাছপালার মধ্যে ডুবে গেল। বিদায় মুহূর্তের সেই ম্লান আর আর্ত্ত-বেদনায়-ভরা মুখটাই যেন এক্ষুণি আর্শিতে উঁকি মেরে তার প্রসাধনে বাধা দিল।

আবার আর্শির দিকে চেয়ে দেখলো। বসে বসে সে কেবলি ভাবছে সিঁদুর পরা হয়নি—সিঁথিটা তেমনি সাদা। চোখের কোন বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। কোথায় তাড়াতাড়ি সিঁদুরটা পরে কাপড় বদলিয়ে পাড়ায় বেরুবো, তা না স্বামীর বিরহে কাঁদতে বসেছে। আপন মনেই মুখ টিপে একটু হাসলো সে। মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—অজয় শুনিয়েছিলেন—কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা। কিন্তু উঠে পড়বো বললেই তো উঠে পড়া যায় না—চিন্তার কেমন একটা মোহ আছে, বিশেষ করে অসংলগ্ন চিন্তার এবং তাতে যদি আবার প্রিয়জনের আমেজ মেশানো থাকে। বিয়ের আগে তার সিঁথিটা এমনি সাদা ছিল, তবে তখন সিঁথিটা ছিল সরু আর উজ্জ্বল। নূতন কচি কালো ধানের শিষের মাঝখানের বৃন্তটির মত। বিয়ের রাত্রে সেই উজ্জ্বল কচি সিঁথিতে তিনি তাঁর লম্বা সরু আঙুলের ডগা দিয়ে প্রথম সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুলটি বুঝি কাঁপছিল। সেই কম্পিত আঙুলের স্পর্শে পায়ের নখ থেকে তার মাথার প্রতিটি চুলে একটা শিহরণ বয়ে গেল! সেই হিল্লোলে চোখ দুটি তার বুজে এসেছিল—সবাই ভাবছিল লজ্জায়। বিয়ের মণ্ডপ থেকে উঠেই সে গোপনে আয়না নিয়ে দেখতে গিয়েছিল প্রথম সিঁদুর তাকে কেমন মানিয়েছে। বকুল ফুল তার পিছু ছাড়েনি—আড়াল থেকে দেখে বলে উঠেছিল—ওলো অত লুকিয়ে দেখতে হবে না, চমৎকার মানিয়েছে তোকে, ঠিক যেন মেঘলা কালো আকাশের গায়ে প্রথম সূর্য্যোদয়। হঠাৎ ধরা পড়ে সে চমকে উঠেছিল—হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল আর্শিটা ঝন্‌ঝন্ করে। শব্দ শুনে মা ছুটে এসেছিলেন, বলেছিলেন—আয়নাটা ভাঙলি এই শুভ দিনে—যত সব অলুক্ষণে ব্যাপার করিস মা তোরা। এত রাতে আয়না নিয়ে ও কি কচ্ছিল রে হেমলতা? বকুল ফুলকে মা প্রশ্ন করেছিলেন। হাসতে হাসতে বকুল ফুল, ফাজিল আর দুষ্টু বকুল ফুল, বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দিয়েছিল—নূতন সিঁদুর পরে কেমন মানিয়েছে নির্ম্মলা তাই দেখছিল মাসীমা। হাসবারই কথা, কিন্তু মা গালে হাত রেখে ভয় আর বিস্ময় মিশিয়ে তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—বিয়ের রাতেই নিজের সৌভাগ্যকে কি অমনি করে খুঁড়তে আছে হতভাগী!

নিজের সৌভাগ্যকে নাকি নিজে চেয়ে দেখতে নেই, লোকে বলে উবে যায়। যত সব কুসংস্কার! নড়ে চড়ে পা দুটো মেলে বসলো নির্ম্মলা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে বৈকালের মিঠে রোদ এসে লুটিয়ে পড়লো ওর ধবধবে সাদা পায়ের পাতায়। এখনো আলতা পরা হয়নি। কেমন সাদা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে পা দুটো। মাথা ঘষবার সময় পাও ঘষেছে সে আজ ঝামা পাথর দিয়ে। পায়ের দিকে চাইতে চাইতে চোখে ভেসে উঠলো কাপড়ের অতি সরু কালো পাড়টা। একি? তার পরণে ধুতি! নিজের ভয়ে নিজেই হেসে ফেললো। চুল বাঁধবার আগে তেল লাগবে বলে আলনায় রাখা বাবার ময়লা ধুতিটা পরেছে সে—ওখানে যেমন অজয়ের ধুতিগুলোকে এইভাবে ময়লা করে দেওয়ায় অজয় একদিন রেগে তার একটা ভাল কোঁচানো শাড়ী পরে তেল মাখতে বসেছিল। সেই কথা মনে করে হাসির ঢেউ খেলে গেল তার মুখে চোখে।

না না বসে হাসলে চলবে না, সিঁদুরটা তাড়াতাড়ি পরে ফেলতে হবে। এখনো আলতা পরা, গামোছা, কাপড় পরা সব বাকি। বেশী দেরী হলে বকুলফুলরা রাগ করবে। পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে চিরুণি দিয়ে সিঁথিটা ঠিক করতে গেল আয়নার দিকে চেয়ে। অমনি দেখল তার দিদি বিমলার মুখ আয়নায়। কখন সে দোরের চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। নির্ম্মলা ভাবলো দিদি বিমলা তার সিঁদুর পরা দেখতে এসেছে। নিজে বিধবা তাই ছোট বোনের সিঁদুর

বা দেখে ওর চোখ বুঝি টাটিয়ে যাচ্ছে। দোরের দিকে নির্ম্মলা ফিরেও চাইল না, সে যেন বিমলাকে দেখতেই পায় নি এমনি ভাবে ঠিক করলো ও যখন দেখতে এসেছে তখন ওকে দেখিয়ে দেখিয়েই সিঁদুরটা সে পরবে। কিন্তু একি? ওর দিদির সিঁথিটা লাল কেন, ডগ্‌মগে সিঁদুরে যেন ঢাকা। যত সব অনাছিষ্টি! ওর দিদির সিঁথিটা লাল, আর তার নিজের সিঁথিটা সাদা? এ কখনও হতে পারে। অনেকক্ষণ বসে বসে ভেবে মাথা তার গুলিয়ে গেছে। না আর দেরী নয়। মাথার কাপড়টা দেওয়াই ছিল, রূপোর কৌটটা খুলে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি খানিকটা সিঁদুর তুলেছে, এমন সময়—

এমন সময় কি?

তার দিদি বিমলা চীৎকার করে উঠলো—ওমা! দেখে যাও, নির্ম্মলা আবার আমার সিঁদুর কৌটা নিয়ে সেই পাগলামী সুরু করেছে।

সিঁদুর কৌটাটা ঝন্‌ঝন্ করে নির্ম্মলার হাত থেকে পড়ে গেল—সমস্ত সিঁদুরে মেঝের অনেকখানি লাল হয়ে উঠলো। নির্ম্মলার মাথাটা ঘুরতে লাগলো—দিদির সিঁদুর কৌটা! তার পাগলামী! আজ দুপুরের নীরব নিস্তব্ধতায় ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিল সে?

বেশী দূরে নয়। মাত্র চার বছর আগে সে ফিরে গিয়েছিল।

চার বছর আগে বাপের বাড়ী এসেছিল নির্ম্মলা তার তিন বছরের ছেলে আলোককে নিয়ে। পরের দিন পুরনো সইদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পরিপাটি করে চুল বেঁধে আয়নার সামনে সিঁদুর পরতে যাচ্ছিল। মাথার কাপড়টা টেনে রূপোর সিঁদুর কৌটাটা খুলে আঙ্গুলের ডগায় একটু সিঁদুর তুলেছে সে এমন সময়—

এমন সময় কি?

তার দিদি বিমলা চীৎকার করে ঘরের মধ্যে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। হাতে ছিল খোলা টেলিগ্রামটা —এদের চাপিয়ে ষ্টেশন থেকে ফিরবার পথেই অজয় একটা লরী চাপা পড়ে—।

চার বছর!

অনেক দিন!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত নির্ম্মলা ওর দিদির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মা, দিদি, ছেলে আলোক সবাই কেমন ভয়ে আর বিস্ময়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে ওরা বিশেষ করে নির্ম্মলার আঙ্গুলের ডগায় ওই একটু সিঁদুরের দিকে।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে নির্ম্মলা। ওদের ঐ অদ্ভুত চাউনি সে আর সহ্য করতে পারলো না। একটু হেসে বিমলাকে বোলল—রাগ করো না দিদি, ভুল হয়ে গিয়েছিল। এসো হাতের এই সিঁদুরটুকু তোমার সিঁথিতে পরিয়ে দি।

ডক্টর ৺গিরীন্দ্রশেখর বসু

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আজ বঙ্গদেশের বড়ই দুর্দিন। দিকে দিকে যত দিক্‌পাল ছিলেন, সকলে একে একে যবনিকার অন্তরালে হচ্ছেন অন্তর্হিত, অথচ তাঁদের স্থান-পূরণের কঠিন সমস্যা পূরণের ভার দেশজননীর স্কন্ধেই ন্যস্ত করে যাচ্ছেন—সে ভারে জননী হচ্ছেন মুহ্যমানা। দেশ হলো স্বাধীন; এ সময়ে যাঁদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাঁদের অপূরণীয় অভাবে আমরা হয়ে পড়ছি বিকল।

ডক্টর বসু মহাশয় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, মনোবিকলন বিজ্ঞানে ভারতে অগ্রণী ছিলেন—তা' সুবিদিত। তাঁর মনোবৃত্তিবিষয়ক গবেষণার আলোকে নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। কিন্তু যেখানে তিনি সম্পূর্ণ একক, অতুলনীয়, সেটী হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি গভীরতম অনুরাগ। এ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁর জীবনের প্রতি কাজে মূর্ত্ত রূপ পরিগ্রহ করতো। এক কথায়, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। জগতের প্রতি ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান সংগ্রহে ছিলনা তাঁর দৈন্য; কিন্তু তাকে নিজের বলে পরিগ্রহ করতে ছিল তাঁর অসাধারণ সাবধানতা। অশেষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আধার হয়েও তাই সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি মনে প্রাণে আসক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে ও আমার সহধর্মিণীকে দেখা হলে প্রায়ই বলতেন—"বাঁচবে ভারতবর্ষে ঐ একটী ভাষা, যা' দেবভাষা—যা' অমর। আর সব ভাষাই রূপান্তরিত হয়ে হয়ে অচিরে অপরিচিত হয়ে উঠ্‌তে বাধ্য। তাই বৌদ্ধেরা, জৈনেরাও সংস্কৃত ভাষার অবিনশ্বর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।" আর একদিন তিনি আমাদের গভীর দুঃখসহকারে বলেছিলেন—"আমার স্বপ্ন, পুরাণপ্রবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ যদি সংস্কৃত ভাষায় লিখে যেতে পারতাম, তা হলে আমার আনন্দের সীমা থাক্‌তো না। ঐ ভাষায় লিখিত না হলে ভারতের জ্ঞান-সম্পদ্ স্থায়ী হয়না।"

এজন্য তিনি প্রাচ্যবাণীমন্দিরকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। ফলতঃ,

এ মন্দিরের জন্ম তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে। যতদিন পর্যন্ত তাঁর শারীরিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন তিনি আমাদের সভাসমিতিতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন, পুরাণাদি বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। তিনি সর্বদা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁর চরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখে আমাদের উৎসাহ নিরন্তর প্রবলতর হয়ে উঠতো। অত বড় একজন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতের গোপন কোণ থেকে সংগ্রহ করে পুরাণের গূঢ়তত্ত্ব, গীতার মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ প্রভৃতি জগদ্বাসীকে পরিবেশন করেছেন,

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু

এতে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। সর্বদা মনে হতো—অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও যদি ভারত জননীর এ অনবদ্য প্রোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের প্রতি উদাসীন না হতেন, অতীত-বর্তমানের অনবদ্য সেতু নির্মাণে তাঁরাও যদি আমাদের ডাক্তারবাবুর মতো না হোক, কথঞ্চিৎও ব্যাপৃত থাকতেন —কি আনন্দই না হতো !

সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের যেমন ডাক্তারবাবুর অন্ত ছিলনা, তেমনি "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"—জীমূতবাহনের এই সাবধানবাক্যের প্রতিও তাঁর অপরিসীম আস্থা ছিল। তাঁর বিচার ছিল যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস—এগুলির তিনি ছিলেন বহু উর্ধ্বে। তজ্জন্য তাঁর সংস্কৃতবিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থরাজিতে অপূর্ব এক বস্তুর রসাস্বাদন ঘটে, সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা নিষ্ঠাপূর্ণ যুক্তি। নির্ভীক চিত্তে তিনি সর্বদা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন। উদাহরণক্রমে বলি, তাঁর গীতাগ্রন্থে তিনি বলেছেন যে—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮-২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ৮-২৫"

অর্থাৎ "অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্ল ছয় মাস উত্তরায়ণ, তা'তে মৃত ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি ও কৃষ্ণ ছয় মাস—দক্ষিণায়ন, তা'তে যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরাবর্তন করেন।" যোগীর এ শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি—তা শাশ্বত মত বলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে বলছেন, তৎসম্বন্ধেও ডক্টরবাবু তাঁর মত অকুণ্ঠচিত্তে বলেছেন। মহাত্মা তিলকের মতকে অবিশ্বাস্য ঘোষণা করে তিনি বলেছেন যে—মঙ্গোলিয়া থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা এসেছিলেন, সেটা আমাদের পিতৃলোক এবং ততদূর পর্যন্ত পথ—পিতৃযান। মেরুপ্রদেশ আমাদের ব্রহ্মলোক, যেখানে দিবা ও রাত্রি সমান—ছয় মাস ছয় মাস—ততদূর পর্যন্ত পথ ব্রহ্মযান—ব্রহ্মযানের যাত্রী সেখানে পৌঁছিয়ে আর ফিরে আসে না। কালক্রমে লোক এসব তথ্য গেল ভুলে—শাস্ত্রে ঐ পথের স্মৃতিই হয়ে রইলো তথ্য বলে। এ শাশ্বত সমস্যা—দেবযান, পিতৃযান বিষয়ক—সমাধানের অনুকূলে আমাদের উপনিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থে অনুপম উক্তি আছে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর মত, নিজস্ব মতও অবশ্য চিন্তনীয়, বিচারণীয়। তাঁর রচনার অন্য একটী বৈশিষ্ট্য—অপূর্ব সরল ভাষা, যে ভাষার স্বচ্ছ প্রবাহের মধ্যে কোনও কালিমা নেই, জটিলতা নেই। সুন্দর দেহের অন্তঃস্থিত অতি সুন্দর প্রাণটী যেমন ডাক্তারবাবুর ছিল, তাঁর রচনাও ছিল তেমন—অনবদ্য সুন্দর ভাষার মধ্যে ভাববস্তু ছিল প্রাণারামে নিমগ্ন। তাঁর যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, গীতা ব্যাখ্যা, পুরাণ কাহিনী এত সুখপাঠ্য, অথচ এত শিক্ষাপ্রদ—এ এক অতুলনীয় সৃষ্টি।

এই অগ্রগণ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ ভারতীয় ইতিহাসমূলক গবেষণায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর Reconstruction of the Andhra Chronology গ্রন্থ Asiatic Society পরম সমাদরে প্রকাশ করে ঐতিহাসিক গবেষণার পরম সহায়তা সম্পাদন করেছেন। তাঁর রচিত "লাল-কালো" ছেলেদের বই ও কেবল ছেলেদের নয়, রসজ্ঞদেরও পরম আদরের সামগ্রী। "স্বপ্ন" গ্রন্থখানা বাঙ্গালীপাঠকমাত্রেরই পরিচিত। তাঁর "Everyday Psycho-analysis", "The concept of Repression" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্ব বিদ্বৎসমাজে ভারতের অনবদ্য দানরূপে দীর্ঘকাল সকলের সম্মান আহরণ করবে, সন্দেহ নাই। তাঁর সৃষ্ট লুম্বিনীপার্ক মেণ্টাল হাসপাতলে (Mental Hospital) এবং ইণ্ডিয়ান সাইকো এনালিটিক সোসাইটী দেশের স্থায়ী সম্পদরূপে চিরকাল পরিগণিত হবে এবং তাঁর স্মৃতি চির অম্লান রাখবে। কত দুঃখী পরিবারের দুঃখের বোঝা অপসারিত করছে, এ দুই প্রতিষ্ঠান—তা ভাবতেই হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। সর্বশেষে বলি তার "সমীক্ষা" ত্রৈমাসিক পত্র ও আমাদের পরম গৌরবের বস্তু। ১৯৫১-৫২ সালে পর্যন্ত স্বলিখিত প্রবন্ধ তিনি এ পত্রিকায় প্রকাশিত করে এর গৌরব বর্ধন করেছেন।

উপসংহারে তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের অমর ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি—

"যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগৎ মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্॥
তত্ত আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে"

(ঋগ্বেদ, ১০-৫৮-৬, ১০, ১২)

"তোমার যে আত্মা সুদূরে প্রসারিত কিরণমালার পথে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা সুদূরে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা সুদূরে ভূত ও ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক। ঋগ্বেদ ১০-৫৮-৬, ১০, ১২।

শরৎসাহিত্যে বাংলার সমাজ চিত্র

শ্রীউমা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

বাংলার অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলিতে তখনকার বাঙালী সমাজের একটি নিখুঁত ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বিগত এক দশকে সেই সমাজের উপর দিয়ে নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের এক তুমুল ঝড় বয়ে গিয়েছে। তার আগেও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এই সমাজের বুকে এক প্রবল আলোড়ন জাগিয়েছিল, যাতে করে আমাদের রক্ষণশীল সমাজের অচলায়তনেও অল্প অল্প ভাঙন ধরতে সুরু হ'য়েছিল। যুগধর্মকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। শরৎচন্দ্র যে সমাজের ছবি এঁকেছিলেন আজ তার চেহারা অনেকটা বদলে গিয়েছে। কিন্তু তবুও ঘরোয়া বাঙালী জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা, হাসি-কান্নায় ভরা যে কাহিনীগুলি তিনি তাঁর সহজ, সরল অনুপম ভাষায় পাঠক সমাজের কাছে পরিবেশন করেছিলেন, তার আবেদন বাঙালীমাত্রেরই মর্মে না পৌঁছে পারে না। কথাশিল্পীর লেখনীই যেন তাঁর তুলি। সেই তুলির অপরূপ মায়াপরশে ফুটে উঠেছে তখনকার বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের ছবির পর ছবি। দরদী সাহিত্যিকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন তাঁর সমাজের দোষ গুণ—উভয়ই। সামাজিক সমস্যাগুলি তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠক পাঠিকাদের চোখের সামনে। সেই সমস্যাগুলির কোনও সমাধান তিনি নির্দেশ ক'রে দেন নি শুধু তাঁর পাঠক সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন সেইগুলির সমাধান সম্বন্ধে। তিনি কদাচিৎ তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে কোনও সুক্ষ্ম ও জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের অবতারণা করেছেন। কোনও কঠিন মনস্তত্ব-মূলক সমস্যা তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক আধুনিক উপন্যাসিকের মতো তিনি তাঁর বইগুলিতে কোনও বিদেশীভাবের আমদানী করতেও চেষ্টা করেন নি। সেইদিনকার সেই অচল, অনড়, রক্ষণশীল সমাজের যে রূপটি তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন তারই একটি জীবন্ত ছবি তিনি বাংলার পাঠক সমাজকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। সেই সমাজ দোষে গুণে অপরূপ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল কথা শিল্পীর তুলিতে। রসস্রষ্টা তাঁর বইগুলিতে যে বৈচিত্র রসের সৃষ্টি করেছেন তাঁর মূল উৎসটি ঘরোয়া বাঙালীদের সামাজিক জীবনেই নিহিত আছে। তাঁর রচনা সম্পূর্ণ বাঙালীর নিজস্ব ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁর বর্ণিত কাহিনীগুলিতে অভিনবত্ব কিছুই নেই—কিন্তু আছে এক অনাস্বাদিত বৈচিত্র্য ও অনাবিল মাধুর্য। তাঁর গল্পগুলি বাংলার ঘরোয়া জীবনের অতি সামান্য সামান্য ঘটনা-সমাবেশে অপূর্ব মধুর হয়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে নেই কোনও অসঙ্গতি ও অসাধারণ নাটকীয় বা চমকপ্রদ ঘটনা-বাহুল্যের কষ্টকর প্রচেষ্টা। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা-সংঘাতে ফুটে উঠেছে তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলি। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে তিনি কাহিনী বিন্যাসের চেয়ে চরিত্র চিত্রণেই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। সেগুলি যেন নিত্যদৃষ্ট আমাদের চোখের দেখা মানুষ বলে মনে হয়। যাঁরাই তখনকার বাংলার সমাজকে ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই একথার সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের লেখার ভঙ্গীতে ও ভাষায় আছে এক অদ্ভুত জাদু, যাতে করে পাঠক পাঠিকাদের চিত্ত অতি সহজেই বিমোহিত হয়ে যায়। রূপস্রষ্টা শিল্পীর তেমনি অপূর্ব নৈপুণ্য শব্দ-চয়নেও। তাঁর রচনা ভঙ্গী সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত। সেই রচনায় কোথাও অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর অর্থহীন বর্ণনাবাহুল্য বা কষ্ট-সাধ্য ভাব-বিলাস নেই। তাঁর ভাব ও ভাষার সুমিত সংযমই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাব ও ভাষার গতিও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সেইজন্যই তাঁর রচনার অনবদ্য সৌন্দর্য, মাধুর্য, ও সৌকর্য অমন করে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সুনিপুণ শিল্পী অতি সাধারণ সহজ কথার মাধ্যমে যে অতি সাধারণ সামাজিক চিত্রগুলি আঁকতে প্রয়াস পেয়েছেন তাই তার আবেদন এমন নিবিড়, গভীর ও সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে যে সামাজিক চিত্র-গুলি পাঠক পাঠিকাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেগুলির মধ্যে তাঁর একান্ত দরদী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙালী সমাজের দোষ গুণ উভয়ই অকুণ্ঠিত-চিত্তে দেখিয়েছেন। তাঁর দরদী মন বুঝেছিল সমাজের ত্রুটিগুলি কোথায়। নিষ্করুণ সমালোচকের কঠিন সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন সেই সমাজের সকল অসাম্য, অবিচারও অনুদারতাকে। তার জন্যে তিনি সমাজকে নিদারুণ কশাঘাত করতেও ছাড়েন নি। সমাজের ত্রুটিগুলির নিষ্ঠুর, অনাবৃত নগ্নরূপ তিনি অতি নির্মমভাবে প্রকাশ করেছেন। তবুও সেই সমাজের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমত্ব। যে সমাজের দোষত্রুটিগুলি কঠোর বিচারকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন তার প্রতি সীমাহীন মমতাও ফুটে উঠেছে তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে। তিনি নিজেও যে সেই সমাজেরই একজন, সেকথাও তিনি মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি। সমাজের দোষগুলি তাঁর সংবেদনশীল একান্ত কোমল অন্তরকে অশেষ বেদনা দিয়েছি। কিন্তু তবুও তিনি তাকে অবজ্ঞা ক'রে তার থেকে দূরে থাকতে চান নি। সমাজের বাইরে থেকে যে কেউ কোনও দিন তার দোষ ত্রুটিগুলি শোধরাতে পারে-না একথা শরৎচন্দ্র মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই তিনি "পল্লীসমাজে" "জ্যাঠাইমা" বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"তাছাড়া জানি নি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভালো করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—যে কাজ এমন কঠিন। আগে যে মিলতে হয়, সকলের

সঙ্গে ভালোতে মন্দতে এক হতে না পারলে কিছুতেই ভালো করা যায় না—সে কথা ত মনেও ভাবি নি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার মস্তো জোর, মস্তো প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেল না।—এইবার তাকে তোরা নামিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি তাতে অধর্ম যতই বড় হ'ক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে একথা আমি ব'ড়ো গলা করেই ব'লে যাচ্ছি।" বাস্তবিকই রমেশের সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরীর এই কথাগুলি অত্যন্ত খাঁটি।

যে সমাজের ছবি শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলিতে এঁকেছেন তার সকল স্তরের মানুষগুলির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল অতি নিবিড় ও গভীর। সচরাচর ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লেখকদের সমাজের নিম্নস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ অতি সামান্যই থাকে। সাধারণতঃ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের দুঃখ দুর্গতির কাহিনী তাঁরা বই পড়েই জেনে থাকেন। তাঁরা কদাচিৎ এই সব তথাকথিত 'ছোটলোক'দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাই তাঁরা এদের প্রকৃত অবস্থা বা চরিত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার যথেষ্ট সুযোগ পান না। এই স্বল্প পরিচয়ের বাধাই এই সব চরিত্র চিত্রণে এঁদের এক মস্তো বড়ো অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। ফলে তাঁদের অংকিত চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কোনও দিনও এই শ্রেণীর লোকদের ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে রাখতে চান নি'। বরং এদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে মিশবার এবং এদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ করবার ও এদের দৈনন্দিন সুখদুঃখের কথা জানবার প্রচুর অবকাশ পেয়েছিলেন। তাই তিনি এই মানুষগুলির অন্তরের যথার্থ রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং এদের অন্তরে প্রবেশ করবার চাবিকাঠিটিও খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই জন্যেই তিনি মানুষকে তার প্রকৃত মূল্য দিতে শিখেছিলেন এবং এতো গভীরভাবে ভালোবাসতেও পেরেছিলেন।

বাংলার সমাজ-পরিত্যক্তা নারীরাও শরৎচন্দ্রের উদার হৃদয়ের অপার সহানুভূতি লাভে বঞ্চিতা হয় নি'। তাঁর ভালোবাসায় ভরা অন্তর তাঁদের দুঃখেও কেঁদেছিল। তাদের মধ্যেও যে দেবত্ব আছে, তাঁর দরদী মন তা বুঝতে একটুও ভুল করে নি'।

"দেবতাকে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,"

সমাজত্যক্তা পতিতা নারীদের সমাজের বিরুদ্ধে—সমগ্র পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে—এই চিরন্তন ও অতি সত্য অভিযোগটি শরৎচন্দ্র যেন তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে খণ্ডন করতে চেয়েছেন—তাদের সহজ মনুষ্যত্বকে, তাদের দেবত্বকে স্বীকার করে নিয়ে। তাই সতীধর্মের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক সময়েই নারীধর্ম বড়ো হ'য়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর আদৌ নৈতিক শুচি-বায়ু ছিল না। তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মন সর্বদা মানুষের সহজ বুদ্ধি দিয়েই মানুষকে বিচার করতে চেয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্বকেই তিনি সব সময়ে বড়ো করে দেখেছেন—বুঝেছেন সেই মনুষ্যত্ব তার পশুত্বকেও ছাপিয়ে ওঠে। সেই জন্যেই তিনি সতীত্বের কষ্টিপাথরে ভাগ্যবিড়ম্বিতা ভ্রষ্টা নারীদের জীবনের মূল্য যাচাই করতে কখনও প্রয়াস পান নি'। কঠিন নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে তিনি এই সব হতভাগিনীদের পাপ পুণ্য বিচার করতেও চান নি'। তাঁর সৃষ্টি চন্দ্রমুখী পতিতা নারী হয়েও ত্যাগ ও সেবায় আদর্শস্থান অধিকার করে আছে। উচ্ছৃংখল অসংযত চরিত্র, মদ্যপ দেবদাসের প্রতি তার অনুপম প্রেম—পার্বতীর নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ভালোবাসার চেয়ে কম পবিত্র নয়। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে "পিয়ারীবাইজীই বড়ো হ'য়ে ওঠে নি'। তার সেই পরিচয় অতি গৌণ। তার মধ্যে আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে পাই এক মহীয়সী নারীকেই—যে ত্যাগ, স্নেহ, মমতা, সেবা, পুণ্য, দয়া ও দাক্ষিণ্যে অতুলনীয়া। কোন্ সুদূর শৈশবের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে যাকে সে একান্তভাবে ভালোবেসেছিল—কণ্টকময় বৈঁচীফলের মালা দিয়ে যাকে সে একদিন খেলাচ্ছলে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিল সেই প্রেমাস্পদের প্রতি কী অগাধ তার ভালোবাসা, তার জন্য কী অপরিসীম তার ত্যাগ। এই পতিতা নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা স্বতঃই নত হয়ে আসে। সমাজত্যক্তা সাবিত্রী সতীশকে গভীরভাবে ভালোবেসেও তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারলো—সেই ভালোবাসার জোরেই। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না। ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।" তাই সাবিত্রী যেন ত্যাগ সেবা ও প্রেমের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। নিজের সুখকেই সে বড়ো করে দেখলো না। সে অনায়াসেই হাসি মুখে নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিলো—সতীশের সুখের জন্যে। নিজের কলংকিত জীবনের সংস্পর্শে সে কলুষিত করতে চাইলো না প্রেমাস্পদের জীবনকে।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি পতিতা নারীগুলি তাদের নিজ নারীত্বের এই বিপুল মহিমারই যেন জয়গান গেয়েছে। বাস্তবিকই এই পতিতা সমাজচ্যুতা হতভাগিনীদের মধ্যে যে নারীসুলভ দয়া মায়া স্নেহ প্রেম, সেবা ও দাক্ষিণ্য থাকতে পারে তা শরৎচন্দ্রের আগে আর কোনও বাঙালী কথা সাহিত্যিক এমন করে সমস্ত অন্তরের দরদ দিয়ে দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এরা যেমন সমাজে, তেমনি সাহিত্যেও যেন অপাংক্তেয় ছিল। উদার মানবতার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন এই সমাজলাঞ্ছিতা নারীদের বিড়ম্বিত জীবনের সমগ্ররূপটিকে—নিজ অন্তরে অনুভব করেছিলেন তাদের অন্তরের নির্বাক পুঞ্জীভূত দুঃখ ও বেদনাকে। যদি কখনও কোনও ভদ্র রমণীর মুহূর্তের ভুলের জন্য ক্ষণিক দুর্বলতা-বশতঃ কিংবা অভাবের তাড়নায় পদস্খলন হতো আমাদের তখনকার রক্ষণশীল সমাজে তার সেই অপরাধের আর মার্জনা ছিল না। ভদ্র-সমাজের দ্বার তার কাছে চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যেতো। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজের বিধান ছিল অন্যরূপ। সেই একই অপরাধে অপরাধী পুরুষের মান, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সমাজে অক্ষুণ্ণ থেকে যেতো। অনুদার, রক্ষণশীল সমাজের এই সহজ মনুষ্যত্ব-বোধের অভাব, তার অকরুণ নির্মমতা ও নিষ্ঠুর অবিচার শরৎচন্দ্রের অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল। তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভালো হতে চাইলে তাকে ত' কেউ

..রে না ; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন ? অজ্ঞানে, পোড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন আমাদের তোমরা ভালো হতে দেবে না ?" পতিতা ..র প্রতি আমাদের তখনকার রক্ষণশীল সমাজের এই চরম অবিচার ..ন্দ্রর বুকে বড়োই বেজেছিল। রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে তিনি যেন বলেছেন—"আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়। একেও ..স্তি একদিন পেতে হবে। ভগবান্ এর সাজা দেবেনই দেবেন।" শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের । বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে—প্রকট হয়ে উঠেছে সামাজিক ..র ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর বাস্তব রূপটি।

..রৎচন্দ্র বাংলার সমগ্র নারীসমাজকেই অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিলেন। ..র মেয়েদের মধ্যে মমতাময়ী নারীর এই কল্যাণী মূর্তিই তিনি যেন করে দেখেছিলেন। যে নারী অপরের সুখের জন্যে নিজেকে ..সে বিলিয়ে দেয়—নিজ অন্তরের সুধা সিঞ্চনে সংসারে ও সমাজে পাঁচজনের জীবনকে মধুরতর করে সেই কল্যাণময়ী নারীর অসীম মমতায় ভরা অন্তরের রূপটিই তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন তাঁর কয়েকটি নারীচরিত্রে। "রামের সুমতি"তে বৌদিদি নারায়ণীর ..তৃহীন বৈমাত্রেয় দেবর সন্তানতুল্য রামের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-। "বিন্দুর ছেলেতে" ভাসুরপুত্রের প্রতি বিন্দুর গভীর স্নেহ ও বাৎসল্য ..ত্র বোধহয় বাঙালী পরিবারেই সম্ভব। "দেবদাসে" পার্বতী আপন মাধুর্যে স্নেহ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তার বয়স্ক সপত্নীপুত্র ..দের কেমন আপনার করে নিয়েছে। "অরক্ষণীয়া"তে অশিক্ষিতা ..াঁয়ের মেয়ে "পোড়া কাঠে"র রুক্ষ বহিরাচরণের অন্তরালে বয়ে ..চ বাঙালী মায়ের অন্তরের স্নেহমমতার স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। "মেজ-..তে হেমাঙ্গিনী তার বুড়ো মা কাদম্বিনীর মাতৃপিতৃহীন বৈমাত্রেয় ..কেষ্টকে সন্তানাধিক স্নেহযত্ন করে কতই না নিগ্রহ ভোগ করেছে !

শরৎচন্দ্র যে নারীচরিত্রের খারাপ দিকটা একবারেই দেখান নি ..য়। "বামুনের মেয়ে"র রাসমণি, "মেজদিদি"র কাদম্বিনী প্রভৃতি ..টি নিষ্ঠুর প্রকৃতির নারীচরিত্রও তিনি এঁকেছেন। তাঁর গল্প ও ..াসগুলিতে তাঁর চিত্রিত নারীচরিত্রগুলিই যে অনেক পুরুষ চরিত্রের ..চের বেশী ফুটে উঠেছে একথা সর্ববাদীসম্মত। শ্রীকান্তের চেয়ে ..লক্ষ্মী ও কমললতার চরিত্র, রোহিণীদাদার চেয়ে অভয়ার চরিত্র, ..াসের চেয়ে পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর চরিত্র, অতুলের চেয়ে জ্ঞানদার ..র, নরেনের চেয়ে বিজয়ার চরিত্র, জীবানন্দের চেয়ে ষোড়শীর চরিত্র, ..শ ও দিবাকরের চেয়ে সাবিত্রী ও কিরণময়ীর চরিত্র, অপূর্বর চেয়ে ..তীর চরিত্র বেশী করে পাঠক পাঠিকাদের মর্মস্পর্শ করে। "পল্লীসমাজে" ..হিমা বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রটি বাস্তবিকই অতি অপূর্ব হয়েছে। এই ..ব বুদ্ধিশালিনী পল্লীরমণীর দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কাছে উচ্চ ..ক্ষিত রমেশকেও মাথা নত করতে হয়েছে। বিশ্বেশ্বরী তাঁর সহজ ..র দিয়ে রমেশের অনেক প্রশ্নের, অনেক সমস্যার কেমন সহজ সমাধান ..র দিয়েছেন। কী উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি বিচার করেছেন সমাজের দোষগুণ—ক্ষমা করেছেন মানুষের মনের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে। এই উদারহৃদয়া নারীর চরিত্রে হিন্দু বিধবার নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও সংযমের সঙ্গে সংস্কারবিচ্ছিন্ন ঔদার্য ও মহত্ত্বের অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছে। বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি গোপন আসক্তির কথা জেনেও তিনি তাকে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিতে চান নি—বরং তাকে আরও কাছে টেনে নিতে চেয়েছেন। রমার প্রতি গভীর সমবেদনায় তাঁর অন্তর ভরে উঠেছে। তিনি বলেছেন —"সারাজীবন ধ'রে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব কেন—ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়াল !" এ যেন শরৎচন্দ্রের নিজ অন্তরেরই ব্যাকুল প্রশ্ন। বাংলার মেয়েদের দুঃখ, দুর্দশা, তাদের প্রতি সমাজের অবিচার ও অত্যাচার তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। তাই তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে বাংলার নারীদের অন্তর বেদনাকে অমন করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি নিষ্ফল প্রেম এবং তার জন্যে তার মিথ্যা অপবাদ ও সামাজিক নিগ্রহ তার অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিদারুণ মর্মবেদনা সহায়সম্বলহীনা বিধবা জননীর অরক্ষণীয়া কন্যা জ্ঞানদার হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথা—তথাকথিত কুলীন বামুনের মেয়ে সন্ধ্যার অকরুণ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস—বিরাজ বৌএর মর্মান্তিক দুঃখ ও দুর্ভাগ্য—পার্বতীর ব্যর্থ নারীজীবনের দুর্বহভার—জননীর পাপে কলংকিতা নিরপরাধী সরযূর অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাই তিনি নিজ অন্তরে অমন করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের নব্য শিক্ষিতা মেয়েদের চরিত্রাঙ্কণে শরৎচন্দ্র বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বোধহয় এই আধুনিক বাঙালী সমাজের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার এবং তাদের দেখবার তাঁর বিশেষ সুযোগ ঘটে নি। "বিপ্রদাসে" উচ্চশিক্ষিতা বন্দনার চরিত্রটি তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য নারীচরিত্রের মতো তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

বাংলার পল্লীসমাজের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল, যাতে করে তাঁর চিত্রিত বাংলার পল্লীসমাজের চিত্রগুলি অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার পল্লীক্রোড়েই কেটেছিল তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন। পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীসমাজের সঙ্গে ..র অন্তর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল—আমরণ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের কাহিনী ও চরিত্রগুলি পল্লীপরিবেশকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। সাধারণতঃ শহরবাসী শিক্ষিত লেখকেরা পল্লীসমাজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাঁদের অনেকেরই ধারণা পল্লীবাসীরা অত্যন্ত সরল ও সাদাসিদে মানুষ, যাদের মধ্যে কোনও জটিলতা ও কুটিলতা কদাচিৎ দেখা যায়। যাঁরা বাংলার পল্লীসমাজকে ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন এ ধারণা কত ভ্রান্ত। শরৎচন্দ্র এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলার পল্লীসমাজকে আঁকতে মোটেই চেষ্টা করেন নি। তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন এই সমাজের প..

দুর্নীতি, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে। এই গ্রাম্য সমাজের দলাদলি, কলহবিবাদের জটিলতা ও কুটিলতা—অজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ পল্লীবাসীদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, স্বার্থান্ধতা ও সংকীর্ণতা তাঁর অন্তরকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল। "পল্লীসমাজে" কুচক্রী, স্বার্থান্বেষী বেণী ঘোষালের কুটিলতার পংকিল আবর্তে পড়ে শহরের মানুষ, উচ্চশিক্ষিত রমেশকে যে দুঃখ ও নিগ্রহভোগ করতে হয়েছিল তাতে তার পল্লীসংস্কারের মোহ প্রায় ছুটে যাবার উপক্রম হয়েছিল, যদি না তার জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী তাঁর সহজ সরল বুদ্ধি দিয়ে তাকে সমস্ত জিনিসটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। এই বেণী ঘোষালের চক্রান্তে রমাকে কতো দুঃখই না পেতে হ'লো। মিথ্যে কলংকের ভয় দেখিয়ে সে রমাকে দিয়ে রমেশের কত অনিষ্টই না করতে চেষ্টা করলো। শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" উপন্যাসখানিতেও আমরা বাংলার তখনকার গ্রাম্য সমাজের একটি অতি নিখুঁত চিত্র দেখতে পাই। গ্রামের অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষগুলি নিজেদের ভালো বুঝতে শেখে নি। গ্রামে মড়ক লেগেছে। কলেরায় গ্রাম প্রায় উজাড় হবার জোগাড়। পুকুরের জল যাতে দূষিত না হয় সেদিন কারুরই লক্ষ্য নেই। পুকুরে কলেরা রোগীর ময়লা কাপড়-চোপড় কাচতে নিষেধ করাতে গল্পের নায়ক 'পণ্ডিত মশাই'—বৃন্দাবন বোষ্টমকে উচ্চবর্ণের মানুষগুলির কাছে কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করতে হ'লো। ফলে তার একমাত্র পুত্র চরণ বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে কলেরায় মারা গেল। "বিরাজ বৌ"তে অশিক্ষিত, ইন্দ্রিয়সুখসর্বস্ব গ্রাম্য জমিদারের লাম্পট্যের ও অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীসমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের গভীরতা এই সব চিত্র থেকেই বোঝা যায়। সেইজন্যে তাঁর সৃষ্ট গ্রাম্য সমাজের মানুষগুলির চরিত্র অমন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হ'য়েছে। তাঁর বেণী ঘোষাল, ভৈরব আচার্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দীনু ভট্টাচার্য ইত্যাদিকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়।

অনেকেই শরৎচন্দ্রকে বিপ্লবী লেখক শ্রেণীভুক্ত করতে চান। এর কারণ তিনি তাঁর কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে অবৈধ প্রণয় চিত্র দেখিয়েছেন—বিধবা ও পতিতা নারীদের প্রেম ও তাঁর গল্পের কাহিনীগুলিতে স্থান পেয়েছে। সমাজচ্যুতা ভ্রষ্টা নারীচরিত্রও তিনি তাঁর কয়েকটি গল্পে এঁকেছেন এবং এই চরিত্রগুলি তাতে বিশিষ্ট স্থানই অধিকার করেছে। এই জন্যে একশ্রেণীর লোক তাঁকে তীব্র আক্রমণ করতেও ছাড়েন নি। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ—তাঁর তুলিতে 'পাপীর চিত্র'গুলি 'মনোহর' হয়ে উঠেছে। কোনও সমাজই কোনও দিনও সমাজভ্রষ্টা পতিতা নারীদের প্রেমকে ভালো চোখে দেখে নি। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের তো কথাই নেই। সমাজের চোখে সেই প্রেম ও ভালোবাসা অবৈধ এবং পাপ হ'লেও ঐ রকম প্রেম আদৌ অস্বাভাবিক বা বিরল নয়। এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের অন্তরে প্রেমতৃষ্ণা—ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার দুর্নিবার বাসনা—জাগা খুবই যে স্বাভাবিক একথা তো অস্বীকার করা যায় না। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করেন নি'। যদি তা করতেন তাহলে তাঁর সমাজ-চিত্রণ অসম্পূর্ণই থেকে যেতো। উপন্যাস যদি মানুষের সত্যিকার বাস্তব জীবনের আলেখ্যই হয় তবে ঔপন্যাসিকের কাজ—জীবনে যা নিয়তই ঘটছে তাই দেখানো—সমাজের প্রকৃত ছবিখানা সকলের সামনে তুলে ধরা। এটা ঠিক শরৎচন্দ্র সকল সামাজিক অনুশাসনকেই নির্বিচারে মেনে নিতে পারেন নি'। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত হতে দেখেছেন সেখানেই তাঁর অন্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই পতিতা নারীদের মনুষ্যত্বকেও তিনি অপমান করতে পারেন নি'। সমাজের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়েছেন। কতগুলি অর্থহীন নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের প্রতিও তিনি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। কিন্তু তিনি সমাজদ্রোহিতাকে কোথাও সমর্থন করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন—"সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে।" সামাজিক বন্ধনকেও তিনি মেনেই নিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর রচনায় যথেষ্ট সংযম ও নীতিবোধ দেখতে পাওয়া যায়। "পল্লীসমাজে" বালবিধবা রমার সঙ্গে রমেশের বিবাহ ঘটিয়ে অনায়াসেই তিনি গল্পটি অন্যরকম করে শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি'। বরং জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে সে বামুনের মেয়ে—তার মতোই তাকে আজীবন শুদ্ধ ও সংযতভাবে থাকতে হবে। নিষ্ফল প্রেমের ব্যর্থতায় রমার বেদনাহত চিত্তের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চেষ্টা করে বিশ্বেশ্বরী তাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন—৺বিশ্বনাথের চরণে তার বাকী বৈধব্য-বিড়ম্বিত জীবনটাকে নিবেদন করে দিতে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দেবদাসে" ও তিনি পার্বতীর বিয়ের পর তার সঙ্গে দেবদাসের অবৈধ মিলন ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি পার্বতীর চরিত্রের মধ্যে সংযম ও নীতিবোধকেই যথেষ্ট বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। স্বামীকে ভালবাসতে না পারলেও সে আদর্শ স্ত্রী হতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে—অহরহ নিজের মনের সঙ্গেও যুঝেছে। "চরিত্রহীন" সতীশের সঙ্গে মেসের ঝি, কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর বিবাহে এবং হারাণ ও সুরবালার মৃত্যুর পরে কিরণময়ীর সঙ্গে উপেনের বিবাহে কোনও দুস্তর সামাজিক বাধা ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসখানি অন্যরকম করেই শেষ করেছেন। "গৃহদাহে" অচলা তার স্বামীর বন্ধু খামখেয়ালী ধনীপুত্র সুরেশের সঙ্গে ঝোঁকের বশে গৃহত্যাগ করেছিল। পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের তীব্র দহনে জ্বলছে—সে যেন রক্ষণশীল সমাজের বনেদ পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে চায়। পুরোণো সব কিছুই তার কাছে বর্জনীয়—সে তার সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তা দিয়ে যেন নতুনেরই জয়গান গেয়েছে। তাই কমল যেন একটি চরিত্র বিশেষ না হয়ে একটা 'আইডিয়া' (idea) হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর "শেষ প্রশ্নের" পাঠক পাঠিকাদের কাছে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই তুলে ধরতে চেয়েছেন ব'লে মনে হয়—সেই প্রশ্নের বা সমস্যার কোনও জবাব তিনি দিতে চেষ্টা করেন নি। সুতরাং "শেষ প্রশ্ন"কেও বিপ্লবাত্মক উপন্যাস বলা যেতে পারে না। শরৎচন্দ্র খাওয়া ছোঁওয়ার হাস্যকর বাড়াবাড়িটাকে অপছন্দ করলেও বর্ণাশ্রমকে মেনেই নিয়েছেন বলে মনে হয়। "পল্লীসমাজে" বিশ্বেশ্বরী

বলেছেন—"পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড় সেজন্যে এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। ছোট ভাই যেমন ছোট বলে বড় ভাইকে হিংসে করে না, দু'এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়া গাঁয়েও ঠিক তেমনি।" কিন্তু শরৎচন্দ্র মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণাকেও ক্ষমা করেন নি। তিনি বলেছেন—"ধর্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষ হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার!……এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখ্‌খোনো ক্ষমা করবেন না।" তাঁর মতে শুদ্ধমাত্র খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়েই পাপের সমস্ত অন্যায় ও অধর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জাত বোষ্টমের মেয়ে টগর নন্দ মিস্ত্রীর সঙ্গে বিশ বছর ঘর করেও তাকে কোনও দিন হেঁসেলে ঢুকতে দ্যায় নি। তার এই অর্থহীন জাত্যাভিমান ও খাওয়া ছোঁওয়ার হাস্যকর বিচারটির বর্ণনা পাঠকপাঠিকাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র সর্বদা উদার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই রক্ষণশীল সমাজের সকল সংকীর্ণতাকে ও অনুদারতাকে বিচার করেছেন। তাই সকলপ্রকার অসাম্য ও অবিচারই তাঁর অন্তরে সীমাহীন বেদনা জাগিয়েছে। তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের দাবী, ভালোবাসার দাবী সব চেয়ে বড়ো হলেও তিনি সামাজিক বন্ধনকেও অস্বীকার করেন নি। পতিতার ভালোবাসাকেও যেমন তিনি বড়ো করে দেখিয়েছেন তেমনি নারীর সতীত্বকে কম শ্রদ্ধা করেন নি—তাকেও অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর "অন্নদা দিদি"—যিনি স্বামীর জন্যে কুলত্যাগিনী অপবাদ নিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা হন নি—সতীত্বের দৃপ্ত তেজ ও মহিমায় চিরসমুজ্জ্বল। "গৃহদাহে" মৃণালের মধ্যেও তিনি একটি আদর্শ পতিব্রতা সতী নারীর চরিত্র এঁকেছেন। মৃণাল অচলাকে বলেছেন—"স্বামী জিনিষটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি সত্য, জীবনেও সত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাকে আর আমরা বদলাতে পারি নে।" "বিরাজ-বৌ"তে বিরাজ বৌএর সতীত্বের তেজই কঠিন বর্মের মতো তাকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিপ্লবের পুরোপুরি পরিপোষক না হ'লেও তিনি কতকগুলি নিষ্ঠুর অর্থহীন সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের ভয়াবহ পরিণামও তাঁর কয়েকখানি বইতে দেখিয়েছেন। "অরক্ষণীয়া"তে একটি সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে সমাজের দাবী—জাতিচ্যুতির ভয়, আর এক দিকে একমাত্র সন্তানের প্রতি সহায়-সম্বলহীনা বিধবা জননীর অতুল স্নেহ। কৌলীন্য প্রথার ফল যে কী বিষময় ও ভীষণ হতে পারে তা তিনি তাঁর "বামুনের মেয়ে"—উপন্যাসখানিতে দেখাতে চেয়েছেন। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণদের শতাধিক বিবাহও দোষনীয় ছিল না। ফলে বিবাহটাই হ'য়ে দাঁড়াতো তাদের একটি পেশা। তাতে স্বামীরা সব সময়ে সকল স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিতও হতে পারতেন না। এই অপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কোনও স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর কাছে নিজে না গিয়ে অপর কাউকে পাঠানোও বিচিত্র ছিল না। অথচ এই ব্যাপারটি জানাজানি হ'য়ে গেলে সমাজে একজন নিরপরাধা স্ত্রীলোকের ও তার সন্তানদের নিগ্রহের সীমা থাকতো না। এই সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্র তাঁর "বামুনের মেয়ে" বইখানিতে লেখনী ধারণ করেছিলেন। "চন্দ্রনাথে" তিনি দেখিয়েছেন, মায়ের দোষে নিরপরাধা কন্যার শাস্তি। সরযুর মায়ের কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে চন্দ্রনাথ যখন তাকে ত্যাগ করলেন তখন সমাজের কঠোর নির্মমতায় পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পতিত্যক্তা নিরপরাধা সরযুর অকরুণ ভাগ্য যেন কতকটা নির্বাসিতা সীতার ভাগ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। "পণ্ডিতমশাই"তে বৃন্দাবন বোষ্টমের যে দেবোপম চরিত্রটি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন তার কাছে কোনও পরমশুদ্ধাচারী আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের চরিত্রও লাগতে পারে না। অথচ সেই বেন্দা বোষ্টমকেই গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ ছোট লোক—নীচ জাত বলে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হয় নি। "দেবদাসে" পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের বিবাহ-প্রস্তাবে দেবদাসের মা ঘোরতর আপত্তি তুললেন—"কেনা বেচা" চক্রবর্তী বামুনের ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ করতে কিছুতেই তাঁর মন সরলো না—বিশেষ করে বাড়ীর পাশের কুটুম্ব ব'লে। এই অহেতুক আপত্তির ফলে দুটি তরুণ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। দেবদাস ও পার্বতীর বেদনাবিদ্ধ অন্তরের অশ্রু-সজল করুণ কাহিনীই "দেবদাসে" বর্ণিত হয়েছে। দেবদাস ও পার্বতীর মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এক নিতান্ত অর্থহীন সামাজিক সংস্কার। রক্ষণশীল সমাজের অনুদারতাই দেবদাসের নবীন জীবনের অমন শোকাবহ পরিণামের জন্য দায়ী। "পল্লীসমাজে"র রমা ও রমেশের ব্যর্থ প্রেমের কথা উল্লেখ ক'রে শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—"রমার মতো নারী ও রমেশের মতো পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু, হ'য়ে গেল।" ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই "বার্তাটুকুই পৌঁছে" দিতে চেয়েছেন তাঁর "পল্লীসমাজ" বইখানিতে। তিনি যে বাঙালী হিন্দু সমাজের ছবি এঁকেছেন তার যেমন দোষ আছে তেমনি গুণও আছে। তিনি এই সমাজের সংকীর্ণতা ও অনুদারতাও যেমন একদিকে দেখিয়েছেন, আর একদিকে তেমনি তার অশেষ মহত্ব ও ঔদার্যকে দেখাতেও ভোলেন নি। তিনি "পল্লীসমাজে" কুচক্রী, কুটিল বেণী ঘোষালের চরিত্রও যেমন এঁকেছেন তেমনি বিশ্বেশ্বরীর মতো উদারহৃদয়া নারীর চরিত্রও চিত্রিত করেছেন। "চন্দ্রনাথে" একদিকে যেমন কতগুলি লোকের সংকীর্ণতা দেখিয়েছেন আবার অন্যদিকে তেমনি ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের হৃদয়ের বিশালতা ও দেখিয়েছেন—যিনি নিজে দরিদ্র নিঃসম্বল হয়েও নিরাশ্রয় সমাজত্যক্তা সরযুকে আশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। "বৈকুণ্ঠের উইলে" গোকুলের চরিত্র ও "নিষ্কৃতির" গিরীশের চরিত্র সেকালের একান্নবর্তী বাঙালী হিন্দু পরিবারের ত্যাগ ও উদারতারই সাক্ষ্য দেয়।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাঁর সময়কার বাঙালী হিন্দু সমাজের যে রূপটি নিজের চোখে দেখেছিলেন তাকেই তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। কাল ধর্মের প্রভাবে সেই সমাজের চেহারা যতোই বদলে যাক, কথাশিল্পী তাঁর পাঠক পাঠিকাদের কাছে যে অপূর্ব রস পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তার মূল্য চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে……তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।" তাই বাঙালী শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে নিজেকেই—নিজের সমাজকেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি চিরদিনই বাংলা সাহিত্যের অক্ষয়, অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। যা সুন্দর যা শাশ্বত, তার মূল্য কখনই দেশকালের সীমা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না।

এমারেল্ড বুদ্ধের দেশ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

কালাপানি পাড়ি দিবার সৌভাগ্য ও আভিজাত্য অর্জন এপর্যন্ত ভাগ্যে ঘটে নি। কোনদিন যে ঘটবে তারও কোন আশু সম্ভাবনা দেখি নি। বন্ধুরা প্রায়ই বলতেন, "ওহে যে ক'রেই হোক একবার বিলেতটা ঘুরে এসো ; দেখতেই তো পাচ্ছ, যা সরকারী হালচাল তাতে গায়ে একটু বিলাতী গন্ধ না থাকলে চাকুরীর বাজারে কল্কে পাওয়া কঠিন।" কথাটি যে সত্যি তাতে ভুল নেই। দীর্ঘদিন ইংরাজ প্রভুদের প্রভাবাধীনে থেকে বিলাতীর মোহটা আমাদের বড্ড পেয়ে বসেছে। এমনকি স্বাধীনতা লাভের পরেও আমরা এই হীনমন্যতার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করিনি। বিদেশ ভ্রমণ ও বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়—সে খুব বড় জিনিস। ব্যক্তিগত বা জাতিগতই হোক, মনের প্রসার ও দৃষ্টিভংগীর উদারতা এ দু'ই হচ্ছে বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফল। ইতিহাসে নজীর আছে যে, যে সময় থেকে হিন্দুরা বর্হিজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন হ'য়ে, সমুদ্রযাত্রাকে বর্জন ক'রে নিজেদের চারদিকে একটা সংকীর্ণতার প্রাচীর তুলে আত্ম-তুষ্ট হ'য়ে বসে রইল, সেই সময় থেকেই শুরু হ'ল তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক অধঃপতন। কিন্তু বিলাতীর মোহ, আর বিদেশ-ভ্রমণ এক জিনিস নয়। কবির কথা একটু উল্টিয়ে বলা যেতে পারে "বিদেশের কুকুর পুজি' স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" অর্থাৎ বিলাতী যা'ই হোক না কেন—তাই ভাল। দেশের যা কিছু সবই নিকৃষ্ট। সরকারী মহলে এ ধরণের ভাবাপন্ন বহু ব্যক্তি আছেন, যাদের বিলাতি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার মোহ অত্যন্ত প্রবল এবং এই ভাব-প্রাবল্যের সুযোগ নিচ্ছেন অনেকেই—যারা টাকা খরচ ক'রে যেমন তেমন একটা বিলাতি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নিয়ে এসে চাকুরীর বাজারে জাঁকিয়ে বসেন। বিলাতের সস্তা ডিগ্রীধারী বহুকেই দেখেছি। বেশীর ভাগই বিলেত থেকে শিখে আসেন কতকগুলি খুঁটা আদব কায়দা এবং কারণে অকারণে বা স্থানে অস্থানে সেইগুলি জাহির ক'রে স্ব-প্রাধান্য স্থাপন করবার একটা অশোভনীয় প্রয়াস করে' থাকেন। বিলাতী বা ইউরোপীয় সভ্যতার যে প্রকৃত উৎকর্ষ—ইউরোপীয় ভাবধারার যে নিগূঢ় তাৎপর্য তা কয়জন বিলাত-ফেরৎ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন! বিলাতী সভ্যতার আপাত চাকচিক্যেই আমরা বেশীর ভাগ এতটা অভিভূত হ'য়ে পড়ি যে আমরা বাইরের খোলসটাকেই আঁকড়ে ধরি, আর ভিতরের আসল বস্তুটা থেকে যায় নাগালের বাইরে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীও বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সবল ব্যক্তিত্ব বিলাতী সভ্যতায় আচ্ছন্ন হ'তে পারে নি, বরঞ্চ তাঁদেরই প্রভাবে বিলাতী সভ্যতা নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে।

ব্যাংককের উপকণ্ঠে একটি সুদৃশ্য বৌদ্ধ মন্দির

প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই খবর পেলাম যে "কলম্বো পরিকল্পনার" সর্তানুযায়ী ভারত থেকে চার জনকে অষ্ট্রেলিয়া পাঠান হচ্ছে—সেখানকার সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এবং সেই চার জনের মধ্যে আমিও একজন। যেতে হবে প্রথমে মেলবোর্ণ শহরে এবং সেখানে দু'মাস থাকতে হবে। বিলাত না হোক, বিদেশ তো! মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। কালাপানি পার হ'তে হবে তো,আর ইংলণ্ডেরই দোসর অষ্ট্রেলিয়া—এই ভেবেই খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেল। বন্ধুবর্গ মহাখুশি! পরবর্তী প্রোগ্রাম পরে জানান হবে। কলকাতা থেকে বিমান যোগে যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে ১১ই জানুয়ারী ১৯৫২। সংবাদটি আমি যখন পেলাম তখন থেকে মাত্র দু' সপ্তাহ সময় থাকল প্রস্তুত হবার জন্যে। তাড়াহুড়া লেগে গেল। পাশপোর্ট, হেলথ্-সার্টিফিকেট, পোষাক পরিচ্ছদ ও সর্বোপরি টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে কম হায়রাণি ভোগ করতে হয় নি! যা'হোক শেষটায় মোটামুটি সব কিছুই গুছিয়ে নেওয়া গেল।

১১ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১০টায় দমদম বিমানঘাঁটি হ'তে যাত্রা করতে হবে। দমদমে এসে হাজিরা দিতে হবে অন্ততঃ সাড়ে

আটটায়। আমাদের বেলগাছিয়ার বাসা হ'তে একটা বড় গাড়ীতে আমরা সবাই দমদম রওনা হলাম বেলা সাড়ে সাতটায়। বাবা, মা, স্ত্রী, বোন, ছেলেমেয়ে ও আরও অনেকে মিলে ছোটখাট বেশ একটি দল এলেন দমদম বিমানঘাঁটিতে আমায় বিদায় দিবার জন্য।

করাচী হ'তে K. L. M. (Royal Dutch Air Line) কোম্পানীর বিরাট Constellation বিমানপোত যথাসময়ে দমদম এসে হাজির হ'ল। কাষ্টমসের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বিমানপোতের দিকে রওনা হলাম। বাবা-মা প্রভৃতি সকলে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে সস্নেহে, অশ্রুসজল দৃষ্টিতে বিমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে বিমানপোতের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে রাশি রাশি জোড়া আসন। ভাগ্যে আমার আসনটি পড়েছিল একটি গবাক্ষের ধারে। যদিও পুরু কাচে ঢাকা, তা'হলেও সেই গবাক্ষ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সবাইকেই দেখতে পেলাম, যদিও তাঁরা আমাকে আর দেখতে পাননি। তবু আমার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে সবাই বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগলেন। দূরে আমার মায়ের কোলে ছোট্ট গোপাল (ছেলে)—তাকেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল।

এ আমার দ্বিতীয় বার বিমান যাত্রা। ছাত্রজীবনে একবার আধ-ঘণ্টার জন্য সখের বিমান ভ্রমণ করেছিলাম। তারপর এত দিন পরে আবার এই আকাশ ভ্রমণের সুযোগ মিলল। দীর্ঘ যাত্রাপথ ও অনভ্যস্ততা এই দুইয়ে মিলে মনে মনে বেশ একটু উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। বিরাটকায় বিমানপোত। ভিতরে সত্তর জন আরোহীর বসবার ব্যবস্থা আছে। চারটি প্রবল শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাহায্যে এই বিরাট যন্ত্র-জটায়ু দুই বিস্তৃত পক্ষে ভর দিয়ে মহাশূন্যে উল্কার বেগে ছুটে যায়। এর স্বাভাবিক গতি গড়ে ঘণ্টায় ৩৮০ হ'তে ৪০০ মাইল। ইঞ্জিনের হুঙ্কার সুরু হতেই ভিতরে যাত্রীদের চোখের সামনে লাল আলোর সতর্ক-বাণী জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলে উঠল:—Fasten your Seat-belt. No Smoking please. এরোপ্লেন উড়বার পূর্বে, আর ভূমিতে অবতরণ করবার সময় যাত্রীগণকে সাবধান হ'তে বলা হয়। বিমানঘাঁটির দীর্ঘ র‍্যানওয়ে (run away) বরাবর বিমানখানা প্রায় আধ মাইল ছুটে গিয়ে ধীরে ধীরে মাটির মায়া কাটিয়ে শূন্যে উঠে গেল। বিমানের অপরিসর গবাক্ষ দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ক্রমে দমদম বিমানঘাঁটি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কলিকাতা মহানগরী ও পুণ্যতোয়া গঙ্গা—সবই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হ'য়ে গেল। বিমান ক্রমশই উচ্চ হ'তে উচ্চে উঠে যেতে লাগল—মেঘপুঞ্জ বিদীর্ণ ক'রে নিঃশব্দে শূন্যপথে আরম্ভ হ'ল বিমানের অবাধ যাত্রা। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি নানা বর্ণবৈচিত্র্যে সুদর্শন। কখনো বা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক আধ ঝলক মাটির পৃথিবীর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে আভাস মাত্রই। নদী-গিরি-প্রান্তর সবারই এক অবিচ্ছিন্ন বামন রূপ।

বিমানখানা কখনো কখনো নয়-দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল, আর সেই সময়ে ভিতরেও বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। অবিশ্যি হাতের কাছেই আছে গরম কম্বল, ইচ্ছে হলেই গায়ে জড়িয়ে নিবিড় হয়ে বসা যায়। বিমানের পরিচারক ও পরিচারিকা (Steward and Air Hostess) আরোহীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এতক্ষণে যাত্রীদল যার যার আসনে স্থির হয়ে বসে কেউ বা ধূমপান করছেন, কেউ বা কোন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছেন, আর কেউ বা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আরোহীরা বেশীর ভাগই ডাচ্ বা হল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং ডাচ্ নিউগিনির যাত্রী। ভারতীয় আমরা তিনজন এবং তিনজনই অষ্ট্রেলিয়াগামী। একজন ভারতের পশ্চিম উপকূলবাসী, একজন দক্ষিণী আর বাঙালী আমি। আমাদের তিনজনের আসন পড়েছিল পাশাপাশি, তাই আলাপ-পরিচয় শীঘ্রই জমে উঠল। পশ্চিম উপকূলবাসী ভদ্রলোকের নাম বি, ভি, চন্দ্রা, আর দক্ষিণী ভদ্রলোকের নাম আনন্দ সাহু। খানিকটা আলাপ করেই বুঝলাম যে দুজনেই বেশ একটু interesting ধরণের লোক। চন্দ্রা মশায় এর পূর্বে বিলেত গিয়েছিলেন, খুব বিলেতের গল্প করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা বিলেতের আদব-কায়দা তাঁর মতো কেউ ভাল জানে না, কথায় কথায় তিনি আমাদের নানা বিষয়ে সাবধান করে দিতে লাগলেন। সাহু মশায় আবার অনেকটা এর বিপরীত। সাধারণ ভদ্রতারও বড়

ব্যাংককের বিখ্যাত মর্মর মন্দির

একটা ধার ধারেন না—প্রায়ই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ভাব—নিজের দিকে তাকিয়ে অপরের প্রতি লক্ষ্য দিবার বড় একটা অবসর পান না। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন যে তিনি একজন বিখ্যাত আধুনিক কবি এবং তাঁর রচিত কাব্য পৃথিবীর বহু ভাষাতেই নাকি তর্জমা হয়েছে—যদিও দুঃখের বিষয়, এঁর কাব্য পড়া দূরে থাক, এমন কি এঁর নাম পর্যন্তও ইতোপূর্বে আমার জানা ছিল না, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করতে হ'ল।

প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই চন্দ্রা ও সাহু মশায়ের মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠল। চন্দ্রা মশায় মহা-আড়ম্বরে stewardessএর কাছ থেকে কতকগুলি বিলাতী ম্যাগাজিন নিয়ে এসে পাতা উল্টাতে লাগলেন, আর সাহু মশায়কে এটা ওটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে লাগলেন। আমি ভাবগতিক দেখে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় সেরে একটু আলগা থেকে এদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। চন্দ্রা মশায়ের মাতব্বরি সাহু মশায় বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে না পেরে উল্টো মাতব্বরি সুরু ক'রে দিলেন। কেউই হঠবার পাত্র নয়। একজন হচ্ছেন বিলাতী আদব-কায়দা-দোরস্ত অভিজাত, আর অন্যজন হচ্ছেন কবি-দার্শনিক—সাম্যবাদী ইত্যাদি। সংঘর্ষ অনিবার্য। খানিকক্ষণ বাদানুবাদের পর চন্দ্রা মশায় সাহুকে বললেন, "আপনার সাধারণ বুদ্ধি বড় কম—"you lack in common sense!" আশ্চর্যের বিষয় সাহু মশায় কোন একটা সদুত্তর না দিয়ে মুখভার ক'রে গুম হ'য়ে বসে থাকলেন। এর পরেও চন্দ্রা-সাহুর মধ্যে অনেকবার কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাটি হয়েছে এবং প্রায় বারই চন্দ্রামশায়ই শেষ কথা (last word) বলেছেন, তার কারণ চন্দ্রামশায় বাক্চাতুরীতে অদ্বিতীয়।

K. L. M প্লেনে যাত্রীদের পান-ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা। নানা রকমারি মদ বিনা খরচে যাত্রীদের দেওয়া হয়। চন্দ্রামশায় আমাকে অনেক ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে অন্ততঃ বিয়ার (Beer) পান না করা ইউরোপীয় সমাজে অভদ্রতার সামিল। যদিও বিয়ার পান না করার দোষে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড সমাজে আমাকে অভদ্র ব'লে কেউ মনে করেছে এমন প্রমাণ পাই নি, তবু একথা সত্যি যে মদ খাওয়াটা এসব দেশের সমাজে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। মেয়েপুরুষ সবাই অবাধে মদ খেয়ে যাচ্ছে। মদ না খাওয়াটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক। ড্রিঙ্ক্ বলতে এরা মদ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। হোটেলে-রেস্তরায় না চাইলে পানীয় জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হয় মদ, নয় চা, নয় কফি। আর চাইলেও জল পাওয়া যাবে নিক্তির ওজনে বা নির্দিষ্ট পরিমাণে। দুপুরে বা বিকালে লাঞ্চ এবং ডিনারের পূর্বক্ষণে শহরের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য পানাগারে (bar) দেখা যাবে অগণিত তৃষ্ণার্ত নরনারীর ভীড়। মদের গ্লাস হাতে না নিয়ে এদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশাই ভাল ক'রে করা যায় না।

মদ না খেলেও প্লেনে soft ড্রিঙ্ক্ বা লেমনেড ও অরেঞ্জ স্কোয়াস পাওয়া যায়—তাই দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করায় বাধা নেই। যাহোক লাঞ্চ ও বৈকালিক চা-পান প্লেনেই সমাপন করা গেল। প্লেন ছুটেছে সগর্জনে দুর্নিবার বেগে। নীচে সমস্ত দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি পৃথিবীকে আড়াল করে রেখেছে। কখনো চকিতে ছিন্ন মেঘের রন্ধ্র দিয়ে নীচে জল-স্থলের ক্ষীণ, অস্পষ্ট ছায়াটুকু মাত্র দেখা যায়। বিমান ভ্রমণ এদিক দিয়ে বড়ই একঘেয়ে। শূন্যে ব্যোম অপরিমাণ—কিন্তু যাত্রীদের অবস্থা যেন অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়। মেঘ মুলুকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। রাশি রাশি মেঘ—কোথাও নিকষ কালো হয়তো বা বজ্রগর্ভ—ঢালবে তৃষিত ধরার বুকে অঝোর ধারা, কোথাও মেঘের রূপ শুচিশুভ্র, আবার কখনো সাতরঙা রামধনুর মতো আলো ঝলমল। মেঘরাজ্যের ভিতর দিয়ে বিমান চালনা বিপদজনক—প্রবল বায়ুস্রোত ও ঝড়ঝাপটার এলাকা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরুপদ্রব ঊর্ধ অন্তরীক্ষ পথেই বিমানের চলাচল পথ।

বেলা গড়িয়ে বৈকাল হ'য়ে এল। বিমান চালকের নির্দেশ মতো ঘড়ির কাঁটা ৩০ মিনিট এগিয়ে দিলাম। আমরা এখন শ্যাম রাজ্যের ব্যাংকক শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নীচে পিছনে পড়ে রইল বঙ্গোপসাগর ও বর্মা মুলুক।

বেলা চারিটায় আমরা ব্যাংকক বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলাম।

প্রবাদ আছে যে একবার ব্যাংককের বিখ্যাত এমারেল্ড বুদ্ধ মূর্তি দর্শন করলে আবার নাকি ভগবান বুদ্ধকে প্রণতি জানাবার জন্য ফিরে আসতে হয়। ভাল কথা। যদি ভগবান বুদ্ধের দয়ায় আবার ব্যাংকক আসতেই হয় তাতে দুঃখিত হব না। কারণ মাত্র যে তিনদিন ব্যাংককে ছিলাম তার মধ্যে ব্যাংককের সব কিছু ভাল করে দেখা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাতে শহরটি ও শহরের মানুষগুলিকে বেশ ভালই লেগেছে।

শহর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে বিমানঘাঁটি। K. L. Mএর মোটর বাসে প্রথমে মাইল তিনেক দূরবর্তী ডাচ্ পান্থশালা প্লাজ-উইকে (Plaswijck) যাত্রীদের নিয়ে আসা হ'ল। K. L. Mএর অতিথি হিসেবে এখানেই তিনদিন বাস করতে হবে।

চমৎকার ব্যবস্থা! প্লাজ-উইকের বাড়ীটি নাকি পূর্বে থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বা অধিনায়ক পিবুল সংগ্রামের পল্লীভবন ছিল, পরে K. L. M. কিনে নেয়। আন্তর্জাতিক বিমান পরিচালনা প্রতিষ্ঠানগুলির—বিশেষ ক'রে K. L. M (Royal Dutch Air Line) কর্তৃপক্ষের যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার তারিফ করবার যোগ্য। পয়সা এরা যথেষ্টই নেয় বটে, কিন্তু সুখসুবিধার ব্যবস্থাও ক'রে অকৃপণভাবে। কলকাতা থেকে ব্যাংকক-ম্যানিলা-বিয়াক হয়ে সিডনি অবধি রিটার্ণ টিকিটের দাম দিতে হয়েছিল তিন হাজার টাকার কিছু বেশী। রিটার্ণ টিকিট না কিনে এক তরফা টিকিটের দাম পড়ে আরও কিছু বেশী—যাতায়াতে চার হাজার টাকা।

কিন্তু বিমানে আরোহণ করার পর থেকেই যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য—আহার-পানীয়, থাকা. এমন কি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন সব কিছুর ব্যবস্থাই কোম্পানী করে থাকে। প্লাজ-উইকের সুপরিসর ও সুসজ্জিত কক্ষে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। পৌছানোর অব্যবহিত পরেই steward

প্রত্যেক যাত্রীকে কুপন দিয়ে গেল, সে কুপন দিয়ে পান্থশালার পানাগারে বিনা পয়সায় মদ ও অন্য পানীয় পাওয়া যেতে পারে। আমার কুপন কয়টি চন্দ্রামশায় নিলেন।

প্রাতঃরাশ, লাঞ্চ, বৈকালিক চা ও ডিনারের উত্তম বন্দোবস্ত রয়েছে। K. L. M. নিজেদের মোটরবাসে ক'রে যাত্রীদের প্রতিদিন শহরে নিয়ে যায় এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার বন্দোবস্ত করে দেয়—এর জন্য কোন পয়সা খরচা করতে হয় না।

তিনদিন ঘুরে ঘুরে ব্যাংকক শহর দেখলাম। বোম্বাইয়ের নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজর শ্রীযুক্ত নানাবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ভদ্রলোক খাতির ক'রে একদিন তাঁর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ ক'রে আপ্যায়িত করলেন।

ব্যাংকক্ শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত—মাঝখান দিয়ে নদী প্রবাহিত, নদীর দুই তীর সুপ্রশস্ত সেতু দ্বারা সংযুক্ত। বিমানঘাঁটির দিক হ'তে শহরে প্রবেশ করতেই প্রথমে চোখে পড়বে যুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ। তারপর দীর্ঘ ও চওড়া রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকলে ক্রমে রাজপ্রাসাদ, রাজা রামের অশ্বারূঢ় মর্মর মূর্তি, ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তরখানা, বড় বড় হোটেল, বাজার ও সারি সারি দোকান দেখতে দেখতে শহরের কেন্দ্রস্থলে আসা যাবে। যাত্রীদের পথপ্রদর্শক হয়েছিল K. L. M. কোম্পানীর কর্মচারী একটি থাই মেয়ে—নাম সুপীত, মেয়েটি তরুণী এবং সপ্রতিভ। বাসে যেতে যেতে রাস্তার দু'ধারের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় দিয়ে যেতে লাগল।

থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ ও ভারতবর্ষ এই দু'য়ের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বহু সাদৃশ্য ও সংযোগ বর্তমান রয়েছে। এদের নামগুলি যে সংস্কৃতজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বেশীর ভাগ লোকই হয় বৌদ্ধ, নয় খৃষ্টান। বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রচারিত হয়েছিল ভারতীয় তথা বাঙালী দ্বারা খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে।

বাঙালী ঔপনিবেশিকরা এক সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী বহন ক'রে এনেছিল। দ্বীপময় ভারতের নানা বিক্ষিপ্ত অংশেই আজও পর্যন্ত ভারতের সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে অসংখ্য মঠ-মন্দির, স্থানীয় লোকের ভাষা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, অভিনয়, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

"স্থপতি যাদের রচনা করিল বরোবুদুরের ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজ-ওঙ্কার ধাম তাদেরই মহান্ কীর্তি।"

ব্যাংককের বৌদ্ধ মন্দিরগুলি কবির উক্তি সমর্থন করছে। বিখ্যাত পো মন্দিরের এমারেল্ড বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে গেলাম। অনেকটা স্থান জুড়ে মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বর। নানা কারুকার্যখচিত মন্দিরের অভ্যন্তরে সু-উচ্চ বেদীর উপরে সমাসীন ভগবান তথাগতের ধ্যানমূর্তি। নীচে কার্পেটাচ্ছাদিত মেঝেতে জনকয়েক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পুণ্যলোভাতুর নরনারী মুদিত নেত্রে উপাসনা করছেন। বুদ্ধের ধ্যানমূর্তির পাদদেশে দুই পার্শ্বে দুইটি সুদৃশ্য পিলসুজে রক্ষিত তৈল-প্রদীপের আলোকে সেই বৃহৎ মন্দির-কক্ষের অন্ধকার নিবারিত হচ্ছে। মন্দির অভ্যন্তরে বেশ একটা শান্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিমণ্ডল।

প্রধান মন্দিরটিকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে অনেকগুলি কক্ষ। এই কক্ষগুলির প্রাচীরে অঙ্কিত আছে সমগ্র রামায়ণের মুখ্য আখ্যানগুলির তৈলচিত্র। ভারতের শাশ্বত মহাকাব্য রামায়ণ বৃহত্তর ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত!

শ্যামদেশীয় রামায়ণের ইংরাজী তর্জমা প্রকাশ করেছেন ইণ্ডো-থাই-সংস্কৃতি পরিষদ। ইণ্ডো-থাই পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ও প্রীতি স্থাপন। থাই রামায়ণে মূল রামায়ণের

ব্যাংককের রাজকীয় মন্দিরে—প্রহরীর প্রতিমূর্তি

আখ্যানটি অপরিবর্তিত থাকলেও প্রধান কয়েকটি চরিত্রের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে। যেমন রামায়ণ-বর্ণিত মহাবীর হনুমানকে আমরা জানি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পৌরুষ ও বীর্যবত্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে। থাই রামায়ণের হনুমান সাহসী বীর বটেন, কিন্তু কামুক ও পরদারগামী! ব্যাংককে থাকাকালীন বাঙালী শিল্পী শ্রীশুভো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল। তিনি সেই সময়ে ইণ্ডো-থাই পরিষদের উদ্যোগে ব্যাংককে তাঁর নিজস্ব চিত্রকলা ও ভারতীয় শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। কয়েকজন পাঞ্জাবী ও কাথিয়াবাড়ী ভদ্রলোকের দেখাও

পেলাম। এঁরা প্রায় সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে অনেকদিন ধ'রেই এদেশে আছেন। এঁদের মুখে গত মহাযুদ্ধের সময় এদেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। এদেশের ভারতীয়রা নেতাজীকে আদর্শ জাতীয় নেতা হিসাবে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করে।

১৩ই জানুয়ারী রবিবার বেলা চারটার সময় ব্যাংকক ছেড়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা অভিমুখে রওনা হলাম। আবার সেই শূন্য পথে এরোপ্লেনের সবেগ ও সগর্জন পরিক্রমণ সুরু হ'ল! সহযাত্রীদের মুখ কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। অনেকেই ব্যাংককে নেমে গেছেন—তাঁদের স্থান অধিকার করেছেন নবাগতের দল। আমার ঠিক পিছনের আসনেই বসেছিলেন একজন বৃহৎ-বপু ওলন্দাজ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ভারী আলাপী। খানিকটা বাদেই ঘাড়ে টোকা মেরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন "Having a nice trip?" অর্থাৎ এসো আলাপ করি। আমার পাশের শূন্য আসনে আমন্ত্রণ জানাতেই উঠে এলেন। তারপর কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। ভদ্রলোক সুরা রসিক। আমার মদ চলে না শুনে হাত নেড়ে হতাশার সুরে মন্তব্য করলেন "Ah! Half life's wasted?" আমি বল্লুম "I mean to waste the whole life!" তিনি আবার দু'হাত প্রসারিত ক'রে হতাশার ভঙ্গী করলেন।

এদিকে ভদ্রলোকের দু' পা ফুলে গোদের মতো হয়েছে—জুতো জোড়া পায়ে না পরে হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওদিকে পেগের পর পেগ গিলছেন। মাঝখানে একবার Pantry-র দিকে উঠে গেলেন! ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম "Interested in engine, are you?" হেসে বল্লেন "Oh no! Rather interested in gin!" খানিক বাদেই steward আবার মদ পরিবেশন ক'রে গেল।

এই চলল বেলা চারটা থেকে প্রায় রাত আটটা অর্থাৎ ডিনারের প্রাক্কাল পর্যন্ত।

সেদিনটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। ভেবেছিলাম মেঘলোকের উপরে চন্দ্রালোকিত নভোমণ্ডলের কতই না সৌন্দর্য প্লেনে বসে দেখা যাবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হ'ল। এরোপ্লেন ভ্রমণ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। ছোট্ট কাচে ঢাকা গবাক্ষ দিয়ে সীমাহীন দিঙ্‌মণ্ডলের সামান্য অংশটুকু মাত্রই চোখে পড়ে। কোথায় সেই চাঁদের হাসির বান—যা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে মুক্তধারায়! চাঁদের কাছে এসে যেন চাঁদকে হারিয়ে ফেলা! হঠাৎ হয়তো এক ঝলক চাঁদকে দেখা গেল গগন কোণে—যেন "ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা", আবার তার পরমুহূর্তেই সে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তার হদিস নেই! অন্ধকারময় মহাশূন্যে মানুষের অমিত স্পর্ধার নিদর্শন এই ব্যোমযান যেন উল্কার সংগে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে এক বিষম আবেগে।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে,
বিশ্ব-জগত নিশ্বাস বায়ু সম্বরি'
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।

হে যন্ত্র বিহঙ্গম অব্যাহত থাকুক তোমার গতিবেগ—চলুক তোমার সগর্জন পক্ষ-বিধূনন—

আছে মহা নভো অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

কিন্তু ক্রমেই বিমানের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে বিমানখানা নীচের দিকে নামছে বোঝা গেল। নামার সময় সামান্য একটু স্পন্দন অনুভূত হয়। নচেৎ বিমান ভ্রমণে এক কাণে-তালা-লাগা গর্জন ভিন্ন অন্য কোন রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হয় না। এক যদি বায়ু পরিমণ্ডলে কোন উপদ্রব থাকে বিমান-ভ্রমণ হয় তাহলে কষ্টদায়ক।

উপর থেকে গবাক্ষ-পথে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন সমস্ত ভূপৃষ্ঠে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-সাদা লক্ষ আলোর মেলা। নিশীথ নগরীর এক অপূর্ব অভিসারিকার বেশ। ম্যানিলার ঘাঁটিতে বিমানপোত অবতরণ করল রাত বারোটায়। বিমানঘাঁটি হ'তে শহর চার পাঁচ মাইল দূরে। অত রাত্রে শহর পরিভ্রমণের কোন সুবিধা হল না, তা ছাড়া ঘণ্টা দুই মাত্র বিশ্রামের পর আবার উড়তে হবে ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত বিয়াক দ্বীপের অভিমুখে। কাজেই কোনমতে বিমানঘাঁটির আফিসে বসেই দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। রাত দু'টোয় আবার সুরু হ'ল যাত্রা।

চলন্ত বিমানে ঘুম বড় একটা হ'ল না, যদিও স্প্রিংয়ের-আসন হেলিয়ে দিয়ে সারা দেহ কম্বলে আবৃত ক'রে অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকা যেতে পারে। তবে তন্দ্রার ভাব এসেছিল। তন্দ্রা কেটে গেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জগৎ সংসার আলোময় হয়ে উঠছে—নীচে বহুদূরে আবছা আবছা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জলরাশি। ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল—বুঝলাম আমরা এখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছি। অনন্ত বিস্তার নীল জলরাশির মাঝে মাঝে শাদা-রেখায় পরিবেষ্টিত ছোট বড় সবুজ দ্বীপ। এগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জেরই কোন না কোনটা। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি যে দ্বীপ তা বুঝা যায় না, মনে হয় যেন সমুদ্রেরই অংশ। কিন্তু ঐ শাদা রেখার পরিবেষ্টনটি হচ্ছে তরঙ্গতাড়িত শুভ্র ফেণার রেখা। আর এই দ্বীপগুলি প্রায়ই ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল ও অন্যান্য ট্রপিক্যাল বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, তাই সবুজ দেখায়। বিয়াকে অবতরণ করলাম সকাল ছটায়—স্নান ও প্রাতরাশের জন্য যাত্রীদের সময় দেওয়া হ'ল ঘণ্টা দুই।

বিয়াক ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত হ'লেও একটি বিচ্ছিন্ন ছোট্ট দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একখণ্ড সবুজ জমির ফালি! সারা দ্বীপটি গাছ-গাছালিতে ঢাকা—নারিকেলই অধিক, আর আছে অজস্র পেঁপে ও ডুমুর গাছ। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে আমেরিকানরা একটা বেশ বড় রকমের যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি করেছিল—তার চিহ্ন এখনও ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে প্রচুর দেখা যায়—পরিত্যক্ত ডায়নামো (dynamo), টারবাইন (turbine), ভাঙ্গা মোটর লরী ইত্যাদি। বিয়াকে এখন K. L. M এর একটা বিমান ঘাঁটি রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াগামী বিমানগুলি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। ইন্দোনেশীয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর হ'তে K. L. M বিমানপোত জাকার্টা বিমানপোতে অবতরণ করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। তাই K. L. M বা ডাচ্ বিমানগুলি বিয়াকের পথে চলাচল করে। কিন্তু B. O. A. C (British Overseas Air Company) প্লেন যথারীতি জাকার্টা হয়েই যাতায়াত করে। বিয়াকের লোকসংখ্যা অতি সামান্য। বিমান ঘাঁটি তদারকের কাজে নিযুক্ত জনকয় কর্মচারী—প্রায় সবাই ডাচ্ আর কয়েকজন নিউগিনির পলিনেশীয় অধিবাসী।

চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা এই ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীরা যেন সেই গল্পের রবিনসন ক্রুশো!

* * * *

বিয়াক থেকে সিডনি দীর্ঘ পথ। বেলা আটটায় রওনা হয়ে রাত প্রায় দশটায় সিডনির ম্যাসকট বিমানঘাঁটিতে নামলাম। অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মচারী মিঃ বারম্যান বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য। সে রাত্রে সিডনির ওরিএন্টেল হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন ভোরে আবার বিমানযোগে শেষ গন্তব্যস্থান মেলবোর্ণ যেতে হবে।

এ যাত্রায় সিডনি শহরের কিছুই দেখা হ'ল না। ১৫ই জানুয়ারী বিমানযোগে সিডনি হ'তে মেলবোর্ণ এসে পৌছলাম বেলা প্রায় এগারটায়।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শিবু পুনরায় সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বড় কর্ত্তা—

চাঁদমোহন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—বড় কর্ত্তা নয়, আমি যা ব'ল্‌বো তাই করতে হবে। দাদাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমরা মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে শিখেছ, কিন্তু চিরদিন তা চলবে না। তিন বছর, চার বছর সব খাজনা বাকী—এ কি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর না কি?

চাঁদমোহন কাজ ও অর্থ চিনেন, তাহার কাছে যুক্তিতর্ক, আব্দার যেমন নিষ্ফল, তেমনি স্নেহ-মমতা করুণা-সহানুভূতিও আশাতীত। প্রজাগণ তাই ম্লানমুখে একে একে ফিরিয়া আসিল।

গোপাল কাল রাত্রিতে একটা মানসিক ৺কালীপূজা করিয়াছেন। সারা দিনরাত্রি উপবাস গিয়াছে, পূজান্তেও তিনি বিশেষ কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাহার বয়স হইয়াছে, উপবাস আর তেমন সহ্য হয় না—কাজেই সকালে যখন ঘুম হইতে উঠিলেন তখন সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা জড়তা ও আলস্য জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছে। গত রাত্রির অনাহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনটা একদিকে যেমন বিষণ্ণ, অন্যদিকে তেমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—যজমানের মানসিক কালীপূজায় আহারাদি, গান বাজনা প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে কিন্তু পূজা করিতে বসিয়া তিনি দেখেন ৺মায়ের জন্য একখানা আট-হাতি শাড়ী আসিয়াছে। যজমান অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অর্থবান। গোপাল তাই বলিয়াছিলেন—এত খরচ করলে বাবা, কিন্তু ৺মাকে আট হাতি কাপড় পরালে? আর বাবাকে দু'হাতি গামছা?

যজমান জবাব দিয়াছিল—কাপড় ত মা পরবেন না, আপনার ছেলে মেয়েরা পরবে—ওতেই হবে—

গোপাল উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—৺মা ত খান না, তবে আর কেন নৈবেদ্য বলিদান প্রভৃতি দেওয়া? না দিলেই ত হয়, আর পূজা করবারই বা কি প্রয়োজন?

—এই একটু আমোদ করা, মেয়েরা ধর্ম্মান্ধ তাই—নইলে সবই ত অপব্যয় আর বামুনকে খাওয়ানো।

গোপাল বিরক্ত হইয়াছিলেন—চারিদিকে একই কথা, পূজা আর পূজা নয়, বিলাস ব্যসনের অঙ্গ মাত্র। এই উপেক্ষার দান গ্রহণ করিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, পূজায় মনঃসংযোগ হয় না কিন্তু উপায় নাই, জমিতে ধান জন্মে না, জন্মিলেও চাষীতে ফাঁকি দেয়। পূজার্চ্চনা কমিয়া গিয়াছে, পাওনা ততোধিক কমিয়াছে। সংসার চলে না, দুইটি ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়ে তাহাদের খরচ যথেষ্ট—

গোপাল বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন—আনমনে হুকা টানিতে টানিতে অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। মতিঠাকুর মহাশয় যখন মারা যান সে সময়ে হরি ইংরাজি স্কুলে পড়ে। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—হরি রইল দেখিস্ গোপাল—

গোপালের পিতার মৃত্যুর সময় তিনিও এমনি বলিয়াছিলেন, মতিঠাকুর সারাজীবন তাহা পালন করিয়াছেন। গোপালও নিজে না খাইয়া, জমি বন্ধক দিয়া হরিহরকে দুইটা পাশ করাইয়াছেন, জীবনে তাহার পড়ার খরচা জোগাইতে দুইখানির বেশী কাপড় তাহারা পরেন নাই—শেষ পরীক্ষার ফি দিবার সময় গোপালের স্ত্রীর হার বাঁধা দিয়াছিলেন তাহা সুদের দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—আজ হরি ভাল চাকুরী করিতেছে যদি মাসে দশটা টাকা সাহায্য করিত, তবে এই অবহেলা ও উপেক্ষার দান আর তিনি গ্রহণ করিতেন না।

যজমান একটা লোকের মাথায় একটা ঝুড়িতে পুরোহিতের প্রাপ্য জিনিষপত্র আনিয়া কহিলেন—কাল হঠাৎ চলে এলেন ঠাকুর মশায়, আপনার জিনিষপত্র সব তাই নিয়ে এলাম। পূজার পরে একটু কিছু খেলেন না—

লোকটির কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া গোপাল বিরক্ত হইলেন। কহিলেন—তোমরা তখন গান বাজনায় ব্যস্ত ছিলে তাই আর বিরক্ত করিনি। পূজার পরে মণ্ডপেও

কেউ ছিলে না, তাই চলে এলাম—পূজার প্রয়োজন যখন নেই—তখন আর আমি থাক্‌বো কেন ?

লোকটি হাসিয়া কহিল—ও রাগ করে চলে এলেন, তা আমি এমন ত কিছু বলি নি। না খেয়ে চলে এলেন উপবাসের পরে—মা বলছিলেন।

গোপাল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—তোমরা ত ভাবো নি সেজন্যে—

—আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম গান বাজনায় তাই। আপনার জিনিষপত্র রইল—

—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ঐ অবহেলার পূজার কুণ্ঠিত দানকে আমি গ্রহণ ক'রবো না—নিয়ে যাও—

—তা কি হয়, ঠাকুরমশাই। আপনি রাগ ক'রছেন—আর আজ মা ব'ললেন আমাদের ওখানে খাবেন—

—না, খেতে পারবো না—তোমার মাকে ব'লো—

লোকটি সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের এই অভিমান ও অসঙ্গত ক্রোধ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল—আচ্ছা আসি তাহ'লে ঠাকুরমশায়—

—ও সব নিয়ে যাও—

—তা কি হয় ঠাকুরমশায়। না হয় নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করে নেবেন।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া লোকটি চলিয়া গেল—

গোপাল দ্রুত হুকা টানিতেছিলে—এমনি করিয়া অসম্মান বরণ করিয়া আর কতদিন জীবন ধারণ করা চলিবে। তাহার কর্ত্তব্য, চিন্তা সবই যেন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিক্ষকও নাই, গুরুও নাই, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষাও অনাকাঙ্ক্ষিত, তবে এ দান কেন গ্রহণ করিবেন।···হরিকে বলিলে যদি সে দশটা টাকাও দেয় তবে হয়ত এ অসম্মানকে আর বরণ করিতে হয় না। কিন্তু হরিকেই বা কেমন করিয়া বলেন যদি সে আজ স্বেচ্ছায় কিছু না দেয়। সে ত প্রচুর রোজগার করে কোনদিনই ত কিছু দেয় নাই—তবে কি করিয়া তিনি চাহিবেন ?

হরির ছেলেমেয়েরা আধুনিক জামা গায়ে ঘুরিতেছে; সে ত পূজার সময়ও তাহার ছেলেদের জন্য কিছু আনে নাই, দিবার শক্তি থাকিলেও হয়ত ইচ্ছা নাই, কাজেই বলা চলে না। সংসারের এই অনটন দেখিয়াও সে ত দেখে না—তবে ছেলেমানুষ—অত বুঝিয়া সুঝিয়া চলিবার মত বুদ্ধি হয়ত তাহার হয় নাই—এই ত সেদিনের ছেলে—

গোপাল মনে মনে যখন হরিকে প্রায় ক্ষমা করিয়া ফেলিয়াছেন এমনি সময়ে হরি আসিয়া তাহার সামনে বসিল। গোপাল মুখ তুলিয়া কহিলেন—কি হরি ?

—ছুটি ফুরিয়ে এল; পরশু যেতে হবে—

—ও আচ্ছা দেখি, দিনটা ভাল ত ? গাড়ী একখানা চাই কেমন ? আচ্ছা—

—একটা কথা ব'লব ভাবছি—

—বল বাবা বল, আমিও ঘুরেই বেড়াচ্ছি। কথা ব'লব, দু'দণ্ড তোমাদের নিয়ে কাটাবো তার সময়ই নেই।

গোপাল মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সংসারের অবস্থা বোধহয় হরি বুঝিয়াছে এবং কিছু সাহায্য করিবে বলিয়াই হয়ত বা কিছু বলিতে চায়। গোপাল মনে মনে আশান্বিত হইয়া কহিলেন—বল বাবা বল—তোমরা বড় হ'য়েছ বলবেই ত ?

হরি মাথা নত করিয়া কহিল—চাকুরী যা করি তাতে ত সংসার চলে না। পড়াশুনো আছে, মেয়েও ত বড় হচ্ছে—বিয়ে দিতে হবে—

গোপাল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—চলে না ?

—এখানে হলে চলত কিন্তু শহরে থাকি, ভদ্রলোকদের সঙ্গে থাকতে হ'লে একটু কাপড় জামা গয়নাপত্র লাগে, একটু ষ্টাইলে থাক্‌তে হয়—মানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্‌ লিভিং সেখানে ত বেশী—

গোপাল শঙ্কিতভাবে কহিলেন—ও তাই—

—বলছিলুম, জমি জাতির—মানে—ধান-পানের হিসাবটা একটু দেখতাম, আমার অংশের ধান—

গোপাল বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, যেন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পরে কহিলেন—হিসাব কিছু ত রাখিনি বাবা—কোনদিনই রাখা হয় না—

হরি মৃদুকণ্ঠে কহিল—কিন্তু রাখা ত দরকার।

—তোমার বাবাও কোনদিন হিসাব রাখেন নাই, আমিও রাখিনা—আমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবাকে বলে গিয়েছিলেন তিনি সারা জীবন পুত্রাধিক স্নেহে

আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তোমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন—আমি যথাসাধ্য করেছি—কিন্তু ধানের হিসাব ত কোনদিন কেউ রাখেনি—

কথাগুলি শুনিয়া হরি লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু কেন যেন তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিল। গোপাল বুঝিলেন সে যেন আরও কিছু বলিতে চায়; তাই কহিলেন—আমাদের ভাবনার সঙ্গে তোমাদের মত শিক্ষিত লোকের ভাবনা ঠিক মিলে না, তোমরা যা বল তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, যা বল্‌বে স্পষ্ট করে বল বাবা—তাতে দোষের কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই—

হরি ঢোক গিলিয়া কহিল—সংসার চলে না মানে—যেমন চলা উচিত তেমন চলে না, তাই আমার একটা অংশ ত আছে সম্পত্তির—

গোপাল কহিলেন—নিশ্চয়ই আছে, সে অংশ যদি তুমি নিতে চাও তবে এখন থেকে হিসাব রাখবো, ধান নিয়ে যেও—তা'তে তোমার লজ্জার কি আছে—

হরি এইবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল—সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল—

গোপাল পুনরায় তামাক সাজিয়া টানিতে লাগিলেন—এবার তাহার কোটরগত চোখ দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে ঠাকুর পূজার জন্য উঠিয়া পড়িলেন—স্নান, পুষ্পচয়ন ও পূজা ত করিতে হইবে। মধ্যস্থল হইতে একবার কহিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ—তাহার পর গামছা কাঁধে করিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন।

হরিহরের স্ত্রী আধুনিক শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের বাড়ী এবং শিক্ষিতাও বটে অর্থাৎ সামান্য ইংরাজিও পড়িয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিহর যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউন ব্যক্তিত্ববতী বড়লোকের মেয়েটির নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব মতামত বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না—

রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্ত্রী কহিলেন—কবে যাচ্ছো? এখানে কি থাকা যায়?

—শিগগিরই যাবো।

—এতগুলো টাকা খরচ করে এখানে এসে এই কষ্ট ভোগ করে কি লাভটা হ'ল তোমার? এ টাকায় মেয়েটার দু'টো রুলি হত!

—সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল এই—

—তোমার কাকা কি ব'ল্‌লেন?

হরি একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। স্ত্রী কহিলেন—সে জানি, যেয়ে মিউ মিউ করেছ—কেমন ত?

হরি কহিল—বাবা ম'রবার পর আমাকে কাকাই মানুষ ক'রেছেন, তাঁকে ভাগ বাটোয়ারার কথা বলি কি করে? বিয়ের সময় কাকীমা গলার হার খুলে তোমাকে দিলেন—সে সব ত জানো—

—তবেই তুমি সংসার করেছ। এ বিদ্‌ঘুটে গাঁয়ের বাড়ীতে আমি থাক্‌তে পারবো না। ওখানে বাড়ীটা তা হ'লে করবে না ত? তোমাকে মানুষ যেমন করেছেন তেমনি তোমার সম্পত্তির সবই খেয়েছেন, ট্যাঁক থেকে ত কিছু করেন নি?

—তাতে কি সব হ'য়েছে—

—না হোক্‌, নিজের ন্যায্য অংশের ধান টাকা চাইবে তাতে লজ্জা বা সংকোচের কি আছে?

হরি অসহায়ের মত কহিল—হিসাব রাখবেন ব'ল্‌লেন—

—তা হ'লেই সব হল। হিসেবের কাগজ গলায় মাদুলী করে ঝুলিয়ে রাখো, তাতেই সব হবে। একটা কথা বোঝো না, তোমার যদি এমন তেমন হয় তবে আমি যাবো কোথায়, ঐ সামান্য লাইফ্‌ইনসিওর ছাড়া কি আছে? একটা বাড়ীও ত নেই যে মাথা গুঁজবো—যা সোনা আছে মেয়ের বিয়েতে ত চলে যাবে—

হরি মৃদু প্রতিবাদ করিল—বাবা ত লাইফ্‌ ইন্‌সিওর করেন নি, তাতে আমি ত ভেসে যাই নি—

স্ত্রী কহিলেন—হ্যাঁ সেরা বুঝ্‌ বুঝেছ, বুঝেছি আমার অদৃষ্টে অনেক আছে, তবে সে জব্দ করতে পারবে না, গলায় দড়ি দেওয়া ত কেউ ঠেকাতে পারবে না—

তাহার পরে যাহা হইল সেটি সহজ বোধ্য—স্ত্রীর শেষ মারণাস্ত্র চোখের জল ছাড়িয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন—যেন হরিহর সত্যই পরলোক যাত্রা করিয়াছেন এবং স্ত্রী নাবালক পুত্র কন্যা লইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াই-

য়াছেন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

শিমুল-বনের ধারে শালবনের নতুন কচি সবুজ পাতা বর্ষান্তে গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ ভূমি বর্ষার জলে ধৌত হইয়া চিক চিক করিতেছে। নতুন নতুন মসৃণ পরিষ্কৃত পাথর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মাঠে নতুন ধানে সবে মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। বর্ষাস্নাত শারদীয় পৃথিবী অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে—

বলাই, নিতাই ও শিবদাস গরুগুলিকে শালবনে ছাড়িয়া দিয়া মহুয়া তলায় তিনখানা পাথরে বসিয়া কথা বলিতেছিল। মসৃণ পাথরের গোড়াটা পাচনী দিয়া খুঁচিতে খুঁচিতে শিবদাস কহিল—খাজনা দেওয়ার কি করবেক রে নিতাই—

নিতাই বলিল—কোথা থেকে দেবেক, গরু বেচবেক না হাল বেচবেক—যা হয়—হোক্ কেনে—

শিবদাস ভীত হইল—ছোটবাবু জমি কেড়ে লেবেক, খাবেক কি? জমিদার—

বলাই বলিল—কি করবেক, তুবিঘা জমি কর্ত্তা দেওয়া করলেক, খাজনা আড়াই টাকা—উ লেয় লেবেক, খাদকে চলে যাবেক—দেশান্তরী হবেক—

নিতাই কহিল—এক কাজ কর কেনে—বসন্ত সায়রে মাছ ধরা কর্, কেনে ভিনগায় বেঁচে খাজনা দে কেনে—এ কার্ত্তিক মাসে কে টাকা দেবেক—

বলাই কহিল—চুরি করবেক কেনে? নেই ত দেবেক নাই—ছোটবাবু ত সব লয়, বড়বাবু ত রইছেন—

শিবদাস কহিল—বড়বাবু ত আর জমিদারী দেখা করবেক নাই—ছোটবাবুই ত দেখা ক'রবেক—

বলাই কথাটা অনুমোদন করিল না। সে কহিল—কি হবেক, কি করবেক শুনি? খাজনা মোরা দেবেক নাই—

—খাস জমি কেড়ে লেবেক।

—কে হাল দেবেক বল? তু দিবি? না হয় মোরা দেবেক, বাবু ত জমি চষবেক নাই—সব মোরা খাজনা দেবেক নাই; কি করবেক?

শিবদাসের ভয় ছিল, যে খাজনা দিবে না তাহারই জমি ছাড়াইয়া লইবে, অতএব তাহার আর উপায় নাই। বলাই প্রস্তাব করিল যদি সকলেই খাজনা না দেয় তবে কাহার জমি ছাড়াইবে এবং কাহাকেই বা দিবে? জমি ত বাবু নিজে চাষ করিবে না! এ প্রস্তাব সাধু সন্দেহ নাই কিন্তু শিবদাস কহিল—খাজনা ত বাউরীপাড়ার কতক দেওয়া করবেক—ধান ছিল বেচা করলেক। মোদের বটু, ফকির, ভজি ত খাজনা দেওয়া করলেক বটে—

বলাই এবার বিপন্নমুখে কহিল—তবে ত বিপদ করলেক বটে!

নিতাই কহিল—তু মাছ ধর কেনে—দু'টো মাছ ধরা কর, খাজনা হবেক বটে!

বলাই রুক্ষস্বরে কহিল—মোরা খাজনা দেবেক নাই, জমি ছাড় হলে খাদকে যাবেক—

একটা গরু শালবনের সীমানা ছাড়িয়া ধানের মাঠে নামিতে যাইতে ছিল, বলাই সেইটার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালাগালি দিয়া ছুটিল এবং ছোটবাবুর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল গরুটিকে নিদারুণ প্রহার করিয়া।

রাত্রি নিশীথ—

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের অস্তায়মান ক্ষীণ চাঁদ—পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় পৃথিবী নিদ্রাতুর। নিতাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বলাইকে ডাকিল—বলাই চল্, বসন্ত সায়রকে মাছ ধরা করি—

বলাই চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া কহিল—তু যাবি?

—হঁ্যা বটে, মাছ ধরা করবেক, খাজনা দেবেক—

বলাই কি যেন ক্ষণিক ভাবিল, তাহার পর কহিল—নাঃ মু যাবেক নাই—

নিতাই ধীরে ধীরে যাইয়া শিবদাসকে ডাকিল—শিবুদা, চল্—

শিবু উঠিল। গোটা দুই তোগী ও জাল লইয়া বসন্ত সায়রে উপস্থিত হইল। তোগী দুইটিকে সায়রের ঘাটে রাখিয়া তাহারা জাল লইয়া নামিল। বর্ষায় জল অনেক বাড়িয়াছে; সাধারণ জালে মাছ ধরিবার উপায় নাই। তবে টানা জালে ঘাট ঘিরিতে পারিলে ঘেটেল মাছ দুই একটি ধরা পড়িতে পারে। প্রথম ঘাটটা ঘিরিতেই একটা সের তিনেক

কাতলা মাছ ধরা পড়িল। ভোরের পূর্ব্বে তিনটি মাছ প্রায় বারসের মত ধরা পড়িয়া গেল। নিতাই কহিল—শিবু দা তু যা কামারডাঙ্গাকে, মু যাবে মামুদপুর—মাছ বেচা করে ফিরচি—

—হ্যা, তাই চ—

তাহারা দ্রুত মাছ লইয়া চলিয়া আসিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ভিন্নগ্রামে রওনা দিল। চারিটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপাততঃ ছ'মাসের খাজনা দিয়া রেহাই পাওয়া যায়।

গোপালপুর হইতে নিকটবর্ত্তী গঞ্জ প্রায় বার মাইল দূরে। গ্রামের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামের ব্যবসায়ীরা ঐ গঞ্জ হইতে আনে এবং গ্রামে বেচাকেনা করে। গোবিন্দ তিলির ছেলে বংশী মুদিখানার দোকান করে। তাঁতিদের মধ্যে নবীন তাঁতি মনোহারী দোকান করে এবং হারু তাঁতি হাটে হাটে কাপড়ের দোকান লইয়া বেড়ায়। গোপালপুরের বারোয়ারী তলার অদূরে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। তাহাতে সব জিনিষই পাওয়া যায়, গ্রামেও সাধারণ প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। বংশীর দোকানই বড়—কুলুদের অনেকেই গাড়ী চালায় এবং চাষ আবাদ করে—এমনি করিয়াই এই তিরিশ বছর তাহারা বাঁচিয়া আছে। দুই চারখানা তাঁত চলে, তাহাতে গামছা ও মশারীর থান হয়।

কোজাগরীর পরে অকস্মাৎ একদিন মেঘ করিয়া প্রথমে ঝিম ঝিম করিয়া পরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল এবং বর্ষার বর্ষণান্তে এই সামান্য বৃষ্টিতেই পথঘাট এবং মাঠ কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল—চাঁদমোহনের যাইবার কথা ছিল কিন্তু তিনি রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

দুই-তিনদিন ধরিয়া ঝিম ঝিম বৃষ্টি হইতেছে—সারদা মল্লিকের ছেলে বিষ্ণু সরিষার তেল কিনিতে গিয়াছিল বোতলটা দরজার সামনে নামাইয়া, ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া পা মুছিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। বংশী কহিল—

—কি বিষ্ণুদা, স'রষের তেল চাই নাকি ?

—হ্যাঁ হে বংশী। আরও জিরে চাই, নুন চাই—

—চাইত খুড়ো—কিন্তু মাল যে নেই। গাড়ীত গঞ্জে যায় না, সারা দিন ঘুরে ডবল ভাড়া দিয়েও গাড়ী পেলাম না—

—কিছুই নেই কি ?

—নেই ঠিক তা নয়, তবে কি জানো—অবশ্য তোমাকে ফেরাই কি করে ?

—তা ত' বটে, কিন্তু ব্যাপার কি ?

—দরটা চড়ে গেছে—আমদানী নাই ত! সরষের তেল ছ' আনা হলে দিতে পারি, তাও এক পো—আর—

বিষ্ণু চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—বল কি বংশী, চার আনার বদলে ছ আনা—এ যে মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা আরম্ভ ক'রলে—

—তবে ঠাকুর, যেখানে পাও যাও, আমার তেলই নেই —তার দেব কি ?

বিষ্ণু কহিল—এটা কি ধর্ম্ম হ'ল বংশী। কায়দায় পেয়ে এমনি টাকা আদায় করা—

বংশী কহিল—ঠাকুর টাকা রোজগারটাই ত ধর্ম্ম। তাছাড়া আর কি ধর্ম্ম আছে বল? গরীব বলে চোখ রাঙাচ্ছো ত, ছোটবাবু যে খাজনা আদায় ক'রছে তাতে ত কিছু বলছ না —

বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সোজা ভগবতী চাটুয্যেদের কাছারীতে আসিয়া উঠিল। চাঁদমোহন বসিয়া খাজনা আদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাহার নিকট বংশীর ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া কহিল—আপনি ছোটবাবু, জমিদার, আপনি থাক্‌তে এমন অনাচার হবে আপনি দেখবেন না!

চাঁদমোহন কহিলেন—অন্যায়, নিশ্চয়ই অন্যায়। লাভ সে পাবে কিন্তু একেবারে দেড়া দাম—কালী বংশী তিলিকে ডাকতো—

কাছারী হইতে আহ্বান পাইয়া বংশী আসিল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আলিসায় বসিল। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন—তেল ছ'আনা চেয়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দর হ'য়েছে—

—তাই বলে দেড়া দাম চাইছ এটা কি হ'ল—

বংশী কহিল—ব্যবসায় লাভ ক্ষতি আছেই, সুবিধে পেলে লাভ হয়। আজ্ঞে তাই। আর ব্যবসাটা ত টাকার জন্যেই করি হুজুর—

—তা বটে, কিন্তু লাভের একটা সীমা আছে ত ?

বংশী হাসিয়া কহিল—হুজুর একটিন তেল আনবার জন্যে দুই টাকা দিয়েও লোক পাইনি। গাড়ী ত বন্ধ—নিজে মাথায় ক'রে এনেছি তা আমি কি দু'টো টাকা পাবো না! আর টাকার জন্যে আনিনি হুজুর—গ্রামের লোক তেল পাবে না আমি থাকতে, এই জন্যেই আমি মাথায় করে এনেছি হুজুর। আপনি ধর্ম্মাবতার, বিচার করে দেখুন আমি দুটো টাকা মুনাফা পেতে পারি কি না ?

বিষ্ণু কহিল—তুমি আবার কবে গেলে গঞ্জে বল ?

বংশী হাসিয়া কহিল—ঠাকুর মশায় বৃষ্টিতে আপনি ঘর থেকে বেরোন নি আপনি জানবেন কি করে—এর নাম ব্যবসা—

উপস্থিত সকলেই বুঝিল এ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিও কিছু দিল না। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন—খাজনা আদায় ক'রছি বলে তুমি কি বলেছ ?

—টাকার দরকার বলেই হুজুর খাজনা চাইছেন, তাই বলেছি। আমিও টাকার দরকার বলেই ব্যবসা করি, বৃষ্টিতে যখন সকলে ঘরে শুয়ে থাকে আমি তখন ভিজতে ভিজতে গঞ্জে যাই—আজ্ঞে এই বলেছি হুজুর।

চাঁদমোহন যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া কিছু পুঁথিগত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বংশীকে বিদায় করিলেন। বংশী দোকানে ফিরিয়া আসিতেই বিষ্ণু আসিল। বংশী কহিল—তেল নেই ঠাকুর, ফুরিয়ে গেছে—এবং মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল। নিতাই একছটাক তেলের জন্য দোকানে আসিয়া তেলের বোতলটা দিল। বংশী কহিল—আট আনা সের, ইচ্ছে ক'রলে নিতে পার—

নিতাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু কহিল—এই যে নেই ব'ললে!

—তুমি ত বড় বেয়াড়া লোক ঠাকুর, আট আনা হ'লে আছে, নইলে নেই—বুঝলে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কে ক'রছে বল ? সকলেই টাকার পূজো আরম্ভ করেছে আমরাও করেছি।

বিষ্ণু বোতল হাতে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বন্দী

আশা দেবী

অরণ্যের স্বপ্ন দেখে
টবে রাখা ঝাউ শিশুগুলি
প্রাণ নাই—স্নেহ নাই—
আছে শুধু সীমাহীন কঠিন বন্ধন
থেকে থেকে ভেসে আসে
আরণ্যক ঝড়ের ক্রন্দন।

আন্দোলিত শাখাগুলি—বাহুতুলি
ডাকে যেন আয়— :
দু-বাহু—পশারি ডাকে
রুদ্ধবাণী—মৌন ইশারায়।
তবু পারে নাকো যেতে
বন্দী কাঁদে রুদ্ধ বেদনায়

মরা পাতা ঝরে পড়ে
অশ্রু ভরে কানায় কানায়।

বসন্ত আসে না হেথা
চাঁদ হেথা নিষ্প্রভ মলিন :
প্রাণের মাধুর্য্য রসে উদ্বেলিয়া
হয় না ফেনিল।
যৌবনের পূর্ণতার গান—
মর্ম্মরিয়া—শিহরিয়া মনোবনে
আনে না তুফান।
শুধু আছে বেঁচে থাকা
আর আছে হাত তোলা স্নেহ
পূর্ণ হতে দেবে না তো

দেবে না তো তারে—
মুক্তি আর ঝড়ের আকাশে॥

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

১১।১১।২৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। এরমধ্যে তুমি যে বিন্ধ্যাচলে[১] গিয়েছো তা ভাবিনি। বরঞ্চ আমি ভাবছিলাম সেদিন নরেনের ওখান থেকে ফিরে আসতে হ'ল সে ছিল না বলে—আর একদিন এরই মধ্যে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।

বিন্ধ্যাচলে আমাকে যেতে বলচো এ খবরে মন খুসিতে ভরে উঠলো। কিন্তু এখন আমার কোথাও যাবার একতিল সময় নেই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাসাধ্য পুরস্কার পাওয়া গেছে। স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হয়নি বটে, কিন্তু দিদির এক দেওরকে[২] মূল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয়নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যো হয়েচে।

দ্বিতীয়তঃ আগামী কংগ্রেসের[৩] ভারী গোলযোগ বেধেছে। পরশু সুভাষ[৪] ধরেছিল যে দিনকতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে দিতে। মিটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।

শরীরটার সম্বন্ধে ঠিক করেছি আর একটা কথাও বলব না। তুমি কেমন আছ? এইবারে পারো যদি ওটাকে আর একটু মজবুত করে ফিরে এসো।

মাঝে মাঝে ভাবি চোখ কান বুজে যদি একবার কোথাও নিরালায় পালাতে পারি তো বাঁচি। ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে—এ আচ্ছা হাঙ্গামায় নিজেকে জড়িয়ে তুলেচি। মনের শান্তি ও দেহের স্বস্তি দুই নষ্ট হতে বসেছে। শুধু একটা বাঁচোয়া যে নিজের কাজের ফন্দ এখনো খবরের কাগজে বার হতে পায় না। এটুকু কোনমতে সামলে যেতে পারচি এই সৌভাগ্য।

তুমি আমার সেবার ভার নিতে যে চেয়েচো সে কেবল তুমি আমাকে চেন না বলে। এ পৃথিবীতে কেউ পারে না দিন দুই তিন এ কাজে নিযুক্ত হও যদি তো বলবে বড্ড গেলে বাঁচি। পরীক্ষা করে নিতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যে স্নেহটুকু এখনও আছে, সে খাটুনিতে পড়লে তার লেশটুকুও আর থাকবে না। ৭।৮ বার চা'ই খাই—নিজে এতবার কি তৈরী করে দিতে পারবে? অন্য খাওয়া দাওয়ার বালাই বেশি নেই; কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটার জ্বালায় কারো বাড়ীতে কখনো থাকতে সাহস করি নে।

তোমরা কতদিন ও দেশে থাকবে? লাহোর[৫] থেকে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবার সময়ে কি ওখানে একবার তোমাকে দেখে আসবার সুবিধে পাবো?

ছেলেবয়সে একবার একজনের[৬] নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম—তোমার চিঠিটা পড়ার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। এক একটা কথা

১। এই সময় রাধারাণী দেবী তাঁর পিতার সহিত বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র এঁদের গ্রাম সামতাবেড়ে এসেই বসবাস করেছিলেন।

৩। এই সময়ে বাঙ্গলা কংগ্রেসে দু'টা দল দেখা দিয়েছিল। একদলের নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপর দলে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৪। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৫। লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এক সাহিত্য-সভায় যোগদান করবার জন্য শরৎচন্দ্র এই সময় লাহোর গিয়েছিলেন।

৬। শরৎচন্দ্র যৌবন-প্রভাতে তাঁর জনৈকা সাহিত্যানুরাগিণীর আমন্ত্রণে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না—অথচ ভোলা ছাড়া আর কি?

যাক্ সে কথা। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমার—বড়দা

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু

রাধু, চিঠির জবাব না দেওয়ায় লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখানো আমার ভার হয়ে উঠেচে। রোজ ভাবি আজই চিঠি লিখবো, অথচ রোজই পড়ে থাকে। আর ক'টা দিনইবা বাঁচবো, দাদার এই মজ্জাগত ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে নিয়েই মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। খবর পেলে মনে মনে যে কি আনন্দ পাই সে তোমরা বুঝবে না। আর বুঝলেই বা কি মাপ আছে? মানুষের মনতো। তখুনি ভেবে নেবে দাদা বড় বলেই আমাকে অবহেলা করলেন, যাক্, আমিও আর চিঠিপত্র কিছুই লিখব না। এমনি করে এ জীবনে কত পরমাত্মীয়ই না পর হয়ে গেল।

অর্শ নিয়ে প্রায়ই ভুগি, মাঝে মাঝে ভালও থাকি। তখন এক আধবার কলকাতায় যাই। আর অসুস্থ বললেও সব সময়ে রেহাই পাইনে বলেও যেতে হয়। এমনি একটা দিনেই গিয়ে Presidency Collegeএ দু'চারটে কথা[৭] বলেছিলাম। তুমি বোধকরি খুসি হ'তে পারোনি, না?

যে বিশ্রী পথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয় এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্য্যন্ত না উঠলো তো আর পাড়াগায়ের মর্য্যাদা রইলো কোথায়?

শীতের সময় একবার এসো। তখন কাদাও থাকবেনা, মাঠের পথও পড়বে। বেশি হাঁটতে হবেনা। পাঁচ ছ'দিন পরে ভাবচি নরেনদের ওখানে একবার যাবো, সেই সময়ে যদি সুযোগ মেলে তো তোমাকেও দেখে আসবো। কাল নরেনের খেলার পুতুল ডাকে এসে পৌছল। রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি, আজ রাত্রেও পড়বো। সে বেশ লেখে। এমনি যদি কোথায় থামতে হয় এ কৌশলটাও জানতো। তোমার লেখা যেখানেই বার হোক আমার নজরে পড়ে। কারণ সব মাসিকপত্রগুলোই প্রায় বিনা পয়সায় পাই। রাধু স্বাধীন অভিমতটা যেন কুসংস্কারে গিয়ে না দাঁড়ায়। তারও সীমানা আছে এবং আছে বলেই তার মূল্য।

এখন কেমন আছো? আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩৩৬

বড়দা

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু

রাধু, তোমার বইখানি[৮] পাবার পর থেকে প্রায়ই ভাবতাম কবিতা নিয়ে কথা কইবার অধিকার ভগবান যদিবা নাই দিয়ে থাকেন, অন্ততঃ বইখানি পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি এ খবরটাও তো দিতে পারি। তাই কেন না দিই? এমনি ভাবি আর দিন যায়। অবশেষে শিলঙ[৯] থেকে এলো চিঠি—এলো নিমন্ত্রণ। মনে মনে লজ্জার অবধি রইল না—স্থির হ'ল এবার আর দেরি নয়—জবাব একটা দেবই দেব। কিন্তু আবার ভাবি আর দিন যায়—এমনি করে ভাবতে ভাবতে আজ দুপুর রাত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার করে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ কোরবই কোরব। কাল সকালেই যেন ডাকে দিতে পারি।

কিন্তু জানোইত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'জলাশয়' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।

৭। ১৩৩৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দনের উত্তর।

৮। "লীলাকমল" নামক কাব্যগ্রন্থ।

৯। রাধারাণী দেবী এই সময় তাঁর পিতার সহিত শিলঙ বেড়াতে গিয়েছিলেন।

হয়নি ত বটেই, কিন্তু হয় যে কি কোরে সেও তো বুদ্ধির অতীত, সুতরাং আমার মত সুধীব্যক্তি যত্ন করে এ বই যদি পড়েও থাকেন তাতে তোমাদের মত কবিদের আনন্দ দূরে থাক সান্ত্বনাটাই বা কি?

বুড়ি[১০] ছেলেবেলায় কবিতা লিখতো, মন্দ নয়, সে এটা বোঝে; তাকে যদি পাঠাতে বোধকরিবা—এমনতর অযোগ্যের হাতে তুলে দেওয়ার আক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। জলধর দাদার[১১] 'অভাগী' বেরিয়েচে; আমাদের বাড়ীর ইনি[১২] পড়েন আর কাঁদেন। চোখমুখ ফুলে উঠলো, আমাকে কাছে পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বললেন, কি যে ছাইপাশ তুমি লেখো,---এমনি একখানিও যদি লিখতে পারতে!

পারিনে তা মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যাপারটা কি ওতে?

বললেন—ব্যাপার! এই ছাখো সতীত্বের তেজ!

দেখা গেল—অভাগী তখন কাশীতে। সেখানে দারোগা, কনেষ্টবল, বাড়ীওয়ালা, পাণ্ডা, সন্ন্যাসী সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা করে হার মেনেচে। অভাগা অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পেয়ে গেছে। কেউ তার কিছুই করতে পারেনি!

কেউ যে কিছুই করতে পারবেনা সে আমিও জানতাম, তবু তর্কে হারবার ভয়ে বোললাম, বইতো এখনো শেষ হয়নি, এরি মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হোয়োনা। এখনো কাশীর বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত!

তখনকার মতো মান থাকলো বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবেনা এও জানতাম। থাকেও নি!

সে যাক্, আমার মুখ থেকে 'লীলাকমলের' আলোচনা তোমার কাছেও হয়ত ঐ রকমই ঠেকরে। তাছাড়া বাইরে থেকে যে একটু শিখবো তারই কি যো আছে? কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি—অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ-কে এক লীলাময়[১৩] লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয়নি। এর সব খারাপ। এমন কি যতীনের[১৪] ছবিটা পর্য্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম রাখতেন 'সূর্য্যমুখী' একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।

এমনি সব সমালোচনার নমুনা! আমার নিজের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। প্রথম যেদিন তোমার বই এলো, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোন এক শিক্ষিত, ভদ্র বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে একথা মন যেন আপনি আন্দাজ করে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা, তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গী। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয়না।

তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে—সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য্য কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই। ভালো ত তুমি কখনো কাউকে সত্যিই বাসোনি রাধু। তুমি বলবে—সবাই কি সত্যিই ভালবেসেছে, আর তারপরে কবিতা লিখেছে বড়দা? আমি তার জবাবে বোলবো—যদি না বেসে থাকে সে তার দুর্ভাগ্য! তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বা কামনাকে দোষী করা যায়না। শুধু দুঃখ করে এইটুকুই বলা যায়—বেচারা সংসারে বঞ্চিত হয়েছে মানুষ পায় নি,—সে ওর দোষ নয়---ভাগ্য।

কিন্তু তোমার ত' তা নয়। সেই লীলাময় লোকটা একটা কথা সত্যি বলেছে যে রাধারাণীর যোগ্য মানুষ দুনিয়ায় নেই, মানুষের প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই "জীবনদেবতা"কে উৎসর্গ।

কিন্তু, ও জিনিসটি কি ভাই? সত্যিই কি কিছু?···

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কঠিন তিরস্কারের মত শুধু নিরুদ্দিষ্টকেই নয় পাঠককেও আঘাত করে। সমস্ত বইয়ের

১০। নিরুপমা দেবী।

১১। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন।

১২। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

১৩। লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়)।

১৪। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

উপর যেন মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মনে হয়! তাই হয়ত লীলাময়ের বোধ হয়েছে এ গ্রন্থে আনন্দ নেই, আছে শুধু অভিযোগ।

তুমি ভাবো এ জীবনে তোমার মানুষকে ভালোবাসা দুর্নীতি পাপ। তোমাকেও যে কেউ ভালোবাসবে সেও গর্হিত—অপরাধ। কেউ যদি তোমাকে বলে—বড়দা তোমাকে মনে মনে ভয়ানক ভালোবাসে। শুনলে তুমি রাগে ক্ষেপে যাবে। বলবে—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! কারণ, মনে মনে তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছো—এ দুনিয়ায় কাউকে নয়! এ সম্বন্ধে মনটা তোমার একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে। এইখানেই মস্ত তফাৎ। আর এই তফাৎটাই অতিশয়োক্তির আকারে মাঝে মাঝে ধরা দেয় তোমার কবিতায়।

রাধু, একটা কথা মনে পড়লো, যৌবনে এক কালে ফরাসি সাহিত্যের সখ ছিল! আজ প্রাচীন কালে তার কিছুই মনে নেই, সমস্তই ভুলে গেছি শুধু দুটো ছত্র মনে পড়ে—

Ah! l'affreaux esclavaga
Qui detre a soi.

ভাবটা এই যে একান্ত স্বাধীনতার মত এত বড় দাসত্ব আর নেই!

যাক এ সব কথা। আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশি বুদ্ধি ধরো আমি মনে করি।

বইখানিতে না দেখার দোষে অনেকগুলি বানান ভুল হয়ে গেছে। শব্দের মাথায় বড় বেশি নিরর্থক কমার চিহ্ন পড়েছে—যথা বধূ'র, নূতনে'র মাধবী'র এই সব। কবিরা নিরঙ্কুশ বটে, কিন্তু এই দোষগুলো না করাই ভালো, যেমন 'আলোক অমিয় ক্ষরা'। আলোক শব্দটা তো স্ত্রীলিঙ্গ নয়। রবিবাবুর কবিতায় প্রায় কোথাও এসব ভুল পাওয়া যায় না।······তবুও এসব অতি তুচ্ছ কথা বোন। আজ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমাকে মস্ত বড় দেখতে পাচ্ছি। আমার এ দেখায় ভুল হয়নি জেনো।

তুমি আমাকে শিলঙেও নিমন্ত্রণ করেছো বটে, কিন্তু যাই কি কোরে! আমার ত সাহিত্যচর্চ্চা একপ্রকার বন্ধই হয়েছে, কিন্তু আর একটা কাজ জুটেছে যে। দেশের এই অতি হাঙ্গামার সময়ে পালাই কি বলে? হাবড়া জেলার আমি আবার কংগ্রেসের President: কিছুই করিনে তবু থাক্‌তে তো হয়। অথচ যাবার লোভও প্রবল। সাহিত্য-চর্চ্চার অভ্যাসটা আমার প্রায় ছেড়েই গেছে! তোমাদের মত সাহিত্যিকের কাছে এলে আবার যদি তার কিছু অংশও ফিরে পাই তো অনেক লাভ। আমার মতো কুড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখন কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন'[১৫] ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়োনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মত নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত' লিখেচি—আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এইদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মিয়াদের বাকি দু-চারটে বছর ভোগ করেই নিইনা কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু, আর না। রাত অনেক হল; তোমারও অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। এদিকে টের পাচ্চি যে ঘুম চোখে যা লিখে গেলাম তার হয়ত অসঙ্গতির সীমা নেই। অথচ এ চিঠি ফিরে পড়বারও সাহস নেই—আশঙ্কা আছে তাহলে বোধকরিবা ছিঁড়ে ফেলে দেবো; আর হয়ত পাঠানোই হবে না। তাই খামের ভেতর বন্ধ করে দিচ্ছি। যদি অন্যায় কোথাও কিছু লিখে ফেলে থাকি বড়দা বলে ক্ষমা কোরো। ইতি—২০শে বৈশাখ ১৩৩৭

তোমার বড়দা

১৫। জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেক রাত পর্য্যন্ত অবন্ধনার সঙ্গে গল্প করলাম। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিলে না সে। 'প্রহেলিকা' কথাটা দিয়েও ঠিক বর্ণনা করা যায় না তাকে। তাকে যে আমি বুঝতে পারছিলাম না একথা ঠিক নয়। সে যে ভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল আমি সে ভাবে বুঝতে চাইছিলাম না। সেদিন তার কাছ থেকে এসে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে হ'ল অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে। কোনও অতি-পরিচিত লোকের নাম মনে না পড়লে যে ধরণের অস্বস্তি হয় এ অনেকটা সেই ধরণের অস্বস্তি। অবন্ধনাকে আমি চিনেও চিনতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম সে বদলেছে, নীতিবিদরা যা অধঃপতন বলে' অভিহিত করেন তা-ও হয়তো তার ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তবু তার সম্বন্ধে আমি মোহ-মুক্ত হতে পারছি না কেন। তাকে কলঙ্কিতা বলে' সন্দেহ হচ্ছে, তার আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা মোটেই ভদ্র নয় কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে সে সত্যিই মন্দ। মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারলে শুধু যে, সুখী হব তা নয় কৃতার্থ হয়ে যাব। এই অনুভূতি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার বিবাহের প্রস্তাব অবন্ধনা বারম্বার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু আমার অন্তরের অন্তস্তলে আমি উপলব্ধি করছি অবন্ধনা আমাকে চায়। তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক, নিগূঢ় অভিমানের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অনুভব করছি সে আমাকে চায় বলেই না-চাওয়ার ভান করছে। ওটা ভাণ মাত্র। কিন্তু এ ভাণ কেন? নারীর ছলনা? কিন্তু যে সত্য নির্ণয় করবার জন্যে নারীরা সাধারণত ছলনার আশ্রয় নেয় সে সত্য কি এখনও অজ্ঞাত আছে অবন্ধনার? সে কি জানে না যে আমি তাকেই সারাজীবন চেয়েছি, তাকেই সারাজীবন চাইব? না, কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে। অবন্ধনাকে চিনেও চিনতে পারছি না···"

শিখর সেনের ডায়েরির খানিকটা অংশ লিখিয়া কবি লেখনী-সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবার কি লিখিবেন। ছোট ছোট পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে উড়িয়া গেল। কিছুদূর উড়িয়া গিয়া তাহারা যবক যুবতীতে রূপান্তরিত হইল; একেবারে আধুনিক যুগের যুবক যুবতী। যুবতীর দিকে চাহিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে বাণী! আমাকে?"

"বেশ, চমৎকার"

"চল একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক। একটা সমস্যা উদয় হয়েছে মনে—"

"চলুন। নদী এখান থেকে কতদূরে?"

"ঠিক জানিনা। খুঁজে দেখি চল। আছেই নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোনও নদী···"

উভয়ে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। তাহাদের ঘিরিয়া নৈশ অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। ঘন কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নক্ষত্রকুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, সঞ্চরমান শ্বাপদকুল গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে এই যুগলযাত্রীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ঝিল্লীকণ্ঠে নূতন রাগিনী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, পেচকদম্পতী বিশ্রম্ভালাপ স্থগিত রাখিয়া বিস্ফারিত-নয়নে এই সহসা-আবির্ভূত অপরূপ মানব-দম্পতীকে কি ভাষায় অভিনন্দিত করিবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকদূর হাঁটিয়াও কিন্তু নদীর সন্ধান পাওয়া গেল না। "কই নদীতো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও"

"সামনে ওটা কি—"

"প্রকাণ্ড মাঠ একটা"

"মাঠ? ঠিক দেখতে পাচ্ছ তুমি? বড্ড অন্ধকার, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না"

যুবক ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিল। মধ্যগগনে বীণা-মণ্ডলে অভিজিৎ নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। পিতামহের দৃষ্টিপাতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। জ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত এক আলোক-রেখা অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই অম্বরাগত দিব্য নক্ষত্র-আলোকে দেখা গেল প্রান্তরের অপর-প্রান্তে এক খরস্রোতা কল্লোলিনী প্রবাহিত হইতেছে।

"ওই তো নদী! চল ওরই পাড়ে গিয়ে বসা যাক"

বাণী হাসিয়া বলিল, "এত কাছে যে নদী ছিল তা' তো বুঝতে পারি নি—"

"মনুষ্যের রূপ ধারণ করেছি কি না, বুদ্ধিটা তাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে আলো না এলে অধিকাংশ ব্যাপারই বোঝা যাবে না এখন"

"ওই নদীটা এখানে ছিল অথচ আমরা বুঝতে পারি নি?"

"ছিল কি ছিল না এ সবই আপেক্ষিক কাণ্ড। ওর মধ্যে ঢুকো না। যখন নদী পাওয়া গেছে, চল ওর পাড়ে গিয়ে বসা যাক, আর যে কথাটা মনে হয়েছে তাই নিয়ে একটু সময় কাটানো যাক। যারা অমর তাদের কাছে সময় কাটানোটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে কি না—"

পিতামহ ও বাণী নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল নদীতীরে একটি সুদৃশ্য মর্ম্মর-বেদীও রহিয়াছে। বেদীর উপর উভয়ে উপবেশন করিলেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নদীর তরঙ্গ মালায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাণী প্রশ্ন করিলেন—"কি আলোচনা করবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন"

"যে কাণ্ডটা করলাম সেটা তোমার ভাল লাগল কিনা"

"লাগল বই কি"

"এটা কিন্তু সেকেলে রূপকথার কাণ্ড। এর তুলনায় ভবিষ্যযুগের কবি যা লিখে যাচ্ছে সেটা খুব খেলো হচ্ছে না?

"আপনিই তো তাকে লেখাচ্ছেন—"

"তা লেখাচ্ছি কিন্তু লিখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি না। সত্যি সত্যি যা ঘটে সেইটেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কি? দুটো ছোঁড়া প্রেমে পড়ে ছটফট করে মরছে আর কাতরাচ্ছে এই ঘটনাটা হুবহু নকল করে' দেওয়াটা কি সৃষ্টির পর্য্যায়ে যাবে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আমি যখন কেঁচো কৃমি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলাম তখনও তাতে অনন্যতা ছিল, ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাতে। আমার কালকুটের কল্পনাটাও নিতান্ত খারাপ হয়নি। নিজের স্ত্রীর জিবের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে লোকটা প্রণয়িনীর সন্ধানে—অ্যাঁ কি বল!

বাণী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এরাও অনন্য। এদের জোড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকায় দুরবীন কিনে আলেয়াকে দেখছে যে কমল-কিশোর সে-ও কম নয়"

পিতামহ সহসা খুশী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি ঝলমল করিতে লাগিল।

"তোমার ভাল লেগেছে কমল কিশোরকে?"

"লেগেছে। শিখর সেনকেও লেগেছে। তবে ওকে পুলিসের গুপ্তচর করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। ভবিষ্য যুগের চার্ব্বাক আঁকবার কথা ছিল—"

"আমার মনে হল সন্দিগ্ধচিত্ত চার্ব্বাকরাই ভবিষ্যৎ যুগে পুলিশের গুপ্তচর হবে"

"ও তাই বুঝি—"

"দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা। কিন্তু সে যাই হোক, গল্পটা তোমার ভাল লাগছে কি না বল। আমার নিজের কেমন পানসে পানসে ঠেকছে। এটার চেয়ে চার্ব্বাকের গল্পটা যেন বেশী জমাট হয়েছে"

"কেন ওতে বনজঙ্গল, সিংহ এই সব আছে বলে'? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি শিখর সেনের চার দিকেও বনজঙ্গল সিংহ আমদানী করেছেন। জঙ্গলটা অবশ্য মানুষের জঙ্গল আর সিংহটাও মনুষ্যরূপী সিংহ—"

"বাঃ ঠিক ধরে' ফেলেছ তো—"

সহসা যুবক-রূপী পিতামহ যুবতী বাণীকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। নদীর তরঙ্গকুলও নাচিতে লাগিল। বাণী লক্ষ্য করিলেন অসংখ্য ময়ুর-ময়ূরী আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নয়নে মাণিক্য-দ্যুতি,

গ্রীবাদেশে লীলার সৌন্দর্য্য, পক্ষদ্বয়ে মুক্তা-মালা এবং প্রসারিত পুচ্ছমণ্ডলে অসংখ্য পান্না প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত পক্ষী বাণী আর কখনও দেখেন নাই।

"ময়ূর তো রাত্রে নাচে না! এমন ময়ূরও তো দেখিনি কখনও"

একটি ময়ূরই উত্তর দিল, "আমরা রাতের ময়ূর, রাতেই নাচি"

"কোথায় থাক তোমরা"

"কোথায় থাকি জানি না ঠিক। হয়তো তোমার মনেই আছি"

"কবিতায় কথা কও না কি তোমরা"

ময়ূরের দল ইহার কোন উত্তর দিল না, মুচকি হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বাণীও নৃত্যপরা হইলেন। চরাচর নৃত্যময় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন—"চল এবার কবির কাছে যাওয়া যাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছে"

আবার দুইটি পতঙ্গ কবির বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত ইলেকট্রিক বাতির সুদৃশ্য ডোমের উপর উপবেশন করিল। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দুইটির আগমন বা নির্গমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। পতঙ্গ দুইটি আসিয়া বসিবার পর পুনরায় তাঁহার মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, পুনরায় তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এরকম লুকোচুরি কতদিন চলেছিল তা বলা শক্ত। কারণ শিখর সেনের ডায়েরিতে অবন্ধনার কথা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ নেই। আছে সেই কালো-বাজারীটার কথা যার খোঁজে এই বোর্ডিংএ এসে সে বাসা বেঁধেছিল। একদিনের ডায়েরিতে দেখছি এই বিশেষ বোর্ডিংটাতে কালোবাজারীটার আকর্ষণ কোথায় তা সে আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে' স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

শিখর লিখছে—'এমন একটা ঘটনা ঘটেছে আজ আমার জীবনে যা হয়তো আমার জীবনের গতিকেই পরিবর্ত্তিত করে' দেবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা আর কখনও এমনভাবে বিচলিত হয় নি। যে লোকটার জন্যে এই বোর্ডিংএ এসে বাসা বেঁধেছি সে লোকটাকে এই বোর্ডিংএ ঢুকতে এবং বেরুতে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কেন সে আসে এখানে তা নির্ণয় করতে পারি নি। এ বিষয়ে কাউকে প্রশ্ন করতেও ভরসা পাই নি, পাছে কেউ আমাকে পুলিশের লোক বলে' সন্দেহ করে। দোতলার একটা ঘরে গণেশবাবু নামে একজন দালাল আছেন, আমার সন্দেহ ছিল তার সঙ্গেই হয়তো কোন রকম যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু স্বচক্ষে কোনও দিন তার ঘর থেকে তাকে বেরুতে দেখি নি, তার ঘরে ঢুকতেও দেখি নি। এইটে স্বচক্ষে দেখবার জন্যে অনেক সময় আমি সমস্ত দিন কোথাও যাই নি, কিন্তু সেদিন সে আসেই নি বোর্ডিংএ। এই ভাবেই চলছিল। আশা ছিল একদিন না একদিন তাকে হাতে-নাতে ধরবই। আজ সন্ধ্যের একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে নাবছি এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সেই লোকটারই সঙ্গে। সে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া নিয়ে উপরে উঠছিল। আমি তাকে দেখিয়ে গট গট করে নেমে গেলাম বটে কিন্তু সে উঠে যেতেই তৎক্ষণাৎ ফিরলাম। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন ঘরে সে ঢুকছে। যা দেখলাম তাতে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। দেখলাম লোকটা অবন্ধনার ঘরে ঢুকল! ফুলের তোড়া নিয়ে অবন্ধনার ঘরে ঢোকার মানে? কি করব ভাবছি এমন সময় অবন্ধনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

"কোথা যাচ্ছ এমন অসময়ে"—জিজ্ঞাসা করতে হল।

"'কলে' বেরুচ্ছি। আমাদের আবার সময়-অসময় আছে না কি—"

মুচকি হেসে সপ্রতিভ ভাবে নেমে গেল।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দামী একটা মোটরকারও দাঁড়িয়ে আছে নীচে। অবন্ধনাকে নিয়ে লোকটা মোটরে চড়ল। আমিও দ্রুতবেগে নেমে এলাম নীচে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিটাকে বললাম ওই মোটরটাকে অনুসরণ করতে।

...অবন্ধনা সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেছি তা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তা লিখতেও ভয় করছে। অবন্ধনা না হয়ে যদি অন্য কেউ হ'ত তাহলে আজই তাকে

এ্যারেস্ট করতাম। যে সব পদস্থ গভর্ণমেণ্ট অফিসার অর্থের বশীভূত নয় কামের বশীভূত, ওই কালোবাজারীটা অবন্ধনাকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের ভোলাবার জন্যে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, অথচ আমি বেঁচে আছি—"

এইভাবে আরও কয়েক পাতা লিখেছে শিখর। অবান্তর বোধে সবটা আর উদ্ধৃত করলাম না। ঠিক এর পরের তারিখে কিন্তু আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে শিখর যা এ কাহিনীর পক্ষে মোটেই অবান্তর নয়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

শিখর লিখছে—'ছেলেবেলায় আমি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতাম। উঠে বেড়িয়ে বেড়াতাম বাড়ির সামনের বাগানটায়। রাত্রে কুঁড়ি কি করে' ফুল হয় তা জানবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার। আশ্চর্য্য লাগত সন্ধ্যাবেলার ছোট্ট কুঁড়ি কয়েক ঘণ্টায় কি করে' পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে যায়! ঘুমের ঘোরে উঠে দেখতে যেতাম তাই। আমার মা অনেকদিন আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায়। অনেক সময় খাটের সঙ্গে হাত-পা-ও বেঁধে দিতেন। ডাক্তাররা বলেন ওটা নাকি একপ্রকার অসুখ। অনেক দিন এরকম আর হয় নি। বোর্ডিংয়ের চাকরটা কিন্তু কাল রাত্রে সিঁড়ি থেকে আমাকে ধরে' এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল, আমি না কি ঘুমের ঘোরে সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাচ্ছিলাম। অন্তর-নিহিত প্রবল কৌতূহল ছেলেবেলায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত। কাল কোন কৌতূহলের টানে উঠেছিলাম? সিঁড়ি দিয়ে নেবে কোথায় যাচ্ছিলাম? অবন্ধনার ঘরের দিকে না কি—!"

ডায়েরির এই অংশটা পড়ে মনে হচ্ছে আহা শিখরের মতো আমারও যদি ওই অসুখটা থাকত। স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে সত্যিই যদি যেতে পারতাম আলেয়ার কাছে। আজ বিকেলে আলেয়া জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। কি ভাবছিল? মনে করতে ইচ্ছে করে যে আমার কথাই ভাবছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সত্যটা কি করে' জানি না প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ও আমার কথা ভাবছিল না···

প্রথম পতঙ্গ চুপি চুপি দ্বিতীয় পতঙ্গকে বলিল, "চল, চার্ব্বাক-সুরঙ্গমার খবরটা নেওয়া যাক এবার। এদের ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগছে না আর—"

"চলুন—"

পুনরায় পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ধ্রুবতারা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

নীলাকাশ ভেদি মোর রজনীতে
চেয়ে আছে ওগো ধ্রুবতারা!
তোমার নয়ন জেগে রয় চির
পাছে হই প্রিয়-পথ হারা।
তোমার স্বপনে পেয়েছি যে ঠাঁই,
যখনি চেয়েছি তুমি ভুল নাই,
নিকট হয়েছে সীমাহীন দূর
অন্তরে ঝরে প্রীতি ধারা।

দেখেছি যে আমি তোমার নয়নে,
চির জনমের চেয়ে থাকা!
কোন ষোড়শীর নয়ন মণিতে
বিরহ ব্যাকুল ছবি আঁকা।
শুধু চেয়ে থাকা পলক বিহীন,
মিলন সে চির বিরহে বিলীন,
নয়নের দিঠি নয়নে হানিয়া
নীরব ভাষায় ডেকে সারা।

বাংলায় শান্তি-আন্দোলনের ধারা

নরেন্দ্র দেব

বাংলা দেশে আর একবার শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য যে শান্তি-আন্দোলন আজ কেবল বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী। কিন্তু, প্রশ্ন উঠ্‌ছে, এই আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক সম্মেলন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলিকে যথার্থ শান্তির দিকে এগিয়ে দিতে পেরেছে কতটুকু?

বছর দুই তিন আগে আমার প্রতিবেশী কয়েকজন তরুণ সাম্যবাদী বন্ধু যেদিন এসে আমাকে অনুরোধ করলেন বালিগঞ্জ আঞ্চলিক শান্তি কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণের জন্য; আমি বিনা দ্বিধায় তা' গ্রহণ করি। আমি খুশী হয়ে উঠি এই ভেবে যে—যাক্, এঁরা তাহলে এঁদের হিংসা ও ভাঙনের নীতি ভুলে এখন থেকে শান্তির স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টির কাজে লেগে যাবেন।

কিন্তু, দেখা যাচ্ছে তা' এঁরা লাগেন নি। এঁদের ভাঙার কাজই আজও শেষ হয় নি! গড়ার কাজ কবে শুরু করবেন জানি না। সংসারে দেখেছি ভাঙে একদল, কিন্তু গড়ে আর একদল। রাশিয়ায় কিন্তু যারাই ভেঙেছিলেন জারের রাজ্য তাঁরাই গড়েছেন সোভিয়েট রাষ্ট্র। মধ্যপন্থীদের দ্বারা কিছু হয় না জানি। তাঁরা সবাই 'স্ট্যাটাসকো'র ভক্ত। কোনও কিছুর শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনেও তাঁরা নারাজ! দীর্ঘ প্রচলিত অন্যায়ের সংশোধন করা প্রয়োজন বুঝেও তাঁরা সে কাজে অগ্রসর হতে ভয় পান। লোকে তাঁদের 'অতি সাবধানী' বলে বিদ্রূপ করে।

আমি কমিউনিস্ট মূল মতবাদের বিরোধী নই। ভারতবর্ষেই শ্রীভগবান গৌতম বুদ্ধ একদা সাম্যবাদ শুধু প্রচারই করেন নি, প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। আদর্শের দিক থেকে মানব সমাজে সাম্যবাদকে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করি। মহাত্মা গান্ধীও সাম্যবাদের সুস্থ ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যদি অবিলম্বে সোভিয়েট রাশিয়া বা নব্য-চীনের সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে, কে না স্বীকার করবে সেটা ভারতের সৌভাগ্যের কথা বলে? কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে উপায়ে ও যে ধারায় সেদিকে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করছেন সেটাকে কল্যাণের পথ বলে মেনে নিতে পারা যায় না। What is sauce for the goose is not always the sauce for the gander. ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাণপুরুষের গতি একই ছন্দানুবর্তী নয়।

যেদিন বালিগঞ্জ আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনের প্রথম সভা শেষ ক'রে ফিরি, আমার কমিউনিস্ট-বিরোধী বন্ধুরা, আমার বুকে শান্তির পায়রা আঁকা সুনীল একটি প্রতীক আঁটা দেখে চম্‌কে উঠে বেশ উত্তেজিত হ'য়েই বললেন—"এঃ! শেষে কমিউনিস্টদের ভাঁওতায় ভুলে শান্তির খপ্পরে পড়ে কমরেডদের দলে ভীড়ে গেলেন দাদা?"

এঁদের অভিযোগের এই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সেদিন লক্ষ্যণীয় বলে মনে হয়েছিল। তবে কিনা, ঠিক যেমন বেচারা কীচ্‌লু সাহেব আজ বলছেন—"শান্তি আন্দোলনকে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে মনে করলে ভুল করা হবে। শান্তি আন্দোলন সারা পৃথিবীর সকল মানবের আন্দোলন" তেমনি করেই আমি সেদিন আমার রুষ্ট বন্ধুদের মন্তব্যের উত্তরে বলেছিলুম "বিভিন্ন রাজনৈতিক তাঁবুর কোনোটাতেই আমার ছায়াটুকুও পড়ে নি আজও। কারণ, আমার ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি নয়। দেশে যুদ্ধ চলতে থাকলে দেশবাসীর যে সর্বাঙ্গীন ক্ষতি হয়, তাতে সাহিত্যই আঘাত পায় সকলের চেয়ে বেশি! সাহিত্যের স্ফূর্তি শান্তির মধ্যেই। সভ্যতার প্রথম দিবারম্ভ থেকেই শান্তি মানবের কাম্য। মানুষের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে, ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে প্রবল অশান্তি নিয়ে আসে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ। তার সাজানো সংসার ওলোট্-পালট্ ক'রে দিয়ে যায়। অতএব, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল কণ্ঠ নিয়ে দাঁড়ানো আমি প্রত্যেক সভ্য মানুষের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

শান্তি আন্দোলন কারা পরিচালনা করছেন? তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদটা কি? এই আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁদের আসল কি উদ্দেশ্য লুকানো আছে? এসব জানবার সেদিন কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনি। এঁরা শান্তি চান। আমিও শান্তি চাই। যথার্থই এঁরা মনে মনে শান্তি চান কিনা সে খবর আমি সেদিন জানবার কোনো চেষ্টাই করিনি। মনের খবর মনের মানুষই কি পায়? তবে, মুখে তো এঁরা শান্তির আওয়াজ তুলছেন খুব জোর! দেখতেও পাচ্ছি বেশ একটা বিরাট বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন। সুতরাং আমাদের মতো যাঁরা নির্দলীয় এবং শান্তিকামী, তাঁরা এই বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তির প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে শান্তিবাদী ও শান্তিপ্রচারক সৈনিকদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না কেন? এখানে তো কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে যাওয়া বা তাঁদের দলে ভিড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না! হ'লই বা এ শান্তি-আন্দোলন কমিউনিস্টদের একটা আত্মরক্ষার সুচতুর প্রচেষ্টা বা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আরও কিছুদিন সময় হরণের কৌশলমাত্র! তাতে ক্ষতি কি? শান্তির আন্দোলনটাকে তো আর কোনো যুক্তির দ্বারা আপত্তি-জনক বলে প্রমাণ করা যায় না! এ আন্দোলন আজ দেশের যে কোনও দল বা সম্প্রদায় শুরু করতেন পৃথিবীর শান্তিকামীরা বিনা দ্বিধায় তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। কেন না, এই একটিমাত্র ক্ষেত্রই এখনও অবশিষ্ট আছে যেখানে সকল দলেরই ভিন্ন মতাবলম্বী নরনারী আজও একত্রে মিলতে পারে। চলতে পারে একই পথে, বিশেষতঃ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যদি তাদের এক হয় এবং সে লক্ষ্য যদি মহৎ হয়।

কিন্তু, বেদনার সঙ্গেই স্বীকার করছি, যে এঁদের শান্তি আন্দোলনের ধারা দেখে ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি। বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলনে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে এক মহা অশান্তি ভোগ করতে হয় এঁদের। প্রথমতঃ প্রতিনিধিদের যাতায়াতের ভাড়ার টাকা সংগ্রহ নিয়ে অশান্তি। তারপর তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ করার অশান্তি। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে অশান্তি, এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক অশান্তি হ'ল শান্তি-সৈনিকেরা প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রচুর অশান্তির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ ক'রে যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মহামান্য ব্যক্তিদের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি সাজিয়ে পকেটে পাথেয় ও দক্ষিণা গুঁজে দিয়ে বিমানে রওনা ক'রে দেন, তাঁরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তুচ্ছ কোনও ত্রুটির অজুহাতে অকুণ্ঠ পদে বিপক্ষ-পক্ষের শিবিরে গিয়ে ওঠেন!

বিপক্ষপক্ষ কথাটা শুনে কেউ যেন বিস্মিত হবেন না! মনে হতে পারে হয়ত'—সংসারে আবার শান্তির বিপক্ষে কে? কিন্তু, সংসারের পক্ষে যেটা সত্য, রাষ্ট্রের পক্ষে হয়ত সেটা সত্য না হ'তেও পারে। 'শান্তি' বর্তমানে কোন্ কোন্ দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী আর কোন কোন দেশেরই বা স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল, আশা করি এটুকু জানতে আজ আর কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির বাকি নেই। এ সংবাদ আজ সর্বজন বিদিত যে এই শান্তি আন্দোলনের স্রষ্টা ও পরিচালক হলেন স্বয়ং বিশ্বত্রাস সোভিয়েট রাশিয়া। কমিউনিস্ট বন্ধুরা এর প্রতিবাদে যতই সমস্বরে 'না না' করুন না কেন, সে অস্বীকার আজ আর কারুর কাছেই গ্রাহ্য হবে না।

কেন, তা বলছি!

এর অনেকগুলি কারণ এবং প্রমাণ আছে। কারণ হ'ল, শান্তির মধ্যে সোভিয়েট মতবাদ যে ভাবে দেশে দেশে দারিদ্র্যের ছিদ্রপথে নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে, অভাব ও অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের সহজেই কমিউনিস্ট মতাবলম্বী ও পথাবলম্বী ক'রে তোলে, একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধলে তাতে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। কারণ, সবাই তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনও না কোনও কাজ পায়। বেশ ভালই উপার্জন করে! বেকার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই, দল বৃদ্ধির কাজটাও বাধা পায়। শুধু তাই নয়, দেশে দেশে এঁরা যে ঘরোয়া বিবাদ, সামাজিক অসন্তোষ, দলাদলি, আত্মকলহ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রভৃতি বাধিয়ে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক' বলে আওয়াজ তোলেন, হিংসাত্মক আন্দোলন ও অশান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ দেন আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গ ক'রে লাঠি বা গুলি না-চলা পর্যন্ত নিরস্ত হন না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে এসব কাজ-কারবার তাঁদের বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণের জন্য আমাদের একটু ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চান যাঁরা, যাঁরা ধনসাম্য ও জনসাম্যের প্রচারক, সেই সম-অধিকারবাদীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশৃঙ্খল রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন কোনো রকম 'মেক-আপ' বা রূপসজ্জা না-করে। লাল ঝাণ্ডার চেয়ে তার ডাণ্ডাটাই ছিল তাঁদের কাছে সেদিন বেশি দামী। তাঁরা বুঝেছিলেন রাতারাতি একটা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ওলোট-পালোট করতে হলে দেশব্যাপী রুদ্র বিপ্লব অনিবার্য। প্রয়োজন বোধে তাঁরা লোক বিশেষের মাথায় হাতুড়ি মারতে বা গলায় কাস্তে চালাতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। পাইকারি হত্যাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল অবাধে। অহিংসার ইউটোপিয়া তাঁদের মধ্যে ছিল না। দেশের পুঁজিপতি বড় বড় ধনী মহাজন ও অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতিও আমাদের সদাশয় কংগ্রেস সরকারের মতো কোনো স্নেহ মমতা বা দুর্বলতা কখনো পোষণ করেন নি। 'কুড়ুল' সম্বন্ধে তাঁদের 'কোদাল' ভ্রান্তির বুজরুকী ছিল না। কুইস্‌লিংদের প্রতি তাঁরা ছিলেন চূড়ান্ত নির্মম! সেদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি, বিশ্বসংসারে 'একঘরে' হয়েও পৃথিবীর একজোটের বিরুদ্ধে তাঁরা বেপরোয়ার মতই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিন লোকে বলশেভিকদের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতাকে ভয়ও করেছে, শ্রদ্ধাও করেছে।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। শেষ হ'ল হিটলারের পতনে ও স্ট্যালীনের জয় জয়কারে। কিন্তু শান্তি এলনা পৃথিবীতে। হিটলার-বধ যজ্ঞে সকলে একত্র হ'লেও মার্কিণ ও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ছিল সোভিয়েট-রাশিয়ার আদর্শগত বিপুল বিরোধ। রুশের সাম্যবাদ আন্দোলন পাছে এঁদের ঘরে ঢুকে প'ড়ে নিয়ে আসে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অশান্তি, এই আশঙ্কায় এঁরা একজোট হ'য়ে রুশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নাম করে রুশ কণ্টক নির্মূল করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে শুরু করলেন। রাশিয়া যে আয়োজন দেখে প্রমাদ গণলেন। তাঁরাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ ক'রে আর হাঁফ্ ছাড়বার অবসর পেলেন না। চলতে লাগলো এঁদের অস্ত্রসজ্জা। শুরু হল স্নায়ুযুদ্ধ। তারপর হঠাৎ দেখা গেল মস্কোর রঙ্গমঞ্চে আচম্বিতে এক পট পরিবর্তন। পোল্যাণ্ড, ইউক্রাইন, পূর্ব-জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলি নাজী ও ফ্যাসিস্ট্ কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে ইতোপূর্বেই সোভিয়েট প্রেমালিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। হঠাৎ মার্শাল টিটো দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সোভিয়েট রাশিয়া প্রমাদ গণলেন। এবার তিনি দেখা দিলেন শান্তির পারাবত কোলে নিয়ে শান্তির অলিভশাখা মাথায় জড়িয়ে শান্তি-সৈনিকের গৈরিক বেশে! লোকে অকস্মাৎ তাঁদের এই ভোল ফেরাতে দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল! এই সেদিনের সেই বজ্রবাহু বিরাটবক্ষ শস্ত্রপানি সৈনিকের দল সহসা বিভীষণ-পুত্র তরণীসেনের মতো সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে এসে দাঁড়ালেন বটে শান্তির পঞ্চনি হাতে, কিন্তু বৈষ্ণবী বিনয় নিয়ে নয়, দাবীর দুর্দান্ত দম্ভ নিয়ে।

আজ তাঁরা অস্ত্র সংবরণের জন্য দাবি জানাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা 'এ্যাটম বোম' ব্যবহার জীবাণু যুদ্ধের ন্যায় নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গের জোট বাঁধায় আপত্তি করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য আত্মরক্ষা-সংহতি ভেঙে দিতে বলেছেন। এ সব প্রচেষ্টা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে দুর্বলতা প্রসূত। সোভিয়েট রাশিয়া বোধ করি গত মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত এখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেন নি। তাই কেবলমাত্র পৃথিবীব্যাপী 'শান্তি-আন্দোলনের' উপরই নির্ভর ক'রে তাঁরা

নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বিশ্বের নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য এক বিশ্বব্যাপী নারী-আন্দোলনও খাড়া করেছেন। জগতের শিশুদের কল্যাণের জন্যও পৃথিবী জুড়ে এক শিশুরক্ষা আন্দোলন চালাচ্ছেন। বিশ্বের যুব সমাজের জন্যও বছর বছর বিরাট যুব উৎসবের বিপুল আয়োজন করছেন। আর, সেই সব সম্মেলনেই ঘুরে ফিরে এই একই প্রস্তাব কানে আসছে—"আমরা শান্তি চাই। আমরা যুদ্ধ চাই না!"

আমাদের বাংলার কমিউনিস্ট কমরেড ভায়ারা দেখি মস্কোর ওস্তাদদের হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো শহর ও মফঃস্বলের রঙ্গমঞ্চে নেমে নৃত্য নাট্য করছেন। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট হেড্ কোয়ার্টারের খবর জানি না। শুনতে পাই, মস্কোর নির্দেশ আসে তাঁদের উপর এবং তাঁদের কাছ থেকে আবার বাংলা দেশ পান তাঁদের কর্মসূচী। এমনি করেই দেশ-প্রদেশ, জেলা-গ্রাম ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর কমিউনিস্টদের মধ্যে মস্কোর মাকড়সার জাল। বাংলাদেশে একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দেখলে তিন শ্রেণীর কমিউনিস্ট চোখে পড়বে। একদল খুব উচ্চ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী এবং মার্ক্স্ এঞ্জেলস্ প্রভৃতির সাম্যবাদ তত্ত্বের অথরিটি বা বিশেষজ্ঞ। এঁরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। এঁরা প্রায়ই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আর এক দল এঁদের সঙ্গে থাকেন যাঁরা—অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। হয় বেকার, নয় কেরাণীগিরি প্রভৃতি সামান্য কিছু কাজ করেন। এঁরা মার্ক্স ও এঞ্জেলস্ প্রভৃতির নাম শুনেছেন। পড়বারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু দন্তস্ফুট করতে পারেন নি। লেনিন ও স্টালীনকে দেবতা বা 'পিতা' বলে জানেন, আর, 'দাদা'রা যা বলেন তাই বেদবাক্য বলে মেনে নেন। এঁরা দুই দলই বাংলার অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় দল হলেন—যাঁরা মেহনতি সম্প্রদায়। এঁরা চলেন স্ব স্ব কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের ইঙ্গিতে। এই চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের আবার পরিচালিত করেন দ্বিতীয় দলের নিরভিমান বাবুরা, যাঁরা এঁদের বস্তিতে যান, এঁদের সঙ্গে বিড়ি খান, তাশ খেলেন, আবার ক্লাশ খোলেন লোক শিক্ষার, সভা করেন বক্তৃতা শোনাবার। অভিনয় ও গানের আসর বসান চিত্তজয়ের প্রচেষ্টায়। মিছিল করেন ঝাণ্ডা উড়িয়ে, শ্লোগান দিয়ে এদের নিরানন্দ জীবনের মধ্যে একটু উত্তেজনার আবেগ সঞ্চার করেন। এ ছাড়া আরও অনেক কাজ এঁরা করেন সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই যার পরিচয় পাই। যেমন কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, অফিস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে ধর্মঘট, রাইটার্স বিল্ডিং ও পরিষদ গৃহ অবরোধ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান ঘেরাও, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও মনুমেন্টের তলায় বিরাট সভা, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দাবী। অল্পবিত্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগের অবিচারের প্রতিবাদ। বাংলার উপবাসী কেরাণী ও লেখক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা। ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালার দ্বন্দ্ব, এবং সম্প্রতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন, জম্মু-কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র, কিছুই এঁরা বাদ দেন না। মোট কথা সরকারকে বিব্রত করবার কোনও সুযোগই এঁরা ছাড়েন না। এর ফলে দায়িত্ব এঁদের ক্রমেই অসংখ্য হয়ে উঠছে অথচ কর্মীর সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যাঁরা নতুন এসে দলে ভিড়ছেন তাঁরা খাটতে রাজি নন। মনে করেন, এসেই ত' কৃতার্থ করেছেন! কাজেই দিন দিন নানা দায়িত্বের চাপে হিমসিম খেতে হ'চ্ছে সেই আদি ও অকৃত্রিম পুরাতন কর্মীর দলকেই! ভাগ্যে এঁদের কোনও গঠনমূলক কর্মসূচী নেই, তাই রক্ষে! নইলে এঁরা মুস্কিলে পড়তেন!

প্রতি বছর শান্তি সম্মেলনের সভায় গিয়ে দেখি সেই একই সব চেনা মুখ, যাঁরা একদিন বীরদর্পে চেঁচিয়েছিলেন "জাপানকে রুখতে হবে।" সেই সব পরিচিত কণ্ঠেই আজ আবার ধ্বনিত হচ্ছে "মার্কিণ যুদ্ধবাজকে রুখতে হবে। গত নির্বাচনে ভোটের সময় এঁদেরই রাজপথে ঘুরতে দেখেছি "কংগ্রেস মুর্দাবাদ!" বলে। এঁরাই আওয়াজ তুলেছিলেন "লাঙ্গল যার জমি তার।" বাস্তুহারাদের নিয়ে এঁরাই ঘোরেন দেখি এক নূতন ধ্বনি দিয়ে "আমাদের দাবি মানতে হবে!" ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে

গুলোকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়ান এই বলে "পুলিশ জুলুম মানবো না!" আবার এঁরাই যখন আর এক সভায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন "আমরা শান্তি চাই!" ব'লে—তখন, সে আওয়াজের মধ্যে আর যাই থাক, কোন আন্তরিকতার সুর খুঁজে পাওয়া যায় না! সে ধ্বনি হ'য়ে ওঠে কলের গানের কৃত্রিম আওয়াজের মতো।

এঁরা বলেন "যুদ্ধ আমরা চাই না। কেননা, যুদ্ধে শুধু মূল্যবান জীবন অকালে ঝরে পড়ে। কত গৃহ শ্মশান হয়। কত জননী পুত্র-হীনা হয়। কত স্ত্রীলোক স্বামীকে হারায়, ভাইকে হারায়, বন্ধুকে হারায়! কত শিশু অনাথ হ'য়ে পড়ে! কত দেশ ধ্বংস হয়ে যায়! কত রাজ্য নিঃস্ব হয়ে পড়ে! ইত্যাদি। কিন্তু, এই 'রাম-নাম' তো এঁদের মুখে শোনা যায় না, যখন এঁরা শ্রেণী-সংগ্রামাত্মক গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিয়ে দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব সংগঠনে ব্রতী হন? তার পরিণামও তো একই! তেলেঙ্গানায় যা ঘটেছিল, মালয় বা ভিয়েৎনামে যা হ'চ্ছে, কোরিয়ায় তো তারই রাজসংস্করণ প্রকাশ হয়েছে মাত্র!

সব দেশেই দেখা যাচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরাই এই শান্তি সম্মেলনের জন্য অর্থ ও রসদ সংগ্রহ থেকে শুরু ক'রে এর প্রস্তুতি, প্রস্তাব, অধিবেশন, আলোচনা, মায়, প্রচার, প্যাণ্ডেল, প্রতিনিধি, পরিচালক প্রভৃতি সব কিছু কঠিন ধাক্কাই নিঃশব্দে ও অকাতরে সামলাচ্ছেন। এঁদের প্রথমদিকে যে শোচনীয় অর্থাভাব দেখা যায়, শেষপর্যন্ত কিন্তু আশ্চর্যভাবে তা মিটে যাচ্ছে! যে যে দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত এবং এংলো-আমেরিকানদের সঙ্গে সৌহার্দ বন্ধনে যুক্ত সেখানে শান্তি আন্দোলন করতে গিয়ে একাধিকবার ব্যর্থ হ'তে হয়েছে। কিন্তু, যে সব দেশ সোভিয়েট আদর্শে অনুপ্রাণিত বা সোভিয়েট প্রক্রিয়ার ভুক্ত সেখানে শান্তিসম্মেলন ক'রে সাফল্য ও সার্থকতার স্বরচিত জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ পূর্বক আত্মপ্রসাদ লাভেরও সুযোগ পাওয়া গেছে।

জগতে শান্তিস্থাপনের মহৎ আদর্শে আকৃষ্ট হ'য়ে আমার মতো নির্বোধ ও অরাজনৈতিক কেউ কেউ এই শান্তি আন্দোলনে যোগ দিতে আসেন। তবে সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। নৈবেদ্যের ডালায় সাজানো দু' চারটি চিনির ডেলা সন্দেশের মতো! কিন্তু, মজা হ'চ্ছে এই, যে, তাদেরই এই ক'জনকে সর্বত্রই খুব উঁচু করে ধ'রে দেখানো হয় যে, এই দেখ, আমাদের এই শান্তি আন্দোলনে এমন সব লোকও রয়েছেন যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্তম্ভ স্বরূপ অথবা একেবারেই নির্দলীয়! কমিউনিষ্ট শান্তি-আন্দোলনের সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হ'ল এই মিথ্যার আশ্রয়, এই সর্বদলীয়ের কাঙাল ছদ্মবেশ! 'শো-বয়' খাড়া ক'রে 'শো-বোট' দেখানো যায় ঘাটে দাঁড়িয়ে। সে বোট কিন্তু কোনও বন্দরেই প্রয়োজনীয় মাল পৌঁছে দিতে পারে না। They can not deliver the goods! এই যে দীর্ঘ চার পাঁচ বছর ধরে 'শান্তি' শান্তি' বলে এত আওয়াজ তোলা হ'ল, শান্তির স্বপক্ষে কত লক্ষ লক্ষ সই সংগ্রহ করা হ'ল, কত ছোটবড় আঞ্চলিক ও বৃহৎ শান্তিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল এ কি কেবল আলেয়ার পিছনে ছুটে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ, উদ্যম, সময় এবং দেশের মূল্যবান যুব-প্রাণশক্তির অপব্যয় ও অপচয়ই করা হ'ল?

আমার শান্তিসৈনিক বন্ধুরা বেশ জোর গলায় বলেন "এই পীস্-ফ্রন্ট্ খুলে দেওয়াতে খুবই কাজ হয়েছে। স্নায়ু-যুদ্ধের এমন প্রতিষেধক প্রলেপ আর নেই। অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকে যদি কেউ ঠেকিয়ে রেখে থাকে এতদিন, তবে সে এই বিশ্বব্যাপী শান্তি-আন্দোলন। নইলে যে ভাবে আমেরিকা আজ বিশ্বজয়ে প্রস্তুত হ'য়ে 'ইউ-এন-ও' কে মুঠোর মধ্যে পুরে পৃথিবীর চারিদিকে সামরিক ঘাঁটি গেড়ে, ডলারের হরির লুট ছড়িয়ে চলেছে, তাতে, কবে এতদিন ঝুটোপুটি বেধে যেত! বিশ্বযুদ্ধের বোমার পল্‌তেয় দেশলাই জ্বেলে তো ওরা দিয়েছিল কোরিয়ায়! এশিয়া ও ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলোকে ওরা নিশ্চিহ্ন ক'রে দিত এতদিন। কিন্তু পূর্ব তোরণ দ্বারে শান্তির সতর্ক প্রহরী বিনিদ্র জেগেছিল বলেই, শুধু কোরিয়াই ধ্বংস হয়ে গেল, আর সে সঙ্গে ব্যর্থ হয়ে গেল মার্কিণের বিশ্বজয়ের দুঃস্বপ্ন। তাই সে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে যেন! শান্তির সকল প্রস্তাবকেই সে নানা ছুতোয় উড়িয়ে দিচ্ছে।"

এসব উক্তি যুক্তিসহ বলে যদি মেনে নেওয়াও হয় তথাপি এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে যে 'এই শান্তি আন্দোলনটা কমিউনিস্টদের একটা সুচিন্তিত 'কামুফ্লেজ' মাত্র!' এঁরাই তো একদিন দলবদ্ধ হয়ে সবাইকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটাকেই 'জনযুদ্ধ' বলে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সেদিনও তাঁরা যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থে যুদ্ধটাকেই সমর্থন করেছিলেন, আজও তেমনি তাঁরা রাশিয়ার স্বার্থেই যে এই শান্তি-আন্দোলন পরিচালনা করছেন—এ সত্যটা একেবারে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। শান্তি সৈনিকদের গৈরিক বেশের তলায় যে কমিউনিষ্টদের লাল উর্দি ঢাকা রয়েছে, অতিরিক্ত সোভিয়েট-প্রীতি ও মার্কিণ-বিদ্বেষের দমকা বাতাসে তা মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ছে তাঁদের হিংস্র স্বরূপ! আইসেনহাওয়ার ও ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহ, 'ডালেস ফিরে যাও' বলে অভদ্র চিৎকার যেমন শান্তি আন্দোলনের সহায়ক নয়, তেমনি ভারতে পদে পদে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে কোরিয়া, চায়না, ভিয়েৎনাম ও মালয়ের শান্তি কামনায় কুম্ভীরাশ্রুপাতে তাঁরা কারুর সহানুভূতিই উদ্রেক করতে পারবেন না! আন্দোলনেরও একটা শিষ্ট বিধি মেনে চলা উচিত।

আগে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে যদি চেষ্টা না করি, নিজেদের ঘর যদি নিজেরা না সামলাই, নিজেরা যদি সুস্থ সবল হ'তে না পারি, নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্য যদি দূর করতে না পারি, নিজেদের অভাব অভিযোগ যদি মেটাতে না পারি, নিজের দেশে শান্তি, সুখ ও সম্পদ না আনতে পারি তবে অন্য দেশের ভূপতিত মানুষদের টেনে তোলবার জন্য হাত বাড়াবো কোন গুণে বা কোন জোরে? সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অনন্য সাধনায় নিজের দেশকে আগে সকল দিক দিয়ে বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ক'রে তুলে তবে না কমিউনিস্ট জগতের 'পিতা' ও গুরুস্থানীয় ষ্ট্যালীনের সোভিয়েট রাশিয়া আশে পাশের মুখথুবড়েপড়া, পর-পদাশ্রিত, ছোট খাটো দুর্ভাগা দেশগুলোকে টেনে তোলবার জন্য হাত বাড়াতে সাহস করেছিল। বিশাল চায়নাকে টেনে তোলবার মতো হাতীর বল সংগ্রহ ক'রে তবেই না সে আজ 'মাও সে তুং'কে দাঁড় করাতে পেরেছে?

আমাদের দেশের কমরেড্ ভায়ারা আজ 'কোরিয়া দিবস' কাল 'মালয় দিবস' পরশু "ভিয়েৎনাম দিবস" করেছেন। এসব দিবসের বিলাস কি এঁদের মুখে সাজে? এঁদের মুখে শুধু 'হিজ মাস্টার্স্ ভয়েসের' প্রতিধ্বনিই শুনি! রুশ ও মার্কিণরা জন্মাবধি জঙ্গী বা মানোয়ারী যুদ্ধবাজ জাত। ওরা সামরিক পরিভাষা ছাড়া নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারে না। শান্তি শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই 'যুদ্ধ' কথাটাও তাই তাদের মনে আসে। যুদ্ধ-নিরপেক্ষ শান্তির চর্চা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউই করেনি। তাই, ভারতবর্ষ যখনই শান্তির কথা বলেছে ন্যায়, ধর্ম, প্রেম ও সত্যের বাণী শুনিয়েছে; তাদের ভাষা ছিল শান্ত সংযত

দাঁর গম্ভীর। তাই আমার 'শান্তি সৈনিক' বন্ধুদের আমি একাধিকবার বলেছি তোমরা শান্তিব্রতী হ'য়ে নিজেদের 'শান্তি সৈনিক' বলে পরিচয় দাও কেন? সৈনিকরাত' যুদ্ধধর্মী। নিজেদের 'শান্তিসেবক' বা 'শান্তিকর্মী'ও তো বলতে পারো। লড়াইয়ে-বুলি ছাড়া যুদ্ধবাজদের অভিধানে আর কোনও শব্দ না থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের শান্তি-সাধকের দেশে তো শান্তিবাণীর অভাব নেই! তা'ছাড়া, এই সব চড়া চড়া উগ্র কঠোর জঙ্গীবাত্‌চিজ্‌ থেকে শান্তি-সৈনিকদের মধ্যে শান্তির চেয়ে দাঙ্গাবাজী মানসিকতার পরিচয়টাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বেশি। তাঁদের এই উদ্ধত অবিনয়ী আচরণের দ্বারা আর যাই হোক, দেশে শান্তি কোনও দিনই আসবে না। এই সব তথাকথিত শান্তি-সৈনিক তাঁদের পূর্বোল্লিখিত আরও পাঁচরকম দাবির সঙ্গে শান্তির প্রস্তাবটাকেও একটা দাবি হিসাবেই উপস্থিত করেন। কিন্তু দাবি জানিয়ে আর যাই কেন পাওয়া যাক না 'শান্তি'র আশা—নৈব নৈবচ। দাবি করা মানেই তো অশান্তি সৃষ্টি করা। ওটা জবরদস্তির এলাকার মধ্যে—গায়ের জোরের কোঠায় গিয়ে পড়ে। 'Demand' কথাটার পিছনে বেশ একটা সঙ্গিন্‌ উঁচানো ভাব রয়েছে। আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য আমরা দাবি করতে পারি, কিন্তু শান্তির জন্য চাই একান্ত সাধনা। কমিউনিস্ট্‌ ভায়ারা যদি তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ যে-সব রকমারি উৎপাতজনক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, শান্তি আন্দোলনটাকেও তারই একটা গৌণবিভাগ মনে করে মাঝে মাঝে 'ভল্‌গা' বা কাস্পিয়ান হ্রদের নোনা জলে ভাগীরথী ভূমিতে শান্তিবারি ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তা'হলে ভায়াদের 'শান্তি' 'অশান্তি' কোনও আন্দোলনই সফল হ'য়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। এঁদের ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসে সবগুলো ঘোড়াতেই বাজী ধরা! যেটা লেগে যায়! তাতে, কিন্তু লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়।

দু'চারজন যথার্থ শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী নিরীহ লোক যদি এঁদের ওড়ানো শান্তির পায়রার পিছনে ছুটে শান্তি আন্দোলনের পুণ্য প্রবাহে ভাসতে ভাসতে সোজা একেবারে কমিউনিস্ট সাম্যবাদের বাঁধাঘাটে এসে লাগেন এবং সেখান থেকে পিকিং হয়ে একেবারে মস্কোয় পৌঁছে 'স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার' গলায় ঝুলিয়ে দেশে ফিরে আসেন, তাতে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রচারবিভাগের দক্ষতা ও তাঁদের পাবলিসিটি প্রোপাগাণ্ডার জয় জয়কার হ'তে পারে, কিন্তু শান্তি যে অশান্তির মধ্যে চাপা পড়ে আছেন সেখানেই থেকে যান না কি?

দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে আমরা যত বোকা মনে করি তারা কিন্তু ততটা নিরেট নয়। প্রথমটা না বুঝতে পারলেও সিংহচর্মাবৃত গর্দভকে একদিন তারা ধরে ফেলেই। "You can fool some people for sometime, but not all people for all time." ওঁ শান্তি।

অন্যপূর্ব্বা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্ব আমারে দিয়ে
নিজেরে যে রেখেছ লুকিয়ে—
একথা কে করিবে বিশ্বাস?
আমার সমস্ত দেহে তোমার নিঃশ্বাস
এখনও তেমনি উষ্ণ শিহরণ জাগায় কৌতুকে,
যে কম্পন উঠেছিল রিক্তবাস তোমার ও বুকে
তুমি কি ভুলিয়া গেছ সে কম্পন থেমেছিল
কিসে?
আরক্ত অধর তব চুম্বনের বিষে
মৃত্যুনীল করেনি ত তব তনুদেহ,
নিজেরে নিঃশেষ করি প্রেম-অনুলেহ
ঢেলে দিয়েছিলে তুমি তৃষ্ণা মিটাইতে;
তোমারও যে তৃষ্ণা ছিল,—অয়ি অসম্বৃতে
আনন্দ পেয়েছ তাই সেই আত্মদানে।
আমার তৃষ্ণার জ্বালা একই পানপাত্রের সন্ধানে
চরম মুহূর্ত্ত তরে ছিল কম্পমান,
আমার দারুণ তৃষ্ণা তোমার তৃষ্ণায় বহ্নিমান
চেয়েছিল সর্বস্ব আহুতি।
কামনার উন্মত্ত আকুতি
শিরায় শিরায় তোল দ্রুত সঞ্চারিত,
তোমার দাক্ষিণ্য অবারিত
আমার সম্মুখে যদি কাঁদে সকরুণ বেদনায়
আমি কি ফিরিয়া যাব মূঢ়তার তুচ্ছ সান্ত্বনায়?

কি দিয়েছ তুমি জান, কি দিয়েছি আমি তাহা জানি,
নিরুদ্বেগ অবসরে আমারে নিয়েছ তুমি টানি
নিরালায় একান্ত নিকটে।
ভোগবতী তরঙ্গিণী তটে
মম লীলা-সঙ্গিনীরে সাথে লয়ে দাঁড়ালাম যবে
দেখিলাম যৌবনের অনন্ত বৈভবে
তুমি যেন অন্যপূর্ব্বা, পরমা সুন্দরী।
আমারে আচ্ছন্ন করি
তুমি হলে সর্বময়ী; আমার আমিরে ভুলিলাম
ইহকাল পরকাল এক সাথে তোমারে দিলাম।
আজ তুমি একাকিনী বৈরাগ্যের সঙ্গীতে মুখরা
আমি কবি, গেয়ে যাই চিরবসন্তের মধুক্ষরা
চিরন্তনী সেই গীতিমালা,—
এ দেহ নিশ্চিহ্ন হোক, মনে থাক সে তৃষ্ণার জ্বালা।

শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আর এক কলঙ্কময় অধ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—দেশবরেণ্য নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক অকাল প্রয়াণে। একদা আমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করিয়া জাতীয় জীবন কলঙ্কিত করিয়াছে, আর আজ পুনরায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী কুটিল চক্রান্তে বাঙালীর মরমী নেতা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটাইয়া পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করিল। ভারতের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র কাশ্মীর রাজ্যের লৌহযবনিকা ভেদ করিয়া সেদিন এই দুঃসংবাদ অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিল—শ্যামাপ্রসাদ নাই। বঙ্গশার্দূল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সন্তান—বাঙালীর একান্ত দরদী নেতা—ভারতের অন্যতম জননায়ক বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ নাই! শেখ আবদুল্লা-শাসিত কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যন্তরে বিনা বিচারে বন্দীদশায় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। আর এ মৃত্যু যেমনি আকস্মিক তেমনি অস্বাভাবিক। যে মুহূর্তে এই দুঃসহ দুঃসংবাদ রাষ্ট্র হইল, স্তম্ভিত বাঙালী জনগণের চিত্তে ও অগণিত ভারতবাসীর চিত্তে তৎক্ষণাৎ সন্দেহের অংকুর উপ্ত হইল—ইহা প্রকৃত মৃত্যু না হত্যা? সংবাদে প্রকাশ—আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নাকি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীনগরের নিশাদবাগ বাংলো (জঙ্গলাকীর্ণ ছোট একটি ঘর) হইতে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মতো একজন সর্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের যোগ্য চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা কাশ্মীর সরকার করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন তাহাও ত্রুটিপূর্ণ। আর তাহাই তাঁহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কেন? কেন এমন ভ্রান্ত চিকিৎসার দ্বারা শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় একটি বাঙালীর অমূল্য জীবন কাশ্মীর সরকার ধ্বংস করিলেন? কাশ্মীর কি ভারতের অংশ নয়? কেন তবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাশ্মীরে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না? কেন বিধি নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তাঁহার গতিরোধ করার চেষ্টা হইয়াছিল? কাশ্মীরে বে-আইনী পদক্ষেপের সামান্য অজুহাত সৃষ্টি করিয়া কেন ও কি সাহস বলে শেখ আবদুল্লা সরকার তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন? এবং কেন মাসাধিককালের মধ্যেও তাঁহার অপরাধের কোনো বিচার হইল না? আর ভারত সরকারই বা কেন এই অন্যায় অবিচারের কোনো প্রতিবিধান করিলেন না? তবে কি আমরা ইহাই বুঝিব যে, ইহার পশ্চাতে সুপরিকল্পিত কোনো চক্রান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে!

কাশ্মীর আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তবিক্ষোভের কারণ হইয়া আছে। যে-দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একটি ভারতীয় রাজ্য হিসাবে গণ্য হইবার কথা, তাহার কতকাংশ পাকিস্তানী হামলাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়া বাকী অংশটুকুর সার্বভৌমত্ব স্বীকারের মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত থাকিলেও তাহাতে ভারতবাসীর সমষ্টিগত ক্ষতি রহিয়াছে। তাই এ ব্যাপারে একটা বিরাট সংশয় ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মনে ধূম্রজাল বিস্তার করিতেছে। বর্তমান ভারত সরকারের এই অস্পষ্ট নীতি এবং ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সমস্ত ব্যাপারটি কৌশলে গোপন রাখার অপপ্রচেষ্টার প্রতিবাদেই শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির এমনি দুর্ভাগ্য যে, কাশ্মীর-সমস্যা তেমনি রহস্যাবৃত রহিয়া গেল; অধিকন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে মহৎপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদ বলি হইলেন।

শ্যামাপ্রসাদের এই মৃত্যুকে দেশবাসী কিছুতেই স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া গণ্য করিতে পারিতেছে না। আর এই সন্দেহকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে আবদুল্লা সরকারের যুক্তিহীন ও পরস্পর-বিরোধী বিবৃতিগুলি এবং নেহেরু সরকারের হৃদয়হীন ব্যবহার। আরো আশ্চর্যের ও বেদনার বিষয়, শ্যামাপ্রসাদের পরলোকগমনের সংবাদে নেহেরুর শুষ্ক ব্যবহার। ব্যক্তিগত জীবনে নেহেরুর ঐশ্বর্যবান হৃদয়ের আবেগ ও উদারতার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে। একদা ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতেও শোক সহানুভূতি, প্রশংসা প্রভৃতির প্রবল প্রবাহ তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি। কিন্তু জাতির এতো বড় শোকের ব্যাপারে সে হৃদয়ের উৎস কোথায় কি কারণে অন্তর্হিত হইল? অথচ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সহিত একদা সহকর্মীরূপে ও পরে বিরোধীপক্ষের নেতারূপে তিনি দীর্ঘদিন বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তাঁর মুসলিম তোষণনীতির সমর্থন করিতেন না এবং হিন্দুর স্বার্থহানিকর যে কোনো কর্মের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করিতেন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত বহু বিষয়ে তিনি এক মত হইতে পারেন নাই। তাঁহার যুক্তিসহ প্রখর বিতর্কের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত বিপন্ন ও ম্লান হইয়া পড়িতেন। বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন পণ্ডিত নেহরুর একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও স্বেচ্ছাকর্মে কণ্টকস্বরূপ! এবং আগামী নির্বাচনে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান বিপরীত হওয়াও বিচিত্র ছিল না। দেশবাসী আশাও করিয়াছিল তাই। তথাপি শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় একজন যোগ্য বিরোধীর এই রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপারে নেহরুর এমন বিশুষ্ক নিশ্চেষ্ট ব্যবহার আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে মনের মধ্যে নানা সন্দেহের উদয় হয়। স্বতই মনে হয়, বুঝি বা শ্যামাপ্রসাদের অভাবনীয় বন্দীত্বে ও আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে ভারত-সরকারও নির্দোষ নন। দেশের জনগণের চিত্তে তাই এ ব্যাপারের সংশয়হীন নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে ও অবহেলায় অচিকিৎসায় ষড়যন্ত্রজালে বাঁধিয়া যাহারা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের

অকাল মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহাদের বিচারের দাবীতে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যতীত আজ দেশের প্রত্যেকটি নেতা এই বিচারের দাবী জানিয়াছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে গণদাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শুভ ফল প্রসব করে না। ভারত সরকারের উচিত তদন্ত ও বিচারের দ্বারা ইহার আশু মীমাংসা করা।

সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদের শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীও এই তদন্ত ও বিচারের দাবী লইয়া পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে পত্রাদি লিখিয়াছেন এবং নেহরু সেই পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই পত্রগুলি এইখানে সংযোগ করিলাম।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের জননীর নিকট লিখিত শ্রীনেহরুর পত্র

নং ৪৯৯—পি, এম

নয়াদিল্লী

৩০শে জুন, ১৯৫৩

প্রিয় মিসেস মুখার্জ্জী,

কয়েকদিন পূর্ব্বে জেনেভা হইতে আমার কায়রো যাত্রার সময় আপনার পুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া গভীর বেদনা বোধ করি। এই সংবাদে আমি মর্মবেদনা অনুভব করি; কারণ, রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম এবং ভালও বাসিতাম। আপনি তাঁহার মাতা, এই শোক আপনাকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে। আপনার দুঃখ অপনোদনের জন্য আমি কি-ই বা বলিতে পারি।

কায়রো হইতে টেলিগ্রাম করিয়া আমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমার গভীরতম সমবেদনা ও শোকের কথা আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলাম। আটক দশায় শ্যামাপ্রসাদবাবুর মৃত্যুই আমার পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলাম তখন তাঁহার আটকের স্থান ও স্বাস্থ্যের বিষয় খোঁজ লই। আমাকে জানান হয় যে, তাঁহাকে কোন জেলে না রাখিয়া শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল হ্রদের তীরে এক বেসরকারী বাংলোতে রাখা হইয়াছে। আমি দেখিলাম যে, কাশ্মীর সরকার তাঁহাকে যথাসাধ্য আরাম ও সুযোগ দিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন এবং তিনিও ভাল আছেন। ইহা জানিয়া তখন আমি খুশী হই। কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, বাস্তবিক আমি সেই আশাই করিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহা হয় নাই। তাই শোক ও দুঃখের আঘাত অনেক বেশী বোধ হইতেছে। কিছু করা মানুষের সাধ্যাতীত ছিল বলিয়াই আমার মনে হয় এবং ক্ষমতার বাহিরের অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভদ্রে, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য ও দুঃখ নিবেদন করিতেছি। আমাকে দিয়া আপনার যদি কোন কাজ হয়, তবে আমাকে জানাইতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

একান্ত অকপট

(স্বাঃ) জহরলাল নেহরু

শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের জননীর পত্র

৭৭, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,

কলিকাতা

৮ঠা জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ৩০শে জুনের পত্র ২রা জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

আপনার সমবেদনা ও শোকবার্ত্তার জন্য ধন্যবাদ।

আমার প্রিয়পুত্রের লোকান্তরে জাতি আজ শোকাভিভূত। সে শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আমি তাহার মাতা, আমার দুঃখ এত গভীর ও পূত যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। কোন সান্ত্বনা লাভের জন্য আপনাকে লিখিতেছি না। আমি আপনার শুধু বিচার চাই। আমার ছেলে মারা গিয়াছে আটক দশায়। সে আটক বিনা-বিচারে আটক। আপনার পত্রে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যে, কাশ্মীর সরকার করণীয় সবই করিয়াছেন। আপনি যে আশ্বাস ও সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহাই আপনার ধারণার ভিত্তি। যে-সব লোকের নিজে-দেরই বিচার হওয়া উচিত, আমি জিজ্ঞাসা করি তাহাদের দেওয়া সংবাদের কি মূল্য আছে? আপনি বলিয়াছেন, আমার ছেলের আটকদশায় আপনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন। তাহাকে আপনি ভালবাসিতেন সেকথাও বলিয়াছেন। সেখানে নিজে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে এবং তাহার স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হইতে কিসে যে আপনাকে বাধা দিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হই।

তাহার মৃত্যু রহস্যাবৃত। সেখানে তাহাকে আটক রাখার পর—তাহার মা আমি—আমাকে সর্ব্বপ্রথম কাশ্মীর সরকার যে সংবাদ দিলেন তাহা হইল তাহার মৃত্যু সংবাদ, আর তাহাও অন্ততঃ সব শেষ হওয়ার দু'ঘণ্টা পরে—ইহা কি একান্ত অদ্ভুত ও শোকাবহ নহে? আর কি নিষ্ঠুর গোপনীয়তার সঙ্গে সেই সংবাদ দেওয়া হইল। এমন কি তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে আমার ছেলের সেই টেলিগ্রামও আমাদের কাছে আসিল তাহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদের পর। কাযাতঃ আটকের সময় হইতে তাহার শরীর যে ভাল যাইতেছিলনা সে সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে নিশ্চয়ই কয়েকবার ও তাহার পরবর্তী সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশ্মীর সরকার বা আপনার সরকার আমাকে বা আমার পরিবারকে কোন রকম সংবাদই দেন নাই। এমন কি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার সময়ও আমাদের বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়ারও তাঁহারা দরকার বোধ করিলেন না।

ইহাও স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে, শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের পূর্ব ইতিহাস জানিবার জন্য কাশ্মীর সরকার মোটেই মাথা-ব্যথা করেন নাই এবং শুশ্রূষার ও প্রয়োজনের সময় চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা তাঁহারা

করেন নাই। এমন কি তাহার পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণকে সতর্কতা জ্ঞাপন হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। তাহার মারাত্মক ফলই হইয়াছে। আমার কাছে একথা প্রমাণ করিবার নিশ্চিত তথ্য আছে যে, ২২শে জুন সকালে সে অবসন্ন বোধ করে—ইহা তাহার নিজেরই কথা। সরকার কি করিয়াছিলেন? কোনপ্রকার চিকিৎসা সাহায্য দেওয়ার অনিয়মিত বিলম্ব, নিতান্ত অবিবেচকের মত তাহাকে হাসপাতালে পাঠান, তাঁহার সহ-বন্দীদ্বয়কে হাসপাতালে তাঁহার কাছে যাইতে না দেওয়া—এগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন আচরণের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। সে যে ভাল ছিল তাহা শ্যামাপ্রসাদের পত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধার করা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তি দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে কাশ্মীর সরকার ও তাঁহাদের নিজের ডাক্তারদের দায়িত্ব মোটেই এড়ান বা কমান যাইবে না। এইরূপ উদ্ধৃতির মূল্য কি? কেহ কি আশা করে যে, প্রিয়জনদের নিকট হইতে বহুদূরে আটক দশায় থাকিয়া সে তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিবে বা তাহার নিজের রোগ নিজেই নিরূপণ করিবে। সরকারের দায়িত্বের অন্ত নাই, আর সে দায়িত্ব গুরুতরও বটে। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, তাঁহারা এই অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য পালন করেন নাই। আপনি আটকদশায় শ্যামাপ্রসাদকে আরাম ও সুযোগ দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইহাও তদন্তের ব্যাপার। কাশ্মীর সরকার এমন-কি পারিবারিক পত্রাদিও অবাধে লেনদেন করিতে দেন নাই। দীর্ঘকাল পত্রাদি আটক রাখিবার কোন যুক্তি নাই এবং কয়েকখানি পত্রেরও অন্তর্দ্ধান রহস্যজনক! তাহার বাড়ীর সংবাদ, বিশেষভাবে তাহার পীড়িতা কন্যার ও আমার সংবাদের জন্য তাহার দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আপনি একথা জানিয়া কি বিস্মিত হইবেন যে, ২৭শে জুন আমরা তাহার ১৩ই জুনের পত্র পাইলাম? কাশ্মীর সরকার এক প্যাকেটে ভরিয়া তাহা ২৪শে জুন অর্থাৎ তাহার মৃতদেহ পাঠাইবার এক দিন পরে আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। সেই প্যাকেটে শ্যামাপ্রসাদের কাছে লেখা আমার ও এখানকার অন্যান্যের লেখা পত্র ছিল। সেই সব পত্র ১১ই ও ১৬ই জুন শ্রীনগরে পৌঁছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে তাহা দেওয়া হয় নাই। ইহা শুধু মানসিকভাবে পীড়ন করার ঘটনা মাত্র। সে পুনঃ পুনঃ বেড়াইবার মত যথেষ্ট যায়গা চাহিয়াছে, তাহা না পাইয়া সে অসুস্থ বোধ করে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহাও কি শারীরিক অত্যাচারের অন্যতম ব্যবস্থা নহে? তাহাকে কোন কারাগারে না রাখিয়া শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল হ্রদের তীরে এক বেসরকারী ভিলাতে রাখা লইয়াছে—আপনি আমাকে এই কথা জানানতে আমি বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিতেছি। সামান্য প্রাঙ্গণ লইয়া গঠিত ছোট একটি বাংলায় দিবারাত্রি একদল সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা—ইহাই ছিল দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র। সোনার খাঁচায় বন্দী সুখী হয় একথা কি বিশ্বাস করা যায়? এইরূপ বেপরোয়া প্রচারে আমি ভয় পাই। কি চিকিৎসা সাহায্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি জানি না। সরকারী রিপোর্টও স্ববিরোধী বলিয়া আমাকে জানান হইয়াছে। বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এই অভিমত দিয়াছেন যে, ইহা ভীষণ অবহেলার ঘটনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই বিষয়ে পূর্ণ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।

আমার প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে আমি বিলাপ করিতেছি না। স্বাধীন ভারতের এই নির্ভীক সন্তান বিনা বিচারে আটক অবস্থায় মর্মান্তিক ও রহস্যজনকভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। সেই মহান্ সন্তানের জননী—আমি দাবী করিতেছি যে, অবিলম্বে যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক। আমি জানি, যে জীবন অনন্তে বিলীন হইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু আমি চাই যে স্বাধীন ভারতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার প্রকৃত কারণ এবং গভর্ণমেণ্ট সে সম্পর্কে কি করিয়াছেন তাহা জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করিবার সুযোগ পাক।

যদি কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সেই অন্যায়কারী যতবড় পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক, ন্যায়বিচারের বিধান হইতে সে যেন অব্যাহতি না পায়। জনসাধারণ সতর্ক হউক, যেন ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে কোন মাতাকে আমার মত দুঃখ বেদনার অশ্রু না পাত করিতে হয়!

আপনি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তাহা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন। আমি নিজের পক্ষ হইতে এবং ভারতের মাতাদের পক্ষ হইতে এই দাবী উত্থাপন করিতেছি। ঈশ্বর আপনাকে সত্যপ্রকাশের সৎসাহস দিন।

চিঠি শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাইতেছি। শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও অন্যান্য লেখা কাগজপত্র কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট প্রেরণ করেন নাই। * * * * * * আপনি যদি সেগুলি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। সেগুলি নিশ্চয়ই কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের নিকট আছে।

আশীর্ব্বাদ সহ শোকগ্রস্তা

যোগমায়া দেবী।

নেহরুর উত্তর

নয়াদিল্লী

৫ই জুলাই, ১৯৫৩

শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ মুখার্জী—

আপনার ৪ঠা জুলাইয়ের পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

আমি বুঝি, মাতার নিকট প্রিয় সন্তানের মৃত্যু কি গভীর দুঃখ ও বেদনাদায়ক! আপনি যে আঘাত পাইয়াছেন, আমি মুখের কথায় সে আঘাতের বেদনা হ্রাস করিতে পারিব না।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আটক ও মৃত্যু সম্পর্কে ভালভাবে তদন্ত না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস পাই নাই। যে সমস্ত লোক এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের নিকট আমি আরও তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি এবং আমি আপনাকে এইটুকুই বলিতে পারি যে,

আমি পরিষ্কার এই সুসিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, ইহার মধ্যে কোন রহস্য নাই এবং ডাঃ মুখার্জী সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাই পাইয়াছিলেন।

আমি আপনাকে জানাইতে পারি যে, কাশ্মীরে চিঠিপত্র যায় বিমানে। আবহাওয়ার গোলযোগের জন্য বিমান চলাচল অনিয়মিত হয় এবং কখনও কখনও চিঠিপত্র এক সপ্তাহ পর্যন্ত আটক থাকে। প্রকৃতপক্ষে গত এক সপ্তাহ যাবৎ কাশ্মীরে কোন চিঠিপত্র যায় নাই। কাশ্মীরে প্রেরিত আমার বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্র বিলম্বে পৌঁছিয়াছে।

আমিও ১০ বৎসর জেলখানায় কাটাইয়াছি এবং সারা ভারতের বহু জেলখানায় বাস করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। কাজেই বন্দীদশায় মানুষের মনের অবস্থা কি হয়, তাহা আমি জানি এবং কি অবস্থায় তাহাকে কাটাইতে হয় তাহাও আমার জানা আছে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর দিন কাশ্মীরের একজন মন্ত্রী টেলিফোনে বিচারপতি মুখার্জীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি কথা বলিতে পারেন নাই। পথে দুইবার তাঁহার বক্তব্য অপারেটাররা পুনরুক্তি করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে বক্তব্যটি খাপছাড়া ও অসমাপ্ত অবস্থায় আপনাদের নিকট পৌঁছায়।

ডাঃ মুখার্জীর ডায়েরী ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্বন্ধে আপনি যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা বক্সী গোলাম মহম্মদের নিকট পাঠাইলাম। তাঁহার কাছে কাগজপত্র থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার নিকট প্রেরণ করিবেন, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। আন্তরিকভাবে আপনার

জওহরলাল নেহরু

যোগমায়া দেবীর পত্র

কলিকাতা

৯ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় নেহরু—

আপনার ৫ই জুলাইয়ের পত্র ৭ই জুলাই পাইয়াছি। পত্রটি সমগ্র পরিস্থিতির এক শোচনীয় ভাষ্য। আপনার মনোভাব রহস্য উদ্ঘাটনের পরিবর্তে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। আমি আপনার পরিষ্কার এবং সুসিদ্ধান্ত জানিতে চাহি নাই। সমগ্র ঘটনাটিকে আপনি কি চোখে দেখেন তাহা এখন আর কাহারও নিকট অজ্ঞাত নাই। মা হিসাবে আমার এবং সমস্ত দেশবাসীর সন্দেহভঞ্জন করার প্রয়োজন আছে। বহু লোকের মনেই সন্দেহ দৃঢ়মূল। এখন প্রয়োজন অবিলম্বে প্রকাশ্য নিরপেক্ষ তদন্ত।

আমার পত্রের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর পাই নাই। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলিয়াছি যে, সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রমাণের মত যথেষ্ট তথ্য আমার নিকট আছে; আপনি সেগুলি দেখিবার অথবা জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাহার পরিবারের লোক হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আলোকপাত করিবার জন্য আপনি আমাদের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও আপনি আপনার সিদ্ধান্তকে সুসিদ্ধান্ত বলেন।

কাশ্মীরে বিমান ডাক চলাচলের অসুবিধা সম্পর্কে আপনি যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। উহার মধ্যে চিঠিপত্র সম্পূর্ণভাবে উধাও হওয়ার এবং বিলম্ব হওয়ার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার পত্র মন দিয়া পাঠ করিলে আপনি এমন কুযুক্তি উত্থাপন করিতেন না। চিঠির উপর ডাকঘরের যে ছাপ আছে তাহা আপনার যুক্তিকে অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে অসার প্রতিপন্ন করে।

জেলখানায় আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমরা সকলেই জানি। এক সময় উহা ছিল আমাদের পরম জাতীয় গৌরব। কিন্তু আপনি বিদেশীর শাসনকালে জেল ভোগ করিয়াছেন, আর আমার পুত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আমলে বিনা বিচারে আটক অবস্থায় জেলে মারা গিয়াছে। বৃটিশ আমলে জেলখানায় এইরূপ মর্মান্তিক ও রহস্যজনক ঘটনা ঘটিলে কি অবস্থা হইত?

আপনাকে আর পত্র লেখা অর্থহীন। আপনি ঘটনার সম্মুখীন হইতে আতঙ্কিত। আমি আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টকেই দায়ী করিতেছি। এ ব্যাপারে আপনার গভর্ণমেণ্ট যোগসাজস করিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। আপনি আপনার বিরাট শক্তিসামর্থ্য লইয়া যতই প্রচার করুন সত্যকে চিরকাল ঢাকিয়া রাখা যাইবে না। ভারতবাসীর নিকট এবং স্বর্গে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে জবাব করিতে হইবে।

আমি এই পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি। প্রধান মন্ত্রী যাহা পারেন নাই ভারতবাসী তাহা বিচার করিয়া দেখুক ও তদনুযায়ী যাহা করিবার করুক। আপনার শোকগ্রস্তা

যোগমায়া দেবী

*

ইহার পরেও যদি পণ্ডিত নেহরু ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যুর তদন্ত ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে সমগ্র বাংলা ও ভারতের জনগণ তাঁহার প্রতি নিশ্চয় আস্থা হারাইবে।

সম্প্রতি দিল্লীর 'হিন্দুস্থান সমাচারে' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদের বিশ্বাস—জনমতের চাপে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত যদি ভারত সরকারকে ডক্টর মুখার্জীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের দাবী মানিয়া লইতে হইত তাহা হইলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে ভারত ও কাশ্মীর সরকারের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই দিক দিয়া ভারত সরকারের নিকট 'শাপে বর' প্রমাণিত হইয়াছে এবং তদন্তের দাবীর প্রধান উদ্গম স্থান কলিকাতাই যখন ঐ বিষয়ে শান্ত হইয়াছে তখন আর ওদিক দিয়া ভয়ের কারণ নাই।...

অনেকে আবার এই মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই নাকি কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহকে ভিন্নমুখী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা

হয়। কিন্তু উহার পরিণাম এমন ভয়াবহ হইবে বলিয়া নাকি আশা করা যায় নাই। এখন এই কলঙ্ক অপনোদনের চিন্তাই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।"

কিন্তু কোনো কারণেই বাঙালী তাহার প্রিয় নেতার এই অবাঞ্ছিত মৃত্যুর বেদনা বিস্মৃত হইবে না। সত্যের মৃত্যু নাই। যে রহস্যের যূপকাষ্ঠে শ্যামাপ্রসাদ বলি হইয়াছেন সে রহস্য বাঙালী উদ্‌ঘাটন করিবেই। কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। সম্প্রতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, যাহাতে শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার, আটক ও বন্দীদশায় রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকাটি সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্যামাপ্রসাদের জননী। তিনি লিখিয়াছেন: "আমার বীর সন্তান সাহসিকতার সহিত যাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করিয়াছিল তাঁহাদেরই দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়া, হাসপাতালে অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—**আমার এই বীর সন্তানের জন্য অনেকেই প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিত। * * অন্তিম রজনীর কথা ভাবিলেই ভয়ে আমি শিহরিয়া উঠি! সরকারী কর্মচারীরা সমগ্র রহস্যের উপর লৌহযবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বলিতেছেন, ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে আমাকে ভগবানের নাম শুনিতে হইল! * *

"আমি শ্রীজওহরলাল নেহরুর নিকট সুবিচার চাহিয়াছিলাম। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্তের দাবীও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে অভ্রান্ত এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, তিনি "শুধু সরল ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত" আমাকে জানাইতে পারেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই পুস্তকে এ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত যেসব ঘটনা ও তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কোনো তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং সরকারী ভাষ্যসমূহ সঙ্গতিহীন, বিকৃত তথ্যে পরিপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ত মনে করেন, সরকারী-নীতির বেদীতে সত্যকে বলি দেওয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্যমেব জয়তে।"

"এই পুস্তকে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।"

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা দেশবাসী কোনোমতেই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ভারত সরকারের নিকট পুনরায় দাবী জানাইতেছি যে, আমরা—সমগ্র দেশবাসীরা এই রহস্যময় মৃত্যুর আশু নিরপেক্ষ তদন্ত চাই—অপরাধীর বিচার চাই। বিশ্বকবির বাক্য যেন কোনো কারণেই আমরা বিস্মৃত না হই:

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে॥ (৫।৮।৫৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ

সত্যবান

আকাশে মেঘের স্তূপ হারায়েছে পথের নিশানা,
কালো মেঘে ঢেকে গেল মানুষের অন্তর বাহির,
জোনাকির আলো জ্বলে নিভে যায় দুর্বল অস্থির,
আঁধার রাতের বুকে ভীড় করে সংশয় অজানা।
ধ্রুবের আশ্বাস নাই; তর্জ্জনী তুলিয়া করে মানা
ভেকের কর্কশ তান; অরণ্যের হিংস্র প্রহরীর
আহ্বানে শিহরে কূল; গতি ভ্রষ্ট ভগ্ন তরণীর;
নির্জ্জন পিচ্ছিল পথে শতাব্দীর শব যাত্রা নানা।
তোমার উদয়ে কি কেটে গেল মেঘের বাঁধন,
দিগন্ত রঙ্গীণ হ'ল, অরণ্যের জাগিল উচ্ছ্বাস,
ভরা নদী হেসে ওঠে, কূল পায় দিকহারা মন,
রবির আলোকে দীপ্ত পথে পথে মিলিল আশ্বাস।
ঘর ছাড়া মানুষেরা ঘরে তুমি এনে দিলে, তাই
জীবন প্রভাতে আজ তোমারেই প্রণাম জানাই।

অতল

শিশিরকুমার দাশ

ধূ ধূ করে চর দুপাশে শুধুই মাঝেতে অথৈ জল
অবাক সূর্য্য দুরন্ত হাওয়া দিগন্তময় নীল
ছড়ালো অনেক—অনেক কিছুই সবুজের ঝিলমিল
রুদ্ধ আবেগে ডুব দিয়ে তবু পেলাম না খুঁজে তল।
বেঁধে দিল মন এপারের মাঠ, ওপারের বন টান
দিল বারবার শিস্ দিয়ে কোন ব্যাকুল পাখীর মত
নীরব প্রহরে চকিতে দাঁড়াই, ডাক শুনে অবিরত
এপারে ওপারে দুপারেই মন চঞ্চল আনচান।
সূর্য্যের কণা তবুও ছড়াই বনে বনে নির্জ্জন
দিশাহারা নদী ব্যাকুল বাতাসে অজানা মন্ত্র দিয়ে
ডেকে আনে বাক্ হারা মুখে নিরুক্ত মন নিয়ে—
তল খুঁজে মরি শুনি ভেসে আসে জলদের গর্জ্জন।
সূর্য্য ছড়ায় অগণ্য আলো আকাশের পথ ভরে—
তলের পাইনা ধরা দুপারেই চর শুধু ধূ ধূ করে।

একটি প্রেমের কাহিনী

শ্রীতন্ময় বাগচী

(মোপাসাঁ অবলম্বনে)

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। অস্ত-রবি তার রক্তিম রশ্মি-আভা গাছের মাথা আর সমুদ্রের তরঙ্গকে স্পর্শ করে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে মিশে যাচ্ছে। সমুদ্রতীরের গাছের ডালে প্রকৃতির শিশুরা তারি বিদায় সঙ্গীত গাইতে ব্যস্ত! গোধূলির এই ম্লান সন্ধ্যায় আমরা কয়েক বন্ধু চা খেতে খেতে সেই পুরাতন প্রেমের চিরন্তন মামূলী গল্প ফেঁদেছি। চা-রস-বিভোর কোন বন্ধু প্রণয়িনীর অধর সুধা পান করার মত রজতশুভ্র চিত্র-বিচিত্র পেয়ালায় অধরের স্পর্শ লাগিয়ে প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চলেছে। সমুদ্রধারের আইভি-লতার ঝোপে-ঢাকা ঘরে বসে আমাদের গল্প চলেছে। জানলা ভেদ করেও স্পষ্ট দেখা যায় সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা! সমুদ্রের ঢেউ-ছোঁওয়া ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের শরীরে এসে লাগছে। ম্লান গোধূলি মানুষের সাথে কি নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছে জানি না, তবে দিনের আলো যতই নিভু নিভু হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যেও কেমন যেন এক উদাস বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। আমাদের চা-রসসিক্ত গলার স্বরও সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে আসে।

'কারো প্রেম কি চিরস্থায়ী হয়?'

'নিশ্চয়ই।'

'না…না কখনই হয় না—একেবারে অসম্ভব! সেদিন…'—বন্ধু জোকার উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল।

তখনই সুরু হোল এক বিরাট তর্কযুদ্ধ। হেনরিন সাইমন যেন এক বুলেটিন! সহরের সব সেরা খবর তার কণ্ঠস্থ! মুখখানা গম্ভীর করে, অনেক উদাহরণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ প্রেমের ঘটনার উল্লেখ করে, নিজের বক্তব্যকে আমাদের মনে চিরদিনের মত গেঁথে দেবার আশায় হাত পা নেড়ে অনর্গল বকে চলল।

হেক্তর অত্যন্ত ধীর স্থির আর শান্ত প্রকৃতির। তর্কের দিকে মোটেই পা বাড়াতো না। তাই হেনরীন সাইমনের উত্তেজনায় কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল— 'হেনরিন! বাজে তর্ক করে এমন জমাটি আড্ডা মাটি করে লাভ আছে কিছু? তার চেয়ে সবাই নিজের প্রেমের কাহিনী শোনাও না কেন? তাহলেই তো বোঝা যাবে প্রেম চিরস্থায়ী হয় কি না?'

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে নেমে এলো অখণ্ড নিস্তব্ধতা। সবার মনই নিজের নিজের প্রেমের স্মৃতির দোলায় দুলতে সুরু করে দিয়েছে। স্ত্রী আর পুরুষের দুটি হৃদয়ের মিলন রহস্যের কথা গভীর উৎসাহে কণ্ঠ ভেদ করে ভিড়ে এসে মিশে যাচ্ছে। তাই সবাই নীরব।

এদিকে বিকাল ক্রমেই গড়িয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। সান্ধ্য-আকাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দুটি একটি তারা। সমুদ্রতীরের শুকনো ফুল-বাগানের ঘুম ভেঙ্গেছে; শুষ্ক মুকুলে লেগেছে হাসির আনন্দাভা!

'দেখ…দেখ… ঐদিকে তাকাও দেখি!'—সন্ধ্যার নীরব গাম্ভীর্য ভেঙ্গে হঠাৎ জর্জ বুপেটিন হাত তুলে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—'দেখ দেখি ঐদিকে!'

সমুদ্রের ওপর এক বিরাটকায় ধূসর রঙ্গের অবিচ্ছিন্ন জিনিস আমাদের চোখে পড়ল। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে ঐ দৃশ্য দেখতে লাগলাম!

জোকার বলল—'এ যে কার্সিকা দ্বীপ! এর মত আশ্চর্য আর কিছু নেই। এই দ্বীপ বছরে দু'তিনবারের বেশী দেখা যায় না। প্রকৃতির কয়েকটি বিশেষ নিয়মে আর বায়ুর গুরুত্ব মত মাঝে মাঝে কুয়াশার আবরণ ভেদ

করে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। শুনেছি কার্সিকা দ্বীপের পাহাড়গুলো একটু বিভিন্ন রকমের।'

জোকারের কথায় অবাক্ হয়ে আবার সেই সমুদ্রের মাঝে কার্সিকা দ্বীপের দিকে তাকালাম।

আমাদের থেকে খানিকটা দূরে এক বৃদ্ধ এতক্ষণ নিষ্পলক নয়নে আমাদের কথা শুনছিল। এবার সে তার সমস্ত শরীরে একটা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'এই কার্সিকা দ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি আমি। বলছি শোন—! প্রথমেই বলে রাখি যে-কথাগুলো তোমাদের শোনাব—সে-সব অনেকদিন আগের কথা। আমাকে ভেবে ভেবে বলতে হবে। এতক্ষণ যা নিয়ে তর্ক করছিলে আমার এ কাহিনীও সেই প্রেমেরই। শুনে সুখী হবে হয়ত এ গল্পের মানুষ দুটির প্রেম সত্যি চিরস্থায়ী হয়েছিল। আজ এই যে দ্বীপটা ভেসে উঠেছে আমার মনে হয় তোমাদের তর্কযুদ্ধ মেটাবার জন্যেই বোধহয়।'

দম নেবার জন্য একটুখানি থেমে বৃদ্ধ লোকটি আবার বলে চলল—'যৌবনে আমি নিজে একবার কার্সিকা দ্বীপে গিয়েছিলাম। তখন ঐ অর্ধসভ্য দ্বীপের কথা মাঝে মাঝে অল্প একটু শোনা যেত। আজ আমরা ফ্রান্সের তটপ্রান্ত থেকে কার্সিকাকে যত কাছে মনে করি, বাস্তবিক সেটা তত কাছে নয়—আমেরিকার চেয়েও অনেক দূরে। মনে মনে এমন একটা রহস্যময় জগতের কথা কল্পনা করে নাও যার অস্তিত্ব এখনও অনেকের কাছে অজানা রয়েছে। কতকগুলো পাহাড় আর চারিধারের প্রবল ঘূর্ণিস্রোতের কথা কল্পনা কর, কল্পনা করো এমন একটি দেশ যেখানে বাস করবার মত এতটুকু সমতল যায়গা নেই—চারিধারে শুধু লতাপাতা আর বাদাম গাছে ভরা। এই যায়গার মাটি অকর্ষিত, অবহেলিত আর অনুর্বর। মানুষের বসবাসের চিহ্নস্বরূপ দুর্গম বনে পাহাড়ে দু' একটা কুঁড়ে ঘরের দেখা পাওয়া যায়, আর দেখা যায় পাহাড়ের শিখরে স্তূপীকৃত শিলারাজি। এই অসভ্য দ্বীপবাসীদের শিল্প-নৈপুণ্যের কোন নিদর্শন পাবে না, মানুষের কল্পনা আর প্রতিভা যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করে এ খবর তাদের স্বপ্নেরও বাইরে। প্রথম মানুষের মতই তারা চিরদিন অর্ধসভ্য—যেন যুগযুগান্তর থেকে বাস্তব জগতে বংশানুক্রমে বাস করেও পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

'ইতালী···! কি সুন্দর আর সুসভ্য দেশ-ই না এই ইতালী! সভ্য জগতের মুকুটমণি এই ইতালীতে গেলে দীন-দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদে পর্যান্ত প্রতিভাশালী শিল্পীর অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের দর্শন পাবে। চারিধারে সভ্য জগতের প্রাণবন্ত রুচির নিদর্শন মাখানো। মনে হবে ইতালী-ই যেন শিল্পীর মানস-কল্পনা-প্রসূত শিল্প-সৃষ্টি! কলালক্ষ্মীর আনন্দভবন! তারি পাশে কার্সিকা··! স্বর্গ আর নরক যেন!'

বৃদ্ধ ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করল। তারপর এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগল—'অতি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই দ্বীপবাসীরা সভ্য জগতের সামনে নিজেদের দাঁড় করাতে পারল না। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকা আর ঝগড়া ছাড়া অন্য সব বিষয়ে উদাসীন হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তারা যেমন হিংসাকলহপরায়ণ তেমনি রক্তপিপাসু। এত দোষ ছাড়াও তারা গুণে বঞ্চিত নয়। তাদের মত অতিথি-সেবাপরায়ণ, উদার ও সরলের দেখা পাওয়া ভার। তারা অপরিচিত আগন্তুক অতিথিকে অসংকোচে আতিথ্য দেয়। পরম আত্মীয়ের মতই সেবা যত্ন করে।

হ্যাঁ এবার আসল প্রসঙ্গে আসি। ঘটনাচক্রে এই চমৎকার দ্বীপে আমাকে একমাস কাটাতে হয়েছিল, যে কদিন ছিলাম কেবলি মনে হোত আমি যেন জগতের এক অনাবিষ্কৃত প্রান্তে এসে পড়েছি। এখানে কোন হোটেল নেই, নেই কোন পান্থশালা। রাজপথও নিশ্চিহ্ন! ঘোড়ার পিঠে চড়ে এখানকার ছোট ছোট গ্রামে গেলে দেখতে পাবে গ্রামগুলো যেন পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কি সকাল, কি দুপুর, কি সন্ধ্যা—সব সময়ই নির্ঝরমুক্ত জলরাশির সুগভীর পতনধ্বনিতে চারিদিক মুখর। দরজায় দরজায় আঘাত করে আশ্রয় চাইলে গৃহস্বামী সাদরে আর সানন্দে আশ্রয় দেবে। দীন পরিবারে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বিদায় প্রার্থনা চাইবার সময় দেখবে বাড়ীশুদ্ধ সবাই তোমার পথের সঙ্গী হয়েছে কিছুটা। কার্সিকা দ্বীপবাসী অসভ্য বর্বর বটে, কিন্তু অতিথির সম্মান দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না।'

বৃদ্ধ কথার মাঝে জানলার বাইরে তাকিয়ে সেই কার্সিকা দ্বীপ তখনও দেখা যাচ্ছে কিনা দেখতে চেষ্টা করছিল। পল এই কাহিনী শুনছিল কিনা জানিনা, তবে বৃদ্ধের ঘৃণা আর হতাশা মাখানো মুখভঙ্গী আর উৎসাহ—আনন্দোচ্ছ্বাসের কথাগুলো চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বার সময় বেশ লক্ষ্য করছিল। তার্কিক জোকার তার পাইপের জন্য ছুরী দিয়ে তামাক কাটছিল। বৃদ্ধ আমাদের সবাইকে ধূমপান করতে দেখে নিজের পকেট থেকে একটা নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে আবার বলতে সুরু করল—'একদিন ক্রমাগত দশ ঘণ্টা হেঁটে অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার সময় উপত্যকার কাছে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে সমুদ্র খুব বেশী দূর নয়। লতাপাতা ঢাকা দুটো পাহাড় আছে একপাশে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাহাড় দুটি এই নীরব উপত্যকাকে যেন মাতৃস্নেহাঞ্চলে ঢেকে রেখেছে। কুঁড়ের চারিদিকেই দ্রাক্ষা বন। আরো খানিকটা দূরে কয়েকটা বাদাম গাছ। ক্ষুদ্র সংসারের পক্ষে এই পর্যাপ্ত! সেই কুঁড়ের দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে এক বৃদ্ধ মহিলা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা বেশ গম্ভীর, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধ মোড়ায় বসেছিল। আমাকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে আবার বসে পড়ল। বৃদ্ধের দিকে আমাকে তাকাতে দেখে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—'ওঁকে মাপ করবেন। উনি সম্পূর্ণ বধির, আর বয়স বিরাশী বছরেরও বেশী।'

'তাঁর নির্ভুল ফরাসী ভাষায় উচ্চারণে আমি অবাক না হয়ে পারি না। ঘরগুলো বেশ সাজানো; চারিদিকে বিলাসিতার উপকরণে উজ্জ্বল—কিন্তু সুরুচি আর সৌন্দর্যবোধ এমনভাবে মাখানো যা দেখলে চোখ পীড়িত হয় না মোটেই। দেওয়ালে নানা রঙের ছবি, সৌন্দর্যের আড়ালে ইঁট কাঠের কাঠিন্য একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। চারিদিকে কেমন যেন কোমলতা-মাখা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। বিস্ময়ের পালা ক্রমেই বেড়ে চলে। যতই দেখছি ততই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই। তার ওপর বৃদ্ধার পরিষ্কার ফরাসী ভাষার কথা! প্রবল বিস্ময়ের সাথে একসময় বৃদ্ধাকে জিগ্‌গেস করে ফেললাম—'আপনি কি কার্সিকার লোক নন?'

'না মসিঁয়ে! আপনার মত মহাদেশের লোক আমরাও। এখানে আমাদের বাস পঞ্চাশ বছরেরও বেশী।'

আমি আরো অবাক হয়ে যাই। পঞ্চাশ বছর এই জনমানবহীন দুর্গম অরণ্যে কি করে বাস করছে তা ভেবে ঠিক করতে পারি না। বৃদ্ধার সাথে যতই কথা হয় আমার বিস্ময়ের পালা তত বেড়ে যায়। খানিকবাদে এক কৃষক আসতেই আমরা আহারে বসলাম। আহার্যের উপকরণ সামান্য—মহাদেশবাসী আমাকে আহার্য দেবার সময় বৃদ্ধার চোখেমুখে সংকোচের ভাব ফুটে উঠেছে দেখে গভীর তৃপ্তির সাথে আহারে প্রবৃত্ত হলাম। বৃদ্ধারও আনন্দের সীমা নেই। নারীর অন্তরে কোমলতা আর মাধুর্য বৃদ্ধার জরাকে গ্রাস করে নিয়েছে। বহু যুগের ওপর থেকে আজ এক মহাদেশবাসী অতিথিকে পেয়ে অতিথি-সৎকারের আনন্দ বৃদ্ধার অন্তরে উপছে পড়তে লাগল।

'সামান্য আহার্য অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আমি দরজার কাছে এসে বসলাম। নানা চিন্তা আমার মনে অনবরত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এ কোথায় এলাম আমি···? এরা কারা···? মহাদেশ ছেড়ে এই অসভ্য বর্বর দ্বীপের দুর্গম অরণ্যে বাস করছে কেন···? রাত যত বেড়ে চলেছে অন্ধকার ততই গাঢ়ো হয়ে আসছে। জনহীন অরণ্যের নির্জন অন্ধকারের রাতে একা বসে মনের মধ্যে এক করুণ সুর যেন শুনছি। জেগে-জেগেই আমি যেন স্বপ্ন দেখছি!

গৃহকর্ম শেষ করে বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বসলেন।

'আপনি বোধহয় ফ্রান্স থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ। সখের ভ্রমণে বেরিয়েছি আমি!'

'তাহলে কি বরাবর প্যারিস্ থেকেই আসছেন?'

'না ন্যান্‌সি থেকে।'

ন্যান্‌সির কথা শুনেই কেন জানি বৃদ্ধার চোখে মুখে এক উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল। ঘরের বাইরে দরজার কাছে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে জগতের অন্যান্য বধিরদের মতই সুখ-দুঃখ বোধশূন্য অসহায় লাগছিল আমার। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বৃদ্ধা বলে উঠলেন—'ওঁর জন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই, আপনি বলে যান। আমাদের কথার একটি বর্ণও উনি বুঝছেন না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁত দিয়ে হাতের নখ কেটে বৃদ্ধা আবার বললেন—'ন্যান্‌সির সবাইকে আপনি চেনেন বোধহয়?'

সম্মতির ঘাড় নাড়লাম শুধু।

'স্যাণ্ট এলিজ পরিবারকে চেনেন?'

'খুব ভালো করে। তারা আমার বাবার পরম বন্ধু।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

পুরো নাম শুনে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নিষ্পলক নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নীচু করে

লোকে যেমন কোন বিষয় চিন্তা করতে করতে আপন মনে বকে চলে তেমনি বিগত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে আপন মনে বলে চললেন—'হ্যাঁ···হ্যাঁ···আমার বেশ মনে পড়ে। আচ্ছা ব্রিস্ মেয়েদের খবর জানেন ?'

'তাঁরা সবাই মারা গেছেন।'

দুঃখ-সূচক মুখভঙ্গী করলেন বৃদ্ধা !

'আপনি সাইরেমণ্টকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ। তবে তাদের পুরুষ একজন সেনাদলে ঢুকেছে।'

আমার কথা শুনে বৃদ্ধা যেন চমকে উঠলেন ! তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে কেন জানি আমার মনে হয় এতদিন হৃদয়ের গোপন গহ্বরে যে কথাগুলো লুকানো ছিল সেগুলো শোনাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

'এই হেনরী আর ডি সাইরেমণ্ট-ই আমার ভাই।'

বৃদ্ধার কথা শুনে পরম বিস্ময়ে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম আমি। ধীরে ধীরে আমার মনে পড়তে লাগল অনেকদিন আগে লোরেনের এই সম্ভ্রান্ত বংশে কি যেন এক গণ্ডগোল হয়েছিল। সব ঘটনা মনে নেই, তবু এইটুকু মনে পড়ল এ বংশের সুজেন ডিস্বামণ্ট নামের এক কিশোরী এক সৈনিকের প্রেমে পড়ে। কিশোরীর পিতা সেই সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর ঐ সৈনিক এক কৃষক-পুত্র। কিন্তু দেখতে এত সুন্দর আর সুপুরুষ ছিল যে তাকে কৃষকের পুত্র বলে মনেই হোত না। তার উন্নত ললাট আর বিস্তৃত বক্ষের সাথে দিব্য কান্তি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। প্রত্যেকটি কথাবার্তা আর অঙ্গভঙ্গী যেন বীরত্বব্যঞ্জক। সব সময় মূল্যবান পোষাক পরে থাকতো। ভগবান শুধু তাকে শারীরিক সৌন্দর্য-ই দেননি মানসিক সৌন্দর্যও দিয়েছিলেন প্রচুর। সৈনিকটি অবসর সময়ে নিপুণ হাতে ছবি আঁকতো।

'একদিন শোনা গেল সৈনিক অদৃশ্য হয়েছে। সেই সৈন্যাধ্যক্ষের কন্যা সুজেনও নিরুদ্দেশ। অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে ক্রমে ফ্যাকাশে হতে হতে একদিন সবার মন থেকেই মুছে গেল তার রেশ !

কিছুদিন সবাই ভাবল—আমিও অবশ্য সে দলে ছিলাম—সুজেন হয়ত মৃত। কিন্তু এখন সেই সবার মধ্যের আমি একজন দেখছি সেই কিশোরী সুজেন এখন লোলচর্মা বৃদ্ধা। এই নির্জন প্রান্তের নিবিড় অরণ্যে প্রেমাস্পদকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে। আর ঘটনাচক্রে আজ আমিই তাদের অতিথি···'

গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে এক টিপ নস্যি নিল বৃদ্ধ। আর পল দু' চোখ বুঁজে ভাবে বিভোর হয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

'আমি বৃদ্ধাকে বললাম—আপনি তাহলে সেই সুজেন !'

বৃদ্ধা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তিনি-ই সুজেন, আর ইংগিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইনি সে-ই সৈনিক।'

আমি স্পষ্ট দেখলাম বৃদ্ধা সুজেন এখনও তাঁকে ভালোবাসেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে এখনও তাঁর দিকে তাকান !

'আপনারা বেশ সুখী হয়েছিলেন বোধ হয় ?'

'নিশ্চয়ই !'—অত্যন্ত গাঢ় স্বরে বৃদ্ধা জবাব দিলেন—'আমরা সত্যি সুখী হয়েছিলাম। আমাকে কখনও অনুতাপ করতে হয় নি।'

বৃদ্ধার চোখে মুখে যৌবনের মোহময় দীপ্তি অনুরাগ যেন আবার সগৌরবে ফুটে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি মুগ্ধ নয়নে সেই মহিমাময় শক্তির আকর্ষণ দেখলাম।

'জীবনে যে সুখ ভোগ করেছি তা অতুলনীয়। এই জীবন-সায়াহ্নেও আমরা সুখী বেশ। এখন পরপারের খেয়ায় বসে কেবলি ভাবছি এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত ফুটে ভগবানের অশেষ দয়ায় আমরা দু'জন মিলিত হয়েছিলাম আজও যেন তেমনিভাবে তাঁর চরণে দুটি হৃদয় উৎসর্গ করতে পারি।'

কি সুন্দর···! কি চমৎকার···! কোথায় এই পদস্থ সৈনাধ্যক্ষের কন্যার বিবাহ দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীর সাথে হবে, মর্মর প্রাসাদের মাঝে কোথায় এরা কপোত-কপোতীর মত সব সময় প্রেমপূর্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে কত সুখ-স্বপ্ন দেখবে—না একজন কৃষক পুত্রের পতিত্ব বরণ করে নিয়েছে। বিলাসিতার সব রকম উপকরণ ত্যাগ করে এই দুর্গম অরণ্যে বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা বা স্বপ্ন, সুন্দর মূল্যবান কারুকার্যপূর্ণ হীরে জহরতের অলংকার প্রভৃতি নারী জীবনের কাম্যের প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই। প্রস্ফুটিত যৌবনেই পার্থিব সমস্ত সুখ উপেক্ষা ! আমরণ তাঁর স্বামী-ই পার্থিব জগতের একমাত্র সুখ-কল্পনা-আশা-আকাংখা। এর চেয়ে সুখের কল্পনা বৃদ্ধার যেন আর কিছুই নেই।

বৃদ্ধের বিকট নাক-ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে আর বৃদ্ধার সাথে গল্প করতে সারা রাত কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। পরদিন এই প্রেমিক-যুগলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলাম।

* * * *

দিগ্‌বলয়ের নীচে কার্সিকা দ্বীপ সন্ধ্যার কুয়াসা আর অন্ধকারের মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। মনে হচ্ছে এই ছায়াচিত্র যেন রামধনুর মত আকাশের গায়ে মিশে যাচ্ছে। কেন জানি না, আমিও মনে করতে লাগলাম এই কার্সিকার ছায়াচিত্র দুটি আত্মহারা প্রেমিকের কাহিনী শোনাবার জন্যই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছিল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের নির্ম্মম দণ্ডাদেশে দেশপ্রেমী বিপ্লবী ঋষি হার্ম্মোজেনের মৃত্যু-বরণের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ-রাজ্যের সর্ব্বত্র জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। দেশের স্বাধীনতা এবং 'জার্'-সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে, কস্‌মো মিনিন্ নামে প্রাচীন 'নিজনী-নোভগোরোদ' (আধুনিক 'গোর্কী' সহর)-এর প্রবীণ ধর্ম্মপ্রাণ এক কশাইয়ের চেষ্টায় রুশের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ রাজ-অমাত্যবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিজাত-বীর ডিমিট্রি পোঝারস্কীর নেতৃত্বে রীতিমত বিদ্রোহ জাগিয়ে তুললেন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে। দেশ-মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের দমনের জন্য পোলাণ্ডের শাসক-প্রতিনিধিরাও নিতান্ত নৃশংসভাবে পাল্টা আক্রমণ চালালেন! সারা দেশ জুড়ে তাঁরা যে অমানুষিক অত্যাচার আর উৎপীড়ন সুরু করলেন—তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বর্ব্বর আর বীভৎস। বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য পোলাণ্ডের ভীত-ত্রস্ত শাসক-সম্প্রদায় মরিয়া হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তা, পৈশাচিকতার চরম-পর্য্যায়ে পৌঁচেছিল! বিদ্বেষ হানাহানি আর অমানুষিক প্রতিহিংসার বিষ-বাষ্পে ভরে উঠেছিল সারা দেশ···লোক-জনের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা ছিল না···চারিদিকে অশান্তি উত্তেজনা এবং অরাজকতা। সামান্য অপরাধে, তখনকার দিনে এমন নির্ম্মম সাজার ব্যবস্থা হলো যে সে-কাহিনী শুনলে শিউরে উঠতে হয়!

সে আমলে পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের অন্যায় জুলুম আর কঠোর দমন-নীতির প্রতিবাদে, মস্কো-রাজধানীর শকট-চালকরা একদা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধর্ম্মঘট বাধিয়ে তোলেন। সে ধর্ম্মঘট দমন করতে পোলাণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় যে জঘন্য বর্ব্বর বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন—তার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ! চূড়ান্ত শিক্ষা দিয়ে বিদ্রোহীদের জন্মের মত শায়েস্তা করার জন্য তারা মস্কোর সাত হাজার নিরীহ নিরপরাধ রুশ-নাগরিককে প্রকাশ্যে হত্যা করে রাজধানীর রাজপথ রক্তে রাঙিয়ে তুলেছিল! প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রুশ-বিপ্লবীরাও বিদেশীদের এ-অত্যাচারের শোধ দিয়েছিলেন এমনি নৃশংসভাবে। মস্কো সহরের উপকণ্ঠে প্রকাশ্য প্রান্তরে, সম্মিলিত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে দেশ-প্রেমিক বিপ্লবী নেতা কশাই কস্‌মো মিনিন্, নির্ম্মম জল্লাদের শাণিত অস্ত্রাঘাতে আবক্ষ ভূপ্রোথিত যুদ্ধবন্দী বিদেশী শত্রুদের মুণ্ডচ্ছেদের বীভৎস লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন পরম পরিতৃপ্তিতে! পোলাণ্ডের শাসক-প্রতিনিধির দলও এ-অপমানের শোধ নিয়েছিলেন মস্কো সহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে···এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল দু'পক্ষের হিংসা।

পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের সঙ্গে রুশবাসীর এই তুমুল সংগ্রাম বিদ্বেষের জের চলেছিল সুদীর্ঘকাল ধরে। পরাক্রান্ত রুশ-বীর ডিমিট্রি পোঝারস্কীর সুনিপুণ নেতৃত্বে দেশের বিদ্রোহী জনগণ বারম্বার বিক্ষুব্ধ অভিযান চালিয়েছে ক্রেমলিন্ দুর্গপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত বিদেশী-শাসকদের উচ্ছেদ সাধনকল্পে। মুক্তিকামী জনগণের এই প্রবল আক্রমণে অস্থির উত্যক্ত হয়ে পোলাণ্ডের সন্ত্রস্ত শাসক-সম্প্রদায়কে বহুবার ক্রেমলিন্ দুর্গের সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছিল। দীর্ঘ বিপ্লব-অবরোধের ফলে, দুর্দ্দশার মাত্রা অসহ্য হয়ে উঠলে, পোলাণ্ডের বিদেশী শাসকের দল প্রায়ই পাল্টা আক্রমণ চালাতেন রুশ-জনগণের বিরুদ্ধে। কিন্তু, সে-সব যুদ্ধে,—বেশীর ভাগ তাঁদের হার মানতে হতো।

এমনি অশান্তি বিপ্লব আর যুদ্ধ-বিগ্রহের আগুনে পোলাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার প্রতাপ প্রতিপত্তি সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে, জনগণ অবশেষে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদেশী শাসকের দাসত্ব-বন্ধন থেকে নিজেদের দেশকে আবার মুক্ত স্বাধীন করে তুলেছিলেন। সেই অপরূপ মুক্তি আন্দোলনে বিজয়-কীর্ত্তির অবিস্মরণীয় প্রতীক হিসাবে সে-যুগের রুশজনগণ ক্রেমলিন্ দুর্গ-প্রাসাদের সামনে সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রালের কাছে মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'লাল-চত্বর' বা Red Square-এর উপর দেশপ্রেমী বিপ্লব-নেতা কস্‌মো মিনিন্ ও ডিমিট্রি পোঝারস্কীর যে বিরাট মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন—আজও সোভিয়েট আমলে তা অক্ষয় অটুট রয়েছে। দেশের জনসাধারণ বিগত-কালের এই দুই নির্ভীক মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের মূর্ত্তির পাদপীঠে দাঁড়িয়ে অন্তরের সভক্তি প্রণাম জানায় আজও।

দেশ থেকে পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের তাড়িয়ে, বিজয়ী রুশবাসী রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন 'জার্'-শাসন-ব্যবস্থার! তবে এবারে রাজ্য-ভার গ্রহণ করলেন রুরিক-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শ্লাভ-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব

সম্রাট চতুর্থ আইভানের সম্পর্কীয় রোমানফ্ বংশের এক তরুণ বংশধর—মাইকেল রোমানফ্। সেই থেকে ১৯১৭ সালের প্রথমার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ তিনশো-চার বছর ধরে রোমানফ্ বংশের 'জার্'গণ দেশের সার্ব্বভৌম-অধিপতি হিসাবে একচ্ছত্র রাজত্ব করে গেছেন—এ বিচিত্র উত্থান-পতনের প্রবাহে ভেসে। ভাগ্যচক্রে, মস্কোর রাজ-সিংহাসনে রোমানফ্ রাজাদের প্রতিষ্ঠা-লাভের ব্যাপার যেমন বিচিত্র নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সে আসন থেকে তাঁদের নির্ব্বাসনের কাহিনীও তেমনি মর্ম্মান্তিক করুণ!

'জার্' বোরিস গোদুনভের রাজ্যকালে রুশ সিংহাসনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাবী করার দরুণ রোমানফ্-বংশীয় রাজ-অমাত্য ফিদোরকে রাজরোষ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেষে ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি নিয়ে দেশের ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়! ধর্ম্মাশ্রমে এসে ফিদোর রোমানফ্ নূতন নাম নিলেন—সাধু ফিলারেট। নব-প্রতিষ্ঠিত রোমানফ্ রাজ-বংশের প্রথম রাজা তরুণ-'জার্' মাইকেল রোমানফ্ হলেন এই সাধু ফিলারেটের পুত্র।

নিজের ক্ষমতাগুণে সাধু ফিলারেট কালে রুশরাজ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাছাড়া পোল্যাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম-পরিচালনার ব্যাপারে বিপ্লবী জনগণকে সহায়তা করার দরুণ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে তিনি দেশের সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই ধর্ম্মাশ্রয়ী দেশপ্রেমিক সাধু ফিলারেটের তরুণ পুত্রকে রাজ্যের অধীশ্বর হিসাবে গ্রহণ করতে রুশ প্রজাদের কোন আপত্তি ছিল না। উপরন্তু রুশ-স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু পুণ্যাত্মা ঋষি হার্ম্মোজেন চেয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত রোমানফ্ বংশধর ফিলারেটের পুত্রকে যেন মস্কোর সিংহাসনে 'জার্'-রূপে অভিষিক্ত করা হয়। সুতরাং দেশ থেকে বিদেশী শত্রু অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর 'Zemsky Sobor' বা 'রাষ্ট্রীয় গণ-পরিষদের' এক অধিবেশনে দেশের জনসাধারণ সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে সাধু ফিলারেটের তরুণ পুত্র মাইকেল রোমানফ্‌কে রাজ্যের সার্ব্বভৌম সম্রাট নির্ব্বাচিত করা হয়। সিংহাসনের আশেপাশে স্বার্থান্বেষী অমাত্যবৃন্দের কুটিল-চক্রান্ত আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের পাছে প্রাণহানি ঘটে, এই আশঙ্কায় মাইকেল রোমানফের মাতা মার্থা প্রথমে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এই 'জার্'-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে। কিন্তু দেশের রাজ-অমাত্যেরা এবং 'প্রজা-পরিষদের' সদস্যেরা যখন আন্তরিক আগ্রহে রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, তখন পুত্রকে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে দিতে মায়ের আর আপত্তি রইলো না! তবে সর্ত্ত হলো যে, পুত্র মাইকেল অপরিণত-বয়স্ক বলে যতদিন না তিনি সাবালক হন, ফিলারেট তরুণ 'জারের' প্রতিভূ হিসাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন।

তারপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ক্রেমলিন দুর্গপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ গির্জ্জায় মহা আড়ম্বরে নব-নির্ব্বাচিত 'জার্' মাইকেল রোমানফের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। সে উৎসবে দেশের রাজ-অমাত্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীরা, ধর্ম্মযাজকের দল এবং সাধারণ প্রজাবর্গ সবাই আনন্দে যোগদান করে নবীন 'জার্'কে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নবীন-'জার্' মাইকেল রোমানফ্ কিন্তু ছিলেন নিতান্ত দুর্ব্বল-চরিত্রের মানুষ...রাজ-কার্য্য পরিচালনার চেয়ে আরাম-বিলাস আর অলস আমোদ প্রমোদ নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন সারাক্ষণ। তাঁর এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজ-কার্য্যাদির দেখাশোনা করতেন রাজ্যের অমাত্যবৃন্দ এবং প্রতিপত্তিশালী জমিদারের দল। তাছাড় রোমানফ্-বংশীয়দের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করার দরুণ দেশের ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। রাজ্যের রাজা এবং প্রজা-সাধারণের উপরে কাথলিক ধর্ম্ম যাজকদের প্রতিপত্তির ফলে ধর্ম্মের গোঁড়ামি আর নানা কুসংস্কারে

মস্কোর 'রেড্ স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত রুশ বীর কসমো মিনিম ও ডিমিট্রি পোঝারস্কীর মূর্ত্তি

দেশ ছিল আচ্ছন্ন। দেশে খানিকটা শান্তি ছিল এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশারও কতক উপশম হয়েছিল! তবে দীন-দরিদ্র ভূমি-দাস কৃষক এদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি—নূতন-'জারে'র আমলে। বরং—রাজানুগৃহীত অমাত্য-ধর্ম্মযাজক, প্রতিপত্তিশালী জমিদার আর মহাজনদের অবাধ-শোষণ এবং নিষ্ঠুর-নির্য্যাতনে তাদের দুর্ভোগ-দুর্দ্দশা চরমে ওঠে! তাদের পানে কেউ ফিরে তাকাতো না—তাদের ভাগ্য নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না! নিজেদের বিলাস-বিভব-প্রতিষ্ঠা নিয়েই তাঁরা মশ্‌গুল থাকতেন। দেশের ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ও এ সম্বন্ধে ছিলেন একান্ত উদাসীন!

তারপর ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে 'জার্' মাইকেল রোমানফের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেক্সিস্ ষোল বছর বয়সে হলেন রুশ-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে আলেক্সিস্ ছিলেন তাঁর পিতার অনুরূপ। তাঁর রাজ্য-চালনার ভার ছিল পার্শ্বচর-অমাত্য আর মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর! তিনি থাকতেন নিজের খেয়াল-খুশীমত ছবি-আঁকা, কবিতা লেখা কিম্বা বাজ-পাখী উড়িয়ে শিকার নিয়ে! কর্ত্তব্যে উদাসীন রাজার মন্ত্রীরা ছিলেন কিন্তু সুদক্ষ! তাঁদেরই শাসন-ব্যবস্থায় রাজ্যের বহু উন্নতি এ-সময়ে সম্ভব হয়েছিল! 'জার্' আলেক্সিসের বিচক্ষণ-মন্ত্রী আথানাসি ওরদুইন্-নাশ্‌শোকিনের ব্যবস্থায় পারস্য এবং বাল্‌টিক-সাগরের উপকূলস্থ রাজ্য-গুলির সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক এবং সৌহার্দ্দ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে আথান্‌সির পরামর্শে রুশে সে-সময়ে বিচিত্র-বিরাট বাণিজ্য-তরী,
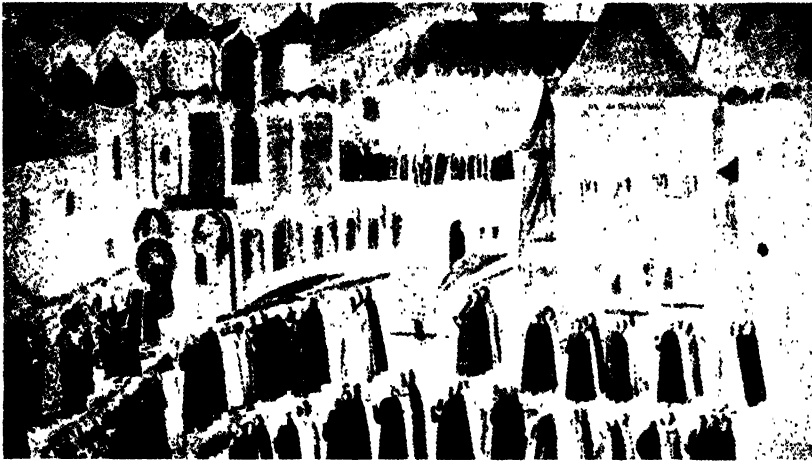
মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গ প্রাসাদের গীর্জায় প্রথম রোমানফ্ 'জার' মাইকেলের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পুরাতন প্রতিচিত্র

অর্ণব যান প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া সে-যুগে রাজ্যের সর্ব্বত্র পথ-ঘাটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়···রীতিমত দুর্গম! সে-পথে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া লোকজনের পক্ষে ছিল প্রাণান্তকর ব্যাপার···সময়ও লাগতো প্রচুর। এ-দুরবস্থা মোচনের জন্য মন্ত্রী আথান্‌সির নির্দ্দেশে দেশের যত পুরোনো পথ-ঘাটের আমূল সংস্কার হয় এবং বহু সুদীর্ঘ পাকা-সড়ক তৈরী হয়। সর্ব্বত্র পথ-ঘাটের সুব্যবস্থা এবং চিঠিপত্র-সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য ডাক-বিভাগের উন্নত-বন্দোবস্তে রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বেশ সুযোগ মিলেছিল। তার ফলে ইউরোপের তখনকার নানা প্রগতিশীল-রাষ্ট্রের উন্নত সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মন্ত্রী আথান্‌সি, প্রাচীন-পন্থী রাজ্যের নানা সংস্কারে 'জার্' আলেক্সিসকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অমন সুব্যবস্থা সত্ত্বেও, 'জার্' আলেক্সিসের আমলে রাজ্যে জেগে উঠলো অসন্তোষের তীব্র আগুন! বিলাস-মত্ত সম্রাট দেশের সাধারণ প্রজাদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে একান্ত উদাসীন—তাঁর এই ঔদাসীন্যের অন্তরালে পার্শ্বচর স্বার্থান্বেষী-চাটুকার অমাত্য এবং বিত্তশালী জমিদারের দল রাজ্যের ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের সাহায্যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সাধারণ দীন-দরিদ্র প্রজাদের উপর অবাধ স্বেচ্ছাচার চালাতেন নিতান্ত নির্ম্মমভাবে। রাজা ছিলেন অভিজাত অমাত্য-জমিদার আর মহাজনদের হাতের মুঠোয়—কাজেই অসহায় প্রজাদের কাতর-অনুনয়-ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি! রাজ্যের মুষ্টিমেয় জমিদার, মহাজন আর রাজ-পরিবারের লোকেরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের অধিকাংশ জমির মালিক। এঁদের শোষণ আর নিগ্রহের ফলে রাজ্যের দরিদ্র অসহায় কৃষক-শ্রেণীর দুর্দ্দশা এমন হয়ে উঠেছিল যে জমি ছেড়ে দূর-দূরান্তে দুর্গম-অঞ্চলে পালিয়ে জীবন কাটাতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইলো না! এই সব মরিয়া কৃষি-শ্রমিকদের অতর্কিত-অন্তর্ধানে জমির মালিকদের দারুণ অসুবিধা ঘটলো—তাঁরা রাজার শরণাপন্ন হলেন। 'জার্' আলেক্সিসও অনুগৃহীত পার্শ্বচরদের প্ররোচনায় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে এমন কড়া-আইন জারি করলেন যে তার ফলে দেশের দরিদ্র-অসহায় কৃষক-সম্প্রদায় হলো অভিজাত ভূমি-মালিকদের কেনা-গোলামের সামিল!! চাষের দরুণ উচ্চহারে খাজনা দেওয়া ছাড়া বিনা-মজুরীতে নিজস্ব সরঞ্জাম দিয়ে জমিদারের খাশ-জমিতে এমন কি বাড়ীর কাজ-কর্ম্মেও ভূমি-দাস কৃষকদের গতর খাটিয়ে অভিনব ধরণের 'বাড়্‌তি-খাজনা' দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হলো। তাছাড়া রাজার এই আজব-কানুনের বিধানে জমিদার-মালিকের অনুমতি ছাড়া ভূমি-দাস কৃষকদের জমি ছেড়ে অন্য কোথাও অপর কারো জমিতে কাজ-কর্ম্ম করার অধিকার রইলো না।···এমন কি জমিদারের কাজের পর নিজেদের অবসর-সময়েও ভূমি-দাস কৃষকেরা অন্য কোথাও গিয়ে বাড়তি-খাটা খেটে কিছু রোজগার করবে বা অন্য কাজ-কর্ম্ম, কি, ক্ষেতের টুকিটাকি ফশল বেচে দু'চার পয়সা রোজগার করবে, সে স্বাধীনতাটুকুও কৃষকদের রইলো না! জমি-মালিকদের নির্ম্মম-নির্য্যাতন এড়িয়ে পালিয়ে যারা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতো, তাদের ধরে এনে অতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এমন কি, রাজ্যের কোথাও কেউ যদি দয়া-পরবশ হয়ে কোনো পলাতক কৃষি-শ্রমিককে আশ্রয় দেছেন বা কোনো রকম সাহায্য করেছেন বলে খবর পাওয়া যেতো, তো রাজার বিধানে, তাঁকেও যৎপরোনাস্তি দণ্ড ভোগ করতে হতো! বিক্রী বা হস্তান্তরিত হয়ে কোনো জমির মালিকানা পাল্‌টালে, সে-জমিতে যে-সব ভূমি-দাস কৃষক থাকতো—ইট-কাঠ-পাথরের মত তারাও বিক্রীত-

সম্পত্তির অংশ-হিসাবে নুতন-মালিকের সম্পত্তি হতো! দীর্ঘকাল এমনি নির্য্যাতন ভোগ করে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষি-শ্রমিকের দল অবশেষে দলে-দলে হিম-শীতল সুদুর সাইবেরিয়ায় এবং ডন্ নদীর উপকূলে বর্ব্বর কশাক অঞ্চলে পালাতে সুরু করলো। তাদেরই সে-গতি বন্ধ করতে ১৬৬৪ সালে শাসক এবং অভিজাত সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আর উৎপীড়ন চালিয়েছিলেন—এই সব অব্যবস্থার ফলে দেশের সাধারণ জনগণের তখন না ছিল শিক্ষা···না ছিল শান্তি···না ছিল কোনো শ্রী!

এছাড়া রাজ-অবহেলা এবং স্বার্থান্বেষী অভিজাত-সম্প্রদায়ের অবাধ-স্বেচ্ছাচারিতায়—এ সময় সারা-দেশ দুর্নীতি-অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে উঠেছিল। তাছাড়া পোলাণ্ডের সঙ্গে বহুকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নির্য্যাতনে অতিষ্ঠ কৃষি-শ্রমিকদের দেশান্তরী হয়ে পালানোর হিড়িকে রাজ্যে চাষ-আবাদের অবস্থা সে-সময়ে নিতান্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। খাদ্য-শস্যের এই অভাব-অনটন আর রাষ্ট্রীয়-অব্যবস্থায় দেশের মুদ্রা-মান হ্রাস পাবার দরুণ, রাশিয়ার বিত্তহীন শ্রমিক এবং সাধারণ-প্রজাদের এমন দারুণ অর্থনৈতিক-দুরবস্থা ঘটে যে তারা শেষে মরিয়া হয়ে দল বেঁধে প্রচণ্ড অভিযান চালায় মস্কো, পস্কোভ্ প্রভৃতি সহরের স্বেচ্ছাচারী অভিজাত-শাসকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এত অনাচার-অব্যবস্থা স্বত্বেও, 'জার্' আলেক্সিসের আমলের অন্যতম স্মরণীয়-ঘটনা হলো—প্রবল যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী-রাষ্ট্র পোলাণ্ড আর সুইডেনকে হারিয়ে শস্যশ্যামলা ইউক্রেণ দেশটিকে রুশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা! (ক্রমশঃ)

বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আমরা অতীত দিনের উদার জীবনই। অনাগত কালের মধ্যাহ্নেই আমাদের স্থান।

শ্বাসের জন্য নব নৈসর্গিক বায়ুর মুক্তগতি, মানুষের পক্ষে খোলা আছে আরও মুক্ত, আরও আনন্দময় জগত।

নিত্যপূর্ণ আত্মার আবরণ উম্মোচনেই মানবের পূর্ণতা।

অধ্যাত্মানুরাগী সমাজই গড়তে পারে ছন্দ-মধুর ব্যক্তি এবং আনন্দ-মুখর গোষ্ঠী।

চলার পথের ভুল ভ্রান্তি, পথ ছাড়ার ভ্রম হ'তে শিক্ষাপ্রদ।

ব্যক্তি-মানব যা' করতে পারে জাতিও পারে সে কাজ করতে এবং পরিশেষে সফল হয় তেমন কর্ম-সম্পাদনে। কারণ বিশেষ মানুষই ভাবী-কালের নমুনা এবং অগ্রদূত।

আরও অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃ ভাব; আজিও অনাবিষ্কৃত প্রেমের ধারা পূর্ণ সামাজিক অভিব্যক্তির দৃঢ় ভিত্তি।

একান্ত সহানুভূতি যেথায় নাই মানব তথায় নেতৃত্ব করতে পারে না।

আমাদের চলতেই হবে। যদি আমরা না করি অগ্রগমন, কাল আমাদের টেনে নিয়ে যাবেই সম্মুখে, যতই আমরা কল্পনা করি না কেন যে আমরা অচল।

মানুষের উন্নতির মাঝেও সদাই থাকে কিছু অবান্তর, কিছু অসমাপ্ত, কিছু বেদনা।

সকল দমন-নীতি এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা উপস্থিত বিপদের কবল এড়াবার কৌশল। প্রকৃত নীতি অন্তর হতে জাগবে। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে না সে নীতি, স্বাধীনতার মুর্ত্তি এবং বিকাশই সেই নীতি।

সকল জ্ঞান অন্তরে নিহিত। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, বাহির হতে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মাত্র প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি হতেই আদর্শ উন্নত সমাজ গড়ে উঠ্‌তে পারে।

সকল আদর্শের পরীক্ষা শক্তির লাভে। কি ধর্মরাজ্যে কি সাংসারিক ব্যাপারে অদ্যাবধি কেহ শক্তি লাভের মোহ প্রতিরোধ করতে পারে নি। সবাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আপনাকে কুঞ্চিত বা দোষ-বহুল করেছে।

নয় পরীক্ষার জন্য, না হয় আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত।

ব্যক্তি মানুষের সম্প্রসারণেই সমাজ।

ঐশ্বর্য্যবান ধনকুলীন, কর্ম-সফল প্রকাণ্ড ধনিক এবং শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাই আজ ব্যবসায়ী যুগের মহামানব, আর প্রকৃত পক্ষে সমাজের শাসক।

সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ অভেদ্য শক্তি।

সৌন্দর্য্য সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণের চিত্র নয়। বহু ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য মুখোস-ঢাকা অমঙ্গল। তার অন্তরের বস্তু মঙ্গলময় নয়।

অতি প্রগাঢ় এবং সুনিশ্চিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিও জ্ঞান নয়।

মানব চিত্তে এমন কোনই শক্ত-সমস্যা জন্মাতে পারে না যার সমাধান করতে অক্ষম মানব-মন।

পৃথিবী রাজনৈতিক (পোলিটিশিয়ান) মানুষে পূর্ণ, কিন্তু জগৎ প্রায় রাষ্ট্রনীতিবিশারদ (স্টেট্‌স্‌ম্যান) শূন্য।

সকল ভাবের অন্তরে নিহিত থাকে অদম্য ইচ্ছা নিজের পূর্ণতার।

সংযম এবং প্রসার ব্যতীত মুক্তিলাভ অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটে।

মানব জাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিজের গতি উন্নতির পথে।
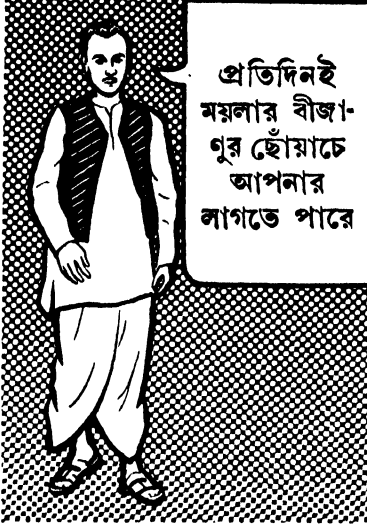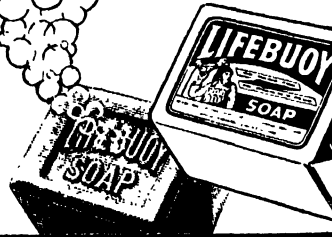
—আট—

"Ela penteia a cabelo"—

এ কোন্ মোহ? একি সর্বনাশা আকর্ষণ?

কোথা থেকে এ কী হয়ে গেল শঙ্খদত্তের? দক্ষিণ-পাটনে যাওয়ার পথে তীর্থদর্শনে এসে এ কোন্ ভয়ঙ্কর দুর্বলতা তাকে জড়িয়ে ধরল নাগপাশের মতো? দেবতার পায়ে নিবেদিত—আকাশের তারার মতো সুদূর—দেবদাসীর প্রতি এ কোন্ মুগ্ধতা তার রক্তের মধ্যে ছড়াচ্ছে তীব্র বিষক্রিয়া?

রূপ? রূপ সে তো অনেক দেখেছে। সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর ভাগ্যবান বণিকদের ঘরে অসংখ্য রূপবতীর উজ্জ্বল মুখ ফুটে আছে ফুলের মতো। শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের সে একমাত্র বংশধর—কত মুগ্ধ কালো চোখ জানালার মধ্য দিয়ে তার দিকে অনিমেষ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সে তা জানে। শঙ্খদত্ত ফিরেও চায়নি। তার পৌরুষের উদ্দেশ্যে সমর্পিত অর্ঘ্য সে গ্রহণ করেছে দেবতার মতো—নিয়েছে নিজের প্রাপ্য হিসেবে; কোনো দিন কিছু যে ফিরে দিতে হবে এমন কথা কখনো মনেও জাগেনি তার। না—রূপ নয়! সপ্তগ্রামের অনেক কুমারীই লাবণ্যে-সুষমায় শম্পার চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

তবে কি নগ্ন নারী? তাও নয়। কত উদ্দাম বসন্ত-উৎসবের দিন প্রত্যক্ষ করেছে সে। সারাদিন আবীর কুঙ্কুমের খেলায় কেটে গেছে, তারপর সন্ধ্যা হলে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করেছে সরস্বতীর জলে। শ্রেষ্ঠীদের নৃত্যশালায় শুরু হয়েছে বাসন্তী-পূর্ণিমার উৎসব। হাজার ডালের ঝাড়-বাতি জ্বলে উঠেছে—মাধবীর গন্ধে মদির হয়েছে বাতাস, নেশায় রাঙানো চোখগুলো ভারী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আর সেই নেশা-জড়ানো রাত্রিতে বেজেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর; মন্দিরের গায়ে গায়ে খোদাই-করা মূর্তিগুলির মতো নগ্ন সুন্দরীরা লাস্যের বিভ্রম জাগিয়েছে প্রত্যেকটি দেহ-ভঙ্গিমায়। উৎসবের আসরের ওপর দিয়ে তাদের সেই দেহকান্তি এক একখানি ধারালো ঘুরন্ত তলোয়ারের মতো আবর্তিত হয়ে গেছে।

একটি শ্বেতপদ্ম। নাচের ভঙ্গি তো নয়! প্রতিটি মুদ্রায় মুদ্রায়, প্রতিটি অঙ্গ-বিক্ষেপে কী আশ্চর্য করুণতা! শরতের পদ্মের ওপর যেন শীতের শিশির ঝরছে। শঙ্খদত্তের মনে হয়েছে এ দেবতার প্রতি ভক্তির তন্ময়তা নয়—এ যেন আহত-প্রাণের বিষণ্ণ বিলাপ! তার প্রতিটি দেহরেখা যেন নিঃশব্দ ভাষায় বলতে চাইছে: এ আমার কারাগার—এ আমার অভিশাপ! এখান থেকে তুমি উদ্ধার করো আমাকে—এই অসহ্য বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দাও!

কিন্তু কে শঙ্খদত্ত? কেমন করেই বা সে মুক্তি দেবে? একটি শ্বেতপদ্মকে জড়িয়ে রয়েছে উদ্যত-ফণা কালনাগ। রাজা স্বয়ং তাকে অনুগ্রহ করেন, তার দ্বারপ্রান্তে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুদ্রপাণি কালভৈরবের মতো। রাঢ় দেশের একজন শ্রেষ্ঠী কেমন করে সেই সাপের মাথা থেকে মণি খুলে নেবে—কেমন করে অতিক্রম করবে সেই বজ্রব্যূহ?

হুতা!

ওই শব্দটাকে তো কোনোমতেই সে ভুলতে পারছে না। মানুষের ঘর যে আলো করতে পারতো—মন্দিরের কঠিন পাথরে একটি একটি করে পাপড়ি তার ঝরে যাচ্ছে চূড়ান্ত অবহেলার মধ্যে; মানুষের প্রেমে যে পরিপূর্ণ হতে পারত—নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দেবতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে।

—রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পথ জুড়ে?

একজন পথিক ধমকে উঠল। সংকুচিত হয়ে শঙ্খদত্ত সরে গেল একপাশে।

দাঁড়িয়েই সে আছে বটে। সামনে একটি বিরাট প্রাসাদ। তার সিংহদ্বারের ভেতর দিয়ে সেই শোভাযাত্রা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে রাত্রির সেই শ্বেতপদ্ম, আর দিনের সেই নীলাঞ্চলা অপরাজিতা। ভেতর থেকে আসছে মানুষের কোলাহল—উৎসবের মুখরতা; মাঝে মাঝে সেই কোলাহল ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বাঁশির সুরে সুরে কানাড়া-সোহিনী, উঠছে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি, তার সঙ্গে মিলিত নারীকণ্ঠের গানের গুঞ্জন। যেন এক ঝাঁক মধুমত্ত ভ্রমর।

ওখানে শঙ্খদত্তের প্রবেশ নিষেধ।

—সরো—সরো—সরে যাও—

আশা-শোঁটা ধারী একদল মানুষ আসছে এগিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়—রাজার সৈন্য। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল, একটি বিশাল হাতী আসছে তাদের পেছনে। পতাকা উড়ছে, হাতীর হাওদায় সোনা-রূপোর দীপ্তি ঝল্‌মল্ করছে সূর্যের আলোয়। তার ওপরে জরিদার এক বিরাট মখমলের ছাতা।

রাজা আসছেন।

বাড়িটার সামনে শুধু শঙ্খদত্তই নয়—একপাল ভিখারীও আশায় আশায় অপেক্ষা করছিল। তাদের লক্ষ্য রূপের দিকে নয়—প্রয়োজনটা অত্যন্ত স্থূল। ভাগ্যবানের উৎসব-বাড়িতে নিশ্চয় কিছু দান-ধ্যান হবে—কিছু খাদ্যও হয়তো বিতরণ করা হবে এই শুভ উপলক্ষে। লুব্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছিল তারা।

রাজার সৈন্য আর হাতীর আবির্ভাবে দু দিকে সভয়ে ছিটকে গেল তারা। একজনের গায়ের ধাক্কা লেগে অপ্রস্তুত শঙ্খদত্ত হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার হাঁটুর কাছটায় ছড়ে গেছে অনেকখানি—দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

শম্পা!

কত দূরের সে—কত অধরা—এই রূঢ় আঘাতে যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল সেই কঠিন সত্যটাকে। সামনের সিংহ-দ্বারটা শব্দ করে খুলে গেল। মাথা নত করে দু ধারে এসে দাঁড়ালেন অনেকগুলি সুসজ্জিত মানুষ—আজকের ভাগ্য-বান গৃহস্বামী স্বয়ং রাজাকে অতিথিরূপে পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে। গলায় সোনার ঘণ্টার ধ্বনি তুলে—দামী হাওদার ঝলকে চারদিক চকিত করে দিয়ে—বিরাট মখমলের ছাতার বিপুল গৌরব ঘোষণা করে রাজার হাতী প্রবেশ করল ভেতরে। ভয়াতুর ভিখারীদের সঙ্গে দুর্ভাগা শঙ্খদত্তও সেদিকে তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

এখন ওখানে হয়তো আবার নতুন করে নাচ শুরু হবে শম্পার। রাজ-অতিথির সম্মানে নতুন সুর বাজবে বাঁশিতে, নতুন তালে তালে গুরু গুরু করে উঠবে মৃদঙ্গ। নতুন মুদ্রায়, নতুন দেহছন্দে দেবদাসী দেবতার প্রতিনিধি রাজাকে জানাবে তার বন্দনা।

এর মাঝখানে সে কোথায়?

মুখে একটা লবণাক্ত স্বাদ। দাঁতের গোড়া দিয়ে তার রক্ত পড়ছে। ছড়ে-যাওয়া হাঁটুটায় একটা তীক্ষ্ণ জ্বালার চমক। নিরুপায় ক্ষোভে একবার ঠোঁট কামড়ালো শঙ্খদত্ত—তারপর ফিরে চলল।

মহাদেব পাণ্ডা কিছু কি অনুমান করেছিল? বোঝা গেল না।

—শ্রেষ্ঠী আর কতদিন থাকবেন পুরীধামে?

শঙ্খদত্ত একবার চকিত চোখ তুলল। কিছু একটা অনুমান করতে চাইল মহাদেবের অভিব্যক্তিতে।

—আরো দিন কয়েক।

মহাদেব মৃদু হাসল: ভালোই তো। দেবস্থান—যে ক'দিন থাকবেন, সে ক'দিনই পুণ্যলাভ হবে। তা হলে কার ভোগ আনাব আজ? জগন্নাথের, না বলভদ্রের?

—যার খুশি।

মহাদেব একটু চুপ করে রইল: শ্রেষ্ঠীর কি এখানে কোনো বাণিজ্যের কাজ আছে?

—হাঁ। কিছু পাথরের জিনিস, ঝিনুকের মালা আর

কড়ি নিতে হবে। তা ছাড়া হরিণের চামড়াও কিনতে হবে।

—ও।—মহাদেব সরে গেল।

ঠিক কথা। পাথরের জিনিস—ঝিনুকের মালা। শঙ্খদত্তের মনে পড়ে গেল। এ কোন্ পাগলের মতো একটা অর্থহীন মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে? নিজের কাজকর্ম সব পড়ে আছে—সেগুলো এর মধ্যেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া সামনে দুস্তর দক্ষিণ পাটনের পথ—সিংহল এখনো কত দূরে! মাঝখানে নিতল্ কালো মৃত্যুর মতো সমুদ্র—বিশ্বাস নেই, কখনোই তাকে বিশ্বাস নেই। যদিও অনুকূল বাতাস বইছে—যদিও উত্তরের হাওয়ায় মেঘবর্ণ জল ঘুম-পাড়ানি গান শোনাচ্ছে এখনো—তবুও কখন যে তার বুকের ভেতর থেকে এক সঙ্গে হাজার রাক্ষসী গর্জন করে উঠবে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

সারা শরীরে মনে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াতে চাইল। ঠোঁটের কোনা এখনো একটুখানি ফুলে রয়েছে—হাঁটুতে যন্ত্রণার চমক দিচ্ছে থেকে থেকে। এই আঘাত—এই লাঞ্ছনা—এ যেন তারই ভবিষ্যতের প্রতীক! আর নয়—আর নয়। দক্ষিণের অসংখ্য মন্দিরে এ রকম সংখ্যাতীত দেবদাসী আছে, তাদের সকলের দুর্ভাবনার ভার বইতে পারে—এমন শক্তি তার নেই!

সে চলে যাবে - কালই। করম আলীর কথা মনে পড়ল। বজ্র-স্তম্ভিত আকাশ। সাসারামের পাঠান শের খাঁ দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে—টান পড়েছে দিল্লীর মসনদে। স্বয়ং বাদ্শা হুমায়ূন এগিয়ে আসছেন শের খাঁকে দমন করার জন্যে। করম আলী বলে গেছেন, একটা প্রবল বন্যা আসছে! কী যে তার রূপ হবে এখন তা অনুমান করাও অসম্ভব! হয়তো তার একটা ঢেউ এসে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতেও ভেঙে পড়বে। অনেক সমুদ্রই সে পাড়ি দিয়েছে—সেই তুফানের মুখেও তাকে বহর সামলাতে হবে—সে কথা যেন সে ভুলে না যায়।

দক্ষিণ পাটন। করম আলী। আর—আর সোমদেব।

একটা আকস্মিক ভয়ের আঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়ালো। এ দুঃস্বপ্ন তার দূর হোক—এই মোহ তার ছিন্ন হোক!

এক ঝলক হাওয়া এল তার ঘরে। শীতল, লবণাক্ত হাওয়া। সমুদ্রের ডাক। পাটনের হাতছানি। দূর-দূরান্ত যার জন্যে প্রসারিত হয়ে আছে—তাকে এ ভাবে এক জায়গায় নোঙর ফেলে থাকলে চলবে না। কাল—কালই যাত্রা শুরু করবে শঙ্খদত্ত।

কিন্তু!—

শঙ্খদত্ত ঝিনুকের মালা কিনছিল। সারাটা বেলা কেটে গেছে ব্যস্ততার মধ্যে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এই ব্যস্ততার তাড়ায় আর একবারও শম্পার কথা তাকে পীড়া দেয়নি। আস্তে আস্তে তার ব্যাধিটা সেরে আসছে, সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে—এই-ই তার প্রমাণ।

কিন্তু!

—ওই যে বাড়িটা দেখছ না? ওই যে মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি? ওই বাড়িতে শম্পা থাকে।

শম্পা! যেন পিঠের ওপর একটা চাবুক পড়ল শঙ্খদত্তের। বিদ্যুৎগতিতে সে ফিরে তাকালো।

নিতান্তই সাধারণ মানুষ। রাজার হাতী আর মন্দিরের সেরা নর্তকী সম্বন্ধে যাদের কৌতূহলে কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে না কখনো। শঙ্খদত্ত জ্বলন্ত চোখ মেলে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

—হাঁ, ওইটেই শম্পার বাড়ি।—একটা সাধারণ মানুষ আর একজনকে বলে চলল।

—কে শম্পা?—মূঢ় দ্বিতীয় জনের জিজ্ঞাসা। অসীম হিংসায় শঙ্খদত্তের ইচ্ছে হল, লোকটাকে সে প্রবলভাবে একটা আঘাত করে বসে।

—শম্পাকে চেনো না? মন্দিরের প্রধান দেবদাসী। রূপে-যৌবনে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় জন এবার নির্বোধের মতো একটা রসিকতা করে বসল: সে কি হে! তোমার নিজের স্ত্রীর চাইতেও? বাড়িতে গিয়ে কথাটা যেন আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ কোরো না।

—কেন, ভয় কিসের?

দ্বিতীয় জন অল্প অল্প হাসল: একবার বলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

অসহ্য মনে হচ্ছে। শঙ্খদত্ত আর দাঁড়ালো না। একটা অদৃশ্য দুর্নিবার টান পড়েছে নাড়ীতে। সারা দিন যাকে

সে অবদমনের মধ্যে চেপে রেখেছিল—দ্বিগুণ বেগে মুক্তি পেয়েছে সে।

—কী হল শ্রেষ্ঠী? নেবেন না জিনিসগুলো?—দোকানদার বিস্মিত প্রশ্ন করল।

—আসছি—

শঙ্খদত্ত দ্রুত পা চালালো। আর সে থাকতে পারছে না। যা চেয়েছে তা পেয়েছে! ওই বাড়িটা।—যার মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি! একটা ডাইনির দৃষ্টির মতো ওটা শঙ্খদত্তকে আকর্ষণ করছে!

বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে শীত সন্ধ্যার পাণ্ডুর ছায়া। নেশাগ্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল শঙ্খদত্ত। এই তো বাড়ি! এইখানেই শম্পা থাকে।

পিতলের মোটা মোটা কীলক-বসানো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। রাজা আর প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারো ঢোকবার অধিকার নেই এখানে।

শঙ্খদত্ত বাড়িটার চারদিকে ঘুরতে লাগলো আচ্ছন্নের মতো। তারপর পেছন দিকে—যেখানে দুটি উঁচু দেওয়ালের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা—সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়ালো। চোখ মেলে তাকালো ওপর দিকে! আশ্চর্য! এও কি সম্ভব! এতখানি আশা কি স্বপ্নেও করেছিল?

ওপরে জানালায় বসে যে মেয়েটি চুল বাঁধছিল—সে শম্পাই! না—আর কেউ হতেই পারে না! তার পরণে এখন বাসন্তী রঙের শাড়ী—দেহের কনকচাঁপা রঙের সঙ্গে সে শাড়ী যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। তার মুখের ওপর বেলা শেষের রক্ত-রৌদ্র পড়েছে—যেন নিশীথ মন্দিরের সেই আশ্চর্য প্রদীপের আলো। রাশি রাশি কালো সাপের মতো অপর্যাপ্ত অজস্র চুল তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির মধ্যে খেলা করছে।

শঙ্খদত্ত সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

মেয়েটি কি দেখতে পেল তাকে? একবারও কি তার মুখের ওপর দুটি অতল চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল? শঙ্খদত্ত বুঝতে পারল না। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে যেন সময় কেটে চলল—আলো নিভল, নামল অন্ধকার। শঙ্খদত্ত ভালো করে জানতেও পারল না—কখন চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেছে মেয়েটির—কখন বন্ধ হয়ে গেছে জানালাটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাবে, এমন সময় ঘটল পরমতম আশ্চর্য ব্যাপার!

সামনের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোট দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। দেখা দিল একটি তরুণী। চাপা গলায় ডাকল: শ্রেষ্ঠী?

শঙ্খদত্তের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল দিলে: কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন। দেবদাসী শম্পা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ক্রমশঃ

গানের ঝরণা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

গানেরই ঝরণা ধারায়
ভেসে যাই আপন মনে।
পুলকের দোলা লাগে
উতলা মোর-ভুবনে।

দখিনা পবন আসি'
কাননে বাজায় বাঁশী
কী কথা কানাকানি
মধুপের গুঞ্জরণে॥

সেতারের একখানি তার
বে-সুরে বাজে যে হায়
হিয়া মোর সে কার লাগি'
চকিতে দিশা হারায়।

রজনী আলোয় ভরা
তবু সে দেয়না ধরা
কেন সে ছন্দ হারা
হ'য়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে॥

কলিকাতার মর্ম্মন্তুদ ঘটনা—

গত জুলাই মাসে কলিকাতা সহরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা এক দিক দিয়া যেমন অসাধারণ, অন্য দিকে তেমনই যে কোন শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে লজ্জাজনক। কলিকাতা সহরে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়—বর্ত্তমান অর্থ-নীতিক দুরবস্থার দিনে ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতার জনসাধারণ ঐ বর্দ্ধিত ভাড়া প্রদান করিতে অসম্মত হন। ১লা, ২রা ও ৩রা জুলাই দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বর্দ্ধিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকার করিয়া বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে। তৃতীয় দিন বিকালে ট্রাম চলাচলে বাধা দান করায় নানারূপ গণ্ডগোল ঘটিতে থাকে। ট্রাম কোম্পানী বিদেশী মূলধন লইয়া গঠিত এবং বিদেশে গঠিত পরিচালকগণ উহার ব্যবস্থাপক। কাজেই যে কোন কারণেই তাহার ভাড়া বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়া থাক না কেন, জনসাধারণ এই স্বাধীন দেশে বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারে নাই। ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া ঐ ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল করা হয় ও সে হরতাল অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উহার দ্বারা জনগণের মনোভাব বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পূর্ব্বেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। ৪ঠা হরতালের দিন জোর করিয়া ট্রাম বা সরকারী বাস চালাইবার চেষ্টার ফলে নানা স্থানে দুর্ঘটনা ঘটে—পুলিস লাঠি ও গুলী চালায়—হাঙ্গামাকারীরাও স্থানে স্থানে বোমা, ইটপাটকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে থাকে। সেদিন দমদমে ২খানা রেল গাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হয়—তথায় পুলিস ১১বার গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ২০জন পুলিস ও ২০জন পথিক আহত হয় ও ঐ স্থানে পুলিস ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহা ছাড়া সহরে ৩২৫ জনকে দাঙ্গার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বিলাত যাত্রা করেন। ৫ই দাঙ্গা কম ছিল—৬ই আবার ট্রাম চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিস ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ৭ই হারিসন রোড ও আশুতোষ মুখার্জি রোডে দাঙ্গা খুব বেশী হয় এবং পুলিস বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে—সে দলে বিধান সভার সদস্য শ্রীঅমর বসু, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীরণেন সেন, শ্রীজ্যোতিষ জোয়ার্দার ও শ্রীহেমন্ত বসু ছাড়াও লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিরোধকারী দলের নেতা ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোহিত মৈত্র ছিলেন। ট্রাম চলিতে থাকে বটে, কিন্তু ট্রামে ইট বা বোমা নিক্ষেপের ফলে ট্রামে যাত্রী উঠা বন্ধ হইয়া যায় ও ফলে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। ১১ই জুলাই সহরের বহু গণ্যমান্য লোক এক আবেদন প্রকাশ করিয়া ভাড়াবৃদ্ধি স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মন্ত্রিসভা বা ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কেহই তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রতিরোধকারীরা ১৫ই জুলাই সাধারণ হরতাল ঘোষণা করিলে কংগ্রেস-নেতারা মন্ত্রিসভার সমর্থনে সেই হরতাল বন্ধ করিতে অগ্রসর হন। ১৪ই সন্ধ্যায় কংগ্রেসের যে মিছিল বাহির হয়, তাহা জনসমর্থন লাভ না করায় প্রতিরোধকারীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ১৫ই জুলাই বেলা ৪টা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, কংগ্রেস-নেতারা এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই। সে দিন সন্ধ্যার পর রাজপথের আলো বহু স্থানে নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে বহুলোক আহত হয়—সহরতলীতে ৮।১০ ঘণ্টা রেল বন্ধ থাকায় সর্ব্বত্র হাঙ্গামা বাড়িয়া যায় ও সেদিন শুধু সহরেই ৭৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরদিন সহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং সহরের পথে সৈন্যদল বাহির করা হয়। ১৬ই তারিখে শুধু মধ্য কলিকাতায় ২২ স্থানে পুলিস গুলী চালায়। ট্রাম ও ষ্টেট বাস চলাচল বন্ধ থাকে—পুলিস বহু বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বোমা প্রভৃতি আবিষ্কার করে ও শত শত লোক গ্রেপ্তার

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

S. 206-50 BG

য়। বহুবাজারে জনতা একটি পুলিস গাড়ী হইতে বন্দী ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করায় পুলিসের গুলীতে একজন নিরীহ পথচারী শিক্ষক নিহত হন। ১৭ই সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতায় পথ অন্ধকার করিয়া তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। ঐ স্থানে ৬০ জন লোক পুলিসের গুলীতে ও জনতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমায় আহত হয়। ১৮ই জুলাই মন্ত্রিসভা ঘোষণা করে যে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে কোম্পানী ট্রাইবিউনালের বিচারের রায় মানিয়া লইবে ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লইয়া ট্রাইবিউনাল গঠিত হইবে। তাহাতেও অবস্থা শান্ত হয় নাই —প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রতিরোধকারীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বিভিন্ন পার্কে সভা করিতে থাকে ও পুলিস তাহাতে বাধা দেওয়ায় প্রত্যহ দাঙ্গা হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে বোমা সম্পর্কে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তারের জন্য দাঙ্গা সেদিকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়। ২০শে জুলাই কলিকাতায় আবার দাঙ্গা বাড়িয়া যায় ও পুলিস সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের আক্রমণ আরম্ভ করে। ২২শে জুলাই অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। মন্ত্রিসভার অস্থায়ী সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গৃহে সন্ধ্যায় যখন নেতারা অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সে সময় মাঠে প্রতিরোধকারীদের এক সভায় উন্মত্ত পুলিস ও পুলিস কর্তৃক নিযুক্ত গুণ্ডার দল ঐ স্থানে সমবেত সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারগণকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ এবং সেই সঙ্গে নির্য্যাতন করে। এই ঘটনা সকলের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। সকল দেশেই সাংবাদিকগণ নিরপেক্ষ দল বলিয়া বিবেচিত হন এবং কেহই তাঁহাদের আক্রমণ করে না—বরং তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে। কলিকাতা সহরের পুলিস যে দিন সকল নিয়ম শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া বিনা উত্তেজনায় সাংবাদিকগণকে আক্রমণ করিল, সেদিন জনগণ পুলিসের ব্যবহারে নিজেদের 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বলিয়া মনে করিল এবং সকলে সমবেত ভাবে তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। সে জন্য প্রধান মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অপসারণ দাবী করা হয় এবং পুলিস কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী ও তাহার সহকারী ডেপুটী কমিশনার শ্রীপ্রণবকুমার সেনের পদচ্যুতি প্রার্থনা করা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রিসভার—পরদিন অর্থাৎ ২৩শে জুলাই চৈতন্যোদয় হয় এবং তাঁহারা সেদিন সকালেই কলিকাতা হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন। প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ২৩শে রাত্রিতেই বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন—এবং আসিয়াই সকল ধৃত ব্যক্তিকে ও বিনাবিচারে আটক নেতাদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। সাংবাদিকগণের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থার জন্য বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার প্রদানও করেন। সাংবাদিকগণের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২৮শে জুলাই কলিকাতার ২৩খানি দৈনিক সংবাদপত্র নিজেদের প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিল—সেদিন কলিকাতা সহরে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায় ফিরিয়া আসিয়া সকলের সকল অভিযোগ প্রতীকারের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার আগমনের পর কলিকাতায় পুনরায় ট্রাম চলাচল সুরু হইয়াছে। ২৫ দিন ধরিয়া সহরের অধিবাসীদের অযথা নানাপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও হায়রাণি সহ্য করিতে হইল। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে দেশে যে কিরূপ অশান্তি সৃষ্ট হইতে পারে, কলিকাতাবাসী সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, বিচারে শুধু অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হইবে না—ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে, সে জন্য উপযুক্ত নির্দেশ প্রদত্ত হইবে।

কাশ্মীর সমস্যার পরিণতি—

কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কার্য্য গত কয় মাস হইতে সন্দেহজনক হইয়াছিল। গত ৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে সহসা সংবাদ আসিল—কাশ্মীরের মহারাজ-কুমার (নূতন উপাধি সর্দার-ই-রিয়াসৎ) শ্রীকরণ সিং প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। শেখ আবদুল্লা ও রাজস্ব মন্ত্রী মির্জা আফজল বেগকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। শেখ আবদুল্লার সহিত তাঁহার সমর্থক আরও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৭ই আগষ্ট মন্ত্রিসভায় শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছিল।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে এক দল লোক 'স্বাধীন কাশ্মীর' দেশ গঠনের আন্দোলন করিতেছিলেন। অথচ গত কয় বৎসরে ভারত-রাষ্ট্র কাশ্মীর তাহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বহু কোটি টাকা কাশ্মীর রাজ্যের উন্নতি বিধানে ব্যয় করিয়াছেন। কাশ্মীরের যে অংশ গত কয় বৎসর ধরিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া শাসিত হইয়াছে, আজ নূতন করিয়া তাহার স্বাধীনতা ঘোষণার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কাজেই শেখ আবদুল্লার পরিণতিতে সকল স্থানে সকল দলের লোক আশ্বস্ত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রে শ্রীজহরলাল নেহরুও এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

নূতন আইন অনুসারে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি বা সিনেটের সদস্য নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ আসনে যে ২৫ জন নির্বাচিত হইয়াছেন তন্মধ্যে ৫ জন ডাক্তার ও ৫ জন এঞ্জিনিয়ারের স্থান সংরক্ষিত ছিল। মোট ১১৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া ডাঃ সুবোধ মিত্র প্রথম ও শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন—৫ জন ডাক্তার—(১) শ্রীসুবোধ মিত্র (২) শ্রীকনক সর্বাধিকারী (৩) শ্রীশৈলেন সেন (৪) শ্রীবিবেকমোহন সেনগুপ্ত ও (৫) শ্রীহিমাংশুশেখর শেঠ। ৫ জন এঞ্জিনিয়ার—(১) শ্রীজে-দাশগুপ্ত (২) শ্রীভূপাল দত্ত (৩) শ্রীজে-গাঙ্গুলী (৪) শ্রীপি-ঘোষ ও (৫) শ্রীকালিদাস রায়। ১৫টি সাধারণ আসনে—(১) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (২) শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ (৩) শ্রীঅতীন বসু (৪) শ্রীকেশবেশ্বর বসু (৫) শ্রীনীরদ ভট্টাচার্য্য (৬) শ্রীক্ষীরোদ চৌধুরী (৭) শ্রীসরোজ দাস (৮) শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত (৯) শ্রীঅনিলা দেবী (১০) শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ (১১) শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ (১২) শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ (১৩) শ্রীগোপাল হালদার (১৪) শ্রীনীহার মুন্সী ও (১৫) শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র। সাধারণ আসনেও কয়েকজন ডাক্তার নির্বাচিত হইয়াছেন। ১২ হাজার গ্র্যাজুয়েট এই নির্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন।

পরলোকে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও বক্তা, বহু বৎসর যাবৎ দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভা তথা লোকসভার সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র গত ২৫শে জুলাই মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাসগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অসুস্থ লক্ষ্মীকান্তবাবু মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং এক মাসের মধ্যেই বাংলার জাতীয় জীবনকে অন্ধকার করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের কথা তাঁহাদের মত করিয়া বলিবার আর কেহ রহিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত নদীয়া শান্তিপুরের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া একই সঙ্গে ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন—এম-এ, বি-এল পাশ করার সঙ্গে তিনি কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাধিও লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে আইন ব্যবসা করিয়া তিনি যশ ও অর্থ অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন ও কংগ্রেস-জাতীয় দলের নেতা হন। তাঁহার ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় নেতায় পরিণত করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের সদস্য হইয়া তিনি নূতন সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মাত্র গত ২১শে জুলাই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার জীবনে যে স্থান শূন্য হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

কলিকাতার সহরতলীর উন্নতি—

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় তিলপাড়া বাঁধ নির্মাণের ফলে ঐ অঞ্চলের ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর পতিত জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর-আরাপাচ এলাকায় জল নিকাশের একটি যন্ত্র দ্বারা ৩৭ বর্গ মাইল এলাকার ২৫ হাজার একর পতিত জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে—তথায় ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ মাইল জলনিকাশী খাল ও ১৯ মাইল ইলেকট্রিক লাইন নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে জল আটক থাকার ফলে ৩৭ বর্গ মাইল জমীতে চাষ বন্ধ থাকিত—এখন ঐ জল নিকাশ হইয়া এ বৎসরই ২২ বর্গ মাইল জমীতে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গার জলস্রোত বন্ধ হওয়ায় ঐ স্থানের জল আটকাইয়া থাকিত—ফরক্কায় গঙ্গার বাঁধ নির্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোত বাড়িবে না—সে জন্য সোনারপুরে পাম্প বসাইয়া ঐ বিস্তৃত জলাভূমির জল

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

উপমা রামকৃষ্ণস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তার একটি সযত্ন চয়ন ও আলোচনা। কিংবা, যিনি একাধারে আলোক ও লোচন তাঁর বন্দনা। ব্যাখ্যা করতে করতে বন্দনা করেছেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর।' ভূমিকায় বলেছেন অচিন্ত্যকুমার—'তত্ত্বের তাৎপর্য না বুঝি কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই। সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে।

'গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুকাল, শুধু নাম দস্তখৎ করতে পারতেন, একছত্র রচনা করেন নি নিজের হাতে, তারই কাব্যরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্য আহ্বান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সালের শরৎচন্দ্র স্মৃতি-বক্তৃতার বিষয় হল "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"। সংসারের অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এ একটা। সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ। স্বাধীনভাবে এ-বই প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিন্ত্যকুমার তিনদিন ধরে এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন গত নভেম্বর মাসে, প্রথমে দ্বারভাঙ্গা হল্ ও পরে 'আশুতোষ হলে বিপুল জনমণ্ডলীর সম্মুখে' (আনন্দবাজার); 'আশুতোষ হল্ হুইচ ওআজ় প্যাক্‌ট্ টু স্যাফোকেশন' (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড)। সেই বক্তৃতার বিষয় "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থাকারে শিগগিরই প্রকাশিত হচ্ছে, ইতিপূর্বে কোনো সাময়িক পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি।

সংসারাশ্রম, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সত্যকথা, সরলতা, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা, সন্ন্যাস, সাকার-নিরাকার ও সর্বধর্মসমন্বয়—নানাবিষয়ে নানা কাব্যকথা। তা ছাড়া সেই সব আশ্চর্য গল্প—বুড়ি গয়লানির নদীপার, কৌপীনকা ওয়াস্তে গৃহস্থালী, জটিল বালকের পাঠশালা, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল, গাছের উপর বহুরূপী, বাইরের বেয়ানের সুতো লুকানো। শুধু আবিষ্কারের দিক থেকে নয়, উদ্ঘাটনের দিক থেকে অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।

মজবুত গ্রন্থসজ্জা, কাপড়ে বাঁধাই, দাম চারটাকা।

'আমাকে রসে বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে'—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা। অচিন্ত্যকুমার ব্যাখ্যা করছেন—এই হচ্ছে নিত্যকালের কবির প্রার্থনা। রস চাই সঙ্গে সঙ্গে বশও চাই। আবেগ চাই সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সংযম, শৃঙ্খলা।...রস যদি অ-বশ হয় তাহলে যা— বশ যদি বি রস হয় তাহলেও তাই। ফল একই, কোনোটাই কবিতা হয় না।...কবিতা কাকে বলে? অল্প কথায় কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝংকার এসব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়...

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কাঠামোটি গদ্য। গদ্য যে কবিতা হয় তাতে দ্বৈধ নেই। আর সে গদ্য রদ্দুরে ঝলসে ওঠা ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে। তীরের মতো তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। দূরভেদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে। কিন্তু রামকৃষ্ণ গোড়াতেই বলেছেন 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা'। যতক্ষণ পেটে অন্ন নেই ততক্ষণ সংসারে রস নেই। আর যতক্ষণ রস নেই ততক্ষণ ঈশ্বরও নেই। যতক্ষণ তার পেটে রুটি নেই ততক্ষণই চাঁদ ঝলসানো রুটি। যতক্ষণ মাঠে ধান নেই, ততক্ষণই চাঁদ কাস্তে। অজন্মা বা অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে কিন্তু ভাবের শেষ নেই। খিদে জুড়োয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।

তাই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'র পরেই 'অন্য-চিন্তা পরাৎপরা' তখন, সেদিন, চাঁদকে মনে হয় শিশুর হাসি, প্রিয়ার মুখ, মায়ের স্নেহধারা শুধু রুটি নয়, রুটি চাই। শুধু প্রেমা নয়, চাই প্রেম। তখন রামকৃষ্ণের মতো দেখি 'চাঁদ মামা সকলের মামা।'......

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট বুকশপে আপনার অর্ডার দিয়ে রাখুন। কলেজ স্কোয়ারে: ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। বালিগঞ্জে: ১৪২।১, রাসবিহারী এভিনিউ

নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ অঞ্চলে চাষ হইলে কলিকাতা সহরে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন—

খ্যাতনামা কোবিদ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই-সি-এস বোম্বায়ে কাজ করিতেন ও শেষ পর্যন্ত বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন। সম্প্রতি শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদত্যাগ করায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত ক্ষিতীশচন্দ্রের গভীর সৌহাদ্য ছিল—তিনি যৌবনে রবীন্দ্রনাথের বহু বাংলা কবিতা ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কবিগুরু সে সকল অনুবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, ক্ষিতীশচন্দ্রের পরিচালনায় বিশ্বভারতীর গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ড—

নিখিল ভারত খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ডের গত বোম্বাই অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—ধানভানার জন্য হালার মিল ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হউক। চাউল কলের সংখ্যা ও উহাদের ধান ভানিবার পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। হালার মিলে ধানভানায় ফলে আতপ চাউল হয় না—সব চাউল ভাঙ্গিয়া যায়। এ বিষয়ে দেশের জনগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে এবং পুনরায় ঢেঁকীতে চাউল তৈয়ারীর ব্যবস্থা বাড়িলে দেশের বহু লোক উপকৃত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

গত ১৬ই শ্রাবণ শনিবার কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৯তম বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল পুনরায় যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতির ভাষণে সজনীবাবু পরিষদের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেশবাসী সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগকে পরিষদের সদস্য হইতে আবেদন জানান। অর্থের সংস্থান না হইলে গত ৬০ বৎসর ধরিয়া যে সকল মূল্যবান দ্রব্য তথায় সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আমরাও এ বিষয়ে বাঙ্গালী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি-উৎসব—

সম্প্রতি কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারিট গ্রামে তাঁহার স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে নারিট নবকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার এবং নারিট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেরও বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক

কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

শ্রীহীরালাল রায়। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নার্সদের উচ্চতর শিক্ষাদান—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদে নার্সদিগকে উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল বঙ্গ-ভাষাভাষী মহিলা এই বৃত্তি লাভ করিতে পারিবেন। রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার অত্যন্ত আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করিয়া সারা জীবন যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাহা এই ভাবে বহু জনকল্যাণজনক কার্যে দান করিয়া তাঁহার উদারতা ও

মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃত রাজর্ষি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী—

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, সরকারী আইনে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্য যে বেতনের হার স্থির করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা অনুমোদন না করায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক সপ্তাহ-ব্যাপী প্রতিবাদ-সভা হইয়া গিয়াছে। সর্বত্র জনগণ সমবেত হইয়া দরিদ্র মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির দাবী সমর্থন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষকগণের মহার্ঘ ভাতা বাড়াইয়া ৫ টাকা স্থলে মাত্র ১০ টাকা না করিয়া ৩৫ টাকা করারও দাবী জানানো হইয়াছে। এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে শিক্ষকগণকে যে জীবন ধারণোপযোগী বেতন দেওয়া প্রয়োজন; সে কথা কেহ অস্বীকার করেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন—শিক্ষা বিস্তারে তাঁহাদের এই কৃপণতার কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহারা অচিরে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা—

সম্প্রতি দিল্লীর লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা মত পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত ৫০ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়। রেশন এলাকায় ৭ আনা সেরের চাল ৯ আনায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় লোক অর্থাভাবে পুরা রেশন গ্রহণ করিতে পারে না ও সেজন্য তাহারা অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়। যে স্থানে রেশন ব্যবস্থা নাই, সে স্থানে চাউলের সর্বাপেক্ষা কম দাম মণ প্রতি ৩০ টাকা—কোন কোন স্থানে চাউল ৪০ টাকা মণে বিক্রীত হইতেছে। সেখানেও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় লোক উপযুক্ত পরিমাণ চাল ক্রয় করিতে পারে না। বর্তমান বৎসরের (১৯৫৩) গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী চাউল সম্বন্ধে যে সকল আশার কথা শুনাইয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা ভুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চালের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল খাদ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। সরিষার তৈলের দাম হঠাৎ মণকরা ২৫ টাকা বাড়িয়া গেল—কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। গুড় বা চিনির দাম কমিবার কথা শুনা গিয়াছিল—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। দেশ যে ক্রমে কোন পথে চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হই। খাদ্য না দিয়া শুধু পরিকল্পনার কথা শুনাইয়া আমরা দেশবাসীকে আর কতকাল ঠেকাইয়া রাখিব?

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

এ বছর ক'লকাতার ফুটবল লীগের চারটি বিভাগের খেলা শেষ হ'ল না ; আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে লীগ খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম থেকে ট্রামের ২য় শ্রেণীর 'এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি'র প্রতিবাদে সহরে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তার ফলে মাঠে পুলিশ প্রহরীদের সাহায্য না পাওয়াতে নামকরা দলগুলির খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু সহরে ১৪৪ ধারা জারী হওয়াতে সমস্ত ফুটবল খেলাই বন্ধ রাখা হয়—অথচ ঘোড়-দৌড় মাঠের জনসমাবেশ ১৪৪ ধারার আওতায় পড়েনি। মাঠের অভাব এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩১শে জুলাই) লীগের বাকি খেলাগুলি শেষ করা সম্ভব নয় এই কারণে আই-এফ-এ-র সভায় আলোচ্য বছরের চারটি বিভাগের লীগ খেলা পরিত্যক্ত এবং সমাপ্তি হ'ল—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ক'লকাতার সাম্প্রতিক ঘটনা এই ঘোষণার পক্ষে একটা বড় অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েক বছর ধরে আই-এফ-এ কর্তৃপক ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা ব্যাপারে যে সব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় নয়। এই আইনগত কারণেই গতবার প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় কোন দলকে দ্বিতীয় বিভাগে নামানো সম্ভবপর হয়নি। ভাল ভাল খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ খেলিয়ে প্রতি বছর আই-এফ-এ মোটা টাকা রোজগার করে। জনসাধারণের পয়সায় আই-এফ-এ-র খরচার হার দিন দিন বেড়ে চলেছে—বহু বছরের রীতি পরিহার ক'রে মোটা টাকার মাহিনায় বেতনভুক সম্পাদক রাখা হয়েছে—কিন্তু আই-এফ-এ-র কাছ থেকে জন-সাধারণ কতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন ? যে প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতেই অপারগ তাঁদের কাছ থেকে জনসাধারণ বড় আশা কি করতে পারেন !

৩য় টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩১৮ (হাভে ১২২, হোল ৬৩, ডিকুসি ৪১ ; বেডসার ১১৫ রানে ৫ এবং ওয়ার্ডলে ৭০ রানে ৩ উইঃ)

ও **৩৫** (৮ উইকেটে। ওয়ার্ডলে ৭ রানে ৪ ; বেডসার ১৪ রানে ২ ; লেকার ১১ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ২৭৬ (হাটন ৬৬, কম্পটন ৪৫, ইভান্স নট আউট ৪৪। মিলার ৯৭ রানে ৩ উইঃ)।

মাঞ্চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের বিশেষতঃ এখানে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলার বেশীর ভাগই অমীমাংসিত থেকে গেছে। এর কারণ হ'ল মাঞ্চেষ্টারের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া—অতি বর্ষণ। আলোচ্য সিরিজের ৩য় টেষ্ট খেলা নিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ১৬টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ইংলণ্ডের পক্ষে জয় ৩, অষ্ট্রেলিয়ার ২, আর বাকি ১১টা খেলাই ড্র গেছে। অতি-বৃষ্টির দরুণ দু'বার ১৮৯০ এবং ১৯৩০ সালের টেষ্ট খেলা আরম্ভই হয়নি। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠ হ'ল ইংলণ্ডের পয়মন্ত।

অর্দ্ধ শতাব্দির অধিককালের মধ্যে ইংলণ্ড এ মাঠে কোন দেশের কাছে টেষ্টে হারেনি। শেষ হেরেছে ১৯০২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে মাত্র ৩ রানে।

৮ই জুলাই আলোচ্য ৪১ টেষ্ট পর্য্যায়ের ৩য় খেলাতেও হাসেট টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং নেন্। সূচনা খুবই

খারাপ হ'ল, ৪৮ রানে ৩টে উইকেট খোয়া যায়। হার্ভে এবং হোল চতুর্থ উইকেটের জুটি বেঁধে দলের পতন রোধ করলেন। প্রথম দিনের খেলায় ৩ উইকেটে ১৫১ রান দাঁড়ায়।

২য় দিনে বৃষ্টির দরুণ মোট খেলার সময় থেকে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের খেলা নষ্ট হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার ২২১ রান হয়, ৩ উইকেটে। হার্ভে ১০৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে হার্ভের এই প্রথম সেঞ্চুরী—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২য় এবং টেষ্ট খেলায় ১১। তৃতীয় দিনে ৩১৮ রানে, অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে শেষ হয়। অর্থাৎ বাকি ৭টা উইকেটে ৯৭ রান উঠে, ২২ ঘণ্টায় খেলায়। হার্ভের আউট হওয়ার পর ডিকুর্শি ছাড়া আর কেউ খেলতে পারেন নি। হার্ভে-হোলের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৭৩ রান ওঠে, ২০৯ মিনিটের খেলায়। ইংলণ্ডের ১২৬ রানে ৪টে উইকেট পড়ে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়।

১২ই রবিবার অবিরাম বৃষ্টি পড়ে মাঠের অবস্থা খারাপ করে দেয়। ১৩ই সোমবার বৃষ্টির দরুণ চতুর্থদিনের খেলা আরম্ভ করা সম্ভবই হয়নি। শেষদিনে লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ হয়; ইংলণ্ডের ২৭৬ রানে ইনিংস শেষ হয়। খেলা ভাঙ্গার পূর্ব্বে, একঘণ্টার খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসে ৩৫ রান করে ৮ উইকেট হারিয়ে। খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। জলসিক্ত মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ইংলণ্ড যে অনেক দক্ষ তার পরিচয় এ খেলাতে পাওয়া গেছে। খেলার নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ৩০ ঘণ্টার খেলার মধ্যে কিছুকম ১৪ ঘণ্টা খেলা সম্ভবপর হয়েছিল বাকি ৬ ঘণ্টা সময় বৃষ্টিতে ধোয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়া দলের অসন্তোষ ঃ

খেলোয়াড়োচিত রীতিনীতি সম্পর্কে ইংলণ্ডে বহু সারগর্ভ হিতোপদেশ দেওয়া হয় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই হিতোপদেশকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ খুব আমল দেয় না। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অবজ্ঞা, অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব বহুবার ঘটনা-পরম্পরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত 'সাণ্ডে সান' পত্রিকায় প্রকাশ, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড-সফররত অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধেও ইংলণ্ডে নানা গুজব রটনা করা হচ্ছে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অসন্তোষের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ইংলণ্ডের খবরের কাগজগুলিতে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলা সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ, আম্পায়ারের ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্ষতি এবং দর্শকদের আসন থেকে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের গায়ের রং কালো হ'লে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াতো তা বর্ত্তমানের বিশ্ব-রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রবাহিত ঘটনাসমূহ থেকে অনুমান করা কঠিন নয়।

৪র্থ টেষ্টম্যাচ ঃ

ইংলণ্ড ঃ ১৬৭ (গ্রেভনী ৫৫। লিণ্ডওয়াল ৫৪ রানে ৫ উইকেট) ও **২৭৫** (এডরিচ ৬৪ ; কম্পটন ৬১ ; লেকার ৪৮। মিলার ৬৩ রানে ৭ এবং লিণ্ডওয়াল ১০৪ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৬৬ (হার্ভে ৭১ ; হোল ৫৩। বেডসার ৯৫ রানে ৬ এবং বেলী ৭১ রানে ৩ উইকেট) ও **১৪৭** (৪ উইকেটে। মরিস ৩৮ ; হার্ভে ৩৪, হোল ৩৩)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৬১ টেষ্ট পর্য্যায়ের ৪র্থ টেষ্টম্যাচও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আলোচ্য টেষ্ট পর্য্যায়ের ৫টি টেষ্ট খেলার মধ্যে চারটি টেষ্ট খেলাই ড্র গেল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হাসেট এই নিয়ে পর পর চারবার টসে জিতলেন কিন্তু মাঠের অবস্থা অনুকুল না থাকায় ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে ছেড়ে দিলেন। বৃষ্টির দরুণ খেলা দেরীতে আরম্ভ হয় এবং খেলার মাঝে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। প্রথম দিনের খেলায় ইংলণ্ড ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ডের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে, মাত্র ২৫ রানে, ইনিংস শেষ হয় ১৬৭ রানে। চা-পানের সময় ৩ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ১৫৭ রান দাঁড়ায়, ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ১০ রান কম। দলের ১৬৯ রানে হার্ভে-হোলের চতুর্থ উইকেটে জুটি ভেঙ্গে যায়। আরও পাঁচটা উইকেট পড়ে ৮৯ রানে। এ অবস্থায় মনে হয়েছিল ইংলণ্ডের থেকে অষ্ট্রেলিয়া খুব অল্প রানের ব্যবধানে থাকবে কিন্তু শেষ উইকেটের জুটিতে ১৮ রান যোগ হয়; ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া ৯৯

রানে এগিয়ে যায়। বেডসার এই ইনিংসে ৬টা উইকেট পান। টেষ্ট ক্রিকেটে তার উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৭—৪৬ টেষ্ট খেলায়। অষ্ট্রেলিয়ার ক্লরি গ্রিমেট ৩৭ টি টেষ্ট খেলায় ২১৬ উইকেট পেয়ে টেষ্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। বেডসার সে রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড করেছেন; বর্তমানে তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৮ (২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত)। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কুড়ি মিনিট আগে বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে যায়—খেলা আর হয়নি। ইংলণ্ডের রান ১ উইকেটে ৬২। চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৭৭। খেলার শেষ দিনে চা-পানের আগে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২৭৫ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ডের শেষ পাঁচ উইকেটে ইংলণ্ডের মাত্র ৯৮ রান ওঠে। এই শেষ পাঁচটা উইকেট পেতে অষ্ট্রেলিয়াকে ৪ ঘণ্টা খাটান দিতে হয়। এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ইংলণ্ড এ যাত্রা হার থেকে বেঁচে যায়।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৭ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, হাতে সময় ১১৫ মিনিট।

অষ্ট্রেলিয়া পিটিয়ে খেলে দ্রুত রান তুলে ৪ উইকেটে ১৪৭ রান করে—মাত্র ৩০ রানের জন্যে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভে বঞ্চিত হয়। ঘড়ির কাঁটা অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বিবিধ খবর ঃ

১৯৫৩ সালের ইণ্টার সার্ভিস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টার্ণ কমাণ্ড ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সদলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ীদল ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালেও চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়।

* * * *

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ফোক্‌স্টোনে মহিলাদের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যোগদান করবে। ১৭জন মহিলা খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। দল গঠনের পূর্ব্বে বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের হাতে এই দলের খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হয়। ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতার শেষে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানের হকি খেলায় যোগদান করবে।

* * * *

চতুর্থ বিশ্বযুব ও ছাত্র সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, ভারতীয় সাইকেল, কুস্তি এবং ভলিবল (উত্তর প্রদেশের) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থান বুখারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা করেছে। আমরা এই সব দলের সাফল্য কামনা করি।

হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ ঃ

'ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি'র উদ্যোগে ঢাকুরিয়া হ্রদে গত ২৫শে এবং ২৬শে জুলাই এক মনোজ্ঞ জল-ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। খ্যাতনামা ভারতীয় সাঁতারু শ্রীযুক্ত রবিন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের দুহিতা কুমারী মমতা চট্টোপাধ্যায় হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় প্রশংসার সঙ্গে জলপথ অতিক্রম করেন।

অনুষ্ঠানের ফলাফল ঃ

	দূরত্ব পথ	সময়
রবিন চট্টোপাধ্যায়	৫ মাইল	৬ ঘঃ ১ মিঃ ২৬ সেঃ
শান্তি চট্টোপাধ্যায়	১ মাইল	১ ঘঃ ২০ মিঃ ৩৫ সেঃ
মমতা চট্টোপাধ্যায়	১ মাইল ১৯৫ গজ	১ ঘঃ ৩৭ মিঃ ৫২ সেঃ

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ১৯২৯ সালে রবিন চট্টোপাধ্যায় হেদুয়া পুষ্করণীতে (বর্ত্তমান নাম আজাদবাগ) ৫৪ ঘণ্টা কাল একটানা সাঁতার দিয়ে অবিরাম সন্তরণে প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালে এলাহাবাদে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিঃ সাঁতার দিয়ে তিনি অবিরাম সন্তরণে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈকুণ্ঠের উইল" (১১শ সং)—১৷৹, "কাশীনাথ" (১১শ সং)—২৷৹, "হরিলক্ষ্মী" (৭ম সং)—১৷৹, "বিজয়া" (৬ষ্ঠ সং) ২৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বয়ংসিদ্ধা" (১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সং)—৩৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "যৌতুক"—২৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "মহামনীষী জর্জ্জ বার্ণার্ড শ"—১৲
যোগাচার্য্য আশ্রম প্রকাশিত "সহজ রাজযোগ সাধন প্রণালী"—২৷৹
স্বামী হরানন্দ গিরি প্রণীত 'ভাবোদয় সোপান'—১৷৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ভ্রান্ত পথের শেষে"—৷৹
শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়"—১৷৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শতশ্লোকী গীতা"—১৷৹
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "লাল মেঘ" (পরিবর্দ্ধিত সং)—৩৲
অমলেন্দু দাশগুপ্ত-অনূদিত "রাশিয়া কি সমাজতন্ত্রী দেশ?"—১৷৹
শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" (১৩৬০)—২৷৹
শ্রীবলাই প্রামাণিক প্রণীত উপন্যাস "খেলাঘর"—২৲
শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থ "ত্রিবেণী"—৪৲
শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি প্রণীত 'রাসলীলা'—২৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৬০

একচত্বারিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা

মূল্য :—বার্ষিক ৭॥০

শিল্পী—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

হর-পার্ব্বতী

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

একটি প্রাচীন তামিল কাব্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসের প্রকাশ নানা দিকে নানা রূপের মধ্যে একথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। ভাবি সাল, অব্দ তারিখ শিলালেখ, মুদ্রা, পট্টোলি, শাসনাবলী, লিখিত কাহিনীই বুঝি সবটুকু মালমশলা। কিন্তু যিনি দৃষ্টিমান্ তিনিই দেখিতে পান ইতিহাস সৃষ্টির কত উপকরণ ছড়ানো থাকে কাব্যে গাথায়, কত ছায়া আনত হইয়া পড়ে মানব মনের ওই প্রবহমান ভাবধারার আলেখ্যে। বিশ্বরমার স্পর্শ পড়ে সেখানে, ইতিহাস লক্ষ্মীর এক একটি কমলদল খোলে। রসিকের চিত্তে, জিজ্ঞাসুর মনে একটি সমগ্রতার রূপ ফুটিয়া ওঠে। হয়ত সেটা তারিখ মিলাইয়া অঙ্ক কষা বিশ্লেষণমুখী ইতিহাস নয়, তবু তার মধ্যে যদি সেই যুগের ধ্যানময় মনটিকে কিছুটা ধরা যায় তাহ'লেই মন খুশীতে বলে এই যথেষ্ট। কারণ ইতিহাসকে আমরা সাধারণতঃ দেখি Quantitative কাহিনী হিসাবে, Qualitative বিবর্ত্তনের চিত্র হিসাবে নয়। ভুলিয়া যাই, যে কোন দেশের যে কোন গোষ্ঠীর ইতিহাস একটা "Unfinished process" (Breastead) এবং তার রূপ Absolute নয়, Relative. অতীত তাতে সুপ্ত, বর্ত্তমান্ তাতে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যতের বীজ তার মধ্যে উপ্ত। ভাবরাজ্যে সাংস্কৃতিক ধারা সমৃদ্ধ হয় আদানপ্রদানে। বহু গোষ্ঠীর মিলনে ও সহযোগে কৃষ্টির বিশাল ধারা "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" পরিণত হয়।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কথা বাংলাদেশে অনেকেই জানেন না। প্রাচীন "চেন তামিজ" সাহিত্যের দুই যুগ একটি "সঙ্গম" যুগ ও আর একটি কয়েক শতাব্দী পরে শৈব ও বৈষ্ণব যুগ, সিদ্ধ ও ভক্তের যুগ।' দুই যুগই অপূর্ব্ব রসসিঞ্চিত। দুই হাজার বছর পূর্ব্বেও সুদূর দাক্ষিণাত্যের একপ্রান্ত চের, চোল ও পাণ্ড্য-রাজাদের সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা, মান ও গৌরব আকাশচুম্বী হইয়াছিল। কাব্যে গাথায় প্রশস্তিতে তাদের অতুল কীর্ত্তি কবিরা অমর করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আনন্দবাজার পত্রিকার মারফৎ ইহার একটু সামান্য পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই কাহিনীগুলির কিছুটা পুনরাবৃত্তি করিলে দোষের হইবে না। কারণ বাংলাদেশে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। শুধু শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী কবি তিরুবল্লুবরের "কুরল" বা "মুপ্পাল" গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক রসঘন পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষিণে "কুরল" গ্রন্থ বেদের মতই সম্মানার্হ ও

প্রামাণিক্। কুরলের রচনা খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের পরে হইলেও মাদুরা-ই-কাঞ্চী প্রভৃতি নাগর কাব্যগুলি আরো প্রাচীন বলিয়াই তামিল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন। ইহার সমর্থনে শুধু এইটুকু বলা যায় যে ভাষার দিক হইতে এই সব পদাবলীগুলি সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত। প্রাচীন তামিলকে বলা হইত "চেন তমির্ষ" এবং আধুনিক তামিলকে কোটুমতমির্ষ (দ্রাবিড়, দ্রমির্ষ, তমির্ষ, দামিল, তামিল)। এই সব কবিদের বলা হইত "সজ্ঞম" কবি। চঙকম্ বা শঙ্গম বা সঙ্গমের তামিল ভাষায় অর্থ হইতেছে "পণ্ডিত ও কবিদের পরিষৎ"। কিম্বদন্তী যে স্বয়ং মহাদেব, কার্ত্তিকেয় এবং অগস্ত্য মুনি প্রথম কবিপরিষদের তিনজন প্রধান সদস্য ছিলেন। এই যুগের কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য হইতেছে "মদুর-ই-ক কাঞ্চী" "চিল্ল পদিরকম্" "মণিমেগলই" "ইন্ন ইনারপতু" প্রভৃতি এবং ইহাদের রচয়িতা হইতেছেন "মঙ্কাদি মারুথনর" "ইলঙ্কোআদিকনত" "চীদলনই চ চাদনর" "পুথন চেম্বনর" প্রভৃতি কবিরা। নারিকার নামে আর একজন কবি যাটটি শ্লোকে প্রেম কাব্যের মধ্যদিয়া একটি রূপক ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত ব্যাকরণ "তোল-কপ্পীয়মও এই যুগের। এইসব কাব্যগুলি খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে আনুমানিক দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হইলেও সেই যুগের প্রাচীন ভাষায় এগুলি বর্ত্তমানে আসে নাই। মনে হয় এই সব কাব্যগুলি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া কয়েক শতাব্দী পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই পাণ্ড্যরাজ্যের সমৃদ্ধি উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। তাঁহারা চের চোলদের পরাভূত করিয়াছিলেন, দুর্ধর্ষ বন্য শত্রুদের ধ্বংস করিয়াছিলেন, বিরাট নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন এবং প্রজারঞ্জক নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় নেদুন চেলিয়ানের উদ্দেশ্যে রচিত। "মানকুড়ি" নিবাস 'মারুথানার' নামক রাজার সভা কবি ইহার রচয়িতা।

অনুবাদের মধ্য দিয়াও রসগ্রহণে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না এবং সেকালের চিত্র হিসাবে এগুলি অনবদ্য ও অপূর্ব্ব, যদিও কবিপ্রশস্তির মধ্যে রাজার মনোরঞ্জন ও নিজের দেশের গর্ব্বের জন্য অতিরঞ্জন থাকিতে বাধ্য।

এই সব কবিতাগুলিতে আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার এক বিচিত্র রসায়নের চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃতপদ শতকরা দুইটিও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, যদিও দক্ষিণে আর্য্য সভ্যতার প্রবেশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতা প্রাক্ আর্য্য দ্রাবিড় সভ্যতাকে কখনই সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই এ কথা ত সত্যই, বরং বহুলভাবে ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই সময়ে দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতার সমীকরণ চলিয়াছে। রাষ্ট্রিক্ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সমন্বয় আর্য্য দ্রাবিড় সংস্কারকে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছিল।

মদুর-ই-কাঞ্চী কাব্যটি মহানগরী মাদুরার অপূর্ব্ব রসস্নিগ্ধ বর্ণনা। মাদুরা নগরীর ঐতিহ্য শুধু নায়কযুগের মীনাক্ষী মন্দিরের মধ্যে বা বিজয়-নগর রাজ্যের প্রাচীরের বা তার শিল্পকলার মধ্যে বা আটশত বৎসর পূর্ব্বের "মধুরা স্থলপুরাণের" কাহিনীতেই নিবদ্ধ নয়। ইতিহাসে বলে প্রাচীনকালে মাদুরা নগরীর খ্যাতি দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত ছিল। শুধু সিংহল আরব যবদ্বীপের সঙ্গে নয়, সুদূর রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গেও নিকট বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অনেকেই মনে করেন যে মাদুরা উত্তরাপথের মথুরার অপভ্রংশ। আর্য্য উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নগরীর নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন তামিল ভাষা খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে প্রায় সংস্কৃত অপ্রভাবিত ভাষাই ছিল।

এইবার মূল মদুরা-ই-কাঞ্চী কবিতার কথাই আলোচনা করা যাক্। কবি প্রথমেই গাহিলেন—

সমুদ্রমেখলা এই যে ধরিত্রী
কূলে কূলে যার ভেঙে পড়েছে
নীলাম্বু রাশির সঙ্গে তরঙ্গমালা
দূরে যার দেখা যায় নীলাভ পাহাড়ের শ্রেণী গগনচুম্বী
যেখানে সবই হরিৎ ও শস্যশ্যামলা
যেখানে আকাশে বাতাসে সবই মধুময়
সবিতৃদেব যেখানে নিয়মিত তাপ দেন
দিনকে করেন আবাহন্
রাত্রে চন্দ্রের শোভায় যার দৃশ্য হয় মনোহর
কালে যেখানে পর্জন্য বৃষ্টি দেয়
জনসাধারণ যেখানে সদাই সুখী
বৃক্ষ দেয় ফল, মাটি দেয় শস্য শতগুণে
হে রাজন্, সেই পুণ্যদেশেই তোমার
পিতৃগণ রাজত্ব করেছেন
কেউ সেখানে বিনা অন্নে মরেনি
প্রচুর পর্য্যাপ্ত আহার
সুরম্য হর্ম্যে শোভিত বিরাট বর্ত্মগুলি
যেন নদী বিশেষ
রাজঅমাত্য ও মন্ত্রণা প্রবীণ মনীষিরা সেখানে থাকেন
যাঁরা কখনও মিথ্যা বলেন না, সদাই সত্যভাষী

কবি তাঁহাকে প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পরোক্ষে উপদেশ দিতেছেন—তিনি যেন জয়মদদৃপ্ত হয়ে রাজ্যশাসনের প্রধান কথা—প্রজারঞ্জন, সুবিচার ও সুশাসন—ভুলিয়া না যান। রাজা নেদুনচেলিয়ান থালাইলাঙ্গনমের যুদ্ধে চের ও চোল রাজাদের পরাভূত করেন। পরে তিনি বিখ্যাত নেলোর বন্দরটি অধিকার করিয়া লন্ ও উগ্র পারবারদের দূরীভূত করেন।

কবি তাই বলিলেন—

তুমি শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুল
পবনের বেগে তুমি গমন করো
জ্বলন্ত আগুন ছড়াতে ছড়াতে

কিন্তু এই যে রাজা, তিনি যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ জয় করেন না। কালিদাসে

উপমায় বলিতে গেলে—বূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ আত্মধর্ম্ম-ক্ষম এই যে বীর ইনি ছিলেন "ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ" প্রকৃত ক্ষাত্র ধর্ম্ম যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। জীবনের অনিত্যতাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেন—

তুমি সত্য ও শ্রদ্ধাকেই জানো
স্বর্গ ও অমৃতের বিনিময়েও তুমি ভোলোনা
ত্রিদিব হতে দেবতারা ও গর্জমান্ সিন্ধুও যদি
তোমার শত্রু হয়, তবু তুমি স্থির অচঞ্চল
ভয় ভাবনাহীন অভীঃ
সারা পৃথিবীর সম্পদের বিনিময়েও
তুমি অন্যায় করোনা।

একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই সময়ে খাস আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ও দক্ষিণে সিংহল হইতে বৌদ্ধ সদ্ধর্মের প্রভাব ও প্রচার চেরচোল পাণ্ড্যরাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে বঙ্গরাজ বংশীয় সীহবাহু ও সীহসীবলীর পুত্র বিজয়ের সিংহল যাত্রার কিম্বদন্তীর মধ্যে সত্য আছে এবং বহু বঙ্গদেশবাসী নাবিক তামিলনাদ ও অতি দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আর রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সাম্রাজ্য যে প্রায় পাণ্ড্যরাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল একথা ইতিহাস সম্মত। "সবা মুনিষে পজা মমা" এখনও গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়' হইয়াও তিনি তদন্ত ও অশস্ত্রের দ্বারা জম্বুখণ্ড জয় করিয়াছিলেন "অদণ্ডেন অসত্থেন বিজয়েৎ"। কিন্তু এই গাথায় যুদ্ধবিমুখতার কোন পরিচয় নাই। বরং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব কিছুটা দেখা যায় যেখানে কবি রাজাকে বর্ণনা করিতেছেন যে তিনি নিষ্কাম হইয়াই যুদ্ধ করেন। একথা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে উত্তরাপথের মথুরা নগরীতেই দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। বিষ্ণুকুল যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত বংশ। "পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা" তাঁরা শিক্ষা করিতেন। এর প্রবর্ত্তন কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস, সূর্য্যোপাসক। কৃষ্ণপুত্র শাম্বও সূর্য্যোপাসনা করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয় দ্রবিড় সভ্যতায় সূর্য্যপূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল—মিশর দেশের সম্রাট ইখনাটোনের সৌরগাথা আজও অপূর্ব্ব বিস্ময় জাগায়। অবশ্য ঋগ্বেদে ও উপনিষদেও "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যোন প্রচোদয়াৎ" এর মধ্যে সূর্য্যপূজার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ঋষিদের অনুভূতিতে সবিতা হইয়া গেলেন বিশ্বের প্রসবিতা, যিনি "আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ" পরম পুরুষ, সূর্য্য নন্। মনে হয় মথুরা ও মাদুরার সঙ্গে উপনিবেশের মধ্য দিয়া সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

এইবার আবার কাব্যকথায় ফিরিয়া আসা যাক্। নগরীর বর্ণনার পূর্ব্বে কবি বর্ণনা করিলেন সমগ্র দেশের। কত পাহাড়, কত জঙ্গল, কত হরিৎক্ষেত্র, কত ধান্য নবান্ন, কত বাঁশ, কত রকমের শস্য, 'থোরাই' চাল, 'আইনা' 'তিনই' শস্য, কত আঙ্গুর, আদা, তিন্তিড়ী, আম কাঁটাল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাংলার এক কবি (সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত) বাংলার পল্লী সমৃদ্ধির এক চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছিলেন—শালিচ্ছদ সমৃদ্ধ হালিক গৃহা সংসৃষ্টনীলোৎপল…

স্নিগ্ধশ্যামযব প্ররোহ নিবিড় রা দীর্ঘ সীমোদরাঃ
মোদন্তে পরিবৃত্ত ধেন্বণতুহচ্ছতাঃ পলালৈ নরৈঃ
সংসত্ত ধন দিক্ষু যন্ত্র মুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ

চাষীদের গৃহে ধান্যস্তূপ ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে, নীলোৎপলের সংযোগ নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রের সীমাকে দীর্ঘায়ত করিতেছে গোবলদছাগ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নতুন খড় খাইয়া তৃপ্তি পাইতেছে। গ্রামগুলি আখমাড়াই কলের শব্দে আর নতুন গুড়ের গন্ধে আকুল।

—দক্ষিণের কবি রাজার প্রশস্তি উপলক্ষে বর্ণনা করিলেন যে সমুদ্র থেকে কত জিনিস আসে—মুক্তা, শঙ্খ প্রবাল। বন্দরে আসে দেশ-বিদেশের বড় বড় পোত, কত জিনিস তারা লইয়া আসে, কত জিনিস লইয়া যায়—কত তেজী ঘোড়া, নোনা মাছ, মিষ্টি তেঁতুল—কত সূক্ষ্ম বস্ত্র, আভরণ। প্লিনি ও পেরিপ্লাসেও এই দক্ষিণ রাজ্যগুলির বিরাট বাণিজ্য সম্পদের কথা পড়ি।

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রান্তরের পর কবি আরম্ভ করিলেন মহানগরীর বর্ণনা। এই নগরীতে এত জিনিস যে তার ভারে সে যেন অবনমিত। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা নাই। সহরের প্রাচীরগুলি গগনস্পর্শী, মাঝে মাঝে বিরাট সিংহদ্বার—নিষ্ক্রমণের পথ। সিংহদ্বারগুলির উপরে মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি। মনে হয় বণিকবহুল এই নগরী লক্ষ্মীর উপাসনা প্রকৃষ্ট ভাবেই করিতেন। কলসী কলসী ঘৃত ঢালিয়া দ্বারগুলিকে মসৃন ও কৃষ্ণবর্ণ করা হইত। নগররক্ষীর দল প্রাচীরের উপর বিরাট কক্ষগুলিতে বাস করিত। সেগুলি এত উচ্চে যেন মনে হইত মেঘলীন পর্ব্বতেরই এক অংশ। মহানগরীতে জন-স্রোতের বিরাম ছিল না। নদীপ্রবাহের মত দিকে দিকে কলগুঞ্জন। সহরের হর্ম্ম্যগুলি সুউচ্চ হইত, সাততলা পর্য্যন্ত। বড় বড় গবাক্ষ থাকিত যার মধ্য দিয়া দক্ষিণা বাতাসের দাক্ষিণ্য পূর্ণভাবেই পাওয়া যাইত। পথের চারিপার্শ্বে কেবল বাজার ও বিপনী, ক্রয় ও বিক্রয় —নানা দ্রব্য ও পণ্যের বিপুল সম্ভার। দিকে দিকে নানা রংএর পতাকা—কোথাও যুদ্ধজয়ের, কোথাও জল স্কন্দাবারের, কোথাও দেবমন্দিরের উপর।

পথের ধারে ধারে খাদ্য ও পানশালা। উৎসবপ্রমত্ত নাগরিক নাগরিকারা ইচ্ছা করিলে "খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে গুণগুণিয়ে দিনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন্। মধুমিশ্রিত কাঁটালের কোয়া, নানা জাতীয় আম্র, নারিকেল ও শর্করা যোগে নানাবিধ পিষ্টক্, বড় বড় মাংসের খণ্ড সহ সুগন্ধি অন্ন ও নানারকম পানীয়ের কথা কবি বলিয়াছেন। উৎসবমুখরিত নগরীতে পানশালার প্রাচুর্য্যের কথাও তিনি জানাইয়াছেন —সেখানে থাকিত ফেনিল তরল তালের রস। তার উপর পান সুপারির কথাও দেখিতে পাই। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এই পানীয় ও পানসুপারির প্রচলন ও প্রসার দেখা যায়।

এই নগরীতে নৃত্যগীতের বিশেষ আদর ছিল। গায়ক গায়িকাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজপ্রাসাদ হইতে তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার্য্য প্রেরিত হইত। তাঁহারা স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার উপহার পাইতেন। তাঁহাদের সুন্দর মণিবন্ধগুলি ভরিয়া উঠিত কেয়ূর কঙ্কণ চন্দনমাল্যে।

শুধু কি তরুণীরা, বৃদ্ধারাও সে যুগে সযত্নে শোভন করে কেশবিন্যাস করিতেন শ্বেত শুভ্রকেশ হইলেও। তাঁরা সুদৃশ্য পেটিকাতে পশরা সাজাইয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। তাঁদের বিশেষ আদরের ছিল তরুণী ও যুবতীরা।

সেই তরুণীরা কি রকম—কালিদাসের ভাষায় বলিতে গেলে—
"কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা নববধূরিব রূপরম্যা"

কবি বর্ণনা করিতেছেন—

ভাস্করে গড়া মূর্ত্তির মত
তাদের গাত্র চাকচিক্যময়
যেন বালারুণ দীপ্ত
তাদের গোপন ভীরু সন্ত্রস্ত দৃষ্টি
পুরুষদের করে উন্মন্
মসৃণ গাত্রবিভা করে চঞ্চল
তাদের শক্ত শুভ্র দন্তরাজি
মুক্তার পর মুক্তার মত সজ্জিত
তাদের নবোদগত সুডোল কুচযুগল
সৌন্দর্য্যোদ্দীপক্ কৃষ্ণতিলগুলির
দ্বারা রমণীয়
যেন কোন শিল্পীর
কমনীয় অঙ্কণের ক্ষণিক উন্মেষ

প্রতি পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যায় উৎসবের দিন পড়িত। ঐদিন সবাই স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিত। পথে বিপণীতে কোলাহল, মুখর উৎসবের রেশ জমিত। বহুমূল্য মহার্ঘ রক্তিম পরিচ্ছদে ধনী অভিজাতরা রথারূঢ় হইয়া পবনবেগে গমনাগমন করিতেন। সন্ধ্যায় যখন সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী ম্লান হইয়া আসিত, তখন তাঁহারা সঙ্গে লইতেন স্বর্ণখচিত কোষনিবদ্ধ তরবার, স্কন্ধে ঝুলিত অঙ্গাবরণ বহির্বাস। তারা নিমের মালা পরিতেন শক্তিলাভের জন্য, গলায় দুলিত মুক্তার মালার সাথে কুমুদকহ্লারের শতদল।

সুউচ্চ অট্টালিকাগুলির ছাদে অলিন্দে সুন্দরীরা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রোষিতা-ভর্তৃকা হইয়া। তাঁদের গাত্রে খাঁটি স্বর্ণের ও মণিমুক্তার অলঙ্করণ। তাদের সুনিপুণ অঙ্গরাগ ও চারু প্রসাধনের সৌরভ রাজপথ পর্য্যন্ত আমোদিত করিত। দোদুল কর্ণভূষণের দীপ্তির আভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত তাদের সুন্দর মুখগুলি। পতাকার অন্তরালে কখনো তাদের দেখা মিলিত, কখনো মিলিত না।

সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া যাইত, উৎসবের স্রোত ততই বর্দ্ধিত হইত। মন্দিরগামী পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা সুস্নাত হইয়া দ্রুত গমন করিত দেবতার নিকট পূজার জন্য, শুধু বিকট ভয়ঙ্কর সঙ্কটমোচন দেবতা নয়, তাঁকেও, যাঁর চোখের পলক পড়ে না, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের অধীশ্বর।

এইখানে শৈব আগমসিদ্ধান্তের কিছুটা বীজ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় মহাযান্ বৌদ্ধধর্ম্মে "ওঁ মণিপদ্মেহুম্" যেমন বীজমন্ত্র শৈবধর্ম্মে "ওঁ নমঃ শিবায়" এবং তিনিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোমের অধিপতি। তাঁর পঞ্চ ক্রিয়া, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, অনুগ্রহ। শৈবসাধনার এই সূত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের অতি দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্য লেখার কয়েক শতাব্দী পরেই দক্ষিণে শিবের অষ্টাদশ লীলামূর্ত্তির কথা জানা যায়, যেমন—(১) গঙ্গাধর (২) চন্দ্রশেখর (৩) বৃষভবাহন (৪) ত্রিপুরান্তক (৫) কল্যাণসুন্দর (৬) লিঙ্গোদ্ভব (৭) কঙ্কালবাহন (৮) ভিক্ষাটন্ (৯) কালসংহার (১০) গজসংহার (১১) সোমস্কন্দ (১২) পাশুপত (১৩) হরিহর (১৪) চণ্ডেশ্বর (১৫) দক্ষিণামূর্ত্তি (১৬) ভৈরব (১৭) অর্দ্ধনারীশ্বর (১৮) নটেশ।

এই নটেশই হইল উৎসব মূর্ত্তির শেষ ও চরম বিকাশ। দক্ষিণের ইতিহাসে কত ভাব ও ভঙ্গীতে নটরাজের প্রকাশ হইয়াছে অমর সাধক শিল্পীদের কল্পনায়, তার ইয়ত্তা নাই।

চন্দ্রমপত্রশিখি প্রসারিতকরম্ ঊর্দ্ধং
পদং কুঞ্চিতম্……………………

এই নগরীর প্রান্তে বৈদিক মন্ত্রপরায়ণ ঋষিরাও যে থাকিতেন তাহাও কবি জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা থাকিতেন পর্ব্বতের উপর কৃত্রিম গুহায়। পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসে চালুক্য যুগে আজীবক্ সম্প্রদায়কে এইরূপ গুহায় বাস করিতে দেখা যায় রাজ সাহায্যে। এই ঋষিরা নিয়মিত যজ্ঞ করিতেন। কবি বলেন তাঁরা বিরাট্ বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম এবং এই জীবনেই স্বর্গভোগ করেন—সর্ব্বভূতে তাঁদের মৈত্রী, তাঁরা কখনও ধর্ম্মের পথ অতিক্রম করেন না, সদানন্দে বিরাজ করেন। তাছাড়া নগরপ্রান্তে থাকিতেন শ্রমণরা—তাঁরা ভূতজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্রষ্টা। এঁরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন পন্থীয় শ্রাবক বা পরিব্রাজক্ তার কোন উল্লেখ নাই। শুধু এইটুকু প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম্মের দিক দিয়া নানা মতের ও পথের এক বিরাট্ সমীকরণ চলিয়াছে। বৌদ্ধমত, শৈববাদ, প্রাচীন অষ্ট্রিক সুমেরীয় দ্রাবিড়ী রীতি সব মিলিয়া হিন্দুধর্ম্মের পতাকায় মিলিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে দেব মন্দিরে দলের পর দল লোক আসিতেছে, প্রণাম করিতেছে, অর্ঘ্য দিতেছে। কবি বিশেষ করিয়া মধুক্ষর ফুলের কথা বলিয়াছেন, যাতে ভ্রমররা লুব্ধ হয়। প্রাচীন দ্রাবিড় দেবতা মুরগা বা মুরুগেশের সঙ্গে যোগীশ্বর শিবের পূজা আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রাবিড় সংস্কৃতির রূপান্তরেরই পরিচয় দেয়। দ্রাবিড় মাতৃকা কোটাভী পরিণত হইয়াছিলেন দুর্গায়, শক্তিতত্ত্বে। অবশ্য ঋগ্বেদে উমা, বৈরোচণী, হৈমবতী, অম্বা অম্বালিকার নাম পাওয়া যায়। দেবীসূক্তে "অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি" শক্তিবাদের মূলমন্ত্র। অদিতি বা

ভূমাতা বা magnum materএর পূজা দক্ষিণে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মাতৃতন্ত্রবাদী-সমাজ দক্ষিণে আজও কিছুটা প্রচলিত। প্রশান্ত যোগীশ্বর নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি শিব আসলে আর্য্য কি অনার্য্য দেবতা সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। মহেঞ্জদড়র শিলগুলির সম্যক্ পাঠোদ্ধার হইলে হয়ত তাহার অনেকটা সমাধান মিলিবে। তবে দক্ষিণে বহুদিন হইতেই শিবপূজার যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল একথা সর্ব্বসম্মত। রামায়ণে যে আগন্তুক অগস্ত্যবাহিত আর্য্য সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শ পাওয়া যায় তাহাতেও দেখা যায় যে হরধনুভঙ্গকারী শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রবন্ধনের পূর্ব্বে সাগরসৈকতে বালুময় তটে শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন। ধনুষ্কোটী ও রামেশ্বরম আজও সেই ঐতিহ্যের ও কাহিনীর গুরুভার বহন করিতেছে। কেউ কেউ রুদ্রকে বলেন "Syncretic diety" ঋগ্বেদে তিনি পশুপ, তাঁর স্থান পশ্চাতে। হিরণ্যকেশিন্ গৃহ্য সূত্রের মতে তিনি পশুযূথের এবং সর্পগণের মধ্যে বাস করেন। Keith বলেন যে রুদ্রের শিবত্বপ্রাপ্তি তামিল "শিবম" বা রক্তবর্ণপুরুষ হইতে আসিয়াছে। আসলে বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে শৈববাদ ও লিঙ্গপূজা মিশিয়া গিয়াছে। স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতিতে স্মরতপ্রিয় শিবের নানা উপাখ্যানের সঙ্গে লিঙ্গপূজার নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কিরাতমূর্ত্তি শিব, শবরী-বেশী শিবানী প্রাচীন অনার্য্য প্রতীকেরই পরিচয়। দক্ষিণ দেশে শিবলাম্বী ব্রাহ্মণরা সমাজে অচল। শিব নির্মাল্য খাইয়া পতিত ব্রাহ্মণদের কথাও শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে শৈববাদীদের সমাজে খুব উচ্চস্থান ছিলনা এবং তাঁহাদের উপাস্য শিব প্রাচীন প্রাক আর্য্যযুগের দেবতা। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবের কথাও আমরা পাই। মহাভারতে তিনি দিগবাস্, নগ্ন, কিন্তু যোগী, সিদ্ধযোগী, মহাযোগী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী, মহাতপা, ঘোরতপা। মনে হয় শৈববাদ আর্য্য অনার্য্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির রসায়ন হইয়া উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া বাংলা, আসাম, তিব্বত নেপালে বৌদ্ধপ্রভাবিত তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবাদে ও সর্ব্বাস্তিবাদে মিশিয়া গিয়াছে। বহুযুগ পরে মহাযান-সূত্রের কারণ্ডব্যূহে দেখি যে ভগবান অবলোকিতেশ্বর মহেশ্বর ও উমাকে "সদাক্ষরী" বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন এবং মন্ত্র দিলেন 'ওম্ শূলে শূলে শূণো স্বাহা'। মিলিন্দ প্রশ্নের মহাপণ্ডিত নাগার্জ্জুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য আচার্য্য আর্য্যদেব তৃতীয় শতাব্দীতে শূণ্যবাদ প্রচার করেন।

উত্তর ভারতের এই পরিণতি দক্ষিণে প্রসার লাভ করিয়াছিল কিনা তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে দক্ষিণে শৈববাদ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

আবার কবি কথায় আসা যাক্। এই নগরীতে যাঁরা বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিতেন তাঁরা সবাই ন্যায়জ্ঞ। অর্থী ও প্রত্যর্থী সকলেই তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁরা ভয় লোভ ও দুঃখকে দূর করেন, নিক্ষিপ্ত হইয়া সম্যক্ বিচার করেন, তৌলে ওজন করা নিক্তির মত। এই ন্যায়াধীশরা মহারাজের কার্য্যের পর্য্যন্ত বিচার করেন। তাঁদের দৃষ্টি রাজা যেন প্রেম ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁরা নিজেদের সুবিচারক বলিয়া সুনাম বজায় রাখার জন্য কৃতসংকল্প।

বণিক ও শ্রেষ্ঠীরা এখানে লোভী নন—তাঁরা ন্যায্যদামে জিনিষ ক্রয় ও বিক্রয় করেন। তাঁদের উচ্চচূড় প্রাসাদগুলি নানা পণ্যে পূর্ণ। তাঁরা বাণিজ্যের জন্য নিয়মিত সমুদ্রযাত্রা করেন। দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেন মণিমুক্তা বৈদূর্য্য স্বর্ণ নানা দ্রব্যসম্ভার।

রাজার মন্ত্রী সংসদে থাকেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা। তাঁরা তাঁকে সুপরামর্শই দেন। গ্রামের কাষ্য গ্রাম্য বৃদ্ধদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। রাজা নিত্য সভায় বসেন, প্রজাদের দর্শন দেন।

কবি সন্ধ্যার পর নারীর যা বর্ণন দিয়াছেন তাহাতে তার কবিত্বশক্তি, বর্ণন কৌশল ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এইরূপ—দিনের শেষ সন্ধ্যা নামিতেছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—'নামে সন্ধ্যাতন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা'। আস্তে আস্তে অস্তাচলে গেলেন ক্রুদ্ধ দিনমণি, হেলিয়া পড়িলেন পশ্চিমের গিরিপ্রান্তে, যেন রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি—

> পথরেখা লীন হলো অস্তগিরির শিখর আড়ালে
> স্তব্ধ দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
> শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া
> সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন অবসানের রাগিণী।

ওদিকে পূর্ব্বাচলে জ্যোৎস্নাপুলকিত চন্দ্রোদয়, রাত্রি নামিয়া আসে। কিন্তু তরল আলোয় সহর উদ্ভাসিত হয় দিনের মতই। হরিণ চকিতনয়না সুন্দরীরা ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপের প্রদীপ জ্বালে এবং নিজ নিজ প্রিয়তমদের সাথে হাস্যকৌতুক ও নৃত্যে মত্ত হয়। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ আসিয়া তাদের আবরণ করিয়া দেয়। কবি স্মরণ করাইয়া দেন কালিদাসের কুমার-সম্ভবের একটি শ্লোককে

> যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং
> যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাং
> দরী গৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো
> জলদা ভবন্তি।

নারীদের প্রসাধন ক্রিয়া চিরন্তনী। সব যুগে সব দেশেই তার প্রসিদ্ধি। কমুদ ও পদ্মের পাপড়ি, আর চন্দনচূর্ণে মাদুরাবাসিনীদের কেশপাশ সুরভি হইত, সুগন্ধি ধোঁয়ায় পরিধেয় বস্ত্র হইত মৃদুগন্ধবহ। মনে পড়ে হিন্দী কবির গান

> মোতিম হারে বেশ বনালে
> সিঁথি লাগালে ভালে
> উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর
> তোর বাঁধহ চম্পকমালে

রাত্রি আগাইয়া যায়, সহরের কলরোল ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। সপ্তস্বরা বীণা লইয়া প্রিয়সমাগমে নারীরা বসে। কেশপাশের পুষ্পস্তবকের সুরভি ঘরকে আমোদিত করে, তাদের হস্তসঞ্চালনে কনককিঙ্কিনী কিনি কিনি বাজে চিক্ চিক্ করিয়া উঠে কেয়ুরকঙ্কণ। কবি বলেন এই নারীরা

মোহিনী, পুরুষকে ক্রীড়নক করিয়া শোষণে তাদের এক দানবীয় উল্লাস আছে। কবির মতে এই স্বাধীনা ভর্তৃকারা সমাজ ও গোষ্ঠীকল্যাণের কিছুটা পরিপন্থী হইলেও তাহাদের অস্বীকার বা অমর্য্যাদা করা যায় না।

> চমৎকার ভাবে পুষ্প মাল্যে সজ্জিত হয়ে তারা বসে থাকে
> দূর ও নিকট থেকে ধনী ও তরুণরা আসে
> ছলা কলায় গীতে নৃত্যে তারা তাদের মনোরঞ্জন করে
> বন্দী করে আলিঙ্গনোদ্যত বাহুলতায়
> যতক্ষণ মধু থাকে ততক্ষণ তারা ভ্রমরের মত গুণ গুণ করে
> আহরণ করে শেষবিন্দু পর্য্যন্ত।

কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে আর একটি চিত্র—সন্মিলনের পরিভূষিত উৎসব। বাদক বাজাইতেছে, চারণ গীত গাহিতেছে, অপূর্ব্ব রাগিণীতে নামিয়া আসিতেছে সঙ্গীত, মিশিতেছে দূরে মন্দ্রের সঙ্গে। কেউ বীণা-বাদিনী। কোন রমণী নৃত্যপরা, কেউ চিত্রাঙ্কণ নিপুণা। প্রিয়জনের জন্য কেহ ভোজ্য থালী সাজাইতেছেন, কেউ পড়িতেছেন কাব্য, কেহ বা প্রিয়তমের নিকট স্মরতশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন! শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন যে মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লেখ আছে যে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সহদেব মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সেখানে যজ্ঞাগ্নি জ্বালাইবার ভার মেয়েদের উপর। চারুওষ্ঠের ফুৎকার ছাড়া হোমশিখা সেখানে প্রজ্বলিত হয় না। নারীরা সেখানে স্বাধীনা স্বেচ্ছাচারিণী। তখনকার দিনের কবিরা এই শ্রেণীর নারীদের হয়ত বিশেষ অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু সমাজ জীবনে তাঁদের সহজেই গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নারীকে বলা হইয়াছে—তড়িল্লেখা, তপনশশী, বৈশ্বানরময়ী, অর্থাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক, সূর্য্যের তেজ চন্দ্রের স্নিগ্ধতা এবং আগুনের দাহ লইয়া নারী! মৃচ্ছকটিকে যখন আমরা বসন্ত সেনাকে দেখি তখন মনে হয় না চারু দত্তের সহিত তাঁর মিলন কবি দোষের চক্ষে দেখিয়াছেন। মহারাজ শূদ্রকের স্মরতোৎসবে মদনোৎসবে তাঁদের আমন্ত্রণ হয়, গায়ক ভাবরেভিল তাঁদের গান শোনায় "যৎ সত্যং বিরতেঽপি গীতসময়ে গচ্ছামি শৃণ্বনিব"। কবিদের ভাষায় এই সব রমণীদের বলা হইত শোভনিকা, নিপুণিকা। রুদ্রভট্ট তাঁদের বলিয়াছেন 'সামান্যা'। একজন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন "They did not muster simply to lust. What they sold and gave in the bargain was much more than womanhood." আমাদের স্বর্গ রাজ্যের কল্পনাতেও এদের স্থান অল্প নয়। তারা নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী উর্ব্বশী। গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনের কাছে অর্জ্জুন "স্ত্রীষু সঙ্গ বিশারদ" কিরূপে হইতে হয় তাহার পাঠ লইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারের পাশেই বাৎস্যায়নের কামসূত্র। পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, স্বীয়া, পরকীয়া, কত রূপেই প্রাচীন কামশাস্ত্রবিদরা নারীকেও তার প্রতি "মুড"কে চিত্রিত করিয়াছেন। কেউ মুগ্ধা, কেউ মধ্যা, কেউ প্রগলভা। তখনকার দিনে কবিরা কিন্তু ইহার মধ্যে নিন্দার কিছু দেখেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই রূপপ্রবণতাকে দেহাতীত করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে যে তখনকার কবিরা দার্শনিকরা এই সহজ সরল প্রাণের অভিব্যক্তির মধ্যে ছলাকলা দেখিলেও এর প্রকাশকে মানবজীবনের সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং কালিদাস অতবড় মহাযোগী মহেশ্বরের চিত্র আঁকিতে গিয়াও তাঁহাকে "পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকানম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" উমার সামনে ক্ষণেক বিহ্বল করিয়া ফেলিলেন। অথচ কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁর আত্মদর্শন হইয়াছে। "আত্মানম্ আত্মানি বিলোকয়ন্" অন্তঃপরমাত্ম সংজ্ঞং পরং জ্যোতি দৃষ্টা"। সেই চক্রীকৃত চারুচাপের শর এড়াইয়া যাওয়া শক্ত, তাহাকে শোভন সুন্দর করাই কর্ত্তব্য।

প্রাচীন গ্রীসেও তাই। ভিনাস পূজার উৎসবে বিবসনা ফ্রাইন্ অভিনয় করিতেন। চিত্রশিল্পী অ্যাপেলস্ তাঁর ছবি আঁকতেন প্রস্তর শিল্পী প্র্যাক্সাইটেলেস্ তার মোহিনী মূর্ত্তি গড়িতেন। আসপেসিয়া দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতা দিতেন—পেরিক্লিস্ সক্রেটিস্ তার সমজদার। লেইস্ ডেমস্থিনিস্ ও ডায়োজিনিসের আদরিণী। হিপারশিয়া বড় লেখিকা, ভাবুক ক্রোটসের প্রিয়তমা। রূপসী রেখিসের মৃত্যুতে গ্রীক সাহিত্যে যে শোকোচ্ছ্বাস আছে তা পৃথিবীর এক সম্পদ বিশেষ। থিয়োডস্ সক্রেটিসের, লিওনটিয়াম্ এপিকিউরাসের সঙ্গিনী।

বৈষ্ণব কবিরাও বহু মৃদুলা, অধীরা, বিধুরা, মানিনী, মুগ্ধা, মুখরা, কোপনাদের চিত্র আঁকিয়াছেন—সেই রস সাহিত্যেরও পরিধি সঙ্কীর্ণ, আছে অভিসারিকাদের নানা বর্ণনা কিন্তু দক্ষিণের কবির নায়িকাদের মাঝে বিদগ্ধমাধব আসে না, উজ্জ্বল নীলমণি নাই। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ মিলন, অভিসারের জন্য আকুলতা আছে কিন্তু "সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" সে আত্মবিলোপের ভাব নাই—প্রিয় দেবতা হইয়াছেন, কিন্তু দেবতা প্রিয় হন নাই। তুমি আমার (মদীয়া রতি) সে ভাব আছে, কিন্তু আমি তোমার—"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে" (তদীয়া রতি) সে ভাব নাই।

দক্ষিণের কবি অবশ্য নারীদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানভ্রষ্টতা বা নীতিভ্রষ্টতার প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করেন নাই। কিন্তু তিনি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিতই উল্লেখ করিয়াছেন পুত্রবতী মাতাদের। যাঁরা প্রদীপ ও পূজোপচার লইয়া দেবতাদের মন্দিরে যান। আর যাঁরা সদ্য গর্ভবতী তাঁহারা যান দেবতার কাছে বীরপুত্রের কামনায়। কবি বলিতেছেন তাঁরা বীণা লইয়া বসেন, সুরে তালে তন্ময় হইয়া দেবতাকে প্রণতি জানান, নৃত্য করেন। বীরপুত্রের জন্য মুরুগা বা মুরুগেশের পূজা যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। এই মুরুগেশই ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিগেশে পরিণত হইয়াছেন। অপুত্রকাদের কার্ত্তিকেয়ের পূজা এখনও বাংলা দেশে প্রচলিত। হয়ত প্রাচীন দ্রাবিড় সংস্কৃতির একটি লুপ্ত ইঙ্গিত। দেবতার সম্মুখে নারী ও পূজারিণীদের নৃত্য ও বীণাবাদন আজও দক্ষিণে সমাদৃত। কবি এখানে একটু বিশেষ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে নারীর সহজাত বৃত্তিই হইতেছে জননী হওয়া। যিনি সহধর্ম্মিণী হইবেন তিনি শুধু নায়িকা বা প্রিয়া নন—

তাঁর সামাজিক দায়িত্ব আছে, সংসার আছে। নারীর রক্তে আছে নীড় রচনার চিরন্তন মোহ, প্রিয় ও পরিজন লইয়া পুত্রকন্যা লইয়া সে নিজের একটি স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবী তৈয়ারী করে—সেইখানেই সে সম্রাজ্ঞী। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'য় দেখি মহর্ষি কণ্ব পতিগৃহযাত্রার সময় কন্যাকে আশীর্বাদ করিতেছেন" "যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব, সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি" যযাতিও শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করিয়া ! এই নিয়ম বহির্ভূত প্রেমের কল্যাণ কামনা করিতেছেন ঋষি। পুত্রলাভের যে আশীর্বাদ তার অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে যে সমাজের, গোষ্ঠীর কল্যাণ হোক্—পুত্র সমাজ রীতি ও ঐতিহ্যের বাহক—নিরঙ্কুশ দায়িত্ববিহীন প্রেমের বাধা স্বরূপ। সেই কল্যাণের মধ্যেই প্রেম পূর্ণত্ব লাভ করে।

কবি বর্ণনা করিতেছেন—রাত্রির প্রথম যাম, শঙ্খধ্বনি স্তব্ধ হয়, বিপণি বন্ধ। বাদ্যকার, কর্ম্মকার, সূপকার সবাই নিদ্রায় নিমগ্ন। এমন কি নৃত্যশালায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীরাও নিদ্রিত। কিন্তু ভূতপ্রেত পিশাচরা, রক্তপিপাসু দৈত্যেরা নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাত্রির মধ্যযামে বিচরণ করে। দেবীরাও এই সময় মর্ত্ত্যে নামেন। মনে হয় কবি তন্ত্রোক্ত যোগিনী ভৈরবীদের ইঙ্গিত করিতেছেন। কবি তস্করদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গভীর রাত্রেই তাদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয়। এই সব তস্করদের কাছে কি কি জিনিষ থাকিত—কবি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যে তস্করবৃত্তি বেশ প্রচলিত ছিল। তাহাদের কাছে থাকিত পাথর ও কাঠ কাটার যন্ত্র, কটিদেশে তরবারি, পরিধানে দুগ্ধ পরিচ্ছদের ভিতর জঙ্ঘার নীচে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা এবং নানা রকমের থলি ও কোমরবন্ধের নিম্নে রজ্জু নির্ম্মিত মই। চুপি চুপি নিঃশব্দে লোকচক্ষু অন্তরালে তড়িৎগতিতে যাইতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তস্করদের প্রতিশোধ স্বরূপ ছিল প্রতিহারীর দল—নগরপাল ও রক্ষীবাহিনী—তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন কবি। এই রক্ষীবাহিনী নিদ্রাবিহীন রজনী কাটান্ ধনুর্বাণ হস্তে। তাহারা ন্যায় ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের নিক্ষিপ্ত তীর হইতে কাহারও রক্ষা নাই। এইরূপে রাত্রি শেষ হইয়া থাকে।

অন্ধকার তরল
পূর্ব্ব দিগ্বলয়ে আলোর রেখা ক্রমস্ফুট-
স্তিমিত নগরীর জীবনধারা আবার চঞ্চল
দূরে ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আগত—
পাখীরা যোগ দেয় দিনের বন্দনা গানে

কিন্তু কবির বলিতে ভুল হয় না যে পানাসক্ত নাগরিকদের তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠ তখনও শোনা যায়, কারণ তাড়ীরসের বিপণি সকাল হইতেই খোলা হইত। নাগরিক ও নাগরিকাদের এই পানীয়ের প্রতি বিশেষ আসক্তির কথা কবি ভোলেন নাই। কবি প্রাতঃকালের বর্ণনা করিয়া বলেন—নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি মাল্যখচিত বরাসনে আসীন। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পরিচারিকা ও সখীরা তাঁকে ঘিরিয়া আছে। তাদের গায়ের রং কচি আম্রবৃক্ষের শ্যামল উদ্গমের মত। নৃত্যরতা ময়ূরীর মত তাদের চঞ্চল দৃষ্টি পরাগমিশ্রিত পদ্মকোরকের মত সহাস বদন। অলঙ্কারের শিঞ্জনে তারা ব্যস্ত। এই সব বরযুবতীদের মুখে সূর্য্যের প্রথম কিরণ পড়িয়া স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্য্যোদয়
আকাশের ভালে লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখীদের গান।

সূর্য্যদেব অশোককুঞ্জের পাশ দিয়া আকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, রাজাও গাত্রোত্থান করিলেন—যেন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব। তাঁর বক্ষস্থলে সখীরা চন্দনের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে মুক্তার হারের সঙ্গে তা মিশিয়া গেল। তারা তাঁকে সজ্জিত করিয়া দিলেন নানা ফুলের মালায়। অঙ্গুরীয় পরিলেন তিনি, কেয়ূর বলয়, মণিমাণিক্যের নানা আভরণ। তার পর তিনি সভায় গিয়া বসিলেন নৃত্য গীতের মধ্যে। গুণের আদর হয় সেখানে—গায়ক গায়িকা নর্ত্তকনর্ত্তকীরা সবাই যথাযোগ্য আদর পায়, যুদ্ধাগত সৈনিকরা পায় পুরস্কার শৌর্য্য ও বীর্য্যের জন্য।

কবির প্রশস্তি শেষ হয়। পুনরায় রাজার পিতৃপুরুষদের উল্লেখেও গুণকীর্ত্তন করিয়া তিনি বলেন—জ্ঞানী ও গুণী তুমি, অচ্যুতপরাক্রম, অমিত তেজ, বিপুল বিক্রম, তুমি ভগবদ্দত্ত দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুশাসনে সুখী হও, সুখী করো।

প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের পাণ্ড্যরাজ্যের তামিল সভাকবির কাব্যের যে কিছুটা পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতে তখনকার দিনের সাহিত্য, সাধনা, সংস্কৃতি ও সমাজ মনের একটা বলিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়। নিছক কাব্য হিসাবে ইহা এক অপূর্ব্ব রসঘন বস্তু। সংস্কৃতির ইতিহাসেও ইহার অবদান কিছু কম নয়। দ্রাবিড় আর্য্য অনার্য্য সভ্যতার এক সমীকরণের দিনে এর উদ্ভব। এই কবিতাগুলি প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে শুধু "গাথা" পড়িতেছি না, একটা বাস্তব বলিষ্ঠ জীবনবেদের, সুস্থ ভোগবাদের পরিচয় পাইতেছি। রুশ বীর ইগোর, গ্রীক বীর হিরাক্লিস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ ওডিনের মত বীর কাহিনী এই কাব্যে রেখাপাত করে না সত্য, কিন্তু ইহার সঙ্গে মনে পড়ে সংস্কৃত কবিদের কাব্য লালিত্য, বৈষ্ণব কবিদের রসবিলাস, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা। বিখ্যাত সাহিত্যিক জোরের ভাষায় বলিতে গেলে এই সব কবিদের পৃথিবীর অনাবৃত মাটি, জননীর স্নেহক্রোড়ের মত ডাকিয়াছে। I belong to her, she belongs to me.

সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য টয়নবী বলেন—There is nothing new or startling in the proposition that every civilization creates……a style of its own and if we are attempting to ascertain the limits of any given civilization in any dimension either spatial or temporal we find as a matter of fact that the aesthetic taste is the Surest as well as the sublest……It speaks in clearer accents than either politics or economics.

এই সব রসিক মহাজনদের প্রণাম জানাইয়া বিদায় লই।

শতযুগান্ত আগে যে মানুষ
যাত্রা করেছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ
জীবনে মরণে
পথের শরণে
দুনিয়ার যত পদাতিকদের
একটি প্রণাম লহ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়্যন্ত্র

আগ্নি বুড়ার কুটিরের কয়েক ঘর অন্তরে কোদণ্ড মিশ্রের গৃহ। ইহাও মাটির কুটির, খড়ের ছাউনা। গত বিশ বৎসর কোদণ্ড মিশ্র এই কুটিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নাই।

কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বদ্ধ দ্বারের অন্তরালে দুই জন বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন; একজন স্বয়ং কোদণ্ড মিশ্র, অন্য ব্যক্তির নাম কোকবর্মা।

কোদণ্ড মিশ্রের সামান্য পরিচয় পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। তিনি শশাঙ্ক দেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন। শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর পর মানব দেবের হ্রস্ব রাজত্বকালে মন্ত্রিদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই; কুটিলতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই নিভৃত দীন পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

তারপর ভাস্করবর্মা আসিয়া রাজ্য গ্রাস করিলেন; বিজয়ী মন্ত্রিরা নূতন রাজার কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। কেবল কোদণ্ড মিশ্র বাঁচিয়া গেলেন; ভাস্করবর্মা অবজ্ঞা ভরে এই স্বয়ং নির্বাসিত মন্ত্রীকে গ্রাহ্য করিলেন না।

তদবধি বিশ বৎসর ধরিয়া কোদণ্ড মিশ্র নূতন রাজ বংশের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছেন। চাণক্য যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বর্ম বংশ শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না। ভাস্করবর্মার রাজ্যকালে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন অগ্নিবর্মাকে পাইয়া আশা হইয়াছে শীঘ্রই তাঁহার চক্রান্ত ফলবান হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল একটি বাধা: অগ্নিবর্মার পরিবর্তে সিংহাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে না।

কোদণ্ড মিশ্রের বয়স এখন সত্তর। অস্থিচর্মসার ব্রাহ্মণ; তাঁহার জীবনে আর কোনও কাম্য নাই, স্বনির্বাচিত রাজাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া নিজে মন্ত্রিত্ব করিবেন এই সংকল্প লইয়া বাঁচিয়া আছেন।

আজ রাত্রে কোদণ্ড মিশ্র যাহার সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন সেই কোকবর্মা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। কোকবর্মার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু আকৃতি দেখিয়া অধিক বয়স মনে হয়। মাংসল দেহ, কদাকার মুখে মসূরিকার চিহ্ন, চক্ষু দুটি কুঁচের মত রক্তবর্ণ। তাহার মুখ দেখিয়া ভেকের মুখ মনে পড়িয়া যায়।

কোকবর্মা গৌড়রাজের একজন সেনাপতি। সে জাতিতে উগ্র, বর্ধমান ভুক্তির এক মাণ্ডলিক। উগ্রগণ তৎকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বাহুবল ও যুদ্ধে পরাক্রমের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। কোকবর্মা এই উগ্রগণের পরম্পরাগত অধিনায়ক। অগ্নিবর্মার যৌবরাজ্যকালে সে তাঁহার বয়স্য ছিল, গুপ্তব্যসনে সহযোগিতা করিত। তারপর অগ্নিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার কৃপায় এবং উগ্রগণের অধিনায়কত্ব হেতু সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সেনাপতির গুরু দায়িত্বের প্রতি তাহার বিন্দু মাত্র নিষ্ঠা ছিলনা। সে ঘোর নীচকর্মা ও বিবেকহীন পাষণ্ড। চাটুবৃত্তি যেমন তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল তেমনি প্রয়োজন হইলে কৃতঘ্নতা করিতেও সে পশ্চাৎপদ ছিলনা।

রাণী শিখরিণীকে যেদিন সে প্রথম দেখিল সেদিন তাহার অন্তরে কদর্য লালসা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সে মনে মনে রাজার শত্রু হইয়াছিল।

রাণী শিখরিণী তখন গুপ্ত প্রণয়লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোকবর্মার আশা জন্মিল সেও বঞ্চিত হইবে না, সে দূতীর হস্তে রাণীকে লিপি পাঠাইতে

আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না; রাণী তাহার ন্যায় কুৎসিত পুরুষকে অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন না। কোকবর্মা অনেক চেষ্টা করিয়াও লালসা চরিতার্থ করিতে পারিল না। উপরন্তু তাহার প্রণয়পত্রগুলি রাণীর হস্তে মারাত্মক অস্ত্র হইয়া রহিল।

ওই ভাবে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কোকবর্মার লিপ্সা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ছলে বলে যেমন করিয়া হোক রাণীকে বশে আনিতে হইবে। কিন্তু শিখরিণী যতদিন রাণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা আছে ততদিন তাহাকে লাভের আশা নাই। ধীরে ধীরে কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র জালে জড়িত হইয়া পড়িল।

বর্তমানে কোকবর্মা ও কোদণ্ড মিশ্রের মধ্যে যে আলোচনা হইতেছে তাহা নূতন নয়, পূর্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন—'কোকবর্মা, তুমি রাজা হও। এমন সুযোগ আর পাবেনা।'

কোকবর্মা ভেকমুণ্ড নাড়িয়া বলিল—'রাজা হতে চাই না, আমি শুধু রাণীকে চাই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'মূর্খ! রাজা পেলে সেই সঙ্গে রাণীকেও পাবে।—দেখ, এখন কর্ণসুবর্ণে তোমার দু'হাজার উগ্র ছাড়া আর কোনও সৈন্য নেই, অন্য সব সেনাপতি সৈন্য নিয়ে দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করছে, জয়নাগকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সুযোগে তুমি সিংহাসনে বসলে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

কোকবর্মা দংষ্ট্রাবহুল হাসিয়া বলিল—'ঠাকুর, আপনার কথা শুনতে ভাল। কিন্তু এখন গৌড়ের সিংহাসনে বসা আর শূলে বসা একই কথা। জয়নাগ অতি ধূর্ত এবং কুটিল, সে একদিন না একদিন গৌড়রাজ্য গ্রাস করবেই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—আমিও ধূর্ত এবং কুটিল, আমি কৌটিল্যের শিষ্য। আমি যতদিন মন্ত্রী আছি ততদিন জয়নাগ গৌড়ে দন্তস্ফুট করতে পারবে না।'

কোকবর্মা রূঢ়ভাবে বলিল—'কিন্তু আপনি আর কত দিন?—তারপর? আমার এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আছে, জীবন সম্ভোগ আমার পূর্ণ হয়নি।'

কোদণ্ড মিশ্র ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন—'তুমি অদূরদর্শীর মত কথা বলছ। রাজার মত জীবন সম্ভোগের সুযোগ আর কার আছে? আজ তুমি রাণী শিখরিণীর জন্য লালায়িত, কাল তার প্রতি তোমার অরুচি হবে; নূতন সম্ভোগতৃষ্ণা জাগবে। এ সুযোগ ছেড় না কোকবর্মা। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ একবারই আসে। সমস্ত প্রস্তুত। অগ্নিবর্মার অন্তরঙ্গ অর্জুন সেন তাকে মদন-রস খাইয়ে উন্মত্ত করে রেখেছে, আমার সঙ্কেত পেলেই তাকে বিষ খাওয়াবে। তুমি ইচ্ছা করলে কালই গৌড়ের রাজা হতে পার।'

কোকবর্মা কিন্তু ভিজিবার পাত্র নয়, দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ঐটি হবে না। আমি অগ্নিবর্মাকে সিংহাসন থেকে নামাতে রাজি আছি, তার সিংহাসনে বসতে রাজি নই। আমার শেষ কথা শুনুন। অগ্নিবর্মার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আমি আমার সৈন্য নিয়ে রাজপুরী দখল করব; রাজপুরীতে যা ধনরত্ন আছে লুঠ করব, রাণীকে লুঠ করব, তারপর নিজের মণ্ডলে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা রাজা করুন আমার আপত্তি নেই।'

কোদণ্ড মিশ্র হতাশভাবে বলিলেন—'কিন্তু রাজা পাব কোথায়? কে এমন আছে যাকে দেশের লোক রাজা বলে মেনে নেবে? সেনাপতিরা যাকে স্বীকার করবে? আজ যদি শশাঙ্ক দেবের একটা বংশধর থাকত—'

শশাঙ্ক দেবের বংশধর তখন ঠিক দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বদ্ধ দ্বারে টোকা পড়িল। কোকবর্মা চমকিয়া তরবারির উপর হাত রাখিল; কোদণ্ড মিশ্রও শঙ্কিতভাবে দ্বারের পানে চাহিলেন। তখন দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল এবং আয়ি বুড়ীর স্বর আসিল—'ঠাকুর, জেগে নাকি গো? একবার দোর খুলবে? আমি গঙ্গার আয়ি।'

কোদণ্ড মিশ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার শঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল না। কোকবর্মাকে তিনি নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘরের একটি কোণ দেখাইয়া দিলেন। কোণে দড়ি হইতে একটি কাপড় শুকাইতেছিল, কোকবর্মা তাহার পিছনে গিয়া লুকাইল। কোদণ্ড মিশ্র তখন দীপ হস্তে উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বিরক্ত স্বরে বলিলেন—'এত রাত্রে তোমার আবার কী চাই গঙ্গার আয়ি?'

কিন্তু আয়ি বুড়ীকে উত্তর দিতে হইল না, তৎপূর্বেই

কোদণ্ড মিশ্রের দৃষ্টি বজ্রের উপর পড়িল। তিনি দ্রুত দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কে? কে? কে তুমি?'

বজ্র এতক্ষণ আলোক চক্রের কিনারায় দাঁড়াইয়াছিল, এখন কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে আসিয়া শান্তস্বরে বলিল—'আপনিই আর্য কোদণ্ড মিশ্র? শশাঙ্কদেবের মন্ত্রী ছিলেন?'

কোদণ্ড মিশ্র স্খলিত স্বরে বলিলেন—'হাঁ।—তুমি—?'

বজ্র যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল—'আমার নাম বজ্রদেব।'

'বজ্রদেব! তুমি কি--! না না, এখন কিছু বোলো না। এস, আমার ঘরে এস।'

কোদণ্ড মিশ্র হাত ধরিয়া বজ্রকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আয়ি বুড়ী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া বকিতে বকিতে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে কোদণ্ড মিশ্র কম্পিত হস্তে দীপদণ্ডে প্রদীপ রাখিলেন, দীর্ঘকাল সম্মোহিতের ন্যায় বজ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—'যদি বিশ বছর কেটে না যেত, বলতাম তুমি মানবদেব।'

বজ্র বলিল—মানব দেব আমার পিতা।'

'বৎস, উপবিষ্ট হও। তুমি দৈব প্রেরিত হয়ে এসেছ। তোমার নাম বজ্রদেব। বজ্রের মতই আমি তোমাকে ব্যবহার করব।'

উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে কোকবর্মা বস্ত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বজ্রকে কুটিল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ কে?'

কোদণ্ড মিশ্র উদ্দীপ্ত চক্ষে বলিলেন—'মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব! কোকবর্মা, এতদিনে রাজা পাওয়া গেছে।'

কোকবর্মা বজ্রের প্রতি তির্যক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'মানবদেবের পুত্র! মানবদেবের পুত্র ছিলনা। হতে পারে এ ব্যক্তি তার দাসীপুত্র।'

বজ্র কোকবর্মার পানে চক্ষু তুলিল, স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল—'আমার পিতার সঙ্গে আমার মাতার বিবাহ হয়েছিল।'

কোকবর্মা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কোদণ্ড মিশ্র বাধা দিয়া বলিলেন—'ও প্রসঙ্গ অবান্তর। তুমি নিঃসন্দেহে মানবদেবের পুত্র। শুধু তোমার আকৃতি নয়, তোমার বাহুর অঙ্গদ তার সাক্ষী। ও অঙ্গদ আমি চিনি। কর্ণসুবর্ণে এমন অনেক প্রাচীন লোক আছে যারা তোমাকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। শশাঙ্কদেবের পৌত্রকে সিংহাসনে বসালে গৌড়দেশে কেউ আপত্তি করবে না।'

কোকবর্মা ঈষৎ মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল—'যাক, রাষ্ট্রবিপ্লবের তাহলে আর কোনও বাধা নেই!'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'না, আর বাধা নেই। কোকবর্মা, তুমি আজ ফিরে যাও। তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত রেখো। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাব।'

'ভাল। আমার পণ মনে আছে?'

'আছে। তুমি যা চাও তাই পাবে। তোমার বাহুবলই নির্ভর।'

কোকবর্মা বিদায় লইল। খেয়াঘাটের অন্ধকারে তাহার ডিঙি বাধা ছিল। কোকবর্মা যাইবার সময় বজ্রের সুঠাম সুন্দর দেহের প্রতি একটা সামর্ষ ঈর্ষাবঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। সুদর্শন পুরুষ সে সহ্য করিতে পারিত না।

* * *

সে রাত্রে বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র শয্যাগ্রহণ করিলেন না; প্রদীপের দুই পাশে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কথা হইল। কোদণ্ড মিশ্র মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রদীপের তৈল পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বজ্র আপন জীবন বৃত্তান্ত বলিল; গ্রামের জীবন, গ্রাম হইতে যাত্রা, শীলভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ, কর্ণসুবর্ণে বাস, বণিক্তে অপহরণের দুশ্চেষ্টা, সমস্তই বিবৃত করিল। অপরপক্ষে কোদণ্ড মিশ্র তাহার বিশবর্ষব্যাপী ষড়্‌যন্ত্রের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। অবজ্ঞা, দৈন্য, বিফলতা তাঁহার সংকল্প টলাইতে পারে নাই। এতদিনে নিয়তির চক্র ঘুরিয়াছে; বর্মবংশে উচ্ছেদ করিয়া শশাঙ্ক দেবের বংশধরকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

বজ্র বৃদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিল, কোন আপত্তি করিল না। কাল প্রাতে সে যে গ্রামে ফিরি যাইতে মনস্থ করিয়াছিল তাহা আর তাহার মনে রহিল না;

বাহিরে কাক কোকিলের ডাক শুনিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইল, রাত্রি শেষ হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বজ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'বৎস, যতদিন না রাজপুরী অধিকৃত হয় তুমি এখানেই থাক, কর্ণসুবর্ণে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার অনেক কাজ, অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কর্ণসুবর্ণে যেতে হবে। আমি গঙ্গার আয়িকে বলে দেব, সে তোমার সেবা-যত্ন করবে।'

বজ্র কুটিরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, সম্মুখেই বিপুল-বিস্তার ভাগীরথী। পরপারের আকাশে সিন্দূরের রঙ ধরিয়াছে, এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। স্রোতের মাঝখান দিয়া একটি হাঙ্গর-মুখ বহিত্র ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পিছনে আরও কয়েকটি বহিত্র। তাহারা সাগরে যাইতেছে।

বহিত্রগুলির পট্টপত্তনের উপর মানুষের চলাচল দেখা যাইতেছে। নাবিকেরা পাল তুলিতেছে; গুণরক্ষের শীর্ষে আড়কাঠের উপর বসিয়া দিশারু দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছে।

বজ্র হাঙ্গর-মুখ বহিত্রটিকে চিনিল। কিন্তু উহার খোলের মধ্যে যে বিম্বাধর ও বটেশ্বর বন্দী আছে তাহা জানিতে পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ
নরকের দ্বার

দিনটা আলস্য ও কর্মহীনতার মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল।

কোদণ্ড মিশ্র প্রভাতেই স্নানাদি সমাপন করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের জীর্ণ শরীরে কর্মপ্রেরণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বজ্র শূন্য কুটিরে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর আলস্য ভঞ্জন করিয়া বাহির হইল। তাহার মনের অবস্থা এখন স্তিমিত; সে যেন বিবাহের বর; তাহাকে ঘিরিয়া সকল তৎপরতা, অথচ সে নিজে নিষ্ক্রিয়।

বজ্র বাহিরে আসিয়া কাল রাত্রে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে চলিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটির, তাহার চারিপাশে শাক কন্দ ফল ফুলের উদ্যান। কুটিরগুলিতে মানুষ নাই, বোধহয় সকলেই কর্ণসুবর্ণে হাটে গিয়াছে। ইহাদের গৃহে চুরি করিবার মত তৈজস কিছু নাই, তাই তাহাদের মনেও কোনও দুশ্চিন্তা নাই।

এইরূপ কয়েকটি গৃহের পরে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া বজ্র গঙ্গাকে দেখিতে পাইল। গঙ্গা দাওয়ায় বসিয়া পায়ের উপর সলিতা পাকাইতেছিল, হাসিমুখে বজ্রকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল—'এস। আয়ি এক কাঁদি কলা আর ইঁচড় নিয়ে কানসোনায় বেচতে গেছে। এখুনি আসবে।'

গঙ্গা দাওয়ায় পাটি বিছাইয়া দিল; ধামিতে করিয়া এক ধামি মুড়ি ও গুড় আনিয়া বজ্রকে খাইতে দিল, উঠানের লতা হইতে ক্ষীরিকা পাড়িয়া দিল। বজ্র পরম পরিতৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতে লাগিল।

গঙ্গার আজ আর শঙ্কা সংকোচ নাই, সে পলিতা পাকাইতে পাকাইতে গল্ গল্ করিয়া কথা বলিতে লাগিল; আর থাকিয়া থাকিয়া বজ্রের অঙ্গদের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বজ্র তাহা দেখিয়া বলিল—'দেখবে?' বলিয়া অঙ্গদটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

গঙ্গা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। দুই চক্ষে আনন্দ এবং সম্ভ্রম ভরিয়া সে অঙ্গদটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিবার পর গভীর পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অঙ্গদ বজ্রকে ফিরাইয়া দিল। বজ্র লক্ষ্য করিল, গঙ্গার মুখে ক্ষণেকের জন্যও লোভ বা গৃধ্নুতা প্রকাশ পাইল না। যাহাদের কিছুই নাই তাহারাই বোধকরি নির্লোভ হইতে পারে।

আয়ি বুড়ী ফিরিয়া আসিল। কলা ও ইঁচড় বিক্রি করিয়া সে কাঁকড়া কিনিয়াছে; ঘটা করিয়া অতিথির জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসিল। কাঁকড়া কুটিতে বসিয়া গঙ্গার আহ্লাদের সীমা নাই।

দ্বিপ্রহরে বজ্র ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আসিল। তারপর উদর পূর্ণ করিয়া বুড়ীর রান্না অতি মুখরোচক অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিল।

আহারের পর হরীতকী চর্বণ করিতে করিতে বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে ফিরিয়া গেল, দেখিল তিনি এখনও আসেন নাই। সে নল-পাটি পাড়িয়া শয়ন করিল। কাল রাত্রে জাগরণ গিয়াছে, তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। ক্রমে সে অশান্ত অর্ধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন দিন প্রায় শেষ হইয়াছে। বজ্র দেহের জড়িমা দূর করিয়া বাহিরে আসিল। কোদণ্ড মিশ্রের দেখা নাই। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই,

কিম্বা হয়তো ফিরিয়াছিলেন, আবার বাহির হইয়াছেন। বজ্র ঘুমাইয়া ছিল তাই জানিতে পারে নাই।

বজ্র অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তারপর ভাগীরথীর তীর ধরিয়া ভ্রমণে বাহির হইল। নিশ্চেষ্টভাবে কুটিরে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই।

সে উত্তরমুখে চলিল। এখানে জন-বসতি অধিক নাই, স্থানে স্থানে দুই চারিটা বিচ্ছিন্ন কুটির। শূন্য তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সে ক্রমে ময়ূরাক্ষী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল। ময়ূরাক্ষীর ধারা ভাগীরথীর তুলনায় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যেস্থানে দুই স্রোত মিলিত হইয়াছে সেস্থান তরঙ্গ সমাকুল। গত রাত্রে বজ্র এই স্রোত অন্ধকারে পার হইয়াছিল।

এই সঙ্গমস্থলের অপর পারে কোণের উপর বহু শিখরযুক্ত তুঙ্গ রাজপ্রাসাদ। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগ। দুই দিক হইতে উচ্চ প্রাকার আসিয়া নদীর কিনারায় দুইটি বিপুল স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে, মাঝের অবকাশ স্থলে অবরোধের স্নান-ঘাট। সারি সারি দীর্ঘ সমান্তরাল সোপান উচ্চ সৌধতল হইতে নামিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বজ্র দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। দুই তীরের মাঝখানে অনুমান তিন চারি রজ্জুর ব্যবধান। অস্তমান সূর্যের তির্যক আলোকে প্রাসাদ ও ঘাট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রাসাদ যেন সুপ্ত, কোথাও কর্মচঞ্চলতা নাই; ঘাটে কয়েকটি পুরনারী জলে নামিয়া গা ধুইতেছে। আসন্ন দুর্যোগের কোনও পূর্বাভাস সেখানে নাই।

বজ্র ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পরপারে প্রাসাদের উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল। তাহার অন্তরে কোনও বিপুল হৃদয়াবেগ উত্থিত হইল না, কেবল নির্লিপ্ত শ্লথ চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল; তাহার পিতামহের রচিত ঐ রাজপুরী কোদণ্ড মিশ্রের চেষ্টা সার্থক হইবে কি?···কপর্দকহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা রাজ্য ওলট-পালট করিয়া দিবে!···ইহা কি সম্ভব? না ইহা স্বপ্ন?—

রাজপুরী পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। এখানে খেয়াঘাটের আশে পাশে জনবসতি অধিক। খেয়াতরী যাত্রিদের পারাপার করিতেছে; ওপারেও ক্ষুদ্র একটি খেয়াঘাট। বজ্র অদূরে উচ্চ পাড়ের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দর্শনীয় কিছু নয়; তবু তৃপ্ত মনে বসিয়া দেখা যায়।

অল্পকাল পরে সূর্যাস্ত হইল। খেয়ার মাঝি নৌকা বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। ঘাট শূন্য হইয়া গেল।

বজ্র উঠিয়া আবার নদীতীর ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। রাজপ্রাসাদের সমান্তরালে আসিয়া দেখিল যেখানে প্রাসাদ ছিল সেখানে পিণ্ডীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের জঠর হইতে দুই চারিটি বর্তিকার ক্ষীণ রশ্মি নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া কাঁপিতেছে।

বজ্র যখন কোদণ্ডমিশ্রের কুটির সম্মুখে ফিরিয়া আসিল তখন দিবালোক সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র ফিরিয়াছেন, কুটির কক্ষেই আছেন; বদ্ধ দ্বারের ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে।

বজ্র দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মৃদু জল্পনার শব্দ শুনিতে পাইল। সে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িল—হয়তো কোনও গূঢ়-পুরুষ আসিয়াছে। বজ্র একটু দ্বিধা করিল, তারপর দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহার দৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে পিছাইয়া আসিল।

কুহু! কোদণ্ড মিশ্রের সহিত মুখোমুখি বসিয়া কুহু কথা কহিতেছে! তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া নীল রঙের ঊর্ণা, কিন্তু চিনিতে কষ্ট হয়না—সেই মিষ্ট-দুষ্ট হাসিভরা মুখ! কুহু কোথা হইতে আসিল? কোদণ্ড মিশ্রের সহিত তাহার কী সম্বন্ধ?

দ্বারের বাহিরে নির্বাক দাঁড়াইয়া বজ্র শুনিতে পাইল, কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন—'এই লিপি নাও, অর্জুন সেনকে আজ রাত্রেই দিও। আর মুখে বোলো, সমস্ত প্রস্তুত; অমাবস্যার তিথি যেন ভ্রষ্ট না হয়।'

কুহু বলিল,—'বলব।—অমাবস্যা কবে?'

'পরশু। সেই রাত্রির মধ্যযামে—'

'যে আজ্ঞা। আজ তাহলে উঠি। ফিরতে দেরি করলে রাণী সন্দেহ করবে।'

'স্বস্তি।'

কুহু সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। তারপর বজ্রকে দেখিয়া সেও বজ্রাহতবৎ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনেই হতবাক।

এই সময় ঘরের ভিতর হইতে কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠস্বর আসিল—'কে? বাহিরে কে?'

বজ্র চমকিয়া বলিল—'আমি—বজ্র।'

'এস বৎস, ভিতরে এস।'

বজ্র দ্বিধাভরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে কুহু চকিতে হাত তুলিয়া কি যেন ইসারা করিল, তারপর বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। বৃদ্ধের মুখে চোখে তীব্র উত্তেজনা, শুষ্ক দেহে তিলমাত্র অবসাদ নাই। তিনি নিম্নকণ্ঠে আজিকার সমস্ত দিনের কর্মতৎপরতা বজ্রকে শুনাইতে লাগিলেন। কর্ণসুবর্ণে এখনও অনেক ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছে যাহারা বর্তমান রাজারাণীর কুক্রিয়া ও জঘন্য জীবনযাত্রায় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্ক দেবের বংশধর সিংহাসনে বসিলে তাহারা আনন্দিত হইবে, সহায়তাও করিবে। ব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তুত। অমাবস্যার রাত্রে অগ্নিবর্মার নারকীয় জীবন শেষ হইবে। পরদিন প্রাতে কোকবর্মার সৈন্যগণের সাহায্যে বজ্র রাজপুরী অধিকার করিবে। নগরে শাসন-ডিণ্ডিম প্রচারিত হইবে; অগ্নিবর্মার মৃত্যু এবং বজ্রদেবের অভিষেক ঘোষিত হইবে। কোকবর্মা যাহা চায় তাহা লইয়া নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। দুই শত বাছাই করা খস্ যোদ্ধা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহারা রাজপুরী রক্ষা করিবে। কোদণ্ড মিশ্র তখন নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিবেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে।

বজ্র মনোযোগ দিয়া শুনিল, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও প্রকার তীব্র আগ্রহ অনুভব করিল না। তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, অথচ তাহার অন্তর যেন এই জটিলতা-কুটিলতায় সায় দিতেছে না। পিতৃ-পিতামহের সিংহাসন তাহার প্রাপ্য, সে তাহা চায়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কুটচক্রান্ত, বিষপ্রয়োগে নরহত্যা, সে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সে অধিক সুখী হইত।

কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ভাবনা মুখে প্রকাশ করিতে সে অভ্যস্ত নয়। প্রকাশ করিয়াই বা লাভ কি। সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'আমার কর্তব্য কিছু আছে কি?'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'উপস্থিত কিছু না। তুমি কেবল অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবে, আর কোনও কর্তব্য নেই। আমার ঘরে এমন অনেক লোকের যাতায়াত হবে, তোমার এখানে না থাকাই ভাল! তুমি আগ্নি বুড়ির ঘরে থাকবে।'

আরও দুই চারি কথার পর বজ্র বাহিরে আসিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নিম্নে কুটিরগুলিতে মৃৎ-প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা। বজ্র অন্য মনে আগ্নি বুড়ীর কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় একজন আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'মধুমথন!'

'কুহু!'

কুহু এতক্ষণ বাহিরের অন্ধকারে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল! বজ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'তুমি এখানে?'

কুহু প্রতিধ্বনি করিল—'তুমি এখানে?'

বজ্র সংক্ষেপে নিজের নদীসন্তরণ কাহিনী বলিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'কিন্তু কোদণ্ড মিশ্রের কাছে তুমি এলে কি করে? তাঁর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ?'

কুহু বলিল—'আছে, পরে বলব। কাল আমি মদিরাগৃহে গিয়েছিলাম। দেখলাম, দোর বন্ধ, কেউ নেই। কী দুঃখ যে হয়েছিল!'

বজ্র লক্ষ্য করিল কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে একদিকে লইয়া যাইতেছে। সে বলিল—'কোথায় যাচ্ছ?'

কুহু বলিল—'চল, আমাকে রাজপুরীতে পৌঁছে দেবে।'

'কিন্তু—খেয়া তো বন্ধ। নদী পার হবে কি করে?'

'আমার উপায় আছে। এস।'

কুহু তাহার বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল। দুইজনে নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিল।

খেয়া ঘাটে খেয়া তরীর পাশে একটি মোচার খোলার মত ছোট্ট ডিঙি বাঁধা আছে। এটি অবরোধের নারীদের ব্যবহার্য ডিঙি, ঘাটের এক কোণে স্তম্ভের গায়ে অর্ধ-নিমজ্জিত হইয়া বাঁধা থাকে; পুরীর দাসীরা প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করে। কুহু ও বজ্র সেখানে উপস্থিত হইলে কুহু বলিল—'তুমি আগে ওঠ। বৈঠা ধর।'

বজ্র উঠিয়া বসিয়া বৈঠা ধরিল। কুহু পিছনের গলুইয়ে

উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল। বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'রাজপুরী কোন দিকে। কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।'

কুহু বলিল—'ভাবনা নেই, দু'বার দাঁড় টেনে স্রোতের মুখে ডিঙি ছেড়ে দাও, আপনি রাজপুরীর ঘাটে গিয়ে লাগবে।'

বজ্র তাহাই করিল। আঁধারে ডিঙি ভাসিয়া চলিল।

এতক্ষণে বজ্র অন্তরের মধ্যে একটা সহস উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সে যেন হঠাৎ একান্ত আপনার জনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মনের আনন্দে হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল—'কুহু! তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তা একবারও ভাবিনি।'

কুহু বলিল—'আমিও না।—কিন্তু ঘাট এসে পড়েছে।'

ঘাটের পাষাণে ডিঙি ঠেকিল। দুইজনে অবতরণ করিল। কুহু স্তম্ভের গায়ে লোহার আংটায় ডিঙি বাঁধিল, তারপর আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল।

বজ্র বলিল—'এবার আমি ফিরে যাই?'

কুহু বজ্রের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'মহারাজ বজ্রদেব, আজ আপনাকে ছাড়ব না। দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

মহারাজ বজ্রদেব! এই সম্বোধন শুনিয়া বজ্র যেন ক্ষণেকের জন্য মন্ত্রমূঢ় হইয়া গেল। কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীর মধ্যে লইয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

ভাষার বিবর্তন

অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

সাধনা, কল্পনার দ্বারা লব্ধ সূক্ষ্ম বিজ্ঞানী বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-বোধের সাহায্যে জানা যায় অসংখ্য, বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই বিশ্ব। কিন্তু অতি সহজ, স্থূল ও অর্চিত ইন্দ্রিয়-শক্তির সাহায্যে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়; সেগুলি হচ্ছে, রূপ (রঙ ও রেখা), রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। কিন্তু এগুলি সংখ্যায় কম বলে মনে হলেও আসল তা নয়। এদের প্রতিটির প্রকাশ বিচিত্র। এক একটিরই এত আকৃতি, প্রকৃতি ও স্তরের ভেদ আছে যে যে-কোন একটিকেই অসীম বলে মনে হয়, যদি তেমনভাবে দেখা যায়। এক-একটির শক্তি ও প্রভাব সহজে নিরূপ্য নয়।

শব্দ বা ধ্বনি সারা সৃষ্টির একটা মৌলিক উপাদান বলে অনুমান করলে অসঙ্গত মনে হবার কারণ নেই। ধ্বনির কারণ যাই হোক, এ যে একটা বিরাট শক্তি তা বুঝতে খুব যে বেগ পেতে হয় তা নয়। তবে সাধারণত এর শক্তি সম্বন্ধে তত স্পষ্ট সচেতন উপলব্ধি ও স্বীকৃতি চোখে পড়ে না। আকাশে, বাতাসে, সাগরে, নদীতে, অরণ্যে কোথায় নেই ধ্বনি? কোন-না-কোন আকারে-প্রকারে সর্বত্রই সে আছে। বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত, সুপ্ত-গুপ্ত নিগূঢ় রহস্যের অনেকখানিই প্রকাশ পাচ্ছে এর মাধ্যমে; তার বিবর্তন ও পরিণতি হবার একটি বিশেষ উপায় হয়েছে এই ধ্বনির কল্যাণে।

প্রাণীর মধ্যে এই ধ্বনির বিকাশ হতে পেরেছে ইচ্ছা-প্রণোদিত; মানুষের মধ্যে নিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষের মধ্যে সচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগার সংগে-সংগে ধ্বনির সুপরিকল্পিত প্রকাশ ঘটেছে মানুষে। মানুষ যে শুধু তার নিজের মধ্যেকার ধ্বনিবস্তুকে কাজে লাগিয়েছে সুন্দর করে গড়ে তুলে তাই নয়, বাইরের শব্দশক্তিকেও নানা ভাবে ব্যবহার করে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আনন্দ পাবার কৌশল খাটিয়েছে। এই বাইরের ধ্বনিপদার্থকে আপন বশে রাখবার জন্য কত যন্ত্র বানিয়েছে মানুষ: সঙ্গীত-যন্ত্রের কথা মনে করলেই তা বোঝা যাবে।

মানুষ বুদ্ধিমান ও বিবেকবান জীব হলেও সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়; সেও নিসর্গের অধীন। তার বুদ্ধি-বিবেকও একদিনে জাগে নি। বহুযুগের অভিজ্ঞতার পর আজ যে পরিণতি পেয়েছে তার মানস শক্তি, সেই অতি-আদিম কালে সে অবস্থা ছিল না তার—এই অনুমানই যুক্তিযুক্ত। মানুষ-সৃষ্টির সংগে-সংগেই তার সব সম্ভাব্য শক্তির বিকাশ হতে পারে নি নিশ্চয়। আজও মানবিক মানস-শক্তির যে বিকাশ হ'য়েছে তাই যে চরম তা কে বলতে পারে? সে তো উত্তরোত্তর বাড়তির পথে চলেছে। তবে এ কথা ঠিক যে মানুষ সেই আদিম কালেই পরিণমনীয়তা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই ছিল পরিণতির বীজ। প্রত্যেক জীবই কতকগুলো শক্তি নিয়ে জন্মায়। মানুষেরও কতকগুলো সহজাত শক্তি আছে; সে শক্তি দৈহিক ও মানসিক দুই-ই হয়ে থাকে। শৈশব থেকেই মানুষ কয়েকটি সহজ ভাষা বা ধ্বনির অধিকারী হয়, যেমন হয়

কয়েকটি ভাব বা প্রবৃত্তির। অনুভূতি ও বুদ্ধি তখন কম থাকে বলে তার প্রকাশ-রীতি ও উপায়ের সংখ্যাও থাকে কম। তাই কয়েকটি ধ্বনি বা আওয়াজের সাহায্যে শিশু তার মনোভাব ব্যক্ত করে। দুঃখ কষ্টের অনুভূতি খুব গভীর ও তীব্র বলেই বোধ হয় তার প্রকাশই শিশুর মধ্যে আগে হয়; সুখ কি আনন্দের অনুভূতি হলেও তার প্রকাশ প্রথম থেকেই হতে দেখা যায় না। হাসির প্রকাশ হয় কান্নার বেশ-কিছুটা পরে; কান্না কিন্তু জন্মাবার সাথে-সাথেই প্রকাশ পায়। তার পর ক্রমশ মানুষ শুনে-শুনে, বলে-বুঝে অন্য উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতে শেখে এবং শেষ পর্যন্ত নানা ধ্বনি-মিলিত শব্দ পদ ও বাক্য আয়ত্ত করে বলতে শেখে। তেমন প্রয়োজন হলে এবং শক্তি থাকলে মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষাও শিখে ফেলতে পারে।

এ থেকে বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত করা অসংগত হবে না যে মানুষ প্রথমে যে ধ্বনি বলতে পারে তা হচ্ছে স্বরধ্বনি; কারণ স্বরের উচ্চারণে সব চেয়ে কম আয়াস লাগে। সহজেই মনুষ্য কণ্ঠে স্বর ধ্বনিত হবার ঝোঁক আছে। একেবারে কচি শিশুর কান্নার আওয়াজে স্বরধ্বনিই শোনা যায়: ওঁ্যা, ওঁ্যা। এই কথাটিও এই সংগে মনে রাখতে হবে যে অতি প্রাথমিক ভাষা যেমন, স্বরধ্বনির ভাষা তেমনি একধ্বনি ভাষা। তার পর ক্রমে এক স্বর থেকে একাধিক স্বরান্বিত শব্দ, এক ব্যঞ্জনধ্বনিত শব্দ, একস্বর ও একব্যঞ্জন সমন্বিত শব্দ, একাধিক স্বর ও ব্যঞ্জনের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ অর্থাৎ একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, চতুরক্ষরী, পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি পদ, তার পর দ্বিব্যঞ্জন, বহুব্যঞ্জনধ্বনিবিশিষ্ট পদ ও বহু পদের একপদীভাব হয়ে সমস্ত পদ, একই পদ হতে ব্যুৎপন্ন নানা পদ, নানা পদের অন্বয়ে গঠিত নানা রকমের বাক্য লেখা এবং বলা অভ্যাস হয়। অনুরূপ ভাবেই আদিম কাল হতে এক এক গোষ্ঠী তথা দলের মধ্যে এক-একটি ভাষা গড়ে উঠেছে। এটা মনে হওয়া খুবই সহজ ও স্বাভাবিক যে প্রথম যুগে, এক-একটা ধ্বনি এক-একটা ভাব বা বস্তুরই প্রতীক ছিল। তারপর একই ধ্বনিকে একটু ইতর-বিশেষ করে একাধিক ভাব বা বস্তুর প্রতীক রূপে নেয়া হতে থাকল; তারপর বিভিন্ন ধ্বনিকে স্বতন্ত্র ভাবে একই ভাব বা বস্তুর বাহন হিসেবে ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবিত হল। এরই বিবর্তনে দেখা যায়: একই পদ অনেক বস্তু বা ভাবের দ্যোতক হতে পারে, এক বস্তু বা ভাবের অনেক প্রতীক বা পদ হয়; অর্থাৎ, একই কথার অনেক অর্থ হতে পারে, আবার, অনেক কথার একই অর্থ হয়। আরো সোজা করে বলতে গেলে, এক কথা দিয়ে অনেক ভাব বা বস্তুকে বোঝানো যায়, আর একই ভাব বা বস্তুর নানা প্রতীক বা পদ থাকতে পারে। আধুনিক যে কোন ভাষায়, অন্তত সমৃদ্ধ ভাষায় এর উদাহরণ মিলবে।

ভাষা যখন দীন ছিল, তখন এক পদ দিয়েই অনেক ভাব বা বস্তুকে বোঝাবার কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে অর্থবিভ্রাট ঘটার অর্থাৎ ভুল বোঝার সম্ভাবনা দেখা দিত। তাই, পৃথক-পৃথক ভাব বা বস্তুর পৃথক-পৃথক পদ-গঠনের দরকার হল। অপর ভাষার সংগে পরিচয়ের ফলেও একই বস্তু বা ভাবের নানা পদ বা সমনামী শব্দ পাওয়া গেল। এক পদ হতে বহু পদ নিষ্পন্ন হবার রীতিও নির্ধারিত হল প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে। যেমন, বিশেষ্য হতে বিশেষণ ও বিশেষ্য হতে ক্রিয়া, বিশেষণ হতে বিশেষ্য ও বিশেষণ হতে ক্রিয়া, ক্রিয়া হতে বিশেষ্য ও ক্রিয়া হতে বিশেষণ প্রভৃতি পদের উদ্ভব হবার ব্যবস্থা ও উপায় হল। আবার একই পদকে বিভিন্ন শ্রেণীর পদরূপে ব্যবহার করার স্বাধীনতা না দিয়ে পারা যায় নি বলেও ভাষার শক্তি বাড়ল; যেমন, বিশেষ্যকে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদরূপে বিশেষণকে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদরূপে এবং ক্রিয়াকে বিশেষ্য ও বিশেষণপদ রূপে। বস্তু বা ভাবের সংখ্যা নির্দেশক বচন, স্ত্রীপুরুষ ক্লীবত্ব-নির্ণায়ক লিঙ্গ, কার্যনিরূপক কারক ও অবস্থা-বোধক বিভক্তি প্রভৃতি উপায়েও ভাষার সম্পদ অর্থাৎ প্রকাশ ক্ষমতা বাড়তে লাগল। ক্রিয়াপদ গঠনের বিভিন্ন প্রণালী, ক্রিয়ার বিভিন্ন কালবাচক, পুরুষবাচক, সংখ্যা-বাচক রূপ ভাষাকে সমৃদ্ধ করল।

ভাষার বিবর্তনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে উচ্চারণ। মানুষের কণ্ঠে ও মুখে যে সব ধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী ও পর্যায়ে ভাগ করে নেয়া যায়। মানব-সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালে কয়েকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও অধিকাংশ ধ্বনি বিষয়ে সব মানব-সমাজের মধ্যে সাম্যই লক্ষ্য করা যায়। ভাষার মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তার বেশীর ভাগই হয় ধ্বনি পরিবর্তনের জন্য, আর বাদবাকী হয় গাঠনিক কারণে, অর্থপরিবর্তনের জন্য, আলঙ্কারিক বাচনভঙ্গীর ফলে, বাক্যরীতির পরিবর্তন ও বিদেশী ভাষার ধ্বনি, শব্দ, ইডিয়ম, ছন্দ, অলংকার ও বাক্যরীতির নিমিত্ত। প্রধানত উচ্চারণের কারণে এক-একটি ভাষা আপন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। প্রত্যেক ভাষার কিছু না কিছু উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য থাকে। উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের ফলে একই ভাষায় অনেক উপভাষার সৃষ্টি হয়। একই ভাষার মধ্যে একই পদের বিভিন্ন উচ্চারণ বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। এর ফলে, এক পদ হতে ভিন্ন-রূপের অনেক পদ গড়ে ওঠে। উচ্চারণ-জনিত ধ্বনি পরিবর্তনহেতু ভিন্ন ভিন্ন পদ হতে একরূপ পদের উদ্ভব হয়। উচ্চারণের ফলে প্রাচীন শব্দকে বারে বারে রূপ বদলাতে দেখা যায়; অনেক সময় শব্দের এমন পরিবর্তন হয়ে যায় উচ্চারণ হেতু—যে তার নোতুন রূপ হয়েছে বলা যায়। ভাষায় নতুন ছন্দের আবির্ভাব হতে পারে উচ্চারণের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে। কোন ভাষার উচ্চারণ-রীতি বিশিষ্ট হয়ে ওঠার পর বিদেশী বা অপর ভাষা হতে আমদানী শব্দের বেশির ভাগই যায় বদলে। কতকগুলি এক জাতীয় উপভাষার মধ্যে একটি যে নিদর্শন standard হয়ে ওঠে তা যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হয়, তেমনি হতে পারে তার উচ্চারণের স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুর্যের জন্যে।

ভাষার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় এক ভাষা হতে অনেক উপভাষার উৎপত্তি হয়; পরে আবার সেই সব উপভাষা হতে কোন-কোনটি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাষার মর্যাদা লাভ করে। একই ভাষা হতে উদ্ভূত উপভাষাগুলির পার্থক্য হয় কতকগুলি স্বতন্ত্র পদ ও উচ্চারণ-রীতির ব্যবহারে. এ থেকে ক্রমে ক্রমে পদবিন্যাস পদ্ধতি, পদ গঠনসংগী এবং ছন্দেরও স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয়। নবজাত স্বতন্ত্র পদাংশ,

প্রকৃতিপ্রত্যয় উচ্চারণের জন্যে রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপ গড়ে ওঠে।

ভাষা সার্থক ধ্বনিসমষ্টি ছাড়া আর কি? সব ধ্বনির মধ্যেই সুর আর তাল বিদ্যমান, তা সে যত অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম আকারে হোক। এক-একটি নিজস্ব কালমান আছে, অবশ্য অপর ধ্বনির সহিত অন্বয় ও পরিণয়ে তার রূপান্তর ঘটে। কতকগুলি ধ্বনি একটা নির্দিষ্ট নিয়মিত কালের মাপের মধ্যে ধ্বনিত হলে যে ভংগী লক্ষিত হয় তাকেই ছন্দ বলা যায়। একটি ভাষায় বিশিষ্ট ধ্বনি ও উচ্চারণপদ্ধতির জন্য বিশিষ্ট ছন্দের উৎপত্তি হয়। ধ্বনিপরিবর্তন ও উচ্চারণভংগীর রূপান্তরের ফলে নব নব ছন্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাষার পরিবর্তনের সংগে ছন্দেরও বিবর্তন ঘটে; ছন্দের যে কতকগুলো বাঁধাধরা সংখ্যা ও রূপ থাকতেই হবে এমন নয়। ছন্দ ভাষার তনুশ্রী, সুষমা-মাধুরী। ছন্দের মাধ্যমেই ভাষার প্রাণের লীলানন্দ নৃত্যমান হয়ে উঠতে পায়। ভাষার জড়তা-আড়ষ্টতা কেটে যায় ছন্দের অনুপ্রাণনায়। ভাষায় বৈচিত্র্য জোগাবার অন্যতম প্রধান উপকরণ হচ্ছে ছন্দ। ভাষায় গদ্যে পদ্যে সর্বত্রই অল্পবিস্তর ছন্দ থাকে, তবে কোথাও তা অস্পষ্ট, কোথাও স্পষ্ট হয়ে। একই তালমান যখন পর পর অনেকবার অবলম্বিত হয়, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সমকালিকতা রক্ষিত হয়, তখনই ছন্দের তরঙ্গ-হিল্লোল শ্রোতার কান-প্রাণ-মনকে দোলায়িত করে সহজে। এই নির্দিষ্ট সময়সাম্যের ঘনবিন্যাসই পদ্যের বৈশিষ্ট্য-দায়ক। যতি-বিরতি-সমন্বিত কালপর্বের অনির্দিষ্টতা, সংখ্যা ও বিন্যাসের তারতম্য হেতু ছন্দের রূপবৈচিত্র্য ঘটে। গদ্যকাব্য ও গদ্যকবিতার মধ্যে যতি-বিরতিসমন্বিত কালসাম্য, অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে একই মাপের সময়ের মধ্যে ওঠা নামা, থাকে না; তাই তার ঊর্মিলতা তেমন সহজে অনুভূতি-গোচর হয়ে ওঠে না। পদ ও ধ্বনির বৈশিষ্ট্য যেমন ছন্দের নিয়ামক হয়, ছন্দের অনুরোধে তেমনি শব্দের রূপান্তর ঘটে। ক্রমে এই রকম রূপান্তরিত শব্দ গদ্য ও সাধারণ ভাষায় চালু হয়ে যায়। এই থেকে ভাষার শক্তিসম্পদ যায় বেড়ে।

ভাষার পরিবর্তন নানা ভাবে হয়; তার মধ্যে শব্দের ধ্বনিগত ও প্রত্যয়গত যে পরিবর্তন তা প্রধান। কিন্তু এ হল ভাষার বাহ্যিক পরিবর্তন। ধ্বনি বা শব্দ অর্থ-সাপেক্ষ; অর্থবত্তাতেই তাদের সার্থকতা। অর্থ ই ভাষার প্রাণ, শব্দ ভাষার দেহমাত্র; যদিও প্রাণের প্রকাশের জন্য দেহের প্রয়োজনীয়তার মত ভাব বা অর্থপ্রকাশের জন্য ভাষার আবশ্যকতা। তবু ভাব বা অর্থ না থাকলে স্থায়ী প্রাণস্পর্শিতা থাকে না ভাষার। অর্থহীন, মানে, বিশেষ অর্থছাড়া শব্দের যে কোন দাম নেই তা নয়; আছে, যেমন আছে ছবি বা ভাস্কর্যের, যার প্রাণ না থাকলেও দৃষ্টিপ্রসাদকতা আছে। তেমনি অনেক ধ্বনি ও শব্দের তথাকথিত অর্থবত্তা না থাকলেও শ্রবণাভিরাম মাধুর্য আছে। তথাপি সত্যি, অর্থবান ভাষাই প্রাণ মনকে যথার্থ বিভাবিত করে। কিন্তু দেখবার বিষয় এই যে অর্থবান ভাষার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে চলে। শব্দের অর্থ বদলাতে বদলাতে একেবারে ঠিক উল্টো অর্থে ব্যবহার হতেও দেখা যায়। কোথাও অর্থের বিস্তার, কোথাও বা সংকোচ ঘটে থাকে। স্বজাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার পদেরই অর্থান্তর ঘটে। বিদেশী শব্দ প্রথম থেকেই অন্য বা উল্টো অর্থে গৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকে। আলঙ্কারিক ভাবে প্রয়োগ হতে-হতেও পদের অর্থান্তরপ্রবণতা ভাষার নমনীয়তা জ্ঞাপন করে, কিন্তু এর আধিক্য প্রমাদকর; তবে তা প্রায়ই হয় না। অর্থের যে পরিবর্তন ঘটে তা ধীরে ধীরে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিতদের অপব্যবহারের দরুণও অর্থান্তর হয়। লোকব্যুৎপত্তি ও সাদৃশ্য অর্থ পরিবর্তনে অনেক পোষকতা করে।

ভাষার আদিম অবস্থাতেই যে বহুপদী বাক্য ছিল এমন মনে করা অসংগত। বাক্যের, বাক্যরীতিরও বিবর্তন ঘটে এসেছে যুগে-যুগে! একধ্বনি শব্দ হতে যেমন বহুধ্বনি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, একধ্বনি, পরে একপদী বাক্য হতে তেমনি বহুপদী বাক্যের উদ্বর্তন হয়েছে। অপর ভাষা, বিশেষ করে উন্নত ভাষার বাক্যরীতির ছোঁয়াচ লেগে ভাষার বাক্যশৈলীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভাষার পরিণত অবস্থাতেও অল্পপদী, এমন কি, একপদী বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয়, মানুষের অন্তরে অনুভূতির বৈচিত্র্য বাড়ার সংগে-সংগে মগজে বুদ্ধিবৃদ্ধির ফলে প্রকাশ-ভংগীর বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হয়েছে। পদবিন্যাসের বিভিন্ন ধরণ হতেও বাক্যরীতির পরিবর্তন ঘটেছে।

মনের ভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করার শক্তি ও যোগ্যতা ভাষায় অর্জিত হবার পর চেষ্টা হল কেমন করে সেই সোজাসুজি-বলা ভাবকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দর করে, চমৎকার করে বলা যায়; সাধনা হতে থাকল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা-রঙে বলবার। মানব সভ্যতার অপরাপর বিষয়ে যেমন এখানেও তেমনি প্রয়োজন মেটার পর শিল্পসৌন্দর্যের সৃষ্টিতে মন বসল। এর ফলে বাক্যে অলংকার-যোজনার রেয়াজ হল। ভাষার কল্যাণে বিচিত্র-সুন্দর অনুভূতি, চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় স্থায়ী রূপ পেয়ে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান গ্রথিত হবার উপায় হল; ব্যক্তিগত মানসিক সাধনা সর্বজনীনতার পথে এগোবার রথ পেলো।

ভাষার বিবর্তনে লিপির কথাটি এক হিসেবে সব চেয়ে বড়; কারণ, এই লিপির সাহায্যেই মানুষের ভাব, অভিজ্ঞতা, এমন এককথায় কৃষ্টির বেশীর ভাগ জিনিসই স্থায়ী হবার সুযোগ পেয়েছে, উত্তর-পুরুষের লভ্য হতে পেরেছে। নানান্ দেশে নানান্ ভাষার মত নানা লিপির প্রবর্তন হয়েছে। যুগে-যুগে লিপিরূপেরও পরিবর্তন না ঘটে পারে নি। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ভাব-প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে; দূর-দূরান্তরে, বহু মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে প্রকাশে-অপটু মানুষের বাচনশক্তিই যে বাড়বার পথ হয়েছে শুধু তাই নয়, কবি-শিল্পী-দার্শনিকদের অনুভূতি ও চিন্তিত বিষয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ বেড়েছে; মানুষের মহত্ত্ব ও মহিমা ফুটে ওঠবার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই সংগে যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে পাওয়া গ্রামোফোন, লিংগুয়াফোন, ডিক্টাফোন, টেলিপ্রিন্টিং, সিনেমা, রেডিওর কথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা উচিত। ভাষার প্রচার তথা বিবর্তনকে কম সাহায্য করছে

না এগুলি। এর পর আরো কত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে ভাব-প্রকাশ এবং জ্ঞান ও আনন্দ লাভ সহজ ও সুলভ হবে তা তো আর অনমুমেয় নয়।

হাব-ভাব, অংগভংগী, ইংগিৎ-ইসারা, রঙ-রেখা, সুর-কথা কত মিডিয়ামেই না মানুষ অন্তরের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিকে রূপ দেবার সাধনা করেছে; এক-একটি উপায়েরই আবার কত অসংখ্য রূপান্তর ঘটেছে, আরও ঘটে চলেছে। ভাষার রূপ ও রূপান্তর মানব-ইতিহাসের একটি বড় কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। হাওয়ার মত সুলভ-হয়ে-থাকার জন্যে এর মর্যাদা ও অসাধারণত্ব সব সময় বুঝতে পারা যায় না। একবার মূকতা কিংবা প্রকাশশক্তিহীনতার কথা অনুমান করে দেখলে এর মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ফলে আরো কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশ হবে ভবিষ্যতে। নানা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এখনো বিরোধ বিবাদের অবশেষ থাকা সত্ত্বেও যেমন বিশ্বরাষ্ট্র ও একপরিবার গড়ে ওঠবার প্রয়াস ও সম্ভাবনা দেখা যায় মানুষ-সমাজের মধ্যে, নানা ভাষার সম্পদ নিয়ে বহু-বিচিত্র ভাষার মধ্যে তেমনি একটি ভাষার উদবর্তন-কল্পনা কি শুধু ভাববিলাস মাত্র?

গান্ধীবাদ ও শ্রমনীতি

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম্-এ, ডি-এস্-ই, ডি-এস্-ডব্লু

১

গান্ধীজীর রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাঁর শ্রমনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি শুধু রাষ্ট্রের কর্ণধারই ছিলেন না—তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক-নেতাদের অন্যতম। উপেক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী সমাজের কাঠামোর এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাই, ভারতের পুনর্গঠনে শ্রমিকদের যে অনেকখানি অবদান আছে ও ইতিহাসে এদের একটা ভূমিকা আছে—সে কথা তিনি উপলব্ধি ক'রে শ্রমিক আন্দোলন সুরু করেন। মানব-দরদী গান্ধীজী শ্রমিকদরদী না হবেন কিরূপে? স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্যও সমানভাবেই নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে শ্রমিকদের উন্নতি চেয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে তিনি কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস ছিলেন না—শ্রমিক আন্দোলনেরও তিনি আদিগঙ্গা। তিনি পেটে-খাওয়া মানুষদের কল্যাণের নিমিত্ত যে বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন—তা আজ শাখাপ্রশাখামণ্ডিত হ'য়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাব হয় ১৯১৮ সালে। যদিও ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৯১০ সালে—শ্রমিক আন্দোলনের গতি অতি মন্থর অবস্থাতেই চলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের ঢেউ ভারতেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আবার, তার পরের দিনের কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ, যেমন ভারতের স্বরাজ আন্দোলন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দমননীতিমূলক কার্য্যকলাপ, জালিয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাউলট আইন প্রভৃতি—এদেশের জনসাধারণকে চূড়ান্তভাবে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। অগণিত স্বদেশপ্রেমিকদের সঙ্গে সহরের শ্রমিকশ্রেণী ও পল্লীর কৃষককুল এতে তাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। কল-কারখানার শ্রমিকেরা নূতনভাবে দাবীদাওয়া পেশ ক'রে মলিকদের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টির সূচনা করেছিল। এই সন্ধিক্ষণে শ্রমিক নেতারূপে গান্ধীজীর আবির্ভাব হোলো। তাঁর অসহযোগ পন্থা, সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও অহিংসনীতি শ্রমিক আন্দোলনের মোড় দিল ফিরিয়ে। স্তিমিত ও ম্রিয়মান শ্রমিক আন্দোলন যেন ঐন্দ্রজালিকের হাতে প্রাণের পরশ্ পেয়ে সঞ্জীবতা লাভ ক'রে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো।

২

গান্ধীজী আমেদাবাদে কলকারখানার মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, আমেদাবাদ সুতাকল মজুর সঙ্ঘের (Ahmedabad Textile Labour Association) সহায়তায় তাঁর ঐতিহাসিক শ্রম-আন্দোলন সুরু করেন। বিশ দিন যাবৎ ধর্মঘট চালিয়ে যখন তিনি মালিকদের অনমনীয় ও একগুঁয়েমিভাবকে অহিংস পন্থায় জয় করতে পারলেন না, তখন তিনি একদিন আমরণ অনশনের ধনুকভাঙ্গাপণ ক'রে বসলেন। এর দ্বারা তিনি শুধু মালিকদিগকেই নিজের আওতার মধ্যে আনলেন না—তিনি শ্রমিকদের সংহতি বাড়িয়ে দিলেন অশেষ পরিমাণে। তিনি মজুরদেরও জানালেন যে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে যদি দুর্বলতার ছোঁয়াচ লাগায় ও নেতার নেতৃত্বে যদি শেষ পর্য্যন্ত অটুট আস্থাবান না থাকে—তা হ'লে তাঁর অনশন দাঁড়াবে তাদেরই বিরুদ্ধে। সারাদেশ এই সময় প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার সূচনার প্রথম পরিচয় পেলো। ভারতের শিল্পবিপ্লবের সুরু হ'তে এযাবৎ শ্রমিকদের চালিত করেছে বাইরের লোকেরাই। শ্রমিকনেতা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হ'তে আবির্ভূত হয় নাই। সমাজদরদী মানুষ—তিনি ডাক্তার হউন বা উকিল ব্যারিষ্টার হউন—শ্রমিকদের সেবা ক'রে লোকসমাজে শ্রমিকনেতা বলে পরিচয় লাভ করেছেন। এদেশের শ্রমিক বলতে প্রধানতঃ নিরক্ষর শ্রমিকই বুঝায়। এখানে শতকরা মাত্র দু'তিনজনকে লেখাপড়ার গণ্ডীতে পা দিতে দেখা যায়। এইদিক দিয়ে বিদেশের শ্রমআন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিলেতে শ্রমিকনেতা শ্রমিকদের মধ্য হ'তেই

আসে। একজন সাধারণ শ্রমিকই সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করে। মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের তরফ হ'তে দাবীদাওয়া পেশ ক'রে বুঝাপড়া করতে পারে। যখন তার কাজের চাপ বেড়ে যায়, আর তার পক্ষে কারখানার কাজে মন দেওয়া সম্ভব হয় না—তখন কাজে ইস্তফা দিয়ে সেই শ্রমিক একজন পুরাদস্তুর শ্রমিকনেতা হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য ইউনিয়ন হ'তে তার মাসোহারার ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী যতদিন পর্য্যন্ত না শিক্ষার আলো পাচ্ছে—ততদিন পর্য্যন্ত তাদের ইউনিয়নগুলির পক্ষে অনুরূপভাবে গ'ড়ে উঠা সম্ভব হচ্ছে না।

৩

ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান শ্রমিক আন্দোলনের নানা ত্রুটীবিচ্যুতি সম্বন্ধে গোড়া হ'তেই অবহিত ছিল ও গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই, ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমূলক ও তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য এক প্রস্তাব পাশ হয়। এই সময় গান্ধীজী আমেদাবাদে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলেন। ১৯২০ সালের শেষ নাগাদ দেখা গেল—আমেদাবাদে কলকারখানার মজুরদের প্রায় ৪০ ভাগ গান্ধীজীর কোন না কোন একটা ইউনিয়নে যোগদান করেছে। এই সময়ের ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা ও চাঁদা আদায়ের হার দেখলেই বুঝা যাবে—গান্ধীজীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী কিরূপ ভাবে সাড়া দিয়েছিল! ১৯২০ সালের হিসাবে দেখা যায় গান্ধীজী চালিত ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল—১৬,৪৫০ ও আদায়ী চাঁদার পরিমাণ হয়েছিল ৫৪৭৯৭৲। আর ১৯২১ সালের মাঝামাঝি সভ্যসংখ্যা উঠেছিল ২০,০০০ ও চাঁদা আদায় হয়েছিল—৭৫০০০৲। সত্যের উপাসক গান্ধীজী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'তে শ্রম আন্দোলনকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালাবার জন্য কতকগুলি মূলনীতি নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন। এগুলি আজও তাঁর অন্তর্ধানের পর চিরন্তন সত্য :—

(১) শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের পক্ষে তাঁদের দাবী অযথা বাড়ানো উচিত নয়। দাবী পেশ করার আগে দাবীদাওয়ার ভালমন্দ দুদিকই বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত।

(২) যেহেতু আপোষ মীমাংসা ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের অবসান বাঞ্ছনীয়, সেইজন্য ধর্মঘটকে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। ধর্মঘট চলা কালেও বিরোধের যথাযথ মীমাংসার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা দরকার। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া কখনও উচিত নয়। তা ছাড়া, শ্রমিকদের ইউনিয়নের সমর্থন সাপেক্ষেই এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত।

(৩) শ্রমিকদের ধর্মঘট সত্যাগ্রহ বিশেষ। কাজেই সত্যাগ্রহীর মনোভাব নিয়েই সত্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে—কর্তব্যসাধনে অটল থাকতে হবে। ধর্মঘটের পন্থা হিসাবে অহিংসনীতিই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের অহিংসভাবেই ধর্মঘট করা উচিত।

গান্ধীজীর অহিংস ধর্মঘট পাশ্চাত্যের ধর্মঘট হ'তে কিছুটা স্বতন্ত্র। পশ্চিমের দেশগুলিতে ধর্মঘট বাহ্যতঃই অহিংস, কিন্তু আসলে এগুলি হিংসা ও দ্বেষ দ্বারা প্ররোচিত হওয়ার দরুণ হিংসাত্মক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে—সে দেশের ধর্মঘট জবরদস্তমূলক, আর তাতে অনুরোধ অনুনয়ের দ্বারা রাজী করানোর স্থান বিশেষ নাই। সেখানে ধর্মঘট মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহীর ধর্মঘট হবে—অন্তরে ও বাইরে সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতির পরিপোষক। ধর্মঘটকে বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্মঘট হচ্ছে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এতে বাইরের প্রেরণা থাকলেও তার সৃষ্টি হয় অন্তরে। এর দ্বারা ভ্রান্তপথে চলা মালিককে শ্রমিকদের মতের বশীভূত করার প্রয়াস পাওয়াই-এর উদ্দেশ্য। এই জন্যই সত্যসন্ধানী গান্ধীজী সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য মনে করেন নাই। তাঁর মতে অত্যাচারীর হাতে নিপীড়িত জনগণকে নিজেদের মুক্তির জন্য—তাহাদিগকেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে (অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নয়) বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। সে সংগ্রামে "লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর" ব'লে কিছু থাকবে না। নিজেদের সত্ত্বাকে অত্যাচারের পদতলে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে; সত্যাগ্রহের দ্বারা মুক্তিসংগ্রামে বাইরের সাহায্যের আশা পোষণ করলে আত্মার দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাই তিনি অপরের স্বেচ্ছা প্রণোদিত নিঃস্বার্থ সাহায্যের বিরুদ্ধেও সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "আত্মত্রাণের বাণী। এই মহাগীতিকে ভারতের শাশ্বত হিন্দুদর্শনের ত্যাগের দ্বারা জয়-করা-পন্থার নামান্তর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবিগুরুর ভাষায়

"দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
* * *
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।"

গান্ধীজী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মঘট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। যেহেতু দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হ'য়ে উঠে নাই, সেজন্য রাজনীতির দোহাই দিয়ে শ্রমিকদিগকে ধর্মঘট করানো যুক্তিসঙ্গত নয়। এর দ্বারা শুধু শ্রমিকদের রাজনীতির কুক্ষীগত করাই হয়। ধর্মঘটের ঠিকমতো ব্যবহার করতে হ'লে সুষ্ঠুভাবে গঠিত জোরালো অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ও অরাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন দরকার।

গান্ধীজীর মতে শ্রমিক-মালিক স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব। এই মতবাদকে গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা বলা চলে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক পক্ষকে সুসংগঠিত হ'তে হবে। পাশ্চাত্যের শ্রম-আন্দোলনের ফলে—যদি সে দেশে একরূপ স্বার্থের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা গিয়ে থাকে, তবে তার প্রধা

কারণ হচ্ছে—সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়ন অতীতের আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। আমেদাবাদ টেক্সটাইল্ লেবার এ্যাসোসিয়েশন্ গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে চলার ফলে অহিংসনীতির পরিপোষক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে এই ইউনিয়নটী ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ইউনিয়ন। আর এ যাবৎ যথোচিতভাবেই মালিকদের সঙ্গে বুঝাপড়া ক'রে আসছে। ১৯৪৭ সালে আমেদাবাদ টেক্সটাইল্ লেবার এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৫,০০০ ও মাসে ২০৮০০৲ টাকা চাঁদা আদায় হোতো। ব্যক্তিগঠনের আগে জনসাধারণের বৈষয়িক জীবনের উন্নতিসাধনের চেষ্টা নিষ্ফল—এটা গান্ধীবাদের অন্যতম মূলসূত্র। সেইজন্য গান্ধীজী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বে ব্যক্তির উৎকর্ষসাধনে প্রয়াসী হন। তাই, তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটী শ্রমিক হবে স্বাধীন ভারতের পুরাদস্তুর দায়িত্বশীল নাগরিক। তিনি যে শ্রেণীবিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা তাঁর নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

গান্ধীজীর শ্রমিক আন্দোলনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে—সালিশী-নীতি মেনে নেওয়া। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারা শক্তি পরীক্ষার আগে সরাসরিভাবে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থতার প্রয়োজন। তাঁর মতে মালিক-শ্রমিকের মাঝে যে পার্থক্য আবহমানকাল হ'তে বর্তমান রয়েছে—তা ঘুচানো সম্ভব একমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সালিশী দ্বারা। গান্ধীজী নিজে আমেদাবাদে ১৯১৮ সাল হ'তে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সালিশীর মাধ্যমে বহু বিরোধের মীমাংসা ক'রে তাদের অবসান ঘটিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে এর দ্বারা শ্রমিক ও মালিক উভয় শ্রেণীই অশেষ লাভবান হয়েছেন। শিল্পজগতে স্থায়ী ও পূর্ণ সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থাই প্রকৃষ্ট।

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার জন্য অধুনা ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গিরি যে মতবাদ প্রচার করছেন—তাতে গান্ধীদর্শনই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত গিরির মতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক—এই তিন পক্ষের মিলিত প্রয়াসকেই ঐতিহাসিক সূত্রে দেখা গিয়েছে যে শ্রমিক মালিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘুচাতে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হয়েছে। শ্রমিক-মালিকের সহযোগিতার মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তিনি বলেছেন যে এই তিন পক্ষের একত্রিত আলাপ-আলোচনাই মীমাংসার যথাযথ উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসানকল্পে শ্রমবিরোধ আইনের মাধ্যমে যে সমস্ত আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে—তাদের অপেক্ষা তিনপক্ষের বুঝাপড়ার ভিত্তিতে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াসই অধিকতর কাম্য। তাঁর মতে শ্রম আইনের আওতায় শ্রম-বিরোধ মিটাবার যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—তাতে বিরোধের বিচার হয় মাত্র, কিন্তু আসল মীমাংসা হয় না।

গান্ধীজীর শ্রমনীতির সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মালিক ও শ্রমিক আলাদা শ্রেণীর মানুষ নয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধন বর্ত্তমান। এর দরুণ তাঁর মতে এই উভয় শ্রেণীকে নিয়ে এক বিরাট পরিবার-বিশেষ মনে করতে হবে। শ্রেণী বিভাগের ধারণা (class consciousness) হতে কালক্রমে শ্রেণীসংগ্রাম (class struggle) দেখা দিতে পারে। আর শ্রেণীসংগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত সমাজের কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। তাই, গান্ধীজী শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে কলকারখানার মালিকের সঙ্গে তাঁদের একজন নগণ্য শ্রমিকের সম্বন্ধ হওয়া চাই—পিতাপুত্র স্বরূপ অথবা ভ্রাতৃতুল্য। মালিক ও শ্রমিকের এই মধুর সম্পর্ক তাঁর চোখে কোনদিন প্রভুভৃত্যের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয় নাই। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব চিরতরে নির্বাসিত করতে হ'লে তিনি মালিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন—তা মালিককুলকে কার্য্যকরী করতে হবে। প্রশ্ন হ'তে পারে—গান্ধীনীতি অবলম্বন করলেই কি শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব হ'তে একেবারে রেহাই পাওয়া যাবে? উত্তরে বলা যায়—গান্ধীবাদের আশ্রয় না নিলেও দ্বন্দ্ব ও বিরোধ যেরূপ অবধারিত, এই নীতি অবলম্বন করলে তার সম্ভাবনা অনেক কমবে। যদি গান্ধীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে মালিক-শ্রেণী দরদ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ও অন্তরের সহিত গ্রহণ করে, তাহ'লে ধরাতল হতে শিল্পবিরোধ একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলাও সম্ভব হতে পারে। গান্ধীজীর মতে একজন কারখানাদার তাঁর শ্রমিকের শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি করলেই রেহাই পাবেন না—তাঁকে শ্রমিকের নৈতিক উন্নতির জন্যও দায়ী থাকতে হবে। মালিক শ্রমিকের মঙ্গল করার জন্য ট্রাষ্টী স্বরূপ। সেইজন্য শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় ও তাদের কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় ও তারা উদ্যম, বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজেদের দৈহিক পটুতা পূর্ণভাবে নিয়োগ করতে পারে। গান্ধীজীর নিজের কথায়—"The only sanction that I can think of in this connection is of mutual love and regard as between father and son, not of law. If only you make it a rule to respect these mutual obligations of love, there would be an end to all labour disputes, the workers would no longer feel the need of organising themselves into unions." (Young India, 1927-28)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, আই-এ-এস, মহোদয়ের "Gandhian Approach in Industrial Relations" নামক ইংরাজী প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

নদীয়ার বাণী-সাধক

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

অতীতের নদীয়ার ভৌগলিক আয়তন কমিতে কমিতে বর্তমানে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে নদীয়ার সীমানা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি, আর কৃষ্ণনগর নামের উৎপত্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম হইতে। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল রেউই। মহারাজ রুদ্র রায় রেউই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে কৃষ্ণনগরের নামকরণ করেন। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের ইতিহাস লইয়াই নদীয়ার ইতিহাস। এই নদীয়াতেই বল্লাল সেন কর্তৃক হিন্দু সমাজের সংস্কার হইয়াছে। বাংলার ইতিহাস এই নদীয়ার সহিত জড়িত। কিন্তু রাজনৈতিক, ভৌগলিক উত্থান পতনের কথা বাদ দিয়া এই প্রবন্ধে আমি নদীয়ার পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

ভাষার দিক দিয়া নদীয়া বাংলাকে কি দান করিয়াছে বিচার করিতে হইলে দেখিতে পাই, দেশের সেই প্রাচীন অন্ধকার যুগে বাংলা ভাষার সাহিত্যাকাশে প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল এই নদীয়ায়। এই নদীয়াতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের গঠন ও পুষ্টি। প্রেমিক পাগল শ্রীচৈতন্যদেব নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে তাঁহার মোহন স্পর্শে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের কেন্দুবিল্বে জন্ম হইলেও নবদ্বীপে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস এই নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে বসিয়াই রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। বাংলার বিক্রমাদিত্য কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বসিয়াই রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের উজ্জ্বলরত্ন কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সাধনা ও কবিপ্রতিভা বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের উপরেও নদীয়ার দাবী কম নহে। কারণ তাঁহার অনেক কাব্য এই নদীয়ার একপ্রান্তে শিলাইদহে বসিয়া রচিত হইয়াছে। শিলাইদহেই কবি-সাধনার সূচনা। আমরা তাঁহার বহু রচনায় নদীয়ার পল্লীজীবনের আভাষ পাই।

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এই নদীয়াতেই। নদীয়ার এই বাউল-সঙ্গীত ও অনেক সাধকের সাধন সঙ্গীত বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। নদীয়া একদিন জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে বাংলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজও তাহার প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই।

নদীয়ার পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের স্মরণ করিয়া আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাঁহাদের সামান্য সামান্য পরিচয় এখানে বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করিলাম। ইহাছাড়া আরও কত বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যসেবী তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা দ্বারা বঙ্গ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীতের সমস্ত খ্যাত অখ্যাত নদীয়ার সাহিত্যসেবীদের প্রতি এই বাণী-তর্পণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আবার নমস্কার জানাইতেছি।

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-জন্ম ১৮৬১ সালে ১লা মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার নওয়াপাড়া থানার অধীন সিমলা গ্রামে। মৃত্যু ১৯৩০ সাল, ১০ই ফেব্রুয়ারী। ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি একদিন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার অল্পসংখ্যক রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

২। অক্ষয়কুমার দত্ত—জন্ম ১৮২০ খৃঃ ১৫ই জুলাই, শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় পূর্ব্বে নদীয়া—বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে রাত্রি অনুমান ৭-৪৫ মিনিটে ৬৬ বৎসর বয়সে দুরন্তরোগভোগে মৃত্যু হয়। বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সাহায্যে অক্ষয়কুমার যে বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন।

৩। অবনীকুমার বসু—বীরনগর, উলা, কবিতা লেখক

৪। অঘোরনাথ গুপ্ত—শান্তিপুর, শাক্যমুনি

৫। অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিল্বগ্রাম, উপনিষদ সম্বন্ধে গ্রন্থ।

৬। অনুকূলচন্দ্র বিশারদ—আনুলিয়া, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

৭। কবিকর্ণপুর—কাঁচড়াপাড়া, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

৮। কৃত্তিবাস ওঝা (মুখোপাধ্যায়)—১৪৩২ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রিকালে ফুলিয়ায় জন্ম হয়। তাঁহার জন্মক্ষণ সম্বন্ধে রচিত কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।"

৯। কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহারাজা—কৃষ্ণনগর, সাধনসঙ্গীত।

১০। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর—শান্তিপুর, পাদপূরণ কবিতা।

১১। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—(মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভার রসসাগর) বাড়ে বাঁকা গ্রাম।

১২। কৃষ্ণকমল গোস্বামী—ভাজনঘাট, বিচিত্র বিলাস প্রভৃতি।

১৩। কৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণাঘাট, সুলেখা উপন্যাস।

১৪। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবনিবাস, বঙ্গবাসী সম্পাদক।

১৫। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—নবদ্বীপ, তন্ত্রসার।

১৬। কৃষ্ণচন্দ্র সরস্বতী—ধর্ম্মদহ, নাট্য-পরিশিষ্ট।

১৭। কৃষ্ণনাথ সিংহরায়—নাকাশীপাড়া, মৃত্যু ১২৯৮ সালে ১৪ই চৈত্র, ভক্তি ও ভক্ত, ষট্‌চক্র প্রভৃতি।

১৮। কালীময় ঘটক—রাণাঘাট, ছিন্নমস্তা, চরিতাষ্টক প্রভৃতি।

১৯। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপ, নবদ্বীপ মহিমা।

২০। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—কৃষ্ণনগর, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত।

২১। কিরণচন্দ্র সাহা—মেহেরপুর, গল্পলেখক।

২২। কুমুদনাথ মল্লিক—রাণাঘাট, নদীয়া কাহিনী, সতীদাহ।

২৩। কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক—শান্তিপুর, রঙ্গাখ্যায়িকা।

২৪। কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়—রাণাঘাট, মালতীমাধব।

২৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—লোকনাথপুর, হিতবাদী সম্পাদক।

২৬। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ—স্বরূপগঞ্জ, জৈবধর্ম্ম, প্রেমপ্রদীপ, শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত প্রভৃতি।

২৭। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—হরিপুর, চপলা কবিতা গ্রন্থ।

২৮। ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর, ঐতিহাসিক উপন্যাস।

২৯। গোপালচন্দ্র গোস্বামী—শান্তিপুর, অমৃতবিন্দু।

৩০। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কৃষ্ণনগর, গল্পলেখক।

৩১। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—গরিবপুর, রাণাঘাট, অপর্ণা, পরিমল।

৩২। ঘনুরাম পণ্ডিত—আঁইসতলা কবির গান, পাঁচালী লেখক।

৩৩। চন্দ্রশেখর কর—কৃষ্ণনগর, অনাথ বালক প্রভৃতি।

৩৪। চন্দ্রশেখর বসু—(উলা) বীরনগর, অধিকারতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

৩৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাবআঁচড়া, ভূতের লেখা, স্বদেশরেণু।

৩৬। চণ্ডীচরণ দে—শান্তিপুর, বীর আশানন্দ।

৩৭। জগদীশ্বর গুপ্ত—(মেহেরপুর) মির্জাপুর, লীলাস্তবক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৩৮। জগদানন্দ রায়—কৃষ্ণনগর, পোকামাকড়, বৈতালিক।

৩৯। জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—মাজদিয়া, চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতি।

৪০। জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়—রাণাঘাট, কবির গীত।

৪১। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—জন্ম, ১৭৭৫ খৃঃ ৭ই অক্টোবর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। ১৮৪৬ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল ৭০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে পরলোক গমন করেন। শিক্ষাগার, চণ্ডী, বাল্মীকি কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পারসিক অভিধান, বঙ্গাভিধান প্রভৃতি।

৪২। জলধর সেন—১৮৬০ খৃঃ ১৩ই মার্চ্চ নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্ম হয়। ১৯৩৯ খৃঃ ১৫ই মার্চ্চ ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা বড় কম নহে।

৪৩। জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মুড়াগাছা, অনাথা অভিশপ্ত।

৪৪। জয়গোপাল গোস্বামী—শান্তিপুর- সীতাহরণ, শৈবলিনী প্রভৃতি।

৪৫। জীবানন্দ মল্লিক—রাণাঘাট, অভিষেক, ডিটেক্‌টিভ গল্প।

৪৬। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—কৃষ্ণনগর, পতাকা, নবপ্রভার সম্পাদক।

৪৭। তারাশঙ্কর তর্করত্ন—জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে। মৃত্যু ১৮৫৮ সালে শেষার্দ্ধে। তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। বাবলি, কাদম্বরী, রাসেলাস প্রভৃতি গ্রন্থের নামই উল্লেখযোগ্য।

৪৮। তারাপদ রায়—কৃষ্ণনগর, ভদ্রার্জ্জুন নাটক।

৪৯। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর, দার্জ্জিলিং প্রবাসীপত্র।

৫০। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়—নবদ্বীপ, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৫১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—জন্ম, ১৮৪৩ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর নদীয়া জেলার বাবআঁচড়া গ্রামে। ১৮৯১ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। বক্সারের বিখ্যাত রামরেখা ঘাটে তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন হইয়াছিল। সাহিত্যিক ত' ছিলেনই, সর্ব্বোপরি ছিলেন রহস্যপটু। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন -স্বদেশ ও সমাজ হইতে উপকরণ লইয়া সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্বর্ণলতাই বাংলাদেশের সামাজিক উপন্যাস- এই একটিমাত্র উপন্যাসের দ্বারাই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

৫২। দীনবন্ধু মিত্র—জন্ম, ১২৩৮ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া রেল-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু ১৮৭৩ খৃঃ ১লা নভেম্বর। তাঁহার নিমচাঁদ, ঘটিরাম, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, লীলাবতী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনেও সজীব। তাঁহার সধবার একাদশী, জামাই-বারিক, বাংলাদেশের সে যুগকেও এযুগে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নীলদর্পণ আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

৫৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। ১৯১৩ খৃঃ ১৭ই মে অপরাহ্নে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার সংজ্ঞালোপ পায়। প্রধানতঃ তিনি নাট্যকার এবং হাসির গান ও স্বদেশী গানের রচয়িতা। সাহিত্যের অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শকের গৌরব দাবী করিতে পারেন। বহু পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। নাটকে তাহার নিজস্ব একটা ভঙ্গী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৫৪। দীনেন্দ্রকুমার রায় জন্ম মেহেরপুর। পল্লীচিত্র, বহু ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

৫৫। দীননাথ সান্যাল—১৮৫৪ খৃঃ কৃষ্ণনগরে জন্ম ও ১৯৩৩ খৃঃ মৃত্যু হয়। মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা, সীতা প্রভৃতি।

৫৬। দীনদয়াল প্রামাণিক—শান্তিপুর, গাথামালা।

৫৭। দামোদর মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর। মৃন্ময়ী, সোনার কমল, মা ও মেয়ে প্রভৃতি।

৫৮। দ্বারিকানাথ অধিকারী— গোস্বামী দুর্গাপুর, সুধীরঞ্জন।

৫৯। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(উলা) বীরনগর, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

৬০। নরোত্তমদাস ঠাকুর—নবদ্বীপ, বৈষ্ণব পদাবলী।

৬১। নলিনীমোহন সান্যাল—শান্তিপুর, জন্ম ৩রা কার্ত্তিক ১২৬৮ সন ইং ১৯।১০।১৮৬১, মৃত্যু ১৯শে আষাঢ় ১৩৪৮ সন ইং ৩।৭।১৯৪১ বহু পুস্তক রচয়িতা।

৬২। নিরুপমা দেবী—ভালিকা, দিদি, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি।

৬৩। প্রেমদাস বা পুরুষোত্তমদাস মিশ্র—ফুলিয়া নবদ্বীপ, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় অনুবাদক।

৬৪। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়—নারায়ণপুর, গ্রাক ও হিন্দু প্রভৃতি।

৬৫। প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—আনুলিয়া, নীলাম্বর, অশোক ইত্যাদি।

৬৬। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসান, ডিটেকটিভ উপন্যাস।

৬৭। বাসুদেব সার্ব্বভৌম—নবদ্বীপ, ন্যায়শাস্ত্র কুসুমাঞ্জলী।

৬৮। বৃন্দাবন দাস—নবদ্বীপ, নিত্যানন্দ বংশলীলা।

৬৯। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—দেবগ্রাম, কাদম্বিনী প্রভৃতি।

৭০। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—মাটিয়ারী, রামলীলামৃত গ্রন্থ।

৭১। বেচারাম লাহিড়ী—শান্তিপুর, সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ।

৭২। বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী—মায়াপুর, বঙ্গে সামাজিকতা।

৭৩। বেনোয়ারীলাল গোস্বামী—শান্তিপুর, খিচুড়ী পোলাও প্রভৃতি।

৭৪। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—শান্তিপুর, ধর্ম্মগ্রন্থ লেখক।

৭৫। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—১১১৯ সালে (১৬৩৪ শকে) জন্ম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনাই তাঁহার প্রথম রচনা। তারপর অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, তাঁকে অমরতা দান করে। ১১৬৭ সালে (১৬৮২) ৪৮ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

৭৬। ভূদেব শোভাকর—হরিপুর, সঙ্গীত রচয়িতা।

৭৭। মদনমোহন তর্কালঙ্কার—জন্ম ১৮১৭ সালে নদীয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিল্বগ্রামে। ১৮৫৮ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ কান্দিতে মৃত্যু হয়। শেষ জীবনে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও প্রথম জীবনের কীর্ত্তি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। শিশু শিক্ষায় তাঁহার দান অস্বীকৃত হইবে না। রাসবদত্তার কবিকে আমরা ভুলিতে পারি না। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন।

৭৮। মদনগোপাল গোস্বামী—শান্তিপুর, চৈতন্যচরিতামৃত।

৭৯। মীর মশরফ হোসেন—জন্ম ১৮৪৭ সালে ১৩ই নভেম্বর, নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে। ১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মৃত্যু হয়। এদেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য শিল্পী। তাঁহার বিষাদসিন্ধু যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৮০। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—নবদ্বীপ, পদার্থদর্শন, বহু স্কুলপাঠ্য।

৮১। মতিলাল রায়—নবদ্বীপ, রামবনবাস, রাবণবধ ইত্যাদি।

৮২। মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রাণাঘাট, প্রশান্ত, বেলা প্রভৃতি।

৮৩। মোজাম্মেল হক—শান্তিপুর। ফেরদৌসী চরিত, জাতীয় মঙ্গল প্রভৃতি।

৮৪। মেহেন্দ্রলাল রায়—কৃষ্ণনগর, গল্পলেখক।

৮৫। মহেন্দ্রনাথ রায়—কৃষ্ণনগর পদ্য লেখক।

৮৬। মধুসূদন তর্কপঞ্চানন—বহিরগাছি, বামনোপাখ্যান।

৮৭। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—১৮৪৫ সালে ২রা জুলাই রাণাঘাট সাবডিভিশনের অন্তর্গত শিমহাট গ্রামে মাতামহের আলয়ে জন্ম। ১২ই জুন ১৯০৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। রচনাবলীর মধ্যে প্রধানতঃ স্বদেশ-প্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৮৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—কুমারখালি, হিতকথা, প্রকৃতিশিক্ষা, (কবিরাজ) নীতিস্তবক ইত্যাদি—

৮৯। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মাটিয়ারী, রামায়ণ অনুবাদক

৯০। রঘুনাথ শিরোমণি—নবদ্বীপ নব্যন্যায় ইত্যাদি

৯১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য (স্মার্ত্ত)—নবদ্বীপ, শাস্ত্র প্রণেতা।

৯২। রামপ্রসাদ সেন (সাধক)—কৃষ্ণনগর মহারাজার সভাকবি।

৯৩। রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—গোস্বামীদুর্গাপুর, ভূবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

৯৪। রামনাথ তর্করত্ন—শান্তিপুর, বাসুদেববিজয় প্রভৃতি।

৯৫। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৪৫ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামীদুর্গাপুর গ্রামে। ১৮৮৬ সালে ১০ই অক্টোবর মৃত্যু হয়। তিনি বাংলা গদ্যে ও পদ্যে সব্যসাচী ছিলেন।

৯৬। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—বিল্বগ্রাম, রূপের মোহ।

৯৭। লালনসাহী ফকির—ভাঁড়ারাকুষ্টিয়া, সাধন সঙ্গীত।

৯৮। লোহারাম শিরোরত্ন—কৃষ্ণনগর মালতীমাধব, শিশুবোধ

৯৯। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কাঁচকুলি পাগলাঝোরা কাব্যসুধা প্রভৃতি।

১০০। ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর সুধাস্মৃতি, সুধাকণা প্রভৃতি।

১০১। লালমোহন বিদ্যানিধি—জন্ম ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। নদীয়ার বনগ্রাম সাবডিভিশান মহেশপুরে জন্ম। ১৩২৩ সালে ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪॥০ ঘটিকায় শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ইহধাম ত্যাগ করেন। কাব্য নির্ণয়, সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ।

১০২। সরোজিনী রায়—১২৯২ সালে ৪ঠা কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি ৯টার সময় বহরমপুরে জন্ম হয়। কিন্তু শেষ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করেন। ৬২ বৎসর বয়সে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় যান এবং তথায় ১৩৫৪ সালে ১২ই ফাল্গুন বুধবার বেলা ৭॥০ সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। বহু গান, কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জলি।

১০৩। শিবচন্দ্র মহারাজা—কৃষ্ণনগর, সাধন সঙ্গীত।

১০৪। শ্রীশচন্দ্র মহারাজা—কৃষ্ণনগর, সাধন সঙ্গীত।

১০৫। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—নবদ্বীপ, পদাঙ্কদূত।

১০৬। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী—নবদ্বীপ, শঙ্করাচার্য্য চরিত প্রভৃতি।

১০৭। শিবনারায়ণ শিরোমণি—নবদ্বীপ, সংস্কৃত কণিকা।

১০৮। শ্যামাধর রায়—কৃষ্ণনগর, কবি রসসাগরের জীবন চরিত।

১০৯। শিবনাথ শাস্ত্রী—নবদ্বীপ, মেজবৌ, নয়নতারা প্রভৃতি।

১১০। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—কুমারখালি, শৈবী গীতাঞ্জলী।

১১১। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—নবদ্বীপ, আত্মতত্ত্ব প্রকাশ

১১২। ষষ্টিধর দাস—নদীয়ার রাজাপুর গ্রামে জন্ম হয়। বহু সাধন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। হাতে লেখা নাকাশীপাড়া কাহিনী হইতে তাঁহার জন্মস্থান জানা যায়।

> "কায়স্থ কুলেতে জন্ম রাজপুরে বাস,
> রামনারায়ণ পুত্র জগন্নাথ দাস।
> বিজ্ঞ দুর্গাচরণ সদাত্মগুণধাম,
> তস্য পুত্র ষষ্টিধর দাসচন্দ্র নাম।"

১১৩। শ্যামাচরণ সরকার—মাসজোয়ানী গ্রাম, ব্যবস্থাসার সংগ্রহ

১১৪। শরৎশশী দেবী—কয়া (কুষ্টিয়া), কবিতা রচয়িত্রী

১১৫। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—অনন্তপুর (চুয়াডাঙ্গা মহকুমা), ভিখারিণী, হেমচন্দ্র, ছিন্নমস্তা, শিক্ষা ও সাধনা প্রভৃতি।

১১৬। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—আঁইসমালি গ্রাম, সাজি ছিন্নমস্তা প্রভৃতি।

১১৭। হরনাথ মিত্র—কৃষ্ণনগর, রহস্য সন্দর্ভ।

১১৮। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর, টডের রাজস্থান।

১১৯। হরিনাথ মজুমদার—জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে। ১৮৯৬ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়ায় ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তিনি আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের কাজে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিজয় বসন্ত, পদ্মপুণ্ডরিক, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ, কবীরের গীতাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছেঁপী

শ্রীমতী বীণা দে

এক

ঘাটের পথে একা চলেছি। খেয়ে উঠতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। দুপুরের সঙ্গী যে-ক'জন বৌ সকলেই চলে গেছে যে যার বাড়ীতে।

বাড়ীর পাশের পুকুরটি চৈতের আগেই শুকিয়ে উঠে—অন্তর্নিহিত বড় বড় পাথর ক'খানি চোখের সামনে জাগিয়ে দিয়ে সার্থক ক'রে তুলেছে তার 'পাথুরে' নামটি। একরত্তি জল চিক্‌চিক্ করছে তার বুকের মধ্যে, ঐ তপ্ত পাথরের নুড়ি ভরতি উঁচু পাড় ভেঙে আর নামতে ইচ্ছে হয় না।

উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এক-একবার তপ্ত-ঝলকে হাওয়া আস্‌ছে--সঙ্গে ব'য়ে আন্‌ছে তালগাছের খড়খড়ে শুকনো ঝাঁকড়া মাথা নাড়ার শব্দ, ঘুঘুর ডাক—আর গানের এক কলি—"আন্তে যামুনার জল সরে না ম-অ-অ-ন্"। 'আনতে যমুনার জল'—ঐ একটী লাইনই কেবল বারে-বারে ঘুরে-ঘুরে কানে আসছে। মন-এর উপর টানটা খুব জোর। গলাটি খুবই মোটা, তবুও বোঝা যায়— মেয়েরই গলা। সুরটা ভেসে আস্‌ছে 'নতুন পুকুর'-এর দিক থেকে।

চল্‌লুম 'নতুন-পুকুর'-এর দিকেই।—একটু হাঁটতে হবে, তা হোকগে, তবু তো বেশ জল পাব।--চারদিকে তালগাছ। বেশ ছায়া আছে।--মানুষও আছে।

গিয়ে দেখি, ডোমেদের মেয়ে 'ছেপী' গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে, মাছ না গুগ্‌লি কী তুল্‌ছে। পিছনে একটা হাঁড়ি ভাস্‌ছে, আর সে উচ্চৈস্বরে তার ভাঙা মোটাগলায় গান গাইছে—'আন্তে যমুনার জল সরেনা ম-অ-অ-ন্'। দ্বিতীয় প্রাণী কেউ কোথাও নেই···

"ও ছেঁপী কী করছিস ?"

"গুগ্‌গুলী তুল্‌ছি গো বোওমা, আপনি এত খরায় আইছ কেনে ?" জল থেকে গা তুলে ছেপী একমুখ হেসে সামনে দাঁড়ায়।

নিটোল স্বাস্থ্য। ভরাট যৌবন ছেঁপীর বেটে খাটো মোটা শরীরটায় যেন আর ধরছেনা। একখানা পাথরকে কুঁদে কেটে, পিটিয়ে ছোট করে কে যেন গড়েছে মেয়েটার এই দেহখানা। গোল চাকাপানা মুখে ছোট্ট একটু থ্যাবড়া নাক, ফুলো ফুলো গাল, পুরু পুরু ঠোঁট আর কুঁৎকুঁতে কালো চোখ দুটিতে খুসীর হাসি যেন উপ্‌চে উঠছে। পরনে একখানি ছেঁড়া গামছা, কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাঁড়ি, জল থেকে উঠে দাঁড়াতেই সে হাঁড়িটা তার পিছনে ঝুলতে লাগল।

তার প্রাচুর্য্য-ভরা দেহটার দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কী রে কত গুগ্‌লি পেলি? কী দিয়ে রাঁধবি ?"

"তা' বেশ পেয়াছি গো বোওমা।—পুঁস্ত দিঁয়ে রাঁধব। আমাদের ডু'মাহয়ের অনেক হবে। খালভরা পুঁস্ত গুগ্‌গুলী পেলো যা' ভাত খার গো বোওমা? একটা হোঁড়োলা ঠাসা ভাত খাবেক আজ।"

ছেপীর পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরা মুখে তার সোহাগের খালভরা অর্থাৎ স্বামী হরিপদা মীরধার অসামান্য পোস্ত-গুগ্‌লি প্রীতির গল্প শুনতে শুনতে ভাতখেগো কাপড় কেচে গা ধুয়ে ভরাকলসী কোমরে তুলে যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম, ছেঁপীর ভাষায় তখন—ঢুকুরে-খরা মরো পালুছে—

দুই

দিন দশেক পরের কথা। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বার দুয়োরে ছড়া দিয়ে—উঠোনে মাড়ুলি দিচ্ছি---হৈ হৈ করে সারা ডোমপাড়া একেবারে উঠোনে হাজির—

"টাঠিব্যামশাই, টাঠিব্যামশাই গো—আমরা আস্‌ছি—

বিচার করে গ্যান- বিচার করেন—ন্যায় বিচার"—বলতে বলতেই নিজেদের দুই দলের মধ্যে গালিগালাজ চেঁচামেচি সুরু করে দিল।

চাটুজ্যেমশাই—আমার শ্বশুর—গাঁয়ের মধ্যে মুরুব্বি মানুষ, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, এক কথায় গাঁয়ের মাথা। এ গাঁয়ের লোক কথায় কথায় কেউ ডুমকা দৌড়য়না। গাঁয়ের ঝগড়া গাঁয়েই মিটিয়ে নেয়। গ্রাম থেকে ডুমকার পথ দূর ও দুর্গম, দুই-ই বটে। সে সময়ের কথা বলছি, তখন বাস চলাচল সুরু হয়নি। নেহাৎ ভদ্রলোকের বাড়ী হলে বা খুব বড় কিছু ব্যাপার ঘটলে তবেই লোক থানা-আদালত করতে ডুমকা ছোটে।

চাটুযোমশায় এসে দাঁড়াতেই, আবার একবার দুইদলে হৈ-হৈ চেঁচামেচি করে উঠল। একদলে, চার পাঁচজন লোক হরিপদাকে চেপে ধরে আছে। সর্ব্বাঙ্গে ধূলোমাখা, ছেঁড়া-কাপড়পরা, আলুথালু ঝাঁকড়াচুল, রক্তচক্ষু নিয়ে হরিপদ ফোঁসাচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ছেপীর দিকে তেড়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে···

অন্যদলে চার পাঁচজন স্ত্রীপুরুষে ছেপীকে ধরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ছেপী তার ভাঙা মোটাগলায় একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে—"নামুনি নামক খালভরা —আমাকে বলে কিনা শালুকেমুখী? একদিন এক দশান ত্যাল দিতে পারলেকনি মাথায়, আজ আলছে মাথায় লাদনা ভাঙতে? ভাত দেবার ভা—লন্ কীল মারবার গোসাই" ইত্যাদি।

তার কপালে শুকনো রক্তের দাগ, মাথায় ছেঁড়া ময়লা পটি বাঁধা। কাদামাখা খোলাচুল, ফোলা চোখে জলের চেয়ে ক্রোধেরই প্রকাশ বেশী। ছেপী রাগে মাটীতে পা ঠুকছে—দাঁতে দাঁত ঘসছে আর চেঁচাচ্ছে—

গাঁয়ের আরো পাঁচজন মুরুব্বিলোক জড়ো হয়ে বসার পর, দুইদলের বাদবিতণ্ডা ও নালিশের মধ্যে থেকে যা উদ্ধার হল, তার সারমর্ম্ম ;—হরিপদার কথা হচ্ছে, ছেপী তার বিয়েলো বৌ বটে, কিন্তু এদানিকে তার ব্যাভার বড়ই খারাপ। সে ঝুমুরিদের মত ভোম্‌রাপেড়ে কাপড় চায়, কপিপাতা মাকুড়ি চায়। চুলে তার নিত্যিদিন ত্যাল চাই। সবচেয়ে রাগের কথা—আলকাটার কাপ এর সেই বদ ছোঁড়া তামু হাজরার মুখের দিকে ছেপী হাঁ করে তাকায়। এমন কি দু' একদিন তার সঙ্গে মস্করা করতেও যেন দেখেছে। আজ দু'দিন থেকে আবার ভাতও রাঁধছে না, সাঁঝ লাগ্‌লেই ঘুম···

আর ছেপীর কথা হচ্ছে—আগে যখন খালভরা চরণ-বাবুদের বাড়ী মাহিন্দারি করত—তখন বাবুদের দেওয়া ধানে তাদের ছ'মাসের খাবার বেশ পুরোপেট চলত—হরিপদা বাবুদের বাড়ী দিনে ভাতমুড়ী খেত—রেত্যে একবেলা ঘরে খেত। ছেপী ধানভেনে ঘোসি বেচে শাক-গুগ্‌লি তুলে নিজেরটা শেশ করে নিত।—মাঝে মধ্যে পালপার্বণে মনিব-বাড়ী যেত—ভালমন্দ খেতে পেত দু' একখানা পুরনো শাড়ীও দিত বৌঠাকুরুণরা। সাঁঝ লাগলেই হরিপদা মাথায় ত্যাল ঘসতে ঘসতে ঘরে ফিরত। যা রাঁধত ছেপী, তাই সোনাহেন মুখ করে খেত। আর, আজকাল—বাবুদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরী করতে লেগেছে। ভিনগাঁয়ে 'দলান' এর কাজে সারাদিন খেটে যাই পয়সা পায়, সন্‌জে হলেই গিয়ে পচুইএর দোকানে বসে। পয়সা পত্তর কোথায় যেছে ঠিক নেই—বাড়ী এসে বলে—ভাত দে। ভাত কোতি পাব? পয়সা চাইলেই রাগ মার্। সাতজন্মে মাথায় একদশান ত্যাল দিলেক্‌নি, পরনে একখান কাপড় দিলেক্‌নি—উ-মরদের ঘর কে করবেক? যে খাবেক যাক্—ছেপী লয়।

অনেকক্ষণ বকাবকি চেঁচামেচির পর, শেষে ঠিক হ'ল হরিপদার দাঁড়ম্ অর্থাৎ দণ্ড দিতে হবে, পাঁচটাকা। তিন টাকায় ছেপীকে একখানা কাসিপাড় শাড়ী কিনে দেওয়া হবে, দু'টাকা খরচ করে ছেপীর বাপ মা আত্মীয়স্বজনদের জল খাওয়াতে হবে। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হরিপদাকে বলতে হবে যে ছেপীকে আর মারধোর করবেনা। আর ছেপী হরিপদার ঘর করবে!

বেশ তাতেই রাজী। কিন্তু টাকা এখনি চাই, নইলে ছেপীর দল রাজী হয় না। হরিপদা মুখ গুঁজে বসে পড়ে। বলে টাকা কোথায় পাই? শুধু হাতে তো কেউ হাওলাত দেবে না?

আমি শ্বশুরমশায়ের কথামত পাঁচটি টাকা বার করে দি। হরিপদার হাতে দিয়ে তিনি বলেন—"এইনে ছেঁপীর হাতে দে।—আর মনে রাখিস, দুমাসের মধ্যে আমার টাকা ফেরৎ চাই, তা নয়তো কুড়ি দিন ব্যাগার দিতে হবে।"

হরিপদ এসে তাঁর পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বলে—'আজ্ঞে মশায় আমি তো আপনারই, আপনার হুকুম আমি মাথা পেত্যে লিব'।

ছেপীর হাতে টাকা দিতেই ছেপীদের দল থেকে একজন বলে উঠল—কুকুর করে ভেক্। অপর সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—যার মেয়্যা সে লেক্। হরিপদ গিয়ে ছেপীর হাত ধরে নিজের দলের দিকে নিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে হৈ হৈ করতে-করতে বেরিয়ে গেল।

প্রায় মাস পাঁচ ছয় পরের কথা। হরিপদ আমাদের বাড়ী মনিষ খাটে, জমীতে কাজ করে। কারণ, সেই পাঁচ টাকা আর শোধ করতে পারেনি। হঠাৎ একদিন শুনলুম, ছেপী পালিয়ে গেছে কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ বলে, ঝুমরির দলে গেছে—কেউ বলে, আলকাটার বাগদির ছোড়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে; কেউ বলে, মল্লারপুরের ইষ্টেশনে দেখে এসেছে প্যাজ ফলুরি ভাজছে, ইত্যাদি আরো কত কী।

তিন

বছর তিনেক পর—পিত্রালয়ে চলেছি। ন'মাইল বাস। সেখানে এসে, রামপুরহাট ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরী।

হঠাৎ পিছন থেকে—'পেন্নাম হই, কেমন আছেন গো বোওমা'—বলে, কে যেন পরিচিত সুরে ডাক দিল।

ছেপীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ এই অভিনব বেশে তাকে দেখে অবাক। তার পরণে ঘন নীলরঙের শাড়ি, সামনে কুঁচি আর ঘুরিয়ে আঁচল দিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতন করে পরা। গায়ে পুরোহাতা গোলাপী রঙের জামা। দু'হাতে একগোছা করে কাঁচের রেশমি চুড়ি। মাথার চুলটি বাঁকা সিঁথি কেটে পরিপাটী করে আঁচড়ানো। আরো যেন মোটা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে। গায়ে বিড়ির গন্ধ।

বললুম, কী রে ছেপী কেমন আছিস? কোথায় আছিস? গাঁয়ের কথা মনে হয় না?

সত্যি কথা বুলতে কি বোওমা, গাঁয়ের লেগে আমার খুব মন ঘোরে। আবার গাঁয়ের নোক দেখ্‌লেই সানকাড়ি মুখ লুকোই, পাছে চিন্যে ফেলে। পালিয়েঁ্যা আলছি তো?' বোলে একটু কুণ্ঠার হাসি হাসে।

'তা' আমায় দেখে যে সানকেড়ে পালালিনি—আমি বুঝি গাঁয়ের লোক নই?'

'ওমা তা কেনে—আপুনি আমাদের গাঁয়ের নোক লও তো কী? গাঁয়ের মরুব্বিবরের বৌ বট তুমি। তা লয়, তোমাকে দেখেই আলাম যে, দুটো কথা বুলে গাঁয়ের খপর শুধোই গা। তুমি তো মা ভাবতাহেন নোক। শরীলে কত দয়া। ছোটনোক আমাদেরকে ডেকে রা কাড়ো, ভালমন্দ শুধোও, আর কে তা করে বল? তোমার কথা বোওমা খুব মনে হয় আমার'। কথার শেষের দিকে তার গলাটা যেন কেঁপে যায়।

বলি, 'ভাল আছিস তো বেশ? কেমন লোক? কী করে? আদর যত্ন করে তো?'

বলে,—'হে তা ভালই আছি—যার সাথে আলছিলাম তার কাছে তো নাই।—সে ঠগ—তার ঘরে তিন বেট্টা বিটি, বিয়েলো বো, সে বো আবার পোতি বড়ি মা—ঘরে ভাতজল করার লোক নাইকো। ধান ভেনে পাত কুড়িয়েঁ্যা ভাতজল করো মরি। খাবার বেলায় ভাত নাইকো, মাথার বেলায় ত্যাল নাইকো—আর, দিনরাত কাজিয়া—'

একটু থেমে আবার বলে, 'এখন ভালই আছি, যার কাছে আছি, সে একটো বুদ্ধিমান লোক ভাল চাকুরে। সায়েব সুবোর সাথে কথা কয়—ভদ্দরলোকের মত সব্বদা গায়ে পিরান—'ইত্যাদি। তার ভাষায় সে তার বর্তমান পুরুষটির অনেক কিছু গুণ-গরিমার পরিচয় দিল।

মোদ্দাকথায় জানলাম যে, সে যার কাছে এখন আছে, সে ডাকবাংলোর চৌকীদার। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তাদের থাকবার ঘর, দুজন থাকে। লোকজন সায়েব সুবো এলে, চৌকীদারই মুর্গী কাটে, রাঁধে—বেশ ভাল রাঁধতে জানে। লোকজন এলে ছেপীও বেশ ভাল খুসবুইওলা মাংস, অর্থাৎ গরম মশলাযুক্ত মুর্গী খেতে পায়। নিজেরা মুর্গী পুষেছে, তার ডিম সায়েবদের কাছে বিক্রি করে। ছেপীরা দু'বেলা চা খায়—মাটীর ভাঁড়ে বা টিনের মগে নয়—কেঁচের বাটীতে অর্থাৎ পেয়ালা পিরিচে। ছেপীর ঘরে এলুমিনির বাসন আছে। রাতে ডিবি জালতে হয় না, ঘরে হাঁরিকল আছে। চৌকীদার তার কানে সোনার

বেলকুঁড়ি, নাকে চিঁড়িতন গড়িয়ে দিয়েছে। খাতির যত্নও করে। তবে—ছেঁপী সারাক্ষণ ঘরের কাজ নিয়ে ঘরের মধ্যে থাক্‌তে পারে না—ছেলেপিলেও হয়নি, মন ছট্‌ফট করে। আজ দু'মাস হ'ল ডিপ্‌টি সায়েবের বাড়ী কাজ নিয়েছে—ছেলের কাজ। তারা ওকে ডাকে আয়া বলে। জামা কাপড় তারাই দিয়েছে, চৌকীদারের এতে মত নেই তেমন। বলে, 'তোর অভাব কিসের? কাজ করবি কেনে? কিন্তু ছেঁপীর খুব ভাল লাগ্‌ছে কাজ করতে। সে তাদের সবঘরে ঢুক্‌তে পায়, তারা' ছেঁপীর ছোঁয়া ভাত জল সব খায়। রবিবারে সেজেগুজে গীর্জে যায়। ছেঁপীও ছেলের ঠেলাগাড়ি ঠেলে সঙ্গে যায়। ছেলেটাকে খুব ভালবাসে। সেখানে কাজ ক'রছে বলেই তো ইষ্টেশনে বেড়াতে আসতে পেল—তাতেই তো আমায় দেখতে পেল—ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করি, এ কাজ জোগাড় করলি কী করে?

বললে, সায়েববাড়ীর বাবুর্চি আস্‌ছিল মুর্গী কিন্‌তে। তা'পর সে রোজই খরারবেলা আসত, বসত, ডিম কিনত। সেই ঠিক করো দিল কাজটা। লোকটি বেশ ভাল। আমাকে চা খেত্যে দ্যায়, কাজ বুল্যে দ্যায়। সেই তো ছিম্‌ছাম্ থাক্‌তে শিখোলেক···

ছেঁপীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প শেষ হতে না হতেই ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

ট্রেনে ওঠবার সময় পর্য্যন্ত ছেঁপী প্রায় কাছে কাছেই রইল। আমি উঠে বসতে, সেও একবার কামরার মধ্যে ঢুকে আবার তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বললে, কখনও কলগাড়ীতে চাপি নাই, ভাগ্যি আজ আলছিলাম তাই আপনার সাথেও দেকা হ'ল—কলগাড়ীতেও চাপা হ'ল—

ট্রেন ছাড়ার পর যতক্ষণ দৃষ্টি যায়—দেখলাম ছেঁপী একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।···

আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল সেই চৈতের দুপুরে নতুন পুকুরে গুগ্‌লি-চয়ন-রতা ছেঁপী···

চার

প্রায় আঠারো বছর পরে আমরা ওঁর কর্ম্মস্থল থেকে দেশের বাড়ীতে ফিরেছি। এই আঠার বছরে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। দেশের পরিবর্ত্তন আরো ঢের বেশী। ময়ূরাক্ষীর পরিবর্ত্তনও বড় ছোটখাটো নয়। আমরা সদলবলে সিউড়ী এসেছি, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ দেখতে।

সারকিট হাউস-এর বারান্দায় বসে আছি। সাম্‌নে বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সিভিলসাপ্লাই অফিসারের স্ত্রী মিসেস বাগ্‌চী বসে গল্প করছেন।

তাঁরা সারকিট হাউস-এর একরকম স্থায়ী বাসিন্দা বললেই হয়। বীরভূমে প্রায় দশমাস বদলি হয়ে এসেছেন সিউড়ী সহরে, তবুও ভালবাড়ি খালি পাননি। কাজেই সারকিট হাউস-এর ঘরেই অস্থায়ী সংসার গুছিয়ে বসেছেন। আমরা তাঁদেরই নিমন্ত্রিত।···

চা ও মিসেস বাগচীর গল্প দুই-ই বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় তাঁর ছেলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—মা, মা, দেখ ফের্ সেই পাগলিটা এসেছে।

মিসেস বাগ্‌চীর কথায় জানা গেল—এই পাগলির দৌরাত্ম্যে তাঁরা নাকি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। পাগলির মজা হচ্ছে—সে নাকি হাটে বাজারে, সাধারণ লোকের বাড়ীতে, কোথাও যায় না—ডাকলেও যেতে চায় না। তার ঝোঁক খালি—সারকিটহাউস, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো, সিভিলসার্জন-এর বাংলো অর্থাৎ এককথায় সরকারী কোয়ার্টার্‌স-এর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো। বিশেষ করে' তার সারকিটহাউসটার উপরেই রোখটা যেন বেশী। এমন কি ফাঁক পেলে যখন তখন ডাইনিং হল, বাবুর্চিখানার মধ্যেও ঢুকে পড়ে। চীনেমাটির বাসন এর উপরে নাকি সাংঘাতিক রকমের লোভ। ভাঙা কাপ, ডিসের টুকরো পেলে তখনি কুড়িয়ে ঝুলিতে ভরে। চুরির অভ্যাসও আছে। অন্য কিছু নয় শুধু কাঁচের বাসন, চামচ আর খাবার জিনিষ। আর পাগলি বল্‌লেই, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে।···

কথা হতে-হতেই পাগলি এগিয়ে এল। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, চাকা-চাকা ঘা ও চুলকানিতে ভরা। পা ফুলো। বাঁ পাটাতে কী হয়েছে—লাঠি ধরে' খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাথা প্রায় ন্যাড়া—এখানে ওখানে শনের মত দু একগাছা চুল। কোটরগত চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পরনে শতছিন্ন কাপড়। গায়ে ততোধিক ছেঁড়া একটা জামা। জামার ডানহাতটা একেবারেই নেই।—

আস্‌তে আস্‌তে হেঁট হয়ে কী যেন একটা কুড়িয়ে

বাঁ-কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড পুঁটুলিটার মধ্যে ভর্‌ল। বিড়্‌ বিড়্‌ করে কী বলতে বলতে এসে বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপাস করে বসে, চায়ের টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—থ্যান থ্যান চা থ্যান তো খানিক।

মিসেস বাগচী আমায় ইঙ্গিতে বল্‌লেন—দেখুন মজা।

উঠে ঘর থেকে একটি খালি সিগারেটের টীন এনে তাতে চা দিতেই, পাগ্‌লি মাথা নেড়ে বলে' উঠ্‌ল, 'মগে লয়, মগে লয় কেঁচ্যের বাটিতে চা খাব।'

'দেব না বাটি, মগে খাবিতো খা। না-খাবি তো যা' —মিসেস বাগ্‌চী বলেন।

পাগ্‌লি মুখখিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'এঁহ্‌, না খাব্বি তো যা, অম্‌নি গেলোই হ'ল্যা? চা খাবনা? আমার কি বাটি নাইখো? ভাবচো কি আমার কিছুই নাই?—হেই ভ্যাখ্‌স্তে।'

বলে, ঝুলির ভিতর থেকে হাত্‌ড়ে একটি ডাঁটভাঙা কাপ বার করে চা ঢেলে নিল।

চাপরাসী এসে তাড়া দিল, এই পাগ্‌লী ফের এসেছিস? না উঠে যা।

রেগে লাঠি নিয়ে পাগ্‌লি তেড়ে যায়—খালভরা ফের পাগলী? কেনে আমার কি নাম নাই? আমি কেনে পাগলি হ'তে যাব? তোর মা-বুন পাগল হোক, তু পাগল হ আখামুখো।

আমার যেন কী রকম মনে হয়। ডেকে বলি বিস্কুট খাবি-চায়ের সঙ্গে?

পাগলি খুসীতে ভরে ওঠে—"হেঁ মা খাবো, আহা তুমার কথা কীবে মিষ্টি মা! কেউ একটা ভালকর্যে রা কাড়েনা গো বাছা। খালি বলে—পাগলী দূর দূর।"

বিস্কুট দিয়ে বলি—তোমার নাম কি? লোভী ছোট্ট-মেয়ের মত বিস্কুটে কামড় দিয়ে, দুলে দুলে নিজের নাকে হাত বুলিয়ে বলে—আমার নাম? ছোটতে আমার নাকটো খুব ছুটুই পারা ছিল তো, তাথেই মা বুলতো ছেঁপ্পী। সেই হতে সব্বাঁই বল্‌ত ছেঁপ্পী। গাঁয়ের মধ্যে এই ছেঁপ্পী বুল্‌লে সব্বাঁই চিন্‌ত আমাকে। আমায় জান্‌তো-না এমন লোক নাইখো। চৌকীদার আবার সগ কর্যে, বুল্‌ত ছেঁপু। কুন দিকে যে গেল? তাথেই খুঁজতে আমার এই—'

আমার সন্দেহ সত্য হল। এই সেই ছেঁপী! চোখের সামনে ভেসে উঠল,রামপুরহাট ষ্টেশনের সেই ছেঁপীর ছবি।···

চোখের দিকে চেয়ে বলি—'হ্যাঁরে ছেঁপী তোদের গাঁয়ের সেই চাটুয্যেদের বড়বৌকে তোর মনে পড়ে? সেই নতুন পুকুরের ঘাটে যাকে গান শোনাতিস? গাঁয়ের কথা মনে আছে তোর?'

পাগলী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কী যেন খোঁজে। তার দৃষ্টি যায় বদ্‌লে। হাউ হাউ করে কেঁদে পাগলি পায়ের কাছে এসে আছ্‌ড়ে পড়ে,—'মাগো তুমিই সেই—তুমি সেই বড়বৌওমা? মাগো তাই তোমার এমন মধুর রা। আমি সেই ছেঁপী গো মা—আরো জোরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে·····

কেঁদে-কেঁদে সে যা বল্লে, তাতে জানতে পারি—চৌকীদার-এর সুখের ঘরও বেশীদিন সে করতে পারেনি। ডেপুটীবাবুরা বদ্‌লি হবার সময়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। চৌকীদার তাকে অনেক করে বারণ করেছিল, কেঁদেছিল, কিরে দিয়েছিল—সে শোনেনি। বাবুর্চির বুদ্ধিতে পড়ে, আর কলগাড়ী চেপে নতুন সহর দেখার লোভে—সে সায়েবদের সঙ্গে শহরে অর্থাৎ বহরমপুরে যায়। সেইখানেই তার ভারি খারাপ ব্যামো হয়। বাবুর্চিটা ছিল যত নষ্টের মূল। সায়েব কিছু টাকা ধরে দিয়ে দুজনকেই চাক্‌রী থেকে বরখাস্ত করে। বাবুর্চি এখন তাকে জঙ্গীপুর হাঁস-পাতালে রেখে তার সর্ব্বস্ব চুরি করে, চৌকীদারের দেওয়া সেই বেলকুঁড়ি আর চুড়িতন পর্য্যন্ত চুরি করে কোথায় যে পালায় কেউ জানে না। যখন হাঁসপাতাল থেকে ওকে বার করে দিল—ভাল করে ও পথ চলতে পারে না। হাঁস-পাতালের এক মেমসাহেব দুটী টাকা দিয়েছিল। তাই নিয়ে টিকিট কেটে রামপুরহাটে আসে, চৌকীদার-এর খোঁজে। এসে দেখে, অন্যলোক সেখানে বাস করছে। সে নেই—কোথায় চলে গেছে—সেই থেকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে চৌকীদারকে···

ওর মনে হয়, এই সব সরকারী সায়েবদের বাড়ীর কাছেই সে কোথাও আছে। লোকের বাড়ী কাজ করতে গেলে কেউ কাজে লাগায়না। খারাপ রোগ দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়,অথচ খেতেও দেয় না! ছেঁপী কী করবে? চৌকীদারকেই খুঁজে বেড়ায়।—বলি—গাঁয়ে যাবি ছেঁপী?

খানিক গুম হয়ে থেকে, মাথানেড়ে বলে—না। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বড় কান্নাই কাঁদে, কে বলবে ছেঁপী পাগল!

সহজ মানুষের মতই বলে—না মা যাব না—গাঁয়ে আর এ মুখ দেখাব না। লোকেই বা আমায় গাঁয়ে ঢুকতে দেবে কেনে মা? আমি তো পতিত—বারুর্চি মোচনমান—

বলি—পাড়ায় ঢুকতে যাবার তোর দরকার কী? তুই আমাদের খামারে থাকবি, গোয়ালের পাশে চালা তুলে দেব। গোয়াল কাড়বি, খামার ঝাঁট দিবি, আওনা নিকোবি, খাবিদাবি থাকবি—ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যাবে—যাবি?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সে বলে—না—বলতে-বলতেই চোখের দৃষ্টি আবার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

ঘর থেকে একখানা সাড়ি বার করে এনে দি তার হাতে। বলি, পর ছেঁপী কাপড়খানা।

সাড়িখানা হাতে নিয়ে প্রথমটা খুব খুসী হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়ের বাহার দেখে, তারপরেই সেটাকে জড়ো করে ঝুলির ভিতর ভরে ফেলে বলে—থাক্ কাপড়খানা বোওমা, চৌকীদার এলে পরব। এখন পর্‌লে লোকে মেরো কেড়্যে লিবেক্। আগে খালভরাকে খুঁজ্যে বার করি—

বলতে বলতেই লাঠিটি তুলে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়ল—যাই খুঁজ্যে দেখি তাকে—

বাড়ী ফেরার পথে মোটরে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ময়ূরাক্ষীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও বিপুল সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে। আমিই শুধু নীরব। আমার সমস্ত মনটা নিয়ে জুড়ে থাকে ছেঁপী।

আফ্রিকার বিদ্যাসাগর 'কোয়েগীর আগ্রে'

শ্রীসুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় অগ্রগতির বাহক শিক্ষা, আর সকল দেশের পুনর্জাগরণের মুখেই দেখি এক-একজন জ্ঞানপাগল, সব বাধা তুচ্ছ ক'রে নিজেকে শিক্ষিত ক'রেছেন, সঙ্গে সমাজের সবার মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেবার জন্য জ্ঞানের প্রদীপ হাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

আফ্রিকায় এসে জানলাম জেমস্ কোয়েগীর আগ্রের কথা। জন্ম তার ১৮৭৫ সালে ইংরেজ উপনিবেশ গোল্ড-কোষ্টের আনামাবু গণ্ড গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন স্থানীয় প্রধান; গুঁড়ো সোনা যাচাই ক'রতেন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য, আর দোভাষীর কাজ ক'রতেন।

কোয়েগীর পিতার সপ্তদশ সন্তান, তাঁর মার চতুর্থ। মিশনারী স্কুলের সংস্পর্শে লেখাপড়ার অদম্য উৎসাহে, কোয়েগীর রান্না ক'রে, কাপড় কেচে নিজের খরচ চালিয়ে ১৬ বৎসর বয়সে মাষ্টারি সুরু করেন। তাঁর ভাই বোনেরা কেউই লেখাপড়ায় এগুতে পারেন নি—অলস, বহু বিবাহ-বদ্ধ, গীত ও পানাসক্ত জীবনেই তাঁরা থেকে যান। কোয়েগীর ২৩ বৎসর বয়সে আমেরিকায় যান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সুবক্তা, ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ হিসাবে কোয়েগীরের খ্যাতি ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় তিনি ডিগ্রীর পর ডিগ্রী, খ্যাতির পর খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে আফ্রিকার মুখোজ্জ্বল করেন। দুর্ভাগ্যবশত ৪৯ বৎসর বয়সে জন্মস্থান গোল্ড-কোষ্টের নূতন ধরণের বিখ্যাত কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ফিরে আসার পর মাত্র আড়াই বছর বেঁচেছিলেন। শেষ বয়সেও নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির জন্য গবেষণালব্ধ নিবন্ধ লিখতে ফিরে গিয়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে অকালে মারা যান ১৯২৭ সালে। "আচিমোতা" কলেজ আজ গোল্ড-কোষ্টের গর্ব। সেখানে আগ্রেকে দ্বিতীয় সহকারী অধ্যক্ষপদ দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু তিনিই ছিলেন তার প্রধান।

কোয়েগীর তাঁর দেশ বলতে গোটা আফ্রিকা মহাদেশকে বরণ করেছিলেন। আফ্রিকার স্থানীয় ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্পকলা নৃত্য-গীত তার শ্রদ্ধার বিষয় ছিল; অনুকরণে তার ঘৃণা ছিল, কিন্তু আফ্রিকার উন্নতির পথে যে সব বাধা তিনি দেখতেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তার দ্বিধা কখনো হয়নি। আধুনিক ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার বিস্তার তাঁর কাছে আফ্রিকার নবজীবন লাভের জন্য অত্যন্ত দরকারী মনে হ'য়েছিল; আর আফ্রিকান্ যে শিক্ষায় সবার সমান হ'তে পারে এরই প্রমাণ দেবার জন্য তিনি আমেরিকায় নিগ্রো কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিদ্যার চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকতেন।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের নানা অসুবিধা ছিল, আগ্রে হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও আচরণ "প্রতিবাদ করবার জন্য নয়—কালোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য"—এই ছিল তাঁর মনোবলের ভিত্তি। "নিগ্রোজাতীর কর্ম্মবীর" বুকার ওয়াশিংটন আমেরিকায় নিগ্রোর জন্য যা ক'রেছেন, আগ্রে আফ্রিকান্‌দের জন্য তাই ক'রতে চেয়েছিলেন। দুবার তিনি আফ্রিকাময় এক শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। সে সময় তাঁর বক্তৃতায় বহু আফ্রিকান সম্প্রদায়

আধুনিক শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার, প্রয়োজনীয়তা, বহু বিবাহের কুফল ও কায়িক শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়। আজকের আফ্রিকার জাগরণের মূলে আমেরিকায় ও ইয়োরোপে আফ্রিকান শিক্ষার্থীদের ভিড়ের কারণ—এই অক্লান্ত কর্ম্মী, নিরলস, নিরহঙ্কারী, সদাহাস্যময় ও রসিক পুরুষ। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী আমেরিকা থেকে আফ্রিকার কয়েক জায়গায় এসেছিলেন। আফ্রিকানরা আগ্রেকে কি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, তা দেখলাম শ্রীমতী আগ্রেকে সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ থেকে। আফ্রিকার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে জন্মে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির ও দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে থেকে এই শিক্ষাবিদ এক মহাদেশের শিক্ষা, সমাজ ও জীবন-দর্শনে বিপ্লবের সূচনা ক'রেছেন;—বিদ্যাসাগরের জীবনের কথা পদে পদে মনে করিয়ে দেয় বাঙালীকে।

আফ্রিকানরা গল্প উপকথা রসিকতার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ ক'রতে ভালবাসে। আগ্রেও আফ্রিকান্‌-সুলভ রসিকতার মধ্য দিয়ে বা গল্প ও উপকথায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। এজন্য দেশ-বিদেশে তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতার ভীড় হ'তো। দুটি গল্প আগ্রে প্রায়ই ব'লতেন। প্রথমটি "ঈগলের আকাশ বিচরণ" নিয়ে। একটা পাখী পোষবার শৌখিন লোক একজন, চোখে পড়লো এক ঈগল ছানা। তাকে এনে হাঁস-মুরগীর সঙ্গে রেখে একই খাবার দিয়ে বড় ক'রতে লাগলো—যদিও ঈগল হ'চ্ছে পাখীর রাজা।

পাঁচ বছর বাদে একদিন এক বিজ্ঞানবিদ্‌ এসে ব'ললেন, "ভাই, এ যে ঈগল, একে মুরগী বানাচ্ছ কেন? লোকটি বোঝালো ওর আর ওড়বার ইচ্ছে নেই। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ঈগলটিকে ধরে সাগ্রহে চিৎকার ক'রে ব'ললেন, "পক্ষীরাজ তুমি ঈগল, তোমার স্থান আকাশে, মাটিতে নয়, ডানা মেলে উড়ে যাও। ঈগলটা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে,—হঠাৎ দেখ্‌লো মাটিতে মুরগীরা খুদ-কুঁড়ো নিয়ে ব্যস্ত—সে দলে ভিড়ে গেল।

পরের দিন বিজ্ঞানী তাকে এক বাড়ীর ছাদে তুলে ওড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঈগলের দৃষ্টি আবার ঐ মাটিতে ছড়ানো খাবারের দিকেই গেল।

তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের আগে এসে, বিজ্ঞানী সহরের বাইরে এক পাহাড়ের নিচে ঈগলকে নিয়ে হাজির হ'লেন। সূর্য্য সোনালী-ছটা পাহাড়ের উপর সবে ছড়িয়েছেন, এমন সময় তিনি ঈগলকে আকাশে উড়ে যাবার আহ্বান শোনালেন। ঈগলের চোখে ও দেহে এক নূতন কাঁপন এলো, কিন্তু তবু সে নড়ে না। সূর্য্য দেখা দিলেন, ঈগলের দৃষ্টি আবার সূর্য্যের দিকে ফেরানো হ'লো—হঠাৎ দুই পাখা মেলে, আপন ধ্বনিতে ও পাখার ঝাপ্‌টানিতে স্থির পর্ব্বতকে মুখরিত ক'রে, উঁচুতে আরও উঁচুতে ঈগল উড়ে গেল। মোরগ ছানার মত পালিত হ'লেও সে যে জাত-ঈগল তা তার স্মরণে এসেছে।

এই আখ্যানের পর আগ্রে হয়তো ব'লে উঠতেন "আফ্রিকার লোক, ভুলো না ভগবানের ছায়ায় আমরা গড়া, মানুষ মোরগ ছানার মত রেখে দিলেও, যখনই বুঝবে তোমরা ঈগলের জাত তখনই তোমরা ডানা মেলে আকাশে উড়তে সুরু ক'রবে,—মোরগের খুদ-কুড়ো আর তোমাদের টেনে রাখতে পারবে না।" কার মন এরকম কথায় সাড়া না দেয়?

দ্বিতীয় উপাখ্যান নদ-নদী নিয়ে; নদীদের সম্মেলন হ'লো, সভা শেষে সভাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন 'তোমরা কে কোথায় যাচ্ছ, আর কি ক'রবে একে একে ব'লে যাও'। টেমস নদী জানালো সে লণ্ডন যাচ্ছে—সবাই তাকে জানবে একদিন নদ নদীর সেরা ব'লে। হাড্‌সন্ (যার উপর নিউইয়র্ক সহর) বললো "আমার দু'ধারে তলার পর তলা আকাশ-চুম্বী বাড়ী উঠবে, সব চেয়ে ধনী নদী হবো আমি।" গঙ্গার দাবী সব চেয়ে পুণ্যতোয়া নদী হবার। মিসিসিপি নদী বললো "কত জলপ্রবাহের যে আমি জনক হবো, তার হিসাব করা ভার—কিন্তু একটা নদী কিছু বলে না। সভাপতি বললেন "কে তুমি?" "আমি নীলনদী।" "তোমার লক্ষ্য ও বক্তব্য জানাও।" নীল ব'ললো "বহুকাল আগে পৃথিবীর ভাঙা গড়া যখন হ'চ্ছে—সাহারা ব'লে এক জঙ্গল হ'লো, যেখানে না মানুষ বাস ক'রতে পারে, না গাছপালা জন্মায়। আমি স্থির করলাম পাহাড় থেকে জল বয়ে মরুভূমিতে প্রাণ আনবার, আর ভূমধ্য সাগরে নিজেকে নিঃশেষ করবার।" সবাই হেসে উঠলো "আফ্রিকায়, আর জায়গা পেলে না?" নীল নদ ব'ললো 'হ্যাঁ, সেখানেই যাচ্ছি।"

ভগবান নীলের কাছে গেলেন, খুশী হ'য়ে ব'ললেন, "আমি নীলকে সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্র নদ ক'রবো, তাই তার তীরে মোজেস (Moses)-যীশুর অভিষেক ক'রলেন।

এর পরই আগ্রের আবেদন 'আফ্রিকাকে ছোট চোখে দেখো না ভাই। যীশুর কথা যদি স্মরণ করো, তবে দেখবে তাঁর বাণী আত্মত্যাগের। আফ্রিকার পাশে এসে দাঁড়াও। সাদা জাতিরা যদি তাদের গায়ের রঙ ও জাতের অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে যীশুর বাণী সার্থক ক'রতে ভাই এর মত আমাদের পাশে দাঁড়ান, তবে আফ্রিকায় ঈশ্বরের ইচ্ছা সফল হয়।"

আগ্রের জীবন ছিল এই সুরে বাঁধা। "পিয়ানোর কালো আর সাদা দুরকম "চাবি" এক সঙ্গে না বাজালে সুরের সঙ্গতি হয় না, কালো আর সাদার সহযোগেই আফ্রিকার তথা কি পৃথিবীর উন্নতি সম্ভব,"—কত ভাবে এই কথা তিনি জানাতেন। আচিমোতা কলেজে এই সুর-সঙ্গতির বাণী স্মরণে রাখবার জন্য পিয়ানোর কালো সাদা চাবির এক প্রতীক স্থাপিত হ'য়েছে, আগ্রের মৃত্যুর পর। কিন্তু আফ্রিকায় কালো সাদায় মিলনের সুরের উল্টোটাই যেন বেসুরো বাজছে—পীড়াদায়ক ভাবে। আগ্রের স্বপ্ন কবে সার্থক হবে?

সোভিয়েট দেশে
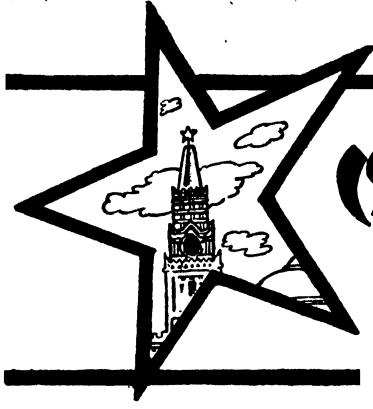
শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে আলেক্সিসের মৃত্যুর পর মস্কোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ফিদোর। নবীন সম্রাট ফিদোরের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না মোটে···মাত্র ছ' বছর দুর্ব্বল রাজ্য-শাসনের পর তিনি অকালে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তাঁর রাজ্য-কালে দেশে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়··· রাজার অক্ষমতার দরুণ স্বার্থান্বেষী অমাত্য-অভিজাতবৃন্দের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়—দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার সকল দিকে !

ফিদোরের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে মস্কো-রাজ-দরবারের প্রতাপশালী অমাত্যবৃন্দ এবং ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত-

সম্রাট পিটারের প্রতিষ্ঠিত রুশ রাজ্যের সেন্ট পিটার্সবুর্গ রাজধানীর দৃশ্য—প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ মতানৈক্য দেখা দেয়। রাজ-অমাত্যের দল ফিদোরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ব্বল-প্রকৃতি আইভানকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন—বিত্তশালী জমীদার এবং ধর্ম্মযাজকদের দল চাইলেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটারকে সিংহাসনে বসাতে। এই নিয়ে দু'দলে যখন বেশ রেশারেশি চলেছে, তখন দীর্ঘ-অনাদায়ী-বেতনের দাবী জানিয়ে ক্রেমলিন্ দুর্গ-প্রাসাদের রক্ষী-প্রহরী 'স্ত্রেলেৎস্কী' শাস্ত্রীরা বিদ্রোহ-ঘোষণা করে বসলো শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ! প্রাসাদ-প্রহরী স্ত্রেলেৎস্কীদের সঙ্গে অভিজাত-অমাত্যদের এই গোলযোগের সুযোগে 'জার্' আলেক্সিসের সুচতুর কন্যা রাজকুমারী সোফিয়া তাঁর দুই নাবালক-ভ্রাতা আইভান্ আর পিটারকে রাজ্যের 'যুগ্ম-অধিপতি' হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে, তাদের প্রতিভূ হয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। এ-কাজে সোফিয়াকে সহায়তা করতেন প্রিন্স বেসিল গোলিৎসিন্ নামে তাঁর এক অনুরাগী প্রেমিক···সুদক্ষ-শিক্ষিত অভিজাত-বংশীয় রাজ-মন্ত্রী ! আইভান্ ছিলেন সোফিয়ার সহোদর আর পিটার বৈমাত্রেয় ভাই। কাজেই সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী পিটারের উপর সোফিয়ার আক্রোশ ছিল। রাজা হবার কিছু পরেই আইভানের মৃত্যু হয়। তাছাড়া নিষ্কণ্টক রাজ্য-ভোগের অভিপ্রায়ে, রাজকার্য্য-ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়া, ক্রেমলিন-প্রাসাদের রাজনৈতিক আওতার বাইরে···মস্কো সহরের উপকণ্ঠে এক নিরালা পল্লী-ভবন, বিমাতা নাতালিয়া এবং তাঁর কিশোর-পুত্র পিটারকে স্থানান্তরিত করেন। পিটারের বয়স তখন দশ বছর।

এই নির্জ্জন পল্লী অঞ্চলেই পিটারের কিশোর-জীবন অতিবাহিত হয়। পিটারের বাসস্থানের কাছেই সে-আমলে ছিল বিদেশীদের এক বিরাট উপনিবেশ। খেলার সঙ্গী হিসাবে. এই বিদেশী ছেলেপুলেদের সঙ্গে পিটারের হলো ঘনিষ্ঠ সংযোগ ! ছোটবেলা থেকে বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে, নিজের দেশ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং সে সব দেশের বাসিন্দাদের রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পিটারের মোটামুটি বেশ একটা ধারণা এবং জ্ঞান জন্মেছিল। তাছাড়া দরবারের আড়ষ্টকৃত্রিম আবহাওয়ার বাইরে উন্মুক্ত পল্লীর মাঠে-ঘাটে অবাধ-স্বাধীনভাবে অষ্টপ্রহর দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা-বাওয়া, দৌরাত্ম্য ডানপিটেমী করে বেড়ানোর দরুণ পিটার যেমন নির্ভীক সাহসী বলীয়ান্, তেমনি চালাক-চতুর-চটপটে হয়ে উঠেছিলেন। উপরন্তু দেশ-বিদেশের সরল-উদার সাধারণ-মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে কৈশোরে পিটার যে

বিচিত্র অভিজ্ঞতা-লাভ করেছিলেন, পরবর্ত্তী-কালে রাজকার্য্য-পরিচালনায় সে-সব তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

অবশেষে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দী-শত্রু হিসাবে পিটারকে চির তরে অপসৃত করার উদ্দেশ্যে সোফিয়া গোপনে এক চক্রান্ত করে। ভাগ্য-ক্রমে সে খবর আগেই জানতে পেরে পিটার সে যাত্রা পল্লী-ভবন ছেড়ে দূরান্তরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। তারপর তাঁর বিশ্বাসী-অনুচর সৈন্যদলের সহায়তায় সোফিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে, নিভৃত এক ধর্ম্মাশ্রমে বন্দী করে রেখে, মস্কোর রাজ-সিংহাসন অধিকারান্তে রুশ-রাজ্যের একচ্ছত্র-রাজা হয়ে বসেন। পিটারের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর!

সিংহাসন অধিকার করার পর রাজমাতা নাতালিয়ার হাতে শাসনের ভার দিয়ে বৈদেশিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ার্থে সুদীর্ঘ কয়েক বছর পিটার উত্তর পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেন। এই বিদেশ-পর্য্যটনকালে তরুণ-সম্রাট পিটার বিশিষ্ট গুণী বিদেশী-পণ্ডিতদের শিক্ষাধীনে থেকে পরম-আগ্রহে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যামিতি, নৌ-বিদ্যা, যুদ্ধ-রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

১৬৯৬ সালে পিটার আজভ-সাগরের উপকূলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে বেরুলেন। সে-যুদ্ধে গোড়ার দিকে উপযুক্ত রণতরী এবং নৌ-সেনার অভাবে প্রবল-প্রতাপান্বিত তুর্কী ফৌজের বিরুদ্ধে পিটার জয়লাভ করতে পারেন নি! কিন্তু পিটারের একনিষ্ঠ আগ্রহে এবং প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে সে অভাব অচিরে পূর্ণ হয় এবং তুর্কীদের হারিয়ে বিজয় গৌরবে তরুণ 'জার' সর্ব্বপ্রথম রুশ রণ-তরী-বাহিনী ও স্বদেশী নৌ সেনাদলের সৃষ্টি করেন।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পিটার জ্ঞানাহরণের জন্য আবার বেরুলেন বিদেশ-পর্য্যটনে—পশ্চিম-ইউরোপে। বার্লিন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ঘুরে তিনি অবশেষে গেলেন ইংলণ্ডে। ছোট বেলা থেকেই সামুদ্রিক ও নৌ বিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর দারুণ ঝোঁক। তাই বড় হয়ে তিনি মেটালেন দুস্তর সাগর পার হয়ে বিদেশের বন্দরে-বন্দরে ঘুরে সে সাধ বিচিত্র-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পিটারের বিদেশ-সফরকালে মস্কোতে স্ত্রেলেৎসী-রক্ষীদল হঠাৎ আবার বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে...'জার' পিটারকে সরিয়ে নিভৃত ধর্ম্মাশ্রমে বন্দিনী সোফিয়াকে এনে রুশ রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করবে—এই তাদের অভিলাষ। খবর পেয়ে পিটার অবিলম্বে দেশে ফিরে এলেন এবং অতর্কিত আক্রমণে দুর্দ্ধর্ষ স্ত্রেলেৎসী-বিদ্রোহীদের দমন করে ক্রেমলিন-প্রাসাদের সামনে সুপ্রসিদ্ধ 'লাল চত্বর' বা Red square এর মুক্ত প্রাঙ্গণে বিরুদ্ধাচারী প্রাসাদ-রক্ষীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে তাদের হত্যা সাধন করলেন। এমন কি বিপ্লবীদের যথোচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, মস্কোর 'লাল চত্বরে' সমবেত বিপুল জনতার সমক্ষে, নিজের হাতে তলোয়ার ধরে 'জার' পিটার স্বয়ং অপরাধী স্ত্রেলেৎসী নেতৃবৃন্দের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন—নিতান্ত নৃশংসভাবে। স্ত্রেলেৎসী-রক্ষীদের নিশ্চিহ্ন করার পর পিটার তাঁর পরম-শত্রু সোফিয়াকে চির-নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে মস্কোর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে তোলেন।

অতঃপর নিজের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করে প্রবল প্রতাপশালী পিটার দেশোন্নতি এবং সমাজ-সংস্কারের কাজে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশ পর্য্যটন এবং বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে বিচক্ষণ দূরদর্শী সম্রাট পিটার যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন, তারই প্রত্যক্ষ-প্রয়োগ সুরু করলেন তিনি প্রাচীন-পন্থী রুশ-দেশ তার দেশের অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্ম্মান্ধ, পশ্চাৎপদ জনগণের আমূল-সংস্কার এবং উন্নতিবিধানকল্পে। দেশের সনাতনী প্রথা আর

রুশ-রাজ্যের মহিমান্বিত সম্রাট 'জার' পিটার

রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছিল—প্রগতি-বাদী 'জার'-পিটারের সুদীর্ঘ এবং সুযোগ্য শাসনকালে। তাঁর আমলে রুশ-রাজ্যে এত অজস্র রাজনৈতিক, সামাজিক এবং লৌকিক সংস্কার সাধিত হয়েছিল যে অল্প দু'চার কথায় তার ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব।

পিটারের প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত...এমন সদা-ব্যস্ত কর্ম্মময় জীবনও বড় একটা চোখে পড়ে না জগতের ইতিহাসে কোথাও। মনে-

প্রাণে পিটার ছিলেন নূতনের উপাসক···প্রগতি পূজারী! তাঁর ধারণা ছিল যা-কিছু সনাতন, পুরোনো, গৎ-ধরা—সে-সব হলো অকেজো···বাজে···কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হয় তার আমূল পরিবর্ত্তন, নয় রীতিমত সংস্কার-সাধন প্রয়োজন! না হলে গতি হয় রুদ্ধ···অপমৃত্যু ঘটে জীবন-ধারার,···সভ্যতা, সংস্কৃতি সব কিছু লোপ পায়! তাই, বিলাস-আরামে বৃথা কালক্ষয় না করে দেশের ও দশের হিতার্থে আজীবন আপ্রাণ-চেষ্টায় তাঁর বিভিন্ন-বিচিত্র সংস্কার-স্বপ্নগুলিকে তিনি প্রাণে-রসে-বর্ণে মূর্ত্ত-শাশ্বত করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

'জার' পিটারের ভগিনী রাজকুমারী সোফিয়া

'জার' পিটারের ছিল বহুমুখী প্রতিভা! তাঁর আমলে রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য সুবিশাল রুশ-রাজ্যকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। আগেকার কালে দেশের বিশিষ্ট প্রবল-প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত অভিজাত-রাজ-অমাত্যবর্গের নির্দ্দেশ ও পরামর্শানুযায়ী জারেরা রাজ্য-বিধান করতেন! রাজ-পরামর্শদাতা এই সব সম্ভ্রান্ত অভিজাত-অমাত্যেরা ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের সামনে, মস্কো-রাজধানীর সুপ্রসিদ্ধ 'লাল-চত্বরের' (Red Square) উপর অবস্থিত যে বিরাট-বিশাল মন্ত্রণা-গৃহে সভায় বসে রাজ্য-বিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত করতেন, সেটির নাম—'The State Duma' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় অভিজাত-পরিষদ'। একমাত্র অভিজাত-বংশীয় অমাত্যবৃন্দ ছাড়া দেশের সাধারণ-প্রজাদের কারো এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হবার অধিকার ছিল না! দেশের জনগণকে দূরে ঠেলে, রাজা এবং রাজ্যের শাসন-নিয়ন্ত্রণের আসল-যন্ত্রটিকে করায়ত্ত করে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কুচক্রী-রাজানুচররা এমনি অন্যায় পক্ষপাত-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন সেকালে। বিচক্ষণ দূরদর্শী 'জার' পিটারের রাজ্যকালে কিন্তু প্রাচীন-আমলের এই অন্যায় ব্যবস্থার আমূল রদ-বদল ঘটে। রাজ-কার্য্যে স্বার্থান্ধ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে, প্রগতিবাদী-সম্রাট পিটার রাষ্ট্রীয় পরিষদ 'ডুমার' সম্ভ্রান্ত-সভ্যদের হাত থেকে রাজ্যের শাসন বিধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, দেশের প্রবীণ-বিচক্ষণ সুদক্ষ সেরা রাজকর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচিত করে, রাষ্ট্রীয় গণপরিষদকে সম্পূর্ণ নূতন-ছাঁদে গড়ে তুললেন। সে-পরিষদের নাম হলো—'Senate' বা 'প্রাজ্ঞ সভা'। নব-প্রতিষ্ঠিত এই 'সেনেট-সভার' অভিজ্ঞ পারদর্শী রাজপুরুষ সভ্যবৃন্দের সুচিন্তিত-মতামত এবং সুমন্ত্রণানুসারে সম্রাট পিটার সুদীর্ঘকাল ধরে পরম-সুশৃঙ্খলভাবে দেশ শাসন করে গেছেন।

পিটারের সুশাসন-ব্যবস্থায় রুশ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি এবং শ্রী-বৃদ্ধি ঘটেছিল সর্বদিক দিয়ে। দেশের অশিক্ষিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জন-গণকে শিক্ষা-দীক্ষায় সুসভ্য-মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পিটারের অক্লান্ত-প্রচেষ্টায়, ছোট বড় অনেক বিদ্যালয় শিক্ষা কেন্দ্রাদি স্থাপিত হয়েছিল। দেশের পশ্চাৎপদ-প্রজাদের উন্নত করে তুলতে পিটার ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ 'Academy of Sciences' বা 'বিজ্ঞান সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ফলে রাজ্যে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে তখন থেকে। এছাড়া পিটারের উৎসাহে রুশ-দেশে মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বই-পত্রাদি ছাপার সুব্যবস্থা হয় এবং লোক শিক্ষার প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেকালে। উপরন্তু, দেশের সুযোগ্য ছাত্রদের পিটার ইউরোপের বিভিন্ন সভ্য-বৈদেশিক-রাষ্ট্রে পাঠিয়ে ছিলেন—নানা বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লাভ করে এসে স্বদেশের সংস্কার-সাধন করবেন বলে।

পশ্চিম-ইউরোপের প্রগতিশীল বৈদেশিক-রাষ্ট্রের উন্নত-ভাবধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত পিটারের এই স্বদেশ সংস্কার পরিকল্পনা কিন্তু রুশ-রাজ্যের সনাতন-পন্থীদের কাছে নিতান্ত বেয়াড়া ঠেকেছিল···সুযোগ পেলেই তাঁরা যখন-তখন বিরুদ্ধাচরণ করতেন···তীব্র-প্রতিবাদ জানাতেন—সম্রাটের বিবিধ বিজাতীয় কার্য্যকলাপের জন্য।

পিটার কিন্তু এ-সবে কান দিতেন না মোটে। তিনি তাঁর বিচিত্র সংস্কার-উন্নতির কাজ নিয়েই মেতে থাকেন সারাক্ষণ। তবে দেশের কোথাও কোনো রকম বিপ্লব বা রাজদ্রোহিতার আভাস পেলে তিনি অবিলম্বে নির্ম্মম-নৃশংসভাবে তার চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি করেন।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের ধর্ম্মান্ধ সনাতন-পন্থী ধর্ম্মযাজকদের প্ররোচনা-চক্রান্তে পিটারের নির্বোধ-পুত্র তরুণ-যুবরাজ আলেক্সিস একদা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করে। প্রবল-আক্রোশে সে-বিদ্রোহ-দমনের পর, 'জার্' পিটার তাঁর অবাধ্য-পুত্রকে বন্দী-শিবিরেই হত্যার আদেশ দেন। অন্য বিদ্রোহীদের তিনি সুদূর সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে চির-নির্বাসিত করেন।

ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবেও পিটারের কীর্ত্তি রুশ ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। যুগ-যুগ ধরে জার আর অভিজাত জমীদার-দের শোষণ, জুলুম আর একান্ত অবহেলার ফলে, দারুণ অশিক্ষা, কুসংস্কার আর দারিদ্র্য দুরবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সারা রুশ দেশ। উপরন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরিক-বিশৃঙ্খলার সুযোগে ধর্ম্মযাজকদের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবার দরুণ ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে ভরে উঠেছিল রুশবাসীদের মন···সামাজিক রীতি-নীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহারের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও এত রকমের বেয়াড়া সব সংস্কার আর ছুঁৎ মেনে চলতেন সে আমলের লোক-জন, যা বলে শেষ করা যায় না! রুশ-রাজ্যের সনাতন সামাজিক বিধানে দেশের ধর্ম্মযাজকদের আসন ছিল রাজার উর্দ্ধে সেজন্য রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে তাঁরা রীতি-মত প্রভুত্ব ফলিয়ে বেড়াতেন। পিটারের আমলে এ রীতির পরিবর্ত্তন ঘটে···ধর্ম্মযাজক সম্প্র-দায়ের প্রতাপপ্রতিপত্তিও হ্রাস পায়। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে দেশের ধর্ম্মযাজকবৃন্দকে দাবিয়ে 'জার্' পিটার স্বয়ং রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ধর্ম্ম নায়ক হয়ে বসেন।

ধর্ম্ম সংস্কার ছাড়াও পিটারের রাজত্বকালে রুশবাসীদের সামাজিক আচার ব্যবহার আর সাজ সজ্জা, আদব কায়দারও বিশেষ সংস্কার-সাধন হয়েছিল। দেশ জোড়া অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের দরুণ সে-যুগের লোক-জন সবাই যেমন অসভ্য বর্ব্বর, তেমনি অপরিচ্ছন্ন আর রুচিহীন হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে রুশ দেশের ধনী-দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো সব পুরুষের জংলী-বুনোদের মত মুখে একরাশ ঘন-গোঁফদাড়ি আর মাথায় সুদীর্ঘ ঝাঁকড়া চুল রাখার রেওয়াজ ছিল! তাছাড়া তাঁদের সাজ-সজ্জাও ছিল নিতান্ত শ্রী-হীন···মাথায় পশু লোমের লম্বা টুপী, অঙ্গে আপাদ লম্বিত 'কাফ্‌তান' বা ঢিলেঢালা ইয়া-লম্বা হাতা ওয়ালা জোব্বা আর রাঙা ঝল্‌ঝলে পাজামা···পায়ে পশমের মোজা, আর হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু বুট জুতো···এই ছিল তাঁদের পোষাক! এমনি বিদ্‌ঘুটে-জবড়জঙ্গ সাজ-সজ্জায় ভূষিত হয়ে চট্‌পট্‌, নড়ে-চড়ে বেড়ানোয় বিশেষ অসুবিধা ঘটতো। ইউরোপের সুসভ্য-উন্নত দেশের সুরুচিপূর্ণ সাজ সজ্জার ব্যবস্থা দেখে এসে 'জার্' পিটার স্বয়ং নিজের হাতে কাঁচি ধরে তাঁর অনুগত অনুচরবর্গের জংলী দাড়ি গোঁফ আর 'কাফ্‌তানে'র বেমালুম উচ্ছেদ সাধন করে রুশ-রাজ্যের সাজ পোষাকের ভোল্ ফিরিয়ে-দিয়ে-ছিলেন। দেশের প্রাচীন-পন্থী প্রজারা প্রথমে প্রবল আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন—সম্রাটের এই তাণ্ডব বৈদেশিক অনুকরণ সম্বন্ধে। কিন্তু পিটারের দুর্দ্দান্ত-দৃঢ়-শক্তির কাছে তাঁদের সে আপত্তি মোটে টিঁকতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত, পিটারের কড়া আদেশে মস্কো-রাজদরবারের অভিজাত অমাত্যদের সবাইকেই তাঁদের পরম-প্রিয় সনাতন দাড়ি আর 'কাফ্‌তান' জোব্বা ত্যাগ করে পশ্চিম-ইউরোপের সুসভ্য সাজ পোষাক আর আদব কায়দা গ্রহণ করতে হয়েছিল। অমাত্য-অভিজাতদের পুরোনো চাল চাল বদলে দেশের পশ্চাৎপদ বাসিন্দাদের সুসভ্য করে তুলতে পিটার কড়া আইন জারী করলেন। দাড়ি না কামানোর দরুণ রাজ্যের প্রত্যেক ব্যবসায়ী আর সাধারণ প্রজাদের বিশেষ একটি রাজস্ব-কর দিতে হবে। এই উদ্ভট আইন জারির ফলে, রুশ-প্রজাদের মধ্যে দাড়ি কামানোর মহা-হিড়িক পড়ে গেল! ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু দেশের দরিদ্র কৃষকদের বেলায়। বিধানে দাড়ি-রাখার অনুমতি মিলেছিল শুধু তাদের।

মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের গীর্জায় প্রথম রোমানফ্ 'জার' মাইকেলের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পুরাতন প্রতিচিত্র

পিটারের স্বদেশ-সংস্কারের নেশা খালি যে এ-সব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। রাষ্ট্র পরিষদের সহায়তায় দেশে তিনি বহুবিধ সুশৃঙ্খল আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাছাড়া রুশ দেশের সনাতন-প্রাচীন 'বর্ষ-পঞ্জিকার'ও (Calender) সংস্কার-সাধন করেছিলেন তিনি। আগে রুশদেশে সেকালের রীতি-অনুসারে বর্ষ-গণনা করা হতো সেপ্টেম্বর মাস থেকে। তার ফলে, ইউরোপের অন্যান্য বৈদেশিক-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে ভারী অসুবিধা ঘটতো। সে অসুবিধা দূর করার জন্য পিটারের আমলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির

অনুকরণে জানুয়ারি মাস থেকে বর্ষ গণনা করার রীতি প্রচলন হলো রুশ-দেশে।

এছাড়া কৃষি-প্রধান রুশ-দেশের পশ্চাৎপদ প্রজাদের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার উন্নতি-সাধনকল্পে সংস্কার-ব্রতী পিটার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় বহু নগর, জনপদ এবং কল-কারখানাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের চাষ-আবাদের সুবিধা এবং দুরন্ত নদীর বন্যা-প্লাবনের নিত্য-নিয়ত দায় থেকে প্রজাদের ঘর-বাড়ী-সম্পত্তি রক্ষার জন্য রুশ-রাজ্যে বহু খাল পরিখাও খনিত হয়েছিল সে সময়ে। এই সব খাল-পরিখা খনন আর রাজ্যের সর্বত্র পথ-ঘাটের সুব্যবস্থা হবার দরুণ, বাণিজ্য পণ্যের এবং যান-বাহন চলাচলে বিশেষ সুবিধা ঘটে। পিটারের আমলে, রুশ-সেনাবাহিনীরও যথেষ্ট উন্নতি-সাধন হয়। তাঁর প্রাণপাত চেষ্টায় দেশের সৈন্যবল শুধু যে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, রণ-কুশলী সম্রাটের পরিচালনাধীনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে শৌর্যে-বীর্য্যে-সামরিক-কলায় তাদের প্রত্যেকেই দুর্দ্ধর্ষ-পারদর্শী হয়ে ওঠে! তাছাড়া রাষ্ট্রের অস্ত্র-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য, দেশের খনিগুলির সংস্কার-সাধন করে তামা, লোহা, শীসা প্রভৃতি খনিজ ধাতু সংগ্রহের দিকেও পিটার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে, যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসাবে রুশ-রাজ্যে অনেক বড়-বড় সব কামান, বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রাদি এবং রণতরী নির্ম্মিত হয়েছিল···সে সবের কিছু কিছু নিদর্শন আজও সযত্নে রক্ষিত আছে সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক-যাদুঘরে। যোদ্ধা হিসাবেও পিটার ছিলেন অমিতবিক্রম! ১৭০০ সালে 'নার্ভার' যুদ্ধে সুইডেনের দুর্দ্ধর্ষ রাজ-শক্তির কাছে পরাজিত হলেও সুশিক্ষিত রুশ-সৈন্যদের সহায়তায় ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে 'পোলটাভার' যুদ্ধে পিটার এ-অপমানের প্রতিশোধ দিয়েছিলেন বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে। পশ্চিম-ইউরোপের সুসভ্য-সমাজের আদর্শে এই সব অভিনব বিচিত্র উন্নতি-সাধনের ব্যাপারে রুশ-দেশের সনাতন-পন্থী প্রজাদের ঘোরতর আপত্তির ফলে পিটারের মনে ধারণা জন্মেছিল, সুপ্রাচীন মস্কো-সহর থেকে দূরে অন্যত্র কোথাও সরে গিয়ে বিরোধী-দলের আওতার বাইরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাঁর বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনাগুলিকে তিনি কার্য্যতঃ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। সেই উদ্দেশ্যে, প্রাচীন রাজধানী সমৃদ্ধ মস্কো সহর ছেড়ে রুশ-রাজ্যের উত্তরাংশে বল্‌টিক সাগরের বিখ্যাত নেভা নদীর তীরে এক বিস্তৃত জলা-ভূমির উপর ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজধানী পত্তন করেন। নেভা নদীর কূলে অবস্থিত সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট পিটার দুর্গের নামানুসারে নয়া-রাজধানীর নাম রাখা হলো সেণ্টপিটার্সবুর্গ। তাছাড়া মহা-মহিম সম্রাট পিটারের নিজের হাতে গড়া জন-পদ বলে পরবর্ত্তীকালে নূতন রাজধানীর আরো একটি নাম হয়েছিল—পেট্রোগ্রাড্। সোভিয়েট আমলে, এই পেট্রোগ্রাড্ বা সেণ্টপিটার্সবুর্গেরই প্রাচীন নাম বদলে নূতন নাম হয়েছে—লেনিনগ্রাড্। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত স্থাপত্য-রীতি অনুকরণে, সাজে সজ্জায় অপরূপ শিল্পশ্রী-মণ্ডিত করে, প্রগতি পরিকল্পক পিটার পরম-আগ্রহে সুদীর্ঘ ন' বছরের অক্লান্ত চেষ্টায়, তাঁর এই সমৃদ্ধ নূতন রাজধানীটি গড়ে তুলেছিলেন। অবশেষে ১৭১২ সালে 'জার' পিটারের আদেশানুযায়ী নব-নির্ম্মিত সেণ্টপিটার্সবুর্গে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হবার ফলে ঐতিহ্য গরিমায় সমৃদ্ধ প্রাচীন মস্কো সহরের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়···অবস্থারও অবনতি ঘটে। ওদিকে সংস্কার-পন্থী সদয়-সহানুভূতিতে এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় রুশ-রাজ্যের নবীন-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবুর্গে দিনে দিনে এমন সমৃদ্ধ গরীয়ান হয়ে উঠেছিল যে ইউরোপের অপরাপর সভ্য উন্নত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি তাতে রীতিমত বিচলিত এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে এমনি বিবিধ-বিচিত্র সংস্কার-সাধনের ফলে পশ্চাৎপদ রুশ-রাজ্যকে প্রতীচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগ-শয্যাতেই মহিমান্বিত 'জার' পিটারের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

ক্রমশঃ

উটজ প্রাঙ্গণের শাখী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

গুটী কত শিশু-শাখী উটজ-প্রাঙ্গণে
সারা বেলা খেলা করে; মৃদু সমীরণে
পল্লবের বাহু তুলে জানায় উল্লাস;
আনন্দ-সঞ্জাত সঙ্গীতের কলভাষ
ছড়ায় সতত; আকাশের সূর্য্য-সুধা
কাণ্ড-মুখে টেনে লয় মিটাবারে ক্ষুধা।

চিক্কণ শ্যামল কান্তি কী যে শান্তি ভরা!
অবকাশ যদি পাই, শ্রান্তি-ক্লান্তি হরা
শাখী-শ্রেণী দেখে দেখে মেটে না তিয়াষ।
আমার জীবনে ওরা গভীর উল্লাস—
সূক্ষ্ম প্রশান্তির সুধা সঞ্চারিয়া যায়।
জড়বাদ-পিষ্ট ক্লিষ্ট যান্ত্রিক জীবন—

বস্তু-বিদ্ধ—রুদ্ধ—রিক্ত; তবু পায় মন
যে মাধুরী, সে যে শুধু ওদেরই কৃপায়।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি[১] লিখেছিলুম, তোমার কবিতার বইয়ের লম্বা সমালোচনা করে। সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি ঠিক মনে পড়চে না[২]। রাত্রিবেলায় বসে বসে তোমার 'লীলাকমলের দলগুলি' (তোমার ভাষায়) নাড়তে চাড়তে তার সৌরভে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক কথাই লিখে ফেলেছিলুম। চিঠিখানা আদৌ পেয়েছ কিনা জানিয়ো। এখন দিনের বেলায় মনে হচ্চে, সে-চিঠি তোমাকে হয় তো দুঃখ দেবে বা! চিঠিখানি যদি না পেয়ে থাকো, তাতে যা' লিখেছিলুম তা' মোটামুটি জানাচ্চি। কারণ, তুমি হয় তো এখুনি সোজাসুজিই বলে বসবে—

'ও সমস্তই বড়দার চালাকি। দীর্ঘদিন বইখানা পেয়েও নিছক কুড়েমি করে নিরুত্তর থাকার বাজে কৈফিয়ৎ।' অথবা বলবে—'বুঝেচি ওটা আমার রাগের ভয়ে পরিপাটি একটি বানানো গল্প।'

সত্যি বলচি বোন্, এটা কিন্তু একটুও বানানো-গল্প নয়। তবে তোমাদের রাগের ভয়টা যে আমার আজও সত্যিই আছে সেটা কবুল করচি। সংসারে যে দু' চার জায়গায় সত্যিকারের অকৃত্রিম স্নেহ ও নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা পেয়েচি বোন্, আমি তার দাম জানি। তাই তাকে হারাতে আমার সত্যিই ভয়।'

তুমি হয়তো এখুনি হেসে উঠবে। বলবে—'অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা!' সে কথা সত্যি দিদি! তবুও কি-জানো—অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহও সংসারের অনেক রকম কারণ অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে বা আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়। এমন কি, অনেক সময়ে সে আপনাকে আপনারই কাছে স্বীকার করতে রাজী হয়না, যদিও বা নিজের কাছে নিজেকে মানেও—অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়না, বিশ্বের কাছে তো নয়ই। তারপরে আছে ভুল-বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল-বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্ত্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশির ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা।...

ঐ দেখ, কি-লিখতে বসে কি সব বকতে সুরু করেচি। বুড়ো হওয়ার পূরোপুরি লক্ষণই হচ্চে এই বকা। বাজে বকা। ধান ভান্‌তে দিয়েচ কি, তান ধরবে সেই সময়ে শিবঠাকুরের গানের। দেখচ না তোমার গুরুদেবের[৩] কলমের কাণ্ড! একটা পয়েন্টে কথা সুরু করে কোথায় কোন্‌দিকে কোন পথে যে চলে যান্ তার আর হাল্‌হদিশ্ খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই হোলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ-লক্ষণ। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও[৪]) তা কিছুতেই মানতে চাওনা। আমারও আজকাল ঐ দোষটা পুরো মাত্রায় এসেচে যেন অনুভব করচি। বাজে বকতে পেলে আর যেন কিছুই চাইনে।

এই দেখ, তুমি যাতে রাগ না কর আর ভুল না বোঝো বলে চিঠি লিখতে বসে' তোমাকে রাগিয়েই দিলুম বুঝি বা! দোহাই, বুড়ো বড়দাকে ভুল বুঝোনা ভাই, লক্ষ্মীটি।

যে-চিঠিখানা লিখেও তোমাকে পাঠাইনি মনে হচ্চে,

(১) ভারতবর্ষের গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা শেষ চিঠিখানির কথাই শরৎচন্দ্র এখানে উল্লেখ করেছেন।

(২) শরৎচন্দ্রের আত্মভোলা স্বভাবের এও একটা নিদর্শন।

(৩) রবীন্দ্রনাথ

(৪) রবীন্দ্রনাথ

তাতে তোমার বইয়ের সমালোচনায় যা লিখেছিলুম জানাচ্ছি। লিখেছিলুম—"রাধু, তোমার লীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তস্পর্শী, এতই emotional যে, পড়তে পড়তে বার বার ভুল হয়ে যায়, এ তোমার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝিবা! কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি। আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়। কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়কে এমন গভীর সত্যিকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক্ হচ্ছি। যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই!

তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেচি রাধু! তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেচি; এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয় তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না তা' নয়, তোমরা নিজেরাও বোধহয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭ তোমার বড়দা

পুনশ্চ—

তোমার বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটী চমৎকার হয়েছে। যারা ওর নিন্দে করেছে, তারা অমনটি পারে নি বা পারে না বলেই নিন্দে করেছে। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, বরং হেসো একটু বেশি করে।

সামতাবেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, কুমিল্লায়[৫] হঠাৎ লোকে আমাকে চালান্ করে দিয়েছিলো। ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম।

'শেষ প্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙ্লা দেশে হয়ত পাবোনা; শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখচি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন। এ হোলো একটা দিক, অপর দিকটা এখনো চোখের আড়ালে আছে, ঝড় বইতে সুরু হ'লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য

(৫) শরৎচন্দ্র এই সময় কুমিল্লায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। এই সময় বাঙ্গলা কংগ্রেসে দুটা দল ছিল। দুটা দলের একদিকে ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপর দিকে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের দলে ছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রই শরৎচন্দ্রকে কুমিল্লায় পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কুমিল্লার রাজনৈতিক সম্মেলন থেকে ফিরে এসে রসিকতা ক'রে সেই সময় শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন—"মণ্টু,—দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বল্লে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি-জ্ঞাপন করলে; আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া। যাই হোক্ রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।"

পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ—ফলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইলো। ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ কত যে সামান্য এ সম্বাদ আর যার কাছেই লুকনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। অথচ মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো—সময় হ'ল না দিয়ে যাবার তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষপ্রশ্নে করেচি।

তুমি চেয়েচো আমার কাছে সৎ-পরামর্শ।[৬] কিন্তু চিঠির মধ্যে তো সৎ-অসৎ কোনো পরামর্শই পাঠাতে পারিনে ভাই; পারি শুধু পাঠাতে আমার অকুণ্ঠ কল্যাণ কামনা। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে—সব কথা জেনে নেবো। আজ কেবল এইটুকুই জানাবো যে, দুঃখ যারা সইতে ভয় পায় না এ পথ তাদের জন্যেই।

ইতিমধ্যে যদি ধৈর্য্য থাকে 'শেষপ্রশ্ন'খানা আরও একবার পড়ে দেখো। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। যে সব কথা হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে তাদেরও দেখা পাবে। কোনো বই বার দুই না পড়ে দেখলে তার সবটুকু চোখে পড়ে না।

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখবার ইচ্ছেও হয়। কবে দেখা হতে পারে যদি একটু জানাও ভাল হয়। আরও একটা কথা। বামুন মানুষ, বিশেষতঃ বুড়োমানুষ, যত্ন কোরে খাওয়ানোটা যে একটু বেশি রকম পছন্দ করি, আমার লেখার মধ্যে এ ইঙ্গিতটুকু অনেকেই আমার নিজের ব'লে অনুমান করে। ভাবে মনে হয় তোমারও আন্দাজ যেন ঐ রকম। ঠিক না?

আমার অন্তরের গভীর স্নেহাশির্ব্বাদ রইলো। ইতি

৩০শে বৈশাখ' ৩৮ বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশির্ব্বাদ চেয়েছিলে তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করি নি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠে নি ভাই। "এই কালই জবাব দেবো" এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান আর জন্মালো না যে ভাবো—'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশির্ব্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন —একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেচেন।[৭] তোমরা পারো না?

একটা কথা লিখেচো দেখলাম যে—কমলের স্রষ্টা রমার স্রষ্টা তো নয় যে—ইত্যাদি। তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাদের বুঝতেন—তোমাকে আদর করতে পারতেন, কিন্তু কমলের কথা যিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁর কাছে আর ভরসা করবার কি আছে? এই না কি?

কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লী-সমাজের রমা পল্লী-সমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্য নিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষপ্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি কোরে?

আরও একটা কথা রাধু! লোকে লিখতে বলে—না লিখলেও দেখি চলে না—কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি

(৬) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধা ও স্নেহের গভীরতা লক্ষ্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের প্রায়ই বলতেন— তোমরা যদি বিবাহের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার নাও, তাহলে তোমাদের জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। রাধারাণী দেবী এই সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের কাছে সৎ-পরামর্শ চেয়েছিলেন।

(৭) শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল। তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহুপত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাস পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাসই ব্যক্ত হয়েছে।

শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলো-মেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্ছে—না? দেবার কথাও। আসলে আমি ত সাহিত্যিক নই, দিদি। এ যেন আমার এম-এস্-সি পাশ করে ওকালতি পেশা ধরা। সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনোদিন তেমন আনন্দও পাই নে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে।[৮]

(৮) "সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে—" একথা শরৎচন্দ্রের নিছক রসিকতা মাত্র। অবশ্য বিজ্ঞানেও যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন একথাও ঠিক। কারণ তিনি এক সময় বহু বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া সব সময়েই বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ তাঁর শেল্‌ফে সাজানো থাকতো। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে এ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া এই যে কাহিনীর যাদুকর হঠাৎ এক শুভপ্রভাতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে চকিত, চমৎকৃত করিয়া দিলেন, তাঁহারই সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া মুগ্ধ বাঙ্গালী সেদিন তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। সতীশ, উপীনদা, রমেশ এমন কি দেবদাসের মধ্যেও আমরা সেদিন তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছি, সেই সঙ্গেই তাঁহার ভোলা কুকুরের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরের মধ্যে টাঙ্গান বন্দুকের পাশে রুদ্রাক্ষের মালার কথা, তাঁহার শেল্‌ফে সাজানো অজস্র বিজ্ঞান-গ্রন্থের কথা।" (শরৎ-বন্দনা, পৃষ্ঠা ২১৭ ২১৮)

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশি পড়াশুনা করেছিলেন যে, একবার তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভারতবর্ষে প্রকাশিত "জড়-জগৎ" নামক একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করে তাঁর দিদির নাম দিয়ে (শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে সমালোচনা লিখতেন) একটা প্রতিবাদ লিখতে চেয়েছিলেন। তাই তখন তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম সত্বাধিকারী, তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন থেকে ২৫. ১২. ১৫ তারিখের এক পত্রে লিখেছিলেন—"এবারকার ভারতবর্ষ চমৎকার হইয়াছে। আমি নিজে ত পড়িবার জিনিষ অনেক পাইলাম। আচ্ছা, একটা কথা—"জড়-জগৎ" সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু প্রতিবাদ করে, ধরুন আমার দিদিকে দিয়া যদি কিছু লিখাইয়া লই, আপনারা সে প্রতিবাদ কি ছাপিবেন? অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করার পর। [Symbol অর্থাৎ কল্পনা প্রতিমা খাড়া করিয়াই কাজ চলিতেছে (একটা উদাহরণের মত উল্লেখ করিলাম) জার্ম্মানির সকল পণ্ডিতই ত তা মানে নাই। তাদের মতামতটারও ত একটু মূল্য আছে। তাছাড়া হেল্‌মহোজ কি শুধু standard সম্বন্ধে ঐ বলিয়াই শেষ করিয়াছেন? তখন সবাই মানিয়া লইয়াছেন কি? আপনিই বলুন না? আর এটা ত শুধু পদার্থ বিদ্যার Philosophy of science]

এর জন্যেই হয়ত আমি তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেল ঠিক উল্টো। ভাবি, আবার যদি কখনো জন্ম হয়, সেবার যেন না এত বড় ভুল আর ঘটে।

কেমন আছ? দেখা সাক্ষাৎ হবারও যো নেই—যখন ফিরবে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ো। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ, '৩৮

বড়দা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়াসু—

তোমাদের বিয়ের খবরটা এত দেরিতে এসে পৌঁছালো যে তখন আর যাবার কোন উপায়ই হাতে নেই। সেদিন শুধু এই কথাটাই ভেবে সান্ত্বনা পেলেম যে এ মিলনের মূলেই ত' ছিলেম আমি।[৯]

সেদিন তোমাদের নূতন গৃহস্থালী দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল খুবই, কিন্তু এদিকের জরুরি নানা কাজ সারতে সারতে স' আটটা বেজে গেল। তখন আর লিলুয়া[১০] গিয়ে ফিরে এসে স' নটার ট্রেণ ধরা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া, তোমাদের কাছে রাতটার মতো যে আতিথ্য স্বীকার করবো—সে সাহসও হ'ল না, অভিসম্পাতের আশঙ্কা ছিল। তাই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারলাম না। যাই হোক সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও—জয়ী হও। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, কিছুদিন হোলো তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলে জবাব দিয়ে উঠতে পারি নি।

(৯) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের বিবাহে শরৎচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

(১০) লিলুয়ায় নরেন্দ্র দেবদের "দেবালয়" নামক উদ্যান বাটীতে এঁদের বিয়ে হয়েছিল।

সেদিন কে যেন বললে—তোমাদের ওখানে গিয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন দেখলে? সে যা বললে তাতে মনটা খুসি হয়ে উঠেছিল।

* * * তোমার আশঙ্কা অমূলক। পৃথিবী তা নয়। দুদিনের বেশি কেউ কারো কথা ভাববার অবকাশই পায় না। তাহ'লে এ দুনিয়ায় কারও বাস করাই চলতো না।··· তবে একটা কথা বলে রাখি। বয়েস অনেক হোলো, অনেক কিছুই দেখলাম। দুটি মাত্র মানুষের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে কারও বেশিদিন চলে না। পুরুষের তো নয়ই। সুতরাং লিলুয়ার নিরালা[১১] ছেড়ে যত শীঘ্র পারো কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসো তোমরা। * * * আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

বড়দা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিপত্রের জবাব না দিয়ে দিয়ে যে তোমাদের কাছে কত অপরাধ করি তার আর শেষ নেই। তা সে যাই হোক, মনে জেনো যে দাদার স্নেহ সে জন্যে একটুও কমে না।

তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অসুখে ভুগচেন এ খবর আমি পূর্ব্বেই নরেনের কাছে পেয়েছিলাম। তাকে বলেছি —যেমন করে পারো মাকে তোমার সুস্থ করে তোলো। কেমন আছেন তিনি আজকাল? কোনো মতে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, নাহলে তোমাদের বড় মুস্কিল। স্নেহের এত দাবী কারও কাছে আর তোমরা খুঁজে পাবে না। নরেনের মাকে আমি যথার্থই শ্রদ্ধা করি।

আমি নিজে বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েচি। ৭/৮ দিন থেকে অর্শ দিয়ে এত রক্তপাত হচ্চে যে প্রায় শয্যাগত করে ফেলেচে। কিছুতেই রক্ত থামচে না, কিম্বা কমও হচ্চে না। আজ লোক পাঠাচ্চি কলকাতায়, দেখি যদি হাঁসপাতালেই গিয়ে উঠতে হয় তো একটা যেন স্থান পাই।

ভেবে রেখেছিলাম এবার যেন লেখাটা না থামে, কিন্তু সে ইচ্ছে কাজে লাগবে বলে ভরসা পাই নে।

আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের যেন সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। নরেনকে বোলো আমার আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছি।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৯ বড়দা

(১১) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়েই কবি। শহরের কোলাহলের বাইরে লিলুয়ার "দেবালয়ের" নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ এঁদের ভাল লাগায়, বিয়ের পর এঁরা এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের লিলুয়ার নিরালা ছেড়ে কলকাতায় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ফিরে আসবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

যদি সখি, এ জীবনে আর একবার
মুকুলিতা তন্বী সেই কিশোরীর প্রায়
চকিত হরিণ-নেত্রে অসম্বৃত কেশে
একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়াইতে এসে
সম্মুখে আমার! কোন্ ঐন্দ্রজালিকের
অপরূপ যাদুমন্ত্রে ভস্মস্তূপ হ'তে
মোহন মুরতি ধরি' উঠিত জাগিয়া
মৃত পুরাতন প্রেম! জরাহত ধরা
উচ্ছল যৌবনরাগে উঠিত উলসি'
কনকচম্পকপুঞ্জে, কাঞ্চন-কিংশুকে
পুনর্ব্বার! দেখিতাম সায়র-সোপানে,
মৃত্তিকায়, তৃণে তৃণে তব চরণের
ললিত অলক্তরাগ! শুধু একবার—
হ'তে যদি লোভনীয় সেই পঞ্চদশী!

পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন যে পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। মালয় উপদ্বীপের সুদীর্ঘ পুচ্ছ ও তার নিকটবর্তী পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নাকি এক সময়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশ ছিল এক অবিচ্ছিন্ন মহাভূখণ্ডের অংশ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই দুই মহাদেশের সংযোগ সেতু স্মরণাতীতকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়ে যায়। যে অংশগুলি সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হ'য়ে যায় সেগুলি ছিল পর্বতসঙ্কুল ভূমি। এখন ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তবর্তী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সেই নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ। প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে এশিয়া ভূখণ্ডের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক কাল হ'তে ঐতিহাসিক যুগের বহু দিন পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন ক'রেছিল। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একদল মানুষের চাপে এশিয়ার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলনিবাসী একদল কৃষ্ণকায় আদিম মানুষ সমুদ্র অতিক্রম করে আশ্রয়ের আশায় আরও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। এই কৃষ্ণকায় মানুষই অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম বা আদিম অধিবাসী। সঠিক কোন সময়ে এবং কোন জায়গা হ'তে বা কি উপায়ে এই আদিম মানুষের দল সমুদ্রবেষ্টিত অজ্ঞাত মহাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে কাহিনী চিরদিনের মতো অকথিত রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় যে আদিম মানুষ বা অ্যাবরিজিন (aborigines) দেখতে পাওয়া যায় তারা সেই আদিম শরণার্থীদেরই বংশধর। এদের গায়ের রং নিকষ কালো, মাথার চুল সোজা, নাক ঈষৎ চাপা। কিন্তু এদের মাথার খুলি, চোয়ালের হাড় এবং চুল পরীক্ষা ক'রে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে এরা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ নয়। এরা হচ্ছে বর্তমান শ্বেতকায় ইউরোপীয় জাতিগণেরই আদিম পূর্বপুরুষ। নৃতত্ত্ববিদের পরিভাষায় "A white stock gone black।"

ইতিহাসের যে যুগে মানুষ প্রথম নৌকা যোগে দরিয়ায় পাড়ি দিতে সুরু ক'রে, সে সময়ের কাহিনী ও কিংবদন্তীতে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এক একটা অনিশ্চিত বা কল্পনামূলক ইঙ্গিত কখনো কখনো পাওয়া যায়। যে সময়ে অনেকে বিশ্বাস করত যে পৃথিবীর (পূর্বগোলার্ধের) উত্তরাংশের এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর দক্ষিণভাগেও একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে। ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাবিকগণের মুখে মুখে এই অজ্ঞাত ও কাল্পনিক মহাদেশের নানা কথা চারিদিকে প্রচারিত হ'ত। ১৫০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট লুসিয়ানের রাজসভায় মারসুপিয়াল (Marsupial) নামক একজাতীয় অদ্ভুত জীবের কথা আলোচিত হ'তে দেখা যায়। বিবরণে প্রকাশ যে এই জীবের পেটে বাচ্চা রাখবার থলে ছিল। Marsupial যে ক্যাংগারু জাতীয় জীব সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্যাংগারুর বাসভূমি হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া।

ইউরোপীয় ইতিহাসে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক হচ্ছে নৌ-অভিযান এবং আবিষ্কারের যুগ। কলম্বাসের ঐতিহাসিক অভিযানের বিস্ময়কর সাফল্য ইউরোপীয় নাবিক ও বোম্বেটেগণকে এক নূতন নেশায় উন্মাদ ক'রে তুলেছিল। প্রথমে স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ডের এবং পরে ইংরাজ ও ফরাসী জাতীয় দুঃসাহসিক নাবিকেরা এই বিশাল পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশগুলি খুঁজে বের করবার জন্য তৎপর হ'য়ে উঠেছিল। ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ক'রে ভারতে আগমন করবার পরবর্তী সময়ে ভারত সমুদ্র এবং সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয় বণিক ও অভিযানকারিগণের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু খৃষ্টিয় পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রতি এই সকল অভিযানকর্তাদের নজর পড়েনি। ভারত সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে এই নাবিকেরা tradewind বা বাণিজ্য বায়ুর গতি অনুসরণ ক'রে সোজা পূর্বদিকে না গিয়ে, উত্তরদিকে মোড় ঘুরে পূর্ব ভারতীয়দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির দিকে অগ্রসর হ'ত। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে টোরেস (Torres) নামক একজন স্পেন দেশীয় নাবিক খুব সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইনস্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের পূর্ব উপকূলের ত্রিশমাইলের মধ্যে এসেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার কথা তখন কেউ বড়ো একটা জানত না। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল জাহাজ ভিড়বার পক্ষে অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র মালয় উপদ্বীপবাসী দুর্দান্ত ধীবর সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ এদিকে নজর দিত না।

আর মালয়ী ধীবরেরা উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রে মাছ ধরেই ক্ষান্ত থাকত। ভূভাগের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। সমস্ত দেশটাকেই তারা 'মৃতের দেশ' ব'লে অভিহিত ক'রত।

কিন্তু পূর্বভারতীয় দ্বীপ এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহ হতে পর্তুগীজ নাবিকগণকে বিতাড়িত ক'রে ওলন্দাজ নাগরিকগণের প্রভুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ নাবিকেরা খাস অষ্ট্রেলিয়ায় না এলেও এর আশে পাশে আনাগোনা সুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অনাবিষ্কৃত অন্ধকারময় মহাদেশ ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর গোচরে আসতে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অনেক জায়গায় নাম থেকে অনুমান করা যায় যে এই সকল স্থানে সম্ভবতঃ ওলন্দাজ বা অন্য ইউরোপীয় নাগরিকগণ এসেছিল। কিন্তু ভূমির অনুর্বরতা, পার্বত্য উপকূলভাগের বন্ধুর অনাতিথ্য তাদের

মনকে এই নূতন দেশের প্রতি প্রসন্ন করে তুলতে সক্ষম হয় নি। অধিকাংশ আগন্তুকেরাই দেশটাকে অনুর্বর ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছেন।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জেমস কুক নামক একজন ইংরাজ নাবিকের এদেশে আসার পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। যদিও আরও পূর্বে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ডেম্পিয়ার অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম উপকূলভাগে পদার্পণ করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে আবেল ট্যাসম্যান নামক আর এক ব্যক্তি কর্তৃক ট্যাস্‌ম্যানিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কিন্তু এই আবিষ্কারের পরবর্তী বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কেউ এই নূতন দেশগুলির কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় নি। এদিকে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাভবে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীগণকে পূর্বে আমেরিকায় পাঠান হ'ত। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন হ'য়ে যাবার পর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কাপ্তেন কুক প্রথমে রাজকীয় পোত "এনডিভার" (Endeavour) চালনা ক'রে প্রশান্তমহাসাগরীয় তাহিটি দ্বীপে উপস্থিত হন। তাঁর জাহাজের আরোহীগণের মধ্যে ছিল একদল জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিক। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুকতারা বা Venusএর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা। সেই বৎসর Venusএর গতিপথ সূর্যের পরিক্রমণ-পথের উপর দিয়ে যাবার কথা ছিল। তাহিটি দ্বীপের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শেষ হওয়ার পর, কাপ্তেন কুক অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলভাগে অবতরণ করেন। এই নবাবিষ্কারের ফলে এই নূতন মহাদেশের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং কুকের আবিষ্কারের ঠিক সতের বৎসর পর কাপ্তেন ফিলিপ নামক এক নৌসেনাধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে একদল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীকে এদেশে দ্বীপান্তরে পাঠান হন। কাপ্তেন ফিলিপ হচ্ছেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম শাসনকর্তা। বিনা বাধায় ও বিনাযুদ্ধে এত বড় একটা মহাদেশ ইংরাজের করতলগত হয়। ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ হচ্ছে নিউ-সাউথ-ওয়েলস—যার বর্তমান রাজধানী সিড্‌নি—অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের রাজধানী মেলবোর্ণ নগরের ফিট্‌জরয় গার্ডেনে কাপ্তেন কুকের কুটীর আজও (Capt Cooks cottage) অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে।

কাপ্তেন কুকের ইয়র্কশায়ারস্থিত পৈতৃক বাসগৃহটি তুলে এনে অষ্ট্রেলিয়া-আবিষ্কারকের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আদিম মানুষের কাহিনী

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও নবীনতম মহাদেশ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। হাজার হাজার বৎসরের বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন অপসারিত ক'রে বিশাল মহাদেশকে সভ্য জগতের নিকট পরিচিত করল দুর্ধর্ষ ইংরাজ নাবিক। নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হ'তে চলল। মাত্র ১৭০ বৎসরের কথা। এরি মধ্যে একটা গোটা সভ্যতা অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে গড়ে উঠেছে। যদিও এ সভ্যতার একটা বৃহৎ দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র। শ্বেতাঙ্গ নাবিকের পদার্পণের পূর্বে এই অজ্ঞাত ও বিস্মৃত মহাদেশের অবস্থা কি ছিল—সেটা আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের পরম কৌতুহলের বিষয়। যে কৃষ্ণবর্ণ মানুষ-গোষ্ঠী এদেশের আদিম অধিবাসী ও প্রকৃত মালিক, তাদের নিয়ে আজ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু গবেষণা চলেছে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক—Prof. Elkin এবং Dr. Capellএর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অবসরপ্রাপ্ত Director of Nature Affairs and Advisor to the Commonwealth Govt. on Aborigines, মিঃ চিনেরী (Mr. Chinnery)

কোয়েলা—অষ্ট্রেলিয়ার নিরীহ খুদে ভালুক

অষ্ট্রেলিয়ার দ্রুতক্ষয়িষ্ণু আদিম অধিবাসীগণের কল্যাণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আদিম অধিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে এঁদের সুচিন্তিত অভিমত ও পরিকল্পনা বিবেচনার যোগ্য।

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ আদিম অধিবাসী-গণের সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই নূতন নীতির নাম হচ্ছে Policy of Assimilation। ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থা—এই তিন উপায়ে আদিম অধিবাসীগণকে ক্রমে ক্রমে

শ্বেত অষ্ট্রেলিয়ান সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলাই—Policy of Assimilation এর মূল উদ্দেশ্য। আদিম অধিবাসীরা সাধারণত দুই শ্রেণীর —(১) অবিমিশ্রিত বা full-blooded aborigines (২) মিশ্রিত বা half-castes. Assimilition Policy বা একাঙ্গীকরণ নীতি প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণী বা half-casteদের উপরেই প্রযুজ্য। একদিক দিয়ে একাঙ্গীকরণ খুব কঠিন ব'লে মনে হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে যে এক, দুই বা বড় জোড় তিন পুরুষের রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই কালা মানুষ তার কালোত্ব ঘুচিয়ে একেবারে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে—

ভাই—ওয়ালাবি

অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ, অথচ লোক সংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ। জন-বিরলতা এদেশের একটা প্রধান সমস্যা। লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য এরা অনেক কিছু উপায় অবলম্বন করেছে। প্রত্যেক অষ্ট্রেলিয় নাগরিক অনূর্দ্ধ ষোল বৎসর বয়স্ক সন্তানের জন্য সরকারী তহবিল হ'তে নির্দিষ্ট হারে ভাতা পেয়ে থাকে। সাদা চামড়া অর্থাৎ ইউরোপীয় যে কোন জাতীয় লোকের জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার দ্বার অবারিত। কিন্তু সাদা চামড়ার আভিজাত্য এরা ছাড়তে নারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার Apartheid 'নীতির মতো অতো উগ্র কালা-বিদ্বেষী না হ'লেও শ্বেত অষ্ট্রেলীয় (White Australian Policy) কালা আদমির প্রতি বিশেষ প্রসন্ন নয়। কালা আদিম অধিবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গ-রক্তে শোধন ক'রে লোক-বিরলতা সমস্যা সমাধানের একটা উদ্দেশ্য Assimilation Policyর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আজ গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নানা মিশনারী প্রতিষ্ঠান এই হাফ্-কাষ্ট্ নেটিভগুলিকে ক্রমশঃ অষ্ট্রেলিয় সমাজভুক্ত ক'রে ফেলবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু হাফ্-কাষ্ট নেটিভ আর অবিমিশ্রিত (full blooded aborigines) আদিম অধিবাসী এ দু'য়ের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের।

এক শত সত্তর বৎসর পূর্বে প্রথম যখন ইংরাজ ঔপনিবেশিক এদেশে আসে তখন সারা দেশে আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। কমতে কমতে সেই সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র পঁচাত্তর হাজারে। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণস্থ টাসম্যানিয়া দ্বীপ হ'তে আদিম মানুষের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। খাশ অষ্ট্রেলিয়ার পাঁচটি বিভাগ বা রাজ্য—কুইনসল্যাণ্ড, নিউসাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়া। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভূমিই উর্বর, শস্যোৎপাদনোপযোগী এবং বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মহাদেশের মধ্যভাগ এবং উত্তরভাগ মরুময়, পর্বতসঙ্কুল, অনুর্বর ও নির্জলা। দেশের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অংশ সবই শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত। সেখানে কালা আদমির প্রবেশ নিষেধ। মধ্য ও উত্তরাংশের ঊষর পার্বত্য ভূমিই কালা মানুষের একমাত্র বাসভূমি।

স্মরণাতীত কাল হ'তে এই কালা মানুষের দল এদেশকে আপনার ক'রে নিয়েছিল। জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে এরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্তন সাধন করবার আদৌ কোন সুযোগ পায় নি। বনে, প্রান্তরে, মরুভূমি ও পাহাড়েপর্বতে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আদিম মানুষের দল এক পরিবর্তনহীন আরণ্য যাযাবর জীবন যাপন ক'রে আসছিল। প্রকৃতির কোলে নির্বোধ শিশুর মতো এরা উলঙ্গ বিচরণ করত।

প্রথম যখন শ্বেতজাতির এদেশে আগমন হ'ল তখন এরা এই নূতন আগন্তুকদের না করল সাদর অভ্যর্থনা, না করল প্রতিরোধ। অভ্যর্থনা বা প্রতিরোধ দুই ছিল এদের পক্ষে অর্থহীন। অভ্যর্থনা করবার মতো এদের ছিল না কোন সম্পদ, আর প্রতিরোধ করবার মতো ছিল না এদের কোন কৌশল বা অস্ত্র শস্ত্র। হেতা হোতা দু'একটা মাছ ধরার ফাঁদ, কোথাও বা গাছের ডাল পালা দিয়ে তৈরী সাঁকো, গাছের বাকলে তৈরী এক চালা ডেরা (mia-mia), পাহাড়ের গায়ে গুহা আর আগুন-ছাই —এই ছিল সারা দেশে মানুষ-বসতির একমাত্র নিদর্শন। শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকেরা এদের এক রকমের আজব মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে নি, এরা রেড ইণ্ডিয়ান বা আফ্রিকার পিগমিদের মতো নূতন আগন্তুকদের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টাও করেনি, কারণ লড়াই করবার উপযোগী কোন হাতিয়ারও এদের ছিল না। নূতন আগন্তুকের দল প্রায় বিনা বাধায় এদের জায়গা জমি, অবাধ বিচরণ স্থল, অরণ্য ভূমি দখল ক'রে নিল। এরা অনন্যোপায় হয়ে অপেক্ষাকৃত উত্তম উপকূলভাগ ছেড়ে মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ ক'রে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেল। দেশের ভাল ভাল জায়গা সবই আগন্তুকদের করতলগত হ'ল—এদের ভাগে রইল অনুর্বর,

জলহীন, পার্বত্য উষর ভূমি। জীবন ধারণের যে গুলি প্রধান প্রয়োজনীয় উপকরণ সে গুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা জীবন সংগ্রামে প্রতি পদে পর্যুদস্ত হতে লাগল। আর তারই ফলে ১৭০ বৎসরের মধ্যে তিন লক্ষ সংখ্যা কমে আজ মাত্র ৭৩০০০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। হয় এরা assimilation policy'র প্রসাদে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে, নতুবা ধীরে ধীরে ধরা পৃষ্ঠ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ নৃতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের বংশধর। এদের বিলুপ্তিতে মানুষের সনাতন বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের পক্ষে সেটা হবে একটা শোচনীয় ক্ষতি। তাই বোধ করি আজকাল অষ্ট্রেলিয় গভর্ণমেণ্ট, তথা জনসাধারণ এই আদিম মনুষ্য-গোষ্ঠীর অবশিষ্টাংশকে বাঁচিয়ে রাখবার কথা চিন্তা করছেন।

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মানুষের ক্রম বিবর্তনের দিক দিয়ে আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, আচার ব্যবহার, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি এক অতি চমৎকার এবং অনুধাবনীয় বিষয়।

মানুষ-সৃষ্টির আদিকাল হ'তে এরা প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এক অকৃত্রিম আরণ্য-জীবন যাপন ক'রে আসছে। এদের জীবনেতিহাসে ক্রম-বিবর্তনের ইঙ্গিত বড়ই ক্ষীণ। প্রকৃতিকে এরা কোথাও লঙ্ঘন করে নি, প্রকৃতির নিয়মকেই এরা সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি সেখানে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা না করে বিনা প্রতিরোধে পরাভব স্বীকার ক'রে নিয়ে বিলুপ্তি বরণ ক'রে নিয়েছে। এই আদিম মানুষের জীবনে "জ্ঞানবৃক্ষের" প্রলোভন কোন দিন দেখা দেয় নি। এরা নির্লিপ্ত, নিরুদ্বেগ, আরণ্য জীবন যাপন ক'রে আসছিল হাজার হাজার বৎসর ধরে। হয়তো আরো হাজার বৎসর এমনিভাবেই কেটে যেত, যদি না ইউরোপীয় শ্বেত নাবিকের বিশ্বগ্রাসী শ্যেন দৃষ্টি এই মহাদেশের উপর পড়ত। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন দিন এদের যোগাযোগ ছিল না। এদের জীবনে বাইরের কোন প্রভাব কোনদিন পড়ে নি এবং প্রতিযোগিতাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই মানুষের দল প্রায় একই অপরিবর্তিত অবস্থায় হাজার হাজার বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে।

সর্ব প্রথম যে মানুষের দল এদেশে আসে, তারা ছিল খুব সম্ভবতঃ নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—রং কালো, বেঁটে, ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাবড়া, মাথার চুল ভেড়ার লোমের মতো কোকড়ানো। এরা কিন্তু বেশীদিন এ মহাদেশে বাস্তব্য করতে পারে নি, কারণ এদের পরে পরেই এল আর একদল, যারা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দ্বিতীয় দলের ধাক্কায় প্রথম দল ছিটকে পড়ল আরও দূরে—দক্ষিণের ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপে। এই দ্বীপে এরা প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর নিরুদ্বেগ জীবন যাপন ক'রে আসছিল। মাত্র একশত বৎসর আগেও ট্যাসম্যানিয়ায় এই আদিম মানুষের কিছু চিহ্ন ছিল। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের অত্যাচারে অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নির্বংশ হয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গের দল প্রথমে এসেই এদের ভাল ভাল জমি, বনভূমি প্রভৃতি থেকে তাড়িয়ে সেই সব জায়গা নিজেরা দখল করে নিল। তারপর কখনো সামান্য কারণে, বেশীর ভাগ অকারণে, প্রায় পশুর মত এই বন্য মানুষগুলিকে শিকার ক'রে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একবার একটা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু কাঠের বর্শা আর বুমেরাং নিয়ে এরা বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। সবাইকে হয় গুলির আঘাতে, নয় দূর নির্বাসনে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। ট্যাসম্যানিয়ার সর্বশেষ আদিম অধিবাসিনী এক কৃষ্ণাঙ্গী—নাম তার টুকানিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি শ্বেতাঙ্গদের দাসীবৃত্তি নিয়ে বেঁচেছিল। যাবার আগে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিল যে তার মৃতদেহটি যেন তার জন্মস্থানে সমাহিত করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গীর এই শেষ অনুরোধ শ্বেতাঙ্গ প্রভু রক্ষা করে নি। টুকানিনির কঙ্কাল ট্যাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্ট শহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ট্যাসম্যানিয়ার কালো নিগ্রোবটুর পরে যে দল এদেশে আসে তারাই হচ্ছে এদেশের আদিম অধিবাসী। লম্বা, শীর্ণকায়, সোজা লম্বা চুল,

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর বংশধর

গায়ের রং কালো—এই হচ্ছে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য। এরা হয় Black Caucasians অথবা Dravidians। অর্থাৎ বর্তমান ইউরোপীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পূর্বপুরুষ, পৃথিবীর প্রথম মানুষ। স্যার আর্থার কিথ্ বলেন "Of all the races of mankind now alive, the aboriginal race of Australia is the one which in my opinion, could serve as a common ancestor for all modern races."

এদের ব্যবহৃত ভাষায় এবং এদের অনেক আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জাতির সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মানুষকে এরা বলে ইজ্জা (Idja) হিব্রুভাষায় যার প্রতিশব্দ হচ্ছে ইস (ish); পিতাকে এরা বলে আবিয়া (abia) যার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে আব্বা (abba)। এদের বুমেরাং এর

মতো অস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়গণ ব্যবহার করত, যা প্রাচীন মিশরীয় প্রাচীর-চিত্রে খোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। এদের একটা লিখিত ভাষা বা কতকগুলি সঙ্কেত চিহ্নও ছিল, যার অন্তর্নিহিত অর্থ আজ আর কেউ বুঝতে পারে না।

পণ্ডিতেরা এদের প্রস্তরযুগীয় মানুষের গোষ্ঠিভুক্ত করেছেন। স্মরণাতীত কাল হ'তে এদের জীবনধারণ প্রণালী একই অপরিবর্তিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসলেও কতকগুলি সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা এদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতি এদের প্রতি খুব বেশী অনুগ্রহ প্রকাশ করেনি। কি বনজ সম্পদ, কি জীবজন্তু, এমন কিছুই এদেশে ছিল না যা থেকে এরা প্রাণধারণের উপযোগী সামগ্রী খুব বেশী আহরণ করতে পারত। দেশের মাটি অধিকাংশই অনুর্বর, বন্ধুর ও জলাভাবে ঊষর। ক্যাঙ্গারু, কোয়েলা (ভালুক) আর প্ল্যাটিপাস ছাড়া অপর উল্লেখযোগ্য বন্য জন্তু এত বড়ো মহাদেশের কোথাও দেখা যায় নি। গাছপালা প্রায় সবই বুনো ও ফলহীন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর মাংস, নদী নালার মাছ, আর বুনো দুচার রকমের গুটি ফল—এই ছিল এদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু আদিম এবং অনুন্নত হ'লেও এই মানুষগুলি বুদ্ধিমান জীব। কেবল সুযোগের অভাবেই এরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে নূতন ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে এরা খুব সহজেই সাড়া দেয়।

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগে আদিম অধিবাসীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। নানাভাবেই এরা বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ ক'রে কারিগরির কাজে এরা খুবই নিপুণ। সুযোগ সুবিধা পেলে এরাও যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে চলতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কতকগুলি আচার ও প্রথা উল্লেখযোগ্য।

এদের ধর্মবোধ সকল আদিম মানুষের মতোই ভীতি-সঞ্জাত। কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই এদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই সব অনুষ্ঠানের মূলে হয়তো কোন নিগূঢ় রহস্য বা অর্থ কোনদিন নিহিত ছিল, কিন্তু আজ সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবার কোন উপায় নেই। ফলে এদের আচার অনুষ্ঠান কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভাবা যায় না। পর্বতগাত্রে অঙ্কিত সঙ্কেতলিপি ও চিত্র, নাচ বা গান কোন কিছুর মধ্য দিয়েই আদিম মূলসূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো কখনো কোন ক্রিয়া বা লৌকিক আচারের মধ্যে একটু একটু প্রতীকতা বা symbolismএর প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে এদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির কোন বিশেষ উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বপ্ন দেখাই এদের জীবনের সর্বোচ্চ আত্মিক উপলব্ধি। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন এরা একটা অজ্ঞাত ও রহস্যময় শক্তির ভীতিপ্রদ আভাস পায়। কিন্তু সেই শক্তির কোন আধ্যাত্মিক অনুধ্যান এদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। একটা অদৃশ্য ও অজ্ঞাত ভীতিই হচ্ছে এদের আচার অনুষ্ঠান, উপকথা বা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। ভয় কাটিয়ে জ্ঞান, ভক্তি বা উপলব্ধির উচ্চস্তরে এরা কোন দিনই উঠতে পারে নি। মানসিকতার দিক দিয়ে তাই এরা রয়ে গিয়েছে সেই আদিম অন্ধযুগে।

ব্যবহারিক জীবনেও এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন বা ক্রমোন্নতি ঘটেনি। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানেও এদের আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতি সেই একই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রামহীনতা—এই তিন কারণেই এদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আগুনের ব্যবহার এরা জানত। কাঠে কাঠে বা পাথরে পাথরে ঘষে এরা আগুন উৎপাদন করত—কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে অগ্নি-উৎপাদন বা অগ্নির তাপ-সংরক্ষণ এরা করতে শেখে নি। জমি চাষ এরা করতে জানত না—এই বিরাট মহাদেশে এমন কোন জন্তুও কোনদিন ছিল না, যা মানুষ পোষ মানিয়ে তার কাজে লাগাতে পারে। ক্যাংগারু-শিকার আর মাছ-ধরা এই ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। শিকারের অস্ত্র ছিল পাথর বা কাঠের ফলাবিশিষ্ট বর্শা। তীর ধনুকের ব্যবহার এরা করতে জানত না। ব্যমেরাং বা বাঁকা কাঠের হাতিয়ার অষ্ট্রেলিয় আদিম মানুষের এক বিশেষ অস্ত্র। মেয়েরা কখনো কখনো গাছের ছালে দেহ আবৃত করলেও উলঙ্গ বিচরণ করাই ছিল এদের রীতি। গৃহবিহীন অবাধ যাযাবর জীবনের একমাত্র তাগিদ ছিল আহারান্বেষণ ; গাছের ছালে তৈরী ডিঙ্গি বা canoe নিয়ে বহিসমুদ্রে মাছ ধরায় এরা ক্ষিপ্রতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিত। সিডনি, মেলবোর্ণ, হবার্টের যাদুঘরে আদিম জাতির হস্তশিল্পের যে সব নিদর্শন রক্ষিত আছে তা দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বন্য বর্বর জীবনেও এরা একটা প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে আসছিল। এদের তৈরী ঢাল, লাঠি, দড়ি প্রভৃতির গঠন-নৈপুণ্যে শিল্পীর একাগ্রতা ও সুক্ষ্মরসবোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক আচার ব্যবহারেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সারাদিনের শিকারে যা কিছু সংগৃহীত হ'ল সেটা শিকারীর একা ভোগের বস্তু নয়—দলের বা গোষ্ঠির প্রত্যেকেই একটা নিদিষ্ট হারে আহার্যের ভাগ পাবে।

মুসলমান এবং ইহুদীদের মতো এরাও চুন্নত বা circumcission প্রথা পালন করে। স্ত্রীলোকের গর্ভধারণে পুরুষের সঙ্গ বা সহবাস যে প্রাকৃতিক নিয়ম—এই মৌলিক তথ্য এদের নিকটে অজ্ঞাত। এদের বিশ্বাস সন্তান-প্রজনন কোন ভৌতিক প্রভাবের ফল। কোন স্ত্রীলোক কতকগুলি বিশিষ্ট সময়ে কোন বিশিষ্ট জায়গায় গেলেই নাকি তার গর্ভসঞ্চার হয়। ভূমিষ্ট হওয়ার পর হ'তে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন ও শিক্ষা পিতার উপর না ব'র্তে, তার মাতুলের উপর বর্তায়।

চুন্নৎ বা circumcission পর্বের পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পুরুষই কোন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। অন্যথায় একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

ক্যাঙ্গারু নাচ এদের আমোদ-প্রমোদের একটা বিশেষ অঙ্গ। খেলাধুলা বা অবসর বিনোদনের দিক দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য খুব বেশী নেই। লুকোচুরি খেলার মত এদের ছেলেরাও এক রকম খেলা ভালবাসে। নাম তার কলটা গরগর। প্রকৃতপক্ষে কঠোর জীবন সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন তাগিদে এদের অবসর বিনোদন ও খেলাধুলার অবকাশ ছিল খুবই কম।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হরিহর আজ বাড়ী হইতে চাকুরীস্থলে যাইবে, যাত্রার শুভদিন, গোপাল ঠাকুর দেখিয়া দিয়াছেন। সদর দরজায় গরুর গাড়ী অপেক্ষমান, ভারবাহী বলদ দুইটি দুই আঁটি শুষ্ক খড় চিবাইতেছে। গাড়োয়ান ভিতর হইতে চাউল প্রভৃতি তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া গাড়ীর মাঝে সাজাইয়া রাখিতেছে, পথে ফিরিবার কালে তাহাকে পথে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। রেল ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় গরুরও বিশ্রাম প্রয়োজন এবং চালককেও ভাত খাইয়া লইতে হয়। কুকুটিয়ার আমবাগানে সকলেই রাঁধিয়া খায়—

হরিহর সহপাঠী চাঁদমোহনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, তাহার যাইতে এখনও দুই চারদিন দেরী হইবে। হরিহরের স্ত্রী বাক্স পেটরা প্রভৃতি দেখাইয়া দিতেছিলেন, গাড়োয়ান একে একে তুলিতেছিলেন। হরিহর ফিরিয়া আসিলে গোপাল প্রশ্ন করিলেন—কি বাবা, দেখা হ'ল, কথাবার্ত্তা সব হ'ল—

—হ্যাঁ—কি যেন একটা কথা বলিতে যাইয়া হরিহর থামিয়া গেল। গোপাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কি কথা সব হ'ল ?

হরিহর মাটির পানে চাহিয়া কহিল—চাঁদু বলছিল, ওখানে একটা বাড়ী করে ফেলার কথা, নইলে পরে ঠক্‌তে হবে—গ্রাম আর বাঁচবে না, সহরে বাড়ী থাক্‌লে—

গোপালের আর ধৈর্য্য ছিল না, তিনি কহিলেন—তা করো বাবা, যা সুবিধে হয়। আমরা গ্রামে থাকি, গ্রামের কথাই ভাবি, শহর বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তুমি ভেবো না—তোমার সমস্ত ধান ও হিসাব আমি ঠিক রাখবো—

হরিহর জবাব দিল না। হরিহরের স্ত্রী গোপালের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে গোপাল কহিলেন—সাবধানে থেকো মা, হরির সেবা-যত্ন করো—ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন—লাড্ডুর হাঁড়িটা গাড়ীতে দিয়েছ' ত ?

দরজার পাশে স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন—এই ত সে হাঁড়িটা, এটা তুমি না হয় হরি তুলে নিক্। ও ছোঁবে কি করে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত বটে! গোপাল হাঁড়িটা গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যাইতেছিলেন—হরির স্ত্রী কহিল—গাড়ীতে ত অনেক জিনিষ হ'য়ে গেছে, ওটা থাক্, ওরা লাড্ডু টাড্ডু খায়ও না—

—তা হোক্, পথে একটু খাবে—দাদুরা ত ছেলেমানুষ খিদে পাবেই—

হরি কহিল—শুধু শুধু নষ্ট হবে ত—

—হোক্—খাক্ আর নাই খাক্, যাবার সময় একটু কিছু দেওয়াই ত' আমাদের আনন্দ, হরি। দাদার মৃত্যুর পরে কত কষ্টে তোকে মানুষ করেছিলাম কিন্তু দু'দিন তোদের নিয়ে থাকতে পারি না।

হরি প্রণাম করিল। গোপাল বৌমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বৌমা, যে ক'দিন আমি আছি, ওদের নিয়ে এসো—একটু দেখবো—

বৌমা কহিলেন—আস্‌তে ত চায় কিন্তু আসা যে কষ্ট—অর্থাৎ হরি আসিতে চায় কিন্তু পথশ্রমের জন্য আসা চলে না।

গোপাল জবাব দিলেন না। হরিহর গাড়ীতে উঠিলেন—গোপাল উচ্চকণ্ঠে ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা⋯পাঠ করিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে বাঁকের পরে অদৃশ্য হইয়া গেল—হরি ও বৌমা কেহই ফিরিয়া চাহিল না, দরজায় দাঁড়াইয়া গোপাল ও তাহার স্ত্রী সাশ্রু নেত্রে এই বিদায় দৃশ্য দেখিলেন—গোপাল একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—তাহার নির্ব্বাক স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। গোপাল কহিলেন—যাও—আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে!

গোপালের মনে হইল—হরিহর আজ তাহার হৃদয় নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় তিনি মৌনভাবে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

হুকাটা সাজিয়া লইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—অনেক কথা—হরি যখন ছোট ছিল—তাহার বিবাহ দিলেন তখন তাহার স্ত্রী গলার হার খুলিয়া দিয়াছেন, সে হার তাহার বৌঠাকুরুণ দিয়াছিলেন। এমনি কত কি—

গোপালের স্ত্রী অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কলসী লইয়া ঘাটে রওনা দিলেন। গোপাল দেখিলেন তাহার মুখ বিষণ্ণ—বিদায় বেদনায় যেন কালির প্রলেপ পড়িয়াছে। এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও ওই স্ত্রীলোকটি একান্তে বসিয়া লাড়ুগুলি তৈয়ারী করিয়াছে কিন্তু উহারা লইতে চাহে নাই—এমনি অকুণ্ঠ স্নেহের দান তাহারা ফিরাইয়া দিতেছে। কি দিতেছে তাহাই শুধু দেখিল। কিন্তু কে দিল, কত স্নেহে, কত আগ্রহে, কত কষ্ট করিয়া দিল তাহা একবারও দেখিল না। এত কষ্ট করিয়া, এত সহ্য করিয়া তিনি কি হরিকে এই শিক্ষা পাইতে সদরে পাঠাইয়াছিলেন।

গোপাল মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন।

চাঁদমোহন সরকার তিনুকে লইয়া খাজনা আদায় করিতেছিলেন। প্রজারা কেহ বাহিরে কেহ ভিতরে বসিয়া ছিল। এক একজন ডাক হইতেছিল এবং তাহারা সাধ্যমত খাজনা দাখিল করিয়া চেক লইয়া যাইতেছিল। নিষ্প্রয়োজন বোধে শশধর আসেন নাই—এবং পাছে তিনি কোন দয়াদাক্ষিণ্য করিয়া বসেন এই ভয়ে চাঁদমোহন তাহাকে দূরেই থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বলাইএর ভগ্নিপতি অর্থাৎ সরোজের সাঙ্গার স্বামী আসিয়াছিল। সেও ভিনগ্রামের প্রজা—সে পাঁচ বিঘা জমি রাখে, খাজনা সোয়া ছয় টাকা। মুহুরী-আনা সেস্ প্রভৃতি লইয়া প্রায় সাত টাকা। মথুরের ডাক পড়িল—

মথুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তিনু কহিল—খাজনা কি এনেছ দাও—

মথুর একটু নিরীহ সংপ্রকৃতির ভীরু লোক। সে কহিল—হুজুর—

চাঁদমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—খাজনা টাজনা কিছু এনেছ না রং দেখ্‌তে এসেছ?

—দিতে লারছি হুজুর। ঘরে ত পেটভাত নেই—এক

—সকলে পারছে' তুমি পারছ' না। ও সব শয়তানী আমি বুঝি—

—হুজুর মা বাপ্, কি করবেক হুজুর।

—কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ হবে। আর আমাদের কতটুকু জমি চাষ কর?

তিনু কহিল—পাঁচ বিঘে—

—এবার ছাড়িয়ে দেব—সব সিধে করে দেব—

মথুর কাতর কণ্ঠে কহিল—হুজুর—

—যা—যা—হুজুর হুজুর ক'রতে হবে না—

মথুর ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিল। শিবুর ডাক পড়িল—শিবু দুই টাকা দিয়া কহিল—ধানচাল বেচা করলেক হুজুর, মুখের ভাত হুজুর বেচা করে দু'টাকা দিচ্ছেন হুজুর—

—তহুরী দু'আনা। তিনু বলিল।

—দেবেক হুজুর, দুদিন বাদে—

চাঁদমোহন কহিলেন—আচ্ছা ওটা জমা করে দাও—তহুরী দিয়ে যাবি—

—আজ্ঞে হুজুর—

নিতাইও দুই টাকা দিয়া নিস্কৃতি পাইল। তাহার পর ডাক পড়িল বলাইএর—বলাই উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে একটা বিদ্রোহ তাহার মাঝে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চুপ করিয়া রহিল। চাঁদমোহন কহিলেন—খাজনা এনেছিস্?

—আজ্ঞে হুজুর দিতে লারবেক। কোথায় পাবেক, ঘরের ধান ত ভাদর মাসে ফুরালেক। মনিষ খাটাবেক কে এখন—

চাঁদমোহন কহিলেন—হু—তোমার আর কিছু জুটলো না—বেটা ধাড়ি বদমায়েস—

বলাই কহিল—কোথা পাবেক কর্ত্তা—চুরি ডাকাতি করতে ম্ লারবেক—

—ও এরা বুঝি সব চুরি ডাকাতি করে টাকা আনছে—আর তুমি সতী লক্ষ্মী—ওর সব জমি ছাড়িয়ে দেবে তিনু—ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে দেব—

বলাই কোন কথা কহিল না। দূরের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদমোহন এই অবাধ্য প্রজার বিনয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দূর হ বেটা, জুতিয়ে তাড়িয়ে দেব—বদমাইস্—

বলাই কহিল—যাবেক তব বটেই হুজুর—বলাই চলিয়া আসিল।

সে জানিত, যাইতে তাহাকে হইবেই—শুধু এই কাছারী হইতে নয় এ গ্রাম হইতেও। বলাই কাছারী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বাড়ীর দিকে চলিল—গ্রামের সর্ব্বাঙ্গে একটা মমতার চাহনি বুলাইয়া একবার হয়ত ভাবিল, এর গাছ-পালা পথ-ঘাট তাহার কত আপনার, কিন্তু তথাপি তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

পথে গোপাল ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। বলাই প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—ঠাকুর মশায় মোরা চলে যাবেক—

—কোথায় যাবি ?

—ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক, কেমনে গাঁয়ে থাক্‌বেক বাবাঠাকুর—

গোপালের মনটা ভাল ছিল না। চাঁদমোহনের খাজনা আদায়ের ব্যাপার সবই জানিতেন। এই কয়েকটি কথায় সবই তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটু বিচলিতভাবেই বলাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

বলাইএর অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া তাহার বেদনা কোথায় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন—তাই কি হয় রে বলাই, প্রজা না থাকলে জমিদারের জমিদারী কি ? আজ কাল অমনিই হয়েছে, তাই বলে গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবি ? চৈত্র মাসে খাজনা দিস, তা হলেই সব মিটে যাবে—

কথা কয়েকটির মাঝে বলাই অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়া যেন আপনার দুঃখকে অনেকখানি ভুলিয়া গেল। গোপালের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। গোপাল কহিল—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো—

বলাই অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল কিন্তু গোপাল হাসিলেন—তাহার এ আশীর্ব্বাদ একেবারেই মিথ্যা। কেহ বাঁচিয়াও আর থাকিবে না। কেহ আর সুখেও থাকিবে না। গ্রামের সে শান্ত নীরব শুচি পরিবেশ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে।

বলাই ঘরে যাইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়াছিল। যদি চৈত্র মাসে বর্গা জমি সব বাহির হইয়া যায়, তবে থাকিবে মাত্র দুই বিঘা জমি, তাহাতে ভরণ-পোষণ চলিতে পারে না। বলাইএর স্ত্রী মালিনী প্রশ্ন করিল—কি হলেক রে ?

বলাই কহিল—তু বুঝবি না, ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক।

—কেনে—

—খাজনা দিতে লারলেক।

মালিনী কথাটার অনেকখানি বুঝিয়াছিল। সে কহিল, জমি সব লিয়ে লিলে খাবেক কি ? বললি না—

—এ ত কর্ত্তা নয় রে মালি, এ ছোটবাবু—কোন কথা শুনবেক নাই, তার কথাই শুনতে হবেক—সে কাল আর নাই রে মালি—

—কি করবি ?

—পেট ভাত না জুটে ত খাদে যাবেক, কয়লা কাট্‌বেক—

মালিনী কহিল—গরু কি করবি ?

—বেচা করবেক—যা তু কাজ কর—

বলাই বিরক্ত হইয়াছিল, সে আর কোন কথার জবাব দিল না। মালিনী অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ গৃহকর্ম্মে—

বলাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল—যাহা হইতেছে এবং যাহা হইতে যাইতেছে সবই যে অন্যায় ও অত্যাচার—এ বিষয়ে তাহার কোন সংশয় ছিল না, মনে মনে চাঁদমোহনের প্রতি একটা ক্রোধ ও অভিমানে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—

নিতাই আসিয়া কহিল—বলাই, দে তামাক খাবেক—

বলাই ইঙ্গিতে হুকা কলিকা ও তামাকের সরঞ্জাম দেখাইয়া দিল। নিতাই তামাক সাজিয়া আনিয়া কহিল—তোর খাজনা ত আড়াই টাকা—হ্যাঁরে বলাই—

—হ্যাঁ বটে—

নিতাই কহিল—চল্ আজ মাছ ধরা করি, কাল পাঁচ সিকে খাজনা দেওয়া করবেক। ছোটবাবু জমি ছাড়া করাবেক নাই। ওর মাছে ওর খাজনা দেওয়া কর কেনে—যেমন কাজ তেমনি ফল পাবেক—মোরা ত তাই করলেক—আরও একটা মাছ সেদিন ভাজা করে খাওয়া করলেক—

বলাই কিছু কহিল না। চুপ করিয়া রহিল—সে জানিত বসন্ত সায়রের মাছ বিক্রয় করিয়াই নিতাই ও শিবু খাজনা

পরিশোধ করিয়াছে। কিন্তু একটা অন্যায় দ্বারা আর একটা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না বরং অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়া চলে, এই কথাই বোধ হয় বলাই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছিল। নিতাই হুকা দিয়া কহিল—বলাই কি হবেক রে ?

বলাই হুকা টানিতে টানিতে কহিল—ভগমান যা কপালে লিখ্‌লেক তাই হবেক।

—তু চল, মাছ ধ্‌রবেক—

—না, মু চুরি ক'রবেক নাই। জমি ছাড়া ক'রলে খাদকে যাবেক—চুরি করবেক কেনে ? মোর বাবা বল্‌লে, কর্ত্তা যখন গঙ্গা যাত্রা করলেক, মা ঘরে কেঁদে আঁচল ভেজা করালেক। মোদের বাড়ী পুড়লেক তাই বসন্ত সায়র বানা করালেক—তার মাছ চুরি মু করবেক না—

—তবে জমি ছাড়বেক—

—মু ত ছাড়বেক নাই, ছোটবাবু ছাড়া করাবেক ত ছাড়বেক—

—মথুর কি করবেক ?

—কে জানছে—সব খাদকে যাবেক। তোরা বিশ বিঘা চাষ করবি—তোদের ক্ষেতকে আট্‌কাবেক—

নিতাই এ সব যুক্তির কিছু বুঝিল না। একরাত্রি একটু পরিশ্রম করিলেই ত খাজনা পরিশোধ হয় তবে কেন এত কষ্ট করা। নিতাই কহিল—কি বুঝছিস্ তু ?

বলাই জবাব দিল না, নিতাই চলিয়া গেল। বলাই হুঁকা টানিয়া যাইতে লাগিল। মালিনী আসিয়া কহিল—ঝুড়ি ত নাই রে—

বলাই একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দা লইয়া বাঁশ ঝাড়ের দিকে রওনা দিল। কঞ্চি কাটিয়া আনিয়া দুইটা ঝুড়ি তৈয়ারী করিতে হইবে।

গোপালের ইচ্ছা ছিল না তবুও অভ্যাস বশতঃ চাটুয্যেদের কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা এক প্রহর হইয়াছে—বাহিরে শারদীয় স্নিগ্ধরৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবী—গোপাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রজারা সকলে চলিয়া গিয়াছে, তিনু আদায়ী টাকার হিসাব করিতেছিল, চাঁদমোহন বসিয়াছিলেন, শশধর একপাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

গোপাল প্রবেশ করিতেই, শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—বসুন, ঠাকুর মশায় বসুন—হঠাৎ এমনি সময় ?

(ক্রমশঃ)

বঙ্গসাহিত্যে হীরেন্দ্রনাথের দান

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

কয়েক বৎসর হইল দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যায় যে কার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ চিরজীবন সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক হিন্দুসমাজের অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার "রাস-লীলা" প্রকাশিত হইলে বৈষ্ণবসমাজের কেহ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দানে বঙ্গভাষা যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দান ত্রিবিধ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ।

এই সূত্র অনুসারে বর্ত্তমানকালে সাহিত্যে সাত্ত্বিক দান দুর্লভ। সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যসেবা দ্বারা বর্ত্তমানে জীবিকার্জ্জন (কঠিন হইলেও) পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে এবং কয়েকজন বঙ্গসাহিত্যসেবী সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের দানকে কিন্তু সাত্ত্বিক দান বলা যায় না। অর্থ কামনা না করিয়া কেবলমাত্র যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহাদিগের দানও সাত্ত্বিক নহে। কিন্তু ইহা হইতে যদি অনুমান করা যায় যে সাহিত্যে দান কখনও সাত্ত্বিক হইতে পারে না—কেন না যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা সকল সাহিত্যিকেরই থাকে, (মহাকবি কালিদাসেরও ছিল) তাহা হইলে ভুল হইবে। কেননা প্রাচীনকালে অনেক কবি কেবল লোকহিতার্থেই সাহিত্য-রচনা করিয়া, তাহা সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বগত সাহিত্যিকদিগের গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, যশঃলোভী হইয়া আপনাদের নামে প্রচার করেন নাই। হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার মূলে ছিল,

তাঁহার অকৃত্রিম স্বধর্মপ্রীতি ও দেশপ্রীতি এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবা। ফলাভিসন্ধিবর্জিত নহে বলিয়া, তাহা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক না হইলেও সাত্ত্বিক দানেরই সান্নিধ্যবর্তী।

হীরেন্দ্রনাথ ব্যবহারাজীবী ছিলেন, কিন্তু জীবিকার জন্য উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনাতেই ব্যয়িত হইত। তিনি থিওসফিকাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং শ্রীমতী আনি বেশান্তের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। বঙ্গদেশে থিওসফির মত প্রচারের জন্য তিনি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে পারদর্শী এই মনীষী অর্দ্ধশতাব্দীকাল বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নানাভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আধুনিকতম মতের সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকদিগের মন হইতে হীনমন্যতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময় ছিল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের বিশেষ কোনও স্থান ছিল না। আমরা যখন বি-এ পড়ি, তখন বি-এ অনার্সেও হিন্দুদর্শনের পাঠন হইত না। বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমানে সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত। এখন আর্ট-এর ছাত্রগণ হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে অল্পাধিক জ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সাময়িক-পত্রিকাগুলিতেই কেবল হিন্দুদর্শনের আলোচনা হইত। হীরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম্মের দুইটি প্রধান স্তম্ভ। উভয় তত্ত্বই উপনিষদে বিবৃত আছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিতবর ৺কালীবর বেদান্তবাগীশের শঙ্করভাষ্য ও অনুবাদসহ বেদান্তদর্শন বোধ হয়, তখন প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার "উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব" এবং "যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ "ব্রহ্মবিদ্যা" ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য সংশোধিত করিয়াছিলেন। এতদিন পরে সেই সকল প্রবন্ধ "উপনিষদ জড় ও জীবতত্ত্ব" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হয়। পাতঞ্জলদর্শন ইহার সেশ্বররূপ। সাংখ্যদর্শনের ত্রিগুণবাদের মূল যে উপনিষদে নিহিত, গ্রন্থকার সবিস্তারে তাহা দেখাইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মকে বিশ্বরূপং ত্রিগুণ ত্রিবর্ত্তন বলা হইয়াছে। আবার ঐ উপনিষদেই "অজাং একাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং" বলিয়া প্রকৃতির বর্ণনাও আছে। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াও গ্রন্থকার সাংখ্যদর্শন যে উপনিষদ হইতে উদ্ভূত তাহা দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু ১৷৬৯ সাংখ্যসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনমতে অচেতন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে। এই বুদ্ধিও অচেতন, চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব ইহার উপর পতিত হইলে ইহা চেতনের মতো হয়। অসংখ্য পুরুষের সহিত অসংখ্য সংযোগের ফলে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়; সে বুদ্ধি সসীম ব্যক্তিগত বুদ্ধি হইবার কথা। কিন্তু এই বুদ্ধিকে (মহত্তত্ত্বকে) কেহ কেহ সমষ্টি বুদ্ধি (Cosmic Intellect) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। কিন্তু স্বতন্ত্র পুরুষের সহিত সংযোগের ফলে প্রকৃতির যে বিকার হয়, তাহা অসীম বুদ্ধি হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য। আবার তাহা যদি ব্যক্তিগত বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধি হইতে যে পঞ্চতন্মাত্র ও পরে স্থূলভূত-সমূহের উদ্ভব হয়; তাহাদিগের দ্বারা সর্ব্ববুদ্ধি সাধারণ বাহ্যজগতের উৎপত্তি হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। সেশ্বর সাংখ্যদর্শনে এ সমস্যা নাই, কেননা তাঁহার যাবতীয় বুদ্ধির আধার এক মহেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্রে এই সমস্যার সমাধান কি? অহং তত্ত্বের পূর্ব্বে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়, তাহা অবশ্য জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্ত নহে। কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিত্বের বীজ তো নিহিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব বীজসমন্বিত বুদ্ধি হইতে এক সাধারণ জগতের উদভব অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। উপনিষদে যে মহত্তত্ত্বের কথা আছে, তাহা যে সমষ্টিগত বুদ্ধি (হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি) তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে গ্রন্থকার বহু বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরমাত্মা ও প্রত্যাগাত্মা শীর্ষক অধ্যায়ে—ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ, মৃত্যু ও উৎক্রান্তি অধ্যায়ে জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় যে যে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার সকলই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

"কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর" গ্রন্থে যেমন শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া জন্মান্তর মতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তেমনি দার্শনিক যুক্তিদ্বারা তাহা প্রমাণিত করা হইয়াছে। নানাবিধ যুক্তিদ্বারা গ্রন্থকার জড়বাদীদিগের যুক্তির খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার অমরতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং নানা প্রমাণ দ্বারা—জন্মান্তর যে সংঘটিত হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিস্তারিতভাবে তাহা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ আলোচনা পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যতটা বিস্তার হইয়াছে, সেই পরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য উপন্যাস গ্রন্থের যথেষ্ট চাহিদা থাকিলেও দর্শন-বিজ্ঞান-প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের পাঠক বেশী নাই। ইহা সত্ত্বেও হীরেন্দ্রনাথের কোনও কোনও গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। তাঁহার উপনিষদ ও জন্মান্তর গ্রন্থদ্বয়েরও যে বহুল প্রচার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সানফ্রান্সিস্কো

এক শনিবারে এখানে একটি ছোটখাটো ঘরে বক্তৃতা দিতে হ'ল। Metaphysical Hall -এখানে কত যে বই দেখলাম ধর্ম সম্বন্ধে! গুরুদেবের বই ও ছবিও দেখলাম। এমন কি রমণ মহর্ষির ছবিও এরা রেখেছে। আনন্দ হ'ল। মনও উঠল উজিয়ে গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে, ঘর ভ'রে গিয়েছিল যদিও বেশি বড় তো নয়—তাই সব জড়িয়ে ৭০।৮০ জন শ্রোতা ও শ্রোত্রী শুনল আমার বক্তৃতা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে। আমি বললাম প্রায় এক ঘন্টা পনের মিনিট। বাংলায় তর্জমা ক'রে মর্মটুক মাত্র দিই সংক্ষেপে।

"আপনাদের কাছে আমি আসি নি আজ বক্তা হিসেবে—এসেছি আপনাদেরি একজন হ'য়ে, মানে জিজ্ঞাসু সত্যার্থী। যা বলতে যাচ্ছি তার কিছুই হয়ত আপনাদের অজানা নেই, তবু যদি কেউ কিছু অনুভব ক'রে বলে তবে সেই অনুভবের তাপে জানা কথাও হৃদয়গ্রাহী হয়। এইটুকুই যা আমার ভরসা।

"ভারতবর্ষে একটি কথা হয়ত অন্য দেশের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত তথা গ্রাহ্য হয়েছে: যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ-কথা আমরা বহুদিন থেকে শুনে ও প'ড়ে আসছি এবং এক সময় ছিল যখন এ-বাণীতে অবিশ্বাস করার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দীক্ষার প্রভাবে আমরা ভাবতে সুরু করেছি: এও কি সম্ভব? এক তো প্রথমত ভগবান আছেন কি না এই গোড়া ধরেই টানাটানি। তার পরে যদি বা ধ'রে নেওয়া যায় যে এ জগতের এক নিয়ন্তা আছেন। যিনি অনাদি অশেষ 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ'—তখনও নিস্তার নেই, প্রশ্ন ওঠে: অণোরণীয়ান্ কীটা-দপিকীট মানুষ কি এমন মহতো মহীয়ানকে পেতে পারে? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবীর বলেছেন হেসে যে সিন্ধুতে বিন্দু দেখতে পায় সবাই, কিন্তু বিন্দুতে যিনি সিন্ধু দেখেন সেই বিরল দ্রষ্টারই উপাধি—জ্ঞানী।

"কিন্তু এ দর্শন যে আমাদের আয়ত্তাধীন একথা জানব কার কাছে? না, তাঁদের কাছে যাঁরা দেখেছেন, যাঁদের নাম জ্ঞানী বা ঋষি বা মহাপুরুষ। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন এহেন মহাপুরুষের দেখা, প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে: 'আপনি কি দেখেছেন তাঁকে?' উত্তরে হেসে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব: 'শুধু যে দেখেছি তাই নয়, তোমাকে দেখাতে পারি যদি তুমি চাও সে পথের পথিক হ'বে—যে-পথে চললে তাঁর দেখা মেলে।' ঠিক এই কথাই ব'লে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাজারের লেখায়, বাণীতে, পত্রে। আমাকে তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে: 'বাস্তব? কাকে বলছ তুমি বাস্তব? মধ্যাহ্ন সূর্যকে বাস্তব বলবে তো? যদি তাঁকে দেখতে পাও, যদি তাঁর শান্তি রসে আপ্লুত হ'তে পারো, যদি তাঁর আনন্দ হিল্লোলে তোমার দেহের প্রতি অণু হয় রসস্নিগ্ধ, সুধাসিক্ত, হিল্লোলিত তখনও এ-প্রশ্ন উঠতে পারে ভাবো যে তাঁর দর্শন তাঁর স্পর্শ বাস্তব কিনা? আমার জীবন্মুক্ত কবিতায় আমি দিয়েছি খানিকটা আভাস—কিন্তু শুধু কণিকা আভাস মাত্র—যে তিনি কি রকম প্রত্যক্ষ প্রেমাবেশে ভক্তকে ধারণ ক'রে থাকেন, কেমন তাঁর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন।

"কিন্তু এজন্যে চাই তাঁর শক্তির শরণাপন্ন হওয়া, বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে:

> 'O mortal, bear this great world's law of pain,
> In thy hard passage through a suffering world
> Lean for thy soul's support on Heaven's strength
> Make of thy daily way a pilgrimage.
>
> 'হে মানব! এ-বিশ্বের অঙ্গীকারি' বেদনা-বিধান
> ক্লিষ্ট জগতের সুদুর্গম পন্থে আত্মারে তোমার
> করো ন্যস্ত আজ সর্বধাবয়িত্রী দৈবশক্তি 'পরে…
> দৈনন্দিন পথ তব হোক তীর্থযাত্রি-পথ সম।'

"কিন্তু এ সর্ত পূরণ মুখের কথা নয়। তাই মেলে না তাঁর ধারয়িত্রী শক্তির স্পর্শ। পাবার মতন কিছু পেতে হ'লে শিখতে হবে চাওয়ার মতন চাওয়া। আমরা চাই না পরম স্পর্শমণি, কাঞ্চন ছেড়ে থাকি কাচ নিয়ে ভুলে। ইন্দিরার একটি মীরাভজনে আছে 'ঔ দীপকো ন মোল কর অমোল রতন ছোড়কে'—ঝিনুক নিয়ে দর কেন আর ছেড়ে অমল মুক্তা-ধনে?' (শ্রুতাঞ্জলি, ১১৪ পৃঃ)

"জগতে আজ দুঃখ কষ্ট নিষ্ঠুরতা অবিশ্বাস—এরাই সর্বেসর্বা। যেখানে চাই, দেখতে পাই মুক্তা ছেড়ে শুক্তির জন্যে কাড়াকাড়ি। এ পথে মেলে না পরম চেতনার পরশমণি। যদি সত্যি চাই এ-মণি—যেতে হবে তাঁদের কাছে যাঁদের করায়ত্ত হয়েছে এই মণির মণি। তাই গীতায় বলেছে:

> 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
> উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ'।

অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চাই তিনটি জিনিস, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাঁকে করা চাই প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা! তাহ'লে তাঁরা দেবেন জ্ঞানের বর।

"এ-বাণী ভারতীয় সন্ধানীদের মনে ঠাঁই পেয়েছে প্রথম থেকেই। তাই বহুদিন থেকেই ভারতে শরণীয় ও বরণীয় ব'লে গণ্য হয়েছেন জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ভাবুক ভক্ত। কারণ সত্যিকার উপদেশ দিতে পারেন কেবল তাঁরাই

আর কেউ নয়। পাশ্চাত্য দেশে আজকের দিনে এ-উপদেষ্টার সিংহাসন অধিকার করেছেন ঋষি মুনি জ্ঞানী যোগীরা নন—এখানে পরমশরণ্য হ'লেন বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, রণবীর। অনেকে হয়ত আজো পুরো-পুরি টের পান নি একথা যে পাশ্চাত্য দেশে আজ খৃষ্টধর্মের পুরোহিতরা নামে মাত্র উপদেষ্টা, আসল দীক্ষাদাতা আজ বুদ্ধিবাদী তথা বৈজ্ঞানিক - যাঁরা বলছেন ঠেঁকে যে চোখে দেখা যায় না, ভেবে-পাওয়া-যায়-না, একটু যদি বা ছুঁই ধরতে গেলেই যায় ফ'স্কে—এমন সত্যকে ডিশমিশ ক'রে যাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া তাকে নিয়ে ঘর করাই সুবুদ্ধির কাজ। অন্য-ভাষায়, বুদ্ধি ও যুক্তি যার নাগাল পায় তার কাছেই হাত পাতো।

"কিন্তু চলতি বুদ্ধি হাজার ধারালো হ'লেও পায় না অচিন্ত্যের দিশা করা—সে পরম মণি শুধু বিশ্বাসের কাছে প্রেমের কাছে নিরভিমানের কাছেই ধরা দেয়—আর কারুর কাছে নয়।

"তাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শীরা ব'লে এসেছেন বরাবরই যে বুদ্ধির অভিমান ছেড়ে হাত পাততে শেখো এই বিশ্বাসের কাছে যে, তাঁকে পাওয়া যায় যদি চাওয়া যায়। বলেছেন : আধ্যাত্মিক পথের তীর্থযাত্রী এ বিশ্বাসের পারানি বিনা দুস্তর অজ্ঞানাম্বুধি পার হবার চেষ্টা করলে মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি হবেই হবে। আগে চাই জানার আগে মানা—দীনতার সুরে চাই বলতে শেখা : আমি জানি না তুমি জানাও। আমি চিনি না, তুমি দাও চিনিয়ে।

"পাশ্চাত্য জগৎ রুখে উঠে বলল : 'না। আমরা কিছুই মেনে নেব না। আগে দেখব তবে মানব। একথা শুনতে মন্দ লাগে না হয়ত, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে এ দাবি করে আমাদের আত্মম্ভরী মন তার অজ্ঞানকে নিয়েই ঘর করতে চেয়ে। তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে (যখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন ?) যে মানুষের সব আধিব্যাধির মূলে আছে তার অজ্ঞানা-সক্তি। জ্ঞানকে যে চাইবে তাকে ছাড়তেই হবে এই আত্মাভিমানের অজ্ঞানের দাসত্ব।

"এই যে পরম বাণী এ আমরা শুনে আসছি কবে থেকে! কিন্তু মুস্কিল এই যে, জগতে আমরা হাজার দুঃখ পেলেও চাই না জাগতিক দুঃখ থেকে অব্যাহতি। আমাদের মধ্যে আছে এক বিচিত্র দুঃখাসক্তি। আর এ-দুঃখাসক্তিই দেবদ্রোহিতার জননী তথা ভরণী। আমরা চাই না নিজের চেতনার রূপান্তর। যাতে অভ্যস্ত তাকে নিয়ে ঘর করতে ভালো লাগে, অথচ অতৃপ্তি যখন ছেয়ে যায় মনে প্রাণে তখন হ'য়ে উঠি অতিষ্ঠ। আসে বৈরাগ্য—একদিন না একদিন আসবেই সবার মনে এই বৈরাগ্য—নিছক ইন্দ্রিয় সুখে বিতৃষ্ণা। তখনই আসে ডাক—মন বলে 'বৈরাগ্য মেবাভয়ম্।' "এ-বৈরাগ্য দুরকম। এক, যে বলে এ জগৎ মায়া সুতরাং পরিত্যাজ্য। এ শ্রেণীর বৈরাগ্য সূচনায় কিছুদূর এগিয়ে দিলেও অন্তিমে আনে আংশিক অসাফল্য—কেন না এ-জগত ভগবান সৃষ্টি করেছেন শুধু দুঃখের ছায়াবাজি দেখাতে নয়—নব নব পরিবেশে তাঁর আনন্দের নব নব লীলা ছন্দ সুর তাল মূর্ত ক'রে ধরতে। তাই শ্রীঅরবিন্দ চান না বিশ্ববিমুখ বৈরাগ্য।

"কিন্তু আর এক ধরণের বৈরাগ্য আছে যার নাম সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। সে বলে : 'আমি চাই সেই অমৃত যা আমাকে করে অমৃত—যে-সুখে অমৃত স্বাদ নেই কী করব সে সুখ নিয়ে—সে তো সুখের ছদ্মবেশে দুঃখ : সুরু যার অলীক অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগে কিন্তু সারা—অবসাদে অতৃপ্তিতে হাহাকারে।' বৃহদারণ্যকে তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে যে গ্রাম্য সুখে তাঁর না আছে রুচি, না আস্থা—তিনি চান অমৃতকে :

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ?
যাতে অমৃত হব না, তাকে নিয়ে কী করব !'

'আজকের দিনে আমাদের সব আগে বরণীয় এই অমৃত বাণীতে পুনর্বিশ্বাস, গভীর শ্রদ্ধা, অনিত্য বস্তু ছেড়ে নিত্য বস্তুর কাছে হাত পাততে

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

দেখা আর এ দীক্ষা দিতে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ অরবিন্দের মতন ঘোষণা করতে পারেন যে 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—যাঁরা দেখেছেন যে মানুষ তার মানবত্বেই পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না—উঠতে হবে তাকে মানবতা ছেড়ে ভাগবতী চেতনার কোঠায়—উত্তীর্ণ হ'তে হবে অতিমানব-লীলায়। এ-উত্তরের ফলে কী হবে প্রচার করেছেন এ যুগের মহা ঋষি তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে :

When superman is born as Nature's King
His presence shall transfigure Matter's world :
He shall light up Truth's fire in Nature's night,
He shall lay upon the earth Truth's greater law ;

Man too shall turn towards the spirit's call···
A divine force shall flow through tissue and cell
And take the charge of breath and speach and act
And all the thoughts shall be a glow of suns
And every feeling a celestial thrill···
Nature shall live to manifest secret God,
The spirit shall take up the human play,
This earthly life become the life divine.

যেদিন অতিমানব হবে প্রকৃতির অধিরাজ,
রূপান্তরিত হবে বস্তুবিশ্ব আবির্ভাবে তার।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সত্যের জ্বালিয়ে অগ্নি সে বিশ্বের গভীর নিশীথে,
স্থাপিবে ধরার 'পরে ধর্মের বিধান মহত্তর ;
সত্যের আহ্বান মুখে ফিরিবে মানবও সেই দিনে···
প্রবাহিবে এক দিব্য শক্তি প্রতি অণু, প্রতি কোষে,
নিয়ামক হবে সে-ই প্রতি শ্বাস বাণী ও কর্মের,
প্রতি অনুভব হবে স্বর্গের পুলক শিহরণ,
প্রবৃত্তি প্রবহমানা হবে প্রমূর্তিতে গূঢ় দেবে,
মানব লীলায় রশ্মি অন্তরাত্মা করিবে ধারণ,
এ-মর্ত্যের লীলা হবে ছন্দায়িত অমর্ত্য জীবনে।

* * * *

কয়েকদিন বাদে হল-এর অধ্যক্ষ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন খামে ক'রে পঁয়ত্রিশ ডলার। বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরীকে বললাম। হরিদাস বললে : "এখানে সব কিছুর জন্যেই এরা টাকা দেয়। এমন কি ধরুন আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলতে এল—যদি দরকারি কথা হয় তবে কথাবার্তার পরে দেবে দক্ষিণা।" ইন্দিরা হেসে বললে আমাকে : "আমাদের সভয় হোটেলের কথা মনে পড়ল। একজন বলেছিল আমার পিতৃদেবকে : 'ক্যাপ্টেন সাব্! আপনি যে-হোটেলের পাট বসিছেন সে অতি নিদারুণ। এখানে একটিবার হাঁচলেও কয়েকটি চাকতি বেরিয়ে যায়।' কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কী আছে—যখন মার্কিন জাত স্বভাবে সুপার-হোটেলবাসী!

এক দেশের ধরণধারণ অপরের কাছে বিচিত্র লাগে অনেক সময়েই। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে—বলে না? ধরুন, এখানে মোটর রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "পার্কিং"। এখানে যে কী মুস্কিল মোটর "পার্ক" করা। এখানে পার্কিং নৈব নৈব চ, ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়, সেখানে আধ ঘণ্টা দাঁড় করালেও পাঁচ ডলারের বিল। একটি সুড়ঙ্গ দেখলাম আমাদের হোটেলের কাছে—একটি মনোরম উদ্যানের নিচে দুর্দান্ত সুড়ঙ্গ! কী? না, মোটর "পার্ক" করা যেতে পারে—প্রতিদিন এখানে নাকি ৬৩০০ মোটর দাঁড়ায় (এক চিঠি দেখালেন এক বন্ধু—লস এঞ্জেল্সে কোথায় গান্ধিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা—কার্ডে লেখা : "Cars can be parked" মিস টাইবার্গ আমাদের নিয়ে যান নানা জায়গায় তাঁর মোটরে—অনেক জায়গায় প্রায় পাঁচ মিনিট হেঁটে তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হয়—যেহেতু অন্যত্র মোটর পার্ক করা যায় না। সব চেয়ে মজার খবরটা বলি রসিয়ে। কনসালের বাড়ি তাঁর আপিস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। রোজ তাঁকে আপিসে আসতে হয় কিন্তু মোটর ফিরে যায় তাঁর বাড়িতে—কেন না আপিসের কাছাকাছি কোথাও মোটর পার্ক করতে হ'লে দিন পিছু পাঁচ ডলার খরচা। অন্য পক্ষে ২০ মাইল আসতে পেট্রোল খরচ এক ডলার। সুতরাং বুদ্ধিমানে কী করবে? উত্তরের কি প্রয়োজন আছে?

আতিথেয়তা ও বদান্যতারও চূড়ান্ত! মিসেস ডার্লিং ছাড়েন না, প্রায়ই ধ'রে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে—মধ্যাহ্ন ভোজন না ক'রে নিস্তার নেই। একজন ভদ্রলোক ইন্দিরার হাঁপানি আছে শুনেই ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন নানাবিধ—খরচ দিয়ে। আর একজন টেলিফোন করলেন : "সান-ফ্রান্সিস্কো দেখবার মতন দেশ—চলুন মোটরে ঘুরিয়ে দেখাই চার ঘণ্টা।" চার ঘণ্টা ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া মানে তো প্রায় দেউলে হওয়া। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম : "আচ্ছা"। আর একজন বললেন : "দিনের বেলা আমার কাজ। তবে যে-কোনো দিন সন্ধ্যায় টেলিফোন করলেই আমি আসব মোটর নিয়ে—নানা জায়গায় নিয়ে যাব, যদি চান।" এবার ধন্যবাদ দিয়ে বলতেই হ'ল "না"। কারুর কাছ থেকে ক্রমাগত সেবা নিতে বাধে —বিশেষ যখন দেখি প্রতিদানে আমাদের কিছুই দেবার নেই। এরা

হাঁ হাঁ ক'রে আপত্তি করে: "দিচ্ছেন না? সে কি কথা? আপনার কাছে আমরা যে কী পাচ্ছি তার কতটুকু খবর রাখেন মহাপ্রভু?"

* * *

মোটর নিয়ে এলেন সজ্জন। সত্যিই অতি সজ্জন—নাম ওয়েস্টন ডেভিড হাণ্টার, এখানে থিয়েটারের ডিরেক্টর। কোনো থিয়েটারে দুর্নীতির বাড়াবাড়ি দেখে ইনি সেখানে জীবিকা অর্জন ছেড়ে অন্যত্র যান। অর্থাগম ইনি চান কিন্তু সদুপায়ে। ধর্মভীরু মানুষ আজকের দিনে যে খুব বেশি দেখা যায় না একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। ধর্মভীরু—ওরফে God fearing—বিশেষণটি উচ্চারণ করতে না করতে মনে পড়ে ভীরু বিশেষণটি। অর্থাৎ অধর্ম করতে যারা ভয় পায় তারা কাপুরুষ। তাছাড়া নৈতিকতার নিয়মকানুনও বদ্‌লে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু এই মানুষটি দেখলাম আধুনিক হ'য়েও অত্যাধুনিক নন। তাই বুঝি ধর্মভীরু? মোটরে নিয়ে ঘোরালেন প্রায় চল্লিশ মাইল। সানফ্রান্সিস্কোর বিখ্যাত "স্বর্ণদ্বার" Golden Gate বাগান দেখলাম। বাগান না ব'লে বোধহয় নন্দন কানন নাম দেওয়াই ভালো। কী সুন্দর সবুজ মাঠ, বীথিকা, উঁচু নিচু রাস্তার বাহার! এদিকে ফুলের পাতার অজস্রতা, ওদিকে বিশাল প্রশান্ত মহাসমুদ্র লক্ষ ফেন বাহু তুলে অভিনন্দন করেছে ধরণীকে। এক এক জায়গায় খাড়াই উঠে দেখি ওমা!—সমুদ্র একেবারে আমাদের পাদমূলে মাথা কুটছে! তারপরেই ফের হুশ ক'রে নেমে সমতল সৈকতে বিচরণ।

এই মঞ্জু পরিবেশে কত গল্পই হ'ল যে। ইন্দিরা সহজে কারুর সঙ্গে এত মন খুলে কথা কইতে চায় না, কিন্তু এই নবলব্ধ বন্ধুটি পেয়ে সে যেন উজিয়ে উঠল। বলল তাঁকে অনেক কিছু—পাশ্চাত্যের আত্মাভিমান সম্বন্ধেও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। বলল: এখানে ওখানে নানা শুভার্থীরই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে প্রকট হ'য়ে ওঠে এঁদের মার্কিণ সভ্যতার সম্বন্ধে গভীর অভিমান, আত্মপ্রসাদ—আমরা কী পরোপকারী পতনোন্মুখ কত যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে সর্বদাই প্রস্তুত! "কিন্তু"—বলল ইন্দিরা হেসে—"আমাদের গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা একটু অন্যধরণের দীক্ষা: যে, অপরকে তুলবার আগে একটু নিজেকে তুললে ভালো হয়।"

বন্ধুবর হেসে বললেন: "আপনি আমাদের আত্মাভিমানের গোড়ায় গলদের কথাটি বলেছেন চমৎকার। এ আমি নিজেও বহুসূত্রেই অনুভব করেছি। তাই তো আমি শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছি…" ইত্যাদি।

আরো কত কথা হ'ল পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে। ইনি বললেন একদিন আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁদের নবতম নাটকের মহলায়—ফ্রান্সিস টমসনের বিখ্যাত কবিতা "হাউণ্ড অফ হেভ্‌নের" নাট্যরূপ। ফেব্রুয়ারি মাসে এ-নাটকটি এখানে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। ফ্রান্সিস টমসনের "হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন্" কাব্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ উচ্চধারণা প্রকাশ করেছেন। আমি এ কবিতাটি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে পরমানন্দে। বন্ধুবর ক্ষিতীশ সেন বম্বেতে আমাকে বলেন—সে কবে—যে এই বইটির ছন্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দের প্রেরণা পেয়েছিলেন। যদিও এখানে ব'লে রাখি—অবান্তর হ'লেও—যে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে একথা সত্য নয় যে বলাকার ছন্দে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এ ছন্দে প্রথম কবিতা লেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আর্যগাথায়। কিন্তু সে থাক—বন্ধুবরের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এ-বন্ধুটির মধ্যে ভাবুকতা দেখে বড় ভালো লাগল। ইনি একলাই থাকেন ও সারাদিনের কাজের পরে খুব হৈচৈ না ক'রে অন্তর্মুখীনতারই সাধনা করেন—ধ্যান ধারণা পাঠ এই সব নিয়ে আধ্যাত্মিকতার শ্রদ্ধা তথা প্রবেশ এঁর সহজাত। আর একটি মার্কিণ যুবক একদিন টেলিফোন করলেন: সেদিন রাতে আমার বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছে—দেখা করতে চান। ইনি এলেন একটি তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে। বুঝতে দেরি হ'ল না যে বান্ধবী বন্ধুর প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যা হয়—ইনি চান ধর্মজীবন স্বকীয় তৃষ্ণায়, উনি চান ধর্মজীবন এঁর জন্যে। বল্লভের ধর্মতৃষ্ণায় সাড়া দেন দরদী হ'তে চেয়ে যাকে বলে at one remove.

সে যাই হোক এই যুবকের কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত হ'লাম। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine শুধু চার চার বার প'ড়েই ইনি ক্ষান্ত হন নি—তার সূচীপত্র তৈরি করেছেন। এঁর মধ্যে দেখলাম স্বাধীন চিন্তার অভাব নেই। বললেন: "অনেকে মিলে ধ্যানধারণা—ওতে তা'র বিশ্বাস নেই। ধ্যান হয় একান্তে।" ইনি আরো বললেন! "আমেরিকা আজব দেশ! যে-কোনো বুদ্ধিমান্ মানুষ ভারতবর্ষে দুদিন কাটিয়ে এখানে এসে বক্তৃতা দিতে পারে ভারত সম্বন্ধে—বলতে পারে বড় বড় কথা—আর পাঁচজনে শোনে উৎসুক হ'য়ে। ধর্মবুদ্ধির স্ফুরণ হ'তে পারে না এই ধরণের পাঁচমিশেলি লেকচার বা প্রপাগাণ্ডায়।" সাধু সাধু।

* * *

ক্রমশঃ)

২০

অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে চার্ব্বাক আশ্রয় লইয়াছিল। বিশাল বিশাল বনস্পতি-বেষ্টিত যে নির্জ্জন স্থানটি সে নির্ব্বাচন করিয়াছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা-মুখ ছিল। চার্ব্বাক স্থির করিয়াছিল—যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। সুরঙ্গমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সমস্ত রাত্রি সে একটি বৃক্ষের উপরই যাপন করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নূতন আশ্রয়টি সে আবিষ্কার করিয়াছে। কতদিন যে অরণ্যবাস করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুরঙ্গমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই, সুতরাং গুহার ভিতরটা নিরাপদ কিনা তাহা দিবা-লোকেই স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য সে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া গুহার ভিতর সেগুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল কোন জন্তু বা সর্প বাহির হইয়া আসে কি না। সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পরও যখন কোনও প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না; চার্ব্বাক তখন চিন্তা করিতে লাগিল এইবার গুহার ভিতরে প্রবেশ করা সমীচীন হইবে কি না। ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল, হইবে না। অগ্নি সংযোগ করিবার পরও যদি কোনও প্রাণী বাহির না হয় তাহা হইলেই ওই অন্ধকার অপরিচিত গুহায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু অগ্নি কোথায় পাওয়া যাইবে? অরণ্যের মধ্যে শবর-পল্লী থাকা সম্ভব, সেখানে গেলে শুধু অগ্নি নয়, হয় তো আশ্রয়ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শবর-পল্লীতে যাওয়াও কি সমীচীন? কুমার সুন্দরানন্দের সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তাহারা রাজভক্তির আতিশয্যবশত তাহাকে ধরাইয়াও দিতে পারে। সুতরাং শবর-পল্লীতে গমন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। সহসা মনে হইল এই অরণ্যে সন্ধান করিলে অরণি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। কিছু ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, জলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। চার্ব্বাক উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, সে ঠিক করিয়া ফেলিল এই গভীর অরণ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইবে। আকাশ-চুম্বী বনস্পতি শ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে হাসিয়া ফেলিল। মনে হইল গুরুগম্ভীর ধর্ম্মগ্রন্থ-গুলির আপাত-পবিত্রতার মধ্যে সে যেমন ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই; স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইলে এই গম্ভীরা বনভূমিও তেমনি শেষে হাস্যকর নগণ্য কিছুতে পরিণত হইয়া যাইবে না তো! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, না হইবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার দর্শন, সে দর্শন কখনই নগণ্য হইতে পারে না, তাহাই একমাত্র সত্য। চার্ব্বাক গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

২১

যজ্ঞের জন্য আজ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ত্রিবেদজ্ঞ মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্মা-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বয়ং সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কুমার সুন্দরানন্দ। মহর্ষি পর্ব্বত কুমারকে বলিলেন, "দেখুন, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার কেমন যেন মন খুঁতখুঁত করছে। মনে হচ্ছে সুরঙ্গমাকে বলি দেওয়া চলবে না"

"কেন—"

"প্রথমত, কোন নারী-পশুকে বলি দেওয়ার বিধি কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, বলির পশুটি যতদূর সম্ভব হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। নর্ত্তকী সুরঙ্গমা পেলব লতার মতো,

তন্বী। ওর শরীরে কিছু নেই। তৃতীয়ত, বলির মাংস খেতে হয়। সুরঙ্গমার মাংস কি খেতে পারবেন? সুতরাং যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে নির্ব্বাচন করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে। সুরঙ্গমার মতো একজন রূপসী শিল্পীর এমনভাবে জীবনাবসান হবে, এটাও কি শোভন? সুরঙ্গমার মতো নর্ত্তকী দুর্লভ। তাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে কেন চাইছেন?—"

"দুর্লভ বলেই চাইছি। আমি যতদূর বুঝেছি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করলেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুরঙ্গমাকে ভাল করে' পাব বলেই তাকে ত্যাগ করতে চাই। সে নিজেও তাতে রাজি আছে। সে যদি অসম্মত হত, তাহলে আমি এ যজ্ঞের আয়োজন করতাম না"

মহর্ষি পর্ব্বত ক্ষণকাল কুমার সুন্দরানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ মিম্মির আপনাকে যা বুঝিয়েছে তাই আপনি বুঝেছেন। নর-বলির প্রথা এককালে এদেশেও প্রচলিত ছিল। শুনঃশেফের গল্প নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই। বলি দেওয়ার কথা ছিল রোহিতকে, কিন্তু শুনঃশেফকে তার বদলে কিনে আনা হল। সেই শুনঃশেফকেও শেষকালে দেবতারা ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে যা ইঙ্গিত আছে তাতো স্পষ্ট।"

কুমার সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "মহর্ষি আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার অবাধ্য হওয়ারও কল্পনা আমি করতে পারি না। একটি বিষয়ে শুধু আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নর-বলির সঙ্কল্প নিয়েই আমি এই গভীর বনে যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমার এ সঙ্কল্প দেবতার অগোচর নেই। এখন যদি আমি প্রতিশ্রুত বলি অগ্নিমুখে সমর্পণ না করি, দেবতা কি অপ্রসন্ন হবেন না? আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, সমস্ত দায়িত্ব আপনারই—আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করব"

মহর্ষি পর্বত কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহলে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। সুরঙ্গমার বদলে আর কাউকে বলি দেওয়া হোক।"

"সুরঙ্গমা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল। আর কেউ কি রাজি হবে?—"

"চেষ্টা করলে হয় তো হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে নিষাদ-পল্লী বা শবর-পল্লী থেকে কোনও বালক পাওয়া অসম্ভব নয়—"

"কিন্তু সে বালক কি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজি হবে? কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই আমার মহর্ষি"

"সুরঙ্গমাও কি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে?"

"হয়েছে"

"আপনি তাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন কুমার। নারী-চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা, সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়"

"বেশ, আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব"

২২

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুমার সুন্দরানন্দ কিন্তু সুরঙ্গমার সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুরঙ্গমার দাস-দাসীরা বলিল, "কাল রাত্রে তিনি আহারাদির পর বললেন 'আমি কিছুক্ষণ একা একা বনে বনে ভ্রমণ করতে চাই, তোমরা সবাই শুয়ে পড়, আমার অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই।' এখনও পর্য্যন্ত তো তিনি ফেরেন নি"

কুমারের নয়ন যুগল হইতে ক্রোধ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। দাস-দাসীদের ভর্ৎসনা করিবার উপায় ছিল না; তিনি নিজেই তাহাদের আদেশ দিয়াছিলেন সুরঙ্গমার কোন আচরণে যেন তাহারা বাধা না দেয়।

মিম্মিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিম্মির একটি অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ এক শুক-দম্পতীকে তিনি ফলাহার করাইতেছিলেন। সুন্দরানন্দ এরূপ অদ্ভুত শুক আর কখনও দেখেন নাই। তাহাদের পক্ষদ্বয়ে মরকত, বৈদূর্য্য, নীলা ও মুক্তার বর্ণ-দ্যুতি যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ে রূপায়িত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তাহাদের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত মাণিক্যের মতো জ্বলিতেছিল!

"এমন অদ্ভুত শুকপক্ষী আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন—"

"এরা নিজেই এসেছে। আজ সকালে উঠে দেখি আমার বাতায়নের ধারে পাশাপাশি বসে' আছে দু'জনে। ধরতে গেলাম, ধরা দিলে না। কিন্তু পালিয়েও গেল না। সরে' সরে' বসছে। ফল দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছি, আমার জন্যে প্রচুর ফল আপনি কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা দু'জন প্রায় তা নিঃশেষ করেছে। বাকী আছে এই আঙুরগুলি—"

মিম্মিরের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি শুক ঘাড় নাড়িয়া সুমিষ্ট স্বরে কি যেন কহিল। পক্ষী-ভাষায় কি তাহার তাৎপর্য্য তাহা মিম্মির সম্যক বুঝিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অবশিষ্ট আঙুরগুলি শুকদম্পতীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারাও ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মিম্মির কহিলেন, "সুরঙ্গমাকে ডেকে আনুন। এদের দেখলে তিনি খুশী হবেন।"

"তাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি এখানে এসেছিল?"

"আজ তো আসে নি। কাল রাত্রে এসেছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। এসেই চলে গেল"

"কোনদিকে গেল···"

"তা তো লক্ষ্য করি নি—"

"কোথায় গেল সে তাহলে। দেখি—"

শুকদম্পতীর দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমার সুন্দরানন্দ বাহির হইয়া গেলেন। সুরঙ্গমার অন্তর্ধানে তিনি কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়তো প্রাণভয়ে সুরঙ্গমা পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিয়াছে? মহর্ষি পর্ব্বতের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"নারী চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।··" কুমারের মুখ সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি বেশ্যাপল্লীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া রাজরাণীর মর্য্যাদা দান করিয়াছেন সে তাহাকে এভাবে প্রতারণা করিবে? মিম্মিরের নিকট হইতে বাহির হইয়া কুমার গেলেন কুলিশপাণির কাছে।

"কুলিশ সুরঙ্গমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে' খোঁজ। তাকে না পাওয়া গেলে যজ্ঞই পণ্ড হয়ে যাবে—"

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া রাজাদেশ গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

আমার কবিতা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আমার কবিতা সে তো তোমারি প্রেমের অবদান
আঁখির পলক পাতে এলো তার ভাব ছন্দ সুর।
ব্যথাবিদ্ধ মরুমাঠে মানসীর লভিয়া সন্ধান,
পেখম তুলিয়া নাচে অকস্মাৎ মনের ময়ূর।

তুমি আছ, ভালো লাগে তাইতো নদীর জলধারা,
সুদূর নীলার পটে রাত-জাগা ক্ষীণ শতভিষা;
বনের মর্ম্মরে নিত্য শুনিতেছি নূতন ইসারা—
পথভ্রান্ত সারণিক অতর্কিতে খুঁজে পেলো দিশা।

তোমার নয়নে আছে অতলান্ত সমুদ্রের নীল,
দেহের দেহলি জুড়ে যৌবনের উঠে দীপারতি।
হৃদয়-গহনে ডুবে খুঁজে পাই কবিতার মিল,
ভুলে গেছি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ লাভ ক্ষতি।

তোমারে সঙ্গিনী লভি তুচ্ছ করি জীবনের জ্বালা
হাসিমুখে সয়ে যাই সংসারের যতেক যন্ত্রণা।
সহসা ভরিলে কবে চুপি চুপি কবিতার ডালা,
নূতন নির্দ্দেশ দিলে, চলিবার নব সম্ভাবনা।

এলো স্বপ্ন, এলো সুর, অলক্ষিতে শূন্য মোর চিতে,
আমার কবিতা তাই মুখরিত তোমার সঙ্গীতে।

শীতের দেশের পথ

কালো ও আলো

ফটো : শ্যামল বসু

বাড়ীর মতন

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রুশ গল্প : লেখক— আলেকজান্দার কুপরিন)

প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা···ত্রিশ বছরে জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল কত মেঘ, কত রৌদ্র! কত ঘটনা, জয়-পরাজয়ের কত আলো-ছায়া! হর্ষ-বেদনার কত দোলাই না লাগলো মনে!···কিন্তু এ-ঘটনাটুকু···এততেও মনের পটে এখনো জ্বল্-জ্বল্ করছে···মিলিয়ে যায় নি! মনে হয় যেন কালকের ঘটনা!

তখন আমি কিয়েভে থাকি পাদোলার কাছে—গাভানের বাড়ীতে। বোর্ডিং-হাউস। গাভান আগে কাজ করতো কোন্ জাহাজে···বাঁধুনির কাজ। ভয়ানক মদ খেতো। তার জন্য চাকরি গেল। চাকরি যেতে সে আর তার স্ত্রী আনা পেদ্রোভনা···দুজনে মিলে এই বাড়ী ভাড়া নিয়ে এখানে খুলেছে বোর্ডিং-হাউস।

স্থায়ী-ভাড়াটিয়া বলতে আমরা আছি ছজন। ছজনেই নিঃসঙ্গ একা মানুষ। বাড়ীতে ন-খানা কামরা। এক নম্বর কামরায় যে থাকে—আমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে পুরোনো। কাজ-কারবার ছিল···কসেটের বেশ বড় দোকান। হঠাৎ জুয়ার নেশায় তাকে পেয়ে বসলো—জুয়ার নেশায় সে দোকান গেল উঠে। তারপর কোথায় কেরাণীগিরি-চাকরি জুটিয়েছিল। সে-চাকরিও রাখতে পারলো না···তাসের জুয়ায় মত্ত-মাতোয়ারা থাকতো বলে। এখন কি করে তার চলে, ভগবান জানেন! দেখি, লোকটি সারাদিন ঘরে পড়ে' ঘুমোয়···কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নয়! সন্ধ্যার পর উঠে চোরের মতো নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। যায় নদীর ধারে—গলি-ঘুঁজিতে ছোট-খাট জুয়ার আড্ডা, সেইখানে। জুয়াড়ীদের যেমন হয়ে থাকে—খেলায় লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা রাখে না! খেলে অভ্যাসের বশে···নেশা!

তিন-নম্বর কামরায় ভাড়াটিয়ার নাম বুৎকোভস্কি। মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে—সেই সঙ্গে টেকনিকাল-স্কুলে সিভিল-এঞ্জিনীয়ারিং পড়া চালাচ্ছে ·· তার উপর আরো কটা স্কুলে লেখাপড়া! সে-কথা আমরা বিশ্বাসও করি না। লোকটা যেন সবজান্তা···হেন বিষয় নেই, যা সে জানে না! নিজে থেকে এত কথা বলে যায়—কেউ শুনছি না, শুনবো না, তবু সে বকতে থাকবে! এভিয়েশন, বটানি, ষ্টাটিষ্টিক্স, পলিটিক্স, জ্যোতিষ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান···মায় সহর এবং পথ-ঘাট তৈরীর কলাকৌশল—সব জ্ঞান তার মগজে! মনে হতো, মানুষ নয়! চামড়ার সুটকেস! তার মধ্যে জামা-কাপড় থেকে চায়ের পেয়ালা পিরীচ গ্লাস ··হাবিজাবি সব জিনিষ ঠেশে পুরে রাখা হয়েছে। চেপে চেপে ঠেশে রাখা এমন যে, তালা খোলবা-মাত্র জিনিষগুলো ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে··· এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাবে। মাসে এখন একবার করে মদ খায় এবং তিন দিন তিন রাত্রি ধরে তার এ-খাওয়া চলে, ···যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নেশায় বেহুঁস-কাবু হয়! তারপর আরো পাঁচদিন সময় লাগে তার প্রকৃতিস্থ হতে। তখন তার মুখে শুধু ফরাসী বুলির বুকনি ফুটতে থাকে—যেন খই ফুটছে! কাজের মধ্যে দেখি, সহরে যত খবরের কাগজ আছে, তার সবগুলোয় চিঠি লিখে পাঠায়—কি-কথাই না লেখে! গ্রামের কোথায় জলা আছে, বুজোনো প্রয়োজন ·· কোথায় কবে একটা নতুন নক্ষত্র দেখা যাবে বলে ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার—কোথায় জল-কষ্ট—নিরাকরণের জন্য নল-কূপের আশু প্রয়োজন···এমনি সব চিঠি! এ-সব চিঠির জবাব কখনো প্রত্যাশা করেছে বলে মনে হয় না! পয়সা-কড়ি মাঝে মাঝে পায়—আমাদের কাছ থেকে ধার-ধোরও

করে এবং সবচেয়ে জমা টাকাকড়ি পেলে···কুচো-নোটে তার ঘরের কানাচে বহু কেতাব পড়ে আছে—কোনো কেতাবের মধ্যে নোট রেখে দেয়! একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে—আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল—উপুড়-হস্ত করবে, সে-আশা আমি রাখিনি। হঠাৎ কি জন্য তার ঘরে গেছি—কথায় কথায় আমাকে বললে—দয়া করে ঐ সেল্‌ফ্‌ থেকে ফোর্থ ভলুম্‌ এলিশা হালদা বইখানা যদি পাড়েন। আমি বই পাড়লুম। পাড়বামাত্র আমাকে বললে বুৎকোভস্কি—ওর মধ্যে পাঁচ রুবলের একখানা নোট আছে—নিন। আপনার কাছ থেকে একদিন ধার নিয়েছিলুম—শোধ! বুৎকোভস্কির মাথায় টাক···গালে লম্বা দাড়ি এবং ইয়া মোটা গোঁফ!

আমি থাকি আট-নম্বর কামরায়। সাত-নম্বরে থাকে এক ছোকরা—কোন্‌ স্কুলে সে পড়ে। মাকুন্দো এবং একটু তোৎলা। এখন সে কোন্‌ জেলায় পাবলিক-প্রশিকিউটর, ওকালতিতে বেশ পশার করেছে। যেমন খ্যাতি, তেমনি প্রতিপত্তি। ছ-নম্বরে থাকে কার্ল—জাতে জার্মান···পথ ঘাট তৈরী করে—কনট্রাক্টর।

ভদ্রলোক বীয়ার খাবার যম।—পাঁচ-নম্বর কামরার থাকে এক যুবতী জোয়া, বাড়ীউলির কাছে জোয়ার খুব খাতির। আমাদের চেয়ে এঁকে একটু বেশী যত্ন-আত্তি করে! তার কারণ—আমরা যে-রেটে ভাড়া দিই, জোয়া ভাড়া দেয় তার চেয়ে বেশী-রেটে এবং এ-ভাড়া মাস মাস আগাম দেয় চুকিয়ে। তার উপর জোয়া চুপচাপ থাকে—বাড়ীতে আছে বলে জানা যায় না। না করে কোনো নালিশ, না এতটুকু তম্বি! মাঝে-মাঝে সে পার্টি দেয় নিজের কামরায় এবং সে-পার্টিতে যারা আসে, তাদের কেউ কম-বয়সী নয়···বেশী বয়সের স্ত্রী পুরুষ। পার্টিতে এতটুকু কলরব ওঠে না! রাত্রে জোয়া বড় একটা বাসায় থাকে না··· নানা হোটেলে তার রাত কাটে।

আমরা পরস্পরকে চিনলেও অন্তরঙ্গতা নেই। পরস্পরে অসদ্ভাব নেই—প্রয়োজন হলে সকলেই এর-ওর কাছ থেকে চা ধার করে আনি—কয়লা, তুলো, গরম জল, কালি, কলম, পেন্সিল···খবরের কাগজ চেয়ে আনি। এ-দানে কারো কার্পণ্য নেই যেমন—তেমনি চাইতেও সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা জাগে না!

সেবারে শীতটা চট্‌ করে চলে গেল। বসন্তের বাতাস এলো বয়ে—নীপার নদীর বুকের বরফ গলে' দু-কূল জলে জলময় হয়ে উঠলো। রাত্রে যেমন গরম, তেমনি অন্ধকার—মাঝে মাঝে দু-চার পশলা বৃষ্টি দেখা দেয়।···একদিন দেখি, গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে খশে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখি, কচি কিশলয়-পল্লবে গাছপালা সবুজে সবুজ!

ঈষ্টারের পরব এলো···আলো-হাসি-আনন্দের পশরা নিয়ে। আমার যাবার জায়গা নেই। সহরে কেউ নেই জানা বা চেনা···আপন-জন তো নেইই! পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই একা-একা · নিঃশঙ্গ। কখনো যাই কোনো চার্চে। পথে দাঁড়িয়ে দেখি প্রোসেশন চলেছে—গান-বাজনার প্রোশেসন—আলোর প্রোশেসন! সাজ-পোষাক পরে ছেলেমেয়ের দল বেরিয়েছে পথে—তাদের মুখ-চোখ আনন্দে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে! কিশোরীরা দলে দলে বাতি ধরে প্রোশেসন করে পথে চলেছে···বাতির আলোর আভা পড়েছে কিশোরীদের মুখে···মুখগুলি মনে হচ্ছে, যেন সদ্য-ফোটা গোলাপ, না লাল পদ্ম! দেখতে দেখতে বুক আমার বেদনায় ভরে ওঠে—ছেলেবেলায় ইষ্টারের পরবে কি আনন্দই না করতুম! মনে ছিল সরল বিশ্বাস···ঠাকুর-দেবতার উপর কি গভীর ভক্তি আর ভালোবাসা! আজ···মন থেকে সে বিশ্বাস, শুচিতা, ভক্তি-ভালোবাসা···কোথায় গেছে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে!

সেদিন বাসায় ফিরতেই অফিসের বেয়ারা ভাস্‌কা··· বয়সে ছোকরা হলেও বেশ চালাক-চতুর—ভাসকা আমাকে জানালো ঈষ্টারের অভিবাদন। আমিও তাকে অভিবাদন জানালুম। ভাসকা বললে—পাঁচ নম্বরের মেয়েলোক ভাড়াটে আপনাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

শুনে অবাক হলুম! তাঁর সঙ্গে মোটে জানাশুনা নেই—পরিচয় নেই! তিনি হঠাৎ···

ভাসকা বললে—আপনার জন্য চিঠি দেছেন···অফিস-কামরায় আছে।

অফিস কামরায় গিয়ে চিঠি নিলুম—পকেট-বুক থেকে রুলটানা ছেঁড়া একটুকরো কাগজ কাগজের উপর 'ক্যাশ-

মেমো, কথা ছাপা—সেই কাগজে লেখা তুটিমাত্র ছত্র! লেখা—

আট-নম্বরের বন্ধু,—আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে এবং কোনো আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার ঘরে এলে সুখী হবো। এক সঙ্গে ঈষ্টারের উপবাস-ভঙ্গ করতে চাই। আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারবেন।
প্রীতি জোয়া ক্রামারেনকভ

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো!...এখন...? এঞ্জিনীয়ারের কামরার দোরে দিলুম টোকা...জিজ্ঞাসা করবো...তার পরামর্শ! দরজা ভেজানো ছিল। ভিতর থেকে সাড়া—কে? চলে এসো।

ঘরে ঢুকলুম। দেখি, বড়-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে চেপে-চেপে মাথার শোরের-কুঁচির মত খোঁচা চুলগুলোকে চোস্ত করছেন। চুলে বেশ পাক ধরেছে...এবং ও-চুল কিছুতে নুইতে চায় না! গায়ে ঝকঝকে পালিশ-করা ফ্রক-কোট...সে-কোটে যা মানিয়েছে, মনে হয়, রীতিমত মাতব্বর ব্যক্তি! গলায় চওড়া কলার—তার উপর সাদা নেকটাই বাঁধা। কথাটা আমি পাড়তেই তিনি বললেন—আমিও পেয়েছি মশায়, নিমন্ত্রণ-পত্র...ওখানে যাবার জন্মই আমি...

তুজনে একসঙ্গে চললুম নিমন্ত্রণ রাখতে।

ঘরের দরজাতেই জোয়ার সঙ্গে দেখা...বিনম্র সলজ্জ ভঙ্গীতে মার্জ্জনা চেয়ে ধন্যবাদ এবং অভ্যর্থনা! সামনা-সামনি চেহারাখানা ভালো করে দেখলুম। মুখ...রাশিয়ার সাধারণ বার-বনিতাদের মুখ যেমন হয়, অবিকল তাই! ঠোঁট নরম...রঙ-করা...মোটা নাক...ভ্রূ নেই বললেই হয়! মুখে মৃদু হাসি—শান্ত, নম্র, কোমল...জোর করা বা ধার করা হাসি নয়! সে-হাসিতে রমণীর রমণীয়তা ফুটে আছে! সে-হাসির জন্য মুখখানি ভালোই লাগলো!

ঘরে ঢুকে দেখি, মেশের সকলেই হাজির। জুয়াড়ী এবং কার্ল...দিব্যি আসর জমিয়ে বসেছে। আসেনি শুধু সেই পড়ুয়া ছোকরা—সে-ছাড়া স্থায়ী ভাড়াটিয়ারা সকলেই এসেছে।

জোয়ার কামরা—যেমন দেখবো ভেবেছিলুম, তেমনি। চেষ্টার ড্রয়ারের মাথায় চকোলেটের কটা খালি বাক্স—কটা বাক্সে সেণ্টের শিশি, গ্রীজ-ন্যাপটানো পাউডার, চুল কোঁকড়া করবার কটা কার্লার। ঘরের দেয়ালে সার-সার ছবি—হতভাগা কজন এ্যাক্টর-এ্যাকট্রেসের ফটো...খোলা-তলোয়ার-হাতে কজন মিলিটারী-ফৌজের ফটো। খাটে বিছানা—বিছানায় লেশ-দেয়া চাদর এবং চাদরের উপর একগাদা বালিশ—বালিশের পাহাড় যেন! টেবিলের উপর ঝালরদার পেপার-ক্লথ বিছানো...এবং বড় পাত্রে প্রকাণ্ড সাইজের একখানা ঈষ্টার কেক। তাছাড়া কতক-গুলো রোল, ডিম—শূয়রের লেগ-রোষ্ট, আর তু-বোতল মদ...বিচিত্র রকমের মদ।

জোয়ার সঙ্গে সকলের ঈষ্টারের প্রীতি-নিবেদন হলো—অত্যন্ত শুদ্ধাচারে তার তু-গালে চুম্বন...তার পর টেবলে বসা হলো খেতে। আমাদের দলটি...কেউ যদি তখন দেখতেন, মজা পেতেন! আমরা চারজন পুরুষ—ক্ষুধায় অন্ন মেলা দায়—চরম তুর্ভাগ্যগ্রস্ত...অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেতো-ঘোড়ার মত কোনোমতে বেঁচে আছি! আর টেবলের পঞ্চম ব্যক্তি...আমাদের হোষ্টেশ...তিনি রাশিয়ার অতি-নিম্নশ্রেণীর বারবনিতা...পথ থেকে লোক সংগ্রহ করে আনা যার কাজ...বিগতযৌবনা অর্থাৎ আমাদের চেয়েও তুর্ভাগিনী, বেচারী...চরিত্র বা মন বলে কোনো বালাই নেই...অতীত কি ছিল, অন্তর্যামী জানেন! বর্ত্তমান বীভৎস—ভবিষ্যৎ আমাদের চেয়েও অন্ধকারে ঢাকা! তবু এমন ছাতি! এমন করুণা মায়া-মমতা...আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে ডেকে এনে এমন ভোজ্য-পানীয়ে তৃপ্ত করা! তুনিয়ায় ধনী আছে অনেক...পরোপকারে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দানে অকৃপণ—কৈ, ভুলেও তাঁরা কখনো আমাদের কথা মনে করেন না তো! ঈষ্টারের পরবে চার্চ্চে গিয়ে চোখ বুজে ভগবানকে ধ্যান...দান-খয়রাতী করেন লোক দেখিয়ে—যেন সে-দানে তুনিয়াকে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন! ভাবে ভঙ্গীতে দানের অহঙ্কার! তাদের চেয়ে এই রূপব্যবসায়িনীকে কত উঁচু মনে হলো! জোয়ার কথায় আচরণে কি বিনয়—কুণ্ঠা! আমরা তার আতিথ্য গ্রহণ করেছি, এতে কতখানি সে খুশী হয়েছে! প্রত্যেককে নিজের হাতে প্লেট দেওয়া, দিতে-দিতে কত কথা—ছ-নাবরের বন্ধু, আপনি বীয়ার ভালোবাসেন জানি...ভাসকা বলেছে! এই বীয়ার আপনার জন্য। এঁদের জন্য আছে ওয়াইন...খুব ভালো ওয়াইন—

তেনেবিলের সেরা ওয়াইন—একজন সেনলরকে জানি—এ ওয়াইন পেলে সে আর কোনো ওয়াইন চায় না।

জীবনে আমরা চারজনে অনেক-কিছু দেখেছি··· অনেক কিছু শুনেছি এবং জানি। ঈষ্টারের এ-ভোজের আয়োজনে খরচ পড়েছে কত···ভোজ্যের উপর এত রকমের মদ···ব্যয়ের বহর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলুম।···

রাত্রে···আমাদের সঙ্গে খেতে খেতে মনে যে সব কথা জাগছে···জোয়া বলে—ব্রাৎসভায় গিয়েছিল' রাতের উপাসনায়। কি ভিড়! ঢোকা দায়। তার ভাগ্য ভালো, সেখানে বেশ ভালো জায়গা মিলেছিল···এ্যাকাডেমি-ফ্রায়ার-দল খাশা গান গাইলো, তার পর ছাত্রেরা পড়লো ঈভাঞ্জেল···শুধু কি আমাদের এই রুশ ভাষায়? উঁহু, ফরাশী, জার্ম্মান, গ্রীক—মায় আরবী ভাষাতেও! তারপর এলো ঈষ্টার-ব্রেড আর কেক—তখন যাত্রীদের দলে কি চাঞ্চল্য! হুড়োহুড়ি—ধাক্কাধাক্কি—মারামারি পর্য্যন্ত!

বলতে বলতে জোয়ার কণ্ঠ হলো ভাবাবেগে জড়িত। একটা নিশ্বাস ফেলে জোয়া শোনাতে লাগলো, তার গ্রামে ঈষ্টারের হপ্তাটা কি-আনন্দে কাটতো সকলের।

জোয়া বললে—আমরা ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট ফুল তুলে জড়ো করতুম—সে-ফুলের কি নাম, জানিনা—আমরা বলতুম, ঘুমফুল এত-টুকুটুক্ নীল রঙের ফুল। তার পাপড়ি থেকে চমৎকার রঙ তৈরী হয়।···সে রঙে ডিম রাঙানো হয়।· অমন ঝকঝকে নীল রঙের ফুল আমি আর দেখিনি!···আমরা করতুম কি, ঘুম-ফুলের পাপড়ি ছেঁচে নিংড়ে তার সঙ্গে মিশোতুম পেঁয়াজ-বাটার রস···দুটো মিশোলে কয়লার রঙ হতো—সে রঙে আমরা ডিম রাঙাতুম···রুমাল ছোপাতুম! হপ্তাভোর আমরা ঐ ফুল এনে-এনে ডিম রাঙাতুম—কত ডিম! ওঃ! তারপর সেই রাঙানো ডিম যাকে পাই, তার গায়ে দিই ছুড়ে। কি মজাই হতো।··· একটা ছেলে করেছে কি···কোথা থেকে লোহার তৈরী ডিম কিনে এনেছিল···সেই ডিম ছুড়ে কত লোককে সে মেরেছিল!···শেষে কজন লোক তাকে ধরে তার কাছে সত্যিকারের যত ডিম ছিল, আর ঐ লোহার ডিম—তাকে মেরে কেড়ে নেয়! কি মারটাই না মারলো তাকে! কিল, চড়, লাথি···মারতে মারতে তাকে পাড়াছাড়া করে' তবে ছাড়ে।

জোয়া বলতে লাগলো—এ ছাড়া আমরা দোলনায় উঠে কী দোল্ না খেতুম! গাছের ডালে দড়ি খাটিয়ে দোলা ···সেই দোলায় বসে দোল হপ্তাভোর! দুলতে দুলতে সকলে মিলে একসঙ্গে গান—

এলো এলো এলো খৃষ্ট
এলো হে ঐ মোদের গ্রামে—
আঁধারভরা সারা গ্রামে
আকাশভরা আলো নামে!

বলতে বলতে জোয়ার কণ্ঠ আবেশে উছল···দুচোখ ভাবে বাষ্পসজল! আমরা একাগ্রমনে শুনছি তার কথা। জীবনে শুধু দুঃখের আঘাত পেয়ে আসছি···নিষ্ঠুর নির্ম্মম আঘাত! সে আঘাতে আমাদের ছেলেবেলাটা···ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে! বাল্যের সব স্মৃতি···মায়ের কথা—বাপের কথা—আত্মজনের কথা···ঈষ্টারের পরব···সব কথা সে-আঘাতে ছিঁড়ে ধূলোয় মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

ঘরে বাতি জ্বলছে···খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসছে ···বাতাসের দোলায় জানলার পর্দ্দা দুলছে··

জোয়া বললে—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জানলা থেকে পর্দ্দা সরিয়ে দি···আকাশ দেখতে পাবো।

আমরা প্রায় সমস্বরে বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

জোয়া উঠে জানলার ধারে গেল পর্দ্দা খুলে সরিয়ে নিতে—আমরাও উঠলুম—যন্ত্রচালিতের মত—গেলুম জোয়ার পিছু পিছু জানলার ধারে।

আকাশে চাঁদ···জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটী···আলো মেখে ঝক্‌ঝক করছে! বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে···গাছের সবুজ কচি পাতাগুলো দুলছে···দুলছে! সামনে নদী নীপার··কূলে কূলে ভরা জল··জলের বুকে পড়েছে চাঁদের ছায়া···ঢেউয়ে সে ছায়া দুলছে! মনে হলো, জ্যোৎস্নার হাসি যেন! চার্চ্চে-চার্চ্চে ঘণ্টা বাজছে···ধীর গভীর উদাত্ত সুর—ডিং ডং ডিং ডং ডিং ডং···ডিং ডং···

হঠাৎ অস্ফুট একটা স্বর! চমকে ফিরে তাকালুম। এঞ্জিনীয়ার কাঁদছে—সরবে···জানলার রড ধরে ফ্রেমে মাথা রেখে। রীতিমত কান্না! বেচারী বৃদ্ধের মনে কি

হলো, ভগবান জানেন! ওঁর অতীত জীবনের কোনো কথা আমি জানিনা—তবে ওঁর নিজের মুখে নানা ভাবে কাটা-কাটা কথায় শুনেছি—বিবাহ, না বিপত্তি! কুচরিত্রা স্ত্রী···সরকারী তহবিল-তছরূপ···স্ত্রীর প্রণয়ীকে ত্যাগ করে একদিন পিস্তলের গুলি···আর ছেলেমেয়েগুলো? তারা থাকে তাদের মায়ের সঙ্গে! সেই ছেলেমেয়েদের কাছে যাবার জন্য ওদের মন কী যে করে।

জোয়া দেখলো—দেখে একটা নিশ্বাস ফেললো—নিশ্বাস ফেলে দুহাতে এঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠ বেষ্টন করে তার টাকওয়ালা মাথা নিজের বুকে ধরলো চেপে; তারপর এঞ্জিনীয়ারের গালে এবং পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললে—বেচারী! ···আমি জানি, জানি···কি দুঃখ, কি দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমাদের দিন কাটছে! দুনিয়া যেন তোমাদের কাছে মরুভূমি!··· নিঃসঙ্গ···একা··মুখের পানে তাকাবে, এমন-জন কেউ নেই তোমাদের! ··কিন্তু দুঃখ করো না, বন্ধু, সয়ে থাকো—আরো সহ্য করো!·· ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না। তিনি নিঠুর নন। একদিন তোমাদের দুঃখ তাঁকে চঞ্চল করবেই —তখন···সব ঠিক হয়ে যাবে! ··বেচারী সব···বেচারী!···

এঞ্জিনীয়ার নিজেকে মুক্ত করলো জোয়ার বাহুবন্ধন থেকে। তার দুচোখ রাঙা · নাকটা লাল টক্‌টক্ করছে! তার পর এঞ্জিনীয়ার বলে উঠলো—ধেৎ তোর নিকুচি করেছে! হুঁঃ···কিছু না কিছু না · সব বাজে!

বুঝলুম, নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন এঞ্জিনীয়ার।

পাঁচ মিনিট পরে আমরা বিদায় নিয়ে এলুম— জোয়ার হাতে শ্রদ্ধা-ভরা চুম্বন দিয়ে। এঞ্জিনীয়ার আর আমি—আমরা এলুম সকলের পরে। আমাদের কামরার সামনে দেখা অন্য কামরার ছোকরার সঙ্গে · সে কোথায় পার্টি সেরে ফিরছে।

চোখে শ্লেষের হাসি, সে বললে— ও! বটে—বুঝেছি, কোথায় যাওয়া হয়েছিল দুজনের! হুঁ·· ফূর্ত্তি হচ্ছিল! কিন্তু! কাল এর···

তার চোখের দৃষ্টিতে কি কদর্য্যতা। তার মাথায় রাংতা-কাগজের তৈরী মুকুট·· সেটা তার মাথা থেকে খুলে নিয়ে মেঝেয় ফেলে মুকুটটা জুতায় চেপে ভেঙ্গে এঞ্জিনীয়ার তাকালো ছোকরার পানে—দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা যেন! দাঁতে দাঁত চেপে এঞ্জিনীয়ার বললে তাকে—তুমি···তুমি··· ছুঁচো···তুমি একটা স্কাউন্‌ড্রেল!

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রামায়ণীযুগে বিজ্ঞান

রামায়ণী যুগের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ের কথা যা রামায়ণে পাওয়া যায়, তা' যদি কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূতও হয় তথাপি তার বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। কেননা মানুষের সব কাজ ভাব বা ভাবনা-সম্ভূত। প্রথম যে চিন্তা মানুষের মনে আদিকালে জাগে, তা' পরবর্ত্তীকালে সে পূর্ণ করে। রাবণের পুষ্পকরথ তপঃসাধ্য বিক্রমে অর্জিত—মনের সঙ্কল্পে রথ ধায় যথা-তথা, তেমনি এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের সেই কল্পনা Radio-active বিমান-যানে বা Raddar যোগে সফল হয়েচে। তেমনি আধুনিক Robot-এর আদি-কল্পনার কথা পাই সুন্দরকাণ্ডের দশম সর্গে (৬-৯ শ্লোকে)···হনুমান রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, স্ফটিকময় বেদী, হস্তীদন্ত, কাঞ্চন, বৈদূর্য্যমণিভূষিত পর্য্যঙ্ক (পালঙ্ক), আর তার একপ্রান্তে শশাঙ্ক-শুভ্র রাজছত্র; তার চারিধারে বেষ্টন ক'রে চামর হস্তে কৃত্রিম নারীমূর্তি (পুতুল) রাবণকে চামর বীজন করচে।

এই ভাবের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়া যন্ত্রপ্রয়োগের কথা রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ডের ২২ সর্গ, ৫৬ শ্লোকে) আছে,······লঙ্কা পার হবার কালে সাগরের উপর সেতুবন্ধনের জন্য হাতীর মত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্ব্বত সকল উৎপাটন করে যন্ত্রের সাহায্যে বহন করে আনা হয়েছিল। এইরূপভাবে যন্ত্রপ্রয়োগের বিষয় (লঙ্কাকাণ্ডের ৩ সর্গে, ১৭ শ্লোকে) আছে, হনুমান লঙ্কার বর্ণনা করে রামকে বলচেন;—লঙ্কাপুরীর চার তোরণদ্বারে পরিখা পার হবার জন্য চারটি সেতু আছে এবং তার নিকট বহু প্রাকার, যন্ত্র এবং বৃহদাকার গৃহাবলী সজ্জিত আছে। শত্রুসৈন্য সেই সেতুর উপর উপস্থিত হলেই যন্ত্রের দ্বারা নিবারিত হয়।

আধুনিককালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে (Atom Bomb) আণবিক বোমার প্রয়োগ হয়েছিল, তার পরিকল্পনা রামায়ণের উল্লেখিত বহু অস্ত্র-

শস্ত্রের মধ্যে আছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার কোনো একটি দ্বীপের উপর যে আণবিক চক্র (disk) নিক্ষিপ্ত হবার কথা জানা গেছে, ঠিক সেইরূপ (লঙ্কাকাণ্ডের ১০১ সর্গে, ৭-৮ শ্লোকে) পাই সৌর অস্ত্রের কথা। তা' থেকে চন্দ্র সূর্য্যের মত সমুজ্জ্বল চক্র সকল নির্গত হয়ে গগন প্রদীপ্ত করে।

তাছাড়া যন্ত্রের বিষয় (লঙ্কাকাণ্ডের ৬১ সর্গে, ৩১ শ্লোকে) আছে,—বিরাট আকার কুম্ভকর্ণকে রণক্ষেত্রে আসতে দেখে বানর সৈন্যেরা যখন ভীত হয়ে পালাতে লাগল, তখন বিভীষণ তাদের ভয় ভাঙাবার জন্যে এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলচেন ;—"যুদ্ধে রাক্ষস কেহই আসেনি—যেটা আসচে, সেটা একটা রাবণের তৈরী যন্ত্রমাত্র। তাছাড়া রাম যে বানর সৈন্যদের নিয়ে বিরাট সেতু বেঁধে লঙ্কা পার হলেন সেটাও কম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়। (লঙ্কাকাণ্ড ২২ সর্গ, ২২ শ্লোকে) লঙ্কায় যাবার জন্য মকরালয় সমুদ্রের উপর নল সসৈন্যে যে সেতু নির্মাণ করলেন তার বর্ণনা ক'রে বাল্মীকি বলচেন, সেটি 'স্বাতীপথ-ইবাম্বর'—অর্থাৎ অম্বরের ছায়াপথের মত দূর থেকে প্রতিভাত হচ্চে। এই তুলনাটির মধ্যেও বিজ্ঞানের পরিচয় নিহিত আছে।

উরোপে রামায়ণের বহু যুগ পরে জ্যোতিশ্চক্রের ঘূর্ণন বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা জেনেচেন। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে (১৩০ সর্গে, ৭০ শ্লোকে) আছে,…যতদিন এই জ্যোতিশ্চক্র আবর্ত্তিত হবে ততদিন রাম জগতের অধীশ্বর থাকবেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের—(psychology) অন্তর্গত মনশ্ছন্দের ইঙ্গিতও রামায়ণে বহুস্থানে আছে। তার দু'একটি নমুনা দেব। অযোধ্যাকাণ্ডে (নবনবতিতম সর্গে, ৩৮ শ্লোকে) আছে,—ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখেন পৃথিবীপতি রাম সীতার সঙ্গে কুশাস্তরণে মাটির উপর বসে আছেন। দেখে দুঃখে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভরত তাঁর নিকটস্থ হয়ে শুধু 'আর্য্য' এই কথাটি বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন। দুঃখের মনোস্তত্ত্বের এই একটি সুন্দর উদাহরণ। লঙ্কাকাণ্ডে (১২৭ সর্গ, ১৫-১৮ শ্লোকে) আছে—রাম ভরতের কাছে গিয়ে তার—

"জ্ঞেয়া সর্ব্বে চ বৃত্তান্তা ভরতস্যেঙ্গিতানি
তত্ত্বেন মুখবর্ণেণ, দৃষ্ট্যা বা ভাষিতে চ ॥

—মুখভঙ্গী, দৃষ্টি বা কথার দ্বারা তার মনোগত অভিপ্রায় জানতে বলচেন। কেননা রাজ্য ঐশ্বর্য্যভোগের দ্বারা মনের গতি কার না পরিবর্তন হয়? তাছাড়া, লঙ্কাকাণ্ডেতে (১১৬ সর্গে) আছে—রক্ষগৃহবাসিনী সীতার উপস্থিতি জানালেন বিভীষণ রামের নিকট; রামের মনে তৎক্ষণাৎ যুগপৎ হর্ষ, দৈন্য এবং রোষের উদয় হ'ল সীতাকে দেখে। এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের যৌন-বিজ্ঞানের (Sex psychologyর) ইঙ্গিত দেয়। নারীদের স্বভাব বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (১৩ সর্গ, ৫ শ্লোকে) আছে,—

এষাহি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামাসৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ ॥
শতহ্রদানাং লোলত্বংশস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥

—রঘুনন্দন, সৃষ্টির আদি হ'তে স্ত্রী-স্বভাব এই যে, তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত এবং বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের মত, তীক্ষ্ণতা অস্ত্রের মত এবং শীঘ্রতা গরুড়ের বা বায়ুর মত।

অরণ্যকাণ্ডের ৪৫ সর্গে দেখা যায় মায়ামৃগের পশ্চাতে যাবার কালে রাম সীতাকে লক্ষ্মণের কাছে রেখে যাওয়ার পর রামের কৃত্রিম আর্তধ্বনি শুনে সীতার মতিভ্রম হয়। লক্ষ্মণ সীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "এ—যা শুনচেন তা' রামের স্বর নয়, রাক্ষসী মায়ামাত্র।" সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ভৎর্সনা করলেন অযথাভাবে; তখন লক্ষ্মণ তাঁকে বল্লেন:

স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে
বিমুক্তধর্ম্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

—স্ত্রীজাতি ধর্ম্মজ্ঞান হীন, চপল, নির্দ্দয়, তারা আত্মীয়দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে থাকে।

যৌনতন্ত্র সম্বন্ধে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৩৩ সর্গ. ৫৫ শ্লোকে) আছে,—

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মৌ
অবেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ ॥

—লক্ষ্মণ, তুমি কন্দর্পতত্ত্ব অবগত নহ। মানুষ কামাসক্ত হ'লে দেশ, কাল, ধর্ম্ম, অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৫৮ সর্গে, ৩১-৩৩ শ্লোকে আছে, সম্পাতি পক্ষীরাজ বলচেন: সুপর্ণ চিহ্নিত দিব্য দৃষ্টিতে বহুযোজন দূরের সব দেখতে পারি। এমন কি—লঙ্কায় সীতা রাবণকেও দেখতে পারি। আধুনিক জন্তুতত্ত্ববিদেরা বলেন—পা দিয়ে কুক্কুট যুদ্ধ করে তারা আকাশে বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না। যে সব পাখী অতি উচ্চে বিচরণ করে তারা আকাশ থেকে দূরের জিনিষকে নিকট দেখে—ঠিক দুর্বিণযন্ত্রে দেখার মত।

আলেখ্য

আলেখ্য বা চিত্রকলার বিষয় রামায়ণে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। উত্তর কাণ্ডে (৫২ সর্গ, ৭ শ্লোকে) আছে……রামের রমণীয় অশোক * উদ্যানটি যেখানে রাম রাবণবধের পর লঙ্কা থেকে সীতাকে ফিরিয়ে এনে বিহার করতেন তার বর্ণনায় বাল্মীকি বলেচেন সেটি "শিল্পিভি পরিকল্পিতে"—অর্থাৎ শিল্পীর পরিকল্পনার মত মৌলিক রচনা। এ থেকে বেশ বোঝা যায় শিল্পীর রচনা পরিকল্পনাপ্রধান ছিল। ভারতবর্ষে আধুনিক কালে উরোপের অনুকরণে যে Landscape বা portrait 'যদৃষ্টম্ তল্লিখিতম্' চলচে তা' তখন চলত না। মন থেকে ভেবে আঁকতে হ'ত ছবি। [প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ভারত শিল্পের নব জাগরণের প্রারম্ভে (১৯০৫-৬ খৃঃ) শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর ভারতীয় চিত্রকলাবিভাগটির নাম (গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে) রেখেছিলেন Advanced design class—অর্থাৎ সেটি ছিল সাধারণ নক্সাকারী পরিকল্পনার উর্দ্ধে চিত্রপরিকল্পনার একটি বিশেষ বিভাগ। মৌলিক চিত্র আঁকা শেখা ছিল তার উদ্দেশ্য।]

চিত্রশালার বিষয় রামায়ণে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। হনুমান রাবণ ভবনে (সুন্দরকাণ্ড ৬ষ্ঠ সর্গ, ৩৩ শ্লোকে) দেখলেন—লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, প্রমোদগৃহ, দিবাবিহারগৃহ এবং চিত্রশালাগৃহ। উত্তর কাণ্ডতে (৮ম সর্গে) রাবণের পুষ্পক বিমানের মধ্যে মণিরত্নের চিত্রণের উল্লেখ আছে। তাতে

---

* অশোক উদ্যান রাবণের লঙ্কাতে ছিল এবং রামের অযোধ্যায় ছিল। শোকনাশক উদ্যান অর্থেই 'অশোকবন'।

যে ঈহমৃগ (নেকড়ে বাঘের) প্রতিকৃতি নক্সা করা আছে তা' আজও দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের বহু তৈজসপত্রের নক্সাকারীতে ব্যবহার হয়। রাবণের বিমানের শিল্পকার্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং অনেক প্রতিকৃতি যে রচিত ছিল, তার কথা সুন্দরকাণ্ডের (৮ম সর্গ) ৩-৫ শ্লোকে আছে। এগুলিকে বাদ দিলেও আদিকবির কাব্যে বর্ণিত চিত্র, ঋতু বর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে যে আলেখ্য চিত্রণের অপূর্ব্ব আভাস পাওয়া যায় তার কথাও বলা প্রয়োজন। এই আদি-কাব্য পাঠে চলচ্চিত্রের মত ঘটনা চিত্রগুলি চোখের উপর ভাসে।

উপদেশ

রামায়ণে উপদেশাত্মক বহু শ্লোক আছে। সেগুলি সবই প্রণিধান-যোগ্য এবং জীবনে উপলব্ধি করার বিষয়। উত্তর কাণ্ডে (৫২ সর্গে, ১১ শ্লোকে) আছে……জনকনন্দিনীকে রাম-আজ্ঞায় লক্ষ্মণ বাল্মীকি আশ্রমে পরিত্যাগ ক'রে এসে জ্যেষ্ঠভাইকে সমাশ্বস্ত করবার জন্যে বলচেন :

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তাং তু জীবিতম্॥

সকল সঞ্চয়ই শেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উন্নতির অন্তে পতন এবং মিলনের অন্তে বিপদ হয়; জীবনের অন্তে হয় মরণ।

প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবার বিষয় আদি কবি উত্তকাণ্ডে (৩ সর্গ, ৩৩ শ্লোকে) লিখেচেন :

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যেন বদন্তিধর্ম্মম্।
নসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম॥

—যে সভায় বৃদ্ধ নেই, তা' সভাই নয়,—যারা ধর্ম্ম সংগত কথা বলে না, তারা বৃদ্ধই নয়। যাতে সত্য নেই, তা' ধর্ম্ম নয়, যাতে ছল আছে তা' সত্য নয়।

উপকারী মিত্রের সঙ্গে ব্যবহারের বিষয় (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, ৩৪ সর্গ ৭-১২ শ্লোকে) উপদেশ আছে :

সর্ব্বাভিজন সম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ
কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে॥
যস্ত-রাজা স্থিতোঽধর্ম্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ॥
আত্মানাং স্বজনাং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে।
পূর্ব্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎ প্রতিকরোতি যঃ।
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা
নিষ্কৃতিবিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি॥

—যে রাজন উপকারী মিত্রেরে আপন
উপকার করিয়া স্মরণ,
দিয়া অঙ্গিকার
ক'রে থাকে তার সাথে মিথ্যা আচরণ
অধার্ম্মিক নৃশংস সে জন।
যে পুরুষ উপকার করিবার তরে
হয়ে প্রতিশ্রুত
করে যদি সত্য ভঙ্গ,—
আত্মহত্যা, স্বজন বধের পাপ
বর্ত্তায় তাহার।
গো-ঘাতক, চোর মদ্যপায়ী
ব্রত যার গেছে ভাঙি
নিষ্কৃতি তাদের দেন সজ্জনেরা সবে;
কৃতঘ্ন পুরুষ তরে
নাহি কোনো নিষ্কৃতি বিধান।

করুণ স্বভাব ব্যক্তিকে সাধারণতঃ লোকে দুর্বল স্বভাব বোধে অবজ্ঞা ক'রে থাকে। তার বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (৬৪ সর্গে ৫৪ শ্লোকে) আছে,—রাম লক্ষ্মণকে নিজের বিষয় বলচেন :

সাং প্রাপ্যহি গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ
অদ্যৈব সর্ব্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ॥

—লক্ষ্মণ, যিনি সর্ব্বলোকের রক্ষক কর্তা এবং বীর, তিনিও যদি করুণ স্বভাব হন তবে অজ্ঞান বশত লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারে।

দুষ্ট লোক দুষ্ট লোককে চিনতে পারে, তার বিষয় সুন্দর কাণ্ডে (৪২ সর্গ, ৯ শ্লোকে) আছে :

অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানিতি ন সংশয়ং।

—সাপেই সাপের পা চিনতে পারে এ বিষয় কোনো সংশয় নেই।

আদি কবি রামায়ণে বলেচেন (অরণ্যকাণ্ড, ৩৭ সর্গ ২ শ্লোকে)

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্য স্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

—রাজা, সতত প্রিয়বাক্য বলে এরূপ লোক সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা দুই দুর্লভ।

সীতা বন যাত্রাকালে পতির দান সম্বন্ধে বলেচেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯ সর্গ, ৩০ শ্লোক) :

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কান পূজয়েৎ॥

—পিতা, ভ্রাতা এবং পুত্রের দান—পরিমিত; কিন্তু ভর্ত্তার দান অপরিমিত, অতএব তাঁকে কে না পূজা করবে?

উত্তরকাণ্ডে (৯৬ সর্গে ২০ শ্লোকে) আছে।

লোকপীড়াকরং কর্মন কর্ত্তব্যং বিচক্ষণে
বালানাপ্ত শুভবাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল।

—মহাবল, লোক পীড়াকর কর্ম বিচক্ষণ ব্যক্তির যোগ্য নয়; বালকেও যদি শুভবাক্য বলে তবে তা' গ্রহণ করা উচিৎ।

মানুষের পক্ষে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা শক্ত ব্যাপার,—যদিও সকল মানুষেই তাই চায়। এ বিষয় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৩২ সর্গ, ৭ শ্লোকে) আছে :—

সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্
অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপিভিদ্যতে॥

—মিত্রতা সুলভ, প্রতিপালন করাই দুষ্কর; চিত্ত চঞ্চল, অল্পকারণেই প্রণয় ভেদ হয়।

মানুষের বিপদের বিষয় উপদেশ আছে (অরণ্যকাণ্ড, ৬৬ সর্গ, ৬ শ্লোক) :

আশ্বসিহি নর শ্রেষ্ঠ প্রণিনঃ কস্য না পদঃ।
সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্রাজানক্ষণেন ব্যপয়ন্তি চ॥

—নরবর, আশ্বস্ত হউন, বিপদ অগ্নির মত সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে কিন্তু ক্ষণকালেই উহা দূরীভূত হয়।

কর্মের উদ্দাম এবং উৎসাহ বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (৬৩ সর্গে) আছে :

উৎসাহবন্তো হি নবান লোকে
সীদন্তে কর্মস্বতি দুষ্করেষু॥

—উৎসাহী মানুষ অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।

আদি কবি বাল্মীকির কাব্যে এই প্রকার বহু উপদেশাত্মক বাণী পাওয়া যায়।

পূর্বানুসরণ

শঙ্খদত্ত অস্বচ্ছ ঘোলাটে চোখ মেলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পার হয়ে গেল কয়েকটা অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত। সমস্ত ব্যাপারটা কি স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলেছে? অথবা এমন স্বপ্নও কি সম্ভব? স্বপ্নেরও একটা সীমা আছে—সেই সীমা ছাড়িয়ে যেখানে পৌঁছোনো যায়—একমাত্র বাতুলতাই তার নাম।

এ মহাদেব পাণ্ডার বাড়ি নয়। মধুক রসের নেশায় সে অভ্যস্ত নয়—পৈষ্টীও না। এই বেলাশেষের আলোয়—এই শীত-তীক্ষ্ণ বাতাসে, শ্যাওলাধরা একটা অতিকায় প্রাচীরের পাশে সে ঘুমের ঘোরে পথ হেঁটে আসেনি! প্রায় নিঃশব্দে সামনের যে ছোট দরজাটি খুলে গেছে আর একটি তরুণী মেয়ে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে—এও তো মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে না!

মেয়েটি আবার কথা বললে। মৃদু হাওয়ায় ফুলের পাঁপড়ি যেমন নড়ে—তেমনি শিথিলভাবে অল্প একটু নড়ল ঠোঁট দুটি।

—শ্রেষ্ঠী শুনতে পাচ্ছেন না? দেবদাসী শম্পা আপনার পদধূলি চাইছে।

রুদ্ধ কণ্ঠনালীর ভেতরে এতক্ষণে কথার আবেগ স্ফুরিত হয়ে আসতে চাইল। একটা অস্ফুট শব্দ করল শঙ্খদত্ত।

মেয়েটি সতর্কতার একটা আঙুল তুলল ঠোঁটের ওপরে।

—কোনো শব্দ করবেন না। ভেতরে চলে আসুন।

পুতুল নাচের খেলনায় সুতোর টান পড়ল। শরীরে নয়—বুকের শিরাগ্রন্থিতে। চোরাবালির ওপরে পা পড়লে যেমন হয়—তেমনি ভাবে তরল হয়ে গেল মাটিটা। যেন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল শঙ্খদত্ত—প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এক একটা ঢেউ লেগে টলে টলে যেতে লাগল তার।

যেমন নিঃশব্দে খুলেছিল, তেমনি নীরবেই বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটি। একটা পাথর বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গন পার হয়ে—একটি ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি আশ্রয় করে মহাশূন্যে উঠতে উঠতে অবশেষে একটি দীর্ঘ বারান্দায় পৌঁছে যেন খানিকটা স্বাভাবিক হল শঙ্খদত্ত। মনের অসাড় অবস্থাটা পার হয়ে গেছে—বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে ঝড়ের পালা। রক্তে সমুদ্র দুলছে এখন। যে মেয়েটি পথ দেখিয়ে এনেছিল, আর একটি বড় দরজার সামনে এসে সে থেমে দাঁড়ালো। সমুদ্র-নীল রেশমী পর্দাটি লঘু হাতে সরিয়ে দিয়ে বললে, শ্রেষ্ঠী, ভেতরে যান।

—ভেতরে?—রক্তে যে সমুদ্র দুলছিল এবার সে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল। সংশয়ক্লান্ত ক্ষীণ গলায় শঙ্খদত্ত বললে, না, থাক।

ফুলের পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট দুটি অল্প একটু বিকসিত হল মেয়েটির। কৌতুকে চকচক করে উঠল চোখ।

—বাইরের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাওয়ার সময় যখন হল—তখনই ভয়?

—না, ভয় নয়!—শঙ্খদত্ত উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বললে, আমি বরং ফিরেই যাই।

—তা হলে আগেই যাওয়া উচিত ছিল।—মেয়েটি হাসল: বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকেছেন, তখন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চলে যাওয়ার আর পথ নেই। ভেতরে

যান শ্রেষ্ঠী, ভয় নেই। দেবদাসী শম্পাকে লোকে আর যা খুশি ভাবতে পারে, কিন্তু তাকে কখনো কারুর বাঘ-ভালুক বলে মনে হয়নি।

বাঘ-ভালুক নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। দেবতার ফুল। তার দিকে মানুষের চোখ পড়লে দেবতার ক্রোধ আকাশ ভেঙে বজ্রের মতো নেমে আসবে।

সমুদ্র-সুনীল রেশমী পর্দাটিকে আরো একটু ফাঁক করে ধরল মেয়েটি।

যা হওয়ার হোক। শঙ্খদত্ত যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছুই চোখে পড়ল না তার। একরাশ সুগন্ধির ঘূর্ণির ভেতরে যেন তলিয়ে গেল সে। ধূপের গন্ধ—ফুলের গন্ধ। নিশীথ রাত্রিতে রহস্যময় মন্দিরের সেই আশ্চর্য পরিবেশ যেন আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। একটি শব্দও যেখানে উচ্চারণ করা যায় না—একটি নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলা যায় না—শুধু বিমূঢ় বিস্ময় বয়ে কোনো অভাবনীয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়!

—নমস্কার, আসুন।

স্বর নয়—সুর। সুগন্ধি ধূপের আড়ালটা সরে গেছে একটু একটু করে। রূপো দিয়ে গড়া একটি সাপের প্রসারিত ফণার ওপরে মণির মতো প্রদীপ জ্বলছে। জালিকাটা শ্বেতপাথরের একটি ধূপাধার থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে সুরভির কুয়াশা। দারুব্রহ্মের একখানি পট-চিত্রের ওপরে শুভ্র একছড়া মালা দুলছে। রক্তরঙের শাড়ী আর নীল কাঁচুলির আবরণে, বুকের ওপর দুটি নিবিড় কালো বেণী দুলিয়ে দেবদাসী শম্পা দাঁড়িয়ে আছে।

—বসুন, শ্রেষ্ঠী।

পাশেই চন্দন কাঠের চিত্রকরা একটি চৌকি। যন্ত্রের মতো শঙ্খদত্ত তার ওপরে বসে পড়ল। বসতে না পারলে মাথা ঘুরেই পড়ে যেত হয়তো।

কিন্তু লাল শাড়ী, নীল কাঁচুলি, আর দুটি কালো বেণীর দিকে শঙ্খদত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না। এ সে করেছে কী! এ কোথায় এসে সে দাঁড়ালো। হীরার বিষের মতো যে জ্বালা এতক্ষণ তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বলছিল—যে নেশার তীব্রতা কীটের মতো কেটে কেটে খাচ্ছিল তার মস্তিষ্ক—এই মুহূর্তে তাদের এতটুকু অস্তিত্বও আর অনুভব করছে না শঙ্খদত্ত। চক্ষের পলকে যেন মুক্তিস্নান হয়ে গেছে তার। আত্মহত্যা করার ঝোঁকে একটা মানুষ যেমন একটু একটু করে তার ছুরিতে শান দেয়, তারপর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ফলাটাকে নিজের বুকে বসিয়ে দেবার আগে যেমন হঠাৎ জীবনের মূল্যটা ধরা পড়ে তার কাছে—ঠিক তেমনি একটা চমক বিদ্যুতের মতো খেলে গেল শঙ্খদত্তের শরীরে। রাজার হাতীর সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল সে—অনুভব করেছিল দেবদাসী শম্পা কত দূরের তারা—কোন্ অধরা দিগন্তের ইন্দ্রধনু। কাছে এসে মনে হল—সামনে সে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রধনু নয়—ইন্দ্রজাল। হয়তো চোখ তুলে চাইলেই শঙ্খদত্ত দেখবে শম্পা নেই—এই প্রাসাদ নেই, কোথাও কিছুই নেই। শুধু একটা ঘন-অন্ধকার নিবিড় অরণ্যের ভেতরে অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবিশ্বাস্য কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। সুরভিত কুহেলিকার মতো। ধূপের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। দুধরাজ সাপের ফণার ওপর মণির মতো রূপালি আধারে দীপ জ্বলছে। মায়ামূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—কখন ধূপের ধোঁয়ার ভেতরে নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যাবে কে জানে।

—শ্রেষ্ঠী কোন্ দেশের?

মায়াময়ীর গলায় বাস্তব প্রশ্ন।

এবারে শঙ্খদত্ত চোখ তুলল। অপরূপ রূপবতী দেব-দাসীর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে। শ্বেত পদ্ম? অপরাজিতা? না, রক্তজবা?

আর একটি চৌকি টেনে আসন নিলে শম্পা। স্বপ্নসম্ভবা ক্রমশ ধরা দিচ্ছে বাস্তবের বৃত্তরেখায়। লাল শাড়ীর সীমান্তে যেখানে দুটি নৃত্য-চঞ্চল পায়ের পাতা আপাতত স্তব্ধ হয়ে আছে, তারই দিকে দৃষ্টি নামিয়ে এই প্রথম সহজ গলায় সে উত্তর দিতে পারল।

—আমি গৌড় দেশের বণিক। আমার বাড়ি সপ্তগ্রাম।

—আপনার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া বেশ-বাস, কানের বীরবৌলি।—শম্পার স্বরে তেমনি সুর ঝরে পড়তে লাগল: এখন তো বাণিজ্য বায়ু বইছে। আপনি কি তীর্থদর্শনে এসেছেন, না বাণিজ্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন?

—আমি বাণিজ্যে চলেছি। যাব সিংহলে।

—কী আনতে যাচ্ছেন শ্রেষ্ঠী ?

আশ্চর্য, এই কি আলোচনার ধারা ? এই ধরণের বৈষয়িক আলাপ শোনবার জন্তেই কি তাকে ডেকে এনেছে শম্পা ? স্নায়ুর ওপরে অসহ্য চাপ পড়া কতগুলো ভয়ঙ্কর অদ্ভুত মুহূর্ত কি সে কাটিয়েছে এরই জন্তে ? এ কোন্ কৌতুক ? এর উদ্দেশ্যই বা কী ?

শঙ্খদত্ত বললে—মুক্তা আনতে যাব সিংহলে। আর আনব কর্পূর। হাতীর দাঁত।

চৌকির ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার। বাম দিক থেকে সরে গেল শাড়ীর আঁচল—নীল পর্বতচূড়া দেখা দিল রক্তমেঘের আড়াল থেকে। পর্বতের পাশে সোনালি ঝর্ণার মতো ঝল্‌কে উঠল মণিহার।

একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে। স্বপ্ন-কল্পনার অতলে হারিয়ে গিয়ে যে-হাসিকে রূপায়িত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠশিল্পী ; যে সুতনুকার হাসির ধ্যানে কল্পান্ত তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল।

—পট্টবস্ত্রের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর মতো এক একটি অতুলনীয় মুক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কেন ঝুটা মুক্তার ওপর ? আর যে ঝুটা মুক্তার চারদিকে তিমি আর হাঙর পাহারা দিচ্ছে—শ্রেষ্ঠীকে যা আয়ত্ত করতে হবে জীবনের বিনিময়ে ?

নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনালি ঝর্ণায় শঙ্খদত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, তড়িৎগতিতে তা ফিরে এল সেখান থেকে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল-অজগরের মতো।

—আমি—

শঙ্খদত্ত কথাটা শুরু করল মাত্র, শেষ করতে পারল না। জানালা দিয়ে হাওয়া এল খানিকটা। মণির নিষ্কম্প শিখাটা দুলে উঠল—জলের ওপর কাঁপতে থাকা জ্যোৎস্নার মতো একটা অলৌকিক আভা দুলল শম্পার চোখে-মুখে।

—অনেক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন আপনি। অনেক বাণিজ্য করেছেন। আজ আপনার এ-ভুল করা উচিত ছিল না।

—কিসের ভুল ?—যে নিবিড় অন্ধকার অরণ্য থেকে কাল অজগর নেমে এসেছে, যার প্রান্তরেখায় জ্বলছে সন্ধ্যা-তারার মতো কুঙ্কুম-কণা, তারি ভেতরে যেন নিরুপায় ভাবে হারিয়ে যেতে লাগল শঙ্খদত্ত, প্রশ্ন করলে নিতান্ত অর্বাচীনের মতো : কিসের ভুল ?

আবার সেই হাসি ফুটল শম্পার মুখে। সেই আশ্চর্য হাসি—যার কল্পনার তুলিতে স্বপ্নের রঙ মিলিয়ে প্রলেপ টেনেছে ধীমান—যাকে প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে অন্ধকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রেতাত্মার মতো রাত্রি জাগরণ করে বেড়িয়েছে শিল্পী বীতপাল !

শম্পা বললে, তা হলে আর একটু স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হল। আজ যে প্রাচীরের পাশে এসে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আসলে ওটা একটা মৃত্যুর ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—মৃত্যুর ফাঁদ ?—শঙ্খদত্তের চোখ চকিত হয়ে উঠল। শম্পার মুখের আর কোনো অংশই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না এখন। শুধু নিশীথ অরণ্যের প্রান্ত থেকে সন্ধ্যাতারাটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ; যেন তারই একটি আলোক-রেখাকে আশ্রয় করে নেমে আসছে শম্পার স্বর আকাশ থেকে। অপরিচিত অজ্ঞেয় অরণ্য থেকে। মৃত্যুর ওপার থেকে। শম্পার স্বরে যেন কোথাও কোনো ধ্বনি নেই ; একটা সূচিসূক্ষ্ম আলোক রেখা হয়ে তা তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে বিদ্ধ করে চলেছে !

—শ্রেষ্ঠী কি জানেন না—এই নগরে প্রাচীরের পাশের ওই নির্জন জায়গাটিই সব চাইতে ভয়ঙ্কর ? ওখানে একটি দুটি নয়—শত শত মৃত-আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর অভিসম্পাত মিশে রয়েছে। আপনি প্রেতপুরীতে পা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী—তারা আপনার হাত ধরে মৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাতারাও আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো অরণ্য। শুধু মৃত্যুলোকের ইঙ্গিত। আর একবার প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল—ডান দিকের বেণীটা দুলে উঠল এইবার—ঘুম ভেঙে জাগল আর একটা কাল-অজগর।

শম্পার স্বর তেমনি সূচিমুখ আলোকের মতো এসে বিঁধছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কিন্তু সূচি নয়—সূচিকাভরণ। বিন্দু বিন্দু সাপের বিষ ক্ষরিত হচ্ছে তা থেকে—একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের ভেতরে।

শম্পা বলে চলল, শুধু আজই নয়। এক বছর, দু বছর, দশ বছরও নয়। কতকাল থেকে কে জানে—মন্দিরের

প্রধান দেবদাসী দিন কাটিয়ে গেছে এই প্রাসাদে। এই জানালায় বসে সে চুল বেঁধেছে, এই নাগ-প্রদীপে আলো হয়েছে তার ঘর—এরই মর্মর-বিস্তারের ওপর মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালের সঙ্গে আর বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সে নাচের পা ফেলেছে। তাকে দেখে কত মানুষ লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আলেয়ার ডাক শুনে ছুটে এসেছে এখানে—দাঁড়িয়েছে এই প্রাচীরের পাশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তারপর যথাসময়ে রাজার প্রহরী এসে শিকলে বেঁধেছে তাকে। দেবতার দাসীর প্রতি পাপ দৃষ্টি ফেলবার অপরাধে বিচার হয়েছে তার—কুঠারের ঘায়ে তার ছিন্নমুণ্ড গড়িয়ে গেছে মাটিতে। শ্রেষ্ঠী, আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ওটা সেই শ্মশান। ওখানে সেই সব অতৃপ্ত প্রেতের আনাগোনা। তাদের সেই বিভীষিকার আতঙ্কে এই নগরের সাধারণ মানুষ দিনের আলোয় পর্যন্ত কখনো ওখানে আসে না।

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে রইল। পাহাড়ের পাশে রক্তমেঘে যেন অগ্নিঝড়ের পূর্বাভাস। কাল-অজগরের ফণা দুলছে সোনালি ঝর্ণার ওপরে। কিন্তু ওই পর্বতচূড়োটা কি একটা নিশ্চল সমাধি? মৃত্যুর ঘন নীল অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে আছে?

কিন্তু—কিন্তু—মন্দিরের সেই রাত। সেদিন এ-দেহে কোথাও মৃত্যু ছিল না। সুরে-বাঁধা সোনার বীণার মতো প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীত জাগছিল তখন। সেই রাত!

শম্পা বললে, এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যেই শ্রেষ্ঠীকে ডেকেছিলাম। গোপনেই ডাকতে হয়েছে। প্রধান পুরোহিত যদি জানতে পারেন তা হলে এর জন্যে কঠিন শাস্তি নিতে হবে আমাকে। কিন্তু তার চাইতেও বড় দায়িত্ব শ্রেষ্ঠীকে সাবধান করে দেওয়া। সে কর্তব্যই আমি করলাম।

রাত্রির শ্বেত পদ্ম—সকালের অপরাজিতা। সন্ধ্যায় সে রক্ত জবা। শোণিতভরা খর্পরের মধ্যেই সে শোভা পায়। কত ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে গেছে তার পায়ের তলায়! আজ নয়—কাল নয়—কত বৎসর—কত শতাব্দী! সেই সব আত্মার শ্মশান ওই প্রাচীরের পাশে নয়—সে শ্মশান ছড়িয়ে রয়েছে এই শম্পার সর্বদেহে। দেবদাসী-পরম্পরায় সেই সব অভিশপ্ত বৎসর আর নিরর্থ কামনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছে শম্পা। তার কালো চুলে তাদের শূন্যময় হতাশা তিমির-স্তব্ধ; সন্ধ্যাতারার কুঙ্কুম-বিন্দু তাদেরই রক্ত দিয়ে রাঙানো; তার হৃদয়ে তাদেরই উত্তুঙ্গ বাসনার বিকাশ; তার সমস্ত শরীরের ছন্দোময় রেখায় রেখায় তারাই জড়িয়ে আছে সরীসৃপ ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ সেই শ্মশানকে প্রত্যক্ষ করল শঙ্খদত্ত। তবু সেই মন্দির। সেই আলো। সেই বীণা। সুকুমার তনুতে সদ্য-ফোটা পদ্মের প্রথম বিস্ময়। নির্মল। নিষ্পাপ। সেই রাত্রি।

কোন্‌টা সত্য? কোন্‌টা মিথ্যা?

শঙ্খদত্ত হঠাৎ মাথা তুলল। চুলে নয়—কপালে নয়—কালো মুক্তোর মতো চোখের দিকে নয়—রক্ত মেঘের দিকেও নয়। সেই রাত্রি। সব কিছু ছাড়িয়ে সেই চন্দন-মূর্তি।

শ্মশান নয়—মন্দিরই বটে। অনেক বলির পরে একজনের সিদ্ধিলাভ।

নিজের স্তব্ধ বিমূঢ় ভাবটা আচমকা কাটিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত

—তারা ভীরু। তাদের সাহস ছিল না।

—কিসের সাহস?—এবার বিস্ময়ের পালা শম্পার সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা দুটি জিজ্ঞাসায় সংকীর্ণ হয়ে এল।

—তারা শুধু প্রার্থনাই করেছে। কেড়ে নিতে পারেনি।

—কেড়ে নেবে কাকে? দেবদাসীকে?

—দেবতার দাসী নেমে আসুক স্বর্গ থেকে। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কী অধিকার দেবতার? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবেনা। প্রতিবাদ জানাবে সে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল শম্পা। সেই হাসির শব্দে ধূপের গন্ধটা পর্যন্ত চমকে উঠল, দুধরাজ নাগের মাথার মণির মতো প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল চকিত হয়ে; নীল পাহাড়ের চূড়ো থেকে রক্ত মেঘের আবরণটা আবার স্খলিত হয়ে পড়ল—চিক চিক করে উঠল গলার সোনার হার।

শম্পা বললে, শ্রেষ্ঠী, অত সহজ নয়। দারুব্রহ্ম নিজের হাত দুটিকে বিসর্জন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর চারদিকে সশস্ত্র বাহুর অভাব নেই। পেছনের দরজা একবারই খুলেছে—বারে বারে তা আর খুলবে না। সামনে দাঁড়িয়ে

সাক্ষাৎ মৃত্যু। অন্ধের মতো সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার একটি মাত্র পরিণামই ঘটতে পারে।

শঙ্খদত্ত এইবার—এই প্রথম তাকালো শম্পার চোখের দিকে। দুর্লভ দামী কালো মুক্তোর মতো সেই চোখ। সুতনুকার চোখের কথা ভাবতে গিয়ে এই চোখেরই তো ধ্যান করেছে রূপদক্ষ দেবদত্ত; এই চোখের আলোটিকে ফোটাবার জন্যই তো ব্যর্থ ক্ষোভে রঙের পরে রঙ্ মিশিয়েছে ধীমান; এই চোখের হাতছানিতেই তো নিশি-পাওয়ার মতো অন্ধকার পাগড়ে পাহাড়ে অভিশপ্ত আত্মার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে বীতপাল!

শঙ্খদত্ত বললে, কিছুই বলা যায় না।

শম্পা আবার তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠল: গৌড়ের শ্রেষ্ঠী কি আমাকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?—কিন্তু মাঝ পথেই একটা গভীর বেদনায় তার হাসির স্বর থেমে গেল: শ্রেষ্ঠী হয়তো আজও কুমার। তাই একটা রোমাঞ্চকর কিছু করবার কল্পনা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলছে। কিন্তু এসব ভাবতে যাওয়াও আত্মহত্যার সমান। শ্রেষ্ঠী রূপবান—দেখে মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যেরও তাঁর অভাব নেই। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের পাণিগ্রহণ করুন তিনি—এসব বিকার দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তা ছাড়া গৌড়দেশ তো সুন্দরী মেয়েদের জন্যে বিখ্যাত।

শঙ্খদত্ত বললে, যাদের সহজে পাওয়া যাবে তারা তো রইলই। কিন্তু যাকে পাওয়া সবচেয়ে দুষ্কর—তারই জন্যে আমি চেষ্টা করে দেখব।

—কিন্তু বাণিজ্য?

—লক্ষ্মীর আশাতেই লোকে বাণিজ্য করে। তাকে পেলে আর কিছুরই দরকার নেই। না মুক্তা—না কর্পূর—না হাতীর দাঁত।

শম্পা তেম্‌নি গভীর গলায় বললে, লক্ষ্মী নয়—আপনার ভুল হচ্ছে। এ অলক্ষ্মী—এ ঝুটা মুক্তা।

—আমি বণিক। কোন্‌টা সাঁচ্চা আর কোন্‌টা মেকি সে আমি চিনতে পারি।

শম্পা হঠাৎ আর্তস্বরে বললে, শ্রেষ্ঠী, আর নয়। আপনি ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে একটা।

—সেই সীমাটা আমি দেখতে চাই।

—কিন্তু পেছনের ওই দরজাটা আর খুলবে না।

—দেওয়াল পার হয়েই আমি আসব।

মুহূর্তে রক্ত সরে গিয়ে শাদা হয়ে গেল শম্পার মুখ। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দাঁতে নিজের ঠোঁটটাকে সে কামড়ে ধরল একবার। তারপর কঠিন গলায় বললে, সর্বনাশ এম্‌নি করেই মানুষকে টানে। আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু আর নয়। চিত্রা—

দরজার সমুদ্র-নীল পর্দা সরিয়ে সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো।

—নৃত্য শিক্ষকের আসবার সময় হয়েছে। তুমি শ্রেষ্ঠীকে বাড়ির বাইরে রেখে এসো। না—আর এক মুহূর্তও নয় এখানে।

ক্রমশঃ

সংকেত

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

জীবনের বৃন্ত হতে
মৃত্যু আজ করে করাঘাত,
ক্লান্ত মন আনে ছায়া
মরণের কঠিন সংঘাত!
কিসের প্রত্যাশা
কাল গোনো প্রহরে প্রহরে—
ধূসর দিগন্তে আর
ধূ ধূ করা বালুকা প্রান্তরে?

তোমার সোনার দিন
আঁধারে যে করিয়াছে গ্রাস—
নীলাকাশ নিভে গেছে,
আকাশেতে ঝড়ের আভাস।
হৃদয় রাঙানো দিন,
কল্পনার জাল বোনা মিছে-
তোমার প্রাসাদে আজ
মরণ শ্বসিছে!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অন্ন ও বস্ত্র—

দেশ বিভক্ত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্নের ও বস্ত্রের অভাব হইতে মুক্তি পায় নাই; ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু নানা পরিকল্পনার অনিশ্চয়তায় লোক যেমন বিভ্রান্ত হইতেছে, তেমনই বহু পরিকল্পনার অপব্যয়ে পরিকল্পনাকারীদিগের আন্তরিকতায় ও যোগ্যতায় আস্থা হারানয় দেশে অসন্তোষের আগ্নেয়গিরির গৈরিকস্রাব প্রবাহের সম্ভাবনাই প্রবল করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বলা হয়, খাদ্যোপকরণে ভারত রাষ্ট্রের স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। কিন্তু তাহার পরে বলা হয়, হিসাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ধরা হয় নাই; যেন দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এ সকল ঘটিবে না মনে করিয়াই সরকারের বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তাহাই সঙ্গত। আবার পরিকল্পনাকারীরা যে আনুমানিক ব্যয় দেখাইয়া কাজ আরম্ভ করিতে প্ররোচিত করেন, কার্য্যকালে ব্যয় তাহা অতিক্রম করিয়া যায়। ইহা অযোগ্যতার পরিচায়ক কি ইচ্ছাকৃত ভুল তাহাও বলা যায় না।

এ বার আমরা শুনিতেছি, খাদ্যোপকরণে ভারতরাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ, ভারতের খাদ্য-মন্ত্রী মিষ্টার কিদোয়াই ব্রহ্মের মন্ত্রীকে—চাউল বিক্রয়ের জন্য কোন অমিত্র দেশের সহিত ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন! কেবল সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের উপদেশ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মের মন্ত্রী মিষ্টার থাকিন ঐ কথার উপযুক্ত উত্তর দেন নাই। কয় বৎসর পূর্ব্বে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অবিমৃশ্যকারিতাহেতু বলিয়াছিলেন, পর-বৎসরের পর ভারত রাষ্ট্র আর বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবে না এবং সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্রহ্ম তাহার অতিরিক্ত চাউল অন্যান্য দেশে বিক্রয় করায় শেষে ভারতকে অনেক অধিক অর্থ দিয়া চাউল কিনিতে হইয়াছিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নাকি পণ্ডিত জওহরলালের হিসাব বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এ বার জিজ্ঞাস্য, ভারত যদি খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে কাহার বা কাহাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য "রেশনিং" ও "লেভী" বহাল রাখা হইতেছে, কেনই বা খাদ্য বিভাগ দৈত্যের মত দেশের স্কন্ধে বসিয়া আছে এবং কেনই বা পশ্চিমবঙ্গে রেশনে কদর্য্য চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইল? এ সকল যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রমাণ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। আর কেনই বা ব্যবসায়ীদিগকে ব্রহ্ম বা নেপাল বা থাইল্যাণ্ড হইতে চাউল আমদানী করিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে না? পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র যে চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ভারত সরকার ২০শে শ্রাবণও স্বীকার করিয়াছেন যে সরকার দীর্ঘ ৫ বৎসরেও কৃষিপ্রাণ দেশকে খাদ্য-বিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে পারিল না, সে সরকারের ক্ষমতায় অবিচলিত থাকিবার দাবী কি যুক্তিসহ বলা যাইতে পারে?

প্রতি বৎসরের মত এ বারও, যখন বর্ষাকালে গুদামে চিনি গলিয়া যায় এবং সেই জন্য ব্যবসায়ীরা "বাধ্যত" চিনি বাজারে ছাড়িতে বাধ্য হ'ন, তখন সরকার দেশের লোকের জন্য চিনি সুলভ করিবার কাজে ব্যাকুলতা দেখাইতেছেন। এমন কি এ বার বিদেশ হইতেও চিনি আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের জন্যই কি চিনির মূল্য হ্রাসে সরকারের অসম্মতি দেখা যাইতেছে না? সরকার কেন চিনির মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছেন এবং ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মে মূল্য হ্রাসের বাধা দিতেছেন? ইহা জনগণের সুবিধার জন্য, না মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর লাভের জন্য?

অন্যান্য বৎসরের মত এ বারও দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে কাপড়ের মূল্য কমাইবার জন্য সরকারের ব্যাকুলতায় লোকের মনে হইতেছে—"মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে, শাখু করল বকে।' কয় মাসের জন্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কলের কাপড়ের মূল্য শতকরা ৫ টাকা বা ঐরূপ হ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছে। অবশ্য কাপড়ের কল-মালিকদিগের পরামর্শেই তাহা হইতেছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ ও পুনর্নিয়ন্ত্রণ—এই নীতি-পরিবর্ত্তন—বহুরূপীর বর্ণ-পরিবর্ত্তনের মতই হইয়া আসিতেছে এবং ফলে লোক কি হইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। কাপড়ের কলে ও হাতের তাঁতে দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব, এমন বিশ্বাসের ভিত্তি নাই—তুলা বিদেশ হইতেও আমদানী হইতেছে এবং পাকিস্তানও আজ বিদেশ। পশ্চিমবঙ্গে হাতের তাঁতে সূতার অভাব মজ্জাগত হইয়াছে। অথচ প্রদেশে সূতার কল কোথায়? যে সকল কাপড়ের কল আছে সে সকলের সূতা তাহারাই বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করে এবং কেবলই শুনিতে পাওয়া যায়, কাপড় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না—আর সেইজন্য

চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে কলের কাপড়ের মূল্য হ্রাস হইতেছে না। বাঙ্গালায় কলের কাপড় বিক্রয় করিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কল-মালিকরা লাভবান ব্যবসা কায়েম করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল। আজ বিভক্ত দেশে বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, কাণপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ এই সকল স্থানের কলে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব সেই পরিমাণ উৎপাদন হইলেও দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হয় না, এ কথা বেবনিয়াদ। কিন্তু যে স্থানে সরকার নীতির দোষে সমস্যার সৃষ্টি করেন, তথায় অবস্থা—"না-দলিল, না-উকীল, না-আপীল।" কেবল বড় বড় কথায় যেমন লোকের উদরপূর্ত্তি হয় না, তেমনই আচ্ছাদনের অভাবও দূর হয় না। বস্ত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতি কাহার বা কাহাদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত ও পরিবর্ত্তিত হয়—তাহা দেবতারা জানেন কি না বলা যায় না—মানুষ জানে না, তাঁহারা মানুষকে জানিতে দেনও না।

যে রাষ্ট্রে অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হয় না, সে রাষ্ট্রে লোকের সুখ-সমৃদ্ধির পরিমাণ কিরূপে পরিমাপ করা যায়?

বেকার-সমস্যা—

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন রাষ্ট্রে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের নিকট আপনাদিগের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সমস্যা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণ ও জনগণের আর্থিক দুর্দ্দশা মিলিত হয়, সেই স্থানেই অগ্নি-জ্বলিয়া উঠে। ইংলণ্ডে যেমন ফ্রান্সেও তেমনই ইহা দেখা গিয়াছে এবং আয়ার্লণ্ডে ও মিশরে ইহাই হইয়াছে। বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও প্রবল। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের সংখ্যাধিক্যে দুই প্রকার বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে--শিক্ষিতগণ চাকরী বা জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন উপায় পাইতেছে না, অশিক্ষিতরা জমীর অভাবে কৃষিকার্য্যে ও শিল্পের অভাবে শ্রমিকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছে না।

সম্প্রতি য়ুরোপে কয়দিন যাপন করিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারজন্য আগামী ৩ বৎসরে ৮।১০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করিলে শিক্ষিত বেকারের সমস্যার কিছু সমাধান হইবে। কিন্তু ৩ বৎসরে ৮।১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ কি সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর মতই হইবে না? তাহাতে কেবল সরকারের এই সুবিধা হইতে পারিবে যে, ৩ বৎসর পরে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে বিনাব্যয়ে সরকারী দলের নির্ব্বাচনজন্য ৮।১০ হাজার কর্ম্মী বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু শিক্ষক-সম্প্রদায় এখনই পারিশ্রমিকের স্বল্পতায় যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্য করিতেছেন না?

আর ১০ হাজার লোক নিয়োগে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কতটুকু হ্রাস পাইবে?

তাহার পরে অশিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যার কি হইবে? কৃষক-দিগের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক পশ্চিম-বঙ্গে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বহু বিলম্বে ৩ কাঠা হিসাবে বাসের জমী দিলে কি হইবে? চাষের জমী ব্যতীত তাহারা কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে? সে জন্য আরও জমী প্রয়োজন। পরলোক-গত সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল যখন পূর্ব্ব পাকিস্তানের নিকট তাহাদিগের জন্য জমী দাবীর কথা বলিয়াছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল সে প্রস্তাবে, যেন ভয় পাইয়া, তাহা চাপা দিয়াছিলেন—পাছে পাকিস্তান রুষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার হইতে বঙ্গভাষাভাষী অংশ পাইবার দাবী করিয়া সে দিকে আর অগ্রসর হ'ন নাই।

শ্রমিক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলে, কাপড়ের কলে, অন্যান্য কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পাটের কলে এই অবাঙ্গালী শ্রমিকের আধিক্য কেন ঘটিয়াছে, তাহা শিল্প কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতাই তাহার কারণ নহে। যে সকল কারণে তাহা ঘটিয়াছে, সে সকল দূর করিবার চেষ্টাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেছেন না। টাটানগরে যদি বিহারী নিয়োগের জন্য বিহার সরকার নির্দ্দেশ দান করিতে পারেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের বিরোধিতা করিতে পারেন না? অশিক্ষিত-দিগকে শিক্ষিত করিয়া বেকারদিগের সমস্যা প্রবলতর করিলে কি ফল লাভ হইবে? আর প্রদেশের শ্রমশিল্প কি অবাঙ্গালীরাই করিতে থাকিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিবের পরিকল্পনা যে হাস্যোদ্দীপক তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হয়ত শিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ও সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক দল অবিচলিত রাখিয়া সমর্থন লাভ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচিবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উপসচিব নিয়োগ করিয়াছেন—এমন কি উপসচিবদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া ২ জনকে পদোন্নতি করিয়া দিয়া অপরগুলিকে নিকৃষ্টতার ছাপ দিলেও তাঁহারা অপমানে পদত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? বহু দিন পূর্ব্বে ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার—এ দেশে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির ফল বিবেচনা করিয়া এই বেকার-সমস্যার ভয়ই দেখাইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুলোৎপাদিকা কৃষির ও উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য করিতেছেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে ফল অতি তিক্ত—বিষময়।

চীন কিরূপে বেকার-সমস্যা বিলুপ্ত করিয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া কাজ করা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনাবশ্যক মনে করেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের ব্যর্থ ব্যবস্থায়, কলিকাতায় যানচালনায় আর্থিক ক্ষতিতে, বহু-উপসচিবের বেতনাদি বাবদে, কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের দুরাশায় যে অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে প্রদেশে উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং যে সকল শিল্প এখনও আছে সে সকলের উন্নতি সাধিত হইলে প্রকৃত উপকার হইত

...তের তাঁত শিল্পে যদি উন্নতি সাধিত হইত—সূতা যোগান হইত ও ...দ্র বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে যে বেকার-সমস্যার তীব্রতার ...শম হইতে পারিত, তাহাও কি সরকারের সর্ব্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করিতে পারেন না?

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ও সৃষ্টি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ভার যে সচিব পাইয়াছেন, তিনি পার্লামেণ্টে সদস্য ছিলেন এবং তথায় "হিন্দু কোড বিল" সমর্থন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ বার তিনি পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচনে বিপুল ভোটে পরাভূত হইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন যদি লোকের আস্থার পরিমাপক হয়, তবে তিনি সে আস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাকে সান্ত্বনা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে সচিবত্ব দিয়া পরে উপনির্ব্বাচনের পথে ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যাধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

(১) উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের কার্য্য সন্তোষজনক হয় নাই।

(২) প্রকৃত উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই।

অথচ এই কার্য্যে এক কোটিরও অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে! তাহার কত অংশ চোরাবালুতে গিয়াছে, কে বলিবে? তাঁহার প্রদত্ত হিসাবে প্রকাশ—

গত জুলাই মাসের শেষপর্য্যন্ত ১৬ হাজার পরিবার আশ্রয় শিবিরে স্থান পাইয়াছিল—তাহার মধ্যে ১০ হাজার পরিবার কৃষক। ২১ হাজার পরিবার যে জমী দেখিয়াছে, তাহাতে বাস করিতেছে। ১০ হাজার পরিবার মুসলমানদিগের ত্যক্ত গৃহে অনধিকার বাস করিতেছে। ২৩ হাজার পরিবার বাসজন্য জমী চাহিয়া আবেদন জানাইয়াছে।

এই স্বীকারোক্তি হইতেই অবস্থার ভয়াবহত্ব সপ্রকাশ। ইহার জন্য দায়ী কে? কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি পল্লীর কথা আমরা জানি—সে বিজয়গড় পল্লী। উহার অধিবাসীরা বহুবার চাহিয়াও জমীর অধিকার লাভ করেন নাই; সুতরাং অনিশ্চয়তাহেতু স্থায়ী বাসের ব্যবস্থাও করিতে পারিতেছেন না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অবস্থা।

যে সকল কৃষক পরিবার আশ্রয় শিবিরে স্থান পাইয়াছে, তাহারা কেবল স্থান পাইলে কি হইবে? কৃষির জন্য জমী কোথায়?

সচিব আশা দিয়াছেন—২ বৎসরে তিনি সুব্যবস্থার আশা করেন। ইতোদিনে যাহারা অনাহারে না হইলেও অপূর্ণাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বা অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, তাহাদিগের অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ যেন মরণাহত রোগীকে আশ্বাস—

"থাক দেখি তুই সয়ে,—
ভাদ্র মাসে ভাত দেব তোরে
ঝিঙের ঝোল দিয়ে।"

সরকার গত ৫ বৎসরে যাহা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যদি ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহা মনে করিতে হয়, তবে আশার কতটুকু অবকাশ থাকিতে পারে?

আজ পুনর্ব্বাসন সচিব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—কাজ সন্তোষজনক, এমন কি আশানুরূপও হয় নাই। অথচ গত জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে:—

কৃষি ঋণ—	৩১,৫৫,৭০৩ টাকা
ব্যবসার জন্য ঋণ —	৫২,৯৬,২৫৭ টাকা
গৃহনির্ম্মাণ জন্য ঋণ—	১,৬২,৩৮,২৪৩ টাকা

এই অর্থের সম্যক সদ্ব্যবহার হইয়াছে কি? যে সকল পদস্থ কর্ম্মচারীর উপর ঋণ দানের ভার ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হ'ন নাই, এমনও নহে। অযোগ্য প্রার্থী ঋণ পাইয়াছে, যোগ্য বঞ্চিত হইয়াছে, এমনও অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে। সর্ব্বত্রই কি সরকার কেবল রাজনীতিক দল বিশেষভুক্ত লোকের সহযোগ গ্রহণ করেন নাই? সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরা কি ক্ষমতাপন্ন অসঙ্গত আচরণের জন্য অভিযুক্তও হ'ন নাই?

এক দিকে এই অবস্থা, আর এক দিকে পাকিস্তানের সহিত জওহরলাল যে ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আরও উদ্বাস্তু সৃষ্টি করা হইবে। তিনি কতকগুলি "ছিটা মহল" পূর্ব্ব পাকিস্তানকে দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন—তাহাতে সেই সকল স্থান হইতে যে বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সরকার গত ৫ বৎসরে করিতে পারেন নাই, সেই সমস্যা আরও প্রবল ও জটিল হইবে।

পাকিস্তান বিনিময়ে কি দিবে? যদি বিনিময়ে অর্থ দেয়, তবে তাহা কি "পেয়েবল হোয়েন এবল"—অর্থাৎ যখন পারিবে তখন শোধ করা হইবে, এই সর্ত্তে—পাকিস্তান কায়েম করিবার জন্য গান্ধীজীর নির্দ্দেশে যেমন টাকা দেওয়া হইয়াছিল তেমনই ভাবে হইবে? না—জমীর বিনিময়ে জমী দেওয়া হইবে? যদি জমী দেওয়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে যে জমী পাওয়া যাইবে, তাহাতে মুসলমানরা নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু যে জমী পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে যাইবে তাহাতে হিন্দুরা বাস করিতে পারিবেন না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-সমস্যা আরও প্রবল হইবে। ইহাই কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিপ্রেত? তিনি কি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন? আর ঐ সকল "ছিটা মহলের" অধিবাসীদিগের গণভোট গ্রহণ করিবার কথা কি তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান ত্রুটি তাঁহারা মনে করেন—সকল সমস্যা সমাধানের উপায় কেবল তাঁহারাই করিতে পারেন—সে জন্য বাহিরের কাহারও পরামর্শের কোন মূল্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। কেবল হয়ত প্রধান সচিব আবার সরকারী ব্যয়ে—য়ুরোপে বা আমেরিকায় যাইয়া, এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে বিশেষ অজ্ঞ কোন কোন লোককে

বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রভূত পারিশ্রমিক দিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিতে আনিবেন।

উদ্বাস্তুদিগকে কলিকাতার উপকণ্ঠে—কাশীপুরে পাটগুদামে কি অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অভিযোগ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং প্রতীকারোপায়ও হইয়াছিল; কিন্তু প্রধান সচিব বা পুনর্ব্বাসন সচিব কি কোন দিন পরিদর্শনে যাওয়া প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন?

এই কার্য্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি রাজনীতিক দলনির্বিশেষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহযোগ চাহিয়াছেন? তাঁহারা কি মানুষের জীবন লইয়া যে খেলা করিতেছেন, তাহা একান্ত লজ্জার বিষয় নহে?

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের মনোভাবের পরিচয় আমরা একাধিকবার পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন?

পঞ্জাবের সমস্যা-সমাধানে যে চেষ্টা হইয়াছে বাঙ্গালার সমস্যা সমাধানে কি সে চেষ্টাও করা হইয়াছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতির অসাফল্য ও ব্যর্থতা যে যে-কোন সভ্য সরকারের পক্ষে কলঙ্ক-জনক তাহা বুঝিয়া সরকারকে কাজ করিতে হইবে—২ বৎসরের কথায় লোক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কারণ, বিপদ দূরস্থ নহে এবং বিলম্বে লোকের মৃত্যুই অনিবার্য্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে রক্ষা করাই সরকারের কাজ।

বাঙ্গালা ও বিহার—

বাঙ্গালার গোমুখীমুখ হইতে জাতীয়তার যে পাবনী ধারা নির্গত হইয়াছিল—ভগীরথ যেমন শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাই গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত লইয়া যাইয়া দেশ পূত করিয়াছিলেন বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই সেই জাতীয়তার ধারা সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী তরুণ প্রথম দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু, বোধ হয়, স্বভাবদোষে, আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনীতিক নেতারা বাঙ্গালাকে সহ্য করিতে পারেন না। মহম্মদ আলী জিন্না যখন সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রে দেশ বিভক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সমৃদ্ধ কলিকাতা বন্দর পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা পাকিস্থানভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। যে জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের মর্য্যাদা বুঝিবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করেন নাই তিনি যে রাজাগোপালাচারীকে স্বায়ত্তশাসনশীল বিভক্ত ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্ণর করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই রাজাগোপাল অনায়াসে পঞ্জাব ও বাঙ্গালা বর্জ্জন করিয়া ভারতের অবশিষ্ট অংশে প্রভুত্ব সম্ভোগের কথা বলিয়াছিলেন। কাজেই আজ যখন জওহরলালের বন্ধু মহম্মদ আলী পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কাশ্মীর রাজ্য উপহার চাহিতে সাহস করিয়াছেন, তখন যে পশ্চিমবঙ্গের লবণ খাইয়া যাইয়া ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু বলিবেন—তাঁহার প্রস্তাব, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিহারভুক্ত করা হউক, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর কাটজু এই কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল ছিলেন, তখন কি কেবল নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়াই তুষ্ট ছিলেন? না—তাঁহার পূর্ব্বব... রাজ্যপাল রাজাগোপালের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অতিথি সৎকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট "সামচুয়ারী এলাওয়েন্সে"ও হাত দিয়াছিলেন?

আমাদিগের মনে হয়, বাঙ্গালার লবন বিদেশী গ্রহণ করিলে তাহার ফল—"নিমকহারামী" হইতে পারে। যে ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ "বিহারে বিহারীরই অধিকার" রব তুলিয়া বিহারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনায়াসে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী করিতে বলিয়াছিলেন, তিনিও বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিহারে নানা উন্নতির কারণ বাঙ্গালী। বিহারী নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে সব বঙ্গভাষাভাষী স্থান ইংরেজ অন্যায় করিয়া বিহার-ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু আজ ক্ষমতা পাইয়া বর্ত্তমান বিহারী নেতারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। আর আজ ডক্টর কাটজু বলিতেছেন, তাঁহার প্রস্তাব-কলিকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিহারভুক্ত করা হউক!

কোন্ সাহসে তিনি এরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু কি তাঁহাদিগের সাহস বাড়াইবার অন্যতম কারণ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও সেই সরকারের তাঁবেদার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির ব্যবহারও কি সেজন্য দায়ী নহে? পশ্চিমবঙ্গে যখন বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের দাবী প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিব রাজ্যের ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব করাইলেন—ধানবাদ ও টাটানগর—সমৃদ্ধ স্থানদ্বয় বাদ দিয়া বিহারের অবশিষ্ট বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হউক—অধিকার স্বীকার করিয়া নহে, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য স্থানাভাব বলিয়া অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া। সে প্রস্তাবে বিহারী নেতারা যখন যুক্তির পরিবর্ত্তে অশিষ্ট গালি দিতেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা "সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" বলিয়া নির্ব্বাক রহিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, বিহার যদি ঐ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দিতে অসম্মত হয়, তবে তিনি তাঁহার কংগ্রেসী বাহিনী লইয়া পদব্রজে তথায় অভিযান করিবেন। তিনি বিহারের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া আর বাক্যব্যয় করিতে না পারিয়া মনে করিলেন—

> যে জন করিয়া যুদ্ধ ত্যজে এ জীবন—
> সে কভু না পারে আর করিবারে রণ;
> যে করে সমর ক্ষেত্র হ'তে পলায়ন—
> সে তবু ফিরিতে পারে করিবারে রণ।

সেই দৌর্ব্বল্য বিহারের সাহস বিবর্দ্ধিত করিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা প্রবল হইলেও পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা কর্পোরেশন

প্রভৃতিতে বিহারীর অন্নার্জ্জনে কোন বাধা নাই। বিহার মনে করে—বাঙ্গালী কলসীর কাণায় আহত হইলেও প্রেম দিতে আগ্রহশীল; সে সুযোগ বিহার কেন গ্রহণ করিবে না?

ডক্টর কাটজু ঐ ধৃষ্ট প্রস্তাব করিবার সময় আবার নির্লজ্জভাবে বলিয়াছিলেন—তাহাতে বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি মনে করিবেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। আমরা কিন্তু বলিতে পারি—কৃতঘ্নতার নগ্ন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া নির্মলচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীকে এই সকল লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশ হইতে সে যে সাহায্য পাইবে, সে আশা হয়ত দুরাশা। যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত, তাহাতেও বাঙ্গালী পঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত অন্য কাহারও সহযোগ লাভ করে নাই! পরন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ, প্রভৃ প্রদেশ তাহার বিরোধিতাই করিয়াছিল।

শ্যামাপ্রসাদ—

বিনাবিচারে বন্দিদশায় কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ২ মাসের অধিককাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু একদিন চিতোরের প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে যেমন অশরীরী বাণী শ্রুত হইয়াছিল—"মৈঁ ভুখা হোঁ" তেমনই আজও ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে—এই মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে বিদেশ হইয়া ফিরিবারও কয়দিন পরে এবং কাশ্মীরের আবদুল্লা সরকারের এক জন সচিবের বিবৃতি প্রকাশের পরদিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিবৃতি দেন ও তাহার পরেই শেখ আবদুল্লা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবকে কাশ্মীরে যাইয়া সমস্ত বিষয় জানিতে আমন্ত্রণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব উত্তরে জানান, তিনি বিদেশে যাইতেছেন; ফিরিয়া আসিয়া কাশ্মীরে যাইবেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেহ জওহরলালকে জানাইয়া—বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার নিকট কবুল জবাব দিয়া গিয়াছিলেন—কাশ্মীরের [illegible]দের বিবৃতিতে তাঁহার মনের সন্দেহের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে। [illegible] বিষয় তিনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বলিতে সাহস করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের [illegible]ক্ষেত্রে ঘটোৎকচের বীরত্বে সন্ত্রাসিত কৌরবদিগের সনির্ব্বন্ধ [illegible]রোধে, কর্ণ যেমন অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ জন্য রক্ষিত একাঘ্নী বাণ [illegible] করিয়াছিলেন, তেমনই স্বয়ং নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াসে জওহরলালই ঐ [illegible] কথা প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু বিধানচন্দ্র কবি গোল্ডস্মিথের [illegible] শিক্ষকের মত—পরাভূত হইলেও তর্ক করিতে পারেন, তাই [illegible]ছেন, তিনি জওহরলালকে লিখিয়াছিলেন বটে, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু [illegible] প্রথম সংবাদে তাঁহার মনে যে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল, কাশ্মীর [illegible]রের সচিবের বিবৃতিতে তাহা দূর হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ত এমন [illegible]লেন নাই যে, তদন্তের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ইহা লোক কি কৈফিয়ৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে?

শ্যামাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীমান উমাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়—জওহরলাল কেন তদন্তে অসম্মত এবং কি জন্য বলিয়াছেন, তাঁহার সুস্পষ্ট ও সাধু সিদ্ধান্ত শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন রহস্য নাই। অবশ্য সাধু (honest) শব্দ এ ক্ষেত্রে তাঁহার মুখে শোভা পায় কি না, তাহা বিবেচ্য। আরও বুঝা যায়, তাঁহার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ—কপট বিলাপ। কারণ, তিনি কাশ্মীরে যাইয়াও শ্যামাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই এবং বন্ধু শেখ আবদুল্লার বা তাঁহার কোন সহসচিবের কথায় বিশ্বাস করিয়া যে বলিয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদ সুস্থ ছিলেন এবং তিনি আশা করিয়াছিলেন, কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, তাহা মিথ্যা,—তখন শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ।

এ অবস্থায় জওহরলাল মিথ্যা কথনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।

আমরা জানি, যদি জওহরলালের বন্ধু শেখ আবদুল্লা দেশদ্রোহিতার জন্য বন্দী না হইতেন, তাহা হইলেও তিনি ভারত সরকারের তদন্তে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং সেই কারণে তদন্ত অসম্পূর্ণ বলিবার সুযোগ ভারত সরকারও পাইতেন। আর এখন ভারত সরকার বলিলেন—বর্ত্তমান অবস্থায় তদন্ত করা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু তথাপি—সত্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদের জননী যোগমায়া দেবী উমাপ্রসাদসঙ্কলিত পুস্তকের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

পুস্তকে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা হইতে আমাদিগের মাতৃভূমির ভাগ্য সম্বন্ধে বহুদূর-প্রসারী ফলদায়ী কতকগুলি প্রশ্নের উদ্ভব হয়—

আমার পুত্র (শ্যামাপ্রসাদ) ভারতের নাগরিক, পার্লামেণ্টের সদস্য ও বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। কোন দিক হইতে বিনা বাধায় তাঁহার কাশ্মীরে প্রবেশের মৌলিক অধিকার ছিল কি না?

কাশ্মীর সরকার কর্ত্তৃক বিনা বিচারে তাঁহাকে বন্দী রাখা আইনসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য কি না?

আমার পুত্র স্বয়ং কাশ্মীর সরকারের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য কি না?

কাশ্মীর সরকার ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দায়ী কি না? তাঁহাদের পক্ষে যাহা করা সঙ্গত ও সম্ভব ছিল তাঁহারা শ্যামাপ্রসাদের জীবন রক্ষার জন্য সে সব করিয়াছিলেন কি না?

শ্যামাপ্রসাদের এই শোচনীয় মৃত্যু ব্যাপারে ভারতসরকার কোনরূপে জড়িত ছিলেন কি না?

শ্যামাপ্রসাদের জননীর সঙ্গে আমরাও বলি—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দাবী করা হইতেছে—উত্তর দিতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনাবসান সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র শুশ্রূষাকারিণী রাজদুলারী টিকু বলিয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদ যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় চিকিৎসককে

ডাকিতে বলিয়াছিলেন, তখন তথায় আর কেহই ছিল না। রাজদুলারী ব্যস্ত হইয়া নূর আহম্মদ নামক আবর্জ্জনা-পরিষ্কারকারীকে ডক্টর জুৎসীকে ডাকিতে পাঠান। ডক্টর জুৎসী আসিয়া দেখেন, অবস্থা ভীতিজনক। তিনি ডক্টর আলীর নিকট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে টেলিফোন করেন। এদিকে রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটের সময় শ্যামাপ্রসাদ শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডক্টর আলী আসেন। রাত্রি ৩টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যুর কথা মিথ্যা। ২টা ২৫ মিনিট হইতে ৩টা ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত সরকারী বিবৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষার্থ নথিপত্র প্রস্তুত করা হয়।

এই সময়ের মধ্যেই কি শ্যামাপ্রসাদের দৈনন্দিনলিপি পুস্তক ও অন্যান্য কাগজপত্র অপহৃত হওয়া সম্ভব নহে?

যোগমায়া দেবী লিখিয়াছেন :—

আমি বহুদিন হইতেই আমার পুত্রকে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলাম। সে দেশমাতৃকার কার্য্যে জীবন দিয়াছে। যাঁহারা ক্ষমতার আসনে সমাসীন তাঁহাদিগের দলের (অন্যায়ের) বিরোধিতা করিবার সাহস তাহার ছিল। স্বাধীন ভারতে বিরোধীদলের নেতৃত্ব করা অপরাধ—ইহাই কি বুঝিতে হইবে? কিন্তু আমার পুত্র অপরাধী দুষ্কৃতকারীর মত বন্দিদশায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল—অপরাধীও বিচার পায়, আমার পুত্রের ব্যাপারে বিচারের অভিনয়ও হয় নাই। মনে হয়, দেশের লোক যাঁহাদিগকে অধিকার দিয়া অসীম ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের হিংসা ও ঈর্ষ্যা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং সঙ্ঘবদ্ধ অবিচারের যন্ত্র তাহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার পুত্রের সাহস তাঁহাদিগের ঈর্ষ্যাকে দলিত করিয়াছিল—তাঁহাদিগের অত্যাচার তাহার শক্তি ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। সে মৃত্যুতেও অমর হইয়া বিরাজিত থাকিবে। যাঁহারা ভগবানের বা কোন মহান কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—যাহারা অত্যাচারীর রথচক্রে পিষ্ট বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন অথবা তরবারে বা শরে বিদ্ধ হইয়াছেন—হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদের কথায় তাঁহাদিগের কথাই মনে পড়ে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে যেন দুষ্কৃতকারীদিগের চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহারা অনুতপ্ত হয়। আর ভারতের জনগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন এবং যাহাতে দেশমাতৃকার এইরূপ বেদনার কারণ আর ঘটিতে না পারে তাহাই করুন।

ভগবান আমার দেশকে রক্ষা করুন।

শ্যামাপ্রসাদের জননীর এই আর্ত্তনাদ দেশমাতৃকার আর্ত্তনাদ। তাঁহার এই আহ্বান—বিচারের জন্য—সত্যের জন্য আহ্বান—দেশমাতৃকার আহ্বান। মৃত্যুকালে—দধীচির মত মৃত্যুবরণ কালে—তিনি যে মা'র নামোচ্চারণ করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই মা'র—সেই গর্ভধারিণী মা'র ও দেশমাতৃকার কামনা পূর্ণ হউক। দধীচির অস্থিতে যেমন দৈত্যবিনাসের জন্য বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তেমনই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে দেশবাসীর যে সঙ্কল্পের উদ্ভব হইবে তাহা সর্ব্ববিধ

কাশ্মীর—

কাশ্মীর-সমস্যার সৃষ্টি, পুষ্টি ও জটিলতাবৃদ্ধি—তিনের জন্যই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অজ্ঞেয় নীতি দায়ী বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহার শেখ আবদুল্লা-প্রীতি সেই নীতিরই অঙ্গ। যখন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কূটনীতির নিকট গান্ধীজীও আত্মসমর্পণ করেন তখন প্রস্তাব ছিল, সামন্ত রাজ্যগুলি যে যাহার অবস্থা বুঝিয়া ভারতে বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারিবেন। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ ইংলণ্ডে গোল টেবল সম্মিলনে—ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানে নীতি গ্রহণই ভাল বলায় যখন ইংরেজের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তখন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা যে শেখ আবদুল্লাকে পুরোভাগে রাখি[illegible] কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা বাধাইয়া মহারাজাকে বিতাড়ি[illegible] করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই আবদুল্লাই কোন অজ্ঞাত কারণে জওহরলালের আস্থার কেন্দ্র হইয়াছিলেন। কাশ্মীর স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যোগ না দেওয়ায় পাকিস্তান যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন মহারাজা হরিসিংহ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেন—তাঁহার রাজ্য তিনি ভারতভুক্ত করিলেন। ভারত সরকার তাঁহার প্রজাদিগকে আক্রমণকারীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন। মহারাজা হরি সিংহ—শ্যামাপ্রসাদেরই মত—আবদুল্লার স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবদুল্লা তখন কারাগারে। জওহরলাল সর্ত্ত করিলেন—আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকেই শাসনক্ষমতা দিতে হইবে। মহারাজা তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। ভারতীয় সেনাবল কাশ্মীর রাজ্য হইতে আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল।

এই সময়—শত্রু-বিতাড়ন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জওহরলাল কাশ্মীর সমস্যার সমাধানজন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইলেন—যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন সমস্যা ছিল না—তাহার সৃষ্টি হইল। ফলে জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক মাত্র ভারত সরকারের নামমাত্র অধিকারে থাকিল এবং আবদুল্লা তথায় প্রধান হইয়া স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; আর ওদিকে বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজঃফরাবাদ নামে "আজাদ কাশ্মীর" প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানভুক্ত হইল। ভারত সরকারের অর্থ ও সৈনিকদিগের জীবন-ব্যয় অপব্যয়ে পরিণত হইল। জওহরলাল আবদুল্লা-শাসিত হিন্দুপ্রধান জম্মু, মুসলমানপ্রধান কাশ্মীর ও বৌদ্ধপ্রধান লাডকের জন্য ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা অবাধে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

বিদেশী প্রতিনিধিরা আসিয়া মীমাংসার পথ সন্ধান করিয়া কেবল সৃষ্ট সমস্যার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

জম্মু ও লাডক ভারতভুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল—লাডক বলিল, ভারতভুক্ত হইতে না পারিলে সে তিব্বতের সহিত যোগ দিবে

[illegible] আবদুল্লার সরকার সে [illegible]

ান্দোলন সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রদ্রোহকর বলিয়া আন্দোলনকারীদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

আবদুল্লার ব্যবস্থা দেখিয়া শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশ্মীর যদি ভারতের অংশ হয় তবে তিনি কিরূপে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার রাজ্যপ্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলেন? এক রাষ্ট্রে ত কখন একাধিক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকিতে পারে না। তবে কি জিন্না যে ভারতবাসীদিগকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান; তিনি ৩ ভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন—হিন্দু, মুসলমান ও কাশ্মীরী? আবদুল্লা কোন উত্তর দিলেন না—কেন না, উত্তর ছিল না। জওহরলাল শ্যামাপ্রসাদকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ও প্রজাপরিষদকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া আবদুল্লাকে প্রশ্রয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। শ্যামাপ্রসাদ চাহিলেন, ভারতরাষ্ট্র যদি কাশ্মীরের রক্ষার জন্য সেনাবল ও উন্নতিসাধন জন্য ষাটি কোটি টাকা ব্যয় করে, তবে হইবে—

এক নিশান
এক প্রধান
এক বিধান।

জওহরলাল বলিলেন, কাশ্মীর মাত্র ৩ বিষয়ে ভারতভুক্ত—

রাজ্যরক্ষা
বিদেশের সহিত ব্যবহার
যানবাহন।

আবদুল্লা যখন য়ুরোপে যাইয়া বলিলেন, কাশ্মীর হয়ত ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না—অর্থাৎ স্বাধীন থাকিবে, তখন জওহরলাল একবার কশাঘাতে চমকিত সারমেয়ের মত ভাব দেখাইলেন বটে, কিন্তু প্রতীকারের কোন পন্থা গ্রহণ করিলেন না।

জওহরলাল বিনা ছাড়ে শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর প্রবেশে কোন বাধা দিলেন না এবং কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ বন্দী হইলে ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগ দিতে গমন করিলেন। আবদুল্লা বলিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল—জওহরলাল স্বদেশে ফিরিলে বন্দী শ্যামাপ্রসাদকে ভারতে পাঠাইয়া দিবেন। তবে কি তিনি জওহরলালের ন্যাসরক্ষকরূপে শ্যামাপ্রসাদকে রাখিয়াছিলেন? আর সেই জন্যই কি তিনি শ্যামাপ্রসাদকে মামলার জন্য ভারত সরকারের কাছে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়া ভারত সরকারকে অপমানিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন?

তাহার পরে—আবদুল্লা বোধহয় মনে করিয়াছিলেন, তিনি যে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসে রাজ্যপাল করণ সিংকে বন্দী করিয়া জম্মু-কাশ্মীর লাডক রাজ্যে আবদুল্লা রাজ্য ঘোষণা করিতে পারেন। ই আগষ্ট তিনি তাঁহার সচিবসঙ্ঘে তাঁহার সহিত মতান্তরহেতু স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীশ্যামলাল সারাফকে পদত্যাগ করিতে বলিলেন। শ্যামলাল পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। আবদুল্লার সচিবসঙ্ঘে মতভেদ সপ্রকাশ হইল। নানারূপ অস্বস্তিজনক সংবাদ আসিতে লাগিল। ৮ই আগষ্ট রাজ্যপাল করণ সিং আবদুল্লাকে পদচ্যুত ও তাঁহার সচিবসঙ্ঘ বাতিল করিলেন এবং আবদুল্লা, তাহার রাজস্ব-সচিব মীর্জ্জা আফজল বেগ সহ আরও ৩০ জনকে ৯ই আগষ্ট গ্রেপ্তার ও বন্দী করিলেন। আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি অন্যান্য অবাঞ্ছিত কার্য্যেরই মত—জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিপজ্জনক কাজ করিয়াছেন। প্রকাশ, আবদুল্লা ও তাঁহার অনুবর্তী ভারতের সহিত কাশ্মীরের সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার ব্যবস্থাই করিতেছিলেন—তাঁহারা সে জন্য পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়া দিল্লীতে আসিয়া জওহরলালের সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি আবদুল্লার গ্রেপ্তারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভারতসরকারকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং জিন্নার ভগিনী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে "ধর্ম্ম যুদ্ধ" ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন। পাকিস্তানের আস্ফালন চলিতেছে।

শেখ আবদুল্লা আজ বন্দী। আর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক জওহরলাল? তিনি পার্লামেন্টে বলিয়াছেন—আবদুল্লা-ঘটিত ব্যাপার কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ভারতসরকার তাহাতে যত কম হস্তক্ষেপ করেন, ততই ভাল।

শ্যামাপ্রসাদ চাহিয়াছিলেন, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিকট যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা হউক। ভারত সরকার কি তাহা করিবেন? আর আবদুল্লার পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবে কি ভারত সরকার মহারাজা হরি সিংএর প্রস্তাবানুসারে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অর্থাৎ—জম্মু, কাশ্মীর, লাডক, বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজফ্ফরাবাদ—এই সকলের ভারতভুক্তি চাহিবেন? বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজফ্ফরাবাদ—এ সকলে পাকিস্তানের অধিকারের ভিত্তি কি?

মহারাজা হরি সিংএর প্রস্তাবের পরে, কাশ্মীরে গণভোটের কি কারণ থাকিতে পারে? যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম পঞ্জাব পাকিস্তানকে প্রদান করা হইয়াছিল, তখন কি জওহরলাল গণভোটের কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন? যখন হায়দ্রাবাদ, বরদা প্রভৃতি ভারতভুক্ত করা হয় তখন কি সে কথা উঠিয়াছিল? হায়দ্রাবাদে ত বাহুবলও প্রযুক্ত হইয়াছিল।

তবে—বিশেষ শেখ আবদুল্লার ব্যবহারের ও ষড়যন্ত্রের পরে—কি হইবে? আর যদি গণভোট গৃহীত হয়, তবে জম্মু, লাডক প্রভৃতি অংশকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তাহা করা হইবে কি?

সে বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি কোনরূপ মত প্রকাশ করিবেন?

নেহরু, মহম্মদ আলী—ভারত, পাকিস্তান—

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার রাজ্যদ্রোহজনক কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর দৌড় দিল্লীতে আগমন

ও পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষোদ্গার উপেক্ষণীয় বলা যায় না। জওহরলালের সহিত মহম্মদ আলীর আলোচনার পরে মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, ভারত যদি পাকিস্তানকে কাশ্মীর উপহার দেয়, তবে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। হইবারই কথা।

পার্লামেন্টে সরকারী সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ৩ মাস পর্যন্ত পাকিস্তানী পুলিস ৩ শত ৬২ বার ভারত সীমান্তে গোল বাধাইয়াছে। নেহরু-মহম্মদ আলী আলোচনায় এই বিষয়টি সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা যে ভারতবাসীর পক্ষে অসম্মানজনক ও বিপজ্জনক তাহা, আশা করি, জওহরলালও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে তিনি স্বীকার করিবেন কি না, তিনিই জানেন।

পাকিস্তানে সংবাদপত্রসমূহ দুই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীতে আলোচনায় তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা যেরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়—আলোচনায় যদি কোন সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা বানচাল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে যদি অল্প পাইবার জন্য অধিক দাবী হিসাবে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা।

পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোটের জন্য আগামী এপ্রিল মাসের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসম্মতি জানাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ "আজাদ কাশ্মীর" নামে পাকিস্তানভুক্ত রহিয়াছে, তথায় আন্দোলন প্রবল হইয়াছে।

কোরিয়ায় শান্তি স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে বৈঠক বসিবে, পাকিস্তান তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের বিরোধিতা করিয়াছে। পাকিস্তান, কাশ্মীরের ব্যাপারে, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্ম্ম যুদ্ধ) ঘোষণা করিবার প্রস্তাবও করিয়াছে ও করিতেছে। যদি শক্তি-পরীক্ষা করাই পাকিস্তানের অভিপ্রেত হয়, তবে ভারত রাষ্ট্রের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে?

পাকিস্তানীরা কতবার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিয়া গিয়াছে ও তাহার প্রতীকার হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি তাহার তালিকা প্রকাশ করিতে সম্মত আছেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যেক ঘটনা ভারত সরকারকে ও পাকিস্তান সরকারকে জানাইয়াছেন। সুতরাং সহজেই তালিকা প্রকাশ করিতে পারেন—সে জন্য কোন অতিরিক্ত উপসচিব নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি প্রয়োজন হয়, তবে যে সকল উপ-সচিবের মন পদোন্নতি না হওয়ায় বিষাক্ত হইয়াছে তাহাদিগের এক জনকে মধ্যম শ্রেণীর সচিব করিয়া সে কাজের ভার দেওয়া যাইতে পারে।

দেখা যাইতেছে, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান ব্যতীত ভারতরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের "মনের মিল" হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত এবং পাকিস্তান কাশ্মীর উপহার না পাইলে সমস্যার সমাধান সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিবে না।

ভারতের জনমতকে সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারত সরকারের নীতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে—জওহরলালকে লোকমতানুসারে চালিত হইতে বাধ্য করিতে হইবে।

যে আপনাকে দুর্ব্বল মনে করে, আর যে তোষণ নীতির ভক্ত—তাহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা কে দূর করিতে পারে?

অশান্ত কলিকাতা—পুলিস ও সাংবাদিক

আগ্নেয়গিরির অতর্কিত অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রায় একমাস কাল কলিকাতায় যে অশান্তি গিয়াছে, তাহাতে পুলিসের কোন কর্ম্মচারীর জীবনান্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুলিসের আক্রমণে নিরীহ পথচারীরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী বিদেশী প্রতিষ্ঠান—তাহার আয়ুষ্কাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্দ্ধিত করিয়া তাহা জাতীয়করণ বিলম্বিত করিয়াছেন। ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ান হইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল এবং কোম্পানীর লাভও হইতেছিল। এই অবস্থায়—দেশের এই আর্থিক দুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া যখন কোম্পানী দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভাড়া এক পয়সা করিয়া বাড়াইতে চাহিলেন, তখন জনগণের পক্ষ হইতে আপত্তি হইল। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি দিলেন। তাঁহাদিগের বাসে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতেছে—বাসের ভাড়া বাড়াইবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। তাহার প্রস্তুতি হিসাবে ট্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ান হইল, এমন কথাও কেহ কেহ বলিলেন। ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়া প্রধান-সচিব বিদেশ যাত্রা করিলেন।

ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ১৫ই জুলাই ভাড়া বৃদ্ধির ও আন্দোলনকারীদিগের প্রতি পুলিসের ব্যবহারের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষিত হইল। হরতাল সফল হইল বটে, কিন্তু সরকারের প্রচার বিভাগ বিবৃতি দিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে!

পুলিস কাঁদুনেগ্যাস ব্যবহার করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিল ও লাঠি চালনা করিল—গুলীও চলিল। সে চিত্র একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

এই অবস্থায় ২১শে জুলাই তারিখে ডক্টর রাধাবিনোদ পালের গৃহে কলিকাতার নাগরিকদিগের এক সম্মিলনে স্থির হয়—ডক্টর পাল, শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমৃণালকান্তি বসু, শ্রীসন্তোষকুমার বসু ও শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধিদিগের ও সচিবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিবেন। তদনুসারে তাঁহারা পরদিন প্রথমে প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্থির হয়, অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ও ধৃতব্যক্তিদিগকে মুক্তিদানের দাবী উপস্থাপিত করা হইবে। তাঁহারা তখন সচিব—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সচিবদ্বয় বলেন, অপরাহ্ণ ৬টার সময় ঐ ৫ জন ও প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধি ৫ জনের সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিবেন। সে ব্যবস্থা বহাল থাকিতে সেদিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় যে সভা প্রতিরোধ সমিতির দ্বারা আহূত

হইয়াছিল, সে সভার কাজ বন্ধ রাখা হইত। কিন্তু প্রতিনিধিরা গৃহে ফিরিবার এক ঘণ্টার মধ্যে সচিবরা জানাইয়া দেন—সেদিন সাক্ষাৎ হইবে না !!

অপরাহ্ণে যে সভা হয়, তাহা অবশ্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া। তাহাতে পুলিস লাঠিচালনা করে এবং সাংবাদিকগণকে প্রহার করা ও গ্রেপ্তার করাও হয়। সাংবাদিকরা বর্ণনায় ও চিত্রে ঘটনা সম্বন্ধে লোককে অবহিত করিতেছিলেন—এই "অপরাধ" অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করা পরিকল্পনানুযায়ী হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। ঘটনার পরে কয় জন সাংবাদিক কলিকাতার পুলিস কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—কর্ত্তব্যপালনকালে সাংবাদিকরা যদি ১৪৪ ধারা অমান্যকারীদিগের সহিত মিশিয়া যা'ন তবে পুলিস কিরূপে তাঁহাদিগকে বাছিয়া লইবে? অর্থাৎ—"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই—

(১) যে সকল সাংবাদিক ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই।

(২) জনতামাত্রই (১৪৪ ধারা থাকিলেও) বে-আইনী হয় না। কারণ ঐ অবস্থায় ট্রাম, বাস, ট্রেণ—এ সকলে ৫ জনের অধিক লোক থাকিতে পারেন না। জনতার উদ্দেশ্য (common object) আইন বিগর্হিত থাকা প্রয়োজন।

ইহার পরেই ভারত সরকারের মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের আদেশে পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা নত হইয়া ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হ'ন এবং তাহার পরে ক্রমে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদিগের মুক্তিদান আরম্ভ হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির বিবৃতি ও শোভাযাত্রা এই ব্যাপারে "এজেণ্ট প্রোভোকেটিয়রের" মত হইয়াছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। প্রথমে ঘোষিত হয়, অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারক শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ সাংবাদিক লাঞ্ছনার তদন্ত করিবেন। প্রধান-সচিব ফিরিয়া আসিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, হাইকোর্টের বিচারক শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় যেমন সে বিষয়ে—তেমনই ভাড়া বৃদ্ধি সঙ্গত কি না, সে বিষয়েরও বিচার করিবেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রশান্তবিহারীর নিয়োগে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু নূতন বিধানে হাইকোর্ট রাজ্য-সরকারের অংশ, সুতরাং কোন কার্য্যকরী বিচারকের বিচারে আপত্তি হইতেও পারে।

প্রধান-সচিব অভিযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সাংবাদিক-সঙ্ঘের দাবী রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

ঘটনাগুলি এখন ঐ ব্যবস্থায় বিবেচনাধীন।

পারস্য বা ইরাণ—

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচীর উপর দিয়া যে নবভাবযুক্ত জাগরণ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে পুরাতন মতাদি নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। তিনি প্রধানতঃ জাপানের ও ভারতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্তি যে কত সত্য তাহা সমগ্র প্রাচীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনে প্রতীয়মান হইতেছে। পুরাতন রাজ্য পারস্য এখনও রাজ-তন্ত্রশাসিত; কিন্তু তথায় গণতন্ত্র রাজ-তন্ত্র প্রভাবিত করিতেছে। পারস্যের তৈল আজ সমগ্র সভ্য জগতে প্রয়োজন। আওয়াজ নামক স্থান হইতে তৈল নলে আবাদানে আনিয়া শোধন করা হয় এবং তথা হইতে পারস্যোপসাগরের পথে নানা দেশে প্রেরিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এই তৈল সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে অনেক টাকা দিয়া অংশ ক্রয় করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজের দ্বারাই পরিচালিত হইত। কিন্তু দেশের এই সম্পদের লাভ প্রায় সবই বিদেশীরা লইয়া যায়, পারস্যবাসীরা এই অস্বাভাবিক ব্যবহার সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহারা প্রতিষ্ঠানের বিষয় অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং মনে করে যে, ইংরেজ-পরিচালকগণ মিথ্যা হিসাব দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়াইতেছে।

পারস্য ইংরেজ-পরিচালকদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার গ্রহণ করে।

কিন্তু এই সম্পদই পারস্যের বিপদের কারণ হয়। কারণ, বিদেশীরা পারস্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। বিদেশীদিগের প্রভাব পারস্যের এক দল লোকের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে এবং রাজনীতিক দলাদলিতে দেশের শাসনকার্য্য নানারূপে বিব্রত হয়।

রাজার (শাহ) নিরঙ্কুশ স্বৈরক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক প্রভাব প্রবেশ করে।

ডক্টর মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী হইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসন পরিচালিত করিতেছিলেন—রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান নাই।

অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ক্ষমতা হস্তগত করিতেছেন বলিয়া রাজা পারস্য হইতে বিদেশে গমন করেন। পারস্যে রাজনীতিক দলগুলি—রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায়।

রাজা যেমন নাটকোচিত অতর্কিত ভাবে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য বা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—কয়দিন পরে তেমনই ভাবে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ডক্টর মোসাদ্দেক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বন্দী হইয়া বিচার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা সানন্দে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। মনে হইতেছে, সেনাবল তাঁহার অনুগত। কিন্তু যে স্থানে ষড়যন্ত্রের প্রাবল্য থাকে, তথায় অবস্থার অনিশ্চয়তা যে কোন সময়ে বিপদ ঘটাইতে পারে।

পারস্যের অবস্থার পশ্চাতে বিদেশীদিগের ষড়যন্ত্র রহিয়াছে, এমন সন্দেহ করা অসঙ্গত নহে। কারণ, তৈল লইয়া ইংলণ্ডের সহিত বিবাদের পর হইতেই পারস্যে নানা অবস্থা-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে এবং ডক্টর মোসাদ্দেকের মন্ত্রিমণ্ডল হয়ত শেষ অবধি রুশিয়াকে তৈল বিক্রয়ের চুক্তি করিতেন।

অবস্থা এখনও অনিশ্চিত এবং পারস্যে পরিবর্ত্তনের প্রভাব কতদূর বিস্তারলাভ করিবে, বলা যায় না।

মরক্কো—

মরক্কোর সুলতান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। অবশ্য সিংহাসন শূন্য থাকে না: নূতন সুলতান তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে ফরাসী প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। মিশরের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজারের ধর্ম্মাধ্যাপকগণ ফতোয়া দিয়াছেন, কেহ যেন নূতন সুলতানের আনুগত্য স্বীকার না করেন। বহু মুসলমান এখনও ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের মতই অভ্রান্ত মনে করেন। সেই জন্যই মসলেম লীগ ভারতে মৌলবী ও মোল্লাদিগের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিলেন। মিশরের ধর্ম্মাধ্যাপকদিগের ফতোয়ার ফল কি হয়, দেখিবার বিষয়। ভারতেও আমরা দেখিতেছি, চন্দননগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা যেরূপ তাহাতে এক দেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে নানা দেশে অগ্নি ব্যাপ্ত হইতে পারে। সেই জন্যই আজ অনেকের দৃষ্টি মরক্কোয় নিবদ্ধ।

কোরিয়া ও ভারত—

কোরিয়ার আত্মঘাতী যুদ্ধে বিরতি আসিয়াছে। উভয় পক্ষ যখন রণশ্রান্ত তখন সন্ধির প্রস্তাব হইলে ভারত সরকার সেই প্রস্তাবে যোগ দেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঘোষণা করা হয়—ভারত সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে সন্ধি হইতেছে—অর্থাৎ কৃতিত্ব ভারত সরকারের। স্বদেশে অন্নকষ্ট, বস্ত্রসঙ্কট, কাশ্মীর-সমস্যা যতই কেন থাকুক না, কোরিয়ায় এই ব্যাপারে ভারত সরকারের ভক্তদল বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু শান্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের স্থানলাভ ঘটে নাই। পাকিস্তানও ভারতকে স্থানদানে আপত্তিতে আপনার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৬০

জ্ঞানের অনুশীলন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

গীতা মোক্ষ-শাস্ত্র, লোকক্ষয়ের মল-তত্ত্বের পটভূমিতে অর্জ্জুনকে মুক্তি-পথের নির্দ্দেশ। আমরা জীবন-রণের সৈনিক। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জ্জুনও ছিলেন সংসারের জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। যে অর্জ্জুন যুদ্ধজয়ী হলেন তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁর মোহ দূর হয়েছিল। আমাদের প্রকৃত পরিচয় মায়ার আবরণে আবদ্ধ-চক্ষু আমরা, তবু মোক্ষপথের যাত্রী। সে পথ কোথায়, কেমন গতি প্রয়োজন সেথায় পৌছবার। সে সাধনার পথে মায়ার আবরণ উন্মোচন একান্ত প্রয়োজন। মায়া—অজ্ঞান। সুতরাং আবশ্যক জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ তিনটি জীবনস্রোত যে ওতপ্রোতভাবে এক স্রোতে মিলে বহে যাচ্চে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর মতো আমাদের জীবনের অন্তরে, এ কথা আমাদের মনে হয় না। শ্রীভগবান জ্ঞান এবং জ্ঞানীর যে উপাধি নির্দ্দেশ করেছেন, সেগুলি কি প্রকৃতপক্ষে ভক্তের উপাধি নয়? নিরুদ্দিষ্ট কর্ম্ম বা রসহীন জ্ঞান সাধন পথে ব্যর্থ প্রয়াস এবং নিরর্থক জ্ঞান। অনন্ত জীবনের পথে যাত্রীর পাথেয় সংগ্রহ করাই প্রকৃত কর্ম্ম। সে পথের পরিচায়ক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তি এদের পবিত্র করে, সরল করে, সার্থক করে। আলোচনার ফলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে যে কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই ভক্ত এবং ভক্ত স্বয়ং কর্ম্মী এবং জ্ঞানী। এ তিন জীবনধারার পরস্পর বিশ্লিষ্ট আলোচনায়, বুদ্ধি আদর্শ গন্তব্য-পথের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয় সংশ্লেষণে। সে আলোচনার সংশ্লেষণ দেখিয়ে দেয় সাধন-পথের মোহানা, যেথায় তিন স্রোতের মিলন।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন। সংসারীর জীবনে তাদের অনুশীলন অনন্ত জীবন নদীতে যাত্রা করবার তরণী। বলা বাহুল্য যে গুণগুলি শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞাভুক্ত করেছেন, মাত্র তাদের শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞান নয়। তাদের অনুশীলন এবং চরিত্রে প্রতিষ্ঠাই জ্ঞান উপার্জ্জনের উপায়। সে অনুশীলনে কর্ম্মের আবশ্যক, বুদ্ধির নিয়োগ প্রয়োজন এবং তাদের পটভূমিতে অনন্য-যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জাগিয়ে না রাখলে, অনুশীলনের পথ সরল ও আনন্দময় হ'তে পারে না। ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে সত্য-পথে সুনিয়ন্ত্রিত না করলে প্রকৃত নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়। কুবুদ্ধিই ভ্রান্ত পথ দেখায় দুষ্ট মনকে, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায়।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই তিনটি কামের আশ্রয়ভূমি বলে কথিত হয়। এই ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয়ের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত ক'রে দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে। অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত কর। পাপ-স্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলি। এরাই জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে। সুতরাং কামকে পরিত্যাগ কর।

তিনি বল্লেন—স্থূল বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন দেহ অপেক্ষা শ্রোত্রাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হতে মন এবং মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা। হে মহাবাহো—এইরূপে তুমি আত্মাকে বিদিত হ'য়ে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির ক'রে এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর।*

মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করলে, নিয়ন্ত্রিত করলে মানুষের অন্তর হতে প্রকৃত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়। তখন মানুষ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সে পথের প্রধান অন্তরায় দুর্জ্জয় মহাশত্রু কাম। কামনাকে দমন করাই জ্ঞানমার্গের প্রথম এবং প্রধান কৌশল। কিন্তু তার নির্ম্মূলের অস্ত্র কি?

গীতা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেছেন জীবনের গভীর রহস্যের। তার অস্ত্রাগারে বিদ্যমান অমোঘ অস্ত্র। গীতা মাত্র দার্শনিক পণ্ডিতের মনস্তুষ্টির সূত্র নয়। যে জগতে মানুষ অনন্ত জীবনের একটি অংশ মাত্র যাপন করে, তার বিশ্ব বিচিত্র। মানুষের সকল অভিজ্ঞতা, সব কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই বিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের পরিণাম, এই কথাই মনে হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে বাছাই ক'রে, ইন্দ্রিয়ের কর্ম নির্বাচন ক'রে মানুষ পর-জগতের সন্ধান লাভ করতে পারে। তাই সকল সঙ্ঘের প্রধানেরা আবহমানকাল নিজ নিজ সমাজের গতি নির্ণয় করবার জন্য মানবগোষ্টির কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করবার প্রয়োজন বোধ করছেন। সহজ আস্তিক্য-বুদ্ধিকে মেনে ধর্ম-পথের পথচারীর পাথেয়র সন্ধানরত তাঁরা যাঁরা পরজন্ম মানেন এবং ঈশ্বরের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্ম ও ভাবনার আদর্শের তালিকা দিয়েছেন বহুস্থলে।

জ্ঞান কি? এ প্রশ্ন তিনি যেমন তত্ত্বরূপে আলোচনা করেছেন তেমনি দৈনিক জীবনের সাধ্যরূপে তালিকাভুক্ত ক'রে বিবৃত করেছেন। নিম্নলিখিত ভাবগুলিকে তিনি জ্ঞান সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১। অমানিত্ব—নিজের শ্লাঘায় মোহাবিষ্ট না হওয়া।

২। অদম্ভিত্ব—দম্ভ বর্জন।

৩। অহিংসা—প্রাণীপীড়ন বর্জন—কায়, মন এবং বাক্যে।

৪। ক্ষান্তি—অন্যে অপকার করলে তাকে ক্ষমা করা।

৫। আর্জব—সরল ব্যবহার।

৬। আচার্যোপাসনা—মোক্ষসাধন উপদেষ্টার শুশ্রূষাদির দ্বারা সেবা।

৭। শৌচ—শরীরের এবং মনের শুচিতা। রাগাদি বর্জন। ভাবশুদ্ধি।

৮। স্থৈর্য—স্থির ভাব। দেহের, মনের এবং বুদ্ধির অন্যায় গতিকে রুদ্ধ করা।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—নিজের উন্মার্গ ভাবকে ধরে রাখা।

১০। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহে বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়ের আপাতঃ মধুর দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্মে বিরতি।

১১। অনহংকার—নিরহঙ্কার।

১২। জন্মমৃত্যুজ্জরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শন—জন্মমৃত্যু প্রভৃতির কবল হতে রক্ষা পাবার কারণ ও দোষ আলোচনা।

১৩। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিতে আসক্তিহীনতা, পুত্রদার গৃহাদিতে সাংসারিক ভাবে আবদ্ধ হবার ভাব ও কর্ম হ'তে বিরতি।

১৪। অনভিষ্ণ—তাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া।

১৫। নিত্যসমচিত্ত—অন্তঃকরণের সাম্যভাব।

---

* ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্। ৩।৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম্। ৩।৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। ৩।৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা
[illegible] মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং। ৩।৪৩

তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই তিনটি কামের আশ্রয়ভূমি বলে কথিত হয়। এই ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয়ের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত ক'রে দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে। অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত কর। পাপ-স্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলি। এরাই জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে। সুতরাং কামকে পরিত্যাগ কর।

তিনি বল্লেন—স্থূল বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন দেহ অপেক্ষা শ্রোত্রাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হতে মন এবং মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা। হে মহাবাহো—এইরূপে তুমি আত্মাকে বিদিত হ'য়ে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির ক'রে এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর।*

মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করলে, নিয়ন্ত্রিত করলে মানুষের অন্তর হতে প্রকৃত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়। তখন মানুষ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সে পথের প্রধান অন্তরায় দুর্জ্জয় মহাশত্রু কাম। কামনাকে দমন করাই জ্ঞানমার্গের প্রথম এবং প্রধান কৌশল। কিন্তু তার নির্ম্মূলের অস্ত্র কি ?

গীতা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেছেন জীবনের গভীর রহস্যের। তার অস্ত্রাগারে বিদ্যমান অমোঘ অস্ত্র। গীতা মাত্র দার্শনিক পণ্ডিতের মনস্তুষ্টির সূত্র নয়। যে জগতে মানুষ অনন্ত জীবনের একটি অংশ মাত্র যাপন করে, তার বিশ্ব বিচিত্র। মানুষের সকল অভিজ্ঞতা, সব কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই বিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের পরিণাম, এই কথাই মনে হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে বাছাই ক'রে, ইন্দ্রিয়ের কর্ম নির্বাচন ক'রে মানুষ পর-জগতের সন্ধান লাভ করতে পারে। তাই সকল সঙ্ঘের প্রধানেরা আবহমানকাল নিজ নিজ সমাজের গতি নির্ণয় করবার জন্য মানবগোষ্টির কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করবার প্রয়োজন বোধ করছেন। সহজ আস্তিক্য-বুদ্ধিকে মেনে ধর্ম-পথের পথচারীর পাথেয়র সন্ধানরত তাঁরা যাঁরা পরজন্ম মানেন এবং ঈশ্বরের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্ম ও ভাবনার আদর্শের তালিকা দিয়েছেন বহুস্থলে।

জ্ঞান কি ? এ প্রশ্ন তিনি যেমন তত্ত্বরূপে আলোচনা করেছেন তেমনি দৈনিক জীবনের সাধ্যরূপে তালিকাভুক্ত ক'রে বিবৃত করেছেন। নিম্নলিখিত ভাবগুলিকে তিনি জ্ঞান সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১। অমানিত্ব—নিজের শ্লাঘায় মোহাবিষ্ট না হওয়া।

২। অদম্ভিত্ব—দম্ভ বর্জন।

৩। অহিংসা—প্রাণীপীড়ন বর্জন—কায়, মন এবং বাক্যে।

৪। ক্ষান্তি—অন্যে অপকার করলে তাকে ক্ষমা করা।

৫। আর্জব—সরল ব্যবহার।

৬। আচার্যোপাসনা—মোক্ষসাধন উপদেষ্টার শুশ্রূষাদির দ্বারা সেবা।

৭। শৌচ—শরীরের এবং মনের শুচিতা। রাগাদি বর্জন। ভাবশুদ্ধি।

৮। স্থৈর্য—স্থির ভাব। দেহের, মনের এবং বুদ্ধির অন্যায় গতিকে রুদ্ধ করা।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—নিজের উন্মার্গ ভাবকে ধরে রাখা।

১০। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহে বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়ের আপাতঃ মধুর দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্মে বিরতি।

১১। অনহংকার—নিরহঙ্কার।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শন—জন্মমৃত্যু প্রভৃতির কবল হতে রক্ষা পাবার কারণ ও দোষ আলোচনা।

১৩। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিতে আসক্তিহীনতা, পুত্রদার গৃহাদিতে সাংসারিক ভাবে আবদ্ধ হবার ভাব ও কর্ম হ'তে বিরতি।

১৪। অনভিষ্ণ—তাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া।

১৫। নিত্যসমচিত্ত—অন্তঃকরণের সাম্যভাব।

---

* ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্। ৩।৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম্। ৩।৫১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। ৩।৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং। ৩।৪৩

১৬। ঈশ্বরে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি।

১৭। বিবিক্ত দেশসেবিত্ব—নির্জন, শুচি, সর্প, চোর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি রহিত নদীর কূল, উপবন, দেবমন্দির প্রভৃতি স্থানে বাস।

১৮। জনসংসদে অরতি—বৃথা জনতায় মেলামেশার আসক্তি বর্জন।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আলোচনা।*

জ্ঞানদীপ্ত নিষ্কাম কর্ম তো চিত্তকে শূন্য করবার বিধান নয়। নিয়ন্ত্রিত কর্মস্রোতে স্ব-চালিত জীবন-তরণীর যাত্রা, নিরুদ্দেশের যাত্রাপথে ভ্রমণ নয়, মন প্রাণ শূন্য করবার ব্যবস্থা নয়, বুদ্ধিনিরত কর্মের অনুষ্ঠান। এমন কর্মের অনুষ্ঠানে লক্ষ্য থাকে ব্রহ্মে, তাই কর্মফল নিবেদন করতে হয় অনাদি কর্ম-নিয়ন্তার অনন্ত সাগরে। কিন্তু সেথায়ও কামনা হয় যাত্রাপথের প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্ব-প্রকাশ। তাঁর জ্যোতি জ্বলবে, জ্বালাবে নিজের চির-উজ্জ্বলতার প্রভাবে—বাহির ও অন্তর। সে জ্যোতির সন্ধান দেয় জ্ঞানের সাধনা।

নাস্তিক-বুদ্ধি নিয়ে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করলে, তার অনিবার্য্য ফল—আপনার অন্তর দেবতার প্রকাশ। অজ্ঞান তাঁকে ঢেকে রাখে। জ্ঞান তুলে দেয় যবনিকা। পদ্মপত্রে জলের বিন্দুর মত নিষ্কাম কর্ম। সে কর্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হ'লে—পদ্মপত্রে যেমন জল মেশেনা—চিত্তের গভীরে তেমনি ব্রহ্মে সমর্পিত কর্ম মেশে না। তেমন কর্মী পাপে লিপ্ত হয় না।†

যে বিংশতি মনোবৃত্তির জ্ঞানসংজ্ঞা দিলেন গীতা, সেগুলির অনুশীলনের কি পরিণাম? নিশ্চয়ই শূন্যতা লাভ নয়। কারণ শ্রদ্ধা থাকলে তবে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। শ্রদ্ধা কার প্রতি শ্রদ্ধা?

চিত্তে তৎপরের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার দোসর ইন্দ্রিয় বিজয়ী-ভাব। শ্রদ্ধা তো মাত্র নিরস সম্মান নিবেদন নয় মহতে। শ্রদ্ধার মূলে রস থাকে। রস আপনার সত্ত্বার সঙ্গে মিশে—চরিত্রের উপাদান হয়। সে শ্রদ্ধা নিজের চলার-পথের পাথেয়-রূপে নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। সেই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের সহায়ক। সে চেতনা নিষ্ফল-সঞ্চয় নয়। যে ইন্দ্রিয়-বিজয়ীর শ্রদ্ধা আছে, জ্ঞান তারই লভ্য। শ্রদ্ধা যাঁর আছে তৎপরে—তিনি ঐ বিংশতি ভাবের অনুশীলনের সুফললাভ করতে পারেন। তাই শ্রীভগবান বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানঃ তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানের অনুশীলনের পথে তাই প্রয়োজন ভক্তির। যাদের জ্ঞান আখ্যা দিলেন বাসুদেব, তাদের প্রত্যেকটি ভাবের বিশ্লেষণ ও বিচারে সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত জ্ঞান ভক্তিপথের সহায়ক। অপরদিকে মনের পটভূমিতে ভক্তি না থাকলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান না হলে, ইন্দ্রিয় সংযত না হলে জ্ঞানের অনুশীলন পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

তাই জ্ঞানযোগের পরিণাম সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—জ্ঞানের অভ্যুদয়ে যাদের পাপ নিবৃত্ত হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারা যাদের বুদ্ধি ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁর প্রতি যাদের নিষ্ঠা তারা ব্রহ্ম-পরায়ণ। পৃথিবীতে তাদের পুনরাবর্ত্তন নাই।*

একটু বিচার করলেই প্রতীতি জন্মাবে যে মনুষ্য চরিত্রের এই অবস্থা তিনের উপর নির্ভর করে—কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি। অথচ তিনটির পৃথক অসংলগ্ন অনুশীলনে পূর্ণতা সম্ভবপর নয়—কোনো একটিকে উপেক্ষা করলে শেষ পথের সহায়তা লাভ হয় না। উপেক্ষিত হয় প্রতিরোধী শত্রু।

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতির মূলে কি আছে? দম্ভ, দর্প অভিমান কার? নিশ্চয় মায়ায়-ঘেরা ক্ষুদ্র আমিত্বের আমি বড়, তাই আমি মানী। আমার মূল্য অধিক। সেই মূল্যের পরিমাণ আমার কাছে আমার মান। আমি রাজা, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী—এ ধারণার মাত্রা যার যত বেশী তার মানিতা তত পুষ্ট। কর্তৃত্বের অভিমানী আপনার স্ফীতরূপ দেখে দম্ভ করে, নিজের কৃতকর্মের মানিত্ব দম্ভিত্বের লোপে ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ। সে অহমিকা এবং অহঙ্কার লোপ পেলে অন্তরের লুকানো

* গীতা ১৩।৮ হতে ১৩।১২

† গীতা ৫।১০

* তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা স্তৎপরায়ণঃ
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ। ৫।১৭

দেবতা আত্ম-প্রকাশ করেন। কারণ অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ঈশ্বর হৃদ্দেশে সবার বিরাজিত।

এ লোপ তো বর্জ্জন নয় পূরণ। আমিত্বের খোলস ত্যাগ তো নিজেকে ক্ষুণ্ণ করা নয় পূর্ণ করা—আবরণের উন্মোচনে হয় পূর্ণ প্রকাশ। জীবের সংযোগ জীবের সাথে যে সূত্রে হয় সে যে পরমাত্মার যোগসূত্র। অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া ক্ষুদ্র করে জীবকে সে সূত্রের বিস্মরণে। অমানিত্ব আমিত্বের লোপ। অদম্ভিত্ব—ব্যক্তিত্বের বিলোপ, পরিপূর্ণতার প্রকাশ। অনহংকার অহমিকার অতি ক্ষুদ্র শিখার অনন্তের চির-জ্যোতিতে আহুতি-দান। তাই এদের অনুশীলনে জ্ঞানের শিখা জ্বলে। এদের বিপরীত স্বভাব—মান, দম্ভ, অহঙ্কার—অজ্ঞান।

আচার্যের উপাসনা জ্ঞান কারণ আচার্য জ্ঞানভাণ্ডার। শৌচ জ্ঞান। দেহের শুচিতা হ'তে মন শান্তি পায়—অবকাশ পায় আধ্যাত্মিক চেতনার। মনের শৌচ ধুয়ে দেয় আবর্জনা, অযথা তুচ্ছ ভাবনার ও ভাবের প্রেরণা। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসার স্রোত হয় ক্রমবর্দ্ধমান। জ্ঞানী অহিংসাব্রতী। হিংসার জঞ্জাল লুকিয়ে রাখে প্রেমকে। হিংসার রক্তবৃষ্টিও তথা-কথিত জ্ঞানীকে প্রাণের মৈত্রী ও করুণার ভাণ্ডারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বাধা দেয়। ভারতের কৃষ্টি চিরদিন তারস্বরে প্রচার করেছে—মা মা হিংসী। ভক্তির পথ, দেখিয়েছে বেদ। পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে যেন উদাত্ত-স্বরে বলেছেন—পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা। তুমি রক্ষা কর—জীব পিতা যেমন সন্তানকে আশ্রয় দেয়, রক্ষা করে, স্নেহে ঢেকে রাখে, তুমি তেমনি করে আমাদের বাঁচাও। এই হিংসার প্রবল স্রোত মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে সদাই সচেষ্ট। বৈদিক ঋষি বলেছেন—চিত্তানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বের পাপ দূর কর।

ক্ষান্তি তার পক্ষে সুলভ যে আপনাকে প্রসার করেছে, নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী হতে তুলে। ক্ষমা—সহজ সরল বৃত্তি তার যে পরকে ভাবে আপন। নিজে কি কেহ নিজের ক্ষতি করতে পারে? ভুল করে মানুষ যখন নিজের অনিষ্ট করে সে তো শাস্তি দেয় না আপনাকে। পরিতাপ করে, প্রার্থনা করে, সলজ্জ হয়। তাই তো যার ক্ষান্তি আছে তার প্রসার আছে—সে প্রতিশোধ নেয় না প্রতিহিংসায়—সে শত্রুর জন্য প্রার্থনা করে। বৈরিতাকে স্থান দেয় না চিত্তে।

বক্রতা জীবে জীবে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। কুটিলতা সত্য গোপন। ঋজুতা সত্যের আবরণ উন্মোচন। সত্যই তো জ্ঞান। জ্ঞানই তো সত্য। তার পথে সর্পিল কুটীল-গতি সহায়ক হ'তে পারে না অগ্রগমনের।

চিত্ত-বৃত্তি নিরোধে মনের একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, যোগ ও ধ্যানের পথ। নিজের উন্মার্গ দিক্-ভ্রমী বিক্ষিপ্ত মনন-শক্তিকে শুদ্ধ করলেই আত্মার স্বরূপ পড়ে দৃষ্টি পথে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের আপাতঃ মনোহর রূপ অজ্ঞানের পোষক ও আশ্রয়-ভূমি। বাহিরের রমণীয় দৃশ্য যদি না স্মরণ করিয়ে দেয়—সর্বাঙ্গ সুন্দরের সৌন্দর্য। সীমার মাঝে অসীমের জ্ঞান সম্ভব স্থৈর্যে।

মনুষ্য জন্ম না হ'লে জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু সে সত্যকে ঢেকে রাখে এই জন্য এ জীবন অশাশ্বত দুঃখালয়। এ দোষের মূল অনুসন্ধান করলে জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধি কেমনে দুঃখের নিগড়ে না বাঁধতে পারে আমাদের, এ অনুসন্ধান জ্ঞান।

এইরূপে বিংশতি জ্ঞানের পর্য্যায় আলোচনা করলে বোঝা যায় গীতার শিক্ষার মহিমা। ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে শাসন না করলে যেমন বিপদ, আত্ম-বিনিগ্রহ বা নিজের লম্ফনশীল মনোবেগকে ধরে না রাখতে পারলে, কোথায় শান্তি, কোথায় নিরাময়তা?

সম্যক আলোচনা করলে আর সন্দেহ থাকে না যে প্রকৃত জ্ঞান ও পরাভক্তি একত্র সংশ্লিষ্ট হ'য়ে—মানুষের জীবনকে সত্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেয়। গীতা যে গুণাবলীকে জ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন, তারা ভক্তি পথের পাথেয়, নির্মল শান্ত জীবন-পথের-নিয়ামক। কিন্তু চাই আমরণ অনুশীলন।

দিনে দিনে আরও
নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার
জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।
রোজ রেক্সোনা সাবান
ব্যবহার করুন। এর
ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপ-
নার গায়ের চামড়াকে দিনে
দিনে আরও কোমল,
আরও নির্ম্মল কোরে
তুলবে।
Rexona
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌*যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।
RP. 109-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

উড়িষ্যায় জমীদারী প্রথা লোপ—

উড়িষ্যা রাজ্যে জমীদারীপ্রথা বিলুপ্ত করিয়া সকল জমী রাষ্ট্রের অধীনস্থ করা হইতেছে। গত ২৫শে আগষ্ট পুরী জেলার ১৭টি ছোট ছোট জমীদারীর পরিচালনভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র কনিকার রাজা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করায় তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পুরী, কটক ও বালেশ্বর—৩টি জেলায় ২৫ হাজার ছোট জমীদারী ছিল—সেগুলি ক্রমে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হইলে রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারিবে। জমীদারীপ্রথা বিলোপের ফলে একদিকে যেমন কৃষির উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হইবে, অন্যদিকে তেমনই জমীদারগণ ক্ষতিপূরণের অর্থ দ্বারা নানাপ্রকার কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবেন। দেশের পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—নূতন অবস্থায় নূতন ভাবে তাহা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হইয়াছে। কি ভাবে তাহা করা যাইবে, সে বিষয়ে সকল চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক আলোচনা করিয়াছেন। সকলের সমবেত সুচিন্তিত প্রথায় দেশের অর্থনীতিক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনই জমীদারীপ্রথা লোপের উদ্দেশ্য। মহাত্মা গান্ধী—যে জনগণের রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে দেশের সর্বনিম্ন স্তরের লোকও স্বাধীনতার মর্ম বুঝিতে পারে—তাহার ব্যবস্থার জন্য আজ সকলের চিন্তাধারাই এক খাতে প্রবাহিত হইতেছে। কবে গান্ধীজির সেই স্বপ্নের ভারত গঠিত হইবে, তাহার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

শিশুরক্ষার দায়িত্ব—

দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীকে-ডি-মালব্য এক 'অনাথাশ্রম' বিল উপস্থিত করিয়া সরকার পক্ষ হইতে দেশের শিশু-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। গত দুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগের পর দেশে অনাথ শিশুর সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু পিতৃমাতৃহীন ও অভিভাবকহীন শিশু নহে—অনাথ ও অনুপযুক্ত পিতামাতার সন্তানও অনাথ পর্য্যায়-ভুক্ত। অনাথ শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদের উপযুক্তভাবে লালন পালনের ব্যবস্থা হইলে তাহারা যে পরে প্রয়োজনীয় নাগরিকে পরিণত হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ২৪পরগণা জেলায় রহড়া গ্রামে রামচন্দ্রপ্রীতিস্মৃতিতে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বালকাশ্রমের গত ৮ বৎসরের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, সরকার সত্বর এ বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য উপযুক্তভাবে পালনের ব্যবস্থা করিবেন।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি—

গত মহাযুদ্ধের সময় টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাহার ফল আজও দেশ হইতে দূর করা যায় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর গত ৬ বৎসরের প্রথম দিকে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেজন্য ভারতের সর্বত্র পুলিশের স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হয় ও তদন্তের ফলে বহু বড় ও ছোট সরকারী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়। ইহার ফলে যত শীঘ্র দুর্নীতি বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। তাহার কারণ জনসাধারণ এ বিষয়ে সরকার পক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই। সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইলে তাহাদের রোষে পতিত হইতে হয় ও সেজন্য নানারূপ অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া জনগণের মধ্যে এ কাজে উৎসাহ দেখা যায় নাই। গত ২ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, সরকারের নূতন পুলিশ বিভাগ বহু কর্মচারীর সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—কিন্তু জনগণের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে সে সকল অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সমূহ গোপনে শুনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও সে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া বহু অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা
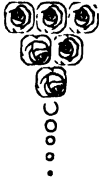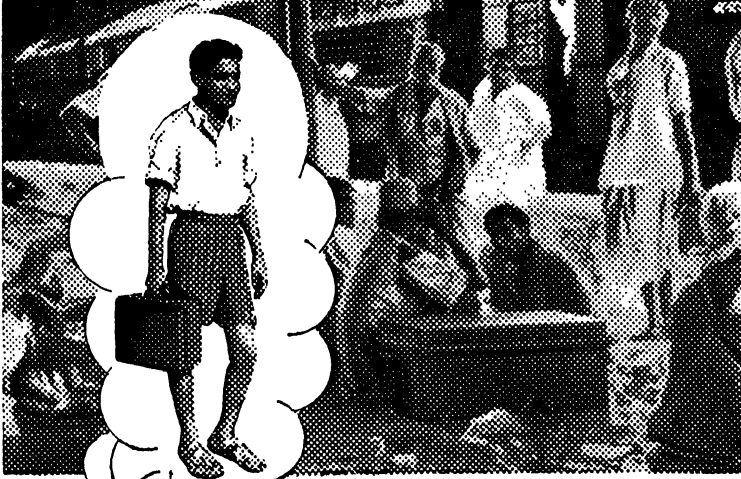
হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, জনগণ এ বিষয়ে অধিকতর তৎপরতা দেখাইলে দেশ হইতে ক্রমে সকল দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে।

তিস্তার উৎসমুখ সন্ধানে—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় অপর ৩ জন সঙ্গী লইয়া কাঞ্চনজংঘার ২৩ হাজার ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত শীর্ষে..উত্তর বঙ্গের প্রধান নদী তিস্তার উৎসমুখ সন্ধানে যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গী হইবেন—(১) ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার শ্রী এ-কে মুখোপাধ্যায় (২) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের জেলার শ্রী এস-পি ঘোষ ও (৩) জলপাইগুড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপার্থ রায়। অন্নপূর্ণা শীর্ষের অভিযানকারী দলের সঙ্গী অংসারি ১৪ জন সের্পা সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। ১৭ হাজার ফিট উচ্চে চোলগালোতে যাইয়া তাঁহারা কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। ইহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী দল এ ভাবে পর্বত-অভিযানে যান নাই। শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিণত বয়সেও যে উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বাঙ্গালী যুবকগণের অনুকরণযোগ্য। আমরা এই অভিযাত্রী দলের সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা অঞ্চলের উন্নয়ন—

কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাহা লইয়া কলিকাতা পৌরসভার সংযুক্ত নাগরিক পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। টালীগঞ্জের এলাকায় পলতা ট্যাঙ্কের অনুকরণে জলাধার নির্মাণ ও টালী নালা সংস্কার করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের পরিস্রুত জল সরবরাহ অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। ইহা দ্বারা লবণ হ্রদ এলাকার পুনরুদ্ধার হইবে এবং সার হইতে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। পৌরসভা ও রাজ্যসরকার উভয়ে এই পরিকল্পনার জন্য সমপরিমাণ অর্থ দিবেন। পৌরসভা ঋণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন। মাণিকতলা ও কাশীপুর অঞ্চলের জল নিষ্কাসন ব্যবস্থাও উহার মধ্যে থাকিবে। কলিকাতা সহরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে—এ অবস্থায় কলিকাতার উন্নয়ন ব্যবস্থা যত শীঘ্র আরম্ভ করা যাইবে, ততই তাহা জনগণের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য একটি সর্বভারতীয় কমিটী গঠিত হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ উক্ত কমিটীর অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সকল রাষ্ট্রের লেখকগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য ১২টি রাজ্যে মোট ৯৫০০ টাকার ১২টি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদান সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। ইহার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে তাহা আলোচিত হইবে ও দেশের সকল সুধী, ঐতিহাসিক ও লেখক এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ লাভ করিবেন।

দৈনন্দিন জীবনে শোচনীয় অবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে সাত আনা সেরের চাউলের দাম বাড়িয়া ৯ আনা হওয়ার পর হইতে ক্রমে সরিষার তৈল, লঙ্কা, জিরা হইতে আরম্ভ করিয়া মাছ, তরকারী, সব্জী প্রভৃতির দাম অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুরবস্থার সীমা নাই। হঠাৎ বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সরিষার তৈল ও লঙ্কার দাম কেন এত বাড়িয়া গেল, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সেরের শুকনা লঙ্কা তিন টাকা সের হইয়াছে। আলু ও সব্জীর দাম এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় দেড়গুণ বা দ্বিগুণ হইয়াছে। মাছের ত কথাই নাই—বাংলা দেশে কোনদিন মাছ দুষ্প্রাপ্য হইবে, এ কথা কেহ কল্পনাও করে নাই। বর্ষার সময় বাঙ্গালীর ভাগ্যে এবার ইলিস মাছও হইল না—কাজেই বাঙ্গালী মৎস্য হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল। মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে অনেক পরিকল্পনার কথাই শুনা গেল—কিন্তু বাজারে যাইয়া মাছের সের ৩ টাকা, সাড়ে ৩ টাকা, ৪ টাকার কম কোন দিনই দেখা গেল না। ইহার কোন প্রতীকার ব্যবস্থাও হইল না।

যুবকগণকে সামরিক শিক্ষা দান—

দেশের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের ছাত্রগণকে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থার জন্য গত ২২শে আগষ্ট দিল্লীতে লোকসভায় আলোচনা হইয়াছিল। সহকারী প্রতিরক্ষা-সচিব শ্রীসতীশচন্দ্র জানাইয়াছেন—যুবকগণকে সামরিক শিক্ষা দানের জন্য 'অক্সিলারী ক্যাডেট কোর' 'ন্যাশানাল ক্যাডেট কোর' 'টেরিটোরিয়াল আর্মি' প্রভৃতি গঠন ও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে—তাহাতে যুব-সমাজ সামরিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পাইবে। কাজেই বর্তমানে স্কুল কলেজে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ—

দিল্লীতে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে জানা গিয়াছে—কলিকাতার সহরতলীগুলিতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলার ব্যবস্থার জন্য আয়োজন বহুল পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে এবং শীঘ্রই সে সম্বন্ধে জরিপ শেষ হইবে। কলিকাতার যানবাহন সমস্যা চরম হইয়াছে—ট্রাম বন্ধ থাকিলে লোকজনকে কি কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। কাজেই যত শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান হয়, ততই সকলের সুবিধা হইবে।

কৃষ্ণনগর বাণী-পরিষদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ

ফটো—সনৎ চৌধুরী

লাডাক ও জম্মুর অবস্থা—

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের আমন্ত্রণে লাডাকের ৩৭ বৎসর বয়স্ক প্রধান লামা বুশক বাকুলা গত ২৫শে আগষ্ট শ্রীনগরে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—লাডাক ভারতে কি কাশ্মীরে যোগদান করিবে, এই বিষয় লাডাকবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের দ্বারাই চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। জম্মু বা লাডাকের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হইবার কোন আশঙ্কা নাই। জম্মুর ব্যাপারটিও ঠিক লাডাকের অনুরূপ। প্রধান লামাই লাডাক জাতীয় সম্মিলনের সভাপতি; তিনি বলেন—লাডাকের জনগণ বক্সী সরকার সমর্থন করে এবং শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি সমর্থন করিয়াছে। এই উক্তি হইতে লাডাক ও জম্মুর অবস্থা সম্যক অবগত হওয়া যায়।

শ্রীরামপুরে কবি-সম্বর্দ্ধনা—

গত ৩০শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর (হুগলী) বনফুল সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে প্রবীণ কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবির সতীর্থ শ্রীতারকচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন দান করা হয় ও বহু সাহিত্যিক সমবেত হইয়া কবি করুণানিধানের কবিতা সম্পর্কে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সমাগত সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সস্ত্রীক ভারত রাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর দিল্লীতে এক ভোজ সভায় তাঁহাদের আপ্যায়িত করেন। ছবিতে দেখা যাইতেছে—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি, রাজকুমারী অমৃত কাউর, বেগম মহম্মদ আলি, মহম্মদ জাফরুল্লা খান, মিঃ গজনফর আলিখান এবং ডাঃ এস্-এস-মেটা প্রভৃতি

খড়্গপুরে নূতন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা—

ইংলণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘের দানে খড়্গপুরে গত ৫ই সেপ্টেম্বর নূতন বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্দিরে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের নূতনতম যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘ ১ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্র দিয়াছেন। বৃটেনের ১২টি বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিকগণ বিভিন্ন যন্ত্র সরবরাহ করিয়াছেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ খড়্গপুর শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক। তাঁহার বিশ্বাস, এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বহু নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের শিল্প বৃদ্ধির সাহায্য করিতে পারিবেন। ২ বৎসর পূর্বে যখন খড়্গপুরে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়, তখন তথায় ঘর বাড়ী ছিল না—এখন তথায় জগতের সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র স্থাপিত হইল—তথায় বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবন—রবীন্দ্র-বাস গৃহে বিশ্বকবির স্মৃতি-পূজা

ফটো—শ্রীশ্যামলকান্তি বসু

চোরাকারবারীসহ মাল ধৃত—

পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে এক দল চোরাকারবারী পাকিস্তান হইতে সোনা রূপো ভারতে আনিয়া ভারত হইতে রেশম, লঙ্কা, ডালচিনি প্রভৃতি পাকিস্তানে লইয়া যাইত। সম্প্রতি সেই দলের ৯২ জন লোক ও ৬ লক্ষ টাকার মাল ধরা পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবে একদল চোরাকারবারী কাজ করিতেছে। এই সকল কারবার বন্ধ হইলে উভয় রাষ্ট্রই লাভবান হইবে। যাহাতে চোরা-কারবারীরা ধরা পড়ে, সেজন্য সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির চেষ্টা ও সাহায্য করা উচিত। জনগণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত না হইলে এই সকল চোরাকারবার বন্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না।

সকলকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর মুখপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জানাইয়াছেন—ভারতরাষ্ট্র বেকারদিগকে বসাইয়া রাখিয়া ভাতা প্রদান করার নীতির পক্ষপাতী নহে—তাহারা সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছে। শুধু বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কি ভাবে বেকারদিগকে কাজ দিবার ব্যবস্থা করা যায়, সকলের সে জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন।

বেকারদিগকে ভাতা দিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহারা আরও অলস হইয়া যাইবে। শ্রীনেহরু দেশবাসী সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন—সকলে নিজ নিজ চেষ্টানুসারে কাজের ব্যবস্থা করিয়া যেন বেকার-সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করেন।

রামপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতি—

২৪পরগণা জেলার হালিসহর গ্রামে সাধক রামপ্রসাদ সেনের সাধন ভূমিতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ঐ স্থানে আহূত রবিবাসরের এক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য শ্রীঅমিয়নাথ মুখোপাধ্যায় অগ্রণী হইয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত 'গানে রামপ্রসাদ' গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ উক্ত সমিতির কার্য্যে দান করিবেন। রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসুই সমিতির সম্পাদক হইয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, স্মৃতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থের অভাব হইবে না।

হালিসহরে রবিবাসরের সদস্যগণ

জম্মু ও কাশ্মীরে সুশাসন—

কাশ্মীরে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পর নানাভাবে দেশের জনগণকে উপকৃত করার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। তথায় চাউলের মূল্য ছিল ২৫ টাকা মণ। জম্মু ও কাশ্মীরে ৮ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ময়দার দরও ২৫ টাকা মণ হইতে কমাইয়া ২০ টাকা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খালের জলের জন্য কৃষকদিগকে যে কর দিতে হয়, তাহাও কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। লাডাকের গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্যও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। কাশ্মীর রাজ্য যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, নূতন মন্ত্রিসভা সে বিষয়ে সকল চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই কাশ্মীরে ডাক, তার, দেশরক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন। তাহার ফলে ঐ সকল বিভাগের উন্নতি হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

ভারত সরকার শিলং অন্ধ বিদ্যালয়ে কয়েকটি ভারতীয় গীতি-যন্ত্র উপহার প্রদান করেন। ওই উপহার শ্রীসি-সি-দেশাই মারফৎ প্রদত্ত হয়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৩ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় বাংলা দল ৩-১ গোলে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা, ১৯৪১ সাল থেকে বাংলা দল প্রতিবারই ফাইনাল খেলেছে এবং অনুষ্ঠিত ১০ বারের খেলায় বাংলা দল ৭বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। বাকি তিনবার পেয়েছে, দিল্লী (১৯৭০) এবং মহীশূর (১৯৪৬ ও ১৯৫২)। বাংলা দল ছাড়া অন্য কোন দল এত অধিকবার ফাইনাল খেলেনি এবং গতবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়নি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী মহীশূর দল ৩-০ গোলে দিল্লীকে এবং সেমি-ফাইনালে ভাগ্যক্রমে ১-০ গোলে শক্তিশালী হায়দ্রাবাদ দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। মহীশূর দল এই খেলায় যে ভাবে গোল দেয়—তাতে বলা যেতে পারে হায়দ্রাবাদ দল দান স্বরূপই এই গোলটি মহীশূর দলকে করতে দিয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় বাংলা দলকে বিশেষ বেগ পেয়ে খেলতে হয়েছে, একমাত্র প্রথম খেলায় বাংলা ৫-০ গোলে পাঞ্জাব দলকে সহজেই হারিয়েছে।

বিহারের বিপক্ষে দ্বিতীয় খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনে বাংলা ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার একেবারে শেষ মিনিটে বিহারের রাইট-আউট পি কে ব্যানার্জি গোল দিলে খেলাটি ড্র যায়। গোলটি দর্শনীয় এবং এরকম গোল কদাচিৎ দেখা গেছে।

ঐ দিনে অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। তৃতীয় দিনের খেলায় বাংলা ২-১ গোলে বিহারকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। এ পরাজয় বিহার দলের অগৌরবের হয়নি। বাংলা দলের বিপক্ষে বিহার দলের চমৎকার খেলা মাঠের দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। সময়ে সময়ে বাংলা দলের খেলা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায় ফলে মাঠের দর্শকরা বিহার দলকে সমর্থন করতে থাকেন। সেমি-ফাইনালে বাংলা-বোম্বাইয়ের প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় দিন বাংলা ১-০ গোলে জয়ী হয়। বাংলার লেফ্‌ট-হাফ নারায়ণ গোলটি করেন। বাংলা দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলায় কোন বোঝাপড়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ ধারা ছিল না। বোম্বাইদল দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ দশ মিনিট জয়লাভের জিদ নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে খেলে—এ সময়ে বাংলা দল আত্মরক্ষায় নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। বাংলার গোলরক্ষক ভরদ্বাজ একাধিকবার অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দলকে রক্ষা করেন। বোম্বাই দল পরাজিত হ'লেও সেদিনের খেলায় গৌরব তাদেরই প্রাপ্য।

ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড কে পালের চরম ব্যর্থতায় বাংলা দল গোল দেওয়ার একাধিক সুযোগ নষ্ট করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মহীশূর প্রথম গোল দেয় খেলার ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৪ মিনিটে বাংলার লেফ্‌ট-আউট এস দত্ত গোলটি শোধ করেন। এর পর বাংলা দল নব উদ্যমে খেলতে থাকে এবং দলের খেলা প্রভূত উন্নত হয়। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষেই আর গোল

না হওয়াতে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষেই গোল হয় না, খেলার ফলাফল ১-১। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম দিকেই ফাঁকা গোল থেকে রবিদাস মাত্র কয়েক গজ দূরে বল পেয়েও গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। এর কিছু পরই রবিদাসই দলের জয়সূচক গোলটি করেন, ফল দাঁড়ায় ২-১। এই গোলের চার মিনিট পর মেওয়ালাল দলের ৩য় গোলটি দিয়ে বাংলা দলের জয়লাভ পাকা করেন। মহীশূর দল পরাজিত হ'লেও তাদের খেলা দর্শকসাধারণকে পরিতৃপ্ত করে। খেলার শেষে উভয় দলকেই দর্শকসাধারণ অভিনন্দন জানান। বাংলার এ জয়লাভ খুবই গৌরবের, কারণ তারা দুর্ব্বল দল নিয়ে জয়ী হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইউরোপ সফরে যাওয়াতে বাংলা দল তাদের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ের সহযোগিতা পায়নি। ফলে বাংলার দল গঠন করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতার ৮টি খেলাতে বাংলা দলে মোট ২৫জন খেলোয়াড় খেলেছেন। এই থেকেই দলের দুর্ব্বলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে চরম ব্যর্থতার অন্যতম কারণই হ'ল খালি পায়ে ফুটবল খেলা; একাধিক খেলার ফলাফল থেকে আমরা অনেক দিন আগেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কিন্তু সময়মত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কর্ত্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ, এতদিন পর তাঁরা সজাগ হয়েছেন। এ বারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাধ্যতামূলক-ভাবে খেলোয়াড়রা বুট পায়ে খেলেছেন। ফল ভালই পাওয়া গেছে।

ইউরোপ সফরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ঃ

বুখারেষ্টে বিশ্ব যুব সম্মেলনে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ক'লকাতার বিখ্যাত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪র্থ স্থান লাভ করে।

প্রথম খেলায় অষ্ট্রিয়ার গ্রাজেট ক্লাবকে ২-০ গোলে এবং ২য় খেলায় লেবাননকে ৬-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ০-৪ গোলে রুমানিয়ার কাছে পরাজিত হয়।

রাশিয়া সফরে চারটি খেলার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টর্পেডো ডায়নামোর সঙ্গে ৩-৩ গোলে প্রথম খেলা ড্র করে। টিবিলসি ডায়নামোর কাছে ১-৯ গোলে, মস্কো ডায়নামোর কাছে ০-৬ গোলে এবং কিয়েভ ডায়নামোর কাছে ১-১৩ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজিত হয়।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৭৫ (লিণ্ডওয়াল ৫২, হ্যাসেট ৫৩; টু্ম্যান ৮৬ রানে ৪ এবং বেডসার ৮৮ রানে ৩ উইঃ) ও **১৬২** (আর্চার ৪৯; লক ৪৫ রানে ৫ এবং লেকার ৭৫ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৩০৬ (হাটন ৮২, বেলী ৬৪; লিণ্ডওয়াল ৭০ রানে ৪, জনষ্টোন ৯৪ রানে ৩ উইঃ) ও **১৩২** (২ উইকেটে এডরিচ নট আউট ৫৫)

ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৪১ টেষ্ট পর্য্যায়ের পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সুদীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষার পর অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে টেষ্ট পর্য্যায়ে জয়লাভের পুরস্কারস্বরূপ কাল্পনিক 'এসেস' পুনরুদ্ধার করেছে। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের এই প্রথম 'এসেস' জয়। ১৯৩২-৩৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ে ৪-১ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু পরবর্ত্তী টেষ্ট পর্য্যায়ে ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডকে 'এসেস' হারাতে হয়। সেই ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে ৬টি টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলা হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এসেস' থেকে যায়। দু'দেশের মধ্যে উপর্য্যুপরি অধিকবার 'এসেস' লাভের রেকর্ড করেছে ইংলণ্ড—৭ বার, ১৮৮৪ থেকে ১৮৯০ পর্য্যন্ত। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে রেকর্ড ৬ বার, ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০-৫১। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার করতে পাঁচটির বেশী টেষ্ট পর্য্যায় অপেক্ষা করতে হয়নি। ইংলণ্ডের পক্ষে ওভাল মাঠ সত্যই শুভ। ১৯২৬ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ের ফলাফলের পুনরাবৃত্তিই ওভাল মাঠে এবার আমরা দেখলাম—প্রথম চারটি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত হওয়ার পর ওভাল মাঠের শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের জয়—অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার। দীর্ঘকাল পর ইংলণ্ড তার জাতীয় ক্রিকেট খেলায় পুনরায় প্রাধান্য অর্জ্জন করেছে—ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে আজ পরম আনন্দ এবং আশা। আরও যে, দ্বিতীয় রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক বৎসরে স্বদেশের মাটিতে ইংলণ্ডের এ সাফল্য জয়লাভের

গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে। ১৯৫৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায় নিয়ে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট পর্য্যায়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৪১। ফলাফল দাঁড়িয়েছে সমান সমান—ইংলণ্ডের 'এসেস' লাভ ১৯ বার, অষ্ট্রেলিয়ারও ১৯। অমীমাংসিত ৩ বার—১৮৭৬-৭৭, ১৮৮২ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে। ৪১টি টেষ্ট পর্য্যায়ে মোট টেষ্ট খেলা ১৬৩। ইংলণ্ডের জয় ৫৭, অষ্ট্রেলিয়ার ৬৮, খেলা অমীমাংসিত ৩৮। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের ৫টি টেষ্ট পর্য্যায়ের ২০টি খেলায় ইংলণ্ডের হার ১১ এবং অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র ২—১৯৫০-৫১ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে এবং ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডে। খেলা ড্র ৭। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলির ওপর সুদীর্ঘকাল একটানা একাধিপত্য বজায় রেখেছিল বলে অষ্ট্রেলিয়াকে বলা হ'ত ক্রিকেট খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান। ১৯৫২-৫৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়, খেলার ফলাফল সমান হওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' লাভে অক্ষমতা এবং পরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ডের কাছে অষ্ট্রেলিয়ার 'এসেস' হাতছাড়া—এই দু'টি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে বেশীর ভাগ ক্রিকেট সমালোচক মনে করেন, যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়ার একটানা একাধিপত্যের যে সমাপ্তি হ'ল তারপর অষ্ট্রেলিয়া পুনরায় সে আধিপত্য লাভ করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৬টি টেষ্ট পর্য্যায়ে খেলেছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৩টি, ভারতবর্ষ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি ক'রে। এই ছ'টি টেষ্ট পর্য্যায়ের সবগুলিতেই অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছে। খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার হার মাত্র ২টি, খেলা ড্র ৫টি। এই একটানা জয়লাভের পথে প্রথম বাধা পায়, ১৯৫২-৫৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২টি টেষ্ট খেলায় হেরে—যার ফলে টেষ্ট পর্য্যায়ের ফলাফল সমান দাঁড়ায়। এখানে মনে রাখতে হবে, অষ্ট্রেলিয়া-দঃআফ্রিকার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৮টি টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছে উপর্য্যুপরি ৭ বার, অমীমাংসিত ১ বার। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে দ্বিতীয় বাধা ইংলণ্ডের হাতে 'এসেস' হারিয়ে। তবে এ দুটি বাধাতেই যে অষ্ট্রেলিয়া সহজে কাবু হয়ে যাবে—এমন ক্রিকেট খেলা অষ্ট্রেলিয়া খেলে না।

১৫ই আগষ্ট, ওভাল মাঠের ৫ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হাসেট টসে জয়ী হলেন। আলোচ্য টেষ্ট পর্য্যায়ের পাঁচটি খেলাতেই হাসেট জয়ী হয়েছেন। টেষ্ট পর্য্যায়ের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়ী হয়েছেন—এ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচজন ভাগ্যবান অধিনায়ক। সুতরাং এ গৌরব কম নয়! হাসেটের পক্ষে এ গৌরব আরও যে, তিনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে দশটি টেষ্ট খেলায় অধিনায়কত্ব ক'রে ৯বার টসে জয়ী হয়েছেন—১৯৫০-৫১ সালে ফ্রেডী ব্রাউনের বিপক্ষে ৪বার এবং ১৯৫৩ সালে লেন হাটনের বিপক্ষে ৫বার। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভের অর্থ, খেলায় অর্দ্ধেক জয়লাভের সমান মনে করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ জয়লাভ এক্ষেত্রে কাজের হয়নি। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ২৭৫ রান ক'রে ৫১/৪ ঘণ্টার খেলায়। ট্রুম্যান ৮৬ রানে ৪টে উইকেট পান, ব্যাটসম্যানদের কাছে তাঁর 'জুজু' আখ্যা কিছুটা প্রমাণিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ে ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ১ রান ওঠে, ১৮ মিনিটের খেলায়। ১৬ই আগষ্ট, রবিবার খেলা বন্ধ থাকে। ১৭ই আগষ্ট, খেলার দ্বিতীয় দিনে ৭ উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ২৩৫ রান দাঁড়ায়; অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ৪৫ রান কম, হাতে ৩টে উইকেট জমা। মাঠে এইদিনে ৩০,০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। অধিনায়ক হাটন ৮২ রান করেন; হাটন-মেএর ২য় উইকেটের জুটিতে শত রান ওঠে। এবং এই জুটির দু'জনকেই আউট ক'রে জনষ্টোন বোলিংয়ে কৃতিত্ব লাভ করেন।

১৮ই আগষ্ট, ছয়দিনের টেষ্ট খেলার ৩য় দিনে ৩০৬ রানে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস শেষ হ'লে ইংলণ্ড ৩১ রানে এগিয়ে যায়। ইংলণ্ডের চৌকস খেলোয়াড় বেলী ৩১/৪ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৬৪ রান করেন। বেলী-বেডসারের শেষ উইকেটের জুটিতে ৪৪ রান ওঠে, ৭০ মিনিটের খেলায়।

লাঞ্চের পর অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের লক এবং লেকার মারাত্মক বল দিয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে কাবু ক'রে দেন। ৬১ রানে ৫টে উইকেট পড়ে যায়। মাত্র ৩০ রানে অষ্ট্রেলিয়া এগিয়ে থাকে।

লক ও লেকারের ১৬টা বলে ৪টে উইকেট পড়ে—হোল, হার্ভে, মিলার এবং মরিস, রান ওঠে মাত্র ২। এ বিপর্য্যয়ে অষ্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তবুও অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলোয়াড়

তার পরিচয় দিতে ভুলেন না। বিপর্য্যয়ের মুখে তরুণ খেলোয়াড় আর্চার এবং ডেভিডসন নির্ভীকভাবে আক্রমণ চালিয়ে খেলতে থাকেন। এক সময়ে লেকারের পর পর বলে ডেভিডসন বাউণ্ডারী এবং 'ছয়ের' বাড়ি মারেন। চায়ের সময় আর্চার-ডেভিডসনের জুটিতে ৪৬ রান ওঠে, আধ ঘণ্টার খেলায়—এই সময় অষ্ট্রেলিয়া ১০০ রানে অগ্রগামী থাকে। চা পানের পরই এ জুটি ভেঙ্গে যায়। ৯ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার ১৪৪ রান, যখন লিণ্ডওয়ালের সঙ্গে জনষ্টোন শেষ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন। লিণ্ডওয়ালও পিটিয়ে খেলেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১৬২ রানে শেষ হ'লে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩২ রান তুলতে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তখন খেলার মাত্র সময় ছিল ৫৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের একটা উইকেট প'ড়ে ৪৮ রান ওঠে; আর ৯৪ রান তুলতে পারলেই ইংলণ্ডের জয়—হাতে ৯টা উইকেট এবং পুরো তিনদিন সময়।

১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট, ইংলণ্ডের জাতীয় ক্রীড়াজীবনে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিনটির জন্যে ইংলণ্ডকে দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ইংলণ্ডের ২টো উইকেট পড়ে ১৩১ রান উঠেছে, উইকেটে খেলছেন এডরিচ এবং কম্পটন, বল দিচ্ছেন মরিস। ইংলণ্ডের জয়লাভের আর ১ রান বাকি। ইংলণ্ডের সর্ব্বজনপ্রিয় খেলোয়াড় কম্পটন সেই রানটি করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আনন্দ ধ্বনিতে সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠলো—জয় ইংলণ্ডের! দীর্ঘ ২০ বছরের ধৈর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার ফ্রেমে আর ধরে রাখা গেল না। পুলিশবেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলে ওভাল মাঠের ওপর দিয়ে জনসমুদ্র প্যাভিলিয়নের দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হ'ল—খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে।

১৯৫৩ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সন্তোষট্রফি বিজয়ী বাংলা দল

ফটো: ডি, রতন

সাহিত্য-সংবাদ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সিংহল-বিজয়" (৫ম সং)—২॥০, "চন্দ্রগুপ্ত" (২৬শ সং)—২॥০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রনাথ" (২৪শ সং)—১॥০, "নিষ্কৃতি" (২১শ সং)—১॥০, "গৃহদাহ" (৭ম সং)—৪॥০

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া"—৩৲

এমিলি জোলা প্রণীত উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ "প্রণয়-তৃষা"—২॥০

ভারত সরকারের মিনিষ্ট্রি অফ ইন্‌ফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রড্‌কাষ্টিং বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "India—1953"—৫৲

সমীর ঘোষ প্রণীত গল্প গ্রন্থ "উত্তরাপথ"—২৲

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "জননায়ক শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্য"—।০

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ক্যানসার চিকিৎসা"—৫৲

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "হিংসার অন্ধকার"—॥০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব কার্তিক সংখ্যার বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ
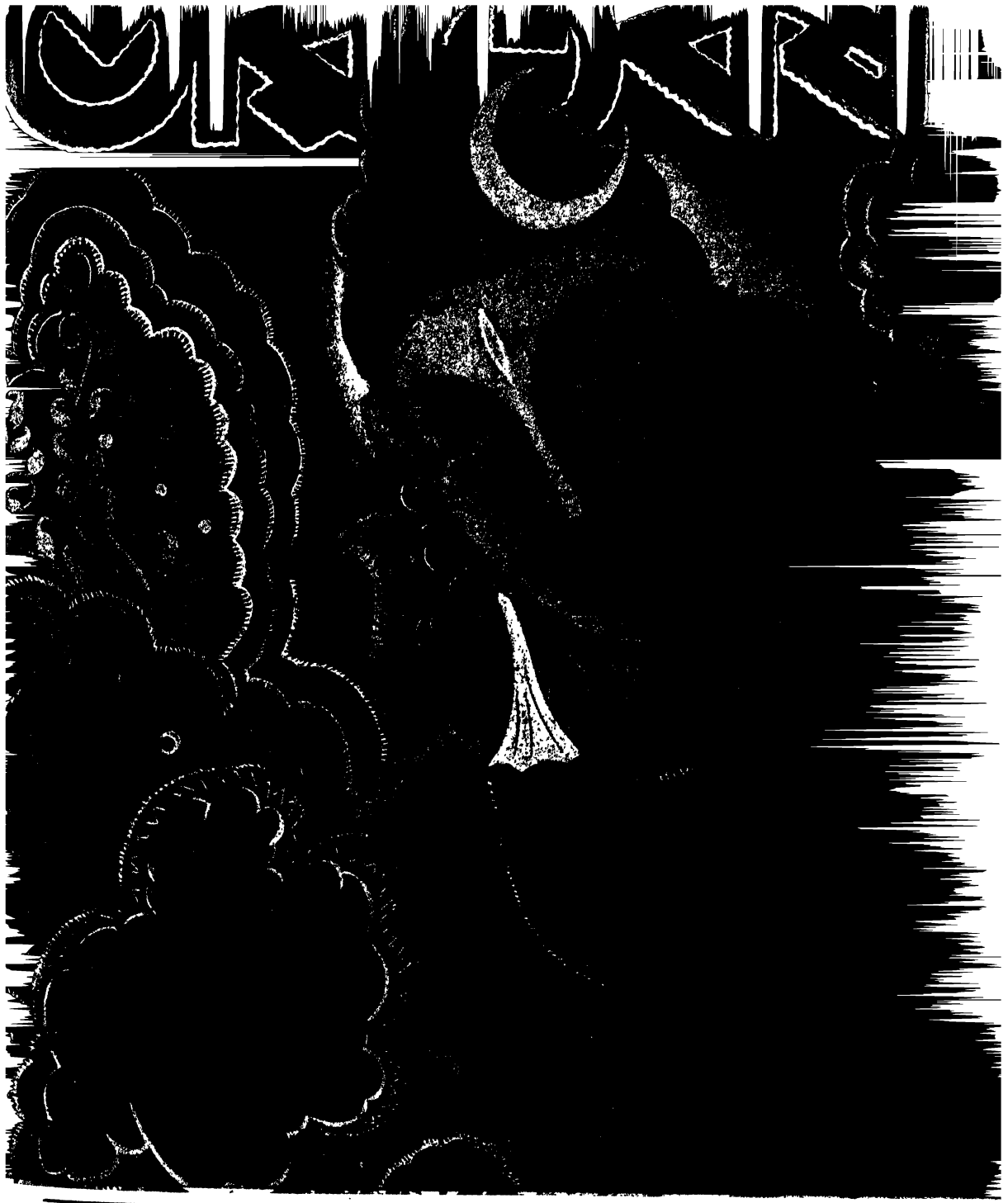
একচত্বারিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা

মূল্য :—বার্ষিক ৭॥০

শিল্পী—উম সেনগুপ্ত

নামসংকীর্তন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভাগবত-ধর্ম্ম

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। উভয়পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইয়াছে। কৌরব পক্ষে সুর-সমর-বিজয়ী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সম্মুখযুদ্ধে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের উনশত ভ্রাতা, পুত্র এবং ভ্রাতৃপুত্রগণ, জয়দ্রথাদি স্বজন সকলেই পরলোকগত। পাণ্ডব পক্ষে দ্রুপদাদি যোদ্ধৃগণ এমন কি অর্জ্জুনের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু পর্য্যন্ত হত হইয়াছেন। কৌরব পাণ্ডব উভয় শিবিরেই হাহাকার উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমগ্র ভারতের রাজন্যগণ, যোদ্ধগণ কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনও জীবিত নাই। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শোকের কৃষ্ণ ছায়া—ভারতবর্ষ অন্ধকার।

যুদ্ধশেষে কুরুপতি দুর্য্যোধন শোকে দুঃখে অভিমানে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ দ্বৈপায়ন তীরে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করিলে গদামাত্র সহায় মহারাজ দুর্য্যোধন হ্রদ-নীর ভেদ করিয়া তীরে আসিয়া দেখা দিলেন। একাকী—তথাপি ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সমযোদ্ধা ভীমের সঙ্গে গদা-যুদ্ধে সম্মত হইলেন।

বলদেব নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন। পুরাণ-পাঠক রোমহর্ষণ ব্যাসাসনে বসিয়াছিলেন বলিয়া দণ্ডায়মান হন নাই। এই অপরাধে বলদেব তখনই তাঁহাকে বধ করেন। মুনিগণ শোকসন্তপ্ত চিত্তে বলদেবকে মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন—রোমহর্ষণকে হত্যা করায় তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে। বলদেব অনুতপ্ত হইয়া রোমহর্ষণ-পুত্রকে ব্যাসাসনে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষালনের জন্য ত্রয়োদশ বৎসর তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ত্রয়োদশ

বৎসরান্তে যেদিন দ্বৈপায়নে আসিয়া উপস্থিত হন, সেইদিন ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়। দুর্য্যোধন বলদেবের প্রিয়-শিষ্য, তিনি বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুদেবকে দেখিয়া হয়তো কুরুরাজের মনে কথঞ্চিৎ ভরসা জাগিয়াছিল।

কৃষ্ণ-বলরামের সমক্ষে উভয়ের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, সহসা ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুদেশে আঘাত করিলেন। উরুভঙ্গে কুরুপতি ইন্দ্র বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। উদরের নীচে গদাঘাত নিষিদ্ধ, বলদেব মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কৃষ্ণ বহু অনুনয়ে তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পুরানো কথা শুনাইলেন। একদিন কৌরব-জননী শিবপূজান্তে দুর্য্যোধনকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন উলঙ্গ হইয়া আইস, দুর্য্যোধন লজ্জায় উরুদ্বয় আবৃত করিয়া আসেন। দুর্য্যোধনের যে যে অংশ গান্ধারীর দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিল, সেই সেই অংশ পাষাণের মত সুদৃঢ় হইয়াছিল, মাত্র উরুদ্বয় তাহার ব্যতিক্রম। কৃষ্ণ শুনাইলেন কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অবমাননার কথা। শুনাইলেন—দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধনের উরুদেশ দেখাইয়া ক্রোড়ে বসিতে নির্লজ্জ ইঙ্গিতের কথা। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা। সমস্ত শুনিয়া বলদেব স্থান ত্যাগ করিলেন। শুধু গদাঘাত নয়, ভীমসেন মহামানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতও করিয়াছিলেন।

বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব, ভারতীয় মনীষা ও মনস্বিতার মূর্ত্তবিগ্রহ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস—সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার উদ্দেশে বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল—

অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ
অভাল লোচন শম্ভুর্ভগবান বাদরায়ণি।

সেই অ-চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা, দ্বিবাহু দ্বিতীয় হরি, ত্রিনয়নহীন মহাদেব, ভগবান বাদরায়ণি কৃষ্ণকথার অধিষ্ঠান ভূমিরূপে—ঐ দ্বৈপায়ন হ্রদতীরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ দেখ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট মহারাজ দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে ভূমিশয়নে শয়ান।

যদামৃধে কৌরব সৃঞ্জয়ানাং
বীরেস্বথ বীরগতিং গতিষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব সৃঞ্জয়গণ বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে ভগ্নোরুদণ্ড ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে ভূপতিত রহিয়াছেন। প্রাসাদাভ্যন্তরে স্বর্ণ-পালঙ্কে কুসুমাস্তৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন, দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর বীজনে যাহার ক্লান্তি অপনোদিত হইত, আজ কঙ্করাকীর্ণ কঠিন ভূমিতল তাঁহার শয্যা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য যাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত, আজ তিনি—অসহায়—একক। কুক্কুর, শৃগাল তাঁহাকে জীবন্ত ভক্ষণ করিবার জন্য চতুপার্শ্বে সমবেত হইয়াছে, তিনি অঙ্গুলী উত্তোলনেও অসমর্থ। কোথায় রাজ্য, কোথায় রাজভাণ্ডার, কোথায় রাজভোগ, কোথায় রাজমহিষী, রাজপুত্র, স্বজনবান্ধব। কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে - "ততঃ কিম" ? পার্থিব ঐশ্বর্য্যের, দম্ভ, লোভ মাৎসর্য্যের তো এই পরিণাম। পাণ্ডব পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনায় পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চাহিলে শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা পূর্ব্বক যিনি বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছিলেন--"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" সে দাম্ভিকের যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু সূচীবিদ্ধ মৃত্তিকা মাত্রও আজি আর তাঁহার আয়ত্তে নাই। এই তো মানুষের জীবন ? তাহা হইলে মানুষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, কেমন করিয়া শান্তিলাভ করিবে।

পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনাপতি অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—যাঁহাদের জন্য রাজ্য চাই, রাজ্যলোভে সেই স্বজনবান্ধবগণকে হত্যা করিয়া কি ফল হইবে ? এই স্বজন গুরুজনের রুধিরপ্রদিগ্ধ রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি ? যুদ্ধে জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম ধ্বংস হয়। রমণীগণ স্বৈরিণী হয়, ফলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব ঘটে। কুলঘ্ন সাঙ্কর্য্য নরকের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোন কথা শোনেন নাই। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, যুদ্ধই তোমার কুলধর্ম্ম।

যুদ্ধ তুমি আমন্ত্রণ করিয়া আন নাই। সুতরাং এ যদৃচ্ছয়া উপপন্ন স্বর্গদ্বারকে কেন স্বেচ্ছায় অর্গলবদ্ধ করিবে।

হয় যুদ্ধে হত হইয়া স্বর্গে গমন কর, নয়তো যুদ্ধে জয়ী হইয়া এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার অধীশ্বর হও। অন্যায়পূর্ব্বক যাহারা তোমাকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। তোমাকে, তোমার সহোদরদিগকে, তোমাদের ধর্ম্মপত্নী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে অযথা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহারা ক্ষমার অযোগ্য। তাহারা তোমার ক্ষমাকে দুর্ব্বলতার নামান্তর বলিয়াই মনে করিবে যাহারা দুষ্কৃতকারী, যাহারা অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের বিনাশের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে? আপনার কর্ম্মদোষে, ইহারা জীবন্মৃত, আপনা আপনি হত হইয়া আছে? কালরূপে আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি। আমি যেমন বাহিরে, তেমনই অন্তর্যামীরূপে তোমার হৃদয়াভ্যন্তরেও রহিয়াছি। তুমি লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক অবিচারিত চিত্তে আমার নির্দ্দেশ পালন কর। অহঙ্কারবিমূঢ় চিত্তে নিজেকে কর্ত্তা মনে করিও না। তোমার মনে যদি হিংসা দ্বেষ না থাকে, কোন কামনা না থাকে, তবে ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে কেন? এইরূপে বহু উপদেশ দান করিয়া সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

অর্জ্জুন উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ হইল, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণামও আসিয়া দেখা দিল। এই পরিণাম নিরোধের উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রশ্নের উত্তর আছে।

দুইটী মহাযুদ্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। অশন-বসনের অকথ্য অভাবে ক্লিষ্ট হইলাম। মুদ্রাস্ফীতির জন্য সমাজের ভার-সাম্য নষ্ট হইয়া গেল। অর্থের জন্য মানুষ পিশাচে পরিণত হইল। ব্যভিচার কালোবাজারে দেশ ছাইয়া গেল। বোমার আঘাতে দেব মন্দির, পান্থশালা, আরোগ্য-নিকেতন পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইল। অপরাধী নিরপরাধী নির্ব্বিচারে শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী বৃদ্ধা কেহ পরিত্রাণ পাইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উইলসনের চতুর্দ্দশ বিধান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টি হইল, কিন্তু জনসাধারণ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া রহিলাম। শান্তি অথবা সান্ত্বনা কোনটাই আমাদের লভ্য হইল না। সম্মুখ-সমর বরং ছিল ভাল, বর্ত্তমানের স্নায়ু-যুদ্ধের তাড়নায় সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকি—কখন কি হয়! কখন কি হয়?

সে কালের যুদ্ধ এত ঘৃণ্য ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, প্রজাদের তেমন দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, নারী, শরণাগত, রণ-বিমুখ—ইহারা অবধ্য ছিল। নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধ হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে সকলেই নিরাপদে থাকিত। তথাপি যুদ্ধের কুফল যাইবে কোথায়? বহু সহস্রাব্দের ইতিহাসে দেশে একজন অর্জ্জুনেরই আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বাকী সকলেই তো সাধারণ মানুষ। এই জনসাধারণই সমাজের ভিত্তি, দেশের সর্ব্বস্ব। ইহারা যাহাতে স্বধর্ম্মহীন না হয়, বিপথগামী না হয়, আপৎকালে বিহ্বল এবং কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হয়, তাহারই জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনায় শ্রীমৎভগবদ্ গীতা এবং অন্তে শ্রীমদ্ভাগবতের মহাবাণী উদ্গীত হইয়াছিল। গীতায় যাহা বলা হইয়াছে—, ভাগবতে তাহাই আদর্শে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। কেমন করিয়া ভগবৎ বাক্যকে নিজের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হয়—নিজের আচরণে রূপ দিতে হয়—ভাগবতে তাহার জীবন্ত উদাহরণ আছে। কেমন করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মফলবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে হয়, কেমন করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিশ্বের শরণ পুরুষোত্তমের শরণ গ্রহণ করিতে হয়—শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান কত আপনার, কত সুন্দর, কত মধুর কত কৃপালু, কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, ভাগবতই আমাদিগকে প্রথম সে কথা শুনাইয়াছেন, তাহাকে ভালবাসিবার রহস্য বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই ভক্তগণ ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার লাভে ধন্য হইয়াছেন।

আমি গীতা এবং ভাগবতের ধর্ম্মকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছি। ভাগবত-ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা হইল—শ্রীভগবানই একমাত্র সত্য বস্তু এবং তিনি নিত্য বিরাজমান। তিনি তোমার ভালবাসার কাঙ্গাল। তিনি তোমার অন্তরেই রহিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই তুমি তাঁহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে পার। অপরের কথা না শুনিয়া আমার কথাটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। কোন ভয়েই তুমি আর ভীত হইবে না। কোন দুঃখই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন আঘাত, কোন প্রলোভনই তোমাকে পতিত করিবে না। আনন্দ কাহাকে বলে জান না, অথচ আনন্দের লালসাতেই ঘুরিয়া মরিতেছ। সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের দর্শন লাভে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাইবে, পরমা শান্তি লাভ করিবে।

তীর্থ-পথে

নরেন্দ্র দেব

খুর্‌দা না-হ'তে পার—
ট্রেনে আমাদের উঠে এল যত
ছেলে বুড়ো ছড়িদার।
সাড়ে-সাত ভাই পাণ্ডার দল,
যাত্রী শিকারে করে কোলাহল,
একটি কিশোর বালক চপল
শুধাইল—তুমি কার ?
প্রশ্ন শুনিয়া উঠিনু শিহরি,
রোমাঞ্চ দেহে! কি বলি—কি করি ?
—কথা খুঁজে নাহি পাই।
আমি কার ? এতো ভাবিনি কখনো ;
কহিলাম তারে, কাছে এসো, শোনো—
নাম কি তোমার ভাই ?
সে বলে, তোমার পাণ্ডার নাম
জানো যদি, বলো তাই :
বলো বাড়ি কোথা, কি নাম পিতার ?
সময় যে বেশি নাই।

* * *

চমকি উঠিনু শুনি তার কথা।
কিশোর কণ্ঠে এ কোন বারতা ?
পুলকে বালকে কহিনু ডাকিয়া
সত্য বলেছো ভাই,
বৃথা ইহকাল কাটে ইহলোকে,
সময় তো আর নাই!
ভুলে গেছি আছে দাঁড়ায়ে মরণ
দিবা নিশি পিছে। করালে স্মরণ—
তুমি তো বালক নও!
মনে হয় তুমি মহাপ্রভুই,
শিশু-রূপে কথা কও!

* * *

দিব্য ছেলেটি, ভাষা তার খাসা,
গুণ্ডিচা-ঘরে তাহাদের বাসা ;—
হ'লো আরও কথা ঢের ;
নামটি 'কৃষ্ণ-বলরাম ঘুঁটে'
মোর পরিচয় জানি ল'য়ে খুঁটে
বলে,—তুমি আমাদের!
শিহরিয়া উঠিলাম!
আপনার যারা গৃহে ফেলে সবে
এসেছি চলিয়া, কবে দেখা হবে ?
হবে কি হবে না! কেবা তাহা কবে ?
ভাবনা এ অবিরাম।
চলেছি সুদূর বিভুঁই-বিদেশ—
অজানা, অচেনা সেথা পরিবেশ,
অপরিচিত সে ধাম।
পথমাঝে আসি এ কোন কিশোর—
হৃদয়ের তার ছুঁয়ে দিল মোর ?
স্নেহের বাঁধনে বাঁধিল যে জোর,
বলে—তুমি আমাদের!
প্রতিবাদ করি শুধালাম হেসে—
প্রমাণ কি বলো এর ?

* * *

খুলিয়া খেরুয়া-মোড়া মোটা খাতা
উলটি পালটি দু' হাজার পাতা
দেখালো আমারে উৎকল-শিশু,
দেড়শো বছর আগে—
বিগত সে কোন বিক্রমাব্দে
তারিখ পঁচিশে মাঘে,
আমার প্রপিতামহের জনক
সঙ্গে পত্নী—শ্রীমতী কনক,
এসেছিল মোর আপনার জন ;
—হরফে হেরি সে ছায়া!

খাগের কলমে বাংলা কালিতে
তুলোট কাগজে ছুপিয়া বালিতে
লিখিয়া গেছেন স্মরণ-ডালিতে—
এতটুকু বিবরণ !
পড়িতে পড়িতে অঙ্গে আমার
বেজে ওঠে শিহরণ !

*　　*　　*

সই করেছেন, নাম—বনমালী,
কালের প্রভাবে বিবর্ণ কালি ;
তবু সুন্দর !·· বড় সুন্দর
লিখনের সেই ছাঁদ
মনে হয়, হাসে খাতার পাতায়
বংশের যেন চাঁদ !
আমার পিতার হাতের লিখার
হুবহু কি এ নকল !
'এ' কার, 'উ' কার ঠিক মিলে যায়
দাঁড়িটিও অবিকল !
এ যে ভারি পরিচিত !
পরিচিত এর প্রতিটি আখর ;
উল্লাসে প্রাণ কাঁপে থর-থর,
না-দেখা জনেরা হ'ল ভাস্বর ;
অন্তর পুলকিত !
উছলিয়া ওঠে মন !
কণ্ঠ আমার স্নেহে গদ-গদ—
কহিনু,—কৃষ্ণধন !
তুমি হবে মোর জগন্নাথের
শ্রীক্ষেত্রে কাণ্ডারী ;
দেড়শো বছর আগে পরিচয়,
সে কথা যে আজও ভুলিবার নয়—
প্রমাণ দিলে গো তারই !

*　　*　　*

খাতা খুলে আছি চেয়ে !
মেটেনা পিপাসা, আশা অক্ষয় ;
ব্যস্ত ছেলেটি ঘোরে গাড়ীময়,
জনে জনে ধরি পুছে পরিচয়—
দমে না সে তাড়া খেয়ে !
কেহ দেয় গাল, কেহ ওঠে রেগে,
যাত্রীর পিছু তবু আছে লেগে,
কি পুরুষ, কি বা মেয়ে !
রূঢ় ভাষে যারা তাড়াইল তারে,
দুর্ভাগা তারা এই সংসারে ;
পূর্ব পুরুষে এনেছে সে দ্বারে—
ইহাতে নাহিক ভুল।
সেই আঙ্করি সাঙ্কর চিনে
দিল না শ্রদ্ধা-ফুল !

*　　*　　*

ডাকিয়া বালকে স্নেহে কহিলাম—
কে রেখেছে তব সুন্দর নাম ?
তুমিই কৃষ্ণ, তুমি বলরাম,—!
আমার প্রণাম নাও।
একাধারে দু'টি যুগ-অবতার !
পদরজ দোঁহে দাও।
কি জানি ছেলেটি মিনতি আমার
শুনেছিল কি না কানে ;
গাড়ি দিল ছাড়ি, যাত্রীকণ্ঠ
মুখরিল' স্তব গানে !
ছোঁয়ানু ললাটে দুটি জোড়হাত
কহিলাম—জয়, হে জগন্নাথ !
দেখা যেন পাই, আমি গো অনাথ—
আশ্রয় তব চাই ;
তোমার অধিক আপনার মোর
এ জীবনে কেহ নাই !

*　　*　　*

সেই প্রণতির কোনও এক ফাঁকে
ব্যস্ত বালক ঠেলে মোরে ডাকে,
বলে, দিদি ! দেখ বাঁয়ে—
ওই আকাশের পূর্ব-সীমানায়
মন্দির-চূড়া দূরে দেখা যায়,
তোমায় নে' যাবো রত্ন-বেদির
দর্শনে ধূলো-পায়ে !
চলন্ত-ট্রেন গেল যেন থামি !
গবাক্ষ হ'তে চেয়ে দেখি আমি—
নীলাচল-নভোমূল—
চক্রবালের দিগন্ত শেষে,
ত্রি-মূর্ত্তি ওই উঠিয়াছে ভেসে !
আঁখিতে কি এল ঢুল ?
মুছি দুই চোখ চেয়ে দেখি ফিরে—
নহে ত' দেখার ভুল !
আকাশের বুকে উজ্জ্বল ত্রয়ী
সূর্যের সমতুল !
দেউল-শিখরে শোভে আমলকী !
ত্রিলোকের গতি হোথা থাম্‌ল কি ?
অকূল সাগরে জীবন-তরণী—
হোথা কি লভিবে কূল ?

দৈন্য

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

দশবছর আগেকার তুলনায় আজকের সংসারে পরিবর্তন ঘটেছে। সংসারে তখন এত পারিপাট্য ছিল না। ঘরে কৌচ সোফা, ড্রেসিং টেবিল, মাথার 'পর ঘূর্ণায়মান পাখার তীর্যক গতি, দেওয়ালের গায়ে ডিস্‌টেম্পারের রঙ্, চক্‌চকে পালিশকরা মেঝে—তখনকার ঐশ্বর্যের মধ্যে এগুলির কোনটিই স্থান লাভ করে নি। এখন সমস্ত বাড়িখানি ভরে একটা প্রতিপত্তির চেহারা যেন ঝল্‌মল্ ক'রছে।

দশবছর আগে এ বাড়িটার রূপ ছিল অন্যরকম। বৃহৎ আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিবেষ্টিত সংসার বহুজনের কলকোলাহলে সবদাই ছিল মুখর। বিশেষ কোন একজনের প্রতিপত্তি তখন লক্ষ্য করা যেত না। একটি সুখী পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-ধারা একটানা গতিতে ছিল প্রবহমান। দৈন্যের লক্ষণ নেই; কিন্তু তা ব'লে আজকের মত সমৃদ্ধির জৌলুষও এত বেশি আত্মপ্রকাশ করে নি।

এ বাড়ির কর্তা এখন সমৃদ্ধিশালী—আজকের বাজারেও বেশ দু'হাতে রোজগার করেন। তা না ক'রলে সংসারটাকে এত ঝক্‌ঝকে রাখা যায় না—বাড়ির ফারনিচারের শোভাও বাড়ানো যায় না।

এই বাড়িতেই অনেকগুলি দিন আমার কেটে গেছে। সেদিনগুলির কথা ভাবছিলাম, আর ভাবছিলাম আজকের এই বাস্তব পরিবেশকে।

নির্জন ঘরখানিতে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম—গৃহস্বামিনী এখন ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা স্কুল যাবে, স্বামীরও অফিস যাবার সময় উপস্থিত হ'য়েছে—বাইরে সোফার মোটর নিয়ে অপেক্ষমান।

জাপানি ওয়াল-ক্লকটা একটা ছন্দের গুঞ্জনধ্বনি তুলে সময়ের গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। বাইরেও বিপুল গতির জোয়ার। আমার এখন অখণ্ড অবকাশ। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি—দীর্ঘদিন পরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

ঘরের পর্দা সরিয়ে জীবনদা প্রবেশ ক'রলেন। প্যান্ট কোটে পুরাদস্তুর সাহেব। মুখে হাভানা সিগার!

—কী হে, সমীর যে! হঠাৎ কী মনে ক'রে?

আসন থেকে উঠে জীবনদা'কে প্রণাম করলাম।

—ছ'দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। তাই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশুনা ক'রতে।

আমার কথা শুনে জীবনদা' অভিমত প্রকাশ ক'রলেন, তা বেশ! তুমি ব'সো—আমার আবার একটা জরুরি কাজ আছে; এক্ষুণি অফিস যাওয়া দরকার।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাভানার ধোঁওয়া ছড়াতে ছড়াতে জীবনদা চ'লে গেলেন।

নির্জন ঘরখানির মধ্যে আবার একলা আমি। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয় পরিবারের ফারনিচারগুলি ব'সে ব'সে দেখছিলাম। নাঃ, অভাবের কোন লক্ষণই নেই, বরঞ্চ উপচে পড়া আভিজাত্যই যেন সব দিক থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রছে।

বাড়ির কর্তার পর ছেলেমেয়েরাও স্কুলে গেল। তারা কেউই আমার পরিচিত নয়। দশবছর আগে তাদের জন্মগ্রহণ হয় নি। তারাও আমাকে চেনে না। তবুও ফ্রক্‌পরা একটি মেয়ে পিঠে বেণী ঝুলিয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'লো।

-ম্যামি ব'ললেন, আপনি একটু ব'সুন!

মেয়েটির কথায় হঠাৎ যেন ধাক্কা খাই—ম্যামি? ম্যামি কী? আমার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে—ম্যামি কাকে বলে জানেন না। ম্যামি মানে মা!

উচ্চারণটা আমি শুদ্ধ ক'রে জানিয়ে দিই। মেয়েটির তাতে কোন আগ্রহ নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

মেয়েটি উত্তর দিলে, ডাক নাম হ'চ্ছে রোজি—আর ভালো নাম শিপ্রা।

রোজির কথায় আনন্দপ্রকাশ করি—শিপ্রা নামটি বেশ। এ নাম তোমায় কে দিয়েছেন?

—আমার মামা। মামা আবার কবি কিনা তাই।

—আর রোজি?

আমার কথার প্রত্যুত্তরে রোজি বললে, আমার আন্টি। ছেলেবেলায় আমি রোজের মতন দেখতে ছিলাম কিনা তাই!

—রোজ?

—বা, তা বুঝি জানেন না। রোজ হ'চ্ছে গোলাপ ফুল।

রোজির কথায় আমি হেসে উঠলাম।

—যাই এইবার, এক্ষুণি স্কুলের গাড়ি এসে প'ড়বে।

—কোন স্কুলে পড়ো?

আমার কথার উত্তরে রোজি ব'ললে, সেণ্ট লরেটো!

—কোন ক্লাশ?

রোজি ব'ললে, ক্লাশ ফোর!

রোজি চ'লে গেলে ভাবছিলাম এই পরিবারটির কথা। দশবছর আগে এ পরিবারে এদিন ছিল না।

আজকের সমৃদ্ধির মাঝখান থেকে হঠাৎ যেন একটা কুশ্রী দৈন্যের সুস্পষ্ট চেহারা দেখতে পাই ঘরের আনাচে-কানাচে দশবছর আগে যার কোন আভাসই ছিল না।

পিসিমা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন, দিনরাতই পূজা-অর্চনা আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন ইদানিং। ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন এখনও হয়ত লক্ষ্য করেন নি। তা না করুন! দীর্ঘদিন পরে এ বাড়িতে এলেও তাঁর জন্যে আগ্রহ আমার ততখানি নয়। এ বাড়িতে বিশেষ ক'রে এসেছি রাঙা বৌদিকে স্মরণ ক'রেই। রাঙা বৌদি যখন প্রথম এ বাড়ির বধূ হ'য়ে আসেন তখন খাতিরটা জ'মেছিল তাঁর আমার সঙ্গেই বেশি ক'রে। তাঁর মিষ্টি স্বভাব, সুশ্রী চেহারা, আর বর্ণ-ঔজ্জ্বল্যই সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিল—বিশেষ ক'রে আমাকে। আমি তাঁর নামকরণ ক'রেছিলাম—রাঙা বৌদি!

মিষ্টি হেসে নববধূ তাতে সায় দিয়েছিলেন; আর ব'লেছিলেন, বিয়ের আগে যখন শুনেছিলাম তোমার দাদা বাপ-মায়ের এক ছেলে তখন বড্ড দুঃখ পেয়েছিলাম।

—কেন? পিসিমার মেয়েও তো আছে!

আমার কথায় রাঙা বৌদি ব'লেছিলেন, ননদের চেয়ে দেওরই বেশি আপন হয়—তা বুঝি জানো না?

রাঙা-বৌদির কথায় নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমারও অপর কোন বৌদি না থাকায় মস্ত একটা অভাব ছিল।

রাঙা-বৌদি খুসি মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রেছিলেন, তোমাকে পেয়ে তাই দুঃখ আমার মিটলো। তুমি আমার মিষ্টি ঠাকুরপো!

—সত্যি বলছো তো?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে।

রাঙাবৌদির কথায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর বিয়ের পরও কিছুদিন আমি তাঁদের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করেছিলাম, তখন তাঁর সদয় ব্যবহারকে আজও আমি ভুলতে পারি নি।

পিসেমশাই ছিলেন, সাবেক কালের মনোভাবাপন্ন মানুষ। আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে থাকতে ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে বিলাতি মাটির অফিসের বড়বাবু, মনটা ছিল তাঁর দরাজ। অভাবের তাপ কখনও সহ্য করেন নি। আর পিসিমা হচ্ছেন ধর্ম-বাতিকগ্রস্ত নিতান্ত সাধাসিধে স্ত্রীলোক, অন্তরভরা তাঁর সদয়-দাক্ষিণ্য এবং স্বজন-প্রীতি। স্বামী-স্ত্রীতে তাই সংসার-জীবনযাত্রায় অকৃপণ ছিলেন। ভাঁড়ারের চাবি ছিল খোলা, হৃদয়ে ছিল উদারতা। নিকট থেকে দূরের জন পর্যন্ত কেউই পর নয় তাঁদের। তাই সব সময়েই লোক-জনে ভরা ছিল তাঁদের সংসার। বহু পোষ্য প্রতিপালিত হ'ত তাঁদের কল্যাণে। আমাদের অবস্থা তখন বিশেষ ভালো নয়। বাবা দেশে জমিদার সেরেস্তায় কাজ ক'রতেন। স্বল্প আয়ে কোন রকমে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হ'ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে পিসিমার বাড়িতে বছর চারেক থেকে আমি পড়াশুনা ক'রেছিলাম। দৈন্যের সংসার থেকে স্বচ্ছলতার মধ্যে এসে মন বেশ প্রসারিত হ'য়েছিল—বিশেষ ক'রে রাঙাবৌদির সস্নেহ ব্যবহার অন্তরকে পরিপ্লাবিত করে রেখেছিল। বি-এ পাশ ক'রে বাঙলার বাইরে চাকরি পাওয়ায় রাঙাবৌদির চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছিল,

আমাদের ছেড়ে থাকবে কেমন ক'রে ভাই ঠাকুরপো! তাঁর পরিহাসের সুরটা আজও কানে বাজে, রাঙা বৌ পেয়ে কিন্তু রাঙাবৌদিকে ভুলো না যেন!

অনেকক্ষণ পরে এলেন রাঙাবৌদি।

দশ বছর পরে এ বাড়ির চেহারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌদিরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে গড়নের বধূর সর্বাঙ্গেই এখন স্থূল মাংসের ভার। সংসারের কর্ত্রীত্বের মাঝে ভারিক্কী চাল-চলন। আমাকে আহ্বান অবশ্যই জানালেন, এসো ঠাকুরপো! বাড়ির খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ। রাঙাবৌদির কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

—তারপর, কলকাতায় কবে আসা হ'ল?

—আজ এসেছি, এইমাত্র!

আমার কথা শুনে হয়ত তত খুসি হ'লেন না তিনি। কেন না, চোখে মুখে তাঁর কোন স্বজন-প্রীতির উল্লাসের চিহ্ন দেখা গেল না।

পুরাতন দিনের মধুর সম্পর্কের জের টেনে বলি, মিষ্টি ঠাকুরপোকে মনে আছে তো?

—মিষ্টি ঠাকুরপো! সে আবার কে?

রাঙাবৌদির কথায় আহত হ'য়ে বলি, ছিল একজন। দশ বছর আগে, এই বাড়িতেই।

রাঙাবৌদি সহজভাবে ব'ললেন, ও তাই বল। তা, তাকে আবার মনে থাকবে না কেন? এই তো চোখের সামনেই জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ভারী মাংসল চেহারার মধ্যেও সূক্ষ্ম রসানুভূতি একেবারে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যায় নি তা'হলে! রাঙাবৌদির কথায় আশ্বস্ত হই।

—এত মোটা হলে কেমন ক'রে এই দুর্দিনের বাজারে?

আমার কথায় যেন মনের সুর ধরা প'ড়েছে। রাঙা-বৌদি আফ্‌শোস ক'রে বললেন, দুর্দিনের কথা আর ব'লো না ভাই। যা দিনকাল প'ড়েছে, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

—তোমাদের আবার দুর্দিন কিসের? দাদা তো ভালো মাইনেই পান।

—কিন্তু পুষ্যি তো কম নয়। একলার রোজগারে কত আর চলে বলো?

রাঙাবৌদির কথায় বিস্মিত হ'লাম—তোমার আবার পুষ্যি কোথায়? দু'টি ছেলে আর তিনটে মেয়ে—তোমরা দুই কর্তা গিন্নী আর পিসিমা।

রাঙাবৌদি বললেন, তা হ'লে আর ভাবনা কী ছিল! তোমার পিসেমশাই তো দাতাকর্ণ ছিলেন। যা রোজগার ক'রেছেন দু'হাতে দান-খয়রাত ক'রে গেছেন। ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনীদের কথা ছেড়ে দাও—নিজের স্ত্রীর জন্যে পর্যন্ত কোন সঞ্চয় করে যান নি। না একটা ইন্‌সিওর, না কিছু নগদ টাকা। তার ওপোর বড়দির সমস্ত সংসারটা পর্যন্ত এখন আমাদের ঘাড়ে—তোমার দাদা তো ভেবে ভেবেই আধখানা হয়ে গেছেন।

রাঙাবৌদির কথাগুলি বজ্রাহতের ন্যায় শুনি। বড়দি অর্থাৎ পিসেমশাইয়ের একমাত্র আদরের কন্যার কয়েক বছর পূর্বে স্বামী বিয়োগ ঘ'টেছে—সে খবর অবশ্য আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সপরিবারে তিনি রাঙা-বৌদির স্বামীর অন্নদাসী হ'য়েছেন এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা আমি শুনি নি।

রাঙাবৌদি সবিস্তারে ব'লে চ'ললেন—এই দুর্দিনের বাজারে বড়দির সংসার চালাতে কত ক্ষতিগ্রস্তই না হ'চ্ছেন তিনি।

কথার মাঝে পিসিমা এসে হাজির হ'লেন। তাঁর সেই সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি আর নেই, বিষাদের কালিমা সর্বাঙ্গে। আর কথাও বলেন অত্যন্ত কম।

তাঁকে প্রণাম ক'রতে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। সাংসারিক কুশলাদির প্রশ্ন করে তিনি তাঁর ঠাকুর সেবা নিয়েই ব্যস্ত হ'তে চ'ললেন। খাবার সময় আমাকে বললেন, যে কদিন কলকাতায় থাকো, এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করো।

পিসিমার কথায় আমি বললাম, বেশিদিন কেন একদিনও থাকবার উপায় নেই—অফিসের খুব একটা জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি। আজকের রাত্রের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।

পিসিমা আর কিছু মন্তব্য প্রকাশ করলেন না—নীরবে তিনি ঘর ছেড়ে আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাঙাবৌদি টিপ্পনি কাটলেন, রাতদিন শুধু ঠাকুর আর ঠাকুর। সংসারের কোনদিকই আর দেখেন শোনেন না।

রাঙাবৌদির এ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে রহস্য ক'রে বলি, এতদিন দেখে এসেছেন তো। এখন যোগ্যকর্ত্রীর হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন।

স্থূল দেহে মানসিক বৃত্তিও স্থূল হয়ে এসেছে রাঙাবৌদির। আমার এ শ্লেষের তাৎপর্য তাই তিনি অনুভব ক'রতে পারেন না। কখনও আত্ম-প্রশংসায় স্ফীত হ'য়েই বলেন, আমি ভাই একলা মানুষ, কতদিক আর সাম্‌লাই বলো ?

—তুমি একাই একশো ; তা না হ'লে কী আর পিসিমা এমন নির্লিপ্ত আর উদাসীন হ'তে পারেন ?

—এই দেখো না ভাই, কথায় কথায় মত্ত থেকে তোমার খাবারের ব্যবস্থাই করা হয়ে ওঠে নি এখনও। তুমি একটু বসো, আগে একটু চা আর জলখাবার এনে দিই। মায়ের তো এগুলোও দেখাশোনা করা উচিত। তুমি তাঁর আপন ভাইয়ের ছেলে—কতদিন বাদে এলে !

রাঙাবৌদি প্রস্থান করতে উদ্যত হ'লে আমি বাধা দিই, এখন আর কিচ্ছু খেতে পারবো না বৌদি। সত্যি বলছি এইমাত্র খেয়ে আসছি।

আমার কথায় কান দিলেন না রাঙাবৌদি। খুসি মনে তিনি আমার আহারের তদ্বিরে প্রস্থান ক'রলেন।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো জ্বলজ্বলে ছবি। জাজ্বল্যমান সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী পিসিমা ; কিন্তু কোথাও তাঁর জন্যে এতটুকুও ব্যক্তিত্বের গরীমা কিংবা গর্বের অভিপ্রকাশ নেই।

দু'হাতে রোজগার করেন পিসেমশাই—তখনকার দিনের মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু ! কিন্তু কতটুকু সঞ্চয় হয় তা থেকে নিজস্ব বিলাস কিংবা ব্যসনে ! স্বার্থবুদ্ধি এতটুকুও মাথা চাড়া দেবার অবকাশ পায় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। কোন দুঃস্থ পরিবার কন্যাদায়গ্রস্ত—পিসেমশাই-এর সঙ্গে পিসিমার তার জন্যে নিভৃত আলোচনা। ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারে না। পয়সা অভাবে কার ছেলে প'ড়তে পারছে না—সে চিন্তা পিসেমশাই, পিসিমাই ক'রে থাকেন।

তাঁদেরই পুত্র এবং পুত্রবধূ কেমন ক'রে এমন অমানুষ হয় ? বিধবা পিসিমাকে আজ তাই ঠাকুরঘরেই সংসার-নির্লিপ্ত হ'য়ে আত্মনিমগ্ন থাকতে হয়। ইহকাল অপেক্ষা পরকালেরই চিন্তা ক'রতে হয়। আর তাঁর বিধবা কন্যাকে শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয় এই হৃদয়হীন অমানুষদের দরবারে।

—এটুকু খেয়ে ফেল ঠাকুরপো ! রাঙা বৌদির কথায় চমক ভাঙে। একটি রেকাবীতে দুটি মিষ্টান্ন, আর এক গ্লাস জল।

সে দিনকাল তো আর নেই ভাই। কত সাধ জাগে তোমাদের সকলকে নিয়ে আদর যত্ন করি। এ বাড়ীতে কত ধুমধাম লোকজন—সর্বদাই ছিল উৎসব আর আনন্দ।

রাঙা বৌদির একথায় আগ্রহের সুরে প্রশ্ন করি, সে সব দিনের কথা তোমার মনে আছে বৌদি ?

—তা আর থাকবে না ? এই তো মাত্র বছর কয়েক আগের কথা। তখন দিনকালই ছিল অন্য রকম। সস্তা-গণ্ডার বাজার—এক হাতে ভর্তি ক'রে এনে আর এক হাতে ব্যয় করতে লোকের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতো না। আজকের মতন দুর্দিন তো তখন আর আসে নি। রাঙা বৌদি চ'লে গেলেন চা আনতে।

সুসজ্জিত ঘরখানির মধ্যে হঠাৎ যেন দুর্দিনের কালো মেঘের ঘন সঞ্চার দেখতে পাই—এখনি হয়ত ঝড় উঠবে।

সবার অলক্ষ্যে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে সদর রাস্তায়। রাঙা বৌদির মন এতক্ষণে হয়ত মিষ্টি দু'টির অপচয়ের বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।

তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির

নির্মল দত্ত

তাঞ্জোর নামের সাথে ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ যে কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা বোঝা যায় তাঞ্জোরের মন্দির দেখ্‌তে গেলে। মাদ্রাজ সহর থেকে ২১৮ মাইল ট্রেণে দক্ষিণ দিকে নেমে গেলে তাঞ্জোরে পৌঁছানো যাবে। তাঞ্জোরের মন্দির দুর্গের মত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং বাইরের দিকে নীচেই প্রাচীরের ধারে ধারে একটা গড় বা পরিখা তাকে চক্রাকারে ঘিরে আছে। দেখ্‌লে মনে হয়, মন্দিরকে বিধর্মীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যেই হয়ত এমনি দুর্গাকারে নির্মাণ করতে হয়েছিল। অবশ্য তাঞ্জোর সহরটা ভাল ক'রে ঘুরলে এই কথাই মনে হয় যে, পূর্বে সমস্ত সহরটাই প্রায় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে। দুর্গ ভেঙ্গে তারই ওপর গ'ড়ে উঠেছে জনপদ। তবে মন্দির আর প্রাসাদের কয়েক অংশ এখনও বিদ্যমান। স্থাপত্য আর ভাস্কর্যে মন্দিরটী অপূর্ব।

পাথরের তৈরী এই মন্দিরের কারুকার্য দেখে বিস্ময় জাগে। মন্দির গাত্রে বিভিন্ন মূর্তির গায়ে খোদাই দেখ্‌লে প্রাচীন শিল্পী ও তার শিল্পচাতুর্যের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ভারতের সর্বপ্রথম পাথরের তৈরী সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়েছিল কাঞ্চিপুরক-এ—পল্লব রাজাগণ কর্তৃক ব'লে ধরা হয়। তাঞ্জোরের মন্দির ঠিক এই মন্দিরের পরেই। প্রধান মন্দিরের চারিপার্শে আরও কয়েকটা মন্দির আছে। তার মধ্যে সুব্রাহ্মণ্য মন্দির, আম্মন মন্দির, কারুভুরর মন্দির, আরুমুগম্ মন্দির প্রভৃতি প্রধান। এমন কি, বিরাটাকার নন্দী অর্থাৎ বলদও দ্রষ্টব্য পাথরের তৈরী এই নন্দীর ওজন প্রায় ২৫ টন, উচ্চতায় ১২ ফিট, দৈর্ঘে ১৯½ ফিট ও প্রস্থে ৮¼ ফিট। মন্দিরগুলি পাথরের তৈরী এবং পাথর কুঁদে মন্দির গাত্রে যে সকল মূর্তি ও কারুকার্যাদি করা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। মন্দির গাত্রের নিম্নভাগ বরাবর

বৃহদীশ্বর মন্দির

বৃহদীশ্বর মন্দিরের প্রথম প্রবেশ পথ
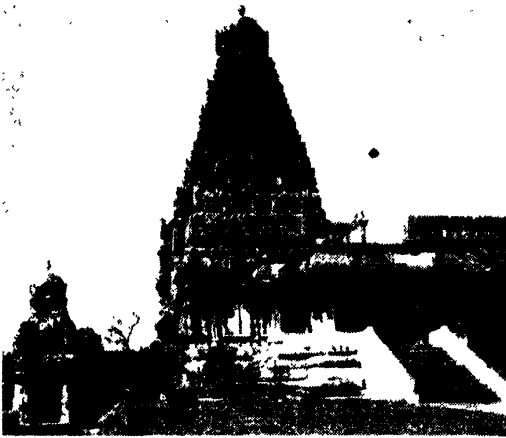
অনেকদিন পূর্বের তৈরী এই মন্দির—প্রাচীন দিনের সেই কথা ভাব্‌তে গেলে ফিরে যেতে হয় অনেকদিন আগের এককালে। চোল রাজত্বের আমলে। সূর্যকূলের বংশধর রাজা সুন্দর চোলের পুত্র প্রথম রাজারাজ চোল এই মন্দির নির্মাণ করেন। সে প্রায় সাড়ে ন'শো বছর আগের কথা। রাজারাজ চোল শিবভক্ত ছিলেন। মন্দির নির্মাণ হ'ল ১০০৩ খৃষ্টাব্দে এবং শেষ যখন হ'ল তখন ১০০৯ খৃষ্টাব্দ। তারপর চোলরাজত্বের অবসান হ'য়ে নায়েক রাজত্ব হয়েছে এবং তারপর মারাঠারা এসেছে ও মারাঠার পর পরাধীন জাতির ওপর শোষণের জয়পতাকা নিয়ে বৃটিশ তার শাসন চালিয়েছে। কিন্তু তারও একদিন অবসান হ'য়ে স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে। বিভিন্ন রাজত্বের এই উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ার মাঝখান দিয়ে তাঞ্জোরের মন্দির আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

মারাঠা ভাষায় শিলালিপি লিখিত আছে। এই শিলালিপি মারাঠারাজ শারকজীর রাজত্বকালেই লিখিত হয়েছে ব'লে জানা যায়। এই শিলালিপিতে মারাঠী রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই লেখাগুলি একত্রিত ক'রে ছাপিয়ে বইয়ের আকারের ১১০ পাতা হয়েছে এবং তামিল ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদও করা হয়েছে। মন্দিরটী সরকারী প্রাচীন মনুমেন্ট আইনানুযায়ী (Archaeological Department) সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ সমিতি (Hindu Religious Endowments Board) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

মন্দিরের প্রবেশ পথেই চোখে পড়বে প্রস্তরনির্মিত একটী ফটক—যা একদিকে বিনায়ক ও অন্যদিকে কার্তিকেয় মূর্তি আছে। এর পরে আ

একটী ফটক আছে যা কারুকার্যে প্রথমটার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ছু'টো প্রবেশ-পথই এক একটা মন্দিরের আকারের বললেই চলে। আর দ্বিতীয়টী কারুকার্যে প্রথম প্রবেশ পথের চেয়েও উন্নততর। দ্বিতীয় ফটকই মন্দিরে প্রবেশের দরজা ও এইখানে রক্ষীও আছে। এর পূর্ব ও দক্ষিণে উঠানের দিকে এক পার্শ্বে যজ্ঞশালা, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর ও খাবার ঘর প্রভৃতি ছিল দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রবেশ-পথের পরেই বিরাটাকার সেই নন্দী—একটী সম্পূর্ণ পাথর থেকে কেটে তৈরী। তারই পাশ দিয়ে একটু বেঁকে গেলেই ও পাশে প্রধান মন্দিরে ওঠা যাবে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠ্‌তে প্রথমেই চোখে পড়্‌বে দরজার ছু'পাশে মন্দির গাত্রে দ্বারপালের মূর্তি। স্থানীয় রক্ষকের নিকট থেকে জানা যায় যে মন্দিরের আয়তন—৭৯২ ফিট দৈর্ঘে ও ৪০০ ফিট প্রস্থে এবং রাজারাজ চোলের ১৯ থেকে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে নির্মিত।

দ্বিতীয় ফটকের গাত্রে পাথরের তৈরি একটি দ্বারপাল

মন্দিরের উচ্চতার দিকে তাকালে ইচ্ছে হবে জান্‌তে কত ফিট এর উচ্চতা। খোঁজ নিলে জানা যাবে ২১৬ ফিট অর্থাৎ বাড়ী তৈরী হিসাবে ১৪ তলা। প্রাচীর—বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে যে কোনও দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, সব দিক থেকেই এমন কি, অনেক দূর থেকেও মন্দিরকে দেখা যাবে। মন্দিরের মেঝে ৯৬ বর্গ ফিট। এ ছাড়া মন্দিরের শীর্ষদেশের স্বর্ণাগ্রভাগ যার ওপর অবস্থিত সেটা ৮০ টন ওজনের একটা স্ফটিক পাথর এবং এই পাথরটা তাঞ্জোরের চার মাইল উত্তরের একটী গ্রাম—'সারাপল্লম্' থেকে আনা হয়েছিল ব'লে জানা যায়। পাথরটী "আলাগী" নামে একজন বৃদ্ধা মহিলার ছিল এবং পাথরের বদলে রাজার কাছ থেকে তিনি 'আলাগী পুকুর' ও 'আলাগী বাগান' লাভ করে। এই পাথরের ওপর ১২½ ফিট উচ্চের একটী তাম্রকলস আছে। এর চারদিকে যে নন্দী আছে তা নীচের নন্দীর চেয়ে ছোট।

মন্দির গাত্রের দক্ষিণ দিকে বিনায়ক মহাবিষ্ণু, ভিক্ষাতন, শূলদেব, দক্ষিণমূর্তি, মার্কণ্ডেয়, নটরাজ প্রভৃতির মূর্তি,—পশ্চিমদিকে অর্ধনারীশ্বর, উত্তরদিকে গঙ্গাধর, কল্যাণসুন্দর, মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি মূর্তি এবং এর একটু উঁচুতে চারটী মনুষ্য মূর্তি আছে। এই চারটী মনুষ্য মূর্তির মধ্যে একজন ইউরোপীয়ানের ন্যায় মূর্তিও আছে। মনে হয়, মন্দির নির্মাণের পরবর্তী যুগে হয়ত এই মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। অনেকে চোল রাজত্বের পরে নায়কদের রাজত্বকালে নির্মিত ব'লে অনুমান করেন। কেউ কেউ একে মার্কোপোলোর মূর্তিও ব'লে থাকেন।

মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গ হচ্ছে প্রধান দেবতা। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা প্রধানতঃ শৈবধর্মাবলম্বী। প্রায় সব মন্দিরেই তাই শিবলিঙ্গ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক মন্দিরে অবশ্য বিষ্ণুমূর্তিও দেখা যায়।

তাঞ্জোরের এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে তার গৌরীপটের পরিধি ৫৪ ফিট ও উচ্চতা ৬ ফিট এবং লিঙ্গ ৯ ফিট উচ্চ ও পরিধি ২৩½ ফিট। শিবলিঙ্গের একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে চন্দ্র এবং দরজার কাছাকাছি আছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই শিবলিঙ্গ বা শঙ্কর মূর্তিকে আরও বহু নামে অভিহিত করা হয়। এর একটী নাম 'রাজরাজেশ্বরম্'—এ ছাড়াও একটী নাম 'দক্ষিণমেরুভীতঙ্কম্'। এখন অবশ্য শঙ্কর বা মহাদেবকে বৃহদীশ্বর ও পার্বতীকে বৃহন্নায়কী নামে অভিহিত করা হয় এবং মন্দির 'বৃহদীশ্বর' মন্দির নামেই পরিচিত।
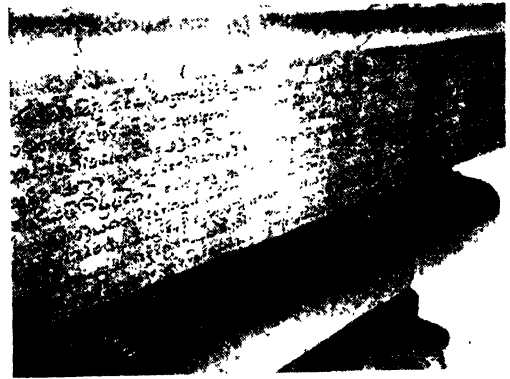
মন্দির গাত্রে মারাঠা ভাষায় লিখিত মারাঠা ইতিহাসের কিয়দংশ

তাঞ্জোরের এই বৃহদীশ্বর মন্দির নির্মিত হওয়ার পূর্বে চোল রাজাগণ 'থিয়াগরাজ' নামে দেবতাকে পূজা করতেন এবং এজন্য প্রতিদিন 'থিরুভারুর' নামক স্থানে যেতে হ'ত। তারপর প্রথম রাজারাজচোল নিজেই এই মন্দির নির্মাণ ক'রে দিলেন। এর মধ্যে অবশ্য তাঁর ছু'টো উদ্দেশ্য ছিল—একটা দেবতার প্রতি ভক্তি এবং অন্যটী পূর্বপুরুষ মুশুকুন্দনের বীরত্বের স্মৃতি-রক্ষা। এ ছু'টীর নিদর্শন রক্ষা স্বরূপ নির্মিত হ'ল এই মন্দির। তারপর মন্দিরে থিয়াগরাজের মহিমা হ'ল কৌ।

প্রধান মন্দিরে বৃহদীশ্বর অর্থাৎ শিবলিঙ্গ ব্যতীতও মন্দির প্রাকারের ভেতর বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় আরও ১০৮টী শিবলিঙ্গ আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর বৃটিশশাসনে আসবার পূর্বে চোল, নায়েক ও মারাঠা রাজাগণ যখন এখানে রাজত্ব করেছিলেন, তখন প্রত্যেকের আমলেই মন্দিরের কিছু না কিছু সংস্কার বা পরিবর্তন হয়েছে। মন্দিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় যে, যে রাজত্ব যখনই আসুক না কেন, তাঞ্জোরের মন্দিরকে কোন রাজাই অবহেলার চোখে দেখেন নি। অবশ্য শ্রীকরুভুরর-বেদী মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বে এক ভক্ত কর্তৃক নির্মিত করা হয়েছে। শ্রীকরুভুরর ব্রাহ্মণ হ'য়েও কামারের কাজ করতেন এবং বিরাটাকার একটী মূললিঙ্গ তৈরী ক'রে যেখানে কঠোর তপস্যায় বসেছিলেন সেখানেই এই বেদীটা নির্মিত হয়েছে। প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গণপতির যে মূর্তি আছে তা দ্বিতীয় শারফজী কর্তৃক নির্মিত (ঊনবিংশ শতাব্দী)। নায়েক রাজাগণও মন্দিরের অনেক অংশ নূতন নির্মাণ বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধিত করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আম্মন' মন্দিরে। স্বামী 'অরুমুগম' মন্দির ছোট হ'লেও এর কারুকার্য উপেক্ষণীয় নয়। এমন কি, মন্দিরে দেবতার মূর্তিও অতি সুন্দর। পঞ্চধাতুর নির্মিত নটরাজের যে মূর্তি আছে তা ধর্মাকাঙ্ক্ষীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রাচীনকালে মন্দিরে বিশেষ বিশেষ উৎসব হ'ত এবং এই উৎসবের সময় নৃত্যপটীয়সীদের নাচও হত।

প্রধান মন্দিরের ভিতর সকল সময় এমন একটী আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে যে, দর্শনাকাঙ্ক্ষীর মনে পবিত্র ভাব ও ভক্তির উদ্রেক করে। ন'শো বছরের অধিককাল পূর্বেও যে মন্দির একদিন ভারতবাসীর কাছে পুণ্য ও পবিত্র স্থানরূপে পরিচিতি পেয়েছিল, আজ সেদিনের সেই সমারোহ নেই---নেই কোন নব নব প্রেরণার আয়োজন। কিন্তু আজও সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীর সমাগমে সে স্থানের সকল মহিমা সার্থক হ'য়ে আছে।

শিশুমনোবিদ্যা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

প্রবাদ আছে "শিশু মানবের পিতা", কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিশুদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রতিপালন করা হয়না ; উপরন্তু তাহাদের মনোবিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়না। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ, দেশবাসীর অজ্ঞতা, অবজ্ঞা ও অসহযোগিতা। শুধু ইহাই নহে- কেহ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তাহাকে নানা বিদ্রূপবাক্য সহ্য করিয়া, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। শুনিয়াছি---"মহাশয় আমি তিন ছেলের বাবা, হরিবাবুর দুই ছেলে আছে ; আমরা কিছু জানিনা শিশু পালন সম্বন্ধে ! আর আপনি কোন সন্তানের পিতা না হয়েই শিশু মনোবিদ্যা সম্বন্ধে বলছেন, আশ্চর্য্য।"

আবার কেহ বলিয়াছেন—"কি করলে আমার সন্তানের ভাল হবে সেটা আমি ভাল বুঝি ; আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। কথাসকল অমূলক। সবাই যদি শিশু পালনে অভিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে দেশের (শিশুদের) এতখানি অধঃপতন হইত না। আমার মন্তব্য শুনিয়া অনেকে রুষ্ট হইবেন, হয়'ত অভিশাপ দিবেন। কিন্তু কি করিব, আমি যেটুকু শিখিয়াছি, তাহা হইতে জানি যে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক যুবকের ও প্রত্যেক শিশুর হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন ও আচারব্যবহারের জন্য দায়ী তাহার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনবৃন্দ। বিশ্বাস করি---কোন পিতামাতাই চাহেন না যে তাঁহার সন্তান খারাপ হয় ;---প্রত্যেকেই আশা করেন, কৃতী সন্তানের "জনক-জননী" হইতে। কিন্তু লালন-পালনের অনভিজ্ঞতার জন্য, তাঁহারা নিজের সন্তানকে সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীকে নিম্নস্তরে নিয়া যাইতেছেন। এই ধ্বংসের গ্রাস হইতে বাঁচাইতে পারে কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই।

ম্যালেরিয়া বা কোন রোগের নিবারণ কল্পে যখন কোন সমিতি (কমিটি) গঠিত হয়, তখন সেই রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের লইয়াই সমিতি গঠিত হয়, অনভিজ্ঞ রোগাক্রান্ত রোগীদের নিয়া নহে। অথবা রোগ নিবারণের উপদেশ ডাক্তারদের নিকটই লয়েন—রোগীদের নিকট নহে। সেইরূপ আপনারা বহু সন্তানের পিতামাতা হইতে পারেন, কিন্তু শিশু পালনে অভিজ্ঞ নাও হইতে পারেন, এমনকি শিশুর মনোবিকাশ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা নাই এমনও হইতে পারে। ইহার জন্য বলিতেছি—লজ্জা দূর করিয়া দেশকে বড় করিতে সচেষ্ট হন, সহযোগিতা করুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেককে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, শিশুদের উন্নতি করিতে গিয়া ; তথাপি, কেন শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে লিখিতেছি ? প্রশ্ন হইতে পারে। উত্তরে বলিব—প্রথমতঃ দেশকে বড় করিতে হইলে, পৃথিবীর সম্মুখে দেশকে ধরিতে হইলে, আমাদের সকলের প্রধান কর্ত্তব্য ভাবী ভারতবাসীদের উন্নতি করা। আমার মনে হইয়াছে—দেশবাসী এখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, কোন বিষয়ই তাহারা হাল্কাভাবে গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু কোন মতামত দিবার পূর্ব্বে তাহারা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ "শিশু মনোবিদ্যা"র উপর বিদেশী ভাষায় বহু পুস্তকও রহিয়াছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহার অভাব, যদি আমার অল্প বিদ্যার সাহায্যে এই অভাব কিছুটা পূরণ করিতে পারি, এই বিশ্বাস নিয়া সাহস করিয়া লিখিতে বসিয়াছি।

কোঠাবাড়ী তৈয়ারীর প্রারম্ভে ভিত পোতা হয়। ভিত প্রস্তুতে

কালে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়, কারণ বাড়ীর সৌন্দর্য্য, আর ভিতের গাঁথুনির উপরই নির্ভর করে। সেইরূপ জাতির ভিত হইতেছে "শিশু", এই কারণে তাহাদের প্রতিপালনের সময়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকের ধারণা, শিশুদের পালন করা সোজা, বয়স্কদের বেলায় কঠিন। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অসত্য। বাড়ীর ভিত তৈয়ারীর সময়ই অতি পরিশ্রম করিতে হয়, আর—একটির উপর একটি ইট বসাইয়া দিলেই বাড়ী তৈয়ারী হয়। ভিত প্রস্তুতের মত, মাটি কাটিতে কিম্বা দুরমুশ পিটিতে হয় না। সেইরূপ শিশুদের পালন করা কঠিন, বয়স্কদের উপদেশ দেওয়া সোজা। মনে রাখা কর্ত্তব্য, শিশু বয়সের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিই সারা জীবনে প্রতিফলিত হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত মানসিক আবেগের দমন ও প্রকাশের পদ্ধতি কেবল পরিবর্ত্তিত হয় শিক্ষানুপাতে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া পৃথিবীতে আসে। সংজাত সকল প্রবৃত্তি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই বিকশিত হয় না। নাড়িকেন্দ্র, নাড়িসংযোগ, পেশী ও ইন্দ্রিয় গণের পরিপুষ্টির উপর সংজাত প্রবৃত্তির বিকাশ নির্ভর করে। পরিপুষ্টি স্বাভাবিক হইলে বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর বিভিন্ন প্রবৃত্তি ক্রমে পূর্ণ বিকশিত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে সংজাত প্রবৃত্তি তাহারই নাম—যে প্রবৃত্তি জন্মগত। শিশুদের বিষয়ে জানিবার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যধিক। সেই কারণে নানা বিচিত্র প্রশ্ন আমরা নিজেদের করিয়া থাকি। কখন ভাবি কত বয়স পর্য্যন্ত শিশু বলা হয়? আবার কখন মনে হয়—কি কি প্রবৃত্তি নিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে? কু প্রবৃত্তি কি উপায়ে সংযত করা সম্ভব? সদভ্যাস কি উপায়ে গঠিত হয়? কি প্রকারে স্মৃতি-শক্তি (শিশুর) বৃদ্ধি করা যায়? কখন হইতে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত?—প্রভৃতি নানা প্রশ্ন মনে আসে। একে একে সকল প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রকারেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সমস্তই ভুল নহে: আবার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলিয়াছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে। আমার এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ আপনারা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া বাহির করিতে পারেন। অযথা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহিনা। এই উক্তির উদ্দেশ্য যে কথা আমরা বর্ত্তমান মনোবিদদের নিকট শুনি, যথা—জন্মের দিন হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত শিশু, তাহার পরই প্রাপ্তবয়স্ক। সেই কথা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চাণক্য শ্লোকে আছে, "প্রাপ্তেন্তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবৎ আচরেৎ"। এমনি ধারা নানা উদাহরণ নিয়া দেখিতে পারেন যে বহু জিনিষ, বহু পূর্ব্বে মনীষীরা বলিয়া গিয়াছেন। তবে তাহারা ব্যাখ্যা বা কারণ দিয়া যান নাই, অথবা তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সমস্ত বিষয়েরই বিষদভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের সামনে ধরিতেছেন, তাই সেই সকল নূতন বলিয়া ভ্রম হইতেছে। পুরাতন—"সব কুসংস্কার" বলিয়া উড়াইয়া দিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষোলবৎসর পর্য্যন্ত শিশু বলা হয়। বর্ত্তমানে শিশুর মনোবিকাশ প্রভৃতি নিয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ভালভাবে শিশু পালন করিতে হইলে মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, এমনকি শিক্ষাগুরুকেও নানা বিধিনিষেধ পালন করিতে হইবে। সংযমী হইতে হইবে এবং নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ অনুকরণ প্রবৃত্তি শিশুদের প্রধান প্রবৃত্তির অন্যতম। আমরা জানি যে প্রায় সকলেই প্রিয়জনের আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি। শিশুদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হইবার কোন সংগত কারণই থাকিতে পারে না। উপরন্তু শিশুরা হুবহু অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। বয়স্করা বিচার বিবেচনা করিয়া, কিছুটা বাদছাট দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। এই কারণেই প্রধানতঃ পিতামাতা অত্যন্ত সংযমী, সদ্ভাবী প্রভৃতি হওয়া উচিত। সেই কারণে সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের শিক্ষিত করা উচিত; ইহার সহিত শিশুপালন ও তাহাদের মনোবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুর অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার পূর্ব্বে তাহাদের প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্ত করা উচিত মনে করি। সেই কারণে তাহাদের প্রধান প্রবৃত্তিগুলি নিম্নে উল্লেখ করিলাম। সাধারণতঃ প্রধান প্রবৃত্তির সংখ্যা ১৪টি বলা হইয়াছে। যথা:—

১। অঙ্গ সঞ্চালন ২। হস্তগ্রাহ ৩। কথন ও লিখন ৪। আহার ৫। রোদন ৬। দ্রব্যসংগ্রহ। ৭। ক্রীড়া ৮। কৌতূহল ৯। অনুকরণ ১০। সঙ্ঘবদ্ধতা ১১। প্রতিযোগিতা ১২। প্রশংসালাভ ১৩। সমবেদনা ১৪। যৌন প্রবৃত্তি।

এই সকল প্রবৃত্তি দেহের পরিপুষ্টির সহিত ক্রমশ বিকশিত হয়; কোন বিশেষ প্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট বয়সে হঠাৎ আবির্ভূত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রবৃত্তি পুষ্ট হইয়া পরিস্ফুট হয় এবং বয়বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ শিশুকাল হইতেই ক্রীড়া-প্রবৃত্তি আভাস দেখিতে পাই; এই প্রবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখি যখন শিশুর বয়স দশ এগার বৎসর। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার প্রভাব হ্রাস পায়।

প্রবৃত্তিগুলির বিকাশে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় সত্য, কিন্তু প্রয়োজনবোধে অনেক প্রবৃত্তিকে কতকাংশে দমন করা উচিত। কারণ অনেক প্রবৃত্তি আছে যাহাদের অতিপুষ্টিতে অন্য প্রবৃত্তির বিকাশে বিঘ্ন ঘটে। শুধু ইহাই নহে, কোন কোন প্রবৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এই সকল প্রবৃত্তিকে কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করা বাঞ্ছনীয়। আবার কোন প্রবৃত্তিই সম্পূর্ণ-রূপে দমন করা উচিত নহে। মনোবিদরা দেখিয়াছেন যে ভবিষ্যৎ জীবনের বহু মানসিক বিকার ও দুঃখের উৎপত্তির মূল এই দমিত প্রবৃত্তি। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

অনেকেরই বিশ্বাস—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে কেবলমাত্র সুপ্রবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; কুপ্রবৃত্তির 'ছিটেফোঁটা' চিহ্নও তাহাদের মনে থাকে না। এমনকি পাশ্চাত্য দার্শনিক Rousseau শিশুদিগকে "দেবদূত" আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"Child is an angel"। এই ধারণা, এই বিশ্বাস বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকবৃন্দ সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার অনেকে "হিংসাপ্রবৃত্তি" মানুষের জন্মগত বলিয়া দাবী করিয়াছেন; এমনকি Hobbs লিখিয়াছেন "Man is an wolf to another man"; এ দাবীও সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ শিশুজন্মের সময়ে কেবলমাত্র সুপ্রবৃত্তি কিম্বা কেবল কুপ্রবৃত্তি লইয়াই আসে না। ভূমিষ্ঠকাল হইতেই এই দুইপ্রবৃত্তি তাহাদের মনে অবস্থিত।
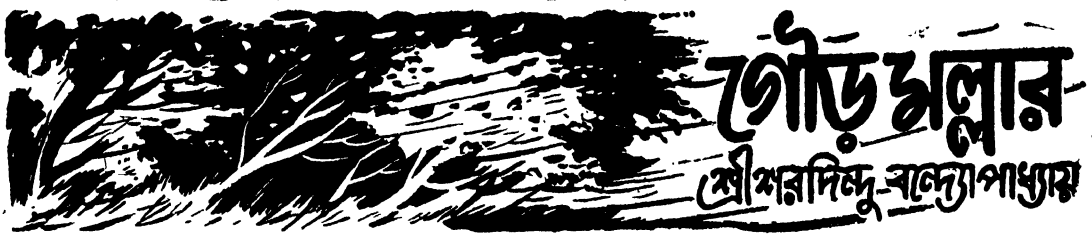
একবিংশ পরিচ্ছেদ

নরক

রাজপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় বজ্রের পা কাঁপিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইল, কণ্ঠের নিকট একটা বাষ্পপিণ্ড উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। পিতৃপুরুষের ভবনে এই তাহার প্রথম পদার্পণ।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলিয়াছে, কিন্তু পুরীর পিছন দিকে বেশী আলো নাই। কুহু আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া এক সঙ্কীর্ণ সোপানের সম্মুখীন হইল। রাজ অবরোধের দাসী-কিঙ্করীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ সোপান অনেক আছে। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

দ্বিতলের এক কোণে কুহুর কক্ষ। দূরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুহু নিজ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার দাসী মালতী দ্বারের পাশে দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। বজ্রকে পিছনে রাখিয়া কুহু আগাইয়া গেল।

মালতী উঠিয়া কুহুর পিছনে চোখ বাঁকাইয়া চাহিল। অবরোধে পুরুষের আবির্ভাব মালতীর চোখে নূতন নয়, তবে এ মানুষটা নূতন বটে; আবছায়া আলোতে দেখিয়াও চাহিয়া থাকিতে হয়। কুহু বজ্রকে যথাসম্ভব আড়াল করিয়া বলিল—'মালতী, তোকে আর দরকার নেই। তুই যা।'

মালতী চোখ ঘুরাইল, অঙ্গভঙ্গী করিল, তারপর দুষ্টামি-ভরা স্বরে বলিল—'এত রাত্তিরে কোথায় যাব গো ঠাকরুণ?'

কুহু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'তোর মনের মানুষ নেই? তার কাছে যা। আজ আর ফিরতে হবে না, একেবারে কাল সকালে ফিরিস।'

মালতী একগাল হাসিল। তাহাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া সে নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

কুহু বজ্রকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে দ্বারের খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরটি খুব বড় নয়, ছোটও নয়। চারি কোণে দীপদণ্ডে চারিটি প্রদীপ, মসৃণ মণিহর্ম্যতলে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। বাতায়নের পাশে খট্বিকার উপর শুভ্র শয্যা। উপাধানের উপর মল্লিকা ফুলের স্থূল মালা শোভা পাইতেছে। ঘরের বাতাস কস্তূরী ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত।

কুহু হাত ধরিয়া বজ্রকে খট্বিকার উপর বসাইয়া দিল; মুগ্ধবিধুর চক্ষে চাহিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিল—'ধূলোর মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি তা কি আগে জানতাম! মহারাজ বজ্রদেব, যখন মাথায় রাজমুকুট ধারণ করবেন তখন এই পাপিষ্ঠা দাসীর কথা কি মনে থাকবে?'

বজ্র কুহুকে টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইল, বলিল—'কুহু, তুমি জানো না, তোমাকে পেয়ে আমি কী পেয়েছি। এই জনারণ্যে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু!'

কুহু আদরে গলিয়া গেল, বজ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল—'মনে থাকবে?'

'থাকবে। তোমাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

কুহু পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর উঠিয়া মল্লিকা ফুলের মালাটি লইয়া বজ্রের গলায় পরাইয়া দিল। মালাটি সে আজ বৈকালে রাণীর আদেশে গাঁথিয়াছিল; সেই মালা আর একজনের গলায় উঠিবে তখন কে জানিত! তৃপ্তির মধ্যেও রাণীর কথা কুহুর মনে পড়িয়া গেল। রাক্ষসীটার কাছে যাইতে হইবে; ছলে ছুতায় আরও দুইটা দিন তাহাকে ভুলাইয়া রাখা দরকার—

ঈষৎ অন্যমনা হইয়া কুহু একটা কুলঙ্গীর কাছে গেল। কুলঙ্গীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ছিল, একটি স্থালীতে তাহা লইয়া বজ্রের কাছে ফিরিয়া গেল।

বজ্র বলিল—'এ কী?'

কুহু বলিল—'একটু খাও।'

কুহু দুই হাতে থালি ধরিয়া রহিল, বজ্র মিষ্টান্ন তুলিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে বলিল—কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ তা তো বললে না।

কুহু বলিল—'আমার মা এই রাজপুরীর দাসী ছিল। কোদণ্ড ঠাকুর মাকে চিনতেন। মা মরবার সময় ঠাকুরকে বলে যায় তিনি যেন আমার দেখাশুনা করেন। তা ঠাকুর আর আমার কী দেখাশুনা করবেন, আমিই তাঁর দেখাশুনা করি। —ও কি, আর একটু খাও।'

'আর না, অনেক খেয়েছি।'

'এই ক্ষীরের পুলি খেতেই হবে'—বলিয়া কুহু ক্ষীরের পুলি বজ্রের মুখে তুলিয়া দিল।

আহার শেষ হইলে বজ্র বলিল—'তুমি আর আমাকে মধুমথন বলবে না?'

'বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার সত্যি নাম পরম-ভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজ বজ্রদেব। মধুমথন তোমার মিথ্যে নাম।'

বজ্র একটু অন্যমনস্ক হইল; গুঞ্জার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল—'মিথ্যে নয়, ওটো নামই সত্যি। তুমি আমাকে মধুমথন বলেই ডেকো।'

কুহু জিভ্ কাটিল—'রাজাকে কি অন্য নামে ডাকতে আছে!'

'রাজা তো এখনও হই নি। হব কি না তারই বা ঠিক কি?'

কুহুর মুখ দৃঢ় হইল; সে বলিল—'তুমি রাজা হবে।'

'বেশ। যতদিন রাজা না হই ততদিন মধুমথন বলে ডেকো।'

'সে ভাল। তিন রাত্রির জন্য তুমি আমার মধুমথন।' কুহু বজ্রের খুব কাছে সরিয়া আসিল।

বজ্র উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল—'এবার কিন্তু আমি ফিরে যাব। কোদণ্ড মিশ্র বলেছেন—'

কুহু তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। বলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর কি বলেছেন আমি শুনেছি। কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। ভোর হবার আগেই আমি তোমাকে ডিঙিতে করে পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু—এখন রাত কত?'

'এখনও প্রথম প্রহর শেষ হয় নি।'

বজ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'না, আমি ফিরে যাই। তুমি যেতে না পারো আমি সাঁতরে ময়ূরাক্ষী পার হতে পারব।'

কুহু কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার অধরে একটি গুপ্ত হাসি খেলিয়া গেল। সে বজ্রের বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমার একটা কাজ আছে সেটা সেরে এসে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'কি কাজ?'

রাণীর কাছে যাইতে হইবে একথা কুহু বলিল না, বজ্রের কাছে রাণীর নাম উচ্চারণ করিল না। বলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর চিঠি দিয়েছেন, রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুন সেনকে দিতে হবে।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'দু' দণ্ড বেশী নয়।'

'দু' দণ্ড বসে থাকব?'

কুহু কুহকভরা হাসিল—'বসে থাকবে কেন? আমার বিছানায় শুয়ে থাকো।'

বজ্র-কোমল শয্যার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি করিয়া বলিল—'যদি ঘুমিয়ে পড়ি?'

অধরের একটি ভঙ্গুর ভঙ্গী করিয়া কুহু বলিল—'যদি ঘুমিয়ে পড়, আমি এসে তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

বজ্র শয়ন করিল। কুহু তাহার প্রতি ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া কুহু সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই, পুরীর এ অংশ নিশুতি হইয়া গিয়াছে। কুহু নিঃশব্দে দ্বারের শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে চলিল।

চতুস্তলে রাণী শিখরিণীর শয়নকক্ষ। কুহু প্রবেশ করিলে রাণী অর্ধোত্থিতা হইয়া প্রশ্নবিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন। ব্যজনরতা দাসী কুহুর ইঙ্গিতে সরিয়া গেল।

কুহু মনে মনে যে-কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিল ম্রিয়মান কণ্ঠে তাহা বলিল।—আজও পানশালা বন্ধ, শৌণ্ডিক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত আগন্তুক যুবকও নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু

জানবার উপায় নাই, পানশালা শূন্য। এদিকে কুহুর অবস্থা শোচনীয়; হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার পা দুটার আর কিছু নাই। এখন দেবী আজ্ঞা করুন—সে কী করিবে।

দেবী প্রজ্বলিত চক্ষে বলিলেন—'তুই দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে চাই না।'

কুহু করুণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ক্লান্তমন্থর পদে দ্বারের দিকে চলিল। দ্বারের বাহিরে গিয়া সে একবার চকিত-বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নিমেষে দেখা দিয়া নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তারপর সে দ্রুতপদে রাজার প্রমোদ ভবনের দিকে চলিল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন রাজার কাছেই আছে, তাহাকে কোদণ্ড মিশ্রের লিপি দিয়া রাণী শিখরিণীর সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তবে সে নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

রাণী শিখরিণী কিন্তু কুহুর ঐ চকিত কটাক্ষ দেখিয়াছিলেন। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার ক্রোধ অপগত হইয়া তাঁহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল।

ব্যজনকারিণী দাসী ফিরিয়া আসিয়া আবার রাণীকে বাতাস করিবার উদ্যোগ করিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল্লী, কুহু কোন্‌দিকে গেল দেখলি?'

বল্লী চমকিয়া বলিল—'তা তো দেখিনি দেবি। নিজের ঘরে গিয়েছে বোধহয়। দেখবো?'

'না—থাক।'

রাণী শিখরিণী আরও কিছুক্ষণ অধর দংশন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন। তারপর সহসা শয্যা হইতে নামিয়া বস্ত্রাঞ্চল সংবরণ করিতে করিতে বলিলেন—'বল্লী, আয় আমার সঙ্গে, কুহুর ঘরে আমাকে নিয়ে চল্।'

বল্লী ভীতচক্ষে রাণীর পানে চাহিল। রাণীর মুখ দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে নীরবে অগ্রবর্তিনী হইয়া রাণীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

* * *

কুহুর শয্যায় শয়ন করিয়া বজ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাতায়ন দিয়া নদীর জল-ছোঁয়া বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার কপালে বুকে স্নিগ্ধ করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিতেছিল। আজ দ্বিপ্রহরে বজ্র ঘুমাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার দেহের গ্লানি দূর হয় নাই। কুহুর কোমল শয্যায় শুইয়া মৃগমদ ও পুষ্পগন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া সে গুঞ্জাকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

গুঞ্জা যেন তাহার পাশে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে, বুকে কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে। বলিতেছে—তোমার মাথায় ও কি? সোনার মুকুট! ছি ছি খুলে ফেল, আমি তোমাকে পলাশ ফুলের মালা পরিয়ে দেব—

গুঞ্জা! কুঁচবরণ কন্যা!…কিন্তু এ কে? এ তো গুঞ্জা নয়! এ কি কুহু!… না, কুহুর মুখ এত সুন্দর নয়, গুঞ্জার মুখও এত সুন্দর নয়। মুখখানা যেন চেনা চেনা…কী তপ্ত নিশ্বাস, বুকের উপর পড়িয়া বুক যেন পুড়াইয়া দিতেছে—

গুঞ্জা কোথায় গেল?…এই নারীর চোখের দৃষ্টি এত তীব্র কেন? না—না!…মনে পড়িয়াছে—রাণী শিখরিণী! কিন্তু না—না! গুঞ্জা কোথায়?

রাণী শিখরিণী সরিয়া গেল…দ্বার খুলিয়া বাহিরে কাহার সহিত কথা কহিল। আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল—তাহার হাতে একগুচ্ছ ধূমনিঃস্যন্দী ধূপশলাকা… কিসের ধূপ! রাণী শলাকাগুলি তাহার মুখের কাছে নাড়িতেছে…

ধূপের গন্ধে মাদকতা আছে। বজ্রের শরীর যেন বিবশ হইয়া আসিতেছে শরীরে অনুভূতি আছে, চেষ্টা নাই… মন কিন্তু সজাগ; সে জাগিয়া আছে, তবু যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে…

তাহার চোখে রাণী নিদালীর মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চোখের পাতা খুলিতে পারিতেছে না… অথচ সে জাগিয়া আছে, সমস্তই অনুভব করিতেছে—

গুঞ্জা, তুমি কোথায়? সোনার মুকুট ভাল নয়, তুমি আমাকে পলাশ ফুলের মালা পরাইয়া দাও—

গুঞ্জা! তুমি কি রাণীর ছদ্মবেশে আমার কাছে আসিয়াছ! তাই কি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না! কুঁচবরণ কন্যা—!

* * *

রাজার প্রমোদভবন অবরোধ হইতে অনেকখানি দূরে, প্রাসাদের অন্য প্রান্তে। কুহু অলিন্দ দিয়া সেই দিকে চলিল। কখনও এক প্রস্থ সোপান অবরোহণ করিয়া কখনও এক প্রস্থ আরোহণ করিয়া খদ্যোতের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে

চলিল। যতই প্রমোদভবনের কাছে আসিতে লাগিল ততই বাদ্যযন্ত্রের শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি !

অবশেষে কুহু প্রমোদ কক্ষের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল।

প্রমোদ কক্ষটি আয়তনে বৃহৎ, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে আলোকিত নয়। মধ্যস্থলে অনেকগুলি উচ্চ দীপদণ্ড চক্রাকারে সাজানো রহিয়াছে, ছাদ হইতেও শৃঙ্খল-লম্বিত দীপাধার ঝুলিতেছে। কিন্তু এই চক্রের বাহিরে অধিক আলো নাই, কোণে কোণে ছায়ান্ধকার; কক্ষে অনেকগুলি মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাহা সহসা ধরা যায় না।

মানুষগুলি কিন্তু সকলেই স্ত্রীজাতীয়। এমন কেহ নাই যে রূপসী ও নবীনা নয়। তাহাদের বেশভূষা সংক্ষিপ্ত, বুকে কাহারও কাঁচুলি আছে কাহারও নাই। তাহারা গুচ্ছে গুচ্ছে হর্ম্যতলে বসিয়া আছে, কেহ বা আস্তরণের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। যাহারা আলোকচক্র হইতে দূরে আছে তাহাদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আলোকচক্রের মাঝখানে এক বিরলবসনা সভানন্দিনী নৃত্য করিতেছে; আলোকবিভ্রান্ত প্রজাপতির ন্যায় তাহার নৃত্যের ভঙ্গী। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তিনটি যুবতী বীণা, মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে। ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রাজা অগ্নিবর্মা যে এই কক্ষে আছেন তাহা সহসা লক্ষ্যগোচর হয় না। কেন্দ্রীয় দীপচক্র হইতে অল্প দূরে একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। অগ্নিবর্মার অস্থিসার মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ নাই, বক্ষও কেশহীন; মাথার চুল নারীর মত দীর্ঘ। তিনি স্তিমিতচক্ষে নর্তকীর পানে চাহিয়া আছেন। ছাগ-চক্ষুর ন্যায় ভাবলেশহীন চক্ষুর্দ্বয়, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন উন্মাদনা।

কুহু উঁকি দিয়া দেখিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিল না। অর্জুনসেন রাজার অন্তরঙ্গ, নিজস্ব বৈদ্য, সর্বদা রাজার সন্নিধানে থাকা তাহার কর্তব্য। কিন্তু কুহু প্রমোদ কক্ষের ছায়াচ্ছন্ন কোণে কোণে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ভিতরে নৃত্যের তাল ক্রমে দ্রুত হইতেছে। দ্বারের কাছে এক বিপুলকায়া প্রৌঢ়া রমণী হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া আছে, সে এই প্রমোদকক্ষের দৌবারিকা। কিন্তু দ্বার রক্ষার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, নৃত্যলীলার দিকেও নাই। সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

কুহু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বিধায় পড়িল। অন্তরঙ্গ অর্জুন সেনকে সে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইবে? খুঁজিলেই কি পাওয়া যাইবে? কুহু ভাবিল, আজ থাক, কাল পত্র দিলেই হইবে। নিজের ঘরের দিকে কুহুর মন টানিতেছিল।

কুহু ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, দেখিল অলিন্দ দিয়া অর্জুনসেন আসিতেছে। তাহার পিছনে এক কিঙ্করী, কিঙ্করীর হস্তে পূর্ণ পানপাত্র।

অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, নধর মসৃণ আকৃতি, মাথায় তৈলসিক্ত কুঞ্চিত কেশ, কুঞ্চিত গুম্ফ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, যেন সর্বদাই বাষ্পোৎফুল্ল। আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রকৃতি অনুমান করা অসাধ্য। কুহুকে দেখিয়া সে গতি শ্লথ করিল, কিঙ্করীকে বলিল—'তুমি মহারাজকে পানীয় দাও গিয়ে, আমি যাচ্ছি।'

কিঙ্করী প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। কুহু মৃদুস্বরে অর্জুনসেনকে কোদণ্ড মিশ্রের বার্তা জানাইল ও সঙ্কেতলিপি দিল।

অর্জুনসেনের বাষ্পোৎফুল্ল চোখে একটু কৌতুক দেখা দিল, সে স্নিগ্ধস্বরে বলিল—'অমাবস্যার রাত্রি? ভাল। নিবন্ত প্রদীপে ফুঁ দেওয়া বৈ তো নয়, তা দেব। আর্য কোদণ্ড মিশ্রকে আমার প্রণাম দিয়ে বোলো, শ্রীমনমহারাজ একদিন আমাকে অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে।'

কুহু একবার অর্জুনসেনের স্নিগ্ধ মুখের পানে চাহিল, একবার দ্বারের ভিতর দিয়া পানপাত্র হস্তে উপবিষ্ট মহারাজের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর নিঃশব্দ ক্ষিপ্রচরণে ফিরিয়া চলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষ-মন্থন

কুহুর ঘরের বাহিরে অলিন্দের প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল, তাহার অস্থির প্রতিচ্ছায়া ভৌতিক আকার গ্রহণ করিয়া প্রাচীরগাত্রে নৃত্য করিতেছিল।

কুহু কোনও দিকে না চাহিয়া নিজের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত তুলিয়া শিকল খুলিতে গিয়া থমকিয়া

গেল। শিকল খোলা! কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, সে দ্বারে হাত রাখিয়া চাপ দিল। দ্বার খুলিল না, ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। কুহুর দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল, সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় পিছন হইতে কেহ তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। কুহু ভীতচক্ষে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—বল্লী! বল্লী হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—'কুহু, আজ তুমি মরেছ।'

কুহু চাপা গলায় বলিল—'আমার ঘরে কে দোর দিয়েছে?'

'তা এখনও বোঝো নি? রাণী!—তোমার ঘরে কি কেউ ছিল?'

'ছিল কেউ।'

'বুঝেছি। কিন্তু তাকে আর পাবে না, রাণী তাকে বশ করেছে। তোমার নাগর শক্ত মানুষ বলতে হবে, বশীকরণ-ধূপ দিয়ে তাকে বশ করতে হয়েছে।'

গলা আরও নিম্ন করিয়া বল্লী যাহা দেখিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কুহু হাত কাম্ড়াইল।

বল্লী বলিল—'হাত কাম্ড়ালে কি হবে? এখন পালাও, রাণী যদি তোমাকে পায় তোমার ধড়ে মাথা থাকবে না।'

কুহু তাহা বুঝিয়াছিল। রাণীর ঈপ্সিত বস্তু সে নিজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়া রাণীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, রাণী তাহা জানিতে পারিয়াছে। ধরা পড়িলে কুহুর আর রক্ষা নাই, রাণী তাহাকে তুষানলে পুড়াইয়া মারিবে। কুহু আর কাল ব্যয় না করিয়া রাজপুরীর কুটিল চক্রব্যূহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুহু শৈশব হইতে রাজ অবরোধে পালিত, অবরোধের অন্ধি-সন্ধি তাহার নখদর্পণে। সে একটি অতি নিভৃত গূঢ় কক্ষে গিয়া লুকাইয়া রহিল। এখানে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

ধূলিমলিন অন্ধকার কোটরে একাকিনী বসিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুহু তীব্র প্রতিহিংসা-চিন্তায় মনের বল্গা ছাড়িয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইল রাজাকে গিয়া সংবাদ দিবে, অগ্নিবর্মার হাত ধরিয়া আনিয়া ব্যভিচার-রতা রাণীকে ধরাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাতে বজ্রের প্রাণনাশ অনিবার্য্য। কুহু রুদ্ধবীর্য সর্পিণীর মত সারা রাত্রি তর্জন করিতে লাগিল।

তৃতীয় প্রহরের ভেরী বাজিয়া গেলে কুহু নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত-কক্ষের বাহিরে আসিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে; রাজপুরীর অলিন্দপথে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে গাঢ় তমিস্রা, একটি দীপও জ্বলিয়া নাই।

নিজের দ্বারের কাছে আসিয়া কুহু সন্তর্পণে হাত দিয়া অনুভব করিল, দ্বার খোলা। সে কক্ষে প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিল, শয্যা হইতে একজনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে।

কুহু দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, ঘরের কোণে গিয়া কম্পিত হস্তে প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল।

বজ্র চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। কুহু তাহার বাহু ধরিয়া নাড়িল, কানে কানে নাম ধরিয়া ডাকিল—মধুমথন! বজ্র কিন্তু জাগিল না। ইহা কি নিদ্রা? না মাদকজাত মোহাচ্ছন্নতা!

বজ্রের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া কুহুর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বল্লী না দেখিয়াও যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা সত্য। কুহু দন্তে অধর কাটিয়া রক্তাক্ত করিল।

এদিকে রাত্রি ফুরাইয়া আসিতেছে। রাণী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার কখন তাহার কি মতি হইবে কে জানে! কুহু ত্বরান্বিত হইয়া বজ্রের পরিচর্যা আরম্ভ করিল। মারণ উচাটন বশীকরণের যেমন ঔষধ ও প্রক্রিয়া আছে তাহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রক্রিয়াও আছে। কুহু বজ্রের মাথায় শীতল জল দিল, সিক্ত বস্ত্র দিয়া বক্ষস্থল মুছিয়া দিল, আরও নানা প্রক্রিয়া করিল। অবশেষে বজ্র রক্তাভ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

তাহার দেহমনের জড়তা কাটিতে আরও কিছুক্ষণ গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—'আমি এখানে কেন?'

কুহু তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল—'তুমি রাজপুরীতে এসেছিলে মনে নেই? আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে!'

বজ্র স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু—'

কুহু বলিল—'তারপর বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলে। ও কথা ভুলে যাও। রাত আর নেই। চল তোমাকে কোদণ্ড ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কোদণ্ড ঠাকুর!—চল।'

কুহুর হাত ধরিয়া বজ্র ঘাটে আসিল। পূর্বাকাশে তখনও উষার উদয় হয় নাই, শুকতারা প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ দপ্‌দপ্‌ করিতেছে।

কুহু বজ্রকে ডিঙিতে বসাইল, হাতে বৈঠা ধরাইয়া দিল। বজ্র যন্ত্রবৎ বৈঠা টানিতে লাগিল।

তাহারা যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটীরে পৌঁছিল তখনও তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উষ্ণ মস্তিষ্কে কুটীর মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন। এই এক অহোরাত্রের মধ্যে বৃদ্ধের দেহ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট; চক্ষে জ্বরাক্রান্ত দৃষ্টি। বজ্রকে দেখিয়া তিনি দুই হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'বজ্র! তুমি কোথায় গিয়েছিলে বৎস? তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি পণ্ড হল! কোথায় ছিলে তুমি?'

বজ্র নিরুত্তর রহিল। কোদণ্ড মিশ্র কুহুর পানে চাহিলেন। কুহু তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া হ্রস্বকণ্ঠে ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, নিজের অভিসন্ধিটুকু গোপন রাখিয়া বাকি সব সত্য কথা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র বিস্ফারিত নেত্রে বজ্রের পানে চাহিলেন, বলিলেন—'কি বিপত্তি! যদি ধরা পড়ত! যদি প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত!—কিন্তু যাক, বাঘিনীর কবল থেকে ফিরে এসেছে এই যথেষ্ট। বজ্র, এখন থেকে তুমি আর কোথাও যাবে না, সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা এখানে থাকবে। কুহু, তুমিও আর অবরোধে ফিরে যেও না, বাঘিনী তোমাকে পেলে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

কুহু প্রজ্বলিত চক্ষে বলিল—'আমি ফিরে যাব, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকব যে, রাণীর সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বার করে। কোকবর্মা রাণীকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাবে—নিজের চোখে দেখব তবে আমার বুক ঠাণ্ডা হবে।' বজ্রের কাছে গিয়া বলিল—'অমাবস্যার পরদিন রাজপুরীতে আবার দেখা হবে।'

কুহু চলিয়া গেল। বজ্র বাহিরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইল। নদীর ওপারে চক্রবাক-পক্ষের ন্যায় ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিয়াছে, আর একটি নূতন দিনের সূচনা হইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া বজ্রের মস্তিষ্কের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সেই যে নটেশ্বর ও বিম্বাধরের সঙ্গে সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে।—

সূর্যোদয় হইলে বজ্র স্নান করিতে জলে নামিল। গঙ্গার স্নিগ্ধ-শীতল জলে অবগাহন করিয়া তাহার দেহমন সুস্থ হইল।

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, দুই হাতে সবেগে গাত্র-মার্জন করিতে করিতে তাহার চোখে পড়িল, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয়! সোনার অঙ্গুরীয়, মাঝখানে গাঢ় নীল একটি মণি। বজ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অঙ্গুরীয়টি নিরীক্ষণ করিল। কোথা হইতে আসিল এই অঙ্গুরীয়? কে পরাইয়া দিল? গত রাত্রে তাহার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন অবিচ্ছেদ্য জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছিল যে কিছুই সে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এই আংটি নিশ্চয় স্বপ্ন নয়। আংটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল ইহার সহিত যেন কোন অজ্ঞাত অশুচিতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। সে আংটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। আংটি এত সুন্দর, তাহার নীলবর্ণ মণি হইতে এমন অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে যে সে তাহা জলে ফেলিয়া দিতে পারিল না। বিশেষত মূল্যবান কোনও বস্তু নষ্ট করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে একটু চিন্তা করিয়া আবার উহা অঙ্গুলিতে পরিধান করিল।

স্নান শেষে সে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিল এবং সিক্তবস্ত্রে গঙ্গার কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আজও বুড়ি কানসোনার হাটে গিয়াছে। গঙ্গা পা ছড়াইয়া বসিয়া সবিতার পাক কাটিতেছিল, হাস্যমুখে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, ধামিতে মুড়ি শসা কলা গুড় নারিকেল আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

অর্ধমুদিত চক্ষে খাইতে খাইতে বজ্র বলিল—'গঙ্গা, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

'কী জিনিস?' গঙ্গা উৎসুক আনন্দে চাহিল।

বজ্র আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল। আংটি হাতে লইয়া গঙ্গার মুখে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল; ভয় সম্ভ্রম আনন্দ সঙ্কোচ ক্ষণকালের জন্য তাহাকে নির্বাক করিয়া দিল। তারপর সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'এ আমার জন্যে এনেছ! এত সুন্দর আংটি! এ নিয়ে আমি কি করব?'

বজ্র বলিল—'এখন রেখে দেবে। যখন তোমার বিয়ে হবে তখন এই আংটি বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা নিয়ে তুমি আর তোমার বর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।'

লজ্জায় আহ্লাদে গঙ্গার মুখখানি সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবলপ্রতাপ 'জার' পিটারের (Peter the Great) মৃত্যুর পর রাজ্যের শাসন-ভার এলো তাঁরই অযোগ্য বংশধরদের হাতে। এঁদের রাজ্যকাল খুব সংক্ষিপ্ত—৩৭ বছর মাত্র (১৭২৫-১৭৬২)। এই ক' বছর পিটারের উত্তরাধিকারী-হিসাবে তাঁর ছ'জন অপদার্থ-বংশধর পর-পর নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেশ-শাসন করেন। তার ফলে, পিটারের হাতে-গড়া সুসমৃদ্ধ রুশ-সাম্রাজ্যের দশা দিন-দিন অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। দুর্নীতি অরাজকতায় ছেয়ে যায় সারা দেশ; রাজ-দরবারও তা থেকে মুক্ত ছিল না। রাজ-শক্তির দৌর্বল্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগে

নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে রুশ সৈন্যদল ফরাসীদের যে সব কামান দখল করেছিল তারই প্রদর্শনী

দেশের কুচক্রী-স্বার্থান্বেষী আমলা-অমাত্যের দল প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রীতিমত জুলুম-নিগ্রহ সুরু করেছিলেন। দলাদলি, বিবাদ-বিদ্রোহ লেগে থাকতো সর্ব্বদা। এই সব বিশৃঙ্খলার দরুণ, দেশের দুরবস্থা শেষে এমন হলো যে, পিটারের একান্ত-অনুগত 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো-গার্ডস্' বা রাজ-রক্ষী সেনাদল দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ওঠে। দুর্দ্ধর্ষ এই রাজ-রক্ষী সেনাদলের দাপটে দেশের রাজা-প্রজা সকলেই রীতিমত তটস্থ থাকতেন সব-সময়ে। ফন্দী-ফিকির কিম্বা উৎকোচ-দানে কোনো-মতে এদের তুষ্ট এবং বশ করে রাখাই ছিল তাঁদের একমাত্র সাধনা। এভাবে প্রশ্রয় পেয়ে 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' রক্ষীদল ক্রমে এমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, নিজেদের খেয়ালমত দেশের এক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে আর-একজনকে গদীতে বসাতে তাদের এতটুকু বাধতো না! বেপরোয়া রাজরক্ষী-সেনাদের এই অবৈধ আচরণের ফলে রুশ-দরবারে রাজা-নির্ব্বাচনের ব্যাপার নিয়ে সে-আমলে বার-কয়েক তুমুল বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' সেনাদল কিন্তু জোর-জুলুম চালিয়ে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাদের জেদ বজায় রেখে ছিল শেষ-পর্য্যন্ত।

পিটারের (Peter the Great) মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে ন্যায্য-দাবী ছিল মৃত আলেক্সিসের (পিটারের বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ তনয়) শিশু-পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় পিটারের। কিন্তু অন্যায়ভাবে সে দাবী অগ্রাহ্য করে, 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' সেনাদলের চেষ্টায় সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন লোকান্তরিত-'জার' পিটারের প্রিয়তমা দ্বিতীয়া-পত্নী রাণী কাথরিণ। রাণী কাথরিণ ছিলেন অত্যন্ত বিলাসিনী...রাজ-কার্য্যে তাঁর এতটুকু আগ্রহ ছিল না। অনুগৃহীত রাজ-অমাত্য দল এবং পরলোকগত পিটারের একান্ত-অনুগত দেশের সুদক্ষ-প্রবীণ-মন্ত্রী প্রিন্স মেনশিকভের হাতে রাজকার্য্য-পরিচালনার ভার দিয়ে রাণী কাথরিন্ চূড়ান্ত-উচ্ছৃঙ্খলভাবে নিজের খেয়াল-মত রাজ-কোষের অর্থ অপব্যয় করে সারাক্ষণ বিলাস-আনন্দে মেতে থাকতেন। তাঁর এই অমিতব্যয়িতার মাত্রা শেষে এমন হয়ে ওঠে যে, প্রিন্স মেনশিকভের মত পরম-অনুরক্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু পর্য্যন্ত রাণীর এ অন্যায়-আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র-প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন। এমনি

উচ্ছৃঙ্খলভাবে বছর দুয়েক রাজ্য করার পর রাণী কাথ্‌রিনের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে!

তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্রোহী-যুবরাজ আলেক্সিসের দ্বাদশ-বর্ষীয় পুত্র দ্বিতীয় পিটার বসলেন সিংহাসনে। পিতামহের দেশোন্নতির আদর্শে-অনুপ্রাণিত, প্রগতি-পন্থী বিচক্ষণ-মন্ত্রী মেন্‌শিকভের উদ্দেশ্য ছিল—কন্যার সঙ্গে নব-নির্ব্বাচিত 'জার্‌'-এর বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তা পাতিয়ে, রুশ-রাজশক্তিকে সুসংবদ্ধ এবং শক্তিশালী করে তুলবেন, কিন্তু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোর-সম্রাট দ্বিতীয় পিটার দেশের কুচক্রী-প্রাচীনপন্থী দোল্‌গোরুকী বংশের রাজ-অমাত্যদের প্ররোচনায় পরম-হিতাকাঙ্খী সুদক্ষ-মন্ত্রী মেন্‌শিকভ্‌কে রাজ্য থেকে সুদূর সাইবেরিয়ায় চির-নির্ব্বাসিত করে সে-বিবাহের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিলেন। নির্জ্জন সাইবেরিয়ার হিম-শীতল প্রান্তরে, জীর্ণ কুটীরে দারুণ দুর্ভোগান্তে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মেন্‌শিকভের মৃত্যু হয়। মেন্‌শিকভের নির্ব্বাসনের পর রাজদরবারে দোল্‌গোরুকী অমাত্যদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মন্ত্রণায় সম্রাট নব-প্রতিষ্ঠিত সেন্টপিটার্স্‌বুর্গ সহর থেকে আবার মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অপরিণত-বয়স্ক দ্বিতীয় পিটারের অভিভাবক-হিসাবে দোল্‌গোরুকী-অমাত্যবৃন্দই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের দারুণ স্বেচ্ছাচারের ফলে দেশের অবস্থা রীতিমত শোচনীয় হয়ে ওঠে।

সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ শহরে রুশ-সম্রাট আলেকজাণ্ডারের গড়া বিজয় তোরণ—প্রাচীন রুশচিত্রের প্রতিলিপি

মাত্র তিন বছর এভাবে রাজ্য করার পর সন্দিজ্বরে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পিটারের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পিটারের জীবনাবসানের পর সিংহাসন অধিকার নিয়ে রাজ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-পরিষদের সম্ভ্রান্ত-সভ্যেরা এক গোপন-বৈঠকে জমায়েৎ হয়ে, সম্রাট পিটারের (Peter the Great) নিকট-আত্মীয়া এবং জার্ম্মানির অন্তর্গত কুর্‌লাণ্ডের (Courland) ডিউকের বিধবা-পত্নী হীন-চরিত্রা এন্‌কে (Anne) Czarina বা সম্রাজ্ঞী হিসাবে সিংহাসনে বসাবার মতলব করেন। সে-খবর জানতে পেরে 'প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কো' সেনাদল বিদ্রোহ-ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে এন্‌কেই সিংহাসনে বসায়। এদের দৌলতে নির্ব্বাচিত হবার ফলে এন্ শুধু নামেই 'সম্রাজ্ঞী' ছিলেন…রাজ-কার্য্য পরিচালনা করতো এই 'প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কো' রক্ষীরা। তাছাড়া এনের স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না…রাজ-কার্য্য অবহেলা করে, সারাক্ষণ তিনি তাঁর জার্ম্মাণ-প্রণয়ী কাউণ্ট আর্ণষ্ট জোহান্ বিরোঁ, আর একদল চাটুকার-অনুচরের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-চর্চ্চায় মেতে থাকতেন। এই অনাচারের দরুণ দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্দ্দশা ক্রমে চরমে ওঠে! অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অরাজকতায় ভরে যায় দেশ…রাজ-দরবার হয়ে ওঠে অনাচারের লীলা-ক্ষেত্র! তাছাড়া

সম্রাজ্ঞী-এনের পক্ষপাত-পৃষ্ঠপোষকতায় রুশ-দরবারে বিদেশীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এমন জঘন্য-প্রসারলাভ করেছিল যে, শুধু দোল্‌গোরুকী এবং গোলিৎসিন্‌ বংশের অমাত্যবৃন্দ ছাড়া দেশের আর-কোনো অভিজাত-রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত জমিদার বা ধর্ম্মযাজক—কারো এতটুকু আধিপত্য-বিস্তারের উপায় ছিল না! বিচক্ষণ মন্ত্রী মেন্‌শিকভের মত প্রিন্স ডিমিট্রি গোলিৎসিন্‌ও ছিলেন রাজ্যের পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট-সুদক্ষ-রাজনীতিবিদ···রাজ-দরবারের দুর্নীতি-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর দরুণ, রাণী এন্‌ তাঁর বিদেশী-অনুচরদের প্ররোচনায় গোলিৎসিন্‌কে কারা-কক্ষে বন্দী করে রাখেন। বন্দী-দশাতেই গোলিৎসিনের মৃত্যু ঘটে।

রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ—রাজ্যাভিষেকের চিত্র

এমনি উদ্দাম-যথেচ্ছাচার চালিয়ে রাণী এন্‌ দশ বছর (১৭৩০-১৭৪০) রাজ্য-শাসন করেন। এই ক'বছর ছিল দেশে দারুণ দুঃসময়। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছাড়া, দেশে সে-সময়ে প্রাকৃতিক-দুর্য্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর অগ্নিকাণ্ডের প্রকোপ এত বেড়েছিল যে, বিরাট রুশ-সাম্রাজ্য প্রায় ছারখার হবার দাখিল! তার উপর বিলাসিনী সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহপুষ্ট স্বার্থান্বেষী আমলা-অমাত্যদের অবাধ-শোষণ, নির্ম্মম-নির্য্যাতন আর যথেচ্ছ রাজস্ব আদায়ের ফলে, দেশের সাধারণ-প্রজাদের দুরবস্থা দিন-দিন একান্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। রাণী এনের অন্যায়-প্রশ্রয়ে যে সব বিদেশী তখন দরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন—দু'জন বিশিষ্ট জার্মান অমাত্য—অষ্টারমান্‌ আর মুনিক্‌ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্বৈরাচারিণী-এনের জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যাভিলাষী এই দুই কুচক্রী বিদেশী-অমাত্য মিলে রাণীর প্রণয়ী বিরোঁকে সুদূর সাইবেরিয়ায় চির-নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে, দরবারের দুর্নীতিপরায়ণ-অনুচরদের সাহায্যে সিংহাসন অধিকারের ফন্দী আঁটেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের সে দুরভিসন্ধি সফল হয়নি। দুর্দ্ধর্ষ 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো-গার্ডস্‌' ঘটনাক্রমে বিদেশীদের এই হীন-ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে মুনিক্‌ আর অষ্টারমান্‌কে অবিলম্বে কারাকক্ষে বন্দী করে। দরবারের একদল কুচক্রী-স্বার্থান্বেষী রাজ-অমাত্যের মতলব ছিল—পরলোকগতা-রাণীর এক চরিত্রহীনা আত্মীয়ার শিশুপুত্র আইভান্‌কে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরা করবেন রাজ্য-শাসন। 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' সেনাদল কিন্তু তাঁদের সে-সাধেও বাদ সাধলেন। লোকান্তরিত-সম্রাট পিটারের (Peter the Great) কনিষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথকে সম্রাজ্ঞী নির্ব্বাচিত করে রাজ-ভক্ত 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' সে-যাত্রা রাজ্যলোভী বিদেশীদের লোলুপ গ্রাস থেকে রুশ সিংহাসনের মর্য্যাদা এবং স্বদেশীয়ানা বাঁচিয়েছিলেন।

রাণী এলিজাবেথও ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল···বিলাস, ব্যভিচার আর মদের পেয়ালা নিয়েই মেতে থাকতেন সারাক্ষণ! তাঁর পানাসক্তি এমন ছিল যে, মৃত্যুকালেও চেরী-ব্রাণ্ডির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন! এলিজাবেথের বিলাসিতা এবং অপব্যয়িতাও ছিল দুরন্ত-রকম। নিজের সখ, বিলাস আর উদ্ভট খেয়াল পরিতৃপ্তি করতে রাণী এলিজাবেথ দু'হাতে রাজ কোষের অর্থ ওড়াতেন। তাঁর এই অপব্যয়িতার ফলে রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা এমন হয় যে, বিচক্ষণ-কোষাধ্যক্ষ কাউণ্ট পিটার শ্যুভালভ্‌কে শেষে দেশের মুদ্রা-মান পর্য্যন্ত হ্রাস করতে হয়েছিল রাণীর বিলাসব্যয়ের দেনা মিটোতে। এলিজাবেথ কিন্তু এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না···রাজ-কার্য্য-পরিচালনার ভার দেশের সুদক্ষ মন্ত্রী শ্যুভালভ্‌-ভ্রাতাদের উপর ছেড়ে, রাণী নিজের উচ্ছৃঙ্খল-সঙ্গীদের নিয়ে মেতে থাকতেন। দেশে-বিদেশে এত দেনা করে বসলেন এর জন্য যে, সে দেনা মেটাতে রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীদের বিব্রত হতে হয়। রাণীর সে দেনা শোধ করতে, রাজ কোষের অর্থ-নিঃশেষিত হবার উপক্রম ঘটলে মন্ত্রীরা প্রজাদের উপর নিত্য-নূতন খাজনা চাপাতেন। তার ফলে জনসাধারণের দুরবস্থা সঙ্গীণ হয়ে ওঠে। দেশের এমনি দুর্গতির সময়, বিলাসিনী-এলিজাবেথের একদা খেয়াল হলো এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করবেন। সে বাসনা মেটাতে তিনি অকাতরে রাজ-কোষের এক-কোটি মুদ্রা ব্যয় করে নেভা নদীর উপকূলে সেণ্টপিটার্সবুর্গ সহরের বুকে 'Winter Palace' নামে অপরূপ সুন্দর এক বিরাট প্রাসাদ-ভবন গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন-সেণ্টপিটার্সবুর্গের (আধুনিক লেনিনগ্রাড্‌ সহর) সেই অভিনব প্রাসাদটি অতীত ইতিহাসের অক্ষয়-প্রতীক হিসাবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ, রাণীর দেনার মাত্রা ক্রমে অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছিল সৌখিনতার পীঠস্থান—সুদূর প্যারিসের দর্জ্জীরা শেষে এলিজাবেথের পোষাকের দাম বাকী-পড়ায়, সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে ধারে কারবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে, রাণী এলিজাবেথ বিশ বছর (১৭৪১-১৭৬১) রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর আমলে, রাজ্যের সেনাদল প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুদীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে প্রবল শত্রু প্রশিয়ার

অধিপতি ফ্রেড্রিক্‌কে (Frederick the Great) হারিয়ে বিধ্বস্ত করে রাজ্যের এই বিক্রমী সেনাদল দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে দরবারের এক বিদেশী প্রুশিয়ান্‌-অমাত্যের সুচতুরা-কন্যা সোফিয়া অগস্তা দ্বিতীয়া কাথরিন্‌ নাম নিয়ে রুশের সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেন। তাঁর সিংহাসন-লাভের কাহিনী বেশ বৈচিত্র্যময়।

লোকান্তরিত সম্রাট পিটার দি গ্রেটের আর এক কন্যা রাজকুমারী এ্যানের বিবাহ হয়েছিল হলষ্টিনের বিদেশী ডিউকের সঙ্গে। এলিজাবেথের বরাবর বাসনা ছিল—ভগ্নী এনের তরুণ-পুত্র তৃতীয় পিটারকে, রোমানফ্‌-বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী-হিসাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা। সে-উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনুগৃহীতা-অনুচরী সোফিয়া অগস্তার সঙ্গে ভগ্নী-পুত্র তৃতীয় পিটারের বিবাহ দিয়ে, তাঁদের নিজের পাশে রেখে দরবারের আদব কায়দা শিখিয়ে দুরস্ত করে তুলেছিলেন। সোফিয়া অগস্তা ছিলেন যেমন প্রখর-বুদ্ধিমতী, কূটনীতিতে তেমনি নিপুণ। তৃতীয় পিটারের চরিত্র পত্নীর বিপরীত। তিনি যেমন নির্ব্বোধ অকর্ম্মণ্য, তেমনি বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল। রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজ কার্য্য পরিচালনার কিছু না শিখে, তৃতীয় পিটার অষ্টপ্রহর ভোগ বিলাস আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতেন। তাছাড়া সোফিয়ার সঙ্গে তাঁর মনের মিল ছিল না। অপদার্থ-নির্ব্বোধ স্বামীকে সোফিয়াও মনে-প্রাণে অপছন্দ করতেন···স্বামী সেবার বদলে দরবারের প্রতিপত্তিশালী অমাত্যদের উপর প্রভাব-বিস্তার করে তাঁদের চিত্ত-জয় এবং সহানুভূতি-অর্জ্জনের দিকেই ছিল সোফিয়ার লক্ষ্য। ছলে বলে-কৌশলে সিংহাসন অধিকার করা ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। এ-কামনা চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাভিলাষিণী সোফিয়া দরবারের দুর্নীতি-পরায়ণ অমাত্যদের যে জঘন্য-উপায়ে বশীভূত রেখেছিলেন, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়! সিংহাসন অধিকার করতে হলে যে-সব ক্ষমতাশালী অমাত্যের সহযোগিতা একান্ত-প্রয়োজন বলে বুঝতেন, উৎকোচ-উপহার এমন কি অকাতরে প্রেম নিবেদন এবং নিজের দেহ-দানে তৃপ্ত করে, সোফিয়া তাঁদের বশে রাখতেন। এই সব গর্হিত-অনাচারের ফলে, দেশের লোকের বিরাগভাজন হওয়া দূরের কথা, দুর্নীতির বিষে রাজ্য তখন এমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল যে, রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর অব্যবহিত-পরে সোফিয়া যখন অনুরাগী-অনুচরদের সাহায্যে স্বামী তৃতীয় পিটারকে সুকৌশলে রাজ-সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিলেন, তখন প্রজারা সে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ জানালো না! তা ছাড়া, দরবারের নৈতিক-আবহাওয়াও সে-সময় এমন কলুষিত হয়ে উঠেছিল যে, দেশের রাজভক্ত 'প্রিয়োব্রাঝেনস্কো' সেনাদলও শেষে লোকান্তরিত পিটার দি গ্রেটের একমাত্র-পৌত্র রোমানফ্‌-বংশধর তৃতীয় পিটারের উত্তরাধিকারত্বের ন্যায্য-দাবী অগ্রাহ্য করে বিদেশিনী-সোফিয়াকে সম্রাজ্ঞী-হিসাবে সিংহাসনে বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। শুধু সিংহাসনচ্যুত নয়, তৃতীয় পিটারকে তারা নির্জ্জন আবাসে বন্দী করে রেখেছিল! বন্দী-দশায় পিটারের সঙ্গী ছিল শুধু তাঁর উপপত্নী, এক কাফ্রী-ক্রীতদাস, একটি পোষা কুকুর, আর একটি বেহালা! সেই বন্দী-শালাতেই সোফিয়ার অন্যতম-প্রণয়ী গ্রেগরী ওর্লভ্‌ নামে এক অভিজাত-অমাত্য উচ্ছৃঙ্খল পান-ভোজনের আনন্দ-আসরে হৈ-চৈ করার ছুতোয় নিতান্ত নির্ম্মমভাবেই তৃতীয় পিটারকে হত্যা করে।

সসৈন্যে নেপোলিয়নের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত মস্কো রাজধানীতে প্রবেশ—প্রাচীন রুশ চিত্রের প্রতিলিপি

স্বামীর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সোফিয়া তাঁর মোহ-মুগ্ধ অমাত্যবৃন্দের সাহচর্য্যে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া কাথ্‌রিন্‌ নাম নিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর সুদক্ষভাবে রাজ্য শাসন করেছিলেন তিনি। গোড়ার দিকে রাণী কাথ্‌রিন ছিলেন পরম-উদার-মতাবলম্বিনী··· সাহিত্যে-শিল্পে এবং অভিনয়-কলায় তাঁর ছিল অসাধারণ অনুরাগ। ভলটেয়ার, দিদেরো, মন্তেস্কু, ব্যুফোঁ, লক, ব্লাকষ্টোন্‌ প্রভৃতি দেশ-বিদেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সঙ্গে রাণী কাথ্‌রিনের রীতিমত পত্রালাপ চলতো। নিজেও তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন এবং তাঁরই আনুকূল্যে নোভিকভ্‌ নামে এক গ্রন্থ-প্রকাশক রুশ-দেশে

সর্ব্বপ্রথম সুলভে গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সাংস্কৃতিক-উন্নতি ছাড়া কাথ্‌রিনের আমলে রাজ্য বেশ বিস্তার-লাভ করেছিল। তুর্কীদের সঙ্গে বার-বার যুদ্ধের পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কাথ্‌রিনের পরম-প্রেমাস্পদ সেনা-নায়ক প্রিন্স গ্রেগরী আলেক্‌জান্দ্রোভিচ পোটেম্‌কিন্‌ ক্রিমিয়া-দেশটিকে রুশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজয়ী-বীর পোটেম্‌কিন্‌ ছাড়া রাণী কাথ্‌রিনের আরো অনেক প্রণয়ী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৃতীয় পিটারের আততায়ী গ্রেগরী ওর্লভের ভ্রাতা প্রিন্স আলেক্সিস্‌ ওর্লভ্‌। ইনি ছিলেন কাথ্‌রিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র-সেনাধ্যক্ষ। এঁ'রই অধিনায়কত্বে রুশ-নৌ-সেনাবাহিনী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে চেশ্‌মের নিদারুণ জল-যুদ্ধে পরাক্রান্ত তুর্কীদের পরাজিত এবং বিপর্য্যস্ত করেন। তা ছাড়া, পোলাণ্ড-বিজেতা বীর-সেনাপতি সার্জ্জিয়াস্‌ সাল্টিকভ্‌ও ছিলেন রাণী কাথ্‌রিনের বিশেষ-গুণমুগ্ধ প্রণয়ী। এই সব সুদক্ষ-সেনানায়কদের আপ্রাণ-চেষ্টায় এবং কাথ্‌রিনের সবিশেষ-উৎসাহে সে আমলে রুশ-সৈন্যবল যেমন বর্দ্ধিত হয়, তাদের শিক্ষাও তেমনি উৎকর্ষ-লাভ করে। শৌর্য্যে-বিক্রমে রুশ-সেনাদল ক্রমে এমন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের শাসক-সম্প্রদায় এদের ভয়ে রীতিমত তটস্থ থাকতেন!
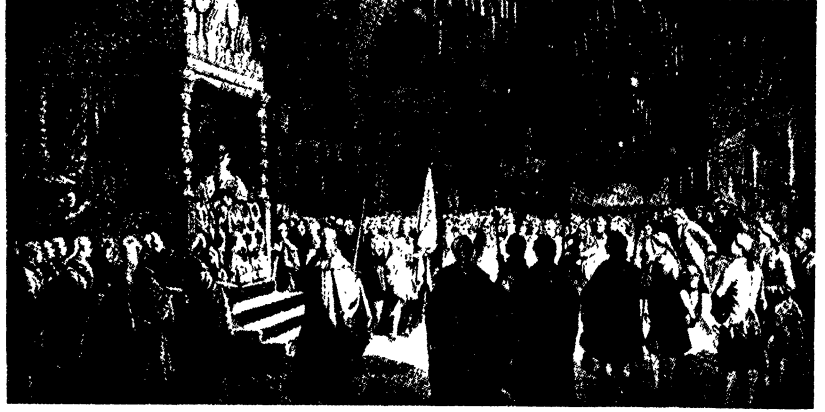
মস্কোর রাজ-দরবারে রাণী ক্যাথারিণের রাজ্যাভিষেক—প্রাচীন রুশ চিত্রের প্রতিলিপি

সৈন্যবল-বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে রাণী কাথ্‌রিনের যেমন দৃষ্টি ছিল, দেশে দাস-প্রথা-নিবারণের ব্যাপারে ছিল তাঁর তেমনি উদাসীনতা! দাস-প্রথা রহিত না করে, সে-প্রথার প্রসার-সাধনে রাণী কাথ্‌রিনের বিশেষ উৎসাহ থাকার দরুণ তাঁর রাজ্য-কালে দেশে 'দাসের' সংখ্যা দাঁড়ায় আটলক্ষের উপর! তা ছাড়া দেশের চিরাচরিত-প্রথানুসারে 'দাসদের' উপর পীড়ন-নির্য্যাতন চলতো সমানে...তার ফলে, জন-গণের মধ্যে তুমুল বিপ্লবের আন্দোলন জাগিয়ে তোলেন পুগাচেভ্‌ নামে ডন-নদীর উপকূলবাসী এক বিদ্রোহী কশাক-নেতা। সে-আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে রাণী কাথ্‌রিন প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অপনোদনের ভান করে রাজ্যের চারিদিক থেকে সর্ব্ব-শ্রেণীর ৫৬৪ জন প্রতিনিধিকে সাদর-আহ্বান জানিয়ে রাজধানীতে ডেকে এনে আঠারো মাস (১৭৬৬-১৭৬৮) ধরে মন্ত্রণার বিরাট আয়োজন করেছিলেন! সে বৈঠকে প্রজাদের হিতার্থে নানা জনে নরম-গরম নানা আলোচনা চালালেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-সবের কোনোটাই আর কার্য্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো না...রাজ্যের দীন-দরিদ্র সাধারণ প্রজাদের দুরবস্থা যেমন ছিল, তেমনি রইলো—এতটুকু অদল-বদল ঘটলো না তার। এভাবে প্রবঞ্চিত হবার ফলে বিদ্রোহী-নেতা পুগাচেভের নেতৃত্বে প্রপীড়িত জন-গণ প্রচণ্ড-আক্রোশে সারা দেশ জুড়ে বিপ্লব বাধিয়ে তুললো। সে-বিপ্লবের আগুনে মস্কো-রাজধানী প্রায় ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। অনাচারী-অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুশ-রাজ্যের নির্য্যাতিত প্রজা-সাধারণের এই বিপ্লব-দমনে রাণী কাথরিন এবং তাঁর সুদক্ষ-সেনাপতিদের রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে গোলিৎসিন্‌, পানিন্‌ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষদের চেষ্টায় বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং বিপ্লবী-বীর পুগাচেভ্‌ আর তাঁর সহকর্ম্মীদের লোহার খাঁচায় বন্দী করে এনে মস্কোর প্রসিদ্ধ 'Red square' বা 'লাল-চত্বরের' উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার সামনে ফাঁশি-কাঠে ঝুলিয়ে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয়।

(ক্রমশ)

অপ্সরা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।

*　　　*　　　*　　　*

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীর প্রশস্তির মধ্য দিয়া অপ্সরার জন্ম-কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আদিম যুগ, বসন্তকাল, ক্ষীরোদসাগর মন্থিত। দেবাসুর অমৃতের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত। এমন সময় সাগর হইতে উত্থিতা হইলেন—অপরূপ লাবণ্যময়ী, পূর্ণযৌবনা, নগ্নকান্তি উর্ব্বশী; তাঁহার একহাতে সুধাপাত্র, একহাতে বিষভাণ্ড। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্রগর্ভ হইতে অসংখ্য অপরূপ সুন্দরী নারী উত্থিতা হইয়াছিলেন। এই সমস্ত নারীদিগকে দেবাসুর কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই, কারণ তাঁহাদের বংশ কিংবা গোত্রের কোন পরিচয় ছিল না; সুতরাং তাঁহারা "সাধারণী" নামে পরিচিতা হইলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র এই সলিলোত্থিতা রূপলাবণ্যময়ী অনন্তযৌবনা নারীদিগকে বন্দনা করিয়া সুর সভায় আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহারা সুরসভাতলে নর্ত্তকীপদ লাভ করিলেন। অপঃ (জল) হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অপ্সরা নামে পরিচিতা হইলেন (অদ্ভ্যঃ সরতি ইতি অপ্সরা)। এই হইল অপ্সরার জন্মকাহিনীর পৌরাণিক ইতিহাস। এই কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ডে এইরূপই বর্ণিত আছে :—

অপ্সু নির্ম্মথনাদেব রসাতস্মাদ্বর স্ত্রিয়ঃ
উপেতুমনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্।

*　　　*　　　*　　　*

ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্নন্তি সর্ব্বে তে দেবদানবাঃ
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ।

১।৪৩।৩৩,১৫

অপঃ বা সলিল মন্থন হেতু উত্থিত রস হইতে উত্থিত হওয়ায় উহার নাম অপ্সরা। দেবদানব কেহ গ্রহণ না করায় তাঁহারা 'সাধারণী' নামে পরিচিতা হইলেন।

হরিবংশে উল্লিখিত আছে যে অপ্সরা ব্রহ্মার 'সঙ্কল্পজাতা কন্যা' (হরিবংশ ১২৪৭৬)—অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটি। অন্যস্থানে উল্লেখ আছে যে অপ্সরাগণ দক্ষকন্যার সন্তান। ব্রহ্মার সঙ্কল্পজাতা অপ্সরাদের মধ্যে মেনকাদি এগারজন বিখ্যাত অপ্সরার নাম উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অন্য নাম 'বৈদিকী'। তাঁহারা দৈবভাবাপন্না এবং বেদেও তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ আছে—যথা—মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অন্ধম্লোচা, প্রম্লোচা ও মনোবতী। বায়ুপুরাণে উল্লেখ আছে যে নারায়ণের উরু হইতে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন; উরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহার নাম উর্ব্বশী (বায়ুপুরাণ ৫২, ৬৯, ৯০)। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে আরও আঠার জন বিখ্যাত অপ্সরার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা দক্ষের অন্যতমা কন্যা কাশ্যপ ঋষির ত্রয়োদশী পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আঠার জনের মধ্যে তিলোত্তমা, রম্ভা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা 'মৌনেয়' অপ্সরা নামে পরিচিতা। হরিবংশের উল্লেখ অনুসারে প্রধা অপ্সরাদিগের জননী (হরিবংশ ১১৫৫৪) এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৪ অনুসারে মুনি গন্ধর্ব্বদিগের জননী। বিষ্ণুপুরাণে (১,২১,২৪) উল্লেখ আছে যে সমস্ত অপ্সরাই মুনির গর্ভসম্ভূতা। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে সুপর্ণ, বরুণ, চিত্ররথ, নারদ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইঁহাদের কেহ দেবতা, কেহ বা গন্ধর্ব্ব (মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ শ্লোক)।

রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী এবং রম্ভার অনেকবার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গন্ধর্ব্বদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, চিত্রসেনা এবং সুগন্ধার নামই বেশী পাওয়া যায়। যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় অপ্সরা ছিলেন ভর্গা।

মেরুপর্ব্বতে সাধারণতঃ অপ্সরাদের আবাস। মহেন্দ্র

পর্ব্বত এবং মলয় পর্ব্বতও অপ্সরাদের প্রিয় ছিল। তাঁহারা সরস্বতী, কাবেরী, যমুনা এবং গঙ্গার তটভূমিতে বাস করিতেন। নন্দন, মন্দার, মুঞ্জবৎ প্রভৃতি অঞ্চলেও অপ্সরার সন্ধান পাওয়া যায়। অপ্সরা ছিলেন নৃত্যগীতবিলাসিনী। দেবতাদের সভায় অপ্সরাদের গতি ছিল অবারিত। মানুষের সভাতেও অপ্সরাদের গমনাগমন ছিল। রাজা দিলীপের যজ্ঞভূমিতে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন (মহাভারত ৭।৬১।৭)। বিশ্বাবসু এই নৃত্য সভায় সঙ্গীত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

অপ্সরাগণ দেববালা, দেবপত্নী এবং দেব-সঙ্গিনী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহারা রত্ন, মাল্যচন্দন এবং সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিতেন; কণ্ঠে হার, কটিতে মেখলা এবং চরণে নুপুর পরিধান করিতেন। নন্দনকাননের দ্বারে অপ্সরাগণ মাল্য হস্তে পুণ্যাত্মাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বীণা, বল্লকী, মুরজ এবং ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা অভ্যাগত জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদের কেশদাম পঞ্চ বেণীতে বিভক্ত ছিল। সেই বেণী চূড়াকারে শিরের শোভাবর্দ্ধন করিত। সুতরাং অপ্সরার অন্য নাম পঞ্চবেণী। অপ্সরাগণ বসন ত্যাগ করিয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন ও লীলা করিতেন। ব্যাসদেব মন্দাকিনীতে অপ্সরাগণকে ত্যক্ত-বসনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। শুকদেব কিন্তু ত্যক্ত-বসনা লীলা-বিলাসিনী অপ্সরাদিগকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হন নাই, কারণ শুকদেব ছিলেন নিষ্পাপ, আত্মস্থ এবং বিদেহ। নৃত্য অপ্সরাদের জীবনের অঙ্গ। মুনিঋষিদের আশ্রমে শুভকর্ম্মে এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভা হইতে বহু অপ্সরা নৃত্য করিতে আসিয়াছিলেন (রামায়ণ ২।৯১।১৬)। দৈত্যের সভায়ও অপ্সরা নৃত্য করিতেন। পদ্মপুরাণে আছে জালন্ধর দৈত্যের সভায় অপ্সরাগণ নৃত্য গীতের জন্য নিযুক্ত ছিলেন (পদ্ম, উত্তর ৮)। মেনকা কুবেরের সভায় নৃত্য করিয়াছেন, (মহা-সভা ১০)। পুঞ্জিকস্থলা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় নৃত্য করিতেন (মৎস, ১৬১)।

অপ্সরাগণ অত্যধিক দেহ-বিলাসিনী ছিলেন। এইজন্য অপ্সরার অন্য নাম রতি এবং বিশেষ করিয়া একজন বিশিষ্ট অপ্সরা রতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হতাশ প্রেমিকা নারী রতি নাম্নী অপ্সরাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন এবং প্রেমের দেবতার উৎসব করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

সরস্বতী নদীর তীরে সুভূমিক নামে একটি তীর্থ ছিল। সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং মুনিঋষিগণ অন্ততঃ মাসান্তে একবার করিয়া দীব্যক্রীড়া উপভোগ করিতেন। পুরাণে দেখা যায় যে অপ্সরাগণ দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য মুনিগণের ধ্যান এবং তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেন। অলঙ্কার-বিভূষিতা নৃত্যপটিয়সী সঙ্গীত-বিলাসিনী অপ্সরাগণ বহুস্থানে চটুল নয়নাঘাতে কিংবা লীলায়িত দেহভঙ্গীর দ্বারা মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন।

অপ্সরাগণের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। অপ্সরাগণের মধ্যে পুরুষ ছিল না। সুতরাং অপ্সরাগণ অন্য জাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিতেন। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আছে যে, কুবেরের পুত্র জলকুবের রম্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অপ্সরাদের বিবাহ চিরন্তন ছিল না। তাঁহারা সকৃৎ-ভর্ত্তা ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহাদের একমাত্র স্বামী থাকিতেন না। রাবণ একদা রম্ভাকে দিব্যবসনে বিভূষিতা হইয়া পথে গমন করিতে দেখিলেন। রাবণ রম্ভার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন। রম্ভা বলিলেন—আমার পথরোধ করিয়া আমায় অপমান করিবেন না। আমি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্রবধূ, সুতরাং আপনারও পুত্রবধূ। রাবণ বলিলেন—

> স্ম যাস্মি মদেবো চস্ময়েব পত্নীধয়ং ক্রমঃ।
> দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরানাং শ্বাশতীমতা॥
> পতিরপ্সরাং সান্তি চৈক, স্ত্রী পরিগ্রহঃ।
>
> রামা—১।৪।৩৩

অর্থাৎ তুমি যদি কোন পুরুষের একমাত্র স্ত্রী হইতে, তোমার কথার মূল্য প্রয়োগ করা যাইত। তুমি অপ্সরা। অপ্সরা জাতির সর্ব্বদা এক স্বামী থাকে না।

মেনকা উর্ণায়ুর পত্নী ছিলেন। তিনিই প্রমদ্বরার মাতা, অথচ এই প্রমদ্বরার পিতা ছিলেন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু। প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি পুরুরাজের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র নহুষ। কথিত আছে এই নিষ্করুণা মেনকা জন্মের পরমুহূর্ত্তেই সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রমদ্বরা যৌবনে ঘৃতাচী অপ্সরার পুত্রকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। মেনকা তাঁহার অন্যতমা কন্যা শকুন্তলাকেও জন্মের পরেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলেই শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল।

ইন্দ্র অপ্সরা দ্বারা অনেক অপকর্ম্ম করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারিত। সুতরাং ইন্দ্র অপরকে কঠোর তপস্যা অথবা যজ্ঞে নিয়োজিত দেখিলে আতঙ্কিত হইতেন। অপরের যজ্ঞ ও তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পুঞ্জিকস্থলা নামক অপ্সরাকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন (ভাগ ১২ শ্লো) রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে জাবালীর তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন (স্কন্দ-নাগ, ১৪৩) ; দধীচিকে আকর্ষণ করিবার জন্য অলম্বুষাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অলম্বুষার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ভরদ্বাজের তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন ফলে দ্রোণের জন্ম হইয়াছিল। বিভাণ্ডক মুনির তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা উর্ব্বশীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিভাণ্ডক-উর্ব্বশীর পুত্র হইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। উর্ব্বশী ও পুরূরবার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশী ছয়টী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা রাক্ষসদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে তিলোত্তমার রূপ দর্শনের জন্য ইন্দ্র সহস্র চক্ষু হইয়াছিলেন এবং শিব চতুরানন হইয়াছিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দৈত্যকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তিল তিল সংগ্রহ ও সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি অপ্সরা সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারই নাম তিলোত্তমা। বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা নামক রাক্ষসের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র "শৃঙ্গারবেশা" চাঞ্চল্যময়ী তিনটী অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অপ্সরাদের অপাঙ্গ-দৃষ্টি এবং লাস্যময়ী হাস্য ত্রিশিরাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মেনকা। (দেবী ভাগবৎ ৯ম স্কন্দ)।

এই অপ্সরাগণ স্বর্গের নর্ত্তকী বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিতা। ইন্দ্রের অমরাবতীতে অপ্সরাগণ সতত নৃত্য করিতেন। অপরাধ করিলে অভিশাপগ্রস্ত অপ্সরাগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেন। ইন্দ্রের নৃত্য সভায় তাল নষ্ট হওয়ার অপরাধে ইন্দ্রের অভিশাপে রম্ভা বিকলাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে অপ্সরা আদ্রিকা ব্রহ্মার অভিশাপে যমুনায় মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে রাজা বসুর ঔরসে আদ্রিকার সত্যবতীনামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতীর পুত্র ছিলেন ব্যাসদেব (মহা-আদি, ১৫), ব্যাসদেবের ঔরসে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের জন্মকালে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। হাহা এবং হুহু নামে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং বাদ্য দ্বারা শুকদেবের শুভ জন্মক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের জন্মকালেও অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। ভীষ্ম যেদিন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপ্সরারাও অভিশাপ দিতে পারিতেন। ঘৃতাচী বিশ্বামিত্রকে শাপ দিয়াছিলেন, ফলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গোপবালাকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত—ব্রহ্ম-১০)।

কখনও কখনও দেখা যায় যে অপ্সরাগণ স্বেচ্ছায় মুনি-ঋষিগণের ব্রত ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। ভর্গা, সৌরভী, সমীচী, বুদ্‌বুদা এবং লটা নাম্নী পাঁচ জন অপ্সরা এক ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গের চেষ্টা করার অপরাধে এক বৎসরের জন্য কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। রামায়ণে এই পাঁচ জন অপ্সরার অধ্যুষিত একটি সরোবরের উল্লেখ আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্সরা অন্তরীক্ষে উপস্থিত থাকিয়া বীরদিগকে সাধু সাধু বলিয়া উৎসাহিত করেন। মৃতবীরকে দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্য সহযোগে স্বর্গে লইয়া যান। যুদ্ধজয়ী বীরদিগকে মৃত্যুর পরে অপ্সরাগণ সঙ্গীত বাদ্য ও সঙ্গ দ্বারা তৃপ্ত করেন (মহা ৫-২১ ; ১৩-১০৭-১৮)।

অপ্সরার সঙ্গে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষের বিবাহ হইত। ভরতবংশীয় বিন্ধ্যাশ্বের ঔরসে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যার জন্ম হয় (মৎস—৫০), মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। পুঞ্জিকস্থলার গর্ভে মহর্ষি পারের ঔরসে কলাবতীর জন্ম হয় (মার্ক—৬৪)। কৃতাচী অপ্সরার সঙ্গে রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের বিবাহ হয়। কৃতাচী শত কন্যার জননী (রামা, ১।৩)। ঘৃতাচীর গর্ভে ঋষির পুত্র প্রমত্তের ঔরসে রুরু নামে এক পুত্র জন্মে (মহা, আদি-৫)। রাজর্ষি ভদ্রেশ্বরের ঔরসে দশকন্যা জন্মে। উহারা সকলেই অত্রির স্ত্রী ছিলেন (লিঙ্গ—৬৩)।

বশিষ্ঠের ঔরসে কৃতাচীর কপিঞ্জল নামে এক পুত্র জন্মে (লিঙ্গ—৬৩)। যক্ষ কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-ব্রহ্ম ১০)। পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত বেদবতীর বিবাহ হয় (বামন-পুরাণ ৬২, ৬৫)। এই সমস্ত কাহিনী হইতে মনে হয় যে ঘৃতাচী মানব, ঋষি, রাজর্ষি দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানা জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য সমাজের পুরুষ জাতির সংস্পর্শে আসিতেন। হেমা নাম্নী অপ্সরা ময়দানবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহারই কন্যা মন্দোদরী রাবণকে বিবাহ করিয়াছিলেন (রামা ৪-৫-৩৯)। পুঞ্জিকস্থলা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অঞ্জনা নামে বানররাজ কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে কেশরীর বিবাহ হয় (রামা ৪-৬৬-৮); অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম।

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নাগ, পনগ প্রভৃতি জাতির ইতিহাস আংশিক রচনা করা যাইতে পারে। ঐ ইতিহাস বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

অরণ্য-স্মৃতি

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ

ড্রাইভার বল্‌লে—সবাইকে ট্রাক থেকে নামতে হ'বে। অগত্যা অনিচ্ছা-সত্বেও সেই নিদারুণ শীতে নামতে বাধ্য হলাম। শুধু নামা নয়—মোজা জুতো খুলে সেই নদী শুধু পায়ে পার হতে হল। পায়ে সেই ঠাণ্ডা জল লাগতেই যেন ছুরি বিঁধার মত মনে হল, তারপর অবশ্য সব অসাড় হয়ে যাবার মত হ'য়েছিল। ধীর মন্থর গতিতে ট্রাক সেই নদী পার হ'ল। আমিও আবার চড়ে বসলাম।

এখানে নদী পেয়ে আমাদের অনেকে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতে গিয়েছিলেন বলে একটু অপেক্ষা করতে হল। এইখানে অপেক্ষা করতে করতে পূর্ব-আকাশ একটু ফর্সা হ'ল। আকাশের নক্ষত্ররাশিও একে একে নিভতে সুরু করলে। নদীর দু'পাশের বন আবছা দেখা যেতে লাগল। নদীর পরেই একটা "ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড" ছিল, গরুর গাড়ীগুলির রাত কাটাবার জন্য। যে সব গরুর গাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডিপোতে বা ষ্টেশনে পঁহুছাতে পারবে না, তারা ঐ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাবে—এই হ'ল সংরক্ষিত বনের আইন। জঙ্গলের অন্য কোনও অংশে আগুন জ্বালাবার নিয়ম নেই—পাছে জঙ্গলের শুকনো গাছ পাতায় আগুন লেগে যায়। আবার আগুন না জ্বালালেও উপায় নেই, বাঘে গরু বা মহিষ নিয়ে যাবে। তাই এই "ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড"-গুলির প্রয়োজন। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্রায় চোদ্দ, পনেরটী গাড়ী আর তত জোড়া বলদ এবং প্রায় জন ত্রিশেক লোক রাত কাটাচ্ছিল। তারাও সেই মাত্র ঘুম থেকে উঠে মুখে চোখে জল দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে থেকে যাঁরা মুখে চোখে জল দিয়ে এলেন তাঁরা শীতে খুবই কাতর হ'লেন। দাঁতে দাঁত কঠ্ কঠ্ করতে করতে কোন রকমে ট্রাকে এসে উঠলেন। এই নদীটীর নাম "সিল্লা"। এই নদীটী আমাদের শিকারের ব্লকের মধ্যে। এখানে প্রায় কুড়ি মিনিটকাল বিশ্রামের পর পুনরায় আমাদের ট্রাক ছাড়ল। এবার বাইরের দৃশ্য বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার বাঁদিকে একটা বেশ উঁচু জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় পড়ল। খুব লম্বা, প্রায় তিন চার মাইল হ'বে। এই পাহাড়ও আমাদের রাস্তার মাঝে যে জায়গা আছে সেটাতে ছোট ছোট ঝাঁটি বন। এক এক স্থানে আবার ছোট ছোট দশ পনেরটী করে খোলায়-ছাওয়া কর্কু অধিবাসীদের ঘর। এ গুলো এক একটা গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা এক একটিতে বিশ, বাইশ জনের বেশী নয়। তাদের কিছু কিছু ক্ষেত আছে, আর আছে গরু মহিষ।

কিছুদূর আরও এগিয়ে গেলে পর কতকগুলি উট, প্রায় দশ বারটী হবে—কিছু কিছু মাল গাদাই করে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছে, দেখতে পাওয়া গেল। এই ভাবে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দূরে একটা ছোট টিলার উপর আমাদের বাংলো দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে একটা মোড় ঘুরে বাংলোর গেট পার হ'য়ে বাংলোর সামনে এসে পৌছালাম। বেশ সুন্দর আসবাবপত্রে সাজান এই বাংলো। দরজায় দরজায় পর্দ্দা টাঙান। দুটী শোবার কামরা। মাঝে আর একটী বড় কামরা। সেটী খাবার বা ডাইনিং হল্‌। আর্শি ও বেতের ইজি চেয়ারেরও অভাব নেই। মেঝেতে জংলি ঘাসে বোনা এক প্রকারের "ম্যাটিং" পাতা। দেয়ালের ধারে 'ফায়ার প্লেস' বা চিমনি করা আছে প্রতি ঘরে—ঘর গরম রাখার জন্য।

সেখানে পৌঁছিয়েই প্রথমে হাঁড়ীতে জল গরম করে সকলে স্নানের পালা শেষ করা গেল। স্নান করার পরই আলস্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। চাকরেরা এই সময়টাতে স্নান করে ফেললে। কিছুক্ষণ বাদে একজন চাকর এসে ঘুম ভাঙ্গালে ও সামনে এক কাপ গরম চা রাখলে। ঘুম ভাঙ্গাতে মেজাজটা একটু যে খিচড়ে যায় নি তা নয়, কিন্তু সামনে গরম চা পেয়ে কোন রকমে লেপটা গা থেকে নামিয়ে উঠে পড়লাম। চাকরের মুখে শুনলাম বেলা সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সকালে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে আর কিছু খাওয়ার অবকাশ হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ খালি করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি পিণ্ড ঝরিয়ার রেঞ্জার সাহেব এসে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা কইছেন। আমার সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটী মারাঠী ব্রাহ্মণ, খুব গোঁড়া। তিনি তাঁর ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন—সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে। আমরা গোটা তিনেক মো'ষ কিনতে বললাম। এ গ্রামে মোষ পাওয়া যাবে না, সুতরাং দু'চার জায়গা খোঁজ করতে হ'বে। ঐ মোষগুলি বাঘ শিকারে একান্ত প্রয়োজন। ওগুলিকে রোজ বিকালে যেখানে রাত্রে বাঘ চলাচল করা সম্ভাবনা আছে সেই রকম স্থানে বেঁধে আসতে হবে। রাতে বাঘের দৃষ্টিগোচর যদি হয়, আর যদি তখন তারা ক্ষুধার্ত্ত থাকে তাহলে ঐ মোষগুলির একটীকে মেরে টেনে নিয়ে যাবে ও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে উপর থেকে শকুন বা কাকের দৃষ্টি যাবে না এইরকম স্থানে নিয়ে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। কিন্তু একটা বাঘ গোটা মো'ষটাকে এক রাতে খেয়ে শেষ করতে পারে না, তাই দিনের আলোতে তা'রা কাছেই কোথাও শুয়ে ঘুমাবে ও আবার সন্ধ্যের পর এসে বাকি অংশ খাবে। এটা প্রায় স্থির নিশ্চয় যে যদি কাছাকাছি কোন জলাশয় থাকে তা'হলে বাঘ তারই আশে পাশে কোথাও নিশ্চয় দিবা নিদ্রা দেবে। এই রকম জঙ্গল দেখেই ঐ মোষগুলো বাঁধা হয়। পরদিন দুপুর বেলা সেই জঙ্গল 'বিট' করালে বাঘ হল্লা শুনে পালাবে ও তার পালাবার রাস্তার উপর শিকারি কোন গাছে মাচান করে বসবেন এবং বাঘ সুবিধামত জায়গায় এলেই গুলি করবেন। কিংবা শিকারী ঠিক যেখানে বাঘে মারা মহিষটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখেছে, তারই উপর কোন গাছে মাচান বেঁধে বসবেন ও দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর বা সন্ধ্যে বেলায় যখন সেই মরা মো'ষ বা 'মড়ি' খেতে আসবে তখন তা'কে গুলি করবে। তা'ই বাঘ মারার জন্যে এই মো'ষগুলি অপরিহার্য্য।

আমাদের তিনটী মো'ষ বাঁধার ভার শিকারী চমক্ সিংকে দেওয়া হ'ল। চমক্ সিংএর এ জঙ্গলের কোথায় বাঘ চলাফেরা করে তা' জানা ছিল। কোনও বাইরের শিকারী সেখানে গিয়ে বন্ জঙ্গল ভেঙ্গে বাঘের খাবার দাগ খুঁজে খুঁজে তা'র চলাচলের পথ বার করতেই মাসখানেক কেটে যাবে, তা'ই এই ব্যবস্থা। চমক সিংই এই মো'ষ তিনটী প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী মিঞাগঞ্জ গাঁ থেকে কিনে এনেছে। চৌদ্দ টাকা প্রত্যেকটীর দাম নিয়েছে। সে'কালে ঐ দামই ছিল যথেষ্ট ঐ জঙ্গলীদেশে।

দুপুর বেলা ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা দেবার পর তিন দিন তিন রাত্রি রেলগাড়ীতে ভ্রমণের গ্লানি অনেকটা গেল! বৈকাল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ উঠে প্রথম দিন মো'ষ বাঁধার স্থানগুলি নিজেই দেখতে যাব স্থির করে চমক্ সিংএর সঙ্গে বা'র হবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। সাথে চলল মথুরা সিং, গনেশ গয়লা ও নরহর পিণ্ডারী। ওরা প্রত্যেকে এক একটী মোষের দড়ি ধরে নিয়ে চলল। আমাদের বাংলো থেকে প্রায় আধ মাইলের মধ্যে একটী মো'ষ বাঁধা হল। সেখানে বন খুব ঘন। একটী ছোট শুকনো নদী প্রায় হাত পঞ্চাশেক চওড়া, তা'র দু'দিকেই জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড় ছিল। ঠিক নদীর মাঝখানটাতে আমাদের প্রথম মো'ষটীকে বাঁধা হ'ল। রাতের আঁধারেও যা'তে দু'পাশের জঙ্গল থেকে দেখা যায়—এই ভাবে বাঁধা হ'ল। সেখান থেকে আরও প্রায় আধমাইল অগ্রসর হ'য়ে একটা ফায়ার লাইন ও একটী পাহাড়ী নালার সংযোগস্থলে বাঁধা হ'ল। তৃতীয়টী পুনরায় বাংলোর অপর পাশে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটী পাথর ও নুড়িবহুল শুকনো নদীর মাঝে বেঁধে আসা হ'ল। এই শেষোক্ত স্থানেও দু'দিকে বাঁশের জঙ্গল ছিল। মোষগুলি যে সব স্থানে বেঁধে আসা হ'ল তা'র প্রত্যেক জায়গাতেই বাঘের চলাফেরার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বিশেষতঃ প্রথম স্থানটীতে বাঘে ঐ প্রথম 'বেট'টী মারবে এটা আমরা খুবই আশা করেছিলাম।

যখন বাংলোয় ফিরলাম তখন প্রায় বেলা পাঁচটা। শীতের বেলা তা'ই সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে দ্রুতই গা ঢাকা দিয়েছেন। আমরা বাংলো থেকে ইজিচেয়ারগুলি সামনের আঙিনায় বা'র করে দু'তিনজন সঙ্গী মিলে আগামী দিন কি করা হ'বে ও যদি বাঘে আমাদের মোষগুলির একটীকেও মা'রে তা' হলেই বা কি ভাবে কি কি করা যেতে পারে তা'রই আলোচনা হচ্ছিল। আর যদি আমাদের বাঁধা মোষগুলির একটীও বাঘের দৃষ্টিগোচর না হয় এবং বাঘ যদি একটীও মো'ষ না মারে তা'হলেই বা কি করা যাবে। স্থির হ'ল যে যদি একটীও মো'ষ বাঘের পেটে না যায় তা' হলে একটা জঙ্গল হাঁকিয়ে হরিণ, শূয়র প্রভৃতি যা হোক কিছু শিকার করে আনা যাবে।

ক্রমে শীত বাড়তে লাগল। আর বাইরে বসা সম্ভব হল না, আমরা বাংলোর বারান্দায় উঠে এলাম। এখান থেকে সামনে চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সামনে ঢেউএর মত চলে গেছে পাহাড়ের পর পাহাড়। প্রত্যেক পাহাড়ের গায়ে লোমের মত দেখা যায় শালের বন। ঐ সব বনের মধ্যে বিচরণ করছে কত নিরীহ হরিণকুল ও ছোট ছোট জীবজন্তু—যেমন নানা জাতের ছোট ছোট বিড়াল-জাতীয় জানোয়ার, সজারু, র‍্যাটেল, প্যাঙ্গোলিন, হায়েনা ইত্যাদি। আর হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত বাঘ, ভালুক, বাইসন, বন্যবরাহ ইত্যাদি।

সঙ্গীদের মধ্যে অনেকের জঙ্গল সম্বন্ধে এইটী ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই তারা যা' কিছু দেখছিল তা'তেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। যারা শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তা'রা অবশ্য সব সময়েই বাস্তবের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল। ওদের মধ্যে যাদের আবার একটু সাহস বেশী, তারা ওভারকোটে আবৃত হ'য়ে জোৎস্না রাতে

খানিক পাড়া বেড়িয়ে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে অবশ্য বিজ্‌লিবাতিসংযুক্ত রাইফেল নিতে ত্রুটি করল না কেউই। আমিও তা'দের সঙ্গী হ'লাম।

প্রথমে বেরিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পিছু-ঝরিয়ার রেঞ্জার সাহেবের কোয়ার্টার পড়ল। জানালার ভেতর দিয়ে দেখি ভেতরে তেলের আলো একটী জ্বেলে স্বয়ং রেঞ্জার সাহেব বোধকরি কাজে ব্যস্ত আছেন। ঐ শীতে সন্ধ্যের পর তাঁর বাসার সামনে দিয়ে পাথুরে সড়কে অতগুলি জুতোর শব্দে একটু আশ্চর্য্য বোধ করে তাঁর সেই আলোর দিকে হাত আড়াল দিয়ে জানালা দিয়ে ব্যাপার কি তাই দেখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে আমিই বলে উঠলাম "কি রেঞ্জার সাহেব, কাজে ব্যস্ত আছেন নাকি?"

"আপনারা এই শীতে এমন সময় কোথায় চললেন?" এই বলে হাস্‌তে হাস্‌তে গায়ে ওভারকোট ও মাথায় ব্যালাক্লাভা ক্যাপ চড়িয়ে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে বেরিয়ে এলেন। আমরাও তাঁকে পেয়ে খুসী হ'লাম। তিনি আশপাশের রাস্তাঘাট ও বনজঙ্গল সবই চেনেন, সেই জন্যে তিনি আমাদের সঙ্গে আসাতে সুবিধাই হল। এই দিনের ঘটনা লিখছি এই জন্যে যে ঐ যাত্রায় এক কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। আমরা চালু পথ বেয়ে চললাম। দু'দিকে বেড়া দেওয়া রবি শস্যের ছোট ছোট ক্ষেত জ্যোৎস্নার আলোতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। এক একটী ক্ষেতের মধ্যে খুঁটো পুঁতে প্রায় হাত চারেক উঁচু করে ছোট ছোট মঞ্চ তৈরী করা রয়েছে। ঐ সব মঞ্চের উপরটা শুক্‌নো উলু ঘাস দিয়ে ছাওয়া। রাতে বন্যবরাহ বা হরিণ এসে যা'তে ফসল নষ্ট করতে না পারে সেই জন্যে রাতে ক্ষেতের মালিকের পরিবারের একজন করে ঐ মঞ্চগুলিতে শুয়ে থাকে ও প্রহরে প্রহরে যেমন শেয়াল ডাকে তেমনি ধারা করে থেকে থেকে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য যদি ক্ষেতের কাছাকাছি হরিণ বা বন-শুয়োর এসে থাকে তবে ঐ চিৎকার শুনে পালিয়ে যাবে।

খানিকদূর যাবার পর একটী ছোট পাহাড়িয়া নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম। নদীর উপর চওড়া করে কাঠের পুল তৈরী আছে। ঐ পুলের উপর দিয়ে মাল বোঝাই করা ট্রাক পার হ'য়ে যেতে পারে। এখন পর্য্যন্ত এলাম বসতির মাঝখান দিয়ে, পুল পার হয়ে দেখা গেল খানিকদূর পর্য্যন্ত লালমাটির ডাঙ্গা পড়ে আছে। তার উপর আছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে মহুয়া গাছ, গাম্ভার গাছ, পলাশগাছ ও আরও দু'চার রকমের বুনো গাছ। আর আছে থেকে থেকে একরকম কাঁটাওয়ালা ঝাঁটি বন। ঐ ডাঙ্গার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া পথ একেবারে বনের মধ্যে। ঐ ডাঙ্গার ওপাশে দু'চারটী করে শাল গাছ ক্রমে ঘন হ'তে হ'তে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। যেদিক থেকে এলাম সেইদিকে দূরে দু'চারটী গ্রামবাসীর গৃহের মধ্যে তাদের কথাবার্ত্তা শুনা যাচ্ছে। গ্রামের মধ্যে কখনও কখনও দু'একটা কুকুরের ডাকও কানে আসছিল। গ্রামবাসীরা শীতের দৌরাত্ম্যে সন্ধ্যা পার হ'বার পরই যে যা'র নিজের কুঁড়েতে ঢুকেছে। অনেকদূরে একটী ঘরের মধ্যে থেকে একটানা ঢোলের শব্দ কানে আসছিল। জ্যোৎস্নায় এই জায়গাটী চমৎকার লাগছিল। যদি শীত কিছু কম হ'ত ত ঐ জ্যোৎস্না রাতে সেই মনোহর দৃশ্য আরও খানিক বেশী করে উপভোগ করা যেত।

রেঞ্জার সাহেব বলে উঠলেন, রাতের বেলা পায়ে হেঁটে আর বেশী দূর এগোন উচিত হবে না। কারণ সামনে যে মহুয়া গাছগুলি দেখা যাচ্ছিল তার তলায় ঝরে-পড়া মহুয়া খেতে অনেক সময় ভালুক এসে থাকে। বাঘ মানুষকে এড়িয়ে চলতেই চায় যতক্ষণ না সে মানুষ-খেকো হচ্ছে, কিন্তু ভালুকের বেলায় সে কথা খাটে না। ওরা মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে ও নখরাঘাতে মানুষের মাথা, মুখ-চোখের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে এবং মানুষ অতীব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়। রেঞ্জার সাহেবের মুখে এই কথা শুনে আমাদের মধ্যে যারা নূতন, তাদের অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ কেউ বলাবলি করল, "দাদা, চলুন না এখানে এই হাড়কালি করা শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।" বলতে কি, স্বয়ং রেঞ্জার সাহেবও সে স্থান ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়—এই রকমের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যা'রা সাহসী, তা'রা দূরে ভালুক দেখা যায় কিনা তাই লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছিল।

আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে এতগুলি লোকের মাঝে কখনও কোন বুনো জানোয়ার আসবে না—এক বুনো হাতী বা বুনো মোষ ছাড়া। তা' ও-দুটোর একটাও এ অঞ্চলে নেই। তাই সকলের মন্তব্যের মাঝে নিজের মত ব্যক্ত করা অপেক্ষা চুপচাপ চাঁদনি রাতে বন্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অনেকাংশে শ্রেয় বিবেচনা করে একটু দূরে সরে গিয়ে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর স্থির হল বাংলোর দিকে ফেরা যাক। সবায়ের একমত হওয়াতে আবার বাংলোর দিকে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই ফেরা হল।

এক সর্ষের ক্ষেতের ধার দিয়ে যাচ্ছি। সারি বেঁধে চলা হচ্ছে। প্রথম চলেছে দ—, তারপরে বন্দুক নিয়ে রেঞ্জার সাহেব, তারপর চলেছে স—, তারপর হ—, হ-এর পিছনে আছি আমি ও আমার পিছনে আছে আমার একটা চাকর। সকলেই সর্ষে ক্ষেতের ধার দিয়ে চলেছি। হঠাৎ দ— সামনে থেকে একটু জোর গলায় বললে—"এই—", বলার সঙ্গে সঙ্গে রেঞ্জার সাহেব, "ভা-লু" অর্থাৎ ভালুক বলে এক আকাট্ চিৎকার করে পিছনে লাফ মেরে এসে পড়লেন স-এর উপর। তাঁর মাথা গিয়ে খুব জোরসে ঠুকে গেল স-এর গালের হনুতে। স—ত গাল চেপে ধরে উপু হয়ে বসে পড়ল। আমরা ত' অবাক। কই ভালুক-টালুক কোথাও কিছু নেই। বেচারা স-এর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, আর ডানদিকের গালের হনুতে রক্ত জমে নীল্‌চে পড়ে গিয়েছিল। সে ত' উঠেই রেগে রেঞ্জার সাহেবকে বলে উঠল "এ কি রকম রসিকতা?" রেঞ্জার সাহেব কেমন এক রকম বোকার মত দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন। যাই হোক স— আর স্বল্পপরিচিত রেঞ্জার সাহেবকে কিছু বললে না। সে ঝাঁঝাল গলায় দ-কে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি? কেনই বা সে "এই" বলে উঠল। দ-ও একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, সে যা'তে পেছনের লোকটীও শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যে একটু জোরে

বলতে যাচ্ছিল যে এই সর্ষের ক্ষেত যাবার সময় সে লক্ষ্য করে নি, আমাদের আর কেউ সে ক্ষেতটা যাবার সময় দেখেছিল কিনা। কিন্তু "এই" বলার সঙ্গে সঙ্গেই রেঞ্জার সাহেব যে-আকাট্ চেঁচিয়ে ঠিকরে গিয়ে স-এর হনুতে চুঁ মারবেন সেই বা তা জানবে কি করে। রেঞ্জার সাহেব মিহি গলায় একটু প্রতিবাদের সুরে বললেন—"আমরা ত' নদীর ধারে ভালুকের কথাই বলছিলাম—তারপর সবাই নিঃশব্দেই ফিরছিলাম, সামনে একটা সর্ষের ক্ষেত দেখে এত বড় গলায় কেউ "এই" বলে আর্ত্তনাদ করতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে।"

আমরা আর যা'রা যা'রা ছিলাম তাদের কথা কাটাকাটি থামিয়ে সকলকে এগিয়ে চলতে অনুরোধ করতে লাগলাম। যদিও এগিয়ে চল্‌ছিলাম এবং আর সবাই চুপচাপই ছিলাম কিন্তু স-- বিড় বিড় করে নিজের মনে কি বকতে বকতে চলছিল। সে সর্ষের ক্ষেতের বদলে সর্ষে ফুল চোখে দেখছিল, সন্দেহ নেই। রেঞ্জার সাহেব পাছে বেশী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন সেইজন্যে আমরা জোর করে হাঁসি চাপ্‌বার চেষ্টা করছিলাম, ফলে আমাদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

দেখতে দেখতে রেঞ্জার সাহেবের বাসার সামনে আসতে তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় ঢুকলেন। আমরাও প্রাণ খুলে হেঁসে বাঁচলাম। কিন্তু স—হাঁসল না। বাংলোয় ফিরে ল্যাম্পে দেখি স-এর গাল ফুলে উঠেছে, আর হনুর কাছে রক্ত জমে কাল্‌সিটে পড়ে গেছে। বেশ যন্ত্রণাও হচ্ছিল, তা'ই তার ভদ্রতার বাঁধ দিয়ে ভাষাস্রোতকে রুখতে পারল না।

যাঁরা জঙ্গলে কর্ম্মব্যপদেশে বাস করেন তাঁরা যে সব সময় সাহসী হ'ন তা নয়। তাঁদের জঙ্গল সম্বন্ধে ধারণা যা'ই থাক জঙ্গলের জানোয়ার সম্বন্ধে ধারণা কিছুই থাকে না। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভীতু হ'ন। দিনের বেলা গাছ 'মার্কিং' করে বেড়ান কুলিদের সঙ্গে। যদি দিনের বেলাতেও একা তাঁদের বনের মধ্যে যেতে বলা হয় তা'হলে তাঁরা যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। এঁদের সাহস মোটেই নেই।

অভিসার

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজ তুমি ফিরে এলে কার বাহু বন্ধে
মেদুর বাদল রাতে কেতকীর গন্ধে ?
ঝরা নীপ-কেশরের
শেষ মধু বাসরের
গাও কোন্ গানখানি নূপুরের ছন্দে ?

কালো তমালের ছায়ে শঙ্কা কি জাগল ?
ঘন-বন-বল্লরী অঙ্গে কি লাগ্‌ল ?
কাঁকনের কণিতে
নূপুরের ধ্বনিতে
পথে ভূঁই-চম্পার স্বপ্ন কি ভাঙ্গ্‌ল ?

বিদ্যুৎ-আঁখি কেন গুণ্ঠনে ঢাক্‌লে ?
বলাকার মালা আজ কেন খুলে রাখ্‌লে ?
ঝাউবন-বীথিকায়
শন্-শন্ গীতিকায়
কোন্ সুর-তুলিকায় কা'র ছবি আঁক্‌লে ?

কামনার অঞ্জন লেগেছে কি চক্ষে ?
তাই কি এ অভিসার দুরু-দুরু-বক্ষে ?
সাজি' নিশিগন্ধায়
আধোজাগা তন্দ্রায়
রূপলোক বন্দিনী, এলে কি অলক্ষ্যে ?

সুন্দরি, ছিলে কোন্ হিমানীর মর্ম্মে ?
অশ্রু-সায়রে কোন্ মুকুতার হর্ম্ম্যে ?
অথবা কি ছিলে সাথী
মেঘলোকে সারারাতি
বিহ্বল বরুণের বিলাসিত নর্ম্মে ?

গাথি নীপমঞ্জরী কুন্তলমাল্যে
গাঢ় মেঘকজ্জলে কি কুহক আন্‌লে ?
দিঙ্‌নাগ-বৃংহন
তাল দেয় সারা'খন,
তাই বুঝি মল্লারে বীণাখানি বাঁধলে ?

দোলে ছায়া-অঞ্চল কহ্লার পর্ণে,
আল্‌তার দাগ ফোটে করবীর বর্ণে,
বক্ষের আবরণ
বনফুল-আভরণ,
অঙ্গ সাজে নি ঊষা-গোধূলির স্বর্ণে ?

আজ তুমি এলে নামি' বল কোন্ সর্ত্তে ?
চন্দন ছাড়ি' এলে পঙ্কিল বর্ত্মে ?
রূপকথা-ছন্দে কি,
যুথিকার গন্ধে কি
শুনাবে তোমারি গীতি তৃষাভরা মর্ত্ত্যে ?

স্বপ্নপুরী সিডনি

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

Vedi Napoli, e poi muori.

ইতালীয় প্রবাদ—"নেপলস্ দেখে মর।" এ পর্যন্ত নেপলস (Naples) দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার শহরগুলি দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ে। অষ্ট্রেলিয়ার শহরগুলির অবস্থান ভারী চমৎকার! বেছে বেছে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের সানুদেশে জনপদ স্থাপন করা হয়েছে। একদিকে অনন্ত নীল সমুদ্র, আর অপর দিকে অরণ্যসমাকীর্ণ সবুজ পাহাড় শ্রেণী—তারই মাঝে মানুষের তৈরী সুন্দর সুন্দর শহরগুলি। এম্নি পাহাড় ঘেরা একটি উপসাগরের তীরে নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনি শহর।

উপসাগরের এক পারে খাস সিডনি শহর—অপর দিকে শহরের উপকণ্ঠ—ক্রেমোর্ণ-মোসম্যান। প্রণালীর দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে বিখ্যাত সিডনি ব্রীজ, যার তুলনা নাকি জগতে নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। একটি মাত্র স্প্যানের (span) উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিরাট ইস্পাতনির্মিত সেতু। দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল, আর প্রস্থে আমাদের নূতন হাওড়া ব্রীজেরও দেড়া। উপর দিয়ে মানুষ, মোটর যান, ট্রামগাড়ী ও রেল যাবার ভিন্ন ভিন্ন পথ রয়েছে। দিন রাত যানবাহন চলাচলের বিরাম নেই। ব্রীজের দুই প্রান্তে দু'টি উচ্চ স্তম্ভ, যার শীর্ষদেশে উঠবার জন্য আছে ইলেক্ট্রিক লিফ্ট। খুশি হয় মাত্র ৯ পেনি দিয়ে উপরে উঠে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সারা সিডনি শহর এবং অদূর সমুদ্রের দৃশ্য একটিবার দেখে নিতে পারা যায়।

দূরাগত অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে ভীড় ক'রে রয়েছে। ষ্টিম ও মোটর লঞ্চ অবিরাম যাত্রী পারাপার করছে। পারানির কড়ি হচ্ছে এক শিলিং। প্রমোদ বিহারের জন্য সুসজ্জিত জাহাজও রয়েছে। চার শিলিং দিয়ে ৬ ঘণ্টার জন্য হারবার ঘুরে আসা যায়। হারবারের দুই তীরেই পাহাড়ের সানুদেশে সুন্দর সুন্দর বাগানঘেরা বাড়ী—স্তরে স্তরে সাজান।

রাত্রিতে যখন নগরীর অসংখ্য আলোকমালা জ্বলে উঠে, তখন এই হারবারের দৃশ্য হয় অপরূপ। বাহির দরিয়ায় কতো বিদেশী জাহাজ যাত্রী বা পণ্য বহন ক'রে দূরের পানে ভেসে চলেছে, আবার কতো জাহাজ বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। যেগুলি বন্দরে নোঙর করে রয়েছে সেগুলি আলোয় আলোময়! নাবিকের দল জাহাজ ছেড়ে ডাঙ্গায় নেমে ফুর্ত্তির খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন জেটিতে একদল ভারতীয় নাবিকের সঙ্গে দেখা। এঁরা দলে ছিল ৭১৮ জন, একজন মাদ্রাজী, আর বাকী সকলেই উড়িষ্যাবাসী। বাংলা কথা বেশ বোঝে ও বলতে পারে। নানা কথাই এরা বলল। গত তিন বৎসর এরা দেশ-ছাড়া। অষ্ট্রেলিয়া থেকে জাপান হয়ে আমেরিকার নানা বন্দরে এদের যাতায়াত। সম্প্রতি এরা কোরিয়া থেকে এখানে এসেছে। এদের জাহাজের নাম ডিভনসায়ার (Devonshire), ডিভনসায়ার হচ্ছে বৃটিশ জাহাজ, বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে কোরিয়া রণাঙ্গনে সৈন্য-পারাপারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

সিডনি হারবারে সেদিন একটি সাবমেরিণের দেখা মিলল। সাব্-মেরিণের ছবি দেখেছি বটে, কিন্তু আসল সাবমেরিণ জিনিসটা কিরূপ তা এই প্রথম দেখলাম। খুব লম্বা সরু—যেন একটা তাঁতের মাকু, মাঝখানে খানিকটা জায়গা উঁচু—সেইখানে পেরিস্কোপ যন্ত্র বসান। মানুষের যন্ত্র-পাঁতির পরিকল্পনা অনেক সময়ে জীব জন্তুর চালচলনের অনুকরণে রচিত হয়। সাবমেরিণ দেখে কচ্ছপের কথা মনে পড়ে। পুকুরে বা খালে দেখা যায় কচ্ছপ জলের উপরে মাথা তুলে নিশ্বাস নেয়, আর চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আবার জলের নীচে আত্মগোপন করে। গঠন ও গতিকৌশলে কচ্ছপের সঙ্গে সাবমেরিণের একটা নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। সাবমেরিণ জলের নীচে গুপ্তভাবে চলা ফেরা করে, আবার সুবিধা মতো জলের উপরে ভেসে উঠতে পারে। জলের নীচে থাকাকালীন লম্বা চোঙার মতো পেরিস্কোপের সাহায্যে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিপদ দেখলে একেবারে জলের নীচে ডুব মারে। সাবমেরিণের কাজ হচ্ছে টর্পেডো মেরে শত্রুর জাহাজ ঘায়েল করা। গত-যুদ্ধে হিটলারের বিখ্যাত U-boat মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহরের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করেছিল।

সিডনি শহর অষ্ট্রেলিয়ার সব চাইতে বড় শহর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের তৃতীয় সর্বপ্রধান নগর ব'লে এর খ্যাতি আছে। এর জনসংখ্যা ১৪।১৫ লক্ষ। আমাদের কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

মেলবোর্ণে প্রায় দুই মাস কাটিয়ে এলাম। মেলবোর্ণ শহরের সৌন্দর্য, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঋজু এবং সযত্ন রক্ষিত। বড় বড় আফিস, হোটেল বা দোকান, বাড়ী আর ছোট ছোট বাংলো বা বাসগৃহ সবই সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই ছোট্ট একটু বাগান—এটা হচ্ছে মেলবোর্ণের একটা বিশেষত্ব। সেন্ট্ কিল্ডা বীচ্—মেলবোর্ণের বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত দেখবার মতো জায়গা। সামনে অনন্ত-বিস্তারী নীল সমুদ্র। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপসাগরের দুই দিকে অনুচ্চ পর্বতমালা—সবুজ গাছপালায় ঢাকা—ফাঁকে ফাঁকে সুদৃশ্য ঘর বাড়ী। সমুদ্রের তীরে তীরে সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজপথ মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে গিয়েছে, যেদিকে ইচ্ছা একশত মাইল অবলীলা-ক্রমে মোটর হাঁকিয়ে যাওয়া যায়।

ছুটির দিনে, বিশেষতঃ যেদিন গরম পড়ে হাজার হাজার নরনারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র তীরে রৌদ্রতপ্ত বালুকা-শয্যায় এরা গা এলিয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যাতপ উপভোগ করে। সান-বেদিং বা রৌদ্র

স্নানের উপযোগী পোষাক—বিশেষ ক'রে মেয়েদের পোষাক—আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকলেও, এদের কাছে এতে দোষনীয় কিছু নেই। তরুণী ও যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত অপরিসর বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ ও স্তনযুগল কোন মতে আবৃত ক'রে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লজ্জা সরমের বালাই নেই। অথচ পুরুষদের বেলায় কড়াকড়ির অন্ত নেই। যে সব হোটেলে থেকেছি সে সব জায়গাতেই আপদলম্বিত ড্রেসিং গাউন না প'রে ঘরের বাইরে যাবার জো ছিল না, অন্যথায় কেবল পায়জামা স্যুট পরিহিত পুরুষ দেখলে লজ্জাশীলা মহিলাবৃন্দের নাকি মূর্চ্ছা যাবার সম্ভাবনা।

কোন এক ভারতীয় মহিলাকে নাকি অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিলম্বিত দীর্ঘ শাড়ীকে হাঁটু অবধি তুলে এই বস্ত্র সংকটের দিনে ব্যয় ও বস্ত্রসংকোচ করায় কি আপত্তি থাকতে পারে? মহিলা কি উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু উত্তর হচ্ছে এই যে, যে কারণে পুরুষের বেলায় হাফ্‌প্যান্ট পরিধান অসামাজিক ও অশোভনীয়—অনেকটা সেই কারণেই ভারতীয় মেয়েদের বেলার হাঁটু অবধি শাড়ীর হ্রস্বতা বিধান অনভিপ্রেত।

সাধারণ ভারতবাসীর ধারণা যে অষ্ট্রেলিয়ানরা ইংরাজেরই জ্ঞাতি ভাই। ভাষায়, চালচলনে ও আচার ব্যবহারে তাই বটে। কোন কোন বিষয়ে এরা আবার ইংরাজের চাইতেও গোঁড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি এরা বহির্জগত বিশেষতঃ এশিয়া ভূখণ্ড ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল বললেই চলে। লণ্ডনগামী জাহাজের যাত্রীর কাছে ভারতবর্ষ বলতে বোম্বাই শহর সম্বন্ধে একটু অস্পষ্ট ধারণাই ছিল যথেষ্ট। ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এদের এতটুকু ধারণাও ছিল না। এখনও পর্যন্ত বহু শিক্ষিত অষ্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষ বলতে গান্ধী নেহেরু জাতিভেদ (Caste System) ও কাশ্মীর এই এই কয়েকটি কথা মাত্রই বোঝে। আবার তাও, পাকিস্থানী অপপ্রচারের কল্যাণে বিকৃত অর্থে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী পররাষ্ট্র বিভাগের কুৎসা প্রচারের বিরাম নাই।

সম্প্রতি কলম্বো পরিকল্পনার কল্যাণে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক ভারতীয় নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যে এদেশে আসছে এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে এদেশের নানাশ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করছে। এই পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদানের ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশের মধ্যে অধিকতর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য গড়ে উঠবে—আশা করা যেতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ানদের জাতিগত কতকগুলি গুণ তুচ্ছ হ'লেও লক্ষণীয়। জাতি হিসাবে এদের এখনও শৈশবাবস্থা। ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের বংশধর হিসাবে এদের মনোভাব যে ইংরাজ-ঘেঁষা হবে এতে আশ্চর্যের বিশেষ কিছু নেই। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে এরা ইংরাজের অনুগামী। সম্প্রতি এদের সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে "অষ্ট্রেলিয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য" প্রচারের ধুম লেগেছে। অষ্ট্রেলিয় সাহিত্য ব'লে যে জিনিসটাকে এরা জোর গলায় প্রচার করতে চাইছে সেটা আসলে ইংরাজী সাহিত্য বই অন্য কিছু নয়—বিশেষত্ব এইটুকু মাত্র যে যে ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশের বদলে আমরা পাই অষ্ট্রেলিয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। পাইনগাছের বদলে গামটি (ইউক্যালিপটাস), আর লেক ডিষ্ট্রিকটের বদলে বুশ (Bush) এবং নর্দার্ণ ডেজার্ট (Northern desert)। এ ছাড়া এই সাহিত্যের কোন লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে নাই। আসল কথা হচ্ছে জাতি হিসেবে এরা এখনও পর্যন্ত কোন Crisis বা সংকটের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও একদিন ইংরাজদের উপনিবেশ মাত্রই ছিল। প্রধানতঃ যে দুই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করেছে তা' হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কচ্ছেদ, আর দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণ।
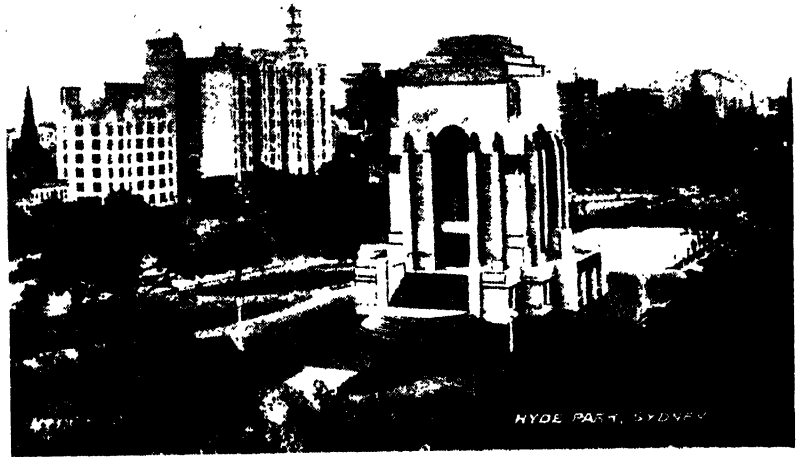
সিড্‌নি নগরীর কেন্দ্রস্থল

অধুনা অষ্ট্রেলিয়ায় ইউরোপ হ'তে দলে দলে immigrant বসবাস করবার জন্য আসছে। এদের মধ্যে আছে ইংরাজ, জার্মাণ, ইতালীয়, ফরাসী, রাশিয়ান, গ্রীক্ প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক। ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির লোকের সংমিশ্রণে হয়তো কালে এই মহাদেশেও একটা নূতন জাতি-সত্তার সৃষ্টি হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় নীতি (White Australian Policy) সম্বন্ধে দু' একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আয়তনে ভারত-

বর্ষের দ্বিগুণ, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র নব্বুই লক্ষ। এই বিরাট ভূখণ্ডের অপরিসীম সম্ভাবনা শতভাবে মানুষের কল্যাণে লাগবার পক্ষে উপযোগী। যদিও এই মহাদেশের উত্তরাংশ মরুভূমি সদৃশ এবং জলের অভাবে কৃষিকার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অকেজো। এদের নিজেদের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ-নৈতিক। অর্থাৎ এরা চায় না যে, এশিয়া ভূখণ্ডের শ্রমজীবীরা এসে এদের জীবন-যাত্রার মান নিম্নগামী করে দেয়। ইউরোপাগত আগন্তুকদের দিক হতে এই আশঙ্কার কোন হেতু নেই। যদিও এরা অর্থ-নৈতিক নীতি বলে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় পলিশির সমর্থনে একটা যুক্তি খাড়া করেছে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এই যুক্তির অসারত্ব ধরা যায়। শ্বেতকায় জাতির বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব-বোধই হচ্ছে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় নীতির পরিপোষক—অর্থনীতির দোহাই হচ্ছে মুখোশ মাত্র। মুখে না বললেও এরাও মনেপ্রাণে দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র কালা-বিদ্বেষী ডাঃ মালানেরই সমধর্মী।

সিড্‌নির বিখ্যাত লৌহসেতু

জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অর্জন না করলেও একজন সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানকে সর্বাংশে ইংরাজের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা ভুল। দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যমদগর্বে স্ফীত "জনবুলের" চেহারা ও প্রকৃতির মধ্যে যে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানের মধ্যে সে সব দোষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা সাধারণতঃই সামাজিক, মিশুক ও মোলায়েম স্বভাবের। রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করবার সময় অনেক সময় ইচ্ছা ক'রেও পথচারী পুরুষ বা মহিলাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস ক'রে সহৃদয় ও সৌজন্যপূর্ণ উত্তর পেয়েছি—বিদেশীদের প্রতি এদের ব্যবহার স্বভাবতঃই আন্তরিকতা-পূর্ণ ও মিষ্ট। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এদের কোন বৈদেশিক আক্রমণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ এই প্রথম এদের মনে জাপানী বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছে। সানফ্রান্সিস্কো সন্ধির (Japanese Peace Treaty at Sans-francisco) আলোচনায় ক্যানবেরা ফেডারেল পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ডাঃ ইভ্যাটের বক্তৃতার প্রতিচ্ছত্রে সেই জাপানী জুজুর ভয় আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ান বৈদেশিক রাজনীতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বেজায় আতঙ্কগ্রস্ত। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানের অমায়িকতার একটা বড় কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান জাতিবৈষম্য ও বিদ্বেষের দিনে অষ্ট্রেলিয়ানদের অমায়িক ও উদার মনোভাব অনস্বীকার্যভাবে প্রশংসনীয়।

ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়ানদের ব্যবহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সিডনি, মেলবোর্ণ ও অ্যাডিলেড প্রভৃতি শহরে যেখানেই গিয়েছি, চোখে পড়েছে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। রাস্তাঘাট, আবাসগৃহ, আফিস-আদালত ও বিপণিশ্রেণী সর্বত্রই একটা সুবিন্যাস, সংযম এবং সুনিয়ন্ত্রণ। শহরের বড় বড় রাস্তায় গাড়ী চলাচলের বিরাম নাই—কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় এ সব শহরে জনপ্রতি মোটরগাড়ী সংখ্যা অনেক বেশী—অথচ শহরের কোথাও, কি বড় রাস্তায় কি ফুটপাথে কোন হৈ চৈ বা হট্টগোল এতটুকু নেই। রাস্তায় পুলিশ বড় একটা দেখতেই পাওয়া যায় না, অথচ সর্বত্রই সুশৃঙ্খলভাবে অসংখ্য যানবাহন ও জনতা পথ অতিবাহন ক'রে চলেছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিউজ ষ্টল—প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাসময়ে ও যথাস্থানে দেখা যাবে সংবাদপত্র ও জর্নাল প্রভৃতি সাজান রয়েছে, কিন্তু প্রায় স্থানেই কোন হকার বা বিক্রেতা নেই। পথচারীর দল যথারীতি মূল্য—তিন পেনি বা চার পেনি দিয়ে কাগজ নিচ্ছে। পয়সাগুলি ট্রে'তে একধারে স্তূপাকারে জমছে—যথাসময়ে মালিক এসে এগুলি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবে। রাস্তার ধারে এভাবে রক্ষকবিহীন পয়সার স্তূপ আমাদের দেশের শহরে পড়ে থাকতে পারে কি?

ওদেশে চুরি, ডাকাতি, জুচ্চোরি বা জালিয়াতি নেই একথা বলব না। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে জাতির নৈতিক চরিত্র যে অনেকখানি উন্নত হয়েছে তার বহু প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে সত্যবাদিতা ও সরল ব্যবহার অষ্ট্রেলিয়ান চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ।

সরকারী অফিস-আদালতেও এদের কর্মতৎপরতা ও সময় নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ইমিগ্রেসন আফিস যেখানেই কর্ম-ব্যপদেশে যেতে হয়েছে—কোথাও অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট

করতে হয় নি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সংগেই অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে একটি অনুসন্ধান বিভাগ। সেই প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ অনুসন্ধান বিভাগে মিলবে। কোন আগন্তুককেই অযথা হয়রানি হতে হয় না। আমাদের বড় বড় সরকারী আফিসেও কোন অনুসন্ধান বিভাগের বালাই নেই। কোন কাজ নিয়ে কোন আফিসে গেলে অনেক সময়েই এ টেবিল থেকে সে টেবিল, এ কেরাণীবাবু থেকে সে কেরাণীবাবু —ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'তে হয়।

একদিন সিডনির জেনারেল পোষ্ট আফিসে এক ভারতীয় ভদ্রলোক মনের ভুলে ডাকটিকিট না লাগিয়েই তাঁর একখানা চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে—বাসায় ফিরে এসে সে কথা তাঁর মনে পড়ে। তখন উপায় কি? অথচ চিঠিখানা তার বিনা টিকিটে বেয়ারিং হয়ে যাওয়া বিশেষ কারণে অনভিপ্রেত। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে ফোন করা হল। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ভদ্রতাসহকারে বললেন যে ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি অনুসন্ধান ক'রে চিঠিখানা পাওয়া গেল কিনা জানাবেন। একঘণ্টা বাদে টেলিফোন বেজে উঠল। পোষ্টমাষ্টার জানালেন যে চিঠিখানা পাওয়া গিয়েছে এবং যদি পত্রপ্রেরক ইচ্ছা করেন তবে তিনি (P. M.) এক শিলিং টিকিট লাগিয়ে চিঠিখানা যথাস্থানে সেই দিনই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন। বলাবাহুল্য পত্রপ্রেরক তার পরদিন বহু ধন্যবাদান্তে পোষ্টমাষ্টারকে টিকিটের দাম এক শিলিং দিয়ে এসেছিলেন।

এ্যাডিলেড পার্লামেণ্ট ভবন

আর একদিনের ঘটনা। ভারতগামী জাহাজ এডিল্যাড বন্দরে ভিড়লে পর, বারো মাইল দূরবর্তী পার্থ শহরটি দেখবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জাহাজ ঘাটা হ'তে ট্রেণে বরাবর এডিল্যাড যাওয়া যায়। প্রায় সারাটা দিনই এডিল্যাডে ঘুরে বেড়ালাম। বিকালের ট্রেনে ফিরবার পথে গ্রাউণ্ডভিল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতে হ'ল। গাড়ী বদল করবার সময় মাথার উপরের বাংকে রক্ষিত ফেল্টহ্যাটের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হ্যাটবিহীন অবস্থায় জাহাজে ফিরে এলাম। হ্যাটের কথা মনে পড়ল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে। ওটাকে যে ফিরে পাব সে আশা ছেড়েই দিলাম, তবুও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ছুটে গেলাম ষ্টেশন মাষ্টারদের কাছে। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো এবিষয়ে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে একটা সাফ জবাব দিবেন। কিন্তু তা না ক'রে তিনি আমার কথা শুনে তক্ষুণি টেলিফোনে গ্রাউণ্ডভিল ষ্টেশনের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন। সেখান থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে এডিল্যাড ষ্টেশনের সহিত যোগ স্থাপন করলেন এবং আমার নাম ও জাহাজের কেবিন নম্বর ইত্যাদি টুকে নিয়ে বললেন যে ঘণ্টা দুই বাদে হ্যাটের কোন হদিশ্ মিলল কিনা জানাবেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। জাহাজ ছাড়বে রাত বারোটায়। খুব বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি, রাত্রের ডিনারের পর কেবিনে ফিরে এসে দেখি হ্যাট সমেত একখানা ছোট্ট লিপি টেবিলে কেউ রেখে গিয়েছে। ষ্টেশন মাষ্টার হারানো টুপিটা ফেরৎ পাঠিয়ে শুভ যাত্রা কামনা করেছেন। বিদেশী ও অপরিচিত ভদ্রলোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমার দেশের কোন ষ্টেশন মাষ্টার তাঁর স্বজাতির কোন যাত্রীর জন্য এতটা করতেন কিনা জানিনা! জাহাজের টেলিফোনে ভদ্রলোককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া আর বেশী কিছু করবার আমার অবকাশ ছিল না। এমনিতর ছোট খাট অনেক ব্যাপারেই এদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়।
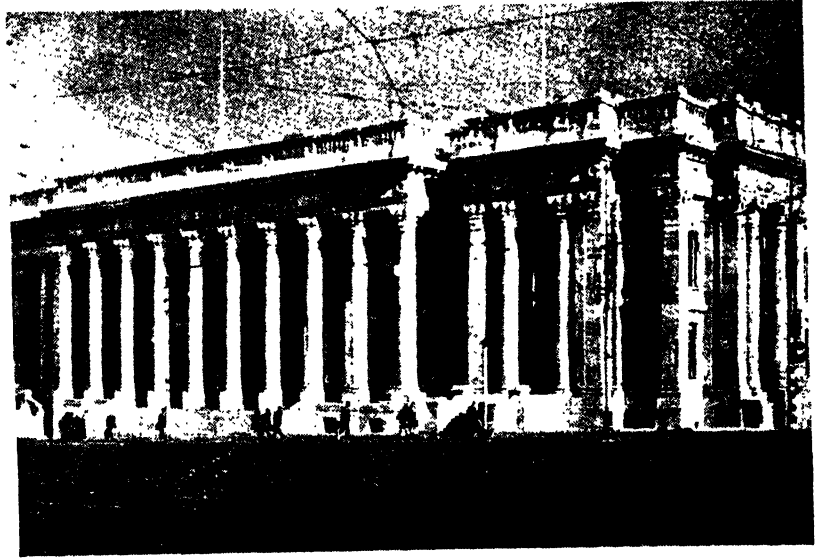
জাতীয় মর্যাদার দিক দিয়ে বিচার করলে অষ্ট্রেলিয়ানদের মাঝারি-গোছের বা mediocre ছাড়া বেশী কিছু বলা যায় না। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৮।৯৯ এবং সে সমাচার নানা ভাবেই এরা ফলাও ক'রে বলে, আর একথাও সত্যি যে ছয় বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে ১৪।১৫ বছর বয়স অবধি প্রতিটি বালক-বালিকার বিনা খরচে শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা অতি সুচারুভাবেই করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষা ধারা হচ্ছে গতানুগতিক ইংরাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার হুবহু অনুকরণ—এর ভিতর দিয়ে কোন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস নেই। একদিকে নেই কোন প্রাচীন ও ইতিহাস-সমর্থিত ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপট ও অপরদিকে নেই কোন নূতন সৃজনাত্মক প্রচেষ্টা? আদর্শবিহীন শিক্ষাধারা শতকরা নিরানব্বুই জন লোককে সাক্ষর (literate) করে তুলতে পারে কিন্তু প্রকৃত জাতীয়

শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়ায় সাক্ষর বা লিটারেট প্রায় সবাই, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত সে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। দৈনিক খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা ও জনপ্রিয় সাহিত্য—যার মাধ্যমে জাতীয় দৃষ্টিভংগী ও জাতীয় মনীষা অহরহ প্রতিফলিত হয়—সেটা খুব উচ্চাঙ্গের নয়। খবরের কাগজের পাতা খুললে চোখে পড়বে ঘোড় দৌড়, বিবাহ, ডাইভোর্স বা তৎজাতীয় হাল্কা সংবাদ। বিভিন্ন খবরের কাগজের স্তম্ভ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও ভারতীয় কোন সংবাদ চোখে পড়ে নি। এশিয়া ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইংলণ্ড বাদে জগতের অন্য যে কোন দেশ সম্বন্ধেই এদের জ্ঞানের সংকীর্ণতা মারাত্মক। ডাঃ পিটার রাসো (Dr. Peter Russo) মেলবোর্ণের 'Argoz' নামক দৈনিক পত্রিকার পররাষ্ট্র-সম্পাদক। বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল—এঁর কিছুটা খ্যাতি আছে। একদিন এক ছোট্ট সভায় এঁর বক্তৃতা হ'ল। বক্তৃতার বিষয়—অষ্ট্রেলিয়া ও প্রাচ্য দেশ সমূহ। ভদ্রলোকের কথায় মনে হ'ল তিনি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে খুব সচেতন, খানিকটা গর্বিতও বটে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান দেখলাম "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" নামক দু'খানা গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি নাকি শ্রীজওহরলাল নেহেরু আর পরলোকগত লিয়াকৎ আলীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্র কর্ণধার দু'জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন যে জওহওলাল নেহেরু চান যে পাকিস্থান যত শীঘ্র আবার ভারতের সঙ্গে মিলিত হয় ততই মঙ্গল, আর নেহেরু নাকি সেই স্বপ্নই দেখেন। কিন্তু লিয়াকৎ আলী পাকিস্থানের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ভারত বিভাগকে তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলেই গ্রহণ করেছেন। এই সহজতথ্য আবিষ্কারের জন্য ভদ্রলোক কষ্ট ক'রে অতদূর না আসলেও পারতেন এবং তাঁর অভিমত জানতে পারলে যে শ্রীনেহেরু পুলকিত হবেন না একথা নিঃসন্দেহ। আসল কথা হচ্ছে ইংরাজের বশংবদ অষ্ট্রেলিয়ান এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের পাকিস্থান-প্রীতি সুবিদিত ও সুস্পষ্ট। বহু অষ্ট্রেলিয়ান প্রথমে আমাকে পাকিস্থানী ব'লে সাদর সম্ভাষণ করেছে এবং লক্ষ্য করে দেখেছি যে পরে পাকিস্থানী নয় জেনে যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গদের পাকিস্থান প্রীতির কারণ সর্বজনবিদিত।

জীবনধারণের মান এদের উঁচু। দৈনন্দিন জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের অভাব নেই। বর্তমান জগতের যে কোন দেশের তুলনায় (অবশ্য আমেরিকা বাদে) এদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অধিকতর। মাথা পিছু সর্বনিম্ন আয় সপ্তাহে গড়ে দশ পাউণ্ড। অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড ভারতীয় এগার টাকার সমান। তা'হলে মাথা পিছু সর্বনিম্ন মাসিক আয় হ'ল প্রায় ৪৫০৲ টাকা। সর্বনিম্ন বেতনের তুলনায় সর্বোচ্চ বেতন খুব বেশী নয়—কুড়ি হ'তে ২৫ পাউণ্ড হপ্তায়। এর ফলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থায় বেশ একটা সমতা রয়েছে। এদের সমাজসেবা আইনের বিভিন্ন ধারায় আসন্নপ্রসবা মাতা, নবজাত শিশু, ষোলবৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর ভরণপোষণ, রোগ, দৈবদুর্ঘটনা, দৈহিক কর্মাক্ষমতা, বেকার জীবন, বার্ধক্য ও বৈধব্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার প্রতিকার বা প্রতিষেধকল্পে সরকারী তহবিল হ'তে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ রয়েছে। সব কিছু ব্যাপারেই এরা সরকার বা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী, শিক্ষা সমাজসেবা নিয়ে সাধারণ নাগরিক বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান বড় একটা মাথা ঘামায় না।

আর্থিক স্বচ্ছলতা, বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য এবং জীবনে সমস্যা ও সংগ্রামের অভাব,—মুখ্যত এই তিনটি কারণেই এরা অনেকটা আত্মতুষ্ট। সপ্তাহে পাঁচদিন মোট চল্লিশ ঘণ্টা এরা কাজ করে। বাকী দু'দিন পূর্ণ বিশ্রাম। অষ্ট্রেলিয়ায় শনিবার আর রবিবার বড়ই একঘেঁয়ে—বিশেষ ক'রে বিদেশী বা ভারতীয়দের কাছে। আফিস-আদালত, পোষ্টআফিস, দোকান পাট, সিনেমা-থিয়েটার এমন কি কাফে রেঁস্তরা প্রভৃতি সবই সে দু'দিন ছুটি। অষ্ট্রেলিয়ানরা এ দু'দিন হয় কাপড়কাচা, ইস্ত্রি করা, গৃহ সংমার্জন বা উদ্যান রচনা করবে, অথবা মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়বে ফুর্তির খোঁজে। বাড়ীতে চাকর চাকরাণীর বালাই নেই। কাজের তুলনায় কারিগরের একান্ত অভাব। সে অভাব অবশ্য অনেকাংশেই এরা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সাহায্যে পুষিয়ে নিয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী আফিসগুলিতেও দেখেছি আমাদের দেশে আফিসের মতো আর্দালি পিওনের ছড়াছড়ি নেই। অফিসারেরা নিজেরাই ফাইল বহন করছেন, নিজেদের ডেস্ক-টেবিল ঝেড়ে পুঁছে সাফ করছেন, আর নিজের হাতেই চা তৈরি করছেন এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে আগন্তুককে পরিবেশন করছেন। আবার চা পানান্তে নিজেরাই চায়ের পেয়ালা ধুয়ে মুছে রাখছেন।

অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহারে আমন্ত্রিত হ'য়ে প্রথম প্রথম বড়ই বিব্রত বোধ করতাম—আহারান্তে যখন গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী নিজ হাতে এঁটো বাসন ধুতে সুরু করতেন। শেষে প্রায়ই "may I lend a hand too," আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি—ব'লে বাসন ধোয়ায় লেগে যেতাম।

আফিসে আদালতে অটোমেটিক লিফট্ বা এস্কেলটর (escalatos) লিফট্‌ম্যানের প্রয়োজন নেই। পোষ্ট আফিসের stamp-kioskএ নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে মুদ্রা নিক্ষেপ করলে ষ্ট্যাম্প বেরিয়ে আসবে। সাধারণের মলমূত্রাগারের প্রবেশ দ্বারেও অনুরূপ ব্যবস্থা। যন্ত্রের সাহায্যে এমিতর বহুক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনীয়তা বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। দেশে বেকার সমস্যা তো নেইই, পরন্তু সর্বত্রই কর্মখালির বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি।

হপ্তায় চল্লিশঘণ্টা কাজ—তাও যেন এদের কাছে অতিরিক্ত! ট্রেডইউনিয়নগুলি চল্লিশঘণ্টাকে কমিয়ে পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা করবার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে।

মেঘলোক থেকে

শরতের মেঘ

ফটো : প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শিকার

ফটো : শ্যামল বসু

— নয় —

"O sol dà nesta janela de manha"

সূর্যের আলো পড়ল ঘরের জানালা দিয়ে।

ক্লান্ত অবসাদে তখনো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে গঞ্জালো। সোমদেবের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা একটা গভীর আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল মন। মাথায় ফণাধরা জটা, আরক্তিম চোখ, কপালে মস্ত বড় রক্তচন্দনের তিলক—সব কিছু একসঙ্গে মিলে একটা অশুভ চেতনায় তাকে চকিত করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল, এখানেও সে খুব নিরাপদ নয়—এই মানুষটির দৃষ্টিতেও যা আছে, তাকেও প্রীতির নিমন্ত্রণ বলা চলে না!

তবু!

তবু আর উপায় নেই। পা আর তার চলছে না—পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় যেন ফেটে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। একটু আশ্রয় চাই—একটু জল। বিভীষিকার মতো সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না বটে—কিন্তু বুকের ভেতরে এখনো তাদের নিয়মিত প্রতিধ্বনি বেজে চলেছে। বন্দুকের আওয়াজ—মানুষের আর্ত চিৎকার আর ক্রুদ্ধ অভিশাপ এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার চারপাশে।

কাকা? অ্যাফন্‌সো ডি মেলো? কোথায় তিনি? এখনো কি বেঁচে আছেন? বুকের ভেতর থেকে একটা করুণ কান্নার উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠতে চাইল তার। কিন্তু কাঁদতে পারল না গঞ্জালো। বীর পর্তুগীজের সন্তান চোখের জল ফেলতে পারল না অপরিচিত বিদেশীর সামনে।

—এসো আমার সঙ্গে—আবার ডাকলেন সোমদেব।

ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন—অন্ধকারে একটা বিরাট সমাধিভূমির মতো এখন মনে হচ্ছে মন্দিরটাকে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ধারাবাহিক একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ আসছে—জোয়ার আসছে সমুদ্রের। একটা রহস্যঘন তরঙ্গিত ভবিষ্যতের পূর্বসংকেত যেন!

গঞ্জালোর কিশোর বাহুর ওপরে বাঘের থাবার মতো একখানা কঠিন হাত—সোমদেবের। গঞ্জালো এগিয়ে চলল। পার হল একরাশ অন্ধকার আর শিশিরে ভেজা পথ। তারপর সামনে ভেসে উঠল মস্ত একখানা বাড়ি—একটা প্রকাণ্ড দরজা।

নবাবের প্রাসাদ?

একবার থমকে গেল গঞ্জালো—একবার কুঁকড়ে উঠল শরীর। না—নবাবের প্রাসাদ নয়। আরো কয়েকটি বিদেশী মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। তাদের কেউ সৈনিক নয়—কোনো অস্ত্র নেই তাদের সঙ্গে। দুই চোখে তাদের পুঞ্জিত বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ কী আলোচনা হল তাদের মধ্যে। গঞ্জালো তার একটি শব্দও বুঝতে পারল না। শুধু লোকগুলো বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল তার দিকে—বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তাদের চোখে মুখে।

ভয়াল-দর্শন মানুষটি কী যেন বললেন কর্কশ কণ্ঠে। একসঙ্গে চুপ করে গেল সবাই। একটা আদেশ।

আর একজন গঞ্জালোর দিকে এগিয়ে এল। প্রৌঢ়, শান্ত চেহারার মানুষ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। কোনো কথা বললে না, গঞ্জালোকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলে শুধু।

মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলে গঙ্গালো। ওই ভয়াল-দর্শন মানুষটির চাইতে এ আলাদা। একে যেন বিশ্বাস করা চলে—অন্তত অনেকখানিই করা চলে। অনুসরণ করে চলল গঙ্গালো।

বড়লোকের বাড়ি। প্রশস্ত পাথরের অঙ্গন। দু দিকে সারি সারি আলোকিত ঘর। সামনে যারা পড়ল—তারা অভিবাদন করে সরে সরে যেতে লাগল। মনে হল—এই মানুষটি এ বাড়ির কোনো বিশিষ্ট জন—হয়তো বা গৃহস্বামী নিজেই।

তাই বটে। রাজশেখর।

গঙ্গালোকে নিয়ে রাজশেখর অগ্রসর হলেন। অস্বস্তি আর আশঙ্কায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতিথিকে আশ্রয় দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই—দৈনিক তাঁর অতিথিশালায় অনেক ক্ষুধার্তই অন্ন পায়। আসলে, গঙ্গালো নবাবের কারাগার থেকে পলাতক। খানিকক্ষণ আগে সে ঘটনাটা ঘটে গেছে—এর মধ্যেই তা কানে এসেছে তাঁর। তাই গঙ্গালোকে আশ্রয় দিতে সংকোচটা তাঁর স্বাভাবিক।

কিন্তু না দিয়েই বা কী উপায় ছিল? একটি সুকুমার কিশোর মুখ। সে মুখে কোনো অপরাধের চিহ্নই কোথাও নেই। তা ছাড়া নবাব খুদাবক্স খাঁর রীতি-নীতিও তাঁর অজানা নেই; বিলাসী এবং অকর্মণ্য—চারদিকে ঘিরে আছে স্বার্থপর পারিষদের দল। তাঁর হাতে পড়লে এর আর নিষ্কৃতি নেই। হয় কঠিন কারাবাস, নইলে মৃত্যু।

অস্বস্তি সেখানে নয়। গুরু সোমদেবের ভাবে-ভঙ্গিতে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর মনে। বলেছেন, আর কদিন পরেই অমাবস্যা। একটা মস্ত শুভ-সুযোগ এসে গেছে। এই ছেলেটিকে তাঁর দরকার।

কিসের দরকার? কী সেই শুভ-সুযোগ?

একটা চকিত ভয় শীতল সরীসৃপের মতো নড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে। কী উদ্দেশ্য সোমদেবের? ঠিক কথা—তাঁকে নিয়ে আসবার পর থেকেই এক ধরণের অনুতাপ বোধ করছেন রাজশেখর। কী একটা বিশৃঙ্খলাব অশুভ সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন সোমদেব—সঙ্গে করে এনেছেন কোনো একটা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শিবের প্রতিষ্ঠা নয়—শক্তির রোধন।

—শিব আজ শব হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর বুকে লীলা চলছে চামুণ্ডার—

সোমদেব বলেছিলেন। কথাটা ভালো লাগেনি। আজো ভালো লাগছে না তাঁর চাল-চলন। এই পর্তুগীজ কিশোরটিকে আশ্রয় দেওয়া কি নিরাপদ হল? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

রাজশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করে ডাকলেন তিনি।

—পুরোণো মহলের একেবারে কোণার দিকের ঘরটা খুলে দে। আলো জেলে দে ওখানে। শোবার ব্যবস্থা কর! দৌড়ে যা।

প্রকাণ্ড বাড়ির অঙ্গনের পর অঙ্গন পার হয়ে—বাইরের মহল থেকে অন্দরমহলের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে থামলেন রাজশেখর। একটা খোলা আর খাড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। দুজন লোক দুটি আলো হাতে অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাজশেখর সিঁড়িতে পা দিলেন। গঙ্গালো অনুসরণ করে চলল।

সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। শ্যাওলাধরা—অসমতল। বেশ বোঝা যায়—বহুদিন ধরে এ সিঁড়ি কেউ ব্যবহার করে না। জায়গায় জায়গায় তার ফাটল ধরেছে—ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে তাদের ভেতরে, ভবিষ্যতে একদা হয়তো একটি বিশাল বনস্পতি উঠে সব কিছুকে গ্রাস করে বসবে। বোঝা যায়—বহুদিন এ সিঁড়ি ব্যবহার হয়নি। আর যদিও বা হয়ে থাকে, তা হলে কালে-ভদ্রে।

কিন্তু ক্লান্ত পা নিয়ে আর উঠতে পারছে না গঙ্গালো। ঝিম ঝিম করছে মাথা। চোখ বুজে আসছে থেকে থেকে। যেন নেশার ঘোরে উঠছে সে। যে কোনো সময় পা টলে সে নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তবু এক সময় শেষ হল এই দীর্ঘ সিঁড়ির পালা। ফাটধরা একটা দীর্ঘ বারান্দার পরে দেখা দিল সারবাঁধা কয়েকখানা ঘর। তাদের খান দুই ধ্বসে পড়েছে—সঙ্গী লোকগুলির মশালের আলোয় ইট-পাথর কড়ি-বরগার ভীতিকর ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল গঙ্গালোর।

কোথায় চলছে এরা তাকে নিয়ে? এবং কী প্রয়োজনে?

সামনে একটি ছোট ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। রাজশেখর তারই ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত করলেন গঞ্জালোকে। কিন্তু গঞ্জালো তবু নিঃসংশয় হতে পারল না। তাকিয়ে রইল বিমূঢ় পশুর চোখে।

রাজশেখর অভয়ের হাসি হাসলেন। আবার ইঙ্গিত করে বললেন, যাও।

গঞ্জালো ভেতরে পা দিলে। একটা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অবশেষে। প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে ছোট একটি শয্যা বিছানো হয়ে গেছে এর মধ্যেই—একটি গায়ের আবরণ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তেমনি বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপরে অনুভব করলে, এ আয়োজন নিশ্চয় তারই জন্যে। কিন্তু তারই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো অতিথির জন্যেই হোক—আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না কণামাত্র। সমস্ত শিথিল দেহ-মন নিয়ে সে বিছানাটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সে এলিয়ে রইল চোখ বুজে। মৃত্যু যেখানেই থাক—অন্তত এই রাত্রিতে সে কাছাকাছি আসবেনা এ প্রায় নিশ্চিত। আর যদি আসেই—তাতেই বা কী করা যাবে। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।

কিন্তু কাকা? অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো?

সেই বন্দুকের শব্দ। সেই আর্তনাদ। সেই ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। এখনো একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে। গঞ্জালো উঠে বসল।

তারপরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল সে। বুকে এঁকে নিলে ক্রুশচিহ্ন—প্রার্থনা করে চলল ভার্জিন মেরীর কাছে—মানবপুত্রের কাছে। সমস্ত বিপদ দূর করুন তাঁরা—মুছে দিন সমস্ত সংকট—

প্রার্থনা করতে করতে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একটা আকস্মিক শব্দে চমক ভাঙল।

দু'জন মানুষ এসেছে ঘরের ভিতরে। হাতে খাদ্যের থালা। জলের পাত্র।

খাদ্য—জল!

ক'দিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি—কতদিনের পিপাসা মরুভূমির মতো জমে উঠেছে বুকের ভেতর! গঞ্জালো আর ভাবতে পারলনা। ভার্জিন মেরীর দান। লোভীর মতো থালাটা টেনে নিলে নিজের কাছে।

সুস্বাদু ফল—সুন্দর মিষ্টান্ন। এদের অনেকগুলির স্বাদই তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও মনে হল যেন অমৃত। কিছুক্ষণের মধ্যেই থালা নিঃশেষ হয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল জলের পাত্র।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল লোক দুটি। খাওয়া শেষ হতে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিলে তারা। তারপর তাকে শুয়ে পড়বার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিলনা তার। ক্লান্ত, উত্তেজিত, কয়েক দিনের বিনিদ্র শরীর মন খাবার পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার ভেতরে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো শব্দ উঠছে—চোখে কুয়াশা ঘনাচ্ছে—ঘরটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে সে এলিয়ে পড়ল। বন্ধ দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ ধরে একটা সমুদ্র দুলতে লাগল—কালো ঢেউয়ের ওপরে ফেটে পড়তে লাগল ফেনার অঞ্জলি—একটা বাতাসের হু হু শ্বাস বাজতে লাগল বার বার। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা ছবির মতো থেকে থেকে ভাসতে লাগল অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর মুখ। তার পর কোথা থেকে প্রকাণ্ড পাল তুলে একখানা জাহাজ এল; হাওয়ায় কাঁপছে—হাওয়ায় নড়ছে—বিরাট একটা শবাচ্ছাদনের বস্ত্রের মতো ধীরে ধীরে সেটা যেন গঞ্জালোর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তেল পুড়ে পুড়ে কখন নিবে গেল ঘরের প্রদীপটা। কখন পেছনের ঘন-অন্ধকার জঙ্গলটার ভেতরে আকাশে মুখ তুলে বার তিনেক আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল শেয়াল; কখন পুরোনো মহলের অজস্র ফাটলের আড়াল থেকে যেন ঘুমের ঘোরে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কথা কইল বনেদী তক্ষক; কখন ঝোপের আড়ে একটা শীর্ণ বোড়া সাপকে মুখ তুলতে দেখে ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে কাঁটা তুলে থেমে দাঁড়াল একটা সজারু; কখন তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান লোক এসে চৌকাঠে চেপে বসল পুরোনো মহলের কোনো প্রেতাত্মার মতো; আর কখন নিজের ঘরে বসে প্রদীপের সল্‌তেটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে একখানা তন্ত্রগ্রন্থের তুলোট পাতা ওলটালেন সোমদেব—গঞ্জালো এসবের কিছুই জানতে পারলনা।

আর সেই সময় শাদা পালটা ক্রমশ দূরে সরে গেল। একটা নয়—পর পর কয়েকখানা। রাত্রির অন্ধকারে প্রাণপণে দূরের সমুদ্রে পালিয়ে গেল সিল্‌ভিরা আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের জাহাজ !

তার পর—

তার পর রাত বাড়ল—রাত শেষ হল। শেষ ডাক দিয়ে গর্তের মধ্যে ঘুমুতে গেল শেয়াল ; গায়ের কাঁটা মুড়ে একটা পুরোনো গাছের শেকড়ের তলায় ঢুকল সজারু। শীতক্লান্ত বোড়া সাপটা এক ঝলক ভোরের হাওয়ায় কী একটা টাট্‌কা ফোটা ফুলের গন্ধ পেলো—আস্তে আস্তে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে চলল সেই দিকে। ফাটলের ভেতর গাছের এক টুকরো শুকনো বাকলের মতো নিশ্চুপ ভাবে লেপ্‌টে রইল তক্ষকটা। দরজার গোড়ায় গোড়ায় বসে সমস্ত রাত যে লোকটা রাত্রি আর অরণ্যের শব্দ শুনছিল—পুরোনো মহলের আনাচে আনাচে প্রেতের মতো চোখ মেলে রেখে দেখছিল প্রেতাত্মাদের ছায়া—সে একটা হাই তুলে উঠে গেল তার পাহারা ছেড়ে। নিজের ঘরে সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন—গম্ভীর গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন স্নানের উদ্দেশ্যে। জঙ্গলে সাড়া দিলে পাখিরা—গঞ্জালোর ঘরের খোলা জানালার ওপরে একটা বুল্‌বুল্‌ এসে বসল—শিস্‌ দিয়ে জাগাতে চাইল এই বিদেশী মানুষটিকে।

গঞ্জালো জাগল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পাতায় পাতায় জমাট শিশিরে টুকরো টুকরো রামধনু সৃষ্টি করে সূর্যের আলো পড়ল ঘরে। যে জানালাটায় এসে বুল্‌বুল্‌ এতক্ষণ গঞ্জালোকে ডাকাডাকি করছিল, সেই জানালার মধ্য দিয়েই খানিকটা মধুতপ্ত প্রভাতী অভিবাদন ছড়িয়ে দিলে তার মুখের ওপরে।

গঞ্জালো একবার এপাশ-ওপাশ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে বসল তার পরে।

এখনো সব অস্পষ্ট—সব ধোঁয়া ধোঁয়া। গত রাত্রির সমস্ত গ্লানি আর উত্তেজনা কেটে গিয়ে একটা নিঃসাড় শান্তি জমে আছে স্নায়ুতে। মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন। সদ্যোজাত শিশুর মতো নির্মল মানসিকতা।

ধোঁয়াটা কেটে যেতে লাগল ক্রমশ। নিরনুভব শূন্যতার বোধটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল চারটি দেওয়ালের নির্ভুল সীমারেখার ভেতরে। শ্যাওলা পড়া দেওয়ালের কতগুলো অসংলগ্ন রেখা যেন চোখে এসে আঘাত করল। মনে পড়ে গেল সব—মনে পড়ল গত রাত্রের সমস্ত দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। এসে দাঁড়ালো রৌদ্র ঝরা জানালাটার সামনে। বাইরে যতদূর চোখ যায় একটা অসংলগ্ন জঙ্গল চলেছে—মাঝে মাঝে ভাঙা ইটের স্তূপ। গঞ্জালো জানত না—এ দেশের লোকে জানে, ওর নাম 'যখের জঙ্গল'। রাজশেখরের বাড়ির পেছনে এই ঘন বনের ভেতরে যখের ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে এমনি প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে। ওই ঐশ্বর্যের সন্ধানে নিশি রাত্রে কত লোক ওখানে এসে কেউটের বিষে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

গঞ্জালো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। একটা শিমূল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের টুকরো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। এখান থেকে কত দূরে নবাবের বাড়ি? কোথায় এখন বন্দীত্ব যাপন করছেন ডি-মেলো?

চিন্তাটা মনে জাগতেই ওখান থেকে সরে এল সে। এল দরজার কাছে। কবাট দুটো ভেজানো ছিল, একটু আকর্ষণ করতেই খুলে গেল। গঞ্জালো বেরিয়ে এল বাইরে।

সামনে একটা লম্বা বারান্দা। এখানে ওখানে ভেঙে গেছে—কোথাও কোথাও বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়েছে শূন্যে। সারি বাঁধা কতগুলো ঘর ছিল পাশাপাশি—অধিকাংশই ধ্বংস স্তূপ। একটু দূরেই সেই ফাটধরা পাথরের খোলা সিঁড়িটা। বোঝা যায়—এ অঞ্চলটা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। অর্ধচন্দ্রাকারে এই ভাঙা বাড়িটার মাঝখানে এলোমেলো ঘাস আর ঝোপ-গজানো একটা বিরাট চত্বর—সেইটে পার হলেই একটি নতুন প্রাসাদ মাথা তুলেছে। রাজশেখরের তৈরি নতুন মহল।

তারই ছাতের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টিটা খুশি হয়ে উঠল গঞ্জালোর। আকাশ থেকে মুঠো মুঠো সোনার মতো শীতের রোদ ঝরছে। আর সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনা দিয়ে গড়া একটি মেয়ে। বয়েস তারই মতো হবে—নিবিড় কালো তার চুল—মুগ্ধ উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গঞ্জালোর ঠিক পেছনে—ঘরের কার্নিশের ওপরে এসে সেই বুলবুল্‌টা শিস্‌ দিয়ে উঠল। অত দূরে কি শিসের সেই শব্দটা গিয়ে পৌঁছুল? কে জানে! মেয়েটি হঠাৎ চোখ নামাল। গঞ্জালোকে দেখতে পেল সে।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা চেয়ে রইল। এই পুরোনো পড়ো মহলে কে এমন অপরিচিত মানুষ? প্রেতাত্মা? কিন্তু এর তো পরিষ্কার একটা ছায়া উজ্জ্বল রোদে পায়ের তলায় এসে এলিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বিদেশী। অদ্ভুত বেশবাস। সুন্দর কিশোর কান্তি। মাথায় চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। চাঁদের আলোর মতো গায়ের রঙ। যখের জঙ্গল থেকেই কি উঠে এল কেউ?

—O-LA!

চমকে উঠল সুর্ণপা! ওই নতুন মানুষটি যেন তাকেই ডাকছে।

—O-La! Boz dias!

আবার সেই ডাক। একটা আকস্মিক ভয়ে সুপর্ণা বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেলো ছাতের ওপরে কোথাও কেউ নেই। যাকে সে সম্ভাষণ করে Boz dias—সুপ্রভাত জানাচ্ছিল—সে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

—Bonito!

আর একবার মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল গঞ্জালো।

সকালের আলোয় বাড়ির সামনে পায়চারী করছিলেন রাজশেখর। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। এলোমেলো ভাবনার তাড়নায় মনটা অত্যন্ত চঞ্চল। এই বিদেশী ছেলেটা—

খট্‌—খট্‌—খটা খট্‌—

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। রাজশেখর উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—মুখ শুকিয়ে গেল আশঙ্কায়। একটু দূরেই ধূলোর ছোট একটা ঝড় দেখা যাচ্ছে।

ওই তো—এদিকেই আসছে! তাঁরই বাড়ির দিকে। আসছে দুজন দীর্ঘদেহ ঘোড়সোয়ার—সকালের রোদে তাদের তলোয়ারের বাঁট আর বেশ-বাসের সমস্ত ধাতব জিনিসগুলো চকচক করে উঠছে।

নবাবের সৈন্যই বটে!

কী বলবেন? ধরিয়ে দেবেন ছেলেটাকে? বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল রাজশেখরের। বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেন আশ্রিতকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে? ওই একান্ত একটি কিশোর—অম্লান-সুন্দর মুখ—

কিন্তু বাড়ির চাকর-বাকরদের মুখে মুখে যদি জানাজানি হয়ে যায়? নবাব যদি একবার শুনতে পান যে তাঁর কারাগার থেকে পলাতক খ্রীষ্টানকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁরই একান্ত অনুগত শ্রেষ্ঠী রাজশেখর? তা হলে?

বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলেন না তিনি। তার আগেই দ্রুতগামী দুটি ঘোড়া এসে থামল তাঁর সামনে। তলোয়ারের ঝঙ্কার তুলে নেমে পড়ল নবাবের দুজন সৈনিক।

—সেলাম শেঠজী!

—সেলাম।

—আপনি বুঝি কিছুদিন এখানে ছিলেন না?

ভয়ার্ত মুখে, নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে রাজশেখর বললেন, না। দিন কয়েকের জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম আমার গুরুদেবকে আনতে। আমার নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

—ও।

সৈনিকেরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—বোধ হয় তৈরি করে নিলে প্রশ্নের ভূমিকা। তারপর একজন বললে, কাল নবাবের কয়েদখানা থেকে জনকয়েক শয়তান খ্রীষ্টান পালিয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠী কি কিছু জানেন?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় রাজশেখর বললেন, শুনেছি।

—তাদের দু একটা আপনার এদিকে এসেছে নাকি?

মুহূর্তের জন্যেই হয়তো একবার দ্বিধা করলেন রাজশেখর। শুকনো ঠোঁট লেহন করে নিলেন জিভ দিয়ে।

—না। সেরকম কিছুই জানি না।

—কেউ আসে নি আপনার বাড়িতে?

ওরা কি খবরটা জানে? জেনে-শুনেই কি একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের সাহায্যে এই ভাবে নির্যাতন করতে চাইছে তাঁকে?

রাজশেখর আবার কান পেতে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগলেন কিছুক্ষণ। বললেন, না, কেউ নয়।

—আপনার বাড়ির পেছনে আশ্রয় নিতে পারে তো? ওই যখের জঙ্গলে?

রাজশেখর জোর করে শুকনো হাসি হাসলেনঃ তা হয়তো পারে। কিন্তু সে দুর্বুদ্ধি যদি কারোর হয়, তা হলে স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে সে। গোখরো আর চিতি বোড়া কিল্‌বিল্ করছে ওখানে। নবাবের সৈন্যের কাছ থেকে যদি বা নিস্তার মেলে, তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই।

—তা বটে!—সৈন্য দুজনও এবার হাসলঃ তা হলে কেউ আসেনি বলছেন আপনি?

—না।

—আচ্ছা, চলি তা হলে। কিছু মনে করবেন না—সেলাম!

শেখরের তলোয়ারে আর রেকাবে ঝঙ্কার তুলে আবার দুজনে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। যেমন দ্রুতবেগে এসেছিল, তেমনি দ্রুতগতিতেই ফিরে চলল ঘোড়া। অন্যদিকে কোথাও খুঁজতে চলল নিশ্চয়। আবার দুটো ধুলোর ঘূর্ণি উঠল—তলোয়ারের বাঁট আর পোষাকের অন্যান্য ধাতব অংশগুলো শেষবার ঝিকমিক করে উঠে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

রাজশেখর তখনো সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। বুকের আন্দোলনটা বন্ধ হয়নি—হৃৎপিণ্ডের উচ্চকিত ধক্‌ধকানি শোনা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটাকে এবারে সশব্দে মুক্তি দিলেন রাজশেখর। আপাতত একটা ভয়াবহ সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলল তাঁর।

কিন্তু এতো সবে আরম্ভ—শেষ নয়। এত বড় ব্যাপারটা কখনো চাপা থাকবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং করতে হবে অবিলম্বেই। গঞ্জালোকে নবাবের হাতে তুলে দেওয়া হোক বা না হোক, অন্তত এখান থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। এমন একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না তিনি। অপদার্থ খুদাবক্সখাঁর কাছে মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই কারো।

অতএব, অবিলম্বে একবার সোমদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

রাজশেখর অন্দর-মহলে এলেন। কিন্তু সোমদেবের সঙ্গে দেখা হল না সেই মুহূর্তে। গুরু পূজোয় বসেছেন। তাঁর গম্ভীর গলার মন্ত্ররব বাড়ির ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে। আপাতত তাঁকে বিরক্ত করবার উপায় নেই।

চিন্তিত পায়ে রাজশেখর আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে কে এসে তাঁকে স্পর্শ করল। ফিরে দাঁড়ালেন। সুপর্ণা।

—কিরে?

—পুরোনো মহলে ওটা কী বাবা? অদ্ভুত চেহারা—অদ্ভুত কথা বলে?

রাজশেখর সভয়ে বললেন, তুই দেখেছিস বুঝি? কেমন করে?

—ছাত থেকে। ওটা কী বাবা?

—বিদেশী মানুষ। খ্রীষ্টান। কিন্তু এ সম্পর্কে কাউকে কোনো কথা বলিসনি মা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

—কেন? কী হয়েছে?

—সে অনেক কথা। তোর শুনে কাজ নেই।

সুপর্ণা চুপ করল, রাজশেখর ভাবলেন মিটে গেল সমস্ত।

কিন্তু সেইখানেই শুরু হল নতুন একটা অধ্যায়।

সকাল শেষ হয়ে যখন দুপুর এল, কাঁচা সোনার মতো রোদ দখন গিল্‌টির সোনার মতো রঙ ধরল; ঘখের জঙ্গলে যখন সজারুটা হঠাৎ উঠে বসল গায়ের কাঁটাগুলোয় ঝাঁকুনি দিয়ে; একটা কাক যখন লম্বা শিমুল গাছটার ডালে বসে বিশ্রী গলায় ডেকে উঠল, তখন—

তখন, একটা মৃদু শব্দে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালো গঞ্জালো।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পীড়নে এই নির্জন দুপুরে চুপি চুপি দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বিদেশী মানুষটিকে। ক্রমশঃ

গান

আমার দু' চোখ ভরে দাও গো তুমি
দাও গো আলো দাও
অমন ক'রে ব্যথা দিয়ে
জানি না কি সুখ পাও।
মুক্তা সম চোখের কোণে,
অশ্রু আমার মালা বোনে,
ঝরে যে ঐ মালার কুসুম
দেখ নাকি তাও।

আঁধার পথে একলা আমি
চলতে ভয় পাই
সুদুর থেকে জ্বলে দেখি
তোমার আলেয়াই।
অন্ধ আমি এগিয়ে চলি'
বিপদ বাধা পায়ে দলি
তুমি দেখি সুদূর থেকে
দূরেই শুধু যাও।

কথা ঃ গোপাল ভৌমিক   সুর ও স্বরলিপি ঃ বুদ্ধদেব রায়

সা সা রা II ণ্া ণ্া সা I সা সা রা I ণ্া ণ্া সা I সা -া রা I
আ মা র দু চো খ ভো রে ০ দা ও গো তু মি ০

ণ্া ণ্া সা I স্ন জ্ঞা -া I রা -া -া I রা -া -া I
দা ও গো আ লো ০ দা ০ ০ ও ০ ০

রা রা পা I পা পা -া I মা মা -া I জ্ঞা রা রা I
অ ম ন কো রে ০ ব্য থা ০ দি য়ে ০

ণ্া ণ্া সা I জ্ঞা রা রা I সা -া -া I সা -া -া II
জা নি না কি সু খ পা ০ ০ ও ০ ০

II গা গা মা I মা মা মা I গা গা মা I মা মা মা I
মু ০ ক্তা স ম ০ চো খে র কো ণে ০

গা গা মা I মা -া -া I গা মা গা I রা সা -া I
অ ০ শ্রু আ মা র মা লা ০ বো নে ০

জ্ঞা -া -া I জ্ঞা -া -া I রা রা জ্ঞা I রা সা সা I
ঝ রে ০ যে ঐ ০ মা লা র কু সু ম

প্‌া ণ্‌া ণ্‌া I ণ্‌া প্‌া প্‌া I রা -া -া I রা -া -া I
দে খ ০ না কি ০ তা ০ ০ ও ০ ০

মা জ্ঞা মা I জ্ঞা রা রা I সা -া -া I সা -া -া II
দে খ ০ না কি ০ তা ০ ০ ও ০ ০

II ণ্‌া ণ্‌া ণ্‌া I সা -া -া I দ্‌া দ্‌া দ্‌া I প্‌া প্‌া প্‌া I
আঁ ধা র প থে ০ এ ক লা আ মি ০

ম্‌া ম্‌া প্‌া I দ্‌া দ্‌া ণ্‌া I সা -া -া I -া -া -া I
চ ল্‌ তে ভ ০ য় পা ০ ই ০ ০ ০

সা সা রা I রা -া -া I রা -া মা I রা জ্ঞা জ্ঞা I
সু ন্দ র থে কে ০ জ্ব লে ০ দে খি ০

মা মা মা I রা -া -া I সা -া -া I -া -া -া II
তো মা র আ লে ০ য়া ০ ০ ই ০ ০

II গা গা মা I মা মা মা I গা গা মা I মা -া -া I
অ ন্‌ ধ আ মি ০ এ গি য়ে চ লি ০

গা গা মা I মা -া -া I গা মা গা I রা সা -া I
বি প দ বা ধা ০ পা য়ে ০ দ লি ০

জ্ঞা -া -া I জ্ঞা -া -া I রা রা জ্ঞা I রা সা সা I
তু মি ০ দে খি ০ সু দূ র থে কে ০

প্‌া ণ্‌া ণ্‌া I ণ্‌া প্‌া প্‌া I রা -া -া I রা -া -া I
দূ রে ই শু ধু ০ যা ০ ০ ও ০ ০

মা জ্ঞা মা I জ্ঞা রা রা I সা -া -া I সা -া -া II
দূ রে ই শু ধু ০ যা ০ ০ ও ০ ০

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আদিকাব্য এবং তার প্রভাব

রামায়ণে যে কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উপদেশই আছে তাও নয়; তা ছাড়াও কাব্য রচনা সম্পদের দিকে যে সর্বাংশে এই আদিকাব্য এদেশের পরবর্তী সকল যুগের সাহিত্যের আদর্শস্থল অধীকার করে আছে, সে বিষয়ও কোনো সন্দেহ নেই। সকল কার্য্যেই রসোৎকর্ষ থাকা চাই; মাধুরী ওজ এবং প্রসাদ গুণত্রয়ও থাকার দরকার। কাব্যের যে গুণ থাকলে শ্রবণ মাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তার নাম 'মাধুর্য্য' (বা Elegance) কাব্যের যে গুণ দ্বারা চিত্ত উদ্দীপিত হয় তার নাম 'ওজ' (Incitement); এবং যে গুণ থাকলে শ্রবণ মাত্র অর্থ গ্রহণ করা যায়, তার নাম প্রসাদ গুণ (Perspicuity)। এই সকল গুণই আদি কবির রামায়ণ মহাকাব্যের ভূষণ। ভারতবর্ষের এই আদি শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্যের মধ্যে পরবর্তীকালের কবিরা যে কি কি রস উপলব্ধি করবেন তার ইঙ্গিতও আদিকবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণের গোড়াতে (আদিকাণ্ড, ৮-৯ শ্লোকে) দিয়েছেন:

> পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
> জাতিভিঃ সপ্তভির্মুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম॥
> রসৈ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
> বীরাদিভিঃ রসৈ যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম॥

—পাঠে, গানে সুমধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মান এবং ষড়জ, ঋষভ প্রকৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যে সমলয়ে গানে যোগ্য এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইলেন। আদি কবির এই কাব্য তৎকালীন প্রচলিত সহজ সংস্কৃত ভাষায় সাধারণের পাঠোপযোগী করেই লেখা হয়েছিল।

এ বিষয় এখন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য তার পরবর্তীকালেরও সকল কবিরাই পাঠ করেচেন এবং ভাস, ভবভূতি, কালিদাস এই রামায়ণ থেকে প্রচুর রসগ্রহণ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেচেন। আমরা—এখন কেবলমাত্র মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার দুটি কাব্যের মধ্যে বাল্মীকির-রামায়ণের প্রভাবের বিষয় যা অণূরণন অনুভব করেচি তারই কথা বলব।

কালিদাসের ঋতুসংহার রচনার বহু যুগ পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণে ঋতু-বর্ণন করেছেন, যার সুন্দর আদর্শ থেকে মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার রচনার অণুপ্রেরণা লাভ অসম্ভব ব্যাপার নয়। অরণ্যকাণ্ডের ষোড়শ সর্গে হেমন্ত ঋতু বর্ণনা,—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অষ্টবিংশ সর্গে বর্ষা-বর্ণনা—ত্রিংশ সর্গে শরৎ ঋতু এবং উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গে গ্রীষ্ম বর্ণনা যেরূপ দেওয়া আছে, তা' কালিদাসের ঋতুসংহারের চেয়ে প্রাচীনকালে লেখা হ'লেও, কম সরস নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।

অরণ্যকাণ্ডে (৪-২২ শ্লোক) আছে;……শরৎকাল অতীত হয়ে হেমন্ত আগত। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম তখন পঞ্চবটিতে বাস করছেন। একদিন প্রভাতে; রাম গোদাবরীতে স্নান করতে গেলেন; তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন সীতা দেবী—এবং কলস হস্তে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ হেমন্তের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য দেখে এবং উপভোগ করে রামকে বল্লেন.

> অয়ং সকালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো প্রিয়ংবদ।
> অলংকৃতইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥
> প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
> প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃকালে দ্বিগুণ শীতলঃ॥
> বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
> শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যানকদাভিক্রৌঞ্চসারসে.॥
> খর্জুর পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
> শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভা॥
> অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশদ্বলা।
> বনানা শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা॥
> এতেহি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
> নবগাহন্তি সলিলমপ্রগলভা ইবাহবম্॥

—প্রিয়ংবদ, যে ঋতু আপনার প্রিয় তা' সমাগত। ইহার আগমনে সংবৎসর যেন মঙ্গলময় এবং অলংকৃত হয়। পশ্চিম বায়ু শীতলস্পর্শ, এখন হিমের জন্য দ্বিগুণ শীতল হয়ে প্রবাহিত হচ্চে। অরণ্য সকল বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হয়েছে। তণ্ডুলপূর্ণ কনকবর্ণ ধান্যের শীষ খর্জ্জুর পুষ্পের মত কিঞ্চিৎ নত হয়ে শোভা পাচ্চে। নীহার পাতে ঈষৎ আর্দ্র হরিদবর্ণ তৃণময় স্থান তরুণ সূর্য্যকিরণ সম্পাতে বনভূমি শোভিত হয়েছে। ভীরু জন যেমন যুদ্ধে নামে না, সেইরূপ এই সকল জলচর বিহঙ্গ জলের নিকটে থেকেও জলে আগাহন করছে না।

কালিদাসের ঋতুসংহারের হেমন্তকাল বর্ণনায় আছে:—

> নব প্রবালোদ্গম শস্যরম্যঃ
> প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
> বিলীন পদ্মঃ প্রপতত্তুষারো
> হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম॥

—হেমন্তকাল সমাগত। রম্য শস্য এবং নবপ্রবালোদ্গমে (কচি কিশলয়

উদ্গমে) ফুল্ল, লোধ্র এবং পরিপক্ব শালিধান্যে এবং তুষারপাতে বিলীন পদ্ম, রমণীয় মূর্তিধারণ করে যে।

বাল্মীকির আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের (২৮ সর্গ, ১৭—এবং ২০২১ শ্লোকে) বর্ষাকাল বর্ণন ও কম অনুপম নয়। রাম মাল্যবান পর্বতে—গিয়ে লক্ষ্মণকে বলচেন :

"ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদ প্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত সন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্ত মহার্ণবস্য ॥
বিদ্যুৎপতাকা সাবলাকামালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতি সন্নিকাশাঃ ॥
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণ নাদা
মত্ত গজেন্দ্রাইব সংযুগাস্থাঃ ॥
ধরোদকাপ্যায়িত শদ্বলানি
প্রবৃত্ত নৃত্যোৎসব বর্হিণানি।
বনানি নিবৃষ্টবলাহকানি
পশ্যোপরাহ্নে দধিকং বিভান্তি ॥

—মেঘ বিক্ষিপ্ত থাকায় গগন কোথাও প্রতিভাত হচ্চে আবার কোথাও বা অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে। কোনো কোনো স্থল পর্বতাকীর্ণ নিস্তরঙ্গ সাগরের মত বোধ হচ্চে। বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের মত গর্জন করচে। দেখ, অপরাহ্নে বন যেন অধিকতর শোভায়িত হয়েছে ; মেঘ থেকে প্রচুর বারিপাতে শ্যামল ভূমি তৃণাকীর্ণ হয়েছে, তাতে ময়ূরের দল নৃত্যোৎসবে মেতে আছে।

কালিদাস এই বর্ষাঋতু বর্ণনায় বলেচেন :

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর
স্তড়িৎ পতাকোঽশনিশব্দ মর্দ্দলঃ।
সমাগত রাজবদুদ্ধ তদ্দ্যুতি
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥

—প্রিয়ে, কামিজন প্রিয় নিবিড়কান্তি উদ্ধতরাজ প্রাবৃট সমাগত। জলকণবাহী মত্ত বারিদ ইহার মত্ত মাতঙ্গ ; তড়িৎ ইহার ধ্বজপতাকা এবং অশনি শব্দ ইহার মাদল (মৃদঙ্গ)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (২৬ সর্গে, ২৪ শ্লোকে) বাল্মীকি বর্ষাবর্ণনায় বলেচেন :

বালেন্দ্র গোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমি নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুচ্ছেদেন শুক প্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিত কম্বলেন ॥

—নবতৃণাবৃত ভূমিতে স্থানে স্থানে নবজাত ইন্দ্রগোপকীট * আছে,—যেন মনে হচ্চে কোনো নারী লাক্ষার বিন্দুযুক্ত শুক (চঞ্চু) বর্ণ কম্বল গায়ে দিয়েছে।

কালিদাসের বর্ণনায় (ঋতুসংহার বর্ষা, ৫ শ্লোকে) আছে :—

প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোন্মিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥

—ধরণী বিদালিত নীলমণিবৎ প্রভাসম্পন্ন তৃণাঙ্কুর, সমুদ্গত কন্দলী দল এবং ইন্দ্রগোপকীট সমূহে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে কৃষ্ণাদি বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট মণি সমূহে সজ্জিত বরাঙ্গনার ন্যায় বিরাজিত।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এরূপ বর্ষাবর্ণনা বহু আছে যা' কালিদাসের বর্ষাঋতুবর্ণনার তুলনাযোগ্য। সীতাকে স্মরণ ক'রে শরৎকাল উপনীত দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলচেন (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩০ সর্গ, ৪৮, ৫৬ শ্লোক)

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশিপূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্ ॥
জলংপ্রসন্নং কুসুমং প্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্বম্।
মৃদুশ্চবায়ু বিমলশ্চচন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপবীতকালম্ ॥

—ওই বিশাল হ্রদের জলে অনেক কুমুদ ফুটে আছে। তার মধ্যে একটি হংস সুপ্ত আছে ; যেন রাত্রিতে মেঘশূন্য তারকা। সমাকীর্ণ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। নদীর তীর নববিকশিত কাশপুষ্প মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত হ'য়ে ধৌত নির্মল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় দেখাচ্চে। স্বচ্ছ জল, প্রস্ফুটিত কুসুম, ক্রৌঞ্চের রব, পরিপক্ব ধান্যের ক্ষেত্র। মৃদুবায়ু ও নির্মল চন্দ্র বর্ষা-অন্ত সূচনা করবে।

কালিদাসের ঋতুসংহারে শরৎ-বর্ণনায় আছে :

কাশাংশুকাবিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
অপক্বশালিরুচিরাতনুগাত্রযষ্টি :
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিবরূপরম্যা ॥

—রম্য শরৎকাল, নববধূর ন্যায় সমাজত। কাকবস্ত্র ধারণ ক'রে বিকচ-কমল-মনোজ্ঞ মুখ নিয়ে পক্বধান্যের চারুতনুরুচি ধারণ ক'রে মত্তহংসের নিনাদনূপুর বাজিয়ে অতি রমনীয় রূপ ধারণ করেছে।

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতেও আদিকবি বাল্মীকির অনুসরণ বা অনুকরণ না করলেও কিরূপে রামায়ণ কাব্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন তার বিষয় এবার কিছু আলোচনা করব।

মেঘদূতের পরিকল্পনার সূত্র হ'ল ;······স্বাধিকার-প্রমত্ত একজন

* বর্ষাকালীন ক্ষণস্থায়ী একপ্রকার লাল 'ভেলভেট' পোকা।

যক্ষকে তাঁর প্রভু (কুবের) এক বৎসরের জন্যে অলকা থেকে রামগিরি শৈলশিখরে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (৪র্থ সর্গে, ১৬ শ্লোকে) আছে বিরাধকে বধ করার কালে, বিরাধ রামকে তার পরিচয় দিয়ে বলচে : "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মোহবশে তোমাকে চিনতে পারিনি। আমি তম্বুরু নামক গন্ধর্ব ; রম্ভার প্রতি আসক্তি বশতঃ আমি অনুপস্থিত ছিলাম, সেই কারণে কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছি। মেঘদূতের যক্ষের অভিশাপ ইঙ্গিত এতে রয়েছে। আবার উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গে রাবণের কুবের জয়ের প্রসঙ্গে আছে,—যক্ষগণ সশস্ত্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু পরাজিত ও শ্রান্ত হয়ে নদী-গিরিগুহায় তারা পালিয়ে রইল। তখন কুবের যক্ষদের ভীত দেখে সেনাপতি 'মণিভদ্রকে আহ্বান করলেন। তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মহাকবি কালিদাস মেঘ-দূতের গোড়াতে যে "স্বাধিকার প্রমত্ত" যক্ষকে কুবেরের পাশে একবৎসরের জন্য নির্বাসন দিলেন। সে এই কুবের সেনাপতি নিজক্ষমতায় প্রমত্ত মণিভদ্রও হ'তে পারে। অবশ্য গৌড়ীয় পণ্ডিতেরা 'স্বাধিকার প্রমত্ত' কথার অর্থ করেন—'কর্ম্মে অমনোযোগিতা। কিন্তু 'প্রমত্ত' শব্দের দ্বারা গর্বিত সেনাপতির ভাবই প্রকাশ পায় প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে কালিদাসের সমসাময়িক কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে যক্ষের বিরাট প্রস্তরের যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েচে তার গায়ে প্রস্তর লিপিতে 'মণিভদ্র' নাম পাওয়া গেছে। এবিষয়টি গবেষণার যোগ্য। এতদভিন্ন কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত অনেক বিষয় আছে যা তিনি আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে পেয়েছেন।

আনন্দমঙ্গল

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

বন্ধুর কণ্টকপথে সংকটের সহ করি' রণ,
যষ্টিভরে ষষ্টি পার হইয়াছে এ পঙ্গু জীবন।
সহিয়াছি দুঃখশোক, বহিয়াছি বক্ষে বহু রোগ,
শূলরূপে বিদ্ধ ভুলে করিয়াছি কত দণ্ডভোগ।
ভিক্ষার ঝুলিতে নিত্য লভিয়াছি ধিক্কার, লাঞ্ছনা,
নিতান্ত বাঞ্ছিত জনও করেছে বঞ্চনা।
মোহবশে ভাবিয়াছি বিধাতার বুঝি অবিচার।
তারা শুধু আনন্দেরে স্বাদুতর করেছে আমার,
বেদনার ফাঁকে ফাঁকে তবু বার বার
যে আনন্দ পাইয়াছি এ জীবনে মম
ভাদ্রের মেঘের ছিদ্রে হেম রৌদ্রসম,
সেই আনন্দের কথা মুক্তকণ্ঠে না করি স্বীকার
নিঃশব্দে বিদায় নিলে ক্ষমা নাই তার।

আনন্দ দিয়াছে মোরে দয়িতার প্রেম শুভ্র শুচি,
নবশিশু নন্দনের কুন্দদন্ত রুচি।
আনন্দ দিয়াছে মোরে সৌহার্দ্যের হৃদ্য আলাপন,
রসজ্ঞের শ্রদ্ধানিবেদন।
স্বজনের স্নেহ ভালবাসা,
জনকের শুভাশিস্, জননীর চন্দনাক্ত ভাষা।
আনন্দ দিয়াছে সে-ও যার কাছে করিনি প্রত্যাশা।

মধুচক্রে মকরন্দ ভুলায়েছে মক্ষীর দংশন,
ভুলালো কণ্টকক্ষত গোলাপের গন্ধবিনোদন।
কূজন, গুঞ্জন, মন্দ্র, জলকলতান
আনন্দ অঞ্জলি মোরে সন্ধ্যাপ্রাতে করিয়াছে দান,
কর্ণ-পুটে করিয়াছি পান।
আনন্দ দিয়াছে এই সৃষ্টিযজ্ঞে ভোজ্যের সম্ভার
ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য-বিস্তার,
অফুরন্ত মাধুরীভাণ্ডার।
রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে পরিতৃপ্ত করেছে বসুধা
হরি' ইন্দ্রিয়ের তৃষা, অন্তরের ক্ষুধা,
বসু পাই নাই বটে, বসুধার পাইয়াছি সুধা।
আনন্দ বিছাল' দেহে রৌদ্রদাহে বটতরুচ্ছায়া,
জুড়াল' জাহ্নবীজল জীর্ণ শ্রান্ত কায়া।
আনন্দের দানসত্র খুলিয়াছে মেঘ, চন্দ্র, রবি,
কত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, কবি।
পুষ্পে ভৃঙ্গসম তৃপ্ত, তাঁহাদের শুভসঙ্গ লভি'।

আনন্দ দিয়াছে মোরে সারস্বত ব্রতের সাধনা,
রস-ব্রহ্ম সুন্দরের ছন্দে আরাধনা।
আত্মাও আনন্দ দানে করিয়াছে মোরে আত্মহারা,
আমারি অন্তর উৎসে উৎসারিল সেই রসধারা,
যে আনন্দ দিল তাহা, ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর-সম।
স্মরণে রোমাঞ্চ জাগে সর্ব্ব অঙ্গে মম।
খেয়া ঘাট পথে সেই আনন্দের স্মৃতি
দূর করে সর্ব্ব তাপ, দুঃখ, পাপ, ভাবনা ও ভীতি,
তাই মোর এ পথে পাথেয়,
আনন্দময়ের পদে অর্ঘ্য তাই, তাই সত্য শ্রেয়ঃ।
মনে হয় যত দুঃখ পাইয়াছি সবি মিথ্যা মায়া,
এ চিত্তের ভিত্তিগাত্রে আনন্দেরই ছায়া।

পূনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। পরম সুন্দর। আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে। আমার বক্তৃতা শুনে এসে বলল: "বলুন আমাকে আরো। আমি চাই ধর্মজীবন উপায় কি? আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়—শুনেছি ধর্মজীবনের একটা চাপ আছে—কেবল বলিষ্ঠ দেহ সে-চাপ সইতে পারে।"

আমি বললাম: "এ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। তিনি লিখেছিলেন আমাকে যে খাঁটি মানুষ যখন খাঁটি ধর্মজীবন চায় তখন ভগবান্ তাকে রক্ষা করেনই করেন—এর অন্যথা হ'তেই পারে না।"

আকাশ ছোঁয়া বিশাল 'রেড্ উড' বৃক্ষের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি শিশু

ইন্দিরার নৃত্য দেখে এ মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কতভাবে যে আমাদের সেবা করত সে কী বলব? ইন্দিরার হাঁপানির ওষুধ চাই—পাঠিয়ে দিল—আমার ডাকটিকিট চাই· অমুক অমুক—দিল কিনে নিজে থেকে। একটি টাইপরাইটার—বলল আমারটা নিন। তার সুন্দর মুখ ও নম্র ভাবের মধ্যে কিন্তু একটা কেমন বিষণ্ণতা ছিল। বলত প্রায়ই: "বলুন কী ভাবে যাপন করব আমার জীবন।" বললাম: "এসো একলা যা জানি বলব বৈ কি।" দেখতে দেখতে খুব ভাব হ'য়ে গেল। ফের সেই মামুলি অনুভূতি—স্নেহের মাধ্যমে পর কত সহজেই আপন হয়!"

অ্যাকাডেমিতে সুরু হ'ল আমার বক্তৃতা ২৬শে জানুয়ারি—শুভদিনে, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে। পর পর তিন দিন বক্তৃতা দিয়েছি। কী ভাবে একটু বলি। বলবার ম'ত।

ক্লাসে গিয়ে দেখি দশ-বার জন ছাত্রছাত্রী—বলাই বেশি, আগাগোড়া আমেরিকান। কী ভাবে সুরু করি? ক্লাসে বক্তৃতা আমার সাতপুরুষে কখনো দেয় নি। তার উপর নির্জলা বিদেশী—তার উপর আমেরিকান। মনকে শুনালাম: "ভোলা মন! এবার মনস্ক হ'তে হবে যে! কী করা যায়?" ভোলা মন হঠাৎ রাজি হ'ল মান বাঁচাতে, বলল: "প্রভু! থিওরির কয়েকটি ছেড়ে আগে প্র্যাক্টিক্যাল কিছুর অবতারণা করুন—চাই আগে ওদের উৎসুক্য জাগানো। নৈলে দেখবেন দুদিনে সবাই ভাগবে—আপনার ছায়াও মাড়াবে না।"

তথাস্তু। প্রথম চিলাবল ঠাট—অর্থাৎ শুদ্ধ ঠাটের—একটি গান গেয়েই বললাম আমার সঙ্গে তাল দিতে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক। ওরা দিল—ইন্দিরা পাশে ব'সে তাল দিচ্ছিল ওদের দেখাতে কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়ছে। তারপর, ওদের একটু স্তম্ভিত করাও তো চাই—নৈলে ভাববে: "এঃ! এ তো জলের মতন সাফ!" যে কথা সেই কাজ, ধরলাম বিষমপদী ভেওরা। খানিকক্ষণ তাল দিয়ে দেখাতে দেখাতে ওরা ধরল তালের মূল ঝোঁক তিনটি। আর সঙ্গে সঙ্গে কী পুলক ওদের! কী আশ্চর্য তাল! কী চমৎকার কদম!—ইত্যাদি। তখন বললাম জলদমন্দ্রে: "বন্ধু! বোঝো কী ভাবে আমাদের সঙ্গীত বিকশিত হয়েছে!" তারপর ইমন রাগের ঠাট বুঝিয়ে ধরলাম তাল। এবার পুলক শিৎকারে ওদের প্রায় দশা হয় আর কি!

তারপর বললাম: "এবার নেওয়া যাক্ একটি পরম সুন্দর রাগ যার ঠাট তোমাদের সঙ্গীতে নেই আদৌ—কিনা ভৈরবী। গ্রীস দেশে এলে বলত Phrygian mode—কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নেই এর দোসর"......ইত্যাদি। ব'লেই ধ'রে দিলাম শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব রচনা (অনিলবরণের মহালক্ষ্মী গানের অনুবাদ):

In lotus groves thy spirit roves
Where shall I find a seat for thee ?

গানটি আবৃত্তি করলাম ওরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মতন প্রত্যেকে খাতায় টুকে নিল। তারপর বললাম : "গাও আমার সঙ্গে। প্রথমটা হার মানবে অবশ্য, কিন্তু সাঁতার দেওয়া শিখতে হ'লে শ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল ঝুপ্ ক'রে জলে নামা। এই ইংরাজি গানটি বিশুদ্ধ ভৈরবী সুরে বসানো। তাই যা পারো গাও সঙ্গে সঙ্গে।"

মিনিট পনের গাইতে গাইতে ওরা উচ্ছ্বসিত! কী সুন্দর সুর! কী সুন্দর ঢং এর ছন্দের—ভঙ্গির! ......ইত্যাদি

যখন ভজনগানি আমেরিকান নরনারী গাইতে লাগল একতালে আমাদের ভৈরবী সুর ইংরাজি গানে —তখন গায়ে আমার যাকে বলে কাঁটা দিয়ে উঠল সত্যিই। মনে হ'ল "আহা রে! যদি কলকাতার কোনো আসরে এই কোরাস শোনাতে পারতাম!"

সত্যি, ভাবুন আমার মনের অবস্থাটা। এসেছি কোন্ বিভুঁয়ে যেখানে না জানে কেউ আমাদের ভাষা, না জানে আমাদের সুর, না জানে আমাদের রীতি নীতি চালচলন। এহেন পরিবেশে খাঁ ক'রে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে ইংরাজিতে আমাদের ভারতীয় রাগ রাগিনী সম্বন্ধে, গাইতে হচ্ছে ভারতীয় সুর—তা আবার ওদের ইংরাজি ভাষায় বসিয়ে—আর গাইতে না গাইতে কিনা গান যাচ্ছে জ'মে—শিক্ষা ও ছাড়াছাড়ি সমান আনন্দে আত্মহারা! ভগবান দুঃখ দেন বহু কিন্তু আবার এমন আনন্দও তো দেন!—কেবল (মামুলি) দুঃখ এই যে এমন শিহরণের আবির্ভাব হয় কদাচিৎ—কালে ভদ্রে : Rarely rarely comest thou, spirit of delight! বলেছিলেন কে? শেলি না?

*　　*　　*　　*

পরের দিন মালকোষ গাইলাম খাস বাংলায় ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গাওয়া গান—ঝাঁপতালে :

"রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়!

ইন্দিরা নৃত্যযোগে তাল দেখাল। ওরা আরো উচ্ছ্বসিত! হাতে তাল দিতে লাগাল ওর পায়ের নূপুরের সঙ্গে মিলিয়ে। ভাবুন অকরুণ পাঠক

রেড্‌উড্ বনের দৃশ্য
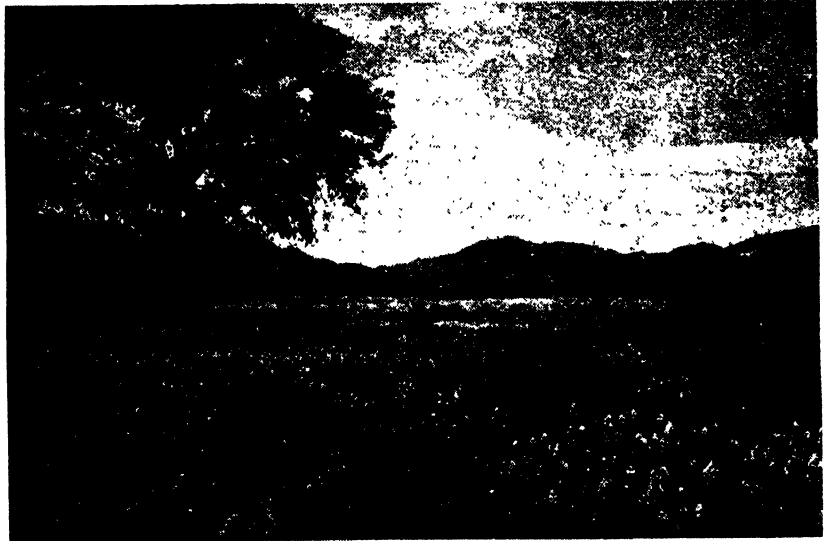
পীতপুষ্প শোভিত 'ব্রাউন হিল'

পাঠিকা! একটু করুণ হ'য়ে ভাবুন কী অঘটনটা ঘটছে অঘটন ঘটন পটীয়সীর ইঙ্গিতে!

কাল যাব ফের শোনাব পিতৃদেবের ঝিঁটিট গান :

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই

আলোর মতন হাসির মতন কুসুমগন্ধ রাশির মতন
হাওয়ার মতন নেশার মতন
ঢেউয়ের মতন এসে যাই।

কিন্তু ওরা গাইবে এটি অবিকল ঐ সুরে—ইংরাজিতে ঃ

We come and float past homing···
Even as light and even as laughter···
Even as the heart-ache's questioning after···
Even as the breeze's mystic thrill
And even as the shimmer of gloaming

দুঃখ এই যে পাদমূলে সমুদ্র দেখতে পেলাম না—কুয়াশা সাধল বাদ। যাহোক ওপারে গিয়ে হু হু ক'রে চলছি তো চলছিই—আর সেই প্রথম দিনের দৃশ্য—ছুটেছে মোটর অগুন্তি অথচ পথে পথিক নেই একটিও!

হঠাৎ, ও মা! পাহাড়ে ওঠা সুরু হ'ল। একেবারে জলজ্যান্ত পাহাড়—আঁকা বাঁকা, উঁচুনিচু—দেখতে দেখতে দুধারে গভীর খট্টা ও উপত্যকা জেগে উঠল। কী সুন্দর! সুইজর্লণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিল। সবুজ পাহাড়ের ঢেউ খেলছে বাঁদিকে, ডানদিকে প্রতিবেশী—তুঙ্গ পাহাড়ের অচলায়তন! চোখ জুড়িয়ে গেল!

তারপর, ওমা! আচম্বিতে হু হু ক'রে মোটর নামতে সুরু করল! দেখতে দেখতে Muir wood বা Red-wood forest!

এপারে ক্যালিফরনিয়া, ওপারে সাউথওয়েষ্ট, মাঝে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ

এখানে কী অপরূপ যে বিটপি-কুঞ্জ তথা বীথিকা! আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ রেডউড গাছ গুলির অজস্রতা ও তুঙ্গতা। এর চেয়ে চওড়া গাছের গুঁড়ি দেখেছি, যথা বট। কিন্তু এত লম্বা গাছ কখনো দেখিনি। সত্যি মিথ্যা জানি না তবে জনশ্রুতি এত লম্বা গাছ আর নাকি নেই ধরাধামে। সবচেয়ে লম্বা গাছটির উচ্চতা ২৪৬ ফিট, বেড় ১৭ ফিট।

কিন্তু শুধু দৈর্ঘ্যে অদ্বিতীয়তাই নয়, কী সুন্দর! চির হরিৎ এই গাছগুলি শীত গ্রীষ্মে যোগীর মতনই সমভাব—সমপ্রফুল্ল—অচল-প্রতিষ্ঠ। পাদমূলে সাথী চলেছে কলধ্বনিময়ী শ্রান্তিহীনা নির্ঝরিণী। অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে সোনার রোদ—মনে পড়ল শেলির লাইন: "The emerald green of leaf-enchanted beams!"

বন্ধুবর সুনীতি আহার্য্য নিয়ে গিয়েছিলেন—ইন্দিরা বেশি কিছু খেল না, কিন্তু আমরা দুজন সানন্দেই পিকনিক করলাম।

* * * *

আর একটি হলে নিমন্ত্রণ মিলল। এখানে আধঘণ্টা ধ'রে বললাম শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের কথা ও জেলে ভগবদ্দর্শনের কথা। তারপরে পিতৃদেবের স্বদেশী গানের কথা ব'লে গাইলাম প্রথম "ভারত আমার ভারত আমার" ও শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত ইংরাজি অনুবাদ। তারপর গাইলাম ইন্দিরার রচিত গান "ইকদিন জানা ইকদিন জানা হৈ পীকি নগরিয়া জানা"—অবশ্য আগে এগানটির অনুবাদ ক'রে গানটির ভাব বুঝিয়ে দিয়ে তবে।

গানান্তে ওরা সোচ্ছ্বাসে ধন্যবাদ দিয়ে হাতে গুঁজে দিল দক্ষিণা—খামে লেখা "with-appreciation" বাড়ি এসে খুলে দেখলাম পঁয়ত্রিশটি ডলার=একশো পঁচাত্তর টাকা। দুদিনে ব্রাহ্মণ বিদায় হ'ল সত্তর ডলার। মন্দ কি—বিশেষ যখন না-চাইতে পাওয়া—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে windfall!

বলব ওদের ঃ "প্রথম গানটি হ'ল নিছক ভক্তির গান, এটি হ'ল ভাবের গান খানিকটা রহস্যময় ওরফে মিস্‌টিক।"

তারপর···কিন্তু পরের কথা পরে।

* * * *

ভৈরবী শেখানোর পরদিন আমার ডিরেক্টর বন্ধু শ্রীমৎ হাণ্টার তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন ফের বহুদূরে, প্রায় ত্রিশ মাইল। গেলাম হু হু ক'রে "স্বর্ণদ্বার সেতু"-র (Golden Gate Bridge) উপর দিয়ে। সানফ্রান্সিস্কোর সবচেয়ে লম্বা সেতুর নাম বুঝি ওকল্যাণ্ড ব্রিজ—সাড়ে আট মাইল লম্বা সমুদ্রের উপর দিয়ে। "স্বর্ণদ্বার সেতু"-ও প্রকাণ্ড ও দীর্ঘতায় বোধ করি মাইল দুই তিন। বন্ধু বললেন এর পরের দিন নিয়ে যাবেন দীর্ঘতম সেতুর উপর দিয়ে।

কিন্তু উণ দীর্ঘতম সেতু দেখেই যারা অস্থির, দীর্ঘতম সেতু দেখলে না জানি কী তাদের অবস্থা হবে! ভাবুন, সমুদ্রের উপর দিয়েই চলেছে ত চলেইছে প্রশস্ত সেতু—এত প্রশস্ত যে পাশাপাশি ছয়টি মোটর ছুটতে পারে এবং প্রায়ই ছুটে থাকে—একদল এদিক থেকে ওদিকে, আর একদল ওদিক থেকে এদিকে—যাকে বাংলা ভাষায় বলে আপ অ্যাণ্ড্ ডাউন।

আশাবরী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে একা আনমনা পাইচারী করছিল সুমনা। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। দিনশেষের একটা গৈরিক ছোপ তার মনকে এই তারাবিভাসিত নিভৃতে ঠেলে দিতো। নিরাবরণ চন্দ্রাতপের নীচে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দুচার ফোঁটা ইলশেগুঁড়ি তখনও পড়ছে। নকল বৈশাখীর নিকষ কালো মালমশলা আকাশের কোণে কোণে ছিন্ন ভিন্ন। সারাদিনের অসহ তিক্ততার পর ভারী আরাম পেলে সে। মনে হলো অনেক দিনের পুরানো আকাশ তাকে নতুন করে হাতছানি দিচ্ছে। সেতারে নতুন তার লাগিয়ে দিয়ে গেছে এক অজানা সেতারী, গলাতেও গান গুণগুণিয়ে ওঠে—তোমার এ ধূপ না পোড়ালে।

কিন্তু তাল কেটে গেলো, হাইহিল জুতোর খট্ খট্ শব্দ করে উপরে উঠে এলো রাজেন্দ্রানীর মত স্বাতী। গ্রীষ্মের ছুটীতে হোষ্টেল খালি—ওদেরি মত দু'একজন ছাড়া সবাই চলে গেছে।

তাচ্ছিল্যভরে একটা বই ছুঁড়ে দিয়ে স্বাতী গম্ভীর স্বরে বললে—তোমার বই, এস্ ডি ওর স্ত্রীকে বুঝি পড়তে দিয়েছিলে, তাঁর চাকর ফেরত দিয়ে গেলো। বইটি দেখছি বেশ কিছুদিন আগের লেখা, এককালে লেখকের নামডাক ছিল, তাই উল্টেপাল্টে দেখছিলাম, বাংলা বইএর বেশীরভাগই থার্ড ক্লাস ট্র্যাশ্—পড়ি না—

ও তাই নাকি—

হ্যাঁ তা দেখলাম বইটা লেখক স্বহস্তে তোমায় উপহার দিয়েছেন—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে—তাই ভাবলাম এত আদরের বইটা নিজের হাতেই ফেরত দিয়ে যাই—

পরিহাস তরল কণ্ঠে হাসতে হাসতে সুমনা বল্লে—

এত কষ্ট না করলেও পারতে, স্বাতীদি—

আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বাতীর প্রায় ফেটে পড়া মুখ চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল সে। বিদ্যুৎগর্ভা নারী বৈশ্বানরময়ী হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করছে—

সেই স্কাউণ্ড্রেল শান্তনুটা দেখছি তোমাকেও মজিয়েছে, চাবকাতে হয় ঐ সব আদর্শবাদী-ভণ্ডদের, কথার আড়ালে যারা নিজেদের লোলুপ মনকে লুকিয়ে রাখে, ভোগ করবার সাহস নেই ত্যাগের বুলি আওড়ায়। পৌরুষহীন ভীরু ভেড়ার দল।

থর থর করে কেঁপে উঠলো সুমনা—

কি বলছো, কাকে বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি না—

হ্যাঁ, ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো, গদগদ হও, কতো বড়, কত ভালো, মহান্, ধীমান, ছেলেরা ছোটে বক্তৃতা শুনতে, মেয়েরা জোটে বই পড়তে—

অবাক হয়ে থাকে সুমনা, কিন্তু আশ্চর্য্য, রাগ হয় না স্বাতীর প্রতি। বরং একটা সমগোত্রীয়া মমতায় মন ভরে ওঠে।

যেমন গট্ গট্ করে এসেছিল স্বাতী তেমনি খট্ খট্ করে চলে গেলো, শুধু রেখে গেলো বিধ্বস্ত প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো লুণ্ঠিত চেতনার এক ভগ্ন চূর্ণ, আর টয়লেট পাউডারের সুগন্ধের সঙ্গে মেশানো ইভনিং ইন প্যারিসের একটু পালিশ করা আমেজ—

মেজাজী মেয়ে বলে স্বাতীর খ্যাতি বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল সত্যি, কিন্তু তাই বলে সে যে অকারণে এমন রূঢ় হয়ে উঠবে তা সুমনা ভাবতেই পারেনি। হাজার হোক্, কোনদিন ঘনিষ্ঠ না হলেও তারা একই জায়গায় দুজনে পড়াচ্ছে, বয়সে কাছাকাছি না হলেও খুব বেশী ছাড়াছাড়ি নয়, আর ভদ্রতারও একটা সহজ সংযম ও সীমা আছে। মফঃস্বলের না সহর না গাঁয়ের এই ছোট্ট ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে যখন উগ্রগন্ধী সান্ধ্যমহলের স্বাতী মিত্রা, কেম্ব্রিজে পড়া ব্যারিষ্টার কন্যা চাকরী করতে এলো, তখন শুধু মৃদু

নয় বেশ সরব গুঞ্জনই উঠেছিল। কুলজী ও শিক্ষাদীক্ষার কথা চেপে গেলেও ভরা যৌবনের সায়রে পালতোলা বঙ্কিম তনুশ্রী চাপা পড়েনি। সর্ব্বশুভ্রা রাজহংসীর মত মরালগ্রীবা বেঁকিয়ে যখন সে ধমক্ দিতো, তখন মনে হতো যেন কোন নর্ডিক পুরাণ থেকে ওডিনপ্রিয়া নেমে এসেছে যৌবনধন্যা রাজকন্যার রূপ নিয়ে।

এরই উল্টো ছিল সুমনা—অত্যন্ত সাদামাটা শান্ত। রোগা কালো ছিপছিপে এই বাঙালীর মেয়েটিকে বড় জোর টেনেটুনে শ্যামলা বলা চলে। বহিঃসলিলা যৌবনের কোন উদ্ধত জলোচ্ছ্বাসই তার তনুতটে আছাড় খেতো না। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যেতো একটা ঘুমের আবছা আমেজ তার পথচাওয়া চোখ দুটোকে ঘিরে এক তন্দ্রালস গভীরে হারিয়ে যাচ্চে। যখন সে সন্ধ্যাবেলায় বৈকালী স্নান সেরে রিক্ত প্রসাধনে এলো-চুলে ছাদে এসে দাঁড়াতো তখন মনে হোত কালিদাসের কাল থেকে খসে পড়েছে এক সদ্যস্নানস্নিগ্ধা সন্নতাঙ্গী। মহাকালের মন্দিরে প্রণাম সেরে বহুদিনের অদেখা প্রিয়জনকে বলছে—আছো ত ভালো।

গরীব বাপ অতি যত্নেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ভালোই ছিল সে, স্কলারশিপও পেয়েছিল। তারই দৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলো সসম্মানে খুলে গেলো, গৌরবের তালিকায় নাম উঠলো। ছেলেবেলা থেকে গান তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেটা ভাল করে শেখবার একটা সুযোগও জুটেছিল। গত বছর দশেক ধরে এখানে ওখানে স্কুলে আফিসে চাকরী করে সে কেমন করে এই প্রায় নাম না জানা অখ্যাততীরে তরী ভিড়িয়েছিল তার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আজ অর্থহীন মনে হয়। আরো অর্থহীন মনে হয় অতো কষ্ট করে শেখা কণ্ঠে নেওয়া গান। বিশ পেরিয়ে পঁচিশ পেরিয়ে ত্রিশ পেরিয়ে এক একটি মাণিকজ্জ্বলা বছর ব্যর্থ ব্যথায় সার্থক করে গীতশ্রী আজ পাণ্ডুতামাননে শ্রী।

মনে পড়ে যেদিন তার গানের প্রথম সাফল্য নিয়ে বাড়ী ফিরলো সেদিন বৈঠকখানায় বসেছিলেন শ্রীপাতিবাবু, তার বাপের বন্ধু, স্কুলের গরীব মাষ্টার, বল্লেন—এসো মা, মনে রেখো, গানটা শুধু সখের খেয়াল নয়, রসের ও সাধনার জিনিস, এটাকে কখনো লোক দেখানো বিলাস করে তুলো না। দুঃখ হয় যখন দেখি মহাকবির এই সাধনাকে ভাগাড়ে পড়া মরা গরুর মত শকুনি মামার দল কৃষ্টির নামে ছিঁড়ছে, তার গান ধন্য হচ্চে না, হচ্চে পণ্য।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুমনা। শান্ত হয়ে আসছে দিগন্তের অবস্থা—মেঘের দল মাদল ছেড়ে পালালো। অনেক দাপাদাপি করে পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে দামাল ছেলেরা। ঝকঝকে তকতকে অয়স্কান্ত আকাশের দিকে দিকে তারার হাটে ফুটে উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের কাকজ্যোৎস্নার গলিত গৌরব। উঁকিঝুকি মারছেন রোহিণীকান্ত অভিসারের আশায়। নিজের অজ্ঞাতসারে সে বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে। তার হাসি আসে, কল্যাণ কিসে, কল্যাণ কি শুধু গতানুগতিকতায়, ভালো ঘরবর ছেলেপুলে নিয়ে তথাকথিত নিরুপদ্রব জীবন যাত্রায়। হাজার তারার বাতি জ্বালানো এই পরমোৎসব রাতি কি সর্ব্বনাশের সন্ধান দেয় না সর্ব্বশেষের।

তারার ইঙ্গিত ত ভুল হবার নয়। কতক্ষণ সে বসেছিল তা জানি না, হঠাৎ মোক্ষদার কাংস্যকণ্ঠে সচকিত হয়ে ওঠে সে—

কী কাণ্ড বল দিকিন ছোট-দিদিমণি, ভরসন্ধ্যেয় কোন সোমত্ত মেয়ে বুঝি এমন এলোচুলে খোলা ছাদে বসে থাকে? বড়দিদিমণি ত কার না কার সঙ্গে হাওয়া খেতে গেলো—যত সব আদিখ্যেতা—তা তোমরা মুনিব—কত লেখাপড়া জানো, দশটা পাঁচটা পাশ করেছো, আমার কী কথা বলা সাজে।

হেসে ফেলে সুমনা কথার দাপটে, বলে—তা হলে কথা কস্ কেন?

কপাল, বয়সের দোষ ত—

গম্ভীরভাবে সুমনা বলে—তাতো ঠিকই, আমরাই ত কবছর পরে চল্লিশে পড়বো—

মোক্ষদাসুন্দরীকে রাগাবার এই এক মোক্ষম অস্ত্র।

ওমা, সেদিনকার মেয়ে চল্লিশ তোমার শত্রুর হোক্, চোখে তার চালশে লাগুক, ঐ সাজগোজানী ঠোঁটে আলতা বড়দিদিমণির হোক্, মা গো মা, কি সব কাণ্ড, সাধ করে বলি, ঘরসংসার নেই, বিয়ে থা নেই, এ কী সমাজের ছিষ্টিছাড়া ছিরি, বুঝতে পারিনা বাবা, ভগবান জানেন—

আস্তে আস্তে সুমনা বলে—হ্যাঁ, একবার যদি কাছে পাই, ধরতে পারি, ভাবছি বেশ একটা গুছিয়ে কড়া চিঠি

লিখবো তাঁকে,চিত্রগুপ্তটা ভারী পাজী, সব কিছু লিখে রাখে তার খাতায়। কয়েকটা পাতা যদি ছিঁড়ে ফেলা যেতো—

তোমার মনের মানুষটির নাম বুঝি ভগবান, তা চিঠি দিয়ো না আমি ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসবো—

ঠিক বলেছিস ত, ভারী চালাক তুই মোক্ষদা।

খুশীতে উপছে ওঠে সে, বলে—দিদিমণি, মুকী এই হোষ্টেলে চাকরী করছে বিশ বছর,কত মেয়ে এলো, কত মেয়ে গেলো, কতো চিঠি দিয়ে এলুম, কতো চিঠি নিয়ে এলুম—

সিঁড়িতে আবার হাইহিল জুতোর খট্ খট্ শব্দ, আজ হলো কি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্ পড়লো—মোক্ষদা—এত তাড়াতাড়ি ত ফেরেন না বড়দিদিমণি, হোষ্টেলের কর্ত্রী। কিন্তু যেতে হলো না তাকে। স্বয়ং স্বাতীই উঠে এলো। মোক্ষদাকে ডেকে বল্লে—যা তুই, খাবারগুলো গরম করে রাখ্, আমরা আসছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এরকম ভাবে গায়ে পড়ে সুমনার সঙ্গে আলাপ জমানো স্বাতীর কুষ্ঠীতে লেখেনি। বায়ুমণ্ডলে যেন একটা বিস্ফোরণের আভাস। আকাশে অস্থির নক্ষত্রদল কাঁপচে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতী বললে—সুমনা, তুমি আমার ছোট বোনের মত—আজ সন্ধ্যেয় ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম, ঝোঁকের মাথায় কতকগুলো কড়া কথা বলেছি, কিছু মনে করো না, বুঝতে পারছি, শান্তনুকে তুমিও চেনো, হয়ত খুব ভালো করেই চেনো,

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুমনা বল্লে—হ্যাঁ, কবছর আগে আমি যখন দার্জ্জিলিংএ এক পরিবারে গান শেখাতাম, সেই সময়েই ওর সঙ্গে আলাপ।

অনেকটা স্বগতই স্বাতী জবাব দিলে—বারো বছরকে লোকে একযুগ বলে, নিরুদ্দেশ হলে কুশপুত্তলিকা দাহ করে—তা প্রায় এক যুগই হোল, বিলেত থেকে সবে ফিরেছি, ছাব্বিশ সাতাশ বয়স তখন, কচি খুকী নই। আমার সে যুগের ভক্ত অনুগতরা ইন্সটিটিউটে এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করলে। সভাপতি শান্তনু, ও তখন এক বেসরকারী কলেজের নামকরা অপেক্ষাকৃত তরুণ অধ্যাপক। ছেলেমেয়েদের মহলে ভীষণ খাতির, সাহিত্য করে, প্রগতি করে, সাম্য ও সংস্কৃতির কথা বলে। শুনলাম চমৎকার বক্তৃতা করে, আরো চমৎকার লেখে। সাধারণভাবে সুপুরুষ না হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মিটিংএ এলো, বক্তৃতা ত দিলে না; যেন কোন অদৃষ্টাপূর্ব্বা অলৌকিকা উর্ব্বশীর জয়গান করে গেলো। বল্লে নারী হচ্ছে বহুর প্রতীক, সে শুধু কি মা, সে শুধু কি বধূ, সে শুধু কি কন্যা! সে মনের মাধুরী দিয়ে মেশানো মায়া, সে ছায়ার মত সরে যায়, আবার কায়ায় রূপ নিয়ে ধরা দেয়। আসলে সে অধরা, সে অবন্ধনা। পুরুষ এই বহুকেই খোঁজে একের মধ্যে। প্রিয় চায় প্রিয়া, সখা চায় সখী, গুরু চায় শিষ্যা, মন চায় মিতা, মা চায় ছেলে।' সব মিলিয়েই নারী, সব কিছু স্ফুলিঙ্গিনী মিশেছে এক হ্লাদিনী অগ্নিতে। তাই শুধু প্রেয়সীকে নিয়ে চিরকালের কারবার চলে না,নিবিড় আশ্লেষও শিথিল হয়ে আসে,চাই শ্রেয়সীকে।

সত্যি কথা গোপন করব না—আগুন লাগিয়ে গেল মনে। প্রথম দিনেই চমকে উঠেছিলাম। যেচে গিয়ে আলাপটা আরো জমিয়ে এলাম তার মেসে। হেসে বল্লে—এই যে, ভেবেছিলাম আপনার মত মেয়ের অন্ততঃ এ দুর্ব্বলতাটুকু হবে না—

কিসের দুর্ব্বলতা—

আমার সঙ্গে দেখা করবার লোভটা, আমার বক্তৃতার পর ভিজিটারের সংখ্যা বাড়ে, রাগ হলো, লোকটা ভাবছে কি, বল্লুম—অন্যায় হয়েছে, বলেন ত চলে যাই—জবাব দিলে—চলে যে যাবে তাকে ধরে রাখা যায় না, এটা অতি সহজ সত্য। কবিরা নাকি বলে ছাড়লে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি—মেয়েদের কাছে প্রশ্রয় পেলে ভারী ভয় হয়—

তারপর কতো কথা হলো। বাইরে রূপবান্ নন্ সত্যি, কিন্তু চিত্তবান্ সত্যবান্ লোক, কিন্তু কোথায় যেন গ্রহণ লেগেছে, ঘুণ ধরেছে দেহে। মনে হলো, সত্যিকার সাবিত্রী চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

একদিন বললেন—আপনি যে এখানে আসেন যান, কতো লোকে কত কথা বলে জানেন—

পাঁচকথায় কান দিলে চলে?—জবাব দিই।

এক একদিন মনে হতো এই কি সেই যাকে সমস্ত যৌবন দিয়ে কামনা করেছি, সমস্ত মনন্ দিয়ে লালন করেছি। আজ একযুগ পরে তোমায় এ সব কথা বলতে একটুও সঙ্কোচ নেই। সারাদিন রাত্রি এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতুম, এমন একটা সর্ব্বপ্লাবী

উন্মাদনা শিরায় শিরায় ঝঙ্কার দিতো যে, মনে হতো যেন ও যা চাইবে, ও যা বলবে সব কিছু দিতে পারি, সব কিছু করতে পারি। শিখরিনী ছিল আমার সখীও বটে, সাথীও বটে—জজ মিঃ চৌধুরীর মেয়ে, বল্লে—স্বাতী, তুই কি পাগল হলি, ওর কি আছে বলতো, না আছে রূপ, না আছে যৌবন, করে ত সামান্য মাষ্টারী, শুধু কথার প্যাচেই ভুললি?

দূর, ভুলেছি কে বল্লে, পেয়েছি—

মরেছিস্, তোকে তমালের ডালেই টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে, কতো ক্যাডিলাক্ বুইক্ তোর দোরগোড়ায় বাঁধা, কতো অযুত নিযুত পতি, আই সি এস্, ব্যারিষ্টার ব্যবসাদার তোকে পেলে বর্ত্তে যায়, আর তুই—

শিখরিনীর মুখটা চেপে ধরি।

আচ্ছা শান্তনু কি তোকে চায়—সে বলে।

কথাটা বুকে বাজলো, কিন্তু লজ্জা মান ভয় এ তিন থাকতে নয়।

সুযোগ এসে গেলো। আমাদের সাউথ অফ্ পার্ক ষ্ট্রীট সমাজের পায়ে চলার দলের পথিক সভার বার্ষিকী উৎসব হবে ব্যোটানিকসে। অবশ্য আমাদের পায়ে চলার দলের শতকরা নিরেনব্বইজন সদস্য ও সদস্যারা মোটরেই আসেন যান বেড়ান। শান্তনুকে অনেকদিন থেকেই বলেছি—এবারে ছাড়ছিনা, যেতে হবে কিন্তু।

শান্তনু জবাব দিয়েছিল—বাপ্ রে, আমরা হচ্চি উত্তুরে লোক, সব সময়েই ঠক্‌ঠক করে কাঁপি, ক্ষিধেয়, তেষ্টায়, লজ্জায়, আশ্রয়ের অভাবে। বড়জোর কাব্য করবার জন্য চেয়ে থাকি উত্তুঙ্গ হিমালয়ের দিকে—ওই আমাদের আদর্শ, কিন্তু কাঁপুনি থামেনা, হাড় হয় হিম। আপনারা দক্ষিণের লোক, দাক্ষিণ্যে ভরপুর, শুধু বালীগঞ্জী লেক্ নয়, তালতমালী বনরাজী নীলা সাউথ সি পর্য্যন্ত আপনাদের গতি। আমরা মেকী টাকা, কাব্যকরা চলে, কিন্তু বাজার করা চলে না।

ওসব শুনছি না, এবারে কিন্তু যেতেই হবে—আপনি হবেন প্রধান অতিথি আমাদের সাংস্কৃতিক বৈঠকের—তিনশো বছরের বটগাছের নীচে হবে—

দি আইডিয়া, বটযক্ষিনী নিজে নামবেন দেখছি—বলতে হবে রসবঙ্কং দদস্বমে—আচ্ছা, আপনাদের ড্রয়িংরুমে দক্ষিণী নটরাজ ও তিব্বতী শাক্যমুনি অক্ষয় হয়ে বসে থাকুন, শোভন সংস্করণ অপঠিত রবীন্দ্র রচনাবলী শোকেসে ঝক্‌ঝক্ করুক, টিশিয়ানের ম্যাডোনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকুক্ শিশু যীশুর দিকে, আমরা হাততালি দিই জয় কৃষ্টির জয়, নিউ এম্পায়ারে নাচ লাগুক তারই উৎসবে, বুড়ো বটগাছকে নিয়ে টানাটানি কেন—

শিখরিনী শুনে বল্লে—একটা অমার্জ্জিত স্নব।

তবু ওকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম ব্যোটানিকসে নিজের গরজে। কিন্তু সেই যে পালালো লাঞ্চের পর, পাত্তাই পাই না, খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি, গঙ্গার দিকে মুখ করে শান্তনু বসে আছে বেশ এক নিরিবিলি ছায়াবহুল ঝোপের নীচে—আশে পাশে আরো পাচটা গাছ স্থানটাকে প্রায় প্রণয়ীর কুঞ্জেই পরিণত করে তুলেছিলো, কিন্তু একেবারে গুঞ্জরণহীন। পড়ন্ত সূর্য্যের পীড়িত আলোর একটা বাঁকা রেখা শান্তনুর মুখে পড়েছে কিন্তু উজ্জ্বল করে তোলেনি। পথিক সভার একমাত্র যাযাবর, যেন খুঁজচে একটা পথের আশ্রয়, চলার নিশানা। আর সবাই ত স্থাণু, শাড়ী জুড়ী-গাড়ীর নকল আভিজাত্যে বাঁধা, শিকলকে বিকল করা দায়।

আমি থাকতে পারলাম না, আমার সাতাশ বছরের দেহমন বেদনায় মুচড়ে উঠলো। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, নতবৃন্ত পদ্মের মত আরো এগিয়ে গেলুম তার বুকের কাছে। আমার সমস্ত সত্তা, অণুপরমাণু এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যের অনুভূতিতে গলে গিয়ে দ্রবীভূতা গঙ্গার মত ছুটেছে মহাসাগরের পানে। জীবনে সেই এক আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তকে অনুভবে পেয়েছিলাম।

কখন সে যে নিজেকে মুক্ত করে চলে গেছে জানতে পারিনি। অনুরাগের সমাধি হলো রাগে। ক্ষোভ, দুঃখ, নৈরাশ্য, অহংকার সব মিলে একটা প্রচণ্ড জ্বালায় ভেতরটা যেন পুড়ে ক্ষার হয়ে গেলো। আমার রূপ যৌবন অর্থ বৈভব মান সব কিছু এতই তুচ্ছ হলো সেই কাপুরুষের কাছে যে আমায় ফেলে উধাও হলো।

রেখা আর শিখরিনী সেদিন আমায় অপদস্ত করতে শুধু বাকী রেখেছিল, বলেছিল—তুই একটা আস্ত ইডিয়ট্, আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। আমার নিজের উপর ধিক্কার এসেছিল, অথচ জানি আমার সঙ্গলাভের জন্য, আমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্য কত বিত্তবান রূপবান বিদ্বান ঘুর ঘুর করেছে, আমাকে কেন্দ্র করে মধুমত্ত ভ্রমরের মত। মিস্তড্ সাঁতারে একটু আলগোছে আমার দেহস্পর্শের

লোভ কত চোখে প্রস্ফুট দেখেছি, পার্টিতে পিকচারে পিকনিকে আমার অনাবৃত শুভ্রদেহের তির্য্যক্ রেখা কত লোকের দৃষ্টিকে উন্মনা করেছে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি আর এই মানুষটা ভয়ে পালালো না এই নিরাবরণ যৌবনশ্রী আর মনের ব্যাকুলতাকে তুচ্ছ করলে। আমি যে সর্ব্বস্ব দিতে রাজী ছিলাম।

হিংস্র হয়ে উঠলাম আমি, গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত। সেইদিন থেকে এই পুরুষজাতটার প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছি। স্বেচ্ছায় হাস্যে লাস্যে ছলায় কলায় এদের মুগ্ধ করেছি, লুব্ধ করেছি, ক্ষুব্ধ করেছি। এই দেখন হাসি খেলায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হার হলো আমারি। শান্তি পাইনি, তাইতো পালিয়ে এসেছি এই দূরে। আজ আমার মন শান্ত কেননা জেনেছি শান্তনুটা আসলে ভণ্ড, অন্যাসক্ত, চরিত্রহীন। কিছুটা প্রমাণ পেয়েছি যে তার লোভী মন নেমে গেছে ভূটিয়া বস্তী পর্য্যন্ত—

সুমনা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, একটু উত্তেজিত হয়ে বললে—সে কী, ওর খবর আর পাওনি নাকি?

বলছি, মাঝে মাঝে কাগজে কলমে শান্তনুর নামটা বেরিয়েছে বটে, ওর একটা বইএর কথাও শুনেছিলাম, আজ দেখলাম তোমার কল্যাণে। আমিও তখন ব্যস্ত, বাবা মারা গেলেন—অতো প্র্যাকটিশ, কিন্তু দেনাও কম ছিল না। লাউডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীটা বিক্রী হয়ে গেলো। অবশ্য কলকাতায় ভক্ত স্তাবকদের অভাব ছিল না, রূপ যৌবনেও ভাঁটা পড়েনি, ইচ্ছে করলেই একটা জবরদস্ত বিয়ে করে সুখে না হয় স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে যে পারতুম না তা নয়, পারলাম না, কোথায় যেন বাধলো। পালিয়ে এলাম এইখানে।

সুমনা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ তার পর বল্লে—স্বাতীদি, ঐ যে বল্লে হাতেনাতে প্রমাণ পেলে—

অত্যন্ত ক্লান্ত সুরে সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, আমি তখন দার্জ্জিলিংএ, এসেছি বুকের জ্বালা জুড়ুতে, তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। একদিন সন্ধের সময় জলাপাহাড় দিয়ে আসছি, দেখতে দেখতে আকাশ কালো করে মেঘের মাদলের সঙ্গে পাহাড়িয়া বাদল এলো ঝমঝমিয়ে। শরতের মেঘ লঘু হলে কি হয় তার আক্রমণ ছিল আকস্মিক ও তীব্র। তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত বর্ষাতী ও ছাতা ভেদ করে জানান্ দিতে লাগলো। আশ্রয়ের আশায় একটা ঘেরা বাংলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চকিতে দেখি সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় কাচের উপর 'সিলহুটেড' হয়েছে একটি ছবি, সেই চিরকেলে পুরুষ ও নারী। মেয়েটি নমস্কার করে উঠছে মুখটা দেখা গেলোনা, অনেকটা তোমার ধরণের সাধারণ চেহারা, রূপসী কিছু নয়। এমন বাদল দিনে কাজলঘেরা পরিবেশে দুয়ের মাঝে তিনের আবির্ভাব অত্যন্ত বেখাপ্পা হবে ভেবে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে। হঠাৎ গলার স্বরে চমকে উঠলুম—এ গলা যে অতি চেনা—এ যে শান্তনুর। হারিয়ে যাওয়া পেছনে ফেলে আসা মনের মাইলপোষ্টটা যেন সামনে ছুটে এলো। সে মেয়েটিকে বলছে—অনেক পেলাম, এই প্রণাম মন ভরে নিলাম, এই দুফোঁটা চোখের জল অক্ষয় অধ্যায় হয়ে রইলো আমার জীবনে। জমা রইলো আমার মনের ক্যাশবাক্সে, কৃপণের মত রেখে দিলাম খরচা করবোনা।

মেয়েটি ধরা গলায় কি যেন বললে শুনতে পেলাম না। খানিক পরে শান্তনুর গলা আবার শুনলাম, বলছে—আমি ত কর্ত্তব্যের যুগে নেই, ক্রতের যুগে, মৃত্যু ফিরিয়ে দিলে কিন্তু পেয়ে গেলাম অমৃতকে। আজ আমি রিক্ত হলেও পূর্ণ, আমার স্বপ্ন দেউলে হলো না।

দাঁড়াতে পারলাম না, টলতে টলতে ফিরে এলাম স্যানিটোরিয়ামে, এসেই পড়েছিলাম অসুখে। জ্বরের ঘোরে ভেবেছি কে সে, আমি রূপসী উর্ব্বশী তাকে ধরতে পারিনি আর কে এ তপঃক্লিষ্টা তাপসী তাকে জয় করলে।

স্বাতীর চোখে জল, সুমনার চোখে জল—চেয়ে রইলো দুজনে দুজনের দিকে।

মোক্ষদা খাবার দেওয়া হয়েছে বলতে এসে ওদের চোখে জল দেখে অবাক হয়ে গেল।

সুমনা ইশারায় বল্লে—এখন যা।

খানিক পরে সুমনাই কথা পাড়লে—কথাটা যখন তুললেই স্বাতিদি, তখন আমার কথাটাও বলেনি, তোমার ভুলটা ভেঙে দি। যেদিনের কথাটা বল্লে তার আগের কয়েকদিনের কথা। চমকে উঠলো স্বাতী—সেদিনের সন্ধ্যায় তাহলে সুমনাই......

সুমনা আস্তে আস্তে ধরা গলায় আরম্ভ করলে—আমি তখন কলকাতায় ছোট ছোট মেয়েদের গান শেখাই।

তাদেরই অভিভাবকদের একদল ঠিক করলেন যাওয়া হবে দার্জ্জিলিংএ —শুধু গ্রীষ্মের কয়েক মাস নয়, বর্ষা কাটিয়ে নভেম্বরের গোড়ায় ফেরা হবে -আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। গরীব মাষ্টারণীর পক্ষে এটা একটা পরম সুযোগ। সেখানে গিয়ে তাঁরা রাখলেন ঐ দেশী আয়াকে। বুড়ীর এক সোমত্ত মেয়ে ছিল, নাম নিমি। ভারী হাসি-খুশী মেয়েটি —প্রায় আমারই বয়সী, দুএক বছরের ছোট যদি হয়। বেশ গড়ন্ পেটন, চক্‌চকে ঝকঝকে, মিশনরীদের স্কুলে পড়েছে, খাসা ইংরাজী শিখেছে। নার্সিং কিছুটা জানে। চমৎকার বাংলা বলতে পারে। আমার সঙ্গে বেশ বনে গেলো। আমার গলা জড়িয়ে বলতো—দিদি, বাংলা গান শিখবো তোমার কাছে—রবীন্দ্রনাথের গান—

আমি বল্লুম—সে কা রে—

বল্লে—হ্যাঁ, এখানে এসেছিলেন যে, দেখেছি তাঁকে, ছেলেবেলায়, কি রূপ দিদি, যেন পাহাড়ের দেবতা নেমে এলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে।

আমরা ছিলাম স্বাস্থ্যনিবাসে—তখনকার দিনে ওরই নীচে ছিল যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ড—প্রায় জঙ্গলে ভরা। নির্জ্জন কারাবাসেরই সামিল। সুস্থরা কেউ উঁকি দিতো না। রোগীও বিশেষ হতো না। সেখানে তখন ছিল একটিমাত্র রোগী—এক বাঙালী ভদ্রলোক। ওখান দিয়ে যাওয়া আসার পথে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কখনো কখনো বারান্দায় দেখেছি, বিশেষ খবর কিছু নিইনি, আগ্রহও হয়নি। নিমির ঐ রাস্তাটাই ছিল সোজা নেমে যাবার পথ। যাবার সময় এক একদিন উঁকি মেরে দেখতো।

একদিন এসে বল্লো—জানো দিদিমণি, ভদ্রলোকের ঘরে একটা রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, তাতে ফুলের মালা দিলে বাবুটি আর ধূপটা জ্বালিয়ে দিলে। কৌতূহল হলো, চকিতে মনে পড়লো—সত্যিই ত আজই পঁচিশে বৈশাখ।

একদিন নিমি এসে বল্লে ম্লান মুখে—দিদি, রোগটা বেড়েছে বাবুর, কেবলই কাশছে—

চকিতনয়নার চোখে পড়লো তার পরের দিন যে রুগ্ন লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, এক ঝলক রক্তে ভেসে গেছে বালিশ বিছানা, কাছে কেউ নেই, ওয়ার্ড এ্যাসিসটেন্ট উধাও।

নিমি প্রকৃতির কোলে মানুষ, শ্লীলতা শালীনতার চেয়ে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকেই মানে—সোজা গিয়ে বসলো বিছানার ধারে, অর্দ্ধ অচৈতন্য মানুষটাকে তুলে নিলে নিজের কোলে, ঠোঁটের লাল রেখা মুছিয়ে দিলে সযত্নে। আর সেইদিন থেকেই নিজেকে কায়েমী করে ফেল্লে সেখানে। মা মাসী হাঁ হাঁ করে উঠলো, আমরা সবাই কতো বোঝালুম বকলুম কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। হাজার হোক্ কিছুটা সেবা শুশ্রূষা জানে। কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ আপত্তি করলেন না। একটা পরম সুযোগ পেয়ে গেলো নিমি। পাহাড়ী মেয়ে, প্রকৃতির বন্য জীবনের কিছুটা নেশা পেয়েছে সে উত্তরাধিকার সূত্রে, রক্তে এসেছে জোয়ার—সে কী কোন কথা শোনে।

আমায় বল্লে—তুমিও একথা বলবে দিদি, কতো অসহায় লোকটা বলো ত—

সত্যিই ত, ঐ অপরিচিত যুবকের জন্য আমার মনেও কোথায় যেন একটু রসের দানা বাঁধা ছিলো।

ভদ্রলোকের কপাল ভালো, শুধু নার্স পেলে না, পেলে আরো কিছু। কী অক্লান্ত সেবাটাই করলে নিমি—আমি পারতাম না একথাটা বলতে পারি। ফল ফললো, এতদিন বলতে গেলে ডাক্তারী দুঃশাসনই চলছিলো। তার রক্তপাত বন্ধ হলো। আস্তে আস্তে জোর পায় মানুষটা— বিছানায় উঠে বসে—নিমির হাত ধরে বাইরের কাচঘেরা বারান্দায় আবার আসে—চেয়ে থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। নিমি তার পাদুটো ঢেকে দেয় চমৎকার পুরু ইটালিয়ান দামী রাগে, অনেক সখ করে অতি কষ্টে টাকা জমিয়ে নিমি যেটা কিনেছিলো এক প্ল্যাণ্টার মেমসাহেবের কাছ থেকে। তার পর দেখি রবীন্দ্রনাথের ছবিটা সাজাচ্ছে ফুল দিয়ে—লাল টুকটুকে রডোডেনড্রন দিয়ে। একদিন দেখি ঠিক তার পায়ের নীচেটিতে মেঝেয় বসে পশমের জাম্পার বুনছে একমনে। ভারী লোভ হতো ওদের দলে যোগ দিতে।

একদিন যাচ্ছি ঐ দিক দিয়ে, দেখি নিমি ঘনিষ্ঠ হয়ে টেনে নিয়েছে তাকে, গলায় হাত জড়িয়ে মুখটা এগিয়ে দিয়ে কানের কাছে কি বলছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—ওর ঘর ছাড়া চোখে যে দেখলাম ঘর বাঁধার স্বপ্ন না লোভ। মুক্তবেণী যুক্তবেণী হতে চাচ্চে নাকি? আমায় দিদি বলতো নিমি—ভদ্রলোকের অসহায় দৃষ্টি দেখে তাকে ডেকে বল্লুম—বেশী বাড়াবাড়ি করছিস্ তুই—চুপ করে রইলো, খানিক

পরে বল্লে—দিদি, ও ত চলে যাবেই, ডাক্তারবাবু বলেছে, ওকে আর এখানে রাখা হবে না, কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকবো, একটা চিহ্ন রেখে যাবে না এইখানে·· বলে নিজেকে দেখিয়ে দেয়।

আমি হিন্দুঘরের মেয়ে, শিউরে উঠি মনে মনে—এ দুর্দ্দান্ত প্রেমকে বাধা দেবে কে—দেহের আগুন অনুকুল পবনে যে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। কিন্তু কোথায় যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, জোর করে ধমকাতে পারি না, বুঝতে পারছি ওর ছোঁয়াচ লাগছে মনে। তবু এগিয়ে গেলাম ছেলেটির কাছে। বাজপড়া গাছ হলে কি হয়, প্রাণশক্তি তখনও ম্লান নয়। বসে রয়েছে ইজিচেয়ারে, সামনে খোলা একটা খাতা, বোধ হয় কি যেন লিখছিল, বল্লে—আসুন, আসুন, আপনার কথা কতো শুনেছি নিমির কাছে—কি চমৎকার গান করেন আপনি,

বল্লাম—সে খবরও পৌছেচে—

জবাব দিলে—তা আর পৌছবে না, গান আমি ভয়ঙ্কর ভালবাসি, নিমি আপনার নাম দিয়েছে কি জানেন—তানপুরো দিদি, আমি একদিন সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলাম—তোমার তানপুরো দিদির একটা গান শুনিয়ে দাও না, কথাটায় আমলই দিলে না, ভাবটা যেন তার একছত্র সাম্রাজ্যে অন্য কোন মনবনবিহারিণী হরিণী যেন না ঢোকে—লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে উঠলো, কথাটা প্রায় ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্চে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনিও ত চমৎকার লেখেন, বক্তৃতা করেন।

হেসে বল্লে—যমরাজের নিমন্ত্রণে ঐ দুটোই সম্বল—

আমি বল্লাম—নিমির হাতযশ আছে। কী সেবাটাই করছে আপনার! দশটা যমরাজ পালিয়ে যাবে—

বেশ ধরা গলায় শান্তনু বল্লে—তা আর জানি না; যদি বেঁচে উঠি, ওরই সেবার জন্য, মায়ের বাড়া। আপনারা প্রিয়াই হোন জায়াই হোন্ শেষ পর্য্যন্ত মা।

কিন্তু—

হাঁ, জানি, ডাক্তার বাবুও সেদিন আভাস দিয়ে গেলেন। যদি অন্য কোথাও যাবার অর্থ ও সামর্থ্য থাকতো, আমি এখনি চলে যেতাম। পৈতৃক ভিটেটা বাঁধা দিয়ে যে কটা টাকা পেয়েছিলাম তার বেশীর ভাগই গেছে কলকাতায় ভুয়ো চিকিৎসায়। আত্মীয়েরা দেখলেন ক্রমশঃ গলগ্রহ হয়ে পড়ছি, দয়া করে বাকী টাকাটা এখানে জমা দিয়ে রেখে গেলেন এইখানেই, যে কদিন চলে চলুক। যেদিন টাকাটা ফুরুবে তার আগেই আমার দিন তাঁদের হিসাব মত ফুরিয়ে যাবার কথা, কিন্তু নিমিই আটকেছে, তা, না হয়···

চোখে জল এসে গেলো, বল্লাম—না হয় কি?

রাজার রাজপথ ত খোলা আছে—

বাপ মা, ভাই, স্ত্রী—

কেউ নেই বোন্—

এমন মধুর করে দাদার গৌরব দিয়ে কেউ বুঝি ডাকেনি। শিউরে উঠলাম আমি। সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে কিসের যেন শিহরণ বয়ে গেলো। আমাদের কর্ত্রী এ রকম মেলামেশা পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে তাঁর ছেলে-পুলের ঘর, সত্যিই ত ছোঁয়াচে রোগ। কিন্তু পারলাম না, নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে ওদের দলে আড্ডা জমাতাম। নিমি প্রথমে যাওয়া আসাটা বেশ সুনজরে দেখতো না। তপস্বিনী উমার চোখে কখনো কখনো বন্য পার্ব্বতীর হিংস্র ছায়া ফুঠে উঠতো—হঠাৎ দেখে ভয় হতো। কিন্তু ক্রমশঃ সে সহজ হয়ে এলো। একদিন শান্তনু বল্লে—ডাক্তারবাবু তাগাদা দিচ্চেন, টাকা ফুরিয়ে এসেছে, এবার ত অন্য আশ্রয় খুঁজতে হয়, অনেক জায়গায় ফ্রি বেডের জন্য লিখেছি—

তার পর কি ভেবে বল্লে—কই, একদিনও ত গান শোনালেন না।

গাইবো না গাইবো না করে শেষ পর্য্যন্ত দুখানা গান গাইলাম—আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে—তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও। সে শুনলে চোখ বুজে, যেন সমস্তটুকু আকণ্ঠ পান করে একেবারে নিংড়ে নিলে, তার পর আচ্ছন্নের মত বল্লে—অনেক পেলাম, কিন্তু আশা যে হারিয়ে গেছে, আজ আর আশাবরী কেন, আবার অবরোহণেও কোমল রে লাগিয়েছেন, সত্যি আপনারা কি কোমল—

লজ্জায় লাল হয়ে উঠি, লক্ষ্য করে—

কথাটা ঘুরিয়ে বল্লে—দেখুন, নিমি তিনদিন উপোষ করে তিব্বতী লামার কাছ থেকে এই বড় মাদুলীটা নিয়ে এসেছে। ওদের দেবতাদের যা বিকট চেহারা, যমরাজ পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যাবেন।

স্বাস্থ্য-নিবাসের কর্ত্তৃপক্ষরা নিমির ব্যাপার নিয়ে বেশ

একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। প্রথমে বিনা পয়সায় একটা নার্স পাওয়ায় আপত্তি তোলেননি। কিন্তু ক্রমশই বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন তাঁরা, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। শেষ পর্য্যন্ত নিমিকে সরিয়ে দিলেন তাঁরা নির্ম্মমভাবে এবং রোগীকে দিলেন স্থানত্যাগের নোটিশ।

সে কদিন আমরা ছিলাম না, কালিম্পংএ গেছি বেড়াতে। ফিরতেই নিমি দৌড়ে এসে কেঁদে পড়লো। শান্তনুকে সরিয়ে দিয়েছেন কর্ত্তৃপক্ষরা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায়। নিমি ওকে নিয়ে তুলেছিল নিজেদের ঘরে। নিমির মার ঘোরতর আপত্তি। শান্তনুকে অপমান করে বার করে দিয়েছে, নিমি নিরুপায় হয়ে পাশের এক ভাঙা ঘরে ওকে রেখেছে। ভদ্রলোকের জোর জ্বর এসেছে। হাতে ছিল দুগাছা সোনার ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ি, গলায় একটা সরু হার, একটা রিষ্টওয়াচ আর যে কটা টাকা ছিল সব এনে ওর কাছে উজোড় করে দিয়ে বল্লাম—কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা কর, হাঁসপাতালে যদি ভর্ত্তি করা যায়।

পরের দিন অতিকষ্টে টিকিট জোগাড় করে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম ওকে। ট্রেনে ওঠবার সময় আমার হাত দুটো টেনে নিলে শান্তনু, হঠাৎ স্পর্শে মনে হলো কি ঠাণ্ডা হাত, জীবনের সব উত্তাপ বুঝি নিভে আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো অগ্নিস্নান হলো পাণিগ্রহণের সঙ্গে। কাঁপতে কাঁপতে একখানা বই তুলে নিয়ে নিজের হাতে নাম লিখে দিলে সে—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে, বল্লে—হয়ত যেদিন রবো না আমি, সেদিনের অলস দুপুরে বা রাতের নিভৃতে এই বইখানা আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।

ছোট্ট ট্রেন ছেড়ে দিলে, তার সর্পিল গতির দিকে চেয়ে রইলাম অনিমেষে।

নিমি সঙ্গে গেছলো পৌঁছে দিতে, কদিন পরেই শুনি ফিরে এসেছে। এক বন্ধুর সাহায্যে শান্তনুর নাকি গতি হয়েছে মদনপল্লীতে। নিমি কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না। হানটান করছি, ওর মা-ই কাঁদতে কাঁদতে খবরটা দিলে—নিমি নাকি আর সে নিমি নেই, এই কদিনেই তার চোখমুখ বসে গেছে, অনেক দিন থেকেই শরীরটা খারাপ হচ্ছিল, নেশার ঘোরে কাজ করে গেছে। এখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, শরীরে সামর্থ্য নেই, চোখেও কি হয়েছে। ঐ বাঙালী বাবুই সর্ব্বনাশের গোড়া। তা না হলে ওদের সমাজে অমন্ মেয়ে পড়ে থাকে।

সব খবর নিয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। নানা রকম পরীক্ষা করে রায় দিলেন তাঁরা—টিবির বিষ ওর চোখে বাসা নিয়েছে—চিরকালের জন্য অন্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তা ছাড়া ওর সাধারণ স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ভাবনার কথা, ওকে বা ওর মাকে কিছু বল্লাম না।

ভারী চিন্তায় পড়লাম। আমার ফিরে যাবার দিনও এগিয়ে আসছে। একদিন আমার কাছে এলো সে অতি কষ্টে, শান্তনুর কোন খবর পেয়েছি কিনা জানতে। শুইয়ে দিলাম আমার বিছানায়, মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে একটু ঠাণ্ডা হলো। খানিক পরে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে নেতিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর অতি কষ্টে চোখ খুলে বল্লে—দিদি, জানলাটা খুলে দাও ত, ভাল দেখতে পাচ্চি না।

বুঝলাম ওর জীবনের ভর দুপুরেই সন্ধ্যা নেমে এলো। যে চিহ্ন সে বাইরে থেকে জোর করে দেহের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলো সে চিহ্ন পায়নি বটে, আরো বড়ো পদাবলীর পদচিহ্ন ওর চোখে অক্ষয় হয়ে রইলো। বাইরের কপাট বন্ধ হলো বটে কিন্তু ভিতরের কপাট যে খুলেছে। কত করে বোঝালাম—চল্ আমার সঙ্গে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—

না, না,—

শেষ পর্য্যন্ত গিন্নীমার কাছ থেকে টাকা ধার করে ঐখানেই হাঁসপাতালে রেখে আসবার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তার বল্লেন—শুধু চোখ নয়, বুকেও বাসা বেঁধেছে, বেশীদিন মেয়াদ নয়—

ফিরে এসে চিঠি দিলাম দুতিনখানা, কিন্তু জবাব দেবে কে। ডাক্তারবাবু শেষ খবরটা দিলেন দয়া করে—নিয়মিত টাকা পাঠাতাম বলে। সেদিন সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য্য তখন ডুবছে—তার শেষ রক্তিম আভাটি যখন মিলিয়ে গেলো তখন নেমে গিয়ে এক গণ্ডুষ জল দিয়ে এলাম অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে।

শান্তনুর সম্পর্কে আমার মন ততদিনে শান্ত হয়ে গেছে। ইচ্ছে করেই চিঠি দিতাম না, তবে খবর রাখতাম—কয়েক বছর পরে শুনলাম সে সুস্থ হয়ে ফিরে ব্রেল শিখতে বিলেতে গেছে। তারপর ঐ দার্জ্জিলিং এর ভূটিয়া বস্তীতে এক অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়াবার স্কুল খুলেছে, থাকেও তাদের সঙ্গে। দুবছর আগে দার্জ্জিলিংএ গেছলাম, জানি না শান্তনু কোথা থেকে খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সে কথা ত সবই জানো স্বাতীদি। আসবার দিন দূর থেকে তাকে প্রণাম জানিয়ে এসেছি, আশাবরীতে গান শুনিয়েছি সেই আকাশকে, নমস্কার করেছি সেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যার রং বদলায় ক্ষণে ক্ষণে, নিয়ে এসেছি এক ঝলক ঝোড়ো কান্না সেই মহাপাষাণের থলি থেকে, আর রেখে এসেছি দুফোঁটা চোখের জল।

চুপ করে বসে রইলো স্বাতী আর সুমনা। হঠাৎ চুপি চুপি তাদের পাশে এসে বসলো যেন এক অশরীরি আত্মা, বল্লে—দিদি, এবার আমি একেবারে ভালো হয়ে গেছি, চমৎকার দেখতে পাচ্ছি।

শারদীয় দেহি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বাঞ্ছাকল্পতরু মা আমার। সবই তো তাঁর দান—শারদ উষার কিরণছটা, পূর্ণিমার ভুবন-প্লাবিনী জ্যোৎস্না প্রাণ-মাতানো বিশ্ব-সঙ্গীত, নটরাজের বিপ্লবী নাচের ছন্দ। বরষার প্লাবনের পর শারদোৎসবে আকাশে বাতাসে আভাস পায় ধরণী মেঘ-মুক্ত নবীন প্রাণের। মহালয়ার মহানিশার পর উদয় হয় নবীন শশী, দিনে দিনে, কালের স্পন্দনের তালে তালে, বাড়ে চন্দ্র—পূর্ণ হয় কোজাগরী পূর্ণিমায়। তাই জাগে সবার প্রাণে জয়ের আশা, পরিবর্ত্তনের সূচনা, মঙ্গলের চেতনা।

এই দিনে বাড়ে ভিক্ষা। ভিক্ষাই বা বলি কেমন ক'রে? মার কাছে চাওয়া সে তো আনন্দের দাবী। সাধু চাহে মোক্ষ। ভক্ত-সংসারী চাহে সংসার যেন হয় মধুর। বলে রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে পূজা-মণ্ডপে পূজার্থী বলে—ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে। ওঁ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভবতি দেহি মে। পুত্রান দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান কামাংশ্চ দেহি মে।

শোভিয়েট রাশিয়া মানে না দুর্গার অস্তিত্ব—কিন্তু মানে শক্তি, নিজের শক্তি, আদর্শের শক্তি। যে বলে—বিধেহি অন্ততঃ আমেরিকার ধ্বংস। আমেরিকা সে শক্তিকে মানে তাকে ডেকে বলে—সর্ব্বনাশ কর কমিউনিষ্টের আর সে শুভকার্য্যে সাফল্যের জন্য তোমার পূজার বেদীতে মা বলি দ'ব দু'পাঁচটা নগণ্য ছোট ছোট রাষ্ট্র। আমাদের ভারতের আশে পাশে কে কি প্রার্থনা করে সে কথা বিশ্ব-জননীও জানেন, আমরাও বুঝি।

তাই এই মধুর শরতের নীল নভোতলে সদাই শুনি—দেহি দেহি। ট্রামওয়ালা বলে—যাত্রী প্রতি একটা পয়সা দাও মা তারা। লোকে বলে—এমন কাজ ক'র না মা দরিদ্রার্ত্তিহারিণী। বেকার ছেলে বলে—মা গো পেট্রোল দাও, দিয়াশলাই দাও, ট্রামে লাগিয়ে দিই আগুন।

আভ্যন্তরীণ দেহির চাপে দরিদ্র গৃহস্থ হয় বলিদানের অর্ঘ্য। গৃহিণী চায় আত্মীয়-ধরায় বস্ত্রবৃষ্টি, উপহারের বরষা, অবশ্য নিজের চাহিদাকে রাখে সে দেহি-সমষ্টির অন্তরালে। পুত্রকন্যা সবারই মনের ভাণ্ডারে জমা থাকে জামা, কাপড়, জুতা বা ফিতার ফর্দ্দ। সেগুলা শারদের শুভ্রালোকে আত্ম-প্রকাশ করে। দাস দাসী পাচক চায় উপহার তার পিছনে থাকে ইঙ্গিত—পূজার উপহার মনোমত না হ'লে মনের মত নতুন গৃহস্থের ঘরে চাকরীর অভাব নাই। তার ওপর রেলগাড়ি চায় যাত্রী—আর মাত্র বিলাসী ধনীর প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে ভাড়ার হার সুবিধা করে দিয়েছে যদি মানুষ যায় পাহাড়ে। কাতর প্রাণী বলে মাগো পাহাড় চাহি না—দে মা পগারেও স্থান কিন্তু দে মা শান্তি—শান্তিময়ি শিবজায়া একমুঠা নির্ম্মল অন্ন আর এক গণ্ডুষ জল-না-মেশানো দুধ।

পথে যাই কর্ম্মস্থলে। দেখি দলে দলে লোক, হাতে লাল ঝাণ্ডা, বলে—পূজার সময় দাও বোনাস্, সারা বৎসর তো বোন্ চূর্ণ ক'রে নিজের তহবিল বাড়িয়েছ কর্ত্তামশায়। এবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই চূর্ণিত হাড়ে ভেল্কী দেখাব। প্রভু বলে—মাগো অঙ্ক-শাস্ত্রে এমন বুদ্ধি দাও অক্ষমালা-বিভূষিতা মা, যাতে প্যাঁচ দিয়ে শ্রমিককে দেখাই অ-লাভ এবং আয়-করের বে-আদবদের দেখাই অষ্টরম্ভা। একদল শ্রমিক নেতা বলে—দেহি কিঞ্চিৎ অর্থ, আমি কুলী-মজুরের মাঝে লাগিয়ে দিই ভেদাভেদ—যা ছিল বেদমন্ত্র ইংরাজ শাসনের।

শারদীয় দেহির হট্টগোলে গরীব গৃহস্থ মাকে বলে—ওসব গণ্ডগোল থেকে রক্ষা কর মা, যে চায় তার মুখ রুখে দাও যেন আমার জর্জ্জরিত দেহে লাগে পূজার বাতাস। কিন্তু হাওয়ার ধর্ম্ম শব্দ-বহা। সে বহে আনে—দেহির গান।

সে গান নিয়ে পূর্ব্বদিনে আসতো দু'মুঠো চাল কি একটা পয়সার আশায় গায়ক। প্রাণ মাতিয়ে দিত গানে—

হের গিরিরাণী তোমার নন্দিনী রাজরাণী রূপে সেজেছে—

কিম্বা—

চল চল গিরি আনিগে গৌরী—

আজ আসে একদল ছেলে—খালি পা, পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট

তার উপর ঝোলা হাত-কাটা সার্ট। বলে—দিন মশায় সার্ব্বজনীন পূজার চাঁদা।

—বিরিঞ্চিবাবু বলে দিয়েছেন এবার দশ টাকা দিতে হবে।

—হ্যাঁ এবার সঙ্ হ'বে—কংগ্রেসের রাহুগ্রাস।

গৃহস্থ বলে—দেখি। দশ টাকা কোথা পাব?

ছেলে বলে—তার জবাব দিতে আসিনি।

অন্যটি বলে—ওপাড়ার গোষ্ঠ মাষ্টার প্রকাণ্ড কাণ্ড করেছে—আমরা···বাবুকে আনব উদ্বোধনে।

—আর···আসবেন চিপ্ গেষ্ট হ'য়ে।

গৃহস্থ বলে—ওঃ তা' আমার চিপ্ চাঁদাটা দেখি কত দিতে পারি। আর একদিন এসো।

দলের নেতা বলে—আমাদের কি আর কাজ নেই। দশটা টাকার জন্য—

দশটা টাকা? পাব কোথা?

অন্যটি বলে—মশায় এক কথা বার-বার বোলে সময় নষ্ট করেন কেন?

গৃহস্থ ঢোক গেলে। আশে পাশে তাকায়। জানালার একখানা কাঁচ ভাঙ্গা। সেদিন সে পথে একটা বেড়াল এসে খোকার সেরে-তিন-পো জল মেশানো দুধের কতকটা পান করে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্কে স্পন্দন এলো।

সে বল্লে—বাবা একটু দয়া কর। অত টাকা কোথা পাব? তবে দয়া করে আর কাঁচ ভেঙ্গোনা তোমাদের মনের মতো চাঁদা না দিলে।

দলের নেতা তিন বছর ফিফ্থ স্টাণ্ডার্ডে পড়ে। গত বৎসর চেষ্টা ক'রেও ক্লাশ উঠ্‌তে পারেনি। সে ওঠ্‌বার চেষ্টার প্রথাটা স্মরণ করলে। বল্লে—ওসব হেড্ মাষ্টারের মিথ্যে কথা। আমি তার পায়ের গোছ তাক করে ইট মেরেছি, কোনো প্রমাণ আছে?

গৃহস্থ বল্লে—সে কথা বুঝবে হেড্ মাষ্টার। তাঁর পায়ের গোছে লাগুক কি শিরদাঁড়ার ডগায় লাগুক, সে কথা বিচার করবেন তিনি। আমার গরীবের কাঁচগুলা গেলে আর হবে না। এক একটি ফাঁকে এক একটি বিড়াল ঢুকলে বাড়িটি হবে বিড়ালপটি।

উকীল প্রতীক্ষায় বসে বলে—মাগো ঘরে ঘরে ঝগড়া বাঁধিয়ে দে মা। এই দুর্দ্দিনে ব্ল্যাক-মার্কেটওয়ালার ব্ল্যাক আর্টের মোহ-কালিমা ভেদ করি। কালাবাজারী সে সময় ভাবে—দেহি মা পুলিশের পায়ে ব্যথা, চোখে ধুলা, যেন আমার লাভের চিনিতে পিঁপড়ে না বসে।

কাজের ভিড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক বলে—মাগো দেশে স্বাস্থ্য দেহি। আর পারি না একটু কীর্ত্তন শুনি। অভুক্ত চিকিৎসক যখন চায় রোগের প্রাদুর্ভাব, হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে আগন্তুক। বলে—আমি নেবার।

চিকিৎসক বলে—মা নেবার লোকের তো অভাব নাই, দেবার লোক পাঠাও মা।

নেবার বলে—আমি প্রতিবেশি কিছু চাঁদা চাই, পল্লীর গরিবদের কাপড় দেওয়া হবে।

বৈদ্য বুঝলেন লোকটি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় অর্থেই—নেবার।

সাহিত্য-সেবী কামনা করে মনের ভাব লেখনীর মারফত পাঠকের মনের পটে প্রতিফলিত করতে। কিন্তু পূজার সংখ্যাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করবার জন্য সম্পাদক মহাশয় চান ফরমাসি প্রবন্ধ।

—কি বিশ্বনাথ?—কাজের ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেন লেখক।

বিশ্বনাথ বলেন—আজ্ঞে পূজার জন্য চাই গল্প।

—সে ব্যবস্থা ছেড়েছি। কারণ এখন পাঠক যা চায়, সে লেখা কলমের ডগায় আসে না। নাতি-নাতিনী বড় হয়েছে।

বিশ্বনাথ মাথা চুলকে বলে—তবে যা হয় দেবেন। মোট কথা এই দেহির চাপে লেখকদের এক এক সময় ইচ্ছা হয়—দুত্তোর বলতে।

বলা বাহুল্য পাওনাদারের তাগাদার এ একটা মরসুম। যে হিন্দু নয় সেও বলে—আজ্ঞে পূজার দিন আমার পাওনাটা—ওর নাম কি।

কে না বলে দেহি এই মা মহামায়ার মহা-আগমনের প্রাক্কালে?

আমি এই চাওয়ার নিন্দা করি না যদি চাওয়ার অন্তরে থাকে একবিন্দু মায়ের উপস্থিতি-বোধ। পূজামণ্ডপ দেখি ভোটের ভোজবাজির একটা আসর। মার মূর্ত্তি কেবল মানুষ ধরবার টোপ। এ পাড়ায় যে সার্ব্বজনীন পূজা তার প্রধান ব্যবস্থা এবং লক্ষ্য যদি হয় ওপাড়ার বারোয়ারী পূজার

অনুষ্ঠানকে ম্লান করা, সে অভিনয় করে যারা তাদের কি চিন্তা করা উচিত নয় দেশের কথা, দশের কথা, বিশেষ সেই অতীত দিনের ঐতিহ্যের কথা যখন ঋষিরা এই বাৎসরিক সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে অজ্ঞতার মনের ভাব ধর্ম্ম-পথে নিয়ন্ত্রণের আয়োজন এ শারদোৎসব। যাঁরা নেতৃত্বের দাবী করেন, এ সব অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে বলি—দেহি কল্যাণের সু-বাতাস জাতীয় এই মহোৎসবে। রাজনীতি ও পূজার বিধি মিলিয়ে জগা-খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করবেন না। বরং পূজায় মন বিশুদ্ধ ক'রে, সব লোককে মায়ের আদরের সন্তান ভেবে রাজনীতি ক্ষেত্রে সেবক রূপে অবতরণ করুন।

মা জননী পরস্পর-বিরোধী ফর্দ্দ পান আর হাসেন। কারণ এ-দেহি মন্ত্রও তো তাঁর শিক্ষা। মোক্ষ-ভিক্ষা, সংসারী উচ্চাভিলাষীর প্রকাণ্ড চাওয়া আর অতি-দীনের দিন-চলার দীন ভিক্ষা সকলগুলি অবাধে পৌঁছে তাঁর শ্রীচরণে। তবু মহামায়ার বিরক্তি নাই। কেন?

বিজ্ঞ লজ্জা পায়। বলে—মা হ'লে এই বিভিন্ন দেহির দোর্দ্দণ্ড উৎপীড়নে পাগল হ'য়ে যেতাম। আবার মা হাসেন। এক একবার তাঁর ভক্তের কথা কানে প্রবেশ করে—এ জগৎ মায়ের গড়া, পোড়া মন কি তাও জাননা?

জগত সে নানা পরস্পর বিরোধী ভাবের মিলন ক্ষেত্র।

সত্যই তো দস্যু চায় গৃহস্থের গাঢ় নিদ্রা, যাতে সে অবাধে তার ভাণ্ডার লুটতে পারে, ধনীর বন্দুকধারী রক্ষীও তো তেমনি মায়ের গড়া দস্যুকে হত্যা করবার যন্ত্রী। বাঘও তাঁর সৃষ্টি আবার তাঁরই সৃষ্টি ত্রস্তা, ভীতা কুরঙ্গিণী। ঋষি বাক্য, দেবতাদের স্তব মনে পড়ে—তিনি সৃষ্টির ব্যাপারে সৃজনকারিণী, পালনে পালয়িত্রী এবং অন্তে গ্রাস করেন তিনি।

তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই অলক্ষ্মী, তিনি মহা-অস্মৃতি আবার মহামেধাও তিনি—সুখ দুঃখের বিধাত্রী তো তিনিই। তিনি মহাবিদ্যা রূপে দিব্য-জ্ঞান দান করেন আবার মহা-মোহা।

মন ভরে ওঠে তাঁর লীলার প্রাচুর্য্যে। দুঃখ না পেলে ত সুখের খোঁজে মন মাতে না। ক্ষণিক সুখে মগ্ন হলে তো চিরানন্দময়ীর আনন্দধামের অমোঘ বাতাস লাগে না প্রাণে—হৃদয় নাচে না আনন্দ স্পন্দনের তালে তালে ছন্দে ছন্দে। যখন পারি না সহিতে ক্লেশ তখনই তো চিত্ত ধায় সেই ভূমির সন্ধানে—মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে যার সঙ্গীত ভেসে আসে।

মায়ের মুখের হাসি মনের পটে পড়ে। মন নিজেকে বলে তুমি কতটুকু জান? যা চাও মা তা দেবেন—কিন্তু দেহীর দেহি যদি সঙ্গত ভিক্ষা না হয়—ভিক্ষালব্ধ কর্ম্ম যে সরিয়ে নিয়ে যাবে—বহুদূরে মায়ের চরণ নখর জ্যোতির আলোক হতে। তাই শিক্ষা কর কোন্ কর্ম্মে, কোন্ ভাবে এগোবে তাঁর চরণের দিকে—বর্জ্জন কর সে ভিক্ষা যার অনিবার্য্য ফল মার সেই মূর্ত্তিতে প্রকাশ যাতে তিনি অলক্ষ্মী। মহাবিদ্যার আশ্রয় চাওয়া অভ্যাস করলে, তাঁর মহামোহা মূর্ত্তি বিলীন হয় মহাবিদ্যা রূপে।

তাই সাধক গায়ক রামপ্রসাদ আনন্দে গেয়েছিলেন—

এ-দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে-জন তার-ঘরেতে ঘর করেছি।

এই বেছে নেওয়াই জীবনের মঙ্গলময় স্রোতের অনুসরণ। মনের মাঝে যে অসুর আছে সেই অসুরকে বধ করেন মা দুর্গা যাঁর সিংহাসনও মনের মাঝে।

তোরা দেখিস নি মোর মাকে
হৃদয় পুরের মা যে আমার জগৎ জুড়ে থাকে।
চেয়ে দেখ মার দুটী চরণ মিললো যেথা জীবন মরণ
যেথা শবের মাঝে শিব জেগে মা'র চরণ ধূলি মাগে।

আমাদের দেহি দেহি রব উচ্চারণ করি যদি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে, তাহলে কামাদি ছয় কুম্ভীরের হাত এড়াবার প্রার্থনাই পৌছবে দেবীর পাদপীঠে আজ এই শুভ শারদ প্রাতে।

চেতনার অভিযান

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

দেবাসুরে বাধিল সংগ্রাম—
সাগর মন্থন করি'
অমৃতের পাত্র যারা নিয়েছিল হরি'—
দেবতা তাদের নাম—
লক্ষ্মীলাভ তাদের ললাটে—
দানবের ভাগ্যে রহে বিষের দহন—
ঈর্ষার দারুণ বিষ !

এ তো গেল পুরাণের কথা—
দেবতা তারাই যারা অমৃত লভিয়া
অমৃতে মিশিয়া গেল !
মনের মন্দিরে
জ্বালিল প্রদীপ ভাতি প্রাণের পূজায়—।
বরিল লক্ষ্মীরে—
জ্ঞানরূপা শ্রীময়ীরে হৃদয় আসনে
পূজিল কর্ম্মের মাঝে,
অর্ঘ রচি' কামনার ফুলে,
ভকতি চন্দনে মাখি প্রাণের বিলাস !
দানবেরা শৃঙ্খলা বিহীন—
অজ্ঞানের বর্ম্মে ঢাকা—;
কোলাহল করে অন্ধ তমসার তীরে।
দেবের জীবন আর দানবের মাঝে
ব্যবধান হ'ল সুরু—
দেব রহে দেবের ভূমিতে,
দানবের কর্ম্মশালা ভরিল অবনী
অজ্ঞানতা-রিপু-তাড়নায়।

প্রাবৃটের অন্ধকারে গুণ্ঠিতা ধরণী,
বাতাস নিশ্চল।
মুহূর্ত্তের তরে
নাহি বুঝি প্রাণের স্পন্দন !
সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গিত ঊর্ম্মিমেলায়
নেমে আসে প্রাণহীন ঘুমের জড়িমা—
নাহি আলো—নাহি আশা—
বেদনার মেঘে ঢাকা আকাশের হিয়া
হ'ল মূর্চ্ছাহত ! দেবত্ব বিদায় নিল'—
দানবের শক্তি যেন ওঠে উছলিয়া
দুরন্ত দুর্ম্মদ সেই তিমির-সাগরে !

দেহের মন্দিরে—
নিত্য সেই দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে
অবিশ্রান্ত নির্ম্মম আক্ষোভে।
বিন্দু বিন্দু রক্তের কণিকা,—
শ্বেত আর লোহিতের ধারা
শিরায় শিরায় তোলে উত্তাল তাণ্ডব।
জড়াগত প্রাণ আর মানসের লীলা
নিত্য দোলে সংশয় সন্দেহে—
খুঁজে ফেরে সন্ধানের সীমা
মুক্তির রঙিন ঊষা !
জড়াগত বুদ্ধি জাগে জড়ের সীমারে লয়ে।
সীমাবদ্ধ দৃষ্টি তাই
মূর্চ্ছাপন্ন আপন বিস্মৃতি মাঝে !
অজ্ঞানতা মানুষী বুদ্ধির মাঝে
খণ্ডিত চৈতন্য তাই
রচিয়াছে সসীমের ছবি
অসীমের পরিচয় গানে।
চেতনার স্তরে স্তরে
আবরণ সৃষ্টি করি'
রূপান্তর করেছে সম্ভব।

এই সুপ্ত প্রচ্ছন্ন চেতনা
আছে প্রতীক্ষিয়া
রহস্যের মায়াজাল উদ্ভিন্ন করিয়া
অজানার অভিযান করিবে সূচনা।
মানব সত্বায় জাগে
চেতনার লীলাময় অতীন্দ্রিয় গতি
অনন্তের পূর্ণ রসাগারে।
নিরন্তর জাগে সমারোহে
সূক্ষ্মরূপে পার্থিব সত্তায়
অখণ্ডের অক্ষর বিকাশ।
পার্থিব এ রজঃ মাঝে সৃষ্টি হয় প্রাণ,
জাগে সেথা মানসের খেলা ;
ঊর্দ্ধপানে উঠিবারে চায়
রূপাতীত অলোকের দেশে।
চৈতন্যের খণ্ডিত স্বরূপ
ছুটে যায় আলোর সাগরে,
অনন্ত প্রবাহে—
আপন সত্বায় জাগে চেতনার দীপ্ত অভিযান

বাংলা সাহিত্যে প্যারডি ও সতীশচন্দ্র ঘটক

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

বাংলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের যেমন আদর নাই, বিশুদ্ধ হাস্যরসেরও তেমনি সমাদর কোন দিনই হয় নাই। বাঙ্গালী কাঁদিতে ভালোবাসে, সাহিত্যেই হোক্ আর সঙ্গীতের মাধ্যমেই হোক্—অশ্রুবিগলিত কারুণ্যই তাহার প্রিয়তর। কথকতায়, কীর্ত্তনে, দেহতত্ত্বের গানে বৈরাগ্যের বাণীই বাঙ্গালী কবিরা শুনাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে বাঙ্গালী জীবনের দুঃখের ইতিহাসই উপজীব্য। বারো মাসই ত দুঃখভোগ করিতে হয়, তাই বারো মাসিয়া দুঃখ 'বারো মাস্যার রূপ ধরিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুরও করুণাবিগলিত। বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু, তাহার মাটি আকাশ, তাহার সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীই অধিবাসীদের সংসার বিমুখ ও দুঃখবিলাসী করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই বিরহবিধুর আর্ত্তিকেই সরস করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া কবিরা পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন। করুণ রস ছাড়া অন্য রসকে যতদূর সম্ভব বর্জন করা হইয়াছিল।

অবশ্য সাহিত্যে হাস্যরস যে একবারেই ছিল না তাহা নয়। হাস্যরস সর্বত্রই অশ্লীলতার নামান্তর হইয়াই উঠিত। আদিরসবর্জিত সুরুচি-সঙ্গত হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সঙ, কবির গানের খেউড় প্রভৃতিতে যে ভাবে হাস্যরস পরিবেশিত হইত—তাহা ভদ্রসমাজে রীতিমতো অ-চল।

সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভারতচন্দ্রকে রঙ্গব্যঙ্গের কবি বলা হয়। বস্তুতঃ সে সময়ে নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা হাস্যপরিহাসে মশ্‌গুল থাকিত। সুবিখ্যাত গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক। ভারতচন্দ্রের উচ্চশ্রেণীর ভাষা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও আলঙ্কারিক সমারোহ ভেদ করিয়াও বিদূষকরূপটিই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের সময়ে বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতা-বর্জিত অংশগুলির রস বাঙ্গালী পাঠক সাগ্রহে উপভোগ করিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুস্থানীয় এবং ভারতচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয়। তাঁহারই কাছে পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদের হাতেখড়ি হইয়াছে। তিনিও ছিলেন প্রধানতঃ রঙ্গপ্রিয় কবি। বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস অর্থাৎ অসঙ্গতির মধ্যে কৌতুকের সন্ধান তিনিই প্রথম দেন; অবশ্য তিনিও সর্বত্র ভব্যতার গণ্ডী রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির শিষ্য। গুপ্ত-কবি ইংরাজী জানিতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের রুচিকে মার্জিত করিয়া তুলিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—

"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত।"

ইংরাজী সাহিত্য হইতে প্যারডিকে প্রথম তিনিই বাংলা সাহিত্যে আনিলেন। প্যারডির ব্যাখ্যায় একজন ইংরাজ কোষকারের উক্তি এই—

"A literary composition in which the form and expression of serious writings are closely imitated and adapted to a ridiculous subject or a humorous method of treatment."

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল Parodyর নামকরণ করিয়াছিলেন 'লালিকা'। তিনি 'আনন্দ বিদায়ে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজী ভাষাতে বলে 'প্যারডি'—জানেন ত পাঠক ও পাঠিকা ॥
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে (পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা ॥

নাই যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা ॥
কে রসিক বেরসিক জানিনা, বিদ্বেষ নিন্দাও মানিনা,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার
—বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা ॥

প্রসিদ্ধ প্যারডিকার সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ও তাঁহার প্যারডি রচনায় ভূমিকায় এ বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"প্রসিদ্ধ ভাল কবিতার ব্যঙ্গ অনুকরণই লালিকা। এটা ইংরাজী 'প্যারডি' কথার প্রতিশব্দ। শরীরটাকে যতদুর সম্ভব বজায় রেখে আত্মাটিকে বদলে দেওয়াই লালিকা-লেখকের কাজ। গুরুগাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়ে যখন লঘুতার অন্তঃসলিল স্রোত বইতে থাকে, তখন আপনা হইতেই হাস্যের তরঙ্গ নেচে ওঠে।"

সাধারণের ধারণা ছিল প্যারডি করিলে আসল কবির রচনাকে বুঝি অপমান করা হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়—প্যারডি কবিতার এক ধরণের appreciation; অবশ্য ব্যঙ্গ করার ইচ্ছা যে কোথাও থাকেনা তাহা নয়।

রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীতগুলির মূলভাবকে রূপান্তরিত করিয়া-

ছিলেন 'আজু গোঁসাই'। তিনি এ ধরণের গানের নামকরণ করেন—'পাল্‌টা গান'। এগুলি ঠিক প্যারডি নয়। ইহা কবিগানের 'উতোরের' রামপ্রসাদের 'মনরে আমার এই মিনতি' গানের তিনি উত্তর দিলেন—

হৈও না মন পড়া পাখী। ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে, দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি॥
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি, পরম তত্ত্ব জানিবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাও গে দেখি,
খেলে, মায়ার ফাঁদে পড়্‌বে না আর শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গানের সঙ্কলক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'মেঘনাদ বধে'র প্যারডি করেন 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' নামে। ইহাই বোধ হয় বাংলাভাষায় প্রথম প্যারডি। ইহাতে মূল কবিতার প্রতি কিছু কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্যই ছিল—মধুসূদনের বিচিত্র শব্দ-সজ্জার এবং ভাষারীতির অনুকরণও করা হইয়াছিল ব্যঙ্গ করিবার জন্যই। যেমন—

দ্রুহিণবাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে…………

* * * *

অর্ক স্নারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্ব লাঞ্ছিত,
সু-আশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে)
চতুষ্পাদ ছুছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,……ইত্যাদি

ইহাতে ভদ্র মহাশয় অভদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন চণ্ডীপ্রশস্তির প্যারডি লিখিলেন তখন তাঁহাকে সে অপরাধে দোষী করিলে ত চলিবে না। তাঁহার মত চণ্ডীর ভক্ত কেহই ত নহেন! বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রচেষ্টা কেবলমাত্র রসসৃষ্টির জন্য, তাঁহার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—

যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ প্রভৃতি (বিষবৃক্ষ)

ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ছিলেন Wordsworth, কারণ তাঁহার কবিতার যত প্যারডি হইয়াছে আর কাহারও ভাগ্যে তত জোটে নাই। J. K. Stephen কবির প্যারডি রচনা করিতে গিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সামান্য দোষ ত্রুটী, মুদ্রণদোষেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্যারডির মূল কবিতা সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সুপরিচিত না হইলে তাহার যোগ্য সমাদর হয় না। যে কবিতা বা গাথা লোকের মুখস্থ রহিয়াছে অথবা প্যারডি শোনা মাত্র পাশাপাশি যাহার মূলের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে তাহারই প্যারডি সম্ভব। তাহা না হইলে রঙ্গরস ঠিক মতো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

প্যারডি রচনায় মৌলিকতা বিশেষ কিছু লাগে না; মূল কবিতার ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি তো বজায় থাকেই—কেবল শব্দগুলির অল্প অল্প পরিবর্ত্তন করিলে কিরূপে রসান্তরের সৃষ্টি হয় তাহারই কৃতিত্ব প্রদর্শন। ইহা একটি স্বতন্ত্র আর্ট; হাস্যরসের গোষ্ঠীতেই ইহার স্থান।

বঙ্কিমের পর প্যারডি রচনা করিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবি অবশ্য খুব বেশি প্যারডি লেখেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশী গানের প্যারডি করিলেন—

কতকাল রবে বল ভারত রে, শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে।
দেশে অন্ন জলের হল ঘোর অনটন—ধর হুইস্কি-সোডা আর মুর্গি-মটন।
যাও ঠাকুর, চৈতন-চুটকি নিয়া—এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা॥

রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বহু কবির হাতে এ দুর্ভোগ (?) ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্যারডিকার হইলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ; কবির 'কড়ি ও কোমল'কে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি রচনা করিলেন 'মিঠে ও কড়া'। এইগুলি রঙ্গরসের কবিতা নয়, ব্যঙ্গরসের ছড়া মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের প্যারডি করিয়াছিলেন। জীবিতকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার কঠোর সমালোচনা করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার এ সব গানে বিদ্বেষের গন্ধ পান।

আধুনিক কালে সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বতন কবিদের যে ভাবে প্যারডি রচনা করিয়াছেন সেগুলিতে ব্যঙ্গের নামগন্ধ নাই; ইহা পুরাদস্তুর রঙ্গরচনা।

সতীশ বাবু সুপণ্ডিত, সুকবি এবং রসবেত্তা ছিলেন। 'লালিকা গুচ্ছ' এবং 'রঙ্গ' ও ব্যঙ্গ' ছাড়া তাঁহার অন্য কোনো বইয়ের নাম নাই। তিনি প্রথমশ্রেণীর লেখক ছিলেন, কিন্তু রচনার সংখ্যাল্পতার জন্য হয়ত সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। প্যারডি ছাড়া তাঁহার অন্যান্য রচনায়ও হাস্যরস ফাটিয়া পড়িয়াছে।

হাসি সম্বন্ধে কবিবরের নিজের উক্তি "অতএব স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্য করা কর্ত্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু শাস্ত্র ব্যতীত জনসমাজকে শিক্ষা দিবার অপর কোনও উপায় নাই। সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্যশাস্ত্র রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।"

সতীশচন্দ্রের মৌলিক হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিও সুপাঠ্য; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চটিজুতো চুরি লইয়া রচিত শোকগাথার অশ্রুধারা হাস্যোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

হে আমার চটি!
কিনিয়া ছিলাম তোমারে যে আমি বাঁধা দিয়ে ঘটি॥
মনে নাই কি হে তালতলা গিয়া কিনিনু তোমারে একটাকা দিয়া।
এবে তুমি কোথা যাইলে চলিয়া মোর পরে চ'টি?
কোন্ অপরাধে হইলে নিদয় হে আমার চটি?

কেশ সমস্যায় বিব্রত কবি যে ভাবে কৈশিক গবেষণা করিয়াছেন—এবং শেষে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এককথায় অপূর্ব্ব—

সৌন্দর্য্যের
সার্থক প্রতিনিধি...
সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্মলোকে।
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃপ্ত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
আজো সৌন্দর্যের
সার্থক প্রতিনিধি।
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
'লক্ষ্মীবিলাস হাউস' :: কলিকাতা-৯

অগত্যা শেষেতে আমি করিলাম ঠিক
সম্ভাবনা বুঝে আর ভেবে চারিদিক ;
নূতন প্রকারে চুল রাখাই বিহিত
পিছন দিকে বড় আর সামনে বিপরীত ॥

এ সব কবিতা অপেক্ষা তাঁহার প্যারডিগুলিই অধিকতর সুপরিচিত। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'মেঘনাদবধ' কাব্য সতীশচন্দ্রের পাঁচ সর্গের 'মশকবধ কাব্যে' অপূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়াছে—

বসে যথা নভস্তলে তারাদল সাথে
শশাঙ্ক, নিভৃত কক্ষে বসিয়া একেলা
বেষ্টিত মশকবৃন্দে আমিও তেমতি
হে দেবি ভারতি ! তব উপাসনা রত
নির্ব্বাক্ নিশ্চল ;……

এই ভাবে কাব্যারম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের বহু প্রসিদ্ধ গানের সর্বাঙ্গসুন্দর প্যারডি তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং প্রমথ রায় চৌধুরী ও কুমুদ মল্লিকের কয়েকটি কবিতা অবলম্বনেও তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিনয়ী কবি উৎসর্গপত্রে তাঁহাদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন—"আপনাদের কবিতার ছবি লালিকার তেরা বাঁকা আয়নায় ফেলে আপনাদেরই হাতে দিচ্ছি, কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো ? খুসি না হোন্—চট্‌বেন না।"

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'হৃদয় যমুনা', 'দুই পাখী'—'সোনার ঘড়ি', 'ব্যবসা নমুনা' এবং 'দুই লাউ' প্যারডিতে কি অপূর্ব রঙ্গরস লাভ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই—

গগনে উদিল ঊষা হল ফরসা,
ঘরে একা বসে আছি নাহি ভরসা ;
রাশি রাশি ভারা ভারা বই পড়া হল সারা
ত্রীফ নাই পড়ি ধারা আঁখি সরসা ;
পড়িতে পড়িতে বই হল ফরসা ॥ (সোনার ঘড়ি)

যদি ধরিয়া লইবে মৎস্য এস ওগো এস মোর পুকুর ধারে ;
থলবল থলবল নাড়িছে মাছেরা জল
ফাত্‌নাটি যাবে তল ফেলিলে চারে ॥ (ব্যবসা নমুনা)

মাচার লাউ ছিল বাঁশের মাচাটিতে
বনের লাউ ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনীর মনে।
বনের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
মাচাতে কি করেই ছিলে,
মাচার লাউ বলে বনের লাউ, হায়
বনেতে কেন গজাইলে ? (দুই লাউ)

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলির সুর, ছন্দ, রীতি সমস্ত হুবহু বজায় রাখিয়া ঘটক মহাশয় যে প্যারডিগুলি রচনা করিয়াছেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে গাওয়া যাইতে পারে। মূলের পর প্যারডিটি গাহিলে অপূর্ব রসের পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। কথার সামান্য রূপান্তর করিয়া গানের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন— ডাক্তার বেচারারা কষ্টে সৃষ্টে পাশ করিয়া রোগী না পাইয়া হা-হুতাশ করিতেছে রবীন্দ্রনাথের 'বল দাও মোরে বল দাও'-এর সুরে—

কল (call) দাও মোরে কল দাও, হাতে দাও মোর চাকতি,
কমিশন লও জুটায়ে, তোমারে করি এ মিনতি।

পরীক্ষকরা ফেল্‌করা ছাত্রদের গ্রেস্ দিয়া পরীক্ষা সমুদ্র পার হইতে আহ্বান জানাইযাছেন—'ওগো কে যাবি পারে'র সুরে—

ওগো, তোরা কে যাবি পারে ?
আমি 'গ্রেস' দিয়ে বসে আছি ছ'টি পেপারে।
ওপারেতে ঘাসবনে ঢুকে পড় এ সুলগনে
এ পারেতে নয় শুধু খড় চিবা রে ॥

উকীল 'সোনার বাংলা' গানের সুরে 'সোনার মামলা'ই চাহিয়াছে—

আমার সোনার মামলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আলাল তোমার দালাল
আমার ঘাড়ে লাগায় ফাঁসি।
ওমা আশ্বিনে তোর ছুটির দিনে ত্রাসে পাগল করে (মরি হায়)
ওমা বৈশাখে তোর পচা ক্ষেতে সেজে 'কমিশনার' কাশি ॥

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কবি নিজেই স্বয়ং ওকালতী করিতেন! ওকালতী শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-প্রেম-মূলক গানগুলিকে সতীশচন্দ্র কৌতুক-রসে নবকলেবর দান করিয়াছেন—

ধন্য মান্য যশে গাঁথা আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস আছে সব আপিসের সেরা ;-
ও সে ইটপাথরে তৈরী আপিস, রেলিং দিয়ে ঘেরা।
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল তেলের ঘানি সে যে আমার কর্মভূমি ॥

তাঁহার ভক্তিরসপ্লাবিত 'গঙ্গাস্তোত্র' সতীশচন্দ্রের হাতে 'টঙ্কাস্তোত্রে' পরিণত হইয়াছে—

পতিতোদ্ধারিণি টঙ্কে !
পাপ-নিরত-জন-ভয়-বিদ্রাবিণি, ভূষণ কলঙ্ক-পঙ্কে !
কত পদ পদবী সিদ্ধ হইল তব চুক্তি-করণ-গুণ পাই ;
কত বড় বাড়ী লভ্য হইল মা তব দলিলে অবগাহি ॥

অতুলপ্রসাদের ওস্তাদী গানের সুর 'বাদল ঝুমু ঝুমু বোলে' শুনিয়া তাঁহার পশ্চিমাদের মাদলের আওয়াজ মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি লিখিলেন—

মাদল খচা খচা বোলে না জানি কি বলে,
বুঝিতে পারি না, ব্যথা শ্রবণ যুগলে।
সারাটা দুপুর ধরি শুনাইছে গান হোরি
বিজলী-সমান তালে নাচে
গাধা কুকুরগুলি পুচ্ছ তুলি গাজে
হানিব গরাণখানি কার বিকট গলে?

তাঁহার হাতে 'কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা'র সুর পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের করুণ মিনতিতে পরিণত হইয়াছে—

বাঙাল বলিয়া করিওনা হেলা, (আমি) আদার ব্যাপারী নহি গো;
শুধু ঘরের ভাতকে মিষ্ট করিয়া 'পরের বাত'টি কহি গো॥

রজনীকান্তের 'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে'র সুরে কবি গাহিয়াছেন ম্যালেরিয়া-প্রশস্তি—

"তুমি নির্ম্মল কর বঙ্গজ নরে শোণিত চর্ম্ম শুকায়ে;
তব কম্প ভীষণ দিয়ে যায় ঘোর দোষ লিভারে ঢুকায়ে॥

নজরুল ইস্লামের গজল সুরের 'কে বিদেশী বন উদাসী' কবির লেখনীতে অপূর্ব রূপ ধরিল—

কে সুকেশী মঞ্জুদাসী ফাঁসের ফাঁসি লাগাও মনে?
ঘুরবো তাগে শঙ্কা জাগে, কুসুম রাগের ছুপ বদনে।
ঝিমিয়ে আছে হোমরা কাকা, খুড়ীর চোখে আবেশ মাখা
কাতর ঘুমে ঠাক্ মা বাঁকা মোর ভবনের দরদালানে॥

সতীশচন্দ্রের এই প্যারডিগুলি আদর পায় নাই। আজ সেগুলিকে বাঙ্গালী একরকম বিস্মৃতই হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীর হাস্যবিমুখ চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এ ধরণের আর্টের আদর করি না, ইহা যে কত বড় আর্ট তাহা বুঝিনা, তাহার জন্য আক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

সতীশচন্দ্রের প্যারডি সম্বন্ধে তাঁহার পরম বন্ধু কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি—

"প্যারডির হাস্যরস wit শ্রেণীর বোধানন্দদায়ক হাস্যরস। সেজন্য এই রসের সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক এবং রসস্রষ্ঠা হইতে হয়—নিখিল শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অন্যান্য উপকরণের জন্য বহু রঙ্গরসের রচনার পাঠক হইতে হয়, সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর versifier-ও হইতে হয়। সতীশচন্দ্রে এই সমস্তেরই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল……"।

শারদ প্রতিমা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেখেছি দেখেছি শারদ রাতের রহস্যময় রূপ,
মাধুর্য্যে অপরূপ।
অনন্তে জাগে আলোক-বরণী,
নিম্নে শ্যামলা শ্রান্ত ধরণী
দিগন্ত-পানে চেয়ে আছে শুধু
বিস্ময়ভরে চুপ।
দেখেছ? দেখেছি শারদ রাতের সেই রহস্য-রূপ।

নাই কলরব, নভোনীলিমায় কোন্ সঙ্গীত বাজে?
সুদূরের চাঁদ নিকটে এসেছে ভুবন-ভুলানো সাজে।
অজস্র সেই জ্যোৎস্না-ধারায়
বিশ্ব-মানব চিত্ত হারায়,
বিলুপ্ত সব ভাবনা-অভাব
আলোর প্লাবন-মাঝে,
স্তব্ধ অবাক জগৎ জুড়িয়া সুর-সঙ্গীত বাজে।

সেই সীমাহীন চন্দ্রালোকের সাগরে করিয়া স্নান
পবিত্র হ'ল প্রাণ।
দিবসে কেবল বাধার যোজনা,
রাত্রি করে না গণ্ডী-রচনা,
সারা দিন ধরি' যারে খুঁজি তার
পাই বুঝি সন্ধান।
অসীম চন্দ্রালোকের সাগরে আনন্দে করি স্নান।

দিগ্‌দিগন্তে জ্যোৎস্না-জড়িত নীলিমা সুবিস্তার,
পূর্ণিমা রাতে জানা-অজানার সীমানা হয়েছি পার।
দূরে স'রে যায় সব আবরণ,
কে করে আরতি, কে করে বরণ?
সমুখে তোমার—প্রতিমা; শোননি
মন্ত্র বন্দনার?
পূর্ণিমা রাতি—জোৎস্না-জড়িত নীলিমা সুবিস্তার।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শশধর বসিবার জন্য একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন। গোপাল বলিলেন—হরি আজ বাড়ী থেকে চলে গেল। বাড়ী একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে, তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম—

শশধর কালিকে তামাক সাজিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল—ও এই। কিন্তু ঠাকুরমশায়, হরি চাকুরী করে সে ত যাবেই, আবার আস্‌বে—তাতে দুঃখ করবেন না—

গোপাল হাসিয়া কহিলেন—দুঃখটা সমস্ত যুক্তিতর্কের বাইরে শশধর। কান্না পায় বলেই মানুষ কাঁদে, কেঁদে কিছু হবে বলে কাঁদে না।

চাঁদমোহন এতক্ষণ মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। তিনু কহিল—দুই শত, পঁচাত্তর সাত আনা—

চাঁদমোহন স্মিত হাস্যে মুখ তুলিয়া কহিলেন—বেশ বেশ—দাও—চাঁদমোহন টাকার থলেটা হাতে করিয়া প্রসন্ন মুখে একবার চাহিলেন। শশধরের উদ্দেশ্যে কহিলেন—কি দাদা, টাকা আদায় হয় না? দেখলে ত, ক'রতে পারলেই টাকা আদায় হয়—

শশধর কহিলেন—তা জানি চাঁদু, কিন্তু প্রজাদের উপর এতে পীড়ন হ'ল খুবই—লাভ কিছুই হ'ল না। এ টাকা ত চৈত্র মাসে এমনিই পেতে পারতে—

চাঁদু কহিলেন—বাড়ীটা যে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, তখন কি আসা চলে?

গোপাল কহিলেন—বাড়ীটা বৈশাখে ক'রলে কি অসুবিধে হত?

—সে কথা আপনাকে কি ক'রে বোঝাবো? কলকাতা যদি থাকতেন, জগতটা দেখতেন তবে বুঝতেন। চাঁদমোহন গোপালের কথা শুনিলেই যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন, তাহাদের জমিদারীর কথায় এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণটি মুরুব্বিআনা করিয়া উপদেশ দেয় এটা তাহার অসহ্য।

গোপাল কহিলেন—বুঝিয়ে বললেও কি বুঝতে পারবো না—

—হয়ত পারবেন, কিন্তু তার প্রয়োজন কি আপনার? আমাদের সংসারের ভিতরের কথায় আপনার প্রয়োজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়—

—কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় হ'য়ে ছিল, আজ হঠাৎ নেই একথাটা ত জানি না চাঁদমোহন। আমরা তোমাদের পুরোহিত, শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথা বলি—প্রজাগুলি পীড়নে শোষণে অবাধ্য ও অসৎ হয়ে উঠবে এটা কি ক'রে দেখবো—

—অসৎ তারা চিরদিনই, আর অবাধ্য যদি হয় তার অষুধ আমি জানি—

গোপাল ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; তিনি কহিলেন—ভগবতী চাটুয্যের প্রতিমা ট্যাং ট্যাং করে বিসর্জ্জন কোনদিন হয়নি। স্বেচ্ছায় হাজার লোক হ'য়েছে, আর আজ পয়সা দিয়ে লোক আনতে হয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিলেন—ওদের খাওয়াতে খরচ হত তিনশ' টাকা, আর লোক আন্‌তে খরচ হ'য়েছে তিন টাকা। লাভ দুই শত সাতানব্বুই টাকা—বুঝেছেন—

—তাহ'লে ত পূজা উঠিয়ে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়—

—আমার আপত্তি নেই, যদি দাদা আপত্তি না করে। চাঁদমোহন জয়োল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন এবং একটা বিজ্ঞজনোচিত হাসিতে সকলকে পরাভূত করিয়া দিয়া, টাকার থলি হস্তে প্রস্থান করিলেন।

গোপাল চুপ করিয়া হুকা টানিতেছিলেন—মুখখানা তাহার বিরক্তি ও অপ্রসন্নতায় মলিন। শশধর কহিলেন—আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ওদের চিন্তা একেবারেই যেন মেলে না। ওদের নতুন বিদ্যা যে কি তা বুঝতে পারি না—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—যে শিক্ষা মানুষকে এমন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, তার প্রশংসা করতে পারি না শশধর, ছেলেদের এ শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই। অন্যের কথা যদি ভাবতে না শেখায় তবে সে শিক্ষা নয় শশধর, সে পাশবিক প্রবৃত্তির সেবা—

শশধর কহিলেন—কিন্তু এত শক্তি কেমন ক'রে হল তাহ'লে—

—পশুর শক্তি ত বৃহৎ। অসুরই শক্তির দ্বারা স্বর্গজয় করেছে, আর দেবতারা পালিয়েছে ভয়ে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা হ'য়েছে পরাজিত, মা চণ্ডী, ভগবান স্বয়ং তাদের সংহার করেছেন—আত্মঘাতী হ'য়ে মরেছে অসুর—

শশধর কি যেন ভাবিয়া কহিলেন—সবই ভগবানের ইচ্ছা! কিন্তু আশ্চর্য্য হই ভেবে চারিদিকে হাহাকারই বেড়ে যাচ্ছে—

গোপাল কহিলেন—প্রয়োজন বেড়েছে তাই হাহাকার, —কত নতুন জিনিষ আজ উঠছে, উঠেছে, সবই ত চাই—

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গোপাল বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, কিন্তু হরির বিদায়, চাঁদুর উপেক্ষা, সব একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মনটার মাঝে একটা অস্বস্তি ও অজ্ঞাত বেদনা যেন বিষের মত ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। গোপাল যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌছলেন তখন বেদনা ও অস্বস্তির দহনে অন্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আনমনে তামাক সাজিতে সাজিতে ভাবিতেছিলেন—এই জড়শিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল—যে শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যা দিল কিন্তু জ্ঞান দিল না। কেবল আত্ম-সুখ-স্বার্থকে চিনাইল—কিন্তু মানুষকে, সমাজকে ভালবাসিতে শিখাইল না, কেবল নিতে শিখিল, কিন্তু দিতে শিখিল না; ভোগ করিতে শিখাইল, ত্যাগ করিতে শিখাইল না।

আপনার ভাইকে বঞ্চিত করিতে শিখাইল, ভালবাসিয়া আপনার করিতে শিখাইল না···

গোপাল আবার ভাবিতে লাগিলেন—এমন শিক্ষা ত ছিল না, পূর্ব্বে হরির বাবা যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ত অন্যরূপ। ভগবতী যে কাজ করিয়াছেন, যেভাবে জমিদারী পরিচালনা করিয়াছেন তাহা ত এমনি নয়—তবে এমন একটা উলট পালট হইল কি করিয়া?

পিতার বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া গোপালের পুত্রদ্বয় নীরবে পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছিল—পিতার হুঁকার শব্দ কিছুটা মন্দীভূত হইলে তাহারা ক্ষীণকণ্ঠে পড়িতেছিল—বি, এল, এ, ব্লে, সি, এল, এ ক্লে—

গোপাল অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোদের ওসব ছাই-পাঁশ পড়তে হবে না, আর ইস্কুলেও যেতে হবে না। কাল থেকে আমার কাছে সংস্কৃত পড়বি—মুগ্ধবোধ।

ওই ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উহারা ত পরস্পর হানাহানি করিবে, ভাইকে সাহায্য না করিয়া তাহার অংশ উদরসাৎ করিবে। অর্থকরী না হয় নাই হইল, তবুও দারিদ্র্যের মাঝে প্রীতি ও স্নেহ লইয়া বসবাস করিতে পারিবে ত! গোপাল এমনি ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন—যা খেলা কর গিয়ে, ওসব আর পড়তে হবে না—

পুত্রদ্বয় পড়িতে হইবে না ও ইস্কুলে যাইতে হইবে না জানিয়া হৃষ্টমনে পাঠ্যপুস্তকের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া গেল। গোপাল বসিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে কেবল উত্তেজিত মনে ভাবিয়াই যাইতে লাগিলেন-তাহার মনে হইতেছিল—মানুষ যেন মানবাচার ত্যাগ করিয়া পশ্বাচার গ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরের দেহ কামড়াইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই ত ঘোর কলি—এখানে কেহ কাহাকেও লেহন করিয়া সান্ত্বনা দিবে না।

চাঁদমোহন খাজনাপত্র আদায় করিয়া কলিকাতার বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামের সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। যাহা হউক কিছুদিনের জন্য আর কেহ পীড়ন করিবে না।

চাঁদমোহনের গো-শকট যখন চণ্ডীতলা দিয়া গ্রামের বাহিরে যাইতেছিল সেই সময়ে নিতাই ও বলাই গরুগুলি চরিতে দিয়া চণ্ডীতলায়ই বসিয়াছিল। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, সঙ্গে যাইতেছে পেয়াদা কালী বাগদী, ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিতাই অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অপস্রয়মান গাড়ীখানি দেখিল—

শালবনের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে সেটা অদৃশ্য হইল গেল। নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ছোট বাবু যে বড়কর্ত্তার বেটা, এটা মনে লিতে লারছি—

বলাই কহিল—কেনে রে?

—বড়কর্ত্তা থাকতে ভয় ডর ছিল নাই। জানছি বড়কর্ত্তা রইছেন, না খেয়ে গাঁয়ের লোক মরবেক নাই। আর বুকের পাটা এত বড় রইছেন—আর ছোটবাবুকে দেখলেই ত ডর লাগে—

—ডর কেনে লাগবেক—মানুষ ত বটেন—

—মানুষ নাই রে, মানুষ নাই—ও মোদের খাবেক।

বলাই সান্ত্বনা দিয়া কহিল—বড়বাবু ত রইছেন—

নিতাই মনে কোন সান্ত্বনাই পাইল না। তাহার মনে যেন কেমন একটা শঙ্কা হইয়াছিল, ছোটবাবুই তাহাকে গৃহহীন করিবে। চিরপরিচিত এই গ্রাম, এই গৃহ, পিতৃপুরুষের এই ভিটা ত্যাগ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতেই হইবে। অনাগত একটা দুর্দ্দিনের কল্পিত বেদনায় নিতাই ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে চণ্ডীতলার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া কহিল—মা যা করবেক তাই হবেক—

শরতের নির্ম্মল আকাশের নীচে ধানের মঞ্জরীগুলি ধীরে ধীরে হেমন্তের হাওয়ায় অবনতশীর্ষ হইল। হিঙ্গুলবনের ধারে শালবনের নতুন পাতা গভীর শ্যামলতায় ভরিয়া গেল—তারপর শীতের পশ্চিম বায়ুতে তাহা ধীরে ধীরে পিঙ্গল হইয়া উঠিল—মাঠের সবুজ ধান ও ঘাসগুলি পাণ্ডুর মৃত্তিকার উপরে পিঙ্গলবর্ণের আবরণের মত পড়িয়া রহিল। সকালের নিস্তেজ সূর্য্যালোক সোনালী ধানের শিষে সঞ্চিত শিশির-বিন্দুর মাঝে প্রতিবিম্বিত হইয়া বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করিল। গাড়ী গাড়ী ধান—সারা বৎসরের পরিশ্রম-লব্ধ ধান সকলের খামারে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল—দিগন্তবিস্তৃত পাণ্ডুর মাঠ পড়িয়া রহিল নিঃশব্দ নীরব। ফাল্গুনের আগুন হাওয়ায় মাঠের মৃত্তিকা ফাটিয়া চৌচির হইল—শুষ্ক ঘাসের মাঝে পাথরগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

চৈত্রের মাঝামাঝি একদিন ধূলিঝঞ্ঝায় আকাশ গৈরিক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বর্ষণ হয় নাই। বর্ষের শেষপ্রান্তে একদিন বায়ুকোণে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া প্রবল বর্ষণ হইয়াছে—শুষ্ক ঘাসে আবার সবুজ আভা দিয়াছে—

গোপালপুরের একটানা ইতিহাস চলিয়াছে একই উপায়ে—বাগ্দী বাউরী পাড়ায় গাজন চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আতিশয্য নাই—সকলেরই অবস্থা খারাপ, তাই কোনমতে পার্ব্বণ রক্ষা হইতেছে।

চাঁদমোহন একাকী আসিয়াছিলেন, খাজনা আদায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার বাড়ীর একতলা সম্পূর্ণ হইয়া এখন দ্বিতলের গাঁথনি চলিতেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে চাষীরা গাড়ীতে করিয়া জমিতে সার দিয়াছে, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে বীজতলায় ধান বুনিয়াছে। ধানের আফরগুলি বড় হইয়াছে—উপযুক্ত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পোঁতা হইবে—

অকস্মাৎ একদিন চাঁদমোহন একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইতেই সকলে শঙ্কিত হইল—এখন যদি পুনরায় খাজনা চাহেন তবে বিপদ—চাষের সময়, তাহারই খরচ সকলের ঘরে নাই।

চাঁদমোহনের কলিকাতাস্থ বাড়ীর দ্বিতলের ছাদ দিতে হইবে, অতএব টাকার তাহার প্রয়োজন ছিল—সকলেই জানিত বিনা প্রয়োজনে তিনি আসেন নাই। শশধরের নিকট টাকার কথা বলিতে তিনি এই আষাঢ় মাসে আদায় করিতে অনিচ্ছুক তাহা জানাইয়াছেন—চাঁদমোহন প্রস্তাব করিলেন গোলার ধান বিক্রয় করিতে হইবে, শশধর তাহাতে জানাইয়াছেন চাষ-আবাদ শেষ না হইলে ধান বিক্রয় করা সম্ভব নয়। ইহা লইয়া দুই ভাইতে মন কষাকষি চলিয়াছে, কাজেই চাঁদমোহন এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারি করেন নাই। দুই ভাইএর মাঝে মাঝে একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেটাকে বচসাও বলা যাইতে পারে।

আষাঢ় যাইয়া শ্রাবণে পড়িল কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, একবিন্দু জলের সম্ভাবনা নাই। আফরগুলি শুকাইয়া যাইতেছে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে এবারের মত চাষ একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। বাগ্দী বাউরী পাড়ায়, নিতাই শিবদাস সকলে মিলিয়া নানারূপ যুক্তি করিয়াছে কিন্তু জলের উপায় কি? বৃদ্ধ শশী বাউরী একদিন কহিল—ঠাকুরমশায়ের কাছে যা, ভগবানকে ডাক, তবেই বৃষ্টি হবে, নইলে সব মাটি—

নবীন বহু পুরাতন দিনের একটা গল্প করিল—মতি ঠাকুর কেমন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। অবশেষে কহিল—গোপাল ঠাকুর ত তারই বংশের, তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত বা বৃষ্টি হইতে পারে—

গল্পটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না—কেহ কহিল, ব্রাহ্মণের সেই তেজ কি আর আছে। তথাপি যখন গত্যন্তর নাই তখন সকলে গোপালঠাকুরের নিকট যাওয়াই স্থির করিল—

সন্ধ্যার পরে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। চণ্ডীতলার

অদূরে জ্যোৎস্নালোকিত অস্পষ্ট মাঠের মৃত্তিকা দেখা যায়। ওই পাড়ার মাতব্বর কয়েকজন গোপালঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইল। গোপালের পুত্রদ্বয় ইংরাজি পড়া ছাড়িয়া সংস্কৃত পড়িতেছিল—গোপাল তাহাদিগকে মুগ্ধবোধ পড়াইতেছিলেন। সকলকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—এস এস বাবা-সকল, বস—তা হঠাৎ এত রাত্রে কি মনে করে?

শিবদাস নিতাই বলাই কালী নবীন সকলে একটা খেজুরের পাটিতে বসিয়া কহিল—শাওন ত এল ঠাকুরমশাই, জল নেই—মাঠের জমি ত খা খা করতে লাগলেক। আপনি বৃষ্টি নামা করান ঠাকুরমশাই। শশীদা বললেক—মতি ঠাকুর আর আপুনি বৃষ্টি নামা করালেক—উই সেই কোন সালে।

গোপাল ধীরে ধীরে কহিলেন—সেদিন ত আর নেই, তখন ভগবানকে লোকে ভক্তি করতো, তাহাদের কথায় তিনি কান দিতেন। এখন দায়ে পড়ে ডাক্‌লে কি তিনি শুনবেন? দেশে ধর্ম্ম নাই, চুরি, ডাকাতি, ফাঁকি, মিথ্যা, অধর্ম্মের আবাস হয়েছি আমরা। আমাদের কথা তিনি শুন্‌বেন কেন?

নিতাই কহিল—তবে ভগবান কি মোদের সব মারবেক? ছিষ্টি লয় হবেক?

শিবদাস কহিল—কি করা লাগবেক ঠাকুরমশাই?

গোপাল কহিলেন—তোমরা নগর কীর্ত্তন কর, তারপর দেখা যাক্ কি হয়। অন্ততঃ সাতদিন ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে ডাকো—

নবীন কহিল—এটা কথা বটেক—হাঁ আজ থেকেই নাম-কীর্ত্তন লাগা করাবেক চল্—সব—চল্—

সেই দিন হইতে নাম-সংকীর্ত্তন চলিল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গ্রামের পথে পথে বাগ্দী বাউরী ডোমেরা কীর্ত্তন করিতে লাগিল—

কিন্তু বৃষ্টি হইল না—বীজতলায় আফরগুলি প্রায় শুকাইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন মাঠ ঘুরিয়া আসিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল—এই আফর মরিয়া গেলে পুনরায় আফর করিয়া চাষ শেষ করিতে আশ্বিন মাস—তাহাতে কি ধান জন্মিতে পারে?

গ্রামস্থ যুবক প্রৌঢ় সকলে নতমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একপাশে শশী বসিয়া তামাক টানিতেছিল—সহসা লাঠির উপর ভর দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—চল্, ছোঁড়ারা সব চল—মোরা ঠাকুরকে ধরা করবেক। গোপাল ঠাকুর ঋষিশের বাচ্চা বটে—উ পারবেক চল্—মা চণ্ডীর থানে উ মন্তর বল্‌বেক—চল্—

শশী লাঠিতে ভর দিয়া ও কোমরে হাত দিয়া কোন মতে চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী দুই চার জন গেল। যুবকদের অনেকেরই এই ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না তাহারা প্রায়ই গেল না। একজন কহিল—মোরা ত কীর্ত্তন ক'রবেক—কি হল বটে—

আর একজন কহিল—পুণ্যির শরীর বট—ভগবানকে ডাকা করলে শুনবেক কেনে? তু ত—মদ মারছিস্ হররোজ—

গোপালের উঠানে গ্রামস্থ ছোটলোকগণ সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে শশী লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া কহিল—ঠাকুর মশাই, তু ত বামুন বটেক, তু যদি লারিস্ ত কোন বেটা পারবেক—মতি ঠাকুর আর তু ত বৃষ্টি নামা করালেক, মু দেখলেক সেই সন। তু পুঁথি ধরা কর, দেশ রক্ষা কর—

আরও অনেকেই গোপালের শরণাপন্ন হইল। গোপাল কহিলেন—ভগবানকে আমি ডাক্‌তে পারি, তবে তার ইচ্ছাই সব।

শশী কহিল—তু ডাক্ কেনে, দেখনা ভগবান কি ক'রবেক—

গোপাল কহিলেন—বেশ তাই হবে—চণ্ডীতলা পরিষ্কার কর গিয়ে। উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠ করবো, ভগবান যদি দয়া করেন।

শশী সদলবলে আশ্বাসিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

খাদ্য-অভাব—

গত ১৫ই ভাদ্র কলিকাতায় রোটারী ক্লাবের ভোজসম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার সমাধানের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে একটি গল্প মনে পড়ে—এক দল সৈনিক নগরের পথ দিয়া যাইবার সময় তাহাদিগের একজন এক মিষ্টান্ন-বিক্রেতার দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন তুলিয়া লইলে দোকানদার দাম চাহিলে যখন বলিয়াছিল—"প্রলয়ের পরে পাইবে"—তখন দোকানদার চিন্তিতভাবে বলিয়াছিল—"সে যে অনেক দিন!" প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্নাভাবে শীর্ণ লোককে বলিয়াছেন—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৫ বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গ চাউল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। গত নির্ব্বাচনে যিনি ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই—দীর্ঘ ৫ বৎসর পরে তিনি জীবিত থাকিবেন কি না এবং জীবিত থাকিলেও সচিবত্ব লাভ করিতে পারিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য।

সম্মিলনে একখানি পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিপাদ্য—পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব নাই। অর্থাৎ চাউলের অভাব সরকারের সৃষ্ট বা সরকারের অযথার্থ উক্তি। প্রফুল্লচন্দ্র সে কথা অস্বীকার করিয়া বলেন—অভাব আছে। অর্থাৎ সরকারের সুব্যবস্থায় চাউলের অভাব ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দূর হইতে পারে না। আর পশ্চিমবঙ্গের লোক—বর্ত্তমান সরকারকে বিব্রত করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল কি তাহাই? তাহারা কাজ করে না—সরকার তাহাদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, এমন কথা বলে! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন—

(১) প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ হাজার ইমারতী মিস্ত্রী অন্যান্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ৫ মাসে ২ কোটিরও অধিক টাকা উপার্জ্জন করে।

(২) কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে ৫০ হাজার (প্রায় নহে—পুরা ৫০ হাজার) অবাঙ্গালী দুগ্ধব্যবসায়ী আছে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের পাট-কলে শতকরা প্রায় ৭০ জন শ্রমিক অবাঙ্গালী।

এ হিসাব অবশ্য সচিবের ব্যবহারার্থ সরকারী দপ্তরখানায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা নির্ভরযোগ্য কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ইহা নির্ভরযোগ্য হয়, তবে ইহার কারণ কি এবং কিরূপে অবস্থার প্রতীকার করা যায়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার—কলিকাতায় ভূগর্ভে—অন্ততঃ আকাশে ট্রেণ চালাইবার পরিকল্পনা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়াছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ও উপেক্ষার একটি উদাহরণ দিতেছি। প্রধান-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগকে ইমারতী কাজ শিক্ষা দিবার জন্য (অবশ্য বহু অর্থ ব্যয়ে) বড় বড় কোম্পানীর সহিত ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন, কলিকাতা বেলগেছিয়ায় একটি অবৈতনিক কারীগরী বিদ্যালয়ে ঐ শিক্ষা দেওয়া হয়—এমন কি ছাত্ররা বৃত্তিও পায়? সে কাজে উৎসাহ দান জন্য সরকার কি করিয়াছেন? সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সরকারের অবিদিত নাই।

পশ্চিমবঙ্গের পাটকলে কেন অবাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে, তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বজ্ঞ সচিবরা শিল্প কমিশনের রিপোর্ট ও ডক্টর ব্রোউটনের (লেডী চট্টোপাধ্যায়ের) ভারতীয় শ্রমশিল্পে শ্রমিক সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। তাঁহারা সে সব কারণ দূর করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে কি তাঁহারা কর্ত্তব্যপালন না করিয়া বাঙ্গালীকে অকারণ দোষ দিতেছেন না?

প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে কেবল চাউলেরই অভাব নহে—খাদ্যোপকরণ মাত্রেরই অভাব—

খাদ্যোপকরণ	প্রয়োজন (লক্ষ টন)	পাওয়া যায় (লক্ষ টন)
গোল আলু	১৩	৫
দাইল	৭	৫½
চিনি ও গুড়	৪¼	৩
স্নেহপদার্থ (ঘৃত, তৈল প্রভৃতি)	৫	২
দুগ্ধ	২২	৪
মাংস ও মৎস্য	৭	½
ডিম্ব	৭৬ কোটি	১৫ কো

বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলাদ্বয়ে গোল আলুর ফলন অধিক। তথাপি কেন তাহার অভাব ঘুচে না, তাহা কে বলিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের কৈফিয়ৎ কি? মাংস ও মৎস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য—মৎস্য

সন্ধানের মরীচিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমুদ্রে কত টাকা নষ্ট করিয়াছেন? আজ যিনি প্রধান-সচিব তিনি কার্য্যভার পাইয়াই বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় মাছ লোক কেবল খায় না—তাহা গবাদি পশুখাদ্যে পরিণত করিয়া দুগ্ধ বৃদ্ধি করে এবং সারেও পরিণত করে। গত ৫ বৎসরে তাঁহার সরকার সে পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? দুগ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য—হরিণঘাটায় ডক্টর শিঙ্কার তাঁবে যে "টোনড" (খাঁটি নহে) দুগ্ধের উৎপাদন-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয়ে কি ফল লব্ধ হইয়াছে? দ্রোণপুত্রকে যেমন পিটুলীগোলা জল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়াছিল, কলিকাতার লোককে কি তেমনই "টোনড" দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে না?

দামোদর ও ময়ুরাক্ষীর জল নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখাইয়া কত দিন পশ্চিম বঙ্গের নরনারীকে অপূর্ণাহারে রাখা এবং সরকারের খাদ্যবিভাগ বহাল রাখা চলিবে? বড় বড় পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতায় ও বর্ণনায় কি লোকের উদর-পূর্ত্তি হইবে? না—

"Reams of hiccoughing platitudes···cannot mend this."

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেনমার্কের নাবিক আনিয়া সমুদ্রে মৎস্য আহরণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছেন, এ বার জাপানীপ্রথায় ধান্যের চাষ প্রবর্ত্তন-চেষ্টায় সমস্যা সমাধান করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা মিশরে সেচের যে পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করেন নাই কেন! পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিদেশের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশে ধান্যের যে মূল্য দিতেছেন, বিদেশ হইতে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া তাহা আমদানী করিতেছেন—অথচ বলিতেছেন, দেশের লোক স্বেচ্ছায় ধান্য সরকারকে বিক্রয় করে না! তাহার কারণ, তাহারা বিদেশী ধান্যের তুলনায় উপযুক্ত মূল্য পায় না। আজ যদি তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি বর্জ্জন করেন, তবে চাহিদাও প্রয়োজনের সাধারণ নিয়মে প্রদেশে চাউল পাওয়া যায়, ইহাই লোকের বিশ্বাস। সে বিশ্বাস যে ভ্রান্ত এমন মনে করিবার কারণও নাই। কিন্তু সরকার তাহা না করিয়া যে অস্বাভাবিক কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাই রক্ষা করিতেছেন, তাহা সঙ্গত কি না তাহা কে বলিবে? একটা বিরাট ব্যয়বহুল বিভাগ রাখায় বহু লোক "হাতে রাখা" যায় এবং বহু অর্থ ব্যয়ের সুযোগ ঘটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা দেশের লোকের উপকারের জন্য, কি তাহাতে দেশের লোকের উপকার হয় না, তাহাই প্রকৃত বিবেচ্য। সে বিবেচনা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেছেন? ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথায় লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ, ততদিনে মানুষের অখাদ্য চাউলে বহু লোকের অকালমৃত্যু অনিবার্য্য। সেজন্য কে দায়ী হইবে? আর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ—সে ত "হনোজ দিল্লী দূরস্ত"।

খাদ্য—আশা ও আশ্বাস—

খাদ্যসচিব বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের বৎসরে ধান্যের প্রয়োজন প্রায় ৪২ লক্ষ টন—আর গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল ৭০ লক্ষ টন। তাহাতেও কেন "হাহাকার" মিটে না, তাহার উত্তর—সরকারের পুলিস প্রভৃতিও সব ধান বাজারে বাহির করিতে পারে নাই।

এই কৈফিয়তে লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহার পরে—১০ দিনের মধ্যেই—আশ্বাস দিয়া লোককে তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এ বার ধানের ফসল যেরূপ ফলন হইয়াছে, গত ১০ বৎসরে তেমন হয় নাই। হিসাব দিতে সরকারের কার্পণ্য নাই। বলা হইয়াছে—

(১) এবার পূর্ব্বাপেক্ষা এক লক্ষ একর অধিক জমীতে চাষ হইয়াছে।

(২) এ বার প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) ২৪পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর এই জিলাত্রয়ে ধানে যে পোকা লাগিয়াছিল, সরকার তাহা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন।

(৪) পোকার উপদ্রবে ও বন্যায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। ইত্যাদি।

যদি ইহাই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে কি আগামী জানুয়ারী মাস হইতে নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জ্জিত হইবে? এই অসুবিধাজনক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—তাহা হইবে না; কারণ, অন্ততঃ ৩ মাসের ব্যবহারের মত উপকরণ মজুত না রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ-নীতি রদ করা যায় না!

সরকারের মতে ৩ মাসের জন্য আবশ্যক সঞ্চয় কখন হইবে কি না তাহা সরকারই বলিতে পারেন। সুতরাং লোক আশ্বাস পাইলেও আশা করিতে পারে না।

বর্ত্তমান মূল্যের হিসাবে বর্দ্ধিত মূল্য কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ কি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না—সেই ধান্যের চাষ বাড়ান হইয়াছে কি এবং তাহার ফল কি হইয়াছে?

খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, অভাব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার পরে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—গত বৎসর আশু ধান্যের ও আমন ধান্যের ফলন মোট প্রায় ৩,৯৩১,৮০০ টন অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ টন অধিক হইয়াছিল! ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ইহাই হিসাব। এই হিসাবে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ লক্ষ টন দেওয়া হইয়াছে। এ বার অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে যদি অভূতপূর্ব্ব ফলন হয়, তবে ত আর অভাব থাকিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় কেন নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জ্জিত হইবে না?

বিশেষ সরকারের বন্ধনমুক্ত হইলে ব্যবসার সাধারণ নিয়মে প্রয়োজনে যে ব্যবসায়ীরাই অন্যান্য স্থান হইতে চাউল আমদানী করিতে পারিবেন ও করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মসলেম লীগের আমলে বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে যে পঞ্জাব হইতে গম আনাইয়া ভারত সরকার ও বাঙ্গালা সরকার—প্রভূত পরিমাণ লাভ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। এ বারও কেহ লাভবান হইতেছেন না ত?

পরিকল্পনার প্লাবন—

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র; রাষ্ট্রে অধিবাসিগণের খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, সেচের অভাব। কিন্তু এক বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বোধ হয়, আর

সকল রাষ্ট্রকে পরাভূত করিয়াছে—কাজে নহে, পরিকল্পনায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব পরিকল্পনার উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর তিনি বিরাট, সুতরাং ব্যয়বহুল পরিকল্পনাই করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে যে কয়টিকে রূপ প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে, সে কয়টিতে আর্থিক ক্ষতি ব্যতীত লাভ হয় নাই। গভীর জলে মৎস্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় যে লাভ হয় নাই, তাহাতে বলা হইয়াছে—উহা পরীক্ষামূলক, সুতরাং আর্থিক ক্ষতির কথা বলিতে নাই: কলিকাতার রাজপথে সরকারী যান-ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ তাহাতে লোকের যে সুবিধা হইয়াছে তাহার তুলনায় ক্ষতি উপেক্ষনীয়। কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় অনেক টাকার অপব্যয় হইয়াছে; এখন আকাশে রেলপথ স্থাপনের কথা বলা হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে ধাপার জলা চাষের ও বাসের উপযুক্ত করিবার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইতেছে।

এ বার কলিকাতায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তিনি অনেকগুলি পরিকল্পনা লইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সরকার নানা পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। প্রথম পরিকল্পনা—অনাহারক্লিষ্ট রাষ্ট্রবাসীদিগকে শিক্ষা দানের ও সমাজ-সেবার জন্য লোক নিয়োগ। হিসাব অনুসারে আগামী ৩ বৎসরে অর্থাৎ পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় পর্য্যন্ত এই সকল কাজে ৩০ হাজার লোক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা ও তাঁহাদিগের স্বজনগণ ভোটার হইবেন—ভোটের ক্যানভাসারও হইতে পারিবেন। গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনায় মাত্র এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৩ হাজার ৫ শত লোক কাজ পাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেই বহু লোক কাজ পাইবে। মাত্র ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আসানসোলে কয়লা হইতে কোক, আলকাতরা, এমোনিয়াম সালফেট ও বেন্জিন ত উৎপন্ন হইবেই অধিকন্তু যে গ্যাস উৎপন্ন হইবে তাহা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে দেওয়া যাইবে।

এ সকল ব্যতীত কলিকাতার আবর্জ্জনাবাহী জল সম্বন্ধে কলিকাতার নিকটে জমী উন্নয়ন প্রভৃতি কত পরিকল্পনাই আছে।

এই সকল পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থ-ব্যয় হইবে, তাহা কোথা হইতে আসিবে এবং সেজন্য বিদেশের নিকট ঋণ করিতে হইবে কি না, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। অথচ ফরাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের দ্বারে ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছেন—সে বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতেছেন না।

এই সকল পরিকল্পনায় ঈশপের উপকথার অশ্ব ও অশ্বপালের কথা মনে পড়ে। অশ্বপাল অশ্বকে যথেষ্ট খাদ্য দিত না, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্দ্দন ও মার্জ্জন করিত। সেই জন্য অশ্ব তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে অধিক খাদ্য দাও—অত মর্দ্দন ও মার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলিতেছে—অধিক অন্নদাও, পরিকল্পনার বহর কমাও!

শ্রমিক বিক্ষোভ—

কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-বিক্ষোভ চলিয়া আসিতেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ও আর কোন কোন রাজনীতিক বলিয়াছেন, অবস্থা যেরূপ হইতেছে তাহাতে বহু কলকারখানা পশ্চিমবঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা। একথা More in anger than in sorrow বলা হইয়াছে, কি শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতৃগণকে ভয় দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে সময় এই রাষ্ট্রে আরও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন—সুতরাং বাঞ্ছনীয়, সেই সময় সে সকল স্থানান্তরিত হওয়া যে দুঃখের ও দুর্দ্দশার বিষয় হইবে, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, কলকারখানা স্থানান্তরিত করাও তেমনই দুঃসাধ্য। সুতরাং ভয় না দেখাইয়া শ্রমিক-বিক্ষোভের নিদান নির্ণয় করিয়া প্রতীকারের বিধান করাই সুবুদ্ধির কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানী অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বেকার-সমস্যা প্রবল। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেকার অবস্থা যে সন্ত্রাসবাদেরও উদ্ভব করে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—"The dread of unempolyment predisposes the minds of our young men to the morbid and fanatical outlook which the leaders of this (terrorist) movement seek to induce."

পশ্চিমবঙ্গে এখনও বহু কলকারখানা বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত। সে সকলে বহু য়ুরোপীয় ছোট বড় নানা চাকরীতে বহু অর্থ দেশ হইতে শোষণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা ট্রাম প্রতিষ্ঠান—বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এ সকল কারণ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ধর্ম্মঘটে শ্রমিকদিগের সহিত সরকার পক্ষের—বিশেষ সচিবদিগের যে সহানুভূতি সহজে মীমাংসার পথ সুগম করিতে পারে, সে সহানুভূতি উৎসারিত হয় না—ইহাই শ্রমিকদিগের অভিযোগ।

বহু শ্রমিক নেতা যে দুর্নীতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সরকার পক্ষের আবশ্যক কার্য্যই তাঁহাদিগের অসঙ্গত ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকার করিয়া শ্রমিকদিগকে শান্ত করিতে পারে। তাহারা নির্ব্বোধ নহে—আপনাদিগের প্রকৃত স্বার্থও তাহারা বুঝে। তাহাদিগকে বুঝান প্রয়োজন। তাহা করা হয় না। আর এ কথাও সত্য যে, তাহারা সরকারের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। কেন করে, তাহা সকলেই জানেন। শ্রমিক-সমস্যা জটিল হইয়াছে। কলকারখানা স্থানান্তরিত করার ভয় দেখান সে সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। বিশেষ সরকারকে মনে রাখিতে হইবে, সরকার একক এই সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম; সেজন্য জনমতের সমর্থন প্রয়োজন—সে সমর্থন লাভ করিবার জন্য যে সহযোগ অবলম্বন করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহা দেখা যাইতেছে কি?

নূতন প্রদেশ গঠন—

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বিনামূল্যে উপদেশ দিয়াছেন—সরকার (অবশ্য সরকার ও কংগ্রেস এখন অভিন্ন) যখন নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কমিশন নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে যেন আর কোনরূপ আন্দোলন করা না হয়। কারণ, কমিশন যেন শান্ত পরিবেষ্টনে কাজ করিতে পারেন। অন্ধ্রবাসীদিগের প্রবল আন্দোলনে নেহরু সরকার বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করার পরে যে সরকার ও কংগ্রেস ভয় পাইবেন তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আন্দোলন ব্যতীত লোকমত কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে? আর যে কমিশন আন্দোলনে অধীর হ'ন, সে কমিশনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

এই সঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী বিবেচনা করিতে হয়। সে বিষয়ে কি হইবে? কংগ্রেসীদিগের কথা—সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও ও নির্ব্বাক থাক। কিন্তু লোক যদি কংগ্রেসের ও কংগ্রেসী সরকারের উপর আস্থাসম্পন্ন থাকিতে পারিত—তাহারা যদি বিশ্বাস করিতে পারিত, কংগ্রেস ও সরকার লোকমতের মর্য্যাদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন—ন্যায়নিষ্ঠ হইবেন, তবেই এইরূপ উপদেশ শোভা পাইত। পশ্চিমবঙ্গের বিহারভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের দাবী সম্বন্ধে বলা যায়, যদি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হিন্দীভাষাভাষীতে পরিণত করিবার হীন চেষ্টার সমর্থক না হইতেন; যদি প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিয়া ঐ সকল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত করা এখন অসঙ্গত এইরূপ অযথা উক্তি না করিতেন; যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ধানবাদ ও টাটানগর ত্যাগ করিতে সম্মত না হইতেন এবং যদি কেন্দ্রী সরকার সে প্রস্তাবও ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান না করিতেন; পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতি যদি পদব্রজে ঐ সকল অঞ্চলে যাইয়া অধিকার-বিস্তারের কথা বলিয়া প্রস্তুত জীবের চীৎকার-বিরতি স্মরণ করাইয়া না দিতেন, তবে দেশের লোক কংগ্রেসের উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারিত। কিন্তু আজ আর তাহার উপায় নাই—সম্ভাবনাও নাই।

সুতরাং লোকজন মত প্রকাশের একমাত্র নিয়মানুগ উপায়—আন্দোলন বর্জ্জন করিতে পারে না। অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রতীকারের গণতন্ত্রসম্মত উপায়—আন্দোলন। সুতরাং যে কংগ্রেসের সহিত গণ সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে, সেই কংগ্রেসের কথায় লোক আন্দোলনে বিরত হইতে পারে না।

কংগ্রেসের অধিবেশন—

দুর্ভিক্ষ-দাবানল-দগ্ধ সুন্দরবনের সান্নিধ্যে, অভাবে জর্জ্জরিত পশ্চিম-বঙ্গে এ বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ইহাকে যদি শ্মশানে বিলাসব্যসন—a pompous pageant of a perishing people বলা হয়, তবে তাহা কি অসঙ্গত হইবে? অধিবেশন-স্থান—কলিকাতা হইতে অদূরে বহু লোককে উদ্বাস্তু করিয়া যে "কল্যাণী" সহর রচনার পরিকল্পনা হইয়াছে তথায়। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল সে সকল বলিতে বলিতে "খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট" হইয়াছিলেন—সাবধানের বিনাশ নাই। কিন্তু এ বার ত অর্থাভাবের কোন সম্ভাবনা নাই। কল ঘুরাইলে যেমন জল পাওয়া যায়, তেমনই যাঁহারা ডক্টর রায়ের জন্মদিনে তাঁহাকে লক্ষ টাকা উপহার দিলেন ও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রদেশ কংগ্রেসকে দিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ঘুরাইলেই টাকা পাওয়া যাইবে। কেবল কি তাহাই? বারাসতে কংগ্রেস সম্মিলনের সময় যেমন কোন কোন উপসচিব অকংগ্রেসী সংবাদপত্রের নিকট হইতেও অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই যদি সব উপসচিব, ২জন মাঝারী সচিব ও সকল পুরাসচিব চেষ্টা করেন, তবে টাকা আসিবে। তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে; "কল্যাণী"র গঠনকার্য্য অগ্রসর হইবে, পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত দুরবস্থাও কেহ লক্ষ্য করিবে পারিবে না। অবশ্য যে জওহরলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তে অসম্মত ও যে কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার উত্তরসাধক—পশ্চিমবঙ্গ তাঁহাদিগকে কিরূপে অভ্যর্থিত করে, তাহা দেখিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। পরিকল্পনায় প্রদর্শনীরও স্থান আছে। কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে যে প্রদর্শনীর হিসাব পাওয়া যায় নাই, তাহাতে কে উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং কাহার গৃহ হইতে প্রদর্শনীর সূচনা হইয়াছিল?

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু—

পার্লামেণ্টে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের দাবী জানাইয়া শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, যে জওহরলাল নেহরু একাধারে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও সরকারের সঙ্গে অভিন্ন কংগ্রেসের চালক তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহার বিশ্বাস, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে কারণ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই, তখন আবার তদন্ত কেন? পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রধান মন্ত্রীর আদেশ ব্যতীত সে দলের কোন সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া ত পরের কথা—কথা বলিতে পারেন না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে প্রস্তাব পরাভূত হইয়াছে। এ বার জওহরলাল নেহরু স্বয়ং কোন কথা বলেন নাই; তবে প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি তিনি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবার সরকার পক্ষের কথা বলিয়াছিলেন—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু। তাঁহার বক্তৃতায় যুক্তির অভাব উগ্রতায় পূর্ণ করা হইয়াছিল। তিনি যে কেবল লোককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—তিনি

"The bravo demagogue of the party who seeks to make up in sound and fury what he lacks in argument."

তাহাই নহে, তাঁহার ব্যবহারে গ্রাটানের উক্তি মনে পড়ে···কোন কোন লোক সম্বন্ধে বলা যায়—

"So obnoxious is he to the very party he wishes

to espouse that he is only supportable by doing those dirty acts the less vile refuse to do."

কৈলাসনাথ বলিয়াছেন, প্রস্তাবটি ভাবাবেগদ্যোতক। কিন্তু আমরা তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। এ কথা কি সত্য যে, তিনি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যখন শ্যামাপ্রসাদের অগ্রজ রমাপ্রসন্নদকে সহানুভূতি জানাইবার জন্য লিখিত পত্রে জানাইয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদের জীবনরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হইয়াছিল, তখন রমাপ্রসাদ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—তিনি যে মৃত্যুর ৪১৫ ঘণ্টা পরেই ঐ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—

(১) কাশ্মীর সরকার কি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? না—

(২) ঘটনার পর ৪১৫ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সকল বিষয়ে এমন ওয়াকিবহাল হইয়াছেন যে, ঐকথা বলিতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে কি রমাপ্রসাদ তাঁহার মিথ্যা উক্তি তাঁহার মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—তিনি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদ রোগ-যন্ত্রণায় কাতর। তিনি (অর্থাৎ কৈলাসনাথ) যদি একবার তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদকে) দেখিতে যাইতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসার ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহা হইলে হয়ত শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যু হইত না।

রমাপ্রসাদের সেই পত্রের উত্তর কৈলাসনাথ দেন নাই। কেন?

এ কথাও কি সত্য যে, য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব জওহরলালকে লিখিয়াছেন, তিনি বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে যে সকল উপকরণে নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন, কাশ্মীরের সচিবের বিবৃতিতে তাঁহার মনের সব সন্দেহ দূর হইয়াছে, উমাপ্রসাদের দ্বারা সঙ্কলিত পুস্তক পাঠ করিয়া (শ্যামাপ্রসাদের জননীর আহ্বানে তিনি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যা'ন নাই, তখন শোকার্ত্ত জননী তাঁহাকে ঐ পুস্তক পাঠ জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন) তিনি বুঝিয়াছেন, সে সকল উপকরণে অনেক ত্রুটি আছে?

নির্ম্মলচন্দ্রের একটি প্রশ্নের কোন উত্তর কৈলাসনাথ দিতে পারেন নাই—বিনা ছাড়ে কাশ্মীরে প্রবেশ যদি শ্যামাপ্রসাদের অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, ভারত সরকার সেজন্য তাঁহাকে ভারত রাষ্ট্রের সীমান্তে গ্রেপ্তার করেন নাই কেন?

কৈলাসনাথের এই প্রশ্নে উত্তর প্রদানে অক্ষমতাই কি ভারত সরকারের কার্য্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

রবীন্দ্র ভারতী—

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কলিকাতায় শোক-সভায় কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে নিখিল-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই সমিতির চেষ্টায় ১২ হাজার ৩ টাকা ৪ আনা ৩ পাই সংগৃহীত হয়। কয়টি প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিশ্বভারতী সে সকলের অন্যতম। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া রবীন্দ্র ভারতী নামকরণ করা হয়। তেজ বাহাদুর সপ্রু তাহার সভাপতি ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক মনোনীত হ'ন! বিভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ রবীন্দ্র ভারতীর ভাণ্ডার পুষ্ট করে। রবীন্দ্র ভারতী মোট ১৫ লক্ষ ১০ হাজার ৬ শত ৩৮ টাকা ১০ আনা ৭ পাই সংগ্রহ করেন। তদ্ভিন্ন কয়জন মহিলা কতকগুলি অলঙ্কার প্রদান করেন এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীকে লক্ষ টাকা দেন।

রবীন্দ্র ভারতী রবীন্দ্রনাথের গৃহ না পাইলেও রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিবারের এক অংশের একটি গৃহ ক্রয় করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করেন। সে গৃহের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও পরে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি জড়িত ছিল। উহা হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে রবীন্দ্র ভারতী ঐ গৃহ ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৩০ টাকায় ক্রয় করেন।

এই সময় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর রবীন্দ্র ভারতী আইনানুসারে রেজেষ্টারী করা হয়।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা নাকি মত প্রকাশ করেন যে, ঐ গৃহের একাংশ এত জীর্ণ যে রক্ষা করা যাইবে না। আবার যে ব্যক্তি গৃহটি পূর্ব্বাধিকারী-দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি প্রদত্ত মূল্যে সন্তুষ্ট না হইয়া আদালতে মামলা রুজু করেন। গৃহের একাংশ ভাঙ্গিয়া তথায় নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। আর আদালতের রায় অনুসারে যাঁহার নিকট হইতে গৃহটি ক্রয় করা হইয়াছিল, তিনি পাইবেন—

(১) আরও ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮ শত ৩৫ টাকা

(২) মামলার ব্যয় হিসাবে ২ হাজার একশত ৯ টাকা ৯ পাই

(৩) যেদিন হইতে গৃহ রবীন্দ্র-ভারতী লইয়াছেন সেইদিন হইতে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে সুদ।

এই রায়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র ভারতী যে আপীল দায়ের করিয়াছেন, তাহাতে পরাজয় হইলে—আর যে টাকা দিতে হইবে তাহা অল্প নহে। অথচ এখন মজুদ তহবিল (ব্যাঙ্কে) কেবল এক লক্ষ ১৭ হাজার একশত ২ টাকা ৩ আনা ৭ পাই।

কাজেই যদি আরও টাকা সংগৃহীত না হয়, তবে কি হইবে বলা যায় না।

সংগৃহীত অর্থের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীতে দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে। বিশ্বভারতী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ ৫ লক্ষ টাকা ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া মনে হয় না। গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই চিত্রাদি সংগ্রহের প্রয়োজন সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গৃহনির্ম্মিত না হইলে সে সকলের কি হইবে?

যে গৃহ (রবীন্দ্রনাথের না হইলেও) ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার স্থানে কতকটা জমীতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' গাড়ী রাখিয়া ভাড়া

দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্র ভারতীর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র মজুমদার ঐ পত্রের স্বত্বাধিকারী। মধ্যে কিছুদিন কোন কোন লোক রবীন্দ্র ভারতীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিমতলা শ্মশানে যে স্থানে রবীন্দ্রনাথের শব দাহ করা হইয়াছিল, তথায় কোন স্মারক গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, যে গৃহ রবীন্দ্রনাথের ছিল না তাহা ক্রয় করিয়া তাহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া বিবৃতিতে ও চিত্রে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র ভারতীর হিসাব প্রকাশ করা হয় নাই, এমন অভিযোগও করা হয়।

যাহা হউক, হিসাব ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণেরও অর্থ—এমন কি যদি বাড়ীর মূল্য বাবদে আরও টাকা দিতে হয়, তবে সে টাকা কোথা হইতে আসিবে, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

রবীন্দ্র ভারতীর সম্পাদক যদি পরিকল্পিত কার্য্যের জন্য মোট কত টাকা প্রয়োজন, তাহা জানাইয়া দিতেন, তবে, বোধ হয়, ভাল হইত। কারণ, ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার সংগ্রহের পরে আর টাকা সংগ্রহ করা—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহা না হইলে মধ্যপথে আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবে। রবীন্দ্র ভারতীর কর্ম্মকর্ত্তারা সে বিষয়ে কি স্থির করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল ও আগ্রহ স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষিত হউক, ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য।

খাদ্য ও অখাদ্য—

ভারত সরকার বিদেশ হইতে নানারূপ খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া রেশনে লোককে গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী মাইলো সে সকলের অন্যতম। মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ—উহা খাইয়া কতকগুলি লোক পাগল হইয়া গিয়াছে, একটি ১০ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে—মাইলোর সহিত কোন প্রকার বিষাক্ত বীজ মিশ্রিত ছিল। কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া এই শস্য বিক্রয়ের জন্য কি সরকার দায়ী নহেন?

পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব স্থায়ী হইয়া আছে এবং সুন্দরবন অঞ্চলের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বহু লোক খাদ্যের দাবীতে বসিরহাটে মহকুমা হাকিমের আদালতের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ২২শে সেপ্টেম্বর মহিলারা মিছিল করিয়া দপ্তরখানার সম্মুখে গিয়াছিলেন। পরদিন খাদ্যসচিব তাঁহাদিগের প্রতিনিধিদিগের সহিত তাঁহাদিগের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহিলারা তাঁহাকে কিছু রেশনে বিক্রীত চাউলও উপহার দিয়া, তাহা মানুষের অখাদ্য কি না, তাহা দেখিতে বলেন। মহিলাদিগকে খাদ্য-সচিব বলেন:—

(১) আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেশনে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহার মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। তাঁহার বিশ্বাস, ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নূতন চাউল (যাহাতে নানারূপ ঔদরিক পীড়া জন্মে) পাওয়া যাইবে। তখন হয়ত মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

(২) রেশনে চাউলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইবে না।

(৩) যাহাতে চাউল হইতে ধূলা ও কাঁকর পৃথক করা যায়, সরকার শীঘ্রই তেমন চালনী সংগ্রহ করিবেন।

চালনী পাইলেও যে তাহা যথাযথরূপে ব্যবহার করিয়া লোককে কাঁকর ও ধূলা বর্জ্জিত চাউল দেওয়া হইবে, এমন কথা অবশ্য খাদ্য-সচিব বলেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার সতর্কতা অসাধারণ। ধূলা বর্জ্জন করিবার চালনী কিরূপ, তাহা জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

মনে পড়িতেছে, প্রধান-সচিবত্ব লাভের দুই দিনের মধ্যেই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে এক মহিলা মিছিলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সে মিছিলে প্রধান-সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্রীও ছিলেন। প্রধান-সচিব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, রেশনে যে খাদ্যোপকরণ প্রদান করা হয়, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না—যাহাতে পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তিনি সে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সে কথা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র আশা দেন নাই; বলিয়াছেন, দাম কমিবে না, পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না। তিনি কেবল এক প্রকার চালনী আবিষ্কারের সংবাদ দিয়াছেন। অর্থাৎ he feasted them on smooth words and dismissed them with fasting stomachs.

মহিলারা যে—অবস্থা অসহনীয় হওয়ায়—প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। খাদ্য-সচিব যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহারা কি করিবেন, তাহা এখন দেখিবার বিষয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে আবশ্যক পরিমাণ চাউলের অভাব নাই, ইহা যে সব হিসাব অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে সে সকল হিসাব সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

অপব্যয়—

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সর্ব্ববিধ অপব্যয় অবশ্যপরিহার্য্য এবং যে ব্যয় না করিলেও চলে সে ব্যয় বিলাস ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

সম্প্রতি দিল্লীতে পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে উপ-অর্থমন্ত্রী শ্রীঅরুণকুমার গুহ—সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—

১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে ভারতবর্ষের লোক ৩৫ কোটি ৫০ হাজার টাকা ধূমপানে—সিগারেটে ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে শুল্ক ধরা হইয়াছে।

সিগারেট-ধূমপানের প্রাবল্য নিবারণ জন্য সরকারকে সভাগৃহে, রঙ্গালয়ে, চলচ্চিত্র গৃহে ও শেষে সাধারণ যাত্রিবাহী যানে ধূমপান নিষিদ্ধ অর্থাৎ আইনতঃ দণ্ডনীয় করিতে হইয়াছে।

যে দেশের লোকের পেটে অন্ন ও পরিধানে কাপড় নাই, সে দেশে বৎসরে ধূমপানে সাড়ে ৩৫ কোটি টাকা অপব্যয় জাতির বিষম দুর্দ্দশারই পরিচায়ক।

দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হইয়া ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দার্জ্জিলিংএ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষার্থ যে গৃহে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা জাতির সম্পত্তি করিয়া জন-কল্যাণকর কার্য্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে জন্য মোট প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। তাঁহার অক্লান্ত আন্তরিক চেষ্টায় ইতোমধ্যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ৩১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ইতোমধ্যেই (গত ২০শে সেপ্টেম্বর) যে গৃহে দাশ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই 'ষ্টেপ এ সাইড' ক্রয় করা হইয়াছে। দেশবন্ধু মেমোরিয়াল সোসাইটী (দার্জ্জিলিং) রেজেষ্টারী করাও হইয়াছে। রাজ্যপাল মহাশয় স্বয়ং দার্জ্জিলিংএ গৃহটির আবশ্যক সংস্কার সাধন—পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন দেখিবেন। রাজ্যপাল মহাশয়ের এই কার্য্যের জন্য সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দান করিয়াছেন, তাহা স্মরণীয়।

ইহার পরে—সমুদ্রতীরে দীঘায় বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে যক্ষ্মারোগ হইতে আরোগ্য লাভের পর লোক যাহাতে সবল হইতে পারে সে জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও ডক্টর হরেন্দ্রকুমার করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অভাব যেমন তীব্র—প্রয়োজন তেমনই অত্যন্ত অধিক। আমরা আশা করি, তাঁহার এই পরিকল্পনা রূপলাভ করিয়া বাঙ্গালার লোকের অশেষ উপকার সাধন করিবে।

সুরেন্দ্রনাথের বারাকপুরস্থ গৃহ রক্ষার ইচ্ছাও ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের আছে।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন—

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। এই সময় পূর্ব্ব-পঞ্জাবে লুধিয়ানায় একটি পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। লুধিয়ানা মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি উৎপাদনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এই স্থানে উদ্বাস্তু-দিগকে ঐ শিল্প শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্রী সরকার ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। ঐ টাকায় প্রায় দেড়শত শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ৩ বৎসরে তাহাদিগের দ্বারা উৎপন্ন মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি প্রায় ৯ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। উহাতে মোট দেড়লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। গৃহের মূল্য-হ্রাস, সঞ্চয় তহবিল ও প্রদত্ত ৫ লক্ষ টাকার সুদ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র—উদ্বাস্তুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলে মোট কত টাকা প্রযুক্ত হইয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্ব্বাসন বিভাগ জানাইয়া দিবেন? ঐ সকল কেন্দ্রে কোন্ কোন্ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যাহারা শিক্ষালাভ করে, তাহারা কিরূপে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল ও আগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, যে টাকা ব্যয়িত হইতেছে, তাহা তাহাদিগের এবং যাহাতে তাহা অপব্যয়িত না হয়, তাহাই তাহাদিগের অভিপ্রেত। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেরূপে উদ্বাস্তু অনাথাদিগকে আবশ্যক দ্রব্য উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে সেরূপ সাফল্য লাভ না হইবার কারণ কি? এই বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কাশ্মীর—

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা যেমন সফল হয় না, কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব ও তাঁহার ভুল ঢাকিবার যে চেষ্টা জওহরলাল নেহরু করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা তেমনই ব্যর্থ হইয়াছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি পার্লামেণ্টে নানা কথার মধ্যে কাশ্মীরের কথাও বলিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন, গত মে মাসে বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন তথায় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে অবস্থায় কাশ্মীর সরকার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি তিনি সেই অবস্থায় পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের দলপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিনা বিচারে বন্দিদশায় রাখিয়া সন্তুষ্ট অবস্থায় বিদেশে গিয়াছিলেন এবং শেখ আবদুল্লা স্বীকার করিয়াছিলেন—নেহরুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি শ্যামাপ্রসাদকে দিল্লীতে পাঠাইতেন, মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ কথা কি সত্য যে, শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করায় তিনি শেখ আবদুল্লাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন? তবুও—শেখ আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাইয়াও, জওহরলাল বলিয়াছেন—কাশ্মীরের ব্যাপার তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—ভারতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এ কথা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, তাঁহার দোষে ভারতের কোটি কোটি টাকা কাশ্মীরে ব্যয়িত হইবার পরেও তাঁহার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শেখ আবদুল্লা ভারতের সহিত কাশ্মীর সংযুক্ত করা ত পরের কথা—ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং তাহার প্রমাণ এমন অকাট্য যে তিনিও আবদুল্লার গ্রেপ্তারে বাধা দিতে পারেন নাই? তিনি কি কাশ্মীরের ব্যাপারে পদে পদে ভুল করেন নাই এবং সেই ভুলের জন্যই শেখ আবদুল্লার বুক বলিয়াছিল?

কিন্তু কাশ্মীরের কি হইবে? এখন কাশ্মীর বলিতে যাহা বুঝাইতেছে, তাহা সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য নহে—তাহার একাংশ মাত্র অর্থাৎ জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক। জম্মুর প্রজাপরিষদ সম্পূর্ণরূপে ভারত-ভুক্তি চাহিয়া আসিয়াছেন এবং সেই জন্য পরিষদের সদস্যরা আবদুল্লা কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এখনও জওহরলাল প্রজাপরিষদের আন্দোলনের নিন্দা করিয়া নির্লজ্জতার পরিচয় দিতেছেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখেও প্রজাপরিষদের নেতা শ্রীপ্রেমনাথ ডগরা বলিয়াছেন—"ডগরাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা বহু কষ্ট সহ্য করিয়া জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সম্মিলিত রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন —আজ আমরা কিছুতেই সেই সকল অংশের ঐক্য রক্ষা করিতে বিরত হইব না।" অথচ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুসৃত নীতির ফলে
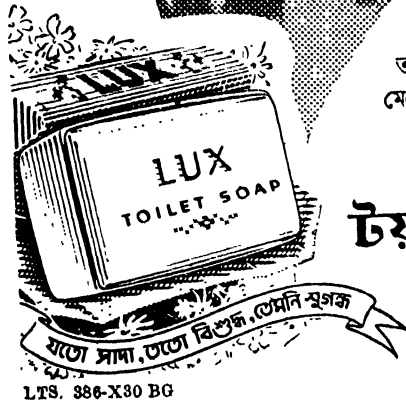
আজ জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক ব্যতীত রাজ্যের আর সকল অংশ পাকিস্তানের সহিত সম্মিলিত—"আজাদ কাশ্মীর" সরকার পাকিস্তানের পুতুল।

শ্রীপ্রেমনাথ ডগরা অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা আমেরিকার বা রুশিয়ার অনুরক্ত নহেন—তাঁহারা চাহেন সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতভুক্ত হইবে?

যে প্রতিষ্ঠান শেখ আবদুল্লার অধীন ছিল এবং যাহা জাতীয় সম্মিলন নামে অভিহিত—সেই প্রতিষ্ঠান, শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পরেও বলিতেছেন, কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কেবল কয়টি বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতে যোগ দিবে। সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব (১৫ই সেপ্টেম্বর)—

"We will resist with all the forces the idea of merger."

যদি তাহাই হয়, তবে ভারত সরকার কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় নাগরিকদিগের অর্থ ব্যয় করিবেন কেন? এখনও গণভোটের কথাই বলা হইতেছে—কেবল বলা হইতেছে, গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে পাকিস্তানকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। গণভোটের কথা উত্থাপিত হয় কেন? মহারাজা হরি সিংহ যখন তাঁহার সমগ্র রাজ্য ভারতভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তখন সেই আবেদনানুসারে কাজ হয় না কেন? সেজন্য পণ্ডিত জওহরলালই দায়ী।

এ দিকে—অবস্থার মীমাংসা না হইলেও—ভারতসরকার কাশ্মীর রাজ্যে ডাক ও তার প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য যদি ভারতভুক্ত হয়, তবেই তাহার জন্য ভারত সরকারের অর্থব্যয় সমর্থিত হইতে পারে; নহিলে নহে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদিকে মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ, আর এক দিকে বলিতেছেন, বিদেশীদিগের হস্তক্ষেপ ভারত সরকার সমর্থন করিবেন না। তাঁহার এই দুই প্রকার উক্তিতে সামঞ্জস্য সাধনের উপায় কি?

যতদিন কাশ্মীর-সমস্যা ভারতের পার্লামেণ্টে দলীয় ব্যাপারের বাহিরে স্থাপিত না হইতেছে, অর্থাৎ যতদিন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার প্রদান করা না হইতেছে, ততদিন ভারতবাসীর প্রকৃত মনোভাব অর্থাৎ গণমত অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীতি ব্যর্থ হইয়াছে—এখনও কি তিনি গণমত জানিয়া তদনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইবেন?

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী—

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা এই পদে বৃত হ'ন নাই। কিন্তু শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন, তাঁহার মনোনয়ন নারী জাতির প্রতি সম্মান বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না—মনে করেন, এই নিয়োগ ভারতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন বটে, কিন্তু কোরিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতিদান পাওয়া যায় নাই।

মিশর ও পারস্য—

মিশরের ঘটনার স্রোতঃ যেন আর বেগে প্রবাহিত হইতেছে না। তথায় নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে আপনাকে দৃঢ় করিবার চেষ্টাই করিতেছেন। সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। সুদান এখন যাহাই হউক, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মিশরের অংশই হইবে। কারণ, বর্ত্তমানকালে ঐক্যই দলের উৎস হয়।

পারস্যে রাজচ্যুত ও বন্দী মন্ত্রীর বিচার চলিতেছে। বিচার—বিচার হইবে, কি বিচারের প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা বলিবার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই। তবে, মনে হয়, পারস্য এখনও—ইংলণ্ডের মত—রাজতন্ত্র-শাসন বর্জ্জন করিবার উপযোগী হয় নাই বা হইল মনে করিতেছে না। তবে ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ যে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই বলা যায়। পারস্যে কি হইবে, বুঝা যাইতেছে না।

১০ই আশ্বিন ১৩৬০

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমায় আজি পড়ছে মনে এই ক্ষণে,
চাঁদের আলোয় শিউলি বনে নির্জ্জনে;
নীল আকাশে হাতছানি দেয় ঘুমপরী;
ধীর বাতাসে জাগ্‌ছে তরু মর্ম্মরি',
দূর-বিহগী একলা ডাকে কোন বনে।

এই যামিনী ছন্দহারা নিঃস্ব,
রিক্ত আজি তোমায় ছাড়া বিশ্ব;
কোথায় তুমি—কোন সুদূরে,
পাই যে তোমায় গানের সুরে,
তোমার সাথে আমার মিলন মনে মনে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুরঙ্গমা পলায়ন করে নাই। শাখা-পত্র-বহুল এক বিরাট মহীরুহে আরোহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সে আত্ম-বিশ্লেষণে নিরত ছিল। একটি কথাই বিশেষভাবে সে চিন্তা করিতেছিল। এই যজ্ঞে সে আত্মাহুতি দিতে সম্মত হইল কেন? মির্ম্মিরের কথায় সত্যই কি সে বিশ্বাস করিয়াছিল কুমার তাহাকে যজ্ঞে বলিদান দিয়া তাহারই ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি সত্যই কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবেন বলিয়াই এমনভাবে ত্যাগ করিতেছেন? মির্ম্মির তানেকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন কি না পাইয়া নারী-লোভ-মুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে মির্ম্মিরের সহিত রাত্রিবাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত অতিশয় ধূর্ত্ত, কৌশলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মির্ম্মির তানেকে যজ্ঞে ত্যাগ করিয়াই সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন কুমারও কি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইবেন? কুমারের বলিষ্ঠ যৌবন, প্রবুদ্ধ কল্পনা, অগাধ ঐশ্বর্য্য, কি কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবে? সহসা তাহার নিরালার কথা মনে পড়িল। সুরঙ্গমা আসিবার পূর্ব্বে নিরালাই ছিল রাজনর্ত্তকী। সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল! কুমার তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নিরালার অপরূপ নৃত্য-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব কণ্ঠ সঙ্গীত কুমারকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কুমার তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন 'ছন্দ-কিন্নরী'। পুরাতন পরিচারিকা শারী তাহাকে বলিয়াছিল নিরালা তাঁহাকে ভালবাসিত বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার যেদিন বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন সেই দিনই সে মরিল। সুরঙ্গমার মনে হইল সে-ও যদি মরে কুমার কি তাহাকে মনে রাখিবেন? ছন্দ-কিন্নরীকে কি তিনি মনে রাখিয়াছেন! কই তাহার কথা একদিনও তো সে কুমারের মুখে শোনে নাই। কুমারের আচরণে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণয়ের কথা একবারও তো আভাসিত হয় নাই। পুরুষ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সুরঙ্গমার কি আজও ভ্রান্তি আছে? সে কি জানে না যে পুরুষ মাত্রেই শিশু প্রকৃতির নূতন ক্রীড়নক পাইলেই পুরাতনের কথা বিস্মৃত হয়? তবে সে এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কেন! সত্যই কি যজ্ঞে তাহার আস্থা আছে? সত্যই কি সে বিশ্বাস করে যে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বিদেহী আত্মা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে? যদি করেই, তাহাতেই বা কি! যে দেহটা লইয়া তাহার কারবার সেই দেহই যদি না থাকে স্বর্গের প্রয়োজন কি! চার্ব্বাকের কথা সহসা মনে হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মা-প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন চার্ব্বাক যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল। চার্ব্বাকের প্রফুল্ল প্রদীপ্ত নয়ন-যুগল তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফুটিয়া উঠিল যেন। চার্ব্বাকের কথাগুলি আবার যেন সে শুনিতে পাইল—"তুমি যদি সাধারণ কোন নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে মনে হচ্ছে তা নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছ এই ধারণাটা।···" সেদিন সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে বলিয়াছিল, "আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি·" সত্যই কি সে করে? সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে সেও ইহলোক ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না, কখনও করে

নাই। তবে সে চার্ব্বাকের কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল কেন! করিয়াছিল চার্ব্বাককে নিরস্ত করিয়া আরও উতলা করিবার জন্য। ইশারায় ইঙ্গিতে এই কথাই সে বলিতে চাহিয়াছিল—'তুমি ভাবিয়াছ তোমার বুদ্ধির দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসাইয়া দিবে? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে যুক্তির জাল দিয়া ধরা যায় না। প্রেম-ডোর ছাড়া অন্য কোনও ডোরে আমাকে বাঁধা সম্ভব নয়। কুমারের প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়াই তাহার কাছে আছি, তাহার চতুরানন বিগ্রহকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তোমার প্রেমে যদি পড়িতাম তাহা হইলে তোমার নাস্তিক্য-বাদকেও মানিয়া লইতাম। আমার কাছে যুক্তি আস্ফালন বৃথা। আমি জলের মতো। যখন যে পাত্রে থাকি সেই পাত্রের আকার ধারণ করি।' সহসা তাহার নজরে পড়িল যূপকাষ্ঠটা পোঁতা হইতেছে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ যেন বহিয়া গেল! ওই যূপকাষ্ঠমূলে সুরঙ্গমা শেষ হইয়া যাইবে? হায়, হায় কেন সে এই সর্ব্বনাশা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে রাজি হইয়াছিল? কেন? নিগূঢ় কারণটা হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল। সে আশা করিয়াছিল কুমার প্রতিবাদ করিবে, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কুমার কিছুতেই এ নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দিবে না। কিন্তু কুমার তো কিছুই করিল না। যজ্ঞের আয়োজন তো মহাসমারোহে চলিতেছে। ওই সিংহটা যেমন কামের প্ররোচনায় বন্দী হইয়াছে সে-ও তেমনি অহঙ্কারের প্ররোচনায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের কি কোনও ভিত্তি নাই? কুমার কি সত্যই তাহাকে বলিদান দিবেন? মনে হইল পুরুষদের চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈরাগ্য সে লক্ষ্য করিয়াছে যাহা দুর্ভেদ্য, যাহা দুর্ব্বোধ্য, যাহা রহস্যময়,আতঙ্কজনক। অন্যমনস্ক সুন্দরানন্দকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করিয়াছে। যেন কোন সীমাহীন সাগরে তাহার মন ছিন্ন-বন্ধন তরীর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে তাহার দেহটা, সে নাই। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুরঙ্গমা সকলকে পিছনে ফেলিয়া তাহার মন পাড়ি দিয়াছে অজানার উদ্দেশ্যে। আর একটা কথাও তাহার মনে হইল, পুরুষদের অহঙ্কারও কম নয়। নিজেদের কথার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য তাহারা অপরের সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। মনে পড়িল রামের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা। রাম কি সীতাকে কম ভালবাসিত? তবু বিসর্জ্জন দিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র কি শৈব্যাকে কম ভালবাসিত? তবু তাহাকে ভিখারিণী করিতে ইতস্তত করে নাই। পুরুষরা সব পারে। শিবি নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, দধীচি অস্থিদান করিয়াছিল। পুরুষদের অসাধ্য কিছু নাই। সহসা চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া বন্দী সিংহটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পৌরুষের দম্ভ সিংহগর্জ্জনে যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিকই বলিয়াছ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও পৌরুষ নিজের মহিমা ঘোষণা করে। জাগ্রত পৌরুষকে কোন মায়া অভিভূত করে না, কোন বন্ধনই বাঁধে না। কোনও বাধা তাহার কাছে দুস্তর নয়, কোনও বিপদ ভয়ঙ্কর নয়। যে পৌরুষ নিজেকে জানিয়াছে সে নির্ভীক, সে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে, পিছন ফিরিয়া চায় না। সুন্দরানন্দের কি এই পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছে? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে সুরঙ্গমার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথ ধরিল। সুন্দরানন্দের এই পৌরুষকেই তো সে ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ সেই পৌরুষের আর একটা রূপ দেখিয়া ভয় পাইতেছে কেন! কিন্তু ভয় তাহার করিতেছিল। প্রোথিত যূপকাষ্ঠটার দিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল। নির্ব্বিকার, শুষ্ক প্রাণ-হীন কাষ্ঠ—মানুষ, মহিষ, ছাগ-শিশু তাহার কাছে সব সমান! সহসা সুরঙ্গমা চমকাইয়া উঠিল। শাখা-পত্রের মধ্যে কথা কহিতেছে কে! উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

"বাণী, বৃহদারণ্যক বলে' একটা উপনিষদ আছে জান?"

"জানি। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশই বৃহদারণ্যক। কেন—"

"তাতে একটা মজার কথা আছে। কোন এক ঋষি তাতে আমাকে ক্ষুধা বলে' কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন ক্ষুধা মানে মৃত্যু—এবং মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ আমি। তাই বোধহয় এত ক্ষিধে পাচ্ছে আজ। ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মিশ্মিরের সমস্ত ফলগুলো নিঃশেষ করেছি, তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি। মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে' ফেলি। সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাক, নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হবে তারপর। চুপ করে' আছ যে—"

"তাই করুন—"

"চার্ব্বাক আর শিখর সেনের ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। করতেই হবে একটা কিছু। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে মনে, মৃত্যুরূপী ক্ষুধা অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরাতনকে গ্রাস করে' ফেলবার জন্যে—"

"এবার স্বৈরচর সৃষ্টিতে মন দেবেন ?"

"কি করব জানি না। উপাদান আর ইচ্ছা দুইই আমার মনের ভিতর আছে। দুটোর সমন্বয়ে কি যে গড়ে' উঠবে তা আমিও জানি না। বৃহদারণ্যকে আছে— প্রথমে ছিলাম ক্ষুধা, তারপর হল জল, তারপর পৃথিবী তারপর সূর্য্যনক্ষত্র, তারপর কাল। আমার প্রেরণা যে কি রূপ নেবে তা আমিও জানি না। এখন এই গল্প দুটো শেষ করা যাক। এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু বাণী, কি খাই বল তো। পক্ষীরূপ তো বড় সাংঘাতিক রূপ, সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে কি খাই কি খাই—"

"বনে অনেক ফল আছে, চলুন খুঁজে দেখা যাক"

"তাই চল"

সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে দেখিল বৃক্ষ শিখর হইতে দুইটি অপরূপ সুকপক্ষী উড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে সে তাহাদের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল অতি শৈশবে মাতামহীর নিকট সে এক রূপকথা শুনিয়াছিল, সে রূপকথায় এক পক্ষীদম্পতী মনুস্য-ভাষায় কথা কহিত। ইহারাই কি তাহারা? কি বলিল কিছু বোঝা গেল না তো! বৃহদারণ্যক কি? বাণীই বা কে। একটি কথা কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সেই কথাটাই তাহার কানে বাজিতে লাগিল—"এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ওযে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই।" কোন মেয়েটার কথা বলিল উহারা! তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল কি? সিংহটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল সহসা। সুরঙ্গমা চাহিয়া দেখিল সিংহটা ঊর্দ্ধমুখে তাহাকেই দেখিতেছে। মনে হইল সে-ও যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে বসিয়া পড়িল এবং সামনের থাবায় মুখটা রাখিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ—অমন নাগালের বাহিরে বসিয়া আছ কেন। আর একটু নামিয়া এস না। সুরঙ্গমা মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার আমন্ত্রণের উত্তর দিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। খাঁচার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সিংহটাও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উন্মুখ আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, আর গর্জ্জন করিল না, কেবল তাহার কণ্ঠ-স্বর হইতে সম্ভবত তাহার অজ্ঞাত-সারেই একটা গর-গর গর-গর শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মাংস খাবার ইচ্ছে না কি? আমি কি ভেড়া হরিণের মতো সাধারণ পশু? কাল রাত্রে তো গান শুনেছ। আজ নাচ দেখবে? দেখ—" সুরঙ্গমা সিংহের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার কেশ আলুলায়িত হইল, বেশবাস বিশ্রস্ত হইল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে নাচিয়া চলিল। উন্মাদিনীর মতো নাচিতে লাগিল। ক্রমশঃ

চলার পথে

শ্রীবীণা দে

কাঁটার মাঝে ফুল ফুটে
রক্ত রাগে
তুলনা নাই,
ব্যথার মাঝে কামনা টুটে
যে প্রেম জাগে
তারেই চাই।

কথার মাঝে যেটুকু কথা
যায়না বলা
সেই তো বাণী,
পথের মাঝে যেপথে ব্যথা
দুরূহ চলা
তারেই মানি।
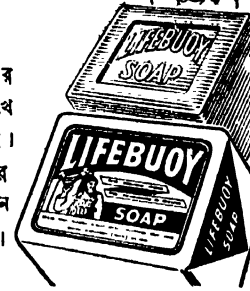
শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১

মনে হয়, এই ত সে-দিনের কথা। এখনও চোখের উপর সে-সব ঘটনা চলচ্চিত্রের মত সজীব হয়ে উঠে। অথচ, হিসাব করলে দেখি, প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। তখনও কলেজে পড়ি। শরৎচন্দ্রের লেখা—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি ও আনন্দ আনে। আজও সে-আনন্দের সীমা নেই। শুধু লেখার মধ্যে দিয়ে লেখককে কেমন করে একান্ত আপনার করে নেওয়া যায় শরৎচন্দ্রের পাঠকবর্গের কাছে তা অজানা নয়। এমনি করে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

তারপর, একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। সেই থেকে তাঁর অতি-নিকটে আসার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জীবনের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সে আমার অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু, সে-সব কাহিনী বলবার জন্যে এ-লেখা নয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকখানি পত্র শরৎচন্দ্র আমাকে দিয়েছিলেন। এখনও সে-সব চিঠি আমারই কাছে আছে। আজ যে-চিঠিগুলি এখানে প্রকাশিত হোল, তার একটি শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। অপর একখানি শরৎচন্দ্রের লেখা, রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রত্যুত্তর। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় নি। চিঠি দুইখানির বিষয়বস্তু শরৎচন্দ্রের পথের দাবী।

পথের দাবী ধারাবাহিকরূপে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২৯, থেকে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। পত্রিকাখানি আমাদের বাড়ী থেকেই বা'র হোত। এই উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা-কালেই শরৎচন্দ্র জানতেন যে বইখানি ইংরাজ-রাজ বাজেয়াপ্ত করবেই। লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে সরকারের কুপিত দৃষ্টি প্রকাশকের উপরও পড়বে—এ-আশঙ্কার বিষয়েও তিনি বঙ্গবাণীর পরিচালকদের প্রথমেই সতর্ক করে দেন।

শরৎচন্দ্রের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসগুলির এমনিতেই এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল। পথের দাবীর ত কথাই নেই। প্রতি মাসে তাঁর নতুন লেখার আশায় পাঠকবর্গ পত্রিকার প্রকৃতই পথ চেয়ে থাকত।

বইখানির শেষ অংশ বঙ্গবাণীর ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বার হয়। কিন্তু, সমাপ্ত হোলেও লেখাটি সে-মাসেও 'ক্রমশঃ' বলে প্রকাশিত হয়েছিল। তার কারণ, উপন্যাসটি বই হ'য়ে ছাপা হোলেই বাজেয়াপ্ত হবে—এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। তাই শেষ অংশ বঙ্গবাণীতে প্রকাশ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বইখানিও ছাপতে আরম্ভ করা হয়। অথচ, বাইরে সবারই ধারণা থাকে, উপন্যাস তখনও শেষ হয় নি। ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে বইখানি ছাপা হ'য়ে প্রেস থেকে বার হয়।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর যে-সব প্রসিদ্ধ প্রকাশক ছিলেন, তাঁরা বইখানি প্রকাশ করতে রাজী হন নি। শেষ পর্য্যন্ত, আমিই তার প্রকাশক হই। শরৎচন্দ্র সে-সময় আমাকে বলেন, যদি জেল হয়, কি করবে?

আমি তখনি বলি, হ'লে ত আর একা প্রকাশকের হবে না, লেখকেরও হবে। দুজনে জেলে একসঙ্গে থাকব—আপনার সঙ্গে থাকা,—সে-ত মহা-ভাগ্যের কথা।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, দেখো, আমার গড়গড়াটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

দুজনেই খুব হেসেছিলাম সেদিন। কিন্তু জেল হোল না। শুধু বইখানি বাজেয়াপ্তই হোল। অর্থাৎ, বাজেয়াপ্তির হুকুম বেরুল, কিন্তু একখানি মাত্র বই সরকারের হাতে গেল। আর সব বই-ই তখন অদৃশ্য হয়েছে। তার কারণ, ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনের মধ্যেই সব বই কলকাতা সহরের মধ্যে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়, যা'তে সন্ধানে এলেও সব বইগুলি পুলিসের হাতে না পড়ে। কয়দিনের ভিতর সব বইগুলি বিক্রীও হয়ে গেল। তাই আইনতঃ বই-এর প্রচার বন্ধ হোল। কিন্তু, ছাপা সব বই-ই তখন পাঠকদের হাতে। এদিকে বাঙ্লার বিপ্লবীদলের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে নূতন সংস্করণ বা'র হয়ে বহু স্থানে বই ছড়িয়ে

পড়ল। হাতে-লেখা সম্পূর্ণ বই-এর কপিও আমি দেখেছি। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে পথের দাবী পড়ার বা এক কপি পথের দাবী কাছে পাওয়ার জন্যে সে কি আকুল আগ্রহ!

এমনি সময়ে, রবীন্দ্রনাথকে এক কপি পথের দাবী পাঠানো হয়। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বইখানি বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রতিবাদ করেন। এ-প্রতিবাদ, বিদেশী শাসকের দ্বারা সাহিত্যের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের প্রতিবাদ। কিন্তু, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা তাঁর চিঠিখানি থেকে প্রকাশ পাবে।

রবীন্দ্রনাথের সে-চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র আমাকে এই পত্রখানি লেখেন:

সাম্‌তাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু, বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। রক্ত বন্ধ ত হয়ই নি, বরঞ্চ যেন বেশী বেশী পড়চে। যাক্, এ প্রসঙ্গ আর না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতাখানেক লিখেই থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারচিনে।

B. N. Ry. স্ট্রাইক তেমনিই চলেছে,—কলকাতায় পৌছতে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা লাগে এবং ফেরা সুকঠিন।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

দাদা

তারপরেই আমি সাম্‌তাবেড়ে যাই। গিয়ে দেখি, শরৎচন্দ্র বিশেষ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। তিনি ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন; কিন্তু পাঠান নি। জবাবটি পাঠানো উচিত হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের কথা হয়। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানতেন, তাঁকে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি কোরতেন। রবীন্দ্রনাথও অকৃপণ ভাষায় শরৎচন্দ্রের শক্তির ভূয়সী প্রশংসা কোরতেন। তবুও, অনেক বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল। দুঃখের বিষয়, এই মতের অমিল রবীন্দ্রনাথের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই চিঠির মাত্র কয়েক মাস আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মতিথির উৎসব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে এই পত্রখানি লেখেন:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এলে খুসি হতুম, তুমিও খুসি হও এমন আয়োজনও হয়ত ছিল। আমার মনে হচ্চে তুমি হয়ত এখানকার লোকসমাগমের কাল্পনিক বিভীষিকা একটা মনে মনে রচনা ক'রে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েচ। তুমি যে আসতে পারনি হয়ত সেটা একটা কারণে ভালোই হয়েচে—এখানে যারা আমাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে থাকে তারা আমার অত্যন্ত কাছের লোক—এই জন্য স্বভাবতই বাড়াবাড়ি করে—তোমার অনভ্যস্ত চোখে সেটা হয় তো ভালো না লাগতে পারত, এমন কি, হয় তো ভাবতে যে, আমি এই রকম সম্মান সমাদরের ভূরি ভোজ পছন্দ করি। কথাটা একেবারেই ভুল।

আমি জানতুম শরৎ আসবেন না। হয় ত সেটাও ভালো হয়েছে—কারণ হয় ত প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেন না তাঁর মন বিমুখ হয়েচে। এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকট্য ঠিক নয়—এর পরে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—জোর করে টানাটানি করা ভুল। খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে না। আজকের দিনে তাই নিয়ে বেজোড়কে জোড়া দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই—কেন না আমার সময় অল্পই বাকি—তাই, যা কিছু হয়ে উঠেছে সেইটেকেই রক্ষা করলেই যথেষ্ট, যা কিছু হতে পারত তাকে সম্ভবপর করে তোলবার মত অধ্যবসায় এখন আর জোগাতে পারব না। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-চিঠি শরৎচন্দ্রের কাছেই ছিল এবং পরে তিনি আমাকে এটি দেন। চিঠিখানি আজও আমার কাছে আছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির কথাও শরৎচন্দ্র ভুলতে পারেন নি। তাই, পথের দাবী নিয়ে আবার একটা বাদানুবাদের অশান্তি তোলায় তাঁর বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। অথচ, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি কাছে রাখাও তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে বলেন, দেখো, বার বার আমি এ-চিঠিখানি পড়ছি, আর ভাবছি, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও আমাকে লিখতে পারলেন!

অবশেষে, আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও শরৎচন্দ্রের জবাব—দু'টিই কলকাতায় নিয়ে আসি। কথা থাকে, শরৎচন্দ্র তার দুদিন পরে যখন কলকাতায় আসবেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে উত্তরটা পাঠানো হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাকে জানাবেন।

দু'দিন পরে তিনি এলেনও। তখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন। আমাকে বললেন, নাঃ। আর বাদানুবাদের মধ্যে নয়। ও আমার ভালো লাগে না। কবির এ-চিঠির প্রচার হওয়াও ঠিক নয়। আমার চিঠিও পাঠিয়ে দরকার নেই। এ-চিঠি দুখানিই তোমারি কাছে থাক্। কিন্তু কাউকে তুমি এ-গুলি দেখিও না—বিশেষতঃ যতদিন রবীন্দ্রনাথ ও আমি আছি। এ-চিঠির বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনাও কোরো না। আমি সম্মতি জানিয়ে তখনি তাঁকে বলেছিলাম যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কথা রাখব; কিন্তু তিনি নিজে কি এ-চিঠির সম্বন্ধে কাউকে না জানিয়ে থাকতে পারবেন?

হোলও তাই। সপ্তাহখানেকও গেল না। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এসে হাজির। তাঁরা শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের মুখেই চিঠির বিষয় শুনে এসেছেন। চিঠি দুখানি আমার কাছে আছে, সে-সংবাদও জেনে এসেছেন। এখন তাঁদের পড়তে দিতেই হবে।

আমি অবশ্য তাঁদের চিঠি দেখতেও দিই নি, পড়েও শোনাই নি। এ-বিষয়ে আলোচনাও করিনি। শুধু তখনি নয়। তারপরও বহুবারই এ-চিঠি দেখার জন্যে অনেকেই এসেছেন, কিন্তু আজ এ-চিঠি প্রকাশ করার আগে পর্য্যন্ত এগুলি কারও কাছে দেখাই নি।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানিতে শরৎচন্দ্র কত গভীর আঘাত পেয়েছিলেন, কয়েক মাস পরে আমাকে-লেখা তাঁর আরেকখানি চিঠি থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে গিরিজাবাবুর প্রতিবাদ, বিচিত্রায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তর মন্তব্য সবই পড়েছি। নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি ভয় হয়, আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন পাছে আমি ততটা না পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না।

তবুও এ কথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ, এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেচেন আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ কোরো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। শ্যামাপ্রসাদ কেমন আছে?

ইতি—১০ই ভাদ্র, '৩৪
দাদা

এর পরেই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'—নামে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লেখেন:

"বিশ্বকবির এই সাহিত্য-ধর্ম্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি

বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে বাঙলা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাঁহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।"

পথের দাবী সম্বন্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি নীচে ছাপলাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব লেখারই কপি রাখতেন। তাই, যদিও মূল চিঠিটি এতদিন আমারই কাছে আছে, শান্তিনিকেতনে রাখা কপিগুলি থেকে এ চিঠি পূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখ্‌লেম একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র—তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখ্‌লে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হ'ত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলি নে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চল্‌বে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাক্‌তে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখ্‌তে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চল্‌তেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালকবালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।

ইতি ২৭ মাঘ ১৩৩৩ তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের উত্তর

(পূর্বেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের এ-চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় নি)

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে

কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠ্‌বারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা ক'রতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হ'ত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙ্‌লা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্ব্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে

প্রীতিভাজনেষু,

ইতি ২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

স্নেহাৎ
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তখন আমিই যে অব্যাগতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চল্‌বেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্য হয় তখন, দুবছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিম্বা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authority'রা ঘাসের ব্যবস্থা করে তখন, হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত বলে মনে করি, তা বল্‌তে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেম্‌নি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়,আমারও ভুল হয়েছেমনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাক্‌তো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। ইতি ২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রের উত্তর পেলেন না। পথের দাবী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে আলোচনা এইভাবে সুরু হয়েই থেমে যায়। কিন্তু, তবুও মতের অনৈক্য মনেই পুষ্ট হতে থাকে এবং প্রায় সাত বৎসর পরেও আর একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এই

চিঠিখানি লেখেন। আশ্চর্য্য লাগে—চিঠিখানি "বিজয়ার অভিবাদন" পত্র !

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎ, কোনো পত্রিকায় দেখলুম তোমার বিশ্বাস যে, উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা হতে পারে কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়। কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোনো লেখার উদ্দেশ্য হয় তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেচ—আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি। এবারও সেই ফন্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল।—আমার বিজয়ার অভিবাদন—ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সাধনায় দুইজনই মহান্ তপস্বী। দুইজনই কত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। পরস্পরের অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে দুইজনেরই কত না গভীর শ্রদ্ধা। তবুও, উভয়ের মধ্যে একি অকরুণ-মনোগত মতভেদ !

সুগন্ধি-পুষ্প-বৃন্তে যেন কণ্টকের মর্ম্মব্যথা।

আজ রবীন্দ্রনাথও নাই, শরৎচন্দ্রও নাই। তাই, এই সব চিঠির অনবদ্য ভাষার মাঝে অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসের আস্বাদ পাই, দুঃসহ আঘাতের স্পর্শ বোধ করি না।

কিন্তু, থাক্ সে-কথা। পথের দাবীর কথা বলেই এ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি।

৪

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩। পথের দাবী বই আকারে তখনও বা'র হয় নি। তবুও, সকলেই জানি, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের নিষেধাজ্ঞা সুনিশ্চিত।

সাম্তাবেড়ে গিয়েছি। এর আগেই বঙ্গবাণীর পাতা কেটে পথের দাবীর একটি সম্পূর্ণ ফাইল তৈরি করেছিলাম। বই প্রকাশের জন্যে শরৎচন্দ্র এ-তে সামান্য কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন করেছিলেন। সেই বাঁধানো ফাইলটি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'দিন, এর উপর কিছু নিজের হাতে লিখে।'

ব্যথা-ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, লিখ্‌ব আর কি ব'ল ? আমি লিখ্‌ব, আর গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করবে। এই ত ? পরাধীন দেশে সত্যকার সাহিত্য-সাধনার ব্যথা কম ?

তবুও, তাঁর প্রকাণ্ড মোটা ফাউণ্টেন পেন্‌টি হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন।

বলেন, নাঃ। কিছুই লিখ্‌তে পারছি না।

তারপর, ধীরে ধীরে কলম চলতে থাকে। দেখি, প্রথম পাতায় লিখেছেন—মাঝখানে আমার নাম। তার পাশেই তাঁর নিজের নামটি। নীচে তাঁর জন্ম-কুণ্ডলী এঁকেছেন। জন্ম-তারিখ, সময়ও লিখেছেন এবং মৃত্যু লিখে ফাঁক রেখেছেন। পাতার মাথার উপর বাঁকা করে লেখা—

"কিছুই লিখ্‌তে পারলাম না। শরৎ—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে—এই কামনা করি ঃ শ"

খাতার শেষ পাতায় লেখা ঃ

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

অস্ফুট স্বরে গানটি গাইতে গাইতে খাতাখানি আমার হাতে দিলেন।

এরও পরের কথা। ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৩। পথের দাবী বই আকারে তার আগের দিন বা'র হয়েছে। শরৎচন্দ্র সে-রাত্রিতে আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে ছিলেন। দুজনে সারা-রাত জেগেছি। কাছে বসে কত গল্প করেছি, কত গল্প শুনেছি। এখনও কানে তার মূর্চ্ছনা বাজে, প্রাণে তার প্রতিধ্বনি শুনি।

সকালবেলায় নিয়ে এলাম তাঁর কাছে তাঁরি নিজ-হাতে লেখা সম্পূর্ণ পথের দাবীর পাণ্ডুলিপি। তিনি আশ্চর্য্য হলেন। বললেন, এ-সব তুমি রেখে দিয়েছিলে—এমন যত্ন করে ? দাও, আমি তোমায় লিখে দিই।

তারপর, তাঁর সুন্দর হরফে লিখে দিলেন প্রথম পাতায় এই কটি কথা—

"বিজু, আমার হাতের লেখা বই এইখানি ছাড়া আর নেই। এ যেন তোমারই কাছে থাকে। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

দাদা

ভাদ্র, ১৩৩৩"

স্নেহের সেই দান সযত্নে রেখেছি। বার বার নিজে দেখি, সবাইকে দেখাই। কিন্তু জানি, এ তো আমার নিজ-স্ব নয়, এ-যে স্বাধীন ভারতের অমূল্য সম্পদ্। তাই ভাবি, কোথায় রেখে গেলে এটি, আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

কুড়ানো ঘড়ি

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এস-সি

ট্রামে যাইতে যাইতে দেখিলাম আমার বন্ধু উত্তেজিত অবস্থায় থানা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঐ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য আমি ট্রাম হইতে নামিলাম। তাড়াতাড়ি তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে রে অমল? আত্মীয়ের মৃত্যুতেও মানুষের মুখের তো এরূপ চেহারা হয় না।"

সে বলিল "আর বলিস কেন—জেলে যাবার হাত থেকে কোন রকমে রেহাই পেয়ে আসছি।"

আমি ভাবিলাম সে কালাবাজারের অসৎপথে মুনাফা লাভের চেষ্টায় ধরা পড়িয়াছে এবং সেইরূপ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছিলাম। সে বোধহয় কিছু আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল তাই বলিল "তুই বুঝতে পারছিস না। একটা সোনার ঘড়ি কাল রাত্রিতে আমি রাস্তায় পাই, এবং সেইটা আমি থানায় জমা দিবার জন্য গিয়েছিলাম। আর সেই অপয়া ঘড়িটার জন্য আমার এই দুর্দশা। চল, ঐ চায়ের দোকানে একটু চা খেতে খেতে বলছি—গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে!"

চা খাইতে খাইতে সে যাহা বলিল তাহা এইরূপ :—"আজ সকাল ৯টার সময় ঐ চমৎকার ঘড়িটা লইয়া আমি থানায় যাই এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ভদ্রলোক সবেমাত্র প্রাতরাশ সমাপন করিয়াছেন দেখিলাম—ভদ্রতাসূচক কোন কথা বলা বা বসিতে বলা বোধহয় তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি চাই হে!' পরোপকারের মনোবৃত্তি লইয়া গিয়াছি তাই আমার মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল। কোন রকম কিছু মনে না করিয়া আমি বলিলাম, 'মহাশয় গত রাত্রিতে রাস্তায় একটি ঘড়ি পাইয়াছি এবং তাহা আপনার নিকট—'

"আমাকে শেষ করিতে না দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ঘড়ি! কি ঘড়ি?' পাশের ঘরে অন্যান্য পুলিশরা বোধহয় তাস খেলিতেছিল। তিনি তাহাদের চিৎকার করিয়া বলিলেন—'কোন হায়, দরওয়াজা বনধ্ কর দেও!' একজন আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গেলে তিনি বলিলেন—'কই, ঘড়িটা দেখি।' আমি ঘড়িটা দেওয়াতে তিনি সেটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তারপর গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন—হাঁ, এটা একটা ঘড়ি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি উহা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া চাবি দিয়া দিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—'কোথায় ঘড়িটা পাওয়া গেল।' আমি বলিলাম —'ঐ সিনেমার সামনে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ফুটপাতের উপর?' আমি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দেওয়ায় তিনি বলিলেন—'খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ফুটপাতটা তো ঘড়ি রাখবার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয় না।' আমি অল্প হাসিয়া বলিলাম, 'আমি তো বলেছি ওটা—' শুষ্ক স্বরে উত্তর আসিল, 'ঠিক আছে, কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, আমার কাজ কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানি।' আমি বিস্ময়ে কথা ও হাসি দুইই বন্ধ করিলাম। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা তুমি কে? কোথায় থাক? কি করিয়া তোমার দিন চলে?' আমি আমার নাম, কোথায় থাকি এবং ব্যবসায়ে বৎসরে বার হাজার টাকা আয়ের কথাও জানাইলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কখন ঘড়িটা পেয়েছিলে?' 'রাত ১টার সময়।' 'তাহলে রাত্রিটা রোজগারের জন্য পথেই কাটাও, কেমন?'

"আমি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম তিনি তাড়াতাড়ি

বলিলেন, 'অত রাত্রিতে ওখানে কি দরকার ছিল?' আমি বলিলাম, 'বাড়ীতে আমার বৌদির প্রসব-বেদনা হওয়াতে ডাক্তার ডাকিতে ও তাঁহার বড় বোনকে আনিতে যাইতে-ছিলাম।' 'তাই নাকি?' আমি বলিলাম, 'তাই নাকির মানে?' উত্তর আসিল 'যা জিজ্ঞাসা করছি ভাল ছেলের মত উত্তর দাও। আমার কর্ত্তব্য হোল সমস্তর সদুত্তর পাওয়া। ঐ রকম রাত্রে বাড়ী থেকে দেড় মাইল দূরে যাবার কি প্রয়োজন ছিল সেটা প্রমাণ করতে হবে। বড় বোন কি বিবাহিত?' আমি উত্তর দিলাম—'হাঁ।' 'বিবাহিত, বেশ তাঁহার স্বামীর নাম কি?' আমি অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর দিলাম—'সে খোঁজে আপনার কোন প্রয়োজন নাই।' তিনি মুখ লাল করিয়া উত্তর দিলেন—'দেখ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা ভালয় ভালয় উত্তর দাও—মেজাজ দেখিও না। মনে হচ্ছে যেন কোথায় তোমায় দেখেছি।' একটু থেমে বললেন, 'তোমার একবার বিচারে সাজা হয়েছিল না?'

"ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়াছিলাম উত্তর দিলাম—'আপনারও কি হয়েছিল?' হনুমানের মতো লাফাইয়া উঠিলেন তিনি, 'চুপ কর হারামজাদা।' আমি আরও জোরে বলিলাম, 'আপনি একটী নীরেট গাধা।' রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন, দেখিলাম হিংস্র পশুর মত তাঁহার চক্ষু দুটি জ্বলিতেছে মুখে কথা বাহির হইল না। অস্ফুট স্বরে কেবল বলিলেন, 'কি বললি?' আমি ভাবিলাম আমার সব শেষের দিন আসিয়াছে। প্রতিবাদ করিবার সুযোগ না দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন 'তোকে জেলে পাঠাব। আমার মুখের উপর কথা বলার কি শাস্তি তা চিরজীবনের মত মনে থাকিবে। যে আমি আইনের মর্যাদা রক্ষা করি তার প্রতি কুব্যবহার।' টেবিল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—'নিজের নাম তো বলছিস রাখাল। কে রাখাল? কি প্রমাণ আছে? বার হাজার টাকার আয় কে তোকে বিশ্বাস করে? কই বার কর তো দেখি তোর বার হাজার টাকা।' আমি অবাক হইয়া আছি। তিনি বলিয়া চলিলেন 'আর তুই যে ঘড়ি চুরি করিস নি তার প্রমাণ কি?' 'চুরি করেছি আমি আর জমা দিতে এসেছি আমি, বা!' পুলিশেরা গোলমালে ঘরের ভিতরে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদের বলিলেন, 'ইহাকে সার্চ করো।' চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিল। তবুও ইন্সেপেক্টর সাহেব বলিতে লাগিলেন 'ভাল করিয়া দেখ, ভাল করিয়া দেখ।' একঘণ্টা অমানুষিক অত্যাচারের পর ছাড়িয়া দিয়াছে।"

আমি স্তব্ধ হইয়া দেশের আইন ও আইন-রক্ষকের কথা ভাবিতে লাগিলাম। *

* ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

মহালয়া

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি তোরে মহালয়া যুক্তবেণী দ্বিধারা সঙ্গম,
মনোরাজ্যে দেহরাজ্যে বন্ধনের তিথি মহোত্তম।
ধ্যানলোকে মূর্ত্ত তুই ঋষির মানসী মহালয়া,
আসিয়াছে দ্বারে তোর জন্মমৃত্যু শঙ্খ বাজাইয়া—
জীবনের মন্ত্র পড়ি'। এ সৃষ্টির চৈতন্যের তলে
মূর্ত্তি ধরি মহাদেবী আসে ঐ ব্যাপি জলে স্থলে।
তাঁরি আগমনী বহি' তারা তাই গাহে শঙ্খে গান,
শরতের হৃদিপদ্মে বিশ্বমাতা করে পদদান।
মৃন্ময়ী মাতার তুই ভুলাইলি সর্ব তাপ গ্লানি,
জন্মমৃত্যুহীন দেহে তোর স্পর্শে তার বক্ষখানি,
দেব জন্মে ধন্য আজি। গাহি জীবনের জয়গান,
এ সৃষ্টির মহাদিনে পুত্রেরে গৌরব করি দান।
তুই দেবী জেগে ওঠ্ পিতৃলোকে খুলে গেছে দ্বার,
দেবযানে পিতৃযানে তোর পথ আজি একাকার!
সপ্তর্ষি জেগেছে আজ অরুন্ধতী দৃষ্টি মেলে নীচে,
সর্বগ্রহ ছায়াপথ কায়া মাগে তোর পিছে পিছে।
মৃন্ময় জীবনে অয়ি বন্দী করা চিন্ময়ীর স্নেহ,
সর্বলোকে বাঁধি দেহে তুই আজ অমৃতের গেহ।
শারদার তীর্থ তুই স্বর্গমর্ত্ত মিলনের দ্বার,
পর্বের পার্বণ গেহ মহালয়া নরদেবাত্মার।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
Rs.10000
Reward!
GUARANTEED
SUNLIGHT
SOAP

হিমাচল পথে

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী

হরিদ্বার হচ্ছে বৈকুণ্ঠের দ্বার। এই স্থানের গঙ্গাতীরে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করে যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। তাঁদের চরণচিহ্নকে বলা হয় 'হর কি পরী'—যে স্থানে তাঁরা স্নান করেছিলেন তার নাম হয়েছে "ব্রহ্মকুণ্ড"। অবশ্যি অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। "ব্রহ্মকুণ্ড"র দৃশ্য এক অপূর্ব। এই কুণ্ডের ঘাট তৈরী হয়েছে হরিদ্বারের রাজপথ থেকে গঙ্গাতীর অবধি। কুণ্ডের জলকে বদ্ধ করা হয়েছে অপর পারে গঙ্গার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড চত্বর তৈরী করে এবং সেই অংশকে সংযোগ করা হয়েছে তটভূমির সংগে—দু'দিকে দু'টি পাকা পুলের দ্বারা। এই বিপুল জলরাশীর স্রোতের বেগ প্রশমিত করা হয়েছে উত্তরাংশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড গংগাবক্ষে স্তূপীকৃত করে। স্নানার্থীদের প্রবল স্রোত হতে রক্ষা করতে দক্ষিণ দিকের পুলে ঝোলান হয়েছে লোহার শিকল। ব্রহ্মকুণ্ডে অসংখ্য মাছ—সামান্য খাবার ফেললে ছুটে আসে তারা। কুণ্ডের ঘাটে আছে গঙ্গা, গায়ত্রী, শ্রীরামচন্দ্র, বদ্রিনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির। প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে এই ঘাটে পুণ্যতোয়া গঙ্গামায়ের "আরতি" একটি দর্শনীয় বস্তু। অসংখ্য দীপশিখার সঙ্গে শংখ ঘণ্টার শব্দ ও স্তোত্রগান মনে এক অপূর্ব ভগবৎ ভক্তি সঞ্চারিত করে। ব্রহ্মকুণ্ড বা 'হর কি পরীর' ঘাট পূর্বে ছোট ছিল, বর্তমানে প্রসারিত হয়েছে এবং উত্তর দিকের ঘাট ও পুল সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত ঘাটের চত্বরে গঙ্গার উপরে বিড়লাজী প্রস্তুত করেছেন এক প্রকাণ্ড ঘড়ি-ঘর। এই ঘড়ি-ঘর বা ক্লক-টাওয়ার 'হর কি পরী'র শোভা বর্দ্ধন করেছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারে আছে নীল পর্বত—তার গাত্র থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নীল গঙ্গা। এই নীল পর্বতের উচ্চ শিখরে অবস্থিত আছে বিখ্যাত 'চণ্ডীদেবীর' প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে উঠিবার রাস্তা খুব প্রস্তরময় ও চার মাইলের পথ। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে রাজা মানসিংহের চিতাভস্ম ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করে গঙ্গাবক্ষে নির্মিত "মানসিংহ কি ছত্রী", বিশ্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও ভীমগোদা।

হরিদ্বার হতে দুই মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে কনখল। কিম্বদন্তি এই কনখল বা অমরাবতী ছিল দক্ষপ্রজাপতি মহারাজার রাজধানী ও বাসস্থান। এর পূর্বাংশে নীলধারা ভাগিরথী! বর্তমানে সামান্য জলরেখায় পরিণত হয়েছে। পুরাকালে যে এই নীলধারা ভাগিরথী বিপুলা ছিলেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বিরাট সৈকত ভূমি ও ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতীর উপর প্রকাণ্ড সোপানশ্রেণী। এই স্থানে আছে এক প্রাসাদোপম বাড়ীর প্রাচীর, কিছু ভগ্ন গৃহাদি ও গঙ্গাবক্ষের ধ্বংসোন্মুখ ঘাট। স্থানীয় লোকেরা বলে এই হচ্ছে দক্ষপ্রজাপতির প্রাসাদ ও ঘাট। ভগ্ন প্রাসাদের দক্ষিণাংশে আছে এক ক্ষুদ্রকায় কুণ্ড—নাম তার সতীকুণ্ড। এইস্থানে নাকি পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন দক্ষপ্রজাপতি কন্যা সতী। সেই সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন মহাকাল মহাদেব রুদ্রমূর্তিতে—তিনি ধ্বংস করলেন দক্ষপ্রজাপতিকে, হল দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস, হল তার দর্প-চূর্ণ দেবাদিদেব মহাদেবকে অবমাননা করার পাপে। তারপর সতীদেহ কাঁধে করে মহাকাল ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন সমস্ত বিশ্ব। স্বয়ং বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত করলেন সতীদেহ ৫১ অংশে—সতীর সেই বিচ্ছিন্ন দেহাংশের পুণ্য স্পর্শে সমগ্র ভারতে একান্ন পীঠস্থান গোড়ে উঠলো। রুদ্রদেব আবার হলেন আশুতোষ—তিনলোক রক্ষা পেল ধ্বংসের মুখ থেকে। এখানে আছে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সরওয়ান মাসের প্রতি সোমবার এখানে বসে এক বিরাট মেলা।

এই পুণ্যতীর্থের অনতিদূরে আছে এক সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়" নামে পরিচিত। শহীদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ১৯০২ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করেন কনখলে। তাঁর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়েছে স্বাধীন ভারতে। আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট শিক্ষামন্দিররূপে পরিণত হয়েছে। এখানে বেদ বেদান্ত উপনিষদ দর্শন ব্যাকরণ নিরুক্ত প্রভৃতি শাস্ত্রাভ্যাসের সংগে পাশ্চাত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি ও ইংরেজী শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে অতি অল্প বয়সের বালকদের ভর্তি করা হয় এবং তাদের বাস করতে হয় সংলগ্ন হোষ্টেলে—প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাসের আবহাওয়ার পরিস্থিতে। এখানকার উপাধী পরীক্ষার ডিগ্রী হচ্ছে "বিদ্যাবাচস্পতি" বেদ-বাচস্পতি, আয়ুর্বেদ বাচস্পতি ইত্যাদি। প্রায় এক মাইল ব্যাপী এক ভূখণ্ডের উপর বিশ্ব-বিদ্যালয় অবস্থিত। আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত হয়েছে ছাত্রাবাস, বিদ্যামন্দির, হাসপাতাল, আয়ুর্বেদ-গবেষণাগার, শিক্ষকদের কোয়াটার, খেলার মাঠ, প্রভৃতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগনে বিড়লাজী নির্মাণ করেছেন এক বিরাট 'বেদমন্দির' গৃহ। এর নীচের তলায় আছে একাংশে বেদ পাঠকের বেদী ও অবশিষ্ট স্থান এক বিরাট হল, শ্রোতাদের বসবার স্থান। দ্বিতলে স্থাপিত হয়েছে এক প্রকাণ্ড মিউজিয়াম—সেখানে রক্ষিত আছে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন রাজ্যের প্রাচীন মুদ্রা ও আরো কত কি। এখানে আমরা দেখলাম প্রাচীন তুলট কাগজে হাতে লেখা তুলসীদাসী রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত এবং লোদীবংশের মুদ্রা।

হরিদ্বার থেকে ১৪ মাইল উত্তরে হৃষিকেশ। হৃষিকেশ পর্য্যন্ত সুন্দর বাঁধান মটরের রাস্তা আছে এবং মটর বাসে অথবা মটর কারে যাতা য়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। এ রাস্তায় দুইটি পুল পার হতে হয়—নদীর নাম সুওয়া ও সং নদী এবং রাস্তার দুই পাশে বিরাট জংগল। এখানে একটি 'ফরেষ্ট অফিস' আছে—প্রতি যাত্রীকে ।০ আনা হিসাবে ট্যাক্স
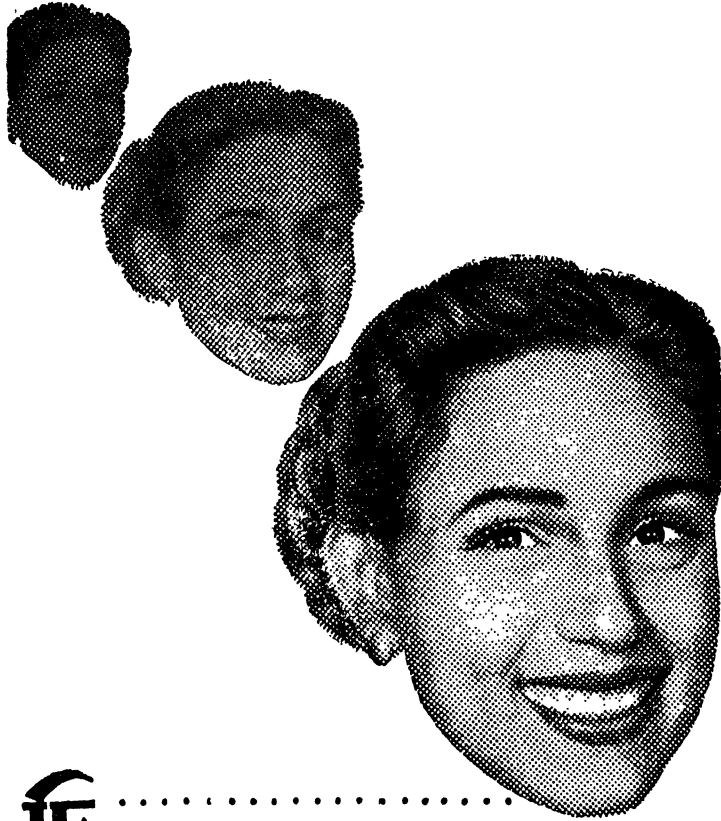
দিতে হয় এই রাস্তায় যানবাহনে যেতে হলে। হৃষিকেশ পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে অবস্থিত, কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে এখানে গঙ্গার সংগে মিশেছে পুণ্যতোয়া যমুনা ও সরস্বতী। হৃষিকেশের ঘাটের দুই পাশ থেকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে ক্ষুদ্রকায়া দুইটি জলধারা—এই দুই জলধারাই নাকি যমুনা এবং সরস্বতী। এই ঘাটে স্নান, তর্পণ—প্রশস্ত ও পুণ্যজনক। এই ঘাটের পশ্চিমাংশে "ঋষিকুণ্ড"—এই কুণ্ডের জল অতি পবিত্র। এই কুণ্ডের পাশে আছে শঙ্কর মন্দির ও শ্রীরাম মন্দির। এখানকার ঘাট থেকে সূর্য্যাস্ত একটি মনোরম দৃশ্য। ঋষিকেশের প্রধান মন্দির হচ্ছে "ভরতমন্দির"—এই শুভ্র শৈলশিখরে নাকি ভরতজী তপস্যা করেছিলেন বহুবছর। ঋষিকেশে ও কালী কমলী-ওয়ালার ধর্মশালা এবং অতিথিশালা আছে। এখানে সত্রও আছে, প্রত্যহ অসংখ্য সাধু ও অতিথিদের আহার্য বিতরণ করা হয়।

ঋষিকেশ থেকে তিন মাইল পূর্ব-উত্তর দিকে হিমাচলের আরো উচ্চ শিখরে লছমন ঝোলা। এর পূর্ব দিকে অভ্রভেদী মণিকুট পর্বত আর ঋষিকেশকে বলে ঋষিকুট পর্বত—মধ্যস্থানের পর্বত শিখরকে বলে লছমন ঝোলা বা স্বর্গের দ্বার। এখানে লছমনজী ২১২ বৎসর তপস্যা করেছিলেন "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে এবং মহামুনি অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র ও শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ঋষিগণ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এখানে। এই পর্বত গাত্রের একাংশে আছে "লছমনজী'র মন্দির—শঙ্করাচার্য্য নাকি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তপস্যান্তে। এখানকার মোহান্ত একটি মন্ত্র পাঠ করলেন :

প্রাপ্ত রাজ্যে তথা রামে নিহতে দশস্কন্দরে
সমাত্রয়ো তপস্তপ্তং লছমন লছমন নিহতং নীত

এই মন্দিরের গায়ে আছে বাঁধান ঘাট—তীর্থযাত্রীদের স্নান ও তর্পণের জন্য। এখানকার গঙ্গা আয়তনে ক্ষুদ্রকায়া হলেও খুব গভীর। মন্দিরের নাতিদূরে গঙ্গাপার হবার জন্য বর্তমানে নির্মিত হয়েছে লৌহ-পুল—গঙ্গার দুই পাড়ে লোহার শিকল দিয়ে ঝুলান হয়েছে পুল—নীচে কোন পীলার নাই, তাই যাতায়াতের সময় পুলটি দোলে—সেই জন্যে পুলের নাম হয়েছে লছমনঝুলা। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর শেঠ সুরজমল এই পুলের ব্যয় বহন করে যাত্রীদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা অর্জন করেছেন।

পুলটি পার হলে বামদিকে যে রাস্তা গিয়েছে সেইটি হচ্ছে কেদার-বদরীনারায়ণ যাবার পুরাতন পায়ে হেঁটে যাবার রাস্তা ও ডানদিকে স্বর্গাশ্রম যাবার পথ গঙ্গার তীর দিয়ে। এই পুল পার হলে বদ্রীনারায়ণ ১৬৫½ মাইল। এ রাস্তার মুখেই আছে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, মন্দির ও ধর্মশালা। আর পূর্বদিক ঘেঁসে আকাশচুম্বী পর্বতমালা বিরাজমান—তার পর গঙ্গার তীর দিয়া চলতে চলতে সেই বিরাট পর্বতমালা পড়বে দক্ষিণে, আর তার সমতল ভূভাগে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। আর গঙ্গাতীরে ও পর্বতের পাদদেশে অসংখ্য কুটীর শ্রেণী—সাধুবাবাদের আশ্রম। স্থানীয় লোকেরা বলল—উর্দ্ধে পর্বত গাত্রে নাকি অসংখ্য গুহা আছে—আর গুহার গহ্বরে যোগাবিষ্ট আছেন অসংখ্য মুনী, কিন্তু সে সব স্থানে যাবার রাস্তা নাই—পর্বত গাত্র ধরে সেই উচ্চ পর্বতে ওঠা বিপদ সংকুল। এই পর্বতশ্রেণীর নাম মণিকুট পর্বত—আর গঙ্গার তীরবর্তী সমতল ভূমিকে বলে স্বর্গদ্বার। এই সমতল ভূমির উপরে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে কালীকমলীওয়ালের আশ্রম পর্য্যন্ত—কালীকমলীওয়ালেই এ পথ নির্মাণ করিয়াছেন। রাস্তার দুধারে আছে ফলবান বৃক্ষশ্রেণী—অধিকাংশই আম গাছ। রাস্তার উপরে অবস্থিত এক সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম কৌতূহলবশে। আশ্রমটি বেশ মনোরম—। ঘরখানি পাকা, সামনে একটি বারান্দা—সেখানে সাধু বসেছিলেন—তিনি যত্ন সহকারে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে একটি মাদুরে বসতে নির্দেশ করলেন। আমার নাতনী মীরা আমলকী চাওয়ায় তাকে বললেন যত খুসী কুড়িয়ে নিতে। আমরা সাধুকে প্রণাম করে দুই একটি মামুলী প্রশ্ন করলাম—কিন্তু তার উত্তর আমাদের হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাল না। সাধুর বিছানায় মশারী খাটানো ও ঘরে দেখলাম চায়ের সরঞ্জাম। সব কলকেও নজরে পড়েছিল।

ইহারই অনতিদূরে কালীকমলীওয়ালের আশ্রম। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী আত্মপ্রকাশজী—সাধারণভাবে লোকমুখে তাঁর নাম কালী-কমলীওয়ালে। ইনি একাধারে কর্মী ও সাধক। তিনি নিজের অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও উদ্যমে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন এই হিমাচল দেশে। এই বিরাট আশ্রমে আছে এক বিরাট অতিথিশালা—সেখানে প্রত্যহ আহার্য পান অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও দুঃস্থ ব্যক্তি। প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টা নিনাদের সংগে সমবেত হয় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথির দল—তারা প্রত্যেকেই পান কিছু রুটী ও তরকারী। অসমর্থ সাধুদের আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁদের আহার্য। তিনি পদব্রজে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই পবিত্র আশ্রম—তপোবন। তাঁরই চেষ্টায় এখানে নির্মিত হয়েছে গীতা ভবন, শঙ্করজীর মন্দির ও গঙ্গার উপরে বিরাট বাঁধান ঘাট। ঘাট থেকে বিনা মাশুলে পারাপার করা হয় দর্শকদের অপর পারে শ্রীরাম ঘাটে। এই স্থানের দৃশ্য পরম রমণীয়—মনে স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাকালের মুনিঋষিদের আশ্রমের কথা।

স্বাস্থ্য ও জীবন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলম্যান)

ইংরেজীতে একটি বড় সুন্দর কথা আছে 'Health is wealth' (স্বাস্থ্যই সম্পদ)। মানুষ তার জীবনে যেমন সম্পদ কামনা করে, স্বাস্থ্যও তেমনি তার কাম্য। সম্পদ সে চায় বর্ত্তমান: ও ভবিষ্যতে সুখী-জীবনের খোরাক মেটাবার জন্য, নিজকে এবং পরিবারকে আর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্য, তাই মানুষ করে জীবনবীমা। স্বাস্থ্যও তেমনি মানুষকে তার বর্ত্তমানেই সুখী করে না--অভাব মিটিয়ে ভবিষ্যতের
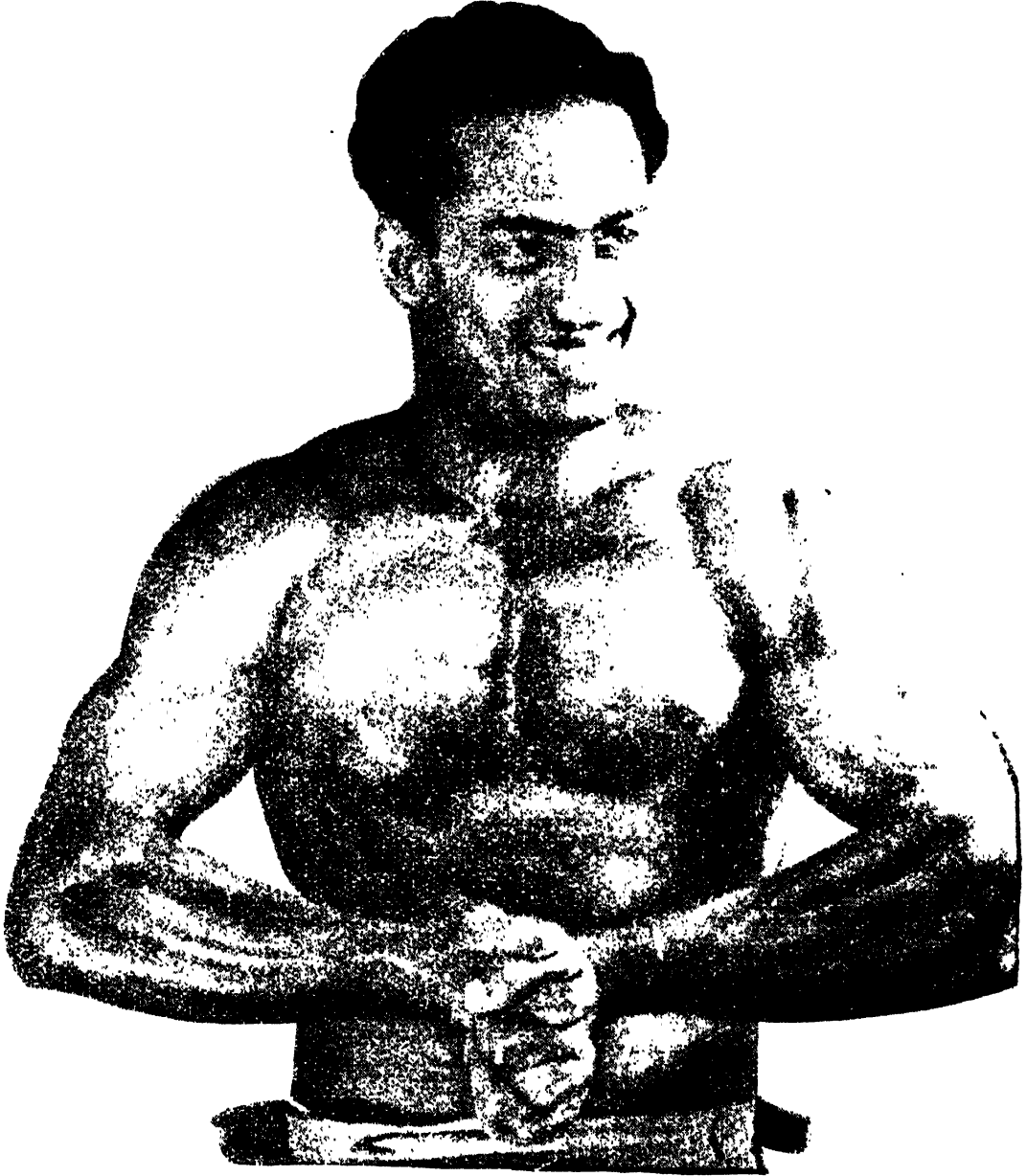
শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলম্যান)

ব্যায়াম শিক্ষক, সিটি কলেজ ও রামমোহন রায় হোষ্টেল।

ফটো : কর ষ্টুডিও

জন্য সঞ্চিত সম্পদ যেমন ভবিষ্যতের বংশধরেরা ভোগ করে, তেমনি সঞ্চিত স্বাস্থ্যও ভবিষ্যতের বংশধরেরা পায়। তাই দেখা যায় স্বাস্থ্যবান পিতা ও স্বাস্থ্যবতী মাতার সন্তান সন্ততিও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

স্বাস্থ্য কাকে বলে ?

আমরা কথায় বলি, "স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না"—"কিংবা মন্দ যাচ্ছেনা।" কিন্তু স্বাস্থ্য শব্দটির মৌলিক অর্থ এভাবে হয় না। স্বাস্থ্য শব্দটির অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। যে অবস্থায় মানুষের দেহ ও মন সুস্থ থাকে, সে অবস্থাটিকে বলে স্বাস্থ্য। আরও সহজ কথায়—শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা মৌলিকভাবে স্বাস্থ্য শব্দটিকে শরীর এই অর্থে ব্যবহার করি।

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন

জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যেমন করে অর্জন করতে হয়, স্বাস্থ্যও তেমনি করে অর্জন করতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্জনের জন্য সাধনার প্রয়োজন। স্বাস্থ্যও তেমনি অর্জন করতে হয় সাধনার ভেতর দিয়ে। সুতরাং সাধনার জন্য যেমন মন্দিরের দরকার হয়—তেমনই ব্যায়ামের জন্যও ব্যায়ামাগারএর প্রয়োজন হয়। কারণ ঐ স্থানের আবহাওয়াতেই মনের ভিতর ব্যায়ামের প্রেরণা এনে দেয়। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন হয়, তা হোলো উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষকের, প্রেরণা ও উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষেরও অনেক উপরে স্বাস্থ্য। কেন না উপরোক্ত চারিটি জিনিষের প্রাপ্তি নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর। শরীর যদি সুস্থ না থাকে, তবে পৃথিবীটা নিরর্থক বলে মনে হয়। ধর্ম্মই বলুন আর অর্থই বলুন, কাম অথবা মোক্ষ সবই যেন অর্থহীন মনে হয়। আবার মনের সঙ্গে শরীরের নিকট সম্পর্ক। শরীর অসুস্থ হলে মনের উৎসাহ উদ্যম লোপ পাবে। কাজেই স্বাস্থ্যের সাধনা সকল সাধনার গোড়ার কথা। জগতে বাস করতে গেলে, কি যোগী—কি গৃহী সকলেরই স্বাস্থ্যের সমান প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সাধনার উপায়

তাহলে স্বাস্থ্য সাধনার উপায় কি ? এ সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান কথা উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ ও রীতিমত ব্যায়াম করা। যা কিছু আমরা খাই, তাই খাদ্য নয়। আমাদের দেহের সব সময় ক্ষয় সাধন হচ্ছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া অতি গোপনে আমাদের বিশ্রামের মুহূর্ত্তেও চলে। সেই ক্ষয় পূরণের জন্য এবং দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য যে সমস্ত খাদ্যোপাদান আমাদের প্রয়োজন তাকেই বলা হয় খাদ্য। শুধু মাত্র উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করলেই আমাদের স্বাস্থ্যচর্চ্চা শেষ হয়ে গেল মনে করলে ভুল হবে। স্বাস্থ্যচর্চার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত এবং নিয়মিত ব্যায়াম। তাহলে ব্যায়ামের দুটি উদ্দেশ্য—প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আমাদের বল বৃদ্ধি। তবে ব্যায়ামটি নিয়মিত হওয়াই প্রয়োজন। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়ামে দেহ ও মন সবল থাকে। আবার এই ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত। বিশৃঙ্খলভাবে বা ইচ্ছামত অঙ্গচালনা করাকে ব্যায়াম বলে না। ব্যায়ামের আরেক উদ্দেশ্য দেহের শ্রী সম্পাদন করা। কিন্তু ইচ্ছামত অঙ্গচালনা করলে দেহের শ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তাই যাঁরা ব্যায়াম করবেন তাঁরা যেন উপযুক্ত ব্যায়ামের অধ্যাপকের কাছে উপদেশ বা শিক্ষা নেন। অবস্থা বিশেষে কোন দক্ষ ব্যায়াম-শিক্ষকের বিভিন্ন অঙ্গচালনার চিত্র দেখে ব্যায়ামাভ্যাস করাও চলে। কিন্তু সাবধান যেন ভুল না হয়।

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে আরও একটু বলা ভাল। কোন কোন দ্রব্যে কি পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন আছে তা জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাসি কিংবা পচা জিনিস খাওয়া অনুচিত। সবজ টাটকা জিনিস খাওয়া শরীরের পক্ষে হিতকর। তার চেয়ে আরও একটি জিনিস বড় বেশী প্রয়োজন—সে হচ্ছে মুক্ত বায়ু সেবন। টাটকা খাদ্যের মত এরও প্রয়োজনীয়তা অনেক। আরও একটি কথা বলা আবশ্যক সেটি হচ্ছে সংযম—যা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে ছিল। পুরাকালে এক একজন মানুষের জীবনকাল কত দীর্ঘ ছিল, আজ তার চেয়ে অনেক কম দিন মানুষ বাঁচে। কিন্তু কেন ? উত্তরে বলা যায়, আমরা খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পাচ্ছি না। ব্যায়াম করলেও মুক্ত বাতাস পাচ্ছি কম। সর্কোপরি হারিয়েছি সেই আর্য্য ঋষিদের শান্ত সমাহিত সংযত জীবন। এই কয়টি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখলে আবার সুস্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারি।

বাঙালী এককালে স্বাস্থ্য ও শক্তিতে ছিল অপরাজেয়, তখন বাংলার ঘরে ঘরে ছিল অন্ন, ছিল দুগ্ধ, ছিল টাটকা তরীতরকারী—আর গ্রামে গ্রামে ছিল ব্যায়ামের আখড়া। সেদিন বাঙ্গালী জীবন সংগ্রামে পিছপা হয় নি। কিন্তু আজ জীবনসংগ্রামে প্রতিপদে পরাজিত। তার কারণ বাঙ্গালী তার দেহচর্চ্চার প্রতি করেছে অবহেলা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দেখিয়েছে একান্ত ঔদাসীন্য। যার স্বাস্থ্য নেই তার সম্পদও নেই, সে রিক্ত, সে নিঃস্ব। বাঙ্গালী আজ তাই রিক্ত, বাঙ্গালী আজ তাই নিঃস্ব। আজ তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা বাঁচবো মানুষের মত, পৃথিবীর মাঝে অধিকার করবো শীর্ষস্থান।

মহাপুরুষদের বাণীতে শুনা যায়, কঠোর সাধনা করে এবং অনেক বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে তবে সিদ্ধিলাভ করা যায়। ব্যায়াম সাধনাও ঠিক সেই রকম। প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করলে, অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে। সে বাধা জোর করে কাটাতে হবে, যেমন এই ধরণের বাধা প্রায় সময়ই দেখা যায়—প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করলে ব্যায়ামবিদ বন্ধুদের কাছে শুনতে হয় শ্লেষাত্মক বাণী। আবার ব্যায়ামের সময়টা বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে অনেক সময় কাটাতে হয় আড্ডায়, সিনেমায় বা অন্য কোনও অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। এই সব নানা বাধা উপেক্ষা করেও যদি বা ব্যায়াম আরম্ভ করা যায় ও কিছুদিন পরে বাধা আসে নিজের মনের

দিক থেকে। মনে হয়েছিল হয়ত দুচার দিন ব্যায়াম করেই, স্বাস্থ্য ভাল করে ফেলব। কিন্তু তা যখন হয় না, তখন মন যায় ভেঙ্গে। ফলে সাত দিনের পর আর কোনো উৎসাহ থাকে না। কাজেই প্রথমে দরকার ধৈর্য। অধৈর্য হলে চলবে না এবং ব্যায়াম প্রথম আরম্ভ করলেই স্বাস্থ্য ভাল হয় না। কারণ ব্যায়ামের আগে শরীর যে নিয়মে চলছিল সে নিয়মটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। শরীর (Recaty) রোগা ছিল। ব্যায়ামের সাথে সাথে শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে সমস্ত আভ্যন্তরীণ যন্ত্র দুর্ব্বল বা খারাপ ছিল বলে সুস্বাস্থ্য ছিল না, প্রথম ভেতরকার সেই সমস্ত যন্ত্রগুলি পুষ্ট ও সবল হয়। এর কিছুদিন পর স্বাস্থ্য ভাল হতে আরম্ভ করে। তখন ব্যায়াম করেও আনন্দ পাওয়া যায়। আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে, ব্যায়াম করার পর স্বাস্থ্য ভাল হবেই। তখন যে সমস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে নিন্দা বা আঘাত এসেছিল তারাই বলবে "নারে, তোর স্বাস্থ্য ত খুবই ভাল হয়েছে—কোথায় ব্যায়াম করিস বল্ ত? আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

এ কথা আমার নিজের কানে শোনা।

ব্যায়াম করার বয়স

একটা প্রবাদ আছে—দাঁত থাকতে দাঁতের প্রয়োজনীয়তা কেউ বোঝে না। সেইরূপ যৌবনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেকে মানে না। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায়, ভুলে যায় তারা ভবিষ্যৎ জীবনের বার্দ্ধক্যের সেই জরা-ব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণ দেহের কথা। ছুটে বেড়ায় তারা অলীক মোহের পিছু, ক্ষণিকের মনের শান্তির জন্য, রোগা দুর্ব্বল শরীর নিয়ে। তার ফলে, তার যেটুকু আছে, তাও নষ্ট হয়ে যায় অত্যাচারে, অনিয়মে। তারা ভুলে যায় আনন্দ পেতে হলে, সুখ পেতে হলে চাই সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য না হলে সেই আনন্দ, সেই সুখ হয় অত্যাচারে পরিণত : ফলে আসে অকাল বার্দ্ধক্য। মনে হয় সবই আছে—অথচ কিছুই নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় হাত পা গুটিয়ে, অন্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকতে দেখেছি অনেককে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে এও বলতে শুনেছি—"হায় হায় যৌবনের প্রথমে কি অত্যাচারই করেছি! ভগবান আজ তারই শাস্তি দিচ্ছেন।"

মানুষের যৌবন হোলো সঙ্কটময় পরীক্ষার সময়। এই সময়েই সে তৈরী করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথ। এর পর যখন তার বিঘ্নসঙ্কুল কর্ম্মজীবন আরম্ভ হবে তখন তাকে প্রতি পদে চলতে হবে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে। আঘাত পেলে মুসড়ে পড়লে চলবে না তার। ভাঙ্গা বুক নিয়েই তাকে চলতে হবে টলতে টলতে। যেমন করেই হোক, বুড়ো বাপ, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়েকে খাওয়াতে পরাতে হবেই, ওরা যে তারই মুখ চেয়ে রয়েছে। অভাবের সাথে, দারিদ্র্যের সাথে করতে হবে তাকে লড়াই, এমনি ভাবে তাকে তৈরী হতে হবে যৌবনে। কাজেই যৌবনে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের সাথে সাথেই তার অটুট স্বাস্থ্য সম্পদও লাভ করতে হবে। তার জন্য করতে হবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়মিত ব্যায়াম। দেখা যায় যৌবনের উন্মাদনা কুপথে চালনা না করে, যে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে চালনা করেছে সেই তার কর্ম্মময় জীবনের পথ স্বচ্ছন্দ করে নিয়েছে এবং সোনার সংসার বেঁধেছে।

আর্থিক অনটনের কোন আশঙ্কা যাদের আসবার সম্ভাবনা নাই তাদেরও সুস্বাস্থ্য হওয়া প্রয়োজন সুখ-ভোগ করার জন্য। মনে করুন, ব্যাধিগস্ত শরীর নিয়ে কেউ ছটফট করছে বিছানায় পড়ে। এমনি সময় তারই ছোট ছোট অবুঝ ছেলেমেয়েগুলি খেলা করতে করতে সেই ঘরে ঢুকে শিশুসুলভ চঞ্চলতা ও চেঁচামেচি করছে, আর তখনই গালমন্দ শুনছে তাদের প্রিয়জনের কাছে। সেই সব ছেলেমেয়েদের মনও আস্তে আস্তে বিষিয়ে ওঠে তাদের প্রিয়জনের উপর। এমনি করে ছোট ছোট জিনিস হতে সংসারের সমস্ত পরিবারবর্গের নিকট সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটি হয়ে ওঠে বিষবৎ। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও মানুষ সেই অনিবার্য্য মৃত্যুভয়কে বা মৃত্যু যাতনাকে ভুলে থাকে কি নিয়ে? কাজের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে দিয়ে, সংসারের সুখ শান্তি সুস্থ, সুন্দর দেহ মন নিয়ে ভোগ করে, আনন্দ করে। এ সংসারে আমরা দুদিনের জন্য এসেছি। যে কয়দিনই বাচবো, সুস্বাস্থ্য নিয়ে আনন্দ করে বাচবো—চির-রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন হয়ে নয়। বাচবো ত সিংহ হয়ে, মুষিকের মত নয়। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক নরনারীর থাকা উচিত। তা হলে প্রতি ঘরে ঘরে উঠবে আনন্দের ঢেউ।

রাত্রির ব্যথা

নমিতা চট্টোপাধ্যায়

বাসন্তী-জ্যোৎস্নায় ছেয়ে ফেলেছে চারিদিকটা। রাত্রির কোল ঘেঁসে পাইন বনের ছায়া জমে উঠেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে—ছড়িয়ে পড়েছে তারই ফাঁকে উঁকি মারা চাঁদের আলো, দুঃখ সুখের জ্বলন্ত নিদর্শন হ'য়ে। কোথাও বা পাথরের গা'টা চিক্‌চিক্ ক'রে উঠছে বেনারসী ওড়না ঢাকা নববধূর সলাজ চোখের মত—আবার চকমকি আলোর মত নিভেও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মুখচোরা বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে এদিক ওদিক থেকে—পাতায় পাতায় সোহাগ জানানো মর্ম্মর ধ্বনি কানেও পশছে অতি সন্তর্পণ-ভাবে। পাখীর কলকাকলী গিয়েছে স্তব্ধ হ'য়ে—হয়তো বা রাতের প্রেমে মাতাল হ'য়ে ব'সে আছে প্রেমিকের আশায়। স্ফটিকের চিক্‌মিকিনি ভরা স্তব্ধ আকাশ লুব্ধ

চকোরের চঞ্চুর মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে মায়াবী নিশির রূপের দিকে—অনিমিলিত নয়ন ভরে উপভোগ করছে প্রাকৃতিক উপচয়। পাহাড়ের বুকে নেচে বেড়ানো পাগ্‌লা ঝোরা ঝরে পড়ছে অঝোর ঝরে—কোন কোন উপল খণ্ড বাধা হানতে এগিয়ে গিয়েছিল তার চলার পথে, কিন্তু পারবে কেন? না-পারা অপমানের আগুনে তাই তো দিয়েছিল তারা আত্মাহুতি; আর শীস্ মহলের শ্বেত-পাথরের ফোয়ারা থেকে জল পড়ার মত তাই তো ঐ পাগলা ঝোরা জল ছিটোতে ছিটোতে নেমে গিয়েছিল নিঃসীম অনন্তের পানে। তারই বুকে আশ্রিত রঙ বেরঙের বাচ্চা মাছের দল খেলে বেড়াচ্ছিল ঝাঁক বেঁধে বেঁধে—ল্যাজে ল্যাজে জড়িয়ে জড়িয়ে জানাচ্ছিল তাদের আবেগভরা মনের ভাষা, আর তারই সঙ্গে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল একটুখানি জায়গায় জমা হওয়া জলের উপর দু'টি মুখের প্রতিবিম্বকে—হাওয়া লাগা ঝুম্‌কো-লতার মত সহেলীও এক ঝিলিক হাসির ফোয়ারা তুলে ঢ'লে প'ড়েছিল তার সাথীর বুকে—সাথীর পরা ফুলের মালাটাকে আঙুলে জড়াতে জড়াতে কত কি না বল্‌তে চেয়েছিল তার না-বলা ভাষায়—আর সাথীও তার পিঠ-ভরা কালো চুলে হাত বুলিয়ে সমর্থন ক'রেছিল সহেলীর সেই ভাব-বিহ্বলতার না-জানা ইঙ্গিতকে। সহেলী ও সাথী। ফুলপাতায় ঢাকা দেহ দু'টির উপর খেলে যাচ্ছিল কতই না জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি—অবাধ্য বাঁশী তাই বার বার বেজে উঠ্‌ছিল সাথীর হাতে নীরব ভাষার স্ফুরণ হ'য়ে।

কুন্দ ফুলের মালা দোলান সহেলীর দেহটা হঠাৎ দুলে উঠে বারেকের জন্য—চকিত বিদ্যুতের মত বন-হরিণী যায় লুকিয়ে—সাথী খুঁজতে থাকে তার সহেলীকে—ফুল ফোটা শাখাগুলো সাথীর পিঠের উপর পরশ বুলিয়ে জানাতে চায় যে সহেলীকে তারা লুকিয়ে রেখেছে, ঘিরে রেখেছে তারা তাদের ফুলের গুচ্ছ দিয়ে আলো ছায়া-ভরা পাতার ফাঁকে—কিন্তু তাদের সেই নীরব বিহ্বলতা বুঝতে পারে না সাথী—একান্ত বিরক্তিভরেই সরিয়ে দেয় সেগুলো—ঝরণা ঝরার সুর মিলিয়ে হাসতে থাকে সহেলী—সে হাসিতে তার বুক ফেটে যায়, না-পাওয়া চোখ দুটি তার বারে বারে খুঁজে ফেরে সহেলীর বাঁকা ভুরুর বাঁকে প্রেম-অঞ্জন মাখা দীঘল চক্ষু দুটি। বাঁশীতে তার বেজে উঠে তাই মন-বেদনার ব্যাকুলিয়া সুর। উপল স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে কখন কখন দেখা যায় ছন্দ-চপল সহেলীর গা—পর মুহূর্ত্তেই হারিয়ে যায় কোন অজানায়—সাথী ছুটে যায় এগিয়ে, কিন্তু খুঁজে সে পায় না তার মরমের সহেলীকে—তখন সে তার মন-বীণায় ঝঙ্কার তুলেই হাতে তুলে নেয় তার বাঁশরী—আমলকী ডালের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলো এসে আদর জানায় সহেলীর দেওয়া কুন্দ ফুলের মালাটাকে। ব্যাকুলিত সুরে ব্যথিয়ে উঠে আকাশ—আকুল হ'য়ে উঠে রিম্‌ঝিমিনী জ্যোৎস্না—"আঁ্যা..." সাহেলীর বুক ফাটা চীৎকারে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় আকাশ-বাতাস—চকিতের মধ্যে সাথীর বিরহ-নেশা যায় টুটে, মরমীয়া বাঁশীর সুর যায় থেমে। তীর-বেঁধা হরিণীর মত ছুটে এসে সহেলী মুখ লুকায় আমলকী গাছে হেলান দেওয়া সাথীর বুকের উপর—সাথী তাকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নেয়—সহেলীর উন্নত বুকে স্পন্দিত হয় ঘন ঘন স্পন্দন—চাঁদনী রাতের মিঠে আলো এসে যোগ দেয় চুপি চুপি তাদের এই নিবিড়-আলিঙ্গনের পুণ্য-লগনে; প্রাণবন্ত ক'রে তোলে সহেলী সাথীর এই শাশ্বত প্রেমকে।

কিন্তু ওকি! ঘনান্ধকার রাতের বীভৎস রাহু যেন ছুটে আসছে তাদের গ্রাস করতে—ঢেকে যাচ্ছে নিশীথ রাতের অপরূপের মাধুরিমা—নৈঃশব্দের বেড়াজালে আস্তে আস্তে লীন হ'য়ে যাচ্ছে সব কিছু—সব কিছুই যেন ধরা দিচ্ছে মৃত্যুর অমোঘ ইঙ্গিতে।

"না—না—না, হ'তে পারে না, কিছুতেই না" চীৎকার ক'রে উঠলো সুস্মিতা—ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে ব'সলো সে খাটের উপর—"কি হ'য়েছে সুস্মি? কি হয়েছে তোমার? ছিঃ, ওঠে না, ডাক্তার বাবু বারণ ক'রে গিয়েছেন, বেশী নড়াচড়া ক'রলে আবার জ্বর বাড়বে: শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি!" সান্ত্বনা দিতে থাকেন স্বামী অমিত।

অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সুস্মিতা বাইরের দিকে—যাঃ, সহেলী সাথীকে আর হয়তো বাঁচাতে পারলো না সে এই নিঠুরের কবল থেকে—মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে সুস্মির—কয়েক দিনের টাইফয়েড জ্বরেই সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। 'শুয়ে পড়ো সুস্মি! ভয় কি, আমি ত' তোমার পাশেই আছি?'

শুয়ে পড়ে সুস্মিতা। আকাশ তখনও রাতের নেশায় মশ্‌গুল; দেওয়াল ঘড়িতে বেজে উঠলো 'ঢং ঢং'—

রাত দুটো। মাথার পাশে ব'সে অমিত সুস্মিতার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আদর ক'রে—মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে লাগলো আপন জায়গায়। সুস্মিতার চোখের পাতা ক্রমে ভারী হ'য়ে আসে—"আ......হা......!"
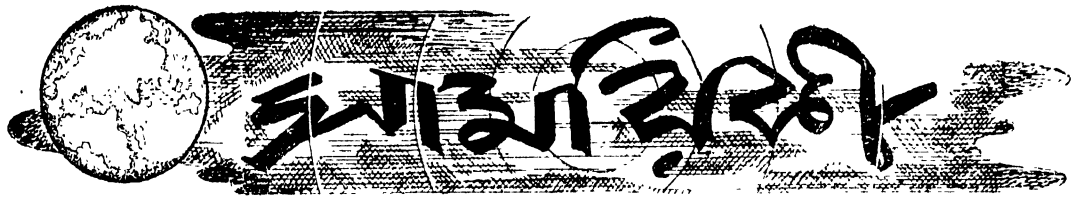
বেকার সমস্যার সমাধান—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিবেন।—(১) আগামী জানুয়ারী মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য ৩০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে—তাহারা প্রত্যেকে মাগ্‌গী ভাতা সহ মাসে ৫৫ হইতে ৮৫ টাকা বেতন পাইবে। (২) ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে তাহাতে আপাততঃ সাড়ে ৩ হাজার লোক কাজ পাইবে (৩) ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে ছোট ছোট শিল্প আরম্ভ হইবে, তাহাতে বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৪) তিন বৎসর ধরিয়া আসানসোলের নিকট যে কয়লার উনানের গ্যাস প্ল্যাণ্ট তৈয়ার করা হইবে তাহাতে ৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ও বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৫) কলিকাতার ময়লা পরিষ্কারের জন্য ২ কোটী ব্যয়ে যে ব্যবস্থা হইবে তাহাতেও বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৬) কলিকাতার নিকট জমী উদ্ধারের জন্য সাড়ে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যে কাজ হইবে তাহাতে বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে ও বহু সহস্র বিঘা চাষের জমী পাওয়া যাইবে। (৭) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি কলিকাতায় আনার জন্য যে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা আছে তাহাতে লোক সুলভে ঐ শক্তি পাইবে ও পথে বহু ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। (৮) ৭১০ খানি বাস ট্যাক্সি চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইলে ২৫০০ লোক কাজ পাইবে। (৯) ফরক্কায় ৩৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ করা হইলে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু জমী উদ্ধার হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্থায়ী উপায় হুগলী নদীকে বহতা রাখা হইবে। এই সব পরিকল্পনার কাজ অচিরে আরম্ভ হইলে দেশে আর এত অধিক বেকার সমস্যা থাকিবে না।

পল্লীশিল্প ও রাজশক্তি—

সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছে। প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশ করিয়াছেন—তৈল কলগুলি কেবল অখাদ্য তৈল তৈয়ার করিবে ও খাদ্য-তৈল উৎপাদনের কাজ পল্লীর ঘানির জন্য সংরক্ষিত করা হইবে। ঐ সুপারিশ সকল প্রাদেশিক সরকারের বিচারাধীন আছে। আর একটি খবর এই যে—কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী দপ্তরসমূহের জন্য ১৯৫১-৫২ সালে সাড়ে ৭ কোটি টাকা মূল্যের ও ১৯৫২-৫৩ সালে ৫ কোটি টাকা মূল্যের মিলে প্রস্তুত কাগজ ক্রয় করিয়াছেন। অথচ ১৯৫১-৫২ সালে মাত্র ৯০ হাজার ৫ শত টাকা মূল্যের দেশীয় তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে। ১৯৫২ ৫৩ সালে এক পয়সারও তুলোট কাগজ ক্রয় করা হয় নাই। অন্য সকল কুটীর শিল্পের কথা বাদ দিয়াও যদি এই মাত্র ২টী কুটীর শিল্পকে সরকারী ব্যবস্থায় রক্ষা করা হয়, তবে দেশের কোটি কোটি বেকার লোকের কর্মের সংস্থান হইতে পারে। ঐ ২টি শিল্পের কলে অতি সামান্য মাত্র লোক কাজ করে—তাহাদের বেকার হইবার ভয় নাই। তাহারা অবশ্যই অন্য কাজ সংগ্রহ করিয়া লইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কি সত্বর এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার হাসপাতালসমূহে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় যে গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৪ বৎসর পরে সেখান হইতে আজ কলিকাতার ৪০ হাজার লোককে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে। সে জন্য সহরে ৪৫টি দুগ্ধ বণ্টন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৩৩ শত একর স্থান লইয়া গোশালা প্রতিষ্ঠিত—এর পরিসীমা ১৯ মাইল। মোট জমির মধ্যে ৭ শত একর জলা—তথায় মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। নদী গবেষণা মন্দিরকে ৩ শত

একর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর বিজ্ঞান গবেষণাগার ও পরমাণুতত্ত্ব গবেষণা মন্দিরকে ১৫০ একর জমী দেওয়া হইয়াছে। তথায় হাঁস, মুরগী প্রতিপালনের বিরাট কেন্দ্র সকলের দ্রষ্টব্য জিনিষ। গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির খাদ্য তথায় উৎপাদন করা হয়। তা ছাড়া তথায় বহু নারিকেল, আম, লিচু, পেঁপে প্রভৃতির গাছ করা হইয়াছে। দুগ্ধ শোধনের জন্য একটি আধুনিক যন্ত্র বসানো হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ৫ শত মণ দুধ শোধন করা যায়। ঐ সঙ্গে পশু গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোক যাহাতে সুলভে দুধ, ডিম ও ফল খাইতে পারে সে জন্যই সরকার হরিণঘাটায় এই বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ৩৭ ভোট পাইয়া ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট
শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি থাইল্যাণ্ডের প্রিন্স ওয়ান ওয়াট থায়াকনকে পরাজিত করিয়াছেন—তিনি মাত্র ২২টি ভোট পাইয়াছেন। রাষ্ট্রসংঘে এই প্রথম একজন মহিলা সভানেত্রী হইলেন। শ্রীমতী পণ্ডিত বলেন—আমার নির্বাচনে যেমন জগতের সকল মহিলার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে—তেমনই আমার দেশের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে। তিনি তাঁহার সাধ্যমত সমগ্র বিশ্ব সমস্যার সমাধানের চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদত্যাগ করায় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে অস্থায়ীভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ পদে ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনকে নির্বাচনের যে সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। ক্ষিতিমোহনবাবু গত ৪২ বৎসর কাল শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন।

পরলোকে নাট্যকার বটকৃষ্ণ রায়—

কলিকাতা অভয় গুহ রোড নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় মহাশয় পরিণত বয়সে গত ২০শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ২ বৎসর পূর্বে বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউসন ও উপেন্দ্র স্মৃতি হাসপাতালের অধ্যক্ষতা এবং যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নট ও নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহু নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার রসিক সমাজ ও সাহিত্য বাসরে সুপরিচিত ছিলেন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ২৫শে অক্টোবর হইতে তিন দিন জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইবে। রাজস্থানের মহারাজপ্রমুখ মেবারের মহারাণা জয়পুরে সমবেত বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীদিগকে চিতোর দুর্গ ও উদয়পুর সহর দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস জয়পুর অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

জয়পুরের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নিবিড় ও দীর্ঘদিনের। এই সম্মেলন তাহা আরও দৃঢ়তর করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব—

বিহার প্রদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা দোষমুক্ত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি ভাগলপুর হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সে জন্য গত ১৪ই মার্চ যে সংস্থা গঠিত হইয়াছে ভাগলপুরের ব্যারিষ্টার সৈয়দ আবুল হাসান তাহার সভাপতি, প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সহ-সভাপতি এবং ইষ্টার্ণ রেলের শ্রীওয়াই চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও বাঙ্গালী বিহারী সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া দেশের ক্ষতি সাধন করিতেছে। নূতন চেষ্টার ফলে ঐ অশান্তি দূরীভূত হউক।—আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্মেলনের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি

মিউনিসিপাল শাসন—

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপাল শাসনের ব্যবস্থায় উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিতেছে। গত কয় মাসের মধ্যে কয়েকটি বড় বড় মিউনিসিপালিটীর শাসন ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহাদের মধ্যে কামারহাটী, বালী প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। আমাদের মধ্যে দুর্নীতি ও দলাদলির অন্ত নাই। তাহা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশ। মিউনিসিপাল শাসনে দলাদলি যে ক্ষতি সাধন করে, তাহা সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয়। তাহা ছাড়া মিউনিসিপাল আইনের গলদও কম নাই। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও সত্বর তাহার কোন প্রতিকার দেখা যায় না। ছোট ছোট মিউনিসিপালিটীগুলির ২।৩ টি একত্র করিয়া দিলে বহু অনাবশ্যক ব্যয় কমিয়া যায় ও দলাদলি ও কম হইতে পারে। বারাকপুর সহরে তিনটি ও দমদম সহরে ৩টি করিয়া মিউনিসিপালিটী রাখার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অন্য দিকে খড়দহ মিউনিসিপালিটীর মত অতি ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী ও করদাতাদের কোন উপকার করিতে পারে না। শুধু বারাকপুর মহকুমায় ১৭টি মিউনিসিপালিটী আছে—যাহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া অনায়াসে ৪।৫টি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। কলিকাতা সহর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও গ্রাম ও সহরে পার্থক্য থাকা উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস, নূতন মিউনিসিপাল আইন রচনার সময় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যেন—ভবিষ্যতে এই অব্যবস্থাজনিত অসুবিধা ও দুঃখ কষ্ট হইতে জনগণ উদ্ধার লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনের আর কোন অর্থ নাই—স্বাধীন দেশ সবটাই স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে। কাজেই গভর্ণমেণ্টের শাসনই এখন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শাসন। দেশবাসী প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশকে ভালবাসিয়া কর্তব্য পালন করিলেই স্বাধীনতার শাসন তাহাদের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি দান করিবে।

কাঁসাই নদীর বাঁধ—

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে কাঁসাই নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে ৪২ বর্গ মাইল ধান জমীর উন্নতির জন্য ঐ বাঁধ নির্মিত হইবে। পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বাঁধ নির্মিত হইলে শুধু ৪ লক্ষ একর ধান জমি ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর রবি শস্যের জমী উদ্ধার হইবে না, ৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হইবে। ১৯৫৫ সালের সালের মধ্যে ঐ কার্য্যও যাহাতে শেষ হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে

উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্যতম শিল্পী কুমারী স্মৃতি চক্রবর্তী। বর্তমানে ইনি নিজে একটি নৃত্যশিল্প ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ঋণ—

১৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লোকসভার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। পাঞ্জাব রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী—তাহাদের ঋণের পরিমাণ ৭৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রাদেশিক সরকারকে মোট ৩ শত ৩২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৩ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৪১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। স্থানীয় দল ২৪টি এবং বাইর থেকে আগত ১৭টি। একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দল, জামসেদপুর দলের সঙ্গে প্রথম দিন ১-১ গোলে খেলা ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিন ৩-০ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে যায়।

সুদীর্ঘকাল পর বে-সামরিক বহিরাগত দল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো। বে-সামরিক বহিরাগত দল হিসাবে সর্ব্বশেষ আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলে গেছে রেঙ্গুন কাষ্টমস, ১৯২৯ সালে।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-১ গোলে ওয়াড়ীকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৯ বার আই এফ এ শীল্ড' ফাইনালে উঠলো। প্রথম শীল্ড ফাইনালে ওঠে ১৯৪২ সালে। শীল্ড পেয়েছে ৫ বার, তার মধ্যে উপর্য্যুপরি ৩ বার—১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল।

নামকরা স্থানীয় দলের মধ্যে গত বছরের ফাইনালিষ্ট মোহনবাগান ২-৪ গোলে চতুর্থ রাউণ্ডে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দলের কাছে হার স্বীকার করে। মোহন-বাগানের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে দায়ী গোলরক্ষক —চ্যাটার্জি এবং আক্রমণ ভাগের কয়েকজন খেলোয়াড়। মোহনবাগানের বিপক্ষে প্রথম গোলটি ছাড়া বাকি গোলগুলি হয়েছে চ্যাটার্জির মারাত্মক ভুল খেলার দরুণ; তেমনি মারাত্মক ভুল খেলে আক্রমণ ভাগের কোন কোন খেলোয়াড় গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে, এমন কি মাত্র কয়েক হাত দূরের ফাঁকা গোলে বল মারতে পারেনি। মোহনবাগান বিপক্ষদলের তুলনায় গোল করার সুযোগ বেশী পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি।

খেলায় অঘটন ঘটাতে পারদর্শী এরিয়ান্স ক্লাব ১-২ গোলে গুর্খাদলের কাছে ২য় রাউণ্ডে পরাজিত হয়। গুর্খা দল সৌভাগ্যক্রমে জয়ী হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং দল একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট ক'রে তৃতীয় রাউণ্ডে ০-২ গোলে জামসেদপুর দলের কাছে হেরে যায়।

৪র্থ রাউণ্ডে গত বছরের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালিষ্ট রাজস্থান ক্লাব ১-২ গোলে খাঁটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী ওয়াড়ীদলের কাছে হার স্বীকার করে। গোল দুটি (পেনালটি এবং ফ্রি-কিক্ থেকে) দর্শনীয় না হ'লেও ওয়াড়ীর খেলা তুলনায় ভাল হয়। সেমি-ফাইনালে ওয়াড়ী ১-২ গোলে শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে হার স্বীকার করলেও তাদের পরাজয় অগৌরবের হয়নি!

প্রেসে শেষ কপি দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল বনাম ইণ্ডিয়া কালচার লীগের শীল্ড ফাইনাল খেলার কোন মীমাংসা হয়নি। দু'দিন খেলা হওয়ার পরও গোল শূন্য ভাবে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। আগামী সংখ্যায় শীল্ড ফাইনাল খেলার বিবরণ থাকবে।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়া লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ৩১ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

উৎসবে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন।

এই উপলক্ষে সোসাইটি পাঁচ অঙ্কের একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক নাটক জল-নৃত্য সহযোগে অভিনয় করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের যুগান্তকারী ঘটনাবলী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের অনুকরণে সূত্রধার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাটকের প্রতি অঙ্কের কাহিনী আবৃত্তি করেন, আর সেই কাহিনীকে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে জল-নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত বিকাশ রায়। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনীর থেকে জানা যায়, চলতি বছরে ৩৫০জন অনভীজ্ঞ এই প্রতিষ্ঠান থেকে সাঁতার শিক্ষা পেয়েছেন এবং ১৭জন 'জুনিয়ার লাইফ্ সেভিং সার্টিফিকেট' লাভ করেছেন। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর জনহিতকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি নগণ্য—আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন।

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

জাপানের টোকিও সহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে জাপান দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে জাপান ৫-৪ খেলাতে প্রথম বছরের বিজয়ী হংকংকে হারিয়ে বরোদা কাপ জয়ী হারিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা বছরে বরোদা কাপ জয় লাভের কৃতিত্বলাভ করেছিল। এ ছাড়া হংকং ম্যাকাওয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানের পুরস্কার কমলা কাপ জয়ী হয়েছিল।

এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে জাপান একটা খেলাতেও হার স্বীকার করেনি, ৫টি খেলাতেই জয়লাভ করেছে।

মহিলাদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে জাপান জয়ী হয়। পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস ফাইনালে ভিয়েৎনাম জয়লাভ করে। মহিলাদের সিঙ্গলসে খেতাব পায় ফরমোসা। ভারতবর্ষ তার শক্তিশালী দল পাঠাতে পারেনি। ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত এবং থিরুভেঙ্গাডাম দলে যাননি। ভারতীয়দলে ছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—রণবীর ভাণ্ডারী (বাংলা) অধিনায়ক, ভায়াস (বোম্বাই), এস থাকার্সি (বোম্বাই) এবং জে এন ব্যানার্জি (বাংলা)। গত বছর কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে ভারতবর্ষ বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ বিভাগে ভারতবর্ষ তিনটি বিভাগের ফাইনালে জয়ী হয়—মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডবলস (জাপানের সঙ্গে) এবং মিক্সড ডবলস। এ ছাড়া প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' সম্মান পেয়েছিলেন একমাত্র গুল নাসিকওয়ালা (ভারতবর্ষ)—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস ফাইনালে জয়লাভ করে। ১।১০।৫৩

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "দক্ষিণের বিল" (২য় খণ্ড)—৪৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পঞ্চভূত" (২য় সং)—২॥০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২০শ সং)—১।০
রুবেন রায় প্রণীত উপন্যাস "মর্ত্তের মৃত্তিকা"—৩॥০
শশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অব্যর্থ মোহন"—২৲, "আর্ত্ত-ত্রাণে মোহন"—২৲, শাস্তার জন্মোৎসবে স্বপন"—২৲
শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কেরাণীর জীবন"—২॥০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মেঘ-কজ্জলী"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কিশোর পাঠ্য "পরাজিত এভারেষ্ট"—১।০
মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "মহাভারতী"—২॥০
শ্রীগোপালদাস চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবপর্ণ"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "কৃষ্ণার অভিযান"—১॥০, "ঢেউয়ের দোলা" (২য় সং)—৩৲, "পাপ্পাপপ"—৩৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিকার-কাহিনী "বাঘের দেশে"—১৲
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অব্যর্থ সন্ধান"—॥০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ছোটদের হাসির গল্প "জন্মদিনের উপহার"—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "রহস্যের মায়াপুরী"—৩৲, "রহস্যের মায়াজাল"—৩৲
শ্রীশৈলজা দত্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ছন্দ-পতন"—২৲
শ্রীভূপতিনাথ দাশ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "হে অতীত!"—॥০
নবভারত পাবলিশার্স-প্রকাশিত "প্রভাতকিরণ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

গ্রহায়ণ- ১৩৬০

একচত্বারিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা

এই বলেই সবাই 'কোকোলা'কে অভিনন্দন জানায়। স্বপ্নালু সুরভি, সূক্ষ্ম সংমিশ্রন, বিশুদ্ধ উপাদান প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে সকলের চিত্ত জয় করেছে 'কোকোলা'। তাই আজ 'কোকোলা' ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশ তৈল।

ক্রয়কালে জাল বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বোতল খুলে দেখে নেবেন ইহা আপনাদের সেই চির-পরিচিত সুগন্ধযুক্ত আসল জিনিষ কিনা। জালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায়।

COCOLA
কোকোলা
JEWEL OF INDIA PERFUME CO
CALCUTTA

কোকোলা

অভিজাত কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং
কলিকাতা-৩৪

শিল্পী—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত | বাস্তহারা | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গীতা কি প্রক্ষিপ্ত ?

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

গীতা মহাভারতের মধ্যমণি !

কুরু ও পাণ্ডবের মহারণের পটভূমিকায় পার্থসারথি গীতা বলিয়াছিলেন। গীতা বুঝিতে হইলে মহাভারতের সেই অনুপম চরিত্রগুলি এবং সেই পরিবেশ মনে রাখিতে হইবে। এই কথা মনে না রাখিয়া গীতার আলোচনা করিলে তাহার মর্ম্মার্থ হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি মতবাদ ইহার পরিপন্থী—একটী অধ্যাত্মব্যাখ্যাবাদী, অন্য প্রক্ষিপ্তবাদ। য়ুরোপীয় গবেষক পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্তবাদ লইয়া মাতিয়া থাকেন। তাহারা নিজেদের কল্পনানুযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপ্তি, রীতি ও অর্থ প্রয়োগ করিতে গিয়া বহুস্থলেই ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে গীতা মূল মহাভারতের অংশ এবং ইহা আদৌ প্রক্ষিপ্ত নহে।

গীতার সহিত মহাভারতের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে গীতা কেহ মূল মহাভারতে প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই।

ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণ-নদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ।

সমুচ্চতটশালিনী রণ-নদী বহিতেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ ইহার তটভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, গান্ধার ইহার নীলোৎপল, শল্য কুম্ভীর, কৃপ প্রবাহ, কর্ণ ইহার বেলাকে আকুল করেন, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ইহার ঘোর মকর, দুর্য্যোধন ইহার আবর্ত্ত। এই রণ-নদী পার হইতে কাণ্ডারী কেশব। গীতার সহিত এই ভীষণ সংগ্রামের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ক্ষয় ও ক্ষতি উপলব্ধি করিয়াই অর্জ্জুনের ক্লৈব্য এবং তাহার জন্যই ভগবানের গীতা প্রচার।

কিন্তু অনেকে বলিবেন, যুদ্ধের এই আখ্যানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই গীতাকার গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

করিয়াছেন। ইহা যে ঠিক নয় মহাভারতের অন্তরঙ্গ প্রমাণই তাহা নির্ণয় করিবে। আদি পর্ব্বের অনুক্রমণিকায় ভগবদ্ গীতাপর্ব্বের উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ পর্ব্বের অধ্যায় বর্ণনার সময় এই শ্লোক পাই :—

কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
মোহনং নাশয়ামাস হেতুর্ভিমোক্ষদর্শিভিঃ॥

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের প্রসঙ্গে আছে—ধৃতরাষ্ট্র যখন শুনিলেন যে অর্জ্জুনের মোহ বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তখনই তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন।

শান্তিপর্ব্বে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে নারায়ণীর ধর্ম্ম বর্ণনা করার সময় বলিতেছেন যে এই ধর্ম্ম হরিগীতায় সংক্ষেপে বিধিপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। হরিগীতা ভগবদ্গীতারই নামান্তর। এই পর্ব্বে পুনরায় এই শ্লোক পাওয়া যায়—

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবর্ষোর্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥

কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সমুপস্থিত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে বিমনস্ক অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান এই ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন।

অশ্বমেধপর্ব্বে দ্বারকায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে অর্জ্জুন পুনরায় গীতা শুনিতে চাহিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি যোগস্থ হইয়া যে গীতা বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বলা সম্ভব নয়। এইভাবে আভ্যন্তরিক উল্লেখ হইতেই ইহা নিঃসন্দেহ যে গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ ভাষার সৌসাদৃশ্যও বলিয়া দেয় যে গীতা ও মহাভারত একই ব্যক্তির রচনা। কিন্তু কেবল শব্দ সাদৃশ্য নয়, অর্থ ও ভাবের সাদৃশ্যও নিরূপিত করে যে উভয়ই একই মানুষের লেখা। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বের শেষে ভাগবতধর্ম্মের পরম্পরায় উল্লেখ আছে সেখানে মহাভারতকার বলিতেছেন—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো বাপ্য লোকানবস্থিতঃ॥

ইহা হইতে পাওয়া যায় ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ এই ভাগবতধর্ম্ম মনুকে দিয়াছিলেন—লোক পরিপালনের জন্য মনু তাহা আপন পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন। ইক্ষ্বাকু কথিত সেই ধর্ম্ম এক্ষণে পৃথিবীতে অবস্থিত আছে। এই পরম্পরার সহিত চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকের তুলনা চলে :—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

পরম্পরা ছাড়া প্রবৃত্তিপরতা এই দুই ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

নারায়ণ পরো ধর্ম্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
প্রবৃত্তি লক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ॥

নারায়ণীর ধর্ম্ম প্রবৃত্তিপর, নিবৃত্তিমূলক নহে। গীতাও মূলতঃ কর্ম্মযোগশাস্ত্র। এই কর্ম্মযোগশাস্ত্র যে পটভূমিকায় বলা হইয়াছে—সেটা মনে রাখিলে কেহই বলিবেন না যে গীতা প্রক্ষিপ্ত।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ক্ষেত্র—মন্যুময় দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য লইয়া সুসজ্জিত। বিদ্যুৎ-বজ্র পরিপূর্ণ দুই খণ্ড মেঘ পরস্পরের দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই রুধির-স্রোতে ধরণী প্লাবিত হইবে—তখন অর্জ্জুন ক্লৈব্য অনুভব করিলেন। সেই বিষাদ দূর করিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলিলেন। শোকমোহাচ্ছন্ন যে অর্জ্জুন প্রথমে বলিয়াছিলেন :

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে
গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥

হে কৃষ্ণ, হে কেশব, স্বজনগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, রোমহর্ষ হইতেছে, গাণ্ডীব হাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে, অঙ্গ যেন এলিয়া যাইতেছে। সেই ক্লীব অর্জ্জুন গীতার শেষে উল্লসিত শৌর্য্যে বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং আমার বিনষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি এখন আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, আমি এখন তোমার উপদেশ মানিয়া যুদ্ধ করিব।

গীতার মর্ম্মার্থ মহাভারতের এই রণ-সমুদ্যমের ভিতর

দিয়াই জানিতে হইবে। এই বিরাট যুদ্ধের সমস্যাকে ভুলিয়া গীতার ব্যাখ্যা চলে না।

গীতাধ্যায়গুলির সঙ্গতি বিবেচনা করিলেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অর্জ্জুন বিষাদযোগে বলিলেন যে আত্মীয়স্বজন বধ করার চেয়ে তিনি ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবেন। কুলক্ষয়ের মত মহাপাপ তিনি করিবেন না। গীতা যে বৈরাগ্যের পুঁথি নয়, তাহা কৃষ্ণের কথায় প্রতিপন্ন হইবে। কারণ তিনি অর্জ্জুনকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিলেন না, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন—স্বধর্ম্ম পালন না করিলে প্রত্যবায় হইবে—তাহার অকীর্ত্তি হইবে। অর্জ্জুন তাহাতেও শান্ত হইলেন না, বরং পণ্ডিতের মত তর্ক জুড়িলেন। তদুত্তরে গুরু বলিলেন—কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্ম-সাধন যে পন্থাই তুমি অবলম্বন কর না কেন, উভয় মার্গেই তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সংক্ষেপে গীতায় তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া উপদেশ দিলেন, নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কাজ করাই মানুষের কর্ত্তব্য।

তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কর্ম্মযোগের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন। কর্ম্মকে যজ্ঞের মধ্যে বিলীন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবার উপদেশ দিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জ্জুন জ্ঞানমার্গ এবং কর্ম্মমার্গের উভয়ের একটীর শ্রেয়স্করতা নিশ্চয়রূপে জানিতে চাহিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয় বিচার করিয়া পার্থসারথি জানাইলেন যে কর্ম্মযোগী হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। নিষ্কাম ও নির্ব্বাসনা হওয়াই মানুষের চরম সাধ্য।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তমের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাহীন হয় এবং মানুষ সমতা লাভ করে। সপ্তম অধ্যায়ে মরামর জগতের বিচার হইয়াছে। অষ্টমে জ্ঞান-বিজ্ঞানকথা বলিতে গিয়া যেসব তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নবমে, দশমে, একাদশে এবং দ্বাদশে পুরুষোত্তমের ব্যক্তস্বরূপ যে প্রেমগম্য, সে কথাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শনের দ্বারা পুরুষোত্তম আগম পরম বিভূতি অর্জ্জুনকে দেখাইবার পর ত্রয়োদশে এই বিশ্বেশ্বরই যে প্রত্যেক জীবে তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে দেখান হইল। যাহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে, একথা প্রকৃতি ও পুরুষ বিচারের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে একই আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিন গুণানুসারে জগতের এই বিপুল বৈচিত্র্য এবং পরে অর্জ্জুনকে ত্রিগুণাতীত সাম্য লাভ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চদশে ভগবান বলিলেন—ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম, তাহাকে জানিয়া তাহাকে ভক্তি করিলেই মানুষ জীবনে চরম সার্থকতা পায়। অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের উপাসনা করিতে বলিলেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে মানুষে মানুষে কেন ভেদ হয় তাহা বুঝাইবার জন্য দৈবী ও আসুর সম্পদের ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভেদতত্ত্বের মূল কারণ ব্যক্ত করিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায় সমস্ত গীতাশাস্ত্রের উপসংহার। পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মাচরণে যে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে তাহাই বুঝাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে এবং অর্জ্জুন তাহা বুঝিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

> যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
> মিথ্যৈষ ব্যবশয়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যসি।

হে অর্জ্জুন তুমি অহঙ্কারে বলিতেছ যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। তোমার এই মনন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। তোমার স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। অতএব উদ্ধারের পন্থা কোথায় ?

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি সব ছাড়িয়া আমারই শরণও লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় করিও না।

গীতার সার কথা এই আত্মসমর্পণ। ভগবানে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া মানুষ যখন ভগবৎপরায়ণ হইয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মাচরণ করে, তখন তাহার কোনই পাপ থাকে না—এই ধরণের কর্ম্মযোগী ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্র কল্যাণ লাভ করে।

অতএব অধ্যায় সামঞ্জস্য করিলে দেখা যায় যে গীতা বাহির হইতে প্রবেশ করা হয় নাই—ইহা মহাভারতের

আখ্যানের পটভূমিকায় কমলকোরকের শতদলের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে ইহার এই বীজভূমি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে, কাজেই প্রক্ষিপ্তবাদ আদৌ যুক্তিসহ নহে।

তার্কিকের তর্ক হয়ত ইহাতে থামিবে না। তিনি বলিবেন যে সুচতুর ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে গীতা রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মহাভারতে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি উপরে যাহা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত অনুধাবন করিয়াই অতি যত্নের সহিত গীতাকে মহাভারতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন এবং যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতা লিখিয়াছেন পুনঃ পুনঃ তাহা নিজের পুস্তকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই অতি গম্ভীর দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা যুক্তি নহে—তর্ক।

কারণ যিনি গীতার মত গ্রন্থ রচনায় সামর্থ্য রাখিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই মহাভারতে প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের দুরাশা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। গীতা অপূর্ব্ব সমন্বয় গ্রন্থ। তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক তথ্যের ও মতের এমন সুন্দর সংক্ষেপ অভিব্যক্তি অতি ক্ষুরধারবুদ্ধি মনস্বীর পক্ষে সম্ভব।

এই মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। তথাপি সমস্ত টীকা ও ভাষ্য, সমস্ত প্রাচীন কিংবদন্তী ভুলিয়া আমরা কেন এই প্রক্ষেপবাদ গ্রহণ করিব।

যখনই জীবনে গভীর সমস্যা জাগে তখনই তাহার সমাধানের আকুলতা জাগে। চলিত কথায় বলে, যুদ্ধ উদ্ভাবনের প্রসূতি। সেই ভাবে কুরুক্ষেত্রের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখেই গীতার গভীরতম জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভবপর। এই জন্যই অনুগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনি যোগস্থ হইয়া গীতা বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বলা সম্ভব নয়। মহাভারতকার যিনি তিনি পরম জ্ঞানী কবি—সেই কবির অমর লেখনীতেই গীতা জাগ্রত হইয়াছে—তাহাকে প্রক্ষেপের কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবার আদৌ হেতু নাই।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও গীতা রূপক কাব্য নয়। গীতার যে সার্ব্বজনীন মতবাদ, গীতার যে শাশ্বত মাধুর্য্য তাহা রূপকের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই—তাহা জাতীয় জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে এক মহাসমস্যা সমাধানের পথেই আপন অপূর্ব্বতায়, আপন চিরভাস্কর দীপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের দর্শন-বিস্তার ইতিহাসে ভারতের ধর্ম্মজীবনের যাত্রার পথে গীতা এক দিব্যদ্যুতিময় অধ্যাত্ম গ্রন্থ। মানুষকে মর্ত্ত্য জীবনের মলিনতা হইতে দেবজীবনের পরিপূর্ণ শ্রী, সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবার যে বিরাট প্রয়াস এই মহাগ্রন্থে প্রতিফলিত, তাহা মহাভারতের সুবিশাল পটভূমিকায় সম্ভব হইয়াছে—অন্যভাবে, অন্যরূপে তাহা সম্ভব হইত না।

সর্ব্ব বিষয় জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসুর সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া, গীতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিষয় বিবেচনা করিয়া, ভারতীয় ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা পরম পুণ্য ইতিহাস মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাভারতের অনুপম চরিত্রগুলির নৈতিক সমর্থনের জন্য উপযুক্ত কারণেই উপযুক্ত স্থানেই বেদব্যাস ইহা মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

প্রার্থনা

শ্রীচিম্ময়কুমার রায়

যে ঘন আঁধারে তোমার আলোক তরে
আকুল আবেগে নয়ন আমার ঝরে
যে আঁধারে প্রিয় তুমি চল মোর সাথে
থাক সে আঁধার আমার জীবন রাতে।
যে আলোকে প্রিয় নাহি মিলে তব দেখা
চাহি না জীবনে বৃথা সে আলোক রেখা

সে আলোক যাক্ মোর পথ হতে সরি
জীবন আমার উঠুক আঁধারে ভরি।
যে সুখ বিভবে তোমার চরণ ভুলি
বিলাস আবেশে মিছে কাজে দিনগুলি
তোমার পরশ যার মাঝে নাহি পাই
সে বৃথা বিভব কভু যেন নাহি চাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গৌড়ের সিংহাসন

অমাবস্যার পরদিন প্রত্যূষে কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীরা শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই শুনিল, রাজপথ দিয়া ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। সকলে দ্বার গবাক্ষ খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পথ দিয়া দীর্ঘ সর্পিল সেনাদল চলিয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠে চর্ম, হস্তে শল্য, কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে।

সেনাদলের অগ্রভাগে একটি সুসজ্জিত রথ। রথের ছত্র নাই, মুক্ত রথে পাশাপাশি বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র দাঁড়াইয়া আছেন। কোদণ্ড মিশ্রের শীর্ণ হস্তে অশ্বের রশ্মি, তিনি রথ চালাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, শুদ্ধ প্রাণশক্তির বলে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষে বিজয় গর্ব পরিস্ফুট। তাঁহার পাশে বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া বজ্র দাঁড়াইয়া। বজ্রের মাথায় ধাতুময় শিরস্ত্রাণ, বক্ষে বর্ম, মুখে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা। সে অচঞ্চল-চক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া আছে।

রথের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কোকবর্মা। সে কদাকার মুখে বিকৃত ভঙ্গিমা লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেহে লৌহ-জালিক, হস্তে বিনিষ্ক্রান্ত অসি। সে দক্ষিণে বামে মর্কট-চক্ষু ফিরাইয়া পথিপার্শ্বস্থ জনগণের মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছে, যেন মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে।

সর্বাগ্রে শাসন-ডিণ্ডিম ধ্বনিত করিয়া ঘোষক পদব্রজে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ডিণ্ডিম থামাইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—নগরবাসিগণ, অবহিত হও। অগ্নিবর্মার কালান্ত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ের সিংহাসন শূন্য নয়। পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র, অমিতবীর্য মহারাজ মানবদেবের পুত্র পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ বজ্রদেব তাঁর পিতৃপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তোমরা মহারাজ বজ্রদেবের জয় ঘোষণা কর।

নাগরিকেরা কিন্তু জয় ঘোষণা করিতেছে না। তাহারা উৎসুক নেত্রে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু এই রাজ-পরিবর্তন ব্যাপারে নিজেদের অংশভাক মনে করিতেছে না। কোন রাজা মরিল, কোন নূতন রাজা আসিল, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু তদধিক কিছু নয়। কে যাইবে রাজা মহারাজার ব্যাপারে মাথা গলাইতে? নিরুপদ্রবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট।

জনগণের মধ্যে কেবল একদল লোক এই আকস্মিক ঘটনাসম্পাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জয়নাগের দল। জয়নাগের ষড়যন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল; সাধারণ যাত্রিকের বেশে তাহার দলের পাঁচ সহস্র যোদ্ধা কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং জয়নাগ ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিরা যে-সময় দণ্ডভুক্তির সীমান্ত ঘিরিয়া বসিয়া জয়নাগের গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, চতুর জয়নাগ সেই অবকাশে জলপথে কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়া রাজার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবার কৌশল করিয়াছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিগণ যতক্ষণে সংবাদ পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য ফিরিবে, ততক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত এবং সম্মুখে প্রতিবদ্ধ হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। জয়নাগের এই কূটকৌশল কার্যে পরিণত হইতে আর দুইচারি দিন মাত্র বিলম্ব ছিল, সহসা এই নূতন সংস্থার উদ্ভব হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে যাহা হোক, কোকবর্মার সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে রাজপুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অগ্নিবর্মার মৃত্যুসংবাদ রাজপুরীতে গোপন ছিল না, রক্ষী প্রতীহার দৌবারিক যে যেখানে ছিল পলায়ন করিয়াছিল। তৎপরিবর্তে

কোদণ্ড মিশ্রের সংগৃহীত দুইশত পণ্য যোদ্ধা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইহারা খস-পুক্কস-হূণ-যবন শ্রেণীর যোদ্ধা; ইহাদের দেশ নাই, আত্তি নাই, যে বেতন দিবে তাহার জন্যই যুদ্ধ করিবে। ইহারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, কিন্তু যাহার বেতন লইয়াছে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

কোদণ্ড মিশ্রের আজ্ঞায় তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিল। কোকবর্মা সদলবলে পুরভূমিতে প্রবেশ করিল এবং পঞ্চাশজন বাছা বাছা অনুচর লইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। আর সকলে পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার আর্তনাদ হুড়াহুড়ির শব্দে রাজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কোদণ্ডমিশ্র বজ্রকে লইয়া রাজভবনের একদিকে চলিলেন খস-পুক্কসদের কয়েকজন প্রধান যোদ্ধা রক্ষীরূপে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল।

কোদণ্ডমিশ্র রাজার প্রমোদ ভবনে উপনীত হইলেন। লুণ্ঠনকারীরা এখনও এদিকে আসে নাই, কেবল একজন পুরুষ প্রমোদ-ভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, সে রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন। তাহার কেশকলাপ সুবিন্যস্ত, চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, বাষ্পোৎফুল্ল। অর্জুনসেন প্রফুল্লমুখে বলিল—'আর্য কোদণ্ডমিশ্র আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মহারাজের জয় হোক।'

কোদণ্ডমিশ্র বলিলেন—অগ্নিবর্মার দেহ কোথায়?'

'এই যে। আসুন।' অর্জুনসেন অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল। বিশাল ভবন শূন্য, ছায়ান্ধকার; রাত্রির ক্লেদ যেন এখনও তাহার বাতাসে লাগিয়া আছে। কোথাও পলাতকা সভানন্দিনীর দেহচ্যুত রঙ্গিন উত্তরীয় রক্ত রেখার ন্যায় পড়িয়া আছে, কোথাও স্খলিত নূপুর গড়াগড়ি যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাকুট্টিমের উপর শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব। অর্জুনসেন বস্ত্রের প্রান্ত তুলিয়া দেখাইল। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে অগ্নিবর্মার কামনা-বিধ্বস্ত দেহ চিরতরে স্থির হইয়াছে।

বজ্র একবার সেইদিকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কোদণ্ডমিশ্র কিয়ৎ কাল মৃত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গী করিলেন, তারপর রক্ষিদের বলিলেন—'মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর। হয়তো সদ্গতি হবে।'

অগ্নিবর্মার দেহ প্রাকারশীর্ষ হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। বজ্র ভাবিল, তাহার পিতার দেহও এই পথে গিয়াছিল! গৌড় রাজগণের রাজপুরী হইতে নির্গমনের ইহাই বুঝি একমাত্র পথ।

অতঃপর সকলে সভাগৃহে আসিলেন।

ওদিকে রাজ অবরোধে যে বীভৎস ব্যাপার চলিতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বেলা দ্বিপ্রহরে কোকবর্মা ও তাহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য পুরপ্রাঙ্গণে রক্ষণ করিল; রাণী শিখরিণীকে দোলায় তুলিল। তারপর বিদায় গ্রহণের পূর্বে কোকবর্মা কোদণ্ডমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কার্যসিদ্ধির দম্ভে তাহার কদর্য মুখ আরও কদর্য আকার ধারণ করিয়াছে, মদমত্ততার বশে দেহ টলিতেছে। সে উচ্চ বিকৃতকণ্ঠে হাস্য করিয়া বলিল—'ঠাকুর, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম। তোমার রাজা আর তুমি মনের সুখে রাজত্ব কর।' বলিয়া আবার ধৃষ্টতা ভরা হাসি হাসিল।

কোকবর্মাকে দেখিয়া বজ্রের অন্তর দুঃসহ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। নরকের পশুটাকে পদাঘাত করিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কোকবর্মা বোধহয় কোদণ্ডমিশ্র ও বজ্রের নিকট বহু প্রশস্তি ও চাটুবচন আশা করিয়াছিল, কিন্তু বজ্রকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে শ্বাপদের ন্যায় দশন নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'কুকুরের মাথায় রাজছত্র। কতদিন থাকে দেখব।

বজ্র বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোকবর্মা উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করিতে করিতে দ্রুতপদে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার মনে যতই গরল থাক, বজ্রের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দুঃসাহস তাহার নাই।

দুইদণ্ডের মধ্যে কোকবর্মার দল রাজপুরী ত্যাগ করিল। কোদণ্ডমিশ্রের সৈন্যদল তখন পুরী রক্ষার ভার হইল। তোরণে প্রাকার শীর্ষে সর্বত্র ধনুর্ধর রক্ষিগণ পাহারা দিতে লাগিল।

সভাগৃহে বজ্র ও কোদণ্ডমিশ্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না; একটি রমণী দ্বারের নিকট উঁকি মারিল। বজ্র অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কুহু। তুমি কোথায় ছিলে?'

কুহু হাসিয়া বলিল—লুকিয়ে ছিলাম।' তারপর নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—শ্রীমন্মগারাজ বজ্রদেবের জয় হোক।'

বজ্রের মুখ কঠিন হইল। সে কুহুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কোদণ্ডমিশ্র আসিয়া বলিলেন,—কুহু। ভালই হল। এখনই রাজার অভিষেক হবে। আজই অভিষেক করব। তুমি ব্যবস্থা কর।

কুহু সবিস্ময়ে বলিল—'সে কি ঠাকুর। লোকজন কৈ, সভাসদ কৈ! কার সাক্ষাতে অভিষেক হবে?

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'আমি নগরে খবর দিয়েছি, প্রধান নাগরিকেরা এখনি আসবে। যদি না আসে তবু আমি একাই অভিষেক করব।'

'ভাল।' বলিয়া কুহু অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গেল।

প্রধান নাগরিকেরা আসিলেন না, কেহই আসিল না। কোদণ্ড মিশ্র কয়েকজন রক্ষীকে ডাকিয়া রাজসভায় সমবেত করিলেন। অবরোধে যে-কয়জন প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নারী অবশিষ্টা ছিল তাহারা আসিয়া হুলুধ্বনি করিল, লাজাঞ্জলি ছড়াইল; কুহু শঙ্খধ্বনি করিল। কোদণ্ড মিশ্র বজ্রের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন। বজ্র পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসিল। এইভাবে অভিষেকের হাস্যকর অভিনয় সম্পন্ন হইল।

সভা আবার শূন্য হইলে কোদণ্ড মিশ্র সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি বেদিকার উপর শয়ন করিলেন। বৃদ্ধের মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না, কিন্তু দেহ যে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত তিন চারি দিন যাবৎ তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই; এক সর্বগ্রাসী ভাবনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বেদিকার উপর শয়ান রহিলেন।

সভাগৃহের অন্য প্রান্তে বসিয়া কুহু ও বজ্র নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'অবরোধের অবস্থা কি?'

কুহু বলিল—'ভাল নয়। যেন কদলী বনে একপাল বুনো হাতী ঢুকেছিল।'

'আর রাণী?'

কুহু মলিন মুখে বলিল—'রাণীকে কোকবর্মা ধরে নিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমার আনন্দ হবে, কিন্তু দেখে কান্না এল।'

বজ্র সহসা বলিল—'কুহু, চল এবার পালিয়ে যাই।'

কুহু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'সে কি, কোথায় পালিয়ে যাবেন?'

'যেখানে হোক। রাজা তো হলাম, আর কি!' বলিয়া বজ্র একটু তিক্ত হাসিল।

'কিন্তু—কিন্তু—এখনও যে সবই বাকি!'

'থাক বাকি। সত্যি বলছি কুহু, আমার রাজা হওয়ার সাধ মিটে গেছে, রাজার জীবনে বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে, নাগরিক জীবনে ঘৃণা জন্মেছে। এ জীবনযাত্রা আমার জন্যে নয়। আমি চলে যেতে চাই।'

কুহু গালে আঙুল রাখিয়া চিন্তা করিল, বজ্রের মুখের উপর গুপ্ত স্নেহদৃষ্টি বুলাইল, শেষে কোদণ্ড মিশ্রের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিল—'কিন্তু উনি? আপনি যদি চলে যান ওঁর কি অবস্থা হবে?'

বজ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সেই একটা কথা। ওঁর এই রাজা-রাজা খেলা দেখে কৌতুক আর করুণা দুইই অনুভব করছি, কিন্তু ওঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না।'

বেলা তৃতীয় প্রহরে একজন গূঢ়পুরুষ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল—'জয়নাগ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে রাজপুরীর দিকে আসছেন।'

কোদণ্ড মিশ্র উঠিয়া বসিলেন—'জয়নাগ!'

গুপ্তচর জয়নাগ সম্বন্ধে সামান্য যাহা সংবাদ পাইয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পকাল পরে দ্বিতীয় গুপ্তচর আসিল। সে সংবাদ দিল—'কোকবর্মা জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দু'জনে একসঙ্গে পুরী অধিকার করতে আসছে।'

কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠ মধ্যে অস্পষ্ট একটি শব্দ হইল তিনি ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

* * * *

সঙ্কল্পিত কর্মে সহসা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া জয়নাগ চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা যে

সংবাদ লইয়া আসিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। বজ্রদেব নামক এক যুবক নিজেকে মানবদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া অগ্নিবর্মাকে হত্যা করিয়াছে এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠপোষক কেবল কোদণ্ড মিশ্র নামধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক কোকবর্মা।

কোকবর্মার পরিচয় জয়নাগ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার দুই হাজার সৈন্য ব্যতীত অন্য কোনও রাজকীয় সেনাদল উপস্থিত কর্ণসুবর্ণে নাই। কোকবর্মার সেনাদল উত্তম যোদ্ধা বটে, কিন্তু কোকবর্মা স্বয়ং অতি হীন চরিত্র ব্যক্তি। উপযুক্ত উৎকোচ পাইলে সে যুদ্ধ করিবে না।

তারপর জয়নাগ সংবাদ পাইলেন, কোকবর্মা রাজপুরী লুঠপাট করিয়া সসৈন্যে নগরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জয়নাগ এই বিচিত্র সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন, কোকবর্মা কোথায় যাইতেছে কি জন্য যাইতেছে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ত্বরিতকর্মা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি তৎক্ষণাৎ কোকবর্মার নিকট দূত পাঠাইলেন।

কর্ণসুবর্ণে কোকবর্মার বাসভবন ও সেনানিবাস ছিল। দূত সেখানে না গিয়া নগরের উত্তর তোরণের নিকট কোকবর্মাকে ধরিল। জনান্তিকে উভয়ের কথা হইল। দূতের প্রস্তাব শুনিয়া কোকবর্মার পাপ বুদ্ধি আবার জাগ্রত হইল। সে বলিল—'জয়নাগের প্রস্তাবে আমি সম্মত। তিনি যে গৌড় গ্রাস করবেন তা আগেই জানতাম, তাই সময় থাকতে কর্ণসুবর্ণ ছেড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন তখন আমি তাঁর দলে। যে কুকুরটাকে আমি সিংহাসনে বসিয়েছি, তাকে আমিই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব। জয়নাগকে কোনও কষ্টই করতে হবে না।'

নিয়তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোকবর্মা ফিরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে জয়নাগ প্রকাশ্যভাবে নিজে সৈন্যদের সমবেত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গোপনতার আর প্রয়োজন ছিলনা। কোকবর্মা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং বন্দিনী রাণীকে নিজভবনে পাহারার মধ্যে রাখিয়া জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিল।

জয়নাগ স্থির করিয়াছিলেন নূতন রাজাকে শক্তি সংগ্রহ করিবার সময় দেওয়া হইবে না, গাছ শিকড় গাড়িবার পূর্বেই তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। তিনি কোকবর্মাকে পার্শ্বে লইয়া সম্মিলিত সৈন্যদলের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। নগরের অধিবাসিগণ প্রাতঃকালে যেমন শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল অপরাহ্ণেও তেমনি শোভাযাত্রা দেখিল। কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

উজান স্রোত

কুহু বজ্রকে রণসাজ পরাইয়া দিল। বুকে পিঠে লোহার সাঁজোয়া, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, কটিতে তরবারি। পরাইতে পরাইতে কুহুর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতদিনে পাপিষ্ঠা কুহু ভালবাসিয়াছে। শুধু দেহের আসক্তি নয়, এই সরল স্বল্পবাক অ-নাগরিক মানুষটি তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে।

বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুহু বলিল—'চল, পালিয়ে যাই। কাজ নেই যুদ্ধে।'

বজ্র বলিল—'আর হয় না। শত্রু আসছে, যুদ্ধ না দিয়ে পালাতে পারিনা।'

'কিন্তু লাভ কি? ওরা সাত হাজার, আমরা মাত্র দু'শো জন।'

'তবু যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ একজন সৈনিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে ততক্ষণ আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া কোদণ্ডমিশ্র আছেন। এ আমার যুদ্ধ নয়, কোদণ্ডমিশ্রের যুদ্ধ। তিনি যতক্ষণ আজ্ঞা না দিচ্ছেন ততক্ষণ লড়তে হবে।'

বজ্র তোরণের দিকে চলিল। তোরণ দ্বার বন্ধ, তাহার ছায়াতলে পঞ্চাশজন যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যুদ্ধের উদ্দীপনা ছিল না। বজ্রের সসজ্জ মূর্তি দেখিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। একজন অধিনায়ক সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল—'জয়নাগ আক্রমণ করতে আসছে একথা কি সত্য?'

বজ্র বলিল—'সত্য। তোমরা তোরণ দ্বার বন্ধ রাখো, কিন্তু এমন ভাবে বন্ধ রাখো যাতে সহজে খোলা যায়।'

'যে আজ্ঞা।'

বজ্র তখন প্রাকারের উপর উঠিল। আকৃষ্ট ধনুর ন্যায়

অর্ধচক্রাকৃতি প্রাকার, তাহার উপর দেড়শত সৈন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি তাহারা প্রসারিত হইয়া সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে, শত্রু বিনাবাধায় প্রাকার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। বজ্র সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বুঝিল, ইহার অধিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা দিক এখনও অরক্ষিত আছে। রাজপুরীর পশ্চাতে স্নানঘাট অরক্ষিত, শত্রু সেই দিক দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যদিও এ আশঙ্কা অমূলক, জয়নাগ এত অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই; তবু সাবধান থাকা ভাল। বজ্র দশজন সৈনিককে ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিল; যদি ওদিক দিয়া আক্রমণ আসে তাহারা গতিরোধ করিতে পারিবে। অন্তত সংবাদ দিতে পারিবে।

তারপর সূর্যাস্ত হইতে যখন আর দণ্ড দুই বাকি আছে তখন দূরে রাজপথের অন্য প্রান্তে জয়নাগের সৈন্যদল দেখা দিল। অগ্রে দুই অশ্বপৃষ্ঠে জয়নাগ ও কোকবর্মা, পিছনে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈন্য সম্বাধ; যেন জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া বন্যার স্রোত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে ভেরী-তূরী নাই; কিন্তু বিপুল জন-প্রবাহের সঞ্চরণ শব্দ অবরুদ্ধ গর্জনের মত শুনা যাইতেছে।

বজ্র তোরণশীর্ষে প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার বক্ষে হর্ষোন্মাদনা নৃত্য করিয়া উঠিল। এ দৃশ্য যেন তাহার চিরপরিচিত। অস্তোন্মুখ সূর্যের ছটায় সৈন্যদের পদোদ্ধত ধূলা গৈরিকবর্ণ ধারণ করিয়া বিপুল বাহিনীর ঊর্ধ্বে কুণ্ডলিত হইতেছে। তাহার ভিতর দিয়া অস্ত্রের ঝকমকি, বহুবর্ণ কেতন পতাকার আন্দোলন। বজ্র নিজের সমাসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেল, ইহারা যে শত্রু তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার কর্ণমধ্যে রক্তের দ্রুত প্রবাহ ঝাঁঝর-ঝল্লরীর মত রণিত হইতে লাগিল; তীব্রোজ্জ্বল চক্ষে, স্ফুরিত নাসাপুটে সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তোরণ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত দূরে আসিয়া জয়নাগ অশ্ব স্থগিত করিলেন; দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা দাঁড়াইল।

জয়নাগ কোকবর্মার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। উভয়ের দৃষ্টি দুর্গের উপর; কথা কহিতে কহিতে সৈন্যদের পিছনে রাখিয়া দুই আরোহী সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

বজ্র তোরণ শীর্ষ হইতে দেখিতেছিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদ্বয় কি কথা কহিতেছে সে শুনিতে পাইল না, কিন্তু কোকবর্মাকে চিনিতে পারিল। অন্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহ জয়নাগ। বজ্রের চোখের দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিল।

তোরণ শীর্ষের যোদ্ধারা ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল; এখনও শত্রু বহুদূরে, তীর নিক্ষেপ করা তীরের অপব্যয় মাত্র। সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বজ্র একজন নায়ককে কাছে ডাকিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদের নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—'ওরা এখান থেকে কত দূরে বলতে পার ?'

নায়ক বিচার করিয়া বলিল—'আড়াইশো হাতের কম হবে না।'

বজ্র বলিল—'ভাল। আমাকে একটা ধনু দাও।'

নায়ক বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া বলিল—'এত দূর থেকে—'

বজ্র বলিল—'একটা ভাল ধনুক দাও।'

অন্য যোদ্ধারা আসিয়া নিজ নিজ ধনু বজ্রকে দেখাইল। বজ্র একটি শার্ঙ্গ ধনু বাছিয়া লইল; ধনুর্মুষ্টি লৌহের, দুই দিকে শৃঙ্গ। চতুর্হস্ত প্রমাণ ধনু, তাহাতে মৃগতন্তর ছিলা। বজ্র ধনুর গুণ খুলিয়া আবার টান করিয়া গুণ পরাইল। তারপর অতি যত্নে দুইটি দ্বাদশমুষ্টি পরিমিত কঙ্কপত্রযুক্ত শর নির্বাচন করিয়া লইল।

অশ্বারূঢ় দুইজন ইতিমধ্যে আর কিছু নিকটে আসিয়াছে; তাহারা গভীর ভাবে কোনও বিষয় আলোচনা করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও দুইশত হস্তের অধিক দূরে আছে; দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, কিন্তু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষত জয়নাগ ও কোকবর্মা উভয়ের দেহই লৌহজালিকে আবৃত, তীর গায়ে পড়িলেও বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঠিক দুইশত হস্ত পর্যন্ত আসিয়া জয়নাগ অশ্ব সংযত করিলেন; যেন অবচেতন মন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল ইহার অধিক নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়। দুই অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইল; দুই আরোহী প্রাসাদের দিকে চক্ষু তুলিলেন।

বজ্র ইন্দ্রকোষের ছিদ্রমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধনুতে শরসংযোগ করিল। পাশে দাঁড়াইয়া নায়ক

অন্য তীরটি ধরিয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল—'কিন্তু এখনও দুই শত হস্ত দূরে।'

বজ্র শুনিতে পাইল না। শর সন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে গুণ আকর্ষণ করিল। কর্ণ পর্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিয়া শর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শব্দ হইল, যেন এক ঝাঁক ভ্রমর একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

কোকবর্মা হাস্য করিতে করিতে কিছু বলিতেছিল; তাহার মুখের হাসি সহসা মিলাইয়া গেল। সে নিজের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল একটি তীরের পুঙ্খ তাহার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আছে। বজ্রের তীর তাহার লৌহজালিক ভেদ করিয়া বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা শুষ্ক হিক্কার ন্যায় শব্দ বাহির হইল। তারপর সে ঘোড়ার পিঠ হইতে টলিয়া পড়িয়া গেল। নরাধম কোকবর্মা জানিতেও পারিল না যে তাহার লালসা-কলুষিত পঙ্কিল জীবনের অবসান হইয়াছে।

জয়নাগ কিন্তু নিমেষ মধ্যে ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া পশ্চাদ্দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বজ্র দ্বিতীয় শর লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়াছিল, কিন্তু শরসন্ধান করিবার পূর্বেই জয়নাগ লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তোরণশীর্ষে যাহারা বজ্রের এই অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ দেখিয়াছিল তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধারণ ধানুকী আশী হস্ত পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, মধ্যম ধানুকী দেড় শত হস্ত পর্যন্ত পারে। কিন্তু অসামান্য শক্তি না থাকিলে দুই শত হস্ত দূরস্থ শত্রুকে লৌহজালিক ভেদ করিয়া বধ করা অসম্ভব। যোদ্ধগণের উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, এমন ধনুর্ধরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গৌরব আছে।

বজ্র ধনু প্রত্যর্পণ করিয়া তোরণশীর্ষ হইতে নামিয়া গেল। সে মনে বিশেষ কোনও উল্লাস অনুভব করিল না, কেবল ভাবিল—'রাজা হয়ে অন্তত একটা সৎকার্য করেছি।'

ওদিকে কোকবর্মার তীরবিদ্ধ দেহ পথের উপর পড়িয়াছিল, তাহার ঘোড়াটা পলায়ন করিয়াছিল। শত হস্ত পশ্চাতে বিস্ময়াহত সেনাদলের সম্মুখে জয়নাগ নিজ অধীনস্থ সেনানীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রাসাদের রক্ষীরা যত অল্পসংখ্যক হোক তাহারা যুদ্ধ করিবে, স্বেচ্ছায় তোরণদ্বার খুলিয়া দিবেনা। জয়নাগের সঙ্গে হস্তী নাই, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযোগী যন্ত্র নাই। এখন কী কর্তব্য!

ক্রমে সূর্য চক্রবাল রেখা স্পর্শ করিল; রাত্রির আর বিলম্ব নাই। প্রাসাদের রক্ষিসৈন্যদের মুখেও উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তাহারা নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে জল্পনা করিতে লাগিল: রাত্রি হইলে প্রাসাদ রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হইবে? অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শত্রু যদি পাঁচ দিক দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করে তবে তাহাদের নিবারণ করার উপায় কি? একবার তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, পুরীর সকলকে মরিতে হইবে।—

বজ্র বদ্ধ তোরণ দ্বারের সম্মুখে কুঞ্চিত ললাট পাদচারণ করিতেছিল এমন সময় বাহিরে দূরে বহুজনের কলকোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহল ক্রমশ কাছে আসিতেছে। তোরণ শীর্ষ হইতে একজন যোদ্ধা ডাকিয়া বলিল—'ওরা আক্রমণ করতে আসছে।'

নীচে হইতে একজন নায়ক প্রশ্ন করিল—'কতজন?'

'তিন চার শো। একটা গো-শকট ঠেলে নিয়ে আসছে, বোধহয় তোরণদ্বার ভাঙ্গবার জন্য।'

বজ্র ত্বরিতে প্রাকারে উঠিয়া একবার দেখিয়া আসিল। তারপর নিম্নে দ্বার-রক্ষীদের বলিল—'তোমরা প্রস্তুত থাকো। ধনুর্বাণ রাখো, তরবারি নাও। আমি যা আদেশ করব তাই করবে।'

আক্রমণকারীরা কাছে আসিতেছে। তাহারা লক্ষ্যান্তরে আসিলে প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত শর তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল; তাহারা বামহস্তে চর্ম তুলিয়া ধরিয়া শর নিবারণ করিতে লাগিল। দুই চারি জন হতাহত হইল, কিন্তু তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল না।

তোরণদ্বারের ভিতর দিকে পঞ্চাশজন অসিধারী যোদ্ধা অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর শত্রুদল গো-শকট ঠেলিয়া সবেগে দ্বারের উপর আঘাত করিল। দ্বার অটুট রহিল বটে কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বারম্বার এইরূপ আঘাত পাইলে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বার গো-শকট দ্বারের উপর সবেগে প্রহৃত হইল। তারপর বাহির হইতে উচ্চ পরুষ কণ্ঠস্বর আসিল—

'শোন সবাই। তোমরা পুরী রক্ষা করতে পারবে না। যদি দ্বার খুলে দাও, যোদ্ধারা সকলে মুক্তি পাবে, জয়নাগ সকলকে নিজ সেনামধ্যে স্থান দেবেন। কিন্তু যদি বাধা দাও, বাতি দিতে কাউকে রাখব না। যদি ইষ্ট চাও দ্বার খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ দ্বারের উভয় পক্ষ নীরব, কোনও শব্দ নাই। তারপর বজ্র তরবারি নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'দ্বার খুলে দাও।'

বজ্রের পশ্চাতে যে পঞ্চাশ জন রক্ষী ছিল তাহারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিল। সকলে তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার খুলিয়া গেল। এত শীঘ্র দ্বারোন্মোচনের জন্য শত্রু প্রস্তুত ছিল না, তাহারা ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। এই অবকাশে বজ্র ও তাহার দল সিংহনাদ করিয়া তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

অতর্কিত আক্রমণে প্রথমেই শত্রুদলের অনেক সৈনিক কাটা পড়িল। তারপর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বজ্রের পক্ষে পঞ্চাশ, বিপক্ষে তিন শত। কিন্তু বজ্র একা এমন মত্তহস্তীর মত যুদ্ধ করিল যে কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যগণও তাহার আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিল। শত্রুপক্ষ যেন হতবুদ্ধি হইয়াই পলাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্ধদণ্ড যুদ্ধ হইবার পর জয়নাগের দল গো-শকট ফেলিয়া মূল সৈন্যদলে ফিরিয়া গেল। বজ্রের রক্ষীদল বিজয়োল্লাসে শকট টানিয়া ভিতরে আনিল এবং আবার তোরণদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল।

বজ্র সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ছিল; তাহার পক্ষের কয়েকজন যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হইয়াছিল, কেহ মরে নাই। সকলে মহোল্লাসে বজ্রকে বিরিয়া কলরব করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের উল্লাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। একজন প্রবীণ যোদ্ধা অগ্রে আসিয়া বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

'মহারাজ, আপনার মত বীরের পাশে যুদ্ধ করতে করতে আমরা প্রত্যেকে প্রাণ দিতে পারি! কিন্তু প্রাণ দিয়ে লাভ কি? আপনাকে রক্ষা করতে পারব না। ওরা অসংখ্য, আমরা মাত্র দুই শত। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হবে।'

বজ্র বলিল—'তোমাদের ইচ্ছা কি?'

নায়ক বলিল—'আমরা আপনার বেতনভুক, যতক্ষণ আদেশ করবেন ততক্ষণ যুদ্ধ করব। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষা করা যাবে না। আমাদের প্রাণ তো যাবেই, আপনারও প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আপনি যদি গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেন তখন আমাদের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। আমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারব।'

বজ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'আমিও নিরর্থক নরহত্যা চাই না। কিন্তু কোদণ্ড মিশ্র আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। তুমি এস আমার সঙ্গে।'

দুইজনে সভাগৃহের অভিমুখে চলিল। কুহু পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রাসাদের মধ্যে ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রের সঙ্গে চলিল।

সভাগৃহ প্রায় অন্ধকার। কোদণ্ড মিশ্র বেদিকার উপর পূর্ববত শুইয়া আছেন। বহুক্লান্ত বৃদ্ধ গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এখন না জাগাইলে নয়। বজ্র তাঁহার কাছে গিয়া ডাকিল—'আর্য কোদণ্ড মিশ্র!'

কোদণ্ড মিশ্র উত্তর দিলেন না। বজ্র আবার ডাকিল, এবারও তিনি নীরব। তখন বজ্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিল অঙ্গ হিমবৎ শীতল। কোদণ্ড মিশ্র আর জাগিবেন না।

বজ্র কুহুর দিকে ফিরিয়া বলিল—'কুহু, যাঁর জন্য যুদ্ধ তিনি নিজেই চলে গেছেন। সুতরাং আমাদের পালাতে আর বাধা নেই।' সেনানায়ককে বলিল—'তোমরা দুর্গের দ্বার খুলে দাও। যুদ্ধ শেষ হয়েছে।'

ক্রমশঃ

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পয়লা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা গেলাম রুডলফ শেফারের সুন্দর বিদ্যালয়ে। নাম—School of Design. সেখানে বন্ধুবর হরিদাসকে প্রথম দিনই দেখলাম—ধুতি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। আমরা এদেশে ধুতি পরি বেশ একটু সলজ্জভাবে—তাছাড়া সবাই তাকায়, ভাবে: কোন্ চিড়িয়াখানার চিড়িয়া ছাড়া পেয়েছে গো! তাই ধনুর্ধরতম দেশপাণ্ডাও এখনো পর্যন্ত বড়গলা ক'রে বলতে সাহস পান না যে এদেশে বাঙালিবাবু বাবুটি সেজে বেরুবে না কেন? কিন্তু যদি বলি—এদেশে ধুতি পাঞ্জাবী অচল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে—তাহ'লে তাঁরা তর্ক করবেন কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি অনেকদিন থেকে এই দুঃসাহস পোষণ করছি যে এদেশে যে-কাজটি কেউ করে নি, আমিই করি না কেন সব প্রথম? চোগা-চাপকানও তো এদেশে "নতুন কিছু করা" নয়। সত্যিকারের অসমসাহসিক কাজ হবে এদেশে প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে ধুতি পাঞ্জাবী প'রে বেরুনো। এ ঠাণ্ডা দেশ, এখানে ধুতি পরলে মারা পড়বে যে—এ ধরণের নিষেধ বাণী সর্বতোভাবে অসিদ্ধ। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়—বিশেষত দিনের বেলা। দিল্লীতে জানুয়ারি মাসে ঠাণ্ডা এখানকার চেয়ে বেশি। তবে? দিল্লীতে যদি ধুতি পরা চলে, এখানে চলবে না কেন শুনি? যা ভাবা সেই কাজ। দেখতে দেখতে সাহস জেগে উঠল। মরীয়া হ'য়ে বেরুলাম ধুতি চাদর প'রে প্রথম দিন ভারতীয় কনসালের ওখানে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে—২৬শে জানুয়ারি। কই? কেউ তো কুকুর লেলিয়ে দিল না! তারপর থেকে ধীরে সুস্থে ধুতি প'রে বেরুতে লাগলাম—বিশেষ ক'রে বড় বড় হলে গান বাজনা হ'লে। ইন্দিরা নাচত শাড়ী প'রে, আমি গাইতাম ধুতি প'রে। কই, কেউ তো বলল না অশোভন। বরং অনেকেই বলতে লাগল: "কী সুন্দর বেশ—এই ধুতি পাঞ্জাবী!" পরে আরো সাহস বেড়ে গেল—প্রায়ই সময়ে অসময়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এখানে ওখানে ধুতি প'রে। সবাই চেয়ে চেয়ে দেখত, তা সে তো চোগা-চাপকান প'রে বেরুলেও দেখে। দেখুক। কত দেখবে? যাই হোক, যা বলছিলাম বলি।

পয়লা মার্চ শেফারের মস্ত হলে হরিদাস বক্তৃতা দিল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে। বড় সুন্দর বলল। তাকে আমি বললাম তার বক্তৃতার সার-মর্ম আমাকে দিতে, আমার ভ্রমণ-কাহিনীতে জুড়ে দেব। সজ্জন হরিদাস বলল হাসিমুখে: তথাস্তু। শুধু বলা নয়, করা। পাঠানো। লিখে দিই আগে সেটুকু—কার না ভালো লাগবে এমন সুন্দর ভাষা, এমন পণ্ডিতের লেখনীজাত? অবশ্য এ-সারমর্মটুকু ওর ইংরাজি বক্তৃতার তর্জমা।

হরিদাস বলল: "আমি আজ আপনাদের কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু বলব। যোগ সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এখানে অনেকেরই নানা রকম অদ্ভুত ধারণা আছে। যোগ বলতে অনেকেই এখানে মনে করেন ম্যাজিক জাতীয় কিছু, অথবা অলৌকিক কোনো শক্তিপ্রদর্শন, যেমন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, অথবা কাচের টুকরো খাওয়া, অথবা পদ্মাসনে বসে শূন্যের উপর উঠা, ইত্যাদি। কিন্তু এ যে কতবড় ভুল তা' হিন্দুদর্শনের যে' কোনো ভাল বই পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন। "যোগ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুইটি: Union এবং control, সংযোগ এবং সংযম। সুতরাং যোগ কথাটির নিহিতার্থ হ'ল আত্মসংযম, অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সচেতন সংযোগ, অসীমের সঙ্গে সসীমের সংযোগ, শিবের সঙ্গে শক্তির সংযোগ, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ। এই সংযোগের ফলে আসে চিত্তের সমতা ও বুদ্ধির সমদর্শিতা, যা' নাকি পরম জ্ঞানের লক্ষণ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে "Intyvation of personality," অর্থাৎ মানুষের মনের ও সত্তার সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস আত্মবিকাশ, যোগ সেইরূপ আত্মবিকাশের প্রণালী ও উপায়ের নির্দেশ দেয়।

হিন্দুদর্শন বলতে অনেকে মনে করেন অবাস্তব কল্পনাবিলাস ও কর্ম-বিমুখতা। এ ধারণা যে কতবড় ভ্রান্তি তা' আপনারা বুঝতে পারবেন যদি হিন্দুধর্মের বাইবেল স্বরূপ "গীতা" পাঠ করেন। গীতার মূলমন্ত্র হ'ল কর্ম, ভাগবত কর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের ভিত্তিতে দিব্যছন্দে লীলায়িত কর্ম। আমেরিকা কর্মে বিশ্বাস করে, তাই কর্মের নেশায় মেতে উঠেছে। কিন্তু কর্ম যখন শুধু কামনা ও ভোগলিপ্সায় পরিপুষ্ট হয় তখন তা' বন্ধনের কারণ হয়, সমাজে অশান্তি আনে, অন্তরের শূন্যতা ও হাহাকার বাড়িয়ে তুলে। কর্মযোগ হ'ল জ্ঞাননিষ্ঠ, নিষ্কাম কর্মের গুহ্যরহস্য, যা' অন্তর ভরে দেয় ভাগবত-সম্পদে এবং সমাজ-জীবন শান্তি, প্রেম ও সুষমায় সমুজ্জ্বল করে তোলে। নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী গীতার এই কর্মযোগ থেকেই নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আর বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ গীতার শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জগতকে শিখিয়েছেন—কী করে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব এবং কী করে এই সমন্বয়ের মধ্যেই পৃথিবীতে ভাগবত-জীবন রচনার চাবিকাঠি নিহিত আছে। আমার পরবর্তী বক্তৃতায় আমি এই সমন্বয়ের মূল ধারাটি আলোচনা করবো।

খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ আমাদের মধ্যে ভারতের দুইজন খ্যাতনামা কবি ও মনীষী উপস্থিত আছেন—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। আপনাদের যা প্রশ্ন আছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দিলীপকুমার দুটো ভক্তিমূলক গান গাইবেন এবং ইন্দিরা দেবী গুরু নানকের মূল গ্রন্থ থেকে আপনাদের কিছু পড়ে শুনাবেন। আগামী রবিবার রাত্রি ৮টার সময় তাঁরা এখানে একটি কন্সার্ট দেবেন।"

তারপর ইন্দিরা পাঠ করল গুরু নানকের বাণী গুরুগ্রন্থ থেকে। শ্রোতৃবৃন্দ তাকে যে ধন্যবাদ দিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতার আমেজ পেয়ে মন খুশি হ'য়ে উঠল। পরিশেষে আমি গাইলাম একটি মীরা ভজন —পিয়ানো বাজিয়ে।

গান সারা হ'লে ভোজন সুরু হ'ল। শেফার সাহেব পরম অমায়িক। বীণার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে তাকে সাহায্য করা সুরু করলেন। বললেন যে তাঁর এখন বৃহৎ পরিবার, ভাই হরিদাস, বৌমা বীণা, দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী। বড় সদাশয় মানুষটি। হরিদাস বিদেশে এমন বন্ধু পেয়েছে যাঁর মধ্যে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে—অর্থাৎ শেফারের হৃদয়ের মণি ও কোষাগারের কাঞ্চন। নৈলে এ দারুণ আক্রাগণ্ডার দেশে হরিদাস সপরিবারে এমন সুখে বাস করতে পারত কি না সন্দেহ। তবে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়" বলে না? হরিদাস বিদ্বান্ সজ্জন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাগ্য কাঁধ মেলালে যা হয় তারই তো নাম সোনায় সোহাগা। ইন্দিরা শেফারের স্বভাবে মুগ্ধ হ'য়ে বলল তাঁকে: "জানেন—আমি দাদাকে একবার বলেছিলাম যে শেফার ভাগ্যবান্ যে হরিদাসের মতন ভাই পেয়েছেন। কিন্তু এখন ঠিক করতে পারছি না—হরিদাস আরো বেশি ভাগ্যবান্ কিনা এমন দাদা পেয়ে।" তবে আমার মনে হয় ভাগ্য বেশি প্রসন্ন হরিদাসেরই। কারণ বিদেশে এমন বিদ্বান্ মনস্বী তথা ধনী বন্ধুর শুধু স্নেহস্পর্শই নয় প্রত্যক্ষ আতিথেয়তা পাওয়া! তবে একটা কথা আছে: "It is more blessed to give than to receive." এখানে দুজনের মধ্যে কে বেশি দিচ্ছে? এ-প্রশ্ন ক'রেই আজ ক্ষান্ত হই, সমাধানের ভার চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকার উপর ন্যস্ত ক'রে।

রাতে হোটেলে ফিরে মনে এক বিচিত্র ভাবোদয় হ'ল। কালাতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনসংগ্রাম জটিলতর হ'য়ে আসছে—হয়ত নানা বিষয়ে নৈতিকতার শিথিলতা তথা ভ্রষ্টাচারও বাড়ছে। কিন্তু—মনে হ'ল—এদিক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে এটা যদি মেনেও নিই, তাহ'লেও কি বলা চলে না যে অন্য একদিকে লাভের কোঠায়ও কিছু অন্তত জমা হচ্ছে: অর্থাৎ মানুষ নানা বাহ্য ব্যবধানকে ডিঙিয়ে আন্তর-মৈত্রীর অঙ্গনে পরস্পরের কাছে আসছে? শেফার মহৎ মানুষ, হরিদাসও অতি সজ্জন। কিন্তু আগেকার যুগে এ-ধরণের দুটি বিদেশী কি এভাবে ঘরকন্না করতে পারত শুধু প্রীতি ও স্নেহের মূলধনে?

* * *

কনসাল ল্সেন সাহেব টেলিফোন করলেন, প্রেস কনফারেন্স হবে আমাদের কেন্দ্র ক'রে। জনশ্রুতিতে শোনা ছিল প্রেস-কনফারেন্স মানে হচ্ছে—সাদা বাংলায়—প্রেস প্রতিনিধিদের হাজারো রোমহর্ষক প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কাজেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম বৈকি, আজো এই জন্যে যে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে না গিয়ে আমেরিকায় এসে বহু আমেরিকানদের ইংরাজি উচ্চারণ শুনতে শুনতে খেদ বাড়ে—বনমর্মরের বাণী অন্তত এর চেয়ে বেশি বোধগম্য হ'ত। যাহোক স্বয়ং সাহেব-পুরাণে যখন বলেছে "যা বুনবে তেমনি ফসল ফলবে" তখন নিরুপায়। ভরসা ছিল ইন্দিরার শ্রুতি তীক্ষ্ণ—প্রাণ যদি বা যায়, মানটা হয়ত টায় টায় বেঁচে যাবে। ফলেন পরিচীয়তে।

গভর্মেণ্টের প্রতিনিধি হ'য়ে প্রেস কনফারেন্সের জমিতে আমার কথামৃতের বীজবপনের ফসল ফলন বৈকি—যার নাম পাবলিসিটি। কিন্তু সেকথা যথাকালে। উপস্থিত, কনসালের ওখানে যেতে না যেতে এল সশরীরে তিন তিনটি প্রেস রিপোর্টার। শুনলাম week-day ব'লে পার পেলাম, নইলে হাজিরি দিত আধাডজন।

ওদের একজন এসেই ফ্লাশ লাইটে নিল আমাদের উভয়ের ফটো। আমি চোগা চাপকান প'রে, ইন্দিরা শাড়ি। তারপর শুরু হ'ল প্রশ্নের তীর-রাজি। তখন ভাগ্যকে ধিক্কার দেব, না ধন্যবাদ দেব ভেবে পেলাম না—যেহেতু তাদের প্রশ্নের আধাআধি আমার কানেই ঢুকল কিন্তু মরমের নাগাল পেল না। যাহোক ইন্দিরা এগিয়ে এল অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে। আমাকেও কিছু বলতে হ'ল বৈকি। যোগ কী বস্তু, আশ্রম-বাসের অর্থ কী, আমেরিকা কেমন লাগছে, স্পিরিচুয়ালিটি বলতে কী বোঝায়—আরও কত কী সাত সতের। যা পারি বললাম। যথাকালে কাগজে বেরুল আমাদের ছবি সমেত—উপরে জাজ্জ্বল্যমান শিরোনামা মোটা হরফে "YOGA EXPONENTS TO TEACH, GIVE CONCERT" তার পরে ক্ষুদ্রতর মোটা হরফে: "Two Pursuers of the 'Inner Light' Here from India."

শিরোনামা দেখে একটু স্তম্ভিত না হ'য়ে উপায় কি? তবে বাকিটুকু প'ড়ে ঈষৎ আশ্বস্ত হওয়া গেল। পেসিমিস্ট বলে তাকে যে বলে—ভালো হ'ত আরো ভালো হ'লে। অপ্টিমিস্টের মন্ত্র: "মন্দের ভালো।" মনকে বোঝালাম: "ভোলা মন, অপ্টিমিস্ট হ'তে বাধা কি? এ হ'ল আমেরিকা—ভাবো ওরা আরো কত কী লিখতে পারত যা লেখে নি, গুরুর কৃপায়ই বলব।" তবে একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করি রসিকদের কাছে রস পরিবেষণ করবার মহদুদ্দেশ্যে। আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের যোগের কী উদ্দেশ্য। আমি বলেছিলাম, যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর ভাষায়, যে শ্রীঅরবিন্দ চান চেতনার রূপান্তর—Transformation of consciousness. চেতনা ওরফে consciousness সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলাম যা লিপিবদ্ধ হ'লে হয়ত অনেকেই ঠাহর পেতনা কী বলছি, কিন্তু এটুকু অন্তত মানত যে কথাগুলি গালভরা, খুড়ি কানভরা। কিন্তু ওরা—(হয়ত এদেশে conscious শব্দটি ওদের কাছে mysticism শব্দটির মতন শ্রুতিকটু লাগে ব'লেই)—রিপোর্টে শুধু লিখল যে আমি বলেছি: "We start by trying to transform ourselves. If we do, then we have enough light to give to others"—তা একথার নিহিতার্থ যাই হোক। হায়রে, এটুকু বলে থামলেও বা কথা ছিল, কিন্তু ওরা লিখল তার পরেই: "Roy has been transforming himself at the Ashram for twenty-four years, Miss Indira, for three."

হা হতোহস্মি বললে হয়ত আমার মনোভাব ব্যক্ত হ'ত, কিন্তু ভেবে দেখলাম যে ওরা সত্যিই নির্দয় হ'তে যায়নি। ঐ যে বললাম, আরো কত কীই তো লিখতে পারত! নিশ্চয় পারত—কিন্তু লেখেনি মানতেই হবে। কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের আবৃত্তি ওদের খুব খারাপ লাগেনি। কারণ মনে হয়, ওরা দরদী হ'তে যেয়েই লিখেছিল আমার বর্ণনা "grey-haired, benevolent-smiling, respectable plumpish man of fifty-six," এবং ইন্দিরার: "Miss Indira Devi, thirty-two, blue-eyed and with the red-spot of the Brahmin on her forehead." এরা এক একটি কথা হঠাৎ বুঝে ফেলে, যথা "ব্রাহ্মণ" বা "আসন"। এর পরেই দেখলাম বিখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহিনের ছবি—তিনি "আসন" শিখেছেন কোন্ এক যোগীর কাছে—জিভ বের ক'রে ব'সে—সত্যি বলছি। আর সে কি সোজা জিভ! শরৎচন্দ্রের রামের সুমতিতে রক্ষাকালীর জিভ—"এই এতো বড়"! তখন ভগবানকে পুনরায় ধন্যবাদ দিলাম: "প্রণমামি কৃপাময়মন্তহীনম্।"

ক্রমশঃ

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মেঘদূতের গোড়াতে যেমন যক্ষ বৎসরের তরে নির্বাসনকালে কান্তা-বিরহে অস্থির হ'য়ে (জড়বস্তু হলেও) সর্ব্বত্রগতিশীল মেঘকে (১লা আষাঢ়) গিরিসানুদেশে উদিত হ'তে দেখে সখাভাবে আহ্বান ক'রে অলকায় পত্নীর সংবাদ বহন ক'রে আনতে বলচেন, তেমনি রামও রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর পত্নীবিরহে সমীরণকে উল্লেখ ক'রে বলচেন (লঙ্কাকাণ্ড, ৫ সর্গ, ৫৬ শ্লোক):

> ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখংহৃতেতিচ
> এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যাহ্যতিবর্ত্ততে॥
> বাহিবাতযতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপিস্পৃশ
> ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টি সমাগমঃ॥

—প্রিয়া যে দূরে আছেন বা অপহৃতা তার জন্যে দুঃখ নেই; কিন্তু রাবণ যে মাস দুই সময় দিয়েছে সীতাকে, তার জন্যে যে অবশিষ্ট জীবনকাল তার অতীত হচ্চে তারই জন্য শোক। সমীরণ! জানকী যেখানে আছেন ত্বরায় যাও—তাঁর অঙ্গস্পর্শ ক'রে এসে আমার অঙ্গস্পর্শ কর।

মেঘদূতেও ঠিক এই ভাবেই (পূর্ব্বমেঘ ৪র্থ শ্লোকে) আছে:

> প্রত্যাসন্ন নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
> জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তম।

কেবল তফাৎ এই—বায়ুর স্থলে মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে নিবেদন করচেন কুটজকুসুমের অর্ঘ্যরচনা ক'রে বেশ একটু আড়ম্বর ক'রে। যক্ষেরও যেমন অকালে প্রিয়ার মরণভয় দেখা দিয়েছে—রামেরও ঠিক তাই।

মেঘদূতে কবিকালিদাস যেরূপ যক্ষের মুখে মেঘকে যাবার পথে নানা দৃশ্যের বর্ণনা ক'রে দেখিয়েছেন, তেমনি রামও লঙ্কাজয়ের পর রথে সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার কালে (লঙ্কাকাণ্ডের ১২৫ সর্গে) গগনপথে রথে যাবার সময় পথের স্থান ও দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করেছেন। মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘ, ৫৮ শ্লোকে) যে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের রন্ধ্রপথের কথা পাওয়া যায়, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪৩ সর্গে ২৫ শ্লোকেও তার উল্লেখ আছে। রামায়ণে (সুন্দরকাণ্ড ৩৪ সর্গ। ২১ শ্লোকে) সীতা বলচেন;—স্বপনেও যদি রামকে দেখতে পাই।' আর (উত্তর মেঘে ৩৬ শ্লোকে) মেঘদূতে আছে—যক্ষ বলচেন—"স্বপনেও যদি প্রিয়া আমাকে ক্ষণকালের জন্যে ভুজবন্ধনে পান।" মেঘদূতে যক্ষ বলচেন—"শাপ অবসানে বীতশোক হয়ে কান্তার বেণীসংস্কার নিজ হাতে করব" (উত্তর-মেঘ ৩১ শ্লোক); ঠিক এই ভাবেই রামায়ণে আছে: সরমা সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়ে বলচেন:—(লঙ্কাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ, ৩২ শ্লোক) "সীতা, তুমি যে কয়েক মাস জঘনবিলম্বিত এক বেণী ধারণ করেছ, মহাবল রাম তা' শীঘ্রই নিজ হস্তে মোচন করবেন।" মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘে ৬৪ শ্লোকের গোড়ায় যেমন—কৈলাস অঙ্কে প্রেয়সী গঙ্গা বিলোলবাসে ঝরে পড়ার বিষয় উল্লেখ আছে;—(তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গা দুকূলাং) তেমনি উপমার ছলে রামায়ণে (সুন্দরকাণ্ড, ১৪ সর্গ, ২৯ শ্লোকে) আছে;

> অঙ্কাদিবসমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাংপ্রিয়াম্
> জলেনিপতিতাত্রেশ্বপাদপৈরুপশোভিতাম্॥

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, ১৬ সর্গে আছে রাবণ কৈলাসগিরি উঠিয়েছিলেন এবং উত্তরকাণ্ডে ২১ সর্গে ১৬ শ্লোকে আছে;

> প্রপাতপতিতৈশীতৈ
> সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ।

এই দুই ব্যাপার মেঘদূতের (পূর্ব্বমেঘ, ৫৯ শ্লোকে) আছে:

> গত্বা চোর্দ্ধ্বংদশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
> কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃস্যা।

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্যস্থিত খং
রাশীভূত প্রতিদিনমিবত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥

অনন্তর ঊর্দ্ধে উঠে রাবণের বাহুপাশে শ্লথ সানুসন্ধি যেখানে বিশ্লিষ্ট হয়েছে এবং যাহা অমররমণীর দর্পণস্বরূপ (হ্রদযুক্ত) সেই কৈলাস-পর্ব্বতের অতিথি হও।

কুমুদ-ধবল এই পর্ব্বত তুঙ্গশৃঙ্গযুক্ত গগন ব্যাপিয়া অবস্থিত। দেখলে মনে হয় মহাদেবের প্রতিদিনের অট্টহাস্য যেন রাশীভূত করা হয়েছে।

রামায়ণের উক্ত শ্লোকটিতেই আছে, রাবণ কৈলাস শৈল উর্দ্ধে উঠিয়ে ধরার ফলে পার্ব্বতী চঞ্চলা হয়ে শংকরকে আলিঙ্গন করলেন্। মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘের ২২শ্লোকে) আছে:

ত্বমাসাদ্যস্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥

—গুরু গরজন শুনিয়া তোমার
সহচরী যবে শিহরি ডরি
চমকি বাঁধিবে আলিঙ্গনেতে···ইত্যাদি।

কালিদাসের মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘের ৬১ শ্লোকের সঙ্গে এইভাবে বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ২৮ সর্গের ২ এবং ৪ শ্লোকের তুলনা করা যায়। যথাঃ

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনাদত্তহস্তা
ক্রীড়া শৈলে যদি চ বিচরেৎ পদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গী ভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জ্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণয়াগ্রযায়ী ॥

—মহাদেব ক্রীড়া শৈলে ভুজগবলয় ত্যাগ ক'রে গৌরীর হাত ধ'রে পদচারণা করলে তুমি আগে আগে যাবে এবং নিজ অন্তরস্থ জলস্তম্ভন দ্বারা ঘনীভূত হলে পর্ব্ব রচনা করে মনিপৈঠা তৈরী করলে পার্ব্বতী সুখে উঠে যাবেন।

রামায়ণেও ঠিক এইভাবে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৮ সর্গ, ২-৪ শ্লোকে) আছে;—

অয়ং সকালঃ সংপ্রাপ্ত সময়োঽদ্যজলাগমঃ
সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ ॥
শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘ সোপান পংক্তিভিঃ
কুটজর্জ্জুনমালাভিরলংকর্ত্তুং দিবাকরঃ।

—দেখ, বর্ষাকাল আরম্ভ হয়েছে; পর্বততুল্য মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন।··· এই মেঘের সোপান পঙক্তি দিয়ে আকাশে উঠে কুটজঅর্জুনপুষ্পের মালায় সূর্য্যকে অলংকৃত করা যেতে পারে! (কুটজ কুসুমে মেঘকে যক্ষ যে অর্চ্চনা করেচেন, তারও ইঙ্গিত এতে পাওয়া গেল।)

মেঘদূতের উল্লিখিত শ্লোকে যে শম্ভুর লীলাগিরির কথা আছে, তার বিষয়ও বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে (১৬ সর্গ, ১০ শ্লোকে) আছে: নন্দী বলচেন:

নিবর্তস্বদশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শংকরঃ
সর্পনাগরক্ষাণাং দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্ ॥

—দশগ্রীব! ফিরে যাও, এই পর্বত শংকরের লীলাভূমি। এইস্থান পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব বা রাক্ষসেরও অগম্য।

বাল্মীকি-রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে (১৫ সর্গে ১৫ শ্লোকে) আছে:

সৌবর্ণৈ-রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাক্ষিতা ইবাভন্তিগজাঃ পরমভক্তিভি।

—সুবর্ণ, রজত ও তাম্র থাকায় কাঞ্চনময় পর্বত হস্তীর মত শোভা পাচ্ছে।

মেঘদূতে আছে:

রেবা দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা।
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমাঙ্গগজস্য ॥

—রেবা নদী অসমান উপলে পতিত হয়ে বিন্ধ্যপাদদেশে বিস্তৃত হচ্চে। দেখে মনে হয় যেন গজ অঙ্গে বিভূতির চিত্র রচনা।

প্রত্যেক জাতি বা দেশের কাব্যকলা বা শিল্পকলা সে দেশের প্রাচীন কবিদের এবং প্রাচীন শিল্পীদের ঐতিহ্যের উপর (Tradition) যে নির্ভর করে তা' এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয়।

নাটকীয় ভঙ্গীর প্রয়োগ (Dramatic action) রামায়ণের বহু স্থানে আছে। তার সকল বিবরণ দেওয়া সাধ্য নয়। যেমন রাবণের বর্ণনায় (সুন্দরকাণ্ডে, ১৮ সর্গে) আছে:

গন্ধ দীপে উদ্ভাসিত পথে
পত্নীগণে লয়ে আগে আগে
অচিন্ত্য প্রবল দশানন
এসেছেন দ্বারদেশে;
কন্দর্প বিদগ্ধ শরে
কাম দর্পে কন্দর্পেরই মত
পানেতে বিহ্বল তাম্রবর্ণ নিদ্রালস আঁখি;
অঙ্গে শোভে অমৃত ফেনার তুল্য
বসন,—বিমুক্ত,
অঙ্গদে সংলগ্ন
বার বার করিছে মোচন।

বৃক্ষ, জনপদ প্রভৃতি তথ্য

কাব্যের কথা বাদ দিলেও তৎকালের ভারতবর্ষের বহু তথ্য রামায়ণে নিহিত আছে।

প্রাচীনকালের নগর ও জনপদের বিষয় (বালকাণ্ড ৩২ সর্গে) আছে; কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্মারণ্য, বিদিশা, গিরিব্রজ প্রভৃতির কথা। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৪১ সর্গে) আছে,—কলিঙ্গ, কোশল, দশার্ণ, পুণ্ড্র, কেরল, মলয়, পাণ্ড্য প্রভৃতি প্রদেশের কথা। তা ছাড়া, নদীর মধ্যে সরযূ, গঙ্গা, মন্দাকিনী, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী, গোমতী, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি বহু নদীর পরিচয় পাই। রামায়ণে সীতা অন্বেষণ কালে (কিষ্কিন্ধ্যা-

কাণ্ডে ৩০ সর্গে) ভারতের বাইরের সপ্তরাজ্যশোভিত যবদ্বীপ, সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বীপে যাবার কথা আছে। ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিস্থিতির কতকটা পরিচয় যে তখনকার লোকেরা জানতেন না তা নয়। নতুবা রাম অযোধ্যা থেকে লঙ্কা দ্বীপেই বা পৌছলেন কি করে? অযোধ্যা-কাণ্ডের ত্র্যাশীতিতম সর্গে নগরের বণিক, তন্তুবায়, কর্মকার, ময়ূরক (ময়ূর পুচ্ছের ছত্র বা পাখা যারা তৈরী করত), ক্রাকচিক (করাতি), বেধকার, রোচক (কাচাদি যারা তৈরী করত), গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডক, রজক, তুন্নবায় (ধুনুরী বা দর্জি) এবং নট প্রভৃতির বিবরণ আছে।

রামায়ণে সন্ধান করলে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা প্রকার পশুপক্ষী এবং বৃক্ষাদির নাম, বাদ্যযন্ত্র এবং তৈজসপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ুসুত হনুমান (সুন্দরকাণ্ড ৯ সর্গে) রাক্ষসেন্দ্র রাবণ নিবাসে চতুর্দ্দন্ত, ত্রিদন্ত হস্তী দেখেছিলেন। প্রাগঐতিহাসিক অধুনা আবিষ্কৃত Mamoth Elephant এর কথা স্মরণ হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে (সুন্দরকাণ্ডের ১০ম সর্গে) পটহ, ত্রিতন্ত্রী, বীণা, বিপঞ্চি, মৃদঙ্গ, মুরজ, পণব, আড়ম্বর, ডিণ্ডিমা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে একটি তরুলতাদির বিবরণ যেখানে যেখানে বিশেষ ভাবে দেওয়া আছে তার উদাহরণ দিচ্চি।

অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গে (৩-৪ শ্লোকে) আছে—

> জম্বুপিয়ালপনসা ন্যগ্রোধপ্লক্ষতিন্দুকাঃ।
> অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ॥
> ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ।
> নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
> অগ্নিমুখ্যো অশোকাশ্চ সুরক্ত পরিভদ্রকাঃ॥

অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গে (২৩-২৪ শ্লোকে) আছে :

> তিলকৈর্বীজপূরৈশ্চবটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
> পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ॥
> মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা
> অশকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ
> অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈরপ্রমদামিবভূষিতাম।

অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্বর্ণতিতম সর্গে (৮-৯ শ্লোকে) আছে, রাম চিত্রকূটের শোভা সীতাকে দেখাচ্চেন এবং বৃক্ষের বর্ণনা করচেন :

> আম্রজম্বসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
> অঙ্কোটৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ
> কশ্মর্য্যরিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
> বদর্য্যামলকৈর্ণীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ॥

এইরূপ অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গে (১৬-১৭ শ্লোকে) পঞ্চবটী বনের বর্ণনায় আছে—

> চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ
> পুষ্পগুল্মলতোপেতৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ॥
> স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি
> ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমীকিং শুকপাটলৈঃ॥

এইপ্রকার বৃক্ষলতার বর্ণনা আরো বহুস্থানে রামায়ণে আছে। লঙ্কাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে (৭২-৭৩ শ্লোকে এবং ৭৮-৮১ শ্লোকে); উত্তরকাণ্ডে ৫২ সর্গে (২-৭ শ্লোকে) তরুলতার নাম বহু পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ১২ সর্গে ৪০ শ্লোকে 'গজপুষ্পীলতা'র নাম আছে এবং অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গে রাবণ যখন সীতাহরণে মারীচের কাছে সাগর পার হয়ে লঙ্কা থেকে যাচ্চেন তখন তাঁর পথ-বর্ণনায় কদলী, নারিকেল এবং মরীচ (গোলমরিচ) গুল্মের কথা পাওয়া যায়! নারিকেলের বিষয় সুন্দরকাণ্ডে ১ম সর্গে ২০৩ শ্লোকেও আছে।

অনেকের ধারণা গৃহস্থের ঘরে কুকুর পোষা আমরা উরোপীয়দের কাছে প্রথম শিক্ষা করেচি উনবিংশশতাব্দীতে; কিন্তু তা ঠিক নয়। অযোধ্যাকাণ্ডে (সপ্ততিতম সর্গে) আছে, মাতামহের বাড়ী থেকে ভরত অযোধ্যায় ফিরে যাবার কালে মাতুল তাঁকে ব্যাঘ্রসদৃশ বলবান করালদশন কুকুর অন্যান্য উপহারের সামগ্রীর সঙ্গে দিয়েছিলেন।

উত্তরকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড যে প্রক্ষিপ্ত এবং বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমেই গ্রন্থারম্ভে নারদ সংক্ষেপে বাল্মীকিকে যে রামায়ণ কাহিনী শোনালেন তাতে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত কোনো কাহিনীই সন্নিবেশিত হয় নি। লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তিতে যেরূপ বর্ণিত আছে আদিকাণ্ডের ১ সর্গ ৬-৮৯ শ্লোকেও তাই আছে।

সীতাকে দ্বিতীয়বার উত্তরকাণ্ডে অযোধ্যার প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থে নিষ্পাপা প্রমাণ করার জন্য উদ্যোগ থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধযুগে বর্ণসঙ্করের সূত্রপাত হওয়ায় তখনকার কালের বিশেষ একটি মনোভাব নিয়েই রামায়ণে এই উত্তরকাণ্ড জুড়ে দেওয়া হয়েচে। বাল্মীকির সময়ে এই অংশ লেখা হয় নি। উত্তরকাণ্ডে (৬৩ সর্গ, ২০ শ্লোকে) আছে—

> 'উৎপৎস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদুনা কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ
> —বাসুদেব ইতি খ্যাত বিষ্ণু পুরুষ বিগ্রহঃ।'

...যদুবংশ এবং বাসুদেব নামে বিষ্ণু জন্মাবার কথা থেকে পরবর্ত্তীকালের মহাভারতের কথাই মনে আসে। উত্তরকাণ্ডের বৌদ্ধযুগপ্রভাবের কথা আরো বোঝা যায়, মূল রামায়ণে যে-সকল জনপদের উল্লেখ আছে তার পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে তার কোনোই অস্তিত্ব ছিল না দু একটি ছাড়া। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে যে প্রক্ষিপ্ত এবং বৌদ্ধযুগে কোনো সময়ে লিখিত তার প্রমাণ 'শ্রাবস্তি' 'প্রতিষ্ঠানপুর' গান্ধার, তক্ষশীলা, পুষ্কলাবতী প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের জনপদের উল্লেখ থাকায় আরো ভালরূপে পাওয়া যায়। 'মধুপুর' বা 'মথুরা' বৌদ্ধযুগের একটি বিশেষ জনপদ; উত্তরকাণ্ডে (৮৩ সর্গ ৫ শ্লোকে) এর উল্লেখ আছে; কিন্তু মূল রামায়ণে কোথাও তার উল্লেখ নেই। রামায়ণ প্রথমে লোকমুখে প্রচলিত ছিল এবং লিপি প্রচলিত হবার পর কৌশাম্বীতে রাজা উদয়নের দ্বারা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।

তখন বৌদ্ধযুগ আরম্ভ হয়েছে। বুদ্ধ নিজে কৌশাম্বীতে ধর্মপ্রচার করেছেন সেই সময়। আদিকাণ্ডে (৪র্থ সর্গে ২য় শ্লোকে) আছে—

"তথা সর্গশতান পঞ্চষটকাণ্ডানি তথোত্তরম।"

এই 'তথোত্তরম' কথাতেই খটকা লাগে এবং প্রমাণ হয় উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। তা ছাড়া উত্তরকাণ্ডের ১২৪ সর্গের প্রথম শ্লোকেই এইভাবে গোঁজামিল দিয়ে লেখা আছে: 'এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।' বালীদ্বীপ এবং কাম্বোজে যে রামায়ণ প্রচলিত আছে তাতে উত্তরকাণ্ড নেই। এ-থেকেও উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে বেশ বোঝা যায়।

রামায়ণের প্রাদেশিক সংস্করণ

পরিশেষে উত্তর প্রদেশের তুলসীদাস এবং বাঙলাদেশের কৃত্তিবাসের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল কবি রামায়ণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচনা করেছেন তার যথাসম্ভব একটা পরিচয় দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

যবদ্বীপ, খোটান, তীব্বত, কাম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও রামায়ণ গিয়েছিল। আজও যবদ্বীপে রামায়ণের ছায়াছবির (Shadow show) পুতুলনাচ দেখানোর এবং রামায়ণগান প্রচলিত আছে। বাঙলাদেশের পটুয়ারা বিংশশতাব্দীর গোড়াতেও গ্রামে গ্রামে গুটোনো ছবির সঙ্গে রামায়ণ গান ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করতো। দক্ষিণে মহাত্মা রামানুজম বাল্মীকির মূল রামায়ণের একটি সংস্করণ লেখেন এবং টিকা সংযোগ করেন। গৌড়ীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই গ্রন্থই সকলে সঠিক সংস্করণ বলেন। আমি এই পদ্যানুবাদে রামানুজ সংস্করণ, যা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (বাংলা ১৩১১ সালে) প্রকাশ করেছিলেন তারই অনুসরণ করেছি। মৌলিকভাবে দক্ষিণদেশে রামায়ণ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় দেব।

উৎকল রামায়ণ

উৎকল বা উড়িষ্যা ভাষায় শ্রীসিদ্ধেন্দ্র যোগী রচিত রামায়ণই বিশেষ-ভাবে প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সাধু সিদ্ধেন্দ্র যোগীর আধ্যাত্মিক জীবনে যে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছিল তারই ফলে রামায়ণের অন্তরের গূঢ় আধ্যাত্মরস তাঁর রচনায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তিনি যোগী ছিলেন। ভোগবাসনায় তাঁর মন লিপ্ত না থাকায় যশ, অর্থ বা রাজ্যকে সাধারণ লোকের সামান্য অবস্থা অপেক্ষা বড় বলে মনে করতেন না। সমগ্র উৎকল সাহিত্যের মধ্যে তাই তাঁর রামায়ণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে আজও গণ্য হয়।

তামিল রামায়ণ

নবম শতাব্দীতে 'কাম্বান' নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি তামিল ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণ কাম্বা-রামায়ণ নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ চোলরাজ এবং চের-রাজদের সভাকবি ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে তিনি একটি বিরাট সাহিত্য-সভায় স্বরচিত রামায়ণ অল্প-অল্প পাঠ করেন। সভায় পণ্ডিত-মণ্ডলী প্রীত হ'য়ে কাম্বানকে 'কবিচক্রবর্ত্তী' উপাধি দেন। তাঁর তামিল ভাষার উপর এত অধিকার ছিল যে অন্যান্য তামিল-কবি-তারকাদের মধ্যে তিনি চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করতেন।

তেলেগু রামায়ণ

তেলেগু (বা অন্ধ্র) ভাষায় বহু রামায়ণ আছে। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রামায়ণ 'রঙ্গনাথ-রামায়ণ'—কোনাবুদ্ধ রেড্ডী নামে এক কবির দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই রামায়ণ-কাব্য 'দ্বিপদী' ছন্দে রচিত হয় এবং সঙ্গীতের মত গীত হ'য়ে থাকে। এই কবির কোনো জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নি। গ্রামে গ্রামে আজও 'রঙ্গনাথ-রামায়ণ' সকলে পাঠ করে এবং রামায়ণ বিষয় পুতুলনাচ ও গান হয়।

তেলেগুতে 'ভাস্কর-রামায়ণ' 'মোল্লা-রামায়ণ' নামে আরো দুটি প্রসিদ্ধ রামায়ণ আছে। ভাস্কর-রামায়ণ রচনা করেন কবি শ্রীভাস্কর। এই কাব্যে ভাবরসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ মহাকাব্য শ্রেণীর।

'মোল্লা-রামায়ণের রচয়িতা একটি বিদুষী মহিলা—মোল্লা বা মহানারী—। তিনি কুম্ভকার পরিবারভুক্ত এবং বাল-বিধবা ছিলেন। সারা জীবন আতুর জনের সেবা এবং সাহিত্য চর্চ্চায় তিনি অতিবাহিত করতেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণযুগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা শ্রীকৃষ্ণদেব রাইয়ার রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। জনবাদ আছে, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং সাহিত্য-খ্যাতি-গৌরবে-মুগ্ধ অনেক রাজন্য তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু তিনি 'রামকে পতিত্বে বরণ করেছেন' ব'লে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। এঁকে অন্ধ্র দেশের মীরা বলা যায়। মোল্লা-রামায়ণ পাঠে রচয়িত্রীর আধ্যাত্মতত্ত্ববোধের উজ্জ্বল্য এবং কাব্য-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কানাড়া রামায়ণ

দক্ষিণ ভারতে কানাড়া ভাষায় 'রামচন্দ্র চরিত-পুরাণ' বা 'পম্পা-রামায়ণ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১১০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাগচন্দ্র বা অভিনব পম্পার দ্বারা এই রামায়ণ রচিত হয়। তিনি জৈন ছিলেন এবং বল্লাল-রাজ বিটিদেবের (বা বিষ্ণুবর্দ্ধনের) সভার সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই পম্পা রামায়ণের একটি জৈন সংস্করণ আছে। তাতে বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের বিষয় সমগ্র ভাবে উল্টে পাল্টে লেখা। বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধেই এই রামায়ণ রচিত হয়। রামকে বিষ্ণুর অবতার করা হয়নি এবং লক্ষ্মণকেই রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করে দেখানো হয়েছে এবং লক্ষ্মণই রাবণ বধ করেছেন দেখানো হ'য়েছে। রাক্ষসদের বিদ্যাধর বা খেচর বলা হয়েছে এবং বানরদের মানুষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কানাড়া ভাষায় উল্লেখযোগ্য কুমুদেন্দু রচিত 'কুমুদেন্দু-রামায়ণ (১২৭৫ খৃঃ) শতপদী ছন্দের কাব্য এবং 'রামকথাভত্র্যা'—দেবচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত। ইনি মহীশূর রাজসভার সভাকবি ছিলেন।*

মহারাষ্ট্র বা গুজরাটী ভাষায় রামায়ণী গাথা রচয়িতাদের কোনো বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তুলসীদাস কৃত—'রামচরিত মানস' উত্তর ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং সকলেই পাঠ করেন।

এখন মৎরচিত পদ্যানুবাদের বিষয় নিবেদন করার বিষয় বলে নিবন্ধ শেষ করব। সকলেই স্বীকার করবেন যে বাল্মীকিকৃত সংস্কৃত রামায়ণের বাংলায় পদ্যানুবাদ করায় বিশেষ অসুবিধা আছে দুইটি। প্রথমতঃ বিশেষ করে বিশেষণবহুল বর্ণনার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষায় লঘু গুরু ভাব এবং ওজগুণ থাকায়। এই সংকটে আমি অধুনা প্রচলিত 'অমিল প্রবহমান মুক্তক' ছন্দেরই আশ্রয় নিয়েচি। অবশ্য ছান্দসিক পণ্ডিতদের বলে রাখা ভাল যে আমি ছন্দের বাঁধা পথ মানিনি। যুগ্মশব্দ, হস্ব উচ্চারিত শব্দ নির্ব্বাচন দ্বারা ছন্দের ওজ এবং মাধুরী আনবার চেষ্টা করেচি মাত্র। পদ্যানুবাদের দ্বারা আদি মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত কাব্যে অনুপ্রবেশ করতে হ'লে মূল কাব্যের অর্থ, ভাব ও রসের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এবিষয় মৎপ্রণীত মেঘদূতের পদ্যানুবাদের ভূমিকায় সাহিত্য-রসিক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যা' বলেচেন সেই কথাই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেচেন:

"বাঙলা কবিতায় সংস্কৃতকাব্যের অনুবাদের সাফল্যের পরীক্ষা দুইটি। মূলের সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয়, অনুবাদের কবিতা তার স্মৃতিকে জাগিয়ে আনন্দ দেয় কিনা। এবং মূলের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, অনুবাদ প'ড়ে সে কাব্য-পাঠের আনন্দ পায় কিনা।"

অতুলবাবুর উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেচি কিনা এই সংস্কৃত মহাকাব্যের পদ্যানুবাদে তা গুণীজনই বলতে পারেন। একটা কথা আরো বলা প্রয়োজন বোধ করি যে আমার রামায়ণীতে মূল রামায়ণের বহু শ্লোক বাদ দিয়ে সংক্ষেপ আকারে অনুবাদ করতে হয়েচে। কেন না অতিরিক্ত বর্ণনা এবং একই প্রকারের তুলনা উপমার বাহুল্য আধুনিক কালের উপযোগী নয়।

পরিশেষে কোনো প্রাচীন কবির একটি প্রচলিত শ্লোক অবলম্বন ক'রে আদি কবি বাল্মীকি মহামুণিকে বন্দনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করি।

সদূষণাপিনির্দোষা স খরাপিসুকোমলা।
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন রম্যা রামায়ণী কথা॥
খর আছে তবু যাহা রহে সুকোমল
দূষণ থাকিতে দোষ না ঘটেছে যার।
হেন রামায়ণী কথা রম্য সুবিমল
যাঁহার রচনা তাঁরে করি নমস্কার।

* দক্ষিণ ভারতের রামায়ণ রচয়িতাদের বিবরণ অন্ধ্রদেশবাসী বন্ধু শ্রীসঞ্জিব দেব সংগ্রহ করে দেন ; তার জন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী আছি।

প্রতীক্ষা

দীপা সান্যাল

বন্ধু তোমার আশাহত চোখে
আজো কি কামনা জাগে—
আজো কি আশায় বেঁধে আছ তব বুক ;
নয়নে কি তব আজিও তেমনি
মায়া অঞ্জন লাগে—
নূতন নেশায় আজো বুঝি উৎসুক !
বন্ধু কেবলি ভুল—
এ শুধু স্বপ্ন, মরুভূর বুকে
কখনো কি ফোটে ফুল !
বন্ধু আজিকে চাঁদের মায়ায়
চাহিয়ো না দূর নভে,

সেদিনের চাঁদ গেছে আজ দূরে সরে,
বন্ধু সে সব ব্যর্থ হয়েছে,
ব্যর্থ হয়েছে কবে—
আলো নাই আজ, কলঙ্কটুকু
দিয়ে গেছে বুক ভরে।
বন্ধু কেবলি ভুল,
সমুখে তোমার অন্ধ সাগর—
হারায়েছো দুটি কুল !
বন্ধু গো শোনো শোনো ;
নূতন যুগের যাত্রী আসিছে
তারই লাগি দিন গোনো

দেওয়ালীর পুতুল

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ

শুধু আলো আর আলো।······সমস্ত শহর আলোয় হয়ে উঠেছিল আলোকিত, ছাদে ছাদে, বারান্দায় বারান্দায়, আলমারির তাকে সব জায়গায় আর কিছু হোক না হোক অন্ততঃ জ্বলছিল এক একটা মাটীর প্রদীপ······আলোর উপরে আলো পড়ে বাড়ীগুলোর ছায়া পড়ছিল না কোথাও।

বড়লোকদের বাড়ীর ছাদে ছাদে চিক্‌মিক্ করে জ্বলছিল কত রংয়ের বৈদ্যুতিক ছোট ছোট বাল্বগুলো, মনে হচ্ছিল বুঝি নানা রঙ্গের আসল চুণি পান্না রয়েছে দেয়ালের গায়ে একের পর এক গাঁথা······

চারিদিকে অপার আনন্দ, অফুরন্ত হাসি···কোথাও বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটা একটা করে প্রদীপ-গুলো সাজাতে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে তাদের মা কি দিদিমা আগুন থেকে সাবধান করে দিচ্ছে তাদের—"দেখিস রে পুড়ে মরিস্ না" তারা শুধু একবার ছোট্ট একটি 'না' বলে সমস্ত বাড়ী কোলাহল-মুখরিত করে সাজাচ্ছে প্রদীপ রাশি। পথের ধারে বসেছে কত রকম খেলনা পুতুলের কত রকম দোকান···সেখানে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলনা কিনতে ব্যস্ত। কেউ বা এটা চাই ওটা চাই বলে ক'রে তুলছে তার মাকে কি বাবাকে ব্যতিব্যস্ত; কেউ বা কোন খেলনা মনের মত হয়নি বলে জুড়ে দিয়েছে কান্না, মা বেচারী তাই থামাতে ব্যস্ত।···কেবল ভীড়···

সবার মুখেই হাসি আনন্দের ছায়া উঠেছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে। মনে হচ্ছিল বুঝি এ পৃথিবীতে এখন আর নেই কোন রকম জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণা; আছে কেবল বিপুল সুখ-আনন্দের কোমল শিহরণ·· নানা রংএর আলো করে তুলেছিল সমস্ত সহরটাকে মনোহর।

কেবল আলো ছিল না, আনন্দ ছিল না, শহরের একটি নোংরা সংকীর্ণ গলির একটি ভগ্ন জীর্ণ বাড়ির একখানি ঘরে।

ঘরটা ছোট্ট। মাঝখানে ফুট দুয়েক জায়গা ছেড়ে সেই ছোট ঘরটার দুপাশে পড়েছিল দুটো ভাঙ্গা খাট। আর একটা খাটে অনেক দিনকার বহু পুরাতন ছেঁড়া কম্বল ও কয়েক টুক্‌রো কাপড় ঢাকা দিয়ে পড়েছিল একটি ছোট্ট সাত কি আট বছরের মেয়ে। সমস্ত দেহে ছিলনা তার একটুও মাংস, হাড়গুলো বিশ্রীভাবে ছিল বেরিয়ে। মাথার ছোট ছোট চুলগুলি মাসাবধি তেল জল না পেয়ে বিবর্ণ হ'য়ে জট পাকিয়ে গেছে। মেয়েটি হাঁপাচ্ছিল বিশ্রীভাবে! আর ওধারের উনানের ধোঁয়ায় ঘর গিয়েছিল ভরে।

আর খাটের পায়া ধরে যে আধ-বয়সী লোকটি ছিল দাঁড়িয়ে তাকে দেখলে সত্যিই হয় দয়া। টিম্ টিম্ করে যে প্রদীপটা জ্বলছিল তার ম্লান আলোর একটা অস্পষ্ট আভা এসে পড়েছিল তার মলিন বেদনাভরা মুখের উপর। দাড়ি বোধ হয় তার অনেকদিন কামান হয়নি, চুল যে তেল জলের মুখ কদিন দেখেনি সেটা নির্ণয় করতে বোধহয় কোন কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের দরকার। গায়ে তার এক ছোট তুলোর ফতুর্ত্তি, সেটা যে কবে তৈরী করান হয়েছিল ও কার জন্য তৈরী করান হয়েছিল বলা যায় না।

আসলে কোন রংএর কাপড়ে তৈরী সেটা কোন রকমে তাই-ই ঠিক করা যেতে পারে না। পরিধানের কাপড় শতছিন্ন। সেলাই করা ও গাঁট দেওয়া হয়েছে।

হাঁ; কি হয়ে উঠেছিল?···

খাটের ভাঙ্গা বাঁশের উপর একটা হাতের ভর দিয়ে, স্নেহময় অথচ কাতর দৃষ্টি তার মেয়ে মুনুয়ার উপর নিবদ্ধ করে যে খাপ ছাড়া ভাবে যাচ্ছিল ভেবে···

হাঁ···আজ ত দুধ দেবার পর্য্যন্ত পয়সা নেই···গয়লা তো আর আজকের দিনে ধারে দুধ কখনই দেবে না—দেওয়ালীতে ধারে যে কোন দোকানদারই জিনিষ বিক্রী করে না···আহা সে ছিল একদিন যখন আমি মাসে পনের

বিশ টাকা রোজগার করতুম, তাই ত রামিয়াকে করেছিলুম বিয়ে···সে ত বেশই আরামে মেয়েটাকে রেখে তাড়াতাড়ি পাত্ তাড়ি গুটোলে···আমাদের ও কাজ এখন করতে রাজী ইংরাজী-জানা বাবুরা, তবে আর আমাদের কে রাখবে সেই মাইনেয় ?···যেখানে যাই সেখানে শুনি 'কোন কাজ তো খালি নেই সীতারাম'···দিনের পর দিন ত এই-ই আস্‌ছি শুনে···এই রকম ভাবে সে ভেবে যাচ্ছিল তার গত জীবনের কত কথা। সে ছিল এক সময় যখন সে এক বড় ব্যারিষ্টারের বাড়ী মাসে পঁচিশ টাকার চাকুরী করত। তখন ছিল তার যৌবন আর তারই নেশায় সে ভালোবেসেছিল রামঅবতার কাহারের মেয়ে রামিয়াকে। এনেও ছিল তাকে অনেক যত্নে নিজের বাড়ীর গৃহিণী করে। তারপর দশমাস পরে যখন সে আলাবক্স গুণ্ডার সঙ্গে হয়েছিল উধাও, তখন তার মনে লেগেছিল এক ভয়ানক ধাক্কা।···

তবে তখন ছিল তার যৌবন তাই সে টাল সামলে নিয়েছিল কোন রকমে। ও শেষে পঞ্চায়েতের পরামর্শে ছেলেবেলাতেই মা-বাবা দিয়েছিল বিবাহ, তবে সে বৌ অল্প বয়সেই মারা যাওয়ায় পঞ্চায়েতের পরামর্শে এ মেয়ের মা-টাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিল। তার পর যখন এক বছরের এক মেয়েকে রেখে তারও ইহলীলা সাঙ্গ হল তখন সীতারাম কাহার মনে মনে ভাবলে যে বিবাহিত জীবনের সুখ তবে তার কপালে যখন নেই-ই তখন মিছামিছি পরের মেয়েকে ঘরে আনা আর ভাল নয়। সেই অবধি সে অনেক যত্নে বহুৎ কষ্টে এই ছয় বছর হল এই মেয়েটাকে মানুষ করছে। সম্প্রতি মাস-খানেক থেকে তারই অসুখ।···

হঠাৎ তার চিন্তা সূত্র ছিন্ন করে ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে মুন্নুয়া বল্লে—'বাবা !'

গলার স্বর যেন তার আটকে যাচ্ছিল ; কোন রকমে অনেক কষ্টে সীতারাম বল্লে—'কী ?'

জড়িত কণ্ঠে অনেক কষ্টে মুন্নুয়া বল্লে 'আজ দেওয়ালী, না বাবা ?'

নিজের স্বরে সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে সীতারাম জবাব দিলে—'হাঁ মা, আজ দেওয়ালী'।

বোধহয় এই শুনে মুন্নুয়ার আনন্দ হলো। আনন্দের এক ম্লান হাসি হেসে সে বললে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে—'আর বছর কত খেলনা এনে দিয়েছিলে না বাবা ?'

লুপ্ত চেতনপ্রায়ের মত সীতারাম বল্লে শুধু—'হাঁ'। অস্পষ্ট সুরে মুন্নুয়া বললে, 'তবে আজ এনে দাও না বাবা আমায় খেলনা।'

চম্‌কে উঠলো সীতারাম। নেই ত তার মেয়েকে এক চামচ দুধ খাওয়াবার একটাও পয়সা, সে খেলনা এনে দেবে কোত্থেকে ? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মুন্নুয়া ক্ষীণ সুরে ফের বল্লে—'আজ খেলনা এনে দাও না বাবা।' সীতারাম নিরুত্তর।···সত্যি সেই কয়েক সেকেণ্ড সেই ছোট্ট ঘরটি যেন ভয়ানক খালি খালি বোধ হচ্ছিল।

মুন্নুয়া অতি কষ্টে আবার বল্লে কম্পিত কণ্ঠে 'এনে দেবেনা খেলনা বাবা ?···তাহলে কিন্তু আমি আজ রাত্তিরেই মরে যাব'

সীতারামের সমস্ত পায়ে যেন কিসের কশাঘাত সজোরে লাগল। সে মুহূর্ত্তের জন্য হয়ে উঠল একেবারে সচেতন। বিজলীর মত খেলেগেল সমস্ত মনে তার এক কিসের শিহরণ ··

সীতারাম মৃদুস্বরে বল্লে, 'তুই একটু শো' মুন্নুয়া আমি এক্ষুণি খেলনা এনে দিচ্ছি।'

এই বলে দেওয়ালের গায়ের এক খুটার গা' থেকে একটা পুরাতন মলিন কাপড় নিয়ে সমস্ত দেহটাকে কোন রকমে শীতের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ঢেকে নিলে, একবার মুন্নুয়ার দিকে বিচলিত নয়নে চেয়ে দেখলে, তারপর সে যে-কয়েকটা পেতলের বাসন ঘরে ছিল, সেগুলোকে একে একে তুলে নিলে।

বাসনের খন্ খন্ শব্দ পেয়ে মুন্নুয়া ক্ষীণ স্বরে বল্লে—'কিসের শব্দ বাবা ?'

অনেক কষ্টে সীতারাম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে,—'খেলনা আনতে যাব কিনা, তাই বাসনগুলোকে এক পাশে তুলে রাখছি।'

বাপের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, মুন্নুয়া একবার একটু কেসে পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে রইল।···

সীতারাম সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ঠক্ ঠক্ করে কাঁপল ; ও পরে মেয়েকে ঘুমুতে দেখে বাসনগুলো আস্তে আস্তে একটা ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে, কোন শব্দ না করে চুপচাপ একেবারে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ অবসাদযুক্ত নিশ্বাস, মনে হল তার এই কথা—'কতদিনকার এ বাসনগুলো আজ বিক্রী করতে হবে ?···গেকৃগে—এই ভেবে সে যেন অল্প সান্ত্বনা পেলে তার মনে—'যদি আমার মুন্নুয়া সেরে ওঠে···

কিন্তু অন্য চিন্তায় পরক্ষণেই সে কেঁপে উঠল—'আর কাল মুন্নুয়াকে দুধ খাওয়াব কি করে ?··যাক্‌গে'···বলে অনেকদিনকার মায়া কাটিয়ে সে সোজা পথে বার হয়ে পড়ল···

চলতে আর সে কোন রকমেই পারছিল না। সমস্ত দেহে যেন এক অনেকদিনকার সঞ্চিত অবসাদ এসে জড় হয়েছিল। পাদুটো যেন মাটির উপর থর থর করে কাঁপছিল ; সে যেন টলে পড়ছিল গলির ধারের বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে।··

যা হোক অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে যখন সে গলির মুখে এসে দাঁড়াল অকস্মাৎ দেখা তার বহু দিনের জানা শীতলের সঙ্গে। শীতল এখন বড় লোকের বাড়ী করছে চাপরাশির কাজ। তাকে দেখে শীতল একটু হকচকিয়ে হয়ে বললে—'বাসন বেচে জুয়ো খেলবে নাকি ?'

সীতারাম কেঁদে ফেললে। কাতর স্বরে অনেক কষ্টে বললে—'আমার কি আর জুয়ো খেলবার অবস্থা আছে ভাই ? এই গুলো বেচে মুন্নুয়ার জন্যে খেলনা কিনতে যাচ্ছি।'

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে শীতল আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বল্লে—'বাসন বিক্রী করে খেলনা কিনবে ?'

একবার ম্লান হাসি হাসলে—তার চেহারা ঠিক যে রকম হয়েছিল সেটা কলমে বোধহয় লেখা যায় না। হেসে বল্লে সে—'মুন্নুয়া যে খেলনা চায়···' তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সমস্ত বলে, হঠাৎ বাসনগুলো ধপ্‌ করে মাটীতে রেখে দিয়ে, শীতলের দুহাত ধরে মিনতির সুরে বল্লে,—'তুমি বাসনগুলো কিনে নেবে শীতল ?'

নাসা-কুঞ্চিত করে শীতল বোধহয় ব্যঙ্গ হাসি হেসে বল্লে—'আমি এখন বাসনগুলো নিয়ে কি করব ?'

সীতারাম অপলক নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে।···

শীতল বল্লে—'বরং একটা দোকানে বিক্রী কর।'

সীতারামের সমস্ত আশার ক্ষীণ আলো শীতলের কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল কোন অন্ধকারের সঙ্গে। একটা ব্যথার নিশ্বাস ফেলে বাসনগুলো ফের তুলে নিয়ে ক্লেদ-ভরা কণ্ঠে সে বল্লে—'কোথায় দোকান আছে দেখিয়ে দেবে ?'

আট-দশ টাকার বাসন যখন দশ আনায় বেচে মুন্নুয়ার খেলনা কিন্‌বার জন্যে দোকানের দিকে পা বাড়াল, তখন শীতল বল্লে—'এক কাজ কর না সীতারাম, মুন্নুয়া তো এখন নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। চল ঐ দশ আনা দিয়ে 'ফট্‌কা' খেলা যাক। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে।'

সীতারামের মনে হঠাৎ যেন কিসের বিপুল আনন্দ হোলো। 'আমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে ?'—সে খাপছাড়া ভাবে ভাবতে লাগল,—'হাঁ তাহলে আমি দুটাকা দিয়ে বৈদ্য ডেকে আনব, গয়লাকে বলব বেশী করে দুধ দিয়ে যেতে—'

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে শীতল বল্লে—'ভাবছ কি চল না।' একরাশ প্রলোভন শুধু···

সীতারাম একবার আপত্তি করলে, 'না আমি যাবো না আমাদের কপালে জুয়োয় জেতা নেই কখন—মাঝখা[ন] থেকে হাতে যা আছে তাও যাবে।'

উৎসাহ দেবার জন্যে শীতল বল্লে—'কপালে আবা[র] নেই ? কার কপালে কি আছে কেউ বলতে পারে [না] কখনও।'

সীতারাম বল্লে—'দশ আনা দিয়ে ত খেলা যায় না।'

আরও উৎসাহিত করবার জন্যে শীতল বল্লে—'খুব যা[য়] চল্‌ না। ভাল করে খেল ব্যস।'

সীতারামও যে প্রলোভনে পড়ল না তা নয়। তা[কে] টেনে নিয়ে গিয়ে শীতল জুয়োর আড্ডায় বস্‌লো।

তারপর এক পয়সা দু পয়সা করে সীতারাম শুধু হারে আর আকাশ-কুসুম দেখিয়ে শীতল বলে—'ব্যস এইবার পয়সা লাগাও, হারলে আমি দশগুণ দেব।'

পয়সার আশায় মেতে উঠে সীতারাম ফের খেল[তে] লাগল।···

দেখতে দেখতে তার হাতে আর একটা পয়সাও র[ইল] না। সীতারাম তখন করুণ সুরে শীতলের দিকে চে[য়ে] বললে—'আমায় এক টাকা ধার দেবে ?'

শীতল নিষ্ঠুর হাসি হেসে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লে,—'বা[:]

বেচে যে জুয়ো খেলে তাকে আবার ধার দেবে, হ্যাঃ, যাঃ, অন্য জায়গায় যা ধার পাবিথ'ন।'

আর কিছু না বলে সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে সেখান থেকে উঠে বাড়ীর গলির দিকে অনেক কষ্টে চল্‌তে লাগল।...

হঠাৎ একটা ল্যাম্প-পোষ্টের ধাক্কা খেয়ে গলির মুখে সে বসে পড়ল ধপ করে।

* * * *

পরদিন সকালে থানায় ভিড় লেগে গিয়েছিল। পুলিসে কোথা থেকে দুটো মৃতদেহ নিয়ে এসেছে: একটা পরিণত বয়স্ক এক ব্যক্তির, অন্যটি শীর্ণকায়া এক বালিকার।

শীতলও সেই ভিড়ে ছিল। সে একেবারে শিউরে উঠল!... সমস্ত শরীরে তার কিসের স্রোত বইতে লাগলো। সে পকেট থেকে সমস্ত পয়সা পথে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—'সীতারাম...আমি...আমি...' স্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া

অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

মনের মর্মমূলে একটি সুর বাজছে—'মনে রেখো'—তাই কতো আয়োজন অতীতকে মনের মধ্যে বেঁধে রাখবার, সঞ্চয় করবার। কিন্তু তবু হারিয়ে যায় অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্ন—মানুষ ভুলে যায়। মনে রাখা, এও যেমন সত্য, ভুলে যাওয়া এও তেমনি সত্য। তাই এই মনে রাখা—ও ভুলে যাওয়া—আমাদের আলোচনার বিষয়।

সাদা কথায় আমাদের সমস্যাগুলি বলা যাক। কোন একটা বিষয় বারে বারে পড়ে বা করে' আমরা সেটা শিখি। অভ্যস্ত বিষয় আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে সঞ্চয় বা সংরক্ষণ (Retention) ঘটে বলেই আমরা পুনরাবৃত্তি (recall) করতে পারি। আবার অভ্যাস ছেড়ে দিলেই ক্রমে ক্রমে আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই বা পূর্ব্ব দক্ষতা হারিয়ে ফেলি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে (১) অভ্যাসের ফলে আমাদের যে দক্ষতা জন্মায় স্মৃতি শক্তিতে বা কাজে সেটি মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় কি কি কারণে? (২) অভ্যাস ছেড়ে দিলে কত দ্রুত এবং কি ভাবে ক্রমে ক্রমে সে স্মৃতি বা দক্ষতা লোপ পায়? (৩) অভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্মৃতির যে মালিন্য বা বিলুপ্তি ঘটে বা দক্ষতার যে হ্রাস বা বিলুপ্তি ঘটে পুনরভ্যাসের দ্বারা পূর্বের সে শক্তি ফিরে পেতে কতটা সময় লাগে? (৪) বহুদিন অভ্যাসের ফলে অর্জিত স্মৃতি বা কার্য্যদক্ষতা কি একেবারেই ধুয়ে মুছে যায়, না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে?

আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি স্মরণশক্তি বা স্মৃতি শক্তি একটা অভ্যাস যেটা অর্জিত হয় পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়নের দ্বারা বা চর্চার দ্বারা। Sandiford এর ভাষায় it "simply means that we have acquired certain language habits" or musculer habits.

এক একটা জিনিষ আমাদের অনেকদিন মনে থাকে। তার কারণ এক একটা জিনিষ আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। যে যে কারণে মন কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে সে কারণেই সেটা মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। কোন ঘটনা বারে বারে ঘটলে (Repeatition) সেটা মনে গভীর দাগ কাটে এবং সেটা মনেও থাকে অনেকদিন। তাই অভ্যাস স্মৃতিশক্তিকে দৃঢ় করে—অনভ্যাস স্মৃতিশক্তিকে মলিন করে। যে ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্ট (vivid), সেটা মনকে সহজেই আকষণ করে এবং সে জন্যে এ রকম ঘটনা মনেও থাকে অনেক দিন। যে ঘটনা খুব অল্পদিন বা অল্পক্ষণ আগে (recently) ঘটেছে তার স্মৃতিও উজ্জ্বল। যে ঘটনায় আনন্দ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় সেটাও মনে থাকে অনেক দিন। আচ্ছা এই 'মনে থাকা' বা Retention ব্যাপারটা কি? যে পড়াটা শেখা হোল বা যে কাজটা শেখা হোল "সেটা আমার মনে আছে" একথাটা যখন বলি—তখন কি এই বুঝি যে মনে মনে যে পড়াটা বা কাজটা ক্রমাগতই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? তা নিশ্চয়ই নয়। Woodworth বলছেন "Retaining is certainly not a continued repetition of the learned performance। যে পড়াটা বা যে কাজটা "মনে আছে" সেটা ঘুমের মধ্যেও মনে আছে। কাজেই এটা হচ্ছে দেহের বিশেষ করে মস্তিষ্কের (nervous system) মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন যেটা ঘটেছে পড়াটা বা কাজটা শেখবার ফলে। "Activity has left behind it some modified structure of the organism mostly modified brain structure. এটাকে ইংরাজীতে বলা হয় memory trace. এটা প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই এরকম একটা দাগ রেখে যায় এটা আমরা ধরে নিতে পারি—তা না হলে অভিজ্ঞতাটা অতীত হয়ে গেলে আবার সেটাকে আমরা স্মরণ করতে পারতুম না।

সে দাগটা কি চিরকাল থাকে? কবি বলবেন "হারায় না কিছু"। যত কথা যত গান সবই আছে, সবই থাকে। "ভুলে থাকা, সে তো নয় ভোলা, বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা।" একথাটা একেবারেই কবিত্ব নয়। বাল্যকালের বিস্মৃত ঘটনা হঠাৎ যেন মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে।

"মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে, যেতে যেতে, গানটি গেছে ফেলে।"

এমন অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই ঘটে। জ্বরের বিকারের মধ্যে কখনো মানুষ তাদের অতীত জীবনের এমন ঘটনার কথা বলে—যা সত্যি ঘটেছিল কিন্তু সুস্থ হয়ে তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে সে কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু এসব দৃষ্টান্তের থেকে কিছুই মন থেকে হারায় না এরকম একটা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বিপজ্জনক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে এ সিদ্ধান্তই বরং সঙ্গত যে অনেক অভিজ্ঞতা কেন, অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। মনের মধ্যে অতীতের সব অভিজ্ঞতা, সব কথাই যদি ভিড় করে থাকতো তা হলে সে দুঃসহ চাপে আমরা যে পাগল হয়ে যেতুম।

ভুলি কেন?

সময় যত গত হয়, তত আমরা ভুলে যাই। সময়ের গতি এর জন্য দায়ী নয়—সময়ের মধ্যে যা ঘটে তাই এজন্যে দায়ী—"It is not time, but what occurs in time that produces the effect."

একটা মত হচ্ছে অব্যবহারের দ্বারা Memory trace বা স্মৃতির দাগ মলিন হয়ে যায়। শরীরের যে কোন যন্ত্র বা তন্তু বা muscle সম্বন্ধেই এটা সত্য যে, ব্যবহার না করলে সে রক্তস্রোত থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারে না এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। হাত ভেঙ্গে গেলে হাড় জোড়া লাগাবার জন্যে হাতটা plaster করে দিলে যে muscleগুলি নড়াচড়া করতে পারলো না সেগুলো দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই কোন পড়া বা কাজ যেটা শেখা গেছে সেটার আর ব্যবহার না হলে মস্তিষ্কের তন্তু ও শিরার মধ্য দিয়ে যে পথ তৈরী (Nerve Path) হয়েছিল সেটার দাগ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

আর একটা মত হচ্ছে interference বা বাধা দ্বারা memory trace অস্পষ্ট হয়। একটা কাজ বা পাঠ শেখার সময় যে nerve path তৈরী হোল—সেটা মস্তিষ্কের অন্য সমস্ত তন্তু ও শিরার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই অন্য কাজ বা পাঠ শেখার সময় সে nerve path অন্য nerve path দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। শ্লেটে এক লেখার ওপর অন্য লেখা লিখে গেলে আগের লেখাটা অস্পষ্ট হবেই। কাজেই একটা স্মৃতি পরবর্ত্তী অন্য অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে—এটা বোঝা শক্ত নয়।

এ মতের অনুকূলে কতকগুলো তথ্য দেওয়া যায়। দিনের বেলায় আমরা বারে বারেই কাজের বদল করি। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন হয় বিশ্রাম। দিনের বেলায় এক অভিজ্ঞতা আর এক অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে কেবলই বাধা দেয়। রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে তা ঘটে না। তাই দেখতে পাই দিনের বেলার বিস্মৃতির হার (rate) রাত্রে ঘুমের সময়ের তুলনায় অনেক দ্রুততর। একটা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। কতকগুলো অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি (nonsenses syllables) একজন দিনের বেলায় মুখস্থ করে অন্য নানা কাজে ব্যস্ত রইলেন। দিনের শেষে দেখা গেল অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অনুরূপ অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি সেই ব্যক্তি মুখস্থ করার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা করে দেখা গেল ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা কম। একটা কাজ শেষ করেই আর একটা কাজ সুরু করলে memory trace নষ্ট হয় বেশী। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে সংরক্ষণ (retention) দীর্ঘতর হয়। পাঁচটা দাবার ঘুঁটির অবস্থা ১৫ সেকেণ্ডের জন্যে লক্ষ্য করে একজন মনে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক তার পরের মিনিট তাকে দেওয়া হোল কতগুলো রাশি যোগ করতে। যোগ শেষ হওয়া মাত্রই তাঁকে দাবার ঘুঁটিগুলি আগের জায়গায় ঠিক ঠিক বসাতে বলা হোল। শতকরা পঞ্চাশটাই তার ভুল হোল। তাকে ১৫ সেকেণ্ড আবার ঘুঁটিগুলি লক্ষ্য করতে দেওয়া হ'ল। তারপর ১ মিনিট তাঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হোল তারপর ঘুঁটিগুলি জায়গামত বসাতে বসাতে তার ভুল আগের বারের তুলনায় অৰ্দ্ধেক হোল। এ ধরণের বাধাকে Woodworth বলছেন retro-active inhibition. এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে সংরক্ষণের শক্তি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়—"Retrospective inhibition lowered the retention by over 50 per cent.

কখনও কখনও দেখা যায় শারীরিক (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের) মানসিক আকস্মিক গুরুতর আঘাত পেলে আঘাতের সময়ের এবং তার পূর্ব্বেও কিছুক্ষণ সময়ে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার স্মৃতি লোপ পায়—একে Woodworth বলছেন Retro-active shock effect। এটাতেও Interference theoryর সমর্থন পাওয়া যায়।

Freudপন্থীরা এ ভোলা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। তাঁরা বলেন আমাদের অহংবোধ বড় প্রবল—যখন আমরা সচেতন তখনও এই অহং অবচেতন মনে অতন্দ্রভাবে জেগে থাকে। আমাদের এই অহংকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়, তার উপর শোধ তোলে সে তাকে বিস্মৃতির রাজ্যে নির্ব্বাসন দিয়ে। এটাকে তারা বলে

repression অবদমন। কাজেই দেখা যায় আমরা এমন ঘটনাগুলো ভুলে যাই, যেগুলি আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, অপ্রীতিকর, যা আমাদের এই অহংকারকে আঘাত করে। তাই দেনাগুলো ভুলে যাই, পাওনাটা স্মরণ রাখি। Sandiford বলছেন "Repression is a biological function, a defence mechanism guarding the mind against the intrusion of experience which would cause it pain or discomfort. Consequently the mind purchases peace by refusing to remember disquieting experience. We remember our cheques, but forget our bills.

ভোলার কারণ সম্পর্কে Behaviourist মনস্তাত্ত্বিক Watson এর আর একটা মত রয়েছে। তিনি বলতে চান যে সেই ঘটনাই শুধু আমরা মনে রাখতে পারি যেগুলোর সঙ্গে আমরা কথার সম্পর্ক (Verbal association) স্থাপন করতে পেরেছি। একটা বাগানে বেড়াতে গেলাম—দেখলাম দক্ষিণে আটটা সুপারি গাছ রয়েছে—পশ্চিমে তিনটি আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ, পূবে রয়েছে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়। মাঝখানে বেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হেনা, জবা আর মরশুমী বা সৌখিন ফুলের bed রয়েছে ১০টা। মনে মনে এটা লক্ষ্য করলুম—Watson বলবেন নিজের কানে কানেই নীরবে কথা বলা হোল—"thinking is subvocal speech"—অথবা এগুলো নিয়ে আর কারু সঙ্গে আলোচনা করলুম—তা হলে এবার চোখের স্মৃতির সঙ্গে বাচনিক স্মৃতির ডোর বাঁধা হোল—এটা মনে রইল। এটা ভুলতে দেরী হবে। তিনি বলেন শিশুকালের প্রথম চার বছরের কথা আমাদের মনে থাকে না, তার কারণ তখনও বাচনিক সংযোগ ঘটবার সুযোগ হয় না "Our inability to remember the experiences of the first three or four years of life is due to our lack of language, at the time.

এই মতগুলোর কোনটাকেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মনে করলে ভুল হবে। প্রত্যেকটা মতই কতগুলো ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। হয়তো এ মতগুলো আপাতঃবিরুদ্ধ মনে হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

The Rate of Forgetting certain general Conclusions re.forgetting.

যে পড়া বা কাজ শেখা হয়েছে অনভ্যাসে তা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সকলের ভোলার হার সমান নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ ভোলে দেরীতে। অনেকগুলো Muscle একত্র যে সব কাজে লাগে যেমন সাঁতার কাটা, বাইসিকেল চালানো, টাইপ করতে শেখা, এগুলো একবার শিখলে প্রায়ই একেবারে ভুলে যাওয়া যায় না। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপার যাতে ভাষার ব্যবহার দরকার সেগুলি ঠিক অতদিন মনে থাকে না। যে কাজ বা পড়া আমরা খুব বারে বারে করে বা পড়ে শিখেছি (over learned) সেগুলি আমরা খুব শীগগীর ভুলি না। যেখানে মিল আছে; ছন্দ আছে বা যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) আছে যা অর্থপূর্ণ তা আমরা ভুলি অনেক ধীরে ধীরে। আবার অনভ্যাসের দ্বারা কোন জিনিষ ভুলে গেলে তা পুনরায়ত্ত করতে আগের মত অতো সময় লাগে না। ভোলার হারটা গোড়াতে খুব দ্রুত—পরে সেটা মন্থর হয়ে আসে। যারা আরও দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে, তারা মনেও রাখতে পারে অনেকদিন। Lyon কতগুলো পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত কচ্ছেন, "We are entitled to say that with material that is logical in character, those who learn quickly remember the longest." যারা যত বেশী বুদ্ধিমান তাদের স্মরণ-শক্তি জন্মগত এবং একে খুব বেশী পরিবর্তন করা চলে না "no amount of culture would seem capable of modifying a man's general retentiveness." অবশ্য সকলে তার মত সমর্থন করে না।

এ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। Redall সাড়ে তিন বৎসর অনভ্যাসের ফলে Type writing কতটা ভুলেছেন (বা কতটা মনে আছে) তা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। Type writing শেখার শেষ দুই সপ্তাহে তিনি মিনিটে ২৫টি শব্দ type করতে পারতেন এবং তার ভুলের পরিমাণ ছিল শতকরা ৪। সাড়ে তিন বছর পর আবার পরীক্ষা করে প্রথম পাঁচদিনে কটি শব্দ তিনি type করতে পেরেছিলেন এবং কতটা হয়েছিল তা দেওয়া হোল। প্রথম দিন প্রতি মিনিটে শব্দ type করলেন ১৮.৭৫, ভুলের পরিমাণ শতকরা আট। দ্বিতীয় দিন ১৮.৯ ও ভুল ৭½%; তৃতীয় দিন ২১, ভুলের পরিমাণ ৬¾; চতুর্থ দিন ২২.১, ভুল ৫; পঞ্চম দিন ২২.৫, ভুল ৮¾। পাঁচ ঘণ্টা অভ্যাস করে তিনি পূর্বে ৩০ ঘণ্টা অভ্যাসের ফলে যে দক্ষতা অর্জ্জন করেছিলেন তা প্রায় ফিরে পেলেন। Sandiford ১৮৯৫ সালে skating শিখেছিলেন, মাঝে ১৮ বছর এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তার পরে আবার skating সুরু করে দেখলেন পূর্বের দক্ষতা খুব কমই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১৯০৬ সাল থেকে ডেনমার্কে দু বছর থাকতে তিনি Danish ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু ১৯১৩ সালে দেখলেন সবটাই প্রায় ভুলে গেছেন। দুই তিন মিনিট বহু চেষ্টা করেও তিনি Danish ভাষায় ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত গুণতে পারলেন না। Ebbinghaus, Radossauslie Witch, Borears, ভোলার হার নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন—Nonsense syllables নিয়ে এবং কবিতা নিয়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে overlearned বিষয় আমরা কম ভুলি। যত বেশী overlearned হয় ভুলে যাওয়া তত মন্থর।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সরবে আবৃত্তি করে কোন পড়া তৈরী করলে তা বেশী মনে থাকে; মনে মনে সে পড়া তৈরী করার চেয়ে। তা ছাড়া একটা পড়া তৈরী হয়ে গেলে. সেটাকে দুদিন ফেলে না রেখে, কয়েক ঘণ্টা পরে আবার ঝালিয়ে নিলে সেটা মনে থাকে বেশী।

Witasek ও Gates nonsense syllableএর ১৬টি তালিকা এবং জীবনী ৫টি সরবে এবং নীরবে মুখস্থ করে যে ফল পেয়েছেন তা নীচে দেখানো হোল।

Type of learning	Sixteen nonsense syllables percent remembered		Five biographies percent remembered	
	Immediately	After 4 hrs	Immediately	After 4 hrs.
All time devoted to reading	35	15	35	16
One fifth of time devoted to recitation	50	26	37	19
Two third of time devoted to recitation	54	28	41	25
Three-fifth of time devoted to recitation	52	32	42	26
Four-fifth of time devoted to recitation	74	48	42	26

Recitation versus Reading methods of memorisation.

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অনভ্যাসে, শেখা বা কাজ আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সেটা যে একেবারে লোপ পেয়ে যায় না, তা আমরা বুঝতে পারি এ দিয়ে, যে আবার অভ্যাস সুরু করলে পূর্বের দক্ষতা ফিরে পেতে অনেক কম সময় লাগে। একটা কবিতার stanza মুখস্থ করতে ১০ মিনিট সময় লাগলো। সে কবিতাটা অনেক বছর পর আবার নূতন করে মুখস্থ করতে সময় লাগলো ৮ মিনিট। কাজেই দেখা যাচ্ছে আবার শিখবার পরিশ্রম বাঁচলো ২০%। অর্থাৎ ২০% পূর্ব্ব-অধীত বিষয়-বস্তু মনের মধ্যে সংরক্ষিত হোল। প্রথম শেখবার যত কম পরে Re-learningটা হবে সময় লাগবে ততকম। Ebbinghaus ইত্যাদির curves of forgetting থেকে ও কথাটা বুঝতে পারা যাবে।

Application of the results to the field of education—How to avoid forgetting.

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে কথাগুলো জানা গেল—শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের মূল্য রয়েছে। যাদের পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিতে হয় তাদের পক্ষে কি করে মনে রাখা যেতে পারে—এ কথাটা জানা জীবনমরণের প্রশ্ন। এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক কি সাহায্য করতে পারেন? এখানে মনস্তাত্ত্বিক যে উত্তর দেবেন তাতে অনেক কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে—তবুও মোট কথাগুলো এক জায়গায় বলে দেওয়া মন্দ নয়।

কোন পড়া তৈরী করবার সময় সরবে আবৃত্তি করলে সেটা মনে থাকে ভালো।

যা মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে, তা শিক্ষার পথে বিঘ্ন—স্মরণ রাখবার পথেও। তাই সুস্থ দেহ ও শান্ত অনুদ্বিগ্ন মন স্মরণশক্তির পক্ষে অনুকূল।

পড়াটা তৈরী করার সময় বা কাজটা শেখার সময়, ঠিক যতটুকু শিখলে তখন তখন মনে থাকে (Just learnt), সেটুকুই শিখে সময় বাঁচানো মূর্খতা। এ রকম (Just-learnt material) বেশীক্ষণ মনে থাকে না। বরং প্রথম শেখার সময় কিছু বেশী সময় নিয়ে শেখাটা পোক্ত (consolidate) করে নেওয়া ভালো। যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে এ উপদেশটি স্মরণ রাখা বিশেষ দরকার। over-learning এর দ্বারা একটা বিষয় মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাই শিক্ষকদেরও উচিত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন তথ্য over learn করতে ছাত্রদের বাধ্য না করা। তাতে মন অযথা ভারাক্রান্ত হয়।

পড়াটা তৈরী করে বা কাজটা শিখে—সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে বিশ্রাম করলে ভাল হয়—তাতে শিক্ষিত বিষয়টা মনের মধ্যে চেপে বসে (consolidation)।

পড়াটা বা কাজটা শিখে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী। প্রথম দিকেই ভোলাটা বড় দ্রুত—তাই কয়েকঘণ্টা পরেই আবার পড়াটায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। তার পর আবার দীর্ঘতর সময় পরে পরে পড়াটা দেখে নিলে খুব ভাল শেখা হয়ে যায়।

পড়াটা তৈরী করতে বা কাজটা শিখতে মনের মধ্যে যত বেশী যুক্তি-সঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) স্থাপন করা যায় ততই ভাল। কাজেই না বুঝে মুখস্থ করা সময়ের অপব্যবহার—তাতে পরিশ্রমও বেশী, ফলও কম। যেখানে শিক্ষার বিষয় যুক্তিগত সম্বন্ধহীন তালিকা বা নামের সমষ্টি মাত্র, সেখানেও সম্ভব হলে মনগড়া সম্বন্ধ গড়ে নিতে পারলে তাদের শিখতে সময় কম লাগে—মনেও থাকে বেশী দিন।

বিষয়টাতে রুচি জন্মাতে পারলে—সেটাতে রস পেলে মন তাতে ভাল বসে—তা ভাল মনে থাকে। বিরক্ত মন বিস্মরণের অনুকূল।

How to forget? ভুলতে পারা যায় কি করে?

জীবনে অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যেতেই চাই। আমরা প্রিয়জনকে হারাই, তাকে স্মরণ করে বুক ভেঙ্গে যায়। যাকে বিশ্বাস করেছি, সে ভুল বুঝে দুঃখ দেয়। অন্যায় করেছি, লজ্জা পেয়েছি, অপদস্থ হয়েছি—এমন অপ্রীতিকর স্মৃতি আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। Freudপন্থীরা বলবেন তা পারিও—কিন্তু সেটা অবচেতন মনের দুরূহ ব্যাপার—সেটাকে সচেতনভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই সমস্যা হোল—চেষ্টা করে, সচেতন ভাবে আমরা ভুলতে পারি কিনা? ওপরের আলোচনা থেকে কিছুটা উত্তর আমরা পেতে পারি। যেটা ভুলতে হবে সেটা পুনরাবৃত্তি (review) না করলে তার স্মৃতি দুর্ব্বল হবে—সেই ঘটনার সঙ্গে যে সব বস্তু বা ঘটনার সংযোগ ঘনিষ্ট, তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তবুও হয়তো বেদনাপূর্ণ স্মৃতি মনের দুয়ারে এসে হানা দেবে। অনেক সময় জোর করে আমরা ভুলতে চেষ্টা করি—কখনো কখনো কতকটা সফলও হই তাতে। কিন্তু এর বিপদ আছে। এটার থেকে ক্ষুধামান্দ্য, হৃৎস্পন্দন, মাথা ঘোরা ইত্যাদি ব্যাধিই শুধু নয়—কখনো কখনো দৃষ্টিহানি বা পক্ষাঘাতও ঘটতে দেখা গেছে। তা ছাড়া এতে নানা রকম মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি ঘটে. (neurosis & complexes)। অর্থাৎ জোর করে ভোলার চেষ্টা বিপজ্জনক। ঘটনার সবটা স্থিরভাবে চিন্তা করে—তার সবটা দুঃখ ও বেদনার মুখোমুখি হতে পারলে বরং তার চেয়ে সুফল লাভের আশা বেশী। যদিও প্রথম অবস্থায় মানসিক বেদনার পরিমাণ তাতে যথেষ্ট হতে পারে। Woodworth বলছেন "If involved in something we shall hate to remember, the best rule is to face the facts, think them through, do what needs to be done, and reach a satisfactory adjustment before laying the matter aside."

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

অনুন্নত ও পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিগুলিকে উন্নত ও প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি বৃটিশ বণিকী সাম্রাজ্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে দিকে দিকে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে সে ঘোষণা করে যে, অধিকৃত রাজ্যগুলিকে ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদানই তাহার নীতি; অনুন্নত নাবালক জাতিগুলি রাজনৈতিক সাবালকত্ব লাভ করিলেই সে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার অভিনব পদ্ধতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি। অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিয়া বৃটিশ ট্রেড্ মার্কা স্বাধীনতার রকমারী সনদ রচিত হইতেছে লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে। এই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা গিলাইবার জন্য স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সহিত জোট বাঁধিয়া প্রগতিপন্থীদিগকে নিষ্পেষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে,—প্রয়োজনমত সামরিক আইনও জারি হইয়াছে (যেমন হইয়াছিল মিশরে), কোথাও কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ ঘটাইয়া স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে আত্মঘাতী কলহ সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিশরকে বৃটেন স্বাধীনতা দিয়াছিল ১৯২২ সালে; কিন্তু সামরিক প্রভুত্ব সে কিছুতেই ত্যাগ করে নাই। পরবর্ত্তীকালে মিশরের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণে সম্মত হইলেও বৃটেন আজও সুয়েজ খাল অঞ্চল আঁকড়াইয়া রহিয়াছে এবং মিশর হইতে সুদানকে পৃথক করিয়া বৃটিশ ভেদ-নীতির চূড়ান্ত আঘাত হানিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি লিবিয়াকে "স্বাধীনতা" প্রদান করিয়া সেখানে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটী সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সেদিন নাইজেরিয়ায় বৃটিশ মার্কা স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সেখানে দেশীয় গুণ্ডা লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনুন্নত জাতির ত্রাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপ আজ সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস কেনিয়ায় ও মালয়ে। ইহার কারণ কেনিয়ায় বৃটিশ জমিদারদের শোষণে ও পেষণে আত্মসমর্পণ করিয়া ত্রাণকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তনে কেনিয়াবাসী অস্বীকার করিয়াছে, মালয়ে বৃটিশের রবার ও টিনের ব্যবসা পুষ্ট রাখিয়া মালয়বাসীকে বৃটিশ ট্রেড-মার্কা-স্বাধীনতা গেলানো সম্ভব হয় নাই। তবে, বৃটেন বাজীমাৎ করিয়াছে ভারতে। এখানে বৃটিশের অর্থনৈতিক ফাঁস গলায় ঝুলাইয়া স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন দেশবরেণ্য নেতারা।

বৃটিশ গায়না—

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে বৃটিশ গায়নায় স্বাধীনতা বণ্টনের ভণ্ডামী অতি কুৎসিতভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ প্রকট হইয়াছে নগ্নভাবে। পাঁচ লক্ষ নর-নারী অধ্যুষিত ক্ষুদ্র বৃটিশ গায়নায় আখের ক্ষেতের মালিক ইংরাজ, চিনির কলের মালিক ইংরাজ, খনির মালিক ইংরাজ। মাঠে, কারখানায়, খনিতে কাজ করে প্রধানতঃ ভারতীয় কুলির বংশধররা। ভারতীয়, নিগ্রো ও মিশ্র জাতি গায়নায় শতকরা ৯৫ জন; তাহারাই উকিল, ডাক্তার, কেরাণী। শতাব্দীকালের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এই সুদূরবর্ত্তী বৃটিশ উপনিবেশেও। এই আন্দোলন উপেক্ষা করা যখন সম্ভব হইল না, তখন ইংরাজ তাহার ডাউনিং ষ্ট্রীটের মোহরাঙ্কিত এক অপূর্ব্ব সংবিধান এই রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিল। গণতন্ত্রকে যাহারা পথের ধূলায় নামাইয়া উহাকে স্বৈরাচার ও শোষণের যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের ভাষায় ইহা গণতান্ত্রিক সংবিধান। বস্তুতঃ, যাহা কিছু অ-গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বলিয়া এ যুগে নিন্দিত, এই শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি তাহাতে। গত মে মাসে প্রবর্ত্তিত এই শাসনতন্ত্রের বিধানে বৃটিশ গভর্ণরই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী,—তিনি প্রায় সামন্তযুগীয় নিরঙ্কুশ সম্রাট। নিম্ন পরিষদের ২০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত এবং ৩ জন গভর্ণরের মনোনীত হইবার বিধান। স্পীকারটিকে নিযুক্ত করিবেন গভর্ণর; অবাঞ্ছিত বিলের বা কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা গোড়াতেই বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এই পাকা ব্যবস্থা। উচ্চ পরিষদটির সকল সদস্যই গভর্ণরের মনোনীত। অথচ ইহার ক্ষমতা যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের আপত্তিতে যে কোনও প্রস্তাব বা বিল এক বৎসর পর্য্যন্ত ধামা চাপা থাকিতে পারে। সর্ব্বোপরি, বৃটিশ গভর্ণরটির হাতে ব্রহ্মাস্ত্র "ভিটো" রহিয়াছে; নিম্ন পরিষদে কোনও বিল গৃহীত হইবার পর উহা উচ্চ পরিষদের ব্লাইণ্ড লেনে গিয়া মাথা খুঁড়িবে। সেখান হইতে যদি উহার উদ্ধার সম্ভব হয়, তাহা হইলে লাট সাহেবের ভিটোতে উহা বাতিল হইয়া যাইতে পারে। এই গেল ব্যবস্থাপক বিভাগের বিচিত্র ব্যবস্থা। শাসন পরিষদের জন্য গোড়াতেই অভিনব ব্যবস্থা এই যে, পরিষদের সদস্যরা গোপনে ভোট দিয়া মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্ত্তৃক স্বাভাবিক-ভাবে মন্ত্রিমণ্ডল যদি গঠিত হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী প্যাঁচ কষিবার পথে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; তাই এই অপূর্ব্ব পদ্ধতি। অবশ্য, গত নির্ব্বাচনে পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি নিম্ন পরিষদের ২৪টি আসনের মধ্যে ১৮টি অধিকার করায় এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে। নিম্ন পরিষদের ৬ জন মন্ত্রী, ৩ জন সরকারী কর্ম্মচারী (চিফ্ সেক্রেটারী, এটর্ণি জেনারেল এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী) এবং উচ্চ পরিষদের একজন সদস্য লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইবার ব্যবস্থা; এই পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন বৃটিশ গভর্ণর স্বয়ং।

এই বিচিত্র শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গত মে মাসে বৃটিশ গায়নায় প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। পিপলস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টি পূর্ব্ব হইতে এই শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা ভূমি-সংস্কার,

শাসনতন্ত্রের সংস্কার, ট্রেড ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি প্রভৃতি উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। নিম্ন পরিষদের ২৪টি আসনের ১৮টি আসনই অধিকৃত হয় এই দলের দ্বারা। এই দলের নেতা চেদ্দি জাগান্ (ইনি জাতিতে ভারতীয়) নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। দলের বিঘোষিত নীতি অনুসারে মনোনয়ন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল সর্ব্বপ্রথম উচ্চ পরিষদের সদস্যদের বেতন দিতে অস্বীকার করেন। সুরুতেই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গভর্ণর বোধ হয় লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন ; তাই বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। তাহার পর অনাবৃষ্টিজনিত ফসলের ক্ষতি নিবারণের জন্য জমিদারদিগকে সেচের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে একটি জরুরী বিল উত্থাপিত হয়। উচ্চ পরিষদ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কোনও শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিক কোনও ইউনিয়নের সদস্য থাকিলে উহা মানিয়া লইবার ব্যবস্থাসম্বলিত বিলটি গভর্ণরের নিযুক্ত স্পীকার উত্থাপন করিতে দেন নাই। গণতন্ত্রের জ্বালার এইখানেই শেষ নহে। পররাষ্ট্রীয় বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং অর্থবিভাগ তো স্থায়ী কর্ম্মচারীদের (শাসন পরিষদের সদস্য চিফ্ সেক্রেটারী, এটর্ণি জেনারেল এবং ফাইন্যানসিয়াল সেক্রেটারী) হাতে রহিয়াছেই। অন্যত্রও স্থায়ী কর্ম্মচারীরা মন্ত্রীদের নির্দ্দেশ অবাধে অমান্য করেন। একজন মন্ত্রী একটি সেচের পাম্প চালু করিবার আদেশ দিলে বিভাগীয় স্থায়ী কর্ম্মচারী নির্ভয়ে সে আদেশ অমান্য করেন। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য একটি দপ্তরের লরীতে করিয়া পুলিস লইয়া যাওয়া হইয়াছিল শুনিয়া বিভাগীয় মন্ত্রী যখন আপত্তি করেন, তখন তাঁহাকে শুনাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহাই রীতি।

পিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টির রাজনৈতিক আদর্শ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অজানা ছিল না। এই দলের প্রার্থিগণ তাঁহাদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবুও, সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ত আশা ছিল,—ক্ষমতার চাকায় জোতা হইলে এই দলের প্রতিনিধিরা পোষ মানিবেন। এই জন্যই বোধহয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময়ে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অথবা অব্যবহিত পরে বিশ্বের কেহই শোনে নাই যে, বৃটিশ গায়নার পিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টিটি ছদ্মাবরণে কম্যুনিষ্ট পার্টি,—নিয়মতন্ত্র-বিরুদ্ধ পন্থায় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাই ঐ দলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য। নির্ব্বাচনে জয়ী হইবার পর ঐ দলের প্রতিনিধিরা যখন পোষ মানিলেন না,—জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইলেন, তখনই চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিলেন ; ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ—বৃটিশ বণিকী স্বার্থ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে দেখিয়া রুদ্ধদ্বারকক্ষে তাঁহাদের মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলিলেন—জাগান্ গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার অন্য কোনও পন্থা যখন নাই, তখন অবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে। পূর্ব্বে কমিশন বসাইয়া তদন্ত করাইয়া, পরে সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত আঁট-ঘাট বাঁধিয়া যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা প্রত্যাহার করিতে হইলে একটা জুতসই অজুহাত দরকার। অতি খল চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন,—জাগান্ মন্ত্রিসভা এবং তাঁহাদের পিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টি কম্যুনিষ্ট "ক্যাম্পের" ষড়যন্ত্র করিতেছিল এই অজুহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; ইহাতে আমেরিকার সমর্থন সহজেই পাওয়া যাইবে, আমেরিকার অনুগৃহীত রাষ্ট্রগুলিও জাগান্ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে সাহসী হইবে না। যে মতলব, অবিলম্বেই সেই কাজ ; গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধজাহাজ ভর্ত্তি হইয়া বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল, বৃটিশ গায়নায় জাগান্ মন্ত্রিসভা পদচ্যুত হইলেন, শাসনতন্ত্র স্থগিত হইল, গভর্ণর স্যাভেজ শাসন-ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত রাজনৈতিক স্যাভেজারীর পরিচয় দিলেন। অবশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র ইতিহাসই এইরূপ কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত ; বৃটিশ বণিকী স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ সে ইতিহাসের এই প্রথম ঘটনা নয়।

যাহা হউক, ব্যাপারটি যত নীরবে ঘটানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, তত নীরবে উহা ঘটিতে পারে নাই ; কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মার্কিনী জিগিরের নিকট উদারপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ যাঁহারা এখনও বিসর্জ্জন দেন নাই, তাঁহারা বৃটিশের এই অপকীর্ত্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ; জাতিসঙ্ঘের অছি কমিটীতেও প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি, বৃটিশ গায়নার পদচ্যুত মন্ত্রিবৃন্দ বৃটিশের এই স্বৈরাচারী ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করেন নাই ; তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দলের নিকট সহানুভূতি ও সমর্থন চাহিয়াছেন। বৃটিশ জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ চেদ্দি জাগান্ এবং তাঁহার সহ-মন্ত্রী মিঃ বার্ণহাম্ সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ জাগান্ চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্টের অভিযোগগুলির সমুচিত উত্তর দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভই তাহার উদ্দেশ্য। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কম্যুনিষ্ট বলিয়া নিন্দিত ব্যক্তির মুখে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার এই অকৃত্রিম আগ্রহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুতঃ, ডাঃ জাগান্ বলেন যে, তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যদি কম্যুনিষ্ট হন, তাহা হইলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও কম্যুনিষ্ট। পণ্ডিত নেহরুর কমনওয়েলথ্-প্রীতিকে ইঁহাদের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক যোগসূত্র বলিতে হইবে। এই সূত্রের যে নামই হউক, উহা কম্যুনিজম্ যে নহে, তাহা সমসাময়িক রাজনীতির সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

আমেরিকার সমর্থনেই গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের কঙ্কালের প্রতি বৃটেন এইরূপ নির্লজ্জভাবে আঘাত করল। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নিন্দার সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য—"কম্যুনিজম্ গণতন্ত্রবিরোধী, কম্যুনিজম্ হিংসাশ্রয়ী।" কিন্তু বৃটিশ গায়নায় জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিমণ্ডলকে এইভাবে সঙ্গীনের খোঁচায় আসন হইতে ঠেলিয়া নামানোটা কোন্ "ইজম্"? বৃটিশ গায়না একটি গুরুত্বহীন রাজ্য ; সেখানকার জনসংখ্যাও মুষ্টিমেয়। মালয়ে ও কেনিয়ায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা বন্য পশুকেও হার মানাইয়াছে, ক্ষুদ্র বৃটিশ গায়নায় তাহার এই আচরণে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই ; গণতান্ত্রিক

াম্রাজ্যবাদের ভণ্ডামীর মুখোস বাস্তব স্বার্থের সংঘাতে এইভাবেই খসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় আছে প্রচুর। বিশেষতঃ প্রাচ্যে যে সব রাজ্য বৃটিশের মহানুভবতায় (?) স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহারা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক ; সতর্ক হউক মিশর, ইরাণ প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলি। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিতে পারিতেছে একমাত্র এই কারণে যে, এই সব দেশের শাসন ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির অবাঞ্ছিত কোনও শক্তির হাতে যায় নাই। ইরাণে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে উস্কানী দিয়াই অবাঞ্ছিত মাসাদ্দেক্ গভর্ণমেণ্টের উৎসাদন সম্ভব হইয়াছে ; ইহা অসম্ভব হইলে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া অসংখ্য ইঙ্গ-মার্কিন রণপোত পারস্যোপসাগরে উপস্থিত হইত। মিশরের সহিত বৃটিশের মীমাংসায় যতই বিলম্ব হউক, নাগিব্ গভর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এখনও অবাঞ্ছিত মনে করিতেছে না। ভারত, পাকিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রে যদি ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির অনভিপ্রেত শক্তি শাসন ক্ষমতা লাভ করে, এই অঞ্চলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যদি বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটে, এই সব রাজ্য যদি সক্রিয়ভাবে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধতা করিবার স্পর্দ্ধা দেখায়, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারত মহাসাগর ইঙ্গ-মার্কিন রণপোতে ভরিয়া যাইবে। ইহা নৈরাশ্যবাদীর অনুমান নহে, কম্যুনিষ্টের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার নহে,—ইহা দিবালোকের মত সত্য। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতায় বৃটিশ বণিকী স্বার্থে আঘাত লাগে নাই, পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভারতের নিরপেক্ষতা এখনও আন্তর্জ্জাতিক সামরিক ষড়যন্ত্রে বিঘ্ন ঘটায় নাই। তবুও ভারতকে পরিপূর্ণরূপে ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে লইবার জন্য চেষ্টায় ত্রুটি হইতেছে না। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতকে চাপ দেওয়া হইতেছে, পাকিস্তানকে মধ্য-প্রাচ্য কম্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভারতকে অসুবিধায় ফেলিবার আয়োজন চলিতেছে। এই সব আয়োজন ও অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ভারতে যদি এমন শক্তির উদ্ভব ঘটে, যাহা সাম্রাজ্যবাদীর অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের পক্ষে বিঘ্নকর, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার স্বরূপ ধারণে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না।

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জের—

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু কোনও পক্ষের বিজয়ে এই যুদ্ধের সামরিক মীমাংসা হয় নাই ; যে মনোভাব লইয়া তিন বৎসর এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলিল, তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ যে নৈতিক চাপ দিতেছিল, তাহা উপেক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না ; তাই, অন্ততঃ সাময়িকভাবে কোরিয়ায় অস্ত্র সংবরণ করিতে হইয়াছে। অর্দ্ধেক-কম্যুনিষ্ট কোরিয়ার সহিত সীগ্ম্যান্ রীর শাসিত ফ্যাসিষ্ট অপরার্দ্ধের শান্তিপূর্ণ মিলন বর্ত্তমানে কিছুতেই সম্ভব নহে। এই বাস্তব সত্য উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ ধুরন্ধররা তাহাদের আশ্রিত রীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক সম্মেলনে যদি তিন মাসের মধ্যে কোরিয়ার দুই অংশকে মিলিত করিবার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ কোরিয়া তখন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে একাকী সামরিক বল প্রয়োগ করা অসম্ভব ; সে বলের উৎস মার্কিণ সমর-ভাণ্ডার। বস্তুতঃ, সিগ্ম্যান্ রীকে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ এই আশ্বাসবাণীই শুনাইয়াছেন যে, তিন মাসের মধ্যে রাজনৈতিক সম্মিলনীতে কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা না হইলে মার্কিণ সামরিক সাহায্য লইয়া দক্ষিণ কোরিয়া পুনরায় উত্তরাভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই বিষয়ে একটি অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে : আমেরিকার পিতামাতারা কোরিয়ায় গিয়া তাহাদের পুত্রদের মৃত্যুবরণ আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। কোরিয়ায় মার্কিণ যুবকদের নিধন বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই আইসেনহাওয়ার গত বৎসর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এখন পুনরায় কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রীকে আমেরিকা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে ; কিন্তু দিতে পারিবে না মার্কিণ সৈন্য। "এশিয়াবাসীকে দিয়া এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইবার" যে ডালেস্-আইসেন্হাওয়ারী নীতি ইতিপূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছে, তাহাই তখন পুরাপুরি অনুসরণ করিতে হইবে। যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ের প্রশ্ন লইয়া ডালেস্-রীর দলের যে এত জিদ্, তাহার মূল কারণ ইহাই। কম্যুনিষ্ট পক্ষের যে বিপুলসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য বন্দিরূপে তাহাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে হাতছাড়া করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নন। বন্দী-বিনিময় সম্পর্কে যখন একটা "ফরমুলা" আবিষ্কৃত হইল এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে এই ব্যাপারে মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন সিগ্ম্যান্ রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাতাশ হাজার বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের পশ্চাতে যে মার্কিণ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের গোপন পরামর্শ ও সমর্থন ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই সব প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট সৈন্য এখন নিশ্চয়ই দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেতে-কারখানায় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে না ; তাহাদিগকে আধুনিক মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া উত্তর কোরিয়া অভিমুখে এবং ফরমোজা হইতে দক্ষিণ চীনে লেলাইয়া দিবার আয়োজন চলিতেছে।

যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীর ভার এখন পড়িয়াছে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর। ভারত, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড এই কমিশনের সদস্য ; ভারত উহার চেয়ারম্যান্ ; ভারতীয় সৈন্য এখন বন্দিশিবিরের রক্ষী। যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে—এই সময় উভয়পক্ষ তাহাদের বক্তব্য যুদ্ধবন্দীদের নিকট ব্যক্ত করিবে ; এই বক্তব্য শুনিয়া বন্দীরা তাহাদের চূড়ান্ত স্থির করিবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিবার অথবা না ফিরিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। কিন্তু এই কার্য্য কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। দক্ষিণ কোরিয়ার রীর দল যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিরপেক্ষ কমিশনের হাতে দিবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে গুপ্তচর ও প্ররোচক রাখিয়াছে প্রচুর সংখ্যায় ; সংবাদ আদান-প্রদানের গোপন ব্যবস্থাও করিয়াছে। এই সব গুপ্তচর ও প্ররোচক বন্দিশিবিরের

অভ্যন্তরে এমনই দল পাকাইয়াছে এবং ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে যে, বন্দীদিগকে প্রকৃত অবস্থা শুনাইবার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না; তাহাদিগকে উত্তর কোরীয় ও চীনা প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থাপিত করাই অসম্ভব হইতেছে। প্রথম দিকে ইহারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল। সে ব্যবস্থায় দুই জন যুদ্ধবন্দীর প্রাণহানি ঘটায় দক্ষিণ কোরিয়ার পেশাদার বিক্ষোভকারীদিগকে রাজপথে বাহির করিয়া ভারত-বিরোধী জিগির তোলা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ কোরিয়ায় এখন সর্বপ্রকার দুষ্কার্য্যের জন্য এক শ্রেণীর পেশাদার বিক্ষোভকারী পাওয়া যায়; ইহারা শ্মশানে চিতার সারির পাশে দাঁড়াইয়াও মহামারী-নিবারণ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। যাহা হউক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল থিমায়ার বিচক্ষণতায় এবং ভারত গভর্ণমেন্টের দৃঢ়তায় দক্ষিণ কোরিয়ার এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে; বন্দিশিবিরে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর অযোগ্যতা বা কম্যুনিষ্টদের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। এখন উত্তর কোরীয় ও চীনা প্রতিনিধিদের নিকট বন্দীদের উপস্থাপন অসম্ভব করিয়া প্রকৃত অবস্থা এবং আশ্বাসবাক্য বন্দীদিগকে শুনিতে না দিবার নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ কমিশন ও ভারতীয় সেনাবাহিনী অত্যন্ত জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। বলপূর্ব্বক বন্দীদিগকে "ব্যাখ্যাশিবিরে" উপস্থিত করাইতে গেলে হাঙ্গামা এবং রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। অথচ, শান্তিপূর্ণভাবে বন্দীদিগকে উপস্থাপিত করাও অসম্ভব। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিরতি সর্ত্তের এই অংশে একটা গোঁজামিল দিবারই চেষ্টা হইবে। উত্তর কোরিয়া ও চীন সে গোঁজামিল সহ্য করে কি না, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ—

আড্রিয়াতিক সাগরের উত্তর উপকূলের ত্রিয়েস্ত পোতাশ্রয়ের ভবিষ্যৎ ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতালীয় শান্তি-চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে এই পোতাশ্রয়টি এক জন নিরপেক্ষ গভর্ণরের শাসনাধীনে স্বাধীন নগরীতে পরিণত হইবার কথা। কিন্তু শান্তি-চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মতদ্বৈধের জন্য গভর্ণর নিযুক্ত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ, ত্রিয়েস্তকে স্বাধীন নগরে পরিণত করিয়া এই সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন পোতাশ্রয়কে আপন কর্ত্তৃত্বচ্যুত করিতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি প্রস্তুত নয়। ত্রিয়েস্ত লইয়া ইতালী ও যুগোশ্লোভিয়ার মধ্যে যে বিরোধ, তাহাকে জীয়াইয়া রাখাই এই পোতাশ্রয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই নীতি অনুসারে সম্প্রতি ত্রিয়েস্তের "ক" অঞ্চল ইতালীকে প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে; "খ" অঞ্চল রহিয়াছে যুগোশ্লোভিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীনে। ত্রিয়েস্তকে এইভাবে বিভক্ত করায় এবং সমগ্র পোতাশ্রয়ের জন্য যুগোশ্লেভিয়ার দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় মার্শাল টিটো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি হুমকী দিয়াছেন যে, "ক" অঞ্চলে ইতালীর সৈন্য প্রবেশ করিলেই তিনি তথায় যুগোশ্লাভ্ সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অটল; মার্শাল টিটোর হুমকীতে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ—ইতালীতে মার্কিণ প্রভুত্বের ভিত্তি শিথিল হইবার লক্ষণ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। ইতালীর সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট এবং বামপন্থী সোস্যালিষ্টরা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী পেল্লা অতি সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া কোন প্রকারে মন্ত্রিত্ব-তরণী টিকাইয়া রাখিয়াছেন। ইতালীতে বামপন্থীদের এই শক্তি-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ ইতালীয় জনমতকে কতকটা তোষণ করিতে আগ্রহী হইয়াছে। ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে ইতালীতে জনমত অত্যন্ত প্রবল। সমগ্র ত্রিয়েস্তের পরিবর্ত্তে উহার অন্ততঃ অর্দ্ধেকও যদি ইতালীর অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আঁচলধরা পেল্লা-মন্ত্রিমণ্ডলের মর্য্যাদা জনসাধারণের নিকট কিছু বাড়িবে বলিয়া তাহারা আশা করে। পক্ষান্তরে, মার্শাল টিটোর হুমকীতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি কিছুমাত্র বিচলিত নন; কারণ তাঁহাদের বিরোধিতা করিবার শক্তি যে মার্শাল টিটোর নাই, ইহা তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের শিবিরে ফিরিয়া যাইবার পথ তাঁহার রুদ্ধ; কি অর্থ-নৈতিক, কি সামরিক—সকল বিষয়েই তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ অনুগ্রহের প্রতি নির্ভরশীল।

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা ব্যর্থ—

সুয়েজ অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ সম্পর্কে পাঁচ মাস ধরিয়া যে আলোচনা চলিতেছিল, গত অক্টোবর মাসে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় বৃটিশ সৈন্য পুনরায় সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে, এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। মিশরের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ককাসস্-ইরাক্ সীমান্ত যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে বৃটিশ সৈন্য পুনরায় সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু বৃটেন দাবী করে যে, তুরস্ক আক্রান্ত হইলেও বৃটিশ সৈন্যকে সুয়েজে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে; তাহা ছাড়া পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জাতি-সঙ্ঘ যদি স্থির করে, তাহা হইলেও বৃটিশ সৈন্যকে সুয়েজে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আর একটি দাবী—বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পর সুয়েজ অঞ্চলে চার হাজার বৃটিশ বিশেষজ্ঞ থাকিবে এবং তাহারা সামরিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে। সামরিক বিশেষজ্ঞের অবস্থানে মিশরের আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহাদের সামরিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দিতে মিশর সম্মত নয়, কারণ তাহাতে জনসাধারণের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইবে না যে, বৃটিশ সৈন্য সত্যই অপসারিত হইয়াছে।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জাতি-সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই জাহাজ ভর্ত্তি বৃটিশ সৈন্য আসিবে সুয়েজ অঞ্চলে,—এই দাবী অদ্ভুত। এই ব্যবস্থা অনুসারে কোরিয়ার সাম্প্রতিক

যুদ্ধের ন্যায় অবস্থায় বৃটিশ সৈন্য সুয়েজে প্রবেশের অধিকারী হইবে; ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জাতি-সঙ্ঘ হইতে যদি কোন প্রকারে একটা ঘোষণা বাহির করা যায়, তাহা হইলে সৈন্য বোঝাই হইয়া বৃটিশ রণপোত সুয়েজে আসিতে পারিবে। প্রকৃত কথা এই—বিশেষজ্ঞের ছদ্মাবরণে চার হাজার মাত্র বৃটিশ সৈন্য সুয়েজ অঞ্চলে রাখিবার ব্যবস্থায় বৃটেন তাহার মধ্যপ্রাচ্য স্বার্থ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না; আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সামান্য চাঞ্চল্য ঘটিলেই সেই অজুহাতে সুয়েজে সে পুনরায় প্রবেশ করিতে চায়। বস্তুতঃ, বৃটেনের মধ্য প্রাচ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য সুয়েজ অঞ্চলে তাহার সামরিক প্রভুত্ব চাই-ই। সম্প্রতি ইরাণে তৈল স্বার্থ বিপন্ন হইবার সময় রক্ষণশীল বৃটিশ সংবাদ-পত্রগুলি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের উপর বৃটেনের সামরিক প্রভুত্ব না থাকিবার জন্যই মোসাদ্দেক্ গভর্ণমেণ্টের এইরূপ দুঃসাহস সম্ভব হইতে পারিয়াছে। ভারতে বৃটেনের সামরিক প্রভুত্ব গিয়াছে; এখন সুয়েজ অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া বৃটেন মধ্য প্রাচ্যে তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যুর পরোয়ানা লিখিয়া দিতে কিছুতেই পারে না।

২৪।১০।৫৩

পাশ্চাত্ত্য দর্শন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়কে আমি ছেলেবেলা হইতেই জানি। ইনি ১৯০০ সালে জেনারেল এসেমব্লি হইতে বি-এ পাশ করেন। দর্শন শাস্ত্রে ইহাঁর অনার্স ছিল এবং একমাত্র ইনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী পাইয়া আর কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই। ইনি এম, এ পরীক্ষা দিলে দর্শন বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। ডেপুটি হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিয়া যখন ইনি অবসর লইলেন তখন মনে করা গিয়াছিল যে এইবার অবসরের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াই সময় কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু দেখিতেছি যে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস সংকলনে। এই কঠোর কার্য্যে অনেকে যুবা বয়সেও হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত। কিন্তু তিনি অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই দুরূহ কার্য্যে শুধু হস্তক্ষেপ করা নহে—ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে প্রভূত যশের অধিকারী হইলেন। আমার বোধহয় এই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রকাশন একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইনি যে ভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের পঠদ্দশায় দেখিয়াছি দর্শন শাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ ইংরাজীতে না বলিলে বা ব্যাখ্যা করিলে ভাল বোঝা যাইত না। কিন্তু বিগত ৫০ বৎসরে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। আমরা যাহা ইংরাজীতে পড়ি তাহাও বাংলা ভাষায় ব্যক্ত না করিলে আমাদের জ্ঞান-স্পৃহা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এই ধারণাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে রায় মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিত না, বাংলা দেশে তাহারই চাহিদা মিটাইবার জন্য এই প্রয়াস।

তিনখণ্ডে প্রকাশিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস বাংলায় ইতিপূর্ব্বে বাহির হয় নাই। তিনখণ্ডে ঘন-সন্নিবিষ্ট মুদ্রণ কার্য্য দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, কি অসাধারণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বাংলায় ত এরূপ পুস্তক নাই-ই, ইংরাজী ভাষায়ও ইহার মত পুস্তক এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই। ইংরাজীকে অবলম্বন করিয়াই লেখক এই বিরাট পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা ঠিক। কিন্তু নির্বাচন-কুশলতার এবং অনুরাগের জন্য এই পুস্তকখানি যে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রীকদর্শনে (প্রথমখণ্ড) সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল সম্বন্ধে লেখক যে মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাঠক মাত্রেই উপকৃত হইবেন। প্লেটোর Communism সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উপাদেয় হইয়াছে। কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না।

Platoর আদর্শ রাষ্ট্রে সমস্ত সম্পত্তি এজমালী বলিয়া গণ্য হইবে। স্ত্রী ও ছেলেপেলেদের উপর কাহারও কোনও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। কে কাহার পিতা তাহা যখন কেহ জানে না তখন পিতা হইবার উপযুক্ত বয়সের সকলকেই লোকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। লটারী দ্বারা যুবক যুবতীদের মিলন ঘটাইতে হইবে। সন্তান হইবার পরেই তাহাকে পিতামাতার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইবে—ইত্যাদি, আরিষ্টটল সম্বন্ধে তিনি সত্যই লিখিয়াছেন যে "তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোক জগতে অধিক আবির্ভূত হয় নাই।" তিনি তর্কবিদ্যা, অলঙ্কার (Rhetoric), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, প্রাণ বিজ্ঞান, মনবিজ্ঞান, চরিত্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং আরও অনেক বিষয় রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছিলেন। এর প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে লেখক অদ্ভুত প্রতিভার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটো শ্রেয়ঃ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, শ্রেয়ই বিশ্বের আদি, অন্ত, সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা এবং সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়া, আমাদের জগতেরও স্রষ্টা ও পিতা। তিনি শ্রেয়কে ইন্দ্রিয় জগতের ও চিন্তা জগতের স্রষ্টা বলিয়াছেন। শ্রেয় (The good) সম্বন্ধে আমাদের দর্শনেও অনুরূপ কথা আছে। লেখক কঠোপনিষদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়েই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন।

মধ্যযুগে আসিয়া তিনি স্পিনোজা সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও সুন্দর হইয়াছে। স্পিনোজার চরিত্র ও সমাজের অভিসম্পাত এখনও আমাদের নিকট সমস্যার সৃষ্টি করে। যাঁর চরিত্র সর্ব্ববিষয়ে অনবদ্য ছিল, তাহার সম্বন্ধে সমাজকর্ত্তাদের এরূপ কঠোর হওয়া, বড়ই রূঢ় আচরণ বলিয়া মনে হয়। "সে দিবাভাগে অভিশপ্ত হউক, রাত্রিকালে সে অভিশপ্ত হউক, শয়নে অভিশপ্ত হউক, শয্যাত্যাগে বহির্গমনে সে অভিশপ্ত হউক, গৃহ প্রবেশে সে অভিশপ্ত হউক। ঈশ্বর যেন কখনও তাহাকে ক্ষমা না করেন ইত্যাদি—মধ্যযুগেরই আচরণ বলিয়া মনে হয়। এই মধ্যযুগেই লোককে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা খৃষ্টীয় সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কাহাকেও মারিতে হইবে, অথচ রক্তপাতও হইবে না, এই অবস্থায় তাহাকে Inquisitionএ পাঠাইয়া দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাহাকে জীবন্ত অগ্নিতে সমর্পণ করা হইত। বর্ত্তমান যুগের এই গৌরব যে, আমরা এইরূপ বর্ব্বরতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

Immanuel Kant সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা সবদিক দিয়াই ভাল হইয়াছে। আমার বোধহয় কাণ্টের দর্শন মানবের চিন্তাকে যত প্রভাবিত করিয়াছে এত আর কিছুতেই করে নাই। কাণ্টের বৈপ্লবিক মতবাদ তাঁহার Critique of Pure Reasonএ প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার Critique of Jdgementএ সে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইয়াছিল। নৈতিক বিচার এবং ভগবানের সত্তা নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যাহা যুক্তির সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই অনুভূতির জানালা দিয়া প্রবেশ করিল। ইহার পর Fichteএ অহংবাদ, Schellingএর রহস্যবাদ এবং সোপেনহরের দুঃখবাদ বিশেষ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিক রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মতবাদ বিশ্লেষণে লেখক অসামান্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। সোপেনহরের দুঃখবাদের মধ্যে আমাদের দর্শনের অনেক আভাষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। "জীবনে দুঃখই সত্য পদার্থ। সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। এ দুঃখ কখনও নিবৃত্তি হইবে না। কারণ জগৎ ইচ্ছা-স্বরূপ। ইচ্ছা অভাব হইতে উদ্ভূত এবং যত চায় তত পায় না। একটা কামনা যদি পূর্ণ হয়, দশটা অপূর্ণ থাকে। ইচ্ছা ভিক্ষুকের মত। ভিক্ষার দ্বারা ভিক্ষুক প্রাণরক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা প্রাণরক্ষার ফল দুঃখের স্থিতিকালের বৃদ্ধি। যে কামনা পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইতে নূতন কামনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং কামনার অন্তহীন স্রোত বহিতে থাকে। বৌদ্ধেরাও বলিয়াছেন যে, অনাদি বাসনা হইতেই জগতের উৎপত্তি।

হেগেল সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। হেগেলের দর্শন অনেকের পক্ষেই দুর্ব্বোধ্য। এ সম্বন্ধে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র লোক আছেন যিনি হেগেল বোঝেন এবং তিনিও ভাল বোঝেন না। সেই একমাত্র লোকটী হেগেল নিজেই। এ অবস্থায় হেগেলের দর্শন বুঝিতে যাওয়া নিতান্তই কষ্টকর। হেগেল

Abstract চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার Logic অনেকে বুঝিতে পারে নাই। তাহা সত্ত্বেও তিনি Heidelberg বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অথচ এই হেগেল সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তিনি যখন ডিগ্রী পাইলেন তখন তাহাতে লেখা ছিল যে তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। হেগেলের দর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের সমন্বয় বলা যাইতে পারে। গ্রীক দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া Kantএর মধ্য দিয়া Fichte Schellingএর মতবাদ তিনি যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেগেলের মতের প্রধান কথা হইল Absoluteএর ধারণা। হেগেলের অসঙ্গ বা Absolute স্ব-সংবিদ Self-conscious ইহাতে Aristotleএর ন্যায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ঈশ্বর চৈতন্যরূপী"। তিনি রূপের রূপ এবং চিন্তার চিন্তা। তিনি আপনাকেই চিন্তা করেন। ন্যায়ের নিয়ম হইতে এই জগৎ উদ্ভূত। অসীম হইতেছে সীমাহীন। সুতরাং অসীম অবিশিষ্ট। তাহার কোন গুণ নাই। অসীম কেবল আপনা কর্ত্তৃক বিশেষিত ও নিয়ন্ত্রিত। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত যে একত্ব তাহাই Absolute. হেগেলের মতে হিন্দুরা Absoluteএর ধারণায় পৌছিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাস লেখক দেখাইয়াছেন যে হেগেলের এই ধারণা হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতারই ফল। হিন্দুদের ব্রহ্ম—যাহার সম্বন্ধে উপনিষদে নির্গুণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা হেগেলের Absolute ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হেগেলের মৃত্যুর পর এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই সমস্ত দেশে তাঁহার মত ছড়াইয়া পড়ে। ব্যবহারশাস্ত্র (Law), রাষ্ট্রবিজ্ঞান,চরিত্রনীতি এবং অন্যান্য শাস্ত্র হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এমন কি সাম্যবাদ বা Communism হেগেলের নিকট ঋণী। Carl Marx হেগেলের Dialectic বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। Communism প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। Platoর মধ্যে আমরা ইহার পূর্ণপরিণতি দেখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিবাদের ফলে Carl Marxএর Communism নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে যত রকম মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে Communism বহুবিস্তৃত ও বিশেষ শক্তিশালী। রুশিয়া, চীন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দেশে ইহা একরূপ ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড,আমেরিকা—এমন কি বর্ত্তমান ভারতেও ইহার প্রভাব অনুভূত হইতেছে। Marx লিখিয়াছেন, ধনিকদের নির্মূল না করিলে শ্রমিকদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। "ধনিকতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াও ফল হইবে না।" "ধনিকতন্ত্রের গর্ভেই সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অবশেষে একদিন আসে সেদিন জননীর গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া এবং তার প্রাণনাশ করিয়া সাম্যবাদ পরিপুষ্টি লাভ করে।" Capitalist বা ধনিকতন্ত্র নির্মূল হইলে জগতে শ্রেণীবিহীন সমাজের আবির্ভাব হইতে পারে। জগতের মূলে কোন যুক্তির প্রেরণা নাই। সেইজন্য ইহা অসম্পূর্ণ। বিরোধের মধ্য দিয়াই ইহার অগ্রগতি। Marx হেগেলের ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম বলিয়া কোন কিছু নাই। ধর্ম্ম নামে যে জুজুর ভয় চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, মানুষ যখন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে, তখনই সে স্বাধীন হইবে। জড় হইতে অবস্থা বিশেষে প্রাণের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং Marx জগতের মূলে যে কোন যুক্তি আছে তাহাও মানেন না। ইহাই হইল Marx Materialistic Conception of History, অর্থাৎ ইতিহাসের জড়বাদমূলক ধারণা।

Marx ব্যতীত তৃতীয় খণ্ডে কোমৎ, বার্গস, হোয়াইট-হেড্ এবং ক্রোচে প্রভৃতির দর্শন সম্বন্ধে যথেষ্ট সারগর্ভ আলোচনা আছে। আমেরিকার Pragmatist দর্শন সম্বন্ধেও লেখক অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারকচন্দ্র রায়ের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এর পাঠ্যপুস্তক মধ্যে এই পুস্তকখানির স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি ছাত্র-ছাত্রীরা এবার পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের পরিশ্রমও অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে; দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী ভক্তেরাও এই তিন খণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ করিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ পাঠের ফলে আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে তুলনা মূলক সমালোচনা আরম্ভ হইতে পারিবে। অনেকে বলেন যে, আমাদের দেশের চিন্তাধারায় দর্শনের স্রোত থামিয়া গিয়াছে। সে কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে সংশয় নাই।" তাহার কারণ এই যে, আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রেরা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা সুরু করেন। এখন আমার আশা হইতেছে যে, তারকচন্দ্র রায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া দেশে স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে যে সত্য ব্যাখ্যাত হয় না তাহার রস গ্রহণে কয়েক-জন ভাগ্য-বান ব্যক্তি ব্যতীত অবশিষ্ট কেহই সমর্থহইতে পারেন না।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি, এ, প্রণীত। তিনখণ্ড। মূল্য সর্ব্বসমেত ১৮৲। প্রকাশক। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাজ্য-শাসনকালে এই সব বিশৃঙ্খলা ঘটায় উদারমতাবলম্বিনী-কাথ্‌রিন্‌ ক্রমে দারুণ সংস্কার-বিদ্বেষিণী হয়ে ওঠেন। তাছাড়া ফরাসী-দেশে সে-সময় গণ-বিপ্লব (French Revolution) বেধে ওঠার দরুণ, রুশ-রাজ্যে কোনো কিছু নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে রাণী কাথ্‌রিন্‌ সর্ব্বদা হুঁশিয়ার থাকতেন ! প্রজারা পাছে ক্ষেপে আবার বিরুদ্ধাচরণ করে বসে—এই ছিল তাঁর ভয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও রাণী কাথ্‌রিনের আমলে রুশে প্রভূত-উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তাঁর রাজ্যকালে বিশিষ্ট রাজ-অতিথিদের বাসস্থান-হিসাবে অজস্র মুদ্রা-ব্যয়ে সেণ্ট-পিটস্‌বুর্গে-এ 'Hermitage' বা 'তপোবন' নামে অপরূপ শিল্পশ্রী-মণ্ডিত এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল। অতীত-শিল্প-কলার নিদর্শন হিসাবে কাথ্‌রিনের রচিত এই সুন্দর প্রাসাদ অক্ষয়-অটুট দেহে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে আধুনিক লেনিন্‌গ্রাড্‌ সহরের বুকে। সোভিয়েট-আমলে এটি হয়েছে 'জাতীয় চিত্রশালা-ভবন' ! এছাড়া রাণী কাথ্‌রিনের রাজত্ব-কালে সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গের (আধুনিক লেনিনগ্রাড সহর) সুবিখ্যাত 'Smolny Institute' ভবনটি নির্ম্মাণ করা হয়। সে-যুগে এই বিরাট ভবন ছিল অভিজাত রুশ-মহিলাদের অন্যতম-প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার-কল্পে রাণী কাথ্‌রিন্‌ বিরাট একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন···তবে, একমাত্র অভিজাত-সম্প্রদায় ছাড়া রাজ্যের সাধারণ-প্রজাদের সেখানে সহজে প্রবেশাধিকার মিলতো না। দীন-দুঃখী প্রজাদের জন্য রাণী কাথ্‌রিন্‌ দেশের অনেক জায়গায় বহু আতুরাশ্রম স্থাপনা করেছিলেন। এছাড়া দেশে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধার্থে রাণী কাথ্‌রিন্‌ ভালো হাসপাতাল আর চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রুশে সে-সময়ে দুরন্ত বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশী। সে-রোগের প্রতিবিধান-কল্পে, রাণী কাথ্‌রিন-রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম বসন্তের টিকা নেওয়ার রীতি প্রচলন করেন। সংস্কারাচ্ছন্ন-রুশবাসীদের ভ্রান্ত-ধারণা মোচনের উদ্দেশ্যে রাণী কাথ্‌রিন সকলের আগে নিজের অঙ্গে বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক-টিকা গ্রহণ

'জার' নিকোলাসের আমলে প্রকাশ্যভাবে মহিলাকে চাবুক মারার রীতি—প্রাচীন রুশ প্রতিলিপি

করেছিলেন। নিজে সুশিক্ষিতা ছিলেন বলেই কাথ্‌রিনের বিদ্যোৎ-সাহিতা ছিল অপরিসীম। তাঁর আমলে, সুপ্রসিদ্ধ রুশ-বিজ্ঞানবিদ্‌ ও কবি-দার্শনিক লোমোনোসভ্‌ বিশেষ সমাদর-লাভ করেছিলেন। এছাড়া রুশ-কবি দ্বেরঝাভিন্‌ এবং বিখ্যাত-ঐতিহাসিক কারাম্‌জিন্‌ও রাণী কাথ্‌রিনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। নোভ্‌গোরোদের শাসনকর্ত্তা সিভার্সে'র পরামর্শে প্রগতি-পন্থী রাণী কাথ্‌রিন্‌ দেশের কৃষি-

ব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে রাজ্যের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে একটি অর্থনৈতিক-সংসদ (Free Economic Society) গঠন করে রীতিমত গবেষণা-অনুশীলন চালিয়েছিলেন। কাথ্‌রিনের আমলে দরবারে বীর-যোদ্ধাদেরও বিশেষ খ্যাতি ছিল। রাণীর এই অসীম গুণগ্রাহিতার ফলেই আলেকজান্দার্‌ সুভোরোভ্‌ নামে এক সুদক্ষ-বীর যুদ্ধ-বিদ্যায় অতুলনীয় পারদর্শিতা-লাভ করে রাজ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হন।

সম্রাজ্ঞী-হিসাবেও রাণী কাথ্‌রিনের দক্ষতা ছিল অসাধারণ! অতি-বড় বিপদের মাঝেও কাথ্‌রিনের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যেতো না··· রাজ-কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি ছিলেন নির্ভীক, অটল। কূটনৈতিক-ব্যাপারেও তাঁর নিপুণতা ছিল অসামান্য। বিদেশিনী হয়েও বিরাট রুশ-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে প্রবল-প্রতাপে তিনি রাজ্য-শাসন করে গেছেন সুদীর্ঘ-কাল।
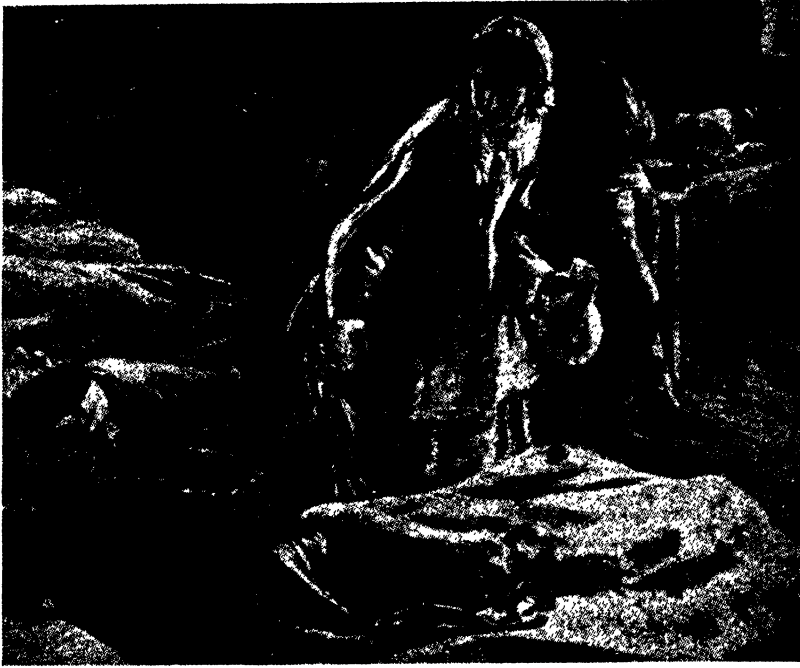
১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে কাথ্‌রিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পল্‌ সিংহাসনে বসেন। পল্‌ যখন রাজা-নির্ব্বাচিত হন—তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। দেখতে তিনি ছিলেন দারুণ কুশ্রী-কদাকার এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল উদ্ভট-খেয়ালী···পাগলাটে-গোছের। এ-সব খুঁত থাকা সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন পরম উদার-পন্থী এবং কঠোর শাসক। পলের কড়া-শাসনে, রাজ্যে দুর্নীতিপরায়ণ-অমাত্যবৃন্দের যথেচ্ছ-অনাচার ও প্রজা-পীড়নের মাত্রা বিশেষ হ্রাস পেয়েছিল; দেশের কৃষি ও শ্রমজীবী দীন-দরিদ্র সাধারণ-প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন সব বিধান করেছিলেন যে, তার ফলে তাদের অপরিসীম-খাটুনীর জের অনেকখানি কমে গিয়েছিল। উপরন্তু, পলের ধমনীতে প্রুশিয়ান-রক্ত প্রবাহিত থাকার দরুণ, দরবারের অনাচারী রুশ-অমাত্যদের প্রতি তাঁর ছিল বিজাতীয়-আক্রোশ। সে-আক্রোশের বশে যে-কোনো সামান্য ছুতো-নাতায় রাজ্যের সম্ভ্রান্ত অমাত্য-অনুচরদের তিনি প্রকাশ্যে নির্ম্মম-ভাবে অপমান-অপদস্থ বা শাস্তি দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এমন কি, রাণী কাথ্‌রিনের জীবনান্তের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পরম-অনুরাগী অনাচারী-অমাত্যদের চূড়ান্ত-শিক্ষা দেবার জন্য পল্‌ যে কাণ্ড করেছিলেন, সে-কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হতে হয়! দেশের সম্ভ্রান্ত-অভিজাতদের সাদরে প্রাসাদে রাণীর শয়ন-কক্ষে আমন্ত্রণ করে এনে, তাঁদেরই চোখের সামনে, মৃত্যুশয্যা-শায়িতা কাথ্‌রিনের শব-দেহের পাশে কবর থেকে তুলে-আনা নিহত-সম্রাট তৃতীয় পিটারের গলিত-কঙ্কালটিকে শুইয়ে রেখে উদ্ভট-খেয়ালী রাজা পল্‌ মহা-আড়ম্বরে রাজ-মুকুট পরিয়ে তাঁর লোকান্তরিত পিতা-মাতার অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন! শুধু তাই নয়, পলের কঠোর-নির্দ্দেশে কাথ্‌রিন্‌ পিটারের গলিত-পূতিগন্ধময় শব-দেহের পাশে দাঁড় করিয়ে দুঃসহ নারকীয় যাতনা সয়ে মৃতা-রাণীর প্রণয়াসক্ত-অনুচরদের প্রত্যেককে দীর্ঘ দিন-রাত সমানে পাহারা দিতেও হয়েছিল। খামখেয়ালী-সম্রাটের উদ্ভট-পীড়নের ফলে, রাজ্যের অভিজাত-অমাত্য-বৃন্দ সে-আমলে এমন বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন যে, শেষে নির্ম্মম-চক্রান্ত এঁটে নিতান্ত নৃশংসভাবে তাঁরা পল্‌কে হত্যা করেন।

বালাক্লাভার ঐতিহাসিক যুদ্ধে আহত সেনাদের শুশ্রূষায় রত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

এমনি স্বেচ্ছাচারী-শাসন চালিয়ে মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর, ১৮০১ সালে পলের মৃত্যু হলে তাঁর সুদর্শন পুত্র আলেকজান্দার রাজ্যের রাজা হন। লোকান্তরিতা-পিতামহী কাথ্‌রিনের উদার-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুদক্ষ-সম্রাট আলেকজান্দার রাজ্য-বিস্তারে এবং রাজ্যের সংস্কৃতি-সাধনে বিশেষ মনোযোগী হন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের দিকেও ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। তাঁর সদয়-সহানুভূতির ফলে সে-সময়ে, দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা কতক উন্নতিলাভ করেছিল। যুদ্ধ-বিদ্যাতেও আলেকজান্দার ছিলেন বিশেষ কুশলী। রণ-জয় করে ফিন্‌লণ্ড্‌ দেশটি তিনি রুশ-রাজ্যভুক্ত করেন। ফিন্‌লণ্ড্‌-বিজয়ের পর, সে-দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করাও উদার-পন্থী আলেকজান্দারের এক স্মরণীয় কীর্ত্তি। সে-যুগে এ-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব!

সম্রাট আলেকজান্দারের রাজ্য-কালে ইউরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ ফরাসী-বীর নেপোলিয়নের আবির্ভাব ঘটে। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সারা ইউরোপ জুড়ে তিনি যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তার ঢেউয়ে সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যও রীতিমত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। দিগ্বিজয়ী-নেপোলিয়নের সঙ্গে অষ্টারলিৎজ্, ইলাউ এবং ফ্রায়েড্‌লাণ্ডের যুদ্ধে রুশ-শক্তিকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অবশেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিল্‌সিতে (Tilsit) নেপোলিয়ন এবং আলেকজান্দারের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে। সেখানে নাইমেন্ (Niemen River) নদী-বক্ষে রচিত অপরূপ-সুসজ্জিত 'ভাসমান-শিবিরে' মিলিত হয়ে তাঁরা চুক্তি করেন, দুজনে একজোটে সারা ইউরোপ জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবেন! চুক্তি হলেও আলেকজান্দার জানতেন—নেপোলিয়ন চান একাধিপত্য…আর কেউ পাশে থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত, এ ছিল তাঁর অসহ্য। কাজেই, বাইরে বন্ধুত্বের ভাব দেখালেও মনে-মনে দুজনেরই ছিল বেশ রেষারেষি। সাম্রাজ্য-লোভী নেপোলিয়নের আসল মতলব ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে আলেকজান্দারকে হারিয়ে রুশ-রাজ্য দখল করা। আলেকজান্দারের বশ্যতা-স্বীকারের পর রুশ-সহযোগিতায় ফরাসী-সেনাদলকে আরো সুদৃঢ়-শক্তিশালী করে তুলে সুদূর ভারতবর্ষের পানে বিজয়-অভিযান চালাবেন—নেপোলিয়নের ছিল অভিপ্রায়। সুচতুর আলেকজান্দারও ওদিকে, দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী-শত্রুদের উচ্ছেদ-কল্পে, প্রুশিয়ার অধিপতি ফ্রেড্‌রিক উইল্‌হেল্‌মের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত চালিয়েছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির মানসে প্রতাপশালী নেপোলিয়ন অবশেষে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রচুর সৈন্য নিয়ে আচম্কা রুশ-সীমান্ত আক্রমণ করে বসেন। ফরাসীদের এই অতর্কিত-আক্রমণের জন্য রুশ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সম্রাট আলেকজান্দার তখন 'ভিল্‌না'র প্রাসাদে 'বল্'-নাচের আসরে মত্ত…নেপোলিয়নের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি অবিলম্বে মস্কো-রাজধানীতে হাজির হলেন। দেশের সুদক্ষ সেনাপতিদের সাহচর্য্যে সৈন্যসমাবেশ করে সম্রাট আলেকজান্দার তৎক্ষণাৎ তাঁদের রণাঙ্গনে পাঠালেন।

সেভাষ্টোপোলের রণাঙ্গণে সৈন্য-সমাবেশের প্রাচীন প্রতিলিপি

মস্কোর কাছে সুবিস্তৃত 'বোরোদিনো'-প্রান্তরে ফরাসী-সৈন্যদের সঙ্গে রুশের তুমুল যুদ্ধ হলো। সে-যুদ্ধে রুশ-সেনাদল এমন অপূর্ব্ব রণ-চাতুর্য্য দেখালো যে, তাঁর দাপটে নেপোলিয়নের মত দুর্দ্ধর্ষ-বীর রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন! বিজয়-লাভে সমর্থ না হলেও এ-যুদ্ধে, নেপোলিয়নের প্রবল-সেনাদলের হাতে রুশ-ফৌজের অর্দ্ধেক প্রায় বিনষ্ট হয়। সম্মুখ-সমরে সুবিধা করতে না পেরে সম্রাট আলেকজান্দারের নির্দ্দেশে, রুশ-সেনাদল শেষে এক অভিনব 'গেরিলা' (Guerilla) কৌশল অবলম্বন করে। নেপোলিয়নের আস্তানা এবং শিবির ঘিরে রুশ-সৈন্য দারুণ অগ্নিকাণ্ড বাধালো…অগ্নি-চক্রের ব্যূহ! সে-ব্যূহ ভেদ করে নেপোলিয়নের পক্ষে সদলে নিষ্ক্রমণ ছিল অসম্ভব! বিপদ বুঝে নেপোলিয়ন আলেকজান্দারকে পত্র লিখে পাঠালেন—সন্ধি প্রার্থনা করে। আলেকজান্দার কিন্তু সে-পত্রের কোনো জবাব দিলেন না…মস্কো থেকে সেন্টপিটার্সবুর্গে সরে গিয়ে তিনি চুপচাপ বসে রইলেন।

নেপোলিয়ন পড়লেন মহা ফাঁপরে! বিপদের উপর বিপদ…রুশ-জনগণও ইতিমধ্যে ক্ষেপে উঠেছে! দেশের যত চাষা কুলী-মজুর সবাই একজোট হয়ে মেতে উঠলো বিদেশী-শত্রুদের নির্ম্মমভাবে উৎপীড়ন এবং উচ্ছেদ করতে। মস্কো রাজধানী এবং আশ-পাশের গ্রাম-সহর জ্বালিয়ে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে, ক্ষেত-খামার তছ্‌নছ্ করে, খাদ্য-শস্য নষ্ট করে সারা দেশ তারা এমন ছারখার করে দিয়েছিল, যে, শত্রু সৈন্যদের বরাতে না জোটে একমুঠো অন্ন, না মেলে মাথা-গোঁজবার ঠাঁই! চারিদিকে অভাব আর রিক্ততার ছায়া! তাছাড়া রুশের দুরন্ত-শীত আর প্রচণ্ড তুষার-পাতে, বিদেশী ফরাসী-সৈন্যদের দুরবস্থা ক্রমে অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠলো! নেপোলিয়নের শিবিরে, মড়ক-মহামারী দেখা দিল ব্যাপকভাবে…রোগে, কষ্টে, অনাহারে দারুণ দুর্দ্দশা-ভোগ করে নিতান্ত অসহায়-অবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ ফরাসী-সৈন্যেরা দলে-দলে প্রাণ হারাতে লাগলো।

চোখের সুমুখে এভাবে লোকক্ষয় হতে দেখেও ক্রেম্‌লিন্-প্রাসাদের হৃত-শ্রী, নির্জ্জন-কক্ষে বসে হতাশার নিশ্বাস ফেলা ছাড়া অবরুদ্ধ-নেপোলিয়নের গত্যন্তর ছিল না! এক দিকে নিদারুণ অগ্নি-ব্যূহ-চক্র…অন্য দিকে প্রমত্ত রুশ-জনতার অপরিসীম নির্য্যাতন…এ-দুয়ের মাঝে অমিত-বিক্রমী নেপোলিয়নের দুর্দ্দশা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে ছিল। শেষে একান্ত-নিরুপায় হয়ে স্মোলেনস্ক্ এবং ভিল্‌নার বিজন প্রান্তর-পথে নেপোলিয়ন সদলে পলায়নপর হলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে 'বোরোদিনো' নদী। ঐ-নদী পার হয়ে নেপোলিয়ন রুশ-অভিযানে এসেছিলেন একলাখের বেশী সৈন্য নিয়ে, কিন্তু রুশের প্রচণ্ড শীতে, এই

অভাব-কষ্টে—আর প্রমত্ত জনগণের নির্মম-উৎপীড়নে বিপর্য্যস্ত হয়ে দেশে ফেরাবার সময় 'বোরোদিনো' পার হয়ে তিনি দেখেন, তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষাট হাজার···চল্লিশ হাজার সৈন্য সাফ্ হয়ে গেছে এর মধ্যে !

রুশ-পরাজয়ের গ্লানি-মোচনের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরে এসে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করে আবার অভিযানে বেরুলেন। এবারে তাঁর সঙ্কল্প—মধ্য-ইউরোপের রাজ্যগুলি অধিকার করা। রুশ-সম্রাট আলেকজান্দার ওদিকে হাত মেলালেন অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার সঙ্গে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পর-পর দুটি যুদ্ধে নেপোলিয়ন এই 'ত্রি-শক্তিকে' পরাজিত করে সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হন। সে-সন্ধি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কিছুদিন পরেই 'ত্রি-শক্তি' প্রবল যুদ্ধে নেপোলিয়নের সেনাদলকে পরাস্ত করে। অবশেষে 'লাইপ্‌জিগে'র তুমুল-সংগ্রামে 'ত্রি-শক্তি'র কাছে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। আলেকজান্দারের অধিনায়কত্বে 'ত্রি-শক্তি' সেনারা প্রবল-বিক্রমে ফরাসী-মুল্লুকে এসে হানা দেয়। পরাভব-স্বীকারান্তে নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়···। বিজয়-গর্ব্বে আলেকজান্দার ১৮১৪ সালে পারিসে প্রবেশ করেন। অতঃপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের কাছে নেপোলিয়নকে মাথা নত করে সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হতে হয়। এ-সন্ধির ব্যাপারে অধিনায়ক ছিলেন রুশ-সম্রাট আলেকজান্দার। 'ভিয়েনা-সন্ধির' ফলে নেপোলিয়নের আক্রমণ-ত্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে সারা ইউরোপ অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো এবং রুশ-সম্রাট আলেকজান্দারের দৌলতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার দরুণ ইউরোপের রাজ-শক্তিবর্গের মধ্যে রুশ হয়ে দাঁড়ালো সবার অগ্রণী !

বালাক্লাভার ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রতিলিপি

এরপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে হেরে নেপোলিয়ন যখন চির-তরে সেন্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত হলেন, তখন ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলে সন্ধি-বদ্ধ হন,—আর যুদ্ধ বিগ্রহ নয়··· ইউরোপে শান্তি রক্ষা করতে হবে। এ-সন্ধি স্বাক্ষর-কালে, সম্রাট আলেকজান্দার সেন্টপিটার্সবুর্গ সহরে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। সে উৎসবে সেন্টপিটার্সবুর্গে (আধুনিক লেনিনগ্রাড্ সহর) আলেকজান্দার অপরূপ শিল্প-শ্রীমণ্ডিত প্রকাণ্ড একটি 'তোরণ' রচনা করেছিলেন। সে-তোরণ (Arch of Alexander I) আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে,—সোভিয়েট দেশের অতীত-ইতিহাসের অন্যতম গৌরব-নিদর্শন হিসাবে !

বিচক্ষণ-সম্রাট আলেকজান্দারের রাজ্যকালে রুশে আরো এক স্মরণীয়-ঘটনা ঘটেছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যের অগণিত 'দাসের' (Serfs) দলও রাজ-সৈন্যের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ-শত্রু-বিতাড়নে বিশেষ সহায়তা করেছিল। দাসের দল তখন অর্দ্ধ-চেতন হয়েছে··· তাহলেও, দাসত্ব-বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি মেলেনি ! গণ-জাগরণের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করেছিল, শক্তি-সামর্থ্যে তারা হীন নয়···বরং বলীয়ান। এই আত্মোপলব্ধি তাদের হলো দেশের দুর্দ্দিনে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিলে-মিশে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করার দরুণ।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ সম্রাট আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তরাধিকারী-হীন অবস্থায় 'জার্' আলেকজান্দারের মৃত্যু হলে তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত সম্রাট পলের তৃতীয় পুত্র নিকোলাশ (Nicholas I) সিংহাসনে বসেন। নিকোলাশ যে সময়ে রাজা হন, রুশ-দেশে তখন পরম-যুগসন্ধিক্ষণ ! ফরাসী-বিপ্লবের পর, অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সারা ইউরোপ জুড়ে আভিজাত্য-বিনাশী গণ-জাগরণের যে নব্য-ভাবধারা, আদর্শের যে ব্যাপক-প্লাবন বইতে সুরু করেছে, তার উত্তাল ঢেউ এসে লেগেছিল রুশ জনসাধারণের মনে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রুশ জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ বেশ প্রবল হয়ে ওঠে··· 'জার্'-অনুগৃহীত রাজ-অমাত্যবৃন্দের অবজ্ঞা-নির্য্যাতন রহিত করতে দেশের সাধারণ প্রজারা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পে গণ-জাগরণের এ-সাড়া প্রকাশ পেতে লাগলো ব্যাপকভাবে ! সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-সাহিত্যিক ভলতেয়ার, জার্ম্মান-দার্শনিক হেগেল—এঁদের লেখা পড়ে, নব-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রাশিয়ার জনসাধারণ চেতনা পেলো। রুশদেশের সাধারণ প্রজাদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা আর দুর্ভোগ-নির্য্যাতন দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে, স্বার্থান্ধ-উদাসীন 'জার্'-আভিজাত্যের উচ্ছেদসাধন-কল্পে ওদেশের যে-সব মুক্তিকামী বিদ্রোহী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-দার্শনিক এবং সমাজ-সংস্কারকের দল প্রপীড়িত দেশবাসীদের গণতন্ত্রের মহান আদর্শে সে-যুগে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় হলেন—সুবিখ্যাত রুশ-কবি আলেকজান্দার পুশকিন্, যশস্বী-লেখক নিকোলাই গোগোল, ইউক্রেনের লোক-কবি তারাস্ শেভচেঙ্কো, প্রখ্যাতনামা কবি-নাট্যকার মাইকেল লিয়েরমনটভ, সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ফিদোর্ ডষ্টয়েভস্কী, প্রথিতযশা

নাট্যকার-সমালোচক ভিসারিয়োঁ বেলিন্‌স্কী এবং স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ্‌ স্যাভোফিল্‌ উরী সামারিন্‌। অভিজাত 'জার্‌'-অধ্যুষিত রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-সাধনে, সেকালে এই সব প্রগতিশীল দেশপ্রেমী-মনীষীদের যে অপরিসীম নির্য্যাতন আর সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল—তার তুলনা জগতের ইতিহাসে খুব কমই মেলে। এঁদের এই একনিষ্ঠ সাধনা আর অপরূপ আত্মোৎসর্গের ফলেই দিনে-দিনে সুবিশাল সোভিয়েট দেশে প্রজাতন্ত্রের পত্তন কায়েমী হতে পেরেছে। অতীত যুগের এই সব জনকল্যাণকামী মহাত্মাদের পুণ্য-স্মৃতি পূজাকল্পে সোভিয়েট দেশবাসীরা আজ যে শুধু রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র বিরাট বিবিধ সৌধ-মন্দির, এবং মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি রচনা করে রেখেছেন তাই নয়, দেশের প্রত্যেকটি সহরে এবং গ্রামে বিভিন্ন পথ-ঘাট, সরকারী ভবন ও বিশিষ্ট জনপ্রতিষ্ঠান-গুলিও বিগত দেশপ্রেমীদের নামে উৎসর্গিত করে নিজেদের অন্তরের সশ্রদ্ধ-সম্মান জানান নিত্য-নিয়ত।

নিকোলাশের রাজ্য-শাসনের গোড়াতেই গণতন্ত্রবাদী-সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল পেস্তেল এবং তাঁর সহধর্ম্মী আরো চারজন বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীর নেতৃত্বাধীনে বিক্ষুব্ধ রুশ-প্রজারা অবশেষে ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'জার্‌'-সম্রাটের বিরুদ্ধে তুমুল বিপ্লব বাধিয়ে তোলেন। ডিসেম্বর মাসে এ-বিপ্লবের সূচনা—রুশ ইতিহাসে এর নাম 'Decembrist Revolt' বা ডিসেম্বর-বিপ্লব'। বিপ্লবীদের দলে শুধু যে বিক্ষুব্ধ প্রজা-সাধারণ আর বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীরাই ছিলেন তা নয়, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য অনেকেই গোপনে এ-বিপ্লবে যোগদান করে ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবশ্য ইউরোপের তৎকালীন নব্য-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত…এঁদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত জীর্ণ প্রাচীন 'জার্‌' শাসন ও ঘুণধরা আমলা-তন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ায় নূতন আদর্শে নবীন গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা। কিন্তু সুসংবদ্ধতার অভাবে এবং বিপ্লবীদের মধ্যে মতদ্বৈধতার ফলে এ-বিপ্লব বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারলো না। 'জার্‌' নিকোলাশের সুদক্ষ সেনাবলের সঙ্গে সংঘাতে সেন্ট্‌পিটার্সবুর্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাড) সহরের সুপ্রসিদ্ধ 'উইণ্টার প্যালেস্‌' প্রাসাদের সামনে 'ডিসেম্বর-বিপ্লবীদের' শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বিদ্রোহ-দমনের পর সম্রাট নিকোলাশের আদেশে নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে বিপ্লবী-নেতাদের হত্যা করা হয়।

এমনিভাবে বিদ্রোহ দমন হলেও গণ-বিক্ষোভের আগুন কিন্তু নিভলো না…ছাই-চাপা তুঁষের মত সে আগুন জ্বলতে লাগলো সারা রাশিয়া জুড়ে। রাজ্য-সংস্কারের অজুহাতে, কঠোর শাসন-বিধান আর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চালিয়ে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের শায়েস্তা রাখার উদ্দেশ্যে 'জার্‌' নিকোলাশ সে-যুগে যে সব অমানুষিক বর্ব্বর বিধি-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, সে কাহিনী শুনলে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়! নিকোলাশের নির্ম্মম অনুশাসনের ফলে, রুশদেশের দরিদ্র অসহায় চাষী-মজুর এবং জন-সাধারণের দুরবস্থা দিন দিন প্রায় কুকুর বেড়ালের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আমলে তাদের না ছিল কোনো স্বাধীনতা…না ছিল মনের সুখ-শান্তি বা উন্নতির এতটুকু আশা! সারা জীবন উদয়াস্তকাল ধরে শুধু রাজা আর রাজানুগৃহীত অভিজাত-আমলাবৃন্দের কেনা গোলাম হয়ে, যথেচ্ছ পীড়ন সয়ে মনিবের খেয়াল চরিতার্থ করা এবং মুখ বুজে বেগার-খাটাই ছিল তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-মোক্ষ! সামান্য কারণে, অর্থাৎ পাণ থেকে চুণ খশলেই রাজার কড়া-বিধানে রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী কর্মচারীর দল চামড়ায় মোড়া তারের মোটা মোটা চাবুক (Knout) হাঁকড়ে প্রকাশ্যভাবে বেপরোয়া অবাধ্য অপরাধী রুশপ্রজাদের বেয়াদবির চূড়ান্ত শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না। এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত এই জঘন্য-বর্ব্বর চাবুকের মারার হাত থেকে রেহাই পেতেন না এতটুকু! নিকোলাশের আমলে রুশদেশের এই নৃশংস নির্ম্মম চাবুক মারার প্রথা, সারা ইউরোপে এমন নিদারুণ কুখ্যাতি লাভ করেছিল যে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মাদাম্‌ কালের্গী নামে 'ওয়ারস'র' (Warsaw) এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে চাবকানোর সাজা বন্ধ করার জন্য ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত এক মাসিক-পত্রিকার তরফ থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কাছে পর্য্যন্ত সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানানো হয়েছিল। চাবকানী ছাড়া 'জার্‌' নিকোলাশের রাজ্যকালে রাজ-বিধানের বিরুদ্ধ সমালোচনা বা অবহেলা করলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে রুশ জনসাধারণকে লোকালয়-বর্জ্জিত নির্জ্জন-নিঃসঙ্গ সুদূর-প্রান্তরে কিম্বা সাইবেরিয়ার যন্ত্রণাদায়ক-বন্দীশালায় সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে পাঠানো হতো। এছাড়া প্রজাদের বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্র এবং ক্রিয়াকলাপের তদারকী এবং তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'জার্‌' নিকোলাশ সারা রাশিয়ার বুকে একরাশ দুর্দ্ধর্ষ সুচতুর গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন। এই সব রাজ-গোয়েন্দার দল সামান্য সন্দেহে, সামান্য ছুতো-নাতায় দেশের লোকজনের উপর যথেচ্ছ জুলুম চালিয়ে ঘর-বাড়ী তল্লাশী, গ্রেপ্তার এবং নির্ম্মম-কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে সারা রুশ-রাজ্য আতঙ্ক-বিভীষিকায় কাঁপিয়ে তুলেছিল। রাজ-গুপ্তচরদের দোর্দ্দণ্ড-দাপটে রাশিয়ার অসহায় জন-সাধারণ এমনই নাস্তানাবুদ এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে কোনোমতে বেঁচে থাকাও সে-সময়ে নিতান্ত দুর্ব্বিসহ বলে মনে হতো তাঁদের কাছে!

এই নিদারুণ-কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করেই 'জার্‌' নিকোলাশ্‌ অনুগৃহীত অভিজাত-আমলাদের সহায়তায় সুদীর্ঘকাল (১৮২৫-১৮৫৫) একাধিপত্য করে গেছেন রুশ-সিংহাসনে বসে। দেশে গণতান্ত্রিক-মতবাদের অঙ্কুরও যাতে মাথা তোলবার সুযোগ না পায়—সেদিকে ছিল তাঁর প্রখর-সজাগ দৃষ্টি! রাজ্য-রক্ষার ব্যাপারে নিকোলাশের এই কড়া-নজরের ফলে, সে-যুগের লোকেরা পরিহাসছলে তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'ইউরোপের কোতোয়াল'! ব্যঙ্গ হলেও, 'জার্‌' নিকোলাশের এই নূতন নামকরণের পিছনে তারিফ-প্রশংসারও আভাস ছিল অনেকখানি। রাজ-একাধিপত্য বজায় রাখার দিকে 'জার্‌' নিকোলাসের ছিল একাগ্র-জেদ। সে-জেদের দরুণ তিনি ১৮৩০ সালে সামন্ত-রাজ্য পোলাণ্ডের প্রজা-বিপ্লব দমন করে গণ-জাগরণ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রসারের যা কিছু আশা-ভরসা সবই নির্ম্মমভাবে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আশপাশের প্রতিবেশী-রাজ্যের কোথাও গণ-আন্দোলনের আভাস পেলেই, প্রতাপশালী 'জার্‌' নিকোলাশ্‌ সাগ্রহে ছুটে গিয়ে সে-বিপ্লব দলনে সক্রিয়-সহায়তা করতেন। এমনিভাবেই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে, প্রতিবেশী-রাষ্ট্র হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুদয় দমনে সম্রাট নিকোলাশ সসৈন্য-সহযোগিতা করে সে-দেশের বিপন্ন রাজ-শক্তি এবং রাজ-সিংহাসনের মান-মর্য্যাদা-আভিজাত্য অক্ষয় অটুট রেখেছিলেন! এই সবের দরুণ সারা ইউরোপের অভিজাত-রাজশাসকদের কাছে রুশ-সম্রাট নিকোলাশ পরম বন্ধু, সহায় ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৪-৫৫ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, সেভাস্তোপোল বন্দরে এবং বালাক্লাভার রণাঙ্গনে ইংরাজ এবং ফরাসীদের সম্মিলিত-সেনাপুঞ্জের কাছে রুশ রাজসেনাদলের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানিতে দুর্দ্ধর্ষ-জার্‌ নিকোলাশের গৌরব-গরিমা প্রতিপত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। লুপ্ত-মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার-মানসে সম্রাট নিকোলাশ্‌, প্রাণপণ-প্রচেষ্টায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, নিয়তির নির্ম্মম-বিধানে যুদ্ধ-ফলাফল নির্দ্ধারিত হবার আগেই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত অকস্মাৎ ভাবেই 'জার্‌' নিকোলাশের জীবনান্ত ঘটে!

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

৩০শে জানুয়ারি' ২৬
শিবপুর, হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে আনন্দ পেলাম। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বছর মাস দিয়ে মাপ্‌তে গেলেই ভুল হয়, অথচ এই ভুল অধিকাংশ লোকেই করে।

তুমি ফিরে এলে[১] আবার দেখা হবে। বাইরের লোকের জানাবার দরকার কি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজ শ্রীমান হরিদাস শাস্ত্রী থাকেন, খাঁটি মানুষ। তাঁকে বাস্তবিকই আমি বড় ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় তোমার আলাপ নেই, যদি পারো—পরিচয় কোরো, খুসি হবে।

আমার মেজভাই[২] এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। আরোগ্য হবার মুখে চলেছেন, আশা করি শীঘ্রই পুনরায় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

আমি ঠিক ভাল নই বটে, তবে মোটের ওপর আছি এক রকম। Constipationএর জ্বালাই হয়েছে আমার সব চেয়ে অশান্তি। রোজ রোজ তাল তাল হত্যুকি বাটা খেয়ে চালিয়ে যাচ্ছি।

সম্প্রতি একজন কোব্‌রেজ আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন এ রোগ মানসিক। অতএব মাস খানেকের মধ্যেই আমাকে নিরাময় করতে পারবেন। পারেন ভালই, না পারেন আমার হত্যুকি এবং Liquid parafin ত আর কেউ ঘুচোবে না। দিন কেটে যাবে।

আমার—স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১) উমাপ্রসাদবাবু এই সময় কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

(২) প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। আমি শয্যাগত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। এখন ভাল হইয়াছি। পথের দাবীর শেষ অধ্যায়টা[৩] যদি দেখানো প্রয়োজন জ্ঞান করত দেখাইয়ো। এখানে আমার ত নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই—এতদূরে যে-কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আসেন সত্যই খুসি হই।

খবরের কাগজ ত পড়ি না, তবে শুনিয়াছি, কলিকাতায় নাকি হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া-ঝাঁটি হইতেছে,—সে ত এতদিনে নিশ্চয় থামিয়া গিয়াছে।

সুধীর সরকার[৪] আজও বই ছাপানোর সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিল না। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।

রমাপ্রসাদ[৫] কেমন আছেন ?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিয়ো—ইতি ২৮শে চৈত্র, ১৩৩২

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু[৬], কাল রাত্রে তোমার চিঠি পেলাম। বোধ করি ৩১শে ভাদ্রই এই লিপিটুকু তোমার হাতে গিয়ে পড়বে—আর সেদিন আমার জন্মদিন, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। নিশ্চয়

(৩) এই সময় উমাপ্রসাদ বাবুদের বাড়ী থেকে "বঙ্গবাণী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার হ'ত। এই বঙ্গবাণী পত্রিকাতেই শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪) কলকাতার এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স নামক পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সত্বাধিকারী। ইনি প্রথমে "পথের দাবী" পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে রাজদ্রোহিতার ভয়ে প্রকাশ করতে রাজী হন নি।

(৫) উমাপ্রসাদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(৬) উমাপ্রসাদবাবুর ডাক নাম।

জানতাম এর আগে আর কিছু হবে না, কিন্তু একান্ন বছরে আর বিশ্বাস নেই। বলি, ভগবান এই যেন করেন। আমাদের বংশে পঞ্চাশ কেউ পূর্ণ করেনি, আমিই প্রথম।

কলকাতা থেকে এসে পর্য্যন্ত এক প্রকার যেন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম। অর্শ থেকে ভয়ানক রক্ত পড়তে সুরু হয়েছিল। এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তরসু একটা আর কাল একটা—আজ দেখচি আর রক্ত পড়ে নি।

তোমাদের বাড়ীর খবর কি? বেরি বেরি ভাল হ'ল কি? কি নাগাদ কলকাতায় ফিরবে?

কাল ভাবচি কলকাতায় যাবো। মণ্টু[৭] নেমতন্ন করেছে।

বইটার সম্বন্ধে নানা গুজব যে বাজেয়াপ্ত হবেই কিম্বা হয়েই গেছে।[৮] কিছু জানো?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৩

দাদা

সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী ২৭
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

বিজু, এবার দেখচি injectionএ কোনও সুবিধে হচ্চে না। রক্তপাত হচ্চে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মত[৯]।

হরিদাসকে[১০] লিখে দাও আমি এ সময় কোথাও যেতে পারব না। আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বোধ হয় আর এ অসুখ ভালও হবে না, স্থগিত ও থাকবে না।

দাদা

(৭) শ্রীদিলীপকুমার রায়।

(৮) পথের দাবী প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েকদিন পরেই তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

(৯) শরৎচন্দ্র অর্শে ভুগতেন। এখানে অর্শের রক্তপাতের কথাই বলছেন।

(১০) রাজনৈতিক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদবাবু শরৎচন্দ্রকে নদীয়া জেলার একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন।

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
জেলা—হাবড়া

বিজু, তোমার পাঠানো বইখানা পেয়েছি।[১১] ধন্যবাদ।

এই চিঠিখানা[১২] তোমাকে পাঠালাম কারণ আত্মশক্তির বর্ত্তমান সম্পাদকের[১৩] সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তুমি যদি তাঁকে বলে কিম্বা উপীনকে[১৪] বলে কয়ে এটা আত্মশক্তিতে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারো ত বড় ভাল হয়। আমার হাতের লেখা M.s.s টা তুমি চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখো।

আর যদি ছাপ্‌তে তাঁরা সম্মত না হন ত লেখাটা তোমার কাছেই রেখো, পরে দেখা যাবে।

৫ই আশ্বিন, '৩৪ দাদা

সামতা বেড়
পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু তোমার কাছ থেকে বহুকাল পরে চিঠি পেয়ে বড় আনন্দ লাভ করেছিলাম। যাবার[১৫] সময়ে যদি একবার দেখা করে যেতে কি জানি, হয়তো বা সত্যিই যাবার চেষ্টা কোরতাম। বহুদিন থেকে বদরীকাশ্রম দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু হয়ে উঠলো না। এবারের মত এ ইচ্ছে

(১১) শরৎচন্দ্র ফরাসী ভাষা কিছু কিছু জানতেন। তাই তিনি পড়বার জন্য মূল ফরাসী ভাষায় লেখা মোঁপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" (The cousins of the colonelle) এবং "বেলামি" (Bel-Ami) বই দুখানি কিনে উমাপ্রসাদবাবুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলেছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু তখন মোঁপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" বইখানি পাননি, মাত্র "বেলামি" বইখানি পেয়েছিলেন এবং এই বইখানিই তিনি সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(১২) "আত্মশক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৩৩৪ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের "আত্মশক্তি" পত্রিকায় মুসাফির লেখা "সাহিত্যের মামলা" নামক প্রবন্ধের পত্রাকারে প্রতিবাদ।

(১৩) গোপালচন্দ্র সান্যাল।

(১৪) বিপ্লবী ও সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র সান্যাল—উভয়েরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

(১৫) উমাপ্রসাদবাবু এই সময় মানস সরোবর ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

স্থগিত রইল। কারণ ইচ্ছে করবার বয়সটাও পার হয়ে গেছি।

তুমি লিখেছিলে ১৬ই মের আগে চিঠির জবাব দিতে। আজ ১৫ই মে। আশা করি এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে। তোমার চিঠি পাবার পরে থেকে অনেকবার মনে হয়েছে তোমার মা সঙ্গে ছিলেন, আমাদের কারও খাবার অভাবটা হোতো না। মস্ত সুযোগ বয়ে গেল।

আমার শরীর তেম্‌নিই চলচে। এ আর ভালো হোল না। আজকাল ডাক্তাররা বলছেন, এ হয়েছে আপনার শাপে বর। প্রাচীনকালে এ একটা Safty valve.

জ্বালা যন্ত্রণা তো নেই, এখন আমিও ভাব্‌তে সুরু করেছি এ একপ্রকার—সুবিধেই হয়েছে।

তুমি বাড়ী আসার পরে যদি সময় পাও একবার এদিকে এসো, তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

শুনেচি, ওদিকে নাকি চমৎকার লাঠি পাওয়া যায়। যদি মনে থাকে একটা আমার জন্যে এনো।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। প্রার্থনা করি তোমাদের যাওয়া-আসা যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়।

ইতি—১৫ই মে। ১৯২৮।

দাদা

Sarat Chandra Chatterjee
P 566 Monohar Pukur
Kalighat, Calcutta.

কল্যাণবরেষু,

বিজু তোমার চিঠি পেলাম। আমার স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ জেনো।

কালিয়া (যশোর) থেকে[১৬] পরশু রাত্রে ফিরেচি, আজ বাড়ী যাচ্চি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজ ভাই বেদানন্দর মৃত্যুর দিন। তার সমাধির কাছে দু-পাঁচ জনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্ত্তন করে। এই জন্যে যাওয়া। ৮।১০ দিন পরে ফিরবো।

৯ই কার্ত্তিক ১৩৪১, তোমাদের শুভার্থী

দাদা

(১৬) শরৎচন্দ্র কালিয়ায় এক সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলেন।

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
২রা আশ্বিন ১৩৪৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন injection দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভার দিয়ে মানুষে বেশ সুস্থ হয়ে বসে ঠিক সেই যায়গায়। উঃ কি এর ব্যথা! নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হরিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি। বেশি দিন ওখানে থেকো না, নইলে ফিরে এসে তোমার জন্যেও হয়ত এম্‌নি ব্যবস্থা করতে হবে। মুর্শিদাবাদে[১৭] যাবার দুর্ব্বুদ্ধি যে তোমার মাথায় কে দিলে তাই ভাবি। অন্যান্য কুশল।

শুভার্থী—দাদা

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
কলিকাতা। ১২ই কার্ত্তিক ১৩৪৩।

কল্যাণীয়েষু,

বিজু, কাল বাড়ী থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো তার কারণ বড় বৌ[১৮] নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। নইলে গরীব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারব না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ[১৯]

(১৭) মুর্শিদাবাদে উমাপ্রসাদবাবুর আত্মীয়-বাড়ী।

(১৮) শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

(১৯) রবিবাসরের উদ্যোগে উদয়ন-সম্পাদক অনিলকুমার দে সাহিত্য-বন্ধুর বেলিয়াঘাটাস্থ "প্রফুল্লকানন" নামক উদ্যানবাটীতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে সেদিন এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ৩১শে ভাদ্র সভা না হয়ে ২৫শে আশ্বিন তারিখে সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কবির সেই অভিনন্দনবাণীটি এই সঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন। তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভাল নই বটে, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। জ্বরটা গেছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও এবং দাঁদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্ম্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ-ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে; নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে; তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী; এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল তারপরে তেল ফুরিয়েছে—অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ-বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমনধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফস্‌লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ—এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ? যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষ পথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়—মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

খাদ্য—কুখাদ্য—অখাদ্য—

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঙ্গালার লোকের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়, উইমাটী খায়, বনের পাতা খায়?" তখন যাহা কল্পনাতীত ছিল, বাঙ্গালায় মানুষের সৃষ্ট ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তাহাই স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং তদবধি পশ্চিমবঙ্গের নরনারী অন্নকষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। সেই দুর্ভিক্ষের সময় সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে লোককে যে খাদ্যের জন্য কুখাদ্য ও অখাদ্য ভক্ষণ করিতে হইতেছে, তাহা জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশ-বিভাগের পরে স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রের সরকার সে অবস্থার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। তাহা লজ্জার কথা। পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক সরকার প্রদেশকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে অক্ষমতারও সেই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিবার কথায় বলেন—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে—যাঁহারা আজ সরকার পরিচালিত করিতেছেন তাঁহাদিগের কার্য্যফলে—যে সকল হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্যই এমন হইয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী হিসাব হইতে কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব নাই, অথচ বলা হইতেছে, চাউলের অভাব।

যাঁহারা সরকারী হিসাব অবলম্বন করিয়া এইরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহাদিগের ভুল পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখাইতে পারিতেছেন না : সুতরাং যাহা বলিতেছেন, তাহাকে গোঁজামিল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। প্রথমে খাদ্য-সচিব সেই গোঁজামিল দিতে যাইয়া যে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কেবল চাউলের নহে—পরন্তু দাইলের, গোল আলুর, দুগ্ধের, মৎস্য ও মাংসেরও অভাব তাহার আলোচনা আমরা গত মাসে করিয়াছি। তাহার পরে প্রধান-সচিব সেই সুরে সুর মিলাইয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে খাদ্যের নামে যে অখাদ্য দেওয়া হয়, তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে—বিদেশ হইতেও চাউল আনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়, সুতরাং ভাল মন্দ দেখা চলে না। এ দেশে চলিত কথা—"ভিক্ষার চা'ল—তা' আবার কাঁড়া আর আকাড়া!" কিন্তু বিদেশ হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনা হয় না—ন্যায্য মূল্যেরও অধিক মূল্য দিয়া কিনিয়া আনা হয়। সুতরাং ভাল মন্দ দেখিয়া আনা অসম্ভব হইতে পারে না। আর তাঁহার কথায় দুইটি বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে :—

(১) দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও স্বদেশী সরকার কৃষিপ্রাণ পশ্চিমবঙ্গকে তাহার প্রধান খাদ্যোপকরণ চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

(২) সরকার যে হিসাব করিতেছেন, তাহা রেশনে ১২ আউন্স খাদ্যোপকরণ প্রদান করা ধরিয়া।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে প্রদেশকে খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে না পারা সরকারের অক্ষমতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কি বলা যায়?

আর রেশনের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা প্রধান-সচিবকে তাঁহার একটি উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ (১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রমুখ মহিলাদিগের মিছিলের প্রতিনিধিদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন—

"My view is that 16ozs of food should be provided for every person."

অর্থাৎ আমার মত এই যে, প্রত্যেক লোককে ১৬ আউন্স খাদ্য দিতে হইবে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে যে তিনি সে ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাহা কি তিনি কলিকাতায় ভূমিতলে রেল পরিচালন, সরকারী পরিবাহন-বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার আয়োজন—এই সকল বহুব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার অসাফল্যের দুশ্চিন্তায় ভুলিয়া গিয়াছেন? এই পাঁচ বৎসর অপূর্ণাহারে থাকিয়া যাহারা তিলে তিলে মরিয়াছে তাহাদিগের মৃত্যুর দায়িত্ব কি তাঁহাকে ও তাঁহার সহসচিবদিগকে পীড়িত করিতেছে না? খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে চারিদিকে অভাব; তিনি কেবল বলেন নাই, পশ্চিমবঙ্গে সচিবের অভাব নাই।

প্রধান-সচিব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মাছ, ডিম প্রভৃতি আসিত, এখন না আসায় অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু দেশের লোক কি জানে না যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে খাদ্যোপকরণ না আসিলেও ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশ ও সকল বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী হইতেছে? তবুও লোককে কি কারণে অপূর্ণাহারে থাকিতে হয়, তাহা কি তিনি বলিতে পারেন?

খাদ্যোপকরণের অভাব দূর করিবার জন্য কত উপায় যে অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহা ব্যর্থ হইয়াছে ও লোকের পক্ষে পীড়াদায়কই হইয়াছে,

তাহা পশ্চিমবঙ্গের লোক অনুভব করিয়াছে। লোককে জমী হিসাবে ধান দিতে বাধ্য করা সে সকলের অন্যতম। এতদিনে প্রধান-সচিব কবুল জবাব দিয়াছেন, তাঁহার সুযোগ্য পুলিস—সাংবাদিকদিগকে প্রহার করিতে পারে বটে, কিন্তু গুলী চালাইয়াও লুকান ধান বাহির করিতে পারে নাই। তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—ইহার কারণ হয় লুকান ধান নাই, নহে ত কোন অপ্রকাশ্য কারণে পুলিস তাহা বাহির করিতে বিরত হইয়াছে। ইহার কোন্‌টি তিনি গ্রহণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

চাউলে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে যখন সন্দেহের অবকাশ আছে, এখন নিয়ন্ত্রণ বাতিল করিয়া ফল লক্ষ্য করা কি অসঙ্গত?

এ কথা কি সত্য যে—

(১) উড়িষ্যায় বনে যে চাউল পূর্ব্বে হস্তীকে খাওয়ান হইত, তাহাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্গত মূল্যের অসঙ্গত রূপ অধিক মূল্যে কিনিয়া লোককে রেশানে লইতে বাধ্য করিয়াছেন?

(২) অন্য প্রদেশে যে চাউল মানুষের অখাদ্য বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহাও আনা হইয়াছে?

(৩) কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সময় অন্যান্য প্রদেশ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বর্জ্জন করিতেই আগ্রহশীল, সেই সময়েও যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা বহাল রাখিতে চাহেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়?

কেন্দ্রী সরকারের মন্ত্রীর সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবদিগের আলোচনার ফলে যে পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর ধান ও চাউল লোকের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লইবেন না বা সংগ্রহ করিবেন না।

(২) কেন্দ্রী সরকার কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানে রেশন-ব্যবস্থা আছে সে সকলের জন্য মাসিক ৩০ হাজার টন চাউল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৩) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও রেশনিং অঞ্চল বেষ্টনিবদ্ধ থাকিবে; পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রদেশের বাহিরে ধান ও চাউল প্রেরিত হইতে পারিবে না—রেশনিং অঞ্চলে বাহির হইতে ধান ও চাউল আসিতে ও পারিবে না।

(৪) রেশনে যে খাদ্যোপকরণ দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্ববৎ থাকিবে।

(৫) লুকান ধান ও চাউল বাহির করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করা হইবে।

(৬) লোককে (চাউলের পরিবর্ত্তে) অধিক পরিমাণ গম বা গমজাত খাদ্যোপকরণ ব্যবহারে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

(৭) যদি সরকার ধান্য ও চাউল সংগ্রহে বিরত হওয়ায় কোন অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের মূল্য অসঙ্গতরূপ হ্রাস পায়, তবে সরকার চাষীর স্বার্থ রক্ষার্থ তথায় ধান্য ও চাউল কিনিবেন।

এই ৭ দফার মধ্যে পঞ্চম দফার জন্য যে অনাচার অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। ষষ্ঠ দফার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু মূল কথা—কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে কেন মাসে ৩০ হাজার টন চাউল লইতে হইবে? যতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সত্য সত্যই চাউলের অভাব আছে, ততক্ষণ তাঁহারা যেমন মাসিক ৩০ হাজার টন চাউল পাইবার অধিকারী নহেন, কেন্দ্রী সরকারও তেমনই উহা দিতে বাধ্য নহেন। অভাব কোন সচিবের বা সচিবদলের কথায় প্রমাণিত হয় না।

আর একটি কথা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশে ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় কি ফললাভ হইয়াছে?

শুনা যাইতেছে, জাপানী প্রথায় চাষের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু দেশে যে সকল প্রথা অবলম্বন করিলে সত্য সত্য ফলন বৃদ্ধি পায়, সে সকল কি নিঃশেষ করা হইয়াছে? আশা করি, জাপানী প্রথায় চাষের ফল ডেন-মার্কের প্রথায় সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া কলিকাতায় মৎস্যের অভাব দূর করিবার মতই হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু অকারণ ব্যয়বাহুল্যহেতু করদাতাদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইবে না।

বেকার-সমস্যা—

কেন্দ্রী সরকারের মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বেকার সমস্যা লইয়া যেন বিব্রত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খাস কলিকাতায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার বেকার অন্নার্জ্জনের জন্য চাকরীর চেষ্টায় পথে ঘুরিতেছে। সরকারী হিসাব—কলিকাতার অধিবাসীদিগের সংখ্যা ২৫, ৬৯, ৭০০; তাহাদিগের মধ্যে ১৭, ৭৭, ২০০ জনের বয়স ১৬ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর এবং অবশিষ্টের সংখ্যা ৭, ৯২, ৫০৫—যাহা-দিগের বয়স ১৬ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর তাহাদিগের মধ্যে প্রায় শত-করা ৬২ জন বাঙ্গালী এবং শত-করা প্রায় ৩৭ জন অবাঙ্গালী। যাহাদিগের বয়স ১৬ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর, তাহাদিগের মধ্যে—

কার্য্যে রত—৮,৫৫,১০০ জন

কাজের চেষ্টা করিতেছে—২,৫৭,৩০০ জন

অবশিষ্ট—৬,৬৪,৮০০ জন

যাহারা কাজের চেষ্টা করিতেছে, তাহারাও বেকার।

এই হিসাব কতটা নির্ভুল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অবস্থাও যে ভয়াবহ, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারত সরকার যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেখাইয়া লোককে আশা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাতেও পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। কখন বা ভারত সরকার বলিতেছেন, প্রাথমিক পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে শিক্ষক হইতে বাধ্য করা যায় কি না, তাহা বিবেচনা করা হইবে; কখন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছেন।

প্রথমে দেখা যাইতেছে, সরকার শিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যা সম্বন্ধেই সমধিক অবহিত ও উৎকণ্ঠিত। ইহার কারণ হয় ত এই যে, ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের ও মিশরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে—

"It is at the point where education and starvation meet that the flame breaks forth."

সেই জন্যই বাঙ্গালার গভর্ণররূপে সার জন এণ্ডারশন এদেশে সন্ত্রাসবাদের নিদান-নির্ণয়-চেষ্টায় বলিয়াছিলেন—অবস্থা যে শোচনীয় সরকার তাহা অনবগত নহেন ; কারণ দেখা যাইতেছে—

"Year after year our youngmen are growing up—ago and our girls now,—to find no outlet for their energies".

বৎসরের পর বৎসর যে তরুণ তরুণীরা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহারা তাহাদিগের উদ্যম ও উৎসাহ প্রযুক্ত করিবার পথ পাইতেছে না।

হয়ত বেকার অবস্থাই সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ না-ও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে মনের যে অবস্থা ঘটে, তাহা সন্ত্রাসবাদের উপযোগী।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই ইংরেজদিগেরই এক জন স্বীকার করিয়াছেন, ইহার ফলে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইবে, তাহাদিগকে লইয়া সরকার কি করিবেন—তাহাতে সমাজের কি অবস্থা ঘটিবে? তিনি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহার প্রতিকারোপায় অবলম্বন করেন নাই। স্বদেশী সরকারও যে করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। বেকার—উপার্জ্জনে অক্ষম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে যদি বলা হয়—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত অনাহার বা অপূর্ণাহার সহ্য কর, তবে তাহা উপহাসের মতই শুনায়। তাহাতে কি ফল ফলিবে?

অথচ বেকার-সমস্যা নানারূপ দুর্নীতিতে সমাজ কলুষিত করে এবং তাহাতে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, তাহা যখন আগ্নেয়গিরির অন্তরস্থিত গৈরিকস্রাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাই বিপ্লবের রূপ—তাহাই ফরাসী বিপ্লবে দেখা দিয়াছিল, আইরিশ ও রুশ বিপ্লবে দেখা দিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন নানা দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, তুরস্ক—যে যাহার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। সে সকল মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে হয়ত এ দেশের সরকার দেশের উপযোগী ব্যবস্থার সন্ধান পাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা কি তাহা করিতেছেন? সরকারের সহিত দেশের জনগণের যোগ নাই ; সরকারী কর্ম্মচারীরা আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন—কেহ কেহ শিষ্টাচার পদদলিত করিয়া অধিকাংশ লোককে "তুমি" ব্যতীত "আপনি" বলেন না!

সচিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি ব্যতীত শিক্ষিত বেকারদিগকে কাজ দেওয়া যায় না।

বেকার-সমস্যা কেবল শিক্ষিত সমাজেই নিবদ্ধ নহে। পশ্চিম বঙ্গে কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের অবলম্বন ; উটজ শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্পের গুরুত্ব অধিক। কৃষি ও বয়ন শিল্পের আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?

কৃষককুল মহাজনের ঋণভারে পিষ্ট—উৎসাহ ও আশা উভয়ে বঞ্চিত। কোন ইংরেজ শাসক বলিয়াছিলেন :—

"The province is not poor either in natural resources or in manpower, but there must, I feel, be some maladjustment somewhere in a system which keeps a vast agricultural population groaning under a load of debt, eking out a narrow and penurious existence and yet, in most districts, lacking useful occupation for nearly nine months out of the twelve."

কৃষক ঋণে জর্জ্জরিত, কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—অথচ বৎসরে প্রায় ৯ মাস কাল কোন উপার্জ্জন-সহায় কাজ পায় না।

ইহার কারণ, এ দেশ কৃষিপ্রধান ছিল, কিন্তু কৃষিপ্রাণ ছিল না। দেশে নানারূপ উটজ শিল্প লোককে অবসরকালে ব্যাপৃত ও উপার্জ্জনক্ষম রাখিত। সে সব লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষির উন্নতির উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে না—পথের অভাবে কৃষিজ পণ্য নিকটবর্ত্তী সহরে বা বন্দরে আনাও ব্যয়সাধ্য।

আর বয়ন শিল্প যে সরকারের সুতাসরবরাহ সম্বন্ধে নিত্য নূতন নিয়মে, অভাবে ও অনাচারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ, পুনর্নিয়ন্ত্রণ—এই সকলে শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ দুষ্কর হওয়া অনিবার্য্য।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তৎকালীন সরকার বাঙ্গালার বিভিন্ন উটজ-শিল্পের সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল হইতে বর্ত্তমান সরকার, ইচ্ছা করিলে, অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা তাহা করিবেন কি না বলিতে পারি না। মধ্যে উটজ শিল্পের পরিচালন-পদ্ধতিতে উন্নতি সাধনের চেষ্টা বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পে উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে নূতন নূতন উটজ শিল্প ও ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি, নাটাগড়ের তালা প্রভৃতি আর দেখা যায় না। যশোহরের চিরুণী, টুথব্রাস প্রভৃতি মধ্যে আদর লাভ করিয়াছিল। ঢাকার শঙ্খ-শিল্পীরা অনেকে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছে। যদি বর্ত্তমানের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যায়, তবে যে বেকার-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ঢাকায় কাশিদা নামক যে কাপড়ে মুগার কাজ করা টেবল ঢাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, পশ্চিমবঙ্গে তাহা প্রস্তুত করান সহজসাধ্য। পূর্ব্বে হুগলী জিলায় "চিকন" দরিদ্র নারীরা গৃহকর্ম্মের অবসরকালে প্রস্তুত করিত এবং বিদেশেও তাহার চাহিদা ছিল।

বড় বড় কলকারখানার জন্য প্রভূত মূলধন প্রয়োজন—তাহা সহজে সংগৃহীত হয় না। কিন্তু উটজশিল্প সহজে—বিশেষ একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত করা যায়। সে জন্য সরকারের শিক্ষাদানের ও সাহায্যের (আর্থিক ও বিক্রয়-ব্যবস্থার) প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যার সমাধান বক্তৃতার দ্বারা হইতে পারে না। সে জন্য দেশের জনগণের প্রতি প্রকৃত—আন্তরিক সহানুভূতির ও সযত্নে উপায় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যা যাহাতে সমাজে দুষ্টক্ষতের মত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ ও অশান্তি—

কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ ও অশান্তি যে প্রবল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার ফল যে অভিপ্রেত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ইহাতে এক দিকে যেমন শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন, অপর দিকে তেমনই অনিশ্চয় অবস্থার জন্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসার বিস্তার সাধনে ভয় পাইতেছেন এবং প্রদেশে অশান্তি ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অন্যান্য বৎসর এই সময়ে পাটকলের জন্য পাট ক্রীত হয়—চাষী ভাল দাম পায়। এ বার সেই অবস্থার ব্যতিক্রম হওয়ায় চারিদিকে অভাব তীব্রতর হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ নহেন; কিন্তু ধনিক ও ধনীদিগের ধাতু তিনি অবগত আছেন। প্রধান-সচিব হইয়া তিনি প্রথম যে বার বন্ধুবান্ধবীসহ য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন যাত্রাকালে বিমান ঘাটীতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"একি! এ যে সারা বড়বাজার এখানে হাজির!" পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রধান-সচিবের জন্মদিনে যাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধনিক ও ধনী। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ ও অশান্তি হেতু অনেক ব্যবসায়ী পশ্চিমবঙ্গে আর কারখানা করিতেও ব্যবসা চালাইতে চাহিতেছেন না।

যাঁহারা তাঁহার সমর্থক সেই ধনিকরাও যেন ধৈর্য্যচ্যুত হইতেছেন। য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যান' (১৯শে অক্টোবর) "বর্ত্তমান কলিকাতা" সম্বন্ধে মিষ্টার গোরওয়ালার একটি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পরেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে :—

(১) কম্যুনিষ্ট প্রভাব দমনজন্য কেন্দ্রী সরকার অবহিত হউন ;

(২) প্রদেশ সরকার শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন।

কিন্তু প্রদেশ সরকার কি স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা কম্যুনিষ্ট প্রভাব দমন করিতে অক্ষম এবং তাঁহারা শাসনকার্য্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না? ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন যদি লোকমতদ্যোতক হয়, তবে দেখা যায়—নির্ব্বাচিত সদস্যগণ (যে কারণেই কেন হউক না) অধিকাংশ কংগ্রেসপন্থী; এমন কি যে দিন কলিকাতায় গড়ের মাঠে সাংবাদিকরা পুলিসের আক্রমণকেন্দ্র হইয়াছিলেন, সে দিনও কংগ্রেসী সদস্যগণ অস্থায়ী প্রধান-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ভবনে সমবেত হইয়া তাঁহার অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই নীতি অনুসারে অস্থায়ী প্রধান সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিব বেলা ১০টার সময় ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতিকে অপরাহ্ণ ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ সমিতির ৫ জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রদেশের লোকের মধ্যে কম্যুনিষ্টের আধিপত্য স্বীকার করা সঙ্গত কি না, সন্দেহ। শাসনকার্য্যে দৃঢ়তার অভাব সচিবসঙ্ঘ দেখান নাই; হয়ত অকারণ আতিশয্য প্রকট করিয়াছেন! কলিকাতার রাজপথে পুলিসের গুলিতে নিহত তরুণদিগের রক্তে রঞ্জিত হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

এমন কি লোকমত নির্ব্বাচনে যে সচিবদিগের সম্বন্ধে আস্থার অভাব দেখাইয়াছে, তাঁহাদিগকেও—অন্য পথে—সচিব করিবার সাহস প্রধান-সচিবের হইয়াছে। প্রমাণ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—যে দুইজন পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

বিদেশী ধনিকদিগের মুখপত্রের পরে ভারতীয় ধনিকসম্প্রদায়ের মুখপত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিন্দা প্রকাশিত হইয়াছে। যে দিন 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' পূর্ব্বোল্লেখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার পরদিন দিল্লী হইতে প্রকাশিত ব্যবসায়ী বিড়লাপরিবারের 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রে বলা হয়—

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গের সচিব সঙ্ঘের ব্যর্থতা স্বপ্রকাশ;

(২) সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রধান-সচিবের "স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের" পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদলের (অর্থাৎ সচিবসঙ্ঘের) জনগণের সমর্থন অতি সামান্য।

(৪) সাম্প্রতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে প্রধান-সচিব-পরিকল্পিত "কল্যাণী" নামক স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হইবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।

চতুর্থ দফায় যে সন্দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আরও অনেকের আছে। তাহার কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্ত পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থা লোকের পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই এবং ঐ স্থানের নিকটে বহু উদ্বাস্ত-বাস করিতেছেন; "কল্যাণী" সহর রচনার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে; "কল্যাণী" রচনার জন্য বহু লোককে উদ্বাস্ত করা হইয়াছে; অদূরে সুন্দরবনে যে অবস্থা তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার "দুর্ভিক্ষ" বলিতে অসম্মত হইলেও "অন্নকষ্ট" বলিতে বাধ্য হইবেন।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিশ্চয়ই মনে আছে—

(১) উদ্বাস্তরা পাছে তাঁহার গাড়ীবেষ্টিত করে সেই ভয়ে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য সজ্জিত পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে দমদম বিমান-ঘাটী হইতে রাজভবনে যাইতে হইয়াছিল।

(২) তাঁহার যান লক্ষ্য করিয়া পাদুকা এবং তিনি যে সভায় বক্তৃতা করেন তাহাতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

(৩) তিনি—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবেরই মত—শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদিগের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে গমন করেন নাই।

(৪) উদ্বাস্তু শিবিরে সর্ব্বহারা নারীদিগের প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়াছিল।

যে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ধনিকরা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের প্রধান সমর্থক ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্তব্যের জন্যই তাঁহাকে দিল্লীতে যাইতে হইয়াছিল—কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই মতই সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু দিল্লীতে যাইয়া তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-বিক্ষোভের নিদানানুসারে বিধান করিবার জন্য যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, রোগ পশ্চিমবঙ্গের, ঔষধের ব্যবস্থা দিল্লীতে করা হইয়াছে।

প্রধান সচিবের ব্যবস্থাপত্রের কথা—শ্রমিকদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য তাহাদিগের কিরূপ পারিশ্রমিক প্রয়োজন তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করা হউক।

ইহা ঈশপের উপকথার পর্ব্বতের মূষিক প্রসব ব্যতীত আর কি বলা যায়? শ্রমিক বলিতে কেবল শ্রমিক, কি পরিবারসহ শ্রমিক বুঝিতে হইবে? আর সমিতি যে পারিশ্রমিক সঙ্গত মনে করিবেন, শিল্প তাহা দিয়া উৎপন্ন পণ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। শিল্প সে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হইলে কি সরকার অর্থ-সাহায্য করিবেন? গল্প আছে, ক্ষুধার্ত্ত জনতা খাদ্যাভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে শুনিয়া রাজকন্যা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারা যদি রুটি না পায়, তবে পিষ্টক খায় না কেন? এ ব্যবস্থা তেমনই প্রহরিবেষ্টিত গৃহবাসীর উপযুক্ত।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধনিকে শ্রমিকে, সচিবে জনগণে, সরকারে প্রজায় সহানুভূতির অভাব দূর করিলে যে ধর্ম্মঘট প্রভৃতির কারণ দূর করা সম্ভব হইতে পারে ইহা কেহই বিবেচনা করিতেছেন কি না সন্দেহ। দাম্ভিকতাই কি বহু বিপদের কারণ হয় না?

অপব্যয় ও কালক্ষয়—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যদি ভারতচন্দ্রের কথা মনে রাখেন, তবে ভাল হয়—"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।" বক্তৃতার মত্ততায় তিনি অনেক কথাই বলেন এবং সময় সময় তাঁহার সরকারের ব্যবস্থারই নিন্দা করেন। গত ২৮শে অক্টোবর সেচ ও তড়িৎশক্তি কেন্দ্রী বোর্ডের বার্ষিক সভায় তিনি এঞ্জিনিয়ারদিগকে উপদেশপ্রদানের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

সেই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সরকারের ব্যবস্থারই নিন্দা করিয়া কিরূপে অকারণ অপব্যয় ও কালক্ষয় হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় নয়াদিল্লীতে অর্থাৎ সরকারের চাপরাশীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার, আর আজ হইয়াছে ১৯ হাজার। অথচ এখন অনেক স্থানেই "ফাইল" না পাঠাইয়া টেলিফোনে আলোচনা করিয়া কর্ম্মচারীরা সহজে কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন।

তিনি বলিয়াছেন, নয়াদিল্লী শাসনের অরণ্য—তাহাতে লোক পথ হারাইয়া ফেলে। এখনও সরকারী লোকরা মোটা মাহিয়ানা, জাঁকজমক প্রভৃতি ভালবাসেন, তার দপ্তরখানা অতিকায় হইয়া উঠিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন বাঙ্গালা (সমগ্র) বিহার ও উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল তখন এক জন ছোটলাট—একজন চীফ সেক্রেটারী লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন—হয়ত কাজও ভাল হইত। আর আজ? আজ সচিবের উপর সচিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও নিস্তার নাই—মধ্যসচিব ও উপসচিবও প্রয়োজন। কাজের জন্য কি দলরক্ষার জন্য তাহা বলা দুষ্কর। উপসচিবদিগকে সরকারের কাজ না হইলেও সরকারের অবলম্বন কংগ্রেসের জন্য অকংগ্রেসীর নিকটেও চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতে হয়। প্রত্যেকেরই চাপরাশী প্রয়োজন, মোটর গাড়ী নহিলে চলে না, সফরের ভাতা আছে। দেখিলে এবরী ম্যাকের সেই কথা মনে পড়ে:—

"While the Indian villager has to maintain the glorious phantasmagoria of an imperial policy, while he has to support legions of scarlet soldiers, golden chupassies, purple politicals, green commissions, he must remain the hunger-stricken, overdriven phantom he is."

এই অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? আজ ভারতকে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদ নীতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না বটে, কিন্তু কমনওয়েলথে থাকায় প্রধান মন্ত্রীকে বৃটেনের রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগ দিতে যাইতে হয়, মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে হয়—ইত্যাদি; আজ ভারতকে, অহিংসার প্রতি ভক্তি দেখাইলেও, কোটি কোটি টাকা সামরিক ব্যয় সহ্য করিতে হয়; চাপরাশীর বাহুল্য সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর স্বীকৃতিই যথেষ্ট; রাজনীতিকদিগকে পুরুষানুক্রমে পেন্সন না হইলেও নানা সুবিধা (যথা বাসের ও ট্যাক্সীর ছাড়) দিয়া তুষ্ট রাখিতে হইতেছে; কমিশনের বাহুল্য অসাধারণ হইয়াছে; আর দুর্নীতির কথা বলা বাহুল্য। যে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতালাভের পূর্ব্বে চোরাবাজারীদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে চোরাবাজারীরা বিরাজ করিতেছে।

অপব্যয়ে ও কালক্ষয়ে দেশের শাসন-ব্যবস্থা লোকের মনে কেবল দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছে। তাহার অনিবার্য্য ফল কি, ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে।

কেবল বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে কখন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সেজন্য সাধনার প্রয়োজন—সেজন্য কাজ প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশের লোককে তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি তাহার উপযোগী পরিবেশ রচনা করিবার উপায় করিয়াছেন বা করিতেছেন?

রোগান্ত স্বাস্থ্যাবাস—

কিছুদিন হইতে এ দেশে ক্ষয়রোগের প্রাবল্য ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার নানা কারণের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অন্যতম। ক্ষয়রোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে রোগীর সংখ্যার তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা অতি অল্প। যাদবপুর

চিকিৎসাগারে স্থানাভাবহেতু সরকার কাঁচড়াপাড়ায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতেও স্থানাভাব। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে আছে—তাহাও যথেষ্ট নহে।

হাসপাতালের একটি অসুবিধা—রোগী যখন আরোগ্যলাভ করে, তখনও গৃহে যাইতে পারে না—পরিবারস্থ ব্যক্তিরা ভয় পায় এবং গৃহে রোগ পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। ফলে নূতন রোগীর পক্ষে হাসপাতালে স্থানলাভ দুর্ঘট হয়। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রোগীদিগের রোগমুক্তির পর কোথাও কিছুদিন থাকিয়া সবল হইবার ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া রোগান্ত স্বাস্থ্যাবাস স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাদবপুরে হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে তিনি সেই পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তাহাতে তথায় সামান্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়—রোগীরাও সে জন্য যথাসাধ্য অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল মহাশয় দার্জ্জিলিংএ দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার জন্য আবশ্যক অর্থ (কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ টাকা) সংগৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা রেঞ্জার্স ক্লাব ক্ষয়রোগীদিগের রোগান্ত স্বাস্থ্যাবাসের জন্য তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কিন্তু কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সুখের বিষয় সমুদ্রতীরবর্ত্তী—স্বাস্থ্যাবাসের উপযোগী স্থান দীঘায় (মেদিনীপুর) এক ব্যক্তি ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি দান করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দীঘায় খাস মহলে সরকারের অনেক জমী পতিত আছে। তাহা হইতেও আবশ্যক জমী পাওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের মনে হয়, এই কাজে সরকারের সাহায্য সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হইলে সঙ্গত হয়। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া দেশের লোক অর্থদানে আগ্রহশীল হইবেন, এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। কিন্তু সরকার যদি ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন, তবে কাজ অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইতে পারে।

রেঞ্জার্স ক্লাবের মত টার্ফ ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই কার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতে অনুরোধ করি। পশ্চিমবঙ্গের খেলার প্রতিষ্ঠানগুলি সকল সৎকার্য্যে সাহায্যদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে এ কাজে সাহায্য দিতে অগ্রসর হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। চলিত কথা আছে—সাধু যাহার সঙ্কল্প, ভগবান তাহার সহায়। রাজ্যপাল মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের কল্যাণকর এই কার্য্য অর্থাভাবে অসম্পন্ন রহিবে না। কলিকাতায় অবস্থাপন্নদিগের সম্মিলন-কেন্দ্র ক্যালকাটা ক্লাব, লেকে সাঁতারের ক্লাব প্রভৃতিকেও এই কার্য্যে সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর হইতে বলা অসঙ্গত নহে। প্রদর্শনীর ও স্ফূর্ত্তিখেলার দ্বারাও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জমীদাররা দানের উৎস ছিলেন, সে উৎস শুকাইয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় কল্যাণকর কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন মিটিবে—এ আশা পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনই তাহার প্রতি দেশের ধনীদরিদ্র সকলের সাহায্য আকৃষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ—

এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে জমীদারী প্রথার বিলোপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে সে সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের আয়োজন হইয়াছে। জমীদারী প্রথার বিলোপ অনিবার্য। যে অবস্থায় ও যে কারণে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে অবস্থার অবসান ঘটিয়াছে—সে কারণ আর নাই। এই প্রথার উপযোগিতার অবসান হইয়াছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আইন প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে কালোপযোগী ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। ইহাতে—

(১) সরকার জমীদারী ক্রয় করিয়া জমীদার হইবেন।

(২) প্রজার অবস্থা "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবে।

এ অবস্থায় সরকারের পক্ষে জমীদারীর মূল্য—শত টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রজা জমীতে স্থায়ী অধিকার পাইবে না—ইয়ং যাহাকে "স্বামিত্বের ইন্দ্রজাল" বলিয়াছেন, তাহার ফলে কৃষকের জমীর উন্নতিসাধনের ও উৎপাদনবৃদ্ধির উৎসাহ সঞ্জাত হইবেনা। পরন্তু তাহার দুর্ভোগ বর্দ্ধিত হইবে। কারণ, জমীদারকে আদালতে নালিশ করিয়া অনেক দিনে বাকিখাজনার টাকা আদায় করিতে হয়, সরকার খাসমহলে সরাসরি সার্টিফিকেট জারি করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে, প্রজার ঘটী বাটি গরু ও ধান সব নিলাম করাইয়া বাকি খাজনার টাকা ওয়াশিল করিতে পারেন। এখনই দেখা যায়, জমীদারের প্রজা খাসমহলের প্রজার তুলনায় অনেক সুবিধা সম্ভোগ করে।

যদি প্রজাকে বিস্তৃত অধিকার প্রদান করা না হয়—তবে সরকার জমীদারী কিনিলে তাহাকে জাতীয়করণ বলা যায় না—তাহা দুর্ব্বল জমীদারের পরিবর্ত্তে সবল জমীদারের প্রজা হওয়া। গল্প আছে, ব্রাহ্মণ গরু বেচিয়া গরুকে সে কথা বলিলে গরু বলিয়াছিল—তাহাতে তাহার ইষ্টাপত্তি কিছুই থাকিতে পারে না—এখানেও খাসজল সেখানেও তাহাই।

বরং জমীদার উদারতাবশে বা অন্যান্য কারণে রাস্তাঘাট করিয়া, পুষ্করিণী খনন করাইয়া, বারমাসে তের পার্ব্বণে, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিয়াছেন। সরকারকে সম্ভ্রমের জন্যও সে সব করিতে হইবে না।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে জমীদারের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে; সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন।

গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে যে অধিকার প্রজার প্রাপ্য প্রজাকে যদি তাহাতে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে বহু অর্থব্যয় করিয়া সরকারের জমীদার হইবার অধিকার কি সমর্থনযোগ্য? যদি প্রজাকে গণতন্ত্রানুমোদিত অধিকার না দিয়া সরকার জমীদারী ক্রয় করেন তবে যে

ব্যবস্থা হইবে, তাহা যদি স্বৈর ব্যবস্থা না হয়, তবে "না ঘাটকা না ঘরকা" হইবে।

অর্থাৎ তাহাতে দেশের জমী জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুদিন বিলম্বে—"অনেক চিন্তার পর" যাহা করিতে যাইতেছেন, তাহাতে প্রজার কোন উপকার হইবে না—হইতে পারে না। অথচ সরকার বিরাট দায়িত্ব ও বিরাট ঋণ গ্রহণ করিবেন। জমীদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য—কিন্তু যেভাবে তাহা হইতেছে, তাহা প্রজার দ্বারা ও অর্থনীতিকদিগের দ্বারা কোনরূপেই সমর্থিত হইবে না।

নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২৫শে অক্টোবর (৮ই কার্ত্তিক) হইতে রাজস্থানে—জয়পুর নগরে নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগে ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আগ্রহে কাশিমবাজারে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি দীর্ঘকাল উহাই বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর সম্প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার অনুকরণে ও আদর্শে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীরা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যে সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত করেন। নানা কারণে, বিশেষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যখন ক্ষমতার জন্য দলাদলি আরম্ভ হয় তখন পরিষদের হস্তে সাহিত্য সম্মেলন পরিচালন-ভার ন্যস্ত হওয়ায়, প্রতিষ্ঠানটির শক্তি ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তখন সতেজে চলিতে থাকে। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় দুই প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়াছে। আশা করা যায়, যোগ্য ব্যক্তিদিগের পরিচালনায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—কেবল যে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী-দিগের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিবে, তাহাই নহে; পরন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি সাধন করিবে।

জাতির বৈশিষ্ট্য তাহার সাহিত্যে রক্ষিত ও প্রতীত হয়। সেই জন্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই জন দিক্‌পালের—মধুসূদনের ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীকে ৩টি বিষয় দিয়া গিয়াছেন—

(১) বাঙ্গালা ভাষা

(২) বাঙ্গালা সাহিত্য

(৩) বাঙ্গালী জাতি।

রাজস্থানের আদর্শ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। টডের রাজস্থান ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে তাহা বাঙ্গালায় এত আদর লাভ করে যে, সেই বিরাট গ্রন্থের দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়—প্রথম বরদাকান্ত মিত্রের, দ্বিতীয় যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বঙ্গবাসী প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত)। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল বীরত্বের ভিত্তিতে কাব্যরচনার জন্য রাজস্থানের আদর্শ গ্রহণ ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত উপন্যাস চতুষ্টয়ের একখানিতে রাজপুত জীবনসন্ধ্যার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন; মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি রাজস্থানের সহিত বাঙ্গালীকে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

জয়পুরের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ মোগল সম্রাটদিগের সময় হইতে। জয়পুরের (অম্বরের) মহারাজা মানসিংহই বাঙ্গালাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন—তিনিই প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিয়া তাঁহার শিলা-বিগ্রহ কালী অম্বরে লইয়া যাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন—দেবীর যথাবিধি পূজার জন্য তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত লইয়া গিয়াছিলেন। জয়পুর সহর রচনায় বাঙ্গালীর সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল; জয়পুরই আমেরিকার সিকাগো সহরের আদর্শ। ইংরেজের আমলেও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের দাওয়ান—সংসারচন্দ্র সেন তাঁহার পরবর্ত্তী।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অবাঙ্গালীরাও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অবদান অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন!

এ বার সম্মেলনে—

(১) রাজস্থানের মহারাজপ্রমুখ মেবারের মহারাজা তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

(৩) মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীজী চন্দাবত সাহিত্য শাখার অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

(৪) শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস সভাপতিত্ব করেন।

(৫) শ্রীমনোজ বসু সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

(৬) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

(৭) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

(৮) শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

(৯) রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার শ্রীমথুরালাল শর্ম্মা রাজস্থানী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

(১০) পণ্ডিত রবিশঙ্কর চারুশিল্প (সঙ্গীত) শাখার সভাপতি ছিলেন।

বাঙ্গালার (পশ্চিমবঙ্গের) আর্থিক অবস্থার আলোচনা হয় এবং সে আলোচনায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহা কেবল সময়োপযোগীই নহে, পরন্তু অত্যাবশ্যক। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালা যখন মসলেম লীগ সচিবসঙ্ঘের দ্বারা শাসিত তখন কেবল যে সরকারই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ইতিহাস বিকৃত করাইবার চেষ্টা (বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকে) করিয়াছিলেন তাহাই নহে, পরন্তু কোন বিখ্যাত ইতিহাস লেখকও লিপিতে দ্বিধামুভব করেন নাই যে, ঔরঙ্গজেব জেজিয়া কর রদ [illegible] (মসলমান) কর্ম্মচারীদিগের দোষে সে

নির্দ্দেশ যথাযথরূপে পালিত হয় নাই। আবার কংগ্রেসের উদ্যোগে লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসে রাজনীতিতে বাঙ্গালার অবদান যথাসাধ্য অস্বীকার করিবার চেষ্টা সপ্রকাশ।

বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাহা বুঝেন নাই। সেই জন্যই তিনি ভারত রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় বৃহত্তর প্রাদেশিকতায় আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে বিহারের কিয়দংশ বা উড়িষ্যার অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা নহে; বাঙ্গালীর যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাই সমগ্র ভারতে প্রসারিত করা। সে বৈশিষ্ট্য রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ পর্য্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; সেই বৈশিষ্ট্য স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল; সেই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার গোমুখীমুখ হইতে প্রবাহিত জাতীয়তার পাবনী ধারা ভারতের দিকে দিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রসারণ; সেই বৈশিষ্ট্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নকরণে; সেই বৈশিষ্ট্য সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বে সপ্রকাশ। সেই বৈশিষ্ট্য যদি সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত ও গৃহীত হয়, তবে সমগ্র ভারতকে আমরা বৃহত্তর বঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিব এবং তাহাতে সেই বৃহত্তর বঙ্গের উপকার ও উন্নতিই হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে বর্ত্তমান ভারতীয় সাহিত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র দেশের কল্যাণ করুক—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উত্তরোত্তর অধিক শক্তিশালী হউক, আমরা এই কামনাই করি।

সমগ্র ভারতে বাঙ্গালা সাহিত্য সমাদর লাভ করুক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধনভাণ্ডার—

বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালন জন্য যে সকল ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র সংগৃহীত ভাণ্ডার সে সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ঐ সকল ভাণ্ডারের কি হইয়াছে, এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে; সংপ্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব সে সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

(১) জাপানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর যে ধনভাণ্ডার ছিল, তাহা ভারতে আনা হইয়াছে। তাহার মূল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। উহার ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা প্রধান মন্ত্রী স্থির করিবেন।

(২) শ্যামে (থাইল্যাণ্ড) ভারতীয় স্বাধীনতা-লীগের টাকা তথায় বৃটিশ কর্ত্তারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাঙ্কে ভারতীয় দূতাবাসের জিম্মায় আছে। এই টাকার সুদ হইতে ভারতীয় ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে।

(৩) যুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার কোন কোন স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সম্পত্তি বলিয়া বিঘোষিত কিছু স্বর্ণাদি পাওয়া গিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—ঐ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ভারত সরকারের তাহাই মত। কিন্তু যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঐ ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থের ও স্বর্ণাদির পরিমাণ আরও অধিক ছিল; সুতরাং অনুসন্ধান প্রয়োজন।

যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেশের লোকের মত না লইয়া প্রধান মন্ত্রী যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে তাহা যে স্বৈরাচারদ্যোতক হইবে তাহা কখনই সমর্থনীয় নহে।

বর্ণবিদ্বেষ—

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের প্রাবল্য হ্রাস না হইয়া যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি চলিত কথা আছে—বিনাশের পূর্ব্বে গর্ব্ব ও পতনের পূর্ব্বে অশিষ্টতা দেখা যায়। শ্বেতকায়দিগের গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য দীর্ঘকাল হইতে তাহাদিগকে যে পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহাই পতনের ও বিনাশের পথ। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ভারতীয়দিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহা একদিন ইংরেজও অসঙ্গত বলিয়া বুয়ারদিগের সহিত যুদ্ধের অন্যতম কারণে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে—দক্ষিণ আফ্রিকাতে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়া ইংরেজ বলিয়াছিল—স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশ, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও—তাহার শাসননীতিতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। ভারতীয়দিগের প্রতি সেই ব্যবহারের প্রতিবাদে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তখনই তিনি বাঙ্গালায় নীলকরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবলম্বিত অহিংস প্রতিরোধনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ আর ভারত ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; কিন্তু ভারত সরকার কমনওয়েল্থের মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ভারত সরকার কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে যে ভাবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহশীল, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বজাতীয়দিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় কেন যে সেই ভাবে আগ্রহ দেখাইতেছেন না, তাহা বলা যায় না। ভারত সরকার কি স্বীকার করেন না—"নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ—পর পর সদা"? দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ভারত সরকারের কাজ বিস্ময়কর।

বৃটিশ গায়েনা—

গল্প আছে, মহারাজা রণজিত সিংহ ভারতের মানচিত্র দেখিয়া রক্ত-রঞ্জিত অংশগুলি ইংরেজের অধিকৃত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সব লাল হো যায়েগা"—আজ য়ুরোপের ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকবাদীরা তেমনই দেখিতেছেন, "সব লাল হো যাতা"—সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ঠ-ভীতি। সেই জন্য বৃটিশ গায়েনার মন্ত্রিমণ্ডল কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত মনে করিয়া বৃটিশ সরকার তথায় মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিয়া (২২শে আশ্বিন) গভর্ণর সার আলফ্রেড স্যাভেজকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়া—সঙ্কটকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের লোক যদি সত্য সত্যই কম্যুনিজম ভক্ত হয়, তবে বাহুবলে তাহা-দিগকে রাজভক্ত রাখা যে অসম্ভব তাহা নানা দেশেই দেখা গিয়াছে। বিশেষ দেশের লোককে গণতন্ত্রাযুগ বা গণতন্ত্র মুখী। ক্ষমতা দিয়া তাহা হরণ করিয়া স্বৈর শাসন পরিখা লনের ফল কি হয়, তাহা রুশিয়ায় আমরা

প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইংরেজ কি কারণে আমেরিকা হারাইয়াছিল এবং পরে আয়ার্লণ্ড ও ভারত হারাইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে শাসন গণমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা বিদেশীরই হউক আর স্বদেশীরই হউক তাহার ভিত্তি দুর্ব্বল এবং তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বৃটিশ গায়েনার গবর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন, অল্পকাল পরামর্শদিগকে লইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনের পরে তিনি নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করিবেন এবং তাহাতে গায়েনার অধিবাসী গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু দেশের জনমত কি, তাহা তিনি বলেন নাই। গণমতের সমর্থনশূন্য শাসন কখন স্থায়ী হয় না।

পাকিস্তান—

ভারত সরকারের তোষণ নীতি অব্যাহত থাকিলেও পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্প্রীতি ঘটিতেছে না। ঐ তোষণ নীতির ফলেই হয়ত তাহা ঘটিতেছে না। করাচী-চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে। সে জন্য কে দায়ী, তাহার আলোচনা করিতে পাকিস্তান অসম্মত। বাণিজ্য-চুক্তি ভারতের পক্ষে সন্তোষজনক হইতেছে না। অথচ উভয় দেশের পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিবার কারণ সপ্রকাশ। মিষ্টার মহম্মদ আলীর গতায়াতে যে সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ব্যতীত কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হইবে না। আবার পাকিস্তানে কোন কোন রাজনীতিক— "ভাঙ্গি তবু মচকাই না" নীতির অনুসরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জিহাদের (ধর্ম্ম যুদ্ধের) ধ্বনি তুলিতেছেন। বাণিজ্য-চুক্তির আবার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু বস্তু-ত্যাগীদিগের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে না। দেশ-বিভাগের পূর্ব্বে বহু লোকের যে প্রাপ্য পাকিস্তানের দেয়, তাহাও আদায় হইতেছে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা সাধারণ নাগরিকের অধিকার লাভ করিতেছেন না। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে—বরং পীড়াদায়ক। মুদ্রা মূল্য, বোধ হয়, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। কাশ্মীর সম্বন্ধে শেখ আবদুল্লার ব্যাপার ধামা চাপা পড়িলেও তাহাতে পাকিস্তানের মনোভাবের পরিচয় যে পাওয়া যায় নাই, তাহাও নহে। তাহার প্রতিক্রিয়া ভারত সরকারের উপর কিরূপ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই—জওহরলাল তাহা কাশ্মীরের "পারিবারিক ব্যাপার" বলিয়া চাপা দিয়াছেন। কিন্তু "মনের কথা মনই জানে।"

কোরিয়া—

কোরিয়ায় এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারত হইতে প্রেরিত সৈনিকরা বিপদ-সম্ভাবনার সম্মুখীন অবস্থায় তথায় রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তথায় সৈনিক প্রেরণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, সাধারণতঃ যুদ্ধ করিবার জন্য সেনাদল প্রেরণ করা হয়; ভারতীয় সেনাদল কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হয় নাই—তাহারা ভারতীয় পতাকা লইয়া গিয়াছে, সে পতাকা শান্তির ও সম্প্রীতির প্রতীক। তাঁহার কথা, যুদ্ধের সময় বিবদমান দেশসমূহ নিরপেক্ষ মধ্যস্থের প্রয়োজনে ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে ভারতের প্রতি তাহাদিগের আস্থাই সপ্রকাশ হইয়াছিল। কাজেই ভারত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দ্বিধানুভব করে নাই এবং তাহার দায়িত্ব সে পালন করিবেই। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে সম্ভ্রমলাভের আশায় জওহরলাল যেন যিশু খৃষ্টের সেই উপদেশ বিস্মৃত না হন—

যাহারা তোমাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে, তাহাদিগের নগর ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং— "Whosoever shall not receive you nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under you feet for a testimony against them."

কোরিয়ার ব্যাপারে জড়িত হইয়া ভারত সরকারকে কত টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে ও হইবে, তাহার হিসাব পাইলে এ দেশের লোক— জওহরলালের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ক্রয়ের জন্য ভারতকে কি মূল্য দিতে হইল, তাহা বুঝিতে পারিবে। শেষে সে খ্যাতি মৃগতৃষ্ণিকা না হয়।

ব্রহ্ম, পারস্য ও মিশর—

ব্রহ্ম এখনও অশান্তির কেন্দ্র। যে সরকারকে ভারত ব্রহ্ম সরকার বলিয়া স্বীকার করে, সে সরকার এখনও তথায় শান্তি স্থাপিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহা দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক কি সে সরকার দেশের জনগণের সমর্থনে বঞ্চিত, তাহা বিবেচনার বিষয়।

পারস্যে আপাততঃ অশান্তির কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। যদি তথায় রাজতন্ত্রীদল সত্য সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া থাকে, তবে তথায় বহু সমস্যার সমাধান ও দেশের উন্নতি সাধিত হইবে, এ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, গণ আন্দোলন কোটরস্থ বহ্নির মত শাসনতন্ত্র নষ্ট করে—সহসা তাহার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

মিশরেও আপাততঃ শান্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পলায়িত রাজার ত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হইতেছে—বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেশের হইবে; পলায়িত রাজার অনুরাগীদিগের দিকে নূতন সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। সুদান-সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। সে সমস্যার অগ্নিতে বিদেশী রাজনীতিকরা ইন্ধন যোগাইতেছেন, ইহাই মিশরে অনেকের বিশ্বাস।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৬০

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রত্যুষে নিতাই বলাই সুমী পুনি প্রভৃতি সকলে চণ্ডীতলা পরিষ্কার করিয়া, লেপিয়া পুঁছিয়া সুন্দর করিয়া তুলিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গোপাল আসিয়া যাহা প্রয়োজন সমস্ত গোছাইয়া লইয়া সংকল্পবাক্য পাঠ করিলেন এবং ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর উদ্দেশ্যে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—কিছুক্ষণ পরে শালবনের পিছনে রক্তিম নির্ম্মেঘ আকাশ নবোদিত সূর্য্যের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদূরের শালবন, মাঠ, প্রান্তর রক্তিম আলোকে ঝলমল করিতেছে। একে একে গ্রামের দুই একজন আসিয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিল—বাগ্দী বাউরী পাড়ার গৃহবধূগণ বসন্তসায়র হইতে ফিরিবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম করিয়া গেল—

ধীরে রৌদ্র প্রখরতর হইল—পথের কাঁকর বালি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—গোপালের এক রূপ চণ্ডীপাঠ শেষ হইল,—তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—শশী বাউরী অদূরে বসিয়া আছে,—সেও মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। আরও দুই একজন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বসিয়াছিল কিন্তু তথাকথিত ভদ্রলোক কেহ বিশেষ নাই। তিলি তামুলীপাড়ায় দুই একজন আসিয়া গিয়াছে মাত্র। ছোটলোক পাড়ায় একটি তরুণ যুবক পাচনী হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শশী জেঠা, এ যে বড় রোদ ফুটে গেলেন বটে!

শশী কহিল—তা যাক্, বৃষ্টি হবেক রে হবেক—ভগমান কি বামুনের কথা শুনবেক নাই রে! তা কি হয় বটে! গোপাল পুনরায় চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—পিছনের ওই তরুণটির অবিশ্বাসের কথা তাহার কানে না গিয়াছিল এমন নয়; তথাপি তিনি পাঠ করিয়া চলিলেন—কিন্তু মনটা খারাপ, বিমনা হইয়া যাইতে লাগিল। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন মতি ঠাকুরের সঙ্গে এই চণ্ডীতলায়ই তিনি চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন, সেদিন চারিপাশে গ্রামের কতলোক ভক্তিভরে আকুল আগ্রহে এখানে বসিয়া ছিল, তাহারা কত আগ্রহে মায়ের চরণে মাথা খুঁড়িয়াছে কিন্তু আজ এই অবিশ্বাস ও একক প্রার্থনায় কি দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন? বার বার তাহার মন বিমনা হইয়া যাইতেছে এই বিচ্ছিন্ন মনোযোগহীন চণ্ডীপাঠেই বা কি হইবে! গোপাল একবার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দূরদিগন্তের পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, তবুও একান্ত কর্ত্তব্য ও সংকল্প হিসাবে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু বার বার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিতে লাগিল। বার বার মনে মনে বলিলেন—মা আজ যদি তুমি প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তবে তোমার মহিমা যে এই পাপময় পৃথিবীতে লোপ পাইয়া যায়? তোমার যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, আমার কর্ত্তব্য আমি করিতেছি—

বিচ্ছিন্ন মনকে সংযত করিয়া তিনি পুনরায় চণ্ডীর আখ্যানভাগে মনঃসংযোগ করিলেন এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে বার বার উচ্চারণ করিলেন—দেহি দেবি নমস্তুতে।

শশধর প্রায় দেড় প্রহর বেলায় একবার ঘুরিয়া গেলেন,—বিষণ্ণমনে। তাহার সঙ্গে একটা বৃহৎ সিধাও আসিয়াছিল। চণ্ডী পাঠরত গোপালকে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তিনি একবার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন, তাহার পর এক অধ্যায় পাঠ শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইল—আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই—কয়েকখানি স্তূপমেঘ মাত্র আকাশের বুকে ঝুলিয়া আছে। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র—ছায়া শীতল চণ্ডীতলাকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—

গোপালের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, একাকী চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—

ক্রমে অপরাহ্ণ—তাহার পর বেলা পড়িতে লাগিল।

গোপাল একান্ত নৈরাশ্য ও বেদনার সঙ্গে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন—কিন্তু কেন যেন চোখ দুইটি বার বার অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—তিনি কি পারিবেন? মতি ঠাকুরের যে সাধনা ছিল তাহার ত তা নাই—মনটা কিছুতেই সংযত হয় না—

শশী বাউরী অকস্মাৎ লাঠিতে ভয় দিয়া উবু হইয়া প্রণাম

করিতে করিতে তারস্বরে কহিল—মা চণ্ডী, মোদের কথা শুনবেক রে—মা শুন্‌বেক—মা মা—

উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের চারিপাশে তাকাইতে লাগিল কিন্তু কোথায়ও মেঘ নাই। শশী উঠিয়া কহিল—ইশ্‌নে মেঘ উঠ্‌লেক রে, ভেসে যাবেক সব ভেসে যাবেক—ছাতা আনা করা কেনে, মোদের ঠাকুর ভিজে যাবেক—

কয়েকজন শশীর প্রলাপ বচনে হাসিয়া উঠিল। একজন কহিল—ইশ্‌নে মেঘ আস্‌বেক, ত ছাতা আনা করাবেক—

কিছুক্ষণ বাদেই অকস্মাৎ দেখা গেল ইশানের ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ বায়ুচালিত হইয়া আকাশের অর্দ্ধেক ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঘন কালো মেঘ ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া পাণ্ডুর হইয়া গেল—প্রবল বায়ু রাস্তার ধূলি উড়াইয়া দিগমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া দিল—তাহার পর আসিল বর্ষণ—প্রবল, ক্রমে প্রবলতর—

উপস্থিত জনগণ শশীর কথায় মা চণ্ডীর জয়ধ্বনি করিল। কে একজন ছাতা আনিয়া দিলে গোপাল কোনমতে পুঁথি রক্ষা করিয়া তাহার সংকল্পিত পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিশ্বাসীর দল বার বার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বর্ষণ থামিল—মাঠঘাট প্লাবিত হইয়া জল কান্দোড়ে নামিতেছে। আর চাষ আবাদের ভয় নাই—কয়েকদিনে বহু জমি পোতা হইয়া যাইবে। সাধারণে গোপালের ধন্য ধন্য করিল—ব্রাহ্মণের মুখে এখনও আগুন জ্বলে একথাটা যেন পুনরায় প্রমাণিত হইয়া গেল।

পশ্চিমের ছেঁড়া কালো মেঘের ফাঁকে অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরশ্মি চণ্ডীতলার ভিজা ঘাসের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতে লাগিল—গ্রামের অনেকেই সিধাহস্তে চণ্ডীতলায় আসিয়া মাতা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া গেল---

সন্ধ্যার পূর্ব্বে চাঁদমোহন চটি পায়ে, ছড়ি হাতে করিয়া আসিলেন—চণ্ডীতলায় লোকসমাগম লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই আসিলেন—তখনও গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছেন।

চাঁদমোহন উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লোকসমাগমের কারণটা জানিয়া লইলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলেন—

তখন সূর্য্যাস্তের পরে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, গোপালেরও চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি সিধাগুলি নিবেদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভিজা কাপড়ে থাকিয়া উপবাসী গোপালের জীর্ণ শরীর শীতার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে—

চাঁদমোহন আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠ করলেন বুঝি—কেন ?

—অনাবৃষ্টির জন্যে কৃষি হচ্ছিল না, তাই উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠের সংকল্প করেছিলাম—

—চণ্ডীপাঠের জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তা হ'লে—কি বলেন ?

গোপাল ঠিক বুঝিলেন না, চাঁদমোহন কি বলিতে চায়। তাই তিনি নীরব রহিলেন। চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন—আপনার জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তাহ'লে—

গোপাল কহিলেন—না না, আমার সাধ্য কি ? মায়ের কাছে সকলে প্রার্থনা করেছে, তাই তিনি দয়া করেছেন—

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিল—তা কিন্তু নয় ঠাকুরমশায়, বৃষ্টি আজ হ'ত কারণ নৈসর্গিক কারণগুলি আজ অনুকূল। চণ্ডীপাঠের সঙ্গে বৃষ্টির কোন যোগাযোগ নাই। চাঁদমোহন মূঢ় ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিলেন।

গোপাল কহিলেন—হ'ত সে ত ভাল কথাই, লাভের মধ্যে ভগবানের নাম হ'ল—সেই আনন্দ—সেটাই ত ভাগ্য !

চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন—হ্যাঁ ভাগ্য বই কি, তাই সিধে জুটেছে মন্দ নয় দেখছি—

গোপাল অপরাধীর মত কহিলেন—আমি সিধে আন্‌তে বলিনি—লোকে স্বেচ্ছায় এনে দিয়েছে—

—হ্যাঁ, সংস্কার ওদের মজ্জাগত—ওরা ত আন্‌বেই—

গোপাল কহিলেন—থাক্ ওসব কথা, পরে হবে। বড় ক্লান্ত, আজ আসি—

গোপাল যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কয়েকজন সিধার চাল প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া তাহার সঙ্গে গেল। চাঁদমোহন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন—দেশের অশিক্ষা ও সংস্কারান্ধ সমাজ দেখিয়া সম্ভবতঃ বেদনাবোধ করিলেন।

শশধর কাছারী বাড়ীতে বসিয়াছিলেন,—সরকার তিনু খাসজমির চাষ-আবাদের হিসাব লিখিতেছিল। পেয়াদা কালী বাগদী গোপাল ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিল। গোপাল

আসিতেই শশধর কহিলেন—পরশু পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ তা মনে আছে ত ঠাকুরমশায় ? ফর্দ্দটা করে দিয়ে যান্—

উভয়ে বসিয়া সত্যনারায়ণ পূজার ফর্দ্দ করিতেছিলেন। তিনু কহিল—তা হ'লে বড়কর্ত্তা একবার মাঠটা ঘুরে আসি, কে কি করছে—

—হ্যাঁ দেখে এসো। আলগুলো ঠিক ঠিক বাঁধা হ'য়েছে কিনা নজর রেখো—এই জলে অন্ততঃ অর্দ্ধেক জমি ওঠা চাইই—

তিনু চলিয়া গেল।

সত্যনারায়ণের ফর্দ্দ সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় চাঁদমোহন কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল—দাদা আমি আর কতদিন ব'সে থাক্‌বো ?

শশধর কহিলেন - এখন হয় না, বরং আশ্বিনে কিছু হতে পারে।

—তাই বলে বাড়ী আরম্ভ করে বন্ধ ক'রবো ? ধান না হয় বিক্রি করে দাও—খাজনা আদায় করতে দেবে না, ধান বিক্রি করতে দেবে না—তাহ'লে আমি যাই কোথা—

—এই চাষের সময় খাজনা চাওয়াই চলে না, বরং তাদের দিতে হবে—টাকা, ধান, চাল। নইলে জমি উঠ্‌বে না। আর সুষ্ঠুভাবে চাষ হ'য়ে গেলে তবে ধান বিক্রি হ'তে পারে। তা নইলে বিক্রি হবে না—তাতে গ্রামের লোক মারা যাবে।

চাঁদমোহন দৃঢ়স্বরে কহিলেন—কিন্তু টাকা আমার চাইই, বাড়ীর ছাদটা দিলেই হয় এখন থামতে পারবো না—

—বাড়ীটা ছ'মাস পরে সম্পূর্ণ হ'লে ক্ষতি কি ? তুমি চাষ-আবাদ এসব ব্যাপার বুঝ্‌তে পারো না, কাজেই বুঝ্‌বে না—

চাঁদমোহন কহিলেন—বুঝি আমি সবই। কারণ বিনা কার্য্য হয় না। আমার চেয়ে তোমার দরদ বেশী হল ছোট-লোকদের প্রতি—

—তা নয়, ওরা আছে তাই জমিদারী, নইলে ধানই বল টাকাই বল কিছুই আস্‌তো না। তাদের বাঁচাতে হবে ত ? যদি চাষ ভাল না হয় তবে কি করে তারা বেঁচে থাক্‌বে বল ?

চাঁদমোহন এবার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন—কিন্তু আমার ভাগটাও কি আমি বিক্রি করতে পারবো না ?

শশধর উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সে কেবল নিজে কি পাইতেছে—কি দরকার তাহাই ভাবিতেছে, অন্য কাহারও দিকে এতটুকু তাকাইতে শিখে নাই। তাই শশধর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—না তোমার ভাগের ধানও এখন বিক্রয় করা হবে না। যদি ইচ্ছে কর পূজার সময় এসে ভাগ করে নিও—সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিও,তাতেও আপত্তি নেই।

—আমার ন্যায্য ভাগও আমি পাব না ?

—নিশ্চয়ই পাবে কিন্তু এখন নয়।

—আমি চাই—আমি বিক্রয় করবো—

শশধর কহিলেন—আমি দেব না। তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি ধান বিক্রি করে নিয়ে যাও।

চাঁদমোহন কহিলেন—বেশ তাই হবে—

চাঁদমোহন উঠিয়া যাইতেছিলেন। গোপাল কহিলেন—বসো চাঁদমোহন, জিনিষটা বুঝে দেখ। ওই ধানের মধ্যে তোমাদেরই হাজার হাজার প্রজার জীবন রয়েছে, সেটা কি এমনি সময়ে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত। যদি আবাদ না হয় তবে সকলে কি করে বেঁচে থাক্‌বে—বুঝে দেখ—

চাঁদমোহন ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন—আমি অত্যন্ত কম বুঝি এটাই বা আপনি ধারণা করছেন কেন ?

গোপাল কহিলেন—তুমি বোঝ বই কি ? তবে গ্রামে ত থাকো না, গ্রামের এই সব ব্যাপার ত ঠিক তোমার জানা নেই—তাই বলি—

চাঁদমোহন কহিলেন—থাক্ থাক্, আমি হিতোপদেশ চাই না। যাকে দিচ্ছেন তাকেই দিন—পূজোর ফর্দ্দগুলো বেশ মোটা মোটা করে ধরুন, তাতেই সুসার হবে—

গোপাল ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন তিনি কহিলেন—তুমি সবই বুঝে ফেলেছ—এ অহমিকা থাকাও ত ভাল কথা নয় চাঁদমোহন। তোমরা এ শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছ জানি না—তবে এত মঙ্গলের লক্ষণ নয়—

চাঁদমোহন কটু কটাক্ষে গোপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—বিদ্যার অহমিকা যদিও সহ্য করা যায়, অজ্ঞতার অহমিকা অসহ্য। আপনি কেন আমাদের কথায় কথা বলেন, বলুন ত ?

শশধরের দিকে ফিরিয়া চাঁদমোহন কহিল—আমি আজ চলে যাচ্ছি, পূজার সময়ই আস্‌বো এবং আমার সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকো—

শশধর কোন জবাব দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া

রহিলেন। চাঁদমোহন উঠিয়া গিয়া ডাকিলেন—কালী এখুনি গাড়ী তৈরী কর, আমি এখুনি যাবো—

চাঁদমোহন উম্মাসহকারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন—

শশধর ও গোপাল জানিতেন—আত্মকেন্দ্রিক বর্ত্তমান ভোগগত শিক্ষা তাহাদের একান্নবর্ত্তী বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সংসার ও সমাজকে খান্ খান্ করিয়া দিবে। চাঁদমোহন সম্পত্তির ভাগ চাহিয়াছে সহরে বসবাসের জন্যে, হরিহরও চাহিয়াছে, এমনি করিয়া সকলেই সহরে যাইবে—পড়িয়া থাকিবে যত দুর্গত অশিক্ষিত লোক এই ভগ্ন জীর্ণ পল্লীর অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতার মাঝে। তাই তাহারা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তিলি, তাঁতি ও তাম্‌লী পাড়ায় পরিত্যক্ত বাড়ী দুই একখানি বন্যজন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে —চারিপাশে চুরি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা চলিতেছে। সততা, বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া মানুষ কেবল ধন-সম্পদের পূজা আরম্ভ করিয়াছে—গোপালের শিক্ষা উপদেশ, ভগবতীর ত্যাগ সেবা এ প্লাবনের পথরোধ করিতে পারে নাই, গোপাল ভাবিয়া ভাবিয়া বিষণ্ণ হন মাত্র এবং নিরুপায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—

তিনু নিতাই এর উপর আদেশ দিয়াছিল যে সে খাসজমি চাষ করিতে পারিবে না। চাঁদমোহন এই আদেশ দিয়াছিলেন—সকলে ভাবিয়াছিল ওটা হুমকি মাত্র, কিন্তু চৈত্রের শেষে তিনু এই আদেশ জানাইয়াছে। অবাধ্য প্রজার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে নিতাই ও তাহার ভগ্নিপতি মথুরও আছে। খাস জমি ছাড়িয়া দিলে নিতাই এর জমিমাত্র দুইবিঘা—তাহা চাষ করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে থাকা চলে না। নিতাই এই সব লইয়া বহুচিন্তা করিয়াছে কিন্তু পরিশেষে ঠিক করিয়াছে, জমি চাষ করিয়া রাখিয়া খাদে যাইবে। মথুরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

ভরত আর আহ্লুরী মিলিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গাইতে চালাইয়া ও পাথর কুড়াইয়া যে দু'বিঘা জমি উঠাইয়াছিল,সে দু'বিঘা জমি আজও সোনার ফসল দিতেছে। শ্রাবণের প্রথম বর্ষণে দেখিতে দেখিতে জমি চাষ করিয়া নিতাই ও সুমী জমি পুঁতিয়া দিয়াছে। এখন পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া দুইচার আনা যাহা হয় তাহাতেই দিন চলে। ঘরের ধান ফুরাইয়াছে'। চারিপাশে আবাদও শেষ হইয়া আসিল—কেহ মনিষ' চাহে না। সংসার অচল হইয়া আসিলে নিতাই গরু বিক্রয় করিল, এমনি করিয়া আশ্বিন আসিল—তখন সংসার একান্তই অচল—

আহ্লুরী ও ভরত যেমন করিয়া একদিন গৃহ ফেলিয়া খাদে গিয়াছিল তেমনি করিয়া একদিন প্রভাতে সুমী ও নিতাই গৃহ ও গ্রাম ছাড়িয়া ভাতুলিয়া কলিয়ারীতে চলিয়া গেল। পাড়ার নবীন বুড়া লাঠি হাতে করিয়া দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া ছিল অশ্রু চোখে। সে যাইবার সময় বলিল— আবার অঘাণে আসবেক একটা ব্যবস্থা বড়কর্ত্তা করবেক। ডর কি! আসবি—

নিতাই হ্যা বলিয়া প্রস্থান করিল—

ওদিক মথুর ও সরোজিনীও এমনি করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া জামুড়িয়া কলিয়ারীতে উপস্থিত হইল।

এখানে স্বামী-স্ত্রীতে যে হপ্তা পাওয়া যায় তাহাতে খাদ্য, বস্ত্র ও নেশাটা কোনমতে চলে—

ভাতুলিয়া কোলিয়ারীর ধাওড়া - জানালাহীন অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘর পিছনে একটু ঘুলঘুলি—গৃহ অন্ধকার। বারান্দায় রান্না করা যায়—গ্রীষ্মে বাহিরেই শোয়া চলে, শীতে কেবল ঘরে আসিতে হয়—

সকাল ৬টায় নিতাই আর সুমী খাদে নামে, এগারটায় উঠিয়া আসে—আবার ১২টায় নামে ৪টায় উঠিয়া আসে। তখন দিনের আলো নিষ্প্রভ—পৃথিবীর উপরের মাঠ ঘাট বন যখন রৌদ্রে ঝলমল করে তখন তারা ভূগর্ভের নিবিড় তিমিরের মধ্যে গাঁইতি চালায়, সুমী কয়লা বহন করিয়া টব বোঝাই করে। নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ছোট ছোট মিশকালো কয়লার গলির মাঝে সেফটি ল্যাম্পের আলোয় তাহারা কাজ করে—সন্ধ্যায় আসিয়া রাঁধিয়া খায়, সন্ধ্যার পরে ক্লান্তদেহে নিদ্রা যায়। এমনি করিয়া দিন যায় রাত্রি আসে—কলের মত নিয়মিত জীবন! ঘণ্টা ও বাঁশীর সঙ্গে জীবন বাঁধা—গ্রামের উদার স্বাধীনতা নাই। সে মুক্ত বাতাস নাই, চারিপাশের নয়নাভিরাম সবুজাভা নাই— কয়লার কালি, ধুলা, ধূম দিকমণ্ডল মলিন করিয়া রাখে— সে মালিন্য আসিয়া জমে মানুষের অন্তরে, কালিমা লেপন

করে বস্ত্রে, দেহে, অন্তরে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগত পশুত্ব সমাজহীন অপরিচয়ের সুযোগে এবং ধনলিপ্সার কালিমার মাঝে জাগ্রত হইয়া উঠে—ভূগর্ভে নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখে সে পশুত্ব। গ্রামের সরল সুন্দর লোকগুলিকে টানিয়া আনিয়া তিমিরাচ্ছন্ন পশুত্বের গর্ভে নামাইয়া দেয় এই যন্ত্রদানব—তাহারা ভাসিয়া যায় নিরুপায়ের মত, সে কারাগার হইতে বাহির হইবার উপায় থাকে না। মানুষের হয় মৃত্যু, পশুত্ব জাগিয়া উঠে অকস্মাৎ উদ্দাম শক্তি লইয়া।

সেদিন শনিবার নিতাই ও সুমী হপ্তা পাইয়াছিল—ধাওড়ায় ফিরিবার পথের অদূরে পচুইএর দোকান। বহু সহকর্মী তেলে ভাজা ও পঁচুইএর হাড়ি সামনে করিয়া ইতিমধ্যেই জমিয়া গিয়াছে। সারা সপ্তাহের ক্লান্তির পর নিতাই-এর কাল ছুটি—সে প্রলুব্ধ হইয়াছে, একদিন একটু আনন্দ না করিলে বাঁচিবে কি করিয়া। নিতাই কহিল—সুমী তু ঘরকে যা, রস খাওয়া করে মু যাবেক—

সুমী তাহার হাত ধরিয়া কহিল—তু কেনে যাবি—রস খেলে ভাল হবেক নাই—মাতাল হবে বটে! গাঁকে কেমনে যাবি?

গ্রামের প্রসঙ্গে নিতাইএর অন্তর অভিমানে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গাঁয়ে যাবেক? হুঁ··, কোন গাঁয়ে? ছোটবাবুর ও পচা গাঁয়ে মু যাবেক নাই—যা তু ঘরকে, রাঁধা কর—নিতাই হেঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দোকানের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। সুমী অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল,তার পর ধীরে ধীরে ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল।

নিতাই ভরপেট পাঁচুই ও তেলেভাজা গিলিয়া, সুমীর জন্যে আধসেরটাক পাঁচুই লইয়া যখন ফিরিল তখন রাত্রি হইয়াছে। অভিমানে নিতাই ভাসিয়াছে—ভাসিয়া যাইবে—

সুমীর শাকান্ন রাঁধা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা ছেঁড়া খেজুরের পাতার তালাই বা পাটিতে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। নিতাই মত্ত, দ্রব্যগুণে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ধাওড়ায় আসিয়া ডাকিল—সুমী—সুমী—

সুমী শুইয়াই কহিল—ডাক্‌ছিস্ কেনে—

—রাঁন্না হল বটে!

—হাঁ।

—তবে,লে মালটো খাওয়া কর—একসঙ্গে ভাত খাবেক—

—মাল মু খাবেক নাই—

—কেনে—তু খা। শরীরটা ত বেদনা বটে! কয়লা টানা ক'রলেক না কত? ব্যথা ম'রবেক—

সুমী খাইতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু সারা সপ্তাহ কয়লা টানিয়া টানিয়া শরীরটা বেদনা হইয়াছে। নিতাইএর অনুরোধে অবশেষে সে পুচইটুকু পান করিল।

আহারান্তে উভয়ে তামাক সাজিয়া লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল—মত্ত অবস্থায় নিতাই বলিয়া যাইতেছিল—গাঁকে আর মোরা যাবেক নাই—হোথা কি আছে বল কেনে? পেটভাত হবেক নাই—বারো দুয়ারে মনিষখাটা করে কুকুরের মত আর বাঁচবেক নাই—হেথাই কাটাবেক—

সুমী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কুটুম, আত্মীয় সব ছাড়া করবেক? হেথা তোর কোন কুটুম আছে?

নিতাই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—অনেকক্ষণ আপন মনে হাসিয়া কহিল—বড় কুটুম হেথা রে সুমী, বড় কুটুম রইছেন?

—কে বটে?

—টাকা, টাকা,—টাকা! এ কুটুম ছাড়া ক'রে বড় কুটুম ছোটবাবুর গাঁয়ে যাবেক কেনে? শিবু নিতাই মাছ চুরি ক'রলেক, তারই খাজনা দিলেক—তাদের খাস জমি বাড়তি দিলেক। মু চুরি করবেক নাই, ধরম খোয়াবেক নাই তাই—জমি ছাড় করালেক। লে—লে—ধরম কেনে তবে? বল সুমী বল—ধরম কেনে তবে? ও গাঁয়ে মু যাবেক নাই—টাকাই ত ধরম বটে—নিতাই পুনরায় হাসিল।

সুমীর নেশা লাগিয়াছিল, সে অতটা কিছু এখন বুঝিতে পারিল না, সেও নিতাইএর দেখাদেখি হাসিল। কহিল—টাকাই ত ধরম বটে—ধরম বটে—

পঁচুইএর উন্মত্ততার মাঝে ধাওড়ার বারান্দায় শুইয়া তাহারা শনিবারের দুর্লভ রাত্রি কাটাইয়া দিল—

সুমীর বর্ণ নিকস কালো, কিন্তু দেহটা তাহার ক্ষীণ ও মজবুত। এখানে যাহারা কাজ করে তাহাদের দেহের লালিত্য ও কমনীয়তা বহুদিন পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু গ্রামের উদার মাঠ, মুক্ত বায়ু, সবুজ গাছের দেওয়া স্বাভাবিক কমনীয়তাটুকু সুমীকে তখনও লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে—

বয়স তাহার আঠার উনিশ, সন্তান হয় নাই, ঋজু সরল ক্ষীণ চঞ্চল দেহ। চোখ দুটি টানাটানা, ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব—এখানে কালিকাময় কয়লার খাদে তাহার দেহসৌষ্ঠব লোভনীয়—তাই অনেকেই চাহিয়া দেখে। সিফ্‌টবাবু, লোডিংবাবু সকলেই চাহিয়া দেখেন—পরিচয় করেন কিন্তু সুমী তাহার সংশয়হীন অকুণ্ঠ মনে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না—ভাবে, তাহারা নতুন বলিয়া তাহাদের প্রতি এটা করুণা মাত্র!

প্রভাতে উঠিয়া নিতাই হাটে গিয়াছে সপ্তাহের দোকান আনিতে এবং তরিতরকারী কিনিতে—সঙ্গে পাড়ার সহকর্ম্মীরাও গিয়াছে। পূবের পুরাতন বটগাছের মাথার উপরে সূর্য্য উঠিয়া ঝলমল করিতেছে। সুমীর পূব-দুয়ারী ধাওড়ার বারান্দায় রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সরু গলির দুইদিকে ধাওড়া—সুমী সকালে উঠিয়া গৃহ-মার্জ্জনা, জল আনা প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—নিতাই কি সত্যই আর গ্রামে ফিরিয়া যাইবে না? এখানেই সারাজীবন কাটাইয়া দিবে—এখানে গৃহ নাই, স্বজন নাই, আপনার বলিতে কিছু নাই। এখানে কেমন করিয়া সারাজীবন কাটান যাইবে।

সামনের ধাওড়ার কুলি হাটে গিয়াছে তাহার স্ত্রী বসিয়া বাসন মাজিতেছে, দুইটি ছেলেমেয়ে দিগম্বর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওরাও কাজ করে—এখানেই রহিয়া গিয়াছে পুরুষানুক্রমে। ওই ছেলেমেয়ে দুইটিও এখানে কাজ করিবে।

সুমী হঠাৎ লক্ষ্য করিল একজনবাবু সরু গলির মধ্য দিয়া ছড়ি হাতে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। চোখে চোখ পড়িতেই বাবু ডাকিলেন—এই শোন ত!

সুমী উঠিয়া গেল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তোর নাম কি?

—সুমী।

—তোর লোকের নাম কি?

—নিতাই বটে।

—কি করিস?

—খাদকে কয়লা কাটি—

—ওঃ কুলি! কতদিন এসেছিস্?

—দু হপ্তা হল—

—বিকেলে আমার বাসায় যাবি—

সুমী বিস্মিত হইয়া কহিল—কেনে?

—কেনে কি? যাবি বলছি—যাবি। তার আবার কেনে কি?

সাম্‌নে যে মেয়েটি বাসন মাজিতেছিল সে উঠিয়া আসিয়া যুক্ত করে নমস্কার করিয়া কহিল—হুজুর এদিকে—

—এমনি বেড়াতে এসেছি—

মেয়েটি সুমীকে কহিল—সিফ্‌টবাবু—হুজুর—উনি বলছেন্ তা যাবেক নাই কেনে?

সুমী তবুও কহিল—কেনে যাবেক?—মোর মনিষ ঘরকে আসুক। শুনবেক নাই—

মেয়েটি বুঝাইয়া বলিল—বাবু কইছেন তা মনিষকে কি শুধাবেক! বড় ভাল মনিব—মন মত কাজ করবি, কত পাবি, রস খাবি, গয়না পরবি—টাকা পাবি—

সুমী তখনও ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন—যাবি, বুঝলি—আমি বিনি পয়সায় কাউকে দিয়ে কিছু করাই না—বাসনটা মেজে দিলেও আমি পয়সা দেই—বুঝলি—আর তোদের দিয়ে খাইয়েই ত আজি ফতুর—বাবু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন।

সাম্‌নের ধাওড়ার মেয়েটি মুচকি হাসিয়া কহিল—তোর বরাৎ খুলবেক রে, সুমী, বরাৎ খুলবেক—

সুমী বিষণ্ণভাবে পুনরায় দাওয়ায় আসিয়া বসিল—তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে হিজুল বনের মাঠ, বসন্তসায়র, চণ্ডীতলায় বিরাট বটগাছ—গাভী, গ্রামের পায়েচলা পথ, —পাড়ায় লোকজন, প্রতিবেশী বন্ধু—গোপাল ঠাকুর আরও কত কি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসিয়া সে গোপালপুরের স্বপ্ন দেখিতেছে—কি মোহময় সেই ক্ষুদ্র গ্রাম—কি সুন্দর—অথচ একান্ত নিরুপায়ের মত তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এই শিশির ঝলমল ঘাস, শস্য-শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, তাহার মাঝে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া কাজ করা যায়—সেখানে কি আর ফিরিয়া যাওয়া চলে না—এই অপরিচিত হৃদয়হীন প্রতিবেশী ও কয়লার কালির মধ্যে কেমন করিয়া জীবন অতিবাহিত করা যায়—

সুমী ভাবিতে ভাবিতে ব্যথিত হইয়া উঠিল—অশ্রুভারে চোখ দু'টি টলমল করিতে লাগিল।

নিতাই হাট করিয়া ফিরিতেছিল—সপ্তাহের দোকান খরিদ জিনিষপত্র ও তরি তরকারী। একপোয়া মাংসও সে আজ কিনিয়াছে। রবিবারের হাটে মাংস পাওয়া যায়।

কলিয়ারীর প্রান্তে ঢুকিতেই দেখে একটা ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে একটি মেয়ে রস খাইয়া নেশার ঘোরে কি সব বলিতেছে, আর মাঝে মাঝে গান গাহিতেছে—

মেয়েটির রং ফরসা, ক্ষীণ তন্বীদেহ, সুন্দর স্বচ্ছন্দ। বয়স কুড়ি বাইশ হয়ত হইবে কিন্তু যৌবনের ম্লানিমা দেখা যায় না। কেবল মাত্র চোখের কোনে একটা কালিমা তাহার দৈহিক অত্যাচারের কথা ঘোষণা করে। এখানে ওমনি একটি মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে কি করিয়া আসিল, কি বা করে—তাহা নিতাই ভাবিয়া পাইল না। কৌতূহলবশতঃ সাথী নগরবাসীকে প্রশ্ন করিল—উ কে নগরবাসী। এই কয়দিনে নগরবাসী বাউরীর সঙ্গে তাহার একটু ভালবাসা হইয়াছে। লোকটি ভাল, নিতাইকে ভাল চোখেই দেখে। সে প্রায় দশবৎসর এইখানে কাজ করে। নগরবাসী কহিল—জানিস্ না? উ সুন্দরী বাউরীর বেটি। সুন্দরীর মনিষ হেথা খাদে চাপা পড়ে মারা গেলেক—সুন্দরী দারোয়ান পাঁড়েজির কাছে রইলেক। পাঁড়েজির রং ছেলো টুক্‌টুকে—তাই ওই বেটী হলেক সুন্দরীর। ওর নামটা বট লছমী—

নিতাই প্রশ্ন করিল—খাদকে কাজ করে?

—কাজ করবেক কেনে? বাবুরা আস্‌বেক যাবেক টাকা দেবেক—উর অভাব কি? রস খেয়ে দিবারাত্রি হল্লা করবেক—বড় সাহেব জনসন্ তিন বছর উকে রাখলেক—

কথা বলিতে বলিতে তাহারা লছমীর প্রাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী হইল—প্রাঙ্গণের পাশ দিয়াই পথ। লছমী উঠিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, অত্যধিক মদ্য পানে তাহার দেহ টলিতেছে। সে প্রশ্ন করিল—তু কোন বট রে?

নগরবাসী কহিল—নগরবাসী—

—তু কোন? তোকে কে বলছেক?

অর্থাৎ নিতাইকে সে প্রশ্ন করিয়াছে। নিতাই জবাব দিল—মু নিতাই বাগ্দী।

লছমী একগাল হাসিয়া কহিল—তু বাউরী নয়, বাগ্দী কুলীন বট? নতুন বট?

—হ্যাঁ নতুন বটি—

—খাদকে কাম করিস্—

—হাঁ বটে।

—আচ্ছা জোয়ান বট! তু আয় বসবি, গান শুন্‌বি রস খাবি, আর তু—আয় মোর ঘরকে—

নগরবাসী যাহা কহিল তাহার অর্থ এই যে নিতাইএর সুন্দর সুডৌল তরুণ দেহ দেখিয়া লছমী মজিয়াছে। সুযোগ লইলে নিতাই বিনাপয়সায় যথেষ্ট রসপান ও স্ফূর্ত্তি করিতে পারিবে।

নিতাই লছমীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল—এমন একটি দিব্যরমণী তাহাকে রসপান করিতে ডাকিতেছে সে কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করে! সে কহিল—নগরদা তু আয়—

নগরবাসী কহিল—না মু ঘরকে যাবেক—

লছমী নিতাইএর হাত ধরিয়া এককলি গান গাহিয়া শেষে কহিল—তু যা নগরবাসী ঘরকে—নিতাই আয় রস খাবি—

নগরবাসী চলিয়া গেলে, লছমীর হাতে বদ্ধ অবস্থায় নিতাই বিস্মিতভাবে তাকাইতে লাগিল। লছমী কহিল—আয় তু জোয়ান বটে, রস খাবি—

নিতাই একটু ভীত ভাবে কহিল—সকালে কেনে রস খাবেক?

—বিকালে আসবি বল?

নিতাই বিহ্বল ভাবে কহিল—আস্‌বেক—

—তবে যা—আসবি।

নিতাই ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসিল—কিন্তু লছমীর অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ ও অকুণ্ঠ আবেদনের কাছে হৃদয়টা রাখিয়া আসিল। তাহার স্পর্শ, তাহার আহ্বান, তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিল। এমন বিচিত্র ঘটনা তাহার জীবনে ঘটে নাই—

ধাওড়ায় ফিরিয়া দেখে সুমী বিষণ্ণ মুখে স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া আছে। নিতাই একবার তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল—লছমীর সুন্দর সুডৌল দেহের কাছে সুমীর দেহ যেন অত্যন্ত কুৎসিৎ। নিতাই কহিল—উঠ্ সুমী, রাঁধা কর—

সুমী গোপালপুরের স্বপ্ন ছাড়িয়া উনুনে আঁচ দিতে গেল—তখন বেলা ৯টা—

ক্রমশঃ

প্রাচীন ভারতের গণিত-সাধনা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম-এস্‌সি

(১)

বৈদিক যুগ

ভারতীয় গণিতের ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে জাতির অপূর্ব সভ্যতা স্থাপনের নিদর্শন দেখিয়া আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, সে জাতির গাণিতিক জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কিছু কিছু তথ্য সাম্প্রতিককালে উদ্ধার করিয়াছেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ছোট বড় নানা রকমের বহু ওজন পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণকারের ব্যবহারের উপযোগী অতি ক্ষুদ্র ওজন হইতে আরম্ভ করিয়া টানিয়া তুলিতে কষ্ট হয় এইরূপ বড় ও ভারী ওজনও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড় ওজনগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ ঘনর আকারে নির্মিত। ছোট ওজনগুলির আকার অনেকটা চোঙের মত; মেসোপোটামিয়া ও এলামে এইরূপ ওজনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। একক (unit) হিসাবে মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পায় যে ওজনের ব্যবহার দেখা যায় গ্র্যাম্‌-এ (gram) পর্যবসিত করিলে ইহার মান দাড়ায় ০·৮৭৫০ গ্র্যাম। এ পর্যন্ত বৃহত্তম যে ওজন পাওয়া গিয়াছে তাহার মান হইল ১০৯৭০ গ্র্যাম। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা উভয় স্থান হইতেই ১৩·৬৪ গ্র্যাম ভারী একটি বিশেষ ওজন যথেষ্ট সংখ্যায় আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এই ওজনটিই সাধারণ বেচা-কেনার কাজে হামেশা ব্যবহৃত হইত। ইহা উপরোক্ত একক ওজনের ঠিক ১৬ গুণ। মাপ-জোক ও হিসাবনিকাশের ব্যাপারে ভারতীয় পদ্ধতিতে ১৬-র প্রাধান্য সুবিদিত। হয়ত মহেঞ্জোদড়োর আমলেই এই প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি দাঁড়িপাল্লার উপরের দণ্ডটি পিতলের ও পাল্লা দুইটি তামার। হাল্‌কা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ওজনার্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হইত। ভারী দ্রব্যাদি ওজনের জন্য সম্ভবতঃ কাঠের দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা ছিল।

৬·৬২ ইঞ্চি লম্বা একটি খোলকের বা শেলের মাপনী পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ম্যাকে দেখাইয়াছেন, এইরূপ মাপনীর সাহায্যে দৈর্ঘ্য মাপিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার এককের মান ০·২৬৪ ইঞ্চি। মাপনীটি আবার পাঁচটি করিয়া দাগে (১·৩২ ইঞ্চি) পর পর বিভক্ত। ইহাতে ম্যাকে অনুমান করেন, গণনার ব্যাপারে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা সম্ভবতঃ দশমিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিল। উপরোক্ত মাপনীটি সম্ভবতঃ ১৩·২ ইঞ্চি লম্বা একটি সম্পূর্ণ মাপনীর ভগ্নাবশেষ। চতুর্থ রাজবংশের আমল হইতে মিশরে এবং একই সময়ে এলামে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথমে কোন একটি সভ্যতার কেন্দ্রে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়া পরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে দশমিক পদ্ধতি অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ নাই; তবে স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ব্যবহার আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন হইতে ইহার অধিক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের অমূল্য বৈদিক সাহিত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে বৈদিক ঋষিগণ অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া যে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কোন তুলনা নাই।

বৈদিক যুগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-তৎপরতা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে এই যুগের প্রাচীনত্ব ও সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থাদির রচনা কাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব স্বীকারে কুণ্ঠাবোধবশতঃ একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন বৈদিক কালকে ক্রমশঃ খ্রীষ্টীয় শতকের কাছাকাছি আগাইয়া আনিবার জন্য উদ্বিগ্ন, সেইরূপ অনেক ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সুমহান প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৈদিক যুগকে ক্রমশঃ অতীতের দিকে ঠেলিয়া এক ঐতিহাসিক অবাস্তবতার ও অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ফলে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৪০০০ অব্দের মধ্যে অসংখ্য তারিখ বৈদিক যুগের আরম্ভ হিসাবে নানা পণ্ডিতের রচনায় উল্লিখিত দেখা যায়। এমন কি নক্ষত্র-সংস্থানের জ্যোতিষীয় বিচার হইতে কেহ কেহ ঋক্‌বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর মনে করেন। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সর্বত্র তখন নব্য-প্রস্তর যুগ চলিতেছে; পৃথিবীর কোথাও কৃষিনির্ভর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে নাই; এবং সর্বোপরি খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের আগে কোনও প্রকার আক্ষরিক লিপি আবিষ্কারের প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-এশিয়ায় বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এক আলোচনা-সভায় বৈদিক যুগের ও প্রাচীন ভারতের কাল সম্পর্কে উপরোক্ত মতান্তর ও অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ঐ সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে* এবং আরও বিশদভাবে

---

* Scientific Achievements of the Ancient Hindus: Chronological and Sociological Background'—By Dr. R. C. Majumdar; দক্ষিণ-এশিয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ; ১৯৫০।

প্রাচীন ভারতের গণিত-সাধনা

সম্প্রতি প্রকাশিত 'The Vedic Age' গ্রন্থে বৈদিক যুগের প্রাচীনত্ব ও বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক সভ্যতার কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১০০০ মধ্যে মনে করাই এখন সব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত। ইহা হইল বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৫০০ অব্দ। প্রাচীনতম বেদ ঋক্-সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ ; এই বেদের কিছু কিছু অংশ হয়ত ইহার কয়েক শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময় হইতে ঋক্-সংহিতার রচনা অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কিছু আগে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পরবর্তী কালের রচনা (যদিও ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত ও অভধেশনারায়ণ সিংহ History of Hindu Mathematics-এ তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ লিখিয়াছেন)। সাম, যজু, অথর্ব প্রভৃতি পরবর্তীকালের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য সম্ভবতঃ রচিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে। ঋক্-সংহিতার মত ইহাদের কিছু কিছু অংশ আবার উপরোক্ত সময়ের কিছু আগে, এমন কি ঋক্-সংহিতার কালেও রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

উপনিষদের কাল-নির্ণয় সুকঠিন, কারণ ইহাতে যে সকল তথ্যের ও তত্ত্বের আলোচনা আছে তাহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তবে উপনিষদের প্রাচীনতম অংশগুলি যে প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর, তাহাতে কোন সংশয় নাই। উপনিষদ্ রচনার সর্বশেষকাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অতিশয় মূল্যবান। সূত্রযুগে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০-২০০) ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ডাঃ দত্ত ও সিংহ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দের উল্লেখ করিয়া বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। স্মৃতি ও পুরাণ রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে।

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও মতদ্বৈধ আছে। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনাবলী, ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ সংঘটিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে। এই বৃত্তান্ত বহু শত বৎসর মুখে মুখে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থাকারে লিখিত হইতে আরম্ভ হয় এবং বর্তমান আকারে পৌছিতে এই মহাকাব্য যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, ইহার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ ; এখন দেখা যাইতেছে ইহার অন্ততঃ দুইশত হইতে চারিশত বৎসর পরে এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদির তারিখ সম্বন্ধে নানা অনিশ্চয়তা ও পরস্পর-বিরোধী নানা দাবী থাকায় এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ ঐতিহাসিক মহলের সর্বশেষ অভিমত উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনার প্রারম্ভে প্রামাণ্য গ্রন্থাদির রচনা কাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক। এইবার আমরা প্রবন্ধের মূল বিষয় অবতারণা করিব।

গণিত অর্থ গণনাবিদ্যা। বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলিতে সাধারণতঃ পাটী-গণিত ও জ্যোতিষকে বুঝিতেন ; জ্যামিতি বা রেখাগণিত (ক্ষেত্র গণিত) ছিল কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গণিত যে শ্রেষ্ঠবিদ্যা, বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আমরা একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান সর্বোচ্চ ; বেদোক্ত সকল বিদ্যার ইহা শীর্ষস্থানীয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের এক জায়গায় আছে :

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতম্॥"—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ৪।

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতের অবস্থিতি।

বৈদিক হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি দশমিক। মিশরীয়দের মত বিরাট সংখ্যাসমূহ কল্পনা করিবার ক্ষমতা হিন্দুদের এক বিশেষত্ব। হিন্দুরা বিরাট সংখ্যার নানা নামকরণ পর্যন্ত করিয়াছে। যজুর্বেদ সংহিতায় বিভিন্ন সংখ্যার আমরা এইরূপ নামকরণ পাই : এক (১), দশ ($১০^{১}$), শত ($১০^{২}$), সহস্র ($১০^{৩}$), অযুত ($১০^{৪}$), নিযুত ($১০^{৫}$), প্রযুত ($১০^{৬}$), অর্বুদ ($১০^{৭}$), ন্যর্বুদ ($১০^{৮}$), সমুদ্র ($১০^{৯}$), মধ্য ($১০^{১০}$), অন্ত ($১০^{১১}$), ও পরাধ ($১০^{১২}$)। বিভিন্ন ও এইরূপ বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গ্রীকদের গণিতে মিরিয়াড বা $১০^{৪}$-এর উর্ধ্বে কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না ; অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার দুর্বলতার জন্য বৃহৎ সংখ্যা চিরদিনই গ্রীকদের কল্পনাতীত থাকিয়া গিয়াছে।* সাধারণ ব্যবহারিক কাজে অবশ্য সহস্রের উপর সংখ্যা ব্যবহারের বেশী প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অযুত, নিযুত, প্রযুত ইত্যাদি ব্যবহারের পরিবর্তে সহস্র বা শতকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ করিবার আর একপ্রকার রীতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চাশৎ সহস্রম্ (৫০,০০০), দ্বানপ্ততি সহস্রাণি (৭২,০০০), ইত্যাদি।

আমরা ১০-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি মাত্রার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংখ্যার নাম দিয়াছি। ইহাদের মধ্যবর্তী নানা সংখ্যা নির্দেশ করিতে যোগ ও বিয়োগ উভয় ধারণারই ব্যবহার দেখা যায়।

---

* আর্কিমিডিস ইহার ব্যতিক্রম ; "Sand Reckoner"-এ গ্রীক সংখ্যার সাহায্যে বড় সংখ্যা কিরূপে প্রকাশ করা যায় আর্কিমিডিস্ তাহা দেখান।

'একাদশ' (১০ + ১), 'সপ্তবিংশতি' (২০ + ৭) প্রভৃতি নামকরণে যোগের এবং 'একোন-বিংশতি' (২০ – ১), 'একোন-ত্রিংশৎ' (৩০ – ১) প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিয়োগের ব্যবহার অবলম্বিত হইয়াছে। 'একোন-বিংশতি' কথারই অপভ্রংশ 'উনবিংশতি' ও 'উনবিংশ'।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরে ও অন্যান্য লিপিতে সংখ্যা লিখিবার যে নমুনা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলিয়া অনুমিত হয়। এক বা একাধিক দাঁড়ির সাহায্যে সংখ্যা নির্দিষ্ট হইত। ২০, ৩০, ৪০ প্রভৃতি বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ বিশেষ কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হইত কিনা তাহা জানা যায় না। মহেঞ্জোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধার এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর ভারতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালিপির যে নমুনা পাই তাহা হইল খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। অশোকের শিলালিপিতে এই উভয়বিধ সংখ্যালিপির প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খরোষ্ঠী লিপি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত ব্যবহৃত দেখা যায়; ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী হইতেও প্রাচীনতর লিপি।

প্রাচীন গান্ধার দেশে (আধুনিক পূর্ব-আফগানিস্থান ও উত্তর-পাঞ্জাব) খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিবার রীতি। অশোকের শিলালিপিতে এই লিপির যে নমুনা দেখা যায়, তাহার অনেক উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি শক, পার্থিয়ান ও কুশানদের আমলের খরোষ্ঠী লিপিতে। এই সময়ের উন্নত খরোষ্ঠী সংখ্যা লিপির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
I	II	III	X	IX	IIX	IIIX	XX
১০	২০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	
?	3	33	?33	333	?333	3333	
১০০	২০০	৩০০	১২২	২৭৪			
?I	?II	?III	II3?I	X?333?II			

(১নং চিত্র)

এই লিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৪ সংখ্যা লিখিবার মধ্যে। পূর্বে এই লিপিতে ৪ লিখা হইত শুধু পর পর চারিটি দাঁড়ির সাহায্যে (IIII); এখন সম্পূর্ণ একটি নূতন প্রতীকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সহিত ব্রাহ্মী ৪-এর, +, বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ৯-সংখ্যার কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই; ডাঃ দত্ত ও সিংহ অনুমান করেন ইহা সম্ভবতঃ লেখা হইত I × ×. তারপর দশ লিখিবার জন্য কেন একটি ভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন হইল এবং X ও I প্রতীকদ্বয় ব্যবহার করিয়া কেন ইহা II × × ভাবে লেখা হইল না, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। খরোষ্ঠী সংখ্যা যৌগিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সব শেষের সংখ্যার দৃষ্টান্তই ধরা যাক। ২৭৪-এর অর্থঃ ৪ + ৭০ + ২০০ (দক্ষিণ হইতে বামে লিখিলে, কারণ খরোষ্ঠীর উহাই রীতি)।

খরোষ্ঠী বিদেশী লিপি। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তনের কাল অজ্ঞাত। পারসিক রাজ দরায়ুসের (বা দারয়বৌষের) (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর এদেশে খরোষ্ঠীর প্রচলন অনেকে অনুমান করেন।

খরোষ্ঠী লিপির পাশাপাশি আমরা ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহারও দেখিতে পাই। ভারতের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ের ব্রাহ্মী সংখ্যা লিপির যে সব নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য কোন সমতা পাওয়া যায় না এবং তাহা আশা করাও অসঙ্গত। কালের ব্যবধানে ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই লিপির যথেষ্ট প্রভেদ ঘটিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে অশোকের শিলালিপিতে, মধ্যভারতে পুনার ৭৫ মাইল দূরে নানাঘাট পাহাড়ের গুহাভ্যন্তরে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) ও বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলার এইরূপ আর একটি গুহায় (খ্রীঃ অঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতক) ব্রাহ্মী সংখ্যা-লিপির কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার রীতি, খরোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত। প্রাচীনতম খরোষ্ঠী ও সেমিটিক সংখ্যা লিপিতে আমরা শুধু ১, ১০, ২০, ও ১০০-র জন্য পৃথক পৃথক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মীতে ১, ৪ হইতে ৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০...১০০০, ২০০০...ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহৃত হইত। ১০, ২০,...১০০, ২০০,...ইত্যাদি সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শূন্যের ব্যবহার ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই।

খরোষ্ঠীর মত মধ্যবর্তী নানা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য যৌগিক নিয়মের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, উপরোক্ত তালিকার নানাঘাট লিপি অনুযায়ী।

২৮৯ = ২০০ + ৮০ + ৯ ..

প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা লিপি বিবর্তনের ইতিহাস যাহারা বিশদভাবে জানিতে আগ্রহী তাহাদের ডাঃ দত্ত ও সিংহের 'History of Hindu Mathematics' এবং স্মিথ্ ও কার্পিন্স্কির "The Hindu Arabic Numerals' পড়িতে অনুরোধ করি।

সংখ্যা সম্বন্ধে যে জাতি সুদূর অতীতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, পাটীগণিতে তাহারা যে নানা স্বকীয়তার পরিচয় দিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রথমে সমান্তর প্রগতির (arithmatic progression) কথা ধরা যাক। তৈত্তিরীয় সংহিতায় কাব্যাকারে রচিত কয়েকটি স্থানে আমরা নিম্নলিখিত প্রগতির উল্লেখ পাই :—*

* The Cultural Heritage of India, vol III, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত; ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্তের 'Vedic Mathematics' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১, ৩, ৫,……১৯, ২৯, ৩৯,…৯৯

২, ৪, ৬,……২০,

৪, ৮, ১২,……২০,

৫, ১০, ১৫,……১০০,

১০, ২০, ৩০,……১০০,

	অশোক লিপি	নানাঘাট লিপি	নাসিক লিপি
১	।	—	—
২	।।	=	=
৩			≡
৪	+	¥ ¥	¥ ¥
৫			ħ ҕ
৬	ε, ϕ	ϕ	ϕ
৭		?	7
৮			५ ५
৯		?	?
১০		∝ ∝, ∝	∝ ∝
২০		o	θ
৩০			
৪০			ㅈ
৫০	ʊ, ɔ		
৬০		ㅓ	
৭০			ꭓ
৮০		ꝏ	
৯০			
১০০		ਮ	ɱ
২০০	ਮ, ਮ, ਇ	ਮ	ɱ
৩০০		ਮ	
৪০০		ਮ+	
৫০০			ɱ
৭০০		ਮ	
১০০০		T	ɋ
২০০০			ɋ
৩০০০			ɋ
৪০০০		TY	ɋ+
৬০০০		Tϕ	
৮০০০			ɋ५
১০০০০		T∝	
২০০০০		To	

(২নং চিত্র)

সমান্তর প্রগতিগুলিকে আবার যুগ্ম ও অযুগ্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একটি গুণোত্তর প্রগতির (geometric progression) দৃষ্টান্ত আছে :

২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২…৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬

শ্রৌত্রসূত্রে এই প্রগতিটি পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

সমান্তর বা গুণোত্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বৈদিক হিন্দুরা জানিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের একটি দৃষ্টান্ত আছে [৩ × (২৪ + ২৮ + ৩২ + …৭টি রাশি পর্যন্ত) = ৭৫৬]। একটি বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একটি সমান্তর প্রগতিতে রূপান্তরিত করিতে হয় বৌধায়ন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সহিত বৈদিক হিন্দুরা পরিচিত ছিলেন। শুল্বসূত্রে লিপিবদ্ধ ভগ্নাংশ গণিতের কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{২}{৫} = ১৮\frac{৩}{৪}\ ;$$

$$(২\frac{২}{৫})^২ + (\frac{১}{২} + \frac{১}{১৫})(১ - \frac{১}{২}) = ৭\frac{১}{২}\ ;$$

$$\sqrt{৭\frac{১}{৯}} = ২\frac{২}{৩}\ ;$$

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{১৫} \text{ এর } \frac{১}{২} = ২২৫।$$

দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য আধুনিক গাণিতিক পদ্ধতিতে লিখিত হইল। উপরোক্ত দৃষ্টান্তের তৃতীয়টিতে বর্গমূলের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। বর্গমূল নির্ণয়ে ও অমূলদ রাশির ব্যবহারে বৈদিক হিন্দুরা নিঃসন্দেহে তদানিন্তন অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক ঋষিগণের শুল্বসূত্রে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ প্রভৃতি অমূলদ রাশির বর্গমূল নির্ভুলরূপে বাহির করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বর্গক্ষেত্রকে নানাভাবে ভাগ করিয়া নির্ণীত $\sqrt{২}$ ও $\sqrt{৩}$ অমূলদ রাশির স্থূলমান হইল :—

$$\left.\begin{aligned} \sqrt{২} &= ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩\cdot৪} - \frac{১}{৩\cdot৪\cdot৩৪} = ১\cdot৪১৪২১ \\ \sqrt{৩} &= ১ + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩\cdot৫} - \frac{১}{৩\cdot৫\cdot৫২} = ১\cdot৭৩২০৮ \end{aligned}\right\} \text{দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিলে}$$

বেদী নির্মাণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী নির্মাণ হইতে যে শুধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তাহা নহে, ইহা বীজগণিতের প্রাথমিক বিকাশের জন্যও দায়ী। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারে বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এই সব সমীকরণের সমাধান বাহির করা হইত। শুল্বসূত্রে ও বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ-সমীকরণ সমাধানের অনেক নজির আছে। একঘাত সমীকরণের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—"প্রথম রাশিটি অজ্ঞাত, দ্বিতীয় রাশি প্রথম রাশির দ্বিগুণ ; তৃতীয় রাশি দ্বিতীয়ের তিন গুণ চতুর্থ রাশি তৃতীয়টির চার গুণ ; এখন চারিটি রাশির যোগফল ১৩২ হইলে, প্রথম অজ্ঞাত রাশিটি কত ?" আধুনিক পদ্ধতিতে অজ্ঞাত রাশিকে x ধরিয়া সমীকরণটি লিখিলে তাহা দাঁড়ায় :—

$$x + ২x + ৬x + ২৪x = ১৩২$$

বেদীর ক্ষেত্র সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কিরূপে বিভিন্ন মাত্রার সমীকরণ সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করা যাক, একটি প্রদত্ত বর্গক্ষেত্রকে (বাহু $= a$) একটি আয়ত

ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহার একটি বাহু হইতেছে b ; আয়ত ক্ষেত্রের অপর বাহু x কত ? অর্থাৎ আমাদের

$$bx = a^2$$

একঘাত সমীকরণটি সমাধান করিতে হইবে।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 'মহাবেদীর' প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাবেদী আসলে একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম, ইহার দুই সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য ২৪ ও ৩০ এবং উচ্চতা ৩৬। এখন এই সমান্তরাল বাহুদ্বয় ও উচ্চতাকে সমান অনুপাতে, অর্থাৎ x গুণ বাড়াইলে ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল যদি m বর্ধিত হয়, তবে x ও m-এর সম্পর্ক কিরূপ ? অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে,

$$৩৬x \times \frac{(২৪x + ৩০x)}{২} = ৩৬\frac{(২৪ + ৩০)}{২} + m$$

ভাঙ্গিয়া সহজ করিয়া লিখিলে উপরোক্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়

$$৯৭২x^2 = ৯৭২ + m$$

x + 7333 + 5" = x75335

৮৫০২
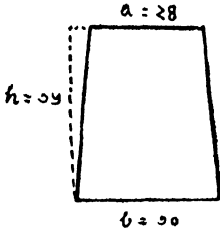
(৩নং চিত্র)

ইহা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। শতপথ ব্রাহ্মণে m-এর কতকগুলি বিশেষ মান ধরিয়া এইরূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা বৈদিক হিন্দুদের জ্যামিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচায়ক, ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল $\left[h\left(\frac{a+b}{২}\right)\right]$, জানা না থাকিলে এইরূপ সমীকরণে পৌঁছান অসম্ভব। বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল 'শুল্ব'। শুল্বকারগণ ঋজুরেখার ক্ষেত্র (rectilineal figure) রচনায়, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিরূপণে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত করিতে (squaring the circle) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শুল্বশাস্ত্রে বৈদিক হিন্দুদের পারদর্শিতা ও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ শুল্বকারগণের নানা উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া গণিতের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনে করেন, তথাকথিত পিথাগোরীয় উপপাদ্য হিন্দুদের আবিষ্কার। এই উপপাদ্য হইল, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উহার অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ প্রখ্যাত বৈদিক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"একটি আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান।" হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে (Junge) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পিথাগোরাস তাঁহার নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হীথ এই উপপাদ্য আবিষ্কার সম্পর্কে গ্রীস, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনের দাবী চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস ইহার আবিষ্কর্তা এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার অভিমত, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত বৌধায়নের কাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০ শব্দ ধরিয়া মনে করেন, পিথাগোরাসের অনেক পূর্বে হিন্দুরা এই উপপাদ্যের কথা জানিত। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপপাদ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।*

কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা খুবই কঠিন। কারণ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি শুল্বকারদের কাল অনিশ্চিত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাহারা বৈদিক সাহিত্যের এইরূপ প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"Some of the writers quoted below (for example, G. Milhand, 1910) claim that Pythagorean geometry may have been partly inspired by Hindu models. This argument is based upon the assumption that the high antiquity of āpastamba's work is proved. It is not. The dates of the S'ulvasūtras (rules of the chord) are so uncertain that I cannot deal with them in this part of the Introduction…It is highly probable that the S'ulvasūtras date from a period posterior to 500 B. C. and pre-christian. They are most probably post—Pythagorean. Introduction to the History of Science. G. Sarton, Vol I, pp. 74.

এই কাল নির্ণয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রাধিকার চিরকাল নিষ্ফল বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য।

---

* …The Hindu Baudhāyana (800 B. C.) in whose S'ulva we now meet with the general enunciation of the theorem, was much anterior to the Greek Pythagorus. Instances of application of it occur in the Baudhāyana S'rauta and S'ataptha Brāhmana (C 2000 B. C.) There are reasons to believe it to be as old as the Taittirīya and other Saimhitās (.C. 3000 B. C.)—Vedic Mathematics, Cultural Heritage of India ; pp 385.

সাঁতার

ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আনমনা

ভাস্কর— শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

মুখের কাটা দাগ

সমারসেট ম্যম্

মাথার রগ থেকে গালের নীচে পর্যন্ত একটা অদ্ভুত লাল কাটা দাগের জন্য লোকটির ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। আঘাতের চিহ্নটা যে গভীর, আর সেটি বোমার না বন্দুকের তাই ভাব্তে সুরু করলাম। মোটা সোটা গোলগাল সদাহাস্য চেহারার মধ্যে ঐ দাগটা বেমানানই নয়—আতংকেরও। গায়ে শক্তির প্রাচুর্য পুষ্ট মাংসপেশীই প্রমাণ দিচ্ছে। সাধারণের চেয়ে একটু যেন বেশী লম্বা। ছাই রং-এর সস্তা প্যান্টের ওপর বুক খোলা সাদা সার্ট ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা পরতো বলে মনে হয় না। তার ওপর মাথা সর্বদাই একটা দোমড়ানো টুপিতে ঢাকা থাকতো। শহরের 'প্যালেস' রেস্তরাঁয় রোজ-ই তাকে দেখা যায় লটারীর টিকিট বিক্রী করছে। 'বারের' এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধীর পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে প্রত্যেকের কাছে টিকিট কেনার বিনীত অনুরোধ জানাতো। অন্ন সংস্থানের এ পথকে সহজ বলতে পারি না—কারণ কোনদিন কেউ তার কাছ থেকে টিকিট কিনতো না, তা জোর করে বলতে পারি। তবে প্রায়ই মদ খাবার জন্য তাকে যে কেউ অনুরোধ করতো না তা নয়। টেবিলের ধার দিয়ে তার হেলে দুলে যাবার চলন্ত মূর্তি দেখে ভাবতাম নির্বিবাদে অনেকখানি পথ সে নিশ্চয়ই অক্লেশে হেঁটে যেতে পারে। প্রত্যেক টেবিলের কাছে মুহূর্তের জন্য থেমে তার অনুরোধ জানাতো। কেউ শুনতো কেউ ফিরেও তাকাতো না। তাতে অবশ্য তার খুব বেশী অসুবিধা হয় না, আর দুঃখও পেত কিনা জানি না, তবে বেশ লক্ষ্য করেছি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যাবার সময় তার ঠোঁটের প্রান্তে একটুকরো হাসি খেলে যায়। মনে ভাবতাম ওর এই টিকিট বিক্রী যেন এক পুরানো নেশা।

গুয়াতামালার রেস্তরাঁর সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে শুকনো মাংস। একদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বন্ধুকে নিয়ে সেই রেস্তরাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সেই লোকটি এসে হাজির। তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাকে কিছু বলতে না দিয়েই অসম্মতির মাথা নাড়লাম আমি। এর আগে অনেকবার টিকিট কাটবার অনুরোধ জানিয়েছে, কিন্তু কোনবারই ওর কথা রাখি নি। আমাকে অবাক করে পাশের বন্ধু বলে উঠল—'গুড ইভ্নিং।'

স্মিত হেসে সে-ও অভিবাদন জানালো।

'দিনগুলো কাটছে কেমন?'

'এই এক রকম আর কি। এ ব্যবসায় তেমন সুবিধা করা যায় না।'

'কি খাবেন জেনারেল কোয়েটাল?'

'সামান্য ব্রাণ্ডি হলেই চলবে।'

বয়কে ফরমাস করল বন্ধু। এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা বয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'অশেষ ধন্যবাদ। এবার চলি। নমস্কার!'

'নমস্কার!'—বন্ধুও হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

ধীরে ধীরে সে অন্যদিকে পা বাড়ায়।

লোকটি সরে যেতেই বন্ধুকে বললাম—'ও কে? মুখের কাটা দাগটা কিন্তু ভয় পাইয়ে দেয়।'

কি মনে করে বন্ধুটি আমার দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকালো। তারপর এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল—'মুখের কাটা দাগটা খুবই বেমানান, না? গুণ্ডার মত দেখতে হলেও আসলে ও লোক খুব খারাপ নয়। নিকারগুয়া থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ওকে সাধ্যমত সাহায্য করি। সেখানকার বিদ্রোহীদের নায়ক ছিল ও। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস দেখ ও

কোথায় প্রধান মন্ত্রী হবে—তা না এমনি ভিক্ষা করতে হচ্ছে। যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ গুলি বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় আজ ওর এই দুর্দশা। শেষ পর্যন্ত দলের সবাই ধরা পড়ে। পরদিনই সামরিক বিচারালয় বসল। সেখান থেকে পরের দিন রায় বের হোল—গুলি করে মারা হবে সবাইকে। এ সব বিচার ও সব দেশে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলা হয়। যখন রায় বের হোল তখন ভগবান বোধহয় একটু মুচকি হেসেছিলেন। শাস্তির কথাতেও খুব বেশী গুরুত্ব ছিল না। সে রাত শুধু জুয়া খেলেই কাটিয়ে দিল। দলে ওরা পাঁচজন। শুধু গোলাম পর্যন্ত তাস নিয়ে ওদের খেলা চলছিল। কিন্তু দু'বারের বেশী ও জিততে পারল না।

সকাল হোল। সিপাহীরা শাস্তির আদেশটা আবার জানিয়ে দিয়ে গেল। কিছু পরে সবাই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল যত দেশলাইএর কাঠি ও হেরেছে তাতে করে একটা মানুষ সারাজীবন জ্বালিয়ে শেষ করতে পারবে না।

জেলের পাঁচিলের ধারে পাচজনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল। গুলি যে করবে সে ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। চারিদিকে কেমন যেন এক থমথমে ভাব। সবার চোখে-মুখে বিস্ময় আর আতংক। ও তখন প্রধান অফিসারকে ডেকে জিগ্‌গেস করে বসল—'এ রকমভাবে পুতুলের মত আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হবে ?'

প্রধান সেনাপতি উত্তর দিলেন—'সরকারী সৈন্য বিভাগের কর্মকর্তা শেষ সময় উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাই এত দেরী।'

'একটা সিগারেট খাওয়া যাক্। সরকার সময়মত কিছু করতে তো অভ্যস্ত নয় !'

সিগারেটে টান দেবার আগেই দেহরক্ষীকে সংগে নিয়ে প্রধান কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন। কর্মকর্তা হচ্ছেন সান্ ইগ্‌নাশিও। একবার চারিদিকে ঘুরপাক্ খেয়ে এসে বন্দী পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস করলেন—তাদের অন্তিম বাসনা কি ? পাঁচজনের মধ্যে চারজন চুপ করে রইল। কেবল ও বলল—'হ্যাঁ আমি শুধু আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শেষ বিদায় চাই।'

'বেশ তাই হবে। তিনি থাকেন কোথায় ?'

'জেলের দরজায় অপেক্ষারতা।'

'তাহলে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া যায় না।'

'অতখানি সময়েরও প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে তুমি সরে দাঁড়াও।'—প্রধান কর্মকর্তা আদেশ দিলেন।

দুদিক থেকে দু'জন সেপাই ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই প্রধান কর্মকর্তা মাথা নেড়ে ইংগিত করলেন গুলি ছোঁড়বার জন্য। লক্ষ্য ব্যর্থ হোল না। চারজনের নির্জীব রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। এক সংগে নয়—একটার পর একটা! ঠিক যেন অভিনয়-মঞ্চের পুতুলের মত। জনৈক কর্মচারী তাদের দিকে এগিয়ে এলেন—একজন কেমন করে যেন বেঁচে ছিল—কর্মচারীর রিভলবার আবার যেন গর্জে উঠল।

গেটের কাছে অস্পষ্ট গোলমাল শোনা যায় হঠাৎ। পরমুহূর্তে সবেগে ছুটে এলো একটি মেয়ে—মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার ছুট দিল।

প্রধান কর্মকর্তা চীৎকার করে উঠলেন—'ক্যাবাম্বা !'

কালো পোশাকে মেয়েটীর সর্বাংগ ঢাকা। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখখানা। বয়স খুব বেশী হবে না হয়ত। রোগা তন্বী হলেও বেশ সুশ্রী। টানা টানা চোখ দুটোয় সরলতার চাউনি। সারা মুখে কৈশরের এমন একটা সারল্যের ছাপ যা দেখে সমস্ত সৈনিকেরাও বেদনাহত দৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে তাকালো। ও ধীরে ধীরে এক পা দু' পা করে এগিয়ে আসছে—কিন্তু মেয়েটীর গলা দিয়ে শুধু একটু ঘর্ঘর শব্দ বের হোল। নিজেকে সামলাতে না পেরে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।

ও গভীর এক চুম্বন এঁকে দেয় মেয়েটীর গালে। ঠিক সেই সংগে ছেঁড়া সার্টের ভেতর থেকে হাতির দাঁতের তৈরী এক সাদা ছুরি বের করে আমূল বিদ্ধ করে দিল মেয়েটীর গলায়। চারিদিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ ছুরি ওকি করে রেখেছিল তা রীতিমত রহস্যের। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে তার সার্ট ভিজিয়ে দিল। সেই অবস্থাতেই মেয়েটীকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে গভীর এক চুম্বন করল।

এক পলকে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল তাই প্রথমে সবাই নির্বাক হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের সামলে

নিয়ে চীৎকার করে উঠল।—কয়েকজন সেপাই ওকে ধরে ফেলল। হাতের শিথিল বাঁধনে মেয়েটী পড়বার উপক্রম হতেই প্রধান কর্মকর্তার এক দেহরক্ষী মেয়েটিকে ধরে ফেলল। মেয়েটীর রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহ মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হোল। ওর আঘাত ঠিক যায়গাতেই লেগেছিল তাই সহজে রক্ত বন্ধ করা গেল না। দেহরক্ষী হাঁটু গেড়ে বসে তাকে একবার পরীক্ষা করে চুপি চুপি বলল—'সব শেষ।'

ও তাদের প্রথানুযায়ী নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে ক্রশ আঁকল।

'এ কাজ করার উদ্দেশ্য কি ?'—গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন প্রধান কর্মকর্তা।

'ভালোবাসার যোগ্য সমাদরের চিহ্ন এটা।'—নিষ্কম্প স্বরে জবাব দিল ও।

চারিদিকে কৌতূহলী ভীড়ের মধ্যে চাপা নিঃশ্বাসের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তার ওপর সবার বিস্ময়াগত দৃষ্টি ততক্ষণে ওর মুখের ওপর আটকে গেছে।

'সত্যিকারের প্রেমিক না হলে এ কাজ করা অসম্ভব।'—আগের মতই গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন প্রধান কর্মকর্তা—'এ মহান্ প্রাণ ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত নয়। যাও একে সহরের শেষ সীমার বাইরে দিয়ে এসো। বীরের কাছে বীরের মর্যাদাই আজ তোমাকে দিলাম।'

আশে পাশের সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। দেহরক্ষী হাত দিয়ে আস্তে আঘাত করল ওর পিঠের ওপর। তারপর মাথা নীচু করে সবার মাঝখান দিয়ে নীরবে হেঁটে গেল গাড়ী পর্যন্ত .....

* * * *

বন্ধু তার কাহিনী শেষ করল। আমিও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। বলতে ভুলে গেছি আমার বন্ধুটি গুয়াতামালার বাসিন্দা. এতক্ষণ স্প্যানিস্ ভাষায় কথাবার্তা চলছিল। উচ্ছ্বাসের আবেগে ভেসে না গিয়ে যতদূর সম্ভব ততখানি সহজ করে তার কথার অনুবাদ করলাম। এ কথা সত্যি এ গল্পে উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সবশেষে বন্ধুকে জিগ্‌গেস করি—'তবে মুখের ও দাগটা কিসের ?'

'জিন্‌জারের বোতল খুলতে গিয়ে ফেটে যায়—তাই তার চিহ্ন ঐ মুখে লেগে।'

আমি শুধু দীর্ঘশ্বাস চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম !

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী

কাশ্মীর-স্বপ্ন

নবনীতা দেব

মানসবিহঙ্গ মোর উড়ে চলে স্বরগের টানে,—
অমরা-কাননে নয়, তুচ্ছ এই ধরাকোণ-পানে।
যেখানে উদয়-রবি ধবল তুষারশৃঙ্গগুলি
বর্ণ বিচিত্রিত করে বুলাইয়া আলোকের তুলি !
নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ হ্রদে কমলকানন ফুল্ল হাসে,
শিকারা-তরণী বাহি ভেসে যাই শীতল বাতাসে।

মানসবিহঙ্গ মোর উড়ে যায় ভূস্বর্গের মোহে,
প্রকৃতি উচ্ছল যেথা কুসুমের দীপ্ত সমারোহে।
পাইন ঝাউএর দোলা—আখরোট আপেলের বন,
নির্ঝর প্রপাত-গান—স্বপ্নে ভরে পথিকের মন।
বাতাস বিহ্বল যেথা জাফরাণ কেশর-সৌরভে—
ষ্ট্রবেরি-রক্তিম ক্ষেতে দৃষ্টি-ঘ্রাণ-স্বাদ তৃপ্তি লভে।

মানসবিহঙ্গ মোর গন্তব্য করেছে তার স্থির,—
চেনার-কানন-বাস-পরিহিতা পুষ্পিতা কাশ্মীর।
দিগন্ত-বিস্তার-হ্রদে ভেসে যায় শ্যামশষ্পভূমি,—
'হরমুকুটে'র শীর্ষে স্বর্ণ রবিকর আছে চুমি'।
চলিয়াছে সৌধতরী ধীরে ধীরে ঘাট হতে ঘাটে।
'ভেনিস্' আঘাত দেয় বারংবার মনের কবাটে।

মানসবিহঙ্গ মোর কল্পাকাশে মেলিয়াছে ডানা।
মানেনা পথের বাধা, মানেনা দূরের বিঘ্ন নানা।
নিশাতের তরুকুঞ্জ, শালেমার-উদ্যান-কুসুম,—
পপ্‌লার-বীথির হাওয়া মর্মরিয়া ভাঙ্গে মোর ঘুম।
কাশ্মীর—তোমার লাগি চিত্ত মোর হয়েছে আকুল-
স্বপ্নে দেখি ডাল্-লেক—ক্ষেত-ভরা আফিমের ফুল

সমুদ্র-পথ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

১৯৫২ সনের ২৮শে মার্চ, শুক্রবার। বেলা চারটায় সিডনি বন্দর হ'তে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর ষ্ট্রেথেয়ার্ড (Strathaird) জাহাজে ভারতাভিমুখে রওনা হ'লাম। জাহাজ ছাড়ল কাঁটায় কাঁটায় চারটায়। জাহাজ ছাড়বার বহু আগে থেকেই পিয়ারমণ্ট (Piermont) জেটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। জাহাজের যাত্রী হবে এগারোশ, মাঝিমাল্লা ও কর্মচারী আরও পাঁচশ। যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে হাজার পাঁচেক নরনারীর সমাগম হয়েছিল। দোতলা জেটির উপর দাঁড়িয়ে যাঁরা বিদায় দিতে এসেছেন তাঁরা প্রায় সবাই জাহাজের দিকে রঙীণ কাগজের শিকল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, আর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিদায়ী বন্ধু ও প্রিয়জন সেইগুলি লুফে লুফে ধরছেন। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ কাগজের শিকলে তীর ও তরঙ্গের

একটি আধুনিক জাহাজের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ব্যবধান ঘুচিয়ে আসন্ন বিচ্ছেদকে বিলম্বিত করবার নিষ্ফল প্রয়াস। অনভিপ্রেত ভবিতব্যকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়াই বোধ হয় মানুষের স্বভাব। ধীরে ধীরে মাটির মায়া কাটিয়ে বিরাট বপু জাহাজখানা গতি চঞ্চল হয়ে উঠল। জেটিতে দাঁড়িয়ে অগণিত নরনারী হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগল। ক্ষণ-ভঙ্গুর কাগজের শিকলগুলি অপসৃয়মান জাহাজের আকর্ষণে পটপট শব্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে। জাহাজ ক্রমেই জেটি ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্রুত তালে জাহাজের ব্যাণ্ড বেজে উঠল। 'ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার, মোদের যাত্রা হ'ল সুরু—এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক ফিরব না'ক আর।'

এদিকে জাহাজের যাত্রীদল—বেশীর ভাগই শ্বেতাঙ্গ—যাত্রা-পর্ব উদ্‌যাপন করছে আকণ্ঠ সুরাপানে। দলে দলে নরনারী মদের বোতল শূন্য ক'রে জাহাজ থেকে জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে—আর সেই বোতলগুলি খাড়া ভাবে জলে ভাসছে। উপসাগরের দুইতীরে সুদৃশ্য সিডনি শহর যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে। কিন্তু অকারণ এই পেছনের ডাক—নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পেছন ফেরা।

পশ্চিম দিগন্তে সিন্ধুপাড়ে সূর্যদেব অস্তাচল গমনোদ্যোগী। সন্ধ্যার অস্তরাগে সারা আকাশ ও পুঞ্জীভূত মেঘ নানা বর্ণে বৈচিত্র্যময়, দূর আকাশের গায়ে বলাকাবদ্ধ বিহঙ্গদল কোন সুদূরের যাত্রী। দলে দলে বুভুক্ষু সীগাল (Sea gull) জাহাজের আশে পাশে উড়ছে। তাদের কাকলী ধ্বনিতে সমুদ্র বক্ষ মুখর। সিড্‌নির শেষ দৃশ্য—বিখ্যাত সিডনি হারবার ও ব্রীজ, ক্রমে আসন্ন গোধূলির আবছায়ায় পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাইলট জাহাজ সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে আবার বন্দরে ফিরে গেল। সম্মুখে অনন্ত বিস্তার সুনীল জলধি। ডেকে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভ'রে অসীমের এই বিরাট রূপকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম।

"কোথা তা'র তল, কোথা কূল।
বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার
অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগভীর মৌন, তা'র
সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তার অশ্রুরাশি।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ও সমুদ্র আচ্ছন্ন হ'য়ে এল। একটি দু'টি ক'রে তারায় তারায় নীল গগন ভ'রে গেল। জাহাজের গতি এতক্ষণে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটানা ইঞ্জিনের ঝাঁ ঝাঁ গর্জন। জাহাজের গতিবেগে সমুদ্রের জল দু'ভাগে ভাগ হয়ে প্রবল ফেনোচ্ছাসে দুই পাশে ভেঙ্গে পড়ছে।

তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি'
হেসে হ'ল কুটি কুটি।

দুর্নিবার বেগে সিন্ধু বক্ষ মথিত করে জাহাজ চলেছে। দূরে অষ্ট্রেলিয়ার তটরেখার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে হেথা-হোথা বিক্ষিপ্ত লাইট-হাউস বা আলোক স্তম্ভগুলি।

সিডনি থেকে রওনা হয়ে প্রথম তিনদিন বেশ আরামে কাটান গেল। অনেকেই সঙ্গে ট্রাভেল টেবলেট (Travel tablets) নিয়ে এসেছিলেন এবং পাছে সমুদ্র পীড়া হয়, সেই ভয়ে দু'চারটে ট্যাবলেট আগেই খেয়ে নিয়েছেন। আমি কোন ট্যাবলেট খাই নি। সমুদ্র-পীড়া যদি একান্তই হয়, তা' হবে। প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে থাকব। দেখা যাক কি হয়। জাহাজ মেলবোর্ণ বন্দরে তিন দিন নোঙর ফেলে থাকল। মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলভাগ প্রায় সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে অষ্ট্রেলিয়ার শেষ বন্দর ফিম্যান্টল হ'তে জাহাজ ভারত-সমুদ্রে পাড়ি জমায় কলম্বো অভিমুখে। মেলবোর্ণ ছাড়ার পর গ্রেট অষ্ট্রেলিয়ান বাইট (Great Australian Bight) অতিক্রম করবার পালা। অষ্ট্রেলিয়ান বাইটের বদনাম নাকি বে অব্ বিস্কের (Bay of Biscay) চাইতেও বেশী। একজন সহযাত্রী গল্প করলেন যে একবার এই বাইট অতিক্রম করবার সময় সমুদ্রের এতই ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল যে তিন দিন কোন যাত্রীই কেবিনের বাইরে আসতে পারে নি। একশ দশফিট উঁচু ঢেউ জাহাজের ডেকের উপর দিয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। জাহাজখানা নাকি মাতালের মতো জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আমাদের ভাগ্য বাইটের এ রুদ্ররূপ দেখতে হয়নি। তাও যেটুকু হয়েছিল তারই ফলে আমাকে একদিন কেবিনে শুয়ে থাকতে হ'ল। অনেক যাত্রীরই এই অবস্থা। সমুদ্রপীড়ায় সারাদিন বমনেচ্ছা ও মাথা ঘোরা চলল। আহার্য ও পানীয় কোনটাই গ্রহণ করা গেল না। কেউ কেউ উপদেশ দিলেন উঠে খোলা ডেকে হেঁটে বেড়াতে" to develop the sea-leg" অর্থাৎ সমুদ্র পীড়াকে সহজে বা স্বাভাবিক করে নিতে। কিন্তু আমার ভয় সী-লেগ ডেভেলপ করতে গিয়ে যদি সবার সামনে বমি আরম্ভ হয় তবে সে অবস্থাটা হবে বড়ই অবাঞ্ছনীয়, কাজেই বন্ধুদের উপদেশ গ্রহণ না ক'রে কেবিনেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। ফল হ'ল ভালই। পরদিন বেশ সুস্থ বোধ করলাম, যদিও বাইটের উত্তাল তরঙ্গে জাহাজের গতি তখনো টলটলায়মান।

অষ্ট্রেলিয়ার সুদৃশ্য বনপথ

এর পর আর সমুদ্রপীড়া বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নি। আমি বাঙলার লোক। মাদারীপুরে থাকাকালীন সরকারী চাকুরীর দায়ে তিনবৎসর নদী আর খালে বিলে বহুদিন নৌকায় নৌকায় কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম যখন কোনদিন river sicknessএ ভুগিনি, তখন Sea-sicknessও বোধ হয় আমার হবে না। কিন্তু মহাসমুদ্র মাদারীপুরের তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। তাঁর পরাক্রমের একটু মৃদুস্পর্শমাত্র দিয়ে গেল—আর তাতেই আমরা প্রায় কাবু। দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে প্রবাহিত তুষার-শীতল বায়ু অষ্ট্রেলিয়ান বাইটের জলরাশিকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। বিশাল ফেনশীর্ষ তরঙ্গের দোলায় এতো বড় জাহাজটি মোচার খোলার মতো নাচতে থাকে—আর সেই নর্তনের তাণ্ডবে ক্ষীণপ্রাণ মানুষের হয় মরণদশা।

যাহোক এযাত্রা অল্পের উপর দিয়েই ফাঁড়া কাটল। পর পর মেলবোর্ণ, অ্যাডিলেড ও ফ্রি ম্যান্টল্ বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগার দিনের

দিনে আমাদের জাহাজ উত্তর পশ্চিম মুখে ভারত মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাল। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সিংহল দ্বীপের রাজধানী কলম্বো বন্দর। পুরো সাত দিন সাত রাত্রি অবিরাম চলার পর কলম্বো বন্দরে পৌছান যাবে। মাঝে পড়বে বিষুব রেখা। বিষুব রেখা অতিক্রম করার সময় প্রাচীন প্রথানুযায়ী জাহাজের নাবিকেরা বরুণ দেবতার (King Neptune) প্রতি সম্মান দেখাল নৃত্যগীতে ও সং তামাসার অনুষ্ঠান করে। জাহাজের কাপ্তেন বিষুবরেখা অতিক্রম করার নিদর্শনরূপে আমাকে তার স্বাক্ষরযুক্ত একখানা অভিজ্ঞানপত্র দিলেন। নীচে সেই সার্টিফিকেটের অবিকল অনুলিপি তুলে দেওয়া হল :—

This is to certify that Mr. N. Roy on board "Strathaird" has been duly initiated as a Son of Neptune according to the ancient rites and ceremoies existing from time immemorial.

I hereby grant him Freedom of the Seas and charge all kippers, haddocks and other denizens of the deep from molesting him in any way should he fall overboard, Given under our Hand on the Equator.

Henry S. Allan
By Command of His Majesty
King Neptune
Lord of the Seas, Sovereign of all Oceans
Ruler of the Waves.

জাহাজের যাত্রীরা প্রায় সবাই স্ফূর্তিবাজ ও আমুদে লোক। বেশীর ভাগই শ্বেতাঙ্গ, জনকয়েক সিংহলী, আর আমরা চারজন ভারতীয়। আমাদের চারজনের একজন চন্দ্রামশায় দু'দিনেই অপর স্ফূর্তিবাজদের দলে ভীড়ে পড়লেন। অনেক অষ্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক ও মহিলা ৩।৪ মাসের ছুটিতে ইংলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছেন। ভাবটা—

Oh! to be in England,
Now that April's there.

ইংলণ্ডে এখন রমণীয় বসন্ত কাল. আর অষ্ট্রেলিয়ায় এখন শীত পড়ি পড়ি করছে। এদের ফন্দিটা মন্দ নয়। অষ্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে ইংলণ্ডে চল্লেন বসন্তকাল উপভোগ করতে, আবার সেখানের উষ্ণ মাসগুলি উপভোগ করে যখন ফিরবেন তখন অষ্ট্রেলিয়ায় শীত অবগত হয়ে গ্রীষ্মের সমাগম হয়েছে। শীতের জুজুকে ফাঁকি দেওয়ার বেশ ফিকির! বারমাসে তিন বসন্ত!

বাইশ হাজার টনের যাত্রী জাহাজ। নির্মাতারা যাত্রীদের আরাম আয়েসের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি করেন নি। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। সেবাপরায়ণ ও ভদ্র পরিচারক সর্বদাই যাত্রীদের নানা ফাই ফরমাস খাটছে। স্নান আহার, ভ্রমণ, খেলাধুলা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন, চলচ্চিত্র, বলনাচ, সাঁতার ও প্রচুর মদ—যার যেরকম অভিরুচি সে সেই ভাবেই তার সময় কাটাতে পারে। আমাদের চন্দ্রামশায় বলনাচ ও অন্য অনেক রকমের ফূর্তি নিয়ে খুব মেতে উঠলেন। যাত্রীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাও প্রচুর। যাঁরা বর্ষীয়সী তাঁরা প্রায়ই সেলাই বা উলবুনন নিয়ে ব্যস্ত, অথবা খোলা ডেকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিদ্রিত। বুড়োরা খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর প্রায়ই বেশ আলাপী। অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'ল, কেউ বা পার্লামেন্টের (অষ্ট্রেলিয়ান) সদস্য, কেউ আইনজীবী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। ইংলণ্ডে যাচ্ছেন অবকাশ বিনোদনের জন্য। আর যারা খাস ইংরাজ তারা যাচ্ছেন স্বদেশে। সামাজিকতা এদের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ। যেচে এসে আলাপ করবে। দেখা হলেই অভিবাদন করচে—কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

যাত্রীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী তাদের চালচলন আবার অন্য ধরণের। যুবক যুবতীর দল জোড়ায় ফূর্তির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মদ্য-পানের পরিমাণ দেখে অবাক হ'তে হয়! এক আসনে বসে একটানা ৬।৭ ঘণ্টা মদ খেয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র স্নান বা ডেক টেনিস ইত্যাদি নিয়ে এক দল মত্ত। কেউ কেউ আবার ডেকের কোন এক নিভৃত কোণে বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন। তরুণীর দল সকাল সন্ধ্যা অত্যন্ত হ্রস্ব জাঙ্গিয়া এবং এক খণ্ড সংকীর্ণ বক্ষাবরণ পরিহিতা হয়ে নগ্ন মূর্তিতে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেজায় নাকি গরম! কিন্তু সারাদিনের বেহায়াপনার শোধ তুলে নিবে সন্ধ্যাবেলা ডিনারের সময়। পুরুষদের বেলায় ডিনার স্যুট সাদা সার্টের উপর কালো বো-টাই ও কালো কোট, আর মেয়েদের বেলায় আপাদলম্বিত গাউন—এই হচ্ছে অনুমোদিত ডিনার স্যুট। এ না পরে ডিনারে গেলে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমার ডিনার টেবিলে বসত এক সিংহলী ছোকরা। তিন বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় থেকে লেখাপড়া বিশেষ কিছু না শিখলেও আবদ-কায়দা আর মদ্যপান এ দুইটা জিনিসে খুব রপ্ত হয়ে এসেছে। খুব ফলাও ক'রে তার সাহেবীয়ানার গল্প করত। ছোকরার নাম সুখলিঙ্গম, সিংহলের কোন সরকারী স্কুলের শিক্ষক। ছোকরা যে পরিমাণ মদ খেতে শিখেছে তাতে মাষ্টারীর চাকুরী নিয়ে তার দিন চলা ভার হবে। সিংহলের আরও জনকয়েক ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীর সঙ্গেও অষ্ট্রেলিয়ায় আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এরা সবাই পানীয় ব্যাপারে খুব উদার-নৈতিক ও অগ্রগামী। ইংরাজের ভাল গুণ বেশী কিছু গ্রহণ করতে না পেরে, এরা দেখছি ইংরাজের দোষ অনেকটাই পেয়েছে।

আমার পৌর-প্রতিবেশীর জীবনযাত্রা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ তখন ছিল বিদেশীর নাগপাশে বাঁধা—পরাধীন। আমাদের নাগরিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত ছিল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কুক্ষীগত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় জীবন গঠনে আত্মনিয়োগের কর্মসাধনা ব্যর্থ হয় নি। আমলাতন্ত্র সরকারের কবল থেকে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা সহরের পৌর ব্যবস্থায় প্রথম স্বরাজ পত্তন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৯২৩ সালে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত সংবিধান বলে ১৯২৪ সালে মহানগরীর পৌর-প্রতিষ্ঠান নব কলেবর লাভ করলো। নববিধানানুযায়ী নির্বাচনে জনগণপ্রতিনিধিরাই হলেন পৌর-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। সংখ্যাগরিষ্ঠদলরূপে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে-সময়। মহানগরীর সাহেবী পাড়া ও সরকার-তাঁবেদার ভাগ্যবানদের পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সীমাবদ্ধ অবস্থাকে সমগ্র

শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবি-কে-সেন

পৌরবাসীগণের কল্যাণ পথে কর্মযোগের সাধনায় সর্বপ্রথম নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নির্ভীক বীর: ও ত্যাগধর্মে দীক্ষিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রথম পৌরাধিপতির পদে বৃত হয়ে তাঁর সকল কর্মযোগের আদর্শের মূলমন্ত্র রইলো—দরিদ্রনারায়ণের সেবা—দয়া নয়। তারপর পৌর উন্নতির সকল কাজের সেরা কাজের দিকে নজর দিলেন তদানীন্তন পৌরনায়কগণ। তখনকার দিনে তাঁরা বুঝে-ছিলেন, নগরবাসীকে পৌরাধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতন করতে না পারলে উন্নতিমূলক কোন কাজই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে না।

পৌর প্রতিনিধি স্বর্গীয় মদনমোহন বর্মন পৌর মুখপত্র প্রকাশ করবার প্রস্তাব আনলেন পৌর-সভাতে। পৌরাধিপতি দেশবন্ধু এ-প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পৌর-জনগণ শিক্ষা প্রচারের সর্ব ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিলেন তিনি। পৌর-শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-চৈতন্যের আধারস্বরূপ পৌর মুখপত্র—কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট জন্মলাভ করলো ১৯২৪ সালেই। দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজের সুষ্ঠ পরিচালন ভার পড়লো বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মযোগী পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্রের যোগ্য হস্তে। পৌরপ্রধান কর্মকর্তারূপে সুভাষচন্দ্র পৌর মুখপত্রখানির কথা ভোলেন নি। তিনিও বুঝেছিলেন যে, নাগরিক জনমত গঠনের দ্বারাই পৌর স্বাচ্ছন্দ্যকে সার্বজনীন রূপ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের সাংবাদিক-দিক্‌পাল সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, মতিলাল নেহরু, লালা

প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে দর্শকগণ

লাজপত রায়, কালিনাথ রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য ও সহকারী রূপে যাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত, তাঁর উপর ন্যস্ত হোল এই মুখপত্রখানির সম্পাদনা ও পরিচালন ভার। ইনি সাংবাদিক শ্রীঅমল হোম। এঁর পরিচর্যাতে পৌরবার্তাখানি সত্বরই ভারতীয় জনসমাজে সমাদৃত হোল। বার্ষিক ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাগুলি পৌরজীবনের অপরিহার্য্য বিষয় বস্তুর সম্ভারে কোলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানকে দেশে ও বিদেশে সুনামের গৌরব শীর্ষে তুলে দিল। কোলকাতার পৌরবার্তাখানি স্বাধীনোত্তরকালে বিশ্বসমাজেও সমাদর লাভ

হয়েছে। পরাধীন ভারতে স্বায়ত্বশাসনের পথপ্রদর্শক কোলকাতা করপোরেশন থেকেই পূর্বদিগন্তে পৌরবার্তা-সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন হয়। জাতীয় আন্দোলনের চরমাবস্থায় বাংলার এই পৌর-প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কর্মীগণের শিক্ষা শিবির বলে অখ্যাত কুখ্যাত শত্রুরূপেই তদানীন্তন সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। বহু বাধাবিঘ্ন সত্বেও স্বায়ত্বশাসন গৌরবকে সমুজ্জ্বল রেখেছিলেন তখনকার পৌর-নায়কগণ। পঁচিশ বছর পূর্বেকার কোলকাতা সহর ও অধুনাকালের ঐ সহরকে নিরপেক্ষভাবে তুলনামূলক সমালোচনা করলে, নাগরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সার্বজনীন অগ্রগতির প্রগতির আভাষই পাওয়া যায়। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর পথে সীমারেখা টেনে, এবার চলে আসা যাক্ স্বাধীনোত্তরকালে।

দেশ এখন স্বাধীন, মাত্র ছ-বছর পূর্বে অধীনতার অক্টোপাশ থেকে

পৌর-প্রতিবেশীর জীবন যাত্রা (১)

আমরা মুক্ত হয়েছি। পৌর-ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এখন বিদেশী সরকারের কোন সংস্রবের কথা উঠা অবান্তর। আমরাই এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা। এ-রাজ্যের মহাধিকরণে এবং পৌরাধিকরণে যাঁরা শাসন ও পরিচালন তক্তে আসীন, তাঁরা সমগ্র রাজ্যের এবং পৌরবাসীদেরই নেহাত্ত আপনার জন—একেবারে ঘরের লোক বলা চলে। সকলেই আমাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমাদেরই আচার ব্যবহার, নিয়ম ও নিষ্ঠার প্রতিধ্বনি করবেন, এই জন-গণ-মন প্রতিনিধিরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে। এঁদের কর্মকাণ্ড নির্ভর করছে এখন আমাদেরই ব্যক্তিগত নিয়ম, নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও আচরণের উপর।

শুনেছি ধরিত্রী দেবী নাকি সদাজাগ্রত এবং ঘূর্ণায়মান। মানুষের বাস সেই পৃথিবীর উপর। মানুষের জীবনচক্রও ঘুরবে। ঘোরাটাই পরিবর্তন। মানসিক ভাগ্যচক্রের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাগিদে মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন আসাটা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন ঋতু পরিবর্তনের ন্যায় স্বাভাবিক ধর্ম। এ'তে অবাক্ হবার কিছু নেই। সর্বকালেই পরিবর্তনমুখী নয়া সৃষ্টির পথে নানা মতান্তরও ঘটে, পৌর জীবনবিকাশের উপাদানগুলিও স্থবির হয়ে বাঁচতে পারে না, প্রকৃতির গতিশক্তি এখানেও সচল। তাই দেখি, যুগপরিবর্তনকালে মানুষের জীবন গতি ও মতি পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতিরও ধারা বদ্‌লে যায়। প্রগতির অগ্রগতি পথে এগিয়ে চলাটাই মানুষের জীবনবিকাশের প্রতীক।

স্বাধীনোত্তরকালে আমাদের পৌর-জীবনে নূতন ক'রে আত্মবিকাশের পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বিগত পৌর-প্রতিষ্ঠানের একদা অন্যতম পৌরাধিনায়ক আজ এ-রাজ্যের কর্ণধার। তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের পৌর সংবিধান রদ্-বদল হ'য়ে পরিবর্তিত যুগপোযোগী করে ১৯৫১ সালের পৌর সংবিধানে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের মে মাস থেকে এই সংবিধানানুযায়ী পৌরসভার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে। ছ-বছরের মধ্যে ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে করলে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের নাগরিক গণ-মন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর অবিচার করা হবে।

স্বাধীনোত্তর কালে নব নির্বাচিত পৌরনায়কগণের গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানে এবার গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে নব পৌর সংবিধানানুযায়ী পৌরসভাতে জাতীয় কংগ্রেস দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তাই বলে বিরোধী দলকেও নগণ্য বলে উপেক্ষা করবার নয়। আজকের দিনে তাঁরাও পৌরবাসীদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁদের মতামত পৌরবাসীদেরই একাংশের মতামত বলে গণ্য হবে। প্রগতিসম্পন্ন ও পৌরবাসীদের কল্যাণকামী এই প্রতিষ্ঠানে সকল দলের মধ্যে সম্প্রীতি ও পরস্পর সহযোগিতায় আত্মশোধন ও আত্মকর্তব্য নির্ধারণের দ্বারাই আগামী কালের কোলকাতাকে সুন্দর ও মনোরম করে গড়া সম্ভব হবে। স্বমন-রচিত নানা কল্পনার একটা দিকে যেন এখনই সাড়া লেগেছে। কোলকাতাকে বৃহত্তর নগরে রূপায়িত করবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ-বিষয়ে বর্তমান পৌরনায়কগণের এগিয়ে চল্‌বার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুদিনের সাধনার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে এঁদের হাতে—টালিগঞ্জ-মিউনিসিপাল এলাকাভুক্ত স্থানগুলি কোলকাতা সহরের সঙ্গেই মিশে গেছে সম্প্রতি। বৃহত্তর কোলকাতা সহর পরিকল্পনার ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিগুরুর জন্মভূমি কোলকাতা সহরে তাঁর স্বপ্নরচিত সুন্দর ও মনোরম সহর আজিও গড়ে উঠে নি,—এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। বর্তমানের আলো আর আঁধার, সুন্দর ও কুৎসিত মিলিয়ে গোটা কোল-কাতাকে সুন্দর ও মনোরম করতে হ'লে শুধু নিন্দে আর অকেজো আলো-চনার মধ্যে আমাদের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখলে কোন কাজই হবে না। পৌরবাসী হিসেবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের ঔদাসীন্য ঘোচাতে ও দায়িত্ববোধে সচেতন করতে যতখানি আমাদের অধিকার আছে, তেম্‌নি পৌর প্রতিষ্ঠান কর্মী ও পৌর অধি-

নায়কগণের সঙ্গে সকল কাজে সহযোগিতার দ্বারা নাগরিক কর্তব্য পালন করবার কথা মনে রাখ্‌তে হবে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পৌর কর্তব্য পালনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ বাণীকে স্মৃতিপথে স্মরণ করতে হবে। আমরা যেন না ভুলি, আমাদের সকলের ধন দৌলত, নিজ জীবন ও ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; আমাদের পৌর সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার একটা ছায়া ; এখানকার নীচ জাতি, মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, দরিদ্র, অজ্ঞ, বিজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদেরই রক্ত ও আমাদেরই ভাই বলে স্ব স্ব কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে।

বর্তমান পৌরাধিপতি শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পৌর প্রধান কর্ম কর্তা শ্রীবিনয়কুমার সেনের সহযোগিতায় কোলকাতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযানের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন এলাকাতে পৌরনায়কগণের প্রতিটি এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সাথে সম্যক পরিচয়ের দ্বারা এই বিরাট সহরের সামগ্রিক কল্যাণই সূচনা করে। বস্তীগুলির উন্নয়ন, সহর থেকে খাটাল অপসারণ, জনবহুল সহরের রাস্তাগুলি থেকে গরু-মহিষাদি পশুদের বিতাড়ন প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি আজিও পৌর সভার বিবেচনাধীন। তবে এ-সব কর্ম-পদ্ধতির প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে সহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের মনকে সূচক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়জ্ঞাপক। কমিশনারের সাপ্তাহিক অভিযান ব্যবস্থা ও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিভাগীয় কর্মকর্তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পৌরবাসীদের অভিযোগগুলিকে প্রত্যক্ষ দেখা ও প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণ ও বিভাগীয় কর্মচারীগণের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো, ইত্যাদি কর্মপদ্ধতিকেও অনাগত শুভদিনের শুভ লক্ষণ বলতে হয়। ছেলেমেয়েদের খেলা-ধূলা ও বৈকালিক ভ্রমণ জন্য কোলকাতার বাগান-বাগিচাগুলির সাম্প্রতিক পঙ্কোদ্ধার নগরবাসীদের কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়েছে।

পৌর জনশিক্ষা বিষয়ে আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান পরম্পরাগত গৌরব সংস্কারকে কেবলমাত্র অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, স্বাধীনদেশের পৌর-জীবন ও সমাজকে উন্নত করবার জন্য সুনাগরিক গঠনে নব-পন্থা আবিষ্কারে মনসংযোগ করেছেন জন সংযোগ বিভাগটী। জনশিক্ষা কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও কোলকাতার মতো বিরাট সহরের পৌর সমাজের কল্যাণকে ক্ষুদ্রজ্ঞানে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখানকার পৌর শিক্ষা দ্বারা পশ্চিম বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র মহানগরীর মধ্যে যে সামাজিক উন্নতি হবে, তাই হবে এ-রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিটী প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রকৃত আদর্শ।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে এক মনোরম আলোকচিত্র প্রদর্শনী—এক অভিনব জনশিক্ষামূলক প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। পৌরাধিকরণের কেন্দ্রভবনের যে স্থানে পৌরবাসীদের সুখ-সুবিধার্থ একটা ছোট-খাটো প্রদর্শনী অনুসন্ধান আফিসটী অবস্থিত, ঠিক এরই বিপরীত দিকে দ্বিতলে উঠবার সিঁড়ির নীচেতে প্রদর্শনীকে দর্শন করেছেন বহুজনেই। সেখানে এও দেখে এসেছি আমাদের প্রতিবেশী কিভাবে বাস করে—এই নামেই প্রদর্শনীটা সর্বসাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রদর্শনীর আলোক-চিত্রগুলি এক ঢিলে দুটী পাখী মারার মতো পৌরপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের

পৌ-রপ্রতিবেশীর জীবন যাত্রা (২)

মধ্যে আলোকচিত্রবিদ্যার প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে তা'দের কর্ম জীবনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেওয়াও হোল, আবার পৌরবাসীদে প্রতিবেশীরা কিভাবে বাস করে তাদেরই পাশে, তাও দেখানো হোল ম্যানচেষ্টার পৌরসংস্থার অল্প সংখ্যাতেই চিত্ত সমর্থিত করেন ি সেখানে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন বুদ্ধিমত্তারও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে ছিলেন। তাঁরই মস্তিষ্কগত মন ও জনসংযোগ অফিসারের অন্তরগ বুদ্ধিতেই সাম্প্রতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীটা জন শিক্ষার জন্য পৌর সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এঁদের প্রচার কাজের নব উদ্ভাবনে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমন্ত্রণও এসেছে কোন কো সার্বজনীন প্রদর্শনী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে।

চিত্রগুলির সাজ-সজ্জার ভিতর কৃত্রিম জাঁক-জমক না-থাকাে পৌর সচেতনার দিক থেকে প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। মনোগ্রাহ

আলোকচিত্রের চিত্রবিদ্যার পারদর্শিতার ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে পৌর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ মহানগরীর সৌন্দর্য্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়; চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে চিত্রবিদ্যার নিখুঁত পারদর্শিতার ভিতর ফুটে উঠেছে নাগরিক জীবনের সর্ববিধ সুখের আকর—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথি-পার্শ্বের দু-ধারে ছবিসদৃশ সুরম্য অট্টালিকাগুলি মহানগরীর সৌন্দর্য্যের অলঙ্কারস্বরূপ। নগরবাসীদের নাগরিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতীক দেখে মনটা খুসীতে ভরে উঠে। পাশা-পাশি···একটু তফাতে রক্ষিত চিত্রগুলির দিকে চোখ ফিরালেই কি দেখেছি—একই সহরের অন্তঃস্থলে, রুচিপ্রদ মনোরম পরিবেশের সীমার মাঝে এক অদ্ভুত বৈষম্য! আমাদেরই কাছা-কাছি আমাদের প্রতিবেশী আলো বাতাস-বিহীন, সভ্যসমাজের রুচি-বিগর্হিত, কদাকার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কুটীরগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখে হতাশ হইনি, বেদনা অনুভব করেছি। সুরু-গলি রাস্তার দু-ধারে অবস্থিত কুটীরগুলির পরিবেশ দেখে শিউরে উঠেছি। চারপাশে বিক্ষিপ্ত জঞ্জালের ছোট ছোট স্তূপগুলিই দূষিতগ্যাস-বাষ্প তৈরীর শুধু সাহায্য করে না, মক্ষিকাগণ মহানগরের মহাদুর্য্যোগের গুঞ্জনধ্বনি তোলে। নরকসম পূতিগন্ধময় আলোকচিত্রের পরিবেশ দেখে আমাদের ভেতর একশ্রেণীর অশিক্ষা ও আলস্য-জনিত কদভ্যাসের মানসিক শুচিতার কথাই কেবল মনে বাজেনি, মনে হয়েছে দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের মানসিক পরাধীনতার দীনতাসহ আত্ম-স্বার্থের অধীনতা ঘোচেনি।

আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতার চিত্র-বিদ্যার কৃতিত্ব ও নিপুণতার কথা আমার আলোচ্য বিষয়ের বাইরে, তবু বলবো আমাদেরই পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌরকর্তব্য কাজেরত কর্মীগণের অন্তরে কোলকাতা সহরের আলো আর আঁধার সুন্দর ও কুৎসিত সমভাবে স্থান পেয়েছে। এ'তেই কোলকাতা বিরাট সহরের পৌরজীবনের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও মনোরমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি বর্তমান কর্মীদের মানসক্ষেত্রে নিহিত, তা বুঝা গেছে। এখন দেখতে হবে, যাঁরা আমাদের এই সহর কোলকাতাকে নোংরা ও কদর্য্য করে রাখেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে পৌরবাসীদের সহযোগিতায় সমবেত আন্দোলন না-হলে পৌরনায়কগণের কোনও প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারবে না।

আমাদের কোলকাতা সহরকে সুন্দর ও মনোরম করতে হলে পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কথাও ভাবতে হবে, তাদেরও মানুষের মতো বাঁচবার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মীরাই এ-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, তাদেরই নিরলস অভিযানই পৌর জীবন বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে। তাদের সেবা ও সাধনা, নিস্পৃহতা ও সংযম পৌরজীবনকে মহান ও গৌরবান্বিত করবে। হৃদয়ই হৃদয় জয় করতে সমর্থ। পৌরবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সমবেদনা ও সহানুভূতি অন্তর দিয়ে পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তবেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে। এ-কথাও তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, গর্বোদ্ধত শক্তির স্পর্দ্ধিত আদেশে মানুষের শরীর নড়তে পারে, কিন্তু অন্তর তা'তে সাড়া দেবেনা।*

* কলিকাতা করপোরেশনের জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে করপোরেশনের কেন্দ্রভবনে বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, কমিশনার শ্রীবিনয়-কুমার সেন কর্মচারীদের মধ্যে এইরূপ আলোক-চিত্র গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং জনসংযোগ বিভাগের প্রচেষ্টাতে প্রদর্শনীটি পৌরবাসীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ক্রমবর্দ্ধমান জনসমাগমের জন্য প্রদর্শনীটী নির্দ্ধারিত তারিখের পরও একদিন খোলা রাখা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় আলোক-চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্তা শ্রী পি এস মাথুর, ব্রিটিশ সংবাদ সার্ভিসের কর্তা মিঃ ডনেলস্ ব্রাউন ও ফটোগ্রাফার ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া যথাক্রমে ১ম, ২য় ও তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রেস বিভাগের শ্রীমন্দার মল্লিক, হিসাব বিভাগের শ্রীশচীন বোস, হিসাব ফুড্ বিভাগের শ্রীজহর ঘোষ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এই রচনাটী উক্ত আলোক-চিত্র প্রদর্শনী অবলম্বনে রচিত।

গান

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য

তোমার গানের মাঝে আমি তোমায় খুঁজি কবি,
রাঙা-বরণ পলাশ-বনে আঁকি তোমার ছবি।
তোমার যে-সুর তারায় তারায়
বাজে উছল ঝরণা ধারায়—
সেই সুরে আজ পূর্বাচলে জাগে প্রভাত-রবি।
ওগো কবি!

নূতন দিনের বন্দনা-গান কণ্ঠে তোমার লগ্ন,
অনাগতের বরণ-ধ্যানে আবেশ-মোহ-মগ্ন।
দুঃখ-ব্যথার রক্ত-রেখায়
পুরাতনের মৃত্যু-লেখায়—
নীহারিকার আলিম্পনে রচো রাঙা ছবি।
ওগো কবি!

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
Rs.10,000
Reward!
SUNLIGHT
SOAP

S. 203-50 BG

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সহসা তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল শুধু সিংহ নয়, স্বয়ং কুমারও একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিতেছেন। কুমারকে দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল এতক্ষণ সে যাহা ভাবিতেছিল তাহা ভুল, কুমারের চোখের দৃষ্টি হইতে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে ঔদাসীন্যের কোনও চিহ্ন নাই—তাহা অনুরাগপূর্ণ। কুমার আগাইয়া আসিলেন।

"সুরঙ্গমা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি চারিদিকে"

"ভয় হয়েছিল না কি যে আমি পালিয়ে যাব? আমি ছাগল বা ভেড়ার মতো সাধারণ পশু নই কুমার, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি পালিয়েও যাব না, আপনার সুখের জন্যে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও ইতস্তত করব না"

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার পুষ্পিত দেহ-লতার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগলে কৌতুকদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ—"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম চারিদিকে। মরবার আগে পৃথিবীটাকে ভাল করে' দেখে নিচ্ছিলাম একবার।··"

"সিংহটার সামনে নাচছিলে দেখলাম"

"ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে চাইছে। কিন্তু আমার দেহটা তো দেবতার উদ্দেশ্যে আগেই নিবেদন করেছি, তাই ওকে নাচই দেখাচ্ছিলাম শুধু। গানও শুনিয়েছি কাল রাত্রে—"

সুন্দরানন্দের চোখের দৃষ্টি আরও কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"একটা হিংস্র পশুর প্রতি এ পক্ষপাত কেন বুঝতে পারছি না ঠিক—"

মুচকি হাসিয়া সুরঙ্গমা বলিল, "সম্ভবত ও নিছক পশু বলেই। চলুন, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক এবার। যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে—"

"কাল—"

"আজ কি আমাকে উপবাস করে' থাকতে হবে"

"আমি ঠিক জানি না। মহর্ষি পর্ব্বত কিন্তু তোমাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে চাইছেন না"

"কেন—"

"তিনি বলছেন নারী-পশু যজ্ঞে বলিদান দেওয়ার রীতি নেই। তিনি বলছেন নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে–"

"নিষ্ক্রয় ব্যাপারটা কি"

"তোমার বদলে আর একটি মানুষ বলি দিতে। মহর্ষি বলছেন যথোচিত মূল্য দিলে মানুষ পাওয়া যাবে"

"আপনি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছেন?"

"এখনও হইনি। কাউকে টাকার জোরে বশীভূত করে' তারপর তাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলে বলেই এ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। তোমারি অনুরোধে করেছিলাম। মিস্মিরের কথার উত্তরে তুমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলে--যজ্ঞের আয়োজন করুন আমিই তাতে আত্মাহুতি দেব! জানিনা এ কথা কেন বলেছিলে তুমি—"

"কেন বলেছিলাম তা যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বুঝিয়ে বলবার দরকারও নেই। কারণ ঠিক বোঝান যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি আত্মাহুতি দিতে এখনও আমি রাজি আছি, আমার মত এতটুকু বদলায় নি। তবে মহর্ষি পর্ব্বত যদি আমাকে অমনোনীত করেন সে আলাদা কথা—"

"তুমি যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চাইছ কেন"

"আপনাকে ভালবাসি বলে'। ওই ম্লেচ্ছ মির্ম্মির যে তার তানেকে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে বলে' আপনার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাঁকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমিও তাঁর তানের চেয়ে কিছু কম নই। আর আপনিও তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নন"

"কিন্তু আমি ভাবছি—"

কুমার সুন্দরানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেলেন।

"কি ভাবছেন—"

সুরঙ্গমা সোৎসুকে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভাবছি মির্ম্মিরের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তোমাকে চিরকালের মতো হারানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

"ম্লেচ্ছ মির্ম্মির কিন্তু তানেকে হারিয়েই চিরকালের মতো পেয়েছে। আপনিও হয়তো পাবেন আমাকে। সেই ভরসাতেই যজ্ঞের আয়োজন করেননি কি?"

"না। আমি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম আমার দেশের মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু এখন ভাবছি ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিছুক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি—"

সুরঙ্গমার কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরানন্দ বলিতে লাগিলেন, "তাছাড়া, স্পর্দ্ধা করে' কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। তার বৈশিষ্ট্য বিনয়ে নীরব-সাধনায় নম্রতায়। তোমাকে যজ্ঞে যদি আহুতি দিতেই হয় তা তোমার এবং আমার প্রয়োজনের জন্যে দেব। তার সঙ্গে মির্ম্মিরের সম্পর্ক কি। তুমি ভেবে বল তোমার অভিপ্রায় কি। তুমি যা বলবে তাই হবে—"

সুরঙ্গমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি যদি এখন আত্মাহুতি দিতে রাজি না হই, আপনি কি যজ্ঞ বন্ধ করে' দেবেন? এত আয়োজন করেছেন"

"যজ্ঞ বন্ধ করব না। মহর্ষি পর্ব্বত যা ব্যবস্থা করবেন তাই করব। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, তাঁর আদেশই পালন করতে হবে। শুধু একটি অনুরোধ তাঁকে করব টাকা দিয়ে কিনে এনে তিনি জোর করে' কাউকে যেন বধ না করেন—"

"কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ কি প্রাণ দিতে রাজি হবে! কোনও উপায়ে তাকে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই"

"তুমি তো স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি হয়েছিলে—"

"আমি তো অনেক আগেই আপনার বশীভূত হয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখনও আমি আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি"

"না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, চল, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—"

সিংহটা আর একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"ও বেচারীর আর একটু নাচ দেখবার ইচ্ছে আছে। আপনি ওই পাথরটার উপর বসুন না, ওকে আর একটু নাচ দেখাই"

সুন্দরানন্দ সহসা সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তাহার পর প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়া বসিয়া বলিলেন, "নাচবার আগে মাথায় কিছু ফুল পরে' নাও। ওই যে লতায় থোকো থোকো ফুল ফুটে রয়েছে, দাঁড়াও পেড়ে দিই আমি—"

নিকটেই একটা বনলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছিল, সুন্দরানন্দ উঠিয়া গিয়া কিছু ফুল পাড়িয়া আনিলেন এবং সুরঙ্গমাকে সাজাইতে লাগিলেন। ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া সুরঙ্গমা নাচিতে লাগিল। মনে হইল কোনও অপ্সরী বুঝি নাচিতেছে।

২৩

রাত্রির ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব অন্ধকারকে শব্দ খচিত করিয়া একটা অদৃশ্য জগত সৃষ্টি করিয়াছিল প্রচণ্ড গর্জ্জনে তাহা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন। সেই নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, পাখা ঝটপট করিয়া একদল বাদুড় উড়িয়া গেল। একটি

বৃক্ষতলে চার্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল। অরণ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত দিন যে দুরূহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে তাহার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামিয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল সে। সিংহের প্রচণ্ড-গর্জ্জনে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কি আকাশ-লোকে বসিয়া আছে? চতুর্দ্দিকে এত নক্ষত্র কেন! শব্দটা কি বজ্রের? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এ ভ্রম ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিল জোনাকী-পরিবৃত হইয়া সে বসিয়া আছে, গর্জ্জনটা সিংহের, বজ্রের নয়। সুরঙ্গমা কখন আসিবে? আসিবে কি না? সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল কেন? কাছাকাছি কেহ আসিয়াছে কি? গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করা সমীচীন হইবে কি না, এই ধরণের চিন্তা তাহার মনে পর পর জাগিতে লাগিল। কিন্তু একটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, চার্ব্বাক গাছের তলার ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ভাবিল সুরঙ্গমা যদি সত্যই আসে, কোন না কোন সঙ্কেত দ্বারা সে নিশ্চয়ই আপনার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু চার্ব্বাক বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঝোপের ভিতর হইতে কোঁক্ কোঁক্ শব্দ হইতে লাগিল। চার্ব্বাকের মনে হইল সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বিষধর সর্পের এত নিকটে বসিয়া থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। গাছের নীচে অন্ধকার সূচীভেদ্য ছিল, বাহিরে আসিয়া চার্ব্বাক অনুভব করিল—আকাশের অগণিত নক্ষত্র অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিয়াছে। স্বল্পালোকিত অন্ধকারে সিংহের খাঁচাটা দেখা যাইতেছে। জমাট অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চার্ব্বাকের ব্যক্তিত্বও যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল বটে, কিন্তু অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্বস্তিও ভোগ করিতে লাগিল। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে সে? অপেক্ষা করাও কঠিন। রাত্রি যত বাড়িতেছে, গভীর অরণ্য তত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। তাছাড়া অসংখ্য মশা। কোথাও সুস্থির হইয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার উপায় নাই। এত কষ্ট সত্ত্বেও কিন্তু চার্ব্বাক অবিচলিত ছিল। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা তাহার একবারও হয় নাই। বরং কষ্ট যতই বাড়িতেছিল ততই তাহার সমস্ত হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিবার আগ্রহ তো তাহার ছিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল এই বেদ-পন্থী ভণ্ডদের যজ্ঞটা পণ্ড করিয়া দিবার। সুরঙ্গমাকে সে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া আগ্রহটা হয়তো তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল কিন্তু সুরঙ্গমা না হইয়া অন্য কোন নর বা নারী যদি যজ্ঞীয় পশু রূপে মনোনীত হইত তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যও চার্ব্বাক অনুরূপ কষ্ট-স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। শুধু প্রেমের জন্য নহে, একটা বিশেষ আদর্শের জন্য কষ্ট সহ্য করিতেছিল বলিয়া চার্ব্বাকের আনন্দ হইতেছিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চার্ব্বাক পুনরায় ঘনতর অন্ধকারে আত্মগোপন করিবার জন্য গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় গাছের উপর হইতে সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"মহর্ষি, আপনি এসেছেন না কি। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি"

"কোথায় তুমি"

"গাছের উপর"

"নেমে এস"

সিংহ পুনরায় গর্জ্জন করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন আপনি"

"অনেকক্ষণ"

"আমিও অনেকক্ষণ এসেছি"

"সিংহটা কি তোমাকে দেখেই গর্জ্জন করছে"

"হ্যাঁ। ও, আমার নাচ দেখতে চায়। চলুন, এখান থেকে সরে' যাওয়া যাক"

"কোথায় যাওয়া যায় বলতো। এই জঙ্গলে তো সুস্থির হ'য়ে কোথাও বসবার দাঁড়াবার উপায় নেই"

"আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আপনাকে"

"আমার সাহসের অভাব নেই। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারি"
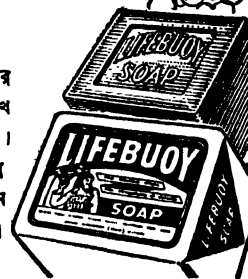
"মৃত্যুর মুখেই যেতে হবে, যদি যান"

"কোথা যেতে হবে বল"

"যজ্ঞের জন্য অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে অনেক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সব ঘরগুলো কাজে লাগেনি। পশ্চিমদিকে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়ার বিপদ আছে, যদি কেউ এসে আপনাকে হঠাৎ চিনে ফেলে তাহলে আপনাকে বন্দী করবে। আপনার অপরাধ প্রমাণ করতে শক্ত হবে না, ধারামতী মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গেই এসেছে এ কথাতো আগেই জানিয়েছি আপনাকে"

"তার চেয়ে চল না এখনই এ অরণ্য ত্যাগ করি। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে, রাত্রির অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না—"

"মাপ করবেন মহর্ষি, তা আমি পারব না। আমি সামান্যা নর্ত্তকী হতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ আমি করব না। কুমারকে না জানিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পালাতে পারব না। তবে আপনার বক্তব্য আমি শুনব—"

"কিন্তু তা শুনে লাভ কি—যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে বসে' থাক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এইটেই হল আমার বক্তব্যের মূল কথা—"

"আপনার বক্তব্য শুনে যদি মনে হয় যে আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু কুমারকে বলে' যাব। লুকিয়ে পালিয়ে যাব না"

"কিন্তু কুমার কি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবেন?"

"তিনি তো চিরকালের মতোই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এ যজ্ঞে তো আমাকেই বলিদান দেওয়া হবে। কুমার তো আপত্তি করেন নি। আমি যদি চলে' যেতে চাই, তাহলেও আপত্তি করবেন না।"

"তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কি তোমাকে বলিদান দেওয়া হচ্ছে?"

"হ্যাঁ—"

"তোমার এরকম ইচ্ছে করার মানে—?"

"মানে একটা আছে বই কি। সব কথা শুনতে যদি চান তাহলে চলুন পশ্চিম দিকের একটা খালি ঘরে গিয়েই ঢোকা যাক। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ দেখতে পাবে না আমাদের"

"চল—"

অরণ্যের অন্ধকারে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিচিত্র-পক্ষ শুক পক্ষীদ্বয় সেই অরণ্য মধ্যে বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় পাশাপাশি বসিয়াছিল।

"প্রথম শুকপক্ষী দ্বিতীয় শুকপক্ষীকে বলিল, "মানুষের ভাষায় এখন কথা কইব না। এ গাছে অনেক পাখী আছে, তারা ভয় পাবে। তুমি শুকের ভাষায় উত্তর দিও। আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে খুব। সরলভাবে উত্তর দিও। তোমার কি আনন্দ হচ্ছে?"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"হচ্ছে। আপনার আনন্দ হলে আমার হবে না?"

"আমার আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি সেটা?"

"পারছি বই কি—"

"সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি চিরকাল, কত কোটি কল্প এল আর গেল, এ আনন্দের আর শেষ নাই। সৃষ্টির আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। জানি না পালন করে' বিষ্ণু এ আনন্দ পাচ্ছে কি না। পাচ্ছে নিশ্চয়। ধ্বংস করে' মহেশও কি আনন্দ পাচ্ছে?"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর কি আলাদা?"

"আলাদা নয়, কিন্তু আলাদা করে' ভাবতে ভাল লাগছে! যে-আমি সৃষ্টি করছি, সেই-আমি আবার অন্যরূপে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছি, একথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ওই চার্ব্বাক-সুরঙ্গমা শিখর-অবন্ধনা কেউ থাকবে না জানি, কিন্তু আমি নিজেই ওদের ছবি এঁকে আবার নিজেই ছবি মুছে ফেলছি—ভাবতে কি রকম লাগছে। নিজেকে এতটা ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না বাণী"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"তা না দিতে পারি। কিন্তু আসলে আপনি একটি খামখেয়ালী শিশু"

"সত্যি?"

কথাটা বলিয়া প্রথম শুক শুকপক্ষীদের ধরণে খুক খুক করিয়া হাসিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শিশু ও পিতামাতা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

নরনারীর পারস্পরিক প্রেমের সৃষ্টি—সন্তান। পিতামাতা তাই তাঁদের নতুন ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে গর্ব্বের এক অপরিহার্য্য বস্তু বলে মনে করেন। জগৎ তাঁদের এই গর্ব্বকে স্বীকার করে—সম্মানের সঙ্গে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষার পর, প্রসবের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য, মাতা তাঁর সাহসকে অভিনন্দিত করেন—নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন। কিন্তু এই গৌরবের প্রধান মূল প্রকৃতি। অতএব শিশুর লালন-পালনের অধিকাংশ প্রকৃতির উপর ন্যস্ত করা উচিত।

শিশুর সৃষ্টি মুহূর্ত্তে; কিন্তু সুষ্টুভাবে বহু বৎসর প্রতিপালিত করে—পত্রপুষ্পে শোভিত বৃহৎ মহীরুহে পরিণত করার কর্ত্তব্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতারও অনেক। সন্তানকে নিজের অধিকারভুক্ত জীবন্ত এক সম্পত্তি, কখনই বিবেচনা করেন না। মনে করবেন না যে নিজের খুসীমত তাদের নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ধিত করে—ইচ্ছানুসারে ছাঁচে ঢালবেন। নিজেকে, নতুন জীবনের একজন অছি (Trustee) মাত্র মনে করবেন। নিজের মনোবাসনা পূরণের পরিবর্ত্তে, নতুনের যাতে সহজাত অব্যক্ততা (innate potentiality) সকল পরিপুষ্টির পর, পরিস্ফুট হয়—তার প্রতি দৃষ্টি রাখা আপনার প্রকৃত কর্ত্তব্য বিবেচনা করবেন। হৃদয়ঙ্গম করবেন যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার আওতায় শিশুকে প্রতিপালিত করে তার ক্রমবৃদ্ধির সহায়তা যদি না করেন, তা'হলে সন্তানের কর্ত্তব্য স্বরূপ. ভবিষ্যতে শিশুর কাছে পিতামাতা কিছুই দাবী করতে পারেন না।

ডাক্তারদের জীবনের এক একটি সন্তোষজনক মুহূর্ত্ত, যখন নবজাতকের ক্রন্দনে প্রাণের সাড়া পেয়ে যাঁরা ; বলতে পারেন—যাক বিপদ কাটল। ঠিক তেমনি নরনারীর সন্তোষজনক সময় তখনই ; যখন পিতামাতা বেশ হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ্যে বলতে পারবেন—যাক আমাদের বিপদ কাটল, সন্তান সব মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসব করানর জন্য ডাক্তারকে বেশ কয়েক বছর শিক্ষা করতে হয়। মাতাপিতা, নরনারী প্রত্যেককে শিশুপালনের জন্য শিক্ষা নিতে হবে। সন্তান পালন উদ্দেশ্যে বিধি-নিষেধ কিছু মানতে হবে।

উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন—"শিশুপালন উদ্দেশ্যে আমাদের পিতামাতাকে কখন শিক্ষাদীক্ষা নিতে হয়নি। আমাদের তাঁরা বড় করে তুলেছেন তাঁদের সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই"। তাঁদের এই উক্তি, মানি ; বিশ্বাস করি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পিতামাতা তাঁদের শিশু প্রতিপালিত করেছেন সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা। সাধারণ বুদ্ধিকে অন্যভাবে বলা হয়, আমাদের সুপরিচিত তথাকথিত পুরাণপন্থা অবলম্বন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পুরানপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ—আমাদের পিতামাতা যতখানি দৈবের উপর নির্ভর করতে পারতেন, ততখানি আমরা পারি না। দৈনন্দিন ক্রমবর্দ্ধিত পারিপার্শ্বিক চাপ আমাদের অস্থির করে তুলছে। স্নায়বিক ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। পুরাতন সব কিছুর উপর আস্থা হারিয়েছি। মানব জনম দুর্লভ জনম। সকল সময়ে তাই আমরা মানবজাতিকে একটি সার্থক জাতিতে পরিণত করতে সচেষ্ট ; সেই কারণে পুত্রকন্যাদের সুষ্টুভাবে লালনপালনের জন্য আমরা ব্যস্ত। শুধু এই নয়—বর্ত্তমান বিভিন্ন চাপে আমাদের যে পরিমাণ শক্তি অপচয় হয়েছে ও হচ্চে ; তার থেকে পুত্রকন্যাদের বাঁচাবার জন্য, সকলেই ইচ্ছুক। এই জন্য শিশুপালনের বিধিনিষেধ মানা প্রয়োজন। সাধারণের ধারণা যে শিশুর জন্মের পর শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন সঙ্গে সঙ্গে তা' প্রয়োগ করে শিশুকে লালিতপালিত করবেন। এ ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ শিশুর প্রথম পাঁচ বৎসর অত্যন্ত মূল্যবান বৎসর। এই পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশুর উত্তর জীবনের ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, ইত্যাদি এমন কি মানসিক ব্যাধিরও বীজ উপ্ত হয়—বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বীজ সকল পরিপুষ্ট হয়ে স্থান, কাল, পাত্র, সময় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি শিশু-পালনের শিক্ষা নেওয়া হয় তা'হলে কিছুটা সময় শিশুর নষ্ট হয়'। উপরন্তু তাড়াহুড়া করে শিক্ষালাভের ফল ভাল হয় না ; শিক্ষাদানেরও ফল শুভ হয় না।

'শিক্ষককে শিক্ষিত হবার জন্য যেমন কিছুটা সময় প্রয়োজন, সেইরূপ শিশুপালনের জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণে মনোবিদের মতে শিশু সৃষ্টির সাথে সাথে শিশু লালনপালনের শিক্ষা গ্রহণ করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। আমার মতে দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভেই শিশু লালনপালন সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুল ত্যাগ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়ে ছাত্রছাত্রী সকল যেমন কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয় ; নব দম্পতীও ঠিক তেমনই কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়। নতুন জীবনের উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও উচ্ছৃঙ্খল আয়ত্তে এনে—শিশুপালনের বিধিনিষেধ মেনে প্রকৃত শিশুপালন বেশ কষ্টসাধ্য। প্রথম থেকেই যদি বিধিনিষেধ জানা যায় এবং তা আয়ত্তে আনা যায় তা'হলে পরে শিশুপালনে আর তত কষ্ট হয় না। এই জন্য সামান্য কয়েকটি বিধিনিষেধ নিম্নে দেওয়া হল। এই বিধিনিষেধ সকলই মনোবিদদের বিরচিত। প্রথমেই বলে রাখি যে—বিধিনিষেধগুলি প্রয়োগ করবার আগে একটু চিন্তা করবেন। অঙ্কের সূত্রের মত চোখ কান বুজে ব্যবহার করবেন না। মনে রাখবেন বিধিনিষেধের কোন একটি একবার ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে যে বার বার ভাল ফল পাওয়া যাবে তা' নয় ; আবার কোন একটি বিশেষ কোন এক বালকের উপর প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে যে প্রত্যেক বালকের ক্ষেত্রেও শুভ—এমন নয়। তবে সকল বিধি-

নিষেধই, আগে পরে, যখনই হোক প্রয়োগ্য। কখন, কোথায় ও কি ভাবে বিধিনিষেধের সদ্ব্যবহার করবেন, সেটা আপনার চিন্তা—সেখানেই আপনার বুদ্ধির প্রকাশ।

প্রবাদটা নিশ্চয়ই জানেন যে "আষাঢ়ে না হলে সুত; হা সুত যো সুত"। অর্থাৎ—আষাঢ় মাসের দিনমান দীর্ঘ, সে মাসে যদি সুতা কাটা না হয়, তা'হলে সুতার জন্য কষ্ট পেতে হয়। উপযুক্ত সময়ে কোন কার্য্য না করলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। আপনারা শিশুদের যদি সময় মত লালনপালন না করেন, পরে অনুতাপ করে বা ঔষধ খাইয়েও ভাল করতে পারবেন না।

অনেক পিতামাতার ধারণা যে শিশুদের ছোটবেলা থেকে বেশী খেলাধূলা করতে না দিলে ও সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশতে না দিলে তারা সবচাইতে ভাল হয়। অনেককে বলতে শুনেছি যে "ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে"। বাইরে মিশতে দিয়ে ওদের নষ্ট করে ফেলব! তার চেয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা অনেক ভাল। এই সমস্ত শিশুদেরই প্রাপ্তবয়স্কে দেখা যায় অসামাজিক, অমিশুক জীব বিশেষ। এরা বাইরে না পায় সমাদর; গৃহে না পায় শান্তি। এরাই বেশীর ভাগ স্নায়বিক অবসাদে আক্রান্ত হয়, নানা রকম মানসিক ব্যাধিতে ভোগে। তাই শিশুদের ঘরকুণো না করে বিভিন্ন বয়সানুযায়ী সমবয়স্কদের সঙ্গে খেলতে দেওয়া উচিত।

শিশুর ক্রীড়া অপরিহার্য্য। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু একে অন্যের সহিত মিশতে শেখে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে দলগত স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়। দায়িত্বপূর্ণ কাজের মূল্য বোঝে, এবং তা' সমাধা করে সহজাতপ্রবৃত্তি (প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা) তাদের পূরণ হয়। পিতামাতা শুধু শিশুর খেলাধূলার উপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে'না। শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি (যথা—খাবার, প্রশংসা পাবার, সঙ্গীতের সঙ্গে খেলবার ইত্যাদি) যাতে পূরণ হয়, সেদিক দৃষ্টি রাখবেন। বয়সানুপাতে তাদের শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা করে, উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবেন, সাথে সাথে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাও দেবেন।

দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিশু যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সমাধা করতে পারে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। নিজের ইচ্ছানুসারে পিতামাতা কখনই শিশুর চিন্তা বা ভাবধারাকে পরিচালিত করেন না, উপরন্তু তাদের অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন।

সময় সময় শিশুদের অভাব, অভিযোগ, অন্যায় আবদার বলে মনে হতে পারে। এমন কি নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য তারা এমন অনেক কাজ করে যা "দোষ" বলে বিবেচিত হয়। পিতামাতা আদর করে মিষ্ট কথা বলে শিশুদের আবদার অন্যায় বুঝিয়ে দেবেন; সেই সঙ্গে দোষ সংশোধন করবারও চেষ্টা করবেন। এই পন্থা, একেবারেই দুঃসাধ্য নয়। প্রথম থেকেই যদি শিশুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হয়; তা'হলে সহজে রূঢ় ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একবার রূঢ় ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত করলে পরে আর মিষ্ট কথায় চালিত করা সহজসাধ্য নয়। কথায় আছে, "লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে?" অর্থাৎ যাদের তিরস্কার প্রহার দিয়া কাজ করান হয়েছে; তাদের কাছ থেকে বাবু বাছা বলে কাজ পাওয় যায় না।

অনেক সময় শিশুরা মিষ্ট কথা শুনছে না বলে মনে হয়; পিতামাতা তখন বলপ্রয়োগ করেন। এখানে জানা প্রয়োজন যে শিশুরা বিধি, নিষেধ, উপদেশ প্রভৃতি শুনে বিশেষ কিছু শিক্ষা করে না। তারা পিতামাতা ও গুরুজনস্থানীয়দের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, হাবভাব ইত্যাদি দেখে শিক্ষা করে। অতএব শিশুদের সামনে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংযমী হবেন।

শিশুদের স্বাবলম্বী হতে শেখাবেন। তাদের অভিপ্রেত কাজ চেষ্টা করতে দেবেন। অযথা তিরস্কৃত হয়ে নিরুৎসাহ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সকল প্রকার বিপদ আপদের সম্মুখীন হবার উৎসাহ দেবেন। সুখ দুঃখ সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে শেখাবেন। কিন্তু পিতামাতা শিশুর দুঃখ কষ্টে ধীর থাকবেন।

বহুক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানের দুঃখ কষ্টে মাতা ধীর থাকলেও পিতা স্থির থাকতে পারেন না; অথবা পিতা শান্ত থাকলেও মাতা অধীর হন। কারণ মাতাপিতা উভয়ে সকল সন্তানকে সমান ভালবাসেন না। ফলে গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়—সংসারে ভাঙ্গন ধরে। প্রতিকার স্বরূপ বলা যায় যে পিতামাতা উভয়েই সন্তানকে সমান ভালবাসবেন।

চার থেকে আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা পিতার নিকটে থাকতে ও নানা প্রশ্ন করতে চায়। মাতা এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হন, অভিমানও করেন সময় সময়। কিন্তু মাতার অভিমান না করে শিশুর এ কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এমন কি যে পিতা শিশুর সঙ্গে থাকতে চান না; তারা যাতে কিছু সময়ের জন্যও সন্তানের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথী হন সে বিষয়ে মাতার শিশুদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। মনে রাখবেন কেবল মাত্র মাতার বা পিতার শিক্ষাতেই শিশু লালিতপালিত হয় না, উভয়ের শিক্ষা-দীক্ষা শিশুর মনে প্রতিফলিত হয়। মনে রাখবেন একজনের কর্ত্তব্যহীনতায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

পিতামাতাই শিশুর সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান বন্ধু। জন্মের পর হ'তেই শিশু পিতামাতাকে কাছে পায়—উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে সকল রকম সুখ সুবিধা দেবার জন্য তাঁরা সকল সময়ে চেষ্টিত ও সমস্ত রকম বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত। এই কারণে শিশু সর্ব্বপ্রথম পিতামাতার কাছেই মনের কথা খুলে বলে। পিতামাতাও শিশুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যাতে শিশুর এই বন্ধুত্বভাব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত থাকে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা উপহাস করে শিশুর মনে আঘাত দেবেন না। অনেক সময় শিশু কি, কেন, কোথায় প্রভৃতি প্রশ্ন করে পিতামাতাকে বিপদগ্রস্ত করে। বহুক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও কি ভাবে উত্তর দেবেন ভেবে পান না। (যেমন যৌন বিষয়ক প্রশ্ন) সেখানে আপনারা ডেঁপ বা ফাজিল ইত্যাদি বলে তাঁদের কৌতুহলকে চাপা দেন। এটা অন্যায়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন। (যৌন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয় পরে আলোচিত হবে)। জোর করে তাকে থামাবেন না। এমন কি

জোর করে এক কাজ থেকে অন্য কাজ করাবার চেষ্টাও কখন করবেন না।

অবশ্য আমি একথা বলছি না যে শিশুর সকল আবদারের প্রশ্রয় দেবেন। বরং এ কথা বলব যে সকল আবদারের প্রশ্রয় দেবেন না। খেয়াল রাখবেন, যে শিশুর আবদার প্রশমিত করার জন্য, ভুলক্রমেও যেন অন্য ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। মনে রাখবেন শিশুর চিত্ত অতি চঞ্চল; এক বিষয় বস্তু থেকে অন্য বিশয় বস্তুতে অতি শীঘ্র ধাবিত হয়। পিতামাতা শিশুর চঞ্চল চিত্তের সুযোগ গ্রহণ করবেন। নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা পরিবেশ অনুধাবন করে, শিশুর মন আবদারের বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুতে পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত করতে পারেন অনায়াসে। "জোর জবরদস্তি"র কখনই প্রয়োজন হয় না শিশুর আবদার থামাবার জন্য। আরও বলে রাখি যে জোর জবরদস্তি করে ক্রুদ্ধ শিশুকে খাওয়াবেন না। জোর জবরদস্তি করে ক্রুদ্ধ শিশুকে খাওয়ানর ফল ত ভাল হয়ই না, বরং দৈহিক ও মানসিক দু'য়েরই ফল অশুভ হয়।

আপনারা ক্ষুদ্র শিশুকে বিশ্বাস করেন না। শিশুদের সামান্য ভুল ভ্রান্তি তাই আপনাদের বিচলিত করে। শিশুদের অসামাজিক বাসনা বা ব্যবহার দেখে আপনারা ভীত হন, আতঙ্কিত হন। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুদের অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণিত অন্যায়, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। পিতামাতার অজ্ঞান মনের অবস্থিত অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছা শিশুর উপর অভিক্ষেপিত (projection) হয়েছে। পিতামাতা সজ্ঞানে যে এটা করেছেন তা' নয়; সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতভাবে তাঁদের এই মানসিক কার্য্য সাধিত হয়েছে। এই অসামাজিক ইচ্ছার অস্তিত্ব যে আপনার মনে, তা' আপনারা অনুধাবন করতে পারেন না। চলতি কথাই আছে তাই, "আপনি যেমন জগৎ দেখি তেমন।"

অসামাজিক ইচ্ছা বা কার্য্য আমরা পছন্দ করি না। তাই আমরা শিশুর কোন অসামাজিক কার্য্য বা ইচ্ছা দেখলেই তা দমন করবার জন্য চেষ্টিত হই। শিশুকে তিরস্কার ও প্রহার করি তার "কুকর্ম্ম" দূরীকরণের জন্য। এই কারণে শিশুকে কঠোর বা অযথা শাসন করা উচিত নয়। প্রহার যতদূর সম্ভব ত্যাগ করা উচিত। সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায় প্রভৃতির ধারণা শিশুর ভিতর অতি প্রবল। শিশুর অন্যায় আচরণ বোঝাবার চেষ্টা না করে তার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করলে বা সামান্য দোষে কঠোর শাস্তি দিলে—শিশুর মনে তা গভীর ক্ষত রূপে অবস্থান করে। শিশু প্রতিশোধের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রতিশোধ তারা নেবেই—সে আজই হক বা দুদিন বাদেই হক। প্রতিশোধের রূপ এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যে পিতামাতা চমকে উঠেন—শিশুর বন্ধুবান্ধব বা অন্যকার উপর দোষারোপ করে নিজের মনকে প্রবোধ দেন। শিশু প্রতিশোধের রূপ অন্য কার থেকে শেখে না—পিতামাতার কাছ থেকেই শেখে। মনে করুন একদিন আপনি রাগ করে শিশুকে অথবা শিশুর প্রিয় কাউকে বল্লেন যে "লাথি মারব।" আপনি মুখে বল্লেন কিন্তু শিশু একদিন সত্যই লাথি মারল। এ সময় যদি শিশুকে সংশোধিত না করা হয় তা'হলে পরে যে শিশু লাথি মারবে না, কিম্বা লাথি মারব বলবে না এ ধারণা একেবারে অনুচিত।

সংশোধনের জন্য আমি শিশুকে প্রহার করতে বলছি না। পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রহার যতদূর সম্ভব ত্যাগ করা উচিত। এ ধারণা অবশ্য আজকাল বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে। এটা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দান মনে করে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। সামান্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞান যা প্রকাশ করেছে; তার বহু পূর্ব্ব থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, "ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে; আপনার ক্ষতি আপনি করে।"

একথাও আপনারা মনে করবেন না যে শিশু লালনপালনের জন্য অত্যধিক আদর দিতে হবে। দোষ সংশোধনের জন্য মাঝে মাঝে সামান্য তিরস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। তিরস্কারের পর শিশুকে ভালবেসে আবার কোছ টেনে নিতে হবে; তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার ভালর জন্যই তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল। কোন অন্যায়ের জন্যই শাসন করার জন্য শিশুকে দূরে ঠেলে রাখবেন না—কিম্বা অতি সামান্য সময়ের জন্যও তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করবেন না। পিতামাতার এইরূপ আচরণ যদি শিশু লক্ষ্য করে, পরে তা'হলে পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঐরূপ আচরণ করতে দ্বিধা করবে না। শাসন করার পর শিশু যাতে অভিমান করে না থাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। সেই কারণে শাসিত শিশুকে একটু বেশী সমাদর করবেন এবং সম্ভব হলে কিছুক্ষণের জন্য কাছে রাখবেন—মিষ্ট বাক্যে তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করবেন।

শাসন করার অভিলাষে পিতামাতা ভুত প্রেত বা জুজুর ভয় দেখিয়ে থাকেন। ভুত, প্রেত, জুজু প্রভৃতির ভয় শিশুর মনকে দুর্ব্বল করে দেয়। শিশু আতঙ্কগ্রস্ত হয়। এর উপর যদি এটা পারবে না, ওটা পারবেনা; —পারবে না, পারবে না বলে নিরুৎসাহ করা হয়—তা'হলে শিশু নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়; মনে হীনতা ভাব (inferiority complex) বাসা বাঁধে। ফলে উত্তর জীবনে উৎসাহিত হয়ে নতুন কিছুর সৃষ্টি অথবা কোন কিছুর ভার নেওয়া শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য। সকলের পিছনে সে পড়ে থাকবে।

পিতামাতা শিশুদের সামনে ঝগড়া করবেন না, বা অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি যতদূর সম্ভব কম রূঢ় ব্যবহার করবেন। কারণ আপনাদের রূঢ় ব্যবহার দেখেই শিশুরা খারাপ ব্যবহার করতে শেখে—ঝগড়া করে। শিশুদের ঝগড়ায় কখন হস্তক্ষেপ করবেন না; নিজেদের মীমাংসা করার জন্য উৎসাহ দেবেন এবং যাতে নিজেরা মিটমাট করে তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে তাদের জীবনের প্রায় শেষ দিন অবধি ঝগড়া করে যাবে—কিন্তু মীমাংসা করতে পারবে না আর কোনদিন।

শিশুদের কাছ থেকে যদি শ্রদ্ধা পেতে চান তা'হলে মাঝে মাঝে শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবেন। ওদের মতামত বা পরামর্শকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না বা ধমক দিয়ে তাদের থামাবেন না—সে যতই অবাস্তব হোক না কেন। তাদের পরামর্শ যদি গ্রহণ করতে না পারেন তা'হলে সময় মত বুঝিয়ে দেবেন যে কেন তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। ভবিষ্যতে যাতে আরও ভাল মতামত দেয়, তার জন্য তাকে উৎসাহ দেবেন।

উপসংহারে বলে রাখি যে পিতামাতা বলতে কেবল মাত্র পিতামাতাকেই বোঝায়নি। পিতামাতা, শিক্ষক, গুরুজন ও তৎস্থানীয় সকল নরনারীকেই আমি পিতামাতা রূপে অভিহিত করেছি আমার বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্য। সর্ব্বশেষে প্রকাশ করি যে শিশুকে সকলের নিকট হতে দূরে রাখবার চেষ্টা করবেন না। লেখাপড়া না শিখলেও কেবল ভদ্রসমাজে থাকলেই শিশু অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবে। কথায় আছে, "পড়ুক বা না পড়ুক পো, সভায় নে সে থো।" তাই অনুরোধ করি নিজেদের দোষ ত্রুটি সংশোধন করুন; শিশুকে ভদ্র হতে সহায়তা করুন—সমাজকে ভদ্র হতে ভদ্রতম করে তুলুন।

যোগ-ব্যায়াম

শ্রীলাবণ্য পালিত

আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু···সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যে কোন কাজ করুন না কেন তার মূলে আছে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য অর্থাৎ সু-স্বাস্থ্য···। ছোট বড় সকল কাজেরই উৎসাহ আনে আমাদের স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ···নিরুৎসাহ ব্যক্তিকে আমরা রুগ্ন বল্‌তে পারি। যার কাজ করবার ক্ষমতা নেই··· মানুষকে কাজে অনুপ্রেরণা জাগাবার সামর্থ্য নেই যার অনাবিল পবিত্র আনন্দ নেই···, দিন রাত যে আছে রোগ-শয্যায়···তার জীবন হ'য়ে গেছে জড়·· পঙ্গু! কোন সৎ চিন্তা তাকে দেবেনা আনন্দ···কোন বিবেক বুদ্ধি তাকে দেখাবে না শুভ পথ···!! সৎ চিন্তা, বিবেকবুদ্ধি আসে কোথা থেকে? স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতী মানুষের কাছ থেকে। ভগবানের ধ্যান করতে গেলেও সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন—সংযমের প্রয়োজন। সংযম আসে সুস্বাস্থ্য থেকে। স্বাস্থ্য ভাল না হলে কোন কাজেই একাগ্রতা আস্‌বে না, বার্দ্ধক্যে মন বসবে না···। তাই কুস্বাস্থ্য হোল মানুষের প্রধান শত্রু।

যে কোন পরিবেশের মাঝে নিজেকে ঠিক্ সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুল্‌তে হ'বে। তবেই জীবনকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করতে পারবো···, তবেই হ'বে দেশের · দশের সেবা। তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হ'লে চাই সু-স্বাস্থ্য অর্থাৎ জীবনী-শক্তির বিকাশ।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে রোগ ও রুগীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী! এটা আমাদের পক্ষে কম লজ্জার কথা নয়। খাদ্য পথ্যের বিচার করে যদি দেহের স্বাস্থ্য বিকাশের চেষ্টা করা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হ'তে পারবো শরীর গড়ার কাজে। বাংলা মায়ের চরণে হাত রেখে বল্‌তে পারবো—শক্তিরূপিণী মা, শক্তি দাও···শান্তি দাও···

বিভিন্ন রকম শরীর চর্চ্চার ভেতর দিয়ে আমরা নীরোগ শরীর গড়তে পারি, তার মধ্যে 'যোগাসন' প্রণালী একটি। শুধু এটুকু বল্‌লেই তার যথেষ্ট গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না··, যোগ-প্রণালী দ্বারা শরীরচর্চ্চা করার পক্ষপাতী ছিলেন আমাদের মুনিঋষিরা; তাঁরা এই ভারতবর্ষের তপোবনে বসে শত শত বছর ধরে যোগাসনে ভগবানের ধ্যান ধারণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের কোন অসুস্থতাই বিপদে ফেল্‌তো না, তার কারণ তাঁরা ঐ যে একাসনে দীর্ঘ দিন ধরে ধ্যান করতেন এতে তাঁদের শরীরে ব্যায়ামের কাজ হোত··· এই ভাবে বিভিন্ন রকম 'আসনে' বসে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ-সাধন করতেন, তাই এর নাম হ'য়েছে 'যোগাসন'। অবশ্য আমরা গৃহী, সাধু সন্ন্যাসী নই। সেই জন্যে আমরা এই 'যোগাসন'কে শুধু ব্যায়ামরূপে ব্যবহার করে দেখ্‌ছি, এতে বহু লোকের হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হ'য়েছে।

আজ আপনাদের কাছে আমি এনেছি তার প্রেরণা, যদি আপনাদের কোন উপকারে লাগে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পদ্মাসন

ধ্যান ধারণার আসন। আপনারা অবশ্য এইটি বিশেষ করেই জানেন, তাই গোড়ার দিকে 'পদ্মাসন' দিয়েই

পদ্মাসন

আরম্ভ করলাম। ছবিটি দেখে বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে কেমন ভাবে বস্‌তে হ'বে, প্রথমে শরীর সোজা করে বস্‌বেন, তারপর একটির পর একটি পা উরুর ওপর তুল্‌বেন। পা দু'টির গোড়ালি যেনো তলপেটের কাছে ঠেলে

যায়। এই বসে দু'টি হাত পরস্পর আঙুল জড়িয়ে ছবি অনুযায়ী ধ্যানের ভঙ্গিতে রাখবেন, অথবা দু'হাঁটুর ওপর হাতের তালু দু'টি রেখে দেবেন সাধারণভাবে। দেহের মধ্যে কোন রকম অন্যমনস্কতা থাকবে না, আর দেহ শক্ত করবেন না, সহজ ভাবে বসে আসন করবেন। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়া উচিত। ৩ বার আসন করে, প্রতিবার শুয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল করে বিশ্রাম করবেন।

উপকারিতা

বয়স্কদের পায়ের বাতের পক্ষে এ আসন অত্যন্ত উপকারী। এই আসনে যদি প্রথম থেকেই অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে পায়ের পেশী নমনীয়তা বজায় থাকবে। তাছাড়া ধমনী ও শিরার গায়ের স্থিতিস্থাপকতার শক্তি দৃঢ় হয়। এই জন্যে পায়ের রক্ত চলাচলের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

রক্তের প্রবাহশক্তি সহজ ভাবে হতে থাকলে দেহের মল ঠিক্ ভাবে বেরিয়ে আসে তাছাড়া দেহের ভেতরে মল জমে যে সকল শক্ত অসুখ হবার সুযোগ থাকে, তা নষ্ট হয়।

ক্যানভাসার

শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়

"পিপাসার শান্তি—তানসেন গুলি······"

শেয়ালদা ষ্টেশনে আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বসে আছি—ট্রেণটা ছাড়তে আধঘণ্টা দেরী—এর মধ্যে যদি দম আটকে মরে না যাই তবেই ভরসা হবে আবার মাতৃভূমি দেখতে পাবো, এই ভীড়েও কি কৌশলে জানিনা ক্যানভাসার মুখ বাড়িয়েছে—বারোয়ারী পূজোর মাইকের মত কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে চলেছে তার মুখস্ত করা বুলি, তানসেন গুলি, আশ্চর্য মলম, সার্জিক্যাল অয়েলের গুণগান, মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠলেও কিছু বলতে মুখে আটকাচ্ছিল। কিন্তু বলবার লোকের অভাব হলনা—আমার বয়সী একটি ছেলে বলে উঠলো, "কেন মিথ্যে এখানে চেঁচাচ্ছেন—বাইরে গিয়ে যত খুসি চেঁচান।" ক্যানভাসার এতে যাবার কোন লক্ষণই ছাখালেনা, ধীরে সুস্থে বক্তৃতা শেষ করার পর সে তার স্যুটকেশটা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল—পাশের কামরা থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠের পুনরাবৃত্তি · "সার্জিক্যাল অয়েল···"

বাবা ছিলেন সরকারী চাকুরে, বদলী হলেন কৃষ্ণনগরে, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি, প্রথম দিনেই একটা ডিবেটিং ক্লাস ছিল—বিষয় "ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত"। এতদিন ছিলাম বাংলার বাইরে—তবু বাংলাভাষার ওপর টান ছিল সবচেয়ে বেশী। এই ক্লাসে বাংলাকে সমর্থন করে যে বলতে উঠল তাকে চিনলাম—সে সেদিন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ক্যানভাসারটাকে তাড়াতে চেয়েছিল। আধ-ঘণ্টা ধরে চমৎকার যুক্তি দিয়ে যখন সে বসল তখন বিপক্ষে কাউকেই দাঁড়াতে ছাখা গেলনা—শিক্ষকের অনুরোধ তাদের ভাষাপ্রীতি টলাতে না পারায় আমিই উঠলাম কিছু বলতে—যখন শেষ করলাম তখনও বুঝতে পারছি বাংলার স্বপক্ষের প্রায় যুক্তিই আমি খণ্ডন করতে পারিনি। সেই দিন টিফিনে রাস্তার ধারে তার সঙ্গে আলাপ হল—নাম তার রণেন—আশা ভবিষ্যতে সে হবে ব্যারিষ্টার।

বছর দুয়েক পরের কথা—কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ছি, বহুদিন পর হঠাৎ রাস্তায় রণেনের সঙ্গে ছাখা, অনেক কথা হল—ম্যাট্রিক পাশ করে সে কলেজেই ঢুকেছিল। বোধহয় খরচ চালাতে না পেরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে—কোথায় যেন সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখছে—ব্যারিষ্টার হবার আশা আর তার নেই। সে চায় একজন নামকরা 'ষ্টেনো' হতে।

ছাত্রজীবনের কটা বছর কেটে গিয়েছে—তারপর এই বেকার জীবনের দিনগুলো যেন আর চলতে চায়না, দিনের পর দিন, দরখাস্তর পর দরখাস্ত ছেড়ে চলেছি—হঠাৎ চাকরী একটা মিললো—বাংলা ছাড়িয়ে সুদূর মাদ্রাজে, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম কলকাতার দিকে—ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার—কোনক্রমে মালপত্তর তুলে একটা কোণে উর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই শোনা গেল এক বাজখাঁই গলার আওয়াজ "Passengers Look at me, I am not a Canvasser" বক্তৃতার অভিনবত্বে আগ্রহ হল ক্যানভাসারটিকে ছাখবার—বহু কষ্টে যখন দেখতে পেলাম তখন নিজের চোখের ওপর নিজেই যেন বিশ্বাস হারিয়েছি, ক্যানভাসার—রণেন।

দিনে দিনে আরও
মসৃণ ও রমণীয় ত্বক্
রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে
নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার
ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো নির্ম্মল হ'য়ে উঠছে।
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌*যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
Rexona
RP. 101-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

নানা কারণে এ অধিবেশনটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় অধিবেশন হলেও রাজস্থান বা রাজপুতানায় এই হ'ল সর্বপ্রথম অধিবেশন, তাই এর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অতীত আর বর্তমান—রাজপুতানার ঊষর মরুভূমি আর শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ—স্বাধীনতা রক্ষায় রাজপুতের আত্মদান আর স্বাধীনতালাভের জন্য বাঙালীর আত্মবলি—রাজস্থানের বাহুবল আর বাংলার প্রেম—রাজপুতের অসির ঝনৎকার আর বাংলার সোনার আখরে লেখা সে ইতিহাস, তার মাঝে যেন স্থান ও কালের দূরত্ববিজয়ী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনরূপী যোগসূত্র! অতীতে বাংলার সম্পদ আর বাঙালীর ঔদ্ধত্য
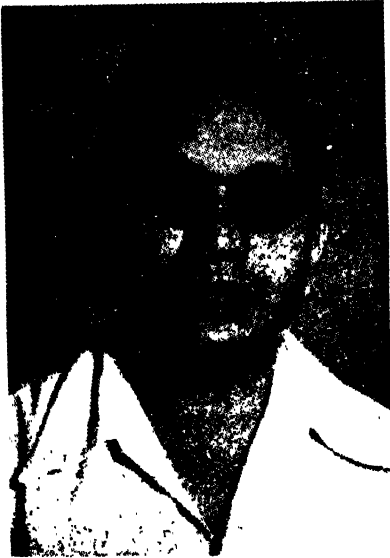
মূল সভাপতি—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল মোগল সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে, বাঙালী সেদিন নিয়তির পরিহাসে জয়পুর রাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করে বিজয়ীকে উপঢৌকন দিয়েছিল পত্নীরূপে কেদার রায়ের মেয়েকে আর দেবী যশোরেশ্বরীকে! পরবর্তী কালে নির্বাসিতা বাঙালীর দেবী আর বৃন্দাবন হতে নির্বাসিত বাঙালীর প্রেমের ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো বঙ্গবিজয়ী রাজপুতের শির! ধীরে ধীরে পরবর্তী কালে বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধি, মনীষা ও সংস্কৃতি একটা উচ্চ আসন অধিকার করলে, জয়পুরকে নতুন সাজে, নতুন ভাবে গড়ে তোলবার কাজে! সুতরাং বিজয়ীর কাছে বিজিতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যেখানে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে—সে মিলনতীর্থে, যেখানে আজও একজন বাঙালী রাজকন্যা স্বীয় মর্যাদায় রাজপ্রমুখের মহিষী রূপে অধিষ্ঠিতা—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্যে সম্মেলনের সাদর আহ্বান, বাঙালীর হৃদয়কে নতুন করে জয় করবার প্রচেষ্টা নয় কি? বাঙালী যে প্রেমের হাতছানিতে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি, তার প্রমাণ এ অধিবেশনে সাড়ে চারশোরও বেশী ডেলিগেটের সাদর আমন্ত্রণে ছুটে যাওয়া। অন্য কোন কারণ না থাকলেও শুধু এই একটি কারণেই জয়পুর-অধিবেশনটি উল্লেখযোগ্য বলে দাবী করতে পারতো!

'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জয়পুরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি রাজস্থান বিধান সভার একজন সদস্য! তাঁরই প্রচেষ্টায় আশাতীতসংখ্যক ডেলিগেটদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল এম্ এল্ এ দের জন্য নির্দিষ্ট বিরাট গবর্ণমেণ্ট হোষ্টেলে। সম্মেলনের অধিবেশনের জন্যও স্থান হয়েছিল ঐ প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রাঙ্গণে। প্রতি দুটি বাসের কামরার সঙ্গে একটি করে স্নানাগার ছিল এবং প্রথমে ব্যবস্থা হয়েছিল যে প্রতি কামরায় দুজন করে ডেলিগেট থাকবেন, কিন্তু ডেলিগেটের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য অবশেষে প্রতি কামরায় দুজনের পরিবর্তে ছয়জনের থাকার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ডেলিগেটদের খাওয়ানোর ভার দেওয়া হয়েছিল হোষ্টেল সংলগ্ন হোটেলটির উপর—প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, সান্ধ্য চা এবং নৈশভোজনের জন্য প্রতিদিন চারখানি করে কুপন বা টিকিটের সাহায্যে।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে আমরা কোলকাতার প্রায় একশোজন ডেলিগেট জয়পুরে গিয়ে পৌঁছলুম ২৪শে অক্টোবর বিকেল প্রায় সাড়ে চারটার সময়ে। পাটনা, বেনারস, পুরুলিয়া, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতির ডেলিগেটগণও একই ট্রেণে এসে পৌঁছলেন জয়পুরে। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কাণ্ড! গবর্ণমেণ্ট হোষ্টেলের বিশাল ভবনটি হঠাৎ যেন কোন আলাদীনের প্রদীপের ছোঁয়াচ লেগে কোলাহলমুখর ও জীবন্ত হয়ে উঠলো! সান্ধ্য চা-টি শেষ করে একটু বেড়িয়ে আসার জন্য বাইরে যাচ্ছি, এমনি সময়ে সম্মেলনের মূল-সভাপতি শ্রীযুক্ত দাশের সঙ্গে জ্যোতিষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইউরোপা,' 'প্রেমরাগ' ও 'রাজোয়ারা'র লেখক সুসাহিত্যিক সৌম্য-দর্শন যুবক শ্রীযুক্ত দাশ, কয়েক মিনিটের পরিচয়েই মনে একটা বিশেষ ছাপ রেখে গেলেন। তখুনি আবার ডাক পড়লো সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ঘরে। কোলকাতা হতে জয়পুর পর্যন্ত সভ্রাতা ও সপত্নী আমার সঙ্গে আগেকার স্বল্প পরিচয় নিবিড়তম হয় পুত্র ও জামাতাসহ শ্রীযুক্ত বসু ও শ্রীমতী বসুর সঙ্গে—একই কামরার

যাত্রীহিসেবে। পথে ঠাণ্ডা ও ধুলোলেগে মনোজবাবুর গলা বসে গেছে, তখুনি তার একটা বিহিত করতে হবে! নারদ-বাহনের ভাগ্য আর কাকে বলে! সাহিত্যসম্মেলনে এসেও ধান না ভেনে অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন না লিখে চলে না। গলা দেখে নাড়ী টিপে বার দুই "হয়. জাস্তি পার না" ব'লে হতে আরম্ভ করে সইর নীচে registration নম্বর পর্যন্ত লিখে মাণিক বাবাজির (জামাতা) হাতে দিলুম-ওষুধের তালিকা তুলে!

রাত্রিতে মেঝেতে দড়ির কার্পেটের উপর সারি সারি বিছানা—পরিশ্রান্ত দেহে তারই উপর নিঝুম ঘুম ভেঙে গেল রাত্রি চারটায়—কারণ বারোয়ারী স্নানাগার ও শৌচাগার—"যে জানে দুনিয়ার ভাও, সে মারে আগের দাঁও" দেখতে দেখতে অরুণোদয়ের আগেই দাঁড়ি কামানো পর্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সব হয়ে গেল! অর্থাৎ সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত!

প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পরে অনেকেই অম্বর রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে চলে গেলেন। 'কন্‌ডাক্টেড টুরের জন্য টাকা জমা দিতে দেরী হওয়াতে আমাদের শুনতে হলো "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।" তাই অগত্যা দুখানি টাঙ্গা করে লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন সান্যাল, তদীয় পত্নী ও পুত্র এবং বন্ধু শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমরা জয়পুরের নানা দ্রষ্টব্য দেখতে বের হলুম।

জয়পুর খুব পুরানো শহর নয়। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়, জ্যোতিষবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বর হতে রাজধানী সরিয়ে এনে জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরেরই একজন বাঙালী, কেদাররায়ের কুলদেবী শিলামাতার প্রথম পুজারীর বংশধর বিদ্যাধর ভট্টাচার্য নামক ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনায় জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়! প্রায় আড়াইশো বছর আগে তিনি যে পরিকল্পনার সাহায্যে নগরীর পত্তন করেন, বর্তমান যুগেও তার চেয়ে উন্নততর কোন পরিকল্পনার ধারণা করা যায় না। পরে অবশ্য বর্তমান যুগোপযোগী নগরীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে! জয়পুরে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন, নয়তলাযুক্ত বিরাট সৌধ হাওয়াই! এতে গৃহ-শিল্পে জাফ্‌রির কাজ অপলক দৃষ্টিতে দেখবার মত জিনিস! এই বিরাট সৌধের অপরূপ গঠন কৌশল সত্যিই মনকে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও অভিভূত করে তোলে। এটি পার হয়েই রাজস্থান বিধান পরিষদের বিশাল ভবনটি। সম্পূর্ণ আধুনিক বলে তার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ নেই। এর কাছ দিয়েই একটি বিশাল ফটক পার হয়ে পড়তে হয় রাজপ্রাসাদ সম্মুখবর্তী প্রশস্ত একটি চত্বরে। সোজাসুজি মুখোমুখি চারটি বিশাল ফটককে যুক্ত করেছে পিচের বাঁধানো রাস্তা, আর তাই ভাগ করেছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণটিকে গালিচার মত নরম সবুজ ঘাসে-

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীমনোজ বসু

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

২৫শে তারিখ বেলা ন'টার জন্য নির্দিষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ ব্যাস উদ্বোধন করলেন রাজস্থানী চারু ও শিল্প প্রদর্শনীর, একটি নাতিদীর্ঘ প্রাসঙ্গিক ভাষণে বেলা প্রায় দশটায়। জয়পুরের প্রাসাদ শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন ঘোষ ও তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত ঘোষের এবং অন্যান্য বাঙালী ও রাজপুত শিল্পীর অঙ্কিত নানা চিত্রের রেখা ও রঙে ফুটে উঠেছে রাজস্থানের সঙ্গে সুদূর বাংলার মানস চেতনার ঐক্য! রাজপুত শিল্পী ও কবি শ্রীরামগোপাল বিজয় বর্গীয়ের অনেকগুলি ছবিও প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ! অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুসহায়, শ্রীকুশল মুখার্জি, শ্রীমণি গাঙ্গুলী, শ্রী বি, সকসেনা প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। রাজস্থানী কোট, কাঙ্‌ড়া, বুন্দী, যোধপুরী অঙ্কনশৈলী রাজপুতানার প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনও প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল।

ঢাকা চতুষ্কোণ চারটি মাঠে। একদিকের ফটক পার হয়ে পড়তে হয় গোপালজীর মন্দিরের সামনের রাস্তায়, আর তাই দিয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয় মহারাজ জয়সিংহের 'যন্তর-মন্তর' নামক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা ও ছায়ার দ্বারা সময় নির্ণয়ের নানা যন্ত্রপাতি পূর্ণ উন্মুক্ত গবেষণাগারে! দিল্লী, উজ্জয়িনী ও বানারসেও জয়সিংহের এরূপ 'যন্তর-মন্তর' আছে; তাহলেও মনে হয় জয়পুরের 'যন্তর-মন্তর'ই সর্বশ্রেষ্ঠ! অপর বৃহৎ ফটক দিয়ে আধুনিক রাজপ্রাসাদে ঢুকতে হয়। সম্মেলন-উপলক্ষে বাঙালী ডেলিগেটরা যাতে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদটি ভাল করে দেখতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দিল্লী ও আগ্রা ফোর্টের অনুকরণেই জয়পুর মহারাজের 'দেওয়ানী খাস' ও 'দেওয়ানী আম' দর্শনযোগ্য দুটি স্থান। এখনো প্রতি বছরে কয়েকবার দরবারের জন্য ব্যবহৃত হয় ব'লে তাদের পারিপাট্য ও কারুকার্য অটুট আছে। দশহরা ও দেওয়ালী উপলক্ষে দুবার দরবার হয়,

ইতিহাস শাখার সভাপতি—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুতরাং মধ্যবর্তী ক'টি দিন দেওয়ালের সোনালী ও রূপালী কারুকার্য খোলা অবস্থায় ছিল বলেই আমরা ভাল করে দেখতে পেয়েছিলুম। দেওয়ালীর পরে তা' পুরু কাপড়ের আবরণে ঢেকে দেওয়া হবে। দেওয়ানী আমের মেঝেকে আগাগোড়া ঢাকবার জন্য জয়পুরেই প্রস্তুত যে গালিচাখানি গুটনো অবস্থায় আছে, এত প্রশস্ত কারুকার্যখচিত গালিচা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে অস্ত্রশালা আছে সেগুলি শুধু সাধারণ দর্শকের কাছেই নয়, ইতিহাসের গবেষণাকারীদের নিকটও অত্যন্ত মূল্যবান্।

প্রাসাদের একটি কক্ষে মহারাজ মানসিংহ হতে আরম্ভ করে অধস্তন চৌদ্দজন রাজার নিজ নিজ তরবারি খাপের মধ্যে রক্ষিত আছে। নূতন রাজকুমারের জন্মের পর নামকরণ-উৎসবের কালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ঐখানে। রাজপুত্র যে পরলোকগত মহারাজের তরবারি প্রথমে স্পর্শ করে, তার নামানুসারেই রাজপুত্রের নামকরণ হয়। বর্তমান মহারাজ নাকি এম্নিভাবে সুবিখ্যাত অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহের তলোয়ার স্পর্শ করেছিলেন, সেজন্যই তারও নাম মহারাজ মানসিংহ।

প্রাসাদের একাংশে মহারাজের প্রথমা মহিষী যোধপুর-তনয়া বাস করেন। তিনি প্রাসাদে থাকলে, প্রাসাদের দরজা জানালাগুলি সবকটিকেই বন্ধ করে রাখা হয়। রাজপ্রাসাদের পশ্চাতস্থ অতি প্রশস্ত নয়নমুগ্ধকর বাগানে প্রাসাদের সোজাসুজি সুপ্রসিদ্ধ ৺গোবিন্দজীর মন্দিরটি অবস্থিত—যাতে বাগানটি পার হয়েই রাজঅন্তঃপুরবর্তিনীরা ইচ্ছামত মন্দিরে পুজো দিতে পারেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে আয়নাগুলি নাকি এমনভাবে বসানো আছে, যাতে প্রাসাদে থেকেও রাণী ও সহচরীরা আরতির সময়ে রাধা-গোবিন্দের সম্পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। এই রাধা গোবিন্দই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনের আসল বিগ্রহ। ঔরংজেবের নিষ্ঠুর নিগ্রহের হাত হতে বিগ্রহকে বাঁচাবার জন্য মির্জারাজা জয়সিংহ তাঁকে অম্বরে এনে কাম্যবনে স্থাপন করেন পরে মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ তাঁকে এনে নিজের নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের সম্মুখের বর্তমান মন্দিরে স্থাপন করেন। একই ভাবে বৃন্দাবনের গোপীনাথজী ও মদন-মোহনজীর মন্দিরও জয়পুরে স্থাপিত হয়। মদনমোহনের আসল বিগ্রহটি আর এখন জয়পুরে নেই! করৌলীর মহারাজা জয়পুরের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে বিশিষ্ট যৌতুকরূপে মদনমোহনকে বাঙালী সেবায়েৎসহ করৌলীতে নিয়ে যান--এখনও তিনিই করৌলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! জয়পুর যাত্রায় আমার পত্নীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই গোবিন্দজী! বলাবাহুল্য শুধু একবার নয়, প্রতিদিন অর্থাৎ যেকদিন আমরা জয়পুরে ছিলুম, তিনি মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে তারিখ গোবিন্দের অন্ন-প্রসাদও পেয়ে গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলে উঠলেন "গোবিন্দজীর দর্শন ও প্রসাদ পেয়ে শুধু আমিই ধন্য হই নি, গোবিন্দজীও নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত হয়েছেন!"

প্রাসাদ সম্মুখস্থ বিশাল চত্বরের চতুর্থ ফটক পার হয়ে আবার আমরা চত্বরের চারিদিকে অবস্থিত দপ্তরখানার নানা বিভাগ পার হয়ে পুনরায় জয়পুরের প্রসিদ্ধ ত্রিপোলীর বাজারে পড়লুম। একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে জয়পুরের বিখ্যাত যাদুঘরটি অবস্থিত। তার মধ্যে নানাদেশের কার্পেট, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি সত্যি সত্যি দেখবার মত, কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুবই কম ছিল বলে, যাদুঘরের সকল কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের দেখবার সুযোগ হয়নি। যাদুঘরের কাছেই একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে! লক্ষ্ণৌয়ের চিড়িয়াখানার অনুকরণে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় তাতে পশুপাখীদের বসিবার ব্যবস্থা আছে। জন্তু-জানোয়ারগুলি হৃষ্টপুষ্ট এবং মোটেই ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য লালায়িত ব'লে মনে হলো না। বাঘিনীরা দিব্যি আরামে রেলগাড়ীতে উপরের বাঙ্কে উঠে আমরা যেমন আরাম করি তেম্নি আরাম কচ্ছে, অথচ ঘরে মাংস ও হাড়ের ছড়াছড়ি, তার প্রতি দৃকপাতও নেই। চিড়িয়াখানায় একটি রাম-পাঁঠা

নাকি দিনে আধপো করে দুধ দেয় এবং দুটি উভলিঙ্গ হরিণও নাকি আছে। আমার মত হর্মোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পক্ষে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্দেহ নেই! মাংসের প্রতি বীতরাগিণী এবং 'আধুনিকাদের মত উপরের বাঙ্কে উঠতে অভ্যস্তা বাঘিনী, দুধ দেয় পুরুষ-ছাগল, পোষাকে-পরিচ্ছদে চেনা যায় না কী স্ত্রী কী পুরুষ এম্নি হরিণ—সুতরাং হাস্যরসিক দ্বিজুদা' তার উপযুক্ত সঙ্গিনী-পরিহাসপ্রিয়া বৌদি, অনুগামী বন্ধু চিন্ময়বাবু, আর দাদার উপযুক্ত লক্ষণ ভাইটি, সকলেই তখন রসিকতা-সাগরে ডুব দিয়েছি। শুধু 'কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা'র মত আমার সহধর্মিণী একান্তই নির্বাক শ্রোত্রীছিলেন।

মূল অধিবেশন প্রথমে আড়াইটায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা' আরম্ভ হ'ল সাড়ে তিনটায়। সুবৃহৎ মণ্ডপটি লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণেরও স্থান নেই বল্লেই চলে। পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের দ্বারা মূল অধিবেশন আরম্ভ হলো। এবারও

কবি সম্মেলনের উদ্বোধক—শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস (রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী)

প্রধান মন্ত্রী প্রায় তার সকাল বেলাকার ভাষণটিকে পরিবর্তিত রূপ দিয়ে সম্মেলনের মূল অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। তারপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ৺ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ, বাংলা-ভাষা ও বাঙালী জাতির ক্ষতির উল্লেখ করে জয়পুরে দুই শতাব্দীরও অধিককাল বাঙালীদের অবদান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে অধিবেশনে সমবেত ডেলিগেটদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন—কতকটা থমকে থমকে, লেখা অভিভাষণটি পাঠ করে। অতঃপর অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ কবিজনোচিত কণ্ঠে পাঠ করলেন তাঁর অভিভাষণটি, তাতে বাংলার, বাংলার সাহিত্যে রাজস্থানের বীরত্ব-গাথা, জয়পুরের পরিকল্পনা ও গঠনে বাঙালীর বিশিষ্ট অংশ, সম্মেলনের সভ্যদের উদয়পুরে সাদর আমন্ত্রণের জন্য মহারাণাকে ধন্যবাদ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকাল-প্রয়াণে শোকোচ্ছ্বাস, ফরাসী চরিত্রের সঙ্গে বাঙালীর চরিত্রের তুলনা, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে বর্তমান বাঙলার ধূমায়িত অসন্তোষের সাদৃশ্য, একদা রত্নপ্রসূ বাংলার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে। তাই পথ দেখিয়ে তিনি বলছেন "এই দুর্যোগের চিত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমরা চাই শুধু জীবনের দর্শন······এ সাহিত্য সম্মেলনে জীবন সমস্যার সমাধানের শুরু হোক। সাহিত্য দিক আমাদের নূতন প্রাণ, নবীনতর প্রেরণা। ······তারি আশায় আমরা আজ ভারতের পশ্চিমতর প্রদেশে সমবেত হয়ে পূর্ব তোরণে আলোর জন্য তাকিয়ে আছি। থাকুক জীবনে শত ব্যথ্যা-ব্যর্থতা-পরাজয়! সব ছাপিয়ে সব কিছুর উর্দ্ধে বিরাজ করছে জীবন মন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠ বাঙালীর অমৃত পিপাসা।"

সভাপতিত্বের ফাঁকে ফাঁকে শ্রীযুক্ত দাশ অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হতে, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে নানা ঘোষণা কচ্ছিলেন। উদয়পুরের মহারাণার সম্মেলনের ডেলিগেটদের জন্য শ্রীযুক্ত দাশের নিকট লিখিত আমন্ত্রণ লিপি

রাজস্থানী সাহিত্য শাখার সভাপতি—ডাঃ মথুরালাল শর্মা

পড়া হলে, শ্রীযুক্ত দাশ ঘোষণা করলেন যে যাঁরা উদয়পুরের আতিথ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিবেশনের অফিসে তাদের নাম লিখিয়ে আসেন। এভাবেই প্রথম দিনের অধিবেশনের পরি-সমাপ্তি ঘটলো। কথাছিল রাত্রিতে কুমারী অরুন্ধতী গুহ সদলবলে নৃত্যগীতে সকলকে আপ্যায়িত করবেন, কিন্তু কোন কারণে তিনি উপস্থিত হ'তে না পারায়, শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব ঘোষ প্রথমে দুখানি গান করলেন, গুজরাটি মেয়েরা গরবা নৃত্যে সকলের মনোরঞ্জন করলে, কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছিল রাজপুতানার নিজস্ব লোক নৃত্যে পুরুষ-বেশধারী অপর একটি মেয়ের সঙ্গে ব্রীড়ানম্রা অবগুণ্ঠনবতী একটি রাজপুত বালিকার সাবলীলা নৃত্য! আর সকলকে আনন্দ দিয়েছিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' পর্বে পরিহাসরসিক ও সুকণ্ঠ দ্বিজুদা'র ক্যারিকেচার ও গান।

২৬শে তারিখ সকালবেলা অভ্যাস মত দেরীতে প্রায় দশটায় আরম্ভ হল শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর সভাপতিত্বে সাহিত্যশাখার অধিবেশন। উদয়-

পুরের সুপ্রসিদ্ধ চন্দাবৎ বংশীয়া রাণী লক্ষ্মী কুমারীর দ্বারা উদ্বোধন সেদিনের অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ! পিতার মুখে অসাধারণ একটি পরিহাসের জন্য মেবারের সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন যে যুবরাজ চণ্ড, সেই শিশোদীয় কুলগৌরব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দাবৎ বংশের রাজকুমারীর প্রকাশ্য সভায় যোগ দিয়ে তার উদ্বোধন করা এককালে স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল। রাজপুত জাতির বাঙালীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতির বলেই তা সম্ভবপর হয়েছিল। সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে চন্দাবৎ-রাণী লক্ষ্মী কুমারী নিজের জাতীয় মনোরম পোষাকে সজ্জিতা হয়েই সভায় এসেছিলেন এবং নারীসুলভ কমনীয়তার সঙ্গে রাজপুত নারীর স্বাভাবিক দৃপ্তভাব তাঁর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠেছিল !

তার পর আরম্ভ হ'ল সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ভাষণ ! প্রথমে একটু জড়িত কণ্ঠ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা ও দার্ঢ্য ফিরে এল ! ভাষণের ভাব, ভঙ্গিমা,

শিল্পকলা শাখার সভাপতি—পণ্ডিত রবিশংকর

ভাষায় সর্বত্র এমন একটি সুষ্ঠু বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছিল যা আজকালকার বহু সাহিত্যিকের মেয়েলী ছাঁদে লেখার মধ্যে কখনও আশা করতে পারা যায় না। তাতে শুধু ভাববার নয়, বোঝবার এবং করবারও অনেক কিছুর নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। "মাতৃভাষা মায়ের মতই প্রিয়। তার উপরে আক্রমণ নাই যদি বলি—অবহেলা অন্তরে কঠিন আঘাত হানে। যেমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে তেমনি ভাষার ব্যাপারেও নিরাপত্তা চাই রাষ্ট্রকর্তাদের কাছে।...বহু ভাষা থাকা সত্ত্বেও এতে ভেদ বাড়বে না, প্রতিটি পর্ব রূপে গন্ধে প্রস্ফুট হয়ে দেশ আত্মা একটি শতদল হয়ে ফুটবে।" মনোজবাবুর ভাব ও ভাষার মধ্যে কোন জড়তা নাই, বরং সাহিত্য ও প্রত্যেক মানুষের প্রতি যে দরদী মমত্ববোধ আছে, তাই আজ তাঁকে স্থান দিয়েছে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পুরোভাগে, তাঁরই কথায় "সাহিত্য তাই একাধারে জীবনের ভাষ্যকার ও পথিকৃৎ।"

মনোজবাবুর ভাষণ শেষ হতে না হতেই ডাক পড়লো যে "রথ প্রস্তুত, সারথি দাঁড়ায়ে দ্বারে," অম্বরে যেতে হবে। মহারাজ মানসিংহের রাজধানী ও অম্বরের প্রাসাদ আজ জনমানবহীন, কেবল দর্শকদের আকর্ষণ করে মাত্র। সু-উচ্চ পাহাড়ের উপর অম্বরের প্রসিদ্ধ দুর্গ এবং তার মধ্যে শিলাদেবী বা যশোরেশ্বরীর মন্দির, মীরাবাইর মন্দির এবং মহারাজ মানসিংহের বিরাট প্রসাদ অতীতের সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার বারো ভুঁইয়ার আক্রমণে পর্যুদস্ত ও রণক্লান্ত মানসিংহকে নাকি দেবী স্বপ্ন দিয়েছিলেন যে তাঁকে পুজো করলে তার পক্ষে বঙ্গবিজয় সম্ভবপর হবে। তাই শিরোধার্য করে তিনি দেবীকে পুজোয় সন্তুষ্ট করেন এবং রণজয়ের পর প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রীর সঙ্গে কেদার রায়ের কন্যাকে পত্নীরূপে এবং দেবী যশোরেশ্বরীকে আরাধ্যা দেবীরূপে নিয়ে এসে অম্বর প্রাসাদের সম্মুখে মর্মর নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেন। মনোজবাবুর ভাষায় বলতে হয় "তা আছেন চমৎকার। পাহাড়ের উপর অপরূপ মন্দির, সোনা আর মণিমাণিক্য দেবীর গায়ে ধরে না। ভোগের অতি

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম এল-এ (রাজস্থান)

উত্তম ব্যবস্থা। পুরুত সেবাইত মশায়দের চেহারা দেখে হিংসা হয়।" সম্প্রতি দেবীর মন্দিরের মার্বেল নির্মিত চৌকাটের উপর আর একজন বাঙালী রাণী গায়ত্রী দেবীর আদেশে মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে ফলভারাবনত দুটি কলাগাছের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মীরাবাইর মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পুরোভাগে মীরার নিজস্ব নন্দলালের মূর্তি। মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সঙ্গে এ বিগ্রহটিকেও অম্বরে নিয়ে আসা হয়।

অম্বর প্রাসাদে অসংখ্য নানা কারুকার্যখচিত হল ও কামরাগুলির মধ্যে দোতলায় মহারাজ মানসিংহের নিজস্ব বাসের কামরাগুলি এবং তেতলায় প্রধান মহিষীর কামরাগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দৈনন্দিন পূজার স্থান, তুলসীমঞ্চ, এমন কি ভোজন-কক্ষের দেওয়ালে সপ্ততীর্থের ছবি পর্যন্ত এখনও অবিকৃত আছে। শীশমহলটি একটি

"চেষ্টা ক'রে দেখুন...
লাক্স টয়লেট্ সাবান মেখে
...আপনি আরও সুন্দর
হ'তে পারেন।"
রেহানা বলেন।
"এ এক সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব সহায়," রেহানা বলেন, "লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সরের মত ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে, লাক্স্ টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বকের এক নতুন সৌন্দর্য্য এনে দেবে।"
LUX
TOILET SOAP
যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ
লাক্স টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 388-X52 BG

বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। দেওয়ালে, ছাদে অসংখ্য উত্তল কাচ এমন ভাবে বসানো আছে যাতে ভিতরের যা কিছু, এমন কি নিজের মুখকে পর্যন্ত অসংখ্যবার প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। রাজা মানসিংহের নাকি বারোজন রাণী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি করে মহল ছিল। সেগুলি দেখে মনে হয় "রাজারাজ্ড়ার কাণ্ড" বটে !

দুপুরবেলা আমাদের আবাসিক হোষ্টেলে ফিরে এসে হঠাৎ মনে হল যেন কী একটা কি ঘটেছে ! যে শান্ত সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে অধিবেশন এগিয়ে চলেছিল তা যেন আর নেই ! চারিদিকে ফিস্‌ফাস্—গম্ভীর মুখ ও চাপা অসন্তোষ ! দেহে ছিল ক্লান্তি আর জঠরে হুতাশন, সুতরাং কোনরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্য শয্যায় শুয়ে পড়লুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না—সাড়ে তিনটায় ঘুম-জড়িত চোখে যখন নীচে নামলুম তখন ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাষণ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত মজুমদার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সুতরাং তাঁর অভিভাষণে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে আমাদের চোখের সামনেই রাজনীতিকদের সুবিধের জন্য যে ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে প্রতিদিন—তাতে পুরাতন ইতিহাসের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ! সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাজ—অন্য কোন স্বার্থগন্ধলেশহীন নির্ভেজাল ও খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা ! তাঁর মতে রাজনৈতিক কারণে অপদার্থ সিরাজদ্দৌলাকে আদর্শ স্থানে বসিয়ে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের মনগড়া মিলনদৃশ্যকে বাস্তব বলে না চালালে হয়ত বাংলাদেশের বুকে এ ভাবে অতর্কিতে দেশভাগ-জনিত বিপর্যয় এসে পড়তো না। ভাষণের পরে অনেকেই নানা প্রশ্ন করলেন এবং মজুমদার মশাইও অতি প্রাঞ্জল-ভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে সকল প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিলেন !

এইদিনই জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডক্টর এম এল শর্মার সভাপতিত্বে রাজস্থানী সাহিত্য ও কৃষ্টি শাখার অধিবেশন আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রাজস্থান সরকারের রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীকিষণপুরী এর উদ্বোধন করেন। ডক্টর মথুরালালশর্মা অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হিন্দীতে বাংলাদেশ, বাঙালীজাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন "সূর্যোদয়ের দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ভারতের চেতনাবোধ ও নবজাগরণের দেশ। বাংলা দেশেই প্রথম হিন্দী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় এবং ৺রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।......মহারাজ মানসিংহ বাঙালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরই গর্ভজাত পুত্র যে বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন রাজস্থানের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।......রাজস্থানের ইতিহাসে বাঙালীর অবদান অতুলনীয়।"

এই অধিবেশনের আর একটি বৈশিষ্ট্য দূরাগত ও স্থানীয় কবিদের একত্র সম্মেলন। বাংলা ও হিন্দী-ভাষাভাষী কবি ও রাজস্থানী চারণ কবির একত্র সমাবেশ সত্যসত্যিই অতুলনীয় এবং অভূতপূর্ব ! এই কবিত্ব-মদিরা প্রভাবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাস পর্যন্ত যে ভাবে শুধু কবিতাই আওড়ালেন এবং গলা ছেড়ে গান ধরলেন, তাতে তাঁর পণ্ডিত নেহেরু, রাজাগোপাল আচারি, বিধানচন্দ্র রায়, কিংবা গোবিন্দবল্লভ পন্থের রাজনীতির মুখোসপরা মুখের সঙ্গে তুলনা করা চলে না ! শ্রীযুক্ত দাশ পরে আমাদের বলেছিলেন 'যে অনুরোধ করলে হয়ত আনন্দের আতিশয্যে তিনি নাচতেই আরম্ভ করতেন—এম্নি আমোদ-প্রিয় সকলের প্রিয় নেতা তিনি।'

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের পৌরোহিত্যে চারু শিল্পকলা ও সঙ্গীত শাখার অধিবেশন হলো। তাঁর ভাষণের চেয়ে তাঁর সঙ্গীতে ও সেতার বাজনাতেই অনেকে অধিক পরিতৃপ্ত হলেন। কিন্তু আমার সে সঙ্গীত-রস আস্বাদনে বার বার বিঘ্ন ঘটতে লাগলো—দলে দলে ডেলিগেটদের আমার কাছে গমনাগমনে ! শুনতে পেলুম দুপুরে নাকি শ্রীযুক্ত দাশ ঘোষণা করেছেন যে উদয়পুরের মহারাণা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—এ আমন্ত্রণ ডেলিগেটদের সকলের জন্য নয়। সুতরাং...অপমান...একটা কিছু করতেই হবে... ইত্যাদি, ইত্যাদি।" ব্যাপার গুরুতর দেখে উঠেই আসতে হলো, ডক্টর শ্রীকুমার ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে শ্রীযুক্ত দাশ ঐ রকম কিছু বলেছেন বটে, কিন্তু হয়ত ঐ ভাবে বলা তাঁর ইচ্ছে ছিল না—হঠাৎ বেরিয়ে গেছে !" এদিকে আবার বিপদ—এলাহাবাদের একটি ছেলের ১০৪° ডিগ্রী জ্বর, মনোজবাবুর ছেলেরও জ্বর, তাঁর স্ত্রীরও আমাশয়, আমার দুখানি ঘর পরেই একজন ভদ্রলোক ৭।৮ বার পাইখানা করে কী রকম হয়ে পড়েছেন, পুরুলিয়ার এক ভদ্রমহিলার ৫।৬ রাত্রি ঘুম নেই ইত্যাদি ইত্যাদি ! সুতরাং প্রতিবিধানের আশ্বাস দিয়ে ডাক্তারের প্রাথমিক কার্য সেবা কার্যে এ ঘর হতে ও ঘরে ছুটাছুটি করতে করতে রোগীদের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কিংকর্তব্য তাই পরামর্শ করে বেড়াতে লাগলুম। ওদিকে শ্রীযুক্ত দাশের কন্যাটি অতি চমৎকার নাচ দেখাচ্ছে—যেতে যেতে এক ঝলক দেখে গেলুম, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও বসে দেখার উপায় নেই ! এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত কিরণ সিংহ বল্লেন—বিষয় নির্বাচনী সভায় রাত্রিতে শ্রীযুক্ত দাশকে জিজ্ঞেস করতে হবে—অধিবেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে তাঁর দুরকম ঘোষণার কারণ কি ?

রাত্রিতে প্রায় সাড়ে এগারোটায় বিষয় নির্বাচনী কমিটি বসলো ! কোলকাতার এবং অন্যান্য স্থানের ডেলিগেটরা আমাকে মুখপাত্ররূপে এগিয়ে দিলেন, কিন্তু দেবেশবাবু সেখানে অনুপস্থিত—এবং তাঁর পরিবর্তে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ভূপেন কর মশাই সভাপতিত্ব করলেন। অন্যান্য বিষয় নির্বাচনের পর স্থির হলো যে তিনি ও আমি পরদিন শ্রীযুক্ত দাশ এলেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া কোরব ! রাত প্রায় দুটোয় এ বিতর্কসভা ভাঙ্‌লো !

পরদিন অর্থাৎ ২৭শে সকাল বেলা আমি শ্রীযুক্তা বসুকে দেখতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেবেশবাবু এলেন। ভূপেশবাবু ও আমি একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বল্লুম। ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে তিনি বুঝতেই পারেননি আগে, এ বিষয় খোলাখুলি সমাধান না হলে কোন ডেলিগেটই উদয়পুরে যাবেন জেনে তিনি চিন্তিতভাবে আমাদের পরামর্শক্রমে যাতে কারো মনে শঙ্কা বা সন্দেহ না থাকে সে ভাবেই ঘোষণা করবেন বল্লেন। যাক্ কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভারতবর্ষের গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি

সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর পূর্বে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ-সেবার যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বহুকাল যাবৎ যোগ্যতার সহিত "ভারতবর্ষে"র সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ সেই মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা এই ভারতবর্ষেই লেখনী ধরিয়া সুদীর্ঘকালব্যাপী দেশবাসীকে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশের গৌরব অর্জন করিয়াছে। প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকগণের উপন্যাস ও গল্পে এবং বিখ্যাত প্রবন্ধকারগণের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-সম্ভারে ভারতবর্ষ আজও নির্ভীক ও অকুণ্ঠভাবে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে।

এই সেবার পথে গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে বহু অসুবিধা ও আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়িয়াও আমরা সমপর্যায়ের অন্যান্য পত্রিকাগুলির ন্যায় ভারতবর্ষের মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। কলেবর বর্ধনও তেমন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক ভারতবর্ষের কলেবরবৃদ্ধির জন্য বারংবার অনুরোধ করায় আমরা আগামী পৌষ সংখ্যা হইতে ভারতবর্ষের কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌষ্ঠব এবং উৎকর্ষও বর্ধিত হইবে। আগামী পৌষ হইতে ভারতবর্ষ প্রতি সংখ্যা এক টাকা, ষাণ্মাসিক ছয় টাকা এবং বাৎসরিক বার টাকা হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, ডাক বিভাগের নিয়মানুসারে তাঁহাদের অনুমতিপত্র ব্যতীত ভি, পি, পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতবর্ষ পাঠাইবার নির্দেশপত্র পাইলেই আমরা কাগজ পাঠাইব। তবে ভি-পি-তে কাগজ লওয়া অপেক্ষা মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা।

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও এজেন্টগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্তভাবে কামনা করিতেছি।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

—দশ—

"Os senhores estão em sua casa—"

আবার ডাক পড়েছে সুলতান খোদাবক্স খাঁর দরবারে।

কিন্তু এ ডাকের অর্থ এবারে আর দুর্বোধ্য নয়। আহত সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভয়েই কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। যা হবে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। ধূর্ত সুলতান এখন খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে আছেন। পালানোর ব্যর্থ চেষ্টার পরে এখন একটি মাত্র পরিণামই সম্ভব। এইবার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। হয় বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হবে, নয় তলোয়ারের মুখে মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, আর নতুবা মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে খাওয়ানো হবে কুকুর দিয়ে। আরো কত নিষ্ঠুরতা আছে কে জানে! মুরদের অসাধ্য কোনো কাজই নেই।

ডি-মেলো একবার তাকিয়ে দেখলেন সঙ্গীদের দিকে। সবাই বুঝেছে, তাঁর মতোই সকলে অনুমান করে নিয়েছে নিজেদের পরিণতি। কিন্তু কেউ কি ভয় পেয়েছে? মৃত্যুর আশঙ্কায় কি বিবর্ণ হয়ে গেছে কোনো কাপুরুষ? ডি-মেলো জ্বলন্ত চোখে যেন সকলকে পরীক্ষা করে দেখলেন একবার। না—কারো মুখেই আতঙ্কের ছায়া নেই কোনোখানে। পর্তুগালের বীর সন্তান সব। মৃত্যুবিজয়ী শক্তি। সাত-সমুদ্র জয় করেছে—লড়াই করেছে সব বাধা— সব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। বীরের মতো মরবার জন্যেই সকলে প্রস্তুত।

কিন্তু মুরদের এ আনন্দ বেশি দিন থাকবে না। আছে দুর্জয় পর্তুগীজের দল—আছে দুরন্ত নৌবহর—আছে ভয়ঙ্কর কামান—আছেন দুর্ধর্ষ নুনো-ডি-কুন্হা। এরও বিচার হবে। আল্মীডার নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হবে—কালিকটের মতোই কামানের গোলায় এই মুরদের হাত-পা-মাথা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে দিকে দিকে।

ডি-মেলো দাঁতে দাঁতে ঘষলেন একবার।

কিন্তু গঞ্জালো? কোথায় সে? মুরদের হাতে পড়লে তিনি জানতে পারতেন। যেখানেই হোক—সে অন্তত নিরাপদে থাকুক। হয়তো কোয়েল হো আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলস তাকে জাহাজে করে তুলে নিয়ে গেছে। সেইটেই সম্ভব। নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন ডি-মেলো।

শিকলে বাঁধা বন্দীরা সার দিয়ে দাঁড়ালেন সুলতানের দরবারে। সেই হিংস্র গম্ভীর পরিবেশ। সেই চারদিকে বিদ্বিষ্ট ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আঘাত।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বললেন। উঠে দাঁড়াল দো-ভাষী। কী বললে আগেই অনুমান করে ক্ষিপ্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো।

—এর প্রতিশোধ একদিন পেতে হবে সুলতানকে।

সেই আকস্মিক চিৎকারে সমস্ত দরবারটা যেন গম্ গম্ করে উঠল। নিজের আসনে পরম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ। মুর সেনাপতি—সেই বিশ্বাসঘাতক—কোমর থেকে টেনে বের করলে তার তলোয়ার। মুর সৈনিকদের হাত চলে গেল কোমরবন্ধে। একটা তীক্ষ্ণ চঞ্চলতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল সমস্ত দরবারের ওপর দিয়ে।

এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে, তারপর হেসে উঠল দো-ভাষী।

—সুলতানের আদেশে খ্রীষ্টান ক্যাপিটান সসৈন্যে

মুক্তিলাভ করলেন। তাঁর যে-জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—তাও সরকার থেকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

কথাটা বজ্রপাতের মতো শোনালো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না ডি-মেলো। পর্তুগীজেরা বিহ্বল-বিভ্রান্তভাবে তাকালো এ ওর মুখের দিকে।

বিস্ময়ের চমকটা সামলে নিয়ে ডি-মেলো বললেন, একি ব্যঙ্গ?

—না ব্যঙ্গ নয়। সুলতান সসৈন্যে ক্যাপিটানকে মুক্তি দিচ্ছেন।

সেই মুর সেনাপতির উদ্দেশ্যে দো-ভাষী আদেশ উচ্চারণ করলে একটা। কিছুক্ষণ সেনাপতিও যেন হতবাক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বন্দীদের হাতের শিকল খুলে দিতে লাগল সৈনিকরা।

তবুও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এ কেমন করে সম্ভব? এ কি মা মেরীর অনুগ্রহ? না—মুরদের আবার কোনো চক্রান্ত? মুক্তি দেবার ভাণ করে একটা নিষ্ঠুর কৌতুক?

দো-ভাষী আবার বললে, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে সুলতান অত্যন্ত দুঃখিত। যাদের প্রাণ গেছে, তাদের জন্যেও তিনি বেদনা বোধ করছেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর জন্যে সুলতানের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা অধৈর্য হয়ে কারাগার ভেঙে পালাতে চেয়েছিল বলেই তাদের এ শাস্তি পেতে হয়েছে। তা ছাড়া সুলতানের দুজন সিপাহীকেও তারা হত্যা করেছে। যাই হোক—অতীতের কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভালো। পর্তুগীজ ক্যাপিটান এখন সুলতানের বন্ধু।

বন্ধু! ডি-মেলোর বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। এই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না তিনি—দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

দরবারের মধ্য থেকে একটি নতুন মানুষ এগিয়ে এল ডি-মেলোর দিকে।

মধ্য বয়েসী একজন পারসী বণিক। গায়ে মূল্যবান পোশাক—মাথায় জরির কাজ করা টুপি। মুখে প্রসন্ন হাসি।

—আদাব ক্যাপিটান।

—কে আপনি?

—আমি খাজা সাহেব-উদ্দিন।

—কী প্রয়োজন?

ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সাহেব-উদ্দিন বললেন, এই বন্দরে আমার জাহাজ আছে। সেখানে আপনাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত খাজা সাহেব-উদ্দিনকে বিশ্লেষণী চোখে লক্ষ্য করলেন ডি-মেলো। তারপরেই বন্ধুত্বের দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিলেন সাহেব-উদ্দিনের দিকে।

দামী কার্পেট, ইরাণী মদ, প্রচুর ফলমূল, রাশি রাশি মাংসের খাবার। জাহাজ নয়—যেন নবাবী মহল। সাহেব-উদ্দিন আর এক গ্লাস মদ তুলে দিলেন ডি-মেলোর হাতে।

বললেন, মাননীয় নুনো-ডি-কুন্হা আমার হাতেই ক্যাপিটানের তিন হাজার 'ক্রুজাডো' মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

ডি-মেলো শুনে যেতে লাগলেন।

—পর্তুগীজ ক্যাপিটান ভ্যাজ-পেরিরা আমার দুখানি জাহাজ আটক করেন। তার কারণ, আমার জাহাজ দুখানা দেখতে অনেকটা পর্তুগীজ জাহাজের মত ছিল। ভ্যাজ-পেরিরার সন্দেহ হল, ওই জাহাজ নিয়ে আমি সমুদ্রে ডাকাতি করি আর অপবাদ যায় পর্তুগীজদের ওপর। আল্লার দোহাই, ওসব কোনো মতলব আমার ছিলনা। পর্তুগীজ জাহাজের ধরণ ভালো দেখে আমি ইচ্ছে করেই ও ভাবে আমার জাহাজও তৈরী করিয়েছিলাম।

ডি-মেলো এবং সাহেব-উদ্দিন এক সঙ্গেই চুমুক দিলেন ইরাণী মদের পাত্রে।

সাহেব-উদ্দিন বলে চললেন, পেরিরা মালপত্রশুদ্ধ আমার জাহাজ আটক করলেন—তারপর পাঠিয়ে দিলেন গোয়াতে। নিরুপায় হয়ে আমিও গোয়াতে গেলাম। সেখানে পরিচয় হল মহামান্য নুনো-ডি-কুন্হার সঙ্গে। দোস্তী হতেও দেরী হল না। ডি-কুন্হা চাকারিয়া আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, যে বাংলা দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে তিনি এত ব্যস্ত—সেখানে যুদ্ধ করে লাভ হবে না, বন্ধুত্ব করে কাজ আদায় করতে হবে।

ডি-মেলো উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

—অনেক আলোচনা হল এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ডি-কুন্হা যদি আমার জাহাজ দুখানা ছেড়ে দেন,

আমি ক্যাপিটান ডি-মেলোর মুক্তির ব্যবস্থা করব। তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তা সম্ভব হয়েছে।

মদের গ্লাস নামিয়ে ডি-মেলো সাহেব-উদ্দিনের হাত চেপে ধরলেন।

—এখানে এসে শুধু পেয়েছি বিশ্বাসঘাতকতা আর শত্রুতা। বন্ধু বলতে কেউ ছিলনা। স্বয়ং জননী মেরী আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—সে তো বটেই—সে তো বটেই!—বিচক্ষণ খাজা সাহেব-উদ্দিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আল্লার দোয়া না থাকলে কিছুই হয় না। আমি আপনাকে বলছি ক্যাপিটান—যদি আমাকেও আপনারা সাহায্য করেন, তা হলে চট্টগ্রামে পর্তুগীজ কেল্লা বসাবার ফরমান আমি জোগাড় করে দেবই।

ডি-মেলো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমাদের দিক থেকে সাহায্যের কোনো ত্রুটিই হবে না। বলুন—কী করতে হবে।

—গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে আমার বিরোধ চলছে। তার একটা মীমাংসা না হলে আমার পক্ষে এ দেশে বাস করা অসম্ভব।

—আমরা যথাসম্ভব করব।

সাহেব-উদ্দিন হাসলেন: পর্তুগীজদের কাছে যে উপকার পাব—তার ঋণ শোধ করতে আমারও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আসুন—আল্লার নামে আর একবার আমাদের চুক্তি পাকা করে নেওয়া যাক। আবার দুপাত্র ইরাণী মদ ঢাললেন সাহেব-উদ্দিন, গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি রচনা করলেন, তারপর চুমুক দিলেন দুজনে। সেইখানেই তা থামল না। বোতলের পর বোতল ইরাণী মদ শূন্য হয়ে চলল।

নেশায় রক্তিম চোখ মেলে সাহেব-উদ্দিন বললেন, ক্যাপিটান—নাচ চলবে?

—নাচ?

—হাঁ, খাঁটি ইরাণী নর্তকীর নাচ। এমন নাচ কখনো দেখোনি তুমি।

—তোমাদের জাহাজে এসবও থাকে নাকি?

নেশার উচ্ছলতায় সাহেব-উদ্দিন হেসে উঠলেন: থাকে বইকি। আমাদের ব্যাপার তোমাদের মতো শুকনো নয়। তোমরা শুধু যুদ্ধ আর ব্যবসা করো—একটু রঙ্ নইলে আমাদের চলেনা। দাঁড়াও—আনাচ্ছি নর্তকীদের—

সাহেব-উদ্দিন হাততালি দিয়ে অনুচরদের ডাকলেন।

এল বাজনা—এল নর্তকী। শুরু হল উন্মত্ত উৎসব। নেশার জড়তার মধ্যে শুধু একটা ভাবনায় বার বার ডি-মেলোর মনের সুর কেটে যেতে লাগল: গঞ্জালো? গঞ্জালো কোথায় এখন?

* * *

শ্রেষ্ঠী রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন একবার।

—গুরুদেব, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—না বোঝবার মতো কোনো দুর্বোধ্য কথাই তোমাকে বলা হয়নি।—সোমদেব কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—কিন্তু প্রভু, এ আমি হতে দেবনা। না—কিছুতেই না।—রাজশেখরের সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ মনে হল।

—তুমি হতে দেবার কে?—তীব্র ভাবে সোমদেব বললেন, দেবী চামুণ্ডা যা চান তাই হবে।

—কিন্তু আমি শৈব।

—না শাক্ত।—সোমদেবের ভয়ঙ্কর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল—সাপের ফণার মতো দুলতে লাগল মাথার জটা: শিব আজ শব—তাঁকে দিয়ে আজ আর কোনো প্রয়োজনই নেই।

—আমি পারব না প্রভু! একে ছেলেমানুষ, তার ওপরে আমার আশ্রিত। তাকে—

—রাজশেখর!

সোমদেবের ভয়ঙ্কর গর্জনে মাঝ পথে থেমে গেলেন রাজশেখর।

—প্রভু!

—প্রভু নয়। দেবীর আদেশ পালন করবে কিনা জানতে চাই।

—পারব না।—মৃতের মতো ক্ষীণ গলায় রাজশেখর বললেন, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমার প্রশ্ন নেই। আজ ধর্মের জন্যেই এর প্রয়োজন। ও সব দুর্বলতা দূর করতে হবে তোমাকে।

—গুরুদেব!

—তোমার সঙ্গে আর তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই রাজশেখর। তুমি জানো, আমি যে সংকল্প করি, তার কখনো অন্যথা হয় না। এবারেও তা হবে না। যা বলেছি, তাই করো। কাল অমাবস্যা—কাল মধ্যরাত্রেই মায়ের পূজো। সব আয়োজন করে রাখো!

রাজশেখর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। যেন ডুবতে ডুবতে আঁকড়ে ধরলেন একটি তৃণখণ্ডকে।—প্রভু, একি না হলেই নয়?

—না—না—না!—আবার আকাশ ফাটানো চিৎকার করে উঠলেন সোমদেব: বলেছি তো, এ তোমার আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। এ দেবীর আদেশ।

রাজশেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার ভেতরে সব যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে—চোখের সামনে শুধু একরাশ ধোঁয়া যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ক্রমশঃ

অভিবাদন—

মহাপূজার অন্তে ভারতবর্ষের সকল পাঠকপাঠিকা ও শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণকে আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাইতেছি, মাতৃশক্তির শুভস্পর্শে জাতি-জীবনের সকল অঙ্গে নূতন বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হউক—নূতন আশা ও আনন্দ বুকে লইয়া স্বাধীন দেশ সংগঠন ও কল্যাণের সাধনায় আরও অগ্রসর হউক—ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। পূজা-কালীন সংবাদসমূহ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমরা পূজার উৎসবে আধ্যাত্ম মর্ম ভুলিয়া, এমন অতি-রাজসিক বাহ্য প্রমত্ততায় পড়িয়াছি, যাহা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। এই উচ্ছৃঙ্খলতা শুধু যে আজ পূজার উৎসব ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ তাহা নহে, কারণ ইতিপূর্বে আমরা চায়ের দোকান, ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-সম্মিলনে, ট্রামে, বাসে সর্বত্র কারণে-অকারণে বোমা ও পটকার আবির্ভাবে দেখিয়াছি। জাতির এই শোচনীয় মনোগতি কোথা হইতে কোথায় আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। তরুণ মনের উচ্ছৃঙ্খল মতি-গতির সুচিকিৎসা-ব্যবস্থা আশু চিন্তনীয় ও করণীয়।

পুনর্বসতি দান—

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ পরিবারগুলি ক্যাম্পে অর্থাৎ অস্থায়ী অবস্থায় বাস করিতেছিল—

কৃষিজীবী—	৯৭৮৩ পরিবার
বারুজীবী—	৫৫৯ ”
মৎস্যজীবী—	১৮১ ”
অন্যান্য—	৫৫৮৭ ”
মোট—	১৬১১৫ পরিবার
অর্থাৎ	৬০৭০২ জন লোক

যে ভাবে জমী সংগৃহীত হইতেছে, সেই ভাবেই ঐ সকল পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। আশা হয়, ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ পরিবারগুলিকে পুনর্বসতি প্রদান করা যাইবে—(১) কৃষিজীবী ৪ হাজার পরিবার (২) বারুজীবী—২০০ পরিবার (৩) মৎস্যজীবী—১৮১ পরিবার ও (৪) অন্যান্য ২০০০ পরিবার। মোট ৬৩৮১ পরিবার। বাকী থাকিবে ৯৭৩৪ পরিবার—তাহাদের ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে পুনর্বাসন প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। মোট ২০৭৯৯টি পরিবার জোর করিয়া বা বেআইনিভাবে দখল-করা জমীতে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ৫৫৯৪টি পরিবার যে জমীতে বাস করে, সরকার সে জমী গ্রহণ ও ক্রয় করিয়া ঐ সকল পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন—তাহাদের মধ্যে ২ হাজার পরিবারকে ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই জমী দেওয়া সম্ভব হইবে। ৭০৬৭টি পরিবার যে জমীতে বাস করে তাহাদের কতক জমীগ্রহণ ও ক্রয় করা সম্ভব হইবে, কতক হইবে না। আর ৮১৩৮টি পরিবার যে জমীতে বাস করে, সে সকল জমীগ্রহণ বা ক্রয় করা আদৌ সম্ভব হইবে না। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রথম শ্রেণীর ৩৫৯৪ পরিবার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০৬৭ পরিবার—মোট ৬৬৬১ পরিবারকে জমী দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু বাকী যে ১২১৩৮ পরিবার জমী পাইবে না তাহাদের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪ হাজার পরিবারের জন্য অন্যত্র জমী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—অর্থাৎ তাহাদের স্থানচ্যুত করা হইতে পারে। যে সকল পরিবার পরের বাড়ী জোর করিয়া দখল করিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সংখ্যাও ১০ হাজারের কম নহে। তন্মধ্যে ২ হাজার পরিবারকে ১৯৫৩-৫৫ সালে ও বাকী ৮ হাজারকে ১৯৫৪-৫৫ সালে অন্যত্র জমী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া ১০ হাজার পরিবার নিজ অর্থে জমী সংগ্রহ করিয়াছে—তাহাদের ১৯৫৩-৫৪ সালে গৃহ-নির্মাণ ঋণ দেওয়া হইবে ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ঐরূপ ২০হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হইতে পারে। সমস্যা এত বিরাট যে কিছুতেই ইহার সমাধান করা সম্ভব হইতেছে না। সেজন্য এখনও বহু সময় ও অর্থের প্রয়োজন হইবে।

সাহায্য দান—

গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য বিভাগ হইতে মোট ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৪ টাকা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন খাতে দান করা হইয়াছে। ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু ২৪পরগণা জেলায় মোট ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯ শত ৭৪ টাকা দেওয়া হইয়াছে—তাহা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে (১) বিনা সর্তে দান—৫০২৫০০ টাকা (২) কাজ করাইয়া পারিশ্রমিক দান—১১৪৪৫৮৫—যে অঞ্চলে খাদ্যাভাব হয়, সেখানকার কার্য্যক্ষম লোকদিগকে কাজ দিয়া সাহায্য করা হয়—কাজের অভাবে তাহারা কষ্ট পাইতেছিল (৩) কৃষি ঋণ—১০০৯৩৫০ টাকা (৪) শিল্পীদের দান—২৬৪৫০ টাকা (৫) শিল্পীদের ঋণ—৩৪১০০ (৬) গৃহ-নির্মাণ দান—৫৮৪০ টাকা (৭) অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্তদের দান—৭৫০ টাকা (৮) দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের দান—১১৪০০ টাকা। ঐরূপ দান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা, জলপাইগুড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, কুচবিহার, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাতেও দেওয়া হইয়াছে—যেখানে যেমন অভাব সেখানে সেইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কৃষি বিভাগ হইতে মোট ১৮৭৪০০ টাকা ও ২৩ হাজার টন সার দেওয়া হইয়াছে। ২৪পরগণা জেলা ফসল ঋণ বাবদ—১০২৪৭০০ টাকা, জমীর উন্নতির জন্য ঋণ—২০ হাজার টাকা, পশু কিনিবার ঋণ—৩৫০০০০ টাকা, বড় চাষীকে ঋণ—১০ হাজার টাকা এবং এমন সালফেট, সুপার ফসফেট ও মিশ্র সার—তিন রকম যথাক্রমে ১৭৫০ টন, ১০০ টন ও ১৫০ টন বিনামূল্যে পাইয়াছে। ধুতি, সাড়ী, কম্বল ও জামা বিতরণ করা হইয়াছে—জলপাইগুড়ী জেলায় ৪৪৫ খানি ধুতি, ৬২৫ খানা সাড়ী, ১২০ খানা কম্বল ও ৫ হাজার জামা বিতরণ করা হইয়াছে—গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর ৭ মাসে। সকল জেলাই কৃষি বিভাগের টাকা ও জামাকাপড় প্রভৃতি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারী সাহায্য বিভাগ গুঁড়া দুধ, ভিটামিন-ট্যাবলেট প্রভৃতিও বিতরণ করিয়াছেন। নানা কারণে দেশে যে খাদ্যাভাব হইয়াছিল, তাহা দূর করার জন্য সরকারী চেষ্টার অভাব ছিল না। তবে চাহিদার তুলনায় দান হয় ত অত্যন্ত কম। জাতি হিসাবে আমরা যাহাতে ভিখারী হইয়া না যাই, তাহা দেখাও সকলের কর্তব্য।

আগামী ২ বৎসরে রেলপ্রসার পরিকল্পনা—

ভারতীয় রেলের অর্থবিভাগীর উপদেষ্টা শ্রীপি-সি ভট্টাচার্য্য গত ২রা নভেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন যে রেলের উন্নতি বিধানের জন্য আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ১০০ কোটি টাকার কর্ম্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ বৎসরে বিদেশ হইতে ৭৫০ খানা এঞ্জিন আমদানী করা হইবে—ইতিমধ্যে জাপান, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীকে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৪ শত এঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২ বৎসরে যাত্রী ও মালবাহী গাড়ীর সংখ্যাও বাড়ান হইবে। মোট প্রায় ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার যাত্রী ও মালবাহী গাড়ী বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে। চিত্তরঞ্জন ও টেলকো কারখানায় উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় পুরাতন গাড়ীগুলিকে অনেক বেশী ছুটিতে হইতেছে। নূতন গাড়ী না আনাইলে এ অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি এদেশে এঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারীর ব্যবস্থার উন্নতি ও বৃদ্ধি করা না হয়, তবে ত আমাদের চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইবে।

সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্য নিবাস—

কলিকাতা হইতে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার কণ্টাই রোড রেল ষ্টেশন হইতে ৫২ মাইলের মধ্যে দিঘা নামক স্থানে সমুদ্রতীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস নির্মিত হইতেছে। ঐ ৫২ মাইল পথ পীচ-ঢালা হইয়াছে ও অতি সহজে ও আরামে ঐ পথে দিঘা যাওয়া যায়। ঐ স্থানে এক হাজার একর জমী দখল করা হইয়াছে ও একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ১৪০ একর জমীতে গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে। ২৫ লক্ষ টাকা সমিতির মূলধন—আপাততঃ তথায় ১০০ গৃহ নির্মিত হইতেছে। সমুদ্রতীর ধরিয়া একটি ভাল পথ গভর্ণমেণ্ট এ বৎসরই নির্মাণ করিয়া দিবেন। গভর্ণমেণ্ট, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ঐ সকল বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে—তাঁহাদের কর্মীরা প্রয়োজনমত স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তথায় গিয়া বাস করিবেন। স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষগণও ইচ্ছা করিলে

ছাত্রদের তথায় অবকাশমত থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ঐ স্থানে সমুদ্রের ধার প্রশস্ত ও কঠিন—দিঘা হইতে ১৬ মাইল সুবর্ণরেখা নদের মুখ পর্যন্ত মোটরে বেড়ান যায়। গত পূজার সময় বহু লোক যাইয়া ঐ স্থান দেখিয়া আসিয়াছেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারী মেদিনীপুর পরিভ্রমণে কাঁথি মহকুমার কৃষ্ণনগর গান্ধীভবন সম্মুখে প্রার্থনা সভা। গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই সভাকে সঞ্জীবিত রাখা হইয়াছে। প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে এখানে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতি সভামণ্ডপে রাখিয়া সম্প্রতি একটি অনুরূপ সভা হইয়া গেছে

ফটো—শ্রীঅবিনাশ বেরা

প্রাচ্য সম্মেলন—

গত ৩০শে অক্টোবর হইতে তিনদিন আমেদাবাদে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সপ্তদশ নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীজি-বি-মবলঙ্কার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৪ শতাধিক পণ্ডিত ও বহু বিদেশী কোবিদ ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসারের জন্য ১৯১৯ সালে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল।

নূতন পুলিস কমিশনার—

শ্রীযুত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার নূতন পুলিস কমিশনার নিযুক্ত হইয়া গত ১৩ই অক্টোবর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে যোগদান করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় পুলিস সুপারের পদে কাজ করেন ও তথায় প্রশংসা লাভ করেন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিস বিভাগের

নবনিযুক্ত পুলিস কমিশনার (সস্ত্রীক)

পুনর্গঠন ও নূতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি ডেপুটী ইন্সপেক্টার-জেনারেল হন। তাঁহার মত একজন ধর্মপ্রাণ, ধীর ব্যক্তি পুলিস কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় লোক তাঁহার দ্বারা পুলিস কর্তৃক সুশাসনের আশা করিবে। তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্ট—

গত ২৮শে অক্টোবর ভারতের সকল রাষ্ট্রের বিধান সভা ও বিধান পরিষদসমূহের সভাপতিগণ বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষে ইন্দোরে সমবেত হইয়া ইন্দোর হইতে ৬ মাইল দূরে কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্টের প্রধান কেন্দ্রও পরিদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজি-ভি-মবলঙ্কর উক্ত ট্রাষ্টের সভাপতি। ১৯৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ

২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও মোট ৪৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ১শত ৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গ্রাম্য মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাই ট্রাষ্টের কার্য্য।

তারাশঙ্কর

প্রথম থেকে এই যুগ অর্থাৎ বারো বছর- যতদিন ফাউন্টেন কলম কিনেছি, কাজল কালীতেই লিখে এসেছি। কাজল অভ্যাস- কবে ছেলের মত কলমে কাজল কালী বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

এলোকেশী কালীর চুলের মত কালো কাজল কালী। কালীর কালো মনে দাগ ফেলে না কিন্তু কাগজের মন ভরে দেয়।

২৭।১০।৫৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

কাজলকালীর লেখা। [illegible]

[illegible] কাজলকালি

[illegible]

[illegible]

লেখার বিঘ্ন ঘটায় নি, [illegible]

[illegible]

বিকৃতি সৃষ্টি করে নি। [illegible]

[illegible]

প্রতিষ্ঠিত এই কাজলকালী [illegible]

[illegible]। ৮ই কার্তিক ১৩৬০ [illegible]

শ্রী [illegible]

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা ১) কর্ত্তৃক প্রচারিত

এ পর্য্যন্ত ৮১টি কেন্দ্রে গ্রাম-সেবিকা প্রস্তুতের শিক্ষা দেওয়া হয়, ১৩০টি কেন্দ্রে চিকিৎসা ও ২০৬টি কেন্দ্রে গ্রাম-সেবা করা হয়। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫২ পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে ট্রাষ্ট মোট ১৪২১জন কর্মীকে শিক্ষাদান করিয়াছে। ১৩০টি কেন্দ্রে প্রসূতি পরিচর্য্যা করা হয়। প্রধান কেন্দ্রটির নাম কস্তুরবা গ্রাম। সকলে উহা পরিদর্শন করিয়া উহার আদর্শ প্রচার করিলে সারা ভারতে কস্তুরবা ট্রাষ্টের কার্য্যের বিস্তার লাভ হইবে।

আড়িয়াদহে মাতৃমঙ্গল—

একজন মাত্র কর্মীর চেষ্টায় ২৪ পরগণা জেলার আড়িয়াদহে যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে তাহা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে।

আরিয়াদহ—শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গলে চিকিৎসকগণসহ প্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তের ট্রাষ্ট ভাণ্ডার হইতে তথায় নূতন গৃহ নির্মিত হইতেছে। রেঞ্জার্স ক্লাব হইতে সম্প্রতি ৫ হাজার টাকা ও শ্রীযোগেশচন্দ্র মল্লিক ও তাহার কন্যার নিকট হইতে ৫ হাজার ৫ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ উপকারে লাগিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞ—

পশ্চিমবঙ্গ ভূদান যজ্ঞ কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সম্প্রতি 'ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা দেশে ভূদান যজ্ঞের কথা প্রচারিত হয় নাই এবং এ বিষয়ে সাধারণে প্রায় কিছুই জানেন না। সে জন্য সুবৃহৎ পুস্তকখানি মাত্র

৮ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে ও তাহা ২৪ পরগণা, ডায়মণ্ডহারবারে ভাণ্ডারী মহাশয়ের নিকট পাওয়া যাইবে। ভূমি সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ভূদান যজ্ঞ জানিয়া মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং তাঁহার যোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে ঐ আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভাণ্ডারী মহাশয়ও ঐ আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রচার ও কার্য্যফলে এ দেশের ভূমি সমস্যার সমাধান হউক, সকলেই ইহা কামনা করে। ভূমি সমস্যার সমাধান না হইলে খাদ্য সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

শিল্পী দেবীপ্রসাদের সম্মান—

আগামী বৎসর টোকিওতে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে যে এসিয়ার প্রান্তিক সম্মিলন হইবে তাহাতে শিল্পকলা বিভাগের পরিচালনার ভার পাইয়াছেন মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল, খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এসিয়ার বিভিন্ন দেশের কথাবিদ্ ও শিল্পীরা তাঁহার নেতৃত্বে মিলিত হইয়া শিল্পকলার মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের উন্নতির পরিকল্পনা স্থির করিবেন। আমরা শিল্পী দেবীপ্রসাদের এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি ও প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সমগ্র ভারতের গৌরব বর্দ্ধনে সহায়তা করুন।

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

সাংবাদিক ও পুলিস—

কলিকাতায় গত জুলাই মাসে পুলিস কর্তৃক সাংবাদিক নিপীড়ন ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে একমাত্র সদস্য করিয়া গঠিত তদন্ত কমিশন তদন্তানুষ্ঠান শেষে গত ২রা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা ৫ই নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে পুলিসের হস্তে সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা ও গ্রেপ্তার পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন- ২২শে জুলাই বিকালে কলিকাতা ময়দানে সাদা পোষাকের পুলিস দল কর্তৃক কয়েকজন রিপোর্টার ও প্রেস ফটোগ্রাফারকে
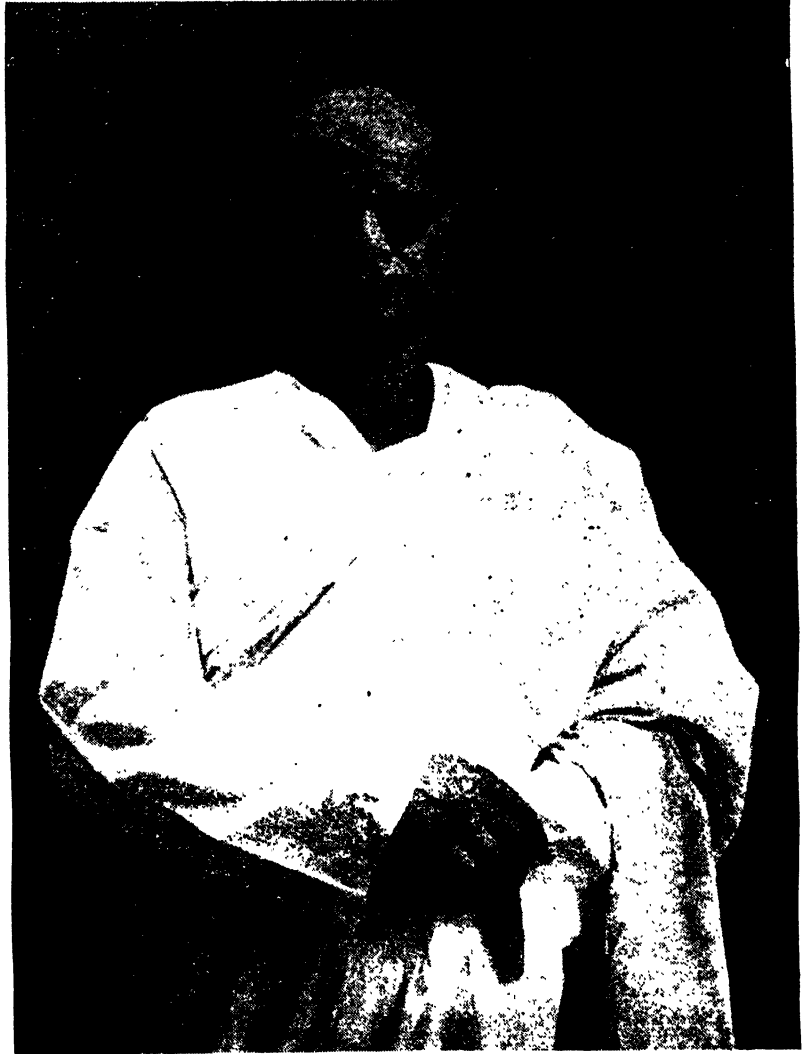
লাঞ্ছনা করা হয় এবং তাঁহাদের কয়েকজনকে ধরপাকড়ও করা হয়। কমিশন সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া এবং পুলিসের কার্যে হস্তক্ষেপ ও বাধা প্রদান করিয়া উভয়বিধ আইন অমান্য পূর্বক সাংবাদিকগণ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুযায়ী যে অপরাধ অনুষ্ঠান করেন, তাহার জন্য তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা সঙ্গত ছিল। কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার পুলিস কমিশনার ও প্রধান দপ্তরের ডেপুটী কমিশনার অথবা অন্য কোন ডেপুটী কমিশনারগণ অথবা সহকারী কমিশনারগণ কেহই সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা করা অথবা গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোনও প্রকারে জড়িত নহেন। এই রায় প্রকাশের পর সাংবাদিকগণ স্তম্ভিত হইয়াছেন ও দেশের লোকের মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে।

কল্যাণীতে কংগ্রেস-নগর নির্মাণ—

আগামী ২০শে হইতে ২৪শে জানুয়ারী কাঁচরাপাড়ার সন্নিহিত কল্যাণীতে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে তাহার জন্য নগর নির্মিত হইতেছে। কল্যাণী ষ্টেশন হইতে কংগ্রেস নগরের প্রদর্শনী পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইতেছে। বারাসত হইতে কল্যাণী যাওয়ার রাস্তাও প্রশস্ততর করা হইতেছে। কংগ্রেস-সেবাদলের কর্মীরা কল্যাণীতে থাকিয়া সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন ও তথায় শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা মণ্ডপ সজ্জার জন্য চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। ২০ বৎসর পরে বাংলায় কংগ্রেস হইবে—কাজেই তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ভার গ্রহণ প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্তব্য।

গ্রামবাসী গৃহ-ভৃত্যের আদর্শ—

মেদিনীপুর জেলার কাঁথির এক গ্রামে শ্রীহরিপদ মণ্ডল নামক একটি গ্রামবাসী গৃহভৃত্য তাহার জীবনের সমগ্র সঞ্চয় মোট ৫ শত টাকা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রামের দুর্গতদের কর্ম সংস্থানের জন্যমেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদককে দান করিয়াছেন। হরিপদর বয়স মাত্র ২২ বৎসর—তাহার এক কাঠা ভিটা আছে। ২৫ টাকা বেতনে গৃহ-ভৃত্যের কাজ করিয়া সে ঐ টাকা জমাইয়াছিল। তাহার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়।

পাকিস্তান হইতে খাদ্য আমদানী—

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্তান হইতে খাদ্য আমদানীর লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহার ফলে হাসমুরগী, মাছ, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, আলু ও সকল প্রকার শাকসবজী, নারিকেল, সকল প্রকার ফল, ফসলা, ডিম, বেত, বাঁশ, বনৌষধি, ঔষধ, জালানী কাঠ, হিং প্রভৃতি পাকিস্তান হইতে ভারতে আমদানী করা চলিবে। ইহাতে পাকিস্তানের সুবিধা হইলেও ভারতের লোকেরও আপাততঃ হয়ত সুবিধা হইবে। কিন্তু ভারতে এই সকল জিনিষের অভাব স্থায়ীভাবে দূর করিতে হইলে, আমাদের আমদানীর কথা ভুলিয়া দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইবে।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

আই এফ এ শীল্ড খেলায় যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। সেই সঙ্গে ক'লকাতার ফুটবল খেলার ওপরও। ১৯৫২ সালে মোহনবাগান-রাজস্থানের শীল্ড ফাইনাল খেলা দু'দিন অমীমাংসিত থাকার পর আর খেলানো সম্ভব হয়নি। ফুটবল মরসুম সরকারীভাবে শেষ হওয়াতে রাজস্থান ক্লাবকে পুনরায় ফাইনালে খেলতে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ রাজী করতে পারেন নি। ফলে আই এফ এ-র সভায় ১৯৫২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৫৩ সালে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম চারটি বিভাগের ফুটবল লীগ খেলাও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না এই কারণে মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের মীমাংসাও সাধারণভাবে হয়নি। গত মাসে ছাপাখানায় শেষ লেখা দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল-ইণ্ডিয়া কালচার লীগের ফাইনাল খেলা দু'দিন খেলানোর পরও গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থাকে। তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলাতেও কোন পক্ষই জিততে পারেনি, উভয়পক্ষই একটি ক'রে গোল দেয়।

ক'লকাতার ফুটবল মরসুম সরকারীভাবে শেষ হলেও পুলিস কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আই এফ এ তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা করে এবং খেলার পূর্ব্বে নাকি ঠিক হয়, তৃতীয় দিনের খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'লে উভয় দলকে যুগ্মভাবে ১৯৫৩ সালের আই এফ শীল্ড জয়ী ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ইণ্ডিয়া কালচার লীগের এক প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হয়নি। খেলা আরম্ভের আগে মৌখিকভাবে এবং খেলার শেষে লিখিতভাবে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ প্রতিবাদ জানায়, তৃতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে ফকরী এবং নিয়াজের যোগদান আইনসঙ্গত হয়নি। এই প্রতিবাদের ফলে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার টুর্ণামেণ্ট কমিটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছ থেকে লিখিতভাবে এক বিবৃতি গ্রহণ করে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দলকে ১৯৫৩ সালের আই এফ এ শীল্ড জয়ী ঘোষণা করে; ফকরী এবং নিয়াজকে অনুমতি ব্যতিরেকে খেলানোর দরুণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তারা ১৯৫৩ সালের পরবর্ত্তী কোন ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবং পুরো ১৯৫৪ সালের কোন ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে না; ফকরী এবং নিয়াজও এ বছরের মত খেলায় যোগ দিতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে মনে থাকতে পারে যে, ক'লকাতায় ফুটবল লীগ খেলার সময় পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন পাকিস্তানের যে কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড় তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে ক'লকাতায় বিভিন্ন দলে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের যোগদান বে-আইনী ঘোষণা ক'রে এক নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রে। ফকরী এবং নিয়াজ এই খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন।

এই নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকরী না হওয়াতে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেসন আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেসনের শরণাপন্ন হয়। আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেসন পাকিস্তানের আবেদন মঞ্জুর করে এবং এ আই এফ এফ-কে উক্ত খেলোয়াড়দের সম্পর্কে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নির্দ্দেশ দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় দিনের

ফাইনাল খেলায় ফকরী এবং নিয়াজ ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে খেলেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ৩য় দিনের ফাইনাল খেলার দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-কে জানায়, পাকিস্তানের অনুমতি অনুসারে তাঁরা ফকরী এবং নিয়াজকে ঐদিনের খেলায় দলভুক্ত করছেন ; আই এফ এ কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেসনের কাছ থেকে সরকারীভাবে কোন লিখিত চিঠিপত্র না পাওয়াতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে জানান, এ ব্যাপারে আই এফ এ কোন অনুমতি দিতে পারে না ; একান্তই যদি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঐ দু'জনকে খেলায় তাহলে নিজের ঝুঁকিতে খেলাবে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগের প্রতিবাদের ফলে টুর্ণামেণ্ট কমিটির তরফ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে লিখিতভাবে এক বিবৃতি এবং ফকরী এবং নিয়াজ সম্পর্কে অনুমতি পত্রাদি পেশ করতে বলা হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিছু দিন সময় চায়। আরও প্রকাশ, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের লিখিত বিবৃতিতে জানান, তাঁরা এ আই এফ এফ-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্তের মৌখিক অনুমতি পেয়েই ফকরী এবং নিয়াজকে খেলিয়েছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত এ কথা সরাসরি অস্বীকার ক'রে বলেছেন, এরূপ অনুমতি দেওয়ার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জানায় কোন এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনুমতি লাভের বিশেষ আশা পেয়েই ফকরী এবং নিয়াজকে খেলানো হয়েছিল এবং টেলিফোনে অনুমতি এসেছিলো। টুর্ণামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে আই এফ এ-র গভর্নিং বডিতে আবেদন করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি মারফৎ এ আই এফ এফ-এর সভাপতি পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির কাছ থেকে অনুমতি সম্পর্কিত এক চিঠি পেয়েছেন।

এই চিঠিখানি নতুন ক'রে ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছে এই বিবেচনায় আই এফ এ-র গভর্নিং বডি মামলাটি টুর্ণামেণ্ট কমিটিতে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে, কারণ টুর্ণামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের কাছে এ চিঠি পেশ করা হয়নি। এদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই-এফ-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং হাইকোর্ট থেকে আন্তর্বর্ত্তিন-কালীন একতরফা ইনজাংশন পেয়েছে যে, আদালতে এই মামলার চূড়ান্ত রায়ের পূর্ব্বে অথবা আদালতের আদেশ ভিন্ন টুর্ণামেণ্ট কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ ইস্টবেঙ্গল দলের উপর প্রযোজ্য হবে না। বর্ত্তমানে মামলাটি আদালতের বিচারাধীন সুতরাং এ সম্পর্কে কোন রকম অভিমত প্রকাশ সমীচীন হবে না।

শীল্ড ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার দরুণ গতমাসে এ সম্পর্কে অল্প বিবরণ দিয়েছিলাম। তিন দিনের ফাইনাল খেলার মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় দিন ইস্টবেঙ্গল দলই তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। প্রথম দিনের খেলায় গোল করার যে সব সুযোগ নষ্ট হয়েছে তা না হলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেরই জয়লাভ হ'ত। তৃতীয় দিনের প্রথমার্দ্ধের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই একতরফা আক্রমণ চালিয়ে কালচার লীগকে চেপে রাখে। এই সময়ের মধ্যে কালচার লীগ মাত্র একবার ইস্টবেঙ্গলের হাফ-লাইন ডিঙ্গিয়ে বল নিয়ে যায় এবং তা থেকেই অতর্কিতে গোল হয়। কালচার লীগ দলের গোলরক্ষক সঞ্জীব দু'দিন দলকে পরাজয়ের হাত থেকে একাধিকবার রক্ষা করেন। তাঁর এ খেলার জন্যই ইস্টবেঙ্গল দলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এবারের শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আই এফ এ-র খুবই দুর্নাম হয়েছে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগ বোম্বাইয়ের থেকে এসেছিল, তাদের ওপর খুবই অবিচার করা হয়েছে। প্রথম দিনের শীল্ড ফাইনাল খেলা নিয়ে তাদের পাঁচটি ম্যাচ খেলতে এক মাসের মত ক'লকাতায় থাকতে হয়েছিল। শীল্ডে তারা প্রথম ম্যাচ খেলে ৩রা সেপ্টেম্বর আর প্রথম দিনের শীল্ড খেলা হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর। এই দলের অনেকেই ছিলেন চাকুরী-জীবী ; অনেকেরই ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং কর্ম্মস্থানে যোগদানের জন্যে জরুরী তাগিদ এসেছিলো। দলের ক্যাপটেন শেষের দু'দিনের খেলাতে যোগ দিতেই পারেননি, ১ম ফাইন্যাল খেলার পরই বিমানপথে বোম্বাইতে ছুটতে হয়েছিলো। আরও অনেকের ছুটি মঞ্জুর করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। আই এফ এ-র এই ব্যবস্থাপনায় ইণ্ডিয়া কালচার লীগ এক অভিযোগ পত্রে জানিয়েছে, কোন একটি বিশেষ দলকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরুণই তাদের ক'লকাতায় এতদিন থাকতে হয়েছে নানা অসুবিধা সহ্য ক'রে।

বাইরের ফুটবল দলের ওপর এরূপ ব্যবহারে সত্যই

বাংলার ফুটবল ক্রীড়াসংস্থার সুনাম নষ্ট হয়েছে। তাদের ওপর বরং কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করলে আমাদের সুনাম বই দুর্নাম হবে না। মনে রাখা উচিত, ভবিষ্যতে এইরূপ ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হলে আই এফ এ শীল্ড খেলায় বাইরে থেকে ভালদল যোগদান করবে না। ফলে আই এফ এ শীল্ডের কৌলিণ্য লোপ পাবে।
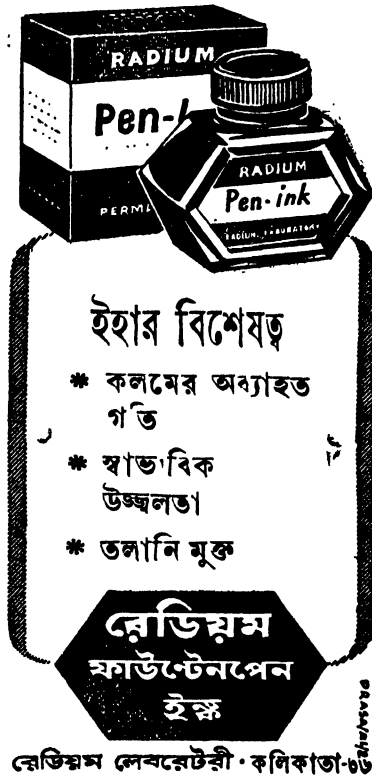
এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল ঃ

রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে কলম্বো কাপ এবং ব্রহ্মকাপ (স্থায়ীভাবে) জয়ী হয়েছে। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথমবারের প্রতিযোগিতায় সমান পয়েণ্ট পেয়ে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল। এবাবের প্রতিযোগিতায় চারটি দেশ যোগদান করে—ভারতবর্ষ পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল। লীগ প্রথায় খেলা হয়—প্রত্যেক দেশ তিনটি ক'রে খেলে। ভারতবর্ষ তিনটি খেলাতেই জয়ী হয়। ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্তানের খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—১টা জয়, ১টা হার এবং ১টা ড্র। সিংহল তিনটে খেলাতেই হেরে যায়। ভারতবর্ষ ১-০ গোলে পাকিস্তানকে, ২-০ গোলে সিংহলকে এবং ৪-২ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে। এ প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। জাতীয়তাবোধের অভাব আমাদের দেশের ফুটবল খেলার দর্শক সাধারণের মধ্যে কত কম তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল যেদিন ভারতীয়দল রেঙ্গুন থেকে দম দম বিমান ঘাটিতে পৌছালো। ভারতীয়দলকে জয়মাল্য বা অভিনন্দন দিতে কোন জনসমাগম হয়নি। সব থেকে দুঃখের কথা, আই এফ এ-র কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। অথচ এই ফুটবল খেলার দৌলতেই তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং কারও কারও অন্ন সংস্থানও হয়ে থাকে। ভারতীয়দলের আগমনবার্ত্তা তার যোগে আই এফ এ-কে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমাদের দেশের বিভিন্ন খেলার দর্শক সাধারণ হ'লেন উগ্র দলগত সমর্থক। তাঁদের মধ্যে দলীয় বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমনই উগ্র যে, সেখানে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'তে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব। তাদের মধ্যে খেলাধূলা নিয়ে কম রেশারেশি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় না বরং আমাদের দেশের থেকে অনেকগুণ বেশী। বিদেশী শাসককুল এদেশের লোকের চোখ থেকে সে সব ঘটনা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতো, নিজের দেশের কেলেঙ্কারী শাসিত দেশে পৌছলে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতো। কিন্তু এসব নোংরামী থাকা সত্বেও ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে একটা মহৎ গুণ আছে, তা জাতীয়তাবোধ। সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা যেমন আছে, তেমনি তাদের জাতীয়তাবোধ। আমাদের মধ্যে আছে প্রথমটা, দ্বিতীয়টা নেই বলেই ১৯২৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিকজয়ী হয়ে ভারতীয় হকি দল বোম্বেতে ফিরে এলে দেখা গেল, জনসাধারণ দূরের কথা কর্ম্মকর্ত্তারাও খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা জানাতে উপস্থিত হ'ন নি। এমন ধরণের ঘটনা অনেক আছে। অথচ কোন স্থানীয় দলকে (জাতীয়দল নয়) সম্বর্দ্ধনা জানাতে দলীয় সমর্থকদের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ জনসাধারণের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি বলেই যে এক্ষেত্রে জনসমাগম হয়নি এমন নয়, অন্যান্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সংবাদপত্রে কোন জাতীয় দলের স্বদেশত্যাগ বা প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে সাড়া পাওয়া গেছে তা জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় ফুটবল দল সম্বর্দ্ধনা তো পেল না, পেল কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে—কাষ্টমস কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় দলের জয়লাভের পুরস্কার কলম্বো এবং ব্রহ্ম কাপ দুটি বাজেয়াপ্ত ক'রলেন। প্রকাশ, কাগজপত্রে এ দু'টির কথা ঠিক ভাবে নাকি উল্লেখ করা ছিলনা। তা যদি হয়েও থাকে তাহলে একটা কথা বলার আছে। এই টেকনিক্যাল ভুলের দরুণ যা করা হয়েছে তা কি বড় বেশী কড়াকড়ি হয়নি? সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে ঘটনার সহজ

মীমাংসা হয়; এই দুটি জিনিষ জয়লাভের পুরস্কার, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানী হয়নি। আমাদের দেশে কাষ্টমস সম্পর্কে নানা অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রায়ই চোখে পড়ে যার অর্থ দাঁড়ায় আরোহীদের অনর্থক হায়রানী।

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের রোভার্স কাপের ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-০ গোলে বাঙ্গালোর মুসলীমদলকে হারিয়ে উপর্যুপরি চারবার রোভার্স কাপ পেয়েছে এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন দলই উপর্যুপরি চারবার রোভার্স কাপ পায়নি।

রজতজয়ন্তী বৈদেশিক ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের রজতজয়ন্তী বৎসর উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগত বেন বার্ণেটের নেতৃত্বে বৈদেশিক ক্রিকেটদল এ পর্য্যন্ত ৫টি ম্যাচ খেলেছে; ফলাফল জয় ০, হার ১ (ভারতীয় একদশদলের কাছে ৩ উইকেটে) ড্র ৪। লক্ষ্ণৌতে গত ৫ই নভেম্বর থেকে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু খেলাটি বাতিল হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌতে ছাত্র সমাজের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সহরে হরতাল পালন এবং নানা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। এই সময় বিক্ষোভকারীরা টেষ্ট ম্যাচ খেলার মাঠের পীচ নষ্ট ক'রে দিয়ে পীচের ওপর গাছ পুঁতে দেয়। ফলে খেলাটি বাতিল করতে হয় অন্য কোন উপায় না থাকায়।

ধ্যানচাঁদ হকি ট্রফি ঃ

১৯৫৩ সালের ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ২য় দিনের ফাইনালে গতবারের রাণার্স-আপ্ হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ ট ১-০ গোলে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিস দলকে হারিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।

দিল্লী ক্লথমিলস্ ফুটবল ঃ

ফাইনালে এরিয়ান জিমখানা (বাঙ্গালোর) ৩-২ গোলে ই আই আর একাউণ্টসক্লাবকে (ক'লকাতা) হারিয়েছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঃ

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১-০ গোলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে স্যর আশুতোষ শীল্ড লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "প্রচ্ছন্ন আততায়ী" (২য় সং)—২৲
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "বিবাহে জ্যোতিষ" (২য় সং)—২৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "হারানো খাতা" (২য় সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (১ম—১৮শ সং)—৩৲,
"দত্তা" (১৫শ সং)—৩৲, "নব-বিধান" (৯ম সং)—১৸৹
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "লালমাটি" (২য় সং)—৪৷৹
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বনমল্লিকা"—১৸৹
শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত সচিত্র কাব্য-গ্রন্থ "মানস-মুকুর"—৫৲
রমাপতি বসু প্রণীত উপন্যাস "রোশনচৌকি"—২৸৹
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "প্রাচীন কবির কাহিনী"—১৷৹,
"মঙ্গলকাব্যের কাহিনী"—১৷৹
নবরত্ন প্রণীত "মৃত্যুর পরপারে"—৷৹
শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "পূর্ণানন্দ-বিবেক"—১ম খণ্ড ।৹, ২য় খণ্ড ।৵৹
শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চৌধুরী প্রণীত "সংগীতের অভিধান" (১ম খণ্ড)—৩৲
শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত গল্প গ্রন্থ "অমিতাভ"—৷৹
শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রণীত "ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন ?"—৷৹
শ্রীললিতানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "সাধনা-গীতি" (২য় খণ্ড)—২৲
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দীপায়ণ"—৪৷৹
শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "নীহারিকা"—২৷৹
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত শারদীয় সংকলন "পূর্বরঙ্গ"—১৷৹
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ক্ষণকাল"—৩৲
অমলা দত্ত প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "আরেক আকাশ"—২৸৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিষাক্ত হাসি"—৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত "আঙ্কল্ টমস্ কেবিন"—১৷৹
শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "মনের মানা নাই"—৩৲
দেব সাহিত্য-কুটীর-প্রকাশিত ছোটদের পূজাবার্ষিকী "বসুধারা"—৪৲
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক-সম্পাদিত "শারদীয়া দৈনিক বসুমতী"—৩৲
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত "শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা"—৩৷৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত শারদীয়া সংখ্যা "বিশ্ববার্ত্তা"—১৷৶৹
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত শারদীয়া সংখ্যা
"আর্থিক প্রসঙ্গ"—১৷৹
শ্রীভবতোষ রায়-সম্পাদিত শারদীয় সংখ্যা "হিন্দু"—১৲
শ্রীঅপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস—"মৃগতৃষ্ণিকা"—১৷৹
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চোরকাঁটা"—২৲
ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অমর মিলন"—১৷৹
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "ভাব-রূপা"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

এই বলেই সবাই 'কোকোলা'কে অভিনন্দন জানায়। স্বপ্নালু সুরভি, সূক্ষ্ম সংমিশ্রন, বিশুদ্ধ উপাদান প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে সকলের চিত্ত জয় করেছে 'কোকোলা'। তাই আজ 'কোকোলা' ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশ তৈল।

বোতলের মুখ 'এ্যালু-ক্যাপসুল' দিয়ে মোড়া, আর ক্যাপসুলের উপর আমাদের কোম্পানীর 'ম নো গ্রা ম' অঙ্কিত আছে।

ক্রয়কালে জাল বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বোতল খুলে দেখে নেবেন ইহা আপনাদের সেই চির-পরিচিত সুগন্ধযুক্ত আসল জিনিষ কিনা। জালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায়।

COCOLA
কোকোলা
JEWEL OF INDIA PERFUME CO
CALCUTTA

কোকোলা

অভিজাত কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং
কলিকাতা - ৩৪

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৭ম খণ্ড)—৪৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত মাক্সিম গর্কীর "দি ওর্লফ্‌স্"
গ্রন্থের অনুবাদ "নতুন আলো"—২॥•
নিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পরের ছেলে" (২য় সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পল্লী-সমাজ" (২৮শ সং)—২॥•,
"রামের সুমতি" (নাটক—৬ষ্ঠ সং)—১॥•
প্রাণতোষ ঘটক প্রণীত উপন্যাস "আকাশ-পাতাল" (২য় পর্ব)—৫৸•
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "ঝড়ের সংকেত"—৩॥•
রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মেঘলা আকাশ"—২॥•
বিমল মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পুতুল দিদি"—৩৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মালাচন্দন"—২৸•
নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "নীল আলো"—২॥•
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "শালিক কি চড়ুই"—৩৲
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তুমি কোথায়"—৩৲
সুকুমার চক্রবর্তী প্রণীত নাটক "কী চাই ?"—২৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "নারী কি শুধু স্বামীর ?"—১৲
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মৃত্যুহীন প্রাণ"—॥•, "রক্তকমল"—॥•
দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত উপন্যাস "মধু-মিলন"—২
শ্রীগোপেন্দ্র বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "সুন্দরবনের গুপ্তধন"—১॥•
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "মহাভারতীয় গল্প"—॥৴•,
"পুরাণের গল্প"—॥৴•
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অগ্নিশিখা"—৸•,
"কৃষ্ণার পরিচয়"—১॥•
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "কাব্যকাকলি"—১৲

গ্রাহক ও এজেণ্টগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'ভারতবর্ষ' দ্বিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই সুদীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর যাবৎ 'ভারতবর্ষ' একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উপচর্যা করিয়া আসিতেছে। বাংলা দেশের যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-সম্ভার সেই প্রথম হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ পাঠকসমাজে পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। একদা ভারতবর্ষই **শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশের গৌরব অর্জন করিয়াছে।**

বর্তমানে সচিত্র ভারতবর্ষের মূল্য প্রতি সংখ্যা **সডাক—১৲ টাকা, ষাণ্মাসিক—৬৲ টাকা, এবং বাৎসরিক ১২৲ টাকা।**

ডাক বিভাগের নিয়মানুসারে গ্রাহকগণের অনুমতিপত্র ব্যতীত এখন আর ভিঃ পিঃ যোগে কাগজ পাঠানো সম্ভব নহে। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক **ভারতবর্ষ পাঠাইবার নির্দেশপত্র** পাঠাইবেন। তবে ভিঃ পিঃতে কাগজ লওয়া অপেক্ষা **মণি-অর্ডারে** টাকা পাঠাইয়া দিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়।

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও এজেণ্টগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্তমনে কামনা করিতেছি।

কর্মাধ্যক্ষ—**'ভারতবর্ষ'**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ

কমলিনী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৬০

দ্বিতীয় খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বিজয়া-দশমী *

আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বিজয়া-দশমী হয়ে গেছে। এই যে বিজয়া-দশমী হয়ে গেল, আপনাদিগকে তার অর্থ শুনাতে চাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দু'টি কন্যা আমার নিকটে এসেছিল।

"কেন এসেছ ?"

"বিজয়া করতে।"

"বিজয়া কি ?"

একজন বললে, "জানি না।"

আর একজন বললে, "প্রণাম করা।"

"আজ প্রণাম করতে হবে, এমন কি কথা আছে ?"

"আজ যে বিজয়া।"

শতকে ঊনশত জন এই উত্তর দিবেন। কেহ বলবেন, "ত্রেতাযুগে রাবণকে রাম আশ্বিন শুক্লানবমীতে বধ করেছিলেন ; এই জন্য দশমীতে বিজয়োৎসব।" কিন্তু শরদ্ ঋতুতে যুদ্ধ হ'ত না, রাম রাবণের যুদ্ধও হয় নাই। শরদ্ ঋতুতে ভূমি আর্দ্র থাকে, সৈন্যদের যাত্রার সুবিধা হয় না। তখন শস্যও গৃহজাত হয় না। পানীয় জল কর্দমাক্ত থাকে। বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণ-বধার্থে রামের দুর্গাপূজার নামগন্ধও নাই। কালিকা-পুরাণ দুর্গাপূজার সময়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ এনেছেন। আর কোন পুরাণে নাই। কালিকা-পুরাণ আসামে অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু রামের বিজয়ে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি আছে? প্রকৃত কথা অন্যরূপ। আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি ; বিজয়া দশমীর গুরুত্বও ভুলে গেছি।

আমি যদি বেদের কালে থাকতাম, তা' হ'লে বলতাম, চুরানব্বই শরৎ দেখেছি। "পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্"—যজুর্বেদে এইরূপ প্রার্থনা আছে। শরৎ

* গত ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৬০) আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির পঞ্চনবতিতম জন্মদিবস পালনোৎসবে বাঁকুড়া টাউন-হলে নগরবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি যে ভাষণ দান করেন, এই প্রবন্ধ তাহার অংশ-বিশেষের অনুলিপি। শ্রীসুখময় সরকার-কর্তৃক অনুলিখিত॥

শারদ ঋতু এবং শরৎ বৎসর। অমরকোষে পাবেন। এককালে শরৎ-প্রবেশে বৎসর আরম্ভ করা হ'ত। সেকাল অল্প নয়, ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। আমরা সে প্রাচীন বিধি অদ্যাপি পালন করছি। আশ্বিন শুক্লা দশমী শরদ্ বর্ষের প্রথম দিন। যদি রবিবারে দশমী হয়ে থাকে, আজ (১৩২০।৪ কার্ত্তিক) শরদ্ বর্ষের চতুর্থ দিন। সকল জাতিই নববর্ষ প্রবেশে উৎসব করে' থাকে। আমাদের বিজয়া-দশমী-কৃত্য সেই নববর্ষোৎসব। সেদিন নববস্ত্র পরিধান করতে হয়, আত্মীয়-স্বজনদিগকে নিয়ে উত্তম দ্রব্য ভোজন করতে হয়, আর সারাদিন আমোদ-আহ্লাদে কাটাতে হয়। বিশ্বাস এই, বৎসরের প্রথম দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটলে সারা বৎসর এই ভাবে কাটবে।

এই দশমীর নাম 'বিজয়া' কেন? এই দিন আমরা নববর্ষে বিজয় কামনা করি। একবৎসর অতিক্রম করেছি, সকল কামনা সিদ্ধ হয় নাই, কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, এই নূতন বৎসরে যেন আমাদের সকল কার্যে সিদ্ধি হয়। এই আনন্দের দিনে কনিষ্ঠেরা গুরুজনদিগকে প্রণাম করে, নববর্ষে বিজয়লাভের জন্য তারা তাঁদের আশীর্বাদ চায়। বয়স্যেরা পরস্পর আলিঙ্গন করে, একে অন্যের শুভ কামনা করে, আহ্লাদ প্রকাশ করে। কোলাকুলি করতেই হবে, এমন কিছু নয়। করস্পর্শ দ্বারাও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কোলাকুলি করা শুধু হর্ষ-প্রকাশ। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের আশীর্বাদ চায়, জ্যেষ্ঠকে আলিঙ্গন করে না। করলে ধৃষ্টতা ও আচার-ভ্রষ্টতা প্রকাশ পায়।

বঙ্গদেশে বিজয়া-উৎসব আমরা তেমন করি না; এটি দুর্গাপূজার অঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা নাই; সে সে দেশের লোকে নবরাত্র ব্রত করে। দশমীর দিন ব্রত উদ্‌যাপন। দশমী দশম রাত্রি, সংক্ষেপে দশ-রা। এই থেকে সে সকল দেশে উৎসবের নাম 'দশেরা' হয়েছে। রাত্রি শব্দে দিবস বুঝায়। যেমন, দোসরা, দ্বিতীয় রাত্রি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিবস; তেসরা, তৃতীয় রাত্রি বা তৃতীয় দিবস। সে সব অঞ্চলে দশেরা একটা বড় পর্ব। উত্তর-প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে লোকে 'রামলীলা অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ-বধ, সীতা-উদ্ধার, রামের বিজয়-যাত্রা ইত্যাদি অভিনয় করে' আনন্দ প্রকাশ করে। পঞ্জাবে সেদিন বণিকেরা নূতন খাতা করে। সেদিন দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য এই ক্রীড়ায় সকলেরই জয় হয়। অবিকল এইরূপ কারণে গুজরাত-প্রদেশের বণিকেরা দেওয়ালীর পরদিন অর্থাৎ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে নূতন-খাতা করে। কিন্তু দেওয়ালীর উৎপত্তি স্বতন্ত্র। নববর্ষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই।

পূর্বকালে বিজয়া-দশমীর দিন রাজাদের নীরাজন-কৃত্য ছিল; অদ্যাপি পশ্চিমভারতে রাজারা সে বিধি পালন করে' আসছেন। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বগজাদির পূজার নাম নীরাজন। পূর্ব হ'তে যুদ্ধাস্ত্র মার্জিত ও তৈললিপ্ত করা হয়, অশ্ব-গজাদির গাত্র ধৌত করে' ভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়। দশমীর দিন অস্ত্র ও বাহনের পূজা হয়। অপরাহ্ণে রাজা এক বৃহৎ গজে আরোহণ করেন; অন্যান্য অমাত্য ও পার্ষদেরাও যথাযোগ্য অশ্ব-গজে আরোহণ করে' প্রাসাদ হতে বহির্গত হন। সুসজ্জিত সৈন্য তাঁদের অনুসরণ করে। তিন চা'র মাইল দূরে কোন মন্দিরে দেবী-প্রতিমাকে প্রণাম করে' এবং প্রতিমা না থাকলে শমীবৃক্ষকে প্রণাম করে' তাঁরা সকলে রাজধানীতে প্রত্যাগত হ'ন। শমীবৃক্ষ দুর্গার প্রিয়। নীরাজন এক বৃহৎ উৎসব। সেদিন যুদ্ধযাত্রা করে' রাখলে সম্বৎসর বিজয় হয়। আমরা বঙ্গদেশে দূরস্থ প্রবাসে যেতে হ'লে দশমীতে 'যাত্রা' করে' রাখি।

বিজয়া-দশমীর দিনে আমরা দূরস্থ আত্মীয়-স্বজনের নিকটে প্রণাম-পত্র কিম্বা সম্ভাষণ-পত্র পাঠাই। আমার এক মরাঠী বন্ধু বিজয়া দশমীর পরে পত্রের মধ্যে কাঞ্চনবৃক্ষের ক্ষুদ্র পত্র কুঙ্কুম-লিপ্ত করে' পাঠিয়েছিলেন। সেদেশে শমী-পত্র প্রেরণই বিধি। তিনি শমী পান নাই, তার পরিবর্তে কাঞ্চন-পত্র পাঠিয়েছিলেন।

বঙ্গদেশে বণিকেরা ১লা বৈশাখ নূতন খাতা করে। এটা সামাজিক ব্যাপার নয়। আমরা সেদিন নববস্ত্র পরিধান করি না, আনন্দোৎসব করি না। এক বৎসরে দু'দিন নববর্ষ হ'তে পারে না। এটা বণিকের নববর্ষ হ'তে পারে। ইংরেজেরা ১লা জানুয়ারি নববর্ষ গণনা করে, কিন্তু বণিকেরা ১লা এপ্রিল নববর্ষ ধরে। আমাদের গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগেও ১লা এপ্রিল নববর্ষ। পূর্ববঙ্গে ১লা বৈশাখের একটু গৌরব আছে। কিন্তু এটি অর্বাচীন

কালে প্রবর্তিত হয়েছে। স্মৃতিতে ১লা বৈশাখ আমাদের কোনও কৃত্য বিহিত হয় নাই।

গুজরাতে নবরাত্র ব্রতের সময় একপ্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে। এর নাম গর্বানৃত্য। এক বর্ষীয়সী নারী একটা শতছিদ্র হাঁড়ীতে শাদা রং মাখিয়ে ভিতরে দীপ জ্বালিয়ে সে হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে এ-বাড়ী সে-বাড়ী নৃত্য করে' বেড়ায়। অন্য নারীরা তাকে ঘিরে মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। সেদেশে ভদ্র-নারীর প্রকাশ্যে নৃত্য দূষ্য নয়। গর্বা নৃত্যের উৎপত্তি কেউ জানত না। আমিই প্রথম Modern Reviewতে এর ব্যাখ্যা করি। সংস্কৃত 'গর্ভ' শব্দের অপভ্রংশে গর্বা। গর্ভ, মাতৃকুক্ষিস্থ ভ্রূণ। হাঁড়ির ভিতর প্রজ্বলিত দীপ সেই গর্ভ, নববর্ষের নবসূর্য্যের দ্যোতক। হাঁড়ির ছিদ্র দিয়ে দীপের রশ্মি বাহির হতে থাকে; দীপসমেত হাঁড়িটি যেন নবসূর্য। একদিন নয়, ন'দিন ধরে' নৃত্যগীত চলতে থাকে। নববর্ষের প্রথম দিনের সূর্য আসছে। এই আনন্দ প্রকাশের জন্যই নৃত্যগীত। সকল জাতিই নববর্ষের প্রথম দিনে নানা ভাবে আহ্লাদ প্রকাশ করে। বিজয়া-দশমীতে আমরাও সেইরূপ করি।

যেকালে আর্যেরা শরৎ প্রবেশে নববর্ষ আরম্ভ করতেন, সেকালে তাঁরা তার পূর্বদিন রুদ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করতেন। এখন আমরা সেদিন রুদ্রাণীর পূজা করি। রুদ্রাণী রুদ্রের শক্তি, তিনিই দুর্গা। তিনি সর্বদেবের সম্মিলিত শক্তি; এই কারণে তিনি মহাশক্তি, বিশ্বশক্তি। তাঁর নিকটে আমরা প্রার্থনা করি, যেন নববর্ষে আমাদের বিজয় হয়। আমরা বলি, 'সর্বকামাংশ্চ দেহি মে।' দুর্গা-পূজা বৈদিক যুগের রুদ্রযজ্ঞের অনুকরণ। রুদ্রযজ্ঞ সোম-যাগ। সোম-যাগে পশুবধ এবং যজ্ঞের পর সোম-পান করা হত। আমরাও দুর্গাপূজায় পশু বলি দিই এবং পূজান্তে সিদ্ধিপান করি। ভঙ্গার বাংলা নাম সিদ্ধি। ভঙ্গাই বেদের সোম। অর্বাচীন সংস্কৃতে ভঙ্গার এক নাম হয়েছিল 'বিজয়া'। বিজয়া অর্থে সিদ্ধি। যাঁরা দুর্গাপূজা করেন, তাঁরা বিজয়ার দিন সিদ্ধিপান করেন। যিনি সিদ্ধি পান করেন না, তিনি স্পর্শ করেন। লোকের ধারণা, দুর্গাপূজা-অনুষ্ঠানে তিন-চার দিন গুরু পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করবার জন্য সিদ্ধি পানের বিধি হয়েছে। সে ধারণা ভুল। ভঙ্গা হর্ষোৎপাদক। বেদের কালে ইন্দ্রদেব প্রচুর সোমপান করে' অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এই কারণে ভঙ্গার এক নাম ইন্দ্রাশন। বঙ্গের কবি সদাশিবকে ভাঙ্গড় রূপে কল্পনা করেছেন। শিব ভঙ্গাপ্রিয় ছিলেন। সুরা অস্পৃশ্য, অপেয়। কিন্তু ভঙ্গা এরূপ নয়।

আশ্বিন শুক্লা-দশমীর নাম বিজয়া-দশমী হয়েছে। সেদিন আমরা বিজয় কামনা করি, এই হেতু বিজয়া। কিম্বা, সেদিন আমরা বিজয়া পান করি, এই হেতু বিজয়া। বিজয়া নামের উৎপত্তি এই দুই-ই হ'তে পারে।

মহাশক্তির আশীর্বাদে নববর্ষে আমাদের বিজয় হউক, আমাদের দেশের বিজয় হউক।

আগত উষা

—অনিরুদ্ধ—

অন্তহীন তমসার অন্ধতার মাঝে
চিত্তে চাপি অজ্ঞানের দুর্বিসহ ব্যথা
তাপসী প্রকৃতি এবে সূর্য্য-ধ্যান রতা।
অবিরাম সিন্ধু তাঁর সম্মুখে বিরাজে।

তিমিরান্ধ বৃক্ষরাজি বক্ষ ব্যথা ভারে
ফেলে দীর্ঘশ্বাস—যেন কোন অজানায়
লক্ষ লক্ষ বাহু মেলি বাঁধিবারে চায়।—
নিশাবায়ু কাঁদি ফেরে প্রভাতের দ্বারে।

ধীরে ধীরে নিশাথের ভেদী লৌহ কারা,
উষার আশার আলো প্রকৃতির ভালে
এবে নব আগমনী দীপশিখা জ্বালে;
জাগায় জড়ের বুকে পরাণের সাড়া।—

জাগাবে যে মহা উষা ধরা, অন্তরীখ
প্রকৃতির এ প্রভাত তারই প্রতীক।

প্রেমের গল্প

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সিঁড়ি দিয়ে নামছি—পিছন থেকে ডাকলে রবীন।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম।

না—ব্যাপার কিছু নয়, হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাই। কাল আপনার লেখা একটা গল্প পড়ছিলাম কিনা! হাসি মুখে রবীন উত্তর দিলে। একটু থেমে বললে, পড়তে পড়তে একটা কথা খালি মনে হচ্ছিল···যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

বেশতো, বল না।

এই নিয়ে আপনার লেখাতো অনেকগুলি পড়লাম—তার মধ্যে একটিও প্রেমের গল্প কিন্তু পাইনি! বেশ জমাট একটা প্রেমের গল্প লিখুন না এবার? অনুরোধের ছোঁয়ায় ওর গলার স্বরটা নরম হয়ে উঠল।

প্রেম! একটু যেন বিস্মিত হয়েই থমকে দাঁড়ালাম। তিনতলার সিঁড়িটা আর দু'টি ধাপের সঙ্গে শেষ হবে, দোতলায় পৌছব আমরা। তারপর আরও কুড়িটা ধাপ পেরিয়ে তবে একতলা। দু'বেলা এই চল্লিশটা ধাপ ভেঙ্গে—চড়াই-উৎরাইএর পাল্লায় ভারী হয়ে ওঠে জীবিকা-অর্জ্জনের স্বরূপটি। আমার হ'ল কুড়ি বছর। রবীনের কোন্ না পৌনে এক কুড়ি হয়েছে! বাতিক দু'জনেরই আছে বলতে হবে; আমার গল্প লেখার—ওর গল্প পড়ার। আপিসের নিরেট টেবিলে—হিসাব নিকাশের নীরস জাব্‌দা খাতাগুলি সাজিয়ে অঙ্কের অথৈ জলে যারা হাতপা ছোঁড়াছুড়ি করে—তাদের এই বেয়াড়া সখ কেন যে হয়! যারা কর্ম্ম-সঙ্গী—সর্ব্বদা স্থূল রস আর রুচিহীন রসিকতায় টইটম্বুর হয়ে রয়েছে, যারা উপরিওয়ালা—কড়া চুরুটের সঙ্গে কড়া মেজাজ জাহির করে, যারা পাওনাদার—কর্জ্জশোধের কড়া-মিঠে তাগাদায় জীবনটা অস্বস্তিতে ভরিয়ে তোলে—এদের কারও সঙ্গ তো প্রেম-অনুকূল নয়। বিস্মিত হয়ে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়াবারই কথা আমার।

রাগ করলেন তো? রবীন ম্লান কণ্ঠে বললে।

রাগ নয়, প্রেমের অনুকূল পরিবেশ কোথায় আছে—তাই—ভাবছি।

হাসালেন—আপনার আবার ভাবনা। আপনারা তো যা—নয়—তাই একটা ভেবে নিয়ে কলম চালিয়ে দেন। লিখুন না একটা জমাট প্রেমের গল্প, যা পড়লে মনটার বেশ আনন্দ হয়, একটা কিছু পেলাম—পেলাম মনে হয়।

একতলায় পৌছে বললাম—আচ্ছা রবীন, তুমি বিয়ে করেছ তো!

তা আর করিনি! চাকরিতে ঢুকে বাঙালীর ছেলে কতদিন আর কুমার থাকে বলুন?

নিজে পছন্দ করে, না—

সে অনেক কথা—বলতে গেলে একটা বড় গল্পই হয়ে যায়।—তবে ভাল প্রেমের গল্প নয় কিন্তু। রবীন অপ্রতিভের মত হাসলে।

বল কি—প্রেম না করে বিয়ে করেছ—অথচ বলছ—

বিয়ের পর কি প্রেম হয় না। পাল্টা প্রশ্ন করলে রবীন।

ও—বুঝেছি। বলে হাসলাম।

না—না—সত্যি বলছি—সে রকম প্রেমের গল্প আমার ভাল লাগে না। এই বিয়ের আগে কিংবা পরে যাকে বিয়ে করলাম—সে ছাড়া আর কাকেও তো ভালবাসতে পারি? যেমন সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট—যেমন কালিদাসের শকুন্তলা—যেমন বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধিকা। কিংবা আধুনিক লেখকরা—

আমার হাসিটা উচ্চ হয়ে উঠতেই রবীনের উৎসাহ হু-হু করে নেমে গেল। অত্যন্ত ম্লান মুখে ও চুপ করল সহসা।

বললাম, বেশ—তোমার বাড়ীতে যাব একদিন, ও বিষয়ে আলোচনা দরকার।

রবীন ম্লান মুখেই জবাব দিলে, গল্প লিখবার প্লট কিন্তু নেই সেখানে।

প্লটের সন্ধানে তো কারও বাড়ী ধাওয়া করবার দরকার হয় না—ওটা মনেতেই আপনি গজায়, এই একটু আগে তুমি যা বললে।

হেঁ—হেঁ—তা যা বলেছেন। নিরুৎসাহ-কণ্ঠে হাসলে রবীন। আচ্ছা—আসি তাহলে।—বলে দু'হাত তুলে প্রণামের ভঙ্গী করে দ্রুত সরে গেল।

তারপর কিছুদিন রবীনের আর দেখাই নেই। অন্য কাজের তাড়ায় ওর কথা যখন প্রায় ভুলেছি—হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে উঠবার মুখে পিছন থেকে ও ডাকলে, শুনচেন!

কি খবর?

আজ আপনার সময় হবে—ছুটির পর? মানে সেদিন বললেন কিনা—একদিন যাবেন আমার ওখানে—

আরে—না না, ঠাট্টা করে বলেছিলাম ও কথা।

তা যাই বলুন—আজ আপনাকে যেতেই হবে। আমি বাড়ীতে বলে এসেছি।

বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, কি পাগল! আমার যদি আজ জরুরি কাজ থাকত?

জরুরি কাজ নেই তো—চলুন না। ওর সকাতর অনুনয়ে বিস্ময় বাড়ল। কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম যেন।

অবশেষে ওর পীড়াপীড়িতে সম্মতি দিতে হল।

২

রবীন থাকে শহরতলীতে—শহরের কোলের গোড়াতে বললেই হয়। ট্রামের মত ঘন ঘন ট্রেণ আছে—বাস'এর সুবিধাও আছে। কলের জল আর বিদ্যুৎ আলো ভরসা দিচ্ছে অদূরকালে এই গ্রামটিও সহরের আভিজাত্য লাভ করবে। অনেক জায়গায় ঝোপ ঝাড়—বাঁশবন—খানা-ডোবা থাকলেও এখানে জমির দাম নাকি হু—হু করে বাড়ছে। দুটো বড় ইস্কুল আছে—হাতের নাগালে একটা কলেজ রয়েছে। আর আছে দোকান পসার বাজার—ভোর থেকে সুরু হয়ে রাত ন'টা-দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে—আত্মীয় কুটুম্ব এলে অখ্যাতির দায়ে পড়তে হয় না গৃহস্থকে। পুকুরের সংখ্যা কিছু বেশীই। তা বলে এঁদো পুকুর নয় ওগুলো—রীতিমত মাছের চাষ হয়। দিনের বেলায় ক্ষেপলা জাল ফেলে অনায়াসে পুঁটি মৌরলা ধরে গৃহস্থ ব্যঞ্জনকে রসনা-লুব্ধ করতেও পারে। একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় আর একটা পাঠাগার পথ চলতে চলতে সামনে পড়ল।

রবীন বললে, এই পাঠাগারে বেশ বড় রকমের একটা ফাংশান হয়ে গেল সেদিন—কবি-গুরুর জন্মোৎসব। কলকাতা থেকে একজন মন্ত্রী এসে সভাপতিত্ব করলেন। আমাদের ইচ্ছে ছিল কোন বড় সাহিত্যিককে আনি কিন্তু—একটা ঢোক গিলে বললে, আর্থিক দিকটাও তো দেখতে হয়। শিশু পাঠাগার—অর্থাৎ···আর একটা ঢোক গিললে রবীন।

অর্থাৎ আর অর্থে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেতো দুগ্ধপোষ্য একটা শিশুতেও জানে। সাহিত্যিকের আশির্ব্বাণীর চেয়ে রাজপুরুষের আশ্বাস-বাণী শিশু-প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণে ফল সঞ্চার করে—তাতেই হামাটানা থেকে দু'পায়ে খাড়া হয়ে ওঠে ত্বরিত গতিতে এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করে। দেশের নাবালকত্ব ঘুচলে আপনজন কার না আনন্দ হয়!

গ্রামের পরিচয় নিতে নিতে অবশেষে রবীনের বাড়ীতে পৌছলাম।

বাড়ীটা ওর ছোটই। দু'তিনখানা ঘরে সদর অন্দর দু'মহল। দু'মহলের ব্যবধানও সামান্য—একই প্রাচীরের এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে—পথের বিজলী আলোর তেজ পথের ধারের গাছের ছায়ায় বহুলাংশে অপহৃত—ঘরের আলোটাও সেই অনুপাতে ম্লান। এলো-মেলো অগোছালো জিনিসপত্রের মত কয়েকটি ছোট আর মাঝারি শিশু—একটি ময়লা বিছানার উপরে হুড়োহুড়ি করছে। খুনটিটি ঝগড়া ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট হয়ে গেছে—ভূরি প্রমাণ অভিযোগ জমেছে সকলের মনে। রবীন ঘরে ঢুকতেই সঞ্চিত অভিযোগের বোঝা নিয়ে সবাই কোলাহল করে উঠ।

বাবা—বাবা—

অপরিচিত মানুষ দেখে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ে সন্দেহে বাপের পিছনে সরে গেল।

রবীন বললে, ইনি তোমাদের জ্যেঠু হন—প্রণাম কর।

তবু এদের ভয় কাটল না—পিছন থেকেই হুড়োমুড়ি করে সরে পড়ল একসঙ্গে। পাঁচীলের ও-পিঠ থেকে ওদের

কলকণ্ঠ শোনা গেল, মা—একজন লোক এসেছে—আমাদের জ্যেটু হন—সত্যি মা—

কোন্ জ্যেটু এলেন আবার? ভারি গলার আওয়াজ। প্রীতি-প্রসন্ন সুর নেই কণ্ঠে।

রবীন তাড়াতাড়ি বললে, বসুন, আমি আসছি। অন্দরের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সেটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

কিন্তু ফাটা দরজায় অনতি দূরের শব্দকে রোধ করার প্রয়াস নিষ্ফলই। ও-দিকের চাপা বিরক্তি শ্রুতিতে পৌছল।

এখন লোক জুটিয়ে গল্প করতে বসলে হবে না। দোকানের আনা নেওয়া—

হবে—হবে। চট করে চায়ের জল চাপিয়ে দাও তো।

শুধু চা ধরে দেবে ভদ্দরলোকের সামনে? যা হোক মানুষ!

মানে—ঘরে কিছু নেই? সুজি কি ঘি—

থাকলে তোমার খোসামোদ করি! হুট্ বলতে বাইরের লোক এনে তো ফেললে, এখন হ্যাপা সামলাক এই জন—না?

আস্তে আস্তে। কি কি আনতে হবে বলই না।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে এলাম। এটাও অন্দর-চৌহদ্দির মধ্যে, তবু বাইরে আছে বিস্তীর্ণ আকাশ। সেখানে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলছে অসংখ্য। দেশ-দেশান্তরের কত মানুষ এই দীপালির আরতি দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে অসীমের রহস্য-লীলায় মগ্ন হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেকার দাগ-দেওয়া জীবন উত্তীর্ণ হয়ে তারা বুঝি জীবন-পারাবারের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অনন্ত বিস্তারের চমৎকারিত্বে জীবনের তৃষ্ণা মিটে যায় না কি?

একি বাইরে এসে দাঁড়ালেন কেন? ঘরে গিয়ে বসুন, আমি চট করে ঘুরে আসছি। আমাকে প্রশ্নের অবকাশ মাত্র না দিয়ে বড় একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে রবীন সুরুৎ করে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, রবীন আমাকে আহ্বান করে এনে কেন এই বিপত্তি ঘটালে। এখানে যে উপকরণ ছড়িয়ে আছে—তা দিয়ে কি প্রেমের গল্প লেখা সম্ভব?

আকাশে তখনও একটি একটি করে নক্ষত্র-দীপ জ্বলছে। তিথিটা কৃষ্ণপক্ষ ঘেঁষা। আকাশ যতই কালো হয়ে উঠছে—নক্ষত্ররা আলো জ্বেলে সেই কালো পৃষ্ঠপটখানি ভেলভেটের সুষমায় ভরিয়ে তুলছে। লঘু মেঘের চাপল্যে সে যবনিকা ঈষৎ দুলছে—অন্তরের রহস্য উন্মোচনে আকাশ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

একি—এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? আসুন, আসুন—ঘরে আসুন।

এতক্ষণে ঘরের মধ্যে ভাল করে চাইলাম। মাঝারি গোছের ঘর—বহুদিন চুণকামের অভাবে দেয়ালের বর্ণ লোপ হয়েছে; মাঝে মাঝে পলস্তরা খসেছে এবং মেঝের খোয়াও উঠেছে দু'এক জায়গায়। ঘরের মধ্যে খান দুই ক্যালেণ্ডার ছাড়া ছবি বড় একটা নাই। একটা পায়াভাঙ্গা চেয়ার—নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে খাড়া করা রয়েছে। একটা রং-চটা বড় ট্রাঙ্কের মাথায় তুলো বার-করা একরাশ ময়লা বিছানা চাপানো—মেঝেতেও এই রকম ময়লা তোষক পাতা। এ ছাড়া কোথাও ময়লা কাপড় জামা জড়ো করা, কোথাও খানিকটা জল গড়াচ্ছে, কোথাও কলাই-ওঠা দু'একটা বাটি গেলাস—তারই সঙ্গে একটা লাট্টু আর ছেঁড়া কাগজ ও বই শ্লেট গড়াগড়ি খাচ্ছে। এখানে যে অহরহ খণ্ড প্রলয় ঘটে তার বহু চিহ্ন বিদ্যমান এবং এই সব গুছিয়ে রাখার পরিশ্রম করার মানুষও নাই। এখন অন্ধকারে ঢাকা এই গ্রামের পৃথিবীটাকে যেমন সুবিন্যস্ত মনে হচ্ছে—আমার আগমনে এই বাড়ীখানিতেও তেমনি নিস্তব্ধতা। কিন্তু এতো তার আসল রূপ নয়। এখানে নিত্য বাস করে রবীন কি করে প্রত্যাশা করে চমৎকার একটি প্রেমের গল্প চেখে চেখে তার রস উপভোগ করবে।

উপরোধে চা জলখাবার সারা হল। কিছুক্ষণ গল্প করলাম ওর সাংসারিক বিষয় নিয়ে। ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না, কিন্তু আতিথ্য-গ্রহণ করে ব্যক্তিকে তো অস্বীকার করা চলে না।

বিদায় নেবার আগে রবীন বললে, দাঁড়ান, একটি জিনিস আপনাকে দেব—বাড়ী গিয়ে পড়বেন।

একখানি বাঁধানো খাতা নিয়ে এল রবীন। বললে, এটি নিয়ে যান। এতে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের কথা আছে। গল্প নয়, ও আমি লিখতে পারি না। লিখতে

পারলে আপনাকে বলব কেন—প্রেমের গল্প লিখতে? ওটা ষ্টীলের ফ্রেম—ইমারৎ তৈরীর মালমসলা নিয়ে চমৎকার একটা কিছু গড়ে তুলতে পারেন। কারিগর আপনারা—আপনাদের বেশী কি বলব বলুন।

৩

বাড়ী এসে খাতাটা নিয়ে বসলাম। খাতাটায় লেখা আছে—অতি সাধারণ একটি কাহিনী। যে কাহিনী এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটে থাকে। সাধারণ ছেলেরা কোন কোন অসাধারণ মুহূর্ত্তে কল্পনার জাল বুনতে বুনতে অথবা কামনার নেশায় স্থান এবং কালের হিসাব ভুলে যায়, আর ভুলে গিয়ে সেই বিস্মৃত-ক্ষণে নিজেকে গল্পলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের সাধআহ্লাদগুলিকে খুসীমত পুরণ করে নেয়।

একটি ছেলের ভাগ্যে এমনি ঘটেছিল। কলেজে পড়বার সময় দেশ-বিদেশের কথা-সাহিত্য তার মনকে প্রলুব্ধ করে—সে সেই কাহিনীগুলিকে গেথে গেথে জীবনের চারধারে মালার মত সাজিয়ে রাখে। বাংলা-সাহিত্যেও তখন বস্তি নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে ফ্রয়েড অ্যাঙ্গেল্‌সরা অবচেতন মনের একাংশে আলোকপাত করে বিবাহ-বন্ধন আর সমাজ-স্থিতির মূলে রীতিমত আঘাত হানছেন। সে আঘাতের শব্দটা বাংলা কথা-সাহিত্যের রাজ্যেও খুব বেশী করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একদল তরুণ বস্তি-জীবনের মধ্যে এই অবচেতনার ক্রিয়াকে নানানভাবে লোভনীয় করে আঁকতে সুরু করেছেন। তরুণ মনে তার প্রভাবটা কল্পনা করুন একবার। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধার মনোবিকলনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কুমারসম্ভব মেঘদূতের রস নূতন করে অনুভূত হ'ল—রোমিও-জুলিয়েট আর কিরণময়ী-অভয়া-বিনোদিনীরা এক লাইনে এসে দাঁড়ালেন। সর্ব্বত্রই দেখা গেল—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে এবং সে প্রেমের অন্তর্নিহিত রহস্যে যে বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল—তাই নাকি মানব-জীবনের নিয়ামক।

তরুণটিও একদা ধরা পড়ল। তাকে বেশী দূর যেতে হয়নি। তাদেরই মামার বাড়ীর একাংশে যে ভাড়াটে এল—সেই পরিবারের একটি কিশোরী মেয়ে ওর চোখে পড়ল। চটুলা—কলহাস্যময়ী তরুণী। বয়ঃসন্ধিক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তনের কার্য্যটা দ্রুত সুরু হয়েছে। গমনে ব্রীড়া, দৃষ্টিতে কটাক্ষ এবং দেহ-ভঙ্গিমায় লাস্য প্রভৃতি মনোজয়ী অস্ত্রগুলি তার দেহতূণীরে সুবিন্যস্ত হচ্ছে। পাঁচীলের এ-পিঠ ও-পিঠের ব্যবধান আর রইল না—আত্মীয়তার সূত্র নির্ম্মাণ করে পরস্পরের কাছে এসে পৌছল। দুই পরিবার যত না পৌছল কাছে—দুই তরুণ মানুষ তার চেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। প্রথম মিলনের পুলক মদের নেশার মত তাদের আচ্ছন্ন করে রাখল—যদিও মদ খাওয়ার অভিজ্ঞতা ওদের কারও ছিল না। যাই হোক, এমনি করে কাটল কিছুদিন। তারপর একদিন মেয়ের অভিভাবক ছেলের অভিভাবকের কাছে এসে ওদের দু'জনের মনের মিল নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন—আর সে আলোচনার উদ্দেশ্যই হল যাতে ওদের মিলনটি পাকাপাকিভাবেই হয়ে যায়।

খবর পেয়ে ছেলের বাবা এলেন। তিনি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠে নিজস্ব বাড়ী, ছেলে কলেজে পড়ছে এবং রূপবান। বিত্ত এবং সম্মান দু'টি স্বর্ণস্তম্ভের উপর যে সৌধটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তাঁর মনে—তা যেন অকস্মাৎ ভূমিকম্পে নড়ে উঠল।

বললেন, তা কি করে হবে! কলেজের পড়া ওর এখনও শেষ হয়নি—উপার্জ্জনের ক্ষেত্রও ঠিক হয়নি—

কিন্তু আমি তো তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। মেয়ের অভিভাবক জবাব দিলেন।

ছেলের অভিভাবক উষ্ণ হয়ে উঠতেই মেয়ের অভিভাবক ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় বললেন, রাগের কথা নয়—এ হ'ল মান-সম্ভ্রমের কথা। তাহলে সব খুলেই বলি।

সব শুনে ছেলের বাবা অধর দংশন করলেন। বুঝলেন, অনিবার্য্য ঘটনার স্রোতে ওরা ভেসে চলেছে—এই বিবাহ না দিয়ে আর উপায় নাই। আত্মীয়তার সূত্র মৈত্রী করে অবাধ মেলামেশার সুযোগ কেন দিয়েছিলেন ওঁরা!

যথাসময়ে ওদের বিয়ে হল। ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের পিতা ঘর ছাড়লেন। তাঁদের কাল তো ফুরিয়ে গেছে—আর কেন? যাবার সময় বললেন, দোষ তোমার নয়, আমারও নয়। তবু জেনে রাখ তোমাদের ভালবাসা তোমাদের বাঁচাতে পারবে না অশান্তি থেকে। আমাদের

সমাজ তো সায়েবদের সমাজ নয়—মনে আমাদের যা জমে তা সহজে বার হয় না।

সে কথা যেন বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল। বিয়ের একটি বছর ফুরোল না—ওদের ভালবাসার উগ্রতা অকস্মাৎ হ্রাস হয়ে গেল। পরস্পরের সান্নিধ্যে যে উত্তাপ উত্তেজনা—যে কল-কাকলির প্রস্রবণ—যে সব-পেয়েছির পূর্ণস্বাদ পৃথিবীর রূঢ়তাকে ওদের চারিদ্দিক থেকে লুপ্ত করে দিত—তা ভাঁটায়-জাগা কাদা আবর্জ্জনার মত জেগে উঠল। ছেলেটি চাকরি নিলে—মেয়েটি সংসারের ছায়ায় সরে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু প্রখর রোদে ছায়া তখন প্রায় নিঃশেষিত।

মেয়েটি একদিন বললে, এত রাত করে কেন আস আপিস থেকে?

ক্লাব হয়ে আসি।

ক্লাব—না আর কিছু? বাঁকা সুরের প্রশ্ন।

ছেলেটি সবিস্ময়ে বলে, আর কি হতে পারে?

সে তুমিই জান। তোমাদের গুণে ঘাট নেই।

এসব কি বলছ অনু?

বলছি ঠিকই। বিয়ের আগে যে কুমারী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে—সে যে নির্দ্দোষ এ বিশ্বাস আমার নেই।

ছেলেটি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। এই কলঙ্কের বোঝা তাকে বইতে হবে আজীবন? হায়—যাকে একদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল—তারই মন থেকে উঠছে এই অবিশ্বাসের হলাহল? সত্য বটে—যৌবনের ধর্ম্মে কামনার উগ্রতা থাকে। ভালবাসা দেহজ আকর্ষণে জন্ম নেয় বলেই কি দেহ-ভোগেই তার সার্থকতা? ওর সঙ্গে মনটাও কি জড়িয়ে পড়ে না? মনটা কি ছড়িয়ে পড়ে না আর একটি মনের উষ্ণ পরিমণ্ডলে? এবং সেই উষ্ণতা দিয়ে রচনা করে না একটি অনবদ্য মহিমা—জ্যোতি-বিচ্ছুরিত ভুবন? কখনও কি অনুভব করেনি যে ভালবাসার মন্দিরে—এই কামনাই ফুল হয়ে আহ্বান করে তার দেবতাকে?

ছেলেটি—সবই ত্যাগ করে—ক্লাব, বন্ধুসঙ্গ; তবু নিস্তার নাই।

জানি—মন তোমার পড়ে আছে আর এক জায়গায়। বিয়ে করে ফাঁদে পড়েছ, না হলে সৌখীন প্রজাপতি তুমি, ফুলে ফুলে মধু খেয়েই আনন্দ করতে।

সব ছেড়ে—গল্পের বই পড়াতে মনোযোগী হল ছেলেটি। প্রেমের গল্প সে পরম আগ্রহে গিলতে থাকে। মিলিয়ে দেখে—যে চিত্রটি একদিন মনেতে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়েছিল, তার রঙ—রেখা-লোকের তুলিকায় যথাযথ ধরা পড়ল কিনা। দেহকে ছাড়িয়ে প্রেম পৌছল কিনা সৌন্দর্য্যের সৌরমণ্ডলে।

বৈষ্ণব কবির লেখা মনে পড়েঃ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে চিত ভোর;
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

কিন্তু গুণের সৌরভে চিত্ত পরিপূর্ণ হল কই!

ছেলেটি মন্তব্য লিখলেঃ

যে আকর্ষণ বিয়ের আগে অনুভব করেছি—সেই হল প্রেম, আসুক সে দেহকে ধরে। আর যে দেহভোগ-লালসা বিয়ের পর জন্মায়—তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক মাত্র নাই। পুরাতন অভ্যাসের জীর্ণতায় তা প্রেমকে তো নষ্ট করেই, মানুষকেও তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আমরা শুধু মাত্র সান্ত্বনা পেতে পারি প্রেমের গল্প পড়ে। জমাট প্রেমের গল্প শুধু হারানো যৌবনের উদ্দীপনা এনে দেয় না—তা জীবনকে জাগ্রত করে। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সান্ত্বনা শুধু নয়, ওর মধ্য থেকে আনন্দ আহরণ করে প্রতি মুহূর্ত্তে। তাই তো সত্যিকারের জীবন।

দোতলার সিঁড়িটায় পা দিয়ে দেখলাম—রবীন কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেছে। ওর কাহিনীবদ্ধ খাতাটা তখন আমার হাতে রয়েছে, আর মনে বাজছে মন্তব্যগুলি। ওকে ডাকলাম।

সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করে ও আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ওর হাতে খাতাটা দিয়ে বললাম, ছেলেটি যা লিখেছে—তা কি তোমার জবানী?

রবীন হেসে বললে, আমার নয়, সকলকারই কথা। ভাল করে প্রেমের গল্প লিখুন—বাঁচতে দিন আমাদের। না হলে ওপরে-ওঠা আর নীচে-নামার ধাপগুলি কোন দিনই শেষ করতে পারব না আমরা। বলে শব্দ করে হেসে উঠল।

রবীনের অনুরোধটা অকৃত্রিম—কিন্তু হাসিটাতে প্রাণ নেই।

কোন কথা না বলে ওর পাশে পাশে চলতে লাগলাম।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যদর্শন মহর্ষি কপিল-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং কাপিল দর্শন নামেও পরিচিত। মহর্ষি কপিল কে এবং কোন্ যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলা হয়। কথিত আছে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার নাম আদি বিদ্বান। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত এক শ্লোকে আছে, আদি বিদ্বান্ কপিল (কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইলেও) মহর্ষি আসুরির প্রতি করুণাবশতঃ নির্ম্মাণ-চিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সাংখ্য-তন্ত্র বলিয়াছিলেন। রামায়ণে কপিলমুনি কর্ত্তৃক সগরবংশ-ধ্বংসের বিবরণ আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি ব্রহ্মার পুত্র। ভাগবত মতে তিনি বিষ্ণুর এক অবতার, দেবহূতির গর্ভসম্ভূত। কেহ কেহ তাঁহাকে অগ্নির অবতারও বলিয়াছেন। মহর্ষি কপিল স্বীয় শিষ্য আসুরিকে যে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, আসুরি তাহাই স্বশিষ্য পঞ্চশিখকে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এক আসুরির উল্লেখ আছে। তিনি ও সাংখ্যপ্রবক্তা আসুরি সম্ভবতঃ অভিন্ন। সাংখ্যতত্ত্ব আর্য্যসমাজে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্যসন্তানের পক্ষে প্রত্যহ পিতৃপুরুষের তর্পণ বিহিত। পিতৃপুরুষদিগের তর্পণের পূর্ব্বে সনক, সনন্দ ও সনাতনের সঙ্গে কপিল, আসুরি বোঢ় ও পঞ্চশিখেরও তর্পণ করিতে হয়।* ইহা হইতে আর্য্যসমাজের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করিতে পারা যায়। গৌড়পাদ তাঁহার সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে সাংখ্যাচার্য্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সাতজনের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সনক, সনন্দ, সনাতন ও বোঢ়র ঐতিহাসিকতা ও দার্শনিক মত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থাবলী

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য: (১) ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, (২) সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, (৩) তত্ত্ব-সমাস, (৪) বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্য-তত্ত্ব কৌমুদী (সাংখ্যকারিকার ভাষ্য)। (৫) বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য ও সাংখ্যসার (৬) গৌড়পাদ-রচিত সাংখ্যকারিকাভাষ্য (৭) নারায়ণ-রচিত সাংখ্যচন্দ্রিকা, (৮) চরকসংহিতা (৯) পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য, (১০) বাচস্পতি মিশ্র-রচিত ব্যাসভাষ্যের টীকা তত্ত্ব-বৈশারদী, (১১) বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক, (১২) ভোজ-রচিত ভোজবৃত্তি এবং (১৩) মহাভারতের অন্তর্গত অনুগীতা (অশ্বমেধিক পর্ব্ব), সাংখ্যযোগ কথন (শান্তিপর্ব্ব), জনক-পঞ্চশিখ সংবাদ (শান্তিপর্ব্ব), পঞ্চশিখ জনদেব সংবাদ (শান্তিপর্ব্ব)। (১৪) অনিরুদ্ধ রচিত সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্য, (১৫) সীমানন্দ-রচিত সাংখ্যতত্ত্ব বিবেচন, (১৬) ভাব গণেশ রচিত সাংখ্যতত্ত্ব-যাথার্থ্য-দীপন, (১৭) মহাদেব-রচিত সাংখ্যসূত্র বৃত্তিসার, (১৮) নাগেশরচিত লঘুসাংখ্যসূত্র বৃত্তি।

কাল-নির্ণয়

সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে কোনটিই যে মহর্ষি কপিল-প্রণীত নহে, ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত। কিন্তু সাংখ্যদর্শন যে অতি প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েবরের মতে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শন প্রাচীনতম। মহাভারতে সাংখ্য ও যোগদর্শন সনাতন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতপুরাণে আছে যে সাংখ্যদর্শনের অতি সামান্য অংশই বর্ত্তমান আছে, অধিকাংশই কালবশে নষ্ট হইয়াছে (কাল-বিপ্লুত)। সাংখ্যশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ যে বিনষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞান ভিক্ষুও তাহা বলিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধের পূর্ব্বে যে সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অধ্যাপক গার্বের মতেও কপিল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধশাস্ত্রেও কপিল বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম। তাহার অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে যে কপিলের দর্শন প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের যে সূত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে আদি বিদ্বান কপিল কৈবল্যপ্রাপ্তির পরে নির্ম্মাণদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আসুরিকে সাংখ্যদর্শন শিক্ষা দিয়াছিলেন। কতদিন পরে তাহার উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের পূর্ব্বে আসুরি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চশিখ ছিলেন আসুরির শিষ্য। সুতরাং তিনিও খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধা নাই।

সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস এই তিন গ্রন্থের মধ্যে সাংখ্যকারিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মাধবাচার্য্যের (১৩৫০ খৃঃ অঃ) সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে সাংখ্যসূত্র ও তত্ত্বসমাসের উল্লেখ নাই। একাদশ শতাব্দীতে রচিত আলবেরুণির ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও তাহার গৌড়পাদ-রচিত ভাষ্যের সহিত আলবেরুণির যে পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু সাংখ্যসূত্র ও তত্ত্বসমাসের সহিত

---

* সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

যে তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র-রচিত সাংখ্যকারিকার ভাষ্য সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী নবম শতাব্দীর গ্রন্থ।* তাহাতে সাংখ্যসূত্র ও তত্ত্বসমাসের উল্লেখ নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রচিত কোনও ভাষ্য সাংখ্যসূত্রের নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত গুণরত্নের গ্রন্থেও এই দুই গ্রন্থের উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে সাংখ্যপ্রবচন সূত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কিন্তু গার্বের মতে উক্ত গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত।

বাচস্পতি মিশ্রের ভাষ্য রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে যে সাংখ্যকারিকার অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে চীন দেশে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরমার্থ নামে এক বৌদ্ধ-প্রচারক চীন দেশে গমন করিয়া চৈনিক ভাষায় "সুবর্ণ-সপ্ততি-শাস্ত্র" নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সাংখ্যকারিকার অনুবাদমাত্র। সুবর্ণসপ্ততিশাস্ত্র নাম হইতে মনে হয়, তখন সাংখ্যকারিকায় সত্তরটি কারিকা ছিল। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সাংখ্যকারিকা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। অনেকের মতে ইহা প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সাংখ্যকারিকার ৭০ ও ৭১ কারিকায় আছে "মুনি কপিল এই পবিত্রতম শাস্ত্র অনুকম্পাবশতঃ আসুরিকে দান করিয়াছিলেন এবং আসুরি পঞ্চশিখকে দান করিয়াছিলেন, পঞ্চশিখ এই শাস্ত্র "বহুধা" করিয়াছিলেন। শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহা প্রাপ্ত হন, এবং ইহার সিদ্ধান্ত সম্যক অবগত হইয়া আর্য্যাকারে (আর্য্য=ছন্দ বিশেষ) প্রকাশিত করেন।" ৭২ কারিকায় আছে, ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্য দর্শনের) সমগ্র অর্থ সাংখ্যকারিকার ৭০ কারিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল আখ্যায়িকা ও পরবাদ (মতান্তর) বর্জ্জিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে সাংখ্যদর্শনের নাম ছিল ষষ্টি-তন্ত্র এবং তাহাতে ৭০টি কারিকা ছিল।

মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, পরমার্থ-কর্ত্তৃক অনূদিত সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকার ভাষ্যে আছে, "কপিল এক ঋষি ছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম-প্রজ্ঞা-বৈরাগ্য-ও-মোক্ষ-সমন্বিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আসুরিনামা এক ব্রাহ্মণকে সহস্র বৎসর যাবৎ দেবারাধনা করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি কি গৃহস্থের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছ?" সহস্র বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় আসুরিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আসুরি বলিয়াছিলেন যে তিনি গৃহস্থের অবস্থাতে সন্তুষ্টই আছেন। ইহার পরে আবার যখন তিনি আসুরির নিকট আসেন, তখন আসুরি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।" এই আখ্যায়িকা হইতে পরমার্থ যে কপিল ও আসুরিকে অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখিয়াছেন, যে চীনদেশে প্রবাদ আছে যে বিন্ধ্যবাস-নামা এক ব্যক্তি বার্ষগণ-রচিত এক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করেন। বিন্ধ্যবাস ও সাংখ্যকারিকা-রচয়িতা যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্যকারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চীনদেশীয় প্রবাদ অনুসারে বিন্ধ্যবাস বসুবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী। বসুবন্ধুর গ্রন্থে সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয় কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছিল। বসুবন্ধু চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরকৃষ্ণ তৃতীয় শতাব্দীতে সাংখ্যকারিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে।

বিজ্ঞানভিক্ষু যে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চম অধ্যায়ে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন (পরবাদ) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দৃষ্টান্তমূলক কয়েকটি কাহিনী আছে। যে পরবাদ ও আখ্যায়িকা সাংখ্যকারিকা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা ইহাতে আছে। এই গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত মনে করিবার কারণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। বালশাস্ত্রীর মতে সাংখ্যপ্রবচন সূত্র বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত এবং বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রগুলি রচনা করিয়া নিজেই তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে সাংখ্যসূত্রাবলীর অনেকগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহাতে বিজ্ঞানভিক্ষু ২।৪টি সূত্র সংযুক্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যাবতীয় সূত্রই যে তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে যেমন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বার্ষগণ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সূত্র আছে, তেমনি হয়তো দুই একটি বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত সূত্রও থাকিতে পারে। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটি আছে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে। সাংখ্যকারিকা সম্পূর্ণ দ্বৈতমূলক, কিন্তু সাংখ্যসূত্রের সহিত অদ্বৈত ঈশ্বরবাদের বিরোধ নাই। গার্বে লিখিয়াছেন "সাংখ্যসূত্রকার অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে সাংখ্য দর্শনের সহিত সগুণ ঈশ্বরবাদ, ব্রহ্মের নির্বিশেষ একত্ব, ব্রহ্মের আনন্দ-রূপত্ব, এবং স্বর্গলোকে নিঃশ্রেয়স্-প্রাপ্তির বিরোধ নাই।" গার্বের মতে সাংখ্যসূত্রের উপর বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরবাদী। তিনি ঈশ্বরবাদের সহিত সাংখ্যদর্শনের ভেদ লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানামৃত নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—"মহর্ষি কপিল বেদান্তসাগর মন্থন করিয়া অমৃত দ্বারা সাংখ্যকূপসকল পূর্ণ করতঃ ঋষিদিগকে সেই অমৃত পান করাইয়াছিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন "কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু লোকহিতের জন্য সাংখ্যশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কোন কোনও বেদান্তী

* Indian Philosophy by Radha Krishnan. Vol. II. P 255

বলেন—সাংখ্যশাস্ত্রকার কপিল বিষ্ণু নহেন, তিনি অন্য ব্যক্তি, অগ্নির অবতার। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যকার কপিলই বিষ্ণুর অবতার।" সাংখ্য-দর্শন আদিতে নিরীশ্বর ছিল, অথবা বৌদ্ধ প্রভাবে উহা নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য।

অধ্যাপক মোক্ষমূলার তত্ত্বসমাসকেই প্রাচীন কাপিলসূত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতে সকল শাস্ত্রই সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। সুতরাং সাংখ্যদর্শনও যে ব্রহ্মসূত্র, জৈমিনিসূত্র প্রভৃতির মতো সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল, ইহা খুবই সম্ভবপর। সে সূত্রগুলি কোথায় গেল? সাংখ্যকারিকা যে সেই প্রাচীন সূত্রাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞান ভিক্ষু যে তত্ত্বসমাসকে সাংখ্যকারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকা পাঠ করিয়া তাহাই ধারণা হয়। সাংখ্যসূত্র ও তত্ত্বসমাস—সাংখ্যকারের এই দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিবার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা তত্ত্বসমাসে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সাংখ্যসূত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বলিয়াছেন। যদিও "তত্ত্বসমাসে" কতকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ আছে, এবং তাহার উপক্রমণিকার ভাষা আধুনিক কালে রচিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে, তথাপি মোক্ষমূলার সূত্রাকারে লিখিত এই গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন কাপিলসূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াছেন।

তত্ত্বসমাসে পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল প্রাচীন সাংখ্য মত এবং সে মত নিরীশ্বর ছিল না। নিরীশ্বর বলিয়া চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ মত যে সমাজে ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জিত হইয়াছিল, নিরীশ্বর হইলে সাংখ্যবাদ সেই সমাজে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত না।

সাংখ্য শব্দের অর্থ

"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতেঃ
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ, তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

এই ভারতবাক্য মতে সংখ্যা-নিরূপণ, প্রকৃতি কথন ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব-নিরূপণ যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই সাংখ্য। আবার "সংখ্যা সম্যক্ বিবেকেন আত্মকথনমিত্যর্থঃ অতঃ সাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়তয়া তৎকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যং ইত্যাদি শ্রুতিষু" অর্থাৎ সম্যক বিবেচনাপূর্ব্বক আত্ম-কথনের নাম সংখ্যা; সাংখ্যশব্দের যোগরূঢ়ার্থে শ্রুতিতে সাংখ্যশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ভাষ্যে ইহা বলিয়াছেন। কুমার-সম্ভবে "প্রসংখ্যান" শব্দ "আত্মতত্ত্বের ধ্যান" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব)। সংখ্যা ও প্রসংখ্যান একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে শাস্ত্রে সম্যক আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে সাংখ্য বলা যায়। গীতায় "সাংখ্য" শব্দ সাংখ্য মত ও সাংখ্য মতাবলম্বী উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম)। ৫।৫

কুলীন-গ্রাম

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে কুলীন-গ্রাম-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি পাঠ করিলে হৃদয় স্বতঃই ঐ স্থানের রজে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়।

প্রভু কহে, কুলীন-গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥
কুলীন-গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেই কৃষ্ণ গায়॥১

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—রচয়িতা শ্রীমালাধর বসু-গুণরাজখানের প্রগাঢ় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি এবং তৎপুত্র শ্রীসত্যরাজ-খানোপাধিক শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীশঙ্কর, শ্রীবিদ্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের প্রেমসেবায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই সকল মহাভাগবতের সম্পর্কে কুলীন গ্রামের কুকুরকে পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন। যে গ্রামে একসঙ্গে এতসংখ্যক মহাভাগবতের বাস, সেই গ্রামে যে শূকরচারণকারী ডোমের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম বহির্গত হইবে, তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য কি?

হাওড়া—বর্ধমান কর্ড লাইনে হাওড়া হইতে ৪১ মাইল দূরে জৌ-গ্রাম নামক ষ্টেশন। কলিকাতা ও বর্ধমানের মধ্যে একটি প্রধান (Main) লাইন আছে। আর কলিকাতা ও বর্ধমানের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাইবার জন্য পরবর্তীকালে একটি সোজা (Chord) লাইন নির্মিত হইয়াছে।

এই লাইনটি বেলুড়-ষ্টেশনের পর হইতে পৃথক্ হইয়া বর্ধমানের দুই ষ্টেশনের পূর্ববর্তী 'শক্তিগড়'-নামক ষ্টেশনে Main Lineর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নূতন Chord Line নির্মিত হইবার পূর্বে হাওড়া—বর্ধমান Main Lineর মেমারী ষ্টেশন বা বৈঁচি ষ্টেশন হইতে কুলীন-গ্রামে যাইবার পথ ছিল। কুলীন-গ্রাম মেমারী-ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু নূতন কর্ড লাইনের জৌ-গ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া হাঁটা পথে প্রায় তিন মাইল এবং গরুর গাড়ীর পথে প্রায় চারি মাইলের মধ্যে কুলীন-গ্রাম পাওয়া যায়। জৌ-গ্রাম ষ্টেশন হইতে পূর্বোত্তর কোণে প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর রাণাপাড়াগ্রাম, রাণাপাড়া-গ্রামের প্রায় অর্ধ মাইল পরে কুলীন-গ্রাম। রাণাপাড়া-গ্রামে শ্রীশ্যামদাস

১। চৈ. চ. আ. ১০।৮২-৮৩

আচার্যের প্রকাশিত শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ আছেন।—১৬১৪ শকে (১০৯৮ বঙ্গাব্দে) উক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দজীর যে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা ১১ই (11E) গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-নিবাসী বলাই চাঁদ নাথখানের পুত্র শ্রীবৈদ্যনাথ নাথখান ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৬১৪ শকে নির্মিত মন্দিরটি দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখিয়াছেন। রাণাপাড়ার ঠাকুর বাড়ীটি যে শ্রীশ্যামদাস আচার্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁহার পরিচয় আমরা কুলীন-গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও পাইলাম না। এই শ্রীবিগ্রহের তিনজন বর্তমান সেবাইতের নাম—(১) শ্রীপার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী ও (৩) শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্প্রতি শ্রীবিগ্রহের সেবার্থ চারি বিঘা ধান্য জমি দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ দেখিতে না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সুব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পাঁচ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের ত্রয়োদশ পর্যায়ে শ্রীগুণরাজ খান আবির্ভূত হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্‌দত্ত উপাধি—'গুণরাজ খান।' পর্যায় যথা—

শ্রীমালাধর বসু, উপাধি—'গুণরাজ খান'
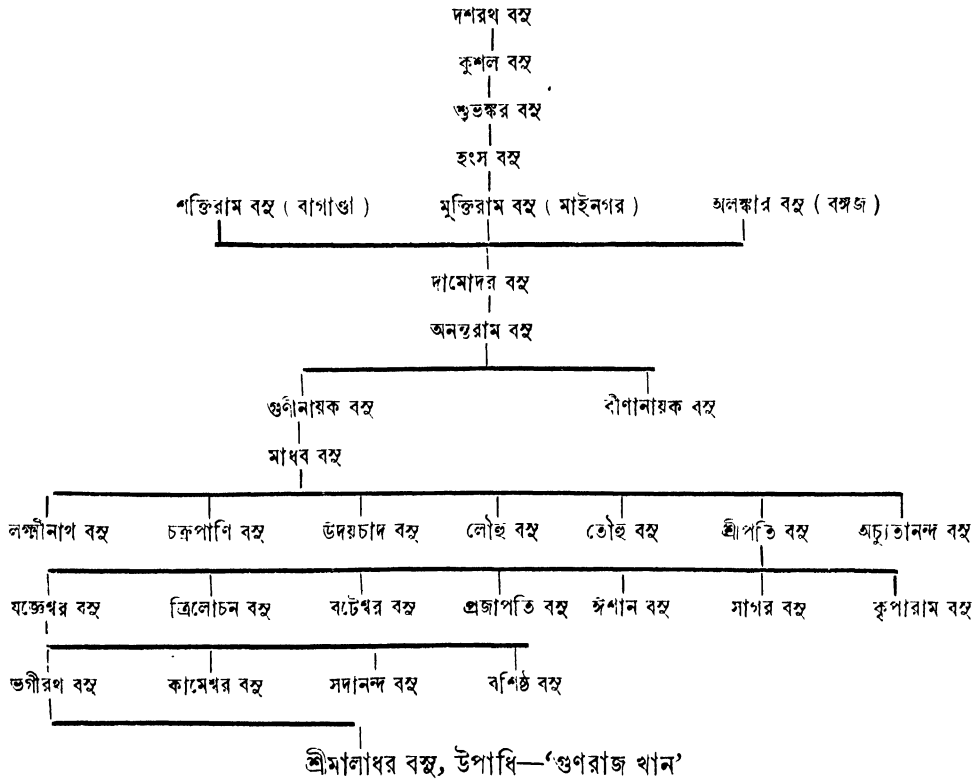
শ্রীমালাধরের চৌদ্দ জন পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি—'সত্যরাজ-খান।' তাঁহার পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। শ্রীরামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্যায়। শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুর বিবাহ করেন নাই, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কুলীন-গ্রামে বাস করিয়া ভজন এবং বসুবংশীয়গণের প্রতি কৃপা-বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ খান্ প্রভৃতি ভাগবতগণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপোদ্ভাসিত হইয়া কুলীন-গ্রামে শ্রীনাম-সংকীর্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এইজন্যে শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো ল'ন অপতিত॥
তাঁ'র উপশাখা—যত কুলীন-গ্রামী জন।
সত্যরাজ—আদি—তাঁ'র কৃপার ভজন॥২
কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য—চৈতন্য প্রাণধন॥
প্রভু কহে—'কুলীন-গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥'
কুলীন-গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥৩

২। চৈ. চ. আ. ১০।৪৩, ৪৮ ;
৩। ঐ ১০।৮০-৮৩

শ্রীগৌরসুন্দর কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দকে প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্বে রথ টানিবার জন্য পট্টডোরী আনিবার কৃপাদেশ করিয়াছিলেন। এই কৃপাদেশের মধ্যে একটি গূঢ় ভজনের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

কুলীন-গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥৪

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুণরাজ খান ও তাঁহার বংশকে, এমন কি তাঁহার গ্রামের কুক্কুরাদি পশুকেও নিজপ্রিয় বলিয়া স্বমুখে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা একবাক্য তাঁ'র আছে প্রেমময় ॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁ'র বংশের হাত ॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥৫

কেহ কেহ বলেন—"শ্রীগুণরাজ খান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অতি অল্পকাল পূর্বেই অর্থাৎ ১৪০২ শকে যখন গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, তখন তাঁহার পৌত্রের (অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ বসুর) পক্ষে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থাশ্রমের পার্ষদ' হওয়া অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" কিন্তু শ্রীমালাধর বসু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের ন্যায় অতি বৃদ্ধ বয়সে যদি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া থাকেন, তবে সেই সময় তাঁহার পৌত্র শ্রীরামানন্দ বসু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহা কিছু অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রীরামানন্দ বসুর উপাধিই 'সত্যরাজ' অর্থাৎ শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীরামানন্দ বসু একই ব্যক্তি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীরামানন্দ বসু দুই জন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥৬

কুলীন-গ্রামে প্রাচীন গোপেশ্বর-শিবমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীরে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তন্মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে "সত্যরাজ খান তস্য পুত্রঃ শ্রীরামানন্দ বসু" এই বাক্যটি দৃষ্ট হয়। সুতরাং সত্যরাজ খানের পুত্র যে রামানন্দ বসু এ বিষয়ে ইহাও একটি অকাট্য প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্য বসুবংশের প্রাচীন কুলজী ও মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপির প্রমাণসমূহ উপেক্ষা করিয়া অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীমালাধর বসু ১৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় তের বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংলা পদ্যানুবাদ—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে সমাপ্ত করেন৭ এবং গৌড়াধিপতি দ্বারা 'গুণরাজ-খান' উপাধিতে ভূষিত হ'ন।৮ প্রসিদ্ধ গৌড়েশ্বর 'হোসেন শাহ' গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার পূর্বেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থের ভণিতায় ব্যবহৃত গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত 'গুণরাজ-খান্' উপাধি অন্য কোনও পূর্ববর্তী গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন,—ঐ সময় গৌড়ের সিংহাসনে শমস্ উদ্দিন্ ইউসফ্ শাহ্ (১৪৭৪-৮২ খৃঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিই শ্রীমালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান্' উপাধি প্রদান করেন।৯ আবার কাহারও কাহারও মতে ঐ গৌড়েশ্বর—সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ)।১০

শ্রীগোপেশ্বর শিবের মন্দির—কুলীন-গ্রাম

শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কুলীন-গ্রামবাসী ভাগবতগণ একটি কীর্তনীয়া-সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। প্রতি

৪। ঐ ম ১৫।৯৮
৫। চৈ. চ. ম. ১৫।৯৯—১০১,
৬। ঐ ম ১৫।১০২

৭। তেরশ' পঁচানই শকে গ্রন্থ-আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥
—কৃঃ বিঃ ১০০ তম গীত, ২২১ পৃঃ গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং

৮। গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—'গুণরাজ-খান্' ॥
—কৃঃ বিঃ ১০০ তম গীত, ২২ পৃঃ গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং

৯। ডাঃ মহম্মদ্ শহীদুল্লাহ; ১০। ডাঃ সুকুমার সেন-প্রণীত 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় সং, ১০৭ পৃঃ,

বৎসর তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সুখার্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে কীর্তন করিতেন এবং শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ সেই সংকীর্তন-মণ্ডলীতে নৃত্য করিতেন—

কুলীন-গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥১১

শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দের পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীবৈষ্ণব-সেবা ও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন গৃহস্থের একান্ত কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলাগত কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীসত্য-রাজাদিপ্রমুখ ভক্তগণকে যথাক্রমে তিন বৎসরে 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম'—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ জ্ঞাপন করেন। এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবাই গৃহস্থের কর্তব্য। মহাপ্রভু প্রথম বৎসরে বলিলেন, যাঁহার

শ্রীমদনগোপালের শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির—কুলীন-গ্রাম

মুখে একটি কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ যাঁহার নামাভাস হয়, তিনিই বৈষ্ণব।

অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥১২

দ্বিতীয় বৎসরে শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলাগত কুলীনগ্রামিগণকে প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, যিনি রুচি ও প্রীতির সহিত অনুক্ষণ নিরপরাধে শ্রীনামভজনপর, তিনিই বৈষ্ণবতর—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥১৩

তৃতীয় বৎসরে নীলাচলাগত শ্রীসত্যরাজ প্রমুখ কুলীনগ্রামিগণের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বৈষ্ণবতম বা মহাভাগবতোত্তমের লক্ষণ বলিলেন—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥১৪

কুলীন-গ্রামে 'চৈতন্যপুর' ও 'চৈতন্যপুর পটী' নামক স্থানে বসু-বংশীয়গণের ভদ্রাসন ছিল। সম্ভবতঃ শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুরের সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে সেই স্থানটির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। উহার চতুর্দিকে গড় ও প্রাকার ছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থান দর্শন করিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"আমরা মহানুভব শ্রীশ্রীমালাধর বসু, উপাধি—গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের বাসস্থানের চিহ্ন ও তৎচতুর্দিকস্থ গড়ের সীমা দর্শন করিতে গেলাম।"১৫ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও তখন উক্ত কুলীন-গ্রামবাসী গুণরাজখান মহাশয়ের বাস্তুভিটার চিহ্ন ও তৎচতুর্দিকস্থ গড় ও প্রাচীরাদি দর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন ক্ষেত্রাদি-কর্ষণের ফলে অনেকটা লুপ্ত হইয়া গেলেও অদ্যাপি সেই স্থান 'বসু ঠাকুরের গড়বাড়ী, 'রামানন্দ ঠাকুরের গড়বাড়ী', 'চৈতন্যপুর-পটী,' চৈতন্যপুর' প্রভৃতি নামে কথিত হয়। কুলীন-গ্রামে প্রাচীন শ্রীগোপেশ্বর শিবমন্দিরের পশ্চাতে পূর্বদিকে মন্দিরের ঊর্ধ্ব-প্রদেশের ইষ্টকে উৎকীর্ণ একটি লিপির মধ্যেও "শকাব্দ ১৬৬৬ শিবঠাকুর সত্যরাজ খাঁ তস্য পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুরের গড়বাড়ী···সাকিন চৈতন্যপুর"—এইরূপ লিখিত আছে। ইহা হইতেও জানা যায় যে, বসু-ঠাকুরগণের ভদ্রাসনেরই নাম চৈতন্যপুর হয়। শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য-দেবের নামানুসারে স্বীয় বাস্তুভিটার নামকরণ করিয়াছিলেন।

কুলীন-গ্রামের 'চৌধুরী পাড়া' পল্লীতে যে কেলিকদম্ব-বৃক্ষের তলে নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্বপ্রথমে কুলীন-গ্রামে আসিয়া—উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন কেলিকদম্ব বৃক্ষটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন সম্মান করিতেন, এরূপও কথিত হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের 'ভোজন-স্থান'ও বলা হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকায় এই স্থানকে 'শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভোজন স্থান' বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই স্থানটি গ্রামের ঘন বসতির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া শ্রীল রামানন্দবসু ঠাকুর কুলীন-গ্রামের দক্ষিণাংশে একটি নির্জন স্থানে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ভজন-স্থান প্রদান করেন। বর্তমানে কেলিকদম্ব বৃক্ষের উত্তর পশ্চিম দিকে একটি তুলসী-বেদী দৃষ্ট হয়। এই স্থানে ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দশী বা অনন্তচতুর্দশী তিথিতে শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব হয়। সেই দিন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনপাট হইতে শ্রীরামানন্দ বসুর

১১। চৈ. চ. ম. ১০।৪৪ ; ১২। ঐ ১৫।১১১ ; ১৩। চৈ. চ. ম. ১৬।৭২

১৪। ঐ ম ১৬।৭৪ ; ১৫। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, বৈশাখ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ ১০ম পৃঃ।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্তি কেলিকদম্বের তলদেশে আনয়ন করিয়া তৎসম্মুখে মালসা ভোগ এবং চিড়ামহোৎসব ও শ্রীনাম-কীর্তনাদি উৎসব হইয়া থাকে।

উক্ত কেলি-কদম্ববৃক্ষ হইতে প্রায় অর্ধ ফার্লং পূর্বদক্ষিণে শ্রীরঘুনাথ, শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবিগ্রহত্রয় ও তৎপার্শ্বে শ্রীহনুমানের দারুময়ী শ্রীমূর্তি একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন। কথিত হয়, এই শ্রীরঘুনাথজী-শ্রীবিগ্রহ শ্রীরামানন্দ বসুর সমসাময়িক কাল হইতেই এই স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্বের মন্দিরটি ভগ্ন হইলে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কুলীন-গ্রাম-নিবাসী স্বধামগত উকিল প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের অধস্তন জনৈক আত্মীয়ের অর্থানুকূল্যে উক্ত মন্দির সংস্কৃত হয়।

শ্রীরঘুনাথ-মন্দিরের পশ্চিমে দশভূজা ভুবনেশ্বরীর মন্দির। শ্রীরঘুনাথ-মন্দিরের পূর্বপার্শ্বে 'দেবকুণ্ড'-নামক একটি শুষ্কপ্রায় কুণ্ডের ব্যবধানে পাঠক-পাড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রত্যাদিষ্ট পট্টডোরির যজমান শ্রীরামানন্দ বসুঠাকুর এই শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে একটি প্রাচীন শৈলী নারায়ণ মূর্তি ও শৈলী গরুড়মূর্তিও অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় বসুবংশীয় শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও চেষ্টায় একটি নূতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে। পুরীর ন্যায় এই স্থানে প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথের স্নান-যাত্রা, নবযৌবন ও রথযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে। মন্দিরের সীমানার মধ্যেই স্নানবেদী এবং বাহিরে কিছু দূরে একটি জীর্ণ রথ দৃষ্ট হয়। কুলীন-গ্রামে রথযাত্রার সময় বিশেষ মেলা হয়।

শ্রীরামানন্দ বসুঠাকুর যে ব্রাহ্মণকে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায়েৎ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি ও সেবার জন্য যে সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই সেবাইত-ব্রাহ্মণের বংশলোপ পাইয়াছে। মূল সেবাইতবংশের সর্বশেষ সেবাইতের নাম ছিল—সতীশচন্দ্র অধিকারী। ইঁহার পর তাঁহার নাতজামাই সুধীরচন্দ্র বালিয়াল সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবার্থ বিরাট ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। এখন মাত্র ৮।১০ বিঘা ধানী জমি অবশিষ্ট আছে। মাসিক দেড়টাকা বেতনভুক্ অর্চক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাঠক মহাশয় সেবাইতের পক্ষে অর্চন করেন। উক্ত পাঠক মহাশয় শ্রীরঘুনাথজী শ্রীবিগ্রহেরও অর্চক। পূর্বে এই স্থানে পাঠক-বংশীয়গণের খ্যাতি ছিল। ৬৬ বৎসর পূর্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই কুলীন-গ্রামে এক "বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পাঠক মহাশয়ের বাটী" দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।[১৬] শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র পাঠক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ পরম বৈষ্ণব ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু বর্তমানে তাঁহাদের সেই খ্যাতি আর নাই।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রায় এক ফার্লং দূরে শ্রীশ্রীমদন-গোপালদেবের সুপ্রাচীন ও সুদৃশ্য মন্দির। শ্রীশ্রীমদনগোপালদেব 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা শ্রীমালাধর বসুরও পূর্বে কুলীন-গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শ্রীসত্যরাজ খান এই মন্দির নির্মাণ করেন। মূল মন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে ও দক্ষিণদ্বারের উপরিভাগে মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ অনেকগুলি লিপি দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা মন্দির-সংস্কার ও তদুপরি চূণকামাদির দ্বারা অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ এই শ্রীমদনগোপালকে শ্রীসত্যরাজ খান—প্রতিষ্ঠিত, কেহ বা শ্রীরামানন্দ বসুরও প্রতিষ্ঠিত বলেন। শ্রীসত্যরাজ খানের পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্যের বংশধর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী মহাশয় বলিলেন, শ্রীমদনগোপালের মন্দিরের গাত্রের উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে এই মন্দির শ্রীসত্যরাজখান নির্মাণ করিয়া পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ-

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী—কুলীন-গ্রাম

দেবাচার্যকে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির ও সেবার্থ সহস্র বিঘা ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। শ্রীমদনগোপালদেব সুঠাম—সুন্দর শৈলীশ্রীমূর্তি। তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে দারুময়ী শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা মূর্তি। উক্ত কৃষ্ণদেবাচার্যের বংশধর ছয়জন অংশীদার বর্তমানে পালাক্রমে শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন। (১) শ্রীতিনকড়ি অধিকারী, (২) শ্রীশুকদেব অধিকারী, (৩) শ্রীগোপেশ্বর অধিকারী, (৪) শ্রীগণেশচন্দ্র অধিকারী, (৫) শ্রীবিশ্বনাথ অধিকারী (৬) শ্রীখগেন্দ্রনাথ অধিকারী, ইনি বর্তমান সেবাইত। পূর্বের ভূ-সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীমদনগোপালের মন্দিরের সম্মুখে পূর্বদিকে নাট্যমন্দির, তৎসম্মুখে একটি প্রাঙ্গণ ও তৎপূর্বভাগে গোপালদিঘী' নামে একটি বিরাট

১৬। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা ৩য় বর্ষ বৈশাখ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ১০ম পৃষ্ঠা।

এই শ্রীমদনগোপালবিগ্রহ শ্রীমালাধর বসুকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া স্থানীয় গোপাল-ডাঙ্গা পাড়ায় আবির্ভূত হন।

শ্রীগোপালদেবের মন্দিরের সম্মুখে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী হইতে মাঘী সংক্রান্তি পর্যন্ত মেলা হয়। এই সময় পারিপার্শ্বিক গ্রাম হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গোপাল দীঘির নৈঋ‌র্ত কোণে গোপেশ্বর বা গোপীশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দির পশ্চিমাভিমুখী। মন্দিরের অলিন্দে উত্তর পার্শ্বে প্রস্তর-নির্মিত একটি বৃষ অধিষ্ঠিত আছে। ইহার কণ্ঠদেশে মালাকারে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক লিপি দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায়[১৭] উহার পাঠ নিম্নলিখিতরূপ ধরিয়া লিখিয়াছেন,—

"শাকে বিশতি বেদে খে মনৌ হি শিবসন্নিধৌ।
খাঁন-শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং ময়া বৃষঃ॥"[১৮]

বোধ হইতেছে যে, শ্রীশ্রীগুণরাজ খান ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপুত্র শ্রীসত্যরাজ খান মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মের তিন বৎসর পূর্বে উক্ত ষাঁড়টিকে স্থাপন করেন।

আমরা বৃষটির গলদেশে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে যেন একটু পৃথক্ পাঠ লক্ষ্য করিলাম। বিশতির স্থানে বিংশতি ও 'বেদে খে' এর স্থানে বেদৈকে, 'মনৌ হি'র স্থানে যে তিনটি অক্ষর দৃষ্ট হইল, উহার অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। প্রথমটি একটি যুক্তাক্ষর; হয়ত উহা 'ক্ষ' হইতে পারে; তৎপরবর্তী অক্ষরটি 'ঙ' বা 'ঙঁ' এবং তৎপরবর্তী অক্ষরটি 'খং' র মত প্রতীয়মান। তৎপরে 'শিব সন্নিধৌ কথাটি ঠিকই আছে। পরবর্তী চরণের খাঁন শ্রীসত্যরাজেন,' শব্দে 'স্থাপিতোয়ং' পর্যন্ত বাক্য ঠিকই দেখিলাম। তবে 'ময়া'র স্থানে 'শনা' (সনা?) এইরূপ পাঠ প্রতীয়মান হইল, 'বৃষঃ' পাঠটির সহিত আমাদের দৃষ্ট লিপির মিলই আছে। আমরা সেই উৎকীর্ণ লিপি হইতে যে পাঠটি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে এইরূপ পাঠ দাঁড়ায়,—

শাকে বিংশতি-বেদৈকে ক্ষ ওঁ খং শিবসন্নিধৌ।
খাঁন শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং সনা বৃষঃ॥

আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান এই পাঠই ঠিক কিনা তাহা বলিবার আমাদের শক্তি নাই, তবে এইরূপ পাঠ ধরিলে নিম্নলিখিত অর্থ করা যাইতে পারে। এক = ১, বেদ = ৪, বিংশতি = ২০; 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই ন্যায়ানুসারে ১৪২০ শকাব্দ হয়। ক্ষ = ক্ষেত্রপাল; ওঁ = প্রণব; খং = পঞ্চদেবতাস্বরূপ; পরবর্তী চরণে সনা = নিত্য। এখন সমস্ত শ্লোকটির এইরূপ অর্থ হয়—১৪২০ শকাব্দে ক্ষেত্রপাল, প্রণব ও পঞ্চদেবময় শিবের নিকটে শ্রীসত্যরাজ-খানের দ্বারা এই নিত্য বৃষটি (বাহনটি) স্থাপিত হইল।

বৃষের পাদপীঠে 'নেপালেন বিনির্মিতঃ' এই বাক্যটি আছে। মনে হয়, নেপাল নামক কোন ভাস্করের দ্বারা এই বৃষটি নির্মিত হইয়াছিল।

পাঠটি যাহাই হউক, উক্ত লিপির যে অংশের পাঠ স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীসত্যরাজ খাঁন এই বৃষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উক্ত শিবমন্দিরে পশ্চাদ্ভাগের পূর্বদিকের প্রাচীরগাত্রের ঊর্ধ্বপ্রদেশে ছয়খানি ইষ্টকে উক্ত মন্দিরের সংস্কারের তারিখ ১৬৬৬ শক বলিয়া লিখিত আছে। কতকগুলি অক্ষর চূর্ণকামের ফলে পরবর্তিকালে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি স্পষ্ট বুঝা যায়।

শকাব্দ ১৬৬৬ (বা ১৬৫৫?) শিবঠাকুর * * *

* * *

সত্যরাজ খাঁ তস্য পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুরের গড়বাড়ী * * নারায়ণ দাস সাকিন চৈতন্যপুর"

১৬৫৫ বা ১৬৬৬ শকে (১৭৩৩ বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) কুলীন-গ্রামের অন্তর্গত চৈতন্যপুরনিবাসী নারায়ণ দাস উক্ত মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। গোপেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গটি শ্রীগুণরাজ খাঁ বা তৎপুত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। কারণ, শিবের বাহন নন্দী বা বৃষকে সত্যরাজ খাঁন স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা বৃষের কণ্ঠদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়। গোপেশ্বর-মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের উত্তর পার্শ্বে একটি ধ্যানমগ্ন শৈলীমূর্তি আছেন। ঐ মূর্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ আছে; উহারও পাঠোদ্ধার হওয়া আবশ্যক। বসুবংশীয় স্থানীয় কোনও কোনও ব্যক্তি উক্ত ধ্যানমগ্ন মূর্তিকে শ্রীমালাধর বসুর মূর্তি বলিয়া উল্লেখ করেন।

কুলীন-গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে যে নির্জন স্থানে নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেন, তাহা শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের 'ভজন-পাট' বা 'ভজন-স্থলী'—নামে খ্যাত। এই স্থানকে 'গঙ্গারামপটি' বলে। ইহা গোপেশ্বর শিবমন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে তিন ফার্লং দূরে অবস্থিত। পূর্বে যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নির্মিত একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুময়ী শ্রীমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন এবং সেই সিংহাসনেই বামে যুগল-মূর্তি শ্রীগোপীনাথ ও দক্ষিণে যুগলমূর্তি শ্রীশ্যামসুন্দর এবং শ্রীলক্ষ্মীজনার্দন, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাজরাজেশ্বর, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীধর শালগ্রাম ও শ্রীনাড়ুগোপাল অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাম পার্শ্বে একটি পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্তি বিরাজমান আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্তি শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। প্রাচীন মন্দিরটি বর্তমান মন্দিরের পূর্বোত্তর কোণে দক্ষিণাভিমুখী ছিল। এখন যে প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু আছেন, তাহা পূর্বাভিমুখী।

প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের অবশেষ সুদীর্ঘ শাখা-বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উক্ত মূল-বটবৃক্ষের কোটরে শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভজন

১৭। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বৈশাখ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ ১০ম পৃঃ।

১৮। [১৪০৪ শকাব্দের (বেদ = ৪, খ = ০, মনু = ১৪; 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ'—এই ন্যায়ানুসারে) প্রবেশে (প্রারম্ভে) শ্রীসত্যরাজ খান— [illegible] এই বৃষ শিব-সমীপে সংস্থাপিত হইল।]

করিতেন বলিয়া শুনা যায়। সেই মূল বৃক্ষটি বর্তমানে লুপ্ত। ঐ স্থানের স্মৃতিরক্ষার্থ ১৭৩৩ শকাব্দায় (১৮১১ খৃষ্টাব্দে) একটি মন্দিরাকার কুটীর নির্মিত হইয়াছিল; তাহাও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের পূর্ব-দিকে একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-স্থলীর দক্ষিণ পার্শ্বে সমাজবাড়ী অর্থাৎ ভজন-স্থলীর মহান্তগণের সমাধি স্থান। এই সমাজবাড়ী এক সময় ভূতের বাড়ী আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

কুলীন-গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে হাটতলা ও পোষ্টাফিসের নিকট খাঁ দীঘি নামক উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ শৈবালাবৃত একটি দীঘি গুণরাজ খাঁর সময়ে খনিত বলিয়া কথিত হয়। কুলীন-গ্রামে বহু প্রাচীন কীর্তি রহিয়াছে। হাটতলার মধ্যস্থলে শিবানীদেবীর একটি পাষাণময়ী মূর্তি পূর্বের ভগ্ন মন্দির হইতে একটি ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন মন্দির গাত্রের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ৯৬৩ শকে (১০৪১ খৃষ্টাব্দে) উক্ত মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিবানী মন্দিরের পার্শ্বদেশ দিয়া লুপ্তস্রোতা 'কংসাবতী' নদীর খাত দৃষ্ট হয়। কুলীন-গ্রামে সোম ও বৃহস্পতিবার হাট হইয়া থাকে।

উক্ত হাটতলার পশ্চিম দিকে প্রায় এক ফার্লং দূরে শ্রীগোপীনাথের মন্দির ছিল। বর্তমানে ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঢিপিমাত্র দৃষ্ট হইল এবং ঐ ঢিপির উত্তরে 'গোপীনাথ-পুষ্করিণী' নামে একটি কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ ঐ স্থানের পশ্চিম-উত্তর দিকস্থ পল্লীতে কোনও অর্চকের গৃহে পূজিত হইতেছেন।

কুলীন-গ্রামে (১) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (২) শ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা শ্রীমালাধর বসু, (৩) শ্রীসত্যরাজ, (৪) শ্রীরামানন্দ বসু, (৫) শ্রীশঙ্কর, (৬) শ্রীবিদ্যানন্দ ও (৭) শ্রীবাণীনাথ বসুর শ্রীপাট। এজন্য পাটপর্যটন-গ্রন্থের পরিভাষানুসারে কুলীন-গ্রাম 'মহাপাট' নামে খ্যাত।

কুলীন-গ্রামে মাকরী সপ্তমীতে ও ভীমাষ্টমীতে উৎসব হয়, মাঘী শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে উৎসব আরম্ভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রসঙ্গ

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জীবনের যুদ্ধে মানুষ হায়রাণ হইয়া উঠিয়াছে—ধর্ম্মকথা শুনিবার অবসর কোথায়? তবু কিছুদিন হইল দেখা যাইতেছে দৈনিক সংবাদপত্রে বহুবিধ ধর্ম্মসভার ও ধর্ম্মগ্রন্থ-আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রচুর। ঐরূপ সভাসমিতিতে লোকসমাগমও যথেষ্ট। যদিও সাম্প্রদায়িকতার গরল-প্রচার (প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে) বা ধর্ম্মান্তর-করণের প্রয়াস তথায় নাই। পৌরাণিক গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনার আধুনিক মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা, তুলনামূলক যুক্তিসহ প্রবন্ধ, দেশবিদেশের আধ্যাত্মিক বিভূতিসম্পন্ন মনীষীদের জীবনকথা ও আবির্ভাবের তাৎপর্য্য ইত্যাদির অবতারণা ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে; অবশ্য রাজনীতি-মূলক সভার সহিত তুলনা হয় না—যেহেতু সেগুলি অতুলনীয় এবং নীতিকূলে রাজনীতি রাজোপাধি পাইয়াছে।

আজকাল শুধু সভাসমিতিতে নয়, মঞ্চে ও ছায়াচিত্রেও কোন কোন ধর্মগুরু ও যুগস্রষ্টার পুণ্যকাহিনী বিবৃত হইতেছে। সাধুজীবনের অলৌকিক ঘটনার কথাগুলি অনেকে 'মাইথোলজী' বা 'কাহিনী' হিসাবে দেখিলেও সেগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার সহিত ভবিষ্যৎ নীতির সাফল্য ও পরিপূর্ণতার বিশ্লেষণ চলিতেছে। দুঃসময়ে শুভ-বুদ্ধির জাগরণের অভিযান একান্ত বাঞ্ছনীয়। অন্ধ-আবেগের বন্যায় সাধারণভাবে চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতেছে; এই বিপুল জলোচ্ছ্বাসে অভাব অনটন বৃহৎবিদ্যার উনপঞ্চাশ পবন যোগ দিয়াছে। গোস্বামীর বিষয়ে কলিকাতার সুধী বৈষ্ণব সমাজ আলোচনার অবকাশ দিয়া প্রেমের ভেলা ভাসাইবার দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম কতো প্রাচীন, কতো পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার সহিত তাহার নিবিড় পরিচয়, ইতিহাসে অসম্পূর্ণভাবে তাহা জানা যায়। বৌদ্ধযুগের গুপ্তবংশের সম্রাটগণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাহাদের প্রবল প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি হইল—প্রধানতঃ দুইটি কারণে—বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংস্কার এবং আর্য্যধর্ম্ম ও দ্রাবিড় ধর্ম্মের সংমিশ্রণ। হিন্দু ধর্ম্মপুস্তকের সংস্কার, পুরাণগুলির নবকলেবর, সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও বিরাট হিন্দুসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ ঐযুগেই [৩২০-৪৬০ খৃঃ] ঘটিয়াছিল। বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা, ঘটা করিয়া মূর্ত্তিপূজার প্রচলন, যাগযজ্ঞের বিস্তৃতি এই বৈষ্ণব প্রধান যুগের অবদান। তারপর পুনঃপুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে ও গৃহ-বিবাদে স্বর্ণদেউল মাটিতে মিশাইল এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম মিথ্যাচারের কলুষপঙ্কে ডুবিল। কঠোর মায়াবাদের প্রচারে ভারতের ধর্ম্মজীবন যখন বিশুষ্ক, বৌদ্ধ কাপালিকের বিকৃত সম্মোহনলীলার সহিত হিন্দুর কুসংস্কার ও বৈষ্ণবসমাজের কদাচার মিশিবার ফলে সমাজজীবন যখন উদ্‌ভ্রান্ত, রাষ্ট্রচেতনা হতাশায় মুহ্যমান—ধর্ম্ম ও সমাজ বিপর্য্যয়ের সেই মহাদুর্দ্দিনে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩)। উত্তরভারতে (১৪৬৯) নানক, কবীর, মহারাষ্ট্রের একনাথ, দাক্ষিণাত্যে (১৪৭৯ খৃঃ) বল্লভাচার্য্য তাহার সম-

ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রামানন্দ তাঁহার অগ্রগামী; দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরভারতে আসিয়া বারাণসীর পঞ্চগঙ্গার ঘাটে রামানন্দ ভক্তিমূলক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া "রামায়েৎ" নামে সুবিখ্যাত বৈষ্ণবসম্প্রদায় গঠন করেন। ভারতবর্ষের অন্ধকার যুগটি এই নূতন ভক্তি বা প্রেমধর্ম্মের অভ্যুদয়ের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের মূলকথা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, নামগান, ভক্তি ও সেবার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। ইহাতে জাতিভেদ, সামাজিক বৈষম্য বা যাগযজ্ঞের আচারনিষ্ঠার স্থান ছিল না। এই যথার্থ সাম্যবেদ—প্রহ্লাদের উক্তি "সমত্বমারাধনং অচ্যুতস্য" এই নববেদের ভিত্তি।

প্রহ্লাদের নিষ্কাম উপাসনা প্রকৃত ভক্তি; ইহারই উপর শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; ইহাই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদ; বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। ধ্রুব সকাম উপাসনাকে মনীষীরা প্রকৃত ভক্তি বলেন না। ধ্রুব পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও কায়মনোবুদ্ধি সমর্পণ করিয়া ইহলোকে পদমর্য্যাদা কামনা করিয়াছিলেন—সে কামনা পূর্ণ হইয়াছিল; প্রহ্লাদ কিন্তু কিছুই চাহেন নাই—তাই পাইয়াছিলেন মুক্তি। এই মুক্তির তাৎপর্য্য মোক্ষ বা পরিনির্ব্বাণ নহে, ইহজগতে চিত্তের অনন্ত প্রশান্তি বা মনের সুখ। রাজার মনের সুখ না থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আদর্শ ভক্তের মনের সুখের সীমা নাই। দুঃখ তাহাকে দীর্ণ করিতে পারে না, মান-অপমান তাহার পক্ষে সমান, মনের সুখ থাকায় তাহার কর্ম্মশক্তি বিপুল—নিষ্কামকর্ম্মী বলিয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধিতে সমর্থ; শ্রীভগবান তাহাকে বলিয়াছেন 'দক্ষ'—"অনপেক্ষ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ" (গীতা ১২।১৬) (অল্পদিনব্যাপী নিজ জীবনে শ্রীচৈতন্য দক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ ভক্তের নিকট জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, আত্মসংযত, চিত্ত পরিশুদ্ধ। সে আত্ম-জয়ী, তাঁহার সুকুমার বৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকশিত—সে মুক্ত, সে ইহজীবনে পরম আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছে। কতো বড় আদর্শের সন্ধান শ্রীচৈতন্য দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মহাপ্রভু নাম সার্থক।

তাঁহাকে ঘিরিয়া কতো মনোহর কাহিনী রচিত হইয়াছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একত্র প্রাপ্ত হইয়া রাধাভাব ও রাধাকান্তিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন—শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর এই অপূর্ব্ব অনুভূতি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় অনবদ্য ভাষায় লীলায়িত করিয়া বুঝাইয়াছেন ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কতো নিবিড়, কতো সহজসাধ্য। এই তত্ত্ব কবিরাজ গোস্বামীর বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব ও অমূল্য দান। ভক্ত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন এই অনুভূতিটিকে নূতন রূপ দিয়াছেন—সংক্ষেপে বলিব।

জটিলা কুটিলার আমন্ত্রণে কানু মূর্চ্ছিতা রাইএর কর্ণমূলে "ওঠ" বলায় মূর্চ্ছা অপনোদনের পর রাই বলিলেন 'ওরা আমার কাছে তোমায় নিয়ে এসেচে, আমার নিন্দার কি শেষ হ'ল?' কানু বলিলেন—'না, জটিলা কুটিলার সরলতা সে মুহূর্ত্তের, তারপর তাদের বিদ্বেষ আবার জাগবে—বৃন্দাবনে তোমার আমার কলঙ্কপতাকা আবার প্রোথিত হবে। কলঙ্ক দিনরাত স্মরণ করবেন, আর এই কলঙ্কপঙ্কের পঙ্কজ স্বরূপ যিনি আসবেন, তিনি পরে এক যুগে তোমাকে ও আমাকে নিজ দেহে অভিনন্দিত ক'রে, কেঁদে কেঁদে সংসারের দোরে দোরে সেই কথা গাইবেন * * এই সময়ে সখীরা এসে পড়েচে—তারা জিজ্ঞেস করল—সে কবে? কানু বলিলেন—"যিনি আসবেন তোমরা সবে তাঁর অনুচর হয়ে আসবে—কেউ কবি হয়ে তাঁর আগমনী গান করবে, কেহ তাঁর চরিতামৃত লিখে ধন্য হবে, কেউ বা তাঁতে মত্ত প্রেমের আবেগ দেখে হৃদয়খানি পথে পেতে তাঁর পদপঙ্কজ ধারণ করবে।"

এই গেল একদিক—আর একদিক রাই বলিলেন—"সেদিন তুমি আমি এক হবে যাব।" দেখি—শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে কৃষ্ণ নিজেই রাধাকে বারম্বার মূল প্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; বলিয়াছেন—"দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্ব্বদাই আছি! তুমি স্ত্রী আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না (ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে, নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ) আমি সর্ব্বরূপ, তুমি সর্ব্বস্বরূপা; আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা; আমি সূর্য্য তুমি দীপ্তি; তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা—যাহাই স্ত্রী তাহাই তুমি, যাহাই পুরুষ তাহাই আমি * * আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি—তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'গৌরাঙ্গদেবের বাহিরের ভাব শ্রীরাধার, ভিতরের ভাব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা।'

দর্শনের গহনে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই; শুধু এইটুকু যেন মনে রাখিতে পারি—রাধা ঈশ্বরের শক্তি, রাধাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রী।

ভাগবত যে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য—শ্রীচৈতন্যের এই অভিমত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় তাহা বুঝা যায়। শঙ্কর বুদ্ধের অদ্বৈতবাদও নির্ব্বাণ আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত করিলেন বৈষ্ণব কবি—অদ্বৈত-বাদের ভগবান নামিয়া আসিলেন মানুষের মধ্যে; মানুষের জয়গানে বৈষ্ণব কবিরা মুখর। মহাভারতের "ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরঃ হি কিঞ্চিৎ" বৈষ্ণব-সাহিত্যে রূপ পাইল। কতদিনই বা শ্রীচৈতন্যের নরলীলা? মাত্র ৪৮ বৎসর (১৪৮৫-১৫৩৩ খৃঃ) রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ভগবানকে আমরা যে নিবিড়ভাবে পাইতে পারি শুধু ভালোবাসার দ্বারা, আদর করিয়া ডাকার দ্বারা—এই মহাসত্য ধর্ম্মের বিরাট গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া আলোঝলমল দিকদিগন্তে প্রসারিত করিয়া দিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী কবিরাজ গোস্বামী ৭৫ বৎসর বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। সুপণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের মতে রচনাকাল প্রায় আট বৎসর এবং রচনা শেষ হইয়াছিল ১৫৩৭ শকাব্দা (১৬১৫ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে।

(শাকে সিন্ধু অগ্নি বাণে দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ)।

কাব্যের মতোই আরম্ভ ও তিনপ্রকার মঙ্গলাচরণ (বস্তু নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার)। প্রথম কয়েকটি শ্লোক সংস্কৃতে রচিত। অর্থাগমের উদ্দেশ্য লইয়া রচনা করেন নাই। প্রেরণাবশে লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনগোপাল। শ্রীধর গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এই অনুভূতি রচনার প্রাক্কালে পাইয়াছিলেন। Coleridge ইহাকে বলেন Ecstasy. Homer, Milton, Wordsworth কৃতজ্ঞতার সহিত এইপ্রকার ঐশী করুণার জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র মধ্যে লিখিয়াছেন :—

এ বাক্‌সাগর আমি সযতনে
লভিমা, কবিতামৃত নিরুপমসুধা
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি।"

বিস্মৃতপ্রায় সাধককবি রামানন্দ রায় সরল গ্রাম্যভাষায় বলিয়াছেন

হৃদয়ে থাকিয়া তুমি জিহ্বায় কহাও বাণী
কি যে বলি, ভালমন্দ কিছুই না জানি।

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে গোস্বামী কবিগণ সংস্কৃতে যে সব প্রেম-ভক্তির আলোচনা করেন তাহাই বাংলা-ভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পরিষদ জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীপাট যশড়া হইতে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পুঁথি তাঁহার বংশীয় প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়গণের উদ্যোগে ও প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর সাহায্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গবাসী" পত্রিকার অগ্রানুকূল্যে কবিরাজ গোস্বামী রচিত এই গ্রন্থের প্রচারে (প্রথমে বিনামূল্যে) সমর্থ হন। ইহার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ছাপান চৈতন্যচরিতামৃত (বটতলার অনুগ্রহে) অতি অনাদৃতভাবে অনেক ভুল ভ্রান্তি লইয়া কৌতূহল মিটাইত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত (যাহাতে বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সূচিত হয়) এবং লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (যাহাতে দ্বারকা হইতে তাঁহার আগমন সূচিত হয়)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাসকে দ্বিতীয় বেদব্যাস বলিয়াছেন এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চা, দাসগোস্বামীর স্তবমালা ও কবিকর্ণপুরের কয়েকটি রচনা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও গৌরপার্ষদগণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনী অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার আধিক্য দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যযুগের বাঙালী গৃহস্থের আচার ব্যবহার, খাদ্যপ্রণালী, সুখ শান্তি ও রহস্যালাপের খণ্ড বিবরণ, দক্ষিণদেশের তীর্থ ভ্রমণের কথা সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সে যুগের উপযুক্ত যানবাহনের অভাব, পথের বিপদ, নৈতিক অবনতি, মোগলপাঠানের দ্বন্দ্বের বিভীষিকা, কুসংস্কারে অন্ধ বিশ্বাস—এইরূপ অসংখ্য বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণভারত পরিক্রমা ও প্রেম ধর্ম্মপ্রচার একান্ত অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কতিপয় অলৌকিক কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে—গৌতমবুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, এমন কি পরমহংসদেবের কর্ম্মজীবনের আখ্যানের মধ্যেও অনেক অলৌকিক কাহিনী রহিয়াছে।

এই প্রকার অলৌকিকের সহিত প্রাচীন চর্য্যাগীতি ও মঙ্গলকাব্যের অলৌকিকত্বের প্রভেদ সুস্পষ্ট ; চর্য্যাগীতির কবির জীবনের তুচ্ছতাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিয়া কল্পলোকে তাহারই পরিপূর্ণতা কামনা করিলেন। মঙ্গলকাব্যে জীবনের তুচ্ছতা প্রধান হইয়া দেখা দিলেও সমস্ত ভেদ বিচারের বিপক্ষে সাম্যের অভিযানে আকৃষ্ট হইল। বৈষ্ণবকাব্য এই সকলের সমন্বয় ঘটাইয়া জীবনকে প্রেমের পুলকে মধুময় করিয়া তুলিল। তবুও সে প্রচেষ্টায় প্রতি পদে পঙ্কিল জন্মে নাই।

প্রেম ধর্ম্মের পরিচয়ে দেশবাসী একদা ধন্য হইয়াছিল, আবার তাহার অভ্যুদয় আবশ্যক হইয়াছে।

কল্যাণময়ী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

এ জীবনে আর প্রিয়-পরশন পাবে না তোমার হিয়া,
তাই কি রচিলে বিগ্রহ তার বিরহ-অশ্রু দিয়া ?
মিলিবে না আর চির-বাঞ্ছিত-বল্লভ-দরশন,
তাই আমরণ খুলে কি রাখিলে হৃদয়ের বাতায়ন ?
তাই কি গভীর গম্ভীরালীলা দেখালে নবদ্বীপে ?
তাই কি আরতি করিলে প্রভুরে প্রাণের পঞ্চদীপে ?
তাই কি লইলে সংসারমাঝে সন্ন্যাস আজীবন ?
করিলে প্রিয়ের নাম-জপ-মালা কণ্ঠের আভরণ ?
জননীর দুখে দিলে সান্ত্বনা রহিয়া অচঞ্চল
প্রিয়ের স্বধর্ম্ম যাহাতে নাহি হয় নিষ্ফল ?
বিচ্ছেদ-মেঘে স্নিগ্ধ হাসির রামধনু অভিরাম
রচিয়া নিখিল-নয়ন-আড়ালে লভিলে কি প্রাণারাম ?
নিতি তিলে তিলে প্রেম-হোমানলে নিজেরে আহুতি দিয়া
শিখাবে তাহার কল্যাণময়ী করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্রোতের কূল

কুহু ও বজ্র যখন স্নানঘাটে আসিল তখন দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে, আকাশ হইতে যেন সেই চিতার ধূসর ভস্ম নদীর জলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যে দশজন যোদ্ধাকে বজ্র ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল তাহারা তখনও ঘাটের স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছিল! শত্রু কিন্তু আসে নাই। হয়তো এদিক দিয়া আক্রমণের কথা জয়নাগ চিন্তা করেন নাই, কিম্বা নৌকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরিপূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই আক্রমণ করিতে হইয়াছে বলিয়া এই অব্যবস্থা।

বজ্র যোদ্ধাদের বিদায় দিল। তারপর দুইজনে ঘাটের কোণের দিকে গেল। স্তম্ভের ছায়াতলে ডিঙি বাঁধা আছে, দড়ি খুলিয়া উভয়ে আরোহণ করিল।

কুহু বলিল, কিন্তু কোথায় যাব তা তো জানিনা।'

বজ্র বলিল, 'আমি জানি। দাঁড় আমায় দাও।'

দাঁড়ের টানে ডিঙি স্রোতের মুখে পড়িল, তারপর স্রোতের টানে সঙ্গমের দিকে ভাসিয়া চলিল।

বজ্র শিরস্ত্রাণ খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল, বুক হইতে সাঁজোয়া খুলিয়া নদীতে বিসর্জন দিল। তরবারিও সেই পথে গেল। সে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'বাঁচলাম।'

দুইজন ডিঙির দুই প্রান্তে বসিয়া আছে, অস্পষ্টভাবে পরস্পর দেখিতে পাইতেছে। কুহু জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার দুঃখ হচ্ছে না?'

বজ্র বলিল—'না। তোমার হচ্ছে নাকি?'

কুহু বলিল—'কি জানি। আমরা যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মনে হচ্ছে।'

বজ্র বলিল—'আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে এতদিন নিজেকে চিনতে পারিনি। কিন্তু এবার পেরেছি। আমি শশাঙ্ক-দেবের পৌত্র মানব-দেবের পুত্র বটে, কিন্তু আমার প্রকৃত পরিচয়—আমি মধুমথন।'

ডিঙি দুই নদীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ জলের প্রবল কল্লোলধ্বনি হইল, ডিঙি টলমল করিয়া দুলিতে লাগিল; তারপর ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল। বজ্র তখন দুই হাতে বৈঠা লইয়া উজান টানিয়া চলিল।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে; অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে অল্প দেখা যায়, পশ্চিমের তীর নিকটে; ডিঙি আলোকহীন রাজপুরীর প্রাকার রেখা ছাড়াইয়া চলিল। গতি কিন্তু অতি মন্দ; দাঁড়ের জোরে যেমন দুই হাত আগে যাইতেছে, স্রোতের টানে তেমনি এক হাত পিছাইতেছে।

কুহু জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যাচ্ছ?'

দাঁড় টানিতে টানিতে বজ্র বলিল—'রাঙামাটির মঠে। সেখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, হয়তো দেখা পাব। তারপর গ্রামে ফিরে যাব।'

অনেকক্ষণ কথা হইল না। অন্ধকারে কেবল ছপ্ ছপ্ দাঁড়ের শব্দ।

সহসা কুহু বলিল—'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?' বলিয়াই অন্ধকারে জিভ কাটিল।

বজ্রের নিকট হইতে উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; তারপর বজ্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কুহুর প্রশ্নের উত্তর দিলনা; মৌরীতীরের ক্ষুদ্র গ্রামটির কথা, মায়ের কথা, গুঞ্জার কথা, চাতক ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিল। যেন কাহাকেও শুনাইবার জন্য বলিতেছে না, আপনমনে বলিয়া চলিয়াছে। জলের কলধ্বনি মধ্যে কুহু কান পাতিয়া শুনিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহারা রাঙামাটির মঠের ঘাটে পৌঁছিল। বিস্তৃত ঘাটের পাশে বিপুলকায় চৈত্য নৈশ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে, চিনিয়া লইতে কষ্ট হইলনা।

ঘাটে জনমানব নাই, সংঘ সুপ্ত। বজ্র ডিঙি ঘাটের পৈঠার উপর টানিয়া তুলিয়া রাখিল, যাহাতে স্রোতে ভাসিয়া না যায়। তারপর দুইজনে শুষ্ক সোপানের উপর পাশাপাশি বসিল। সংঘের কাহাকেও এখন জাগানো চলিবেনা, নিশাবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

কুহু বলিল—'মধুমথন।'

'কী ?'

'তুমি চলে যাবে, তারপর আমি কি করব, কোথায় যাব, বলে দাও।'

স্নেহে ও করুণায় বজ্রের বুক ভরিয়া উঠিল, সে বাহু দিয়া কুহুর পৃষ্ঠ জড়াইয়া লইয়া বলিল—'চল, কুহু, তুমি আমার সঙ্গে গ্রামে চল।'

কুহু ধীরে ধীরে বলিল—'না, আমি ভুল বলেছিলাম। তোমার সঙ্গে গ্রামে গেলে তোমার জীবনে অনেক দুঃখ অশান্তি আসবে, তাতে কাজ নেই।—কিন্তু একদিন আমি যাব তোমার কাছে। যখন আমার আর যৌবন থাকবে না, তখন যাব। ততদিন আমাকে মনে থাকবে ?'

বজ্র গাঢ় স্বরে বলিল,—'থাকবে। আমি যাদের ভালবাসি তাদের ভুলিনা।'

কুহু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু বজ্র তাহার অশ্রু দেখিতে পাইল না।

ক্রমে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। গঙ্গার বুক-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পূর্বাকাশে যেন একটু লালিমার স্বপ্ন। সংঘের ভিতর নিদ্রোত্থিত মানুষের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্র বলিল—'কুহু, এবার তোমায় যেতে হবে। ডিঙি ভাসিয়ে একেবারে গঙ্গার আম্রির ঘাটে যেও, সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকো। তারপর—অদৃষ্ট যেদিকে নিয়ে যায়।'

কুহু বলিল—'সেই ভাল। আমার তো আর কেউ নেই, যার কাছে যাব।'

বজ্র বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া কুহুকে দিল, বলিল—'এটা রাখো। দেখলে আমাকে মনে পড়বে।'

কুহু অঙ্গদটি আঁচলে বাঁধিল। আলো ফুটিতেছে, দুজনে অসচ্ছভাবে পরস্পর মুখ দেখিতে পাইতেছে। কুহু জলভরা চোখ তুলিয়া বলিল—'শুধু অঙ্গদ দেখলে তোমাকে মনে পড়বে ? না হলে পড়বে না ?'

বজ্র কুহুকে দুই বাহু দিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল, তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিয়া নামাইয়া দিল।

কুহু কিছুক্ষণ বজ্রের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিল, তারপর ডিঙিতে গিয়া উঠিল। ডিঙি স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল।

* * *

মণিপদ্ম বজ্রকে ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

'আপনি ফিরে এসেছেন !'

মণিপদ্ম বজ্রের হাত ধরিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল; তাহাকে আহার্য দিল। বজ্র বলিল—'কানসোনায় টিকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম।

মণিপদ্ম বিমনাভাবে বলিল—'হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি কি যেন গোলমাল হয়েছে।' তারপর উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া বলিল—'আর্য শীলভদ্র কাল সমতট থেকে ফিরে এসেছেন। এবার আমরা নালন্দা যাব।'

'কবে ?'

'তা জানিনা। আর্য শীলভদ্র জানেন।'

বজ্র তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া বলিল—'ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিতে দাও। তাঁকে কিছু বলবার আছে।'

মণিপদ্ম বজ্রকে শীলভদ্রের নিকট লইয়া গেল। শীলভদ্র পূর্বের ন্যায় গন্ধকুটির কোণের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। বজ্র প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলে শীলভদ্র তাহার মুখ ক্ষণেক অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বলিলেন—'কর্ণসুবর্ণের সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভুক্তভোগী। সব কথা বল।'

বজ্র সকল কথা বলিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন, শেষে হাত নাড়িয়া যেন এ প্রসঙ্গ মন হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—'বুদ্ধের ইচ্ছা।—এখন কি করবে স্থির করেছ ?'

বজ্র বলিল—'আপনার কি উপদেশ ?'

শীলভদ্র বলিলেন—'আমি আগে যা বলেছিলাম

এখনও তাই বলি। গ্রামে ফিরে যাও। আর তোমার নাম যে বজ্রদেব তা ভুলে যাও।'

বজ্র নীরবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্র বলিলেন—'কিন্তু পথঘাট এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। রাজা হবার পর তোমাকে সকলেই দেখেছে, সকলেই চিনতে পারবে। এ পথ দিয়ে ক্রমাগত সৈন্য যাতায়াত করছে, তারা সব জয়নাগের সৈন্য।' একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'কিন্তু তুমি এক কাজ করতে পার। কাল প্রভাতে আমি নালন্দা যাত্রা করব, আমার সঙ্গে কয়েকজন ভিক্ষু থাকবেন। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকো তাহলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম।'

শীলভদ্রকে নিজের কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে বজ্রের মন ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, আর কাজ নাই সংসারে ফিরিয়া গিয়া! এই মহাপুরুষের সঙ্গে জ্ঞানের মহাতীর্থে চলিয়া যাই, বুদ্ধের শরণ লই। তিনি আমাকে শান্তি দিবেন। মণিপদ্ম যে আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে আমিও সেই আনন্দের স্বাদ পাইব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল নিজ গ্রামের কথা। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল চিরপ্রতীক্ষমাণা মায়ের মুখ। অর্ধেক জীবন যাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটিয়াছে, বাকি অর্ধেক জীবনও তাহার তেমনি ভাবে কাটিবে! স্বামীহারা অভাগিনী পুত্রকেও ফিরিয়া পাইবে না। আর গুঞ্জা! গুঞ্জা দিনের পর দিন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া থাকিবে—

বজ্র মস্তক নত করিয়া বলিল—'যে আজ্ঞা। আমি আপনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব যাব, তারপর গ্রামের পথ ধরব।'

সেদিন বজ্র সংঘের একটি প্রকোষ্ঠে রহিল।

সারাদিন সংঘের সম্মুখস্থ পথ দিয়া দলবদ্ধ সৈন্যগণের যাতায়াত। পদাতি গজ অশ্ব, অধিকাংশই কর্ণসুবর্ণের দিকে যাইতেছে। সমবেত পদধ্বনির গমগম শব্দ, হস্তীর গলঘণ্টা, চীৎকার কোলাহল। সংঘে কিন্তু কেহ প্রবেশ করিল না, কোনও উৎপাত করিল না।

বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল—জয়নাগ প্রাসাদ অধিকার করিয়াছেন, নগর তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে। নগরের উপর অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য তিনি আরও অনেক সৈন্য আনিতেছেন। হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। যে সকল সেনাপতি দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করিতেছে তাহারা রাজধানী পতনের সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিবে—

বজ্রের জল্পনা সর্বৈব মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহার পক্ষে যাহা অনুমান করা সম্ভব নয় এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছিল।

দণ্ডভুক্তি-অবরোধকারী সেনাপতিদের নিকট রাজধানী পতনের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তাঁহারা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; তারপর তাঁহাদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন, জয়নাগ যখন কর্ণসুবর্ণে গিয়াছে তখন দণ্ডভুক্তি আক্রমণ করিব। কেহ বলিলেন, কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া গিয়া যুদ্ধ দিব। কেহ বলিলেন, রাজাই নাই, কাহার জন্য যুদ্ধ করিব? মতভেদ বাড়িয়াই চলিল। ইতিমধ্যে, দণ্ডভুক্তিতে জয়নাগের যে সৈন্য ছিল তাহারা তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। একতাহীন হতোৎসাহ সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাদের ফিরিবার স্থান নাই, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণকে শাসন করিবার শক্তি নাই, তাহাদের বেতন দিবার সামর্থ্য নাই। সৈন্যগণ এরূপ অবস্থায় যাহা করে তাহাই করিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিজের দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমগ্র দেশে, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর জয়নাগ আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিলেন না, ইহাতে তাঁহার ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। তিনি জানিতেন সৈন্যগণের এই উচ্ছৃঙ্খলতা একদিন শান্ত হইবে। এখন তাহাদের আশ্রয় নাই, একদিন তাহাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে। তখন তাহারা নূতন রাজার পতাকাতলে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। নূতন রাজার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পুনর্মিলন

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রারম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইল। শীলভদ্রের সঙ্গে সমতট হইতে দুইটি চৈন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নালন্দা যাইবেন। সর্বসুদ্ধ দশ বারোজন

রাত্রিক। মণিপদ্ম বজ্রকে চৈনিক বেশ পরাইয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহাকে সহজে কেহ চিনিতে না পারে; অঙ্গে চীনাংশুকের কষায়বর্ণ অঙ্গাবরণ জানু পর্যন্ত লম্বিত, মাথায় শুঁড়তোলা কানঢাকা শিরস্ত্রাণ।

যাত্রারম্ভ হইল। অগ্রে অশীতিপর শীলভদ্র দুইজন চৈন ভিক্ষুকে দুই পাশে লইয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহাদের পিছনে এক সারি ভিক্ষু। মাঝে চারিটি অশ্বতর দীর্ঘ পথের পাথেয় বহন করিয়া চলিয়াছে। চৈনিক শ্রমণদ্বয় বহু তালপত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; সেগুলি দুইটি গর্দভের পৃষ্ঠে বাহিত হইতেছে। জন্তুগুলির পশ্চাতে মণিপদ্ম ও বজ্র তাহাদের তাড়না করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সর্বশেষে দুই সারি ভিক্ষু।

যাত্রিদল রাজপথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিল।

পথে সৈন্যদলের চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পদাতি সৈন্য, মাঝে মাঝে যূথবদ্ধ হস্তী অশ্ব বা রথ যাইতেছে। সকলের গতি কর্ণসুবর্ণের দিকে। কদাচিৎ বার্তাবাহী একক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর মুখে যাইতেছে। তাহারা সকলে আপন আপন কর্মে ব্যগ্রনিবিষ্ট, পীতবাসধারী ভিক্ষুদের কেহ বিরক্ত করিল না।

মণিপদ্ম হ্রস্বকণ্ঠে বজ্রের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে। তাহার মুখে চোখে আনন্দ ক্ষরিত হইতেছে; সে যেন তাহার জীবনের চূড়ান্ত অভীপ্সা লাভ করিয়াছে, আর কিছু তাহার কাম্য নাই।

বজ্র চলিতে চলিতে নতমুখে শুনিতেছে, কিন্তু সব কথা শুনিতে পাইতেছে না। তাহার মন অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে দোল খাইতেছে। একদিকে বিম্বাধর বটেশ্বর কুহু শিখরিণী কোদণ্ড মিশ্র, অন্য দিকে মা গুঞ্জা চাতক ঠাকুর। এই দুইয়ের মাঝখানে যেন যুগান্তরের ব্যবধান। কতদিন হইল সে গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছে? এক মাস? এক বৎসর? দশ বৎসর? মাস বৎসর দিয়া এই সময়ের পরিমাপ হয়না। যখন আসিয়াছিল তখন তাহার মন ছিল শিশুর মত, আর এখন—?

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা বনের কিনারায় পৌঁছিল। পথের পশ্চিমে বন; এই বনের ভিতর দিয়া রত্তি ও মিত্তি তাহাকে পথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। শীলভদ্র স্থির করিলেন এই স্থানেই, রাত্রি যাপন করিবেন।

বন দেখিয়া বজ্রের মন অস্থির হইয়াছিল, সে শীলভদ্রের কাছে গিয়া বলিল—'এই বন পার হয়ে আমি এসেছিলাম, আমার গ্রাম বনের পর পারে। যদি অনুমতি করেন এখনি যাত্রা করি।'

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন কত বড়?'

বজ্র হিসাব করিয়া বলিল—'এক দিনের পথ।'

শীলভদ্র বলিলেন—'তবে আজ রাত্রিটা আমাদের সঙ্গে থাকো। কাল সকালে যেও।'

ভাগীরথীর তীরে একটি বৃক্ষতলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল; আকাশে কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা দেখা দিয়াই অস্তমিত হইল। পথে সৈন্যদলের যাতায়াত থামিয়া গিয়াছে। বজ্র অশান্ত মন লইয়া রাজপথের এক প্রান্তে বসিয়া বনের পানে চাহিয়া রহিল।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইলে বজ্র লক্ষ্য করিল, বনের গভীর অন্তর্দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু দেখা যাইতেছে। সম্ভবত আলোক নয়, আগুন; অসংখ্য বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরাল হইতে আলোকবিন্দু বলিয়া মনে হইতেছে। তারপর নিস্তব্ধ বাতাসে যেন অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। বজ্র অবহিত হইয়া শুনিল, আবার অশ্বের হ্রেষা শুনা গেল।

বজ্র গিয়া শীলভদ্রকে বলিল। শীলভদ্র বৃক্ষতলে বদ্ধাসন প্রস্তরমূর্তির ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। অদূরে ভিক্ষুগণ চুল্লী জ্বালিয়া রাত্রির জন্য রন্ধন করিতেছিলেন, চুল্লীর চঞ্চল প্রভা তাঁহার অস্থিসার মুখের উপর সঞ্চরণ করিতেছিল। তিনি বজ্রের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'বোধহয় একদল সৈন্য ওখানে লুকিয়ে আছে। কোন্ দলের সৈন্য বলা যায়না; জয়নাগের দলও হতে পারে, অপরপক্ষও হতে পারে। তা সে যে পক্ষই হোক, কাল তোমার বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আরও উত্তরে বন শেষ হয়ে মাঠ আরম্ভ হয়েছে। সেই মাঠ বোধহয় পশ্চিমে মৌরী নদীর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তুমি মাঠ ধরে পশ্চিম দিকে গেলে গ্রামে পৌঁছতে পারবে।'

রাত্রে বজ্র ভাগীরথীর সৈকতে শয়ন করিয়া জ্যোতিঃ-চর্চিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল—আজ আমি মুক্ত আকাশের তলে শুইয়া আছি। কাল রাত্রে ছিলাম রক্ত-মৃত্তিকার সংঘারামে। তার আগের রাত্রে কোথায় ছিলাম?

সংঘের ঘাটে কুহুর সঙ্গে। তার আগের রাত্রে? কোদণ্ড মিশ্রের কুটীরে। তার আগে? রাজপুরীতে—! কি বিচিত্র সঙ্গতিহীন মানুষের জীবন!—

প্রাতে আবার যাত্রা আরম্ভ হইল।

তীব্র সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। পথ যতই উত্তরে যাইতেছে ততই জনবিরল হইতেছে। বজ্র আসিবার সময় যেমন দেখিয়াছিল তেমনি দেখিতে দেখিতে চলিল, ভাগীরথীর বুকে ছোট ছোট ডিঙা ও ভরা ভাসিতেছে, দুই একটা বহিত্র পালের ভরে চলিয়াছে; নদীর উচ্চ পাড়ে গাঙ-শালিখের ঝাঁক কোটরের চারিপাশে কিচিমিচি করিতেছে; একটা সারস পাখী জলের কিনারায় নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। বজ্র ভাবিল, এ কি সেই পাখীটা, যাইবার সময় যাহাকে দেখিয়াছিলাম? পাখীটা কি সেই অবধি এমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

বেলা দ্বিপ্রহরে যাত্রিদল বনের উত্তর প্রান্তে পৌছিলেন। বনের কোল হইতে মাঠ আরম্ভ হইয়াছে—সীমাহীন শ্যামলতা—কাল-বৈশাখীর আকালবর্ষণ তৃণগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। বজ্র এই তৃণের বর্ণ দেখিয়া যেন চিনিতে পারিল ইহা তাহার গ্রামের গোচারণ মাঠের তৃণ! এই প্রান্তরের পরপারে তাহার একান্ত আপন বেতসগ্রাম।

এই স্থানে সকলে মধ্যাহ্নের আহার সম্পন্ন করিলেন। তারপর বজ্র চৈনিক ছদ্মবেশ খুলিয়া নিজ বেশ পরিধান করিল; মণিপদ্মকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল; শীলভদ্রের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। শীলভদ্র তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্নেহগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'বৎস, সংসারে ফিরে যাও, এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি আছে। সংসারকে ভয় কোরো না, তাকে জয় কোরো। আর মহাকারুণিকের করুণার জন্য হৃদয়ের দ্বার সর্বদা খুলে রেখো। কখন তাঁর কৃপা আসবে কেউ জানেনা; দেখো যেন এসে ফিরে না যায়।'

* * * *

সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে। বজ্রের ক্লান্তি নাই, জনহীন প্রান্তর দিয়া যতই সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ততই তাহার অধীরতা বাড়িতেছে। ঐ বুঝি মাঠের সীমান্তে তাহার গ্রাম দেখা যায়! না—গ্রাম নয়, কয়েকটি বর্বুর বৃক্ষ সারি দিয়া দিগন্তরেখার উর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে।

সূর্যের প্রখর শুভ্রতা ক্রমে পীতাভ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাপের কিছুমাত্র হ্রাস নাই! বজ্রের সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। বর্বুর শ্রেণীর বিরল ছায়াতলে ক্ষণেক বিশ্রাম করিলে অঙ্গের ঘাম শুকাইত, কিন্তু বজ্র থামিতে পারিল না। গৃহের এত কাছে আসিয়া থামা যায় না।

আরও ক্রোশেক পথ চলিবার পর বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল, দিগন্তের কাছে সোনার সূতার মত কি যেন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বজ্র নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল। ঐ আমার মৌরী নদী! এতক্ষণে দেখা দিয়াছে।

বজ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়িয়া থামিল, চক্ষু হইতে ঘর্ম কলুষ মুছিয়া আবার দেখিল। হাঁ, মৌরী নদীই বটে। কিন্তু গ্রাম কোথায়? বজ্র নদীর রেখা অনুসরণ করিয়া উত্তর দিকে চক্ষু সঞ্চালন করিল!—একস্থানে উচ্চভূমি নদীর স্বর্ণসূত্রকে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বেতসগ্রাম! কিন্তু গ্রামের মাথার উপর আকাশে যেন একটা কালো মেঘ স্থির হইয়া আছে। মেঘ? না ধূম?

বজ্র আবার ছুটিয়া চলিল।

* * *

মৌরী নদীর তীরে বেতসগ্রাম। কিন্তু গ্রাম আর চেনা যায় না। কুটীরগুলি একটিও নাই, তাহাদের স্থানে এক স্তূপ করিয়া ভস্ম পড়িয়া আছে। ভস্মস্তূপ হইতে এখনও মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে। জীবন্ত মানুষ নাই, এখানে ওখানে কয়েকটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

কাল প্রাতে হঠাৎ একদল সৈন্য আসিয়াছিল, সংখ্যায় প্রায় একহাজার। তাহারা পূর্বে অগ্নিবর্মার সৈন্য ছিল, এখন যূথভ্রষ্ট নায়কহীনভাবে লুঠপাট করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের লোক তাহাদের আসিতে দেখিয়া অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছিল। সৈন্যগণ প্রায় নির্বিবাদে গ্রামের সঞ্চিত শস্যাদি লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর কুটীরগুলিতে আগুন দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

আজ অপরাহ্ণে ভস্মীভূত গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বজ্র ক্ষণকালের জন্য পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এ কি! এই তাহার বেতসগ্রাম! কেমন করিয়া এমন হইল!

গ্রামের লোক সব কোথায়? মা কোথায়? গুঞ্জা কোথায়?

উন্মাদের মত বজ্র ভস্মচক্রের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইল আর মা মা বলিয়া চীৎকার করিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিলনা। মৃতদেহগুলা সব পুরুষের। বজ্র একে একে তাহাদের চিনিল। গ্রামের মহত্তর। আরও দুইজন বৃদ্ধ, যাহারা পলাইতে পারে নাই। গ্রামের কর্মকার রাজীব, কুম্ভকার শ্রীদাম। একটি মৃতদেহ এমন ভাবে পড়িয়া আছে যে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না; বজ্র ছুটিয়া গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দেখিল—মধু! যে-মধুর সহিত গুঞ্জার জন্য তাহার লড়াই হইয়াছিল, সেই মধু। মধু গ্রাম রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছে। বজ্র মধুর দুই বলিষ্ঠ বাহু ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে দিতে বলিল—'মধু! মধু! মা কোথায়? গুঞ্জা কোথায়?'

মধু'র নিকট হইতে উত্তর আসিল না। বজ্র কিছুক্ষণ মধু'র মৃত মুখের পানে পাগলের মত চাহিয়া রহিল, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কি জীবিত নাই! চাতক ঠাকুর! তিনি কোথায়? তিনি তো পলাইবার লোক নয়—

বজ্র দেবস্থানের অভিমুখে ছুটিল।

দেবস্থানে চাতক ঠাকুরের একচালা অক্ষত আছে। বজ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল ঠাকুরের শুষ্ক শীর্ণ দেহ এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে; তাঁহার মাথায় ও দেহে রক্ত শুকাইয়া আছে। বজ্র তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আর্তস্বরে ডাকিল—'ঠাকুর! ঠাকুর!'

ঠাকুরের দেহে তখনও প্রাণ ছিল, তিনি কোটরগত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বজ্রকে দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠ একটু নড়িল—'বজ্র এসেছিস। ওরা বেঁচে আছে—পলাশবনের মধ্যে—।'

এইটুকু বলিবার জন্যই তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার মাথা বামদিকে হেলিয়া পড়িল, ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল।

সূর্য তখন পাটে বসিয়াছেন। দিগন্তে শোণিতোৎসব চলিতেছে। রাক্ষসী বেলা।

বজ্র বনের দিকে ছুটিল। বনের আগে বাথান। বজ্র দেখিল, বাথানের আগড় খোলা; পূর্বে যেখানে শতাধিক গরু থাকিত সেখানে মাত্র গুটিকয় রহিয়াছে। অন্য গরুগুলি মাঠে চরিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই, রাখালের অভাবে বনে জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে।

পলাশবনে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোন দিকে যাইবে ভাবিয়া পাইল না। রাত্রি আসন্ন, অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু চাতক ঠাকুর বলিয়াছেন, উহারা বাঁচিয়া আছে। বজ্র চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বনের একদিকে ছুটিল—মা! মা! গুঞ্জা! গুঞ্জা!

অবশেষে বহুদূর বনের মধ্যে গিয়া বজ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেহে আর শক্তি নাই, চীৎকার করিয়া ডাকিবারও শক্তি নাই। এদিকে বন ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, দূরে ভাল দেখা যায় না। বজ্রের অজ্ঞাতসারে চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কী করিবে সে এখন! কোথায় তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে? তাহারা কি আছে?

ও কী! বজ্র উচ্চকিত হইয়া চাহিল। দূর হইতে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল—মধুমথন!......অস্পষ্ট ছায়া-কুহেলির মধ্য দিয়া কে ঐ ছুটিয়া আসিতেছে—মুক্তবেণী প্রেতিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে! তাহার পাদুটি যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না।—গুঞ্জা!

বজ্রও পাগলের মত ছুটিল—'কুঁচবরণ কন্যা!'

'মধুমথন!'

দুইটা জ্বলন্ত উল্কা যেন পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া এক হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শাশ্বত সন্ধান

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

রঘুনাথ পালালো !

কেউ দেখল না, কেউ জানল না ! তাকে তার নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে রঘুর সেবক ও রক্ষকেরা। বিশ্বস্ত প্রহরীর দৃষ্টি সতত সজাগ আছে জেনে নির্ভয়ে ঘুমিয়েছে রঘুর মা, বাপ ও স্ত্রী।

রঘু পালালো। চারিদিক নিস্পন্দ, নীরব, তন্দ্রাচ্ছন্ন ; অতন্দ্র শুধু চন্দ্র, কোমল কিরণের আকাশ-জোড়া আস্তরণে বসে পৃথিবীর দিকে অপলক চোখে চেয়ে আছে। উদাসী হাওয়ায় রূপালী মায়া ঝরিয়ে মাঝে মাঝে কাঁপছে জ্যোৎস্না-ধোওয়া গাছের পুষ্ট পাতাগুলি। আলো-ছায়ার স্বপ্নপুরীর মধ্য দিয়ে একা চলেছে রঘুনাথ।

স্বপ্নেও জানেনি, কখন কল্পনাও করেনি যে এমন শুভযোগ তার হবে। ঘর ছাড়বার চেষ্টা করেছে সে কতবার। প্রতিবারই তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মাঝপথ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। কোমল-প্রকৃতি রঘু প্রতিবাদ করেনি, নীরবে সে কেবল অপেক্ষা করেছে উপযুক্ত সুযোগের। কিন্তু পাছে আবার পালায় তাই তার অভিভাবকেরা সজাগ প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। দু'জন ব্রাহ্মণ, চারজন সেবক এবং পাঁচজন রক্ষক সর্বদা তাকে আগলায়।

সুযোগ ঘটে না, বহুদিন তাই আর সে ঘর ছাড়বার কোন প্রয়াসই করেনি। সদাজাগ্রত প্রহরা নিজ হতেই সে জন্য ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়েছে। রঘুর এগারজন রক্ষী আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে।

বাধাহীন নির্জন বনপথে, সুমস্ত জনপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে রঘুনাথ। বারবার তার স্মরণে আসে নিজের কৈশোরের কথা—আর মনে পড়ে সেই সৌম্য শান্ত মানুষটিকে—সহজ গভীর কথায় যিনি তাকে জীবনের পরম রহস্যের সন্ধান দিয়েছিলেন।

রঘু চলে আর অতীতের কাহিনীগুলি ছবির পর ছবির মত তার মনে জাগে……

* *
*

বড় বিস্ময় লাগে ! একেবারে কাছে যেতে সাহস হয় না, অথচ মানুষটিকে বারে বারে দেখতে সাধ যায়। রঘুনাথ তাই ফিরে ফিরে ছুটে আসে, আশেপাশে ঘুরে ঘুরে চলে যায়। যতবারই সে আসে সবিস্ময়ে দেখে দীর্ঘায়তন ঐ সুন্দর পুরুষটি স্থিরাসনে বসে আছে, বন্ধ ঘরে প্রদীপ শিখার মত নিষ্কম্প, অচল। সারা অঙ্গে কোথাও চঞ্চলতা নেই, শুধু ঠোঁট দুটি যেন প্রজাপতির পাখার মত ঈষৎ কাঁপছে, আর হাতের আঙুল যেন একটু একটু নড়ছে। ঘটিযন্ত্রে বালু যেমন ঝিরঝির করে' নিঃশব্দে ঝরে, আঙুলের ডগাটা যেন তেমন ভাবে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

অযুত প্রশ্ন জাগে রঘুর মনে। তারই উদ্দীপনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠে, কিন্তু কৌতূহল তার ভরে না। অসংখ্য রহস্য ঘিরে আছে এই অজানা সুন্দর শান্ত মানুষটিকে। রঘুর কিশোর চিত্ত তার সমাধান খোঁজে এবং সেই সব রহস্যের সহস্র বন্ধন তাকে বারংবার আকর্ষণ করে আনে এই অপূর্ব পুরুষটির সান্নিধ্যে।

বিচিত্র কত কাহিনী শোনে রঘু। কিছু সে বোঝে, কতক সে বুঝতে পারে না এবং বোঝে না বলেই বিস্ময়ের তার অন্ত নেই ! অবুঝ একটি শ্রদ্ধার ভাব তার নির্মল বালক-মনে স্থির আসন পেতেছে—তার জাগ্রত জীবনে সারাক্ষণ সে তাকেই প্রদক্ষিণ করে ফিরছে।

বহু গল্প শুনেছে রঘু এই অদ্ভুত মানুষটির সম্বন্ধে। ঐ যে ওর ঠোঁট নড়ে আর আঙুল চলে, সেও কেবল জপ করে বোলে। ও জপ করে সারা দিনরাত্রি। পূজা, জপ তো দেখেছে রঘু—কত আয়োজন, কত প্রকরণ, কিন্তু সে তো সারাদিনের নয় ! এ জপ করে হরি নাম, অথচ তা করবার তার কথা নয়। সে যবন, তার পক্ষে এ জপ অধর্ম, পাপ। এহেন সৌম্য মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে, রঘু তা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারে না। পাপীর কি এমন সুশ্রী চেহারা হয় ? এমন স্নিগ্ধ প্রশান্তি ?

অথচ রঘু শুনেছে—এই অধর্মের অপরাধে ওকে হাজার বেত মেরেছে কাজীর লোক—বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে সকলের সামনে কত অপমান, নির্য্যাতন করেছে—কিন্তু নির্ভীক এই মানুষটি তার হরিনাম জপ ছাড়েনি। অবিচার, অত্যাচার তাকে স্পর্শ করেনি। সে প্রতিবাদ করেনি, চায়নি প্রতিকার। আপন মনের সকল স্নিগ্ধতা জড়ো করে' সে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে অত্যাচারীর কল্যাণ, তাদের অপরাধের ক্ষমা, পাপের পরিত্রাণ !

ধনজন সুখসম্পদ সব ছেড়ে সে চলে এসেছে। ফেলে এসেছে তার নাম ধাম, জ্ঞাতি গোত্র, সকলই এক হরির জন্য। তাই তার নাম হয়েছে হরিদাস। পথ থেকে একদিন তাকে আদর করে নিয়ে এলেন বলরাম আচার্য্য, রঘুদের বংশের পুরোহিত। নিরালায় একটি ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী করিয়ে তাতে বসালেন হরিদাসকে। সেদিন গ্রামের উচ্চ নীচ সকলেরই কি আগ্রহ ও উদ্দীপনা—তার জেঠা ও বাবার এই মানুষটিকে কি সমাদর ও সহৃদয় আনুকূল্য !

নির্জন পর্ণশালায় হরিদাস আপন মনে সর্বক্ষণ নাম কীর্ত্তনে ব্যস্ত। কারো সঙ্গের তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁকেও কারো দরকার হয় না। বালক রঘু কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারলে না। পড়ুয়া সে। পড়া ও খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে হরিদাসকে দেখে আসে। বিস্ময় থেকে জাগে শ্রদ্ধা, সহজ প্রীতি।

রঘু ধরলে বলরামকে। বালকের আগ্রহ তাকে স্পর্শ করল। তারই সহায়ে রঘু আশ্রয় পেলে হরিদাসের। মধুর তাঁর ব্যবহার, অমৃতময় তাঁর কথা, স্নিগ্ধ শীতল শান্ত নির্মল তাঁর পরিবেশ। যে বিরাট সম্পদের মধ্যে রঘু জন্মেছে, যে ভোগ সুখে সে আজন্ম অভ্যস্ত—তার আকর্ষণ ও বন্ধন যেন ক্রমে শিথিল হয়ে এল।

গৌড়পতির মজুমদার রঘুর জেঠা ও বাবা, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন। বৎসরে কুড়ি লক্ষ মুদ্রা তারা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে; বারো লক্ষ দেয় বাদশাহকে, নিজেরা রাখে আট লক্ষ। জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় পরিজনে ভরা বিরাট সংসার, লক্ষপতির বিপুল প্রতিপত্তি, অবিরাম সম্ভোগের বিচিত্র ও বহুল উপকরণ-সম্ভারের সাড়ম্বর আয়োজন ও নিত্য নূতন পার্বণ উৎসবের আনন্দ ও দীপ্তি ক্রমে যেন রঘুর কাছে ম্লান হয়ে এল।

নির্মোহ হয়ে প্রাসাদ ও প্রিয়জন ছেড়ে রঘু চলে আসে হরিদাসের পাতার কুটীরে। নিভৃত আলাপের সরসতা ও তৃপ্তি তাকে দিনে দিনে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। নির্বাক হয়ে সে শোনে পর্বে পর্বে এক বিচিত্র রহস্য কাহিনী—বন্দী আত্মার মুক্তির ইতিহাস।

মান-মোহের লতাতন্তু দিয়ে আপন-রচা জালে আত্মা বন্দী। কোন জীব জানে সে কথা, কেউ বা আদৌ জানে না, শুনলেও বোঝে না। কিন্তু যে জানে, শুনে যে ব্যথা পায়, সে চায় মুক্তি পেতে। অদ্ভুত এই বন্দীত্ব, অপূর্ব এই মুক্তি। জীব বন্দী আপন স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, নিজ মনের অধীনতায়, মুক্তি তার ঈশ্বর পরতন্ত্রতায়, ভগবদাশ্রয়ে। তাই ভগবানই কেবল পারেন এই মুক্তি দিতে। জীবের বন্ধনে যে তাঁরও বন্ধন, তিনি যে আত্মার আত্মা।

তাই তিনি অবিরাম ডাকছেন জীবকে আপনার দিকে, আকর্ষণ করছেন। স্বাতন্ত্র্যের বন্দীকোষ থেকে এই ভাবে নিত্য আকর্ষণ করেন বোলে ভক্ত তাঁকে বলে কৃষ্ণ। কত ভাবে আসেন কৃষ্ণ, কত রূপে। দিব্য তাঁর জন্ম ও কর্ম, বিচিত্র গভীর তাঁর লীলা। যুগ যুগান্তর ধরে চলেছে কৃষ্ণের এই লীলা-বিলাস। আত্মা ও পরমাত্মার গম্ভীর সম্বন্ধের অতল রহস্য-কথা মানুষ কত কাল ধরে বলছে, অপূর্ব কত কাব্য কাহিনী রচনা করেছে। সে কথার শেষ নেই!

শুনতে শুনতে রঘু একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। শরীরে জাগে রোমাঞ্চ। জানা অজানা, সত্য মিথ্যা, বিশ্বাস অবিশ্বাস সব একাকার হয়ে যায়। মূক বিস্ময়ে রঘু শোনে হরিদাসের কথা—মানুষের ঘরে মানুষের রূপে পরম দেবতার দিব্য লীলার অশ্রুতপূর্ব কাহিনী।

রুদ্ধনিশ্বাস রঘু হরিদাসের কাছে বসে তাঁর অবসর কালে ভক্ত ও ভগবানের নানা লীলা কথা শোনে দিনের পর দিন এবং ধীরে ধীরে তার বয়স বাড়ে। কৈশোর পার হয়ে আসে যৌবন প্রারম্ভ। আত্মিক আত্মীয়তায় বিভিন্ন বয়সী দুটি মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠে। হরিদাসের হৃদ্য সাহচর্যে রঘুর পরম আনন্দ, তার সান্নিধ্যে রঘু জগৎ ভুলে যায়।

কিন্তু জগৎ তো তাদের ভোলে না! সংসারের ঘটনার কুটীল আবর্ত্তের বিষম ঘূর্ণিপাকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—তাদের নিরালা সম্পর্কে ছেদ পড়ে একদিন।

তার সূচনার ব্যাপার ঘটলো রঘুদেরই বৈঠকখানায়। আচার্য বলরামের সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে কৃষ্ণকথা শোনাতে এসেছেন হরিদাস। হৃৎকর্ণরসায়ন সে কথা ভক্তিমান হয়ে শুনছে সকলে। অকস্মাৎ উদ্ধত এক যুবা অনাবশ্যক রূঢ় প্রতিবাদে মর্য্যাদাহানি করলে হরিদাসের। বিরক্ত ও ক্ষুন্ন হয়ে সকলেই সেই যুবার হয়ে ক্ষমা চাইলো হরিদাসের কাছে।

স্মিতমুখে হরিদাস বল্লেন:

> তোমা সবা দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
> তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
>
> * *
>
> যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
> আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কার॥

এই ঘটনার পরে সকলের নিন্দাভাজন ও অবজ্ঞার কারণ হয়ে সেই যুবা বিষম দুঃখে পড়ল। হরিদাস ব্যথা পেলেন এবং কিছুদিন পরে বলরামের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলেন শান্তিপুরে।

রঘুর জগৎ শূন্য হয়ে গেল। সবার মমতা ছেড়ে যাঁকে সে আঁকড়ে ধরেছিল, তিনি চিরদিনের মত দূরে চলে গেছেন। সুখ সম্পদের কোন আকর্ষণই যে বোধ করে না, সেই সমৃদ্ধি সম্ভোগের বিপুল আয়োজন তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। তার মুখ চেয়ে যে সঞ্চয় ও সংসার—রঘুর জেঠা ও বাবা তাকে তা ছাড়তে দেবেন কেন? অথচ তার মন পড়ে থাকে শান্তিপুরে। লোক মুখে সে শুনেছে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ও ভক্তাগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্যের অপূর্ব জীবন ও চরিত্র কথা। বহু সমাদরে হরিদাসকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। গঙ্গাতীরে নির্জনে তার জন্য তৈরী করেছেন এক গোফা। সেখানে দুজনে পরম প্রেমে একান্তে নিত্য কৃষ্ণকথা আস্বাদন করেন।

নিজ সুখে কিন্তু অদ্বৈতের তৃপ্তি নেই। সাধারণ মানুষের ঈশ্বর-স্পর্শহীন জীবনের ব্যর্থতা তাঁকে উদ্বেলিত করে, অশান্ত করে' তোলে তাঁর প্রশান্ত নির্মল হৃদয়। অদ্বৈতের তাই এক ধ্যান—কেমন করে মানুষকে ঈশ্বর-মুখ করে তুলবেন। এরা যদি নিজেদের অজ্ঞতায় তাঁকে না চায়, তবে সর্বজ্ঞ তিনি কেন এদের উদ্ধারের জন্য নিজে আসবেন না? ডাকার মত ডাকলে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকবেন কেমন করে?

একদিন রঘুর কানে এল অদ্বৈতের অপূর্ব প্রতিভার কথা। সভক্তি আরাধনে ও সমুৎকণ্ঠ আবাহনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নব আবির্ভাবের সাধনায় মন দিয়েছেন। যে কৃষ্ণ সর্বজীবকে আকর্ষণ করেন, সর্বজীবের হয়ে প্রেম ভক্তির সুদৃঢ় ডোরে তাঁকে আকর্ষণ করছেন অদ্বৈত আচার্য্য!

তাঁর অভিনব এ সাধনায় যোগ দিয়েছেন হরিদাস। দিনরাতে তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপের ব্রত নিয়েছেন তিনি। ভক্তের বিরাম বিশ্রামহীন ভালবাসার ডাক তিনি কি না শুনে থাকতে পারেন? রঘুও

ডাকে, প্রতিনিয়ত তার ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে। কৃষ্ণ আবাহনের এ দিব্যনাট্যে ভূমিকা নিতে তার মন উৎসুক হয়ে উঠে। কেবল মনে হয় সে যদি চলে যেতে পারতো অদ্বৈত-হরিদাসের কাছে। তাঁদের পাদমূলে বসে সেও কাতর হয়ে ডাকতো ভগবানকে।

হরিদাসের কাছে সে কতবার শুনেছে শরণাগতের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি যে ভক্তবৎসল। ভক্ত তাঁর প্রাণের চেয়ে আপন, প্রিয়াৎপ্রিয়। আর হরিদাস বলেছিলেন যদি কেউ নিষ্কপটে একবারও বলে 'কৃষ্ণ আমি তোমার,' তবে তিনি অবিলম্বে আশ্রয় দেন। বারংবার তাই রঘু এই কথা বলে আপন মনে। কেমন সে আশ্রয়, কি তার রূপ বা চিহ্ন—তা সে জানে না, কিন্তু এই কথায় তার মন পায় সমূহ আনন্দ ও তৃপ্তি। সে অন্য কারো নয়, সে কেবল কৃষ্ণের—এই কথা বলার গৌরবেই সে সহস্রবার আবৃত্তি করে হরিদাসের উপদেশ—আর মনের অন্তরে জাগে আশ্বাস যে কৃষ্ণ তাকে আশ্রয় দেবেন।

ঈশ্বরশরণাগতের কৃষ্ণাশ্রিতের স্পষ্ট ও পরিস্ফুটরূপ তো দেখেছে রঘু। যেমন বলেছে শ্রুতিতে

প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

এমন একটি মানুষের নিত্য স্নেহাশীষের সরসতায় পদ্মের পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠেছে তার কিশোর হৃদয় যিনি

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী॥

দম্ভ, দর্প অভিমান ও অহঙ্কারের যে অযুত উপকরণ তাকে সতত অজগরের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে আছে, তার বিষ নিঃশ্বাসের মালিন্য থেকে কৃষ্ণই কেবল তাকে পরিত্রাণ করতে পারেন ভক্তির অমলতায়। কৃষ্ণে ভক্তি করলে সব কাজই করা হয়, একথা তাকে বলেছিলেন হরিদাস। সংসার ও বিষয়ের সব কাজই তার কাছে বিরস বিস্বাদ। সব কাজ ছেড়ে তাই কৃষ্ণ আরাধনায় সে মনপ্রাণ দিতে চায়, থাকতে চায় সে সংসারের সহস্র অনাকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণের বাহিরে, ভক্তিনির্মল মনোমন্দির দ্বারে।

শান্তিপুরে যে দিব্যনাট্যের সূত্রপাত হয়েছিল জনান্তিকে, কালের সঙ্গে স্থানের পরিবর্তন হয়ে তা প্রকট পরিণতির পথে এল নবদ্বীপে। পাণ্ডিত্যের মাতৃক্রোড়ে চন্দ্রকলার লাবণ্যে জেগে উঠল ভক্তির শিশু। রঘুনাথের কাছে অজানা রইল না বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব কাহিনী, তাঁর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম এবং অবশেষে একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাঁর অপূর্ব রূপান্তর কথা।

অদ্বৈত-আলয়ে নবীন সন্ন্যাসীরূপে এসেছেন বিশ্বম্ভর, সঙ্গে তাঁর অবধূত নিত্যানন্দ। হরিনাম কীর্ত্তনের ঢল নেমেছে গঙ্গার কূলে কূলে। বিশাল জনসংঘট, আপনাদের হারিয়েছে সে প্রবল প্লাবনে। সকল অভিমান ভুলে' সবাই আজ সবায়ের আপন!

নিরালায় আর থাকতে পারল না রঘুনাথ। গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে সে চলে এল শান্তিপুরে। প্রসন্ন হয়ে অদ্বৈত তাকে চৈতন্য-চরণে নিবেদন করলেন; স্নেহে অভয় দিলেন নবীন সন্ন্যাসী।

শান্তিপুরে ভক্তিবিলাস উৎসব-শেষে সন্ন্যাসী চলে গেলেন নীলাচলে। ক্ষণিক সে সুখনাট্য যখন শেষ হ'ল, শূন্য মনে রঘু ফিরে এল সপ্তগ্রামে নিজের ঘরে। কিন্তু ঘরের সকল আকর্ষণই যে তার নিঃশেষে কেটে গেছে। চৈতন্যদেবের চরণলগ্ন মন ও দেহ তার নীলাচলের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথই যে দেখে না, আশ্রয়নীয় জ্ঞান করে না। বারংবার সে সপ্তগ্রাম ছেড়ে যেতে চেষ্টা করল। প্রতি বারই তার সে প্রয়াস ব্যর্থ হোল—আত্মীয়তার শৃঙ্খলে সে রইল বন্দী।

রঘুর মা কিছুতেই বোঝেন না 'কেন তার এ পালাবার প্রয়াস—তার এই নির্মোহ। কোন উপায় না দেখে তিনি স্বামীকে অনুরোধ করেন—

"পুত্র যে বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।"

বিষন্ন চিত্তে রঘুর বাপ বলেন:

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হয়েছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥

অন্তরের অন্তরে রঘুর বাবা এই কথাই জেনেছিলেন। তবু, সাংসারিক দায়িত্ব পালনে উদাসীন না হয়ে একমাত্র বংশধর ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারীকে ঘরে রাখবার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করলেন। তাদের সদাজাগ্রত স্নেহময় প্রহরা এড়িয়ে রঘু আর পালাতে পারে না।

দিন যায়। রঘু শোনে পুরী থেকে ফিরে নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে পাণিহাটীতে আছেন! পিতার অনুমতি নিয়ে সে এল অবধূতের চরণ-দর্শনে। পরম স্নেহে ও বাৎসল্যে আশ্রয় দিলেন তিনি এবং এতদিন সে আসেনি এই স্নেহাপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে এক ভোজন মহোৎসবের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও দরিদ্র সেবায় মুক্তহস্ত রঘুর দুই অভিভাবক অবধূতের প্রসন্নতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত আয়োজনে ত্বরান্বিত হলেন। অসংখ্য মানুষের মিলন উল্লাসে ও হরিনাম কীর্ত্তন-মঙ্গলে সে দিনটি সকলের স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল হয়ে রইল।

রঘুর এক আস্পৃহা, এক প্রশ্ন। তাকে অভয় দিলেন নিত্যানন্দ

"নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ॥"

ভক্তজনের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রঘু ঘরে ফিরল। অবধূতের আশ্বাসে তার মন অনেক শান্ত। তবু সারাক্ষণ তার মনে হয়—কবে পাবে সে অভয়পদ, কবে হবে তার স্বাতন্ত্র্য থেকে পরিত্রাণ। রঘু দিন গোণে। চৈতন্যদেবের প্রত্যেকটি সংবাদের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। নবীন সন্ন্যাসী শান্তিপুর ছেড়ে নীলাচলে গেছেন, সে আজ প্রায় পাঁচ বছর আগে।

এই দীর্ঘ দিন-প্রবাহ রঘুকে উদ্বেজিত করেছে, তবু এসেছে আশ্বাস, জাগ্রত আছে আশা, দীপ্ত আছে তার আস্পৃহা।

বৃন্দাবন যাবার পথে চৈতন্যদেব আবার শান্তিপুরে এসেছেন। সঙ্গে সেবার দ্রব্য ও লোকজন দিয়ে রঘুর বাপ পাঠালেন ছেলেকে। সস্নেহ অনুরোধ করতে তিনি ভুললেন না যে, সত্বর সে যেন বাপের কাছে ফিরে আসে।

চৈতন্যদেবের চরণকমলছায়ায় রঘুর আশ্রয়, তবু প্রতিক্ষণে তার মনে হয়—

"রক্ষকের হাতে মুই কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥"

চৈতন্যদেব উপদেশ দিলেন রঘুকে

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে উদ্ধার॥"

পাণিহাটিতে অবধূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই রঘু আশ্রয় নিয়েছিল বাহিরে, দুর্গামণ্ডপে। তার এই নিরাড়ম্বর ও অনাসক্ত অবস্থান মর্মপীড়ার কারণ হলেও, সে যে বাড়ীতে চোখের সামনে আছে এই ভেবেই রঘুর আত্মীয়স্বজন তৃপ্ত হয়েছেন। এবার শান্তিপুর থেকে ফিরে গুরুর উপদেশমতো রঘু লোকব্যবহার অব্যাহত রাখল, যথাযোগ্য কাজে মন দিল। তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জ্যেঠা, বাপ ও অন্য আত্মীয়স্বজন যেমন শান্ত হলেন, সেই সঙ্গে রঘুর উপর প্রহরাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল।

গোপনে রঘু চৈতন্যদেবের সকল সংবাদ সংগ্রহ করে। মথুরা বৃন্দাবন পরিক্রমা শেষে তিনি ফিরেছেন নীলাচলে। তাঁর গৌড়ের ভক্তেরা বিরাট একটি দলে সংঘবদ্ধ হয়ে চলেছেন তাঁর চরণ দর্শনে। আছেন সে দলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও রাঘব, মুকুন্দ ও মুরারি, আছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়রচয়িতা গুণরাজ, ভক্ত যাত্রীদলের পালনকর্তা ও কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ, আর আছেন বাসুদেব দত্ত, গুরুর চরণে যাঁর অমর মিনতি মানুষের উদারতার সীমা।

"জীব দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব জীব পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীব পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

এই ভক্তের মেলায় স্থান হোল না কেবল রঘুনাথের। সকল প্রাণ, মন, দেহ যার উন্মুখ হয়ে আছে পথে নামবার জন্য, সেই রইল বন্দী। অথচ গুরু তাকে শান্তিপুরে মিলনকালে উপদেশ সূত্রে বলেছিলেন—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥

সে কাল এসেছে; আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় রঘু প্রতিটি মুহূর্তের দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চৈতন্যবাক্য অমোঘ, তবু বার বার মনে হয় কোথায় সে ছল—যা হবে তার মুক্তির উপায়।

আজ রাত্রে বিশ্রামের সময় কত প্রার্থনাই না সে করেছে। কৃষ্ণনাম-জপে নিবিষ্ট তাকে নিদ্রিত মনে করে রক্ষীরা নিজেরা ঘুমিয়েছে। তখনও চারদণ্ড রাত বাকি, এমন সময়ে রঘুর নিজ পুরোহিত এবং বাসুদেব দত্তের বিশেষ অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য এসে তাকে ডাকলেন। যদু নিজে অদ্বৈতের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং সেই হেতু চৈতন্যদেবের পরম অনুরক্ত। বিষম অসুবিধায় পড়েছেন ব্রাহ্মণ—তাই রঘুর সাহায্য প্রয়োজন। ভোর না হতেই তাঁর নিজ গৃহদেবতার পূজা রাগ ভোগের জন্য পুরোহিত চাই। নিত্য ঠাকুর-সেবা যে করে সে কোন কারণে নারাজ। রঘুকে তিনি বল্লেন "আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে তুমি বলবে চল, তোমার কথায় কাজ হবে। অন্য কোন ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না।"

পুরোহিতের সঙ্গে রঘু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। রক্ষীরা নিদ্রিত। বাইরে এসেই রঘুর মনে হল এই তো সুযোগ—সেবক রক্ষক কেউ বাধা দেবার নেই। যদুকে সে বল্লে—"আপনি বাড়ী যান, আমি এখনি গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব।" সন্তুষ্ট হয়ে যদু নিজের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন, আর রঘু চৈতন্যচরণ স্মরণ করে পা বাড়াল নীলাচলের পথে।

প্রণাম করে' রঘু এগিয়ে গেল, যদুনন্দন ফিরে এলেন। নির্জন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রির অস্পষ্ট মায়ালোকে অকস্মাৎ তার সংশয় জাগল যে—আজ ডাক দিয়ে যিনি তাকে আনলেন ঘরের বাহিরে সত্যই কি তিনি যদুনন্দন। অদ্বৈতের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সেই হেতু চৈতন্যের পরম অনুরক্ত এই উদার ব্রাহ্মণের ছদ্মরূপেই কি ঘর ছাড়বার আহ্বান দিলেন তার পরমগুরু—যাঁর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণের জন্য তার যুগাধিক কালের সাগ্রহ প্রতীক্ষা? এই কি সেই ছল যা তার মুক্তির উপায়? এই নিশিশেষে তার জীবনে নব অরুণোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণের এই সূচনা কি সেই ইষ্টকৃপা?

সকল সংশয় ও সঙ্কোচ নিঃশেষে মন থেকে মুছে রঘু নির্ভয়ে পথে নামল—যুগে যুগে যে পথে নেমেছেন কত মহাজন জীবনের পরম পুরুষার্থের শাশ্বত সন্ধানে।

সেকালের কথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সালের কথা…বাঙলা ১৩১২। জাতে আমরা তখন না-বাঙালী, না-সাহেব্—বিলাতী সভ্যতার জলুশে আমাদের চোখের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে আছে! বিলিতি পোষাক, বিলিতি ভাষা, বিলিতি হাবভাব নকল করতে মত্ত! ওগুলো আয়ত্ত করতে না পারলে যেন 'মানুষ' বলে' পরিচয় দিতে পারবো না—এমন অবস্থা! ভালো সরকারী চাকরি—তদভাবে ওকালতি, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারি করে অর্থ-উপার্জ্জন করতে হবে। দেশ বা দেশী-ভাব—এ-সবের স্বপ্নও দেখিনা!

এমন সময়ে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন লর্ড কার্জ্জন—১৮৯৯ সালে।

এতবড় দাম্ভিক বুরোক্রাট লাট ভারতে বড় আর আসেননি! কার্জ্জন ছিলেন অতি-সাধারণ ইংরেজ—পারস্য ভ্রমণ করে পারস্যের রাজনীতি প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি একখানা বই লেখেন—সে বই পড়ে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আমেরিকায় পাঠান কী এক দৌত্যকার্য্যে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তখন ক্লীভলাণ্ড—প্রেসিডেণ্টের হোয়াইট হাউসে মার্কিন ক্রোড়পতির কন্যা মিস লাইটারের সঙ্গে হলো কার্জ্জনের পরিচয় এবং প্রেম—তার ফলে বিবাহ। বিবাহে রাজকন্যা এবং রাজ্যলাভ করে কার্জ্জন ফিরলেন ইংলণ্ডে। রাজকন্যা পত্নীর দৌলতে তাঁর মিললো বিলাতী সমাজে আভিজাত্য এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে তখন লর্ড অফ কেড্‌লেষ্টোন উপাধিতে ভূষিত করে ভারতে পাঠালেন ভারতের বড়-লাট করে!

১৮৯৯ সালে কার্জ্জন এলেন ভারতবর্ষে। এসেই স্ত্রীর দৌলতে পাওয়া বড়মানুষী এবং দম্ভের পরিচয় দেয়া সুরু: সব-কাজে নিজেকে জাহির করা চাই—যেন তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নন—ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা! সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া মারা গেলে তাঁর পুত্র সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হলো—লর্ড কার্জ্জন করলেন ১৯০৩-এ ভারতের দিল্লীতে দরবারের অনুষ্ঠান। সে-দরবারে সম্রাট আসবেন না—তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আসবেন রাজপুত্র ডিউক অফ কনট—সস্ত্রীক। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লীর মরুবক্ষে তৈরী হলো বিরাট প্রাসাদ—রেল-লাইন প্রসারিত করে কিংসওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণ—এবং বহু শিবিরের সন্নিবেশ। ভারতের রাজা-মহারাজারা, প্রজারা সম্মান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে! দরবারের সময় প্রাসাদে এসে উঠলেন লর্ড কার্জ্জন সস্ত্রীক; ডিউক অফ কনটের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো শিবিরে। দরবার-প্রাঙ্গণে সস্ত্রীক লর্ড কার্জ্জন বসলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে—ডিউক অফ কনট বসলেন সস্ত্রীক তাঁর পিছনে রৌপ্য-সিংহাসনে। রাজার সম্মান প্রথমে নিলেন লর্ড কার্জ্জন—তারপর অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করলেন ডিউক অফ কনট—লর্ড কার্জ্জনের পিছনে দণ্ডায়মান অবস্থায়! দিল্লীর দরবারেই কার্জ্জনের জাঁক-জমক নিবৃত্ত হলো না—বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংস্থাপন! এ সবের ব্যয়-নির্ব্বাহ করলো ভারতের প্রজা এবং রাজা-জমিদারের দল!

এর পর ইউনিভার্সিটি-আইন রচনা করে কার্জ্জন করলেন বিদ্যা-শিক্ষার ব্যয়কে দুর্ম্মূল্য—এবং সাধারণ-গৃহস্থের পক্ষে প্রায় দুর্লভ সামগ্রী। তারপর ১৯০৫ সালে কার্জ্জনের মোক্ষম-আঘাত—বঙ্গ-বিভাগ!—সারা বাঙলা-দেশ জুড়ে উঠলো প্রতিবাদ। কার্জ্জন তাতে কর্ণপাত করলেন না। ৩০শে আশ্বিন তারিখে বাঙলাদেশ হলো কার্জ্জনের হাতে দ্বিখণ্ডিত!

প্রতিবাদে ফল হলো না দেখে বাঙলার নেতৃবর্গ—তখন বিলাতী বণিকের পকেটে আঘাত দিতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। সকলে বিলিতি জিনিষ বর্জ্জনের পণ করলেন! কত টাকার বিলিতি কাপড়-চোপড় আগুনে পোড়ানো হলো—তার সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিলাতী বর্জ্জনের প্রোগ্রাম-পালনে বিলাতী লবণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করা হলো—অবজ্ঞাত দেশী করকচের হলো আদর! সকলে বিলাতী সাবান-সেণ্ট বর্জ্জন করতে লাগলেন। সাবানের কত দেশী

কারখানা স্থাপিত হলো। সেগুলির মধ্যে স্বর নীলরতন সরকারের ন্যাশনাল সোপ এবং কবি প্রমথনাথ রায়-চৌধুরীর ওরিয়েণ্টাল সোপ—এ দুটি কারখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩০-এ আশ্বিনের জন্য—যেদিন বঙ্গ দ্বিধাভিন্ন হবে—প্রোগ্রাম হলো—অরন্ধন। কোনো বাড়ীতে উনুন জ্বলবে না। রোগী এবং শিশু ছাড়া সকলে ফলাহার করবেন—কিম্বা বাসি-ভোজন। সকালে উঠে সকলে গঙ্গায়—যেখানে গঙ্গা নেই,সেখানে নদীতে—স্নান ; স্নানান্তে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবেন।—রাখী বন্ধনের মন্ত্র বিরচিত হয়েছিল—

"ভাই ভাই এক ঠাঁই—
ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠান-পর্ব্বের জন্য গান লিখলেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান।"

এ-গান কাগজে ছেপে সারা বাংলা দেশে হ্যাণ্ডবিলের মতো আগে থেকে বিতরিত হলো! রাখী বেঁধে সমস্বরে সকলে এ-গান গেয়ে পথে বিচরণ এবং অর্থ ও বনিয়াদী সম্ভ্রমের আপামর সাধারণের হাতে রাখি বাঁধতে হবে। এমনি মিছিলে "বন্দেমাতরম" গান গাওয়া হয়েছিল। এই বিদেশী বয়কট চরম পরিপূর্ণ করবার জন্য নানা সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তর কলিকাতায় ৺সুরেশ সমাজপতি "বন্দেমাতরম" সম্প্রদায় এবং ভবানীপুরে ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গঠিত "স্বদেশ সেবক" সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সহরে আশ্চর্য্য রকমে স্বাদেশিকতা-প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম' সম্প্রদায় 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে সহরের পথে পথে ভিক্ষা সংগ্রহ করতেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় দুজন ভালো গায়ককে বেতন দিয়ে নিয়োগ করেন—এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ৺নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নারায়ণচন্দ্রের একখানি গান তখন গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে অনেকের কণ্ঠে উৎসারিত হতো। গানের দুটি ছত্র আমার মনে পড়ে—

মা, আমার টানাটানি পড়েছে—
বাজারেতে ধার মেলে না,
এবার চুরি করবো শ্যামা
চুরি করবো তোর পা দুখানি—মা
তাও শিব আগলেছে।

কাব্যবিশারদ মহাশয় নিত্য নতুন নতুন গান লিখে তাঁদের দিয়ে গাইয়ে সহরের পথে পথে বেড়াতেন। সে-সব গান খুব জনপ্রিয় হয়। সে-সব গানের মধ্যে মনে পড়ে, একটি ছিল—

দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এসো চণ্ডি যুগান্তরে
. পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে বঙ্গ-অঙ্গ খণ্ড করে।

এ ছাড়া আরো গান—

আমার যায় যাবে জীবন চলে—
আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবে ?
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?

আর একটি গান—

গুর্খা দেখে মূর্খ যত, কি আতঙ্কে অভিভূত
উচ্চ শির অবনত, এত শঙ্কা কি কারণে ?

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নতুন করে' খুব সহজ ঘরোয়া-ভাষায় লিখলেন—"বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা"। এই ব্রত-কথাও ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে দেশের বেশীর ভাগ মানুষ জানতো—মস্ত বড় ঘরের ছেলে, সোনার পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে কবিতা লেখেন! কজন জানতো, কিশোর বয়স থেকে তিনি এবং তাঁর দাদারা নানাভাবে স্বদেশীয়ানা-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন; মেলা, থিয়েটার প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানকে 'ন্যাশনালে' পরিণত করেন ৺নবগোপাল মিত্র এবং এই ৺নবগোপালের সহযোগী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। ৩০শে আশ্বিন (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পল্লী-যুবকদের এবং গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিয়ে খালি পায়ে গঙ্গায় স্নান করে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন—গেয়েছিলেন গান—

"আমরা আজ দ্বারে দ্বারে ফিরবো
তোমার নাম গেয়ে।"

বস্তীতে ইতর-অন্ত্যজদের ডেকে তাদের হাতে রাখী বেঁধে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন।—"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" বলে। বৈকালে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর প্রকাণ্ড গৃহের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ভিক্ষা-সংগ্রহের ব্যবস্থা—লক্ষ লক্ষ লোক উড়ানি মাত্র গায়ে নগ্ন পায়ে এসে দেশমাতার নামে সামর্থ্য-মতো ভিক্ষা দিয়েছেন। ভিক্ষালব্ধ সে অর্থ—ন্যাশনাল ফণ্ড। সেদিন সাতাত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। ধনী আর গৃহস্থ শুধু নয়—মুটে মজুর গাড়োয়ানরা পর্য্যন্ত কিছু না কিছু অর্থ ন্যাশনাল-ফণ্ডে ভিক্ষা দিয়েছিল। সেদিন কেউ গাড়ীতে চড়েননি এবং স্বেচ্ছায় সকলে অরন্ধন মেনেছিলেন। দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল। কাকেও দালালী করতে হয়নি, হুমকি দিতে হয়নি—দোকান বন্ধ করো বলে! অভিজাত-সম্প্রদায়—মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ, ধনিক, বণিক, শ্রমিক সকলে মনে-প্রাণে যে মেলা-মেশা করেছিলেন—অন্তরের সেই স্বতস্ফূর্ত্ত মিলন—সেদিনকার সে ছবি মন থেকে আজো মিলিয়ে যায়নি!

কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে জাতীয়তার উদ্বোধন···শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের মনে সমভাবে জাগে দেশাত্মবোধের প্রেরণা। বাংলাদেশই শুধু জাগলো না—ভারতের অন্যান্য প্রদেশ—বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ—এরা তখনো বিদেশী স্বপ্ন-মোহে সমাচ্ছন্ন! বাঙলার এ চেতনা কি করে সারা ভারতে চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করলো—সে ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। মহামতি গোখেল যে কথা বলেছিলেন—বাঙালী আজ যা করে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকে সে সম্বন্ধে চিন্তা করে তার অনেক পরে—এ-কথা খুবই সত্য।

এই বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান উৎসারিত হয়েছিল—

তা বলে ভাবনা করা চলবে না
বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার খুলবে না।
* * * *
একলা চলো একলা চলো
একলা চলো রে···

এবং এই জাগরণের পর বাংলার বীর-কিশোররা সক্রিয় হলেন বিদেশের শৃঙ্খল থেকে, লাঞ্ছনা অপমান থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য।

বাঙালীর জীবনে স্বাদেশিকতার যে-বন্যা সেদিন উৎসারিত হয়েছিল, যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা তা ভুলবেন না! এর আগে দেশ বা দেশীয়তার সম্বন্ধে শুধু সৌখীন বক্তৃতা চলতো—মাসিকে-সাপ্তাহিকে লাগসৈ প্রবন্ধ লিখেই আমাদের উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হতো। বঙ্গবিভাগকে উপলক্ষ করে এই যে স্বদেশী-জিনিষ ব্যবহার এবং বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনের পণ নিয়েছিল বাঙালী—তার ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের নয়ানসুক-ধুতি, রেলির থান, ধুতি, শাড়ী বাঙালীর সংসার থেকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হলো। নতুন মিল খোলার প্রচেষ্টা চললো এবং ধনী-মধ্যবিত্ত-গরীব—সব পরিবারেই বিলাতী মিহি ধুতি-শাড়ী ছেড়ে মিলের মোটা ধুতি-শাড়ীর বহুল-প্রচলন হলো। কবি ৺রজনীকান্ত গান লিখলেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই!

এ গানের বাণী এবং সুর বাঙালীর প্রাণকে নব ভাবে স্পন্দিত করে ক্ষান্ত হয়নি—কাজে উদ্দীপনা, ব্রত-পালনে নিষ্ঠাদান করেছিল। হিন্দু-মুসলমান—হাতে হাত মিলিয়ে এক বাঙালী-মায়ের সন্তান দুজনে ভাই-ভাই বলে' সর্ব্ব-বাংলা বিভেদ ভুলেছিল।

এই সময়েই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংগঠিত হয়। পরিষদের জন্য আপার-সার্কুলার রোডের উপর পার্শীবাগানে (যেখানে আজ পালিত সায়েন্স কলেজ সংস্থাপিত) বহু বিস্তৃত জমি কেনা হয়। স্যর তারকনাথ পালিত এ জমি কেনেন। পরে স্যর আশুতোষের চেষ্টায় ঐ জমিতে প্রতিষ্ঠা হলো স্যর তারকনাথ পালিত সায়েন্স কলেজ।

দেশের মঙ্গলের জন্য—দেশের টাকা বিদেশীর হাতে যাবে না—এই উদ্দেশ্যে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে হয়েছিল।

এক কথায় লর্ড কার্জ্জনের ঐ আঘাতে বাঙলায় সর্ব্ব প্রথম স্বদেশী ভাব হলো জাগ্রত—এবং এ ভাব ক্রমে নানা ঘটনা-পর্য্যায়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মোহ-নিদ্রা ভেঙ্গে দেয়!

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিন্তু আমেরিকা তো ! এই এক ছবি ও ইনটার্ভিউ-এতেই যেন লোক-খ্যাত হ'য়ে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজার খাতির করতে লাগল বেশি : "সার আপনাদের ছবি যে !" একদিন রাতে Promoter নামে একটি ছায়াছবি দেখতে গেলাম—ছবিটির সুনাম শুনে। গেটে ঢুকতে না ঢুকতে এক দীর্ঘকায় পুরুষ বেরিয়ে এলেন, বললেন, ইংরাজিতেই অবশ্য : "স্বাগতম্। আপনাদের ছবি দেখেছি কাগজে। আসুন—টিকিট কিনতে হবে না।" আমরা "না না, সে কি—দুঃখিত হব—টিকিট কিনলাম ব'লে" আরো কত কী বললাম, মণিব্যাগ পর্যন্ত বার করলাম—কিন্তু কে কার কথা শোনে—অধিকারীর আরদালি ধ'রে নিয়ে গিয়ে চমৎকার আসনে বসিয়ে দিল। সেখানে ব'সে গুনগুনিয়ে গাইলাম মনে মনে :

আজব দেশের আজব কথা বলব ও ভাই কত !
যতই দেখি—ভাবি—ভাবি যতই মজি তত !

* * * *

কিন্তু তারকা যখন উর্দ্ধে মুখে তখন তাকে রোখে কে ? সহৃদয় বন্ধু শেফার এলেন এগিয়ে, বললেন আমাদের সংবর্ধনা করবেনই করবেন। চমৎকার কার্ড ছাপানো হ'ল "In honour of Dilip Kumar Roy and Indira Devi"······ইত্যাদি।

এ ধরণের সংবর্ধনা কালাপানির এপারে কখনো পাই নি। তাই একটু ভাবিত হ'য়েই গেলাম—কী জানি কী আছে কপালে ? ইন্দিরাকে বললাম কাছে কাছে থাকতে, কিছু শুনতে না পেলে যেই ধরিয়ে দেবে। কিন্তু হায় রে, সে জনতার অরণ্য কল্লোলে কোথায় পাব তাকে ? এ আসে এগিয়ে—আলাপ করিয়ে দেন গৃহকর্তা : "ইনি একজন নাম করা চিত্রী···উনি দার্শনিক···তিনি ভাস্কর···উনি কবি···উনি অধ্যাপক···" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু সমাদরের প্রাচুর্যই নয়, বিলক্ষণ জলযোগও তার সঙ্গে। আহার্যের অপর্যাপ্তির দেশে মিষ্টান্ন, আইসক্রীম, আরও নাম-না-জানা কত রকম রসনাতৃপ্তির উপকরণ ! বলেছি কিনা মনে নেই, মার্কিণ ভোজ্য অতি সুস্বাদু তথা বলকারী তথা বহু বিচিত্র। চর্ব্যচুষ্য লেহ্যপেয় যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম কেবল এই জন্যে যে সদাশয় শেফার সোমর পরিবেশন করেন নি—তাহ'লে কিছু আগে বর্ণিত সভার মতন হয়ত অনেক সভাসদই বেচাল হ'য়ে বলতেন আমাকে কত শত কথা—যা ব'লে ভদ্রসমাজে তাঁরা যদি বা মুখ দেখাতে পারতেন, শুনে আমি পারতাম না বিচরণ করতে। "সবাই কি সব পারে মণ্টু !" বলতেন শরৎচন্দ্র।

তবে সলজ্জে স্বীকার করব যে আত্মপ্রসাদকে রুখতে পারি নি যখন শেফার বললেন : "এত লোক আসবেন আপনাদের সংবর্ধনায় আমিও ভাবি নি।"

আমাদের অগণ্য শত্রুবৃন্দ হয়ত কিছুতেই মানবেন না যে এ-ধরণের সংবর্ধনার ফুলধনুর নিচে স্থায়ী কোনো ইন্দ্রধনু আছে। কিন্তু কতিপয় মিত্রও তো আছেন আমাদের। তাঁরা হয়ত সাধুবাদ দেবেন—তীব্র নিখাদে না হোক অন্তত কোমল গান্ধারে। বলবেন হয়ত : "সুনামের কিছু মূল্য থাকেই—খতিয়ে।" তবে উত্তরে হয়ত শত্রুবৃন্দ ফের বলবেন তারস্বরে : "এ কিছুই নয়—কাগজে নাম বেরুলে "হুজুগেরা" হাজিরি দেয়ই। কিন্তু তাঁদের মনে দুঃখ দিতেই হবে—যেহেতু সভায় এসেছিল বহু মানী, ধনী, চিত্রী, শিল্পী, অভিজাত। এঁদের সবাই হুজুগে—এঁদের চিন্তাভাবণের খাতিরেও একথা মানা সম্ভব নয়।

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবরের সুবৃহৎ হলে আমাদের নৃত্য গীতের আসর বসল। টিকিট করা হ'ল। নৈলে ঘরে স্থান সংকলান হ'ত না কিছুতেই। টিকিট করা সত্ত্বেও ঘরে স্থানাভাব হয়েছিল। অনেকে শেষটায় মাটিতেই বসেছিলেন ; যাঁদের মধ্যে শেফার অন্যতম।

শুরুতে শেফার আমাদের সংবর্ধনা করলেন একটি উপাধি দিয়ে : "এঁরা ভারতের সংস্কৃতির রাজদূত—cultural ambassador—আমরা ধন্য হয়েছি···" ইত্যাদি কত শ্রবণমঙ্গল কথা !

তারপর আমি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে। রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধেও কিছু বললাম। বললাম আমাদের সুর ইংরাজি, উচ্চ জর্মণেও গাওয়া যায় শ্রুতিমধুর ক'রে এবং একথার প্রমাণ প্রয়োগ করলাম পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গানটি যথাবিধি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ও জর্মণ ভাষায় গেয়ে। ওরা খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। বলল—এধরণের গান আরো গাইতে। কিন্তু প্রোগ্রাম ছিল মাত্র দেড়ঘণ্টার—তাই গাওয়া হ'ল না ফরাসী, রুশ কি ইতালিয়ান গান।

তারপর ইন্দিরা দিল একটি ছোট বক্তৃতা। বুঝিয়ে দিল মীরার কথা, মীরার বাণী—কী ভাবে তাঁর গানের সঙ্গে নৃত্য করবে। লোকে খুব নিল ওর নৃত্য—যখন আমার গাওয়া ইন্দিরার-রচিত মীরা ভজনের সঙ্গে ও নাচল নানা রকম তোয়া দিয়ে। সকলে খুব উচ্ছ্বসিত।

তারপর আমি একটি ভজন গাইলাম প্রথমে হিন্দিতে "ধীরে ধীরে সঙ্গ সমীরে," পরে বাংলায় ওর অনুবাদ—আজ কে প্রেমের তীরে এল সখী ধীরে ধীরে—যে গানটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। এ গানটিতে বহু তান ছিল—ওরা বলল তানগুলি শুনে ওরা মুগ্ধ হয়েছে। অন্তত বলল তো জনে জনে—জানি না সে উচ্ছ্বাস মেকি না খাঁটি। অন্তর্যামী

তো নই। তবে ওদের মধ্যে অনেকেই যখন প্রস্থান ক'রেও করতে চান না—কেবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন করমর্দন ক'রে বলতে—কী অপরূপ নৃত্য, কী অপরূপ গান"—পরে চিঠিও আসতে লাগল—আমাদের নামে—একটি অভিজাতবংশীয়া তাঁর সাল'তে আর একটি সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করলেন—তখন কী ক'রে বলি এদের উচ্ছ্বাসের ঘোলোকড়াই কানা? এই অভিজাতবংশীয়া বিবেকানন্দ স্বামীকে জানতেন—তাঁর স্বামীর মুখে শুনলাম। আরো শুনলাম যে তিনি না কি উদয়শঙ্করকে অর্থানুকূল্য করেছিলেন। ইনি খুব স্পষ্টভাষিণী—বন্ধু হাণ্টারকে বলেছিলেন: "ওঁদের আমি আমার এখানে সংবর্ধনা করতে চাই, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় আমার না আছে প্রবেশ, না ঔৎসুক্য।" এহেন মহিমা নৃত্য দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন যে এধরণের ভক্তিভাবের নৃত্য তিনি কখনো দেখেন নি। ইন্দিরাকে ও আমাকে বললেন: "আপনাদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল ব'লেই করেছি আপনাদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা।" এঁর ওখানে আমাদের সংবর্ধনায় ইনি শুধু যে নিমন্ত্রণ করলেন অনেক খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নীকে তাই নয়, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন তাদের নামধাম ইতিহাস টাইপ ক'রে যাতে ক'রে আলাপ ভালো জমে। এ-ধরণের নিমন্ত্রণপদ্ধতি কখনো চোখে পড়ে নি। মনে হয় বিদেশীকে নিমন্ত্রণ করলে তাকে আগে থাকতে এ ভাবে অভ্যাগতদের নামধাম কীর্তিকলাপ জানিয়ে দিলে উভয়পক্ষেরি বেশ একটু সুবিধা হয়। ইনি এঁর চিঠিতে শেষে লিখলেন: "As you know, I teach international relations at the San Francisco State College—for more than 25 years now, so I am a pioneer in this field···I hope to have everyone here by 4. 3o, so that we can get down to earnest talk."

এ-ব্যাপারটি এত ঘটা ক'রে বর্ণনা করলাম এই জন্য যে আজকের দিনে earnest talk বা সদালাপের সুযোগ বড় একটা ঘটে না বিশেষ ক'রে বড় শহরে—আমেরিকায় তো নয়ই। এখানে সকলেই ধায় দ্রুত, কাজ করে দ্রুত। একমাত্র ককটেল সেবন করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। কাজেই আলাপের যে প্রধান সর্ত অবসর, তার এখানে দেখা পাওয়া ভার। ইনি আরো নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে আলাপের প্রথম অঙ্কের পূর্বে গানের উপক্রমণিকা জমাতে। দেখা যাক কিরকম হয় এখানকার আলাপচক্র।

* * *

এর দুদিন পরে কনসাল সাহেবের ওখানে হ'ল আমাদের একটি সংবর্ধনা—তথা রাত্রিভোজন। গৃহকর্তা আমাদের পাঠালেন তাঁর বিরাট্ মোটর—সেক্রেটারি সমেত। তাঁর বাসভবন আমাদের হোটেল থেকে অনেক দূরে—সমুদ্রের ঠিক উপরেই। চমৎকার দৃশ্য সেখানে। খানিকটা গ্রামের শোভা—অথচ পুরোদস্তুর ফিটফাট শহর—"রুরাল তথা অর্বাণ"। কনসাল সাহেবের বৈঠকখানা ঘরের গবাক্ষ দিয়ে "স্বর্ণসেতু" দেখায় চমৎকার—সমুদ্রের একটি খাড়ির উপরে দোদুল্যমান বক্রাভ ছন্দে! উপরেও বড়রকমেরই আলো! বাস্তবিক, কী আলোরই সম্পদ এরা অর্জন করেছে! এক এক সময়ে কিন্তু চোখ বলে দুঃসহ। গেটে মৃত্যুকালে বলেছিলেন: "আরো আলো, আরো আলো।" এখানে এলে এমন কথা বলবার মুখ থাকত না—উল্টো গাইতেন নিশ্চয়। যাক্।

কনসালের ওখানে কয়েকজন চিন্তাশীল অধ্যাপক-জাতীয় অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে খুব ভালো লেগে গেল, কেন না ইনি চমৎকার কথা বলেন—রীতিমত পণ্ডিত যাকে বলে—তার উপর ধার্মিক কি না জানি না কিন্তু ধর্মজ্ঞ, কিনা ধর্ম সম্বন্ধে জানেন অনেক তথ্য। তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তিনি একবার কথায় কথায় বললেন—আলাপ আলোচনা ক'রে এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষকে অনেক কিছু বোঝাবে এটা বাঞ্ছনীয়। বলতে বলতে বৌদ্ধদের "জেন" সম্প্রদায়ের কথা উঠল। তাতে আমি বললাম হেসে: "জেন সম্প্রদায়ের কথা যখন উঠলই তখন বলি শুনুন ওদের এক গল্প। এক যে ছিল জেন প্রচারক—মস্ত জ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সত্যিকার জ্ঞানী। নাম গো-সান। তিনি একদিন তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন—একটি ভারি রসাল কথা বলেছিলেন তিনি: 'সদাশয় মানুষ যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকের মুখেই শোনা যায় কোনো প্রাণীকেই হত্যা করতে নেই। একথা আমিও মানি। কিন্তু শুধু প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রেই থামো কেন তোমরা? যারা সময়কে হত্যা করে, অপচয় ক'রে অর্থকে হত্যা করে, সমাজের অনেক সৌন্দর্যকে কদাচারে হত্যা করে তারা কি কম ঘাতক? সর্বোপরি, জ্ঞানলাভ না ক'রে যারা জ্ঞানের বাণী প্রচার করে তারা? এরা যে বৌদ্ধধর্মকেই করছে হত্যা'।

রস পেয়েছিলেন বন্ধু যদিও আমাদের গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়ত এ-লঘুহাসে একটু তরল হয়ে এসে থাকবে।

পরিশেষে আমাদের গান হ'ল।

এখানে এক আমেরিকান মহিলা ইন্দিরাকে বললেন—একটি দুর্দান্ত কথা। বললেন: "আমি নানা পুরুষের সঙ্গে ঘর করি—আমার স্বামী বোঝেন না—কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি তাদের সহবাস করি। ভগবান আমাকে দিয়েছেন রূপ যৌবনের সঙ্গে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আমি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করি আমার প্রাণশক্তি দেহস্পর্শের মাধ্যমে।"

এরকম সাংঘাতিক কথা যে কোনো মহিলা এমন অম্লানবদনে একজন সদ্য-পরিচিতাকে বলতে পারেন ভাবা হয়ত আমাদের পক্ষে একটু কঠিন, কিন্তু এদেশে এধরণের কথা নাকি নরনারী অবাধে ব'লে থাকেন, অনেক সময়ে উচ্চাঙ্গের বেপরোয়া হাসি হেসে। এতে হয়ত সত্যভাষণের কোঠায় কিছু লাভ হয়, কিন্তু ফলে যে সমাজে শীলাচারের কোঠায়ও স্থায়ী সম্পদ বাড়ে এমন বিশ্বাস হয়ত আমাদের মনে ঠাঁই পেতে পারবে না এখনো। তবে দিনাতিপাতে নৈতিকতা সম্বন্ধে যে মানুষের ধারণা বদলে যাচ্ছে এ-সত্য এত অতিপ্রত্যক্ষ যে আমরা হয়ত অতীত যুগের কোঠায় প'ড়ে যাচ্ছি—আর অতীত কবে বুঝেছে বর্তমানকে বা ভবিষ্যৎকে? যেই চিরন্তন বিরোধ যুগের সঙ্গে যুগের, লোকাচারের সঙ্গে লোকাচারের। প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের সন্ধি কি সম্ভব? কি জানি? জল চলেছে—কোথাকার জল কোন্ খালে গিয়ে কোন্ সংঘাতের সৃষ্টি করবে—কেউ কি বলতে পারে আগে থেকে?

(ক্রমশঃ)

অরণ্য-স্মৃতি

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ

(৩)

তার পর নয়দিন কেটে গেছে, আমাদের একটাও মোষ বাঘে মারে নি। এ কয়দিনে আমাদের সঙ্গীরা কেউ হরিণ, কেউ বা বন-শূয়োর মেরেছেন। কেউ সকাল সকাল উঠে পক্ষীকুল ধ্বংস করেছেন। আমার ভাগ্যে কিছুই জোটে নি।

আজ দু'টী জঙ্গল 'বিট' করান হবে স্থির হয়েছিল। প্রথমটীতে আমার সামনে দিয়ে তিনটী হরিণ ছুটে চলে গেল—তিনটীই মাদী, সেই জন্যে গুলি করলাম না। তারাও আমার দিকে দৃক্‌পাত না করে আস্তে আস্তে চলে গেল। একটু বাদেই আবার শুকনো পাতার উপর খচ্‌মচ্‌ করে চলার শব্দ পেয়ে বন্দুক উঁচিয়ে লক্ষ্য করছি—দেখি বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড শিংওয়ালা এক সাম্বর হরিণ। পূর্ব্বের হরিণগুলি ছিল হরিণ অর্থাৎ যে হরিণের গায়ে সাদা সাদা ফোঁটা কাটা দাগ থাকে ও আকারে সাম্বরের চেয়ে অনেক ছোট হয়। সাম্বরটীর মাথার শিংগুলি দেখলেই শিকারীর লোভ হয়। দেখবামাত্র আমি গুলি করলাম। গুলি খেয়েই সে চার পা ছুঁড়ে পড়ল এবং দু'একবার পা নেড়ে স্থির হয়ে গেল।

এক একটা সাম্বর হরিণের ওজন ছয়, সাত মণ পর্য্যন্ত হয়। কাজেই লম্বা লম্বা দু'টী মোটা শাল গাছের ডাল কেটে দু'টীর সাথে চার পা বেঁধে বিটারদের মধ্যে থেকে যণ্ডা যণ্ডা বার চৌদ্দজন মিলে সাম্বরটীকে নিয়ে সন্ধ্যের কিছু পূর্ব্বেই বাংলোয় ফেরা হল। বাংলোয় ফিরে শিং দু'টীর মাপ নেওয়া হ'ল। দু'টী শিংই মাপে চল্লিশ ইঞ্চির বেশী হ'ল। হরিণটীর চামড়া ছাড়াবার পর আমাদের নিজেদের খাওয়ার জন্যে খানিক মাংস রেখে বাকি বিটারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ল। এই মাংস ভাগের ব্যাপার বড় সহজ নয়। ঐ সব গ্রামের কর্ক, গোঁড় প্রভৃতিরা ভয়ানক মাংসাশী জাত। তারা সব কিছু খায়। বাঘ ভালুকও বাদ পড়ে না তাদের কাছে। কাজেই মাংস ভাগের সময় তারা সব সময় লক্ষ্য রাখে—কারও ভাগে বেশী পড়েছে কিনা। যদি তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়—তা'হলে নিজেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। আর এ রকমের ঝগড়া প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। একমাত্র কোন শক্ত লোক যদি সেখানে উপস্থিত থাকে তবেই তা'রা চুপ থাকে, তার ভয়ে। এ ক্ষেত্রেও হ'য়েছিল তাই। কোন ব্যতিক্রম ঘটতে না ঘটতেই তাদের একজন অপরের ভাগ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল—তা'তেই হল ঝগড়ার সূত্রপাত। তারপর প্রায় হাতাহাতি হতে যায় আর কি। আমাদের মধ্যে থেকে যে ছিল সে তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই ভাবে মাংসবণ্টন ও বাক্‌যুদ্ধ চললো প্রায় রাত সাড়ে সাতটা, আটটা পর্য্যন্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তুর পিছনে

আরও দু'দিন কোন মোষ 'মড়ি' হয় নি। হঠাৎ একদিন সকালবেলা খবর নিয়ে এল নরহর পিণ্ডারী—যে আমাদের বাংলোর উত্তরে যে মোষটা বাঁধা হয়েছিল সেটা খুবই ঘায়েল হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ সকালবেলা কোন চিতাবাঘ ঐ মোষটাকে আক্রমণ করেছিল, আর সেও ঠিক সেই সময় বাঘে মোষ মেরেছে কিনা দেখবার উদ্দেশ্যে সেইখানে উপস্থিত হওয়ায় একটু দূর থেকে তার পায়ের শব্দ পেয়ে মোষকে ছেড়ে বাঘ চলে গেছে। চিতাবাঘের একটা বড় চমৎকার অভ্যাস আছে। ওরা যদি শিকার ধরবার সময়ে মানুষের সাড়া পেয়ে শিকার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়—সে ক্ষেত্রে ওরা ঐ শিকারের কাছেই কোন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সেই শিকারের দিকে লক্ষ্য রাখে। মানুষ সেখান থেকে চলে যেতে না যেতেই আবার ঐ শিকারকে আক্রমণ করে।

আমাদের মোষগুলি দেখবার ভার দিয়েছিলাম নরহর পিণ্ডারীর উপর। প্রতিদিন সে ও আর একজন, এই দু'জন একসঙ্গে সব মোষগুলি দেখতে যেত। এক্ষেত্রে সে একটা মস্ত ভুল করলে। তার উচিত ছিল—সেই মোষটার কাছে উপস্থিত থাকা ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমাদের কাছে খবর দিতে পাঠিয়ে দেওয়া এবং আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে একটু আধটু শব্দ করা। আমরা গিয়েই একটা ছোট খাটিয়াকে গাছের উপর বেঁধে বসে যেতাম ও তারা কথা বল্‌তে বল্‌তে দূরে চলে যেত।* তারা সেখান থেকে চোখের আড়াল হ'লেই সেই চিতাবাঘ আবার আসত। এতে নিজেদের হাত কামড়ে থেকে যেতে হল, যখন দেখলাম গিয়ে যে আমাদের বাঁধা মোষটী সেখানে নেই। সেই স্থানে খানিক রক্ত পড়ে আছে। ঘসৃটিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গেছে। যে দড়িতে মোষটী বাঁধা ছিল সেটী ছিঁড়তে পেরেছে যখন, তখন বুঝতে বাকি থাকল না যে চিতাবাঘটী বেশ বড় ও জোরদার। সাধারণতঃ ওরা দড়ি ছিঁড়ে মড়িকে নিয়ে যেতে পারে না, বড় বাঘেই ওরকম করে। কিন্তু বড় বাঘ শিকার ধরার সময় যদি মানুষের গোল পেয়ে ছেড়ে যায় তা'হলে আর আসে না।

স—আমাদের মধ্যে কখনও শিকারে আসে নি, কিন্তু তার বন্দুকের নিশানা ছিল ভাল, এ ছাড়া তার সেই গালের ব্যথা নিয়ে ভোগান্তিও কম হয় নি। তাই আমাদের স্থির হল, আমাদের মোষগুলির যেটী প্রথম

* কথা বলতে বলতে যাওয়ার কারণ, চিতাবাঘ তাদের গলার শব্দে বুঝতে পারত, যারা তার মড়ির কাছে এসেছিল, তারা চলে গেছে।

মড়ি হবে সেইটার উপর স-ই বসবে। আমরা সকলে তাকেই সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। বেচারার গাল ফুলে উঠাতে বেশ কয়েকদিন ভুগলো। এ ক'দিনের মধ্যে তার মুখে হাসি ফুটতে দেখা যায় নি। সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে রেঞ্জার সাহেবকে আর আমাদের বাংলোর দিকে মাড়াতে দেখা যায় নি। বরঞ্চ আমিই মাঝে মিশেলে তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁর কুশলাদি তত্ত্ব নিয়ে আসতাম। সেদিন আমাদের একটা মোষ মড়ি হয়েছে শুনে তিনি একটু ইতস্ততঃ করতে করতে এলেন। আমরা অবশ্য তাঁকে আমাদের মনোভাব জানতে দিইনি। এখন তিনি আর বাঘ ভালুক, বন-জঙ্গল সম্বন্ধে কোন গল্পও বলেন না, বা পূর্ব্বের সেই মুরুব্বিয়ানা ভাবও তাঁর চলে গিয়েছিল। আজ এসে খুব অমায়িকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি আমাদের কোন কাজে লাগতে পারেন কিনা। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বললাম—তিনি যেন বিকেল বেলা—আমরা যখন স-কে মাচানে বসিয়ে আসতে যাব, সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে যান। তিনিও খুব খুসী হ'য়ে রাজী হ'য়ে বিদায় নিলেন।

একটা ছোট দেশে খাটিয়া আমাদের পূর্ব্ব থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। খাটিয়াটীতে বসে একটু আধটু নড়াচড়া করলে কোন রকম ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হ'ত না। স এর সঙ্গে আমরাও খাটিয়া ও মই নিয়ে তাকে মাচানে পঁহুছিয়ে দিতে চললাম। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ স—মাচানে গিয়ে বসল, আমরাও তার কাছে ইসারায় বিদায় নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটু জোরে জোরেই নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করতে করতে ফিরলাম।

আমাদের বাংলো থেকে জায়গাটা এক মাইলের অধিক দূর হবে না। কাজেই স-এর বন্দুকের আওয়াজ হ'লে আমরা আমাদের বাংলো থেকেই শুনতে পাব ভেবে বাংলোয় ফিরে এলাম। কতকগুলি লোক, চমক সিং, নরহরি পিণ্ডারী প্রভৃতি তারা সেখান থেকে অল্প দূরেই একটু ফাঁকা জায়গায় অপেক্ষা করবে এবং গুলি খেয়ে যদি চিতাবাঘ মরে তাহ'লে স-চিৎকার করে তাদের আসতে বলবে—তখন তারা মই প্রভৃতি নিয়ে গিয়ে স কে সাথে নিয়ে বাংলোয় ফিরবে। কিন্তু বাঘ যদি আহত হ'য়ে পালায় তাহ'লে স-চিৎকার করে ওদের জানিয়ে দেবে যে চিতাবাঘটী মরে নি—দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে। তাহ'লে তারা নিঃশব্দে সেখান থেকে গাঁয়ে ফিরে আসবে এবং দিনের আলো ফুটলে সেখানে গিয়ে স-কে সঙ্গে নিয়ে বাংলোয় ফিরবে।

আমরা স-কে মাচানে তুলে দিয়ে প্রায় তিন ফার্লং কি আধ মাইল এসে একটা পরিষ্কার জায়গায় রাস্তার উপর সাত আটজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। তারা এসেছে কাছের গাঁ থেকে, ঐ রাস্তার উপর প্রতিক্ষা করবে। স-এর প্রচেষ্টার ফলাফল যা' হয় সেই সংবাদ গাঁয়ের অপর সকলকে দেবে। এদের কাছেই আমাদের সাথে যে চমক সিংএর দল এসেছিল, তাদের সেই সাত আটজনকে অপেক্ষা করতে বলে বাংলোয় ফিরে এলাম। ফিরে আমাদের আর গল্পগুজব বিশেষ কিছুই হ'ল না। সবাই স-এর বন্দুকের আওয়াজ শুনবার আশায় কানখাড়া করে প্রতীক্ষা করছিলাম। যখন বাংলোয় ফিরলাম তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে, শীতও বাড়ছে। আমি স্থির করলাম, যতই শীত হো'ক না কেন, আজ বাইরেই অপেক্ষা করব। সঙ্গীরা এক এক করে বাংলোয় ঢুকলো। আসর জমাবার আশায় আমাকেও ডাকছিল তারা। আমি 'যাব না' বলে গরম কাপড় ওভারকোট ইত্যাদি গায়ে চড়িয়ে সেইখানেই বসে রইলাম।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বাংলোর সামনে যে পথ আছে সেই পথ দিয়ে গ্রামের গরু মোষগুলি পথের লাল ধূলো উড়িয়ে যে যার আস্তানায় ফিরছে। 'গোধূলি' বেলা নামের সার্থকতা সেখানে। তাদের গলার ঘণ্টাগুলির একটা বেশ একটানা সুর আছে। টুং টাং, ডুং ডাং শব্দ শোনা যায় সামনের পথে ও পাড়ার দিকে—তারপর উঠেছে পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গল।

এখানকার এই পিছু-ঝরিয়া গাঁখানি অন্যান্য যে সব গাঁয়ের উল্লেখ আগে করেছি তার চাইতে কিছু বড়। লোক সংখ্যাও অনেক বেশী। এরা প্রায় লম্বায় আধ মাইল ও প্রস্থে প্রায় পাঁচশ' গজ চওড়া স্থান বন কেটে সাফ্ করে বসতি করেছে। ঘরগুলি যে যার ক্ষেতের মধ্যেই করেছে সেই কারণে ঘরবাড়ীগুলি সব দূরে দূরে ও ছড়ান। এখন শীতকাল, তাই এদের ক্ষেতে মসে, কলাই দেখতে পেলাম। গম তখনও বাড়েনি, তবে মাঠগুলি বেশীর ভাগই গম বুনেছে। গম বুনবার জন্যে ঐ ক্ষেতগুলি একেবারে ঘন সবুজ দেখাচ্ছিল। ওদের ঐ বাড়ীগুলির ছাদগুলি সব গোল 'খাপরায়' ছাওয়া। তাই সেই সবুজ ক্ষেতের মাঝে দূরে দূরে ছোট ছোট লাল লাল ঢাল্ ছাদওয়ালা ঘরগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। এখানকার বাসিন্দারা বেশীর ভাগ 'কর্কু'! এদের মধ্যে যারা 'ব্যায়গা' তারা হচ্ছে পুরুত; যেমন আমাদের মাঝে বামুন। এরা খুবই সরল ও ভূতপ্রেত বিশ্বাসী। ভূতপ্রেতই কর্কু এবং ব্যায়গাদের আরাধ্য অপদেবতা, শুনা যায় এই ব্যায়গাদেরও নাকি অদ্ভুত সব ক্ষমতা থাকে। তা'কে আমরা ইন্দ্রজালও বলতে পারি, কিংবা অলৌকিকও বলতে পারি! শিকারীদের কাছ থেকে এই ব্যায়গারা পুজা আদায় করে। এমন কি গোরা সাহেব-লোকেরাও এদের পুজা দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য আমরাও স্থানীয় পুরুত ব্যায়গাকে পুজা দিয়ে শিকার করতে নেমেছি। পুজার মধ্যে বিশেষ আড়ম্বর কিছুই নেই, একটা মোরগ আর এক বোতল দেশী চোলাই করা মদ। গ্রামের মধ্যে একটা পাথরে সিন্দুর মাখিয়ে রেখেছে। সেখানে ব্যায়গা সেই মোরগটী বলি দেয় তারপর সেই মদের বোতলটা একবার সেই পাথরটাতে ছুঁইয়ে নিজেই সবটা ঢক্ ঢক্ করে গলাধঃকরণ করে নেয়। এই ব্যায়গাদের এক বুড়ীর সংস্পর্শে আসবার আমার একবার সুযোগ হয়েছিল—সে ঘটনা অন্যত্র দেব।

আমি গরম ওভারকোটে দেহ আবৃত করে, একখানি কম্বল কোলের উপর থেকে মেলে, বাংলোর সামনের পাকা সুরকি পেটান আঙিনায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আশপাশের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। দেখতে দেখতে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। সামনে গাঁয়ে যাবার পথ। ঐ পথ দিয়ে শাল কাঠ বোঝাই ক'রে ঠিকাদারদের ট্রাক চলাচল করে দিনের

বেলায়। রাতের বেলা সেই পথ হয় নিচুপ, তখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হরিণ ও বন শূয়রের দল আসে গাঁয়ের ক্ষেতে চরতে। মাঝে মধ্যে ঐ পথের ধুলোর উপর বড় বাঘেরও পদচিহ্ন পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

গাঁখানি আমাদের বাংলোটাকে বেষ্টন করে আছে বলা যেতে পারে। গাঁয়ের মাঝে একটা টিলা, সেই টিলা দিয়ে এই বাংলোর হাতা এবং টিলার মাথায় আছে আমাদের বাংলো। একধারে আছে আউটহাউস ও রসুই ঘর, আর একপাশে আছে শিকারী বা কোন সরকারী কর্ম্মচারী যিনি হাতী নিয়ে আসবেন সেই হাতী রাখবার খুব উঁচু চালা ও মোটর রাখবার গ্যারাজ। আমাদের সঙ্গে হাতী ছিল না, মোটরখানি আমরা এসে পৌঁছুবার প্রায় সাত দিন বাদে এসে পৌঁছেছিল। এখন আমাদের মোষগুলি বাঁধাবার কাজ আমরা স্বয়ং করি। প্রতি বাঁধবার জায়গায় পূর্ব্ব থেকে সেই মোষগুলিকে হাঁটিয়ে পাঠিয়ে দি'—আর প্রতিদিন বিকালে মোটরে করে আমাদেরই মধ্যেকার একজন করে মোষ বাঁধিয়ে আসি। কিন্তু যেটা বেশী দরকার সেইটাই আমরা এ পর্য্যন্ত করতাম না। সেটা সকাল সকাল উঠে মোষগুলির কোনটা মড়ি হল কিনা সেগুলি নিজেরা গিয়ে দেখা। এই দিনের ঘটনার পর স্থির করেছিলাম আমাদেরই একজন মোটরে করে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর গিয়ে তারপর বনের ভিতর হেঁটে হেঁটে গিয়ে মোষগুলির কোনটা মড়ি হল কিনা দেখে আসবে এবং যে যাবে তার হাতে হাতিয়ারও থাকবে। যদি এ'দিন সকালের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখে ত' সঙ্গে সঙ্গে তার বিহিত করবে।

বাংলোর আঙিনায় বসে বসে বাইরের দৃশ্য চমৎকার লাগছিল। গরু মহিষগুলি গাঁয়ে ফিরে যাবার পর তাদের গলার ঘণ্টার সেই টুংটাং শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। পশ্চিম আকাশে সাঁঝ-তারা উঠেছে। সূর্য্য অস্ত গেছেন কিন্তু আকাশ এখনও ফর্সা আছে। গ্রামের লাল খাপরায় ছাওয়া বাড়ীগুলির উপর এবং গাঁয়ের এখানে ওখানে এক এক স্থানে এক একটা ধুঁয়ো চাঁদোয়ার মত হাওয়ায় ভাসছে। শীতের জন্যে উপরে উঠতে পারছে না। যে দিকে তাকাই, যা দেখি তাই সুন্দর লাগছিল। তারপর সেই অরণ্যপুরীর নিজ্জনতা আরও ভাল লাগে তাদের—যারা মাঝে মিশেলে যায় কর্ম্মবহুল লোকালয় থেকে। সঙ্গীদের সকলের এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার অনুভূতি হয়তো আমার চেয়ে কম হবে, তাই তা'রা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাস খেলা প্রভৃতির আড্ডা ফাঁদবার চেষ্টায় ছিল। আমি অবশ্য প্রত্যেককেই কানখাড়া রাখবার কথা বলে দিয়ে-ছিলাম, স-এর বন্দুকের শব্দ শোনবার আশায়। সন্ধ্যে ছ'টা পর্য্যন্ত কোন শব্দ হল না দেখে ভাবলাম স-এর ভাগ্যে হয়তো বা অনেক দুর্ভোগ আছে। চিতাবাঘ মড়ি খেতে সাধারণতঃ সন্ধ্যের সময় বা ভোরের সময় আসে। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম হয় না তা নয়। কিন্তু যে সময় আসবার সম্ভাবনা বেশী, তার প্রথম সময় প্রায় পার হয়ে যায়—তখনও দূরে রাইফেলের শব্দ না শুনে ভাবছিলাম হয়তো বা ভোরের দিকে আসবে ও স-এরও ভোগান্তির একশেষ হবে এই দুর্দ্দান্ত শীতের মধ্যে। ভাবছিলাম ইজিচেয়ারে বসেই থাকব, কি দু' এক পা করে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে যাব। কারণ বাংলোর ভেতরে সঙ্গীদের নিস্তব্ধতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তারা সবাই আড্ডায় মেতে গেছে এবং তাদের সেই কলরব বাংলোর আঙিনাকে মুখরিত করছিল। যেখানে নিস্তব্ধতাই ভাল লাগে সেখানে কাছেই গৃহ-মধ্যেকার কলরব, যা অন্যত্র ভিন্ন পরিবেষ্টনে প্রাণের সাড়া জাগায়, তা' ভাল লাগছিল না। তাই চিন্তা করলাম ইজিচেয়ার থেকে উঠে গাঁয়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে পায়চারি করি এবং আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যদি স-এর বন্দুকের আওয়াজ শুনতে না পাই তা'হলে বাংলোয় ফিরে আসব। এই চিন্তা করে কোলের উপরকার কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দু'এক পা করে গেট পার হলাম। আমাদের গেট পার হলেই পথের অপর পারে রেঞ্জার সাহেবের কোয়ার্টার ও তার পাশে ফরেষ্টার-বাবুর কোয়ার্টার। ফরেষ্টারবাবু উলের কম্ফার্টারের ঘোমটা টেনে ও নিলামে কেনা পুরান একটা খাকি রং এর পা পর্য্যন্ত ঝোলা মিলিটারী ব্র্যাণ্ডি কোটে দেহটাকে ঢেকে তাঁর দেশওয়ালি ভাই পশ্চিমা এক ফরেষ্ট-গার্ডের সঙ্গে কি বাক্যালাপ করছিলেন, আমায় দেখে ফরেষ্ট গার্ড সেলাম ঠুকে সরে পড়ল এবং ফরেষ্টারবাবু এসে এক গাল হেঁসে জিজ্ঞাসা করলেন ওদেশী ভাষায়—"আজ সকালে শুনলাম আপনাদের একটা মোষ মড়ি হয়েছে?" তাঁর সামনের দু'টী দাঁত নেই। অকালেই তারা অবসর নিয়েছে। অন্যগুলি পান ও "পত্তির" বদৌলত মিশি মাখা গোছের কালো রং ধারণ করেছে। এদিকে ছোট খাট একহারা চেহারা বটে কিন্তু এখানকার কম্মু গ্রামবাসীরা তাঁকে ভয় করে যমের মত। ভদ্রলোক লেখাপড়া বিশেষ জানেন না, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে খুবই বিচক্ষণ। রেঞ্জার সাহেবের বেশীর ভাগ কাজ উনিই করেন। বয়স প্রায় রেঞ্জার সাহেবের সমানই হবে অর্থাৎ পঞ্চাশের উদ্ধে। তবে হয়তো ফরেষ্টার-বাবুর বয়স কিছু দু' এক বছর বেশী হতেও পারে। কারণ তিনি বল্লেন, পর বৎসর তাঁর অবসর নেবার কথা রয়েছে। এ লোকটার খুব সাহস। ছেলে বেলায় প্রায় বছর ষোল বয়সের সময় সরকারের বন বিভাগেয় চাকরীতে ঢোকেন ফায়ার-ওয়াচার কিংবা ওদেশী ভাষায় "আগ্ চৌকিদার" হিসেবে। এই ফায়ার-ওয়াচাররা সব সময়ে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখে কোনও বনে আগুন লেগেছে কিনা। কোথাও আগুন লেগে থাকলে লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই আগুন যেন তার সীমা বিস্তার না করতে পারে সেইভাবে যে স্থানে যতদূর পর্য্যন্ত আগুন লেগেছে তারই বাইরে শুকনো গাছ ডাল ইত্যাদি কেটে সাফ করে দেওয়া ও মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ সব ঝেঁটিয়ে ফেলা। ওঁদের সময় ঐ চাকরির মাইনে ছিল নাকি মাসিক তিন টাকা এবং ফায়ার কুলিদের সেড়ে তাদের সঙ্গে খাবার। সেকালে ঐ জঙ্গলের অধিবাসী আধ-ছটাক নুন পাবার আশায় সারাদিন খাটতো। আমার দেখাও যখন গোড়ার দিকে শিকারে ঐ সব অঞ্চলে গিয়েছি, তখনও দেখেছি ওরা নুনের বিনিময়ে সারাদিন খাটতো তবে আধ ছটাক নয়। এমন কি যখনকার কথা লিখছি—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে—এক একজনের সারাদিনের মজুরি ছিল দু' আনা মাত্র। আজ সেখানে লোকে তিন টাকা করে রোজ চেয়ে বসে। সে সময় বড় বাঘ শিকার হ'লে বা বাইসন প্রভৃতি জানোয়ার মারা হ'লে ওদের বকসিস দিতে হ'ত এক এক বোতল মহুয়া চোলাইকরা মদ। এক এক বোতলের দাম পড়ত সাড়ে তিন আনা ও বোতলগুলি ভাঁটিতে ফেরত দিতে হ'ত। সেদিনে আর আজকের দিনে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। সেই সব অধিবাসীরাই বলে যে তারা তখন রোজগার কম করত বটে, কিন্তু খেয়ে পরে সুখ ছিল। এখন তার বহুগুণ গায় বেড়ে যাওয়াতেও স্বাচ্ছন্দ্য কোথাও নেই।

ফরেষ্টারবাবুর নাম হল দাত্তাত্রেয় সিন্ধে, আমার সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা বল্লেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'ল। আরও দু' এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই প্রথম রাত্রের পথেই। সেবারে ছিলাম অনেকে, এবারে মাত্র দু'জন। ফরেষ্টারবাবুটী রেঞ্জার সাহেব অপেক্ষা অনেক সাহসী।

ক্রমশঃ

জ্যোতিষিক

জ্যোতি বাচস্পতি

কর্মজীবনে জ্যোতিষ

কর্মজীবনে বৃত্তি-নির্বাচন একটা মস্ত সমস্যা। আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে এ সম্বন্ধে চিন্তা কেউ বড় একটা করেন না। আমরা স্কুল কলেজে ছেলেদের পড়াই শুধু এই জন্য যে, সকলে তা করছে এবং আমরা না করলে অন্য লোকে কী বলবে! ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময়, না ছেলেদের অভিভাবক—না স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ কেউই ভেবে দেখেন না যে কোন ছেলের কোন্ বিষয়ে যোগ্যতা আছে অথবা কী রকম ভাবে শিক্ষা দিলে প্রত্যেক ছেলের ভিতরকার স্বাভাবিক যোগ্যতার পূর্ণ স্ফুরণ হবে। শিক্ষায়তনগুলিতে নিজের যোগ্যতানুযায়ী শিক্ষা লাভের সুযোগ খুব কম ছেলেরই মেলে এবং শিক্ষা শেষ করে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখনও তাদের কোন্ বিষয়ে যে যোগ্যতা আছে, সে সম্বন্ধে তাদের নিজেদের কোনও ধারণা থাকে না, অভিভাবকদের ত নয়ই।

নিজের খেয়ালেই হোক্, আর অভিভাবকের তাগিদেই হোক্; তারা সামনে যে পথ পায়, সেই পথেই কর্মজীবনের যাত্রা শুরু করে। দৈবাৎ কারো হয়ত অবলম্বিত পথটা তার যোগ্যতা প্রকাশের অনুকূল হয়ে পড়ে, কিন্তু অধিকাংশের বেলায় ছ্'কুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে ওঠে। ভালও লাগে না, ছাড়াও যায় না।

যে বিষয়ে যোগ্যতা নেই, তাতে আত্মনিয়োগ করে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু তবুও আশা থাকে; একদিন না একদিন হয়ত জীবন সাফল্যে না হোক্, বাক্স টাকায় ভরে উঠবে এবং সেই শুভদিন কবে আসবে, তাই জানবার জন্য তাঁরা হয়ত জ্যোতিষীর কাছে জন্মকোষ্ঠি নিয়ে উপস্থিত হতে থাকেন। কিন্তু তখন খুব সম্ভব বিলম্বটা একটু বেশীই হয়ে গেছে। ফিরে নতুন পথ ধরবার আর সময় নেই।

অনেকে মনে করেন এবং বলেও থাকেন যে গ্রহ নক্ষত্র আমাদের যা কিছু সব করে থাকে—আমাদের নিজের কিছুই করবার নেই, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উপরে যে ব্যর্থতার কথা বলা হ'ল তার সকল দায় গ্রহ নক্ষত্রের উপর চাপালে তাদের উপর অবিচার করা হবে। আমাদের অজ্ঞতা বা অসাবধানতার দোষ গ্রহের ঘাড়ে চাপনোর চেয়ে বেশী বোকামি কিছু নেই। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সভ্য দেশগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সহজাত গুণগুলি যাতে ক'রে উদ্বুদ্ধ করা যায়, সেই ধরণের শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। পাশ্চাত্যেরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দিয়েই এ করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁরা যদি জ্যোতিষের সাহায্য নিতেন তাহলে, আরও অল্প চেষ্টায় তাঁরা এ বিষয়ে বেশী ফল পেতে পারতেন। আমার এ প্রবন্ধ লেখায় প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে কী উপায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মজীবন সার্থক করা যায়, তার কতকগুলি সঙ্কেত দেওয়া। জ্যোতিষের নির্দেশ মাফিক্ অগ্রসর হতে পারলে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় কম এবং ন্যূনতম বিঘ্নের পথে চললে সাফল্য বা সার্থকতা আসে বেশী। একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে যিনি এর বিচার করতে চাইবেন তাঁকে গোড়ায় জ্যোতিষের কিছু কিছু প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করতে হবে। আমি ধরে নিচ্ছি, যিনি এই প্রবন্ধ পড়ছেন তাঁর জ্যোতিষ সম্বন্ধে এ জ্ঞান আছে। যাঁর এ জ্ঞান নেই তিনি আমার লেখা "সরল জ্যোতিষ" বা "কোষ্ঠি দেখা" একবার পড়লে সহজেই একটা মোটামুটি জ্ঞান ক'রে নিতে পারবেন। এমন শক্ত কিছু নয়।

কর্মজীবনের বিচার করবার আগে কর্মজীবন বলতে আমরা কি বুঝি সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন নতুবা কর্মজীবনের বিচারে কর্মভাব বিচারের যে সব নিয়ম দেওয়া হবে, তার আসল মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। মানুষ যে শ্রেণীরই হোক, সকলকেই কর্ম করতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

> নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
> কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

জ্ঞানীই হোক্ আর অজ্ঞানীই হোক্, কোন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কর্ম না ক'রে মুহূর্ত মাত্রও থাকতে পারে না। স্বভাবজাত গুণগুলিই মানুষকে অবশ করে কাজ করিয়ে নেয়।

কিন্তু তার মধ্যে তফাৎ এইটুকু যে, অজ্ঞেরা তাদের প্রবৃত্তি যে কর্মে তাদের প্রেরণা দেয়, বিবেচনাশূন্য হ'য়ে মূঢ়ের মত সেই কর্মেই লেগে যায়। আর জ্ঞানীরা কর্মে প্রবৃত্ত হবার আগে বিচার ক'রে কর্মের পদ্ধতি বা ধারা স্থির করেন। মানুষ নানা কারণে এবং নানা উদ্দেশ্যে কর্ম ক'রে থাকে। প্রকৃতির প্রেরণায় একদিকে যেমন নিজেকে এবং আত্মীয়কে রক্ষা করবার জন্য তাকে কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে হয়, অপরদিকে নিজের প্রবৃত্তি বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যও সে কর্ম ক'রে থাকে। কিন্তু কর্মজীবন বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যে এই সব রকমেরই কর্ম জড়িত এমন বলা চলে না। সাধারণতঃ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য এবং নিজের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য মানুষ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সব কাজ করে থাকে বা করতে বাধ্য হয়, তাকেই আমরা মানুষের কর্মজীবন বলে থাকি।

এই কর্মজীবনকে গ্রহ-নক্ষত্র কী ভাবে প্রভাবিত করে তা বুঝতে হ'লে, জ্যোতিষের মতে কী সূত্র ধ'রে বা কী হিসাবে কর্মের শ্রেণীবিভাগ করা হয় তা জানা দরকার। যত রকমের কর্ম আছে জ্যোতিষের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কর্মের বাইরের দিক দিয়ে যতই বৈচিত্র্য ঘটুক, মনের চারটি বিভাগ থাকবেই। শ্রীভগবান

গীতায় বলেছেন "চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ" তাঁর এই উক্তি একটি নিত্য শাশ্বত এবং অব্যভিচারী সত্য প্রকাশ করছে। মানুষের সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন এর ব্যত্যয় হবে না। আজকাল বর্ণাশ্রম বলতে অনেকে হিন্দু সমাজের বর্তমান জাতিভেদ প্রথাটিকে বুঝে থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ 'বর্ণ' কথাটি শ্রীশ্রীভগবানের উক্তিতে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। এই উক্তিমত বর্ণ গুণ ও কর্ম, এই তিনটি শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলে—জ্যোতিষের দিক দিয়ে মানুষের কর্মজীবন নির্ণয়ের হদিস পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই বংশগত অবস্থার জন্যই হোক, পারিপার্শ্বিকের জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হ'য়ে জন্মায়। হয়ত এ পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কার। সে যাই হোক্, সহজাত সংস্কারের বিভিন্নতায় ব্যক্তিগত যোগ্যতাও যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হ'য়ে থাকে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সহজাত যোগ্যতা শ্রীভগবান গীতায় তাকা একই 'গুণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। অনেকের সঙ্গে এক সমাজে বদ্ধ হ'য়ে তাকে যখন বাস করতে হ'য়, তখন সমাজের উপরও তার কর্তব্য আছে। এক ব্যক্তি যখন সমাজে বাস ক'রে, তখন তার ব্যক্তিগত অনেক প্রয়োজনে অপরের সাহায্য নিতে হয় এবং তাকেও অপরের অনেক কাজে সাহায্য করতে হয়। না হ'লে সমাজ টিঁকতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক সমাজেই শ্রমবিভাগের রীতি আছে। সমাজ-সংহতি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি যে কর্ম ক'রে তাকে উদ্দেশ্য করেই গীতায় "কর্ম" শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। এখন সেই সমাজই হবে আদর্শ সমাজ—যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সহজাত যোগ্যতার হিসাবে কাজ পেতে পারে। এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম বললে আমাদের দেশের বংশগত ও জাতিগত অনিষ্টকর ভেদ-প্রথা না বুঝিয়ে সেই ধর্মকে বোঝাবে যা দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতানুযায়ী কর্ম পেয়ে নিজেও ধন্য হয় সমাজকেও ধন্য করে। "বর্ণ" শব্দটি দিয়ে গীতাতে এই গুণ হিসাবে শ্রমবিভাগকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

বর্তমান সমাজে লোকে যখন কর্মজীবন আরম্ভ করে তখন সে মনে ক'রে তার কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের জীবিকা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য অর্জ্জন করা এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা। সমাজকে দৃঢ় রাখবার জন্য যে কর্মের একটা যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী বিভাগ আছে এবং দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে কর্মের যতই বিচিত্র ভেদ ঘটে থাকুক, এই শ্রেণী-বিভাগের যে কোন ব্যতিক্রম হ'তে পারে না, সে কথা অতি অল্প ব্যক্তিই ভেবে থাকেন। এ তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—এবং এ তার স্থলও নয়। জ্যোতিষের সঙ্গে এই বর্ণাশ্রম তত্ত্বের যা সম্বন্ধ তা বোঝাবার জন্য যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী বলা অনাবশ্যক।

বর্ণাশ্রম ধর্মের উল্লেখ শুনলেই আমাদের দেশের লোকের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। জ্যোতিষেও রাশি এবং গ্রহের এই রকম বর্ণ বিভাগ আছে। আগে বলেছি যে বর্ণ ও জাতি এক জিনিষ নয়। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও সে গুণ হিসাবে শূদ্র হ'তে পারে—এবং জাতিতে শূদ্র হলেও বর্ণে ব্রাহ্মণ হ'তে তার বাধা নেই। জাতি পদার্থটার সৃষ্টি বংশ ও জন্ম নিয়ে, কিন্তু বর্ণের প্রভেদ হচ্ছে সহজাত প্রকৃতি ও গুণ নিয়ে।

জ্যোতিষে রাশি ও গ্রহের যে বর্ণ বিভাগ দেওয়া হয়েছে কার্যক্ষেত্রে তার সঙ্গত প্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। বিবাহের যোটক-বিচারে পাত্র-পাত্রীর চন্দ্রের অবস্থান ধরে কে কোন বর্ণ তাই দেখে এবং পাত্রী পাত্রের চেয়ে বর্ণ-শ্রেষ্ঠা কি না শুধু এইটুকু দেখেই বর্ণের ব্যাপারে জ্যোতিষের প্রয়োগ শেষ হ'য়ে যায়। বর্ণের আসল তত্ত্ব বা মর্ম জানা না থাকাতে বৃত্তি বা কর্মজীবনের ব্যাপারে এর যে কতখানি প্রয়োগ হ'তে পারে সে কথা কারো মনেই আসে না।

সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য মানুষকে যে সব কর্ম করতে হয় এবং যে সব কর্মের বিনিময়ে মানুষ নিজের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন ক'রে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের দ্বারা আহার্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্রব্যাদি উৎপাদন করা এবং সেগুলি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহজ-প্রাপ্য করা। কেন না আহার ও আচ্ছাদন না পেলে, সমাজের কোন ব্যক্তিই বাঁচতে পারে না। উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ ও যথারীতি বণ্টন এইটেই সবচেয়ে বড় দরকার বটে, কিন্তু এ করতে হ'লে এমন কতকগুলি লোকের দরকার যারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন না করলেও সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে শান্তিপূর্ণ উৎপাদনে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণে সাহায্য করবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও প্রাণ রক্ষার জন্য এই দুই শ্রেণীর কর্মী একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মানুষ শুধু দেহধারী জীবই নয় এবং দেহ শুধু প্রাণের খোরাক নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তার মন-বুদ্ধির খোরাকও আকাঙ্ক্ষা করে এবং তার জন্য চাই তার আনন্দ ও জ্ঞান। এই আনন্দ ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তার যে নিছক খেয়াল এ কথা বলে চলে না। জ্ঞান ও আনন্দ দিয়ে সে অনেক বেশী শক্তি অর্জন করতে পারে, যা শুধু দেহ-প্রাণ-ধারী জীবের আয়ত্তের মধ্যে নয়। অতএব দেহ ও প্রাণের খোরাক উৎপাদনে যেমন একদল লোক নিযুক্ত আছে, তেমনি মন ও বুদ্ধির খোরাক তৈরী করবার এবং জোগাবার জন্যও একদল লোক চাই। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, চাহিদা প্রভৃতির বিভিন্নতায় এই সব কাজের জন্য নানা শ্রেণীর কর্মীর সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু মূলতঃ তাদের প্রধান চারটি বিভাগের কোন না কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

সমাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, সমাজের বর্তমান গঠনের জন্য তারা যে সব কাজ করে, তাদের এই হিসাবে বিভাগ করা যায়—

১। যাঁরা নিজের ইচ্ছামত উৎপাদন ও বণ্টন করেন, এঁদের বৈশ্য-বর্ণ বলা চলে।

২। যাঁরা নিজের নিজের ইচ্ছামত তাঁদের যোগ্যতা বা শক্তি সমাজের ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ করেন, এঁদের ক্ষত্রিয় বর্ণ বলা যায়।

৩। যাঁরা তাঁদের শ্রম বা যোগ্যতা একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়ে সমাজকে বা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে দান করেন—এঁদের শূদ্র বর্ণ বলা যায়।

৪। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কোন কর্ম্মেই লিপ্ত থাকেন না। এঁদের বিপ্রবর্ণ বলা যায়।

—কেন এই হিসাবে নাম দেওয়া হ'ল, তার একটু ব্যাখ্যা বোধ করি প্রয়োজন। সামাজিক ব্যক্তি সম্পূর্ণ একক ও অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ-রহিত হয়ে সমাজের জন্য কোন কাজ করতে পারে না। কর্মের জন্য অপরের সংশ্রবে তাকে যখন আসতে হয় তখন তার তিন রকম ভাব হ'তে পারে। (১) স্বেচ্ছাধীন, (২) পরাধীন, (৩) সমানাধিকারী—যেখানে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়, অপরের অধীনও নয়।

ব্যক্তিটির যদি বিশেষ কোন একটি গুণ বা শক্তি থাকে, যা অপরের নেই এবং অপরে যখন তার সেই শক্তির সাহায্য নিয়ে তার বিনিময়ে তাকে আনুপাতিক মূল্য দেয় তখন অপরে তাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করে। এই শ্রেণীর যে সকল কাজ, যাকে বর্তমান যুগে বিশেষজ্ঞের পেশা বা profession ব'লে উল্লেখ করা হয়, তাকে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বলা যেতে পারে। বাহুবল মানে যে শুধু গায়ের জোর তা নয়, গায়ের জোরই হোক্ বা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যই হোক্ বা শিক্ষা কি কৌশলই হোক্, যা দিয়ে মানুষ বিশেষ শক্তি লাভ ক'রে থাকে তাকেই বাহুবল বলা যায়। যে নিজের শক্তি দিয়ে অপরের কাজে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে নিয়োগ ক'রে থাকে, তাকেই ক্ষত্রিয় বলা যায়। বর্তমান সমাজে ব্যবহারাজীবী, চিকিৎসক, বিভিন্ন ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি স্বাধীন পেশাধারীগণ সকলেই এ হিসাবে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ক'রে থাকেন। এই শ্রেণীর পেশাকরদের কাছে যখনই কেউ তাঁর বিশেষ শক্তির সাহায্য নিতে আসে, তখনই পরোক্ষভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। এঁরা নিজের শক্তি দিয়ে স্বাধীন ভাবে সমাজের সেবা করে থাকেন।

বৈশ্য বলা যেতে পারে সেই শ্রেণীর লোককে, যাঁরা সমাজে ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনিময়ের কার্যে নিযুক্ত থাকেন। কৃষি শিল্প খনি প্রভৃতি থেকে যাঁরা দ্রব্য উৎপাদন করেন তাঁরাও যেমন বৈশ্য তেমনি যে সকল ব্যবসায়ী এই দ্রব্যগুলি নিয়ে কেনা বেচা করেন তাঁরাও তেমনি বৈশ্য। যেখানে দ্রব্যের কেনা-বেচা চলে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অধিকার সমান, কেউ কারো চেয়ে শক্তিতে শ্রেষ্ঠ নয়। কাজেই বর্তমান যুগে কৃষক, কারখানার মালিক, খনির মালিক ইত্যাদি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক, ব্যবসায়ী থেকে সুরু ক'রে দোকানদার, ফিরিওয়ালা পর্যন্ত সকলেই এই বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত।

বর্তমান যুগে শূদ্র বলা যায় তাঁদের যাঁরা একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়ে নিজের নিজের শক্তি অপরের আদেশ মত অপরের কাজে প্রয়োগ করেন। তাঁদের অনেক রকমের গুণ বা শক্তি থাকতে পারে কিন্তু তা তাঁরা স্বাধীনভাবে বা স্বেচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারেন না। তাঁদের প্রভু বা নিয়োগকর্তার হুকুম মত তাঁদের চলতে হয় এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। বর্তমানে গভর্ণমেণ্ট বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি থেকে সুরু ক'রে কেরাণি, কলকারখানার কুলি, মজুর, গৃহের দাসদাসী প্রভৃতি সবারই এই শূদ্রের বৃত্তি।

এছাড়া সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত পরিশ্রম না করলেও সমাজ তাদের অর্থ দেয়। বৃত্তি, কর, বাড়ীভাড়া, সুদ, ভিক্ষা প্রভৃতি থেকে যাঁদের জীবিকা হয়, তাঁরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁদের কর্মকে ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলা চলে। জমিদার, মহাজন, পেন্সন বা বৃত্তি-ভোগী, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলেই এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত।

জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে বৃত্তি বিচার করতে হ'লে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে কর্মের এই শ্রেণী বিভাগ জানা বিশেষ আবশ্যক। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই, জ্যোতিষে রাশি ও গ্রহগুলিকে ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য ও বিপ্র এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে যে শ্রেণীর রাশি ও গ্রহের প্রাধান্য থাকে, তা থেকে জানা যায় তিনি কী ধরণের কর্মে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

শব্দ-ব্রহ্ম

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শব্দ-সমুদ্রের শ্রুত—অশ্রুত কল্লোল,—
সংখ্যাতীত পশু-পক্ষী-পতঙ্গের গান,
পলে পলে পরিপূর্ণ করে মোর প্রাণ ;—
অন্তরে জাগায়ে তোলে সুরের হিল্লোল।
সুন্দরের ধ্বনি-রূপ কোমল—নিটোল—
মোহন—মধুর, মনে হয় মূর্ত্তিমান।
এ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ সঙ্গীতের সুর
হৃদয়ের স্তব্ধ বীণা সঙ্গীত মহান
গেয়ে ওঠে। নন্দনের আনন্দের দোল
মনে লাগে—প্রাণে লাগে—হৃদয়-ভিতর ;—
করে মোরে শব্দ-ব্রহ্ম সাধনা তৎপর।
চরাচরে চিরদিন শব্দ-সাধনায়
জড়ে জীবে কী অব্যক্ত মিতালি মধুর !

শিল্পকলা ও কারুকৃৎ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ভারতবর্ষ শিল্প ও কারুকলার দেশ। যে বইখানিকে আমরা 'অপৌরুষেয়' বলি এবং ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও দর্শনের প্রাচীনতম নিদর্শন যার মধ্যে পাই, সেই বেদে আমরা দেখতে পাই নানাশিল্পের উল্লেখ রয়েছে। কিছুদিন আগে সিন্ধুর মোহেন্‌জো-দড়ো ও হরপ্পা এই দুই বিস্তৃত প্রাচীন শহরের যে ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মৃত্তিকা গহ্বর থেকে টেনে বার করেছেন তার বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছরের বেশি। এই দুই প্রাগৈতিহাসিক

মথুরার জৈন স্তূপে প্রাপ্ত তীর্থঙ্করের মুণ্ড (কুশান শিল্প)

যুগের নগরে যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পের সন্ধান মিলেছে তা'ও বিস্ময়কর! একথা বলাই বাহুল্য যে যাঁরা সেই অতি প্রাচীনকালেও পুরাণোল্লিখিত অট্টালিকা রচনা করতে জানতেন তাঁরা সকল প্রকার শিল্পকলা ও কারুকৃৎ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। মোহেনজো-দড়োর আবিষ্কার এই অনুমানকেই প্রমাণিত করেছে।

'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে' আমরা দেখতে পাই—যুগ যুগ ধরে ভারতের নানা প্রদেশের নানা অঞ্চলে এই শিল্পকলা ও কারুকৃতের একটা ধারা চ'লে এসেছিল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে ভারতীয় শিল্পকলার বহুশত শতাব্দীর কোনও যোগ-সূত্র মধ্যযুগে খুঁজে না-পাওয়া গেলেও, মৌর্যযুগে ও গুপ্তযুগে এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে নাকি মোহেন্‌জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শিল্প নিদর্শনের সবিশেষ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তের শিল্পকলা ও কারুকৃতের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানের পরও যে

মথুরার জৈনস্তূপে প্রাপ্ত যক্ষিণীদ্বয় (খৃষ্ট-দ্বিতীয় শতাব্দী ও কুশান রাজত্বকালের মূর্তি শিল্প)

মিল বা ঐক্য দেখা গেছে তাতে নিঃসন্দেহ বলা চলে যে এই দুই শিল্প-গোষ্ঠী একই বংশসম্ভূত!

গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় দেখা যায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ নাকি অতি মনোরম ও অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত ছিল। সে রাজ-প্রাসাদ ছিল কাঠের তৈরি। কবে ধ্বংস হয়ে গেছে, বা শত্রুরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, আজ তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু, খুঁজে পাওয়া যায় এ দেশে

আজও সেই অপূর্ব কাঠের কাজের কারুকৃৎ! শিল্পী ও তার শিল্প নিদর্শন লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু শিল্পধারা আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় পাই, প্রাসাদের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সারি সারি যে সব স্তম্ভ ছিল তার প্রত্যেকটি নাকি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অপূর্ব কারুকার্যখচিত ছিল। রজতস্তম্ভ বেষ্টন করে উঠেছিল ফলফুলে সুশোভিত সুবর্ণের দ্রাক্ষালতা। সেই লতার শাখায় বসে আছে দ্রাক্ষালোভী বিহগ দম্পতীরা। যাদের চঞ্চু ও চক্ষু বহু মূল্য রঙীন প্রস্তরে নির্মিত।

এ থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে সে সময় শুধু স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও দারুশিল্পই নয়, ধাতু শিল্পেরও আশ্চর্য নিদর্শন

বুদ্ধদেবের মুখমণ্ডল (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর গান্ধার শিল্প)

ছিল। ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ বলেন—ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে নাকি প্রাচীন ইরাণীয় শিল্পকলার অনেকখানি মিল আছে। এটা থাকা কিছু বিচিত্র নয়। একদিন বৈদিক আর্য সভ্যতাই এই উভয় দেশেই প্রচলিত ছিল, সুতরাং শিল্পগত ঐক্য থাকা খুবই সম্ভব। হ্যাভেল বলেন—পারস্য শিল্পের উপর ভারতীয় প্রভাব ছিল বলা যায়, আবার ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন—ভারতীয় শিল্পের উপর পারসিক প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে ভিন্‌সেণ্ট সাহেব এও বলেছেন, যে, ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের বিশেষত্ব হারাননি। খৃষ্টীয়

আসেন, তিনি সম্রাট অশোকের প্রস্তরে গঠিত বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের যে প্রস্তরে গঠিত অপূর্ব কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দেখেছিলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—এমন বিচিত্র তোরণ দ্বার—এমন সুগঠিত সুচারু বহির্বেষ্টনী—এমন অপূর্ব সুন্দর খোদাই কাজ এবং উৎকীরণ-শিল্পকলার পরিচায়ক ভাস্কর্য নৈপুণ্য জগতে আর কোনও দেশের মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

কাথিয়াবাড়ে প্রাপ্ত মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ গন্ধর্ব মূর্তি
(দশম খৃষ্টাব্দের)

অশোকের সেই প্রস্তরনির্মিত রাজপ্রাসাদ কোন স্মরণাতীতকালে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। নদী তলের গহন গভীরে দীর্ঘকালের পলিমাটির অন্তরালে তার চিরসমাধি লাভ ঘটলেও বিজ্ঞান হয়ত একদিন তাকে উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু সম্রাট অশোকের সমসাময়িক কালে নির্মিত আরও অনেক সৌধ, বিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভারতের নানা প্রদেশে পাওয়া গেছে—যা দেখে মনে হয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কিছুমাত্র অতিরঞ্জ

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে ব্যবহার হচ্ছে, যে ধর্ম-চক্র আজ জাতীয় পতাকার শোভা বৃদ্ধি করেছে, তা' এই যুগেরই ভাস্কর্য শিল্প থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ অপূর্ব শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন পৃথিবীর আর কোন দেশেই যে ছিল না, এমন কি এর সমকক্ষ কোনও শিল্প নিদর্শনও যে কোথাও পাওয়া যায়নি, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সকলেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

ব্রোঞ্জের পার্বতী মূর্তি (দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত)

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা রঙীন চিত্রপট ও প্রাচীর-চিত্রও উল্লেখযোগ্য। দেব, দেবী, অপ্সরী, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, মানব এবং এমন কি বিবিধ পশুপক্ষীর প্রস্তরীভূত অপরূপ সুন্দর প্রতিমূর্তিও পৃথিবীর আর কোনও দেশের প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীয় ভাস্কর্যের বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে মূর্তির কোন অংশকেই শিল্পীরা অনাবশ্যক বা বাহুল্য মনে করে অবহেলা করেননি। প্রত্যেকটি ছোট খাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারও পরম ধৈর্য ধরে

ব্রোঞ্জের রামচন্দ্র (দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত)

তারা দেবী (নেপালে প্রাপ্ত তামার উপর সোনার কলাই-করা ও রঙীন মীনার কাজ করা)

নিষ্ঠার সঙ্গে অতি সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করেছেন। এমন নিখুঁত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য—একমাত্র ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা চোখে পড়ে না। গ্রীক ও রোম্যান ভাস্কর্যও খুবই সুন্দর, কিন্তু তার মধ্যেও এমন প্রস্তরে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। পাষাণী অহল্যা, আর কোনও দেশে শিল্পী শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে এমন সজীব মানবী হ'য়ে উঠতে পারেননি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অশোক-স্তম্ভগুলি আজও অখিল বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন ক'রছে।

রাধাকৃষ্ণ (কাংড়া চিত্রকলা)

ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশের যাদুঘরে এই অনুপম ভারতীয় শিল্পকলা ও কারুকৃতের বিবিধ নিদর্শন বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'য়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মিউজিয়মে তো এ সব আছেই। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট মিউজিয়মে ভারতীয় কারুকৃৎ ও শিল্পকলার কিছু কিছু উৎকৃষ্ট ও দুর্লভ নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানে সবচেয়ে প্রাচীন যে ভাস্কর্য-নিদর্শন সংগৃহীত আছে তা' বুদ্ধ-গয়া থেকে নিয়ে যাওয়া খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর নির্মিত মর্মরবৃতি স্তম্ভ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কুশান ভাস্কর্যের বিবিধ নমুনাও এখানে সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে।

এই সঙ্গে সমসাময়িক গান্ধার শিল্পেরও কিছু ভাস্কর্য সংগ্রহ এখানে আছে। শিল্প-সমালোচকেরা এগুলিকে বলেন 'গ্রেকো-বুদ্ধিসট্' গোত্রের ভাস্কর্য শিল্পকলা। অভিজ্ঞদের মতে এগুলি চূণ-বালি বা খড়ি মাটি মিশিয়ে তৈরি ক'রে জমানো হয়েছে। মূর্তিগুলি ভারি সুন্দর! গান্ধার শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত কাঠ ও পাথরের ওপর খোদইয়ের কাজ—যেমন, ঝিলিমিলি, বাড়ীর কার্ণিশের ঝালর এবং প্রাচীর গাত্রের ছককাটা খুবরির মতো চৌকনা অলঙ্করণের নমুনাও আছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হ'তে সংগৃহীত বিবিধ খুচরো প্রত্নবস্তুর সংগ্রহও এখানে রয়েছে। এই সংগ্রহগুলি থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতের উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য কলার গৌরবময় পরিচয় বহন ক'রে এনেছে এখানে সাঁচীস্তূপের একটি ভগ্নমূর্তি! দেখে মনে হয় স্বয়ং বুদ্ধদেব বা কোনও বুদ্ধভক্ত নৃপতির অথবা দেবতার প্রতিমূর্তি ছিল হয়ত! অজন্তা গুহা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া একটি পর্বতগাত্রে খোদিত বোধিসত্ত্বের মূর্তিও এখানে আছে। ভারতের হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পকলার নানা নিদর্শনও এখানে সংগ্রহ করে এনে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কতকগুলি মন্দির গাত্রের খোদিত মূর্তি—যেমন, বংশী-বাদনরত গন্ধর্ব। এটি গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের একটি মন্দির থেকে নিয়ে আসা। আর আছে দক্ষিণ

স্ফটিক পাত্র (মুঘল আমলের)

ভারত থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া কতকগুলি ব্রোঞ্জ ও তামা-পিতলের অনুপম মূর্তি! যথা নটরাজ, শ্রীবিষ্ণু, রামচন্দ্র, পার্বতী, হনুমান, অবলোকিতেশ্বর, তারা দেবী, ইত্যাদি।

কয়েকখানি মুঘল আমলের অপূর্ব চিত্রকলার সংগ্রহ এই মিউজিয়মটির মর্যাদা যেন ভারত-প্রেমিকদের কাছে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। আমীর হোমজার প্রণয়-কাহিনীমূলক ষোড়শ শতাব্দীর অঙ্কিত ষোলোখানি রঙীন ছবি, বাদশাহ বাবরের আত্মস্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সতেরোখানি রঙীন চিত্র। সম্রাট আকবরের 'স্মৃতি কথা'র ১১৭ খানি সুরঞ্জিত ছবি। এ ছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের আমলেরও কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিকৃতি এবং নানা ভারতীয় জীব জন্তুর চিত্রও সংগ্রহ করা রয়েছে।

কিছু কিছু রাজপুত চিত্রকলার নমুনা, অজন্তা গুহার প্রাচীর চিত্রের অসংখ্য বৃহদাকার নকল এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার অনেকগুলি নিদর্শনও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভারতীয় বস্ত্র ও সূচীশিল্পের যে বিরাট সংগ্রহ এখানে আছে পৃথিবীর আর কোনও যাদুঘরে তা নেই। জরি, বারাণসী, কিংখাপ, তসর, গরদ, মুর্শিদাবাদী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন, মোগলবাদশাহদের সাঁচ্চা জরির কাজ করা শল্মা চুম্‌কীর ফুল তোলা ব্রোকেড্, মখমল,

শির প্যাঁচ কল্কা (মুঘল আমলে উষ্ণীষের শোভা বর্ধন করতো)

ভেলভেট ও সাটিনের চোগা-জোব্বা, ফতুয়া আঙ্‌রাখা, পেশোয়াজ, সালোয়ার, প্রভৃতি। দরবারী পোষাক, বাদশাহী পোষাক, আমিরী কার্পেট, নমাজী আসন, ইত্যাদিও আছে। আর আছে ভারতীয় তৈজসপত্র; সোনা রূপার তৈরি নানাদ্রব্যাদি, হীরা মুক্তা জহরতের অলঙ্কার, চন্দন কাঠ, আবলুশ কাঠ ও হাতির দাঁতের তৈরি কত আসবাবপত্র ও খেলনা পুতুল। শ্বেতপাথরের জিনিস, কষ্টি পাথরের সামগ্রী, মোটের উপর দেখা গেল প্রায় সর্বপ্রকার ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ও কারুকৃৎ এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

২

[ব]িকালে দিল্লীর অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে সভা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতে তাঁর পাঠানো ভাষণ পাঠের পর বাঙালীদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা-সভা আরম্ভ হল। ডক্টর [শ্র]ীকুমার ব্যানার্জি ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা বাঙালীদের ক্রমাবনত অর্থ-[নৈ]তিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কী করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৎপরে বাংলা দেশের বিধানসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলকুমার [মু]খোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার অধিবেশন আরম্ভ [হ]য়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এ শাখার উদ্বোধন [ক]রার কথা ছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি শারীরিক অসুস্থার জন্য [জ]য়পুরে উপস্থিত হতে পারেননি। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত [মু]খোপাধ্যায় বলেন যে বর্তমান অবস্থায় বৃহত্তর বঙ্গ কথাটির আর কোন [আ]বশ্যকতা নাই, সুতরাং বৃহত্তর ভারতে তার পরিবর্তন আবশ্যক।

জয়পুর অধিবেশনের স্থান ও ডেলিগেটদের সাময়িক আবাস-ভবন—
গবর্ণমেণ্ট হোস্টেল (জয়পুর)

[ব]িশেষে তিনি বলেন যে এই সম্মেলনে বার্ষিক অধিবেশনের কাজ ছাড়া [বর্ষ]ব্যাপী আঞ্চলিক সমিতির দ্বারা বাংলার বাইরে বাঙালীর চিরস্থায়ী [নি]বন্ধন (Register) প্রণয়ন এবং তাদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার তথ্য-[সং]গ্রহ করতে পারলে খুব ভাল হয়।

অতঃপর মূল-সভাপতি ঘোষণা করেন যে উদয়পুরের মহারাণার [নি]মন্ত্রণলিপি তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে আসেনি, সম্মেলনের সভাপতিরূপে [সক]ল ডেলিগেটকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তের জন্যই তাঁর কাছে এসেছে।

বিকেলের দিকে সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে বিষয় নির্বাচনী কমিটির [সু]পারিশ-অনুসারে সমিতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি অদল-বদলের [প্রস্]তাব এবং কয়েকজন সাহিত্যিক ও কৃতী বাঙালীর মৃত্যুতে শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। তার পরেই ধন্যবাদের পালা। শ্রীযুক্ত অবনীবাবু অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। ডেলিগেটদের তরফ হতে সভাপতি ও অভ্যর্থনা-সমিতিকে ধন্যবাদের ভার আমার উপর পড়লো! শ্রীযুক্ত দাশ যেভাবে একাধারে মূল-সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির মুখপাত্র ও তাদের পক্ষে ঘোষণাকারীরূপেও সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছেন তা সত্যই প্রশংসার্হ! অভ্যর্থনা সমিতি ও জয়পুর-বাসীদের অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ডেলিগেটরা সকলেই যা' অনুভব করেছেন সেই অপ্রিয় কথাটি আমাকে বলতে হলো যে—জয়পুরে অতিথিদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও আন্তরিকতাটুকু পাইনি! এ যেন ভায়ের নিমন্ত্রণে এসে হোটেলে থেকে খেয়ে দেয়ে যাওয়ার মত! পাটনার শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ঘোষও স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানালেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজুদাদা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে আগামীবারের জন্য লক্ষ্ণৌতে অধিবেশনের জন্য আহ্বান জানালেন এবং তা গৃহীত হ'ল। শ্রীযুক্ত দাশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে বল্লেন "আসুন আমরা সব দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে জয়পুর হতে উদয়পুরে এবং উদয়পুর হতে একে অন্যের 'হৃদয়পুরে' যাত্রা করি! সব ভাল যার শেষ ভাল! বাঙালীর মনের অসন্তোষ প্রভাতের মেঘ-গর্জনেরই মত, একটু সহানুভূতির স্পর্শেই যে তা আকাশের কোণ হতে দূরে চলে যায়—আবার তাই প্রতিপন্ন হ'ল জয়পুরের অধিবেশন-সমাপ্তির দিনে।

রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনের ইংরেজী অনুবাদ "Sacrifice" অভিনীত হল। মামুলী অভিনয়—একমাত্র কুমারী জুলেখা সেনের রাণীর অভিনয় ছাড়া আর কোনটিই প্রাণবন্ত বা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

২৮শে তারিখে অফুরন্ত অবসর। বিসর্জনের পর পূজামণ্ডপের অবস্থার মত অবস্থা! সেই বিকেলে সাড়ে চারটার সময় রওয়ানা হতে হবে সদলবলে উদয়পুরে। শ্রীমতী পালের আগ্রহে রওয়ানা হচ্ছি পুজোর জন্য গোবিন্দজীর মন্দিরে—এম্নি সময়ে সম্মেলনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীমান্ দিলীপ দত্ত এসে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন তাদের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য! আগেই বলেছি সৌভাগ্যক্রমে মন্দিরের গোঁসাইজির আহ্বানে সেদিন সেখানেই অন্নপ্রসাদ নিতে হয়েছিল আমাদের, কিন্তু তা' সত্ত্বেও দিলীপের দাদা শ্রীঅজিত দত্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ত না যাওয়া চলে না। দুপুরে মন্দির হতে ফিরে এসেই দেখি গাড়ী নিয়ে দিলীপ ও তার দাদা উপস্থিত। সুতরাং তখনই গেলুম তাদের বাড়ীতে। সেখানে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সুধাংশুবাবুপ্রমুখ অন্যান্য সাংবাদিকদের সকলেরই নিমন্ত্রণ, শুধু অসাংবাদিক পত্নী ও ভ্রাতাসহ আমি! প্রসাদে পেট ভরপুর থাকা সত্ত্বেও বসতে হলো খেতে এবং খেতেও হলো আকণ্ঠ! দত্তরা তিন ভাই,

দিলীপের বৌদি ও দিলীপের দু'বোন যেভাবে সেদিন ষোড়শোপচারে আমাদের সযত্নে খাইয়েছিলেন তা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। তারপর তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে আমাদের ফটো নেওয়া হ'ল এবং আমরা ভারাক্রান্ত চিত্তে বিদায় নিয়ে—হোষ্টেলে এসেই "লয়ে রশারশি, করে কষাকষি, পোটলা পোটুলি বাঁধি"—উদয়পুরের পথে জয়পুর ত্যাগ করলুম! দুঃখের বিষয় যে বিদায় সম্বর্ধনার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কিংবা কার্যাধ্যক্ষকে জয়পুর ষ্টেশনেও দেখতে পাওয়া গেল না।

পরদিন ভোরে চারটার সময় চিতোরগড়ে এসে পৌছান গেল! চিতোরগড়ে মহারাণার অতিথি সৎকারের কোন আয়োজন দেখতে পাওয়া গেল না। নিজেদের বন্দোবস্তে সেখানকার প্রাসাদ গোপাল-ভবনে পৌছে দেখা গেল যে মাটির ভাঁড়ে করে চা-পানের ব্যবস্থা, আর রুদ্ধদ্বার প্রাসাদের বারান্দায় কয়েকখানা সতরঞ্চি বিছানো! ভদ্রমহিলা কয়েকজন প্রাতঃ-কৃত্যের জন্য ভেতরে যেতে চাইলেও তাদের জন্যও কেউ দরজা পর্যন্ত খুলে দেয় নি। ডেলিগেটের দল ততক্ষণে মনের অসন্তোষ মনেই রেখে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিতোরগড় দুর্গের দিকে এগিয়ে চলেছে, কেউ বা টাঙ্গায়, কেউ বা লরীতে, আর কেউ বা দ্বিপদবাহনে। মিসেস পালের বড়দা বোনটিকে টাঙ্গায় করে নিয়ে যাওয়াতে আমরা কজন পায়ে হেঁটেই উপরে উঠতে আরম্ভ করলুম! এই সেই চিতোরগড়—যা শতাব্দীর পর শতাব্দী পাঠান ও মোগলের আক্রমণকে তুচ্ছ করে আজও উন্নতশির হয়ে মেবারের রাজপুতদের বীরত্বগাথা ও কীর্তিকাহিনী সগৌরবে ঘোষণা করছে! পাহাড়ের উপর পরপর তিনটি সুদৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা ঢাকা চিতোর দুর্গ—মাঝে মাঝে একইরূপ সুদৃঢ় তোরণদ্বারগুলি দিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়। দুর্গপ্রাকারের সংযুক্ত বাঁধানো উঁচু পথে একসঙ্গে ৫।৭ জন অশ্বারোহী অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারে। দুর্গে ঢুকেই খানিকটা দূরে আমরা জয়মল্লের সমাধিস্থান দেখতে পেলুম। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করেন তখন ভীরু রাণা উদয়সিংহ জয়মল্লের হাতে চিতোর রক্ষার ভার দিয়ে দুর্গম মেবারের পাহাড়ে আশ্রয় নেন। জয়মল্ল ও তার কিশোরবয়স্ক সহকারী পুত্ত. মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর সাহায্যে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভগ্ন দুর্গ প্রাকারের মেরামত কার্য তত্ত্বাবধানরত জয়মল্লকে মশালের আলোকে দেখতে পেয়ে আকবর হাতীর উপর হতে নিজের হাতে গুলী করে যেখানে নিহত করেন তারই স্মারক-চিহ্ন এই সমাধিস্থান! জয়মল্লের পর পুত্ত সংগ্রামরত অবস্থায় প্রাণ দিলে আকবর চিতোর দুর্গ জয় করেন! উদয়সিংহ কিংবা তার পুত্র বীরাগ্রগণ্য রাণা প্রতাপ সারাজীবনের অক্লান্ত চেষ্টায়ও আর চিতোর-উদ্ধার করতে সক্ষম হননি।

তারপরেই আমরা গিয়ে ঢুকলুম রাণা কুম্ভের প্রাসাদে! এই রাণা কুম্ভের রাজত্বকালেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বপ্ন দেন "ম্যয় ভুঁখা হুঁ" বলে। দেবীর সে ক্ষুধা মেটাবার জন্য যখন রাণা কুম্ভের এগারোটি পুত্র পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে জীবনাহুতি দেন তখন বংশরক্ষার জন্য অবশিষ্ট একটি মাত্র রাজপুত্রের পরিবর্তে বৃদ্ধ রাজাই যুদ্ধ যাত্রা করেন ও যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সু-উচ্চ স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। মহম্মদ খিলিজির সঙ্গে হাম্বির যুদ্ধ করে প্রথম বারের মত চিতোরোদ্ধারের গৌরব লাভ করেন। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী আলাউদ্দিন খিলিজির চিতোর আক্রমণের সময়ে জহরব্রত পালন করে নিজের ও সখীদের সতীত্ব রক্ষা করেন! এখন সেই প্রাসাদে খনন কার্য চলছে এবং প্রদর্শক একটি গহ্বর দেখিয়ে যখন বললে—যে প্রাসাদ হতে জহরব্রতের স্থান পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কৃত হয়েছে—তখন কৌতূহল দমন না করতে পেরে অন্ধকারে দুটি সিঁড়ী পার হয়ে যেমন "রাজপুতানার নারীর মত, করব না হয় জহরব্রত…" বলতে বলতে তৃতীয় সিঁড়ীতে পা দিতে গেছি, অমি একেবারে পতন ও মূর্ছা! মনে হল যেন কত নীচে নেমে যাচ্ছি—যাচ্ছি ত যাচ্ছি—এমন সময়ে কে যেন দু'বাহু বাড়ায়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে! আর কিছু বলতে পারিনে—যখন জ্ঞান হল দেখতে পেলুম রাণা কুম্ভের প্রাসাদের বাইরে পাথরে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—আর আমাকে ঘিরে আমার ভাই,

হাওয়াই মহল—(জয়পুর)

অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা ডেলিগেটগণ—মায় আমার সহধর্মিণী পর্যন্ত! নিজের কাছেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লুম এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়—এবং ডান হাতে ও কাঁধে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও বল্লুম "আমি ভাল আছি, কিছুই হয় নি, চলুন যাই!" কিন্তু যাই বল্লেই যেতে দেয় কে? পরে আমি উঠ্‌বো না এই কথা দিলে তারা সকলেই দ্রষ্টব্য স্থা‍ ‍গুলি—অর্থাৎ মীরাবাইর মন্দির, রাণাকুম্ভের স্মৃতিস্তম্ভ, চিতোরেশ্বরীর মন্দির, পদ্মিনীর জহরব্রতের কুণ্ড, যে কক্ষে প্রথমবার আলাউদ্দীন খিলিজি—দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেই দুধের আশা ঘোলে মিটিয়ে চিতোর ত্যাগ করেন—এ সকল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে যান। আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের একজন যুবক ইঞ্জিনীয়ার আমাকে খানিকটা গরম দুধ ও ব্রাণ্ডি দিয়ে সুস্থ করেন। খানিকক্ষণ পরে তারই টর্চের সাহায্যে আমি একাকী গিয়ে আমার পদস্খলনের স্থানটুকু ভাল করে দেখে আসি! কোন সুড়ঙ্গের চিহ্নমাত্র নেই, মাটির নীচে সাত-আট ফুট নীচে একটা ঘরমাত্র—

মেঝেতে পাথর থাকলেও যেখানে আমার মূর্ছিত শরীর পড়েছিল সেখানেই শুধু নরম বালুকার বিছানা যেন পাতা ছিল, আর তাকেই আমি পড়তে পড়তে পদ্মিনী বা অন্য কোন রাজপুত ললনার কোমল বাহুপাশ বলে ভুল করেছিলুম। ওঃ হরি, "স্বর্গ হতে হল পতন রচেছিলাম যাহারে।"

একখানি টাঙ্গা করে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতী ঘোষ ও পাটনার বন্ধু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ফিরছিলেন—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তই দয়া করে নেমে এসে আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিলেন। পথে ফিরতে ফিরতে এবং গোপাল ভবনে ফিরে আসার পরও যাঁর সঙ্গে দেখা তিনিই জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন "কেমন আছেন. বড্ড লেগেছে কি? উঃ কী বেঁচেই গেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি!" চিতোরগড় ও উদয়পুর পঁচিশ বছর আগে দেখা ছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার দৈব দুর্বিপাকে দেখা হয়নি বলে ততটুকু দুঃখিত

মীরাবাঈর মন্দির—চিতোরগড়

হইনি—যতখানি হয়েছিলুম সকলের আনন্দের মাঝখানে নিজেকে একটি দুঃস্বপ্নের রূপে দাঁড় করিয়ে! যাক্ শ্রীমতী পালের সিথীর সিঁদুরের জোর আছে—সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলুন।

গোপাল-ভবনে মহারাণার অতিথিদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা—ডাল, ভাত, আর সবজির ঘণ্টসহ হালুয়া—হাতে দারুণ ব্যথা নিয়ে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। সেখানকার কে একজন বল্লে—পরে ষ্টেশনে যাবার টাঙ্গা হয়ত না পাওয়া যেতেও পারে—এ যেন গোয়ালন্দ হোটেলে খেতে বসেছি অম্নি হোটেলওয়ালার কথা—শীগ্‌গির করুন এখুনি ষ্টীমার ছেড়ে দেবে! কোথায় ডাল-ভাত-মাছ—মুখের গ্রাস পড়ে রইলো—ছুট্—ষ্টীমার কিন্তু ছাড়লে ঠিক দেড় ঘণ্টা পরে।

ষ্টেশনে ফিরে এসে শুনি সকলের মুখে এক বুলি—ঢের হয়েছে মহারাণার আতিথ্য, আর কেন—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' কয়েকজন মহিলা বল্লেন, আমরা আর উদয়পুরের দিকে এক পাও বাড়াবো না! আর কয়েকজন বল্লেন—না আসাই উচিত ছিল—আর কেন চলুন ফিরে যাই। কেউ বল্লেন যে তারা উদয়পুরে যাবেন কিন্তু হোটেলে থেকেই দেখে আসবেন—মহারাণার আতিথ্যে আর কাজ নেই! এগোই কি পিছোই? সকলের মনেই তখন এই প্রশ্ন। তখন মুস্কিল-আসান্ হয়ে দেখা দিলেন দ্বিজুদা' —বলেন "এতদূর এগিয়ে দেখাই যাক্ না কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। আর এমনও হতে পারে যে উদয়পুরেই ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে বন বাদাড়ে কিছু সম্ভবপর হয়নি। দেবেশবাবুও আগেই গেছেন উদয়পুরে—দেখাই যাক্ না তার দৌড় কতটুক! চিতোর হতে ফিরে গেলে মহারাণা কি মনে করবেন, ইত্যাদি। যাক্ একরকম নিমরাজী হয়েই অসংখ্য ডেলিগেট মনে চাপা অসন্তোষ নিয়ে এবং আমি হাতে ও কাঁধে দারুণ ব্যথা নিয়ে উদয়পুরে রওয়ানা হলুম।

ট্রেণ যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই—মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চ শির, তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর—আমাদের চারিধারে এক দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর সৃষ্টি করলে! ধরার বুকে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসাতে মেবার পাহাড় আরো রহস্যময় হয়ে দেখা দিতে লাগলো! দেবারি ষ্টেশন ছাড়িয়েই রেল লাইনকে যেন চেপে ধরলে দুদিকের অতিকায় সুউচ্চ পাহাড় দুটি! মনে পড়লো বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ বইতে এই গিরিরন্ধ্রে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ইঁদুরের কলে পড়ে যেমন লাঞ্ছনা হয় রাজসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের হাতে সেরূপ লাঞ্ছনার স্থান এই দোবারি—তার বিশেষ বিবরণ! সকলে বিস্ময়-অভিভূত নেত্রও চিত্তে তাই দেখছিলুম আর অনুভব কচ্ছিলুম। এম্নি সময়ে হঠাৎ ট্রেণ এসে উদয়পুরে ষ্টেশনে থমকে দাঁড়ালো। দেখলুম সহাস্যে শ্রীমতী দাশসহ শ্রীযুক্ত দাশ মশাই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে বলছেন—"রথ প্রস্তুত—আপনারা সকলে আসুন—আমরা আপনাদের নিতে এসেছি।" কে একজন উদয়পুরে থাকা ও দেখাশোনার ছাপানো অন্য একটা প্রোগ্রাম আমাদের হাতে হাতে দিয়ে গেলেন। আবার কে একজন আমিও শ্রীযুক্ত দাশ যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেখানে শ্রীযুক্ত দাশকে বল্লেন—জানেন ডাঃ পালের কি ফাঁড়াই গ্যাছে আজ! নৌকোয় চলতে চলতে ইন্দ্রনাথ যেমন শ্রীকান্তের ভয় দূর করেছিল "ও কিছু নয়—সাপ" বলে —আমিও তেমনি অসহ্য ব্যথা সত্বেও হাসিমুখে বল্লাম "ও কিছু নয়—সাময়িক পদস্খলনমাত্র!"

প্রায় সকল ডেলিগেটদের জন্যই রাত্রিবাস হয়েছিল ফতে মেমোরিয়াল প্রাসাদোপম গৃহে। শুধু শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর পরিবার, শ্রীযুক্ত সুধাংশু বসুর পরিবার ও পাল পরিবারের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ইনকাম ট্যাক্স বিলডিংয়ে। পরে অবশ্য একটি হল ঘরে পাটনার তের জন এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে বাড়িতে মহারাণার প্রাসাদ হতে অতিথিদের জন্য নৈশ্য ভোজের ব্যবস্থা হ'ল পুরু পুরু পুরী, ডাল, আর অতি ঝাল তরকারী। আমাদের অনেকেরই তাতে চুয়াল ব্যথা ও নাকের-জলে চোখের-জলে এক হয়েছিল।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে ভোরে আটটার সময় শ্রীযুক্তা দাশ আমাদের

নিয়ে যাবার জন্য মোটর নিয়ে হাজির হলেন, শ্রীযুক্ত দাশ গেলেন বড়দলের সঙ্গে। উদয়পুরের পিছৌলা লেকের পারে বংশীঘাটে এসে আমরা মোটর ছেড়ে মহারাণার ষ্টীমলঞ্চে চড়ে প্রথমে গেলুম জগমন্দির প্রাসাদে—লেকের মধ্যে এই প্রাসাদটি ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে পুরোপুরি নির্মিত হয়। রাজকুমার খুরম যখন পিতা জাহাঙ্গীর ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তৎকালীন মহারাণার আতিথ্যের নির্ভয় আশ্রয়ে এখানেই বাস করেন। পিছৌলা লেকের একদিকে বিরাট রাজপ্রাসাদ—চিতোর হতে পলায়িত মহারাণা উদয়সিংহই উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন। লেক-মধ্যস্থ কতকগুলি দ্বীপে গাছে বসে রামধনু রঙের সৃষ্টি হয়েছে, নানারঙের পাখীর মেলায় সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! তারপরে আমরা গেলুম 'জগ্‌-নিবাস' নামক মহারাণার পিছৌল লেকস্থ গ্রীষ্মাবাসে! এ সকল সুন্দর দৃশ্য দেখে শ্রীমতী পাল বল্লেন "কোথায় লাগে এর কাছে সুইজারল্যাণ্ড্?" আর শ্রীমতী বসু (মনোজবাবুর স্ত্রী) ত গান ধরলেন "যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল, সখিগো—" লেক হতে উঠে এসে আবার গাড়ীতে করে আমরা এলুম সাহেবলিয়ো-কি বাদী, নামক বাগানে! এখানেও সেই দেওয়ানী-খাস, দেওয়ানী-আম—আর শীশ-মহল! আমাদের জন্য মালী বাগানের সব কয়টি ফোয়ারা খুলে দিলে—পাথরের হাতীর শুড় দিয়ে পর্যন্ত ফোয়ারা উঠতে লাগলো! এখানে শ্রীযুক্ত দাসের নেতৃত্বে বড় দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল।

দুপুর বেলা ভোজের ব্যবস্থা—ভাত, মাংস, কচুর তরকারি, আর লাড্ডু। বিকেল বেলা গেলুম মহারাণার প্রাসাদে—এ কক্ষ সে কক্ষ ঘুরে ঘরে ঢুকলুম—অস্ত্রশালায় যেখানে রাণাসংগ্রামসিংহ হতে আরম্ভ করে রাণাপ্রতাপ এবং রাণা রাজসিংহ হতে স্বর্গত রাণা ফতে সিংহ পর্যন্ত সকলের ব্যবহৃত আয়ুধরাশি সযত্নে রক্ষিত আছে! রাণাপ্রতাপের বর্ম, ঢাল ও চৈতকের বর্ম দেখবার মত বস্তু! প্রাসাদে আমাদের জন্য লেমনেড, অরেঞ্জ স্কোয়াস প্রভৃতি পানীয় ও পান-সিগারেটের ব্যবস্থা ছিল! ঠিক চারটের সময় আমরা সকলে গিয়ে মিলিত হলুম মহারাণার প্রাসাদের সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত বারান্দায়—যেখানে ফরাস পেতে দরবারের ব্যবস্থা হয়েছে। একদিকে মেয়েদের, আর একদিকে পুরুষদের বসবার ব্যবস্থা—মাঝে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে মহারাণার সিংহাসনের সম্মুখে! তারই চার পাশে ইয়া দাড়ি, ইয়া জোব্বা, আর আর ইয়া তলোয়ারে সজ্জিত মেবারের সর্দারগণ! তাঞ্জামে করে পঙ্গু মহারাণা ভূপালসিংহ যখন এসে সিংহাসনে বসলেন—তখন মনে হল যেন আমরা কোন মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে বিরাজ কর্চ্ছি! ওদিকে বহিঃপ্রাঙ্গণে চারণ প্রশস্তি গীতি গাইলে, ভাঁড় ভাঁড়ামি করে অট্টহাসি হাসলে, আর শ্রীযুক্ত দাস মহারাণাকে অভিবাদন করে লাল মখমলে বাঁধাই নিজের 'রাজোয়ারা' বইএর একখণ্ড উৎসর্গ করলেন। প্রত্যুত্তরে মহারাণার একান্ত-সচিব মহারাণার পক্ষ থেকে তার জন্য ধন্যবাদ জানালে মহারাণা ভূপালসিংহ রাজস্থান ও বাঙলা দেশের মধ্যে 'রাজোয়ারা'র মাধ্যমে মিলন-সেতু রচনার জন্য মহারাণা প্রতাপের যুগের একখানি অসি ও ঢাল শ্রীযুক্ত দাশের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে উদয়পুরের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। উদয়পুরে মসীজীবী বাঙালীর শিশোদীয় বংশের অসিতে ভূষিত হওয়ার সম্মান এই বোধ হয় প্রথম! সুতরাং শ্রীযুক্ত দাশের এ গৌরবে আমরা শুধু বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ডেলিগেটগণই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতিই গৌরবান্বিত হ'ল বলে মনে করি। কে বলে বাঙালীর স্বাজাত্য-বোধের অভাব? এ কারণেও জয়পুর অধিবেশন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জয়পুর অধিবেশনে সমবেত ডেলিগেটদের একাংশ। × চিহ্নিত লেখক-পত্নী। সম্মুখে। ও লেখক (পশ্চাতে)

দরবার শেষ হলে মহারাণা মোটরে করে বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। উদয়পুরে সদলবলে উপস্থিত হওয়ার আগে অনেকেই মনে মনে ভেবে-ছিলেন এবং অসমীচীন ভাবেই মুখেও প্রকাশ করেছিলেন যে হয়ত বা বাঙালীদের বিশৃঙ্খল ব্যবহারে বাঙালীর সুনাম ক্ষুন্ন হবে। কিন্তু জোর গলায় বলতে পারি, নানা অসুবিধে, নানা বিভ্রান্তিকর উক্তি, এবং উত্তেজনার সমূহ কারণ সত্ত্বেও সেদিন উদয়পুরে বাঙালী যে শৃঙ্খলাবোধ ও শালীনতার পরিচয় দিয়ে এসেছে, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে তা' চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। মেবারের রাজলক্ষ্মী মীরাবাই একদিন যে বাঙালীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন, সে বাঙালীর ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা উদয়পুরেও সে সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই স্বমর্যাদায় ফিরে এসেছে।
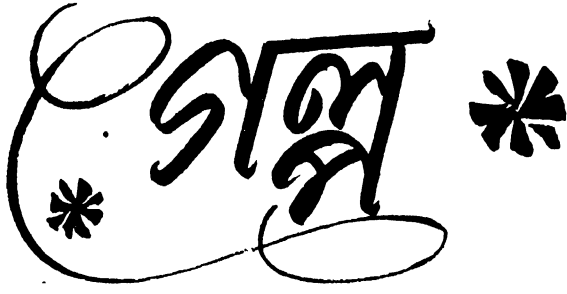
নিন্দিতা

আশাপূর্ণা দেবী

এই নিয়ে প্রায় রোজই ললিতার সঙ্গে তর্ক হচ্ছে!

বিরক্তিকর তর্ক!

তর্কটা—মৃত বন্ধু মোহনদার বাড়ীতে আমার গতিবিধির বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে।

মোহনদা সম্প্রতি মারা গিয়েছেন, ললিতার মতে অবশ্য "বেঁচে গিয়েছেন," কিন্তু সে যাক্। ওর প্রশ্ন—বন্ধুই যখন নেই, তখন নিত্যি তা'র বাড়ীতে হাজরে দেওয়ার দরকারটাই বা কি আছে? বিশেষ করে যে বাড়ীতে বন্ধুর রূপসী বিধবা স্ত্রীটি ছাড়া দ্বিতীয় আত্মীয়মাত্র নেই!

দরকার যে নেই, দরকার থাকাটা যে উচিতও নয়, সে কথা কি আমি বুঝিনা? কিন্তু মোহনদা যে আমাকে জব্দ করে রেখে গেছেন। ললিতাকে আমার নিরুপায়তা বোঝাতে পারিনে। বুঝেও বুঝতে চায় না।

মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে মোহনদা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, সব কিছুর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমার ঘাড়ে।…অর্থাৎ সেই সব ছড়ানো সম্পত্তি যেন তাঁর "অবলা বিধবা" স্ত্রীর হাত ফস্কে পালিয়ে না যায়। সব দিক গুটিয়ে ফেলে, তা'র ফলটা বৌদির মুঠোয় পুরে দিতে পারলেই আমার ছুটি, তা'র আগে নয়!

অথচ এ সব কাজ একদিনে হয় না।

অনেক কাঠ খড় না পোড়ালে আর কোম্পানির ঘর থেকে পাওনা টাকা বার করা যায় না।…

এই নিয়েই যাওয়া আসা।

আর ললিতার বিরক্তি সেই যাওয়া আসায়। মৃত্যুপথ-যাত্রীর অনুরোধ অবহেলা করা যায় কি না, এ প্রশ্ন করেছি ললিতাকে। সদুত্তর পাইনি।

ওর ভয় মোহনদার বৌকে।

শুধু ভয় নয়—আক্রোশ, আশঙ্কা, সন্দেহ। বৌটি যে 'সন্দেহজনক' সে কথা আমিও অস্বীকার করি না, তবু ললিতা যখন সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যে জেরা করিতে থাকে, এতো বন্ধু থাকতে মোহনদা আমাকেই বা মুরুব্বি ধরতে গিয়েছিলেন কেন, তখন ওর সেই জেরায় জেরবার হয়ে বিরক্ত ভাবে বলি—সত্যি আমিও ভেবে পাই না 'কেন'? তোমার মতো মনিব যার ঘরে, তা'র ওপরে আর মনুষ্যত্বের দায় চাপানো কেন!

ললিতা এক লহমা স্থির হয়ে তাকিয়ে থেকে কণ্ঠে উদাস স্বর আমদানী করে—মনুষ্যত্ব! তা' হবে! মুখ্যু মানুষ ভাষাতত্ত্ব ঠিক বুঝিও না!… তবে কি না আমাদের সহজ ডিক্সনারিতে 'মানুষ মনিষ্যত্ব' করার মধ্যে ডিমের কচুরী—কপির সিঙাড়া খাওয়ার দরকার তো বড়ো দেখি না! তাই—বলে ফেলেছিলাম!

সত্যি বলতে, শুনে অবাক হয়ে যাই।

সত্যিই বটে আজ মোহনদার বৌয়ের কবলে পড়ে ও বস্তু দুটো গলাধঃকরণ করে আসতে হয়েছে, প্রায়ই হয় অমন এটা সেটা, কিন্তু সে সংবাদ তো ললিতার জানার কথা নয়! মরিয়া হয়ে শেষ অবধি গুপ্তচর লাগিয়েছে না কি?

রাগের মাথায় সেই সন্দেহ ব্যক্ত করি।

ললিতা মিষ্টি হাসি হেসে বলে—নাঃ সে ভয় রেখো না। মুখ্যু হলেও অতোটা অভদ্র অবিশ্যি হতে পারবো না।… তিনি নিজেই এ গরিমা ব্যক্ত করেছেন। বিকেল বেলা ফোন্ করে বলেছিলেন কি না—"আজ আর ঠাকুরপোর খাবার নিয়ে বসে থাকবেন না যেন, আমি ডিমের কচুরী আর কপির সিঙাড়া ভাজছি—মজলিশ করে খাওয়া যাবে দু'জনে—!"

শুনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো।

ললিতার ওপর নয়, বৌদির ওপর! এ কী অসহ্য নির্লজ্জতা!

হিন্দু বিধবার উপযুক্ত খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাঁর দেখতে পাই না সত্যিই। খুব দৃষ্টিকটু লাগলেও পুরুষের উদারতায় "আধুনিকতা" বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু মেয়েদের দৃষ্টিতে সে 'কটু'ত্বের সীমানা কোথায় পৌঁছয় সেটা তো বুঝি! তিনিও যে না বোঝেন, এমন নির্বোধ অবশ্যই নয়।

তবে?

সেই দৃষ্টিশূল আচরণটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করবার কি দরকার পড়েছিলো! স্পর্দ্ধারও কি একটা সীমা থাকা উচিত নয়?

আমি কিছু বলার আগে ললিতাই আবার বলে— মজলিশটা ভালোই জমেছিলো আশা করি?

এ প্রসঙ্গের শেষ করতেই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলি— কেন জমবে না? সুন্দরী বিদুষী তরুণী-বিধবার সাহচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মুখরোচক সুখাদ্য, ভালো না লাগবার তো কথা নয়।

এর পরে অবশ্য ললিতা আর কথা বলে না।

কিন্তু ললিতাকেই বা দোষ দিই কি করে?

মোহনদা'র বৌকে ভয় না করে উপায়ও নেই।...সেই জলন্ত অগ্নিশিখাটি মোহনদা বেঁচে থাকতেই অনেক পতঙ্গকে পুড়িয়ে মেরেছে, এখন তো আরো অবাধ রাজ্য।

বরাবর বিবাহ-বিতৃষ্ণ মোহনদা যখন বেশী বয়সে অকস্মাৎ কোথা থেকে যেন এই বহ্নিরূপিণীটিকে সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে এলেন, তখন অনেকেই মোহনদার সৌভাগ্যে হিংসে করতে সুরু করেছিলাম। আবার যখন মোহনদা অবাধ ঔদার্য্যে বন্ধুমহলের সকলের সঙ্গে স্ত্রীটিকে পরিচিত করিয়ে দিলেন, তখন অস্বীকার করবো না—মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে—এ মেয়ে এতোটা বয়েস অবধি অবিবাহিতা ছিলো কেন?

শুধুই কি রূপ?

হাসিতে আলাপে সৌজন্যে স্বকীয়তায় একখানি মেয়ের মতো মেয়ে! প্রথমটা 'বৌদি' বলতে অজ্ঞান হয়েছিলাম সকলেই। কিন্তু ভুল ভাঙতেও দেরী হয়নি।

দেখলাম দীপ্তি নয়, দাহ!

বন্ধুমহলে কিছুটা বয়োজ্যেষ্ঠ মোহনদাকে আমরা যথার্থই ভালোবাসতাম। ওঁর স্ত্রীর বেপরোয়া আচার আচরণগুলো শুধু চক্ষুকেই পীড়া দিতো না, মনকেও পীড়িত করতো।

আমাদের মতো অতি-সাবধানীরা একরকম ভয়েই সরে এসেছিলাম, যারা পতঙ্গের জাত, তা'রা তা'দের পাখ্‌নাকে আহুতি দিয়ে বসতে দ্বিধা করেনি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, মোহনদাকে কোনোদিন চৈতন্য করিয়ে দিতে পারা যায়নি। আমাদের বিরক্তির আভাস দেখলেই শান্ত হাসি হেসে বলতেন—ছেলেমানুষ! একটু চঞ্চল তো হবেই।

মনে মনে 'অন্ধ' 'স্ত্রৈণ' প্রভৃতি ভালো ভালো বিশেষণে বিভূষিত করতে ছাড়িনি।...এখন ভাবি হয়তো তা' নয়, হয়তো নিতান্তই ক্ষমাশীল ছিলেন।.. নয়তো—রোগ শয্যায় পড়ে পড়ে স্ত্রীর প্রসাধন পারিপাট্য, আর রোগীর ঘর থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়ে ডাক্তার-বদ্যি অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসের বহরটা কি চোখে পড়তো না তাঁর?

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মোহনদার শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমারও এ বাড়ীতে শেষ! কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখে গেলেন মোহনদা নিজেই।

সত্যিই বটে, আমি উকীল নই, এ্যাটর্ণী নই, আমাকে মুরুব্বি ঠাওরানো কেন?

আমার আপত্তির ভাবে রোগশীর্ণ মুখে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেছিলেন—তুই যে ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারিসনে, তাই তোকেই ভরসা। ওকে যারা বড্ডো ভালোবাসে, তারাই যে ওকে পথে বসাবার চেষ্টা আগে করবে, তাই না?

উত্তরে কি বলেছিলাম ঠিক মনে নেই, হয়তো বলে থাকবো—ওঁর ভাবনা ভেবে এখনও আর অস্থির হচ্ছো কেন মোহনদা? উনি যে তোমার অভাবে খুব বেশী কাতর হয়ে পড়বেন এ বিশ্বাস আমার নেই।

মোহনদা হেসেছিলেন। বলেছিলেন—তা' হয়তো সত্যি। কিন্তু ওর দোষ কি বল? ভগবান ওকে কাতর হ'বার জন্যে গড়েননি। দোষ যদি কাউকে দিতে হয় তো ওর গঠন কর্ত্তাকে।

আমি রাগ করে উঠে গিয়েছিলাম।

এর পরে তো মোহনদার মৃত্যু, শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদিতে ক'টা দিন ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে।

আসা যাওয়ার লোক চলে গেলে বাড়ী খালি হয়ে যাবার

পর, ললিতাকে কাণ্ডারী করে যেতে চেয়েছিলাম—ললিতা স্রেফ্ জবাব দিয়েছিলো দায় পড়েছে আমার। বলেছিলাম—তবু সামাজিক কর্ত্তব্য হিসেবে—

ও বলেছিলো—আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তোমাদের মতো অতো টনটনে নয়।

হেসে বলেছিলাম—একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে?

ললিতা উত্তর দিয়েছিলো—ছেড়ে না দিলেই কি ধরে রাখা যায়?

এসব কিছুদিন আগের কথা।

ললিতা বোধহয় ভেবেছিলো ওর এই অহিংস প্রতিরোধে আমি সমঝে যাবো। অবস্থা আশানুরূপ না দেখে, এখন অন্য মূর্ত্তি ধরছে।

আর—ওকে জ্বালাতন করাই যেন মোহনদার বৌয়ের আমোদ!

আজও—কর্ম্মান্তে বাড়ী ফিরে শুনলাম—ইতিমধ্যে দু'বার নাকি আমাকে 'ফোনে' ডাকাডাকি হয়ে গেছে।

ভাবলাম এই নির্লজ্জতার একটা হেস্তনেস্ত অন্তত করে আসবো আজ।

গেলাম!

সাড়া পেয়ে ওপর থেকেই ডাক্ দিলেন—চলে এসোনা, অনেক কথা আছে।

বললাম—'অনেক কথা'র মতো কিছু আছে বলে আমার তো ধারণা নেই। আপনিই একবার নেমে আসুন না দয়া করে।

—যদি না নামি।

—তা' হলে বুঝবো খুব বেশী জরুরী কথা নয়।

—ওঃ! আমার গরজের ওজন করছো? বলে নেমে এলেন—রঙে রূপে বাসে সুবাসে ঝলমল করতে করতে! বেশ উচ্চগ্রামে হেসে উঠে বললেন—এতো অহঙ্কার কেন? না কি আতঙ্ক?

যতোদূর সম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বলি - ও সব থাক্, ডেকেছিলেন কেন তাই বলুন!

—বাবা—বাবা! একেবারে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এসেছো দেখছি যে! কিন্তু চা খাওয়ার আগে তো কোনো কথাই হ'তে পারে না।

—খাবোনা, খেয়ে এসেছি।

—আহা তা'তে কি? 'অধিকন্তু ন দোষায়'!

বললাম—ওটা থাক বৌদি, শাস্ত্রবাক্য জিনিষটা একটু গুরুপাক। দরকার যদি সত্যিই কিছু থাকে তো বলুন।

—উঁহুঁ! চা না খেলে কোনো কথা নয়। এ রকম নীরস লোকের সঙ্গে কথা বলিনা আমি। গোমড়া মুখ আমার অসহ্য।

বললাম - উপায় কি! দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলো নীরস কর্ত্তব্যের দায় আমার ওপর চাপানো হয়েছে, সেই দুর্বিপাকে পড়ে আমার আপনাকে এবং আপনার আমাকে সহ্য করতেই হচ্ছে!

ফল ফললো!

এবারে কিঞ্চিত গম্ভীর হলেন তিনি! বললেন—নাঃ, আজ ঠাকুরপোর সত্যিই মন খারাপ!···বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছো বুঝি?·· ঝগড়ার কারণটা বোধহয় আমি?

বললাম— ধরে নিন তাই! কিন্তু সেটা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়?

হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখালো বৌদিকে।

বললেন—কি জানি বাপু, বোধহয় স্বাভাবিক! তোমাদের ন্যায় শাস্ত্র বুঝতেও পারি না। কিন্তু এইটাই আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে ভাই! ধরতে পারি না—তোমরা মানুষের দাম কষো ঠিক কোন নীতিতে!

—অর্থাৎ?

বৌদি একটু হেসে বললেন—ধরো না কেন, এই আমি—আমি তোমাদের সামাজিক নীতিশাস্ত্রের ধার ধারি না, আমার আচার-আচরণে নিয়মনিষ্ঠার বালাই নেই, আর যাই হোক আমাকে—'সাধ্বী সতী' বলে ভুল করবে না কেউ, কেমন তো? আর তুমি—হেঁট মুণ্ডে ছাড়া পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো না, দুর্নীতির ছায়া দেখলে তোমার বুক কাঁপে···ইত্যাদি ইত্যাদি, অথচ আমার সঙ্গে তোমার বাজার দর এক।···তোমার বৌয়ের আমাদের দু'জনের ওপরই সমান অবিশ্বাস!

গম্ভীরভাবে বলি—'অবিশ্বাস' একথা আপনাকে কে বললো ?

বৌদি মুচকে হেসে বলেন—তা' ছাড়া আর কি ? বিশ্বাস থাকলে কি আর তুচ্ছ একটা মোমবাতির আগুনকেও এতো ভয় হয় ? আচ্ছা থাক্ ওসব ! কাজের কথাই হোক !...তোমার বন্ধুতো এই টাকার পাহাড় আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, বোধহয় ভেবেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতার ভারে যদি ভারাক্রান্ত হয়ে থাকি ! কিন্তু—

বলে একটু থামলেন।

বললাম—থাক্, তাঁর কাজের মধ্যে আর 'মতলব' আবিষ্কার করতে বসলেন না বৌদি, 'কিন্তু'টা কি তাই শুনি।

বৌদির মুখে সামান্য একটু ছায়া খেলে যায় যেন। তবু সামান্য হেসেই বলেন—কি জানো ভাই, আমার কথা বলার ধরণই ওই। সে যাক—বলছিলাম—টাকার কথা ! এগুলো নিয়ে আমি কি করবো ?

শুনে রাগে যেন আপাদমস্তক জ্বলে গেলো !

মুখে আসছিলো—'দেখুন ঢঙেরও একটা সীমা থাকা উচিত'—নেহাৎ ভদ্রতায় বাধলো বলেই ঘুরিয়ে বললাম—টাকা নিয়ে কি করবেন, তাই ভেবে আকুল হচ্ছেন ? কিন্তু আপনি যখন ঠিক সামাজিক রীতিনীতির ধার খুব বেশী ধারেন না, তখন—টাকা খরচ করবার পথ তো আপনার বন্ধ হয়ে যায়নি ? একাহারী একবস্ত্রা বিধবাদের মতো নির্ব্বোধ হলেও বা ভাবনা ছিলো।

এতোক্ষণে ভেতরের উষ্মাটা প্রকাশ করে বাঁচি।

কিন্তু আশ্চর্য্য ! কিছুতেই দমানো যায় না মানুষটাকে।

এই অদম্য শক্তির উৎস যে কোথায়, বোঝা দায়।

দিব্যি খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

যেন ভারী একটা মজার কথা বলেছি আমি।

বলেন—আহা সে হলেই তো বরং ভাবনা ছিলোনা। তা'তে তবু—একটা অধিকার বোধ থাকতো। টাকাকড়িগুলো—পরলোকগত পতিদেবতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম ! আমার যে সে সুখও নেই।

তিক্তস্বরে বলি—হেঁয়ালি টেয়ালি আমি বুঝিনা, তবে উইল যখন আছে, তখন নিষ্ঠা না থাকলেও টাকাটা আপনার ঠিকই থাকবে। অতএব ভয় কি ?

না হেসে যে কথা কইবে না প্রতিজ্ঞা করেছে তা'কে জব্দ করার ভাষা কোথায় ?

এতো বড়ো বিদ্রূপের পর'ও হাসি মুখে বলেন—কই আর ঠিক থাকছে ? রাখতে পারছি না যে ! অহরহ কাঁটার মতো ফুটছে। আপদের শান্তি না করে ফেললে আর নিস্তার নেই।

অবাক হয়ে বলি—তার মানে ?

—কী মুস্কিল এখনো বলে 'মানে !' এতোক্ষণ তবে বোঝালাম কি ? মানে হচ্ছে—ভেবে ভেবে দেখছি, আলোচাল কাঁচকলা খাওয়ার চাইতেও বিবেকের কামড় খাওয়া আরো শক্ত।...তা'র চাইতে ওর মূল উচ্ছেদ করে ফেলাই ভালো।

তীব্র ভাবে বলি—তা'হলে আপনি আমাকে বোঝাতে এসেছেন—বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি আপনি বিলিয়ে দিতে চান ?

হয়তো ভাষার তীব্রতার চাইতে সুরের তীক্ষ্ণতা বেশী হয়ে পড়েছিলো !...হয় তো আমার মুখে অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, দেখলাম সদাহাস্যময় মুখে একটা মেঘের ছায়া খেলে গেলো।

ক্ষণমাত্রই।

তারপরেই মুখে হাসি এনে বলে উঠলেন—এই দেখো, কার জিনিষ কে বিলোয় !...বলছি ওর ভার আমার সইছে না। তবে—কথাটা যখন তাই দাঁড়াচ্ছে তো বলি—কতো রকম মিশন-টিশন তো রয়েছে—

অনেক কষ্টে বলি—আপনার সব কিছু মিশনে দিয়ে দিতে চান ?

—কী সর্ব্বনাশ ! এ ভদ্রলোক বলে কি। আমার 'সব কিছু' একথা আবার কখন বললাম ? তোমার দাদার টাকাকড়িগুলোর কথা বলছি।...হাজার হোক চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা বস্তু আছে ? যার নামটা ডোবাবো, তা'র পয়সায় বসে বসে খাবো কোন লজ্জায় ?

একটু চুপ করে থেকে বলি—এতোটাই যদি পারছেন, ইচ্ছে করলেই তো একটু 'ইয়ে' ভাবে থেকে—

বৌদি হেসে ওঠেন—'কিয়ে' ভাবে ? নিষ্ঠাবতী হিন্দু

বিধবার রীতিতে ?···দেখো বোকামী ! চিনির 'কোটিঙ' দিলে কি লঙ্কার ঝাল যায় ?···সে হয় না। এই দেখো মোটামুটি একটা—দানপত্তর গোছের-অর্থাৎ ওটাই যখন আইনগ্রাহ্য—করে রেখেছি, এটাকে পাকা করে ফেলতে যা করতে হয় করো। অনেক তো ভুগলে আমার জন্যে। আমি অবশ্য ভাবি না ভোগাচ্ছি, মনে জানি ধন্য করছি।

কাগজখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলি—এ ভার আপনি আর কাউকে দিন।

বৌদি স্বচ্ছন্দে আমার গা ঘেঁসে বসে পড়ে বলেন—ক্ষেপেছো ? আর কেউ রাজী হবে কেন ? আমাকে যে সব্বাই ভয়ঙ্কর ভালোবাসে। একমাত্র তুমিই আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারো না, তাই যা কিছু ভরসা তোমার ওপর ! আমাকে নিঃসম্বল করতে তুমিই যদি পারো !

কয়েক সেকেণ্ড সেই অপূর্ব্ব মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থেকে বলি—কিন্তু আপনার চলবে কিসে ?

—এই দেখো ! সাধে কি আর বলেছিলাম—চা না খেলে কথা হবে না। ওটা মাঝে মাঝে খাওয়া ভালো ঠাকুরপো, বুদ্ধি বাড়ে।···বলি—আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কি আমাকে 'অচল' করে পাঠিয়েছেন ? ভয়ঙ্কর রকম কিছু একটা নাও যদি পারি, যাহোক কিছুও তো পারবো ? তোমাদের এই সংসার যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পড়ে, জগতের পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করবার একটা পথ কি আর খুঁজে পাবোনা ? তিলে তিলে আত্মহত্যার চাইতে সেটা আর বেশী কি খারাপ হবে ? অ্যাঁ ?··· তুমি কি বলো ?

তখন আর কিছুই বলিনি, বাড়ী এসে সব কিছুই বলি। মানে বলতে বাধ্য হই। ললিতা জেরা করে করে আদায় করে। সবশেষে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে—নিজে মুখে বললে—'নাম ডোবাবো !'

—বললেন তো !

—হয়েছে ! 'বললেন করলেন' বলে আর মান্য করতে হবে না ! এই কথার পরও তুমি তার বিষয়-বৈরাগ্যের মহিমায় অভিভূত হয়ে যাচ্ছো ?

—তাও তো যাচ্ছি !

—নমস্কার !

—হ্যাঁ আমিও তো তাই বলছি—

ওগো সুন্দর ! সে কি গো তোমারি সম ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রভাতের মত দিল না তো কেহ সাড়া
সন্ধ্যার পথে নেমে আসে বিভাবরী।
আজ সব নদী আর সব জলধারা
হোলো একাকার, ভেসে যায় কত তরী !
অন্ধকারের জপমালা জপে জপে
আঁখি তারা কার চেয়ে আছে দূর নভে !
কেকা কলরবে বরষার উৎসবে
কে গেল কুটীরে নদী হ'তে ঘটভরি !
নেমেছে বাদল রতির অশ্রুজলে
হরকোপানলে মদনভস্ম পরে,
ঘনমেঘদলে বজ্রের কোলাহলে
প্রাণ কেঁদে ওঠে জীবন নদীর চরে।
ব্যর্থ-বাসনা বিরহে বেপথু রহে,
তরু কিশলয় তোমারি কথা যে কহে।
ওগো সুন্দর ! সজল গন্ধ বহে
তোমার গানের সুরগুলি ঝরে পড়ে।

ফুলের জীবন হোলো যে বিফল প্রিয় !
ঘুমহারা রাতে মিলহারা পথমাঝে,
কাজলপ্রহরে তোমারি উত্তরীয়,
উড়ে যায় দূরে, নাহি আসে আর কাছে !
প্রতি নিশি মোর এমন শ্রাবণক্ষণে
মন্থিত স্মৃতি আনে যে সঙ্গোপনে,
মনের গহনে বিজলী দিভার সনে
ধেয়ানে আমার তোমারি মূরতি রাজে।
সংসারে আজ শত জনতার ভিড়ে
জ্বালা পেয়ে পেয়ে ভেঙেছে হৃদয় মম,
প্রাণের পাখীরে আগামী দিনের নীড়ে
কার কাছে রেখে চলে যাবো প্রিয়তম !
জীবনমৃত্যু মাঝখানে আলোছায়া,
তারি মাঝে মায়া হয়েছে কি মহামায়া ?
তরুবীথিকায় নবঘন শ্যামকায়া—
ওগো সুন্দর ! সে কি গো তোমারি সম ?

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(জলধর সেনকে[১] লেখা)

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া

দাদা,

শেষপ্রশ্নের কিছুই লিখতে পারলাম না[২] অসুখের জন্যে। সমস্ত দিন মাথা ভার হয়ে থাকে, কোন চিন্তার কাজই করতে পারিনি। ২।৩ দিন হ'ল সেটা সেরেছে। আমার লেখার ব্যাপারে এ ত্রুটি তো ১৫ বচ্ছর দেখে আসচেন,[৩] সুতরাং খারাপ লাগলেও আশ্চর্য্য যে হন নি এ কথা নিশ্চয় জানি। আবার এমনি কোরেই অবশেষে একদিন বই শেষও হয়।

এই ছেলেটির হাতে এঁরই লেখা একখানা বই পাঠালাম। সেবার এর কথাই আপনাকে গল্প করেছিলাম। বইখানি পড়ে দেখলে বোধ হয় খুসি হবেন। লেখকের নাম সুধীবেন্দু, এঁর ভারি ইচ্ছে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। যদি কোথাও প্রয়োজন মনে করেন তো আমি নিজেই সংশোধন করে দেবো[৪]। সে যাই হোক্ মন দিয়ে গল্পটি একবার পড়ে দেখবেন। ৩০।৯।২৮

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শরৎ

১। "ভারতবর্ষ" সম্পাদক জলধর সেন। ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর পর্যন্ত জলধর সেন বহুবৎসর ভারতবর্ষের সম্পাদক ছিলেন।

২। এই সময় শরৎচন্দ্রের "শেষপ্রশ্ন" ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হচ্ছিল।

৩। সাহিত্য-রচনায় শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট কুঁড়েমি ছিল। তিনি যখন রেঙ্গুন থেকে "ভারতবর্ষে" লিখতেন, তখন চিঠির পর চিঠি দিয়ে তাগাদা করে লেখা আদায় করতে হ'ত। তারপর রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যখন নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ভারতবর্ষে লিখতে লাগলেন, তখনও জলধরবাবুকে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে একরূপ রীতিমত ধর্ণা দিয়েই তবে ভারতবর্ষের জন্য লেখা আদায় করে আনতে হ'ত।

৪। নতুন লেখকদের দাঁড় করানোর জন্যে শরৎচন্দ্র কিরূপ চেষ্টা করতেন, এখানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

[ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

ভাই ভূপেন,

তোমার চিঠিখানি পড়ে কত কথাই না মনে পড়লো—কিন্তু সে সব তো আর চিঠিতে লেখবার নয়। আমি ত এদিকে বজ্জাতি করেই টিকে আছি—যাবার নামটি নেই। সেদিন ছিলুম আমরা যৌবনের কোঠায়, যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার নিয়ে—আর আজ নড়তে চড়তে গেলেও মনে হয় থাকগে আজ—কাল দেখা যাবে। অতএব শরৎদার উপদেশ সেদিনের সঙ্গে এদিনের মাঝে মাঝে একটু তুলনা ক'রে দেখো—আমোদ পাবে।

চিঠির জবাব দিচ্চি ব'লে আশ্চর্য্য হয়ো না। শতকরা নব্বুইটা চিঠিই আমার নিরুত্তরে শেষ হয়, কিন্তু বাকি দশটার মধ্যে যাঁরা আজও আছেন, তাঁদের একজন তুমি। তাই।

তোমার নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই নিতুম, কিন্তু এই রবিবার কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে যাচ্চি। মাসখানেক পরে হয়না ভাই? কত খুসির সঙ্গেই যে তোমার ওখানে যেতুম তা আর বলতে পারিনে।

তোমার ছেলেটি[২] আমাকে জ্যাঠামশাই ব'লে ডাকে এবং পিতৃব্যের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এ কথা ঠিক তোমার মতোই জানি। বলবার প্রয়োজন নেই। তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ দিয়ো এবং তুমিও জেনো পুরণো বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪০। তোমাদের শরৎদা

১। এই ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ উপন্যাসের সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। বিরাজ-বৌ নাটকে রূপান্তরিত হ'লে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়। পেশাদার রঙ্গালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে মঞ্চস্থ করা এই-ই প্রথম। বিরাজ-বৌএর নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভূপেনবাবুর পরিচয়ের সূত্রপাত। পরে তাঁদের এই পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল।

২। শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

তুলু, দুটি ছেলে মুখুয্যেদের বাড়ীতে পড়তে যায়[২],। একটির হ'ল নেমন্তন্ন আর অন্যটি গেল বাদ[৩]। আমার ত খাবার নেমতান্ন হয়েছে। আমি না হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার representative. ইন্সি—২০শে মাঘ ১৩৩০

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়কে লেখা]

Sarat Chandra Chatterjee
P. 566 Monoharpakur
2nd Lane. Calcutta
Phone Park—834

কল্যাণীয়েষু,

কুমুদ, পত্রবাহক তুলুর[১] যে একটা ছবি Photo Ry. Hospital থেকে নেওয়া হয়েছিল, তার report নাকি তোমার কাছে ছিল। সে যাই হোক্ তোমার কি মনে আছে ছবিতে কি অসুখ ধরা পড়েছে। যদি জানো একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। Election ব্যাপার[২] কেমন চল্‌ছে? ৮ই চৈত্র ১৩৪২ শরৎবাবু

[ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে[৩] লেখা]

24, Aswini Dutt Road.
Calcutta

প্রিয়বরেষু,

আপনাকে আমার মনে থাকবে না[৪] এ কি রকম কথা? মনে বরাবরই আছে এবং থাকবে। চারু[৫] আমার ছেলে-

১। তুলসীবাবু হলেন শরৎচন্দ্রের দিদির ছোট জায়ের ছোট ভাই। তুলসীবাবু এই সময় তাঁর দিদির বাড়ীতে থেকে কলকাতায় চাকরী করতেন।

২। শরৎচন্দ্রের দিদির সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় স্থানীয় ওড়কুলি এম.ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি গ্রামের ও আশ পাশের গ্রামের কয়েকটি ছাত্রকে সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীতে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী দুটি ছেলেও পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়তে যেত।

৩। তুলসীবাবু একবার মানত হিসাবে তাঁর দিদির বাড়ীতে ৪ বছর সরস্বতী পূজা করেছিলেন। পূজায় তিনি লোকজন খাওয়াতেন। পাঁচকড়িবাবুর কাছে যে সব ছেলে পড়তে যেত তুলসীবাবু তাদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী যে দুটি ছেলে পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়ত, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নকুল। তুলসীবাবু এক বছর পাঁচকড়িবাবুর সকল ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করলেও, কি ভাবে কেবল নকুলকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান। বালক নকুল নিমন্ত্রণ না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়। শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা জানতে পেরে তুলসীবাবুকে এই চিঠিখানি লেখেন। চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটি বালকের দুঃখকেও যে কিরূপ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এই ক্ষুদ্র চিঠিখানি তারই নিদর্শন।

৪। শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়।

১। শরৎচন্দ্র নিকট কি দূর যে কোনও আত্মীয়-স্বজনের অসুখ-বিসুখ করলে বড় চিন্তিত হয়ে পড়তেন। সম্ভব ক্ষেত্রে তিনি নিজে ত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেনই, তা ছাড়া অন্য ডাক্তারেরও ব্যবস্থা করে দিতেন। তুলসীবাবুর একবার অসুখ করলে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের কাছে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। তুলসীবাবু ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে (বর্তমান নাম ইষ্টার্ণ রেলওয়ে) চাকরী করতেন। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে হাসপাতালের রেডিওলজিষ্ট ডাঃ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আবার কুমুদবাবুর বন্ধু। কুমুদবাবু গণেশবাবুকে বলে দিলে রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে তুলসীবাবুর এক্স-রে করা হয়েছিল। এই সময় তুলসীবাবুর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ই শরৎচন্দ্র বহন করেছিলেন। এমন কি অনেক সময় শরৎচন্দ্র নিজে গিয়েও কুমুদবাবুর কাছ থেকে তুলসীবাবুর জন্য ওষুধ নিয়ে আসতেন।

২। এই সময় কর্পোরেশনের নির্বাচনে কুমুদবাবু একজন প্রার্থী ছিলেন।

৩। ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র আর ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রমেশবাবুর প্রথম পরিচয় হয়। সম্মেলনের শেষে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে ঢাকায় তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করলে, শরৎচন্দ্র সেই সময় ঢাকায় গিয়ে রমেশবাবুর বাড়ীতে দু' এক দিন থেকে এসেছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে যে ডি-লিট্ উপাধি দেওয়া হয়, সেই উপাধি দেওয়ার ব্যাপারে রমেশবাবু বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তখন ওখানকার ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ এ. এফ্. রহমানের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। (এই রহমান সাহেবের পরই রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন।) তাই শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট্ দেওয়ানোর ব্যাপারে রমেশবাবু ডাঃ রহমানের উপর তাঁর নিজের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট্ দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লে শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে যাতে রমেশবাবুর বাড়ীতে ওঠেন, সেইজন্য রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের কথা স্মরণ আছে কিনা লেখায় শরৎচন্দ্র একথা লেখেন।

৫। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

বেলার বন্ধু; তাঁর বাড়ীতে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেই মন চায়।

তবে দিন কয়েক যখন থাকতেই হবে তখন প্রতিদিনই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

তুলসী গোসাই[১] বলছিলেন আমার সঙ্গে যাবেন তাই আমি লিখেছিলাম তাঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে, কারণ—বাহ্যতঃ ওরা যত দুঃখই স্বীকার করুক ওদের অভ্যাস আলাদা, খুব গরীবের মত থাকতে ও পারে—কিন্তু পারা উচিত নয় মনে হয়।

পরশু রাত্রে তুলসীর বাড়ী থেকে ডাক্তার বিধান রায় আমার গাড়ীতে এ বাড়ীতে এলেন—বললেন, কথা আছে তাই সঙ্গে যেতে চাই। পথে বললেন, চার মাস পূর্ব্বে বহু কষ্টে ওকে বাঁচিয়েছি, blood pressure উঠেছিল ২৪০°॥ তারপরে একে নামিয়ে এনেছিলাম ১৪০°তে। কিন্তু কিছুদিন থেকে communal award নিয়ে খেটে খেটে আবার হয়েছে ১৭৫°॥ সুতরাং ওকে আপনি কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। গেলে অবশ্য খুবই ভালো হতো। কারণ এই মানুষটি যেমন পণ্ডিত তেমনি সজ্জন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হতো। কিন্তু তা ঘটলো না, বোধহয় আমাকে একলাই যেতে হবে। তাই তুলসীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না। ইচ্ছে আছে—রাধাকুমুদকে[২] চিঠি লিখেছি লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসতে। যদি রবিবারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তাহলে সে যেতে পারে। তাকেই Secretary করে নিয়ে যাবো। অবশ্য তার কাজ হবে আলাদা। আপনাদের কারও সঙ্গেই তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যাই হোক্ রওনা হবার পূর্ব্বে তার করে সমস্ত জানাবো। জগন্নাথ হল ব্যাপারে[৩] আপনারা যা হুকুম করবেন তাই করবো।

আপনাকে এবং গৃহের শ্রীযুক্তা গৃহিণীকে আমার প্রীতি ও নমস্কার জানালুম। ইতি ৮ই শ্রাবণ—৪৩

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

24, Aswini Dutt Road
Kalighat, Calcutta
8.7.36

Dear Sir,

With ref. to your letter on behalf of the Dacca University Students Union[৪], I am glad to inform you that I have no objection to accept the address which your union so kindly offers to present me when I go to Dacca during the University Convocation.

I intend to stay there for 3-4 days. We will fix the date when we meet.

Yours Sincerely
Sarat Chandra Chatterjee

রমেশবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের ইংরাজী চিঠিটির প্রতিলিপি এবং এই সঙ্গে রমেশবাবুকে বাঙ্গলায় লেখা শরৎচন্দ্রের আর একটি চিঠিরও প্রতিলিপি পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল। এই বাঙ্গলায় লেখা চিঠিটি রমেশবাবু ইতিপূর্ব্বে "শরৎ-স্মরণিকা"য় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছিলেন।

১। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার এবং বাঙ্গলা দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক।

২। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ইনি তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রাধাকুমুদবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকায় যেতে পারেন নি।

৩। ঢাকা ইউনিভারসিটিতে তিনটি হল বা ছাত্রাবাস আছে, যথা—জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই এই তিনটি হলের যে কোন একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়। তিনটি হলে তিনটি পৃথক ছাত্র ইউনিয়ন আছে। এই তিনটি ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত ইউনিভারসিটির ছাত্রদেরও একটি ইউনিয়ন আছে। তার নাম—ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে এই চারটি ইউনিয়ন থেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সংবর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল।

রমেশবাবু ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হল ইউনিয়ন—এই দু'টিরই সভাপতি ছিলেন। তাই তিনি এই দুটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই শরৎচন্দ্রকে দুটি পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন। অপর দুটি ইউনিয়ন থেকে আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র গিয়েছিল। রমেশবাবু জগন্নাথ হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—জগন্নাথ হলে আপনি মামুলী কিছু না বলে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বললেন। আর ছেলেরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করবে।—শরৎচন্দ্র এখানে রমেশবাবুর চিঠির সেই কথাই উল্লেখ করেছেন।

৪। ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালে উত্তরে শরৎচন্দ্র রমেশবাবুকে ইংরাজীতে এই চিঠিখানি লেখেন।

24. Aswini Dutt, Road.
Calcutta.

Vice Chancellor Dr. R.C. Majumdar Ph.D
Dacca.

ভাই দুর্গের, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবে। ক্ষেত্রী ঠাকুরানীকে নমস্কার দিবে ও চারুর সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবে।

শ্রীবিজিতাদি

এদিকে আমার জ্বর ও সারিলনা। ডাক্তারের দল কোন নির্ণয়ে- অক্ষম।

নানান ছাঁদের ক্যাপ্সুলে শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
বুদ্ধির শেষে আদি হলে বড়, কবলে যখন আছি জর-জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।

ভাবছি, দুই তিন দিনেই স্থান ত্যাগের বাসনা। নিজের বং সমুদ্রে। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সাধ্যালোর নিজ মহের ১০০° জ্বর, তুমি আর একটু খানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরক্ত কান্তটুকু চড়ুদাও দেখে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি — ২২ পৌষ ১৩৪৩॥

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়.

24. Aswini Dutt Road
Kalighat, Calcutta.
6.7.36.

Dear Sir,

With ref to your letter on behalf of the Dacca University Students Union, I am glad to inform you that I have no objection to accept the address which your Union so kindly offers to present me when I go to Dacca during the University Convocation.

I intend to stay there for 3-4 days. We will fix the date when we meet.

Yours sincerely
Sarat Chandra Chatterji

আন্দামান

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

দিন ছিল যখন আন্দামানের নামে মানুষের গাড় হ'য়ে যেত হিম—জমাট বাঁধতো রক্তের স্রোত। আবার একদিন আমার প্রথম যৌবনে খুনের দায়ে অভিযুক্ত মক্কেলকে যখন জজ সাহেব বল্লেন—"তোমার অপরাধ অতি বীভৎস্য। তোমার হওয়া উচিত ছিল প্রাণদণ্ড। তোমার তরুণ বয়স বিচার ক'রে তোমায় যাবজ্জীবন কারাগারের আজ্ঞা দিলাম।" সেদিন আনন্দে মন বল্লে—পোর্টব্লেয়ার ভূস্বর্গ। বড় বড় দেশ-হিতৈষীরা যেতেন সেথায়, আর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—নির্বাসিতের আত্মকথা—ওদেশকে করলে স্মরণীয়। শেষ যখন সংবাদ এলো জাপানী অত্যাচার প্রশমনের জন্য স্বয়ং নেতাজী আন্দামানে উপস্থিত হ'য়েছেন, বোমার ভয়ে ভীত কলিকাতাবাসীর আশা-চঞ্চল দৃষ্টি পড়ল আন্দামানে।

মহারাজা জাহাজ

বাল্যকালে শুনতাম দেশটার নাম পুলিপোলাও্। দুশো বারটি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান নিকোবর। তার মধ্যে একটির ঐ রকম নাম। কিন্তু সেটি পোর্টব্লেয়ার হ'তে বহু দূর দক্ষিণে।

আন্দামানের নাম হ'ল কোথা হতে? ম্যানে আছে ইংরাজির আমেজ। প্রত্নতত্ব নানা কথা বলে। যথা, শিবাস্তোবল—শিবের আস্তাবল, ওখানে মহাদেবের বলীবর্দ থাক্‌তো। হয়তো এটা রসিকতা। কিন্তু আন্দামান সম্বন্ধে এক বিশিষ্ট মত হ'চ্চে এই যে আজকের লঙ্কা রামায়ণের লঙ্কা নয়। আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জ ছিল রাবণ রাজার রাজ্য। হনুমন্ত হতে নাম হয়েছে—আন্দামান। এ গভীর গবেষণা-মূলক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কোন মতামত দেবার বিদ্যা বা বুদ্ধি নাই এবং এ বয়সে সিংহলকে লঙ্কা না ভেবে কোনো ভিন্ন দ্বীপকে তার স্থলাভিষিক্ত করবারও বাসনা নাই। সুতরাং সিংহল লঙ্কা, আন্দামান—আন্দামান—এই আমার দীন অভিমত।

এই দ্বীপগুলি প্রকৃতির লীলাভূমি। ওদের পূর্বদিকে শ্যাম ও মলয়ের সন্নিকটে পারফোরেসন দ্বীপ প্রভৃতি দেখে একদিন প্রাণে কবিতা স্ফুলিঙ্গের চেতনা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে স্ফুলিঙ্গ হ'ল গমগমে আগুন—আন্দামান নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জের অতুলনীয় শোভা। এমন সবুজের প্রসার তৃপ্ত প্রাণে সামুদ্রিক পরিবেশে কোথাও দেখা যায় না। প্রভাতে যখন নীল-সাগরের মাঝে বনানী-আবৃত দ্বীপ-শৈল দেখলাম—একের পর এক, আনন্দে প্রাণ হল উৎফুল্ল। তাদের নাম বিলাতী—লিট্‌ল সিষ্টারস—দুটি এক রকমের ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন তোরণ। জন্ম-ভূমি কলিকাতার প্রতি অনাস্থা-রূপ পাপ কলুষিত করলে প্রাণকে। সাগরের ঊর্মির আঘাতে জাহাজের দোলা হ'ল সুখের দোদুল-দোলা।

প্রতিমা—আন্দামান

দ্বীপে দ্বীপে ঘিরে সাগরকে বেঁধে পোর্টব্লেয়ারের পোতাশ্রয়কে করছে গোলদিঘির মত শান্ত। ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে জাহাজ যখন দাঁড়ালো জেঠিতে—আবার পেলাম প্রাণের সাড়া, লোকের কোলাহল, গাড়ির শব্দ। কবিতার রাজ্য ছেড়ে এলাম বাস্তব জগতে। কিন্তু আশে পাশে উপরে নীচে মধুরের সঙ্কেত লুপ্ত হল না। মানুষের হাসি-মুখ সে পরিবেশে সত্যই লাগলো মিষ্ট। কারণ জাহাজের যাত্রীদের মাঝে ছিল আত্মীয়-বন্ধু তাঁদের—যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন জেঠির উপর। হাত নড়লো, অভ্যর্থনায় শব্দ-মুখর হল সাগরবেলা। নারিকেল বৃক্ষে ডাকছিল পাখি। আর জাহাজের ধারে স্বচ্ছ সুনীল জলের মাঝে সাঁতার দিচ্ছিল অজস্র মাছ। উড়ুক্কু মাছের পালা শেষ হয়েছিল। মোটরের প্যাঁক প্যাঁকও এ পরিবেশে লজ্জায় হতেছিল ক্ষীণ।

ছেলেদের দৌড়

যখন অর্ণব-পোতে পোতাশ্রয়ে লাগল কাছির ফাঁসি, উঠে এলেন জাহাজে স্থানীয় বিশিষ্টেরা সাথে তাঁদের স্ব স্ব ঘরণী। হ্যালো, আলো, করমর্দন চল্‌লো। কিন্তু আমি তখন ভাবছি—বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা। এমন অবস্থায় পড়লে মানুষ ভুলে যায় শান্তির কবিতা—দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। জাহাজে সহ-যাত্রী ছিলেন নূতন বন্ধু উইম্‌কো দীপশলাকা কারখানার প্রধান, সুয়েডেনের লোক মিঃ প্যাটারস্থান। তিনি তাঁর বাঙলায় আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই চিফ্‌ কমিশনার শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয় বল্লেন—আপনার থাকবার স্থান হয়েছে সরকারী অতিথিশালায়। প্রাণটা কেঁপে উঠলো। শেষে বুঝলাম বারীন্দ্র উপেন্দ্র উল্লাসকর বা নারায়ণ রায় যে অতিথিশালায় ছিলেন এ গেষ্ট হাউস সেটি হতে ভিন্ন। ধড়ে প্রাণ এলো। আবার সমুদ্রের শীতল বাতাস লাগলো গায়ে। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল শালিখের গান—রী রী কট্‌ কট্‌ কোঁ কোঁ, কোকিও, কোকিও।

আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে দেশে হোটেল নাই। পান্থশালা নাই, যার কেহ নাই তুমি আছ তার—এ গানের তুমি মানে সরকার। কেন তা বলছি।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ও দ্বীপ-পুঞ্জের যোগাযোগের বাহন মাত্র একখানি তিন হাজার টনের জাহাজ—মহারাজা। এ জাহাজে ভ্রমণ করতে হ'লে টিকিটের অনুমতি নিতে হয় পোর্টব্লেয়ারে চীফ কমিশনারের কাছে। এ তথ্য সংগ্রহ করলাম কলিকাতায় টার্ণার মরিসনের দপ্তরে। তার ক'রে স্থান ঠিক করেছিলাম জাহাজে। এ জাহাজ সরকারের ইজারায়। সুতরাং যদি সরকারী যাত্রী থাকে জাহাজ জুড়ে, বে-সরকারীর পক্ষে সম্ভবপর নয় জাহাজে উঠে গুণ গুণ স্বরে গান গাওয়া—আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। আমি বার দুই তার করে, তারযোগে টাকা পাঠিয়ে একটি স্থান সংগ্রহ করেছিলাম পরিশেষে। বে-সরকারী লোক—আমি আর উইমকোর সাহেব। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি ও-দেশের কারখানার কর্তা, তাকে আমার মত বে-পরোয়া বে-সরকারী বলা হবে বে-রসিকতা।

স্থানও ঐ একটি অতিথি-শালা বাহিরের লোকের বসবাসের। ছটি কামরা মাঝে সজ্জিত প্রকাণ্ড হ'ল। যদি ছয়টি সরকারী লোক সে সময় এ বাড়ি দখল করতেন তা হ'লে আমার কেহ নাই শঙ্করী—হেথার ব্যথাও শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ের মৈত্রী বা করুণা দূর করতে সমর্থ হ'ত না।

কবিতার ভাবটার অবদমনের পর, ওকালতির কু-ভাব ঠিক করলে যে গবর্ণমেণ্টের হাতে যাত্রী চলাচলের নিয়ন্তির মূলে আছে কু-যুক্তি। এ শান্তিময় স্থানে যাতে হুজুক-প্রিয়রা এসে অশান্তির সৃষ্টি করতে না পারে, জাহাজ চারটারের মূলে কিয়ৎ পরিমাণে আছে সেই বুদ্ধি। বাহিরের লোক জাহাজ চালাবার পারিশ্রমিক পাবে না—পান্থ-নিবাস প্রতিষ্ঠা হবে না লাভের ব্যবসা। ডাক যায় এই একমাত্র জাহাজে। সুতরাং অন্ততঃ পনেরো দিনের বাসী খবর

মানুষের মনকে টাটকা রাখতে পারে না—যতই কাব্য-গাথা হাওয়ার সঙ্গে উড়ে বেড়াক এ-মধুর দেশে।

আমি এ দেশের সমাচার দিব পরে। আজ অধিবাসীর আনন্দ উৎসবের কথা বলি। অধিবাসীর মধ্যে পদস্থ সবাই কর্মচারী। দোকান অতি অল্প আছে, জনকতক ক্ষুদ্র দোকানী আছে মোটর-চালক আছে নাগরিক। আর লোকে আসবেই বা কেন? মাত্র একটি স্কুল আছে। সেটি ছিল বাঙলা দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ বৎসর দিল্লী দপ্তর থেকে তাকে জুড়ে দিয়েছেন আজমীর-মারবারার সঙ্গে। এই হ'ল রসবোধ। এই রকম উদ্‌ঘুটে বহু বিধানের তালিকা পেলাম।

বলছিলাম পূজার দিনের আমোদের কথা। পোর্ট-ব্লেয়ারে হিন্দুরা, অবশ্য বাঙ্গালীদের অধিনায়কতায় সার্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। দুর্গা-মূর্তি বসেছিলেন সহকারী হার্বার মাষ্টার ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমলয় সাণ্ডেল মহাশয়ের আবাস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। মার মূর্তি গড়েছিলেন তিনি। মনোরম মূর্তি। চীফ কমিশনরের পত্নী শ্রীমতী মৈত্র রঙ্‌ দিয়েছিলেন মূর্তিতে। শ্রীমতী ব্যানার্জি—চীফ কন্‌সারভেটার অফ ফরেষ্টের ঘরণী—সাজিয়েছিলেন মায়ের মূর্তি। এক ব্রাহ্মণ কর্মচারী পূজা করলেন অতি নিষ্ঠভাবে। যুবকেরা বাজনা বাজালেন, দুটি অভিনয় করলেন এবং প্রতিদিন আরতির পর দুজন নৃত্য করে মনোরঞ্জন করলেন সকলের। শ্রীমতী সাণ্ডেলের সৌজন্য ছোটো বড় সকলকে পরিতুষ্ট করলে।

প্রদর্শনী

বাঙালী বাস্তুহারার উপনিবেশ এই দ্বীপের অন্য অংশে রাণঘাটে। একদল বাস্তুহারা পোর্টব্লেয়ারের দুর্গা-মণ্ডপে নদের নিমাই অভিনয় করলেন। হিন্দী ভজন গাইলেন হিন্দী ভাষা-ভাষী। বড় মিষ্ট সঙ্গীত। ছেলেদের দৌড় ও লম্ফ প্রতিযোগিতা হ'ল।

এমনি দুর্গোৎসব হয়েছিল—রাণঘাটে। সেথায় ঔপনিবেশিক কদিন মহানন্দে বাঙ্গালার জাতীয় মহোৎসবে প্রবাসের জ্বালা ভুলেছিলেন।

পোর্টব্লেয়ারে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল—স্থানীয় শিল্পের। সেথায় সকল শ্রেণীর লোক আনন্দ-মিলনের সুখ উপভোগ করেছিল। ছোট দেশ। বহু ভাষা বলে লোকে। ভারতের ও বর্মার বিভিন্ন স্থান হ'তে কর্ম করতে এসেছে মানুষ। সকলকে একত্র বসবাস করতে হয়। কাজেই প্রথমে লক্ষ্য হয় হৃদ্যতা। সকলে মিলে প্রবাসবাসকে সুখের নিবাস করতে কৃত-সঙ্কল্প না হলে জীবন হয় অতিষ্ঠ। জীবনের প্রধান উপাদান অভাব। মনের বিশিষ্ট বিকাশ অভিযোগ। সুতরাং অভিযোগের সাহচর্য অবশ্য প্রয়োজন, প্রতিদিনের অভাব অপসরণের আয়োজনে। কিন্তু সে আয়োজন হওয়া চাই শুভ ও সুষ্ঠু। মাত্র পরের ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা নির্মাণ এবং সেগুলির আলোচনায় অরণ্যে রোদন করা সুষ্ঠু উপায় নয় অবস্থা পরিবর্তনের। তার ফলও হয় না শুভ। আত্মদোষানুদর্শন—কর্ম পথের এক বিশেষ পাথেয়। সুতরাং সাধারণের সুখ-শান্তির সাথে নিজের শান্তি জড়ানো আছে—এ ভাব অভাব নিরাকরণের উপায়।

প্রদর্শনীর তোরণ

পোর্টব্লেয়ারের জীবন স্রোতে বাধার অভাব নাই। কিন্তু সকলে মিলে পরস্পরের সাহচর্য জীবন-নদীর প্রধান স্রোতের উপকরণ করেছে প্রবাসী, এ উপলব্ধিতে ছোটো বড়ো সবার প্রতি শ্রদ্ধা হ'ল। বলছি না সেথায় মানুষ মানুষ নয়। অর্থাৎ ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থ-পরতা, কুটিলতা বা দম্ভ সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ চির-হরিত মলয়-হাওয়ার লীলাভূমি দ্বীপ-পুঞ্জে বসবাস করে।.. তাদের দমনে সুখ—এ অনুভূতি যার তার জীবনে বিরাজ করে শান্তি। ভূ-পর্য্যটকের তড়িৎ-দৃষ্টিতে যা দেখলাম, তার ফলে মনে হ'ল এরা বাহিরের আঘাতের সঙ্গে জীবনের একটা রফা-রফিয়ত করতে প্রবৃত্ত। হয়তো কলিকাতার কুরুক্ষেত্র ছেড়ে গিয়েছিলাম তাই আন্দামানের আনন্দ-হিল্লোল আমার চিত্তে শান্ত ছবি এঁকেছিল। আমি সবার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে কিন্তু এ কথাটা স্পষ্ট অনুভব করলাম যে হেথায় জীবন শৃঙ্খলিত তাই শান্ত।

মেলা সমুদ্রের ধারে এক বিশাল জমিতে হয়েছিল। আলোক-মালা বিভূষিত ভূ-খণ্ড। বহু দ্রব্যের প্রদর্শনী। ও-দেশের কাঠের নানা নিদর্শন প্রদর্শিত হ'য়েছিল। কাঠ কোঁদাই করে গৃহস্থালীর দ্রব্য নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সে সব ভারতের বিভিন্ন স্থলে চালান দিতে না পারলে লাভের ব্যবসা হবে কেমন করে। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পি সি রায় কোম্পানী উত্তর আন্দামান ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দিচ্ছেন। দু'খানি জাহাজও তাঁরা ভাড়া করেছেন কাঠ চালান দিবার জন্য। ব্যাপারটা সুখের। বনানী বিভাগের কর্তা শ্রীব্যানার্জী বিধিমতে চেষ্টা করছেন বনানী রক্ষা ও কাষ্ঠ বিক্রয়ের। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে যদি এ-দেশের লোক সেথায় কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠা করে উভয় পক্ষের সুবিধা। বাঙলায় কাঠের চাহিদা বাড়াতে হবে। অবশ্য এ সব পরোপদেশে পাণ্ডিত্য। কিন্তু সত্যই কি ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন দেবার মত মনন-শক্তি হতে আমরা বঞ্চিত ?

ভাঙ্গনের বেলা

শ্রীনীরেন্দ্র দত্ত

কৃষাণী মাগো ! অনেক দিন তো বসিয়ে তোমার কোলে
শোনালে অনেক নতুন ধানের গান,
শোনালে অনেক পাখীর নীড়ের আনন্দ-কল্লোল,
শোনালে অনেক নবান্নের উৎসবের তান।
শোনালে কত বালিকা-বধূর সহাস্য-কাহিনী,
তুচ্ছ কত দুঃখ সুখের স্মৃতি।
রূপকথা আর উপকথায় গাথলে কত মালা,
জাগালে কত ফসল-ফলার গীতি।

সবুজে ঢাকা গাছের ছায়া, নিতল দিঘী-জল,
শাপলা আর পদ্মফুলের গোপন ঐক্যতান,
দোয়েল-শ্যামার জয়ধ্বনি তুলসী-মঞ্চ ঘিরে,—
তারই স্নেহে ভরলে উদাস প্রাণ।
পৌষালী আর চৈতালীর গাথা,
বৈশাখীর গল্প কত শোনালে মুখে মুখে।

সকল সুর—সকল কথা মিলে
বিধুর হত অনেক আকাশ অনেক দুখে সুখে।
কৃষাণী মাগো ! সেদিনখানি হারায়ে গেল কোথা !
এই মাটিতে এই জীবনে তুমি তো আর নেই।
নেই তো তোমার ধানের গান, চরকা ঘোরার সুর,
এমন স্নেহ মিলায়ে গেল এমন সহজেই !

আর্তপ্রাণ

সন্তোষ দাস

এ আকাশ, এই শ্যামভূমি
দিতে পার তুমি ;
জানি, শুধু একবার
মুক্তাশুভ্র প্রসন্ন হাসিতে
পারো যদি এখনি আসিতে।
রক্তিম অবাক মুঠি ভরি
দিতে পারো ধরি,
মোর হাতে—
আছে যাহা ধরণীর
শ্যামায়িত সজল ছায়াতে।
এখন আকাশ
পাঠায় আমার প্রাণে
ধূলিম্লান অন্তিম নিশ্বাস ;
দিন ভোর শুধু
লোলুপ মরুর ধূলি ধূধূ,
এখানে ওখানে
কাঁটাগাছ তীব্র ব্যথা হানে।
এইক্ষণে, যদি তুমি আসো
প্রশ্রয় প্রোজ্জ্বল চোখে হাসো
আর কিছু নয়
কেটে যাবে আর্তপ্রাণ
যন্ত্রণার বিষণ্ণ সময়।

পাষাণের বুকে

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ফটো : শ্যামল বসু　　জলকে চল্　　ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়াকস্

২৪

কবি তন্ময় হইয়া শিখরের গল্প লিখিতেছিলেন।

"সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল। যে আলেয়াকে আমি স্বর্গের দেবী ভেবেছিলাম, যাকে কল্পনা-কাননের অপ্সরীরূপে চিত্রিত করেছিলাম মানসপটে, সেই আলেয়াই আমার সমস্ত স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিলে সেদিন। একটা তাজমহল যেন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল, রূপান্তরিত হয়ে গেল ইঁট-চুণ-সুরকির স্তূপে। ঘটনাটা ঘটল যখন, তখন আমি বিচলিত হইনি, এমন কি বিস্মিতও হইনি। আমার মনের মধ্যে যে নির্ব্বিকার দ্রষ্টা আছেন তিনিই বোধহয় দেখছিলেন তাকে তখন, নিতান্ত প্রত্যাশিত ঘটনারূপেই দেখছিলেন। মনের মধ্যে এই দ্রষ্টার অস্তিত্ব সব সময়ে টের পাই না আমরা, জীবনে বৃহৎ বিপর্য্যয় যখন আসে তখনই আত্মপ্রকাশ করেন তিনি, সত্তার যে অংশটা সুখদুঃখে বিচলিত হয় সেটাকে আড়াল করে' ফেলেন কিছুক্ষণের জন্য। সার্জনরা বড় বড় অপারেশন করবার সময় ক্লোরোফর্ম দেয় যেমন, অনেকটা তেমনি। ক্লোরোফর্ম কিন্তু চৈতন্যকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন করে' থাকে না, নির্ব্বিকারও বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারি না; পরে আমি বিচলিতও হয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম, আলেয়ার সান্নিধ্য লাভ করবার একটা পথ পেয়ে পুলকিতও কম হই নি। কিন্তু স্বর্গের দেবী মানবীতে রূপান্তরিত হওয়াতে এখন কেমন যেন ক্ষতিগ্রস্ত বঞ্চিত বোধ করছি; মনে হচ্ছে আমি নিজেই যেন কোন স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছি, নাগালের বাইরে দূরবীণের ভিতর দিয়ে যে আলেয়াকে দেখতাম সে আলেয়া যেন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, আর তাকে পাব না। শিখরের ডায়েরিতে শিখরের জীবনের যে মর্ম্মান্তিক পরিণতি দেখছি আমার জীবনেও তেমনি কিছু ঘটবে না কি! আশা এবং আশঙ্কার দোলায় দুলছে মনটা। লোভ হচ্ছে, ভয়ও হচ্ছে। শিখর অরন্ধনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে যেমন কাছে পেয়ে গিয়েছিল, আলেয়াকে আমিও তেমনি পেয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আলেয়া যে আমার কপাটে করাঘাত করে' আমার ঘরে এসে হাজির হবে একথা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু হাজির হল যখন—তখন আমি বিস্মিত হই নি, আমার সপ্রতিভতা আলেয়াকে বিস্মিত করেছিল কি না কে জানে। কপাট খুলেই যখন দেখলাম আলেয়া দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সাজসজ্জা করে' তখন খুব সপ্রতিভভাবেই আমি বলেছিলাম—"ও, তুমি। তারপর, কি খবর—"

এমনভাবে বললাম যেন আমার ঘরে তার আগমন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার একটা। আলেয়া হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

"আমার ভয় হচ্ছিল আপনি হয়তো আমাকে চিনতেই পারবেন না।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে মৃদু হেসে বললাম, "না, তোমাকে ভুলিনি। কোনও দরকারে এসেছ না কি? না, এমনি দেখা করতে। বস—"

আমার ইজিচেয়ারটায় বসল আলেয়া, যে ইজিচেয়ারে বসে' জানলার ফাঁক দিয়ে দূরবীণ-সহযোগে রোজ আমি তাকে দেখতাম, সেই ইজিচেয়ারটাতেই বসল সে। মনে হল অসম্ভব সম্ভব হল, দূর নিকটে এল, অসীমা ধরা দিলে বুঝি সীমার মধ্যে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটা ভাঙল।

আলেয়া বললে—"আপনি যে এত কাছে আছেন তা জানতাম না। জানলে আগেই আসতাম আপনার কাছে। কাল হঠাৎ দেখতে পেলাম আপনি ফুটপাথ থেকে এই বাড়িটাতে ঢুকছেন। খবর নিয়ে জানলাম এই বোর্ডিংএ-ই আছেন আপনি অনেক দিন থেকে"

"দরকার আছে কোন—"

"আছে বই কি। প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করছি কিছু মনে করবেন না—আপনি কি লাইফ ইনশিওরেন্স করিয়েছেন ?"

"না"

"তাহলে আমার কম্পানিতে কিছু করুন। অন্তত দশ-হাজার—"

এইবার আমি একটু অবাক হলাম।

"তোমার কম্পানিতে, মানে ?"

"আমি আজকাল ইনশিওরেন্সের দালালী করছি যে"

বলেই চক্ষু আনত করে' শাড়ির একটা খুঁট পাকাতে লাগল, তারপর আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি হাসলে একটি।

"নিরুপমবাবু কোথা ?"

"তিনি এলাহাবাদেই আছেন"

আলেয়ার মুখভাব কঠিন হয়ে গেল সহসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল। আলেয়া তাড়াতাড়ি জানলার কাছে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—"আসছি এখুনি। এক মিনিট—" তারপর আমার দিকে ফিরে বললে "ফর্ম নিয়ে আসব ওবেলা? শুধু নিজে ইনশিওর করলেই হবে না, আমাকে সাহায্যও করতে হবে একটু! আপনার তো অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা—"

কণ্ঠস্বরে আবদারের সুর বাজল একটু। চোখের দৃষ্টিতে চকমক করে' উঠল বিদ্যুৎ—যদিও মিনতির বিদ্যুৎ, নিঃশব্দে বজ্রপাতও হল যেন একটা। বললাম, "আচ্ছা—"

"চলি তাহলে—"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম।

দেখলাম বোর্ডিংয়ের সামনে বেশ দামী বড় মোটর দাঁড়িয়ে আছে একখানা। স্টিয়ারিং ধরে' বসে' আছেন তাতে বলিষ্ঠ একটি ভদ্রলোক। মোটর চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে'। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল না। আশ্চর্য্য!

এ ঘটনার পর দূরবীণের প্রয়োজনটা আরও বেড়ে গেল। কাজ থেকে ফিরে এসে সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি আলেয়াকে দেখবার জন্য নয়; তার সঙ্গীটিকে দেখবার জন্যে। এই সময় শিখর সেনকেও লক্ষ্য করেছিলাম তার অজ্ঞাতসারে। লক্ষ্য করে' যদি চুপ করে' থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না বোধহয়। কিন্তু আমি চুপ করে' থাকতে পারি নি। যা দেখেছিলাম তা শিখরকেই বলে-ছিলাম একদিন রহস্যভরে। সে রহস্যের এ পরিণাম যে হবে তা কে জানত!

শিখর সেনের ডায়েরি থেকে, এবার উদ্ধৃত করছি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে তাহলে।

"নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনার সম্বন্ধে যে সব ভয়ানক খবর সংগ্রহ করেছি, যে সবের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আর কারো সম্বন্ধে যদি সে সব খবর পেতাম তাহলে সে এতক্ষণ জেলের বাইরে থাকত না, নিশ্চয়ই থাকত না। অবন্ধনা কিন্তু আছে। পুলিস অফিসার হিসাবে নির্মম হয়ে আমি এতদিন কর্ত্তব্য পালন করে' এসেছি, আইনের সীমাকে এতটুকু লঙ্ঘন করিনি, ভিক্টর হুগো'র অমর চরিত্র জ্যাভার্টই এতদিন আমার আদর্শ ছিল, কিন্তু এখন আমি সে আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছি। অবন্ধনাকে আইন-সিংহের কবলে নিক্ষেপ করতে ইতস্তত করছি। গীতা পড়েছি। একবার নয়, অনেকবার। শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "নির্ব্বিকার অবিচলিত থেকে তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে' যাও, তুমি ভাবছ আত্মীয়স্বজনকে বধ করব কি করে'? ওটা তোমার অহংকার। তুমি কাউকে বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। এই দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা আগে থাকতেই মরে' আছেন...।" এসব শ্লোক কণ্ঠস্থ আছে আমার। কিন্তু কার্য্যকালে কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অবন্ধনা পাপীয়সী, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার ফাঁসি হবে। আমার বিবেকের একটা অংশ বলছে তার ফাঁসি হওয়াই উচিত, কিন্তু আর একটা অংশ বলছে যে সমাজ তাকে পাপীয়সী করে তুলেছে সেই সমাজেরই ফাঁসি হওয়া উচিত ওর কোন দোষ নেই, সমাজের বিধি-ব্যবস্থার দোষেই ওই অম্লান কুসুমের গায়ে ধুলো-কাদা লেগেছে। সে ধুলো-কাদা পরিষ্কার করে' দিলেই আবার ও অম্লান হবে। তাই করব। এই দ্বিধাবিভক্ত বিবেক নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে

পড়েছি। কি করি? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলাম তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করব, যদিও বিবেকের জ্যাভার্ট-ভক্ত অংশটি বারবার বলতে লাগল, অন্যায় করছ।

…বোর্ডিংয়ের বাৎসরিক সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। চূণকাম হয়ে গেছে, রং লাগানো হচ্ছে দরজা-জানলায়। এসব না করলেও নয়, অথচ কি বিরক্তিকর।

অবন্ধনার কাছে সেদিন সন্ধ্যার পর যখন গেলাম, দেখলাম সে বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কইছে।

"আমার ঘরে কাল হাত দেবেন বলছেন? বেশ, আমি জিনিসপত্তর সরিয়ে রাখব। আর একটা কাজও কিন্তু করতে হবে—"

"কি বলুন—"

"দেখছেন না, ঘরে ঢোকবার দরজাটার সামনে কি হয়ে আছে! মেজেটা ফেটে সুরকি বেরিয়ে পড়েছে একেবারে। ওটা ঠিক করিয়ে দিন—"

"দেব। ভাল করে' সিমেণ্ট করিয়ে দেব"

ম্যানেজার আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চলে গেলেন। অবন্ধার সম্বন্ধে ম্যানেজারের হৃদয়েও একটু 'কোমল কোণ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'সফ্‌ট্ কর্ণার', আছে বলে সন্দেহ হল। ম্যানেজার চলে যাবার পর অবন্ধনার চেহারা বদলে গেল যেন। নূতন লোক হয়ে গেল সে। হেসে বললে, "তোমার উপর রাগ করেছি"

"কেন"

"কাল পরশু দু'দিন আসনি কেন"

"কাজে ব্যস্ত ছিলাম—"

"রাত্রেও ফেরনি?"

"ফিরেছিলাম অনেক রাত্রে। তখন আর তোমার ঘরে আসাটা উচিত মনে হল না। ঘুমিয়েও পড়েছিলে হয়তো—"

আমার দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে অবন্ধনা বললে—"তোমার উচিত-অনুচিত বোধটা এখনও বেশ টনটনে আছে দেখছি। আশ্চর্য্য মানুষ তুমি—"

সিগারেট কেস থেকে বার করে' একটি সিগারেট বেশ নিপুণভাবে ধরালে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, হেসে বললে—"আমাকে খুব ঘেন্না কর, নয়?"

তার চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল একটা। মনে হল সত্য উত্তরটা শোনবার জন্য সে কৌতুহলী, অথচ তার সঙ্গে স্পর্দ্ধার ভাবও রয়েছে একটা—"তুমি ঘেন্না করলে বয়েই গেল আমার"—এই গোছের একটা ভাব।

বললাম, "ঘেন্না করলে তোমার কাছে আসতাম না"

"আস ভদ্রতার খাতিরে। ছেলে-বেলার কথা মনে করে'। তাছাড়া আমি সত্যিই তো তোমার শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্তও নই"

তারপর হঠাৎ হেসে বললে, "বুঝি গো বুঝি, সব বুঝতে পারি আমি। আমাকে যতটা বোকা তুমি মনে কর, ততটা বোকা আমি নই"

তার হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম একটু। মনের অবচেতনলোকে হয়তো ভাবছিলাম—ওই কালোবাজারীটা একে ইন্ধন করে' কত লোকের কত কামনার আগুনই না জানি জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে!

বললাম, "বোকা তুমি মোটেই নও, বরং একটু বেশী চালাক, আর সেই জন্যেই বোধহয় মাত্রা ঠিক রাখতে পারছ না। অতি-বুদ্ধিটা বিপজ্জনক"

"মানে—?"

তার মুখের হাসি নিবে গেল হঠাৎ।

খানিকক্ষণ আমাদের দু'জনের কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না। আমার মনে হল এইবার কথাটা পাড়াই ভাল। বললাম—"তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনছি"

"কি শুনছ—"

বললাম সব। শুনে আবার সে চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। ক্রমশ তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আগুন। কিন্তু সে কোনও উত্তর দিলে না। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শেলফ্ থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে তার বিছানার শিয়রের দিকে যে টেবিলটা ছিল তারই উপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বইগুলোর পিছন দিকে সায়ানাইডের যে শিশিটা লুকোনো ছিল সেটাও বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে' একটা বইয়ের আড়ালে রেখে দিলে সেটা। তারপর চাকরটা ঢুকল একগ্লাস জল হাতে করে'।

"কোথা রাখব মা এটা—ওখানে বই রাখলেন যে"

"এরই একপাশে রেখে দে"

চাকরটা জলের গ্লাস টেবিলে রেখে একটি বই দিয়ে জল ঢাকা দিয়ে চলে গেল। অবন্ধনা রোজ রাত্রে উঠে জল খায়। টেবিলের উপর প্রত্যহ একগ্লাস জল ঢাকা-দেওয়া থাকে। আমি হাত-ঘড়িটা দেখলাম। প্রায় দশটা বাজে। অবন্ধনার দিকে চাইলাম, দেখলাম সে একটা বই খুলে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি বইগুলো শেল্‌ফ্‌ থেকে নামিয়েছে। এগুলা না নামালেও চলত, নিজের নামাবারও দরকার ছিলনা চাকর যখন রয়েছে।

বললাম—"আমার কথার কোন উত্তর দিলে না তো। তোমার সম্বন্ধে যা যা শুনেছি, তা কি সত্যি ?"

বইয়ের পাতা ওলটালে খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললে, "সত্যি"

"সত্যি হলে তো ভয়ানক কথা ! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। এ রকম করার মানে ?"

"না করে' উপায় নেই"

"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর পরিণতি এর তা জান ?"

"জানি"

"সব জেনেও এরকম করা কি উচিত ?"

অবন্ধনার মুখে একটা হাসি ফুটল। অদ্ভুত হাসি।

"একটা বলকে ঢালুর মুখে গড়িয়ে দিয়ে তারপর সেটাকে থামতে বললে যে রকম শোনায়, তোমার উপদেশটাও সেই রকম শোনাচ্ছে !"

উপমাটা ভাল লাগল।

বললাম, "বল হয়তো থামতে পারে না, কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে পারে। বলকে কেউ যদি থামিয়ে দেয় তাহলে বলও আর গড়াতে পারে না"

"আমাকে থামিয়ে দেবে এমন কেউ নেই, এক মৃত্যু ছাড়া"

বইটা মুড়ে রেখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বললাম, "আমি আছি। আমি তোমাকে থামিয়ে দিতে পারি, থামিয়ে দিতে চাই"

"কি করে'"

"বিয়ে করে'"

"বলেছি তো, তা আর হয় না !"

দুজনেই চুপ করে' রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর সে হেসে বললে, "আমার বিষয়ে এত সব শোনবার পরও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তোমার ?"

"হয় বই কি। আমার সোনার হাত-ঘড়িটা হঠাৎ সেদিন নালীতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে' আবার ব্যবহার করছি। এই দেখ, একটুও কাদা লেগে নেই আর"

"আমি হাত-ঘড়ি নই, মানুষ। আমাকে অত সহজে পরিষ্কার করা যাবে না"

"নিশ্চয় যাবে। হাত-ঘড়িকে জল দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তোমাকে পরিষ্কার করব ভালবাসা দিয়ে"

"আমাকে এখনও ভালবাস তুমি ? আশ্চর্য্য !"

"রাজি হও তুমি অবু। চল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করে' ফেলি—"

"না, সে হয় না"

"কেন হয় না"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল সে আমার দিকে।

"আমি যতই খারাপ হই, আমি হিন্দুর মেয়ে, উচ্ছিষ্ট জিনিস দিয়ে দেবতার ভোগ সাজাতে পারি না"

"কি যে পাগলের মতো বকছ তুমি। মানুষ দেবতাও হ'তে পারে না, উচ্ছিষ্টও হ'তে পারে না"

"পারে—"

"কি করে' বুঝলে সেটা"

"স্বচক্ষে দেখছি"

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পেয়ে দুজনেই ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম ম্যানেজার এসেছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

"মিস্ মুখার্জি, কাল রাজমিস্ত্রি লাগাতে পারব না। কাল তাদের কি পরব আছে, আসতে রাজি হচ্ছে না। পরশু দিন আসবে। কাল চুণকামটা হয়ে যাক"

"বেশ"

ম্যানেজার চলে' গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম, সুরটা কেমন যেন কেটে গেল।

"চলি তবে আজ। পাগলামি কোরো না, যা বলছি শোন সেটা। তোমার ভালর জন্তেই বলছি—"

"আমার ভাল করবার ক্ষমতা তোমারই ছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সে ক্ষমতা তুমি ব্যবহার কর নি। গোড়া কেটে গেছে, এখন আগায় জল ঢেলে কোন লাভ নেই। যাও শোওগে যাও, অনেক রাত হল। আমাকে এখুনি একটা 'কলে' বেরুতে হবে হয়তো।"

"কি 'কল'—"

"একটা লেবার কেস"

কিছু না বলে' দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। বারান্দাতেই দেখা হল সেই কালোবাজারীটার সঙ্গে। হাতে ফুলের তোড়া, বগলে হুইস্কির বোতল। নিঃশব্দে নেমে গেলাম। একবার মনে হ'ল লোকটাকে আজই হাজতে পুরে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হয় নি, সুতরাং এ ইচ্ছাকে দমন করতে হল। হাজতে পুরেই বা লাভ কি? অবিলম্বে জামিনে খালাস পেয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াবে আবার, জজসাহেবেরা হয়তো রায় দেবেন লোকটা নির্দ্দোষ। আমার ঘাড়েই উলটো চাপ পড়বে শেষে!

···একটু পরেই লক্ষ্য করলাম লোকটার সঙ্গে অবন্ধনাও নেমে গেল, নেমে গিয়ে চড়ল সেই মোটরকারটায়। আমিও আবার তাদের অনুসরণ করলাম একটা ট্যাক্সিতে।

দেওয়ালের উপর যে দুইটি প্রজাপতি নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিল। প্রথমে একটি প্রজাপতির পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। সে কম্পন ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। মনে হইল কম্পনের ভাষায় সে যেন দ্বিতীয় প্রজাপতিটিকে কিছু বলিতেছে। কম্পনের ভাষায় দ্বিতীয় প্রজাপতিও উত্তর দিল, তাহারও পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কম্পনের ভাষাকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিতে করিলে নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়।

প্রথম প্রজাপতি বলিতেছিল, "পিতামহ, মনে হচ্ছে আপনার এই নবতম কাহিনী দুটিও আপনার প্রাচীনতম কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি হবে। মহেশ্বরকে মুখে আপনি যতই গাল দিন, মনে মনে তাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন—"

দ্বিতীয় প্রজাপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি করে' বুঝলে—"

"আপনার সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের তো তাঁর হাতেই সমর্পণ করছেন"

"করছি তো। করবও চিরকাল। মহেশ্বর আর আমি আলাদা না কি। কতকগুলো কুঁদুলে বামুন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করেছে তোমাদের মনে—"

"যাই বলুন, সব নায়ক-নায়িকাদের এমনভাবে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে ভাল লাগে না"

"কিন্তু ওইটেই তো খেলা। মৃত্যুতেই খেলার পরিণতি। পঞ্চভূতের কাছ থেকে মালমশলা ছিনিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি জীব দেহ-ধারণ করেছে, পঞ্চভূত সেই অপহৃত জিনিসগুলি পুনরধিকার করতে চাইছে—জীবরা তা ফিরে দিতে চাইছে না। যুদ্ধের খেলা জমেছে সুতরাং। পঞ্চভূত শেষ-পর্য্যন্ত জিতবেই, কারণ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, একটা জীব-দেহে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারে না, ওরা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবেই। জীবেদের ইচ্ছে অন্য রকম। তারা ওদের দেহ-পিঞ্জরে চিরকাল আটকে রাখতে চায়। কিন্তু তা কি পারে কখনও?"

"আপনার কৃতিত্ব তাহলে কোথায়—"

"এই একরঙা গল্পটাকে নানা রঙে রঞ্জিত করে' নানা রসে রসিয়ে ফুটিয়ে তোলা। রাবণের মৃত্যুবাণ তার নিজের হাতে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার বুদ্ধিতে এমন একটি পাক লাগিয়ে দিলাম যে সেই বাণটি সে একটি স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দিলে। তারপর সীতা হরণ করে' বসল। ফলে ছদ্মবেশে এল, মৃত্যুবাণটি মন্দোদরীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সরে' পড়ল, রাবণের মৃত্যু হল। হিরণ্যকশিপুকে মহর্ষি কশ্যপের ছেলে করে' সৃষ্টি করলুম। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বর দিলুম যে সে জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হবে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিনে বা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তবু তাকে মারতে হল। তাকে মারবার জন্য স্তম্ভ ভেদ করে' বার করতে হল নর-সিংহকে, সে তাকে জানুর উপরে রেখে দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে নখ দিয়ে চিরে ফেললে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। মারতে হবেই। জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে ছন্দ যোজনা করাই তো কবির কাজ। এই দ্বন্দ্বের অসংখ্য রূপ, অসংখ্য সম্ভাবনা—"

"এসব কথা আমিই তো বলেছিলাম আপনাকে একদিন"

"বলেছিলে না কি? তা হবে। তোমার কথা আমি চুরি করছি, আবার আমার কথা তুমি প্রকাশ করছ। এই চলছে চিরকাল। চলবেও, সূর্য্যের আলো পড়বে কুঁড়ির ওপর,ফুল ফুটবে, পড়বে চাঁদের উপর জ্যোৎস্না হাসবে, পড়বে মরুভূমির উপর মরীচিকা জাগবে। এই হচ্ছে—"

"চলুন, এই কবিতার ভাবে তন্ময় হয়ে ঘুরে আসি একটু—"

"চল—"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়াই রূপান্তরিত হইল খদ্যোতে। তাহার পর পেচক-দম্পতীরূপে তাহারা অন্ধকারকে মুখরিত করিয়া চলিল। তাহার পর সহসা মহাশূন্যে উড়িয়া গেল। একটু পরে দেখা গেল দুইটি উল্কা অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

ক্রমশঃ

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলেও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই দুইটি রাষ্ট্র এতকাল মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করিয়াছে। নূতন চীনের সহিত উভয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক পররাষ্ট্রীয় নীতিতে ইহাদের মূলগত ঐক্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ ; চীনের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশের দাবীও ইহারা সম্মিলিতভাবে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। আরব-এশিয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্যরূপে ইহারা উভয়ে অধিকাংশ সময়ে জাতি-সঙ্ঘে একযোগে ভোট দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতির এই মূলগত ঐক্যের প্রধান কারণ—বৃটেনের সহিত উভয়ের সমান ঘনিষ্ঠতা এবং ইহাদের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনে সেই ঘনিষ্ঠতার পরোক্ষ প্রভাব। তবে, গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। সে দ্বন্দ্বে বৃটিশের বিরোধী পক্ষ পাক-ভারতের এই নীতি সম্পর্কে উদাসীন থাকে নাই। বৃটিশ প্রভাবাধীন এই দুই রাষ্ট্রের তথাকথিত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি ওয়াশিংটনের কর্ত্তারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন, —পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইহাদের ভূমিকা পরিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের তৎপরতা চলিতেছিল গভীর সংগোপনে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত।

ভারত ও পাকিস্থান—

ভারতীয় উপ-মহাদেশের যে দুইটি রাষ্ট্র সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাকিস্থানের রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা অধিক। সেখানে যে দলটির হাতে শাসনক্ষমতা, তাহাতে অন্তর্বিরোধ প্রবল ও ব্যাপক ; কখনও উপসাম্প্রদায়িকতা, কখনও বা প্রাদেশিকতাকে আশ্রয় করিয়া উপদলীয় স্বার্থদ্বন্দ্ব প্রচণ্ড আকার ধারণ করিতেছে। উপরতলার এই আদর্শবিহীন স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতির ফলে ঘটিতেছে সামরিক ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক "ক্যূপ্", রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা। অযোগ্য হাতে শাসনক্ষমতা থাকায় জাতীয় অর্থনীতি বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। এই স্বার্থদ্বন্দ্বে ও অপদার্থতায় নিষ্পিষ্ট হইতেছে সাধারণ মানুষ ; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর অপসরণে ও স্বতন্ত্র ইসলামীয় রাষ্ট্র লাভে তাহাদের ইহলৌকিক অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উহা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় পরিণতির দিকে যাইতেছে। ইহাদের পক্ষ লইয়া প্রগতিশীল রাজনীতি পাকিস্থানে দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই ; উপরতলার প্রতিক্রিয়াশীল দল সে দিক হইতে এখনও অনেকটা নিরাপদ। পক্ষান্তরে, ভারতের অবস্থা বিশেষ উন্নত না হইলেও এই রাষ্ট্রের শাসনরজ্জু যে দলটির হাতে, তাহার আভ্যন্তরীণ সংহতি এখনও বিনষ্ট হয় নাই। সর্ব্বোপরি, এখানে রাজনৈতিক চেতনা ব্যাপক, প্রগতিশীল রাজনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী। ভারতবর্ষের অৰ্দ্ধশতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্য বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতেছে। এই কারণেই কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা হইলেও তাহার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির পশ্চাতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ ; কখনও কোনও ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইতেছে মনে হইলেই সে নীতির সমালোচনা হয়, পক্ষপাত-হীনতার জন্য উহা সমালোচিত হয় না।

ভারতীয় উপমহাদেশের এই দুইটি রাষ্ট্র সম্পর্কে "স্বাধীন জগতের" অছি আমেরিকার নীতিতে স্বভাবতঃ কিছু পার্থক্য আছে। ভারত সম্পর্কে সে অধিকতর সতর্ক, তাহার নীতি অধিকতর কৌশলী। ভারতের প্রবুদ্ধ জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং প্রাচ্যে ভারতের মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের সহিত সম্পাদিত চুক্তিগুলিতে আমেরিকা সোজাসুজি কোনও রাজনৈতিক সর্ত্ত রাখে নাই—তাহার নিঃস্বার্থপরতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছে। কোরিয়ায় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধির যোগদানের প্রস্তাবে আমেরিকা প্রবলভাবে আপত্তি

করিতেছে ; আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে ভারতের মর্য্যাদার কথা স্মরণ রাখিয়া জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাবিহীন মর্য্যাদাসর্ব্বস্ব সভাপতি-পদের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিকে সে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান সম্পর্কে এত সতর্ক হইবার প্রয়োজনীয়তা সে দেখে না ; সেখানে প্রগতিশীল জনমতের চাপ না থাকায় প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতৃবৃন্দ যে সহজেই তাহার বিশ্বব্যাপী সমর-প্রচেষ্টার সহযোগী হইতে পারেন, তাহা সে বোঝে। কাশ্মীর প্রসঙ্গ লইয়া এই নেতৃবৃন্দকে সে সন্তুষ্ট করিয়াছে ; ভারতের সঙ্গত অভিযোগ অনুসারে পাকিস্থানকে আক্রমণকারী ঘোষণা করিতে সে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের প্রতি আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব অস্পষ্ট ছিল না। বর্ত্তমানে কাশ্মীরের যে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পাকিস্থানের অধিকারভুক্ত, অন্ততঃ ততটুকু যাহাতে কিছুতেই তাহার হাতছাড়া না হয়, তাহার জন্য আমেরিকার আগ্রহ ব্যক্ত না হইলেও কখনও অবোধ্য ছিল না। ভারতের দৃঢ়তার জন্য জাতি-সঙ্ঘের বেনামীতে কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে আমেরিকার মনঃপূত সমাধান সম্ভব হয় নাই। তখন সেখ আবদুল্লাকে হাত করিয়া "স্বাধীন কাশ্মীরের" ধূয়ায় উস্কানি দেওয়া হইয়াছিল। সে চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় এখন পাকিস্থানকে সোজাসুজি আমেরিকার সমরপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

পাক-মার্কিণ আলোচনা—

গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়ুব খাঁ এবং দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী কর্ণেল ইস্‌কান্দর মির্জ্জা তুরস্কে যাইয়া মার্কিণ রাজনীতিকদের সহিত গূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। করাচীস্থিত ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ রাষ্ট্রদূত তুরস্কে স্থানান্তরিত হইয়াছেন ; তুর্কি-মার্কিণ আঁতাতের পক্ষ হইতে প্রধানতঃ তিনিই আলোচনা চালান। ইহার পরই তুরস্কস্থিত মার্কিণ সামরিক মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ করাচী পরিদর্শন করেন। এই সময় ইস্তাম্বুলে রটে যে, তুরস্ক ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক চুক্তি স্থাপনের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

তাহার পর, সম্প্রতি (নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ ওয়াশিংটনে গমন করেন। এই সময় ওয়াশিংটনের কর্ত্তাদের মনে হয়—পর্দ্দার অন্তরালে যাহা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে বিশ্ব-জনমত একটু মাপিয়া দেখা উচিত ; তাই, তাঁহাদের উৎসাহে "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকায় সম্পাদকীয় অভিমত প্রকাশিত হয়—"এত দিন মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্রকে লইয়া সামরিক চুক্তি সম্পাদনের যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে ; ভবিষ্যতে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ পাকিস্থানের সহিত আমাদের সামরিক চুক্তি করা উচিত, যেমন তুরস্কের সহিত আমরা করিয়াছি।" খুব সম্ভব ওয়াশিংটনের কর্ত্তাদের ইঙ্গিতেই "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের" এই সদুপদেশ করাচীতে ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জনাব গোলাম মহম্মদের ওয়াশিংটন পরিদর্শনের সময় পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়ুব খাঁও তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং, এই অনুমান সঙ্গত যে, জনাব গোলাম মহম্মদের নিজের কথামত তাঁহার দেড়মাসব্যাপী বিদেশ ভ্রমণটা "ব্যক্তিগত" কারণে নহে, নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও নহে ; নৈর্ব্যক্তিক রাজনীতি ও সমরনীতির দ্বিবিধ উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই দীর্ঘ ভ্রমণ। পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির বাস্তব রূপ কেমন হইবে, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। চুক্তিটা হইবে তুরস্ককে মাঝখানে রাখিয়া ; আমেরিকা পাকিস্থানের সামরিক ঘাঁটী ব্যবহারের অধিকার লাভ করিবে, পাকিস্থানকে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য সে ঋণ দিবে ; সে অর্থে পাকিস্থান তাহার সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিবে আমেরিকা ও তুরস্ক হইতে। জাতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনায় পাক প্রতিনিধিরা খোলাখুলিভাবে বলিয়া বেড়ান যে, পাকিস্থানকে যদি উপযুক্তভাবে অস্ত্র-সজ্জিত করা হয়, তাহা হইলে উহার বিনিময়ে আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটী প্রদান করিতে সে প্রস্তুত। কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাইলে পাকিস্থান আধুনিক অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হইতে পারে, তাহার একটা হিসাবও হইয়া যায় ; পাকিস্থানের অস্ত্রসজ্জার জন্য নাকি ২৫ কোটী ডলার প্রয়োজন।

ভারতে উদ্বেগ—

পাক-আমেরিকান্ সামরিক চুক্তির এই সম্ভাবনায় স্বভাবতঃ বৃটেনে ও ভারতে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। বৃটিশ পত্রিকাগুলি লিখিতে আরম্ভ করে,—বৃটেন স্বেচ্ছায় তাহার সেনাবাহিনী ভারতীয় উপমহাদেশ হইতে অপসারণ করিয়াছে ; আর এখন সেই উপমহাদেশের একাংশে মার্কিণ সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোনও পত্রিকা ভারতের প্রতি দরদ দেখাইয়া লেখে—আমেরিকা চিরদিনই ভারতের প্রতি বিরূপ ; সেই বিরূপতার জন্য সে যদি ভারতের স্বার্থ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে উহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় দূত মিঃ জি, এল, মেহটা প্রকৃত ব্যাপারটা জানিবার জন্য মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ফষ্টার ডালেসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হইলেও প্রকাশ পাইয়াছিল, মিঃ মেহটাকে বলা হয় যে, পাকিস্থানের সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার বিষয়টি পররাষ্ট্র বিভাগ চিন্তা করিতেছেন ; তবে এই সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সম্ভাবিত পাক-আমেরিকান সামরিক চুক্তি সম্পর্কে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করেন যে, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায়—বিশেষতঃ ভারতে ও পাকিস্থানে এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইবে। তিনি প্রকারান্তরে জানাইয়া দেন যে, আমেরিকা ও পাকিস্থানের মধ্যে এইরূপ চুক্তিকে ভারত ঐ দুইটি রাষ্ট্রের অমিত্রোচিত কার্য্য মনে করিবে। তাহার পর, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় সুনির্ব্বাচিত কূটনৈতিক ভাষায় বুঝাইতে আরম্ভ করেন যে, ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ফষ্টার ডালেস বলেন যে, "বর্ত্তমানে" পাকিস্থানে সামরিক ঘাঁটী স্থাপন অথবা পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কিত "আলোচনায়" (negotiations) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রবৃত্ত নয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, পাক-আমেরিকান

সম্পর্ক এমন ভাবে গড়িয়া তোলা হইবে না, যাহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে: পাক্ গভর্ণর জেনারেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকালে সমারিক ঘাঁটী ও সামরিক সাহায্যের প্রসঙ্গ "বিস্তারিত ভাবে" আলোচিত হয় নাই। লণ্ডন হইতে জনাব গোলাম মহম্মদ্ বিবৃতিযোগে জানান যে, সামরিক ঘাঁটীর বিনিময়ে সামরিক সাহায্য লাভের জন্য পাকিস্থান আমেরিকার সহিত "আলোচনায় প্রবৃত্ত" বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন।

কূটনৈতিক ভাষায় রচিত এই সব প্রতিবাদে "বর্ত্তমানে," "আলোচনা," "বিস্তারিত ভাবে" প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহারথীরা মিথ্যা বলিতে পারেন না; তাঁহারা এই সত্য কথা জানাইয়াছেন যে, সামরিক সাহায্য ও সামরিক ঘাঁটী সম্পর্কে "আনুষ্ঠানিক আলোচনা" আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, সকলেই ইহা বোঝে যে, আনুষ্ঠানিক আলোচনাটা (negotiation) আরম্ভ হয় সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে। তাহার পূর্ব্বে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, প্রস্তাবের মূলনীতি মানিয়া লইয়া সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়, আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনাও চলে। আইক্-ডালেস্-মহম্মদের তিনটি বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পাক-আমেরিকান্ সামরিক চুক্তির প্রসঙ্গ এই সব স্তর অতিক্রম করিয়াছে: তাঁহাদের কেহই এমন কথা বলেন নাই যে, এই ধরণের চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই, সে বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই অথবা ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের সময় প্রসঙ্গটি ঘরোয়াভাবে আলোচিতও হয় নাই। ইহা নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যবনিকার অন্তরালে এই চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। অবিলম্বে এই চুক্তি সম্পাদিত না হইতে পারে; তবে এই দিকেই পাক্-মার্কিণ সম্পর্ক ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

মার্কিণ সামরিক নীতি—

সোভিয়েট রুশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে দুর্গশ্রেণী রচনা করা আমেরিকার বিশ্ব-সমরনীতির প্রধান অঙ্গ। পশ্চিম-এশিয়ায় প্রথম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তুরস্কে; অতঃপর, এই দুর্গশ্রেণীকে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূল, ইরাণ, পাকিস্থান, ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া প্রসারিত করিয়া শ্যাম, ইন্দোচীন, ফরমোজা ও ফিলিপাইনের দুর্গগুলির সহিত উহাকে মিলিত করাই আমেরিকার আক্রমণাত্মক "বিশ্ব-ষ্ট্র্যাটেজি"। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইলে প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থের সহিত কোথাও আপোষ করিতে হয়, কোথাও উহাকে কৌশলে কোণঠাসা করিয়া ফেলা প্রয়োজন। সুয়েজ অঞ্চলে বৃটিশ স্বার্থের সহিত আপোষ না হওয়ায় ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে ঘাঁটী রচনা সম্ভব হইতেছে না। ইরাণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি এতদিন দারুণ সমস্যা সৃষ্টি করিতেছিল। এই সব কারণে তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য সামরিক-সংস্থা গঠন, (অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক ঘাঁটীর প্রতিষ্ঠা) আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ইরাণ সম্পর্কে একটা সুরাহা হইলেও মিশরকে তুষ্ট করিতে এখনও বিলম্ব হইবে; ইসরাইলের সহিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিরোধ আবার নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থানকে দলে টানিলে ক্রমে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করা সহজ হইতে পারে; এক প্রান্তে তুরস্ক এবং অন্য প্রান্তে পাকিস্থান যদি ক্রমাগত নৈতিক চাপ দিতে থাকে, তাহা হইলে আরবরাষ্ট্রগুলির মতিগতির শীঘ্রই পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব। এই অঞ্চলের ইরাণ ও ইরাককে তো এখনই দলে আনা যায়।

পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির প্রতিক্রিয়া—

পণ্ডিত নেহরু সত্যই বলিয়াছেন যে, পাক্-আমেরিকান্ সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো বদলাইয়া যাইবে। এই চুক্তির ফলে পাকিস্থান সুনির্দ্দিষ্টভাবে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হইবে; কম্যুনিষ্ট-বিরোধী আক্রমণ-ঘাঁটী স্থাপিত হইবে সিন্ধু নদের তীরে, পদ্মা-নদীর চরে। ভারতীয় উপমহাদেশের কণ্ঠে ও কটিতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শাণিত ছুরিকা ঝুলাইয়া দিয়া আমেরিকা সমগ্র অঞ্চলটির চেহারা বিভীষিকাপূর্ণ করিয়া তুলিবে। যাহার উদ্দেশ্যে এই সমরায়োজন, সে নিশ্চয়ই উদাসীন থাকিবে না—এই উদ্যোগ আয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান সে রাখিবে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র এই ঘাঁটিগুলি তাহার প্রতি-আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইবে। কোনও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বিনা কারণে পাকিস্থানকে আক্রমণ করিবে, ইহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে পাক্ নেতৃবৃন্দ সুনিশ্চিতভাবেই তাহাদের রাজ্যকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত করিবেন। সে যুদ্ধের শেষ জয়-পরাজয় যে পক্ষেরই হউক, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশের একাংশ শ্মশানে পরিণত হইবে। ভারতের সহিত অচ্ছেদ্য ভৌগোলিক সূত্রে আবদ্ধ অঞ্চলের এই পরিণতির সম্ভাবনা ভারতবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই উদ্বেগের বিষয়।

বলা বাহুল্য, এই সামরিক চুক্তির ফলে পাকিস্থানের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনও ইতর-বিশেষ হইবে না। পাক্-রাষ্ট্রনায়করা আশা করেন যে, এই চুক্তির দ্বারা কাশ্মীরকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া তাঁহারা পাক জনসাধারণকে বুঝাইতে পারিবেন; শেষ পর্য্যন্ত যদি উহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ তখন সোৎসাহে তাঁহাদের অনুসৃত নীতি সমর্থন করিবে—কোনও বিরোধিতাই কার্য্যকরী হইবে না। বৈষয়িক দুর্গতি হইতে পাক্ জনসাধারণের মনোযোগ ফিরাইবার জন্য পাকিস্থানের নেতারা কাশ্মীর সমস্যাকে সব সময়ে তাহাদের সমক্ষে বিস্ফারিত করিয়া উপস্থাপিত করেন; কাশ্মীর পাইলেই যেন তাহাদের সব দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! মার্কিণ সাহায্যে সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত হইলে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের সুর সম্পূর্ণরূপে বদলাইবে; "জেহাদের" চীৎকার তখন আর শূন্যগর্ভ থাকিবে না—সঙ্গে সঙ্গে সামরিক মহড়াও আরম্ভ হইয়া যাইবে।

মার্কিণ প্রভুরা কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; কাশ্মীর রাজ্যে যদি তাঁহারা ঘাঁটী স্থাপন করিতে না পারেন, তাহা হইলে পাকিস্থানে ঘাঁটী স্থাপনের অধিকার অনেকটা গুরুত্বহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং, ইহা নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কাশ্মীর পাইবার জন্য পাকিস্থানের ভারত-বিরোধী সামরিক মহড়া,—এমন কি আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা সম্পর্কেও মার্কিণ ধুরন্ধররা উদাসীনতার ভান করিবেন। পাকিস্থানকে প্রদত্ত সামরিক সাহায্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধে নিয়োজিত হইবে, কি হইবে না, তাহা পরের কথা। তবে, আপাততঃ ইহার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিবে।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক সঙ্ঘর্ষ ঘটাইবার এবং পাকিস্থানকে সোভিয়েট বিমান ও কামানের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিবার সম্ভাবনাপূর্ণ যে সামরিক চুক্তির প্রস্তাব উঠিয়াছে, তাহা ব্যর্থ করিতে পারে একমাত্র পাকিস্থানের প্রগতিশীল আন্দোলন। বর্ত্তমানে যে বাদ-প্রতিবাদ দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে চুক্তির আনুষ্ঠানিক সম্পাদন হয়ত বিলম্বিত হইবে, কিন্তু উহার উদ্যোগ-আয়োজন বন্ধ থাকিবে না। আন্তর্জাতিক জনমতকে বুঝাইবার জন্য কোনও মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করিয়া আপাততঃ চূড়ান্ত পাক-মার্কিণ সামরিক মিলন স্থগিত রাখা হইতে পারে। কিন্তু এই অশুভ মিলন চিরদিনের মত বন্ধ করিতে হইলে চাই সমগ্র পাকিস্থানে প্রবল প্রগতিশীল আন্দোলন। একই সঙ্গে সিন্ধু নদের তীরে ও পদ্মার চরে যদি দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উত্থিত হয়, "মার্কিণ সামরিক শিবিরে যাইব না" "আমেরিকার ক্রীড়নক হইব না," তাহা হইলেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক সংস্থা—

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভূতপূর্ব্ব জবরদস্ত দেশরক্ষাসচিব র‍্যামন্ ম্যাগসেসে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারভুক্ত থাকিবার সময় এই ব্যক্তি মোটর মিস্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া গেরিলা নেতা হন। দেশরক্ষা সচিবরূপে ইনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্টের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইনি তখন একদিকে যেমন কম্যুনিষ্টদিগকে (হুক্) প্রবলভাবে ঠেঙ্গাইয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে সামরিক বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড অভিযান চালাইয়াছেন, হুক্-প্রভাবিত অঞ্চলে কৃষকদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থাও কিছু কিছু করিয়াছেন।

এই জবরদস্ত ব্যক্তিটি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবার পরই কথা উঠিয়াছে যে, ইনি ইউরোপের উত্তর আটলাণ্টিক সংস্থার ন্যায় একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক সংস্থা গঠনে তৎপর হইবেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ক্যানাডা, চীনের চিয়াং চক্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া ও ল্যাওস্ এবং পাকিস্থানকে লইয়া এই সংস্থা গঠনের চেষ্টা হইবে। ইতিপূর্ব্বে মিঃ ডালেস্ যখন জাপানের সহিত সন্ধি-চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেন, তখন তিনি জাপানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সান্ত্বনার জন্য এইরূপ চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা ও আমেরিকাকে লইয়া এই ধরণের একটা চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু এশিয়ার কোনও রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী করানো সম্ভব হয় নাই—বিশেষতঃ ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এইরূপ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইতে অসম্মত হইয়াছে। বর্ত্তমানে র‍্যামন্ ম্যাগ্‌সেসেকে আগাইয়া দিয়া ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ব্যতিরেকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক সংস্থা গঠনের আয়োজন হয়ত আরম্ভ হইবে। ভারতের পরিবর্ত্তে পাকিস্থানকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে বলিয়া মার্কিণ প্রভুরা আশা করেন। মুস্লীম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থান ইন্দোনেশিয়ার উপর কতকটা চাপ দিতে পারিবে বলিয়াও হয়ত তাঁহারা মনে করেন।

ইন্দোচীন—

ফ্রান্স সম্প্রতি ব্যাপকভাবে তোড়জোড় করিয়া ইন্দোচীনে ভিয়েৎ-মীনদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল; সে অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার পর ফরাসী প্রধান মন্ত্রী জোসেফ্ ল্যানিয়েল্ ভিয়েৎমীনের উদ্দেশে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গত প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে প্রস্তুত; শত্রুপক্ষের বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য নহে।

সাত বৎসরব্যাপী এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ফ্রান্সকে বিশেষভাবে বিপন্ন করিয়াছে; অথচ এই যুদ্ধ শেষ হইবার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি বিশিষ্ট ফরাসী সাংবাদিক মঃ র‍্যামণ্ড আরোঁ ইন্দোচীন পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনের শতকরা ষাট ভাগ অঞ্চল ভিয়েৎমীনদের অধিকারভুক্ত; অবশ্য বৃহৎ সহর ও ব্যবসা-কেন্দ্র ভিয়েৎনাম (ফরাসী অনুগত) পক্ষের হাতে রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, সমগ্র দেশে ভিয়েৎমীনদের প্রচুর সমর্থক রহিয়াছে, দেশের অভিব্যক্ত জনমত তাহাদেরই পক্ষে; ইহার কারণ দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাকামী। ফরাসী জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে ডাঃ আঁরো বলেন যে, শতকরা নিরানব্বুই জন ফরাসীই ইন্দোচীন হইতে ফরাসী অভিযাত্রী বাহিনী ফিরাইয়া লইবার পক্ষপাতী। মঃ ল্যানিয়েলের যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবে ফরাসী জনসাধারণের এই মনোভাব প্রতিফলিত দেখা যায়। তবুও এই প্রস্তাবের বাস্তব গুরুত্ব অধিক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ফরাসী জনসাধারণ ভিয়েৎমীনের সহিত আপোষ করিতে চাহিলেও "স্বাধীন দুনিয়ার" অছিটি কখনই সঙ্গত আপোষ হইতে দিবে না; অসম্ভব সর্ত্ত আরোপ করিয়া আপোসের চেষ্টা সে ব্যর্থ করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সন সম্প্রতি সাইগঁতে যাইয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্টরা (ভিয়েৎমিন্) সফলকাম হইলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত দেশের স্বাধীনতার শেষ আশা চিরদিনের মত বিনষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে থাইল্যাণ্ড, মালয়, ফরমোজা, ফিলিপাইন্‌স্ প্রভৃতি দেশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বাহকরূপে যে অভিনব স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে, সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইন্দোচীনে ভিয়েৎ-মিনকে সায়েস্তা করিতেই হইবে, ইহাই নিক্সনের বক্তব্য। অবশ্য, ভিয়েৎমিন্ গভর্ণমেণ্ট যে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট নয়, ইহা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ফরাসী সাংবাদিক মঃ আঁরো স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, ভিয়েৎমিন্ গভর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত হইলেও প্রচুর জাতীয়তাবাদী এই গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। বস্তুতঃ, ইন্দোচীনের স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী শক্তিই মূর্ত্ত হইয়াছে এই ভিয়েৎমিনে। পণ্ডিত নেহরু এক সময় ভিয়েৎমিন্‌দের যুদ্ধ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, ইহারা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু এশিয়াবাসী নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী, আর আটলাণ্টিক পারের কর্ত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক হইতে পারে না। ইন্দোচীনের ভিয়েৎমিন্ পক্ষ সত্যই আইক্-ডালেস্ মার্কা স্বাধীনতার শত্রু। তাই, ল্যানিয়েল্ গভর্ণমেণ্ট আজ বাধ্য হইয়া ইহাদের সহিত আপোষ চাহিলেও ওয়াশিংটনের এই চক্রটি কখনই সে আপোষ হইতে দিবে না। ল্যানিয়েল্ এখন আরও অধিক পরিমাণে মার্কিণ সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইবেন, ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় মার্কিণ বিশেষজ্ঞ লাভের আশ্বাসও শুনিবেন।

২৪।১১।৫৩

কাশ্যমীর

শ্রীনিত্যনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বজনের মনোহারিণী কাশ্মীর, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, মহামুনি কাশ্যপের সৃষ্টি কাশ্যপমীর, হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমানের ভিন্ন সংস্কৃতির লীলাভূমি কাশ্মীর আজ আর শুধু সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রকৃতির পূজারীদেরই আকর্ষণের বস্তু নয়, আজ তা' সৃষ্টি কোরেছে জটিল রাজনৈতিক আবর্ত্ত ভারতে ও ভারতের বাইরে।

বর্তমান কাশ্যমীর

কাশ্মীর সমস্যার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য আজকের কাশ্মীরের অন্তরের সত্য পরিচয় জানবার আগ্রহ জনসাধারণের স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে দু'বার কাশ্মীর গিয়েছি, একবার তুষারতীর্থ অমরনাথের যাত্রী হিসাবে, আর একবার সৌন্দর্য্যপিপাসু ভ্রমণকারীর মন নিয়ে ; কিন্তু এবার গেলাম প্রধানতঃ বর্তমান কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থার সত্য পরিচয় কি জানবার জন্যে।

কাশ্মীর রাজ্যের মোট আয়তন প্রায় ৮৭৪৭২ বর্গ-মাইল, গ্রেট বৃটেনের চেয়ে কিছু ছোট কিন্তু ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য। মহীশূর গোয়ালিয়র বিকানীর রাজ্যগুলির একত্রিত আয়তনের চেয়েও কাশ্মীরের আয়তন বেশী ; বোম্বাই প্রদেশের দু তৃতীয়াংশের প্রায় সমান। কাশ্মীরের উত্তরের যে অধিত্যকা ভূমিতে রাজধানী শ্রীনগর—তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪ মাইল এবং প্রস্থ ২৪ মাইল, তার উচ্চতা ৫০০০ থেকে ৬০০০ফিট। এই উপত্যকার প্রায় চারিদিকই অবিচ্ছিন্ন অভ্রভেদী পার্বত্যতরঙ্গে বেষ্টিত, উত্তরে তুষার ধবল নাঙ্গা পর্বত (২৬৬২০ ফিট) অমরনাথ (১৭৩২০ ফিট) হরমুখ (১৬৯০০ ফিট) দক্ষিণে পীরপঞ্জল (১৫০০০

ফিট) পশ্চিমে কাজীনাগ (১২১২৪) পূর্বে বিশাল হিমালয়ের বিভিন্ন শিখর।

ইউরোপে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খ্যাতি যে যে কারণে, কাশ্মীরেও ঘটেছে তার অপূর্ব সমন্বয়। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের মধ্যে বিরাট সমতল ভূমি, তার মধ্যে নদনদী ফল ফুল প্রভৃতির শ্যামলিমার অফুরন্ত শোভা; অদূরে তুষার মৌলী গিরিমালার শীতল শুভ্রতা। পাহাড়ের কোণে কোণে স্বতঃ-উৎসারিত নির্ঝরিণী, আর তারই কূলে কূলে মানুষের তৈরী বিভিন্ন বাগানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব বিন্যাস। মানুষগুলিও সুন্দর ও সুশ্রী। দেহের রংও এদের যেমন দুধে আলতায় গোলা, শারীরিক গঠনেও এদের আছে আর্য্যসুলভ তীক্ষ্ণতা। এদের সাধারণ ব্যবহারও নম্র ও ভদ্র। শুধু ব্যবসাদার সম্প্রদায় বহুদিনের অসাধুতার ফলে বিদেশীর কাছে কিছু অপবাদ কুড়িয়েছে। "হাউস-বোট"ওয়ালা, ফেরীওয়ালা, দোকানদার এরা ন্যায্য দামের তিন চার গুণ দাম বলে, নকল জিনিষকে আসল বলে চালায় একথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সে ত ব্যবসারই অঙ্গ। তবু তাদের বিনয়, সৌজন্য এমনই—যে তাদের সব ধূর্ততা জেনেও তাদের কাছে জিনিষ না কিনে উপায় থাকে না।

একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে কাশ্মীরের শতকরা ৯০ জন মুসলমান এবং এই ধারণার ওপর ভিত্তি কোরে অনেকে এখানের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কাশ্মীরে মুসলমানের সংখ্যা ১৯৪২ সালের গণনানুসারে শতকরা ৭৭'১১ জন। কাশ্মীর তিনটি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত। জম্মু, কাঠুয়া, সিমপুর, রিয়াসি, মীরপুর, পুঞ্চ ও চেনালী জেলা নিয়ে জম্মু প্রদেশ, অনন্তনাগ, বারামুল্লা, মজফ্‌ফরাবাদ জেলা ও শ্রীনগরের সমগ্র উপত্যকা নিয়ে কাশ্মীর প্রদেশ, লাদাক, স্কার্দ্দু, কারাগিল, জানস্কার এবং গিলগিট অঞ্চল নিয়ে সীমান্ত এলাকা।

শ্রীনগরের পথে পপলার প্রহরী

কাশ্মীর কন্যা

কাশ্মীরে ২টি নগর, ৩৯টি সহর এবং ৮৯০৩টি গ্রাম আছে। সহরবাসীর সংখ্যা—৩৬১৩১৪ জন এবং গ্রাম্য লোকের সংখ্যা—৩৫০৩৯২৯ জন। ১৯৪১ সালের হিসাব মত ধর্মানুসারে রাজ্যের লোকসংখ্যা—

মুসলমান—৩১,০১,২৪৭
হিন্দু — ৮,০৯,১৬৫
বৌদ্ধ — ৪০৬৯৬
শিখ — ৬৫৯০৩
অন্যান্য — ৪৬০৫

সমগ্র কাশ্মীরে ১৩টি ভাষা প্রচলিত, তার মধ্যে প্রধান—ডোগরী, কাশ্মীরী, পাহাড়ী, লাদাকী এবং দারদী। ডোগরা রাজপুতদের ভাষা

ডোগরী। এদের অধিকাংশ আবার পাঞ্জাবী ভাষাও ব্যবহার করে। পীরপঞ্জল পাহাড়ের ওপরে কাশ্মীর উপত্যকাবাসীদের প্রধান ভাষা কাশ্মীরী। পুঞ্চ, মীরপুর, মজফরাবাদ ইত্যাদি পার্বত্য এলাকার ভাষা পাহাড়ী। লাদাক প্রদেশের ভাষা লাদাকী, যা' পশ্চিম তিব্বতীয়দের অনুরূপ।

কাঠুয়া, জাম্মু, জিমপুর এবং রিয়াসী ও মীরপুর জেলার পূর্বাংশে ডোগরাদের প্রধান বাসভূমি। এখানের মোট ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৯ লক্ষ হিন্দু। এই অংশটি ভারতের সীমানার একেবারে সংলগ্ন।

পাঞ্জাব ও ডোগরাদের ভূমি ডুগারের উত্তরে সংলগ্ন হোল লাদাক। এর মোট লোকসংখ্যা ৪০ হাজারের মধ্যে ৩৬ হাজার বৌদ্ধ।

এই থেকে বোঝা যাবে কেন জম্মুর প্রজাপরিষদ কাশ্মীরের ভারতের সংগে বিনাসর্তে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবী কোরেছে, অন্যথায় কাশ্মীর প্রদেশ বাদ দিয়ে শুধু জম্মু ও লাদাককে ভারতের সংগে অন্তর্ভুক্তির জোর আন্দোলন চালিয়ে ছিল।

ডাল দরজার কাছে নৌগৃহের নোঙ্গর

বাল্টিস্থান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজফরাবাদ এবং কাশ্মীরের উপত্যকা বাদে বাকী সব অংশই এখন পাকিস্থানের কবলে। কাশ্মীর উপত্যকার মোট জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ—এর মধ্যে ১ লক্ষ হিন্দু।

কাশ্মীরকে ভারতের সংগে যুক্ত রাখার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তার বিশেষ ভৌগলিক পরিস্থিতির জন্য। কাশ্মীরের বিভিন্ন দিকে এসে মিশেছে ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, রাশিয়া, চীন এবং তিব্বতের সীমানা। এর মধ্যে উত্তরের সংগে যোগাযোগের প্রধান রাস্তা হোল গিলগিট। ভারতের উত্তর সীমান্তকে নিরাপদ রাখতে হোলে গিলগিট ভারতের হাতে থাকা প্রয়োজন।

পূর্বে ভারত থেকে কাশ্মীর যাবার তিনটি রাস্তা ছিল। একটি রাওয়ালপিণ্ডি মারি হয়ে বারমুল্লা দিয়ে, দ্বিতীয়টি শিয়ালকোট হয়ে জম্মু দিয়ে, তৃতীয়টি হাবালিয়ান হোয়ে এবটাবাদ দিয়ে—এর সবকটাই এখন পাকিস্থানের কবলে। তাই পাকিস্থান যখন কাশ্মীরকে তার সঙ্গে যোগ দেবার প্রথম অস্ত্ররূপ এই পথগুলি অবরোধ কোরে বাইরের জগতের সংগে কাশ্মীরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোরে দিলে, তার জনসাধারণের জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ নুন, গম, কাপড়, কেরসিন, পেট্রোল সব বন্ধ কোরে দিলে, তখন তাড়াতাড়ি ভারতের সীমান্তবর্তী পাঞ্জাবের পাঠানকোট সহর থেকে ৬৭ মাইলব্যাপী এক নূতন পথ তৈরী কোরে ভারতকে জম্মুর সঙ্গে যোগ করা হয়। এই পথ ছোটখাট পাহাড় ও পার্বত্য নদীর ওপর দিয়ে বিপুল ব্যয়ে তৈরী করা হয়। এই পথ দিয়েই আমাদের যেতে হোয়েছিল।

পাঠানকোট থেকে দিনের সর্বক্ষণই বহু বাস ও ট্রাক জম্মু পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। তবে এদের মধ্যে বাইরের যাত্রীদের পক্ষে ডাকবাহী বাস এবং কাশ্মীর সরকারের তত্ত্বাবধানে চালিত কাশ্মীর টুরিষ্ট সার্ভিসের বাসই ভাল, কারণ এরা সময়মত ছাড়ে ও পৌছায়।

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ভাড়া জনপিছু ২০৲ টাকা এবং ৪২ পাউণ্ডের অতিরিক্ত মালের ভাড়া মণ পিছু ৭৵০। মরশুমের সময় টুরিষ্ট জায়গা পাওয়া কঠিন হয়। তাই কোলকাতা, দিল্লী প্রভৃতির কাশ্মীর সরকারের ব্যবসাকেন্দ্র (Emporium) গুলির মারফৎ বা ভিজিটার্স ব্যুরোতে টাকা জমা দিয়ে পূর্ব্বে রিজার্ভ কোরে রাখা ভাল। যাঁরা স্টেশান-ওয়াগনে (৬ জন যাত্রী-বাহী) যেতে চান তাঁরাও ২০০৲ টাকা দক্ষিণা দিয়ে তার ব্যবস্থা কোরতে পারেন।

এখন কাশ্মীরে যেতে হোলে প্রত্যেককে নিজ প্রদেশের সরকারের কাছ থেকে পরমিট বা ছাড়পত্র নিতে হয়। যাত্রার দিন পনের পূর্ব্বে ছাড়পত্রের দরখাস্ত হোম ডিপার্টমেণ্টে করা উচিত। এই ছাড়পত্র পাঠানকোট থেকে ইরাবতী বা রবিনদী পেরিয়ে ১০ মাইল পর—ভারত-সীমান্তে মাধোপুরে একবার পরীক্ষা করা হয়। আবার তা ২০ মাইল পরে কাশ্মীর সীমান্তে লখিনপুরে (সম্ভব লক্ষণপুর) পরীক্ষিত হয়। এখানে মালপত্রও পরীক্ষা করা হয়; উদ্দেশ্য কাশ্মীরে ব্যবসার জন্য নীত মালপত্রের ওপর শুল্ক নেওয়া। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষের কোনও শুল্ক লাগেনা। এখানেই যাত্রীরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে নেন। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়ে প্রায় বেলা ১০টায়, কিন্তু পরীক্ষার ঝামেলা সেরে এই ১২ মাইল আসে ১২ টায়। এখান থেকে ছোটবড় কয়েকটি পার্বত্য নদী ও প্রায় জনহীন প্রান্তর পেরিয়ে বাস মোট ৬৭ মাইল পথ

এসে তাওয়াই নদীর অপর তীরে জম্মু পৌঁছায় প্রায় ৩ টায়। পথের নদীর সেতুগুলিতে সামরিক পাহারা আছে। উষর-প্রান্তরের মাঝে মাঝে সৈন্যদের ছাউনী। সামরিক বিভাগের গাড়ীগুলি একক বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রায়ই যাওয়া আসা কোরছে। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ২৬৭ মাইলের সর্বত্রই যুদ্ধের প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া যায়। জম্মুতে বাস বদল কোরে অন্য বাসে উঠে পাহাড় চড়াই সুরু হয়। পূর্ব্বে জম্মু পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল এখন তা' পাকিস্তানের কবলে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্থান এই লাইন অবরোধ কোরে—কাশ্মীরের ব্যাবসা বাণিজ্য ও বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র নষ্ট করে দেয়।

কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী জম্মু। তাওয়াই নদীর তীরে পাহাড়ের কোলে এই প্রাচীন সহর। এর উচ্চতা ১০০০ ফিট, এখান থেকেই হিমালয়ের বেড়াজালে পাহাড়ীরাস্তা মাথা গলিয়েছে। জম্মু সহরের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রের সেনাপতি জাম্বুবান এর কাছাকাছি কোন গুহায় বাস কোরতেন। এই সহর প্রথম তিনিই নির্মাণ করেন, তারই নামে সহরের নামকরণ হোয়েছে "জম্মু"। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজ-বংশের সংগেও জম্মুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

বর্ত্তমান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা গুলাব সিং ছিলেন জম্মুর অধিবাসী, জাতিতে ডোগরা রাজপুত। ১৮০০ শতকে জম্মুতে ডোগরা রাজপুতেরা কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন; পূর্ব্বে ইরাবতী (রবি) এবং পশ্চিমে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদী পর্য্যন্ত ছিল বিস্তৃতি। এদের মধ্যে স্বনামখ্যাত রাজা ছিলেন রণজিৎ দেও। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজ্য উদীয়মান শিখ সাম্রাজ্যের আওতায় আসে। গুলাব সিং এই বংশেরই বংশধর। ১৮১২ সালে তিনি লাহোরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই নিজ শক্তি ও বুদ্ধির জন্য মহারাজার প্রিয়পাত্র হন। মহারাজা রণজিৎ সিংহ মহম্মদ আজিম খাঁকে পরাস্ত কোরে কাশ্মীর জয় করেন ১৮১৯ সালে। দীর্ঘদিনের মুসলমান রাজবংশের সেই সময় অবসান হয়। একবার বাজোরীর রাজা বিদ্রোহ কোরলে মহারাজা রণজিৎ সিংহ গুলাব সিংকে তা' দমন কোরতে পাঠান। গুলাব সিং সে অভিযানে সাফল্যলাভ করায় ১৮২০ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ পুরস্কার স্বরূপ গুলাব সিংকে জম্মুর রাজা কোরে দেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হোলে তার দুর্ব্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে পোড়ল রাজ্যের গুরুভার। এদিকে ইংরেজ তখন ধীরে ধীরে ভারতের অনেকখানি অধিকার কোরে পাঞ্জাব কেশরীর ভয়ে পাঞ্জাবে সুবিধা কোরতে পারছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে (নভেম্বর) তারা পাঞ্জাব আক্রমণ কোরলো। ইতিমধ্যে গুলাব সিং তার বাহুবলে জম্মুর সীমানা ছাড়িয়ে বাল্টীস্থান, পশ্চিম তিব্বত, লাদাক দখল কোরে জম্মু রাজ্যের অঙ্গীভূত কোরেছেন। লাহোরের শিখ দরবার তাঁর শৌর্য্যবীর্য্য ও বুদ্ধিবলের সাহায্য পাবার জন্য তাঁকে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রীত্বে বরণ কোরলে। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত সুযোগ ও সুবিধা লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা কোরলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পরিচালনা কোরলেন না। সেব্রাওয়ের যুদ্ধের ফলে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে শিখদের পরাজয় ঘটলো এবং ইংরাজেরা লাহোর দখল কোরলো। এইভাবে ভারতের স্বাধীন শিখরাজ্যের অবসান ঘটলো। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে "অমৃতসহরের চুক্তির" দ্বারা গুলাবসিং কাশ্মীর উপত্যকা এবং ১৮৪২ সালে শিখদের বিজিত গিলগিট ইংরেজদের কাছ থেকে ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা নজর দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ পান এবং নিজের জম্মুরাজ্যের সংগে তা' যুক্ত করে নেন। এই জন্যই আজও এইরাজ্যের নাম কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য, কারণ দুটি পৃথক রাজ্য একত্রীভূত করা হয়েছিল। গুলাব সিংহ এগার বৎসর রাজত্ব করেন। এর মধ্যে তাঁকে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ কোরতে হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গিলগিট এবং সিন্ধুর অপর তীরের ভূমি শত্রুর হাতে তাঁকে হারাতে হয়। ১৮৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র জীবিত পুত্র রণবীর সিং মহারাজা হন। তিনি পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেন। কিন্তু তিনি পিতার মত রণপিপাসু ছিলেন না। মহারাজা রণবীর সিং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সংস্কৃত এবং পারসীক পুরাতন গ্রন্থের একটি বিরাট

শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের মাথায় শিব মন্দির

গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তিনিই প্রথম বিতস্তা নদীর তীরের রাস্তাটী (বারামুল্লা হোয়ে) নির্মাণ করেন আজ যা' পাকিস্তানের কবলে।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর মহারাজা রণবীর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। মহারাজা প্রতাপসিংহের বহু কীর্ত্তিকলাপ আজও কাশ্মীরের বহু স্থানে তাঁর প্রজা-প্রীতির পরিচয় দেয়।

বিতস্তার বুক থেকে শা' হামদান

জম্মু সহরের বিরাট রঘুবীরের মন্দির গুলাব সিং, রণবীর সিং ও প্রতাপ সিংহের ধর্মপরায়ণতার সাক্ষ্যস্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে। এত বড় বিরাট মন্দির এবং প্রাঙ্গণ উত্তর ভারতে প্রায় চোখে পড়ে না। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিধারে ঘরগুলি পাণ্থশালা এবং একাংশে মস্ত চতুষ্পাঠী। এই চতুষ্পাঠীতে আজও বহু ছাত্র বিনা বেতনে বিদ্যালাভ করে। বিনা পয়সায় তারা আহার্য্যও পায়। অসংখ্য নারায়ণ শিলা (পাণ্ডাদের কথা মত ১১ লক্ষ) মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া বহু মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রাঙ্গণস্থ নানা মন্দিরে আজও পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরে প্রবেশ করেই ডাইনের দুটি মন্দিরে গুলাব সিংহ ও রণবীর সিংহের নামে প্রতিষ্ঠিত দুটি সুন্দর চুণী ও স্ফটিক পাথরের বাণলিঙ্গ শিব আছেন। এতবড় স্ফটিক কদাচিৎ চোখে পড়ে। বামের একটি মন্দিরে অন্য পাথরের বিরাট বাণলিঙ্গ শিব আছেন মহারাজা অমর সিংহের নামে। অমর সিংহ প্রতাপ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। বর্ত্তমানে গদীচ্যুত মহারাজা হরি সিংহের পিতা।

কাশ্মীরে বর্ত্তমান সরকার প্রায় ১৫ বিঘার ওপর সব জমি একজনের অধিকার থেকে আইন কোরে কেড়ে নিয়েছেন। তাই এই সব দেব সম্পত্তি কি করে চলে জিজ্ঞাসা কোরলাম। যা জানতে পারলাম তা'তে বোঝা গেল—জমি কেড়ে নিয়েও বাকী যা জমি বা আয়কর সম্পত্তি আছে তার আয় সরকারী ধর্ম্মার্থ দপ্তরে জমা হয়, কিন্তু ইদানীং মন্দির খরচের জন্য সেখান থেকে লেখালিখি করেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। মন্দিরের সেবায়েৎ মহারাজ নন। পৃথক একটি পঞ্চায়েৎ আছে। তাঁদের অনুরোধ মত এখনও প্রয়োজনীয় টাকা মহারাজ হরি সিংহ দিচ্ছেন, কিন্তু সে তহবিল শেষ হলে প্রভূত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে হয়তো এত বড় দেবসেবা ও জনসেবার প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে—এই আশংকাই যেন এখানের হিন্দুদের মধ্যে প্রবল দেখলাম।

জম্মু সহরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু মন্দির চোখে পড়ে। এখান থেকে ৩০ মাইল দূরে এ অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থ বৈষ্ণু দেবী (সম্ভবত বৈষ্ণবী থেকে স্থানীয় উচ্চারণে "বৈষ্ণু" দাঁড়িয়েছে)। শীতের সময় শত শত তীর্থযাত্রী পাঞ্জাব ও আরও অনেক দূর থেকে এখানে আসে। এখান থেকে বাসে করে…গিয়ে বাকী পথ পায়ে হেঁটে এই বিখ্যাত শক্তি মন্দিরে পূজা দিতে যায়।

ক্রমশঃ

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

শিল্পাঞ্চল এমনি একটা স্থান যেখানে বিচিত্র লোকের সমাবেশ, বিচিত্রভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে—সমাজহীন, নৈকট্যহীন, প্রতিবেশীহীন একটা রাজ্য, যেখানে কেহ কাহাকেও কৈফিয়ৎ তলব করে না। মানুষের বিকিকিনি চলে শিল্পজাত দ্রব্যেরই মত। মানুষ ধনের দাসত্বে হয় কলকব্জার মত প্রাণহীন। জীবন চলে ঘড়ির কাঁটায়, টাকার দামে, টাকার নিয়ন্ত্রণে। মানুষ সেখানে গৃহহীন, চারিপাশে অপরিচিত দূরাগত লোকজন—মানুষের মনে স্বভাবতঃই পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। সেখানে লোকলজ্জা, লোকভয়ের বালাই নাই, কলিয়ারী বদল করিলেই সব মিটিয়া যায়; তাই সেখানে চলে স্বেচ্ছাচার—পশুজীবনের অপরিহার্য্য পরিণতি; প্রলোভন ও অর্থের মোহকে সংযত করিবার মত কোন শৃঙ্খল নাই—যাহারা মালিক তাহারা চান—ধনের বিনিময়ে কাজ ও কাজের উপরে মুনাফা—মানুষ পশু হইলেই, কলের মত হইলেই মুনাফা। তাই শিল্প-সাধনার সঙ্গে চলে মানুষকে পশুকরণ-যজ্ঞ দরিদ্র জনশ্রেণী সেখানে আত্মাহুতি দিয়া মুনাফা যোগায়—বাড়িয়া চলে বিলাস-ব্যসন,—ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং।

বাধাহীন মন এখানে সহজেই উচাটন হইয়া উঠে—তাই লছমীর ডাক নিতাইকে দিশাহারা করিয়া দিল। গোপালপুর হইলে লোকলজ্জা লোকভয় সমাজশাসন হয়ত তাহাকে সংযত করিতে পারিত—কিন্তু নিতাই আজ মুক্ত, তাই পশুমনের স্বেচ্ছাচার জাগিয়া উঠিয়াছে নিরঙ্কুশভাবে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে নিতাই ও সুমী শুইয়াছিল দুইটি পাটীতে। স্বপ্ন দেখিতেছিল গোপালপুরের, নিতাই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল লছমীকে ঘিরিয়া। মধ্যাহ্ন সূর্য্য মাথার উপরে থাকিয়া পৃথিবীতে ঢালিয়া দিতেছিল আলো—চারিপাশে নিঝুম—ধাওড়ার সামনে গলিটার মাঝে নিদ্রাহীন কুলিতনয়গুলি চেঁচামেচি করিতেছে মাত্র।

সুমী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, নিতাই গাঁকে আর যাবেক নাই রে ?

নিতাই-এর স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সে সংক্ষেপে কহিল—তু ঘুম করনা, গাঁকে যেয়ে খাবেক কি ?

কথাটা সত্য, সেখানে উদরান্ন উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। তথাপি সুমী কহিল, হেথা বারমাস কেমনে থাক্‌বি বল কেনে ?

সুমীর প্রশ্নে নিতাই-এর চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হইতেই সে বলিল—চুপ কর কেনে ঘুম কর। তু যা গাঁকে মু যাবেক নাই হোথা—তু যা সাঙ্গা করবি, যা কেনে—

সুমী ব্যথিত হইয়া চুপ করিল।

অপরাহ্নে নিদ্রা হইতে উঠিয়া নিতাই একটা বিড়ি পান করিতেছিল। সুমী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—সিফ্‌টবাবু বৈকালে যেতে ব'ললেক কেনে রে ?

নিতাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিতে সুমী কহিল, সিফ্‌টবাবু যেতে ব'ললেক বিকেলে কি ক'রবেক ?

—কেনে ?

—কে জান্‌ছে। বল্‌লেক—হোথা সড়কে দাঁড়িয়ে, কেনে তা কে জান্‌ছে—উঃ সামনের ধাওড়ার কামিন ব'ললেক কি ?

—কি ব'ললেক—

—শুন্‌না উর কাছকে—

সামনের ধাওড়ার কামিনটা বসিয়া তামাক খাইতেছিল, নিতাই উঠিয়া গিয়া তাহাকে কি সব প্রশ্ন করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং রাগে রক্তাঁসি হইয়া কহিল, তু যাবেক নাই, শালা ডাকু তোকে রস খাওয়াবেক, তোকে ঘরকে রাখবেক—

—মু থাক্‌বেক কেনে ?

—শালা বলছেক টাকা দেবে—শালাকে খুন করবেক—

সন্ধ্যার আগমনে নিতাইয়ের অন্তরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল লছমীর জন্যে। এক পায়ে দু' পায়ে সে ঐ দিকেই

চলিল। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে লছমীর ঘরের নিকটে উপস্থিত হইল। লছমী ডাকিল—নিতাই, তু—আয় এদিকে। তোর তরে বসে থাকতে লারি। আয় রস খাবেক নাই—.

লছমীর আগ্রহে তাহার পয়সায় প্রচুর পচুই পান করিয়া এবং রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া নিতাই যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সুমী রান্না-করা ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিতাই নেশার ঘোরে আসিয়া কহিল—এ সুমী ভাত দে—সুমী—

সুমী উঠিয়া ভাত দিল। নিতাই চোখ বুজিয়াই খাইতে লাগিল। সুমী কহিল, রস খেলি কোথাকে?

—উই হোথা—

—পয়সা পেলি কোথা?

—কেনে? পয়সা মোর নাই, মদ কিনতে লারি?

সুমী কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল তাহার পরে প্রশ্ন করিল, সিফ্‌টবাবু ত আবার আস্‌লেক বটে, মু গেলেক নাই—

নিতাই বিরক্ত হইয়াছিল সে কহিল, যা কেনে, টাকা পাবি। বাবু আশনাই করবেক তোর সাথে, যা কেনে? শাড়ি পাবি গয়না পাবি—

সুমী আশ্চর্য্য হইল, তাহার স্বামী হইয়া নিতাই এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিল, প্রকারান্তরে সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে! সুমী ব্যথিতভাবে কহিল, তু কি ব'লছিস্ সব!

—ঠিক বল্‌ছি, টাকা চাই মোরা—লুটেলে দু' হাতকে লুটেলে—

সুমী বুঝিল নিতাই নেশায় উন্মত্ত, তাই চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষেপ—

লছমীর প্রেমে নিতাই ভাসিয়া চলিল—হপ্তা যাহা পায় তাহার সবই লছমীর ওখানে রাখিয়া আসে, আর ঘরে আসিয়া সুমীর উপর অত্যাচার করে। সুমীও সিফ্‌টবাবুর হাত বেশীদিন এড়াইতে পারে নাই—প্রথমে বাসনমাজা ঘর-দোর ঝাড়ু দেওয়া এবং সেই সূত্রে ভালই উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানটা এমনিস্থান যেখানে নিষ্কৃতি নাই, সংযমের সংস্কারের শৃঙ্খল এখানকার তাপে গলিয়া যায়, তাই চারিপাশের বন্যার মাঝে আপনাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না—পশুত্ব আপনি প্রবলতর হইয়া উঠে। অর্থের জন্যে এখানে মানুষ সবই করিতে পারে—

সেদিন নিতাই লছমীর ওখানে গিয়াছিল কিন্তু লছমী তাহাকে বিদায় দিয়াছে—তাহার ঘরে কোন এক বাবু শুভাগমন করিয়াছেন তাই—নিতাইকে লইয়া রসপান করিবার সময় তাহার ছিল না। দুঃখে ক্ষোভে একটা উত্তেজনা লইয়া সে ফিরিয়া একেবারে দোকানে উপস্থিত হইল। যে শেষ সম্বল ছিল সব দিয়া নিতাই আকণ্ঠ পচুই পান করিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল—তখন রাত্রি এক প্রহর হইবে। নিতাই এত সকালে কোন দিনই ফিরে না। অন্ধকার ধাওড়ার বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, সুমী—সুমী—

সুমী নাই। কপাটে কুলুপ দেওয়া, চারিপাশে অন্ধকার, দূরে দূরে কাঁচা কয়লার স্তূপ জ্বলিতেছে, তাহার স্বল্প আলোয় উঠানের একাংশ দেখা যায়—সে ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিল। পুনরায় ডাকিল, সুমী। সুমী—

সুমী নাই—ক্ষীণ আলোয় কুলুপের কিছুটা চিকচিক করিতেছে। নিতাই-এর মাথায় হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সুমী কোথায় গিয়াছে। উঠানের কোণ হইতে সাবলটা হাতে লইয়া সে অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল—

বাবুদের কোয়াটার প্রাচীর ঘেরা, সিফ্‌টবাবুর বাসাটা একেবারে মাঠের ধারে। নিতাই দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল ভিতর হইতে দেওয়া। বাসার ভিতরের একটা পেয়ারা গাছের ডাল এদিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে, সে সেইটা ধরিয়া প্রাচীরের 'পরে উঠিল এবং গাছ বাহিয়া উঠানে আসিয়া নামিল। ঘরের মাঝে মিটিমিটি একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে—অতি সন্তর্পণে সে ঘরের দরজার নিকটে গেল এবং ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। সুমী চীৎকার করিয়া উঠিল, মারলেক রে, মারলেক—

নিতাই শাবল তুলিয়া তক্তপোষে শায়িত লোকটির দেহে এক বিরাট আঘাত করিয়া মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া পড়িল। নেশার ঘোরে হইলেও সে জানিত সে কি করিয়াছে,

তাই ধাওড়ায় না ফিরিয়া সোজা কেষ্টপুর কলিয়ারীর দিকে রওনা দিল—

পরদিন একটু হৈ চৈ হইল, সিফ্‌টবাবু কিছুদিন হাসপাতালে থাকিয়া ফিরিলেন, সুমী রহিয়া গেল ভাদুলিয়াতেই। যেমন করিয়া লছমীর মা ছিল তেমনি দিন চলিতে লাগিল।

নিতাই নতুন কলিয়ারীতে কাজে লাগিয়া গেল তাহার নতুন নাম হইল গিরিধারী।

আদুরীর মেয়ে সরোজ ও মথুর গিয়াছিল জামুরিয়া কলিয়ারীতে। মথুর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কাজকর্ম্ম করে, শনিবারে দোকান হইতে পঁচুই কিনিয়া ধাওড়ায় বসিয়া খায় আর ঝুমুর গান করে। লেটো গানের সুরে সুরে আপনার হাত বাজায়! নির্ব্বিরোধ লোক—এমনি করিয়াই দিন চলিয়া যায়—

সরোজের দেহেও আদুরীর দেহের মাদকতা কিছুটা ছিল, তাই এখানে আসিবার পরই তাহাকে বহু প্রলোভনের সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। মথুর মদ খাইয়া আনন্দে গান করিতেছিল। সরোজ আসিয়া কহিল, চল্ বাড়ী চল্—হেথা থাক্‌বেক নাই। চল্—গাঁকে ঘুরে যাই—

মথুর হাসিয়া কহিল, গাঁকে কি খাবি?

—দু'টো পেট-ভাত জুটবেক নাই?

—না। কোন্ দেবেক, কোন্ খাটাবেক—জমি ত সব ছোটবাবু ছাড় করালেক—কোথা যাবি? বল—

সরোজ কহিল, হেথা সব মোর সঙ্গে লাগ্‌লেক রে! ছোটবাবু ডাক্‌লেক তার ঘরকে যেতে, লোডিংবাবু বল্‌লেন—ম কি করবেক, টাকার জন্যে ধরম দেবেক?

মথুর সুর করিয়া কহিল, টাকা বিনা ধরম নেই রে? টাকার জন্যে সব প্রাণ দিলেক, ধরম কি করবেক? টাকার জন্যে ছোটবাবু ধরম খোয়ালেক নাই? তাঁতি তিলি কুলু সব ত ধরম খোয়ালেক, জাতখোয়ালেক। তোর এত কেনে। যা তু—পিথিমে ধরম আর লেইরে সরোজ—সরোজ ব্যাকুলভাবে কহিল—মু পারবেক নাই, পারবেক নাই, চল গাঁকে ঘুরে যাই। খেতে ধান বোঁয়া করবেক, কাস্তে চালাবেক, তু গাইতি চালাবি, কোদাল চালাবি—

আদুরী একদিন এমনি সংকল্প লইয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল তাহার কন্যা সরোজও আজ ব্যাকুল হইয়াছে—মথুর স্বভাবসুলভ হাসি সহযোগে কহিল, কার জমিতে তু রোয়া করবি, মু গাইতি চালাবেক বল? গাইতি খাদকেই চালাতে হবেক—টাকা রোজগার কর কেনে, গাঁকে যেয়ে জমি কিন্‌বেক কোন্ জান্‌ছে বলন—

সরোজ উর্দ্ধে হাত তুলিয়া ভগবানকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, উ-ত জান্‌ছে বটে—নরকে যাবেক—

—বহুলোক জুটবেক নরকে, বাবুরাও বহু জুটবেক সরোজ। শুন্ বলি, বড়বাবু দেখ্‌ছিস্ তো, ঐ ত লোডিংবাবু ছিলেক, পঁচিশটাকা মাসমাহিনা ছিলেক। বড়সাহেবকে খানাপিনা দিলেক, ভেট দিলেক, উর কামিন আশনাই ক'রলেক, বড়বাবু হলেক বটি। তু কোন সতী-সাবিত্রী? ভদ্দরলোক বাবুরা টাকা কামালেক তু পারবিনা, —তু ত বাগ্দীর কামিন মেয়ে, ধরনা কেনে আর একটা সাঙ্গা করলেক—

মথুর নেশার ঘোরে নিজের রসিকতায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! সরোজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সরোজ স্ত্রীলোক, লোভ মোহ মানুষের মতই তাহার মধ্যে ছিল, সেটা গাঁয়ের মাঝে স্নিগ্ধপরিবেশে মাথা তুলিতে পারে নাই, এখানে এই স্বেচ্ছাচারী সমাজে ধাপে ধাপে মাথা তুলিতেছিল।

পাড়ার একটা কামিন আসিয়া কহিল, সরোজ চল, ছোটবাবু তোকে ডাক্‌ছে—চল। হোথা কি কাজ আছে—

সরোজ কহিল, মু যাবেক নাই—

কামিনটি কহিল, চল কেনে—মু ত যাবেক তোর সঙ্গে, চল কেনে—

সরোজ কহিল, যাবেক কেনে? এ রাতে মু কেনে যাবেক, কোন কাজ লাগবেক্—

মথুর হাসিয়া কহিল—লাগবেক বটি লাগবেক—যা কেনে—ছোটবাবু ডাকলেক, মু সর্দ্দার হবেক বটে, তু সর্দ্দারণী হবেক—

সরোজ প্রশ্ন করিল, তু বল্‌ছিস মু যাবেক?

—যা কেনে, মু ত বলছি,—

সরোজ দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া কামিনের পিছন পিছন চলিয়া গেল। মথুর—হাঁড়ির শেষ পঁচুইটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া দুইখানা পেয়াজী এক সঙ্গে গালে

ফেলিয়া দিল, দেয়াল ঠেস্ দিয়া বিচিত্রস্বরে ঝুমুর গানের এককলি বার বার গাহিতে লাগিল—তাহার পরে পচুইয়ে বিস্মৃতির মাঝে কাটিয়া গেল রাত্রি—

চারিপাশে শহর, কলকারখানা গজাইতেছে—পল্লীর সে শান্ত কর্ম্মহীন পরিবেশ নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে—অভাব বাড়িয়াছে, কাজ বাড়িয়াছে। দেশে শিল্পোন্নতি হইতেছে, কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে জনপদ, বিচিত্র মানুষ লইয়া। মানুষ ত্যাগ করিতে ভুলিয়াছে—ভোগ করিতে শিখিয়াছে। বহু সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে—মানুষের সমাজে চলিতেছে প্রতিযোগিতা—ধনী হইবার সম্পদশালী হইবার। গ্রামের রক্ত শোষণ করিয়া নগর স্ফীত হইয়াছে, —মানুষ সভ্য হইয়াছে।

এই গোপালপুরে একদিন হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সারদা মল্লিক কি কাণ্ডই না করিয়াছিল, আর আজ ছোটলোকদের পাড়ায়ও ঘরে ঘরে লণ্ঠন—সেটা আর বিস্ময় নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটি। এমনি করিয়া ধান চাউলের বিনিময়ে ঘরে ঘরে লণ্ঠন, কাঁচের চুড়ি, গন্ধ তৈল প্রভৃতি সভ্যতার আনুসঙ্গিক আসবাব স্থান পাইয়াছে—চারিপাশে চলিতেছে অগ্রগতি—দ্রুত তীব্রগতিতে—

অন্যান্য জমিদারীর ইতিহাসের মতই ভগবতীর জমিদারীর ইতিহাস। চাঁদমোহন তাহার অংশ ভাগ করিয়া লইয়াছেন এবং আপনার পাওনা-গণ্ডা আদায় করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ও ব্যবসায় করিয়াছেন, ছেলেরা শিক্ষিত হইয়াছে। ভগবতীর দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ও দান ধ্যান বজায় করিতে ঘরের সম্পত্তি অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে—দরিদ্র প্রজাকে বহু জমি বিলি করিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে দেন নাই। ধর্ম্মকর্ম্মের মোহে বেকুবের মত নিজের সব কিছুই প্রায় নষ্ট করিয়া পরম আত্মতৃপ্তি লইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। চাঁদমোহন বুদ্ধি ও কৌশলে সম্পত্তি বাড়াইয়াছেন। বড় হইয়াছেন। হরি প্রথমে সম্পত্তির অংশ লইয়া শহরে বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেটা বিক্রয় করিয়া ভাড়া বাড়ী করিয়াছিলেন, —তাহা হইতে এখন যে উপার্জ্জন তাহা উল্লেখযোগ্য।

গোপাল অধিকতর বৃদ্ধ হইয়াছেন—গ্রামান্তরে যজমান রক্ষা তাহার পুত্রদ্বয়ই করিয়া থাকে তিনি কেবল নয়নতারার কাজগুলি নিজে করিয়া দেন এবং মাঝে মাঝে শাস্ত্র কথা বা ভাগবত শুনান। গোপাল সেদিন লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে যাইতেছিলেন, একবার জমিটা দেখিতে হইবে —সার প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে কিনা—

চৈত্রের মাঝামাঝি। বেশ গরম পড়িয়াছে—মাঠ তৃণ-শূন্য, গরুগুলি শুষ্ক মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোপাল মাঠের পানে যাইতে যাইতে দেখেন—কে একজন বসন্ত-সায়রের পাড়ে একটা পাকুড়গাছের ডাল কাটিতেছে। গোপাল বিস্মিত হইলেন এমন অনাচার কে করিতেছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন—কে পাকুড়ের ডাল কাট্‌ছিস্?

উপর হইতে নবীন কহিল—আমি বট ঠাকুর মশায়—

—পাকুড়ের ডাল কাট্‌ছিস্ কেন? এ যে মহাপাপ রে?

—কেনে ছাগল গরুগুলো কিছু খাবে—

—অন্য ডাল কাট, বনস্পতির ডাল কাটিস্ না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ছাড়া বট পাকুড়ের ডাল কাট্‌তে নেই। নেমে আয়—নেমে আয়—

নবীন বাউরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামিয়া আসিল। গোপাল কহিলেন—ধর্ম্মকর্ম্ম ত দেশে নেই-ই—আর থাক্‌বারও সঙ্গত কোন কারণ নেই। মানুষ পশুর মত কেবল নিজের স্বার্থ ও উদর নিয়েই ব্যস্ত। তবে যে কয়দিন আছি বলবো। শাস্ত্রে বলে বনস্পতি লাগানো এবং রক্ষা করা ধর্ম্ম, কারণ এতে সমাজের মঙ্গল, এই গাছের ছায়ায় বসেই ত দুদণ্ড জিরোবে গরমের সময়, কাজেই তার শাখা কাটা অধর্ম্ম—

গোপাল লক্ষ্য করেন নাই, কোন সময় চাঁদমোহন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোপাল পিছন ফিরিয়া যেন একটু ভীত হইলেন। শাস্ত্রবাক্য বলাটা হয়ত চাঁদমোহন পছন্দ করিবেন না। ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আয়রণম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার

শরীরচর্চ্চা ও শক্তি-সাধনা

জগতে যে যে-কাজই করুক না কেন, স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কাজেই তেমনভাবে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। দেশবিদেশের প্রত্যেকটী মনীষী, কর্মী ও ত্যাগী পুরুষ প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান—এঁদের মধ্যে কে স্বাস্থ্যহীন? পৃথিবীর সকল দেশই বিশেষ ভাবে যত্নবান স্বাস্থ্যের দিকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা করি এ বিষয়ে অবহেলা। প্রাচীনকালের মানুষের খবর নিলে দেখা যায় তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান শক্তিশীল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশে মনীষী জন্মেছেন, আজ বিংশ শতাব্দীতে নাই কেন? প্রত্যেক নরনারীই আজ স্বাস্থ্যহীন শক্তিহীন—এর মস্ত কারণ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা। তার চেয়ে বড় কারণ বৈদেশিক শাসন ও আমাদের জল বায়ুর প্রতিকূলে শিক্ষাধারা প্রচলন, ভেজাল খাদ্যাদি গ্রহণ এবং প্রকৃতির সংগে তাল মিলিয়ে না চলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনযাপন। আগেকার মানুষ প্রকৃতির সংগে চলত, করত কায়িক শ্রম, খেত পেট ভরে। যা খেত তাই হজম হত—তাই তারা সুস্থ সবল ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘ দিন কর্মক্ষম জীবনযাপন করত।

আজ এই প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণ, আমাদের জলবায়ুর প্রতিকুল খাদ্য গ্রহণ—তা ছাড়া যাও গ্রহণ করা হয় তাও ভেজাল—ইত্যাদির জন্য নানা রোগে মানুষের দিন দিন আকার ছোট, কর্মহীনতা ও সহনশীলতা কমে যাচ্ছে। আজ সারা দেশময় বিষাক্ত ঘায়ের বেদনা। একথা সকলেরই জানা আছে যে আমরা যা খাই তা যদি ঠিক ভাবে হজম হয় তাহলেই মোটামুটী স্বাস্থ্য ভাল চলতে পারে ও দৈহিক মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সহরের লোক অধিকাংশই কায়িক শ্রম করে না, এমন কি অনেক গ্রামে সহুরে হাওয়া লাগায় গ্রামের অনেকেও এখন কায়িক শ্রম করতে অপমান মনে করে—ছোট কাজ বলে মনে করে। কায়িক শ্রমের অভাবে ও অপ্রাকৃতিকভাবে জীবনযাত্রার জন্য আজ স্বাস্থ্যহীনতার ঘটাঘটী। যারাই কায়িক শ্রম করে, তারা ডাল ভাত খেয়ে স্বাস্থ্যের অধিকারী। মানুষ যা খায় তা যদি ঠিক ভাবে হজম না হয় আস্তে আস্তে দৈহিক ক্ষমতা কমে যায় এবং দিন দিন মগজ পরিচালনার ক্ষমতাও হ্রাস হতে থাকে। যৌবনে হয়তো কেউ কেউ স্বাস্থ্যহীনতাটা উপলব্ধি করে না, কিন্তু যৌবনান্তে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কর্মজীবনে বিফলতাই লাভ করে থাকে বেশী। অনেকের ধারণা পেট বুটবাট করলে, পাতলা পায়খানা হলে বুঝি বদহজম—তা কিন্তু নয়; কোষ্ঠ ভাল ভাবে পরিষ্কার না হলেই পূর্ণ বদহজমের লক্ষণ। এই হজমশক্তি বৃদ্ধি হলেই মানুষ নিয়মিত পরিমিত ডাল ভাত মাছ তরীতরকারী চিড়ে মুড়ি ফলাদি যা খায় তাতেই সবল সুস্থ থাকতে পারে। কিন্তু সেই হজমশক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টা কি তেমন ভাবে করা হয়? অন্নসংকট বস্ত্রসংকট অর্থসংকটের দিনে সবাই এই সব সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। কিন্তু এ কথাটা কি ভাবা উচিত নয় যে—এই সংকটের সমাধান যিনি করবেন সেই দেহই যদি ভাল না থাকে বা চালু না থাকে বা কর্মক্ষম না থাকে তাহলে সংকটের সমাধান না হয়ে সংকট লেগেই থাকবে।

সুস্থ সবল দেহীরা শুধু নিজেরাই ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হন না, তাঁরা জগতের অশেষ কল্যাণও সাধন করে থাকেন। নিত্য কায়িক শ্রমাভাবে ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করে যারাই স্বাস্থ্যহীন—তাদের প্রত্যেকেরই নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা দেহটীকে সুস্থ সবল কর্মক্ষম করাই হল ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হবার একমাত্র পথ। তা বলে যারা স্বাভাবিকই সুস্থ কর্মক্ষম, তারা যে ব্যায়াম করবে না তা নয়।

রোগী সুস্থ দুর্বল সবল বুড়া যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী প্রত্যেকেরই বয়স, সহনশীলতা, দেহের গঠন ও সত্ত্বের উপর নির্ভর করে নিত্য নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিমিত আহার নিতান্ত প্রয়োজন।

ব্যায়াম করতে হবে বলেই যে কুস্তি গদা লাঠী বারবেল রিং ৫০০ শত গুণ দিতে হবে, তা কিন্তু নয়।

শরীর সুস্থ সবল কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলাই হল ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। এজন্য যার যার শরীর উপযোগী ব্যায়াম বেছে নিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন দেহীর রুচী, বুদ্ধি, সহনশীলতা, গঠন যেমন ভিন্ন ব্যায়ামও, তেমন ভিন্ন—তবে কতকগুলি ব্যায়াম আছে যা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

আমার মতে সাধারণ স্বাস্থ্য, মগজ পরিচালনার ক্ষমতা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি বা ঠিক রাখার জন্য আমাদের দেশীয় ব্যায়ামই ভাল। যন্ত্রপাতির ব্যায়ামে শরীর গঠিত হয় দ্রুত, নষ্টও হয় তেমন দ্রুত—তাছাড়া অনেক সুন্দর-দেহী শক্তিশালী ব্যক্তিকেই দেখা যায় একটু বয়সে তাদের দেহ তো ঠিক থাকেই না—কর্মক্ষমতাও তেমন থাকে না। তখন শুধু বিগত যৌবনের গরব নিয়েই তাদের কাটাতে হয়। ইহা ছাড়া অনেককে আবার নানাপ্রকার রোগের সহচরও হতে দেখা যায়। এমন কারণে ব্যায়ামের উপর অনেকেরই ভীতি আছে। যৌবনে দেহ দ্রুত সুন্দর করার জন্য বেশী খাটিয়ে শেষ বা মধ্য বয়সে অনেক সুন্দর দেহীর দেহ-বিকৃতি ঘটে থাকে ও অপ্রয়োজনীয় মেদ হয়ে কর্মক্ষমতা কমে যায়। ব্যায়াম করে যদি সাধারণ লোকের চেয়ে অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতা না থাকে এবং দীর্ঘ দিন দেহ ও মগজ না খাটানযায় তাহলে ব্যায়াম করে লাভ কি?

এমন ভাবে ব্যায়াম করা উচিত যাতে পেশীতে অধিক চাপ না পড়ে, প্রত্যেকটী শিরা-উপশিরা স্নায়ুগ্রন্থি সন্ধিস্থল বিশেষ ভাবে সক্রিয় থাকে। যকৃত সুস্থ থাকে ও হজমের কোন গোলমাল না হয়। ব্যায়াম সুরু

করার পূর্বে দেখতে হয় দেহে কোন রোগ বা ত্রুটী আছে কিনা? থাকলে রোগ-প্রতিষেধক ব্যায়াম দ্বারা ঐ সব দূর করে নিয়ে তার পর ক্রমবর্দ্ধন ব্যায়াম সহনশীলতা বাড়বার সংগে সংগে করতে হয়। আমাদের দেশীয় ব্যায়াম আমাদের পক্ষে যত উপযোগী এমন আর কোনো ব্যায়াম আছে কিনা জানিনা, দেহের ভীত-গড়ন, সহনশীলতা ও রোগহীন করতে আমাদের দেশীয় ব্যায়ামই অতি চমৎকার—নির্দোষ। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামে শরীরের গঠন খুব দ্রুত পুষ্ট হয় না বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ স্নায়ু পেশী প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সক্রিয় করে ও ধীরে ধীরে উন্নতি দৃষ্ট হয়, যে উন্নতিটুকু হয় তা সহসা নষ্ট হয় না। দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আমাদের দেশীয় ব্যায়ামে পেশীর উপর অধিক চাপ পড়ে না। স্নায়ু-গ্রন্থি সন্ধিস্থল প্রভৃতি সক্রিয় হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়—মগজ পরিচালনার ক্ষমতা, দেহের ও মনের বলবৃদ্ধি পায়।

রোগহীন দেহে ব্যায়াম ছাড়া যে কোন প্রকার কায়িক শ্রম করলেও স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে। গ্রামের চাষী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যাদের কায়িক শ্রম করে খেতে হয় তারা কলম-পেশা চাকরীজীবীদের চেয়ে অনেক সুস্থ। দৈহিক শ্রম করে তাদের কোন কোন পেশী ও স্নায়ুর অধিক খাটুনী হয়, আবার কোন কোন স্নায়ু ও পেশীর তেমন খাটুনী হয় না—সেইজন্য ঐ নিষ্ক্রিয় স্নায়ু পেশীকে সক্রিয় করার জন্যই ব্যায়াম করা প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে এরূপ অবস্থায় অধিক শ্রমের পর, আবার ব্যায়াম করে শ্রম করলে কি শ্রম অধিক হয় না? আমি বলব অল্প শ্রমে যাতে পেশী স্নায়ু সবল হয় এইরূপ ব্যায়ামই করা দরকার। সে জন্য আমাদের দেশীয় বহুবিধ ব্যায়ামই আছে, তার মধ্যে বিনা ক্লেশে ও স্বল্প সময়ব্যয়ে যোগব্যায়ামই শ্রেষ্ঠ। যোগব্যায়ামের কথা পরে বলা যাবে। যে কোন ব্যায়ামের কথা বল্লেই অনেক শিক্ষার্থী চাকরী-জীবী বলে থাকেন সারাদিন কলম পেশা পড়াশুনা—এর পর আবার ব্যায়াম করা চলে কি? যারা এইরূপ ধারণা নিয়ে ব্যায়াম করে না তাদের হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনাই রোগগ্রস্ত—হয় তো অনেকানেক রোগই অনুভূত হয় না—গাসয়া হয়ে যায়। কিন্তু দিন দিন জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে শেষে মগজ পরিচালনার ক্ষমতাও থাকে না। কোন কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম না করে যারা শুধু মগজ পরিচালনা করেন তাদের স্বাস্থ্য-হীনতার জন্য মগজ ও কর্ম্মহীন ক্ষমতাশূন্য হতে পারে। আবার যারা শুধু ব্যায়াম নিয়ে পড়ে থাকে বা দিনরাত্র কায়িকশ্রম করে, মগজ পরিচালনা মোটেই করে না—তাদের দৈহিক শক্তি হতে পারে, স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে—কিন্তু লেখাপড়া তেমন হয় না—মগজের ক্ষমতাও তেমন প্রসারতা লাভ করে না। তার মগজের ক্ষমতা তেমন না থাকতে পারে, সে বুদ্ধিহীন কেবল হয় না বা রোগের সেবায় অকালে চোখ বোজে না।

আমার মতে কোনটা বাদ দিয়েও কোনটা করা উচিত নহে, দৈহিক ও মানসিক শক্তির সম ভাবেই বিকাশ করা উচিত। যে যে বিষয়ে বেশী যত্ন নেয় তার সে বিষয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবহেলা করে যে শুধু মগজ নিয়ে থাকে তার ধীরে ধীরে সবই নষ্ট হয়ে যায়।

তাই যাতে সমস্ত পেশী শিরা-উপশিরা গ্রন্থি সন্ধিস্থল প্রভৃতির সুচারুরূপে ব্যায়াম হয় সেইরূপ ভাবেই ব্যায়াম করা উচিত। বর্ত্তমানে নানা কারণে মানুষের জীবনী শক্তি কমে গেছে তাই এমন ভাবে ব্যায়াম করা উচিত, যাতে শ্রম হয় কম—অর্জ্জন হয় বেশী এবং জীবনী শক্তি পায় বৃদ্ধি।

সেরূপ ব্যায়াম করতে হলে যোগব্যায়াম ছাড়া অন্য কোন ব্যায়াম আছে কিনা জানা নেই। ভারতের আর্য্যঋষিদের প্রবর্ত্তিত এই যোগ-ব্যায়ামের মত নির্দোষ ব্যায়াম আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা শরীর বিজ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট। যোগব্যায়াম দ্বারা যে কোন রোগ দূর হয় এবং রোগ হতেও পারে না। তাছাড়া শরীরকে এমন ভাবে গঠিত করে যে শরীর দীর্ঘদিন নীরোগ কর্মঠ থাকে এবং সহসা কোন জটিল ব্যাধিও আক্রমণ করতে পারে না, যোগব্যায়ামে দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ নষ্ট করে এবং হতেও দেয় না। নানা ব্যাধি তো দূর করেই—তা ছাড়া বিকলাংগতাও দূর হয়।

ঋষিপ্রবর্ত্তিত এই যোগব্যায়ামের কথা শুনে অনেকেই ভয় পেয়ে থাকেন, তার কারণ এই ব্যায়াম নানা কারণে আমাদের দেশ হতে লুপ্ত হয়ে যায়। ইহা গুপ্ত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সাধুসন্ন্যাসীদের নিকট লুপ্ত থাকে। গুরুগিরি ব্যবস্থার জন্য সাধুসন্ন্যাসীরা ইহা পরম ভক্ত ছাড়া কাউকে শিক্ষা দিতেন না। তাছাড়া যে সমস্ত গৃহীকে শিক্ষা দিতেন তাদের পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না এজন্য অধিকাংশ স্থলেই কুফল হত। তার কারণ সাধুসন্ন্যাসী গৃহত্যাগীদের জীবন-যাত্রা প্রণালী এক প্রকার, গৃহীদের অন্য প্রকার। গৃহীদের দেহ একভাবে গঠিত সাধুদের অন্যরূপ। কোন কোন স্নায়ুকে সাধুরা নির্জীব করে দেন, গৃহীদের সমস্ত স্নায়ুকেই সজীব রেখে নিজ আয়ত্তে রাখতে হয়। গৃহীদের খাদ্য একরূপ সন্ন্যাসীদের অন্যরূপ। সাধুদের যে ভাবে আসন অধিকক্ষণ করতে হয় গৃহীদের সে আসন ততক্ষণ করতে নেই। অনেক আসন আছে যা সন্ন্যাসীদের করণীয়—গৃহীদের তা করণীয় নহে। বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন গৃহী এরূপ ভাবে শিক্ষালাভ করে কেহ কেহ এই সব কারণে কুফল পাওয়াতে যোগব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। তাছাড়া অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজেদের বাহাদুরীর জন্য পুথিগত বিদ্যার জোরে পাত্রাপাত্র বিচার না করে শিক্ষা দেওয়ায় অনেকেই কুফল পেয়ে এবিষয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন।

কয়েক বৎসর পর যোগব্যায়ামের প্রসারতা বেশ লাভ করেছে, জন-সাধারণ গ্রহণও করছেন। এই জনপ্রিয়তার জন্য অনেকেই—যাদের কোন দিন যোগব্যায়াম করতে বা কাউকে করাতে দেখা যায় নি তারাও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছে। তাতে ভাল যত হয় ততই দেশের মংগল। কিন্তু ভুল ভাবে শিক্ষা পেয়ে কেহ কুফল না পায়।

এতে কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি ভুল হলে এবং ভাল অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষার দোষে কুফল হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক গৃহীই যেন কোন আসনই একবারে একটানা তিন মিনিটের বেশী না করেন ও শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক থাকে। প্রতি আসন করার পরই যেন অবশ্য শবাসন করা হয়। রোগী, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, শিশু সুস্থ ব্যক্তি প্রভৃতির একই ধারায় একই প্রকার আসন করণীয় নহে। হয়তো আবার একই আসন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবে অথবা সময়ের তারতম্য করে করতে হয়। যে কোন অবস্থায় যে কোন বয়সী লোকই যোগ-ব্যায়াম করতে পারে। এ বিষয়ে পরে বলব।

ভল্‌গা বোটম্যান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ডাক :

আয় ওরে আয়, আয় যমুনায়।
বাঁশি ডাকে শোন্ উভরায়।
আয় ওরে আয়, নীল যমুনায়
বাঁশি ডাকে : "সব ছেড়ে আয়।"
শোন্ কান পেতে শোন্ গায় শ্যামরায় :
"সব যে হারায় সে-ই সব পায়
আয় ওরে আয় আয়
আয় সব ছেড়ে আয়
চায় যে শরণ চরণ পায়।"

আয়ে হম আয়ে, বাঁসরি বুলায়ে।
দূর কহিঁ পার স্থনো সাঁৱলিয়া গায়ে।
আয়ে হম আয়ে, বাঁসরি বুলায়ে
দূর কহিঁ পার স্থনো সাঁৱলিয়া গায়ে।
প্রীতকি রীত স্থনো মুরলি স্থনায়ে :
"হারে প্রেমী সভি তভি সভি পায়ে।"
আয়ে হম আয়ে আয়ে
আয়ে হম আয়ে আয়ে
চাহে জো শরণ চরণ পায়ে।

সাড়া :

ধায় মন ধায় নীল যমুনায়
যেথা থাকে আজ শ্যামরায়
ধায় মন ধায়, ধায় মন ধায়
যেথা ডাকে বাঁশি সেথায়।
দাও নাথ দাও দাও ঠাঁই রাঙা পায়,
দাও হে শরণ-- চায় অসহায়।
চায় মন আজ চায়
চায় ঠাঁই রাঙা পায়
জীবন মরণ সঁপি' সেথায়।

চায়ে মন চায়ে---পার জানা চায়ে
যমনাকে পার জহাঁ সাঁৱরা বুলায়ে।
চায়ে মন চায়ে—আজ জানা চায়ে
চলা উস্ ওর জহাঁ বাঁসরিয়া গায়ে।
আয়ে নাথ আয়ে হম বনে অসহায়
শরণ দেনা শ্যাম আজ লগে তেরে পায়ে
আয়ে হম্ আয়ে আয়ে,
পী তেরে চরণ পায়ে,
জীনা মরনা সোঁপনে আয়ে।

বাংলা গানটি ও তার ইন্দিরা দেবী কৃত হিন্দী অনুবাদটি বিশ্ববিখ্যাত Volga Boatman গানটির স্থরে বসানো হয়েছে। এ গানটিকে বলা যেতে পারে রুষদেশের ভাটিয়ালি বা সারি গান, অর্থাৎ জলের গান, মাঝির গান। রুষ গানটির স্থরে নিহিত আছে ভাটিয়ালি স্থরের বৈরাগ্য। "এএ উখ্ নেম্" ব'লে ওরা দাঁড় টেনে গেয়ে চলে এ গানটি রুষ ভাষায় (আয় ওরে আয়) ঠিক "এ এ উখ নেম্"-এর স্থরে বসানো হয়েছে। কোনো কোনো রুষ গানের সঙ্গে আমাদের গানের স্থরের কোথায় যেন একটা গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ গানটি সেই সাদৃশ্যের আর একটি দৃষ্টান্ত।

জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I

আ য় ও রে আ - - য় আ য় য মু না - - য়

ধা য় ম ন ধা - - য় নী ল য মু না - - য়

জ্ঞা -া দা -া | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I

বাঁ - শি - ডা - কে - শো ন্ উ ভ রা - - য়

যে - থা - ডা - কে - আ জ শ্যা ম রা - - য়

জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I

আ য় ও রে আ - - য় নী ল য মু না - - য়

ধা য় ম ন ধা - - য় ধা য় ম ন ধা - - য়

জ্ঞা -া দা -া | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I

বাঁ - শি - ডা - কে - স ব ছে ড়ে আ - - য়

যে - থা - ডা - কে - বাঁ - শি সে থা - - য়

জ্ঞা ৷ -া ঋা | সা ণ্া দ্া -া I দা -া জ্ঞা জ্ঞা | সা -া -া -া I

শো - ন্ কান্ পে তে শো ন্ গা য় শ্যা ম রা - - য়

দা - ও নাথ দা ও দা ও ঠাঁ ই রা ঙা পা - - য়

জ্ঞা -া -া ঋা | সা ণ্া দ্া -া I দ্া -া জ্ঞা -া | সা -া -া -া I

স - ব্ যে হা - রা য় সে ই স ব পা - - য়

চা - ও হে শ - র ণ চা য় অ স হা - - য়

মা -া মা মা | সা -া সা -া I দা -া পা মা | জ্ঞা -া সা -া I

আ য় ও রে আ য় আ য় আ য় ও রে আ য় আ য়

চা য় ম ন আ জ চা য় চা য় ঠাঁ ই রা ঙা পা য়

জ্ঞা -া দা -া | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা সা -া | সা -া -া -া I

চা য় যে - শ - র ণ চ - র ণ পা - - য়

জী - ব ন্ ম - র ণ্ সঁ - পি সে থা - - য়

জ্ঞা সা মা -া | সা -া -া -া I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I

আ য়ে হ ম্ আ - - য়ে বাঁ স রি বু লা - - য়ে

চা য়ে ম ন্ চা - - য়ে পা র জা না চা - - য়ে

জ্ঞা -া দা -া | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I
দূ র ক ছিঁ পা র সু নো সাঁ ব লি য়া গা - - য়ে
য মু না কে পা র জ হাঁ বাঁ স রি বু লা - - য়ে

জ্ঞা সা মা -া | সা -া -া -া I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I
আ য়ে হ ম্ আ - - য়ে বাঁ স রি বু লা - - য়ে
চা য়ে ম ন্ চা - - য়ে আ জ জা না চা - - য়ে

জ্ঞা -া দা দা | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা মা মা | সা -া -া -া I
দূ র ক ছিঁ পা র সু নো সাঁ ব লি য়া গা - - য়ে
চ লা উ স্ ও র্ জ হাঁ বাঁ স রি য়া গা - - য়ে

জ্ঞা -া ঋা ঋা | সা ণ্া দ্া -া I দ্া দ্া জ্ঞা জ্ঞা | সা -া -া -া I
প্রী - ত কি রী ত সু নো ম্ র লি সু না - - য়ে
আ য় না থ আ য়ে হ ম্ ব নে অ স হা - - য়

জ্ঞা -া ঋা -া | সা ণ্া দ্া দ্া I দ্া দ্া জ্ঞা জ্ঞা | সা -া -া -া I
হা - রে - প্রে মী স ভি ত ভি স ভি পা - - য়ে
শ রণ দে না শ্যা ম আ জ ল গে তে রে পা - - য়ে

মা মা মা -া | সা সা মা মা I দা দা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা সা সা I
আ য়ে হ ম্ আ য়ে আ য়ে আ য়ে হ ম্ আ য়ে আ য়ে
আ য়ে হ ম্ আ য়ে আ য়ে পী - তে রে চ রণ পা য়ে

জ্ঞা -া দা দা | পা দপা মা পমা I জ্ঞা সা মা -া | সা -া -া -া I
চা - হে জো শ - র ণ্ চ - র ণ্ পা - - য়ে
জী - না - ম র না - সোঁ - প নে আ - - য়ে
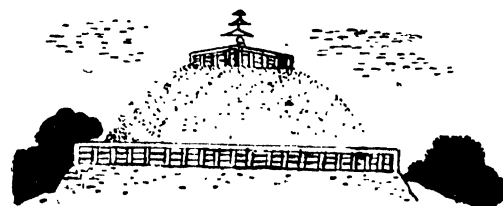
দু'ফোঁটা রক্ত

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

(রহস্য গল্প)

—এক—

রাত প্রায় বারটা নাগাদ প্রিয়নাথ অধিকারীর ওখান হ'তে নিমন্ত্রণ খেয়ে কিরীটি এসে শুয়েছিল এবং টেলিফোনের মুহুর্মুহুঃ শব্দে ঘুম যখন ভাঙ্গল রাত তখনও শেষ হয়নি। শেষ রাতের পাত্‌লা অন্ধকারের পর্দাটা প্রকৃতি জুড়ে থির থির করে কাঁপছে। একান্ত বিরক্ত চিত্তেই ঘুম-জড়িত চোখে হাত বাড়িয়ে শিয়রের ধারে ত্রি'পয়ের 'পরে রক্ষিত টেলিফোনের রিসিভারটা টেনে নিল: হ্যালো?

'মিঃ রায় আছেন কি?—' চাপা পুরুষ কণ্ঠে অস্পষ্ট প্রশ্নটা ভেসে এলো।

'বলুন। কথা বলছি।—'

'ডোভার লেন থেকে কথা বলছি। প্রিয়নাথবাবু মারা গেছেন।—' স্তম্ভিত বিস্মিত কিরীটিকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ মাত্রও না দিয়েই অকস্মাৎ যেমন তারের বুকে শব্দ তরঙ্গ জেগে উঠেছিল তেমনি অকস্মাৎই আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল। কেবল অন্য প্রান্তে ঠুং করে একটি শব্দ জাগল মাত্র ফোনের রিসিভারটি রেখে দেবার।

কিরীটি কিন্তু ততক্ষণে শয্যার 'পরে সোজা হয়ে উঠে বসেছে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে: হ্যালো। শুনছেন, হ্যালো?

কিন্তু বৃথাই। আর কোন সাড়া শব্দই অপর প্রান্ত হতে এলো না। কিরীটি শয্যার পরে বসে বসেই তখন অগত্যা আর একবার আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করলে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত। ডোভার লেনের প্রিয়নাথ অধিকারী তার যথেষ্ট পরিচিত। সামনের ত্রি'পয়ের 'পরে রক্ষিত রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত টাইম পিসটার দিকে তাকাল: সাড়ে চারটে।

গ্রীষ্মের রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক আগেও কিরীটি ভদ্রলোককে জীবিত দেখে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এবং সাড়ে নয়টায় আহারাদির পর রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এক সঙ্গে বসে দাবা খেলেছে। তারপর শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি হলো যে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আর কেইবা ফোন করলে এবং অমন করে হঠাৎ কথা না শেষ করে ফোন ছেড়েই বা দিল কেন? প্রিয়নাথের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হলেও অকৃতদার কর্মঠ প্রিয়নাথের শরীরে কোথাও বার্দ্ধক্য তার দাঁত বসাতে পারেনি। এখনো অটুট স্বাস্থ্য। সাধারণ প্রৌঢ়দের ইদানীং যে রোগটি—রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে তাও ত তাঁর নেই। এখনো প্রত্যহ খুব ভোরে শয্যা ছেড়ে উঠে মাইল দুই প্রাতঃভ্রমণ করে আসেন। প্রচুর খেতে পারেন এবং এই বয়সেও ভাইপোদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে কাঠের ব্যবসা সুরু করেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী। নীরোগ, সুস্থ এবং সুখী লোকটা।

কিরীটি ফোনটা তুলে নিল এবং প্রিয়নাথের বাড়ির নাম্বারটা চাইলে। কিন্তু অপর প্রান্তে রিং অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেলেও কোন জবাব পাওয়া গেল না। অপারেটার বললে: 'No reply!'

এবারে আরো বিস্মিত হলো কিরীটি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকি দিলে। কিরীটি আর দেরী করে না। গায়ে জামা চাপিয়ে উঠে পড়ে এবং সোজা নিচে নেমে এসে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

ডোভার লেনে কিরীটি যখন এসে পৌছাল 'অধিকারী লজের' কারোই বড় একটা তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। আমেরিকান স্টাইলের সামনে লনওয়ালা দোতালা শাদা রংয়ের কংক্রিটের বাড়ি। গাড়ি-বারান্দায় এসে গাড়ি থামাতেই প্রিয়নাথের পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ যোগেশের সঙ্গে দেখা হলো। যোগেশ সবে ঘুম হ'তে উঠে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই যে যোগেশ, তোমার বাবু কেমন আছেন?—'

'বাবু! কেন ভালই আছেন এখনও ত ঘুমাচ্ছেন—কাল অনেক রাত্রে শুয়েছেন তাই এখনও হয়ত ওঠেন নি।—'

যোগেশের কথায় কিরীটি যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে মনে মনে সকৌতুকে ভাবে:

থাক্। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বেশ একটু কৌতুক করা যাবে। মুখে বলে: চল উপরে যাওয়া যাক।

দোতলায় একেবারে টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে প্রিয়নাথবাবুর ঘরের সামনে এসে কিন্তু দেখা গেল ভিতর হ'তে ঘরের দরজা বন্ধ। এখনো ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গেনি আশ্চর্য! চিরদিন খুব ভোরে ওঠাই ত ওর অভ্যাস।

'কই হে যোগেশ! তোমার বাবুর যে এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি দেখছি!—'

'তাই ত!—' যোগেশ মৃদু করাঘাত করে বন্ধ দরজায় এবং ডাকে: বাবু! বাবু!—

কিন্তু কোন সাড়া নেই। এবারে জোরে জোরে করাঘাত করে ডাকে: বাবু! বাবু! কিরীটিবাবু এসেছেন!

না, কোন সাড়া নেই।

'প্রিয়নাথবাবু! প্রিয়নাথবাবু!—' কিরীটিও নাতি-উচ্চকণ্ঠে দরজায় করাঘাত করে ডাকে।

আশ্চর্য! তবু কোন সাড়া নেই।

যোগেশ এবারে পাশের জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল এবং জানালার ভেজান পাল্লা দু'টো ঠেলে খুলে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বিস্মিত কণ্ঠে বললে: আশ্চর্য বাবু ত দেখছি চেয়ারে বসে আছেন—

চকিতে কিরীটি যোগেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং খোলা জানালা পথে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে: বড় একটা হেলান-দেওয়া চেয়ারে বসে আছেন প্রিয়নাথ—দেহের বাম অংশ ও সম্মুখের টেবিলের 'পরে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি মাত্র দেখা যাচ্ছে।

কিরীটি ও যোগেশ দু'জনেই উচ্চকণ্ঠে ডাকে, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না প্রিয়নাথ অধিকারীর। এদিকে ততক্ষণে পাশের ঘরের দরজা খুলে প্রিয়নাথের ভাইপো বিমল বের হ'য়ে এসেছে। ব্যগ্রকণ্ঠে শুধায়: কি! ব্যাপার কী?

যোগেশ কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে: বাবু! বাবুকে এত ডাকছি সাড়া দিচ্ছেন না।

'সাড়া দিচ্ছেন না? সে কি!—' উৎকণ্ঠিত বিমল জানালার সামনে এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকে: জেঠামণি! জ্যাঠা!··

না। সাড়া নেই।

ক্রমে একে একে বাড়ির অন্যান্য সকলেই উঠে এসে ঘরের সামনে ভিড় করে। প্রিয়নাথের আর দুই ভাইপো বিকাশ ও বিমান এবং ভাইঝি সুজাতা। এমন কি প্রিয়নাথের ছোট ভাই অমিয়নাথের বিধবা স্ত্রী সরমা দেবী, যাকে গত তিন বৎসর ধরে এই বাড়িতে নিয়মিত আসা যাওয়া সত্ত্বেও একটি দিনের জন্য বা এক লহমার জন্যও কিরীটি কখনো যার ছায়া মাত্রও দেখেনি অথচ প্রতি মুহূর্তে যার নিরন্তর সেবারত অদৃশ্য সেবা ও যত্নের নিদর্শন পেয়েছে সেই রহস্যময়ী মধ্যবয়সী নারীও এক সময় এসে নিঃশব্দে সকলের থেকে কিছু দূরত্ব রেখে একটি পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছোট খাটো মানুষটি। পরিধানে শুভ্র থান, নিরভরণা, অর্ধেক কপাল পর্যন্ত ঘোমটা। কিরীটি সরমার দিকে তাকিয়ে সত্যিই বিস্মিত হয়: কেবলমাত্র সুন্দর বললেই বোধ হয় সবটুকু বলা হলো না। আগুনের মত উজ্জ্বল সে রূপ অথচ চন্দনের মতই স্নিগ্ধ। ঈষৎ ঘোমটার সীমানা অতিক্রম করে কুঞ্চিত অলকের কয়েক গাছি কপালের দু'পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে। দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠ। ধারালো চিবুক—টিকোল নাসা। বোবা দৃষ্টিতে কি এক মূক প্রশ্ন। বয়স তার যাই হোক, যৌবন যেন এখনও মনে হয় সমগ্র দেহটিকে আঁকড়ে রয়েছে। কে বলবে তিনি বিমল, বিকাশ, বিমান ও সুজাতাদের মা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিরীটির পরামর্শেই ডিঃ ইনেসপেক্টার সলিল সেন ও স্থানীয় থানার O. C. সুদর্শন রক্ষিতকে সংবাদ দেওয়া হলো। তাঁরাই এসে ঘর খুলবেন। এ অবস্থায় নিজেরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা আইন-সংগত হবে না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই একে একে সকলে এসে হাজির হলেন এবং পুলিশের লোকই দরজাটা ভেঙ্গে ফেলল। সলিল সেন, সুদর্শন রক্ষিত ও কিরীটি তিনজনে সর্বপ্রথম ঘরে প্রবেশ করে। প্রথমেই কিরীটি তার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের সবত্র একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

শয্যা হ'তে অল্প দূরে হাত চার পাঁচ ব্যবধানে গদি মোড়া প্রশস্ত ব্যাকওয়ালা যে চেয়ারটার 'পরে সাধারণত প্রিয়নাথ বিশ্রাম করতেন বসে—সেই চেয়ারটার 'পরেই হেলান দিয়ে বসে আছেন। মাথাটা একটু হেলে আছে। ডান হাতটা সামনের চৌকো শ্বেতপাথরের টেবিলটার 'পরে প্রসারিত এবং ঠিক প্রসারিত হাতের কাছে একটি ঘড়ি বসান টেবিল ল্যাম্প। ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছে। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলছে। টেবিলের 'পরে খানিকটা দুধ ছড়িয়ে আছে; কিছু অংশ তার শুকিয়ে গিয়েছে—কিছুটা এখনো শুকায় নি এবং ঠিক নিচে চেয়ারের পাশে একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে পড়ে আছে। মৃতের চোখে মুখে একটা বিরক্তি ও কষ্টের চিহ্ন তখনও যেন লেগে আছে। পরিধানে একটা মিহি ফরাসডাঙ্গার শৌখীন ধুতি ও গায়ে হাফহাতা পাতলা নেটের গেঞ্জী, কোলের 'পরে একটা ফাইল পড়ে আছে। পায়ে জাপানী ঘাসের চপ্পল।

সলিল সেন ঝুকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করছিল কিরীটি তাকে সাবধান করে দেয়: সাবধান সলিল, কাঁচের টুক্‌রো ছড়িয়ে আছে।

কিরীটি অতঃপর ঝুঁকে নিচু হয়ে মেঝেতে কি যেন দেখবার চেষ্টা করেঃ হঠাৎ তার নজরে পড়ে মেঝেতে দু' ফোঁটা রক্তের দাগ কালো হয়ে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। আর কোন পায়ের ছাপ বা অন্য কিছু তার নজরে পড়ে না। মৃতদেহও কিরীটি পরীক্ষা করে হঠাৎ নজরে পড়ে মৃতের প্রসারিত ডান হাতের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে। তর্জ্জনীর অগ্রভাগে ছোট্ট একবিন্দু পরিমাণ রক্ত জমে আছে কালো হ'য়ে।

মেঝের 'পরে ছড়ানো ভাঙ্গা গ্লাসের কাচের একটা বড় টুক্‌রোর মধ্যে তখনও সামান্য যে দুধ ছিল সেটা আলাদা করে Chemical analysisয়ের জন্য কিরীটির পরামর্শে সরিয়ে রাখা হলো। প্রাথমিক তদন্তের পরে এবারে সকলের জবানবন্দী। কিরীটি একসময় প্লাগ্ খুলে টেবিল ল্যাম্পটাও নিভিয়ে দিল।

প্রিয়নাথ অধিকারীর সঙ্গে কিরীটির আজ বছর তিনেক আলাপ। দক্ষিণ কলকাতার এক ক্লাবে দাবার আসরে প্রথম অধিকারীর সঙ্গে কিরীটির পরিচয়। পরে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় হয় পরিণত। পরস্পরের দাবার নেশাই পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। সেই হতেই মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এ বাড়িতে কিরীটির যাতায়াত সুরু হয়। পিতার দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তন সংগ্রামই একদিন প্রথম যৌবনে প্রিয়নাথকে যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনের কঠোর প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সেই কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহাজে খালাসীর চাকরী নিয়ে প্রিয়নাথ বর্মা-মুলুকে পাড়ি জমান। প্রিয়নাথের পিতা তার এক বাল্য-বন্ধুর মেয়ে সরমার সঙ্গে প্রিয়নাথের বিবাহ দেবেন স্থির করেছিলেন। দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের ফলে প্রিয়নাথ ও সরমার মধ্যে আলাপ পরিচয়ও ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ প্রিয়নাথ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় এবং তিন বৎসর পর্যন্ত তার আর কোন সংবাদ না পাওয়ায় শেষটায় কথা রাখবার জন্য কনিষ্ঠ পুত্র অমিয়নাথের সঙ্গেই সরমার বিবাহ হলো। প্রিয়-নাথের সংবাদ পাওয়া গেল দীর্ঘ বার বৎসর বাদে—অমিয়নাথ যখন সামান্য কেরাণীর আয়ে চারটি সন্তান নিয়ে নিত্য অভাব অভিযোগের মধ্যে দিশেহারা হ'য়ে উঠেছেন।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের নিকট হ'তে সৌভাগ্যের সংবাদ বহন করে ঐ সঙ্গে দশ হাজার টাকার এক ড্রাফ্‌ট্ পিনযুক্ত হয়ে পিতার কাছে এল চিঠিঃ বাবা, না বলে চলে এসেছিলাম বলে ক্ষমা করবেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দারিদ্র্যকে জয় করে আপনার চরণে প্রণত হবো। প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হয়েছে। আর একটা কথা, সরমার যদি এখনো বিবাহ না হ'য়ে থাকে তবে জানাবেন।

কিন্তু হায় এই সৌভাগ্যের আনন্দ গ্রহণ করতে হতভাগ্য পিতা তখন আর জীবিত ছিলেন না। সাত বৎসর পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছিল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শরীর ভেঙ্গে গিয়ে। জবাব এলো অমিয়নাথের কাছ হ'তে এবং অতি সংকোচের সঙ্গে ছোট্ট একটি কথায় চিঠির শেষাংশে সে জানাল—সরমা তারই স্নেহের ভ্রাতৃবধূ এখন।

ঐ চিঠির জবাব প্রিয়নাথ আর দেননি, তবে নিয়মিত ভাইয়ের নামে এরপর হ'তে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। সেই অর্থেই ডোভার লেনে বছর তিনেক বাদে বাড়ি হলো, কিন্তু বাড়ি শেষ হওয়ার মাস চারেক বাদেই অমিয়নাথ হঠাৎ একদিন রক্তচাপ-আধিক্যে মারা গেলেন। তারও অনেক পরে গত মহাযুদ্ধের হিড়িকে প্রকাণ্ড ব্যবসা ও বাড়ি ঘর-দুয়ার ও সেখানকার ব্যাংকে গচ্ছিত সমস্ত কিছু ফেলে কেবলমাত্র প্রাণটি হাতে করে যাঠের কোঠা পেরিয়ে দীর্ঘকাল পরে প্রিয়নাথ আবার বাংলা দেশে ফিরে এলেন। সমস্ত কিছু হারিয়েও কলকাতার ব্যাংকে তখনও তাঁর যা গচ্ছিত ছিল তাও লক্ষাধিকের উপরে। বড় ভাইপো বিমলের বয়স ৩২, মেজ বিকাশের ২৯, বিমানের ২৫ এবং ভাইজি সুজাতার বয়স বছর একুশ।

বিমল বাপ-মার আদরে লেখাপড়াও যেমন বিশেষ কিছু করেনি তেমনি অলস প্রকৃতির ও অমিতব্যয়ী এবং বিলাসী। ইলেকট্রিক মেকানিক কিছু কিছু জানে এবং নিজের একটা ছোট ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকান আছে। মেজ বিকাশ সায়েন্সের ষ্টুডেন্ট এখনো—এম্-এস্-সি পাশ করে ডক্‌টারটের থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত। নিজের লেখাপড়া ও রিসার্চ তাতেই সে সর্বদা মশগুল। ছোট বিমান প্রিয়নাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং কর্মঠ শক্তিশালী—জ্যাঠার ব্যবসায়ের বর্তমানে দক্ষিণ হস্ত। মেয়ে সুজাতাও বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। সুজাতার রূপ যেন তার মায়ের রূপকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রিয়নাথের বাড়ির সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। ব্যবসা দেখা শোনা ছাড়া বাকী যে সময়টা বাড়িতে থাকতেন দো'তলার নিজের ঘরটিতেই থাকতেন। বহুকালের প্রিয় নিত্যসহচর পুরাতন ভৃত্য যোগেশ ও সুজাতাই তাঁর যা কিছু দেখা শোনা করত। তবে ঐ দুইজন ছাড়াও অদৃশ্য নিরন্তর-সেবাপরায়ণ স্নেহময় দু'টি হাতের আভাষ যা অতিবড় অন্ধেরও দৃষ্টিকে এড়াত না—ঘিরে ছিল প্রিয়নাথকে কলকাতায় আসা অবধি। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই অন্তঃপুরচারিণীর প্রতি প্রিয়নাথেরও শ্রদ্ধার যেন অবধি ছিল না। অথচ পাঁচ বৎসর এই বাড়িতে থেকেও প্রিয়নাথের সঙ্গে একটিবারের জন্যেও তার চোখাচোখি হয়নি। নিভৃত সংগোপনে সে যেন নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। ঠিক নিয়মিত সময়ে স্নানের তাগাদা, সকালের জলখাবার, দ্বিপ্রহরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশিত আহার্য্য, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস গরম দুধ—ঠিক আছে। কোন ব্যতিক্রম নেই।

ইদানিং প্রিয়নাথের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতা হওয়ায় কিরীটি প্রিয়নাথের জীবনের অনেক খুঁটিনাটিই জেনেছিল।

—দুই—

প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা করে জবানবন্দী নেওয়া হলো সুরু।

প্রথমেই ডাক পড়লো বিমলের: শরীর খারাপ থাকায় আগের দিন সে একটু আগেই শয্যার আশ্রয় নিয়েছিল এবং সকালে ওদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গেছে। রাত্রে একবারও তার ঘুম ভাঙ্গেনি। প্রিয়নাথের পাশের ঘরেই সে থাকে কিন্তু দুই ঘরের মধ্যে যাতায়াতের কোন রাস্তা নেই। গতকাল বিকালের দিকে একবার বিমলের সঙ্গে প্রিয়নাথবাবুর দেখা হয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। বিমানের সঙ্গেই বোধহয় প্রিয়নাথবাবুর শেষবার দেখা হয়েছিল—রাত পৌনে বারটায়। দাবা খেলার পর কিরীটি চলে গেলে, ব্যবসা সংক্রান্তই বিশেষ একটা জরুরী কাজে বিমান জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে গিয়েছিল।

কিরীটিই প্রশ্ন করে: সে সময়ে তিনি কি করছিলেন?

'একটা ফাইল নিয়ে যেন কি দেখছিলেন ?—'

'মনে পড়ে কি আপনার সে সময় দুধের গ্লাসটা কোথায় ছিল ?—'

'টেবিলের 'পরেই ছিল। দুধ তখনও গ্লাস ভর্তিই ছিল, খাননি।—'

'সে সময় তাকে কোনরূপ অসুস্থ বা কিছু দেখেছিলেন ?—'

'না। বেশ হেসে হেসেই ত আমার সঙ্গে গল্প করলেন।—'

'কতক্ষণ ছিলেন আপনি ?—'

'মিনিট পনেরর বেশী নয়।—'

'আপনার প্রতি আপনার জ্যাঠার মনোভাব কেমন ছিল ?—'

'ভালই। তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়।—'

'ব্যবসা সংক্রান্ত ছাড়া অন্য কোন কথা তার সঙ্গে আপনার হয়েছিল ?'

'না।—'

'আপনার জ্যাঠার কোন উইল আছে জানেন ?—'

'জানি। তবে উইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।—'

'আপনার জ্যাঠার কোন শত্রু ছিল বলে জানেন ?—'

'না। তার মত লোকের শত্রু থাকতে পারে আমার কল্পনারও অতীত।'

'আচ্ছা আপনার কোন আংটি হারিয়েছে ?—' কিরীটির প্রশ্নে বিমল হাত দেখে বলে: না, আমার আংটি ত আমার আঙুলেই আছে।

এবারে বিকাশ। গত রাত্রে প্রায় দু'টো পর্যন্ত সে ল্যাবরেটারীতে ছিল। রাত দুটোর পর বাড়ি ফিরে সোজা শয্যায় আশ্রয় নেয়।

'আপনাকে দো'তলার সিঁড়ির দরজা খুলে দেয় কে ?—' কিরীটিই প্রশ্ন করে।

'আমার মা !—'

'আমি যতদূর জানি বিকাশবাবু আপনার জ্যাঠার সঙ্গে আপনার খুব সম্প্রীতি ছিল না। Am I wrong ?—'

'সম্প্রীতি বলতে আপনি ঠিক কি mean করছেন জানিনা মিঃ রায়, তবে শুধু তার সঙ্গে কেন—আপনি যখন এতটাই জানেন একথাও নিশ্চয়ই জানেন এ-বাড়ির সঙ্গেই আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক কোন দিনই নেই। আমার রিসার্চ নিয়েই আমার সময় কাটে।—'

'তা জানি। আচ্ছা আপনার জ্যাঠার উইলের কথা আপনি জানেন ?—'

'জানি। মানে শুনেছি, কিন্তু সে ব্যাপারে আমার কোন interestই নেই !—'

'আশ্চর্য। কেন বলুন ত ?—'

'কেন শুনবেন? I used to hate that miser !—'

'কিন্তু আমি তাকে এই তিন বৎসরে যতদূর চিনেছি he was not a man of that type ! সে প্রকৃতির লোক ত তিনি ছিলেন না !—'

'থাক মশাই। মায়ের সংবাদ মাসীর মুখে আমি শুনতে চাই না। দেখুন আমার সময়ের দাম আছে। ল্যাবরেটারীতে এখন আমার অনেক কাজ। আমায় ছেড়ে দিলে বাধিত হবো।—'

'আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।—'

এরপর ডাক পড়লো সুজাতার।

সুজাতা বললে, রাত সাড়ে এগারটায় কিরীটি চলে যাওয়ার পরই দুধের গ্লাস নিয়ে সে জ্যাঠার ঘরে যায়। তিনি তখন চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছিলেন।

'কি কথা হয়েছিল আপনার তাঁর সঙ্গে ?--' প্রশ্ন এবারেও কিরীটিই সুরু করে।

'তিনি বলেছিলেন—নতুন কি উইল করবেন সেই কথা ?—'

'নতুন উইল !—'

'হাঁ।—'

'কি ভাবে নতুন উইল করবেন তা কিছু বললেন ?—'

'না। কেবল বলেছিলেন দু' একদিনের মধ্যেই নাকি নতুন উইল করবেন।—'

'আপনাদের ভাই বোনেদের মধ্যে প্রিয়নাথবাবু সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন কাকে সুজাতা দেবী ?—'

'মেজদাকে ও আমাকে বলেই মনে হয় !—'

'বিকাশবাবুকে ?—'

'ইদানিং তার ব্যবহারে জ্যাঠামণি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ছিলেন।—'

'কেন?—'

'ছোটদা জ্যাঠামণির কাছে হাজার চল্লিশ টাকা চেয়েছিলেন নিজস্ব একটা ল্যাবরেটারী করবার জন্য, কিন্তু জ্যাঠামণি রাজী হননি। তাই নিয়েই মনোমালিন্য।—'

কিরীটি তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেঃ আপনার কোন আংটি হারিয়েছে কি? জবাবে সুজাতা হাতের আঙুল দেখে বলেঃ না, আংটি ত হাতেই আছে।

* * * *

এবারে ডাক পড়লো সরমা দেবীর। নিঃশব্দ পদে সরমা কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

'বসুন সরমা দেবী! একান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করলাম—'

সরমা বসলেনও না, কিরীটির কথার কোন জবাবও দিলেন না—যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই—'

'বলুন?—' ধীর প্রশান্ত কণ্ঠস্বর।

'রাত দু'টোর সময় আপনি বিকাশবাবুকে দরজা খুলে দেন—সে সময়ে কি আপনি জেগে ছিলেন?—'

'হাঁ!—'

'অত রাত—'

'হাঁ বিকাশ বাড়ি ফেরেনি, তাই বসে একটা বই পড়ছিলাম!—'

'তারপর শুতে যান কখন?—'

'আরো ঘণ্টাখানেক পরে বোধহয়।—'

'বিকাশবাবু আসার আগে বা পরে যতক্ষণ আপনি জেগেছিলেন বাইরের বারান্দায় কোন রকম শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?—'

সরমা দেবী চুপ।

'আমার প্রশ্নের জবাবটা দিন?—'

একটু ইতঃস্তত করেঃ না।

'কোন রকম শব্দই শোনেন নি?—'

'না!—'

'কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ?—'

'না!—'

'আপনার ডান হাতের আঙুলে ন্যাকড়ার পট্টি বাঁধা দেখছি। কি হয়েছে আঙুলে?—'

কিরীটির অতর্কিত প্রশ্নে সরমা চমকে ওর মুখের দিকে তাকান এবং একটু ইতঃস্তত করে বলেনঃ কেটে গিয়েছে।

'কি করে কাটল? কবে কাটল?—'

'কাল তরকারী কাটতে গিয়ে।—'

হঠাৎ কিরীটি বলে উঠল যেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই।

'কিন্তু আমি যদি বলি—কাল রাত্রে কোন এক সময় প্রিয়নাথবাবুর ঘরে ঢুকে গ্লাসের ভাঙ্গা কাঁচের টুক্‌রোয় অসাবধানবশতঃ আপনার আঙুলটি আপনি কেটেছেন সরমা দেবী?'—

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। সলিল ও সুদর্শন দু'জনেই যেন স্তম্ভিত বিমূঢ়। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে সরমা দেবী। বোবা। কণ্ঠে শব্দমাত্র নেই।

'কি বলেন সরমা দেবী! আমার অনুমান কি মিথ্যে?—'

'হাঁ!—'

'মিথ্যে?—' কঠিন তীক্ষ্ণ কিরীটির কণ্ঠস্বর।

'হাঁ মিথ্যে! ওঘরে আজ পাঁচ বৎসর আমি পা দিইনি!—'

'পাঁচ বৎসরের কথা আমি জানিনা তবে কাল রাত্রে আপনি গিয়েছিলেন!—' বলতে বলতে চকিতে কিরীটি সরমার বাঁ হাতের অনামিকার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে কতকটা যেন আদেশের সুরেই বলেঃ বাঁ হাতের অনামিকায় আপনার আংটিটা কই সরমা দেবী?

'আংটি?—' কতকটা স্বগতোক্তির মতই যেন কথাটা উচ্চারণ করে ভূতগ্রস্তের মত বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে সরমা তাকান কিরীটির মুখের দিকে।

'হাঁ। আপনার আংটি!—' বলতে বলতে পকেট হ'তে একটা মীনা করা 'S' লেখা সোনার আংটি বের করে হাতটা আংটি সমেত সামনের দিকে প্রসারিত করে বলেঃ দেখুন ত এইটাই আপনার হারান আংটি কি না? প্রিয়নাথবাবুর বাথরুমে ওয়াশিং বেসিনে পেয়েছি। আপনার আঙুলের দাগই প্রমাণ করছে হাতের আঙুলে আপনার কোন আংটি ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই।

একটু থেমে এবারে কিরীটি বলেঃ শুনুন সরমা দেবী! আমি কিরীটি রায়। আমি বলছি—গত রাত্রে আপনি প্রিয়নাথবাবুর ঘরে গিয়েছিলেন এবং কাঁচের টুক্‌রোতে আপনার আঙুল কাটে। বাথরুমে রক্ত ধুতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ কোন এক সময় নিশ্চয়ই সাবানে পিছলে আঙুল থেকে আংটি খুলে বেসিনে পড়ে যায়—সেই সময়কার মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য ব্যাপারটা আপনার নজরে পড়েনি। আরো আমি বুঝতে পারছি—ঘরে ঢুকবার পর নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্য বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন আপনি।—

তথাপি নিশ্চুপ সরমা দেবী!

'বলুন, কখন আপনি কাল রাত্রে ঐ ঘরে গিয়েছিলেন এবং কেনই বা গিয়েছিলেন?—'

'আমি আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবো না কিরীটিবাবু!—' শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন সরমা।

'জবাব দেবেন না ?—'

'না !—' বলে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সরমা কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

—তিন—

মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে দেখা গেল তীব্র Curare বিষ প্রয়োগেই প্রিয়নাথ অধিকারীর মৃত্যু হয়েছে। গ্লাসের দুধ ক্যেমিকেল এ্যানালিসিস্ করে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। তা'হলে কিভাবে বিষপ্রয়োগ হলো এবং উপরের তলার একটা নক্সা কাগজে এঁকে নিয়ে কিরীটি ভাবছিল সে রাত্রে কার পক্ষে প্রিয়নাথকে বিষপ্রয়োগ করা সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভব ছিল ? প্রিয়নাথকে বিষপ্রয়োগে হত্যার পূর্বে বা পরে সরমা সেই কক্ষে ঐ রাত্রে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কেন ?

প্রিয়নাথের এ্যটর্নী কমলবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, প্রিয়নাথের উইল অনুসারে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা আছে : বাড়িটা পাবে সরমা এবং তার মৃত্যুর পর পাবে বিকাশ—তার ইচ্ছামত ল্যাব্রোটারী করবার জন্য এবং নগদ ত্রিশ হাজার টাকাও পাবে। আর বাকী ব্যাংকের মজুদ টাকা সমান ভাগে দশ হাজার টাকা সুজাতার বিবাহ খরচ বাদ দিয়ে প্রত্যেকে কুড়ি হাজার করে বিমান ও বিমল পাবে। নতুন উইলের কথা তিনিও প্রিয়নাথের মৃত্যুর দিন দশ বার আগে একবার শুনেছিলেন বটে, তবে কি ভাবে হবে সে সম্পর্কে কিছু তখনও বলেন নি বা নির্দেশ দেননি। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রিয়নাথকে হত্যা করার মোটিভের দিক দিয়ে বিমল, বিমান বা বিকাশ কেউই সন্দেহের তালিকা হ'তে বাদ পড়ে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—কি কারণেই বা হঠাৎ কিছুদিন পূর্বে প্রিয়নাথ নতুন উইল করতে মনস্থ করেছিলেন। আর নতুন উইল কি ভাবেই বা করতে চেয়েছিলেন ?

ভৃত্য জংলী এসে সংবাদ দিল; প্রিয়নাথের ভৃত্য যোগেশ এসেছে। যোগেশকে ঐ ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বললে কিরীটি।

যোগেশ ঘরে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

'কি খবর যোগেশ ?—বোস !—' যোগেশকে বসতে বলে কিরীটির হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় বিদ্যুৎ-চমকের মতই এবং কোনরূপ দ্বিধামাত্রও না করে সরাসরি প্রশ্ন করে : যোগেশ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। তুমি ত প্রিয়নাথবাবুর অনেক দিনকার পুরাতন লোক, তাই না ?

'তা বাবু সারাজীবনটাই ত বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গিয়েছে—' বলতে বলতে বৃদ্ধের দু'চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে।

'আচ্ছা যোগেশ, সরমা দেবীর সঙ্গে তোমার বাবুর কি রকম সম্পর্ক ছিল ?—'

যোগেশ মাথা নিচু করে।

'বল। জবাব দাও। তোমার বাবুকে যে হত্যা করেছে নিশ্চয়ই তুমি চাও তার শাস্তি হোক ?—'

'নিশ্চই চাই। কিন্তু বাবু—ছোটমা একাজ কখনো করেন নি !—'

'কিন্তু তোমার ছোটমা প্রায়ই রাত্রে তোমার বাবুর ঘরে যেতেন—তাই না ?—'

'যেতেন !—' তারপর একটু ইতস্তত করে বলে : একদিন অনেক রাত্রে বাবুর ঘরে আলো জ্বলতে দেখে হঠাৎ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি বাবু চেয়ারে বসে আছেন—ছোটমা চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ও আস্তে আস্তে দু'জনে কি যেন সব কথাবার্তা কইছেন।—

কিরীটি কিছুক্ষণ কি যেন মনে মনে ভাবে, তারপর আবার এক সময় যোগেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে : হাঁ, তুমি কি জন্য এসেছো তাত কই শোনা হলো না যোগেশ ?

'আপনার কথামত বাবুর ঘরে তালা দেওয়াই ছিল। আজ সকালে উঠে দেখি ঘরের তালাটা ভাঙ্গা।—'

'বলকি ?—'

'হাঁ। কিন্তু এখনো জানিনা কিছু চুরি গেছে কি না ? —তবে আমি আর একটা নতুন তালা এনে আজ সকালেই লাগিয়ে দিয়েছি দরজায়।—'

'কখন তালাটা ভাঙ্গা তোমার নজরে পড়েছে ?—'

'আজই সকালে।—'

'আচ্ছা তুমি যেতে পারো !—'

* * * *

যোগেশ চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই সলিল সেন এলো। মুখে তার জয়ের হাসি।

'কি খবর সলিল ?—'

'তোমার অনুমানই ঠিক কিরীটি।—' বলতে বলতে পকেট হতে ছোট্ট ব্রাউন রংয়ের পাউডার ভরা শিশি বের করে : এই দেখ। Curare powder—most powerful poison !

'তাত বুঝলাম, ওটা পেলে কোথায় ?—'

সায়েন্স কলেজে বিকাশের ল্যাব্রাটারী ঘরে যেখানে সে রিসার্চ করে—তার রিসার্চ টেবিলের ড্রয়ারে। এবারে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলে যাচ্ছে। শুধু এই নয়, দেখ—একটা হাইপোডারমিক্ সিরিঞ্জও পেয়েছি তার ড্রয়ারে।—'

'বিকাশের টেবিল যখন সার্চ করো, বিকাশ ছিল ?—'

'ছিল ! এ শিশিটা সে তারই বললে, ঐ বিষটি নিয়েই সে বর্তমানে রিসার্চ করছে ! তবে সিরিঞ্জটার কথা সে

নাকি বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানে না। তা সে নাই জানুক, আপাততঃ তাকে আমি arrest-ও করেছি।—'

'বেশ করেছো।—' নিরাসক্ত কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়।

'ব্যাপার কি, তুমি যেন বিশেষ উৎসাহ বোধ করছো না ?—'

'না। তার কারণ ওই দু'টি বস্তুর দ্বারাই তুমি কিছু প্রমাণ করতে পারবে না যে বিকাশই প্রিয়নাথের হত্যাকারী !—'

'কিন্তু তার সঙ্গে, I mean বিকাশ ও প্রিয়নাথবাবুর মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও ছিলনা এওত আমরা জানি। তাছাড়া আমরা ত জানি উইল অনুযায়ী প্রিয়নাথের মৃত্যুতে সে লাভবানই হবে—তার চির আকাঙ্ক্ষিত ল্যাবরেটারী গড়ে তুলতে পারবে।—'

'তবু—however I wish you success !—' পূর্ববৎ নিরাসক্ত কণ্ঠেই কিরীটি কথাগুলো বলে।

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়। কিরীটি ঘরে আলো জ্বালায়নি। অন্ধকারেই চুপটি করে বসে আছে, মৃদু পদ-শব্দ তার কানে এলো।

'কে ?—'

সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত অস্পষ্ট ছায়ার মত এক নারী মূর্তি তার কক্ষে প্রবেশ করল।

'কে ?—'

ছায়া মূর্তি কিরীটির প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আঁচলের তলা থেকে একটা সাদা চিঠির খাম ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে আবার ঘর হতে বের হ'য়ে গেল। বিস্মিত হতভম্ব কিরীটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়ঃ ছায়ামূর্তি তখন দ্রুত পদে সিঁড়ি অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে।

'কে! শুনুন! শুনুন!—' তবু সে ফিরল না।

বিস্মিত কিরীটি ঘরে ফিরে এসে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালাল এবং দেখতে পেলে একটা শাদা খাম মেঝেতে পড়ে আছে। খামের উপরে তারই নাম লেখা। খামটা তুলে নিয়ে কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে খামটা ছিঁড়ে ফেললেঃ একটা চিঠি।

কিরীটিবাবু,

আমার পুত্র বিকাশকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন, কিন্তু আমি বলছি সে নির্দোষ। সে একটু রগচটা ও খামখেয়ালী বটে কিন্তু আমি ত তার মা। আমি জানি এত বড় অন্যায় সে করতে পারে না। তাছাড়া বিকাশ বাড়ি ফিরবার পূর্বেই তাঁর ঘরে আমি গিয়েছিলাম তখুনিই তিনি মৃত। তাকে হত্যা করে নিজেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—আত্মহত্যা করবো বলেই তার ঘরে সে রাত্রে যাই। অস্বীকার করবো না আজ আর, তাকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারিনি। দুর্বলা নারী আমি তাই জোর গলায় বাবাকে আমি তার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহের অমত জানাতে পারিনি। বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। দীর্ঘ দিনের অদর্শনে ক্রমে মনের সে ক্ষত শুকিয়েও এসেছিল কিন্তু যখন সে ফিরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, ডাকলে সরমা বলে, সব বিস্মৃত হলাম। প্রেম বা ভালবাসা বলতে আপনারা কি বুঝবেন জানি না এবং মানুষের সাধারণ চোখে প্রেম বা ভালবাসার যে সংজ্ঞা আমাদের ক্ষেত্রে তাও খাটবে না। তবু সেই মুহূর্তে যেন আমার কাছে পুণ্য ধর্ম সব মিথ্যে হয়ে গেল। ভাবলাম এইত আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। তারপর চোরের মত সংগোপনে প্রতিরাত্রে তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছি। পাপ পুণ্য জানিনা—জানিনা সত্য মিথ্যা—এইটুকুই জানি মনে মনে চিরদিন তাকেই স্বামী বলে জেনে এসেছি। কিন্তু যাক, যা বলতে এসেছি তাই বলি—হঠাৎ এমন সময় একদিন জানতে পারলাম আমার এ গোপন বিহার আর একজন জানতে পেরেছে—সে আমারই আত্মজ—আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিকাশ। ভাবতে পারেন এ কতবড় লজ্জা। একি গ্লানি! বিকাশ আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করলে, কিন্তু তবু নিজের গতি রোধ করতে পারলাম না। অবশেষে এক রাত্রে বিকাশ আমার পথ আগলে দাঁড়ালঃ মাথা নিচু করে ফিরে এলাম। তারপর—দুটো দিন ও রাত কি ভাবে যে আমার কেটেছে তা আমিই জানি—কি সংশয় কি দ্বন্দ্ব! তারপরই শেষ প্রতিজ্ঞা নিই তাকেও হত্যা করবো নিজেও প্রাণ দেবো। বিকাশের ঐ ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠার সঙ্গে তার হলো ঝগড়া। তাই চটে গিয়ে বোধহয় তিনি নতুন উইল করবেন স্থির করেন। শুনলাম গ্রেপ্তারের পর নাকি সে আপনাদের কাছে ঐ ব্যাপার সম্পর্কে কোন জবানবন্দী দিতে চায়নি, তার কারণ তারই এই অভাগিনী জননী! সে রাত্রে তাকে হত্যা করতে গিয়ে মৃত দেখে ফিরে আসতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ হাতে লেগে দুধের গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং সেই গ্লাসের কাঁচের টুকরো তুলতে গিয়েই আঙুল কাটে। বাথরুমে সেই হাত ধুতে গিয়েই বোধহয় আংটি পড়ে গিয়েছিল। তাকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে ত সে আমি। বিকাশ নয়। তাকে মুক্তি দিন—আমায় আপনি ঘৃণা করুন, তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু আমি তার মা। আমি বলছি সে নির্দোষ।

ইতি অভাগিনী—'সরমা'

সরমার দীর্ঘ চিঠিটা শেষ করে কিরীটি আর একটা মুহূর্তও দেরী করে না। তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে ছোটে 'অধিকারী লজের' দিকে। যাবার আগে থানায় সলিলকে একটা ফোন করে যায়। কিন্তু 'অধিকারী লজে' গিয়ে দেখে—সরমা দেবী বাড়িতে নেই এবং কেউ বাড়ির মধ্যে

বলতে পারলে না—কখন সরমা দেবী কি অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হ'য়ে গিয়েছেন।

কিরীটি, বিমল ও বিমানের সমস্ত অনুসন্ধানই দু'দিন ধরে ব্যর্থ হলো—সরমা দেবীর কোন সংবাদই আর পাওয়া গেলনা।

কিরীটির অনুরোধে বিকাশকে মুক্তি দেওয়া হলো, কিন্তু আসল হত্যাকারীর কোন কিনারাই হলো না।

* * * *

আরো দিন দুই বাদে কিরীটি দ্বিপ্রহরে বসে বসে প্রিয়নাথ অধিকারীর হত্যাকারীর কথাই ভাবছিল, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকের মতই একটা সম্ভাবনা তার মনে উঁকি দিয়ে যায় এবং সেই দিনই বিকালের দিকে আবার কিরীটি প্রিয়নাথের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। প্রিয়নাথের ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখতে হবে। যোগেশের কাছ হ'তে চাবি নিয়ে দরজা খুলে কিরীটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। যোগেশও সঙ্গে আছে। সরমা দেবীর অন্তর্ধ্যানের ব্যাপারে যোগেশের মুখে এঘরের তালা ভাঙ্গার সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও কিরীটি ঘরটা পরীক্ষা করতে পারেনি এবং মনেও ছিল না আকস্মিকভাবে চিঠি একটা দিয়ে সরমা দেবী নিরুদ্দিষ্টা হওয়ায়। তালা দোতালার ঘরে—ভাঙ্গতে হলে একমাত্র এ বাড়িরই কেউ ভেঙ্গেছে। কিন্তু কেন? কোন মারাত্মক প্রমাণ অপসারণের জন্য কি? সেটা কি? যা কিরীটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গিয়েছে। কি এমন প্রমাণ—কিরীটির নজরে পড়ল না। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কিরীটি। হঠাৎ সামনের চৌকো শ্বেতপাথরের টেবিলটার পরে নজর পড়ে—টেবিল ল্যাম্প্! টেবিল ল্যাম্প্‌টা কোথায় গেল?

'ঐ টেবিলের পরে যে ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্প্‌টা ছিল সেটা কোথায় গেল যোগেশ?'

'টেবিল ল্যাম্প্? জানিনা ত?—'

টেবিল ল্যাম্প্! টেবিল ল্যাম্প্! কেন? কেন সেটা চুরী গেল? Curare বিষপ্রয়োগে মৃত্যু! চকিতে মনে পড়ে মৃতের ডান হাতের আঙলে একটি রক্ত বিন্দু!

কিন্তু কোথায়। কোথায় সেই ল্যাম্প। কে চুরী করলে সে ল্যাম্প! কে চুরী করতে পারে?—হত্যাকারী! হত্যাকারীই!

চার

যোগেশের কাছেই ঠিকানাটা পাওয়া গেল। বেশী দূরে নয়, রসারোডের উপরেই।

থানা হ'য়ে সুদর্শন রক্ষিতকে এবং দু'জন পুলিশকে নিজের গাড়িতেই তুলে নিয়ে কিরীটি গাড়ি চালাল এবারে রসারোডের দিকে।

রসারোডের উপরেই দোকানটা: দি মডার্ণ ইলেক-ট্রিক্যাল ষ্টোরস্।

মাঝারী সাইজের দু'খানা ঘর নিয়ে দোকানটা। নতুন পুরাতন নানা জাতীয় ইলেকট্রিক আলো, ফ্যান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ঘর দু'টো ঠাসা। দু'জন কর্মচারী এবং মালিক। সামনের ঘরেই দোকানের মালিক একজন কর্মচারীর সঙ্গে কি একটা ইলেট্রিকের যন্ত্র নিয়ে কথা বলছিলেন। কিরীটিকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখে মালিক উঠে দাঁড়ায়: একি! কিরীটিবাবু যে! আসুন। আসুন—কি সৌভাগ্য আমার। ওরে জনার্দ্দন একটা চেয়ার দে।

'থাক। ব্যস্ত হবেন না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম—'

'বিলক্ষণ। কি বলুন ত?—'

'একটি টেবিল ল্যাম্প—ঘড়ি বসান ঠিক যেমনটি আপনার জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরের টেবিলে একটি আছে!—'

বিমল কিরীটির মুখের দিকে তাকায় এবং মৃদু কণ্ঠে বলে: সে রকম টেবিল ল্যাম্প ত আমার কাছে নেই।

'কিন্তু আমার ধারণা আছে। এবং একটি নয় দু'টি!—'

'একটি নয় দুটি, কি বলছেন আপনি?—' বলতে বলতে চেয়ার ঠেলে বিমল উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

'উঁহুঁ! উঠবার চেষ্টা করবেন না বিমলবাবু! কারণ আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। চেয়ে দেখুন দরজার গোড়াতেই থানা অফিসার রক্ষিত সাহেব দু'জন লাল পাগড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ভালয় ভালয় আলো দুটি বের করুন, যেটা original বরাবর আপনার জ্যাঠার ঘরে টেবিলে থাকত এবং রাত্রে যেটা জেলে রেখে তিনি ঘুমাতেন—আর যেটা আপনি তার মৃত্যুর দিন কোন এক সময় কৌশলে rep'ace করেছিলেন, আপনার নিজস্ব সম্পত্তি!—'

ব্যাপারটা যেন কতই কৌতুকের এমনিভাবে লঘু হাস্যে বিমল বলে ওঠে: চমৎকার গল্প ফাঁদতে পারেন ত আপনি রায় মশাই।

'গল্পই। তবে সে মারাত্মক গল্পের উপসংহারে আপনি হবেন লৌহবলয়-মণ্ডিত ফাঁসির আসামী!—'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়।

তথাপি মুহূর্তে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে বিমল, কিন্তু কিরীটির অতর্কিত যুযুৎসুর প্যাঁচে পড়ে গতিহারা হয়।

দোকানের মালপত্রের মধ্যেই দু'টি একই ধরণের টেবিল ল্যাম্প পাওয়া গেল। সত্যিকারের মেকানিক বিমলচন্দ্র। টেবিল ল্যাম্পটির সুইচ্ প্রেস্ বটনের মত সেটিকে খুলে ফেলে সেই সুইচেরই অনুরূপ হাইপোডারমিক্ নিডিল সংযুক্ত একটি প্রেস্ বটন তৈরী করে তার নিচের অংশে একটি বিষ ভর্তি রবার ক্যাপসুল জুড়ে দিয়ে আলোর সুইচের জায়গায় লাগিয়ে প্রিয়নাথকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা হয়েছিল। অপূর্ব পরিকল্পনা। অর্থাৎ যেই প্রিয়নাথ

শয়নের পূর্বে নিত্যকার অভ্যাস মত প্রেস্ বটন টিপে আলোটি জ্বালতে যাবেন সেই মুহূর্তে প্রেস্ বটনের মধ্যস্থিত নিডিলের অগ্রভাগ আঙুলে বিদ্ধ হবে ও সেই সঙ্গে চাপ লেগে বটনের নীচে সংগুপ্ত রাবার ক্যাপসুলের ভিতর হ'তে মারাত্মক বিষ শরীরে সংক্রামিত হবে। পিন্ বিদ্ধ হবার জন্য আঙুলে সামান্য একটু জ্বালা প্রথমটায় টের পাওয়া যাবে মাত্র, তার চাইতে বেশী কিছু নয়। এদিকে ক্রমে ভয়ংকর বিষ Curare শরীরের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার দরুণ ধীরে ধীরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরের যাবতীয় মোটর নার্ভের কেন্দ্রগুলো বিষের প্রক্রিয়ায় ঝিমিয়ে আসবে, অথচ চিৎকার করবার বা উঠবার শক্তিও লোপ পাবে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসবে অবধারিত মৃত্যু!

আলোর সব মেকানিজম্ দেখিয়ে দিয়ে কিরীটি বলছিল: ঠিক ঐ ভাবে হত্যা করা হয়েছিল প্রিয়নাথকে। শয়নের পূর্বে নিত্যকারের মত আলোটা জ্বালিয়েছিলেন বটে তিনি কিন্তু শয্যায় গিয়ে শয়নের আর অবকাশ পাননি। চেয়ারের পরেই ধীরে ধীরে বিষের মারাত্মক ক্রিয়ায় মরণের কোলে ঢলে পড়েছেন। প্রথম হ'তে সরমা দেবীকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু তার চিঠি পাওয়ার পর বুঝলাম তিনি নন। তবে কে! তবে কি বিকাশই। সরমা দেবীর আকস্মিক অন্তর্ধানে সত্যিই প্রথমটায় আমি বড় বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম, নচেৎ যোগেশের মুখে প্রিয়নাথের ঘরের তালা ভাঙ্গবার সংবাদটা পাওয়ার পর সেইদিনই আর একবার ঘরটা পরীক্ষা করলেই প্রিয়নাথ-হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটনে এত দেরী হতো না। হলোও তাই। ঘরে ঢুকে তালা ভাঙ্গবার উদ্দেশ্য খুঁজতে গিয়েই সত্য সূর্যের আলোর মতই আমার সামনে প্রকাশ পেল—যেই দেখলাম ঘরের টেবিলের 'পরে সেদিনকার টেবিল ল্যাম্পটি নেই এবং ল্যাম্পটা কেন চুরী গেল ভাবতে গিয়েই বিদ্যুৎ চমকের মত আর একটা সম্ভাবনা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল, প্রিয়নাথের ঘরে রাত্রে সরমা দেবীর গোপন অভিসারের কথা কেবলমাত্র বিকাশই নয়, আরো একজনও জানত। এবং কে সে! কার পক্ষে আর এ বাড়িতে সে রহস্য জানা বেশী সম্ভব ছিল ভৃত্য যোগেশ ছাড়াও! কে! কে! জানা সম্ভব ছিল তারই পক্ষে বেশী যে প্রিয়নাথেরই পাশের ঘরে শয়ন করতো। সে সরমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলেকট্রিসিয়ান বিমল! বিমলই যদি হয়, তাহলে—বিমল! বিমল! ইলেকট্রিক মেকানিক। ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্প। সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেলাম টেবিল ল্যাম্প চুরীর মীমাংসাও। হাঁ বিমলই—কিন্তু বিমলের ইলেট্রিক ল্যাম্পটা চুরী করার সঙ্গে হত্যা-রহস্য জড়িয়ে আছে কি ভাবে! মনের মধ্যে তখন আমার অত্যন্ত দ্রুত একটার পর একটা সম্ভাবনা এসে উঁকি দিচ্ছে—মনে পড়লো মৃতদেহের ডান হাতের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে ছোট্ট রক্ত বিন্দুটি। ব্যস্ মিলে গেল দু'য়ে দু'য়ে চার। ঐ আলোর মধ্যেই ছিল মৃত্যু ফাঁদ এবং সেই আলো জ্বালাতে গিয়েই ঘটেছে মৃত্যু! আর দেরী না করে তখনই ছুটলাম বিমলের দোকানে।—' একটু থেমে কিরীটি বাকীটুকু বলে: হত্যার মোটিভ্ সম্পর্কে আগেই আমরা জেনেছি প্রিয়নাথ ও সরমার মধ্যে প্রেম—রাতের পর রাত তাদের গোপন অভিসার পুত্র বিমলকে মরীয়া করে তুলেছে। যার ফলে সে প্রিয়নাথকেই হত্যার সংকল্প করেছিল।

হত্যার যে পরিকল্পনাটি সে করেছিল, পূর্বেই বলেছি সেটা অপূর্ব। বিকাশকে প্রশ্ন করেই বোধ হয় সে Curare বিষের ক্রিয়া জেনে নেয়। কারণ বিকাশ গত কিছুদিন ধরে ঐ মারাত্মক বিষটি নিয়ে রিসাচ করছিল জানা গিয়েছে। হত্যার পরিকল্পনার পর হয়ত স্বাভাবিক মানুষের পাপ হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার বৃত্তিতেই বিকাশের ঘাড়ে হত্যাপরাধটা চাপাবার জন্য তার ল্যাবরেটারীর টেবিলের ড্রয়ারে তার অজ্ঞাতে কোন এক সময় যখন বিষ সংগ্রহ করে তখুনি একটা সিরিঞ্জ রেখে এসেছিল হত্যাকারী এবং মনে মনে হয়ত এও ভেবেছিল: ঐ ভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা একমাত্র সায়েন্সের স্টুডেণ্ট তার পক্ষে ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না, পুলিশেরও ধারণা তাই হবে। কিন্তু পাপ পুণ্য ধর্মাধর্মের যিনি বিচারকর্তা—যাঁর চোখে কিছুই এড়ায় না, যাঁর বিচারের খাতায় প্রতিটি হিসাব নিকাশ অতি সূক্ষ্ম; তিনিই হত্যার পর বিমলকে দিয়ে আমায় ফোন করিয়েছিলেন। নিজের পরে আত্মবিশ্বাসের দম্ভে যে কৌতুক সে করতে গিয়েছিল আমাকে ফোন করে—সেটাই হলো তার পক্ষে মৃত্যু শর। মৃত্যু-শর তারই বুকে ফিরে এলো কৌতুক হ'য়ে নয়, চরম আঘাতে। অবশ্য এও আমার অনুমান টেলিফোনের ব্যাপারটা।—'

'অনুমান?—' সলিল প্রশ্ন করে।

'হাঁ। ভুলে যাও কেন ঐ অনুমানের উপরেই যে আমাদের তদন্তের সমস্ত বাহাদুরীটা দাঁড়িয়ে আছে। Guess and intelligent guess! এবং সেই অনুমানের পরে ভিত্তি করেই ত মৃতের ঘরের মেঝেয় দু' ফোঁটা রক্ত সরমা দেবীর দিকে আমায় চালিত করে। দু' ফোঁটা রক্তই সত্যকে করলে উদ্ঘাটিত। দুঃখ হয় কেবল হতভাগিনী সরমা দেবীর জন্য। যে বুক-ভরা আগুন নিয়ে তিনি পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন, শুধু শেষ প্রার্থনা জানাই সেই তাঁরই কাছে—ক্ষমার দেবতা তাকে যেন ক্ষমা করেন।—'

কিরীটি চুপ করলো।
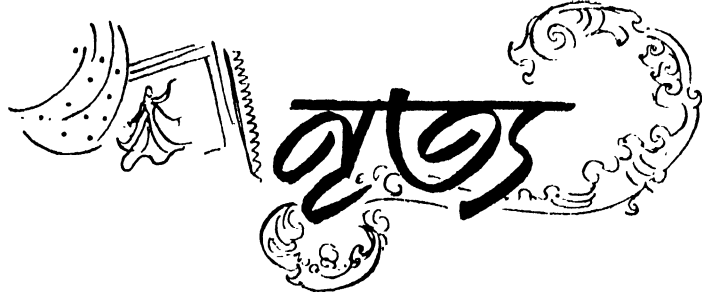
পাশ্চাত্যে উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অভিযান

শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তী

যে-সকল নিজস্ব অমূল্য সম্পদ নিয়ে ভারত সমগ্র পৃথিবীর সামনে গৌরবোন্নত শিরে দাঁড়াতে পারে নৃত্যকলা সেগুলির অন্যতম। খাঁটি ভারতীয় নৃত্যসমূহের মধ্যে ভরত নাট্যম হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কার্তিকেয় নৃত্যে উদয়শংকর

কোন্ স্মরণাতীতকালে দক্ষিণ ভারতের দেব-মন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করে এই অপূর্ব্ব মনোহর নৃত্যকলা বিকশিত হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ মহিমায়, তা সঠিক করে বলা কঠিন। এই নৃত্যকলার শিক্ষাগুরুদের বলা হয় নট্টুভান। তাঁদের নিপুণ শিক্ষাদানে মন্দিরের দেবদাসীরা এই নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করে ক্রিয়াসিদ্ধা বলে গণ্য হত। অভিনয় হচ্ছে ভরত নাট্যমের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অঙ্গ—চোখ মুখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ভাবাবেগ প্রকাশই হচ্ছে ভরত নাট্যমের অঙ্গীভূত অভিনয়।

বাংলা লোক নৃত্যে প্রীতি চক্রবর্ত্তী ও স্মৃতি চক্রবর্ত্তী

ভরত নাট্যম ছাড়া দক্ষিণ ভারতে আরও দুই শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত—কথাকলি আর মোহিনী অট্টম। কথাকলি হচ্ছে মাদ্রাজের কেরল দেশে উদ্ভাবিত ভারতের নিজস্ব নৃত্যনাট্য—এতে মুদ্রার প্রচলন খুব বেশী। মুখের ভাষা যেখানে মূক বিভিন্ন ভঙ্গীর মুদ্রাগুলি সেখানে প্রকাশ করে

নৃত্যশিল্পীর অন্তরের অনুভূতিকে। পূর্ব্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যে উদ্ভূত মণিপুরী নৃত্যও শাস্ত্রীয় নৃত্য। প্রধানতঃ মেয়েরাই মণিপুরী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে। মণিপুরী নৃত্যের ভাবৈশ্বর্য্য অপরিমেয় এবং নৃত্যকারিণীদের লীলায়িত দেহভঙ্গী অনুপম। উত্তর ভারতের কথক নৃত্য মূলতঃ ভারতীয় হলেও এতে ঘটেছে ইস্‌লামিক নৃত্যকলার সংমিশ্রণ। কিন্তু বহিরঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটলেও এই নৃত্যের ভারতীয়ত্ব লোপ পায়নি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এই নৃত্যের বিষয়বস্তু। কি ভরত নাটাম্, কি কথাকলি, কি মণিপুরী প্রত্যেকটি নৃত্যকলারই মর্ম্মমূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছে ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা, রূপসৃষ্টির মাধ্যমে রূপাতীতের আভাস জাগানোই ভারতীয় নৃত্যকলার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের নৃত্যকলা তাই ভারতের আধ্যাত্ম সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের লীলা আমাদের নৃত্যকলার বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ

স্বাগম্ নৃত্যে প্রীতি চক্রবর্তী, অমলাশংকর, গীতা নন্দী ও স্মৃতি চক্রবর্তী

যে একদিন জগদ্‌গুরুর আসনে বসেছিল সে তার আধ্যাত্ম সম্পদের কল্যাণে। অতীতে পৃথিবীর দিকে দিকে সে প্রচার করেছিল আত্মার বাণী, তারপর এল চরম দুর্দ্দিন, ভারতবাসী ভুলে গেল তার নিজস্ব অতুলনীয় সম্পদের কথা, বিশ্বের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে দেবার মত সম্পদ তারও যে কিছু আছে সে কথা সে বিস্মৃত হল। দীর্ঘকালান্তরে উনবিংশ শতাব্দীতে আবার আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করেই হল বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণ। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দ্বারাই বর্ত্তমান যুগে আমেরিকায় প্রথম উড্ডীন হল বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে আমরা পাশ্চাত্য জগৎকে দিলাম আমাদের সেই পরম সম্পদ। ভারতের সেই শাশ্বত বাণীরই সন্ধান পেলেন আর একজন বাঙ্গালী ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে—তিনি নৃত্যভারতীর একনিষ্ঠ সাধক শিল্পীশ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর। সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে শাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন মুখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় নৃত্যকলা হল পুনরুজ্জীবিত। নৃত্যকলার ভেতর দিয়ে নবমন্ত্রের উদ্‌গাতা উদয়শঙ্করের প্রথম অভ্যুদয় শুধু ভারতবাসীর নয় সমগ্র বিশ্ববাসীর মনে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা বিরল। সেদিন যখন পাশ্চাত্যে নৃত্যাভিযানে বেরিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল নৃত্যকলার মাধ্যমে একদিকে যেমন রসের পরিবেশন, অন্যদিকে তেমনি জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির নিকট ভারতের আত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। তাঁর এই সাংস্কৃতিক অভিযান সেদিন জয়যুক্ত হয়েছিল; পাশ্চাত্য বিজয় করে সগৌরবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন স্বদেশে। তারপর কেটে গেল দীর্ঘকাল। পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করা সত্ত্বেও উদয়শঙ্করের সাধনায় ছেদ পড়ল না, ভারতীয় নৃত্যকলাকে প্রথাগত বন্ধনের হাত থেকে মুক্তিদান করে নব নব রূপসৃষ্টির জন্য চলল বিরামহীন প্রচেষ্টা। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন—"I have to unfold evernew possibilits in the revelation of beauty and truth. My creations will not be a mere imitation of the past nor burdened with narrow conventions." অর্থাৎ—"সুন্দর এবং সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে উদ্‌ঘাটি করতে হবে নব নব সম্ভাবনা—আমার সৃষ্টি সমূহ যেমন হবে না শুধু অতীতের অনুসৃতি, তেমনি হবে না সঙ্কীর্ণ প্রথাগত বোঝার ভারে প্রপীড়িত।"

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উদয়শঙ্কর শুধু শাস্ত্রসম্মত নৃত্যকলার মধ্যে নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের মধ্যেও সত্য এবং সুন্দরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। শিল্পীর সত্য দৃষ্টি শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত লোকনৃত্যের মধ্যেও আবিষ্কার করল ভারতেরই প্রাণসত্তাকে—তাইতো তিনি কুণ্ঠিত হলেন না লোকনৃত্য সমূহকে ক্লাসিক্যাল নৃত্যের সঙ্গে একই পংক্তিতে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে।

সাধনার পথে এগোতে এগোতে উদয়শঙ্করের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল কল্পনার নূতন দিগন্ত। এক দিব্য প্রেরণার মুহূর্ত্তে এই সত্যোপলব্ধি তাঁর হল যে, নৃত্যকলার রসোপলব্ধিকে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে করে তুলতে হবে সার্ব্বজনীন, এ রসভোজের আসরে টেনে আনতে হবে সবাইকে, বাদ দিলে তো চলবে না কাউকেই। তাঁর নিজের কথায়—"So if we are going to make a great change, it must be a national one, and every one must be in it." অর্থাৎ—"কাজেই যদি আমরা বিরাট পরিবর্ত্তন

ং প্রত্যেককেই নিয়ে আসতে হবে এর ভেতরে।" নৃত্যশিল্পের মাধ্যমে …সংযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই উদয়শঙ্কর আজকের দিনের …শিল্পীদের তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই মর্ম্মে …েছেন যে, নিজেদের প্রাণপণ প্রয়াসের দ্বারা একদিকে যেমন তাদের …তে হবে সত্য সুন্দরকে প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক এবং …তীয় কল্যাণ সাধনও হবে তাঁদের আদর্শ। জনগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা দ্বারা জনমানসে গভীর প্রভাব …স্তার করবার জন্যেও তাদের যত্নবান হতে হবে।

এই সত্যোপলব্ধি নৃত্যরস পরিবেশন সম্পর্কে উদয়শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দিলে, তাঁর সৃজনী প্রতিভার ধারাও প্রবাহিত হল নূতন খাতে। …র রূপ সৃষ্টি ভারতের ঐতিহ্যানুসারী এবং সনাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা হল যুগোপযোগী। ১৯৪৯ সালে উদয়শঙ্কর যখন

কলম্বোর (৩৯৩৩) অডিটোরিয়ম্

…র সম্প্রদায়সহ পশ্চিম যাত্রা করেন তখন তিনি এ কথাই বলেছিলেন "I dance the life of our God's and our people." সেবার …নি পাশ্চাত্যে যে বাণী প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে ছিল নৃত্যরসকে …জনভোগ্য এবং সকলের কল্যাণপ্রদ করবার উদার প্রতিশ্রুতি। তাঁর …ই নৃত্যাভিযানে সহযাত্রিনী হবার দুর্ল্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। …ডন ও আমেরিকায় যে বিপুল সংবর্ধনা কলালক্ষ্মীর এই বরপুত্র সেদিন …ভ করেছিলেন তা প্রত্যক্ষ করে আমরা ধন্য হয়েছি, তাঁরই কল্যাণে … অযাচিত প্রশংসা আমাদের ভাগ্যে জুটেছে তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

১৯৪৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর লণ্ডনের পিকাডেলী মঞ্চে প্রথম আমাদের …প্রদর্শন হয়, তার সাফল্য এবং রসজ্ঞদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের যাত্রাপথকে করে তোলে কুসুমাস্তীর্ণ। তারপর ২৭শে …ডসেম্বর আমেরিকার নিউ ইয়র্কস্থ ফোরটি এইট ষ্ট্রীট্ থিয়েটার হলে যেদিন আমাদের শো হল সেদিনকার আনন্দময় অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলব না। শেখ আব্দুল্লা সর্দ্দার, জে, জে, সিং, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পার্লবাক এবং আরো অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেদিনকার নৃত্যপ্রদর্শনে। দেশ বিদেশের গুণী জ্ঞানী ও মনীষীদের সামনে আমাদের মাতৃভূমির মর্য্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন উদয়শঙ্কর। পাশ্চাত্যে উদয়শঙ্করের ভারত-সংস্কৃতি প্রচারের এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর অংশভাগিনী হতে পেরেছি ভেবে সেদিন বিমল আত্মপ্রসাদে আমাদের অন্তর ভরে উঠেছিল। তারপর আমেরিকার বড় শহরেই আমাদের সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। সেখানকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Losangels tanisএ W. A. বলেছেন—"Udayshankar and his Hindu

হলিউড্—মেট্রো গোল্ডেন মায়ারে দীপ্তি ও প্রীতি

Ballet in bringing the Art of the far east is performing a true cultural services similar enterprises must go a long way toward international unity." লোভ মোহ ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থ আজকের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরাট ব্যবধান রচনা করেছে এর অবসান ঘটানোর জন্যে আজকের দিনে তাই ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আশ্রয়ে রচিত হোক আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র আর তাতে প্রতিষ্ঠিত হোক আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরে সুন্দরের পাদপীঠ, আর তাঁরই উপাসনায় এগিয়ে আসুক জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল দেশের নরনারী। তাহলেই সফল হবে সুন্দরের সাধনায় মগ্ন উদয়শঙ্করের জীবনের স্বপ্ন, সার্থক হবে জড়বাদী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অভিযান।

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

ফ্রান্স :—আবেলার্দ ও এলয়শার প্রণয়-কাহিনী ফরাসী সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। এ কোনও রূপকথা বা কবি-কল্পনা নয়। ফ্রান্সের দ্বাদশ শতাব্দীর এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেটনের এক অভিজাত পরিবারে আবেলার্দ জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে উঠেছিলেন। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে নতার্‌দাম গীর্জা সংলগ্ন পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। শীঘ্রই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, বহু বিদ্যার্থী তাঁর কাছে শিক্ষা লাভের জন্য আসেন। দার্শনিক পণ্ডিত এবং আবেলার্দের নাম তখন লোকের মুখে মুখে।

এই নতার্‌দাম গীর্জারই ধর্মযাজক ফুলবার্টের একটি পরমা সুন্দরী ভাইঝী তাঁর কাছে থাকতো। মেয়েটির নাম এলয়শা, বয়স মাত্র সতেরো। এই মেয়েটিকে দেখে পরিণত বয়স্ক আবেলার্দ একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। আবেলার্দের বয়স তখন আটত্রিশ! তিনি অবিবাহিত। কারণ, তাঁর একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি এই চার্চের ভিতর দিয়েই দেশের সর্বোচ্চপদ অধিকার করবেন। বিবাহ ক'রে সংসারী হলে তাতে বাধা পড়বার সম্ভাবনা। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, এই গীর্জা ও তৎসংশ্লিষ্ট পুরোহিত এবং যাজক সম্প্রদায়ের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আবেলার্দের যেমন উচ্চ ধারণা ছিল, তেমনি মনে মনে তিনি খুব উচ্চ আশাও পোষণ করতেন। ধর্মরাজ্যে প্রভুত্বলোভী আবেলার্দ তাই কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তরুণী এলয়শার রূপযৌবন তাঁকে এমন ভাবে প্রলুব্ধ করলো যে তিনি নতার্‌দাম গীর্জার ধর্মযাজক এবং তরুণীটির অভিভাবক ফুলবার্টকে মুরুব্বি ধরলেন। আবেলার্দ নিজেও ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ আকৃতি, সৌম্য-দর্শন, তেজদ্দীপ্ত মূর্তি! আটত্রিশ বছর বয়সেও তাঁর যৌবনের দিব্যকান্তি কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। ফুলবার্টকে তিনি কোনও বন্ধুর মুখে বলে পাঠালেন যে আবেলার্দ আপনার গৃহে অতিথিরূপে বাস করতে চান। এজন্য মাসিক খরচ আপনি যা চাইবেন তাই দিতেই তিনি প্রস্তুত; কারণ, আলাদা বাসা করে একটা সংসার পেতে থাকা তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'য়ে পড়ছে। ফুলবার্ট এ প্রস্তাব শোনবামাত্র খুব আগ্রহের সঙ্গেই রাজী হলেন। প্রথমতঃ আবেলার্দের মতো এমন একজন খ্যাতনামা দিগ্‌গজ দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাঁর গৃহে অতিথি হ'য়ে বাস করলে সমাজে তাঁর গৌরব ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বাড়বে এবং খরচ হিসাবেও মাসে মাসে যে টাকা তিনি ওঁর কাছে আদায় করবেন তাতে চাই কি তাঁর নিজের খরচটাও চলে যাবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল ভাইঝিটা এত বড় পণ্ডিতের কাছে বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ পেয়ে তর্কশাস্ত্রে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারবে।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর। মেয়েটিও ছিল অসাধারণ বিদুষী। দর্শনশাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞান। তার সেই সতেরো বছরের জীবনের মধ্যেই সে গ্রীক ও হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। আবেলার্দ একাধিক ভাষা জানলেও এ দুটি ভাষা জানতেন না, কিন্তু, ছাত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন, আবেলার্দ সে পাত্রই নয়। শিখে নিলেন ও দুটো ভাষা। ছাত্রীও শিক্ষকের বিদ্যাবত্তায়, তাঁর রূপে গুণে ভাষণে আচরণে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। শিক্ষক ও ছাত্রীর ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে গভীর প্রেমে পরিণত হল। প্রতিভার সংস্পর্শে এলে প্রতিভা দীপ্ত হয়ে ওঠে! এলয়শার প্রতিভা আবেলার্দের সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আবেলার্দের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে আনন্দে কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যায় এলয়শা জানতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে—আবেলার্দকে তার খুব ভাল লাগে, বুঝতে পারে—আবেলার্দের সান্নিধ্য তাকে প্রীত করে। তার সমস্ত মনপ্রাণ দীর্ঘক্ষণ এই মানুষটির সঙ্গ ও সাহচর্য কামনা করে।

নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন দুটি হৃদয়ের এই যে অপূর্ব মিলনানন্দ—এই যে দীর্ঘপ্রহর নিমেষে অতীত হ'য়ে যাওয়া; অনুরাগের আবেগে পরস্পরকে আশ্চর্য রকম ভাল লাগা—সে যেন কোন এক সুখস্বপ্নে বিচরণ করতে করতে রূপকথার আলোক-সৌন্দর্যের মধ্যে পরস্পর একত্রে আত্মহারা হ'য়ে যাওয়া! তাদের চোখের সামনে থেকে সরে যায় পৃথিবী। অদৃশ্য হ'য়ে যায় তাদের পারিপার্শ্বিক। স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে সকল প্রকার বাহ্যজ্ঞান হ'য়ে যায় তিরোহিত। শুধু দুটি হৃদয় একই সুরে স্পন্দিত হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। সামনে পড়ার বই খোলাই পড়ে থাকে, তারা তখন পড়ে উভয়ের মনের পুঁথির পাতায় লেখা গোপন কথাগুলি। দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, কোথায় যে কেমন করে বিদায় হ'য়ে আলোচনার বস্তু হ'য়ে ওঠে প্রেমের গূঢ় রহস্য, প্রণয়দেবতার ফুলশরের বিচিত্র কাহিনী। ক্রমে প্রগাঢ় সুদীর্ঘ চুম্বন ও নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে সকল মুখরতা মৌন হ'য়ে যায়।

শিক্ষক ও ছাত্রীর এই অবৈধ প্রেমের সংবাদ ক্রমে ফুলবার্টের গোচরে এল। অতিথির বিশ্বাসঘাতকতা, তদুপরি শিক্ষকের এই গর্হিত আচরণ তাঁকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিলে। ফুলবার্ট তখন কর্তব্যের অনুরোধে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তাঁর সেই পণ্ডিত অতিথিটিকে গৃহ হ'তে বিদায়

[ক']রে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু প্রেম কি তাতে বাধা মানে? যে প্রেমের আদানপ্রদান চলছিল তাদের পাঠাগারের মধ্যে প্রকাশ্যে—তা এইবার সুড়ঙ্গপথের আশ্রয় নিলে। আবেলার্দ ও এলয়শা গোপনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে শুরু করলো। কিন্তু, ফুলবার্ট তা' জানতে পেরে এলয়শার একা বাড়ী থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করলেন।

প্রেমের ধর্মই হ'চ্ছে বাধা পেলে তা অদম্য হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রথম সুযোগেই এলয়শা তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেল। আবেলার্দ তাকে একেবারে ব্রেটনে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে তুললেন। আবেলার্দের ভগ্নী বহুযত্নে এলয়শাকে নিজের কাছে রাখলেন। এলয়শা তখন সন্তান-সম্ভবা। এইখানেই আবেলার্দকে সে একটি পদ্মফুলের মতো সুকুমার পুত্র উপহার দিলে।

ফুলবার্ট এই ব্যাপারে একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। আবেলার্দকে হাতের কাছে পেলে খুন ক'রে ফেলেন এমনি তাঁর মনের অবস্থা। পারিবারিক মর্যাদা, সামাজিক নীতি, ধর্মগত প্রথা যে একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক পরিণত বয়সেও এমন করে ধুলায় লুটিয়ে দিলে তাকে হত্যা করায় পাপ নেই! বরং, পৃথিবী থেকে একটা শয়তানকে সরিয়ে দিতে পারলে পুণ্যই হবে। ফুলবার্টের মনের এই অবস্থা জানতে পেরে আবেলার্দ তাঁর কাছে অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেন। এলয়শাকে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ ক'রে ধর্মপত্নীর মর্যাদা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হ'লেন, কিন্তু শর্ত রইল যে, এ বিবাহ গোপনে হবে, এবং সংবাদটাও গোপন রাখা হবে। কারণ, আবেলার্দ বিবাহিত এটা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা সফল হবে না। তার উন্নতিতে বাধা পড়বে। ফুলবার্ট অবশেষে আবেলার্দের এই শর্তেই রাজী হলেন। তিনি বুদ্ধিমান, বুঝলেন এ তবু মন্দের ভালো।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এলয়শাকে নিয়ে। সে বিবাহের ব্যাপারে একেবারেই রাজী নয়। তার আশঙ্কা—বিবাহ করলে আবেলার্দের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও প্রতিপত্তি সব রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। নিজের স্বার্থের জন্য সে তার প্রেমাস্পদের উন্নতির পথে বাধা হ'তে চায় না। আবেলার্দ সর্ব বন্ধন মুক্ত থেকে তাঁর জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক এলয়শা এই চায়। একেই বলে প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম! ত্যাগের উপরই যার রত্ন সিংহাসনখানি প্রতিষ্ঠিত। এলয়শা বললে—'আমাকে যদি সারাজীবন আবেলার্দের উপপত্নী হয়েও থাকতে হয় আমি তাতে কিছমাত্র ব্যথিত হব না, কিন্তু, আমার জন্য কোনও কারণে আবেলার্দের জীবনে কণামাত্র ক্ষতি যদি উপস্থিত হয়, সে ক্ষতি আমি সইতে পারবো না।' এলয়শা বলে—'যাকে ভাল বেসেছি, তাকে আমি ছোট ক'রতে পারবো না। আমাকে তাঁর জন্য যত নীচেই নামতে হোক না কেন,—আমি হাসি মুখে নেমে যাবো, কারণ, আমি জানি, আমার সে আত্মসমর্পণে—আমার সে ত্যাগে—প্রেম আমার সোনা হয়ে উঠবে।

কিন্তু, ভীরু কাপুরুষ আবেলার্দ পাছে ফুলবার্ট তার কিছু অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় এলয়শাকে বহু কাকুতি মিনতি করে এই বিবাহে সম্মত করালে। অশ্রুজলে সিক্ত এলয়শা এই গোপন বিবাহের মন্ত্র পড়ে গেল যেন কলের পুতুলের মতো। এযে তার প্রেমাস্পদের আদেশ! এলয়শা কি অবহেলা করতে পারে? সে যে নিজের বলে কিছু রাখেনি। আপনাকে সে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে তার পরম প্রেমাস্পদ দেবতার চরণে। এলয়শার এই আত্মসমর্পণ প্রেমধর্মের ইতিহাসে অমরত্ব পেয়েছে।

বিবাহের পর ফুলবার্ট কিন্তু তাঁর কথা রাখলেন না। বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আবার সন্ধি কী? সর্তভঙ্গ করে সকলের কাছেই তিনি প্রকাশ ক'রে দিলেন যে, অদ্বিতীয় পণ্ডিত আবেলার্দের সঙ্গে তাঁর বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী এলয়শার বিবাহ হ'য়ে গেছে। এ সংবাদে চারিদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল! বিশেষ ক'রে গির্জা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত হৈ চৈ শুরু হ'ল। এলয়শা প্রমাদ গুণলেন। তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান চিন্তা—আবেলার্দের না কোনও ক্ষতি হয়। এলয়শা তাঁর বিবাহের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন। আবেলার্দের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে একথা তিনি জোর গলায় অস্বীকার করলেন। ফুলবার্ট ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই আচরণে ক্রোধান্ধ হ'য়ে এলয়শাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

আবেলার্দ তখন নিরুপায় হ'য়ে এলয়শাকে একটি খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী-দের আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আবেলার্দের একান্ত অনুরোধে এলয়শা সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র অবগুণ্ঠন গ্রহণ করলেন না। আবেলার্দ এখানেও গোপনে এলয়শার সঙ্গে মিলিত হতেন। ফুলবার্ট এদের পিছনে চর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যখন আবেলার্দের এই চাতুরির কথা জানতে পারলেন তখন প্রতিহিংসার তাড়নায় পাগলের মতো এক কাজ করে বসলেন। গুণ্ডা লাগিয়ে রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আবেলার্দকে শয্যার সঙ্গে বেঁধে ফেলে তাঁর পুং চিহ্ন নির্মূল ক'রে দিলেন! যাতে সে আর এ জীবনে "খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের"মধ্যে কোনও স্থান না পায়। কারণ, গির্জার অধীনে পুরুষত্বহীন কোনও ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেন না। এজন্য ফুলবার্ট ও তার সঙ্গীদের সাজা হল বটে, কিন্তু আবেলার্দের ভবিষ্যৎ উন্নতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল।

আবেলার্দ মনের দুঃখে একটি সন্ন্যাস-আশ্রমে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এলয়শাও এইবার ব্যথিত চিত্তে অশ্রুসজল নেত্রে আবেলার্দের ইচ্ছায় সন্ন্যাসিনীর পবিত্র অবগুণ্ঠন ধারণ করলেন। আর একবার এই মহীয়সী নারী প্রেমের জন্য আত্মবলি দিলেন। প্রেমাস্পদের মুখ চেয়ে জীবনের সব সুখ সাধ স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিলেন। এই তেজস্বিনী মেয়েটি ছিল আমাদের সীতাসাবিত্রী সতীরই স্বজাতী।

এর পরেও আবেলার্দের জীবনে উত্থান পতনের অনেক অবস্থাই ঘটেছিল। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধাচরণে তাঁকে বার বার নিষ্পেষিত হ'তে হ'য়েছে, বার বার তিনি আপনার অসামান্য প্রতিভার গুণে সব কিছু তুচ্ছ করে উল্কার মতো জ্বলে উঠেছিলেন। 'পারাক্লিতে' তিনি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এলয়শাকে সেই মঠের কর্ত্রী করে দিয়েছিলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর এলয়শা তার গুরু, তার শিক্ষক, তার প্রিয়তম, তার বন্ধু, তার স্বামী ও সতীর্থ সন্ন্যাসী আবেলার্দের জন্য দীর্ঘ একবিংশ বৎসর অশ্রুবিসর্জন করে তারপর তাঁর কবরের পাশে স্থান নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এঁদের মধ্যে যে চিঠিপত্র লেখা-লেখি হয়েছিল সেগুলি ফরাসী সাহিত্যের অমূল্য বস্তু। আমরা আগামী মাসে ভারতবর্ষের পাঠকদের সেই পত্রাবলী উপহার দেব।

কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা

মন্মথ রায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপুতনার মধ্যে মেরতা রাজ্যের ভূস্বামী রতন সিংহের প্রাসাদ সংলগ্ন নাটমন্দির। মন্দিরে গিরিধারীলালের বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। কাল সন্ধ্যা। রতন সিংহের কন্যা মীরাবাঈ ও তাহার দুই সখী গঙ্গা ও যমুনা গিরিধারীলালের সন্ধ্যারতির আয়োজনে ব্যস্ত। আরও দুই তিন জন দাসদাসী সাহায্য করিতেছে। নাটমন্দিরের দালানে বসিয়া রতন সিংহের পিতা দুদাজী গীতা পাঠ করিতেছেন।

দুদাজী। "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃকুতোঽন্যো,
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব॥"

হে অপ্রতিম প্রভাব শালিন্! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; সুতরাং তুমি পূজ্য; গুরু ও গুরু হইতেও গুরুতর; ত্রিলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে থাকিতে পারে?

"তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমী শমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥

হে দেব, এই জন্য আমি দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্বক জগতের আরাধ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের এবং পতি যেমন প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ (প্রিয়সাধনার্থ) ক্ষমা করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

গঙ্গা॥ মীরা, আরতির সময় হ'লো। কিন্তু তোমার গিরিধারীলালকে ফুল দিয়ে এখনো সাজাচ্ছো না যে?

মীরা॥ গিরিধারীলালকে সাজাবো আজ নীলপদ্ম দিয়ে। নীলপদ্ম যে এখনো আসেনি গঙ্গা।

যমুনা॥ অচেনা, অজানা বিদেশী লোক। একদিন শ্বেতপদ্ম দিয়ে গেছে বলেই কী করে আশা কর যে সে আজও আসবে নীলপদ্ম নিয়ে?

মীরা॥ সে বলে গেছে আজ সে আসবে নীলপদ্ম নিয়ে। কেন যমুনা, তুমিও তো তা শুনেছো।

যমুনা॥ তা শুনেছি বটে, কিন্তু লোকটা তো বিদেশী। কোন পরিচয়ও দিল না। ওর কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমি বসে আছো মীরা?

দুদাজী॥ সেই লোকটা তো—যে কাল শ্বেতপদ্ম এনেছিলো? পরিচয় দেবে কী! মীরার ভজন শুনে মুখে আর কথাটি নেই। দেখলাম দু'চোখ জলে ভেসে গেছে। রোজ এই আরতির সময় কতো লোক আসছে—দেশ-বিদেশ থেকেও লোক আসছে। তা' তারা দিদি, তোর নাচ-গান দেখে খুসী হতেই আসে—খুসী হয়েই চলে যায়। কিন্তু এমন হাউ হাউ করে কেউ কাঁদে না,—যেমন ওই লোকটাকে দেখলাম কাল। তা' যখন কেঁদেছে, জানবি দিদি—মজেছে। আমি বলছি, সে আসছে—সে আসছে—ওই নীলপদ্ম নিয়েই সে আসছে।

উত্তেজিত ভাবে রতন সিংহের প্রবেশ।

রতন॥ পিতাজী! এ তো বড় বিপদ হলো।

দুদাজী॥ কী বিপদ বেটা?

রতন॥ গিরিধারীলালের সামনে মীরার আরতি দেখতে, ভজন শুনতে আজকাল এতো লোক এসে জড়ো হয় যে, বসবার জায়গা হয় না। রোজই এজন্য গোলমাল হয়। এ গোলমালে ভজন-পূজনে ব্যাঘাত হয়।

দুদাজী॥ হয় বৈ কি! যেন একটা হাট বসে যায়।

মীরা॥ (রতনসিংহকে) হ্যাঁ বাবা। আমার গিরিধারীলাল বলেন, "ওরা আমাকে দেখতে আসে না। দেখতে আসে মীরা—তোমাকে।"

রতন॥ আমি জানি, আমি বুঝি। আমি তাই আজ সদর-দেউড়িতে আদেশ দিয়েছি, বাইরের কাউকেই আরতির সময় আসতে দেওয়া হবে না আজ। কিন্তু

এই নাটিকায় মীরার ভজনগুলির বঙ্গানুবাদ স্বামী বামদেবানন্দ কৃত মীরাবাঈ গ্রন্থ হইতে উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের অনুমতিক্রমে দেওয়া সম্ভব হইল। এজন্য গ্রন্থকার তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এরই মধ্যে সদর-দেউড়ীতে প্রায় হু'শো লোক জমে গেছে। তারা বলছে, তারা জোর করে ঢুকবে এই নাটমন্দিরে। রক্ষীদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতিও হয়েছে শুনলাম। একটা মারামারি হ'তে পারে আশঙ্কা হচ্ছে।

হুদাজী॥ না না রতন, তুমি গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বল, এ আরতি, এ ভজন আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। পারিবারিক পূজারতিতে সর্ব-সাধারণের জোর-জুলুম কেন? বুঝিয়ে বললে, তারা বুঝবে।

রতন॥ বুঝুক বা না বুঝুক, আমি তাদের কাউকে আসতে দেবো না। তোমরা পূজারতি কর—কোনও ভয় নেই মা।

মীরা॥ (রতনসিংহকে) পিতাজী! শুধু একজনকে আসতে দিও—যার হাতে রয়েছে নীলপদ্ম।

রতন॥ কে সে?

মীরা॥ কে আমি জানি না। মনে হয় বিদেশী ভক্ত। কাল এনেছিল শ্বেতপদ্ম। বলে গেছে, আজ আনবে নীলপদ্ম। নীলপদ্ম দিয়ে সাজালে গিরিধারীলালের আজ কী শোভা হবে দেখো!

রতন॥ বেশ, তাকে আসতে দিচ্ছি। কিন্তু আর কাউকে নয়।

রতন সিংহের প্রস্থান।

হুদাজী॥ ওঃ! সে না এলে আজ আর বুঝি পূজারতি হবে না?

মীরা॥ হ্যাঁ—হবে না। আমি যে গিরিধারীলালকে বলে রেখেছি,—আজ তোমাকে সাজাবো—নীলপদ্ম দিয়ে সাজাবো। ভারী খুসী হয়েছেন গিরিধারী।

হুদাজী॥ তবেই হয়েছে। এ মুলুকে আবার কোথায় নীলপদ্ম? নীলপদ্ম আছে শিব পাহাড়ের ওধারে—দুর্গা হ্রদে। খুব কম করেও সে দুদিনের পথ। অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে আর এলে, তবে যদি সে আজ আসতে পারে। আর তা যদি সে আসে, তবে বুঝবো—সে যে সে লোক নয়···বীরের বীর—মহাবীর। এমন লোক—শুধু তোর ভক্ত কেন, তোর বর হলেও আমার আনন্দ হবে।

মীরা॥ কিন্তু বর হবে—সে পথ তো তুমি রাখোনি দাদু। এই এক নাতনীকে তুমি কবার বিয়ে দেবে? বিয়ে তো তুমি আমার একবার দিয়েছো—ওই গিরিধারী-লালের সঙ্গে। যতো বুড়ো হচ্ছো, সব ভুলে যাচ্ছো?

হুদাজী॥ ও, সেই বিয়ে! আরে, সে তোকে ভুলিয়েছিলাম। তুই যখন খুব ছোট, তখন একদিন পথ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বৌ নিয়ে বর যাচ্ছিল। হাত-পা ছড়িয়ে তুই কাঁদতে বসে গেলি, তোরও বর চাই। গিরিধারীলালকে তোর হাতে তুলে দিয়ে বললাম,—এই নে বর। তা, ওই পাথরের বর নিয়েই যদি তুই খুসী থাকিস্—থাক্।

নাগরিকের ছদ্মবেশে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভের প্রবেশ। তাহার হস্তে একরাশ নীলপদ্ম।

মীরা॥ এই যে—এসেছো! তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম আমরা। (ফুলগুলি একরকম কাড়িয়া লইয়া) বাঃ কী সুন্দর নীলপদ্ম!

ফুলগুলি লইয়া মীরা ছুটিয়া গিরিধারীলালের বিগ্রহের নিকট গিয়া গিরিধারীলালের উদ্দেশ্যে বলিল,—

মীরা॥ গিরিধারী! ছাখো, ছাখো—কী সুন্দর ফুল এনেছে ওই লোকটি! কী সুন্দর সাজ হবে তোমার আজ!

নীলপদ্মগুলি দিয়া মীরা বিগ্রহটিকে সাজাইতে লাগিল।

হুদাজী॥ (মীরাকে) সাজানো-গোজানোটা একটু চট্‌পট্ করে সেরে নাও মীরাদিদি। আরতির সময় বয়ে যায়।

গঙ্গা ও যমুনা আরতির আয়োজন-উত্তোগ করিতে লাগিল।

গঙ্গা॥ কিন্তু আর কাউকে দেখছি না যে। কে বাজাবে ঘণ্টা, আর কেই-বা বাজাবে কাঁসর?

হুদাজী॥ দেউড়িতে গোলমাল বেধেছে। সব গিয়ে জুটেছে সেখানে। আমি বাজাচ্ছি ঘণ্টা, আর-- (কুম্ভের প্রতি) ওহে ছোকরা, এদিকে এসোতো। কাঁসরটা বাজাতে পারবে?

কুম্ভ॥ তা' পারবো।

হুদাজী॥ দুর্গা হ্রদ থেকে নীলপদ্ম এনেছোতো?

কুম্ভ॥ হ্যাঁ, কর্তা।

হুদাজী॥ সাবাস! তুমি সব পারবে। চুপ! ওই আরতি সুরু হলো।

মীরা নৃত্যভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভজন গাহিতে সুরু করিল। গঙ্গা ও যমুনা ধূপ ও প্রদীপ যোগে আরতি সুরু করিল। ডুদাজী ঘণ্টা ও কুম্ভ কাঁসর বাজাইতে লাগিল।

—মীরার গান—

"সুনী মৈঁ হরি আওয়নকী আওয়জ।"
"হরি মোর আসে—তার ধ্বনি শুনি আজ।
প্রাসাদ মহলে চড়ি খুঁজি ওলো সজনি
কবে আসে মোর মহারাজ॥
দাদুরী ময়ূর আর পাপিয়ারা ডাকে,
ধরে পিক সুমধুর আ'জ।
গরজে বাদল মেঘ ঘন ঘোর ডাকে
দামিনী সে ছাড়িয়াছে লাজ॥
ধরণী ধরেছে রূপ নব নব সাজে
প্রিয়তম মিলন যে আজ।
মীরার এ চিতখানি ধৈরয মানে না
ত্বরা করি এসো মহারাজ॥"

মীরার সঙ্গীত শেষ হইলে চিতোরের রাণার সৈন্যাধ্যক্ষ খড়্গা সিংহের সহিত রতন সিংহের প্রবেশ।

রতন॥ (খড়্গা সিংহের প্রতি) ওই আমার কন্যা মীরা। এইতো আরতি শেষ হলো। কোথায় আপনাদের যুবরাজ কুম্ভ?

খড়্গা সিংহ কুম্ভকে দেখিয়াছে, কিন্তু কুম্ভের পরিচয় তখনই প্রকাশ করিল না।

খড়্গা॥ তিনি আছেন—এই রাজপ্রাসাদেই আছেন।

রতন॥ যুবরাজ কুম্ভ এলেন আমার গৃহে—আর আমি তা জানলাম না!

খড়্গা॥ যুবরাজের বেশে তিনি আসেন নি। তিনি এসেছেন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে—আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে। আপনি তাঁকে ভিক্ষা দেবেন বলুন,—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কোথায় সেই ভিক্ষুক।

রতন॥ মেবারের যুবরাজ—রাজস্থানের মধ্যমণি—আমাদের প্রভু। তাঁকে আমার অদেয় কী থাকতে পারে? বলুন সেনাপতি, কোথায় তিনি? কী তিনি চান?

খড়্গা॥ (হঠাৎ কুম্ভকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া) যুবরাজ! বলুন আপনি কী চান?

সকলে সবিস্ময়ে কুম্ভের দিকে চাহিল। কুম্ভ রতন সিংহের নিকট আসিয়া বলিল,—

কুম্ভ॥ রাজা রতন সিংহ! মৃগয়া করতে করতে এসে পড়েছিলাম আপনাদের এই অঞ্চলে। এসে আবালবৃদ্ধ বণিতার মুখে শুনেছি আপনার কন্যা মীরাবাঈ-এর অপরূপ রূপ লাবণ্যের কথা আর তার অপূর্ব নৃত্যগীতের খ্যাতি। সত্যতা পরীক্ষার জন্য আমি ছদ্মবেশে আসাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলাম। জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে আমি কালও এসেছিলাম, আজও এসেছি। দেখলাম, তাঁর খ্যাতি এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। বলতে আমার এতোটুকু কুণ্ঠা নেই—আমি মুগ্ধ···আমি অভিভূত! রাজা, আমি তোমার কন্যার পাণি-প্রার্থী।

রতন॥ পিতাজী! (ডুদাজীর দিকে চাহিলেন)

ডুদাজী॥ মেবারের মহিমময় রাজবংশের বধূ হবে মীরা—এ আমাদের মহা সৌভাগ্য।

রতন॥ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। (কুম্ভের প্রতি) আপনার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে আমি ধন্য হবো, যুবরাজ। শুধু দুঃখ এই, মীরার গর্ভধারিণী বেঁচে নেই। আমাদের এ সৌভাগ্য সে দেখল না।

খড়্গা॥ যুবরাজের ইচ্ছা, তিনি শুভকার্য সমাধা ক'রেই রাজধানীতে সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করেন।

রতন॥ তাই হবে—তাই হবে, সেনাপতি খড়্গা সিংহ। আসুন, আপনারা প্রাসাদে আসুন। (ডুদাজীর প্রতি) পিতাজী! মীরাকে নিয়ে আপনি অন্তঃপুরে আসুন।

কুম্ভ ও খড়্গাসিংহকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া রতনসিংহ তাহাদের লইয়া চলিয়া গেলেন। গঙ্গা ও যমুনা সানন্দে শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের অনুসরণ করিল। মীরা ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ডুদাজী ধীরে ধীরে মীরার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডুদাজী॥ মীরা! (কোনও উত্তর না পাইয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া) দিদি আমার!

মীরা॥ এ তোমরা কি করলে দাদু?

ডুদাজী॥ কোন অন্যায় আমরা করিনি মীরা। শ্রীরাধিকার কথা ভেবে দ্যাখ্। কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ হয়েও লোকাচারে তাঁরও হয়েছিল বিবাহ। পতি হ'লেন আয়ান

ঘোষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকেও তো তিনি মুহূর্তের তরে হারান নি। হারিয়ে ছিলেন ?

মীরা॥ (ভাবাবিষ্ট ভাবে) না, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রাধার ধ্যান, জ্ঞান, জপ, মন্ত্র !

দুদাজী॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মীরা। কেননা শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পতিরও পতি—জগৎপতি ! হোক্ না কেন কুম্ভ তোমার পতি, কিন্তু তোমার ওই গিরিধারীলাল···ওই জগৎপতি— উনি তোমার পরমপতিই থাকবেন—আজও যেমন আছেন।

মীরা ভাবাবিষ্টের মতো গিরিধারীলালের সহিত কথোপকথনে রত হইল।

মীরা॥ একি ! তুমি হাসছো কেন গিরিধারীলাল ? ·· য়্যাঁ ?···তুমি আমার পতি নও ! তবে - তবে ? · য়্যাঁ, কী বললে ?·· উপপতি ! তুমি আমার উপপতি ! (দুদাজীর প্রতি) উপপতি—সে আবার কী দাদু ?

দুদাজী॥ বললে ? গিরিধারীলাল তোর উপপতি হবে বললে ? তা' উপপতিই তো উনি ছিলেন -রাধিকারও। উপপতি কিনা পতির চেয়েও মিষ্টি--মানে সংসারে তোকে থাকতে বলছেন, নষ্টা স্ত্রীর মতো।

মীরা॥ নষ্টা স্ত্রীর মতো ! মানে ?

দুদাজী॥ নষ্টা স্ত্রী কি করে জানিস না বুঝি ? সংসারে থাকে গৃহকর্ম করে, স্বামীর সেবা করে, শ্বশুর-শাশুড়ীর শুশ্রূষা করে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে—যা কিছু কর্তব্য সব কিছুই করে···কোনখানে কোনও ত্রুটী নেই। কিন্তু জানবি মীরা, তার মন পড়ে থাকে উপপতিতে—বাইরের সেই আর একজনের উপর, যাকে সে পতির চেয়েও বেশী ভালবাসে—যার সঙ্গে তার আসল প্রেম।

মীরা॥ আসল প্রেম ! উপপতির সঙ্গে !

দুদাজী॥ হাঁ। পতির চেয়েও মিষ্টি সেই উপপতি ! দিনরাত কাজের মধ্যেই ডুবে রয়েছে, কিন্তু তারই মাঝে চোখ আর কান সজাগ রেখেছে, কখন সেই উপপতি আসবে—কখন তাকে দেখবে। আয়ান ঘোষ ছিলেন রাধিকার পতি—আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর উপপতি।

মীরা॥ গিরিধারীলালের একী খেলা দাদু !

দুদাজী॥ খেলা বলছিস্ তুই কাকে দিদি ? সংসারে থেকে এ যে এক মহা সাধনা। পতির সংসারে উপপতি ভগবান—সংসারে থেকেও পরমাত্মার গোপন আস্বাদ। এ উপপতি যদি কোন মানুষ হয়, সেটা হয় ব্যভিচার। কিন্তু সে উপপতি যদি হন স্বয়ং ভগবান, জীবাত্মার তাতে হয় মোক্ষলাভ।

মীরা॥ (গিরিধারীলালের বিগ্রহটি তুলিয়া লইয়া) ওগো, তাই যদি তুমি চাও, তাই হোক—তাই হোক্। কুম্ভ যদি আমার পতি, তুমি আমার উপপতি।

বিগ্রহটি বুকে চাপিয়া ধরিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর রাজপ্রাসাদ। কালিকাদেবীর মন্দিরের সম্মুখভাগ। অদূরে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। কাল—সকাল। কুম্ভের জননী রাজমহিষী চণ্ডীবাঈ, ভগ্নী চম্পা ও অন্যান্য পুরনারীরা বরণডালা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া কুম্ভ ও তাহার নবপরিণীতা পত্নী মীরাকে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। পুরনারীদের হস্তে শঙ্খ রহিয়াছে। তাহাদের পুরোভাগে কুলপুরোহিত রক্তপট্টাম্বর পরিহিত শঙ্করদেবকে দেখা গেল। বিপরীত দিক দিয়া বৃদ্ধ রাজভৃত্য কৌশিক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

কৌশিক॥ দেখে এলাম—দেখে এলাম রাণীমা, তোমাদের সবার আগে আমি নতুন বৌয়ের মুখ দেখে এলাম। বৌকে নিয়ে কুম্ভ একই হাতীতে বসেছিল।—হাতী থেকে এই নামলো। হ্যাঁ, বৌ বটে ! মুখতো নয় ? একেবারে একটি পদ্মফুল !

চণ্ডীবাঈ॥ তা' তুমি চলে এলে কেন কৌশিক ? কুম্ভ নিয়ম টিয়ম কিছু জানে না। নতুন বৌ নিয়ে আগেই রাজপ্রাসাদে না ঢুকে কুলদেবতার আশীর্বাদ নিতে প্রথমে আসবে—এই কালিকা মন্দিরে। তুমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, তাই তোমাকে পাঠালাম। তা' তুমি একা চলে এলে ?

কৌশিক॥ সব বলে এসেছি। এখানেই আসছে। এলো বলে। আমি ছুটে এলাম বলতে ; ছোট ঘরে বিয়ে করেছে বলে বৌ কিছু খাটো হয়নি। হ্যাঁ রাণীমা, দেখবে এখন—গোবরে পদ্মফুল !

চম্পা॥ থামো কৌশিকদা, তুমি তো যা' ছাখো, সবই পদ্মফুল।

কৌশিক। তা দেখি বটে, কিন্তু এমনটি আর

দেখিনি। নতুন বৌ এখানে এসে দাঁড়াক, দেখবে তোমরা সব মিইয়ে যাবে।

নবপরিণীতা মীরাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ। পুরনারীগণের উলু ও শঙ্খধ্বনি।

চণ্ডী॥ কুম্ভ, বৌমাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে প্রথমে প্রণাম কর কুলদেবতা—মহাদেবী কালিকা। কুলপুরোহিত শঙ্করদেবের অনুগমন কর।

শঙ্কর॥ (তাহাদের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া) কিন্তু নববধূর হাতে দেখছি কোন এক বিগ্রহ।

মীরা॥ আমার ইষ্টদেবতা—গিরিধারীলাল রণছোড়জী।

শঙ্কর॥ তোমার ইষ্টদেবতা গিরিধারীলাল রণছোড়জী?

কুম্ভ॥ হ্যাঁ, ওরা বৈষ্ণব।

শঙ্কর॥ কিন্তু তোমরা শাক্ত। তা বেশ, তুমি মা তোমার গিরিধারীলালকে এখানে আর কারুর হাতে দিয়ে মা কালিকাকে প্রণাম করবে এসো।

মীরা॥ আমার ইষ্টদেবতা—আর কারুর হাতে আমি দিতে পারবো না দেব।

শঙ্কর॥ মহারাণী!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মহারাণীর দিকে তাকাইল।

চণ্ডী॥ (মীরাকে) শোনো মা। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শুধু গোত্রান্তরই হয় না, ধর্মান্তরও হয়। স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম!

মীরা॥ কিন্তু গিরিধারীলাল জগৎস্বামী—আমার স্বামীরও স্বামী—

শঙ্কর॥ মহারাণী!

চণ্ডী॥ কুম্ভ!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কুম্ভের দিকে তাকাইল।

কুম্ভ॥ মীরা!

মীরা॥ আমার গিরিধারীলাল বলেন,—

"সর্বধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শঙ্কর॥ কিন্তু গিরিধারীলালের বিগ্রহ বুকে নিয়ে মা কালিকার আশীর্বাদ চাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তা' হবে না।

কুম্ভ॥ মীরা!

সানুনয়ে মীরার দিকে তাকাইল।

মীরা॥ আমি তাহলে এখানে অপেক্ষা করি। তুমি মন্দিরে প্রণাম করে এসো।

চণ্ডী॥ কিন্তু তুমি যদি আমাদের কুলদেবতা মা কালিকাকে প্রণাম না কর, তোমাকে তো আমরা বধূবরণ ক'রে রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারবো না।

চম্পা॥ (মীরার কাছে গিয়া) ছিঃ ভাবী! মার আদেশ অমান্য করো না। উনি শুধু তোমার শ্বশ্রূমাতা নন্, দেশের মহারাণীও উনি।

মীরা॥ কিন্তু—

চণ্ডী॥ কুম্ভ! তুমি ওকে বৈষ্ণব-অথিতিশালা গোকুলে রেখে অবিলম্বে মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসো।

কুম্ভ॥ (ব্যাকুলভাবে) মা!

চণ্ডী॥ না এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই কুম্ভ। মেবারের সুপ্রাচীন শিশোদীয় বংশের কুলপ্রথা ভাঙ্গবার অধিকার কারুর নেই—তোমারও নয়, আমারও নয়।

চণ্ডীবাঈ চলিয়া গেলেন। পুরোহিত ও চম্পা তাঁহার অনুগমন করিল। পুরনারীগণও ইতস্তত করিয়া অবশেষে মহারাণীর অনুসরণ করিল।

কুম্ভ॥ এ কী হলো মীরা! রাজঅন্তঃপুরে তোমার প্রবেশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল, মীরা!

মীরা॥ ভালোই হলো। যেখানে আমার গিরিধারীলালের আবাহন নেই, অভ্যর্থনা নেই,—সে নরকে আমি যেতে চাই না—চাই না স্বামী! বৈষ্ণবের অতিথিশালা—সেই আমার স্বর্গ। আমায় নিয়ে চল—নিয়ে চল প্রভু।

গত্যন্তর না দেখিয়া কুম্ভ মীরাকে লইয়া বিপরীতদিকে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

মেবারের রাণা মহাকালের উপবেশন কক্ষ। কাল সকাল। রাণা মহাকাল আলবোলা যোগে ধূমপান করিতেছেন। মন্ত্রী বুধাদিত্য তাঁহার সহিত আলোচনায় রত।

মহাকাল॥ বুঝলেন, মন্ত্রীবর, মেয়েটি বোধহয় ডানাকাটা পরী। বাবাজীবন দেখেছেন, আর মাথা ঘুরে গেছে। তাই, একেবারে বিয়ে করে আমাদের খবর দিয়েছেন। জানেন তো কুম্ভ এমনিই একটু খেয়ালী ছেলে!

বুধাদিত্য॥ কিন্তু তাই বলে আমাদের অধীন ক্ষুদ্র এক

সামন্তবরের কোনও মেয়েকে একদিন মেবারের মহারাণী বলে অভিবাদন করতে হবে, এ কথা ভাবতে আমাদের লজ্জা হচ্ছে, মহারাণা।

মহাকাল॥ না না, ও কথা বলবেন না, বুধাদিত্য। শাস্ত্রেই বলেছে—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" আমি এসব ভাবছিনে। আমি ভাবছি, মেবারের যুবরাজের বিবাহ হলো, অথচ আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-রাজন্যবর্গ, অধীন সৈন্য-সামন্ত এবং প্রিয় প্রজাদের নিয়ে মনের মতো একটা উৎসব করবার সুযোগ পেলাম না।

বুধাদিত্য॥ তা' সে উৎসব এখনও হতে পারে। আহেরিয়া উৎসব এই বিবাহের উৎসব দিয়েই সুরু হতে পারে মহারাণা।

মহাকাল॥ বেশ, তাই হবে। কিন্তু যাদের নিয়ে উৎসব, তাদেরই তো দেখা পাচ্ছিনা। কালিকা মন্দির থেকে প্রাসাদে আসতে ওদের এতো দেরী হচ্ছে কেন? এই যে মহারাণী

চণ্ডীবাঈ ও শঙ্করদেবের প্রবেশ

মহাকাল॥ কিন্তু তারা কোথায়? কুম্ভ আর বধূমাতা?

চণ্ডীবাঈ॥ কে বধূমাতা? কাকে বধূমাতা তুমি বল মহারাণা?

মহাকাল॥ কেন? কুম্ভের স্ত্রী—রতন সিংহের কন্যা মীরাবাঈ?

চণ্ডীবাঈ॥ কুম্ভের স্ত্রীরূপে তাকে স্বীকার করতে গ্রহণ করতে—আমরা পারি না পারি না মহারাণা।

মহাকাল। কিন্তু কেন? তোমাদের কতোবার বলবো, —"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।"

শঙ্কর॥ তাতে আপত্তি করছি না মহারাণা। কিন্তু বৈষ্ণবের ঘর থেকে এসেছে বলে এ কন্যা শাক্তাচার গ্রহণে অসম্মত। ইষ্টদেবতা তার কৃষ্ণ বলে রাণাবংশের কুলদেবতা কালিকা প্রণাম সে করেনি। ওই মহারাণীর অনুনয় ব্যর্থ হয়েছে, আদেশও তুচ্ছ করেছে।

মহাকাল॥ কী আশ্চর্য!

বুধাদিত্য॥ আমি ভাবছি, কী স্পর্দ্ধা!

মহাকাল॥ কোথায় সে? কোথায় কুম্ভ?

চণ্ডীবাঈ॥ আমি সে মেয়েকে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দিইনি। কুম্ভকে দিয়ে পাঠিয়েছি বৈষ্ণব অতিথি-শালায় গোকুলে।

মহাকাল॥ কুম্ভ কী বলে?

চণ্ডীবাঈ॥ ওই সে এসেছে।

কুম্ভের প্রবেশ

চণ্ডীবাঈ॥ তোমার স্ত্রীর আচরণ তুমি দেখেছো কুম্ভ। তোমার কী বলবার আছে, বল।

কুম্ভ॥ সে গুরুতর অন্যায় করেছে পিতা। অবোধ বালিকা—তার হয়ে আমিই তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপরাধের গুরুত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলে, সে অনুতপ্ত হবে ক্ষমা চাইবে।

মহাকাল॥ বেশ, তাই হোক্। কী বল মহারাণী?

চণ্ডীবাঈ॥ আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি—কুলদেবতার এই অমর্যাদায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। পুত্রবধূ—তাকে নিয়ে কতো আনন্দ করবো···কতো উৎসব হবে··· কতো স্বপ্নই না আমার ছিল, কিন্তু সব চুরমার হয়ে গেছে। তার মুখখানা যখন দেখলাম, মনে হলো স্বয়ং লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে। কিন্তু সে যে এতো বড়ো অলক্ষ্মী, কে জানতো। যতো দিন সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করছে, ততোদিন তাকে আমরা স্বীকার করতে—গ্রহণ করতে পারবো না। এ তুমি জেনে রাখো কুম্ভ।

শঙ্কর॥ কুলদেবতার অমর্যাদা—মহাপাপ। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের মঙ্গল নেই, আপনাকে আমি বলে রাখছি মহারাণা। আর সে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওই দুর্বিনীতা নারীকে কৃষ্ণবিগ্রহ বিসর্জন দিয়ে—কালীমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। রাজ্যের পুরোহিত আমি, এই আমার বিধান।

বুধাদিত্য॥ শুধু তাই নয় মহারাণা। এ কাহিনী মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এরই মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচারিত হয়ে গেছে প্রজাপুঞ্জের মাঝে। আশঙ্কা করছি, প্রজা-বিক্ষোভ অনিবার্য। শিশোদীয় রাজবংশের যদি মঙ্গল চান মহারাণা, তবে এই পাপের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক—অবিলম্বে।

মহাকাল॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! শোনো কুম্ভ, বংশ-মর্যাদা তুচ্ছ করে তুমি বিবাহ করেছ নিম্নকুলে। তোমার সে অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু তোমার স্ত্রীর এ অপরাধ—ক্ষমার অযোগ্য। আমার বিধান কৃষ্ণ-বিগ্রহ বিসর্জন দিয়ে—আমাদের কুলধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাকে তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কুম্ভ॥ আমি দেখছি পিতা—আমি দেখছি—

প্রস্থানোদ্যত।

মহাকাল॥ শোনো। যদি তোমার স্ত্রী এ প্রায়শ্চিত্ত না করে, ওই স্ত্রী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

কুম্ভ॥ কিন্তু পিতা—

মহাকাল॥ হাঁা। আর যদি তুমি তা' না কর, মেবারের সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করতে হবে তোমাকে।

কুম্ভ॥ পিতা!

মহাকাল॥ হাঁা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বেকার-সমস্যা—

বেকার-সমস্যার প্রাবল্য দিন দিন সরকারের পক্ষে আতঙ্কজনক হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা, বোধ হয়, অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যার তুলনায় অল্প। অশিক্ষিত বেকারদিগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিতেছেন, তাহা প্রকাশ নাই। শিক্ষিত বেকার-সমস্যার সমাধান-কল্পে তাঁহারা আপাততঃ যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে হাতুড়ে বৈদ্যের মুষ্টিযোগের কথাই মনে পড়ে। সরকারের হিসাবে কলিকাতাতেই আড়াই লক্ষ বেকার কাজের সন্ধানে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ঘুরিতেছে। খাদ্য বিভাগ বন্ধ হইলেও ১০ হাজারের অধিক লোক বেকার-বাহিনী বর্দ্ধিত করিবে। সেই অবস্থায় যদি শিক্ষিত বেকার-সমস্যার সমাধানজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমাজ-সেবা শিক্ষাদানের জন্য ১০ হাজার লোক নিযুক্ত করেন, তবে কি তাহা সিন্ধুতে বিন্দুর মতই হইবে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কেন্দ্রী সরকারের মতানুসারে স্থির করিয়াছেন, আগামী জানুয়ারী মাসে বা তাহার অনতিকাল পরে তাঁহারা কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১০ হাজার লোককে ৬ সপ্তাহে সমাজ উন্নয়নের ও শিক্ষাদানের কার্য্যে সুশিক্ষিত করিয়া চাকরী দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি কেন্দ্রে কয় জন গ্র্যাজুয়েট, কয় জন ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কয় জন ম্যাট্রিকুলেট নিযুক্ত করা হইবে তাহার হিসাব এইরূপ :—

স্থান	কেন্দ্র সংখ্যা	গ্র্যাজুয়েট	ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	ম্যাট্রিকুলেট
বাঁকুড়া	৩০	৩২	৭৭	৩৬৯
বীরভূম	৩১	৪১	৬০	৫৫২
বর্দ্ধমান	৬০	১৫৩	১৫৫	৮৮৮
হুগলী	৯০	৬২	৮০	৫৬০
হাওড়া	৯৫	৬৮	১১২	৭৪২
মেদিনীপুর	৫০	১৪৬	৩১৬	১১১৯
কুচবিহার	২০	২৪	২৫	৩০৫
দার্জ্জিলিং	৩০	২৫	৩০	১২০
জলপাইগুড়ী	২০	৪৫	৬০	২২৫
মালদহ	২০	২১	৩৪	২৭৫
মুর্শিদাবাদ	৩০	৫২	৮৫	৪২০
নদীয়া	৫০	৭১	৫৫	৩৯০
২৪ পরগণা	১৫০	২৩৬	৩৫০	১২৮৯
পশ্চিম দিনাজপুর	২০	৪২	৫৫	৩০৯
কলিকাতা	৩০০			

ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সরকার দিবেন—অপরার্দ্ধের ভার মিউনিসিপ্যালিটী অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর হুদ্দায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে।

কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় কেন্দ্রের সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইল, তাহা প্রকাশ নাই।

কতগুলি ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে, তাহার হিসাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু "স্কুল ফাইন্যাল" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা কি অপাংক্তেয় হইবে?

মিউনিসিপ্যালিটীগুলি কিরূপে অতিরিক্ত ব্যয় দিতে পারিবে, তাহাও বিবেচ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীগুলির ক্ষমতা গ্রাস করিবার জন্য যে আইনের খসড়া ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিতে দেখা যায়, সরকারের মত এই যে, পশ্চিম বঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটীগুলি অর্থাভাবে বিব্রত। সরকারই সেই অজুহত দেখাইয়া স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ত-শাসন পঙ্গু করিতে চাহিতেছেন। সে অবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটীর স্কন্ধে নূতন ভার চাপাইয়া দিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা আশা করি, যাঁহাদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহাদিগের নির্ব্বাচনে দলগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে না এবং তাঁহাদিগকে দলবিশেষের পক্ষে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতেও হইবে না।

সর্ব্বোপরি কথা—যদি ১০ হাজার শিক্ষিত বেকারকে এইরূপে নিযুক্ত করা হয়, তবে কি সমস্যার সীমাও স্পর্শ করা সম্ভব হইবে?

ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক যুদ্ধের পরে, অনিবার্য্য কারণে—বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয়। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের শেষে আয়ার্লণ্ডে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে—এমন কি তুরস্কেও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছিল। আমাদিগের রাষ্ট্রে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও তাহার পরে দেশ-বিভাগ—সমস্যা জটিল ও ভয়াবহ করিয়াছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও তুরস্ক বেকার-সমস্যার সমাধানজন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, সে সকল অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা হয়ত আমাদিগের সমস্যার সমাধানের উপযোগী উপায়ের সন্ধান পাইতে পারি। সে কাজ হয়ত সচিব, রাষ্ট্র-সচিব ও উপসচিবদিগের দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে। সে কাজের উপযুক্ত লোক হয়ত কোন একটি রাজনীতিক দলে বা সেই দলের আশ্রিত ও অনুগতদিগের মধ্যেও না পাওয়া যাইতে পারে। মাত্র ১০ হাজার শিক্ষিত বেকারকে প্রায় "পেট ভাতায়" চাকরী দিয়া

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই
সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট
দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক
কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন
সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড়
নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন।
এতে খুব খুসী হবার কথা—নয় কি?"

S. 219-X52 BG

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার-সমস্যার সমাধানচেষ্টা যে একান্তই হাস্যোদ্দীপক এবং নিষ্ফল তাহা বলা বাহুল্য।

কিরূপে এই বিরাট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে, সে জন্য সরকারের পক্ষে জনগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিদিগের পরামর্শের সুযোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য।

কিন্তু গত ২রা অক্টোবর শিক্ষা-সচিব বলিয়াছিলেন, শিক্ষাবিস্তার জন্য ৩৫ হাজার (১০ হাজার নহে) লোক নিযুক্ত করা হইবে।

জমীদারী উচ্ছেদ—

পশ্চিমবঙ্গে ব্যবস্থা পরিষদে জমীদারী উচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় দুইটি ব্যাপার লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে :—

(১) আইন-সচিব—ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্রকুমার বসুর নিকট হইতে ব্যবস্থা পরিষদে খসড়া আইনের ভার চিকিৎসক প্রধান-সচিব বিধানচন্দ্র রায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সত্যেন্দ্রকুমার তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্মানজনক মনে করিয়া পদত্যাগ করেন নাই।

(২) অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধান-সচিব—কলিকাতা সহরটি আইনের হদ্দা হইতে বাদ দিতে সম্মতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সে জন্য পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার দলীয় সদস্যদিগের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আর সদস্যগণও তাহাতে কোনরূপ আপত্তি জ্ঞাপন করেন নাই!

আইন-সচিব সিলেক্ট কমিটীর অনুমোদন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অস্বীকার করায় প্রধান-সচিব তাঁহাকে ভারমুক্ত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' মন্তব্য—এই পরিবর্ত্তন—

"created a furore among some members of the Congress Party. They had to be cajoled by the Chief whip of the Party into leaving the Chamber and voting in accordance with their leader's decision."

ইহাতে গণতন্ত্রের যে রূপ সপ্রকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত স্বৈরাচারের সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য বিচার করা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, যদি কোন এক জন সচিব "দাঙ্গা ফুরাইয়া লইবার" উপযুক্ত হ'ন, তবে অপদার্থ বহু সচিব রাখা কি অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে না? আর একটি কথা—যদি আইনের খসড়া রচনার সময় টালীগঞ্জ যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিয়াই কি কাজ করা হইয়াছিল?

প্রথমে কলিকাতাও জমীদারী উচ্ছেদ আইনের এলাকায় আসিবে বলিয়া সহসা মত-পরিবর্ত্তনের ফলে যদি বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত ও অল্পসংখ্যক লোক লাভবান হইয়া থাকে, তবে তাহার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে? টালীগঞ্জ অঞ্চলে বহু জমী যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে ফাট্‌কা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে "স্পেকুলেশন" বলে যে ধাতুগত—তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। হয়ত তাঁহারা এই উক্তি ও উক্তি-প্রত্যাহারের সুযোগ লইয়াছেন এবং কত টাকা "হাতফের" হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিমৃশ্যতার-ফলেই ইহা হইয়াছে।

প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, ভবিষ্যতে জমি কৃষককে দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ভাল কথা। কিন্তু স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সে ভবিষ্যৎ কতদিনে দেখা যাইবে এবং জমী কৃষককে বণ্টন করিবার আইন ও জমীদারী উচ্ছেদ ব্যবস্থার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান রাখা হইল, তাহার কি কোন সঙ্গত প্রয়োজন থাকিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাশিয়ার সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, কি ফ্রান্সের সরকারের পথ গ্রহণ করিবেন, তাহা কি স্থির করিতে পারিতেছেন না? না—তাঁহারা একটা মধ্যব্যবস্থার সন্ধান করিতেছেন, যেমন—

"আউশও নয়, আমনও নয়—
কার্ত্তিক মাসের ধাটী :
বেলেও নয়, আঠালও নয়—
দো-আঁশ মাটী।"

নির্ব্বাচনের ফলাফল—

কলিকাতার দক্ষিণাংশের কেন্দ্র হইতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ কেন্দ্র হইতে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে অর্থাৎ ভারতের পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যু যে স্বাভাবিক কারণে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই; শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব সে সম্বন্ধে কখন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কখন বলিয়াছেন—তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়াছে, আবার—অব্যবস্থিতচিত্তের মত বলিয়াছেন, কারণানুসন্ধানের কারণ থাকিতে পারে। সে যাহাই হউক, গত ২৪শে জুন বন্দিদশায় কাশ্মীরে—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পৃষ্ঠপোষিত শেখ আবদুল্লার অধিকারে আবদ্ধ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে শূন্য আসন পূর্ণ করিবার জন্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে সরকারের দীর্ঘ ৫ মাস কাল লাগিয়াছে। হয়ত কংগ্রেস তাঁহাদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত প্রার্থী সংগ্রহ করিতে না পারাই বিলম্বের কারণ। সে যাহাই হউক, এত দিনে একই সময়ে উভয় কেন্দ্রে সদস্য নির্ব্বাচন হইয়াছে।

লক্ষ্মীকান্ত—কংগ্রেস পক্ষীয় ছিলেন। সে কেন্দ্রে এ বার নির্ব্বাচন ফল—

শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী—৬৯,৬০৬ ভোট
শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়— ২৭,৪৫৫ „
শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়—১৯,৮০২ „
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস— ৭,৩৬৫ „

প্রথম প্রার্থী কংগ্রেসী, দ্বিতীয় কম্যুনিষ্ট, তৃতীয় প্রজা-সোশ্যালিষ্ট, চতুর্থ স্বতন্ত্র।

এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিপুল ভোটাধিক্যে জয় হইয়াছে। শ্রীমতী ইলা নাটুদহের জমীদার পরিবারের বধূ—বিধবা।

দ্বিতীয় নির্ব্বাচন দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্রে। তাহার ফল :—

শ্রীসাধন গুপ্ত—৫৮,২১১ ভোট

ডক্টর রাধাবিনোদ পাল—৩৬,৩১৯ ভোট

শ্রীজে, পি, মিত্র—৫,৪৩১ ভোট

ডক্টর ভূপাল বসু—৫,৪১৫ ভোট

প্রথম অর্থাৎ বিজয়ী প্রার্থী কম্যুনিষ্ট। তিনি শৈশবেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রার্থী কংগ্রেসের মনোনীত। তিনি জাপানে যুদ্ধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের অন্যতম বিচারক হিসাবে যে রায় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় প্রার্থী জনসঙ্ঘের ও চতুর্থ ফরওয়ার্ড ব্লকের মনোনীত।

এই নির্ব্বাচনের ফল সুদূরপ্রসারী। কংগ্রেস ডক্টর রাধাবিনোদের সাফল্যের জন্য ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, অর্থ ব্যয়েও কার্পণ্য করেন নাই; এমন কি ডক্টর কালিদাস নাগের মত শিক্ষাব্রতীও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাধাবিনোদবাবু নির্ব্বাচনের প্রথম পর্ব্বে জাপানে ছিলেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, লোকনায়ক শরৎচন্দ্র বসু যেমন বিদেশে থাকিলেও এই কেন্দ্রে জয়ী হইয়াছিলেন, রাধাবিনোদও তেমনই হইবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই—মৌক্তিকংন গজে গজে। তাহার কারণ, শরৎচন্দ্রের ত্যাগ ছিল অসাধারণ, সাহস ছিল অসীম, নিষ্ঠা ছিল বিস্ময়কর, রাজনীতিক অভিজ্ঞতা ত্যাগে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। রাধাবিনোদবাবু রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত। সেইজন্য একবার পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে ব্রাইট ও কবডেনের পরাভবে 'টাইমস' যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কেহ তাহা বলিতে পারিবেন না—

"Nothing can be more alien to our feelings than to insult these gentlemen with expressions of commiseration when the battle of life has for the moment turned against them……While they are living and in full possession of their faculties no House of Commons will be complete without them."

দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্রে নির্ব্বাচনের প্রথম বৈশিষ্ট্য—শতকরা মাত্র ২৬ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন এবং একটি ভোটদান স্থানে একটি ভোটও প্রদত্ত হয় নাই। গণতন্ত্রের এই মূর্ত্তিতে লোকের পক্ষে স্তম্ভিত হওয়া অনিবার্য্য। ইহার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, এই কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিতে কেন্দ্রী সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদে এই কেন্দ্রের প্রায় অর্দ্ধেক ভোটার বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য-নির্ব্বাচনে বিরত ছিলেন—কারণ, নির্ব্বাচন নিষ্ফল, "ক্রট মেজরিটী" গণতন্ত্রের বিরোধী। এই নিদান-নির্ণয় অভ্রান্ত কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ডক্টর রাধাবিনোদ পাল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় ও কংগ্রেস তাঁহাকে প্রার্থী হইতে প্ররোচিত করায় অনেকগুলি অপ্রীতিকর ফল ফলিয়াছে। ডক্টর রাধাবিনোদ যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনাই পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন—তাঁহার সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধুভাবে করা হইয়াছে—শত্রুভাবে নহে। এই নির্ব্বাচন ফলে—

(১) রাধাবিনোদ পালের মত আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির পরাভব ঘটিল এবং ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারই নহে। কারণ—

(২) যে জাপানে তিনি বিশেষরূপ সম্মানিত সেই জাপানের লোক হয়ত মনে করিবে, স্বদেশে তাঁহার কোন আদর নাই। ইহাতে হয় তাঁহার সম্বন্ধে, নহেত ভারতের নির্ব্বাচিতদিগের সম্বন্ধে, হয়ত বা উভয়ের সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

(৩) আজ যখন এশিয়া বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন, তখন এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে সম্মিলনের যে স্বপ্ন বহুদিন পূর্ব্বে জাপানী মনীষী কাকাজু ওকাকুরা দেখিয়াছিলেন, যাহা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ও কার্য্যের প্রভাবে সাফল্যের সম্ভাবনা-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিল, তাহার সাফল্যে সাহায্য করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

(৪) ভারতবর্ষের পূর্ব্বরাজধানী—পরে অখণ্ড বাঙ্গালার ও বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর যে অংশ পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র বসুকে ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নির্ব্বাচিত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে সেই অংশে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে দীর্ঘ ৫ মাস আয়োজন ও অর্থব্যয় করিয়া—সমগ্র শক্তি প্রযুক্ত করিয়া এবং ডক্টর রাধাবিনোদ পালের মত আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াও কংগ্রেসের শোচনীয় পরাভব ঘটিল। ইহার পরে কাহাদিগকে দেখাইয়া কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আপনার লোকমতের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারিবেন?

(৫) কল্যাণীতে কংগ্রেসে এই নির্ব্বাচনফলের নিবিড় ছায়া কি ভাবে লক্ষিত হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচ্য।

মিউনিসিপ্যাল বিল—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীকে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তীরা—চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে—তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা ইংরেজ সরকারে করিয়াছিলেন। তাহার পরে স্বদেশী সরকার কিছুকাল মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনা করিয়া যে আইন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন সরকার মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন আইন করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে :—

(১) যে হেতু অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থকষ্ট রহিয়াছে এবং জমীর ও বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারণে ত্রুটি থাকে, সেই হেতু বা সেই ছল ধরিয়া স্থির হইতেছে—জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মূল্য-নির্দ্ধারক (এসেসর) নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং নির্দ্ধারিত মূল্য সঙ্গত কি না সে বিচারের ভার পাইবেন—চেয়ারম্যান, এক জন কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোনীত এক ব্যক্তি।

(২) প্রয়োজন মনে করিলেই সরকার কর্ম্মকর্ত্তা (একজিকিউটিভ অফিসার) নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) বর্ত্তমান আইনে কমিশনারদিগের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি ব্যতীত চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করা যায় না ; এখন কমিশনারদিগের সংখ্যাধিক্যে তাহা করা যাইবে অর্থাৎ শতকরা ৫১ জন বিরোধিতা করিলেই চেয়ারম্যানকে বিতাড়িত করা যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রভুত্ব করিতে দেওয়া হইবে এবং সরকার ইচ্ছামত লোক নিযুক্ত করিবেন ও করদাতারা তাঁহার—সঙ্গত বা অসঙ্গত—বেতন দিতে বাধ্য হইবেন।

আবার বিদেশীয় কমিশনারদিগের অবসরাভাবের অজুহতে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থাও হইবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী কমিশনারের পদ অনাবশ্যক বলিয়া তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনগুলি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতির বিরোধী। লর্ড রিপণের শাসনকালে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৯০৭-৯ খৃষ্টাব্দে বিকেন্দ্রীকরণ কমিটী প্রথাটি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ঃ—

"Except in cases of grave mismanagement local bodies should be permitted to make mistakes and learn by them, rather than be subjected to interference either from within or from outside."

(ভারত সরকারের রেজলিউশন ১৭ ধারা)

ঐ রেজলিউশনের ত্রয়োদশ ধারায় এমনও বলা হইয়াছিল যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা ব্যবহার না করিলে আর্থিক দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এই নীতি যদি—ক্ষমতালোভে—সরকার বর্জ্জন করেন, তবে তাহা যে দেশের ও দশের পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া অকল্যাণের কারণ হইতে পারে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। সরকার যদি ক্ষমতালোভে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতি ত্যাগ করেন, তবে তাহাতে সেই কথাই লোকের মনে পড়িবে—ক্ষমতা লোককে (বা প্রতিষ্ঠানকে) হীন করে, অবল্মিত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হীন করে। কিন্তু সে কথা কি সরকার মনে করিবেন ?

সাংবাদিক লাঞ্ছনা—

যে সময় কলিকাতায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় গড়ের মাঠে এক সভায় পুলিসের হস্তে কয়েকজন সাংবাদিকের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে তদন্ত হইবে, এই প্রতিশ্রুতিতে কেন্দ্রী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধ্য করেন। তখন প্রকাশ পায়, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীশরৎকুমার ঘোষ তদন্তের ভার লইবেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব য়ুরোপে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য্যের নিন্দা করেন ও হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজদিগের অন্যতমকে তদন্তের ভার প্রদান করা হয়। সে সম্বন্ধে বক্তব্য—কলিকাতা হাইকোর্ট এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন এবং এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা—প্রত্যক্ষে সেই সরকারের পুলিসকর্ম্মচারী, পরোক্ষভাবে একাধিক সচিব অথবা যৌথ দায়িত্বে সচিবসঙ্ঘ। সুতরাং যদি ভারত রাষ্ট্রের অন্য কোন প্রদেশের হাইকোর্টের জজ তদন্তের ভার পাইতেন, তবে কাহারও মনে কোনরূপ অকারণ সন্দেহেরও অবকাশ থাকিত না।

সে যাহাই হউক, বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে পুলিসের কাজ চুণকাম হইয়াছে এবং সাংবাদিকদিগের ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে। বিচারকের বিচার-বুদ্ধিতে কোনরূপ দোষারোপ না করিয়াও বলা অসঙ্গত নহে যে, তিনি যদি সাংবাদিকদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকিতেন, তবেই ভাল হইত। এ সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন—

"If in this matter we consider that not the law, but the administration of it should be tempered with commonsense perhaps we may be pardoned."

মোট কথা—পুলিসের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য ও সাংবাদিকদিগের সাক্ষ্য নির্ভরের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতঃপর সাংবাদিকদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা তাঁহাদিগের বিচার্য্য। যদিও ঘটনার দিন সকাল ১০টায় অস্থায়ী প্রধান-সচিব ও শ্রম-সচিব (উভয়েই ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য-নির্ব্বাচনে বিপুল ভোটে পরাভূত হইয়াছিলেন) মীমাংসার জন্য সাক্ষাৎকারী ডক্টর রাধাবিনোদ পাল, সন্তোষকুমার বসু, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে অপরাহ্নে—ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটীর প্রতিনিধিদিগের সহিত একযোগে—সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন তথাপি যখন বিচারক সাক্ষ্যপ্রমাণে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সাংবাদিকদিগকে লাঞ্ছিত করা পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুযায়ী নহে এবং সাক্ষাৎকারীদিগের মধ্যে ডক্টর রাধাবিনোদ পালকেই কংগ্রেস দক্ষিণ কলিকাতায় শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে শূন্য আসনের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী করিয়াছিলেন, তখন সে বিষয় আর উত্থাপিত না করাই আমরা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রকৃত গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদিগের স্থান তাঁহারা বহু চেষ্টায় অধিকার করিয়াছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একটি মামলার রায়-প্রদান কালে ইলিনয়িস হাইকোর্টের প্রধান বিচারক টমশন—সংবাদপত্রের সহিত স্বৈরশাসনপ্রিয় শাসকদিগের সঙ্ঘর্ষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোক সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ করে "and history begins to record unspeakable persecution of the editors." ইংরেজের আমলাতান্ত্রিক শাসনে ভারতবর্ষে এই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং খণ্ডিত ভারতবর্ষের ভারত রাষ্ট্রে এখনও ইংরেজের রচিত আইন ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সাংবাদিকরা যদি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য স্থির

...য়া লক্ষ্যানুগামী না হন, তবে তাঁহারাই দৌর্ব্বল্যের পরিচয় প্রকট ...রিবেন।

এই প্রসঙ্গে তদন্তের রিপোর্ট সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহা ...রিয়াছেন, তাহা ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন সদস্য গণতন্ত্রানুমোদিত নহে, এমন কথা বলিয়াছেন। সরকার ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় রিপোর্ট আলোচিত হইতে দেন নাই। রিপোর্ট বিক্রয়ার্থ বাজারে দিয়া যতদিন ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলিতেছিল, ততদিন বিক্রয়ের আদেশ বাতিল রাখিয়া অধিবেশন শেষ হইলে আবার বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। অথচ তদন্ত প্রকাশ্যভাবে করা হইয়াছিল এবং তদন্তের বিবরণ দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় লোক ঘটনা সম্বন্ধে আপনাদিগের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। এই অবস্থায় রিপোর্ট প্রকাশ, প্রকাশ বন্ধ ও আবার প্রকাশ—এইরূপ ব্যবস্থা অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়কই বলা যায় না কি? তাহার উদ্দেশ্য—হয় ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় তাহার আলোচনাপথ রুদ্ধ করা; নহেত, ভারত সরকারের আদেশে—১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও তদন্ত ব্যবস্থা করার মত—মতপরিবর্ত্তন। ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা বন্ধ করিবার সময় সভার সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সরকারের কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলেন—রিপোর্ট ব্যবস্থাপক সভার নিকট নাই।

আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, সরকারের প্রেস নোটে রায়ের কোন কোন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজের রায় দপ্তরখানার কর্মচারীর দ্বারা পরিবর্ত্তন কি জজের অপমান নহে?

রিপোর্ট প্রকাশে অনিচ্ছা—

কলিকাতায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে না—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান-সচিব তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ট্রাম কোম্পানীর বা সরকারের বা উভয়ের অসুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব হইবে কি না, তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল তদন্তজন্য কমিটী নিযুক্ত করিয়া কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ না করার প্রবৃত্তি ভারত সরকারের দেখা যাইতেছে। আমরা নিম্নে দুইটির উল্লেখ করিতেছি:—

(১) পার্লামেণ্টে আলোচনার ফলে ভারত সরকার "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন" সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন ...ও বিবেচনার পরে সে কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু কয় মাস অতীত হইলেও তাহা লোকের গোচর করা হয় নাই।

(২) যে বহুব্যয়সাধ্য "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে" কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে এবং এখনও যাহার সম্বন্ধে সরকার পক্ষ হইতে অনেক প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহার কার্য্য কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার রিপোর্টও প্রকাশ করা হয় নাই।

কেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি মনে করেন, তদন্ত কেবল তাঁহাদিগের অবগতির বা কাজের জন্য তবে তাঁহাদিগের সে ধারণা, আর যাহাই কেন হউক না—গণতন্ত্রের মূল নীতির অনুমোদিত নহে। কারণ, জনগণ সরকারের সহিত সম্পর্কছিন্ন এবং সরকার জনগণকে না জানিতে দিয়া কাজ করিতে পারেন এ ধারণা যে সরকারের থাকে, সে সরকার কখনই জনগণের সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না।

পাকিস্তান ও ভারত—

পাকিস্তানীরা যে ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া নানারূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার বহু প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইলেও ভারত সরকার তোষণ নীতিরই অনুসরণ করিতেছেন। গত ২৪শে নভেম্বর পার্লামেণ্টে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—গত মে মাসে পাকিস্তানীরা ভারত-পাকিস্তান-সীমান্তে ৫ জন সাঁওতাল নারীর মৃত্যু ঘটায়। সে বিষয়ে পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও নিকটস্থ পাকিস্তানী কর্ম্মচারী যে তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা একমত হইতে না পারায় ভারত-সরকার—অপরাধীদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান জন্য পাকিস্তান সরকারকে লিখিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—"ভারত সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।"

দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার গুরুত্ব আরোপ করিলেও তাহাতে যে ঈপ্সিত ফললাভ হইতেছে, এমন প্রমাণ দেশের লোক পাইতেছে না। পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে দুর্ব্বৃত্তরা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যে বহু বার অত্যাচার করিয়া যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা ভারত সরকারকে জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যে অপরাধীরা দণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমরা অবগত নহি।

যে সরকার নিরপরাধ প্রজাকে অন্য রাষ্ট্রের প্রজার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে সরকার ক্ষমতা-পরিচালনে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। যে সরকার সেরূপ অত্যাচারের প্রতীকার করিতে অক্ষম সে সরকারে লোকের আস্থা শিথিল হয়। ভারত সরকার যে প্রজাকে রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তবুও যে পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁহারা তোষণ-নীতি কিছুতেই বর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না, ইহা অনেকের নিকট প্রহেলিকা বলিয়াই মনে হইতেছে।

কাশ্মীরের ব্যাপারে শেখ আবদুল্লার পাকিস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠতার বিষয় প্রকাশ পাইলেও পণ্ডিত জওহরলাল কাশ্মীরের ব্যাপার তাহার নিজস্ব বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। অথচ কাশ্মীরের জন্য ভারত সরকার যে কোটি কোটি টাকা অবাধে ব্যয় করিতেছেন, তাহা অপব্যয়ে পরিণত হইবার সম্ভাবনা যে নাই, এমন নহে। শেখ আবদুল্লার পরে যাঁহারা কাশ্মীরের কর্ণধার হইয়াছেন, তাঁহারাও শেখ আবদুল্লার মত বলিতেছেন—কাশ্মীর ভারত ছাড়া নহে, কিন্তু তাঁহারাও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি চাহিতেছেন না—ভারতসরকারও সে দাবী করিতেছেন না! অথচ কাশ্মীরের একটা প্রধান অংশ পাকিস্তানভুক্ত হইয়া রহিয়াছে!

পাকিস্তানের আমেরিকার সহিত চুক্তির সংবাদে জওহরলালও উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা খড়ের আগুনের মতই যেন জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গিয়াছে।

অথচ তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা প্রকাশের প্রতিক্রিয়া দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্রে পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচনে লক্ষিত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির কথা বলিব না) কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? সেই উৎকণ্ঠা প্রকাশের প্রতিক্রিয়া যদি লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী বা রাষ্ট্রে প্রবাসী মুসলমানদিগের পাকিস্তান ও ভারত সম্বন্ধে মনোভাব বিবেচনা করা হয়ত রাজনীতিকের পক্ষে উচিত। কারণ, আজ যাহা ক্ষুদ্র বীজ, তাহাই সুযোগ লাভ করিলে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে।

আবার পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমুদ্র হইতে মৎস্য আনিয়া কলিকাতাবাসীর মৎস্যের অভাব দূর করিবার চেষ্টা এমনই ব্যর্থ হইয়াছে যে, পাকিস্তান হইতে মৎস্য আমদানী সঙ্কুচিত হইলেই বাজারে মাছ দুষ্প্রাপ্য হয়—দুর্মূল্য ত আছেই। ইহাতে লোক বিস্ময় প্রকাশ করিলে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল—ব্যাপারটি পরীক্ষামূলক, সুতরাং সে বাবদে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা জলে যায়, তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কলিকাতার ভূগর্ভে রেল চালাইবার পরিকল্পনায়ও কয় লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়াছে। সরকারের পরিবাহন বিভাগে লাভ হয় না। এখন পাথুরিয়া কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করা প্রভৃতির পরিকল্পনা চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার নিকটে যে বিস্তৃত জলাভূমিতে মাছের চাষ হয়, তাহা জলশূন্য করিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য কি করা যায় তাহা দেখিয়া মত প্রকাশ জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইয়াছে। প্রথমে সে জন্য ব্যয় হইবে—প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। হয়ত বিশেষজ্ঞের মত হইবে—এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে না। দেশের জলনিকাশের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রেলপথ বিস্তারের ফল কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে লেলী লিখিয়াছেন—Does any one know or care to know how the advent of a railway affects the life of a village or district ?"

যে ভাবে নানা পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনা হইতেছে ও বিদেশ হইতে যন্ত্রাদি আমদানী করা হইয়াছে ও হইবে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, পরিকল্পনায় দেশের লোকের কোন উপকার হউক বা না হউক—বিদেশে যে টাকা দিতে হইবে, তাহাতেও আমাদিগের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

ধাপার জলা জলমুক্ত করিয়া—প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া জমী উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কি পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে ২০ মাইলের মধ্যে গঙ্গার উভয় কূলে যে জমী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে, তাহা বাসের ও চাষের উপযোগী করিলে সে কাজ অনেক অপব্যয়ে হইতে পারিত না? দামোদরের জলনিয়ন্ত্রণে হুগলী ও হাওড়া জিলা দুইটির লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে, সে সম্বন্ধে সার উইলিয়ম উইলকক্সের মত কি বিবেচনা করা হইয়াছে? এই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য :—

(১) এ সকল আশু প্রয়োজনীয় কি না?

(২) এ সকলে যে লাভ হইতে পারে তাহা ব্যয়ের তুলনায় অধিক কি না?

(৩) এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার মত লোক কি এ দেশে পাওয়া যায় না?

(৪) বিদেশী বিশেষজ্ঞরা কি এ দেশের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞই নহেন?

(৫) কে, কি ভাবে, কাহার উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞ মনোনীত করিয়া থাকেন? সে মনোনয়নে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে কিনা?

(৬) এই সকল পরিকল্পনার বাহুল্যে ফারাক্কায় বাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে "পতিত" জমী চাষের ও বাসের উপযোগী করিবার কার্য্য পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইতেছে কি না?

দেশের বা প্রদেশের উন্নতি যদি ব্যক্তিবিশেষের বা দল বিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে জন্য লোকমতের অপেক্ষা রাখা না হয়, তবে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি—

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত রাষ্ট্রে খাদ্যোপকরণ ৫০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিসাব—উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, পঞ্জাব, পেপসু ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশগুলিতে অধিক খাদ্যোপকরণ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। আর আসাম, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূর চারিটি রাষ্ট্রে পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, যদি এই হিসাব নির্ভরযোগ্য হয়, তবে ভারত সরকার খাদ্যোপকরণ নিয়ন্ত্রণ রদ করিতে দ্বিধাবিচলিত হইতেছেন কেন? গম ও দাইল প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণে যে শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে, চাউল সম্বন্ধে তাহা প্রকাশ পাইতে বিলম্বের কারণ কি? খাদ্যোপকরণ নিয়ন্ত্রণ সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা—স্বাভাবিক সময়ে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। যুদ্ধে জর্জ্জরিত—বিদেশের উপর খাদ্যোপকরণের জন্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল ইংলণ্ড যুদ্ধের পরে—কয় বৎসরেই নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাতিল করিতে সমর্থ হইয়াছিল; রুশিয়া বিপ্লবের পরে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাই করিয়াছে। কিন্তু কৃষিপ্রাণ ভারতরাষ্ট্রে সে প্রথার উচ্ছেদসাধন আজও হইল না!

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

বৈদেশিকী

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ—

রাজনীতিক বিসমার্কের বুদ্ধি, সেনাপতি মলকের রণকৌশল ও সম্রাট উইলিয়মের (প্রথম) নেতৃত্বে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য সম্মিলিত করিয়া যে জার্ম্মানী গঠিত করিয়াছিল, সম্রাট তৃতীয় উইলিয়মের অতিলোভে তাহা প্রথম দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল। উইলিয়মকেও জার্ম্মানী ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যেন—মজালে জার্ম্মাণকুলে—মজিলা আপনি। তাহার পরে জার্ম্মানীর রঙ্গমঞ্চে হিটলারের আবির্ভাব—সে-ও অতিলোভের অভিব্যক্তি এবং সেই কারণে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরশাসকের স্বেচ্ছাচার। ফলে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্ম্মানী আজ খণ্ডিত। কেহ বলিবেন, জার্ম্মানী আজ নর-সিংহাকার; তাহার কতকাংশ রুশিয়ার দ্বারা অধিকৃত, কতকাংশে সম্মিলিত দেশসমূহের প্রভাব। অনেকেই বলিবেন—যদি জার্ম্মানদিগের মত গৃহীত হইত, তবে দেখা যাইত, জার্ম্মানী প্রয়াগসঙ্গমে গঙ্গা যমুনার প্রবাহের মত—যমুনার নীল জল ও গঙ্গার শ্বেতধারা মিশিয়া মহাস্রোতে পরিণত হইতেই চাহিতেছে। ভারতবর্ষে—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ব পাকিস্থানে অবস্থা সেইরূপ কি না, কে বলিবে?

এখন জার্ম্মানীর সমস্যা য়ুরোপের কেন্দ্রী-সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ—ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার কম্যুনিষ্টভীতি।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা লইয়া প্রধান শক্তিগুলি সমবেত হইয়া উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবেন—ইহাই কেবল আলোচিত হইতেছে। কিন্তু আলোচনার মূল সর্ত্তগুলিতেও সকলে একমত হইতে পারিতেছেন না; কারণ—প্রথম প্রভেদ মতবাদ লইয়াই, আর যে যাহার কোলে ঝোল টানিতে ব্যস্ত এবং কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই পরস্পরের উদ্দেশ্যে ও কথায় অবিশ্বাস য়ুরোপের রাজনীতিতে নূতন নহে। বহুদিন পূর্ব্বে যখন বার্লিণে য়ুরোপীয় তুরস্কের ভাগ্য-নির্ণয় অর্থাৎ বাটোয়ারা ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ডিজরেলী ও তাঁহার সহকারী লর্ড অলসবেরী যে সত্য গোপন করিয়াছিলেন, তাহা 'গ্লোব' নামক সংবাদপত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল! কোনরূপে মুখরক্ষা করিয়া ডিজরেলী বলিয়াছিলেন, তিনি "peace with honour" আনিয়াছেন।

এখন য়ুরোপের রাজনীতি আর কেবল য়ুরোপীয় দেশসমূহের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। য়ুরোপে আমেরিকার প্রভাব—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলশনের মিত্রশক্তিকে সাহায্য দানের ফলে পুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ ও প্রবল হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রপতি উইলশন পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিলে, ইংলণ্ডের পক্ষে লয়েড জর্জ্জ, ফ্রান্সের পক্ষে ক্লেমেঁশ, ইটালীর পক্ষে ডিউক অব অর্লাণ্ডো সমবেত চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ করিয়া যে ব্যবস্থার উদ্ভব করিয়াছিলেন, তাহাতে পৃথিবী ভণ্ডামীর জন্যই নিরাপদ হইয়াছিল এবং তাহাতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তাহার পরে—সমগ্র পৃথিবীর দেশসমূহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রুশিয়া প্রবলতর হইয়াছে এবং সে জানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নূতন ভাবে জার্ম্মানীকে আক্রমণে অসম্মত হইয়াছিল, তখন তাহারা রুশিয়ার পতনই কামনা করিয়াছিল—"ষাঁড়ের শত্রু বাঘ মারে।" রাশিয়াও আজ আণবিক বোমার মত মারণাস্ত্রে সজ্জিত। কে অধিক প্রবল, তাহা কে বলিবে? ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে—ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্থান স্বায়ত্ত-শাসনশীল। জাপান পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। চীন—আমেরিকার ও ইংলণ্ডের তাঁবেদার চিয়াংকাইশেকের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নূতন রূপে আবির্ভূত হইয়াছে; তিব্বত পর্য্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। মিশরে রাজা ফারুককে দেশত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছে। মিশর তুরস্কের অধিকৃত দেশ ছিল; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড প্রভৃতির প্রলোভনে শাসনকর্ত্তা (খদিব) তুরস্কের প্রভুত্ব অস্বীকার করায় প্রলোভনদাতারা তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন। আজ মিশরও গণতন্ত্রাধীন। ফ্রান্স দুর্ব্বল। ইটালীও সবল হইতে পারে নাই।

এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অর্থে ও সামর্থ্যে আমেরিকা প্রবল হইয়াছে। কেহ কেহ এমন আশঙ্কাও করেন যে, আমেরিকা যুদ্ধবিরোধী নহে; যুদ্ধ বাধিলে তাহার দেশের লোকের দৃষ্টি দেশের বাহিরে নিবদ্ধ থাকিবে, দেশের রাজনীতিকরা নিরাপদ থাকিবেন। সে অনুমান সত্য কি না, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন অবস্থা এই যে, কেহই—ইচ্ছা থাকিলেও—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেছেন না। সেই জন্যই আশঙ্কার কারণ এই যে, কোথায়, কখন, কি কারণে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে বলা যায় না। জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ লইয়া কি হয়, তাহাও চিন্তার বিষয়। দেশের লোকের অধিকাংশের মতানুসারে ব্যবস্থা হইলেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব, নহিলে নহে।

আমেরিকা ও পাকিস্থান—

আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের সামরিক চুক্তি হইতেছে, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকা বলিতেছে—তাহার পররাজ্য লোভ নাই, সে শান্তিকামী। কিন্তু আমেরিকার ভক্ত ভারতের প্রধান-মন্ত্রীও যে সে কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছেন, এমন মনে হয় না। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অজ্ঞাত নাই; বিশেষ পূর্ব্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তানের অধিক ভাগ যে বিক্ষুব্ধ তাহা যে ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত-বহ্নি আগ্নেয়গিরির গর্জ্জন মাত্র নহে, পরন্ত গৈরিকস্রাব। সুতরাং পাকিস্তান যদি প্রবল দেশের সহিত চুক্তি করিবার আগ্রহে—যাহাকে shouting and touting for alliance বলে, তাহাই করে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্য কি? এই চুক্তিতে সে হয়ত আপনার নাককাণ কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবে। কাশ্মীরে পাকিস্তানের ব্যবহার এইরূপ চুক্তির অন্যতম কারণ যে হইতে পারে না, এমন নহে। পাকিস্তান যে করাচী চুক্তি ভঙ্গের বিষয় ভারতের সহিত আলোচনা করিতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারত সরকার কাশ্মীরের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করায় অনেকের—সেকালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আফগানিস্থানকে "বার্ষিক" প্রদানের কথা মনে পড়িতেছে। এদিকে লাডক বলিতেছে, সমগ্র কাশ্মীর

যদি ভারতভুক্ত না হয়, তবে লাডক তিব্বতের সহিত (চীনে) সংযুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য, লাডক পূর্ব্বে তিব্বতভুক্তই ছিল।

পাকিস্তানকে আমেরিকা কিরূপ সাহায্য প্রদান করিবে? কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবগণ নারায়ণীসেনা ও পাণ্ডবগণ নারায়ণকে পাইয়াছিলেন। পাকিস্তান কি তেমনই আমেরিকার সামরিক সাহায্য ও ভারত তাহার কারীগরী বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি পাইবে?

পাকিস্তান মধ্যে মধ্যে যে যুদ্ধের হুমকি দিতেছে না, তাহাও নহে। যদিও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিষয় ভারত সরকারেরও অজ্ঞাত নহে, তথাপি আক্রমণকারীকে দুর্ব্বল মনে করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত সরকারের ব্যবহার এবং পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে পাকিস্তানীদিগের অনাচারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, বিহার সরকারের ও ভারত সরকারের ব্যবহার দৌর্ব্বল্যদ্যোতক—ইহাও কেহ কেহ মনে করিতেছেন। ভারত সরকার পাকিস্তানকে কয়লা, কাপড়, লবণ প্রভৃতি প্রদান সম্পর্কে যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহার মত উদারতা পাকিস্তান দেখাইতেছে কি?

পাকিস্তান কি ভারতের সহিত সম্পাদিত চুক্তিসমূহের সর্ত্ত যথাযথ রূপে পালন করিয়াছে ও করিতেছে? ভারত রাষ্ট্রে পাকিস্তানীদিগের অনাচারের প্রতিবাদে যে অনেক সময় উত্তরও প্রদত্ত হয় নাই অর্থাৎ পাকিস্তান তাহা "উড়ায় হাসে" করিয়াছে, তাহাও জানা গিয়াছে।

আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের চুক্তির কারণ সন্ধান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভারত সরকারকে অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

গ্রেট বৃটেন—

গ্রেট বৃটেনের সহিত অতি দীর্ঘকাল ভারতের যে বিজেতা ও বিজীত সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা জানিতে ভারতবাসীর কৌতূহল অনিবার্য্য। একদিন ইংলণ্ডের গর্ব্ব ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্য এত বিশাল যে তাহাতে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না। কিন্তু সে গর্ব্ব আর করিবার অধিকার ইংলণ্ডের নাই। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান গৌরবের কারণ—ভারতবর্ষ আজ তাহার হস্তচ্যুত। ব্রহ্মও আর তাহার অধীন নহে। পূর্ব্বেই আপনার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য সে আমেরিকা হারাইয়াছিল। তাহার পরে আয়ার্লণ্ডের একাংশও গিয়াছে। যুদ্ধজনিত বিপর্য্যয়ে লণ্ডন আজ আর পৃথিবীর আর্থিক ব্যাপারে মহাজন নহে। আজ ইংলণ্ড দুর্ব্বল। সে আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। কিন্তু—

ইল্লোৎ যায় ধু'লে,
স্বভাব যায় ম'লে।

তাই এখনও তাহার সাম্রাজ্যবাদের সংরক্ষণ চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহাও যে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকের দেশ-প্রেমই এখনও ইংরেজকে রক্ষা করিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে উইনষ্টন চার্চ্চিলকে লাঞ্ছিত করা হইয়াছিল, ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আবার তিনিই প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি আর অল্পদিন পরেই সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। আপাততঃ তিনি তাঁহার অফুরন্ত উৎসাহবশে রাজনীতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তাহা নাকি পাঠক-সমাজকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিবে। হয়ত তাহা তাঁহার দীর্ঘকালীন রাজনীতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়লিপি হইবে।

মিশর, ব্রহ্ম ও পারস্য—

সে আজ বহুদিনের কথা। কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"নিয়তির গতি রোধ হ'বে না কি আর?
উঠিবে না কেহ কিরে উজলি আবার
মিশর পারস্য ভাতি　　গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কিরে চির অন্ধকার?"

মিশর ও পারস্যে উন্নতি বা পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। মিশরের রাজার অর্জ্জিত রত্নাদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। পারস্যেও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে—রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র কাহার জয় হইবে বলা যায় না। গ্রীস ও রোম লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারচেষ্টা করিয়াছে। ভারতে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মিশরের গণতন্ত্র হইতে সুদানকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য য়ুরোপীয়দিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। সুদান মিশরের অঙ্গীভূতই থাকিতে চাহিতেছে—বিদেশী প্রভাবের কলঙ্ক সে আর বহন করিতে অসম্মত।

পারস্যে রাজতন্ত্র হয়ত আবার জয়ী হইবে—শাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন, ডক্টর মোসাদেকের বিচার হইতেছে। কিন্তু প্রজাসাধারণের মত যে জয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই জয়ের পরে পারস্যের অবস্থা কি হইবে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্রহ্মে এখনও সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কতকাংশে কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রবল। অপর অংশ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দেশের প্রভাবে প্রভাবিত। সঙ্ঘর্ষ যেন লাগিয়াই আছে। ব্রহ্মের পরে শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

সিংহল ভারতীয়-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত। ভারতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব বিপন্ন রহিয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা—

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ সমভাবে শ্বেতাঙ্গদিগের প্রভাবাধীন সরকার কর্তৃক পুষ্ট করা হইতেছে। তথায় ভারতবাসীরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে। ইহার ফলে যখন শ্বেতাতিরিক্ত জাতিরা প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তখন তাহারা যদি প্রতিশোধ লইতে আগ্রহশীল হয়, তবে যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা উদ্ধত শ্বেতাঙ্গগণ বিবেচনা করিতেছেন না বটে, কিন্তু তাহা বুদ্ধিভ্রংশেরই পরিচায়ক এবং বুদ্ধিনাশ বিনাশের কারণ।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

—এগারো—

"Posso, sim senhor"—

মহাদেব পাণ্ডা কিছু একটা সন্দেহ করেছিল নিশ্চয়।

—শ্রেষ্ঠীর দক্ষিণ-পাটন কি এবার নীলাচল পর্যন্তই ?

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল। এই আকস্মিক প্রশ্নে বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

—না, সিংহল অবধি আমি যাব।

—এবার কিন্তু জগন্নাথধামে অনেক দিন আপনি রইলেন।

শঙ্খদত্ত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শীর্ণ গলায় বললে, এই পুণ্যভূমিতে পা দিলে এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করেনা।

কয়েক মুহূর্ত একটা অদ্ভুত দৃষ্টি শঙ্খদত্তের মুখের ওপর মেলে রাখল মহাদেব। পুণ্যভূমি—নিঃসন্দেহ। জগন্নাথের পাদপদ্মে এসে পড়লে কোন্ ভক্তের মন আর যেতে চায় এখান থেকে। নীলমাধবের এই পরম তীর্থে আসবার জন্যে কত দুস্তর সাধনা করে মানুষ। আসে গুজরাটের দুরান্ত থেকে, আসে কেরল থেকে, আসে গৌড় থেকে। কত পাহাড়-পর্বত, কত অরণ্য, কত নদ-নদী। দস্যুর ভয় আছে, আধি-ব্যাধি আছে, মৃত্যু আছে সঙ্গে সঙ্গে। তবু আসে পলিতকেশা বৃদ্ধা, আসে অন্ধ-পঙ্গু, আসে ব্যাধিগ্রস্ত! কত দূর-দুর্গম পার হয়ে এসে শেষে এই মন্দিরের সামনেই হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ফেলে কেউ কেউ। 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে'। সেই পুনর্জন্মের দুঃখকে এড়াবার জন্যে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী—রথের চাকার তলায় প্রাণ দেয় কতজন। ভক্তের রক্তে আর চোখের জলে এই নীলাচলের মাটি স্বর্গের চন্দন হয়ে গেছে। সত্যিই তো—এখানে এলে কার মন আর সহজে বিদায় নিতে চায়!

কিন্তু গৌড়ের শ্রেষ্ঠীকে এতখানি ধর্মপ্রাণ বলে তো কোনোদিন মনে হয়নি। তা ছাড়া এই বণিকেরা যে দেবতার সঙ্গেও বাণিজ্যই করতে আসে, সে অভিজ্ঞতা মহাদেবের নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ। যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক, প্রসন্ন থাকুন মহাসাগর, পথের দস্যুভীতি দূর হোক—বাণিজ্যতরী ভরে উঠুক সোনায় সোনায়। দেবতার সঙ্গে যেখানে এই সহজ দেনা-পাওনার সম্বন্ধ—সেখানে ভক্তির এই বাড়াবাড়িটা খুব স্বাভাবিক মনে হলনা মহাদেব পাণ্ডার।

মহাদেব কী বুঝল সেই জানে। সংক্ষেপে হেসে বললে, তা বটে।

মহাদেব চলে গেলে কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। সন্দেহ হয়েছে পাণ্ডার মনে? অসম্ভব কী? সেদিন দেবদাসীর প্রাকারের তলায় অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—তাও কি কারো চোখে পড়েনি?

হঠাৎ একটা তীব্র ভয় আর লজ্জা এসে শঙ্খদত্তকে আচ্ছন্ন করে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে যেন সে আবিষ্কার করল—তার গোপন কথা এখানে আর গোপন নেই। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়েছে—ছড়িয়েছে মুখে মুখে। দেবদাসী—একমাত্র দেবভোগ্য যে, তার ওপরে গিয়ে পড়েছে তার লুব্ধ দৃষ্টি। নগরের প্রত্যেকটি মানুষ, প্রতিটি তীর্থযাত্রী—দুই চোখে ঘৃণা আর পুঞ্জিত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে! এ সংবাদ শুনেছেন রাজা—শুনেছেন রাজ-পুরোহিত, আর—আর হয়তো তারই মাথা লক্ষ্য করে এতক্ষণ শান পড়ছে রক্তচক্ষু জল্লাদের খড়্গে! শম্পার পুরীর চারপাশে নিশি রাত্রের স্তব্ধতায় যে সমস্ত অপমৃত প্রেতাত্মা দগ্ধ-কামনার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় বাতাসে—দুদিন পরে হয়তো তারও স্থান হবে তাদেরই দলে!

না—এ নয়, এ নয়। এই বিষকন্যার কুটিল জাল থেকে তার মুক্তি চাই। যেমন করে হোক, আজই সে পালাবে এখান থেকে। ঠিক কথা, তার দেশ গৌড়েও সুন্দরীর অভাব নেই—সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর শ্রেষ্ঠীদের ঘরে ঘরে অসংখ্য রূপবতীর কালো চোখ তাকে বরণ করে

নেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। জোর করে শুধু বন্দরের নোঙরই নয়—বুকের নোঙরও উপড়ে ফেলতে হবে তাকে। ব্যথা বাজবেনা তা নয়—কিন্তু সমুদ্রের চঞ্চল হাওয়ায় তা মিলিয়ে যাবে দেখতে দেখতে!

ধনদত্ত বণিকের ছেলে শঙ্খদত্ত জোর করে উঠে দাঁড়ালো। চরিত্রবান্ শঙ্খদত্ত—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে যে কখনো পাশা খেলেনি—মধূকের সুরায় মাতাল হয়ে যে কখনো উদ্দাম রাত্রি কাটাতে যায়নি গণিকাদের ঘরে! এই মতিভ্রম তার চলবেনা। অনেক কাজ তার বাকী। তা ছাড়া গুরু সোমদেব—একটা চাবুকের ঘা খেয়ে যেন শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল! আজই—আজই সে পালাবে এখান থেকে।

শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ল। ভয় আর আত্মবিশ্বাসের চাপ দিয়ে এতক্ষণে সে অনেকটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে তার দুর্বিনীত দুর্বার মনকে। এমন কি, এইবারে একটা আশ্চর্য প্রশান্তিও যেন অনুভব করছে সে।

সকালের আলোয় চারদিক প্রাণ চঞ্চল। দলে দলে মানুষ চলেছে মন্দিরের দিকে, চোখে-মুখে তাদের ভক্তির পবিত্রতা। দারুব্রহ্মের জয়ধ্বনি উঠছে থেকে থেকে। কয়েক দিন আগে অন্নকূটের মহোৎসব হয়ে গেছে, বিক্রী হচ্ছে মুঠো মুঠো প্রসাদ। একজন সন্ন্যাসী এসে তার মুখে এক মুঠো শুকনো ভাত গুঁজে দিলে। অন্যমনস্কভাবে তার হাতে একটা টাকা তুলে দিলে শঙ্খদত্ত।

এই তো জীবন—এই তো স্বাভাবিক। এরই মাঝখানে থেকেও কেন সে এমন ভাবে ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ ইচ্ছার ওপরে সচেতন শাসন বসিয়েছে শঙ্খদত্ত। যে-পথে দেবদাসী শম্পা বাস করে সে-পথে নয়। এমন কি, যেদিকে সে থাকে, সেদিকেও নয়। সম্পূর্ণ উল্টো মুখে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সে কত দূরে চলে এসেছে খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চিৎকারে যেন তার ধ্যান ভঙ্গ হল। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল সে নগরের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে এসে পা দিয়েছে। বহু পেছনে, গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের উঁচু চূড়োটা।

ফিরে যাবার কথা মনে হতেও সে ফিরতে পারলনা। ওই চিৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে-দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তার ওপর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল সে।

খোলা মাঠের মতো জায়গা একটুখানি। প্রায় পনেরো ষোলো জন লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। চিৎকার আর গোলমালটা উঠছে তাদের মধ্য থেকেই।

ঝগড়া চলছে।

জাতে সকলকেই ব্যাধ বলে মনে হল। পেশী দিয়ে গড়া কালো কালো শরীর। মাথায় জটা বাঁধা চুল, হাতে লোহার বালা। তাদের মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা সম্বর হরিণ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই শিকার করা হয়েছে হরিণটাকে—তার সোনালী দীর্ঘ লোমগুলোর ভেতর দিয়ে তখনো তাজা রক্ত গড়িয়ে নামছে।

কলহ শুরু হয়েছে হরিণের ভাগ নিয়ে।

পনেরো জনের বিরুদ্ধে একটি মাত্র প্রতিপক্ষ। কিন্তু সেই একজনের দিকে তাকিয়েই শঙ্খদত্তের চোখে আর পলক পড়তে চাইলনা। মাথায় সে সকলের ওপরে আধ হাত উঁচু; পাহাড়ের মতো চওড়া কালো বুকে কয়েকটা রক্তের ছিটে—বোধ হয় হরিণটারই—কিন্তু তাতে করে তাকে দেখাচ্ছে একটা গুলবাঘের মতো। অত বড় শরীরের তুলনায় চোখ দুটো অত্যন্ত ছোট—কিন্তু তাতে গোখরো সাপের হিংস্রতা।

চারদিকের কলহ-কলরবের মধ্যে আশ্চর্য নিরাসক্ত লোকটি। অদ্ভুত রকমের স্থির। যেন একটা সুদীর্ঘ শালগাছ অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে আছে নিচের একরাশ ঝোপ-ঝাড়ের দিকে।

শঙ্খদত্ত কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এটা অনুমান করছিল যে অবস্থা চরমের দিকে এগোচ্ছে। হলও তাই। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জন দুই ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দৈত্যটার ওপরে।

লোকটার বুকের দিকে চেয়ে শঙ্খদত্ত ভাবছিল পাথরের প্রাচীর। কথাটা সত্যিই মিথ্যে নয়! লোকটা তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আক্রমণকারী দুজনকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে আট দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একজন একটা চাপা আর্তনাদ তুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালালো, আর একজন বালির মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইল মড়ার মতো। অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

দৈত্যটা দু হাতে বুক চাপড়াল একবার। ঢাকের বাজনার মতো গুম্ গুম্ আওয়াজ উঠল তার থেকে। তারপরে হা-হা করে একটা দানবীয় অট্টহাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল সে। সে হাসির শব্দ শুনে শঙ্খদত্তের বুকের ভেতরটা অবধি ভয়ে হিম হয়ে উঠল।

—আর কেউ আসবে?—হাসি থামলে জিজ্ঞাসা শোনা গেল দৈত্যটার।

কিন্তু আর কারো আসবার প্রশ্ন ছিলনা। ভয়ে-আতঙ্কে বাকী লোকগুলো পিছু হটতে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই দু পাশে অদৃশ্য হল তারা। মুখ থুবড়ে যে পড়ে গিয়েছিল, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর চোখের বালি রগড়াতে লাগল দু হাতে। গালের দুটো কষেই তার রক্তের রেখা।

দৈত্যও আর দেরী করলনা। হরিণটাকে একটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল কাঁধের ওপর, তারপরে যেন নিতান্তই বেড়াতে বেরিয়েছে এম্‌নি মন্থর অলস-ভঙ্গিতে চলতে শুরু করল উল্‌টো দিকে।

প্রথম কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিল শঙ্খদত্ত। তারপরেই চেতনার মধ্যে খরধার বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে গেল তার। আর তারই আলোয় শঙ্খদত্ত নিজের মনের হিংস্র রূপটাকেও দেখতে পেল প্রত্যক্ষ।

জীবনে এই রকমই ঘটে। দিনের পর দিন নিজেকে নিয়ে রোমন্থন করেও যে প্রশ্নের সমাধান মেলেনা, একটির পর একটি বিনিদ্র রাত যে-ভাবনায় ঝরে পড়া তারার মতো অর্থহীন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়—এম্‌নি আকস্মিকভাবেই তাদের চকিত মীমাংসা এসে দাঁড়ায় সম্মুখে। সে মীমাংসা চরম—সে নিরঙ্কুশ। হত্যা করা উচিত কিনা এ নিয়ে নিজের ভেতরে আলোড়ন করা যায় মাসের পরে মাস, কিন্তু হাতে যদি তলোয়ার পাওয়া যায়, আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাওয়া যায় কোনো নির্জনতার অবকাশে, তা হলে আর চিন্তা করবার প্রয়োজন থাকেনা।

সেই মীমাংসা—সেই উন্মত্ত সমাধান শঙ্খদত্তের রক্তের ভেতরে ফণা তুলে উঠল ক্রুদ্ধ কালনাগের মতো। সেই তলোয়ার যেন আকাশের বিদ্যুৎ থেকে ছিনিয়ে এনে তার হাতে তুলে দিলে কেউ। বুকের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে কী একটা বেজে উঠল তার।

শঙ্খদত্ত লোকটার পিছু নিলে।

মন্থর গতিতে সেই ভাবেই হেঁটে চলেছে। প্রকাণ্ড কাঁধের নিচে দুলতে দুলতে চলেছে হরিণের ঝুলে-পড়া মাথাটা। বিশাল পা দুটোর হাঁটুর নিচে ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে কঠিন মাংসপেশী। বালির ওপরে তার পায়ের পাতার অতিকায় ছাপ পড়া দেখতে দেখতে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত।

দু ধারের ফণী-মনসার গাছে যখন পথটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং আশে-পাশে আর একটি মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না, তখন শঙ্খদত্ত ডাকল: শোনো?

অতবড় শরীর নিয়ে যে অমন তীব্রগতিতে কেউ পেছন ফিরতে পারে শঙ্খদত্ত সেটা এই প্রথম দেখল। ক্রোধ আর সন্দেহে বীভৎস-ভয়ঙ্কর লোকটার মুখ—হয়তো ভেবেছে তার পেছনে পেছনে আসছে সেই মাংস-লোভীর দল—নির্জন জায়গার সুযোগ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে বসবে!

আবার আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে গেল শঙ্খদত্ত। কাঁধের ওপর থেকে সে ধপ্ করে হরিণটাকে ছেড়ে দিয়েছে মাটিতে। একটা হাত কোমরে নেমে গেছে তার। শক্ত করে আঁটা কাপড়ের সীমান্তে একটা ছোরার বাঁট।

কিন্তু শঙ্খদত্তকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের কঠোর রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। সহজেই বুঝতে পেরেছে, এ আর যেই-ই হোক, তার কোনো সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ নয়। অভিজাত চেহারা—সম্ভ্রান্ত বেশ-বাস। নিশ্চয় বণিক।

লোকটা ছোট ছোট শীতল চোখ দুটো ছড়িয়ে দিলে শঙ্খদত্তের মুখের ওপর। গলার স্বর সাধ্যমতো কোমল করে বললে, বণিক কি আমাকে ডাকছিলেন?

মুহূর্তের জন্যে শঙ্খদত্তের মনের মধ্যে গুর্ গুর্ করে উঠল। খুব সু-বিবেচনার হয়নি কাজটা। এই মানুষজন-বর্জিত প্রায় জঙ্গলের মধ্যে লোকটা যদি তার গলা টিপে ধরে সর্বস্ব কেড়ে নেয়, তা হলে চিৎকার করারও সুযোগ পাবেনা সে। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবারও পথ নেই তার।

শঙ্খদত্ত বললে, একটা কথা ছিল।

লোকটা এবারেও হাসিল: বুঝেছি। বণিক এই হরিণটাকে কিনতে চান। কিন্তু এ আমি বেচবনা। নিজে খাব বলেই নিয়ে চলেছি।

—না, হরিণ আমি কিনবনা। আমার অন্য কথা আছে তোমার সঙ্গে।

অন্য কথা? লোকটা জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো। শুধু সন্দেহে একবার কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠল তার।

—তোমার গায়ে খুব জোর আছে দেখছি।—শঙ্খদত্ত সহজ হতে চেষ্টা করল: নাম কী তোমার?

—রাঘব।

—তা রাঘব নামটা বেমানান হয়নি।—শঙ্খদত্ত আরো অন্তরঙ্গ হতে চাইল: কিন্তু কাজটা ভালো করলেনা তুমি।

দৈত্যটা আর একবার কুটিল চোখে দেখে নিলে শঙ্খদত্তকে। মেঘাচ্ছন্ন সন্দিগ্ধ গলায় বললে, কেন?

—অতগুলো লোকের মুখের গ্রাস তুমি একলা কেড়ে নিলে?

রাঘব এবারে হাসল: হরিণটাকে ওরা তাড়া করেছিল বটে, কিন্তু জাপটে ধরেছি আমিই। তারপরে মেরেছি আমার ছোরা দিয়েই। চাইলে কিছু ভাগ ওদের আমি দিতাম। কিন্তু আমাকে বিদেশী দেখে ওরা চোখ রাঙিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এল। তাই বিবাদ মেটাবার জন্যে সবটাই নিজেকে নিয়ে নিতে হল।

শঙ্খদত্তও হাসল: নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কিন্তু তুমি বিদেশী?

—হুঁ।

—কোথায় তোমার ঘর?

—অনেক দূরে। গ্রামে মড়ক লাগল—আমার যারা ছিল, তারা মরে ফুরিয়ে গেল। যারা বেঁচেছিল, তারা কে যে কোথায় পালালো তার হদিশ রইলনা। আমিও চলে এসেছি। নতুন ঘর বাঁধতে পারিনি—একটা জঙ্গলের মধ্যে থাকি এখনো।

শঙ্খদত্ত চারিদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। কোথাও কেউ নেই। শুধু যতদূরে দেখা যায় ফণী-মনসার উদ্যত ফণা।

একবার গলাটা সে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর বললে, কয়েকটা সোনার মোহর যদি পাও, তুমি কি তা দিয়ে ঘর বাঁধতে পারো না ?

—সোনার মোহর ?—রাঘব চমকে উঠল, সবিস্ময়ে খাবি খেল কয়েকবার : কে দেবে ?

শঙ্খদত্ত বললে, আমি।

রাঘব তবু বুঝতে পারলনা। বললে, কেন ?

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

—কী কাজ ?

—একটু শক্ত। পৃথিবীতে কেউ যদি পারে তা হলে তুমিই পারবে।

রাঘব হেসে উঠল : তা পারব। যা কেউ পারে না—তা আমিই করতে পারি।—রাঘবের ছোট ছোট হিংস্র চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল উত্তেজনায়। স্বর নামিয়ে বললে, আপনার মতলব খুলে বলুন শ্রেষ্ঠী। কাউকে খুন করতে হবে ?

—তার কাছাকাছি।—নিজের কানে শয়তানের মন্ত্রণা শুনতে শুনতে ক্ষিপ্তপ্রায় শঙ্খদত্ত আরক্ত মুখে বললে, একটা মেয়েকে চুরি করে আনতে হবে।

—এই ?—রাঘবের মুখে বৈরাগ্য প্রকাশ পেল : বড় নোংরা কাজ—বড় ছোট কাজ। ওসব করতে প্রবৃত্তি হয়না।

—যত সহজ ভাবছ তা নয়। এ সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে আনার মতেই শক্ত।

রাঘব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল : তাই নাকি ? বেশ, সব কথা বলুন।

—তবে একটু এসো ওদিকে। একথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবার মতো নয়। হয়তো বাতাসও আড়ি পেতে আছে শোনবার জন্যে।

মাটি থেকে হরিণটাকে তুলে নিয়ে আবার কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে দিলে রাঘব। তারপর বললে, চলুন।

সমুদ্রের ধারে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গাটিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত।

সামনে কালো সমুদ্রের অশ্রান্ত রাক্ষস গর্জন। মৃত্যুর অসংখ্য ধারালো দাঁতের মতো চিক চিক করছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেণার চঞ্চলতা। আকাশ-বাতাস পৃথিবী—সকলের বিরুদ্ধেই যেন একটা ক্রুদ্ধ অভিযোগে মাতাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র—একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়, একটা প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনা যেন তার বুকের ভেতর থেকে ফুঁসে যেন লক্ষ লক্ষ রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দুর্বিনীত সমুদ্রের এই মাতলামি। হয়তো একটু পরেই বজ্রের হুঙ্কারে নেমে আসবে তাদের তর্জিত শাসন।

উত্তরের তীক্ষ্ণ হাওয়া দমকে দমকে এসে কালো উদ্দাম জলের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। এতক্ষণ পরে থর থর করে কাঁপছে শঙ্খদত্ত। ভয়ে, অনুতাপে, উত্তেজনায় আর শীতে। সারাদিন ধরে মস্তিষ্কের মধ্যে যে অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলছিল, এতক্ষণে নিভে শীতল হয়ে গেছে তার উত্তাপ। তারই প্রতিক্রিয়া, সারা শরীরে। যদি ধরা পড়ে রাঘব ? যদি প্রাচীর পার হয়ে পেরিয়ে আসবার সময় ধরা পড়ে খড়্গাধারী প্রহরীর হাতে ? তারপর—

শঙ্খদত্ত একবার রোমাঞ্চিত কলেবরে পেছনে ফিরে তাকালো। অন্ধকার। রাশি রাশি গাছপালা মৃত্যু-মূর্ছিত। জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া রাত্রির কালো আকাশেও আবছা রেখায় তাকিয়ে আছে প্রেত-প্রহরীর মতো। যদি ওই অন্ধকারে এখন দপ দপ করে জ্বলে ওঠে মশালের আলো ? যদি শোনা যায় দ্রুতগামী অশ্বের পায়ের শব্দ ?

—না—কোথাও কেউ নেই। শুধু রাত্রি—শুধু স্তব্ধতা। ওখানে—অতদূরে কী ঘটে চলেছে এখান থেকে অনুমান করবারও উপায় নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকা—শুধু রোমাঞ্চিত দেহে অনিশ্চিত-আশঙ্কায় প্রহর-যাপন।

সামনেই ঢেউয়ের ওপরে নৌকাটা অন্ধকারে নেচে উঠছে। দূর-সমুদ্রে মিট মিট করে আলো জ্বলছে শঙ্খদত্তের বহরে। ওদের আদেশ দেওয়া আছে—তৈরি হয়েই আছে ওরা। শঙ্খদত্তের নৌকো পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বহর খুলে দেবে। খরধার হাওয়া বইছে উত্তর মুখে। এক রাত্রের মধ্যেই বহু পথ পার হয়ে যাবে—রাজার সৈন্যদল অত দূরে আর পৌঁছুতে পারবে না।

কিন্তু কী হল রাঘবের ?

সারা শরীরে সেই ভয়ের শীতলতা। দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠক করে বাজছে শঙ্খদত্তের। বুকের মধ্যে দুলছে আর একটা আ-দিগন্ত তুহিন্ সমুদ্র। চিকচিকে ঢেউগুলোর মতো একটা হিংস্র চঞ্চলতা তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে রক্তে :

ও কিসের—কিসের শব্দ ?

অত্যন্ত ক্ষিপ্রপায়ে যেন বালির ডাঙার ওপর দিয়ে ছুটে আসছে কেউ। যেন হরিণের পদধ্বনি। না—একাধিক নয়, একজনই। অশ্বারোহী নয়, তলোয়ারের ঝঙ্কার নেই, জ্বলন্ত মশালও নেই। তা হলে—তা হলে ?

শীতল রোমকূপগুলোতে অসহ্য উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ণ অগ্নিকণার মতো জ্বলতে লাগল। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখের দৃষ্টি। পায়ের তলার মাটিটা দুলতে লাগল সমুদ্র হয়ে।

দূরাগত ওই শব্দে যেন অন্ধকারটাও ছুটে চলেছে।

একবার। তারপর দেখা দিল সেই দৈত্যের মূর্তি। কী একটা ভার বয়ে আসছে সে। রক্ত ফুটে পড়তে চাইল শঙ্খদত্তের চোখের তারা থেকে—মাথার শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল চোখের ওপরে অসহ্য পীড়নে!

সামনে এসে দাঁড়াল রাঘব। যেন আবির্ভাব ঘটল কাল-ভৈরবের। পাহাড়ের মতো চওড়া বুকের আড়াল থেকে তার হৃৎপিণ্ডের উদ্দামতা দেখা যায় বুঝি! ঝড়ো-হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

যেমন করে রক্তাক্ত সম্বর হরিণটাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেম্‌নি ভাবেই কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে এনেছে তার শিকার। তারও মুখ বাঁধা অচেতন মাথাটা রাঘবের কাঁধের ওপরে অসহায় করুণ ভঙ্গিতে দুলছে। সোনালি লোম নয়—নীল বিস্রস্ত শাড়ীর আড়ালে সুকুমার শুভ্র শরীরের ঝলক!

এই মুহূর্তে নিজের নিষ্ঠুরতাটা একটা তীরের মতো এসে বিঁধল শঙ্খদত্তকে। এই মুহূর্তে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারল না। এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করল, রাঘবকে একটা কঠিন আঘাত করে বসে সে!

কিন্তু সময় ছিল না।

শ্বাস টানতে টানতে প্রায় অবরুদ্ধ গলায় রাঘব বললে, চলুন বণিক, আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না।—তারপর অসাড় শুভ্র শরীরটাকে তেম্‌নি একহাতে চেপে ধরে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। তীব্র গতিতে শঙ্খদত্তও তাকে অনুসরণ করল।

নৌকোর খোলের মধ্যে অচেতন দেহটাকে শুইয়ে দিয়ে রাঘব পাল তুলে দিল আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। হাল ধরল পরমুহূর্তে। উত্তরের তীক্ষ্ণ প্রবল হাওয়ায় ঢেউয়ের মাথায় ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকো এগিয়ে চলল দূরের বন্দরের দিকে। শঙ্খদত্ত অনিমেষ স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে অস্বচ্ছ একটা মৃত্যুম্লান তনুশ্রীর ওপরে।

আর রাত্রির আকাশে দূরান্তে তেমনি আবছা রেখায় মাথা তুলে রইল জগন্নাথ মন্দিরের বিশাল চূড়োটা। (ক্রমশঃ)

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

নারীর অক্ষমতা

পুরুষ যে কাজ করতে সক্ষম নারীর তা'তে অক্ষমতা—এ নিয়ে সভ্যতার আদিম যুগ থেকেই তর্ক বিতর্ক চ'লে আসছে। এর কতকটা মীমাংসা যদিও করে দিয়েছে গত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমকক্ষতা আজও সপ্রমাণিত হয়নি। তার কারণ, নারীকে পুরুষরা কোনও দিনই সেটা প্রমাণ করবার সুযোগ দেয়নি। তাকে চিরদিন নারী ক'রে রাখাই ছিল পুরুষের প্রচেষ্টা, যে হেতু, এ ব্যাপারে পুরুষের ষোলো আনা স্বার্থ জড়িত। মেয়েদের—অন্তঃপুরে অন্তরীণ রাখতেই চেষ্টা করেছেন তাঁরা বরাবর। সেদিনও কোনও কোনও মহাপুরুষ বলেছেন "রান্না ঘরই তাঁদের উপযুক্ত স্থান!" অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মনীষীরাও নারীর শরীরের কোমলতা ও হৃদয়ের কমনীয়তার উল্লেখ করে পুরুষের সঙ্গে নারী সমান আসন পাবার অযোগ্যা ব'লে রায় দিয়েছেন। কেউ কেউ এ অপবাদও দিয়েছেন যে, তাঁদের নিজেদের কোনও মৌলিকতা নেই। কল্পনা শক্তিরও অভাব। তাঁদের অলঙ্কারের ডিজাইন, শাড়ীর পরিকল্পনা, পুরুষেই করে দেয়, এমন কি নূতন নূতন ভাল অনুশীলন, গবেষণা—সূক্ষ্মরসবোধ, প্রতিভার ঐশ্বর্য, এসব নারীর মধ্যে বিরল! অবশ্য, অল্প কয়েকজন মহিয়সী মহিলা জগতে অবিনশ্বর খ্যাতি রেখে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়!

কথাটা কিন্তু আজকের যুগে আর মেনে নেওয়া চলে না। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে নারী যে পুরুষকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে আসতে পারে এ সত্য আজ প্রমাণিত হয়েছে। নারীর ভোটাধিকার ছিল না। আজ সে পেয়েছে। বিলেতের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও উপর হল নারী। ও দেশের শ্রমিকদের মধ্যেও এক তৃতীয়াংশ প্রায় নারী। আর ব্যাঙ্ক, অফিস, দোকান, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যত পুরুষ কর্মী আছেন নারীকর্মী তাঁদের চেয়ে প্রায় একলক্ষ বেশি। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হয় যে, দায়িত্বপূর্ণ কাজে পুরুষের চেয়ে নারীর যোগ্যতাই বেশি। অবশ্য ও দেশের পার্লিয়ামেণ্ট বা মন্ত্রী-সভায় মেয়েদের প্রবেশের খুব বেশি সুযোগ দেওয়া হয় না, তবু নয় নয় ক'রে ১৫ জন সদস্যা আছেন। সুযোগ দিলে যে তাঁরা যোগ্যতায় ওঁদের কারুর চেয়ে কোনও অংশে কম
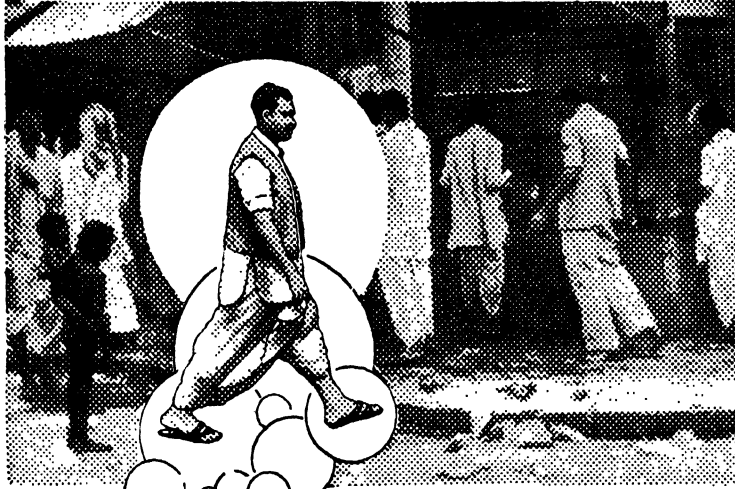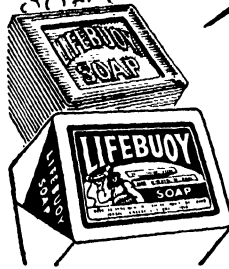
পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন। পঁচিশ বছর আগে মান্দ্রাজের প্রথম নারী সদস্যা শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী একটি আইন করে মান্দ্রাজের দেবমন্দির থেকে দেবদাসী প্রথা তথা দেবতা ও ধর্মের নামে ব্যভিচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর পরে আজ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী, অমৃত কাউর, শ্রীমতী মুন্সী প্রভৃতি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সুযোগ পেলে নারীও ভুবন বন্দনীয়া হ'তে পারেন। সারা বার্ণহার্ট, এলেন টেরি, পাভ্‌লোভা, মাদাম কুরি, পার্লবাক, হালিদে এদিব্‌ হানুম্‌, ক্রুপ্‌স্‌ কায়া প্রভৃতি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহিলার নাম ইতিহাসে জোয়ান অফ্‌ আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, ঝাঁন্সীর রাণী, পদ্মিনী, সুলতানা রিজিয়া, রাণীভবানী ও এলিজাবেথের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ওঁরা যেদিন থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে ওঁদের বদ্ধমুষ্টি খুলে দিয়েছেন সেদিন থেকে আর মেয়েরা মুষ্টিমেয় নয়। ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্পোরেশনে বা কাউন্টি কাউন্সিলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিমান বন্দরে, পুলিশে, রেলে, বাসে, চিকিৎসাকেন্দ্রে, আইনে ও বিজ্ঞানে অসংখ্য মেয়ে আজ এসে পড়েছে। তুরস্ক, পারস্য, ভারত, চীন, জাপান ও বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নারী জাগরণ দেখা দিয়েছে তাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয়েছে যে নারী কোনও বিষয়েই অক্ষম নয়। বন্দুকের লক্ষ্যভেদে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাঙালী মেয়ে।

শিশু-মঙ্গল

অনেক পুরানো কথা। তবু আলোচনা করতে হ'চ্ছে। কারণ, মানুষ বদলে যাচ্ছে, সমাজ বদলে যাচ্ছে, দেশাচার বদলে যাচ্ছে এবং সামাজিক বিধি ব্যবস্থাও বদলে যাচ্ছে। এখন আর সে পেঁচোয়-পাওয়া নোংরা আঁতুড় ঘরে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো বধূকে বাড়ীর প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দরমার বেড়ার মধ্যে সন্তান প্রসব করতে হয় না। হাসপাতালে সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন ঘরে প্রসূতি বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই তাঁরা সন্তান প্রসব করছেন। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও যমে মানুষে টানাটানি চলে। প্রায় ক্ষেত্রে-হয় প্রসূতি যায়, নয় শিশুটি যায়। দুটিকেই বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য অনেক সময়ই ঘটে না। কারণ, প্রসবের পূর্বে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রত্যেক ভাবী জননীর একটা প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন আছে। সেই প্রস্তুতিটিকে আমাদের আসন্ন-প্রসবারা আজকাল অবহেলা করেন বা করতে বাধ্য হ'ন ব'লেই এ দেশে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশি।

সন্তান গর্ভে এলেই ভাবী জননীর কর্তব্য একটু নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা। কারণ, মাতাই তাঁর গর্ভস্থ শিশুটিকে স্বীয় জীবনীরসে পরিপুষ্ট করে তোলেন। শিশুর জন্মের পর তার একমাত্র স্বাস্থ্যকর খাদ্য হ'ল মাতার স্তনদুগ্ধ। শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে মাতার শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর। মাতার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর দুর্বল হ'লে সন্তান প্রসবের সময় একটা বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত হয়ই। বাংলাদেশে প্রতিবৎসর প্রায় অর্ধলক্ষ প্রসূতি সন্তান-প্রসবের সময় কোনও না কোনও কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এ অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার!

সেকালের বাপ মা'য়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল ব'লে অত নোংরা ও অবহেলার মধ্যে প্রসব হ'য়েও প্রসূতি ও শিশু বেঁচে থাকতো। অবশ্য পেঁচোয় পাওয়াটা পরবর্তী অনাচারের ফল। বর্তমানে সংসারের অস্বচ্ছলতার জন্য উভয়েরই পুষ্টিকর খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব। আলোবাতাসহীন অল্পভাড়ার ড্যাম্প ঘরে বাস, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজালের উৎপাত, ঘৃত মাখন দুগ্ধ বা ডিম মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য কেনার অক্ষমতা, সন্তান-সম্ভবা নারীকে ক্রমেই দুর্বল ক'রে তোলে। স্বাস্থ্য অপটু হয়ে পড়ার ফলে নানা রোগে ভোগেন তাঁরা—অথচ একা সংসারের সমস্ত কাজই করতে হয় ব'লে একটুও বিশ্রাম করবার অবসর পান না। এ এ ক্ষেত্রে প্রসূতি ও সদ্যজাত শিশুর জীবন নিরাপদ হ'তে পারে না। প্রসবের পর অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্য অনেক প্রসূতি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। প্রায়ই অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত মারা পড়েন! 'সূতিকা' রোগ সেকালেও ছিল বটে, তবে সংখ্যায় এত বেশি ছিল না তখন।

প্রসবান্তে শরীরের কলকব্জা একটু ঢিলে হ'য়ে পড়ে। প্রসূতি দীর্ঘকাল দুর্বল ও অপটু থাকেন। এ সময়ও তাঁর বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু জোটে না। অভাবের সংসার। শরীর সারতে না সারতে হেঁসেলে হাঁড়ি ধরতে হয়, রোগ চেপে ধ'রে। মাতা ও সদ্যজাত শিশু উভয়ের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমবার যদিবা পরিত্রাণ পায়, দ্বিতীয়বার আর যুঝতে পারে না। দরিদ্র পরিবারে উপযুক্ত চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যেরও অভাব। কাজেই স্তন্যাভাবে শিশু মরছে এবং খাদ্যাভাবে মা মরছে। এটা যে কত বড় জাতীয় ক্ষতি সে জ্ঞান আমাদের নেই। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে শিশুকে ও প্রসূতিকে বাঁচাবার জন্য সরকার তাদের ভার নেন। কারণ, শিশুরাই যে জাতির ভবিষ্যৎ। তাঁরা ভবিষ্যৎ জাতকে শুধু বাঁচিয়েই রাখেন না, সুস্থ সবল করে রাখেন। প্রসূতি ও শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ পথ্যের বিনামূল্যে ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশের সরকারের এ সুবুদ্ধি হবে কবে?

[আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিতা মহিলাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাঁরা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই "মেয়েদের কথা" বিভাগে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত

মতামত লিখে পাঠান। আলোচনা সঙ্গত মনে হলে সাদরে পত্রস্থ করা হবে। রচনা পাঠাবার সময় উপরে "মেয়েদের কথা" লিখতে ভুলবেন না। রচনা যথাসম্ভব ছোট করে লিখে পাঠাবেন।] (ভাঃ সঃ)

১। এ দেশের মেয়েদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক যে সব অভাব অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও উন্নতির উপায় নির্দেশ।

২। এ দেশের মেয়েদের বিবিধ অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে যে সব আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত তার আলোচনা এবং মেয়েদের স্বার্থের বিরোধী যে সব আইন-কানুন আছে তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

৩। ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও স্বার্থের অনুকূল কি কি বিধিবিধান প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৪। পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তার যথাসম্ভব খবর।

৫। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং শিল্পকলা প্রভৃতির পরিচয়।

৬। মাতৃত্ব, শিশুমঙ্গল, শিশু-শিক্ষা, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনা।

৭। সমাজ সেবা ও নারী কল্যাণ (Social service & Womens welfare) সংক্রান্ত কাজ কর্মের বিবরণ।

৮। সংসার, পরিবার ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা।

৯। মেয়েরা কোথায় কোন্ বিষয়ে কি কৃতিত্ব প্রদর্শন করে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের বিবরণ, (সম্ভব হলে সচিত্র) [খেলাধুলা, নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ও এর অন্তর্গত]।

১০। মেয়েদের উন্নতি ও প্রগতি সম্বন্ধে অল্প কথায় লেখা প্রস্তাবাদি গ্রাহ্য হবে।

ছোটদের গেঞ্জি বা ভেষ্ট

ছোটদের এই গেঞ্জিটি বোনা খুব সহজ। এটি বুনতে সামনে ও পিঠ আলাদা না বুনে একই সঙ্গে বুনতে হবে।

প্রথমে ৬১টি ঘর নিন।

১ম লাইন—২ সোজা ; * ১ উল্টা ; ১ সোজা ; * শেষের ঘর পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। ১ সোজা। এইভাবে ১ম ও ২য় লাইন বুনে যান যতক্ষণ না ৯ ইঞ্চি হয়।

পরের লাইন—২ সোজা ; (১ উল্টা, ১ সোজা) ৮ বার করুন। তারপর ২৫ ঘর ফেলে দিন। (১ উল্টা, ১ সোজা) ৮ বার ; ২ সোজা।

এবার ১৮ ঘর ২ ইঞ্চি রিব, (১ উল্টা, ১ সোজা) বুনে গলার দিকে উল ছিঁড়ে ফেলুন এবং এই ঘরগুলি অন্য একটি কাঠিতে তুলে রাখুন। এবার গলার অপরদিকে উল যোগ করে পূর্ব্বের মত এই ১৮ ঘর রিব বুনুন যতক্ষণ না ২ ইঞ্চি বোনা হয়। এইভাবে ২ ইঞ্চি (গলার দিকে শেষ ঘর পর্যন্ত) বোনা হ'লে ঐ কাঁটাতেই ২৫ ঘর তুলে নিন ; এবং যে ১৮টি ঘর অপর একটি কাঠিতে তুলে রেখেছেন সেগুলাও এই কাঁটাতে বুনুন। তারপর সামনের মত রিব বুনুন এবং পিঠ হ'য়ে গেলে ঘর বন্ধ ক'রে ফেলুন।

হাত—৪৯টি ঘর নিন।

১ম লাইন—২ সোজা ; * ১ উল্টা, ১ সোজা, * শেষ ঘর পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন, ১ সোজা।

২য় লাইন—১ সোজা ; * ১ উল্টা, ১ সোজা ; * শেষ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। এবার ১ম ও ২য় লাইন একবার পুনরাবৃত্তি করুন। তারপর রিব বুনে যান এবং পরবর্ত্তী (২ লাইন) প্রত্যেক কাঁটার শেষে ১ ঘর করে এবং ৬ লাইন অন্তর ১ ঘর করে কমান যতক্ষণ না ১৩ ঘর থাকে। এরপর ৫ লাইন ঘর না কমিয়ে বুনে যান, তারপর ঘর বন্ধ করে দিন।

অপর হাতটিও এইভাবেই বুনুন।

এখন গেঞ্জিটাকে সমান ভাবে কাঁধ থেকে পাট করে নিন। তারপর হাত দুটির ধার সেলাই করে নিয়ে কাঁধের সঙ্গে (হাতের মাপে) হাত বসিয়ে জামার ধারগুলা সেলাই করে ফেলুন।

এবার ক্রুশ কাটিতে সমস্ত গলাটি ৩টি করে লংষ্টিচ ও দু'টি চেন, এইভাবে ফিতে পরাবার ঘর করে নিন। তারপর ৩ গাছি উল পাকিয়ে নিয়ে বা ক্রুশে একত্রে লম্বা চেন করে নিয়ে দু'ধারে দুটি থোবা লাগিয়ে নিন। এবার ফিতা পরাবার জায়গায় ভেতর দিয়ে এটি লাগিয়ে নিলেই জামাটি সম্পূর্ণ হল।

নির্বাসিত

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এসসি

নীচে আমার কেবিনে নামিয়া যাইব বলিয়া স্থির করিতেছিলাম সেই সময় একজন সুসজ্জিত অথচ বিষণ্ণ যাত্রী আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিলাম। পূর্বে খাবার ঘরে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন—"খুব চমৎকার রাত্রি, নয় কি?"

"আশ্চর্য রকমের সুন্দর" আমি উত্তর দিলাম।

"আপনি কি আলেকজান্দ্রিয়ায় নামিবেন?"

"হাঁ, কাল সকালে।"

"ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেখানে পৌছাইব। সোনালী আলোকে উদ্ভাসিত আলেকজান্দ্রিয়াকে ঠিক পরীর দেশের মতই মনে হইবে—অবশ্য আপনি নিজেই ইহা দেখিতে পাইবেন। এত সুন্দর তো কোথাও দেখি নাই, এই সহর দেখিয়া আমার মনে হয় ইহা যেন ঈজিপ্ট মরুভূমির প্রান্তে একটী উজ্জ্বল মুক্তা। আলেকজান্দ্রিয়া খুবই সুন্দর—তবুও মনে হয় পৃথিবীতে আরেকটী স্থান আছে যাহা ইহা অপেক্ষাও আকর্ষণীয় এবং সেই সহরটী প্যারিস; আপনি কি কখন প্যারিসে গিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"ইহা আমার জন্মস্থান।"

"ঠিক যা' ভাবিয়াছিলাম—আমি যেন অনুভব করিয়াছিলাম। চোখ বন্ধ করিয়াও আমি ভিড়ের মধ্য হইতে প্যারিসের অধিবাসীকে বাছিয়া লইতে পারি।" জাহাজের রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া তিনি জাহাজের ধাক্কায় জ্বলজ্বলে ঢেউগুলির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলিলেন—"আপনি কি সুখী!" হঠাৎ তিনি আমার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষুগুলি অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনি একজন খুবই সৌভাগ্যবান লোক—আপনার সৌভাগ্য কি তাহা হয়ত আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার সম্মুখে একজন দাঁড়াইয়া আছে যে প্যারিসকে পূজা করে, যার শিরার মধ্যে, রক্তের মধ্যে প্যারিসের নামে শিহরণ জাগে—অথচ সে কখন প্যারিস দেখিতে পাইবে না। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আর কি কল্পনা করিতে পারেন?"

"আপনি কি নির্বাসিত?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

উদাসীনভাবে তিনি উত্তর দিলেন—"তাহা অপেক্ষা অনেক খারাপ, আমি মৃত।" আমি বোধহয় খুবই চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, না, ভয় পাইবেন না। আপনি পাগলের পাল্লায়ও পড়েন নাই, আপনার কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই। কারণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক স্থিরমস্তিষ্ক ও শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি। আমার গল্পই তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে। গল্প নিশ্চয়ই একটা আছে বলিয়া আপনিও অনুমান করিতেছেন। তাহা না হইলে যে লোক নিজেকে মৃত বলিয়া স্বীকার করে, সে এই জাহাজে আপনার সম্মুখে কি করিয়া আসিবে? কিছুক্ষণ গল্প করিতে কি আপনার আপত্তি আছে?" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইতে তিনি পাশে একটী বেঞ্চির উপর বসিতে নির্দেশ দিলেন। আমার ঠিক উল্টা দিকে বসিয়া একটী সিগার ধরাইলেন, তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেণ্ট ম্যয়ের নাম শুনিয়াছেন?"

উত্তর দিলাম—"কেবল তাঁহার নামই শুনিয়াছি তাহা নহে, তাঁহার অনেক লেখাই আমি পড়িয়াছি। আপনি কি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবেন?"

"ঠিক, 'হেরাকেলসে'র সহস্রতম অভিনয় গত রাত্রিতে হইয়া গিয়াছে তাহারই লেখক বিখ্যাত সেণ্ট ম্যয় সম্বন্ধে বলিব। 'মেরী', 'সেবটসের নারী' প্রভৃতি যে সমস্ত নাটক গত দশ বৎসরে প্রভূত সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে তাহারই লেখক সম্বন্ধে বলিতে চাই। এই সমস্ত খ্যাতির গৌরব উপভোগ না করিয়াই যে সেণ্ট ম্যয় মরিয়া গিয়াছেন তাঁহারই সম্বন্ধে—"

"আপনি তাঁহার বিষয় কি বলিতে চান?"

"শুধু ইহা ভুল তাহা জানাইতে চাই এবং বলিতে চাই যে সেণ্ট ম্যয় জীবিত। ইহাতে আশ্চর্য হইবেন না, এই যে আমি আপনার নিকট আছি ইহা যেরূপ সত্য তিনিও বাঁচিয়া আছেন ঠিক ততখানিই সত্য। বলতে কি সেণ্ট ম্যয় আর আমি একই ব্যক্তি।"

আমি ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলাম—"অ্যাঁ"
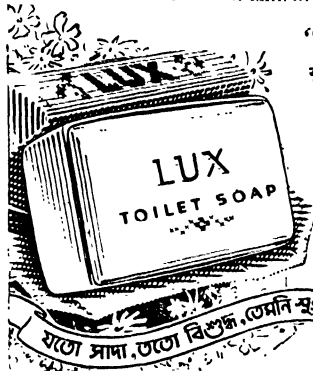
"সত্য। দশ বৎসর পূর্বে আমি বৃথাই সময় কাটাইতে ছিলাম। আমার রচনা সকলের নিকট হইতে কেবল অবজ্ঞাই লাভ করিতেছিল। আমার সঙ্গীত-নাটক 'মেরী' থিয়াটারের দ্বারে দ্বারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিতে লাগিল। এক স্থানে অবশেষে অভিনীত হইল—কিন্তু এতই নিকৃষ্ট ধরণের বলিয়া প্রতীয়মান হইল যে দ্বিতীয় দিনেই তাহার সমাধি হইল। অথচ আমার বাক্স অপ্রকাশিত রচনায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য এবং আমার ভাগ্যের কথা নিভৃতে চিন্তার জন্য ব্রিটানির এক ক্ষুদ্র গ্রামে চলিয়া আসিলাম। আমার এই অবসর যাপনের একদিন সকালবেলা প্যারিসের এক কাগজে দেখিলাম আমি মৃত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। একজন সংবাদ-দাতার সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে পাহাড়ের ধাক্কায় স্টীমার ডুবি হইয়া আমার মৃত্যু হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই আমার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করিবার কি উদ্দেশ্য ছিল ঐ সংবাদদাতার। যাহা হউক ঐ ঘটনাই আমার খ্যাতির পথ সৃষ্টি করিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি করিয়া তাহা সম্ভব হইল ?"

"আমাকে বলিতে দিন। প্রথম যখন খবরটা পড়িলাম তখন ইচ্ছা হইতেছিল নিকটের কোন ডাকঘরে গিয়া একটি তার পাঠাইয়া সংবাদের প্রতিবাদ করিতে। আমার গৃহ হইতে সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী ডাকঘরের দূরত্ব ছিল চার মাইল। রাস্তায় যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম প্যারিসের বড় বড় দশটা কাগজে টেলিগ্রাফ করিতে আমার কত খরচ পড়িবে। হিসাবে দেখিলাম আমি বাঁচিয়া আছি এই কথা জানাইতে যাহা খরচ হইবে তাহাতে আমি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিব। এই কথা চিন্তা করিয়া আমি সেইখানে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া পড়িলাম। হঠাৎ একটা খেয়াল আমার মাথায় আসিল—মনে হইল দেখাই যাক না আমার মৃত্যুর পর লোকে কি বলে আমার সম্বন্ধে। সেইজন্য আমি আবার পরের দিনের কাগজের জন্য অপেক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেশী বলিয়া আপনার বিরুদ্ধভাজন হইতে চাহি না। আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার পারিবারিক জীবন যে অতিশয় কলঙ্কিত ছিল তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে—যাঁহারা আমাকে জানেন না—তাঁহাদের নিকট হইতে সম্মানলাভে সাহায্য করিলেন মাত্র তাঁহারা। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমার প্রশংসায় তাঁহারাই গগন মুখরিত করিতে লাগিলেন। সাময়িক পত্রিকায় আমার গুণকীর্ত্তন করা হইতে লাগিল—অবশ্য ইহা করা কিছুমাত্র কষ্টকর নহে, কারণ প্রশংসাসূচক বাক্য ঝুড়ি ঝুড়ি আছে। এক কথায় বলিতে গেলে একটা বিরাট প্রতিভা বলিয়া আমায় স্বীকার করা হইল। আমার সঙ্গীত নাট্য 'মেরী' যাহা পূর্বে অসাফল্যের লজ্জায় অন্ধকারে মুখ লুকাইয়াছিল তাহা পুনরায় মঞ্চস্থ করা হইল এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিল। প্যারিসের প্রধান রঙ্গমঞ্চে যেখানে শত শত 'হেরাকেলস' অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে ইহা অভিনয়ের সময় দর্শক উন্মাদের মত ইহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। আমি তখনও ব্রিটেনিতে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার সাফল্যকে নষ্ট করিতে চাহিলাম না। আমার তখন মনে হইতেছিল যে মৃত লেখকের পক্ষে জীবিতের অপেক্ষা নামকরা সহজ। মৃত লেখকের লেখা প্রকাশের জন্য প্রকাশকের অভাব হয় না বা মঞ্চস্থ করিবার জন্য ব্যবস্থাপকেরও স্বল্পতা দৃষ্ট হয় না এবং জীবিত লেখক মৃত্যুর পরেও যে সাফল্যের আস্বাদ পান না তাহা মৃত লেখকের পক্ষে সহজলভ্য। ইহা আমার দ্বারাই প্রমাণ হইয়া গেল।

বাকী গল্পটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করি। আমার একজন ভাগনে ছিল যাহার গীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনরূপ দুর্বলতা ছিল না, তাহাকে আমার কাজে লাগাইবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিলাম। আমার প্রস্তাব তাহাকে জানাইলাম এবং স্থির হইল আমার মৃত্যু আত্মহত্যা-ঘটিত তাহা জানাইতে হইবে—আর তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভাগনের নিকট লিখিত আমার মৃত্যুর পূর্বদিনের পত্র থাকিবে। ঐ পত্রে আমি তাহাকে আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এবং যেখানে জাহাজডুবী হইয়াছিল তাহারই নিকটবর্তী উপকূলে আমার ভাগনে লেখাসমেত আমার বাক্সটী পাইয়াছে। আমার একমাত্র উত্তরাধিকার-স্বরূপ আমার গ্রন্থের সম্পূর্ণ স্বত্তাধিকারী ছিল সে এবং ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল যে শতকরা পঁচাত্তর টাকা সে আমাকে দিবে। আমার অপ্রকাশিত নাটকসমূহ সে ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশিত করিতে পারিবে ইহাও একটা দলিলে প্রকাশ পাইবে এইরূপে আমার মৃত্যুর পরে আরও ছয়খানি নাটক লিখিয়াছি ও আরও লিখিবার ইচ্ছা আছে। আমার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে কত অসংখ্য নাটক লিখিয়াছি তাহার সংখ্যা গুণিয়া জনসাধারণ চমৎকৃত হইবে। এই জন্য আমি অসাধারণ শক্তিতে কাজ করিয়া থাকি—আমি একজন বিপুল উৎসাহী মৃতদেহ। মৃত্যুর পর হইতে আমি অমিতব্যয়ী হইয়াছি। জীবনে যে সকল প্রয়োজন ছিল না, মৃত্যুর পর তাহাদের আস্বাদ পাইয়াছি। ভারতবর্ষে জমিদারী করিয়াছি, রিওতে একটী প্রাসাদ ও ডামাস্কাসে হারেম। ইহাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং আমাকে খুবই খাটিতে হয়। আমার মনে হয় কোন মৃতদেহ বোধহয় জীবনকে এত ভালভাবে উপভোগ করিতে পারে নাই। কিন্তু হায় ? এত বড় সুখ সামান্য

একটুর জন্য নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দুঃখ আছে এবং আমার দুর্ভাগ্য আমি প্যারিসকে এত ভালবাসি। হে প্যারিস, তোমাকে রিওতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষে নয়, দামাস্কায় নয়, এমন কি স্বর্গেও নয়। হাঁ, ভাল কথা 'বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে'র অভিনেত্রী ইভলিনেটিকে জানেন?"

"হাঁ, তাহাকে চিনি।"

"কি আশ্চর্য! আপনি মাঝে মাঝে কি তাঁহার সহিত দেখা করেন?"

"প্রায়ই, তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"সত্য? কি অদ্ভুত যোগাযোগ। সে কি একবারও আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট বলিয়াছে?"

"কখনও বলে নাই।"

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"তাহলে দেখুন, মৃত্যুরও কিছু অসুবিধা আছে। তাকে কতই না ভালবাসিতাম অথচ আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।" *

* ফরাসী গল্প।

পট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

চিত্র-পট ঃ

সম্প্রতি ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি পাকিস্থানের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা যেমন নৈরাশ্যজনক তেমনি পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী　ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে প্রথমে ভারতীয় ফিল্মের প্রতি ফুটের উপর ছয় পাই কর পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট ধার্য্য করেন। ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে পাক সরকার সহসা ছয় পাই-এর স্থলে চারি আনা কর ধার্য্য করেন। ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীরা এই কর ধার্য্যের প্রতিবাদ করিলেও কোন ফল হয় না। ইহার পর পাঁচ বৎসরের জন্য পাক-সরকার

সালে পাকিস্থান-ভারত আলোচনার ফলে, এই নীতি পাক-সরকার প্রত্যাহার করেন। বিদেশী রাষ্ট্রকে এতদ্‌সম্পর্কে যে সুযোগ-সুবিধা পাক-সরকার দিয়া থাকেন, ভারতকেও সেই প্রকার দেওয়া হইবে আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু পাকিস্থান সরকার শেষ পর্য্যন্ত এমন ব্যবস্থা করেন যাহার ফলে, পাকিস্থানের ফিল্ম ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভারতীয় ফিল্ম আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। ব্রিটিশ ও মার্কিণ ফিল্ম পাকিস্থানে অবাধে আমদানী চলিতে থাকে, কিন্তু ১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ভারতীয় ফিল্ম আমদানীর জন্য পাক-সরকার একটি লাইসেন্সও মঞ্জুর করেন নাই এবং পাকিস্থানের শুল্ক ঘাঁটিতে যে সকল ভারতীয় ফিল্ম আজও

স্টার থিয়েটারে শ্যামলী নাটকে তারিণী দাদুর রূপসজ্জা
শ্রীজহর গাঙ্গুলী ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

পড়িয়া আছে, সেগুলির উপর পূর্ব্বেকার দর অনুসারে অর্থাৎ ফুট প্রতি চারি আনা হিসাবে কর ধার্য্য করা হইতেছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে ভারতীয় ফিল্ম চালু করিবার জন্য এক কোটি টাকা ব্যয়ে অধিকার ক্রয় করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যদি তথায় ভারতীয় ফিল্ম আমদানী করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় ফিল্ম দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইবে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান ফিল্মকে যে সুবিধা দেওয়া হইতেছে—ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীরাও সেই সুবিধার

ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীদের এ দাবী যদি পাক-সরকারের নিকট উপেক্ষিত হয়,তাহা হইলে ভারত-সরকারকে আমরা অনুরোধ করিব ইহার পাল্টা জবাব দিতে।

* * *

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমানে বাংলা ছায়া-ছবির ব্যবসা ক্ষেত্রের পরিধি রচনা করিতে হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে যেখানে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী আছেন, সেই রকম কয়েকটী মাত্র জায়গায় কোনরকমে এক সপ্তাহকাল বাংলা ছবি চলে। বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে বাংলা ছবির যে সম্ভাবনা ছিল আজও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে বাংলা ছবির যথেষ্ট চাহিদা (এমনি কি ভক্তিমূলক চিত্র) থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র পাকিস্থান সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার দরুণ তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। বাংলাভাষার ছবির প্রতি পাকিস্থান সরকারের এ ভয় কেন? আমরা যতদুর জানি, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লোকেরা কেহই উর্দ্দু শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, আজও সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের জন্মগত বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। এমতবস্থায় পাক-শাসক পূর্ব-পাকিস্থানের অধিবাসীদের বাংলা ছবি দেখার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন কেন?

* * *

বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা ফণী রায় গত ১লা অগ্রহায়ণ কালিঘাট দ্বারিক গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। স্বর্গত রায়ের প্রকৃত নাম ছিল পঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন এবং তাঁহার পূর্ব পেশা ছিল কবিরাজী চিকিৎসা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি খ্যাতিলাভও করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ-গবেষণার কাজে ও যাত্রার পালা রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিভিন্ন যাত্রার দলে তাঁহার রচিত প্রায় ত্রিশটি নাটক অভিনীত হইয়াছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও তিনি যাত্রার নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার শেষ রচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'রূপসনাতন'—হাওড়া সমাজ অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি কালী-ফিল্মের 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চিত্রে অভিনেতা হিসাবে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৪৩ সালে 'শহর থেকে দূরে' নামক চিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি সেবছরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েসনের নিকট হইতে মানপত্র লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে গিরীশ সংসদ তাঁহাকে 'রস-সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ফণী রায়ের মৃত্যুতে একাধারে চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রাদলগুলির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।
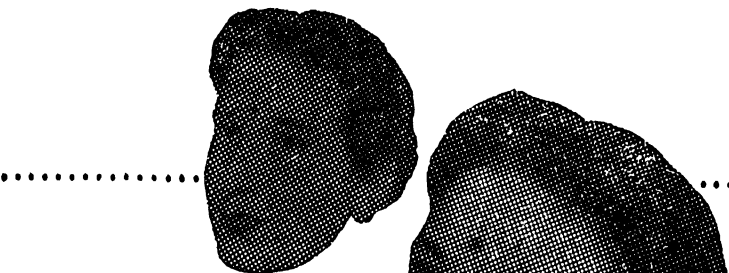
শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় চিত্রমায়ার 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' গত ১১ই ডিসেম্বর সহর ও সহরতলীর বিভিন্ন চিত্র গৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী একদিকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ অপরদিকে তেমনি অপূর্ব্ব নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে সুসমৃদ্ধ। এই বিশেষ চিত্রটি সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

* * * *

গত ২২শে নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে ছায়াচিত্র পরিষদের 'শুভযাত্রা'র মহরৎ হইয়া গিয়াছে। এই নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যারাণী অভিনেতা বিকাশ রায় ও পরিচালক চিত্ত বসু কর্তৃক গঠিত হইয়াছে। 'শুভযাত্রা'র কাহিনী রচনা করিয়াছেন—প্রবোধকুমার মজুমদার। পরিচালনা করিবেন—চিত্ত বসু। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

* * * *

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে কানন দেবীর প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের 'নববিধানে'র কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় করিয়াছেন—জহর গাঙ্গুলী, কানন দেবী, মঞ্জু দে, কমল মিত্র প্রভৃতি। পরিচালনা করিতেছেন—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

* * * *

১৯৫৩ সালের 'গীতশ্রী' সঙ্গীত পরীক্ষায় কুমারী পূরবী দত্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রথম বিভাগে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গীতশ্রী পূরবী দত্ত এই বৎসরেই কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইন্টার কলেজিয়েট্ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি আশুতোষ কলেজের বি. এ. চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। ইঁহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্র-সঙ্গীত পরিচালক শ্রীবিভূতি দত্তের নিকটে ইনি সঙ্গীতের শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

মঞ্চ-পীঠ ঃ

সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটার গৃহ-সংস্কার করিয়া নূতন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্যামলী'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করিয়াছেন। নাটকের পরিচালনা করিয়াছেন রঙ্‌মহলের প্রাক্তন কর্ণধার শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্র। উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। দৃশ্য-সজ্জার কাজ করিয়াছেন শ্রীসতু সেন। গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন যথাক্রমে শ্রীশৈলেন রায় ও শ্রীদুর্গা সেন। বিভিন্ন ভূমিকায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, উত্তমকুমার, সাবিত্রী [illegible] শিশির ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রূপদান করিয়াছেন। নাটকটি ইতিমধ্যে নাট্যরসপিপাসুদের আনন্দদানে সমর্থ হইয়াছে। ষ্টার থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্রের এই নবতম প্রচেষ্টা একাধারে যেমন সাফল্যলাভ করিয়াছে অপর-দিকে তেমনি নাট্য-জগতে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছে। বাংলার নাট-মঞ্চ যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল ষ্টার থিয়েটার তাঁহাদের নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, যুগের সঙ্গে তাল ফেলিয়া চলিতে জানিলে রঙ্গমঞ্চে দর্শকের অভাব হয় না।

* * * *

শ্রীরঙ্গমে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার শীঘ্রই একটি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। নাট্যরসিক মাত্রেই শিশিরকুমারের প্রতি আস্থাবান। সুতরাং তাঁহার নূতন নাটকে নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে এখানে শিশির-অহীন্দ্র সম্মেলনে পুরাতন নাটক অভিনীত হইতেছে।

* * * *

কুমারী পূরবী দত্ত

রঙ্‌মহলে সম্প্রতি 'লাল-পাঞ্জা' নামক একটি নূতন ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছে। শোনা যাইতেছে, এখানেও শীঘ্র নূতন নাটক খোলা হইবে।

* * * *

কলিকাতার প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ মিনার্ভা থিয়েটারের দ্বার সহসা বন্ধ হওয়ায় নাট্য-রসিক মাত্রেই বিস্মিত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শিল্পী ও নেপথ্য কর্ম্মি বেকার হইয়া

ড়য়াছেন। এই প্রাচীন-
…র রঙ্গমঞ্চটি সম্পর্কে নানা-
কার জনরব শোনা
ইতেছে, কেহ বলিতেছেন—
…ন্দী থিয়েটারে পরিণত
হবে, কেহ বলিতেছেন—
…র-গৃহে রূপান্তরিত হইবে।
…লার নাট্য-জগতের
…তি হাসে মিনার্ভা থিয়ে-
টারের এই শোচনীয় পরিণতি
সত্যই দুঃখের কথা। দেশে
শিল্পপতি ও নাট্যরসিকের
অভাব নাই। তথাপি এই
প্রাচীন রঙ্গালয়টি যদি বাংলা
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস হইতে
নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তাহা
হইলে সত্যই দুঃখের কারণ
হইবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চিত্রের মহরৎ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন দেশবরেণ্য নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ …গাকে বক্তৃতারত দেখা যাইতেছে—পার্শ্বে উপবিষ্ট ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

*　　*　　*

রঙ্গালয়ের প্রতি এতকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে এতদ্‌সম্পর্কে নাট্যলোক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় একটি জাতীয় নাট্য-শালার পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলিকেও সাহায্যদানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বারান্তরে এ বিষয়ে আমরা বিশদ্ আলোচনা করিব।

*　　*　　*　　*

বোম্বাই হইতে লিখিত আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির এক পত্রে প্রকাশ, ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা মিঃ হার্কাট মার্শালের উদ্যোগে 'দি সিভিক থিয়েটার' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করা এবং ইয়োরোপীয় নাটকের সঙ্গে এদেশের লোকেদের পরিচিত করা। এতদ্ব্যতীত থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় শিক্ষাদান করাও এঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্প্রতি এঁরা বার্ণাড শ-এর 'পিগ্‌ম্যালিয়ান' নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছেন। এরপর মিঃ মার্শাল সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিকা' নাটক হিন্দীতে অভিনয় করিবার তোড়জোড় করিতেছেন।

উক্ত পত্র প্রেরক বোম্বাই-এ থিয়েটারের অভাবের কথা জানাইয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন 'নাটক বড় একটা হয় না, হলেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। পৃথ্বীরাজের থিয়েটার কিছুটা অভাব পূরণ করলেও, কলকাতার রঙ্গমঞ্চের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়।' পত্র প্রেরকের উপরোক্ত উক্তিতে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কল্যাণীতে কংগ্রেস—

কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল দূরে কাঁচরাপাড়ার নিকট কল্যাণী নামক নূতন সহরে আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী ৫ দিন নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ১৬ই জানুয়ারী হইতে একমাস কাল কংগ্রেস নগরে এক বিরাট সর্বোদয় প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইতেছে। দীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন—১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কলিকাতা পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—এবার কল্যাণী কংগ্রেসে তাঁহার পুত্র শ্রীজহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করিবেন। এ অঞ্চলের শ্রমিকগণ যাহাতে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন, সেজন্য প্রতিদিনের দর্শকদের টিকিটের মূল্য মাত্র ২ টাকা ও অধিবেশনের কয়দিনের দর্শকদের টিকিটের মূল্য ৩ টাকা করা হইয়াছে। কংগ্রেস কর্মীদের জন্য ১০ টাকা ও সাধারণ দর্শকদের জন্য ২০ টাকা টিকিটের মূল্য করা হইয়াছে। ৭ হাজার প্রতিনিধি ও কর্মী ছাড়াও ৪ হাজার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সেজন্য প্রত্যেককে ৫ টাকা ভাড়া দিতে হইবে। সপরিবারে থাকার জন্য ১২৫ টাকা ভাড়ায় ভাল বাড়ী পাওয়া যাইবে। প্রদর্শনীর ১৪০ একর জমী লইয়া কৃষি বিভাগ হইতে বিভিন্ন রকমের কৃষিক্ষেত্র দেখান হইবে। নূতন ধরণে কংগ্রেস মণ্ডপ নির্মিত হইবে ও তাহা শান্তিনিকেতনের শিল্পীগণ কর্তৃক সজ্জিত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী—

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের প্রতিষ্ঠান নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের বেতন ও ভাতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার কোন বিবেচনা না করিলে তাঁহারা সকলে একযোগে ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ধর্মঘট সুরু করিবেন। বর্তমানে শিক্ষকগণ যে বেতন পান, তদ্দারা তাঁহাদের জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষকদের যে বেতনের হার স্থির করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেই হার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে—সে হার এইরূপ—আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক—৫০ টাকা স্থলে ৭০ টাকা, গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ৬০ টাকা স্থলে ৮০ টাকা, ট্রেণ্ড শিক্ষক ৭৫ টাকা স্থলে ১০০ টাকা, এম-এ, বি-টি ১২৫ টাকা। ঐ হারে বেতন বৃদ্ধি করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৯০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে ভাতাও বর্দ্ধিত করিয়া বর্তমান হার ২০ টাকা স্থলে ৩৫ টাকা করিতে বলা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী বেতন বৃদ্ধির দাবীতে সম্মত হইয়াছেন ও ভাতাও কতকাংশ বৃদ্ধির দাবী মানিয়া লইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার ব্যাপারে সরকার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন—সেই সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির এই ন্যায়সঙ্গত দাবীও পূরণ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ক্ষয়রোগ-কথা—

পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও তজ্জনিত খাদ্যাভাবের ফলে সর্বত্র বিশেষ করিয়া সহর ও সহরতলী অঞ্চলে ক্ষয়রোগ ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। ইহার নিবারণ ও প্রতীকার প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি ক্ষয়রোগের খ্যাতনামা ও প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় 'ক্ষয়রোগ-কথা' নাম দিয়া এ বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মূল্য তিন টাকা—কলিকাতা-৬, ১২ কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীটস্থ নিউ গাইডে পাওয়া যায়। ডাঃ অধিকারী গত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রায় বিনামূল্যে ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করিতেছেন—যে পরিবারে চিকিৎসা করিতে যান, তিনি সে গৃহের আত্মীয়, বন্ধু ও পরামর্শদাতা হইয়া থাকেন। কত কম ব্যয়ে ক্ষয়রোগের চিকিৎসা হয়, তাহা তিনি সকলকে বুঝাইয়াছেন এবং রোগ যাহাতে সংক্রামক না হয়, সে বিষয়ে সকলকে উপদেশ দেন। তাঁহার পুস্তকে তিনি জীবনের সেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানই প্রচার করিয়াছেন। রামচন্দ্র সুপণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ—কাজেই বইখানি উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য হইয়াছে। রোগ চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ-নিবারণের উপায়ের কথাই আজ চিন্তার বিষয়—এ বিষয়ে ডাঃ অধিকারীর পুস্তক সমাজের উপকার করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ধর্ম মহাসম্মেলন—

আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একমাস কাল এলাহাবাদে কুম্ভমেলা হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৮দিন তথায় ধর্ম মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। দিল্লী সাধুমণ্ডলের স্বামী ভাস্করানন্দজী উহার উদ্যোগে আয়োজন করিতেছেন। ৩৮টি বিভিন্ন দেশের ধর্ম-নেতা সম্মেলনে যোগদান করিবেন। এলাহাবাদ

১৯০৫এ বাঙালী স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে ঝুঁকেছিল। উৎসাহ উত্তেজনায় স্বদেশী শিল্প জন্মলাভ করেছিল অনেকগুলি, কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী বন্যার জলের মত সেগুলিকে ভেসে যেতে দিয়েছিল। সেই ভাববন্যা কাটিয়ে বাঙালীর কীর্তি স্থায়ী হয়ে রয়েছে সামান্য দু-চারটিতে।

১৯২১এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী শিল্পের নতুন উদ্বোধন করেছিল। তারও অধিকাংশ কালের প্রবাহে ভেসে গেছে। অসহযোগ-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল **'কাজল কালি'** বাংলা দেশে আজও সগৌরবে টিকে আছে। এর কারণ ভাবাবেগের সঙ্গে এর আবিষ্কারক-পরিচালকদের চিত্তে নিষ্ঠা ও সততা ছিল। **'কাজল কালি'** এক জায়গাতেই থেমে থাকেনি, সময়ের এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কালি কলমের মর্যাদা রেখে এগিয়ে চলেছে। দামে এবং গুণে হার মেনেছে যাবতীয় বিলিতী কালি।

বাংলা দেশের একজন সামান্য বাণীসেবক আমি, বিগত শতাব্দীপাদের অধিক কাল এই **'কাজল কালি'**র সাহায্যেই বাণী সাধনা ক'রে আসছি। কখনও অসুবিধেয় পড়িনি, শ্লথ হয়নি কলমের গতি, বন্ধ হয়নি লেখনীর মুখ। এরই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ! সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবশে **'কাজল কালি'**র অক্ষয় জীবন কামনা করছি।

২৬।১০।৫৩　[signature]

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসি-বি-অগ্রবালকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ৫০জন হিন্দু, ৫০ বৌদ্ধ, ৪০ খৃষ্টান, ৪০ মুসলমান, ১০ ধর্মনিরপেক্ষ ও ১০ বিবিধ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিবেন। ভারতে এইরূপ মহাসম্মেলনের প্রয়োজন—কাজেই ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সকলের যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের যক্ষ্মা-সেবা—

গত ১০ই নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদ রাঁচী হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়ামে (১) ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত অস্ত্রোপচার কেন্দ্র (২) মহেশ ভট্টাচার্য্য ওয়ার্ড (৩) ত্রিপুরা-সোহাগিনী ওয়ার্ড ও (৪) ক্যাপ্টেন দত্ত ওয়ার্ডের উদ্বোধন করিয়াছেন। ২৫০ একর জমির উপর এই স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত—১৯৫১ সালে ৩২টি মাত্র রোগী লইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল—এখন তাহার তিন গুণ রোগী রাখার ব্যবস্থা হইবে। ৬০ জন রোগীর মধ্যে ৪৪ জন সাধারণ ওয়ার্ডে, ৭ জন স্পেশাল ওয়ার্ডে ও ৯ জন কুটীরে বাস করে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ১০ জন পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা রোগীর ব্যয় দান করেন ও ইষ্টার্ণ রেল ৫ জন রোগীর খরচ দেন। রোগীরা রোগ-মুক্তির পর যাহাতে ঐ স্থানে থাকিয়া পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান, সেজন্য উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে—যাহাদের বহু দিন ব্যাপী চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহাদের জন্যও স্বতন্ত্র নিবাস খোলা হইবে। ঐ সঙ্গে গো-পালন, পক্ষী-পালন, মৎস্যের চাষ, কৃষি-ক্ষেত্র, ছাপাখানা প্রভৃতিও খোলা হইবে। কেহ এককালীন ৬ হাজার টাকা দান করিলে তাহা দ্বারা একটি অতিরিক্ত রোগী রাখার ব্যবস্থা হয় ও এককালীন ২০ হাজার টাকা দিলে তাহার সুদে একটি রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। স্বাস্থ্য-নিবাসকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন—(১) রোগীদের জন্য অতিথিশালা—৩০ হাজার (২) যন্ত্রপাতি—২৫ হাজার (৩) একস্‌রে প্রভৃতির জন্য ৬০ হাজার (৪) ইলেক্‌ট্রো থেরাপীর জন্য ৪০ হাজার (৫) জল সরবরাহ ব্যবস্থা—৫০ হাজার (৬) কর্মীদের বাসগৃহ—১ লক্ষ টাকা। এই স্বাস্থ্যনিবাস বিহারে অবস্থিত হইলেও তথায় বহু বাঙ্গালী রোগী থাকার ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতেও বাঙ্গালীরা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই। তবে ২০ জন বাঙ্গালী ধনী যদি প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করিয়া দান করেন, তবে বাঙ্গালীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্লক করা যায় ও তাহাতে ২০টি রোগী রাখার ব্যবস্থা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা সত্যই অসাধারণ কাজ করিয়া থাকেন—কলিকাতার একজন ধনীর দানে এই স্বাস্থ্যনিবাস বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই বিরাট ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেবা কার্য্যের জন্য দাতার অভাব

ভাবে এই কার্য্যের দ্রুত অগ্রগতির ব্যবস্থা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পুনর্ব্বসতির জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ—

আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৬০টি বাস্তুহারা পরিবারকে গৃহনির্মাণের জন্য মোট ৩১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ঋণ দান করিবেন। সহরের ১৮৫৬টি পরিবার ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ পাইবে ও গ্রামাঞ্চলের পরিবারসমূহ মোট ৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ঋণ পাইবে। সহরবাসীদের বরাদ্দ টাকার শতকরা ৫১ ভাগ ও গ্রামবাসীদের বরাদ্দ টাকার শতকরা ৩৬ ভাগ শুধু ২৪পরগণা জেলাতেই দেওয়া হইবে। সহরবাসী পরিবারগুলির মধ্যে ১২৫০টি ক্যাম্পে, ৩০০ বন্ধুদের পরিবারে ও ২৫০টি জবর-দখল জমীতে বাস করিতেছে। বাকী ৫০টি বাস্তুহারা পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচন করিবেন। গ্রামবাসী ৭৫৪টি পরিবার ক্যাম্পে বাস করে। এই অর্থ যাহাতে ঠিক সময়ে প্রদত্ত ও ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে বিষয়ে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

আশ্রম—

২৪পরগণা জেলার রহড়াস্থ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের নাম সর্বজন পরিচিত। গত প্রায় ৮ বৎসর কাল তথায় একজন নিরাশ্রয় অনাথ বালককে রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হয়। বর্তমানে তথায় প্রায় ৩শত বালক বাস করে—সম্প্রতি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুবৃহৎ গৃহ ক্রয় করিয়া তথায় ১২ বৎসরের কম বয়স্ক ৭৫জন বালকের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয় হইতে 'আশ্রম' নামক একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়—সম্প্রতি অষ্টম বর্ষ—১৩৬০এর সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমও যেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, কাগজখানিও তেমনই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। তাহাতে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ছাড়াও ২টি সংস্কৃত রচনা পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। বাঙ্গালা ও ইংরাজি লেখাগুলিও বেশ ভালই হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লিখিত ও পরিচালিত সাময়িক পত্রসমূহের মধ্যে ইহা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। এই আদর্শ সকল বিদ্যালয়ে অনুকৃত হইলে বাঙ্গালার ছাত্র সম্প্রদায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৩৮৭ (রামচাঁদ ১১৯, মঞ্জরেকার ৮৬, উমরীগড় ৪৭ ; বেরী ৮৯ রানে ৫ এবং ওরেল ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

রজত জয়ন্তীদল ঃ ১৯৮ (সিম্পসন ৫৭। গুপ্তে ৯১ রানে ৮ এবং গোলাম আমেদ ৮০ রানে ২ উইকেট) ও ১৭৪ (সিম্পসন ৫৯, ওরেল ৫৮। গোলাম আমেদ ৫২ রানে ৬ এবং গুপ্তে ৮২ রানে ৪ উইকেট)

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম রজত জয়ন্তীদলের প্রথম টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস এবং ১৫ রানে জয়ী হয়েছে। পাঁচ দিনের টেষ্ট খেলা দেড় দিন আগেই শেষ হয়ে যায়।

১৯শে নভেম্বর খেলা সুরু হয়। ভারতীয় দলে মানকড় এবং ফাদকার দলে নির্ব্বাচিত হ'ন। কিন্তু তাঁরা দলে যোগদান না করাতে ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে খুব বেশী আশা খেলার আগে করা যায় নি। ভারতীয় দলের অধিনায়ক পলী উমরীগড় টসে জয়ী হয়ে দলকে ব্যাট করতে পাঠান। সূচনা ভাল হয় নি ; পি রায় নিজস্ব ৫ রান ক'রে দলের মাত্র ৭ রানে এল-বি-ডব্লউ হয়ে আউট হ'ন। মঞ্জরেকার আপ্তের জুড়ী হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। মঞ্জরেকার খেলার বিভিন্ন রকমের দর্শনীয় মার দিয়ে দর্শকদের উল্লসিত করেছিলেন। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে ভারতবর্ষের ৯ উইকেট পড়ে ২১৪ রান ওঠে। নট আউট থাকেন উমরীগড় এবং রামচাঁদ যথাক্রমে ২৪ এবং ৫৩ রান ক'রে। দ্বিতীয় দিনে চা-পানের কিছু আগে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয় ৩৮৭ রানে, ৫২০ মিনিটের খেলায়। রামচাঁদ তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনে প্রথম সেঞ্চুরী করেন। যদিও একাধিক বার আউট হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তবুও তাঁর খেলার প্রশংসা করতেই হয় এই কারণে যে, তিনি বেপরোয়াভাবে পিটিয়ে খেলে বোলারদের দমিয়ে দিয়েছিলেন।

রজত জয়ন্তীদল কোন উইকেট না হারিয়ে ঐ দিন এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় খেলে ৪২ রান করে। খেলার তৃতীয় দিনে রজত জয়ন্তীদলের ১ম ইনিংস ১৯৮ রানে শেষ হয়ে যায় ; ফলে ১৮৯ রান পিছনে পড়ে তারা ফলো-অন করে এবং ২য় ইনিংসের ৩ উইকেট পড়ে ৮৭ রান ওঠে। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ১০২ রানের প্রয়োজন ছিল, হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট।

গুপ্তের বোলিং সিম্পসন এবং ওরেল ছাড়া অপর সকল খেলোয়াড়দের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরেল এবং গুপ্তের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

রজত জয়ন্তীদলের ১ম ইনিংস খেলার আশু পতনের কারণ হয়েছিলেন যেমন গুপ্তে—৯১ রানে ৮টা উইকেট তেমনি ২য় ইনিংসে গোলাম আমেদ—৫২ রানে ৬ উইকেট। খেলায় গুপ্তে মোট উইকেট পেয়েছিলেন ১২টা ১৭৩ রানে এবং গোলাম আমেদ ৮টা, ১৩২ রানে। গুপ্তে এবং গোলাম আমেদের বোলিংয়ের দরুণই ভারতবর্ষ রজত জয়ন্তীদলকে এমন শোচনীয়ভাবে হারাতে পেরেছিল। ৪র্থ দিন লাঞ্চের সময় রজত জয়ন্তীদলের ২য় ইনিংসে রান ছিল ১৬১, ৫ উইকেটে। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখন মাত্র ২৮ রান বাকি। ওরেল তখন উইকেটে খেলছেন। কিন্তু বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১৩ রানে লাঞ্চের পর আধ ঘণ্টার খেলায়। দলের নতুন উইকেট রক্ষক তামহানি ৫ জনকে আউট করেন, ৩ জন কট্ ২ জন ষ্টাম্পড। দলে যোগ্য এবং প্রবীণ খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও উমরীগড়কে অধিনায়ক করাতে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাঁরা এরপর এই বলে মনের সান্ত্বনা পেতে পারেন সত্যই উমরীগড় ভাগ্যবান অধিনায়ক।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের ডুরাণ্ড ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ৪-০ গোলে ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীকে হারিয়ে অনেক বারের চেষ্টার পর ডুরাণ্ড

কাপ জয়ী হয়েছে। মোহনবাগান ১৯৫০ সালের ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলাতে হায়দ্রাবাদ দলের কাছে হেরে আসে। ঐ বছরের দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলাতে গোলরক্ষক আহত হয়ে পড়ায় মোহনবাগানকে দশজন খেলোয়াড় নিয়ে যে অসুবিধায় পড়ে হার স্বীকার করতে হয়েছিল, এ বছরের সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ দলও সেই রকম অসুবিধায় পড়ে হার স্বীকার করেছে। অসুবিধা সত্ত্বেও হায়দ্রাবাদ দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ ব্যূহ রচনা ক'রে মোহনবাগানের রক্ষণভাগকে কয়েকবার বেশ উদ্বিগ্ন ক'রেছিলো। এ বছরের প্রতিযোগিতায় সবথেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা—ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী দলের কাছে গত দু' বছরের ডুরাণ্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের ০-২ গোলে পরাজয়। ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীর খেলোয়াড়দের বয়স কুড়ির মধ্যে। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলার মত তাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও খেলায় জয়লাভের পক্ষে দুটো প্রধান অবলম্বন ছিল—খেলায় দম এবং সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা। ফাইনালে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, প্রায় পরপর খেলার দরুণ দলের খেলোয়াড়দের শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ দেখা দিয়েছিল। মোহনবাগান দলের কাছে তাদের এ পরাজয় মোটেই অগৌরবের হয়নি।

জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর লাল কেল্লায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশ দলগত এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের সদস্য ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি। আলোচ্য বছর ১৬টি প্রদেশ থেকে ৪১০ জন মহিলা এবং পুরুষ যোগদান করেছিলেন।

ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের শ্রীমতী সবিতা চ্যাটার্জি মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় সব থেকে, বেশী ট্রফি এবং মেডেল পেয়েছেন ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি; তাঁর পরই শ্রীমতী সবিতা চ্যাটার্জি।

ডেভিস কাপ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইউরোপীয়ন জোন চ্যাম্পিয়ান বেলজিয়াম ৫-০ খেলাতে এসিয়ান জোনের একমাত্র যোগদানকারী দেশ ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। বেলজিয়ামের পরবর্ত্তী খেলা পড়েছে আমেরিকান জোন-চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার সঙ্গে। বেলজিয়াম-আমেরিকার বিজয়ী দল ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে। ভারতবর্ষের পক্ষে যোগদান করেছিলেন সুমন্ত মিশ্র এবং ষোল বছর বয়সের তরুণ খেলোয়াড় আর কে-কৃষ্ণান। ভারতীয় দলের ২নং খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ এবং ৩নং খেলোয়াড় নরেশকুমার ব্যক্তিগত কারণে দলের সঙ্গে যেতে না পারায় ভারতীয় দল স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ বনাম জাপান ঃ

ভারতবর্ষ বনাম জাপানের সরকারী এবং বে-সরকারী রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে। সরকারী প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ২টি এবং জাপান ১টিতে জয়ী হয়। বে-সরকারী প্রতিযোগিতায় ছয় একটি বিষয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে বেশী স্কোর করেন ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থ "হাতের রেখা" (২য় সং)—২৲
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "বিল্বমঙ্গল" (১১শ সং)—২
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কৃত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "বিন্দুর ছেলে" (৪র্থ সং)—১৷৷৹
চিত্রিতা দেবী প্রণীত "উপনিষৎ"—২৷৷৹
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "ফুল্লরা" (৪র্থ সং)—২৲
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত নাটক "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" (৯ম সং)—১৷৷৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "কুল-লক্ষ্মী" (২০শ সং)—২৲
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত "বিপ্লবের পদচিহ্ন"—৪
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "চায়না লজ"—৷৷৹, "মিথ্যা চমক"—৷৷৹
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কৃত নাটক "বাংলার মেয়ে" (৪র্থ সং)—২৷৷৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক "বুড়িবালামের তীরে"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত উপন্যাস "ক্যুয়ো ভাদিস্"—১৷৷৹
শ্রীরমেন চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "ওগো মোর মরমিয়া"—৩৲
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি গ্রন্থ "ভোরের বকুল"—২৲
শ্রীঅনিল সেন প্রণীত উপন্যাস "প্রতিবেশী"—১৷৷৹
শ্রীমতী বাণী রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "প্রতিদিন"—২৷৷৹
শ্রীরবি গুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মন্দাকিনী"—৩৲
অগ্রহায়ণ সংখ্যা "পূর্ব্বরঙ্গ"—৷৵৹
সন্তোষকুমার দে প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পরিচয়"—২৷৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ
১৩৬০
PERMANENT
BLUE-BLACK
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন কালি
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালির সমকক্ষ
ইহাতে সলভেন্ট 'এস-১০০' আছে
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক · কলিকাতা ৩২

এই বলেই সবাই 'কোকোলা'কে অভিনন্দন জানায়। স্বপ্নালু সুরভি, সূক্ষ্ম সংমিশ্রন, বিশুদ্ধ উপাদান প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে সকলের চিত্ত জয় করেছে 'কোকোলা'। তাই আজ 'কোকোলা' ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশ তৈল।

ক্রয়কালে জাল বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বোতল খুলে দেখে নেবেন ইহা আপনাদের সেই চির-পরিচিত সুগন্ধযুক্ত আসল জিনিষ কিনা। জালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায়।

COCOLA
কোকোলা
JEWEL OF INDIA PERFUME CO.
CALCUTTA

কোকোলা

অভিজাত কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং
কলিকাতা-৩৪

শিল্পী—শ্রীতাপস দত্ত

বারবনিতা বললে হেসে "স্বামী,
দেখছ যা' তা' সত্য বটে আমি!"

ওমর-খৈয়াম
নরেন্দ্র দেব

মাঘ—১৩৬০

দ্বিতীয় খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মহারাজা নন্দকুমার

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মহারাজা নন্দকুমার তাঁহাদের অন্যতম। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের পরে জালিয়াতির অপরাধে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়—সাধারণতঃ এই ঘটনাটাই ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কারণ ইহার জের বিলাত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল—এবং হেষ্টিংস ও ইম্পে উভয়কেই ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। এই সুপরিচিত ঘটনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। নন্দকুমারের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই এবং সাধারণ লোকের নিকটও ইহা সুপরিচিত নহে। কিন্তু সম্প্রতি কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নন্দকুমার বাংলার প্রথম শহীদ্—অর্থাৎ তিনিই প্রথম দেশের জন্য আত্মবলিদান করেন। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু বাঙ্গালী যুবক দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল—অনেকে হাসিমুখে প্রাণ দিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা প্রকাশ্যে এই সব শহীদগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। এই প্রসঙ্গেই কথা উঠিয়াছে যে নন্দকুমার আমাদের দেশের প্রথম শহীদ। যে বিচারের ফলে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, তাহার সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হইয়াছিল দেশের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অন্ততঃ তাঁহার প্রাণদণ্ড যে এই অপরাধে হয় নাই—তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাংলার শহীদ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত কিনা তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য।

কিন্তু এই কারণে ঠিক শহীদ না হইলেও নন্দকুমার

দেশের জন্য কোন মহৎ কার্য্য করিয়াছেন কিনা তাহারও বিচার করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। এই জন্য প্রথমে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি জানা দরকার।

হেষ্টিংসের বন্ধু ও সহযোগী বারওয়েল এদেশ হইতে তাঁহার ভগ্নীকে লিখিত একখানি পত্রে নন্দকুমারের জীবনীর সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। তাহার সারমর্ম নিম্নে দিতেছি।

'নন্দকুমারের পিতা দুইটি কি তিনটি পরগণার আমিন ছিলেন। নন্দকুমার প্রথমে তাঁহার অধীনে নায়েব ও পরে নবাব আলিবর্দ্দির আমলে হুগলী ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রজাগণের উপর অত্যাচার ও আশি হাজার টাকা তহবিল তসরূপ করায় রায় রায়াণ তাঁহাকে বরখাস্ত ও কয়েদ করেন। জেলে তাঁহার হাতে শিকল দিয়া তাঁহাকে বহুবার বেত্রাঘাত করা হয়। তাঁহার পিতা পাওনা টাকা শোধ দিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনও ঐ পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন না। অতঃপর নন্দকুমার মুস্তাফা খাঁর অধীনে কার্য্য করেন কিন্তু এখানেও কারারুদ্ধ হইবার ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি একটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই পদচ্যুত হন। অতঃপর তিনি যুবক সিরাজউদ্দৌলার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। একদিন তাঁহার কানে কানে কি কথা বলেন, তাহাতে সিরাজ বংশদণ্ড দিয়া তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করেন। তার পর মহম্মদ ইয়ার বেগ খানের বিশ্বাসভাজন হইয়া তিনি হুগলীর দেওয়ান ও পরে ফৌজদার হন।

নন্দকুমারের পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে আমরা অন্যান্য প্রমাণ হইতে অনেক কথা জানি। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং উপরে বারওয়েলের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি—ইহা কতদূর সত্য তাহা জানিবার উপায় নাই। বারওয়েল নন্দকুমারের শত্রু ছিলেন, সুতরাং তিনি নন্দকুমারের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক আরোপ করিবেন—অথবা দোষগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবেন—ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহাও বিচার্য্য যে নন্দকুমারের পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে বারওয়েল যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা মোটামুটি সত্য। সুতরাং প্রথম ভাগে তিনি যে নিছক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এরূপ মনে করিবারও যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। যতদিন নন্দকুমারের প্রথম জীবনের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ না পাওয়া যায় ততদিন বারওয়েলের বিবরণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইহা পুরাপুরি সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও নন্দকুমার যে খুব সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন না ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বারওয়েল এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে নন্দকুমার প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমসাময়িক অনেক ইংরেজ রাজপুরুষই নন্দকুমারের চরিত্র এইরূপ হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন—সে যুগের এমন কোন লেখকের নাম করা যায় না। এ সমস্ত বিশ্বাস না করিলেও ইহার বিপরীতই যে সত্য তাহা মনে করিবারও কোন কারণ নাই। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার প্রথম জীবনী সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি তাহাতে তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করা অসম্ভব।

নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার ছিলেন তখন ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। সিরাজউদ্দৌলার সহিত ফরাসীদের সদ্ভাব ছিল এবং ইংরেজের সহিত বিবাদ বাধিলে ফরাসীরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে তাঁহার এ ভরসা ছিল। সুতরাং তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইংরেজদিগকে নিষেধ করেন। হুগলী চন্দননগরের নিকট; সুতরাং তিনি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে আদেশ করেন যে ইংরেজ সৈন্য ফরাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে যেন বাধা দেওয়া হয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সিরাজ রায়-দুর্লভের অধীনে আর একদল সৈন্য হুগলীতে প্রেরণ করেন। এদিকে ক্লাইবও বেশ জানিতেন যে ফরাসীদিগকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে সিরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যাইবে না এবং নবাবী সৈন্য ফরাসীদের সাহায্যে অগ্রসর হইলে তাঁহার যুদ্ধ জয় অসম্ভব। সুতরাং তিনি উমিচাঁদের মারফৎ মোটা ঘুষ দিয়া নন্দকুমারকে হাত করিলেন। যখন ক্লাইব সসৈন্যে চন্দননগর যাত্রা করিলেন তখন নন্দকুমার নিজে তো কোন বাধা দিলেনই না, রায়দুর্লভকেও নানা স্তোকবাক্যে অগ্রসর হইতে নিরস্ত করিলেন। ইংরেজেরা স্বীকার

করিয়াছেন যে নন্দকুমার এইভাবে সাহায্য না করিলে তাঁহারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন না। ফরাসীরা বাংলা দেশ হইতে বিতাড়িত না হইলে পলাশীর যুদ্ধ হইত না এবং হয়ত বাংলা দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত না। সুতরাং নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতকতাই যে বাংলা দেশের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সিরাজের পতনের পরে নন্দকুমার ক্লাইব ও মীরজাফরের প্রিয়পাত্র হইলেন। ইংরেজদের সুপারিসে তিনি উচ্চপদ ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। মীরজাফর তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করিতেন। এই কারণেই ক্রমে ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাঁহার প্রতি বিরাগভাজন হন—এবং নন্দকুমারও কোন কোন ব্যাপারে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মীরজাফর নবাব হইয়া যখন দেখিলেন যে তিনি ইংরেজদের ক্রীতদাস মাত্র—তখন তিনি নানা উপায়ে ইংরেজদের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করেন। কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন যে এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামপুরের ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দেশীয় শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে মীরজাফরের পক্ষে রাজবল্লভ ওলন্দাজদের সহিত ও নন্দকুমার অন্যান্য শক্তির সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করেন। ওলন্দাজদের সহিত বাস্তবিক কোন প্রকার গোপন সন্ধি হইয়াছিল কিনা—কলিকাতার কাউন্সিল তাহার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে মীরজাফরকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। রাজবল্লভ যে এই প্রকার কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিতে পারেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপ আর একজন ইংরেজ বলেন যে ঠিক ঐ সময়ে রাজবল্লভ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া সিরাজের ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইংরেজদের নিকট প্রস্তাব করেন। সুতরাং নন্দকুমার এইরূপ কোন চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন কিনা—এবং থাকিলেও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই।

যখন মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে নবাব করা হইল তখন নন্দকুমার মীরজাফরকেসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে নন্দকুমার ঠিক কি করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না—কিন্তু তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অতঃপর এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

নন্দকুমারের সম্বন্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে তিনি শাহজাদা ও পণ্ডিচেরীর ফরাসীদের মধ্যে পত্র-বিনিময়ে সহায়তা করেন। দ্বিতীয় অভিযোগ যে বর্দ্ধমানের রাজা বলমগড় খান ও অন্যান্য যে সব জমীদারগণ মীরকাশিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাদের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। তৃতীয় অভিযোগ এই যে তিনি কতকগুলি পত্র জাল করিয়া শেঠবংশীয় রামচরণ রায় ও রায়দুর্ল্লভ শাহআলমের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কারণ রামচরণই তাহার গোপন ষড়যন্ত্রের প্রধান সাক্ষী ছিল এবং রায়দুর্ল্লভ তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিল এই অভিযোগগুলি সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া তদন্ত করেন এবং প্রথম দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। তৃতীয় অভিযোগটি সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ থাকিলেও তাঁহারা মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করেন যে নন্দকুমার দেশে অশান্তি সৃষ্টির এবং ইংরেজ কোম্পানীর অনিষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিজের গৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখা হউক। কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং যাহাতে নন্দকুমার বাংলার বাহিরে গিয়া কোম্পানীর কোন অনিষ্ট চেষ্টা না করিতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে বলেন।

যখন মীরকাশিমকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন তখন তিনি নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট প্রথমে ইহাতে সম্মত হন নাই,কিন্তু মীরজাফরের বিশেষ অনুরোধে ও ভ্যান্সিটার্টের বিরুদ্ধ পক্ষের চক্রান্তে নন্দকুমার এই পদে নিযুক্ত হইলেন। মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ শেষ হইলে নন্দকুমারের নামে আরও কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়। মীর আসরফ নামে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত রূপে সাক্ষী দেয়।

"হাজি আবদুল্লা নামে মীরকাশিমের একজন সৈন্য

এক্ষণে নন্দকুমারের সৈন্যদলে কাজ করে। একদিন সে আমাকে বলে যে নন্দকুমার তাহাকে অনুরোধ করে—যাহাতে মীরকাশিমের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে নন্দকুমার গোপনে ইংরেজ সৈন্যের সমস্ত সংবাদ মীরকাশিমকে জানাইবে—বিনিময়ে মীরকাশিমের জয় হইলে তিনি নন্দকুমারকে বাংলার দেওয়ানী পদ দিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মীরকাশিমের নিকট নিজের শীলমোহরযুক্ত একখানি কাগজ পাঠাইয়াছেন।

"কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিতে রাজী হইলে নন্দকুমার তাঁহাকে পত্র লেখেন যে ইংরেজদের মধ্যে আত্মকলহ ও অনৈক্য এবং তাঁহাদের কথার বা মতের স্থিরতা নাই—সুতরাং তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ প্রভু সুজাউদ্দৌলাকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম ও নিন্দনীয়।

"এই পত্র পাইয়া বলবন্ত সিংহ সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত দেখা করেন। এই সংবাদ পাইয়া আসরফ বলবন্ত সিংহের গোমস্তা রামচাঁদ পণ্ডিতকে পত্র লেখেন। তদুত্তরে রামচাঁদ তাহাকে জানাইলেন যে রাজ্যের দেওয়ান যদি এরকম পত্র লেখেন তবে তাঁহার প্রভুদের কথায় কিরূপে বিশ্বাস করা যায়।"

নন্দকুমারের এই পত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত করা হয় এবং ইহা যে সত্যই লিখিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। ভ্যান্সিটার্ট বলেন যে পরে তিনি বলবন্ত সিংহকে জিজ্ঞাসা করায় বলবন্ত সিংহ নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি এই পত্র পাইয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই সুজাউদ্দৌলার পক্ষে যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বলবন্ত সিংহ আরও বলেন যে তিনি নন্দকুমারের নিকট হইতে দুই তিনখানা পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু সুজাউদ্দৌলার নিকট নন্দকুমার অন্ততঃ পঞ্চাশখানা চিঠি লিখিয়াছেন। এই পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই কিন্তু একখানি পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এবং আরও কিছু সংবাদ ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে আছে। এই পত্রে নন্দকুমার লেখেন যে সুজাউদ্দৌলা যদি এদেশ হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দেন তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ নন্দকুমার) এক কোটি টাকা নজরাণা এবং পাটনা প্রদেশ সুজাউদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দিবেন। সুজাউদ্দৌলা এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় নন্দকুমার কয়েক লক্ষ টাকাসহ তাঁহার উকীল সৈয়দ রুল্লাকে সুজাউদ্দৌলার কর্ম্মচারী হাসেম আলী খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং হাসেম আলীর প্ররোচনায় অবশেষে সুজাউদ্দৌলা নন্দকুমারের প্রস্তাবে রাজী হন।

এখানে বলা আবশ্যক যে সুজাউদ্দৌলা ও নন্দকুমারের উল্লিখিত বিবরণ কাহার নিকট হইতে পাওয়া গেল এবং ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কোন বিশেষ তদন্ত হইয়াছিল কিনা—এ সম্বন্ধে দপ্তরের কাগজপত্র হইতে কিছুই জানিতে পারি নাই। এ সমুদয় সত্ত্বেও মীরজাফরের জীবদ্দশায় নন্দকুমারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। দিল্লীশ্বর এই সময় তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দেন। কিন্তু মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমুদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের নূতন সন্ধি হইল। ইহার একটি সর্ত্ত ছিল যে শাসনবিভাগের সমস্ত ক্ষমতা একজন নায়েব সুবার হস্তে থাকিবে এবং ইংরেজ গভর্ণরের পরামর্শমত নবাব তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। নজমুদ্দৌলা নন্দকুমারকে এই পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন—কিন্তু গভর্ণর রাজী হইলেন না এবং মহম্মদ রেজা খাঁকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমার এই নিয়োগের বিরুদ্ধে নানারূপ আপত্তি তুলিলেন।

বলবন্ত সিংহ ও সুজাউদ্দৌলার সহিত ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া ইংরেজ সেনাপতি কার্ণাক নন্দকুমারকে বন্দী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন—কিন্তু কতকগুলি কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগের পরে গভর্ণরের আদেশে নন্দকুমারকে সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় পাঠান হইল। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা কলিকাতা কাউন্সিলের ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ—১৯শে জুলাইর অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইতে জানা যাইবে।

"নন্দকুমার মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; পুনঃ পুনঃ গোপনে নানারকম অসৎ কার্য্যের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল; মুখে ইংরাজের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি ষড়যন্ত্র

করিয়াছিল ; এবং দিল্লীর দরবার ও কার্ণাটিকের ফরাসীদের মধ্যে পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল ;—"

"এই সমুদয় কারণে কাউন্সিলের গত অধিবেশনে তাহাকে চট্টগ্রামে নির্বাসন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সুপরিচিত বন্ধু মুন্সী নবকৃষ্ণ আমাদের একটি সৎ পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে নন্দকুমারের মত কূটচক্রী লোককে কলিকাতা হইতে দূরে রাখা নিরাপদ নহে, কলিকাতায় কঠোরভাবে নজরবন্দী করিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত।"

"সুতরাং এই ব্যবস্থা হইল যে নন্দকুমারকে সতর্ক পাহারার অধীনে কলিকাতায় রাজবন্দীরূপে রাখা হউক।"

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর হেষ্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া নন্দকুমারের সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করেন। কলিকাতা কাউন্সিলের তিনজন সদস্য এই নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন—এবং নন্দকুমারের পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করেন যে পুত্র দেওয়ান হইলে প্রকৃতপক্ষে নন্দকুমারের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে—এবং এরূপ লোকের হাতে এই প্রকার ক্ষমতা দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

হেষ্টিংস এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে দিতেছি।

"নন্দকুমারের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এবং তাহার পূর্ব্বকাহিনী আমি সমস্তই জানি—তথাপি, অনিচ্ছাসত্বেও, কেবল গভর্ণমেণ্টের ইষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি নন্দকুমারের পুত্রকে দেওয়ান করিতেছি।"

"মনে রাখিতে হইবে যে নন্দকুমার ইংরেজদের ভৃত্য ছিল না, নবাব মীরজাফরের দেওয়ান ছিল, সুতরাং মীরজাফরের স্বার্থের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। বহিঃশক্তির সাহায্যে ইংরেজের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া নবাবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা মীরজাফর ও তাঁহার দেওয়ান উভয়ের পক্ষেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এ বিষয়ে মীরজাফর ও নন্দকুমারের মতের বিশেষ ঐক্য ছিল—এবং নন্দকুমার কখনও মীরজাফরের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছে এরূপ অভিযোগ শোনা যায় নাই। মীরজাফর যে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নন্দকুমারের বিশ্বস্ততায় বিশেষ প্রীত ছিলেন নানারকমে তাহার উন্নতি বিধান করিয়া তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।"

"মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজের অজ্ঞাতসারে নন্দকুমার যে দিল্লী হইতে নজমুদ্দৌলার জন্য সুবাদারীর সনদ আনাইয়াছিলেন এবং নবাবের সমস্ত ক্ষমতা মহম্মদ রেজা খাঁর হাতে অর্পণ করার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইহাতেও নন্দকুমারের প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—ইহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া দূরের কথা, বরং প্রশংসাই করিতে হয়।"

নন্দকুমার মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া হেষ্টিংসকে সাহায্য করেন। কিন্তু পরিণামে রেজা খাঁ নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হন। ফলে নন্দকুমারের বিশ্বাস হইল যে হেষ্টিংস রেজা খাঁর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াই তাহাকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা—অর্থাৎ কলিকাতার নূতন কাউন্সিলের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ আনয়ন, মোহনপ্রসাদ কর্ত্তৃক নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এবং বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি—এ সকলই সুপরিচিত ঘটনা এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা অনাবশ্যক।

নন্দকুমারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, প্রামাণিক নথিপত্রের সাহায্যে আমি তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যাহা কিছু প্রমাণ তাহা সকলই ইংরেজদের নথি হইতে প্রাপ্ত, নন্দকুমারের দিক হইতে আমরা এ যাবৎ কোন প্রমাণ পাই নাই। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা কি এবং নন্দকুমার কি উদ্দেশ্য লইয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বিভিন্ন লোকের মনে নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

হেষ্টিংস নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি সত্য হইলেও—যে সময় তিনি মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন সে সময় মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার

পক্ষ লইয়া ষড়যন্ত্র করায় মীরজাফরের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল কিনা—ইহা বিশেষভাবে বিচার্য্য।

এই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কেহ হয়ত বলিবেন যে কুচক্রী নন্দকুমারের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক এবং মীরকাশিম নবাব হইলে তিনি আরও বেশী লাভবান হইবেন এইরূপ আশা করিতেন। আবার কেহ বলিতে পারেন যে ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজশক্তি বিতাড়িত করাই তাহার শেষ জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহার পূর্ব্বেও তিনি যে সমুদয় ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহারও ঐ একই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম জীবনে সিরাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ইহার বিষম পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নন্দকুমারের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তাহাতে তিনি যে এইরূপ মহান উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে স্বতঃই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই মত যে একেবারে ভ্রান্ত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সপক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণও আমাদের হাতে নাই। নন্দকুমারকে শহীদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আলোচনা করা হইয়াছে।

আদর্শ-নারী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লক্ষ টাকা সঙ্গে করে এসেছিলে লক্ষপতি গৃহে
প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষ হ'লো গত, অয়ি মা নিঃস্পৃহে।
আরোহি সোনার তরী এসেছিলে সোনার সংসারে
সাথে তব কত বস্তু এলো ভারে ভারে
সবাই দেখিল তাই। কি ঐশ্বর্য্য অন্তরে তোমার
কেহ তাহা দেখে নাই, সে যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার,
শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বিনয়, সংযম,
করুণা, অসীম ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বাৎসল্য পরম
এ সব স্বর্গের ধন, এনেছিলে সবি,
দেখিল না অন্য কেহ, দেখিল তা কবি।
মুখে তব গুণ্ঠা আজো, সেবা হস্তে কুণ্ঠা নাই কভু,
কল্পতরুতলে ছিলে আত্মসুখ চাহনিক তবু।
অয়ি নিষ্ঠাবতী
বিলাসে শূকরী বিষ্ঠাসম তুমি গণেছিলে সতী।
অশ্রুজলে চিরদিন যাচিয়াছ সবার কল্যাণ
তাই তব আজো ধ্যানজ্ঞান।
হিন্দুর সংসারে তুমি ত্যাগধর্ম্মে আদর্শ গৃহিণী
লক্ষ্মী হয়ে চিরদিন রহিলে দুঃখিনী।
শ্রীহরি তোমার চিত্তে বসতি করিতে চিরদিন
রুগ্ন পতি শয্যাপার্শ্বে করিলেন তোমারে আসীন।
বিশ বর্ষ ধরি
সেই শয্যাপার্শ্বে আছ দিবা বিভাবরী
ধনরত্ন আজ আছে কাল তাহা নাই,
শাশ্বত সম্পদ যাহা আগুলিয়া রহিলে তাহাই
সাবিত্রী দেবীর মত তুমি অবিরাম
শমনের সাথে ধরি বিশ বর্ষ করিছ সংগ্রাম।
কে তুমি মা সতী?
শত শত কৈকেয়ীর মাঝে অরুন্ধতী?
সমগ্র সমাজভরা ময়ূরীমণ্ডলে
তুমি কি মা রাজহংসী চির শুভ্রা ধৌত অশ্রুজলে।
চারিদিকে মূঢ় আর মূঢ়া,
তার মাঝে জাগে তব নারীত্বের নন্দাদেবীচূড়া।
ভাবিয়া কি দেখিয়াছে কেহ
তোমার মাঝারে কোন্ দেবী আসি ধরিয়াছে দেহ?

প্রত্যহ প্রভাতে আসি তব পদধূলি
আত্মীয়ারা লয় কি মা তুলি'?
নিতান্ত ঘনিষ্ঠজনও বুঝেছে কি তোমার মহিমা?
বিধাতাই বুঝিল না, কার কথা তোমারে কহি মা।
চারিদিকে সোহাগিনী বিলাসিনীদল
তোমার সান্নিধ্য পেয়ে লভিল কি ফল?
তোমার আদর্শ হায় এযুগে বিফল।
পথ ভুলে আসিয়াছ ভোগিনী সমাজে
তব স্থান মহাকাব্য মাঝে
দিয়ে যাও পদধূলি এযুগের সকল বধূরে
উজ্জ্বল করুক তাহা তাহাদের সঁীথির সিন্দূরে
কেহ না চিনুক তোমা এই অর্ঘ্য তোমা সঁপিলাম
আমি কবি করি তোমা সহস্র প্রণাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানবের কাহিনী

প্রাতকল্য ঊষাকালে চাতক ঠাকুর দক্ষিণের দহে পদ্মফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, পথেই তিনি দেখিলেন অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষ নদী পার হইতেছে। ময়ূরী নদী এখানে অগভীর; কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর পর্যন্ত।

দেখিয়া চাতক ঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে গ্রামে ফিরিলেন। গ্রামে সংবাদ রাষ্ট্র হইল। প্রথমে গ্রামবাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল; ঠাকুর ঠিক দেখিয়াছেন তো? বুড়া মানুষ, হয়তো কি দেখিতে কি দেখিয়াছেন। কয়েকজন যুবক আগ বাড়িয়া দেখিতে গেল।

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার কুটিরে গিয়া বলিলেন—'রাঙা বৌ, গ্রামে দস্যু আসছে, তোমরা এই বেলা পালাও, নৈলে পরে আর পালাতে পারবে না। যা পারো সঙ্গে নিয়ে যাও, পলাস বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকো। আমি এদিকে চললাম, যদি ভালয় ভালয় বিপদ কেটে যায়, তোমাদের ডেকে আনব।'

ওদিকে যাহারা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা একদণ্ড পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিয়া আসিল। গ্রামে ভয়ার্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মেয়েরা যে যেদিকে পাইল পালাইতে লাগিল; পুরুষেরাও তাহাদের পিছু লইল। ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে সুরু করিল। দুই চারিজন বেতসকুঞ্জে লুকাইল; অনেকে নদী সাঁৎরাইয়া পরপারে চলিয়া গেল।

কেবল মুষ্টিমেয় পুরুষ গ্রাম ছাড়িল না, লাঠি ভল্ল মুদ্গর যাহা পাইল হাতে লইয়া দাঁড়াইল। চিরদিনই পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক আছে যাহারা নিজের বিপদ চিন্তা করে না; মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও রুখিয়া দাঁড়ায়। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে মৃত্যু বরণ করিয়া তাহারা চিরঞ্জীব হইয়া আছে। তাহাদের লইয়া কোনও কবি মহাকাব্য লেখেন নাই; তাহারা যুগে যুগে মৃত্যুঞ্জয়, তাই তাহাদের লইয়া মহাকাব্য লেখার প্রয়োজন হয় না।

মার্ মার্ করিয়া শব্দ করিয়া দস্যুদল গ্রামে প্রবেশ করিল। ক্ষুধাক্ষিপ্ত সশস্ত্র জনতা; যুক্তিহীন, বিবেকহীন; আপন উদগ্র প্রয়োজন ছাড়া তাহারা কিছুই বোঝেনা। সম্মুখে কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া হিংস্র তরক্ষু-পালের মত তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল; প্রত্যেক গ্রামবাসীকে পঞ্চাশজন দস্যু আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধের প্রহসন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, গ্রামের সকলেই মরিল। কেবল চাতক ঠাকুর নিরস্ত্র ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ মরিলেন না, মরণাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, তারপর অতিকষ্টে দেবস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

দস্যুগণ গ্রামে সঞ্চিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া কুটীরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিল। আপন দুষ্কৃতির চিহ্ন আগুন দিয়া মুছিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

পলাশবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্থান ঘন তরুশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এত ঘন এই তরুবেষ্টন যে রাত্রিকালে আগুন জ্বালিলে বাহির হইতে দেখা যায় না।

আজ এই স্থানে আগুন জ্বলিতেছিল। চুল্লীর আগুন; তিনটি প্রস্তর খণ্ডের মাঝখানে থাকিয়া ক্বচিৎ শিখা-প্রক্ষেপ করিয়া জ্বলিতেছিল। চুল্লীর উপর মৃৎপাত্রে অন্ন সিদ্ধ হইতেছে, তাই কোনও দিক দিয়াই আগুন বাহির হইতে পারিতেছিল না, পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীর মত ছিদ্রপথে অঙ্গুলি বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইতেছিল।

আবদ্ধ আগুনের শিখায় স্থানটি অস্পষ্টভাবে আলোকিত। বৃক্ষের কাণ্ডগুলি স্তম্ভের মত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, ইহারাই যেন এই বনগৃহের প্রাচীর। বনগৃহে দুইটি মানুষ রহিয়াছে।

ইহাদের দেখিয়া সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয় না; যেন ইহারা কোন্ অবাস্তব স্বপ্নলোকের অধিবাসী। এই মানুষ দুটি রঙ্গনা ও মানব। দস্যুর আক্রমণে পলাইয়া আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

রঙ্গনা উনানের উপর নত হইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছে। তাহার মুখের উপর মুগ্ধ আলোর খেলা। মুখখানি তেমনি মধুর-সুন্দর, কিন্তু যেন ইহলোকের নয়; পরীরাজ্যের স্বপ্নাতুর মুখ, রূপকথার বিস্ময়-মুকুলিত মুখ। রঙ্গনার দেহ-মন যেন বাস্তবলোক ছাড়িয়া কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছে।

মানব কিছুদূরে একটা গাছের স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ভাল দেখা যাইতেছে না; দেহের অস্থিপঞ্জরের উপর অস্পষ্ট আলোক ক্রীড়া করিতেছে; দীর্ঘ রুক্ষ চুল মুখের উপর পড়িয়া মুখের অধিকাংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মানব স্থির হইয়া বসিয়া আছে, নড়িতেছে না। যেন উৎকর্ণ হইয়া কিছু শুনিবার যত্ন করিতেছে।

'রাঙা!'

রঙ্গনা মানবের পাশে গিয়া বসিল, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। মানব তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে লইল, বলিল—'গুঞ্জা অনেকক্ষণ জল আনতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন?'

রঙ্গনা বলিল—'এখনি ফিরবে। নদী তো কাছে নয়।'

'ভাবনা হচ্ছে।'

'তুমি ভেবনা। গুঞ্জা এল বলে।'

'খুব অন্ধকার হয়ে গেছে কি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু গুঞ্জা পথ চেনে।'

দুইজন কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর মানব কথা কহিল—'বজ্র যদি ফিরে আসে, সে কি করে জানবে আমরা বনে লুকিয়ে আছি?'

রঙ্গনার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—'চাতক ঠাকুর আছেন।'

'চাতক ঠাকুর কি আছেন? থাকলে আমাদের খবর নিতেন না?'

সহসা মানব খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল, একাগ্র হইয়া শুনিল। বলিল—'কারা আসছে! দু'জন—।'

পদধ্বনি রঙ্গনা শুনিতে পায় নাই। সে সত্রাসে নতজানু হইয়া মানবকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া লইল। এবার মানব তাহাকে আশ্বাস দিল—'ভয় পেও না। হয়তো গুঞ্জা আর চাতক ঠাকুর—।'

কয়েকটা স্পন্দিত মুহূর্ত কাটিয়া গেল। যাহারা আসিতেছে তাহাদের পদশব্দ এখন স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। তারপর গুঞ্জা আর বজ্র তরুস্তম্ভের আড়াল হইতে আলোক-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুঞ্জার বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'মা, দেখ কে এসেছে!'

তীরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় রঙ্গনা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর অশ্রুবিকৃত স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল।

রঙ্গনার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা এতদিনে শেষ হইল।

মাতাপুত্র কিছুক্ষণের জন্য জগৎ ভুলিয়া গেল। ক্রমে বজ্রের কর্ণে একটি কণ্ঠস্বর বারম্বার প্রবেশ করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল - 'বজ্র! পুত্র! পুত্র!'

পুরুষের কণ্ঠস্বর, গভীর আবেগে অবরুদ্ধ। বজ্র চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল তরুতলের অস্পষ্ট ছায়ায় এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে আর দুই বাহু বাড়াইয়া ভগ্নস্বরে ডাকিতেছে—পুত্র! পুত্র!

বজ্র মাতার দেহ এক হাতে জড়াইয়া পুরুষের দিকে অগ্রসর হইল। কাছে গিয়া চিনিতে পারিল, এ সেই অন্ধ ভিক্ষুক, যাহাকে সে কর্ণসুবর্ণ যাত্রার পথে বনের অন্তিকে দেখিয়াছিল! ভিক্ষুকের অক্ষি-কোটর হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতেছে।

বজ্রের কণ্ঠেও প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে ব্যাকুলচক্ষে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল—'এ কে?'

রঙ্গনা কম্পিত অধরে অস্ফুটস্বরে বলিল—'তোমার পিতা —মহারাজ মানবদেব।'

বজ্রের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে নতজানু হইয়া পিতার জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

সে-রাত্রে চারিজনের কেহই ঘুমাইল না, চুল্লীর আগুনের প্রভায় পরস্পর হাত ধরিয়া জাগিয়া রহিল; যে হারানিধি তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে তাহা আবার হারাইয়া না যায়। অতীত আতঙ্কের স্মৃতি, বর্তমানের

পরিপূর্ণতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মিলিয়া চারিটি হৃদয়কে এক করিয়া দিল।

বজ্র তাহার কর্ণসুবর্ণ প্রবাসের কাহিনী বলিল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে বলিল, যেন কেহ আঘাত না পায়। শুনিয়া মানব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেছে—হোক একদিনের জন্য—আমার আর দুঃখ নেই। কিন্তু আর্য শীলভদ্র যথার্থ বলেছেন, আজ থেকে ও-কথা ভুলে যেতে হবে। আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ-যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।'

তারপর মানব আপন কাহিনী বলিল। দীর্ঘ বিংশ বৎসরের কাহিনী। একটা মানুষ কী দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই ইতিহাস।—

রঙ্গনাকে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস দিয়া মানব কর্ণসুবর্ণে উপনীত হইল। রাজধানী রক্ষার জন্য নূতন সৈন্যদল গঠন করিবার পূর্বেই ভাস্করবর্মা বিজয়ী সেনাদল লইয়া কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিলেন। নগর রক্ষা হইল না। মানব রাজপুরী সুরক্ষিত করিয়া শেষবার যুদ্ধ করিল।

ভাস্করবর্মা দুই দিন রাজপুরী অবরোধ করিয়া তৃতীয় দিনে নদীর ঘাটের পথে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরী অধিকৃত হইল; মানব রক্তাক্ত-কলেবরে যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হইল।

মানব যদি যুদ্ধে মরিত তাহা হইলে ভাস্করবর্মা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু সে জীবন্ত বন্দী হইয়া ভাস্করবর্মাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। পরাজিত শত্রু-রাজাকে হত্যা করা রাজধর্ম নয়, তাহাতে সকল রাজার জীবনই সংশয়ময় হইয়া পড়ে। অথচ শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। ভাস্করবর্মা এক কূটকৌশল অবলম্বন করিলেন। গভীর রাত্রে মানবের চক্ষু অন্ধ করিয়া তাহাকে প্রাকার হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করা হইল। প্রকাশ্যে রটনা করা হইল, যুদ্ধকালে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির ফলে মানবের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব চারিপাঁচ জন ব্যতীত কেহ জানিল না।

অন্ধ অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত দেহে নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মানব মরিল না। একদল বেদিয়া ভেলায় নদীপার হইতেছিল, তাহারা সন্তরমান মানবকে তুলিয়া লইল।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে বন-বাদাড়ের মধ্যে বেদিয়ারা কিছুদিনের জন্য ডেরাডাণ্ডা ফেলিল। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় মানবের দেহক্ষত জোড়া লাগিল। সে সারিয়া উঠিয়া বিপদের বন্ধু বেদিয়াদের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিল।

পরিচয় শুনিয়া বেদিয়ারা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা অতি দীনপ্রকৃতি, সকল সমাজের অপাংক্তেয়, রাষ্ট্র-নীতি-ঘটিত কোনও ব্যাপারে তাহারা থাকে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া মানবকে স্নানের ছলে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল এবং উচ্চ পাড় হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল।*

অন্ধ মানব ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সমস্ত দিন ভাসিয়া চলিবার পর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় সে কূল পাইল। বহুদূর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহারই ঘাটে সারারাত্রি পড়িয়া রহিল।

পরদিন হইতে মানবের দীর্ঘ পরিব্রজন আরম্ভ হইল। যষ্টি হস্তে অন্ধ ভিক্ষুক দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত নদী পার হইয়া কত রাজ্যে গেল; বঙ্গাল, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মানবের প্রব্রজ্যা শেষ হইল না।

মানব একবার যে ভুল করিয়াছিল তাহা আর দ্বিতীয়বার করিল না, কাহাকেও নিজের পরিচয় দিল না। এখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বেতসগ্রামে ফিরিয়া আসা। সে সসংকোচে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করিত—ভাই, বেতসগ্রাম কত দূর?' কিন্তু বেতসগ্রামের উদ্দেশ কেহ দিতে পারিত না। অন্ধ ভিক্ষুককে অনেকেই দয়া করিত; কেহ অন্ন দিত, কেহ ছিন্ন কন্থা দান করিত, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান কেহ দিতে পারিত না। মানব অধিক প্রশ্ন করিতেও সাহস করিত না। কি জানি কেহ যদি কিছু সন্দেহ করে!

এইভাবে বিশ বৎসর কাটিয়াছে। ভাগীরথী যে কতবার

* গোপা বেদেনীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মরিয়াছিল।

মানব পারাপার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তি কঙ্কগ্রামভুক্তি, সর্বত্র সে বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান পায় নাই।

তারপর একদিন নদীতটে বজ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বজ্র তাহাকে নিজ অন্নের ভাগ দিল, বেতসগ্রামের পথ দেখাইয়া দিল—

বিশ বছর পরে রঙ্গনার নিকট মানবের শপথ উদ্‌যাপন হইল।

রঙ্গনা এ কাহিনী পূর্বে শুনিয়াছিল, দ্বিতীয়বার শুনিয়া তাহার চোখে আবার অশ্রুর নীরব ধারা নামিল। কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না; চারিজনে একসঙ্গে কাঁদিল।

পরিশিষ্ট

পরদিন বজ্র চাতক ঠাকুরের দেহ মৌরীর তীরে দাহ করিল। শুদ্ধ শান্ত নিরীহ ঠাকুরের দেহ ভস্ম হইয়া গৌড়-বঙ্গের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

বাকি দেহগুলি মৌরীর জলে বিসর্জন দিতে হইল। সকলকে দাহ করিবার মত ইন্ধন নাই।

তারপর তাহাদের নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই; পুরাতন রথের যে চক্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহাই সংস্কৃত হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই পথ, সেই রথ। পুরাতনের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইল না।

দস্যুর ভয়ে যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ভগ্নাবশেষ গ্রামের অবস্থা দেখিয়া অধিকাংশই আবার চলিয়া গেল। দুই চারিজন রহিল।

বজ্র পুরাতন গৃহে ভিত্তি পরিষ্কার করিয়া আবার কুটীর বাঁধিল। পূর্বে দুইজনের উপযোগী কুটীর ছিল, এখন চারি-জনের উপযোগী কুটীর হইল। রঙ্গনা নদী হইতে জল আনিয়া মাটিতে ঢালিয়া কাদা করিল, অন্ধ মানব পা দিয়া সেই কাদা দলিয়া পিণ্ড করিল; গুঞ্জা বেতসবন হইতে বেতের চঞ্চারি কাটিয়া আনিয়া দিল। সকলে মিলিয়া কুটীর নির্মাণ করিল।

বর্ষা নামিল। ধান্য ও ইক্ষুর ক্ষেত্র আর্দ্র হইয়া নূতন শস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কে বপন করিবে? বীজ কোথায়? গুঞ্জা অতি যত্নে কয়েক মুঠি ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্র তাহাই ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। যে কয়টি গাভী বাথানে অবশিষ্ট আছে তাহাদের দুগ্ধই এখন এই কয়টি প্রাণীর প্রধান আহার্য-পানীয়।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ আসিল। ধানের শীষ্ লক্ লক্ করিয়া বাড়িতে লাগিল। ইক্ষু ক্ষেত্রে পুরাতন মূল হইতে আপনি অঙ্কুর বাহির হইল।

বজ্র বনে গিয়া হরিণ ময়ূর শিকার করিয়া আনে; সুযোগ পাইলে গুঞ্জা তাহার সঙ্গে যায়। রঙ্গনা আর মানব কুটীর-দেহলিতে হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া থাকে। মানব রঙ্গনার মুখে অঙ্গুলি বুলাইয়া অনুভব করে, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

কর্মহীন মধ্যাহ্নে বজ্র বেতসকুঞ্জে গিয়া একাকী শুইয়া থাকে; অতীতের কথা ভাবে—। কি বিচিত্র এই জীবন! কখনও নিষ্কম্প নিস্তরঙ্গ, কখনও উত্তাল তরঙ্গসংকুল।...কুহু এখন কী করিতেছে?...রাণী শিখরিণীর কি পরিণাম হইল?...বটেশ্বর ও বিম্বাধর কি সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিবে?...আর্য শীলভদ্র ও বন্ধু মণিপদ্ম কি এতদিনে নালন্দায় পৌঁছিয়াছেন?...তাহার দিবাস্বপ্ন শেষ হইতে পাইত না। গুঞ্জা আসিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত; গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিত—'আমাদের চেয়ে সুখী আর কি কেউ আছে?'

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। পথ এখনও শেষ হয় নাই। হে চির-সারথি, যে-পথে তোমার রথ লইয়া চলিয়াছ কোথায় কি তাহার শেষ আছে?

সমাপ্ত

মালদহের গম্ভীরা

শ্রীকালীপদ লাহিড়ী

মালদহের গম্ভীরা উৎসব চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে কিংবা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ ক'রে তাতে শিবপূজার ব্যবস্থা করা হয়। মণ্ডপটী প্রাচীনকালে পদ্ম দ্বারা সজ্জিত করা হত এবং পরবর্ত্তী কালে পদ্মের অভাবে কাগজের পদ্মদ্বারা গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভা সম্পাদন করা হত। ঝাড় লণ্ঠন এবং নানাপ্রকার ছবি দ্বারা মণ্ডপের উপরিভাগ সজ্জিত করা হত এবং দর্শকদের আদর অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ছবিগুলির মধ্যে দেশীয় পটুয়াদের পটুয়াশিল্পের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যেত। বর্ত্তমানে মণ্ডপসজ্জার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, এখন গম্ভীরা মণ্ডপ ইলেকট্রিক বাতি, গ্যাসের আলো দ্বারা আলোকিত করা হয় এবং এর সাজসজ্জাও অতি সাধারণ ধরণের।

গৌড়, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ২য় ধর্ম্মপাল দেবের ও গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্বকালে চণ্ডীমণ্ডপ গৃহ বিশেষকে গম্ভারি বা গম্ভীরা বলা হত। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গম্ভীরা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বৰ্দ্ধমান জেলায় বাবা ঈশানেশ্বর দেবের গাজনের বন্দনায় গম্ভীরা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তা ছাড়া উৎকলের শিব-বন্দনায় গম্ভীরা শব্দের উল্লেখ আছে। শিবের অপর নাম গম্ভীর এবং এই শব্দ হতে গম্ভীরা শব্দের উৎপত্তি।

গম্ভীরা উৎসবের ভৌগলিক বিবরণ পর্য্যালোচনা করলে প্রাচীন ধর্ম্ম-স্রোতের গতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা দরকার। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর পূর্ব্ব ভাগে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে গম্ভীরা, অনুষ্ঠিত হত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে এককালে ঐ সকল অধিবাসীদের অনেকেই পদ্মানদীর পূর্ব্বভাগে বাস করত। মেদিনীপুর, বীরভূম, বৰ্দ্ধমান, হুগলী, ২৪পরগণা, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলাতে গম্ভীরা উৎসব গাজন নামে অভিহিত হয়। এই সকলের মধ্যে মালদার গম্ভীরা, তারকেশ্বরের গাজন ও পূর্ব্ববঙ্গের নীল পূজা উৎসবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎকলে এই উৎসবকে "সাহীযাত্রা" বলা হয়। তিব্বতে লামারা বিবিধ জীবের মুখোস পরিধান করে গম্ভীরার অনুরূপ অনুষ্ঠান করে। রামাই পণ্ডিত বর্ণিত "বনপাঠ" ও পারিন্ত উৎসব গম্ভীরার সাদৃশ্য বহন করত। তাছাড়া ইউরোপ, আফ্রিকা, ব্যাবিলন, গ্রীস ও মিশরদেশে পুরাকালে এইপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। গ্রীসদেশে এই উৎসবকে "ফেলিফোরিয়া" উৎসব বলা হ'ত এবং বেকস্‌দেবের পুত্র প্রায়েপ্‌স্‌ দেবের সময় ঐ প্রকার উৎসবে পথের পাশে শিবলিঙ্গ মূর্তি শোভা পেত। মিশর দেশেও "আসীরিস্‌" দেবতা ও বৃষবাহনের যে উৎসব হ'ত তা গম্ভীরার অনুরূপ। মহাভারতে শিবপূজা ও উৎসবে গম্ভীরার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ আছে যে—শিব পাশুপত অস্ত্রদান কালে কিরাত বেশ ধারণ করেন এবং জটাভস্মাদিবিশিষ্ট সন্ন্যাসীগণ শিবদীক্ষা লাভ ক'রে বাদ্যধ্বনি দ্বারা শিবপূজা ও উৎসব করতেন। চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিউএন্‌থ্‌সাঙ্গ লিখিত বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। তাঁরা বৌদ্ধতান্ত্রিকতা-মূলক যে সকল উৎসব ও শোভাযাত্রা দর্শন করেন, তা হতে গম্ভীরার ক্রমবিকাশের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে গম্ভীরা উৎসবের ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈদিকযুগে দেবতার আরাধনা, পূজা বা যজ্ঞাদি কালের উৎসবে নৃত্যগীত ও বাদ্যাদিসহ অনুষ্ঠান জটিলতাপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বত্র আড়ম্বর-প্রিয়তা দেখা দেয়। তার মধ্যে গম্ভীরার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হিন্দুযুগের অবসানকালে বৌদ্ধপ্রভাব কাল আরম্ভ হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শাখা দ্বারা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল তাতেই গম্ভীরা উৎসবের অঙ্কুর পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ উৎসবে গম্ভীরার ন্যায় নৃত্যগীতাদির উল্লেখ রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণে জানা যায়। বৌদ্ধদের ধর্ম্মপূজা হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধমতের মূলতঃ শূন্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মরাজ ক্রমে শিবের মধ্যে বিলীন হয়। ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি নামক পুস্তকে আদ্যার সহিত শিবের বিবাহ অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধ আদ্যাচণ্ডিকা দুর্গারূপে মহেশের বামে বসেন হরগৌরীরূপে। এই সময় হতে শিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হয়। অবলোকিতেশ্বর ও লোকেশ্বর প্রভৃতি বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি শিবমূর্ত্তির মত ছিল এবং লোকে একই দেবতা ব'লে গণ্য করত। মালদা জেলায় অবস্থিত রামাবতী (বর্ত্তমান অমৃতি) ও গৌড়ে শৈবধর্ম্ম উৎকর্ষতালাভ করে। সেই রামাবতী বা অমৃতি নামক স্থানে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধরাজগণের তাম্রশাসনেও শৈব প্রভাবের বহু পরিচয় উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিক যুগের শেষে পৌরাণিক যুগের আবির্ভাব হয়, কিন্তু শিবপূজা ও শৈবদের আবির্ভাব বৈদিকযুগা-বসানের পূর্ব্বেই হয়েছিল। প্রমাণ পাওয়া যায় যে লঙ্কেশ্বর রাবণ, বান, কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ বৈদিকাচারী হ'লেও শৈব ছিলেন এবং গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ও পঞ্চনদের শিবিস্থানে শিবপূজা ও শিবোৎসব দর্শন করেন। রাজা অশোক প্রথমে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৌর্য্য বংশেও শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল—তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—কারণ কদ-ফিস্‌ নিজে শিবপূজা করতেন। মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে শিবশ্রী শিবস্কন্দ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শক রাজগণের সময় ও রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত শৈব ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায়। এমন কি

শঙ্করাচার্য্যও শৈবধর্ম্ম প্রচারের আজ্ঞা প্রদান করেন। রুদ্রযামলের মতে বশিষ্ঠদেব তারাদেবীর মূর্ত্তি চীনদেশ থেকে এনেছিলেন। কুব্জিকাতন্ত্রে এর প্রমাণ আছে এবং এই মূর্ত্তি কালী মূর্ত্তির অনুরূপ। বৌদ্ধগণ অনুষ্ঠিত এই তারাদেবীর উৎসব গম্ভীরা উৎসবের অনুরূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ-শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তবংশের রাজা সমুদ্রগুপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাভারত-বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুরূপ ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত ও 'অবভৃথ' স্নানোৎসব গম্ভীরায় অনুষ্ঠিত নদী স্নানাদির ক্ষীণ চিহ্ন বলে প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় শৈবপ্রভাব বর্ত্তমান ছিল এবং মুদ্রায় শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই সময় হ'তে প্রাচীন যুগের পূজা, উৎসব ও দেবতা-মূর্ত্তিসমূহ হিন্দু ধর্ম্মাভিমুখী হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখ বা অষ্টমী তিথিতে সার্ব্বজনীন বৌদ্ধ উৎসব সময়ে সুসজ্জিত আলোকমালায় পরিশোভিত রথস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তিকে উৎসবমণ্ডপে নৃত্যগীত বাদ্য সহকারে আনা হ'ত এবং এই উপলক্ষে যে প্রকার ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শন করা হ'ত তা গম্ভীরার অনুরূপ। শ্রীহর্ষদেবের চৈত্রোৎসব ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে কান্যকুব্জের এই চৈত্রোৎসব গম্ভীরা বা গাজনের ক্রমবিকাশে সাহায্য করেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ও পালবংশ-নৃপতিদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিষ্পন্দ হয়ে আসে এবং শৈবধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। সেই সময় হ'তে শিবশক্তি-পূজা তান্ত্রিক ভাবময় হ'য়ে উঠে। এই তান্ত্রিক ভাবময় মহাযান ধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম একত্র বা পৃথকভাবে তান্ত্রিকদেবগণের পূজা উৎসবের প্রবর্ত্তন করেছিল এবং এই তান্ত্রিক যুগই প্রধানতঃ গম্ভীরার ক্রমবিকাশে সাহায্য করে। রামাই পণ্ডিত মৃত মহাযান ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে যে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন তাতে হিন্দুর শিব, দুর্গা ও অন্যান্য দেবতাগণকে স্থান দিতে হয়েছিল। শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি নামক পুস্তকে গাজনের যে সকল বিধি নিবদ্ধ আছে তাহাই গম্ভীরার বিধি ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে গম্ভীরার আধুনিক রূপলাভ রামাই পণ্ডিতের সময় হ'তে আরম্ভ হয়েছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময় শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং তিনি শৈবধর্ম্ম প্রচারের আজ্ঞা প্রদান করেন।

গোপালদেবের সময়ও শৈবধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায়। তার প্রমাণ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দা নামক গ্রামের সন্নিকটস্থ একটি শিবালয়ের প্রস্তরফলকে গোপালদেবের নাম উৎকীর্ণ আছে। ধর্ম্মপাল গয়াতে মহাবোধিবৃক্ষের নিকটে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেবের সময়ে গৌড়ে শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি স্বয়ং সহস্র শিবায়তন সংস্থাপন ক'রে পাশুপত মতের প্রচার করেন। তখন শিবালয়ে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নৃত্যবাদ্যাদিসহ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত এবং ঐ সকল উৎসবে সকল ধর্ম্মের লোক যোগদান করত। এইরূপে ক্রমে গম্ভীরা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করে। পাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় এদেশে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীগণের প্রাধান্যে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তারলাভ করে। এইরূপে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা শৈবধর্ম্মে বিলীন হবার সুযোগ লাভ করে। বল্লালসেনের রাজত্বকা[ল] গৌড়বঙ্গের হিন্দু সমাজ নূতন রূপ ধারণ করে। তিনি প্রথমে শৈব পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর প্রদ[ত্ত] তাম্রশাসনগুলির প্রথমে মহাদেবের বন্দনা শ্লোক ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমা[ন] চণ্ডীপুর বল্লালসেনের সময় গৌড়নগর নামে খ্যাত ছিল এবং উ[ত্তরে] দ্বারকাবাসিনী ও দক্ষিণে পাতালচণ্ডী পর্য্যন্ত তৎকালে গৌড় নগরের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। অনিরুদ্ধ ভট্ট যখন বল্লালসেনের গুরু হন, তখ[ন] বল্লালসেনের ধর্ম্মমত শৈবমত অবলম্বন করেছিল। এই সময় প্রতিষ্ঠি[ত] সমাজ যে শিবের উৎসব করত তাহাই বর্ত্তমান কালের শিবের গাজন বা গম্ভীরা নামে খ্যাত! বল্লালসেনের সময় যখন নূতন হিন্দু সমাজ গঠি[ত] হয় তখন ধর্ম্মের গাজন নীচজনভোগ্য হ'য়ে পড়ে এবং শিবের গাজন বা গম্ভীরা হিন্দুগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসব মধ্যে পরিগণিত হয়! এই উৎসবে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, নাগর, ধানুক, চাঁই ও রাজবংশী প্রভৃতি জাতির উৎসাহের আধিক্য দেখা যেত—কিন্তু বর্ত্তমানে গম্ভীরা ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। উৎকলরাজ ললিতকেশরীর সময়ও শৈবধর্ম্মে প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়দেশে বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিকতার অবাধ প্রসার ছিল। এই সময় রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণের সৃষ্টি-পত্তন হ'তে আরম্ভ করে সমস্ত ব্যাপারই গম্ভীরা, গাজন ও ধর্ম্মগাজনরূপে গীত হয়। তা ছাড়া রামাই, সেতাই, নীলাই ও কংসাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ধর্ম্মপূজা প্রচারে ও গৌড়বঙ্গে গাজন ও গম্ভীরার যে পূর্ণ বিকাশ হয়েছে, ধর্ম্মপুরাণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-উৎসব ধর্ম্মের গাজনের প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান আধুনিক গম্ভীরা বা গাজনে বিদ্যমান আছে।

গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠান দিবসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন। এই উৎসব প্রধানতঃ চারিদিবসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যহ শিবাদি দেবতার পূজার ব্যবস্থা থাকে। প্রথম দিবসকে ঘট-ভরা বলা হয়, কারণ এইদিনে ঘট স্থাপনা ক'রে গম্ভীরামণ্ডপে শিব পূজা করা হয়, দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ছোট-তামাসা দিনে ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যসহ রাত্রিবেলা বিভিন্ন নৃত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ বড় তামাসা দিনে অতি শুদ্ধাচারে শিবভক্তগণ কর্ত্তৃক কাঁটা ভাঙ্গা বা ফুল-ভাঙ্গা পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনে শিবভক্ত বা বালাভক্তগণ উপবাসী ও সংযমী হয়ে গম্ভীরা মণ্ডপে রক্ষিত কাঁটাগাছ বক্ষে ধারণ করে ও শিব স্তবাদি পাঠ করে। পরে তাহারা ঐ কণ্টক শয্যায় দেহ লুণ্ঠিত করে। ময়ূরভট্ট বিরচিত ধর্ম্মপুরাণে রামাইপণ্ডিত প্রচারিত ধর্ম্মের গাজন উৎসবেও অনুরূপ কণ্টক শয্যার উল্লেখ আছে। ঐ দিবস বৈকালে বাণ-ফোঁড়া পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিবভক্তগণ লৌহ-নির্ম্মিত ত্রিশূলের সূক্ষ্মভাগ কোমরে বিদ্ধ করে এবং তাতে তৈলসিক্ত বস্ত্র জড়ায়। পরে উহা প্রজ্জ্বলিত ক'রে মধ্যে মধ্যে তাতে ধুনা নিক্ষেপ দ্বারা দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত করে এবং বাদ্যাদিসহ এক গম্ভীরা হ'তে অন্য গম্ভীরায় নৃত্যাদি প্রদর্শন করে বেড়ায়। এই বাণবিদ্ধ অনুষ্ঠান ধর্ম্মপুরাণবর্ণি[ত] গৃহভরণ গাজনেও উল্লিখিত আছে। তিব্বতীয় সাহিত্যেও গম্ভীরা[র]

অনুরূপ নৃত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। এই বড় তামাসা দিনে নানাপ্রকার সং বাহির করা হয় এবং এই সং জেলেপাড়ার সং-এর অনুরূপ। এর উপকারিতা এই যে, সামাজিক দুর্নীতির বিষয় লোকসমক্ষে প্রচারিত হওয়ায় লোকে দুর্নীতি হ'তে দূরে থাকে। এই ভাবে এই প্রকার সং সমাজ-সংস্কৃতির দিক দিয়ে হিতকর ব'লে বিবেচিত হয়। এই সং দর্শনে সর্ব্বসমাজের লোকের উৎসাহের আধিক্য দেখা যায়। রাত্রিবেলা মণ্ডপে মুখোস পরিধান ক'রে চামুণ্ডা, কালী, নরসিং এবং নানা সাজে সজ্জিত হ'য়ে শিবদুর্গা, রাম লক্ষ্মণ, ঘোড়া, পৈরী প্রভৃতির নৃত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। এই নৃত্যে ঢাক, কাঁশি ও ঢোলের বাদ্যই প্রধান স্থান অধিকার করে এবং উৎসাহদানের জন্য পুরস্কার বিতরণ করে নৃত্যশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কালী, নরসিং প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির নৃত্যাদি প্রদর্শনকালে অপর ব্যক্তিগণ সম্মুখে ধুনচির ধূপ স্থাপন ক'রে তাকে শান্ত করে। এই প্রকার নৃত্য ও বাদ্য সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে "গম্ভীরা-পরিষদ" নৃত্য ও গীতশিল্পীদের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দানে উৎসাহিত করেন, এই উৎসবে শিবভক্তগণ কপালে সিন্দুর বিন্দু ধারণ করে কেহ বা মড়ার মাথার খুলি হস্তে ধারণ ক'রে বাদ্যসহ মশাল নৃত্য প্রদর্শন করে বেড়ায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বৈদিককাল হ'তে এই নৃত্য প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে যজ্ঞের শোভা সম্পাদন করেন। তাছাড়া পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতাগ্রন্থ, জ্ঞানসংহিতা, জৈনপুরাণ, মুণিসুব্রতপুরাণ, ঘনরামরচিত ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী রচিত ধর্ম্মমঙ্গল, কবিকঙ্কণের মঙ্গলচণ্ডী গীত, মালদার মাণিক দত্তের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ বিদ্যমান। চতুর্থ দিবসে গম্ভীরা মণ্ডপে শিবপূজা ব্যতীত নীল ও আহারা পূজার ব্যবস্থা করা হয় এবং রাত্রিবেলা গম্ভীরা গান অর্থাৎ "বোলবাহি" বা বোলাই আরম্ভ হয়। এই গানে মালদহের নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব সুর ব্যবহৃত হয়। গানের বিষয়বস্তুকে "মুদ্দা" বলা হয়। নাটকীয় ভঙ্গীতে অতি সাধারণ সাজে সজ্জিত হয়ে প্রথমে শিববন্দনা গায় এবং পরে অভিনয় আরম্ভ করে। এই উপলক্ষে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

এই গম্ভীরা গানে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বর্ত্তমান। এই উৎসবে "আলকাপ" নামে নানাপ্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশমূলক পালা গানও গীত হয়ে থাকে। নিজস্ব গম্ভীরা ছাড়া ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরাও আছে। গ্রামের মণ্ডলগণ গ্রাম্যসালিশীর সাহায্যে যে অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাজা জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি হতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ছত্রিশী গম্ভীরার ব্যয় সঙ্কুলান হয়। এই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরা দ্বারা পল্লীবাসীরা একতাবদ্ধ, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। গম্ভীরা গানের বার্ষিক বিবরণী-গানে সামাজিক দুর্নীতির নিন্দা করা হয় ব'লে সমাজ সংস্কৃতির দিক দিয়ে এর মূল্য অনেক। আবার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও গম্ভীরা গান একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাছাড়া সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে গম্ভীরার যথেষ্ট অবদান আছে। বৌদ্ধ, শৈব, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্য দিয়ে এবং গ্রীস ও মিশরাদি দেশে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সাহিত্য পুষ্ট হয়েছে। ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কালে সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়। গম্ভীরা উৎসবের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কবির কবিত্ব বিকাশ লাভ করে। এমন কি অনেক রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই গম্ভীরার মধ্য দিয়া আবির্ভূত হয়েছেন! সাহাপুরের কবি ৺হরিমোহন কুণ্ডু রচিত গান "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান" শীর্ষক গানে রামপ্রসাদের ন্যায় সাধকভাব, ভক্তি ও চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান। স্বর্গীয় বিনয়কুমার সরকার গম্ভীরা সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন "ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গীতকর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালা চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালী সভ্যতা ও বাঙ্গালী আদর্শ প্রস্তুত করবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা। প্রাচীন কবিদের মধ্যে ৺শরৎচন্দ্র দাস, মহম্মদ সুফী, ৺মৃত্যুঞ্জয় হালদার, ৺হরিমোহন কুণ্ডু, ডাঃ সতীশচন্দ্র গুপ্ত সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁদের মধ্যে মহঃ সুফী ও ডাঃ সতীশচন্দ্র গুপ্ত বর্তমানে জীবিত আছেন। সুখের বিষয় এই যে পল্লীর সাহিত্যশিল্প নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মধ্যে যে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি প্রচার এবং বিশ্বের লোক-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত ভাবের আদানপ্রদান ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১৩৫৮ সালে কলিকাতায় "গম্ভীরা পরিষদ" নামে একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং মালদহ জেলায় তাহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিশু-শিক্ষা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

(১)

"বাঁকে করে তারা কমলালেবু ফেরি করত পাড়ায় পাড়ায়। বিকাশ বলে চল্ল,"—সেদিন এমনি এক ফেরিওয়ালা আমাদের পাড়ায় লেবু বেচতে এসেছিল। পাড়ার ছেলেরা তাকে ঘিরে লেবুর দর করছে—কেউ বা হাতে নিয়ে দেখছে, কখন কখন পাশের লোককেও দেখাচ্ছে। মিনিট পনেরোর পর তারা লেবুওয়ালাকে ফিরিয়ে দেয়, লেবুর দাম বেশী এই অজুহাতে। দৃষ্টির অন্তরালে ফেরিওয়ালা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা সবাই বল্লে, "চল্ কমলা খাবি চল্।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে তারা যখন বল্লে, "এ হাতের গুণের রোজগার," তখন ঘৃণায় মনটা কুঁচকে গিয়েছিল। কি উত্তর দেব ভাবছি এমন সময় মা ডাকলেন, তাই চলে আসতে হল। একদিক থেকে বাঁচলাম বটে, কিন্তু অন্যদিকে ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে বেদম প্রহার করতে লাগলেন—কেন, কিসের জন্য কিছুই জানিনা। তাঁর টুকরো টুকরো কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে লেবুচুরির অপরাধে আমি অপরাধী। আপত্তি করলাম আমি; সুফল কিছুই হল না, বরং উল্টো ফলই হল; অপযশ নিলাম মিথ্যাবাদী।

কপালটা সেদিন খারাপ ছিল খুবই আমার। দিনটা ছিল রবিবার, বাবা ঘরে ছিলেন। মার তর্জন গর্জনে তিনি ঘরের বাহিরে এসে মার সঙ্গে যোগ দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে আমাকে দলাই-মলাইয়ের পর তাঁরা ছেড়ে দিলেন। তখন আমার ভিতরে ক্রোধানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঠিক করলাম, যে মিথ্যা অজুহাতে আজ প্রহৃত হলাম, আমি তাই হব।

সামনে ঝুলন পূর্ণিমা; পাড়ায় বেশ জাঁক করেই ঝুলন পূজা হয়। সেই সময়ে চাঁদা করে নানা পুতুল কেনা হয় সাজাবার জন্য। এবারকার পুতুল কেনার ভার আমার ও আলমের উপর পড়ল। পুতুল কিনতে গেলাম। সন্তর্পণে, সকলের সজাগ চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বেশ একটা বড় খেলনা আমি ঝোলার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছি; এমন সময় দোকানদার নীচে নেমে আলমকে বল্লে, "পকেটের মধ্যে যে পুতুলটা রাখলে, বার করে দাও।" আলম বিনা বাক্যব্যয়ে পুতুলটা বার করে দিল। দোকানদার তারপর বল্লে, "তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তাই আর মারধর করলাম না।" কথাটা লাগল, কে যেন বিছুটি গায়ে দিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি ঝোলাটা তুলে বল্লাম, এটার দাম কত? দোকানদার জিনিষটা কি জানতে চাইল—মূল্য বল্ল;—ন্যায্য দাম দিয়ে আমি চলে এলাম। কান্নায় তখন বুক ফেটে যাচ্ছে; মনে মনে বল্লাম—কি করতে যাচ্ছিলাম, আমরা না ভদ্রলোকের ছেলে!

একটু থেমে আবার বিকাশ বল্লে, "দেখলেন; আমি চোর হচ্ছিলাম; আমার আপনজন আমাকে চোর করছিল।"

বিকাশের এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি, কেননা আত্মীয়স্বজনরা কেউ চান না যে, তাঁদের সন্তান খারাপ হয়। তবে শিক্ষা দিতে না জানার দরুণই, নিজেদের অজ্ঞাতসারে সন্তানদের খারাপ করে ফেলেন। তবে আজকাল আর তত ভীত হওয়ার কারণ নেই।

তখন একটা সময় ছিল যখন সকলে মনে করত—কেবলমাত্র পঠন, লিখন ও অঙ্কবিদ্যাই প্রকৃত শিক্ষা। আজকাল সর্ব্বসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে মাত্র পঠন, লিখন ও অঙ্কবিদ্যায় শিক্ষিত করাকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর দৈহিক ও মানসিক সকল গুণাবলী ক্রমশঃ সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হওয়ায় সহায়তা করা। জন্মের পর হতেই দিনে দিনে বয়সের অগ্রগতি আরম্ভ, মাস ও বৎসরের সহায়তায় এর প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এই বয়সকেই প্রকৃত বয়স নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ কতদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে তারই সময় নির্ণয় প্রকৃত বয়সের দ্বারা। প্রকৃত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মন সামঞ্জস্য রেখে পাকাপোক্তভাবে পূর্ণতালাভের পর বিকশিত হবে এবং পরস্পরের সম্বন্ধ থাকবে, এমন কোন অলঙ্ঘনীয় সূত্র নেই। শিশুর দৈহিক বা প্রকৃত (Chronological) বয়স ব্যতীতও আর অনেক বয়স আছে—যেমন মনোবয়স (Mental age), সামাজিক বয়স (Social age), প্রমোভজ বয়স (emotional age), ইত্যাদি। প্রায়তঃ দেখা যায় যে ক্রমশঃ বয়ঃসন্ধির দিকে অগ্রসর হলেও শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অপ্রতুল। এমনও দেখা যায় যে দৈহিক স্বাস্থ্য নিটোল সুন্দর, বুদ্ধি অতীব প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রমোভজ অসাম্য, সমাজীয় অপরিণত। সুস্থ ও সতেজ শিশু তাকেই বলা যায়—যার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রমোভজ প্রভৃতির বৃদ্ধি সুসদৃশ, যার বুদ্ধি, মেজাজ ও অন্যান্য গুণাবলী এমনই সুন্দরভাবে গঠিত যে উত্তরকালে বালক পরিণত নরে এবং তাহারই জীবনযুদ্ধে নির্ভরযোগ্যা ও সহকারিণীরূপে বালিকার রূপান্তরিত নারীতে। এ কেবল সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমেই।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুর শিক্ষাদান ব্যয়-সাপেক্ষ এ ধারণা অমূলক। পূর্ব্বে যেমন লোকের ধারণা ছিল যে "বিশ্বশ্রী" হতে গেলে বহু অর্থের প্রয়োজন—দুধ, ঘি, মাছ, মাংস ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য, অতএব ও কেবল অর্থবানদের সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে কেবলমাত্র ভাতের ফ্যান শাকসবজি প্রভৃতি আহার করে "বিশ্বশ্রী" উপাধি পাওয়ার পর সর্ব্বসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা বিতাড়িত হয়েছে। ঠিক তেমনি সকলে আজ বুঝতে পেরেছে, শিশুর

লালনপালনের জন্য অর্থের যত না প্রয়োজন, তার চেয়ে প্রয়োজন বেশী শিশুর প্রকৃত শিক্ষা।

শিশুর প্রকৃতশিক্ষা সম্ভব কেবল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। ইদানীন্তনও বেশীরভাগ বিদ্যালয়ই তথাকথিত ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অনুরাগী শিক্ষাবাদের উপর নীরব বিশ্বাসে পুরুষানুক্রমিক কিংবদন্তীক্রমে অর্পিত (Traditional) পথে পরিচালিত। দেশের প্রতিটি অধিবাসীর শিক্ষার সমস্যার সমাধানের জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব জানা প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা রাখা উচিত।

অনেকেই মনে করেন যে বি.এ এম.এ ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরাই বুঝি প্রকৃত শিক্ষিত। এ ধারণা ভ্রান্ত। যে শিক্ষার সহায়তায় মানবের চরিত্রবল গঠিত হয় না, জীবনে নিজের উপর নির্ভর করতে পারে না, —যার সহায়তায় সহজাতপ্রবৃত্তি পরিপুষ্টির পর পরিস্ফুট হয় না; সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়, "যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছা-শক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি এবং প্রতিকূল অবস্থার অপসারণ।"

মোটামুটিভাবে, শিক্ষা বলতে আমরা যথা-প্রয়োজনীয় মানসিক শিক্ষাই বুঝি। শিশুকে কয়েক বছর একটা দারুণ নিয়মমত গড়ন-লেটনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে—অর্থাৎ সত্যকার শিক্ষা দিয়ে নয়, অযথাভাবে তার মস্তিষ্ককে পীড়ন করে—আমরা মনে করি তার মানসিক উন্নতির জন্য সব কর্ত্তব্য করা হল। বস্তুত শিক্ষা আদৌ ওরকম নয়।" শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, "মনের প্রকৃত শিক্ষা—যা তাকে উন্নততর জীবনের জন্য তৈরী করে তুলবে, পাঁচটি প্রধান ধারা নিয়ে। সাধারণতঃ এরা আসে ক্রমপরম্পরায়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তারা আগে পরে কিম্বা সব একত্রেও আসতে পারে। এই পাঁচটি ধারা সংক্ষেপে ঃ

১। একাগ্রতার শক্তি, মনঃসংযোগের সামর্থ্য বৃদ্ধি।

২। প্রসার, ব্যাপৃতি, বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্যদায়ক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনে।

৩। একটা মূল ভাব বা উচ্চতর আদর্শ কিম্বা একটা পরম জ্যোতির্ম্ময় লক্ষ্য যা আমাদের দিশারী হতে পারে, তাকে ঘিরে সব চিন্তা সুসংবদ্ধ করা।

৪। চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ, অবাঞ্ছনীয় চিন্তাবলী বর্জন, যাতে শেষে ভাবতে পারি ঠিক যা চাই এবং যখন চাই।

৫। মানসিক নিস্তব্ধতা, পূর্ণ প্রশান্তি, সত্তার উজ্জ্বললোক সব হতে আগত প্রেরণা ধারণে ক্রমবর্দ্ধমান ধারণা-সামর্থ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার এই পঞ্চধারা কি রকমে অনুসরণ করে চলতে হবে, এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা প্রধানতঃ মনের বিষয়। শিক্ষার দৈহিক ভিত্তি অস্বীকার করা চলে না; কারণ দেহ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মন বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি মন বাদ দিয়ে দেহ অক্রিয়। এই জন্য দেহ ও মনকে একত্রিত করে জ্ঞানার্জনের জন্য দেহ মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন। কিন্তু মনের ক্রিয়াকে সাহায্য দিতে হ'লে দেহ-বিদ্যা ফলপ্রসূ নয়। তাই শিক্ষা প্রধানতঃ মানসিক বলেই পরিচিত। বলতে গেলে মনই আমাদের সব। জ্ঞান, অজ্ঞান মনের দুই অবস্থা। বন্ধন, মুক্তি, সাধু ও অসাধু সবই মনে। মনেই পাপী, আবার মনেই পুণ্যবান। এই কারণেই মনের বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। মন পরিস্ফুট হয় আনন্দের মধ্য দিয়ে। এই হেতু শিক্ষা এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যেখানে আনন্দের অভাব নেই; ফলে মন বিকশিত হয়, শিশুর প্রবৃত্তি সদাভিমুখী হয়, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে সঙ্গাভিলাষী হয়। গভীর স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতির সাহায্যেই অনুসঙ্গ স্থাপন সহজসাধ্য। এইজন্য আনন্দদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা সহজ ও পাকা হয়; অন্যধারে নিরানন্দদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা-প্রচেষ্টা বৃথা হয়, কারণ অপ্রীতির মাধ্যমে অনুষঙ্গ স্থাপন দুঃসাধ্য।

যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের ভিতর অনুষঙ্গের অভাব, সেখানে শিক্ষক কেবল বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতামাত্র। পরিণামে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অন্তরে বিশ্বাস, বিনয়নম্র আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকে না যেমন, তেমনই ছাত্রেরও কোন প্রকার চিত্তোন্নতি হতে পারে না। শিক্ষা এখানে নিরর্থক।

শিক্ষা নিষ্ফল হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ, শিশুদের হৃদয়ঙ্গম করায় শিক্ষকের অক্ষমতা। শিশুকে প্রকৃতভাবে অনুধাবন করার জন্য শিক্ষক ও শিশুর অন্তরঙ্গতা প্রয়োজনীয়। অন্তরঙ্গতার মাধ্যমেই শিক্ষক নিজের মনের সহায়তায় শিশুকে উপলব্ধি করতে পারেন, শিশুর মানসিক গঠন ও বিকাশের প্রতি নজর রাখতে পারবেন নিজেকে সহস্রধা বন্টন— অতি সহজে ছাত্রদের মধ্যে বিরাজ করতে পারবেন। এই সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রদের প্রয়োজন অনুসারে ভিন্নভাবে শিশুদের শিক্ষার সহায়তা করা সম্ভব। শিক্ষায় অন্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন—শিক্ষাশক্তি ও সময়ের সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য। কেবল উপদেশেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ।

ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের জন্যই শিক্ষকের চরিত্র হওয়া প্রয়োজন "জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, দীপ্ত; যা ছাত্রের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শের" মত অবস্থিত। এ কেবল আশা করা যায় প্রকৃত শিক্ষকের কাছেই। বিবেক বাণী তাই—"তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি নিজেকে ছাত্রদের জন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্রধা করতে পারেন। আকাশের এক চন্দ্র যেমন নদীর সহস্র তরঙ্গে সহস্র বিম্বিতরূপে প্রতিফলিত হয়— শিক্ষককেও ছাত্রদের মধ্যে তেমনি ভাবে বিম্বিত হতে হবে। তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি একেবারে ছাত্রদের স্তরে নেমে আসতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে ছাত্রের আত্মাকে একীভূত করে তাঁ'রই মানস দৃষ্টি দিয়ে সব কিছুই দেখেন এবং উপলব্ধি করেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ, অন্যে নহে।"

প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্যই অনুষঙ্গ অন্তরঙ্গতা প্রয়োজনীয়; ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা তাই অপরিত্যাজ্য। শিক্ষকের ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনা করেই শিক্ষাদান করা উচিত। একত্রে অভিধানপুষ্ট ভাষায় তথ্যের ব্যাখ্যা অথবা শিক্ষাদানের দ্বারা বিদ্যা

জাহির, কিম্বা শিক্ষার জন্য ছাত্রদের উপর জোরজবরদস্তি করলেও শিক্ষার্থীবৃন্দ কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ শিক্ষাদান এখানে ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতার সীমাতিরিক্ত। শিশুদের গ্রাহ্য শক্তির আলোচনার্থ এক ইহুদি শিক্ষক বলেছেন যে বালকের মন "সংকীর্ণ-কণ্ঠ বোতলে"র তুল্য। প্রভূত শিক্ষা শিশুরা গ্রহণ করতে পারে যদি ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু একত্রে অধিক পরিমাণে বষণ করলে শিক্ষাদানের ফল অপচয় এবং ধ্বংস। শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যানুযায়ী না হয় তা' হলে সে শিক্ষা, অশিক্ষা। অখাদ্য যেমন উদরে অপথ্যের ফলে পূতিগন্ধের সৃষ্টি ও স্বাস্থ্যের হানি করে, তেমনি অশিক্ষার ফলে অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ ও মানবজাতির হানি ঘটায়। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষাদানপদ্ধতির জ্ঞানার্জন এবং তৎপ্রয়োগে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করা উচিত।

অনেকেই বলেন যে গতানুগতিক বিদ্যালয়সমূহে সেরূপ প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না যেমন, তেমনি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বহু শিক্ষক এর উত্তরে বলেন যে—প্রথমতঃ দৈনিক পাঁচ ছয় ঘণ্টা ক্লাশ নেওয়ার পর অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করেন তাই ধৈর্য্য ও মেজাজ থাকে না; দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে বেতন পান তাতে সংসার প্রতিপালন সুষ্ঠুভাবে অসাধ্য।

শিক্ষকদের এ অভিযোগ এড়ান দুঃসাধ্য। যুগপৎ পাঁচ ছয় ঘণ্টা ক্লাশ নেওয়ার পর তাঁরা ক্লান্ত হন ঠিকই, কিন্তু মানসিক ভয় থাকে না। শিশুরা, অন্যধারে একত্রে পাঁচ ছয় ঘণ্টা পাঠের পর পরিশ্রান্ত হয় যেমন, তেমনই মানসিক ভয়ও বৃদ্ধি পায়। মানসিক ভয়ের সৃষ্টি—শিক্ষকদের অমানুষিক শাসন, ছাত্রদের সংশোধন অভিলাষে। প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সুখ-অসুখের প্রতি নজর রাখা শিক্ষকদের কর্ত্তব্য। অনুষঙ্গ স্থাপনে তা'হলে অসুবিধা হবে না।

শিক্ষকতাকে অর্থ উপার্জ্জনের কারখানা মনে করা উচিত নয়। শিক্ষক-বৃন্দ সকলেই জ্ঞানী বা গুণী। যদি অর্থ না থাকে তা' হলে গুণ দ্বারা অর্থউপার্জ্জন করা যায় না। কিন্তু অর্থবানকে জ্ঞান ও গুণ দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জনে সাহায্য করা যায়। এই জন্যই গুণী ব্যক্তিরাই অর্থবানের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন। চাণক্য তাই বলেছেন,

"গুণাঃ ধনেন লভ্যন্তে ন ধনং লভ্যতে গুণৈঃ।
ধনী গুণবতাং সেব্যো ন গুণী ধনিনাং ক্বচিৎ।"

অর্থাৎ "ধন থাকিলেই গুণ লাভ করিতে পারা যায়—কিন্তু গুণের দ্বারা ধন পাওয়া সম্ভব নয়। গুণবান ধনীরই সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু ধনী গুণীর সেবা করিতেছে দেখিতে পাইবে না।"

শিক্ষকতা যখন পেশারূপে গ্রহণ করা হয়েছে তখন শিক্ষকদের জানা উচিত যে জীবনে তাঁদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই কারণেই পূর্ব্বে শিক্ষা দিতেন ঋষিরা, যাঁরা বাসনা, কামনা, আকাঙ্ক্ষার বহু উর্দ্ধে। অবশ্য এই সমস্ত ঋষিদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তু তখনকার রাষ্ট্রপরিচালক রাজা মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রদান করতেন। আশাকরি বর্ত্তমানের রাষ্ট্রপরিচালকবৃন্দ শিক্ষকদের প্রতি নজর দেবেন, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা লাভ করে তা' প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

শিক্ষকদের ত্যাগের অবশ্য একটা মূল্য আছে। ত্যাগের মাধ্যমেই শিক্ষক ও ছাত্রদের অন্তরঙ্গতা ও অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়। লোভ বা আকাঙ্ক্ষার জন্যই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রেমসূত্র ছিন্ন হয়। স্বামীজী বলেছেন—"অর্থ, মান বা যশের কাঙাল হইয়া অন্তরে কোন স্বার্থের ভাব পোষণ করিয়া শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্রতী হওয়া উচিত নহে। লাভ বা নামের আকাঙ্ক্ষারূপ কোন স্বার্থাভিসন্ধি থাকিলে তাহা শিক্ষার বাহনকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবে, প্রেমসূত্রকে ছিন্ন করিবে।"

শিক্ষকদের আবার অভিযোগ যে শিশুরা বিদ্যালয়-প্রবেশের পূর্ব্বেই উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, উদ্ধত, অসামাজিক, অভদ্র ও অপরাধপ্রবণ ইত্যাদি শেষে অপরাধী। শিক্ষকদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য নয়। শিশুর জন্মের সময় থেকেই "সু" ও "কু" দুই প্রবৃত্তিই থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের সাহায্যে অবস্থানুসারে এই দুই প্রবৃত্তিকে পরিচালিত বা অবদমিত করা হয়। প্রবৃত্তিদ্বয়ের পরিচালন বা অবদমনের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ পিতামাতার শিক্ষার দ্বারা। পিতামাতা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল সময়েই শিশুদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত! প্রহার, তিরস্কার, সোহাগ, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, উদ্বেগ প্রভৃতি সকল সময়েই পিতামাতা শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এই কারণেই পিতামাতার শিশু-শিক্ষার জ্ঞানার্জ্জন অপরিত্যজ্য। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পিতার অপেক্ষা মাতারই বেশী। জন্মের পর থেকেই প্রায় পাঁচ বছর পর্য্যন্ত শিশু মার কাছেই বেশী থাকে। এই কারণেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত মার দ্বারাই গ্রথিত হয়। শৈশবে শিশুকে উত্তমরূপে শিক্ষিত না করতে পারলে, অধিক বয়সে শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় না। যেমন "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন করলে উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হলে কিন্তু আর ভাল মাখন তোলা যায় না" তেমনই শৈশবের শিক্ষার পরিমাপের উপরই শিক্ষা নির্ভর করে।

সাধারণতঃ দধি মন্থন যেমন বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা সাধিত হয়, তেমনই মানবজাতির পিতার প্রাথমিক শিক্ষা নারীদের দ্বারাই সংঘটিত, এটা পূর্ব্বেই বলেছি। নারীদের দধিমন্থন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করতে হয়। অনভিজ্ঞার নিকট যেমন উত্তম মাখনের আশা অনুচিত, তেমনি অশিক্ষিত নারীদের নিকট সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষাদানের আশা করা অপ্রাসঙ্গিক। স্ত্রীশিক্ষা অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানবের প্রকৃষ্ট ভিত্তিপত্তন নারীদের দ্বারাই সম্ভব; তাই স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য্য।

স্ত্রীশিক্ষাদানের চেষ্টাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দান মনে করা উচিত নয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বহুপূর্ব্বেই আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন ছিল; প্রমাণস্বরূপ সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দময়ন্তী, খনা ও আর অনেক মহীয়সী রমণীর নাম উল্লেখ করা যায়। আজও অনেক

…রা বলেন যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারীরা বিধবা হবেন—স্ত্রীশিক্ষা ম্লেচ্ছ—…চাত্য শিক্ষার অনুকরণ মাত্র। এ সমস্ত অজ্ঞনারীদের বুঝিয়ে দেওয়া …যে স্ত্রীশিক্ষা ম্লেচ্ছ নয়, কিম্বা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ মাত্র নয়। …শ্চাত্য শিক্ষার বহু পূর্ব্বেই মনু বলেছেন, "কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষ-নীয়াতিযত্নতঃ।" অর্থাৎ পুত্রগণকেও যেমন যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া …য়, কন্যাগণকেও সেই ভাবে পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূল সমর্থনের জন্য অনেকে বলেন যে বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন পুত্ররাই হবে; অতএব পুত্রদের শিক্ষা উত্তমরূপে হওয়া উচিত। স্ত্রীশিক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই, তারা গৃহের গৃহিণী হবে মাত্র। নারীকে কেবলমাত্র প্রজনন-যন্ত্র মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মুখ্য সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়; বর্ত্তমান বংশধরদের ভয়াবহ দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হচ্ছে। তখন একটা সময় ছিল যখন জমিদার ধান বোঝাই গরুর গাড়ী গোলায় না তুলে প্রজাদের সুবিধার্থে কর্দ্দমাক্ত পথের উপর বিস্তৃত করে দিত। কিম্বা সামান্য সঙ্গতিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের "ম"বর্গকে (square) সঙ্গী করে দিনাতিপাতের পরও দু'বেলা অন্নের জন্য এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে হত না। এখন কিন্তু এটা আর সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের বংশধরদের আরও অনেক দুরূহ পথ অতিক্রম করতে হবে। এই কারণেই এখনই জীবনের প্রারম্ভেই তাদের জীবনপ্রয়াসের প্রস্তুতি আরম্ভ করা উচিত। আগামীকালের যুবক যুবতীর জীবন সার্থক হওয়ার সুযোগ অতি অল্পই, যদি তাদের মানসিক ও দৈহিক উভয়েরই গুণাবলী সর্ব্বতঃ ভাবে পরিস্ফুট না হয়। এই হেতু পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনার পূর্ব্বে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ আলোচনা অযৌক্তিক হবে না। প্রথমেই প্রকাশ করা উচিত যে কোন এক বিশেষ বৈজ্ঞানিকের মতবাদ উৎকৃষ্ট এবং অন্য সকল বৈজ্ঞানিকবৃন্দের মতবাদ নিকৃষ্ট—এ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। মতবাদের পার্থক্য অসম্ভব নয়, কিন্তু সকল বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য এক। যেমন দেশ, কাল, পাত্রের পার্থক্যের জন্য জলের বিভিন্ন নাম—বারি, পানি, ওয়াটার বা একোয়া, তেমনি দেশ, কাল ভেদে বৈজ্ঞানিকদের ভিন্ন ভিন্ন মত—উদ্দেশ্য কিন্তু সমান, প্রকৃষ্টভাবে শিশু-পালনীয় মতবাদের প্রকাশ ও প্রচার।

কবি

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

আমি যখন গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়ি তখন আমাদের শিক্ষক হয়ে এলেন বরদাবাবু। চল্লিশ বছর আগে বরদা-বাবুদের বাস ছিল আমাদের গ্রামে। বরদাবাবু মানুষ হয়েছিলেন কলকাতা শহরে। পাষাণকায়া রাজধানী ছেড়ে গ্রামে আসা এই তাঁর প্রথম। মল্লিকদের বাইরের বাড়ির দুখানা ঘরে বরদাবাবু এসে উঠলেন স্ত্রীকে নিয়ে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যে পৈতৃক-ভিটেয় একখানা শোবার ঘর আর একখানা রান্নাঘর তৈরি ক'রে বাস করতে লাগলেন সেখানে।

বরদাবাবুর বয়স বেশী নয়। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে তারুণ্যের দীপ্তি, চোখে স্বপ্নভরা দৃষ্টি। যেমন শান্ত স্বভাব, তেমনি মিষ্টি কথা। চমৎকার মানুষটি। অল্প দিনেই তিনি আমাদের অন্তর জয় ক'রে ফেললেন। পড়ানোর ভংগিটিও সুন্দর। ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে এনে হাসিমুখে পড়া বুঝিয়ে দেন। কেউ কোন জিনিস বুঝতে না পারলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতরকম ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেন। অসীম তাঁর ধৈর্য। পড়া বলতে না পারলে বিরক্ত হন-না বা রাগ করেন না। বলেন—"শোনো, বোঝো, আর পাঁচজনের মতো তুমিও পারবে।" অফুরন্ত তাঁর উৎসাহ। পরীক্ষায় ফেল করলে স্নেহের কার্পণ্য দেখা যায় না, বরং মন-মরাদের প্রতি তাঁর মমতা বেড়ে যায়। আড়ালে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—"এমন হয়। এতে লজ্জার কারণ নেই। মনে ক'রে দেখ, হাঁটতে শেখার আগে কতবার আছাড় খেয়েছ। চেষ্টা কর, তুমিও পাস করবে। তুমি কারও চেয়ে কম নও।" বরদাবাবুর আশীর্বাদের অন্ত নেই। সেকালে গুরু মশাইদের নি রতার বদনাম ছিল। বরদাবাবু অন্য ধরণের মানুষ। তিনি বেতে বিশ্বাস করেন না, অনুসরণ করেন প্রীতির পদ্ধতি। মারের জোরে জানোয়ার জব্দ করা যায়, মানুষের মন পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েদের রক্তচক্ষু দেখানো অক্ষমতার পরিচায়ক, দৈহিক শাস্তি দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। বরদাবাবুর এই নীতি অচিরেই অভিভাবকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

সুন্দর বরদাবাবুর হাতের লেখা। যখন বোর্ডে লেখেন খড়ি দিয়ে—তখন অক্ষরগুলো ফুটে ওঠে ছবির মতো। তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে আমরা বিস্মিত হই। কত গল্প করেন—পরমহংসদেবের, বিবেকানন্দের, বিদ্যাসাগরের, ওয়াশিংটনের, নেপোলিয়নের, আরও কতজনের। মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান—মাইকেল মধুসূদনের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি তাঁর মুখেই আমরা প্রথম শুনি। মর্মার্থ না বুঝলেও ভারি ভালো লাগে বাংলা দেশের সহজ সরল বর্ষার চিত্র।

দেখতে দেখতে বরদা মাস্টারের নাম ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হয় জমিদার-বাবুদের বৈঠকখানায়, মাতব্বরদের মজলিসে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের চণ্ডীমণ্ডপে, মেয়েদের পুকুরঘাটের পার্লামেন্টে। আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে ছেলে এসে ভর্তি হয় আমাদের স্কুলে। গ্রামবাসীরা মাথা নেড়ে বলেন—মাস্টার গ্রামের লোক না হ'লে কি ইস্কুল জমে। প্রফুল্ল মাস্টার ছিল ভিন গাঁয়ের লোক। তার মন পড়ে থাকত বাড়িতে। নিত্যি কামাই। আজ নিজের অসুখ, কাল স্ত্রীর ব্যারাম, কোন দিন কাঠ ফাটা রোদ, কোন দিন ঝড়-বৃষ্টি। একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে। এতে কি আর পড়াশুনা হয়। বরদা মাস্টার আসবার পর থেকেই ইস্কুলটা জেঁকেছে।

বরদাবাবু নিঃসন্তান। স্বামী-স্ত্রীর অপর্যাপ্ত অবসর। দুজনে পরিশ্রম ক'রে ফুলবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। আমাদের অবাধ গতি তাঁর বাড়িতে। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনের দর্পণে শিক্ষক বরদাবাবুর অন্যরূপ নজরে পড়ে। হাসেন, কথা বলেন, গ্রামবাসীর খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করেন। আবার থেকে থেকে কেমন যেন হয়ে যান। উঠানে রাধা-পদ্মের উপর সূর্যের স্বর্ণচ্ছটা দেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। 'বউ কথা কও' পাখির-ডাকে আনমনা হয়ে পড়েন। বাতাসের দোলায় যখন গাছে গাছে মর্মর ধ্বনি জাগে তখন কান পেতে শোনেন। চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ খাতা খুলে খস খস ক'রে লিখতে সুরু করেন। স্কুল-গৃহে সদাজাগ্রত বরদাবাবু স্বগৃহে সদাই অন্যমনস্ক। আমাদের আশ্চর্য-লাগে।

সকালে বিকেলে আমাদের কয়েকজনকে সংগে নিয়ে বরদাবাবু বেড়াতে যান। কোন দিন মরা নদীর সোঁতায়, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কখনও মাঠের বাগানে। কখনও সরষে খেতে। পুকুর পাড়ে মেছো কুমির রোদ পোয়ায়; মাঠের গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুট দেয় খরগোশের ছানা; পাকা বৈঁচির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে; 'খোকা হোক' 'খুকী হোক' পাল্লা দিয়ে বনস্থলী মুখর ক'রে তোলে। এসব খুব ভালো লাগে বরদাবাবুর। যখন দূরের রাখালদের বাঁশিতে বাজে বেলাশেষের তান, পথের ধুলো উড়িয়ে বিচিত্র কলরবে ঘরে ফেরে গরু ভেড়ার পাল, পদচিহ্নহীন প্রান্তরে সন্ধ্যা নেমে আসে কৃষ্ণকেশ এলিয়ে দিয়ে, মনসাতলার মন্দিরের দিকে শোনা যায় আরতির ঘণ্টা, তখন বরদাবাবুর চোখ ছল ছল করে অকারণে। মন কেমন-করা সন্ধ্যায় ওঠে বুক-কেমন-করা ব্যথা। পল্লী প্রকৃতির রূপান্তর কেন যে বরদা-বাবুর ভাবান্তর আনে বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারিনে।

একদিন ভারি মজার ঘটনা ঘটে। দোলের ছুটি। বনে বনে লেগেছে ফাগুন, কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙে রঙিন্ হয়েছে আকাশ, অশোক মেতেছে সোনার ফুলে। সকাল বেলা বরদাবাবুকে পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রী বললেন—"ভোর বেলা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।" খুঁজতে খুঁজতে আমরা চৌধুরী দীঘির জংগলে এসে পড়ি। দেখি কাঠ-মল্লিকার আবেষ্টনীর মধ্যে দেবদারু গাছের তলায় একান্তে বসে পাতার-পর পাতা লিখে যাচ্ছেন বরদাবাবু।

বরদাবাবু কলকাতার লোক। আমরা পাড়া গাঁয়ের ছেলে। কলকাতা দেখিনি, শুনি সে আজব শহর। কত দেখবার জিনিস ছড়ানো আছে নানা জায়গায়। সেখানে যাদু ঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট আছে; হাইকোর্ট, হাওড়ার পুল, ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সেখানে কলে জল পড়ে, রাস্তায় ট্রামগাড়ি চলে, আলোয় আলোয় কোন ব্যবধান থাকে না রাত্রি আর দিনমানে। কলকাতায় থিয়েটার বায়োস্কোপ আছে, গড়ের মাঠে আতশবাজি হয়, ইডেন গার্ডেনে গোরার বাজনা বাজে। সেখানে বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার দেখা যায়, কল-কারখানায় ভোঁ দেয়, হাওয়া গাড়িতে সাহেব মেম হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। কলকাতা দেখবার জন্য আমাদের মন যখন আঁকুবাঁকু করে, তখন বরদাবাবু পাড়া গাঁয়ের বনে জংগলে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে অপার আনন্দ পান। অদ্ভুত নয় কি?

আমাদের কাঁচা বুদ্ধি যুক্তি খুঁজে পায় না। বরদাবাবুকে মনে হয় যেন রহস্যময় পুরুষ।

বরদাবাবু যখন প্রতিষ্ঠার সুউচ্চ শিখরে, ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন গ্রাম ত্যাগ করলেন। সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। গ্রামশুদ্ধ লোক অবাক্। প্রাচীনেরা অনেক ভেবে চিন্তে রায় দিলেন— ও-বংশের ধারাই এই রকম। এক জায়গায় টিকে থাকতে পারে না। বরদা মাষ্টারের বাবা সারদা মিত্তিরও ছিটগ্রস্ত ছিল। গ্রামের বাস তুলে দিয়ে ছন্নছাড়ার মতো নানা দেশ ঘুরে শেষ বয়সে কলিকাতায় এসে কিছুকাল পরে মারা যায়। এদের পূর্ব-পুরুষ কেউ পূর্ব জন্মে বেদে কিংবা বেদুইন ছিল।

ছেলের দল আমরা একেবারে মুষড়ে পড়লাম। অনুক্ষণ অনুভব করতে লাগলাম বরদাবাবুর অভাব। একটা আক্ষেপ কাঁটার মতো বিঁধেছিল বহুদিন আমাদের প্রাণে। বিদায়-বেলায় তাঁকে একবার প্রণাম পর্যন্ত করতে পারিনি।

বিশ-বাইশ বছর কেটেছে। বিস্মৃতির অতলে ডুবেছে চলন্ত কালের কত জীবন্ত ছবি। জড়বাদী জীবনের বিচিত্র তুচ্ছতার মাঝে হারিয়ে গিয়েছে বরদাবাবুর স্মৃতি। কলকাতায় চাকরি করি। বউবাজারে থাকি। বিকেলে বেড়াই গোলদীঘির ধারে। সভাসমিতিতে যোগদান করি অ্যালবার্ট হলে আর ওভারটুন হলে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সাহিত্যিক বন্ধু কমল কর বললেন—ওহে, সন্ধ্যা ছটায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কবি 'মরমী-র' শোকসভা হবে। সভাপতিত্ব করবেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। গেলে মন্দ হয় না।

'মরমী'-র মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল কাগজে। তাতে তাঁর কাব্যের পরিচয় ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের কথা তেমন ছিল না। আমি 'মরমী'-র কবিতা পড়েছিলাম একটু আধটু, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। শুধু শুনেছিলাম তিনি প্রবাসী বাঙালী। মিটিং-এ যাবার জন্যে কৌতূহল হ'ল। ভাবলাম সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যাবে। মৃত্যু সাধারণকে ঢেকে ফেলে, কিন্তু অসাধারণকে প্রকাশ করে।

যথাসময়ে হাজির হলাম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। স্টেজের উপর একটি স্ট্যাণ্ডে মাল্যভূষিত করা হয়েছে 'মরমী'-র আলোক চিত্রখানিকে। দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে আমাদের বরদাবাবুর ছবি! কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম। কোন সন্দেহ নেই, বরদাবাবুর ছবিই বটে। 'মরমী' আমাদের সেই মাস্টার মশাই! আকাশ পাতাল চিন্তা করি। মনে জাগে অতীতের নানা ছোট খাটো ঘটনা। সত্যিই তো বরদাবাবু কত কি লিখতেন আপনমনে। হয়তো তখন তিনি আত্মগোপন ক'রেছিলেন নামহারা নির্জনে।

সভা আরম্ভ হ'ল। 'মরমী' সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা যা বললেন তার সার মর্ম এই :—

* * * *

'মরমী'-র আদিবাস নদীয়া জেলার সদর মহকুমায়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও লেখাপড়া শেখেন কলকাতায়। বছর দুই স্বগ্রামে শিক্ষকতা করেন। তারপর বন্ধুর আহ্বানে চলে যান এলাহাবাদে। তাঁর বন্ধু 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন কিছুদিন আগে। এই পত্রিকা-পরিচালনায় তিনি বন্ধুকে সাহায্য করতেন অন্তরালে থেকে। 'সাধনা'-র মাধ্যমেই 'মরমী'-র কাব্য প্রতিভা ক্রমবিকাশ লাভ করে। 'বনফুল'-এর মতো 'মরমী' ছদ্মনাম। কবির আসল নাম বরদাকান্ত মিত্র। জগতে সৌভাগ্যবান্ সাহিত্যিকের সংখ্যা খুব কম, তা আমাদের দেশে তো কথাই নেই। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় 'মরমী'-র সাহিত্যিক জীবনের যা কিছু সামান্য সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যায়। অত্যন্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কবির স্মৃতিরক্ষা ও কবি-পত্নীর সাহায্যের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন।

* * * *

'মরমী' তহবিলে এক-শ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। নতুন ক'রে পড়ছি 'মরমী'-র কাব্য। মৃত্যুর আলোকে দেখছি তাঁকে নতুন চোখে। আমার প্রাণে লেগেছে তাঁর কাব্য—রঙমহলের রঙ। কল্পনায় দীপ্তি পায় কত অপূর্ব জিনিস! যখন হাঁসের পালকের মতো সাদা সাদা মেঘগুলো আকাশে ভেসে যায়, যখন তার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য-কিরণ প'ড়ে চিক চিক করে, তখন মনে হয় ঐ বুঝি স্বর্গের পোখরাজ বাঁধানো পথ। কত যুগ যুগ ধ'রে চির সুন্দরের মন্দিরের যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে ঐ পথে অন্তহীন অলক-রাজ্যের অন্তরালে। তাঁদের মধ্যে বরদাবাবুকেও যেন দেখতে পাই।

ওগো মাস্টার মশাই, জ্ঞানে ও চরিত্রে তুমি আমাদের মুগ্ধ করেছিলে। আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি, ভালো-বেসেছি, কিন্তু সাহিত্যিকের সম্মান দিতে পারিনি। তোমার স্বরূপ তো ধরা পড়েনি আমাদের কাছে। আমরা যে ছেলে-মানুষ ছিলাম। ওগো কবি, জীবনের দীপ হীন পথে ঘুরে ঘুরে তুমি আজ উপনীত হয়েছ আলোক-তীর্থে। সেখান থেকে আমাদের অপরাধ মার্জনা কর। ওগো গুণি, গুণমুগ্ধ দেশবাসীর অশ্রুজলে তোমার স্মৃতি পল্লবিত হোক। তোমার বিনীত ছাত্রের নিভৃত প্রাণের প্রার্থনা ব্যর্থ হবেনা।

খড়কুটো

শক্তিপদ রাজগুরু

সেদিন ঝগড়াটা একটু বেশীই হয়। মাস-কাবারের রোজ, ডাউন বাসের বাবুদের পকেট ভারি, সহরে যাবার পথে বাবুদের অবস্থা ত প্রায় 'অন্তভক্ষধনুর্গুণ', সেদিন নটারও হাতে অফিসফেরতা বাবুদের দু'একটা ডবল পয়সা—আনিও আসে। এদিকে কাঁহাতক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গোকুল, বাড়ীতে চাল না-কিনলে উপোস,·· সমস্ত সন্ধির সর্ত উপেক্ষা করেই সেও গিয়ে সুরু করে—

—"নারায়ণ আপনাদিকে সুখী করবেন বাবা—"

নটার চেয়ে নটার বৌটাই বেশী দজ্জাল, সে চোখে দেখতে পায়···বয়সও আছে। দেখেছে বাবুদের অনেকে দু'একটা পয়সা দেবার সময় 'বাস' থেকে তার দিকে কেমন করে চেয়ে থাকে; অবশ্য তার জন্য গর্বও বোধহয় বৌটার, সেই দেমাকেই বোধহয় গোকুলের হাতের লাটিটা কেড়ে নেয় ফস্ করে একটান দিয়ে।

—"আমার লাঠি···অন্ধের লড়ি-গো—"

"কেন এসেছিস-র‍্যা মিন্‌সে, ওপারের মানুষ ওপারে থাকবা, এখানে কেনে?"

রাগের বশেই গোকুল চীৎকার করে ওঠে—"তোর বাপের জমিদারী পেয়েছিস—"

তারপরই সুরু হয়ে যায় ব্যাপারটা, নটার বৌ অশ্লীল-কুশ্লীল ভাষায় বুড়োর চরিত্র বর্ণনা ক'রে চলে। তার নানা কুমতলব নাকি আছে সেই কথাটাও জানাতে থাকে বড় রাস্তার সকলকেই। নটাও হাতড়ে হাতড়ে এসে এই অবসরে গোকুলের চুলের মুঠি ধরে ঘা-কতক বসিয়ে দিতে ছাড়েনা।

চীৎকার করছে গোকুল, বাবার চীৎকারে ছুটে আসে বসন্ত···কিন্তু ছোট মেয়েটা কাছাকাছি এগোতে পারেনা, সেও চীৎকার করে···শেষকালে একজন বাস কণ্ডাক্টর, টাইমবাবু এরাই ছাড়িয়ে দেয় গোকুলকে।

···অন্ধের চোখের কোটর থেকে গড়িয়ে আসে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। বসন্তও কাঁদছে। ছেঁড়া ফ্রকের প্রান্ত দিয়ে

চোখের সামনে তার অতল অন্ধকার, এ অন্ধকারের শেষ নাই·· এখানে কৃপণ সূর্য্যের এককণা আলোও ছিটকে আসেনা কোনদিন, তার জগৎ—ঘ্রাণ এবং স্পর্শের জগৎ। তবুও সচেতন মন আকাশে বাতাসে পায় তার হারাণো জগৎকে···। হাতের তালুতে সামান্য একটুকু স্পর্শ, ঠিক বুঝতে পারে কার হাত থেকে এল ওই দান : হাতটা কপালে ঠেকিয়ে আবার অভ্যাসমত হাঁকতে থাকে—

—"নারায়ণ···আপনাদিকে সুখী করবেন বাবা, একটি পয়সা অন্ধকে দিয়ে যান।"

···এর বেশী তার চাওয়া নাই।

সহরতলীর বড় রাস্তায় ঠিক খালপুলের ওপারেই বাস ষ্ট্যাণ্ড, একটু বেশীক্ষণই দাঁড়ায় 'টাইম' নেবার জন্য। ব্রিজের চড়াই উঠবার সময় গাড়ীর শব্দ কানে আসতেই গোকুলও লাঠি হাতে চীৎকার সুরু করে, গাড়ীখানা থামার পরই অভ্যস্ত পায়ে ফুটপাথ থেকে নেমে গাড়ীর পাশে পাশে একটানা চীৎকার করতে থাকে জোরে—

—"নারায়ণ···আপনাদিকে সুখী করবেন···"

কখনও কখনও রাস্তার ওপারে ডাউন গাড়ীগুলো দাঁড়াবার জায়গাতেও যায়···। সেদিন ঝগড়া থেকে প্রায় হাতাহাতি বাধবার উপক্রম হয়েছিল এই নিয়েই।

···আগে যে যেখানে পারত ভিক্ষে করত, ফলে নিজেদের ভাগেই কম পড়ত তাদের। তারই পাশের বস্তির নটবর ভিক্ষে করত এইখানেই···, শেষকালে অনেক ঝগড়া গণ্ডগোলের পর রফা হয়—কেউ কারও এলাকায় যাবে না, এপারে থাকে গোকুল, রাস্তার ওপারে নটা। নটার সঙ্গে থাকে তার বৌটা, পাড়ার অনেকেই তার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে—কিন্তু যাই হোক ভিক্ষে করে গোকুলের চেয়ে নটার রোজকারই হয় বেশী,নটার চেয়ে নটার বৌ-এর গলার আওয়াজই বেশী পায় গোকুল, চীৎকার করছে মেয়েটা—"দুনিয়ায় কেউ নাই গো—ওগো বাবুগো···"

চোখ মুছে বাবার হাত ধরে এপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে নিয়ে এল।

…গোকুলের মনে কি যেন ঝড় বয়ে চলেছে। মনের সামনে বহুদিন আগেকার এক টুকরো আলোরাঙ্গা জগৎ, সবুজ ধানের বুকে বাতাসের আনাগোনা, সাদামেঘের ভেলায় আকাশ ভরপুর।…একটা মিষ্টি মিঠে আমেজ মেশা বাতাস। একজনের মুখ…তারই স্ত্রী ভাসানি!… তার পর…তারপর সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। স্ত্রীর শেষ শয্যায় তাকে দেখতে পায়নি চোখের দেখা, হাত বুলিয়ে তার কঙ্কালসার হিমশীতল দেহের স্পর্শ নিয়ে বুঝেছিল ভাসানি আর নাই, বসন্ত তখন অনেক ছোট।

তারপর থেকেই চলে আসছে তার সেই আগেকার চোখে-দেখা জগতের কল্পনা, এই বড় রাস্তার উপর দিয়েই সে এককালে যাতায়াত করেছে বুক ফুলিয়ে, এই খালপুলের উপর দিয়ে সেও একদিন রিক্সাতে করে ফিরেছিল ভাসানিকে বিয়ে করে, সেদিন যেন কি বার ছিল?… বোধহয় মঙ্গলবার…তারপর কত শত শত মঙ্গলবার এসে চলে গেছে।…যেখানে সে একদিন মুক্ত পাখীর মত বেড়িয়েছিল, আজ সেখানে অন্ধকারের অতলে বন্দী হয়ে হাত পেতে বাঁচবার চেষ্টাই করে চলেছে।

—"বাবা—"

বসন্তের ডাকে তার ভাবনা থেমে যায়, ঝগড়া মারামারিতে ভুলেই গিয়েছিল গোকুল রাত্রি হয়ে গেছে। রাস্তার কোলাহল—গাড়ীর শব্দও কমে এসেছে।

—"বাড়ী যাবে না?"

—"চল!"…

দিনের রোজকার মাত্র বারো আনা পয়সা, তাই দিয়েই দুটো পেট চালাতে হবে। ওপাশে নটা—তার বৌ দুজনে তখনও চীৎকার করে চলেছে—"বাবু—একটি পয়সা বাবুগো…"

রাত্রি হয়ে আসে, ছোট মেয়েটার দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসে, কাঠকুচো দিয়ে মাটির হাঁড়িতে খুদ আর শাক সিদ্ধ করে চলেছে, কাগজের মোড়কটা খুলে খানিকটা নূন-হলুদ দিয়ে দেয়,…চোখের সামনে মুদির দোকানটা ভেসে ওঠে, মসলার দোকানে কাজ করে সেই ছেলেটা, ফটিক না-কি তার নাম। তার দিকে চেয়ে কারণে অকারণে হাসে… মসলার মোড়কটার নীচে কতকগুলো ডাল। সেই দিয়েছে।

…আজ আর রাঁধতে পারেনা, কাল যা-হয় হবে।

—"হলরে তোর রান্না।"…

বাবার ডাকে চিন্তাজাল সব ছিঁড়ে যায়, "এই হয়ে গেছে বাবা।"

বসন্তের কাছে পৃথিবীটা কেমন নেশা আনে। কত লোকজন…সন্ধ্যার আলোতে ঝলমল করে দোকান-পসার, কত রং বেরংএর শাড়ী, দোকানে কত খাবার, রাস্তার ওপাশে সাদা মস্ত বাড়ীটা সিনেমা হাউস…সাদা ধপধপে মার্কারি ভেপারের আলোটা নীল ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়ালে পড়ে কেমন নেশার মৌজ আনে। যদি আনাকয়েক পয়সা পেত!—একদিন যেতে দোষ কি? রাস্তায় বাস-কণ্ডাক্টরদের মুখে শুনেছে কত গান ওখানে শোনা যায়।

সবই ভালো লাগে—এই বস্তির নোংরা জলবসা ঘরখানা—ওই অন্ধ কুশ্রী লোকটা,—এই কালিলাগা মাটির হাড়ীতে কাঠে জ্বাল দিয়ে শাকপাতা চাল সেদ্ধ করা ছাড়া, মনের কোণে কোথায় যেন একটা চাপা অতৃপ্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বাইরের জগতের মোহ তার মনে বাসা বাঁধছে ধীরে ধীরে—তার দেহ মনের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই।

গোকুলের মনে সামনের জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; তার মনে নেশা লাগায় অতীতের সোনালী সকাল… বিগত বর্ষার দিনে গাছের মাথায়… ঘাসের বুকে বাদল-মেঘের ঘন-নীলাঞ্জন তার চোখ থেকে আজও মুছে যায়নি আজও তার অন্ধকার জগতের মাঝে আলোকের দীপ্তি আনে শরতের পড়ন্ত রোদ। কোন বিস্মৃত অতীতের হাসি-ভরা একটি মুখ…এই নিয়েই তার জগৎ।

আজও অস্তাচলের দিকে মুখ করে সে পূর্বাচলের স্বপ্ন রচনা করে।

গোকুলের কাছে বছর কয়েকটা বিভিন্ন স্বাদ গন্ধ এবং অনুভূতির সমাবেশমাত্র। রাস্তার নীচেই খালটা চলে গেছে সহরের প্রান্ত থেকে দূর জলার দিকে। নৌকায় করে বিভিন্ন মালপত্র—তরিতরকারি আসে জলপথে, ব্যাপারীদের কোলাহলে জায়গাটা ভরে ওঠে মাঝে মাঝে, খালের ধারে কৃষ্ণচূড়া—বাবলা গাছগুলো কখন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তার

খবরও ঠিক পৌছায় গোকুলের কাছে। পাকা আমের গন্ধে ঘাটটা ভরে ওঠে···গোকুলের পায়ের তলে গলন্ত পিচের তাপে ফোস্কা পড়ে···মাথার উপরে খাড়া রোদ চিন্‌চিন্ করে জ্বালা ধরায় সর্ব্বাঙ্গে, হাঁফিয়ে ওঠে গোকুল। তারপর আসে ধরণীর শান্তিজল নিয়ে বর্ষার প্রথম মেঘ, মটরের টায়ারের নীচে ভিজে মাটির একটা অব্যক্ত আর্তনাদ।

বর্ষা এলো। এমনি করে আসে শরৎ! অন্ধ ভিখারী আলোকোজ্জ্বল পূজামণ্ডপের মাইকের শব্দ লক্ষ্য করে দশভূজার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়···ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে বসন্ত তার দুচোখ ওই ঝলমলে শাড়ী গহনা পরা মেয়েদের চাকচিক্য বিলোল চাহনির দিকে, দুর্গার মূর্তি তার কাছে একটা নির্বাক জড়পদার্থ বলেই মনে হয়। নিজের মলিন শাড়ীখানার দিকে চাইতেই পারে না, হাতে কাঁচের চুড়িটায় বিজলীর আলো ঝিলিক তুলে তাকেই যেন ঠাট্টা করছে।

"চল বাবা—" মেয়ের হাত ধরে গোকুল পথ ধরে। গোকুলের মনে আজ গানের সুর দোলা লাগায়, বসন্তর মুখে একটা অতৃপ্তির কালো-ছায়া, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। এই আনন্দের ভোজে এককণাও অংশ তার নাই, সে রবাহূত অনাহুতের দলে।

আসে শীত··সেইটাই জানান দিয়ে যায় গোকুলকে হাড়ে হাড়ে। একটা শীত পার হলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়, হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতে পারবে। খালের বুক থেকে জলো-হাওয়া ভোরের কুয়াসায় হিমেল হয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনি ধরায়,খড়কুটো—করপোরেশনের পিচের টিনের তলায় টুকরো টুকরো কাঠের কুচি দিয়ে আগুন জ্বালায় বাজারের ধাঙ্গড়রা, গোকুল জীর্ণ গেঞ্জির উপর—হাঁটু অবধি একটা ছেঁড়া কোট চাপিয়ে—একখানা ধুতি দুভাগ করে জড়িয়ে নিয়ে ওদের মধ্যে একটু গুড়িসুড়ি মেরে ঢুকে পড়ে, কোন কোন দিন ওদিকে একটা পয়সা দিয়ে ওদের ছোট কলকেরও একটু পেসাদ পায়। ভোরবেলাতে একাই ফাঁকায় ফাঁকায় এসে গোকুল হাজির হয় বড় রাস্তায়, বেলা হলে বসন্ত আসে বাবার কাছে। কারণ অবশ্য আর একটু আছে, গোকুলের চায়ের নেশা আছে···চার পয়সার চা তার চাই, এতে বসন্তকে:ভাগীদার করতে সে নারাজ। তাই বসন্তকে বলে "এই শীতে তুই যাস্‌নে, বেলা হলে যাবি।"

বসন্ত জানে বাবার আসল কারণটা, তবুও এই সামান্য বঞ্চনা তার বড় বাজে। বাবা তার কাছে কিন্তু গোপন করলে। করুক—সেও গোপন করতে সুরু করেছে বাবাকে অনেক কিছু। সেদিনের নতুন শাড়ীখানা দেখে তার আশ মেটে না। মসলার দোকানের সেই ছেলেটা আসে রোজ সকালেই তাদের বস্তিতে, দোকান থেকে চা-চিনি-গুঁড়ো দুধও আনে, দুজনে বসে গল্প করে বেলা অবধি, বাবা তখন বড় রাস্তায় চীৎকার করছে।

ফটিকের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়, সে কেন যাবে ভিক্ষে করতে। নতুন শাড়ীখানা পরে রাস্তায় দাঁড়াতে তার লজ্জায় মাথা নুইয়ে আসে। মাঝে মাঝে বুড়ো গোকুল গান ধরে হাত পাতে বাস-যাত্রীদের কাছে—

'অন্ধ হয়ে ভাই—কত কষ্ট পাই
কারে বা জানাবো জানেন ভগবান—'

চিড়-খাওয়া গলায় সুরটা বিকৃত হয়ে বিশ্রী শোনায়, এমনি একটা লোকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকাও তার লজ্জা বলে মনে হয়, কিন্তু না হলে দিন চলে কি করে।

বাস কণ্ডাক্টররাও তাকে হাসি ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে, কারণ অকারণে চামড়ার ব্যাগটা তার সামনে ঝম্ ঝম্ করে বাজায়···কেউবা একটা আনি—দুয়ানি তার হাতে ফেলে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেদিন সুবীর সিং-এর গাড়ী এসে থামল। ঝাঁকড়া বটগাছটার ঘন পাতার ব্যূহ ভেদ করে রাস্তার আলোও প্রবেশ পথ পায় না। সুবীর সিংহ-এর দাড়ি ঢাকা মুখের আড়ালে চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে, তার হাতে একটা সিকি দিয়ে হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরে।

একটা শিহরণ খেলে যায় বসন্তের সারা শরীরে—শিরা উপশিরায়। একটা অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা···অস্পষ্ট আলোতে দেখে সুবীর সিংহএর মুখে-চোখে একটা কঠোর কাঠিন্য। জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে আসে বসন্ত···, গোকুল যথারীতি সুধীর সিংয়ের গাড়ীর ধারে চীৎকার করছে—"নারায়ণ আপনাদের মঙ্গল করবেন বাবু।"

—"বাড়ী যাবে না বাবা?"

—"আরও গাড়ী কতকগুলো দেখি—দাঁড়া একটু।"

বসন্তের বুকের কাঁপুনি তখনও থামেনি। হাতের তালুতে সিকিটা যেন জ্বালা ধরায় সারা শরীরে।

ব্যাপারটা সকলের নজর এড়ালেও, নটার বৌএর নজর এড়ায় নি। এককালে সেও এমনি অনেক বন্ধুর পথ বেয়ে এসেছে। আজ—

এটাও তার কাছে অসাধারণ কিছু বলে মনে হয় না, কিন্তু বসন্তের ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসাটাতে সে একটু বিস্মিত হয়। মটরের কাঁচা পয়সা, ছোঁড়াটাকে খেলাতে পারলে বসন্ত দুপয়সা হয়ত পেত। আজ তারই হিংসে হয় বসন্তের উপর, কিন্তু বৃথা সে হিংসা, অভাব অনটনে সারাদিন রোদ জলে কাটিয়ে তার চেহারা হয়ে এসেছে ধ্বসে পড়া এঁদো বস্তির মতন।

পরদিন তাই গোকুলের সঙ্গে অবসর সময়ে যেচেই আসে আলাপ করতে। সকালবেলা রোদে পিঠ দিয়ে গোকুল খালের দিকে মুখ করে বসে আছে, বাবলা ফুলের মিঠে গন্ধ আমেজ আনে হারানো দিনগুলোর, নটার বৌএর গলা শুনে একটু চমকে ওঠে—"কি করছ গো ?"

একথা সেকথার পর বসন্তের কথাতেই এল বৌটা "মেয়ে ত ডাগর ডোগর হয়েছে, এইবার বিয়ে থা দাও—"

—"বিয়ে !" চমকে ওঠে গোকুল।

সারা মনে চিন্তার জট বেধে যায়। বিয়ে-থা দেবেই বা কি করে ? খরচও আছে। তারপর মেয়েত চলে যাবে পরের ঘরে···সে কি আর খোঁজ খবর রাখবে বাবার ! অন্ধ মানুষ কোথায় বা থাকবে, কেইবা রেঁধে দেবে দুমুঠো ভাত। তাছাড়া বসন্ত··এই ত সেদিনের কথা, এতটুকু মেয়ে মায়ের কোলে মানুষ হয়েছে, কালো ডাগর দুটো চোখ মেলে চেয়ে থাকত তার দিকে।

—"কি ভাবছ গো—"

—"বিয়ে। সে যে অনেক টাকার ব্যাপার। এইত রোজকার—"

নটার বৌএর মুখে হাসি খেলে যায় অন্ধের চোখের আড়ালে, মেয়ের রোজগার কমে যাবে। পর হয়ে যাবে মেয়ে তাই বুড়ো পিছিয়ে যেতে চায়।

—"পাত্র আছে সন্ধানে গো—"

কোন কথার জবাব দেয় না গোকুল, কি যেন ভাবছে সে। বৌএর কথায় চমকে ওঠে।

—"সময় থাকতে বিয়েথা দাও, নইলে সোমথ মেয়ে কখন কি করে বসে···শেষকালে—"

গর্জ্জন করে ওঠে গোকুল—"থামবি তুই, তোকে কেউ পরামর্শ দিতে ডাকেনি। আমি জানি আমার মেয়েকে, তোর মত নয়—যে সে ঘরের মেয়ে কি।"

চলে গেল বৌটা। গোকুল ভাবছে·· তবে কি···বৌটার কথা সত্যি, আজকাল কেমন যেন দূরে দূরে থাকে বসন্ত, আগেকার মত সহজভাবে বাবার হাত ধরে নিয়েও যায় না। একটার পর একটা গাড়ী বার হয়ে যায়, বুড়োর উঠবার সামর্থ্য যেন নাই···সে ভাবছে বসে বসে আকাশ পাতাল।

বেলা বাড়তে যথারীতি বসন্ত এসে হাজির হয় বাবার কাছে টিনের কৌটোয় করে দুখানা রুটি আর গুড় নিয়ে। খাওয়া হয়ে গেলে রাস্তার কল থেকে জল ধরে আনে— "খাও··" মেয়ের হাত থেকে জলটা নেয় গোকুল।

বসন্ত ত বদলায় নি, প্রতিটি কাজই সে করে চলেছে, পরক্ষণেই মনে হয় তার চোখের দৃষ্টি ত নাই, বসন্তর মুখে চোখে কি লেখা আছে তা সে বুঝবে কেমন করে।

বুঝলে সে চিন্তিতই হত বেশী, বসন্তর মন থেকে কাল রাত্রির ঘটনাটা মুছে যায় নি, প্রথম কৈশোরের একটা স্তব্ধ অজানা আতঙ্ক তার মনকে ছেয়ে রেখেছে। সুবীর সিংএর বাঘের চাহনি তার সুপ্ত নারীত্বকে প্রথম জাগরণের বাণী শুনিয়েছে, এনে দিয়েছে একটা আতঙ্কের ছোঁয়া আজ যেন নিজেকে প্রকাশ্যে বার করতে লজ্জা হয় কতজনের বুভুক্ষু দৃষ্টি তাকে গ্রাস করছে অহরহ, অকারণেই কাপড়টাকে সংযত করে নিয়ে চারিদিকে ভীরু চাহনি ফেলে দেখে নেয়।

—"বাড়ী যাবো বাবা, রান্না করিনি··"

—"এখানে থাকলে দুচার পয়সা ত হবে, বাড়ী গিয়ে কি করবি।"

যে দুস্তর লজ্জা তার প্রথম যৌবনের জাগরণের জোয়ারে ভেসে এসেছে তার সন্ধান কি অন্ধ রাখে, সে ভা·স তা মেয়ে এখনও সেই তেমনিই রয়েছে।

সশব্দে একখানা গাড়ী এসে থামল, গোকুল যথারীতি চীৎকার সুরু করেছে—"নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করবে বাবা···

চমকে ওঠে বসন্ত কালকের আবছা আধারে দেখা সে মুখ, দিনের আলোকে দাড়ি চুমরিয়ে এগিয়ে আ সুবীর সিং ; আবার একটা সিকি—"লেও, ডরতি কি'উ !

নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বসন্ত—ভালভাবে কাপড়-খানাকে গায়ে জড়িয়ে। "লেও"···সিংজী তার হাতেই দিয়ে গেল সিকিটা।

যাবার সময় অকারণেই গোকুলকে জিজ্ঞাসা করে —"আচ্ছা হ্যায় গোকুল?"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ সিংজী; ঘাড় নাড়ে অন্ধ, মুখে তার তৃপ্তির হাসি, তার কথাও অন্য লোকে ভাবে তাহলে।

"এইটুকু থেকে ওকে চিনি, ভাল ছেলে বুঝলি—বসি।"

বাবার কথায় বসন্ত সায় দেয় না। কেন কে জানে—তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি ছেলের মুখ, মসলার দোকানের ফটিক—কত দিনের কত টুকরো ঘটনা!··· সুবীর সিংকে দেখে আবক্ষ ঘৃণাই বাসা বাধে মনে, বার বার তার যাকে ভাল লাগে, তার কথাই মনে করে শান্তি পেতে চায়।

বৃষ্টি নেমেছে সন্ধ্যা থেকেই, বসন্ত বাসায় গিয়েছিল আহার করতে, কিন্তু বৃষ্টি থামবার নাম নাই, বাবাকেই বা কি করে আনতে যাবে, একাই বসে থাকে। টিনের চালে বৃষ্টির অঝোর ধারাপাত, অস্পষ্ট লালাভ আলোয় দেখা যায় বৃষ্টির চূর্ণ জলকণা ছিটিয়ে পড়ছে চারিদিকে, একা একা বসে থাকতে ভয় লাগে। বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে কানে আসে মাঝে মাঝে ওপাশের ঘর থেকে বেসুরো গানের শব্দ···চঞ্চলা গাইছে···অত্যাচারের ফলে কণ্ঠে এসেছে কর্কশতা, তবুও সাজগোজ করে বড় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে···সঙ্গে করে মাঝে মাঝে ডেকে আনে অজানা অচেনা লোককে। সেদিন বসন্তকে ও বলেছিল—আসবি আমার ওখানে?

—"না" বসন্ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। চঞ্চলা ইচ্ছা করেই বলে—"আমার সেই শাড়ীখানার দাম কত জানিস? সেই যে কাল পরেছিলাম ডুরে শাড়ীটা—বাইশ টাকা দাম। কানের গয়না ভেঙ্গে এবার নতুন ডিজাইনের কানপাশা গড়াবো—"

সরে আসে বসন্ত, জানে কিসের প্রলোভন এসব, তার কাছেও এসেছিল···। এমনি আবছা আঁধারে ফুটে ওঠে একখানা মুখ।

হঠাৎ বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে কানে আসে বাবার ডাক, ছেঁড়া বস্তাখানা মাথায় চাপিয়ে বার হয়ে আসে বসন্ত, সামনে সাপ দেখলেও এত চমকে উঠত না, রিক্সা থেকে নামছে গোকুল সঙ্গে সুবীর সিং! বাবাকে নিয়ে ঢুকল বসন্ত।

—"একটু আসুন সিংজী, জোর বৃষ্টি, একটু থামুক···"

—"নেহি-নেহি।"

—"আসুননা গরীবের ঘরে···"সিংজী নেমে এল ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

—"মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটু চা আন বসন্ত সিংজীর জন্যে—"

বসন্তকে চট মাথায় দিয়ে ছুটতে হল, বাড়ী ফিরল যখন ভিজে নেয়ে উঠেছে। হাতে তার কলাইকরা গেলাসে চা।

ভিজে কাপড়ে ওর সামনে যেতে লজ্জা করে, নিজের দেহের দিকে চেয়ে সেও একটু বিস্মিত হয়! কবে তার দেহে এসেছে জোয়ার তার সংবাদ সেই রাখেনি। কোনরকমে সিংজীর সামনে চা দিয়ে বাইরে চালার এককোণে আশ্রয় নিল।

সে রাত্রে সিংজী চলে যাবার পর যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে বসন্ত। রাত্রে বাবার গল্প আর থামেনা, বৃষ্টিতে ভিজে গোবর হয়ে যেত—সিংজীই শেষে ট্রিপ ছেড়ে তাকে রিক্সাকরে পৌঁছে দিয়ে গেল, হাতে দিয়েছে নগদ একটা টাকা, আর চা কেনার ছ'আনা পয়সা।

—"কেন তুমি ওর টাকা নিলে?"

বিস্মিত হয়ে যায় বুড়ো, অজানা লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করতে পারে তারা, চেনাজানা লোক দয়াকরে টাকা দিলে নেবেনা—সে কোন্ কথা! বুড়ো জানেনা ওর টাকা নিয়ে বসন্তকে কতখানি ঠেলে দিয়েছে তার পানে। যার কোন পুঁজি—কোন সম্পদই নাই, তার মান-সম্মানেরও বালাই থাকেনা। কিন্তু আজ বসন্ত নিজেকে নিঃস্ব মনে করেনা—ওরা তবে কেন আসে তার চারি পাশে? সেই বা কেন ওদের দান কুড়োবে?

তাই ভিক্ষে করতেও তার সম্মানে বাধে; যে সম্মান তাকে লোকের চোখের আড়ালে রাখতে চায় সেই সম্মানেই তাকে ভিক্ষে করতে নিষেধ করে, কিন্তু পেট চলে কি করে?

কদিনপরই সিংজীকে দেখা যায় আবার তাদের বাড়ীতে, থলিথেকে কি সব নামাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে যায় বসন্ত।

—"বাবা বাড়ীতে নাই।"

—হাসে সিংজী, হাসির অর্থ তার বুঝতে বাকী থাকেনা,

এমনি হাসিই প্রথম সন্ধ্যায় হেসেছিল তার হাত ধরে, একা ঘরে বসন্ত একটু ভয়ই পায়।

—"লেও উঠাকে রাখো। একগিলাস পানি—"

বসন্ত কলাইকরা গেলাসে জল এনে দেয়, খানিকটা খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে, দাওয়াতে চেপে বসল সিংজী। ওপাশ থেকে চঞ্চলার মোটা গলা শোনা যায়।

—"নাগরকে মাটিতেই বসালি বসি, দেখিস যেন পথে বসাস না।"

—"বাত নেহি করতী কেও?"

কি কথা বলবে বসন্ত···বাবার কাছে যেতে হবে··, দরজায় তালাবন্ধ করে যাবার আয়োজন করে তখনকার মত উঠে পড়ে সিংজী।

· মাকড়সার জালে পোকা পড়লে প্রথমে সে ছটফট করে উদ্ধার পাবার জন্য, মাকড়সাও তত জোরালো বাঁধনে তাকে জড়িয়ে ফেলে। বসন্তের অবস্থাও প্রায় তেমনি। বাবার উপর মাঝে মাঝে রাগ হয়—দুঃখও হয়।

গোকুলের কাছে সিংজীকে মনে হয় ভগবানের দূত, সারাদিন ভিক্ষে করে পেত একটাকা, নাহয় দেড়টাকা বড়জোর, বর্ত্তমানে সিংজীই প্রায় তাকে পুষিয়ে দেয়, সেদিন সিংজীই বলে কয়ে অন্যান্য কণ্ডাক্টরদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে গোকুলের চাকরীর, ভিক্ষে করতে হবে না।

শিয়ালদহ বাসষ্টাণ্ডে দাঁড়িয়ে সে হাঁকতে সুরু করেছে —"বেলেঘাটা—রাসমণি—জোড়ামন্দির, খালি গাড়ী—খালি গাড়ী—"

গাড়ী আগাগোড়া বোঝাই হয়ে গেছে, তিল ধরবার জায়গা নাই, তবু গোকুল ডুসাইজ লম্বা একটা সার্ট পরে চীৎকার করতে থাকে—'খালি গাড়ী—খালি গাড়ী—"

এর জন্য পায় ট্রিপপিছু চারপয়সা, প্রায় টাকা দুয়েক হয়।

সিংজীর গাড়ীতেই ফিরে আসে, কোন কোন দিন সিংজীও আসে। দোকান থেকে মাংস পরটা আনে সেই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প গুজব চলে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে বুড়ো, সিংজীর চোখে তখনও সমান জ্যোতিই বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত সেদিন বাইরের দরজা বন্ধ করতে এসেছে সিংজীর পিছনে পিছনে। হঠাৎ—বস্তির আলো নিভে গেছে · সবাই ঘুমে অচেতন···নিস্পন্দ পুরীর মধ্যে এগিয়ে আসছে তারা, হঠাৎ বসন্ত চমকে উঠে চীৎকার করতে যাবে ··কঠিন একটা হাত তার মুখে বাধা দেয়, সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে আসে ···সারা দেহে ঈষৎ রক্তস্রোত বয়ে যায়। সিংজী আজ উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ বার হয়ে আসে তার সঘন কম্পিত বুকখানার ভেতর থেকে···সমস্ত শরীরে একটা ব্যথিত অসাড়ভাব। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল জানে না, রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু চেতনা ফিরে আসতে কোন রকমে উঠে এসে মেজেতে লুটিয়ে পড়ে বসন্ত···খোলা দরজা বন্ধ করবার ক্ষমতাও তার নাই। দুচোখ ছাপিয়ে আসে কান্না, আজ বাবাকেও সব-চেয়ে শত্রু বলে মনে হয়।

বাবাকে কিছু বলতে পারে না, কদিন পরই বৈকাল বেলায় সিংজীকে আসতে দেখে বসন্ত আজ তৈরী হয়ে নেয়।

"বেরিয়ে যাও—নইলে এখুনি চীৎকার করে লোক ডাকবো।"

—"ক্যা? একঠো শাড়ী লায়া—দেখতো পয়লি—"

—"চেঁচিয়ে হাট করব। দাড়ি গোঁফ তোমার উপড়ে নিয়ে ছেড়ে দোব, যাও—যাও বলছি।"

···বসন্তর মূর্ত্তি দেখে চমকে ওঠে সিংজী, গতিক সুবিধের নয় বুঝেই সরে পড়ে।

বসন্তর উত্তেজনা তখনও কাটেনি, হাঁফাচ্ছে সে। কতক্ষণ বসেছিল জানে না, সন্ধ্যা নেমে এসেছে; আশেপাশের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, বসন্তর উঠবার নাম নাই, আজ চারিদিকে যেন তার এমনি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে চাইল, ফটিক এগিয়ে আসছে—হাতে তার কয়েকটা মোড়কে কি সব, আলোটা সেই জ্বালে, বসন্তর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে যায়··· "কাঁদছ কেন?"

• কথা কয়না বসন্ত, ফটিক ও কাছে এসে বসে।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মনের অতল আঁধারের যেন নিবিড় মিতালী, তার দুঃখের কথা একজনকে না জানালে সে বাঁচবে কি করে, তাই ফটিককেই বলে ফেলল সব। স্তব্ধ হয়ে শুনে যায় ফটিক।

কতক্ষণ বসেছিল দুজনে জানেনা, ফটিকের হাতখানা তার হাতে; অজ্ঞাতসারেই ফটিক টেনে নেয় তাকে নিজের কাছে···

হঠাৎ দরজায় কাদের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে, গোকুল ঢুকছে, পিছু পিছু সিংজী। ফটিক উঠে বার হতে যাবে···

গোকুলের কানে যায় কার পায়ের শব্দ।

"কে যায়—"

ফটিক বার হয়ে গেল জবাব না দিয়েই।

গোকুল এসে একেবারে বসন্তের চুলের মুঠি ধরে—"কে এসেছিল—বল, বল, হারামজাদী।"

কথা কয় না বসন্ত, বুড়ো ক্ষেপে উঠেছে।

"যত সব নষ্টামি,·· সিংজীকে কি বলেছিলি যাতা? কেন বলেছিলি?

তবুও নিরুত্তর বসন্ত, কি করে বাবার কাছে তার চরম অপমানের কথা বলে সে,

···"জানিস ওর দয়াতেই খেতে পাস দুমুঠো—ওকেই তাড়িয়ে দিবি বাড়ীতে এলে—যাতা বলে।"

···"যা তা লোককে বাড়ীতে আনবে কেন তুমি?"

"কি বললি? যা-তা লোক? ওটা কে এসেছিল? কি করছিলি এতক্ষণ?"

চুলের মুঠি ধরে এক ছটকায় বসন্তকে রক থেকে উঠানে ফেলে দেয় গোকুল, তার শরীরে যে এত শক্তি কোথা থেকে এল সেই তা কল্পনা করতে পারে না।

···"পায়ে ধরে ক্ষমা চা ওর। শুনতে পেলি কথা—?"

বাবার ব্যবহারে আজ স্তম্ভিত হয়ে যায় বসন্ত, তাহলে বাবাই তাকে এই দিকে এগিয়ে দিতে চায়! তার নিশ্চিন্ত দু'মুঠো খাবার জন্যই কোন অন্যায়ই আজ তার কাছে অন্যায় নয়। না, একটা জানোয়ারের কাছে ক্ষমা চাইতে পারবে না সে!

সিংজীই বলে—"ছোড় দে গোকুল, আরে ছোট্টা লেড়কী বোল দিয়া জবানসে—ক্যা হোগা।"

গোকুল আজ নিজের প্রাধান্য দেখাবার ঠাঁই পেয়েছে। চিরকালের বঞ্চিত নিগৃহীত জীবন তার! সুতরাং এ সুযোগ সে ছাড়তে রাজী নয়। চীৎকার করতে থাকে···বসন্ত উত্তরই দেয় না,কাঁদছে নীরবে। হঠাৎ মাথায় একটা আঘাত পেতেই আর্ত্তনাদ করে ওঠে। কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে। গোকুল হাতের লাঠিটাই বসিয়ে দিয়েছে সজোরে।

রাত্রি হয়ে আসে, বুড়ো ওপাশে বসে রয়েছে···, বসন্ত তখনও কাঁদছে, আজ তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুনিয়ায় তার বেঁচে থাকার মানে ওই চঞ্চলার পথেই তাকে নামতে হবে। ওই সুবীর সিংকে মেনে নিতে হবে···আরও কতজন!! শিউরে ওঠে সে।

কপালে জমাট বেঁধে গেছে রক্ত,···বার হয়ে আসে বাড়ী থেকে বসন্ত। বাবার দিকে চাইতে ঘৃণা হয়···ওর জীবনের দাম কি···কে, কি অধিকার আছে তার ওই মূল্যহীন জীবনকে বাঁচাবার—নিজেকে এই অতল ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে।

কিন্তু আশ্রয় কোথায় তার···অন্ধকার গলি থেকে বার হয়ে এগিয়ে চলে কোন অজানার দিকে। নারকেল গাছ ঘেরা পুকুরের ধারেই ফটিকদের বাড়ী। গ্যাসের আলোতে দেখে ফটিকই সামনে দাঁড়িয়ে। ফটিকও বিস্মিত হয় বসন্তকে এই অবস্থায় দেখে। আরও বিস্মিত হয় বসন্তের কথা শুনে।

—"আমাকে নিয়ে চল, যেখানে খুসী, এখানে থাকলে মরে যাবো। ওরা মেরে ফেলবে আমায়। দোহাই তোমার - "

—"কিন্তু আমার বাবা-মা?"

—"তোমার বাবা-মা আছে?···" কি যেন ভাবলে বসন্ত, তারপর ফটিককে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় বসন্ত মাঠের দিকে। বিস্মিত ফটিক বসন্তের কথায় আজ রীতিমতই ঘাবড়ে গেছে। এতদূর ভাবতে সে পারে নাই।

···পুরোনো রাস্তা ভেঙ্গে তছনছ করে গড়া হচ্ছে নতুন রাস্তা। জল সাফ করে গড়া হচ্ছে আগামী সভ্যতার নিদর্শন "নতুন লেক।" সদ্যকাটা মাটি স্তূপাকার করে সাজান রয়েছে···, অতলে গহনকালো জল তারার আলোতে চিক চিক করে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, হঠাৎ···বসন্ত আবিষ্কার করে নিজেকে এই নির্জ্জন পরিবেশে·· চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাবার বিকৃত মুখখানা—কার উজ্জ্বল দুটো চোখের বীভৎস চাহনি···হিংস্র শ্বাপদের মত দাড়ি-ভরা মুখ খানা এগিয়ে আসছে তার দিকে···আর্ত্ত চীৎকার করে সামনের দিকে ছুটে পালাতে যায় বসন্ত··। বহু নীচে কালো জলের বুক থেকে 'ঝপাং' করে একটা শব্দ উঠে মহাশূন্য রাতের বাতাসে মিলিয়ে গেল এক মুহূর্ত্তেই, আবার নিথর নীরবতা রাত্রির বুক জুড়ে ফেলে।

পরদিন সকালে কৌতূহলী জনতা···কুলির দল লেকের জল থেকে তোলে একটি মেয়ের প্রাণহীন দেহ,···সনাক্ত করবার জন্য নিয়ে আসে গোকুলকে। অন্ধ স্থির হয়ে বসে আছে···

বেসনাক্ত হয়েই লাস পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হল। গোকুলের সৎকার খরচাটা বাঁচলো।

রাস্তায় গাড়ীচাপা পড়ে বেওয়ারিশ কুকুর বেড়াল মলেও দুচার জন লোক জোটে,···বসন্তর মৃত্যুতে তাও জোটেনি, গোকুলও ফিরে আসে বাড়ী।

·· এখনও দেখা যায় খালপুলের বাস ট্রামে নটা আর তার বৌ দুপাশেই ভিক্ষে করছে, এ পারে ভিক্ষে করবার জন্য গোকুল আর আসে না, বড় রাস্তার আশে পাশে দেখা যায় জীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানা পড়ে রয়েছে···মাঝেমাঝে ওর অর্দ্ধমৃত কঙ্কাল থেকে বার হয়···নারায়ণ···

পয়সা না ওর নিজেরই মুক্তি ভিক্ষা করে ব্যাকুলকণ্ঠে—ঠিক বোঝা যায় না।

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নির্ম্মম কঠোর 'জার' নিকোলাশের মৃত্যুর পর রুশ-রাজ্যের সম্রাট হলেন তাঁর বিচক্ষণ-পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। স্বভাবের দিক থেকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর পিতার বিপরীত। আলেকজাণ্ডার যেমন শান্ত-ধীর-দরদী, তেমনি রাজ-কর্ত্তব্যে পারদর্শী উদারমতাবলম্বী পণ্ডিত। সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ রুশ-কবি জুকোভ্স্কী ছিলেন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শিক্ষা-গুরু। জুকোভ্স্কীর সুশিক্ষার গুণে প্রজানুরঞ্জক সম্রাট আলেকজাণ্ডার শৈশবকাল থেকেই দিনে-দিনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন ইউরোপের সুসভ্য-উদার প্রগতিশীল ভাবধারার আদর্শে। রাশিয়ার এবং রুশবাসীদের মঙ্গল সাধন করার দিকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ছিল সদা সজাগ দৃষ্টি, আর আন্তরিক সহযোগিতা। লোকান্তরিত 'জার' নিকোলাশের মত দেশের নব জাগ্রত জনমতকে উপেক্ষা করে কঠোর দমন-নীতি না চালিয়ে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার পরম উদারভাবেই জনমত মেনেই রাজ্য-শাসন করেছিলেন। এমন কি দেশের জনগণকে তুষ্ট করতে বিগত 'ডিসেম্বর-বিপ্লবের' অনুষ্ঠাতা অভিযুক্ত-রাজদ্রোহীদের ক্ষমা করে মুক্তি দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। তাছাড়া বিক্ষুব্ধ জনগণকে খুশী রাখতে দেশের স্বার্থান্ধ জমীদারদের তাঁবেদারী থেকে দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জর অসহায় রুশ কৃষি-শ্রমিকদের মুক্তিদান করাও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরেই ১৮৬১ সালে 'রাজ-সনদে' সই করে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সুবিশাল রুশ-রাজ্যের দু' কোটি চাষী-মজুর আর দাস-শ্রমিকদের বিনাসর্ত্তে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁর এই সংস্কারপন্থী-আচরণে সে-আমলে দেশের স্বার্থান্ধ অভিজাত-অমাত্যের দল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে প্রবল আপত্তির ঝড় তুলেছিলেন। সে-ঝড়ের দাপটে সম্রাট আলেকজাণ্ডার কিন্তু আদৌ বিচলিত হননি···বরং দীপ্ত-নির্ভীক-কণ্ঠে স্বার্থলোভী অমাত্যদের তিনি জানিয়েছিলেন—"নীচে থেকে খোঁচা খেয়ে ওরা (নিষ্পেষিত চাষী-মজুর ও দাস-শ্রমিকের দল) মুক্তি আদায় করে যদি, তার চেয়ে উপর থেকে এ-মুক্তি দেওয়া···ভালো নয় কি ?" সম্রাট আলেকজাণ্ডারের এ-উক্তিটি আজকের দিনেও রীতিমত প্রণিধানযোগ্য।

রাজদ্রোহী বিপ্লবী-বন্দীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন যাত্রা

এমনিভাবে জঘন্য দাস-প্রথার বিলোপ-সাধন করে, সম্রাট আলেকজাণ্ডার শুধু যে দেশের দাস-শ্রমিকদের মুক্তি দিলেন তাই নয়, তাদের কিছু-কিছু জমি-জমা-সম্পত্তি দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন—যাতে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের খুশীমত কাজ-কর্ম্ম চালিয়ে দিন-গুজরাণ করতে পারে। দাস-প্রথা উচ্ছেদকল্পে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এই অভিনব কীর্ত্তি, আমেরিকার তৎকালীন-রাষ্ট্রপতি সুবিখ্যাত রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারক প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম্ লিন্কনের দাস-প্রথা-নিবারণী ব্যবস্থাকেও হার

মানায়। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ আমেরিকার ক্রীতদাস-সম্প্রদায়কে শুধু দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন…চাষ-আবাদ বা অন্যান্য কাজ-কর্ম্ম করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে হলে মূলধন-হিসাবে তাদের যে কিছু জমি-জমা-সম্পত্তির প্রয়োজন, তার কোনো ব্যবস্থা করেননি তিনি। দূরদর্শী রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কিন্তু সে-সব ব্যবস্থাও করেছিলেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দাস-প্রজাদের জন্য। তবে সে-সব জমি-জমা-সম্পত্তির দরুণ রাশিয়ার দাস-শ্রমিকদের নামমাত্র কিছু দামও দিতে হয়েছিল রাজ-দপ্তরে। দাম দিতে হলেও, আলেকজাণ্ডারের এই অভিনব-ব্যবস্থার গুণে রাশিয়ার দীন-দরিদ্র··কৃষিজীবী দাস-শ্রমিকেরা তবু জমির মালিক হবার এবং স্বাধীনভাবে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা পেলো।

দাস-প্রথার উচ্ছেদ ছাড়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে রুশ-রাজ্যের আরো নানান্ সংস্কার-উন্নতি হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব-বিশৃঙ্খলা আর অভিজাত আম্‌লা-অমাত্যদের যথেচ্ছ অসাধু-আচরণের ফলে, রুশ-রাজ্যের বিচার-বিভাগ রীতিমত কলুষিত ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রাণপাত-প্রচেষ্টায় তার আমূল সংস্কার-সাধন করেন। দেশের দীন-দরিদ্র অসহায়-প্রজারা যাতে সুবিচার পায়,

পেট্রোগ্রাডের পথের বুকে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উপর বিপ্লবীদের অতর্কিতে বোমাবর্ষণ

সে-উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলেই রাশিয়ার সরকারী আদালতগুলিকে সর্ব্বপ্রথম 'উকিল' বা 'কৌশুলী' নিয়োগ করে মামলা চালানোর পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাছাড়া উদ্ধত-উন্নাসিক অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের সাধারণ-প্রজাদের সদ্ভাব-সমন্বয় ঘটিয়ে একতা-সৃষ্টির মানসে, তৎকালীন ইউরোপের সুসভ্য-উন্নত দেশগুলির আদর্শে রুশ-রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের অন্যতম কীর্ত্তি। এই স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার ফলে রুশদেশের কারবারী এবং মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। সেকালে রুশ-সেনাদলে সৈন্যদের নির্দ্দিষ্ট-নির্দ্ধারিত বেতন-দানের তেমন কোনো সুষ্ঠু-ব্যবস্থা ছিল না। তার ফলে; প্রয়োজন হলেই জোর-জুলুম ফলিয়ে যখন-তখন দেশের সাধারণ-অধিবাসীদের লুঠ-তরাজ কিম্বা স্বার্থান্বেষী ধনী-অভিজাতবর্গের কাছ থেকে উৎকোচ-সংগ্রহ করাটাই ছিল রুশ-সেনাদের টাকা-রোজগারের পন্থা। এজন্য দেশের গরীব আর বড়লোক প্রজাদের সবাইকেই সব সময় তটস্থ থাকতে হতো সৈন্যদের দুরন্ত-দাপটের ভয়ে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কিন্তু দেশবাসীদের সে-ভয় ঘোচালেন রুশ-সেনাদের নির্দ্দিষ্ট-নির্দ্ধারিত বেতন-দানের সুব্যবস্থা করে। তাছাড়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সুনিপুণ বন্দোবস্তের দরুণ রুশ-সেনাদল সে-যুগে প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মধ্য-এসিয়ার বোখারা, খিভা, সমরখন্দ, তাশ্‌কান্দ এবং ককেশাস্ অঞ্চলের জর্জ্জিয়া রাজ্যগুলি দখল করে সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের সীমানা আরো অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। এ-সব বিজয়-অভিযানের পর ১৮৭৭-৭৮ সালে দুর্দ্ধর্ষ রুশ-সেনাদল তুর্কীদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী-রাজশক্তিদের প্রবল-প্রতিপক্ষতার দরুণ রুশ-সেনাদের পক্ষে সে-যুদ্ধে জয়লাভ করার সুবিধা জোটেনি শেষ পর্য্যন্ত। কারণ, যান্ত্রিক-শিল্পোন্নতির ব্যাপারে রাশিয়া তখনও ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের চেয়ে অনেক পেছিয়ে ছিল। তাই উন্নত-শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাল রেখে সুপ্রচুর কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি এবং যুদ্ধের অন্যান্য রশদ জোগান দেওয়া রাশিয়ার পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে-সময়। তার ফলে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে রাশিয়াকে অবশেষে

১৮৯১ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত রুশবাসীদের বিদেশ যাত্রা

সন্ধিসর্ত্ত করে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। এই ঘটনার পর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রুশ-দেশে ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক-শিল্পোন্নতি-সাধনের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এমনই মন্দ ভাগ্য যে তাঁর সে শুভ-সঙ্কল্প, শুধু সঙ্কল্পই রয়ে গেল মনে-মনে…কার্য্যে রূপায়িত করবার সুযোগ আর জুটলো না দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বরাতে! দেশের শাসন-পরিচালনার কাজে জনমতের প্রাধান্য দিয়ে প্রজা-সাধারণের পরম-প্রিয় হয়ে উঠলেও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের গুপ্ত-শত্রুর অভাব ছিল না রাশিয়াতে। এই সব গুপ্ত শত্রুরা ছিলেন রাজদ্রোহী-বিপ্লবী। এঁরা ছিলেন দুটি দলে বিভক্ত। একটির নাম—'নিহিলিষ্ট্' (Nihilists) সম্প্রদায়, আরেকটির নাম 'এনার্কিষ্ট' (Anarchists) দল। 'নিহিলিষ্ট'-দলের নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ-বিপ্লবী বাকুনিন, আর 'এনার্কিষ্ট' দলের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন অভিজাত-বংশীয় প্রবীণ-বিপ্লবী প্রিন্স পিটার ক্রোপোট্‌কিন। মতের এবং পথের পার্থক্য থাকলেও, এ দুটি বিপ্লবী-দলের উদ্দেশ্য ছিল 'জার্'-শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব ঘুচিয়ে রুশ-রাজ্যে নূতন-ধরণে স্বরাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সে

উদ্দেশ্যে এই সব বিপ্লবীরা 'জার্' দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রাণনাশের চেষ্টাও করেছিলেন বহুবার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এঁদের সে-সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল বারম্বার। বরাতক্রমে প্রত্যেকটি বারই সম্রাট আলেকজাণ্ডার প্রাণে বেঁচে গেছেন নিতান্ত আশ্চর্য্য রকমে! প্রাণে বাঁচলেও বিপ্লবীদের ছুরি আর বোমা অলক্ষে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের দেহ লক্ষ্য করে উদ্যত থাকতো সব সময়েই। তাই প্রাণ-হারানোর ভয় আলেকজাণ্ডারের মনেও অহরহ জেগে থাকতো এবং শেষ পর্য্যন্ত ঘটলোও সে ব্যাপার নিতান্তই শোচনীয়ভাবে। ১৮৮১ সালে একদিন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন তাঁর এক নিকট-আত্মীয়ার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সেরে গাড়ী চড়ে পেট্রোগ্রাড (আধুনিক লেনিনগ্রাড) সহরের রাজপথ বেয়ে 'উইণ্টার-প্যালেস' রাজ-প্রাসাদের সভা-কক্ষে শাসন-তন্ত্রের খশ্‌ড়া-চুক্তির কাগজে দস্তখৎ করবার জন্য ফিরে চলেছেন, এমন সময় বিপ্লবীদের হাতের অতর্কিত-বোমার আঘাতে রীতিমত মর্ম্মান্তিকভাবেই তাঁর জীবনান্ত হয়।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পর রুশ-সিংহাসনে বসেন—তাঁর তৃতীয় পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার। শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং স্বভাবে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর পরলোকগত-পিতারই অনুরূপ…প্রগতিশীল, উদার। কিন্তু রাজদ্রোহী-বিপ্লবীদের হাতে তাঁর পিতার শোচনীয় পরিণাম দেখে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের উদার-মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে…তিনি হয়ে ওঠেন দারুণ সংস্কার-বিরোধী। তাছাড়া তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের উপর তাঁর শিক্ষা-গুরু—সে-যুগের বিশিষ্ট রুশ-পণ্ডিত প্রোফেসর কনষ্টান্টিন্ পোবেদোনোষ্টসেভের ছিল অসামান্য প্রভাব। গুরুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রাজ্যের সাধারণ-প্রজাদের স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার-দানের আশা নির্ম্মূল করে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এক কড়া সরকারী-ইস্তাহার জারী করেন। এই নিদারুণ-ঘোষণার ফলে দেশের সাধারণ-প্রজাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়…রাজদ্রোহী 'নিহিলিষ্ট' এবং 'এনার্কিষ্ট' বিপ্লবীরাও প্রগতি-বিরোধী সম্রাটের বিপক্ষে সক্রিয়-বিরোধিতা সুরু করে দিলেন। প্রজাদের এই বিরুদ্ধাচরণের দরুণ, মনে-মনে বিচলিত হলেও তৃতীয় আলেকজাণ্ডার কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের বিপ্লবাত্মক-প্রচেষ্টার সম্বন্ধে পরম অবজ্ঞার ভাব দেখাতে লাগলেন। রাজার এই সাহসের পরিচয় পেয়ে বিপ্লবী-প্রজারাও বেশ একটু থমকে গিয়েছিল সে-সময়—তবে সে নিতান্তই সাময়িকভাবে। স্বায়ত্ত-শাসনলাভের সাধনা তাঁদের চললো অন্তরীক্ষে…অবিচ্ছিন্নভাবে…ছাই-চাপা তুঁষের আগুনের মত!

ঘটনাচক্রে সংস্কার-পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালেও, তৃতীয় আলেকজাণ্ডার মনে-প্রাণে ছিলেন নিতান্তই সরল, সাধাসিধে, দরদী, দেশপ্রেমী মানুষ। নিজের দেশ এবং দেশের প্রজাদের তিনি ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশী। তাই রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করলেও, রুশ-দেশের শিল্পোন্নতির দিকে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দেশোন্নতির এই কাজে তাঁকে সক্রিয়-সহায়তা করেছিলেন রুশ-দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ্-পণ্ডিত সার্জ্জিয়াস্ উইট্। প্রথম-জীবনে উইট্ ছিলেন রুশ-রেলপথের সামান্য এক ষ্টেশন-মাষ্টার। কিন্তু দক্ষতা-গুণে কালক্রমে হন রুশ-রাজ্যের যান-বাহন বিভাগের সুযোগ্য মন্ত্রী। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'জার্' আলেকজাণ্ডারের আমলে সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের নানান্ অঞ্চলে সুদীর্ঘ রেল-পথ, রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী ও যান-বাহনাদি চলাচলের সুগম রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়েছিল। উইটের সুব্যবস্থার-

সীভাস্টপুলের যুদ্ধ

গুণে শুধু যে রুশদেশের পথ-ঘাটের সংস্কার সাধিত হলো তাই নয়, দেশের মজে-যাওয়া নদী-খাল-বিলগুলিকেও খনিত এবং পরিষ্কার করে বড়-বড় জলযান, নৌকা, ফেরী-ষ্টীমার চলাচলের ব্যাপক-বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। উইটের এই অসামান্য কর্ম্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 'জার্' আলেকজাণ্ডার তাঁকে রুশ-রাজ্যের অর্থ-মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থ-মন্ত্রী হিসাবেও উইট্ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। রুশ-রাজ্যের অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে স্বর্ণ-মান (Gold standard) ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে উইট ইউরোপ, আমেরিকা এবং রাশিয়ার বাইরে অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, আর টাকা-লেন-দেনের বিশেষ সুবিধা-সুযোগ ও প্রসারতা ঘটিয়েছিলেন কৃতীপুরুষ উইটের সক্রিয়-সহযোগিতা এবং সুপরামর্শানুসারে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার পশ্চাৎপদ-অনুন্নত রুশ-রাজ্যকে সর্ব্বদিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের নানান্ অঞ্চলে বিবিধ

শিল্পোন্নতিকর প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, শ্রমশিল্পাগার প্রভৃতি গড়ে তুলতে লাগলেন। প্রাচীন-কৃষিজীবী রাশিয়ার সুবিশাল বুক জুড়ে নূতন-উদ্যমে বইতে সুরু করে দিলো নব-জীবনের নব-নব সৃষ্টির নবীন বন্যা-প্লাবন। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে সুদূর সাইবেরিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে লেনা নদীর উপকূলে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সুবর্ণ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলো রুশ-রাজ্যের বিরাট এক স্বর্ণ-খনি। সে-খনিতে কাজ করবার জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত দেশের রাজদ্রোহী-বিপ্লবীদের এবং সরকারী-কয়েদখানার কয়েদীদের দলে-দলে পাঠানো হলো…দুর্দ্ধর্ষ-রাজ-সেনাদলের সতর্ক-কড়া পাহারাধীনে। এই সব কয়েদী-শ্রমিকদের হাড়-ভাঙা মেহনতীর ফলে সুদূর সাইবেরিয়ার স্বর্ণ-খনি থেকে সে-আমলে যে-সব সোনার তাল সংগৃহীত হতো, তারই সাহায্যে বিদেশের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে রাশিয়া অচিরেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং তৎকালীন ইউরোপীয় রাজ্যগুলির কাছে পরম ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

দেশের যান্ত্রিক-শিল্পোন্নতির দিকে সক্রিয়-নজর দিলেও, 'জার্' তৃতীয় আলেকজাণ্ডার আর তাঁর মন্ত্রীরা রুশ-কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নোতির সম্বন্ধে ছিলেন একান্ত উদাসীন। তাছাড়া লোকান্তরিত-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বিধানে রাশিয়া থেকে আইনতঃ দাস-প্রথার বিলোপ-সাধন ঘটলেও, আসলে কিন্তু রুশ-কৃষিশ্রমিকদের দুরবস্থার তেমন-বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হলো না। কারণ, বাহ্যতঃ প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিয়ে হিত-সাধনের ভাব দেখালেও, 'জার্'-সম্রাটরা মনে-মনে চাইতেন দেশের জনগণকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে কড়া-তাঁবেদারীতে রাখতে। সেজন্য দাসপ্রথা-নিবারণী আইন-জারি করে রাশিয়ার কৃষি-শ্রমিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার দিলেও, 'জার্'-শাসকেরা রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা-প্রভাব অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যে সেই সাবেকী-প্রথানুযায়ী দেশের জমীদার-সম্প্রদায়ের হাতেই কৃষকদের জমি-বিলি করার সম্পূর্ণ ভার দিয়েছিলেন। তার ফলে রাশিয়ার অসহায়-দরিদ্র কৃষিজীবীদের চাষবাসের জমীর দরুণ আগেকার মতই স্বার্থান্বেষী-জমীদারদের কাছ থেকে নগদ টাকা অথবা ক্ষেতের ফসল খাজনা দিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিতে হতো। সময়মত খাজনা দিতে না পারলে আগেকার দিনের প্রথামতই কৃষি-শ্রমিকদের বিনা-মজুরীতে নিজস্ব হাল-যোড়া দিয়ে জমীদারের খাস-জমিতে গতর খেটে সে-দেনা শোধ করতে হতো। কাজেই রাজার কানুন-জারি হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার কৃষি-শ্রমিকদের উপর জমীদারদের শোষণ-জুলুম কিন্তু বজায় রইলো পুরোমাত্রায়। অথচ এই সব কৃষি-শ্রমিকদের ফসল-ফলানো এবং ভাল-মন্দ অবস্থার উপরেই নির্ভর করে একটা দেশ, বিশেষ রাশিয়ার মত কৃষিপ্রধান সুবিশাল-রাজ্যের উন্নতি-অবনতির অনেকখানি। অবশেষে হলোও তাই। কৃষি-জীবীদের এই শোচনীয় দুরবস্থার ফলে, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজ্যকালে ১৮৯১-৯২ সালে সারা রাশিয়া জুড়ে নামলো নিদারুণ দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়া। সুদীর্ঘকাল ধরে স্বার্থান্ধ জমীদারদের নির্ম্মম শোষণ-অত্যাচারে জর্জ্জরিত রুশ-কৃষকদের দুরবস্থা ক্রমে এমনই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো যে শেষ পর্য্যন্ত দেশে না রইলো চাষের লোক, না রইলো হাল, বীজ, ফসল। তার উপর দেশে হামেশাই দেখা দিতে লাগলো দারুণ অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ। দুর্দ্দশার চরম-সীমায় পৌঁছায় গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধানে দেশের মানুষ সব নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো শহরে-বন্দরে, কল-কারখানায়, আর ধনী-অভিজাতদের দোরে-দোরে। কত লোক অনাহারে প্রাণ হারালো…কত লোক হারালো পথে পড়ে—রোগে-শোকে জীর্ণ হয়ে। মন্বন্তর, মহামারী আর দুর্দ্দশায় অতিষ্ঠ হয়ে রাশিয়ার লোকজন শেষে দলে-দলে দেশ ছেড়ে পালাতে সুরু করলো সুদূর বিদেশে…ইউরোপে, আমেরিকায়, আরো নানান্ রাজ্যে। এমনিভাবে প্রায় চার কোটিরও বেশী রুশবাসী সে সময় নিজেদের দেশের মায়া কাটিয়ে বিদেশের মাটিতে পালিয়ে গিয়ে কোনোমতে প্রাণধারণ করেছিলেন। দেশের এই পরম বিপর্য্যয়ের দিনেই ১৮৯৪ সালে সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

(ক্রমশঃ)

আজো শেষ হয় নাই

শ্রীঅজিতকুমার সেন

আজো শেষ হয় নাই—আজো তার আরো আছে বাকী।
সুরের ফেনিল তপ্ত যে সুরায় জীবনের সাকী—
ভরেছিনু একদিন, ধমনীর রক্তের স্পন্দনে—
উন্মাদ আবেশে যার উত্তরঙ্গ হল ক্ষণে ক্ষণে —
চঞ্চল হিন্দোলে লাস্যে লীলায়িত ছন্দের বিলাস,—
কিছু তার অবশেষ,—কিছু তার রক্তিম আভাস—
আজো রহে পান-পাত্রে। সাধ মনে—শেষ কণা তার
আকণ্ঠ করিয়া পান বেলা শেষে আর একবার
স্বপ্নায়িত করে তুলি তন্দ্রাতুর ক্লান্ত চেতনারে।
আবার পসরা খানি বিরচিয়া গানের সম্ভারে
বারেক মেলিয়া ধরি মন বিকিকিনির মেলায়,
— কলরব মুখরিত উচ্ছ্বসিত প্রাণের খেলায়।

তারপর ?—তারপর চূর্ণ করি শূন্য পাত্র খানি—
বিদায় মাগিব মনে না রাখিয়া কোন ক্ষোভ গ্লানি।

আবার রোমান হরফ্

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ এম-এ, পি-এচ-ডি, এফ্-এন্-আই

বহু বৎসর পূর্ব হইতেই রোমান হরফের কীট কয়েকজন সুধী ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছিল। বিভিন্ন দিক হইতে বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, এই মতবাদ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম, আপদ বোধ হয় চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই উদ্ভট ও অসঙ্গত পরিকল্পনা এখনও কাহারও কাহারও চিন্তার বিষয় হইয়া আছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। এই বর্ণমালা মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত করিবার পক্ষে যেমন সুসঙ্গত, তেমনি স্বসম্পূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত। এরূপ চমৎকার বর্ণমালা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই। পাশ্চাত্য মনীষীরাও ইহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্বে ইউরোপে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের একটি সম্মেলন হইয়াছিল। ঠিক কবে, কোথায়, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। পাঠকগণের মধ্যে কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে। এই সম্মেলনের মনীষীবৃন্দ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে যদি সমগ্র পৃথিবীতে একটি বর্ণমালা প্রচলন করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত বর্ণমালাই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এই বর্ণমালা অতি সম্পূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত। আমার মনে হয়, জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যেমন ভারতের সংখ্যালিখনপদ্ধতি একটি শ্রেষ্ঠ অবদান, তেমনি সংস্কৃত বর্ণমালাও একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

ইংরাজি বর্ণমালা মানুষের সকল প্রকার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করিতে পারে না। ওদেশের লোকের কণ্ঠস্বর এবং জিহ্বাদির গঠন এরূপ যে থ, ঝ, ঢ, ড়, ত প্রভৃতি বহু শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। উহাদের ভাষা অনেকটা আধ-আধ। উহাদের psalm, dumb প্রভৃতি কথার মধ্যে অনেক অক্ষর silent, তাহার মূল কারণ এই যে, ওগুলি silent না হইলে শব্দের যে উচ্চারণ হয়, তাহা উহাদের মুখ দিয়া বাহির হয় না। এটা ভাস্করীয় পরিহাস নয়। আমি উহাদের সহিত দিবারাত্র বাস করিয়া উহাদের আবালবৃদ্ধবনিতার সর্বপ্রকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই একথা বলিতেছি। সুতরাং উহাদের অসম্পূর্ণ, অবৈজ্ঞানিক আধ-আধ বর্ণমালা গ্রহণ করার কথা উঠিতেই পারে না। আমরা জোর করিয়া উহাদের বর্ণমালা অভ্যাস করিলে এবং প্রচলন করিলে, কালক্রমে আমাদের কণ্ঠস্বরও ঐ বর্ণমালার উপযোগী হইয়া যাইতে বাধ্য। কিছুদিন পরে আমাদের সন্তানেরাও ত, ড়, থ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে পারিবে না। আমাদের গলা এবং জিহ্বাদি আড়ষ্ট হইয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ইংরাজেরা বাংলা বলিবার চেষ্টা করিলে, কি অবস্থা হয়, তাহা আমরা ভালরূপই জানি। দুই পুরুষ পরেই আমাদের বৃদ্ধেরাও বলিবেন,

> "ও বওদা, গাযী তান
> চুপতি কোয়ে দাযিয়ে কেন ?
> দেগে উথে কান্‌বে থেলে
> তাই তো আমাল্ বয় !"

ব্যাপারটা মোটের উপর দাঁড়াইবে, একটু দাম কম বলিয়া সাত নম্বরের জুতা না কিনিয়া পাঁচ নম্বরের জুতা কিনিয়া আনিয়া, সেই জুতা পরিবার জন্য পাদুটি চাঁছিয়া ফেলার মত।

অন্য কোন দেশের (তুরস্ক ছাড়া) লোকেই এই হীনতা স্বীকার করে নাই! জাপান তাহার বর্ণমালা পরিবর্তন করে নাই। চীন করে নাই, যদিও কিছু সংস্কার করিবার চেষ্টা হইতেছে শুনা যাইতেছে। রাশিয়া তাহার বর্ণমালা ত্যাগ করে নাই। জার্মান বর্ণমালা প্রায় ইংরেজিরই মত, একটু আলঙ্কারিক ধাঁজে লেখা। তথাপি তাহারা, বিদেশে রপ্তানির জন্য মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত, তাহাদের নিজের দেশের পুস্তকে এই সামান্য আলঙ্কারিক পার্থক্যটুকুও বিলোপ করে নাই। গ্রীস এতটুকু একটা দেশ। তাহার বর্ণমালা হইতেই ইংরেজি বর্ণমালা উদ্ভূত। তথাপি গ্রীস ইংরেজি বর্ণমালা গ্রহণ করে নাই। আভ্যন্তরীণ সকল কাজেই সেই

মান্ধাতার আমলের অ্যাল্‌ফা, বিটাই চলিতেছে। স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি মানুষের যেমন একটা মজ্জাগত আকর্ষণ ও মমতা আছে,. তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও একটা সহজাত মমত্ব আছে। বর্ণমালার উচ্ছেদ করিয়া মাতৃভাষার স্বকীয়তা রাখা যায় না। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সহিত তুরস্কের কোন তুলনাই হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অন্তর্গত বিবিধ প্রকার প্রতীক (symbol) অবশ্য যে কোন ভাষার বর্ণ হইতে পারে। কোন ভাষার অন্তর্গত নয়, এইরূপ বহুবিধ চিহ্নও বৈজ্ঞানিক পুস্তকে ব্যবহৃত হয়।

বাংলা বর্ণমালার মুদ্রণের অসুবিধা তো অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যে লাইনো-টাইপ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে মুদ্রণের অসুবিধা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ মুদ্রণে প্রায় সাড়ে ছয় শত টাইপ প্রয়োজন হয়। লাইনোতে প্রায় একশত টাইপেই কাজ হইয়া যায়। একশতটা টাইপের ব্যবহার এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। সুরেশ-বাবুর এই লাইনো-টাইপের উদ্ভাবন বাংলার মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ অবিস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। টাইপ-রাইটারেও এই ধরণের টাইপ ব্যবহার করা হইতেছে। যদিও তাহার speed ঠিক ইংরাজির মত হয় নাই। নাই বা হইল। টাইপ-রাইটারের স্পীডের একটু তারতম্য এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। কণ্ঠস্বরের জন্যই টাই-রাইটার, টাইরাইটারের জন্য কণ্ঠস্বর নয়।

ইংরাজি বর্ণমালার অসুবিধা অনেক আছে। এক 'a' এর বহুপ্রকার উচ্চারণ হয়। কর্ম কথাটাকে যদি karma লিখি, তাহা হইলে, ইহার উচ্চারণ কর্‌ম, কর্‌মা, করম্যা, কের্‌মা, কেরম্যা, কার্‌মা, কার্‌ম, কার্‌ম্যা, ক্যার্‌ম, ক্যার্‌মা, ক্যার্‌ম্যা, সবই হইতে পারে। যদি 'a'র বিভিন্ন উচ্চারণ বুঝাইতে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে তো বর্ণমালার সংখ্যা বাড়িয়াই গেল। ইংরেজি বর্ণমালাকে নূতন পোষাক পরাইয়া গ্রহণ করিব, অথচ আমাদের নিজের সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বর্ণমালা পরিত্যাগ করিব, এ কেমন যুক্তি? ইংরাজি বর্ণমালা যে কত অসম্পূর্ণ ও কত অবৈজ্ঞানিক তাহার প্রমাণ সর্বত্রই বিদ্যমান। টেলিফোনের বই খুলিয়া মুখার্জি বাহির করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয় কেন? একটা শব্দের বিবিধ প্রকার বানান কেন সম্ভব হইবে?

বাংলা যুক্তাক্ষরের কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু সে অসুবিধা এমন কিছু মারাত্মক নহে। বিশেষ প্রয়োজনের স্থলে হসন্ত বর্ণদ্বারা যুক্তাক্ষর এড়ান যাইতে পারে। সে ব্যবস্থাও ত আমাদের ব্যাকরণেই রহিয়াছে। 'কর্ম্ম' কে 'কর্ম' বা কর্‌ম লেখায় কোন বাধা নাই। হাতের লেখার অসুবিধা সব ভাষাতেই আছে! উহার জন্য একটু পৃথক অভ্যাস সকল ভাষার পক্ষেই এবং সর্বদেশের সর্বপ্রকার বর্ণমালার পক্ষেই প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমাদের কণ্ঠস্বর ভগবৎপ্রদত্ত। তিনি আমাদের শরীরটাকে জটিল করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছেন। অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত, নাড়ী প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার শক্ত, নরম, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গোল, লম্বা, উঁচু, নীচু, আঁকাবাঁকা, মসৃণ, কর্কশ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ইহার গঠন করিয়াছেন। যদি মানুষের শরীরের এই জটিলতা না থাকিত, তাহা হইলে কত সুবিধা হইত! যদি আমাদের শরীর একটা জোঁক বা একটা জেলিমাছের মত হইত' তাহা হইলে কত সুবিধা হইত! ডাক্তারদিগের ও কত পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। ছয় বৎসর ধরিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতে হইত না, বাহাত্তর টাকা দিয়া গ্রে'র অ্যানাটমি কিনিতে হইত না। কিন্তু বিধি বাম। আমাদের শরীরে নানা জটিলতা বিদ্যমান। কণ্ঠস্বরেও তাই নানা জটিলতা। যদি আমাদের কণ্ঠস্বর ঘোড়ার মত হইত, তাহা হইলে ছাব্বিশটার পরিবর্তে তিন চারটা অক্ষরেই চলিয়া যাইত। ঘোড়ারা টাইরাইটার ব্যবহার করিলে তাহাতে দুইটা চাবি হইলেই যথেষ্ট হইত।

কোন জিনিষ বিজ্ঞানসম্মত হইতে হইলে একটু জটিল হওয়া অপরিহার্য। গরুর গাড়ী অপেক্ষা মোটর গাড়ী জটিল। সামনের ঢাকনি খুলিলেই দেখা যাইবে, কি ভীষণ জটিলতা সেখানে। নৌকা অপেক্ষা ষ্টীমার জটিল। রিকশ অপেক্ষা ট্রাম জটিল। ঠিক একই কারণে a, b, c, অপেক্ষা ক, খ, গ কিঞ্চিৎ জটিল। কিন্তু বর্তমানে লাইনো-টাইপের সহায়তায় এই জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং অযথা অতর্কিত হইয়া আমাদের বহু প্রাচীন রত্নগুলিকে নষ্ট কাগজের ঝুড়িতে ফেলিবার চেষ্টা করা কর্তব্য নয়।

সভ্য হইতে হইলে একটু ঝঞ্ঝাট পোহাইতেই হয়। সব সময় শুধু তুচ্ছ সুবিধার দিকটাকেই বড় করিয়া দেখিলে মানুষের বা সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আত্মসম্মান কিছুরই মূল্য থাকে না। আমাদিগের মাতৃজাতির জন্য আমরা যদি লংক্লথের একটি হাফ্‌প্যাণ্ট এবং হাফ্‌সার্টের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কত দিক দিয়া কত সুবিধা হইত! সুতী-রেশমী-পশমী-মিল-তাঁত-ভয়েল-জর্জেট-মাদুরা- শান্তিনিকেতন শাড়ী-ব্লাউজ প্রভৃতি ঘটিত অগণিত ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত! কিন্তু আমাদের সংস্কার, আমাদের অভ্যাস, আমাদের শিক্ষা, আমাদের ঐতিহ্য এই সরলী-করণের পথে ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। তেমনি আমাদের স্বকীয়ত্ব, আমাদের জাতীয়তা, আমাদের অতীত সংস্কৃতি, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, আমাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য গর্ব ও মমতা আমাদের মাতৃভাষার ধারক ও বাহক এই প্রাচীন, উৎকৃষ্ট, সম্পূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত বর্ণমালা পরিত্যাগ করিবার সকল কল্পনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের অন্যান্য কোন প্রদেশেরই এমন তুরীয় অবস্থা হয় নাই যে তাহারা এইরূপে স্বীয় মাতৃভাষার বিনাশ-সাধনে তৎপর হইবে।

আমি বাংলার জনসাধারণকে, সাহিত্যিকগণকে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকবর্গকে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বাংলা ভাষার এই আত্মঘাতী পরিকল্পনাকে কোন প্রকার প্রশ্রয় না দেন।

লিখিতে, শিখিতে, পড়িতে, কোন বিষয়েই বাংলা বর্ণমালা অসুবিধাজনক নহে। লাইনো মুদ্রণ-প্রথায় ইহার মুদ্রণও সহজ হইয়াছে। ইহাকে টাইপ রাইটারের উপযোগী করিয়া লওয়াও তেমন কঠিন নহে। প্রয়োজনমত ইহার আকারাদিতে ঈষৎ ব্যতিক্রমও করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বর্জন করা হীরক ফেলিয়া কাচ গ্রহণ করিবার মতই অত্যন্ত নিবুর্দ্ধিতার কার্য হইবে। আমার বিশ্বাস, রামমোহন-কেশবচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-কালীপ্রসন্ন-রামেন্দ্রসুন্দর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে বাংলাভাষা গঠন করিয়াছেন, তাহার বর্ণমালা পরিত্যাগ করিতে কোন বাঙালীই সম্মত হইবেন না।

হেমন্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হেমন্ত। মাঠে মাঠে রোদ্দুর।
বন-কপোতীর সুর কি মধুর!
গাঁদা-বনে জৌলুস্ স্বর্ণের;
মর্ম্মী ফুল কতবর্ণের
ফুটে আছে আলো ক'রে উদ্যান!
উর্দ্ধে কী গাঢ় নীল আস্‌মান্!
সত্যই ধরণী কি সুন্দর!
'জলঙ্গী' ব'য়ে যায় তরতর্;
তীরে তীরে ফসলের সুষমায়
আনন্দে সারা মন ভ'রে যায়।

*   *   *   *   *

হলদে রঙের ফুল উচ্ছের;
কী যে শোভা মাধবীর গুচ্ছের!
সবুজ পাতার মাঝে জবা লাল;
মাঠে মাঠে চরে ঐ পশুপাল।
খামারে খামারে চাষী সারাদিন
কাজ করে, অন্তরে বাজে বীণ্।
বেণুবনে ধ্বনি ওঠে মর্ম্মর;
হায় রে, মানুষ কেন বর্ব্বর!

কেন সুখী পড়্‌শীর কান্নায়?
দিকে দিকে রক্তের বন্যায়
নিয়ে আসে বিভীষিকা মৃত্যুর।
নারী আর শিশু কাঁপে ভয়াতুর
হেমন্তে বারে বারে মনে হয়—
মানুষ কেন রে এত নির্দ্দয়!

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জম্মু বেশ বড় সহর ; এখানে সরকারী ডাকবাংলায় আহার ও বাসের ব্যবস্থা আছে। মাথাপিছু ঘরের ভাড়া, আলোসমেত ২।০ ; পাখা ঘরপিছু ১৲, খাওয়ার খরচ পৃথক, ডাকবাংলোটী সুসজ্জিত, সুরক্ষিত, সুপরিচালিত ; অনেক ছোট, মাঝারি, বড়, হোটেলও আছে। কাশ্মীর সরকারের একটী দোকান ও সরকারী ভ্রমণকারী সংস্থা এখানেও আছে (Visitors Bureau), মহারাজার শীতকালীন প্রাসাদ জম্মু-

বিতস্তার একাংশ

সংলগ্ন রামনগরে। প্রাসাদ এবং তার সংলগ্ন কর্ম্মচারীদের বাসগৃহগুলি যেন মৌনমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে পূর্ব্বের প্রাণ চাঞ্চল্য নেই, কারণ আজ আর সেগুলি মহারাজার বাসভূমি নয়। বলে রাখা ভালো আবদুল্লা সরকারের আমলেও জম্মু শীতকালীন রাজধানী আছে এবং শীতের সময় সরকারী দপ্তর শ্রীনগর থেকে এখানে চলে আসে ও ১লা মে আবার শ্রীনগর যায়। কাশ্মীর রাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রধান সহরে এখন অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠেছে—উলেন্ মিল, কাশ্মীর পটারি, কাশ্মীর শিল্ক ফ্যাক্টরী, ফ্রুট ক্যানিং ফ্যাক্টরী, ঔষধ গবেষণাগার ইত্যাদি। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে এখন বাস্তুত্যাগী শিখ ও পাঞ্জাবী হিন্দু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং ছোটবড় অনেক ব্যবসায়ে তারা আত্মনিয়োগ করেছে।

জম্মুতে মটর বাস বদল করে টুরিষ্ট কোম্পানীর আর একটী বাসে আমরা ঘণ্টাখানেক পরে আবার যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা সাতটার পর জম্মু থেকে এ পথে গাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ। চল্লিশ মাইল পরে উধমপুর নামে একটী বড় গ্রাম পড়ল। উধমপুর এ অঞ্চলের সদর দপ্তর। মোটর-যাত্রীরা জম্মুর পর এখানে পেট্রল পুরে নিতে পারেন। এই উধমপুর এবং জম্মুতে আজ প্রজাপরিষদ দলের ভারতভুক্তির আন্দোলন বেশ প্রবল হোয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা, রাজ্যপালের পৃথক নামকরণ (সর্দ্দার-ঈ-রিয়াসৎ) এবং ভবিষ্যতে ভোট দ্বারা পাকিস্থানের যোগদানের স্বাধীনতার বিরোধী এই দল। এরা চায় কাশ্মীর যে ভারতের অবিভাজ্য অংশ তার স্বীকৃতি। মহারাজা গুলাব সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উধমসিং এই উধমপুরের প্রতিষ্ঠাতা।

আরও ২১ মাইল গিয়ে সন্ধ্যায় "কুড" পৌছলাম, এখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। যদিও এর উচ্চতা ৫৭০০ ফিট, তবু প্রচণ্ড শীত ছিল, গরম কাপড় জামা, মায় মোটা ওভার-কোট গায়ে চাপিয়েও সন্ধ্যায় শীতে কাঁপতে হোয়েছিল। বলা বাহুল্য, দুপুরে জম্মুতে গরমের জন্য ডাকবাংলার পাখা চালিয়েছিলাম। কুড়ে ভাল ডাকবাংলা, কয়েকটি

রেষ্টুরেণ্ট ও দোকানপাট আছে এবং স্থানীয় অনেকে ঘর ভাড়া দেয়। ভাড়া মাথা পিছু ঘর হিসাবে রাত্রিবাসের জন্য চার আনা থেকে দু' টাকা। এখন আমরা হিমালয়ের ভেতর অনেকখানি ঢুকে পড়েছি, কাজেই চারিদিকে চমৎকার পাহাড়ী দৃশ্য। নীল আকাশের কোল পর্য্যন্ত শ্যামল শোভার একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। কাছের পাহাড়গুলি পুষ্ট, তাদের বুকে কোথাও কোথাও বুভুক্ষু মানুষ আহার্য্যের সন্ধানে মাটী খুঁড়ে ক্ষেত করেছে, ধাপে ধাপে সে জমি পাহাড়ের বুক থেকে পা' পর্য্যন্ত নেমে গেছে, দূরের পাহাড়গুলি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হোয়ে আকাশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। রাস্তাটী এঁকেবেঁকে এই পর্ব্বততরঙ্গে হারিয়ে ফেলেচে নিজেকে। বাড়ীগুলি পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠেছে—রাস্তার ধারের প্রথম সারির ঘরগুলির দোতলার ছাদ, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ীগুলির উঠান—যেমন সব পাহাড়ী সহরেই চোখে প'ড়ে।

ডালের বুকে নৌগৃহের শ্রেণী

পুর্ণিমার রাত্রিতে পাহাড়ের ওপর থেকে সেদিন সে দৃশ্য আরো মনোরম দেখাচ্ছিল, গ্রীষ্মে এ সমস্ত জায়গায় মশা, ছারপোকা ও পিশুর যথেষ্ট উৎপাত থাকে, কিন্তু শীতে তাদের উৎপাত কম।

প্রত্যূষে আবার যাত্রা শুরু হোল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ পাহাড়ের বুক চিরে ক্রমাগত উঠেছে। প্রায়ই সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ধরণের মোটর ট্রাকের সঙ্গে দেখা হোতে লাগলো। মাঝে মাঝে বাঁক ফিরেই বা বাঁকের মাথায় হঠাৎ সেরকম চোখো-চোখিতে প্রাণ চমকে উঠছিল। এটা অহেতুক নয়; রাস্তার ধারে ধাক্কা খাওয়া স্থবির গাড়ী কয়েক জায়গাতেই চোখে পড়েছিল। তা'ছাড়া লোকমুখে শোনা গিয়েছিল এরকম সাংঘাতিক সংঘর্ষ এ'পথের স্বাভাবিক ঘটনা, পথের ধারের কোন পাহাড় পাথর আর মাটির, কোনটা শুধু পাথরের, কোথাও পাইনের বন, কোন পাহাড়ে শ্যামলতার লেশমাত্র নেই।

কমল কানন

৭০০০ ফিট চড়াই করে ১২ মাইল এসে বাটোটে গাড়ী থামলো একটু বিশ্রাম করবার জন্যে। এখানে ভালো ডাকবাংলো, ধর্ম্মশালা ও বাজার আছে, একটী যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে, গণ্ডগ্রামটীর উচ্চতা ৫১১৬ ফিট, কুডের মত মোটরযাত্রীদের এটীও একটী রাত্রিবাসের আড্ডা। উধমপুরের পর মোটরযাত্রীরা এখানেই পেট্রল পাবেন।

এরপর আমরা ক্রমশঃই নীচে নামতে লাগলাম। অবশ্য পাহাড়ী রাস্তায় কোথাও সোজা নীচে বা উপরেই ওঠা যায় না, চড়াই উৎরাই করেই চলতে হয়। আরও ১৭ মাইল গিয়ে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদী পেরিয়ে রামবানে (২৪০০ ফিট) কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী থামলো। পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক যাত্রীই বমি করতে আরম্ভ করেছিলেন, আর অনেকেই মাথা টিপে চোখবুজে বসেছিলেন, গাড়ী থামতে তাঁরা মাটীর বুকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পাহাড়ের কোলে কোলে

সমতলক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ছাউনি মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছিল ; এখানের ছাউনীটী বেশ বড়, সামরিক কারণে এ অঞ্চলের ছবি নেওয়া নিষিদ্ধ। রামবাম থেকে রামলু (১৪ মাইল, ৪১০০ ফিট) হোয়ে বানিহালে (১০ মাইল) মধ্যাহ্নে গাড়ী থামলো। এখানে সকলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিলেন। পীরপাজমল পাহাড়ের কোলে বানিহাল গ্রাম, এর উচ্চতা ৫৭০০ ফিট। এখানে ডাকবাংলো, রেষ্টহাউস, ডাকখানা ও শুল্কদপ্তর আছে। সমস্ত মালপত্র পরীক্ষা করা হয় ও প্রত্যেক গাড়ীপিছু মাশুল আদায় করা হয়। এখানে ভাল হোটেল চোখে পড়লো না। সাধারণ বাজার মিষ্টির দোকান ও ছোটখাটো হোটেল আছে। এখানে আশে পাশের পাহাড়গুলির দূরত্ব যেন কিছু বেশী, কারণ তাদের মধ্যে ধানের ক্ষেতগুলি ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে নেমে গেছে ; খাড়া ঢালু নয়।

কাশ্মীরী মাছ শিকার

গুলমার্গের পথে সার্কুলার রোড়

এখানে মাছের স্বাদের সুনাম আছে। কতকটা সেজন্য এবং কতকটা কোলকাতা ছেড়ে মাছের মুখ না দেখায় একটা হোটেলে ভাত আর মাছের বরাত দিলাম। কাঠের টেবিলের ধারে বেঞ্চে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা কোরতে লাগলাম। কেউ পাশেই কুক্কুট মাংস, কেউ বা ভেড়ার মাংস খাচ্ছিলেন। হোটেলওয়ালারা অধিকাংশই পাঞ্জাবী—মিষ্টির দোকানীও ওরাই। ছোট ভেটকী বা কইমাছের মত দেখতে ভাজা মাছ আর ভাত দিয়ে গেল। সজল জিভে মাছের টুকরো মুখে দিতেই গা গুলিয়ে উঠলো। এত বিস্বাদ মাছ রাশিয়াতেও খাই নাই। (পরে শুনেছি রাশিয়ায় ভাল মাছ পাওয়া যাচ্ছে ; ১৯৩১ সালে তা' ছিল বিলাস দ্রব্যের সামিল, তাই দুর্মূল্য, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ) আহারে আশাভঙ্গ হোল, অগত্যা কইএর বদলে শুধু দই দিয়ে আহার পর্ব শেষ হোল।

এখানে আশে পাশের পাহাড়গুলির দুরত্ব যেন কিছু বেশী, কারণ তা'দের মধ্যে ধানের ক্ষেতগুলি ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে নেমে গেছে—খাড়া ঢালু নয়। এখানের ভেড়া কুকুর ছাগল প্রভৃতির লোমগুলি বেশ লম্বা, শীতের জন্য প্রকৃতিদেবী তাদের এই স্বাভাবিক সজ্জায় সাজিয়েছেন। দুপুর বেলাতেও বেশ শীত ছিল। পাহাড় পেরিয়ে এখান থেকে একটী হাঁটাপথ কাশ্মীর উপত্যকার মোগল যুগের অন্যতম বিখ্যাত বাগান ভেরীনাগ গেছে। এখানে পেট্রোল পাম্প আছে। এর পর শ্রীনগর ছাড়া পথে আর কোথায় পেট্রোল পাওয়া যায় না। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চড়াই সুরু হোলো। প্রায় ২০ মাইল পাহাড়ী পথ এঁকে বেঁকে উঠে পীরপঞ্জল পাহাড়ের মাথায় এসে গাড়ী থামলো। এদিকের পাহাড় অধিকাংশই শুধু পাথরের, তাই বনানীর শ্যামলতাশূন্য। পীরপঞ্জলের এই শৃঙ্গটিকে আর বেড়ে যাবার উপায় নাই, মাথা উঁচু কোরে সে পথরোধ কোরে দাঁড়িয়ে আছে, তাই মানুষ এর বুক ফুঁড়ে সৃষ্টি কোরেছে সুড়ঙ্গ। এই 'টানেল' বা সুড়ঙ্গটি ৬৫০ ফিট লম্বা এবং ১৫ ফিট চওড়া। এখানের উচ্চতা ৮৯৮৫ ফিট। এর মধ্যে একখানি মাত্র গাড়ী যেতে পারে, এজন্য পূর্বে বানিহাল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে বাইরের গাড়ীগুলিকে ছাড়া হয়,

যা'তে কাশ্মীর থেকে আগত কোনো গাড়ীর সুড়ঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হয়। এখন কিন্তু সামরিক বাহিনীর যাতায়াতের জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলাম। অবশ্য সামরিক বাহিনীর কোন বড় রকমের যানশ্রেণী কোন দিক থেকে গেলে অপর দিকের গাড়ী বন্ধ রাখা হয়—দু'একখানা গাড়ী এলে তা'কে সুড়ঙ্গের মুখে আটক রেখে সুড়ঙ্গের ভেতর একদিকের গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন সুড়ঙ্গের উভয় মুখেই সামরিক শান্ত্রী রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সুড়ঙ্গপথ তুষারপাতের জন্য বন্ধ থাকে, তখন আকাশ-পথ ছাড়া কাশ্মীরের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের আর পথ থাকে না। বরফগলার প্রথম মুখে এ রাস্তা বেশ বিপজ্জনক; কারণ বরফগলার জলে চারিদিকের পাহাড় নরম থাকে, তার ফলে পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে রাস্তা হঠাৎ বন্ধ কোরে দেয়, ঘাড়ে পড়াও বিচিত্র নয়। রাস্তার ধারে ধারে এরকম বড় ধ্বস পড়ার চিহ্ন অনেক জায়গাতেই চোখে পড়লো। আমরা অক্টোবর মাসে (১৯৫২) গিয়েছিলাম, কাজেই রাস্তা ছিল পরিষ্কার। কিন্তু পথের ধারে অধিকাংশ নির্ঝরিণী ছিল জলহীন, তা'দের বিরস বুকের ছোটবড় পাথরগুলিই জানিয়ে দিচ্ছিল তাদের অস্তিত্ব। বর্ষায় কিন্তু এদের প্রবল প্রতাপ! এদের প্রচণ্ড স্রোতে তখন পাহাড় ভেঙে পাথর বালি হয়ে যায়—পথ হয় বন্ধ।

শীতের গুলমার্গ

খিলাল মার্গের একাংশ। পিছনে তুষারমণ্ডিত পাহাড়

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরও কিছুদূর ক্রমাগত উৎরাই কোরে পাহাড়ের বাঁকের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়তে লাগলো কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামল শোভা—সবুজ সমতলের বুকে আঁকা বাঁকা ধানের ক্ষেতের সীমারেখা, আর তা'দের মাঝে মাঝে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘশীর্ষ শুভ্রদেহ সরল পপলার গাছের শ্রেণী। যাঁরা এতক্ষণ মাথাটিপে চোখ বুজে বসেছিলেন কেউ কেউ বা আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়েছিলেন বমির কেলেঙ্কারী থেকে বাঁচবার জন্য—তাঁরা এবার ধীরে ধীরে মাথার ঢাকা সরালেন। চোখ মেলে নীচে তাকালেন উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা কোরলেন "আর কত দূর?"

প্রায় ৯ মাইল পথ এসে সমতলের বুকে পেলাম একটি ছোট গ্রাম "মুণ্ডা" (আপার মুণ্ডা ৭২২৭ ফিট), এর কিছু পর নীচু মুণ্ডা। এখান থেকে ভিন্ন পথে ৫ মাইল দূরে "ভেরীনাগ।" (ক্রমশঃ)
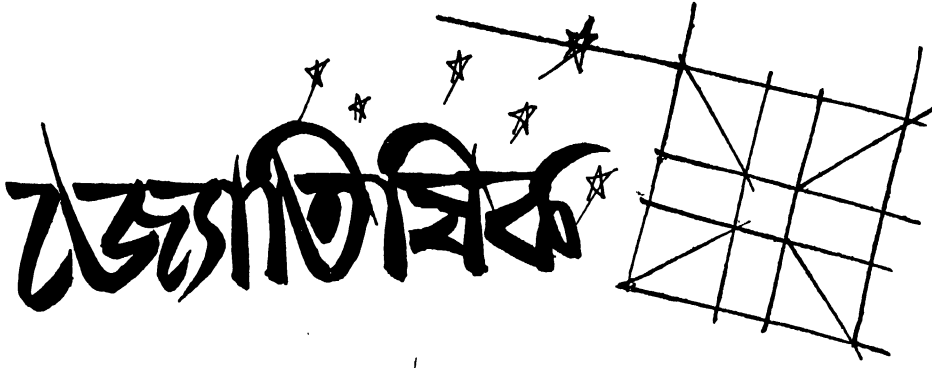
কর্মজীবনে জ্যোতিষ

জ্যোতি বাচস্পতি

বর্ণ হিসাবে বা কর্ম নির্ণয়ের জন্য রাশি ও গ্রহগুলিকে এই ভাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ—কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশি এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও বরুণ গ্রহ।

ক্ষত্রিয়—মেষ, সিংহ ও ধনু রাশি এবং রবি, মঙ্গল ও রুদ্র গ্রহ—

বৈশ্য—তুলা, কুম্ভ ও মিথুন রাশি এবং চন্দ্র, বুধ ও প্রজাপতি গ্রহ—

শূদ্র—মকর, বৃষ ও কন্যা রাশি এবং শনি, রাহু ও কেতু গ্রহ—

কোষ্ঠীতে সে শ্রেণীর রাশি ও গ্রহ বলবান হয়, জাতকের সেইরকম কর্মে কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।

উপরে কর্মের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাতে মোটামুটি এইটুকু বোঝা যায় যে জাতক কোন্‌দিক দিয়ে জীবনে সাফল্য অর্জন করবেন—ব্যবসা, পেশা, না চাকরী। কিন্তু এ থেকে বলা সম্ভব নয়, জাতক কি পেশা বা কোন ব্যবসা কিংবা কী চাকরী করবেন, কিংবা কিভাবে ঘরে বসে উপার্জন করবেন। এ নির্ণয় করতে গেলে আরও কিছু জানা প্রয়োজন।

উপরে রাশি ও গ্রহগুলিকে যে চার বর্ণে ভাগ করা হ'য়েছে, কোষ্ঠীতে দ্বাদশ ভাবকেও সেই হিসাবেই ভাগ করা যায়। দ্বাদশ ভাবের মধ্যে লগ্ন, পঞ্চম ও নবম ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম শূদ্র, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ বৈশ্য এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ ব্রাহ্মণ। এর প্রয়োগ কি কি ভাবে করতে হবে তা পরে বোঝা যাব। তার আগে জানা দরকার একটা কোষ্ঠী থেকে কী ভাবে বোঝা যেতে পারে জাতকের কোন্ কোন্ বিষয়ে যোগ্যতা আছে এবং কী ধরণের কাজে তার সেই যোগ্যতার পূর্ণ স্ফুরণ হওয়া সম্ভব।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, কার কোন্ বিষয়ে যোগ্যতা আছে—জানলেই তার কোন্ ধরণের কাজে যোগ্যতা প্রকাশ পাবে তা বুঝতে পারা যায়। বাস্তবিক কিন্তু তা ঠিক নয়। অনেক লোকের একই বিষয়ের যোগ্যতা থাকলেও কাজের বেলায় তাঁরা কিন্তু এক এক জনে এক এক পথ নিতে পারেন। ধরুন এমন কতকগুলি ব্যক্তির কথা, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে যাঁদের মধ্যে হয়ত রসায়ন-বিদ্যার দিকে একটা সহজ আকর্ষণ অভিব্যক্ত হয়েছে, শিক্ষার সুযোগ পেয়ে তাঁরা রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু তারপর যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সম্ভাবনা উপস্থিত হল, তখন কেউ বা রসায়ন সংক্রান্ত কোন শ্রমশিল্প, কারখানা বা ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিলেন, কেউ বা রসায়নের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন, কেউ বা ঝুঁকলেন রসায়নবিদের চাকরির দিকে।—অতএব যোগ্যতা বিচারের বেলায়, কোন বিষয়ে কার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে—শুধু সেইটুকু জানলেই চলে না, কোন্ ধরণের কাজের তিনি যোগ্য তাও ঠিক করা দরকার।

কে কোন্ কর্মের যোগ্য এবিচার করতে হ'লে দুটি জিনিস দেখা দরকার। এক, কার কোন কর্ম ভাল লাগে; অপর, যা ভাল লাগে সেই কর্ম করার শক্তিও সুযোগ তার আছে কিনা। সাধারণতঃ যে কর্ম যার ভাল লাগে, তাতে পটুত্ব অর্জন করার চেষ্টা তার পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তবুও যদি বা সুযোগ না থাকে, তাহ'লে পূর্ণ পটুত্ব লাভ সম্ভব হয় না।

উপরে বলা হয়েছে, কে কোন্ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে সাফল্য অর্জন করবেন, তার হদিস পাওয়া যাবে রাশি, গ্রহ ও ভাবের বর্ণ হিসাবে শ্রেণীবিভাগ থেকে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাতে সমান কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারবেন বা সমান পরিমাণে যশ, অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাবেন। এ নির্ভর করবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে যতখানি সম্ভাবনীয়তা আছে তার উপর। সুতরাং কার-কি ভাল লাগে, কিসে তার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে এবং কার কতখানি শক্তি বা সুযোগ আছে এ সবগুলি বিচার করলে, তবেই কর্মজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দেশ পাওয়া যাবে।

কার কোন্ বিষয়ে যোগ্যতা আছে বা কোন্ কর্মের দিকে আকর্ষণ আছে তা নির্ণয় করতে হ'লে, প্রথম দেখা দরকার রবিকে। একজনের জন্মকুণ্ডলীতে রবি যে রাশিতে ও যে ভাবে থাকে এবং যে গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ করে, তা থেকে তাঁর কি ভাল লাগবে না লাগবে, কোন্ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা প্রকাশ পাবে, তা নির্ণয় করা যায়। রবি কোন্ রাশিতে থাকলে বা কোন্ গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কি রকম ফল হয়, তা বলার আগে জ্যোতিষের মতে কর্মজীবনের নির্দেশ করতে হ'লে কি কি

প্রশ্নের সমাধান করতে হয় তাঁর একটা পরিষ্কার ধারণা আবশ্যক। প্রশ্নগুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে—

১। কোন্ কর্মের দিকে জাতকের আকর্ষণ থাকবে?

২। কোন্ কর্মে জাতকের সহজাত পটুত্ব থাকা সম্ভব?

৩। জাতকের কর্মশক্তি কতখানি থাকবে? তা তাঁর যোগ্যতার স্ফুরণের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি না?

৪। জাতকের পরিবেশ তাঁর কর্মের অনুকূলে হবে কি না? তাঁর শক্তি-বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাবেন কিনা?

৫। কর্মে জাতকের কতখানি সম্ভাবনীয়তা আছে? কর্মের দ্বারা তিনি কি পরিমাণ অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন?

এখন দেখা যাক্ রবির অবস্থান থেকে এসম্বন্ধে কতখানি জানা যায়। জ্যোতিষের মতে রবি কোন্ রাশিতে থাকলে কর্মের দিকে জাতকের সহজ আকর্ষণ অভিব্যক্ত হয় তা লিখিত হল।

মেষ রাশি

যে সব কাজে ঘন ঘন পরিবর্তন আছে, যা একটানা বা একঘেয়ে নয়। যে সব কাজে বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কাজ। সব রকম সাহসিক কাজ। Speculative কাজ। যে সব কাজে উদ্যম ও তৎপরতার প্রয়োজন।

বৃষ রাশি

যে সব কাজে পরিবর্তন কম, যা ধরা-বাঁধা নিয়মে চলে। সরকারী দপ্তরের কাজ। কৃষি, উদ্যান প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজ। গঠনমূলক কাজ। জায়গা-জমি সংক্রান্ত কাজ। যে কোন ব্যাপারে হোক্ পরিচালকের কাজ। সবরকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ, যাতে ধীর ও স্থির ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

মিথুন রাশি

লেখাপড়ার কাজ, গণিতজ্ঞ, হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারী, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ ইত্যাদির কাজ। শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ। দালালি, এজেন্সি প্রভৃতি কাজ। যে সব কাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ করতে হয় এবং যাতে অপরের সঙ্গে কোনরকম চুক্তি করা দরকার। যে সব কাজে হাতের কৌশল দরকার হয়।

কর্কট রাশি

জলসংক্রান্ত কাজ। জাহাজ বা জলযাত্রার কাজ। পূর্তকর্ম—খাল, কূপ, জলাশয় ইত্যাদি খনন, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের কাজ। যে সব কাজে নিজের দেহের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কৌশল দেখাতে হয়—নৃত্য, ব্যায়ামক্রীড়া, অভিনয় প্রভৃতি যে সব কাজে নতুনত্ব আছে বা যাতে ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। যে সব কাজে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে হয়। শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। মহাজনী, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি কাজ।

সিংহ রাশি

সব রকম সংগঠন-মূলক কাজ। পরিচালকের কাজ। যে সব কাজের সঙ্গে সাধারণের শিক্ষা বা আনন্দের সংশ্রব আছে। কৃষিকর্ম—পশু-পালন। রাজকর্ম, ধাতুসংক্রান্ত কাজ, চিকিৎসক, শিল্পী, সম্পাদক প্রভৃতির কাজ। যে সব কাজে সাধারণের কাছে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সুযোগ আছে। ছোট কাজের চেয়ে বড় বড় কাজের দিকে লক্ষ্য।

কন্যা রাশি

মানুষের সামাজিক জীবনে যা নিত্যপ্রয়োজন, সেই সকল ব্যাপারের সংশ্রবে কাজ। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, যানবাহন ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কাজ। শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ। সেক্রেটারীর কাজ। চিকিৎসা ও ঔষধাদি সংক্রান্ত কাজ। গান্ধর্ব বিদ্যা, কলাবিদ্যা, মণিকার, স্বর্ণকার প্রভৃতির কাজ ও অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ।

তুলা রাশি

যে সব কাজের মধ্যে শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়ার অবসর আছে, শিক্ষকতা, গুরুগিরি প্রভৃতি কাজ, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতির বিশেষজ্ঞের কাজ। ব্যবসা-সংক্রান্ত সব রকমের কাজ। জল-পথে বাণিজ্য, তরল পদার্থের বাণিজ্য, কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য, শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা প্রভৃতি। সবরকম কলা ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ।

বৃশ্চিক রাশি

সেই সব কাজ যাতে গোপনীয়তা আবশ্যক, যার সঙ্গে কোন বিপদ অথবা মৃত্যু জড়িত আছে। সব রকমের confidential কাজ। দেহ-চিকিৎসার কাজ। ডিটেক্টিভ, রাষ্ট্রদূত, যুদ্ধ বা সৈন্যবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। Mill, factory ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। খনি-সংক্রান্ত কাজ। সব রকম সাহসিক কাজ।

ধনু রাশি

যে সব কাজে মন্ত্রণা, শিক্ষা অথবা উপদেশ-দানের সংশ্রব আছে—শিক্ষকতা, পৌরোহিত্য, গুরুগিরি, মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি! যে সব কাজের সঙ্গে দেশের আইন, সমাজ-গঠন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সংশ্রব আছে। আইন-বিদের কাজ, চিকিৎসকের কাজ প্রভৃতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা, পশুপালন প্রভৃতি। পূর্ত-কর্ম, নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রাদি নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট-নির্মাণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম।

মকর রাশি

যে সব কাজে একটানা পরিশ্রম, গভীর অভিনিবেশ ও বিশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন। সবরকম গবেষণার কাজ। সব রকম সংগ্রহের কাজ। ব্যাঙ্কিং, মহাজনী প্রভৃতি কাজ। সব রকমের কুটীরশিল্পসংক্রান্ত কাজ এবং সেই সব কাজ যাতে জনতা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হতে পারেন, সরকারী বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজ, বড় ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানে পরিচালকের কাজ।

কুম্ভ রাশি

যে সব কাজে মৌলিকতা দেখাবার সুযোগ আছে এবং কোন রকম অভিনবত্ব আছে। সব রকম পরিকল্পনার কাজ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মূলক কাজ। ইলেক্ট্রিক, রেলওয়ে, রেডিও, বিমান ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। ব্যাঙ্কার, একাউণ্ট্যাণ্ট প্রভৃতির কাজ। রাষ্ট্র বা সমাজের সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। যে সব কাজের সঙ্গে গোপনীয়তার সংশ্রব আছে।

মীন রাশি

যে সব কাজে বুদ্ধি-কৌশলের চেয়ে প্রেরণার অবকাশ বেশী। কলাবিৎ ও শিল্পীর কাজ। ভাস্কর্য বা স্থাপত্য বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। জলজ পদার্থ বা তরল দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। জলযাত্রা, বিমান-পথ প্রভৃতির সংশ্রবে কাজ। রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ। যে সব কাজে হিসাব-নিকাশ, পরিসংখ্যান ইত্যাদির সংশ্রব আছে।

একটি নির্ব্বাচন কাহিনী

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(নক্সা)

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ফরাসী-ইন্দোচীনের পূবদিকে চীন সাগর আড়াআড়ি পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ। এদের অবস্থান 'ওয়ালেস'-রেখার পশ্চিমদিকে অর্থাৎ জীব-জন্তু গাছপালার প্রকৃতির দিক দিয়ে এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে এদের জ্ঞাতিত্ব আছে। তা'হলেও সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ পর্য্যন্ত এগিয়েও প্রাচীন ভারতীয়েরা যেমন দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর হিংস্র জন্তুদের পাল্লায় পড়ে বোর্নিও দ্বীপে ঢোকেন নি, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজের পর চীন সাগরের টাইফুনের ধাক্কা খেয়েই সম্ভবত তাঁরা আর এই দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগোতে পারেন নি! তা' না হ'লে হয়তো আজ এদের নাম 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ' না হ'য়ে নাম হ'তো 'কৃত্তিকা-দ্বীপপুঞ্জ' বা 'ছায়াপথ-দ্বীপমালা'।

তবে এই দ্বীপগুলি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত —তাই হয়তো এদের অধিবাসীদের ভাগ্য ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধরগণের ভাগ্যেরই কতকটা অনুরূপ। এইখানে ব'লে রাখা ভাল—ফিলিপিনোদের কথায় প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জ্জন দ্বীপের বা আফ্রিকার অন্ধকার অঞ্চলের কোন অরণ্যচারী, সভ্যতার আলোক বিবর্জ্জিত, অপক্ক মাংস-ভোজী আদিম বর্ব্বর জাতির কথা কারো মনে না হয়—কারণ, ভারতীয় প্রভাব পাক্ আর নাই পাক্, ফিলিপিনোরা একটি প্রাচীন সমাজ-বদ্ধ জাতি; চিন্তা-ধারায়, কৃষি-প্রণালীতে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যে তাদের একটা নিজস্ব সভ্যতার ঐতিহ্য আছে। অবশ্য পার্ব্বত্য বন্যজাতি সেখানেও অল্প স্বল্প আছে, কিন্তু তা'রা স্বতন্ত্র থাকে আর তাদের ভাষাও স্বতন্ত্র—এবং আমাদের সঙ্গে সাঁওতাল, কোল প্রভৃতির সম্পর্ক যে রকম, ফিলিপিনোদের সঙ্গে তা'দের সম্পর্ক সেই রকমেরই।

আমাদের ওপর দিয়ে যেমন কয়েকশো বছর ধ'রে তুর্ক-মোগল আর ইংরেজ শাসনের ঝড় ব'য়ে গেল, এদের ওপরেও তেমনি অনেক বছর ধ'রে পর পর স্প্যানিশ ও আমেরিকান শাসন চেপেছিল। ফলে, আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি, ও সামাজিক জীবন-ধারার ভিৎ যেমন অনেকটা আল্‌গা হ'য়ে গেছে, রাজনৈতিক চিন্তাধারারও যেমন পরিবর্ত্তন হয়েছে—এদের জীবনেও তেমনই নানা রকম পাশ্চাত্য-প্রভাব—বিদেশী মাল-মশলা এসে প'ড়েছে! কিন্তু গ্রামবাসী ফিলিপিনোর মনে এই প্রভাব তেমন গভীরভাবে এখনো পৌছয় নি। গ্রাম্য কৃষক-জীবনে সেই প্রাচ্যধারা—ভারতের কৃষক-পল্লীতে যেমন দেখা যায়! গোষ্ঠীতে বিভক্ত সমাজ—গাছ নিয়ে, ফল নিয়ে, জমি নিয়ে ঝগড়া; মোরগের লড়াই দেখে আর সস্তার জুয়াখেলে আনন্দ, অথচ বংশ-গরিমার ফাঁকা আভি-জাত্য বোধে সচেতন। এখনো, এদের গ্রামের রাস্তায় একখানা মোটরগাড়ী এলে গ্রামশুদ্ধ লোক দৌড়ে দেখতে আসে! এ সত্ত্বেও আধুনিক কিছু কিছু নিয়ম গ্রাম-বাসীদেরও মেনে নিতে হয়েছে, যেমন—পাঞ্চায়েত নির্ব্বাচন প্রথা।

এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত লুজান-দ্বীপের একটি গ্রাম্য-সহরে কি ভাবে একবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হয়েছিল সেটাই এই কাহিনীর বর্ণনার বিষয়। কাহিনীটির বক্তা একটি ছোট ছেলে—বয়স খুবই অল্প। চাষার ছেলে—লেখাপড়ার বালাই নেই। বাপের একটু আদুরে—বাপের সঙ্গেই থাকে—মাঠে কাজও করে আবার বাপ আদর করে বিড়িটা আসটা কিংবা তাড়িটা পোচুইটা প্রসাদ দিলে খেতেও আপত্তি করে না। তবে এর দেখবার চোখ আছে। নেহাৎ ছোট বলেই হয়তো অন্তরে এর কোনো কিছুর গভীর ছাপ পড়ে না—শুধু যা' দে'খে মুগ্ধ-কৌতূহলেই তা' লক্ষ্য করে, আর ছবি দেখার মত অবিকল তার বর্ণনা করে যেতে পারে। ছেলেটি তার প্রত্যক্ষ দেখা সেই নির্ব্বাচন-কাহিনী বর্ণনা করছে এইভাবে :—

চার বছর পরে আমাদের শহরের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় এল, আর সেই সময় মাঠের বাড়ী ছেড়ে বাবার সঙ্গে আমি আমাদের শহরের বাড়ী চলে এলুম। দেখলুম, ভোটের সময়টা হচ্ছে বাবার আনন্দে সময় কাটাবার একটা অবসর—কারণ এই সময়ে তাঁর অনেক পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হ'লো। তাঁদের কথা-বার্ত্তায় এটা জানতেই পারলুম যে যেবার অন্ততঃ পাঁচ ছ'জন প্রার্থী না দাঁড়ায়, সেবার তাঁরা ভোট দিতে আসেন না। তা'র কারণটা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। তবে, সেবার আমার কাকা ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, আর আমিও একটু বড় হয়েছি—তাই বাবা আমায় সঙ্গে ক'রে সব যায়গায় ঘুরেছিলেন এবং আমিও সব কিছু দেখবার সুযোগ পেলুম।

শহরে আসতেই কাকা বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন—দাদা, জিতবো ব'লে মনে করো ?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কটা শূয়ার মেরেছো ?

কাকা—দশটা।

বাবা—কটা খাসী মেরেছো ?

কাকা—কুড়িটা।

বাবা—কটা মোরগ ?

কাকা—পঞ্চাশটা।

বাবা—এই পর্য্যন্তই… ?

কাকা—আর—হ্যাঁ—গাঁয়ের খামারে আমার দশটা ষাঁড় আছে।

বাবা—কাউকে পাঠাও—সেগুলো নিয়ে আসতে।

কাকা তখন জিজ্ঞেস ক'রলেন—এটা কি একান্তই দরকার দাদা ?

বাবা ব'ললেন—তুমি প্রেসিডেণ্ট হ'তে চাও তো…?

কাকা বললেন—নিশ্চয়ই !—ব'লে, এদিক ওদিক কিছুক্ষণ বেড়িয়ে যেন আপন মনেই ব'লে উঠলেন—আচ্ছা …তাই-ই করি !

আমার কাকার উপজীবিকা ছিল জুয়াখেলা এবং আমাদের সেই আধা-শহরের অধিবাসীদের মান অনুসারে কাকাকে ভাল লোকই বলা চলে। লোকেরা যা থেকে কোন লোকের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় তা কাকার যথেষ্টই ছিল—তাঁর ঘরে বড় বড় আর্সী, সোনা দিয়ে বাঁধানো তাঁর দাঁত এবং তাঁর ছেলে মেয়ের সংখ্যাও চোদ্দ !

জুয়ার ব্যাপারে কাকার যে সব দালাল ছিল অর্থাৎ যারা তাঁর লড়ায়ে মোরগের ওপর বাজী ধরবার জন্য লোক সংগ্রহ করতো, তারাই এখন তাঁর ভোট সংগ্রহের জন্য ক্যান-ভাস ক'রে বেড়াচ্ছে—তা'রা সব লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবাইকে কাকার বাড়ীতে এসে ভোজ খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল !

বাবা আর আমি খুব সকালেই কাকার বাড়ীর উঠানে গেলুম। দেখলুম, লম্বা লম্বা তক্তা ফেলে সাতটা খাবার টেবিল তৈরী করা হয়েছে। খাবার সাজানোই আছে। সবে সকাল হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট ভীড় ! ওপরটা নারকেল ও কলাপাতা দিয়ে ছাওয়া, সেইজন্যে নিচেটা একটু অন্ধকার —অবশ্য কয়েকটা কেরাসিন তেলের ল্যাম্প ঝুলছে। আমরা একটা টেবিলে বসলুম এবং পরিবেশনকারীদের নানারকম খাবারের ফরমাজ করতে লাগলুম, বাবার দিকে চেয়ে দেখি তাঁর কোমরে প্রকাণ্ড একটা ক্যাম্বিসের থ'লে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে ! তাঁর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সেটা নিচে অবধি ঝুলছে। যখনই কোন সুস্বাদু খাদ্য তাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি অমনই থলের মুখটা ফাঁক ক'রে সেগুলা তা'র ভিতর চালান ক'রে দিচ্ছেন ! থলেটা পোলাও মাংস প্রভৃতিতে ভ'রে উঠছে ! একটা কুকুর টেবিলের তলায় ঢুকে থলেটায় কামড় দিলে ! বাবা তা'কে একটা লাথি কসালেন ! কুকুরটা আবার এসে থ'লেটা কামড়ে ধ'রে একটা টান দিলে। বাবার কোমরে যে দড়িতে সেটা বাঁধা ছিলো—তা' ছিঁড়ে গেলো। কুকুরটা সট্‌কাবার তালে ছিলো কিন্তু বাবা তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় ঢুকে এক হাতে থলে আর এক হাতে কুকুরটার ল্যাজ ধ'রে টানতে লাগলেন। থলের মালিকানার জন্যে টেবিলের নিচে দু'জনের লড়াই চলতে লাগল। আমি টেবিলের নিচেয় উঁকি মেরে দেখি যা'রা খেতে ব'সেছে তাদের সকলেরই দু'পায়ে-চাপা একটি ক'রে ঐ রকম খাবার-ভর্ত্তি থ'লে রয়েছে। বাবা এইবার টেবিলের তলায় শুয়ে পড়ে কুকুরটার পেটে কঁ্যাৎ ক'রে একটা লাথি মারলেন—কুকুরটা ছিট্‌কে পড়লো—টেবিলটা গেল উল্টে ! মাটির প্লেট ভাঁড় যা কিছু তার

ওপরে ছিলো—তা-ও গেল উল্টে সব। যা'রা খাচ্ছিল তাদের সকলেরই গায়ে ঝোল ভাত সব চল্‌কে উঠে ছিটে লাগ্‌ল! কিন্তু তারা না উঠেই তাড়াতাড়ি সে সমস্ত মুছে ফেললে এবং পরিবেশন-কারীদের নতুন প্লেট প্রভৃতি আনতে ব'ললে। তারপর, যেন কিছুই হয়নি—এই ভাবেই খেতে এবং ভরতি করতে লাগল! বাবা এইবার থলের মুখ বেঁধে ফেল্‌লেন এবং গুঁড়ি মেরে টেবিল থেকে উঠে প'ড়লেন। সদর গেটে না গিয়ে তিনি একটা কোণের দিকে গেলেন এবং আমাকে ইসারা করলেন। আমি বেড়াটা টপ্‌কাতে বাবা আমার হাতে থলেটা দিলেন। তারপর আমরা দু'জনে বাড়ী গেলুম। বাড়ী গিয়ে একটা প্রকাণ্ড গামলায় খাবার-গুলা উজোড় ক'রে বাবা খালি থলেটা পাকিয়ে হাতে নিলেন এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে দ্বিতীয় প্রার্থীর বাড়ীর দিকে এগোলেন।

দ্বিতীয় প্রার্থীকে সকলে জজ সাহেব ব'লে ডাক্‌তো! অবশ্য জজ তিনি কোনকালে কোথাও ছিলেন না—তবে জজদের মতন হাতে একটা কালো রংএর ছড়ি ও মাথায় পানামা-টুপি সব সময়েই তাঁর দেখা যেতো! তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি—তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তায় লোকেদের একটা লম্বা লাইন হ'য়েছে! দেখলুম, এরা সেই সব লোক, যা'রা একটু আগে কাকার বাড়ীতে খাচ্ছিল।—আমরাও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। জজসাহেব গ্রামের ট্যাক্স-আদায়-কারীর সঙ্গে গেটের বাইরে এলেন। তাঁর বড় ছেলে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার নিয়ে এলো। ট্যাক্স-ওয়ালা বস্‌ল চেয়ারে, হাতে তার একটা খাতা; 'জজসাহেব' আর তাঁর ছেলে বস্‌ল টেবিলটার দু'ধারে। এইবার লাইনের প্রথম লোকটি এগিয়ে গেলো। জজ তার সঙ্গে 'শেক-হ্যাণ্ড' ক'রে বল্‌লেন—তোমার এ বছরকার ব্যক্তিগত ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে?

সে বল্‌লে—না।

—এখানে নাম সই ক'রো, তাহ'লেই দেওয়া হ'য়ে যাবে।

—আমি যে লিখতে জানি না—জজ!

—তোমার নাম কি?

সে নাম বল্‌লে। 'জজের ছেলে তার নাম লিখে নিলে এবং তার হাতে একটি নগদ টাকাও দিলে। পরের লোকটি লিখতে জানে সে ঠিক যায়গায় নাম লিখলে।—তাকেও একটী নগদ টাকা দেওয়া হ'লো।—এই ভাবে লাইন এগিয়ে চল্‌লো, কিন্তু কমবার যেন লক্ষণ নেই! ক্রমে এলো আমার পালা। জজ একবার ভালো ক'রে আমার দিকে তাকালেন, বল্‌লেন—তোমার নাম কি?

নাম বল্‌লুম।

জিজ্ঞেস করলেন—বয়স কত?

বল্‌লুম—ন বছর।

বললেন—তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ট্যাক্স দিতে হয় না?

বাবা পিছনেই ছিলেন, বললেন—একদিন ও দেবেই…।

সব লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।—হাসতে হাসতে তাদের দম বন্ধ হবার জোগাড়। 'জজ' আমাকে একটা টাকা দিলেন—কিন্তু আমার নাম আর কেউ লিখলে না। এরপর আমরা তৃতীয় প্রার্থীর বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলুম!

এই লোকটি একজন গাঁতিদার এবং প্রচুর ধান-জমির মালিক, এর বাড়ীর সদরে অনেকগুলি বড় বড় ধানের গোলা। আমরা ফটকের কাছে গিয়ে দেখলুম—সেই সব লোকই সেখানে রয়েছে—যাদের আমরা কাকার বাড়ী এবং 'জজসাহেবের বাড়ীতে দেখেছিলুম! আধমুনে এক একটা ধানের বস্তা ঘাড়ে ক'রে তারা একে একে বেরিয়ে আসছিল। আমরা তাড়াতাড়ি একটা বড় গোলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। বাবা আগে ছিলেন—তাঁর প্রাপ্য বস্তাটা নিয়ে লাইন ছেড়ে একটু দূরে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গাঁতি-দার আমার দিকে একটা বস্তা ছুঁড়ে দিলেন। সেটাকে দু'হাতে ধরতে গিয়ে আমি উল্টে পড়লুম। গাঁতিদার বললেন—বড্ড ছেলে-বয়সে ভোট দিতে বেরিয়েছ তুমি!

আমি বল্‌লুম—বড় হয়ে আমি আপনাকেই ভোট দেব।

—বাঃ, বেশ মিষ্টি কথা তো তোমার ছোক্‌রা—ব'লে তিনি আমায় আর একটা বস্তা ছুঁড়ে দিলেন। বাবা আর আমি বস্তাগুলা নিয়ে বাড়ী গেলুম। সেখানে একটা টেবিলের নিচে সেগুলা রেখে চতুর্থ প্রার্থীর ঘাটির দিকে আমরা যাত্রা করলুম।

চতুর্থ প্রার্থী একজন মহিলা—নাম মেরিয়া—বয়স একুশ। ম্যানিলায় পড়াশুনা করেছেন। এঁর চুল খাটো ক'রে কাটা এবং ঠোঁট লাল রংএ পেণ্ট করা। সহরের স্কুল-বাড়ীটাই হয়েছে এঁর নির্ব্বাচনী অফিস। আমরা

যখন পৌঁছলুম—তখন তিনি স্কুলের উঠানে জমায়েত স্ত্রী পুরুষদের উদ্দেশ করে কি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে একটা বেঞ্চিতে ব'সে তাঁর কথা শুনতে লাগলুম। তিনি চীৎকার ক'রে বলছিলেন—স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দেওয়া হোক্—পুরুষদের মত তাদেরও জন-সাধারণের ভিতর—জন-সাধারণের জন্য কাজ করতে দেওয়া হোক্! লোকেরা হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো এবং তাদের টুপি আকাশে ছুঁড়্‌তে লাগলো। বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্ল্যাটফরমের ওপর মহিলাটির পাশে গিয়েই দাঁড়ালেন এবং তাঁর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে ব'লে উঠ্‌লেন—ঠিক্, মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হোক্।

মেয়েটি বাবার হাত ধ'রে টেনে তাঁকে প্ল্যাটফরমের ধারের কাছে নিয়ে এলেন ; তারপর সমবেত জনতার দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—এই সরল প্রকৃতির কৃষক ভদ্রলোকটি যা বললেন, আপনারা সবাই শুনলেন তো? ক'জন আপনারা এঁর মত পোষণ করেন ?

প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে আনন্দ-ধ্বনি করলে।

বাবা ব'লে উঠলেন—এইতো চাই—আসুন কমরেডগণ ! —একটা নতুন রকমের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংঘবদ্ধ-ভাবে চেষ্টা করি !—লোকেরা আবার আনন্দধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। বাবা এই ফাঁকে টুক্ ক'রে স'রে পড়ে প্ল্যাট-ফরমটার পিছনদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, মহিলাটি এক বোতল দিশী মদ বাবাকে দিতে এলেন। বাবা ভালমানুষী দেখিয়ে বললেন—আমি তো—ও সব—

মহিলাটি বললেন—তা'তে কি হয়েছে—নিন।

বাবা এমন ভাবটা দেখাচ্ছেন যেন ছোঁবেন-ই না! কাজেই আমাকেই বোতলটা নিতে হ'লো। কিন্তু মহিলাটি ওপাশে চ'লে যেতেই বাবা সেটা ছোঁ-মেরে আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন! এর পর আমরা পরবর্ত্তী প্রার্থীর বাড়ীর দিকে চললুম।

এঁর নাম হচ্ছে 'বেন'। আগে 'বেঞ্জামিন' ব'লেই সবাই জান্‌তো এঁকে। একবার আমেরিকায় গিয়ে ইনি নামটা ছোট ক'রে এসেছেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যা সাতটা হ'য়ে গেছে। ভোটাররা রাস্তা দিয়ে এ প্রার্থীর বাড়ী ও প্রার্থীর বাড়ী ক'রে বেড়াচ্ছে। আমরা 'বেন'-এর বাড়ী পৌছে দেখলুম বাড়ীটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হ'য়েছে। প্রাঙ্গণের একধারে মিষ্টি বাজনার মজলিস চলেছে, ওধারে—গাছের নিচে নাচেরও আয়োজন! মাঝখানে—তিন-দিক-ঘেরা একটা মঞ্চের মতন—সেখানে 'বেন' দাঁড়িয়ে আছেন। বাজনা থামতেই তিনি হাততালি দিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, তারপর বললেন—ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! আপনারা এইবার হলিউডের একটি চমকপ্রদ বাজনা শুনুন!

পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলো। পিছনের পর্দ্দা ঠেলে মঞ্চের ওপর 'বেন'-এর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন! এঁর বাড়ী টেকসাসে—মেক্সিকান মেয়ে। তিনি এসে একটা অদ্ভুতাকৃতি বাজনা নিয়ে বাজাতে বসলেন। সুরটা অবশ্য খাঁটি হলিউডের নয়—তবে হলিউড আর ব্রেজিলের নাচের সুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। সেটা শেষ হ'লে মেয়েটি প্ল্যাটফরমের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর ওপরের পরিচ্ছদটা আস্তে আস্তে খুলে ফেল্‌লেন। মেয়েরা নিঃশেষ ফেলতে লাগলো—পুরুষেরা ডিঙি মেরে দেখতে লাগলো—ক্রমে তা'রা প্ল্যাটফরম ঘেঁষে এগিয়ে গেল—আর এমনভাবে দেখছিল, যে তাদের চোখের তারা ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছিল! অদ্ভুত মেয়েটি একে একে সব পরিচ্ছদ খুলে ফেল্‌ছে!—শেষকালে তার অঙ্গে খুব পাতলা, টাইট একটি পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই রইল না!—এই সময় সামনের পর্দ্দা পড়লো!

লোকেরা পাগলের মত চীৎকার করতে লাগ্‌লো! আবার পর্দ্দা উঠ্‌লো—লোকেদের উল্লাস দেখে কে! বাবা তো মাটি থেকে এক লাফ দিলেন। আবার পর্দ্দা পড়্‌লো এবং মঞ্চের আলো নিভে গেল!

কিন্তু সকলে সেখানে ব'সেই অনেকক্ষণ গল্পগুজব কর্‌তে লাগলো। তারপর উঠে, ভোট দেবার জন্য তা'রা পঞ্চায়েৎ-ভবনের দিকে পা বাড়ালে!...

আমি পঞ্চায়েৎ-ভবনের দরজার কাছে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। তিনি ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসতে আমরা আবার কাকার বাড়ী গেলুম। সেখানে সেই একই দৃশ্য—গাদা গাদা লোক আস্‌ছে, খাচ্ছে আর

থলে ভর্ত্তি করছে।…প্রায় রাত বারটা অবধি এই রকম চললো!—আর হল্লা, স্লোগানের ঠ্যালায় সারারাত্রিই সহর সরগরম হ'য়ে রইলো।—

…সকালে আবার বাবার সঙ্গে পঞ্চায়েৎ-ভবনের দিকে গেলুম। সেখেনে একটা বোর্ডে খড়ি দিয়ে ফলাফল লেখা রয়েছে। সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন 'বেন'! কাকা দ্বিতীয়! বাবা সত্যই দুঃখিত হ'লেন।—কারণ, যাই করুন—তিনি কাকাকেই ভোট দিয়েছিলেন।

আমরা রাস্তায় কারো দিকে না তাকিয়েই বাড়ীর পথে চল্‌লুম। কিন্তু বাজারের কাছে পৌঁছাতেই আমার এক খুড়তুতো ভাই এসে বাবাকে জানালে যে কাকা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা তাড়াতাড়ি কাকার বাড়ী গেলুম। বাবাকে দেখেই কাকা বললেন—দাদা, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।

বাবা বললেন—তুমি কি বল্‌ছো—তাতো বুঝতে পারছি না সার্জিও!

কাকা বললেন—এইমাত্র খবর পেলুম 'বেন' হার্ট-ফেল ক'রে সকালেই মারা গেছে। আর, আমিই এখন হলুম প্রেসিডেণ্ট!

আনন্দে বাবা কাকাকে জড়িয়ে ধরলেন!

ক্ষয়রোগ কথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে যখন তপস্বী তাঁর সেই তপস্যাগত তত্ত্বকথা বলেন—তখন সেই কথা হয় কথামৃত। সে কথার মূল্য কথার কারবারের বাটখারায় ওজন করা চলে না। ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর 'ক্ষয়রোগ কথা' তেমনি ধরণের কথা। ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীকে জানি ব'লেই এমন কথা নির্ভয়ে বলছি।

'ক্ষয়রোগ কথা' বইখানি আমাদের বহু সমস্যাসঙ্কুল—অন্ন বস্ত্র অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ বাসস্থানগত বহুসমস্যাজর্জ্জরিত এই দেশের পটভূমিতে সর্ব্বনাশা যক্ষ্মারোগের ব্যাপক প্রসার ও তার ভয়াবহতার কথা এবং এই ভয়াবহ রোগ মাধ্যমে মৃত্যুর আক্রমণের গতি প্রতিরোধের উপায়ের কথা তিনি আলোচনা করেছেন। পথের তিনি নির্দ্দেশও দিয়েছেন। আজকাল অন্তত আমাদের দেশে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হয়েও সে বিষয়ে গুরুগম্ভীর কেতাব অনেকে লিখে থাকেন; এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ না ক'রেও রণকৌশল রণনীতিবিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কেতাব লিখেছেন অনেকে; মারণাস্ত্র সম্পর্কেও গবেষণা করেছেন। ক্ষয়রোগ ও তার প্রসার সম্পর্কেও অনেকে এমন বই লিখেছেন। তাঁরা চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক নন। তাঁরা অনেক পড়াশুনা করেছেন। সে সব বই অনেক উপকার অবশ্যই করেছে। কিন্তু ডাঃ অধিকারীর গ্রন্থের আলোচনা—সে সব থেকে স্বতন্ত্র। তার কারণ রোগতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান--সর্ব্বোপরি রোগ প্রসারের ক্ষেত্র এই দেশভক্ত ডাক্তার অধিকারীর বিদ্যায় বুদ্ধিতে উপলব্ধিতে তিন চক্ষুর দৃষ্টিতে অধীত। আরও একটি বড় কথা—ডাক্তার অধিকারী বিচক্ষণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ছাড়াও সাহিত্যে অনুরাগী এবং গোপনে একজন সাহিত্যিকও বটেন। এই কারণেই 'ক্ষয়রোগ কথা' একটি বিশেষ মূল্যমানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বইখানির রচনাভঙ্গির কথাই আগে বলি। সেইটেই প্রথমেই পাঠককে আকর্ষণ করবে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় ডাক্তার অধিকারীর লেখনী কোথাও আড়ষ্ট হয় নি, সরস প্রাঞ্জলতায় সহজ গতিতে—ডাক্তার অধিকারী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করে গেছেন। এবং তাঁর ভাষা সম্পূর্ণ রূপে আধুনিক রীতিসম্মত ভাষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তার গোড়ার অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

"গল্প লিখে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে যে রচনা তাকেই 'কথা' বলা হয়। 'কথার' আদর অনাদি যুগ থেকে। গণিতের অঙ্ক অনেকেই মাথায় রাখতে চায় না, ন্যায়ের বিচার সব সময়ে ভাল লাগে না, ইকনমিক্‌সের থিয়োরিগুলো যখন চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তখন তত্ত্ব বা ইতিহাস কথায় বললে শ্রুতিসুখকর হয়। বেদে, বাইবেলে এ জন্য উপাখ্যান অংশ প্রচুর।"

এ রচনার বাঁধুনী, দীপ্তি, ব্যঞ্জনা নিজেকেই নিজে ব্যক্ত করছে। 'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না' অর্থাৎ তার পরিচয় পৈতের অপেক্ষা রাখে না—এ কথাটা যেমন সত্য তেমনি ব্রাহ্মণের দীপ্তি প্রসন্নতা ও তপস্যার চিহ্ন যে অপরিচিত জনের মুখে থাকে—তাঁর পরিচয়ও উপবীতের অপেক্ষা রাখে না—এ কথাও তেমনিই সত্য। এবং ডাঃ অধিকারীর 'ক্ষয়রোগ কথা'য় উপাখ্যানভাগ না থাকলেও—কথা সাহিত্যের মতই পাঠককে আকর্ষণ করবে।

তাঁর বক্তব্যের কথা সম্পর্কে আলোচনা করবার ঠিক যোগ্য ব্যক্তি আমি নই। এ দিক দিয়ে আমি করেছি—যোগী দেখে যোগের বিচার। সর্ব্বকালেই এমন অনেক হঠযোগী আছেন—যাঁরা হঠযোগ দেখিয়ে মানব-সমাজের বিস্ময় উদ্রেক করে থাকেন। অনেক সময় এমন সব যোগীর অনেক শোচনীয় পরিণামের কথা শোনা যায়। এঁরা না করেন মানব-সমাজের কল্যাণ, না করেন আত্মকল্যাণ। এঁরা করেন আত্মপ্রতিষ্ঠার

সাধনা। তাই এ সব ক্ষেত্রে যোগীকে বিচার করাই তাঁর যোগমাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য এতে ডাঃ অধিকারী হয়তো সঙ্কুচিত হবেন। হয়তো বা যে স্বরূপটি তিনি সযত্নে সমাজের বহিঃপ্রাঙ্গণে ঢাক ঢোল কাঁসীর আসর থেকে গোপন রেখেছেন—সে রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। তা পড়ুক।

ডাঃ অধিকারী আজ প্রবীণ হয়েছেন। নবীন বয়সেই তিনি দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়া শেষ ক'রে ইংলণ্ডে গিয়ে এই ক্ষয়রোগ সম্পর্কেই বিশেষ অধ্যয়ন করে আসেন এবং এ কাল পর্যন্ত এই রোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবেই শুধু চিকিৎসা করে আসছেন। শুধু তাই নয়—এ কাল পর্য্যন্ত এই রোগ সম্পর্কে সর্ব্বাধুনিক ইউরোপীয় গবেষণার সঙ্গে পরিচয় রাখবার জন্য—জ্ঞান লাভের জন্য—তৃষিত বিদ্যার্থীর মত আরও বহুবার ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই রোগ সম্পর্কীয় গবেষণাগারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে চলেছেন।

অন্যদিকে ডাক্তার অধিকারী আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদকে অবহেলা করেন নি। চরক সুশ্রুত অধ্যয়ন ক'রে প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে ও সমাজে ক্ষয়রোগের রূপ, তার চিকিৎসা এবং এ রোগের সেকালে প্রকোপ এবং প্রসার সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন—ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে। কালের প্রভাবে আমাদের সমাজে যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ভাঙন ধরেছে, তারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধুমাত্র পুঁথির মাধ্যমে নয়—কলকাতার এই খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। মানুষের বাইরের অবস্থা জানেন—তাদের মনের অবস্থা জানেন।

বাংলার প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে—সেই সঙ্গে আছে সমাজবিজ্ঞানে দখল—সে সম্পর্কে আধুনিকতম দৃষ্টি এবং বহু অধ্যয়ন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় তাঁর মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। সে দৃষ্টির দক্ষিণ বা বামে পক্ষপাতিত্ব নেই। সেই কারণে তাঁর আলোচনা হয়েছে সত্য এবং সম্পূর্ণ। বাংলা দেশের পল্লী সম্পর্কে আলোচনায় তিনি লিখেছেন—

"এক সময়ে গ্রামে বাস বড়ই আনন্দের ছিল; বিশেষত যাঁরা সহরে বেশ কিছুকাল থেকেছেন, বিশ বছর আগেও গ্রামে যেতে তাঁরা আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতেন!

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ম্যালেরিয়া গত সত্তর বৎসর খুবই কষ্ট দিয়েছে। প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারেই বাংলার বাহিরে বৃহত্তর বাংলা স্থাপিত হয়েছে বলা যায়।

এ ম্যালেরিয়াও কয়েক বৎসরে খুবই কমে যাবে মনে করা যাচ্ছে! পাঁকল ডোবার সংস্কার সুরু হয়েছে। ডি ডি টি মশা কমিয়েছে অনেক! ঔষধের নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া ফুটে উঠবে না।"

আবার এ কথাও তিনি অসংকোচে লিখেছেন—বাংলার কৃষক সম্পর্কে—

"সুদ দিতে দিতে সর্ব্বস্বান্ত; ফলে গরু লাঙল ক'জনার আছে হিসেব করে বলতে পারি না আজও।......কৃষাণের জমি নেই, অথচ কৃষক উপাধি আছে এদের।"

মধ্যবিত্ত সম্পর্কে লিখেছেন—

"জমী চাষ ক'রে দেয় অন্য লোকে, তাঁরা ভাগ পান। জমিদার আর কৃষকের মাঝখানে পত্তনীদার দরপত্তনীদার গাঁতিদার অনেক রকম তালিকা আছে।......সরকার ও লাঙলধরা কৃষকের মাঝখানে যে কতগুলি মধ্য পদ আছে—তাদের লোপ করা সুকঠিন।"

খাদ্যাভাব সম্পর্কে লিখেছেন—

"ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। বাংলার প্রজা বায়ু পিত্ত-কফ ত্রিদোষের কথা জেনেও—নির্লজ্জভাবে পূর্ব্ব পুরুষের ধারা বদলিয়ে কুপথ্য খায়।"

চিকিৎসা সম্পর্কে লিখেছেন—

"চিকিৎসা যেখানে কিনতে হয় সেখানে বড়লোকের এক ব্যবস্থা, গরীবের অন্য ব্যবস্থা এ হয়ে ওঠে বিধিলিপি।" এই কারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে বলেছেন—

"ব্যাধি যদি রাজ্যের অনবধানতায় প্রসার পায় বা ব্যাধির কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রতন্ত্রের অমনোযোগ বলে গণ্য হয় তা' হ'লে করদাতা প্রজার ব্যাধির চিকিৎসা, ব্যবস্থার দায়িত্বও রাষ্ট্রই গ্রহণ করবে—এ চিন্তাও খুব স্বাভাবিক। গরীব চিকিৎসা বা খাদ্য পাবে না, পানীয় পাবে না—জনকতকই পাবে এটা সুবিচার নয়।"

ডাঃ অধিকারী মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সমস্যা আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। লিখেছেন—"আলোচনা শুধু রূপটা কি বা তার চিত্র অঙ্কন নয়, সে রূপ কেন নিয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হয় নিরপেক্ষভাবে। জাতিপ্রেমের দোহাই দিলে সত্য রূপ ধরা পড়ে না। পক্ষান্তরে দেশের দৈন্যে, সমাজ-জীবনের বৈকল্যে যে উল্লাস বোধ করে সে পৈশাচিক স্বভাবেরই পরিচয় দেয়।"

এই কারণেই তিনি নিঃসংশয়ে বলতে পেরেছেন—

"প্রায় দুশো বছর ইংরেজের রাজশক্তির ছত্র ছায়ায় ভারতবর্ষে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নি। কিন্তু তাই বলে যদি কেউ মনে করেন—এখনও পরিবর্ত্তন হতে অনেক বিলম্ব—পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছরের কম নয় অথবা আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকব—তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বা পরাধীন মনোভাব ব্যক্ত করছেন।" অবশ্য উদ্দেশ্যমূলকও হতে পারে এমন মনোভাব।

বইখানি মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের শিরোনামা "কথা", দ্বিতীয় ভাগের শিরোনামা 'ব্যক্তি ও সমাজ'। কথা ভাগটি মোটামুটি ৭২টি ছোট বড় অধ্যায়ে ভাগ করা। রাষ্ট্রের সমস্যা, স্বাধীনতার পরে; সমস্যার গুরুত্ব, জন্মহার, ছাত্র ছাত্রী, যুদ্ধের পর দক্ষার বন্যা, চায়ের দোকান, পল্লীসমাজ, কৃষক, খাদ্য, খাদ্য মন্ত্রী, রেশন চালু রাখা দরকার, চিকিৎসায় সার্ব্বজনীনতা—বহু আলোচনায়—গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন ডাক্তার অধিকারী। এবং এই সব আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ, গীতা, উপনিষৎ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে আলোচনা প্রভূত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ গভীর করে তুলেছেন।

'ক্ষয়রোগ কথা' বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি মূল্যবান সম্পদ। সাধারণ পাঠক জ্ঞাতব্য তথ্য পাবেন- চিন্তাশীলেরা তত্ত্ব পাবেন, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিকেরা দেশের সমস্যা সমাধানে সাহায্য পাবেন এবং সকল জনেই ডাঃ অধিকারীর সরস সরল প্রাঞ্জল অথচ ব্যঞ্জনাময় রচনাভঙ্গিতে পরিতৃপ্ত হবেন।*

* 'ক্ষয়রোগ কথা'—প্রকাশক : নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৪। দাম তিন টাকা মাত্র।

(বাঙ্গলা ভজন)

সিন্ধু-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

তোমার অপরূপ সৃজন
বুঝিতে পারা ভার।
দেব মানব জীব অগণন
নিত্য তোমারে করিছে শরণ
কত রূপে তব স্নেহ বরিষে
সংখ্যা করে কে তার ॥
নানাবিধ ফুল করেছ সৃষ্টি
অতুল গন্ধ যার
গোপেশ কহিছে ধন্য হে প্রভু
তব মহিমা অপার ॥

মীরাবাঈ রচিত "মেরে তো গিরধর গোপাল" গানের ছন্দ ও সুর অবলম্বনে রচিত।

কথা ও স্বরলিপি—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্থায়ী

১´ ০ ১´ ০ ১´
সা ন্‌া সা | া রা জ্ঞা | র্রা না রা | সণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা গা গা |
তো মা র ০ অ প রূ ০ প সৃ০ জ ন বু ঝি তে

০ ১´ ০
না মা মা | গা মা রা | মা জ্ঞা রা ||
• পা রা ভা ০ ০ ০ র ০

অন্তরা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

সা । সা | গা গা মা | পা পা পা | জ্ঞা পা পা | মা । গা | মা মা ধা |
১ম) দে ০ ব মা ন ব জী ব অ গ ণ ন নি ০ ত্য তো মা রে
২য়) না না বি ধ ফু ল ক রে ছ সৃ ০ ষ্টি অ তু ল গ ০ ন্ধ

১´ ০ ১´ ০ ১´

পা গা পা | মা গা গা | মা মা মা | মা মা মা | মা পধা পা |
১ম) ক রি ছে শ র ণ ক ত রূ পে ত ব মে ০০ হ
২য়) যা ০ ০ র ০ ০ গো পে শ ক হি ছে ধ ০০ ন্য

পমা মা গা |
ব০ রি যে
হে০ প্র ভু

১´ ০ ১´ ০

রা মা জ্ঞা | রা সা ণ্ া | রা -া । | সরা মজ্ঞা রা ||
১ম) সং ০ খ্যা ক রে কে তা ০ ০ র০ ০০ ০
২য়) ত ব ম হি মা অ পা ০ ০ র০ ০০ ০

সাহিত্যিক ও সংস্কারক টলস্টয়

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবনের অনেক বিচিত্র গল্প আমাদের শুনিয়েছেন রুশ-মনীষী টলস্টয়। তাঁর নিজের জীবনের গল্পও কম বিচিত্র নয়। সাহিত্যিক ও সংস্কারকরূপে যে-জীবন তাঁর বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রতি অধ্যায়ে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব এবং কার্য্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সংস্কারক-টলস্টয় যে-কথা প্রচার করেছেন, মানুষ-টলস্টয় সেই কথা অনুযায়ী তাঁর নিজের জীবনকে অনেক সময়েই পরিচালিত করতে সক্ষম হন নি। সেজন্যে তাঁর অন্তর্দাহ আর মর্ম্মবেদনার অবধি ছিল না। বারবার প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের রীতিকে পরিবর্ত্তন করেছেন, নিজেকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা আর কৃচ্ছ-সাধনার মধ্যে বেঁধে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন, সহ্যশক্তি কতখানি গভীর তা পরীক্ষা করবার জন্যে নিজের গায়ে নিজে বেত মেরে ক্ষতবিক্ষত করেছেন সর্ব্বাঙ্গ! তাঁর স্বভাবের মধ্যে এই যে জটিলতা আর বিরোধিতা, এরা তাঁর জীবনে বহুবার বহু দুঃখের কারণ হয়েছে।

প্রথম থেকেই এক দ্বন্দ্ব-সমাকুল জীবনের আবর্ত্তের মধ্যে তাঁর চরিত্র-গঠন শুরু হয়েছিল। জন্মেছিলেন অভিজাত পরিবারে, কিন্তু তাঁর সকল সহানুভূতি আর স্নেহ ধাবিত হয়েছিল রাশিয়ার গরীব চাষীদের প্রতি। পরবর্ত্তীকালে তিনি চাষীর জীবন যাপনের সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। অঙ্গে পরতেন চাষীদের মতো রুক্ষ মোটা জোব্বা, পায়ে খেলো চামড়ার বুট জুতা, হাতে নিতেন মোটা লাঠি। কিন্তু চরিত্রের বিরোধী বৈশিষ্ট্য যাবে কোথায়? শোনা যায়, প্রথম প্রথম তাঁর সেই কর্কশ

বহিরাবরণের নীচে পরা থাকতো, সবচেয়ে ভাল নরম সূতার তৈরী কেম্‌রিক শার্ট!

স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের প্রয়াসী ছিলেন তিনি, কিন্তু বিত্তশালী না হয়ে উপায় ছিল না তাঁর। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যে বিশাল জমিদারী পেয়েছিলেন তা বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন দরিদ্রের সেবায়, কিন্তু রাশিয়ার তখনকার আইন ছিল কড়া, সন্তান সন্ততিদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার ছিল না। তবুও তিনি দান করেছিলেন অনেক এবং এই নিয়ে তাঁর স্বামীগতপ্রাণা পত্নীর সঙ্গে অনেকবার বিরোধ ঘটেছিল। তা হলেও, স্ত্রীর প্রতি ভাল-

তীর্থ-পথিক টলস্টয়

বাসার অভাব ছিল না তাঁর, তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত মধুর আর সুখের ছিল।

* * * *

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কাউন্ট লিও টলস্টয়ের জন্ম। ন'বছরে পড়বার আগেই তাঁর বাবা মা মারা যান। মাদাম জুস্‌কভ নামে এক মাসির কাছে মানুষ হন। মাসি ছিলেন দৃঢ়মনা আর বিশ্বাসহীনা মহিলা। তাঁর জীবনের দুঃখবাদ বালক টলস্টয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাঁর অনেক লেখার মধ্যে সে-প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। মাদাম জুস্‌কভ্ কিশোর ও যুবক টলস্টয়কে জীবনে উন্নতির পথে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। পনেরো বছর বয়সে টলস্টয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। প্রতি পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। কিন্তু সাধারণভাবে সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার দিকে কোনদিনই আগ্রহ ছিল না তাঁর। বড়লোকদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে রীতিমতো বদখেয়ালীতে মেতে উঠলেন এবং নিয়মিত জুয়া খেলতে লাগলেন।

অল্পদিনেই তাঁর মোহ ঘুচলো। মনে মনে বুঝলেন, এমন ধারা জীবন যাপনে তৃপ্তি নেই। ফিরে এলেন দেশে। চাষীদের জন্যে ইস্কুল খুললেন। তারপর দান-খয়রাতিতে বেশ কিছু টাকা খরচ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন, এই ধরণের বেপরোয়া দানের কোন মূল্য বা মর্য্যাদা আছে কিনা। মাসি মাদাম জুস্‌কভ্ তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বোঝাতে লাগলেন, এ-ভাবে টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে আখেরে কোন লাভ হবে না, জগতের সকল মানুষকে কোন দিনই সুখী করা যায় না, তার চেয়ে নিজেকে সুখী করাই সমীচীন কাজ এ পৃথিবীতে। শীঘ্রই টলস্টয় নিজেও নিরাশ হলেন। বুঝলেন, মানুষকে শিক্ষা দেবার মতো উপযুক্ত যোগ্যতা তিনি এখনো অর্জ্জন করেন নি। তাছাড়া তাঁর জানতে বাকি রইল না যে, চাষীরা সামনে তাঁকে খাতির দেখায় বটে, কিন্তু পিছনে তাঁকে ভেংচায়, উপহাস করে। হতাশ হয়ে তিনি সেন্ট পিটার্স-বার্গ-এ গেলেন এবং আইনের পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি নিলেন।

রাজধানীর নানা আমোদ-আহ্লাদ আর প্রলোভন তাঁকে ঘিরে ধরল, তাদের আকর্ষণ তিনি প্রতিরোধ করতে পারলেন না। নিজের এবং জনসাধারণের চরিত্র-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি এক উচ্চাশা-মণ্ডিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে-ছিলেন, কিন্তু ফল হয় নি। প্রতিপদক্ষেপে টলস্টয় জীবন সম্বন্ধে গভীর হতাশা আর বীতশ্রদ্ধা বোধ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ককেসাস্ পর্ব্বতে চলে গেলেন তিনি। সেখানে তপস্বীর জীবন যাপন করতে লাগলেন—আর জুয়া খেলে খেলে যে ঋণ হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

পর্ব্বতের সানুদেশে নিরালায় বসে তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। তাঁর "বাল্যকাল" বই এইখানে ব'সেই লেখা। এই গ্রন্থে তিনি নিজের বাল্যজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর চরিত্রের ও চিত্তের সকল স্খলন আর অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। এইখানেই সংস্কারক-টলস্টয় পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করলেন। তিনি লিখলেন—"আমার যৌবনের কল্পনা আর স্বপ্নগুলিকে যেন কেউ শিশুর খেয়াল বলে ভৎর্সনা না করেন। এই কল্পনা আর স্বপ্নের মধ্যে নিহিত আছে আমার জীবনের সকল আদর্শ, সকল পরিকল্পনা। আমি যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকি, আর আমার লেখার কদর যদি তখনো থাকে, তাহলে সত্তর বছর পরেও আমি আবার এই ধরণের যৌবন-স্বপ্নের কথাই লিখবো।"

* * *

টলস্টয়ের এক আত্মীয় এই নবীন তপস্বীকে চাষার কুঁড়ে ঘর থেকে উদ্ধার করে আনলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বেধেছে তখন। আত্মীয় তাঁকে সেই যুদ্ধে যোগদান করতে বললেন। যুদ্ধে গেলেন টলস্টয়। যুদ্ধের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন মনে, কিন্তু তাঁর রক্তের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড তেজ, আর দেহের পেশীমণ্ডলীর মধ্যে ছিল অসীম শক্তি—তাই সহজেই রণোন্মাদনায় মেতে উঠ্‌লেন তিনি। কিন্তু তাঁর বীরত্বের জন্যে যে পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, এক অফিসারের চক্রান্তে তা থেকে বঞ্চিত হোয়ে কিছুদিন পরেই ক্ষুব্ধ অপমানিত মন নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

চাষী ও শ্রমিকবন্ধুদের সঙ্গে কর্ম্মরত টলস্টয়

হঠাৎ জীবনে এক নূতন ধাক্কা এসে লাগল। নূতন প্রেরণায় উজ্জীবিত হলেন টলস্টয়। আকাশে নূতন সূর্য্য জাগল। একটি সুন্দরী কসাক মেয়ে, ভ্যালেরিয়া তার নাম, টলস্টয়কে এক নূতন আনন্দলোকের সন্ধান দিলে। টলস্টয় ভালবাসলেন।

কিন্তু অদ্ভুত এই প্রেমিকের চরিত্র। ভ্যালেরিয়া তাঁকে বুঝতে পারে না। কখনো বা মিষ্ট কথায়, আদরে আর নরম ব্যবহারে ভ্যালেরিয়াকে অভিভূত ক'রে দিচ্ছেন, আবার কখনো বা ভ্যালেরিয়া নূতন পোষাক পরেছে ব'লে তাকে বিলাসিনী কুহকিনী বলে ভৎর্সনা করছেন! অনেক দিন সহ্য করেছিল ভ্যালেরিয়া, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে টলস্টয়কে পরিত্যাগ করলে। হতাশ প্রেমিক তাঁর "বিরাট দুঃখ" অপনোদনের জন্য দেশ ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে চলে গেলেন।

সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে টলস্টয় ধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে হৈ-হল্লায় দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন অনেকগুলি বিত্তশালী বন্ধুর সঙ্গে এক রেঁস্তোরায় ব'সে পানাহার করছেন এমন সময় এক দরিদ্র বেহালাবাদক তাঁদের টেবিলের কাছে এসে কিছুক্ষণ বেহালা বাজিয়ে তাঁদের সামনে টুপী ধ'রে পয়সা যাচ্ঞা করল। পানাহারে মত্ত ইয়ারবর্গ লোকটির দিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু টলস্টয় হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে সেই ছিন্নবাস বেহালাবাদককে অভিবাদন করলেন এবং তারপর তাকে ডেকে কাছে বসিয়ে বেহারাকে তার জন্যে খাদ্য আর পানীয় আনবার হুকুম দিলেন। বন্ধুরা সব থ।

* * * *

দেশে ফিরে টলস্টয় অস্থির, অনিয়ন্ত্রিত এবং বিচিত্র জীবন যাপন করতে লাগলেন। কখনো বা মাসের পর মাস মাসির বাড়ীতে অতি-শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন কাটতে লাগল তাঁর, লিখতে লাগলেন উদয়াস্ত, লেখা-পড়া আর সাহিত্য-সাধনায় তাঁর সমস্ত সত্তা মগ্ন রইল। আবার কখনো বা সাধন-কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন মস্কো-তে, দামী দামী রেশমের পোষাক কিনে বিলাসী যুবকের বেশ ধারণ ক'রে শহরের অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে নিত্য-নূতন আনন্দ আহরণে প্রলুব্ধ হলেন। ভালুক-শিকারেও তাঁর দারুণ নেশা ছিল এবং একবার এই ব্যাপারে অতি-অল্পের জন্যেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। বন্ধুদের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে একটা পাগলা ভালুক-কে মারবার জন্যে একাকী এগিয়ে গিয়ে জন্তুটার আক্রমণে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। সঙ্গীরা সময় মতো এসে না পড়লে নির্ঘাৎ তাঁর প্রাণ যেত।
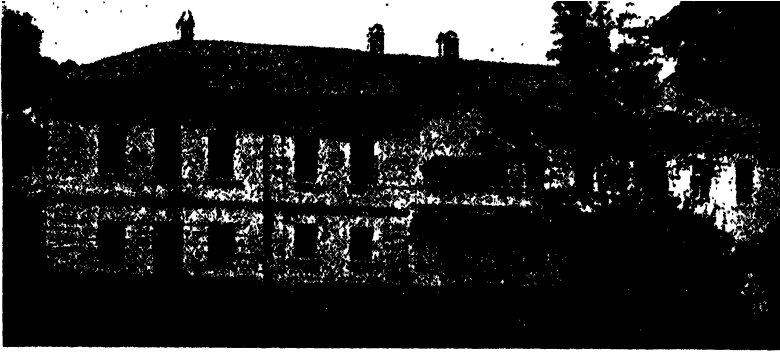
টলস্টয়ের বাসগৃহ

১৮৬০ সালে এক সুদীর্ঘ সফর শেষ ক'রে দেশে ফিরে টলস্টয় আবার প্রেমে পড়লেন। আয়তলোচনা ধীর-প্রকৃতি জার্ম্মান মেয়েটি বত্রিশ বছর বয়সের এই অশান্ত যুবকের চরিত্র আর প্রকৃতিকে বুঝি নিঃশেষে বুঝে নিয়েছিলেন। টলস্টয়ের জীবনসঙ্গিনীরূপে আজীবন তিনি অসীম ধৈর্য্য আর গৃহকর্ম্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তেরোটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন, গৃহস্থালী পরিচালনা করেছেন, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করেছেন এবং স্বামীর সেক্রেটারীরূপে তাঁর সমস্ত কাজে সহায়তা করেছেন। বই লিখে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছেন টলস্টয়। **এই সাফল্যের মূলে ছিলেন তাঁর আদর্শ সহধর্ম্মিণী।**

পনেরো বছর ধ'রে একটানা সুখ আর সাফল্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেন টলস্টয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ War and Peace এবং বহুজনপ্রিয় উপন্যাস আনা ক্যারেনিনা এই সময়ে লেখা। তারপর যখন পঞ্চাশের কাছে পৌছলেন, তখন আবার তাঁর মনে সংশয় জাগল। জীবনের প্রতি গভীর বীতরাগে অস্থির হতাশ বোধ করতে লাগলেন। এই কী জীবন? এই কি তার চরম সার্থকতা —খাওয়া-পরা আর সন্তান-উৎপাদন? বৃহত্তর আর মহত্তর কোন কাজে জীবন যদি উৎসর্গীকৃত না হল তো— পশুর সামিল তো আমি! ভেবে ভেবে যেন পাগল হয়ে উঠলেন টলস্টয়। নূতন পথের সন্ধান চাই, নিষ্কৃতি চাই— এই স্থূল পশুর মতো জীবনের পরিবেশ থেকে। দান করতে লাগলেন দু'হাতে, অবিরত। বাঁচতে হলে, শুধু নিজের জন্যেই বাঁচলে হবে না, সমগ্র মানব-জাতির জন্যে বাঁচতে হবে। প্রাণের সঙ্গে যাদের ভালবাসতেন সেই কৃষক চাষী আর মজুরদের মধ্যে ফিরে গেলেন তিনি। তাদের মতো জীবনযাপন করতে লাগলেন। অঙ্গে নিলেন কর্কশ থেলো কম্বলের পোষাক, আহার করতে লাগলেন শুধু ডাল আর রুটি,দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। গাড়ী ঘোড়া, বিলাস ব্যসন, এ সব বিস্মৃত হলেন তিনি। কিছুদিন আগেই সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল ক'রে দিয়েছিলেন; সুতরাং নিজের কোন ধনসম্পত্তি নেই, একথা মনে ক'রে তৃপ্তিবোধ করলেন; কিন্তু তখনো যে তাঁকে নিজের বাড়ীতে পরিবারবর্গের সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল, তাও অসহ্য লাগছিল তাঁর। তিনি নিজে কৃচ্ছসাধন করছিলেন, কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি, তারা আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করে চলেছিল এবং সেজন্যে অনুক্ষণ মর্ম্মদাহ অনুভব করছিলেন তিনি। এ মোহপাশ ছিন্ন ক'রে পথে বেরুতে হবে—মানবতার পথে, মানুষের দুর্গতি-**মোচনের পথে। অন্তরের ভিতরকার বৈরাগী তার**

একতারায় সুরের ঝঙ্কার তুলেছে। কিন্তু তবুও যেন টলস্টয় মন স্থির করতে পারছেন না। একদিকে সংসারের প্রতি টান, ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, অপরদিকে মহত্তর জীবনের আহ্বান। কিছুদিন ধ'রে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত মন নিয়ে টলস্টয় জীবন কাটালেন। অনেক লেখা লিখলেন, কিন্তু মন ভরল না, চিত্ত শান্ত হল না।

একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনায় নূতন ক'রে ব্যথা পেলেন, সংশয় আর হতাশা বর্দ্ধিত হল, বৈরাগ্যের সুর আরও গভীরভাবে বাজতে লাগল মনের তারে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন—এমন সময় দেখলেন, এক পুলিশ কন্‌স্টেবল একটি ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করবার জন্যে তাড়া করেছে। চৌকিদারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"ভাই, তুমি পড়তে জান ?"

চৌকিদার ঘাড় নেড়ে বললে—"জানি বৈকি। কেন ?"

টলস্টয় জিজ্ঞাসা করলেন—"বাইবেল পড়েছো ?"

—"পড়েছি।" উত্তর দিলে চৌকিদার।

টলস্টয় বললেন—"যিশুর আদেশ আছে, দরিদ্রকে পীড়ন করবে না, তা কি পড় নি ?"

উত্তরে চৌকিদার বললে—"পুলিশের আইন-কানুন আছে, তা কি আপনি পড়েন নি ?"

টলস্টয় আর কোন কথা বলতে পারলেন না। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন।

* * * *

রাশিয়ার দরিদ্র প্রজাবর্গের জন্যে টলস্টয়ের জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম বৃথা হয়নি। তাঁর প্রতিপত্তি আর লেখনীর জোরে তিনি রুশ-সম্রাটকে দিয়ে বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়েছিলেন। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তাঁর রচনাসমূহ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে। কথা-শিল্পী হিসাবে তিনি হোমার দান্তে শেকসপীয়রের সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। সমাজ-সংস্কারকরূপে তাঁর স্থান রুশো আর লুথারের পাশে।

বিরাশী বছর বয়সে মনীষী টলস্টয় তাঁর জীবনের সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে শেষ আত্মিক উন্নতির পথে নির্গত হলেন। একদিন শীতের এক কুয়াসাচ্ছন্ন সকালে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। যাত্রা করলেন বহু দূরবর্ত্তী এক মঠের উদ্দেশ্যে। দুর্জ্জয় শীতের মধ্যে কঠিন বরফাচ্ছাদিত পথে অশীতিপর বৃদ্ধ চলেছেন পায়ে হেঁটে একাকী ; আকাশে বাতাসে বুঝি সেই চিরন্তন সঙ্গীতের সুর অনুরণিত হচ্ছে :

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।"

যাত্রার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। সংসারের আকর্ষণের চেয়ে অনেক বড় আকর্ষণ তাঁকে ঘর-ছাড়া করেছে। এ-পথে প্রিয়জনের সঙ্গ তিনি কামনা করেন না। প্রিয়জনের স্নেহের আকর্ষণ তাহলে তাঁকে দুর্ব্বল করে ফেলবে। তাঁর স্ত্রী বা তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁকে যেন অন্বেষণ না ক'রে, অনুসরণ না করে। এই ছিল সেই চিঠির মর্ম্ম।

"ওরে ভয় নাই আর, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-সেজ-রচনা।"

দুর্ব্বল জরাজীর্ণ দেহ শীতের প্রকোপ সহ্য করতে পারল না, পথের ধারে এক সরাইখানায় অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন টলস্টয়। সংবাদ পেয়ে স্ত্রী ছুটে এলেন তাঁর কাছে।

স্ত্রী তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন শুনে টলস্টয়ের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। স্ত্রীকে ভালবাসেন না বলে নয়, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি তখনো তাঁর মনে অপরিসীম স্নেহ আর ভালবাসা ছিল, তাই তিনি মনে করতে লাগলেন, জীবনের শেষ সময়ে যে দুরূহ-পথের সন্ধানে তিনি বেরিয়েছেন, পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর ভালবাসা বুঝি তাঁকে আবার সে-পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, জীবনকে আহুতি দেবার সংকল্প বুঝি ব্যর্থ হবে।

তা হয়নি। নিজের ইচ্ছা অনুসারে আত্মীয়-পরিজনবর্গ এবং প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করলেন শান্ত সমাহিতচিত্তে সজ্ঞানে। ১৯১০ সালের ২০শে নভেম্বর সেই সরাইখানার মধ্যে যখন তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত হল তখন তাঁর জীবন-সঙ্গিনী অসামান্যা গুণবতী পত্নী স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঘরের মধ্যে না থেকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যদর্শনের মূল

সাংখ্য দর্শনের মূল উপনিষদের মধ্যে নিহিত। কঠোপনিষদের—

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
> মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। ১৩।১০-১১॥

এই শ্লোকদ্বয়ে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়, মনঃ, বুদ্ধি, মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ এই পঞ্চদশ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

> নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্,
> একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
> তৎ কারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যং,
> জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। ৬।১৩

(যিনি নিত্যবস্তুদিগের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুদিগের মধ্যে চৈতন্যবান্, যিনি এক হইয়াও বহুর কাম্যবস্তুর বিধান করেন, সেই সাংখ্যযোগাধিগম্য কারণরূপী দেবকে জ্ঞাত হইয়া, লোকে সর্ব্ব পাশ হইতে মুক্ত হয়) এই শ্লোকে "সাংখ্য" শব্দেরই উল্লেখ আছে। উক্ত উপনিষদের

> তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
> শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ।
> অষ্টকৈঃ ষড়ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
> ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্। ১।৪

শ্লোকে প্রকৃতিকে (একনেমি) ত্রিবৃতং অর্থাৎ তিনগুণযুক্ত, ষোড়শান্ত অর্থাৎ ষোড়শ বিকারযুক্ত (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত), পঞ্চাশৎ অরযুক্ত (পঞ্চ বিপর্য্যয়, অষ্টাবিংশ অশক্তি, নব তুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি), বিংশতি প্রত্যয় যুক্ত (দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়) ষট্ অষ্টকযুক্ত অষ্টপ্রকৃতি (ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, খ, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার) অষ্ট ধাতু, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, অষ্ট ভাব, অষ্টদেব, অষ্টগুণ—বলা হইয়াছে? পরবর্ত্তী শ্লোকেও সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পঞ্চ চিত্তবৃত্তি, পঞ্চ বিপর্য্যয় আদি উক্ত হইয়াছে। ১।১০ শ্লোকে প্রকৃতিকে "প্রধান" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ৪।১০ শ্লোকে প্রকৃতিকে মায়া বলা হইয়াছে।

> অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং
> বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং।
> অজো হ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে
> জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাং অজোঽন্যঃ। ৪।৫

এই শ্লোক বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার সাংখ্যকারিকা ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৈত্রায়ণী উপনিষদে তন্মাত্র, তিনগুণ, পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদের উল্লেখ আছে। মৈত্রায়ণী উপনিষদের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু কঠ ও শ্বেতাশ্বতর যে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপনিষৎ হইতে উদ্ভূত হইলেও আধুনিক সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কথা নাই এবং তাহা নিরীশ্বর দর্শন বলিয়া পরিচিত। সাংখ্য মত যখন প্রথম দর্শনের আকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার কি রূপ ছিল, তাহা অনিশ্চিত। অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়াছেন। চরক সংহিতাও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া (৭৭ খৃঃ অঃ) অবধারিত হইয়াছে। চরক সংহিতায় সাংখ্যদর্শনের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত সাংখ্য-কারিকার বহু পার্থক্য আছে। মহাভারতেও সাংখ্যদর্শনের যে সকল বর্ণনা আছে. তাহাদের সহিত সাংখ্যকারিকার মিল নাই। অধ্যাপক ডাক্তার দাসগুপ্ত বলেন "বাসিলিএফ্ তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, যে বিন্ধ্যবাসী নামক এক ব্যক্তি সাংখ্যদর্শনকে তাঁহার স্বকীয় মতের অনুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। টাকা কুসুর মতে বিন্ধ্যবাসী ও ঈশ্বরকৃষ্ণ একই ব্যক্তি।" গার্বে ঈশ্বর কৃষ্ণকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সাংখ্য নবরূপ গ্রহণ করে, ইহা বলিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে সাংখ্যের রূপ কি ছিল চরক-সংহিতা ও মহাভারত হইতে তাহার কিছু জ্ঞানলাভ করা যায়।

তাহার মূল উপনিষদে প্রোথিত হইলেও সাংখ্যদর্শন উপনিষদ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

চরক সংহিতায় সাংখ্য মত

চরক সংহিতায় যে সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সাংখ্যমতের অনেক বিষয়ে মিল নাই। চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্রের উল্লেখ নাই, পঞ্চ তন্মাত্রের স্থলে আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ। কিন্তু প্রকৃতিকে অষ্ট ধাতুক বলা হইয়াছে—অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চ (সূক্ষ্ম) অষ্ট ধাতু। মনঃ অতিসূক্ষ্ম, অণুপরিমাণ। মনের কার্য্যের জন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রয়োজন। মনের সহিত ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগ না হইলে, কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। মনের ক্রিয়া দ্বিবিধ—উহ এবং বিচার। ইন্দ্রিয় হইতে অনির্দ্দিষ্ট সংবেদন গ্রহণ "উহ" এবং সংবেদন হইতে প্রত্যয় গঠন "বিচার।" ইহার পরে বুদ্ধির কার্য্য আরব্ধ হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ

(স্থূল ভূত) দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, অহংকার, মহৎ ও প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ই মানুষ। কর্ম্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, অজ্ঞান, জীবন, মৃত্যু সকলই এই সমবেত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের। এতৎব্যতীত পুরুষেরও অস্তিত্ব আছে। পুরুষ না থাকিলে জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ ও মোক্ষও থাকিত না। আত্মা কারণরূপে বিদ্যমান না থাকিলে প্রকাশমূলক জ্ঞানালোকের কোনও ব্যাখ্যা করা যাইত না। তাই পুরুষকে চরক পরমাত্মা বলিয়াছেন। পরমাত্মা অনাদি ও স্বয়ম্ভু, তাহার কোনও কারণ নাই। পুরুষের স্বরূপগত সংবিদ নাই। ইন্দ্রিয়দিগের ও মনের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষ সংবিদ-বিশিষ্ট হয়। জ্ঞান, অনুভূতি অথবা কর্ম্ম এই সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। চরকের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন। প্রকৃতির বিকার সকল ক্ষেত্র এবং অব্যক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ। (অব্যক্তং অস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞং ঋষয়ো বিদুঃ)। অব্যক্ত ও চেতনা এক ও অভিন্ন। অনভিব্যক্ত চেতনা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়-দিগের উদ্ভব হয়। প্রলয়ে এই সকল সৃষ্টি প্রকৃতিতে বিলীন হয়। নূতন সৃষ্টিকালে অব্যক্ত পুরুষ হইতে আবার বুদ্ধি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়। নূতন সৃষ্টি, জন্মমৃত্যু-চক্র রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়ার ফল। যাঁহারা এই দুই গুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহারা জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। পুরুষের সহিত সংযোগ না হইলে, মনের ক্রিয়া হয় না। পুরুষই প্রকৃত কর্ত্তা। পুরুষ স্বকীয় ইচ্ছানুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পুরুষের ইচ্ছা অন্য কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুরুষ ভোগ করে, সুখদুঃখ ভোগ করে। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-সমবায় পুরুষ নহে। সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণার উদ্ভব এবং তৃষ্ণা হইতে আবার সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়। সুখ-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। মনঃ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থদিগের সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয়। মনঃকে যখন স্থির ভাবে পুরুষের প্রতি নিবদ্ধ করা যায়, তখন সুখদুঃখবোধ থাকে না। তাহাই যোগের অবস্থা। সকল বস্তুই কারণ-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, কিছুই আত্মাকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় না। সকলই দুঃখময়, কিন্তু কিছুই আত্মারূপী "আমার" নহে, ইহাই সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান হইলে যাবতীয় জ্ঞান ও সুখ দুঃখ বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন আত্মার অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই থাকে না। এ অবস্থা বর্ণনাতীত। এই অবস্থাকে "ব্রহ্মভূত" বলা হইয়াছে, ইহাই সাংখ্যদিগের অপবর্গ। এই চরম অবস্থায় "সমূল সর্ব্ববেদনা, অসংজ্ঞা-জ্ঞানবিজ্ঞান অশেষে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহার পরে ব্রহ্মভূত ভূতাত্মা উপলব্ধ হয় না, তাহার কোনও চিহ্ন থাকে না। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের গতি। তাহা অক্ষর ও অলক্ষণ।"

চরক সংহিতায় বিবৃত সাংখ্যমতের স্থূল মর্ম্ম এই : (১) মনের শুভ অবস্থাসকল সত্ত্বগুণের চিহ্ন ও অশুভ অবস্থাসকল রজঃ ও তমঃ গুণের চিহ্ন ; (২) ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক : (৩) অব্যক্ত অবস্থাই পুরুষ (৪) অব্যক্তের সহিত তাহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য তত্ত্বের সমবায় হইতে জীবের উৎপত্তি, (৫) মোক্ষ ঐকান্তিক বিনাশ অথবা যাবতীয় লক্ষণ-বিহীন নির্ব্বিশেষ সত্তার সমতুল্য। এই অবস্থার নাম ব্রহ্মভাব। এই অবস্থায় সংবিদ থাকে না, কেন না পুরুষের সহিত তাহা হইতে উদ্‌ভূত বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির সংযোগ হইতেই সংবিদের উদ্ভব হয়।

মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে পঞ্চশিখ-জনদেব সংবাদ, সাংখ্যযোগকথন ও জমকপঞ্চশিখ সংবাদ শীর্ষক তিন অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। চরকের বর্ণনার সহিত মহাভারতের কোনও কোনও বর্ণনার মিল আছে। পঞ্চশিখ বলিয়াছেন "অধ্যাত্ম চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদি একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা যখন দেহাদি হইতে ভিন্ন, তখন দেহাদির নাশ নিবন্ধন তাঁহার নাশ হইতে পারে না।" পঞ্চশিখ অব্যক্তকে বলিয়াছেন "পুরুষাবস্থ"। "পুরুষাবস্থ অব্যক্ত" হয় পুরুষ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত অথবা চৈতন্যস্বরূপ প্রকৃতি। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরক ও পঞ্চশিখের যুক্তি অভিন্ন।

অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ের কয়েকটি অধ্যায়েও সাংখ্যদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে মহত্তত্ত্বকে সর্ব্বব্যাপী পুরাতন পরমপুরুষ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চশিখ জনদেব সংবাদে "পুরুষাবস্থ" অব্যক্ত প্রকৃতিকে এই পরমপুরুষ বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেন, "ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের" ভাষ্যকার গুণরত্ন (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) সাংখ্যদর্শনের দুইটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন— মৌলিক্য এবং উত্তর। প্রথম বিভাগের মতানুসারে প্রত্যেক পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র 'প্রধান' যুক্ত থাকে (মৌলিক্য সাংখ্যা হি আত্মানং আত্মানং প্রতি পৃথক প্রধানং বদন্তি)। এই মত চরকবর্ণিত সাংখ্য মত বলিয়া মনে হয়। এই জন্য আমার বিশ্বাস এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শৃঙ্খলাবদ্ধ সাংখ্য মত।" দাশগুপ্ত আরও বলেন—মহাভারতে (১২।৩১৮) তিন প্রকার সাংখ্য মতের উল্লেখ আছে। (১) এক মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৪টি। (২] দ্বিতীয় মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৫টি এবং (৩) তৃতীয় মতে ২৬টি। শেষোক্ত মতে পুরুষ ও প্রকৃতির অতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং পরমেশ্বরই ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। ইহার সহিত যোগশাস্ত্রের মিল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মত মহাভারতের এই অধ্যায়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আসুরির মত সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মত। চরক (৭৮ খৃঃ অঃ) ঈশ্বরকৃষ্ণের মতের উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়।

মহাভারতে সাংখ্যমত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের কোন্ অধ্যায় কখন রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু চরকের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গার্ব্বে সাংখ্যকারিককে প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিলেও কেহ কেহ ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বলিয়াছেন। উহা যে চরক সংহিতার পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং চরক

সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্য মত যে সাংখ্যকারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পতঞ্জলির যে চরকসংহিতার সহিত পরিচয় ছিল, তাহা যোগসূত্রের একটি সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় (১।১৯। ঐ সূত্রের সহিত চরকের মতের সাদৃশ্য আছে।

ষষ্টিতন্ত্র

"ষষ্টিতন্ত্র" শাস্ত্র নামে সাংখ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার সাংখ্য-কারিকার ভাষ্যে "রাজবার্ত্তিক" হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে সাংখ্যকারিকায় ৬০টি বিষয়ের বর্ণনা আছে বলিয়া সাংখ্যকারিকাই ষষ্টিতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু দাশগুপ্ত বলেন, যে অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ষষ্টিতন্ত্রে বর্ণিত বিষয়াবলীর যে বর্ণনা আছে, রাজবার্ত্তিকের বর্ণনা হইতে তাহা ভিন্ন। অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত এবং তাহা পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব মতের সদৃশ। উক্ত সংহিতায় আরও লিখিত হইয়াছে, যে কপিলের মত ছিল বৈষ্ণব মত। বিজ্ঞান ভিক্ষুও তাঁহার বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যদর্শন আদিতে সেশ্বর ছিল এবং নিরীশ্বর সাংখ্য "প্রৌঢ়িবাদ" মাত্র। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, জগতের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার যে অনাবশ্যক, তাহাই প্রদর্শন করা। কিন্তু মহাভারতে স্পষ্টই আছে, যে সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে পার্থক্য এই, যে সাংখ্য নিরীশ্বর; যোগ সেশ্বর। কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ষষ্টিতন্ত্রে বর্ণিত বিষয়-সম্বন্ধে দ্বিবিধ বর্ণনা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে প্রাচীন ষষ্টিতন্ত্র পরবর্ত্তী-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গুণরত্ন সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "ষষ্টিতন্ত্রোদ্ধার" উল্লিখিত হইয়াছে। "ষষ্টিতন্ত্রোদ্ধার" নাম হইতে অনুমিত হয় যে আদিম ষষ্টিতন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল;

অধ্যাপক দাসগুপ্তের মতে অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় উল্লিখিত ষষ্টিতন্ত্রকে যদি কপিল প্রচারিত দর্শন হইতে অভিন্ন মনে করা যায়, তাহা হইলে কপিলের দর্শন সেশ্বর ছিল, ইহা বলা যায়। আসুরি সেই দর্শনেরই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্চশিখ যে মত প্রচার করেন, তাহা প্রাচীন মত হইতে ভিন্ন। মহাভারতে পঞ্চশিখের মতের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা নাই। সাংখ্যকারিকায় আছে, পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক আসুরি প্রচারিত তন্ত্র "বহুধা কৃতং" "বহুধা কৃতম্"এর অর্থ কি? তিনি কি একাধিক গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের মধ্যে অধিকাংশই সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে কপিলের মত ছিল সেশ্বর, কিন্তু পঞ্চশিখ সে দর্শন হইতে ঈশ্বর বর্জন করিয়াছিলেন। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সাংখ্য মত পাতঞ্জল দর্শনে রক্ষিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামেই পরিচিত। পঞ্চশিখের সাংখ্য তাহা হইলে প্রাচীন সেশ্বর সাংখ্য ও আধুনিক নিরীশ্বর সাংখ্যের মধ্যবর্ত্তী। আধুনিক সাংখ্য এই দর্শনের তৃতীয় রূপ।

সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন

সাংখ্যকার বলেন—জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থাচেৎ, নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥ সাংকা—১

দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শারীরিক পীড়াজনিত দুঃখ ও মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক, পার্থিব প্রাণীজাত দুঃখ আধিভৌতিক এবং দৈব কারণজাত দুঃখ আধিদৈবিক। মানব-জীবনে দুঃখও যেমন আছে, তেমনি সুখও আছে সত্য, কিন্তু সুখ অস্থায়ী, ক্ষণিক, দুঃখ শাশ্বত। দুঃখ জগতের একটা উপাদান। সুতরাং জগতের সকলই দুঃখমিশ্রিত। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সাংখ্য-দর্শনে বর্ণিত আছে।

কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) ও আনুশ্রবিক (বৈদিক) উপায় তো রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নূতন উপায় অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন? সাংখ্যকার বলেন, দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক উপায়দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। রোগমুক্তির জন্য ঔষধি আছে সত্য, কিন্তু রোগ একবার শান্ত হইয়া পরে আবার আক্রমণ করে। সকল রোগও ঔষধি-দ্বারা শান্ত হয় না। রোগের ঔষধি তবুও কিছু আছে, কিন্তু শোকের ঔষধি কোথায়? বলিতে পার পার্থিব জীবনে দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণলাভের উপায় না থাকিলেও, মৃত্যুর পরে দুঃখহীন হইবার উপায় তো বেদে বর্ণিত আছে। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া—তো স্বর্গলাভ করা যায়। "অপাম সোমং, অমৃতা অভূম (আমরা সোমপান করিয়া অমর হইব) এ কথা বেদে নাই কি? আর স্বর্গসুখও তো

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং,
ন চ গ্রস্তং অনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ
তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্।

অর্থাৎ যে সুখ দুঃখ কর্ত্তৃক সম্ভিন্ন নহে, যাহা দুঃখ কর্ত্তৃক গ্রস্ত নহে, যাহা অনন্তর (অর্থাৎ যাহার পরে দুঃখ আবির্ভূত হয় না), যাহা অভিলাষমাত্রেই উপনীত হয়, তাহাই স্বর্গসুখ। সে সুখ যদি বৈদিক উপায় অবলম্বন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উপায়ান্তরের অন্বেষণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই, যে স্বর্গ হইতেও পুণ্যক্ষয়ে পতন হয়। বৈদিক কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গসুখলাভ হয়, তাহা ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। তাহাদ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিকাশ হয় না। দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য দুঃখের মূল-উৎপাটনের প্রয়োজন। সেই মূলোৎপাটনের উপায় সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। সে উপায় হইতেছে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞএর বিজ্ঞান।

দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ, স হি অবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ ॥ সাংকা—২

জীবনের দুঃখময় মূর্ত্তি যে কেবল সাংখ্যকারই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। গৌতম বুদ্ধও দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার উপায় আবিষ্কারের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রীক পণ্ডিত সাইলেনাস্‌কে মিদাস্ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মানবের পক্ষে পরম মঙ্গল কি? তখন সাইলেনাস বলিয়াছিলেন, যাহা মানবের পরম মঙ্গল, তাহা তাহার অনধিগম্য; তাহা হইতেছে মানবরূপে জন্মগ্রহণ না করা। তাহার পরেই যাহা তাহার শ্রেয়স্কর, তাহা হইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব মরিয়া যাওয়া। কিন্তু মৃত্যুতেই তো দুঃখের শেষ হয় না। জীব তো অমর। মৃত্যুর পরে যে দুঃখ হয়, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

জার্মান দার্শনিক সোপেনহরও দুঃখের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। অনবদ্য ভাষায় তিনি সেই দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের মূলে আছে "ইচ্ছা"। 'ইচ্ছা' যত চায়, তত পায় না। তাই দুঃখ। দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশ করিতে হইলে ইচ্ছার বিনাশ চাই। ইচ্ছা বিনষ্ট হইলে মানবজাতিরও বিনাশ হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও ঐকান্তিক বিনাশ হইবে। ইহার জন্য তিনি স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ ও সন্তানোৎপাদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সাংখ্যকার যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, ক্রমশঃ আমরা তাহা দেখিতে পাইব। সে উপায়ে যে দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত দুঃখাসংভিন্ন অবিনশ্বর পরমানন্দ লাভ হয় না, তাহাও দেখিতে পাইব।

সৎকার্য্যবাদ

সাংখ্যদর্শন বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহার কার্য্যকারণ-তত্ত্ব বোঝা প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে বেদান্তের সহিত সাংখ্যের ভেদ নাই। কার্য্য ও তাহার কারণের মধ্যে ভেদ নাই, এ বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্য একমত। বাহ্যতঃ বিভিন্ন দৃষ্ট হইলেও, কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন। কার্য্য নূতন কোনও কিছু নহে, কারণ হইতে স্বতন্ত্র, নূতন সৃষ্ট অথবা উদ্‌ভূত কোনও পদার্থ নহে; ইহার আবির্ভাব নূতন হইলেও কারণের মধ্যে ইহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। কার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে কারণের বিনাশ হয় না, তাহা অগোচর হয় মাত্র।

অসদকরণাৎ, উপাদান-গ্রহণাৎ, সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ,
শক্তস্য শক্যকরণাৎ, কারণ ভাবাৎ চ, সৎ কার্য্যম্। সাংকা—৯

(১) কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে তাহার আবির্ভাব অসম্ভব হইত। কেননা অসতের উৎপত্তি কখনও হয় না। আকাশ-কুসুমের উৎপত্তি হয় না। নীল বর্ণকে কোনও উপায়েই পীত বর্ণ করা যায় না। (২) আবার উপাদান হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। উপাদান সৎ, কার্য্যও সৎ। উপাদানের মধ্যে কার্য্য থাকে; উপাদানের সহিত কার্য্য অভিন্ন। (৩) তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু হইতেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা হয় না, কেন না কোন বস্তু যাহার সহিত অভিন্ন, তাহাই কেবল তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। (৪) কোনও বস্তুর শক্যতা অনুসারেই তাহাদ্বারা তথাকথিত অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়। কোনও বস্তু যাহা উৎপাদন করিতে অশক্ত, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। (৫) কার্য্য কারণাত্মক। কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। কারণ সৎ এবং তাহা হইতে অভিন্ন কার্য্যও সৎ। তন্তু (সূত্র) হইতে পট (বস্ত্র) ভিন্ন নহে। যে যে বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যাহা কারণের মধ্যে নিহিত ও গূঢ়, তাহার প্রকাশই কার্য্য—শক্য অবস্থা হইতে বাস্তব অবস্থায় পরিণতি।

সাংখ্যদর্শনের এই মত বৈশেষিক ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শনের বিরোধী। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির সমবায় দ্বারা কারণের ধ্বংস এবং কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এই মতকে আরম্ভবাদও বলে।

সাংখ্য মতে উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। নিমিত্ত কারণের শক্তি উপাদানকে পরিবর্ত্তিত করে, এবং উপাদান তখন কার্য্যে পরিণত হয়। তিলকে তেলে পরিণত করিবার জন্য পীড়নের প্রয়োজন ধান্যকে তণ্ডুলে পরিণত করিবার জন্য অবঘাতের প্রয়োজন।

কার্য্য কারণের মধ্যে শক্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, সেই শক্যতা বাস্তবতা-প্রাপ্তির বাধা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্য কারণে পরিণত হইতে পারে না। এই বাধা-বিদূরণের জন্য নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন কার্য্যের উদ্‌ভবের ফলে কারণের গুণের পরিবর্ত্তন হইলে, তাহাকে বলে ধর্ম্মপরিণাম। যখন বস্তুর শক্যতা বাস্তবে পরিণত হয়, এবং পরিবর্ত্ত কেবল তাহার বাহ্যরূপেরই হয়, তখন লক্ষণ পরিণাম হয়। কেবল কালের গতি হইতে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে অবস্থা পরিণাম বলে। জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কিছুই স্থির নহে। নদীর জলধারা অনবরত বহিয়া যায়। একই স্রোতে কেহ দুই বার অবগাহন করিতে পারে না, কেননা স্রোতঃও যেমন বহিয়া যায়, অবগাহকও তেমনি পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন-স্রোতের মধ্যে অবস্থিত মানবমন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্য কারণের নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারে।

সাংখ্যের এই সৎকার্য্যবাদ তাহার জগতের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে যে জগৎ প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল; তাহা ও প্রকৃতি অভিন্ন। প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, এমন কিছুর উদ্‌ভব হয় নাই। প্রকৃতি জগতের অতীত অবস্থা। অন্তিমে জগৎ আবার সেই অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইবে সাংখ্যদর্শনে কোনও পদার্থেরই আত্যন্তিক বিনাশ স্বীকৃত হয় না "নাশঃ কারণ-লয়ঃ" (সাং সূ ১।১২১), অর্থাৎ নাশ শব্দের অর্থ কারণে বিলীন হওয়া। যাহা অতীত হইয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকে না, তাহা তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহার প্রমাণ যোগিগণ এই অতীত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যোগিগণের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া কিছু নাই, আছে পদার্থের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। যখন কার্য্য উৎপন্ন হয় তখন তাহার কারণ অবস্থান্তর পরিণাম প্রাপ্ত হয়। (বিজ্ঞানভিক্ষু)

বৃটিশ দার্শনিক হিউম কার্য্য ও কারণের মধ্যে কালিক পারম্পর্য্য সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান নাই। কারণের পরে কার্য্য আবির্ভূত হয়, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু কিরূপে হয়? কারণের মধ্যে কোনও শক্তি কার্য্যের উৎপত্তি করে কিনা, তাহা দেখিতে পাই না সাংখ্যকার কারণ ও কার্য্যের মধ্যে "উপাদান নিয়মের" অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন (সাং সূ ১।১১৫)। যদি পারম্পর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ কারণ ও কার্য্যের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বাধ্য বাধকতা থাকিত না।

জার্মাণ দার্শনিক হারবার্টের মতের সহিত সৎকার্য্যবাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। হারবার্টের মত আমার পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাখ্যা করিয়াছি। (ক্রমশঃ

পুনর্গতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হাণ্টার নিয়ে গেলেন একদিন সাগর-সৈকতে না হোক সাগর তীরে। নেওয়া হ'ল এক মোটর বোট। হাণ্টার চালালেন। কথাবার্তা রাগালাপ হ'ল জলবিহারের তালে। আর সে কত কথা—অফুরন্ত! কিন্তু শেষে যখন হাণ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী ও মহাকালীর কী কী রূপ ও বিভূতি তখন আমাকে বলতেই হ'ল: "আমার ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষের কেউই এঁদের কারুর সম্বন্ধে কিছু জানতেন ব'লে আমার জানা নেই—আমি নিজে তো জানিই না। তাছাড়া আমি বলতে চাই না শুধু শোনা বা পড়া কথা। তবু যখন শুনতে চাইছেন তখন বলি।" ব'লে যা পারি বললাম—শ্রীঅরবিন্দের কাছে যা যা শুনেছি। কিন্তু যতই বলি মনের মধ্যে ওঠে দীর্ঘনিশ্বাস: কথা কথা কথা! মনে পড়ে মীরার পরিহাস: "বাকপটুরা কী করেন? না, শূন্য আকাশে কথা দিয়ে জ্বালান তারার দীপালি। দেখতে দেখতে কথার যাদুতে হয়ত লক্ষ তারা ওঠে ঝিকমিকিয়ে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যে—নিতে যায় এ অলীক দীপালি দেখতে দেখতে তখন আরো গাঢ় হ'য়ে ওঠে অনুপলব্ধির স্থায়ী অন্ধকার!" বললাম বন্ধুবরকে যে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি উপলব্ধি-বিহীন কথার ফুলঝুরিতে। ও মায়া আনন্দ। আজ আমি তাই দাঁড়াতে চাই উপলব্ধির ভিত্তিতে। তাই খানিক বুলি উদ্গীরণ ক'রেই বললাম: "আর থাক বন্ধু, এবিষয়ে আরো যদি জানতে চান যাবেন কোনো পণ্ডিতের কাছে। আমি কথা বলতে চাই যে সম্বন্ধে—সে-সম্বন্ধে আমার কিছু অপরোক্ষ অনুভূতি বা জ্ঞান আছে। যথা সাধুসংঘ। যদি শুনতে চান বলতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, শ্রীঅরবিন্দের কথা, রমণ মহর্ষির কথা, রামদাসের কথা। "বলতে বলতে মন একটু আরাম পেল এইটি ভেবে যে, অন্তত যা জানি না তার সম্বন্ধে জানি এমন ভঙ্গি একবারও করি নি। কাজেই আমি অন্তত দেবদেবীদের "হত্যা" করছি না। জ্ঞানের বর্ণপরিচয়ও আমার হয় নি এতবড় মিথ্যা কথা কেমন ক'রে বলি? কিন্তু জ্ঞানের বাণী বেশি বলতে ইচ্ছা করে না। মনে পড়ে মীরার নিষেধোক্তি: "সবচেয়ে বড় প্রচার হ'ল সত্যকে জীবনে পালন করা—তোমার নিজের জীবন যেন হ'য়ে ওঠে সত্যের বাণী—রসনা যেন সে বাণীর প্রচারে বেশি তৎপর হ'য়ে না ওঠে।" অথচ মুস্কিল এই এরা চায় শুনতে—সত্যিই চায়—যা কিছুই এদের বলা হোক না কেন—শোনে এরা পরম উৎসাহে। এ হেন মানসিক অবস্থা ভালো না মন্দ—কে বলবে? সত্যি, ভেবে বলতে গেলে দেখি—না ভেবে যা বলা যায় সে-সব আবোল তাবোলের সাড়ে পনর আনা না হোক অন্তত বার আনা বাদ দেওয়া চলে—তাতে প্রমত্ত বাঁচে, সময়ের অপব্যয়ও কমে। তার চেয়ে গান করা ভালো। কারণ গান যে প্রচার করে ন জ্ঞানের মাধ্যমে নয় আনন্দের মাধ্যমে। আর আনন্দের রসায়নে অসার্থকও হ'য়ে ওঠে সার্থক, নয় কি? ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম—জ্ঞানের বাণী নাই বা পারলাম প্রচার করতে, গানের মধ্যে দিয়ে আনন্দ পেতে ও পরিবেশন করতে তো পারি—অন্তত খানিকটাও।

* * *

ফের গুরুগম্ভীর থেকে নেমে আসি হাল্কামিতে—আপনাদের আবার একটু আশ্চর্য করি? লাভ—বাহাদুরি—যথা কী কাণ্ডই চোখে দেখে এলাম, কানে শুনে এলাম! ট্যাক্সি রেডিও টেলিফোন সবই আপনারা শুনেছেন—কিন্তু—না গোড়া থেকেই বলি।

হ'ল কি, আকাদেমিতে সপ্তাহে তিন দিন আমি গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেই ও গান শেখাই, ইন্দিরা—নাচ সম্বন্ধে। আকাদেমির ডিরেক্টর গেনসবুরোর সেক্রেটারী আমাদের হাতে একটি পুস্তিকা দিলেন হলদে টিকিটের। এখানে আছে নানা রকম ট্যাক্সি—(থুড়ি, ক্যাব, ক্যাব—ট্যাক্সিকেও এখানে ওরা সংক্ষেপে ক'রে ক্যাব দাঁড় করিয়েছে যেমন yes-কে ya!)—yellow cab, red and white cab, veterans' cab ইত্যাদি: প্রত্যেকের বর্ণ ও নামাবলী স্বকীয়। রাশি রাশি "পীত যান" চলেছে রাস্তায়—যে কোনো পীতযানকে আমরা নিতে পারি, গন্তব্যস্থলে গিয়ে কেবল ঐ পুস্তিকার একটি টিকিট ছিঁড়ে সারথির হাতে দেওয়ার অপেক্ষা। এক কথায়, আমাদের ট্যাক্সি বা ক্যাবের ভাড়া আকাদেমি বহন করলেন এই শোভন উপায়ে। হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, দরকার হ'লে রাস্তার প্রায় যে কোনো মোড়ে হলদে বাক্স আছে—সেখানে শুধু টেলিফোন করতে না করতে হলদে ক্যাব এসে হাজির। এখনো আপনারা আশ্চর্য হ'তে রাজি নন—জানি, কিন্তু আমিও নাছোড়বন্দ। যাতে নিজে অবাক হয়েছি তাতে আপনাদেরও অবাক করবার চেষ্টা অন্তত করব—তাতে যদি ব্যর্থকামও হই তবে আপ্তবাক্যের সান্ত্বনা তো মজুদ রয়েইছে—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?" এবার শুনুন মন দিয়ে।

গতকাল—১১ই ফেব্রুয়ারি—সন্ধ্যায় পীতযান ডিপো থেকে আমাদের হোটেলে ট্যাক্সি এসে হাজির—টেলিফোন এল নিচে থেকে উপরে, আমাদের ঘরে। আমরা গেলাম আকাদেমিতে। ওখানে ইন্দিরা ওর ছাত্রীদের শেখাল নাচ, আমি আমার ছাত্রদের শেখালাম একটি নতুন গান. ইন্দিরার রচিত "When day is done and shadows fall" যেটি শ্রুতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। ছাত্ররা ভারতীয় রাগে ইংরাজি গান গাইতে খুব ভালোবাসে ও কোরাসে গানগুলি চমৎকার শোনায় ব'লেই স্থির করেছি একের পর এক গান শিখিয়ে যাব এই ভাবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

গান শেষ হ'ল রাত নটায়। আকাদেমির একটি ছাত্রকে বললাম, পীতযান আসতে যখন দেরি হচ্ছে টেলিফোন করলে কী হয়? সে বলল: বেশ হয়। ব'লেই টেলিফোন করল পীতযান ডিপোতে। সেখান থেকে দেখতে দেখতে এল একটি পীত রথ। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি পীতযান—যেটি আসার কথা ছিল, অর্থাৎ টেলিফোন না করলেও আসত—সেটিও এসে হাজির।

মহামুস্কিল! কোনটাতে যাই? দুজনেই দাঁড়িয়ে। লাভ ছাড়ে কে কোন্ দেশে? ওদের মধ্যে তকরার হ'ল। অবশেষে যে পীতযানটি টেলিফোনের উত্তরে এসেছিল তাকে আমরা সিকি ডলার দিয়ে বিদায় দিয়ে প্রথম যানে আরূঢ় হলাম। হঠাৎ দেখি, ওমা! সারথি একটা টেলিফোনে কথা কইছে ও সামনের একটা ফানেল থেকে তারস্বরে জবাব আসছে। সারথি বলছে কি কি ঘটেছে, উত্তর আসছে কিং কর্তব্যম্। পরিষ্কার শুনছি দুটো কণ্ঠ। টেলিফোনের সামনে যদি কেউ থাকে সে কথা শুনতে পায় একতরফা—মোটরে চ'ড়ে আমরা শুনলাম দুতরফা টেলিফোনিক কথা। কেমন ক'রে ও অসম্ভব সম্ভব হ'ল—জিজ্ঞাসা করতে সারথি বলল, ওদের প্রতি মোটরে থাকে রেডিও টেলিফোন যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো স্থান থেকে ওরা হেড অফিসের অধিকারীর সঙ্গে বা যে কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারে। অর্থাৎ সারথি চলতি মোটরে টেলিফোনে আলাপ করতে পারে তিন ভুবনের সঙ্গে না হোক এ-ভুবনের যে কোনো আলাপীর সঙ্গে। আর যে কথা সে বলে তার উত্তর আসে টেলিফোনের কুঠকুহরে নয়—সামনের ফানেল থেকে। এবার ন'টে গাছটি মুড়োলো—কিন্তু হয়ত এত শত বলা সত্ত্বেও আপনারা কেউ আশ্চর্য হ'তে রাজি হবেন না। নাচার। আমরা হয়েছিলাম।

* * *

ডাক্তার স্পীগেলবার্গ বললেন: স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। সানফ্রান্সিস্কো যেতে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশ মাইলেরো বেশি দূরে। কী ক'রে যাওয়া যায়? চিরসদয় বন্ধু হাণ্টার এগিয়ে এলেন। বিদেশে যখনই অকুল পাথারে পড়েছি কোত্থেকে যে এগিয়ে এসেছেন কাণ্ডারী!

বেরুলাম দুপুর বেলা। কী সুন্দর পথ—উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা—কখনো বা এধারে শৈলশোভা কখনো বা ওধারে সেই আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা কন্যা যাঁর কোলে! আর এক আশ্চর্য—এতক্ষণ বলা হয় নি—এত অজস্র মোটরে ঘুরলাম এদেশে কখনো কোনো রাস্তা অমসৃণ দেখি নি—চাকায় ধাক্কা লাগার কথা তো দূরে থাক্। ভালো রাস্তা আমাদের দেশে নেই এমন কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু অজস্র রাস্তার প্রত্যেকটি ধূলিশূন্য, সর্বত্র মাঝ বরাবর পরিষ্কার সাদা লাইন কাটা যাতে এমুখের গাড়ির পথের সঙ্গে ও মুখের গাড়ির পথনির্দেশ সম্বন্ধে মনে সন্দেহের লেশও ঠাঁই না পেতে পারে এবং সর্বোপরি ঐ যে বললাম কোথাও নেই এতটুকু বেমেরামত, গর্ত বা গর্তাভ কিছু! হাণ্টারকে বললাম: "বন্ধু! আমেরিকাকে নিন্দা করবার লোকের অভাব নেই—কত শত লোকই যে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে আমেরিকানিস্‌ম্ নিয়ে—আমি নিজেও আমেরিকার সব কিছুর সঙ্গে সায় দিতে পারি না। কিন্তু কোত্থেকে পেলে তোমরা এ আশ্চর্য গঠননৈপুণ্য বিধি-নিয়ন্ত্রণ তথা শৃঙ্খলাপরিকল্পনা? হোটেল রেস্তরাঁ, ট্যাক্সি, বিপণি, আলো, জল, পরিচারণ—সর্বত্রই দেখতে পাই এক অবিশ্বাস্য সুব্যবস্থা—ডলার দিলে তার পরিবর্তে চেঞ্জ গড়িয়ে পড়ে যন্ত্র থেকে তৎক্ষণাৎ—প্রতি ট্যাক্সিতে সারথি যেকোনো মুহূর্তে কথা কইতে পারে হেড আপিসের সঙ্গে ও নির্দেশ পায় তখনি তখনি—একটি লিফ্‌টও দেখিনি অচল, একটি সারথিকেও দুবার বলতে হয় নি কোনো ঠিকানা!—এ কী ব্যাপার! কেমন ক'রে এ-আশ্চয্য কর্মকৌশল তোমরা আয়ত্ত করলে বলতে পারো? নানা জাতির লোক এসে রচেছে আমেরিকান সভ্যতা—কিন্তু যেসব জাতির লোক এ-সভ্যতার ভারবাহী তাদের সবার সভ্যতার সমষ্টি তো নয় তোমাদের সভ্যতা। মানতেই হবে—তোমরা একটি বিশিষ্ট জাতি—অখণ্ড জাতি যার জীবনের বোধহয় তিনটি মূল মহামন্ত্র: শৃঙ্খলা, তৎপরতা ও অনলসতা। তোমাদের দেশে অলস আমেরিকান বোধহয় তেম্‌নি অভাবনীয় যেমন অভাবনীয় আমাদের দেশে কর্মিষ্ঠ যোগী।

বন্ধুবর প্রসন্নমুখে হেসে বললেন: "আমাদের দেশে সুব্যবস্থা ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার মূলে আছে দৃষ্টি। তোমরা হয়ত জানো না আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে নামবার আগে বহুদিন ধ'রে কী ভাবে শিক্ষানবিশি করতে হয় দেখার—বুঝে নিতে হয় কোথায় কেমন ক'রে কী ভাবে কাজ করলে সব চেয়ে কম সময়ে সব চেয়ে বেশি কর্মসিদ্ধি হয়। তাছাড়া এ তো কী দেখছ। যুদ্ধের সময়ে যদি থাকতে এদেশে দেখতে এ-কর্মনৈপুণ্যের অতিকায় বিকাশ ও ব্যাপ্তি। কর্মের গতিবেগ বেড়ে যায় তখন বহুগুণ, ঝগড়া ঝাটি হ'য়ে যায় প্রায় অদৃশ্য, প্রত্যেকে দলাদলি মন কষাকষি ভুলে জপে একটি অদ্বিতীয় মন্ত্র—তার হাতে যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সে-কাজ কী ক'রে সবচেয়ে কম সময়ে সুনির্বাহিত হবে। তাছাড়া এসবের পিছনে তখন চলে প্ল্যানিং। মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দেই তোমাকে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে ছিল নানা ছোট ছোট দ্বীপ। প্রত্যেক দ্বীপ অধিকার করা হবে কী ভাবে, কখন ও কোন্ পর্যায়ে সমস্ত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যালোচনা ক'রে তবে আমাদের সেনা ও সেনানী এগিয়েছে। আর চড়াও হয়েছে তারা তখনি তখনি নয়—ছমাস বাদে অমুক ছোট দ্বীপটি দখল করতে হবে এইভাবে, আগে বিমান ফেলবে বোমা পরে ওদিক থেকে আসবে জাহাজ, সেদিক থেকে প্যারাশুটী—ইত্যাদি—সে যে কী অজস্র খুঁটি-নাটি কী বলব?"

কী? শিবের গীত গাইতে ধান ভানা? ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার আরামই তো ঐখানে। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন পরমানন্দে "চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্"—আমি বলি "কথানন্দরূপঃ সখাহং সখাহম্"—অর্থাৎ যাঁরা সখাভাবে কথা শুনতে চান তাঁদের জন্যেই ভ্রমণকাহিনী লেখা—যাঁরা চান জ্ঞানগম্ভীর, সুসংবদ্ধ পরমনৈতিক গবেষণা—না তাঁরা আমার গ্রাহক, না আমি তাঁদের পরিবেষক।

* * *

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে আরো ভালো লাগল। বড় সুদর্শন কলেজটি। চারদিকে সবুজের অখণ্ড রাজত্ব, গাছপালা ঝলমল ঝলমল করছে—ওদিকে পাহাড় এদিকে সমুদ্র। অপরূপ পরিবেশ।

ঘরে ঢুকেই দেখি বহু ছাত্র ছাত্রী। স্ট্যানফোর্ডের পত্রিকায় বেরিয়েছিল আমার ছবি ও স্পীগেলবার্গ-লিখিত পরিচয়। তাই ক্লাস ভরতি। স্পীগেলবার্গ আমার পরিচয় দিলেন উপাধি দিয়ে "ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক রাজদূত"। বললেন আরো অনেক শ্রুতিমধুর কথা—সেসব বললে কুফল ফলবে—অনেকেই হাসবে অবিশ্বাসের হাসি।

তারপরে আমি উঠলাম বক্তৃতা দিতে সঙ্গীত সম্বন্ধে। বললাম: "ডাক্তার স্পীগেলবার্গ আমাকে প্রথম বলেছিলেন শুধুই বক্তৃতা দিতে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে নির্জলা বক্তৃতার বিড়ম্বনা কেন যখন গাইতে পারি? হাত থাকতে মুখোমুখি কেন। বক্তৃতায় স্বর থাকে মন্দ না হোক বড় জোর মধ্যগ্রামে। শুধু গানের সাম্রাজ্যেই তার স্বরে কণ্ঠবিজ্ঞপ্তি।" এরকম আরো কয়েকটি কথা বলতে ওরা হেসে কুটিকুটি।

তারপর বললাম রাগরাগিনী সম্বন্ধে আমাদের বংশকৌলীন্যের কথা, আদিম ধারনার কথা—পৌরাণিক পরিকল্পনার কথা—আমাদের কণ্ঠসাধন সুরবিহার তালবৈশিষ্ট্যের কথা—আরো কত অবান্তর কথা। কিন্তু ঘুরে ফিরে শুধু গান শোনাতে। যতগুলি পারি গান শুনিয়ে যাই এই ছিল আমার দুষ্ট সংকল্প। বক্তা হ'য়ে এসে বক্তৃতার ছদ্মবেশে গানই হোক ক্লাসে।

ফল ফলল, যদিও ওরা টের পেল কিনা সন্দেহ যে আমি মালকোষ ভৈরবী ঝিঁঝিট প্রভৃতি নানা রাগই শোনালাম—ঝিঁঝিট ও ভৈরবী গাইলাম বাংলায় ও ইংরাজি অনুবাদে, মালকোষ বাংলায়। শোনালাম তান প্রাণের মায়া ছেড়ে। দেখালাম তান বিষমপদী ঝাঁপতাল ধা গে না ধি না, তে টে তা ধি না। প্রকট করলাম সার্গম। কী না করলাম—শুধু কুরুক্ষেত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তন ছাড়া? শেষে বললাম: "আপনারা হয় ত আমার পিতৃদেবের 'আমরা এম্নি এসে ভেসে যাই" গানটি বাংলায় শোনার পর ইংরাজিতে শুনে বলবেন: 'কই, আমাদের সঙ্গীতের থেকে তো খুব আলাদা শোনাচ্ছে না!' (একথা বলছি কেন না আমার কোনো কোনো পাশ্চাত্য বন্ধুর কাছে এই ধরণের মন্তব্য শুনেছি যখন গেয়েছি আমাদের নানা বাংলা বা হিন্দি গানের ইংরাজি অনুবাদ বাংলা সুরে।) তার উত্তরে আমি বলব জাতিতে জাতিতে যেমন অমিল আছে তেম্নি মিলও তো আছে। গানের ক্ষেত্রে এ-মিলের বেশি পরিচয় পাই অনেক সরল মেঠো সুরে। যেমন ধরুন নানাদেশের লোকসঙ্গীতে।" ব'লে কালবিলম্ব না ক'রে ধরে নিলাম কুর্শমানের প্রণীত জর্মন ঘুমপাড়ানি গান খাশ জর্মন ভাষায়—ওরা শুনে ভারি পুলকিত—ওদের মুখচোখে আনন্দ উছলে উঠল—কেন না এবার ওদের আর "চিনি চিনি করি" চলারো পথ রইল না—এ যে দস্তুরমত নিজের পায়ে কাটা রাস্তা—অন্ধকারেও চেনা যায়। কিন্তু ওদের মুখে আনন্দের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে ধ'রে দিলাম আমার স্বরচিত "ঘুম যাই মা" অবিকল ঐ সুরে।

ধনুর্ধর না-ই হলাম—তাই ব'লে তীরন্দাজি করতে বাধা কি? মনে পড়ে বহু বৎসর আগে রংপুরে গিয়ে এক পুলিশ সাহেবের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি বললেন: নদীতীরে চলুন বন্দুক ছোড়া শেখাই।" যেখানে গিয়ে দেখি দূরে এক নিরীহ বক দাঁড়িয়ে এক পায়ে। বন্ধু দেখিয়ে দিলেন কেমন ক'রে বন্দুক ধরতে হয় ও টিগার টিপতে হয়। ভাবলাম দেই টিপে বককে তাক্ ক'রে—মরবে না তো। কিন্তু, ওমা! বন্দুক ছুঁড়তে না ছুঁড়তে বক বেচারি ধপ্ ক'রে পড়ে ম'রে গেল। তারপর সে আমার কী অনুশোচনা! সেই আমার প্রথম বন্দুক ধরা এবং (আশা করি) শেষ।

আমার বলবার কথাটা এই যে আন্দাজে ঢিল মেরেও অনেক সময় কাজ হাসিল হয় যদি ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হন। এখানেও হ'ল তাই, বাংলা থেকে ইংরাজি গান শোনার পরই জর্মন থেকে বাংলা শুনে ওরা কেমন যেন হতভম্ব মতন হ'য়ে গেল। এর পরেও আর বলবে কোন্ মুখে: "ভারতীয় সঙ্গীত তেমন কিছু নয়—যে সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের এমন হুবহু তর্জমা হয়!" রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রসিকতা মনে পড়ে: "বিদ্যার জোরে নয় দিলীপ, বুদ্ধির জোরেই ক'রে খাচ্ছি।" দোহাই ধর্ম, আপনারা যদি আমার প্রতি অতি-অপ্রসন্নও হন তাহ'লেও আশা করি বলবেন না যে আমি এতবড় অর্বাচীন যে এই ছলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাতে চাইছি। কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে আমি পাল্লা দেবার স্পর্ধা করি না। কেবল এই কথাটি বলতে চাই দেশবিদেশে বহু ঘুরে হয়ত তাঁর উপলব্ধ এই মন্ত্রটির মর্ম বুঝতে পেরেছি যে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। নইলে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তা হ'য়ে গিয়ে বিনা পাণ্ডিত্যে এতটা সাধুবাদ পেতাম না মাত্র ঘণ্টাখানেকের সাঙ্গীতিক বাহ্বাস্ফোটে।

যদি কোনো তথাপি সন্দিগ্ধ ক্রিটিক বলেন: "ওরা ভালো তো বলেনি—কেবল সুশীল—হাততালিই দিয়েছে হয় ত—" ইত্যাদি, তাহ'লে বার করব একটি সবিনয় যুক্তি। বন্ধুবর হাণ্টার বসেছিলেন একটি চেয়ারে। বললেন! "যখন তুমি গাইছিলে শ্রীঅরবিন্দের 'In lolus grove' গানটি তোমাদের সুরে তখন আমার সামনে দুটি আমেরিকান পাত্রী বলাবলি করছিল: "Lovely song!" ক্রিটিকবর! এবার? যদি এতেও না মানেন তবে দেব হাণ্টারের ঠিকানা তদন্ত ক'রে দেখুন সত্য মিথ্যা।"

কিন্তু না, ভোলা মন, জপ করো: "নৈষা তর্কেন মতিরাপনীয়া—যারা তোমার কথায় বিশ্বাস করে না যেয়ো না তাদের কোনঠাশা করতে। তার চেয়ে বলো: মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা—দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না। দরবার করো শুধু ঐ দরদীর কাছে—কেন না তারাই হ'ল প্রকৃত মনের মানুষ—যখন বলতে চাইবে মনের কথা মনের মতন ক'রে।"

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা

মন্মথ রায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোরে অবস্থিত 'গোকুল' নামধেয় রাজপ্রাসাদ—বৈষ্ণব অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসভবন। কাল—অপরাহ্ণ। গিরিধারীলালের বিগ্রহ-মূর্ত্তি ফুলসাজে সজ্জিত। ধূপ, ধূনা ও দীপ জ্বালানো হইয়াছে। গিরিধারীলালের সম্মুখে নৃত্যগীত সহকারে মীরা ও তাহার সখীদ্বয় গঙ্গা-যমুনা বৈকালী নিবেদন করিতেছে।

গান

"বসো মোরে নৈনন্ মে নংদলাল।"
আমার নয়নে বিরাজ গো নন্দদুলাল।
মোহন মূরতি সুন্দর মনোহর লোচন অতীব বিশাল ॥
অধরে সুধারস মুরলী বাজে, কণ্ঠে শোভে জয়মালা।
কটিতটে ঘুঙ্ঘুর সুমধুর বোলে চরণে নূপুর রসাল ॥
মীরার প্রভু তুমি সাধুজন-সুখদায়ী ভকতবৎসল গোপাল ॥

কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ॥ মীরা!

মীরা ভাবাবিষ্টের মতো গিরিধারীলালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। কুম্ভের ডাক তাহার কানে গেল না। গঙ্গা ও যমুনা কুম্ভকে লক্ষ্য করিল। গঙ্গা মীরার মুখখানি কুম্ভের দিকে ঘুরাইয়া দিয়া চাপা গলায় বলিল—

গঙ্গা॥ যুবরাজ!

গঙ্গা ও যমুনা সহাস্য কৌতুক দৃষ্টিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। মীরা ধীরে ধীরে কুম্ভের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মীরা॥ আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে?

কুম্ভ॥ ভুলে গিয়েছিলাম! কেন?

মীরা॥ সেই কখন চলে গিয়েছিলে। মনে থাকলে এতো দেরী করতে পারতে না তুমি। আমি তোমার জন্য সারাদিন বসে আছি। স্বামীর ঘরে আজ আমার প্রথম দিন। তোমাকে আমার সেবা করতে হবে—পূজা করতে হবে—জানোনা বুঝি?

কুম্ভ॥ (সবিস্ময়ে) মীরা!

মীরা॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বসো। (সখীদের উদ্দেশ্যে) কই, তোরা কোথায়? আন্ পাদ্য···আন্ অর্ঘ্য···আন্ পুষ্প।

গঙ্গা যমুনা এই সব সাজ-সরঞ্জাম লইয়া মীরার এই আদেশেরই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা তখনই তাহা লইয়া আসিল।

কুম্ভ॥ (সবিস্ময়ে) এ কি!

মীরা কুম্ভের হাত ধরিয়া একটি আসনে বসাইল

মীরা॥ হ্যাঁ, দাদু আমাকে সব বলে দিয়েছেন—শিখিয়ে দিয়েছেন।

মীরা একটি পাত্রে কুম্ভের পদদ্বয় রাখিয়া পাত্রস্থিত জল দ্বারা উহা ধৌত করিতে লাগিল।

মীরা॥ হ্যাঁ, তুমি আমার প্রভু · তুমি আমার প্রিয়—আমি তোমার দাসী।

মীরা নিজের কেশপাশ খুলিয়া কেশদাম দ্বারা কুম্ভের পদদ্বয় মুছাইতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা গাহিতে লাগিল।

গান

"হো জী মহারাজ ছোড় মত জাজ্যো।"
মোরে ছাড়িয়া যেও না মহারাজ।
আমি অবলা নাহিক বল, হে গোঁসাই ছাড় ছল,
তুমি হে আমার শিরতাজ ॥
আমি গুণহীনা প্রভু, তুমি সর্ব্বগুণাধার,
অধীনা কোথায় যাবে? হৃদয়ের অলঙ্কার—
মীরার সকলই তুমি, আর কেহ নাই স্বামী,
রাখ মান রাখ তার লাজ ॥

গানের মধ্যে মীরা কুম্ভের পদদ্বয় ধৌত করিয়া তাহাতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিল। গানের শেষ ভাগে গঙ্গা ও যমুনা জলপাত্রটি লইয়া গীতকণ্ঠে চলিয়া গেল।

কুম্ভ॥ মীরা!

মীরা॥ প্রভু!

কুম্ভ॥ তুমি আমার একটা কথা রাখবে মীরা?

মীরা॥ কী?

কুম্ভ॥ চল, আমরা দু'জনে চলে যাই—দূরে···বহুদূরে—রাজ্যের বাইরে···লোকালয়ের বাইরে—কোন পাহাড়ে···কোন বনে!

মীরা॥ কেন—কেন প্রভু?

কুম্ভ॥ তুমি জানোনা মীরা, এ সংসারে কতো অশান্তি···কতো আবিলতা···কতো বিষ! তুমি তা সইতে পারবে না। (মীরার চিবুকটী ধরিয়া) আমার এই ফুলটি দু'দিনেই যাবে শুকিয়ে। আমি তা' সইতে পারবো না।

মীরা॥ না, না, তা কেন? আমার দাদু যে আমাকে সংসার করতেই বলেছেন। বলেছেন,—পরমপতির দিকে মন রেখে, পতিসেবা করবি—সংসার ধর্ম করবি। বলেছেন,—তাতেই সুখ—তাতেই আনন্দ!

কুম্ভ॥ না মীরা, তা হয় না। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে সংসারের বাইরে নিয়ে গেলেই রক্ষা। চল মীরা—

মীরা॥ তুমি আমার জন্যে সংসার ত্যাগ করবে? ত্যাগ করবে এই রাজ্য···এই ঐশ্বর্য? তুমি বীর—রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মেবারের সিংহাসন তোমারই মুখ চেয়ে আছে। প্রজাদের আশা তুমি—ভরসা তুমি! কতো কাজ রয়েছে তোমার। সব কিছু ছেড়ে আমাকে নিয়ে মেবার ছেড়ে চলে গেলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না—কেউ না। না, না, আমি তা পারবো না—পারবো না।

কুম্ভ॥ তবে শোনো মীরা। যে রাজসংসারের জন্যে তোমার আজ এতো দরদ, সেই রাজসংসারের আজ দাবী—ওই গিরিধারীলাল ত্যাগ করে তোমাকে আরাধনা করতে হবে কুলদেবতা কালিকাদেবী!

মীরা॥ গিরিধারীলালকে ত্যাগ করে?

কুম্ভ॥ হ্যাঁ, ত্যাগ করে। আর তা যদি না কর, তোমাকে এ রাজসংসার ত্যাগ করতে হবে—মহারাণার আদেশ।

মীরা॥ আমি রাজসংসারই ত্যাগ করবো। গিরিধারী-লালকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না—পারবো না স্বামী।

কুম্ভ॥ কিন্তু তোমাকেও তো আমি ত্যাগ করতে পারবো না মীরা। আর তা' পারবো না বলেই বলেছিলাম, এসো মীরা, আমরা দু'জনেই এ সংসার ত্যাগ করি। চলে যাই দূরে···বহুদূরে—লোকালয়ের বাইরে।

মীরা॥ তুমি রাজপুত্র,—আমার জন্যে হবে সন্ন্যাসী? না, না, তা' আমি সইতে পারবো না—সইতে পারবো না।

মীরা ছুটিয়া গিরিধারীলালের মূর্তির নিকট নতজানু হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল

মীরা॥ তুমি আমায় বলে দাও—বলে দাও গিরিধারী-লাল, আমি কী করবো—কী করবো। (কী যেন শুনিয়া) কী?·· স্বামীর আদেশ পালন করতে হবে! করতেই হবে? (মীরা ক্ষণকাল কি ভাবিয়া—পুনরায় কুম্ভের নিকটে গিয়া তাহার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক স্বামী। যদি তুমি বল,—সংসার ত্যাগ করবো—তোমার হাত ধরে চলে যাবো দূরে···বহুদূরে···লোকালয়ের বাইরে। আর যদি বল, গিরিধারীলালকে ত্যাগ করতে হবে—আরাধনা করতে হবে কালিকা দেবীর—ভোগ করতে হবে রাজ-ঐশ্বর্য রাজরাণী হয়ে—তাও করবো। তুমি যা' বলবে, আমি তাই করবো—তাই করবো প্রভু।

কুম্ভ॥ মীরা!

মীরা॥ বল, বল প্রভু, কী তোমার আদেশ।

কুম্ভ॥ তোমার গিরিধারীলাল এখানেই থাকুন—বৈষ্ণব অতিথিশালা এই গোকুলে। বৈষ্ণব দিয়েই আমি তাঁর সেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে আমার কুলদেবতা কালিকা-মন্দিরে। কালিকাচরণ অর্চনা করে—মেবারের ভাবী মহারাণী তুমি—অধিষ্ঠিতা হবে মেবারের রাজসংসারে। মীরা! যাবে তুমি?

মীরা॥ যাবো।

কুম্ভ॥ ধন্য আমি। তুমি প্রস্তুত হও মীরা। মেবার-লক্ষ্মীর অভিষেক—উৎসবের আয়োজন করে আমি এখনই তোমাকে নিতে আসছি।

কুম্ভের প্রস্থান। বেদনাহতা মীরা ঊর্দ্ধে তাকাইয়া অদৃশ্য গিরিধারীলালের সহিত আলাপ করিতে লাগিল

মীরা॥ এ কী হলো? এ তুমি কী করলে গিরিধারী-লাল? (উৎকর্ণ হইয়া) কী?·· আমি তোমার অপমান করেছি! কেন?···তুমি শুধু ওইটুকু বিগ্রহের ভেতর আছো, এই কথা মনে করে! কী বললে?···তুমি সর্বত্র! ওই কালিকা মূর্তিতেও তুমি!···কী?···যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী! যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ? গিরিধারীলাল! রণছোড়জি! আমি না বুঝে এতদিন কী পাপ করেছি! আমায় তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর ঠাকুর!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গন। কাল—সন্ধ্যা। মহারাণা মহাকাল ও তৎসহ চম্পার প্রবেশ

চম্পা॥ বাবা! তোমার এমন অসুস্থ শরীর—তবু

তুমি বাইরে উঠে এলে। রাজবৈদ্য দেখলে আমাদের আর রক্ষা নেই। চল, তুমি শোবে চল।

মহাকাল॥ উঠে আসবো না? কালিকা-মন্দিরে প্রণাম করে প্রাসাদে আসতে ওদের এতো বিলম্ব হচ্ছে কেন? তবে কি—তবে কি—মীরা শেষটায় কালিকা প্রণাম করলো না?

চম্পা॥ একবার দেখেই বুঝেছি, প্রণাম করবে বলে প্রণাম করবে না—সে মেয়ে ওই মীরা নয়।

মহাকাল॥ কিছুই বুঝিস্‌নি—কিছুই বুঝিস্‌নি তুই চম্পা। প্রণাম করবো না বলে' যে প্রণাম করবে বলে—তাকে বিশ্বাস কী? বুঝলি মা, ও না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

হন্তদন্ত হইয়া কৌশিকের প্রবেশ

কৌশিক॥ দেখে এলাম মহারাণা, দেখে এলাম। মেয়ের মতো একটা মেয়ে দেখে এলাম বটে!

মহারাণা॥ হেঁয়ালী রাখো কৌশিক। কালী প্রণাম করেছে কিনা বল।

কৌশিক॥ প্রণাম? প্রণাম কাকে বল মহারাণা? মা কালীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে···চোখের জলে মন্দির ভেসে গেছে। একটা দেখবার জিনিস মহারাণা।

চম্পা॥ তোমার কাছে তো সবই দেখবার জিনিষ কৌশিকদা। যা দ্যাখো, তাতেই তুমি মূর্চ্ছা যাও। এখন দয়া করে বল দেখি, তারা কোথায়?

কৌশিক॥ আমি মূর্চ্ছা যাই? শত শত লোক মূর্চ্ছা যাচ্ছে তাকে দেখে—ওই পথে।

মহাকাল॥ আঃ! বলনা কেন—তবে তারা আসছে—প্রাসাদে আসছে?

কৌশিক॥ আসছে মানে? এসে গেছে। মহারাণী আমাকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিলেন—বধূবরণ উৎসবের আয়োজন সব ঠিক আছে কিনা দেখতে।

চম্পা॥ সে আর তোমাকে দেখতে হবে না। সে যা দেখবার আমি দেখছি।

চম্পার প্রস্থান

মহাকাল॥ তুমি বললে না কৌশিক—মা কালীর পায়ে পড়ে কাঁদছিল। কিন্তু কেন কাঁদছিল, বলতে পারো কৌশিক?

কৌশিক॥ বলা ভারী মুস্কিল মহারাণা। সকালে দেখলাম আগুন, আর এখন দেখলাম জল। এই আগুন, এই জল—এমনটি সত্যিই দেখিনি মহারাণা। এই যে পুরোহিত ঠাকুর—

শঙ্করদেবের প্রবেশ

কৌশিক॥ বলুন, আপনিই বলুন। সকালে শুনলেন—তোমাদের কালী, আমার কৃষ্ণ। সেই মুখেই আবার এখন শুনলেন—যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ· যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী। বলুন, এমনটি কখনো দেখেছেন?

শঙ্কর॥ কৌশিক মিথ্যা বলেনি মহারাণা। আজ প্রভাতে মীরাবাঈ-এর আচরণে যেমন অপ্রসন্ন হয়েছিলাম, তেমনি প্রসন্ন হয়েছি আজ সন্ধ্যায়। অপূর্ব ভক্তিমতী ওই মীরাবাঈ। আমার আজ অনেক কিছু বলবার আছে মহারাণা। কিন্তু—ওই ওরা এসে পড়েছে। আজ আনন্দের দিন—উৎসবের দিন।

নহবৎ বাজিয়া উঠিল। কুম্ভ ও মীরাকে লইয়া চণ্ডীবাঈ ও অন্যান্য অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপরীত দিক হইতে চম্পার নেতৃত্বে পুরনারীগণ বরণডালা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া উলু ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ করিল। বর বধূ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে পুরনারীগণ তাহাদের ঘিরিয়া উৎসব-নৃত্য সুরু করিয়া দিল। পুরোহিত, মহারাণা ও মহারাণী একে একে ধান দুর্বা দিয়া বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলে বরবধূ তাঁহাদের প্রণাম করিল। সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইয়া গেলে পুরনারীগণ কুম্ভ ও মীরাকে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। চণ্ডীবাঈ ও চম্পা তাহাদের অনুসরণ করিল। মহাকালও চলিয়া যাইতেছিলেন, শঙ্করদেব তাঁহাকে ডাকিলেন।

শঙ্কর॥ মহারাণা! তোমার ঘরে এলেন আজ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। শুধু লক্ষ্মী ও নয় মহারাণা রূপে লক্ষ্মী, জ্ঞানে সরস্বতী। আমার মস্ত ভুল ভেঙে দিয়েছে ওই অতোটুকু মেয়ে। আমি বলেছিলাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ বুকে নিয়ে কালী প্রণাম চলে না। এতো সংকীর্ণ ছিল আমার জ্ঞান—আমার বুদ্ধি! আজ শিখেছি—ওর কাছেই শিখেছি, যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ···যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী!!

তৃতীয় দৃশ্য

কুম্ভের শয়ন-কক্ষ। পুষ্পশয্যা। নিশীথ রাত্রি, কিন্তু কক্ষটি দীপালোকে উদ্ভাসিত···বিলাস-সম্ভারের সমারোহ। কুম্ভ শয্যায় বসিয়া আছেন। মীরা তাঁহার সম্মুখে গাহিতেছে।

গান

"পিয়া বিন রহ্যো ন জাঈ।"

প্রিয়তম বিনা কভু থাকা নাহি যায়।
আমার এ তনুমন সঁপিয়াছি পায়॥
নিশিদিন চেয়ে আছি পথের দিকে,
কবে আসি মম সনে মিলিবে সখে?
হে মীরার প্রভু, আছি তোমারই আশায়,
এসো প্রভু, ধর তব কণ্ঠে আমায়॥

কুম্ভ॥ (মীরার মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া সাগ্রহে) মীরা!

মীরা॥ প্রভু!

কুম্ভ॥ গান আমি জানি না, তাই গাইতে পারছি না। কিন্তু তোমারই কথা আমিও বলি—তুমি আমার চোখের সামনে থেকো···দূরে যেও না কোনোদিন। কেন যেন আমার কেবলই ভয় হয়, তোমাকে আমি হারাবো। কেন যেন কেবলই মনে হয়, আমার এ বাহুবন্ধন তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না মীরা।

মীরা॥ না, না, তুমি আমাকে বেঁধে রাখো। আমি জানি, আমি বুঝি—তুমি আমায় কতো ভালোবাসো। আমি ভুলতে চাই—সব কিছু ভুলতে চাই—তোমারই মাঝে আমি ডুবে থাকতে চাই। তোমাকে আমার বড়ো ভালো লেগেছে। তোমাকেই আমি চাই। আমাকে তুমি ধরে রেখো—বেঁধে রেখো—ছেড়ে দিও না।

কুম্ভ॥ একী মীরা! তুমি কাঁপছো! বল, বল মীরা, কার ভয় তুমি করছো?

মীরা॥ আছে—আছে—একজন আছে। সে এলে—সে ডাকলে—আমাকে যেতেই হবে, আমাকে ছুটে বেরুতে হবে···চলে যেতে হবে তার সঙ্গে—তার কাছে। (কাহার উদ্দেশ্যে যেন বলিতে লাগিল) না, না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে তুমি থাকতে দাও আমার এই সংসারে। আমার সোনার সংসার···সোনার স্বামী সোনার রাজ্য···সোনার সিংহাসন—আমাকে ভোগ করতে দাও। তুমি চলে যাও—আমাকে ভুলে যাও—আমাকেও ভুলতে দাও—তোমাকে। যাও—যাও—তুমি যাও।

কুম্ভ॥ কে—কে সে? কাকে তুমি একথা বলছো মীরা?

মীরা॥ (আত্মস্থ হইয়া) যাঁ্যা! না। কেউ না। (চারিদিকে তাকাইয়া) উঃ! কতো রাত হয়েছে। এসো—শোবে এস। (কুম্ভের হাত ধরিয়া লইয়া শয্যায় বসাইয়া) তুমি শুয়ে পড়—আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

কুম্ভকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া মীরা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল

মীরা॥ তুমি কিছু ভেবো না। তুমি আমার—আমি তোমার!·· তোমার চুলগুলো কী সুন্দর! তোমার মুখখানি আরো সুন্দর। তোমাকে পেয়ে আমি সব ভুলে গেছি—সব। (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) ও কীসের শব্দ?

কুম্ভ॥ ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অনেক রাত হয়েছে মীরা।

মীরা॥ ঝিঁঝিঁর ডাক! কানে আসছে! দাঁড়াও—আমি সব জানলা—আমি সব দরজা—বন্ধ করে আসছি।

মীরা উদ্ভ্রান্তবৎ ছুটিয়া একের পর এক দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল। হঠাৎ দূরাগত বংশীধ্বনি শোনা গেল। মীরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

মীরা॥ এসেছে—সে এসেছে—বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে এসে গেছে—সে আমায় ডাকছে—যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

উদ্ভ্রান্তের মতো মীরা কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কুম্ভ শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া দেখিলেন, মীরা চলিয়া গেল। কুম্ভ গবাক্ষপার্শ্বে গিয়া গবাক্ষটি খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বাঁশী পূর্ববৎ বাজিতেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-উদ্যান। নিশীথ রাত্রি। পূর্বদৃশ্যে শ্রুত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে। মীরার প্রবেশ

মীরা॥ (নেপথ্যে বংশীবাদনরত গিরিধারীলালকে লক্ষ্য করিয়া) না, না, আর বাঁশী তুমি বাজিও না গিরিধারীলাল। ওখানে আর দাঁড়িও না। এসো—আমার কাছে এসো। প্রাসাদের এই উদ্যানে রক্ষীরা হয়তো এখনো জেগে আছে। তোমাকে আমার কতো কথা বলবার আছে। এসো—এই নিরালায়—এসো—এসো।

বংশীবাদন বন্ধ হইল। গিরিধারীলাল মীরার কাছে প্রত্যক্ষ, কিন্তু অন্যের কাছে অদৃশ্য। বংশীবাদ্য ক্ষান্ত রাখিয়া গিরিধারীলালের প্রবেশ

মীরা॥ হ্যাঁ, এসো—এই নবদূর্বাদলের আসনে বসো।

হ্যাঁ, আমিও বসছি তোমার পাশে। (উপবেশন)···কিন্তু তুমি কথা কইছো না যে? রাগ হয়েছে? আমি তোমায় ছেড়ে এসেছি বলে? কিন্তু তুমিই তো বললে আসতে। তোমার কৃষ্ণরূপ দেখেছি,—তোমার কালীরূপ দেখিনি বলে তুমি আমায় ঠেলে পাঠালে কালিকা-মন্দিরে—স্বামীর সংসারে। তুমিই বলেছিলে স্বামীকে ভালবাসতে। স্বামীকে ভালবাসতে গিয়ে এতো ভালো লাগলো আমার—আমি ভুলে গেলাম সব কিছু-ভুলে গেলাম—তুমি যে তুমি—তোমাকেও—তোমাকেও।

মীরা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

আমি বুঝিনি তোমার এই ছলনা—তোমার এই খেলা—তোমার এই মগ্ন পরীক্ষা। কিন্তু কী তোমার দয়া! আমি যখন সংসারে ডুবে যাচ্ছি, ঠিক তখনই তুমি এলে—হাত ধরে আমায় তুললে। কিন্তু গিরিধারীলাল—আমার রণছোড়জী, তোমার পায়ে পড়ছি—মিনতি করছি—আর তুমি আমায় ছেড়ে দিও না। আর তুমি আমায় পাঁকে ফেলো না—ফেলো না প্রিয়তম!···না, না, তুমি উঠছো কেন? একী! তুমি চলে যাচ্ছো? (মীরা স্তব্ধ হইয়া গেল,··কী শুনিল,···আমাকে ফিরে যেতে হবে? কোথায়?···স্বামীর ঘরে! কেন?···স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে! আর তুমি?···চলে যাবে গোকুলে! আমি যাবো পতির কাছে,—তবে তুমি কে? তুমি আমার কে?···কী?···পতিরও পতি তুমি! জগৎপতি! জানি—জানি, তাই দাদু বলেন—সংসারে থাকবি লক্ষ্মী স্ত্রীর মতো—পতির সেবা করতে ভুলবিনে, কিন্তু মন রাখতে হবে উপপতি—সেই জগৎপতি তোমার পায়ে।···(চীৎকার করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) না, না, পালিও না—দাঁড়াও—দাঁড়াও। আমাকে তুমি বলে যাও—পতি না হয়ে কেন তুমি হবে আমার উপপতি? তোমাকে আমি শিশুকাল থেকে পতিজ্ঞানে—

মীরা গিরিধারীলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে গিয়া দেখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কুম্ভ

কুম্ভ॥ পতি যখন এসে পড়েছে, উপপতিকে পালাতেই হ'বে মীরা।

মীরা॥ তুমি তাকে দেখেছো?

কুম্ভ॥ চোরের মতো যে আসে—চোরের মতো যে চলে যায়, তাকে আমার দেখার কথা নয় মীরা।

মীরা॥ চোর! সত্যিই সে চোর—কী কপট! কী খল!

কুম্ভ॥ তুমি ভেবো না মীরা, তোমার সেই চোর এখনি ধরা পড়বে। উদ্যান-প্রহরীদের আমি সতর্ক করে দিয়ে এসেছি—তবে এসেছি তোমার কাছে।

মীরা॥ ভুল—ভুল—তোমার ভুল। মানুষ হলে ধরা যেতো। কিন্তু সে তো মানুষ নয়, আমার গিরিধারীলাল—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

কুম্ভ॥ (হাসিয়া) ও—তিনিই তবে তোমার উপপতি—যার বাঁশী শুনে পতির ঘর ছেড়ে এসেছো—নির্জন এই নিকুঞ্জে—এই নিশীথে!

মীরা॥ হ্যাঁ—এসেছি। তার বাঁশী শুনে কেউ থাকতে পারে না ঘরে। বাঁশী শুনবো বলে ঘুম আসে না চোখে। এ যে আমার কী জ্বালা—তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না।

গান

"নৈন লল চারত জীয়রা উদাসী—"
নয়ন লালসাপুত জীবন উদাসী।
শ্যামল বনে বাজে শ্যামলের বাঁশী॥
রজনীর শয়নে
ঘুম নাহি নয়নে
প্রিয়তম শ্বাস আসে কুসুম সুবাসী॥

উদ্যান রক্ষীদের প্রবেশ

কুম্ভ॥ ধরেছো?

১ম রক্ষী॥ না যুবরাজ। উদ্যান তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে—কেউ কোথাও নেই।

কুম্ভ॥ তবে সে পালিয়েছে।

২য় রক্ষী॥ অসম্ভব যুবরাজ। কোন দ্বারই খোলা নেই।

কুম্ভ॥ হুঁ। আচ্ছা—তোমরা যাও। কিন্তু বাকী রাতটুকুও সতর্ক থেকো—সন্ধান কর।

রক্ষীদল॥ যে আজ্ঞে যুবরাজ।

রক্ষীগণের প্রস্থান। কুম্ভ ধীরে ধীরে মীরার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল

কুম্ভ॥ গিরিধারীলাল তোমার উপপতি?

মীরা॥ হ্যাঁ।

কুম্ভ॥ আমায় দেখাতে পারো?

মীরা॥ সকলে যখন ঘুমিয়ে থাকে—একা আমি থাকি জেগে, তখন সে অভিসারে আসে।

কুম্ভ॥ (কঠিনতর স্বরে) আমায় তাকে দেখাতে পারো মীরা?

মীরা॥ যদি তোমার ঘুম ভাঙ্গে, তুমিও তাঁকে দেখবে বৈকি স্বামী!

কুম্ভ॥ তা' যদি দেখি, তবে জানবো—তুমি মীরাবাঈ নও—সাক্ষাৎ শ্রীরাধা। আর যদি না দেখি, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব—আমি তা জানি না—আমি তা জানি না। অথবা—জানি—কিন্তু তা ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। বাংলার ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছেন। অতিরিক্ত মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংস ভোজন ক্রমেই উচ্চ সমাজে প্রশ্রয় পাচ্ছিল। দেশবাসীদের এই অসংযম দূর করবার জন্য যাঁরা সেদিন উদ্যোগী হ'য়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি শিক্ষিতদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচারের জন্য Well Wisher অর্থাৎ 'শুভার্থী' নামে একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। প্যারীচরণের উপর বারাসত আশ্রমের সাধু চরিত্র জ্ঞানীপুরুষ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্রের প্রভাব ছিল খুব বেশী। 'দেহ অনিত্য এবং আত্মার অবিনশ্বরতা' সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণের

প্যারীচরণ সরকার

অভিমত তিনি খুব জোর গলায় সকলের কাছে প্রচার করতেন। একদিন প্যারীচরণ তাঁর এক সতীর্থ বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছিলেন। বন্ধুটি তাঁর অত্যন্ত পানাসক্ত। ভোজনের সময় প্যারীচরণকে তিনি একপাত্র সুরা পান করবার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। প্যারীচরণ তাঁর পাতের মাংসভরা বড় বাটিটা বন্ধুকে দেখিয়ে বললেন "আমি ভাই এইতেই পরিতৃপ্ত! জলপথে গিয়ে তোমার মতো ডুবতে রাজী নই!"

বন্ধুটি একথা শুনে বললেন "বটে! রোসো; আমি তোমার গুরুদেব সেই আত্মা-বাদী কালীকৃষ্ণের কাছে খবর পাঠাচ্ছি যে "তোমার চেলাটি আজকাল prefers flesh over spirit!

* * *

৺প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীরা ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। এঁরা মধ্যে মধ্যে লং সাহেবের গির্জায় আসতেন ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে। একদিন বিদ্যাসাগর

রেভারেণ্ড লং

মহাশয় এসে দেখেন যে গির্জার প্রাঙ্গনে একটি নেটিভ খৃষ্টান ছোকরা কালীকৃষ্ণবাবুকে পাকড়াও ক'রে খুব হাত-পা নেড়ে বাইবেলে 'মোজেস্' ও 'যীশুর যত সব 'miracle' সংঘটনের উল্লেখ আছে, তাই বোঝাবার চেষ্টা করছে। আর প্রত্যেকবার কথার শেষে প্রশ্ন করছে—"কেমন? আপনি miracle মানেন তো?" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ভালমানুষ

বন্ধুটিকে বিপন্ন বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে ছোকরাকে বললেন—"আহাহা ! কি করচেন সাহেব? এ লোক আপনার ওসব কিছুই বোঝে না। miracle আমি মশাই খুব ভাল বুঝি ! এই ধরুন না কেন, আপনি জন্মাবামাত্র কারুর না কারুর মামা, কাকা, এমনকি 'ঠাকুর্দাও' হ'তে পারেন, কিন্তু, বলুনতো'—কোনও মানুষের এমন সাধ্য আছে কি—যে, সে জন্মাবামাত্র তার কোনও দূর সম্পর্কের ছোট ভায়ের ছেলের জ্যাঠা হ'তে পারে? কিন্তু, বলতে নেই—আমি দেখতে পাচ্চি—আপনি পুণ্যগ্রন্থ বাইবেলের কল্যাণে সে অঘটন ঘটিয়েছেন ! অর্থাৎ, একেবারে জন্মেই দেখুন একজন বড় রকম জ্যাঠা হ'য়ে উঠেছেন ! এটা কি একটা খুব প্রকাণ্ড miracle নয়? আপনিই বলুন !"

অতঃপর নেটিভ্ খৃষ্টান ছোক্‌রার আর সেখানে টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না !

* * *

বিধবা-বিবাহের সমর্থক বিদ্যাসাগরকে গোঁড়া হিন্দুরা অনেকে ইংরেজ-ঘেঁষা, খৃষ্টানমনোবৃত্তিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন ইত্যাদি বলে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কটূক্তি করেন। সাগর তাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হত না। আমাদের জাতের যে সকল মূল দোষত্রুটী, আমাদের সমাজের যে সকল মারাত্মক গলদ ছিল দেশ-প্রেমিক ও সংস্কার-প্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেগুলি সংশোধন ক'রে নেবার জন্য বারংবার বলতেন। আমাদের মধ্যে ধর্মের চেয়ে যে ধর্মের আচারগুলিই বড় হ'য়ে উঠে ধর্মকে ছোট ক'রে আনছিল, তিনি সেই আচারগুলিকে ধর্মবিরোধী অনাচার বলেই নিন্দা করতেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র একবার স্বহস্তে কিছু আমের আচার প্রস্তুত করে বন্ধুবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আস্বাদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে কোনও একটি অনুষ্ঠানে উভয়ের সাক্ষাৎ হ'তে বিদ্যাসাগর মহাশয় কালীকৃষ্ণের প্রেরিত আচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কালীকৃষ্ণ সেকথা শুনে মৃদু হেসে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—"তা হ'লে তুমিও স্বীকার করচো বিদ্যাসাগর যে, এ দেশের সব আচারই—'অনাচার' নয়, কেমন?"

* * *

একজন উগ্র জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ একবার কোনও এক সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এসে দেখেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঘিরে কয়েকজন অ-ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত রয়েছে। তারা কেউ আগন্তুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেখে উঠে দাঁড়ালো না, দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করলো না, পদধূলি নিয়ে মস্তকে ধারণ করলো না। তিনি এ ব্যাপারে নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অভিযোগ করলেন এবং সমবেত অব্রাহ্মণদের লক্ষ্য করে বললেন—"এই সকল অর্বাচীনের স্মরণ রাখা উচিত যে এই বর্ণশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই একদা এদেশের এবং এজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিল। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সর্বত্র প্রণম্য।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই উত্তেজিত জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণকে হাস্যমুখে ব'লেছিলেন "দেখুন পণ্ডিত মহাশয়; গোলোকাধিপতি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু একদা শূকররূপ ধারণ ক'রে বরাহ অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই ব'লে কি আপনি বা আমি ওই ডোমপাড়ার শূয়োরগুলোকে দেখলেই নারায়ণ জ্ঞানে ভক্তি ভরে প্রণাম করি, না' পূজা করি?

—'পাষণ্ড !' 'নাস্তিক !' ব'লে ব্রাহ্মণ ধূলোপায়েই বিদায় নিলেন।

আমরা সখ করে অনেক রকম জীবজন্তু ও পশুপক্ষী কিনে এনে বা চেয়ে এনে বাড়িতে পুষি, কিন্তু স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে পিতামহ রামসুন্দর বসুর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া তিনি গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেইদিনের জন্য আহারদ্রব্য আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেন।...তিনি 'পাগল' পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন ! একদিন গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাঁহার মোলাকাত হয়; তাহাকে বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের সীমা কি?" ঘটনাটা যে সত্য—এ কথা বলাই বাহুল্য ! তিনি পাগল পুষতেন।

* * * *

রাজনারায়ণ বসু

ম্যাক্সিম গোর্কি গল্পচ্ছলে তাঁর কতকগুলি স্মৃতির টুক্‌রো রুশবাসীদের পরিবেশন করেছিলেন। তা'তে তিনি দেখিয়েছিলেন যে মানুষ যখন কোনও নিভৃত নির্জন স্থানে সম্পূর্ণ একা থাকে, আশে পাশে তার কেউ থাকেনা তখন সে প্রায়ই নিজে নিজে বড় অদ্ভুত আচরণ করে। সাধারণ মানুষ তো করেই, এমন কি অসাধারণ মানুষদেরও এ দুর্বলতা থাকে।

একবার প্রসিদ্ধ রুশ লেখক—চেখভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন তিনি নিজের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বসে মাথার টুপীটি খুলে তারই মধ্যে একফালি প্রভাত-রৌদ্র ধরবার এবং সেটি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঢেলে ফেলে টুপী দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছেন। বার বার চেষ্টা ক'রেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লনা দেখে শেষে বিরক্ত হয়ে টুপীটার মাথাতেই গোটাকতক চাঁটি কসিয়ে তাকে বেশ করে হাঁটুর উপর ঠুকে যেন সব রৌদ্রটুকু ঝেড়ে ফেলে মাথায় পরে নিলেন।

আর একবার কউণ্ট লীয়ো টলস্টয়ের কাছে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন—মহামণীষী টলস্টয় একটি ছোট্ট কাঠবিড়ালীকে আরামে রৌদ্র পোগাতে দেখে তাকে ডেকে বলছেন—"কি ভাই! বেশ সুখে আরামে আছ না?" তারপর একবার সাবধানে চারদিকে চেয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে বেশ অন্তরঙ্গভাবেই কাঠবিড়ালটিকে বললেন—"আমার কথা যদি জানতে চাও বন্ধু, আমি কিন্তু, সুখে নেই একটুও! এ পৃথিবীতে বড় কষ্ট!"

* *

বার্ণার্ড শ' একবার একটি অপরিচিতা অভিজাত মহিলার কাছ থেকে খুব মূল্যবান একখানি নিমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন।

ম্যাক্সিম গোর্কি

জর্জ বার্ণার্ড শ

পত্রখানিতে লেখা ছিল—"Lady X will be at home on Thursday. The Ninth May, between four and six." ইত্যাদি।

সংবাদ নিয়ে জানলেন মহিলাটি কোন ধনকুবেরের স্ত্রী। প্রায়ই বড় বড় পার্টি দিয়ে বিশ্ব-বিশ্রুত সব লোকদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে আনা তাঁর একটা সৌখীন নেশা!

কার্ডে R.S.V.P আছে দেখে বার্ণাড শ' উত্তরে সেই কার্ডখানিরই ওপর এই কটি কথা লিখে ফেরত পাঠালেন—"Mr Bernard Shaw likewise."

* * * *

জনৈক ব্যর্থকাম চলচ্চিত্র প্রযোজক হোলিউডে গিয়ে দীর্ঘ ছ'মাস সেখানে কাটালেন, কিন্তু কিছুই সুবিধা হ'লনা। বিফল মনোরথ হ'য়ে তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'ল যে 'বার্ণার্ড শ'র নাটকগুলির যদি চিত্রস্বত্ব সংগ্রহ ক'রতে পারি তাহ'লে আর আমায় পায় কে? ছুটলেন বার্ণার্ড শ'র কাছে। অথচ, তাঁর এটা বেশ ভালই জানাছিল যে কোটীপতি প্রযোজকেরা বহু টাকা দিতে চেয়েও শ'র কাছ থেকে 'চিত্র-স্বত্ব' পায়নি। শ' ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি আমার একখানি বইয়ের ছবি তোলবার জন্য কতটাকা খরচ করতে পারবেন?" তিনি সবিনয়ে জানালেন—"আজ্ঞে, পনেরো শিলিং ছ' পেন্স মাত্র আর আমার হাতে অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, বাজারে দেনা রয়েছে আমার এক পাউণ্ডের ওপর!"

বার্ণার্ড শ' এই সত্যভাষণ শুনে এত খুশী হলেন, বোধকরি, তখন এই বিলাতী দুর্বাসা বেশ একটু প্রফুল্ল মেজাজেই ছিলেন, ভদ্রলোকের দেনা পরিশোধের জন্য তৎক্ষণাৎ নিজেই এক পাউণ্ড দিয়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক পরামর্শ ক'রে পরীক্ষামূলকভাবে একখানি ছবি তুলতে রাজী হলেন।

বিখ্যাত "পিগ্‌ম্যালিয়ন" চলচ্চিত্রখানি তারই ফল, যা' প্রযোজক গেব্রিয়েল প্যাসক্যালকেও বিখ্যাত করে দিলে।

আমার পৃথিবী

শ্রীশান্তশীল দাশ

মায়াময় এ জগৎ, সত্য কিছু নাহিক হেথায়,
যা দেখি মিথ্যা সবই—ছিন্ন ক'রো এই মোহপাশ:
বন্ধু, তোমার কথা মেনে নিতে বাধা পাই মনে,
এই মিথ্যা জগতের মাঝেই যে আমি করি বাস।

এ জগৎ মিথ্যা যদি, হোক না তা, কিবা আসে যায়,
আমার জীবনখানি এরই মাঝে সুরু হতে শেষ;
যা দেখি, যা শুনি কানে, অনুভব করি প্রতিদিন—
সব কিছু মিথ্যা বলে জীবনে ভরিনি বিদ্বেষ।

বেদনায় আঁখি ঝরে, মিলন আবেশে ভরে বুক,
সুখে দুখে প্রতিদিন গেঁথে তুলি জীবনের হার;
পৃথিবীর আলো-ছায়া দোলা দেয় আমার হৃদয়ে,
হিসাব-নিকাশ ক'রে অকারণ কেন মুখভার।

সহজ সরল ভাবে যা পেয়েছি জীবনে আমার
গ্রহণ করেছি সবই, কারেও করিনি অনাদর;
আমার জীবন ঘিরে নৃত্য যার দিবসে নিশীথে,
তারে অবহেলা করে অজানায় করিনি নির্ভর।

মিলন-বাসর

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

এখানে বন্ধু নরম রোদের আল্‌পনা-আঁকা ঘাসে
শ্যামল ছন্দ বন-বাগিচায় রচে মোহ-পরিবেশ,
চৈত্র-শেষের ঝরাপাতা তোলে করুণ গুঞ্জরণ,—
এখানে মনের উদাস স্বপ্ন উধাও যে নীলাকাশে!

এখানে বন্ধু রাত্রিমায়ায় যুগান্তরের স্বপ্ন
প্রতীক্ষা-ভরা কালো দুটি চোখে আশার দেয়ালী জ্বালা,
এখানে ভোরের মৃদুল হাওয়ায় মিলন প্রদীপ নেভে,
রৌদ্র-মুঠির ক্ষণিক পরশে আসে বিচ্ছেদ-লগ্ন!

তোমার আমার মিলন-বাসর এখানে হবে না সখি,
ছোট্ট রাতির স্বপ্ন-কুলায় একান্তে নীড়-গড়া—
দেহলী প্রেমের উছল ঢেউয়ে দিশাহারা দেহ মন,
তীর-তরঙ্গে যে চির-বিরোধ মোরা আজ মানিব কি?

তাহ'লে বন্ধু, চল দূরে যাই, দেখা যাক্ একবার,
নূতন স্বর্গ যায় কিনা রচা তোমায়-আমায় মিলে,
স্বপ্ন-মায়ায় নয় সখি নয়, তনুর তণিমা ভ'রে—
যুগ-যুগান্ত পান ক'রে যাই সুধারস অনিবার!

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

আবেলার্দ ও এলয়শার পত্রাবলী

গতবারে বিশ্ব-সাহিত্যে যাঁদের কাহিনী বলা হয়েছে তাঁরা যখন শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন-পূর্বক মঠের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রতে বাধ্য হলেন, তার কিছুদিন পরেই আবেলার্দের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় মঠের মধ্যে তাঁর প্রতি প্রবল অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলে। নানাভাবে নির্যাতিত ও বিপর্যস্ত আবেলার্দের অন্তরাত্মা এলয়শার অভাব একান্তভাবে অনুভব ক'রে। প্রিয়া-বিচ্ছেদজনিত বিরহ-ব্যথা তার কাছে এমন দুঃসহ হ'য়ে ওঠে যে আবেলার্দ শেষ পর্যন্ত এলয়শার সঙ্গে সঙ্গোপনে পত্রালাপে সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হন। তিনি বরাবরই অস্থিরপ্রকৃতি ও চঞ্চলচিত্ত পুরুষ। মঠের কঠোর নিয়ম-শাসনের মধ্যে সংযম রক্ষা ক'রে চলা তাঁর পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। চারিদিক থেকে উৎপীড়িত হওয়ার ফলে তিনি মঠ ত্যাগ ক'রে একটি পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে এসে এক শিক্ষামন্দির স্থাপন করেন। কিন্তু নিজের উদ্দাম প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যাকুল হ'য়ে এলয়শাকে গোপনে একখানি পত্র লেখেন। নিজের মনের গভীর দুঃখ ও বেদনা এলয়শাকে প্রাণ খুলে জানাতে না পেরে তিনি যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না, মঠের নিয়ম অনুসারে কোনও সন্ন্যাসিনীকে কোনও ব্রহ্মচারীর পত্র লেখা নিষিদ্ধ। কিন্তু সর্বরকমে নির্যাতিত ও বিরহকাতর আবেলার্দ নিরুপায়ের মতো অধীর ব্যাকুল চিত্তে—এ নিয়ম ভঙ্গ ক'রেই এলয়শাকে সঙ্গোপনে পত্র লিখেছিলেন।

এলয়শার চরিত্র কিন্তু আবেলার্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যেমন অসাধারণ বিদুষী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন, তেমনি মনের বলও ছিল তাঁর অসামান্য। জীবনে যখনই যে অবস্থাকে তিনি একবার স্বীকার করে নিয়েছেন তাকে কোনও প্রলোভনেই, কোনও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়েই পরিত্যাগ করেন নি। প্রিয়তমের প্রসন্নতাই ছিল তাঁর সুগভীর প্রেমের পরম ধর্ম। বারংবার তিনি আবেলার্দের অনুরোধে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে ভালবাসার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু মঠে প্রবেশের পর অধ্যাত্ম ধর্মের প্রভাবে তাঁর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। যে আবেলার্দ ছিল এতদিন তাঁর কাছে রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ, তার আত্মার আত্মীয়—সেই প্রিয়তমই হয়ে উঠেছে আজ তার ইষ্টদেবতা, তাঁর ধ্যানের ধন। এলয়শার কাছে আর কোনও ঠাকুর দেবতাই সত্য নয়। তাঁর মনের এ রকম একটা ভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তিনি কোনও দিনই নিজেকে ফাঁকি দেন নি। আন্তরিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের সহজাত গুণ। তাই মঠে প্রবেশ ক'রে তিনি নিজেকে কায়-মনে মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর কর্তব্য পালনের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলছিলেন। এমন সময় এলো তাঁর কাছে তাঁর অন্তর্দেবতা—আবেলার্দের করুণ কাতর মিনতিপূর্ণ প্রেম-পত্র, যে পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রিয়তমের অন্তরের অসহায় ব্যাকুল আর্তনাদ!

এলয়শার যে সর্বত্যাগী প্রেম, তা' ছিল যেমনি অতল গভীর, তেমনি অকৃত্রিম। সে প্রেম অবিনশ্বর, সে প্রেম ভাগবতী-শক্তি সম্পন্ন। তাই তাঁর অসীম প্রেমাস্পদ আবেলার্দের এই দুর্বলতায় তিনি কাতর হ'য়ে পড়লেন। পত্রের উত্তর দেবেন কি দেবেন না—ভেবে একান্ত আকুল হ'য়ে উঠলেন। শেষে উৎক্ষিপ্তচিত্ত আবেলার্দকে বিপন্ন বোধ ক'রে আসন্ন স্খলন ও পতনের অপরিসীম লজ্জা থেকে প্রিয়তমকে রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে তিনি পত্রের উত্তর দেওয়াই সমুচিত ও অবশ্যকর্তব্য বিবেচনা করলেন।

এখানে তাঁদের পরস্পরকে লিখিত দু'খানি পত্র উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, যা' পড়লে বোঝা যাবে গভীর ও অকৃত্রিম প্রেমের পবিত্র প্রভাব কেমন করে মানুষকে তার হৃদয়ের

সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও দেবতা ক'রে তুলতে পারে। সুদৃঢ় সংযম মানুষকে নির্লোভ করে। তাকে প্রিয়তমের কল্যাণের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে। সেই মহতী ত্যাগের মহিমায় দু'টি অশান্ত হৃদয় কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শাশ্বত প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছে আনন্দের অনন্তলোকে সমাহিত হয়।

আবেলার্দের পত্রোত্তরে এলয়শা লিখছেন:—"পরম প্রিয়তমেষু, তোমার জনৈক বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য লেখা পত্রখানি একজন দৈবাৎ আমার হাতে দিয়ে গেছে। প্রিয়-পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে মুহূর্তে বুঝলুম এ তোমারই। চিঠিখানিকে আমি তেমনিই ভালবেসে পরম আগ্রহে গ্রহণ করলুম, যেমন ভালবাসি আমি এই পত্র-লেখককে। যার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য হ'তে আমি দীর্ঘকাল বঞ্চিত, তার হাতের আখরগুলি থেকে অন্তত আমি সেই প্রিয়জনের সুন্দর মুখখানির ঈষৎ একটু আভাস পাবো এই আশা আমাকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল। চিঠিতে যে সকল কথা লিখেছ, আমি তা ভুলিনি। তার সবটুকুই যে অতি-তিক্ত মর্মজ্বালা ও দুঃসহ বেদনায় ভরা। এ আমায় নিষ্ঠুরের মতো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের মিলিত জীবনের সেই দুর্ভাগ্যময় ইতিহাস, আর সব কিছু ছাপিয়ে আমার কেবলই মনে পড়ছে তোমার সেই অবিরত নিরবচ্ছিন্ন দুঃসহ দুর্গতি।

এ-কথা ঠিক যে তোমার দুঃখের তুলনায় তোমার বন্ধুর দুর্ভাগ্য অতি তুচ্ছ, এমন কি কিছুই নয় বলা যায়। বিশেষতঃ তোমার শক্তিশালী লেখনী যেখানে তোমার বিরুদ্ধে তোমার আচার্যতুল্য গুরু ও শিক্ষকগণের দুর্বিষহ অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছে। তারপর, তোমার শরীরের উপর সেই নৃশংস অমানুষিক অকথ্য উৎপীড়ন, তোমার বিরুদ্ধে তোমার সহপাঠীদের সেই বিপক্ষতাচরণ, যাদের নির্মম প্ররোচনায় তোমার রচিত সেই গৌরবোজ্জ্বল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম-শাস্ত্রখানির নির্দয় ভাবে ধ্বংস সাধন হয়েছে এবং নির্জন কারাগারে আবদ্ধ বন্দীর ন্যায় তোমার সহনাতীত দুরবস্থা, কিছুই তুমি লিখতে ভোলোনি। তোমার মঠের অধ্যক্ষ ও পুরোহিত এবং বিশ্বাসঘাতক ধর্মভাইদের হীন ষড়যন্ত্র, তোমার বিরুদ্ধে তাদের সেই ভয়াবহ কুৎসা প্রচার, প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের তোমার সঙ্গে সেই প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা-জনিত বিদ্বেষবশে ব্যক্তিগত নিন্দা ও দুর্নাম রটানো, এমন কি তোমার নিজের স্থাপিত 'পারাক্লিতের' আশ্রমে নির্জনবাসও যারা তোমার পক্ষে অসাধ্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করচে, যারা তোমার মুখ বন্ধ ক'রে তোমার সেই জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী বক্তৃতার দিব্য-স্রোত রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠুর ও অসহ্য অত্যাচার তোমার সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেবার উপক্রম করেছে, সেই সব পাপিষ্ঠকে, সেই সব হৃদয়হীন বর্বর নীচপ্রকৃতির নরাধমকে তুমি আজও ধর্মভাই বলে উল্লেখ করচো কি বলে? কি ক'রে বলচো তুমি তাঁদের মঠাধিকারী সাধু সন্ন্যাসী, যাঁদের কাছে আত্মস্বার্থ ও পদমর্যাদার লোভই সব কিছুর চেয়ে বড়? তোমার দুর্ভাগ্যের দুঃখময় ইতিহাস—আমার মনে হয়—যেন এর-ফলে চরম সীমায় এসে পৌঁচেছে।

বিশ্বাস করো বন্ধু! তোমার ভাগ্যপ্রপীড়িত জীবনের এই সব বিবরণ পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে কারুর পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা সাধ্য নয়। এই সব মর্মান্তিক ঘটনা আমার জীবনের বিপুল বেদনাকে যেন আঘাতে আঘাতে নূতন করে জাগিয়ে তুলচে। বিপদের ঘনঘটা আজও গাঢ় হয়ে তোমার চারিদিক ঘিরে আছে জেনে আমি তোমার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যেন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়চি! প্রতিদিনই কম্পিত বক্ষে, শঙ্কা দুরু দুরু হৃদয়ে, হয়ত আমাকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে সহসা একদিন নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে হত্যা করা হয়েচে এই চরম দুঃসংবাদ শোনবার জন্য।

এস আমরা প্রভু খৃষ্টের চরণে প্রার্থনা করি, যিনি তোমাকে এতদিন সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্যেও সর্বপ্রকারে রক্ষা ক'রে এসেচেন, তাঁকে জানাই—তিনি যেন কৃপা করে তোমার এই নিমজ্জিতপ্রায় তরণীকে নিরাপদে কূলে এনে পৌঁছে দেন। তাঁর এবং তোমার এই দাসীকে তিনি যেন নিশ্চিন্ত রাখেন। সর্বদা আমি যেন তোমার অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সম্বলিত পত্র পাই। তোমার যে সকল সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে তুমি আজও চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, তোমার বন্ধু তার ভাগ নিতে চায়। জেনো, শেষ পর্যন্ত আমরাও তোমার সঙ্গে আছি। তোমার সুখদুঃখের অংশীদারগণের মধ্যে আমাদেরও গণ্য কোরো। শোকার্তের বেদনায় যারা ব্যথা পেয়ে সহানুভূতি জানায়, তারা যথার্থই শোকে সান্ত্ব

এনে দেয়। ব্যথার বোঝা যতই ভারি হোক না কেন, তার অংশ নেবার জন্য যদি কেউ পাশে থাকে তবে সে বোঝা বহন করা সহজ হয়, চাই কি সে ভার থেকে মুক্তিলাভ করাও অসম্ভব নয়। তোমার জীবনের এই ঝড় কিছুটা শান্ত হয়েচে, তোমার চিঠিতে যদি এ খবর সত্বর আসে, আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। তবে, তুমি আমাদের যাই লেখনা কেন—প্রবোধ দেবার চেষ্টা কোরনা। তুমি এখনও আমাদের মনে রেখেছ, আজও আমাদের ভোলোনি, তোমার চিঠি পেয়েছি—এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট জেনো।

প্রবাসী বন্ধুর চিঠি যে কত মধুর, কত আনন্দদায়ক, মহামতি সেনেকা নিজে আমাদের সেটা শিখিয়ে গিয়েছেন কোনও অজ্ঞাত স্থান থেকে তাঁর বন্ধু লুসিলিয়সকে এই কথা লিখে যে "তুমি সর্বদা আমাকে পত্র লিখো, আমি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দেব, কারণ একমাত্র এই উপায়েই কেবল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'তে পারে। আমি যখনই তোমার চিঠি পাই সেই মুহূর্তে মনে হয় আমরা যেন আবার একত্র হয়েচি।" প্রবাসী বন্ধুদের মুখ মনে পড়লে যদি আমাদের আনন্দ হয়, যদি বিগত দিনের সুখ-স্মৃতি স্মরণে জাগে, তার বিচ্ছেদ বেদনা যদি সেই দিবাস্বপ্নের ন্যায় আত্মপ্রবঞ্চনাতেই পরিতৃপ্ত হয়, তবে ভেবে দেখ দেখি তার চিঠিগুলি যা' সেই প্রবাসী বন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানস্বরূপ, আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে আমাদের পক্ষে তা' কত বেশি আনন্দদায়ক হবে! ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনার পথ তিনি আমাদের খোলা রেখেছেন। কারুর হিংসা-বিদ্বেষ যেন কোনও রকমে নিষিদ্ধ করতে না পারে আমাদের কাছে তোমার এই পত্রযোগে উপস্থিতিটুকুকে। কোনও বাধা যেন এর প্রতিবন্ধক না হয় এবং মিনতি করি, তোমার অবহেলাও যেন কখনো সেই পত্রের গতি না রুদ্ধ করে।

তুমি তোমার বন্ধুর বিপদে তাকে সান্ত্বনাদেবার জন্য এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেছ সত্য, কিন্তু তোমার নিজের সান্ত্বনার কি হবে? বন্ধুর দুর্ভাগ্যের বেদনাকে লঘু করবার সদভি-প্রায় নিয়ে তুমি তোমার নিজের দুরদৃষ্টের যে রক্তাক্ত তালিকা পাঠিয়েছ, তোমার সে দুঃসহ নির্যাতন যে তোমার বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে তাকে আরও অনেক বেশি কাতর করে তুলেছে! বন্ধুর হৃদয় ক্ষতে আরোগ্যের প্রলেপ দিতে গিয়ে তুমি তাকে আরও ক্ষত বিক্ষত করে দিলে। তার আহত প্রত্যেকটি আঘাত পুনরায় রক্তাক্ত করে তুললে। যে ব্যথা তার জুড়িয়ে এসেছিল তা যে আবার টন্‌টন্ করে টাটিয়ে উঠলো! হে বন্ধু, মিনতি শোনো। অপরের ক্ষত-বেদনায় আরোগ্যের প্রলেপ দেবার আগে তুমি তোমার আপন হৃদয়ের পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত গভীর ক্ষতগুলি আরোগ্য করবার চেষ্টা করো। যদিও তুমি আজ অকৃত্রিম বন্ধু ও জীবনের প্রিয়-সঙ্গীর কর্তব্যই পালন করেছ এবং তার ঋণ উভয় সম্পর্কের দিক থেকেই পরিশোধ করেছ, কিন্তু এই ঋণমুক্তির প্রাক্কালে তোমার বন্ধু ও জীবনের প্রিয় সঙ্গীকে যে আরও গুরুতর কর্তব্যভারে নিপীড়িত করে তুললে। আজ আর বন্ধুকে যে তার 'প্রিয়তম' বন্ধু বলে সম্বোধনের অধিকার নেই। আজ তোমার সেই জীবনের সঙ্গীটির সঙ্গে সম্বন্ধ যে আপন সহোদরা বা কন্যার অপেক্ষাও মধুর ও পবিত্র।

দেবস্থান হ'তে দূরে নিক্ষিপ্ত হ'য়েও আপন প্রতিভায় যে বিদ্যামন্দির তুমি আজ বন্যপশুনিষেবিত পরিত্যক্ত নির্জন অরণ্যভূমের জীর্ণ ভগ্নগৃহে স্থাপন করেছো, সে তোমারই অদ্বিতীয় সৃষ্টি! ভগবানের সৃষ্টির পাশাপাশি সে দাঁড়াতে পারে। এই বিদ্যামন্দিরের জন্য তুমি যে কত বড় দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছ, স্ত্রীলোকের পক্ষে সেটা অনুধাবন করা কঠিন নয়। তারা তো কোনও যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণও তলব করে না। তারা অন্তরের অনুভূতির সাহায্যে ভালমন্দ নির্ধারণ করে তাতে অটুট বিশ্বাস স্থাপন করে। সত্য একদিন আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত হবেই। তাকে যারা যেমন-ভাবেই চাপা দিয়ে স্তব্ধ করে দিক না, সত্যের ঘণ্টা স্বতঃই নিনাদিত হবে। জানি তুমি নিঃস্ব। তোমার নিঃসম্বল দু'খানি শূন্য হাত নিয়ে শুধু মনের জোরে, শুধু আত্ম-বিশ্বাসের সুদৃঢ় শক্তিতে তুমি এগিয়েছিলে। তোমার পাণ্ডিত্যের অতুল খ্যাতি দেশদেশান্তরের ছাত্রছাত্রীদের টেনে নিয়ে এসেছে তোমার বিদ্যামন্দিরের পাদপীঠতলে। তোমার আয়োজনের যা' কিছু অভাব ও ত্রুটি ছিল তা' সমস্তই পূর্ণ করে দিয়েছে তোমার শিষ্যেরা! তারা

এতকাল ধর্ম্মমন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে শুধু হাত পেতে ভিক্ষুকের মতো নিতেই শিখেছিল—জান তো না যে দেওয়ারও একটা গৌরব ও তৃপ্তি আছে। তোমার কাছেই প্রথম তারা শিখলো কেমন করে অঞ্জলি ভরে দিয়েও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

তুমি যে বিদ্যার পবিত্র ও অভিনব উদ্যান রচনা করেছ, যেখানে কমনীয় তরুণ তরুলতা রোপিত হ'য়েছে; তাদের ফলেফুলে বিকশিত ক'রে তোলবার জন্য চাই তোমার জ্ঞানবারির উদার সিঞ্চন। একমাত্র আমার আশঙ্কা মেয়েদের সম্বন্ধে, কারণ স্বভাবতঃই তারা বড় দুর্বল-প্রকৃতির। তাদের প্রয়োজন নিয়ত সদুপদেশ ও সৎশিক্ষার। তুমি এতকাল শুধু বেনাবনেই মুক্ত ছড়িয়ে এসেছ। মরুভূমিতে মূল্যবান বীজ বপন করেছিলে তুমি, তাই হতাশ হ'য়েছ বন্ধু। ফসল না ফলে জন্মেছে সেখানে শুধু কাঁটা গাছ যা তোমাকে কেবলই বিদ্ধই ক'রেছে। ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করেছে তোমার পূজ্য পদতল। এবার সব ছেড়ে দিয়ে তুমি লাগো একান্তমনে তোমার নিজের কাজে। উদ্ধত অবিনয়ী অবাধ্যদের বেদনাদায়ক সঙ্গ পরিহার করে তুমি এখন থেকে তাদেরই প্রতি মনোযোগ দাও—যারা তোমার কথা শোনে, তোমাকে মানে, তোমার উপদেশ অভ্রান্ত জেনে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। বিরোধীগণের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও তোমার মুখ। তোমার সন্তান-তুল্য কন্যাদের প্রতি তোমার কি কর্তব্য আজ সেই কথাই ভাবো। অপর সকল চিন্তা ছেড়ে তুমি শুধু এই কথা মনে রেখো যে আমাকে তুমি এবার কি গুরুতর দায়িত্বের মধ্যেই না জড়িয়ে ফেলেছ! তোমার ভক্ত নারীশিষ্যদের প্রতি তোমার যে ঋণ, তার তুলনায় আর একটি নারী যে একমাত্র তোমাকেই জেনে তোমারই কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে তার ঋণ পরিশোধের কথাটাও ভেবো।

(ক্রমশঃ)

মৃগতৃষ্ণিকা

প্রভাময়ী মিত্র

ওরে ভীরু, কেন দুরু-দুরু হিয়া
আয় দুর্ব্বার প্রাণের খেলায়,
সব বাধা দলি', চল তবে চলি'
জীবন মরণ পন্থে হেলায়।

ওরে তৃষার্ত্ত, জর্জ্জর হিয়া
শুষ্ক জীবন বহি',
একি দুরন্ত মরু সাগরার
নিদারুণ দাহে দহি।

ওরে নিরুপায়, আগ্রহ ভরে
কার পানে যাস্ ছুটী,
লোহধারা গেছে আতপে শুকায়ে
মোহ-মাখা আঁখি দুটী।

স্ফটিক পাত্রে ফেনিলোচ্ছল
রঙীন পানীয় রয়েছে ভরা,
ঘুরে ঘুরে ফিরে পিয়াসী অধরে
তিয়াসা জাগায় দেয় না ধরা।

ওর পিছে পিছে ফিরিস নে মিছে
সব পিপাসায় করিয়া জয়;
দুর্ব্বার বেগে চল্‌রে পথিক,
ওরে ও বিজয়ী, অসংশয়॥
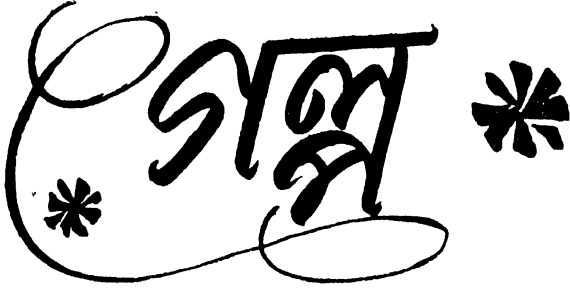
কচ্ছপের কামড়

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

পূজার ছুটিতে চারদিনের জন্য ওয়ালটেয়ার গেছি। প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে একবার এসেছিলাম, এক মেমসাহেবের হোটেলে উঠেছিলাম। সমুদ্রের টাট্কা মাছ খুব খাইয়েছিলেন, তাই খুঁজে খুঁজে সেই হোটেলটিতেই গেলাম। সমস্তই প্রায় ঠিক আগের মতোই আছে, কেবল হোটেল-চার্জ হয়েছে আগেকার তিনগুণ। পূর্বে ছিলাম বারোদিন, এবারে থাকব মাত্র চারদিন, কাজেই হরে দরে পুষিয়ে যাবে।

সমুদ্রের ধারে একটি নারিকেল-কুঞ্জ, তার চিকন্-সবুজ পাতাগুলি হাওয়ায় দোলে। ভোর বেলা সমুদ্রে নেমে স্নান করি, তারপর এসে নারিকেল-কুঞ্জের ছায়ায় একটা ডেক্-চেয়ার নিয়ে বসি। কলকাতার জনোচ্ছ্বাস, সুবিপুল কর্মব্যস্ততা স্বপ্নের মতো মনে হয় এখানে বসে। দুপুরে গুরুভোজনের পর চুণ-কাম করা প্রকাণ্ড শোবার ঘরে বেশ একঘুম দিয়ে, তারপর চা খেয়ে আবার এই নারিকেল-কুঞ্জে এসে বসি। সমুদ্রের ওপর চাঁদ ওঠে, সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে তার প্রতিবিম্ব নাচে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখি, আবার কখনো বা ঘুমিয়েই পড়ি। সঙ্গী সাথী কেউ নেই, বেশ উপাদেয় স্বার্থপরতায় দিন কাটে।

একদিন বিকাল বেলায় ডেক-চেয়ারে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখছি, এমন সময় সেখানে এক প্রৌঢ় দম্পতির আবির্ভাব হ'ল। এঁরা এ হোটেলেই আছেন, থাকেন বোধহয় আমার পাশের ঘরেই। কর্তার গলার আওয়াজ শুনেছি বলে মনে হয় না, কিন্তু গৃহিণী— সে ত্রুটি পূরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁর কণ্ঠস্বরে। এঁরা বাঙালী সে কথা আর ব'লে দিতে হয় না—তাছাড়া কর্তার ওপর বাঙালী গৃহিণীর যেমন দাপট, তেমন আর অন্য কোনো প্রদেশে সম্ভবে না। আমি মন্ত্রী-পরিবার দেখেছি, এম-এল-এ-পরিবার দেখেছি, সামান্য কেরাণী-পরিবারও দেখেছি। সর্বত্রই এক গতি। সুতরাং যেমন পাশের ঘরে ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আদেশ-জ্ঞাপন শুনেছি, অমনি বুঝে নিতে বিলম্ব হয় নি, এঁরা বাঙালী।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, ভদ্রমহিলার বয়স বোধহয় চল্লিশের মধ্যেই। হঠাৎ ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "নাঃ, হবে না, হবে না। এটা বোধহয় পূব দিক। ডাক্তার তোমাকে পূবে হাওয়া হ'তে সাবধান করেছেন। ফিরে চলো।

ভদ্রলোক বললেন, "দেখ সুমিত্রা, সারা ওয়ালটেয়ার সহরটার পূবদিকেই সমুদ্র। এত পয়সা খরচ ক'রে এখানে আসা—সমুদ্র দেখতেই তো! তা এই কদিন তোমার হুকুমে সমুদ্র এড়িয়ে হোটেলের বাবুর্চিখানা, ধোপাখানা, মশালচি-খানা এই সবের কাছেই কাটিয়েছি। পূবদিক ব'লে গোটা সমুদ্রকেই বর্জন করতে হবে?"

ভদ্রমহিলার এসব কথা কানে গেল কিনা সন্দেহ। তিনি বললেন, "তোমার হাঁফানির টেন্ডেন্সি আছে। ডাক্তারের কথা মানতেই হবে। চলো, ওদের হাঁসমুর্গীর ঘরের কাছেই বসি গে।"

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ধাঁ ক'রে আমার কাছে এসে বললেন—খুব নিম্নস্বরে— "আপনার নামটি কি মশায়?"

আমি বিস্মিত হ'লেও তেমনি নিম্নস্বরে ভদ্রলোককে উত্তর দিলাম—"সুধাংশু হালদার।"

ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে সোৎসাহে স্ত্রীকে বললেন, "ও সুমিত্রা, শোন, শোন। আমাদের কী ভাগ্য!"

সুমিত্রা দেবী বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিগেস করলেন, "কেন? কি হ'ল?"

ভদ্রলোক আমার দিকে বারতিনেক চোখ্ টিপে বললেন, "এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সুধাংশু হালদার—যিনি করকোষ্ঠী-গণনায়, ভাগ্য-গণনায় অদ্বিতীয়। তুমি এঁর নাম শোনোনি সুমিত্রা?"

টো : অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

সন্ধ্যা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
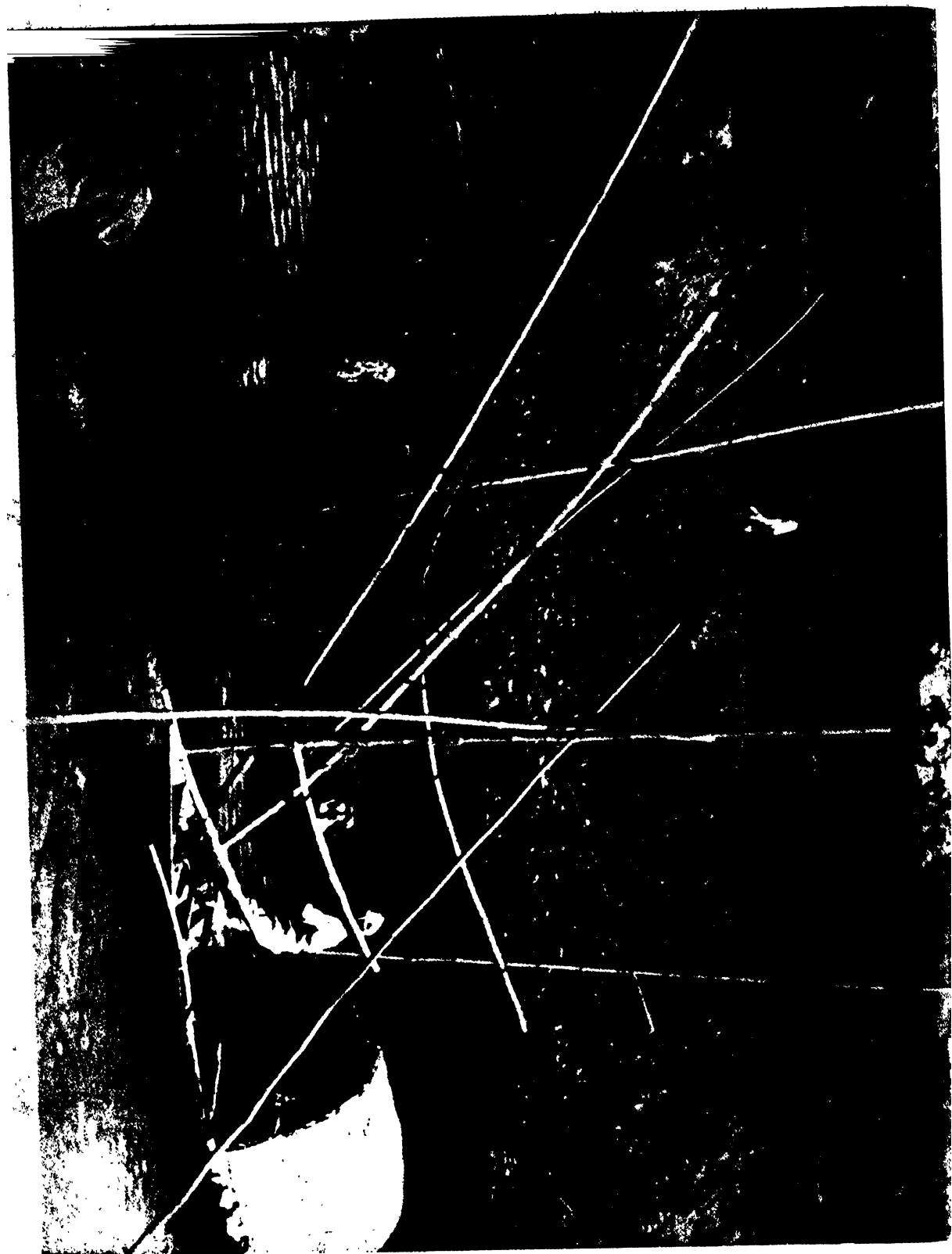
করকোষ্ঠী-গণনা ? ভাগ্য-গণনা ?—আমার চতুর্দ্দশ পুরুষও কেউ করেনি। কিন্তু ভদ্রলোকের তিনবার চোখ টিপুনিতে আমি চুপ করেই রইলাম।

সুমিত্রা দেবী চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি ফুটিয়ে বললেন, "এ্যাঁ! তাই নাকি! আপনি এত বড় গুণী? আমার কি সৌভাগ্য!"

আমি এস্থলে যা করা কর্তব্য—অর্থাৎ বিনয়ের অবতারণা—তাই করলাম। বললাম—"আজ্ঞে, হেঁ হেঁ, আজ্ঞে হেঁ হেঁ।"

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন। তাঁর নাম সুজিত মিত্র, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পূজার ছুটির সঙ্গে আরো কিছু ছুটি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তারপর হঠাৎ আমার বাট্‌ন্-হোলের সামুদ্রিক শ্যাওলাটির খুব তারিফ করতে আমার কানের কাছে এসে নিম্নস্বরে বলে গেলেন—যাতে তাঁর স্ত্রী না শুনতে পান—"মাফ্ করবেন, আপনার ওপর অনেক জুলুম করছি। আমার স্ত্রীর ম্যানিয়া হচ্ছে সধবা মরতে চান। আপনি হাত দেখে অম্‌নি একটা কিছু বলবেন। আর আমার সম্বন্ধে বলবেন, আমার এখনো অনেক দীর্ঘ পরমায়ু। কাজেই এখানে আপনার পাশে একটু বসে সমুদ্র দেখলে কোনো ক্ষতি নেই।"—খুব তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক এতগুলা কথা বলে হাঁফাতে লাগলেন।

আমি গম্ভীরভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে সুমিত্রা দেবীকে বললেম, "মিসেস্ মিত্র, এই বিদেশ বিভুঁয়ে আপনার মতো সাধ্বী নারীকে দেখে আমি ধন্য হলাম।" গলার স্বর বেশ প্রগাঢ় করলাম, আর খুব যে ধন্য হয়েছি সেটা জানাতে দুবার চোখ পিট্ পিট্ করলাম। তাতে কাজ হ'ল।

সুমিত্রা দেবী বিগলিত হয়ে বললেন, "কী যে বলেন!"

আমি বললাম, "আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হোন্।"

ফোঁস্ ক'রে উঠলেন সুমিত্রা দেবী। বললেন, "এ তো অভিশাপ দিলেন। মেয়েদের দীর্ঘ জীবন মানেই তো বৈধব্য।"

আমি তখন মিত্র মহাশয়কে চোখ টিপে ভবিষ্যৎ-বক্তৃত্বের ভান ক'রে সুমিত্রা দেবীকে যা মনে এল তাই ব'লে চমক লাগাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "আপনার ললাটের প্রণিক্কন্ আর চক্ষুতারকার দ্রাঘিমা দেখে, আপনার বাচন-ভঙ্গীর, গতি-যতির এবং শিরশ্চালনার পরিধি দেখে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী। এখনো আপনার করকোষ্ঠী-গণনা করিনি, তবু আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। প্রমাণ চান? প্রমাণং যথা—আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"

"আমি সংস্কৃত তেমন বুঝি না। আপনি একটু বাংলা ক'রে বুঝিয়ে দেবেন"—বললেন শ্রীমতী মিত্র।

মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে, মিত্র মশায়কে আবার চোখ টিপে বললাম—"শুনুন, তবে প্রমাণং যথা—চন্দ্রস্য দৃক্ কোণে, বুধস্য লগ্নে, যন্নাড়ীচক্রম্ ইত্যাদ্যাস্তঃ অর্থাৎ কিনা, কিম্বাদিভ্যঃ মদাশক্তিবৎ—তার মানে হল জফরী তুফরীত্যাদি পতিতানাং বচঃ স্মৃতম্—যার বাংলা মানে হ'ল, এ সমুদয় লক্ষণ থেকে এই নির্দেশ হচ্ছে যে আপনি সধবা মরবেন, বৈধব্য-দোষ আপনাকে স্পর্শমাত্র করবে না।"

"সত্যি বলছেন? তবু একবার আমার হাতটা দেখুন। আপনি যখন অতবড় জ্যোতিষী!"

আমি বললাম, "এই ম্লান আলোকে হাত তো দেখা যাবে না!"

মিত্রমশায় তখন বললেন, "সুমিত্রা, তুমি এক কাজ কর না কেন? এই মাদ্রাজী-মুল্লুকে চিনি আর পুলি খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তুমি ওদের হোটেলের খানসামাকে আজ তোফা ক'রে পোলাও আর মাংসের কারি রাঁধতে দেখিয়ে দাও না কেন? রাত্রে খেতে খেতে জোর বিজ্‌লী আলোতে উনি তোমার হাত দেখবেন, কেমন? জান তো ওঁর হাত দেখার ফী পাঁচশো টাকা? সেটা বেঁচে যাবে যদি ওঁকে পোলাও খাবার নেমন্তন্ন করো।"

আমি বললাম, "বিলক্ষণ! আপনাদের কাছে কি ফি নিতে পারি? তবে জানেনই তো, ব্রাহ্মণরা একটু পেটুক হয়। আজ মিসেস্ মিত্রের হাতের পোলাও খেতে পেলে ধন্য হব।"—তারপর একটু ভারিক্কি গলায় বললাম, "সেবার মল্লিকাপুরের রাজার একুশ বছর বয়সের ফাঁড়া যখন কটাং ক'রে কাটিয়ে দিলাম—"

"বলেন কি! ফাঁড়া একেবারে কটাং ক'রে কাটিয়ে দিলেন?"—বললেন কপালে চোখ তুলে মিত্রমহাশয়।

"তা দিলাম বই কি। তখন খুশি হয়ে রাজা বললেন, কী পুরস্কার দেব?"

"আপনি কি চাইলেন? নিশ্চয় তালুক-মুলুক একটা কিছু চেয়ে নিলেন?"

আমি বললাম, "ক্ষেপেছেন! আমি বললাম—মহারাজ, আমার বাংলাদেশে অ্যাসেম্ব্লীর ভোটাভুটির সময় আমি হেরেছি—গোহারান্ হেরেছি। তাই মনে ভারি খেদ আছে। এবার আপনাদের ফের যখন মন্ত্রিসভা গঠন হবে, তখন আমাকে প্রধান মন্ত্রী করে নেবেন। রাজা কথা দিয়েছেন, তাই হবে।"

"ওরে বাবা, প্রধান মন্ত্রী! তাহলে তো কিস্তী মাৎ! ক'রে নাও দুদিন বই তো নয়, কি জানি কার কখন সন্ধ্যা হয়!"—বললেন মিত্র মহাশয়।

যাই হোক্, আমার বাক্যচ্ছটায় মিত্র মশায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সুমিত্রা দেবী অশ্বস্ত হ'য়ে বাবুর্চিখানার দিকে চলে গেলেন, আর মিত্র মশায় নিশ্চিন্ত মনে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসলেন।

বসেই বললেন, "আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

আমি বললাম, "তার চেষ্টা নাই করলেন। আপনার দয়ায় আজ তোফা খাবার জুটে গেল বরাতে। এখন আপনাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে মিত্তির মশাই।"

"অনুরোধ কেন, আদেশ বলুন। দুঃসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই রাখব।" আমি বললাম, "আপনাকে দেখে খুব রসজ্ঞ লোক বলে মনে হচ্ছে। উপস্থিতবুদ্ধিও আপনার চমৎকার। আপনাকে একটা গল্প বলতে হবে আপনার নিজের অভিজ্ঞতার। এই ফুরফুরে সমুদ্রের হাওয়ায়, এই চাঁদের আলোয় গল্প শুনতে আমার ভারি ভাল লাগবে।"

মিত্র মশাই বললেন, "এই কথা? আচ্ছা শুনুন তবে। আমার মশায় সব গল্পই আমার গৃহিণীকে জড়িয়ে, স্ত্রৈণ বাঙালী কিনা। তা দাঁড়ান, একটু ভেবে নিই, কোন্‌টা বলব।"—ব'লে ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। তারপর তিনি যে গল্পটি বললেন সেটা আমি যথাসম্ভব তাঁর ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি।

"আমার মশায় ছেলে বেলা থেকে ভারি মাছ ধরবার বাতিক"—ভদ্রলোক বলতে লাগলেন,—"আর তাই নিয়ে কত ছিপ, কত হুইল, কত বড়শি, কত সুতা যে কিনেছি, আর কত জায়গায় যে টো টো ক'রে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। বিয়ে হবার পর বড় জোর তিনচার বছর স্ত্রীরা একটু লাজুক, একটু বাক্য-সংযতা, একটু ব্রীড়াবনতা থাকেন, তারপর বাস্—যে কে সেই। আমি বহুদর্শী লোক মশায়, প্রায় সব জায়গায় এই তো দেখেছি। আমার স্ত্রী সুমিত্রা আমাদের বিবাহের বছর চারেক পরে একদিন বললেন, তোমার ঐ ছিপ নিয়ে দুপুর রোদে টো টো ক'রে বেড়ানোটা আমি পছন্দ করি না। ওতে তোমার অসুখ বিসুখ করতে পারে, তাছাড়া ওটা ভারি undignified—লোকে কি ভাবে বল তো? আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম কথাটা। কিন্তু একদিন মাছ ধরতে গিয়ে জলে ভিজে অসুখ পাকিয়ে তুললাম। তখন আমরা মুর্শিদাবাদে পোষ্টেড্। ডাক্তার সাহেব এসে দেখলেন। রোগের কারণ শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু, ঐটি চলবে না। একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ। একে তো সুমিত্রা—তায় ডাক্তার সায়েবের নিষেধ বাণী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার জলধি মন্থন ক'রে বলতে লাগলেন—কবে কোন্ সতেজ মুন্সেফ বাবু মাছ ধরতে গিয়ে শরদি-গরমি হয়ে ধড়ফড়িয়ে মারা গেছলেন, কোন্ পুলিস সাহেব মাছ ধরতে ধরতে এমন বাতব্যাধি-গ্রস্ত হলেন যে সারাজীবনে আর সুস্থ হতে পারলেন না। সুমিত্রা যত শোনে তত তার চোখ কপালে ওঠে, আর বলে—দেখি এবার থেকে কেমন তুমি মাছ ধরো! ডাক্তার সায়েব বারংবার সতর্কবাণী ক'রে, সুমিত্রার হাতের প্যাটি ও কালোজামের সদ্ব্যবহার ক'রে উঠে গেলেন, আর তৎক্ষণাৎ আমার কত সাধের ছিপ হুইল, সুতার বাণ্ডিল, বড়শির গোছা—সমস্ত চাপরাশি মালি প্রভৃতিকে বিলিয়ে দেওয়া হল। আমি সেরে উঠলাম, কিন্তু সেদিন হ'তে আমার মাছ ধরতে যাওয়া নিষিদ্ধ হল। আপনি সাইকোলজি নিশ্চয় পড়েছেন। কোনো জিনিষ নিষেধ করলেই লুকিয়ে সে নিষেধ ভাঙার প্রবৃত্তি জাগে। এম্‌নি করেই তো পৃথিবীতে পাপের সৃষ্টি। সুমিত্রা সাইকোলজি বোঝে না, আর তাকে বোঝাতে গেলেই সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—তা তিনি ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছিলেন কিনা জানা নেই—তবু তিনি একথা বুঝতেন। তিনি তাই লিখে গেছেন, 'নিষেধ-নিরুদ্ধ যে সম্মান, তাই তব দান।' একথা প্রেমের চেয়ে মাছ ধরায় ঢের বেশ খাটে। আমিও মহাকবির উপদেশ পালন করতে লুকিয়ে মাছ ধরায় লেগে গেলাম। কিন্তু তার দুটি প্রধান বাধা। একটি হল সুমিত্রা নিজে। যদি সে

কোনোমতে জানতে পারে তাকে লুকিয়ে মাছ ধরতে গেছি, তাহলে সে অনর্থ করবে। তাই সারাদিন পুকুর ধারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তাকে নানা কৌশলে, নানা মিথ্যা কথার দ্বারা বুঝিয়েছি যে আপিসে হঠাৎ এমন কাজের তাড়া এল যে সে আর বলবার নয়। লুকিয়ে মাছ ধরার দ্বিতীয় বাধাটি হল ধৃত মাছ। যার পুকুরে মাছ ধরতে যাই সে খাতির ক'রে মাছ ধরবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়—হাকিম কিনা, হাকিমকে কি কেউ অসন্তুষ্ট করে? তারপর ফেরবার সময় যতই বলি, না, না, মাছে আমার দরকার নেই—ততই ওরা সবাই সেটাকে আমার বিনয় ব'লে ভাবে, আর গছিয়ে দেয় আমাকে ভারে ভারে মাছ। সেই সব মাছ নিয়ে বাড়ী গেলেই হয়েছে আর কি! সুমিত্রার কাছে বামাল সমেত ধরা পড়তে হবে, আর তিরস্কার-বর্ষণ হবে ঠিক শ্রাবণের ধারার মতো। তাই মাছ নিয়ে যে মুস্কিলে পড়তে হ'ত সে আপনাকে কি বলব! অন্ধকার রাস্তায় কেউ না দেখতে পায়, এমনি ভাবে টুপ্ করে মাছগুলি ফেলে রেখে কতবার পালিয়েছি। কিন্তু একবার এই করতে গিয়ে সে কী কাণ্ড হ'ল শুনুন। তখন আমি লালবাগের এস্, ডি, ও। মাছ ধরতে গিয়েছিলাম মাইল চারেক দূরে। যার পুকুর সে তো কিছুতেই ছাড়ল না, গছিয়ে দিল গোটা দুয়েক মাছ। সেগুলো আমার সাইকেলের হাণ্ডেলে বেঁধে দিলে। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আচ্ছা, দিচ্ছ দাও—দেব পথের মাঝে ফেলে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জনশূন্য রাস্তা দেখে দিলাম ফেলে মাছ। বাড়ী ফিরে বেশ ক'রে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে সুমিত্রাকে বললাম, ওঃ আজ কী খাটুনিই গেছে। সমস্ত আপিস ইন্‌স্পেকসান্ করতে হ'ল কিনা—তাই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখন দাও দেখি চট্ ক'রে এক কাপ চা, খেয়ে বাঁচি। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি চা ক'রে নিয়ে এল, আমি পরম আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা রিক্স এসে থামল। চাপরাশি এসে খবর দিল, হুজুর একজন লোক দুটো মাছ নিয়ে এসেছে। 'দুটো মাছ' শুনেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হল। সুমিত্রার অলক্ষ্যে আমি চাপরাশিকে ইসারা করলাম, লোকটাকে বিদায় ক'রে দিতে। কিন্তু সুমিত্রার মনে হঠাৎ বোধ হয় সন্দেহ হল। বললে, নিয়ে এসো লোকটাকে। লোকটাকে দেখেই আমার রাগ হল। গলায় কণ্ঠির মালা, বিনয়ের অবতার যেন। ধড়াস ক'রে দুটো মাছ (যে দুটো আমি রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম) ফেলে দিয়ে বললে, 'হুজুরের সাইকেল থেকে মাছ দুটো রাস্তায় পড়ে যায়, হুজুর বোধ হয় জানতে পারেন নি। আমি দূর থেকে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে রিক্স ভাড়া ক'রে হুজুরের কুঠীতে পৌছে দিয়ে গেলাম।'—বেটাকে ছ'আনা রিক্স ভাড়া দিতে হল, উপরন্তু বেটা আবার আমার কাছে তার সাধুতার একটা সার্টিফিকেট চাইলে। সেটাও লিখে দিতে হল। যখন সার্টিফিকেট লিখছিলাম উদ্গত ক্রোধ দমন ক'রে, তখন ইচ্ছা করছিল দিই বেটাকে দুটা ঘুসি মেরে—সুমিত্রার সামনে সেটা তো আর সম্ভব নয়। বেটা যখন চলে গেল, সুমিত্রা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু জিগেস করলে, "এটা কি হ'ল? তোমার আপিসের ইন্‌স্পেক্‌সান্‌টা তাহ'লে আজ পুকুরধারেই হচ্ছিল বুঝি?"

"এ ঘটনার পর অনেকদিন আর মাছ ধরবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু মশায় যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ—এবং তার ওপর ওই গৃহিণীর ট্যাবু। সাধ্য কি আমার সৎপথে থাকবার। ঠিক যেন ভূতে ঠেঙিয়ে মাছ ধরতে বার করে। তখন আমরা মালদায় বদলি হয়েছি। মালদার মেয়ে-স্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেস্‌টির সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ হয়ে গেল এক সভায়। আপনি মশায় ছিপে কখনো কাৎলা মাছ ধরেছেন?"

মিত্র মহাশয় সহসা আমাকে এ প্রশ্ন ক'রে বিব্রত ক'রে তুললেন। একে তো আমি মাছ ধরা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাছাড়া মেয়েস্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেসের সঙ্গে কাৎলা মাছ ধরার কি সম্পর্ক তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মিত্র মশায় নিজেই তার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনি বলে যেতে লাগলেন—

"কাৎলা মাছ ছিপে ধরা বড়ই কঠিন। ওরা প্রায়ই টোপ খায় না। চারে এসে জল ঘুলিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো জলের ওপর ভেসে ওঠে, আর মুখটা একবার খোলে আর একবার বোজায়। মৎস্য-তন্ত্রের টেক্‌নিক্যাল ভাষায় তাকে বলে 'হাপুৎ-হাপুৎ করা'। তখন অভিজ্ঞ মৎস্য-শিকারী যদি কৌশল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুতায় বাঁধা বড়শি তার মুখের ভেতর ফেলে টান দিতে পারেন, কাৎলা মাছ গেঁথে যায়। এ রকম ক'রে কাৎলা

মাছ ধরা খুবই কঠিন কাজ এবং আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় দুবারের বেশি ধরতে পারিনি। এখন সেই মালদার মাষ্টারণীকে দেখে আমার কাৎলা মাছের কথাই মনে পড়ল। কী আশ্চর্য্য! তাঁর খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা আর ড্যাব্‌ডেবে চোখ দুটা ঠিক একটা কাৎলা মাছেরই মতো। তার ওপর তাঁর এক মুদ্রাদোষ, কাৎলা মাছের মতো 'হাপুৎ হাপুৎ' করা।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "ছিঃ মিত্তির মশায়, আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার অসম্মান করছেন হয়তো।"

মিত্র মহাশয় সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "দেখুন এই এক-চতুর্থ শতাব্দী সুমিত্রা আমাকে যে কড়াশাসনে লালন-পালন করছে সে-অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো মহিলার অসম্মান করা একেবারেই অসম্ভব। যা একদম সত্যি আমি তাই বলছি। মিস্ ঘটককে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যেতাম, কাৎলা মাছের সঙ্গে মানুষের মুখের সাদৃশ্য দেখে। তাছাড়া মাছ ধরার যে-নেশা আমার বহুদিনের, সুমিত্রার ট্যাবুতে যা অন্যায়ভাবে বেড়েছে—সেই নেশায় আমি ভদ্রমহিলার মুখের দিকে আকৃষ্ট হতাম। ঈশ্বর জানেন, আমার কোনো কুমৎলব ছিল না, কেবল ভাবতাম—নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবতাম এবং পরে অনুতপ্ত হতাম—যে ভদ্রমহিলা যখন কাৎলা মাছের মতো হাঁ করেন, তখন যদি একটা সুতায় বাধা বঁড়শি তাঁর মুখে ফেলে টান দেওয়া যায়!"

আমি বললাম, "কী সর্বনাশ! সাইকোলজীর কোন্ অধ্যায়ে এটা ফেলা যায়! তারপর?"

ভদ্রলোক বলে চললেন, "ভদ্রমহিলা কিন্তু আমার ঘন ঘন দৃষ্টি-বিনিময়কে ভুল বুঝলেন। তিনি আমাকে প্রায়ই চায়ে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন, আর সুমিত্রা কোনোদিন যদি না যেতে পারতো, আমি একলা গেলেই তিনি খুশি হতেন বেশি। কথার ছলে মাছ ধরার কথা উঠল, তিনি জানালেন তিনি মাছের একজন মস্ত ভক্ত। মাছ খেতে ভারি ভালবাসেন। এই শুনে আমার মনের অগোচরে যে শয়তান বাস করত সে প্রবুদ্ধ হল। ভাবলাম, মাছ ধরার যে ঘোরতর বাধাটি এতদিন আমায় মাছ ধরা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে—অর্থাৎ ধৃত মাছ কোথায় পাচার করব—সেই বাধাটি তো অপসারিত করবার এই সুবর্ণ-সুযোগ। ধৃত মাছ মিস্ ঘটককে দিয়ে গেলেই তো বাস্ ল্যাঠা চুকে যায়। তারপর থেকে আবার সুমিত্রাকে লুকিয়ে মাছ ধরা শুরু করলাম। এখন আর মাছ বহন ক'রে নিয়ে যেতে কোনো ভয় নেই। মাছগুলি মিস্ ঘটককে দিয়ে খালিহাতে বাড়ী ফিরতাম। আমি যে মাছ ধরেছি এ তথ্য প্রমাণিত করে তখন কার সাধ্য! নিজের বুদ্ধিকে খুব তারিফ্ করি, আর খুব মাছ ধরে বেড়াই। কিন্তু হায়, স্বর্গের দেবতারা আমার মাথায় যে বজ্র ফেলবার উপক্রম করছিলেন, তখন তা কে জানত!"

সেদিন আকাশ ভরে বৃষ্টি নেমেছে, আমিও মনের সাধে নানারকম চার ক'রে মাছ ধরতে বসেছি। শুনেছি বর্ষায় কবিদের মনে ভাবের আবেগ-বন্যা আসে, বিরহিনীরা হা-হুতাশ করে। কিন্তু আমি মশায় কবিও নই, বিরহীও নই, আমার কেবল পুকুরপানে মন ধায়। কেননা ঝমাঝম বৃষ্টি নামলে মাছেরা বোধহয় পাগল হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে কৈ মাছ তখন কান্‌কো দিয়ে ডাঙায় হাঁটে, রুই-কাৎলার দল সারা পুকুর তোলপাড় ক'রে বেড়ায়। সেদিন একবস্তা মাছ ধরে সেগুলা আমার মোটরে নিয়ে (তখন আমার একটা ঝড়-ঝড়ে মোটর গাড়ী হয়েছে) মিস্ ঘটকের বাড়ীর দিকে চালাতে চালাতে ভাবছি সুমিত্রাকে ভিজে কাপড়ের কি কৈফিয়ৎ দেব। কড়া নাড়তেই মিস্ ঘটক বেরিয়ে এলেন। মাছগুলো তাঁর দরোজার কাছে ঢেলে দিয়ে নমস্কার ক'রে চলে যাচ্ছি, হঠাৎ তিনি আমার হাত ধরে বললেন, "না, তুমি এখুনি যেও না, ভেতরে এসো।"—ব'লেই হিড়্ হিড়্ ক'রে হাত ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

"এখন, জানেন মশায়, এই ললিত মিত্তিরকে ডাকাতের দল ঘিরেছে, দাঙ্গাকারীরা ঘিরেছে, সরকারি কাজে পুলিস-ফৌজ নিয়ে অবৈধ জনতার ওপর লাঠি-চার্জ করতে হয়েছে, ললিত মিত্তির তাতে কাঁপেনি। কিন্তু মিস্ ঘটক যখন আমায় হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন, তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। মিস্ ঘটক বললেন, "প্রিয় আমার, জানি আজ তুমি আসবে। সারা সন্ধ্যা ধ'রে তোমার কথাই ভাবছি। তোমার এতদিনের এই নীরব তপস্যা ব্যর্থ হতে দেব না গো, দেব না। তুমি কত সন্ধ্যায় নিঃশব্দ চরণে—মাছের অর্ঘ্য নিয়ে এসেছ

আমার মন্দিরে। আদর্শ প্রেমিক আমার, নীরবে এনেছ তোমার প্রেমোপহার।

"তিনি এম্নি ভাবে অনর্গল বলে চললেন, আর আমি তো স্তম্ভিত। কিন্তু এ সবের মানে বুঝতে পারছেন তো মশাই?—এ সবের মানে যাচ্ছে তাই। মিস্ ঘটক আমার কথাই শুনতে চান না, নিজের ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে চললেন, জীবনে কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি কোনোদিন, এমন সময় তুমি এলে, তুমি আমার শূন্য হৃদয় ভরে দাও—

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, "আপনি আমায় ভীষণ ভুল বুঝেছেন মিস্ ঘটক, ভয়ানক ভুল করেছেন আপনি।"

খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, "ভুল করেছি? তুমি আমায় ভালবাসোনি তাহলে?"

"না। ভালবাসার কোনো কথাই ছিল না এতে।"

"তবে রাশি রাশি মাছ এনে উপহার দিয়ে যেতে কেন?"

"সুমিত্রার ভয়ে। সুমিত্রা আমাকে মাছ ধরতে মানা করেছে। তবুও লুকিয়ে মাছ ধরি। মাছগুলো বাড়ী নিয়ে গেলে ধরা-পড়বার ভয়। তাই ওগুলো আপনাকে দিয়ে যেতাম। আপনি নিয়েছেন ব'লে কত যে কৃতজ্ঞ মিস্ ঘটক!"

"রাখুন আপনার কৃতজ্ঞতা। আপনি বলতে চান আপনার স্ত্রীর ভয়ে মাছগুলো আমার কাছে dump করে যেতেন! মানে, আপনি আমার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে আপনার মাছ ধরার খেয়াল চরিতার্থ করেছেন! আর আমি ভাবছি কি না আপনি আমাকে—"

"ক্ষমা করুন মিস্ ঘটক। এমনটা হবে জানলে কক্ষণো মাছ দিতে আসতাম না।"

"কিন্তু, কিন্তু—নাঃ এ কক্ষণো আপনার সত্যি কথা নয়। আপনি অমন ক'রে আমার মুখের দিকে তাকাতেন কেন, যদি ভালই না বাসতেন?"—কিছুতেই ছাড়লেন না, বলতেই হল আমায়, তাঁর মুখের দিকে চাইবার কারণ—কাৎলা মাছের সঙ্গে তাঁর মুখের সাদৃশ্য। তারপর যে দৃশ্য হল তা না বলাই ভাল। তিনি আমাকে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করলেন, যার মৌলিকত্ব এবং প্রাঞ্জলতার তুলনা হয় না। কখনো তিনি কাঁদেন, আর কখনো দুচোখে আগুন ঠিকরে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসেন। শেষকালে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললেন, "মাছগুলা সব গাড়ীতে তুলুন, আর বেরিয়ে যান।"

"কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরলাম। মাছগুলি নিজেই সুমিত্রার সামনে রাখলাম। সুমিত্রা একবার আমার ভিজে কাপড়-চোপড় দেখে, আর একবার মাছগুলো দেখে—তারপর বললে, "হুঁ।" একে তো তার নিষেধ মানি নি, তারপর অপরাধ ক'রে অপরাধের সাক্ষী প্রমাণ সব তার কাছে হাজির করেছি—এ তো একেবারে রাজদ্রোহিতা, গার্হস্থ্য পীনাল কোডের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। সুমিত্রা টাইম-টেব্‌ল দেখতে বসল, আজ রাত্রেই সে কলকাতা চলে যাবে। আমি বললাম—"জীবনে আর কোনোদিন মাছ ধরব না, তোমায় ছুঁয়ে শপথ করছি। খুব শিক্ষা হয়েছে আজ।"

"কেন, কিসের শিক্ষা হ'ল আজ?"

আমি বললাম, "কচ্ছপে কামড়েছিল। অনেক কষ্টে ছেড়েছে।"

টাইম টেব্‌ল্ ফেলে দিয়ে সুমিত্রা টিনচার আইডিন নিয়ে এসে বললে, "কোথায় কামড়েছে দেখি!"

আমি বললাম, "আইডিনের দরকার নেই। শরীরে দাগ নেই, দাগ রেখে গেছে মনে।" তারপর থেকে মশায়, আর কোনোদিন মাছ ধরি নি।

মিত্রমশায়ের গল্প শেষ হল। আমি বললাম, "আপনি নিষ্ঠুর লোক মশাই, মিস্ ঘটকের মনে এমন ক'রে ব্যথা দিলেন।"

এমন সময় সুমিত্রা দেবী এসে জানালেন, খাবার তৈরি। তারপর স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, "গলাটা ঢাকো, মাফ্‌লারটা জড়াও, কোটের বোতামগুলো সব আঁটো।" এসব করা হয়ে গেলে বললেন, "এই ঠাণ্ডায় বসে তোমার শরীর হিম হয়ে গেছে। পাঁচ বার ওঠ-বোস ক'রে শরীর গরম ক'রে নাও।"

আমি বললাম, "হাঁ হাঁ তাই করুন। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে ওঠ-বোসের প্রশস্তি আছে। আপনি ওঁকে প্রত্যহ ওঠ্-বোস করাবেন পাঁচ বার।"

সুমিত্রা দেবী আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "জ্যোতিষ শাস্ত্র! আপনারো বার পাঁচেক ওঠ্-বোস করা দরকার। আপনার বেয়ারাকে ডেকে আমি সব খোঁজ খবর নিয়েছি। হরি আপনার খুব পুরানো চাকর, নয়?"

মিত্র মশাই বললেন, "ললিত মিত্তিরকে এক [illegible]বার বলতে হয় না। সুমিত্রা, এই আমি আরম্ভ [illegible]লাম নিন মশায়, আপনিও আরম্ভ করুন।"

আমরা দুজন ওঠ্-বোস করতে লাগলাম। সুমিত্রা দেবী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গুণতে লাগলেন, এক দুই, তিন,……।

চিত্তেশ্বরী কালী ও সর্ব্বমঙ্গলা

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বাগবাজার খালের উত্তরে চিৎপুর। অন্যূন পক্ষে ৪৫০।৫০০ বৎসরের পুরাতন এই গ্রাম নানা রকম যুদ্ধবিগ্রহাদি, ভূমিকম্প, জলঝড় ও ভীষণ দস্যুতস্করাদির উৎপাত সহ্য করিয়াছে। কত বারই জলা-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, নদীর ভাঙ্গাগড়াতেও তীর দেশের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানকার ঐতিহ্য বিচার করিতে হইবে দিল্লী-সম্রাট আকবর শাহের সময় হইতে যখন রাজা মানসিংহ বঙ্গাধিপ। পরন্তু তৎপূর্ব্বেও চিৎপুর বর্ত্তমান ছিল। বিপ্রদাসের প্রসিদ্ধ কাব্যে এঁড়িয়াদহ, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট প্রভৃতির উল্লেখ চিৎপুরের প্রাচীনত্বর নিদর্শন (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। কিন্তু সে যুগে চিৎপুরের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রাজা মানসিংহর কালে এ অঞ্চল মহারাজ প্রতাপাদিত্যর অধিকারে, এদিকে তাঁহার কয়েকটি গড়ও ছিল এবং উহার মধ্যে একটি চিৎপুরে। অপরাপর কয়েকটি মূলাজোড়, টালা, শালিখা ও বেহালা। চিৎপুর গড়ের কোন সন্ধান বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের দ্বিতীয় বিষয়—নবাব মীরজাফর, ভূহারজঙ্গ প্রভৃতির বাগান—যেখান হইতে ইংরাজ সিরাজের সংঘর্ষ কালে রসদ ও যুদ্ধের বিবিধ উপকরণাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল। তৃতীয় ঐ বাগান হইতেই মহম্মদ রেজা খাঁর নেতৃত্বে বাঙ্গলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় অতিরিক্ত মুনাফা-কারীদের চোরা বাজার পরিচালিত হইয়াছিল—যাহার ফলে মাত্র কলিকাতা-সুতানটীতে ৭৬০০০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এবং চতুর্থ—৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির।

প্রথম তিনটি মোটামুটি সকলেরি জানা আছে, তদ্ভিন্ন ঐ বিষয়গুলি এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। চতুর্থটি অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কথিত হয় রাজা মানসিংহর রাজস্ব-মুহুরী মনোহর ঘোষ (শ্রীহরি ঘোষ বলরাম ঘোষ প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ) দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—চিত্তেশ্বরী কালী ও সর্ব্বমঙ্গলা। ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে যে চিত্তেশ্বরী কালী দেবীর মন্দির কলিকাতা-বাগবাজারের গঙ্গার নিকট কোনস্থলে ছিল। এক্ষণে ইহার অবস্থান নিরূপণ করিতে হইলে তৎকালে বাগবাজারে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থলে ক মন্দির ছিল তাহা জানা দরকার, নতুবা চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির ...লে... তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইবে—কেন না প্রাচীন কালের ...কথা ...রি ভা... বর্ত্তমান কালে নাই।

...ন। বাগবাজারে গঙ্গার তীরবর্ত্তী অঞ্চলে তিনটি প্রধান মন্দিরের ...লে... ...ওয়া যায়। এই গুলির একটি হইল, চিৎপুর রোডের উপর মদনমোহন জীউর দক্ষিণে সিদ্ধেশ্বরী কালী, দ্বিতীয়টি গোবিন্দরাম মিত্রের 'নবরত্ন' মন্দির এবং তৃতীয়টি (জনশ্রুতি অনুসারে) চিত্তেশ্বরী কালী। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির ডেনিয়েলের আঁকা 'চিৎপুরের রোডের দৃশ্য' দ্রষ্টব্য (চিত্র সংখ্যা নং ৬০৬ V. M.)। উত্তরকালে ইহার চূড়াটি ভাঙ্গিয়া যায় ও যথেষ্ট ভাবে সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠাতা (?) গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চরণ মিত্র নিজ ব্যয়ে উহার সংস্কারাদি করাইয়া দেন। দ্বিতীয়—গোবিন্দরাম মিত্রের 'নবরত্ন' মন্দির। ইহা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় ও গোবিন্দরাম এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন; ইহার সংলগ্ন স্বল্প আয়তনের অপর কয়েকটি মন্দির ও একটি বৃহদাকার পুষ্করিণী ছিল। এই মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন সকলেই প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ মন্দির উচ্চতায় বর্ত্তমান কালের গড়ের মাঠের অক্টারলনি মনুমেণ্ট (১৫২ ফুট) অপেক্ষা কম ছিল না, কিছু বেশীই হইবে (১৬৫ ফুট)—ইংরাজীতে পাওয়া যাইতেছে "The highest pinnacle of which is higher than the Ochterlony Monument. এই মন্দিরের একটি চূড়ায় সন্ধ্যাদীপ দেওয়া হইত। দুঃখের কথা, এ মন্দির এক্ষণে নাই, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ঝড় ও ভূমিকম্পে ইহা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উহার বাকী অংশ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। একটি জাতীয় গৌরব বিনষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ইহার অবস্থান ছিল কুমারটুলী পল্লী, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ের নিকট (চিত্র সংখ্যা নং ১০৫৭ V. M.)। সম্প্রতি টিটাগড় পেপার কোম্পানী ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের নূতন দেওয়ালপঞ্জীতে 'নবরত্ন' মন্দিরের একটি ছবি দিয়াছেন।

যেমন মুকুন্দরাম ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর কোতরঙ্গর নদীকূল হইতে বরাবর সম্মুখে চিৎপুরের (চিত্রপুর) সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর দেউল দেখিয়া-ছিলেন—উহার প্রতিস্পর্দ্ধীস্বরূপ আর একটি মন্দির ইংরাজ চার্লস জোসেফ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বালিখালের মোহানা হইতে কলিকাতার একটি মন্দির সকলেরি দৃষ্টিতে আসিত—যাহা বনমালী সরকার ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ের নিকট অবস্থিত ছিল। জোসেফ এ মন্দিরের ঐ রূপ স্থান নির্দ্ধারণ করায় বোঝা যাইতেছে যে তিনি উক্ত 'নবরত্ন' মন্দিরের কথাই বলিয়াছেন। প্রবন্ধ অনুসারে, ইহার মধ্য চূড়াটি ছিল "Cupola" ধরণের—এরূপ বলিয়াছেন কারণ তাঁহার প্রবন্ধের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে, অন্যান্য কয়েকটি চূড়া ভাঙ্গিয়া যায় (১৭৮৬।৮৭ খৃষ্টাব্দে ডেনিয়েলের অঙ্কিত চিত্রে কয়েকটি চূড়াবিহীনরূপেই দর্শিত হইয়াছে), প্রবন্ধকার সেই জন্যই এ চূড়া গুলি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। পুনরায় দুর্দ্দৈব কারণে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঐ মধ্য চূড়াটিও (Cupola) ধ্বসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই মন্দিরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।—তদাবধি উহার সংলগ্ন একটি ছোট মন্দিরের নিম্নাংশ মাত্র (পাঁচ হাত প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রায় দেড়তলা)

বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য পরবর্ত্তীকালে যে প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল তাহাও দুই হস্ত প্রস্থ। বাগবাজার চিৎপুর রোডের উপর, সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার পশ্চিম দিকে যে শিব ও শ্যামসুন্দরের কয়েকটি চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি রহিয়াছে সেই মন্দিরের মধ্যে ঐ প্রাচীর দেখা যাইবে। প্রবন্ধকার আরও লিখিয়াছেন (১৮৪৫ খৃঃ) যে এখনও ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। পুরাতন কলিকাতার চিৎপুর রোডের ম্যাপে (চিত্র সংখ্যা নং ১৭৪৭ V. M.) একটি তারকা চিহ্ন দ্বারা এই মন্দিরটির সংস্থান দর্শিত হইয়াছে—এবং উহার নোটে লিখিত আছে—"Great Pagoda"—প্যাগোডা বলায় নবরত্নই উপলক্ষিত হইয়াছে। প্রবন্ধকারের কথাগুলি এই (Calcutta Review 1845 vol III)—"Near the angle where the road ran up from Banamali Sarkar's Ghat joins the great Chitpore Road···there is still to be seen the remains of a large temple, the largest in Calcutta, which was once crowned with lofty cupola. For many years it was the most conspicuous object in the city over which it towered as a dome of St. Pauls does over the city of London * * About twenty five years ago the Cupola suddenly came down with a clash. It has never since been rebuilt. It was visible from a distance of many miles and more especially from a long reach of the river which terminates at Bally khal." মন্দিরটি এই ভাবে বিনষ্ট হওয়ার বিবরণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নিউম্যানের পুস্তকেও ধৃত হইয়াছে। এই বিবরণ—উপরোক্ত ছবি ও ম্যাপের সহিত মিলাইয়া লইলেই আর কোন সন্দেহ থাকিবে না; স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে মন্দির দুইটি নহে, একটি মন্দিরেরই কথা লেখকেরা নিজ নিজ ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বতন কয়েকজন লেখক একের কথা অপরের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছেন—পুরাতন কালের কাগজ-পত্রাদি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়। কাশীপুরের উত্তরে বরানগরে নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণ লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটি কালীমন্দির স্থাপন করেন, ইহার বিবরণ কয়জন মাত্র জানেন। নিউম্যানের পুস্তকে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮২ খৃঃ) গোবিন্দরাম মিত্রর এই নবরত্নবিশিষ্ট শিব মন্দিরকে চিত্তেশ্বরী কালীর' মন্দির বলা হইয়াছে কিন্তু ইহা আদৌ ঠিক নহে। ডেনিয়াল তাঁহার 'নবরত্ন' চিত্রের যে নোট দিয়াছেন উহার মধ্যে দেবমূর্ত্তি-বিগ্রহাদির কোন উল্লেখ নাই। গোবিন্দরাম রাস্তার পূর্ব্বদিকে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর পুনরায় উহার সম্মুখে রাস্তার পশ্চিমদিকে 'চিত্তেশ্বরী কালী' স্থাপনার সম্ভাবনা কোথায়? বরং সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার ভৈরব স্বরূপ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাই গ্রহণযোগ্য কথা। Indian Chiefs, Rajas etc পুস্তকে এই লিঙ্গমূর্ত্তির নাম দেওয়া হইয়াছে 'মহাদেব'। গোবিন্দরামের কুলদেবতা শিব এবং রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নানা নামে নানারূপে অনেকেরই গৃহদেবতা; গোবিন্দরামের রাধাকৃষ্ণ উক্ত নবরত্ন সংলগ্ন অপর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বনমালী সরকারের গৃহদেবতা অদ্যাপি বিদ্যমান। নিউম্যানের পুস্তক (Hand Book to Calcutta) নবাগত ইংরাজগণের নিকট কলিকাতার পথঘাটের পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত, এ সকল বিষয়ে নিউম্যানকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল জনশ্রুতির উপর এবং ঐ জনশ্রুতি সিদ্ধেশ্বরী ও চিত্তেশ্বরী এতদুভয়ের মধ্যে একের কথা অপরের উপর আরোপ করিয়াছে। জনসাধারণ চিত্তেশ্বরীর নাম শুনিয়াছিলেন এবং কলিকাতার মধ্যে এই দেবীর মন্দির না পাইয়া নবরত্ন মন্দিরকেই চিত্তেশ্বরীর মন্দির বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কোনদিনই হয়ত তাঁহারা দস্যুতস্করাদির ভয়-ভীতি উপেক্ষা করিয়া বনপথ দিয়া চিৎপুরের দেবীমন্দিরে যান নাই। পুস্তক সঙ্কলনে নিউম্যান প্রথম সাহায্য পান ইংরাজ বাসিন্দাগণের নিকট, শিবমন্দিরে কালীমূর্ত্তি তাঁহাদেরই অনুমান। এ বিষয়ে আমরা যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে ঐ মন্দিরে চিরদিনই শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল (দ্রষ্টব্য—Indian Chiefs, Rajas and Zamindars প্রভৃতি)। মন্দিরে কোনরূপ জলদানের উল্লেখ নাই, অথচ উহারই সম্মুখে সিদ্ধেশ্বরী সম্বন্ধে তাহা কথিত হইয়াছে।

তৃতীয় মন্দির, চিত্তেশ্বরী দেবী। নিজ চিৎপুরে (চিত্রপুরে) সেকালে উল্লেখযোগ্য দুইটি মন্দির ছিল না। মুকুন্দরাম, অরিপরিপোর্ট বা চার্লস্ জোসেফ কেহই পৃথক দুইটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে, মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যে বলিয়াছেন—

> "কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
> সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥

তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে তৎকালে নদীবক্ষ হইতে সর্ব্বমঙ্গলা দেউলের মধ্যে দর্শনসম্ভব অন্য কোন মন্দিরাদি ছিল না; ভূভাগ জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব চিৎপুর ও চিত্তেশ্বরী এই শব্দ দুইটির উপসর্গ স্বরূপ প্রথম পদাংশ 'চিৎ' দেখিয়া চিত্তেশ্বরীকে চিৎপুরে অনুমান করা ভুল হইবে—যদি না চিত্তেশ্বরীকে চিত্তেশ্বরী-সর্ব্বমঙ্গলা রূপে স্বীকার করা হয়—কারণ তৎকালে চিৎপুরে সর্ব্বমঙ্গলা ব্যতিরেকে অন্য কোন মন্দির ছিল না। সে কালে চিৎপুর রোডের বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণে বৌবাজার (যথার্থতঃ—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, তখন এখানে গঙ্গার শাখা স্বরূপ একটি খাল ছিল) হইতে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত কাশীপুরের মধ্য দিয়া এবং চিত্রেশ্বরী তথা চিত্তেশ্বরীর নাম অনুসারেই চিৎপুর রোডের নাম হইয়াছিল। চিৎপুর নামও 'চিতে' ডাকাইতের সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। কেননা, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থে চিৎপুর নাম থাকায় 'চিতে' ডাকাইতকে এই বৎসর হইতে আরও অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—কিন্তু সময় কালের প্রশ্ন বাদ দিয়াও দেখা যাইতেছে—প্রবাদ ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে অন্য কোনরূপ প্রমাণ নাই। ইংরাজী প্রবন্ধ

অনুসারে ইহার নাম 'চিত্র' এবং চিত্রপুরের মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট। মুকুন্দরাম বলিয়াছেন, চিত্রপুরে সর্ব্বমঙ্গলা।

প্রাচীন কলিকাতার আলোচনায় পূর্ব্বতন অনেকেই চিত্তেশ্বরী কালীর মন্দির বাগবাজার খালের ধারে (গঙ্গা ও খালের সংযোগস্থলে কোনের উপর) বলিয়াছেন। এইরূপ সংস্থান হওয়ায় অবশ্য এমনও হইতে পারে যে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে উহা বিধ্বস্ত হয় এবং ইংরাজ-সিরাজ সংঘ.র কালে ইহার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে পত্রচিত্রাদির অভাবে। টমাস ডেনিয়াল (১৭৮৩-১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) যে সকল চিত্র আঁকিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইহা নাই; ডি, বি, মায়ার্সের চিত্র তালিকাতেও ইহা পাই নাই। পুরাতন কোন প্রবন্ধেও ইহার উল্লেখ দৃষ্টিতে পড়ে নাই। গঙ্গাখালের সংযোগস্থলে ইহার সন্ধান পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ঐ সংযোগস্থলটি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই পেরিন বাগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঝড়-ভূমিকম্পর দোহাই সকল ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায় না। কাজেই বলিতে বাধ্য উক্তরূপ প্রস্তাব যুক্তিসহ নহে। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে 'কলিকাতা সেকালে ও একালে' নামক পুস্তকে একই দেবীমূর্ত্তি ও মন্দিরের প্রসঙ্গে দুইটি নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। একস্থানে বলিয়াছেন—"বাগবাজার গঙ্গার ধারে চিত্তেশ্বরী বলিয়া আর এক অতি পুরাকালের কালীঠাকুর বিদ্যমান।" এবং অন্যত্র বলিয়াছেন—"চিৎপুর রোড কলিকাতার একটি অতি পুরাকালের পথ। * *। এই পথে যাত্রীরা * * সেই পুরাকালে চিত্রেশ্বরী ঠাকুর দেখিয়া জঙ্গল সমাচ্ছন্ন চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া কালীঘাটে যাইতেন। * *। চিত্রেশ্বরীর নাম হইতেই এই পথটির নাম চিৎপুর। চিত্রেশ্বরীর মন্দির বহুকালের। গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই মন্দিরটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার নবরত্ন আজও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।" এখানে নাম বিভ্রাট লক্ষ্য করিবার বিষয়, মতভেদের উদ্ভব এই বিপর্য্যয় হইতে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিয়াছেন চিত্রেশ্বরী মন্দির চিৎপুরে এবং উপরোক্ত সমস্যা নিরসন হইতেছে তাঁহার নিম্নোক্ত বাক্যে:—"Chitpore Road is named after the Goddess Chitteswari whose shrine still stands at Chitpore." এবং ইংরাজী প্রবন্ধ অনুসারে—"Chittreswaree Dabee * * at Chitpore."

মনোহর ঘোষের সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির চিৎপুরে। এই মন্দিরের প্রাচীনতম উল্লেখ সম্ভবতঃ ঘোষ মহাশয়ের সমকালেই বা তাহার অব্যবহিত পরে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যে। অনেকে বলিয়া থাকেন চণ্ডীকাব্যের রচনাকাল ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু সে সময় দিল্লীতে সম্রাট্ আকবর শাহ ও বাঙ্গলায় রাজা মানসিংহের উপস্থিতি ইতিহাস মানিয়া লইবে কিনা তাহা বিবেচ্য। কবি নিজেই কাব্যের মধ্যে বলিয়াছেন—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপাদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।"

এই কাব্যগ্রন্থের তিনখানি বিভিন্ন সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি—(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৬ খৃঃ), (২) এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস (১৯১১ খৃঃ), (৩) আহিরীটোলা, বেঙ্গল প্রিণ্টিং প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১২৭৫ সাল (১৮৬৮ খৃঃ)। এই তিনখানির মধ্যে মোটামুটি-ভাবে কোন গরমিল দৃষ্ট হয় না যদিও একস্থলে আহিরীটোলা সংস্করণে 'চিৎপুর' রহিয়াছে এবং অপর দুইখানিতে আছে 'চিত্রপুর'। ইহাও দেখা যাইতেছে যে আহিরীটোলা ধনপতি সওদাগরের প্রসঙ্গে 'চিত্রপুর' বলিয়া শ্রীমন্তর যাত্রা বিবরণে 'চিৎপুর' বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে (পৃঃ ৭৬৫) পাদটীকায় পাঠান্তর 'চিৎপুর' স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অন্যত্র পাঠভেদ বা শ্লোকসংখ্যার কম বেশী—ইত্যাদি আমাদের বিবেচনার বিষয় নহে। কাব্যের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন কোন প্রভেদ নাই যাহা এই প্রবন্ধ সম্পর্কে যুক্তি বিচারের অপেক্ষা করে।

মুকুন্দরামের ধনপতি সওদাগর চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী কুচিনান গ্রামে পশুপতি দেবের পূজা করেন—

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়। কুচিনান ধনপতি দেখিবারে পায়॥
নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি। কুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি॥
ত্বরায় বহিছে তরি তিলেক না রয়। চিত্রপুরে শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইয়া বেণিয়ার বালা। বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

কিন্তু শ্রীমন্ত সওদাগর কুচিনানে নামেন নাই, তিনি চিত্রপুরে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন—

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী। কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়। চিত্রপুর শালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদটীকায় উক্ত বর্ণনায় রহিয়াছে—

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী। কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়। চিতপুর শালিখা এড়াইয়া যায়॥"

একজন বঙ্গভাষাবিদ্ ইংরাজ E. B. Cowell এই কাব্যগ্রন্থের আংশিক অনুবাদ করেন, উঁহার ভূমিকায় তিনি মুকুন্দরামকে Chaucerএর মত উচ্চস্থান দিয়াছেন এবং ভূমিকার একাংশে লিখিয়াছেন—"It is the vivid realism which gives such a permanent value of the description. Our auther is the brabbe among Indian Poets and his work thus occupies a place which is entirely its own. In fact, Bengal was to our poet what Scotland was to Sir Walter Scott. He drew a direct inspiration from the village life which he so loved to remember." মুকুন্দরামের বর্ণনা তাঁহার চাক্ষুষ বিষয়, ইংরাজগণ ইহা বুঝিয়াই বহুভাবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পুলিশ অফিসের আদেশে এতদঞ্চলে জরিপ (survey) করা হইয়াছিল, সেই রিপোর্টে চণ্ডীকাব্য অনুসরণ করিয়া চিৎপুরকে চিত্রপুর ও তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চিত্রেশ্বরী বলা

রয়াছে এবং তদনুসারেই জরিপের ম্যাপে মাত্র 'চিত্রেশ্বরী দেবীর' মন্দিরই দর্শিত হইয়াছে—উহাতে দুইটি মন্দির দর্শিত হয় নাই। Calcutta Review 1845 Vol III পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উক্ত চণ্ডীকাব্য ও সার্ভে রিপোর্টের (জরিপ) সাহায্যে লিখিত। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন—"A little beyond its junction (the canal and the river) commences. the village of Chitpore which appear from an ancient Bengalee poem to have been in existence three hundred years ago. It was then written Chittrupoor and was noted for the temple of Chittreswaree Dabee or the goddess of Chittru, known among Europeans as the temple of Kalee at Chitpur." উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধটি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত, ইহার তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত Bengalee poem (বাঙ্গলা কাব্য) অনুসারে লেখক চিত্রপুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি ঠিক ঐ সনে (মতান্তরে ১৫৭৭ খৃঃ) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিখ্যাত চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উহার রচনাকাল সম্বন্ধে কবি তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে বলিয়াছেন—

> "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
> সেই কালে দিলা গীত হরের বণিতা ॥"

সাধারণ হিসাবে রস ছয় প্রকার, পরন্তু নয় প্রকার রসও স্বীকৃত। ইংরাজ লেখক ছয় রস ধরিয়া ১৪৬৬ শক, ১৫৪৪।৪৫ খৃঃ পাইয়াছেন ; এতদ্বারা উক্ত প্রবন্ধ হইতে ঠিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীকাব্যই উপলক্ষিত তাহা বোঝা যাইতেছে। এই রচনার মধ্যে কবি চিত্রপুর নাম করিয়াছেন, প্রবন্ধ-লেখকও তদনুসারে চিত্রপুর বলিয়াছেন। কিন্তু কবির উল্লিখিত সর্ব্বমঙ্গলা নাম প্রবন্ধ-লেখক ধরেন নাই, এস্থলে তিনি জরিপের বিবরণ অনুযায়ী দেবীর নাম বলিয়াছেন চিত্রেশ্বরী। জরিপের কর্ম্মচারীরা নদী ও তন্নিকটস্থ স্থানসমূহ পর্য্যবেক্ষণ ও স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়াই চিত্রেশ্বরী নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; অতএব বলিতে হইবে 'চিত্রেশ্বরী' নামও তৎকালে প্রচলিত ছিল। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ঐ প্রবন্ধর এইস্থলের বিবরণে চিত্রপুরে একটি মাত্র মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে, দুইটি মন্দিরের কোন কথা নাই। তাহা হইলে তৎকালে একটি মাত্রই মন্দির ছিল যে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা ও চিত্রেশ্বরী এই দুই নামেই অভিহিত। এন, এন ঘোষ মহাশয়ও চিৎপুরে (চিত্রপুরে) মনোহর ঘোষের একটি মাত্র মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন Indian chiefs. Rajas etc.)। প্রত্যুতপক্ষে দেবীর নাম হইবে "চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা"। উক্ত প্রবন্ধে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারূপে মনোহর ঘোষের নাম ধৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে মুকুন্দরাম ও চিত্রু ডাকাইত বিষয়ক প্রবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। লেখক প্রথম নামটি গ্রহণ করিয়াছেন প্রবাদ ও জরিপ অনুযায়ী—"চিত্রপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিত্রেশ্বরী।" তৎকালে অপর কোন মন্দির এ অঞ্চলে ছিল না, যাহা ছিল এবং রহিয়াছে তাহা চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের পর পুনরায় রামকৃষ্ণ দেবের একান্ত ভক্ত সারদানন্দ স্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া একই কথা শুনিয়াছিলেন ; এই দেবীর নাম চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা। প্রাচীন কাল হইতে এই নামই প্রচলিত আছে। অতএব এ কথা ঠিক যে কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বমঙ্গলা এবং জরিপ বিবরণেরও প্রবন্ধর 'চিত্রেশ্বরী' অভিন্ন, একই বিগ্রহর দুইটি নাম মাত্র। যেমন বারনগর, বরনগর, বরানগর পূর্ব্বইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়া বরাহনগর হইতে চলিয়াছে, চিত্রেশ্বরী শব্দও চলিত ব্যবহারে চিত্তেশ্বরীতে পরিণত হইয়া সকল গোলের সৃষ্টি করিয়াছে এবং চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎলাভ কাহার ভাগ্যে না ঘটায় পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকেই চিত্তেশ্বরী মন্দিরের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন কলিকাতা বাগবাজারে—নবরত্ন মন্দির, ইহা ঠিক নহে। চিৎপুরের সর্ব্বমঙ্গলাই চিত্রেশ্বরী, তিনিই চিত্তেশ্বরী, ইহাতে দ্বিধা সঙ্কোচের কারণ নাই।

প্রবন্ধকার আরও বলিয়াছেন যে ইংরাজগণ—চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরকে চিৎপুরের কালীমন্দির বলিয়া জানিতেন। এখানে তিনি ইংরাজগণের কথাই বলিয়াছেন, দেশীয়গণের নিকট ঐ মন্দির কি নামে পরিচিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"চিত্রেশ্বরী"। ইংরাজগণ এই দেবীকে কালী বলায় বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। অসংখ্য নরবলির কাহিনী-বিজড়িত ভীষণাকেই বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র তাঁহারা দেখিয়াছেন, রামপ্রসাদ—রামকৃষ্ণর কালীর বিষয় তাঁহারা কি করিয়া জানিবেন ! চিত্রেশ্বরী ও সর্ব্বমঙ্গলা এই দুইটি শব্দই তৎকালের ইংরাজগণের পক্ষে দুরূহ ও কষ্টকর উচ্চারণ। এইরূপ অসুবিধাজনক হওয়ায় তাঁহারা 'কালী' নাম ব্যবহার করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা কাব্যগ্রন্থে সর্ব্বমঙ্গলা ও জরিপের বিবরণে (তথা প্রবন্ধে) চিত্রেশ্বরী নাম পান। চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা স্ত্রীদেবতা এবং স্ত্রীদেবতা বলিতে তাঁহারা কালীই বুঝিয়াছিলেন। তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানে কালী নামই শুনিতেন এবং কালী মন্দিরই দেখিতেন—যেমন কালীঘাটের কালী, ঠনঠনিয়া ও চিৎপুর রোডে সিদ্ধেশ্বরী, বরানগরে রাজা রামকৃষ্ণর মহাকালী ইত্যাদি। তাঁহারা সেই জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, নাম রূপের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতাবশতই ইহাকে কালী মন্দির নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদিও কাগজপত্রাদি মধ্যে লিখিত ব্যাপারে স্থানীয় নাম 'চিত্রেশ্বরী' ব্যবহৃত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজরাজপুরুষগণের অনুকরণে এক্ষণ 'কালী' পদের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ চিত্রেশ্বরী (চলিত কথায় চিত্তেশ্বরী) বা সর্ব্বমঙ্গলা নাম ব্যবহৃত হয়। আবার দেখা যাইতেছে, ঠিক একই ভাবে একখানি ইংরাজী পুস্তকে 'নবরত্ন' শিবমন্দিরটিকেও কালীমন্দির বলা হইয়াছে (Newman)। পুনরায় তৎকালীন বৈদেশিক চিত্রকর প্রাচীন কালের নাটমন্দির-বিহীন চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের ছবি আঁকিয়া (চিত্রসংখ্যা নং ১৬৩৫ V. M. Hindu Math in the Chitpur Bazar)

উহার নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন 'চিৎপুর বাজারের হিন্দু মঠ।' ইংরাজ-আগমনের বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপ্রশস্ত ও বিপদসঙ্কুল যে বনপথ ধরিয়া চিৎপুর হইতে বৌবাজার পৌছান যাইত তাহার প্রথম নাম দেন ইংরাজেরা 'যাত্রীপথ'। এই পথ বরাবর আসিয়া তীর্থ-যাত্রীগণ চিত্তেশ্বরী দেবীর পূজা দিয়া বেতোড়ে বেতাই চণ্ডী হইয়া কালীঘাটে যাইতেন। এই নাম যাত্রীপথ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া চিত্রেশ্বরী দেবীর নামানুসারে চিৎপুর রোড নামে অভিহিত হয়। ইহা ছাড়া ইংরাজগণের আরও এক সুবিধা হইয়াছিল যে তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতেন যে ঐ রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলে নিজ চিৎপুর গ্রামে (তথা মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত) ও পূর্ব্বদিকে দমদমা পৌছান যায়। সেকালে

গোবিন্দরাম মিত্তির প্যাগোডা

বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর নাম ছিল "Road to Collegant."। জনবহুল স্থান বা প্রসিদ্ধ মন্দির ও মঠের নামানুসারে রাস্তার নামকরণ স্থান নিরূপণের সহজ উপায়, দিক্‌ নির্ণয়ের সুবিধা ও পথহারা না হওয়া।

উক্ত মন্দির বা মঠ হইতে গঙ্গা কিনারা পর্য্যন্ত ছিল জলা ও হোগলা বন। উচ্চশির বৃক্ষের যথেষ্ট অভাব ছিল এবং ইহাও একটা কারণ যে জন্য মুকুন্দরামের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল কোন্নগর কোতরঙ্গ হইতে সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দর্শন এবং সাধক রামপ্রসাদ সেনও ঐ জলা জঙ্গলের মাঝে কুলকামিনীরূপধারিণী সর্ব্বমঙ্গলার সাক্ষাৎ পান। এই রামপ্রসাদের গান শুনিবার জন্যই সর্ব্বমঙ্গলা দেবী দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া পশ্চিমমুখী হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ দ্বিতীয়বার আসিয়া ভগবতীর পূজাপাঠ সমাপনান্তে নিরাশ্রয় বালকের মত অনন্যনির্ভর মাতৃ সম্বোধনে তিনি পাষাণ প্রতিমার বক্ষনিহিত মাতৃত্বের সুধাস্রোত সবলে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে গানগুলি গাহিয়াছিলেন তাহার একটি এই—

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী, তপন তনয় ভব ভয়বারিণী।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা
ভব পারাবার তারিণী॥
সগুণা নির্গুণা স্থূল সূক্ষ্ম মূলা হীন মূলা
মূলাধার অমল কমল বাসিনী॥
আগম নিগমাতীতা খিল মাতা খিল পিতা
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী॥
হংসরূপে সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি ত্রিধা কারিণী॥
সুধাময় দুর্গানাম কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী॥
তাপত্রয়ে সদাভজে হলাহল কূপে মজে,
ভনে রামপ্রসাদ তার বিষফল জানি॥

রামপ্রসাদ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সন্তুষ্ট, হৃষ্টচিত্তে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পদ্মনাভের জন্মবিবরণের মধ্যে তাঁহার নিজের জন্মকাল বলিয়াদিয়াছেন—১৩ই ফাল্গুন ১১২৭ সাল (২২শে ফেব্রুয়ারী) বুধবার মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।

প্রাচীন কালের ৺সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির (চিত্র ১৬৩৫ V. M.) এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প বাত্যা প্রভৃতি কারণে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মন্দিরের অবস্থা ঠিক এমনই হইয়া পড়ে যে শিব-মন্দির কয়টির চূড়া সংস্কার করা সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু বৃহদাকার মূল-দেবীর মন্দির নূতন করিয়া গড়িতে হয়। সাধক রামপ্রসাদ যখন এ মন্দিরে আসেন সে সময় বর্ত্তমান সেবাইতগণের ঊর্দ্ধতন অষ্টমপুরুষে রামাশরণ সিমলাই প্রথম সেবাইতরূপে বিদ্যমান ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

54, 36th Street
5. 10. 15.

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্র পাইলাম। এই গল্পটা বেশ হওয়ার কোন আশা আমার ছিল না। কারণ প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম, এ সকল বস্তু প্রবন্ধ হইলেও হইতে পারিত। আসলে এ ধরণের লেখাকে ঠিক গল্প বলাও হয়ত সকলের মত না হইতে পারে। যাক্, যদি দু একজনেরও ভাল বোধ হয় সেও আমি আহ্লাদের কথা মনে করিব।

আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ছাপিবেন। আপনার নিজের জিনিস হইলে যা করিতেন ঠিক তাই। এতে ভাল না হয় সেও আমার কপাল, ভাল হয় সেও আমার কপাল।...

হাতটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না।[১] মধ্যে ডান পা-টাও আগাগোড়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া জয় ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা এখন কমিয়াছে এই যা। প্রতিমাসেই কিছু না কিছু একটা ছোট হোক্, বড় হোক্, প্রবন্ধ হোক্ ছাপিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টাই করিব। যদি না পারি সেটা আমার অনিচ্ছার জন্য নয়, অক্ষমতার জন্যই হইবে না।

অন্যান্য বিষয়ে ভাল আছি।

আপনাদের—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"ভারতবর্ষ" পেলাম। প্রথমটা কে যে চুরি করিল তা বলিতে পারি না।

আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না। বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল, এই-বার আর একটু বেশ করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়।

আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ করি ভাল। আমি ত মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্ত্তব্য।

Baje Sibpur
15. 5, 20.

ভায়া,

অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির—আপনি আমার চশমাটা বামাপদর[২] দোকান হইতে আনাইয়া লইয়া—সেই আপনার নিজের লোকটিকে দিবেন। সুধা[৩] জানে কি রকম এক কাঁচের চশমা করা চাই। নম্বর (+ 2.5) দামও শুনি ১৮৲ ২০৲ টাকা। বাস্তবিক জুতায় যদি পরের কথায় ৩২৷৹ খরচ করিয়া ফেলিতে পারি[৪]—আপনাদের কথায়

১। এই হাতের অসুখের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে এর আগের একটি পত্রে লিখেছিলেন—আমার ডান হাতটায় এত ব্যথা যে লেখা ভারি শক্ত। কিছুতেই আরাম হইতেছে না। ডম্বল ভাঁজিতে গিয়া এ এক কাণ্ড ঘটিল!

২। জনৈক চশমা-ব্যবসায়ী।

৩। হরিদাসবাবুর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

৪। শরৎচন্দ্র তখন বাজে-শিবপুরে থাকতেন। সেই সময় তাঁর মাতুল ও বাল্যবন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বাজে-শিবপুরে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে চৌরঙ্গীতে জুতা কিনতে গিয়েছিলেন। উপেনবাবু তাঁর 'স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে সেই জুতা কেনার কাহিনীটি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

"হোয়াইটওয়ের রেক্স-শুর মতো মূল্যবান এবং অভিজাত জুতো কলিকাতার বাজারে খুব বেশি ছিল না। তখনকার দিনে একজোড়া রেক্স-শুর মূল্য ছিল সাড়ে বত্রিশ টাকা।...

—চল ষ্টীমারে যাওয়া যাক, শীঘ্র হবে।

বললাম—চল।

পথে বেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি গল্প করতে করতে ষ্টীমার ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম। শরতের পায়ে একজোড়া ছিন্ন মলিন চটিজুতো। যৌবনকালে তার রঙ কালো ছিল অথবা বাদামি, তা সহজে ঠাহর করা

১৮, ২০, টাকা খরচ করিব এ আর বিচিত্র কি? আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।

যাক্, আপনাদের কথাই রাখি—ঐ এক কাঁচেই (+2·5) চশমা করিয়া দিন। Frame সোনার ত আছেই। বাতিল কাঁচগুলাও ত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

বামাপদবাবুর চিঠিটা পাঠালাম, কিন্তু এ চিঠিখানা যেন আর তাঁর কাছে পাঠিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করবেন না।

শরৎদা

যায় না। কোনো জায়গা দেখলে মনে হয় কালো, কোন জায়গায় বাদামি। শুনলাম জুতোজোড়া পায়খানা যাবার সময়ে শরতের কাজে লাগে।

ষ্টীমার ঘাটের কাছ বরাবর পোয়াটাক পথের মত অত ধূলিবহুল পথ ওই শহরে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।......

পথের ধূলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শরৎতের চটি ধূলিতে ধূসর বর্ণের হয়ে গেল। সেই ধূলিকণাসমূহ শুধু তার জুতোর অবস্থান্তর ঘটিয়ে ক্ষান্ত হ'ল না, ক্রমশ তার দু পায়ে একজোড়া ধূসর বর্ণের স্টকিং পরিয়েও দিল।

গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে হাইকোর্ট ঘাটে উঠে…দুজনে মাঠ উত্তীর্ণ হয়ে হোয়াইটওয়ের দোকানের সামনের ফুটপাথে উঠলাম। শরৎকে বললাম, "শরৎ, তোমার পায়ের আর জুতোর যা অবস্থা, অত দামি রেক্স-শু তোমাকে দেখাবেই না।"

"বল কি উপীন।" ব'লে একটু উদ্বিগ্ন মুখে শরৎ কোঁচা দিয়ে পা আর জুতো দু-চারবার ঝাড়লে। তার দ্বারা ধূলি হয়তো খানিকটা অপসৃত হ'ল, কিন্তু জুতোর অবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করল না।

বললাম, "আগের অবস্থা বরং ভাল ছিল, এ আরও খারাপ হ'ল শরৎ।"

মাথা নেড়ে শরৎ বললে—"হোকগে। চল তো ঢুকি, না দেখাতে চায়, সঙ্গে টাকা তো আছে, চারখানা নোট মুখের কাছে নেড়ে বলব—হিয়ার ইস্ দি মানি।"

গুটি গুটি দুজনে যেখানে ঢুকলাম, সৌভাগ্যক্রমে তার পাশেই জুতো বিভাগ। অদূরে একজন শপ্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, জেণ্টেলমেন?"

শরৎ বললে, "আমি একজোড়া রেক্স-শু কিনতে চাই।"

আমাদের দুজনকে একটা শোফায় বসিয়ে ঘাড় এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে শরতের পায়ের আকারটা ভাল করে দেখে নিয়ে শপ্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট জুতো আনতে গেল।

জাত বণিক এই ইংরেজরা। পায়ের ধুলা অথবা ছিন্ন চটিজুতো এদের কি বিভ্রান্ত করতে পারে?…নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ ধুলা আর ঐ ছিন্ন চটি নিয়ে তখনকার দিনের চাঁদনির কোনো জুতোওয়ালার দোকানে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ টাকা মূল্যের জুতো কিনতে চাইলে দেখাত না তো বটেই, অধিকন্তু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলত, "আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।" চাঁদনির দোকানে জুতোর দর করতে গিয়ে বহুবার এমন কথা শুনাও হয়েছে, "ও-দামে এক জোড়া হবে না, একপাটি হবে।"…

আট দশ জোড়া জুতোর বাক্স দুই বগলে চেপে ধরে শপ-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এসে হাজির হ'ল; তারপর হাঁটু গেড়ে শরতের সামনে বসে পড়ে এক জোড়া পরিয়ে পরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। কিছুতেই তার মন আর সন্তুষ্ট হয় না। পুনরায় চার পাঁচ জোড়া নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল।…অবশেষে একজোড়া পরিয়ে খুশি হয়ে মাথা নাড়লে; তারপর ভাল করে লেস বেঁধে দিয়ে বললে, "একটু চলে ফিরে দেখুন তো! আমার মনে হচ্ছে, এই জোড়া ঠিক ফিট করেছে।"

ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে শরতের মুখে খুশি হওয়ার হাসি ফুটে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন লাগছে?"

শরৎ বললে, "চমৎকার! জুতো পরেছি বলে মনেই হচ্ছে না।" মণিব্যাগ থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বার করে সে শপ-অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের হাতে দিলে।

সাড়ে বত্রিশ টাকার ক্যাসমেমো ও বাকি সাড়ে সাত টাকা নিয়ে… আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে শরৎ বললে,—"চল।"

নূতন জুতো থেকে পা খোলবার কোন লক্ষণ নেই দেখে শপ-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বললে—আপনার শ্লিপারটা জুতোর বাক্সে দিয়ে দোব?

"না ওর আর দরকার নেই।" বলে শরৎ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুতো আর নতুন বাক্স উভয়েই নাথ হীন হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দোকানে পড়ে রইল। এখন বুঝতে পারলাম, জুতোর বাক্স বহন করার কদর্য্যতা হতে অব্যাহতি লাভের জন্যেই শরৎ ঐ পায়খানার জুতো-জোড়া পরে এসেছিল।

পথে বেরিয়ে শরৎ উত্তর দিকে চলতে লাগল।

ধর্মতলার মোড়ের মাথায় পৌঁছে শরতের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শরৎ, ছপয়সা ক্ষইল।'

আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে শরৎ বললে—"তার মানে?"

"তার মানে, অত দামি জুতো, হোয়াইটওয়ে থেকে এ পর্যন্ত আসতে যেটুকু চামড়া ক্ষয়েছে, তার দাম ছপয়সা নিশ্চয় হবে।"

কোন কথা না বলে আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শরৎ ধর্মতলা ষ্ট্রীট পার হয়ে অপর দিকের ফুটপাথে উঠল। তারপর ডানদিকে মসজিদ রেখে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হনহন করে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ গিয়ে বললাম—"শরৎ, তিন আনা ক্ষইল।"

কোন মন্তব্য না করে শরৎ যেমন চলছিল, হনহন করে তেমনি চলতে লাগল। সম্ভবত সে আরামদায়ক মূল্যবান জুতো পরে পথ চলার সা[illegible] মেটাচ্ছিল। আরও খানিকটা গিয়ে বললাম—"শরৎ, সাড়ে চা[illegible] আনা ক্ষইল।"

এবার শরৎ গতিরোধ করে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তিপূর্ণ ক[illegible]

ভাগলপুর
১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩২

ভায়া,

অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভরসা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।

৶জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে এসে আটকে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালাজ্বরে শয্যাগত। বহু injection দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি। এখানে পূজোবাড়ীর নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এমনি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর আমার?

১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে। এখানে এসে এমন সুন্দর হয়েছে যে, পিছনে কামান দাগ্‌লেও চম্‌কাইনে। আমার সম্পূর্ণ আশা হয় যে, শ্রীযুক্ত জলধর দাদাকে এবার আপনি বিদায় দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের traditionএর কোনপ্রকার অমর্য্যাদা হবে না।[১] এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না। এই ত সম্বাদ! আপনার শ্রীঅর্শ কেমন আছে জানতে পারলে সুখি হব। আশা করি সেরে গেছে, এরূপ দুঃসম্বাদ দেবেন না।

সুধাকে[২] আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন।

শুঃ
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বললে, "আরে তুমি তো ভারি পেছনে লাগলে দেখছি।" তারপর অদূরে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে ডান হাত তুলে উর্দ্ধ্বস্বরে ডাকতে লাগল—"এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।"

ট্যাক্সি চালকের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সবেগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দরজা খুলে দিলে।

আমার প্রতি ইঙ্গিত করে শরৎ বললে—"নাও ওঠ।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় চলেছ শরৎ?"

শরৎ বললে—"হরিদাসের দোকানে।"

হরিদাসের দোকান অর্থে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকান—গুরুদাস লাইব্রেরী।…

মাস ছয়েক পরে…সকালে শরতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমাকে দেখামাত্র শরৎ উর্দ্ধ্বস্বরে হাঁক দিলে—"ওরে ভোলা, মামা এসেছে, আমার জুতোজোড়া নিয়ে আয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—"আমার প্রতি এ কি রকম অভ্যর্থনা—তা তো বুঝলাম না।"

কোন উত্তর না দিয়ে শরৎ শুধু মুচকে একটু হাসল…

রেক্স-শু নিয়ে ভোলা উপস্থিত হলে কথাটা বুঝতে পারলাম।

জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে উল্টে ধরে তলাটা দেখিয়ে শরৎ বললে, যেদিন "জুতো-জোড়া কিনি তুমি বলেছিলে—তিন আনা ক্ষইল, সাড়ে চার আনা ক্ষইল। নরম আর হালকা ব'লে মাস ছয়েক ধরে এই জুতো জোড়াই সমানে ব্যবহার করছি। আচ্ছা, ভাল করে দেখে বল তো উপীন, আজ পর্যন্ত ক আনা ক্ষয়েছে? চার আনাও বোধ হয় নয়?"

বললাম,—"নিশ্চয় নয়, দু আনাও বোধ হয় নয়।"

খুশি হয়ে শরৎ বললে, "ঠিক বলেছ। লোহার সোল হ'লে এত দিনে ক্ষয়ে যেত। কিন্তু এ এমন অদ্ভুত পেটা চামড়া যে, ক্ষইতে জানে না। দাম ওরা নেয় বটে, কিন্তু তার বদলেও দেয়।"

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া কত কি যে মনে হইল বলিতে পারি না। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সহিতে পারি না, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক[৩] আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এত বড় থাকে, এ যেন আমি জানিতাম না। কে জানিত ভিতরে ভিতরে আমি এতখানি দুর্ব্বল ছিলাম। কত কি লিখিয়াছি—সকলই মনগড়া। কে ভাবিয়াছিল আমার জীবনেই তাহা এমন সত্য হইয়া উঠিবে। আজ আর একটা সত্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাই বাকি জীবনটা যেন সকলেরই শুভ কামনা করিয়া শেষ করিতে পারি। ২২শে কার্ত্তিক '৩৩।

শরৎদা

টাকাকড়ির প্রয়োজন সম্প্রতি নাই, হইলেই জানাইব।

১। ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন কানে খুবই কম শুনতেন। এছাড়া একসময় বীরেন্দ্রনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি জলধরবাবুর সহকারী ছিলেন, তিনিও কানে খাটো ছিলেন। তাই কালা হওয়াটাকেই ভারতবর্ষের সম্পাদক হওয়ার অন্যতম যোগ্যতা বলে শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করেছেন।

২। হরিদাসবাবুর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

৩। শরৎচন্দ্রের মধ্যম-ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী বেদানন্দের মৃত্যু শোক।

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা]

পানিত্রাস, হাবড়া
৮. ২. ৩২

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, তোমার চিঠি পেলাম। সেদিন তোমার অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার ছবি আমার খুবই মনে আছে। প্রায় সর্ব্বদাই মনে পড়ে। আশীর্ব্বাদ করি, এর থেকে তুমি যেন মুক্ত হতে পারো। উপায়হীন ব্যথার মত ব্যথা সংসারে আর নেই।

সরস্বতী পূজার সময়ে আমার বাড়ীর বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই, কিন্তু এবারে শনিবারে বড় বোয়ের একটা ব্রত-প্রতিষ্ঠার—[১] বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না। তাই এই মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো। অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি। ··

আমি একরকম আছি। লোকের আসার বিরাম নেই —দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনি হবার দরুণ যারা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের।[২] ইতি—

দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া
১২. ৪. ৩২

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেদিন রাত্রে ফিরে এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ের অবধি রইল না। বাড়ীময় আলো, রাত দেড়টায় ওপরের বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ও-বাড়ীর মেয়েরা—নীচেও ৫।৬জন লোক, ভাবলাম ভয়ানক কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। দেখলাম তাই বটে, ডাক্তার এসেছিলেন, বুড়ীর[১] ১০১°-১০৪·৫ জ্বর, পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—প্রায় সারাদিনই যন্ত্রণা চলচে।

কিন্তু তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে সেরে উঠেছে, বউমা[২] যে বল্‌ছিলেন, অত জ্বর—দেখা যাচ্ছে তাই বটে। হাম অথবা এই ধরণের অন্য কিছুর আশঙ্কা নেই। কাল থেকে জ্বর নেই, আজও জ্বর হয় নি, খেলাধুলো করে বেড়াচ্ছে। বোধ করি আর কিছু হবে না, এমনি ভালো হয়ে যাবে।

সুতরাং, যাওয়াই স্থির কোরলাম।[৩] রাত্রে ৮-২৪ ট্রেনে শুক্রবারেই রওনা হবো, আশা করি তুমি যেতে আপত্তি করবে না। Howrah ষ্টেসনেই তোমাকে প্রতীক্ষা কোরব। ননী[৪] সঙ্গে যাবে, তুমি যদি শুধু একটা টিফিন-পটে একটু খাদ্যবস্তু ও একটা কুঁজোতে খাবার জল নাও, বড় ভালো হয়। এখান থেকে ঐগুলো নিয়ে যাবার ভারি অসুবিধে হয়। পথ তো সোজা নয়।

বউমাকে[৫] বোলো একটা দিন মাত্র, বড় জোর তার পরদিনটাও হতে পারে, যদি একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্যে পুরীতে ৺জগন্নাথ দেখতে যাই। কটক থেকে পুরী ত বেশী দূর নয়। যদি যেতেই হোলো ত ওটা না দেখে আর ফিরবো না।

এদের অনেক দিনের অনুরোধ যাবার, এবার নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে—যদি না ইতিমধ্যে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, বুড়ীর অসুখের জন্যে যাত্রা তো প্রায় বন্ধ করেই দিয়েছিলাম।

অন্যান্য মঙ্গল, বউমাকে ও ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ দিয়ো।

দাদা

১। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী জীবনভোর পূজা ও বার-ব্রত নিয়েই আছেন। এঁর এই পূজার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ৯. ৮. ১৩ তারিখের এক পত্রে লিখেছিলেন—ইনি ত দিনরাত জপতপ পুজো-আচ্ছা নিয়েই থাকেন। একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না।

২। দেশকর্মীদের উপর শরৎচন্দ্রের একটা আন্তরিক দরদ ছিল। তাই তিনি সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করতেন।

১। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমুকুলমালা চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলায় এঁর ডাক নাম ছিল বুড়ী।

২। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা প্রকাশবাবুর স্ত্রী।

৩। শরৎচন্দ্র এই সময় কটক থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাওয়া স্থির করেছিলেন।

৪। শরৎচন্দ্রের অন্যতম ভৃত্য।

৫। মণিবাবুর স্ত্রী।

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

দেহটা আবার গোল বাধিয়েছে ; স্থির করেছি এ নিয়ে আর নালিশ জানাবো না—এই এ সম্বন্ধে শেষ। পায়ের ব্যথাটা যে বাত নয়, সেই পুরাতন আঘাতের জের এটাও এবারে নিঃসন্দেহে বোঝা গেছে। এখন বড় বোয়ের[১] চিকিৎসা সুরু হয়েছে—তিনি নাকি এই মুসব্বরের প্রলেপ দিয়ে অনেকের আঘাত-পাওয়া ব্যথা আরোগ্য করেছেন। তিনচার দিন লাগানো হচ্চে, অনেকটা ফল পাওয়া গেছে। নির্দ্দোষ নিরাময় হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে সাময়িক একটু অব্যাহতি পেয়েছি।

তোমাদের ওখানে যাবার জন্যে মনে মনে ছটফট্ করচি, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে ভয় হচ্চে। পাছে তোমাদের বিব্রত করি।

বৌমা ও ছেলেমেয়েদের আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়ো। দিন ৪।৫ হোলো ছোট বৌমা বাঘাকে[২] নিয়ে বাপের বাড়ী মুঙ্গেরে গেছেন। কেবল বুড়ী রইলো, মামার বাড়ীতে যেতে চাইলে না, বড়বৌও ছেড়ে দিলেন না।

অন্যান্য খবর ভালো। ইতি ২৯শে ফাল্গুন ৩৮

পুঃ তোমার দেওয়া Mss. লেখবার কাগজগুলি চমৎকার হয়েছে। খুব আনন্দিত হয়েছি।

দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, বাস্তবিক এম্‌নি কিছু না কিছু একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাই যে যেতেই পারচি নে। আজ তোমার হরিবাবু[৩] গিয়ে আমার দেখা পেলেন দিদির বাড়ীতে। জন দুই ডাক্তারের সঙ্গে তখন আলোচনা চলচে। তুলুকে[৪] মনে আছে? তার স্ত্রীর মারাত্মক অসুখ। বাঁচে কিনা সন্দেহ। আর আমি ছাড়া ওদের ভরসা দেবার ত কেউ নেই, আশার কথা শোনাবারও কেউ নেই। নিজেরও দরকার কলকাতায়, কিন্তু যেতে পারচি নে। শনিবারে যদি যেতে পারি—কাল প্রকাশকে[১] দিয়ে খবর পাঠাবো।

মুখুয্যে মশাই[২] অম্‌নি এক রকম, না ভালো না মন্দ। আমার শরীর ভালোই আছে।

আমার নন্দী গেছে ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী, কাল শুক্রবারে আসবে—যদি যেতেও হয় ওকে নইলে তো যাওয়া হবে না।

আশা করচি শনিবারে যাবো। দাদা

১। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরন্ময়ী দেবীর।

২। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা প্রকাশবাবুর পুত্র শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলায় এঁর ডাকনাম ছিল বাঘা।

৩। মণিবাবুর পরিচিত জনৈক ব্যক্তি।

৪। শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট জায়ের ভাই।

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেই পর্য্যন্ত আমি অসুখ বিসুখের ঘূর্ণাবর্ত্তে দিন কাটাচ্ছি।

মুকুলের হঠাৎ হোলো লিভারের ব্যথা এবং জ্বর! বউমা ঠিক এই ভয়টা সেইদিন করেছিলেন ; তাই হোল অবশেষে। তিনটে এমিটিন ইনজেক্‌শন দিয়ে এবং অন্যান্য ওষুধ খাইয়ে সে একটু আছে ভালো। তার সম্বন্ধে আর চিন্তা নেই, অন্ততঃ সম্প্রতি।

তারপরে হঠাৎ মুখুয্যে মশাই নিলেন শয্যা। আশঙ্কা হোয়েছিল এ যাত্রায় বোধ করি আর তাঁকে ধরে রাখা গেল না। রক্তের চাপ বেড়ে গেছে ২২০তে। বয়সও হোল ৭৩, কিন্তু তা বোললে তো হয় না। তাঁর যাওয়া মানে আমাদেরও এখান থেকে যাওয়া। এখন তাঁকেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি—তবে আজ একটু আছেন ভালো। প্রস্রাব পরীক্ষা হয়ে এলো, তাতে কোন দোষ নেই—এটা ভারী আশার কথা। যাই হোক, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এ তো ঠিক রায় বাড়ীর ফলার নয়, এখানে শেষ পর্য্যন্ত ফলার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার ভয় থাকেই।

তারপরে নিজে। আনন্দ স্বামিজীকে বোলো—failed! absolutely failed! failed ignominiously!

১। শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

রক্তধারা বোধ করি নায়গ্রা প্রপাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কোরতে চায়।[১]

তার পরে হোল কটকের Engagement-এ শুক্রবারে যেতেই হবে। তোমার ঠিকানায় আমাকে খবর দেবার কথা ছিল, বোধকরি তুমিও সম্বাদ পেয়েছো। যাওয়া চাই। বউমার কাছে অনুমতি নিও। একটু মুখ মিষ্টি কোরে। বীরত্ব প্রকাশের চেষ্টা না করলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। মানুষটি নির্ব্বোধও নয়, অসজ্জনও নয়, হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি কোরে তাঁর কাছ থেকে একতিলও আদায় হবে না। তাঁকে বোলো।

আমি সেই ট্রেণেই হাবড়া পৌছব, যদি দেখো আমি নেই, নিশ্চয় জেনো খড়্গপুরে অপেক্ষা করে আছি। তবে আশাকরি তা' হবে না, হাবড়াতেই যাবো এবং দুজনে একত্রেই রওনা হবো। আমার এবং ননীর একটু খাবার নিয়ো ভাই।

দাদা

পুঃ—তুলু বল্‌চে আর লিখ্‌লে ট্রেন পাবেনা।

১। শরৎচন্দ্রের অর্শ রোগ ছিল। এই সময় আনন্দ স্বামী নামে এক সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের অর্শ সারিয়ে দেবেন বলে, তাঁকে ওষুধ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে ওষুধে কিছুই কাজ হয়নি। তাই শরৎচন্দ্র এখানে স্বামীজীর ওষুধের ব্যর্থতা এবং ঐ সঙ্গে পরিহাস করে নিজের অর্শের রক্তপাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

জয়পুর

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শাস্ত্রকার বলেছেন—"জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।" তার যুগ যুগান্তর পরে এই যুগের আমাদেরই এক কবির মুখে তুলনা নেই, অমনি এক মুগ্ধ মন্ত্র বা স্তব আবার দেশ শুনলো, "বন্দেমাতরম্"। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী ধরণী-ভরণী এক দেশমাতৃকার এক অপূর্ব্ব বন্দনা। এমন বন্দনা এর আগে কোনদিন কেউ এমন করে আনন্দময় মুগ্ধভক্তি ভাবেতে বিহ্বল হয়ে করেছেন বলে জানি না। এমন করে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির বন্দনা করা যায়, এই প্রথম শুনেছিল দেশ অবাক হয়ে, আর তার কতদিন পরে মুখর আনন্দে একদা সহসা সমস্ত দেশ সকলে মিলে বলেছিল, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

কবির ভাষাতেই বলি—"শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে" (গীতাঞ্জলি)। সেদিন তেমনি করে বলেছিল। সে মন্ত্র আজো দেশবাসীর মনে গাঁথা আছে।

তারপর কত কবি কত ভাবে জন্মভূমির স্তব রচনা করলেন বন্দনা গাইলেন। কবিগুরু গাইলেন,—

"অয়ি ভুবন মন মোহিনী"
"মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে তোমার মন্দিরে।"

আর এক কবি গাইলেন, "এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি।"

এই যে জন্মভূমির উপর আনন্দময় মোহময়—ভালবাসা—তা যে জন্মভূমি শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিত সমতল নদনদী অরণ্য শ্যামপ্রান্তরময় দেশই হোক, অথবা গিরি পর্ব্বত বনময় কোনো উষর মরুপ্রান্তরের দেশই হোক, কিম্বা যেমনই হোক—একার নেই বলা শক্ত। এমন মানুষ দুর্লভ যিনি জন্মভূমিকে ভালবাসেন না। এ ভালবাসা ঐ নামের নেশায় ডাকা শিশুর মতই মুগ্ধ সরল মধুর ভালবাসা। বোধহয় এই মোহময় ভালবাসাই মোহহীন গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী সাধুকে সন্ন্যাসীকেও দ্বাদশ বৎসরান্তে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে টেনে আনে। কর্ম্মাবসানে কারুকে সাগর পারের স্বদেশে নিয়ে যায়, কারুকে তার মরুপ্রান্তরের দেশে নিয়ে যায়, কারুকে হিমালয়ের কন্দরে—তার জন্মভূমিতে নিয়ে যায়। অন্যের স্বদেশ, নিজের কর্ম্মক্ষেত্র, ধন ঐশ্বর্য্য, যশ কীর্ত্তি ও তাকে তার মাতৃভূমিকে একেবারে ভুলিয়ে রাখতে পারে না।

এ মোহের তুলনা নেই। মানুষ এই স্বদেশে যেতে না পারলেও তার স্বপ্ন দেখে। কখনো চুপি চুপি নিজের মনকে রূপকথা শোনায়। কখনো সন্তান-সন্ততিকে সেই বাল্য শৈশবের অপূর্ব্ব রূপকথা, জন্মভূমির কথা বলে। এমন করে বলে, যেন মনে হয়, 'এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি।' বোধকরি এ মোহের তুলনা নেই। যে মোহে—সেই কবি যিনি একদা সাগর পারের দূর অ্যালবিয়ন উপকূলের স্বপ্নমুগ্ধ হয়ে স্বদেশ স্বধর্ম্ম সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও বলেছিলেন,

"প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে,
এ দেহ আকাশ হতে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে।
……মধুহীন কোরো নাক তব মন কোকনদে।"

এই জন্মভূমির ওপর দুর্ব্বার মোহ আর ভালবাসাই কত দীর্ঘকাল পরে আমাকে জয়পুরে টেনে এনেছে। কত পরিবর্ত্তন হয়েছে দেশের, কত চেনা মানুষ নেই, কত কথা মনে নেই, তবু "নূতনের মাঝে পুরাতন" জন্মভূমি স্মৃতির ভাণ্ডারভরা সুখ দুঃখের অমূল্য সম্পদ নিয়ে কত নূতন অজানা মানুষের মাঝে বসে আছেন। আর সেই অজানারাও এখানে আছেন বলেই আমাদের আপনজন পরমাত্মীয় হয়েই আছেন। এমন রক্তের টান, এমন নাড়ীর টান জন্মভূমির ওপর কে অতিক্রম করতে পারেন জানি না।

এই জয়পুর আমার জন্মভূমি। এই সুন্দর জয়পুর তিনদিকে পাহাড়, একদিকে সমতল মরুপ্রান্তর, কেকামুখর ময়ূর, চকিতনেত্র হরিণের লীলা-ভূমি, অম্বর, নাহারগড়, গণেশগড়, মতি ডুঙ্গরী—শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতমালা বেষ্টিত, কিম্বদন্তি কাহিনী কথায় ভরা, অপরূপ জয়পুর, এত সুন্দর নাও হ'ত যদি—তবু এর রূপের তুলনা পেতাম না। এ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা নয়—তবু মনে হয় 'এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'।

আর এই জয়পুর আমাদেরই এক বাঙালী পণ্ডিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিকল্পনায় গড়া। সাতটী তোরণ, তার নামও সুন্দর। পশ্চিমে চাঁদপোল, পূর্ব্বে সূরযপোল, গণগৌরী দরওয়াজা, আজমেরি, সাঙ্গানেরি, দরওয়াজা, ঘাট দরওয়াজা, কিষণপোল বাজার, চন্দ্রমহল, হাওয়ামহল, নানা নামের প্রাসাদময় মন্দিরময় অপূর্ব্ব নগরী।

নামে রূপে উৎসবে পার্ব্বণে অপরূপ জয়পুর। বারমাসে তের পার্ব্বণের দেশ বাংলার মত এখানেও পালাপার্ব্বণ মেলা উৎসবের শেষ নেই।

বৈশাখ মাসে গোবিন্দজীর ফুল বাংলা, মন্দির ও দেবতার ফুলের সজ্জা ফুল-শৃঙ্গার। জ্যৈষ্ঠে নৃসিংহ চতুর্দ্দশীতে নৃসিংহ মেলা। মেলামণ্ডপে হিরণ্যকশিপুবধ অভিনয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে গোবিন্দজীর জলযাত্রা, নৌকা খণ্ড। শ্রাবণের তৃতীয়ায়, তীজ গণগৌরীর মেলা, শুক্লা তৃতীয়ায় গৌরীর উৎসব। গোবিন্দজীর ঝুলনযাত্রা আর রাখীবন্ধন উৎসব। ভাদ্রে রাজাদের জন্মতিথি "শালগিরা" হয়। সেও রাজমাতাদের মহোৎসব, ছোট বড় কর্ম্মচারীদের ঘরে মিষ্টান্ন পাঠান হয় রাজপ্রাসাদ থেকে। আশ্বিনে নবরাত্রিতে অস্ত্রপূজা। রাজপুত ক্ষত্রিয়রা শুচিশুদ্ধ-ভাবে, একাহারে অস্ত্রাগারে অস্ত্রপূজা করেন ন'দিন ধরে এবং প্রতিপদ থেকে বিজয়া দশমী অবধি অম্বরেশ্বরীর নবরাত্রি পূজা। বিজয়ার দিন রাজাদের বিজয়যাত্রার উৎসব 'দশেরা' উৎসব। কোজাগরে শরৎপূর্ণিমায় অম্বর প্রাসাদে জ্যোৎস্নাতে দরবার। শুভ্র বস্ত্রে সাদা হীরা মুক্তার ভূষণে সেজে এদিন রাজা আর রাণীরা দরবারে যোগ দেন।

সাদা শোকের পোষাক বলে অতি হাল্কা গোলাপী আর বাদামী রংয়ের পোষাকে সেই উৎসবে সর্দ্দাররা রাজকর্ম্মচারীরা যোগদান করেন, বেতন অনুযায়ী নজর করেন মহারাজাকে। রাত্রে সব সাদা দেখায়। এ সভা বা দরবার রাত্রে হয়।

কার্ত্তিক মাসে গোবর্দ্ধনের মেলা। গিরি গোবর্দ্ধন ধারণও বটে, গোধন পূজাও বটে, চমৎকার নীল ও লাল রংয়ে গরু বলদের শৃঙ্গ রঞ্জিত করা হয়—সাজানো হয়। অন্নকূট হয়, গোবিন্দজী মদনমোহন গোপীনাথজী আদি সকলের মন্দিরে মন্দিরে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও হয়। ভাইপূজা ভাইদোজ বলে।

প্রতি মেলাতেই সেকালে তখন রাজা বেরুতেন, বিশেষ বিশেষ যান-বাহনে। রাজদর্শনলোভী জনতা গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সহরে আসত, এখন তারা আসে কি না, রাজা বেরোন কি না জানি না। সেদিন "লওয়াজমা বা সওয়ারী" শোভাযাত্রা বেরুত, চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে। সুন্দর সজ্জিত পদাতিক সৈন্যদলের পর ডাকের সাজপরা কাঁচের মোটা মোটা মুক্তার মালাপরা অশ্বশ্রেণী, তারপর কারুকার্য্য করা লাল গদীতে সাজানো উটের শোভাযাত্রা, তারপর হাতীরদল, বহুমূল্য হাওদা পিঠে নিয়ে ডাকের সাজে শুঁড় ঢাকা, সাদা দাঁতে সোনার গিল্টিকরা অথবা সোনারই বালাপরা, হস্তীযুথ বেরুত। তারপর তাঞ্জাম, বলীবর্দ্দবাহিত রথ, সগ্‌গড় (শকট?) সারি সারি বেরুত। তারি মাঝে রাজা কখনো সুবর্ণখচিত চার, ছ, আট ঘোড়ার গাড়ীতে বেরুতেন। কোনোটায় চমৎকার সাজানো অশ্বপৃষ্ঠে বেরুতেন—"গোবর্দ্ধনের মেলায়" ঘোড়ার সওয়ারী হতেন। বিজয়া দশমীতে বা "দশেরাতে" বিশালকায় হস্তীপৃষ্ঠে বিজয়যাত্রার উৎসবে রাজাকে দেখা যেত। সেদিন রাজাদের সারা বৎসরের জয়যাত্রা বা শুভযাত্রা কল্পনা করা হয়—রাজোয়াড়ার রীতিতে। আর সম্বৎসর দিন-ক্ষণ দেখার শুভাশুভ মুহূর্ত্ত দেখার বাছবিচার তেমন করে করতে হবে না। এ তিথি যুদ্ধের বিজয়যাত্রার জন্য মানা হ'ত।

এর পর দীপাবলী বা দেওয়ালী। দেওয়ালী আর হোলী তো সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের উৎসব, মুসলমানের মহরমের মত খৃষ্টানের বড়দিনের মত। দুর্গোৎসবের আনন্দ বাঙালীজাতের মধ্যেই আছে, হোলী ও দেওয়ালী আমাদের সমস্ত ভারতবাসীর উৎসব। এই দেওয়ালীতে ঘর সাজানো বাড়ী পরিষ্কার থেকে নিয়ে দীপদান, বাসন কেনা, মিষ্টান্ন পাঠানো, স্বজন বান্ধবকে স্মরণ বিশেষ প্রথা। এদিন গজলক্ষ্মী পূজাও ঘরে ঘরে হয়। শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করে জল নিয়ে নারায়ণের ক্রোড়স্থিতা লক্ষ্মীকে স্নান করাচ্ছে। হাওদাতে প্রদীপ দেওয়া মাটীর হাতী কিনতে পাওয়া যায়। চিনির মঠ, খেলনা, নারিকেল শুকনা, ছোলা কড়াই-ভাজা, ভুট্টার খই ইত্যাদি পূজায় লাগে। দেওয়ালীর সহর আলোয় বাসনে, খেলনায় ঝলমল করে। নাহারগড় পাহাড়ের প্রাসাদে অম্বর প্রাসাদেও দীপদান হয়। সারারাত্রি সে প্রদীপ নেবেনা। আমরা নিজেদের বাড়ী প্রদীপ দিয়ে দেখতাম—তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই নিবে আসে। ও প্রদীপ সারারাত্রি কেমন করে জ্বলে ভাবতাম। শুনেছি বড় সরায় প্রদীপ করা হয়। দেওয়ালীতে অম্বরেশ্বরীর মহিষ বলি দিয়ে পূজা হয়।

এর মাঝে বছরের কোন এক সময়ে মহরম হয়ে যেত। সেও সমস্ত হিন্দু মুসলমানের সমবেত পর্ব্বদিনের মত। মেলা বসে, লোক জমে। 'হাসান হোসেনের' শোকযাত্রার তাজিয়া বেরোতো। বুক চাপড়ে হায় হাসনে হায় হোসেন' করতে করতে। নবাবজীর বাড়ীরও বড় বড় মুসলমান 'রইস' ঘরাণা থেকে নিজস্ব 'তাজিয়া' ও শোকযাত্রা বেরুতো সে সময়ে। ইমামী রং সবুজ রংয়ের পোষাকপরা ছেলেমেয়ে দেখা যেত

পথে। বিহারে দেখেছি হিন্দুরাও ইমামী রংয়ের কাপড় জামা করায় ছোট ছেলেদের।

এর পর পৌষ মাসে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব! সারা বছরই ছেলেরা ওড়ায়, আমাদের বাংলাদেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘুড়ির বিশেষ উৎসব; জয়পুরে—বোধহয় ওদিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্রই ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য বিশেষ ভাবে পৌষ মাসই থাকে, সংক্রান্তির দিনই শেষ উৎসব ঘুড়ির।

মাঘে সূর্য্য সপ্তমী বা সূরয়সাতে মেলা। এদিন রাজা বেরুতেন ভোরে চার বা আট সাদা ঘোড়ার গাড়ীতে। ভোরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মেলা বসত। সে মেলায় সিপাহী সৈন্যরা সেদিন প্রথমে সূর্য্য অভিবাদন করত, পরে রাজাকে কুচকাওয়াজ করে সেলাম করত। বাজনার তালে তালে সে অভিবাদন। এই সূর্য্য অভিবাদন রাজপ্রাসাদে তখনকার দিনে সকাল সন্ধ্যায় সানাই বাঁশী বাজিয়ে করার প্রথা ছিল। এখনো আছে কি? কে জানে।

তার পর ফাল্গুনে দোল বা হোলী, গোবিন্দজীরও বটে, আর সারা সহরের সকল অধিবাসীরও বটে।

বৎসর শেষ চৈত্রে শুক্লা তৃতীয়ায় আবার তীজের মেলা গণগৌরী পুজা। কাঁচুলী ঘাঘরা লুগড়ী পরা সালঙ্কারা মৃন্ময়ী প্রতিমা সুন্দরী গৌরী-গণগৌরী দরওয়াজা থেকে বেরিয়ে এসে গোবিন্দজীর পুরোহিতের বাসভবনে সেদিনের মত বিশ্রাম করেন। কুমারী মেয়েরা তাঁর পুজা করে বিবাহের জন্য, সৌভাগ্যের জন্য সধবারা। স্মিতমুখী সুন্দরী গৌরীকে দেখে মনে হয়—দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। গৌরী তাঞ্জামে আরোহণ করে সেদিন মেলায় বেরোন। তাঞ্জাম মানুষে বহন করা সুন্দর সোনালী রূপালী কাজ করা পালকীর মত।

এই বারো মাসের নানামেলায় ভরা জয়পুর। মেলায় খেলনা, পুতুল থেকে নিয়ে রঙীন পোষাকে ঝলমল করা বিচিত্র বসনভূষণ পরা নরনারী শিশু বালক বালিকা সঙ্গে যেন দেখবার জিনিষ। ভিখারিণী তার ছেঁড়া রঙীন লুগড়ীখানিও এমন করে পরে, আর এমনই মুখের সৌষ্ঠব মনে হয়, রূপের বুঝি সীমা নেই। খেলনা পুতুল মাটীর কিন্তু সে স্বর্ণ যুগে এক পয়সায় চারটা, আটটা ছোট ছোট পাখী, বাঘ, সিংহ, বড় জন্তু পয়সায় একটা দুটো পাওয়া যেত। পিতামহীর কাছে সেই সেকালে এক আনা দু' আনা পয়সা দিয়ে সেকালের আমরা বালকবালিকারা মাটীর খেলনা ঝুড়ী ভরে আনতাম গণগৌরী থেকে—গণেশাদি অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও কম থাকত না। এখনও কি আর তেমন মেলা হয়, কিম্বা মেলায় ঐ সব খেলনা থাকে, না আধুনিক খেলনায় আধুনিক বাজার সেজেছে—কে জানে! কিন্তু ঐ সস্তা সেই খেলনার রং করায় বা গড়নে শিল্পীর অবজ্ঞা বা অযত্ন ছিল না। অতি যত্নে হাতী উটের বাঘের সিংহের পাখীর অন্য জন্তুর ও মানুষের আকারের রং গড়ন রচনা করা হ'ত। মেলার উদ্দেশে লোকে সহর ভরে যেত। পথের দুধারের দোকান পসারের ছাত, লোকের বাড়ীর ছাত, মন্দিরের সিঁড়ি রঙীন পাগড়ী জামা কাপড় রঙীন 'লুগড়ী' (ওড়না) ঘাগরা-পরা নরনারী বালক বালিকাতে যেন রংএ ঝলমল করত। মানুষের গুঞ্জন, আলো, হাসি, খেলনা পুতুল, বাঁশী গান বাজনা দুধারে, তার মাঝের পথে রাজকীয় শোভাযাত্রা মহাসমারোহে ধুমধাম বাজনাবাদ্য জাঁকজমকসহ চলেছে। প্রতি বছরেই লোকে দেখত, তবু দেখতে আসত। হয়ত নতুন জগতে আসা নতুন মানুষগুলিকে নিয়ে আসত। জগত পুরোনো, প্রথাও পুরাতন, কিন্তু মানুষ তো' নতুনই। তার দেখা ঔৎসুক্যের শেষ নেই, দেখানোরও শেষ নেই। পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীকে পিঠে কাঁধে নিয়ে গ্রামের পুরুষরা চলেছে। মেয়েরা একগলা ঘোমটা টেনে এক চোখ বের করে দেখতে দেখতে তারস্বরে গান গাইতে গাইতে তাদের পিছনে চলেছে। এদের লজ্জা চোখেমুখে, কথায় বা গানে লজ্জা ওদেশের প্রথা নয়। মেলার পথ একেবারে নানা সুরের নানা কণ্ঠের গ্রাম্য ঐক্য সঙ্গীতে মুখর। তার সুর তাল লয় বোঝবার বয়স সে নয়। গ্রাম্য মেঠো সুর যেন।

এই উৎসব পার্ব্বণদিনের জয়পুর।

আবার প্রতিদিনের কাহিনী—কিম্বদন্তী কথাভরা জয়পুরও ভুলে-যাওয়া মনের কোণ থেকে উঁকি মারে। নাহারগড়ের রাজাদের কোষাগার, তার ভীমদর্শন রক্ষী সেপাই শান্ত্রীদের কথা। জনশ্রুতি বলে তাদের বিশ্বস্ততার সীমা নেই। স্বয়ং রাজাকেও নাকি সে কোষাগারে চোখ বেঁধে প্রবেশ করতে হয়। কতকালের সে রাজকোষ, আর কত কালের সঞ্চিত কত হীরা মুক্তা মণি ভরা! রাজার পর রাজা সে হীরা মতির আভরণ পরেছেন; তাঁদের জীবনশেষে আবার ফিরে গেছেন সব সেই কোষে—নতুন উত্তরাধিকারীর জন্য। রাণীদের অঙ্গেও সেই আভরণ ভূষণ অলঙ্কার উঠেছে। আর যেদিন রাণীত্ব শেষ হয়ে গেছে নিজের বা রাজার জীবনাবসানে, সেদিন খোজারা এসে অন্তঃপুরের মহলের দুয়ারের সুমুখে হেঁকে গেছে, 'এইবার সব হীরা মতির আভরণ বসন ভূষণ রাজকোষে ফিরিয়ে দেবার জমা করে দেবার সময় হ'ল'...। যেন উগ্র ভাষায় বলে, 'হে সিংহাসন অধিকারিণী, তোমার পথ শেষ হয়ে গেছে, রাণী সাজার খেলা সাঙ্গ হ'ল'। তার বিনীত সুরে যেন আদেশ আসে, 'হুকুম হো যায়'! তারপর রূপার থালায় ভরে উত্তরাধিকারগত সমস্ত ভূষণ আভরণ ফিরে আসে সিংহাসনের নতুন অধিকারীর জন্য। থলিতে ভরে কোষাগারে গিয়ে ওঠে, আর একজনের আর একদিনের অভিষেকের জন্য। একটীও এদিক ওদিক হয় না।

কত কথা, রাজঅন্তঃপুরের উপেক্ষিতা রাণীদের কাহিনী, বাঁদীদের কথা। আনারকলির মত সুন্দরী সখি বা বাঁদীদের রাণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কাহিনী। কত হতভাগিনীর কথা—যারা কবে বেঁচেছিল, কখন শেষ হয়ে গেছে কিভাবে কেউ জানে না। অম্বরের প্রাসাদ থেকে —সকল প্রাসাদে প্রাসাদে অসংস্কৃত অন্ধকারময় কক্ষে, 'তয়খানার' কুঠুরীতে কুঠুরীতে তাদের হতভাগ্যের জনশ্রুতিময় কাহিনী যেন থমথম করছে। কখনো সে কাহিনী বহির্জগতের কানে এসেছে, কিন্তু স্বপ্নের মত অস্পষ্টভাবে। তার পরের কথা আর কেউ জানে না।

কত জনশ্রুতি, কোন রাজা বিবাহের বরযাত্রার সময়ে নিহত হন।

আজো নাকি সেই তিথি লগ্ন সংযোগ হলে সেই শোভাযাত্রা জহুরী বাজারের সামনে দিয়ে ত্রিপোলিয়া ঘুরে গণগৌরী দরওয়াজা অবধি যেতে দেখা যায়…!…

"শ্রীকান্ত"র গুণীর মত আমাদেরও অলৌকিক কাহিনী শোনাবার কেউ না কেউ জুটে যেত—ভৃত্য বা দাসী বা কাহিনীকথক পুরাতন কেউ। নিশুতি রাত্রিবেলায় 'জরখে' বা উল্কামুখী শেয়ালের পিঠে উল্টোমুখে বসা ডাইনীর শিশুদেহ লোভে শ্মশান ভ্রমণের কাহিনী ছোট-বেলায় রক্ত জল করে দিয়েছে।

যে কোনদিন কার বাড়ীর ছোট ছেলের দিকে চেয়েছিল,…তার পর? তারপর ছেলে শুকিয়ে যেতে লাগল। আর ভালো হ'ল না। সকলে জানে ঐ ডাকিনী তাকে চোখ দিয়েছে, দেখেছে, তবু কেউ কিছু বলতে পারত না—কেউ তাকে নিজের বাড়ীতে আসতে বারণ করতে সাহস করত না—কে জানে কখন কোন পথে ডাকিনী আসা যাওয়া করে। একবার চেয়ে যাবে তাকিয়ে—দেখবে শুধু সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ছেলের দিকে—তারপর আর রক্ষা পাওয়া শক্ত। 'নজর লগ গিয়া'। আবার অজানা ডাইনীও আছে—যে জানেনা তার চোখে বিষ আছে! সেও চাইলে অমনিই হয়! আমাদের শিশুমন বিশুষ্ক মুখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। কে জানে কোন্ না-জানা ডাইনী এসে কারদিকে চেয়ে যাবে, কোন ছোট ভাই বোনের দিকে চাইবে, আর সে শুকিয়ে যেতে থাকবে অসহায় ভাবে। আস্তে আস্তে অদৃশ্য শোষণকারিণী রক্ত শুষে নেবে কোন্ অদৃশ্য শক্তির বলে! কোনো প্রতিকার নেই, কোনো আশার পথ নেই! সভয় উদ্বেগে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, 'কি লাভ তার? কি করে সে ছেলে নিয়ে?'

তখন আবার এক কাহিনীর অবতারণা করত তারা। ডাইনীর তো নিজের ছেলেমেয়ে থাকে না, তাই সে অন্যের ছেলেমেয়েকে দেখে ভাল লাগলে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চায়। তা লোকে তো তাকে ভয় পায়—ছেলেপিলে সামনে থেকে সরিয়ে রাখে। তাই সে ভাল মোটা-সোটা ছেলেমেয়ে দেখলে নজর দিয়ে ফেলে, তারপর আর সে বাঁচে না। তখন রাত্রে 'জরখে' চড়ে সে শ্মশানে চলে যায়, সেখানে সেই শিশুটীকে বাঁচায় তার সঙ্গে খেলা করার জন্য……।

অবশেষে ভয়ের ভাবনার শেষ হ'ত, যখন তারা বলত, গুণী আছে রোজা আছে, তারা কত ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, কত ডাইনীর ক্ষমতা হরণ করে নিয়েছে। কি ভাবে শাসন করেছে, তারা আর ঘর থেকে বেরোয় না…। কি স্বস্তি! তাহলে শুধু ডাইনীই নেই পৃথিবীতে, রোজাও আছে। গুণীও আছে…। বাল্যকালের সেই বিপুল পৃথিবী আমাদের, এ তারই কথা।

এই ছোটবেলার কাহিনী কল্পনা কথা ভরা আনন্দময় শৈশবের বাল্যের জয়পুর—"যার কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে"।
এই সত্য মিথ্যায় কল্পনা বাস্তবে গড়া, আনন্দ বেদনায় ভরা সুখেদুঃখে ভরা অপূর্ব্ব জয়পুর।

বাঙালীর মেয়ে, বাঙলাদেশে শ্বশুর ঘর, আত্মীয় স্বজন সব—তবু মেয়েদের বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ীর মত মন তাকেও ভোলে না, একেও ভুলতে পারে না। কখনো তাকে মনে হয়, 'এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'। আবার মন বলে, 'আমার সোনার বাংলা—আমি তোমায় ভালবাসি'।

শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যবদ্বীপ ভ্রমণে পড়েছিলাম যেন, 'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেব মহেশ্বর, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'। এও কি তাই বলতে চায়?

* জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জন্য লিখিত।

ডালিয়া ফটো—শ্যামল বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুরঙ্গমা বলিল, "দেখুন, দেখুন, কি আশ্চর্য্য দু'টি উল্কা—"

চার্ব্বাক আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। সত্যই উল্কা হইলে বিস্ময়কর। পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে।

বলিল, "সম্ভবত উল্কা নয়, ফানুস"

"ফানুস? তা হতে পারে। কিন্তু এরকম ফানুসও দেখি নি কখনও। ঠিক পাশাপাশি উড়ে চলেছে, যেন দু'টি আলোর পাখী"

"চল, বাইরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, বিপদে পড়ে' যেতে হবে।"

"চলুন। আপনার প্রাণের ভয় বড্ড বেশী দেখছি—"

"বেশী নয়, যতটুকু স্বাভাবিক, ততটুকু। তোমাদের উপনিষদের ঋষিও বলেছেন ভয়ের তাড়নাতেই সমস্ত পৃথিবী চলছে। সূর্য্য তাপ দান করছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ইন্দ্র নিজ কর্ত্তব্য করছে, এমন কি মৃত্যুও ভয়ে ধাবমান—"

"কার ভয়ে—"

"ওঁরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, যিনি উদ্যত বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর—"

"আপনার ব্রহ্মে বিশ্বাস নেই বুঝি"

চার্ব্বাক হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি ব্রহ্মের প্রকাশ হও তাহলে বিশ্বাস আছে। কিন্তু অনাদি অনন্ত অখণ্ড অজ্ঞাত অমৃত অব্রণ, অকায় এই সব বিশেষণবিশিষ্ট যে আজগুবি ধাঁধার সৃষ্টি করে' ওঁরা বোকা লোকদের ভোলাচ্ছেন তাতে বিশ্বাস নেই"

সুরঙ্গমার চোখের কোণে চাপাহাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"চলুন তাহলে ঘরের ভিতরই ঢোকা যাক"

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় গাদা করা রহিয়াছে। চার্ব্বাক ইহা দেখিয়া খুশী হইল।

"চল, ওর উপর উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসা যাক—"

"আপনি বসুন"

"তুমি?"

"আমি দুয়ারের কাছে বসছি। যদি কেউ এদিকে আসে, আপনাকে সাবধান করতে পারব"

"তুমি ভিতরে এসে কপাটে খিল বন্ধ করে' দাও"

"তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ধরা পড়লে দু'জনেই মারা যাব"

"ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে কি"

"আছে বই কি। কুলিশ পাণি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন"

"বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে কাছে পেলে আমার বক্তব্যের যুক্তিটা আরও জোরালো হ'ত"

সুরঙ্গমার নয়নে আবার হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক তুলিল। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল—"যুক্তি যদি কিছু থাকে, কম জোরালো হলেও তা আমি মানব। বলুন, কি বলবেন—"

চার্ব্বাক খড়ের গাদার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বলিল, "আমার বক্তব্য তো আগেই বলেছি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই"

"কেন—"

"এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য"

"মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে! মৃত্যুই তো আমাদের স্বাভাবিক পরিণাম"

"কিন্তু অকাল মৃত্যু কি স্বাভাবিক?"

"অকাল মৃত্যুও তো ঘটে। কত শিশু শৈশবেই মারা যায়, তা কি শোনেন নি"

"সে সব অকালমৃত্যুও স্বাভাবিক। তা কারও ইচ্ছাকৃত নয়। তুমি যে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছ তা' হত্যার নামান্তর"

"আত্মহত্যা বলতে পারেন, কিন্তু হত্যা নয়। কেউ জোর করে' আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মারবার চেষ্টা করেনি। আমি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—"

"কেন"

"কুমার সুন্দরানন্দের মান বাঁচাবার জন্যে"

"তোমার মৃত্যু হলে তাঁর মান বাঁচবে কি করে' ?"

সুরঙ্গমা তখন মির্ম্মিরের কাহিনী বিবৃত করিল। করিয়া বলিল, "তানে যদি মির্ম্মিরের পারমার্থিক আনন্দের জন্য আত্মবলিদান দিতে পারে, তাহলে কুমারের জন্য আমিও পারি। তাছাড়া এও আমার মনে হল দেহটা যজ্ঞের আগুনে ছাই করে' দিয়ে তানে যদি মির্ম্মিরের অন্তরে চিরস্থায়িনী হয়ে থাকে, আমিই বা কুমারের অন্তরে হব না কেন? আমিই কুমারকে তাই যজ্ঞের আয়োজন করতে উৎসাহিত করেছি। কুমার আমাকে জোর করে' বধ করছেন—আপনার এ ধারণাটা ভুল"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার যুক্তি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, ভাবিয়া পাইল না কি উপায়ে সে এই স্বেচ্ছাচারিণীর গতি-রোধ অথবা মতি-পরিবর্ত্তন করিবে। তাহার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত শক্তি কিন্তু একাগ্র হইয়া উঠিল, যেমন করিয়া হোক ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। শেষে শিশু যে সুরে আবদার করে সেই সুরে সে সুরঙ্গমাকে বলিল, "আমার ধারণা হয়তো ভুল। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তুমি আর থাকবে না, তোমাকে আর কখনও দেখতে পাব না—এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য"

সুরঙ্গমা হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনার ব্যক্তিগত সুখের জন্যই তাহলে আমাকে বাঁচতে বলছেন, এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আপনার আর কিছু নেই ?"

"'আমি চাই' এর চেয়ে জোরালো যুক্তি পৃথিবীতে আর আছে কি ? আমাকে আর আমার চাওয়াকে কেন্দ্র করেই তো সংসার—"

সুরঙ্গমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল তাহার পর বলিল, "মাপ করবেন মহর্ষি, যা বলছি তা হয়তে রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তা না বলেও পারছি না। হয়তে চাওয়াটাই সংসারে বড় যুক্তি, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায় ? দাম না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি একজন সামান্যা নটী, আমাকেও কুমার অনেক দাম দিয়ে তবে পেয়েছেন ! আপনি আমাকে চাইছেন, কি দাম দেবেন বলুন।"

ব্যাপারটা দর-দস্তুরের স্তরে নামিয়া আসিবে চার্ব্বাক তাহা কল্পনা করে নাই। একটু বিব্রত হইয়া সে বলিল, "অর্থের দিক দিয়ে সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না তা আমিও জানি, তুমিও জান। তাই কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ ? এটা কি তুমি জান না যে আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গানের মতো তুমিও অমূল্য ? ধনীরা হয়তো অর্থ ব্যয় করে' আলো-বাতাস-ফুল—পাখীর গান উপভোগ করেন, কিন্তু দরিদ্ররা কি তা বলে' বঞ্চিত হয় ?"

সুরঙ্গমা পুনরায় হাসি মুখে উত্তর দিল—"আলো বাতাস ফুল পাখীর গানের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ওরা স্বাধীন, আমি পরাধীন, সীমাবদ্ধ। বাজারের পণ্য আমি, ক্রেতাই আমার ভাগ্য নির্ণয় করে। যে মহত্ত্বের আমি অধিকারী নই, তা আমার উপর আরোপ করে' আমাকে ভুল বুঝবেন না মহর্ষি"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল, "কত অর্থের বিনিময়ে তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে ? দেখি চেষ্টা করে' সংগ্রহ করতে পারি কি না। অবন্তীনগরের রাজপুত্র আমার অনুরাগী, সে হয়তো আমায় সাহায্য করবে"

"আমি অর্থ চাই না। কুমার আমাকে এত অর্থ, এত মণি মুক্তা অলঙ্কারাদি দিয়েছেন যে ও সবের সম্বন্ধে আমার আর মোহ নেই। আপনার যদি প্রয়োজন থাকে আমার কাছ থেকেই নিতে পারেন কিছু। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, যদি অভয় দেন বলি—"

"বল—"

"রাগ করবেন না তো"

"তোমার কোনও কথাতেই রাগ করব না। তোমার উপর রাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই"

"আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী, ঢের বেশী গুণবতী নারী অনেক আছে। যে অবন্তীনগরের আপনি নাম করলেন সেই অবন্তীনগরেই অপূর্ব্বা নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে-ও নটী। প্রচুর অর্থ পেলে সে আপনার কাছে এসে থাকবে। কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতের প্রণয়ামুগ্ধা হবার আকাঙ্ক্ষা তার অনেকদিন থেকে। আমি আপনাকে অর্থ দিচ্ছি, একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। তার কাছেই যান আপনি।"

চার্ব্বাক স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি তোমাকেই চাই"

"আমার প্রতি এ পক্ষপাত কেন"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বদলে অন্য কারও কথা চিন্তাও করতে পারি না আমি"

ঠিক এই সময়ে দূরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুরঙ্গমা নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি ওই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। আমি উঠে গিয়ে দেখি কে আসছে"

সুরঙ্গমাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। একটু দূর গিয়াই সে কুলিশপাণিকে দেখিতে পাইল। কুলিশপাণিও আগাইয়া আসিয়া অভিবাদন করিল।

"আপনি এখানে! অথচ আপনার সন্ধানে আমি সমস্ত বন তোলপাড় করে' বেড়াচ্ছি"

"কেন—"

"কুমারের আদেশে। তিনি আপনাকে খুঁজে না পেয়ে অধীর হয়ে উঠেছেন। কোথা গিয়েছিলেন আপনি?"

"কাছাকাছিই ছিলাম'—কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার"

"দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ—"

"তাহলেই তো মুশকিল"

কুলিশপাণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

"কিসের মুশকিল—"

"আপনি অন্তর্দ্ধান করুন এইটেই আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আপনাকে খুঁজছিলাম বটে কিন্তু এতক্ষণ আপনাকে না পেয়ে—একটুও দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ফাঁদের কবল থেকে হরিণী সত্যিই বুঝি পালাল—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুলিশপাণি সহসা থামিয়া গেল, আড়চোখে একবার সুরঙ্গমার দিকে চাহিয়া, পুনরায় গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করিল। সুরঙ্গমার নয়নে মোহিনী-দৃষ্টি কুলিশপাণির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আরও মোহিনী হইয়া উঠিল।

"আমি দুর্ব্বলা নারী, আপনাদের কবল থেকে পালাবার শক্তি কি আমার আছে? তাই আত্মসমর্পণ করেছি—"

কুলিশপাণি নির্ণিমেষ নয়নে সুরঙ্গমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আপনি দুর্ব্বলা নন। আপনি শক্তির উৎস। কুমার সুন্দরানন্দের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে তাই তিনি এই নৃশংস যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারি—"

"কি করে'—?"

"এখনি চলুন আপনি আমার সঙ্গে। কাছেই গাছতলায় আমার ঘোড়া বাঁধা আছে। আপনাকে অবিলম্বে আমি স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারি। মহেশপুর গ্রামে আমার পরিচিত পরিবার আছে একটি, সেখানে আপাতত আপনি থাকতে পারেন। যাবেন? আসুন তাহলে"

সুরঙ্গমা আনতনয়নে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"ইতস্তত করছেন কেন? আমি আশ্বাস দিচ্ছি ভয়ের কোনও কারণ নেই"

"আমি আমার ভয়ের কথা ভাবছি না। আমি তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই হয়ে আছি। আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনি কেন এতবড় দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন? আপনার স্বার্থ কি!" কুলিশপাণি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বার্থ তুমি। 'আপনি' সম্বোধন করে' তোমাকে আমার সম্বন্ধে আর ভুল ধারণা করবার সুযোগ দেব না। তোমাকে আমি ভালবাসি সুরঙ্গমা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকেই ভালবেসেছি। এতদিন একথা তোমাকে বলবার সাহস হয়নি, ইচ্ছেও হয়নি, কারণ জানতাম তুমি কুমারের প্রিয়তমা। এখন সে ভুল ধারণা ভেঙেছে। এখন দেখছি

সামান্য পশুর মতো কুমার তোমাকে বলিদান দিতেও প্রস্তুত করছেন না। তোমাকে দূর থেকে দেখেও এতদিন যে আনন্দ আমি পেয়েছি সে আনন্দও আর পাব না। তাই তুমি পালিয়েছ শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। কুমারের আদেশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ঠিক করেছিলাম তোমার নাগাল পেলে কোনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব তোমাকে”

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি কম্পিত হইতে লাগিল। নয়ন যুগলে যে কৌতুক-ছটা বিকীর্ণ হইল তাহা অপরূপ।

“আপনার অদম্য সাহস অসীম শক্তি যে আমার মতো সামান্যা একজন নর্ত্তকীর জন্য উদ্যত হয়েছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যাব না। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনার মতো মহানুভব বীরকে বিপন্ন করতে চাই না।—”

“আমি বিপন্ন হব কেন। আমি কুমার সুন্দরানন্দ হয়তো নই, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার আছে। আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও রাজপুত্র। কুমারের অধীনে সেনানায়কত্ব করছি অভাবের তাড়নায় নয়, শিক্ষার জন্য। আমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার বানপ্রস্থে যেতে চান। কিছুদিন পরে আমাকে গিয়ে রাজ্যভার নিতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তোমার মর্য্যাদার কোনও হানি হবে না। আমার দেহ মন সম্পত্তি সমস্তই তোমার সুখ-সম্পাদনে সর্ব্বদা উৎসুক থাকবে”

“কোন দেশে আপনার বাড়ি? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না”

“আমি পৌণ্ড্র রাজকুমার। কুলিশপানি আমার স্বয়ং-গৃহীত নাম। আমাদের দেশে চল, আমার পূর্ণ পরিচয় পাবে।”

“কুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কলহের সম্ভাবনা কি নেই? আমাকে কেন্দ্র করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ বাধুক এ আমি চাই না। আমি ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, যা হবার তাই হোক”

“কলহের কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমি যে তোমাকে নিয়ে গেছি এ কথা কুমার জানবে কি করে? কুমার জানুক তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছ। তারপর কিছুদিন কেটে গেলে তোমার সম্বন্ধে কুমারের সম্ভবত ঔৎসুক্যই আর থাকবে না। তুমি যেমন এসে নিরালার স্থান অধিকার করেছ, আর কেউ এসে তেমনি তোমার স্থান অধিকার করবে।…কুমার হৃদয়হীন। দেখছ না, তোমাকে যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করছেন? আমি তোমাকে মাথায় করে’ সসম্মানে রাখব। সুরঙ্গমা, তুমি চল আমার সঙ্গে।”

সুরঙ্গমার নয়নের কৌতুক ছটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

“কথা বলছ না যে—”

“আমাকে ভাববার একটু সময় দিন”

“দেবার মতো সময় তো আর নেই—”

“আপনি এখন যান। আমি যদি আপনার সঙ্গে যাওয়া স্থির করি তাহলে শেষ রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে যাব। শয়নকক্ষের দ্বারটী খুলে রাখবেন—”

কুলিশপানির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

“এখন আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে—”

“আছে। কুমারকে আমি কথা দিয়ে এসেছি না বলে’ কোথাও যাব না”

“যিনি যজ্ঞের নামে তোমাকে পশুর মতো বধ করতে চাইছেন—”

“ওটা ভুল ধারণা। তিনি আমাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে চান না। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন”

“পরে শোনবার ধৈর্য্য আমার নেই। আমি তোমাকে চাই সুরঙ্গমা। আমার আশা সফল হবে কিনা তা আমি এখনই শুনতে চাই”

“আমার দেহটা পেলেই আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তা এখুনি পেতে পারেন, সামান্যা নর্ত্তকীর দেহটাকে অনেকেই নেড়ে চেড়ে দেখেছেন কিছুদিন, কুমারও একথা জেনেই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, এখনও তিনি যদি শোনেন যে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেনাপতি কুলিশপাণি আমার দেহটা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন তাহলে তিনি রাগ করবেন না। একটু কৌতুকবোধ করতে পারেন হয়তো। কিন্তু আপনি আমাকে যদি চান, যে আমি আমার দেহ থেকে স্বতন্ত্র, তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে”

কুলিশপাণি নীরবে কিছুক্ষণ গুম্ফ প্রান্ত পাকাইল।

তাহার পর বলিলেন, “অপেক্ষাই করব। কবে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে”

“আজই শেষ-রাত্রে”

“আমার শয়নকক্ষের দ্বার খুলে রাখব?”

“রাখবেন”

কুলিশপাণি চলিয়া গেল।

সুরঙ্গমাও পুনরায় চার্ব্বাকের ঘরে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

স্মৃতি-ফলক

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

নির্জন নিশীথক্ষণে আকাশ যখন
ঝরে পড়ে অঝর ধারায়,
বসুন্ধরা বুকে জাগে বৃষ্টিস্নাত
স্মৃতির সৌরভ—
মনে হয় এত নয় শ্রাবণের ঘনবরষণ
ধরণীর গভীর ক্রন্দন ;
তোমার সজল দুটি আঁখি কোণ হ'তে
ভেঙে পড়ে অশ্রুর পাথার,
ভেসে যায় অধর কপোল,
ভেসে যায় ক্ষুব্ধ ঐ বুকের বসন
নিষেধের বাধা তারা মানে নাকো আর।

কত দিন কত অকারণে
ব্যথা তব জাগায়েছি মনে।
আজ তারা স্মৃতি দাহ হয়ে
দগ্ধ করে হিয়া প্রতি পলে।
হাসি-অশ্রু-মাখা তব বাণী
ভুলিব না কভু মনে জানি ;
সাথী হয়ে জীবনের সাথে
চলে ওরা নিশিদিন মোর।

প্রত্যূষের ক্ষান্তবারি গগনের পটে
জাগে যবে অরুণিমা লেখা
পূর্বাচল সীমায় সীমায়—
সবিতার রশ্মি এত নয় !
বিম্বাধরে অভিমান অন্তে যেন দেখি
অনুরাগে রাঙা তব স্নিগ্ধ-হাসি-রেখা,
অংকিত চঞ্চল ওই আঁখি কিনারায়।
মাঝে মাঝে প্রেমের ছলনা,
দূরে থাকি মিলন-বাসনা,
সাথী হয়ে প্রতিক্ষণে সংগ দেয় মোরে
ভুলিব না, কভু ভুলিব না।

মধ্যাহ্নের অলস প্রহরে
চেয়ে থাকি ক্লান্ত চোখে সুদূরের পানে—
নীলাকাশ ছেয়ে ছেয়ে বিছায়ে রয়েছে
রক্তপুষ্প অশোকের শাখা—
আমারি আঙিনাতলে লয়েছে আশ্রয়
সঞ্জীবিত তব প্রাণরসে।
মনে পড়ে কৈশোরান্তে ওর
কিশলয় হলে প্রস্ফুটিত—
তুমি, প্রিয়া, রহস্যের ছলে
অলক্তরঞ্জিত তব নম্রপদাঘাতে
করেছিলে যারে মঞ্জরিত—
সে আজি এ গোধুলি বেলায়
জানাতেছে যৌবন বিকাশ ;
চরণের আঘাতের ঘায়ে বক্ষদীর্ণ শোণিতের ধারা
বিলায়ে দিতেছে তব স্মৃতির সুবাস
আকাশে বাতাসে আর পথের ধূলিতে
আমার নিঃসঙ্গ এই গৃহের প্রাংগণে
গুমরিছে মর্মরিত সমবেদনায়।
জীবনান্তে সান্ধ্য-সাথী মোর
পুষ্পিত রক্তিম ওই অশোকের তরু।
স্মরণের সোনার ফলকে তব স্মৃতি সাথে
ছবি ওর রেখে দিছি এঁকে
বেদনার আখরে আখরে
ভুলিব কি ওরে ?
স্মৃতি-হীন যদি কভু হই ক্ষণতরে
বাঁধা রবে অন্তরে আমার
তোমা সাথে চির-প্রেম-ডোরে॥

আন্দামান

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আন্দামান ভোগ-বিলাসীর তীর্থক্ষেত্র হবে, সেদিন—যেদিন এদেশ কৃষি-বাণিজ্যে মা-লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু সে অবস্থায় পৌছাতে পারে না কোন দেশ যদি একদল লোক কোমর বেঁধে তাল ঠুকে না বলে যে আমরা এ দেশকে বড় করব—মানুষ আমরা নহি তো মেষ। ঔপনিবেশিক মনোভাব সেইটা। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ আজ সমৃদ্ধ, কারণ কয়েক শতক ধরে কয় পুরুষ লোক শ্রম করছে তাদের শ্রীবৃদ্ধির তাগিদে এবং সেই শ্রমকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তাদের দৃঢ় অগ্রগতির মনোভাব। আজ বাঙলা দেশের যাঁরা আন্দামানে বসবাস করবার জন্য সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা যদি ভাবেন এবং কংগ্রেস-বিরোধী দেশ-হিতৈষী তাঁদের যদি বোঝান, যে রদ্দি কাগজ হিসাবে তাঁদের এই চুবড়িতে ফেলা হয়েছে, তাহলে তাঁদেরও ভাবীকাল হবে দুঃখ-মলিন এবং দেশও থাকবে জঙ্গল। হয়তো অন্য প্রদেশের অধিবাসী সুযোগ পাবে আন্দামানকে সোনার খনি করবার। কিন্তু আমি বাঙ্গালী এ-কথা ভুলতে পারি না কোনো ওজস্বিনী বক্তৃতার ফলে। প্রাদেশিকতা মানে বুঝি না, অন্য প্রদেশের ক্ষতি ক'রে নিজের জন্মভূমিকে ক্ষুদ্র স্বার্থে উত্তেজিত করা। আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জ এতো বড় যে তাতে ভারতের সকল প্রদেশের দুঃস্থ সুস্থ দেহে ধনোপার্জন করতে পারে যদি তার "পায়োনীয়ার" অর্থাৎ অগ্রনায়কের মনোবৃত্তি থাকে। শ্রম-বিমুখতা এবং একতার অক্ষমতা আজ বাঙ্গালীর যাত্রা পথে অশ্লেষা, মঘা। তার মনের জোর অগাধ। সেই মনন-শক্তির পটভূমিতে দেহের বলকে নিয়োজিত করলে আন্দামান হবে বাঙ্গালা দেশের এক অংশ। আমার দেশবাসীর নিকট সবিনয় নিবেদন যে—সে যেন প্রমাণ করে তার গঠন-শক্তির অস্তিত্ব। তবেই সার্থক হ'বে তার শক্তি-পূজা।

এখানে যারা বাস করে তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো নির্বাসিতের সন্ততি। তাদের উন্নতি অধিক শ্লাঘনীয়। আমাদের ভারতবাসী আছে মাত্র পোর্টব্লেয়ারে। কিন্তু বাকি ৩০,০০০ বর্গমাইলে কোন জাতির লোক বাস করে তার সঠিক খবর কেহ জানে না। অথচ তারা আমাদেরই মত ভারতীয়, যেহেতু এ গণতন্ত্রের তারাও প্রজা। যদি কর্তৃপক্ষ এই

নিকোবর হাসপাতাল

বিভিন্ন আদিম অধিবাসীদের নিজের ক্রোড়ের মধ্যে নিয়ে তাদের আত্ম-সম্মান জাগাতে না পারেন, ভগবান জানেন তারা কোন্ চক্রীর হাতের খেলার পুতুল হবে এবং ভারতের কি সর্বনাশ করবে। ভারতের এক বিশ্বাস-ঘাতক কর্মচারী চক্রান্ত উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রেছিল এ দেশে। চক্রীর দুষ্কর্ম ধরা না পড়লে আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হত। এদের বোঝাতে হবে এরা ভারতবাসী। ভারতীয় রীতি নীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য রেখে। সেকুলার ষ্টেট্ বুজরুকি ছেড়ে

তাদের ধর্মকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। হিন্দুধর্ম বলছি—কারণ তাদের হনুমান-প্রীতি এবং হনুমন্ত ঐতিহ্য যথেষ্ট। বীর হনুমানের বুকে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র আঁকা। শ্রীরামচন্দ্রের কহিনীও বড় উন্মাদক। এই ঐতিহ্য এবং ইতিহাস তাদের এবং আমাদের যোগ-সূত্র। এ তার ছিন্ন করলে ভারত হবে আত্ম-ঘাতী। আর এক কথা—এ-বিষয়ে বাহিরে ঝলক্ দেখাবার প্রবৃত্তি প্রশমন ক'রে বাস্তবের পটভূমিতে আদর্শের চিত্র আঁকলে, ছবি হবে প্রাণবন্ত—কর্তৃপক্ষের কাছে আমার এই দীন নিবেদন।

আন্দামানে ছিল উঙ্গি—যাদের সুবিধাবাদী ইংরাজ সভ্য করেছিল। অবশ্য নিজের প্রয়োজনের তাগিদে যেমন বাঙ্গালীকে কেরাণী গড়বার মহান উদ্দেশ্যে শিক্ষার রূপ দিয়ে-

পোর্ট ব্লেয়ার জাহাজ ঘাট

ছিল। উঙ্গিরা সভ্যতার বালাই নিয়ে সবাই মরেছে, বেঁচে আছে নাকি দশটি না বারোটি পরিবার। তারা নিজের জীবন স্রোত ছেড়ে নিশ্চয়ই সস্তার মদ বা অ-হজমী খাদ্যে পেয়েছিল সুখের সন্ধান। কাজেই দশ-ভূজা প্রকৃতি দশ রকম অস্ত্র-সম্পাতে তাদের করলেন নিঃশেষ। ভারতবাসী যদি একটা উচ্চ-ভূমি হ'তে তাদের অসভ্য, বর্ব্বর, অছুৎ না ভেবে এদের নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়, উভয় পক্ষের হবে লাভ।

তারপর আছে নাকি দুর্ভেদ্য সারা বনানী জুড়ে জরোবা নামক এক জাতি। তাদের সম্পর্কে এইটুকু জ্ঞান ধ্রুব যে বিজাতীয় লোক দেখলেই তারা দূর থেকে মারে তীর—যার ফলে মৃত্যু অবধারিত যদি গায়ে লাগে সে অস্ত্র। দেশীয় পুলিস কর্মচারীর দ্বারা তাদের বশে আনবার জন্য এক অভিযান হ'য়েছিল। কিন্তু গুপ্ত শত্রুর বাণের ভয়ে তারা দে ছুট। খবর-পৌছল দিল্লি। সেখানে বিশেষজ্ঞের প্রাচুর্য্য। আমি যে জাহাজে গেলাম তাতে গেলেন এক ইতালীয় নৃ-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ সিপ্রিয়ানী। অসভ্যকে সভ্যতার আলোয় আনতে এঁর সামর্থ্য নাকি অপ্রতিম। মানুষটি বেশ। কিন্তু তিনি থাকবেন তিন মাস। তার মধ্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হবেন আমাদের মত অব্যবসায়ী সে সম্বন্ধে কল্পনা করতে পারে, সিদ্ধান্ত করতে পারে না। তাঁর সঙ্গে এক ভারতীয় নৃ-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ইনি সভ্য লোকের কাছে বিশেষ লাজুক! আমি গায়ে পড়ে ভাব করে সন্ধান পেয়েছিলাম তাঁর পেশার।

ডাঃ সিপ্রিয়ানী বল্লেন—আমি জানি জরোবাদের সঙ্গে নিশ্চয় আগুন থাকে। তারা কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালাতে শেখেনি। কোন্ অতীতে দাবানলের আগুন পেয়েছিল, তাই ভাগ করে প্রত্যেক পরিবার কিছু কিছু নিয়েছিল। সেই অবধি শুকনা কাঠ্ জ্বালিয়ে সে আগুনকে বাঁচিয়ে রাখে।

শুনতে বেশ রূপকথার মত। জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কাঁচা মাংস খায়, না রন্ধন করে?

—হ্যাঁ, শূকর পুড়িয়ে খায় নিশ্চয়। রন্ধনের প্রথাটা এইরূপ। প্রথমে একটু জমির উপর পাথর ও মাটি দিয়ে উননের মত করে। তার ওপর কাঠের রলা দেয়, শুকনো পাতা দেয়, শূকরকে পুরু মাটির খোলসের মধ্যে রেখে সেই চুল্লীর উপর শুইয়ে দেয়।

অবশ্য জিজ্ঞাসাকরবার ধৃষ্টতা হ'ল না—মন্ত্র পাঠ হয় কিনা শূকর-শবের দাহ কার্য্যে। তার পর শুনলাম মাটির আবরণে নিবদ্ধ শূকরের উপর আবার এক দফা কাঠ চাপানো হয়। তখন চুল্লীর নিচে করা হয় অগ্নি-সংযোগ। সেই আগুনে দগ্ধ হ'য়ে ভোজ্য হয় অতি নরম।

যাদের এতো বুদ্ধি এবং ভোজনের বিধি-ব্যবস্থা, তারা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাতে পারে না। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্ নৃশংস তিরন্দাজদের সম্বন্ধে এতো কথা জানলেন কোথা হতে? তিনি পূর্ব্বে একবার কদিনের জন্য এসেছিলেন, তখন ঝরণার ধারে এবং সাগর সৈকতে যে সব প্রমাণ পেয়েছিলেন তার ওপর নির্ভর করে এই ধ্রুব সিদ্ধান্ত। ভদ্র-লোক জাহাজে নিজ প্রকোষ্ঠে সদাই ব্যস্ত থাকতেন কর্মে। কিন্তু আমরা সুবিধা পেলেই তাঁকে ধরে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতাম। মানুষটি রঙ্গপ্রিয় অমায়িক। কিন্তু বুদ্ধিবাণে ধনুর্দ্ধর জারবাদের বশীভূত করে ভারত প্রজাতন্ত্রের ভোটাধি-কারী করবেন সে সম্ভাবনা যেন একটু সুদূরপরাহত এবং ওর-নাম-কি মনে হয়। আপাততঃ তাঁর চাই একখানি মোটর বোট দ্বীপ প্রদক্ষিণের জন্য, যার নির্মাণ ব্যয় হিসাব

করে শ্রীমলয় সাণ্ডেল বল্লেন, খরচপত্তরে অন্ততঃ দশ হাজার। জলযান নির্মিত হবে তাঁর ইটালি প্রত্যাগমনের পর এবং এই নৌকা চড়ে জারবা বশ করবেন তাঁর বিনয়ী লজ্জাশীল সহকারী যাঁর কলিকাতার যাদুঘরের উপর আছে একটি কর্মকক্ষ। খোস্ খবরের ঝুটাও ভালো।

বলা বাহুল্য আদিম জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া হ'লে উভয়পক্ষের মঙ্গল। আন্দামানে আপাততঃ শ্রমিক রাঁচি, হাজারিবাগের ওড়াঁও মুণ্ডারী প্রভৃতি ভারতীয় আদিম জাতি। বন কাটার কাজে অনেক হাতী আছে—অবশ্য হস্তী চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞের অভাব নাই। বনের আগাছা লোপ করবার জন্য পূর্ব্বে কয়েক সহস্র হরিণ আমদানী করা হয়েছিল এ দ্বীপে। অবশেষে বোধগম্য হ'ল যে মাত্র আগাছা তাদের ভক্ষ্য নয়, কুরঙ্গের রসনা চায় চারা গাছের রস-মধুর স্বাদ। চারা গেলে গাছ গজায় না। প্রকৃতির ক্রিয়া হয় বন্ধ। সুতরাং হরিণ মারবার তাগিদে কর্তৃপক্ষ দুটি বাঘ ছেড়েছেন বনে। হরিণ-বংশ ধ্বংস করবার অভিযানের কি যুদ্ধফল তা এখনও প্রকাশ পায়নি।

মাত্র মহারাজা জাহাজ দু'মাসে তিনবার যায় আন্দামানে। সুতরাং ডাক যায় ঐ রকম সময়। একবার মহারাজা যায় সোজা পোর্টব্লেয়ার। কলিকাতায় এসে মাল খালাস করে ফিরে যেতে লাগে পনেরো দিন। তার পরের যাত্রায় যায় পোর্টব্লেয়ায়, কারনিকোবার, মাদ্রাজ এবং ঐ পথে ফেরে। পনেরো দিন লাগে তাই চিঠি পেতে। অবশ্য তার করা যায় খবরের জন্য। কিন্তু স্বল্প যাদের আয়, তারা তারের ব্যয়ভার সরবরাহ করতে পারে না। সরকারের কর্তব্য হাওয়াই জাহাজে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা। তাহ'লে কল্যাণ হবে প্রদেশের এবং মানুষও যাবে ভারতে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ওদেশে বসবাস করতে।

আন্দামানের দক্ষিণে কারনিকোবর। এদেশের অধিবাসী আদিম কিন্তু সরলতা, সততা এবং সম্ভ্রান্ততায় এরা প্রশংসনীয়। এ অবস্থার জন্য খৃষ্টান মিশনারী শ্রদ্ধার পাত্র। নিকোবরের সঙ্গে নগ্নবরম শব্দের সম্বন্ধ আছে। এখনও নারী অর্দ্ধনগ্না। উপরভাগ অনাবৃত। কিন্তু তার সম্ভ্রান্ততা প্রচুর। তাদের কথা পরে বল্‌ব। আজ বল্‌ব ওদেশে পৌছবার কথা।

বৈকালে মহারাজায় চড়লাম। সন্ধ্যায় ছাড়ল জাহাজ। সকালে আট্‌টায় পৌছালাম নিকোবারে। অর্থাৎ আধ মাইল দূরে মাঝ দরিয়ায়। জাহাজ আর এগোতে পায় না বালুবেলার দিকে। দূরে জলে উঠেছে নারিকেল বন সূর্য্যালোকে। যত দেখা যায় কেবল হরিতের-উৎসব দ্বীপ। শৈল-সঙ্কুল নয়।

সেদিন বহিতেছিল বায়ু একটু খেয়ালী তালে। দুখানা মোটর-বোট যাতায়াত করছিল মহারাজার আশে পাশে—কার-নিকোবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য। জাহাজের সিঁড়ি নামল। তার পাশে এসে দাঁড়ালো এক মোটর-বোট। মহারাজাকে এক ঢেউ নামায়, তখন অন্য তরঙ্গ মোটর-বোটকে ওপরে তোলে। এই পতন অভ্যুত্থানের তালটা বেশ আয়ত্ত করে নিলাম। প্রবীণ অন্তরাত্মা বলছে—কাজ কি? নবীন উৎসাহ বলছে—তাল ফসকে যায় তো ডুব দেরে মন কালী বলে—একটু সাঁতার কাট্‌লে এরা তুলে নেবে। ভয়ে না নাম্‌লে বাঙলার বৃদ্ধ-সমাজ হবে হাস্যাস্পদ। সুতরাং দুজন পাঞ্জাবী, একজন কঙ্কনবাসী, একজন মালাবারী সহযাত্রীর সঙ্গে জয় রাম বলে নামলাম বোটে। লাক্কা দ্বীপের মাঝ, নিকোবারের দুজন তার সহচর নিয়ে গেল তীরের দিকে। কী আনন্দ।

তারপর আবার রাম-প্রসাদী সুর লহর তুললে প্রাণে—
হিসাব করে বল দেখি মা, আমার দুঃখের বাকি কত?

বনানী

কারণ মোটর-বোট থামলো। তার যাবার মত জল নাই। এলো এক ভেলা—কাটামসারাণ না—কিন্তু সরু নৌকা।

দুবার হাই তুললাম। জামা ঢিলে করলাম। আমি সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভাপতি। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আজাদ-হিন্দ্‌বাগে সাঁতার কাটি এক এক দিন। একি হৃদয় দৌর্ব্বল্য। ভেলাটাকে দেখলাম। তার সঙ্গে একখানা কাঠের বড় রলার সঙ্গে বাঁধা কতকগুলা খুঁটি। বুঝলাম লাফিয়ে নামবার সময় জলে না পড়লে, নৌকা ওল্টাবার ভয় নাই। কারণ ঐ কাঠের রলা ওকে রাখবে ভাসিয়ে। একে ইংরাজিতে বলে—আউট্ রিগার। সুতরাং ক্যামেরা ঝুলিয়ে, ভিগার দেখিয়ে আউট্ রিগারে ঝম্প দিলাম।

নিকোবার কবিতা-কানন। চমৎকার দেশ। প্রাণ-মাতানো বাতাস।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিলেন—কি আলাপ কচ্ছেন ঠাকুর-মশায় ?

গোপাল অনেকটা অপরাধীর মত কহিলেন—বট-পাকুড়ের ডাল কাটা ঠিক নয় তাই বলছিলাম—গাছপালা লাগানো ধর্ম্ম এই—

—কেন ডাল কাট্‌লে কি হয় ? ব্রাহ্মণেরা ত কাট্‌তে পারেন।

—তা পারেন, তবে যাগযজ্ঞ ব্যপদেশেই কাটা প্রয়োজন হয়।

—গাছ লাগালে কি হয়—

—পুণ্য হয়, কত পথিক গাছতলায় বসে আরাম পায়, ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করে—

চাঁদমোহন ব্যঙ্গের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন—ওসব কিছু না ঠাকুরমশায়, কিছু না। ব্রাহ্মণে যদি কাট্‌তে পারে তবে সকলেই পারে—ডাল ত আবার গজাবে—

—গাছটা মরেও যেতে পারে ত ?

—ডাল কাট্‌লে কি গাছ মরে ?

গোপালের বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি কহিলেন—বেশ বাবা কাটুক, যার খুশী কাটুক—তবে গাছের ছায়াটাত আর পাবে না।

গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে লাগিলেন—অদূরের মাঠের জমিটা দেখিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইবে।

চাঁদমোহন স্মিতহাস্যে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রাতঃ-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

গোপাল আজকাল অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, উপবাস, গ্রামগ্রামান্তরে গমন বা পূজার্চ্চনার কাজ আর করিয়া উঠিতে পারেন না। কেবল গৃহদেবতার পূজা করেন এবং অবসর সময়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। টোলে একটিমাত্র ছাত্র—আর তাহার দুই পুত্র। সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাদের অধ্যাপনা করেন। যদি স্বগ্রামে কেহ নেহাত নাছোড়বান্দা হইয়া পূজা করিতে বলে তবেই পূজা করেন, তাহা ব্যতীত পুত্রদ্বয়ই তাহা সম্পন্ন করে। তাহারা ইংরাজি শিখে নাই, পিতার কাছে দশকর্ম্ম ও সংস্কৃত শিখিয়াছে—এখনও ছেলে-মানুষ হইলেও পূজা পার্ব্বণের কাজ ভালই করিতে পারে এবং তাহারাই এখন যজমান রক্ষা করে।

সেদিন সকালে গোপাল বসিয়া তালপাতার একখানা পুঁথি পড়িতেছিলেন—চোখে সুতাবাঁধা চশমা।

দুই পুত্র পাঠ লইবার জন্যে আসিয়া বসিলে তিনি দশকর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ৺কালীপূজার মুদ্রা আসন হোম প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতেছিলেন এবং মতি-ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিখানার কোথায় কি আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

কনিষ্ঠ ভোলানাথ প্রশ্ন করিল—বাবা, ওর সংক্ষেপ কি ?

—পূজায় আবার সংক্ষেপ কি ? সংক্ষেপ করলেই অঙ্গহানি হবে যে !

—অতবড় পূজা করতে হ'লে ত একরাত্রে একখানার বেশী ৺কালীপূজা হয় না, তাতে পোষাবে কেন ?

গোপাল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে প্রশ্ন করিলেন—৺কালীপূজা কি ব্যবসা নাকি ?

—আজকাল যা দক্ষিণা, তাতে—

—নাই-বা দিলে দক্ষিণা, ভগবানের নাম ত করা হ'ল। যজমানের কল্যাণে ৺মাকে ডাকা হল—সেই ত লাভ—

ভোলা কহিল—যারা বড়লোক তারা কত বাজে ব্যয় করে অথচ পূজা অঙ্গে কিছু দেবে না, তাতেই ত রাগ হয়। গরীবে না দিলে ত দুঃখ হয় না।

গোপাল বিরক্ত হইয়াছিলেন—পুত্রের এই মনোবৃত্তি তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কহিলেন—ভোলা, পূজার্চ্চনা তোর কাজ নয়, তুই দোকানদারি কর গিয়ে—

জ্যেষ্ঠ শিবনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, সে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। পিতার অন্তর বেদনাকে সে জানিত, তাই সে

কহিল—ওসব বাজে কথা, চুপ কর ভোলা। শোনো বাবা, অনেক যজমানই আজকাল চায় যে সকাল সকাল পূজাটা হয়ে যায়, যাতে—তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া মিটে যায়—তাই ভোলা ব'লছিল—

—সে রকম যজমানের বাড়ীতে পূজা করার দরকার নেই—

ভোলা কহিল—সকলেই ত ঐ রকম যজমান—পূজা ভালভাবে হোক্, এত কেউ চায় না—

গোপাল কহিলেন—ঘোর কলি, ঘোর কলি! পূজা এখন ব্যসনের পর্য্যায়ে গেছে—অন্তরে ভক্তি-প্রীতি নেই। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নেই—কেবল টাকা টাকা! ভগবান—আর কতদিন দেখতে হবে আমাকে—

গোপাল উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন—যা তামাক সাজ—আজ আর অধ্যয়ন হবে না—

শিবনাথ উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। গোপাল বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন—কি হইল! যে ভয়ে তিনি ইংরাজি স্কুল হইতে পুত্রদিগকে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভয় তাহার ঘরেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে—ভোলাকে এত শাস্ত্র পড়াইয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত উবিয়া গিয়া এখন সে চিনিয়াছে টাকা? দক্ষিণার অনুপাতে সে পূজা করিতে চায়! মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হইল কি করিয়া—হাওয়ায় যেন এই রোগের বীজাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হায়! হায়! মানুষ যদি এত স্বার্থপর হয় তবে শ্বাপদের সহিত আর পার্থক্য রহিল কি? আজ গোপালপুরের পানে চাহিয়া তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে—এখানে মানুষ কেহ নাই—সমস্ত গ্রাম আজ যেন সর্প, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুরে ভরিয়া গিয়াছে, আর অর্থের পচা শব ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

শিবনাথ হাতে হুকা দিতে গোপাল কহিয়া উঠিলেন—জানোয়ার—জানোয়ারের পৃথিবী এটা—দুর্গা, দুর্গাশ্রীহরি!

তামাক টানিতে টানিতে একখানা পত্র আসিল—

হরিহর লিখিয়াছে, তাহার ধান বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইতে। তাহার লাইফ ইনসিওরের কিস্তি খেলাপ হইয়া যাইতেছে অতএব টাকাটা শীঘ্র পাঠান চাই। গোপাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু লাইফ ইনসিওর কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিলেন না এবং তাহার ফলে কৌতূহলটা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন—চাঁদমোহন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে, অতএব তাহার নিকট হইতেই শুনিয়া আসা যাক্।

গোপাল গ্রামের পথে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন—চরণক্ষেপ আজ তাহার অত্যন্ত অলস, দেহে শক্তি নাই। যাইতে যাইতে গ্রামখানার নূতনরূপ তাহার চোখে আজ প্রতিভাত হইয়া উঠিল—যাহারা পথে তাহার পাশ কাটাইয়া গেল তাহারা যেন মানুষ নয়, হিংস্র শ্বাপদ, অন্যের বক্ষরক্ত পান করিবার জন্য সর্ব্বদা যেন ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ত মদন তাম্বুলীর বাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ—বড় ভাই ছোট ভাইকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া এত বড় বাড়ী করিয়াছিল—ছোট ভাইটা দেশত্যাগী হইয়া কোথায় গিয়াছে। শোনা যায় শহরে সে বাড়ী করিয়া আছে, মদনের সম্পত্তি পাইয়াছিল জামাইরা, বিক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছে—এ বাড়ীতে, এই অধর্ম্মের ভিটায় আর প্রদীপ জ্বলে না।

বংশী তিলির দোকান। দুই চারজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া আছে। বংশী জিনিষপত্র মাপিয়া দিতেছে—মাপে কম হইয়াছে বলিয়া কে যেন বচসা করিতেছে। গোবিন্দ বাঁচিয়া থাকিতে এমন হয় নাই। কতজনের কত গচ্ছিত টাকা থাকিত গোবিন্দের বাড়ীতে, তাহার এক পয়সাও কোনদিন লোকসান হয় নাই। তাহারই ছেলে বংশী আজ অবিশ্বাসী—তেলে ভেজাল, মাপে কম, ঘি'তে চর্ব্বি—কত কি?

গোপাল চলিলেন—গ্রামের পানে চাহিয়া তাহার যেন বুক ফাটিয়া যায়। কি একটা দানব আসিয়া যেন পুরাতন স্বর্গরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে—বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া হাওয়া দুষিত করিয়া দিয়াছে ··

গোপাল চাঁদমোহনের বৈঠকখানায় যাইয়া উঠিলেন। চাঁদমোহন তিনুর সঙ্গে কি যেন একটা পরামর্শ করিতেছিলেন। চাঁদমোহন ফিরিয়া চাহিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না, তিনু বসিতে বলিল। তামাক সাজিবার জন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না কাহারও, কালী বাগ্দী বাহিরে বসিয়া রহিল নির্ব্বিকারভাবে। চাঁদু সিগারেট খান, তাই বর্ত্তমানে তামাকের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই।

গোপাল নিজেই কথাটা পাড়িলেন—চাঁদু, একটা বিষয়

জান্‌তে এলাম। লাইফ ইনসিওর কি? তার কিস্তি খেলাপ হ'লেই বা কি হয় একটু বুঝিয়ে দেবে—

চাঁদু প্রথমেই খানিক বিজ্ঞের হাসি হাসিলেন, তাহার পর ব্যাপারটা কি বুঝাইয়া দিলেন। শেষের দিকে চাঁদু কহিলেন—আর কিছু কাজ নেইত ঠাকুরমশায়?

—না—

—আচ্ছা—

চাঁদু কাজে মন দিলেন। ইহা হইতে চলিয়া যাইবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আর কি হইতে পারে? অতএব গোপাল উঠিলেন। কাছারী হইতে নামিলেই চণ্ডীমণ্ডপ—সেখানে গরু বাঁধা হয়—শুষ্ক গোবর ও খড় রহিয়াছে—গোমূত্রে দুর্গন্ধময়। এই চণ্ডীমণ্ডপ একদিন ঝক্‌ঝক্ করিত—দ্বিপ্রহরে বসিত পাশার আড্ডা। সারদা মল্লিক, মতিঠাকুর সকলে পাশা খেলিতেন। ভাগবত, রামায়ণ, কত গান হইয়াছে এইখানে, পতিব্রতা সীতার দুঃখ, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কাহিনী শুনিয়া ইতর ভদ্র সকলে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়াছে—সে লোকশিক্ষা আজ নাই। ভাগবত রামায়ণ উঠিয়া গিয়াছে—জন্মাবধি কেহ ত্যাগের কাহিনী শুনিতে পায় না, শুনে কেবল টাকার স্তুতি গান। লোকে অবসর সময়ে গল্প করে—অমুক কেমন করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইয়াছে। তদ্বারা মানুষের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করা হয়—কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই কি একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আর কোনটাই নয়। গোপাল পুরাতন জীর্ণ অপরিষ্কৃত মণ্ডপের পানে চাহিয়া মনে মনে বলেন—মা, জগজ্জননী, তুমি ইহাই দেখাইবার জন্যে কি আমাকে এত দীর্ঘায়ু দান করিয়াছ? বৃদ্ধ গোপালের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠে—চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকেন। মনের মধ্যে একটা বিষাদ ও অস্বস্তি তাহাকে যেন বৃশ্চিকের মত দংশন করিয়া ফিরে।

বাড়ীতে যাইয়া গোপাল কহিলেন—শিবু, খন্দের ত্যাখ, হরির ধান বিক্রি করতে হবে, নইলে তার লাইফ্ ইনসিওরের কিস্তি খেলাপ হয়—

শিবু কহিল—হ্যাঁ, দেখছি। বাউরী শশী ত ধান কিন্‌তে এসেছিল।

গোপাল হুকা সাজিতে বসিলেন—মনে মনে ভাবেন—পূর্ব্বে ত এইরূপ লাইফ্ ইনসিওর কেহ করে নাই, কিন্তু জগত চলিয়াছে ত? তবে এখন কেন প্রয়োজন হয়। তখনকার দিনে গুরুজনের স্নেহে লোকের বিশ্বাস ছিল, পুত্রস্বজনদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর আস্থা ছিল—আজ নাই। নিজেরাই সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাহাদের আত্মকেন্দ্রিক মন দিয়া—তাই আজ পরকালের কড়ি জড়ো করিবার জন্য এই তাড়াহুড়া—কিন্তু একটা নিঃসহায় পরিবারের পক্ষে একদুই হাজার টাকা বসিয়া খাইলে কয় দিন? তাহার চেয়ে স্নেহ করুণার উদার হৃদয় একটি ভাই, কি একটি আত্মীয় কি বেশী নয়? সে আত্মীয়তার বন্ধন এরা ছিন্ন করিয়াছে, নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও শিক্ষার অহমিকা দিয়া—জগত হইয়াছে পর, এত পর যে তাহাকে এতটুকু বিশ্বাস করা যায় না। হায়, হায়—কোথায় গেল সেই পরস্পর নির্ভরশীল সমাজ, বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট পবিবার, শাসক-পালক ভূস্বামী!

গোপাল অশ্রুসিক্ত চোখে দূরের পানে চাহিয়া থাকেন—শেষের আর কত বাকী—কতদিন আর এমনি করিয়া আপনার দুঃখে আপনাকে পুড়িতে হইবে।

নতুন সমাজ, নতুন শিক্ষা গোপালের মনোবেদনা বুঝে না, তাহার কথায় লোকে হাসে, তাহার কথা কেহ বুঝে না। নিরন্তর গোপালের মনে হয় তিনি যেন গোপালপুর গ্রামে পড়িয়া আছেন, উৎসব শেষের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ও উচ্ছিষ্টের মাঝে। অতীতের সেই সুখস্মৃতির মাঝে কখনও ডুবিয়া মধু পান করেন—মানুষের প্রয়োজন ছিল অল্প, মানুষ স্বল্পায়াসেই তাহা উপার্জ্জন করিত, বাকী সময়টা কাটাইত আনন্দে, পরস্পরের সহিত মিশিত, তাই ছিল প্রীতির বন্ধন। আজ সে বন্ধন ছিন্ন, মানুষ চাহিয়া আছে নিজের পানে—প্রয়োজন বাড়িয়াছে, সময় কমিয়াছে, বাসনার সঙ্গে ব্যসন বাড়িয়াছে কিন্তু উপার্জ্জন বাড়ে নাই।

গোপাল সেদিন বৈকালে চণ্ডীতলায় বসিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন, বার বার মা চণ্ডীর কাছে প্রশ্ন করিতেছিলেন—মা, কবে তুমি পৃথিবীকে এই পাপমুক্ত করিবে।

নবীন বাউরী আসিয়া প্রণাম করিল। কহিল—ঠাকুরমশায় হেথা একলাটি বসা করেছেন কেনে?

নবীন বৃদ্ধ, অতীতের সেই দিনের ছাপ তাহার মধ্যে আজও রহিয়া গিয়াছে। নবীন ঠাকুরমশায়ের সহিত দুই একটা কথা বলিয়া তাই তৃপ্তি পায়। নবীনের প্রশ্নে গোপাল কহিল—কোথা আর যাবো নবীন, পৃথিবীতে যাবার জায়গা ত আর নেই। আমাদের স্থান নেই হেথা, তবে কেন মা চণ্ডী এখনও পায়ে নিচ্ছেন না, তাই ভাবি। কোন মহাপাতক ক'রেছি—

নবীন কহিল—হেথা কি হ'ল ঠাকুরমশাই—ভালোবাসা উঠে গেলেক। সুবল বাউরীর বেটী সাঙ্গা করলেক—আসনাই করলেক মদনের বেটার সঙ্গে, আর ষষ্ঠীর বেটা দু'খানা গয়না যতুক করলেক আর তাকেই সাঙ্গা করলেক। ভালোবাসার চেয়ে টাকার দাম বেশী হলেক ঠাকুরমশায়—

মতি ঠাকুরের অন্তরের ক্ষতস্থানটায় আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি কহিলেন—তাইত হয়েছে দেশে—নতুন রকম করে সব ভাবতে শিখেছে। পূজা পার্ব্বণে আজ আর পূজা নাই, তা হয়েছে উৎসব—ভক্তিহীন কর্ম্মহীন বিলাসিতা মাত্র—হায় হায়—এইত কলি নবীন—

নবীন ও গোপাল অতীত দিনের পুরাতন চিত্রের পানে চাহিয়া ব্যথিত হইয়া উঠেন। অন্তর ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় যেন চীৎকার করিয়া উঠিতে চায়—স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে সন্ধ্যা কাটিয়া যায়।

দূরের দিকচক্রবালের উপরে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠিয়া পৃথিবীকে জোৎস্নায় স্নান করাইয়া দেয়। নবীন কহে—চলুন ঠাকুরমশায়, বাড়ী পৌছে দেওয়া করি।

—থাক্—নবীন, একলাই যেতে পারবো—

—তা কি হয়? আমি থাক্‌তে একলাটি যাবেন—

—তবে চল—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী ও বরাহনগর পাঠবাড়ী

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

—"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥
শুনিঞা তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায় ॥
সেহো বিপ্র পড়ে পরমানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমার প্রকাশ।
আছড়ে দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস ॥
এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণ-নিধি ॥
বাহ্য পাট বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥
প্রভু বোলে "ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য।'
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য ॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত। অন্ত্যখণ্ড—৫ম অধ্যায়।

প্রভু যে বরাহনগরে রাত্রি তিনপ্রহর অবধি নাচিলেন সেই বরাহনগর আজ পীঠস্থানে পরিণত। যুগে যুগে আমরা দেখেছি মহাপুরুষরা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে পাপীতাপীদের উদ্ধার করে গেছেন। যত মহাপুরুষের আজ পর্য্যন্ত ধরাধামে আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষে যত হয়েছে আর কোনো দেশে কোথায় হয়েছে কিনা বলা শক্ত। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রয়োজন হলেই তাঁরা বার বার এসেছেন এবং আসবেন। কারণ গীতার শ্লোকই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—

—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

কলিকালে যে বারজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজী মহারাজ অন্যতম। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার মাত্র দু'বার হয়েছিল—একবার পোস্তায়, আর একবার শ্রীধাম-নবদ্বীপে। শ্রীপাঠবাড়ীর কথা বলতে গেলেই বাবাজী মশায়ের কথা না বলে উপায় নেই। ভাগবতোত্তম শ্রীল রামদাসবাবাজী মহারাজ

ছিলেন বৈষ্ণবধর্ম্ম ও নামকীর্ত্তনের স্তম্ভস্বরূপ। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল রাধিকা। তাঁর বাবা যখন ফরিদপুরে আবগারী দারোগা ছিলেন সেই সময় ১২৮৩ সালে ২২শে চৈত্র কৃষ্ণা (স্কন্দ) ষষ্ঠীতে তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত, আর মায়ের নাম শ্রীমতী সত্যভমা দেবী।

—"শ্রীদুর্গাচরণ সুত, সত্যভমা গর্ভজাত,
শ্রীরাধিকা, রাধারমণ প্রাণ।
গুপ্তরূপে পদ্মাতীরে, অবতার ফরিদপুরে
কৃপাকরি দিলা দরশন॥
বারশতিরাশিসনে, চৈত্রদ্বাবিংশতি দিনে,
কুজবারে নিশিদ্বিপ্রহরে।

শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী

ষোলদণ্ড চৌদ্দপলে, ধনুরাশি লগ্নকালে
মূলানক্ষত্রে স্থিত শশধরে॥
গৌণ চৈত্রী কৃষ্ণাতিথি স্কন্দষষ্ঠী যার খ্যাতি
...ই দিনে সর্ব্ব শুভোদয়।
ভক্তরাজ প্রকটীলা
...ন দিল জয় জয়॥"—

শ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজী তাঁর সমগ্র জীবনে ... করেছিলেন এবং এ দানে নিজেকে ... তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি

বাড়ীতে যাইয়া গৌর
হরির ধান বিক্রি করতে হবে,
কিস্তি খেলাপ হয়—
শিবু কহিল—হ্যাঁ, দেখা
কিনতে এসেছিল।

—"কলিতে প্রচ্ছন্ন অবতার, অতএব কারুর খোসা দেখে ভুলনি, পারত ভিতরটা দেখ।"—অবশ্য এই ভিতর সকলে দেখতে পায় না, পারে না। ছোট বেলায় একবার বাড়ীতে দেবীর পূজা ও বলির পরে রক্তাক্ত স্থান দেখে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। তার পর থেকে বাড়ীতে পূজা ও বলিদান বন্ধ হয়ে যায়। ১২৯৭ সালে পৌষ মাসে রাধিকাচরণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে টোলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তে থাকেন। কিন্তু যাঁর মন অন্য রসে ভরপুর, তাঁর এসব ভাল লাগবে কেন? তারপর আলোক দেখালেন প্রভুজগদ্বন্ধু। প্রভু জগদ্বন্ধুই তরুণ রাধিকাচরণকে ভবিষ্যৎ পথের আলোক দেখান। শোনা যায়, প্রভু জগদ্বন্ধু রাধিকাচরণকে কখনই 'রাধিকা' বলে ডাকতেন না—কারণ 'রাধিকা' কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। উচ্চারণ করলেই ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন, সেইজন্যই তাঁকে তিনি কখনও 'সারিকা' কখনও 'রামা' বা 'রার্মা' বলে ডাকতেন। ১৩০০ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার গ্রহণে শ্রীধামনবদ্বীপে প্রভু জগদ্বন্ধুব সঙ্গে তিনি আসেন। পরের বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের নামমাত্র সম্বল করে সকলের অলক্ষিতে প্রভুর নির্দেশে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে ও পরে শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনে যান।

১৩০২ সালে পৌষমাসে রাধিকাচরণ শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রথম দর্শন পান কুলিয়ার পাটে। পরে কটকে থাকার সময় শ্রীশ্রীরাধারমণ তাঁকে শ্রীগৌরমন্ত্রাদিতে দীক্ষিত করেন। শ্রীশ্রীরাধারমণকে আমরা "বড় বাবাজী মহাশয়" ও শ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজীকে "বাবাজী মহাশয়" বলে সকলেই জানি। 'বাবাজী শ্রীশ্রীরাধারমণ অপ্রকট হলে জগতে নাম প্রচারের ভার ন্যস্ত হয় 'বাবাজী' শ্রীমদ্‌রামদাসের ওপর এবং শ্রীশ্রীরাধারমণের অন্যতমা কৃপাপাত্রী সর্ব্বজনপূজ্যা শ্রীললিতাসখীর ওপর সমস্ত মন্দিরের, মঠের ও বিগ্রহের সেবার ভার পড়ে।

ভারতের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, প্রাচীন, ভগ্ন ও অবহেলিত মন্দির প্রভৃতি সংস্কার ও সেবার ব্যবস্থা, প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ ও বৈষ্ণবগণের পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষণ, শ্রীমহাপ্রভুর ধারায় নামপ্রেম প্রচার—সারা জীবনভোর বাবাজী মহাশয় করে গেছেন। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, আটিসরা (বারুইপুর), বেনাপোল, পুরীর হরিদাসমঠ, ঝাঁঝপীরমঠ, হাওড়াজিগাছায় শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম, চন্দ্রকোণা, কাটোয়া, মাধাইতলা, বিশ্রামতলা, ধুবুরী, ঠাকুর নরোত্তমের প্রেমতলী, সপ্তগ্রামে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর মন্দির, কাশীধামে শ্রীসনাতন শিক্ষার স্থান প্রভৃতি বহু খ্যাত, অখ্যাত এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ এবং বহুজীর্ণ মন্দির উদ্ধার, সংস্কার, সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

তাঁর শ্রীগুরুদত্ত—

ভজ নিতাইগৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই নামে বাবাজীমশায় সিদ্ধ হ'য়েছেন। বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি ২-৪০ মিনিটের সময় বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমৎরামদাস বাবাজী কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরস্থ পাঠবাড়ী আশ্রমে ৭৭ বৎসর বয়সে

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ক'রে দেয়

স্বামী হিসেবে সত্যিই আমি ভাগ্যবান কারণ আমার স্ত্রী আমার কাপড়-চোপড়ের বিশেষ যত্ন নেন—সানলাইট সাবানের সাহায্যে। সানলাইট সাবানের দ্রুত-উৎপাদিত ফেনা কাপড়ের সব ময়লা বার করে দেয়, **কাপড় আছড়াবার দরকার হয় না**। তার মানে আমার পয়সা বাঁচে, কারণ আমার কাপড়-চোপড় টেঁকে বেশী দিন।

সানলাইট সাবান দিয়ে সহজে ও তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে আপনার আমোদ প্রমোদের অবসর বাড়ান। সানলাইট সাবানের কার্যকরী ফেনা কাপড়ের ময়লাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেয়, আর রঙ্গীন কাপড়কে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে করে তোলে।

S. 220-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত

লীলা সংবরণ করেন ও তাঁর অপ্রাকৃত দেহ এই পাঠবাড়ীতেই সমাধিস্থ করা হয়। গত ১০ই পৌষ শুক্রবার পাঠবাড়ীতে বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিরহোৎসবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল, এত জনসমাগম আর কোথাও আমার জীবনে দেখিনি। সকাল হ'তে নাম সুরু হ'য়েছে—দলে দলে নরনারী আসছে—প্রসাদ নিয়ে দর্শন করে চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল মহাতীর্থ স্থান, পীঠস্থান এই পাঠবাড়ী। এত লোকের কোন ব্যবস্থাই করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনিই কোন অলক্ষ্য হস্তের পরশে উৎসব হতে সুরু করে প্রসাদবিতরণ সুষ্ঠভাবে হয়ে গেল। চোখে না দেখলে এ জিনিষ লিখে বা মুখে বলে কাউকে বোঝান সম্ভব নয়। বাবাজীমশায় যে সব মঠ, মন্দির ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মৃতিবিজড়িত স্থান প্রভৃতি উদ্ধার করেছেন তার একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিখবার ইচ্ছা আছে—জানিনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে কিনা। আজ প্রথমেই শ্রীপাঠবাড়ীর ইতিহাস যেটুকু সংগ্রহ করেছি তা এখানে প্রকাশের চেষ্টা করলাম। কারণ এই পাঠবাড়ীতেই শ্রীমদ্‌রামদাসবাবাজীর অপ্রাকৃত দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে।

এই পাঠবাড়ীতেই মহাপ্রভু লীলা করে গেছেন, তা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করলেই বুঝতে পারি। কালক্রমে এই পাঠবাড়ীর সমস্ত ভার বাবাজী মশায়ের উপর ন্যস্ত হয়। পাঠবাড়ী সম্বন্ধে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা এই যে—বাগবাজার নিবাসী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের অম্লশূলের ব্যারাম ছিল। তিনি অনেক রকম ঔষধাদি ব্যবহার করে কিছুতেই কিছু হয় না দেখে শেষে বাবা তারকনাথের নিকট তারকেশ্বরে গিয়ে ধর্ণাদেন। তিন দিন অনাহারে ধর্ণাদেবার পর বাবা তারকনাথ তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, বরাহনগরে মালীপাড়ার গঙ্গাধারে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর পূর্ব্বপাড়ের জমি খনন করে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগোপালের মূর্ত্তি ও একজোড়া খড়ম এবং শালগ্রাম নারায়ণের মূর্ত্তি পাবে; সেই সব নিয়ে এবং ঐ পুকুরের ধারে দুইটী বড় নিম বৃক্ষ আছে, সেই গাছ কেটে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি করে সেবা করবে—তাহলেই তুমি শূলবেদনা থেকে মুক্ত হবে। ব্রাহ্মণ এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ামাত্র সেই রাত্রেই ফিরে আসেন এবং দয়ারাম পাল নামে এক ব্যক্তির নিকট হতে ঐ পুষ্করিণীটি পাড়সমেত গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত উহার চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত জমি ক্রয় করেন। পরে ভুল করে পশ্চিম পাড়ের জমি খনন করে কিছু না পেলে আবার বাবার নিকট ধর্ণা দিলে একদিন পরে বাবা তারকনাথ পুনরায় আদেশ দিলেন—"তুমি পূর্ব্বপাড়ে খনন না করিয়া পশ্চিম পাড়ের জমি খনন করিয়াছ, কাজেই কিছু পাও নাই। এইবার যাইয়া পূর্ব্ব পাড় খনন কর ও যাহা বলিয়াছি তাহাই করিবে।"

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হয়ে সত্বর চলে এলেন এবং পূর্ব্ব পাড়ের জমি খনন করতে আরম্ভ করলেন। সামান্য খোঁড়া মাত্রই বহু সর্প ফণা বিস্তার করে উঠল। যারা খনন করছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সর্পগণ গর্ত্তে ঢুকে গেলে ব্রাহ্মণ তাদের দিয়ে আর খননকার্য্য করতে না পেরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজেই খুঁড়তে লাগলেন। খননকরার আগে ব্রাহ্মণ ক্ষোভে, দুঃখে, শূলবেদনায় অস্থির হ'য়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, "হা! বাবা তারকনাথ, আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না—আজ রাত্রেই গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিব।" এতক্ষণে স্বয়ং শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের আসন টলল। ব্রাহ্মণের তন্দ্রাঘোরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দুটী বালকের বেশে এসে বললেন, "ব্রাহ্মণ উঠ, দুঃখ করো না, আমি অনন্তরূপে আজ তোমাকে দর্শন দিয়েছি, অন্য কারও দ্বারা খনন না করিয়ে নিজে খনন কর তো তোমার অভিলষিত দ্রব্যাদি পাবে।"

তন্দ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ উঠে স্বহস্তে আবার সেই জায়গা খনন করতে লাগলেন। একটু খনন করতেই একটী সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়ল, সেই সুড়ঙ্গের একখানি ইট তোলামাত্র বাবা তারকনাথের স্বপ্নাদিষ্ট সেই দ্রব্যগুলি অতি যত্নে সেই স্থানে রক্ষিত আছে দেখতে পেলেন। সেই দ্রব্যগুলি আজও পাঠবাড়ীতে অতি যত্নে রক্ষিত আছে। (১) শ্রীমদ্ভাগবত একখানি, এই ভাগবতখানির পাঠ শুনে শ্রীমহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করেছিলেন। (২) শ্রীবালগোপালের মূর্ত্তি একটী (৩) শ্রীশালগ্রাম মূর্ত্তি একটী। শ্রীরঘুনাথ আচার্য এই শ্রীবিগ্রহ লইয়া গৃহত্যাগ করেছিলেন, (৪) শ্রীখড়ম একজোড়া—এই খড়মজোড়াটী শ্রীমহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যকে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে কোনও সেবকের নিকট থেকে উহা অন্তর্ধান হলে উহার স্থলে রূপার খড়ম প্রস্তুত হয়ে শ্রীমহাপ্রভুর খড়ম নামে অভিহিত হয়ে আসছে। পরে শ্রীখড়মের কাঠ পাওয়া গিয়াছে।

এই চারটী দ্রব্য পাওয়ামাত্র ব্রাহ্মণ খনন বন্ধ করে দিলেন এবং পরদিনই ভাস্কর ডাকিয়ে বাবা তারকনাথের স্বপ্নাদিষ্ট পুকুরের পাড়ের সেই নিমবৃক্ষ দুটী কেটে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দুটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করে সেই নিম্ব বৃক্ষতলায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করে মাঘীপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন।

উপরিলিখিত দ্রব্যগুলি এবং এই দুই মূর্তি অদ্যাবধি পাঠবাড়ীতে সেবিত হয়ে আসছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীভাগবত পাঠ শুনিয়ে শ্রীরঘুনাথ আচার্য "শ্রীভাগবত-আচার্য" উপাধি লাভ করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম "শ্রীভাগবত আচার্যের পাঠবাড়ী" রাখলেন এবং শ্রীমহাপ্রভু যে স্থানে দাঁড়িয়ে তিনপ্রহর নৃত্য করেছিলেন সেই স্থানটীতে শ্রীভাগবতাচার্যের সমাধি জানিতে পারিয়া সেইখানে একটী ছোট মন্দির নির্মাণ করে সেই মন্দিরটীর নাম "শ্রীভাগবত আচার্যের পাঠঘর" রাখলেন। এই পাঠবাড়ী বাবাজীমশায়ের নামে ১৩৩৪ সালে ৪ঠা চৈত্র শনিবারে সাড়ে এগারটার সময় রেজেষ্ট্রী হয়। এই পাঠবাড়ীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে, তার মধ্যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করেই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

অনেকদিন আগের কথা—১৩৩৪ সালের ২২এ চৈত্র সন্ধ্যাকালে আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে। আরতি কীর্ত্তনের পর যে যার আসনে বসে মালা জপ করছে—এমন সময় পাঠঘরের ভিতর হতে সুমধুর কীর্ত্তন ও নূপুরের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সকলে বাহিরে আলো লইয়া আসিয়া ঘরে ও বাইরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

আর একদিনের ঘটনা ১৩৩৫ সালের ১৮ই মাঘ হইতে ১৩৩৬ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ একটী ভগ্ন গৃহে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় মঠের সেবাইতরা ভগ্ন গৃহের বারান্দায় রাত্রে শয়ন করতেন; সেই সময় প্রায়ই তাঁরা গভীর রাত্রে দেখতে পেতেন যে এক দীর্ঘকায় পুরুষ খড়ম পায়ে দিয়ে পাঠঘরের ভিতর হতে বাহির হইয়া উঠানে বেড়াইতেন এবং কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আবার পাঠঘরে গমন করিতেন।

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই রকম সব অলৌকিক ঘটনা যে কত ঘটে তা লিখে শেষ করা যায় না।
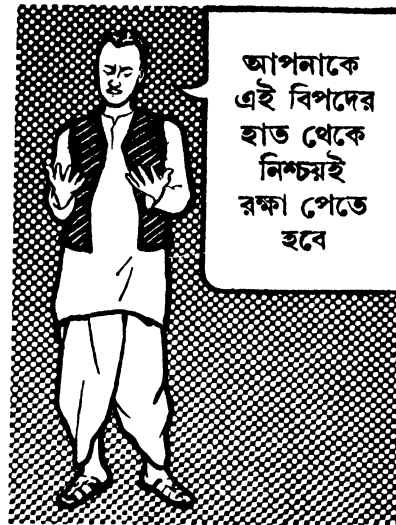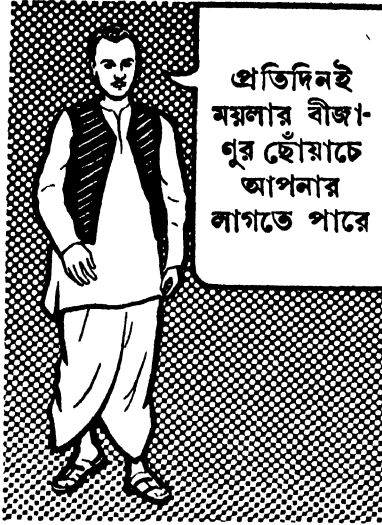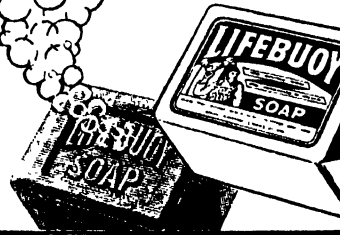
বারো

"Tenho minha pequena"

সুপর্ণার ভাষা অপরিচিত, কিন্তু তার চোখ বুঝতে পারল গঞ্জালো। সে চোখে বিশ্বাস, কৌতূহল, আর হৃদ্যতা। সকালের আলোর মতোই উজ্জ্বল হাসি হাসল সে। শাদা ধবধবে দাঁতে, নরম সোনালি চুলে, নীল্‌চে রঙের সামুদ্রিক চোখে হাসির মীড় ছড়িয়ে গেল।

দীর্ঘ-শুভ্র শিল্পীর আঙুলে বুকে টোকা দিলে গঞ্জালো: Tenho minha pequena (তুমি আমার বান্ধবী)—

সুপর্ণাও হাসল। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই বিদেশী কিশোরটিকে। পর্তুগীজ। কত দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে—কোথায় ওদের অজানা দেশ! কত গল্প ওদের সম্পর্কে শুনেছে সুপর্ণা। ওরা হিংস্র—বাঘের মতো নিষ্ঠুর। দয়া নেই, দুর্বলতা নেই—শুধু রাশি রাশি লোভ নিয়ে এ দেশে ওরা লুঠ করতে এসেছে। ওদের সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ছবিই সুপর্ণা গড়ে নিয়েছিল কল্পনায়। সে ছবির মধ্যে একটা স্বাভাবিক মানুষ কোথাও ছিলনা। কিন্তু ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছে গঞ্জালোকে দেখে। এ তাদের কেউ নয়। চাঁদের আলোর রঙ্‌-মাখা এই মানুষটা যেন সোজা নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

—Pequena, minha pequena—আবার বললে গঞ্জালো।

সুপর্ণাও একটা কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কী বলবার আছে? একটি বর্ণও তো বুঝতে পারবে না। তবে একটা সহজ উপায় আছে—আতিথেয়তার সৌজন্য দেখিয়ে।

মুখে হাত তুলে ইঙ্গিত করে সুপর্ণা বললে, কিছু খাবে?

গঞ্জালো বুঝল। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ক্ষিদে তার পায়নি। তবু বন্ধুত্বের এই আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারল না। মাথা নেড়ে জানাল: সে খাবে।

কিছু করতে পারার উৎসাহে ভারী খুশি হয়ে উঠল সুপর্ণা। পাখির মতো চঞ্চল পায়ে তর্‌ তর্‌ করে নেমে গেল ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে। শীতের রোদে তার চাঁপা রঙের শাড়ীর প্রলেপ মাখিয়ে সে অদৃশ্য হল নতুন মহলের দিকে।

গঞ্জালো চেয়ে রইল। সামনের অজস্র ফাটল ধরা প্রকাণ্ড চত্বরটায় বড় বড় ঘাস উঠেছিল - শীতের ছোঁয়ায় একদল মরে-যাওয়া হল্‌দে রঙের সাপের ছানার মতো এলিয়ে আছে তারা। একটা ভাঙা দেওয়াল বেয়ে তিন-চারটে লেজ-তোলা কাঠবেড়ালী বার বার ওঠা-নামা করছে—অত্যন্ত ব্যস্ত। এককোনে পাঁচ সাতটা ছাতারে পাখি ক্রমাগত লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে। মাথার ওপরে শাদা কালো শরীরে রোদের চমক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুটো শঙ্খচিল। শঙ্খচিলের পাখার সঙ্গে গঞ্জালোর চোখ মাটি ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেল। নতুন মহলের ওপর দিয়ে বহু দূরান্তে নম্র নীল আকাশ ঝলমল করছে—এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রা সেখানে। বসবার জায়গা খুঁজছে কোথাও। কখনো কখনো পায়রাগুলোকে মনে হচ্ছে একদল কালো পাখি, তার পরেই যখন এদিকে ঘুরে আসছে তখন তাদের শাদা বুকগুলো একরাশ শাদা তাসের মতো ঝকঝক করে উঠছে। যেন কতগুলো মাছ উল্‌টে যাচ্ছে আকাশের নীল সমুদ্রে।

ওই আকাশ, আর ওই পাখিগুলোকে দেখতে দেখতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছিল কবি গঞ্জালো। ভুলে যাচ্ছিল নিজের এই বিচিত্র অবস্থাটার কথা, কাকা অ্যাফন্সোর কথা, সেই দুঃস্বপ্নভরা রাত্রিটার কথা, গুলি খাওয়া পেড্রোর সেই মৃত্যুকাতর আর্তনাদের কথা। কী নীল-কী নিবিড় এই আকাশ। তাদের দেশের আকাশে এমন স্নিগ্ধ রঙ্ নেই—কেমন পাণ্ডুর—কেমন তীব্র। রুক্ষ পাহাড়ের মাথার ওপর একটা ভ্রূকুটিভরা শূন্যতা। এত পাখিও নেই সেখানে—কান পেতে থাকলে শুধু সমুদ্র-শকুনের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। এত সবুজও এমন করে সেখানে তার চোখে পড়েনি। খুব ছেলেবেলায় একবার সে বেড়াতে গিয়েছিল আলেমতেজোর জঙ্গলে। জলপাই, শোলার বন আর গোলাপফুলে ছাওয়া সে জঙ্গল তার মন ভুলিয়েছিল, তবু এ দেশের সঙ্গে তার কত তফাৎ! শাদা মার্বেলের পাহাড়ের চাইতে কত আশ্চর্য অফুরন্ত ঘাসে ছাওয়া এ দেশের মাটি।

আর এই মেয়েটি। minha pequena। গঞ্জালোর মনে হল: এই বা মন্দ কী! একটা নতুন পৃথিবী—একটা স্বপ্নের জগৎ! এখানে মগ্ন হয়ে থাকা যায়—কবিতা লেখা যায় নিজের আনন্দে। সব ভুলে যাওয়া যায়—দূর সমুদ্র, কাকা অ্যাফোনসো ডি-মেলো—সব!

কিন্তু মনের গতি থেমে গেল হঠাৎ। শিউরে উঠল গঞ্জালো।

চত্বরের একান্তে একটি মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছে। এই লোকটিকে সে প্রথম দেখেছিল সেই কাল-রাত্রে—নবাবের কয়েদখানা থেকে রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসবার পরে। জেণ্টুরদের সেই পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরটার বাইরে পাথরের মতোই বসেছিল এই লোকটা—প্রদীপের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল এরই মুখ। তারপর একটা বিশাল থাবায় তার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল এইখানে।

তখন লোকটাকে মনে হয়েছিল রাক্ষস—তার লাল লাল দুটো চোখে মানুষ খাওয়ার হিংস্রতা। ইচ্ছা সত্ত্বেও তার হাত ছাড়িয়ে তখন পালাবার ক্ষমতাই ছিলনা গঞ্জালোর। তারপর এখানে এসে আশ্রয় পাওয়ার পরে ওই মানুষটাকে আর সে দেখেনি—প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ওর কথা। কিন্তু এখন—

আবার কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে সে। খানিকটা দূরে চত্বরের ভেতরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে গঞ্জালোকে—যেমনভাবে শিকারীর লক্ষ্য থাকে পাখির দিকে। কী অদ্ভুত প্রকাণ্ড—কী অস্বাভাবিক মানুষ! এখানকার কারুর সঙ্গেই তার কোনো মিল নেই। পরণে লাল রঙের কাপড়, গলায় কাঠের মালা, কপালে লাল রঙ্ দিয়ে কী সব আঁকা, মাথার দুপাশে ফণাধরা সাপের মতো একরাশ বিশৃঙ্খল চুল। দুটো বড় বড় চোখের ক্ষুধার্ত আগুন ছড়িয়ে সে দেখছে গঞ্জালোকেই।

গঞ্জালো শিউরে চোখ নামালো। শির্ শির্ করে ভয় নেমে গেল মেরুদণ্ডের হাড় বেয়ে।

অদ্ভুত লোকটা—বেশিক্ষণ দাঁড়ালনা। একটু পরেই আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল, তারপর কোন্‌দিকে যেন মিলিয়ে গেল সে।

আর তখনি গঞ্জালোর মন থেকে সুর কেটে গেল এই নীল আকাশের—এই পাখির। তখনি মনে হল এরা তার কেউ নয়—এখানে তার কোনো বন্ধু নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো দোলা-খাওয়া সমুদ্র, ঢের ভালো সেই দুধের মতো ধবধবে বিরাট মার্বেলের পাহাড়, সেই জলপাই পাতার লাল-সবুজ রঙ্—সেই শোলা বনের খস্ খস্ শব্দ। না—এ তার জায়গা নয়। এ তার শত্রুপুরী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে তাকে। এবং পারলে, আজ রাত্রেই।

সকালের রোদে আবার চাঁপাফুলী শাড়ীর ঝলক। ফিরে আসছে তার 'পেকেনা'। গঞ্জালো বিভ্রান্ত হয়ে চেয়ে রইল। কোন্‌টা সত্যি? ওই লোকটা, না, এই মেয়েটি?

প্রসন্ন মুখে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সুপর্ণা: থালায় কয়েকটা ফল, কিছু মিষ্টি। তবু গঞ্জালো যথেষ্ট খুশি হতে পারলনা। একটা সুরযন্ত্রের তার কেটে গেছে। আর জোড় মিলছে না।

নিঃশব্দে কয়েকটা ফল দাঁতে কাটল গঞ্জালো। তারপর ইঙ্গিতে জানতে চাইল: কে ওই লোকটা?

—কে?—সুপর্ণা বুঝতে পারলনা।

আবার ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল গঞ্জালো। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে চেহারার বিশালতা, মাথার জটার কথা, কপালের লাল রঙ্।

সুপর্ণা তবু বুঝতে পারলনা। শুধু হাসল। গঙ্গালোও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু হাসিটা তেমন স্বচ্ছ হয়ে ফুটল না এবার—কোথায় একটা কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল খচ্ খচ্ করে।

. .

অজস্র তারায় আকাশ ছেয়ে নামল অমাবস্যার রাত। বাংলা দেশের ইতিহাসের একান্তেও একটি কালো রাত্রি।

সেই বড় অসুখটা থেকে সেরে ওঠবার পরে মা-মরা এই মেয়েটির প্রতি আরো বেশি দুর্বলতা এসেছে রাজশেখরের। বাঁচবার আশাই ছিল না, শুধু চন্দ্রনাথের দয়াতেই সেরে উঠেছে সে। সেই কৃতজ্ঞতার তাগিদেই রাজশেখর নতুন করে মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন—তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাদর আহ্বান করে এনেছিলেন গুরু সোমদেবকে। কিন্তু তার পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে—এ তিনি ভাবতেও পারেননি। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভব হলে নিজের হাতেই তিনি তাঁর ওই মন্দিরকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতেন।

ক্ষোভ, অস্বস্তি আর ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রাজশেখরের। যেন একটা প্রকাণ্ড সর্বনাশকে উদ্যত দেখছেন চোখের সামনে। এই ঘটনার পরিণাম যে তাঁকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে, সে তাঁর কল্পনারও বাইরে। নবাব জানতে পারলে তাঁর ক্রোধ কী মূর্তি নেবে কে বলতে পারে! কিন্তু সেও বড় কথা নয়। দেবতা—দেবতার কোপ! যিনি সুপর্ণাকে দয়া করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যদি—

আর ভাবতে পারেন না রাজশেখর। ইচ্ছে হয়, সোমদেবের কাছে গিয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠেন: এ হবেনা গুরুদেব—এ অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই হতে দেবনা। কিন্তু সে-কথা বলবার শক্তি নেই তাঁর। তাঁর এতটুকু সাহস নেই যে সহজ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখবেন সোমদেবের মুখের দিকে!

বাণ খাওয়া আহত পশুর মতো বিবক্রিয়ায় ঝিমোতে ঝিমোতে প্রাসাদের দীর্ঘ বারান্দাগুলো পার হয়ে হয়ে চলতে লাগলেন রাজশেখর। চারদিকে ঝাড়ের আলো—বড় বড় মশাল জ্বলছে এখানে-ওখানে, কোণায় কোণায় লুকিয়ে আত্মরক্ষা করছে অন্ধকার। তবু রাজশেখরের মনে হল এত বাড়িতে কোথাও আলো নেই—একটা নক্ষত্রহীন কঠিন কালো রাত্রিকে ঠেলে ঠেলে অন্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। খানিক দূর এগিয়েই হয়তো আর পায়ের নিচে কিছু পাবেন না তিনি—একটা অনন্ত শূন্যতার: মধ্যে দিয়ে তিনি পড়তে থাকবেন—পড়তেই থাকবেন—সে মহাপতনের কোথাও বুঝি শেষ নেই!

শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন রাজশেখর।

এক কোণায় প্রদীপটা জ্বলছে ক্ষীণভাবে। চারদিকে ছায়া-ছায়া আলো। কিন্তু সুপর্ণা শোয়নি—চুপ করে বসে আছে খাটের একপাশে।

—এখনো ঘুমুসনি মা?

—তুমি না এলে কী করে ঘুমুব বাবা?

কথাটা ঠিক। অসুখ থেকে ওঠার পরে মেয়েটা তাঁকেই আঁকড়ে ধরেছে দু হাতে। ঘুমুবার আগে কিছুক্ষণ তার পাশে বসতেই হবে তাঁকে—হাত বুলিয়ে দিতে হবে চুলে-কপালে। আজও সে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা?

রাজশেখর বললেন, কাজ ছিল মা। তুই শুয়ে পড়।

গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুপর্ণা।

—তুমি শোবেনা বাবা?

—একটু দেরী হবে।—কথা বলতে স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করলেন রাজশেখর: গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছেন—যেতে হবে তাঁর কাছে।

—গুরুদেবকে আমার একেবারে ভালো লাগেনা।—অস্ফুট মৃদু গলায় সুপর্ণা বললে।

— ছিঃ মা, ও-কথা বলতে নেই।

সুপর্ণা তবু থামল না: কী ভীষণ চেহারা! দেখলেই ভয় করে।

—উনি মহাপুরুষ মা। সাধারণ মানুষের মতো তো নন্। কিন্তু ও-সব বলতে নেই ওঁর সম্পর্কে—পাপ হবে।

পাপ? শুধু সেই ভয়ই নয়। শুধু পারলৌকিক নয়—ইহলোকেও অনিষ্ট করবার একটা ভয়ঙ্কর শক্তি আছে ওঁর—এটা মনে মনে অনুভব করেন রাজশেখর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে গুরুদেব সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি ভাবতে

ান না—তাঁর সম্পর্কে ভুলে থাকতে পারলেই একান্ত খুশি ন তিনি।

—আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে হবে বাবা?

—শিগ্‌গীরই।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি নিজে রোজ পূজোর ফুল তুলে দেব।

—তাই হবে।

—তোমার আজ কী হয়েছে বাবা?—একটা আকস্মিক প্রশ্ন এল সুপর্ণার।

—কী হবে আবার?—রাজশেখর চমকে উঠলেন। এই প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও কি তাঁর মুখের রেখাগুলোকে বুঝতে পেরেছে সুপর্ণা—পেয়েছে তাঁর মনের আভাস? রাজশেখর একটা ঢোঁক গিললেন।

—কই, কিছু তো হয়নি। কী আর হবে?

—তবে তুমি ভালো করে কথা বলছ না কেন?—সুপর্ণার স্বরে অনুযোগ শোনা গেল।

—এই তো বলছি। রাজশেখর শুকনো হাসি হাসলেন।

—না, বলছ না।—প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললে সুপর্ণা।

রাজশেখর জোর করে সহজ হতে চাইলেন—হাতটা সস্নেহে নামিয়ে আনলেন সুপর্ণার কপালে।

—কী পাগলি মেয়ে! রাত হয়েছে—এখন ঘুমো।

—কোথায় বেশি রাত হয়েছে? যখের জঙ্গলে এখনো তো শেয়াল ডাকেনি।

—ডেকেছে—ডেকেছে!—অসহায় ভাবে রাজশেখর বললেন, তুই শুনতে পাস্‌নি! অসীম অস্বস্তিতে তিনি ভাবতে লাগলেন: কেমন করে সুপর্ণাকে বলবেন, আজ বেশি রাত পর্যন্ত তার জাগা উচিত নয়—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ঘুমিয়ে পড়া দরকার? যে-বিভীষিকার প্রহর-গুলো কালো আকাশ আর শীতের শীতল নক্ষত্রগুলির তলায় আসন্ন হয়ে আসছে—সুপর্ণার নিদ্রা-নিবিড় অবসরের আড়াল দিয়েই তারা পার হয়ে যাক। সকালের সূর্য ওঠার সঙ্গে সুপর্ণা যখন চোখ মেলবে—তখন এই দুঃস্বপ্নের একটি চিহ্নও কোথাও আর থাকবেনা!

—শেয়াল ডেকেছিল—আমি শুনতে পাইনি!—নিজের মনেই গুঞ্জন করতে লাগল সুপর্ণা। রাজশেখর তাকিয়ে রইলেন প্রদীপটার দিকে। মিটমিট করছে—একটু পরেই নিভে যাবে। তারপরেই একটা নিতল্‌-নিশ্ছেদ অন্ধকার। ঘরে। বাইরে। তাঁর মনের মধ্যে। আগামী ভবিষ্যতে।

সুপর্ণা আবার ডাকল: বাবা!

—কী?

—ওই খ্রীষ্টান ছেলেটার নাম কী?

রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন।

—কী হল বাবা?

—কিছু হয়নি—শীত করছে।—প্রায় রুদ্ধ গলায় জবাব দিলেন রাজশেখর।

—ওই ছেলেটার নাম কী—বাবা?

—জানি না তো।

সুপর্ণা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, কী একটা বুঝতে চাইল রাজশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথায় যেন গোলমাল ঠেকছে। বাবার গলার স্বরে স্বাভাবিকতার সুর লাগছে না।

সুপর্ণা আবার বললে, ও এখন তো আমাদের এখানেই থাকবে?

নিজের মনের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে রাজশেখর প্রাণপণে বললেন, থাকবে বই কি। কোথায় যাবে আর?

—ওর দেশে যাবে না?

—যাবে। সময় হলে।

—ওঃ।—সুপর্ণা চুপ করে কী ভাবতে লাগল। রাজশেখর তেমনি তাকিয়ে রইলেন ক্ষীণ-দীপ্তি প্রদীপটার দিকে।

—কি রকম নীল্‌চে ওর চোখ—কী অদ্ভুত সোনালি চুল। আর কী যে কথা বলে—একটাও বুঝতে পারা যায় না।—সুপর্ণা নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগল: জানো বাবা, আর কী ছেলেমানুষ! ভালো করে খেতেও জানে না এখনো। মিষ্টি খেতে দিয়েছিলাম, হাত থেকে অর্ধেক তার গড়িয়ে পড়ে গেল!

অসহ্য। শরীরের শিরাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে—মাথার মধ্যে রক্ত ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের মতো। রাজশেখর উঠে দাঁড়ালেন।

—তুই ঘুমো মা—আমি আসছি।

প্রদীপটাকে উজ্‌লে দিয়ে পলাতকের মতো ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলেন রাজশেখর। ওই নিভে-আসা আলোটা যেন একটা অশুভ-সম্ভাবনার প্রতীক। একটা সমুদ্রসীমার ফেন রেখা!

সুপর্ণা কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল। আজ বাবার যেন কী হয়েছে। কী একটা বিরক্তিকর ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছেন তিনি। সুপর্ণা খানিকটা ভাববার চেষ্টা করল—তারপর তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল সোনালি চুল আর নীল্‌চে চোখের আশ্চর্য কিশোরটির দিকে। কেমন ভরাট গম্ভীর গলা—কেমন দীর্ঘ সুঠাম শরীর, আর কী ছেলেমানুষ! ভালো করে খেতেও পারে না এখনো।

পেকেনা! একটা শব্দ কানে লেগে আছে সুপর্ণার। কী ওর অর্থ? কী বলতে চায়?

অর্থটা ভাবতে ভাবতে একটা কোমল অনুভূতি সুপর্ণার বুকের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল, একটা শান্ত স্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মন। কাল সকালে আবার দেখা হবে—তাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—বেশ বোঝা যাবে, তারই জন্যে যেন সে অপেক্ষা করে আছে। আচ্ছা, ও কেন ফিরে যেতে চায় নিজের দেশে? তাদের এখানে থাকলেই বা ওর ক্ষতি কী? আর বাবারও এ ভারী অন্যায়! অমন করে ওই পুরোনো ভাঙা মহলে কেন জায়গা দেওয়া ওকে? ওর পেছনেই তো যখের জঙ্গল—একটা সাপ-টাপ উঠে আসতে পারে যে-কোনো সময়ে। না—কালই কথাটা বলতে হবে বাবাকে।

কিশোর প্রেমের প্রথম ছোঁয়ায় সুপর্ণার চোখে আস্তে আস্তে নেশার মতো ঘুম নেমে এল। আর ঘুমের মধ্যে সে টুপ্‌ টুপ্‌ করে শিশির পড়ার আওয়াজের সঙ্গে শুনতে লাগল: পেকেনা—মিন্‌হা পেকেনা!

তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হল—আরো নিবিড় হল অমাবস্যার রাত। যখের জঙ্গলে ডেকে উঠতে গিয়েই থমকে থেমে গেল শেয়ালেরা। সুপর্ণার ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে সোমদেবের নেশা-জড়ানো মন্ত্রপাঠ আরো গভীর—আরো অলৌকিক হয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে ঝম ঝম করতে লাগল স্তম্ভিত অরণ্য—ভাঙা বেদীটার ফাঁক দিয়ে শীতের ঘুম ভাঙা একটা সাপ একবার মুখ বের করেই মশালের লাল আলোয় ভয় পেয়ে আবার লুকিয়ে গেল ফাটলের আড়ালে।

স্তব্ধ রাত্রির ওপর দিয়ে সোমদেবের মন্ত্রোচ্চার ভেসে চলল—পার হল পুরোনো মহল—এসে পৌঁছুল সুপর্ণার ঘরে। তখন সে ঘরে পুঞ্জিত অন্ধকার—প্রদীপটা নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগেই!

জেগে উঠল সুপর্ণা।

কী যেন একটা ঘটছে—কোথায় কী যেন হয়ে চলেছে রাত্রির আড়ালে। সুপর্ণা অর্থহীন ভয়ে উঠে বসল বিছানার ওপরে। ডাকল: বাবা।

কোনো সাড়া নেই।

আবার ডাকল: বাবা।

এবারেও সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে চকমকি হাতড়ে নিয়ে ঠুকল সুপর্ণা। চকিতের আলোতেই দেখা গেল—বাবার বিছানা খালি—কেউ নেই সেখানে।

শুধু দূর থেকে—দিগন্ত পার হয়ে যেন একটা মন্ত্রের ধ্বনি আসছে। সুপর্ণা সম্মোহিতের মতো উঠে পড়ল—বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঝাড়গুলো নিবু নিবু—মশালগুলোও আর জ্বলছে না এখন। একটা তরল অন্ধকার। আর—আর যখের জঙ্গলে কী যেন একটা হচ্ছে—গাছপালার মাথায় আলোর আভা—একটানা মন্ত্রধ্বনির অস্বাভাবিক গুঞ্জন!

স্বপ্নাহতের মতো বারান্দা দিয়ে চলল সুপর্ণা—নেমে এল চত্বরে, পার হল অন্ধকার খিড়কির দরজা—। মশালের আলো ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বনের মধ্যে। ওই তো শোনা যাচ্ছে সেই মন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান!

সুপর্ণা এগিয়ে চলল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে সে সেই আলো আর ভাঙা বেদীর সামনে পৌঁছুল, সেই মুহূর্তেই আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তুলে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গেল জমে-আসা একরাশ রক্তের ওপর।

বেদীর ওপরে যেখানে একটা কালী মূর্তির দুদিকে মশাল জ্বলছে রক্ত আলো ছড়িয়ে—সেখানে, মূর্তির পায়ের কাছে মাটির পাত্রে একটা ছিন্নমুণ্ড। তার নীল চোখ আর কোনো দিন খুলবে না—তার সোনালি চুল এখন রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে!

—গুরুদেব, গুরুদেব, এ কী করলেন!—চিৎকার করে ছুটে এলেন নিথর হয়ে থাকা রাজশেখর—আছড়ে পড়লেন সুপর্ণার অচেতন দেহের ওপরে।

(ক্রমশঃ)

পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

চিত্র- উঃ

…বুক্ত দেবকীকুমার বসু পরিচালিত চিত্র-মায়ার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য …তি মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মঞ্চে ও চিত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে একাধিক চিত্র ও নাটক রচিত হইয়াছে। প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে—গৃহী নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের …অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য চিত্রেও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতে, কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে নামধারণের পর হইতে জীবনের ঘটনাপ্রবাহকেই বুঝায়। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে দীক্ষাগ্রহণের ইঙ্গিত মাত্র দিয়াই চিত্রনাট্যের নামকরণ করা হইয়াছে। মোটকথা, যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে বা যে সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন-কাহিনী চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাকে—'নিমাই-সন্ন্যাস' বলা যাইতে পারে। চিত্র নাট্য রচনাকালে কাহিনীর যোগসূত্র যে ভাবে গ্রথিত করা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্যে রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই চোখে অসামঞ্জস্যভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইবে। বহু প্রচলিত ঘটনা, যাহা বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া আসিতেছে তাহা যেমন একদিকে বাদ পড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি কোন কোন ঘটনার সহিত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন চাঁদ কাজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যসাধক নিমাই পণ্ডিতের অভিযানের কাহিনী আলোচ্যচিত্রে চিত্রিত হয় নাই; অপরদিকে গুহক চণ্ডাল ও ব্যাধের তীরে বিষ-পাত্র পড়িয়া যাওয়ার কাহিনী দীর্ঘভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য নাটকীয় সংঘাতে গুহক-চণ্ডালের পারিবারিক চিত্রটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু জীবন-নাট্য বা Byographical Drama রচনাকালে জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। ঈশ্বরপুরীর সহিত নবদ্বীপে নিমাই-এর সাক্ষাৎ দেখান হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে—একাধিকবার নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঈশ্বরপুরী 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ রচনা করিয়া নিমাইকে পড়িতে দেন। চাপাল গোপাল একাধারে তান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী এবং তেজস্বী মানুষ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মহাপ্রভুর অনুগ্রহলাভ করেন। নাট্যকার অপরেশচন্দ্র তাঁহার 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটকে উক্ত চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি যে চরিত্রের লোক ছিলেন, তাহাতে জগাই মাধাই-এর সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে বার বার দ্বারস্থ হওয়া …ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার দৃশ্যে নিমাই-… সুদর্শন চক্রের আহ্বান প্রয়োজন ছিল। কেননা চক্র আহ্বানের …ই নিত্যানন্দ নিমাই-এর চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত …ন এবং বলেন—এদের বিনাশ করিলে তোমার কলঙ্ক হইবে, যে …নামে পতিতপাবন তরে, তুমি তাহার দ্বারায় পতিত পাবন নামের …ও রক্ষা কর। তাই লোচনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আমরা …তে পাই—

"সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভু হাসে।
কি করিল ভগবান ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পতিত পামর দুষ্টজন॥
জগাই মাধাই তরি' দীনবন্ধু হব।
পতিত পাবন নামের গরিমা রাখিব॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া।
কহিলেন প্রভুপদে বিনয় করিয়া॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।
পতিত পাবন নাম থাকুক ব্যাখান॥"

সাধারণ বেশে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে'র নায়ক বসন্ত চৌধুরী

ফটো: কালীশ মুখোপাধ্যায়

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তার একদিন মাত্র পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয়। সুতরাং নিতাই-এর সহিত নিমাই-এর বয়সের পার্থক্য মাত্র একদিনের। কিন্তু এখানে নিতাই-এর সহিত নিমাই-এর বয়সের পার্থক্যটি বিশেষভাবে চোখে পড়িয়াছে। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সাজসজ্জায় যথেষ্ট ক্রটী আছে। তৎসত্ত্বেও আমরা বলিব পরিচালক দেবকীকুমারের পাকা হাতের ছাপ বহুক্ষেত্রেই সুপরিস্ফুট। বিশেষ করিয়া গদাধরের পাদ-পদ্মে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জনের দৃশ্যটি অপূর্ব্ব!

নগর কীর্ত্তনের দৃশ্যগুলি আরো উন্নত হওয়া উচিত ছিল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' চিত্রে এই সকল দৃশ্য অত্যন্ত সংযমের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র দের মুখে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু' গানটি অহেতুক বলিয়া মনে হয় এবং চণ্ডীদাসের' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিশু চক্রবর্ত্তী চিত্র গ্রহণে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। শব্দ-গ্রহণ যথাযথ। সৌরেন সেনের শিল্প-নির্দ্দেশ সুরুচির পরিচয় দিলেও—তদানীন্তনকালের আবহাওয়ায় সুপরিস্ফুট নয়। সঙ্গীত পরিচালনায় কমল দাশগুপ্ত সঙ্গীত অংশে প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু নেপথ্য সঙ্গীতে তিনি 'ছন্দোবদ্ধ গতির অনুসরণ করেন নাই।

নিমাই-এর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন সুঅভিনয় করিয়াছেন। নিত্যানন্দের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল গীতাংশ অপেক্ষা অভিনয় অংশে অধিক কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। শ্রীবাস পত্নী মালিনীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবী, চণ্ডাল-পত্নীর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তার অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। সর্ব্বোপরি, ঈশানের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অপূর্ব্ব অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া আর একটি হিন্দী-চিত্র সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। উক্ত চিত্রখানি প্রয়োজনা করিয়াছেন প্রকাশ পিকচার্স এবং পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীবিজয় ভট্ট। চিত্রখানির নামকরণ করা হইয়াছে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।' নিমাই-এর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত প্রায় সকল ঘটনাই আলোচ্য চিত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাহিনীর সন্নিবেশে চিত্রের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। যদিও পারম্পরিক ঘটনায় সামঞ্জস্যের অভাব এবং বিশ্বরূপ ও নিমাই-এর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর উল্লেখ প্রভৃতি বাদ পড়িয়াছে তথাপি জীবন-চরিত রচনার দিক হইতে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে। সংসার হইতে সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাস হইতে দিব্যোন্মাদ-ভাবের লক্ষণ যথাসাধ্য চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি Trick shotএর দ্বারায় প্রকাশের প্রয়াস প্রশংসনীয়। শিল্প-নির্দ্দেশনায় কানু দেশাই সুসামঞ্জস্য শিল্প-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের বিশেষ করিয়া ন্যায়-দর্শনের টীকা বিসর্জ্জনের দৃশ্যটি মুগ্ধ করিয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনের এই ঘটনাটি সন্নিবেশ করা সার্থক হইয়াছে। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চিত্রে যে সূক্ষ্ম রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য চিত্রে তাহার অভাব থাকিলেও নাটকীয় সংঘাত আছে।

রাইচাঁদ বড়ালের সুর-মাধুর্য্যে সমগ্র চিত্রটি ভরপুর। তিনি গাঁটি কীর্ত্তনের সহিত মধ্যে মধ্যে মিশ্রিত সুরের মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু যখন কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া ওঠেন সেই সময় তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে—বৃন্দাবনের রাস-লীলার রূপ-মাধুর্য্য! এই দৃশ্য গ্রহণে পরিচালক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

নাম ভূমিকায় ভারত ভূষণের অভিনয় মধ্যে মধ্যে হৃদয়কে স্পর্শ করিলেও ব্যক্তিত্বের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অমিতার অভিনয় আমাদের একেবারে নিরাশ করিয়াছে। দুর্গা খোটের শচীমাতার অভিনয় প্রাণস্পর্শী। অপর একটী স্ত্রী ভূমিকায় সুলোচনা চ্যাটার্জ্জি সুঅভিনয় করিয়াছেন।

'মেয়েদের গায়ে আধুনিককালের জামা দেওয়া অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে।

* * * *

এন্‌ফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনার রায়বাহাদুর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও তাঁহারই রচিত এক কাহিনী অবলম্বনে সম্প্রতি অরোরা ষ্টুডিওতে 'এরা খুনীর চেয়ে অপরাধী' নামক একটী ৩রীলের ছবি নির্ম্মিত হইয়াছে। জাল ঔষধ বন্ধের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য চিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন

'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' চিত্রের নাম ভূমিকায় ভারতভূষণ

শ্রীপ্রবোধ সরকার। বিশিষ্ট ভূমিকায় কাহিনীকার স্বয়ং এবং মলিনা দেবী অভিনয় করিয়াছেন। আমরা এইরূপ সমাজ-কল্যাণকর ছবির বহুল প্রচার কামনা করি।

মঞ্চ-পীঠ ঃ

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় রঙ্গ-মঞ্চগুলিকে প্রমোদ-কর হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। প্রস্তাব উত্থাপক শ্রীশ্যামল কুমার দত্ত বলেন "বাঙালীর সমাজ, ধর্ম্মাচরণ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আভাস আজও বাংলার রঙ্গ-মঞ্চগুলিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ রঙ্গ-মঞ্চগুলি চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া দারুণ আর্থিক সঙ্কটের দরুণ দ্রুত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। * * * পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে রঙ্গ-মঞ্চগুলিকে রক্ষার জন্য উহাদের প্রমোদকর রহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পৌর প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই।" দীর্ঘকাল পরে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সভায় রঙ্গ-মঞ্চের দুর্দ্দশার কথা আলোচিত হওয়ায় আমরা সাধুবাদ করিতেছি। প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হইলে রঙ্গ-মঞ্চগুলি যথার্থই উপকৃত হইবেন।

* * * *

গত ১০ই ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার তেত্রিশতম বাৎসরিক ভাষণ প্রদান করেন। তেজ গম্ভীর সুচিন্তিত ভাষণে তিনি বলেন—"কল্পনাভিলাষী জাতির প্রকাশ সাহিত্য, নাটক, চিত্র-কলা ও সঙ্গীতে। সাহিত্যের আবার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নাটক। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা শেষ পর্য্যন্ত নাটকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বার্ণার্ড শ' এই মঞ্চ হইতে বিশ্ব-বাসীকে সম্বোধন

করিয়াছেন। বাংলা দেশও নাটককে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছে। দারুণ অর্থাভাব, বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আজো সে বাঁচিয়া আছে ও থাকিবে। বাংলার এই থিয়েটার বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিগুলিকে তুলিয়া ধরিয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় নাট্য-শালা প্রস্তুতের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তৎসম্পর্কে নাট্যাচার্য্য বলেন—"জাতীয় নাট্যশালা বলতে বোঝাবে বাংলা নাটককে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য এমন একটি স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে :—

১। কলকাতায় অ-ব্যবসাদারী একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে উচ্চতম প্রতিভাসম্পন্ন স্থায়ী শিল্পী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত এবং অতি-বিচক্ষণতার সহিত প্রযোজিত অতীত এবং বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলী যাতে ধারাবাহিক দেখাবার সুযোগ হয়।

২। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক যে কোন ধারার নাটকের অভিনয়ে দক্ষতা ও মর্য্যাদা রক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। নাট্যাভিনয়ে যা কিছু মূল্যবান তা পুনরুজ্জীবিত করে তোলা।

৩। সমসাময়িককালের ভালো নাটকগুলির অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা, যাতে সেগুলি লুপ্ত হয়ে না যায়। যেমন—পরিচয়, মধুসূদন, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, দুঃখীর ইমান, নিষ্কৃতি প্রভৃতি।

আধুনিক নাটকের উন্নয়নে নূতন নাটক প্রযোজনা করা।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিককালের নির্ব্বাচিত নাটকাবলী অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করা।

দেশের সর্ব্বত্র এবং বিদেশে জাতীয় নাট্যশালার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

৪। সম্ভাব্য এবং যুক্তিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে নাট্যশিল্পকে শক্তিশালী করে তোলা।

উপসংহারে নাট্যাচার্য্য বলেন—'এ কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় অর্থে যেন এটিকে 'জাতীয় করণ' বলে ধরা না হয় বা এর সঙ্গে কোন রাজনীতিক সূত্র জুড়ে দেওয়া না হয়। এই নাট্যশালা জাতির সাংস্কৃতিক অভিলাষকে প্রতিফলিত করবে, ফুটিয়ে তুলবে সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি, সামনে তুলে ধরবে অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য। যার ফলে নাট্যামোদীদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পাবার উপায় করে দেবে। সরকারের সঙ্গে এই জাতীয় নাট্যালয়ের সম্পর্ক অন্যান্য নাট্যালয়ের মতোই থাকবে। ঠিক ততটাই, কম কিছু নয়। এ নাট্যালয়কে জাতীয় বলে অখ্যাত করা হচ্ছে এই কারণে যে, নাট্যালয়টি নির্ম্মিত ও সরঞ্জামে সজ্জিত করে জাতির হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে নির্ব্বাচিত অছির হাতে পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হবে।"

নাট্যাচার্য্যের উপরোক্ত ভাষণের উপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় গত ২৮শে অগ্রহায়ণ ইং ১৪ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় কমলাকান্তের আসরে শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কমলাকান্ত বলিয়াছেন— সরকারী সাহায্য পাইলেই বাংলার নাট্য শিল্পের নবজীবনলাভ হইবে এমন বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ নাই। * * * শিল্পের মত সুক্ষ্ম, সুকুমার স্পর্শকাতর রস প্রকাশের একটি পন্থার উপরে সরকারী প্রভাব কখনো সুফলপ্রসূ হয় কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।"

আমরা নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ও কমলাকান্তের মতামত উদ্ধৃত করিয়া জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে শুধু মহামনীষী বার্ণার্ড শ'র কথা স্মরণ করাইয়া বলিতে চাই—নাট্যশালা একদিকে যেমন চিন্তার কারখানা অপরদিকে তেমনি বিবেকের নির্দ্দেশ ক্ষেত্র। নাট-মঞ্চ একদিকে যেমন

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার

(১৯৫১ সনে পরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ)

নিষ্ঠার সহিত সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে অপরদিকে তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতির মর্য্যাদাদান করিয়া আসিয়াছে। আমরা চাই, এর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা—বিধিনিষেধের আবর্ত্তে যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

*　　*　　*　　*　　*

ভারত সরকার সম্প্রতি যে সঙ্গীত-নাটক একাডেমী গঠন করিয়াছেন উহার জাতীয় নাট্যশালা পরিকল্পনা কমিটি ভারতে জাতীয় নাট্য-আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য নয়াদিল্লীতে একটি নাট-মঞ্চ নির্ম্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত নাট্যশালায় দুই সহস্র
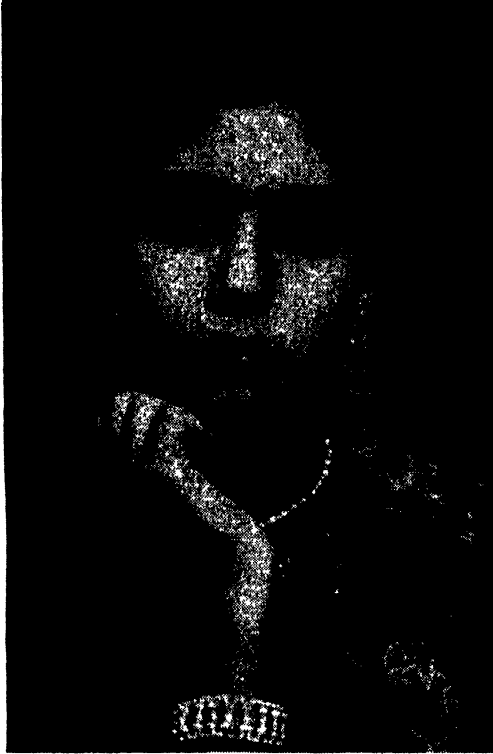
সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি চিত্রের নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

দর্শকের বসিবার স্থান থাকিবে। জাতীয় নাট্যশালা পরিকল্পনা কমিটির পক্ষে শ্রীমতী নির্ম্মলা যোশী জানান যে, কমিটির বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজেও অনুরূপ ভবন নির্ম্মাণের কল্পনা আছে। প্রকাশ, পরিকল্পনা কমিটি যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, ভারত সরকার তাহার সমতুল অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

*　　*　　*　　*　　*

মঞ্চ ও চিত্রের সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক নাট্যাচার্য্য তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কলিকাতা ভবানীপুরস্থিত ভবনে গত ২রা জানুয়ারী শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসে কার্য্য করিতেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর কলিকাতা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি অভিনয়ে অনুরাগী ছিলেন। ভবানীপুরের বান্ধব সম্মিলনী, সঙ্গীত সমাজ প্রভৃতি সৌখীন দলে তিনি অভিনয় করিতেন। তাঁহার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইভ্‌নিং ক্লাবে তাঁহাকে লইয়া আসেন। ইভ্‌নিং ক্লাব ও সঙ্গীত সমাজের সম্মিলিত অভিনয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'তে কমলাকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তদানীন্তনকালের

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কমলাকান্তের অভিনয় দর্শনে এতই মুগ্ধ হন যে 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'র উক্ত পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে উহা মঞ্চস্থ করেন।

১৯২৩ সালে ৺নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, ৺সতীশ সেন, ৺কুমারকৃষ্ণ মিত্র, ৺গণদেব গাঙ্গুলী এবং শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহাতে সর্ব্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। আর্ট থিয়েটারের প্রথম নাটক ৺অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জ্জুনে' তিনি কর্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বাংলার নাট্যামোদীসুধীবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। এই সময় তাঁহার সহিত শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী শিল্পীগণও উক্ত নাটকে সর্ব্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করেন। তিন শত রাত্রির অধিককাল উক্ত নাটক প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়।

ইহার পর তিনি মন্ত্রশক্তিতে—মোথ্‌রো, চিরকুমার সভায়—অক্ষয়, শ্রীগৌরাঙ্গে—শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রফুল্লতে—যোগেশ ও অন্যান্য বহু নাটকে বিভিন্ন

শুভ বিবাহ

বিয়ের ভোজটা বেশ জমেছে।

কি চমৎকার রেঁধেছে—কি দিয়ে রেঁধেছে জানতে হবে।

মা বলেনঃ—চমৎকার রান্নার জন্যে দায়ী ডাল্‌ডা! আর এতে খরচও কত কম।

ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে রান্না কোরলে যে কোনো ভোজের আয়োজন সার্থক হয়। সব রকম রান্নার পক্ষেই ডাল্‌ডা বনস্পতি বিশেষ উপযোগী। বায়ু-রোধক শীল-করা টিনে ডাল্‌ডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর অবস্থায় পাবেন। বিয়ের ভোজের জন্যে ডাল্‌ডা বনস্পতি চাইই-চাই। আর এতে খরচও কত কম!

কি কোরে ভালভাবে বিয়ের ভোজের আয়োজন করা যায়?
বিনামূল্যে উপদেশের জন্যে আজই লিখে দিনঃ-
দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্ পোঃ, আঃ, বক্স্ নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা
বনস্পতি

HVM. 193-X52 BG

ভূমিকায় বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। ইহা ছাড়া তিনি যেমন একদিকে বহু চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি অনেকগুলি চিত্র পরিচালনাও করিয়াছেন, তাঁহার পরিচালিত ঋণ-মুক্তি, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, অন্নপূর্ণার মন্দির, তরুণী, হারানিধি ফুল্লরা প্রভৃতি চিত্র জনসমাদৃত হয়। . মধ্যে দীর্ঘকাল তিনি অভিনয় ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে বিশেষ অনুরোধে কিছুকাল তিনি দক্ষিণ কলিকাতার কালিকা থিয়েটারে যোগদান করেন। মৃত্যুর কয়েকমাসমাত্র পূর্ব্বেও তিনি বার্দ্ধক্যের জড়তাকে উপেক্ষা করিয়া নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের অনুরোধে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের সহিত সম্মিলিত অভিনয়ে কয়েকটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করেন।

তাঁহার ন্যায় একজন সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান অভিনেতার পরলোকগমনে বাংলার নাট-মঞ্চের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। তাঁহার অভিনয়ের ধারা ছিল—স্বতন্ত্র, সৃষ্টি ছিল—অনুপম। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * * *

সম্প্রতি জনপ্রিয় নট জীবন গাঙ্গুলী ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল মঞ্চে ও চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের
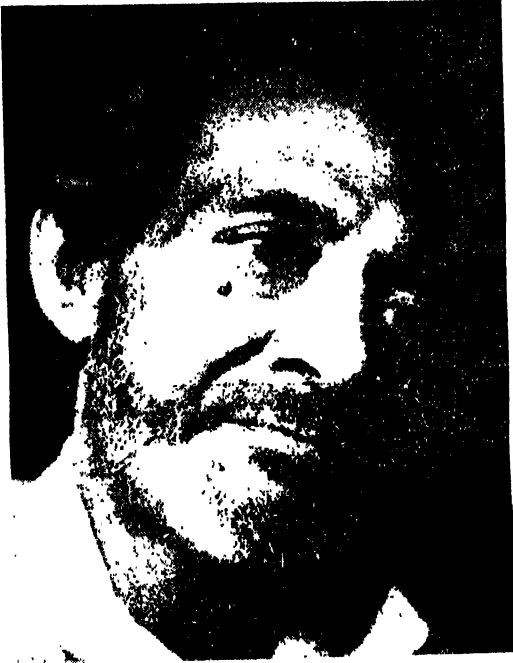
রোগশয্যায় জনপ্রিয় নট জীবন গাঙ্গুলী ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

নিকট অভিনয় শিক্ষা করেন। যৌবনে তাঁহার সুদর্শন অভিনেতা হিসাবে যে খ্যাতি ছিল, পরবর্ত্তীকালে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাঁহার সে খ্যাতি ম্লান হইয়া যায়। দীর্ঘকাল তিনি রোগভোগ করিয়া নানারকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পারলৌকিক আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে এ বৎসর কুমারী ইরা বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার বাদ্যে সকল গ্রুপের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং জীপ্সী নৃত্যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গৌরীশংকর স্বর্ণ পদক উপহার লাভ করিয়াছে। কুমারী ইরা গত বৎসরেও মনিপুরী নৃত্যে অনুরূপ সাফল্য

কুমারী ইরা মুখোপাধ্যায়

অর্জ্জন করিয়াছিল। বর্তমানে ইহার বয়স মাত্র এগারো বৎসর এবং সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। আমরা এই কৃতী বালিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।
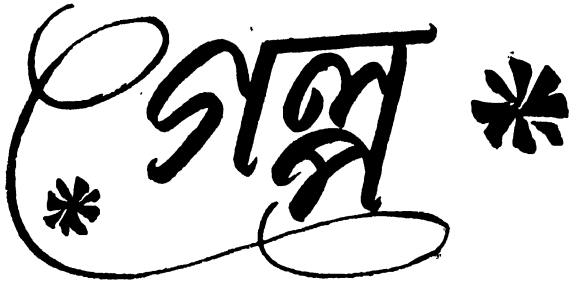
স্বপন

শ্রীঅমিয়া বসু

এই কি জীবন? এই কি বেঁচে থাকা? এর কি কোনো সার্থকতা আছে? দিনের পর দিন এই যে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম—প্রাণটাকে কোনোক্রমে ধ'রে রাখার এই যে সহস্র রকমের প্রয়াস এর কি কোনো প্রয়োজন আছে!…

হাসপাতালের ছোট্ট খাটিয়াটায় নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছে মল্লিকা। ভাবছে তার অতীত জীবনের ভাঙা চেঁড়া, সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নায় ভরা অসংখ্য কাহিনী—ভাবছে বর্তমান বেদনাময় জীবনের কথা। চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে উপাধান সিক্ত করছে। সে-জীবন কোথায় হারিয়ে গেল তার? আর কি সে-জীবনে ফিরে যেতে পারবে সে? এ ব্যাধি কি তাকে মুক্তি দেবে? বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ ক'রে সে।—নাঃ, কোনো আশা নেই! এ রোগ সারে না। বাঁচবার কোনো আশা নেই তার। ডাক্তারেরা যাই বলুক। সে মনে মনে বেশ বুঝতে পারছে, জীবনের দিন ক্রমেই তার সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে। কিন্তু তার আগে একবার যে অশোকের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। অশোক—হ্যাঁ অশোককে একবার দেখবে সে। শেষ দেখা একবার দেখবে। অশোক তাকে ভুল বুঝেছে—অশোক অভিমান ক'রে চলে গেছে। অশোকের সেই ভুল মৃত্যুর পূর্বে ভেঙে দিয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু ভগবান কি সে-সুযোগ দেবেন তাকে?

ইটকী স্যানিটোরিয়ামের ক্ষুদ্র কেবিনের ক্ষুদ্র এক খাটিয়ায় নিঃসঙ্গ শুয়ে আছে মল্লিকা। জানলার ফাঁকে মধ্যাহ্ন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আজ কতো কথাই না মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে মোরাবাদীতে নিজেদের বাগান বাড়িটির কথা—মনে পড়ছে মায়ের কথা, ছোট বোন শিখার কথা, ছোট ভাই সত্যেনের কথা! আর সব চেয়ে বেশি মনে পড়ছে অশোকের কথা। কতো কল্পনারই যে অপমৃত্যু ঘটলো তার এই ত্রিশ বছরের জীবনে।

অশোক এখন কোথায়, কতো দূরে কে জানে। আর দেখা হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে।…

বেশি দিনের কথা তো নয়—এই তো সেদিন। স্পষ্ট সমস্ত কিছুই মনে আছে মল্লিকার। মনে আছে, যেদিন কদিনের সামান্য জ্বরে অকস্মাৎ বাবা মারা গেলেন! উঃ, সে-কি ভয়ংকর দিনই গেছে! তখন কতোই বা বয়স তার—মাত্র তেরো বছর। সত্যেন তখন দশ বছরের আর শিখা আট বছরের। আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে মায়ের সেদিনকার মুখখানি। যেন মূর্তিমতী শোক! যেন নিশ্চল পাষাণ হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রথমটা। তারপর কান্নার একটা মহাসমুদ্রকে বুকের মধ্যে চেপে তাদের তিনটি ভাই বোনকে দু'বাহু দিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর শোকবিদ্ধ বুকখানার ওপর। আজো সে কথা মনে পড়লেই রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে মল্লিকার সর্বশরীর। অশোকের বাবা পালিত জ্যেঠামশাই সেদিন অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তাদের। শুধু সান্ত্বনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি—তাদের সমগ্র সংসারের ভারও তিনি নিতে চেয়েছিলেন তারপরে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হননি। নিজের অবস্থা মন্দ বলে স্বামীর ধনী বন্ধু ডাক্তার পালিতের সাহায্য নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জানিয়েছিলেন—আমাদের যা আছে এতেই আমরা কোনো রকমে চালিয়ে নেবো। তবে প্রয়োজন পড়লে আপনার কাছে চাইবো বইকি। এখানে আপনি ছাড়া আমাদের আর আছে কে?

পালিত জ্যেঠামশাই ম্লান একটু হেসে বলেছিলেন: বেশ। কিন্তু বউমা, আপনি তো জানেন, অনাদি বসু আমার শুধু বন্ধুই ছিল না। সে ছিল আমার সহোদরেরও বেশি। জোর ক'রে তার বিবাহ আমিই দিয়েছিলাম।—ডেপুটির চাকরী নিয়ে নানাস্থানী হ'য়ে ঘুরে বেড়াতো। বাড়ি ঘরদোর করবার মোটেই আগ্রহ ছিল না তার—পৈতৃক বাসস্থানটুকুও যখন আত্মীয়রা গ্রাস করলে তখন জোর করে আমিই তাকে এখানে এই বাগান-বাড়িটি করতে বাধ্য করেছিলুম। ইচ্ছে ছিল শেষ জীবনটা দু'জনে এক জায়গায় কাটিয়ে দেবো। অনাদি আমায় কখনো পর ভাবেনি। তার দাবী ছিল আমার কাছে। কিন্তু যাক্ সে কথা। অসুবিধে যখন নেই তখন আর আমার বলবার কি আছে। তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আমাদের দুই বন্ধুর দীর্ঘদিনের অভিলাষ এবং অনাদির অন্তিম প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না হয়। ভবিষ্যতে অশোক এবং মল্লিকার বিবাহে যেন কোনো বাধা না ওঠে।—

কথা শেষ ক'রে আর দাঁড়াননি তিনি—হন্ হন্ ক'রে চলে গিয়েছিলেন। অন্তরাল থেকে মল্লিকা সব শুনেছিল। শুনে সেদিন মনের ভাব কি হয়েছিল তার আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে একটা কেমন সলজ্জ-পুলকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল তাকে ক্ষণকালের জন্যে।

একটা পরিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ ক'রে পাশ ফিরে শুলো মল্লিকা। চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে—শীর্ণ হাত দু'খানি দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললে সে। তারপর দৃষ্টি মেলতেই সর্ব প্রথম চোখে পড়লো নিজের আঙুলের একটি আংটির প্রতি। দৃষ্টি স্থির হ'য়ে গেল আংটিটার ওপর। মনে পড়লো একদিন অশোক সযত্নে এই আংটি নিজের আঙুল থেকে খুলে তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ আংটিটা নিরীক্ষণ করার পর আর একটা সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে আংটিটাকে চুম্বন করলে সে। তারপর পুনরায় অতীত চিন্তার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ডাঃ পালিত বিশাল ঐশ্বর্যের মালিক। প্রথম জীবনে ডাক্তারী ক'রে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগের পর—কেন জানি না, ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে তিনি রাঁচীতে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। অশোক তখন নিতান্ত বালক। ডাক্তার পালিত অলস হ'য়ে বসে থাকতে পারতেন না। কিছুদিন পরে তিনি রাঁচীতে এক অভ্রের ব্যবসায় শুরু করেন এবং দেখতে দেখতে সেই ব্যবসায়ে একেবারে ফেঁপে উঠলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে বলাবলি করতো যে, তিনি কুবেরের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। আর তাঁর এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁর একমাত্র পুত্র অশোক। অশোক অনেকের ঈর্ষার পাত্র।

ডাক্তার পালিত অশোককে যেমন স্নেহ করতেন তেমনি তার শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। লেখাপড়ায় অশোকও ছিল অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং মেধাবী।

বন্ধু বান্ধব বিশেষ ছিল না অশোকের। লেখা-পড়া নিয়েই দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে যেতো তার। আর অবসর সময় অতিবাহিত করতো মল্লিকাদের বাড়িতে—মল্লিকার সঙ্গে। মল্লিকাও যখন তখন চলে আসতো তার কাছে। দুজনেই জানতো তাদের ভবিষ্যৎ—জানতো তারা উভয়ে সৃষ্টি হয়েছে উভয়ের জন্যে। আগামী জীবনের কতো রঙিন স্বপ্ন রচনা করতো তারা দুজনে মুখোমুখী বসে। কিন্তু তারা স্থির করেছে—শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত জীবন যাপন করবে। মল্লিকার মায়েরও এতে আপত্তি নেই ডাক্তার পালিতেরও না। এখানকার শিক্ষা শেষ করে, অশোকের ইচ্ছে মল্লিকাকে নিয়ে বিলেত যাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর।

এম-এসসি পাশ করার বছরখানেক পর নিজেই একদিন মল্লিকার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লে অশোক। বললেঃ বাবার ইচ্ছে মল্লি, যে, এই সামনের বৈশাখেই আনুষ্ঠানিক কাজটা সেরে ফেলবার। তা ছাড়া তোমারও তো এম-এ পরীক্ষা হ'য়ে গেছে—পাশও করেছ। সুতরাং—কি বলো!—মল্লিকাকে নিরুত্তর দেখে অশোক বিস্মিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেঃ কি ব্যাপার মল্লি? কথা বলছো না যে?

এবার আস্তে আস্তে মল্লিকা বললেঃ তুমি যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি। বলো আগে রাগ করবে না?

—কী কথাটা শুনি আগে।

—তোমাকে না জনিয়েই আমি এখানের বালিকা বিদ্যামন্দিরে একটা চাকরী নিয়েছি—হেডমিস্ট্রেস্—

কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অশোক বললেঃ কিন্তু কেন?

—আমাদের সংসার যে অচল। তুমি তো আমার মাকে জানো—কারো সাহায্য তিনি নিতে চান না। কাজেই এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ কি ছিল বলো! সন্তোন যতোদিন না মানুষ হ'চ্ছে—উপায়ক্ষম হ'চ্ছে ততোদিন আমাদের বিবাহ হয় কি করে? এতোদিন গেছে—আরও কটা বছর এই ভাবেই আমাদের কাটাতে হবে—উপায় নেই।

বুকের মধ্যে একটা প্রবল ধাক্কা অনুভূত হ'ল অশোকের। মুহূর্তে জগৎটা যেন একবার ঝাপ্সা হয়ে এলো তার চোখের সামনে। তারপর আর কোনো কথা না বলে অকস্মাৎ উঠে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই থেকে কিছুদিন রীতিমত মান-অভিমানের পালা চললো তাদের। অশোকের ব্যাপার দেখে ও সমস্ত বিষয় অবগত হ'য়ে মল্লিকার মা-ও অনেক বোঝালেন মেয়েকে। বললেনঃ অশোকের অবাধ্য হয়ো না মল্লিকা। তার যখন ইচ্ছে হয়েছে—আর দেরি করে কাজ নেই—শুভকাজ মিটে যাক্ আমাদের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না—তুমি আর অশোক আমার ভিন্ন নয়।—

কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো গেল না মল্লিকাকে। কোনো কারণে কিছুতেই সে তার মায়ের সম্মান কারো কাছে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। তা সে অশোকই হোক—আর যেই হোক।

ডাক্তার পালিতের কানেও কথাটা পৌছল। তিনি শুধু ভুরু কোঁচকালেন একবার। যেন এমন একটা ঘটনারই প্রত্যাশা করছিলেন তিনি। কয়েকদিন তাঁকেও রীতিমত চিন্তিত থাকতে হ'ল। মল্লিকাকে বড় স্নেহ করেন তিনি। শুধু স্নেহ করেন না—তাঁর কল্পনার অর্ধেক রাজ্য জুড়েই মল্লিকার বাস। স্বর্গত বন্ধু অনাদির অন্তিম বাসনা—নিজের লক্ষ্মীহীন সংসারে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা—এই স্বপ্নেই

"লাক্স্ টয়লেট্
সাবান মেখে
আরও সুন্দর হওয়া"
আখ্তার
জাহান
বলেন

LUX
TOILET SOAP

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

আখ্তার জাহান বলেন যে "কোনও কিছুরই বদলে আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে আমার ত্বকের নিয়মিত যত্ন নেওয়া ছাড়তে রাজি নই। আমি যে দেখতে পাই লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের ত্বক্-শোধন কাজ আমার চামড়ায় আনে এক অপূর্ব পরিবর্ত্তন···আনে নবীনতর উজ্জ্বলতা, আনন্দদায়ী নতুন মসৃণতা।"

লাক্স্
টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 384-X52 BG

দিবারাত্রি বিভোর হ'য়ে থাকতেন বৃদ্ধ ডাক্তার। মল্লিকাকে তিনি মা বলে ডাকতেন। মল্লিকা এলেই তাকে কাছে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবদারের সুরে বলতেন : মা, এই বুড়ো ছেলেটার ভার যে কবে নিবি তুই, আমি তাই খালি দিন গুণছি।—

এমনি দিন গুণতে গুণতেই এতো দিন কাটিয়েছেন তিনি। অশোক-মল্লিকার ইচ্ছার অন্তরায় হননি। তাদের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই অনুরোধে প্রতীক্ষা করেছেন। কিন্তু এই প্রতীক্ষার পরিণতি যে এমনি হবে তা কে জানতো! এর পরেও আরো প্রতীক্ষা? আরো ক'টা বছর? অসম্ভব। না, তা হ'তেই পারে না।···কিন্তু কি হ'তে পারে সেটা স্থির করার পূর্বেই অকস্মাৎ এক রাত্রে বৃদ্ধ ডাক্তার মৃত্যুর আহ্বানে বিদায় নিলেন। তার জীবনের সমস্ত সমস্যার চরম মীমাংসা হয়ে গেল।

ব্যবসা অশোকের ভালো লাগে না। ডাক্তার পালিতের মৃত্যুর পর অশোক বাড়িতে এক বিরাট ল্যাবোরেটরি ক'রে দিবারাত্রি তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো। পুরানো কর্মচারীরা ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

মল্লিকার আসা যাওয়া অব্যাহতই আছে—বরং আরো বেড়েছে। নানাভাবে অশোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে সে এবং আরও বছর কয়েক অপেক্ষা করার অনুরোধ করে। মল্লিকার ছোট ভাই সত্যেন এবং বোন শিখা প্রতিদিনই অশোকের ল্যাবোরেটরিতে এসে নানা অত্যাচার শুরু করে। মল্লিকার বাধা গ্রাহ্যই করে না।

সবই ঠিক আছে—বাইরে থেকে কোথাও কোনো ফাঁক দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তারই মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁটল আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। মল্লিকা মনে মনে সেটা অনুভব করে, মুখ ফুটে বলতে পারে না শুধু। বলতে পারে না, কারণ সে নিরুপায়। অশোক যেন ক্রমেই সরে যাচ্ছে। তার আচার ব্যবহার দেখে কেউই কিছু অনুমান করতে পারে না। কেবল আগে প্রত্যহ দিনে অন্তত দুবার মল্লিকাদের বাড়ি না গেলে তার চলতো না। মল্লিকার হাতে চা-জলখাবার না খেলে তার তৃপ্তি হতো না। ছেলে মানুষের মতো সত্যেন আর শিখার সঙ্গে তাদের বাগানে ছোটাছুটি করে খেলতে এবং সেই খেলার অজুহাতে ঝগড়া বাধাতে না পারলে দিনটাই বৃথা মনে হতো। এখন কেবল সেইটাই বন্ধ হয়েছে। বলে, নতুন একটা রিসার্চ নিয়ে ভারী নাকি ব্যস্ত থাকতে হ'চ্ছে তাকে—সময় একেবারে পায় না। অন্যেরা সেটা বিশ্বাস করে। সত্যিই তো চিরকাল কি ছেলেমানুষী ক'রে কাটালে চলবে। তা ছাড়া ডাক্তার পালিতের মৃত্যুর পর ব্যবসার কতো বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে তার মাথায়। মল্লিকার বিশ্বাস কিন্তু তা নয়। সে ঠিক জানে এর সত্য কারণ কী? মাঝে মাঝে জোর ক'রে সে অশোককে বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতো—নানা কথায় তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতো। কোনো রকমে আর চারটে বছর কাটাতে পারলেই সত্যেনের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ হয়ে যাবে। তারপর তার একটা উপার্জনের ব্যবস্থা হ'য়ে গেলেই—তাদের অভীপ্সা পূর্ণের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না।

অশোক সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল, কিন্তু আর কাটল না। একদিন সকালে হঠাৎ অশোকের ভৃত্য এক সংবাদ বয়ে আনলে। বললে—অশোক নাকি সেই রাত্রেই বিলেত যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

খবরটা শুনে চমকে উঠলো মল্লিকা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে অশোকের বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। অশোকের বাড়িতে পৌছেই দেখতে পেলে অশোক ব্যস্তভাবে ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে : কি খবর? এমন অসময়ে যে? আজ ইস্কুল নেই বুঝি!

মল্লিকা তার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলে। যেন একটা কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টা করলে মনে হ'ল। তারপর একবার তার মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে : তুমি নাকি আজ বিলেত যাচ্ছ?

—ও। খবর এর মধ্যে পৌছে গেছে দেখছি!

—কেন, খবর না দিয়েই যাবার ইচ্ছে ছিল নাকি?

—না। সে রকম কোনো অভিসন্ধি ছিল না। যাবার আগে নিজেই গিয়ে তোমাদের জানিয়ে আসতুম।

—কবে যাচ্ছ?

—আজই রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো।

—কালও তো এ সম্বন্ধে কিছু বলোনি।

একটু হাসলে অশোক। বললে : কাল তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখনও কিছুই স্থির হয়নি। তারপর স্থির হ'ল।

—কিন্তু কেন যাচ্ছ?

—এ তোমার যোগ্য প্রশ্ন হ'ল না মল্লিকা! একজন আত্মপ্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষিকার কাছে এ প্রশ্ন আশা করি না।—চলো তোমাদের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি। পরে হয়তো আরে সময় হবে না।

অশোক মল্লিকার একখানা হাত ধরে আকর্ষণ করলে! সে আকর্ষণে মল্লিকা একটু নড়ে উঠেই সহসা কান্নায় ভেঙে পড়লো একেবারে। এরপর বহুক্ষণ অবধি উভয়ের কথা কাটাকাটি—মান অভিমান—অনুনয় বিনয় প্রভৃতি চললো। অশোকের বিলাত গমনে বাধা সৃষ্টি করার যতো প্রকার

পন্থা মল্লিকার জানা ছিল সমস্ত প্রয়োগ করেও কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। অশোককে নিবারণ করা গেল না। শেষে কাঁদতে কাঁদতে মল্লিকা বললে: আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমায় শাস্তি দেবার জন্যেই যাচ্ছ। কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝে আমার ওপর অবিচার করছো। আমি নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে—

বাধা দিয়ে অশোক বললে: আমায়ও কতকটা নিরুপায় হ'য়েই যেতে হচ্ছে মল্লিকা। নইলে আমি তোমায় ভুলও বুঝিনি—তোমার ওপর অবিচার করার ইচ্ছেও আমার নেই। চারটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ইতিমধ্যে তোমারও কর্তব্যের শেষ হ'য়ে যাবে, আমিও ফিরে আসবো। তারপর, তুমি আর আমি—আমাদের আজন্মের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবো।

—হ্যাঁ, সে আমি জানি। বিলেতে গিয়ে তুমি আর আমায় মনে রাখছো!

—এটাও তোমার যোগ্য কথা হ'ল না। বেশ তাই যদি তোমার সন্দেহ হয়, তাহলে তারও যাবার আগে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাই।—বলেই অশোক নিজের আঙুল থেকে তার শখের পান্নার আংটিটি খুলে মল্লিকার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললে: ওই সামনের দেয়ালে চেয়ে দেখ—আমার বাবার ছবি। বাইরের কেউ জানলে না কিন্তু বাবার প্রতিকৃতিকে সাক্ষী রেখে আজ তোমার আমার বিবাহ হ'য়ে গেল। এরপর আমার ধর্ম আমার কাছে—তোমার ধর্ম তোমার কাছে।

মন্ত্র চালিতের মতো অশোকের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো মল্লিকা। তারপর—তারপর আর কিছু ভাবতে পারে না মল্লিকা। কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল সে ক্ষণকালের জন্যে। অশোক তার বাহু ধরে সবলে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এবং নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বক্ষপাশে আবদ্ধ ক'রে তার অশ্রুসিক্ত কপোলে আর স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল।

অশোক আজ কোথায়? সেই যে চোখের জলে তাকে বিদায় দিয়েছে; তারপর কতোদিন কেটে গেছে! গোড়ায় গোড়ায় চিঠিপত্র আসতো কিন্তু আজ ক'বছর তাও বন্ধ। শোনা যায় নাকি বিমান দুর্ঘটনায় অশোক—

ভুল করেছে মল্লিকা—ভয়ংকর ভুল করেছে।—অশোকের কথা শোনাই উচিত ছিল তার। শোনেনি, তাই অশোক শাস্তি দিচ্ছে তাকে। কিন্তু অশোক জানে না সে-শাস্তির আঘাত কতো নিদারুণ হ'য়ে বেজেছে তার জীবনে। সেই থেকে তিলে তিলে জীবনীশক্তি ক্ষয় হ'তে হ'তে আজ নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। যে কোনো মুহূর্তে তার এই জীবনটার পরিসমাপ্তি ঘটে যেতে পারে। হয়তো একবার দেখাও হবে না অশোকের সঙ্গে—হয়তো এই দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা বুকের কথা একটিও বলা হবে না অশোককে। হয়তো কখন মৃত্যুর ঘনকালো যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে যাবে—তলিয়ে যাবে সে।

কান্নার একটা উদ্দাম উচ্ছ্বাস সবলে দমন করবার চেষ্টা করতে থাকে মল্লিকা—অশোকের পরিয়ে দেওয়া আংটিটা বুকে চেপে ধরে। হঠাৎ মনে হ'ল—আচ্ছা, অশোক ফিরে এসে যদি আর তাকে না চায়? যদি অশোক এতোদিনে অন্য বিবাহ করে থাকে। অশোক যদি ভুলে গিয়ে থাকে তার কথা এতোদিনে? তাহলে—তাহলে—

আর সামলাতে পারলে না সে, আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোথায় যেন কতকগুলো কাচের জিনিস ঝন ঝন করে ভেঙে পড়লো ভয়ংকর শব্দ করে এবং সেই সঙ্গেই কার স্পর্শে ও আহ্বানে চমকে উঠলো মল্লিকা: কে—কে—

—আমি। কি হল তোমার? অমন চিৎকার করে কেঁদে উঠলে কেন?

—অ্যাঁ—ও, তুমি।—ক্ষণকাল বিহ্বলের মতো চেয়ে থেকে হেসে ফেললে মল্লিকা। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিয়ে তাকালে অশোকের দিকে। তখনো [illegible] হাঁপাচ্ছে সে। চোখের জল তখন গড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে বললে: দেখ, কি অলুক্ষুণে কাণ্ড! আবার সেই স্বপ্ন দেখছিলুম।

—কী স্বপ্ন?

—তুমি যেন জোর ক'রে বিলেতে চলে গেলে। আমাদের কারো কথা শুনলে না। তারপর তোমার আর কোনো খবরাখবর নেই। আমার ভেবে ভেবে অসুখ করলো। কি অসুখ যেন—যক্ষ্মা হল। আমি হাসপাতালে ভর্তি হলুম। আর সেখানে পড়ে পড়ে কেবল তোমার কথা—

—আশ্চর্য স্বপ্ন তোমার। তোমাকে ইটকী স্যানিটোরিয়াম দেখতে নিয়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। সেই থেকে প্রায়ই তো এমনি মাথা মুণ্ডু নেই যতো বাজে অবোল তাবোল স্বপ্ন দেখো। একটু থেমে অশোক বললে: নাঃ, এবার সত্যি সত্যি একবার বিলেত গিয়ে দেখতে হবে তুমি কি করো?

—ইশ্! কই যাও দিকি দেখি।—অশোকের হাতখানা চেপে ধরে তার মুখের দিকে তাকালে মল্লিকা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জওহরলাল ও বাঙ্গালী—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের নায়ক। উভয় পদেই নিরপেক্ষতা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, সংপ্রতি কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে সেই নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু দূরবীক্ষণের কাচে ধূলি সঞ্চিত হইলে দর্শক যেমন যাহা দেখেন তাহার স্বরূপের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী, কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহাও তেমনই বিকৃত। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"কংগ্রেস বিরাট প্রতিষ্ঠান। ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা হইতে ইহা অসাধারণ শক্তি অর্জ্জন ও লাভ করিয়াছে। কংগ্রেস বালগঙ্গাধর তিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং তাহার পরে মহাত্মা গান্ধী—এই সকল প্রসিদ্ধ নেতার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।"

বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভারতে (মাউণ্টব্যাটনের দ্বারা খণ্ডিত ও খণ্ডিতভাবে জওহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিগৃহীত—ভারত নহে) সমস্ত ভারতে জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। জওহরলালের অস্বীকৃতি সে সত্যকে মিথ্যা করিতে পারে না। বাঙ্গালীর আহ্বানে কলিকাতায় সম্মিলিত জাতীয় সম্মিলন যে কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্ভব করিয়াছিল, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। ডক্টর বেশাণ্ট যে ১৭ জন ভারতীয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Seventeen good men and true who out of their love and their hope conceived the idea of a political National movement for the saving of the Motherland"

তাঁহাদিগের মধ্যে—বাঙ্গালী ৪ জন, মাদ্রাজী ৫ জন, বোম্বাইবাসী ৩ জন, পুনার ২ জন।

কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম যে অধিবেশন হয়, তাহাতেই কংগ্রেস প্রথম জাতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিক নেতারা বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনেই কংগ্রেসে স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং দাদাভাই নৌরজী বলেন, "স্বরাজ" আমাদিগের কাম্য। বোম্বাইয়ের ফিরোজশা মেটা, মাদ্রাজের কৃষ্ণস্বামী, যুক্তপ্রদেশের মদনমোহন মালব্য নীতি-পরিবর্ত্তনে বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনে ডক্টর বেশাণ্টের নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শাভিমুখে আরও অগ্রসর হয়।

গৌতম বুদ্ধকে তাঁহার নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে যেমন বারাণসীতে যাইতে হইয়াছিল, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তেমনই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে অসহযোগ নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য কংগ্রেসের সম্মতি পাইতে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। যে অতিরিক্ত অধিবেশনে সে নীতি বহুমতে গৃহীত হয়, তাহার সভাপতি লালা লাজপত রায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন :—

"I am inclined to congratulate (the people of Bengal) on the splendid opportunity which an all-write Province, in his dispensation, has offered them for heralding the dawn of a new political era for this country. I think the honour was reserved for Bengal."

গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগের কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন দাশ যে বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন যুক্তপ্রদেশের মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি স্বল্পপ্রভাবসম্পন্ন রাজনীতিকরা তাহারই তলে সমবেত হইয়া—"স্বরাজ্য দল" গঠিত করেন এবং দিল্লীতে অতিরিক্ত অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন জয়ী হইয়া কংগ্রেসকে নির্ব্বাণ হইতে রক্ষা করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া চিত্তরঞ্জনের ও গান্ধীজীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন।

তার পরে—পণ্ডিত ভারত স্বায়ত্তশাসন লাভ না করা পর্য্যন্ত যে বিরাট পুরুষের প্রেরণা দেশকে স্বাধীনতার পথে জয়যাত্রায় প্রোৎসাহিত করিয়াছিল—সেই সুভাষচন্দ্র বসুও বাঙ্গালী।

অথচ বাঙ্গালার রাজধানীতে আসিয়া খণ্ডিত ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসের পরিচালক পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের পরিচালকদিগের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর নামোল্লেখ যে করেন নাই, আর যে গোপালকৃষ্ণ গোখলে কংগ্রেসে কোন নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত করেন নাই, পরন্তু ইংরেজ ভারত-সচিব লর্ড মর্লির অনুগত অনুগামী ছিলেন এবং ইংলণ্ডে বোম্বাইয়ে বৃটিশ শাসকদিগের অত্যাচারের কথা বলিয়া বোম্বাই বন্দরে আসিয়া তাহা প্রত্যাহার করায় তিলক যাঁহাকে "Kutcha reed" বলিয়াছিলেন, তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহা কি বাঙ্গালীর অবদান ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বীকার করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু বলা যায়? তাঁহার এই উক্তির পরেও কি বাঙ্গালী তাঁহাকে নিরপেক্ষ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আস্থা-সম্পন্ন হইতে পারে? তাঁহার উদ্ধৃত উক্তি কি ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শোভন ও সঙ্গত হইয়াছে? বাঙ্গালীকে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

কাশ্মীর-সমস্যা—

কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান সম্ভাবনা দিন দিন যেন সুদূরপরাহত হইতেছে। পাকিস্তান আমেরিকার সহিত চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছে। তাহা যে সমরসজ্জা সরবরাহের চুক্তি তাহা অস্বীকৃত হয় নাই; জনরব, তাহাতে কাশ্মীরের পাকিস্তান কর্ত্তৃক অধিকৃত অংশে আমেরিকাকে সমর ঘাঁটি করিতে দেওয়াও হইবে। এই সংবাদে যে পণ্ডিত জওহরলাল পর্য্যন্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে তিনি এক বার তাঁহার পরমপ্রীতিভাজন শেখ আবদুল্লার উক্তিতেও বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সে বিক্ষোভ ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি—ভারতীয় সেনাবল যখন পাকিস্তানীদিগকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিতে কৃতনিশ্চয় সেই সময় যুদ্ধ বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেক্সপীয়র যে বলিয়াছেন :—

দিনে দিনে
আরও মসৃণ,
আরও লাবণ্যময় ত্বক্
রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার
জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।
রোজ ক্যাডিল্‌যুক্ত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করুন। তা হোলে
দিনে দিনে আপনার গায়ের চামড়া নতুন স্বাস্থ্যে ও
লাবণ্যে ভ'রে উঠবে।
Rexona
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।
RP. 110-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃ-এর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

"There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune ;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows, and in miseries."

তাহা জাতির পক্ষেও সত্য। তাহার পরে জওহরলাল যে ভাবে কাশ্মীর, জম্মু ও লাডক ব্যতীত কাশ্মীর রাজ্যের সকল অংশ পাকিস্তানের অধিকারে রাখিয়া বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লার সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়কর।

মাষ্টার তারা সিংহ বলিয়াছেন—পাকিস্তান উভয়পক্ষের বন্ধুদিগের মাধ্যমে শিখদিগকে হিন্দুদিগের সহিত ঐক্য ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি বলেন—পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের যুদ্ধ অনিবার্য্য; সুতরাং ভারত সরকার যেন সতর্ক থাকেন। পাকিস্তানের হীন অভিপ্রায়ের প্রমাণ তিনি দিতে পারেন। আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের চুক্তি ঘোষিত হইবার সময় হইতে পঞ্জাব সীমান্তে সন্দেহজনক ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা সীমান্তে বাস করায় পাকিস্তানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সমধিক সচেতন। পাকিস্তানের কার্য্যকলাপে মনে হয়, পাকিস্তান একই সময়ে জম্মু, অমৃতসর, ফিরোজপুর ও যোধপুর আক্রমণ করিবে এবং পাকিস্তানী নেতারা প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, তাঁহারা ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে কাশ্মীর অধিকার করিবেন। ভারত সরকারের অবিদিত নাই যে, সংপ্রতি কতকগুলি পাকিস্তানী নিয়মমত ছাড় না লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

মাষ্টার তারা সিংহের এই বিবৃতির প্রতিবাদ ভারত সরকার করেন নাই।

কেহ কেহ এমন অনুমানও করিতেছেন যে, যেমন কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়া ভারত রাষ্ট্রকে পাকিস্তান কায়েমে সাহায্য করা—লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নির্দ্দেশে হইয়াছিল, তেমনই পাকিস্তানীদিগকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত না করিয়া যে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া কাশ্মীর রাষ্ট্রের কতকাংশে পাকিস্তানকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাও মাউণ্টব্যাটেনের চক্রান্তে; এবং হয়ত পাকিস্তানের প্রয়োজনে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তানকে প্রদানের ব্যবস্থাও হইতে পারে। শান্তির অছিলায় ভারত রাষ্ট্রকে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে।

অবশ্য ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু অতঃপর ভারত সরকার কি করিবেন ?

আমেরিকা যে সোভিয়েট রাশিয়াকে বেষ্টিত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তির ফলে কি ভারত রাষ্ট্র চীনের ও রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করিতে পারে না? চীন তিব্বত পর্য্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে এবং লাডক—ভারতভুক্ত হইতে না পারিলে—তিব্বতের সহিত (অর্থাৎ চীনের সহিত) সংযুক্ত হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে—কারণ, গোলাব সিংহের বাহুবলে কাশ্মীররাজ্য গঠিত হইবার পূর্ব্বে লাডক তিব্বতের অধীন ছিল।

যদি পাকিস্তান—আমেরিকার সহিত চুক্তির পরে—সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য দাবী করে, তবে কি ভারত সরকার যুদ্ধ করিবেন? না—যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে, তাহার সঙ্গে কাশ্মীর, জম্মু ও লাডকও দিয়া শান্তি ক্রয় করিবেন? যদি কাশ্মীর, জম্মু ও লাডকও ত্যাগ করা হয়, তবে কাশ্মীরের জন্য ভারতীয়দিগের রক্তপাত ও কোটি কোটি টাকা ব্যয় ব্যর্থ বলিয়া কে তাহার জন্য দায়ী তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না ?

যদি ভারত সরকার পাকিস্তানের দাবীতে সম্মত হ'ন, তবে কি চীনও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পুনঃপ্রাপ্তির দাবী উপস্থাপিত করিতে পারিবে না ?

কাশ্মীর সম্বন্ধে যিনি সন্দেহ প্রকাশ করায় পণ্ডিত জওহরলালের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, কাশ্মীরে যে জওহরলালের বন্ধু শেখ আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতা তিনি যেন নখদর্পণে দর্শন করিয়া ভারতবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন সেই শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে ভারত সরকার তদন্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সেই সম্পর্কে জওহরলালের ও কৈলাশনাথ কাটজুর ব্যবহার দেশের লোককে বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছে—তাহার ফলে যে অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়কই হইবে। আজ কি ভারতবাসীরা শ্যামাপ্রসাদকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ও ভারতের প্রকৃত কল্যাণকামী ত্যাগীবীর বলিয়াই বিবেচনা করিতেছে না ?

কাশ্মীর-সমস্যা কি পণ্ডিত জওহরলালের রাজনীতিক খ্যাতির চিতাশয্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে ?

উটজ শিল্প—

দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থায় উটজ শিল্পের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ যতদিন কুটীর শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল, ততদিন তাহার অধিবাসীদিগের দারিদ্র্য পীড়াদায়ক হইতে পারে না। ইংরেজ লেখকরা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ কৃষকের দেশ। তাহা সত্য নহে। এ দেশ কৃষিপ্রধান ছিল, কিন্তু কৃষিপ্রাণ ছিল না—দেশের লোক কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ উটজ শিল্পে আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিত এবং সেই সকল শিল্পে তাহাদিগের যে অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ—সেই সকল শিল্পজ পণ্যের জন্যই বিদেশী বণিকরা সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া এ দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। এ দেশের হাতের তাঁতের বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিয়া স্বদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইংরেজকে আইন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের ইংলণ্ডে আমদানী বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলশন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা না করিলে ইংলণ্ডে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না—

"Had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped at their outset, and could scarcely have been set in motion even by the power of steam."

ইংরেজ সরকার স্বদেশের স্বার্থসাধন জন্য ছলে, বলে, কৌশলে ভারতের সে সকল সমৃদ্ধ শিল্প নষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু য়ুরোপে সকল দেশেই উটজ শিল্প এখনও আছে এবং কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে।

এ দেশে বেকার-সমস্যার ও দারিদ্র্য-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও লোকের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা সেরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপযোগী।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সকলের সুযোগ গৃহীত হয় নাই।

এখন যে ভারত সরকার উটজ শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ঐ উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিবেন, ইহা সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য প্রথমেই যে পাঁচজন বিদেশীকে আনিয়াছেন—ইহার কারণ কি? এই সকল বিদেশী পরামর্শদাতা—

ভেন হলবার্গ (সুইডেন)
হান্স গ্রাওষ্ট্র'ম (সুইডেন)
রেমণ্ড মিলাব (আমেরিকা)
মেজর আলেকজাণ্ডার (আমেরিকা)
জন মাক্স (আমেরিকা)

ইহাদিগকে পারিশ্রমিক ও সফরের ব্যয় জন্য কত কত দিতে হইবে আমরা জানি না। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের অবস্থার সহিত সুইডেনের বা আমেরিকার অবস্থার যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, এমন নহে। ইঁহারা সেই জন্য এ দেশের উটজ শিল্প সম্বন্ধে যে বিশেষ আবশ্যক পরামর্শ দি-

পারিবেন, এমন মনে হয় না। অথচ হয়ত ইঁহারা বিদেশী নানারূপ ... ব্যবহারের পরামর্শ দিবেন এবং সে সকল যেমন ব্যয়বাহুল্যহেতু এ দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতার অতীত, তেমনই দেশের অনুপযোগী। বিশেষ ভারত রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত হইয়াছিল। সে সকলের সহিত সমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থার ও উপকরণের সুলভ্যতা সম্পর্কিত ছিল। সেই কারণে দেশে উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সে কাজ কি বিদেশীদিগের দ্বারা হইতে পারিবে?

আমাদিগের বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল উটজ শিল্প প্রসিদ্ধ ছিল বা এখনও আছে, সে সকলের উৎপত্তির কারণ ও উন্নতির কারণ বিবেচনা করিয়া উপযোগিতা বুঝিয়া শিল্পে সাহায্য দান প্রয়োজন। যে স্থানে প্রয়োজন, উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে আনিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

অন্যান্য দেশে এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিশেষরূপ বিবেচ্য।

আয়ার্লণ্ডে উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠা দেশের লোকের দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য যে "রিসেস কমিটী" নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার উপকৃত হইতে পারিবেন। সেই রিপোর্ট পাঠ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালার উটজ শিল্পের উন্নতি বিধান প্রয়াসে কোন ব্যক্তিকে যে কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—তাহার ফল—কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় প্রতিষ্ঠিত পান্নালাল শীল শিল্প বিদ্যালয়। সরকার যদি সেইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তবে ভাল হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রধানতঃ শিশিরকুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত যে অ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স আজও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে, সরকার কি তাহা গ্রহণ করিয়া পুনর্গঠিত করিতে পারেন না? তাহার ভাণ্ডার এখনও নিঃশেষ হয় নাই।

উটজ শিল্পের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হয়, তবে ফল ভাল হইতে পারে।

বেকার-সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে কলিকাতায় (টালিগঞ্জ বাদ দিয়া) ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বেকারের সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে—

সহরের ৬১৫,৫০০ পরিবারের মধ্যে ১৭০,০০০টি পরিবারে অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৮টি পরিবারে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান। ইহাদিগের মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—শতকরা ৪৪টি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবার বেকার-সমস্যায় বিপন্ন। আর বাঙ্গালী শ্রমিক পরিবারের শতকরা ৩১টি ঐরূপে বিপন্ন।

ভাষার ভিত্তিতে সহরের ৬১৫,০০০টি পরিবার এইরূপে বিভক্ত ;—

বাঙ্গালী—৩১১,০০০ বা শতকরা প্রায় ৫০টি
হিন্দুস্থানী—২১৩,৪০০ বা শতকরা প্রায় ৩৪টি
উড়িয়া—প্রায় শতকরা ৩টি
দক্ষিনী (মাদ্রাজী)—শতকরা একটিরও কম
অন্যান্য ভারতীয় ভাষাভাষী—শতকরা প্রায় ৮টি
ইংরেজী ভাষাভাষী—শতকরা একটির কিছু অধিক
অন্য ভারতীয় ভাষাভাষী—শতকরা একটির কম।

কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ধরা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে শ্রমক্ষম অর্থাৎ ১৬ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক—.. লক্ষ ৭৭ হাজার ২ শত।—

বাঙ্গালী—১১,১৩,০০০ বা শতকরা ৬২ জন
হিন্দুস্থানী—৪,৫২,০০০ বা শতকরা ২৫ জন

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৩ জন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন।

শ্রমিকদিগের মধ্যে হিন্দুস্থানী বেকারের সংখ্যা বাঙ্গালী বেকারের সংখ্যারও অধিক।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে শতকরা ৪৪টি বেকার-সমস্যায় পীড়িত।

ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করিলে দেখা যায়—বেকার শ্রমিক পরিবার—

বাঙ্গালী—৩১
হিন্দুস্থানী—১৬
উড়িয়া—৯
দক্ষিনী—১৮
অন্য ভারতীয়—২৪
ইংরেজী ভাষাভাষী—২৯

শ্রমিক পরিবার সমূহের শতকরা ২২টিতে বেকার সমস্যা।

এই হিসাব বিশ্লেষণ করিলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদিগের দুরবস্থার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে বেকার-সমস্যা ও সেই সমস্যাজনিত দুর্দ্দশা যে দেশ ও প্রদেশ বিভাগের পরে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল বাঙ্গালী পরিবার প্রদেশ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত—ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী। পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল হিন্দু এখনও রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কৃষক—অনন্যোপায় হইয়া তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে, হয়ত বাধ্য হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধান জন্য কি করিতেছেন? তাঁহারা কয় হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন বলিয়া যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছিল, কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ শত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইতোমধ্যেই প্রায় ১৯ হাজার প্রার্থী আবেদন করিয়াছে! সুতরাং আমরা যে বলিয়াছি, শিক্ষক-নিয়োগে এ সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্ভব নহে—তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শিক্ষিত বেকার-সমস্যা ব্যতীত যে অশিক্ষিত বেকার সমস্যা আছে, তাহা উপেক্ষা করা অসম্ভব। শ্রমিকরা সেই শ্রেণীর বেকারের মধ্যে রহিয়াছে এবং সমস্যা কেবল কলিকাতায় নিবদ্ধ নহে। এই শ্রমিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে বক্তব্য—

(১) পশ্চিমবঙ্গে বহু কলকারখানায় কি বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না? বিহার বিভক্ত হয় নাই; কিন্তু বিহার সরকার কি টাটানগরে অবিহারীর চাকরী দিতে অনিচ্ছুক নহেন? যদি তাহাই হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগে অনিচ্ছুক হইতে পারেন না? ইহা প্রাদেশিকতার কথা নহে—প্রয়োজনের কথা।

(২) পশ্চিমবঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়া বহু কৃষকের কার্য্যসংস্থান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির উপায় করা কি অসম্ভব? কত কালে দামোদরের জল খালে প্রবাহিত হইয়া সেচের সুবিধা করিয়া দিবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অন্যান্য রাষ্ট্র সরকারের মত, কেন্দ্রী সরকারের নিকট টাকা লইয়া সেচের জন্য নলকূপ বসান নাই অর্থাৎ বহুলোৎপাদিকা কৃষির প্রবর্ত্তন করেন নাই, সে অপরাধ কাহার? সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বলেন? কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি

নানারূপে করা যাইতে পারে—করা হয় নাই। অর্থাৎ প্রদেশকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইতেছে না।

বেকার-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ৫ বৎসরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই। অথচ তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার বিস্তার জন্য কলেজের পর কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন—দেশের শিক্ষার্থীদিগকে আবশ্যক মনোভাব প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন না।

বিদেশী ঋণ—

ভারত সরকার বিদেশ হইতে ঋণ লইয়া দেশে কল্যাণকর কার্য্য করিতেছেন। যে ভাবে তাহা হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, শেষে ভারত রাষ্ট্র খদিব ইস্‌মাইলের কার্য্যফলে মিশরের অবস্থায় উপনীত না হয়।

গত ২৫শে জানুয়ারী ভারত সরকার আমেরিকার সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ভারত রাষ্ট্রের রেলের উন্নতিসাধন জন্য আমেরিকা ১০ কোটি টাকা ঋণ দিবে। ঐ টাকা একশত এঞ্জিন ও ৫ হাজার মালগাড়ী (ওয়াগন) কিনিতে ব্যয়িত হইবে—মালগাড়ীগুলির ২ হাজার ৫ শত বড় লাইনের ও ২ হাজার ৫০ খানি ছোট লাইনের জন্য।

অথচ—

(১) পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তিতে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

(২) ভারত-রাষ্ট্রে চিত্তরঞ্জনে যে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারত রাষ্ট্রের এঞ্জিনের অভাব দূর হইবে, এইরূপ ঘোষণা প্রায়ই করা হইয়া থাকে।

(৩) ভারতে মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা বহুদিন হইতে আছে এবং প্রথম যুদ্ধের পরেই যখন (বিদেশী) ভারত সরকার সে শিল্পকে সাহায্য না দিয়া বিদেশ হইতেও মালগাড়ী আমদানীর ব্যবস্থা করেন, তখন মালগাড়ী নির্ম্মাণ কারখানার কমিটীর সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সে কাজের তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই এবং তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতে ঐ শিল্প অল্পদিনেই বিদেশের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

বিদেশ হইতে এঞ্জিন ও মালগাড়ী আনিয়া প্রয়োজন মিটাইলে যে দেশে শিল্পের উন্নতির গতি মন্থর হওয়া অনিবার্য্য, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

গত ২১শে ডিসেম্বর ভারত সরকার একটি জার্ম্মাণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি করিয়া একযোগে ভারত রাষ্ট্রে নূতন ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবেন—স্থির করিয়াছেন। ইহার ব্যয় ৭৫ কোটি টাকা।

ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খণ্ডিত হইয়াও জার্ম্মানী এই কার্য্যের জন্য আবশ্যক মূলধন ও শিল্পী দিতে পারিবে; আর ভারত রাষ্ট্র সে সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী! ইহা কি ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রশংসার কথা?

দেশের সম্পদ দেশের লোকের মূলধনে, দেশের লোকের দ্বারা সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই কি অভিপ্রেত নহে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা পরিকল্পনার জন্য পরমুখাপেক্ষিতার আলোচনা আমরা বহু বার করিয়াছি। সে সকল পরিকল্পনা সম্ভব কি না তাহা পরীক্ষায় কত লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—এই ব্যয় কি অপব্যয় ব্যতীত আর কিছু বলা যায়?

যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারত রাষ্ট্রের সর্ব্বদুঃখমোচনকারী হইবে বলিয়া লোককে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে, তাহার যেরূপ পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত ও স্বীকৃত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, শেষে তাহা বিরাট ধাপ্পায় পর্য্যবসিত না হয়।

দামোদরে জলনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও সিঁদরী সারের কারখানা—উভয়ে যে আনুমানিক ব্যয় বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার কারণ—হয় বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিতেও অসমর্থ, নহে ত তাঁহারা ও ভারত সরকার অল্প ব্যয় দেখাইয়া লোককে বিভ্রান্ত করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া পরে ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

দেশের চেষ্টায়, দেশের অর্থে যে উন্নতি হয় তাহা দ্রুত না হইলেও তাহাই স্থায়ী হয়।

পশ্চিমবঙ্গে চাউল ও সরকার—

রাশিয়া ও ইংলণ্ড বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। তাহারাও খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ ৫ বৎসরকাল লোককে পচা, নিকৃষ্ট জাতীয়, কাঁকর মিশান চাউল খাওয়াইয়াও নিয়ন্ত্রণ শেষ করিতে পারেন নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ চাউল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বোধহয়, কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য মন্ত্রী মিষ্টার কিদোয়াইও সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসা ছাড়িতে অসম্মত। তাই তিনি শেষে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কলিকাতা কেন্দ্রে চাউল সরবরাহের ভার কেন্দ্রী সরকার লইবেন—অন্যত্র নিয়ন্ত্রণ বর্জ্জন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" মনে করিয়া চুপ করিয়াছিলেন এবং কল্যাণীতে বহুব্যয়সাধ্য কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

কলিকাতায় সরকারের ছাড়ে, খোলাবাজারে চাউল বিক্রয় হইতেছিল। ফলে বাঙ্গালী যেরূপ চাউলের ভাত খাইতে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত তাহা কিনিতে পারিতেছিল। সেরূপ চাউলের প্রতি বাঙ্গালীর প্রীতির পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বর্দ্ধমান হইতে বে-আইনী ভাবে চাউল আনিবার প্রলোভন সম্বরণে অক্ষমতা ও প্রধান সচিবের সে ত্রুটি উপেক্ষা করায় পাওয়া গিয়াছিল।

যে সময় খোলাবাজারে চাউল ক্রেতার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ রদ করা সম্ভব ও সুবিধাজনক হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝি ভাবিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে ত বলিতে হইবে—

"Farewell! Othello's occupation's gone."

তাঁহারা দেখিলেন—ব্যবসায়ীরা নানা স্থানে যে সকল রিটেল দোকান খুলিয়াছেন, তাহাতে—

(১) বাঙ্গালী তাহার রুচির উপযোগী চাউল অনায়াসে পাইতেছে।

(২) বহু বেকারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হইতেছে।

(৩) কৃষকগণ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাইয়া আগামী বৎসরের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধানের চাষ করিতেছে।

(৪) প্রায় ১০ লক্ষ ক্রেতা খোলাবাজারে চাউল কিনিতেছে।

সুতরাং আর সে অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত নির্দ্দেশ দিলেন—

৩১শে ডিসেম্বরের পরে পাইকারী ব্যবসায়ীরা আর পশ্চিমবঙ্গের কোন জিলা হইতে চাউল আনাইতে পারিবেন না। পরন্তু সে তারিখে তাঁহাদিগকে গুদামে বাঙ্গালার যে চাউল মজুদ থাকিবে তাহা, সরকারের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে—ক্ষতি স্বীকার করিয়া সরকারকে উপহার দিতে হইবে।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা খোলাবাজারের জন্য উত্তর প্রদেশের চাউল অধিক মূল্যে আনিয়া সে প্রদেশ সমৃদ্ধ করিতে পারেন—বিদেশ হইতে নিকৃষ্ট চাউল আমদানী করিয়া কলিকাতার লোককে ভগ্নস্বাস্থ্য করিতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে সকল জিলায় যথেষ্ট চাউল আছে, সে সকল স্থান হইতে চাউল আনিতে পারিবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন বিদেশীপ্রধান প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গে মফঃস্বলে চাউল কিনিয়া সরকারকে সরবরাহ করিতে অধিকার দিয়াছেন।

এই ব্যবস্থার সহিত যে কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের ও প্রদর্শনীর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা যেমন অবিশ্বাস্য—ইহা যে দক্ষিণ

...কাতা হইতে পার্লামেন্টে সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা ...ও তেমনই বিশ্বাসের অযোগ্য। তবে কেন এই ব্যবস্থা হইত? ... কি শ্রেণ ব্যবস্থায় সরকারের ব্যবসা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা?

ইহার ফলে হইয়াছে :—

(১) জনগণের নিকট প্রিয় পরিকল্পনা নষ্ট করা হইল।

(২) সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তনে বিলম্ব সৃষ্টি করা হইল।

(৩) বহু চাউল ব্যবসায়ী মহাজনের ক্ষতি ও বহু বেকার যুবকের ...সংস্থানের উপায় নষ্ট করা হইল।

(৪) খোলাবাজারের ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে চাউল ক্রয়ের অধিকারে ...ত হওয়ায় প্রতিযোগিতা নির্ম্মূল হওয়ায় চাউলের অনিবার্য্য মূল্য-...সে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

(৫) কৃষকরা বিভিন্ন প্রকার চাউলের ন্যায়সঙ্গত মূল্য না পাওয়ায়, ...শ্চিমবঙ্গে চাউলের শ্রেণী-বিভাগ নষ্ট হইল।

(৬) জনসাধারণ রুচি অনুসারে চাউল কিনিতে পাইবে না।

(৭) উচ্চমূল্যে ক্রীত বিভিন্ন প্রকারের চাউল সরকারকে নিয়ন্ত্রিত ...ল্য দিতে বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, সরকার ...মনই, "কালো বাজারে" না যাইয়াও, লাভবান হইবেন।

কেবল কলিকাতার নহে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের এই ...নষ্টকর, অসঙ্গত ও অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, যে সরকার লোকের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখেন, সে ...রকার লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না।

সরকারের গুদামে কি পচা চাউল মজুদ রহিয়াছে?

ময়দা সরবরাহ বন্ধ করিয়া লোককে আটা লইতে বাধ্য করারও কি অনুরূপ কোন কারণ আছে?

সরকারকে বলিতে হয়—সত্যই "কত কেরামত জান!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব—

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ব-ভারতীর উৎসবে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, ...াহা নানা কারণে আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার নবপর্য্যায়ে ভাইস-চন্সেলার ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। পদ-...াগের কারণ সম্বন্ধীয় অপ্রীতিকর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ...মাদিগের নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পক্ষাবলম্বী কয় জন সেই ...্যাপার লইয়া যে দলাদলি ঘটাইতেছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম ...ন হইবার সম্ভাবনা—তাহার অস্তিত্বও বিপন্ন হইতে পারে। দাশ মহাশয় ...লিয়াছেন, বিশ্বভারতী যেন প্রতিষ্ঠাতার কল্পিত আদর্শ ত্যাগ না করে। ...ে আদর্শের সহিত জাতীয় সংস্কৃতির ধাতুগত যোগ আছে এবং তাহা ...াধ্যাত্মিকতার প্রভাবে পুষ্ট। ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার ...ভাব। সুতরাং বিশ্বভারতী যদি সেই অভাব পূর্ণ করিতে না পারে, ...বে সেই স্বাতন্ত্র্যহীন প্রতিষ্ঠানের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

এ বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়া-...লেন—নেহরু সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু। শ্যামা-...াদের রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন এবং ...না-বিচারে আটক আইনের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি যে ...নাভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সভাপতিত্ব কলিকাতা ...বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদিগের মনে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার ...রতে পারে না। তিনি কোন উল্লেখযোগ্য উক্তিও করিতে পারেন ...। যে প্রয়াগে এ বার কুম্ভ মেলা তিনি সেই প্রয়াগের লোক। তিনি ...গের পাণ্ডার মত ছাত্রছাত্রীদিগকে কুম্ভে যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ...ন বলিয়াছেন, স্বপ্নের ভারত সৃষ্টির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা ছাত্রছাত্রী-...গের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে স্বপ্ন কাহার? ভারতের দেশপূজ্য নেতৃগণের ...র ভারত—স্বাধীন, এক, অবিভক্ত। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করিয়াছেন—তাঁহাদিগের স্বপ্ন অন্যরূপ; বিশেষ তাঁহারা গণতন্ত্রের নামে যে শাসন পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যাঁহারা দেশকে বিভক্ত করিয়াছেন এবং এক দিন যেমন মহাচীনের সৃষ্টিতে বাধাদানকারী—বিদেশীর সহায় চিয়াং কাইশেকের সমর্থন করিয়াছিলেন—তেমনই কাশ্মীরে বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লার সমর্থন করিয়া কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের নামে তাহার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাঁহাদিগের স্বপ্ন কি ছাত্রছাত্রীরা সফল করিবে? না—সে স্বপ্ন তাহারা দুঃস্বপ্ন মনে করিবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার বলিয়াছেন, লোক যে শিক্ষার জন্য শিক্ষার আদরে অধিক অবহিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু চান্সেলারের বা ভাইস-চান্সেলারের বক্তৃতায় একটি বিষয়ের আলোচনা দেখিলে আমরা প্রীত হইতাম। এ দেশে জাতীয় সরকারও যে বিদেশী উপাধির আদর বৃদ্ধির আগ্রহ দেখাইতেছেন, ইহা যে কেবল দাসসুলভ মনোভাবের পরিচায়ক তাহাই নহে, পরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যেমন অপমানজনক, দেশের পক্ষে তেমনই লজ্জার কথা। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "এম, বি" উপাধিধারী ডাক্তারকেও "বিদেশী উপাধি" নাই—এই অজুহাতে অনাদর করা হইতেছে! যদি প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে স্বদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য পরীক্ষার মান উন্নত করাও ভাল; কিন্তু "উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্রছাত্রী প্রেরণ কখন সমর্থিত হইতে পারে না। ডাক্তারদিগের মধ্যে নীলরতন সরকার, কেদারনাথ দাস, সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদেশের উপাধিধারী কয় জন তাঁহাদিগের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে? দ্বারকানাথ মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ব্যবহারজীবরা কলিকাতায় শিক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধিধারিদ্বয়ের অন্যতর। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও বিদেশে শিক্ষার্থ গমন করেন নাই।

সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই বিদেশী উপাধির অকারণ আদর ঘটিতেছে। ইহাতে জাতির গতি যেমন প্রহত হইতেছে, তেমনই জাতির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ ও প্রতীকার প্রয়োজন।

ইংরেজের শাসনকালের শিক্ষা-পদ্ধতি আমরা জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া আসিয়াছি—

"We are dissatisfied with the conditions under which education is imparted in this country, its calculated poverty and insufficiency, its anti-national character……"

কিন্তু আজ ত আর দেশ পরাধীন নহে—তবে কেন বিদেশী উপাধিকে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির তুলনায় উচ্চ স্থান প্রদান করা হয়? ইহার কারণ কি এই যে, এক সম্প্রদায়ের লোকের নিকট "পরস্ত্রী মাত্রেং সুন্দরী?

বিদেশী উপাধিমাত্রেরই উচ্চ স্থান লাভের যোগ্যতা নাই।

বিমান ও রেল দুর্ঘটনা—

ভারতরাষ্ট্রে বিমান ও রেল দুর্ঘটনার বাহুল্য অনুসন্ধানের, চিন্তার ও আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শিক্ষার অভাব বা আবশ্যক সতর্কতার শৈথিল্য প্রকাশক, তাহা দেখিবার বিষয়। বিমানগুলি বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। সেগুলির অবস্থা পরীক্ষা করা হয় কি না এবং বিমান-চালকগণ আবশ্যক শিক্ষা লাভের পূর্ব্বেই চালকের ছাড় পায় কি না, তাহা দেখা হয় কি? এ বিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্প্রতি যে সকল বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকলের একটিতে নিহত সুনীলবিহারী চৌধুরীর মৃত্যুতে বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই বাঙ্গালী তরুণ হাওড়া

চৌধুরীপাড়ার শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। সুবোধবাবু বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একমাত্র সমুদ্রগামী—উপকূল বাণিজ্যে ব্যবহৃত—জাহাজের অধিকারী। তিনি চাঁদবালি ষ্টীমার কোম্পানীর অধিকারী এবং একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ষ্টীমার লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমে তিনখানি ষ্টীমার কোম্পানীর সম্পত্তি করিয়াছেন। শেষ ষ্টীমারখানি বড় এবং কোম্পানীর কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ভারত সরকার সেই ষ্টীমারের জন্য কোম্পানীকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন। সুনীল স্বয়ং ১৭ বৎসর বয়সে পিতার ব্যবসায় যোগ দিয়া তাহার সকল বিভাগের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া য়ুরোপে যাইয়া ও ষ্টীমার বাছিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কোম্পানীর কাজে তিনি মাদ্রাজে যাইতে ছিলেন—পথে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণকে এই আকস্মিক আঘাতে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা আশা করি ষ্টীমার প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিবেন।

আয়কর ও বিক্রয়কর—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইতেছে। সরকারের ব্যয় সংকুচিত করিতে না পারিলে যে লোকের কর-ভার লাঘব সম্ভব নহে, তাহা বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি পরিকল্পনার ও গৃহনির্ম্মাণের বাহুল্য হ্রাস না করেন, তবে লোকের পক্ষে করভার দুর্ব্বহই থাকিবে। আয়কর আদায় সম্বন্ধে ও বিক্রয়কর সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সরকার, বোধ হয় "imperial tyrant—State necessity" হেতু সে সকল দূর করিতেছেন না। বিক্রয় কর সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও স্বীকার করিয়াছেন—রন্ধনের জন্য লঙ্কা, ধনিয়া ও হরিদ্রা, লবণেরই মত, প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্য বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতি লাভের যোগ্য—তথাপি সরকারের নিকট সে কথার কোন গুরুত্ব নাই। এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার বিষয়—পুস্তকের উপর বিক্রয়-কর। ইহা জ্ঞান বিস্তারের পথ সঙ্কীর্ণ করে এবং বিদ্যার উপর কর বলিয়া সভ্যজগতে নিন্দনীয় বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই কর হইতেও লোককে অব্যাহতি দিতে অসম্মত! যে সরকার শিক্ষার প্রসার-পথে এইরূপ বিঘ্ন স্থাপিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, সে সরকার প্রজার কল্যাণ বিষয়ে কিরূপ অবহিত? পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের পক্ষে এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া এই ব্যবস্থা প্রত্যেক নির্ব্বাচনে ভোটদানের সময় বিবেচ্য বলিলে কাজ হইতে পারে।

নবকলেবর—

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ রাজ্যসঙ্ঘের অর্থাৎ কমনওয়েল্‌থের নূতন পরিকল্পনা—খৃষ্টমাস উপলক্ষে—ঘোষণা করিয়াছেন। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল তাহার সাম্রাজ্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল। সে বিষয়ে ফ্রান্সও তাহাকে ঈর্ষ্যা করিত। তাহার সাম্রাজ্যের পরিচয় ফরাসী লেখক "ম্যাক্সওয়েল" দিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষের বর্ণনা ছিল—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজমুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন—"an Empiire of two hundred and eighty millions of people, ruled by princes litenally covered with gold and precious stones, who black his boots and look happy." ভারত আজ আর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে অংশ ইংরেজের কৌশলে সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন নহে—তাহার সহিত নূতন সম্বন্ধ রচিত হইয়াছে—"কমনওয়েল্‌থ।" ভারত স্বায়ত্ত-শাসনশীল, কিন্তু সেই স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ এই যে—ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেকে যাইয়া "ছায়াসম যথা নিশপতি কাছে"—থাকিতে হয়।

আবার কাহারও কাহারও সন্দেহ—যুদ্ধে দুর্ব্বল ইংলণ্ড ও যুদ্ধে সমৃদ্ধ আমেরিকা একযোগে পৃথিবীর সকল দেশ প্রভাবিত করিতে চাহিতেছে।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ আর ভারতের সাম্রাজ্ঞী নহেন। এ বার তিনি বলিয়াছেন—

"কমনওয়েল্‌থের সহিত সেকালের সাম্রাজ্যের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই—It is an extremely new conception—built on the highest qualities of man, friendship, loyalty and the desire for freedom and peace."

কথাগুলি শুনিতে ভাল। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি? বৃটিশ গায়েনা প্রকৃতি স্থানে আমরা কি দেখিয়াছি? সুদানকে মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসের কারণ ও উদ্দেশ্য কি? রাশিয়ার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব কিসে?

এ সকল বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—কমনওয়েল্‌থ সাম্রাজ্যেরই রূপান্তর বা নবকলেবর। সেইজন্যই ভারত রাষ্ট্রকে কমনওয়েল্‌থ ত্যাগ করাইবার আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কমনওয়েল্‌থে থাকাতেই ভারত রাষ্ট্রকে টাকার মূল্য পাউণ্ডের মূল্যের সহিত সামঞ্জস্য-সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান-পথ বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত হইয়াছে। কমনওয়েল্‌থ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আকাশ-কুসুম না হইলেও মৃগতৃষ্ণিকা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

দুইটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশে অনাক্রমণ বা আক্রমাত্মক চুক্তি হইতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশ কমনওয়েল্‌থে থাকে, তাহাদিগের মধ্যে সেরূপ ব্যবস্থা হয় না। না হইবার কারণ, প্রবল পক্ষের স্বার্থে দুর্ব্বল পক্ষকে অবহিত থাকিতে হয়; সে জন্য স্বীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন করিতেও যে হয় না, এমন নহে। বিশেষ দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, কমনওয়েল্‌থে সকলের পক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা করাও সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

এই সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয়—কমনওয়েল্‌থের যে নূতন ও পরিবর্ত্তিত আদর্শ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর আকৃষ্ট হইবার কোন কারণ নাই—থাকিতে পারে না। ভারতরাষ্ট্র যদি তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে—তবে সে স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করিবে। সে সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—অপরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

রাশিয়ায় দেশদ্রোহী—

রাশিয়ার আদালতের বিচারে সোভিয়েট নির্বিঘ্নতা বিভাগের পদচ্যু

প্রধান লাভরেন্টি বেরিয়া ও তাঁহার ৬ জন সহকর্ম্মীর প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। আদালতের নির্দ্ধারণ—তাঁহারা স্বদেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করিয়াছিলেন। বেরিয়ার সহকর্ম্মী—

(১) মার্কুল অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন
(২) ভ্যাল্‌ডিমীর ডিকানোজভ জিয়র্জ্জিয়ার মন্ত্রী ছিলেন
(৩) পস মেস্কিন—ইউক্রেইনের মন্ত্রী ছিলেন
(৪) ভল্‌ডজীমীরস্কি—স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন
(৫) সারজেল গ্যাগলিটজে—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন
(৬) কেবিউলং—সহকারী মন্ত্রী ছিলেন।

ইঁহাদিগের পরিচয়ে মনে করা যায়—ইঁহারা কোন ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বিচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। হয়ত তাহা প্রকাশ রাষ্ট্রের নির্ব্বিঘ্নতার পক্ষে অসঙ্গত। কিন্তু এই ঘটনা লইয়া যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা হইতেছে ও হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

রাশিয়া তাহার মতবাদের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদিগের ও ধনতান্ত্রিকদিগের অপ্রিয়। তাঁহারা যত দিন পারিয়াছিলেন, রাশিয়াকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপনেও বিরত ছিলেন। এখনও যে পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি হইয়াছে, তাহার সহিত যে রাশিয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এমন বলা যায় না। যাঁহারা রাশিয়ার প্রতি বিরূপ, তাঁহারা বলিবেন—

(১) ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, রাশিয়ার অশান্তির অভাব নাই; সে অশান্তি অসন্তোষের অভিব্যক্তি। হয় রাশিয়ার রাজনীতিকদিগের ক্ষমতা লইয়া কলহ আছে, নহে ত শাসননীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

(২) রাশিয়া তাহার সব সংবাদ প্রকাশ করে না। তাহা স্বৈরাচার।

(৩) হয়ত মতভেদ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সহ্য করিতে অসম্মত এবং সেইজন্য মতভেদ দলিত করিবার জন্য সকল উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত।

রাশিয়ার সমর্থকগণ বলিবেন, দেশদ্রোহীর দণ্ডদান ব্যতীত রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে অরবিন্দের উক্তি, তাহা না হইলে—

"The example of unpunished treason will tend to be repeated and destroy by a kind of dryrot enthusiastic unity..."

ভারত রাষ্ট্রেও যে বিনাবিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণ আইনসঙ্গত, তাহা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রাশিয়ার কথা লইয়া—প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ না পাইলে—আলোচনা করা যায় না। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, রাশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকায়, ইংলণ্ডে—এমন কি ভারতেও সরকারের যে আতঙ্ক দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রকৃত অবস্থার বিকৃত রূপ প্রকট হওয়াও অসম্ভব নহে; কারণ, সেরূপ মনোভাব থাকিলে রজ্জুকে সর্পভ্রম হয়—ধূমজাল দৈত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

রাশিয়ার ঘটনা তাহার আপনার বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অপরের তাহা লইয়া কেবল অকারণ আলোচনা।

পাকিস্তানে নূতন ব্যবস্থা—

কথায় বলে "ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।" সেই হিসাবে খণ্ডিত ভারতবর্ষের যে অংশ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আজ পাকিস্তান, তাহা বিদেশ। তাহা কেবল বিদেশই নহে, তাহার সহিত সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টায় ভারতের "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত" হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত সরকার দেশ বিভাগ হইতেই যে তোষণনীতি পরিচালনা করিয়া আসিতেছে, তাহা যতই অহিংসাদ্যোতক কেন হউক না, তাহার সমীচীনতা সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারেন না। পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে মধ্যে মধ্যে হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। আমরা জানি, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোন মুসলমান-প্রধান পল্লী হইতে মুসলমানরা কেহ কেহ "কাশ্মীর হামারা"—লিখিত ঘুড়ী উড়াইয়াছিল। কাশ্মীর লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান কিরূপ হইবে বা হইতে পারে, বুঝা যায় না। কাশ্মীরে সহসা যুদ্ধবিরতির কারণ জানা যায় নাই। পাকিস্তান চুক্তির সর্ত্ত পালন করে নাই। এ বার পাকিস্তান আমেরিকার সহিত চুক্তি করিয়াছে—আমেরিকা তাহাকে সমর-সরঞ্জামে সুসজ্জিত করিবে। কেন?

প্রথমেই মনে হয়, রাশিয়াকে পরিবেষ্টিত করিবার জন্য ঘাঁটী প্রতিষ্ঠা করিতে আমেরিকা আগ্রহশীল। সেজন্য কাশ্মীরের যে অংশ এখন পাকিস্তানের হস্তগত তাহাতে ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাশিয়ার ভয়ে ইংরেজ একদিন যে গিলগিট অধিকার করিতে ব্যগ্র হইয়াছিল—সেই গিলগিটে ঘাঁটী স্থাপিত হইতে পারে। প্রকারান্তরে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তানের হইতে পারে। কারণ, যুদ্ধবিরতির পরে কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ পাকিস্তানের দ্বারা অধিকৃত হইয়া আছে, তাহাতেই আমেরিকার ঘাঁটী হইবে। অবশিষ্ট অংশত্রয়ের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা মুসলমান-প্রধান এবং তাহাতে যে শেখ আবদুল্লার প্রাধান্য ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার চুক্তিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রোষ, অসন্তোষ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারত সরকার কম্যুনিষ্ট চীনকে মানিয়া লইলেও রাশিয়ার সম্বন্ধে সে ভাব কাটাইতে পারেন নাই। তবে এতদিন পরে রুশিয়ার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী মন্ত্রী ভারতে আসিয়াছেন এবং ভারত সরকারই তাঁহার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে যদি ভারত সরকারের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা বলা যায় না। কথায় বলে "গরজ বড় বালাই"। সেই হিসাবে যদি মনোভাব-পরিবর্ত্তন হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না। বহুদিনের কথা—সাংবাদিক ষ্টেড লিখিয়াছিলেন, পৃথিবী রঙ্গমঞ্চ—দেশসমূহ অভিনেতা এবং তাহারা পরস্পরের নৃত্যসঙ্গীর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী একযোগে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন জাপান এই তিনের পক্ষে ছিল—মিশর তুরস্কের অধীনতা ত্যাগ করিয়া এই পক্ষেই যোগ দিয়াছিল; আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইটালী জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ও জাপান সেই পক্ষে যোগ দিয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমেরিকার ব্যবহার রহস্যজনক হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকা ভারত সরকারকে কৃষির যন্ত্রপাতি, রেলের এঞ্জিন ও মালগাড়ী প্রভৃতি দিতেছে এবং ভারত সরকারও কম্যুনিটী প্রোজেক্ট প্রভৃতির জন্য তাহার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন; আবার সে পাকিস্তানের সহিত সামরিক চুক্তিতে বদ্ধ হইতেছে। অথচ সেই সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ ভারত সরকারের বক্তৃতাবিলাসী প্রধান মন্ত্রী তার স্বরে ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিতেছেন, কাহারও ভয়ে পাকিস্তান আমেরিকার সহিত চুক্তি সম্পাদনে বিরত থাকিবে না। কেবল তাহাই নহে, চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে দলে দলে মুসলমান বে-আইনীভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে! পাকিস্তানে যে যুদ্ধোদ্যম লক্ষিত হইতেছে, তাহা কিসের জন্য?

ভারত সরকার যতই কেন বলুক না, কাশ্মীর ভারতভুক্ত এবং কাশ্মীরের করণ সিংহ যতই কেন ঘোষণা করুন না, কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি হইয়াছে, পাকিস্তান কখন সে কথা বলে নাই এবং কাশ্মীরের যে অংশ সে অধিকার করিয়া আছে, তাহা ত্যাগের কোন সম্ভাবনাও

দেখা যাইতেছে না। কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতির আদেশের কারণও বুঝিতে পারা যায় না।

পাকিস্তান সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছে, তাহা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে, পরন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র। সে তথায় মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা তাহার চুক্তির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে। অথচ তাহা জানিয়াও আমেরিকা তাহার সহিত সামরিক চুক্তি করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ইহাতে কি বুঝায়, তাহা ভারত সরকারকে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। কারণ, বিপদ ঘটিলে সেজন্য ব্যবস্থা করা অপেক্ষা বিপদ যাহাতে ঘটিতে না পারে, পূর্ব্বাহ্নে তাহার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থালম্বনই রাজনীতিকোচিত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র অধিকারের অভিপ্রায় আছে কি না, তাহা অনুমান করিয়া কাজ করাই আজ প্রয়োজন।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের সহিত গ্রেট বৃটেনের যে চুক্তি হইয়াছিল, আফগানিস্তান তাহা বাতিল করায় পাকিস্তান উদ্বিগ্ন হইয়াছে এবং আফগানিস্তান হইতে তাহার রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ করিবার জন্য—করাচীতে আসিতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। ঐ চুক্তি যখন সম্পাদিত হইয়াছিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের শাসনাধীন ছিল এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পরে—বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই চুক্তি অনুসারেই পাকিস্তানের সীমান্ত-ব্যবস্থা ও রাজনীতিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে। গ্রেট বৃটেনের সহিত চুক্তি বাতিল হওয়ায় উভয় দেশে নূতন চুক্তি সম্পাদন প্রয়োজন হইয়াছে অর্থাৎ পুরাতন চুক্তির সর্ত্তের পুনঃগ্রহন বা নূতন সর্ত্ত প্রবর্ত্তন এখন উভয় দেশের বিবেচনার বিষয় হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে যে ইস্‌লামিক রাষ্ট্রগঠনের কল্পনা কাহারও কাহারও উর্ব্বর মস্তিষ্কে আবির্ভূত হইয়াছিল, রাশিয়ার ও চীনের নূতন নীতিতে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইন্দোনেশিয়ার ভাবও অনুরূপ দেখা যাইতেছে। কোন কোন দেশ রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অস্বীকার করিতেছে। সে অবস্থায় রাজনীতিক চুক্তি ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত ও সম্ভব কি না, তাহা সকলেরই বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। আফগানিস্তানের সহিত ইসলামাতিরিক্ত দেশসমূহের চুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই তাহাকে পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিতে হইবে। এখন গ্রেট বৃটেনের সহিত আফগানিস্তানের স্বার্থ-সম্বন্ধ আর প্রত্যক্ষ নহে—পরোক্ষ, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। নূতন চুক্তি হইলে তাহার প্রভাব ভারতে কিরূপ অনুভূত হইবে?

১৫ই পৌষ, ১৩৬০

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

আত্মহত্যা

বিষপানে, গলায় ফাঁস দিয়ে, জলে ডুবে, কেরোসিনে পুড়ে মেয়েদের আত্মহত্যার খবর সংবাদ পত্রে প্রায়ই চোখে পড়ে। লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে যে-সব মহিলারা আত্মহত্যা করেন তাঁদের বয়স পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, অর্থাৎ যৌবনেই তাঁরা আত্মঘাতী হন। একটু বয়স হ'লে, বুদ্ধি বিবেচনা পরিণত হ'লে, সংসারের পাঁচটা আকর্ষণের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে মেয়েরা আর এ হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেন না। আর এও লক্ষ্য করা গেছে, যে, যৌবনে যাঁরা তাঁদের দুর্লভ নারী জীবনটাকে অনায়াসে মৃত্যুর চরণে উপহার দেন তাঁরা অতি তুচ্ছ কারণেই অর্থাৎ হয় শ্বাশুড়ীর উপর, নয়ত ননদের উপর কিংবা স্বামীর উপর অভিমান ক'রেই নিজেকে হত্যা করেন। আত্মহত্যা খুনেরই পর্য্যায়ে পড়ে। নিজের জীবন শেষ ক'রে দেওয়া এবং অপরকে খুন করে তার জীবন নাশ করা একই কথা। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁদের জীবন তো কেবলমাত্র তাঁদেরই নিজস্ব একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তিনি যে পিতা মাতার আদরের কন্যা! যাঁরা তাঁকে আজন্ম যত্নে মানুষ ক'রে বহু অর্থ ব্যয়ে বিবাহ দিয়েছেন, তাঁদের ও যে কন্যার জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। ভাই বোনেদেরও অনেকটা স্নেহের দাবী থাকে সে জীবনের উপর। তারপর, স্বামীর কথাও ভাবতে হবে। যাঁর হাতে পিতা মাতা কন্যাকে সম্প্রদান করেছেন, অগ্নি সাক্ষ্য রেখে যিনি মন্ত্র পড়ে বিবাহিতা পত্নীরূপে তাঁকে গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁর যে অধিকার রয়েছে ওই জীবনের উপর। তার পর পুত্র কন্যা, যাদের জননী তিনি, যাদের লালন পালনের ভার তাঁর উপর—সে জীবন তিনি নষ্ট করেন কি অধিকারে? তাই আত্মহত্যাকে সকল দেশের সকল শাস্ত্রই বলে মহাপাপ। উহা বংশের ও পরিবারের পক্ষে একান্ত গ্লানিজনক। সকল মেয়েই ইহা জানেন। কিন্তু, তবু এ কাজ করেন কেন? সংসারের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে, শ্বাশুড়ী ননদের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে, স্বামীর অবহেলার অভিমানে, নয় পিতৃবংশের অসম্মানে অপমানিত বোধ করে? অনেকে বলেন বটে যে, মেয়েদের আত্মহত্যার এই গুলিই প্রধান কারণ। কিন্তু, এ ছাড়াও আরও কারণ আছে, যা সেই আত্মহত্যাকারিণীর চরিত্র ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। সেগুলি সাধারণতঃ অস্বাভাবিক একগুঁয়েমি, অপরিমিত অহংকার ও অভিমান, ভীষণ রাগী স্বভাব এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ মানসিকতা। মূর্খতা, সাধারণ জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অভাব এবং সহনশীলতা না থাকাও এই আত্মহত্যার মূলে কাজ করে। আমি মনে এদের জন্য

করবো – সেই 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের' প্রবৃত্তিও এর মধ্যে থাকে।

আত্মহত্যার যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষ মুহূর্তে অনেকেই বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন, কিন্তু, তখন হয়ত অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে! এ সব ঘটনা অতীব শোচনীয়। মৃত্যু হ'লো তো বুঝলুম না' হয় মুক্তি। কিন্তু, যদি দৈবাৎ বেঁচে যান! হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সেই দাহ-ক্ষত দেহ নিয়ে গুরুতর অপরাধ জনিত লজ্জার ভারে মুখ দেখাতে সকলেরই সংকোচ বোধ হয় না কি? যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে যখন তারই মধ্যে আবার ফিরে আসেন, তখন কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তাঁদের আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি হয় না এই একমাত্র শুভ ফল দেখতে পাই বটে। এটা হ'ল একটা পরীক্ষিত সত্য—'যে সহ করতে পারে শেষ পর্যন্ত সেই জয়ী হয়।' তাই আমাদের বক্তব্য হ'ল, প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ও মূল্য আছে—এটা ভুলে আত্মহত্যারূপ পরাজয় যেন কেউ না বরণ করেন।

সাধুভক্তি

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তিমতী হওয়াটা মেয়েদের ধর্ম-প্রবণ চিত্তের একটা স্বাভাবিক গতি। এটা দোষের বা নিন্দার বলা চলে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা' একটু বেশি রকম বাড়াবাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের ভক্তির মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন না। কখনও কখনও এমনও হয়েচে দেখা যায় যে সাধু সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষ মনে ক'রে তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের ফলে বহু মহিলা প্রতারিত হয়েছেন! কেন হয়েছেন? এজন্য তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসীদের দোষ দেওয়া চলে না। দোষ তাঁদের নিজেদেরই। কারণ, অধিকাংশ মহিলাই এই সাধুসঙ্গ ক'রতে যান তাঁদের পরমার্থিক উন্নতি বা গতি-মুক্তির জন্য নয়, তাঁদের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, ও অভাব অভিযোগের প্রতিকার কামনায়। তারা কেউ মুক্তি বা অক্ষয় স্বর্গ কামনা করেন না। তাঁরা গিয়ে সাধুকে বলছেন 'বাবা, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন সে যেন জলপানি পেয়ে পাশ করে।' কেউ বলছেন 'আমার পুত্রবধুকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন একটি সোনারচাঁদ নাতি পাই।' কেউ বলছেন, 'বাবা, জামাই আমার মেয়েকে নিয়ে ঘর করচে না, আপনি তাকে দয়া না-করলে মেয়েটার জীবন যে নিষ্ফল হয়ে যাবে।' কেউ বলছেন, 'আমার স্বামী আজ ছ'মাস শয্যাগত, তাঁকে সুস্থ করে দিন বাবা!' সবচেয়ে চরম প্রার্থনা হ'ল 'বাবা, আমার সর্বনাশ হয়েছে! আমার যথাসর্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে! সোনা রূপো হীরে মুক্ত জড়িয়ে প্রায় দশ হাজার টাকা হবে। দোহাই বাবা! আমায় বাঁচাও। আমার হারানিধি পাইয়ে দাও।' মামলায় জিতিয়ে দিন, লটারীর টিকিট পাইয়ে দিন, চাকরি জুটিয়ে দিন—এ সব আব্দারও আছে।' আমি বলতে চাই না যে সব সাধু সন্ন্যাসীই বুজরুক, তবে কিনা, যাঁরা অগণিত শিষ্য সেবক নিয়ে এক এক স্থানে এসে বেশ কিছুদিন জাঁকিয়ে বসেন, পূজা, যজ্ঞ, হোম ভাগবত ও চণ্ডীপাঠ, নামকীর্তন, অষ্টপ্রহর প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা ভীড় জমিয়ে রাখেন। অকৃপণ হস্তে প্রসাদ বিতরণ এবং দিয়তাং ভুজ্যতাং চলতে থাকে দিনের পর দিন,—সেখানে দৈবী প্রভাব ও ঐশী শক্তির চেয়ে ব্যবসায়ী বুদ্ধিটাই কি অধিকতর প্রকট হ'য়ে ওঠে না? এমন অনেক ভক্তিমতী মেয়ে আছেন যাঁরা স্বামী পুত্র সংসার ফেলে গুরুদেবের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ান। তিনি যেখানে যান এই সব অতিভক্তি-পরায়ণা শিষ্যারাও সেখানে যান। ভক্তি অবশ্য ভালো, কিন্তু, অন্ধভক্তি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর এবং অতিভক্তি অপরাধনজক! এঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে কে প্রভুকে বেশি চেনে? কার প্রতি গুরুদেব অধিক প্রসন্ন? কে সাধুবাবার সব চেয়ে বেশি শিষ্যা সংগ্রহ করে দিয়েছে? অথবা, সর্বাধিক প্রণামী পাইয়ে দিয়েচে কে? এঁরা গুরুদেবের নানা অলৌকিক শক্তি ও তাঁর সাধন ভজনের আশ্চর্য সিদ্ধির সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক সব গল্প শুনিয়ে সাধুবাবার ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে থাকেন, অনেকটা দালাল বা আড়কাঠিরা যা ক'রে থাকেন আর কি। কিন্তু, মজা হ'চ্ছে এই যে এঁরা সচেতন মন নিয়ে এটা করেন না। প্রভাবান্বিত হয়েই করেন। সেই যে রবীন্দ্রনাথের গান আছে—"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা!" এঁরা ঠিক সেই ভাবেই এঁদের গুরুদেব সাধুবাবাদের মহিমা রচনা করেন অনেক সময় নিজেদের মনের অজ্ঞাতসারেই। এর একটা প্রত্যক্ষ অনিষ্টকর কুফল এই দেখা যাচ্ছে যে দিন দিন এই ধরণের পেশাদার মাতাজী ও সাধু সন্ন্যাসীদের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। বহু পরি-বারের বহু অর্থ এঁরা শোষণ করছেন ও অপব্যয় করছেন। ক্বচিৎ কখনো দু'একটা সৎকাজে এই সাধুবাবারা কিছু মুষ্টিভিক্ষা দেন বটে, কিন্তু, বেশির ভাগই জমে ওঠে মঠে বা আশ্রমে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের মেয়েদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করি।

আল্পনা প্যাটার্ণ

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

(তু'রঙা উল দরকার)

(১৭ ঘরে)

১। সব সোজা, তবে ৭ ঘর সাদা, ৩ কালো, ৭ সাদা।

২। সব উল্টা, তবে ১ সাদা, ৪ কালো, ১ সাদা, ১ কালো, ১ সাদা, ১ কালো, ১ সাদা, ১ কালো ১ সাদা, ৪ কালো, ১ সাদা।

৩। সব সোজা তবে, ১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ১ সা।

৪। সব উল্টা তবে, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ২ কা, ৩ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা।

৫। সব সোজা তবে, ১ সা, ১ কা, ২ সা, ১ কা, ১ সা, ৫ কা, ১ সা, ১ কা, ২ সা, ১ কা, ১ সা।

৬। সব উল্টা তবে, ২ সা, ২ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা।

৭। সব সোজা তবে, ১ সা, ৬ কা, ৩ সা, ৬ কা, ১ সা।

৮। সব উল্টা তবে, ১ কা, ৩ সা, ২ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ২ কা, ৩ সা, ১ কা।

৯। সব সোজা তবে, ৩ কা, ১ সা, ১ কা, ২ সা, ৩ কা, ২ সা, ১ কা, ১ সা, ৩ কা।

১০। সব উল্টা তবে, ১ কা, ৩ সা, ২ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ২ কা, ৩ সা, ১ কা।

১১। সব সোজা তবে, ১ সা, ৬ কা, ৩ সা, ৬ কা, ১ সা।

১২। সব উল্টা তবে, ২ সা, ২ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা।

১৩। সব সোজা তবে, ১ সা, ১ কা, ২ সা, ১ কা, ১ সা, ৫ কা, ১ সা, ১ কা, ২ সা, ১ কা, ১ সা।

১৪। সব উল্টা তবে, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ২ কা, ৩ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা।

১৫। সব সোজা তবে, ১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ১ সা।

১৬। সব উল্টা তবে, ১ সা, ৪ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ৪ কা, ১ সা।

১৭। সব সোজা তবে, ৭ সা, ৩ কা, ৭ সা।

এই প্যাটার্ণটি সোয়েটারের বর্ডারে দিলে চমৎকার দেখাবে।

চিত্তরঞ্জনে শততম এঞ্জিন নির্মাণ—

পশ্চিমবঙ্গের বিহার সীমান্তে মিহিজামের নিকট 'চিত্তরঞ্জন' নামক নূতন সহর ও কারখানায় রেলের এঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। শততম এঞ্জিনখানির নির্মাণ কার্য্য শেষ হওয়ায় গত ৬ই জানুয়ারী তথায় এক উৎসব হইয়াছিল। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী) তথায় যাইয়া উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে এই কারখানার নামকরণ করা হইয়াছে এবং কারখানার সর্বত্র দেশবন্ধুর ছবি রাখার ব্যবস্থা থাকায় বাঙ্গালী দর্শক মাত্রেরই তাহা আনন্দের কারণ হয়। এই কারখানা সম্পূর্ণ হইয়া চলিলে ভবিষ্যতে আর অধিক মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে রেল এঞ্জিন কিনিয়া আনার প্রয়োজন থাকিবে না।

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক—

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক রচনা সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এ বৎসর কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। কবিশেখরের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে

কবিশেখর কালিদাস রায়

দেশের প্রত্যেক সাহিত্যরসিকই আনন্দিত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল, হীরেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী, কামিনী রায়, মানকুমারী, অনুরূপা, প্রমথ চৌধুরী, রায়বাহাদুর যোগেশ রায়, কেদারনাথ, নিরুপমা, রাজশেখর, কাজি নজরুল, করুণানিধান প্রভৃতি দেশ-বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিকরা ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই জগত্তারিণী পদক পাইয়াছেন। ইহাতে গ্রহীতা অপেক্ষা দাতারই গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। এ বৎসরও কবিশেখরকে সম্মানিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক—

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শ্রীমতী সুষমা মিত্র ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী মিত্রের সাহিত্যের অবদান সামান্য হইলেও চমকপ্রদ।

শ্রীমতী সুষমা মিত্র

ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহার সুলিখিত ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি তাহাতে সুযশ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

সম্মান দান ব্যবস্থা—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন লোক ভাল কাজ করিবেন—তাঁহাদিগকে (সরকারী কর্মচারীরা কর্মদক্ষতা দেখাইলে তাঁহাদিগকেও) পথ বিভূষণ পদক দিয়া সম্মানিত করিবেন স্থির হইয়াছে

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদক দেওয়া হইবে। জাতি, পেশা, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উহা পাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জনসেবায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য 'ভারতরত্ন' উপাধি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হইবে। নূতন ভাবে এই সম্মান দানের ব্যবস্থা সর্বত্রই সমর্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র পশ্চিমবঙ্গসরকার কর্তৃক

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২১শে ডিসেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁহার নূতন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত মিত্র ভারতসরকারের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

মাতৃ কল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা—

সম্প্রতি কলিকাতার ন্যাশানাল হেলথ্ সার্ভিস নামক এক প্রতিষ্ঠান একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে এবং শহরে প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য তাহাই আলোচিত হইয়াছে। ভারতে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যে কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নয়। শিশুরাই ভারতের ভবিষ্যৎ এবং আজকের শিশুই হয়তো আগামী দিনে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দেশের নায়কগণের ও দেশবাসীর একান্ত কর্তব্য। তেমনি কর্তব্য প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারণ এই প্রসূতির পরেই শিশুর লালন পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব বর্তমান। ডাঃ ডি-কে-চৌধুরীর পরিচালনায় ন্যাশানাল হেল্থ সার্ভিস যে প্রসূতি পরিচর্যা ও শিশু পালন ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া ইহার প্রতি দেশের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠানটির এই মহান কর্মসূচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়াছেন। আমরাও একান্ত মনে এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি, সেই সঙ্গে সরকারকে ও দেশবাসীকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ভারতের লেখক ও শ্রীনেহেরু—

৫ই জানুয়ারী নাগপুরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—সাহিত্য সম্মিলনগুলি সাহিত্যিকদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করে না—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রকাশকরা দরিদ্র লেখকদের নিকট হইতে অল্পদামে পুস্তকের স্বত্ব কিনিয়া প্রচুর লাভ করেন। লেখকদের এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আইন করা প্রয়োজন। ভারতকে উন্নত করার জন্য তিনি ভারতীয় লেখকগণকে ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি সম্পর্কে গ্রন্থ লিখিতে উপদেশ দেন। শ্রীনেহেরু যে ভারতীয় লেখকগণের দুঃখের কথা জানেন, ইহাই লেখকদের পক্ষে সান্ত্বনার কথা।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শুভেচ্ছা—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নব বর্ষের (১লা জানুয়ারী) শুভেচ্ছা বাণীতে জানাইয়াছেন—বেকার সমস্যার ক্রমবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে রাজনৈতিক মতবাদ ও দলীয় আনুগত্য নির্বিশেষে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একযোগে কর্তব্য পালনে তৎপর হইতে হইবে। নূতন বৎসর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জীবনের প্রত্যেকক্ষেত্রে প্রতি জনের নিকট নূতন আশা, নূতন উপলব্ধি ও নূতন আনন্দবর্দ্ধন করিয়া লইয়া আসিবে। ডাক্তার রায় আশাবাদী, সে জন্য পরিণত বয়সেও তিনি বিরাট আশা লইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে নূতন খনিজ প্রাপ্তি—

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীকেশবদেব মালব্য কলিকাতায় সাংবাদিক সম্মিলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভারতের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে ম্যাঙ্গানিজ ছাড়া স্বর্ণ ও তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত

হইয়াছে। উক্ত আবিষ্কার বিশেষ আশাপ্রদ। পশ্চিমবঙ্গে তৈল নিষ্কাশনের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহিত ভারত সরকারের চুক্তি হইয়াছে! স্বাধীন ভারতে যাহাতে নূতন নূতন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়া দেশ উন্নত হয়, সেজন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন!

কাজি নজরুল ইসলাম—

খ্যাতনামা কবি কাজি নজরুল ইসলাম মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ প্রেরণ করা হইয়াছিল। চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় গত ১৫ই ডিসেম্বর তিনি পত্নী ও পুত্রের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও রোগে কষ্ট পাইতেছেন। কবির রোগ মুক্তি না হওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

সীমান্ত গান্ধীর মুক্তিলাভ—

৬ই জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডি জেল হইতে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খানকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ৬ বৎসর কাল তিনি কারাগারে বাস করিতেছিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবকেও মুক্তিদান করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গাজর ও ওলকপির চাষ করিবেন।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র সেন—

স্বর্গত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের পুত্র রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান ছিলেন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট রূপেও কাজ করিয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি জনহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রী—

গত ১২ই আশ্বিন বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয় আশি বৎসর বয়সে কলিকাতার আরপুলি লেনস্থ নিজ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার আন্তর্গত, কোঁড়কদী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ময়ুর ভট্ট বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই বংশে বহু দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ও সিদ্ধপরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় কেবল বিখ্যাত পণ্ডিতই ছিলেন না, একজন সুকবিও ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে সেই সকল কবিতা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিরতিশয় নিষ্ঠাবান, নিরভিমান ও পরোপকারী সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দুই পুত্র পৌত্র ও অগণিত আত্মীয় পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৩৮ (উমরাগড় ১১২ নট আউট; রামচাঁদ ৩৫। বেরী ৬১ রানে ৪ এবং আইভারসন ৭৮ রানে ৪ উইঃ) ও ১৯০ (রামচাঁদ ১১১। আইভারসন ৪৭ রানে ৬ এবং লোডার ৪৪ রানে ৩ উইঃ)

রজত জয়ন্তী ঃ ২৪৫ (মিউলম্যান ৭৫, এমেট ৩৯। গুপ্তে ৯৫ রানে ৬ এবং গোলাম আমেদ ৬৪ রানে ৩ উইঃ) ও ১৮৭ (৪ উইকেটে। মার্শেল নট আউট ৮৮, ওয়াটকিন্স নট আউট ৫৫। সুন্দরম ৩৬ রানে ২ উইঃ)

ক'লকাতায় রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে ভারত বনাম রজত জয়ন্তী দলের তৃতীয় বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় রজত জয়ন্তী দল ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ফলে বর্ত্তমানে টেষ্ট খেলার ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে—ভারতবর্ষ দিল্লীর ১ম টেষ্ট খেলায় এবং রজত জয়ন্তী দল ক'লকাতায় ৩য় টেষ্ট খেলায় জিতেছে এবং বোম্বাইয়ের ২য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। এখনও দু'টি টেষ্ট বাকি, মাদ্রাজের ৪র্থ টেষ্ট এবং লক্ষ্ণৌর ৫ম টেষ্ট। বোম্বাইয়ের তুলনায় ভারতীয় দল ৩য় টেষ্ট ম্যাচে দুর্ব্বল ছিল। ভারতীয় দলে ভিন্নু মানকড় এবং ফাদকার ছিলেন না। রজত জয়ন্তী দলের ওরেল এবং রামাধীন নিজ দেশের টেষ্ট খেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে দল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের শূন্যস্থান নিয়েছিলেন ইংলণ্ডের চৌকস খেলোয়াড় এলেন ওয়াটকিন্স এবং অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট বোলার জ্যাক আইভারসন। ওয়াটকিন্স আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। ১৯৫১-৫২ সালে নাইগেল হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসে ৫টি টেষ্ট খেলায় ৪৫১ রান (এভারেজ ৫৪.৪২) করেছিলেন। জ্যাক্ আইভারসন মাত্র একটা টেষ্ট সিরিজ খেলেছিলেন, ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫০-৫১ সালে; বোলিং গড়পড়তায় দলের পক্ষে প্রথমস্থান পেয়েছিলেন ২১টা উইকেট নিয়ে। ঐ টেষ্ট সিরিজে তাঁর অদ্ভুত বল দেওয়ার পদ্ধতি ইংলণ্ডের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৩য় টেষ্টে তাঁর বলে ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২১ রানে। অষ্ট্রেলিয়া দলে আইভারসন পরবর্ত্তী কোন টেষ্ট সিরিজে স্থান পাননি। টেষ্ট খেলা থেকে অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড় আইভারসন যে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের কাছে এতখানি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন তা খেলার আগে পর্য্যন্ত আমরা ধারণা করতে পারিনি।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক টসে জয়ী হ'ন। প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও ভারতবর্ষ লাভবান হয়নি। লাঞ্চের সময় ৩ উইকেট পড়ে ৭২ রান ওঠে। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৬ রান করে। উমরীগড় নট আউট ১০০। আইভারসনের বলে ৪টে উইকেট পড়ে যায়—রায়, অধিকারী, হাজারে এবং গাদকারী। বেরী পান ৪টে উইকেট। দলের দারুণ পতনের মুখে পলি উমরীগড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁর পরই রামচাঁদের রান। দ্বিতীয় দিন পাঁচ মিনিট খেলার পরই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৩৮ রানে শেষ হয়। রজত জয়ন্তী দল ২য় দিনে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান করে।

৩য় দিনে রজত জয়ন্তী দলের ১ম ইনিংস ২৪৫ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষের থেকে তারা ৭ রানে এগিয়ে যায়। শেষ উইকেটে আইভারসন খেলতে নেমে ২০ রান করেন—দলের পক্ষে এ রান খুবই মূল্যবান হয়েছিলো। ভারতবর্ষ ৭ রান পিছনে পড়ে ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে। মাত্র ৩০ রানে দলের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। সমস্ত মাঠের দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হয়ে যান। ভারতবর্ষ ৪৫ মিনিট খেলে মাত্র ১৮ রান করেছে। এমন সময় আইভারসন প্রথম বল করতে নামলেন। সমস্ত মাঠ নিস্তব্ধ; দর্শকদের চোখের পাতা স্থির হয়ে গেছে। আইভারসনের প্রথম ওভারের ৫ম বলে অধিকারী এল বি ডব্লু হয়ে আউট হলেন। তাঁর শূন্য উইকেটে মঞ্জরেকার খেলতে নামলেন এবং আইভারসনের ৬ষ্ঠ বলে কোন রান না করেই বোল্ড হ'লেন।

আইভারসনের ওভার শেষ হয়ে গেল নতুবা হ্যাট-ট্রিক হ'ত না বলার মত মনের বল আমাদের ছিল না। ৯০ মিনিটের খেলায় ৩০ রানে দলের অর্দ্ধেক উইকেট পড়েছে—অধিকারী, মঞ্জরেকার, হাজারে, রায় এবং উমরীগড় আউট হয়েছেন। এর পর আশা ভরসা দর্শকদের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। আইভারসন শেষ পর্য্যন্ত কটা উইকেট পান এবং ভারতীয় দলের ইনিংস কত কম রানে শেষ হয় এই দেখার আগ্রহ বড় হয়ে রইলো। এই পতনের মুখে ৬ষ্ঠ উইকেটে রামচাঁদের সঙ্গে খেলতে নামলেন গাদকারী। এঁরা বেশ খেলছিলেন। ৬ষ্ঠ উইকেটে ৬০ রান যোগ হ'লে পর দলের ৯০ রানে গাদকারী আইভারসনের বলে আউট হয়ে গেলেন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান সংখ্যা দাঁড়ালো ১১৯, রামচাঁদ এবং সেন যথাক্রমে ৬১ এবং ২৩ রান ক'রে নট আউট। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৭ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ১৭৬ রান দাঁড়ালো। রামচাঁদ ১০৪ এবং সুন্দরম ১ ক'রে নট আউট রইলেন। ৪র্থ দিনের ২২ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে ১৯০ রান দাঁড়ালো। রামচাঁদ নিজস্ব ১১১ রানের মাথায় আইভারসনের বল স্কোয়ার-লেগে তুললেন; মিউলম্যান বাউণ্ডারী সীমানায় দাঁড়িয়ে বলটা ধরাতে ভারতবর্ষের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। দলের পতনের মুখে রামচাঁদের নির্ভুল খেলা উপভোগ্য হয়েছিলো—অনেক দিন দর্শকদের তা মনে থাকবে। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৪ রান তুলতে রজত জয়ন্তীদল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ১৬ রানে ২টো উইকেট পড়ে যায়। দলের ৬৫ রানে ৪টে উইকেট পড়ে—দলের নামজাদা ৪জন ব্যাটসম্যান সিম্পসন, এমেট, মিউলম্যান এবং বারিক আউট হলেন। খেলাটায় প্রাণ ফিরে এলো। অনেক আশাবাদীর মনে আশাও দেখা গেল, কিন্তু ৫ম উইকেটের জুটি মার্শেল এবং ওয়াটকিন্সকে পৃথক করা গেল না। তাঁরাই দু'জনে ঐ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বার মিনিট আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দিলেন। ৬৫ রানে ৪টে উইকেট ফেলে দিয়ে খেলাটা ভারতবর্ষ নিজের দিকে যথেষ্ট ফিরিয়েছিল কিন্তু উইকেট-কিপার সেন মার্শেলকে ষ্টাম্প করার একটা সহজ সুযোগ নষ্ট করায় খেলার গতি ভারতবর্ষের প্রতিকূলে চলে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি ছিল এবং অধিনায়ক অধিকারীর দল পরিচালনায় বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। রজত জয়ন্তীদলের অধিনায়ক বেন বার্ণেটের দল পরিচালনা সম্পর্কেও বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের খেলায় আইভারসনের বোলিং সাফল্যের মুখে তাঁকে বসানো আইভারসনের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

রজত জয়ন্তীদল ঃ ৫০৪ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সিম্পসন ১২১, বারিক ১০২ নট আউট, মার্শেল ৯০; মিউলম্যান ৫০। মানকড় ১১০ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ১৫৩ (উমরীগড় ৮৩। লোডার ৫৩ রানে ৪, ওরেল ৩২ রানে ৩, লক্সটন ৪২ রানে ৩ উইঃ) ও **৪৪৭** (৫ উইকেটে মানকড় ১৫৫, হাজারে ৬১, গাদকারী নট আউট ১০২ এবং গোপীনাথ নট আউট ৬৭। লোডার ৪৩ রানে ৩ উইঃ)

বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে শোচনীয় পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসে খুব ভাল খেলে শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি ড্র করেছে। ফলে রজত জয়ন্তীদলের জয়লাভের একটি সুবর্ণ সুযোগ মাঠে মারা গেল। দর্শকদের কাছে এ খেলাটি অনেক কাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রতিটি মিনিট দর্শকরা উপভোগ করেছেন; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আশার পিছনে পাড়ি দেওয়া—দুর্ভাবনা ও আশামিশ্রিত এই অনুভূতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

রজত জয়ন্তী দল টসে জিতে প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেটে ২৮৬ রান করে। সিম্পসন টেষ্ট খেলায় দলের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী করেন, রান ১২১। সিম্পসন এবং ফ্লেচার প্রথম উইকেটে খেলতে নেমে গুপ্তের বলকে কোন আমল দেন নি। প্রথম দিনে ২৩ ওভার বলে (২টো মেডেন) ৮০ রান দিয়ে গুপ্তে একটাও উইকেট পাননি। সিম্পসন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছেন। দলের ২০৬ রানে তিনি মানকড়ের বলে ক্যাচ তুলে জাসু প্যাটেলের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। বাউণ্ডারী করেন ১২টা; 'ছয়ের মার' একটা। খেলার দ্বিতীয় দিন চা-পানের সময় অধিনায়ক বার্নেট দলের ৬ উইকেটে ৫০৪ রানের ওপর প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই বিপুল রানের বোঝা মাথায় নিয়ে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। সুচনা খুবই খারাপ হ'ল। এ দিনের খেলায় ৪টে উইকেট পড়ে গেল যথাক্রমে দলের ৩, ৩, ১৮ এবং ২৬ রানের মাথায়। তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৫৩ রানে শেষ হ'ল। দলের মধ্যে একমাত্র অধিনায়ক উমরীগড়ই দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেন, তাঁর রান ৮৩। রজত জয়ন্তী দলের থেকে ৩৫১ রান পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নির্দ্ধারিত সময়ের খেলায় ভারতবর্ষের এক উইকেট পড়ে ৫১ রান ওঠে। তখনও ভারতবর্ষ ৩০০ রান পিছনে এবং খেলা শেষ হ'তে পুরো দু'দিন বাকি। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে পরাজয় থেকে অব্যাহতিলাভ খুবই শক্ত কাজ।

চতুর্থ দিনের খেলায় পূর্ব্বদিনের নট আউট খেলোয়াড় মানকড় এবং মঞ্জরেকার খেলতে নামেন। মঞ্জরেকার মাত্র

অধিনায়ক বেন বার্ণেট (বামে) এবং অধিকারী   ফটো : ডি-রতন

৩ রান ক'রে নিজের ১৮ রানে আউট হ'ন। মানকড়ের জুটি হ'ন হাজারে। হাজারে অনেকবার ভারতীয় দলকে এ ধরণের বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। দর্শকরা তাঁর ওপর ভরসা না ক'রে পারেন না। হাজারে এবং মানকড় খেলায় পতন রোধ করলেন এবং সেই সঙ্গে শোচনীয় অবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে আশার পথ দেখালেন। ঐ দিন রান দাঁড়াল দু' উইকেটে ২২৬—মানকড় ১৩৪ এবং হাজারে ৫৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন। দর্শকরাও মনে যথেষ্ট আশা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় হাজারে নিজস্ব ৬১ রান ক'রে দলের ২৪৪ রানে ক্যাচ আউট হলেন। হাজারে—মানকড়ের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১৮২ রান ওঠে পাঁচ ঘণ্টার আত্মরক্ষামূলক খেলায়। মানকড় তাঁর নিজস্ব ১৫৪ রান করার পরই লোডারের বল পিটতে গিয়ে নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলে আউট হলেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়াল ২৮০, ৪ উইকেটে ; ইনিংস পরাজয় থেকে তখনও ৭১ রান করতে বাকি। রামচাঁদ এবং গাদকারী উইকেটে খেলছেন। রামচাঁদ খুব সতর্কতার সঙ্গে উইকেট বাঁচিয়ে খেলছেন, ১½ ঘণ্টার খেলায় তাঁর রান দাঁড়ায় মাত্র ১২। লাঞ্চের পর রামচাঁদকে তাঁর স্বাভাবিক খেলার দিকে ঝোঁক দিতে দেখা যায়। দলের ২৯৩ রানে রামচাঁদ এল-বি-ডব্লউ হয়ে আউট হ'লেন। ৫ উইকেটে ভারতবর্ষের ২৯৩ রান—পুনরায় খেলার গতি বিপরীতি দিকে ঘুরে গেল। এরপর গাদকারী এবং গোপীনাথ যে জুটি বাঁধলেন বার্নেটের শত চেষ্টাতেও তা ঐ দিন ভাঙ্গলো না। রান বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে উঠতে থাকে। চা-পানের বিরতির ঠিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে নিয়ে ৮ রানে এগিয়ে যায়। গাদকারী সেঞ্চুরী করলেন, খেলা ভাঙ্গার কিছু আগে। গাদকারী ১০২ এবং গোপীনাথ ৬৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল স্কোরবোর্ডে ভারতবর্ষের রান জমেছে ৪৪৭, ৫ উইকেট পড়ে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেল। রজত জয়ন্তী দলের জয়লাভের সমস্ত আশা মাটি চাপা পড়লো।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত নিরুপমা দেবীর কাহিনীর নাট্যরূপ "শ্যামলী"—১৷৹

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "হাসির গান" (১১শ সং)—২৷৹

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "দুই আর দু'য়ে চার" (৪র্থ সং)—২৷৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরিণীতা" (৩৭শ সং)—১৷৹, "বড়দিদি" (২২শ সং)—১৷৹, "নিষ্কৃতি" (২৩শ সং)—১৷৹

শ্রীদিলীপকুমার রায়-অনূদিত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রচিত "শ্রুতাঞ্জলির" উত্তরখণ্ড "প্রেমাঞ্জলি"—৪৲

প্রতিভা বসু প্রণীত উপন্যাস "মনোলীনা (২য় সং)—২৷৹

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অফুরন্ত" (২য় সং)—২৷৹

শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায় প্রণীত গল্প গ্রন্থ "নারদের সঙ্গীত-চর্চ্চা"—৷৵৹

বিমল সেনগুপ্ত প্রণীত ছায়ানাট্য "ভাঙ্গো ভাঙ্গো শৃঙ্খল"—।৵৹

ধীরানন্দ ঠাকুর প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মঞ্জরী"—২৲

রাজা শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বীরবর সাহিত্যভূষণ প্রণীত নাটক "বিষ্ণুচক্র"—২৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "টু মেনি মার্ডার্স"—১৷

ডাঃ মন্মথনাথ ঘোষাল প্রণীত "সাবাস্ ঐ মরণজয়ীর দল"—১৷৹

শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "সর্বজয়ী প্রেম"—৩৲, "বেদুইন-যুদ্ধে স্বপন"—২৲, "মৃত্যু-দ্বীপে স্বপন"—২৲, "বিপদবারণ মোহন"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন কালি
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালির সমকক্ষ
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক · কলিকাতা-৩২
সলভেন্ট 'এস-১০০ আছে'

এই বলেই সবাই 'কোকোলা'কে অভিনন্দন জানায়। স্বপ্নালু সুরভি, সূক্ষ্ম সংমিশ্রন, বিশুদ্ধ উপাদান প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে সকলের চিত্ত জয় করেছে 'কোকোলা'। তাই আজ 'কোকোলা' ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশ তৈল।

ক্রয়কালে জাল বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বোতল খুলে দেখে নেবেন ইহা আপনাদের সেই চির-পরিচিত সুগন্ধযুক্ত আসল জিনিষ কিনা। জালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায়।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কো
কলিকাতা-৩৪

ফাল্গুন—১৩৬০

দ্বিতীয় খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

পরা বিদ্যা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে অজানাকে জানতে চায়। তার ধী শক্তির প্রবল আকর্ষণ—যা রহস্য যা অজ্ঞাত তাকে জানবার প্রতি। এই চেষ্টা বা আকুতির সঙ্গে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য জড়িত নাই। জানতে চেষ্টাতেই আনন্দ, জানতে পারাটাই পুরস্কার। সেই কারণে দেখি, যে অপরিসীম ধী শক্তি এই বিশ্বের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে—বিরুদ্ধমান, তাঁকে জানবার চেষ্টা অতি প্রাচীন কালের মানুষের মনেও দেখা দিয়েছিল। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ঋষি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ইয়ং বি সৃষ্টিঃ কুত আবভূব।' তার পর হতে চিরকাল মানুষের মনকে এই প্রশ্ন আলোড়িত করেছে। নানা দেশের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এই নিয়েই ত দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

এমন কি এই বেদের যুগেই দেখতে পাই যে এই প্রশ্নের আলোচনা মানুষের মনকে এমন ভাবে আকর্ষণ করেছিল যে সে কালের মানুষের জ্ঞান আলোচনার একটা বিশিষ্ট অংশই এই বিষয়টি জুড়ে বসে ছিল। মুণ্ডক উপনিষদে আমরা তার পরিচয় পাই। বিশ্ব সম্বন্ধে, পরম সত্য সম্বন্ধে, জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় সে কালের মানুষ যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল তাকে তা হতে স্বতন্ত্র, অন্য বিদ্যা হতে পৃথক করা হয়েছে এবং উভয়ের এই শ্রেণী বিভাগ নির্দেশ করবার জন্য বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। পরম সত্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাকে বলা হয়েছে 'পরা বিদ্যা' এবং অন্য বিদ্যাকে বলা হয়েছে 'অপরা বিদ্যা'—

> "দ্বে বিদ্যে বেদি তব্যে ইতি হ স্ম ব্রহ্ম বিদো
> বদন্তি পরা চৈরাপরা চ।"

এই শ্রেণী বিভাগের নীতি কি তারও সন্ধান এখানে মিলে যায়। যা অপরা বিদ্যা তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। তারা হল ঋগ বেদ, যজুর্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এই সম্পূর্ণ তালিকার মধ্যে একটি তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত আছে যার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সে কালে

সাধারণ বিদ্যা বলতে আমরা যা বুঝি এ তালিকার বাহিরে তার কিছুই ছিল না। ধর্ম্ম আচরণের জন্য, দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন হত তা সবই এর মধ্যে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে মানুষের আহৃত সকল বিদ্যাকে একই নীতির ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করতে হলে বলতে হয়, বিদ্যা দুই শ্রেণীর—দাশনিক ও অদার্শনিক বিদ্যা। যে বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে, যে বিদ্যা অর্থকরী, তা সবই হল 'অপরা বিদ্যা'

'পরা বিদ্যা' তা হতে স্বতন্ত্র। তার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হয় দুটি বস্তু দিয়ে। প্রথম, তার বিষয়বস্তু হল পরম সত্য, সে কালে তাকে 'অক্ষর' বা 'ব্রহ্ম', বা 'আত্মা' বলত। দ্বিতীয়, তার ব্যবহার। 'অপরা বিদ্যা'র বৈশিষ্ট্য হল যে তা ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজে লাগে না। জানার জন্যই এখানে জানা, মানুষের কৌতূহল, মানুষের জিজ্ঞাসা বৃত্তির তৃপ্তির জন্যই এখানে জানা, তার অতিরিক্ত লাভ তার মধ্যে কিছু নাই। নিছক জ্ঞানের স্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্যই তার ব্যবহার, এই জানাতেই সেখানে আনন্দ।

জীবনে অনেক সময় দেখা যায় যে সিদ্ধির পথে এমন বিভ্রাট এসে দেখা দেয়, যে তা সিদ্ধিকে প্রায় অর্থহীন করে দেয়। রূপকে এই কথাই বলা হয়েছে অমৃত মন্থনের কাহিনীতে। সাগরে অমৃতের সন্ধান মিলেছে, সেই অমৃতকে উদ্ধার করতে হবে। তাই সাগর মন্থনের ব্যবস্থা। দেবতা ও অসুরে মিলে সাগর মন্থন সুরু হল। সে চেষ্টার ফলে সত্যই অমৃত উঠে এল, কিন্তু সঙ্গে একি বিভ্রাট, গরলের ভাণ্ডও যে উঠে এল! সে গরল এমনি বিষময় যে সমগ্র সৃষ্টিকে নাশ করবার উপক্রম করল। আমাদের সাম্প্রতিক জাতীয় ইতিহাসেও তার সুন্দর উদাহরণ আমরা পাই। আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম বটে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এল কৃত্রিম দেশ বিভাগ। সেই গরলের বিষে আমরা এমনি জর্জ্জরিত যে কবে তার বিষক্রিয়া হতে আমরা মুক্ত হব তা ভেবে পাইনা। দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনেও তার উদাহরণ মেলে। রোগীর রোগ সারাতে গিয়ে অনেক সময় যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাতে দেখা যায় যে রোগ সেরেছে বটে, তবে ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফলে নূতন রোগের সৃষ্টি হয়েছে। তখন চিকিৎসার আবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

আধুনিক কালে আমাদের বর্ত্তমান জীবনেও এই রকম একটা বিভ্রাট আমাদের গ্রাস করবার উপক্রম করেছে। যে মানুষ একদিন জানার জন্যই জ্ঞান আহরণে উদ্যোগী হত, সে আবিষ্কার করল—জ্ঞান হতে শক্তি সঞ্চয় হয়, প্রাকৃতিক নানা শক্তির উপর তার আধিপত্য আসে এবং আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত তাদের আয়ত্তে এনে মানুষের কাজে লাগান যায়। ফলে তার লোভ হল এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি। সেই শক্তির প্রয়োগ করে সে জীবনে সুখ ও স্বস্তির প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেল। বাস্তব জীবনে তার উন্নতি হল অনেক, তার জন্য নানা সুখের উপকরণ সৃষ্টি হল। শুধু এই পর্যান্ত হয়ে থামলেই কথা ছিল না, কিন্তু এই সুখ ও স্বস্তির সন্ধান করতে গিয়ে গরলও এল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেল। এখন শুধু দুটি অন্ন ও একখানি কুটীর হলেই হয় না। তার প্রয়োজন যানবাহনের, তার প্রয়োজন নানা বিলাস সামগ্রীর, তার প্রয়োজন নানা ভোগ্য বস্তুর। তার প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকার অন্ত নাই। ফলে এক অতি জটিল, কৃত্রিম, অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা প্রণালীর উদ্ভব হল। এখন তার দৈনিক জীবনের নিত্য ছোট খাট ক্ষুধা মিটাতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। জীবনে অবসর বলে কোন বস্তুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। চিত্ত-বিনোদন করবে কি করে সে, না আছে চিত্ত বিনোদনের অবসর, না আছে তার সামর্থ্য। দীর্ঘ দিবস ব্যাপী পরিশ্রমে তার এত পরিমাণ শক্তির অপচয় হয়, যে এমন উদ্বৃত্ত শক্তি তার দেহে থাকে না, যা দিয়ে সক্রিয় ভাবে কোন চিত্ত বিনোদন সম্ভব। তাই মানুষ আজ চিত্ত বিনোদনের জন্য ছোটে ছবি ও খেলা দেখতে। সেখানে অক্রিয় দর্শক হওয়া ছাড়া ত আর কিছু করবার থাকে না। তার বেশী তার সামর্থ্যও নাই।

মানুষ এই ভাবে সুখ ও স্বস্তি খুঁজতে গিয়ে বোধহয় দুই হারাতে বসেছে। জীবনে না আছে সুখ, না আছে স্বস্তি, শান্তি ত দূরের কথা। অষ্টপ্রহরব্যাপী এক হট্টগোলের পরিবেশের মধ্যে তার জীবন কাটে। কলুর ঘানি টানা বলদের মতই তার জীবন দুর্ব্বিসহ। দৈনিক জীবনের বাস্তব ক্ষুধা মিটাতে তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বিদ্যার প্রয়োগ করতে হয়। যাতে সকল বিদ্যাই এখন কার্য্যকরী বা ব্যবহারিক বিদ্যায় পরিণত হয়ে গেছে, 'পরা

বিদ্যা' বলে আর কিছু নাই। তাই দেখি বৈজ্ঞানিক এখন আর নিছক জ্ঞান আহরণের জন্য গবেষণা করেন না। যদি কোন জাতির কোন বড় বৈজ্ঞানিককে পাবার সৌভাগ্য হয়, ত' তাকে ব্যবহার করে নূতন কোন মারণ অস্ত্রের সন্ধান করতে, যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর জাতিকে সে পরাস্ত করতে পারবে। এই ভাবেই ত আণবিক বোমার জন্ম। এমন কি এও দেখা যায় যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্য নূতন দার্শনিক বাদেরও সৃষ্টি হয়। নিছক জ্ঞান স্পৃহা নিবৃত্তির জন্য এখন আর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ নাই। খাঁটি 'পরা বিদ্যা' এখন লোপ পেতে বসেছে।

অথচ প্রাচীনকালে আমরা দেখি এই 'পরা বিদ্যা' কি ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। শ্রেণী হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য স্বীকার তার এই নামকরণের মধ্যেই পাই। তখনকার দিনে কি বালক, কি নারী, কি সাধারণ মানুষ, সকলেরই তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষের কথাই ধরা যাক। আমরা এখনি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থার কথা বলছিলাম। প্রাচীন রোমে এর জন্য 'এরেনা' বা প্রেক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা থাকত। সেখানে রাজা আসতেন, প্রজা আসতেন, সকলে মিলে পশুতে মানুষে লড়াই দেখতেন। রোমানদের মধ্যে সেইটিই ছিল চিত্তবিনোদনের প্রধান ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে সেকালে উপনিষদের যুগেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। উন্মুক্তস্থানে সভা বসত, সেখানে জনসাধারণের আসবার ব্যবস্থা ছিল, রাজার বসবারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তামাসার জন্য সেখানে পশুর লড়াই এর ব্যবস্থা ছিল না। চিত্তবিনোদনের জন্য যে রস পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল তার রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সেখানে বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত আসতেন। তাঁদের মধ্যে পরস্পর 'পরা বিদ্যা' সম্বন্ধে দার্শনিক বিতর্ক হত। সেই তর্কে যিনি জিততেন, রাজা তাঁকে পুরস্কার দিতেন। সেকালে সাধারণ মানুষ দার্শনিক বিতর্ক শুনে চিত্তবিনোদন করত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ বিতর্কের বহু বিবরণ আমরা পাই। বিদেহ রাজ্যের রাজা জনক এইরূপ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে বহু সভা ডাকতেন। সেকালের বড় বড় দার্শনিকরা সেই সভায় যোগ দিতেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সব থেকে বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন তাঁর নাম ছিল যাজ্ঞবল্ক্য। আমরা সেকালের বিদুষী নারী হিসাবে গার্গীর নাম শুনেছি। সেই গার্গী এইরূপ এক সভায় যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে যে তর্ক করেছিলেন তার বিবরণ এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।

শুধু কি তাই? এইরূপ বিতর্ক সভা নিয়ে রাজায় রাজায় সেকালে বেশ প্রতিযোগিতা চলত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার পরিচয় আমরা পাই। বিদেহের রাজা জনকের এই কারণে অত্যন্ত সুনাম হয়েছিল। তিনি রামায়ণের রাজর্ষি জনক হবেন, কারণ সীতার আর এক নাম বৈদেহী। অজাতশত্রু নামে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার নিকট এই সুনাম অসহ্য হয়েছিল। সেই কারণে যখন গার্গীর পুত্র দৃপ্ত বালাকি নামে ঋষি তাঁর কাছে এইরূপ ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনার প্রস্তাব করলেন, তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, লোকে কেবল জনক জনক ব'লে তাঁর কাছে ছোটে, এ তাঁর অসহ্য, তিনি দৃপ্ত বালাকির এইরূপ ব্যবস্থার জন্য সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছেন।

> "স হোবাকা জাতশত্রুঃ সহস্রমে তস্যাং
> বাকি দতদ্মা জনকো জনক ইতিবৈ
> জনা ধাবন্তী তি।"

এই অজাতশত্রু নিশ্চয় রাজর্ষি জনকের সমসাময়িক ছিলেন। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু তাঁর অনেক পরবর্তী কালের মানুষ। উপনিষদের এই অজাতশত্রুকে 'কাশ্য' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সম্ভবত তাঁর পিতার নাম ছিল 'কশ'।

এই 'পরা বিদ্যার' আকর্ষণ সেকালের মানুষের জীবনে কতখানি ব্যাপক ছিল, তা উপনিষদের মধ্যে যে সব গল্প পাই তাতে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তার দু একটি এখানে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গল্পগুলি অনেকেরই পরিচিত। তবু তার সংক্ষেপে বর্ণনা করার একটু প্রয়োজনীয়তা আছে। গল্প এখানে বড় নয়, গল্পের তাৎপর্যাই এখানে বড়।

কঠ উপনিষদে আমরা নচিকেতার গল্প পাই। নচিকেতা বয়সে নবীন, তাঁর পিতার নাম ছিল উশন। উশন একবার গরু দান করতে আরম্ভ করলেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় যেমন হয়ে থাকে দানের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যয়

সঙ্কোচের ইচ্ছার সংঘর্ষ ঘটল। দুগ্ধহীনা বৃদ্ধা গাভী গুলিকে তিনি দান করতে সুরু করলেন। কিন্তু নচিকেতার বিবেকে তা বাধল। তিনি পিতাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার পাচক দান করবেন ?' পিতা কাজে ব্যস্ত, তিনি উত্তর দেন না। একবার, দুবার, তিনবার একই প্রশ্ন। পিতা বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং ক্রোধের উত্তেজনায় যেমন হয়ে থাকে, পিতা হয়েও বললেন,—

"মৃত্যবে তা দদাতীতি।"

যেমন বলা ঘটলও তাই। নচিকেতা যমের বাড়ী আনীত হলেন। হয়ত মনের দুঃখেই হবে নচিকেতা সেখানে উপবাসী রইলেন। একদিন, দু'দিন, তিন দিন গেল তবু তিনি অন্ন স্পর্শ করলেন না। একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি, যম আর থাকতে পারলেন না, তাঁর উপবাস ভঙ্গ করতে উদ্যোগী হলেন। অবশেষে তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি যদি উপবাস ভঙ্গ কর, তোমায় তিনটি বর দেব। নচিকেতা সম্মত হলেন।

তিনি বললেন, আমায় প্রথম বর এই দিন যেন আমার পিতার আমার প্রতি বিরক্তি চলে যায় এবং তিনি মনে শান্তি পান। যমের তাতে কোন আপত্তি হল না।

এক রকম অগ্নি ছিল যা স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। যম তার অধিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বর হিসাবে নচিকেতা চাইলেন এই অগ্নি সম্বন্ধে যম তাঁকে বিস্তারিত বিবরণ দিল। যম খুসী হয়ে বিবরণ ত দিলেনই, অধিকন্তু বললেন ভবিষ্যতে এই অগ্নি নচিকেতার নামেই প্রচলিত হবে।

এইবার তৃতীয় বর চাইবার পালা। এই অপরিণত বয়স্ক নবীন বালক এবার যা চাইলেন তা যমকে ভীষণ সমস্যায় ফেলল। নচিকেতা বললেন, এই যে প্রেতাত্মা সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ, কেউ বলে তার অস্তিত্ব থাকে কেউ বলে থাকে না, এ বিষয় বিদ্যা আমাকে আপনি দিন, এই হল আমার তৃতীয় বর :

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে,
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে॥ এতদ্ বিদ্যাম্
অনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

যম এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন, দেবতাদেরও এ বিষয় সন্দেহ আছে এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত দুজ্ঞেয়, অতএব তুমি অন্য বর চাও।

বালকটি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি যমের মুখের উক্তিকেই যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ করে উত্তর দিলেন, দেবতারাও এ বিষয় সঠিক জানেন না, আপনি স্বয়ং যম বলছেন বিষয়টি সুবিজ্ঞেয় নয় ; অপরপক্ষে আপনার মত বক্তা আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং এর তুল্য অন্য কোন বর হতেই পারে না।

যম তবু রাজী হল না। তিনি এই বালককে নিরস্ত করতে নানা লোভ দেখালেন। তিনি বললেন, তোমার জন্য পরিপূর্ণ ভোগের ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত আছি। যে কামনাগুলি পৃথিবীতে দুর্লভ একে একে তা প্রার্থনা কর আমি পূর্ণ করব। শতায়ু পুত্র পৌত্র তুমি নাও, বৃহৎ ভূমির অধীশ্বর তুমি হও, যতদিন চাও আয়ু ভিক্ষা কর। কিন্তু মরণের বিষয় আমাকে তুমি প্রশ্ন কোরোনা।

কিন্তু এই লোভনীয় বস্তুর বিপুল তালিকা নচিকেতার মন ভুলাতে পারল না। তাঁর সংকল্প অটুট রইল। তিনি বললেন, যতদিন আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন বাঁচব, যা এমনি পাবার পাব, তার অতিরিক্ত কিছুই চাই না, কিন্তু আমি এই বরই বরণ করলাম। কারণ, জীবন যতই দীর্ঘ হক তার শেষ আছে, ঐশ্বর্য্য নৃত্য গীত সব আপনারই থাক, বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তিলাভ হয়না :

"অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব
বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ন হি বিত্তেন
তর্পণীয়ো মনুস্যঃ॥"

তাহলে এখানে এই তাৎপর্য্য পাই যে পৃথিবীর সকল লোভনীয় বস্তু একদিকে ও একটি দার্শনিক বিদ্যা অপর-দিকে, তার একটিকে নির্ব্বাচন করতে হবে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বালক নচিকেতা, বয়সে নবীন নচিকেতা, অপরিণতবুদ্ধি নচিকেতা, 'পরাবিদ্যার' গলায়ই বরমাল্য দিয়েছিল। সামান্য বালকেরও মনে 'পরাবিদ্যার' জন্য কি গভীর আকর্ষণ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুরূপ একটি গল্প পাই। এই গল্প যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে নিয়ে। যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাঁর বিষয় অনেক কথা লেখা আছে। এই যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী।

তখনকার দিনে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রম

অভিনয়

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

কল্‌কাতা শহরে আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন 'বনমালী মজুমদারকে কখনও দেখেছেন?' তাহ'লে নিশ্চয়ই উত্তর পাবেন 'কেন দেখবো না, কতবার দেখেছি।' তারপর যদি জানতে চান—'লোকটি কেমন?' তাহলে তারা মাথা চুলকে জবাব দেবে, 'তা লোকটি বেশ চালাক-চতুর সন্দেহ নেই, কিন্তু ·" কিংবা "ওরে বাবা! ব্যবসায় একেবারে ঘুণ! ওর কাছে ঘেঁসে এমন বাঙালী ক'জন আছেন? তবে আপনি যদি আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে খবর নেন এই সব 'তবে' এবং 'কিন্তু'র প্রকৃত অর্থটা কি, তাহ'লে তারা বিশেষ কিছুই বলতে পারবে না, আমতা আমতা করবে।

লোকে যখন বলে লোকটি 'চতুর', সত্য কথাই বলে।

লোকটি সম্পর্কে প্রথম রহস্য এই যে বনমালী মজুমদার তাঁর প্রকৃত নামই নয়, তাঁর বাবার উপাধি পালচৌধুরী, এবং প্রকৃত নাম জগদীশ। জগদীশ পালচৌধুরী নামেই পরিচিত ছিলেন, রেল আপিসের নীচের তলার একটি কেরাণীগিরিও জুটিয়েছিলেন। লোকটি গম্ভীর, শান্ত ও সৎস্বভাব।

কলেজে রসায়নে তাঁর আগ্রহ ছিল, তাই একটা দেশী কারবারে কেমিষ্টের কাজ পেয়ে তিনি রেলের চাকরী ছাড়লেন। বিয়েও করলেন অমিয়া হাজরাকে,—কলেজে পরিচয় হয়েছিল। অমিয়া মেয়েটি ভালো,—তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না বটে, তবে সে জগদীশকে ভালোবাসত। বালী আর বেলুড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বাসা করেছিল ওরা। মোটামুটি বেশ সুখেই দিন কাট্‌ছিল।

স্বামী হিসাবে যা যা করণীয় জগদীশের তাতে ত্রুটী ছিল না, মাসকাবারে মাইনের টাকার সবটাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে খবরের কাগজ পড়ে আর বাগানে শাক-সবজীর পরিচর্যা করে দিন কাট্‌তো। ইতিমধ্যে ছেলেপুলেও দু'একটি হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয় অমিয়াকে কিন্তু কোনোদিন কোনো কথা বলতো না জগদীশ। জীবনের অনেক তত্ত্বই সে গোপন করে রেখেছিল। অমিয়ারও এ সব বিষয় মাথা ব্যথা ছিল না।

শুধু অমিয়াই যে অন্ধকারে ছিল তা নয়, কেউই জগদীশের মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ বাহ্যিক রূপের চাইতেও জগদীশের মনোজগতের গঠন ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মনের ভেতর একটা ক্রুদ্ধ আবেগ রুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘকাল। ···"আমি চাপা পড়ে যাচ্ছি"···"আমাকে সবাই দাবিয়ে রেখেছে"···"আমি নীচে পড়ে যাচ্ছি"···"অতলে ডুবছি"—এই ছিল তার ধারণা।···"আমার কাজের দাম হাজার হাজার টাকা, ওরা আমাকে দেয় মোটে দুশো টাকা, আর পাঁচ বছর পরে বেড়ে হয় ত তিনশ হবে, এইভাবে পাড়াগাঁয়ে বসে জীবনের দিন কাটাতে হবে। শুধু যদি কিছু মূলধন থাকতো, তাহ'লে কি আজ পরের দাসত্ব করতে হয়।"

ওর মাথায় যে এসব খেলছে কেউ জানতো না। এমন সময় অমিয়ার পিসিমা কাশীতে হঠাৎ গঙ্গালাভ করলেন, আর তাঁর হাজার দশেক টাকা সোজা অমিয়ার হাতে এসে গেল। ঘটনাটি তেমন অপ্রত্যাশিত নয়, অমিয়া অনেক দিন ধরে মনে মনে একটা খরচের খসড়া করে রেখেছিল! একটা বাড়ি করবে, তবুও তো নিজের বাড়ি হবে। ভাড়াটে বাড়িতে বাস আর বারো মাস বাড়িওলার মুখনাড়া সয় না। জগদীশও কোনোদিন অন্য কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বাড়ি কেনার কথাই আলোচনা করেছে। কিন্তু টাকাটা যেদিন নিয়ে সে পথে বেরোল সেদিন আর উকীলের বাড়ি না গিয়ে সোজা হাওড়া স্টেসনে চলে গেল।

সেইখানেই জগদীশ পালচৌধুরীর অপমৃত্যু। কেউ আর

অভিনয়

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

কল্‌কাতা শহরে আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন 'বনমালী মজুমদারকে কখনও দেখেছেন?' তাহ'লে নিশ্চয়ই উত্তর পাবেন 'কেন দেখবো না, কতবার দেখেছি।' তারপর যদি জানতে চান—'লোকটি কেমন?' তাহলে তারা মাথা চুলকে জবাব দেবে, 'তা লোকটি বেশ চালাক-চতুর সন্দেহ নেই, কিন্তু · ” কিংবা “ওরে বাবা! ব্যবসায় একেবারে ঘুণ! ওর কাছে ঘেঁসে এমন বাঙালী ক'জন আছেন? তবে আপনি যদি আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে খবর নেন এই সব 'তবে' এবং 'কিন্তু'র প্রকৃত অর্থটা কি, তাহ'লে তারা বিশেষ কিছুই বলতে পারবে না, আমতা আমতা করবে।

লোকে যখন বলে লোকটি 'চতুর', সত্য কথাই বলে।

লোকটি সম্পর্কে প্রথম রহস্য এই যে বনমালী মজুমদার তাঁর প্রকৃত নামই নয়, তাঁর বাবার উপাধি পালচৌধুরী, এবং প্রকৃত নাম জগদীশ। জগদীশ পালচৌধুরী নামেই পরিচিত ছিলেন, রেল আপিসের নীচের তলার একটি কেরাণীগিরিও জুটিয়েছিলেন। লোকটি গম্ভীর, শান্ত ও সৎস্বভাব।

কলেজে রসায়নে তাঁর আগ্রহ ছিল, তাই একটা দেশী কারবারে কেমিষ্টের কাজ পেয়ে তিনি রেলের চাকরী ছাড়লেন। বিয়েও করলেন অমিয়া হাজরাকে,—কলেজে পরিচয় হয়েছিল। অমিয়া মেয়েটি ভালো,—তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না বটে, তবে সে জগদীশকে ভালোবাসত। বালী আর বেলুড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বাসা করেছিল ওরা। মোটামুটি বেশ সুখেই দিন কাট্‌ছিল।

স্বামী হিসাবে যা যা করণীয় জগদীশের তাতে ক্রটী ছিল না, মাসকাবারে মাইনের টাকার সবটাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে খবরের কাগজ পড়ে আর বাগানে শাক-সবজীর পরিচর্যা করে দিন কাট্‌তো। ইতিমধ্যে ছেলেপুলেও দু'একটি হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয় অমিয়াকে কিন্তু কোনোদিন কোনো কথা বলতো না জগদীশ। জীবনের অনেক তত্ত্বই সে গোপন করে রেখেছিল। অমিয়ারও এ সব বিষয় মাথা ব্যথা ছিল না।

শুধু অমিয়াই যে অন্ধকারে ছিল তা নয়, কেউই জগদীশের মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ বাহ্যিক রূপের চাইতেও জগদীশের মনোজগতের গঠন ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মনের ভেতর একটা ক্রুদ্ধ আবেগ রুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘকাল। ···“আমি চাপা পড়ে যাচ্ছি”···“আমাকে সবাই দাবিয়ে রেখেছে”···“আমি নীচে পড়ে যাচ্ছি”···“অতলে ডুবছি”—এই ছিল তার ধারণা।···“আমার কাজের দাম হাজার হাজার টাকা, ওরা আমাকে দেয় মোটে দুশো টাকা, আর পাঁচ বছর পরে বেড়ে হয় ত তিনশ হবে, এইভাবে পাড়াগাঁয়ে বসে জীবনের দিন কাটাতে হবে। শুধু যদি কিছু মূলধন থাকতো, তাহ'লে কি আজ পরের দাসত্ব করতে হয়।”

ওর মাথায় যে এসব খেলছে কেউ জানতো না। এমন সময় অমিয়ার পিসিমা কাশীতে হঠাৎ গঙ্গালাভ করলেন, আর তাঁর হাজার দশেক টাকা সোজা অমিয়ার হাতে এসে গেল। ঘটনাটি তেমন অপ্রত্যাশিত নয়, অমিয়া অনেক দিন ধরে মনে মনে একটা খরচের খসড়া করে রেখেছিল! একটা বাড়ি করবে, তবুও তো নিজের বাড়ি হবে। ভাড়াটে বাড়িতে বাস আর বারো মাস বাড়িওলার মুখনাড়া সয় না। জগদীশও কোনোদিন অন্য কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বাড়ি কেনার কথাই আলোচনা করেছে। কিন্তু টাকাটা যেদিন নিয়ে সে পথে বেরোল সেদিন আর উকীলের বাড়ি না গিয়ে সোজা হাওড়া স্টেসনে চলে গেল।

সেইখানেই জগদীশ পালচৌধুরীর অপমৃত্যু। কেউ আর

তাকে দেখেনি বা তার কথা শোনেনি। অমিয়া খোঁজ-খবর করে হয়ত ধরতে পারত, শাস্তিও দিতে পারত, কিন্তু সে কিছুই করল না। পুলিশের এক বড়কর্তার সঙ্গে ওদের আত্মীয়তা ছিল, তিনি ছোটবেলা থেকেই অমিয়াকে স্নেহ করতেন, তাই কি হয়েছে অনুমান করে একটা জোর তদন্ত করতে চাইলেন, অমিয়া কিন্তু বল্‌ল—টাকাটা সে জগদীশকে স্বেচ্ছায় দিয়েছে, এবং টাকার জন্যই হয়ত কোনো দুষ্ট লোক তাকে কেটে ফেলেছে। পুলিশের কর্তা মাথা চুল্‌কে চলে গেলেন।

অমিয়াও মনে মনে বোধকরি ভেবেছিল জগদীশ একদিন ফিরে আসবে এবং একটা বিরাট কিছু করে ফিরবে। এর পর সে বছর কয়েক বেঁচেছিল আর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ধারণাই তার ছিল। ছেলে দুটিকে অতিকষ্টে মানুষ করার চেষ্টা করছিল, স্বামী ফিরে এসে যেন উপযুক্ত ছেলে পান, এই তার অভিলাষ ছিল। বাড়ি কেনা হয়নি বরং এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে বিতাড়িত হতে হয়েছে, সামান্য স্কুল টিচারী করে ছেলেদের পড়িয়েছে। ছোট ছেলেটা কিন্তু মার মৃত্যুর আগেই একদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়ে ধনুষ্টঙ্কার রোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। অমিয়া আর একবার চোখ মুছলো। এই ছেলেটিই তার বেশী প্রিয় ছিল। স্বামীর নিরুদ্দেশে অমিয়ার শরীর ভেঙে পড়েছিল কিন্তু মনে আশা ছিল একদিন সে আসবে। . ছেলে কিন্তু বুক ভেঙে দিয়ে গেল।

অমিয়া বিছানা ছেড়ে আর উঠলো না।

এদিকে জগদীশ পালচৌধুরীর মৃত্যু ঘটেছে। এখন তিনি বনমালী মজুমদার। তাঁর ধারণাই ঠিক, কিছু মূল-ধনেরই অভাব ছিল। মূলধন হাতে পাওয়াতে সব রাস্তা খুলে গেছে। প্রথমে বউবাজারে একটা ছোট ওষুধের দোকান খুললেন। কিছুদিনের ভেতর দুএকটা পেটেণ্ট ওষুধও বার করলেন, তারপর এল মহাযুদ্ধ ও মড়ক। খালি শিশিতে জল বোঝাই করে, জাল ওষুধ বিক্রী করে আর কালোবাজারে চড়া দামে মাল বেচে বনমালী মজুমদার রাতারাতি বড় লোক হয়ে গেলেন। সরকার কখন কি চাইবেন বনমালী তা পূর্বাহ্লেই বুঝতে পারতেন আর সেই মত কাজ করতেন। যুদ্ধের শেষে তাই বনমালী মজুমদার একদিন রায়বাহাদুর উপাধি পেয়ে গেলেন, লোকে বলে ইংরেজ থাকলে এতদিনে স্যার হ'তেন।

বেনামে কোনোদিন অমিয়াকে টাকা দিয়ে তিনি সাহায্য করেননি, বরং পূর্বজীবনের সকল স্মৃতি চাপা দেওয়ার জন্য দাড়ি রেখেছেন, মাথার টাকটা এই ক'বছরে বিশেষ বিস্তার লাভ করায় মাথার কথাটা ভাবতে হয়নি। তা ছাড়া ঐ বিরাট ডি সটো গাড়িওলা ব্যক্তিটি যে বালীর সেই ভাড়াটে জগদীশ একথা কে বল্‌বে? অমিয়ার মৃত্যু সংবাদও তিনি পেয়েছেন কিন্তু ছেলেটার কি হ'ল খবর নেয়নি। এক হিসাবে তিনি যেন সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী।

যুদ্ধ থাম্‌লো। কিছু সুযোগ সুবিধা কমলো বটে কিন্তু বনমালী মজুমদারের ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগলো। 'নবভারত কেমিক্যালসে'র প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তে লাগল,—শহরের বড় বড় কোম্পানী একরকম হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁরা নবভারতের এই প্রতিপত্তিতে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। কয়েকজন তরুণ কেমিষ্ট বেশী মাহিনার লোভে 'নবভারতে' ঢুকে পড়ে অনুতাপ করতে থাকে। বেরোবার পথ পায় না, অথচ তাদের নতুন আবিষ্কারে লাভবান হচ্ছে, 'নবভারত'। একজন সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গিছলেন—সেখানেও জয় হয়েছে বনমালীর। আর সেই তরুণ কেমিষ্ট সর্বস্বান্ত হয়েছে। বনমালীরই প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকা মামলায় খরচ হয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন ছোকরার ফরমূলায় ওরকম অনেক বিশ ত্রিশ হাজার আবার হাতে আসবে।

সুপ্রীম কোর্টের মামলার পর বনমালী মজুমদার ঠিক করলেন এইবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। শরীরটাকেও একটু দেখা দরকার। অফিসে ইদানীং একটি নতুন ষ্টেনো এসেছে। মেয়েটিকে বনমালীর মনে ধরেছে, তাই তার বসবার ব্যবস্থা হয়েছে স্বয়ং বড় সাহেবের ঘরে, একটু ফাঁক পেলেই বনমালী মিস্ সুরবালা সেনকে কাছে ডেকে গল্প সুরু করেন। অনেকদিন ধরেই গাঁথবার চেষ্টা হচ্ছে, মেয়েটিও এতদিনে টোপ গিলেছে মনে হচ্ছে। বনমালী তাকে নিয়েই কোথাও চেঞ্জে যাবেন। কাছাকাছির মধ্যে ওয়ালটেয়ার ভালো জায়গা, ওখানকার লোকগুলো অন্ততঃ গায়ে পড়ে গল্প করতে আসে না, আর একবার

আর একটি টাইপিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে গিছলেন,—সেবার মন্দ কাটেনি।

সুরবালা মেয়েটিও চমৎকার। বনমালী ভেবেছিলেন সপ্তাহখানেক উভয়ে একত্র কাটালে বেশ একটা চেঞ্জ হবে। সুরবালার কি ইচ্ছে কে জানে। হয়ত ভেবেছে চিরকালিক বাঁধনে বাঁধতে পারবে বনমালীকে।

কিন্তু কি যে হয়ে গেল কোথা থেকে, একদিন না কাটতেই সুরবালা নিঃশব্দে হোটেল থেকে সুটকেস নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল। বনমালীর তখনও ঘুম ভাঙেনি। বনমালী ঘুম থেকে উঠে শুন্‌লেন এই দুর্ঘটনার কথা।

সংবাদপত্রের পাতায় যাঁরা বনমালী মজুমদারের ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা ঘুম ভাঙার পর বনমালীর মুখের চেহারা দেখলে নিশ্চয়ই চিনতেই পারতেন না। বিশ্বাসও করতেন না। দাম্ভিক বনমালী প্রথমটা কথাটা বিশ্বাস করতেই পারেননি। কিন্তু হোটেলের দারোয়ানটা রামজীর নাম নিয়ে দিব্যি করে ঐ কথাই বার বার বল্‌ল।

যে-বনমালীর মুখে ছিল দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ —সে মুখ এই মুহূর্তে আগুনের রঙে রাঙা—ক্রোধে, অভিমানে, ক্ষোভে, হতাশায় বনমালী ক্ষেপে গেছেন। ছোট ছেলের মত ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে চুরে তচনচ করলেন বনমালী।

কিন্তু রাগ পড়তেই আবার সেই শান্তসমাহিত ভঙ্গী। '—যাক্ গে, মরুক গে! যত সব—আমি যখন এসেছি তখন দুচার দিন না কাটিয়ে ফিরছি না।

সেদিন দুপুরে ঘরে বসেই লাঞ্চ সারলেন বনমালীবাবু,—সন্ধ্যার আগে ঘর থেকে বেরোলেন না। যখন বেরোলেন তখন মনে হ'ল বয়-বেয়ারারা বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করলেও মনে মনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। আবার তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল।

যাই হোক্ বনমালী তাঁর সেই পরিচিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বেড়াতে থাকেন, মনে অনেক চিন্তা, আজ আর ব্যবসার কথাটাই প্রধান নয়।

কার্তিকের প্রায় শেষ। এখন সিজন নয়, তাই ভীড় কম। অনেক চেঞ্জার চলে গেছেন, তাই 'বীচ্' একরকম খালি পড়ে আছে। কিন্তু দেখা গেল অদূরে একজন আসছেন,—বেশ পরিচ্ছন্ন বেশবাস,—মাথাটি নীচু করে ভদ্রলোক অতি মন্থর গতিতে হাঁটছেন। লোকটি নিজের চিন্তাতেই আকুল,—বনমালীবাবুর কাছ ঘেঁষে চলে গেলেন কিন্তু ওঁর মুখের দিকেও তাকালেন না। বনমালীবাবু কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না, লোকটিকে তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন,...এ যে চেনামুখ। নিশ্চয়ই কোথাও দেখা হয়েছে কোনোদিন।

বনমালীবাবু সমুদ্রতীরে বেড়াতে থাকেন, ও কথা আর বিশেষ চিন্তা করলেন না—। সেই রাতে ডিনারের সময় কিন্তু আবার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। জানলার পাশের টেবলটিতে একটি দম্পতি বসে কথা বলছিল, উনি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় যে ভাবে চমকে উঠ্‌ল তারা তাতে মনে হ'ল হয়ত ওঁর বিষয়েই কথা বল্‌ছে। বলুকগে। বক্-বক্ করছে, যেন দুটি পায়রা। যা তা সব—কি এসে যায়?—তারপর নজর পড়্‌ল ঘরের কোণে, একলা বসে আছে সেই সমুদ্রতীরের লোকটি?

আহারান্তে সবাই বেরিয়ে এসে বাইরে বারান্দায় বস্‌লেন,—বনমালীবাবুও এলেন, আশা ছিল ঐ লোকটি কাছে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে, লোকটি কিন্তু তা করল না, আলোচনাও ভেঙে গেল, সবাই একে একে যে যার ঘরে চলে গেল!

বনমালীবাবু লোকটার কথা ভুলে গিছলেন, সেই সময়টা সুরবালার কথা চিন্তা করছিলেন, কি অকৃতজ্ঞ মেয়েটা। ঘোর কলি! আজকালকার বাজারে পাক্ দেখি আর একটা এমন চাকরী। ফাঁকি দিয়ে জর্জেটের অমন শাড়িখানা পেয়ে গেল—এখন হয়ত ভাব্‌ছে খুব চালাকী করেছি, আবার আমার কাছেই ছুট্‌তে হবে দুমুঠো অন্নের জন্য।

পরদিন সকালে বাথরুমে দাড়ি কামাতে গিয়ে লোকটির কথা আবার মনে পড়ল। সবে দাড়িতে সাবান লাগাতে যাবেন এমন সময় কথাটা হঠাৎ মনে জাগ্‌ল। হাতের ব্রাস মাটিতে পড়ে গেল, বনমালীবাবু আর্সীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠিক এই সময়েই একটা নিদারুণ শূন্যতায় তাঁর অন্তর আকুল আর্তনাদ করে উঠ্‌ল।

নেহাৎ-ই ক্ষণস্থায়ী সেই মনোভংগী। বনমালীবাবু মনকে প্রবোধ দিলেন, মানুষের চেহারার অমন মিল থাকে সব দেশে। আকৃতিতে স্তালিন এবং হিটলারের 'ডবল' ছিল, চার্চিলেরও আছে। কার নেই। রাজা-রাজড়াদের ত' দুটো চারটে নকল থাকে। তবু বনমালী আয়নায় আর একবার মুখ দেখ্‌লেন—মনে মনে সমুদ্র-তীরের সেই লোকটির মুখখানাও চিন্তা করলেন। হ্যাঁ—অপূর্ব মিল বটে।

তবে মুখে আমার মত দৃঢ়তার ছাপ নেই, চোখ দুটো আমার মত হলেও যেন একটু ছোট, নাকটাও ওঁর বড়, তবে আমার মত ছুঁচালো নয়—লোকটার মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক ঝড়-ঝাপটা পার হয়ে এসেছে, আকৃতিতে একটা দৈন্য আছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ আকৃতির তুলনা করে রায়বাহাদুর বনমালীর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। ভালো করে দাড়ি কামালেন, তারপর ব্রেকফাষ্ট টেবলে গিয়ে বসলেন। আহারান্তে হলঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, মাদ্রাজী কেরাণী শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়াল, বনমালী সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—ওদিকের ঘরটিতে যে বাঙালীটি একা থাকেন তাঁর নাম কি?

কেরাণী তাড়াতাড়ি খাতাপত্র দেখে বল্‌লে—এই যে স্যার, জগদীশ পালচৌধুরী।

বনমালীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মনে আবার সেই নিদারুণ শূন্যতা জেগে উঠ্‌ল।

বনমালীর ব্যবহারে এতটুকু অসঙ্গতি নেই। অনেকখানি হেঁটে মার্কেট থেকে এক শিশি হেয়ার টনিক কিনে নিয়ে এলেন। এক মুহূর্তও ভাবেন নি যে এর মধ্যে কিছু অতি-প্রাকৃত ব্যাপার আছে। কিন্তু এর ভেতর নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে।—যত ব্লাক মেল! আগেও এমন দু-একজনের সামনে পড়া গেছে, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, তবে এই সব পাজীদের এমন একটা উদ্ধত ভঙ্গী আছে যা মাইলখানেক দূর থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই জগদীশ পালচৌধুরী লোকটা যেই হোক না কেন, এর মধ্যে তেমন কোনো ভাব নেই।

তবু ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময়, এখনই একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সকালে সমুদ্রতীরে পৌছতে দেখা গেল একটা খালি বেঞ্চের একপাশে সেই লোকটি বসে আছে। পরিষ্কার হৈমন্তী আকাশ, মাঝে মাঝে হাওয়ার গতি প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। রঙীন ছত্রধারী রায়বাহাদুর বনমালী মজুমদার লোকটির পাশে বসলেন—তারপর অকারণেই বলে উঠ্‌লেন—চমৎকার সকালটা না? এই সময়টাই ভালো!

লোকটি যেন চমকে উঠ্‌লো, অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছে সে। যেন ঘুম ভেঙে উঠ্‌ল—বল্‌ল—কি বল্‌লেন?

"বল্‌ছিলাম চমৎকার সকালটা।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা বটে—চমৎকার, চমৎকার।"

রায়বাহাদুর লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর আবার নীরব রইলেন। লোকটার ত' কথা বলার কোনো চেষ্টা নেই, এও এক জ্বালা। বনমালীবাবু মস্ত চোখে লোকটিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন, জুতা অনেক ঘা খেয়েছে, সার্টের কলার ফাটা। চোখের দৃষ্টি করুণ, ভঙ্গী ক্লান্ত—যেন অনেক খেটে অনেক আঘাত পেয়ে এখানে জ্বালা জুড়াতে এসেছে। অথচ ঠিক এই হোটেলে থাকার মত অবস্থা মনে হয় না।

আবার বনমালীর মনে সেই শূন্যতা জাগে। বনমালী ভাবে আমি যদি অমন ভাবে সংসার থেকে সরে না আসতুম, আমারও এই হাল হ'ত। কিন্তু লোকটা কে! কেমন যেন ভৌতিক কাণ্ড!

বনমালীবাবু একটু কেসে বল্লেন—আমার নাম বনমালী মজুমদার।

লোকটা এমনভাবে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন কোনোদিন বনমালীর নামই শোনেনি। কেমন বোকার মত উদাস দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল—"ও:, বনমালী মল্লিক! নম-স্কার।"

—মল্লিক নয় মজুমদার!

—মাফ্‌ করবেন—আমার নাম জগদীশ—

—পালচৌধুরী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

আবার নীরবতা। একটা বিশ্রী মনোভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করল। যেন ঐ লোকটাই খাঁটি, আর উনি প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তবু গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বল্লেন : অনেক দিন এসেছেন নাকি ?

বেশ শান্ত গলায় লোকটি বল্ল : না এই সপ্তাহখানেক, একটু বিশ্রাম করতে এলাম, অনেক দিন ছুটি নেওয়া অদৃষ্টে জোটেনি।

"সারা জীবন খুব খেটেছেন, তা হ'লে ?"

"তা করেছি ! যথাসাধ্য করেছি।"

"দেশ কোথায় ?"

"দেশ, বর্দ্ধমানের দুর্গাপুর, তবে আমাদের জন্মাবধি বসবাস বালি—বেলুড়ে। ওদিকের কোনো আইডিয়া আছে ?"

বনমালীবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালেন, ব্লাকমেলার হলেও হয়ত এই ভাবেই কথা বল্‌ত—কিন্তু লোকটার বলার ভঙ্গীটা বিভিন্ন। বনমালী মজুমদার রীতিমত চিন্তায় পড়েছেন। তার শরীরের স্নায়ু-শিরা যেন —ফেটে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে।

বনমালীবাবু বল্লেন—হ্যাঁ, বেলুড়, জানি বৈকি। মঠ রয়েছে। তা জায়গাটা কেমন ?

—মন্দকি ! বালিগঞ্জ টালিগঞ্জের মত নয় বটে, তবে মন্দ নয়। তাছাড়া বাড়ির মত আর কি আছে, There's no place like home !"

—হুঁম্—আপনার নিজের বাড়ি ? কিরকম বাড়ি ? একতালা না দোতালা ?

—তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে নিজস্ব বাড়ি, আমার স্ত্রী কিছু টাকা পেয়েছিলেন পিসীর কাছে, তাইতেই কিন্‌তে পেরেছিলাম। এখনকার কাল হলে কি আর পারা যেত !"

—ওঃ, কিনেছিলেন ?

বনমালীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা চাপা আর্তনাদ মেশানো রয়েছে। অপর লোকটির কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই।

লোকটি বল্ল—হ্যাঁ, তা ছোটখাটো অসুবিধা থাকলেও চল্‌ছে একরকম !

বনমালী মজুমদার তাঁর রঙীন ছাতাটি সুদৃঢ় হাতে চেপে ধরলেন, প্রভাতে যে আতংক ও আশংকা মনকে উৎপীড়িত করেছে, সেই আতংক এখন যেন আবার এসে গলাটিপে ধরেছে। তিনি রেগে ফুলে উঠে লোকটির হাত চেপে ধরে বল্লেন : "স্কাউণ্ড্রেল, আমি তোমার মতলব বুঝেছি ! আমি বনমালী মজুমদার, আমার ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তুমি আমাকে ঠকাবে ? এক পয়সাও পাবেনা ? একটি আধলাও নয় ? তোমার মত ব্লাকমেলার আমি বহু দেখেছি ! আমার সর্বনাশ করতে এসেছ ?"

অপর ব্যক্তি বনমালীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন, অত্যন্ত অসহায় দৃষ্টি !

অতিকষ্টে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—সত্যি বল্‌ছি মশাই, আপনার কথা একবর্ণও আমি বুঝ্‌তে পারছিনা—কি বল্‌ছেন আপনি ?

বনমালী মজুমদার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—বুঝেছ ঠিক, এইখানে বসে বসে সব কথা ভাবো—তবে বলে দিচ্ছি যদি কোনো হাঙ্গাম করার চেষ্টা করো তাহ'লে বিপদে পড়্‌বে, এমন অবস্থায় পড়্‌বে যা কল্পনা করতে পারোনা।

এই বলে তিনি হোটেলের দিকে চলে গেলেন।

হোটেলে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বনমালী চিন্তা করতে লাগ্‌লেন—কি ভীষণ অবস্থা ! শরীর অতিশয় খারাপ বোধ হচ্ছে, ডাক্তারকে ডাকলে হয়। একবার দেখানো ভালো।

এইভাবে চিন্তা করার সময় টেবিলের ওপর থেকে নানা জিনিস মাঝে মাঝে তুলে নাড়াচাড়া করেন বনমালী। সব চেয়ে মুশকিল বনমালীর আজ সর্বপ্রথম মনে হ'চ্ছে—তিনি যেন আসল মানুষ নন। তাঁর টাকা, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সব কিছুই তুচ্ছ। এই বিরাট মোটর, এই ব্যবসা, সবই যেন আজ এক আঁচড়ে ভেসে গেছে। ঐ লোকটাই যেন বিজয়ী হয়েছে সংসারের দ্বন্দ্বে, আর তিনি আজ পরাজিত হয়ে একপাশে পড়ে আছেন।

কিন্তু মাথা ভীষণ ঘুরছে, ভার্টিগো হল নাকি ? মনে হচ্ছে অনেক উঁচু থেকে যেন হঠাৎ পড়ে গেলাম।

বনমালীর এতদিনে মনে পড়্‌ল অমিয়ার কথা, অমিয়ার দুটি ছোট ছেলের কথা—অমিয়ার মৃত্যু সংবাদ সে পেয়েছে, তারপর কি হয়েছে, একমাত্র ছেলেটা কোথায় সে কথা কোনোদিন ভাবেননি বনমালী। আজ সেই ছেলেটার কথা মনে হ'ল। ছেলেটা কোথায়। লোকটা ওঁর ছেলে নয় ত' ? না তিনি গোপনে খবর পেয়েছেন—যুদ্ধের সময় সে মিলিটারীতে গিয়েছিল আর ফেরেনি। তা ছাড়া তার

বয়স অনেক কম। সে কি করে এত বড় হবে! লোকটা ওঁরই বয়সী। নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে।

কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেও বনমালী জানেন, লোকটা ব্ল্যাকমেল করতে আসেনি—এ অন্য কিছু! ওঁর বিগতদিনের মৃত আত্মা আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি একটা হিসাব নিকাশ করতে চায়?

সমস্ত বিকাল, সমস্ত সন্ধ্যাটা তিনি ঘরেই রইলেন। অত্যন্ত বিশ্রী লাগ্‌ছে, নিচে নামতে ভরসা পাচ্ছেন না।

অনেক রাতে যখন ঘুমালেন তখন স্বপ্ন দেখছেন—যেন এরোপ্লেন থেকে পড়ে যাচ্ছেন, প্যারাসুট আছে বটে কিন্তু প্যারাসুট খুলছেনা। ঘেমে নেয়ে বনমালী দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠলেন। সে রাতে কিন্তু আর ঘুম এলোনা।

শুয়ে শুয়ে বনমালী ঠিক করলেন, কাল সকালেই লোকটাকে আবার ধরতে হবে। ওর জীবন বৃত্তান্ত ভালো করে শুনতে হবে। যে রাতে অমিয়ার টাকাটা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, সেদিন কি বাড়িতে তার অর্ধাংশ রেখে এসেছিলেন। একাংশ বাড়িতে বসে সংসার দেখেছে, অপরাংশ টাকা-রোজগার করেছে কলকাতা শহরে বসে! কিংবা পূর্ণাংশই বাড়িতে বসে ছিল। বাকীটা স্বপ্ন,—মায়া মাত্র। একটা নিছক মনোবিলাস।

পরদিন সকালেও লোকটি সেইভাবেই বসে আছে বেঞ্চটার একপাশ ঘেঁসে। বনমালীকে লোকটি যেন দেখেও দেখল না। বনমালী কিন্তু আজ অন্য লোক, বিগতদিনের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে বলেন—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি! কালকের ঘটনা ভুলে যান। আমার শরীরটা ভালো নয়—হঠাৎ ব্রেকডাউন হয়েছিল আরকি! নারভাস ব্রেকডাউন। আপনি আমাকে মাপ করুন।

লোকটি মধুর হাসলো।

লোকটি বেশ ভদ্র গলায় বল্‌ল—ছিঃ ছিঃ—ওসব কথা ছেড়ে দিন,—এখন কেমন আছেন?

বনমালী ওর পাশে বসে বল্লেন—কি জানি! দিন কয়েক লাগ্‌বে এখনও—

—তা বটে—তা জায়গাটা চমৎকার, বেশ শান্ত।

—হ্যাঁ, শান্তির জায়গা। সেই জন্যই ত' আসা।

—আমার অবস্থাও আপনার মত, আমি ঠিক বেড়াতে আসিনি।

বনমালী এতক্ষণে সোজা হয়ে বসলেন, তাহ'লে সত্যি কথা ক্রমশঃ বেরিয়ে আস্‌ছে দেখছি। বলে কি লোকটা! তিনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু বল্লেন: —ও!

লোকটি করুণ গলায় বলে—হ্যাঁ—সম্প্রতি আমার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে, তাই পালিয়ে এলুম।

বনমালীর মুখ শাদা হয়ে গেছে। সে অতিকষ্টে বলে—আপনার স্ত্রীর নাম কি অমিয়া?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জান্‌লেন?

—জানি, তা তিনি ত' থারটি নাইনে যুদ্ধ বাধার সময়েই মারা গেছেন!

—লোকটি বনমালীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, যেন বাতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তারপর বল্‌ল—আমার স্ত্রী মারা গেছেন—এখনও একমাস হয়নি। তারপর স্বপ্নভরা গলায় বলে, আত্মীয়পরিজন মারা যাওয়ার মত দুঃসময় আর নেই।

—থামুন—থামুন! আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।

লোকটি শান্তগলায় বলল—আহা! অমন করছেন কেন! চুপ করুন! ঠাণ্ডা হোন। আমি বরং আপনাকে হোটেলে রেখে আসি।

বনমালী বললেন—তুমি মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, তুমি কখনই জগদীশ নয়। তুমি বোধহয় আমার ছেলে চঞ্চল।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বল্‌ল—"চঞ্চল পালচৌধুরী আমার ছেলে, যুদ্ধের সময় টামু রোডে সে মারা গেছে।"

বনমালীর মুখ ছাই-এর মত শাদা হয়ে গেল। সত্যই তিনি অতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। লোকটি আবার বল্‌ল: চলুন স্যার—আপনাকে হোটেলে রেখে আসি। সত্যি আপনার ডাক্তারকে দেখানোই উচিত।

—দূর হও! গেট্ আউট! বদমাইস্! জোচ্চোর!—

লোকটি চলে গেল—বনমালী চুপ করে বেঞ্চে বসে রইলেন।

অনেক পরে বনমালী হোটেলে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে রইলেন, ভাবতে থাকেন শুধু যদি লোকটা চলে যায়, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিক। নিশ্চয়ই ওর মতলব খারাপ। সারা সন্ধ্যা সেই ভাবে বিছানায় কাটলো বনমালীর। হঠাৎ মনে হল লোকটির সঙ্গে আর একবার দেখা করে বাকীটা শোনা প্রয়োজন। ডিনার টেবলে বসার আগে ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করা দরকার। বনমালী একজন বয়কে ডেকে বল্‌লেন—একবার ঐ মিঃ পালচৌধুরীকে ৯ নম্বর ঘর থেকে ডেকে আনতে পারো ?

বয় বল্‌ল—জি হুজুর !

ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল মিঃ পালচৌধুরী ডাইনিং হলের দিকেই আসছেন।

বনমালী এগিয়ে গিয়ে বলেন—মাফ করবেন—আপনার সঙ্গে একটু দরকারি কথা ছিল।

লোকটি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল—না, আপনার সঙ্গে আমি কোনো কথাই কইতে চাইনা। আপনি বার বার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। আমি ঠিক এইখানে আবার একটা সীন ক্রিয়েট করতে চাইনা।

—কিন্তু দেখুন, কয়েকটা কথা জানতে চাই—আপনি যা চান দেব, যত টাকা চান—

লোকটি অত্যন্ত ঘৃণাভরে পাশ কাটিয়ে ডাইনিং হলে চলে গেল। বনমালী তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

বয়টা তখনও সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বনমালী হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস,—জলদি আমার জিনিষপত্র বার করে নিয়ে আয়।

বয় তবু তাকিয়ে আছে, বনমালী দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন, এই হোটেলে আর নয়। এই মুহূর্তেই তাকে যেতে হ'বে।

নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলেছেন বনমালী। ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে চলেছে তাঁর বিরাট De Soto গাড়ি। লরী, বাস, গরুর গাড়ি, ট্রামে কণ্টকিত-পথ। গাড়ির বেগ বাড়ছে না। বনমালীর মাথায় আজ আকাশ ভেঙে পড়েছে। এখনই বেলুড় থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্রকৃত তথ্য। স্বয়ং খোঁজ খবর নিয়ে দেখবে। কে তাঁকে চিনতে পারবে ? টাক, দাড়ি, আর বয়স আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার জগদীশকে মুছে দিয়েছে।

হাওড়া ব্রীজে ওঠার মুখেই কিন্তু একটা বিশ্রীকাণ্ড ঘটে গেল, একটা নির্বিকার ধর্মের ষাঁড়কে পাশ কাটাতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক লরী সোজা ডি-সটোর ওপর এসে পড়্‌ল। ছিট্‌কে গেল বনমালী, চুরমার হ'ল তার ডি-সটো, তার জীবনস্বপ্ন, তার ব্যবসা, আর টাকা।

গত সপ্তাহে মোটর দুর্ঘটনার মোট সংখ্যা ছিল উনপঞ্চাশ, এবার সেটি বেড়ে পুরোপুরি পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় বনমালীর বিচিত্র কর্মজীবনের ইতিহাস সকলেরই চোখে জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠল।

কফি হাউসের একপ্রান্তে ছোট্ট টেবলে দুজনে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। একজন রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমার তিন নম্বরের অভিনেতা, আর একজন সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত সুপ্রীম কোর্টে পরাজিত কেমিষ্ট।

অভিনেতা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর গলায় বল্লেন—মেরা ইনাম ? কেমিষ্ট তার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কিছুই বোঝেনি।

অভিনেতা আবার বল্‌ল—'বখশীস্' ! কি চুপচাপ যে ! এমন অভিনয় আমি জীবনে করিনি, আর করবোও না। কে বলে আমার অভিনয় ক্ষমতা নেই ? এমনটি আর কেউ পারবে ?

কেমিষ্ট ভয়ে ভয়ে এবার জবাব দেয়—'কিন্তু আমার যে কিছুই নেই।' আপনি আমাকে মাফ করুন।

অভিনেতা এবার উদাসীন ভঙ্গীতে উদার কণ্ঠে বল্‌ল—বহুৎ আচ্ছা। পয়সা যে আপনার নেই তা আমি জানি, দুবেলা আহার জোটে না তাও জানি, তবু কেন একাজে হাত দিয়েছিলুম জানেন ?

—কি জানি ? মিছিমিছি এই অকারণ অভিনয় !

—অকারণ নয় বন্ধু, অকারণ নয়। এই পার্ট আমার অনেক দিনের রিহার্সেল দেওয়া পার্ট। এ অভিনয় আর কাকে দেখাতাম। বনমালী শুধু আপনাকে ঠকায়নি, জগদীশরূপে আমার মাকেও ঠকিয়েছে। টাকা ছাড়া সংসারে আর কেউ ওঁর আপন জন নেই।

অভিনেতার চোখের কোণ এতক্ষণে সজল হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল গ্রন্থে মনস্তত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ডি-লিট, শাস্ত্রী

ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে ঘটনার আধিক্য, বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের আধিক্য। পূর্ব্বে উপন্যাসের উপজীব্য ছিল ঘটনা; বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনার জাল বোনা হইত। বর্ত্তমানে যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসিক স্বীয় চিন্তার জাল বুনিয়া লন। সেই চিন্তার জালে লেখক পাঠককে জড়াইয়া লন। আধুনিক লেখক ঘটনার প্রচ্ছদপটে একটা নতুন চিন্তার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া পাঠকের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বাহ্নেই রচনা করিতে চেষ্টা করেন। পূর্ব্বে মানুষের মন বিশ্বাস করিতে উন্মুখ ছিল, পাঠক লেখককে অনুসরণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন, পাঠক উপন্যাসবর্ণিত চরিত্র ও চিত্র লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কল্পনা করিতেন। আধুনিক পাঠক একমাত্র লেখকের উপর নির্ভর করিয়া তৃপ্ত হন না। আধুনিক যুগ যুক্তিবাদী, সকল মানুষই ন্যূনাধিক পরিমাণে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তির অনুসন্ধান করেন। পাঠক উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে সমান্তরাল ক্ষেত্রে আসিয়া উপন্যাসের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করেন। সেখানে পাঠক, লেখক এবং নায়ক একই সহানুভূতিসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ। প্রাচীন উপন্যাসে লেখক আর নায়ক ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। আধুনিক উপন্যাসে পাঠক, লেখক ও নায়কের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান অধিকার করেন। আধুনিক পাঠক সম্পূর্ণ সচেতন। লেখক আধুনিক পাঠককে যাহা খুসী শোনাইয়া বা বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ঊনবিংশ শতাব্দী বিলীয়মান—বিংশ শতাব্দী আগতপ্রায়। সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইটি ধারাই বঙ্কিমের রচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাট মেধাবী পুরুষ। তাঁহার কল্পনা ও অংকন-ক্ষমতা অনবদ্য। মনীষী ব্যক্তিগণ কালের পরিমাণে একটা নির্দ্দিষ্ট যুগে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা অনাগত যুগের স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঋষি—বহুদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, ভবিষ্যদ্দর্শী। অতীতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গভীর হইলেও তাঁহার মন নূতনকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। কারণ, তিনি বুঝিতেন যে নূতন অতীতের পরিপূরক মাত্র, ভবিষ্যতের বীজ নূতনের গর্ভে সঞ্জীবিত। অতীত যুগের মত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটনা-প্রধান এবং রোমান্স-পুষ্ট হইলেও আধুনিক মনস্তত্ত্ববিবর্জ্জিত নয়। স্থান কাল পাত্র বিশেষে তিনি ঘটনার প্রচ্ছদপটে একটা যুক্তির ছায়া সম্পাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য ঐ যুক্তিগুলি অনেক স্থানে বর্ত্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়; অনেক স্থলে তাঁহার উপন্যাসের ক্ষেত্র অত্যন্ত স্বল্পপরিসর। বাংলা সাহিত্য তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, সেই জন্য তিনি ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়া চিন্তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম ঘটনা; চিন্তা ঘটনাকে অনুসরণ করিয়াছে; চিন্তার প্রচ্ছদপটে বিবেকের অবতারণা। কৃষ্ণকান্তের উইলে বিবেককে বঙ্কিমচন্দ্র 'সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, (১।৮।২৩) বারুণীর উদ্যানে বসন্তের কোকিলকে আহ্বান করিয়াছেন (১।৮।১৯)। বিধবা রোহিণীর বুভুক্ষিত চিত্তে ক্ষুধা সঞ্চার করিতে গিয়া তাহাকে অহেতুক কামাতুরা বারনারী রূপে চিত্রিত করেন নাই, রোহিণীর নিকট হরলাল বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রোহিণীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন! বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর দুষ্কর্ম্মেরও একটা সমর্থন খুঁজিতেছেন।*

রোহিণীর কলসী, কলসীর জল এবং রোহিণীর হাতের বালার মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেই কথোপকথনে রোহিণীও যোগ দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে সেই কথোপকথন শুনাইয়াছেন (১।৮।২৩)।

আফিঙের ঘোরে কৃষ্ণকান্ত স্বপ্নদর্শনের মধ্যে উইল সংক্রান্ত গোলযোগ ও মানসিক জটিলতার আভাস পাওয়া যায়। (১।৪।১৩-১৪)

রোহিণীর নিপীড়িত, নিগৃহীত বিশুষ্ক চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে হইলে একটা নিমিত্তের প্রয়োজন। সেই জন্য বিধবা রোহিণীর জীবন-যাত্রাকে "বৈধব্যের অনুপযোগী দোষ" বিভূষিত করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের গৃহে অপর কোন স্ত্রীলোক নাই যে রোহিণীকে সতর্ক করিতে পারে, তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হরলালকে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের অন্যনারীবিবর্জ্জিত রন্ধনশালায় রোহিণীর সঙ্গে একাকী বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়াছেন। হরলালের বিধবা বিবাহের ইঙ্গিত মাত্রই রোহিণী প্রলুব্ধ হইল, যেন সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল—হরলাল নিমিত্ত মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। রোহিণী ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত হরলালকে দংশন করিল। হরলাল দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু রোহিণীর মনে যে চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা শান্ত হয় নাই। নূতন পরিস্থিতির সূচনা করিয়া ঘটনার আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে—রোহিণীকে কেন্দ্রবর্ত্তিনী করিতে হইবে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র স্থান কাল পাত্রের সৃষ্টি ও সামঞ্জস্য করিয়া উপলক্ষ সৃষ্টি করিলেন—স্থান বারুণীর উদ্যান, কাল সন্ধ্যা, পাত্র গোবিন্দলাল, উপলক্ষ রোহিণী। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিস্মৃত কথা মনে পড়ে—কি যেন হারাইয়াছি···এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা গেল না।"—এই কথাগুলি যেন রোহিণীর অবচেতন মনের কথা—

---

* ১৮৭৮ খৃঃ অঃ প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ, ২৮ পৃঃ, ১।৮।২৮ লিখিত হইয়াছে।

কোকিলের ডাকে নূতন করিয়া মনে জাগিতেছে। রোহিণী ভাবিতেছিল, "কি অপরাধে এই বাল-বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি পৃথিবীতে কোন সুখ ভোগ করিতে পারিলাম না? যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী—মনে কর গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী? কোন পুণ্যের ফলে তাহাদের কপালে এত সুখ—আমার কপাল শূন্য?…" (১।৭।২১) এই ভোগাকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, ঈর্ষা, লোভ রোহিণী-মনস্তত্ত্বের একটা দিক। এখানে কোকিল প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই রোহিণী হইবে ভ্রমরের দুষ্টগ্রহ; ভ্রমরের সুখের পথে কণ্টক। ভ্রমরের সঙ্গে তুলনায় দেহের দিক দিয়া রোহিণীর আকর্ষণ অধিকতর, রোহিণীর চিন্তার তীব্রতা প্রবলতর। রোহিণীর মনে চাঞ্চল্য-সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোকিলকে আহ্বান করিলেন, ইহা প্রাচীন রীতি। বর্ত্তমান যুগে কোকিল, চন্দ্র, সমুদ্র, আকাশ ও পদ্মের স্থান সাহিত্যক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র মানব মনে সহজাত শুভবুদ্ধির অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন। রোহিণী একটা প্রবল আকর্ষণে অতি দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছিল—কৃষ্ণকান্তের শয়ন গৃহ হইতে উইল চুরি করিয়াছিল, রোহিণীর বিবেক প্রথমে সেই অপকর্ম্মের সমর্থন করে নাই; বিবেক তাহাকে দংশন করিতেছিল। ভ্রমর এমন কি রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি আকর্ষণকেও অবৈধ বলিয়া জগদীশ্বরের নিকট সুমতির জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিল, "আমি বিধবা—আমার ধর্ম গেল, সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু হে জগন্নাথ আমায় সুমতি দাও।" (১।১৪।৪০) শেষ পর্য্যন্ত রোহিণী নিরুপায়ের উপায় দড়ি কলসী সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য-বশতঃ রোহিণী গোবিন্দলালের সাহায্যে রক্ষা পাইল। সুমতি কুমতি দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সুমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী—এই দুই জনে সর্ব্বদা মানুষের হৃদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।" (১।৮।২৪)

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং প্রশ্ন করিয়াছেন, "কেন যে এতকাল পরে রোহিণীর এ দুর্দ্দশা হইল?" অর্থাৎ গোবিন্দলাল রোহিণী বাল্যকাল হইতে পরস্পরকে দেখিয়াছে, আলাপ করিয়াছে, কখনও পরস্পর আকৃষ্ট হয় নাই, তবে এতদিন পরে এই আকর্ষণ আজ কেন? বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উত্তর দিলেন, "সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব তারপর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।" (১।৯।২৫) এই বিশেষণ অসম্পূর্ণ। রোহিণীর মনের ভোগাকাঙ্খা, দেহ-লালসা, হরলালের বিধবা বিবাহের সহিত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নীরব।

তখনও রোহিণীর মন দ্বন্দ্ব নিঃশেষ হয় নাই। "গোবিন্দলাল যদি ঘুণাক্ষরে একথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না।…রোহিণী অতিযত্নে মনের কথা লুকাইয়া রাখিল…রোহিণী রাত্রি-দিন মৃত্যু কামনা করিল।" কিন্তু কিছুকাল পরে অনুকূল ঘটনার পরিবেশে রোহিণীর মন আবর্ত্তিত হইল। হরলালের প্রলোভনে রোহিণী গোবিন্দলালের স্বার্থের যে অনর্থ সাধন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই অনর্থ শোধন করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলা হইল। রোহিণী স্থির করিল, উইল যথাস্থানে রাখিয়া পরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে। রোহিণীর মনস্তত্ত্বের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যখন কোন সিদ্ধান্ত করে, তখন পরিণাম চিন্তা করে না।

রোহিণী দ্বিতীয়বার কৃষ্ণকান্তের গৃহে উইল চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল; ইচ্ছা করিলে অন্ধকারে সে পলায়ন করিতে পারিত। কিন্তু সে পলায়ন করিল না—কারণ সে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎ কর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি, পড়িব!" (১।৯।২৭) রোহিণী পলাইল না, ধরা পড়িল বা ধরা দিল। দৃঢ়চিত্তা রোহিণী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে যথার্থ কথা গোপন করিল কেন? লজ্জা, অথবা গোবিন্দলালের স্বার্থ রক্ষা? অথবা রোহিণী জানিত যে সত্যপ্রকাশ করিলেও কৃষ্ণকান্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং সত্যপ্রকাশ করিয়া লাভ কি? পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে রোহিণীর বিচারের দৃশ্য। গোবিন্দলাল রোহিণীকে "যথার্থ কথা জানিবার জন্য" জেঠামহাশয়ের অনুমতিক্রমে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রোহিণী স্পষ্ট করিয়া বলিল যে সে গোবিন্দলালের হিতার্থে যথার্থ উইল যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করিতে গিয়াছিল। গোবিন্দলাল বলিলেন—'আমার স্বার্থ রক্ষার্থেও আমি তোমাকে এই কাজ করিতে অনুরোধ করি নাই!" প্রগল্ভা রোহিণী উত্তর দিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা জন্মে কখনো পাই নাই—যাহা ইহ জন্মে আর কখনো পাইব না—আপনি তাহা দিয়াছেন"—অর্থাৎ বারুণীঘাটে গোবিন্দলাল "অসময়ে করুণা" প্রকাশ করিয়াছেন। রোহিণীর আত্মপ্রকাশ অস্পষ্ট হইলেও স্পষ্ট। গোবিন্দ-লাল মূর্খ ছিলেন না। গোবিন্দলাল বুঝিলেন, "যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ; ও ভুজঙ্গী ও সে মন্ত্রে মুগ্ধ"। রোহিণীকে এখানে ভুজঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। "ভুজঙ্গী" শব্দে ভবিষ্যতের বহু সম্ভাবনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। বিশেষণটী অত্যন্ত সাবলীল।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া রোহিণীর উত্তর অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দেয়, কারণ আপাতঃদৃষ্টিতে বারুণী ঘাটে গোবিন্দলাল এমন কোন কথা বলেন নাই, যাহার শব্দার্থ দ্বারা ধারণা করা যাইতে পারে যে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আসক্ত। রোহিণী নিজের মনোভাব গোবিন্দলালের উপর আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সামান্যতম করুণার আভাষকেই সজ্ঞানে গোবিন্দলালের সম্মুখে আসক্তি বলিয়া প্রকাশ করিল। অথবা হরলালের ইঙ্গিতে রোহিণীর মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য রোহিণীর মন গোবিন্দলাল অভিমুখী হইয়াছিল। সুতরাং গোবিন্দলালের করুণার আশ্বাসকে কল্পনানুরঞ্জিত করিয়া নিজ মনোবাসনা অনুসারে রূপদান করিল। অবচেতন মনে যাহাই

থাকুক না কেন, রোহিণীর এই পরোক্ষাপরোক্ষ আত্মপ্রকাশ এতই স্পষ্ট যে গোবিন্দলালের পক্ষে উহা ভুল বুঝিবার অবকাশ ছিল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর মনোবাসনা অনুধাবন করুক এই ছিল রোহিণীর ইচ্ছা। ইহা নিঃসন্দেহে যে রোহিণীর সেই উদ্দেশ্য সফল হইল, গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিঃসঙ্কোচে উপদেশ দিলেন, "রোহিণী! তোমাকে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" রোহিণী দেখিল—গোবিন্দলাল তাহার মনোভাব বুঝিয়াছেন। রোহিণীর আনন্দ হইল, সুখ হইল, দেশত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়া রোহিণী গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার দেশত্যাগে "আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে?" গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি অনুরোধ করিব।"

রোহিণী বলিল—আমার হইয়া আপনি জ্যেষ্ঠতাতের নিকট অনুরোধ করিলে "আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।"

গোবিন্দলাল সহজভাবেই বলিলেন, "কর্ত্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে।" গোবিন্দলালের মন তখনও নিষ্পাপ।

রোহিণী অত্যন্ত চতুরা, তাহার শরের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা তখনও গোবিন্দলাল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, "এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল।" ১।১২।৪০

বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করিয়াছেন বলিয়া এই ঘটনাকে প্রণয় সম্ভাষণ বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। রোহিণী গ্রাম ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াও গ্রাম ত্যাগ করে নাই কেন? গোবিন্দলালের আকর্ষণে রোহিণীর আত্ম স্বা বিলুপ্ত হইয়াছিল, উত্তেজনার আতিশয্যে গোবিন্দলাল-বিহনে রোহিণী-জীবন অর্থহীন বলিয়া রোহিণী বিশ্বাস করিল। দায়ত গোবিন্দলালকে দেখার লোভে রোহিণী হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিতে পারিল না। বিবেক রোহিণীকে বলিতেছে—"আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল, সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?" এই বিবেক ও বাসনার সংঘাত রোহিণীর চিত্তলোককে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মতন আলোকিত করিয়াছিল, উদ্ভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সেই বিদ্যুৎ-রেখা অন্তর্হিত হইয়া গেল। রোহিণী গোবিন্দলালকে জানাইয়া গেল যে সে কলিকাতা যাইতে পারিবে না। তাহার অস্বীকৃতির কারণ অস্পষ্ট ত নয়ই, বরং অত্যন্ত অনাবৃত। গোবিন্দলাল ইতিপূর্ব্বে ভাবে, ইঙ্গিতে, আকারে, প্রকারে রোহিণীর মনোভাব জানিয়াছিল—আজ রোহিণী মুক্তকণ্ঠ—কিন্তু তখনও গোবিন্দলালের হৃদয়াকাশে রোহিণীর অনুরাগ প্রভাত সূর্য্যের প্রথম রেখা মাত্র। গোবিন্দলাল নিজেও জানিতেন না যে তিনি রোহিণীর রূপমুগ্ধ। তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরকে নিঃসংকোচে বলিতে পারিয়াছিলেন "আমি রোহিণীকে ভালবাসি না, রোহিণী আমাকে ভালবাসে।" (১।১৪।৪৫)

রোহিণী বারুণীর জলে ডুবিল—কিন্তু কেন? উহার তিনটী কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ অনুশোচনা—কারণ বিধবার পক্ষে পরপুরুষের প্রতি আসক্তি পাপ। এই পাপের অনুশোচনায় রোহিণী আত্মহত্যা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে গিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ কামাগ্নি জ্বালা—তীব্র দহন কামনার জ্বালা নিবারণের জন্য রোহিণীর সলিল-সমাধি। নিরুপায় হইয়া নিজের উপর নিজের প্রতিশোধের চেষ্টা।

তৃতীয়তঃ ভ্রমরের পরামর্শ—রোহিণীর মন চঞ্চল, অস্থির; বদ্ধ গৃহে কুণ্ডলাকৃত ধূমরাশির মত রোহিণীকে কামনা প্রকাশের পথের সন্ধান করিতেছিল। রোহিণীর জীবনের চরমতম সংকট মুহূর্ত্তে ভ্রমর তাহাকে পথ-নির্দ্দেশ করিল—"বারুণীর জলে সন্ধ্যেবেলায় গলায় কলসী দিয়ে—" হয়ত রোহিণীর অবচেতন মনে ভ্রমরের ইঙ্গিতে কাজ করিয়াছিল। এই পরামর্শ অন্যের নিকট হইতে আসা—আর ভ্রমরের নিকট হইতে আসার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, কারণ ভ্রমর পরোক্ষে অথচ প্রত্যক্ষভাবে রোহিণী কামনার রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিনী—যদিও রোহিণী স্পষ্ট করিয়া তাহা ভাবিতে পারে নাই। যে কারণেই হউক, বারুণীর ঘাটে সন্ধ্যেবেলায় "গলায় কলসী দিয়া" রোহিণী ডুবিল। গ্রামে অন্য পুষ্করিণীও ছিল, রোহিণী সেখানে যায় নাই—কারণ অপরিচিত পুষ্করিণীতে গেলে অন্য লোক সন্দেহ করিতে পারে, অন্যথা গোবিন্দলালের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাঁহার গৃহে তাঁহারই পুষ্করিণীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়, হয়ত দয়িতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যাইতে পারে। রোহিণীর মনস্তত্ত্ব তখন চঞ্চল গতিতে চলিতেছিল।

গোবিন্দলালের প্রমোদ গৃহে রোহিণীর প্রাণ চঞ্চারিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষী—"ভ্রমরভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যান গৃহে প্রবেশ করে নাই।" গোবিন্দলাল রোহিণীর মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মরিবে কেন?" রোহিণী উত্তর দিয়াছিল, "চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।" ঘটনাচক্রে গোবিন্দলালের প্রমোদ গৃহে মৃত্যুপথ-যাত্রিনী রোহিণী গোবিন্দলালের অভিসারিকার আসনে অধিষ্ঠিতা; অদৃষ্টের পরিহাস!

গোবিন্দলাল সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। এই কামনা-পীড়িতা অসংযতা নারীর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের পরিণতি চিন্তা করিয়া গোবিন্দলাল ব্যথিত চিত্তে ভগবানের শরণ হইলেন। তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি ভ্রমরকে রক্ষা করেন, নিজকে রক্ষা করেন। আত্মজয় করিবার জন্য তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। গোবিন্দলাল আত্মজয় করিতে না পারিয়া জটিল পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পলায়ন করিলেন—বন্দরখালিতে জমিদারী পরিদর্শনে চলিয়া গেলেন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই পলায়ন গোবিন্দলালের দুর্ব্বল মনের পরিচয় দেয়। কিন্তু রোহিণীর ছায়া গোবিন্দলালের মনের গোপন কোণে সদা বিরাজ করিতেছিল।

বিরহ-কাতরা ভ্রমরের বিরহের তীব্রতা ক্ষীরি দাসীর পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব ছিল। কবিরাজ বলিয়াছেন, ভ্রমর অসুস্থ—ভ্রমর ক্ষীরির হাত হইতে ঔষধগুলি লইয়া জানালা দিয়ে নীচে নিক্ষেপ করিয়াছে, ক্ষীরি ভ্রমরের কার্য্য কলাপকে বাড়াবাড়ি মনে করিল—"এতটা বাড়াবাড়ি" চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে সরল ভাষায় পতিপ্রাণা ভ্রমরকে জানাইয়া দিল গোবিন্দলাল পত্নীগতপ্রাণ নহে। পাঁচি চাঁড়ালনী দেখিয়াছে

সেদিন রোহিণী অধিক রাত্রিতে গোবিন্দলালের বাগানবাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সুতরাং গোবিন্দলালের চরিত্র সন্দেহজনক। দাসীর মুখে পতির চরিত্র বিষয়ে অশোভন ইঙ্গিত শুনিয়া কোন ভদ্রনারী ক্রুদ্ধা না হইবে? ক্রুদ্ধা ভ্রমর ক্ষীরিকে "উত্তম মধ্যম" প্রহার করিল। ক্ষীরি অপমানিতা হইল। ক্ষীরি পত্রপুষ্পপল্লবিত রোহিণী-সংবাদ রটনা করিয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ক্ষীরি ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইয়াও তাহার স্নেহভাজনীয়া ভ্রমরের অমঙ্গল সাধন করিয়া জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বনাশের বিষবৃক্ষ রোপণ করিল। জনশ্রুতি প্রচারিত হইল—"রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

রোহিণীও সে জনশ্রুতি শুনিল। পূর্ব্বে রোহিণীর অপবাদ রটিয়াছিল রোহিণী চোর; আজ নূতন অপবাদ রটিল রোহিণী চরিত্রহীনা। সেই চরিত্রহীনতার সঙ্গে ভ্রমরের স্বামীর নাম জড়িত। সুতরাং রোহিণী মনে করিল ঈর্ষাবিদগ্ধ ভ্রমরই এই কুৎসা রটাইয়াছে। "ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল, আমি আর এ দেশে থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে জ্বালাইয়া যাইব।" রোহিণীর এই মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ কামনার রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাংঘাতিক। ফলে রোহিণী ধার-করা শাড়ী এবং গিল্টী করা গহনার দ্বারা ভ্রমরকে ছলনা করিল। রোহিণী ভ্রমরের অনিষ্ট সাধন মানসে নিজে নির্লজ্জার মতন নিজের স্বৈরিণী বৃত্তির সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত মিথ্যা প্রচার করিতে দ্বিধা করে নাই, রোহিণীর মন চিরকাল বক্রপথে চলিতে অভ্যস্ত, সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় কোন কিছুতেই তাহার মনকে আহত করে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"রোহিণী না করিতে পারে এমন কাজ নাই।"

রোহিণীর গহনা ও শাড়ী দেখিয়া ভ্রমরের মনে স্বামীর সম্বন্ধে কি প্রকার ধারণা হইতে পারে? গোবিন্দলাল অধিক রাত্রিতে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রমরের নিকট সত্য গোপন করিয়াছে, তাহাতে ভ্রমরের মনে মেঘের ছায়া; ক্ষীরি চাকরাণী বলিয়াছে—রোহিণী সেই দিন অধিক রাত্রে বারুণীর বাগান হইতে ফিরিয়াছে—মেঘ ঘনীভূত; সুরধুনী বলিয়াছে—গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে—মেঘ বর্ষণোন্মুখ। রোহিণী সেই গহনা দেখাইয়া গিয়াছে, ভ্রমর বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। মেঘ মুষল ধারে বর্ষিত হইল, ভ্রমর অপমানে, অভিমানে * অনুপস্থিত স্বামীকে ভীষণ পত্রাঘাত করিল—সে আঘাতের প্রতিক্রিয়া যে ভ্রমরকে কি সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে পারে, তাহা অনভিজ্ঞা ভ্রমর কল্পনা করিতে পারে নাই।

ভ্রমরের দুর্ভাগ্য যে হরিদ্রাগ্রামে কিংবা রায়পরিবারে এমন একটী লোক ছিল না যাহার নিকট ভ্রমর মন খুলিয়া সমস্ত ব্যাপারটী জিজ্ঞাসা করে, যাহার সহিত ভ্রমর আলোচনা করে। মন খুলিয়া সব ব্যাপার আলোচনা করিলে ভ্রমরের মনের জটিল গ্রন্থিগুলি খুলিয়া লইতে পারিত। গোবিন্দলালও অনুপস্থিত—স্বামী নিকটে থাকিলে ভ্রমর তাঁহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া, অভিমান করিয়া, তিরস্কার করিয়া, ক্রন্দন করিয়া সন্দেহ নিরশন করিতে পারিত, তাহাও হইল না। রোহিণীর গিল্টী-করা গহনার চমকে ভ্রমর বিভ্রান্ত হইয়া গেল; সন্দেহ দানা বাঁধিল, বিশ্বাসে পরিণত হইল। মনস্তত্বের দিক দিয়া ভ্রমরের কার্য্য স্বাভাবিক। ভ্রমরের অভিমান ক্রোধে পরিণত হইল। ভ্রমর অসুখের মিথ্যা সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে গেল—গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন—ভ্রমর তাঁহার প্রতীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে; তাহাকে কথা বলিবার সুযোগ দিল না, "এত অবিশ্বাস।" অভিমানের প্রত্যভিমানে গোবিন্দলালের মনে নূতন গ্রন্থি রচিত হইল। "যাহার ভ্রমর নাই, সে কি জীবন ধারণ করে নাই?" এখানে নিয়তির খেলা আরম্ভ হইল, গোবিন্দলালের গৃহ শূন্য, শূন্য গৃহে, শূন্য হৃদয়ে রোহিণী আগমন সহজ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়জনকে দূরে রাখিও না, বাঞ্ছিত জনকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে বিষময় ফল ফলে।" ১২৩৬২,

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র অংকন করিলেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, "প্রায়াগত যামিনীর অন্ধকারে···পিছল ঘাটের পার্শ্বে রোহিণীর সঙ্গে বারুণী-উদ্যানে" গোবিন্দলালের সাক্ষাতের দৃশ্য। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অন্ধকার রজনী, এবং পিছল ঘাটের চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বহির্জগতের সঙ্গে মনোজগতের সুসঙ্গত চিত্রাঙ্কন করিয়াছিল। মনোরাজ্যের বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপমুগ্ধ।" গোবিন্দলালের মন এখানে সংঘাতের স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"ক্রমে গোবিন্দলাল রোহিণীর নাম একত্রিত হইয়া" কৃষ্ণকান্তের কাণে উঠিল। অর্থাৎ রোহিণীর অভিসার কিছুকাল চলিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সর্ব্বশেষবার উইল পরিবর্ত্তন করিলেন। গ্রামের দশজন ভদ্রলোক সাক্ষী; ভ্রমর অনুপস্থিতা,

* অভিমান কথাটা বাঙ্গালী জীবনে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদ। অভিমানের ভাবটা অতি মধুর, ইহা অনুভূতির বস্তু। অভিমানের পটভূমিকা আত্মবোধ, উৎস হৃদয়, বিস্তৃতি ব্যাপক, গতি জটিল, পরিণতি প্রতিহিংসা। অভিমান কোন কোন ক্ষেত্রে মনের বিকার। অভিমানের যথার্থ প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় নাই। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিমান বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়—ইহার বিশ্লেষণ সর্ব্বাবস্থায় সম্ভব নয়। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর জীবনে অভিমানের লীলাখেলা প্রচুর। কৃষ্ণকান্তের উইল সামাজিক উপন্যাস, সুতরাং এই উপন্যাসে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, মান-অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকা স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত অভিমানের উপর নির্ভর করিয়া এই উপন্যাসের ভিত্তি রচিত হইয়াছে।

গোবিন্দলাল উপযাচক হইয়া উইলে স্বাক্ষর করার মধ্যে মনস্তত্ত্ব কি? অপমান-বোধ না অভিমান? গোবিন্দলালের পরিবর্তে তাঁহারই স্থানে তাহার স্ত্রীকে সম্পত্তিদান করায় গোবিন্দলাল অপমানিত হইয়াছেন, সুতরাং যথাসম্ভব অপমানের ভার লাঘব করিবার জন্য উপযাচক হইয়া উইলে নিজের সম্পত্তি জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কি উপায় ছিল?

শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদে ভ্রমর শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়াছে। ভ্রমর শ্বশুরালয়ে অবাঞ্ছিত অতিথির মত—সমস্তই পরিচিত, সে সকলকেই চিনে, অথচ সে নিজে অপরিচিতা। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। উইল ব্যাপারে ভ্রমরের কোন দোষ নাই, গোবিন্দলাল স্বয়ং ভ্রমরের নির্দোষিতার সাক্ষী। অথচ ভ্রমরকে গোবিন্দলাল দোষী করিল। ইহার মনস্তত্ত্ব কি? মানুষ যখন নিজে কোন দোষ করে, নিজের কার্য্যের কোন সমর্থন পায় না, তখন মানুষ নিজের দোষ অন্যের উপর আরোপ করিয়া তৃপ্তি পায়। রোহিণী গোবিন্দলালের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। একজন পুরুষের চিত্তে দুইটী নারী সম-অংশভাগিনী হইতে পারে না; সুতরাং ভ্রমরকে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আপাততঃ দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। অনেক সময় প্রথমে মানুষ একটা সিদ্ধান্ত করে, পরে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তির সন্ধান করে। গোবিন্দলাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এবার কিছুকাল রূপের সেবা করিব।" সুতরাং গুণিনীকে পরিত্যাগ করিয়া রূপসী বরণ করিবেন সহজ মনস্তত্ত্ব, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে অত সহজে ত্যাগ করা যায় না। গোবিন্দলাল আবিষ্কার করিলেন—"স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকিবেন না,"…স্ত্রী বিষয় দান করিবে, স্বামী তাহা ভোগ করিবেন না। সম্পত্তিদান গ্রহণ ব্যাপারে ভ্রমরের দোষ নাই। সুতরাং ভ্রমরের অন্য একটী দোষ আবিষ্কার করিতে হইবে—ভ্রমর কেন গোবিন্দলালের প্রতীক্ষায় হরিদ্রাপুরে অপেক্ষা না করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিল? অবশ্য ভ্রমর সেই অপরাধের জন্য বহুবার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে, গোবিন্দলালের রোহিণী রাহুগ্রস্ত মন ভ্রমরকে ক্ষমা করিতে পারে না এবং ক্ষমা করে নাই। ক্ষমা করার মতন মনের অবস্থা তখন গোবিন্দলালের ছিল না।

গোবিন্দলাল তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া ভ্রমরকে বলিলেন যে আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব…আর আসিব না। ভ্রমরের আত্ম প্রত্যয় ছিল, সে বলিল—"তুমি আমারই, রোহিণীর নও।" ভ্রমরও মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া "ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।" ভ্রমরের মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ। সে নিজের মন সম্পর্কে এত বেশী সচেতন যে বাহিরের কোন আঘাত তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

গোবিন্দলালের মাতার মনস্তত্ত্ব খুব স্বাভাবিক, মাতার মনেও উইল জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছিল। "পুত্র থাকিতে পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী" হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপর তিনি একটু বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বশে তিনি ভ্রমরের ইষ্ট কামনা করিতেন, ভ্রমরের উপর তাহার সে স্নেহ ছিল না। তিনি পতিহীনা, আত্মপরায়ণা"—সুতরাং তিনি পুত্রবধূর সংসারে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। ভ্রমরের শাশুড়ী যদি বুদ্ধিমতী এবং উদারদৃষ্টিসম্পন্না হইতেন, তবে রায়-পরিবারের অনেক সমস্যার সরল সমাধান হইত। কিন্তু সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তিনি ইচ্ছা না করিয়া পুত্র, পুত্রবধূ এবং পরিবারের অনর্থ সৃষ্টি করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শাশুড়ীর চরিত্র অতি সহজভাবে অঙ্কিত করিয়া যথার্থ শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন। গোবিন্দলালের মাতা—গোবিন্দলালকে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন।

অন্যদিকে রোহিণীর দুরারোগ্য শূলরোগের চিকিৎসার জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে রোহিণী প্রসাদপুরের নির্জ্জন নীলকুঠিতে গোবিন্দলালের সহিত বিলাস জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ পোষ্টমাষ্টারের সাহায্যে গোবিন্দলাল ও রোহিণীকে প্রসাদপুরে আবিষ্কার করিলেন। এই উপন্যাসে মাধবীনাথের ভূমিকা স্বল্পপরিসর অথচ অত্যন্ত দুরূহ, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ঘটনাকে স্বীকার করিয়া দৈবের উপর তিনি নির্ভর করেন নাই এবং কন্যার অদৃষ্টে বিধিলিপি প্রযোজ্য বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনি অত্যাচার করে তেমন কি কেহ জগতে নাই?" ২।২।৫২

এই অত্যাচারী কে? গোবিন্দলাল না রোহিণী? অথবা উভয়েই? মাধবীনাথের লক্ষ্য একজন হইলেই দুইজন। আপাততঃ তাঁহার মন দুইজনের উপরে বক্র।

নিশাকর প্রসাদপুরের কুঠিতে আত্মবিস্মৃত বিলাসনিমগ্ন গোবিন্দলালের মনে অত্যন্ত সহজভাবে ভ্রমরের লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্ধার করিলেন। গোবিন্দলালের চিত্ত বিভ্রান্ত হইল। "গোবিন্দলাল বড় অন্যমনস্ক"—অনেকদিনের পরে ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর। লুপ্তপ্রায় ভ্রমরের নাম শ্রবণে গোবিন্দলাল আত্মবিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলাল অশ্রুজলে অনুতাপের অনল নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন ভ্রমর বহুদূরে; ইচ্ছা থাকিলেও "ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই।" (২।৭।৯৫), তখন অপ্রাপনীয়া।

রোহিণী কিন্তু নিশাচরের উপস্থিতিতে এক অভিনব আকর্ষণ অনুভব করিল। সেটা নূতনের আকর্ষণ, না সুন্দরের মোহ, না অর্থের প্রলোভন, না ভবিষ্যতের সংস্থান—অথবা অন্য কিছু, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলে ঘটনার প্রবাহের মাঝখানে বিবেক ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব, সুমতি কুমতির বাদানুবাদের অবতারণা করিয়া ঘটনার গতি পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বিবেক বা সংস্কার নীরব, বোধ হয় রোহিণীর সদ্‌বৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রারম্ভে রোহিণীর মনে দেহজ আকর্ষণের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিশাকরের প্রতি আচরণের পটভূমিকারূপে রোহিণীর প্রসাদপুরের বিলাস জীবনের কোন ঘটনা বা চিন্তার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং "পাপীয়সী রোহিণীর" পরিণাম প্রদর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ঘটনার প্রবাহ যে মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে গতি অত্যন্ত দ্রুত। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর

অভিনয়ের যবনিকা পাত করিতে উৎগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যেন রোহিণীকে বধ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া নিশাকরের চরিত্র সৃষ্টি করিলেন। রোহিণী বধ যজ্ঞে নিশাকর পুরোহিত, গোবিন্দলাল ঘাতক। রোহিণী গোবিন্দলালের পাপের চিত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে নিক্ষেপ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়াছেন, হঠাৎ নিশাকরের আবির্ভাবে তুষ্ণীভাব ভঙ্গ হইয়া গেল। সাধারণ পাঠক রোহিণীর এই পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। আধুনিক যুগের পাঠকের চিন্তাধারায় একটা বিশেষত্ব এই যে অপরাধীর সঙ্গে সে সহজ সহানুভূতি অনুভব করে —অপরাধীর দোষস্খালন করিয়া লেখককে অপরাধী করিবার চেষ্টা করে। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলাল যে শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন সে শাস্তি রোহিণীর প্রাপ্য ছিল কিনা? অপরাধের তুলনায় শাস্তি গুরুতর হইয়াছিল কিনা? গোবিন্দলাল রোহিণীর অপরাধের জন্য কতদূর দায়ী?—রোহিণী-হত্যার সময় গোবিন্দলালের মনোধারা কি ছিল? বঙ্কিমচন্দ্র কেন অত আকস্মিকভাবে হত্যা করিয়া প্রসাদপুরের জটিল পরিস্থিতির অত সহজ সমাধান করিলেন?

রোহিণী অপরাধিনী ইহা নিঃসন্দেহ। তাহার ভোগ লালসা ছিল, হিন্দু বিধবা রোহিণী; সমাজের বিধানে রোহিণী পাপীয়সী। আসঙ্গলিপ্সা মানব মনের সহজ ধর্ম্ম। সমাজ, নীতি, ধর্ম্মের অনুশাসনে মানুষকে তাহার মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে মাঝে মাঝে সংযত করিতে হয়, রোহিণী তাহা করে নাই। অবশ্য এই অপরাধে গোবিন্দলালও অপরাধী। রোহিণীর অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু—কারণ তাহার ভোগাকাঙ্খা চরিতার্থ হয় নাই—সে বালবিধবা। গোবিন্দলাল বিবাহিত; প্রেমবিহ্বলা পত্নী ভ্রমরের দেহ সম্ভোগতৃপ্ত, সুতরাং গোবিন্দলালের পরনারীর প্রতি আসক্তির অপরাধ দ্বিগুণতর। রোহিণী স্বৈরিণী হইলে গোবিন্দলাল লম্পট, রোহিণীর উপর গোবিন্দলালের অধিকারের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল—? রোহিণী ত ক্রীতদাসী নয়, সে রক্ষিতামাত্র। রোহিণীর অপরাধ সে গোবিন্দলালকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল—কিন্তু প্রসাদপুরের বিলাস জীবনের ক্লেদ সৃষ্টির জন্য দায়িত্ব কি রোহিণীর একলার?

প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর ভরণ পোষণ করিয়াছেন—তাহার বিনিময়ে রোহিণী তাহাকে দেহ দ্বারা সেবা করিয়াছিল—রোহিণী প্রসাদপুরের নীল কুঠীতে প্রায় বন্দিনী জীবন যাপন করিতেছিল, নিশাকরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপনের চেষ্টা কি বন্দিনী জীবনের প্রতিক্রিয়া নয়? রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল বৈকি। রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইতে ইচ্ছা করে নাই। রোহিণী ভাবিয়াছিল, আমি ত কখনও গোবিন্দলালের নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইব না। দুটো কথা কহিলেই কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে? ২।৬।৯২

গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর সম্বন্ধ কি? গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রোহিণী তুমি আমার কে?" রোহিণী উত্তর দিয়াছে—"কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন দাসী, নইলে কেহ নই।" রোহিণীর এই উত্তরের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না—অত্যন্ত সত্য, রূঢ় সত্য। নাটকীয়ভাবে—গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিলেন—রোহিণীর জন্য তিনি ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিলেন? সে দোষ কি রোহিণীর? রোহিণীর দোষ সে রূপসী, রোহিণীরূপে গোবিন্দলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রোহিণীকে লইয়া তিনি নির্জ্জনে বিলাস জীবন যাপন করিতেছিলেন। অপরাধ কি একলা রোহিণীর?

গোবিন্দলাল পুরুষ; দেহের শক্তি বেশী; বঙ্কিমচন্দ্র ও পুরুষ, পুরুষ যে নারীর বিচারক; গোবিন্দলাল বিচার করিয়াছেন, সুতরাং পুরুষের বিচারে নারী মৃত্যুদণ্ডলাভ করিয়াছে।

রোহিণী-হত্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গোবিন্দলাল কিন্তু প্রকৃতিস্থ ছিলেন? নিশাকরের নিকট ভ্রমরের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল। নিশাকর চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল শয়ন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন—ইচ্ছা নিদ্রা যাইবেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। গোবিন্দলাল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে খানসামার নিকট তিনি শুনিলেন—রোহিণী চিত্রাঘাটে-রাত্রিকালে—নবাগত পর-পুরুষের সঙ্গে অভিসারে গিয়াছে। গোবিন্দলাল রোহিণীর পশ্চাতে আসিলেন—দুই জনকে দেখিলেন, তাহাদের বিশ্রম্ভালাপ শুনিলেন। অধিকারবোধ এবং ঈর্ষা ত ছিলই, গোবিন্দলালের মনে অহংকার তিনি ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, রোহিণীকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন সুতরাং রোহিণী কৃতঘ্ন। গোবিন্দলাল সংবরণ না করিতে পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতেও ক্রোধ শান্ত হইল না, রোহিণীকে হত্যা করিয়া সে ক্রোধ শান্ত হইল। রোহিণী অপরাধিনী নিঃসন্দেহ। কিন্তু গোবিন্দলাল যে শাস্তি বিধান করিলেন—তাহা রোহিণীর দোষের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদী মন রোহিণী রক্তে তৃপ্ত হইল, কিন্তু তাঁহার বিচারক মন?

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং রোহিণী হত্যার অপরাধের জন্য আত্ম দোষ স্খালন শুনিয়া বঙ্গদর্শনের ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যায় বলিতেছেন:—"কাব্য গ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা মাত্র।" সত্যই রোহিণী-হত্যা গোবিন্দলালের জীবনের কঠিন সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিয়াছেন? শ্বশুর মাধবীনাথের চেষ্টায় গোবিন্দলাল নরহত্যার দায় হইতে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বাহিরে মুক্তি পাইলেও নিজের মনের কাছে মুক্তি পাইলেন না, ঘৃণা লজ্জা আত্মগ্লানিতে গোবিন্দলালের মন তখন সংকুচিত, মুক্তিলাভের পরে যদি শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, তবে শ্বশুর তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে লইয়া যাইতেন, ভ্রমরের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভাবনা হইত এবং পরস্পরের সাক্ষাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইতে পারিত, কিন্তু গোবিন্দলাল আবার ভুল করিলেন। তিনি ভ্রমরের নিকট না গিয়া প্রসাদপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নীলকুঠী বিক্রয় করিয়া সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এক বৎসরে সে অর্থ নিঃশেষ হইল। ইহার পূর্ব্বে গোবিন্দলাল অজ্ঞাত-সময় তীর্থস্থানে বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়াছেন, কলিকাতায় ভিক্ষা মিলে না। অন্নাভাবক্লিষ্ট গোবিন্দলাল স্ত্রীর নিকট হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া পত্র দিলেন। পত্রের ভাষায় মনে হয় অর্থাভাব, অনুতাপ, মনোকষ্ট, আত্মগ্লানিতে গোবিন্দলালের মনের শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

নচেৎ রায় বংশের সন্তান—আত্মমর্য্যাদাবোধ যে বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্ত্রীর দান গ্রহণ করিলে রায়বংশের সন্তানের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবে বলিয়া যে বংশের সন্তান ভ্রমরের মতন স্ত্রী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল—তাঁহার পক্ষে অন্নাভাবপীড়িত হইয়া স্ত্রীর আশ্রয় যাচ্ঞা বিসদৃশ মনে হয়। রোহিণী হত্যার পর গোবিন্দলাল যদি আত্মহত্যা করিতেন তবে উহা মনস্তত্বের দিক দিয়া অসঙ্গত হইত না; অন্ততঃ তিনি শেষে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—সে সন্ন্যাস যদি বিচারের পরেই গ্রহণ করিতেন, তবে গোবিন্দলালের মর্য্যাদানুরূপ হইত, রায়বংশের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নায়কের উপযুক্ত হইত। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদী মন গোবিন্দলালের পাপের প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া তৃপ্ত হইবে না, সুতরাং তাঁর মনে বেদনাহত গোবিন্দলালকে উন্মাদ করিয়াছেন। বাহিরের মুক্তি হইলেও অন্তরের মুক্তি প্রয়োজন ছিল—চিত্তশুদ্ধি না হইলে, অনুতাপের অশ্রুজলে মলিনতা দূর না করিলে গোবিন্দলালের মুক্তি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মনোবৃত্তির প্রচ্ছদপটে পরবর্তী পরিচ্ছদগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন।

পতিপ্রাণা ভ্রমর কেন স্বামীর হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বহু দিন বাঞ্ছিত, বহু দিন বঞ্চিত স্বামীর পত্র পাইয়া ভ্রমর প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়াছিল—পত্রখানি সহস্রবার পড়িল। বিনিদ্র রজনীযাপন করিল; জীবনের সংকটের মুহূর্ত—গ্রহণ না বর্জ্জন? স্বামীকে গ্রহণ অর্থাৎ সমস্ত নৈতিক আদর্শ বিসর্জ্জন—স্বামী হইলেও গোবিন্দলাল পত্নীত্যাগী পরদারনিরত, নারী হন্তা—তাহাকে গ্রহণ? স্বামীকে বর্জ্জন—হিন্দু নারীর পক্ষে জীবন মরণের দেবতা, তাঁহাকে বর্জ্জন—কল্পনাতীত। স্বামী সর্ব্বাবস্থায় প্রণম্য—গ্রহণীয় কিনা সেই প্রশ্ন? ভ্রমর সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে—পত্রের পাঠ ও স্থির করিয়াছে। প্রভাতে ভ্রমর নির্ব্বিকার।

ভ্রমর স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করিয়াছিল কেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। গোবিন্দলালের পত্রের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সে কথার আভাস দিয়াছেন, গোবিন্দলাল লিখিয়াছিলেন—তোমাকে যে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছে পরদারনিরত হইয়া পর্য্যন্ত করিল……"। ভ্রমর তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কিনা সে গোবিন্দলাল নিশ্চিত ছিল না। ২।১৩।১১

"ভ্রমর লিখিল"—আপনি আসিয়া……আপনার সম্পত্তি ভোগ করুন। সঙ্গে ভ্রমর জানাইয়া দিল স্বামীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ভ্রমর দেশত্যাগ করিবে। পত্রখানি অত্যন্ত নির্ম্মম. কঠোর। পত্রের মধ্যে স্বামীর কল্যাণকামনা নাই, নিজের শরীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ নাই, পত্রের কোন স্থলে বিন্দুমাত্র কোমলতার আভাস নাই, কিন্তু পত্রখানি অত্যন্ত সচেতন। এই পত্রখানি লিখিতে ভ্রমরের যে কি মর্ম্মবেদনা, তাহা পত্রের কালির অক্ষরের অপূর্ণ অংশের মধ্যে পরিস্ফুট,—প্রথমে ভ্রমর স্বামীকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, পূর্ব্বে বন্দরখালি হইতে লিখিত পত্রে এবং বিবাহিত জীবনের আলাপ আলোচনায় স্বামীকে ভ্রমর তুমি বলিয়া সম্বোধন করিত। সম্বোধনের পার্থক্য দ্বারা স্বামীর মনে সহজ ব্যবধান সৃষ্টি করা স্বাভাবিক—যদিও গোবিন্দলাল স্পষ্ট করিয়া এই অভিযোগ করেন নাই।

গোবিন্দলালের মনে পত্রপাঠে কি ধারণা হইয়াছিল—তাহা মনে করা কঠিন নহে। ভ্রমরের দানপত্র অনুসারে অর্থাভাবপীড়িত গোবিন্দলাল সম্পত্তির দাবী করিতে পারিতেন; বিবাহের দাবীতে ইচ্ছা করিলে ভ্রমরকে আদেশ করিতেও পারিতেন। মেরুদণ্ডবিহীন গোবিন্দলাল সেদিক দিয়া চিন্তা করেন নাই। গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা ত্যাগ করিলেন, ভ্রমরের নিকট ভিক্ষা স্বরূপ অর্থ যাচ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়বার পত্র লিখিলেন, বিচারকের আসনে সমাসীনা ভ্রমর লিখিল "মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অপমানজনক কথা যোগ করিয়া দিল—"আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা আছে।" ইহাতে মনে হয় ভ্রমরের ধারণা হইয়াছিল যে রোহিণীর মৃত্যুর পরেও গোবিন্দলালের চরিত্রসংশোধিত হয় নাই, কলিকাতায় গোবিন্দলাল বিলাসজীবন যাপন করিতেছিল, অধিক অর্থ হস্তে ন্যস্ত হইলে উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে স্ত্রী সন্দিহান এবং সেই সন্দেহ স্ত্রী স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছে—স্বামীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? অবশ্য ভ্রমরের দ্বিতীয় পত্রে যে ব্যথার প্রলেপ ছিল না তাহা নহে, কারণ ভ্রমর পত্র শেষে লিখিয়াছেন, আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়াছে। শরীর অসুস্থতার উল্লেখের পশ্চাতে ভ্রমরের মানসিক অবস্থা কি ছিল? গোবিন্দলালের মনে সহানুভূতি সঞ্চারের আকাঙ্খা, না নিজের অনুতাপ, না নিষ্ঠুর আঘাতের প্রলেপ?

অবশ্য একথা সত্য যে ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল—এবং সে কথা ভ্রমর জানিত। ভ্রমর সেই দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

শীতের শেষ—বসন্ত আগতপ্রায়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার আভাস চারিদিকে, অতীতের স্মৃতি ভ্রমরের চিত্তে দোলা দিয়াছে। এমনি এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি ছিল ভ্রমরের ফুলশয্যার রাত্রি। রুগ্ন শয্যায় মৃত্যুপথযাত্রী ভ্রমর ফাল্গুনের জ্যোৎস্না রাত্রিতে মৃত্যুকামনা করিতেছিল।

দিন যায়, রাত্রি আসে। শেষ পর্য্যন্ত ফাল্গুনী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি আসিল, ভ্রমর প্রতি মুহূর্ত্তে সেই শুভরাত্রির জন্য—তাহার মৃত্যুতিথির জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই দিন পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া ভ্রমর বুঝিল যে তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, শরীরেও মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। প্রতিক্ষণে ভ্রমরের মনে বেদনা যে স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুর মূহূর্ত্তে একবার সাক্ষাৎ হইল না। ভ্রমর যামিনীকে বলিল, "দিদি একটি বড় দুঃখ রহিল। যেদিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। কই আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিনে দিদি—একবার যদি তাহার সাক্ষাৎ পাইতাম, একদিনে দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।" (২।১৩।১৩)

ভ্রমরের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে আসিতে লিখিয়াছিলেন—গোবিন্দলাল হরিদ্রাপুরে আসিয়াছেন। যামিনীর ইঙ্গিত-

ক্রমে গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আগত। স্বামীকে দেখিয়া ভ্রমর সমস্ত বেদনা গ্লানি ভুলিয়া গেল। অভিমান দূর হইল, মনের দ্বন্দ্ব নিঃশেষ হইয়া গেল, ভ্রমর স্বামীর চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু মাথায় দিয়া বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" ভ্রমর যে স্বামীকে আঘাত করিয়া অপরাধ করিয়াছে তাহা ভ্রমর মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও ভুলে নাই। ভ্রমর জীবনে সুখী হয় নাই—সে সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন ছিল। স্বামী ভাল হউক মন্দ হউক, হিন্দু নারীর সংস্কার স্বামী জীবনে স্বামী, মরণে ও স্বামী। মৃত্যুর শুভক্ষণে ভ্রমর স্বামী দেবতার চরণরেণু মাথায় ধারণ করিয়া কৃতার্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মৃত্যুর পরে গোবিন্দলালের যে চিত্র অংকন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, কারণ রোহিণী নিহত, ভ্রমর মৃত। গোবিন্দলাল দুইজনকেই হত্যা করিয়াছেন—রোহিণী হত্যা প্রত্যক্ষ, ভ্রমর হত্যা পরোক্ষ—গোবিন্দলালের এখন যা কিছু দ্বন্দ্ব, দ্বিধা—তাহা নিজের সঙ্গে নিজের। গোবিন্দলাল নিতান্ত একাকী, কাহারো সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত নাই, মান অভিমানের পাত্র নাই। গোবিন্দলালের হৃদয় ঝঞ্ঝার শেষে সমুদ্রের মতন প্রশান্ত। কিন্তু অতীতের স্মৃতি, কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা আত্মগ্লানি তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিল। "কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখে পাইয়াছিল। গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী।" মৃত্যু ছিল ভ্রমরের সহায়, গোবিন্দলালের তাহা নাই। নীলকণ্ঠের বিষের মত রোহিণী মথিত হলাহল গোবিন্দলালের কণ্ঠে লাগিয়া রহিল।" গোবিন্দলালের চরিত্রাঙ্কনে বহু দোষত্রুটী আছে; চরিত্রের পারম্পর্য্য নাই। তাহার মধ্যে নায়কোচিত গুণের অভাব তাহার দোষগুলির মধ্যেও দৃঢ়তা নাই, স্থৈর্য্য নাই ঘটনার প্রবাহকে প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা নাই গোবিন্দলাল যেন স্রোতের মুখে তৃণখণ্ড।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে বহু অসঙ্গতি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন—ঘটনা বর্ণনার পরে স্থানে স্থানে তিনি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা এবং যেখানে সামাজিক সংস্কার আহত হইতে পারে, সেখানে তিনি নীরব, অথবা স্বল্পবাক।

সাংখ্য দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যে প্রমাণ

সাংখ্য মনন-শাস্ত্র—প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার দাবী। তাই প্রথমেই ইহাতে বিবিধ প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। "প্রমা" শব্দের অর্থ যথার্থজ্ঞান, নিশ্চিত জ্ঞান। যাহা দ্বারা প্রমা লাভ করা যায়, তাহাই প্রমাণ।

সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত—দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান বা যুক্তি এবং আপ্তবচন বা আগম। এই তিনটি দ্বারা সমস্ত প্রমাণ সিদ্ধ হয়। প্রমাণ হইতেই প্রমেয় সিদ্ধি হয়।

দৃষ্টম্, অনুমানং আপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং, প্রমেয় সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি।
সাং কা—৪

ইন্দ্রিয়জ নিশ্চিত জ্ঞানই দৃষ্ট প্রমাণ। "ব্যাপ্য" বস্তুর জ্ঞান হইতে যে ব্যাপক বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান। এই অনুমানে বহ্নি ব্যাপক, ধূম ব্যাপ্য। যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে। বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না। কিন্তু ধূম না থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপ্য বস্তু দৃষ্ট হইলে, তাহা হইতে ব্যাপক বস্তু অনুমিত হয়।

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানম্ অনুমানম্। সাং সূ—১।১০০

প্রতিবন্ধ = ব্যাপ্তি। প্রতিবন্ধদৃশঃ = প্রতিবন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে। প্রতিবদ্ধ = ব্যাপক। প্রতিবদ্ধজ্ঞানম্ = ব্যাপকের জ্ঞান।

কিন্তু ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, কেবল একবার মাত্র দেখিয়া সে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শনের অপেক্ষা করে।

ন সকৃৎ গ্রহণাৎ সম্বন্ধ সিদ্ধিঃ।
সাং সূ—৫।২৮

চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন

নাই॥ অনুমানকে তিনি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কেননা যে ব্যাপ্যত্বের উপর অনুমান প্রতিষ্ঠিত, তাহা অসিদ্ধ। চার্ব্বাকের যুক্তি খণ্ডনের জন্যই সাংখ্যকার বলেন, ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ তো কেবল একবারের সাহচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বহু বার সেই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীভূত হইলে এবং কখনও ব্যাভিচার দৃষ্ট না হইলেই তবে ব্যাপ্তিসিদ্ধি হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ের মধ্যে যদি অব্যাভিচারী ধর্ম্মসাহিত্য অর্থাৎ সহচার সম্বন্ধ থাকে—যেখানে ব্যাপ্য সেইখানেই ব্যাপক এবং যেখানে ব্যাপক সেইখানেই ব্যাপ্য—এই সম্বন্ধ যদি থাকে, অথবা ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ের একটি যদি সর্ব্বদাই অন্যের সহচারী হয়, (শেষোক্তটি প্রথমোক্তটির নিত্য সহচারী না হইলেও) তাহা হইলেই এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে।

নিয়ত ধর্ম্ম-সাহিত্যম্ উভয়োঃ একতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ।

সাং সূ—৫।২৯

ব্যাপ্তি অন্য একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন উভয়ের অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব নহে। স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিলে ব্যাপ্তিত্বের আশ্রয়স্বরূপ এক স্বতন্ত্র বস্তুর কল্পনা করিতে হয় এরূপ কল্পনার হেতু নাই।

ন তত্ত্বান্তরং, বস্তুকল্পনা প্রসক্তেঃ।

(সাং সূ—৫।৩০

ব্যাপ্তি যদি স্বতন্ত্র কোনও তত্ত্ব না হয়, তবে তাহার স্বরূপ কি? কোন কোনও আচার্য্য বলেন—ব্যাপ্য বস্তুর স্বকীয় শক্তি হইতে উদ্‌ভূত এক প্রকার বিশেষ শক্তিই ব্যাপ্তি। এই মতে ব্যাপ্তি একটি ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু ব্যাপ্তি যদি ব্যাপ্যের স্বকীয় শক্তি হয়, তাহা হইলে যতদিন ব্যাপ্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ব্যাপ্তিরও অস্তিত্ব থাকিবে। ইহা কিন্তু সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না। দেশান্তরগত ধূম অগ্নির ব্যাপ্য নহে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধূমের উৎপত্তি-কালেই তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে।

নিজশক্ত্যুদ্‌ভবম্ ইত্যাচার্য্যাঃ।

সাং সূ—৫।৩১

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, যে দুইটি বস্তু যখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধযুক্ত হয়, যে একটি অপরটির আধেয় এই প্রকার এক শক্তি আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতিতে প্রকৃতির ব্যাপ্তি আছে। বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতি প্রকৃতির আধেয়।

আধেয়শক্তিযোগঃ ইতি পঞ্চশিখাচার্য্যঃ।

সাং সূ—৫।৩২

ইহার প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন—আধেয়-শক্তি-নামক এক শক্তি কল্পনার প্রয়োজন কি? ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্যের স্বরূপ শক্তি বলিলেই হয়। কিন্তু স্বরূপ শক্তি বলা যায় না, বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। প্রথমতঃ এই শক্তি যদি ব্যাপ্যের স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে অপরের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হউক বা না হউক, তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইবে। সুতরাং সম্বন্ধপাত করিয়া প্রকাশিত হয়, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ যদি আধেয় ভাব বস্তুর স্বরূপগতই হয়, তবে একবার মাত্র ধূমের দর্শনেই অগ্নিজ্ঞান হওয়া উচিত। তবে অনুমানের নিমিত্ত মহানস প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বে ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কোনও প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানেও কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না এবং প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানকে একটি প্রমাণ বলা পুনরুক্তি মাত্রে পরিণত হয়। (স্বামী সত্যদাস মহারাজের ব্যাখ্যা)

ন স্বরূপশক্তিঃ নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ।

(সাং সূ—৫।৩৩)

তাহা হইলে বস্তুর ব্যাপ্য-ব্যাপক—বিশেষণেরও কোন সার্থকতা থাকে না। বিশেষণ যদি বস্তুর স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রয়োগ নিরর্থক।

বিশেষণানর্থক্য প্রসক্তেঃ। সাং সূ—৫।৩৪

পল্লব বৃক্ষের আধেয়। এই আধেয়তা যদি পল্লবের স্বরূপ শক্তি হইত, তাহা হইলে বৃক্ষ হইতে পল্লব যখন ছিন্ন হয়, তখনও তাহাতে এই শক্তি থাকিত। কিন্তু ছিন্ন পল্লবে বৃক্ষের সহিত আধেয় ভাব থাকে না।

পল্লবাদিষু অনুপপত্তেশ্চ। সাং সূ—৫।৩৫

বস্তুতঃ আধেয় শক্তি ও নিজশক্তি উভয়ের অর্থ একই। যে যুক্তিতে আধেয় শক্তি সিদ্ধ হয়, তদ্দারা নিজশক্তিও সিদ্ধ হয়।

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমান-ন্যায়াৎ।

সাং সূ—৫।৩৬

অনুমান ত্রিবিধ। লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞান হইতে যে লিঙ্গী অর্থাৎ হেতুমৎ বিষয়ের জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ। ত্রিবিধ অনুমানের নাম—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। আপ্তশ্রুতিই আপ্তবচন বা আগম। আপ্ত পুরুষ অর্থাৎ ছল, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দোষে যিনি দূষিত নহেন, তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তাহাই আপ্তবচন।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং, ত্রিবিধং অনুমানমাখ্যাতং
তল্লিঙ্গ-লিঙ্গীপূর্ব্বকম্, আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনম্ তু।
সাং কা—৫

প্রতিবিষয়—ইন্দ্রিয়।
অধ্যবসায়—নিশ্চিত জ্ঞান।
প্রতি বিষয়াধ্যবসায়—ইন্দ্রিয়জজ্ঞান।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় মন, এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট প্রমাণ। মানসিক ব্যাপার সকল অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়।

ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যাহা বর্ত্তমান নাই, যুক্তিদ্বারা তাহার জ্ঞানলাভ করা যায়। যুক্তিই অনুমান প্রমাণ। পূর্ব্ব দৃষ্ট বিষয়-সম্বন্ধ যে অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্ব-যুক্ত)। যেখানেই পূর্ব্বে ধূম দেখা গিয়াছে, সেখানেই অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। এখানে অনুমান পূর্ব্বগত অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নি অপ্রত্যক্ষ হইলেও, প্রত্যক্ষ ধূম হইতে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ধূম ও অগ্নি অভিজ্ঞতার মধ্যে সহভাবী। আবার আকাশে কৃষ্ণ মেঘ দেখা গেলে সম্ভাব্য বৃষ্টি অনুমান করা যায়। এখানেও কৃষ্ণ মেঘ ও বৃষ্টির অভিজ্ঞতার মধ্যে সহভাবী।

দুইটি বস্তু যদি অসহভাবী হয়, অর্থাৎ কখনও একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না এরূপ হয়, যেখানে একটি থাকে, অন্যটি সেখানে থাকে না এবং যেখানে একটি থাকে না, সেখানে অন্যটি থাকে, অর্থাৎ যদি তাহারা অসহভাবী হয়, তাহা হইলে একটির অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব হইতে যে অনুমান করা যায়, সেই অনুমানকে শেষবৎ (শেষ অর্থাৎ নিষেধযুক্ত) অনুমান বলে। ইহা ব্যতিরকমুখী যুক্তি) গন্ধ ক্ষিতির একটা গুণ। যেখানে গন্ধ সেখানেই ক্ষিতি। সুতরাং কোনও বস্তুর মধ্যে (যেমন জলের মধ্যে) যদি গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সে বস্তু ক্ষিতি নহে, এই অনুমান শেষবৎ। যে বস্তুর যে যে গুণ আছে, তাহাদিগের হইতে ভিন্ন অবশিষ্ট গুণ তাহার নাই, এই অনুমান ও শেষবৎ (এখানে শেষ=অবশিষ্ট)। কোনও বস্তুতে বর্ত্তমান গুণ ভিন্ন অন্য গুণ তাহাতে নিষিদ্ধ। যেমন গন্ধ ক্ষিতির গুণ। এক খণ্ড মৃত্তিকার মধ্যে যে রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ক্ষিতির গুণ নহে। সুতরাং সেই মৃত্তিকার সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত আছে। এই প্রকার অনুমান শেষবৎ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—বৈশেষিক মতে এই ছয়টি পদার্থ। শব্দ কোন্ পদার্থ স্থির করিতে হইলে, শব্দ দ্রব্য নহে, কর্ম্ম নহে, সামান্য নহে, বিশেষ নহে, সমবায় নহে, ইহা প্রমাণ করিয়া অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, তাহা অর্থাৎ গুণ শব্দ, এইরূপ সিদ্ধান্ত 'শেষবৎ'।

সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দৃষ্ট হইতে অদৃষ্ট বস্তুর অনুমান। দৃষ্ট বস্তুসম্বন্ধীয় ব্যাপ্তি জ্ঞান-অবলম্বনে, অদৃষ্ট তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ জাত্যন্তরীয় বস্তুবিষয়ে যে অনুমান হয়, তাহাকে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলে। যেমন কর্ত্তা কোন করণ ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। করণ সাহায্যেই কর্ত্তা কর্ম্ম সম্পাদন করেন, ইহা সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়। পরন্তু দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিও কার্য্য। অতএব এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষেরও এমন করণ আছে, যদ্দ্বারা তিনি দর্শন, শ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ইন্দ্রিয় সকলের অস্তিত্ব এইরূপে সাধিত হইলে, ইহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ ঘটাদি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও গুণ 'অতএব ইহাদেরও আশ্রয় স্বরূপ আত্মা আছেন। এইটিও সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত। দুইটি বস্তু একজাতীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে, তন্মধ্যে একটির কোনও একটি বিশেষ অব্যভিচারী-অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ঐ অবস্থা সজাতীয় অপর বস্তুরও আছে এই অনুমান হয়। ইহাই সাধারণতঃ সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের স্বরূপ। এক বস্তু এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া তৎপরে দেশান্তরে দৃষ্ট হইলে, তাহার গমন কার্য্য দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাকে গতিশীল বলিয়া অনুমান করা যায়, যেমন দেশ হইতে দেশান্তর-প্রাপ্তি হেতু সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়। এই প্রকার যে অনুমান, তাহাকেও একপ্রকার সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলিয়া ন্যায়-দর্শন ভাষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থে "শেষবৎ অনুমান"। (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—সন্তদাস মহারাজ, প্রথম খণ্ড—৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

বনলতা হঠাৎ সংবাদ দিলেন—গোপাল ঠাকুরকে তাহার অবিলম্বে প্রয়োজন। ঐ একটি মাত্র বধূ মাঝে মাঝে তাহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন—কখনও শিবপূজা, কখনও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির বরাত পড়ে এবং গোপালকে তাহা করিতেই হয়। বনলতার চণ্ডীপাঠ ও শিবপূজা গোপাল ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

গোপাল অন্দরে প্রবেশ করিলেন, বাড়ীটা ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে, একটা দিক চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আধুনিক আসবাবে সজ্জিত, নতুন রকম রং-এর প্রলেপ দেওয়া, অন্য অংশ জীর্ণ, নেহাত সেকেলে। বনলতার তথা শশধরের অংশ সেইটি। কাছারী বাড়ীটা এখনও সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

গোপাল অন্দরে পৌছিতেই বনলতা আসন পাতিয়া দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। গোপাল মনে মনে খুশী হইলেন, এমনিভাবে কেহ আর এখন অভ্যর্থনা করে না। গোপাল সহাস্যে কহিলেন—কি মা, হঠাৎ অকেজো লোকটিকে ডাক পড়ল কেন ?

বনলতা ব্যথিতভাবে কহিল—আমি কি অপরাধ করেছি ঠাকুরমশাই ?

—তোমার অপরাধ কি ? দেহটা সত্যিই অকেজো হ'য়েছে, এইটুকু আসতে যেন দম আট্‌কে আসে—যাক্, হঠাৎ কেন মা ?

বনলতা কহিলেন—ঠাকুরপোর আজ দু'দিন জ্বর, বুকে বেদনা। ঠাকুরেরও ঠিক এমনি বুকে ব্যথা হ'য়ে—বনলতা থামিয়া গেলেন। একটু পরে কহিলেন—ছোট বৌ ক'লকাতা, এখানে আর কেউ নেই, আমার বড্ড ভয় হ'য়েছে। আপনি কাল একরূপ চণ্ডীপাঠ করুন—আমার সাধ্যমত সবই করতে হবে ত ? এখনও যখন বেঁচে আছি—

গোপাল একটু হাসিয়া কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন—তোমাকে ত ভেন্ন করেই দিয়েছে, তুমি কি ক'রবে ? দরকারই বা কি ? ক'লকাতা চিঠি দিয়ে দাও—তারা যা জানে তাই করবে—

বনলতা কহিল – তাই কি হয় ঠাকুরমশায়, আমার দেওর আমার কাছে আছে যখন—সবই আমাকে করতে হবে। ওরা ফেলে দিলেই ত আমি ফেলে দিতে পারিনে ঠাকুর-মশায় ? ধর্ম্ম ত চিরদিনের—

গোপাল বনলতার কথা শুনিয়া প্রথম একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন—বনলতার মন পরীক্ষার জন্যেই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটি বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—মা, এমনি কথা অনেক দিন শুনিনি, এমনি করে ধর্ম্মের কথা, ত্যাগের কথা, আর কেউ এখন বলে না—কেবল বলে আমার, আমার—আর একবার বল মা—বড় মধুর, বড় সুন্দর কথা—

গোপালের কোটরগত চক্ষু হইতে সত্য সত্যই দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বনলতা একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—তিনি কোন্ কথায় গোপালকে ব্যথিত করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাই পদপ্রান্তে বসিয়া কহিলেন—ঠাকুরমশায়, ক্ষমা করুন, আমরা ত কথা ব'লতে জানি না—

গোপাল রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন—তুমি আমি যখন চলে যাবো তখন এই গোপালপুরে আর এসব কথা কেউ ব'লবে না। বড় দুঃখ মা মনে—মানুষ এমন হিংস্র হ'য়েছে কেন ?...আচ্ছা, কাল চণ্ডীপাঠ ক'রবো—নারায়ণকে তুলসী দেব—চাঁদু ভাল হবে—

গোপাল নিজেকে সংযত করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া প[...] চলিতে লাগিলেন—মনে মনে ভাবিলেন বনলতার সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী চাটুয্যের সংসারে ধর্ম্মের শিক্ষা' চিরদিনের ম[...] নিভিয়া যাইবে। দেশে থাকিবে শুধু হিংস্র শ্বাপদ, স্বা[...] লইয়া হানাহানি করিবে—পূর্ব্বে কত ভাই একসঙ্গে চিরদি[...]

থাকিয়াছে কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত শশধরের পুত্রদ্বয়ের হাঁড়িও ত ভাগ হইল বলিয়া। তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—দুর্গা, দুর্গা শ্রীহরি—

গোপাল আপনমনে যাইতেছিলেন—শ্রীধর তিলির ছেলে স্কুলে পড়িয়া এখন কলিয়ারীতে চাকুরী করে, সে কোনরূপ অভিবাদন না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাহার হাসি দেখিয়া শ্রীধর পুত্র ধীরেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গোপাল কহিলেন—শ্রীধরের বেটা বটে?

—হ্যাঁ ঠাকুরমশায়—

—ভাল আছ? কাজকর্ম্ম ভাল চল্‌ছে—

—হ্যাঁ—

—ছুটি নিয়ে এসেছ? ক'দিন?

—ছুটি কি আছে, বলে কয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। বড় সাহেব সকলকে ছুটি দেবে, আমাকে দেবে না?

—কেন?

ধীরেন হাসিয়া কহিল—আমি না হ'লে চলে না। কিছু বোঝে না, আমি চালিয়ে নেই কিনা? মেমসাহেব পর্য্যন্ত কত খাতির করে—

গোপাল হাসিলেন—তাহার গল্প শুনিয়া নয়, এতক্ষণও সে একটা শুষ্ক নমস্কার করে নাই—দেখিয়া। ধীরেন তাই প্রশ্ন করিল—হাস্‌লেন যে ঠাকুরমশায়? বিশ্বাস হ'ল না?

—তা নয় বাবা, অন্য কারণে—

—বলুন না—

—ব'লবো—

—বলুন—

—তোমার বাবা আমাকে কোনদিন প্রণাম না ক'রে রাস্তা পেরোয় নি, আর তুমি একটা কথাও না বলে চলে যাচ্ছিলে তাই—

—না ঠাকুরমশায়, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, ভেবেছেন গালগল্প, তাই হেসেছেন—

—না হে না—আমি ঠিকই বলেছি—

—নমস্কার না করলে হাস্‌বার কি আছে? আর খামকা নমস্কারই বা করতে হবে কেন? আপনি বিশ্বাস না করেন, চলুন একবার কলিয়ারিতে—দেখে আস্‌বেন—মেমসায়েব চা করে বসে আছে কিনা—

গোপাল মনে মনে ছেলেটির ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার কথা সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া নিজের অনুমানটাকেই সে তাহার স্কন্ধে চাপাইতে চায়। গোপাল কহিলেন—ওহে আমি মিথ্যাকথা বলি না—আমি যা বলেছি তাই—আর তুমি যা অনুমান ক'রেছ তা অনুমানই এবং ভুল—

ধীরেন হাসিয়া কহিল—মানুষ চরিয়ে খাই ঠাকুরমশায়, আমার অনুমান ভুল হ'লে ফোর্থ ক্লাস বিদ্যে নিয়ে করে খেতে হ'ত না—পাকা বাড়ীও ক'রতে হোত না—

গোপাল কটু কটাক্ষে ধৃষ্ট ছেলেটির পানে চাহিয়া চলিতে লাগিলেন। ধীরেনও ঠাকুরমশায়কে জব্দ করিয়াছে ভাবিয়া বিজয়োল্লাসে চলিয়া গেল। গোপাল ভাবিলেন—কলিয়ারীর চোরাই পয়সায় পাকা বাড়ী করিয়া ছেলেটা জগতের সবই বুঝিয়া ফেলিয়াছে! এত অহমিকা, এত ধৃষ্টতা কেমন করিয়া আসিল? তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—এমনি করিয়া যাচিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া আর অসম্মানকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন না। যে কয়েকদিন পরমায়ু আছে পৃথিবীর একান্তে নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটাইয়া দিবেন—একমাত্র বিধাতার শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া।

চাঁদমোহনের পীড়া গুরুতর—

তাহার পুত্র অশোক কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার লইয়া আসিয়াছিল, তিনি চাঁদমোহনকে দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ দিন পার না হইলে এ রোগের সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হয় না। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতেছে—অশোকের মাতা ও কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

বনলতা গৃহদেবতার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছেন—ছোটবৌ বলিলেন, আপনি যদি ঠাকুর ঘরেই পড়ে পড়ে কাঁদবেন, তবে অষুধ পথ্যির ব্যবস্থা আমি কি করে করি-ডাক্তারের কথামত সব করতে হবে ত?

বনলতা চোখ মুছিয়া কহিলেন—ঠাকুর কুল দাও—আহ ছোটবৌ— তাহার অশ্রুর ধারা নামিয়া আসে।

ডাক্তারের ঔষধ, বনলতার অশ্রুমার্জ্জনা, ছোটবৌএর শুশ্রূষা ও অশোকের ব্যবস্থা কোনটাই বিশেষ ফলদায়ক হইল না, চাঁদমোহনের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপই হইতে লাগিল—

অশোক কলিকাতার ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করিল, তিনি পুনরায় আসিলেন, পুনরায় ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু খুব আশা দিতে পারিলেন না।

নবম দিন সকালে চাঁদমোহনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। গোপাল বারান্দায় বসিয়াছিলেন—ভোলা আসিয়া সংবাদ দিল, ছোটবাবু বোধহয় আজই যাবেন—

—বলিস্ কিরে? চাঁদু, চাঁদমোহন স্বর্গত হবে—সেদিনের ছেলে?

—হ্যাঁ, তাই ত শুনলাম—

গোপাল তাড়াতাড়ি লাঠিখানা লইয়া উঠিলেন এবং যথাসাধ্য দ্রুতপদে ভগবতী চাটুয্যের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। চাঁদমোহন তাঁহার আগেই ভবপারাবারের পাড়ি জমাইবে এটা তাঁহার নিকটে একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল—মনে মনে কহিলেন, হায় ভগবান এই সব দেখতেই কি বাঁচিয়ে রেখেছিলে?

গোপাল কাছারী বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, কালী বাগ্দী বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং তিনু বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে। গোপাল প্রশ্ন করিলেন—তিনু, চাঁদু কেমন আছে—

তিনু কহিল—ভালো নয়, বোধহয় আর আশা নেই—

—বলিস্ কি? আশা নেই—

গোপাল কাছারী হইতে বাহিরে আসিয়া অন্দরে ঢুকিতে যাইবেন—সহসা তাহার মনে হইল, ভগবতীর মৃত্যুর কথা, এই চণ্ডীমণ্ডপ বোঝাই লোক অশ্রুচোখে বসিয়াছিল, তাহারা শশধরকে অভয় দিয়াছিল—তাহারা আছে, দরকার হইলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ চণ্ডীমণ্ডপ জনশূন্য, খড় গোবর ও নানা আবর্জ্জনায় পূর্ণ, তিনি দ্রুত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। চাঁদমোহনের গৃহের দরজায় দাঁড়াইয়া বনলতা কাঁদিতেছিলেন। গোপাল কহিলেন—চাঁদু, চাঁদু কেমন?

বনলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—ঠাকুরমশায়, মা'র মনে কি এই ছিল—

গোপাল ঘরে ঢুকিলেন—চাঁদমোহন অজ্ঞান, অশোক একটা অষুধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু চাঁদমোহন তাহা গিলিতে পারিলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া বনলতা পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অশোক কহিল—অমনি করে কাঁদবেন না জেঠিমা—রোগীর ঘরে, ওতে ক্ষতি হয়, দুর্ব্বলতা আসে—

বনলতা বাহির হইয়া গেলেন। গোপাল রোগীর শিয়রে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—একবার ডাকিলেন—চাঁদু, চাঁদু—

কোন জবাব কেহ দিল না—গোপাল চাঁদুর মাথায় হাত রাখিয়া কি একটা মন্ত্র জপ করিয়া কহিলেন—মা, ব্রহ্মময়ী মা—

অশোকের মুখে এমন একটা ভাব গোপাল লক্ষ্য করিলেন যেন সে তাহার এই আগমন ও কার্য্যে বিশেষ প্রীত হয় নাই। গোপাল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিলেন,কিন্তু সেদিনের ছেলে চাঁদু তাহাকে রাখিয়া চলিয়া যাইবে ইহা যেন তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই চোখ দুইটি বার বার অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন—

কাছারী বাড়ীতে তিনু ও কালী বসিয়া আছে আদেশের অপেক্ষায়। তাহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই—বাড়ী জনশূন্য, গ্রামে কাহারও যেন এই সংবাদের প্রয়োজন নাই। গ্রামের এতগুলি লোক, কেহ কোনও রূপে উদ্বিগ্ন হয় নাই—যে যাহার কাজ করিতেছে—

পথ দিয়া আসিতে লাগিলেন—কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিল না, চাঁদু কেমন আছে। কেবলমাত্র মল্লিকমশায়ের ছেলে প্রশ্ন করিল—বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলেন ঠাকুরমশায়—?

—হ্যাঁ—

—ছোটবাবু কেমন?

—ভাল না—আমি ত আশা দেখি না—বেঘোরে পড়ে আছে—তোরা একবার দেখ্‌তেও যাস্‌না—

মল্লিকপুত্র কহিল—যাওয়া ত উচিত, গিয়েছিলামও—কিন্তু ওরা সেটা পছন্দ করেন না—তাই এমনি করেই সংবাদ নেই—

—হ্যাঁ—গোপাল চলিলেন। মনটা তাহার অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত—চাঁদু চিরদিনের মত চলিয়াছে, আজ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় গ্রাম নীরবে নিঃশব্দে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—এতটুকু

করুণা, এতটুকু দুঃখ উদ্বেগ কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই—কিন্তু ভগবতী যখন মারা যান তখন আদুরী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়াছিল, বলিয়াছিল—মোর ধর্ম্মের বাপ মারা গেলেক বটেরে—

গোপাল করুণার অশ্রু একবার মার্জ্জনা করিলেন—

দ্বিপ্রহরে বাবুদের বাড়ীর অন্দরে একটা আকস্মিক ক্রন্দনের রোল উঠিল। নিকটবর্ত্তী বাড়ীর পুরুষ স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—সকলে মিলিয়া কাঁদিতেছে। তাহারা কান্না শুনিয়া বুঝিল—চাঁদমোহনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাহারা শুনিয়াই বুঝিল এবং বুঝিয়াই চুপ করিয়া গেল—চাঁদমোহন আভিজাত্যের প্রাচীর দিয়া যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ডিঙ্গাইয়া প্রতিবেশী কেহই দেখিতে গেল না।

লোকমুখে কথাটা প্রচারিত হইল মাত্র। ছোট-লোকদের পাড়ায় শিবুর বৌ আসিয়া শিবুকে প্রশ্ন করিল—কান্না কেনে রে ?

শিবু শণের দড়ি পাকাইতেছিল, কহিল, ছোটবাবু মারা গেলেক বটে—সে পুনরায় দড়ি পাকাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

মাঠে গরু রাখিতে রাখিতে নবীন বাউরীর ছেলে বাঁশী বাজাইতেছিল—কে একজন ডাকিয়া কহিল—ছোটবাবু মারা গেলেক বটে—

ছেলেটি বাঁশী বাজনা থামাইয়া কথাটা শুনিল এবং পুনরায় গরু গুলির উদ্দেশ্যে—হেঁই-পাঁপা—হঃ হঃ বলিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

তখন ছোটবৌ গৃহের মেঝেয় পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছেন, বনলতা তাহার মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। অশোক বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে—তিনু দাঁড়াইয়া আছে নতমুখে, গ্রামের বয়স্ক দুই এক ব্যক্তি অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন—সসঙ্কোচে, নীরবে।

অবিলম্বে গোপাল সংবাদ পাইলেন—চাঁদু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। তিনি লাঠি লইয়া দ্রুত বাহির হইলেন। এখন শেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে, চাঁদু ছেলেমানুষ, অশোক ত বালক, শশধরের দুই পুত্র ত শিশু—কে এই সব ব্যবস্থা করিবে ?

তিনি অন্দরের উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কয়েকজন প্রতিবেশী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। তিনু বারান্দায় ক্রন্দনরত অশোকের সামনে দাঁড়াইয়া। গৃহের অভ্যন্তরে বনলতা ও ছোটবৌ—গোপাল দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন—মা, বনলতা ওঠো—সকলেরই এই গতি, অশোক ভাই ওঠো—তুমি ত শিক্ষিত, জানো জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু—জরা মৃত্যু ব্যাধি, মানব জীবনের অবশ্য পরিণতি—এখন সৎকারের ব্যবস্থা কর—সকলেরই এই এক গতি। ভগবান করুণাময়, শোকের দ্বারা অভিভূত হওয়া ত কর্ত্তব্য নয়। ওঠো বনলতা—

গোপাল ঠাকুরের কথায় অশোক একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। গোপাল কহিলেন—ওঠ ভাই, এখন কাঁদবার সময় নেই, বাবা মায়ের জন্যে সারা জীবন কাঁদবে, ভাবনা কি তার জন্যে সারা জীবনই ত রয়েছে, এখন ওঠো, যাতে সদ্গতি হয় তার ব্যবস্থা কর—

অশোক অসহায়ের মত কহিল—যা করবার তা ত ক'রলাম, আর কি ক'রবো বলুন—

—বুকে বল সঞ্চয় করো, ভেবে দেখো তোমার মা, তোমার বোন, ভাই—সব তোমার উপরে নির্ভর করছে, এখন তোমাকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে, সান্ত্বনা দিতে হবে—তোমার ত কাঁদবার সময় নেই।

অশোক কহিল—বলুন কি ক'রবো—

—চাঁদুর দেহ ত গঙ্গাতীরস্থ করতে হবে। তিনু তুমি সকলকে ডাকো—নবশাকদের আর বাগ্দী পাড়ায় সংবাদ দাও। বেলা বেশী নেই। সন্ধ্যার মধ্যে মুখাগ্নি ক'রে রওনা দিতে হবে—

তিনু অশোকের মুখের দিকে তাকাইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। অশোক কহিল—যা ভাল হয় কর—

তিনু চলিয়া গেল—

উঠানে অপেক্ষমান প্রতিবেশীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া গোপাল কহিলেন—তোমরা এস বাবা সকল, অশোকের কাছে এস, বসো—আজ ওর কত বড় বিপদ, আমরা পাশে না দাঁড়ালে কে আর আসবে বল ?

গোপাল বনলতা ও ছোটবৌএর উদ্দেশ্যে গীতার কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন—পুরাতন বস্ত্রের মত মানবাত্মা পুরাতন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। অতএব যাকে আমরা মৃত্যু বলে শোক করি সেটা নবজীবনের আরম্ভ। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নূতন সুন্দর দেহ লাভ করবো এটা কি আনন্দের নয়?···

তিনু বিষণ্ণমুখে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপাল প্রশ্ন করিলেন—ওরা সব আস্‌ছে ত? তুমি নববস্ত্র, চন্দন, ঘৃত, সমস্ত জোগাড় কর—

তিনু জবাব দিল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

—কি, কি হ'য়েছে বল—

ওরা কেউ গঙ্গাতীরে যেতে পারবে না। যাকে বলছি সেই বলছে কাজ আছে, না হয় পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। মোটের উপর যাবে না—

গোপাল উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—কেন যাবে না? এতদিন গিয়েছে, আজ যাবে না কেন? ভগবতী চাটুয্যের ছেলের দেহ গঙ্গাতীরে দাহ হবে না, তবে কি হিন্দুলবাঁধে দাহ হবে?

তিনু আমতা আমতা করিয়া কহিল—তারা ত ব'লছে তাই, আমি কি করবো?

গোপাল কহিল—দেখি, আমি জিজ্ঞাসা করে দেখি, তারা কেন যাবে না, গ্রামে কি অরাজক হ'য়েছে—কারও কি পরের কথা ভাববার দরকার নেই? তারা কি কোন দিন ম'রবে না?

গোপাল ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। তিনু পিছন পিছন আসিয়া কহিল—ঠাকুর মশায়, ওরা বল্‌ছে, খাই খরচ ও মদের খরচা বাদে মাথাপিছু দশটাকা দিতে হবে—নইলে যাবে না—

—এই কি টাকা রোজগারের সময়? মানুষের যখন চরম বিপদ, তখন চাই টাকা? টাকাই কি পরমার্থ—প্রতিবেশীর প্রতি, মৃতের প্রতি কি তাদের কোন কর্ত্তব্য নেই?

গোপাল উষ্মাসহকারে বাহির হইয়া গেলেন। নবশাক পাড়ায় যাইয়া প্রথম পাইলেন, দোকানী বংশী তিলিকে। গোপাল কহিলেন—হ্যাঁরে বংশী, টাকা না হ'লে তোরা গঙ্গায় চাঁহুকে নিবিনে? দশটা টাকা না হ'লে কি তুই ফকির হ'য়ে যাবি? তোদের কি প্রতিবেশীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—কোন মমতা নেই?

বংশী তাড়াতাড়ি গোপালকে প্রণাম করিয়া কহিল—ঠাকুর মশায়! আমাকে অপরাধী করবেন না। ছেলেরাই ত যাবে, তারা বলছে—আমার ত দেখুন সেদিন গাড়ী থেকে পড়ে পা মচ্‌কে গিয়েছে, চুণ হলুদ দিতে দিতে কোনমতে—

—টাকাই তোদের পরমার্থ। তোদের কি প্রতিবেশীকে কোনকালেই লাগবে না! তোরা কি সব অমর—? আমি ত গরীব মানুষ, আমাকেও কি তোরা হিন্দুলবাঁধের কাদায় পুঁতে রাখবি?

বংশী পুনরায় সভক্তি প্রণাম করিয়া কহিল—আপনার পুণ্যের শরীর, ওকথা ব'লবেন না ঠাকুর মশায়। তবে আজকাল ত মুরুব্বির কথা কেউ শোনে না—ছোকরারাই মুরুব্বি, কি ব'লবো বলুন—

গোপাল কহিলেন—হায় হায়, মানুষ এমন অধঃপাতেও যেতে পারে? ভগবতী চাটুয্যের ছেলে আজ তোদের কাছে এতটুকু ভালবাসা শ্রদ্ধা পাবে না—

—আজ্ঞে কর্ত্তার কাল হ'লে দেখুন একহাজার লোক জড়ো হ'ল। মতিঠাকুর মশায় পর্য্যন্ত তাদের ঠেকাতে পারলেন না। আর আজ তাঁর ছেলের ব্যাপারে—দেখুন ঠাকুরমশায় কি আর ব'লবো—

বংশী যাহা বলিল, গোপাল তাহা বুঝিলেন না; তিনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। নবশাকদের কেহই প্রায় বাড়ী নাই, যাহারা বাড়ী ছিল তাহারা সাড়া দিল না—তরুণের দল তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। কেবল তাঁতিদের একটি ছেলে তাহার সামনে পড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতেই সে কহিল—গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার দরকার কি ঠাকুরমশায়। যার পুণ্য থাকে সে যাবেই, চেষ্টা করতে হবে না—ছোটবাবুর ত এমন পুণ্যের শরীর নয় যে—

বংশী যে কথাটি বলিতে পারে নাই তাঁতিদের ছেলেটি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিল।

—কেন? কেন? ভগবতী চাটুয্যের ছেলে—যে ভগবতীর পুকুরের জল খেয়ে আজও বাঁচছিস্। গোপাল

অশ্রুচোখে কহিলেন—দুদিন বাদে আমিও তো যাবো রে—তোরা কি এমনি করেই বলবি তখন—টাকা চাই—

—না ঠাকুরমশায়, আপনাকে নিয়ে যাবো—ছেলেটা একটু হাসিল। কিন্তু গোপালের চোখ দুইটি দুঃখে ক্ষোভে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—

গোপাল বাগ্দী বাউরী পাড়ায় ঢুকিলেন। শশীকে ডাকিয়া কহিলেন—কি রে, তোরাও কি যাবিনে শশী—

শশী বাঁকা কোমর লইয়া নমস্কারান্তে কহিল—ঠাকুরমশায় আপনি কেনে আর? ওরা যাবেক নাই—ওরা যেতে নারবেক—বলছেন—ছোটবাবুর পুণ্যের দেহ হিঙ্গল-বাঁধেই দেবেক?

—তোরা টাকা চেয়েছিস্ রে? মড়া পোড়াতে টাকা?

—না, ঠাকুরমশায় তা কেনে লেবেক। গঙ্গাতীরে, এত পথ যেতে লারবেক।

আশে পাশে আরও কতকগুলি লোক সঞ্চিত হইয়াছিল।

গোপাল কহিলেন—ভগবতী চাটুয্যের ছেলেকে তোরা গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবি নে—টাকা নিবি?

—না, আমরা কের্ত্তন করবেক—হিঙ্গলবাঁধেই লেবেক। টাকা লেবেক কেনে?—লোকটা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, অর্থ তাহার সুপরিস্কার।

—আমার দেহও তোরা নিবিনে গঙ্গাতীরে? টাকা চাইবি? আমার কে টাকা দেবে—

—না, ঠাকুরমশায়। আপনারে মোরা লেবেক!

শশী কোমর সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—ঝাঁকা করে মু লিয়ে যাবেক ঠাকুরমশায়—একলাটি লিয়ে যাবেক।

গ্রামের সর্ব্বসাধারণের মনোবৃত্তি দেখিয়া গোপাল স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—মৃতের সহিত আজ এরা ঝগড়া করিতে চায়—।

(ক্রমশঃ)

রামমোহন প্রসঙ্গ

আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিগত অক্টোবর মাসে জয়পুরে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে আমি ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলাম। এই উপলক্ষে আমি যে অভিভাষণ দেই তাহাতে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছিলাম। ইহার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। দৈনিক 'যুগান্তরে' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় সাত আট সংখ্যায় এ সম্বন্ধে নানা লেখক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কারণ আমি ঐ অধিবেশনের পর প্রায়ই বাংলার বাহিরে থাকিতাম—এবং ঐ সমুদয় পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা যোগাড় করাও সহজ নহে। সম্প্রতি কোন কোন বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি সংখ্যা পাঠাইয়াছেন। বিষয়টি গুরুতর মনে করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

প্রতিবাদগুলির অধিকাংশই অবান্তর বিষয় লইয়া আলোচনা। অনেক স্থলে আমার উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা প্রকৃতপক্ষে আমি বলি নাই। আমার অভিভাষণ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় নাই। শুনিয়াছি দৈনিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—কিন্তু সংখ্যাগুলি আমি দেখি নাই। সম্প্রতি 'বাঙলার শিক্ষক' নামক মাসিক পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৬০) ইহা ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই পত্রিকাও খুব সুপরিচিত নহে। সুতরাং প্রথমেই রামমোহন সম্বন্ধে আমার অভিভাষণে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাধারণ বাঙ্গালীর বিশ্বাস যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রধানতঃ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনেরই ইতিহাস। দূর হইতে দেখিলে যেমন পাহাড়ের উচ্চ চূড়াই লোকের নয়নগোচর হয়, তাহার আশে পাশে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি সম্বন্ধে কোন ধারণাই জন্মে না—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। রামমোহন রায় সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব বহুবিস্তৃত ছিল, একথা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিনই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা না করিয়াও একথা বলা যায় যে, তাঁহার মহিমা অযথা বড় করিতে গিয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে খাটো করিয়াছি। সাধারণের ধারণা এই যে, তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক, প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারক এবং প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্তু ইহার কোনটিই সত্য নহে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা রামমোহনের পূর্বেই বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখেন এবং তাঁহাদের অনেকের রচনানীতিই রামমোহনের রচনারীতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামমোহনের কলিকাতা আসিবার পূর্বেই এখানে অন্যান্য বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অনুভব করেন এবং তাহার ব্যবস্থা করেন। যে হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না, বরং যখন এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় তখন তিনি ইহার প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। সামাজিক সংস্কার বিষয়েও একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের পূর্বে সুন্দর বাংলা গদ্য রচনা করিয়া ইহার জনকত্বের দাবী করিতে পারেন, তিনিও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রও রামমোহনের পত্রিকার পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমার অভিভাষণের যে সমুদয় প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে—তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি।

১। "ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের পূর্ব্বে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।"

(যুগান্তর পত্রিকা ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৬০,—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী)। আমার অভিভাষণে আমি বলিয়াছি যে—যে বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য রচনা করিয়াছেন তিনিও সতীদাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মত প্রকাশ রামমোহনের পূর্ব্বে কি পরে আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। অথচ ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতটি আমার ঘাড়ে চাপাইয়া গিরিজাবাবু ইহার সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

২। ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন ঃ

"রামমোহনের কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই এখানে যে হিন্দু কলেজ অন্যান্য বাঙ্গালীর ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না......"

রামমোহন রায় কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল কি ?

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী—"দেশ" ২১শে কার্ত্তিক ১৩৬০ পৃঃ ৫৭)

পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন যে আমার অভিভাষণে 'কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই"—এই কথা কয়টির পরে যে বারটি শব্দ ছিল তাহা বাদ দিয়া পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত যোগ করিয়া একটি অদ্ভুত উক্তি সৃষ্টি করিয়া আমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। ইহা যে ছাপার ভুল নহে—তাহার প্রমাণ প্রতিবাদকারীর প্রশ্ন। কারণ আমার উক্তির এইরূপ বিকৃতি সাধন না করিলে হিন্দু কলেজ রামমোহনের কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা সে প্রশ্নই ওঠে না।

প্রতিবাদকারীর অন্ততঃ এটুকু দায়িত্ব জ্ঞান থাকা দরকার যে, যে-উক্তির প্রতিবাদ হইতেছে তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা, এবং তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই কর্ত্তব্য করেন না তাঁহাদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিলে তাঁহাদের কোন অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমি এই সমুদয় বাদ প্রতিবাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছি কেবল তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেক লেখক রাজা রামমোহন সম্বন্ধে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে যে সমুদয় আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস ছিল যে এ সম্বন্ধে মোটা-মুটি ঘটনাগুলি অনেকেরই জানা আছে। এই কারণে এবং অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টায় আমার উক্তির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। এই অভিভাষণ পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত না হওয়ায় কোন পাদটীকা সংযোগ বা প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আমার মৌলিক আবিষ্কার নহে, সুপরিচিত ঘটনামাত্র। তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। রামমোহন ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন

এই সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধেই বেশী প্রতিবাদ হইয়াছে—সুতরাং প্রথমেই এই বিষয়টির আলোচনা করিতেছি।

"হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না"—আমার এই উক্তিটি সম্বন্ধে বহু লেখক প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ নানারূপ কটূক্তি ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (পৃঃ ৭০৮-৭১১) যে সমুদয় প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশা করি আমার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শ্রীঅমল হোমের ন্যায় রামমোহন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখকগণও ৺ব্রজেন্দ্রনাথের একটি পুরাতন প্রবন্ধ প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমাকে গালি দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।* এবং ইহাতে রামমোহনকেই হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের ভুল স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গিরিজাবাবু অথবা অমলবাবু কেহই লক্ষ্য করেন নাই। অথচ এই গ্রন্থ চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক দলিল যে তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের একখানি দীর্ঘ পত্র —একথা সকলেই (আমার প্রতিবাদকারীরাও) স্বীকার করেন। এই চিঠিখানির তারিখ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে। ইহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মে মাসের প্রথমে কলিকাতাবাসী আমার পরিচিত একজন ব্রাহ্মণ আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে অনেক গণ্যমান্য হিন্দুরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক—এবং আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একটি সভা ডাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া একটি সভা ডাকিলাম। ১৮১৬ সনের ১৪ই মে আমার বাড়ীতে

---

* J. Bors, XVI. 154.

এই সভার অধিবেশন হইল। সভাতে পঞ্চাশ জনেরও অধিক ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা সহি হইল এবং আরও অনেকে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

"সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি কয়েকজন গণ্যমান্য হিন্দুকে সভাগৃহের পার্শ্বস্থ এক কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। এখানে পণ্ডিতগণ সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন আমাকে বলিলেন যে "আশা করি রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন চাঁদা নেওয়া হইবে না।' আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে তিনি আমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছেন (Chosen to seperate himself from us) এবং আমাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন (attack our religion)। উত্তরে আমি বলিলাম যে রামমোহনের ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি না, কারণ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় বা পত্র ব্যবহার নাই (not being acquainted or having had any communication with him)। তবে আপনারাই এই বিদ্যালয়ের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিবেন তাহাদের হাতেই চাঁদা নেওয়ার না নেওয়ার ভার থাকিবে। কয়েকজন হাস্য করিয়া বলিলেন যে, যদি রামমোহন রায় এই বিদ্যালয়ের জন্য টাকা দিতে চান তাহা না নেওয়ার কোন কারণ নাই —কারণ রামমোহনের টাকার সহিত অন্যের টাকার প্রভেদ নাই (Which was as good as other people's).

"সভার প্রধান কার্য্য ছিল বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তৃত একখণ্ড জমি কেনা ও তাহার একাংশের উপর গৃহ নির্ম্মাণের খরচের বাবদ চাঁদা তোলা, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করা।

"এই সভার একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক সচরাচর একযোগে কোন কার্য্য করার জন্য মিলিত হন না—তাঁহারাও এই বিদ্যালয়ে তাঁহাদের সন্তানদিগকে একসঙ্গে শিক্ষা দিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উপস্থিত পণ্ডিতগণও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

"স্থির হইল যে এক সপ্তাহ পরে আর একটি সভার অধিবেশন হইবে। বহু লোক এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। চারিদিক হইতেই শুনিতেছি যে হিন্দু জনসাধারণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং একলক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে।"*

এই চিঠিখানির প্রারম্ভে যে ব্রাহ্মণের কথা আছে, মেজর বামনদাস বসু চিঠিখানি উদ্ধৃত করিবার সময় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে তিনি নিশ্চয়ই রাজা রামমোহন রায় (This of course refers to Raja Ram Mohan Roy). ৺ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সনে লিখিত প্রবন্ধে এই চিঠিখানির সম্পূর্ণ নকল দিয়াছেন। তিনিও ঐ 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পরে বন্ধনীর মধ্যে (রামমোহন রায়)—এই অংশ যোজনা করিয়াছেন। রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে "Rammohun Roy." নামে যে গ্রন্থ শ্রীযুক্ত অমল হোম সম্পাদনা করেন তাহাতেও ঠিক এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে (রামমোহন রায়) যোগ করা হইয়াছে। 'রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক' এই প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইলে এইরূপ অনুমান করা অসম্ভব। কারণ এই ব্রাহ্মণ যে রামমোহন হইতে পারেন না, এই চিঠিতেই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। চিঠির আরম্ভে ইষ্ট বলিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তিনি তাঁহার পরিচিত (Whom I knew)। কিন্তু ঐ চিঠিরই পরবর্ত্তী অংশে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "রামমোহনের সহিত আমার পরিচয় বা পত্রব্যবহার নাই"। সুতরাং হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া যে ব্রাহ্মণ ইষ্টের সহিত দেখা করেন তিনি যে রামমোহন রায় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অথচ এই ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই রামমোহনকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, আদিকল্পক প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সম্মান ডেভিড হেয়ারেরই প্রাপ্য। রাজনারায়ণ বসু স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে হেয়ার সাহেব "সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন"। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে ভুল করিলেও পরে এই ভুল সংশোধন করিয়াছেন। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" তৃতীয় সংস্করণের ৭০৯-১০ পৃষ্ঠায় Calcutta Christian Observer নামক মাসিক পত্রিকার ১৮৩২ সনের জুন ও জুলাই সংখ্যা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

এই উদ্ধৃত অংশে হিন্দু কলেজ স্থাপনের গোড়ার কথাও জানা যায়। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে দিতেছি।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বাড়ীতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সমবেত হন। ভারতবাসীগণের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি—ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হয়। রামমোহন রায় বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ডেভিড হেয়ার এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, একটি সংশোধক প্রস্তাব (amendment) আনয়ন করেন যে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই সংশোধক প্রস্তাব অধিকাংশের মতানুযায়ী হওয়ায় হেয়ার শীঘ্রই এই কলেজের সম্বন্ধে একটি খসড়া প্ল্যান প্রস্তুত করেন এবং বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জীকে চাঁদা আদায়ের ভার দেওয়া হয়। এই খসড়া প্রস্তাব কিছুদিন পরে স্যার হাইড ঈষ্টের হাতে দেওয়া হয় এবং তিনি ইহার আলোচনার জন্য তাঁহার গৃহে একটি সভার অধিবেশন করেন।"

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন যে বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী ঈষ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া কলেজ স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহার অনুরোধে হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারা যে এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তাহা ঈষ্ট সাহেবকে জানান।

* অন্যান্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে একলক্ষ টাকার বেশী চাঁদা উঠিয়াছিল।

এই সমুদয় ঘটনা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তাহার সহিত রামমোহনের সম্বন্ধ কি তাহার প্রকৃত তথ্য জানা যায়।

রামমোহন রায় ১৮১৫ সনে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই যে কলিকাতায় গণ্যমান্য হিন্দুগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল ১৮১৬ সনের ঈষ্টের চিঠিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দু একত্র হওয়া এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা সহি করা, এই দুইটি জিনিষই যে বঙ্গদেশে খুব দুর্ল্লভ স্বয়ং ঈষ্ট তাঁহার চিঠিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও এই ইংরেজী শিক্ষার প্রস্তাব সানন্দে ও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তৎকালে কলিকাতার হিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ ক্রম কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। রামমোহন রায়ের কলিকাতা আসিবার এক বৎসরের মধ্যেই রামমোহনের প্রভাবে এরূপ উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছিল বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এ কথা স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বতন কোন সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইলে সকলেই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে পরবর্ত্তী কালে রামমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিলেও তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক একথা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না।

হিন্দুকলেজ স্থাপনের প্রস্তাব তাঁহার বাড়ীতেই প্রথম হয়। কিন্তু ইহা তাঁহার প্রস্তাব নহে। তিনি ব্রাহ্মসভা স্থাপনেরই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেবই বলেন যে নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এইরূপ ধর্ম্মসভার পরিবর্ত্তে কলেজ স্থাপনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। রামমোহন যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতেন তবে সংশোধক প্রস্তাবের কোন প্রশ্নই উঠিত না এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে রামমোহন এইরূপ কলেজস্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মসভা স্থাপনেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

এই অনুমানের সমর্থক হিসাবে বলা যায় যে ঈষ্টের বাড়ীতে যে সভায় বহুসংখ্যক গণ্যমান্য হিন্দু একত্র হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, রামমোহন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে রামমোহন শতবার্ষিকী গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে হিন্দুদের আপত্তি থাকায় রামমোহম ঈষ্টের নিকট চিঠি লিখিয়া প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের কমিটির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। কিন্তু ঈষ্টের চিঠি হইতে জানা যায় যে তাঁহার বাড়ীতে প্রথম সভার অধিবেশনের সময় একজন ব্রাহ্মণ রামমোহনের নিকট হইতে টাকা নিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাহাতে ঈষ্ট বলেন যে, যে-কমিটি গঠিত হইবে তাহারাই টাকা নেওয়া বা না নেওয়ার বিষয় স্থির করিবে। সুতরাং তখন পর্য্যন্ত কোন কমিটিও গঠিত হয় নাই এবং রামমোহনকে কমিটিতে নেওয়ার বিরুদ্ধেও আপত্তি হয় নাই। 'রামমোহনের নাম কমিটির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হউক—হিন্দুদের এই প্রকার অভিপ্রায় জ্ঞাপন এবং তাহার ফলে রামমোহনের উক্ত কমিটির সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন' শতবার্ষিকীর এই বিবরণ অমূলক বলিয়াই মনে হয়। ঈষ্টের বাড়ীতে প্রথম সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে যে ঈষ্টের নিকট রামমোহনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠে নাই তাহা ঈষ্টের চিঠি হইতেই বেশ বোঝা যায়। সুতরাং রামমোহন এই সভায় উপস্থিত হইলেন না কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নির্ণয় করা কঠিন। যদি ঈষ্ট তাঁহাকে সভায় আহ্বান না করিয়া থাকেন, অথবা তিনি আহ্বান সত্ত্বেও উক্ত সভায় উপস্থিত না হইয়া থাকেন—তবে ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার মত ছিল না অথবা আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস থাকিতে পারে যে বহুব্যয়ে একটি কলেজ স্থাপন করা অপেক্ষা ধর্ম্মসভা স্থাপনে দেশের অর্থ ও শক্তি নিয়োজিত করিলে দেশের যুবকগণের নৈতিক চরিত্রের অধিকতর উন্নতি সাধন হইবে। ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করিয়াও এরূপ মত পোষণ করা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নহে।

এসম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার। যে সময় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 'সমাচার দর্পণে' এই সোসাইটির কার্য্যকলাপের কথা এবং যে সমুদয় ইংরেজ ও ভারতবাসী ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় ('সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড ১-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহার কুত্রাপি রামমোহনের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে রামমোহন ব্যতীত আরও অনেক বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশের মহৎ উপকার হইয়াছে একথা যদি আমরা স্বীকার করি তাহা হইলে সে যুগের যে সমুদয় গণ্যমান্য হিন্দু ও সাহেবগণ এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। রাজা রামমোহন রায় নিজের ব্যয়ে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট তিনি যে পত্র লেখেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এবিষয়ে তাঁহার গৌরব ও কৃতিত্বের কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য সব বাঙ্গালীর কথা বিস্মৃত হইয়া রামমোহনকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক (pioneer) বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা রামমোহনের মহিমা অযথা বড় করিতে গিয়া বাঙ্গালী জাতিকে খাটো করিব, আমার অভিভাষণে আমি এই কথাই বলিয়াছি—এবং আশা করি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিবরণ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমার এই উক্তি যে "ইতিহাস বিরুদ্ধ অসত্য কথা বলিবার দুঃসাহস" নহে তাহা স্বীকার করিবেন।

২। রামমোহন ও বাংলা গদ্য সাহিত্য

আমার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে আমি মাত্র দুইটি কথা বলিয়াছি। প্রথম কথা এই যে, রাজা রামমোহনের পূর্ব্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখেন। আশা করি এ সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কথা—ইঁহাদের অনেকের রচনা রীতিই রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সম্বন্ধে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রচনা রীতির ভাল মন্দ বিচার অনেকটা ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বত্রিশ সিংহাসন" "হিতোপদেশ" "রাজাবলি" রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" এবং রামরাম বসুকৃত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" যথাক্রমে ১৮০২, ১৮০৮, ১৮০৮, ১৮০৫ ও ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহনের প্রথম বাংলা বই "বেদান্ত গ্রন্থ" ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ঐ তিন জন পণ্ডিতের গ্রন্থগুলির সহিত রামমোহনের গ্রন্থগুলির তুলনা করিলে রামমোহনের রচনারীতির এমন বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দেখা যায় না—যাহাতে পরবর্ত্তী হইলেও তাঁহাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা নানা দিক হইতেই ইঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। উক্ত সমুদয় গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল এই জন্য ইহাদের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "প্রবাদ আছে যে রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক।" অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির কথা জানিতেন না। সুতরাং পূর্ব্বে সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন সেই নজিরের উপর নির্ভর না করিয়া আমার প্রতিবাদকারীগণ যদি স্বাধীন ভাবে এই সমুদয় গ্রন্থের রচনারীতির তুলনামূলক আলোচনা করেন তবে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে।

এ বিষয়ে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কোন কোন গ্রন্থের ভাষা যেমন সংস্কৃতবহুল তেমনি অন্যান্য গ্রন্থে বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষার নিদর্শন আছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকার' ভাষা প্রথম শ্রেণীর ও তাঁহার যে তিনখানি গ্রন্থের নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'প্রবোধচন্দ্রিকার' ভাষা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী বলেন যে এই ভাষার চারিভাগের তিনভাগ সংস্কৃত এবং একভাগ বাংলা। অন্যান্য অনেকেও সম্ভবতঃ ঐ একই কারণে, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাকে উৎকট বলিয়া মনে করেন। এইজন্য রাজাবলি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিছুকাল পরে আপন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পরে শালিবাহন রাজা বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়াও তাঁহাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক জানিয়া তাঁহার পদে আপনি অভিষিক্ত হইলেন না এবং তাঁহার শকাব্দারও অন্যথা করিলেন না এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রিবর্গের দিগকে কহিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যদি সন্তান থাকে তবে তাঁহাকে পিতৃপদে তোমরা অভিষিক্ত কর।"

এই ভাষা সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যগুলি কতদূর প্রযোজ্য পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন। তুলনার জন্য রামমোহনের গ্রন্থ হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার একটি সংস্কৃতবহুল, অপরটি অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লিখিত।

১। "অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অথচ তাঁহাদের উপাধি সম্বন্ধাধীন পুনরায় স্থানে ২ ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রান্ত করিয়াও আপনাকে কহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্তরূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণাক্রান্তরূপে বর্ণন করেন" (পথ্য প্রদান)।

২। "প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? (প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ)

৩। রামমোহন ও বাংলা সংবাদপত্র

আমার অভিভাষণে আমি বলিয়াছি যে রামমোহন রায় যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারক একথা সত্য নহে। ইহার উত্তরে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বলেন যে "বাঙ্গাল গেজেটি" ১৮১৮ সনের ১৫ই মে এবং "সমাচার দর্পণ" উহার আটদিন পরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং "বাঙ্গাল গেজেটিই" প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

"বাঙ্গাল গেজেটি" "সমাচার দর্পণে"র পূর্ব্বে কি পরে প্রকাশিত হয় ইহা লইয়া মতভেদ আছে (৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা সাময়িকপত্র' ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ "বাঙ্গাল গেজেটি"র প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য এবং হরচন্দ্র রায়। এ বিষয়ে ৺ব্রজেন্দ্রবাবু যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী "বাঙ্গাল গেজেটি" সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "ইহা যে রামমোহনের কাগজ তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" কিন্তু কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। উক্ত "বাঙ্গাল গেজেটি" "বৎসর খানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়"। এই সম্বন্ধে সমসাময়িক সব কাগজেই বাঙ্গাল গেজেটির প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য অথবা হরচন্দ্র রায়ের নাম দেখা যায়। কুত্রাপি রামমোহনের উল্লেখ নাই। রামমোহনের শতবার্ষিকী গ্রন্থেও তৎপ্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে ১৮২১ সনে প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদীর' উল্লেখ আছে—"বাঙ্গাল গেজেটি"র উল্লেখ নাই। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত "বাঙ্গাল গেজেটি"কে "রামমোহনের কাগজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

১৮১৮ সনের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় "দিগ্‌দর্শন" (মাসিক), "সমাচার দর্পণ" ও "বাঙ্গাল গেজেট" (সাপ্তাহিক) এবং "গসপেল মাগাজীন" (মাসিক) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি ১৮১৮ ও শেষোক্তটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং রামমোহনের পূর্ব্বে অন্ততঃ দুইখানি বাংলা সম্বাদপত্র ছিল। ইহার মধ্যে সমাচার-দর্পণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। রামমোহন ও সতীদাহ

সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন যেরূপ তীব্র ও বহুদিনব্যাপী আন্দোলন করেন সে যুগে আর কেহ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমার অভিভাষণে আমি মাত্র এই ইঙ্গিত করিয়াছি যে এ বিষয়েও সে যুগের বাঙ্গালীরা একেবারে উদাসীন ছিলেন না—এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে তাঁহার ন্যায় প্রাচীনপন্থী একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণও যখন এই প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে এ দেশের লোকের মনেও এই প্রথার বিরুদ্ধভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত-প্রকাশ রামমোহনের সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। সুতরাং সে বিষয়ে আমি স্পষ্ট কোন মত ব্যক্ত করি নাই। মৃত্যুঞ্জয় সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন এমন কথাও বলি নাই। আমার প্রতিবাদকারী শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এ ক্ষেত্রেও আমাকে উপলক্ষ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রজেন্দ্রনাথের মতেরই সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি এবং অন্য প্রতিবাদকারীরা বলিয়াছেন যে মৃত্যুঞ্জয়ের সমকালে (১৮১৭ খৃঃ) এবং কিছু পূর্ব্বেও (১৮০৫ ও ১৮১২) অন্য পণ্ডিতেরা সতীদাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আমার পূর্ব্বোক্ত অভিমতই সমর্থন করে। রামমোহনের পূর্ব্বেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানান সতীপ্রথার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন…১৮০৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দশজন হিন্দু পণ্ডিত ছয় মাসের জন্য নানা শ্মশানঘাটে দাহকারীদের শাস্ত্র প্রমাণ ও বিচার দ্বারা নিবৃত্ত করিতে থাকেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ "শুদ্ধি সংগ্রহ" নামে একটি পুস্তকে প্রকাশ করেন। ইহার ফলে এই সময় হইতেই সতীদাহপ্রথার নিবারণ-কল্পে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।* সুতরাং রামমোহন রায়কে "এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক" বলা যায় কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ। রামমোহন রায় এদেশীয় লোকের মধ্যে এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন, কিন্তু আরও অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহার সহায়ক ও সমর্থক ছিলেন।

৫। রামমোহনের দান

আমার অভিভাষণে রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার সমর্থনে আমার যাহা বক্তব্য তাহা উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রতিবাদকারীরা যে সমুদয় অবান্তর প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে মনে করি না।

রামমোহন রায় যে একজন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং বঙ্গদেশে তাঁহার প্রভাব বহু বিস্তৃত ছিল ইহা, আমার অভিভাষণে বলিয়াছি। ইহা এত সুপরিচিত সত্য যে ইহার সমর্থনে কোন যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে মনে করি না। কিন্তু রামমোহনের পূর্ব্বে যে ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা গদ্য সাহিত্য এবং বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং রামমোহনের উপদেশ ও দৃষ্টান্তেই এই সমুদয় সম্বন্ধে তাঁহারা প্রথম সচেতন হইয়া উঠেন—এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমরা ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙ্গালীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অবিচার করি নাই। রামমোহনকে ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা গদ্য সাহিত্য ও সংবাদপত্রের জনক অথবা প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করিয়া আমরা একদিকে তাঁহার মহিমা যেমন বাড়াইয়াছি, অন্যদিকে তেমনি সে যুগের সভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি। আমার অভিভাষণে আমি এই সত্যটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রামমোহনের গৌরবে বাংলার গৌরব—একথা সত্য। কিন্তু রামমোহনের গৌরবেই বাঙ্গালীর গৌরব—ইহা সত্য নহে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব খর্ব্ব করিয়া রামমোহনের গৌরব বৃদ্ধি করায় কেবল যে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় তাহা নহে, বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবমাননা করা হয়। কোন ব্যক্তি যত বড়ই হউন না কেন, জাতির অযথা অসম্মান করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই কথাটিই আমার অভিভাষণে সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন "স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্ত্তি তুমি।" রামমোহন সম্বন্ধেও বলা যায় যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলাদেশের নবজাগ্রত আত্মার মূর্ত্তি অথবা প্রতীক ছিলেন। তিনি যুগপ্রবর্ত্তক না হইলেও সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন, এবং তাঁহার মধ্য দিয়াই নূতন বাংলা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার মনীষা, চরিত্রবল ও অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালীর নবজাগ্রত চেতনাকে সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর করিয়াছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে একটি বিষয়ে রামমোহনকে যুগপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। স্বাধীনতা ও দেশপ্রীতি সম্বন্ধে তিনি যে নূতন ভাবের প্রচলন করেন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যে পথ তিনি প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে তাহা বর্ত্তমান ছিল এরূপ প্রমাণ আমার জানা নাই। বর্ত্তমান ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয় তবে তাঁহার নাম যুগপ্রবর্ত্তক হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বিষয়টি সুপরিচিত এবং এ বিষয়ে কোন ভ্রান্ত মত প্রচলিত নাই বলিয়াই আমার অভিভাষণে আমি ইহার কোন উল্লেখ করি নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রতিবাদকারীদের অবান্তর সমালোচনা স্রোত রোধ করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

---

* শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "নারী-জাগরণ—" পৃঃ ২, ৩, ৫

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

এলয়শার পত্র

ধর্মসম্প্রদায়ের পূতচরিত্র আচার্যগণ পুণ্যাত্মা মহিলাদের শিক্ষার উৎকর্ষ, তাদের সান্ত্বনা ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিবার জন্য যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং নীতি উপদেশাবলী সংকলন করেছেন সে সম্বন্ধে আমার ন্যায় একজন স্বল্প-শিক্ষিতার চেয়ে তোমার মতো একজন মেধাবী পণ্ডিত অনেক বেশি জানেন। সুতরাং, আমাদের এই সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণের গোড়ার কথাটুকু সম্পর্কে তোমার আজকের বিস্মৃতি আমাকে বড় কম বিস্মিত করেনি। তুমি ত' কই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে, বা আমাদের প্রতি তোমার অসীম প্রেমের দোহাই দিয়ে বা পুতচরিত্র আচার্যগণের উপদেশ উদ্ধৃত করে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করোনি? দ্বিধাজড়িত আমি, প্রতিদিনের দুঃখের আঘাতে অভিভূত আমি, আমাকে তুমি সাক্ষাৎ দেখা দিয়ে, আমার কাছে উপস্থিত হয়ে, মুখোমুখি আলাপ আলোচনা দ্বারা, অথবা উপস্থিত হওয়া যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তবে পত্রের দ্বারা আমাকে শান্ত রাখা ত' তুমি কর্তব্য বলে মনে করোনি? অথচ, তুমি তো জানো, আমি মিলনের মন্ত্রোচ্চারিত তোমার বিবাহিত-পত্নী—একথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে কি গুরুদায়িত্বই না নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেম। জানি, আমাকে তুমি বরাবর সেই স্বামী বা প্রভুর দৃষ্টিতেই দেখেছিলে, কেন না, একথা সর্বজনবিদিত হয়ে পড়েছিল যে আমি নাকি তোমাকে অন্তঃহীন প্রেমের সুকঠিন নিগড়ে বন্দী করে ফেলেচি।

তুমি তো একথা জানো প্রিয়তম এবং হয়ত সকলেই জানেন যে, তোমার জন্য আমি কি প্রভূত পরিমাণ ত্যাগ-স্বীকার করেছি। কিন্তু, অদৃষ্টের পরিহাসে, দুর্ভাগ্যের অকরুণ দৈবপ্রতিকূলতায়, যে অপরিমেয় নিষ্ঠুর বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে আমরা পরস্পরকে পেয়েও হারালেম—সে অপরিসীম দুঃখ, সে অতল ব্যথা আমার আরও দ্বিগুণ হ'য়ে উঠেছিল, তোমাকে হারানোর ক্ষতির চেয়ে—তোমাকে যে ভাবে ও যে কারণে হারালুম তারই লজ্জায়। কিন্তু, এও জানি যে, দুঃখের কারণ যতই বড় হবে সে দুঃখ ভুলিয়ে আনন্দের মধ্যে আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসও হবে ততোধিক। এবং সে প্রয়াস অপরে করবে না, সে করবে তুমিই নিজে। কারণ, আমার যা দুঃখ সে তো নিজের দুর্ভাগ্য বিচার ক'রে নয়, আমার যা কিছু দুঃখ সে তোমারই দুঃখ স্মরণ করে। সুতরাং, তোমার কাছেই আছে জেনো আমার সকল সান্ত্বনার মূলধন। আমাকে যে সুখী করতে পারে, বা আমাকে যে বেদনাহত করতে পারে—সে একমাত্র তুমি। আমার সকল ব্যথা নির্মূল ক'রে আমাকে পরম সান্ত্বনা দিতে পারো একমাত্র তুমিই। আর একথাও ভুলো না যে, প্রধানতঃ সে দায়িত্বও তোমারই। এখন যখন আমি তোমার সমস্ত কিছু আদেশই নির্বিচারে পালন করেছি, তখন তোমার কোনও দোষ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগই নেই। আমি এখনও তোমার হুকুমে নিজের জীবন পর্যন্ত অনায়াসে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারি। আরও বলতে পারি, যা' শুনে হয়ত' তোমার আশ্চর্য বোধ হবে; তোমার প্রতি আমার প্রেম উপস্থিত এমন একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যে, আমি তোমার জন্য নিজেকে জগতের সব কিছু আনন্দ থেকে চিরজন্মের মতো বঞ্চিত করতে চাই। তুমি তো জানো যে. তোমার আদেশে আমি একমুহূর্তে পৃথিবীর সর্বসুখভোগ হেলায় বিসর্জন দিয়ে অকালে এই সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান ক'রে এই মঠের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দিনী করেছি। বন্ধু, আমি শুধু আমার বাহিরের বেশটাই পরিবর্তন করিনি, এই পবিত্র পরিচ্ছদ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার আত্মাকেও রূপান্তরিত করেছি। করেছি শুধু তোমার

তৃপ্তির জন্য, যাতে তুমি বুঝতে পারো যে তুমিই আমার এই দেহ, মন ও আত্মার একমাত্র অধীশ্বর।

ভগবান জানেন আমি তোমার কাছে শুধু তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাইনি। আমি যে তোমা বই আর কিছু জানিনি। সরলভাবে, পবিত্র মনে আমি কেবল তোমাকেই চেয়েছি, তোমার কোনও ধন সম্পত্তির প্রতি আমার কখনো কোনও আসক্তি বা কোনও লোভ ছিল না। তুমি জানো আমি বিবাহের চুক্তিপত্রও চাইনি, বিবাহের কোনও যৌতুকও আমার কাম্য ছিল না, এমন কি নিজের ইচ্ছা, আনন্দ, অভিলাষ বলে আমি পৃথক কিছু রাখিনি, তোমাতেই উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেম আমার সর্বস্ব। 'স্ত্রী' অর্থাৎ বিবাহিত 'পত্নী' এই সংজ্ঞাটুকু মানব সমাজে যতই পবিত্র ও নিরাপদ হোক না, আমি তোমার একজন 'প্রিয়বান্ধবী' এইটেই আমার কাছে অধিকতর মধুর মনে হ'ত। এমন কি তুমি যদি আমাকে তোমার রক্ষিতা নারী বা বারবধূ বলেও পরিচয় দিতে, আমি তাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করতেম না কারণ আমি বিশ্বাস করি—তোমার প্রেমের জন্য আমি আমার নিজের সকল মান-অভিমান যতবেশি ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারবো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ততই সার্থক হ'য়ে উঠবে, অথচ তোমার গৌরব তা'তে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। আমি যে তোমার গরবে গরবিণী।

তোমার স্মরণ আছে কিনা জানিনা যে, কেন আমি তোমাকে এত ভালবেসেও তোমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চাইনি। কতকগুলো কারণকে তুমি অবশ্য উল্লেখ করতে ভোলোনি দেখিছি, কিন্তু কেন যে আমি পত্নীত্বের চেয়ে প্রেমকেই বড় বলে মনে করেছিলেম এবং বন্ধনের চেয়ে মুক্তিকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছিলেম সে বিষয়ে তুমি একেবারে নীরব! একটি কথাও এ সম্বন্ধে বলোনি দেখছি! ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমি বলতে পারি যে পৃথিবীর সম্রাট অগস্টস্ যদি এই সমগ্র ভূমণ্ডলটা আমাকে যৌতুক স্বরূপ উপহার দিয়ে আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব এনে আমাকে বিশ্বের সাম্রাজ্ঞী পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইতেন, তথাপি আমার কাছে প্রিয়তর হ'ত তাঁর সাম্রাজ্ঞী-পদের চেয়েও, তোমার রক্ষিতা, তোমার সেবাদাসী হয়ে থাকা! সম্রাট হ'লেই সে ধনী হয় না, শক্তিশালী হলেই সে শ্রেষ্ঠ হয় না, বড় হবার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা চাই—সে ছিল তোমার! তাই তুমি ছিলে আমার পরম প্রেমাস্পদ!

লোকে বলে আমি ভুল করেছি। কিন্তু তারা জানে না যে কতবড় এক সত্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব 'স্বামী' সম্বন্ধে তাদের যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল তারা সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই আমাকে বিবাহের কথা বলেছিল। কিন্তু, পৃথিবী একদিকে—আর আমি একদিকে, কারণ আমি যেমন ক'রে তোমাকে চিনেছিলেম, তেমন ক'রে তো আর কেউ তোমার সত্য পরিচয় পায়নি। তাই তো আমার প্রেমও তোমাকে আশ্রয় ক'রে সত্য হ'য়ে উঠেছিল! আমার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল হয়নি। কে কোথায় আছে এমন রাজ্যেশ্বর বা দার্শনিক মহাপণ্ডিত—যার খ্যাতি তোমার যশোরশ্মিকে ম্লান করতে পারে? তোমাকে একবার দেখবার জন্য এমন কোনো দেশ আছে কি,যার অধিবাসীরা পাগল হ'য়ে ছুটে আসেনি? তুমি যখন রাস্তা দিয়ে চলে যেতে, কে কোথায় ছিল এমন নগরবাসী যে কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে তোমার পানে না সবিস্ময়ে ফিরে তাকাতো? কোথায় এমন মাতা—বা এমন কুমারী আছেন, যিনি তোমার অবর্তমানে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে না থাকতেন, বা তুমি কাছে থাকলে উত্তেজনায় দীপ্ত হ'য়ে না উঠতেন? এমন কোন মহারাণী—বা কোন বারনারী—কোন দেশে আছে যে আমার ভাগ্যের ঈর্ষা করেনি—বা আমার মিলনসুখে নিশিযাপনের কল্পনায় নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়নি।

আমি অকপটে স্বীকার করছি তোমার দু'টি বিশেষগুণ ছিল—যার কল্যাণে তুমি তোমার ইচ্ছামতো যে কোনও নারীর হৃদয়কে মুহূর্তেই বশ ক'রে ফেলতে পারতে। সে হ'চ্ছে তোমার মধুর বাচনভঙ্গীর অন্তর্গত ভাষার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য, আর তোমার কিন্নরকণ্ঠে সুললিত স্বর্গীয় সঙ্গীত! এ দুটোর কোনটাই কোনোও দার্শনিক পণ্ডিতদের ভাণ্ডার ছিল না। তোমার কণ্ঠে তোমারই রচিত অপূর্ব সুরছন্দময় সুমধুর সঙ্গীত এতই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল যে, সে গান সেদিন প্রায় সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হ'ত। তোমার নাম ফিরতো সেদিন লোকের মুখে মুখে! এমন কি, যারা মূর্খ, যারা নিরক্ষর, তারাও তোমার গানের

সুর চেনে, তোমাকে তারা মনে রেখেচে। আমি জানি, তোমার প্রেমে ধন্য হবার জন্য বহু তরুণীই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। তোমার রচিত গানগুলির অধিকাংশই ছিল আমাদেরই প্রেমের অপূর্ব গীতিকাব্য। সেই প্রেম-সঙ্গীত ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল নানা দিক্‌দেশে এবং আমার নামটিও সেই সঙ্গে দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। কত দেশের কত প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী মেয়ের বুকেই না ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেম আমি।

তোমার যৌবন তোমার অন্তরের মানুষটিকে এবং বাহিরের ব্যক্তিটিকে কত না দুর্লভ গুণে অলংকৃত করেছিল? সেদিন যারা আমার ঈর্ষা করেছিল তাদের কে না বলো আজ এই সর্ব-আনন্দ-হারা আমার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবেন? কোন শত্রুর না আমার দুর্দ্দশা দেখে আমার প্রতি দয়া হবে আজ?

বিশ্বাস করো বন্ধু, আমা হ'তে তোমার বহু অনিষ্ট হ'লেও আমি কিন্তু নিরপরাধ! ফল যা দাঁড়ায়, সেটা কোনও ক্ষেত্রেই অপরাধের অংশ নয়। নিরপেক্ষ বিচার কোনও দিনই কাজের হিসাব নেয় না। সে দেখে—কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে কাজ করা হয়েছে? আমি যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার জন্য কখন কোন কাজ করেছি তার বিচার একমাত্র তুমিই করতে পারো, কারণ তুমিই একমাত্র তার ফলভোক্তা! আমি আপন অন্তরকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে তোমার সামনে মেলে ধরছি, তুমি সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান ক'রে দেখ। তোমার বিচারের উপর নিভর করে আমি নিজেকে ছেড়ে দিলুম।

যদি পারো তবে একটি কথা শুধু তুমি আমাকে বলো যে, তোমারই আদেশ শিরোধার্য্য করে নিয়ে আমি এই যে যৌবনে যোগিনী সেজে মঠের সন্ন্যাসিনী রূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেছি, তারপর থেকে তুমি কেন আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে, এমন অনাদরে, এমন অবহেলায় ফেলে রেখেছ। আমি আর তোমার দেখা পাইনি, তোমার কথা শুনতে পাইনি, একখানা চিঠি দিয়েও তুমি এতদিন আমার খোঁজ নাওনি। আমার সান্ত্বনা কোথায়? বলো তুমি আমাকে—তোমার এ ব্যবহারের কারণ কি? নয়ত, আমিই বলবো তোমাকে সে কথা—লোকে যেটা সন্দেহ করছে। আমাকে তুমি লালসার বশে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী করেছিলে, আমার বন্ধুত্ব তোমার কাম্য ছিল না। প্রেমের চেয়ে কামেরই প্রবল আকর্ষণ তোমাকে আমার কাছে টেনে এনেছিল। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে-মুহূর্তে শত্রুপক্ষ তোমাকে নারী-সঙ্গ-সুখে অক্ষম করে দিলে, আমার প্রতি তোমার সকল অনুরাগ যেন কর্পূরের মতো উবে গেল!

এ কেবল আমারই অনুমান নয় প্রিয়তম, সকলেই একথা বলছে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে আলোচনা করছে। এ যদি কেবলমাত্র একা আমারই মনের সংশয় বা সন্দেহ হ'ত, তুমি হয়ত তোমার ভালবাসার যে কোনও একটা কিছু কৈফিয়ৎ দিয়ে আমার মনঃক্ষোভ ও হৃদয়বেদনাকে কিছুটা শান্ত করতে পারতে। হায়, আমি যদি এমন কোনও একটা অবস্থা বা ঘটনার সাহায্য পেতুম যেটাকে অবলম্বন ক'রে আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করতে পারতুম, হয়ত বেঁচে যেতুম। প্রসন্ন মনে তোমার এই অবহেলাকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু এ তুমি কি করলে? আমার যে লজ্জা রাখবার এতটুকু কিছু অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছিনি। মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যু হ'লেই যেন বাঁচি। আমার প্রেমের অহংকারকে তুমি যে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছ!

আমি তোমাকে যে কথা বলতে চাই, একটু মন দিয়ে শোনো। তোমার কাছে হয়ত আমার এ প্রার্থনা অতি তুচ্ছ মনে হবে, তবু আমি চাই—তোমার যে প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ' তার পরিবর্তে অন্ততঃ আমাকে দাও তোমার অমৃত বাণীর উপহার, যা আমি জানি, তোমার আছে অন্তঃহীন ও অপ্রমেয়। তোমার সুন্দর মুখখানি যেন আমার বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে মধুময় হ'য়ে ভেসে ওঠে। তোমাকে সশরীরে এসে দেখা দিতে বলা বৃথা, এতখানি বদান্যতা' এখন আর তোমার কাছে আশা করিনি, তাই চাই শুধু বাণী। আশা করি এটুকু দিতে তুমি কৃপণতা করবে না। তোমার কাছে আমি যে অনেক কিছু পেয়েছি একথা অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস আমাকে তুমি অনেক দিয়েছ। আমিও তোমার সকল অনুরোধ, সকল আদেশ, যতই কঠিন ও দুঃসাধ্য হোকনা, নির্বিচারেই পালন করেছি এবং আজও আমি তোমারই বাধ্য হয়ে এখানে আছি। বস্তুতঃ, আমার মতো একজন তরুণী যুবতী, মঠের এই কঠোর নিয়ম সংযমে বাঁধা

সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণীর জীবনে যে প্রবেশ করেছে এ কোনও ধর্মানুরাগের প্রবল আকর্ষণে নয়, তুমি তো জানো, এ কেবলমাত্র তোমারই আদেশ পালনের জন্য। কিন্তু, এর ফলে আমি যদি তোমার প্রীতির কণামাত্র না পাই, তবে বৃথাই হবে যে আমার এ কৃচ্ছ্রতপ।

বিশ্বাস করো বন্ধু! ভগবানের কাছে আমি এ ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করিনি। করবার অধিকারই বা আমার কই? কারণ, আমিতো সর্বান্তঃকরণে শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি, ভগবানের প্রতি তো আমি কোনও দিনই মন দিই নি। তুমি দ্রুত এগিয়ে চলেছো ঈশ্বরাভিমুখে, আমি কেবল এই ব্রহ্মচারিণীর ছদ্মবেশ পরে তোমার অনুসরণ করছি মাত্র। তুমি নিজে এখনও সন্ন্যাসী হ'তে পারোনি, কিন্তু অতি ব্যগ্র ব্যস্ততায় সর্বাগ্রে আমাকে সন্ন্যাসিনীতে রূপান্তরিত করেছে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে—এ বোধহয় আমার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হবার জন্যই তুমি এ কাজ করেছ। আমার প্রেমের উপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারোনি। জানোকি বন্ধু, এ জীবন গ্রহণ করবার আমার এতটুকুও ইচ্ছা ছিলনা, কারণ আমার এই আশঙ্কাই ছিল—হয়ত' আমি এর ফলে তোমাকে হারাবো। কিন্তু, তবু এসেছি। তুমি যদি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে বল্‌তে, আমি হাসিমুখেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তুম! এই সন্ন্যাসিনীর জীবনের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার কোনও যোগ নেই, কারণ আমার আত্মা যে তোমার মধ্যেই লীন হয়ে গিয়েছে। তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সম্বন্ধে তুমি এখন নিশ্চিত হয়েছ' ব'লেই এমনকরে আজ আমাকে অবহেলা করতে পেরেছ।

আমার দুর্ভাগ্যের কি সীমা আছে?

আমি যেদিন তোমাকে ভালবেসে আমার সর্ব্বস্ব দান করেছিলেম, অনেকে বলেছিলেন আমি প্রেমের জন্য তোমাকে বরণ করিনি, আদিরিপুর তাড়নাতেই একাজ করেছি। আজ আমার জীবনের এই পরিণাম আশা করি তাদের সেদিনের অবিশ্বাসকে লজ্জা দিতে পারবে। আমি তো নিজের বলতে কিছুই রাখিনি। তনু মন প্রাণ সবই তো তোমাকে নিঃশেষে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি। এই কথাটুকু মনে রেখে আমার সামান্য অনুরোধ কি তুমি পালন করবে না? যে ভগবানের সেবায় তুমি আমাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছ, আজ আমি তাঁরই নাম নিয়ে তোমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, চিঠি দিও প্রিয়তম, চিঠি দিও আমাকে, এই আমার সনির্বন্ধ মিনতি। বিদায়—

তোমার এলয়শা।

শিমূল

আশা দেবী

শিমূলের লাল ফুল ঝরে পড়ে নিরালা দুপুরে—
নীল-স্রোতা নদীটির বাঁকে বাঁকে ভেসে চলে যায়
রৌদ্রের নির্জ্জন তারে বেজে ওঠে বৈরাগীর সুর
রিক্ত কামনার অর্ঘ্য গাঢ় রক্ত শিমূলের ফুল।

ভেসে যাওয়া সে শিমূল
অকস্মাৎ মনে হলো : নভোচ্যুত আকাশ-প্রদীপ
তোমার অজানা পথে অনির্দ্দেশ অন্ধকার-লোকে
চলে গেল রেখে দিতে আমারি প্রণাম।

তোমার তমসাঘন সংকটের সীমাহীন পথে
তারা নিয়ে গেল মোর মর্ম্মচারী মঙ্গল-কামনা :

এ নদী তোমারি স্রোত—মোর ঘাটে ক্ষণিক অতিথি
পার হবে কত পথ—মোর স্মৃতি পলকের ছায়া :
মোর মতো কত ফুল দেবে ঢেলে প্রাণ-উপচার
নেবে তুমি উদাসীন—কারো পানে চাহিবে না ফিরে।
তবু কোনো অন্ধরাতে শোনো যদি সাগর গর্জ্জন
সম্মুখে ফেনিল কালো—জীবনের পথ-পরিণাম :

চেয়ে দেখো সেই ক্ষণে সাথে রবে আমার শিমূল
সহমৃতা রমণীর সীমন্তের সিঁদুর যেমন॥
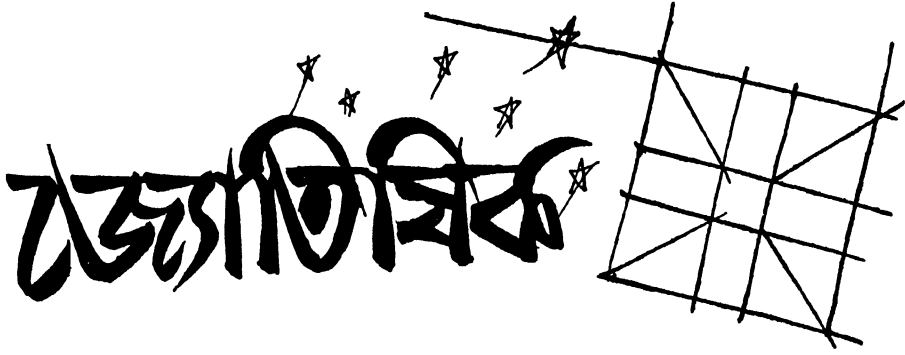
কর্মজীবনে জ্যোতিষ

জ্যোতি বাচস্পতি

কর্ম জীবনের ব্যাপার বুঝতে হ'লে রাশিগুলির সম্বন্ধে আরও কিছু জানার আছে। বর্ণ হিসাবে রাশিগুলির যেমন শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে—অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, জল এই চারটি তত্ত্ব হিসাবেও তেমনি একটি শ্রেণী বিভাগ কল্পিত হয়েছে।

মেষ সিংহ ও ধনু অগ্নি রাশি, বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বী রাশি, মিথুন তুলা ও কুম্ভ বায়ু রাশি, এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জল রাশি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বর্ণ হিসাবে শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে তত্ত্ব হিসাবে এই শ্রেণী বিভাগের একটা সামঞ্জস্য আছে। যেগুলি অগ্নি রাশি সেইগুলিকেই বলা হয়েছে ক্ষত্রিয় বর্ণ। তেমনি পৃথ্বীকে শূদ্র, বায়ুকে বৈশ্য এবং জলকে বিপ্র বলে ধরা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগ থেকে কর্মের সম্বন্ধে যা নির্দেশ পাওয়া যায় তা এই রকম—

অগ্নিরাশিগুলি নির্দেশ ক'রে সেই সব কাজ, যাতে বুদ্ধি কৌশল, উদ্যম ও তৎপরতার দ্বারা কার্য সিদ্ধ করিতে হয় এবং যাতে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করার অবকাশ পাওয়া যায়। সুতরাং রবি যদি অগ্নি-রাশিতে থাকে তাহ'লে জাতকের সেই ধরণের কাজের দিকে ঝোঁক হ'বে যাতে স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে। সাধারণতঃ কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে বা উচ্চতর কোন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মের দিকে তাঁর কমবেশী আকর্ষণ থাকবে। যে কাজ আদর্শ-মূলক, যে কাজে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই সব কাজের দিকে তিনি আকর্ষণ অনুভব করবেন বেশী। যে ধরণের কাজে নিজের শক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় এবং অপরের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেই রকম কাজ না হ'লে তাঁর তৃপ্তি আসে না। কাজের মধ্যে তাঁর খানিকটা উৎসাহ ও উত্তেজনার অংশ থাকা চাই। কাজের মধ্যে ব্যাপকতা ও গভীরতার চেয়ে তীক্ষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য তাঁর কাম্য হবে বেশী।

পৃথ্বী রাশিগুলি নির্দেশ ক'রে সেই সব কাজ—যার বাস্তব উপযোগিতা আছে এবং যার জন্য ধৈর্য, স্থৈর্য, অধ্যবসায় ও একটানা পরিশ্রম দরকার। সুতরাং রবি যদি পৃথ্বী রাশিতে থাকে, তাহ'লে জাতকের ভাল লাগবে সেই ধরণের কাজ, যার মধ্যে কোন কল্পনা বা অনিশ্চয়তা নেই এবং যার ফল বাস্তবক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ধরণের কাজে লেগে থাকতে তিনি কাতর হন না, বরং তার জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করতে পারলে তিনি খুসী হন। সব রকমের স্থুল, ভারী পরিশ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি করতে ভালবাসেন, তা সে কাজ নিজের ইচ্ছামতই হোক বা অপরের নির্দেশ অনুসারেই হোক। চটপট যে কোন কাজ করার চেয়ে ধীরে সুস্থে সব দিক দেখেশুনে কাজ করার দিকে তিনি ঝোঁকেন বেশী। যে সব কাজে দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়, তা-ও তাঁর প্রিয় হতে পারে।

বায়ুরাশিগুলি নির্দেশ ক'রে সেই রকম সব কাজ, যাতে পরিশ্রমের চেয়ে কৌশলের অবকাশ থাকে বেশী, এবং যাতে কম বেশী অপরের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। বেশী শ্রমসাধ্য কাজের চেয়ে অল্পায়াসসাধ্য কাজের দিকেই তিনি ঝোঁক দেন বেশী। জন্মকালে যাঁর রবি বায়ুরাশিতে আছে তিনি সেই সব কাজ করতে চাইবেন—যাতে কৌশল প্রয়োগ করে অল্প পরিশ্রমে বেশী ফল পাওয়া যায়। একটানা একঘেয়ে কাজের চেয়ে তিনি পছন্দ করবেন সেই সব কাজ—যাতে পদে পদে বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করতে হয় এবং যাতে যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দরকার। সাধারণতঃ দৈহিক পরিশ্রমের চেয়ে মস্তিষ্কচালনার দিকেই তাঁর ঝোঁক হবে বেশী। একক কাজ করা তাঁর পছন্দ নয়, তিনি ভালবাসেন সেই সব কাজ যাতে বহুজনের সংস্রব বা সহযোগিতা আছে। ছোট-খাটো শিল্প, ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং যে সব কাজে বাক্য-কৌশল বা লেখা-পড়া প্রয়োগ করতে হয়, সেই সব কাজের দিকে তাঁর একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

জলরাশিগুলি নির্দেশ ক'রে সেই সব কাজ—যাতে কোন গোপনীয়তা কিংবা গুপ্ত তথ্যের সংস্রব আছে, কিংবা যা নির্জনে একান্তে ব'সে করা যায়। যেসব ব্যাপারে বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতির প্রেরণা বেশী দরকার, সেই সব কাজ তিনি পছন্দ করবেন বেশী—যাঁর রবি জন্মকালে জলরাশিতে আছে। যে সব কাজের সঙ্গে হৃদয়ের একটা সংস্রব আছে অর্থাৎ যা ভাবের উদ্রেককে সাহায্য ক'রে, সেই সব কাজের দিকেও তাঁর ঝোঁক দেখা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সেই সব কাজের দিকে

খুঁকবেন যাতে নিজের খেয়াল মত কাজ করা চলে। তাঁর কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য বা উত্তেজনা থাকা চাই। সাধারণতঃ যে সব কাজে মধ্যে মধ্যে বিরাম বা বিশ্রাম আছে সেই সব কাজ তাঁর বেশী পছন্দ। তিনি ভালবাসেন সেই সব কাজ—যাতে সৃষ্টিমূলক কল্পনার অবকাশ আছে, তা সে বাস্তব ব্যাপারেই হোক বা মানসিক ক্ষেত্রেই হোক। একদিকে যেমন সেই সব উৎপাদন-মূলক শিল্প সংক্রান্ত কাজ যার সঙ্গে গোপনীয়তা অথবা কোন গোপন তথ্য জড়িত আছে তার দিকে জাতক আকর্ষণ অনুভব করেন, অপর দিকে যা দিয়ে অপরকে আনন্দ দেওয়া যায় সেই সব কলা বা শিল্পও তিনি ভালবাসেন।

বর্ণ ও তত্ত্ব-হিসাবে রাশির এই যে শ্রেণী-বিভাগ দেওয়া হ'ল কর্মজীবনে জাতকের যোগ্যতা, স্বাভাবিক পটুত্ব ইত্যাদি বিচারের জন্য; তাছাড়া আরও একটি শ্রেণী-বিভাগ জানা প্রয়োজন। শক্তি হিসাবে রাশিগুলিকে চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চররাশি।

বৃষ, সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থিররাশি।

মিথুন, কন্যা ধনু ও মীন দ্ব্যাত্মক রাশি।

কর্মজীবনের বিচারে বর্ণ, তত্ত্ব ও শক্তি হিসাবে এই শ্রেণী বিভাগ জানা এবং তার তাৎপর্য বোঝা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য যাঁরা জ্যোতিষের আলোচনা করেন, তাঁদের এ শ্রেণী বিভাগ অজানা নয়, কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগের অর্থ ও তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে না জানায় অনেকে এর ঠিক প্রয়োগ করতে পারেন না। যাঁরা এ সম্বন্ধে জানতে চান তাঁদের আমার "ফলিত জ্যোতিষের মূল সূত্রের" রাশির ভাব অধ্যায়টি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। আপাততঃ দেখা যাক্, শক্তি-হিসাবে রাশির এই শ্রেণী বিভাগ দিয়ে কর্মজীবনের ব্যাপারে কি বোঝা যায়।

চর রাশিগুলি নির্দেশ ক'রে পূর্ণ গতিশীলতা। সুতরাং তারা সেই সকল কাজের সূচক যার মধ্যে পরিবর্তন আছে। সে পরিবর্তন কর্মের প্রকৃতিরই হোক্, বিষয় বস্তুরই হোক্, আবেষ্টনেরই হোক্ বা কর্মের সময়েরই হোক। এই রাশিগুলি একদিকে যেমন কর্মতৎপরতা উৎসাহ উচ্চাভিলাষ, সংস্কারপ্রিয়তা নির্দেশ করে—অপরদিকে তেমনি চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, হঠকারিতা, একাগ্রতার অভাবও সূচনা করে। সুতরাং যাঁর জন্মকালে রবি চররাশিতে আছে তিনি বেশী পছন্দ করবেন সেই সব কাজ যা একঘেয়ে বা একটানা নয়। নির্দিষ্টভাবে, যথা নির্দিষ্ট সময়ে একইভাবে কাজ করা তাঁর রুচিকর নয়। তিনি চাইবেন কিছু না কিছু নূতনত্ব। যে সব কাজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হয়, কিম্বা এক বিষয় থেকে অপর বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়, সেই সব কাজ তাঁর প্রিয় হওয়া সম্ভব। ধীরে-সুস্থে কাজ করবার তিনি পক্ষপাতী নন, তিনি চান এমন কাজ যা চট্‌পট্ শেষ করা যায়। যে সব কাজে দশজনের চোখের সামনে আসা যায়, সেই সব কাজের দিকে তিনি বেশী ঝোঁকেন।

স্থিররাশিগুলি আবার চররাশির ঠিক বিপরীত। তারা সূচনা করে ধৈর্য, স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য। যাঁর জন্মকালে রবি স্থিররাশিতে আছে তিনি পছন্দ করবেন সেই সব কাজ—যার মূল্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং যা নির্দিষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট প্রথায় করা যায়। কাজের মধ্যে অনৈশ্চিত্য বা পরিবর্তন-শীলতা তাঁর মোটে কাম্য নয়। যে সব কাজ একই স্থানে একই ভাবে করা যায়, সেই সব কাজই তিনি পছন্দ করবেন বেশী। সেই রকমের কাজ যা ধীরে সুস্থে করা যায়, যা চিরাগত প্রথায় চলে আসছে, তার দিকেই তিনি আকৃষ্ট হন বেশী। যে কাজে দৃঢ় নিষ্ঠা ও একাগ্রতার দরকার, যাতে নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিতে হয়, সেই কাজ তাঁর ভাল লাগে। মোট কথা, কাজের নীতি বা ধারার মধ্যে দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অপরিবর্তনীয়তা না থাকলে, তিনি স্বস্তি পান না এবং তাঁর কর্ম প্রতিভার স্ফুরণ হয় না।

দ্ব্যাত্মক রাশিগুলির প্রকৃতি একটু বিচিত্র। তারা নির্দেশ করে স্থিরত্বের মধ্যে গতিশীলতা বা গতির মধ্যে স্থিরতা—অথবা পর্যায়ক্রমে গতিশীলতা ও স্থিরত্ব। সুতরাং যাঁর রবি দ্ব্যাত্মক রাশিতে আছে, তিনি পছন্দ করবেন সেই সব কাজ যার মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে, যার মধ্যে স্থিরত্ব থাকলেও তা একেবারে নিশ্চল নয় এবং প্রগতিশীল হলেও সে প্রগতি অবাধ নয়। তিনি এমন কাজও পছন্দ করেন না, যার নীতি বা ধারা একেবারে অপরিবর্তনীয়। আবার, সে রকম কাজও ভালবাসেন না, যা ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে। সাধারণতঃ তিনি চাইবেন এমন সব কাজে যুক্ত হ'তে—যার বিষয়বস্তু এক হলেও কাজের ধারার মধ্যে পরিবর্তন আছে, কিম্বা ধারা এক হলেও বিষয়বস্তুর অদল-বদল হতে পারে। যেখানে এক সঙ্গে একাধিক ধরণের কাজ করা যায়, সেই সব জায়গায় কাজ করতে তাঁর ভাল লাগে। মোট কথা তাঁর কাজের সঙ্গে স্থিরতা ও পরিবর্তনশীলতা দুই-ই থাকা চাই।

রবি কোন্ রাশিতে থাকলে জাতকের কি ধরণের কাজের দিকে ঝোঁক হয়, তা লেখা হ'ল। কিন্তু এই ঝোঁক যে সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রকাশ পায়, কিম্বা সেই ধরণের কাজে যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমান পটুত্ব থাকে, তা নয়। রবির অবস্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সঙ্গে যোগ, দৃষ্টি ও প্রেক্ষা দিয়ে এর অনেক ইতর বিশেষ হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে হয়ত জাতকের রাশি-নির্দিষ্ট কাজের দিকে আকর্ষণ এবং তাঁর পটুত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, কোন ক্ষেত্রে হয়ত আকর্ষণ যথেষ্ট থাকলেও পটুত্ব তেমন থাকে না, কিম্বা এমনও হতে পারে যে পটুত্ব থাকলেও সে কাজের দিকে তিনি খুব প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এই আকর্ষণও পটুত্ব জাতকের প্রকৃতিতে সুপ্ত থেকে যায় এবং সামাজিক পরিবেশন বা পারিবারিক আবষ্টনের চাপে তা কর্মজীবনে পরিস্ফুট হ'তে পারে না। সুতরাং রবি কোন্ রাশিতে আছে কর্মজীবনের বিচারে তা যেমন জানা-দরকার তেমনি সে কী রকম অবস্থায় আছে এবং কোন্ কোন্ গ্রহের সঙ্গে কী সম্বন্ধ করেছে তা-ও দেখা ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কোরিয়া যুদ্ধের শিক্ষা

কালীচরণ ঘোষ

কোরিয়া বা চোসেন পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটী স্থান ; চীনের উত্তরপূর্ব অংশে পীত ও জাপান সাগরের মধ্যে জ্যোষ্টির লাঙ্গুলের মত ঝুলিয়া আছে। মোট আয়তন ৮৪,৭৩৮ বর্গ মাইল মাত্র। বহুকাল ছিল চীনের অংশ ; পরে জাপান দখল করিল ; গত মহাযুদ্ধে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুইটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইল। সুতরাং বিশাল পৃথিবীতে এই ক্ষুদ্র আয়তনের দুইটা রাষ্ট্র লইয়া জগতের ইতিহাসে বিরাট একটা কিছু রেখাপাত করিবার কথা নহে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এমনিভাবে আপনার পথ ধরিল যে আজ কোরিয়া জগতে বিভিন্ন পরাক্রমশালী শক্তিনিচয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছে।

অতি ক্ষুদ্র ঘটনা। উত্তর কোরিয়া হঠাৎ একদিন তাহার সীমানা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিল। দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করিল এবং রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানাইল। যেখানে এক জাতি, এক ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান মতে একটা প্রদেশ এবং গুণ সমষ্টি মতে সকল অধিবাসী একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার কথা, সেখানে বিভিন্ন অংশ এক হইবার চেষ্টা নিতান্ত নূতন নহে। আয়র্ল্যাণ্ড এই চেষ্টা করিতেছে। ভারত পাকিস্তান এই সেদিন বিভক্ত হইয়াছে সুতরাং মিলনের কথা উচ্চারণ করিবার উপায় নাই, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের কোটি কোটি নরনারী আছে যাহারা সর্বান্তঃকরণে—এক হইবার আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, অথচ রাষ্ট্র পরিচালকদিগের অসন্তোষের ভয়ে মুখ খুলিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলে না। নূতন বিভাগের আর এক নিদর্শন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী। জার্মানীর কোন্ অধিবাসী আবার এক হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না ; কেন যে হয় না, তাহা। কারণ অত্যন্ত গভীর, অতিশয় গুরু।

যাক্, আর উদাহরণে কাজ নাই। সত্যই উত্তর কোরিয়া কি দক্ষিণের সহিত একত্রিত হইবার জন্য আক্রমণ করিল ? প্রকাশ্যভাবে তাহা বলা হইলেও দক্ষিণ কোরিয়ায় যে বিদেশী শক্তি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহজে কমিউনিষ্ট মতবাদ এবং রুশ নায়কত্বের কুক্ষীগত করিবার পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়া আছে, সেই শক্তি দক্ষিণ কোরিয়াকে কতখানি সাহায্য করিবে এবং প্রয়োজন হইলে বলের পরিমাপ করা চলিবে, তাহাই বোঝাপড়া করিবার জন্য এই অভিযান। উত্তর কোরিয়া এবং তাহার অপ্রকাশ্য বন্ধুর মিলিত শক্তি যে নিতান্ত হেয় নয়, তাহা দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধে প্রকাশিত হইল। রাষ্ট্রপুঞ্জের নামে যে বাহিনী যুদ্ধ করিল, তাহা প্রথমে বিরাট আঘাত খাইয়া দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল ; মনে হইল পরাজয় অবধারিত। সে যুদ্ধের মোড় ফিরিল, দক্ষিণ কোরীয় ও রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখা পার হইয়া উত্তর কোরিয়ার উত্তর সীমান্তে পৌছিল। যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে ; এই আশা। বিজয়লক্ষ্মী কখন কাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করেন বোঝা কঠিন। এবার উত্তর কোরীয় বাহিনী চীন "স্বেচ্ছাসেবক" সাহায্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিল, আমেরিকার বহু পত্রিকা বলিল, আমেরিকার এরূপ সামরিক পরাজয়, তাহার ইতিহাসে কোথাও বর্ণিত নাই। পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে উভয় রাষ্ট্রের সীমায় দুই পক্ষ আসিয়া পৌছিল। এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কোথায়, তাহার ঠিক নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ লোকে যে শিক্ষালাভ করিল তাহাই বিচার্য বিষয়।

প্রথমেই রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। ইহার এখনও শৈশব কাটিয়া উঠে নাই। সোভিয়েট রুশ তাহার "ভিটো" প্রভাবে ইহাকে জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধশতাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র সম্ভ্রম করিবে, সমীহ করিবে এবং ভয় করিবে, ইহাই তাহার হইল ন্যায্য প্রাপ্য। এ প্রতিষ্ঠান কোনও একক দেশের বিরুদ্ধে গেলে তাহার সমূহ বিপদ। বলা বাহুল্য, ইহাকে শক্তিমান করিবার পক্ষে আমেরিকার সংযোগ বা আনুকূল্যই প্রধান। রুশ এবং সামন্ত শক্তি কোনও বিষয় তাহাদের মতের অনুকূলে না হইলেই আপত্তি করিবে, জানা কথা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য ভারতবাসী লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জকে সর্বপ্রথম অমান্য করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপুঞ্জের নামে যাহা হয়, তাহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিবে এই আশা। এখানে উত্তর কোরিয়ার হাতে যে পরাজয়, তাহা রাষ্ট্রপুঞ্জের পরাজয়। ইহা মহা দুর্লক্ষণ। ইহাতে অন্যান্য শক্তি সুযোগ সুবিধামত রাষ্ট্রপুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অপর বন্ধুর সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপুঞ্জের নামে যাহা হয়, তাহা নিতান্ত মনের মত না হইলে রাষ্ট্রপুঞ্জকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে বহু রাষ্ট্রের উৎসাহের অভাব দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, "অনেকে ত আছে, আমি না করিলে অপরে করিবে।" ফলে, রাজার পুষ্করিণী দুধের পরিবর্তে জলেই ভরিয়া উঠে।

কোরিয়া সমরে আমেরিকা প্রায় একাই যুদ্ধ করিয়াছে। ইংলাণ্ড উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য সাহায্য করে নাই বলিয়া, আমেরিকার বহু পত্রিকা অভিযোগ করিয়াছে। তথাপি ইংলাণ্ড আসিয়াছে, সামান্য অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহা অপেক্ষা কম তুরস্ক সৈন্য এবং অপরাপর যৎসামান্য কিছু লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী গঠিত। ভারতবর্ষ আর্তের সেবার ভার লইয়াছে মাত্র, তাহার অধিক কিছুই করে নাই। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নামে বা পক্ষে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার পক্ষে এত স্বল্প রাষ্ট্র হইতে জনবলের সাহায্য পাওয়া ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থায় কি দাঁড়াইতে পারে তাহার আভাষ দিতেছে মাত্র।

বহু দেশ মিলিয়া দল বাঁধিয়া শত্রুপুঞ্জের সহিত লড়াই করার রীতি আছে এবং গত দুই বিশ্বযুদ্ধ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এরূপ ক্ষেত্রে

একযোগে কাজ করা, নানা অসুবিধা থাকিলেও, একেবারে অসম্ভব নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়পরাজয়ের সহিত প্রতিটী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং এরূপ অবস্থার বিপাকে যাহা সম্ভব, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের যে আশঙ্কা লইয়া প্রতি দেশ আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মরক্ষার জন্য লালায়িত হয়, তাহা কোরীয় যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটী বৃহৎ রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমা হইতে যুদ্ধের ক্ষেত্র অত্যন্ত দূরে অবস্থিত হওয়ায় যুদ্ধে সৈন্যের প্রাণনাশ সম্ভাবনা ব্যতিরেকে কাহারও গায়ে আঁচ লাগিবার কথা নহে। যুদ্ধায়োজনে, সমরসম্ভার ক্রয়ে এবং প্রকৃত যুদ্ধ পরিচালনায় প্রভূত অর্থব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহাতে অধিক মূল্যের জ্ঞান সঞ্চয় করিবার সুযোগ হয় বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। যুদ্ধের দামামা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসমৃদ্ধ নানা দেশ বিশেষতঃ রাষ্ট্র নানা ভাবে লাভবান্ হয়। জগতের বাজার মন্দা পড়িলে স্বার্থান্ধ ধনী অস্ত্রনির্মাণকারী ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ শত্রুকেও অস্ত্র বিক্রয় এবং প্রচুর অর্থ সাহায্যে প্রচারকার্য করিবার কথাও জগতে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া এরূপ একটা যুদ্ধ শত্রুর "অস্ত্রাগারে" বা "ঝুলির" মধ্যে (অত্যাধুনিক) গোপন কি অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভের জন্য অনেকেই কোরীয় যুদ্ধের ফাঁদ পাতিয়াছেন বলিয়া যে অপবাদ, তাহা খুব অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া মনে না করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

ভবিষ্যৎ বিরাট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা দুইটী বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ মতবাদসম্পন্ন জাতি বা জাতিসঙ্ঘের পক্ষের সুসঙ্গত উদ্দেশ্য। নিতান্ত দোরের কাছে একটা কিছু ঘটিয়া না যায়, অথচ দেশের মান মর্যাদা, নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা প্রভৃতির উল্লেখ বা প্রচার করিয়া দেশের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করিয়া রাখা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সেই হিসাবে কোরীয় যুদ্ধ একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এ মতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বেশী প্রভাবিত হইয়াছে, অপরে ততটা নহে। অপর পক্ষে নিজেদের যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া আমেরিকার শক্তি পরীক্ষার জন্য চীন ও রুশ এরূপ একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারা নিতান্ত শান্তিকামী দেশ এবং কোনও জাতির মধ্যে আত্মবিরোধে অপরের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া আমেরিকা তথা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু সে কারণে তাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে যথাসম্ভব অংশ গ্রহণ করিয়া "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব প্রতিষ্ঠা প্রসার রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং জয় পরাজয়ের কোনও মীমাংসা হইতে না দিয়া তাহারা ইহাতে যে বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এরূপ যুদ্ধে আরও একটা বিষয় অধিকমাত্রায় লক্ষিত হয়। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফল না হইলে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়া যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের পরাজয়ের গ্লানি ও জগতের প্রভাব নষ্ট হইবার প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা নাই। ফল যাহাই হউক, তাহাতে সাক্ষাৎভাবে উত্তর বা দক্ষিণ কোরিয়ার ইজ্জত নষ্ট হইবারই কথা। কিন্তু এই "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি" ব্যাপারে, যাহাদের যাহা বুঝিয়া লইবার প্রশ্ন, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া এ পরীক্ষায় সাধারণতঃ প্রাণ বলি দিতে হয় কোরিয়ার নাগরিককে, উত্তরেরই হউক, আর দক্ষিণেরই হউক। কার্যক্ষেত্রে জিদের বশে আমেরিকার বহু যুবককে আহুতিস্বরূপ দান করিতে হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অপর দেশের ক্ষতি সে তুলনায় অনেক কম।

নিতান্ত বিপাকে না পড়িলে আমেরিকা, ইউনাইটেড্ কিংডম, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, রুশ প্রভৃতি রাষ্ট্র নিজ অধিকারভুক্ত ভৌগলিক সীমার মধ্যে যুদ্ধ ঘটিতে দিবে না বলিয়া নিশ্চিত মনে করা যাইতে পারে। ইহাতে যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই মনে মনে জানে; প্রকাশ্যে কেহ বলে না। "যা শত্রু পরে পরে" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে; সামান্য সাহায্য দিলে যদি কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে পারা যায়, তাহার আশায় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ভরসায় বুক বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

আমেরিকা অপরাজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, সমৃদ্ধিশালী, অভূতপূর্ব, অচিন্ত্যনীয় অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী এবং যাহা মনে করে, তাহাই করিতে পারে এই ধারণা লইয়া বাস করিতেছিল এবং জগতে অপর জাতি যেন তাহা বিশ্বাস করিয়া ভয়, শ্রদ্ধা, সম্মান করে তাহার জন্য প্রচারের অন্ত নাই। তাহার আণবিক বোমা আছে এবং নিতান্ত বিপদে পড়িলে বিরাট জনপদধ্বংসী এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিমেষে জয়ী হইতে পারে, তাহা লইয়া মহা আনন্দে বাস করিতেছিল। যখন উত্তর কোরিয়া এবং চীনের উপর বোমা নিক্ষেপের জন্য আমেরিকার রণনায়করা প্রকাশ্যে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন জগতে যে বিক্ষুব্ধ জনমত তাহার প্রতিবাদ করে, তাহাই ভবিষ্যতে এই বোমা নিক্ষেপের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস। যদৃচ্ছা এ্যাটম বোমা প্রয়োগের দ্বিতীয় অন্তরায় ঘটিয়াছে। এখন আমেরিকা, রুশ ও ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকেরই নিকট কয়েকটা হইতে কয়েক শত বোমা থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং ঢিল মারিয়া পাটকেল খাইবার ভয় এখন সকলেরই মনে মনে জমিয়া উঠিতেছে। কোরিয়া যুদ্ধ এ বিষয়ে যে শিক্ষা দান করিল, তাহা জগতের অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সহিত মিতালী করিয়া আমেরিকার যথেষ্ট সম্মান হানি হইয়াছে, আর সাহায্য পাইয়া দক্ষিণ কোরিয়া কতদূর চাপল্য ও অবিবেকিতাযুক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে এই ভাবে অকাতরে সাহায্য পাইয়া অপরাপর দেশে তাহার কতদূর অপব্যবহার হইতে পারে, তাহার জ্ঞান-লাভের সুযোগ হইল। যখন এক দেশের জন্য অপর ধনী দেশ মাথা ঘামাইতে থাকে, তখন একটা দায়িত্বহীনতার লক্ষণ প্রকট হই' উঠে। চিয়াং-কাইসেক ইহার অপর প্রমাণ।

কমিউনিষ্ট-রুশ এমন কি কমিউনিষ্ট-মতবাদ এ ক্ষেত্রে প্রকৃত জয়ী হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরাট বিস্তৃত সাম্রাজ্য, অজস্র লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত এবং শিল্প সমৃদ্ধিতে রুশ আমেরিকার সহিত না হইলেও ইংল্যাণ্ডের প্রায় সমকক্ষতা করিতেছে। যে কোনও কারণেই হউক, নিয়ম শৃঙ্খলায় বশীভূত করিয়া নাগরিকদিগকে পরিচালিত করা হয়, অথচ তাহার ভিতরের হালচাল বুঝিয়া উঠিবার কোনও সম্ভাবনা

নাই। কোরিয়া যুদ্ধের নামে তাহারা নূতনতর যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে, নূতনতম বোমারু ও প্রতিরক্ষা বিমান রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আরও সুবিধা, নিতান্ত ঘরের ধারে, অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া প্রথমে উত্তর কোরিয়ার, পরে চীন "স্বেচ্ছাসেবক" বাহিনী সাহায্যে নিজ দেশের কয়েকজন অধিনায়ক সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারের সুযোগ লইয়াছে। গায়ে আঁচ লাগে নাই, দেশের লোক মরে নাই, অথচ যাহা চাহিয়াছে, তাহা লাভ করিয়াছে। অপর যে কোনও দেশের অশান্তিতে রুশ কি করিতে পারে, তাহার একটু আভাস পাওয়া গিয়াছে।

সুপ্ত চীন আজ বিরাট দৈত্যের মত উঠিয়াছে। মতবাদে রুশ তাহার গুরু, কুটনৈতিক চালে সে গুরু-মারা বিদ্যালাভে পুষ্ট। যেখানে রুদ্রমূর্তি প্রকাশে লাভ হইতে পারে, সেখানে সে পশ্চাদপদ নয়। কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের পূর্বেই, সে তিব্বত অধিকার করিয়া লইয়াছে, তিব্বতের স্বাধীনতা আর ভারতের মৈত্রী কোনটাই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ করে নাই। স্পেনের অন্তর্বিদ্রোহে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে মুসোলিনী "স্বেচ্ছাবাহিনী" পাঠাইয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চীন উত্তর-কোরিয়াকে সাহায্য করিয়াছে এবং এই ঘটনা যে ভবিষ্যতে যত্রতত্র ঘটিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। জগতে চীনের মত জনবহুল জাতি নাই, আর যত বৈজ্ঞানিক রণসম্ভার সৃষ্টি হউক, শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর দেশ অধিকার করিতে এবং তাহা বশে রাখিতে মানুষের প্রয়োজন। অকাতরে প্রাণ দিয়াও চীন রণক্ষেত্রে সমানে সৈন্য প্রেরণ করিতে সমর্থ। চারিদিকে তাহার উন্নতির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। কোরিয়া-যুদ্ধে তাহার সেনাপতিরা যে রণনীতিচর্চ্চা ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ববিশ্রুত সেনানায়কগণ বিস্ময় মানিয়াছেন।

কোরিয়া-যুদ্ধের শেষ মীমাংসা রোধ করিয়া চীন আজ বিজয়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ জগতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহাতে অপরাপর দেশ সমীহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার আবেদন আজ আমেরিকা ও তাহার কৃপাপুষ্ট কয়েকটী জাতি বাদে সকলে সমর্থন করিয়াছে। আজ চীনারা অবশ্য রুশের সমর্থনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল অঞ্চলে কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচারের সুযোগ লইতেছে এবং স্থানীয় কমিউনিষ্টগণের সহযোগে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে। তাহার প্রভাবে আর তাইওয়ানস্থিত জাতীয়তাবাদী চীনা গভর্ণমেন্টের সমর্থক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সিংম্যান রী আর চিয়াংকাইসেক বৃথা আস্ফালনে জগতে একটা প্রহসনের সৃষ্টি করিতেছে। কোরিয়া যুদ্ধে চীন বহু শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং আয়ত্ত-বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী ও কর্মকর্তাদের চমৎকৃত বিস্মিত করিয়াছে। আজ চীনের মতামত জগতের সকল সভ্য জাতি জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত এবং সম্ভব হইলে সহযোগিতা লাভের জন্য লালায়িত। অদূর ভবিষ্যতে চীনা প্রভাব দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঞ্চলকে যে প্রভাবিত করিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ মতবাদ প্রচারের একটা বড় সুযোগ হইয়াছে বলিয়া কোরিয়া-যুদ্ধকে সামান্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিষ্ঠানের সভ্য অথচ তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়া সৈন্য-সাহায্যে অস্বীকার করায় যদি ভারতের স্বাধীন মতের প্রতি-মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে হয় যে বন্ধুর মত দ্বারা চরম ও গৃহীত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ যে নজির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবেই ভাবিত হইয়া পূর্ব হইতেই দক্ষিণ যুক্তরাজ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণবর্ণ জাতির প্রতি অপমান অত্যাচার করিতেছে। ভারতবর্ষ বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছে, অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আমেরিকা, রুশ, ইংল্যাণ্ড, চীন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, ন্যায় ও নীতির কথা বলিয়া ভারতের প্রাচীন মুনি ঋষি হইতে শ্রেষ্ঠ ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি প্রকাশ করিয়া আর্তের সেবার ভার লইলে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা। কাহার সহিত মিতালীতে সুবিধা হইবে, কোরিয়া যুদ্ধ হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং আমেরিকা হইতে চীন সকলেরই সহানুভূতি, সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা লাভের মিনতি হইয়া সকলেরই বন্ধুর স্থান লাভ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যাহার যখন ইচ্ছা, সেইই উপেক্ষা করিতেছে, ফলে স্থিরচিত্ততা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজীল্যাণ্ড, তুরস্ক প্রভৃতি সকল দেশই কোরিয়ার প্রাঙ্গণে নূতনতর শিক্ষালাভ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। ভবিষ্যতের যুদ্ধের মীমাংসা যে সহজে হইবার নহে, তাহা কোরিয়া বড় করিয়া শিক্ষা দিতেছে। যদি ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স নামমাত্র শতবর্ষী যুদ্ধ চালাইয়া থাকে, এবার যুদ্ধ সারা বিশ্বকে গ্রাস করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার প্রকৃত মীমাংসা কতদিনে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এরূপ এক একবার মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা জাগে যে এই শিক্ষা হইতে অনেকেরই মনে যুদ্ধের ফলাফলে অনিশ্চয়তা ও বিজ্ঞানের রুদ্ররূপের বিভীষিকার একটা রেখাপাত হইবে, সুতরাং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের যে সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিতেছিল তাহা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তিরোহিত হইতে চলিয়াছে। কোরিয়ার প্রাঙ্গণে যুদ্ধ এতদিন ধরিয়া না চলিলে দুই পক্ষই হয় ত, অন্য ক্ষেত্র ও অন্য সুযোগ লইয়া শক্তি পরীক্ষায় নামিয়া পড়িতে বাধ্য হইত। কোরিয়া লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত থাকায় তাহা হয় নাই। শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাই যদি হয় তবে বলিতে ইচ্ছা করে, কোরিয়ার যুদ্ধ জগতের একটা বড় মঙ্গল সাধন করিয়াছে।
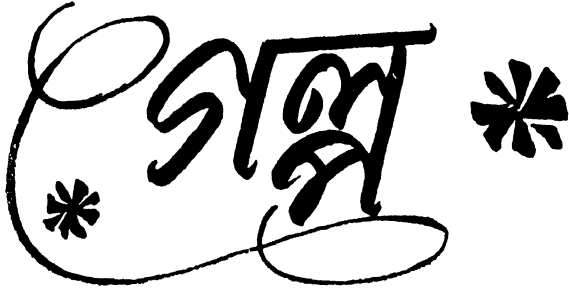
প্রাণ-মঞ্জরী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিজে বর্ষার স্তিমিত সন্ধ্যায় বৈঠকটা বেশ জমছিলো না। চা-চক্রের চক্রীরা প্রায় চক্রান্ত করেই অবিনাশদার বহুবার শোনা হাত-দেখার গল্পটা জোর করে বাতিল করে দিলে। সোম, উদীয়মান ব্যারিষ্টার, করযোড়ে বল্লে—হুজুরদের দরবারে আর্জী পেশ করছি, একটা দিন অন্য গল্প হোক, এতো কষ্ট করে মোটরটা তাতিয়ে গৃহিণীকে কত বুঝিয়ে আড্ডা জমাতে এলুম, তা না শুধু···

মিত্তির বল্লে—গল্প মানেই ত হয় ভূতের,না হয় ভবিষ্যতের, বর্তমান বলে কিছু আছে নাকি আমাদের ··

শেখরদা টিপ্পনী কাটলেন—কেন হে প্রেমের গল্প দোষটা করলে কি, ওয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ ছাড়িয়ে—

প্রণবেশ আরো রং চড়িয়ে বল্লে—রজনী শাওন ঘন, বিজুরী চমকাচ্চে—শুনত গোপি, প্রেমরোপি মন্হি মন্হি আপনা সোঁপি,তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলিক কললোলনি। কথটা ফিরিয়ে হেসে যোগ দিয়ে দিলেন শেখরদা—বিসরি গেহ, নিজহুঁ দেহ, একনয়নে কাজর রেহ, শিথিলছন্দ নীবিক বন্ধ, বেগে যাওত যুবতিবৃন্দ।

অবিনাশদা এতক্ষণে চুপ করেছিলেন, রিটায়ার্ড জজ, বাবালুতার ধার ধারেন না, বল্লেন—ঐ বেগে ধাওয়াই সার, বাবটা হার্ড ফ্যাক্ট, শেখরনাথ, চিরটা কাল ত মুখে মুখে গানের কলি, রসের ফুলঝুরি ছড়িয়ে এলে লাভটা হোল কি?

· লাভ লোকসানের খতিয়ান কি আর করেছি ভাই—বলে হাসতে থাকেন শেখরদা। এই অজাতশত্রু সদালাপী সুন্দর মানুষটি ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে আড্ডা দিতেন। সারাজীবন একমনে নিজের গবেষণা নিয়েই কাটিয়েছেন, বিয়ে করবার পর্য্যন্ত সময় পান নি।

মিত্তির বল্লে—দাদা, আপনার কিন্তু রসসমুদ্র মন্থন বৃথাই হোল, অমৃতভাণ্ড হাতে গৃহলক্ষ্মী উদয় হলেন না, সরম-জড়িত নম্র নেত্রপাতে—

শেখরদা জবাব দেন—আরে, অনেক মালা পরিয়েছি অনাগতাদের গলায়, ফুল ফুটলো, ফল ফললো না, লগ্নে কেতু যে—

সুযোগ বুঝেই অবিনাশদা বলে ফেললেন—তবে ভৃগুর কাছে কিছু লাগে না, লগ্নটি বলে দাও, ছকের সঙ্গে মিলিয়ে নাও, মিললো যদি—তা হলে আর মারে কে, স্বয়ং শিব বলে গেছেন কিনা—

প্রণবেশই কথাটা পাল্টে দিলে—পঞ্চশরকে দগ্ধ করে আপনাদের ঐ শিবঠাকুরটি তাকে যে এরকম ভাবে পৃথিবী মাঝে ছড়িয়ে দেবেন কে জানতো—

কি হে সোম, ওটা তোমাদের আন্তর্জাতিক লাইনের পাল্লায় পড়ে না কি?—'কেস্ ল'টা দেখতে হবে—

আচ্ছা, আত্মদর্শনের পরও যদি উচ্ছ্বসিত প্রেমে আর প্রচণ্ড ক্রোধে স্বয়ং যোগীশ্বর শিবই তলিয়ে যান তাহলে আমরা সামান্য মানুষ সঞ্চারিণী পল্লবিনী দেখলে নড়ে চড়ে বসবো সেটা আর কি দোষের হলো, দেবতাদের ছিঁটে-ফোটা প্রসাদ পেলেই আমাদের মহাপ্রসাদ হয় এমনি যোগাযোগ যে—

রবীন্দ্রনাথের নাকি—অন্যমনস্ক ব্যারিষ্টার সাহেব ফোড়ন্ কাটলেন—আরে, স্বয়ং কালিদাসের—বল্লেন শেখরদা, শ্রীমান মদন্ ত ভস্মাবশেষ হলেন, কিন্তু শ্রীমতী রতিকে নিয়ে যে বিলাপ হলো, আজও তার প্রলাপ চলেছে—

দিসই বলই হি স স ভুলই
হমি একেলা বহু, মরণহি পিথ
সুনহি পহিস, মন ইচ্ছই কহু

অবিনাশদা এবার ফেটে পড়লেন—মনের ইচ্ছা মনেই থাক, থামো থামো—আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না শেখর, ছি ছি বুড়ো বয়সে তুমিও শিং ভেঙে ঐ বাছুরদের দলে ঢুকলে—

গুন গুন করে বলেন শেখরদা—অবিনাশ ভাই, তুমি বাল্যবন্ধু—

আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনালো, পথ হলো অবসান
রেখে যাই আমি সবাকার তরে শুভকামনার দান

ঘনাবে না, একেবারে ঘন দুধ হয়ে বসে আছো যে, একটা দায়িত্ব নিলে না জীবনে, শুধু পালিয়ে পালিয়েই বেড়ালে, সেই একঘেয়ে রোমান্টিক মর্বিডিটি—জীবনটা মন্দাক্রান্তা না হোক অবিনাশ স্বর মন্দ্র আছে শুনিতে পাও কি বন্ধু—

তা আর পাই না, রথের চাকার ঘর্ঘর যে বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে—করোনারী ট্রাবল যে নিত্যসঙ্গী—মনে আছে হোষ্টেল পালিয়ে দুজনে ফৈয়াজ খাঁর গান শুনতে যেতুম—ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল বাজে—নটবেহাগে জীবনটা শুধু বেজেই যাক্—পাকা অভিনেতা আমরা, কেউ ছায়া আর কেউ নট—

সোম বললে—আর কথা কাটাকাটি নয়, ঐ মৃগাঙ্ক আসছে, কথাশিল্পী লোক, গল্প জমবে ভাল।

ভিজে বেড়ালটির মত ভিজতে ভিজতে হাজির হলো মৃগাঙ্ক—গুন গুন করতে করতে 'রেবা রোধসি বেতস তরু-তলে, চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে মে'—

সবাই চেঁচিয়ে বলে—উৎকণ্ঠা কিসের হে কবি, রাধে গৃহং প্রাপয় ! এতো বৃষ্টি নয়, এ যে লাবণ্যামৃতধারায় স্নান—

শোভনলাল এসে গেছে নাকি এরি মধ্যে—অমিট্রায়ের গল্প কিন্তু অচল। উৎকণ্ঠ আমার লাগি, কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে—

গল্প আরম্ভ করলে মৃগাঙ্ক—

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, নাম দেওয়া যাক্ শশাঙ্ক আর ব্রততী। গল্পের প্রথমেই করলে কুঠারাঘাত, বল্লেন শেখরদা, প্রেমের চেয়ে তার আধারগুলোকেই করলে বড়ো, ছেলে আর মেয়ে না হলে গল্প জমে না জানি, কিন্তু সেখানেও কি একলা চলরে নেই—

সব কিছুতেই অসাধারণ দেখা তোমার অভ্যাস শেখর, একলা চলরের কতো সুখ তাতো দেখছো, তুমি একটা আস্ত পাগল। ' চেঁচিয়ে উঠলে অবিনাশদা—

মৃগাঙ্ক বললে—স্যর, গল্পটা শুনুনই না, গল্প গল্পই। বড়ো কনফারেন্সটা মিটে গেছে, গণ্যমান্য বদান্যরা চলে গেছেন' তবু জের মেটেনি, ছোটখাটো জমায়েৎ লেগেই রয়েছে। এমনি একটা জমাটী আসরেই তাদের পরিচয়। কার্য্যসূচীতে দেখা গেলো ব্রততী গাইছে গান, অধ্যাপক শশাঙ্ক হচ্চে সভাপতি। শশাঙ্ক অবশ্য এমন একটা হোমরা-চোমরা মহামান্য ব্যক্তিবিশেষ ছিল না যে তাকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে দেশদেশান্তর থেকে। তবু ভাঙা আসরে বাসর সাজিয়ে বসলো সে। দৈবের বিপাকে তারই গলায় দুললো শুকনো মালাটা, কপালে উঠলো চন্দন, নেহাৎ ফুটো কপাল নয় বলেই। অবশ্য বিশেষ বেমানান্ হয় নি, পদ-মর্য্যাদায় ও ডিগ্রীর ধারে সে ভারী ছিল মন্দ নয়। তার উপর উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছিল একটি সুরসিক মন, বিজ্ঞানের বীক্ষণে সেটি সত্যবান্ বিত্তবান হয়েছিল। সেই পরিশীলিত পরিবেশেই পড়েছিল সবার অলক্ষ্যে একটি গানের বীজ। ছেলেবেলা থেকেই সে ঘুরেছে আসরে আসরে, সুরের সন্ধানে। এখন করছে শব্দতরঙ্গের গবেষণা এবং সেই সূত্রেই একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবান নায়ক সে—আর সেই জন্যই এই ছোট্ট সহরে এসে পড়েছিল।

আর ব্রততী ছিল আগন্তুকা নয়, সেই দেশেরই মেয়ে। তার ছিল চমৎকার গলা, গুণী বাপের কাছে অতি যত্নে শেখা। সভায় সমিতিতে তার চাহিদা ছিল বেশী। তপ্ত গৌরাঙ্গী সন্নতাঙ্গী সে নয়, সে ছিল বাংলাদেশের স্বল্পবিত্তা শ্যামলাদেরই সাধারণ একজন, যারা ষোলোয়-সতেরোয় স্বপ্ন দেখে, বিশবাইশে কামনা করে, পঁচিশ পেরুলে জীবনের মধ্যে যা পেলেনা তার সান্ত্বনা চায় জীবিকার মধ্যে। আর ত্রিশে পড়লে তিলে তিলে পিছনে ফেলে-আসা তিলোত্তমার অনারব্ধ সম্ভাবনার জন্য হয়তো বিরলে বিমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তবু তার কপাল ভালো যে, তার মনের বাতায়ন একদিকে মুক্ত ছিল এবং সিদ্ধি এসেছিল সেই পথেই। যার অবসাদকে ডুবিয়ে তম্বুরায় সাধা সুরেই সে খুঁজে পাচ্ছিল আর এক সৃষ্টির একনিষ্ঠ ইতিকথা, জীবনে ইতিহাস হয়ে যাবার আগেই। আসর সুরু হলো—ইমনে প্রথমেই গাইলেন এক ওস্তাদজী। তার পর বাগেশ্রীতে আলাপ জমলো কোমল-গান্ধার আর কোমল-নিষাদের মাধুরীতে ভরিয়ে। মুদরার ষড়জ থেকে উঠলো কণ্ঠস্বর—যেন ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে, ফিরে এলো উদরায় কোমল-নিষাদ আর ধৈবতকে প্রদক্ষিণ করে। শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে অনুভব করছিল ত্রিসপ্তকের সুর-পরিক্রমা,

সরগমের মধুক্ষর উচ্চারণ, লরজদার তান—কিন্তু তবু তার মন যেন ভরলোনা, কোথায় যেন কিসের অভাব রয়ে গেলো। তারপর সঙ্গত করলেন এক বৃদ্ধ। ঠুংরি গজল দাদরা ধামারে, ঠোক্ আর লড়ী নিয়েই ব্যস্ত, চল্লো তানের সঙ্গে ফিরতির খেলা। কিন্তু কথা, ছন্দ ও সুরের ত্রিপুর-সুন্দরী যেন জাগলেন না, এলো শুধু রাগকঙ্কালমালিনী।

তারপর গান ধরলে ব্রততী। সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ শেখরের কাছে বদলে গেলো আসরটা। শিক্ষিত সুরেলা গলার যাদুর সঙ্গে ঝরে পড়লো মাধুর্য্যের মঞ্জরী ছন্দে ছন্দে। দুটো গান গাইলে সে। প্রথমটা হলো ললিতপঞ্চমে পঞ্চাক্ষরা দুটি কথা "যোবন আয়ে"। চমকে উঠলো শশাঙ্ক —যৌবন আসছে, ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে, দেহে মনে উচ্ছল হয়ে তার রুদ্ধ ব্যথায় আকুলা হয়েছে চিরন্তনী, কোথায় তার প্রীতম প্রিয়, জীবনবল্লভ সাধনদুর্ল্লভ যার বুকের কাছে তার সমস্ত বেদনার ভার সে নিঃশেষে নিংড়ে উজোড় করে দিয়ে বলতে পারবে—আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে করবো নিবেদন।

গাওয়ার মধ্যে গানের বন্দেশ, রাগের বিস্তার বা তানের বড়াই বেশী ছিল না কিন্তু বুকফাটা আকুতি যেন শাশ্বতী-রূপ নিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেললে সভাস্থল।

তারপর সে ধরলে মীরার একটি পদ—

সখী মোর নীদ নসাসী হো পিয়া কো পংথ

নিহারতে সবরৈণ বিহানী হো—সখি আমার ঘুম গেল নষ্ট হয়ে—প্রিয়ের পথ চেয়ে রাত্রি ভোর হয়ে এলো।

বিরহিনীর ব্যথা যেন সত্তা নিয়ে সমস্ত সভা জুড়ে ঘুরতে লাগলো শরীরী হয়ে। ততক্ষণে তানপুরোর পাশে ওলচি চুপ হয়ে গেছে। বৃদ্ধ ওস্তাদজীর আর একটা গান ছিল এর পরে, সে বল্লে—সরম কী বাত্ বাবুজী, এর পরে গান কি আর জমে—

বক্তৃতা করতে উঠে ঐ কথাগুলিই চমৎকার করে ফুটিয়ে তুললে শশাঙ্ক—গান ত শুধু কারুকার্য্য নয়, গলার খেলা নয়, প্রাণের পুজো। প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্তরের অনুভবকে, বাইরে মূর্ত্ত করে স্ফূর্ত্ত করে। বিগ্রহ তৈরীর জন্য একটা কাঠামো দরকার সত্যি, কিন্তু কাঠামোটাই সব নয়। গানকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধ্যানে নিয়ে আসতে হবে প্রাণ-মঞ্জরীকে। কোন পথ দিয়ে তিনি আসবেন, সেই গোপনচারিণী, আকাশ পথে লোলজিহ্বা হয়ে—না তুলসীতলায় সান্ধ্যদীপের শিখায়, তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে শিল্পীর। নটরাজ নৃত্য করছেন অনন্ত হয়ে, তার ছায়া পড়ছে দিকে দিকে। সান্তের সীমায় তাকে ধরতে গেলে রসলোকে নানা জাল পাততে হয়। আঙ্গিক্ টেকনিক্ শৈলী-ভাব ভাষা গায়কী-পদ্ধতি সবই হচ্ছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ মাত্র। আসল কথা হচ্ছে গানের মারফতে প্রাণকে জাগিয়ে তোলা রূপকে ফুটিয়ে দেওয়া, ভাবকে মুক্তি দেওয়া, সেই অধরাকে ধরার জন্য।

গানে যে কথাগুলো ফুটতে চাইছিলো তাকে বিশ্লেষণ করে সঙ্গীতের প্রতি তরঙ্গে সে আরো একটু ঢেউ খেলিয়ে দিলে। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনলো অপূর্ব্ব দরদ-মাখানো সে ব্যাখ্যান্।

রাস্তায় বেরুতেই দুজনের দেখা।

কি চমৎকার গাইলেন আপনি—

সত্যি—

হ্যা।

আর আপনার বক্তৃতার ত তুলনা হয় না, কি অপরূপ হয়ে ফুটে উঠলো গানের কথাগুলো—

সত্যি? ভালো লাগলো আপনার—

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো, হাতঘড়িটা পর্য্যন্ত টিক্‌টিক্ করতে ভুলে গেলো, সময়ের সীমাহীন সীমানায় কালচক্রের গতি বুঝি এক পলক স্তব্ধ।

কালই চল্লেন তা হলে—

তাইতো মনে হচ্ছে—

চলুন্ না আমাদের বাড়ী, ওখানেই চা খাবেন।

কুণ্ঠিত হয়ে শশাঙ্ক বলে—আপনাদের ওখানে?

হ্যাঁ দোষ কি, আমার বাবা-মা খুবই খুশী হবেন—

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বল্লে—সময় থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম কিন্তু—

হেসে ব্রততী বল্লে—নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, না?

হঠাৎ একথা কেন বলুন ত—

এই এমনি, যাক্, আজকের দিনটার কথা অনেক দিন মনে থাকবে—

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ব্রততী, খানিক পরে বল্লে—আমার রাস্তা এইদিকে, এবার চলি, হাজার হোক্ বয়সে

জ্ঞানে বিদ্যায় আপনি কত বড়ো, যদি একটা প্রণাম করি কিছু মনে করবেন না, অভিনয় করছি না। তার গলাটা একটু কেঁপে উঠলো। বিব্রত হয়ে পড়লো শশাঙ্ক, কিছু বলবার আগেই ব্রততী চলে গেলো। শশাঙ্কর মনে হলো—কালো দিঘীর দুফোঁটা জল যেন তার চোখে টলমল করছে।

চুপ করলে মৃগাঙ্ক।—কি হে, মাঝপথে থামলে যে, বল্লেন অবিনাশবাবু—তারপর—

তারপর আর কোথায়—

অবিনাশবাবু মুখ খুললেন—আরে ছ্যা, এ আবার গল্প নাকি?

শেখরদা ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—ডিক্রী খারিজ, সব আশা নামিয়ে দিতে হয়—'তুয়াচরণকমলপর মনভ্রমর ভালভান্'। এই তো মহামন্ত্র, উসকো জপ করো।

থামো শেখর, বড্ড বকো তুমি—

প্রণব বল্লে—আমি হলে এক ডজন্ চিঠি লিখতাম, আপনি থেকে তুমিতে নামতাম্, ঘোরাতাম শিমলে থেকে শিলং, পড়াতাম ডন্ আর ইলিয়ট্।

হ্যাঁ—ওসব পুরাণো মহুয়ার রসে এলকোহল বড় কম, অমিট্রায়ের কাব্যে জমে, কিন্তু জীবনে অচল, যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ—গুণ গুণ করে সোম।

শেখরদা প্রায় কান্নার সুরেই বল্লন—পূর্ণ কুম্ভ যে চাওয়া-পাওয়ার প্রয়াগের ওপারে—

প্রণব জিজ্ঞাসা করে—প্রলোগ্ যখন আছে, এপিলোগও থাকা উচিত—

মৃগাঙ্ক একটু থেমে জবাব দিলে—একটা ছোট্ট পুনশ্চ আছে, শশাঙ্ক একটা চিঠি লিখেছিল—তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নাই বা তোমার থাকলো প্রয়োজন—কিন্তু চিঠিটা আর ফেলা হয়নি।

বাইরে সন্ধ্যা আরো ঘনিয়ে এলো, কালো চুল মেলে এলোকেশী দাঁড়িয়ে। খানিক পরে প্রণব বল্লে—ওকি, শেখরদা চলে যাচ্ছেন যে, চোখ রগড়াচ্ছেন কেন, কিছু পড়লো নাকি?

যেন কার পায়ের নূপুরধ্বনির সঙ্গে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। গজরাতে থাকেন অবিনাশদা—রাবিশ্। বাইরে আরো জোরে বৃষ্টি নামে—ঝম্ ঝম্ ঝম্।

নাট্যকার দীনবন্ধু

অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

নাটক ও নাট্যসাহিত্যের মর্ম্মমূলে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের ব্যক্তিভাব-পরিচ্ছিন্ন নিঃস্পৃহ ভাবদৃষ্টি বর্ত্তমান। তাই রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাস, গীতিরসের অবশ মূর্চ্ছনা ও আবেগের অতিচারী কল্পনা নাটকের বস্তু-সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে। বাঙ্গালীর গীতিরস চঞ্চল কবিচিত্ত বোধহয় নাট্য-রচনার প্রতিকূল; কারণ এই সাহিত্যে কাব্য ও গল্পশাখার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হলেও নাট্যসাহিত্য তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করে নি।

ইংরেজী নাটক ও নাটমঞ্চের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থেকেই বাংলাদেশে বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়, যদিও বহুপূর্ব্ব থেকেই সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের পঠন-পাঠন চলছিল এবং প্রাক্-ঐস্লামিক যুগে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্য অটুট ছিল। বাংলা দেশের নবসংস্কৃতির 'আদ্যাপীঠ' কোলকাতায় বিদেশীর অনুকরণে বাংলা নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠলেও তার পশ্চাদ্‌পটে যাত্রা, পাঁচালী, তর্জ্জাজাতীয় লোকাভিনয়ের প্রভাবও রয়েছে সুপ্রচুর।

বাণীর বিদ্রোহী-সন্তান মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন নাট্যকাররূপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে; তার প্রথম বাংলা রচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক এই বৎসর প্রকাশিত হয়। মাইকেলের পূর্ব্বেও কিঞ্চিদধিক তিন দশক ধরে নাট্যরচনার চেষ্টা চলছিল; কয়েকখানি অতি-সাধারণ কথোপকথনমূলক নাটক রচিত, অনূদিত ও অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্ত নাট্যকার আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন; তাঁদের ধূলিধূসর জীর্ণ রচনা এখন প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের উপাদান মাত্র।

দীনবন্ধু মিত্র মাইকেলের সমকালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন; তখনও দেশের চারিদিক সিপাহীবিদ্রোহের বহ্নি-লীলা একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নি। সেই রক্ত-রাঙা অগ্নিশিখা বাঙ্গালীর সুপ্ত স্বাদেশিক সত্তাকেও উত্তপ্ত করলো। তারই সঙ্গে দেখা দিল নীলকর আন্দোলন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে নীলকর সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কৃষক ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মনে ক্রমে ক্রমে সংগ্রামী প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলো। দীনবন্ধুর আবির্ভাব হোলো এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে।

১৮৬০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র তের বৎসর দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বিচরণ করেছিলেন এবং এরই মধ্যে তাঁর সাতখানি নাটক ও

প্রহসন এবং কিছু কিছু কবিতা ও গল্পকাহিনী রচিত হয়েছিল। রচনার সংখ্যা-গৌরব স্বল্প হলেও বিষয়গুরুত্বে তাঁর নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম স্তরকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করেছিল।

তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সরকারী চাকুরীয়া দীনবন্ধু ছদ্মনামে আত্মগোপন করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নাম গোপন রইলো না কারো কাছে। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'নীলদর্পণের' নাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মতো। এর সঙ্গে জড়িত আছেন পাদ্রী লং সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, প্রধান প্রধান শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারী, ইংরেজী সংবাদপত্রের ইংরেজ সম্পাদক—এবং আরও অনেকে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম দানা বেঁধে ওঠে নীলদর্পণ নাটককেই কেন্দ্র করে। কিন্তু নিছক শিল্প ও সাহিত্যের মানদণ্ড ধরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই বহুখ্যাত নাটক আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নীলদর্পণ ট্র্যাজিক্ ধর্ম্মী; কিন্তু মৃত্যু, খুন ও আত্মহত্যার বাহুল্যে ট্র্যাজেডির সর্ব্বহারা হাহাকার পরিস্ফুট হয় নি। চরিত্রের অন্তর্নিহিত অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বলতার বীজ ট্র্যাজিক নাটকে শেষ পর্য্যন্ত বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু এই নাটকের প্রধান চরিত্রের উপর যে সমস্ত আঘাত এসেছে, তা' সবই বাহ্যিক;—অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির নেমেসিসের (Nemesis) অনুরূপ। কিন্তু দীনবন্ধু সমাজের হীন ও অবজ্ঞাত চরিত্রগুলিকে আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে আঁকতে সমর্থ হয়েছেন। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি—প্রত্যেকটি চরিত্র যেন বহুকালের মূকত্বের অভিশাপ মুক্ত হয়ে নীলদর্পণে বাঙ্‌ময় হয়েছে। তাদের ভাষা, ভাবনা, অনুভূতি—তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাণসত্তাকে নাট্যকার উৎকৃষ্ট বাস্তবাশ্রিত নাট্যরসে পরিণত করতে পেরেছেন—যা বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। এই যে বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তির বস্তুতন্ত্রতা স্বভাব বা objectivity, যা' সেক্সপীয়রের কবি-দৃষ্টিকে মহিমামণ্ডিত করেছে, আমাদের দীনবন্ধুও সেই আশ্চর্য্য নাট্যশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তা' নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে সর্ব্বাধিক। অবশ্য তাঁর ভদ্র ও মহৎ চরিত্রগুলি একেবারে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়েছে।

তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে কামিনী' রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই রচনার সময় তাঁর আদর্শ ছিল সংস্কৃত ও ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্য। ফলে এই দুটি নাটকই কাহিনীর চাতুর্য্য সত্ত্বেও নাটক হিসাবে উপাদেয় হয় নি। 'নবীন তপস্বিনীর' "হোঁদল কুৎকুৎ সংবাদ" এবং 'কমলে-কামিনীর' বকেশ্বরের ঔদরিক ভাঁড়ামি বাদ দিলে এই দুটি নাটক নাটকের ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিশেষ আদরণীয় হবে না। 'লীলাবতী' যদিও তৎকালীন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবু এর মূল সুর রোমান্টিক—নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন। লীলাবতী ও ললিত—এই নাটকের নায়িকা-নায়ক; তারা শারীরধর্ম্মে কোলকাতার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তারা হচ্ছে চিরন্তন নর-নারী। এতেও দীনবন্ধুর ভদ্র ও আদর্শ চরিত্রগুলি প্রাণহীন যন্ত্রমানবে পরিণত হয়েছে, তাদের ভাব-ভাষাও জুগুপ্‌সার ধার ঘেঁষে গেছে। কিন্তু "হাপ্ সহুরে হাপ্ পাড়াগেঁয়ে" যুগল রত্ন নদের চাঁদ হেমচাঁদকে সহজে ভোলা যায় না। তাদের মূঢ়তা, অশিষ্টতা, বিদ্রূপ 'লীলাবতীর' রোমান্টিক আবহাওয়াকে অনেকটা ধাতসহ করে রাখে। এদের ধীকৃত জীবনের প্রতি দীনবন্ধুর ছিল অপরিমেয় সহানুভূতি; এরা পর্য্যুদসিত জীবনের পথচারী হলেও নাট্যকার তাদের প্রতি অকৃপণ স্নেহ বিতরণ করেছেন।

দীনবন্ধুর জনবল্লভতার একদিকে যেমন আছে নীলদর্পণের বিদ্রোহ-বাণী, তেমনি আছে প্রহসন ও রঙ্গব্যঙ্গ। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো,' 'জামাই-বারিক' ও 'সধবার একাদশী' বহু অভিনীত, অযুতকণ্ঠে অভিনন্দিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'জামাই বারিকের' পশ্চাতে সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা থাকলেও এ দুটি নিতান্তই স্থূল প্রহসনের সীমাভুক্ত। সাধারণ বাঙ্গালীর চিত্ততলে যে স্থূল গ্রাম্যতা গোপনে প্রবাহিত, নাট্যকার রচনা-রীতির গুণে তাকেই সুসহ ও অভিনেতব্য করেছেন।

তাঁর 'সধবার একাদশী' অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি। এর বর্ণিত বিষয় হোল উনিশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গলদের' যথেচ্ছাচার ও মর্কটলীলা। ধনীর দুলাল অটলবিহারীর কুৎসিত চরিত্র, মাতলামির ইতরতা ও বৈরিণীবিলাসের ঘৃণ্য আস্ফালন এর প্রধান বক্তব্য; কিন্তু প্রধান হয়েছে তার একটি চরিত্র; সে নিমচাঁদ, সে অটলের মোসাহেব। 'গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে' সে ইংরাজী-সাহিত্য অধ্যয়ন করেছে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রাণের জোয়ারে তার হৃদয় ভরে আছে কানায় কানায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সে আকণ্ঠ পান করেছে বিলাতি সুরা; সে মত্তপ, অধঃপতিত, কিন্তু অমানুষ নয়। নিজের ব্যর্থ জীবনের দিকে চেয়ে তার পরিহাসতরল মত্ত কণ্ঠ মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদে ভেঙ্গে পড়ে। ইংরাজী সভ্যতার পঙ্ক-স্রোতে সে ভেসে গেছে, তার চরিত্রের ভিত্তি গেছে ধ্বসে, সে পরভৃত। তবু মাঝে মাঝে তার ভস্মাচ্ছাদিত পৌরুষ জেগে ওঠে, মুমূর্ষু মনুষ্যত্ব তামসিক জীবনের জাল ছিঁড়তে চায়; কিন্তু সুরাপ্রবাহ আবার তাকে ঠেলে নিয়ে যায় দুর্ভাগ্যের অতলে। প্রাণের কান্নাকে সে মুখের হাসি এবং জীবনের ক্ষয়ক্ষতিকে মাতলামির অসম্বদ্ধ উক্তি দিয়ে ঢাকতে চায়। স্বল্পবিস্তারী বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই নাটক ও এই চরিত্রের সমকক্ষ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

দীনবন্ধুর রচনার মূলসুর বিশুদ্ধ হাস্যরস—হিউমার। জীবনের অসঙ্গতি ও সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের মনের সঙ্গতির সুরকে ঈষৎ পীড়ন করে, ফলে হাসির সৃষ্টি। কিন্তু সেই অসঙ্গতির সঙ্গে লেখকের থাকে বেদনাবোধ ও সহানুভূতি; তখন মুখের হাসি ও চোখের জলের ব্যবধান ঘুচে যায়। এই জাতীয় হাস্যরস সব সাহিত্যেই স্বল্প। দীনবন্ধু মানুষের এই হাস্যকর দুর্ব্বলতা ও অসঙ্গত আচরণের মৃদু আঘাত দিয়ে আমাদের গম্ভীর ও প্রবীণ চিত্তকে হাসি তামাসায় উচ্ছল করে তুলেছেন; কিন্তু অট্টহাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

বাঙ্গালীর স্থায়ী নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে দীনবন্ধুর নাটক। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি কুশলী নট ও নাট্যকারের উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় যে পেশাদারী ও স্থায়ী 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বহুদিন দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটক প্রহসন ছিল একমাত্র অবলম্বন। কি নাটক, নাট্যরচনার আঙ্গিক, আর নাটমঞ্চ,—সব দিক থেকেই দীনবন্ধু অবিস্মরণীয়।

পরিশেষে আধুনিক সমালোচকের রসজ্ঞ উক্তি উদ্ধৃত করে উপসংহার করি; "দীনবন্ধুকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে নিছক মনোবিলাসের Abstraction পরিহার করিয়া, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মহিমা পাঠ করিয়া—সাহিত্যের যে প্রেরণা দেশের আলো বায়ু জল ও জাতির জীবিত চেতনা হইতে রস সংগ্রহ করে—তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।"*

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এবং বেতার কর্তৃ-পক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এরপরই নিমন্ত্রণ এল খাশ আকাদেমী থেকে—১৩ই ফেব্রুয়ারি। বহু লোককে ওরা নিমন্ত্রণ করেছিল ভারতীয় নৃত্যগীত উপভোগ করতে। অবশ্য এখানেও বিজ্ঞপ্তি ছিল—বক্তৃতা হবে গান সম্বন্ধে। এখানে বক্তৃতার নামে, যে-কারণেই হোক, খুব ভিড় জমে—তাই বোধহয়। যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশের মনেই ধারণা ছিল যে ভারতীয় গান ও নাচ সম্বন্ধে তথ্যবহুল নানান্ অনবদ্য কথা শুনে তারা বাড়ি ফিরবে—কী জ্ঞানের চালকলা মনের গামছায় বেঁধে কে জানে? আমি প্রমাদ গণলাম সবপ্রথম এখানে। এরা তো ছাত্রছাত্রী নয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমন—গণমন যে! আর সে কী একটা জাতের? জর্মণি, ইংলণ্ড, আইরিশ, ইহুদি, দক্ষিণ আমেরিকা—ভারতের নানা প্রদেশের লোক—বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিংহলী—আরো হয় ত কত জাত ছিল যাদের সঙ্গে পরিচয় করবার সময় হয় নি। এ হেন বর্ণসঙ্করের আবহাওয়ায় কোন্ সাংস্কৃতিক আভিজাত্য সার্বজনীন স্বীকৃতি পাবে?

ধন্য পিতৃদেব! কত বিপদেই যে তাঁর গান মান রেখেছে! প্রথমেই ধ'রে দিলাম তাঁর "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" তার পরেই গাইলাম এর মৎকৃত ইংরাজি ও সংস্কৃত অনুবাদ, সর্বশেষে ইন্দিরা-কৃত হিন্দি অনুবাদ "পুষ্পরতনমে মঢ়ী"—যেটি কলকাতায় এক প্রেক্ষাগৃহে তার নৃত্যসঙ্গতে আমি গেয়েছিলাম গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে। এ-গানটির সুর য়ুরোপীয়রা সহজেই বুঝতে পারে—তাছাড়া এর ভাবের সরল বিশ্বজনীন সৌন্দর্যে তাদের দেশভক্ত হৃদয় সহজেই সাড়া দেয় এ বহুবার দেখেছি।

তার পর ওদের বললাম: "দেখুন, নানা জাতির সব গানের না হ'লেও গানের সুরের মধ্যেই সময়ে সময়ে একটা আশ্চর্য সরল আবেদন ফুটে ওঠে—যাতে সবাই না হোক বহু মন একযোগে সাড়া দিতে পারে। বহুদিন থেকেই আমরা শুনে আসছি মানুষে মানুষে কত প্রভেদ। ফলে ভেদবুদ্ধি আমাদের মনে শিকড় গেড়েছে। কিন্তু তবু বলব মানুষে মানুষে এই বৈসদৃশ্যই মানবতার পরমবাণী নয়। দৃশ্যতঃ ভেদের অন্তরালে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতন চলেছে এক অপরূপ একতা—ইউনিটির গঙ্গোত্রী। এর প্রমাণ উল্টো দিক থেকেও দেওয়া যায়।" ব'লে একটি জর্মন গান গেয়ে তার মৎকৃত ইংরাজি তথা বাংলা অনুবাদ গাইলাম—এক সুরে এক তানে।

এ-গানটির পরে ওদের করতালি এত বেড়ে উঠল যে গান করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। ওরা যেন সবাই শিহরিত হ'য়ে উঠল। কারণ, মনে রাখবেন, এসেছিল বক্তৃতাই শুনতে—হঠাৎ এ কী কাণ্ড! মন্তব্য আর বাড়াব না।

তার পর বললাম: "শুনুন এবার ভারতের বিখ্যাত মীরাবাঈয়ের অতুলনীয় কাহিনী। ভগবানের জন্যে মেবারের মহারাণী সব ছেড়ে পথে পথে ঘুরেছিলেন ভিখারিণী হ'য়ে···" ইত্যাদি। ব'লে গাইলাম জৌনপুরী তোড়িতে ইন্দিরার শ্রুতিলব্ধ গান "মন মেরা বৈরাগী রাজা" ও মৎকৃত অনুবাদ "মন যে আমার উদাস রাজা"—যে-গানটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। ওরা তানালাপ শুদ্ধ গান শুনে চমৎকৃত হ'ল বৈ কি—গানের শেষে বলতে লাগল এ-ধরণের গান ওদের কাছে কী অভাবনীয়, রোমাঞ্চকর···ইত্যাদি। সব শেষে আমি গাইলাম আমার নব পরিকল্পনায় "বন্দেমাতরম্" গান—যেটি কলকাতায় দুবার রঙ্গমঞ্চে নাট্যনৃত্যে রূপায়িত হয়েছিল। আমি গাইলাম, ইন্দিরা নাচল। তার পর করতালি সুরু হ'ল, কিন্তু সারা হ'তে চায় না। সবাই জিজ্ঞাসা সুরু করল আর কোথায় হবে আমাদের নৃত্যগীত। জয় শেষরক্ষার নিয়ন্তা!

*　　*　　*　　*

এর পরে নিমন্ত্রণ এল সেই বৃদ্ধ কবির বাড়ি যিনি বিবেকানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন সান ফ্রান্সিস্কোতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ এল কিছু গান শোনাতে হবে ও কিছু বলতে হবে শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" মহাকাব্য সম্বন্ধে। বন্ধুবর হাণ্টার নিয়ে গেলেন তাঁর মোটরে। সমুদ্রের কাছেই কবির রম্যহর্ম—তরুবীথিকামর্মরিত—অতি সুন্দর! তাঁর সভায় অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল শিল্পী, বণিক, লেখক আরো কত রকম মানুষ—কিন্তু একটি লোককে ভুলব না। ইনি চৈনিক অধ্যাপক। কী সুন্দর ব্যবহার এদের! স্বভাব-কুলীন যাকে বলে। আর এই প্রথম চৈনিক দেখলাম যিনি স্বচ্ছন্দে ইংরাজি বলতে পারেন। নয়া চীনের কম্যুনিসম্ এঁরও ভালো লাগে না বললেন। ফলে আলাপ জ'মে উঠল। শুধালাম: "পার্ল বার্ককে কেমন লাগে?"

"ভালো। তিনি চীনের একটুমাত্র দেখেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়টি বড় কোমল। লেখার চেয়ে লেখিকা ভালো।"

মনে পড়ল বলি কে এক বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ইংলণ্ডের এক নামকরা অভিনেতার অভিনয় দেখতে। অভিনয় তাঁর ভালো লাগেনি। তবে প্রিয়ভাষী ফরাসী হার মানবার পাত্র নন। তাঁর নিমন্ত্রণে বন্ধু যেই জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল অমুক অভিনেতার অভিনয়? অমনি তিনি উত্তর দিলেন: "শুনেছি উনি চমৎকার মানুষ—এমন মাতৃভক্ত পুত্র এযুগে বড় একটা দেখা যায় না।" কিন্তু গল্পটি বললাম না—ভেবেচিন্তে।

গান করতে হ'ল। প্রথম গাইলাম ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত "Allons enfants"—পরে মৎকৃত বাংলা অনুবাদ "ভারতরাত্রি প্রভাতিল"··· তারপরে গাইলাম ইন্দিরারচিত একটি গান—যে-গানটি সে ১৪ই

তারিখে হরিদাসের ওখানে বলেছিল সমাধিভঙ্গের পরে ও বীণা লিখে নিয়েছিল। গানটির বাংলা অনুবাদও গাইলাম কারণ হরিদাস ও বীণা উপস্থিত ছিল। গানটি বড়, তাই মাত্র পাঁচটি লাইন উদ্ধৃত করি:

পথ চেয়ে রয় বঁধু তব পথ চেয়ে আজো ত্বনয়ন,
সন্ধ্যাসকাল পথ চেয়ে…দেখ, নিশীথ ছায় গহন!
চাহি না গো ধন, রূপ যৌবন যশোমান বৈভব
জানি না সাধন ধ্যান কি বা জ্ঞান—কী দিব চরণে তব?
শুধু জানি নাম তোমার—মীরার বন্ধু চিরন্তন!

মীরা বাঈয়ের জীবনী সম্বন্ধে কিছু ব'লে তবে গাইলাম গানটি ভৈরবী রাগিনীতে। ওদের আশা করি সত্যিই ভালো লেগেছিল—কেননা ওরা মুখে অন্ততঃ খুব উচ্ছ্বাস তো প্রকাশ করল। তবে সত্যি ভালো লেগেছিল কি না জানেন এক অন্তর্যামী।

তারপর ওরা বলতে বলল শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী সম্বন্ধে। আমি সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী ব'লে বললাম: "শ্রীঅরবিন্দ এই মহাকাব্যে চেয়েছেন এই পরম বাণী ঘোষণা করতে যে তপস্যার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—এমন কি দুর্বার নিয়তির ললাট লিখনও মুছে ফেলা সম্ভব। "একথা এ-যুগে সর্বগ্রাহ্য হবে এতটা আশা করি না—বিশেষ যখন শ্রীঅরবিন্দ নিজে মহাপ্রয়াণ করলেন—তাই বললাম: তাঁর এই বাণী যে এমনি এমনি সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হবে এমন আশাকে মনে ঠাঁই দিতে পারি না। শুধু এইটুকু বলা যে ইতিহাসে বহুবারই দেখা গেছে যে একযুগের স্বপ্ন সফল হয়েছে অনেক পরে—আর এক যুগে। মানুষ মৃত্যুঞ্জয় ওর যে স্বেচ্ছামৃত্যু হবে এ স্বপ্ন যুগে যুগে বহু দার্শনিকই দেখেছেন। আজ হয়ত আমরা বলতে পারি—এ হ'ল খতিয়ে ভাববিলাস বা স্বপ্নচারণ। কিন্তু কে বলতে পারে জোর ক'রে যে ভাবী কালের মানুষ এ-স্বপ্নকে বাস্তবের কোঠায় টেনে আনবে না? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উড়ো জাহাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে কবে! সেদিনকার মানুষ এ-স্বপনী শিল্পীকে নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—কিন্তু আজ?"

শুনে ওরা মুগ্ধ হ'ল, আরো এইজন্যে যে এদের স্বভাব হ'ল দিগ্বিজয়ী—বহির্জগৎকে জয় করেছে তো এরাই সব আগে—এবার অন্তর্জগতের দিকে ফিরবে—এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন বার বার। আর তখন এদের দুর্দম্য শক্তি ও অধ্যবসায় আমাদের ধ্যান ও তপস্যার সঙ্গে হাত মিলোতে ঘটবে মণিকাঞ্চন সংযোগ। আর সে-যুগ যে খুব সুদূর তাও নয়। কারণ এরা মুখে যতই কেন না বড়াই করুক, মনে তো পায় নি শান্তি। কী ক'রে পাবে? বহির্মুখী সাফল্য-তন্ত্রী চঞ্চলতায় কি শান্তি মিলতে পারে? বলা যেতে পারে হয়ত যে শান্তি আমরা চাই না। কথাটা সত্য। অথচ সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে শান্তি নৈলে আমরা বাঁচতে পারি না। মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে উঠছে নিচের বহির্মুখী স্তর থেকে উপরের অন্তর্মুখী শিখরে। যে যতটা উঠছে সে ততটা উন্নত—আত্মিক ক্রমবিকাশে। আর এ ক্রমবিকাশ অনিবার্য—মানুষ যতদিন না ভগবানকে উপলব্ধি করবে তার দেহে মনে প্রাণে ততদিন তার নিস্তার নেই। এখানকার একজন উন্নত নিগ্রো পাদ্রীর একটি বই পড়ছিলাম। সবাই না কি তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তিনি লিখেছেন: "A modern poet suggest that God gave to man every gift but rest so that man would never be at ease, finally, except with God." কিন্তু মানুষ স্বভাবে আত্মম্ভরী—ভাবে সে তার সর্ব দৃষ্টি মনশ্চক্ষু দিয়ে যতটুকু দেখছে ও যা দেখছে সেইটুকুই তাকে পৌঁছে দেবে সার্থকতার গোলকধামে। আত্মরূপান্তর চায় সে-ই যে বলে আমি জানি না—বুঝি না—চিনি না। গ'ড়ে নাও, দাও তোমার সালোক্য। যে ভাবে আমি যেটুকু বুঝি সেইটুকুই জ্ঞানের চরম ও পরম বাণী তার অদৃষ্টে আসবেই দুঃসহ বেদনা যন্ত্রণা অশান্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: এই-ই হ'ল বেদনার আদিকথা। সেদিনকার সভায় প'ড়ে শোনালাম (সাবিত্রীর Book of fate থেকে):

Pain is the hammer of the Gods to break
A dead resistance in the mortal's heart…
Pain is the hand of Nature sculpturing men
To greatness: an inspired labour chisels
With heavenly cruelty an unwilling mould.

অর্থাৎ

ব্যথা দেবতার গদা—বিচূর্ণিতে চাহে যে জীবের
অন্তর বাধা—যে রাজ্যে অচল প্রতিষ্ঠ শবসম।…
ব্যথা প্রকৃতির কর—ভাস্করের সম যে নিয়ত
জৈব প্রকৃতিরে করে মহত্ত্বের মহামূর্তিদান
ঊর্ধ্বের প্রেরণা এক সাধনা-নিরত নিরন্তর
নিষ্ঠুর দেবতা সম রূপায়িতে বিদ্রোহী পাষাণে।

আরো অনেক কথাই বললাম—শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর নানা অংশ থেকে আবৃত্তি ক'রে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করলাম তাঁর ধ্যান দৃষ্টি বাণী যে, মানুষকে বিধাতা এ জগতে পাঠিয়েছেন নিয়তির কবলে প'ড়ে হাহুতাশ করতে নয়—তার অন্তর ব্যথা বাহ্য তপস্যার বলে পার্থিব জীবনে অপার্থিব পরমানন্দের বেদী প্রতিষ্ঠা করবে। শেষে বললাম: "শ্রীঅরবিন্দের এ-মহাকাব্য হয়ত এখনি জগতের গণমনের কাছে সমাদৃত হবে না, কিন্তু একদিন আসবেই আসবে যে-দিন মানুষ বুঝবে যে তাঁর ভাষা শুধু কাব্য কথাই ছিল না—ছিল ভাগবত দর্শনের জলদমন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী।"

আমার বক্তৃতার পরে অনেকেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন—সাবিত্রী কোথায় পাওয়া যায়? কিছুদিন পরে শুনলাম যে-কবির গৃহে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম তিনি সাবিত্রী কিনেছেন। হান্টার বললেন, আমার ভাষা শুনে অনেকেই সত্যিই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের প্রতি। আমি বললাম: আমার ভাষণের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কীই বা হতে পারে? (শেষ)

নিখিল ভারত ললিতকলা প্রদর্শনী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শীতঋতু আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব-মুখর হ'য়ে ওঠে মহানগরী কলকাতা। দিকে দিকে আনন্দ আর উত্তেজনার অন্ত থাকে না। সারা বছর যেন এই সময়টির জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে শহর। নৃত্য গীত ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতি তো আছেই তা ছাড়া আছে নানা প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীগুলির মধ্যে ললিতকলা প্রদর্শনীগুলি রীতিমত আকর্ষনীয়। অবশ্য শিল্পানুরাগীদের কাছেই। দেশের খ্যাত অখ্যাত কতো শিল্পীর শিল্প সাধনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই প্রদর্শনীগুলিতে। পরিচয় ঘটে কতো বিদেশী শিল্পীর শিল্পকলার সঙ্গে।

শ্রীঅরবিন্দ শিল্পী—অতুল বসু

নিখিল ভারত ললিতকলা প্রদর্শনী—অর্থাৎ একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্ এই সকল প্রদর্শনীর মধ্যে সুখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ এই প্রদর্শনী সগৌরবে আপন শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করে আসছে। প্রতি বছর শীতকালে কলকাতার জাদুঘরে এই প্রদর্শনী হ'য়ে থাকে, এবারও তার অন্যথা হয়নি। এবারকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁর ঐকান্তিক আশা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে, ভারতীয় শিল্পকলার প্রসারে একাডেমী নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ করে দেবে। পৃথিবীর নতুন নতুন ভাবধারা শিল্পক্ষেত্রে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা অনুকৃতিও দেখা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, এই

রাজা রামমোহন রায় শিল্পী—অতুল বসু

সকলের ভেতর দিয়েই ভারতীয় শিল্পকলার এক নতুন রীতি গড়ে উঠবে, আর তাই হবে ভারতীয় শিল্পকলার শক্তি ও স্বকীয়তা।

একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের সভানেত্রী লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে একটি আশার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কলকাতায় একটি জাতীয় চিত্রাগার নির্মানের জন্যে তাঁরা পশ্চিম-বাংলার সরকারের কাছে যে জমি পেয়েছেন তাতে ওই চিত্রাগার নির্মাণ সম্বন্ধে

আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাঁরা। স্বাধীন দেশের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা সত্যই অনস্বীকার্য।

এবারকার প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পী-দের বহু চিত্রের সমাবেশ হয়েছে দেখা গেল। আরো দেখা গেল—ইটালী, রুশিয়া, জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের শিল্পীদের আঁকা ছবি। এটা আনন্দের কথা নিঃসন্দেহ এবং এতে প্রদর্শনীর গৌরব বর্ধিতই হয়েছে।

প্রায় আড়াই শত শিল্পীর আঁকা পাঁচ শত চিত্র এবং মাত্র চব্বিশটি ভাস্কর্যের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় ছবির সংখ্যা এবার কিছু কম দেখা

আমার পিতা শিল্পী—কিশোর রায়

গেল। কিন্তু এবার প্রত্যেকটি ছবিই সুনির্বাচিত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনাও সর্ব দিক দিয়ে এবার ভালো বলেই মনে হল।

শিল্পকলার স্থান মানুষের জীবনে অনস্বীকার্য এবং সর্ব-প্রকার উত্তেজনার ঊর্ধ্বে থেকে প্রশান্ত চিত্তে শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসনাই শিল্পীর ধর্ম।

কাব্য সাহিত্য, চিত্রকলা সংগীত নৃত্য প্রভৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। শরীর রক্ষার জন্যে যেমন পুষ্টিকর আহার্যের প্রয়োজন, মনকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে তেমনি এগুলির প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া জাতীর নিজস্ব পরিচয়ই তার সাহিত্যে, তার শিল্পে। সুতরাং দেশের শিল্পের যতো উন্নতি হয় ততোই মঙ্গল। অনেক ঝঞ্ঝা বিপর্যয়ের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে আমাদের এই কলা-শিল্পকে। অনেক পরিবর্তন এসেছে তার জীবনে। বহু দেশের বহু শিল্প ধারা এসে মিশেছে তার সঙ্গে—সেই মোঘল পাঠানের যুগ থেকে শুরু করে ইংরাজের আমল পর্যন্ত। তবুও সে মরেনি। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে—নিজের বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বেঁচে আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় রূপশিল্পের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, পরবর্তী মোঘল যুগে তার সঙ্গে এসে মিললো

দীপু শিল্পী—জগদীশ রায়

ইরাণ-পারস্যের রূপ-শিল্পধারা। তারপর এলো ইংরেজ—মুঘলাই আর্টএর অপমৃত্যু ঘটাবার প্রয়াস করলে তারা। ফলে দেশজ শিল্প 'রাজস্থানী' আর 'কাঙড়া' শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে রইলো। অপমৃত্যুই ঘটলো বলা যেতে পারে।

ভারতীয় চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ইংরেজ নিয়ে এলো 'ওয়েস্টার্ণ আর্ট'—ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শিল্প ধারা অভিনব। এর মোহ অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল এদেশের শিল্পীদের কাছে। 'ওয়েস্টার্ণ আর্ট' ভারতীয় শিল্পরাজ্যেও

অনড় আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই কারণে রবিবর্মার সময় থেকে আজ পর্যন্ত 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' নামে অন্য

রোমান দেশের মেয়ে শিল্পী—ডি-পিউরিফিকাটো

কোনো লোকায়ত্ত শিল্পকলা এদেশে প্রবর্তিত হ'তে পারেনি। যা হয়েছে তা একান্তভাবে 'ওয়েস্টার্ণ'

হাউস বোট (শ্রীনগর) শিল্পী—বীরেন দে

আর্টের নামেই হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এই 'ওয়েষ্টার্ণ' আর্টের অপর নাম 'ফাইন আর্টস্'। ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই বটে, কিন্তু এর দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবদান ভারতবাসী স্বীকার করে নিয়েছে। যে অনুশীলন একদা রবিবর্মা প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের হাতে আরম্ভ হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি আজো হ'য়ে চলেছে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এ যুগে ওয়েস্টার্ণ আর্টের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। শুরু করলেন অতীত ভারতের লুপ্ত চিত্রশিল্পের ধারা পুনঃ প্রবর্তন করতে। তাঁর আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত দৃষ্টি ভারতীয় চারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের ওপর পতিত হ'ল এবং তিনি সেখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে নতুন ছন্দে ভারতীয় ললিতকলার নব ভিত্তি পত্তন করলেন। অজন্তা, ইলোরা, এলিফেণ্টা, রাগগুহা

খাজরাণা ঘাট শিল্পী—ভি ডি চিঞ্চলকর

প্রভৃতি—চৈত্য-গর্ভগৃহে লুক্কায়িত চালচিত্র, প্রতিকৃতি এবং অতি সুন্দর ভাস্কর্য মূর্তিগুলির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করলেন আধুনিক কালের লোকশিল্পের। কিন্তু মুঘল আর্ট কিংবা পার্শিয়ান আর্টকেও পরিত্যাগ করেন নি তিনি। এগুলিরও বিশেষ বিশেষ উপাদান তিনি তার নতুন চিত্র পদ্ধতিতে কাজে লাগালেন। নানা দেশের নানা শিল্পধারার সমন্বয়ে তিনি এক অপূর্ব চারু-শিল্পের প্রবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে যামিনী রায় প্রভৃতির নামও সসম্মানে উল্লেখ করতে হয়। তাঁরাও তাঁদের শিল্প সাধনার দানে দেশকে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন।

আলোচ্য ললিতকলার প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা যদি অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অসিত হালদার প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্প নিদর্শন দু'একখানি ক'রেও প্রদর্শনীতে রাখতেন তাহলে মনে হয় প্রদর্শনীর গৌরব আরো বাড়তো। দর্শক সাধারণও খুশী হ'তো। কারণ এঁদের শিল্পসৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রদর্শনী এবারকার দৃষ্টি সুখকরই হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পীরা সাধারণতঃ দুই ধারায় শিল্পচর্চা করছেন দেখা গেল। একটা হ'ল ভারতীয় পদ্ধতি এবং অন্যটি পাশ্চাত্য ধারায়। যাঁরা ভারতীয় ধারা অনুসরণ করেন তাঁদের কারো কারো চিত্রে দেখা যায় আঙ্গিকের মধ্যে লোকশিল্পের প্রভাব, কারও শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির প্রভাব বর্তমান। আবার কেউ কেউ আঁকেন প্রকৃতিগত রূপ, কেউ বা বস্তুর আলংকারিক রূপ বিন্যাসই বেশি পছন্দ করেন এবং চিত্রে তারই প্রয়াস ক'রে থাকেন। পাশ্চাত্য ধারায় যাঁরা শিল্পচর্চা করেন তাঁদের কলাশিল্পেও নানারূপ টেক্‌নিক ও পরিকল্পনার নানা-রূপ দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিল্পে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের রূপ ও টেক্‌নিক, অবচেতন মন-কল্পনা এবং [illegible] বহুল বিকাশ বর্তমান। আলো ছায়ায় বস্তুর [illegible]কে অবলম্বন করে বিবিধ ভাবধারা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে রূপায়িত করেছেন শিল্পীরা। আমাদের দেশের অনেক শিল্পীই এই ধারার অনুসরণ করছেন। আজ-কাল সমস্যা-সংকুল জীবনের নানা সমস্যা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্পে রূপায়িত করার প্রয়াস চলেছে আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে। পরিবর্তনশীল জগতে শিল্পের পরিবর্তনও যুগে যুগে চলে আসছে। প্রদর্শনীর চিত্রগুলির মধ্যে তারই আভাস সুপরিস্ফুট। শিল্পীরা অগ্রগতির পথেই চলেছেন।

কেশ পরিচর্যা শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত

প্রতিকৃতি বিভাগে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতুল বসুর আঁকা রামমোহন, বংকিমচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়, আশুতোষ এবং শ্রীঅরবিন্দ। এর প্রত্যেকটিই সুন্দর এবং প্রাণবন্ত ছবি। বিশেষ ক'রে এই পাঁচখানি প্রতিকৃতির মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতির তুলনা হয়না। মিস্ হানা ফিওলার (অষ্ট্রেলিয়া) তেনজিং ছবিটি চমৎকার হয়েছে। বিদেশী

মেয়ের হাতে আঁকা একজন ভারতীয়ের ছবি সত্যিই উপভোগ্য। জগদীশ রায়ের 'দীপু'—একটি উদাস দৃষ্টি বালিকার মূর্তি। 'এই শিল্পীরই আঁকা আর একটি ছবি 'নীল পোশাক পরিহিতা বালিকা'। এরও দৃষ্টি উদাস এবং স্বপ্নালু। ছবি দুটিই সুন্দর হয়েছে। কিশোর রায়ের 'আমার পিতা'—একটি বৃদ্ধ, ক্লান্ত দৃষ্টি ও বলিকুঞ্চিত ললাট। জীবন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত এই বৃদ্ধের ছবিটি ভালোই লাগলো। এই শিল্পীরই আঁকা 'শরৎচন্দ্র' কিন্তু ভালো লাগলো না। এই সব ছবির পাশে ডি পিউরিফিকাটোর 'রোম দেশের মেয়ে' ছবিটি দর্শকদের চোখে বেশ বৈচিত্র্য এনে দেয়। কিন্তু মনকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারে না।

ফেরি ঘাট শিল্পী—রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকলেরই প্রিয়। বিশেষ করে শিল্পীদের মন এর প্রতি স্বতই ধাবিত হ'য়ে থাকে। তাই রূপে রঙে তুলির আঁচড়ে আঁচড়ে প্রকৃতি রাণীর মধুশ্রী অঙ্কনে শিল্পীদের আগ্রহের অবধি নেই। বহু চিত্রের সমাবেশ দেখা গেল এই বিশেষ বিভাগটিতে।

কুম্ভকার শিল্পী—সমর ঘোষ

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবিগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথ দের 'মধ্য দিন' একটি চমৎকার ছবি। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ফেরী ঘাট' একটি সার্থক রচনা। বীরেন দে'র অনেকগুলি ছবির মধ্যে 'ঝেলাম নদী' 'তুষার' 'হাউস্‌ বোট' প্রভৃতি ছবিগুলি সুন্দর হয়েছে। ডি, চিঞ্চলকরের 'খাজরা

...ট' একটি মনোহর ছবি। সত্যেন ঘোষালের 'পথিপার্শ্বের ...ল্লাসর' ছবিটিও অপূর্ব।

ফোক্ আর্ট বা জাতীয় কলা বিভাগটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে কোনো দেশের কোনো শিল্প-ধারার কোনো সংশ্রব নেই। এ একান্তই ভারতীয় আর্ট। এ বিভাগে প্রবেশ করেই প্রথম যামিনী রায়ের কথা মনে পড়ে। কালীঘাটের পট প্রভৃতি অতীত শিল্পধারাকে আধুনিক মানুষের চোখের সামনে তিনিই তুলে ধরেছিলেন। শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায় তাঁর আঁকা দুটি ছবিতে এই ফোক্ আর্টের ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁর 'খাঁচার পাখী' এবং 'ফুর ফুর' ছবি দুটি সত্যিই অভিনব।

অন্যান্য বিভাগে—রামকিংকরের 'কৃষক', এল-এ-যাদবের, প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস্' —এবং গোপাল ঘোষের 'খেলা' চিত্রগুলি অতি সুন্দর। ডব্লু এইচ্ ব্র্যাকবার্ণএর 'সাদা বিড়াল' একটি অপূর্ব চিত্র। এম পি ডোরান্সের 'গ্রীন লেডী' ছবিটি লরেন্সের 'পিংক্‌ল্' ছবিরই যেন নকল। কে সি এস পানিকর তার 'লাল সেতু' ছবিটিতে আশ্চর্য রঙের খেলা দেখিয়েছেন। জল রঙা ছবিতেও পানিকর অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁর 'প্রভাত সূর্য' ছবিটিতে। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দাদু' ছবিটি সত্যিই চমৎকার হয়েছে। দাদু নাতনীর কৌতুক পরম উপভোগ্য হয়েছে।

সমর ঘোষের 'কুমার' চিত্রটি মনকে আকৃষ্ট করে। মোহন সামন্তর 'সুরশিল্পীগণের স্বর্গ' ছবিটি অতি চমৎকার। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রুপ চিত্রের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। মাখন দত্তগুপ্তর 'কেশ প্রসাধন' চিত্রটি একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। সাদার ওপর কালোর আঁচড়ে এমন সজীব মূর্তি আঁকতে কম শিল্পীকেই দেখা যায়। ইনি এই ছবির জন্যে রাজ্যপালের সুবর্ণ পদক লাভ করেছেন। এঁর 'স্তিমিত আলোক' চিত্রটিও অপূর্ব। এ ছবির জন্যেও ইনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

এবার একাডেমীতে চারুকলার প্রদর্শনের জন্যে শিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত ভিন্ন আর যে সব শিল্পী পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হ'ল—

মোহন বি সামন্ত—ইনি কতকগুলি উত্তম চিত্র প্রদর্শনের জন্যে আগা খাঁ সুবর্ণ পদক পেয়েছেন। গোপাল ঘোষ—জল রঙের ছবির জন্যে শ্রীকানাইলাল জিটিয়ার সুবর্ণ পদক পেয়েছেন। সমর ঘোষ—প্রাচ্য রীতির জন্যে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সুবর্ণ পদক পেয়েছেন। ভবেশ সান্যাল—আধুনিক শিল্পের জন্যে শ্রীদীপক দত্তচৌধুরী স্বর্ণপদক পেয়েছেন। শ্রীমতী উমা রায়—ভাস্কর্যের জন্যে বি-এম বিড়লার স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেছেন এবং গ্র্যাফিক্স আর্টের জন্যে সুশীল মজুমদার জেনারেল মহাবীর সমশের জংগ বাহাদুর রাণার সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছেন।

দাদু   শিল্পী—সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতির পরিচয় লাভের সুযোগ আমরা এই প্রদর্শনীতেই পেয়ে থাকি। অন্যদিকে শিল্পকলা মনুষ্য জাতির সার্বজনীন ভাষা বলেই ইহা আন্তর্জাতিক মিলনের সেতু রচনায় পরম সহায়ক। একাডেমীর ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ডাঃ এস সি লাহার এই উক্তি আমরাও স্বীকার করি।

এবারকার প্রদর্শনী দেখে মনে হ'ল শিল্পীরা পুরাতন পদ্ধতির অনুশীলন অপেক্ষা আধুনিকের চর্চায় মন দিয়েছেন। যেন নতুন কিছুর সন্ধানে উৎসুক আগ্রহে এগিয়ে চলেছেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভেরীনাগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণা থেকেই কাশ্মীরের সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের মূল শিরা ঝেলাম বা বিতস্তা নদীর উৎপত্তি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এখানের করে তার চারধারে স্নানাগারের ব্যবস্থা করেন। কুণ্ডের কাছাকাছি ছিল তাঁর প্রমোদভবন। এর ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। সেখানে মাটীর নলের মধ্যে দিয়েজল নিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, আজও তা দেখা

সন্দিগ্ধা কিশোরী

সালংকারা সাধারণ মেয়ে—কাশ্মীর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হ'য়ে ১৬০ খৃঃ অব্দে এখানে বাগান তৈর করেন ও একটী আটকোণা ইমারৎ দিয়ে এই জলধারাকে কুণ্ডে আবদ্ধ যায়। 'বাগ' বা উদ্যানটী আজও বিদ্যমান। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর নাকি বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন এই সুরম্যস্থানটি...

সমাহিত করা হয়, কিন্তু সম্রাটের এই ইচ্ছা পুরণ হয় নাই ; যদিও কাশ্মীর থেকে লাহোর ফেরার পথে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তার মৃত্যু হয়।

ভেরীনাগের এই কুন্ডটী আজ হৃতশ্রী, তবুও তার স্ফটিক স্বচ্ছ জলে আজও অসংখ্য মাছের নির্ভয় বিচরণ দর্শককে আনন্দ দেয়। তীর্থ হিসাবেও ভেরীনাগ হিন্দুদের কাছে পবিত্র। ভারতে গঙ্গার মত কাশ্মীরে বিতস্তা নদী পবিত্র বলে পরিগণিত ; তার উৎপত্তিস্থল হিসাবে এটী তীর্থস্থান। কারণ, দেবী বিতস্তা যখন নদীরূপ পরিগ্রহ করে এখান থেকে মর্ত্তে প্রকাশ হবার জন্যে এলেন, তখন দেখলেন স্বয়ং মহাদেব এখানে বসে, অতএব তাঁকে ফিরে গিয়ে এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় মাইলখানেক দূরে বিতভুত্র (Vithavutra) নামে একটী ঝরণা থেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় ; অবশ্য তার জলও ক্রমে ক্রমে ভেরীনাগের কুণ্ড-নিঃসৃত জলের সঙ্গে মিশছে, এই থেকেই এ জায়গার নামকরণ হোয়েছে—ভেরীনাগ। সংস্কৃতে 'ভির' শব্দের অর্থ নাকি ফিরে যাওয়া এবং নাগ শব্দের অর্থ ঝরণা। ভিরনাগ থেকে ক্রমে দাঁড়িয়েছে ভেরীনাগ।

শ্রীনগর থেকে এর দূরত্বের জন্য (... মাইল) শুধু এই কুণ্ড ও বাগানটী দেখতে আসা ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। এজন্য সম্ভব হ'লে যাবার পথে "মুণ্ডায়" নেমে এটী দেখে যাওয়া ভাল।

কয়েকটা ছোটখাট পাহাড়ের পাশে পাশে ও বুক দিয়ে আরো একটু এগিয়ে ক্রমে বাস এসে পড়ল একেবারে সমতল ভূমিতে, বড় পাহাড়গুলি গেল দূরে সরে আকাশের কোলে, আশে-পাশে বহু জলপ্রণালী অবিরাম ধারায় চলেছে। তাই থেকে দু'ধারের সমতল শস্যক্ষেত্রগুলিতে সেচন হয়, মাঠের মাঝে মাঝে সোনালী ধান্যগুলি কেটে গোল করে বাঁধা। ...ধান কাটা শেষ হোয়েছে ; মাঠে কয়েকদিন শুকিয়ে ঘরে তুলবে ...ক ; কোথাও এখনও মাঠের বুক জুড়েই নুইয়ে পড়ে রয়েছে এই সোনালী সম্পদ। রাস্তার দু'ধারে সমান্তরভাবে চলেছে শ্যামল ঋজু ...লার গাছের শ্রেণী। সাদা সরল কাণ্ড ঘিরে তার সবুজ পাতা—এ দৃশ্য কাশ্মীরের একেবারে নিজস্ব।

...০ মাইল এসে 'কাজীকুণ্ড' গ্রামে বাস থামলো। কয়েকজন স্থানীয় ...রা এখানে নামলেন। তাজা এবং শুকনো ফলের এটী একটী বড় ...বসাকেন্দ্র। গ্রামটীর আশে-পাশে আখরোট, আপেলের গাছ এবং কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য চেনার গাছ চোখে পড়লো। বিতস্তার জলপ্রণালী ...ক্রমে বেড়ে আশে-পাশে চলেছে।

আরও ১৩ মাইল গিয়ে খানাবল গ্রাম থেকে বিতস্তা বিস্তৃত নদীর আকার নিয়েছে। এখান থেকেই সুরু হোয়েছে তার বুকে নৌকা চলাচল। খানাবল থেকেই দু'টী রাস্তা কাশ্মীরে উপত্যকার দু'টী প্রধান দ্রষ্টব্যস্থানের দিকে গিয়েছে—একটা অমরনাথ যাত্রার পথ পাহালগামের দিকে—অপরটী কাশ্মীর প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদের দিকে।

এখান থেকে বিজবিহার (৪ মাইল) গ্রাম পেরিয়ে আরো কিছুদূর এসে সঙ্গমসেতু দিয়ে বিতস্তা অতিক্রম করলাম এবং তাকে বাঁয়ে রেখে দক্ষিণতীর ধরে এগিয়ে চললাম। খানাবল থেকে ১৭ মাইল পর অবন্তীপুর। এখানে হিন্দু আমলের কয়েকটী বিখ্যাত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। দু'দিন ধরে বাসের ঝাঁকানী এবং পাহাড়ের ঘূরপাক খেয়ে প্রায় সব যাত্রীই তখন কাহিল হোয়ে পোড়েছেন, তার ওপর বেলা থাকতে থাকতে শ্রীনগর পৌঁছে আস্তানা খুঁজে নেওয়ার তাগিদে এখানে নামার উৎসাহ কারও ছিল না। এ জায়গা আমরা পরে দেখেছি, তা যথাস্থানে বোলব। কাশ্মীরের সমতল উপত্যকাতেও মাঝে মাঝে ভারতীয় সেনানীদের ঘাঁটী চোখে পড়ল। অবন্তীপুর থেকে পামপুরের বিখ্যাত কুমকুম ক্ষেতের মাঝ দিয়ে আরও ১৬ মাইল এসে আমরা শ্রীনগর সহর (৫২১৪) পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যা বেলা।
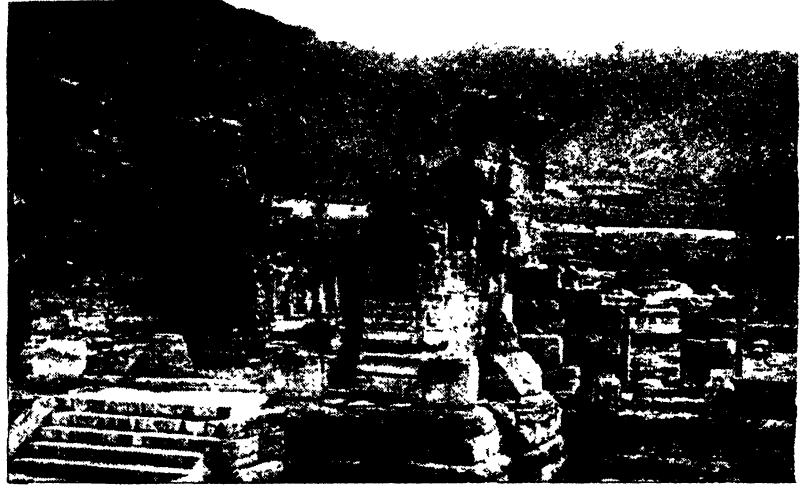
অবন্তীপুরার প্রাচীন পাষাণ সাক্ষ্য

বাসের আড্ডায় হাউসবোট-মালিক ও দালাল এবং হাটেলের লোকেরা যাত্রীদের প্রায় ছেঁকে ধরে। এদের নিজ নিজ হাউস্ বোটের বা নৌকা-গৃহের সজ্জা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনায় বিভ্রান্ত হোতে হয়। অনেকে রাত্রের মত নামকরা সাহেবী হোটেল 'নিডোজ'-এ গেলেন স্রেফ 'সেফটীর' খাতিরে ; কেউ কেউ বা দিশী ম্যাজেষ্টিকে। আমরা হাউস্-বোট দেখতে গেলাম ; ৩ জন বোটের মালিক সঙ্গ নিল ; যার বোট পছন্দ হবে তারটাই ভাড়া নেব স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম। টাঙ্গায় মালপত্র চাপিয়ে ও নিজেরা উঠে ডাল গেটের দিকে গেলাম, এই অঞ্চলটাই

প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে থাকার প্রশস্ত জায়গা। চীনার বাগ শীতকালে ঠাণ্ডা হবে; ঝেলাম সহরের মধ্যে; তাই এই অঞ্চলেই আড্ডা নেওয়া স্থির কোরলাম। কাশ্মীরের বোটওয়ালাদের স্বভাবের সংগে পূর্ব্বে পরিচয় থাকায় তাদের সৌজন্য ও বর্ণনার সত্যতাকে সরলভাবে বিশ্বাস না কোরে মালপত্র গাড়ীতে রেখে শীকারায় চোড়ে ৩।৪টী বোট দেখে একটি বেছে নিলাম।

ডালের তীরে নাসিনবাগ ও নাগিনহ্রদ

প্রতিটী হাউসবোট বা নৌগৃহে সাধারণতঃ একটি সাজান বৈঠকখানা, একটি খাবার ঘর, দুটি বা তিনটি শোবার ঘর, ৩।৪টি স্নানের ঘর ও শৌচাগার থাকে। হাউসবোটের মালিক বা মাঝিরা এরই সংলগ্ন ছোট নৌকায় বাস করে। এটাই তাদের পাকাপাকি বাসস্থান। নৌগৃহের ভাড়াটেদের রান্নাবান্না এখানেই হয় বোলে ইংরেজী আমল থেকেই এদের নাম "কিচেন বোট" (Kitchen boat)—এ ছাড়া তীরে যাওয়া আসার জন্য একটি ছোট নৌকা বা শীকারা থাকে। হাউসবোট ভাড়ার সংগে রাঁধুনী, ২ জন খানসামা এবং মেথরের বেতনও ধরা থাকে। খাবার জল তীরের কল থেকে আনতে হয়, এও বোটের মালিকেরই করণীয়। অবশ্য এসব কাজ মালিকের পরিবারবর্গই সাধারণত করে থাকে। জলের বুকে থাকলেও রান্না ও খাবার জল বাইরে থেকে আনতে হয়; কারণ বিতস্তা বা ডালের জলে সহরের সব নোংরা এসে পড়ে।

কাশ্মীরের কারুশিল্প

হাউসবোটগুলি সাধারণতঃ নদী, খাল বা হ্রদের একটা তীরে খালের মধ্যে গাছপালার সংগে বাঁধা আছে। এই নৌগৃহগুলির অধিকাংশেরই ছাদে বসবার ব্যবস্থা আছে। ছাদের ওপর কাপড়ের ছাউনী, ধারে পদ্ম ও ফুলগাছের টব দিয়ে সাজান। শীতের দুপুরে বা গ্রীষ্মের সকালে বিকেলে এ জায়গাটী বড় আরামের। বর্ত্তমানে প্রত্যেক নৌগৃহের নম্বর ও লাইসেন্স হোয়েছে! নৌকার আয়তন হিসাবে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্ব্বে এদিকের নৌকায় বিজলীবাতি ছিলনা, এখন প্রায় সব নৌকাতেই বিজলী হোয়েছে; কিন্তু শ্রীনগরের বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী মাহুরা পাকীস্থানী "কাবালী"রা ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে নষ্ট কোরে দেওয়ায় এবং আজও তা' সম্পূর্ণ মেরামত না হওয়ায় সহরের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় না। ফলে আলোগুলি দেখতেই—হাউসবোটে লণ্ঠন জ্বালতে হয়।

রাস্তার আলোগুলির অবস্থাও অনুরূপ। এত কম জ্বলে যে বালবের তারগুলিমাত্র লাল হয়, কিন্তু তার কোন প্রভা থাকেনা। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ৩।৪টী জ্বেলেও লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করতে হয়। রাত্রি ১০।১০টার পর যখন অধিকাংশ লোকেই আলো নিভিয়ে দেয়, তখন আলোগু

অপেক্ষাকৃত অনেক উজ্জ্বল হয়। প্রথম দিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ঘরের আলো দেখে ভ্রম হোল বুঝি সকাল হোয়েছে, ঘড়ি দেখে সে ভুল ভাঙ্গলো ; কারণ তখন রাত্রি দু'টো।

এই কাঠের ভাসমান গৃহগুলিকে ইচ্ছামত এখানে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়—অবশ্য তা দু'চার জনের কাজ নয়। ঝেলাম নদী, ডাল হ্রদ, নাগিন বাগ, নাসিম বাগ, বা দূরবর্ত্তী উলার, গন্ধর্ব্বল, মানসবল, হ্রদেও কিংবা সদিপুর, বারামুল্লা সহরেও ২০।২৫ জন কুলীর সাহায্যে এগুলিকে নিয়ে পছন্দমত জায়গায় রাখা যায়—অবশ্য এ জন্য সরকারকে ঐ জায়গার ধার্য্য ভাড়া দিতে হয়। আয়তন ও স্থানমাহাত্ম্য হিসেবে মাসিক ভাড়া ১৫৲ থেকে ৩০৲। এই ভাসমান নৌগৃহগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৭০ থেকে ১৫০ ফিট এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১৫ ফিট। অবশ্য কাশ্মিরীদের নিজেদের বাসের জন্য এর চেয়ে অনেক বড় বা ছোট এবং দেড়তলা, দু'তলা হাউসবোটও চোখে পড়লো। ঝড়ের ভয়ে নৌগৃহগুলিকে বেশী উঁচু করে না, তা'ছাড়া বেশী উঁচু হোলে ঝেলামের ওপরের অনেক সেতুর নীচে দিয়ে পারাপার হবে না। প্রত্যেকটী নৌগৃহের এক একটী নাম আছে—জাহাঙ্গীর, তাজমহল, লোটাস, পপি ডেজী, ভিক্টরি, গ্লোরী, ভাইসরয়, রাণী, জয়হিন্দ, রাজপুতানা, হানিমুন—যা হয় একটা গালভরা বা কাব্যময় নাম।

পূর্ব্বেই বলেছি কাশ্মীর উপত্যকার ১৫ লক্ষ অধিবাসীর মাত্র ১ লক্ষ হিন্দু, বাকী মুসলমান ; হিন্দুদের সাধারণ উপাধি পণ্ডিত। যজন, যাজন, লেখাপড়া, চাকরী, এই ছিল হিন্দুদের পেশা। চাষ, নৌকা এবং অন্যান্য কাজকারবার মূলতঃ মুসলমানরাই করে থাকে।

আমার গৃহিণী হাউসবোটের খাওয়া অপেক্ষা স্বপাকে কুকারে রান্না করাই পছন্দ করলেন। এতে আর্থিক লাভ এবং স্বপাকের বিশুদ্ধতা, দু'টোরই সুবিধা পাওয়া যাবে। আহার্য্য বাদ দিলে সাধারণতঃ নৌগৃহের ৮।১০৲ দৈনিক ভাড়া, তবে অক্টোবরে শ্রীনগরের ভাঙ্গা হাট। অনেক যাত্রীই তখন চলে গেছেন, বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা যাই যাই করছেন। কাজেই দর কষাকষি করে দৈনিক ৫৲ ভাড়ায় আমরা নৌকার মাঝিকে রাজী করিয়েছিলেম। বলে রাখা ভাল, একটু ছোট নৌকা দৈনন্দিন ৩।৪৲ ভাড়াতেও পাওয়া যায়, যদিও মালিকেরা প্রথমে বলবেন ১২।১৪৲— এবং সেটা শুধু আপনার খাতিরেই। এই সেদিন কোলকাতার মিঃ সরকার কি মিঃ সান্যাল ১৫৲ থেকে গ্যাছেন। কোলকাতাওয়ালারা খুব লোক ভাল, বাঙালীসাহেবদের সঙ্গেই তার কারবার বেশী এবং যেহেতু আপনি বাঙালী সেই হেতু ১৫৲ স্থলে ১২৲য় আপনাকে দেবে, কিন্তু আপনি ৩৲ থেকে সুরু করলে সে এমনভাবে হেসে উঠবে ব এমন একটা ভঙ্গী করবে যে আপনার শ্রীনগর না গিয়ে রাঁচী যাওয় উচিত ছিল। তারপর যখন আপনি রাজী না হোয়ে শিকারায় চাপছেন তখন হয়ত বলবে যেহেতু আপনি এতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বোলেছেন ব সে আপনার ভদ্রতায় অত্যন্ত অভিভূত হোয়েছে, সেজন্যে সে ৮৲ আপনাকে দেবে। তাতেও রাজী না হোয়ে যখন শিকারায় করে তীরে এলেন, তখন হয়ত ৪ তেই রাজী হবে। অবশ্য সবই নির্ভর করে চাহিদার উপর।

নৌগৃহের সরকার-নির্দ্ধারিত দক্ষিণা আয়তন ও গৃহসজ্জা হিসাবে মাসিক ২০০৲ হইতে ৩০০৲ এবং খাওয়াশুদ্ধ দৈনিক মাথাপি ১০।১৫৲ টাকা। অবশ্য ২।৩ জন থাকলে সকলের জন্য মোট দৈনিক দক্ষিণা ২০।২৫৲। কিন্তু চাহিদা কম থাকলে এই সরকারী দক্ষিণা অনেক নীচেই ব্যবস্থা হোতে পারে। তবে যে ভাড়াই ঠিক হোক, ওদের ছাপানো চুক্তিপত্রে লিখে একখানা নিজের কাছে রাখা উচিত এবং গরম জল, রেডিও, ইলেকট্রিক, শিকারা ইত্যাদি ভাড়ার মধ্যে থ রইলো কিনা, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা ভাল, নইলে পরে এইসব নিয়ে অকারণ ঝঞ্ঝাট হয়।

(ক্রমশঃ)

সজ্‌নে ফুল

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নিঃশেষে সব মরে ঝরে গেছে সজ্‌নে গাছের পাতা
শীতের দিনের বন্ধ্যা সকাল সেই যবে সুরু হল
মনেই ভাবিনি সেখানে কখন ফুলের বন্যা এসে।
ভরে দিয়ে যাবে বিশ্রী বনের প্রৌঢ় হিসাব খাতা।
পলাশ শিরীষ নিম শিমুলের সকলেরই পাতা ঝরে
কোথায় দেখেছ সজ্‌নের মত ফুলে সব গেছে ভরে!

এপারে এখন সবে শেষ হল ফসল কাটার দিন
পলাশের কুঁড়ি ধরেনি এখনো ঝরেনি নিমের পাতা
আমের বাগানে জেগেছে কেবল কচি মুকুলের মুখ
সাদা কুয়াশায় আকাশ মাটির সবকিছু হল নীল।

এখনি এখন ফুল ফোটাবার লগ্ন তোমার হল!
বাসর তাইত বেসুর বাজবে যত খুশি সুর তোল।

ফুলের ফসল অনেক তোমার রূপের ফসল আছে
ভোরের আলোতে ছুঁয়েছুঁয়ে যাওয়া তোমার পাপড়িগুলি
শীতের সকালে তবু ঝরে পড়ে অজস্র ভারে ভারে,
গাছের পায়ের ধূলায় তারা যে বিদায় প্রণাম যাচে।

তারপর তার চিহ্ন মেলে না কান্না যায় না শোনা
একে একে সব শেষ হয়ে যায় চৈত্রের দিন গোণা।

সঙ্গীতের উৎপত্তি

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

চিৎ ও অচিতের মিলন হইতে বোধের উৎপত্তি এবং বোধ হইতে বাসনা ও কামনার উদয়। বাসনা কামনা হইতে আবার ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বৈখরী শক্তি এবং গতি ও স্থিতির মিলনে এই বৈখরী শক্তির বিকাশ—ধ্বনিতে। এই ধ্বনিই হইল "নাদ"।

নাদ অর্থে প্রণব "ওঙ্কার" ধ্বনি। এই "ওঙ্কার" তিনটি অক্ষরে গঠিত। যথা—অ-উ-ম। ইহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের দ্যোতক। সৃষ্টি হইতে স্পন্দন, স্থিতি হইতে প্রবাহ ও লয় হইতে সীমা করণ। এই স্পন্দন হইতে নৃত্যের উৎপত্তি, স্থিতি হইতে গীত—কারণ ধ্বনির প্রবাহই হইল গীত এবং লয় হইতে বাদ্য—কারণ বাদ্যই নাদকে সীমাকরণ করে। এই তিনের সমষ্টি লইয়া সঙ্গীত। এই জন্য সঙ্গীতকে তৌর্যত্রিক বলা হয়। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে আর্য্য ভারতের যাহা কিছু সংস্কৃতি সবই এই তিনের সমষ্টি লইয়া। যেমন ত্রিতত্ত্ব, ত্রিগুণ, ত্রিদেব, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি ইত্যাদি। অনাদি বাঙ্ময়ী শ্রুতিও এই নাদ-বিদ্যার তনয়া। এই নাদ বিদ্যাময়ী শ্রুতির অপর নাম গন্ধর্ব্ব বেদ। ধ্বনিময় নাদ হইতেই সঙ্গীতের সৃষ্টি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সঙ্গীত বলিতে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যকে বোঝায়। শাস্ত্র যথা—

"গীত বাদিত্র নৃত্যানাং ত্রয়ঃ সঙ্গীত মুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্॥"

—সঙ্গীত পারিজাত

অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিনটির সমাবেশকে সঙ্গীত বলা হয়। তবে কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রাধান্য হেতু গানকেই সঙ্গীত বলা হয়। সঙ্গীত অর্থে সম-গৈ-ক্ত অর্থাৎ যখন গীত ও বাদ্য উভয়ই সমভাবে সমচ্ছন্দে পরিচালিত হয় তখনই প্রকৃত সঙ্গীত সৃষ্ট হয়।

নৃত্যং বাদ্যানুগং, বাদ্যঞ্চ গীতাম্ সমিতি
গীতস্যৈব প্রধানত্বম্"। —সঙ্গীত দর্পণ

অর্থাৎ নৃত্য বাদ্যকে অনুগমন করিবে, বাদ্য গীতকে অনুগমন করিবে, কিন্তু গীতই প্রধান।

এই সঙ্গীত যাহা প্রকৃত হিন্দু ও মার্গ তাহা যদিও প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—যথা ধ্রুপদ ও খেয়াল—বস্তুতঃ তাহা ধ্রুপদকেই বোঝায়—কেননা ধ্রুপদ অর্থে ধ্রুব-পদ—যাহার দ্বারা দেবদেবীর আরাধনা করা হয়।

সঙ্গীতের মূল ভিত্তি হইতেছে নাদ। নাদ বলিতে আদি শব্দ "ওঙ্কার" বুঝায়। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে "ওঙ্কার" বা "নাদই" সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্ম "প্রণব" সত্ত্ব রজস্তমো গুণযুক্ত হইয়া যাবতীয় রাগ ও রাগিনীর সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রকার এই নাদকে—

"ন-কারং প্রাণ নামানাং দ-কারং অনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোভিধীয়তে॥"

—সঙ্গীত দর্পণ

বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর সহিত সত্ত্বময়ী ইচ্ছা মূলাধারস্থ আপন বায়ুর সংস্পর্শে রজোগুণান্বিত হইয়া হৃদয়ে আঘাত করিয়া কণ্ঠনালী দিয়া বহির্গত হইলেই তাহার অভিব্যক্তি হয় "শব্দে" এবং এই শব্দই তখন "নাদ" নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ সত্ত্বময়ী ইচ্ছার আঘাতে বায়ুতে কম্পন সৃষ্টি হয় ও তাহা কণ্ঠনালী দিয়া বহির্গমনের সময় নিম্নোক্ত কম্পনের তারতম্য হেতু তীব্র ও কেবল ধ্বনিবিশিষ্ট স্বর মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। এই যে কম্পনজনিত শব্দ ইহাই "নাদ" নামে অভিহিত হয়। সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ এই নাদের আবার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—

"আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।"

—অনুপ সঙ্গীত বিলাস

এই "অনাহত" ধ্বন্যাত্মক ও প্রাণায়ামাদি যৌগিক এবং "আহত" নাদ বর্ণাত্মক। এই বর্ণাত্মক নাদই ভাব-প্রকাশক হইয়া জগতের সকল প্রাণীকে আনন্দ ধারা প্রদান করে। যথা—

"স নাদস্ত্বাহাতোলোকে রঞ্জকো ভবভঞ্জকঃ"।

অর্থাৎ এই আহত নাদ পৃথিবীর সকল লোককে আনন্দ প্রদান করে।

এই নাদ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবক প্রেরিতং সোহথ ক্রমাদূর্দ্ধ পথে চরণং।
অতিসূক্ষ্ম ধ্বনির্নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষত্ব পুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয় তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্যতে বুধৈঃ॥
কথং কণ্ঠঃ স্থিতঃ পুষ্টঃ স্যাদপুষ্টঃ শিরঃ স্থিতঃ।
উদ্যতে তত্র শিরসি সঞ্চার্য্যারোহি বর্ণয়োঃ॥"

—সঙ্গীত দর্পণ

আত্মা দেহস্থ বহ্নিকে জাগ্রত করিবার জন্য চিত্তকে প্রেরণ করে এবং সেই সত্ত্বময়ী ইচ্ছা পাবককে প্রেরণ করে। পাবক তখন সেই বায়ুকে ঊর্দ্ধপথে প্রেরণ করে। তখন নাভিস্থ অতি সূক্ষ্ম ধ্বনি হৃদয় দিয়া কণ্ঠে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে মস্তকে উত্থিত হয় এবং সেখানে পুষ্টি লাভ করিয়া পুনরায় গলদেশে আগমন করে। এই পঞ্চ প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা ধ্বনি উদিত হয়। সেই ধ্বনি মস্তকে আহত হইয়া কণ্ঠনালী দিয়া বর্ণরূপে নাদে প্রকাশ পায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"

অর্থাৎ এই নাদই সেই পরব্রহ্মের প্রকাশক। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীত বিদ্যাকে সকল বিদ্যাপেক্ষা শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"পূজা কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণং জপঃ॥
জপাৎ কোটিগুণ গানাঃ গানাৎ পরতরং নহি॥"

অর্থাৎ পূজায় কোটি গুণ ধ্যান, ধ্যানের কোটিগুণ জপ, জপের কোটি গুণ গান এবং গানের উপর আর কিছু নাই।

এই নাদরূপী সগুণব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেই নির্গুণ ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়। এই জন্য গন্ধর্ব্ব বেদ বলিয়াছেন—

"নিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে দানাধ্যায়ঃ জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥"

অর্থাৎ দান ধ্যান ও জপে ত্রিবর্গ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু এক মাত্র সঙ্গীতে চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যায়॥

সঙ্গীত দামোদর বলেন—

"ঋগভ্যঃ পাঠ্যস্তুঙ্গীতং সামভ্যঃ সম পত্তত।
যজুর্ব্বেদাৎভিনয়া তাতা রসাঞ্চার্থর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ঋগ্বেদ হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি, সামবেদের দ্বারা তাহার পুষ্টি, যজুর্ব্বেদের দ্বারা অভিনয় ও অথর্ব্ববেদের দ্বারা ইহার রস বিস্তার।

সঙ্গীতই "রসো বৈ সঃ"॥ সঙ্গীতই হইল সকল রসের আধার।

ঋগ্বেদ হইল প্রথম। তারপর সেই ঋক্ ছন্দগুলিতে স্বর সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করাকেই সামগান বলা হয়।

এই সামগানকে সাধারণভাবে সাতটী অংশে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—(১) হুংকার—অর্থাৎ আরতির প্রথমে হুং শব্দটী সমস্ত যাজ্ঞিক পুরোহিতরা উচ্চারণ করেন। (২) প্রস্তা—অর্থাৎ প্রস্তোতৃগণ সাম গানের সূচনাতে যা গান করেন। (৩) উদ্গীথ—যাহা উদ্গাত্রীরা যে সুরে আবৃত্তি করেন। (৪) প্রতিহার—প্রতিহত্রীরা সামের তৃতীয় চরণের শেষে যাহা গান করেন। (৫) উপদ্রব—যাহা উদ্গাত্রীরা তৃতীয় চরণের শেষে গান করেন। (৬) নিধান—যাহা সমস্ত যাজ্ঞিক পুরোহিত সামের শেষে গান করেন এবং (৭) প্রণব অর্থাৎ ওংকার।

এই সাম-গান তিন স্বরে—অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতে হয়। এই উদাত্তাদিস্বর যথা—

অনুদাত্ত—মন্ত্র—র, ধ।
স্বরিত—মধ্য—স, ম, প।
উদাত্ত—তার—নিগ

যাহা হইতে দেখা যায় যে সামগান সপ্ত স্বরেই হয়।

সঙ্গীতের এই প্রথম স্বরকে ষড়জ বলিবার হেতু এই যে ষড়াঙ্গের চালনা হেতু এই স্বর উদিত হয়। ষড়াঙ্গ যথা—জিহ্বা, দন্ত, তালু, নাসিকা, কণ্ঠ এবং হৃদয়। ইহা ময়ূরের কেকাধ্বনি তুল্য। ত্রিগুণাময়ী প্রকৃতি হইতেই এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি। ময়ূরাদি জন্তর অন্তিম স্বর হইতেই এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি। শাস্ত্র যথা—

"ষড়্জং রৌতি ময়ূরাস্তু গাবোনদন্তি ঋষভং।
অজো রৌতি তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণ্বতি মধ্যমং॥
কোকিলঃ পঞ্চমং রৌতি হয়ো হ্রেষতি ধৈবতং।
নিষাদং কুঞ্জরো রৌতি স্বরাণামেব নির্ণয়ঃ॥"

—সঙ্গীত দর্পণ—

অর্থাৎ ময়ূর হইতে ষড়জ, বৃষ হইতে ঋষভ, অজ হইতে গান্ধার, ক্রৌঞ্চ হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, হয় হইতে ধৈবত এবং কুঞ্জর হইতে নিষাদ। প্রকৃতিজাত এই সপ্ত স্বরের অনুকরণ করিয়া ষড়জাদি সপ্ত স্বরের উৎপত্তি।

এই সপ্তস্বরের ক্রমিক হইতেই শ্রুতির উৎপত্তি। অর্থাৎ তীব্রতার তারতম্য হেতু—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে এক সুর অন্য সুরে পরিণত। এইরূপ যতগুলি সূক্ষ্ম তরঙ্গ স্বরান্তরে শ্রুতিগোচর হইতে পারে তাহাদিগকে শ্রুতি কহে। যথা—

"শ্রুতীণাম স্বরারম্ভকারাবয়বঃ শব্দ বিশেষঃ॥"

—মান—

অর্থাৎ শ্রুতি হইল স্বরবেষ্টকারী শব্দ বিশেষ।

"যথাপ্সু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গনাং তদ্বত্ স্বরাগতাশ্রুতি।"

—নারদী শিক্ষা—

মৎস্য যখন জলে চলে তাহার যেমন মার্গ উপলব্ধি হয় না। উড্ডীন বিহঙ্গেরও যেমন মার্গ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ শ্রুতিও বোঝা যায় না।

এই শ্রুতির বিভাগ হইল অনুদাত্তে তিনটী, স্বরিতে চারিটী ও উদাত্তে দুইটী এই মোট ২২টী শ্রুতি। শাস্ত্র যথা—

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়োমতাঃ।
ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥"

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারিটী করিয়া, ধৈবত ও ঋষভে তিনটী করিয়া এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটী করিয়া। এই শ্রুতিগুলির নাম যথা—

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, মার্জ্জন, প্রীতি, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দিপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিনী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নাদই ব্রহ্ম এবং এই নাদ হইতেই সকল স্বরের সৃষ্টি। এই "ওঙ্কার" ধ্বনি কিভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ সপ্ত সুরে না ত্রিস্বরে তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ বলেন উহা ষড়জ ও মধ্যমে উচ্চারিত হয় কেহ বলেন ঋষভ, ষড়জ ও পঞ্চম ইত্যাদি। কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। সেই হেতু কালচক্রের সাহায্য লওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

কালচক্র ধরিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে উহা সপ্ত সুরে উচ্চারিত হয়। কালচক্রে যাহা শ্রবণা নক্ষত্র, তাহার সংখ্যা ২২ ও তাহা মকর রাশিতে অবস্থিত। মকর রাশির অধিপতি হইল শনি গ্রহ। শনি গ্রহ হইল নিজে সপ্ত। মকর রাশি হইল স্রোতস্বিনী সরস্বতী।

সরস্বতী নিজে সপ্ত এবং তিনি সপ্তস্বরে বীণ বাজাইয়া বেদগান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই শ্রবণানক্ষত্র আবার বৃষরাশিস্থ রোহিণী নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ। রোহিণী নক্ষত্রের সংখ্যা হইল ৪। রোহিণী হইতে আরোহণ ও অবরোহণ বুঝায় এবং ইহার দেবতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা —বৃনহ্+মন্—ক=বৃনহ অর্থে শব্দ করা। মন—মা+উন্=মা অর্থে পরিমাণ॥ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে চারিবেদ নির্গত হয়। এই রোহিণী নক্ষত্র আবার কন্যারাশিস্থ হস্তা নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। হস্তার দেবতা দিনকৃত অর্থাৎ রবি। রবি হইতে রব। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মা হইতেই সকল শ্রুতির উদ্ভব হয়। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে বৈদিক গায়ত্রী সপ্ত স্বরেই উচ্চারিত হয়।

এই সপ্তস্বর মানবদেহে অবস্থিত। মানবদেহের মেরুদণ্ডের বর্হিভাগে বামে ও দক্ষিণে দুইটী সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। তাহাদের নাম "ইড়া" ও "পিঙ্গলা" এবং তাহাদের মধ্যে যে নাড়ী আছে তাহার নাম সুষুম্না। এই হইল ব্রহ্ম নাড়ী। ইড়া হইল গঙ্গা, পিঙ্গলা হইল যমুনা এবং সুষুম্না হইল সরস্বতী। এই তিন নাড়ীর মিলন-স্থানকে প্রয়াগ বলা হয়। সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। এই তিন নাড়ী হইতেই সকল স্বরের আবির্ভাব। এই তিন নাড়ীতে রবি, চন্দ্র ও অগ্নির গুণ নিহিত।

এই সপ্তস্বরের গুণ ও ধাতু যথা—

ষড়জ ও ঋষভ সদগুণসম্পন্ন এবং তাহারা ত্বক্ ও রুধির জ্ঞাপক। গান্ধার ও মধ্যম তমোগুণসম্পন্ন ও তাহারা মাংস ও মেধ-নির্দ্দেশক। পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ রমোগুণান্বিত এবং তাহারা অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নির্দ্দেশক।

এই সপ্তস্বরের আবার দেবতা, ঋষি, জাতি, কুল, বর্ণ ও ছন্দ যথা—

স্বর	দেবতা	বেদ	ঋষি	কুল	জাতি	বর্ণ	ছন্দঃ
স	অগ্নি	ঋক্	অগ্নি	দেব	ব্রাহ্মণ	কমলা	অনুষ্টুপ
র	ব্রহ্মা	ঋক্	ব্রহ্মা	মুনি	ক্ষত্রিয়	পিঙ্গর	গায়ত্রী
গ	সরস্বতী	শম	চন্দ্র	দেব	বৈশ্য	ধুস্তর	নিষ্টুপ
ম	শিব	যজুঃ	বিষ্ণু	দেব	ব্রাহ্মণ	কুন্দ	বৃহতী
প	বিষ্ণু	সাম	নারদ	পিতৃ	ক্ষত্রিয়	শ্যাম	পংক্তি
ধ	গণেশ	যজু	তম্বুরু	মুনি	বৈশ্য	পীত	উষ্ণিক
ন	সূর্য্য	অথর্ব্ব	কুবের	অসুর	শূদ্র	বিচিত্র	জগতী

এই সপ্তস্বরের রস যথা—

ষড়জ — সকল রসের মূল।
ঋষভ — করুণ রসাত্মক।
গান্ধার — শান্ত রসাত্মক।
মধ্যম — ভয়ানক রসাত্মক।
পঞ্চম — বীর রসাত্মক।
ধৈবত — করুণ রসাত্মক।
নিষাদ — রৌদ্র রসাত্মক।

এই সপ্তস্বর হইতেই সকল রাগ ও রাগিণীর উৎপত্তি।

রাগ অর্থে অনুরাগ অর্থাৎ যাহা চিত্তকে রঞ্জিত করে। রাগ—রনজ +ঘঞণ। রনজ্ অর্থে রজ করা। রঞ্জ অর্থে চিত্ত-বিনোদন। শাস্ত্র যথা—

"যস্য শ্রবণমাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ
সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥"

—সোমেশ্বর—

অর্থাৎ যাহা শ্রবণে সকলের চিত্তবিনোদন হয় তাহাই রাগ।

এই রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য এখানেও কালচক্রের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

কালচক্রে আর্দ্রানক্ষত্র হইল মিথুনাধিপতি এবং তাহার সংখ্যা হইল ৬। এই আদ্রানক্ষত্রের দেবতা হইল শিব। যেহেতু উহা মিথুনাধিপতি সেই হেতু হর ও পার্ব্বতীর মিলনজ্ঞাপক। শিবের এক নাম হইল নটরাজ। নটরাজ এই মিলনারম্ভের পূর্ব্বে এক মুখে একভাবে এক একটি গান করিলেন। দেবী তাহা শুনিয়া প্লুত হইয়া নিজে একটী গাহিলেন। নটরাজের পঞ্চ মুখে পঞ্চ এবং দেবীর মুখকমল হইতে একটী। এই সর্ব্ব সাকুল্যে ছয় রাগের উৎপত্তি হইল। শাস্ত্র যথা—

"সদ্যোজাতাচ্ছ শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ভৈরবোভূ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমো ভবেৎ॥
ঈশানাখ্যান্মেঘ রাগঃ নাট্যারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নট নারায়ণো ভবেৎ॥

—অনুপ সঙ্গীত বিলাস—

অর্থাৎ হর পার্ব্বতীর মিলনের সময় দেব পঞ্চাননের সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগ, বামদেব মুখ হইতে বসন্ত রাগ, অঘোর মুখ হইতে ভৈরব রাগ, তৎপুরুষ মুখ হইতে রাগপঞ্চম এবং ঈশান মুখ হইতে মেঘ রাগ সকলের উৎপত্তি হইল। এই সকল শ্রবণে দেবী প্লুত হইয়া নিজে একটি গাহিলেন। তাহার নাম হইল নট নারায়ণ, এই মিথুনরাশির অপর একটী নাম হইল নটরাশি। সেই হেতু দেবীর মুখ কমল হইতে যে রাগ বাহির হইল তাহার নাম হইল নট নারায়ণ। এবং যেহেতু ইহা দেবীর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত সেই হেতু ইহাকে নিগম রাগ কহে। আর দেবাদিদেবের মুখ হইতে যে সমস্ত রাগ আবির্ভূত তাহাদের আগম রাগ কহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীইত্যাদি রাগ হইল কেন। তাহার কারণ যিনি সদ্যোদ্ভূত তিনিই সদ্যোজাত। সমুদ্র মন্থনে শ্রীই সদ্যোদ্ভূত। সেই জন্য সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগের উৎপত্তি। বামদেব অর্থে কন্দর্প এবং কন্দর্পের ক্রিয়া বসন্তে। সেই কারণ বামদেব মুখ হইতে বসন্ত রাগের আবির্ভাব। অঘোর অর্থে যাহার ঘোর নাই অর্থাৎ যাহার বিকার নাই। সেই হেতু ভৈরব রাগের প্রকাশ অঘোর মুখ হইতে। তৎপুরুষ অর্থে আদিপুরুষ অর্থাৎ যিনি ভূতনাথ—সকল ভূতের অধিপতি। রাগপঞ্চম এই তৎপুরুষ মুখ হইতে সৃষ্ট। ঈশান মহাদেবের সূর্য্য মূর্ত্তিজ্ঞাপক এবং সূর্য্য হইতেই মেঘের উৎপত্তি। সেই জন্য মেঘ রাগের উদয় ঈশান মুখ হইতে।

রাগিণীসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রাগিণীসমূহের নাম পাওয়া যায় এবং সে সম্বন্ধেও বিশেষ মতানৈক্য দেখা যায়। সেই কারণবশতঃ এখানেও কালচক্রের আশ্রয় লওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

কালচক্রে সপ্তম স্থান হইতে ভার্য্যা ইত্যাদির বিচার হয়। মিথুন রাশির সপ্তম হইল ধনু রাশি। ধনু হইল শক্তির প্রতীক। এই ধনু রাশির অধিপতি অথর্ব্বা স্থত বৃহস্পতি। বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি এবং তিনি নিজে নাদ। বৃহস্পতির সংখ্যা হইল ছত্রিশ। সেই কারণ রাগিণী হইল ছত্রিশ।

এই ছত্রিশ রাগিণী কি কি তাহা রাগসমূহকে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

১। শ্রীরাগ—বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন, ত্রিলোক ব্যাপ্ত, বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণ, সলিলোত্থিত। তাহাতে মধুর রস নিবদ্ধ ও তিনি পর্ব্ব পর্ব্ব করিয়া বৃদ্ধি পান। এই ছয় শক্তি থাকা হেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণীর উদয়।

বিষ্ণুশক্তি হইতে	মালশ্রী
ত্রিলোকব্যাপ্ত হেতু	ত্রিবর্ণী
বিশুদ্ধ শ্বেত হইতে	গৌরী
সলিলোত্থিত বলিয়া	কেদারী
মধুর রস হেতু	মধুমাধবী
পর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি হেতু	পাহাড়ী

২। বসন্ত রাগ—ইহাতে উন্মাদনী, সর্ব্বব্যাপী প্রবল ইন্দ্রিয়শক্তি নিবদ্ধ। ইনি শৃঙ্গার-রসাত্মক ও দোলন-জ্ঞাপক। এই ছয় প্রকার ভাব হেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণীসমূহের প্রকাশ—

উন্মাদনীশক্তি হইতে	দেশী
ইন্দ্রিয়াদি হইতে	দেবগিরি
সর্ব্ব ব্যাপ্তি হেতু	বৈরাটী
প্রবলতাবশতঃ	টোরী
শৃঙ্গার হেতু	ললিত
দোলন হেতু	হিন্দোল

৩। ভৈরবী রাগ অবিকারী শক্তিসম্পন্ন এবং তিনি সর্ব্বভূতে রত ও মস্তকে সমুদ্রোত্থিত চন্দ্র অবস্থিত। তিনি সকল গুণের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া সকল চিন্তার অতীত। এই সকল ভাব থাকা হেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণী সকলের আবির্ভাব।

অবিকারী শক্তি হইতে	ভৈরবী
সমুদ্র হইতে	বাঙ্গালী
চন্দ্র হইতে	সৈন্ধবী
সর্ব্বভূতেরত হেতু	রামকেলী
গুণাশ্রয় হেতু	গুণকেরী
সকল চিন্তার অতীত বলিয়া	গুর্জ্জরী

৪। তৎপুরুষ—ইনি হইলেন মহাপুরুষ। ইনি দেহস্থ বায়ু ও শব্দকে বেষ্টনকরতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া ভূর পালনকর্তৃরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই সকল শক্তি হইতে নিম্নোক্ত রাগিণী সকলের প্রকাশ।

প্রকাশ শক্তি হইতে	বিভাস
ভূ পালন কর্ত্তৃ হইতে	ভূপালী
দেহস্থ বায়ু হইতে	পটহংসিকা
শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে	কর্ণাট
মহাপুরুষ বলিয়া	মালবী
দেহস্থ শব্দ হইতে	পটমঞ্জরী

৫। মেঘ—সমুদ্রমন্থনকালে দাবানল উত্থিত হইয়া গণ হেতু কামাগ্নিতে রূপায়িত হইয়া দেহাকাশকর্ষণ হেতু নিম্নলিখিত রাগিণী সকল সৃষ্টি।

সমুদ্র হইতে	সায়েরী
মন্থন হইতে	সৈরিটী
দাবানল হইতে	হরশৃঙ্গার
গণ হইতে	গান্ধারী
কাম হইতে	কৌশিকি
রূপান্তর হেতু	মল্লারী

৬। নট নারায়ণ—কামাদি প্রযুক্ত মৈথুন অভিলাষী মধুর অস্ফুট হর্ষোধ্বনিযুক্ত কম্পন হইতে কামোদক নিঃসৃত হেতু নিম্নোক্ত রাগিণী সকলের বিকাশ।

কামোদক হইতে	কামোদী
মৈথুনাভিলাষী	অভিরী
কামাদি হইতে	সারঙ্গী
মধুর অস্ফুটধ্বনি	কল্যাণী
হর্ষোধ্বনি হইতে	হাম্বিরী

এই সর্ব্ব-সাকুল্যে ছত্রিশ রাগিণীর সংমিশ্রণে যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্ট হইয়াছে।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি হইল বেদ এবং তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই নাদ-বিদ্যার নাম গন্ধর্ব্ব বেদ। ইহা অপৌরুষেয় এবং গুরুপরম্পরা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য ইহা "অনাদি সম্প্রদায়সিদ্ধঃ"।

এই সমস্ত রাগ ও রাগিণী মানবকৃত নহে। ইহারা ভরত কি নারদ, কি অন্যান্য ঋষি দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহারা অনাদি ও অপৌরুষেয়। মানব তাহার সুকৃতি ও সাধনার দ্বারা ইহা অর্জ্জন করে। এই সমস্ত ঋষিরা তাহাদের তপঃ প্রভাবে এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া শিষ্য পরম্পরায় বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কালের সহিত যেমন আমাদের সকল সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সেইরূপ সঙ্গীতেরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

যোগী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মদর্শনে অসমর্থ হয় কেন? যে কর্মের পরিণামে আবদ্ধ হয় এই কারণেই প্রধানতঃ। নিত্যকর্মের ইষ্টানিষ্ট পরিণাম হতে সুখ দুঃখের ভোগকে সদা দূরে রাখতে পারলে, মনের স্বাধীনতা জন্মে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই নিষ্কাম কর্ম অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন। সংকল্প-সন্ন্যাস মুক্ত করে জীবকে এলোমেলো আপাত-মনোরম কর্মের প্রবাহ হতে। জ্ঞানার্জনের ফলে যখন মানুষ বোঝে দম্ভ, দর্প, অভিমানের ব্যর্থতা, তখন সে উপলব্ধি করে নিজের স্বরূপ। সে বিচ্ছিন্ন নয় সৃষ্টি হ'তে। কাজেই পরের প্রতি দ্বেষ, নিজেরই প্রতিহিংসা এ বোধ উদ্‌বুদ্ধ হয় পরের মাঝে আপনাকে দেখতে শিখলে। বুদ্ধিমান নিজের সত্তাকে বিস্তৃত করে। বোঝে তার আত্মা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নয়। সে বিশাল আত্মার একটি টুকরা বিকাশ মাত্র। সুখ তার তুচ্ছ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে নয়। সুখ ভূমায়—বিস্তৃত বিশাল সত্তায়। এ চেতনায় সে নিজের অন্তরে অনুভব করে তুষ্টি। সে তুষ্টির সুখ অতীন্দ্রিয়। তুচ্ছ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, মানাপমানের অভিমান তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না। তখন তার তৃপ্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানে। আত্মতৃপ্ত নির্বিকার। দৃঢ় শিলাখণ্ডের উপর সাগরের তরঙ্গ যেমন আছাড় খেয়ে পালিয়ে যায়, আত্ম-তুষ্ট ব্যক্তির চেতনায় তেমনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না বহির্জগতের ঊর্মি-মালা। সংসারের অশুভ ক্লেদ জ্ঞানীকে মলিন করে না, স্রোতে ভাসা আবর্জনা তার অনুভূতিতে আশ্রয় পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—চুম্বুক যেমন শতবর্ষ জলে পড়ে থাকলে তার শক্তি হারায় না, জ্ঞানীও তেমনি সংসার সাগরে ডুবে থাকলেও শক্তিহীন হয় না।

যাঁর মনের এমন অবস্থা তিনি আরও গভীরে ডুব দেন আত্মার সন্ধানে। আত্মজ্ঞানেই তো প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান। সবার হৃদ্দেশে ঈশ্বর সমাহিত। আত্মদর্শনে ভগবদ্দর্শন।

কি দ্রষ্টব্য তা তো কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ধ্যানে, একাগ্রতায়, সংযত হৃদয়ে, মন ছাড়িয়ে, সাধারণ বুদ্ধি অতিক্রম ক'রে আরও গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তবে উপলব্ধি হ[illegible]

জ্ঞান বিশুদ্ধ করে মনকে। বুদ্ধি কর্ম-জীবনের প্রবাহকে সচল রাখে মুক্তির প্রণালীতে। মুক্তি পথকে আনন্দময় করে ভক্তি, যার ফলে জীব আত্ম-নিবেদন করে শক্তির স্রোতে। জীবনের চরম রহস্য সমাধানের জন্য ঔৎসুক্য জেগে ওঠে মানব মনের গভীরে—সংস্কারের প্রেরণায়।

কেন জানতে পারে না মানুষ আপনার স্বরূপ? যার মাধ্যমে জানা সম্ভব সে মন যে সদা ইন্দ্রিয়ের বশ। ছ' জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলিহে—এ অভিযোগ অভিজ্ঞতার পরিণাম, পিপাসু ভক্তের হৃদয়ে। কত এলোমেলো ভাব এনে পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতি আমাদের মনের আকাশে দিন রাত ঝড় তোলে, তার কি ইয়ত্তা আছে? যিনি নিজের মনকে জয় করতে পারেন, তিনি বিশ্ব-বিজয়ী। মানব-মনের ক্রিয়া-হিল্লোল প্রশমিত হয়না শয়নে, স্বপনে, জাগরণে।

কিন্তু এ-কথা জীব নিত্য উপলব্ধি করে যে মনের পিছনে যে বুদ্ধি আছে, সে সজাগ থাকলে, মনকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে। বুদ্ধি যদি মার্জিত হয়, এক কেন্দ্র হয়, তবেই তার শাসন সম্ভব। না হ'লে অব্যবস্থচিত্ত নরপতি যেমন কুচক্রী অমাত্যের হাতের ক্রীড়নক হয়, বুদ্ধিও তেমনি হয় ইন্দ্রিয় অমাত্যদের হাতের পুতুল। ইন্দ্রিয় ইষ্টের আবরণে অনিষ্টকর সমাচার পরিবেশন করলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে সমর্থ হয় বুদ্ধি-চালিত মন। তেমন নিয়ন্ত্রিত-মন অন্যায় আদেশ দেয় না—আজ্ঞাবাহী স্নায়ুকে অশুদ্ধ পথে ইন্দ্রিয় পরিচালনার। যার জ্ঞান নির্ণয় করেছে পরদ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ করা অবিধেয়, তেমন লোকের চোখের সামনে মরকতমণি পড়ে থাকলেও, মন হাতকে আদেশ দেয় না সেটিকে তুলে নিতে। তাই সকল মানুষের সমাজ, গোষ্ঠি ও সঙ্ঘ আপনাপন আদর্শ অনুসারে নীতি শিক্ষা দেয়। পরিমার্জিত বুদ্ধি অনুশীলনের ফলে আপনিই সংস্কৃত হয়। তাই নীতি বা ধর্ম-শিক্ষা সকল সমাজের অস্তিত্বের মূলে। নৈতিক আদর্শ ও শিক্ষার বিস্তৃতির উপর সমাজের পুষ্টি ও নিরাময়তা নির্ভর করে।

অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের। সে উপলব্ধির আনন্দানুভূতিও অনির্বচনীয়, অবর্ণনীয়।

এমন প্রত্যক্ষ আত্মানুভূতির উপায় কি? গীতা সে চেতনালাভের উপায় প্রদর্শন করেছেন। ধ্যান পূর্ণ হয় কেমনে? বুদ্ধি এক-কেন্দ্র হয় কোন্ বিধি অনুসরণ করলে? পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র বলেছেন—যোগ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ করবার কী প্রণালী? গীতা সংক্ষেপে সে অবস্থার ব্যবস্থা করেছেন।

একথা বলা বাহুল্য যে কোনো শিক্ষকের শিক্ষার পূর্ণ ফললাভ করতে হলে সম্পূর্ণ শিক্ষার মর্ম গ্রহণ কর্তব্য। ধ্যান-যোগে সাফল্যলাভ করতে গেলে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সকল উপদেশ মানতে হবে। অন্য আদেশ উপেক্ষা করলে যোগের চেষ্টা পর্য্যবসিত হবে পণ্ডশ্রমে। চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। চরিত্রকে নির্মল করতে হবে। নিষ্কাম কর্মী হ'তে হবে। জ্ঞানী হ'তে হবে। ভক্ত হ'তে হবে। এক ভক্তিপরায়ণ না হ'লে সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। চরিত্রকে এমনি ভাবে গঠন করলে তবে যোগে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা। অন্য অনুশীলনে বিরত থেকে কেবল ধ্যানের চেষ্টা নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয়।

অসংযত বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য। যত্নশীল বশীভূতবুদ্ধি মানুষ সদুপায়ে অনুশীলন করতে পারে যোগ। তার সাফল্যের সম্ভাবনাও সম্যক। অতিভোজীর পক্ষে একাগ্রতা সম্ভবপর নয়। অন্যপক্ষে নিরাহারী দেহ যোগসাধন করতে পারে না। তাই বুদ্ধদেব নিজের দর্শিত পথকে মধ্যপথ বলেছিলেন। অত্যন্ত নিদ্রাতুর বা নিদ্রাহীনের অশান্ত মনে ধ্যানের একাগ্রতা আসবে কেমন করে? তাই যোগের বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার প্রচেষ্টায় যুক্তাহারবিহার হওয়া আবশ্যক। কর্মযোগীর পক্ষে যোগ সাধন সম্ভব। সকল কামনা হ'তে মনকে তুলে নিলে তখন চিত্ত বিক্ষেপশূন্য হয়।

উপমা দেওয়া হ'য়েছে প্রদীপের। বায়ুর বেগে প্রদীপের শিখা ইতস্তত: আন্দোলিত হয়। কর্ম-প্রবাহ ও ভাব-হিল্লোল তেমনি ইতস্তত: চালিত করে মনকে। চিত্তবৃত্তির তো সে অবস্থায় নিরোধ সম্ভব নয়। যেখানে বায়ু বহে না এমন নির্বাত স্থলে দীপ রক্ষা করলে তার রশ্মির দোলন ও কম্পন বন্ধ হয়। যোগীর মনকেও তেমনি ভাবনা, কামনা, চিন্তা ও অভাবের ক্ষেত্র হ'তে তুলে নিয়ে এমন ভূমিতে রাখতে হবে—যেখায় মন বিক্ষিপ্ত না হ'তে পারে ভাব-হিল্লোলে।

পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নাই। কারণ আমাদের অজ্ঞাতে পরিবেশের এলোমেলো ভাব-হিল্লোল আঘাত করে মনের দুয়ারে প্রবেশ লাভের জন্য। প্রাণের ছন্দ পরিবেশের ছন্দে না মিললে যোগীর সাধনা-পথে জন্মে বাধা। তাই ধ্যানের সহায়তার জন্য আবশ্যক উপযুক্ত ক্ষেত্র। যোগ সাধনার জন্য যোগীর পক্ষে প্রয়োজন নির্জন স্থল—যেখানে সে একাকী শান্ত-ভাবে আকাঙ্ক্ষার অভিযান হ'তে মুক্ত রাখতে পারে আপনাকে।

শুদ্ধস্থানে স্থির হয়ে নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থলে নিজের আসন স্থাপন করবার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এর কারণও সহজে অনুমান করা যায়। অশুদ্ধস্থানে মন ও দেহের বিদ্রোহ স্বাভাবিক। পুতিগন্ধময় স্থলে মন স্থির করতে গেলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগ্রামে শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। সে বৃথা-যুদ্ধের বিক্ষেপ নিরর্থক, সাধন পথের পরিপন্থী। দুর্গম ও উৎপীড়ক স্থানও স্থিরতার বিরোধী। কোমল বিলাস-শয্যায় সুষ্ঠুভাব পুষ্ট হয় না। অথচ ভূমিকে আসন করলে যুদ্ধ করতে হয় নানা অসুবিধার সঙ্গে। সে ভাবনা তো ভাবনা-হীনতার অবস্থা আনতে পারে না। তাই বলা হয়েছে কুশাসন, ব্যাঘ্র বা হরিণের চামড়া বা চেল বস্ত্রের আসনে উপবিষ্ট হলে একাগ্রতায় সহায়তা পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান এমন আসনের উপকারিতার কারণ নির্দেশ করেছে। এরা বিজলীর প্রবাহবাহী নয়। তাই দেহের বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বন্ধ করে।

নিভৃতস্থলে আসন স্থাপন করে আত্মবিশুদ্ধির মানসে যোগ-অভ্যাস করা বিধেয়। কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত করা আবশ্যক। তাদের ক্রিয়াকলাপের ঘাত-প্রতিঘাতে মন ও বুদ্ধি নিবদ্ধ থাকলে আর সমাধি হবে কেমন করে। বাহিরের দৃষ্টি অন্তরদৃষ্টির পরিপন্থী।

পরিবেশের এবং দেহের আরও সহায়তা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—পায়রা তাড়াতে হলে যেমন হাততালি দিয়ে কাজে বসতে হয়, হরিবোল হরিবোল বলে পূজায় বসতে হয়, বাহিরের বাধাবিঘ্ন সৃজনকারী ভাবকে তাড়াবার জন্য।

সংকল্প হ'তে জাত সমস্ত বাসনা কামনা নিঃশেষরূপে

ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সকল বিষয় হ'তে নিবৃত্ত করে যোগ অভ্যাস করতে হয়।

আসনে স্থির হ'য়ে বসে, মনকে খালি করে, বাহিরের অভিযান বন্ধ ক'রে তখন করতে হবে প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে হয় একাগ্রতার জন্য। আমরা প্রত্যহ দেখি, গভীরভাবে কোনো সংসারিক কথা ভাববার সময় শ্বাস প্রশ্বাস আপনিই এক নূতন ছন্দে বহে। সকল চিন্তা বন্ধ ক'রে তখন আত্মায় মনোনিবেশ করলে যুক্ত হওয়া যায় তার সাথে।

বলা বাহুল্য এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন আবশ্যক। অভ্যাসের ফলে ইন্দ্রিয়ের সঞ্চয় বন্ধ হয়। সংস্কার ও স্মৃতির হাত হ'তেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অতীন্দ্রিয় আনন্দের রসে মন হয় আপ্লুত। সে রস অনির্বচনীয়। বাক্য তাকে বিবৃত করতে পারে না। আনন্দ আনন্দ। যোগীর মন বিস্তার লাভ ক'রে ব্রহ্ম-সংস্থিতি হয়--যেথায় বিরাজ করে পূর্ণতা আনন্দ, অন্তরের জ্যোতি। ধ্যান সচ্চিদানন্দের সন্ধান দিতে পারে সাধনার ফলে।

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার মূলে বিদ্যমান সর্বভূতে মমত্ব-বোধ। ব্রহ্ম নির্বিকার। কিন্তু তিনি মায়ার লীলায় বহু রূপে নানা ভাবে প্রতীয়মান সংসারের রূপে ও কর্মে। যোগী ধ্যানস্থ হ'য়ে এই মায়াময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে লুপ্ত দেখেন। দেখেন এই বহুত্বের মাঝে একত্ব।

ব্রহ্ম সংস্পর্শের অত্যন্ত সুখভোগ করে যোগী। কিন্তু যোগী ব্রহ্মের কোন্ রূপ দেখে? নিরাকার নির্বিকার, না সাকারের মাঝে নির্বিকার? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন।*

অনন্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি তো সৃষ্টির লোপে হয় না, হয় সৃষ্টিকে সম্যক ও পূর্ণ ভাবে চিত্তে ধারণ করলে। দর্শন, দৃশ্য ও দ্রষ্টা হয়ে যায় এক। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার পার্থক্য হয় অবলুপ্ত—জ্ঞান হয় পূর্ণ। সর্বভূতে বিরাজিত দেখে যোগী সেই অব্যয় আত্মাকে। সমস্তই নিবদ্ধ সে অনন্তে। ভেদ-বুদ্ধি কেবল চেতনার পূর্ণতার অভাব।

* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। ৬।২৯

যোগী হয় সমদর্শী। ভেদের মূলে সে দেখে অভেদের অস্তিত্ব, তাই বিভেদ লুপ্ত হয়। কারণ সৃষ্টি সেই একের বিভিন্ন প্রকাশ। সীমার মাঝে অসীমের জ্যোতি-কণা।

এই জগতের ধারা, স্নেহ মমতা, ঈর্ষা দ্বেষ, সুপ্তি ও জাগরণ, আলো-অন্ধকার অবিদ্যা, মায়া। মায়া ঢেকে রাখে অন্তরের সাম্য ও চরম একতা। যোগে এই অপূর্ণের স্রষ্টা মায়ার হয় উচ্ছেদ। তখন পূর্ণ-আত্ম-প্রকাশ সম্ভব। চিত্তে ব্রহ্মের প্রকাশ ব্রহ্ম-নির্বাণ। পার্থক্যের নিভে যাওয়া এবং অখণ্ড জ্যোতিতে সম্প্রসারিত হওয়া ব্রহ্ম-নির্বাণ, নিভে যাওয়া শূন্যত্ব নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এর সুখ আত্যন্তিক।

গীতার কথায়—যে অবস্থায় যোগী অনুভব করে সেই আত্যন্তিক সুখ যা' শুদ্ধবুদ্ধি গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত, এবং যে অবস্থায় বর্তমান থেকে আত্ম-স্বরূপ ভাব হতে বিচলিত হয় না যোগী, যে অবস্থা লাভ ক'রে যোগী অন্য কোনো লাভকে অধিক বিবেচনা করে না, যে অবস্থায় দুঃসহ ব্যথা তাকে বিচলিত করতে পারে না, সে দুঃখ-সংযোগ বিয়োগের অবস্থা অর্থাৎ দুঃখহীন অবস্থা যোগ। অবসাদহীন হৃদয়ে সেই যোগ অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য।*

এই যোগ জ্ঞানের চরম। এর পর আর জানবার থাকে নির্বিকার ব্রহ্ম। কিন্তু গীতায় সে ভাবের উল্লেখ নাই। অনন্ত ব্রহ্মের বিকাশ প্রত্যেকের মাঝে উপলব্ধি এবং তাঁর প্রকাশের জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান। মাত্র জীবে নয়, ঘটে পটে, অনলে অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধরে, সলিলে গহনে, বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে। এ উপলব্ধি জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা। কারণ জ্ঞান ও জ্ঞেয় তথা জ্ঞাতা অভিন্ন।

গীতার এই সমাধিকে যোগশাস্ত্র বলেছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিণামে সমাধি।

গীতার প্রারম্ভ এবং প্রসঙ্গের কারণ বিচার করলে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে সৃষ্টিকে অলীক মাত্র ভেবে পরব্রহ্মের নির্বিকার অবস্থার ধ্যানে নির্বিকল্প সমাধির উপদেশ

* সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম
বেত্তি যত্র না চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ৬।২১।
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। ৬।২২।
তদ্‌বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্ন চেতসা। ৬।২৩।

গীতার প্রতিপাদ্য শিক্ষা নয়। সে জ্ঞান আপনি ফুটে উঠবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিণতিতে। সৃষ্টিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মের উপাসনার কথা, অন্য উপনিষদের সার হলেও গীতায় সে পরম তত্ত্ব গীত হয়নি। অর্জুনের বিষাদ সমুপস্থিত হ'য়েছিল, স্বজন-বধের কল্পনায় বিদ্রোহিতাবশতঃ। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে হত্যায় আত্মার নাশ হয় না, মৃত্যু দেহের পরিবর্তন। জগতের আকার পরিবর্তনশীল। কিন্তু যে আদি-কারণের জ্যোতির অংশ এই জগৎ—সেই আদি কারণ নয় পরিবর্তনশীল। সে অনন্ত, শাশ্বত পূর্ণতার আনন্দ। সৃষ্টি তাঁর লীলা, ওলটপালটই সেই লীলা। তাই সংসারের সব বস্তু মায়া। সৃজন, পালন ও সংহার একই কার্য্য যুগপৎ চলছে। সংহারে নূতন রূপ ফুটছে, রূপ মুছে যাচ্চে না। শূন্যতায় পর্য্যবসিত হ'চ্চে না এ-সৃষ্টি। জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার মূলে রয়েছে রূপ-পরিবর্তন। ইহাই মায়া। সেই মায়ার আবরণ ভেদ করতে পারলে অবগত হওয়া যায় প্রকৃত তত্ত্ব। পরব্রহ্ম প্রকাশ পান জীবের হৃদ্দেশে। কিন্তু সৃষ্টি বাদ দিয়ে নয়, সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। ইহাই ধর্ম।

কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে সেইরূপ পরিবর্তনের আবশ্যক। ধর্মের গ্লানি হয়েছিল। যে সুষ্ঠুভাবে সৃষ্ট সন্নিবিষ্ট হ'লে মায়ার অবসান হবে সেই প্রয়োজনীয় কর্মের আয়োজন—ধর্মযুদ্ধ। এ মুছে ফেলা নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন নয়। তাই অর্জুনের ধ্যান-যোগ শিক্ষা। মায়ায় সৃষ্টির অনাদি অনন্ত মূল-তত্ত্বে যাতে অর্জুন উদ্বুদ্ধ হয়, সে সঙ্গীতই গীতা। চেতনা রূপের মাধ্যমে, রূপ অতিক্রম করে। ইহা পূর্ণতা। পূর্ণজ্ঞানে শত্রুর হনন—এই পরিবর্তনশীল জগতের বেশ-পরিবর্তন।

এ শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন তখন হ'ল এই শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি—সকলই তাঁহাতে, তিনি সর্বত্র। তাই সৃষ্টির প্রতি প্রীতি স্রষ্টার আরাধনা। ধ্যান-যোগে পূর্ণ জ্ঞানলাভ হ'লে উপলব্ধি নিশ্চয় হবে যে তাঁকে যে ব্যক্তি সর্বত্র দর্শন করে এবং সকল পদার্থ তাঁর মাঝে দেখে, তিনি সে সাম্য-দর্শকের দৃষ্টির বাহিরে যান না। সে দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়-সম্যক-দৃষ্টি সাম্য চেতনা।

শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধ ভগবান সম্যক দৃষ্টিকে নির্বাণ মার্গে প্রথম স্থান দিয়েছেন। দৃষ্টির সাথে তিনি শাশ্বত জীবাত্মা বা পরমাত্মার যোগ করেন নি। নিজের শুদ্ধ কর্মেই নির্বাণ লাভ হয়—সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতি উদ্বুদ্ধ হলে। নির্বাণ অতীন্দ্রিয় চেতনা, অবর্ণনীয়, সসীম বুদ্ধির ধারণার অতীত! নির্বাণের উপলব্ধি ঘিরে তাই দেখি বহু মতবাদ। কিন্তু বুদ্ধদেবের সম্যক সৃষ্টি যে দৃষ্টি বাদ দিয়ে নয়, তা বৌদ্ধ-নীতির মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায়। মৈত্রী কার প্রতি? করুণা কার ব্যথিত প্রাণের কাতরতায় সাড়া? অহিংসা কার প্রাণ ও নিরাময়তার জন্য ঔৎসুক্য? প্রভু যীশু ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমকে মুক্তির সোপান বলে নির্দেশ করেছেন। এ দেশের সকল মহাপুরুষের ঐ কথা। শ্রীচৈতন্যের—নামে রুচি জীবে দয়া—মন্ত্র একদিন দেশে প্লাবন এনেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, তারই ফলে স্বামীজি উদাত্ত স্বরে বলেছিলেন—দরিদ্র নারায়ণের কথা।

সর্বভূতে সমজ্ঞান জগদীশ্বরের অনন্ত প্রভাবের উপলব্ধি। ভক্তির এক অঙ্গ এ জ্ঞান। তাই ধ্যানযোগের শিক্ষার শেষে আবার গীতা স্মরণ করিয়েছিলেন—ভক্তির প্রয়োজন। শ্রীভগবান বল্লেন—তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি যোগী হও।*

এ নির্দেশের কারণও সুস্পষ্ট। যোগ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। একাগ্রচিত্তে আত্ম-দর্শনের ফলে যোগী সন্ধান লাভ করে সার সত্যের। তপস্যা, জ্ঞান বা কর্মের পটভূমিতে শ্রদ্ধা না থাকলে জীবন রসহীন হয়। লক্ষ্যহীন জীবন বা তেমন জীবনের কর্মস্রোত পারে না নিয়ন্ত্রিত করতে মনকে একাগ্রতা বিনা।

কিন্তু যুক্ত হ'বে কার সঙ্গে? বলেছি গীতা বুঝিয়েছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। প্রজ্ঞা কার বিষয় ঘিরে? ভগবানের বিভূতি এবং বিশ্বব্যাপক অনন্ত অনাদি চেতনায় শ্রদ্ধাবান হ'লে তবে তো যোগের দ্বারা দর্শন মিলবে পরমাত্মার। তাই ভক্তি জীবনের পরম সাথী ভগবদ্দর্শনে মোক্ষ লাভের পথে। শেষে শ্রীভগবান বল্লেন—মাত্র রসহীন যোগী শ্রেষ্ঠ নয়।

তাঁর অসম্পূর্ণ সত্তায় যুক্ত হ'য়েই বা লাভ কি? দেবদেবী দ্যোতনা করে তাঁর দিব্য-বিভূতি খণ্ডরূপে। একাগ্রচিত্ত হ'য়ে মানুষ লক্ষ্মীলাভ করতে পারে। একাগ্রচিত্তে বিজ্ঞান অনুশীলন করলে—বাণীর কৃপায় সৃষ্টির স্থূল রহস্য বিদিত হওয়া যেতে পারে। মারণ উচাটন বশীকরণ যোগের দ্বারা সম্ভব। এ সব জ্ঞানতা উৎপাদন করে পরিণাম-নিরাসা। ভগবান অনন্ত-শক্তি, অব্যয়। পূর্ণত্বের সন্ধানে যোগ-সাধনায় তাই ভগবানে ভক্তি একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীভগবান তেমন যোগের তত্ত্ব বোঝালেন। তিনি বল্লেন—সকল যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান মদ্গত-চিত্ত হ'য়ে আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে যোগযুক্তদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।†

---

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন। ৬।৪৬

† যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৬।৪৭।

সুতরাং যোগীভক্ত।

প্রাদেশিক সাহিত্য

হিন্দী। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে দিয়েছিল যে ইংরাজী সাহিত্য একথা অস্বীকার করা মূঢ়তা। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁরাই বাংলা সাহিত্যের জনকরূপে পূজিত, তাঁরা সকলেই তাঁদের সাফল্যের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট ঋণী।

তেমনি হিন্দী সাহিত্য, উৎকল সাহিত্য, তামিল ও তেলেগু সাহিত্য, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় ও উর্দু সাহিত্যও বাংলা ও ইংরাজী উভয় সাহিত্য থেকেই রসগ্রহণ করে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত ও অনুসৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকও কিছু কিছু বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর লাভ করেছে। বেচারা বঙ্কিমচন্দ্র যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য তাদের প্রাচীন মহিমা নিয়েই মশগুল ছিল। বর্ত্তমানের আধুনিক সাহিত্যরুচি তখনও তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় নি। নচেৎ বঙ্কিমচন্দ্রও নিঃশেষে অনুদিত হতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দু'এক খানি মাত্র বই কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে শুনিছি।

সে যাই হোক, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দীই কেবল অনেকদিন থেকে বাংলা সাহিত্যের নাগাল ধরবার চেষ্টা করছে। সেটাতে আজও সে কৃতকার্য হ'তে না পারলেও, ভারত স্বাধীন হওয়ায় এবং রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হওয়াতে 'হিন্দীভাষা ও সাহিত্য' হঠাৎ একটা প্রেরণা পেয়ে বেশ একটু গতিবেগ সঞ্চয় করেছে। 'হিন্দি ভাষা প্রচার সমিতি'র প্রচেষ্টাও যে এই উন্নতির মূলে রয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া এবং অসমীয়া সাহিত্যেও যে বাংলা সাহিত্যের ইংরাজী-সংক্রামিত প্রভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে সেটা স্পষ্টই অনুভব করতে পারা যায়। পৃথিবী ক্রমে ছোট হ'য়ে আসছে। দ্রুত-গতি বিমানের কল্যাণে বিশ্বের নরনারী আজ সকলের কাছাকাছি হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং ভাব ও ভাষার দিক থেকে তাদের মধ্যে যে একটা সমধর্মিতা আসবেই একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবিনোবাভাবে মানব-চিত্তজয়ের দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধির যে তিন চার জন শিষ্য তাঁর কঠোর সাধনাকে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পেরে সেই ভাবে নিজেদের জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবিনোবা ভাবে আজ সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন তাঁর ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন নিয়ে। মহাদেব দেশাই চলে গেছেন। শ্রীমসরুওয়ালাও গত হ'য়েছেন। প্রেমের দ্বারা ভালবাসার দ্বারা শত্রু জয়ের যে মন্ত্র মহাত্মাজী আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন আমরা কেউকি তা গ্রহণ করতে পেরেছি? উপরোল্লিখিত মাত্র কয়েকজন এ সত্য উপলব্ধি ক'রে এই ব্রত পালনে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। তাঁদের আচারে আচরণে, তাঁদের বাচনে ভাষণে ও রচনার মধ্য দিয়ে এই আদর্শকে তাঁরা প্রচার করছেন, তার ফলে হিন্দী সাহিত্য আশ্চর্য রকম সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছে। কারণ, এঁদের প্রার্থনার ভাষা, এঁদের আলাপ আলোচনার ভাষা, এঁদের বক্তৃতার ভাষা এবং রচনার ভাষা হিন্দী। কাজেই এঁদের সংস্পর্শে এসে হিন্দী সাহিত্য যেন একটা নূতন প্রেরণা পেয়েছে।

ভারতের জনসাধারণের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থা, বিশেষ ক'রে ভূমিহীন চাষীদের জীবন ও দেশবাসীর অন্ন-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশে বিনোবাজী এই ভূমিদান আন্দোলন শুরু করেছেন। যাদের প্রচুর আছে তারা দাও তোমাদের কিছুটা অংশ ছেড়ে—স্বেচ্ছায়-সানন্দে-ভালবেসে—তাদের জন্য, যাদের আজ পা দু'টি রেখে দাঁড়াবার মতোও

প্রসিদ্ধ অতি-আধুনিক হিন্দিকবি 'নীরজ' (শ্রীগোপাল প্রসাদ)

একটু জমী নেই! বিনোবাজীর এ আন্দোলন এগিয়ে চলেছে আজ সার্থকতার দিকে। এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু হৃদয়বান ব্যক্তি সানন্দে এগিয়ে আসছেন তাঁকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'লেন প্রখ্যাতনামা হিন্দী কবি ও সাহিত্যিকগণ!

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি "অশান্ত" যাঁর প্রকৃত নাম শ্রীশ্যামসুন্দর, ইনি বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলের খাগাদিয়া গ্রামের অধিবাসী—শ্রীবিনোবা জী ভাবের এই ভূদান আন্দোলন তাঁকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে যে তিনি একখানি ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছেন—বিনোবাজীর উপর। বইখানির নাম "নায়া মশিহা" (The New Messiah) কতকগুলি প্রশস্তিমূলক গীত কবিতার মাল্যরচনা করে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন এই প্রেমাবতার, দুঃখার ভগবানের শ্রীচরণে! এই কাব্যখানির মূল সুর হ'চ্ছে দরিদ্রের নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয়ন ছেড়ে আবার জেগে

উঠেছেন। এসেছেন মর্ত্যে নেমে সেই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ যিনি একান্ত সেবা যত্নে প্রেমে ও ভালবাসায় নিজেকে নিঃশেষে দান ক'রে দিলেছেন দেশের বঞ্চিত শোষিত পদদলিত অসহায় নরনারীর প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে।

প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি "দিনকর" জী যাঁর প্রকৃত নাম শ্রীরামধারী সিংহ, ইনিও উত্তর বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলের সিমরিয়া গ্রামের অধিবাসী; এখানে বোধ করি এটা উল্লেখ করা উচিত যে প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ হিন্দী-কবিই এক একটি 'শ্রীকরণ-সংজ্ঞা' (Pen-name) ব্যবহার করেন —এইটেই নাকি হিন্দী সাহিত্যে 'শ্রীতুলসীদাস' থেকে আবহমানকাল ধ'রে প্রচলিত হ'য়ে আসছে। কে জানে 'বিদ্যাপতি' নামটিও এজাতীয় কিনা! আর একটা কথা, হিন্দী কবিতা প্রত্যেকটিই সুরের সঙ্গে আবৃত্তি করতে হয়, তাই হিন্দী কবিতায় 'ধুয়া' বা 'ধরতাই' চরণ থাকে যা বাংলা কবিতায় থাকে না। এটা কেবলমাত্র কীর্তনাদি বাংলা সঙ্গীতেই থাকে। বাংলা কবিতার অতি আধুনিক যে আবৃত্তি-প্রথা তা সম্পূর্ণ সুরবর্জিত! ধ্বনি ছন্দ ও ব্যঞ্জনা বাংলা কবিতার ভাবপ্রবাহের বাহন। কিন্তু হিন্দী

প্রসিদ্ধ হিন্দিকবি 'দিনকর' (শ্রীরামধারী সিংহ)

কবিতা বিনা সুরে আবৃত্তি করলে তা প্রাণহীন মনে হবে। সুরই হিন্দী কবিতার মধ্যে এমন একটা জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে—যা শ্রোতাদের অন্তরকেও ভাবের আবেগে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে! পার্শী ও উর্দু কবিতার ঢং অনুকরণ বা অনুসরণ করেই হয়ত হিন্দী কবিতার মধ্যে এই সুরের চাল প্রবেশ করেছে। সাত আটশো বছরের প্রভাব যাবে কোথা? সাধারণতঃ আমরা যে তুলসীদাস রামায়ণ পাঠ শুনতে পাই, তার মধ্যে একটা সুর আছে বটে, কিন্তু সে আমাদের মা-ঠাকুমার সুর করে রামায়ণ মহাভারত পাঠের মতোই। তবে, চানাচুরওয়ালারা পথ দিয়ে যে একরকার হিন্দী ছড়া সুর ক'রে বলতে বলতে খরিদ্দার আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে, তার মধ্যে সুর থাকলেও ঠিক হিন্দী কবিতার মৌতাত পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ছড়ার সুর, যা বাংলাতেও ঘুমপাড়ানী ছড়ায় মেয়েদের ব্রতকথায় আছে।

এই 'দিনকর'জীও তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞে মেতে লেগেছেন। 'দিনকরজী'র রচনায় বীর ও তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর প্রত্যেকটি রচনা একাধারে প্রসাদগুণযুক্ত অথচ ওজস্বিনী! বিহার যে 'ভূদানযজ্ঞ' এতটা সফলতা অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ মানবপ্রেমিক বিনোবাজীর ঋষিতুল্য চরিত্র-মাধুর্য ও এই সকল লোকপ্রিয় কবির সাহচর্যের অমিত প্রভাব! ভূদানযজ্ঞ সম্বন্ধে দিনকরজীর লেখা কবিতার কয়েক ছত্রের সামান্য একটু ভাবার্থ মাত্র এখানে উল্লেখ করছি, তাহ'লেই কতকটা বুঝা যাবে যে তাঁর রচনার ধরণটুকু কি রকমের?—

> "ঘণ্টা বেজে উঠেছে। সময় আগত। শুনতে পাচ্ছ নাকি ভূস্বামীরা—তোমাদের দ্বারে আগত মহাকালের রুদ্র আহ্বান? ভূমিতে যাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল তাদের বঞ্চিত ক'রে দীর্ঘকাল তোমরা সে জমীর উপস্বত্ব অন্যায় ভাবে ভোগ ক'রে এসেছ, আজ হিসাব নিকাশের দিন এসেছে। ঐ শোনো মনুষ্যত্বের দাবী উঠেছে চারিদিকে। ফিরিয়ে দাও তুমি আজ তাদের সে সম্পত্তি যা বেদখল ক'রে ভোগ ক'রেছ' এতদিন। এবার সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করো। ঘণ্টা বেজে উঠেছে! সময় আগত! মহাকালের আহ্বান শুনতে পাচ্ছনা কি ভূস্বামীরা?"
>
> ইত্যাদি।

কিন্তু, এঁরাও সব হিন্দিসাহিত্যে আজ প্রাচীনের কোঠায় গিয়ে পড়েছেন! হিন্দি সাহিত্যক্ষেত্রে আজ একদল শক্তিশালী তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা এতদিনের প্রচলিত হিন্দি সাহিত্যের প্রাচীন ভাবধারা একেবারে উল্টে দিয়ে নবীনের জয়যাত্রার গান ধরেছেন, যার মধ্যে ধ্বংসের প্রলয় বিষাণের শব্দে ঝংকৃত হয়ে ওঠা সাম্যবাদের সৃজনী-বাণীর সঙ্গে বিপ্লবের দৃপ্ত সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে! এঁদের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর! দৃষ্টান্তস্বরূপ কানপুরের তরুণ কবি "নীরজ" যাঁর প্রকৃত নাম শ্রীগোপালপ্রসাদ, এঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁর কবিতা হিন্দি তরুণ সমাজকে আজ সব চেয়ে বেশি উদ্দীপিত করে তোলে।

রাষ্ট্রভাষা, তথা হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য দিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাদেশিক সরকার থেকেও যে ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয় তাও উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশের দু'জন বিশিষ্ট হিন্দি-সাহিত্যিককে উত্তর প্রদেশের সরকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য প্রত্যেককে ১২০০৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার দিয়েছেন। পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী সাহিত্যবাচস্পতি একজন প্রসিদ্ধ কবি! খাণ্ডোয়া থেকে "কর্মবীর" নামে যে জনপ্রিয় সাপ্তাহিকখানি প্রকাশিত হয় মাখনলাল তার সম্পাদনায় দীর্ঘকাল ধ'রে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁর নবপ্রকাশিত "মালা" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। দ্বিতীয় জন হ'লেন ওয়ার্ধা আশ্রমের শ্রীসত্যভক্তজী। ইনি এ পর্যন্ত হিন্দি ভাষায় আটখানি অতি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। খবর পাওয়া গেছে, যে শ্রীসত্যভক্ত তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের সমস্ত টাকাটাই ওয়ার্ধার 'সত্যাশ্রমে' দান করেছেন। তাঁর ইচ্ছা এই অর্থের সাহায্যে আরও ভাল হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশিত হোক।

উত্তর প্রদেশের সরকার ভারতের সকল প্রদেশের সরকারের চেয়ে ধন্য। এঁরা হিন্দি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মুক্ত হস্তে অগ্রসর হয়েছেন। এ পর্যন্ত এঁরা পঁয়তাল্লিশ জন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিককে পুরস্কার দিয়েছেন প্রায় ২৮০০০৲ আটাশ হাজার টাকা! একটি স্থায়ী "হিন্দি সাহিত্য ভাণ্ডার" স্থাপন করেছেন। এই ভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত একটি "হিন্দি পরামর্শদাতা সমিতি"ও আছে। কোন্ কোন্ লেখক বা গ্রন্থকার পুরস্কার পাবার যোগ্য, এঁরাই সেটা স্থির করে সরকারের কাছে তাঁদের নামের তালিকা পাঠান। বাংলা দেশে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রবর্তিত হবার পর অনেকেই তার অনুকরণ করছেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহ আশাপ্রদ!
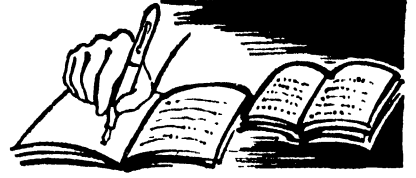
রাজার পোষাক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

যাঁরা ইতিহাস লেখেন, তাঁরা অনেক ভুল করেন।

মৌরশ রাজার কথা সব ঐতিহাসিকই লিখে গেছেন—কিন্তু তিনি কোন্ মুলুকের রাজা ছিলেন, সে-খবরটুকু কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না···তা না গেলেও তাঁর যে-কাহিনী বলছি, সে-কাহিনী যদি বিশ্বাস না করেন, তাতে রাজা মৌরশের কোনো ক্ষতি নেই! কাহিনীটি যেমন পাওয়া গেছে, বলি :—

রাজকার্য্য সেদিন শেষ হতে চায় না—সন্ধ্যা আসন্ন—রাজা কোনোমতে কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে ফেলতে চান! অর্থাৎ রাজ-কার্য্যের শেষ পর্ব্ব—যত হুকুমনামা পরোয়ানায় রাজার দস্তখত, তারপর মন্ত্রী মারেন মোহরের ছাপ।···তাড়া-করা লেখা কাগজ·· রাজা তার কোনোটা পড়েনও না! এক-একখানা কাগজ মন্ত্রী ধরেন রাজার সামনে···ধরে বলেন—কাগজে কি লেখা আছে—কিসের কাগজ। রাজা শোনেন···শুনে সে কাগজে করেন দস্তখত!···সারাদিন কাজ করে করে রাজা ক্লান্ত—চোখ বুজেই তিনি মন্ত্রীর কথা শোনেন—এবং চোখ বুজেই কাগজে করেন সহি। সহির পরে শীল-মোহরের ছাপ। সহির কাগজে কত না বৈচিত্র্য···জেল-জরিমানা ফাঁসির হুকুম···কর্ম্মচারী-নিয়োগ বদলি, ছুটী-মঞ্জুর···কোথায় দাতব্য-খাতে কত টাকা দিতে হবে! অর্থাৎ রাজ্য-পরিচালনার প্রত্যেকটি কাজে রাজার হুকুম চাই—রাজার নিজের হাতের সহি-মার্কা হুকুম-নামা। একালের মতো রবার-ষ্ট্যাম্পের প্রচলন ছিল না সেকালে। তাছাড়া রবার ষ্ট্যাম্পের দস্তখতে কত জাল-জুয়াচুরি চলে।

কাগজের তাড়া শেষ হলে রাজা হাই তুললেন। মন্ত্রী বললেন—যাক, আজকের কাজ শেষ। এ-কথা বলে শীল-মোহরটা মন্ত্রী রাখলেন নিজের রেশমী ফতুয়ার-পকেটে।

রাজা বললেন—শীলমোহরটা বার করো মন্ত্রী···ফাঁসির পরোয়ানা আছে, সহি করে দিই। তারপর তুমি তাতে মোহরের ছাপ মারো!

পকেট থেকে রাজা বার করলেন ভাঁজ-করা কাগজ—তাতে সহি করে মন্ত্রীর হাতে দিলেন।

মন্ত্রী সেটা পড়লেন—পড়ে বললেন—ব্ল্যাঙ্ক পরোয়ানা মহারাজ। কার ফাঁশি—তার নাম নেই।

ভ্রূকুঞ্চিত করে রাজা বললেন—তাতে কি! আমার মর্জ্জি! এতে মন্ত্রী কোনো কথা বলতে পারে না। রাজ-ইচ্ছা!

—রাজার কথার উপর কথা কও! তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী খাঁটী মানুষ—কর্ত্তব্য কাজে অটল—কখনো ঘুষ নেন না—মন্ত্রিত্ব করে মাথার চুল পাকিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন—কি আপনি বলচেন মহারাজ! চিরদিন আমি রাজকার্য্য করছি···কোনো কাজে কোনো ত্রুটি ঘটে নি। আপনার ভুল হলে সে-ভুল দেখিয়ে দেয়া আমার কর্ত্তব্য!

রাজা মৌরশ বললেন—তোমার এ-কথায় আমি খুশী হলুম মন্ত্রী!

মন্ত্রী বললেন—আপনার অসীম করুণা, মহারাজ!

রাজা বললেন—কেন এ-দস্তখত···বলবো।···সভা ভঙ্গ হোক—তোমাকে সে-কথা গোপনে বলবো মন্ত্রী।

সভা ভঙ্গ হলো। সভাসদরা চলে গেলেন। সভায় শুধু রাজা মৌরশ এবং মন্ত্রী নার্জিশ। রাজা বললেন—আমি এক সুন্দরীর প্রণয়-প্রার্থী! সেই সুন্দরী চেয়েছে আমার সহি-আর শীলমোহর-করা ফাঁসির পরোয়ানা। তার এ-সাধ আমি পূরণ করতে চাই···এখন বুঝলে?

—বুঝেছি মহারাজ।

রাজা বললেন—ভেবো না, আমি তার রূপের মোহে এমন উন্মাদ যে তার এ-খেয়াল চরিতার্থ করতে চাই!···মানে, এ সুন্দরীর স্বামী আছে·· সে-স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবে, এমন শক্তি সুন্দরীর নেই! আমি তাকে সে-শক্তি দিতে চাই—এ-শক্তির দৌলতে স্বামীর হাত থেকে সে মুক্তি পাবে!

মন্ত্রী বললেন—বলেন কি, মহারাজ! তার স্বামীকে সে হত্যা করবে! কিন্তু…

রাজা বললেন—কিন্তু নয়, মন্ত্রী! এ পরোয়ানায় আমি দস্তখত করবো—তুমি তাতে মারো মোহরের ছাপ। কার ফাঁসি, সে নাম থাকবে উহ্য। তাকে এ পরোয়না দেবো আমি। রাজ্যের রোজ-নামচার খাতায় লিখে রাখো…এ পরোয়ানা রাজার বুদ্ধির পরিচয়!…ভালো কথা, কাল যে টেক্স-বাড়ানো হুকুম-নামা সহি করে দিয়েছি—তার সম্বন্ধে খাতায় লিখেচো তো, টেক্স-বাড়ানো—রাজার বুদ্ধির পরিচয়?

—লিখেছি, মহারাজ।

—পড়ো, শুনি…কেমন শোনায়…কি লিখেছো!

সোনার মলাটে বাঁধানো মস্ত খাতা…রাজকার্য্যের দৈনিক বিবরণী লেখা হয় এ খাতায়। মন্ত্রী খাতা খুলে পড়লেন—

যে রাজা সত্যই মহাপ্রাণ, রাজ-কর্ত্তব্যে সজাগ—তিনি যেন বাগানের মালী! মালীকে বাগান রক্ষা করতে অনেক গাছ কেটে নির্ম্মূল করতে হয়। রাজাকেও তেমনি…

বাধা দিয়ে রাজা বললেন—ব্যস্, ব্যস্! চমৎকার লেখা হয়েছে! এখন আমি উঠি—বাগানে যাবো। বিশ্রামের প্রয়োজন।

নীল-নদের তীরে রাজার উদ্যান। সন্ধ্যার ছায়া দিকে দিকে নেমেছে:…রাজা এলেন উদ্যানে।

গাছে গাছে গন্ধ-ফুল…নানা পাখীর কল-কূজন—নদীর তরঙ্গে সুরের ফুলঝুরি…রাজা ভাবচেন তাঁর বাঞ্ছিতা সুন্দরীর কথা! সুন্দরীর নাম ফ্লোরিলা—মন্ত্রী নার্জিশের পুত্র রোগাসের প্রেয়সী!

ফ্লোরিলাকে দেখবার জন্য রাজার মন হলো আকুল, অধীর। তিনি চললেন উদ্যান থেকে ফ্লোরিলার গৃহে…মনে নানা চিন্তা। শান্ত্রী-প্রহরীর দল রাজার মূর্ত্তি দেখে শিউরে উঠলো! কারো শির নেবার অভিপ্রায় যেন রাজার মনে!

মন্ত্রীর মনে দুশ্চিন্তার ঘন-অন্ধকার। গৃহে এসে ছেলে রোগাসকে মন্ত্রী বললেন মৃদুকণ্ঠে—কার শিরের উপর রাজার টাঁক?

রোগাসের বুক ছাঁৎ করে উঠলো। সে ভাবলো, আমার নয় তো? রূপসী কিশোরীর উপর রাজার লোভ প্রচণ্ড…ফ্লোরিলার রূপ-মাধুরীর বহু স্তুতিবাদ করেন রাজা—হয়তো ফ্লোরিলার মোহে…রোগাস কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে এলো সে বাড়ীর ফটকে, ফটকের পাহারাদারকে বললে—তোমার পোষাক আমাকে দাও—আমার পোষাক তুমি পরো। আর এ কাজের জন্য বখশিস নাও—এই মোহরের থলি!

পাহারাদারের হাতে রোগাস দিলে মোহরভরা থলি।

পাহারাদার বললে—মাপ করবেন হুজুর, এ কাজ আমি পারবো না। রাজা যদি জানতে পারেন আমার গদানা যাবে!

রোগাস বললে—গাধা কোথাকার! রাজা এ-বাড়ীতে আসচে। বাড়ীতে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে তখন তিনি সন্ধান করবেন! ততক্ষণে তুমি সরে পড়তে পারো। শোনো, আমার কথা যদি না শোনো…আমি তোমাকে কোতল্ করবো!

নিরুপায়। পাহারাদার নিজের পোষাকখুলে রোগাসের পোষাক পরলো—রোগাস পরলো তার পোষাক। তারপর রোগাস ঢুকলো গিয়ে রাজার উদ্যানে।

উদ্যানে প্রমোদ-কক্ষ… লিলাক-ঝাড়ে ঢাকা। সে-ঘরে যাবার জন্য ঐ ঝাড়ের মধ্যে ছোট দরজা। গোপন-দরজা।…রোগাস সন্ধান নিলে…রাজা এখানে নেই! উদ্যানে সন্ধান করলো…রাজা উদ্যানেও নেই! রোগাস বুঝলো রাজা তাহলে…

রোগাস বেরুলো উদ্যান থেকে…এলো নিজের গৃহে!

মন্ত্রীর বাড়ীর সঙ্গে লাগাও বাগান। বাগানে সবুজ-ঘর-লতায়-পাতায় মনোহর স্নিগ্ধ কুঞ্জ! রোগাস এলো সেই কুঞ্জের পিছনে।

সবুজ ঘরের মধ্যে ফ্লোরিলা আর রাজা। রাজা বললেন—আর ফ্লোরিলা…এসেছো! আমার মনের মানসী!

ফ্লোরিলা বললে—এসেছি মহারাজ। ফ্লোরিলার কণ্ঠে যেন বীণার সুর!

রাজা বললেন—তোমাকে বক্ষলগ্ন করতে পারি?

ফ্লোরিলা বললে—এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? রাজার ইচ্ছাই আদেশ!

রাজা বললেন—ফাঁসির পরোয়ানা এনেছি···আমার সহি-করা। মন্ত্রী তাতে দেছে মোহরের ছাপ। কার ফাঁসি চাও? নামটা বসিয়ে দিয়ো।

রোগাস শুনলো—শুনে চম্‌কে উঠলো!···ভাবলো, বাবা এ পরোয়ানায় মোহর দেছেন!

ফ্লোরিলা বললে—দিন ও-পরোয়ানা।

রাজা পরোয়ানা দিলেন। ফ্লোরিলা বললে—আপনি বসুন··আমি এখনি আসছি।

রাজা বললেন—কত দেরী হবে?

—তা প্রায় একঘণ্টা!

—বেশ!

ফ্লোরিলা বেরিয়ে গেল সে পরোয়ানা হাতে নিয়ে—রাজা বসলেন কুঞ্জ-বিতানে!

রাজাকে অপেক্ষা করতে হবে এক ঘণ্টা—এ বড় বিষম কথা! বেশ গরম পড়েছে—এক-ঝলক বাতাস নেই। রাজা কুঞ্জ-বিতান থেকে বেরিয়ে নীল-নদের ধারে এসে দাঁড়ালেন···ফুলের গাছে কটা মৌমাছি···গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে!

নদীর পানে চেয়ে রাজা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন···তারপর হঠাৎ কি মনে হলো! ঘাটে তিনি বসলেন ···ঘাটের পাশে একটা ফুল-ঝাড়ের আড়ালে বসে আছে রোগাস। তার মনের মধ্যে যেন অগ্নেয়গিরি ফুঁশছে। রাজা ভাবলেন, সস্তা জল···স্নান করলে হয়! চারিদিকে তিনি তাকালেন···জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই! রাজা নিঃশব্দে ঘাটের পাশে নিজের মণিমুক্তাখচিত রাজবেশ খুলে রাখলেন ···রেখে নিঃশব্দে নামলেন নীলের শীতল-জলে!

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে নেমেছে···নীলের স্নিগ্ধ-শীতল জলে যেন রাজ্যের আরাম! রাজা জলে গা ডুবিয়ে আরামে দুনিয়া ভুলে গেলেন।

একঘণ্টা জলে কাটিয়ে রাজা উঠলেন তীরে। পোষাক? তাঁর পোষাক কোথায় গেল?···এইখানে খুলে রেখে তিনি জলে নেমেছিলেন!···

পোষাকের চিহ্ন নেই!···নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে —কার এমন স্পর্দ্ধা! রাজবেশ চুরি করে?—অথচ উলঙ্গ তিনি···কাকেও ডাকতে পারেন না! লজ্জা করে! সকলে ভাববে, রাজা উন্মাদ হয়েছেন!···কে···কে চুরি করলে? মানুষের এমন সাধ্য হবে? পৃথিবী?···দাও ফিরিয়ে আমার রাজবেশ—না'হলে তোমাকে বিদীর্ণ করে দেবো, বসুন্ধরা।···মিথ্যা শাসন! মিথ্যা আস্ফালন! রাজবেশ মেলে না। রাজা আকুল!

এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামলো···সেই সঙ্গে ঝড়। আকাশে বজ্রে-বিদ্যুতে মহাযুদ্ধ!···সারারাত বৃষ্টির বিরাম নেই! ফ্লোরিলার কাছে যাবার উপায় নেই।

অনেক রাত্রে ভিজতে ভিজতে রাজা এলেন প্রাসাদের দ্বারে! দ্বারে শান্ত্রী নেই···প্রহরী নেই! রাজা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন···ভাগ্যে কেউ নেই! থাকলে এই উলঙ্গ মূর্ত্তিতে তিনি কি করে তাদের সামনে দাঁড়াতেন!—রাজা বেরুলেন পথে···সারারাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। বৃষ্টিতে পথে লোকজনের চিহ্ন নেই! রাজা যেন আরাম পেলেন!···

পথের ধারে ছেঁড়া একটা থলি গায়ে জড়ানো এক ভিক্ষুক পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে রাজা বললেন—তোর ঐ ছেঁড়া থলি দে আমাকে···আমি আব্রু চাই!

ভিক্ষুক তার হাতের লাঠি উঁচিয়ে খিঁচিয়ে উঠলো—বেরো···পাগলা কোথাকার! না'হলে এই লাঠির একটি ঘা দেবো বসিয়ে তোর মাথায়।

রাজা দেখলেন, বিপদ!···নিঃশব্দে রাজা সেখান থেকে সরে এলেন।

এলেন প্রাসাদের ফটকে··ফটকে শান্ত্রী ঘুমে অচেতন। রাজা তাকে ধাক্কা দিলেন। সে উঠে বসলো, বললে—কে? কি চাও?

রাজা বললেন—আমাকে পুরীতে যেতে দাও।

রক্ষী বললে—তামাসার জায়গা পাস্‌নে! বটে? ন্যাংটা পাগলা কোথাকার! চোর!

রাজা বললেন···বেশ চড়া গলায়—আমার হুকুম···

—ভাগ্‌ ব্যাটা পাগলা! হুকুমদার এসেছেন! শান্ত্রী বুঝি মারবে, এমন তার রোখ!

রাজা বললেন—আমাকে চিনতে পারছিস না?

—না।

—আমি তোদের রাজা···রাজা মৌরশ।

—জানি। তা এখানে কেন? পাগলা-গারদে তোর তখ্‌ত্ আছে—সেখানে যা।

রাজা বললেন—শোনো রক্ষী, আমি পোষাক খুলে রেখে নদীতে স্নান করতে নেমেছিলুম—উঠে দেখি, আমার পোষাক চুরি গেছে। বিশ্বাস করো···আমি মিথ্যা কথা বলছি না! তাছাড়া, আমাকে ভ্যাখো ভালো করে, ভ্যাখো আমার মুখ দেখলে রাজা বলে চিনতে পারবে না?

—আরে যা, যা—দিক করিসনে! রাজা এখন ঘুমোচ্ছেন—ঐ তিনতলার ঘরে!···হুঁঃ! ভাগ্—না'হলে ডাণ্ডা খাবি।

রাজা রাগে জ্বলছেন! মনে হচ্ছে, এখনি এ রাজ্য ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেবেন—আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন! এমন রাজ্য···যে রাজ্যের রক্ষী তার রাজাকে চেনে না!···

কিন্তু কার উপর রাগ করবেন? কি নিয়ে? রাজা পথে বেরুলেন। সেই ভিক্ষুকের সঙ্গে আবার দেখা! রাজা হাতজোড় করে মিনতিভরে বললেন—তোমার থলিটা একবার দাও—বহুৎ বখশিস দেবো!

হেসে সে বললে—কোথায় নেশার ঘোরে কাপড়-চোপড় বন্ধক দিলে, দাদা?

রাজা বললেন—দাও তোমার ছেঁড়া থলিটা!

ভিক্ষুক বললে—লজ্জা করে না? চেহারা তো দেখছি ভবিষ্যুক্ত···ভিখিরির ট্যানা চাও!

নিরুপায় রাজার চোখে এলো জল। তিনি বললেন—শোনো ভাই ভিক্ষুক, আমি তোমাদের রাজা···আমার রাজবেশ চুরি গেছে।

ভিক্ষুক বললে—বটে! রাজা! হুঁঃ!

রাজা বললেন—কেন, আমার মুখ ··ভ্যাখোনি তুমি দেশের মোহরে? টাকায়?

—ভিক্ষে করে খাই···ভিখিরী মানুষ···কোথায় দেখবো টাকা? কোথায় দেখবো মোহর···শুনি?

নাঃ—কোনো উপায় নেই! রাত্রি আর কতক্ষণ! সকাল হলে···

রাজা এলেন রোগাসের বাগানে···এখনো ভোর হয়নি—বাড়ীর সামনে লোকের ভিড় ··যেন কি তামাসা দেখবে বলে সকলে এসে জড়ো হয়েছে।···চপি চপি ফিশফাশ তারা কথা কইছে। দেখে রাজা চিনলেন···সভার অমাত্য-আমীর ওমরাওয়ের দল!···রাজার উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখে পাগল ভেবে সকলে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। রাজা এসে বললেন—আমি তোমাদের রাজা···শোনো—আমার হুকুম···

তারা বললে—যা, যা ব্যাটা পাগল।

রাজা বুঝলেন, হুকুমদারী নয়·· নরম হয়ে কথা বলতে হবে। রাজা বললেন—ভ্যাখো·· সকলে আমাকে ভ্যাখো—চিনতে পারছো না? আমি রাজা! রাজা মোরশ!

সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো।

ওমরাওদের পানে চেয়ে চেয়ে রাজা মোরশ বললেন—তুমি চুপ করে আছো কেন, কেবুল? এই যে ক হপ্তা আগে তোমাকে আমি কত জায়গীর দিয়েছি! আর নাইনস্—তুমি পথে পড়ে দিন কাটাতে—পেটের অন্ন জুটতো না—তোমাকে আমি ওমরাও করে দিয়েছি···তোমরা আমাকে চিনতে পারছো না?

কেবুল···নাইনস্···তবু চিনতে পারেনা রাজাকে।

—বেইমান! শয়তান! রাজা তুললেন হুঙ্কার···বললেন—কোথায় তোদের ফ্লোরিলা? ডাক্ তাকে। ফ্লোরিলা আমাকে চিনবে।

রাজার মুখে এ-কথা বেরুবামাত্র একজন রক্ষী এলো বেরিয়ে—তার হাতে লম্বা সড়কী—সে সড়কীতে গাঁথা এক সুন্দরীর ছিন্ন শির!···রাজা বলে উঠলেন—এ যে ফ্লোরিলার মাথা!···কে এ কাজ করলে? কার এমন স্পর্দ্ধা?

কেউ জবাব দিলে না।···কিন্তু রাজা সব কথা শুনলেন অচিরে···রক্ষী দেখালো ফাঁশির পরোয়ানা···তাতে রাজার হাতের সহি···মন্ত্রী সে-পরোয়ানায় মেরেছেন রাজার মোহর···নামের যে জায়গা ছিল ফাঁক—সে-ফাঁকে লেখা ফ্লোরিলার নাম।

রাজার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে! রাজা বললেন—আমি·· আমি তবে রাজা নই? আমি মোরশ নই?

লোকের ভিড় আরো বাড়লো। আমীর-ওমরাওরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে···সেই সঙ্গে রাজ্যের যত মহিলা···সকলে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ফ্লোরিলার খণ্ডিত শিরের দিকে। সেই ছেঁড়া-থলি গায়ে জড়ানো ভিক্ষুকটাও এসে দেখছে। ভিক্ষুক এলো রাজার পাশে—রাজার হাত

ধরে ভিক্ষুক বললে—চলে এসো গো ভালো-মানুষের পো; এখান থেকে চলে এসো···না হলে এই সব আমীর-ওমরাওয়ের দল, তোমাকে লাথি মেরে পিষে মেরে ফেলবে !···

এ কথা বলে নিজের ছেঁড়া থলির খানিকটা ছিঁড়ে রাজার গায়ে চাপিয়ে ভিক্ষুক চললো রাজাকে টেনে সেখান থেকে নিয়ে। রাজা চলেছেন···ভিক্ষুকের হাতে দম-পাওয়া পুতুলের মতো···তিনি যেন জড়—কোনো চেতনা নেই যেন !···

অনেক-দূরে এসে চৌমাথা। সেখানে রাজা দেখেন, মন্ত্রী নার্জিশ···পাথরের মূর্ত্তির মতো নার্জিশ দাঁড়িয়ে আছেন··· নির্বাক নিঃসঙ্গ। ছুটে গিয়ে রাজা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ··বললেন - নার্জিশ·· নার্জিশ···খোদার দয়া···তাই তোমার দেখা পেলুম।

তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বললেন—কে তুমি ? এর মানে ?

—তুমিও আমাকে চিনতে পারছো না, নার্জিশ ? তুমিও না ? আমি তাহলে তোমাদের রাজা নই ?

—না···রাজা তুমি নও। তবে হ্যাঁ, চেহারা, ভঙ্গী··· এগুলো হুবহু নকল করেছো, বটে ! তবে রাজা এমন ইতর নন !···

কথাটা বলে মন্ত্রী নিঃশব্দে গিয়ে রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন।

শান্ত্রী-পাহারার দল ফটক খুলে সেলাম জানালো। মন্ত্রী এলেন সভায়। সেখানে রাজবেশপরা রোগাসের সঙ্গে দেখা। রোগাস বললো মন্ত্রীকে···রাজার অভিসন্ধি রোগাশ শুনেছিল···দৈবাৎ···শুনেছিল ফ্লোরিলার সঙ্গে নিভৃতে রাজার কথা···তারপর রাজবেশ খুলে রেখে যেমন জলে নামলেন,অমনি সেই বেশপরে রোগাস এসে পরোয়ানায় ফ্লোরিলার নাম লিখে ফাঁশির পরোয়ানার সদ্ব্যবহার···

ইতিহাসে রাজা মৌরশের জীবনের এ কাহিনীটুকু কেন লেখা নেই, কে বলবে এর কারণ !

(হাঙ্গেরিয়ান গল্প ঃ কোলোমান মিজাথ্)

অশাশ্বত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

যে-ফুল ঝরিয়া গেল আজি এই ক্লান্ত দিবাশেষে—
চিহ্ন তার যাবে মুছে ; ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ইতিহাস
কেহ না রাখিবে লিখি' স্বর্ণের অক্ষরে ! অলিকুল
আর না খুঁজিবে তারে ; ভুলিবে মঞ্জুল কুঞ্জতল
তার কথা—নব পুষ্পপল্লবের বিচিত্র সম্ভারে
প্রতিদিন। রিক্তশাখা পুনর্বার উঠিবে উলসি'
উদ্গত কোরকপুঞ্জে। স্নিগ্ধচারু তরুবীথিকায়
তেমনি গাহিবে পাখী,—গাহিতেছে নিয়ত যেমন
সৃষ্টির প্রভাত হ'তে ! মত্ত, লুব্ধ, মুগ্ধ মধুকর
ভুঞ্জিবারে নবমধু সঞ্চরিবে করি' গুঞ্জরণ
নবীন পুষ্পের দ্বারে। এ বিশাল সৃষ্টির প্রবাহ
কার সাধ্য রোধিবার ! দুঃসাহসী কে পারে কহিতে
কাল-কবলিত বিশ্বে সম্বোধিয়া—'তিষ্ঠ ক্ষণকাল' !

যে যায় সে চ'লে যায়—জগতের কিবা ক্ষতি তায় ?
কত পুষ্প গেছে ঝরি, যাবে ঝরি—তবু কোনোদিন
ফুরাবে না বসুধার অন্তহীন কুসুম-প্রবাহ !
কে কাহারে রাখে মনে !—যাযাবর বৃদ্ধ মহাকাল
চাহে না পশ্চাৎপানে ! তবু কি যে দুরাশা বিপুল !
মানুষের ক্ষুদ্র বুকে কি দুর্মর অমৃত-পিয়াসা !

ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধি কবি তাই রাখিবারে চায়
পলাতক মুহূর্ত্তেরে ! উদাসীন মৌন মহাকাল
হাসে শুধু ব্যঙ্গ-হাসি। কেন তবে এ ব্যর্থ প্রয়াস ?
মরণ-মন্দিরে বসি' জীবনের কেন এ সাধনা ?
ঝরা-ফুল আর কভু এ ধরায় আসিবে না ফিরে ;—
জানিবে না তার লাগি কেঁদেছিল কোন্ এক কবি !

তেরো

—"Al diablo que te doy"—

সমস্ত জিনিসটাই এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে শঙ্খদত্ত নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আজ পুরো তিনটি দিনের পরেও তার মনে হচ্ছিল যেন মধূকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে সে ; সে স্বপ্ন তার উত্তপ্ত কামনা দিয়ে গড়া—অসম্ভব কল্পনার কারুকার্য দিয়ে খচিত। হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন ভেঙে যাবে—কল্পনার বুদ্‌বুদ্‌গুলো মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। বিশ্রান্ত চোখ মেলে সে দেখবে মহাদেব পাণ্ডার ঘরের জানালা দিয়ে সকালের আবছা আলো এসে পড়েছে—ঘরের কোণে সদ্য-নিবে-যাওয়া প্রদীপটার একটা উগ্র গন্ধ—তার শিথিল স্নায়ুগুলোতে একটা বিরক্তিকর অবসাদ। আর হয়তো তখনি বাইরে শোনা যাবে কয়েকটা স্পর্ধিত পায়ের শব্দ, কয়েকটা তলোয়ারের চাপা ঝঙ্কার, কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসবে মহাদেব পাণ্ডা, বলবে :

ডিঙার ছাদের ওপরে যেখানে বসেছিল, সেইখানেই থরথরিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত। উত্তরের হাওয়া বইছে সমুদ্রে—ঢেউয়ের নাগর দোলায় দুলতে দুলতে চলেছে বহর। বাতাসে শীতের আমেজ নেই—আছে রোমাঞ্চ। তবু একটা তীক্ষ্ণ শীতলতার স্রোত বইছে শরীরের ভেতরে।

শঙ্খদত্ত পেছন ফিরে তাকালো একবার। কোথায় জগন্নাথের মন্দির—কোথায় তার উদ্ধত চূড়ো? কোথায় তার নিশীথ পলায়নের ওপরে দারুব্রহ্মের কঠিন চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি? অতলান্ত জল শুধু লঘুছন্দে নেচে উঠছে—গাঢ় নীল পত্রপুটের ওপরে থেকে থেকে ফুটে উঠছে ফেনার মল্লিকা—তার পরেই যেন আলতো হাওয়ায় পাপড়িগুলো ঝরে যাচ্ছে তাদের। প্রাণহীন জলের মরুভূমিতে শুধু মৃদু গর্জন করে চলেছে একটা জান্তব প্রাণ : তার নেপথ্যে হাঙরের বুভুক্ষা—তার গভীর অতলে একটু একটু করে দল মেলছে চিত্র-প্রবাল—অন্ধকার আকাশে সারি সারি নক্ষত্রের মতো তার নীল-কাজল নির্জনতায় অগণিত শুক্তার বুকে জ্বলছে মুক্তোর প্রদীপ। ওপরে শুধু শূন্যতা—শুধুই শূন্যতা। অসহ্য লবণাক্ত এক জলাভূমি। পৃথিবীর হৃদয়।

ঠিক কথা। পৃথিবীর হৃদয় এই সমুদ্র—তার হৃৎপিণ্ড। নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের মতো নিরন্তর ঢেউ। কটুস্বাদ লবণ-জর্জর তার অতৃপ্তি ; ওই হাঙরের ক্ষুধায় তার অসহ্য কামনার পীড়ন। আর তার মনের অন্ধকারে অম্‌নি-ভাবেই বহুবর্ণ প্রবালের প্রেম—তার নিঃসঙ্গ সত্তার আকাশে মুক্তোর দীপান্বিতা !

শুধু পৃথিবীর হৃদয় নয়, তারও হৃদয়। কিন্তু সে হৃদয়ের সন্ধান কি এখনো সম্পূর্ণ পেয়েছে শম্পা ? যেটুকু দেখেছে তা ওই নোনা সমুদ্র—তা শুধু ঝড়ের ঢেউ। যে ঢেউ অকস্মাৎ প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে জলস্তম্ভে—হঠাৎ দানবের মতো বাহু বাড়িয়ে কেড়ে নেয় নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক আশ্রয় থেকে—তারপরে ভাসিয়ে দেয় সর্বনাশা বিপর্যয়ের উদ্দামতায়। শঙ্খদত্তের মধ্যে শম্পা প্রত্যক্ষ করেছে সেই লুব্ধ বর্বর জন্তুটাকে : দেখেনি প্রবাল দ্বীপ, দেখতে পায়নি অসংখ্য মুক্তোর আশ্চর্য ইন্দ্রধনু !

কোথা থেকে যে ওই লোকটা এল—ওই রাঘব ! শঙ্খদত্তের সন্দেহ হয় : ও কখনো ছিল না—শম্পাকে নৌকোয় তুলে দেওয়ার পরে একরাশ ধোঁয়ার মতো

নিরস্তিত্ব শূন্যতায় মিলিয়ে গেছে বুঝি। শঙ্খদত্ত শুনেছিল, এক রকমের তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে—সেই অভিচারের নির্ভুল আচরণ করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প-পুরুষ। একটা কবন্ধ দৈত্যের মতো মস্তিষ্কহীন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পশুত্ব সে—তার সাহায্যে যে-কোনো কূট আর ক্রূর কামনার নিরাকৃতি চলে। ওই রাঘবকেও বুঝি তেমনিভাবেই সৃষ্টি করেছিল সে। ও আর কেউ নয়—তারই বীভৎস বাসনার রূপমূর্তি!

নিজের সৃষ্টির কাছে নিজেই হার মেনেছিল শঙ্খদত্ত। তখন আর ফেরবার পথ ছিল না। ওই অন্ধ শক্তিটা যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছিল একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। কিন্তু এখন—

এখন আর শম্পার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার।

শুধু শম্পা নয়—নিজের মনের মুখোমুখিই কি দাঁড়াতে পারে সে? এই জন্যেই কি সে বেরিয়েছিল দক্ষিণ পাটনে—এই কি তার প্রতিশ্রুতি ছিল গুরু সোমদেবের কাছে? দেবতার কাছ থেকে যাত্রার আগে সে যে আশীর্বাদী নিয়েছিল সে কি দেবতার সেবিকাকে হরণ করবার জন্যে?

একবার মনে হয়েছিল—দেবদাসীকে আবার যথা-স্থানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসে সে। কিন্তু তারপর? দেবদাসীকে হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু নিজের আর ফিরে আসা চলে না। রাজার জল্লাদ শুধু খড়্গ দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করবে তাই নয়—তার দেহ হয়তো টুকরো টুকরো করে খেতে দেওয়া হবে কুকুরকে। অথবা, আরো ভয়ঙ্কর—আরো নিষ্ঠুর কোনো শাস্তি—যা তার কল্পনা থেকেও বহুদূরে!

দুদিন শম্পার কাছ থেকে দূরেই পালিয়েছিল সে। কথা বলতে পারেনি, তাকাতে পারেনি মুখের দিকে। প্রথম উত্তেজনার অবসাদ কেটে যেতেই মনে হয়েছে সে অশুচি। দেবতার নৈবেদ্যের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কোথায় তার—শক্তি কই?

তারপর:

তারপর আজ নিজেই কথা বলেছে শম্পা।

—এ তুমি কী করলে শ্রেষ্ঠী?

চারদিকে সমুদ্র না হয়ে সমতল হলে ছুটে পালিয়ে যেত শঙ্খদত্ত। কিন্তু পালাবার যখন উপায় নেই, তখন মরিয়া হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কই?

—দেবতার কাছে অনর্থক ফুরিয়ে যেতে দিইনি তোমাকে। জীবনের প্রয়োজনে উদ্ধার করে এনেছি!

শম্পার গভীর সুন্দর চোখ ঝকঝক করতে লাগল: আমি উদ্ধার হতে চাই কে বলেছিল তোমাকে?

—কেউ বলেনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—আহত নারীত্ব শম্পার চোখের দৃষ্টিতে উগ্র হয়ে উঠল: তোমার দুঃসাহসের সীমা নেই শ্রেষ্ঠী। আমাকে নিয়ে আসোনি—নিজের মৃত্যুকে এনেছ সঙ্গে। যে রাক্ষসটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে—সে রাজার প্রহরীকে গলা টিপে খুন করেছে, তারপর আমার মুখে কাপড় বেঁধে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে। তুমি কি ভেবেছ এতবড় স্পর্ধা রাজা সহ্য করে যাবেন? তাঁর নাবিকের দল এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রে—তাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।

—কিন্তু সমুদ্র বিরাট। বিরাট তার আশ্রয়।

অহমিকায় এবং ক্রোধে ঝল্‌মল্ করে উঠল শম্পার কণ্ঠ: রাজার প্রতাপও সমুদ্রের মতোই বিশাল। কিন্তু তাঁর চাইতেও শক্তিমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কালপুরুষের মতো তাঁর দৃষ্টি—পৃথিবীর যে প্রান্তেই তুমি পালাও সে দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।

—তা হোক। তোমাকে পেয়েছি, সেই অহঙ্কারেই যে-কোনো পরিণামকে আমি স্বীকার করে নিতে পারব।

—কিন্তু আমাকে পেয়েছ, এ অহঙ্কারই বা তোমার এল কোথা থেকে? গায়ের জোরে ছিনিয়ে এনেছ বলেই আমি তোমার কাছে ধরা দেব, এ ধারণা তোমার কী করে জন্মাল?

শম্পার দিকে এবার পূর্ণদৃষ্টি ফেলল শঙ্খদত্ত। শ্বেতপদ্ম নয়—ক্রোধে আর উত্তেজনার উত্তাপে কনক চাঁপার মতো মনে হচ্ছে শম্পার মুখ। আজ আর নীল পাহাড়ের ওপরে রক্ত মেঘের ছায়া পড়েনি; আজ পাহাড়ের চূড়োয় ফুলের কঞ্চুক—একটু বিস্রস্ত—তার ওপরে বাসন্তী রঙের রোদ ঢেউ খেলে চলেছে। শঙ্খগ্রীবা থেকে গলিত স্বর্ণের দুটি ধারা নেমে এসে মিশে গেছে সেই রৌদ্রের ভেতরে।

শঙ্খদত্ত অনুভব করল: মনের একটা অদ্ভুত নথ-দর্পণে সে যেন দেখছে শম্পাকে—সেখানে বার বার রূপান্তর ঘটছে তার। যেন কোনো যাদুকরের কুহকে সেখানে ছায়া-সুন্দরীর মিছিল চলছে। সেখানে নানারূপে নিজেকে প্রকাশ করছে একা শম্পা—কিন্তু এক নয়; সে কখনো সূর্যমুখী, কখনো সন্ধ্যা; কখনো আকাশ—কখনো অরণ্য।

নিজের মোহের জালটাকে জড়িয়ে আনতে একটু সময় লাগল শঙ্খদত্তের।

তারপর কোমল গলায় বললে, সে অপরাধ ক্ষমা করো শম্পা।

—আমি ক্ষমা করবার কে?—শম্পা চোখ ফিরিয়ে নিলে: অপরাধ তোমার দেবতার কাছে। দেবতার দণ্ডই তোমার ওপরে নেমে আসবে।

—আর তুমি?—এতক্ষণে প্রশ্রয়ের আশায় একটু একটু করে লুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল শঙ্খদত্ত: তুমি কি আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেনা?

—দুরাশার মাত্রা বাড়িয়োনা শ্রেষ্ঠী—শম্পার স্বর চাবুকের মতো লিক্ লিক্ করে উঠল: আমি দেবতার। যেদিন থেকে মন্দিরে সেবিকার কাজ নিয়েছি, সেদিনই দেবতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি দেববধূ।

—কিন্তু শম্পা—

—না, কোনো কথা নয়। ভুল মানুষে করে। সর্বনাশা মূঢ়তা জেনেও কেউ কেউ জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। সে দুর্বলতা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন তোমার আছে শ্রেষ্ঠী। এর পরে যে-বন্দরে তোমার বহর ভিড়বে, তুমি সেখানেই নামিয়ে দেবে আমাকে।

শঙ্খদত্ত আবার তাকিয়ে দেখল কনকচাঁপা মুখের দিকে—আবার তার চোখের দৃষ্টি এসে আটকে গেল পাহাড়ের চূড়োর ওপর—বিচিত্র কঞ্চুকে ফুলের সমারোহ যেখানে। হঠাৎ যেন নিজের সম্পর্কে চকিত হয়ে উঠল শম্পা—শঙ্খ-গ্রীবা পর্যন্ত দুলে উঠে এল বাসন্তী রৌদ্রের তরঙ্গ।

—শ্রেষ্ঠী!—শম্পার স্বরে ভর্ৎসনা।

লজ্জিত শঙ্খদত্ত সরিয়ে নিলে চোখ। তারপর কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত ভরে দুজনের ভেতরে সমুদ্রের কলধ্বনি বাজতে লাগল। হঠাৎ শঙ্খদত্তের মনে হল: ওই বিরাট—ওই বিশাল সমুদ্রটাকে এতক্ষণ তারা ভুলে ছিল কী করে?

সমুদ্রের ধ্বনিকে থামিয়ে দিয়ে আবার বেজে উঠল শম্পার কণ্ঠ।

—যে-কোনো বন্দরে, যে-কোনো ঘাটে তুমি আমায় নামিয়ে দাও শ্রেষ্ঠী। আমি আমার দেবতার কাছে ফিরে যাব।

—কিন্তু একটা জিনিস তুমি ভুল করছ শম্পা। পুরীধাম থেকে অনেকখানি পথ আমরা পার হয়ে এসেছি। এখন তোমাকে নামিয়ে দিলেও ফিরে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব?

—তোমার রূপ দেখে লুব্ধ হওয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে আমি একাই নই।

—আমি দেববধূ।—গর্বিত ক্রোধে শম্পার সমস্ত শরীর দীপিত হয়ে উঠল: দেবতাই আমাকে রক্ষা করবেন?

—দেবতা?—মৃদু হাসির রেখা ফুটতে চাইল শঙ্খদত্তের ঠোঁটের কোণায়। নাস্তিক সে নয়—তবু নাস্তিকের মতোই তার মনে হল: দেবতা আজ রূপান্তরিত হয়েছেন দারুব্রহ্মে। মন্দিরের আসনে স্থির-স্থবির তিনি—আশ্রিতকে রক্ষা করার শক্তি নেই তাঁর বজ্র-বাহুতে। যদি থাকত, শম্পাকেও রক্ষা করতেন তিনি। ওই রাক্ষস রাঘব এমন ভাবে দেবতার কাছ থেকে তা হলে ছিনিয়ে আনতে পারত না তাকে। সেই মুহূর্তেই দেবতার অভিশাপ আকাশ থেকে নেমে এসে পুড়িয়ে ছাই করে দিত তাকে।

শঙ্খদত্তের মনের কথা বুঝতে পারল শম্পা? হয়তো খানিকটা বুঝল—হয়তো অনুমান করে নিল খানিকটা।

—হাঁ, দেবতা।—তেমনি গর্বিতভাবেই শম্পা বললে, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তোমাকেও সে-কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই শ্রেষ্ঠী। যদি আমাকে স্পর্শ করার বিন্দুমাত্র দুঃসাহসও তোমার মনে জাগে, তাহলে চারদিকে সমুদ্রে রয়েছে দেবতার কোল—সেইখানেই তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন।

—সমুদ্র? তাই বটে। ইচ্ছে করলেই তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারত শম্পা—শরণ নিতে পারত দেবতার কোলে। কিন্তু সে তো তা নেয়নি। কেন নেয়নি? যে মুহূর্তেই চূড়ান্ত অপমানের মধ্য দিয়ে শঙ্খদত্ত এইভাবে তাকে হরণ করে এনেছে—সেই মুহূর্তেই

তো সে স্বচ্ছন্দে আত্মবিসর্জন করতে পারত। কিন্তু সে করেনি।

কেন করেনি ?

একটা অস্পষ্ট উত্তর চক্‌মকি পাথরের ফুল্‌কির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল শঙ্খদত্তের মনের ওপর। তা হলে কি শম্পা জানে, দেবতা ছাড়াও সে আছে, আছে তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ? সে কি জানে : তার মনকে সে শিখার মতো দেবতার উদ্দেশে জ্বেলে দিলেও তার একটা দেহ আছে—যা মাটির প্রদীপ ? সেই মাটিকে কৃচ্ছ্রের উত্তাপে দগ্ধ করে নিলেও পৃথিবীর ধূলোবালির সঙ্গে মর্মে মর্মে একটা নিগূঢ় যোগ লুকিয়ে আছে তার ?

শম্পা বললে, তুমি এখন আমার সামনে থেকে সরে যাও শ্রেষ্ঠী। তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

শঙ্খদত্ত উঠে পড়ল। কিন্তু হতাশা নিয়ে নয়—ব্যর্থতা নিয়েও নয়। মাটির প্রদীপ। শম্পা জানে সে কথা। সমুদ্রের আহ্বান তার কাছেই তো রয়েছে, তবুও দেবতার ওপরে একান্ত নির্ভর করে সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। শঙ্খদত্তের ভরসা সেইখানেই। দেব মন্দিরের প্রাণহীন গর্ভ গৃহে যে এতদিন পঞ্চপ্রদীপে আরতি করেছে নিজেকে—কোনো বাসর রাত্রির উৎসবেও সে জ্বলে উঠবে না—সে কথা বলা যায় না।

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সমুদ্রের অশ্রান্ত বিক্ষোভকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মল্লিকার পাঁপড়ি ঝরে যাচ্ছে অবিরাম। অসহ্য তৃষ্ণার লবণাক্ত এক জলাভূমি। ল্যাজের ঝাপ্টা দিয়ে মাথা তুলল একটা হাঙর—প্রাণভয়ে ঝট্‌ফট্‌ করে আকাশে উঠে প্রায় একশো হাত দূরে দূরে ছিটকে পড়ল কয়েকটা উড়ন্ত মাছ। কিন্তু ওই হাঙর ছাড়াও আরো কিছু বেশি আছে সমুদ্রে—আছে তার অন্ধকার অতলে চিত্র-প্রবাল, আছে শুক্তির হৃদয়-পুটে মুক্তার দীপাবলী।

কিন্তু সে সন্ধান কি শম্পা পাবে কোনো দিন ? কবেই বা পাবে ?

হিংস্র পশুর মতো মুখের তামাটে দাড়িগুলো মুঠো করে ধরল কোয়েল্‌হো। বললে, এ সহ্য করা যায় না—কিছুতেই না।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস একটা চামড়ার মশক থেকে খানিকটা মদ ঢালল গেলাসে।

—কিন্তু কী করতে চাও ?

—একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার ওই মুরগুলোকে। যেমন-ভাবে আল্‌মীডা একদিন কামানের মুখে ওদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন—ঠিক সেই রকম। রক্ত আর আগুন ছাড়া এদের বুঝিয়ে দেবার উপায় নেই যে বাঘের হাঁয়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বললে, কিন্তু আল্‌বুকার্ক বলেছিলেন, ওই রক্ত আর আগুনের নীতি এদেশে চলবে না। এখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, তাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে—

অধৈর্যভাবে টেবিলে একটা চাপড় বসালো কোয়েল্‌হো। ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল ভুক্তাবশেষ ভোজনপাত্রগুলো।

—ভুল-ভুল করেছেন আল্‌বুকার্ক। সেই ভুলের দাম দিতে হচ্ছে আজ। একটি ক্রীশ্চানের রক্ত ঝরলে তার বিনিময়ে একশো মুরের গর্দান নেওয়া উচিত। বন্ধুত্ব—বিশ্বাস ! সেটা মানুষের সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত বিশ্বাসঘাতক বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে নয়।

গেলাসের জন্যেও আর অপেক্ষা করলে না কোয়েল্‌হো। চামড়ার মশকটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা উগ্র পানীয় ঢেলে দিলে গলায়।

—এই মুরেরা চোট খাওয়া বাঘ। কিউটার যুদ্ধের অপমান ওরা ভোলেনি, ভোলেনি আল্‌হামরার কথা। সুযোগ পেলেই ওরা আমাদের ছোবল দেবে। বন্ধুত্ব পাতিয়ে নয়—তলোয়ার দিয়েই ফয়শালা করতে হবে ওদের সঙ্গে।

—নুনো ডি কুন্‌হা বলেন—এত বড় দেশে ওদের সঙ্গে বিরোধ রেখে আমরা টিকতে পারব না। তা ছাড়া রাজ্য জয় আমরা তো করতেও আসিনি। আমরা চাই বাণিজ্য। বিরোধ করে সে-বাণিজ্য—

—চুলোয় যাক্‌ ডি কুন্‌হা !—কোয়েল্‌হো গর্জন করে উঠল : মরে গেছে হিস্‌পানিয়া, পর্তুগীজ ভুলে গেছে তার শক্তির কথা, ভুলে গেছে মা-মেরীর নাম, ভুলে গেছে আজ লিস্‌বোঁয়াই পৃথিবী শাসন করে। তা নইলে এই হীনতা

কেন? শুধু বাণিজ্য চাইনা আমরা, শুধু মশলা চাইনা—চাই খ্রীষ্টান। সেই খ্রীষ্টান কি হাত বাড়িয়ে ডাকলেই চলে আসবে দলে দলে? নবাবেরা অনুমতি দেবে মস্‌জেদের পাশে পাশে ইগ্রেঝা তুলবার? যা করতে হবে গায়ের জোরেই।

গড়তে হবে সাম্রাজ্য। মাটির ওপরে দখল না থাকলে মানুষের মনের ওপরেও দখল আসবে না।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ চিন্তা করতে লাগল।

কোয়েল্‌হো মত্ত গলায় বললে, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে ওই চাকারিয়াকে আমি শ্মশান করে দিয়ে আসতাম। মানুষ থাকত না—শুধু ছাই উড়ত হাওয়ায়। রক্তে লাল হয়ে যেত নদীর জল। ওই নবাবের মাথাটাকে বল্লমে বিঁধে উপহার নিয়ে যেতাম ডি-কুন্‌হার কাছে। ডি-মেলোর এতক্ষণ যে কী হয়েছে—কে জানে!

—নবাব কখনো ডি-মেলোকে হত্যা করার সাহস পাবে না।

—এই নির্বোধদের কিছু বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌, যদি সত্যিই ডি-মেলোর তেমন কিছু ঘটে, আমি ডি-কুন্‌হার হুকুমের অপেক্ষা রাখব না। দেখব, আমাদের কামান নবাবের তলোয়ার-বন্দুকের চাইতে জোরে কথা বলে কিনা।

সমুদ্রে শীতের জ্যোৎস্না উঠেছে। ম্লান—মৃদু জ্যোৎস্না। পাশের গোল জানলাটা দিয়ে সমুদ্রের দিকে একবার তাকালো ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌। বললে, ওসব কথা ভাবা যাবে পরে। এসো, খেলা যাক খানিকটা।

এক প্যাকেট তাস টেনে বের করলে সে। তারপর গুছিয়ে নিয়ে বাঁটতে আরম্ভ করল।

দুজনের মাঝখানে একটা জোরালো আলো জ্বলছে। দু'জনে হাতে তাস তুলে নিতেই সেই আলো প্রতিফলিত হল তাসের মধ্যে। তখনি দেখা গেল, সাধারণ তাসের চাইতে এরা স্বতন্ত্র, একটু বিশিষ্ট। তাসের বড় বড় বিন্দুর আড়াল থেকে এক একটি করে জল রঙা ছবি ফুটে উঠতে লাগল আলোতে।

সে ছবি আর কিছুই নয়। কতগুলো অশ্লীল রেখা-চিত্র—নানা ভঙ্গিতে দেহ-মিলনের কতগুলো বীভৎস রূপায়ণ। নির্জন সমুদ্রে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে যে-সব মানুষের সমস্ত নীতিবোধ নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়ে শুধু খানিকটা উগ্র পশুত্বই জেগে থাকে, তাদের আত্মতৃপ্তির উপায়ন। নারী-সঙ্গহীন ক্লান্ত দিনযাত্রায় যৎসামান্য সান্ত্বনার উপকরণ।

দুজনের মনেই তীব্র উত্তেজনা সঞ্চিত হয়ে ছিল আগে থেকেই। মদের তীক্ষ্ণ নেশায় সে-উত্তেজনা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তাই খেলার চাইতে ওই জলরঙা ছবিগুলোই যেন বেশি করে আচ্ছন্ন করে ধরতে লাগল দুজনকে। কোয়েল্‌হোর তো কথাই নেই—এমন কি, অপেক্ষাকৃত শান্ত ভ্যাস্‌কন্‌সেলসেরও যেন মনে হতে লাগল: এই মুহূর্তে কিছু একটা করা চাই। কিছু ভয়ঙ্কর—কিছু একটা পৈশাচিক।

—নাঃ, অসম্ভব!

ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠে কোয়েল্‌হো আবার তুলে নিলে মদের মশকটা। ঢক ঢক করে ঢালতে লাগল গলায়। আরো নেশা চাই—আরো।

জানলার ফাঁক দিয়ে আবার দৃষ্টি এবারে চঞ্চল হয়ে উঠল।

—দূরে একটা বহর যাচ্ছে না?

—বহর? কিসের বহর?—রক্ত চোখে জানতে চাইল কোয়েল্‌হো।

অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ প্রসারিত করে—কুঞ্চিত কপালে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস। তারপর বললে, মনে হচ্ছে জেণ্টুদের।

—জেণ্টুদের!—টেবিল ছেড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কোয়েল্‌হো: এখুনি—এই মুহূর্তেই।

—কী এই মুহূর্তেই?—দ্বিধাজড়িত গলায় জানতে চাইল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস।

—লুঠ করতে হবে ওই বহর, পুড়িয়ে দিতে হবে, জ্বালিয়ে দিতে হবে—

উন্মত্তভাবে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো কোয়েল্‌হো।

—কিন্তু শুনো ডি-কুন্‌হা—

—চুলোয় যাক্‌ ডি-কুন্‌হা!—কোয়েল্‌হো ছুটে বেরিয়ে গেল। একটা কাঠের সঙ্গে লেগে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠল তার কোমরের দীর্ঘ বিশাল তলোয়ার।

—ক্যাপিতান!

ভ্যাসকন্‌সেলস বেরিয়ে এল পিছে পিছে। কিন্তু তখন আর সিল্‌ভিরাকে নিবৃত্ত করার সময় ছিল না তার। হয়তো মনের জোরও নয়।

—'Al diablo que te doy—' (শয়তান নিক তোদের) দাঁতে দাঁত চেপে বললে কোয়েল্‌হো!

কামানের গর্জনে রাত্রির সমুদ্র কেঁপে উঠল হঠাৎ। নিরবচ্ছিন্ন অশান্ত ঢেউয়ের দল যেন দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে। দূরের বহর থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

ভীত-বিহ্বল শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল নিজের জাহাজের ওপর। একটা শাদা পতাকা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে উঠল: কেন—কেন তোমরা আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা নিরস্ত্র—আমরা গৌড়ের বণিক—

সে চিৎকার শুনল না কোয়েল্‌হো—শুনতে পেল না তার কামান। পরক্ষণেই আর একটা গোলা এসে জাহাজের অর্ধেক মাথা শুদ্ধ শঙ্খদত্তকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাত্রির কালো শীতল সমুদ্রে। জাহাজ এক দিকে কাত হয়ে পড়ল—ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল সেটা।

সন্ত্রস্ত পশুর মতো জাহাজের কাঁড়ার আর মাল্লারা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জলে। নিক্ষিপ্ত একটা তীরের মতোই দ্রুতগতিতে সমুদ্রের নোনা জলে—মৃত্যুর অতল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে শঙ্খদত্তের শুধু একটা কথাই মনে হল: শম্পা? শম্পার কী হবে?

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র ও রোমান হরফ্

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ 'ভারতবর্ষে'র মাঘ সংখ্যায় "আবার রোমান হরফ্" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালায় রোমান হরফ্ প্রচলনের বিরুদ্ধে যে সকল সদ্‌যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই বোধ হয় সমর্থন লাভ করিবে।

বহুদিন হইতেই বাঙ্গালায় রোমান হরফ্ প্রচলনের প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে উপস্থাপিত হইয়াছে। ৭৪।৭৫ বৎসর পূর্বে 'রোমান অক্ষর সমাজ' নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই সভায় প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে রোমান অক্ষর প্রচলনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

জাতীয়তার পুরোহিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এ সংবাদ বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন।

আমাদের পারিবারিক পাঠাগারে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল প্রেসে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত, জে. এফ. ব্রাউন বি-সি-এস এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ দ্বারা সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী (ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস)' এর একখানি পুস্তক রক্ষিত আছে। উহার নিচোলে মোক্ষমূলরের নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত আছে—"The multiplicity of alphabets the worthless remnant of a by-gone civilization."

বহিখানিতে 'কতলু খানের জন্মদিনে'র একখানি চিত্রও সংযোজিত আছে। ভূমিকায় গ্রন্থের সম্পাদকগণ লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের উদ্দেশ্য দুইটী;—প্রথমতঃ মূল হইতে প্রাচ্য গ্রন্থগুলি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করা যায় কি না; দ্বিতীয়তঃ নির্দেশক চিহ্নের সংখ্যা বহুল-পরিমাণে হ্রাস করা যায় কি না।

তাঁহাদের মতে তাঁহাদের পরীক্ষা সফল হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে কোনরূপ খসড়া প্রস্তুত না করিয়াই রোমান অক্ষরে সমগ্র গ্রন্থখানি কম্পোজিটরদের সাহায্যে মূল বাঙ্গালা হইতে ছাপা হইয়াছে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রেসের অধ্যক্ষ মিঃ ই-জে-ডীন ধন্যবাদার্হ। উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্নগুলি গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত নিয়মানুসারে যৎপরোনাস্তি কম করা হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থখানিই রোমান অক্ষরে মুদ্রণের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান অক্ষরে মুদ্রণের বিপক্ষবাদী ছিলেন না। সেই জন্য সম্পাদকগণ ভূমিকায় বিশেষভাবে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—

"কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার এই সর্ব্বাপেক্ষা জনসমাদৃত উপন্যাসখানি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য আমরা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই খ্যাতনামা গ্রন্থকার রোমান অক্ষর সমাজের সদস্য নহেন, বরঞ্চ তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে অপরের মতের প্রতি যে উদারতা ও অপক্ষপাতিতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই সম্মতিদান করিয়াছেন তাহা দেশীয় সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ের উৎকট রোমান অক্ষর প্রীতির বা উন্মত্ততা সহিত তুলনায় প্রশংসার্হ।"

কারণ বিশ্লেষণ না করিয়া বলিলেও তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্রের মত অনেকেই অনুসরণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গান

হে চিরদিনের দিনের সূর্য
তোমায় প্রণাম করি,
দিবা-বল্লভময় মাধুর্য,
তোমায় প্রণাম করি ;
ভগবান অরবিন্দ অংশুমালী !
তোমারি দিবায় জ্বালি'
প্রণতি শিখার প্রসূন গুচ্ছ,
তোমায় প্রণাম করি।

কথা ঃ নিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II ধা পা মগা | পা মা -া I র্সধা ধা -মা | মা -া মা I
হে চি র০ দি নে র্ দি০ নে র সূ ০ র্য

I সা গা -া | মা র্সা -ধা I ণা ধা -া | -া -া -া I
তো মা য় প্র ণা ম্ ক রি ০ ০ ০ ০

I ধা ধাণ পধা | -ধপা মা মা I গা পা পমা | মগা -রগা সা I
দি বা বল্ ০ ল ভ ম য় মা ধু০ ০ র্য

I সা গা -া | মা পা -রা I গা মা -া | -া -া -া II
তো মা য়্ প্র ণা ম্ ক রি ০ ০ ০ ০

II সা মা মা | -া মা গা I মা -পা পা | পা -া মগা I
ভ গ বা ন্ অ র বি ০ ন্দ অং ০ শু০

I মা ধা -া | -া -া -া I মা ধা ধা | ধা ধা -মা I
মা লী ০ ০ ০ ০ তো মা রি দি বা য়্

I পধা র্সণা -া | -া -া -া I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
জ্বা০ লি ০ ০ ০ ০ প্র ণ তি শি খা র্

I র্সা র্রা র্রা | র্রর্গর্গর্রা -া র্সা I র্রর্সা র্রর্সা -া | ণা ধা -পা I
প্র স্ ণ গু০০ ০ চ্ছ তো০ মা য়্ প্র ণা ম্

I ণা ধা -া | -া -া -া I সা গা -া | মা পা -রা I
ক রি ০ ০ ০ ০ তো মা য়্ প্র ণা ম্

I গা মা -া | -া -া -া IIII
ক রি ০ ০ ০ ০

জিজ্ঞাসা

শ্রীকালিদাস দত্ত

শীতের কুয়াশা শেষ। আকাশ পরীর নীল ডানা
স্বচ্ছ ওড়নার মত নববধূ পৃথিবীর শিরে
নিস্তব্ধে বিকীর্ণ হেথা। রাত্রিযামে অসংখ্য অজানা
নক্ষত্রের কানাকানি হাতছানি সুরু হয় ফিরে।

আবার বসন্ত আসে। শীর্ণবৃক্ষে শ্যামলিমা রেখা,
শাখায় মুকুল ধরে, চোখ মেলে প্রাণগর্ভ কুঁড়ি,
কার্ণিশের ফাটা দেহে নবোদ্গত শিশু পত্রলেখা
উর্দ্ধমুখী হাত ছুঁড়ে প্রস্তুত সে, দেবে হামাগুড়ি।

অনন্তের মানচিত্রে সূক্ষ্ম এক দ্রাঘিমার পাশে
এখানে বিনিদ্র কবি জীবনের পত্রপুটে চায়
বসন্তের পদধ্বনি এখানেও নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শিশুবৃক্ষ, নক্ষত্রের পাশাপাশি যদি শোনা যায়।

এখানে এখনো হায় শীতঋতু। আরো কতকাল
হানাহানি দ্বন্দ্ব দিয়ে বসন্তের রুধিব সকাল ?

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

রম্য-কলায় নারী

কুমারী অনামিকা রায় সাহিত্য-ভারতী

শুনেচি ভারতীয় বিদুষীদের নাকি পুরাকালে চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। বর্তমানে চৌষট্টি না হ'লেও অনেকগুলি কলাই মেয়েরা শিখতে বাধ্য হন তাঁদের অভিভাবকদের তাড়ায়। নচেৎ, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া নাকি অভিভাবকদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। অগত্যা বেশ একটু খরচসাপেক্ষ হ'লেও, মেয়েদের কলেজে পড়ানো, ক্লাসিক ও আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো, সেতার, এস্‌রাজ, গীটার,স্বরোদ, বীণা, সুরবাহার, পিয়ানো, হার্মোনিয়ম বা বেহালা—কোনও একটা বাজনা শেখা, কেউ কেউ তবলাও বাজান দেখি। আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, মূর্তি-শিল্প ইত্যাদিও সযত্নে শেখানো হয়। রঞ্জন, আলিম্পন, সেলাই, বোনা, আচার, জাম, জেলি, বড়ি, আমসত্ব, খাবার—এসব তো তাদের গৃহশিক্ষার মধ্যেই। এ ছাড়া, বারব্রত, ইতু, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মাকাল, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি পূজাপার্বণ, যোগে যাগে গঙ্গাস্নান, তীর্থ-ভ্রমণ ও পারিবারিক ধর্ম-কর্ম্ম তো আছেই! সুতরাং এযুগের মেয়েদেরও কলানৈপুণ্যে সুদক্ষ হ'য়ে উঠবার দায়িত্ব বড় কম নয়।

কিন্তু, উচ্চশিক্ষিতা, বিবিধ ললিতকলায় নিপুণা ও শিল্প কর্মে সুদক্ষা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ের যখন বিবাহ দিই, তখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে কেবলমাত্র পাত্রটিরই বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর। অর্থাৎ, ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত কিনা, সচ্চরিত্র কিনা, পাঁচশো থেকে হাজার বা তদূর্ধ আয় কিনা ও উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটা? স্বাস্থ্য ভাল হয় —ভাল, মাঝারি হ'লেও আপত্তি নেই। বাড়ী ও গাড়ী থাকলেই হ'ল। পাত্রের পিতা যদি খ্যাতনামা বা ধনবান হ'ন সেটা মেয়ের অতিরিক্ত সৌভাগ্য বলেই গণ্য হবে। কিন্তু, আমরা অনেক সময় দেখিনা যে, মেয়েটি যে-বাড়ীর বউ হ'য়ে যাচ্ছে, সে বাড়ীর অন্তঃপুরের আবহাওয়া কি রকম? সেখানে সঙ্গীত, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির সমাদর আছে কিনা? অথবা, ভদ্র গৃহস্থঘরের বধূর পক্ষে এ সকল সে পরিবারে পণ্যা-নারীজনোচিত অবিদ্যা জ্ঞানে নিষিদ্ধ ও বর্জিত কিনা। আমার বিশ্বাস, অনেকেরই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মেয়ে বাপের বাড়ী এসে বলে—গান ভুলে গেছি, গলা আর নেই। কারণ, তার শ্বশুর বাড়ীতে বধূর পক্ষে গান গাওয়া নাকি মস্ত বড় একটা অপরাধ! বিশেষতঃ, যে বউটির স্বামী-গৃহে পূজ্যপাদ শ্বশুর, ভাশুর বিদ্যমান এবং অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ী অথবা বয়োজ্যেষ্ঠা জা-ননদেরা কর্ত্রী—সেখানে গুণ গুণ স্বরে রামায়ণ গান বা হরিগুণ-গান ছাড়া আর কোনও গানকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়না।

বিবাহের পর মাত্র সাত আট দিন সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁরা যে কতগুণের বউ এনেছেন সেটা দেখাবার জন্য যখন তখন নববধুকে ফরমাস করা হয়—'বউমা, "বাজনা বাক্সটা" বার করে একটা গান গেয়ে তোমার মাস-শাশুড়ীকে শুনিয়ে দাওতো।' ইনি, 'হারমোনিয়মকে' 'বাজনা-বাক্স' বলেন কারণ, তাঁর শাশুড়ীর নাম নাকি "হরমণি!" কিংবা বলেন—একটু সেতার বাজিয়ে তোমার মামী শাশুড়ীকে শুনিয়ে দাওনা—আবৃত্তি শোনাবার অনুরোধও তার মধ্যে থাকে। কিন্তু, 'বৌমা! দু'কদম নেচে দেখিয়ে দাও তো' বাছা', এ বলবার কল্পনাও তাঁরা বিয়ের আটদিনের মধ্যেও কল্পনা করতে পারেন না। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ পরিবারেরা বরং অনেক বেশি উদার। পশ্চিম বঙ্গের অভিজাত বনিয়াদি ঘরে এসব ঘোরতর অনাচার বা অতি-আধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খলতা বলেই গণ্য হয়। ফলে, বিবাহের

পর বছর ছুই যেতে না যেতেই দেখা যায় একসময়ে যে বিদুষী ও কলাবতী মেয়েটি ছিল পরিবারের গর্ব ও গৌরব স্বরূপ এবং পল্লীর সর্বজনপ্রিয় ছুহিতা, তার শিল্পী-জীবনের অকালমৃত্যু ঘটেছে। সে আজ তার শিশু বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে এবং শ্বশুরবাড়ীর সংসারের রান্না ভাঁড়ার ইত্যাদি কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে দেওয়ালে ঝুলানো গেলাব ঢাকা সেতারের ছেঁড়া তারে মরচে ধরচে। হারমোনিয়মের মধ্যে নেংটি ইঁদুরের বাসা হয়েছে। গান গাইবারও সময় নেই, বাজনা বাজাবারও ফুরসুৎ নেই! অথচ বিবাহের আগে মেয়েকে এই ললিত কলা শেখাবার জন্য পিতামাতার কত টাকাই না অপব্যয় হয়। তাব'লে আমি বলছিনা যে আমাদের এসব শেখানো বন্ধ করা হোক।

অবশ্য, মেয়েদের এই রম্যকলা শিক্ষা যে সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়, ত' নয়। অবস্থা বিপর্যয়ে আর্থিক অনটন উপস্থিত হ'লে অনেক সময় তাঁরা গান বাজ্‌না শেখাবার জন্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। রূপালী পর্দার কল্যাণে একাধিক সুকণ্ঠী গায়িকা 'প্লে-ব্যাক্' সঙ্গীতে বেশ মোটা টাকা উপার্জন করেন। সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতিতেও অনেকে গীত বাদ্যে তাঁদের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সম্মানিত হ'ন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা ক'জন? অধিকাংশ মেয়েরই কুমারী জীবনের এই অতিব্যয় ও আয়াস-লব্ধ নৃত্য গীত বা বাদ্যযন্ত্র বাজাবার বিদ্যা উত্তর জীবনে কোনও কাজে আসেনা। এর প্রধান কারণ সংসারে ও সমাজে আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের বিশেষ কোনও স্থান নেই। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত মেয়েরাই সৌভাগ্য বশে তাঁদের পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অনুগামী স্বামীর ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে পরবর্তী জীবনেও এই সব কলা চর্চার সুযোগ পান। কারণ, তাঁদের বয়, বাবুর্চি, খানসামা আছে, রান্না ভাঁড়ার দেখতে হয় না। তাঁদের অধিকাংশ সময় কাটে ড্রয়িংরুমের আড্ডায়, পিয়ানোর ধারে, ক্লাবে, খেলাধূলায়, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, নাচের মজলিশে, সখের থিয়েটারে আর মেট্রো, লাইট হাউসে।

এতকথা বলার উদ্দেশ্য 'গরীবের ঘোড়ারোগ' নিবারণের জন্য। মেয়ে নিজে থেকে সখ করে যেটুকু শিখতে চায় সেটাতে উৎসাহ দেওয়া উচিত; তা'বলে পাশের বাড়ীর ব্যারিষ্টারের মেয়ে 'নেলী' 'পলির' দেখা-দেখি গৃহস্থের মেয়েও যদি উগ্র মেমসাহেব বা 'মিসি বাবা' হ'য়ে উঠতে চায় সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে বলে মনে করি না। সে যে-বাড়ীর মেয়ে, যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ, তার অধিকাংশ আত্মীয় কুটুম্ব যে চালে থাকেন, তাকে সেই ভাবেই মানুষ হ'তে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে হয়। কারণ, সে মেয়ের বিবাহ অনুরূপ ঘরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যদিনা মেয়েটি অসাধারণ রূপসী হ'ন। যদি সে সৌভাগ্যবশে বড় ঘরে পড়ে, যাদের চাল-চলন অন্যরকম, তবে, সে মেয়ে শীঘ্রই নিজেকে তাদেরই মতো একজন করে গড়ে তুলতে পারে এও দেখেচি। অর্থের প্রাচুর্য এখানে অঘটন ঘটাতে পারে। কিন্তু, স্বল্পবিত্ত ঘরে তা হয় না।

একটি গল্পে ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। আমাদের খুব জানাশোনা একটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাপ উচ্চ-শিক্ষিত, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। উপার্জন মাঝা-মাঝি। নিজেদের মাথা গুঁজে থাকবার একখানি বাড়ী আছে বলে সংসার ছিল সচ্ছল। মা অল্প-শিক্ষিতা। ছুটি মেয়ে। বড় মেয়েটির লেখাপড়া শেখবার ঝোঁক ভীষণ। ছোট মেয়েটি সে ধার দিয়েও যেতে চায় না। কোনও রকমে বাপের তদ্বিরে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ ক'রে, বার-ছুই আই-এ ফেল হ'য়ে বাড়ীতে মায়ের সংসারে শিক্ষানবিশী করছে। বড় মেয়ে এগিয়ে চলেচে প্রত্যেক-বারে ষ্ট্যাণ্ড ক'রে, স্কলারশিপ নিয়ে, মেডেল নিয়ে, ধাপের পর ধাপ উচ্চ শিক্ষার দিকে। মা' অস্থির হয়ে উঠচেন মেয়েদের বিবাহ দেবার জন্য। "বুড়ো বুড়ো মেয়ে ক'রে ঘরে পুরে রেখেছো, ওদের কি আর কেউ নেবে?" ইত্যাদি, পিতার লাঞ্ছনার শেষ নেই। বড় মেয়ে শুধু বিদুষী নয়, বুদ্ধিমতীও খুব। বিবাহে সে সম্মতি দিলে। বড় পার না-হ'লে ছোটর বাধা যায় না। বড় মেয়ে ও বাপ ছোটকে আগে পার করতে রাজী হ'লেও, মা বলেন—সে আমি পারবো না। বড়কে থুবড়ি ক'রে রেখে ছোটকে বিয়ে দিলে—লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন ক'রে। ছি ছি ছি, তা কখনো হ'তে পারে না। পালের গোদাকে আগে বিদায় করো। অগত্যা বড় মেয়ের পাত্র সন্ধান শুরু হ'ল।

এলো একটি পাত্র বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজে মেয়ে দেখতে। পাত্র এম-এ, পি-আর-এস্ পাশ ক'রে প্রোফেসারিতে ঢুকেছেন। ডক্টরেট দেবার জন্য থীসিস্ লিখছেন। উচ্চতর

শিক্ষার জন্য সাগর পাড়ি দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সেরকম অর্থ সামর্থ্য নেই। কাজেই শ্বশুরের পয়সায় যাবার চেষ্টা করছেন, অথচ রূপসী বিদূষীভার্যা চাই। বড় মেয়ে লেখাপড়াতেও যেমন ভাল, দেখতেও সুন্দরী। পাড়ার মেয়েরা তাকে 'সাক্ষাৎ সরস্বতী ঠাকরুণ' বলেন। মা বলেন—'শ্বেতহস্তী'!

মেয়ে দেখতে এসে পাত্রের বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভাল গাইতে পারেন, না ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের পক্ষপাতী? কেউ জানতে চাইচেন, উদয়শঙ্করের নাচ আপনার কেমন লাগে? আপনি 'কথাকালি' না 'মণিপুরী' কোন নাচটাতে বেশি সুদক্ষ? একজন জিজ্ঞাসা করলেন—অভিনয় বা আবৃত্তি টাবৃত্তি আপনার আসে?

মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। কিন্তু, আর তার পক্ষে চুপ ক'রে থাকা সম্ভব হল না। মেয়েটি প্রথমেই জানতে চাইলে, আপনাদের মধ্যে পাত্র কোনজন? তাঁকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তারপর আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

সবাই এক সঙ্গে একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে সমস্বরে বললেন "ইনিই পাত্র?" মেয়েটি তাঁকে একটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে বললে—দেখুন, আমরা প্রথমেই আমাদের হিন্দু, বিবাহের সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করলুম, অর্থাৎ বিবাহ বাসরে বরণের পর আমাদের শুভদৃষ্টি রূপ রোম্যান্স-টুকু থেকে আমরা বঞ্চিত হলুম। যাক, তার জন্য দুঃখ নেই, কিন্তু, আপনি বিবাহ ক'রে আপনার গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পত্নীকে নিয়ে যেতে চান, না আপনার উদ্দেশ্য অন্য কিছু? আমি শুনেছিলুম আপনি একজন অধ্যাপক, কিন্তু আপনার সঙ্গীদের প্রশ্ন শুনে মনে হ'চ্ছে আপনি কোনও চলচ্চিত্র-পরিচালক! আপনারা সদলবলে নূতন একটি সিনেমা তারের সন্ধানে বেরিয়েচেন বলে সন্দেহ করচি। যে নাচতে জানে, গাইতে জানে, বাজাতেও পারে, অভিনয় ও আবৃত্তিতেও সুনিপুণা—এমন একটি মেয়ে আপনাদের দরকার আমি বুঝতে পেরেচি, কিন্তু আপনারা ভুল ক'রে ভদ্রপল্লীতে এসে পড়েচেন।

পাত্রটি একটু বিনীতভাবে বললে—"না না, তা' নয়। আপনি অন্যায় রাগ করচেন। আমি চাই আমার বিবাহিতা পত্নী যেন সর্বগুণসম্পন্না হন। এটা কি অপরাধ?"

মেয়েটি বললে, "দেখুন, আমি যদি 'শ্বেতহস্তী' সংগ্রহ করতে চাই; তা'হ'লে আমার বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত নয় কি যে আমার হাতী পোষবার ক্ষমতা আছে কিনা? জানেন ত' শ্বেতহস্তীর কাছে কোনও কাজ পাওয়া যায় না? অনুগ্রহ ক'রে আমার গুটিকয়েক প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? প্রশ্ন কটু হ'লে কিছু মনে করবেন না।"

বলুন।

কলেজের মাইনে ছাড়া আপনার আর কিছু অতিরিক্ত আয় আছে কি?

না।

চাকরি গেলে দু' চার মাস বসে খাবার মতো কিছু সংস্থান আছে?

না।

আপনাদের বাড়ীতে পিয়ানো, হার্মোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, সেতার প্রভৃতি কোনও বাদ্য-যন্ত্রের অস্তিত্ব আছে?

না।

আপনি আপনার স্ত্রীর যে-সব কলানৈপুণ্যে অধিকার থাকা প্রয়োজনে মনে করেন, সেই সকল বিদ্যা কি আপনার পরিবারস্থ মেয়েদের শিক্ষা দিয়েচেন? তাঁরাও কি সকলে সর্বগুণান্বিতা?

না।

আপনার দু'টি বিবাহিত বড় ভাই আছেন শুনেছি। তাঁদের পত্নীরা-কি এ সকল বিদ্যায় সুনিপুণা?

না।

আপনি যে মাসিক তিনশ টাকা বেতন পান সেটা কি ভাবে খরচ করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সংসার খরচ ও বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে দু'শো টাকা মা চেয়ে নেন। বাকি একশ টাকায় আমার কলেজ যাতায়াতের রাহাখরচ, বই কেনা, টিফিন, সিগারেট-চা, ছুটিতে বাইরে বেড়িয়ে আসা এবং আমোদ-প্রমোদে ব্যয় হ'য়ে যায়। কিছুই জমাতে পারিনি।

আপনার সত্যভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অযাচিত উপদেশ কাউকে দিতে নেই জানি, তবু আপনাকে আমি

পরামর্শ দিই, আপনি একটি অল্প লেখাপড়া জানা গাঁয়ের মেয়ে বিবাহ ক'রে আনুন যে আপনাকে দু'বেলা রেঁধে খাওয়াতে পারবে। আপনার ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারবে, আপনার রোগে সেবা করতে পারবে! আপনার ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে পারবে। অনুগ্রহ ক'রে সিনেমা-স্টার খুঁজবেন না। হাতী পোষবার ক্ষমতা আপনার নেই এটা মনে রাখবেন।

মেয়েটি আবার একটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে উঠে গেল! অপরিসীম লজ্জায় ছেলেটির যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল।

আপনারা শুনে সুখী হবেন, শেষ পর্য্যন্ত এই মেয়েটির সঙ্গেই ছেলেটির বিবাহ হ'য়েছিল—এই সর্ত্তে যে মেয়েটিকে পড়াশুনো করতে দেওয়া হবে এবং সংসারের প্রয়োজনে অর্থোপার্জনের আবশ্যক বোধ হলে তাকেও কাজ ক'রতে দেওয়া হবে। মেয়েটি উচ্চসম্মানের সঙ্গে এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'য়ে বেরুবার পরেই একটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ছেলেটিও পি-এইচ্-ডির প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন ক'রে শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসেন এবং মাসিক আটশত টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এতো সচরাচর হয় না!

ভারতীয়া নারী—যুগে যুগে

শ্রীসুখলতা রাও বি-এ

ভারতের বিভিন্ন যুগের নারীচরিত্র স্বীয় মহিমায় আজও অমর হ'য়ে আছে—মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রছে, এনেছে নবজাগরণ ও প্রেরণা। শ্রদ্ধানম্র চিত্তে আজ তাঁদের স্মরণ করি।

বেদ ও উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের নবযুগ পর্য্যন্ত আলোচনা করলে জ্ঞানে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যে উন্নত চরিত্রে মহিমান্বিত বহু নারীচরিত্র সম্ভ্রম উদ্রেক করে।

বেদ উপনিষদের যুগে নারীচরিত্র অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল। সমাজেও তাঁদের স্থান অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। তাঁদের শিক্ষার প্রধান আদর্শ ছিল পরমতত্ত্ব লাভ ও আত্মোপলব্ধি। সেই যুগে মহীয়সী গার্গী ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হ'তো, তা সত্যই বিস্ময়কর!

আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মহিমান্বিতা, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠা গার্গী ভারতীয়া নারীর শীর্ষস্থানীয়ারূপে বন্দনীয়া।

সে যুগের আর একজন তপস্বিনী নারী মৈত্রেয়ী স্বামী-প্রদত্ত সকল পার্থিব ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে ব'লেছিলেন, "যেনাহং নামৃতাস্যাং, তেনাহং কিং কুর্য্যাম্"। আত্মার অন্তরতমলোক হ'তে উত্থিত এই শাশ্বত জিজ্ঞাসা-ত্যাগী ও বৈরাগী মানব-মনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

এম্নি আরো কত বিদুষী, কত ত্যাগী, কত জ্ঞানী ও তপস্বিনী নারী সে যুগে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। নানাবিধ ললিত-কলাতেও আমাদের সে যুগের নারীগণ পারদর্শিতা লাভ ক'রেছিলেন। সকল প্রকার শিক্ষা লাভেই তাঁদের পূর্ণ অধিকার ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের নারীগণও নানা বিষয়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী সীতাদেবীর ত্যাগের আদর্শ, দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা সে যুগের নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা"

'পূজনীয়াঃ মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়"—

ইত্যাদি শ্লোকে সে যুগের নারীর প্রতি সম্মান সূচিত হয়।

সুপণ্ডিতা খনা ও লীলাবতীর গভীর জ্ঞানানুশীলন আজও সর্ব্বজনের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপরায়ণা সেবিকা 'শ্রীমতী' রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্র সাধন ক'রতে ক'রতে আপন জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। রাজকন্যা 'সঙ্ঘমিত্রা' সকল সুখভোগ তুচ্ছ ক'রে ধর্ম্মপ্রচারার্থ দেশ-দেশান্তরে গমন ক'রেছিলেন।

মোগল যুগে সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান রাষ্ট্রপরিচালনায় সুদক্ষ

ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিশক্তি দ্বারা সম্রাটকে তিনি প্রভাবান্বিত ক'রেছিলেন।

রাজপুত রমণীদের আপন মর্য্যাদা রক্ষার্থে 'জহর ব্রত' ও নানা বীরত্ব গাঁথা সমগ্র ভারতের অপূর্ব্ব সামগ্রী হ'য়ে আছে।

ভারতীয়া নারীর কীর্ত্তিগাথা রাণী দুর্গাবতী, রাণী ভবানী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই'র কাহিনীগুলিতে বর্ণিত হ'য়েছে।

সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পকলা—এমন কি অস্ত্র-বিদ্যায়ও সেকালের নারীগণ পারদর্শিনী ছিলেন।

রাজকন্যা, রাজবধূ হ'য়েও ভক্তিমতী মীরাবাই সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে ঈশ্বর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন।

এম্‌নি গত যুগের কত মহিমান্বিত জীবন আমাদের আগামী দিনের চলার পথে অনির্ব্বাণ আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে 'ঝাঁসির রাণী-বাহিনীরূপে শত শত ভারতীয়া নারী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন।

আজ নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের নারীগণও বিবিধ ক্ষেত্রে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দেশপ্রীতি ও কর্ত্তব্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে দেশবরেণ্যা সরোজিনী নাইডু প্রথম মহিলা শাসনকর্ত্তারূপে একটি প্রদেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। তিনি সুশিক্ষিতা, কবি ও বাগ্মী ছিলেন। দেশের কাজ তার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর তিরোধানে দেশ আজ ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশের কাজে আজীবন ব্রতী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আপন যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা গুণে দেশবিদেশে সকলের সম্মানিতা হ'য়েছেন। তাঁর গৌরবে সকল ভারতীয় নারী গৌরবান্বিতা।

এই প্রকার বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিতা ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ত্যাগ ও নিষ্ঠা বিভিন্ন যুগের রক্তধারায় প্রবাহিত হ'য়ে একটি সুমহান যোগ স্থাপন ক'রেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জনসেবায় উৎসর্গীকৃত নারীর জীবন ভারতের বহু স্থানে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ নারীর অন্তরের কথা কয়েকটি ছত্রে প্রকাশ করেছেন—

"হে বিধাতা আমারে রেখোনা বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের পরে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে।
নির্ঝরিত স্রোতে।"

সেই অনির্ব্বাণ আলোকের পথে—নবভারতের কল্যাণময় কাজে ব্রতী হোক্ বর্ত্তমান ও আগামী দিনের নারী। ভারতের নারীর ঐতিহ্য ও সাধনা সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করুক্—ইহাই ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

উলের প্যাটার্ণ

কুমারী সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়

পাতা প্যাটার্ণ—

এই পাট্যার্ণটি করিতে ১৬ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হইবে।

১ম লাইন—২ উল্টা, সামনে সূতা ১ সোজা, ৪ সোজা, ১ জোড়া (২ বার) ৪ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা।

২য় লাইন—সব উল্টা।

৩য় লাইন—২ উল্টা, ১ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ৩ সোজা, (২ বার) ৩ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ১ সোজা।

৪র্থ লাইন—সব উল্টা।

৫ম লাইন—২ উল্ট', ২ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ২ সোজা, ১ জোড়া (২ বার) ২ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ২ সোজা।

৬ষ্ঠ লাইন—সব উল্টা।

৭ম লাইন—২ উল্টা, ৩ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ১ সোজা, ১ জোড়া (২ বার) ১ সোজা, সামনে সূতা ১ সোজা, ৩ সোজা।

৮ম লাইন—সব উল্টা।

গুটি পোকা—

এই প্যাটার্ণটি করিতে ৬ ঘর হিসাবে. ঘর লইয়া শেষে ৫ ঘর বেশী লইতে হইবে।

১ম লাইন—২ উল্টা,* ১ সোজা, ৫ উল্টা,* শেষে ১ সোজা, ২ উল্টা।

২য় লাইন—২ সোজা,* ১ উল্টা, ৫ সোজা,* শেষে ১ উল্টা, ২ সোজা।

৩য় লাইন—প্রথম লাইনের মতন করিতে হইবে।

৪র্থ লাইন—দ্বিতীয় লাইনের মতন করিতে হইবে।

৫ম লাইন—প্রথম লাইনের মতন করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ লাইন—দ্বিতীয় লাইনের মতন করিতে হইবে।

৭ম লাইন - *৫ উল্টা, ১ সোজা,* শেষে ৫ উল্টা।

৮ম লাইন—*৫ সোজা, ১ উল্টা,* শেষে ৫ সোজা।

৯ম লাইন—৭ম লাইনের মতন করিতে হইবে।

১০ম লাইন—৮ম লাইনের মতন করিতে হইবে।

১১শ লাইন—পুনরায় ৭ম লাইনের মতন করিতে হইবে।

১২শ লাইন—পুনরায় ৮ম লাইনের মতন করিতে হইবে।

প্রথম প্যাটার্ণটি ব্লাউজে এবং দ্বিতীয়টি সোয়েটারে করিলে দেখিতে ভাল হয়।

[আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিতা মহিলাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাঁরা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই "মেয়েদের কথা" বিভাগে এই লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আলোচনা সঙ্গত মনে হলে সাদরে পত্রস্থ করা হবে। রচনা পাঠাবার সময় উপরে "মেয়েদের কথা" লিখতে ভুলবেন না। রচনা যথাসম্ভব ছোট করে লিখে পাঠাবেন।] (ভাঃ সঃ)

* * *

১। এ দেশের মেয়েদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক যে সব অভাব অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও উন্নতির উপায় নির্দেশ।

২। এ দেশের মেয়েদের বিবিধ অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে যে সব আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত তার আলোচনা এবং মেয়েদের স্বার্থের বিরোধী যে সব আইন-কানুন আছে তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

৩। ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে নারীর অধিকার-রক্ষা ও স্বার্থের অনুকূল কি কি বিধিবিধান প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৪। পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তার যথাসম্ভব খবর।

৫। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং শিল্পকলা প্রভৃতির পরিচয়।

৬। মাতৃত্ব, শিশুমঙ্গল, শিশু-শিক্ষা, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনা।

৭। সমাজ সেবা ও নারী কল্যাণ (Social service & Womens welfare) সংক্রান্ত কাজ কর্মের বিবরণ।

৮। সংসার, পরিবার ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা।

৯। মেয়েরা কোথায় কোন্ বিষয়ে কি কৃতিত্ব প্রদর্শন করে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের বিবরণ, (সম্ভব হলে সচিত্র) [খেলাধূলা, নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ও এর অন্তর্গত]।

১০। মেয়েদের উন্নতি ও প্রগতি সম্বন্ধে অল্প কথায় লেখা প্রস্তাবাদি গ্রাহ্য হবে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুরঙ্গমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—চার্ব্বাক খড়ের গাদার উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

"নেমে পড়লেন কেন"

"তোমরা কি কথা বলছ তা শোনবার জন্যে। কুলিশ-পাণি এসেছিল, না ?

"হ্যাঁ। ওর প্রস্তাব শুনলেন তো"

"শুনেছি"

"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বক্তব্যটাও শুনব"

চার্ব্বাক নীরবে তবু দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোনও কথা জোগাইল না।

"আমার বক্তব্য তো তোমাকে বলেছি। আমি তোমাকে চাই"

"আমাকে অনেকেই চেয়েছে, এখনও অনেকেই চায়। তাই আমি ঠিক করেছি—সর্ব্বোচ্চ মূল্য যে দেবে তার কাছেই যাব আমি—"

"কুলিশপাণি তোমাকে যে মূল্য দিতে চাইছে তা কি তোমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না ?"

"তার আগে একটা প্রশ্ন আপনাকে করি। আমি যদি কুলিশপাণির সঙ্গে চলে' যাই তাহলে কি আপনি খুশী হবেন ?"

"না"

"কেন, হওয়া তো উচিত। কুলিশপাণিও আমাকে বাঁচাতে চাইছেন। আমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য তাঁর আছে। আপনিও তো বললেন—আমাকে এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আপনি এসেছেন এখানে। কিন্তু ওঁর মতো সামর্থ্য আপনার নেই। আমাকে বাঁচানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কুলিশপাণির সঙ্গে যেতে দিতে আপত্তি কি ?"

সুরঙ্গমার নয়নে অধরে যে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল অন্ধকারে চার্ব্বাক তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে সে হাসির তরঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাতে চার্ব্বাক বুঝিতে পারিল—সুরঙ্গমা ব্যঙ্গ করিতেছে।

"আপত্তি কি তা কি বুঝতে পার নি এখনও ? আমি অসহায়, আমাকে ব্যঙ্গ কোরো না সুরঙ্গমা"

"আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে ব্যঙ্গ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই মহর্ষি। আপনি নিজেকে 'অসহায় বলে' বর্ণনা করছেন কেন। আপনার অসহায় অবস্থা কি আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল ?"

"বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"আপনি কি অনুকম্পা চান ? অসহায় মানুষকে দেখে লোকের মনে অনুকম্পা জাগে, প্রেম জাগে না"

"প্রেমই আমাকে অসহায় করেছে সুরঙ্গমা"

"আমি যতটুকু বুঝি—প্রেম মানুষকে অসহায় করে না, শক্তিমান করে। প্রেমে পড়লে মানুষ সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন কি জীবনকেও। আমি সুন্দরানন্দকে ভালবাসি বলেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আপনি অসহায় এ বোধ সত্যিই যদি আপনার মনে জেগে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আপনি প্রেম নয়—অন্য কোন কিছুর প্রকোপে পড়েচেন"

"আমি তোমার প্রেমেই পড়েছি সুরঙ্গমা। কিন্তু বুঝতে পারছি না—কি করে' সেটা প্রমাণ করব তোমার কাছে, তাই অসহায় বোধ করছি"

"মহর্ষি আপনার মতো পণ্ডিতের নিশ্চয়ই একথা জানা আছে যে একটিমাত্র কষ্টিপাথরেই প্রেমের যাচাই হ'তে পারে এবং তা সকলেরই আয়ত্তাধীন"

"কি সে কষ্টিপাথর"

"ত্যাগ"

"কিন্তু ত্যাগ করবার মতো আমার তো কিছুই নেই।

সুন্দরানন্দ বা কুলিশপাণির ত্যাগ করবার মতো অর্থ আছে, কিন্তু আমি দরিদ্র"

"কিন্তু যে জিনিস সকলেরই আছে তা আপনারও আছে, তার তুলনায় অর্থ অকিঞ্চিৎকর"

"কি সে জিনিস"

"আপনার প্রাণ, আপনার জীবন"

"আমাকে প্রাণ-ত্যাগ করতে বলছ? আমি মরে' গেলে তোমাকে পাব কি করে'? মরে গেলে তো সব শেষ হয়ে গেল—"

"আমাদের এই ধারণা আছে বলেই তো প্রাণত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ"

চার্ব্বাক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমাকে ভুল বুঝো না সুরঙ্গমা। আমি প্রাণত্যাগ করতে ভীত নই, প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই আমি তোমার সন্ধানে এসেছি। কিন্তু আমি ইহলোককেই বিশ্বাস করি, পরলোকে আমার আস্থা নেই। আমি ইহজীবনেই তোমাকে পেতে উৎসুক, প্রাণত্যাগ করেও তোমাকে ইহজীবনে পাবার সম্ভাবনা যদি থাকত, মানে—এ অসম্ভব যদি সম্ভব হ'ত, তাহলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করতাম। তোমাকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে' এখানে এসেছি"

"কিন্তু আমাকে পেতে হলে এখানে এলেই শুধু হবে না, মূল্য দিতে হবে—"

"যে মূল্য আমার কাছে তুমি দাবী করছ, কুমার সুন্দরানন্দের কাছে তা কি দাবী করেছ কখনও?"

"দাবী করবার দরকার হয় নি। আমার সুখের জন্য আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় অনেকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। এই সেদিনই তিনি আমাকে জীবন্ত কস্তুরী-মৃগ স্বহস্তে ধরে' দেবেন বলে' গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি আছে জেনেও প্রবেশ করেছিলেন, যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে এ আশঙ্কা তাঁকে নিবৃত্ত করেনি—"

"আমারও তো যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে তবু আমি তোমার জন্যে এসেছি—"

"আপনি এসেছেন নিজের স্বার্থে। আমার সুখের জন্য নয়, নিজের সুখের আশায়—"

"তুমি যদি একান্তভাবে আমার হও তাহলে আমিও বারম্বার আমার জন্য জীবন বিপন্ন করে কৃতার্থ হব। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, চল আমার সঙ্গে—পরীক্ষা করে' দেখ"

"ক্ষমা করবেন মহর্ষি, মূল্য না পেলে আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু যে মূল্য তুমি চাইছ, তা আমি দেবই বা কি করে? আত্মহত্যা করব?"

"আপনি আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ পেলেই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হব—"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল।

সুরঙ্গমা বলিল, "প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেই সব সময় প্রাণ যায় না। যুদ্ধে সব সৈন্যই মরে না। আপনিও হয়তো বেঁচে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ চাই"

"আমার মুখের কথায় তোমার সংশয় যদি না ঘোচে কি করে' ঘুচবে, বল—"

"এই যজ্ঞে আপনি আত্মাহুতি দিতে রাজী আছেন? যদি রাজী থাকেন, আমি বেঁচে যেতে পারি! মহর্ষি পর্ব্বত না কি বলেছেন আমার বদলে অন্য কেউ যদি আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয় আমাকে তিনি ছেড়ে দেবেন"

"কিন্তু তুমি তো বলছ স্বেচ্ছায় তুমি যজ্ঞের বলি হয়েছ"

"হয়েছি। কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত যদি আমাকে মনোনীত না করেন, তা হলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা"

"মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে মনোনীত করবেন?"

"না-ও করতে পারেন। যদি না করেন আপনি বেঁচে যাবেন"

"যদি বেঁচে যাই তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে?"

"আসব"

"কুমার তোমাকে ছেড়ে দেবেন?"

"দেবেন। তিনি আমার কোন কাজেই বাধা দেন না কখনও"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। তাহার মনে হইল যজ্ঞীয় পশুর যে সব খুঁত থাকিলে তাহা যজ্ঞীয় পশু-

রূপে নির্ব্বাচিত হয় না, সে সব খুঁত তাহার শরীরে আছে। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহর্ষি পর্ব্বত যজ্ঞের বলি হিসাবে তাহাকে নির্ব্বাচন করিবে না। কিন্তু মুশকিল হইবে ধারামতীর ব্যাপারটার জন্য।

"তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছি! এ সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কেবল তোমার জন্যে আমি এতে রাজী হচ্ছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি গোপনে দেখা করতে চাই একবার, ধারামতীর সম্পর্কে আমার নামে যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব একটু। আমার বিশ্বাস সব শুনলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল।

"কুমারকে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। কুমারকে যা বলতে চান তা আমাকেও বলতে পারেন, আমি কুমারকে গিয়ে তা এখনই জানিয়েও দিতে পারি"

"আমি কুমারকে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ধারামতী নিজে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। কিছুদিন পরে অনিবার্য্যভাবে যা ঘটল তার জন্যে আমি তাকে বিবাহও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে সে রাজি হয় নি। এর জন্য কুমার আমাকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন। তাঁর সে আদেশ আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। আমি কেবল জানতে চাই আর কতকাল আমাকে অপরাধী বলে' গণ্য করা হবে? সারাজীবন কি রাজরোষ থেকে আমি অব্যাহতি পাব না?"

"মহর্ষি পর্ব্বত যদি যজ্ঞীয় বলি হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করেন তাহলে কুমারের সঙ্গে এ সব আলোচনা কি নিরর্থক নয়?"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন একথাটা না জানলে মরেও আমার শান্তি হবে না"

"আপনার মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো সব শেষ হয়ে যায়। তখন তো শান্তি-অশান্তি কিছুই থাকবার কথা নয়।"

চার্ব্বক পুনরায় অনুভব করিল, সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর লাগিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল, "আমার মত তাই বটে। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা জানি না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ধারামতী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যটা কুমারকে আমি জানিয়ে দিতে চাই। ক্ষমা করা না করা অবশ্য তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কথাটা তাঁকে বলতে পারলে আমি তৃপ্তি পাব। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু যে পরলোকে বিশ্বাস করে না, তার কাছে ওই কিছুক্ষণেরই মূল্য অনেক"

"বেশ আমি যাচ্ছি তাহলে। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করবেন কি?"

"আর কোথায় যাব"

"কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন তাহলে"

চার্ব্বাক ভিতর হইতে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল।

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলেন। সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?"

সুরঙ্গমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "অভিসারে। আমি আশা করি নি যে এত রাত্রে আপনি আসবেন"

কুমারের গম্ভীর মুখও হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ জানতে পারি কি"

"আপনি যদি জানতে চান, নিশ্চয় জানাব। কিন্তু একটি অনুরোধ আছে—"

"বল, তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই"

"তাকে ক্ষমা করতে হবে"

"তুমি যাকে কৃপা করেছ আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি! নিশ্চয়ই ক্ষমা করব। কে তিনি"

"মহর্ষি চার্ব্বাক"

"বল কি! তিনি এখানে এলেন কি করে?"

সুরঙ্গমা তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া সুন্দরানন্দ অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "মহর্ষি পর্ব্বতের কন্যা ধারামতীও তো এখানে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখা কি উচিত নয়—চার্ব্বাক যা বলছেন তা সত্য কি না"

"তাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহর্ষি চার্ব্বক যা বলছেন তা সত্য। মহর্ষি চার্ব্বাক সত্যিই ধারামতীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, ধারামতীও মহর্ষি চার্ব্বাককে এখনও ভালবাসে"

"তাহলে বিবাহ না হওয়ার কারণ কি"

"কারণ আমি। ধারামতীকে মহর্ষি চার্ব্বাক অকপটে বলেছিলেন যে তাকে বিবাহ করতে চাইছেন কর্ত্তব্যবোধে, কিন্তু তিনি ভালবাসেন আমাকে"

"সত্যিই তিনি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ?"

"সত্যিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন। অবশ্য, মহর্ষি পর্ব্বত যদি তাকে নির্ব্বাচন করেন"

"মহর্ষি পর্ব্বত বলি দেবার জন্য শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটি সুলক্ষণ বন্য বালককে কিনে এনেছেন। সে বালক এবং তার পিতামাতা এতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে। তাদের সঙ্গে একটু আগে আমি নিজে কথাবার্ত্তা বলেছি। এই খবরটা তোমাকে দেবার জন্যেই এত রাত্রে এসেছি তোমার কাছে। ব্যাপারটা বেশ সরল হয়ে এসেছিল, মহর্ষি চার্ব্বাক আসাতে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল আবার। মহর্ষি চার্ব্বাক তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হতে পারেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার মনের অবস্থাটা কি— তুমিও কি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ?"

সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"আপনার কি মনে হয় ?"

"নারী-চরিত্রের জটিলতা ভেদ করবার সামর্থ্য আমার নেই।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ

—কবির এ কথা আমি জানি। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তোমার স্মৃতিটুকু নিয়েই ধন্য হয়ে থাকব। তোমাকে বোঝবার চেষ্টাও করব না, তোমাকে বাধাও দেব না। প্রহেলিকাকে প্রহেলিকা বলে' স্বীকার করাই ভালো"

সুরঙ্গমা সহসা সুন্দরানন্দের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "না, আপনি আমাকে বাধা দিন, আমাকে বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি প্রহেলিকা নই—সুরঙ্গমা, আপনারই সুরঙ্গমা—"

আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া সুন্দরানন্দ বলিলেন, "চার্ব্বাকের মুণ্ডপাত করবার ব্যবস্থা করি তাহলে—? তুমি যা চাও তাই হবে"

"আমি আমার কথা রাখতে চাই। উনি আমাকে বাচাবার জন্য যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছেন, আমি দেখতে চাই মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও ওঁর এ মনোভাব বদলায় কি না। সম্ভবত মহর্ষি পর্ব্বত ওঁকে মনোনীত করবেন না, কিন্তু আমি দেখতে চাই উনি ওঁর প্রতিশ্রুতি শেষ পর্য্যন্ত পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন কি না"

"ধর যদি থাকেন—"

"তাহলে আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাব !"

"তার পর ?"

"তার পর ফিরে আসব আবার। কিছুক্ষণ পরেই উনি বুঝতে পারবেন আমাকে সঙ্গিনীরূপে পাবার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই কিছুক্ষণ ছুটি দিতে হবে আমাকে"

"গোড়াতেই তো বলেছি, তুমি যা চাও তাই হবে। তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন হঠাৎ"

সুরঙ্গমা মুচকি হাসিয়া বলিল, "শক্ত সমর্থ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগে। মিস্মির সিংহকে ফাঁদে ফেলে যে মজা দেখছেন, মানুষকে সেই রকম ফাঁদে ফেলে আমি ঠিক সেই রকম দেখতে চাই। আপনি আমাকে মৃগ, পারাবত, শুক অনেক উপহার দিয়েছেন। কিন্তু শক্ত সমর্থ বিদ্বান প্রেমিক পুরুষ উপহার দেন নি কখনও। সেই উপহার আমি নিজেই জোগাড় করেছি আজ। আপনি অনুমতি দিন তাকে নিয়ে খেলা করি এক।"

সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বহুবার চুম্বন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "অনুমতি দিলাম। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই"

সে উল্কা দুইটি পাশাপাশি দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বলিল, "চার্ব্বাক এইবার সম্পূর্ণ বিগলিত হয়েছে। চল, এইবার দেখা যাক, ওর বিশ্বাস অটল আছে কি না—"

দ্বিতীয় উল্কা বলিল, "কি বিশ্বাস—"

"চতুরাননবিশিষ্ট কোনও দেবতা নেই—এই বিশ্বাস। বুদ্ধির প্রাখর্য্য আস্ফালন করে' ও সুরঙ্গমাকে ভোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখছি সুরঙ্গমাই ওকে ভুলিয়েছে। যজ্ঞের হাড়কাঠে ও গলা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে। এখন চল দেখা যাক—চতুরানন দেবতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসটার অবস্থা কি রকম—"

"কি করে' দেখবেন সেটা—"

"তুমি কৃপা করলেই হয়। তুমি সুরঙ্গমা সেজে চল ওর কাছে। আমি অদৃশ্যরূপে তোমার সঙ্গে থাকি"

"কিন্তু আসল সুরঙ্গমা যদি এসে পড়ে ?"

"সে এখন আসবে না। সুন্দরানন্দের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে সে এখন সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। তার পরে সেখান থেকে নেবে সে যাবে কুলিশপাণির ঘরে। কুলিশপাণি দরজা খুলে বসে আছে—"

"বেশ চলুন—"

উল্কা দুইটি বনভূমি লক্ষ্য করিয়া নামিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়[১]কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া
২১, ১০, ২৬

পরম কল্যাণবরেষু,

সুধা, তোমার চিঠি পেয়ে বড় খুসি হোলাম। তোমার অসুখ বোধ হয় নানাবিধ চিন্তা ও মানসিক অশান্তির জন্যই। দয়া করে ৩০ বছরেই আমাদের ছাড়িয়ে বুড়ো হয়ো না। এইটুকু কোরো। নইলে আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো না।[২]

আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। শরৎদা

[শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি এবং কবির[৩] চিঠির নকল[৪] একসঙ্গে কাল পেয়েছি। এখানে চিঠি আসতে যেতে দুদিন লাগে, না হলে উত্তরটা এবার একটু শীঘ্র পেতে।

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না, কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্যং। আমার ধারণা ছিল, তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুরে যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাইনি। যাই হোক্ এখন নিশ্চয় জানলাম, ধারণা আমার ভুল। মস্ত স্বস্তি।

এই শনিবারে তোমার ও তোমার সাগ্‌রেদদের গান-বাজনা শোনবার জন্যে হয়তো যাবো। নিজেরও একটা কাজ আছে। আমার এখানে আসবার ৩।৪খানা গাড়ী আছে। Deulty Ry Station, B. N. Ry : টাইম টেব্‌ল একখানা কিনে সময় দেখে নিয়ো। সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দেড়। ষ্টেশন থেকে হেঁটে আসতে হয়—আধ ঘণ্টা লাগে। যদি জানতে পারি কবে এবং কোন্ গাড়ীতে আসবে, আমি লোক পাঠিয়ে দেব তোমাকে আনতে। শোবার যায়গা কোনমতে একটুখানি দিতে পারবো।

পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম, ভবানীপুর থেকে ফেরবার সময় ইচ্ছে হয়েছিল তোমাদের ওখানে যাই। কিন্তু পাছে না থাকো এই ভয়েই যাওয়া হয়নি।

শরীর নেহাৎ মন্দ যাচ্ছে না।

কবিবরের চিঠি আমাকে দিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজ করেছ[৫] এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তোমার কল্যাণ হোক্!

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। ইনি শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" নামক প্রতিষ্ঠানের এবং "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্যতম সত্বাধিকারী। সুধাংশুবাবু ও তাঁর অগ্রজ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

২। শরৎচন্দ্র তাঁর ৩০।৩৫ বছর বয়স থেকেই সকলের কাছে নিজেকে "বুড়ো হয়েছি" বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। অবশ্য এই সময় থেকে তাঁর জ্বর, ফোলা, অর্শ, আমাশা প্রভৃতি একটা না একটা রোগ সব সময়েই লেগে থাকত। শরৎচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র ৩৭ বছর সেই সময় রেঙ্গুন থেকে ২০.৩.১৪ তারিখের এক পত্রে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে তিনি লিখেছিলেন— "…গত মেলেই সে চিঠির জবাব দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু দেহটা সে সময় এতই মন্দ ছিল যে, পাছে অসঙ্গত কিছু লিখে বসি, এই আশঙ্কায় জবাব দিই নাই। কিছু মনে করিবেন না, শরীরের জন্য আমার সব সময়ে সহজ ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে ভরসা এই যে আমি বুড়ো মানুষ, আপনাদের কাছে সব সময়েই ক্ষমার্হ।"

৩। রবীন্দ্রনাথের।

৪। রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন—"কল্যাণীয়েষু,…… আমি জানতুম শরৎ আসবেন না, হয়ত সেটাও ভালো হয়েছে—কারণ হয়ত প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেননা তাঁর মন বিমুখ হয়েচে। এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকট্য ঠিক নয়—এর পরে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—জোর করে টানাটানি করা ভুল।……"

৫। "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত হলে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন প্রতিবাদ না করায় শরৎচন্দ্র কবির উপর কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর এই মনোভাব তখন তিনি তাঁর দুএকজন পরিচিত ব্যক্তির কাছেও প্রকাশ করেছিলেন।

৬। দিলীপবাবু কবির চিঠির নকল যেমন শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রের এই মূল চিঠিখানিও তেমনি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্র-ভবনে" আজও রক্ষিত আছে।

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

বাজেশিবপুর। হাবড়া
৪ঠা বৈশাখ ১৩৩২

প্রিয়বরেষু,

পৌছানো খবর[২] একটা দিতে হয় প্রথা আছে। কিন্তু তুমি তো জানো আমি সকল 'প্রথার' বাইরের মানুষ। তবুও দিচ্চি শুধু এই কথা মনে করে—হয়ত তোমরা ভাব্‌বে। এখানে এসে মনে হচ্চে কি-ই বা এত কাজ ছিল, আরও দুদিন থাকলেই হোতো। কি যত্নটাই তোমরা আমাকে করেছ। মানুষের জীবনে এই দিনগুলোই শুধু মনে থাকে। ছেলেমেয়েদের আমি আশীর্ব্বাদ করি এবং প্রার্থনা করি তোমরা নিরাপদে এবং কল্যাণে থাকো।

তোমার গৃহিণী কি রকম করেই যে আমাদের সকল দিকে নজর রেখেছিলেন আমি তাই এখানে এসে গল্প করচি।

তোমার শরৎ

ডাক্তার রমেশ[৩] ও তোমার রমেশদিদি[৪] বোধ হয় চলে গেছেন। সবাই মিলে কত আদরই আমাদের করলে। ইচ্ছে ছিল তাঁদেরও একটা চিঠি লিখি। কিন্তু সে চিঠি কি আর পৌছবে।

আর একবার ঢাকায় যেতেই হবে।

*   *   *

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

ভাই চারু,

কাল তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিখানি[৫] পড়েই মনে হ'ল এখনি চলে যাই। সেবার[৬] তোমাদের যত্ন আদরের কথাগুলোই মনে পড়ে। সে কি আনন্দেই দিন কেটেছিল।

গত রবিবার দিন হঠাৎ বমি আর জ্বর—দিন দুই ভারি কষ্ট পেলাম। ডাক্তার এসে বললেন, ইতিমধ্যে বারাকপুর আর হুগলি জেলার নানাস্থানে ঘুরে এসেছেন, অতএব এ জ্বর ম্যালোয়ারি[৭] ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। ৬০।৭০ গ্রেণ কুইনিন ব্যবস্থা করে গেলেন। জ্বর আর হল না বটে, কিন্তু দেহটা এখনো ভারি বে-এক্তার হয়ে রয়েছে। তোমাদের উৎসব[৮] দিন পনেরো পরে যদি হোতো, আমি নিশ্চয় গিয়ে যোগ দিতাম।

আর উৎসব না-ই হোলো। গিরিজা নরেন[৯] প্রভৃতি —এঁদের একটা নিমন্ত্রণ করে পাঠাওনা। আমরা এক সঙ্গে এক বাড়ীতে জুটলেই তো উৎসব সুরু হবে।

চারু, তুমি তো আসতে পারো না, সুতরাং আমার পরামর্শ এঁদের একবার ঢাকায় ডাক দাও। আমি তো আছিই।

তোমার গৃহিণীর আতিথেয়তা—আড়ম্বর নেই, অথচ সমাদরের কোথাও ত্রুটি খুঁজে পাবার যো নেই—আমার সমস্ত মনে আছে। অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই— বাস্তবিক লোভ হচ্ছে যাবার।

পাথেয়[১০] আমি নিইনে ভাই। ও অনুরোধটি কোরো না। আশা করি ছেলেপুলে ভালই আছে। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিয়ো। ইতি ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৬

তোমার শরৎ

১। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সাহিত্য সম্মিলন শেষ হয়ে গেলে শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠেছিলেন। চারুবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক। এখানে শরৎচন্দ্র ঢাকা থেকে ফিরে এসে পৌছানোর খবরের কথা বলেছেন।

৩। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

৪। রমেশবাবুর স্ত্রী। শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করে রমেশদিদি বলেছেন।

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই সময় 'ঢাকা হলে' একটী সংগীত ও সাহিত্য অনুষ্ঠানের সংকল্প করেছিল। ছাত্ররা সাহিত্য অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করবেন স্থির করে। তাই চারুবাবু ছাত্রদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র যেতে না পারায় সাহিত্য অনুষ্ঠান হয়নি, তবে সংগীতের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। কলকাতা থেকে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

৬। মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন সেরে যখন তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন।

৭। শরৎচন্দ্র ম্যালেরিয়াকে ম্যালোয়ারি বলে এখানে রসিকতা করেছেন।

৮। ঢাকা হলের সাহিত্য অনুষ্ঠান।

৯। গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব।

১০। চারুবাবু শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন যে তিনি যদি ঢাকায় যান তাহলে তাঁর পথ খরচ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরই উত্তরে শরৎচন্দ্র এ কথা লিখেছিলেন।

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা

ভাই চারু, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ওখানে গিয়ে থাকবো না ত বিদেশে যাই কোথায়? তোমাদের দেশে (ঢাকায়) গিয়ে—যেখানে যেখানে যে সব সভা সমিতিতে আমাকে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান এসেছে আমি সকলকেই এই জবাব দিয়েছি যে, সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত তারিখ নির্দ্দিষ্ট হতে পারে না। একথাও তাঁদের জানিয়েছি যে আমি চারুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবো।

আজ শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এসে বলছিলেন, শরৎদা আমি আপনার Secretary হয়ে ঢাকায় যাবো। আমাদের উপেন মামা[১] (বিচিত্রার) বলছিলেন—তাঁরও ঢাকা যাবার ইচ্ছে। উপেন শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যেতে পারবে না, কিন্তু তুলসী সম্ভবতঃ যাবে। কোথায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায় বলত?

আর একটা কথা। আমাকে কি একটা গাউন তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে?[২] জীবনে আর কখনো প্রয়োজন হবে না, শুধু একটা দিনের জন্যে একি বিপদ! সঙ্গে একটা তৈরি করিয়ে নিয়ে যাবো? ইতি ২রা শ্রাবণ ১৩৪৩
তোমার স্নেহার্থী—শরৎ

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

চারুচন্দ্র, আজ প্রভাতে এসে পৌঁছেছি। বরাবর রহমান সাহেব[৩] আমার সকল প্রকার সুখ সুবিধার প্রতি চোখ রেখেছিলেন।

জাহাজে জ্বর হয়েছিল কিন্তু খুব বেশি নয়। তোমাদের সমস্ত খবর জানিও, বিশেষ করে দীপুর[৪], তার কথাটা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, অথচ সেবা করেছে কোরক আর হীরক।[৫] বৌমাকে[৬] আমার আশীর্ব্বাদ দিও, এবং তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের প্রীতি জেনো। অসুস্থ মানুষকে যে যত্ন তোমরা করেছো তার সবিশেষ বৃত্তান্ত সবিস্তারে দিয়েছে আমাদের সীতানাথ।[৭]

আজ জ্বর নেই, একদিন অন্তরই দেখি বেশি হয়। কনককে বোলো তার চিঠিটা আমি সর্ব্বদাই মনে রাখবো।

ওদুদ সাহেব[৮], কাজী সাহেব[৯] তাঁরা আমার প্রীতি নমস্কার যেন জানতে পারেন। আজ আনন্দবাজারে দেখলাম Dacca Intermediate College—কেন অভ্যর্থনা বলো, অভিনন্দন বলো করেন নি। যাক্। ২৩শে শ্রাবণ ১৩৪৩
শরৎ

[পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে[১০] লেখা]

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কালীঘাট, কলিকাতা

প্রিয় সেজ কত্‌তা

তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু এমনি দুর্ব্বল যে উঠে বসে দুছত্র জবাব দেবো সে শক্তি নেই। বিধান ডাক্তার দেখচেন—পিলে হয়েছে। আজ Dr. K. S. Roy সকালে এসেছিলেন, নানা পরীক্ষা করে বললেন, পিলে হাতে আর ঠেকে না।

একদণ্ডও ইচ্ছে হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা ত কেউ ছেড়ে দেবে না।

জ্বর কাল বিকালেও ৯৯° হয়েছিল; ঘণ্টা ৩।৪ থাকে। দেশেও ত ম্যালেরিয়া, এর ওপর যদি আবার নতুন infection জোটে ত আর সারাই শক্ত হবে। তোমার

১। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময় ইনি "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল। শেষ পর্যন্ত তুলসীবাবু কি উপেনবাবু কেউই যেতে পারেন নি।

২। ডি. লিট উপাধি নেওয়ার জন্য।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার এ. এফ. রহমান। ইনিও ঐ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় আসছিলেন।

৪। চারুবাবুর পুত্র ৺দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। কোরক ও হীরক চারুবাবুর অপর দুই পুত্র।

৬। চারুবাবুর পুত্র অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

৭। শরৎচন্দ্রের অন্যতম ভৃত্য। সীতানাথ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে ডি, লিট্, উপাধি নেবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং খুব জ্বর হয়। সেই সময় প্রবল জ্বরের জন্য শরৎচন্দ্র কয়েকদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। সেই সময়কার তার সেবার কথা পরে তিনি সীতানাথের কাছে শোনেন।

৮। কাজী আবদুল ওদুদ। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন।

৯। কাজী মোতাহার হোসেন। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক।

১০। ইনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর।

নিজের যে অসুখটা সেরেছে এতে কত যে আনন্দ পেয়েছি তা লিখে জানাবার নয়। পায়ের জুতো কিন্তু সেই রকমই পোরো। একটু বড়। যেন, চলতে ফোস্কা না হয়।

রমেশ ডাক্তার[১]কে আমার নমস্কার দিয়ে বোলো যে, অসুখের সময়ে তাঁর কথা অনেক ভেবেচি, একদিন বিধানকে বলেও ছিলাম যে আমাদের রমেশের চিকিৎসা না হলে হয়ত জ্বর যাবে না।[২]

কতদিনে যে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো এ ভাব্‌না নিত্যি ভাবি—সেজ কত্‌তা।

কলকাতা আমার একেবারে ভালো লাগে না। মাঝে ঢাকায় যেতে হয়েছিল[৩] হয়ত শুনে থাকবে। অসুখটা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নমস্কার জেনো। ইতি

৭ই ভাদ্র ১৩৪৩ তোমাদের শরৎ

* * *

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভাই সেজকর্ত্তা, তোমার চিঠি পেলাম। পারু[৪]র চিঠি হোঁদলের[৫] হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা[৬]র জন্যে তোমার মনের মধ্যে যে সত্যকার উদ্বেগ ছিল, আমি তা জানতাম বলেই প্রতিদিন একখানা পোষ্ট কার্ড তোমাকে পাঠাতাম। যাই হোক, সে গেছে—এখন অকারণ শোক লালন করা এবং প্রাত্যহিক জাগতিক ব্যাপারে তাকে বহন করে চলা নিষ্প্রয়োজন। স্থির হওয়াই ভালো। দিদিকেও সেদিন এই কথাটাই বলে এসেছি।

আমার স্বভাবটা একটু অদ্ভুত। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, মরে গেলে আর বড় সে চিন্তা করিনে। কারণ, মৃত্যুটা আমার কাছে অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার। নিরন্তর ঘটচে,—এই দুনিয়ার আইন। এ আমি মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছি।

আশার মৃত্যুকালে আত্মীয়ের মধ্যে একা আমিই উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার, নর্স প্রভৃতি এঁরা ত ছিলেনই। গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আশা আমাকে চিনতে পারছিস রে? তার দু চোখ বেয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়লো; আমি মুছিয়ে দিলাম। সে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কি যেন বলাব চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না। মিনিট পাঁচ ছয়, তারপরে প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার খোলা চোখ দুটো হাত দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করে চলে এলাম। অর্থাৎ, তাকে যেন মড়ার ঘরে পাঠানো না হয় ইত্যাদি। বেলঘরেতে[৭] এই সংবাদ লোক দিয়ে হোক টেলিগ্রাম করে হোক দেবার জন্যেও হাঁসপাতালে instruction দিয়ে এলাম। তারা সেই মতোই সব কাজ করেছিল। সেই নিশীথ রাতে ডাক্তার ও নর্সদের কথা আমাকে বড় বিচলিত করেছিল। তারা দশ বারোজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা জানিয়ে বললে, আপনি আমাদের অক্ষমতা মার্জ্জনা করবেন—মানুষের যেটুকু সাধ্য ছিল আমরা করেছি। আমি শুধু জবাব দিলাম, সে আমি জানি। তোমাদের কাছে ওর আত্মীয়স্বজন সকলের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের শক্তি ও ইচ্ছের উপরে আরও একটা শক্তির ইচ্ছে ছিল না যে ও বাঁচে। ওর মিয়াদ ফুরিয়েছে—সে কারাগারের বদ্ধ দুয়ার রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটে খুলে দিলে, কার সাধ্য ওকে এক সেকেণ্ড বেশি ধরে রাখে।

যাক্, এ সব কথা। আমার শরীর বাড়ী থেকে এখানে আসার পরে ঢের বেশি খারাপ হয়ে গেছে। আমরা সবাই পূজোর নবমীর দিনে বাড়ী যাবো। অন্যান্য খবর তেমনিই, তেমনি ভালোমন্দে জড়ানো।

ঝড়ের প্রাবল্যে সর্ব্বত্রই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। আমার কি কি ক্ষতি হয়েছে লক্ষ্মণকে[৮] একটু লিখে জানাতে বোলো।

ইতি—১৫ই আশ্বিন ১৩৪৪॥ শরৎ

* * *

[শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৯]কে লেখা]

'মালঞ্চ'
দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়েষু,

হোঁদল, আজ দশদিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামিমা[১০] তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোষ্টকার্ড দাও ত কতকটা নিশ্চিন্ত হই। ইতি ২৬শে ফাল্গুন।

বড়মামা

শরৎচন্দ্রের গ্রামের ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল.এম.এফ।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথা' বলে শরৎচন্দ্র রসিকতা করেছিলেন।

ডি.লিট্ উপাধি নেওয়ার জন্য।

অনিলা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা।

অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনিলা দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা।

৭। আশা দেবীর শ্বশুরবাড়ী।

৮। অনিলা দেবীর জ্ঞাতি ভাসুর-পো।

৯। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে।

১০। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বেকার-সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন, শিক্ষিত বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে জানুয়ারী মাস হইতেই তাঁহারা গ্রামে ১০ হাজার শিক্ষক-সমাজসেবক নিযুক্ত করিবেন। কোন্ জিলায় কত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে, তাহার তালিকাও প্রকাশিত করা হইয়াছিল। এই কাজের জন্য নির্বাচন-সমিতি গঠন করাও হইয়াছিল এবং কমিটিগুলির মতানুসারে ১০ হাজার লোকের তালিকাও প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ব্যাপারটা কতকটা কালনেমীর লঙ্কা ভাগ হইয়াছিল। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের অর্থ সাহায্য পাইবেন বিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন। এখন কেন্দ্রী-সরকার "দিও কিঞ্চিৎ—না কর বঞ্চিত" হিসাবে পরিকল্পনার অর্দ্ধেক মঞ্জুর করিয়াছেন! কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে :—

"ছিল ঢেঁকী, হ'ল তুল,
কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল।"

রাজ্য সরকার এখন সমগ্র পরিকল্পনা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ লইয়া আবার কেন্দ্রী সরকারের দ্বারস্থ হইয়াছেন। মূল প্রস্তাবের বার্ষিক ব্যয় এক কোটি ৪৮ হাজার টাকা; তাহার মধ্যে কেন্দ্রী-সরকার প্রথম বৎসর শতকরা ৭৫ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর ৫০ টাকা ও তৃতীয় বৎসর ২৫ টাকা দিবেন। তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই সমগ্র ব্যয় বহন করিবেন। অবশ্য ৩ বৎসর পরে যখন নূতন নির্ব্বাচন হইবে, তখন কি হইবে তাহা বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বোধ হয়, এখন বুঝিয়াছেন :—

"পরের সোনা দিও না কানে;
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচকা টানে।"

তাঁহারা আপাততঃ ৫ হাজার লোক নিযুক্ত করিবেন—অবশিষ্ট ৫ হাজারের নিয়োগ কেন্দ্রী-সরকারের পুনর্ব্বিবেচনা ও অনুগ্রহসাপেক্ষ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন না?)

শিক্ষার ব্যাপারে এই অবস্থা। এদিকে সকল শিল্পে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কত বেকারের চাকরীর সংস্থান করা যাইতে পারে, আবার সে বিষয়ে অনুসন্ধান হইবে। এই অনুসন্ধান ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শেষ হইবে কি না এবং ইহাতে কত টাকা ব্যয়িত হইবে ও কত লোক নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার হিসাব প্রকাশ করা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতিকে—তাহাদিগের সদস্য-প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কত চাকরী খালি হইবার সম্ভাবনা তাহা জানাইতে বলা হইয়াছে। সরকার বেকার-সমস্যার সমাধান জন্য কি করিলে ভাল হয়, সে বিষয়েও তাঁহাদিগের মত জানিতে চাহিয়া সরকার পত্র লিখিয়াছেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে নাকি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উপযুক্ত লোক অল্পসংখ্যাই পাওয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে, সরকার বেকার 'সমস্যা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে কেবল একদিক দেখা গিয়াছে—বেকার-দিগকে কাজে নিযুক্ত করিবার সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা দেখা যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরে পূর্ণকর্ম্মকাল পরে বহু চাকুরীয়ার যে ভাবে চাকরীর মেয়াদ বাড়ান হইয়াছে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেইরূপ হইলে—মৃত্যু ব্যতীত—চাকরী খালি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে। সুতরাং সরকারের পত্রালাপে কালক্ষেপ হইলেও সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। তবে পত্র ব্যবহারে, অনুসন্ধানে ও অনুসন্ধানের ফল লইয়া প্রথমে রিপোর্ট রচনা ও পরে পরিকল্পনা প্রস্তুত করায় বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে পারে। সকল লোককে কিছুদিন এবং কিছু লোককে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা চলে, কিন্তু সকল লোককে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা যায় না। যাহারা অনাহারে ক্লিষ্ট সেই বেকারদিগকে অনুসন্ধান ও পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলে তাহা নিষ্ঠুর উপহাস ব্যতীত আর কিছুই হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। পাঁচ বা দশ হাজার লোককে যদি সত্যসত্যই চাকরী দেওয়া যায়, তবে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সীমান্তও অধিকার করা সম্ভব হইবে কি?

চীনা-প্রতিনিধি—

দীর্ঘকাল অন্তর্বিপ্লবে দুর্ব্বল ও পরদেশীয়দিগের শোষণে বিপন্ন চীন নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়াছে। চীনের জনগণের গণতন্ত্র কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত হইলেও ভারত সরকার যে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। বিশেষ ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল যেমন কাশ্মীরে বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তেমনই পূর্ব্বে চীনে বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইশেককে প্রথমে সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যেমন শেখ আবদুল্লার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র বসু তেমনই চিয়াং কাইশেকের প্রকৃত রূপ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি যে চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া সাদরে গৃহীত হইয়া গিয়াছেন, ইহাতে চীনের সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন নিশ্চয়ই দৃঢ় হইবে। এই দুই প্রতিবেশী দেশের সভ্যতা যেমন পুরাতন, ঘনিষ্ঠতা তেমনই বহুদিনের।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী যখন লণ্ডনে চীনা সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত

হয়, তখন চীনের মন্ত্রী যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের 'টাইমস' পত্র লিখিয়াছিলেন, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনে যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা অসাধারণ এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ১১০৫ অব্দে তথায় যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ ইংলণ্ড সেই সকল প্রতিষ্ঠান সম্ভোগ করিতেছে। চীনে যখন সভ্য শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন ইংরেজদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও নিশ্চয় বলিতে পারেন না।

বৌদ্ধযুগে যে ভারতের সহিত চীনের পণ্যের ও ভাবের আদান-প্রদান ছিল, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আবার তখন বাঙ্গালার তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুক) বন্দরই চীনের সহিত গতায়াতের কেন্দ্র ছিল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ যে চীনের মন্দিরে বাঙ্গালা পুঁথি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইতিহাসে দেখা যায়, এক সময়ে বৌদ্ধমত হিমালয়ের গিরিপথে ও সমুদ্রপথে ভারত হইতে চীনে প্রবাহিত হইত। বোধ হয়, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তাহা আরম্ভ হয় ও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের সময়ে চীনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তাহা বৌদ্ধকরণ নহে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের ভারতীয়করণ।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—এশিয়া এক। ভারতের ও চীনের যে শিল্প তাহা এশিয়ার শিল্প—তাহার চিহ্ন ও প্রভাব আয়ার্লণ্ডে, ইট্রুরিয়ায়, ফিনিশিয়ায়, মিশরে, চীনে ও ভারতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যেরূপ কারণে ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পরপদানত হইয়াছিল, সেইরূপ কারণেই চীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বিদেশীয়দিগের শোষণের অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—চীন আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলেও আজ স্বায়ত্ত-শাসনশীল। চীন যুদ্ধের রক্তসিক্ত পথে স্বাধীনতার মোক্ষধামে উপনীত হইয়াছে। ভারতে তাহা করে নাই বটে, কিন্তু মীমাংসার পথে—কমনওয়েল্‌থে থাকিয়া সে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিলেও পাঞ্জাবে ও বাঙ্গালায় রক্তপাত, হত্যা, অত্যাচার প্রভৃতি অল্প হয় নাই—কতদিনে সে ক্ষত দূর হইবে বলা যায় না।

চীন স্বতন্ত্রভাবে আপনার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে বলিয়াই হয়ত তাহার অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ উন্নতি দ্রুত হইয়াছে। সে বিষয়ে চীনের নিকট ভারতের শিক্ষার উপকরণ আছে। বোধ হয়, ভারত সরকারও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকবাদী মিত্র-দেশসমূহের অনিচ্ছায় বিচলিত না হইয়া চীনের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র সরকারকে মিত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতরাষ্ট্র এখনও খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না, কিন্তু চীন আজ ভারতকেও খাদ্যোপকরণ প্রদানের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। চীন আজ নানা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে এবং তাহার উন্নতি-সহায়-পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত করিবার জন্য বিদেশীর অর্থ সাহায্য ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইতেছে না।

আজ যদি এশিয়া পূর্ব্ববৎ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অংশ না থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টায় তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেশকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ করিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করে, তবে শ্বেত জাতিসমূহের অকারণ গর্ব্বের অবসান হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ মানব সমাজের বক্ষে পাতরের মত চাপিয়া থাকিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ বিঘ্নবহুল করিতে পারিবে না। চীনের জড়বাদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা পরস্পরকে প্রভাবিত করিতে পারিলে মানবসমাজে যে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হইবে তাহাতে সমগ্র এশিয়া মিলনের কুম্ভমেলায় সমবেত হইয়া মানুষের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান পাইতে পারিবে। এশিয়াই একদিন সেই মুক্তির বাণী শুনাইয়াছে—আবার শুনাইবে। সেই দিনের স্বপ্নই স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়া প্রতীচিকে সতর্ক ও ভারতকে তাহার কর্ত্তব্যে অবহিত করিয়াছিলেন।

ভারতে রুশ-মন্ত্রী—

যতদিন রাশিয়া রাজতন্ত্রশাসনে সম্রাটের অধীন ছিল, ততদিন সে অন্যান্য দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা করে নাই—তাহার কূপমণ্ডুকত্বই জাপানের সহিত যুদ্ধে তাহার পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল এবং সে স্বৈরশাসন হেতু দেশ যে অসন্তোষে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে আগ্নেয়গিরির গৈরিকস্রাবের মত প্রবাহিত হইয়া ধ্বংসের ব্যাপ্তি করিয়াছিল। রাশিয়ার গণজাগরণ সেই ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টি সম্ভব করিয়াছে এবং তাহাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিসমূহকে কম্যুনিজমবশতঃ অপাংক্তেয় রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সেই দ্বিতীয় যুদ্ধে রাশিয়া যত আঘাত পাইয়াছে, ততই শক্তিশালী হইয়াছে।

আজ আমেরিকা ও ইংলণ্ড রাশিয়ার মতবাদের জন্য তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিলেও এবং তাহার পতনকামী হইলেও তাহাকে আর অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। রাশিয়াও আজ বহির্জ্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে রাশিয়ার স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী-মন্ত্রী মাডাম কোভরিগিনার ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। এই মহিলা রাশিয়ার গণস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সরকারের কার্য্যের যে বিবরণ কলিকাতায় এক সম্বর্দ্ধনা সম্মিলনে দিয়াছিলেন, আমরা আশা করি, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা পাঠ করিয়া আপনাদিগের কার্য্যের জন্য লজ্জানুভব করিবেন এবং জনগণের স্বাস্থ্য যে জাতির সম্পদ তাহা বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের কার্য্যের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবেন।

এ দেশে গণস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। দীর্ঘ ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছিলেন, এ দেশে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ-প্রয়োজন যত অধিক তত আর কোন দেশে নহে। কিন্তু এক দিকে লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এবং অন্য দিকে অন্য নানা কাজে সরকারের অর্থব্যয়ের প্রয়োজন —সে বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব করে।

তখন অবস্থা এইরূপ ছিল। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে অর্থের অভাব হইত না।

তাহার পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ডাফরিণ এ দেশে রাজনীতিক

সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—রাজনীতিক সংস্কার অপেক্ষা এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার সংস্কার অধিক প্রয়োজন ; কেন না, এ দেশের লোক যে পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহারই জল পান করে।

অথচ বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও তাহার অনিবার্য্য ফলের আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছিল—ম্যালেরিয়াই বাঙ্গলার কাল। কলেরায় যে স্থানে সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ম্যালেরিয়ায় সে স্থানে দশ সহস্র লোক মরে। বাঙ্গালার উৎসাহের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ—ম্যালেরিয়া।

কিন্তু এই ম্যালেরিয়া যে দূর করা যায়, তাহা প্রমাণিত হইলেও ইংরেজ সরকার এ দেশে তাহা দূর করিবার আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই—প্রজার স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দায়িত্বজ্ঞান এইরূপ ছিল! তাহার পরে লর্ড রোণাল্ডশে বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন—প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ায় সাড়ে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতেই অনিষ্টের স্বরূপ সপ্রকাশ হয় না। কারণ, হয়ত এক শত বার আক্রমণের ফলে রোগীর মৃত্যু হয়। যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারাও জীবিত থাকিয়াও জীবন্মৃত হয়।

কিন্তু তবুও বিদেশী সরকার এ দেশে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধনে আবশ্যক অর্থ ও শক্তি প্রযুক্ত করেন নাই! তাঁহারা যাহা করেন নাই, জাতীয় সরকার তাহা করিয়াছেন কি? বিদেশীর শাসনকালে কোন কোন ব্যক্তি—বিশেষ ডক্টর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমবায় সমিতি সংগঠিত করিয়া—লোককে শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া ম্যালেরিয়া দূরীকরণের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বদেশী সরকার তাহা সফল করিবার কার্য্যে আবশ্যক মনোযোগ ও সাহায্য দেন নাই। তাহা যে কোন সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

আবশ্যক ব্যবস্থার ফলে নানা দেশে লোক ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জাপান যে ব্যবস্থা করিয়া ফর্ম্মোশা হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, এতদিনে এ দেশে স্বদেশী সরকার সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন নাই।

বাঙ্গালার চিকিৎসাগারের প্রয়োজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প নহে। বিশেষ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তপ্রদেশ—ইহা রক্ষার জন্যও সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান অধিবাসীর প্রয়োজন; পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানায় স্বাস্থ্যবান বাঙ্গালী অবাঙ্গালী শ্রমিকের স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার সমাধানের আশা সুদূরপরাহত।

রাশিয়ার সরকার যাহা করিতে পারিয়াছেন, ভারত সরকার কি তাহা করিতে পারেন না?

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও একদেশদর্শিতা—

কল্যাণীতে কংগ্রেসের পূর্ব্বে ও সময়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্বন্ধে সরকারের ও সরকারের সমর্থকদিগের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিষয়ে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

(১) পাতিয়ালার মহারাজার ব্যবস্থায় ভারতরাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পঞ্জাবে শিখদিগের একটি ধর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন। তথায় শিখদিগের মধ্যে এক দল, শিখদিগের স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবী করে। শিখদিগের অন্যতম নেতা তারা সিংকে বিশৃঙ্খলা নিবারণে সক্রিয় হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, তিনি প্রধান-মন্ত্রীকে ধর্ম্মস্থানের বেদী হইতে বক্তৃতা দিতে পারেন না। অগত্যা জওহরলাল স্থানত্যাগ করেন। তারা সিং যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত বা দলগত মত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঐ স্থানেই হয় নাই। ঘটনার অল্পদিন পরে তারা সিং যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে নিষেধ করেন! বিস্ময়ের বিষয়, এই সকল লোকের পুরোভাগে—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন! তিনি কি হিসাবে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কলিকাতায় আসিতে বিরত থাকিতে বলেন, তাহা বুঝা যায় না। তারা সিং কলিকাতায় আসিলে মুষ্টিমেয় লোক তাঁহাকে অপমানিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। সুখের বিষয়, ফলে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নাই। ব্যাপারটি যে কৃত্রিমতাদ্যোতক তাহা মনে করা অসঙ্গত না-ও হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে মেয়রের জড়িত থাকা কি তাঁহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচায়ক?

(২) ভারত সরকার বর্ত্তমান প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহারা—অন্ধ্রের ব্যাপারের পরে—বাধ্য হইয়াই করিয়াছেন, তাহা মনে করা যায়। কমিশনের সভাপতি যে বিহারী, তাহাতে বাঙ্গালীর আপত্তি থাকিতেও পারে। কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সরকার ঘোষণা করেন, যাহাতে কমিশনের কার্য্য বিঘ্নপ্রাপ্ত বা প্রভাবিত হইতে পারে এমন কাজে যেন সকলে বিরত থাকেন—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে কেহ যেন কোন আন্দোলন না করেন। কিন্তু বিহারীরা যেন সে নির্দ্দেশের গণ্ডীর বহির্ভূত। বিহারীরা কিরূপ উগ্র আন্দোলন করিতেছেন, তাহার কথা আমরা অন্য প্রসঙ্গে বলিব। কিন্তু বিহারীরা "রাজনন্দিনী হয়ে প্যারী যা' করিস তা-ই শোভা পায়"—পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও বিহারের বাঙ্গালী-দিগের এ বিষয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মর্য্যাদা বিহার সরকার যেভাবে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়—বিহার, পশ্চিমবঙ্গেরই মত—ভারত-রাষ্ট্রের অংশ হইলেও বিহারে বাঙ্গালীদিগের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই। মানভূমে জনশৃঙ্খলা আইনের বলে বাঙ্গালী নরনারীকে গ্রেপ্তার ও মামলা-সোপর্দ্দ করা হইতেছে। তাঁহাদিগের "অপরাধ"—তাঁহারা বাঙ্গালী-দিগের মনোভাব, সম্পূর্ণ অহিংসভাবে, "টুসুর গানে" জানাইয়া দিতেছেন :—

"শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতি নারবি ডাঙ্গ দেখাই।
বাঙ্গালী বিহারী সবাই
এক ভারতে আপন ভাই"

আর—

"এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে
মাতৃ-ভাষায় রাজ্য চাই।"

এই বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক অতুলচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন :—

"মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙ্গালা বলিয়া এবং জনগণের মধ্যে বাঙ্গালার দাবী ওতঃপ্রোত রহিয়াছে বলিয়া বিহার সরকার নিজের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের কার্য্য সাধনের জন্য প্রাদেশিক মনোভাব আশ্রয় করিয়া অবিরত জিলাবাসীর মধ্যে বিরোধ-সৃষ্টির—ভেদ-সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টার কাজ করিয়াছেন।"

এই চেষ্টা ও এই কাজ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই এক জন—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—আজ ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। বিহার সরকারের কার্য্যফলে বাঙ্গালায়ও কি ভাবের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা কি তিনি অবজ্ঞা করিতে পারেন?

(৩) বিহারীরা আজ বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে প্রত্যর্পণ করিয়া কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালনে ছলে—বলে—কৌশলে অসম্মত বটে, কিন্তু বিহারেই খাস হিন্দীভাষীদিগের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। মৈথিলীরা স্বতন্ত্র প্রদেশ চাহিতেছেন। সেই সম্পর্কে এ বার যাহা হইয়াছে, তাহা এ দেশে ইংরেজের শাসনেও সম্ভব হইত কি না, সন্দেহ। বিহার হইতে শ্রীজানকীনন্দন সিংহ ও কয় জন প্রতিনিধি কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় আসানসোলে তাঁহাদিগকে (ট্রেণে) গ্রেপ্তার করা হয় এবং দারুণ শীতের রাত্রিতে লাঞ্ছনা ভোগের পরে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। ইহাই গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বরূপ! সংবাদটি প্রকাশিত হইলে বিহার সরকার এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয়, দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বিহারের গোয়েন্দা পুলিসের কোন লোক নাকি শুনিয়াছিল (বা স্বপ্ন দেখিয়াছিল) ঐ প্রতিনিধিদিগের সঙ্কল্প ছিল, তাঁহারা কল্যাণীতে আসিয়া মিথিলার দাবী প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করিবেন এবং তথায় বিহারের প্রধান-সচিবের গৃহের সম্মুখে আন্দোলন করিবেন। বিহার সরকারের প্ররোচনাতে ঐ পুলিস কর্ম্মচারী ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছিল—এ কথা অবশ্য বিহার সরকার অস্বীকার করিয়াছেন। কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যদি বেসুরা বাজে, সেই জন্য ঐ কংগ্রেসভক্ত কর্ম্মচারী নাকি সে বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে (কারণ কংগ্রেস ও সরকার এখন এক) জানাইতে ব্যস্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিসের কর্ত্তার নাগাল না পাইয়া গোয়েন্দা বিভাগের কোন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে জানাইয়া দেয়। তাহার পরে, কাহার আদেশে, কে বা কাহারা, কোন্ কারণে প্রতিনিধিদিগকে আসানসোলে গ্রেপ্তার করেন, তাহা প্রকাশ নাই। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের নির্দ্দেশে শেষে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। হয়ত সময় বুঝিয়া সে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। পাছে কংগ্রেসের অধিবেশনে কেহ কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটান, সেইজন্য কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারই গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণতন্ত্রে বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, তবে—বিহার সরকারের বিবৃতির পরে—তাঁহারা কি এ বিষয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিবেন এবং যদি কোন পুলিস কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীরা অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে দণ্ড দিবেন? আর তাহা যদি তাঁহারা করিতে না পারেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের পক্ষে—সম্মানজনক পথ—পদত্যাগ।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার—ভারতের ঐক্য—

আজকাল ভারতের নেতা বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিরা কেবলই বলেন, লোকের পক্ষে ব্যক্তিগত বা প্রদেশগত ভাব বর্জ্জন করিয়া রাষ্ট্রের বিষয় বিবেচনা করাই সঙ্গত ও প্রয়োজন। নহিলে রাষ্ট্রের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়। বিহারীরা ও অন্য অবাঙ্গালীরা এই ঐক্যরক্ষার কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

গত ১৮ই জানুয়ারী রাঁচীতে এক জনসভায় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীজয়পাল সিংহ বলিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা সাবধান! এই দুইটি প্রদেশ যদি বিহারের কোন অংশ দাবী করেন, তবে "রক্তগঙ্গা" প্রবাহিত হইবে।

অবশ্য "রক্তগঙ্গা" প্রবাহিত করা অহিংসভাবে হইতে পারে না। সুতরাং জয়পাল সিংহ কি ভাবে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য নষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কেবল কথা, তাঁহার উক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিবার কোন কারণ আছে কি না?

এক জন বিহারীকে সভাপতি করিয়া ভারত সরকার যে প্রদেশ-পুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিহারের প্রতিনিধিরা অনেকে কংগ্রেসে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক জন বাঙ্গালী বক্তাকে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিতে বাধা দিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়াছিলেন—বিধান অনুসারে বাঙ্গালাও রাষ্ট্রের স্বীকৃত ভাষা; যাঁহারা বাঙ্গালা বুঝেন না বলিয়া বাঙ্গালা বক্তৃতায় আপত্তি করিতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। অনেকে হিন্দী জানেন না—সেই জন্য হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া হইবে না, এমন বলা অসঙ্গত।

কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল বলিয়াছিলেন, যদি কংগ্রেস কমিশন গঠনের প্রস্তাব সমর্থন না করেন, তথাপি কমিশনের কাজ চলিবে; কারণ, কমিশন-নিয়োগ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর বিহারী প্রতিনিধি প্রভৃতি কিভাবে কংগ্রেস মণ্ডপে সংঘটিত একটি ঘটনায় মিথ্যা বর্ণলেপ দিয়া বিহারে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহা পাটনায় কংগ্রেসের নিখিল ভারত সমিতির সম্পাদক মিষ্টার আগরওয়ালার বিবৃতিতে সপ্রকাশ। কতকগুলি প্রতিনিধি নিয়মানুসারে টাকা দিয়া প্রবেশপত্র না লাইয়াই মণ্ডপে প্রবেশের চেষ্টা করিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই অসঙ্গত কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। বিহারে এই ঘটনায় ভাষাগত ব্যাপারের আরোপ করা হইতেছে।

বিহারে যে এইরূপ কাজ করা হয়, তাহার প্রমাণাভাব নাই। তাহা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিহারের

সংবাদপত্রে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে যে সকল উক্তি প্রকাশিত হয়, সে সকলের উত্তর দিতে বাঙ্গালীরা নিশ্চয়ই বিরত থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার কি ব্যবস্থা করিবেন? যদি রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করিতে হয়, তবে যাহারা সে ঐক্যের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাহাদিগকে কি রাষ্ট্রদ্রোহী বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজনে দণ্ডদানই রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষার উপায় নহে?

বিহারের ও ভারত সরকারের এ কথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদিগেরই ধৈর্য্যের সীমা আছে এবং সে সীমা যদি লঙ্ঘিত হয়, তবে যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য হয়, তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশন—

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পরে গত মাঘ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের স্থান, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় নহে—কলিকাতা হইতে অনেক দূরে প্রধান-সচিব ও তাঁহার পরলোকগত অর্থ সচিবের কল্পনারাজ্যে অবস্থিত "কল্যাণী" নগরের জন্য আহৃত জনহীন প্রান্তরে। এই প্রান্তরের কথা করুণ। যে স্থানে ঘোষপাড়ার বার্ষিক মেলা হইত, তাহা ও নিকটস্থ গ্রামগুলি সামরিক প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকার করা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে বিতাড়িত অধিবাসীদিগের অশ্রুসিক্ত জমী তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তাহারা যে সকলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল, তাহাও নহে। তথায় সহর রচনা করিবার যে পরিকল্পনা বে-সরকারী ও সরকারী সাহায্য লাভ করে, তাহার সহিত কাহাদিগের স্বার্থ বিজড়িত, তাহা নিশ্চয়ই একদিন প্রকাশ পাইবে। প্রবল প্রচারকার্য্যেও কয় বৎসরে তথায় সহর রচনা সম্ভব হয় নাই। এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবও লোককে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাহা যে এখনও বাসযোগ্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ—অজস্র অর্থব্যয়েও তথায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে বৃষ্টির জল দূর করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের পাম্প ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সরকার সেজন্য ভাড়া পাইয়াছেন কি না, তাহা পূর্ত্ত বিভাগের সচিব বলিতে পারেন। এত দিনেও তথায় রেল ষ্টেশন কি গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় নাই। এবার ষ্টেশন-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, জেটী নির্ম্মিত হইয়াছে—ইত্যাদি এবং তাহার জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার কাজে কাউন্সিলারদিগের অজ্ঞাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের রোলার পাঠান হইয়াছিল, এমন কথা কর্পোরেশনের সভায় উক্ত হইয়াছে। কিন্তু রাস্তা কিরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয়—পথে প্রধান-সচিবের মোটরযানের অগ্রগামী পাইলটের সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি।

"কল্যাণী"কে জাঁকাইয়া তুলিবার চেষ্টায় যদি ঐ শ্মশানে কংগ্রেসের ব্যয়বহুল অধিবেশন-ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে সেই pompous pageant of a perishing people করিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

কলিকাতায় অধিবেশন না করার হয়ত অনেক কারণ ছিল। যথা—

(১) কলিকাতার রাজপথে এই শীতেও ক্ষুধিত কঙ্কালসার নরনারীর মৃতদেহ দুর্ভিক্ষ নিবারণে সরকারের কার্য্যের পরিচয় প্রকট করিতেছে।

(২) অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গুলী চালাইয়াও সরকার ও কংগ্রেস ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন দলিত করিতে অক্ষম হইয়া পরাভব স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(৩) কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব নিজ গৃহে সশস্ত্র প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া বাস করেন।

(৪) কলিকাতায় সরকারের দপ্তরখানা যে স্থানে অবস্থিত, জাতীয় সরকারের সেই শাসন-কেন্দ্র ১৪৪ ধারা জারি করিয়া নির্ব্বিঘ্ন করিতে হইয়াছে।

(৫) ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আগমনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

(৬) শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের দাবীতে সরকারের ব্যবহারের উত্তর—কলিকাতাবাসীরা দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কংগ্রেসীপ্রার্থী ডক্টর রাধাবিনোদ পালের শোচনীয় পরাভবে দিয়াছে।

আবার কংগ্রেসের যখন অধিবেশন তখনই সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। বাঙ্গালীর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই—

(ক) গান্ধীজী হইতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ পর্য্যন্ত দলীয়কারণে কলিকাতাতেই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যে দুই জন বাঙ্গালী সে কাজে তাঁহাদিগের সহায় ছিলেন, তাঁহারা ক্ষমতা পাইয়াছেন।

(খ) যিনি কংগ্রেসের সভাপতি তিনিই বলিয়াছিলেন, সুভাষ যদি বিদেশীর সাহায্য লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে আগমন করেন, তবে তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন!

"কল্যাণী"-প্রান্তরে কংগ্রেসের অধিবেশন-ব্যবস্থায় আন্তরিকতার অভাব ও দুর্নীতির প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কি না, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে মণ্ডপের কোন কোন অংশ উড়িয়া গিয়াছিল এবং সভাপতি জওহরলালের জন্য যে "পাকা" বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পাকা ছাদ ভেদ করিয়া জল পড়িয়া তাঁহাকে স্নিগ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য ঐ সচ্ছিদ্র গৃহ নির্ম্মাণে কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার হিসাব কংগ্রেস কমিটীর "পারিবারিক ব্যাপার", এবং তাহা প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক—উভয়ের মধ্যে হয়ত bone of contention হইবে।

২৩শে জানুয়ারী বহু বিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও সদস্যদিগকে লইয়া যে শিশু-সমারোহের ব্যবস্থা হইয়াছিল—তাহাতে অব্যবস্থা এমন প্রবল হয় যে, সভাপতি জওহরলাল রুষ্ট হইয়া উৎসব হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। • •

কংগ্রেসের সহিত 'যুগান্তরের' "স্বপন বুড়ো" ঘনিষ্ঠ সহযোগ করিয়াছিলেন—"পণ্ডিত জওহরলাল যে সচিত্র পুস্তকটি শিশু-উৎসবে হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের উপহার দেন" তিনিই তাহার সম্পাদনা

করিয়াছিলেন। তিনি ২৬শে জানুয়ারী ঐ পত্রে লিখেন, "আমরা এ বার কল্যাণী কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম 'শিশু-উৎসবে' যোগদান করতে।" উৎসব যখন চলিতেছিল, তখন "হঠাৎ বিশৃঙ্খলা এলো অতর্কিত ভাবে। একদল অবাঞ্ছিত বুড়ো খোকার দল অনুষ্ঠানক্ষেত্রে এসে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল যে, অনুষ্ঠান পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠল। * * * অনুষ্ঠান শেষ ক'রে নির্দ্দেশ মতো সবাই ক্যান্টিনে গিয়ে হাজির হল, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার ছেলে নিমন্ত্রিত, তাদের খাবার আয়োজন ডাল আর ঘ্যাঁট।" তাহার পর "পাঁচ বছর থেকে বারো বছর পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েরা যখন প্রদর্শনী দেখতে উৎসুক, তখন তাদের দিয়ে থালা গেলাস ধোয়ানো অত্যাচার নয় কি?" ছেলেদের প্রদর্শনী দেখান হয় নাই এবং "দীর্ঘ টানাপোড়েনে তখন অনেকের পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, কেউ কেউ তেষ্টায় জলের জন্যে চীৎকার করছে, বাদ বাকি বলছে—আমরা আর হাঁটতে পারছি না।" অনেক ছেলে খাইতেও পায় নাই! "ছোটদের কষ্ট দেখে অতিবড় পাষণ্ডের চোখেও জল আসতো।"

কিন্তু যাঁহারা "কল্যাণীতে" শিশু-উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া শিশু লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আমরা অবশ্য তাঁহাদিগকে "অতিবড় পাষণ্ড" বলিতে চাহি না।

বারবার প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। দারুণ শীতে লোকের মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া গিয়াছিল। যানের অভাবে লোকের দুর্গতির সীমা ছিল না।

শুনিয়াছি, অব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কেন্দ্রী সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার পরিচিত কলিকাতার রাজভবনে অতিথিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

এমন কি খাদ্যের অভাবে হাসপাতাল ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বন্ধ করা অনিবার্য্য হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে বৈশিষ্ট্য ছিল না। কংগ্রেসেও তাহাই। কারণ—'ষ্টেটস্‌ম্যান' যথার্থ ই বলিয়াছেন—"পণ্ডিত জওহরলালই কংগ্রেস"—তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। ইহাই ভারতে গণতন্ত্রের ও গণপ্রতিষ্ঠানের স্বরূপ!

এই অধিবেশনের জন্য "কল্যাণীতে" রেলষ্টেশনে, বিমান ঘাঁটীতে ও জেটীতে এবং রাস্তায় যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে যে পশ্চিমবঙ্গে বহু বাস্তুহারার পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা ও সুন্দরবনের বহু দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জীবনরক্ষা হইতে পারিত, তাহা বলিলে কে তাহা শুনিবে? হিসাব-নিকাশ ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীর হয় নাই—"কল্যাণীর" কংগ্রেসের হইবে কি?

তবে সেই কথা—

> "But what good came of it at last?"
> Quoth little Peterkin.
> "Why that I cannot tell". said he,
> "But it was a famous victory."

কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণ—

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ভারত-সরকারের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহাতে হতাশ হই নাই। কারণ, আমরা জানি, তাহাতে আশা করিবার কিছু থাকিতে পারে না। 'ষ্টেটসম্যান' লিখিয়াছেন:—

"The dullness of conformity which has characterised recent sessions of the Indian National Congress, has hung heavily on Kalyani."

তাহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বাগাড়ম্বরবিলাসী জওহরলালের নূতন কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে সরকারের কাজ সমর্থন করিবার স্থান ব্যবস্থা-পরিষদ—পার্লামেণ্ট। কংগ্রেস ও সরকার এক হইবার পরে কংগ্রেসে আর তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। পার্লামেণ্টে আলোচনার পরে সরকারের কোন কাজের সমর্থনে সরকারের আর নূতন কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। বিশেষ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেবল পার্লামেণ্টে সরকারের কাজের সমর্থন করিয়াই নিরস্ত থাকেন না। তিনি সময়ে অসময়ে তাহা করিয়া থাকেন।

সেই জন্যই কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহাকে কেবলই পুনরুক্তি করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসে লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শিশু-উৎসব প্রভৃতি করিতে হইয়াছে—সার্কাসের, কবির লড়াইয়ের ও সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা যে করিতে হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। তবে জওহরলাল নাকি কয়জন উপবিষ্ট প্রতিনিধির মাথার উপর দিয়া লাফাইয়া স্বস্থানে যাইয়া সার্কাসের কসরৎ দেখাইয়াছিলেন।

যতদিন কংগ্রেস বিরোধীদিগের রাজনীতিক-প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান ছিল, ততদিন তাহার প্রয়োজনও ও সজীবতা ছিল। এখন আর তাহা থাকিতে পারে না।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলিয়াছিলেন, দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কংগ্রেস যদি রাখিতে হয়, তবে তাহাকে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—রাজনীতি বর্জ্জন করিতে হইবে। আজ যে সকল সরকারপক্ষীয় লোক "বুনিয়াদী শিক্ষার" সমর্থনে বক্তৃতা করেন, তাঁহারা যেমন আপনাদিগের পুত্রকন্যাদিগকে "বুনিয়াদী" বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন না, তেমনই যাঁহারা গঠনমূলক কার্য্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার সমর্থনে বক্তৃতা করেন বা ভোট দেন, তাঁহারা সে সকল কাজে আত্মনিয়োগ করেন না। ইহা আন্তরিকতার অভাবপরিচায়ক।

কংগ্রেসের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? কংগ্রেসের কোন্ বাণী দেশের লোকের মনে ধ্বনিত হয়, দেশের লোককে প্রভাবিত ও কার্য্যে প্ররোচিত করে? যে সকল কথা সরকারের সকল উপায়ে ঘোষিত হইয়াছে, সেই সকলই—এই বেতার, সংবাদপত্র ও প্রচারপত্রের যুগে—এক এক স্থানে গ্রামোফোনে পুনরুক্ত করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে জন কয়েকের স্বার্থ থাকিতে পারে—দেশের লোকের ক্ষতি ব্যতীত লাভ থাকিতে পারে না।

কল্যাণী কংগ্রেস সেই জন্ত কেবল ব্যর্থই হয় নাই, পরন্তু যে খণ্ডিত প্রদেশে পুনর্গঠনের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই প্রদেশে সে কাজে যে অর্থ সুপ্রযুক্ত হইতে পারিত, তাহার যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা অপব্যয় বলিলে অসঙ্গত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৈফিয়ৎ—

বিহারের মিথিলা হইতে যে সকল প্রতিনিধি "কল্যাণী"তে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে আসিবার সময় পথে—আসানসোলে গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন, তাঁহাদিগের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের দায়িত্ব যে তাঁহাদিগের নহে—তাহা বিহার সরকার ঘোষণা করিবার পরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা explanation or excuse কিছুই বলিতে পারি না।

এই বিবৃতিতে এ দেশে ইংরেজ শাসনে সংঘটিত সিন্ধুবালাদ্বয়ের ঘটনা অনেকের মনে পড়িবে। পুলিস কলিকাতায় খানা-তল্লাসের সময় এক যুবকের পুস্তকে সিন্ধুবালা নাম পাইয়া যুবকের বাসগ্রাম (বাঁকুড়া জিলাতে) গমন করে—সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তার করিবে। তথায় যাইয়া যখন পুলিস কর্ম্মচারী দেখে, গ্রামে দুই বাড়ীতে দুই সিন্ধুবালা আছে, তখন সেই বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী উভয়কেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। যখন ব্যাপারটি লইয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন হয় এবং তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভায় ২৪ পরগণার উকীল-সরকার রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করেন, তখন সরকার যে বিবৃতি দেন তাহাতে বলা হয়, পুলিস কর্ম্মচারীটি দুই সিন্ধুবালা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ চাহিয়া কলিকাতায় উপরওয়ালার কাছে তার করেন—তার যথাকালে উপরওয়ালার হস্তগত হয় না এবং শেষে তাহা নির্খোজ হইয়া যায়। সুতরাং ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে—ভুল! কেহই দণ্ডার্হ নহে!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন ঃ—

কলিকাতার গোয়েন্দা-বিভাগের ডেপুটী-কমিশনার তার পান যে, পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীজনকীনন্দন সিং প্রভৃতি এক শত লোক "কল্যাণীতে" বিহারের প্রধান-সচিবের আবাস-সম্মুখে গোলমাল করিবার জন্য যাইতেছেন। রাত্রিতে যখন এই সংবাদ পাওয়া যায়, তখন পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেকটার-জেনারল "কল্যাণী"তে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় যখন "কল্যাণীতে" বহু শ্রমিক (ইহারা মৈথিলী নহে) স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত হাঙ্গামা করিয়াছিল, তখন পুলিসকর্ত্তারা স্থির করেন, বিহারের পুলিসের "বেরাদাররা" নিশ্চয়ই সতর্ক করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্ব দিনের গোলযোগ "কল্যাণীর" শ্রমিকদিগের সহিত স্বেচ্ছাসেবকদিগের হইলেও পুলিসের কর্ত্তাদিগের এই ধারণা যে তাঁহাদিগকে যোগ্যতার জন্য "নোবেল পুরস্কার" দিবার মত, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা হইতে "কল্যাণী" পর্য্যন্ত টেলিফোনও যে বসান হয় নাই, তাহা নহে। অথচ বড়কর্ত্তাদিগকে না জানাইয়া যে ক্ষুদে-কর্ত্তা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার কি পদোন্নতি করা হইবে? না—তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইবে?

কাহার সাহসে পুলিসের পক্ষে এইরূপ কাজ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা কি বিবেচিত হইবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা হাস্যোদ্দীপক।

কাশ্মীর-সমস্যা—

যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়া ও জাতিসঙ্ঘের শরণ লইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের ব্যাপারে যে জটিলতার সৃষ্টি—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, করিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতকে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রাণ দিয়াও শ্যামাপ্রসাদ সে জটিলতা দূর করিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ নিদাঘদিগন্তে মেঘের মত রহিয়াছে। এখন কংগ্রেসে বলা হইয়াছে—কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিঃসন্দেহ! ইহার প্রকৃত অর্থ কি? প্রথম কথা—কোন্ কাশ্মীরের ভারতভুক্তির কথা বলা হইতেছে? সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই? না—কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু ও লাডক? জওহরলালের কার্য্যফলে কাশ্মীর রাজ্যের এই তিনটি অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল অংশ—গিলগিট প্রভৃতি—পাকিস্তানের অধিকারে গিয়াছে। সুতরাং কাশ্মীর বলিতে জওহরলাল যাহা বুঝেন, তাহা সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য নহে। আবার গণভোটের কথার পরে অবশিষ্ট অংশের ভারত-ভুক্তি সম্বন্ধেই বা কি করা যায়? কারণ, যে ভাবে গণভোট গ্রহণের কথা হইয়াছে, তাহাতে কাশ্মীর উপত্যকা কি চাহিবে, তাহা বলা দুষ্কর; সে অংশে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তবে অবশিষ্ট—জম্মু (হিন্দু-প্রধান), ও লাডক (বৌদ্ধ-প্রধান)। লাডক বলিয়াছে—ভারতভুক্ত না হইলে সে তিব্বতে যোগ দিবে। সুতরাং অবশিষ্ট জম্মু।

এই অবস্থায় ভারতভুক্তি নিশ্চিত—বলিয়া ভারতের পক্ষে কোটি কোটি টাকা কাশ্মীরের জন্য—অনিশ্চিত অবস্থায় ব্যয় সঙ্গত কি না কে বলিবে?

শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে বিষয়ে জওহরলাল নিজের ভুল স্বীকার না করিলেও তাঁহার রাজনীতিক দূরদর্শিতায় দেশের লোকের আস্থা শিথিল হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ চাহিয়াছিলেন, কাশ্মীর-সমস্যা জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতার বিষয় করিতে ভারত সরকার অসম্মত হউন। এখনও তাহা করা যাইতে পারে।

এদিকে কাশ্মীরে যে বিদেশীদিগের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সে অবস্থায় যে ভারত কাশ্মীরের (অর্থাৎ কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু ও লাডকের) জন্য অবাধে অর্থ ব্যয় করিতেছে, সে ভারতের কাশ্মীর-সমস্যা সমাধান জন্য জাতিসঙ্ঘের দ্বারস্থ থাকিয়া কেবল কালক্ষেপ করা সঙ্গত নহে—তাহাতে পাকিস্থানেরই সুবিধা হইবে, এই মতই শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। জওহরলালের বিশ্বাস-ভাজন শেখ আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতা শ্যামাপ্রসাদ প্রাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদের জননী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুকে যাহা বলিয়াছিলেন, আশা করি, জওহরলাল তাহা শুনিয়াছেন।

কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত সরকার যদি দৃঢ়ভাবে ভারতের পক্ষে সম্মানজনক

ও ভারতের কল্যাণকর নীতি অবলম্বন ও পরিচালন না করেন তবে সমস্যার জটিলতাবৃদ্ধি অনিবার্য্য ; তাহাতে ভারতের সমূহ অনিষ্ট ও ক্ষতি হইবে।

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—

ভারত রাষ্ট্রে, বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে, মুসলমানদিগকে কেবল যে বিধান-সম্মত সকল অধিকারই প্রদান করা হয় তাহা নহে! তাহাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখাও হয় না। একাধিক মুসলমানকে অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়-পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের কারণ ঘটিতেছে। সম্প্রতি মিষ্টার বদরুদ্দোজা নিবারক আটক-আইনের বলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইনি কংগ্রেস-পন্থীদিগের সমর্থনে এক সময় কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিতও হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাঙ্গালী মুসলমান আলীগড়ে নিখিল-ভারত মসলেম সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। অথচ তাহার পরেও এতদিন তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও মামলাসোপর্দ্দ করা হয় নাই! ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আলীগড়ে মসলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি আর একজন বাঙ্গালী মুসলমান—আব্দর রহিম—হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যে বিষোদ্গার করিয়াছিলেন, তাহার পরেই কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছিল এবং 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সে বক্তৃতা সমরাহ্বান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

আজও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নদীয়ার সীমান্তে মুসলমানরা বিনা-ছাড়ে প্রবেশ করিতেছে। কেন? যে সকল মুসলমান পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গে অবাধে ব্যবসা ও চাকরী করিতে পায় কেন? কেন ভিন্ন রাষ্ট্রের অনুগতদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় না? আর কোন দেশে এইরূপ অসতর্কতা দেখা যায় না।

নেতাজীর জন্মদিন—

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্র এবং ভারত রাষ্ট্রের নানা স্থানে গত ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনের উৎসব পালন হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে স্মরণীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহাকে ভারতে স্বাধীনতার প্রকৃত অগ্রদূত বলা অসঙ্গত নহে এবং তিনি অন্তর্দ্ধান না করিলে হয়ত দেশ খণ্ডিত হইত না। তাঁহার দেশপ্রেম ও কর্ম্মপন্থা অনেকে প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই! সেই জন্যই এ বার "কল্যাণীতে" কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্রের মূর্ত্তিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক মাল্যদান ও তথায় তাঁহার সুভাষস্তুতিতে মনে হয়, এতদিনে সুভাষচন্দ্রের স্বরূপ দেশের সকলেই বুঝিতেছেন। কারণ, এক সময় চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সুভাষের নেতৃত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিতে যেমন লজ্জানুভব করেন নাই, পণ্ডিত জওহরলাল তেমনিই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিতেও কুণ্ঠানুভব করেন নাই ; আজ সকলেই—স্বদেশীদিগের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতায় কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত ও বিদেশী শাসকদিগের দৌরাত্ম্যে দেশত্যাগী বাঙ্গালী বীরের—অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছেন। ইহা জাতির চেতনার পরিচায়ক এবং দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ—সন্দেহ নাই। আজ আমরা তাঁহার উদ্দেশে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিব—

"জয়, তব হ'ক জয়!"

আবার অর্ডিনান্স—

ছাপাখানা (আপত্তিজনক) আইনের আয়ুষ্কাল ভারত সরকার অর্ডিনান্সের দ্বারা দীর্ঘ দুই বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। নূতন আইন করা হইবে এই অজুহাতে কেবল যে আইনের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে তাহাই নহে ; পরন্তু—

(১) পরিচয়হীন সংবাদপত্র আইনের আমলে আনা হইয়াছে।

(২) বিচারে জুরীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর সংবাদপত্রে বা পুস্তকে আপত্তিকর বিষয় আছে কি না, জুরীরা কেবল তাহাই বলিবেন—অর্থাৎ নিদান নির্ণয় করিবেন ; তাহার পরে দণ্ডদানের কর্ত্তা অর্থাৎ বিধানধারী দায়রা জজ।

(৩) এতদিন সরকার কোন মামলায় হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিতেন না অর্থাৎ দণ্ড কম মনে করিলে বা আসামী দণ্ড না পাইলে সরকার অস্বীকার করিতে পারিতেন না। এখন তাহাও পারিবেন।

বলা বাহুল্য, সাধারণ নিয়মে অর্ডিনান্স আইনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না ; আইন করিতে হইলে তাহা ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতে দিতে হয়, লোকমত জানা যায়। অর্ডিনান্সে সে বালাই নাই। তাহা গণতন্ত্রের বিরোধী। সেই জন্যই তাহা সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা বলিয়া সকল সভ্য দেশে বিবেচিত হইয়া থাকে।

ভারত রাষ্ট্রে—"গণতন্ত্রদিবস" সাড়ম্বরে—বহু বাগাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবার পরে—কয়দিনের মধ্যেই এই অর্ডিনান্স জারী হওয়ায়, লোকের মনে স্বতঃই গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে।

পাক-আমেরিকা চুক্তি—

বিদেশী ব্যাপারের মধ্যে পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির গুরুত্ব ভারতের পক্ষে যত অধিক, তত আর কোন ব্যাপারের নহে। ভারতের রাজনীতি-নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তৃত্ব যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা এই চুক্তি সমগ্র প্রাচীর, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াও অভিহিত করিতেছেন। এই চুক্তির ফলে কেবল যে রাশিয়া ভিন্ন মতবাদসম্পন্ন দেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে, তাহাই নহে ; ভারতরাষ্ট্রের অবস্থাও সেইরূপ হইবে।

অবশ্য যে কোন দেশের সহিত চুক্তি করিবার অধিকার যে কোন দেশের আছে ; কেবল সেরূপ চুক্তি যদি অন্য বা অন্যান্য দেশের

সহিত চুক্তির বিরোধী হয়, তবেই নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। "কল্যাণীতে" কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাক-আমেরিকা চুক্তিতে বিশ্বের শান্তিতে বিঘ্ন-সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, পাকিস্তান কর্তৃক প্রাপ্ত সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার আশঙ্কা যে নাই, এমন নহে! কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহাতে আপাততঃ পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ আরও তিক্ত হইবে। কারণ, পাকিস্তানের পক্ষে মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, জওহরলালের উক্তির উদ্দেশ্য—পাকিস্তানের অনিষ্টসাধন—তাহার সামরিক নীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ। মহম্মদ আলী যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিত অর্থ—ভারত সরকার যাহাই কেন বলুন না—"ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ আলী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যে আমেরিকার নিকট হইতে অবাধে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে যদি পাকিস্তান কোন আপত্তি না করে, তবে ভারত পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করে কেন?!

কেবল তাহাই নহে, আমেরিকার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, ভারত যদি আমেরিকার কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে আমেরিকা সে সাহায্যও প্রদান করিতে পারে।

আমেরিকার নিকট হইতে ভারত সরকারের অর্থ ও বিশেষজ্ঞ গ্রহণের আগ্রহের সমালোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এখন বলা প্রয়োজন, পাকিস্তানকে আমেরিকা সামরিক সাহায্য প্রদানে ভারতের আপত্তি থাকিলে কি ভারতের পক্ষে আমেরিকার আর্থিক ও বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধীয় সাহায্যে বিপদ ঘটিতে পারে না? যদি সে সাহায্য বন্ধ করিতে হয়, তবে কি অনেক পরিকল্পনা মধ্যপথেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, আমেরিকা পাকিস্তানের মত ইরাককেও একসঙ্গে সংযুক্ত করিবার কল্পনা করিতেছে।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে আমেরিকা এখন প্রবল—তাহার অর্থ ও সামর্থ্যই তাহার শক্তির কারণ। তাহার উদ্দেশ্য—কম্যুনিষ্ট রাশিয়াকে "যেন তেন প্রকারেণ" খর্ব্ব করা—যাহাতে রাশিয়ার মতের বিস্তার সাধিত না হয়, সেই ব্যবস্থা করা।

পাকিস্তান যে আমেরিকার সামরিক সাহায্য লাভ করিতেছে, সে কথা শিখ তারা সিংহ যখন বলিয়াছিলেন, তখনও ভারত সরকারের পক্ষে জওহরলাল কিছু বলেন নাই; তিনি তখন হয়ত সংবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাহার পরে তিনি বার বার ঘোষণা করিয়াছেন, আমেরিকার পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদান কেবল ভারতের পক্ষেই নহে, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের পক্ষে শান্তির বিপদ। শরৎচন্দ্র বসু একদিন জওহরলালকে fashionable internationalist বলিয়াছিলেন। জওহরলাল আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপাততঃ তিনি যদি পাকিস্তানের এই সাহায্য প্রাপ্তিতে ভারতের বিপদের কারণ লক্ষ্য করেন, তবে কি তাঁহার পক্ষে যাহাকে "ঘর সামলান" বলে তাহাতে অবহিত হওয়াই সঙ্গত হইবে না? সে জন্য প্রয়োজন:—

(১) সামরিক আয়োজন পুষ্ট ও পূর্ণ করা।

(২) দেশে অসন্তোষের কারণ দূর করা।

প্রয়োজন না হইলেও যাহাতে armed neutrality বলে তাহার প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই সঙ্গে আমরা ভারতে শাসন-ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লির উপদেশ স্মরণ করিতে বলিব:—

"In a poor country like India, Economy is as much an element of defence as guns and forts..."

সেই জন্য লর্ড মর্লি ভারতের বাহিরের ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দিতে আপত্তি করিয়া বড়লাটকে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশ বাহিরের ব্যাপারে অনবহিত থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু বাহিরের ব্যাপার অপেক্ষা ঘরের ব্যাপারের গুরুত্ব যে অধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা কি সহজেই অনুমান করা যায় না? দেশে ভারত সরকার কি ভাবে নীতির আবশ্যক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহার উপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নির্ব্বাচন—

পাকিস্তানের পরিচালক মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, ভারত রাষ্ট্র যাহাই কেন মনে করুক না, তাহাতে তিনি ভয় করেন না—কিন্তু মনে হইতেছে, তাঁহার ভয় পাইবার কারণ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যেমন পশ্চিম-পাকিস্তানেও তেমনই দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আসন্ন নির্ব্বাচনের দিন পিছাইয়া দিতে হইয়াছে; তথায় সরকার-বিরোধী দল প্রবল প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। সে দলের নেতৃত্ব ফজলুল হকের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে। তিনি লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাহারা যে হরিদ্রা ও লঙ্কা উৎপাদন করে, তাহা তাহারা খাইতে পায় না কেন? এ যে "যা'র ধন তা'র নয়।" তাঁহার উক্তিতে মনে হয়, পশ্চিম-পাকিস্তানের সুখসুবিধার জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইতেছে। পশ্চিম-পাকিস্তানেও শ্রমিক ধর্ম্মঘট ও অসন্তোষ দেখা যাইতেছে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা লোকের পক্ষে অর্থাৎ তাহার জনসাধারণের পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। এই অবস্থা যখন প্রবল হয়, তখন মানুষের সাধারণ স্বার্থ রাষ্ট্র-সচেতনতার স্থান অধিকার করিয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিদ্রোহের বহ্নির ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে যে সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন পিছাইয়া দিতে হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিদ রাখা সম্ভব হইবে না এবং নির্ব্বাচনের সময় যে উত্তেজনার উদ্ভব অনিবার্য্য তাহার ফলে কি হয়, তাহা ভাবিয়াই যে রাষ্ট্রপরিচালকগণ নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

মিশর—

মিশরের রাজ্যত্যাগী রাজার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া জাতীয় ধনভাণ্ডার পুষ্ট করা হইতেছে। তাঁহার পত্নী বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন

করিয়া নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন, সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালক নেজিব পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাঁহার মত—উহাতে আরব রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। তবে আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের ঐক্য-বন্ধন বা চুক্তি তাঁহার বাঞ্ছিত, তাহা তিনি বলেন নাই। যাঁহারা রাষ্ট্রের পরিচালক তাঁহারা সাধারণতঃই সকল বিষয় সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করেন না। তাহাই রাজনীতিকের লক্ষণ। মিশরের সুয়েজ খালের সমস্যা এখনও সমাধানচেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে; যদিও ভারত সাম্রাজ্য আজ ইংরেজের হস্তচ্যুত এবং সেই জন্য সুয়েজ খালে তাহার স্বার্থ আর পূর্ব্ববৎ প্রবল নহে, তথাপি ইংলণ্ড সম্ভ্রমের জন্যও বটে, আর হয়ত ভবিষ্যতে আশার জন্যও বটে, সুয়েজ খালে তাহার প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না। এই সুয়েজ খালে বিদেশীর প্রভুত্ব বহুদিন হইতে মিশরের জাতীয় দলের বক্ষে কণ্টকের মত অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এই ভাবের প্রথম অভিব্যক্তি আমরা সদি জগলুল পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তখন মিশর তুরস্কের অধীন দেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু তাহাতে মিশর আরবী পাশার ও জগলুল পাশার বাঞ্ছিত স্বাধীনতা পায় নাই। গণজাগরণ এতদিনে সার্থকতার দিকে যাইতেছে।

চতুঃশক্তি সম্মিলন—

রাশিয়া প্রবল শক্তিসমূহের সম্মিলনে চীনকে লইয়া আলোচনা করিবার যে প্রস্তাব দিয়াছে, তাহাতে শক্তিসমূহের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস যে প্রকৃত শান্তিপ্রয়াসকে নষ্ট করিতে পারে, তাহা বুঝা গিয়াছে। মানুষের মধ্যে এক দল আছে, যাহারা নূতনকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহে না। তেমনই জাতি বা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কতকগুলি কিছুতেই নূতন অবস্থা মানিয়া লইয়া কালের ও অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা—বাধ্য না হইলে—করে না, বা করিতে চাহে না। ইহার উত্তর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাজনীতিক পীট দিয়াছিলেন ;—

"All opinion must eventually be subservient to times and circumstances."

যে অবস্থার পরিবর্ত্তনেও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে না, সে ভ্রান্ত।

রাশিয়ার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের ও আমেরিকার মতের পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটাইয়াছিল। আজ চীন নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র! ভারত সরকার চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে—অবিশ্বাসহেতু য়ুরোপের কোন কোন দেশ এখনও চীনকে স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত। যে অবিশ্বাস এই ব্যবহারের কারণ, তাহাই অনেকক্ষেত্রে বিপদের কারণ। যদি রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরকে মিত্রভাবে দেখিতে পারে এবং প্রকৃত শান্তিকামী হয়, তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করিতে পারে! নহিলে চুক্তি করিতেও যতক্ষণ—ভাঙ্গিতেও ততক্ষণ।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও আমেরিকা—

আমেরিকা সম্প্রতি পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি করিয়াছে এবং তুরস্কের সহিত যে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বদ্ধ হইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছে, তাহা আমেরিকায়ও আলোচনার বিষয় দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন—আমেরিকার সরকারের এই কাজে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে ভারতের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় ঘটিবে এবং ভারত রাষ্ট্রকে হয়ত কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীতে যোগ দিতে হইবে। ভারতকে যে সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই কারণে যদি ভারতে দারিদ্র্যের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হয়, তবে লোক সরকারের পরিবর্ত্তন করিবে—কম্যুনিষ্টরাই প্রাধান্য লাভ করিবে। কেবল তাহাই নহে—

(১) তুরস্কের সহিত ইস্রায়েলের বন্ধন শিথিল হইবে;

(২) ইংলণ্ডের পক্ষে আর ইন্দোনেশিয়ার প্রাধান্যরক্ষা সম্ভব হইবে না;

(৩) জাপান তাহার অবস্থা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।

বোমা বর্ষণের জন্য ঘাঁটী সংগ্রহ করিতে যাইয়া আমেরিকা যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়ও বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

২০শে মাঘ ১৩৬০

কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা
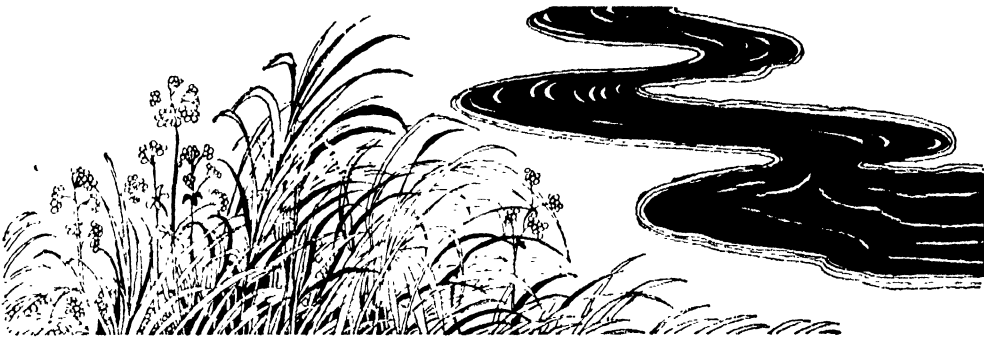
মন্মথ রায়

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুম্ভের শয়নকক্ষ। কাল-প্রভাত। কুম্ভ গবাক্ষপথে বাহিরে তাকাইয়াছিলেন। দুইজন প্রাসাদ-রক্ষীর প্রবেশ।

১ম রক্ষী॥ যুবরাজ!

কুম্ভ গবাক্ষ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।
রক্ষীদ্বয় অভিবাদন করিল।

কুম্ভ॥ পেলে?

১ম রক্ষী॥ না যুবরাজ। তন্ন তন্ন করে প্রাসাদ খুঁজেছি, কিন্তু রাজবধূ মীরাবাঈ প্রাসাদে নেই।

কুম্ভ॥ প্রাসাদে নেই! তাহলে গেল কোথায়? প্রাসাদ-উদ্যান দেখেছো?

২য় রক্ষী॥ দেখেছি। পাষাণ প্রাচীর ঘেরা রাজ-প্রাসাদের সর্বত্র দেখেছি।

১ম রক্ষী॥ শুধু আমরা দেখি নি, প্রাসাদের সমস্ত রক্ষীই খুঁজে দেখেছে।

কুম্ভ॥ সে যদি প্রাসাদে নেই, তবে গেছে প্রাসাদের বাইরে।

২য় রক্ষী॥ কিন্তু প্রাসাদের সমস্ত দ্বার সারারাত বন্ধই ছিল যুবরাজ।

কুম্ভ॥ তবে কি হাওয়ায় উড়ে গেল সে? যাও—যতো সব অপদার্থের দল!

নতমুখে রক্ষীগণের প্রস্থান
কৌশিকের প্রবেশ

কৌশিক॥ বৌমাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

কুম্ভ॥ হ্যাঁ।

কৌশিক॥ কখন থেকে?

কুম্ভ॥ কাল রাত্রে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখনও সে ছিল আমার পাশে ওই শয্যায়। আজ সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি সে নেই। প্রায়ই এমন হয়েছে কৌশিকদা, ভোর হতে না হতেই সে আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এত বেলা হ'ল, আজ আর তার দেখাই নেই।

কৌশিক॥ শুনি, সারারাত সে বাগানে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ,—অনেকে সে গান শুনেছে। আমি তোমায় বলছি কুম্ভ, লোকের মুখে এ কথা শুনে— আমিও শুনেছি সে গান—কাল রাতে—চোরের মতো চুপি চুপি—গাছের আড়াল থেকে।

কুম্ভ॥ শুনেছো? তখন কতো রাত?

কৌশিক॥ রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কী সে গান! এমনটি আর কখনো শুনিনি—কখনো শুনিনি কুম্ভ।

কুম্ভ॥ রাখো তোমার গান। মীরা ছিল, তুমি ছিলে—আর কে ছিল বাগানে?

কৌশিক॥ ছিল—ছিল—আর একজন ছিল।

কুম্ভ॥ ছিল! কে সে?

কৌশিক॥ সেই তো আশ্চর্য কথা। ছিল—আর একজন ছিল। মীরা তাকে দেখছিল, কিন্তু আশ্চর্য—আমি তাকে দেখতে পেলাম না। এমনটি আর কখনো দেখিনি কুম্ভ।

কুম্ভ॥ তারপর?

কৌশিক॥ আরো আশ্চর্য। 'একটা বাঁশী বাজতে শুনলাম। মনে হলো, সেই লোকটাই বাজাচ্ছে। বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে চললো। মীরা চললো তার পিছে পিছে। আমিও চললাম পিছু পিছু। তারপর যা দেখলাম কুম্ভ, এমনটি আর কখনো দেখিনি—কেউ কখনো দেখেনি। ভাবতেও আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে।

কুম্ভ॥ বল—তুমি বল—

কৌশিক॥ বাঁশীর পিছে পিছে চললো মীরা। তার পিছে পিছে আমি। প্রাসাদের সিংহদ্বার এসে দ্বারপাল বসে বসে ঘুমোচ্ছিল। সিংহদ্বার আপনা থেকেই খুলে গেল। বংশীধ্বনির পিছে পিছে মীরা চলে গেল বাইরে।

কুম্ভ॥ আর তুমি?

কৌশিক॥ আমি যখন যাবো, দুয়ার তখন বন্ধ হয়ে গেছে কুম্ভ।

কুম্ভ॥ কী তুমি বলছো কৌশিকদা? স্বপ্ন দেখছো?

কৌশিক॥ তা'—তা' হতে পারে কুম্ভ। আর তাই আমি এসেছি শুধু জানতে—বৌমা কোথায়?

আলুথালু বেশে উন্মাদিনীর মতো মীরার প্রবেশ

মীরা॥ আমি এসেছি প্রভু।

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা

কুম্ভ॥ কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

মীরা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিল

কুম্ভ॥ উত্তর দাও মীরা, কোথায় গিয়েছিলে তুমি কাল রাত্রে?

মীরা॥ সে এসেছিল—তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম গোকুলে।

কুম্ভ॥ কথা ছিল সে যখন আসবে, তুমি আমাকে ডাকবে।

মীরা॥ তাঁর বাঁশী শুনেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম। তুমি জাগলে না। কিন্তু আমিও আর দাঁড়াতে পারলাম না। লগ্ন বয়ে যায় দেখে আমাকে যেতেই হলো—যেতেই হলো প্রভু।

(হঠাৎ কুম্ভের পদতলে পড়িয়া) আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা কর স্বামী

কুম্ভ॥ কৌশিকদা—কৌশিকদা! একটা কাজ করবে আমার তুমি?

কৌশিক॥ কী ভাই? বল—বল—

কুম্ভ॥ এখনি গিয়ে তুমি রাজবৈদ্যকে ডেকে আনো। দেখছো কি! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কৌশিকের দ্রুত প্রস্থান

মীরা॥ স্বামী তুমি। তোমার পায়ে আমি অনেক অপরাধ করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

কুম্ভ॥ (সস্নেহে মীরাকে তুলিয়া) কোনো অপরাধ করোনি আমার কাছে তুমি মীরা। আমি বুঝছি, কী জ্বালায় তুমি ভুগছো। তোমাকে সেবা করতে চাই—শুশ্রূষা করতে চাই—ফিরিয়ে আনতে চাই—আবার আমারই কাছে—আমারই বুকে।

মীরাকে বুকে ধরিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-উদ্যান। কাল—বৈকাল। কৌশিকের স্কন্ধে দেহভার ন্যস্ত করিয়া এবং পার্শ্বে মহারাণী চণ্ডীবাঈকে লইয়া পীড়িত মহারাণা মহাকালের প্রবেশ।

কৌশিক॥ ওই—ওই মহারাণা—ওই যে গাছটা—ওই গাছটার আড়ালে আমি লুকিয়ে থেকে সব দেখেছি।

মহাকাল॥ ছাই দেখেছো! তুমি থামো।

চণ্ডীবাঈ॥ থাক্, ওসব আলোচনা এখন থাক্। মহারাণা, তোমার শরীর অসুস্থ। রাজবৈদ্য বলেছেন, খোলা হাওয়ায় বেড়াতে—প্রফুল্ল থাকতে।

কৌশিক॥ কী আশ্চর্য! রাজবৈদ্য আজ মীরা-বৌমাকে দেখে তাকেও ঠিক এই উপদেশই দিয়েছেন।

মহাকাল॥ রাজবৈদ্য মীরাবাঈকে দেখে যা' বলেছেন, সে আমরা জানি। পাগল নয়—পাগলের ভাণ করে থাকে।

চণ্ডীবাঈ॥ ও সব নষ্টামী আমরা বেশ বুঝি।

কৌশিক॥ না, না, পাগলের ভাণ করে থাকেন, এ কথাতো বলেন নি রাজবৈদ্য। আমি সেখানে ছিলাম যে।

চণ্ডীবাঈ॥ ও বলতে হয় না—দেখেই বোঝা যায়।

কৌশিক॥ বলেন কী মহারাণী! এমনটি তো তবে কখনো দেখিনি।

চণ্ডীবাঈ॥ তুমি কোনো কালে কিছু দ্যাখোনি। চোখের মাথা তুমি খেয়েছো।

কৌশিক॥ না মহারাণী, তা আমি দেখি সব ঠিকই, কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না।

মহাকাল॥ চিকিৎসা তোমারও দরকার হয়ে পড়েছে কৌশিক। যাও—রাজবৈদ্যের কাছে গিয়ে তোমার অবস্থাটা বল।

কৌশিক॥ আর বলতে হবে না মহারাণা। বৌমাকে আজ সকালে যখন দেখতে এসেছিলেন, তখন কাল রাতের সব ঘটনা আমাকেই বলতে হলো কিনা—ওই যে —বাঁশী শুনলাম অথচ লোক দেখলাম না—সেই সব কথা। তা' বৌমাকে কোন ওষুধ দিলেন না। ওষুধ দিলেন আমাকে—একটা তেল—স্বয়ং নারায়ণের তেল।

মহাকাল॥ হ্যাঁ, নারায়ণের তেল। এখন ঘরে গিয়ে

ই তেল মাখগে। ঘর থেকে বেরুবেনা। বেরুলে তোমাকে আমি পাগলা-গারদে পাঠাবো।

সভয়ে কৌশিকের প্রস্থান

মহাকাল॥ যতো সব পাগল এসে জুটেছে!

চণ্ডীবাঈ॥ ও না হয় পাগল, কিন্তু রাজ্যের লোকতো র পাগল নয়। বোয়ের কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেল।

মহাকাল। দেশ ছেয়ে গেল কি! যা' শুনছি, তাতে ক্ষণ ভালো বুঝছি না। কুলের এই কলঙ্ক প্রজাদের ঘরে রে আলোচনা হচ্ছে। প্রজারা সব ক্ষেপে গেছে। পবিত্র শোদীয় বংশের উঁচু মাথাই শুধু হেঁট হয়নি, প্রজা-বিদ্রোহ ও শুনছি। সিংহাসন থাকে কিনা সন্দেহ।

চণ্ডীবাঈ॥ নাথ! তবে উপায়?

মহাকাল॥ মীরাবাঈএর প্রকাশ্যে বিচার হোক্— জাদের দাবী।

চণ্ডীবাঈ॥ এ দাবী অসঙ্গত নয় মহারাণা। হোক্ চার।

মহাকাল॥ কিন্তু প্রমাণ কই? সে যে চরিত্রভ্রষ্টা তার মাণ কই?

চণ্ডীবাঈ॥ রাজকুলবধূর নিত্য নৈশ-অভিসার—সেইতো র বড়ো অপরাধ।

মহাকাল॥ কিন্তু কার কাছে অভিসার? সে লোকটা ? হাতে নাতে ধরতে পারলো নাতো তাকে কেউ!

চণ্ডীবাঈ॥ চুপ! ওর সখীদের কাছ থেকে আজ মি সে কথা আদায় করবো। এই জন্যই তাদের আমি সতে বলেছিলাম এখানে। ওই তারা আসছে।

গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ

চণ্ডীবাঈ॥ এসো, বাছা এসো। মহারাণার সেবা- া করতেই আমার সময় কেটে যায়। তোমাদের নিয়ে দণ্ড গল্প করবো, সময় হয় না। শুনেছি—তোমরা ভালো গান গাইতে পারো। (মহারাণার প্রতি) শুনো এখন। (গঙ্গা-যমুনার প্রতি) তোমরা বুঝি ন।

গঙ্গা॥ হ্যাঁ, মহারাণী।

ণ্ডী॥ গঙ্গা-যমুনা নাম শুনেই বুঝেছি—বেশ নাম। র সঙ্গে তোমরা ছোট বেলা থেকেই আছো—না?

যমুনা॥ হ্যাঁ, মহারাণী। আমরা মীরার জ্ঞাতি-বোন —একসঙ্গেই মানুষ হয়েছি।

চণ্ডী॥ ওঃ! মীরা তাই বুঝি তোমাদের সঙ্গে এনেছে? তা' শুধু তোমরা দু'জন এলে যে? আর কেউ আসেনি?

গঙ্গা॥ হ্যাঁ, আরো একজন এসেছেতো মহারাণী।

চণ্ডী। মীরার ভাই-বন্ধু কেউ হবে হয়তো।

যমুনা॥ ভাই-বন্ধুর চেয়েও বেশী মহারাণী। মীরার জীবন—মীরার প্রাণ—

গঙ্গা॥ মীরার সর্বস্ব!

মহাকাল॥ কে? সে কে? কোথায় সে?

যমুনা॥ কেন? গোকুলে। গোকুলে রয়েছে সে।

মহাকাল॥ কে? কে গোকুলে রয়েছে? কে সে?

গঙ্গা॥ কেন? গিরিধারীলাল।

চণ্ডী॥ গিরিধারীলাল! মীরার সেই বিগ্রহ?

মহাকাল॥ না, না, বিগ্রহ নয়। তার নামও বোধহয় গিরিধারীলাল?

যমুনা॥ (হাসিয়া) না মহারাণা, মীরার গিরিধারী- লাল মানুষ নয়—রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণ—ওই পাষাণ-বিগ্রহ!

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা

গঙ্গা॥ বলতে বাধা নেই মহারাণা, ওই কৃষ্ণ-প্রেমে শিশুকাল থেকেই সখী আমাদের উন্মাদিনী।

মহাকাল॥ কৃষ্ণ-প্রেমেই যদি সে উন্মাদিনী, তাহলে রাজ-সংসারে সে আসে কেন—থাকে কেন?

চণ্ডী॥ যদি বৈষ্ণবীই সে, তবে বেশভূষার ঘটা কেন? উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে কৃষ্ণ-সাধনা করেনা কেন?

গঙ্গা ও যমুনা গাহিয়া উঠিল

গান

নিত্ নাহানেসে হরি মিলেতো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলেতো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেতো বহুৎ রহে হেয় খোজা॥
দুধপিকে হরি মিলেতো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

চণ্ডী॥ বটে! আচ্ছা, তোমাদের সখীকে ডেকে

আনো দেখি। তাকে আমাদের আরো কিছু জিজ্ঞাসার আছে। যাও—গিয়ে বল আমরা ডাকৃছি।

গঙ্গা-যমুনার প্রস্থান। অপর দিক হইতে উদ্যান-রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী॥ খড়্গাসিংহ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রভু।

মহাকাল॥ হ্যাঁ, আমি তাকে আসতে বলেছি। পাঠিয়ে দাও।

রক্ষীর প্রস্থান

মহাকাল॥ খড়্গাসিংহকে কুম্ভের কাছে পাঠিয়েছিলাম—কুম্ভের মনের কথা জানতে।

চণ্ডী॥ কুম্ভের মনের কথা! সে কেউ জানতে পারবে না। আমি মা—আমিই পারলাম না।

মহাকাল॥ প্রিয়তম বন্ধুকে যা' বলা যায়, পূজনীয়া মাকে তা' সব সময় বলা যায় না রাণী। তাই খড়্গাসিংহকে পাঠিয়েছিলাম জানতে—কলঙ্কিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে প্রজা-বিক্ষোভ শান্ত করতে সে সম্মত কিনা।

চণ্ডী॥ ভালোই করেছো মহারাণা। আমরা আর ক'দিন! এ সিংহাসন আজ যদি আমরা হারাই, ক্ষতি হবে তারই।

খড়্গাসিংহের প্রবেশ

খড়্গাসিংহ॥ আমার দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে মহারাণা।

মহাকাল॥ ব্যর্থ হয়েছে! কুলকলঙ্কিনীকে ত্যাগ করতে তবে সে সম্মত নয়?

খড়্গা॥ না, সে সম্মত নয়।

চণ্ডী॥ সিংহাসনহারাতে হতে পারে—এ কথা শুনে ও নয়?

খড়্গা॥ না, তাতেও নয়। তার স্ত্রী যে কলঙ্কিনী—এ কথা সে বিশ্বাস করে না—করে না মহারাণী।

মহাকাল॥ বটে!

খড়্গা। হ্যাঁ, মহারাণা। সে নিজে এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসছে।

মহাকাল॥ হুঁ।

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। গঙ্গা-যমুনার প্রবেশ

চণ্ডী॥ খড়্গাসিংহ, তুমি বাইরে যাও। মীরাবাঈ এখানে আসছে।

গঙ্গা॥ মহারাণী, মীরাবাঈ প্রাসাদে নেই।

মহাকাল॥ প্রাসাদে নেই! তবে সে কোথায়?

গঙ্গা-যমুনা নিরুত্তর

মহাকাল॥ (বজ্রনির্ঘোষে) বল্—সেই পাপিয়সী কোথায়?

যমুনা॥ কেউ জানে না মহারাণা। যুবরাজ নিজে খুঁজেছেন—পাননি।

গঙ্গা॥ আমাদের মনে হচ্ছে, সখী গোকুলে চলে গেছে—গিরিধারীলালের কাছে।

মহাকাল॥ খড়্গাসিংহ। এই মুহূর্তে গোকুলে চলে যাও। যদি সেই পাপিয়সীকে সেখানে সন্দেহজনকভাবে পাও, তোমার মহারাণার আদেশ—বিষ দিয়ে তাকে বধ কর।

গঙ্গা ও যমুনা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

খড়্গাসিংহ॥ মহারাণার আজ্ঞা শিরোধার্য।

খড়্গাসিংহের প্রস্থান

গঙ্গা॥ কৃষ্ণের নামে শপথ করে বলছি মহারাণা, সখী আমাদের নিরপরাধ। এ আদেশ তুমি ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও মহারাণা—

মহারাণীর পদধারণ

যমুনা॥ দয়া কর মহারাণী—দয়া কর—

মহারাণার পদধারণ। কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ॥ এ কী!

মহাকাল॥ আমি জানতে চাই কুম্ভ, তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?

কুম্ভ॥ প্রাসাদে সে নেই পিতা।

চণ্ডী॥ এর পরেও কি তুমি বলতে চাও, তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী নয়?

কুম্ভ॥ না। আর কেন নয়, সেই কথাই তোমাদের বলতে এসেছি আমি।

মহাকাল॥ আর তার আবশ্যক নেই কুম্ভ। আমার অন্তঃপুরের বাইরে সে যেখানেই থাক্, বিষ দিয়ে তাকে বধ করবার আদেশ দিয়েছি খড়্গাসিংহকে।

কুম্ভ স্তম্ভিত হইল। কিন্তু তখনই আত্মস্থ হইয়া কহিল—

কুম্ভ॥ বুঝছি, সীতার মতো মীরারও আজ অগ্নি-পরীক্ষা! আমার কোনো ক্ষোভ নেই পিতা।

কুম্ভের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বৈষ্ণব-অতিথিশালা "গোকুল"। বেদীতে স্থাপিত গিরিধারীলাল-বিগ্রহ। কাল—সন্ধ্যা। মীরা বিগ্রহের সম্মুখে গান গাহিতেছে

গান

ম্হারে জনম মরণকে সাথী।
　　থানি নহি বিসরূঁ দিনরাতী॥
তুম্ দেখ্যাঁ বিন কলন পড়ত হৈ
　　জানত মেরী ছাতী॥
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ
　　রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী॥
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর
　　হরি চরণাঁ চিত রাতী॥
পল পল তোরা রূপ নিহারূঁ
　　নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

মীরা॥ আমার জনম-মরণের সাথী! কী করে তোমাকে ছেড়ে থাকি! ঘরে আমার মন টেঁকে না। পালিয়ে আসি তোমার দুয়ারে—তোমার কাছে। আমায় তুমি নাও—তোমার চরণে আমায় নাও।······একী! কোথায় যাচ্ছো? য়্যা?·····পাশা খেলবে! আমার সঙ্গে! আবার!······না, না, যতোবার খেলা হয়, তোমার হয় জিত, আমার হয় হার।···কী? আমি জিতবো! বেশ, তবে এসো।

মীরা কুলুঙ্গি হইতে পাশা লইয়া বেদীতলে বসিল

মীরা॥ বোসো। আচ্ছা, তুমি পাশা খেলতে এতো ভালবাসো কেন গিরিধারীলাল?······কী?···জীবনটাই একটা পাশা খেলা! (হাসিয়া) তা' যা বলেছো।···কিন্তু শোনো, কোনো ছল চলবে না।···বাজী রাখবে? কী বাজী?···তুমি জিতলে আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে! (আর্তকণ্ঠে) না, না, তা' হবে না—তা হ'লে আমি খেলবো না।

উঠিয়া দূরে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

না, না, আমার জীবন নিয়ে এমন করে পাশা খেলতে তোমাকে আমি দেবো না—দেবো না—

বহির্দ্বারে করাঘাত শোনা গেল। মীরা সচকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল

মীরা॥ (গিরিধারীলালের উদ্দেশ্যে) ওই কে আবার এসেছে—আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে—রাজপ্রাসাদে—স্বামীর ঘরে—সোনার পিঞ্জরে। আমি যাবো না—আমি যাবো না—তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না।

বহির্দ্বারের করাঘাত প্রবলতর হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, দ্বারে প্রবল আঘাতও হইতে লাগিল

মীরা॥ না, না, শোনো—শোনো—আমাকে তুমি নিয়ে চল—আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চল—দূরে···বহু দূরে—তোমার লীলা-নিকেতন বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনে।

দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছুটিয়া প্রবেশ করিল খড়্গাসিংহ ও তাহার কতিপয় সশস্ত্র অনুচর। মীরা চমকিয়া উঠিলেও তখনই প্রকৃতিস্থ হইল। খড়্গাসিংহ ও তাহার অনুচরগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উন্মুক্ত গবাক্ষগুলির নিকট ছুটিয়া গেল এবং কেহ পালাইতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কাহাকেও না দেখিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে একস্থানে সমবেত হইল।

খড়্গাসিংহ॥ পালাতে চাইছিলে? কার সঙ্গে?

মীরা নিরুত্তর রহিল

খড়্গা॥ (বজ্র নির্ঘোষে) বল—কে এসেছিল?

মীরা॥ কেউ আসেনি।

খড়্গা॥ কলঙ্কিনী! কেউ আসেনি? (ছক দেখাইয়া) তবে কার সঙ্গে ওই পাশা খেলছিলি তুই?

মীরা॥ (হাসিয়া) ওঃ। ধরে ফেলেছো দেখছি। তা' কার সঙ্গে আবার খেলবো? খেলছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে।

খড়্গা॥ তোর আবার অন্য কোন্ স্বামী আছে?

মীরা॥ জানো না?

গান

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির মৌর মুকুট মেরে পতি সোই॥
কৌস্তুভ মণি কণ্ঠ পদিকণ্ঠ উরসি দেশ জোই।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোই॥
মৈ তো আয়ি ভক্তি জানি যুক্তি দেখি মোই।
আঁসু আন জল সিঁচি সিঁচি প্রেম বীজ ঠোই॥

সাধুন্ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ গোই।
অব তো বাত ফয়ল গৈ জানে সব কোই॥
প্রেম কি মথানি মথি যুক্তি সে বিলোই।
মাখন ঘৃত কাঢ়ি লেত ছাঁই পিয়ে বোই॥
রাজন ঘর্ জন্ম লেত সবে বাত হোই।
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হো সো হোই॥

খড়্গাসিংহ॥ "মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হো সো হাই।" (ব্যঙ্গে) প্রভুর প্রতি মীরার অনুরাগ হয়েছে! এতে যা' হবার তা' হোক্!

মীরা॥ হ্যাঁ, এতে যা' হবার, তা' হোক্।

খড়্গাসিংহ॥ বেশ, তাই হোক্! দেখি তোমার কোন্ প্রভু তোমাকে কী ভাবে রক্ষা করে। মহারাণার আদেশ—তোমাকে এখনি বিষপান করতে হবে। মৃত্যুবরণ করে পবিত্র শিশোদীয় রাজবংশের এই কুল-কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে। (বিষপাত্রবাহী অনুচরের প্রতি) ভৈরব! বিষপাত্র তুলে ধর ওই কলঙ্কিনীর অধরে।

মীরা। দাও—আমার হাতে দাও।

মীরা বিষপাত্র হাতে লইল। তন্মধ্যস্থ বিষ নিরীক্ষণ করিল।
পরে গিরিধারীলালের বিগ্রহের দিকে তাকাইল

মীরা॥ আমার জীবনে এই তোমার প্রথম দয়া—প্রথম দয়া, প্রভু! তোমার চরণে আমি ঠাঁই চেয়েছিলাম, সেই ঠাঁই তুমি দিলে—এতোদিনে। এ তোমার কতো বড়ো কৃপা—এ আমার কতো বড়ো আনন্দ! (খড়্গাসিংহের দিকে তাকাইয়া) তোমরা আজ আমার সব বন্ধু—কতো বড়ো বন্ধু—তোমরা জানো না—জানো না।

বিষপান করিয়া দুলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে মীরা গাহিতে লাগিল
রামনাম রস পীজে মনুয়া, রামনাম রস পীজে।

সঙ্গীতের মধ্যে দেখা গেল, বিষক্রিয়া দূর হইয়া গিয়া মীরার দেহে ও মনে আনন্দামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সময়ে কুম্ভও এখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তৎপশ্চাতে গঙ্গা ও যমুনা।

খড়্গা॥ এ কী! এ আমি কী দেখলাম! কে তুমি—যার কাছে বিষ হয় অমৃত?

কুম্ভ॥ আমাকে বলতে দাও খড়্গাসিংহ—ও কে। আকাশে ওই তারা দেখেছো—ওই অরুন্ধতী তারা? ও সেই মহাসতী। অরুন্ধতী—অযোধ্যায় ও ছিল সীতা—বৃন্দাবনে ও ছিল রাধিকা—রাজস্থানে ও আজ মীরা। ও সেই সূর্যমুখী ফুল—যার সূর্য যুগে যুগে জগৎপতি ওই গিরিধারীলাল!

কুম্ভের এই বাণীর মধ্যে দেখা গেল, মীরা ধীরে ধীরে গিরিধারীলাল-বিগ্রহের নিকট গিয়া বিগ্রহটি বুকে তুলিয়া লইল। পরে ধীরে ধীরে কুম্ভের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মীরা॥ যে বিদায় পাবো না ভেবেছিলাম, বিষ দিয়ে সে বিদায় তোমরা আমায় দিয়েছো। সে বিষপানে রাজসংসারে মীরার হয়েছে মৃত্যু। বিষ থেকে পেয়েছি অমৃত—আমার নবজন্মের সচ্চিদানন্দ! মীরা চলে আজ বৃন্দাবনে—আমার গিরিধারীলালের লীলা নিকেতনে।

গান

মহানে চাকর রাখো জী,
চাকর রহসূঁ বাগ লগাসূঁ
নিত উঠি দরসন পাসূঁ।
বৃন্দাবন কী কুংজ গলিন মেঁ
তেরী লীলা গাসূঁ॥
হরে হরে সব বন বনাউঁ
বিচ বিচ রাখূঁ বারী।
সাঁবলিয়াকে দরসন পাউঁ
পহির কুসুম্মী সারী॥
জোগী আয়া জোগ করণ কুঁ
তপ করনে সন্ন্যাসী।
হরি ভজন কুঁ সাধু আয়ে
বৃন্দাবনকে বাসী॥
মীরাকে প্রভু গহির গংভীরা
হৃদয়ে রহোজী ধীরা।
আধীরাত প্রভু দর্শন দেহৈঁ
প্রেম নদীকে তীরা॥

খড়্গা॥ কুম্ভ, ওকে ধর—ওর পথ রোধ কর—

কুম্ভ॥ কাকে আটকাবো? ও আজ মুক্ত আত্মা! কোনো বন্ধনই আজ আর ওর বন্ধন নয়। ওই কৃষ্ণ-বিলাসিনীকে আমরা হারিয়েছি—চিরতরে হারিয়েছি।

বিরতি (ক্রমশঃ)

নিরূপা রায়
বলেন
LUX
LUX
TOILET SOAP
ভারতে
প্রস্তুত

কল্যাণী কংগ্রেস

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীতে কংগ্রেস হইয়া গেল। কল্যাণী এক পরিকল্পিত সহর—কাঁচরাপাড়া (২৪ পরগণা) রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে—নদীয়া জেলার মধ্যে। কলিকাতা হইতে মোটরে বারাসত হইয়া ৪১ মাইল ও নৈহাটী হইয়া ৩১ মাইলের পথ। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার ভিড় কমাইবার জন্য এক বিরাট ভূখণ্ডের উপর নূতন এক প্রকাণ্ড সহর বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন ও নূতন সহরের নাম দিয়াছেন কল্যাণী। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন গত কয়েক বৎসর হইতে সহরে না হইয়া গ্রামে হইতেছে—সে জন্য প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের ইচ্ছায় কংগ্রেসের স্থান কল্যাণীতে স্থির হইয়াছিল। এত বড় ফাঁকা স্থান অন্য কোথাও পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। অস্থায়ী রেল পথ ছিল—ঐ পথের শেষে কংগ্রেসনগর নামে একটি রেল ষ্টেশনও খোলা হইয়াছিল—শিয়ালদহ হইতে কংগ্রেসনগর পর্য্যন্ত সরাসরি ট্রেণ যাতায়াত করিয়াছিল এবং কল্যাণী হইতে কংগ্রেসনগর সর্বদা ট্রেণ যাতায়াত করিত। ১৬ই জানুয়ারী শনিবার বেলা ৩টায় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যাইয়া সর্ব-প্রথমে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিলেন—ট্রেণ তাঁহাকে ও কয়েক শত যাত্রী লইয়া শিয়ালদহ হইতে কংগ্রেস-নগর ষ্টেশনে যাইলে তথায় তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। প্রদর্শনীর প্রধান ফটকের সম্মুখে এক নূতন প্রকাণ্ড মণ্ডপে সভা করিয়া ডাক্তার রায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিলেন—তাঁহার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি ও কল্যাণী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবলবন্ত রাও মেটা প্রদর্শনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উদ্বোধনের পর প্রায় এক ঘণ্টা কাল প্রধান-মন্ত্রী প্রদর্শনীর মধ্যে ঘুরিয়া সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বড়বাজারের আশারাম ভিওয়ানীওয়ালা ট্রাষ্টের অছি শ্রীবৈজনাথ ভিওয়ানীওয়ালা কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে কল্যাণীতে এক প্রকাণ্ড হাসপাতাল গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় ১৬০ শয্যা পাতা হইয়াছিল ও বাহিরে রোগী দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার বিরাট ব্যবস্থা ছিল। কংগ্রেস উপলক্ষে কল্যাণীতে ঐ স্থায়ী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কল্যাণীর নূতন অধিবাসীদের একটি প্রধান অভাব দূর হইয়াছে। হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও বিধান-সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেখান হইতে ডাক্তার রায় কল্যাণীর পয়ঃপ্রণালী ও পা[illegible] উদ্বোধন করিতে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এঞ্জিনিয়ার শ্রী[illegible] প্রতাপচন্দ্র বসুর চেষ্টায় ঐ জল-নিষ্কাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া[illegible] প্রতাপচন্দ্র এক মনোজ্ঞ বক্তৃতায় ঐ ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত কর[illegible] ডাক্তার রায় উহার উদ্বোধন করিলেন। সেখান হইতে [illegible]

কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চসজ্জায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান ফটো—সুজিৎ মিত্র

তাহা ছাড়া তথায় সহর হইবে বলিয়া তথায় ইলেকট্রিক আলো, কলের জল ও পাকা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল। সে জন্য তথায় বহু সহস্র লোকের জন্য অস্থায়ী বাসগৃহ নির্মিত হইলেও কাহাকেও কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। কলিকাতা হইতে মাত্র ১ ঘণ্টায় মোটরে তথায় যাওয়া যায়—সে জন্য শত শত বাস কংগ্রেসের সময় কলিকাতা, হাওড়া, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে তথায় যাতায়াত করিয়াছে। রেল-কর্তৃপক্ষ কাচরাপাড়া হইতে কিছু উত্তরে—পূর্বে যেখানে চাঁদমারী রেল ষ্টেশন ছিল, তথায় নূতন সুন্দর কল্যাণী ষ্টেশন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে একটি

কল্যাণীতে নূতন রেল ষ্টেশনের উদ্বোধন করিতে যান। মেন লাইনের উপর কল্যাণী রেল ষ্টেশনটি সকলের দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। ঐরূপ সুন্দরভাবে সাজান ও গড়া রেল-ষ্টেশন নাকি ভারতের আর কোথাও নাই। সে দিন রেল কর্তৃপক্ষ ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পত্রপুষ্প, সাজ-সজ্জা ও আলোক মালায় স্থানটি সত্যই এক অভিনব স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায়ের ঐ স্থানে গমন উপলক্ষে ষ্টেশন-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানের নাম 'বিধান-পার্ক' রাখার কথা সভায় ঘোষিত হয়। উদ্বোধন বক্তৃতার পর রেল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে চা ও জলযোগে তৃপ্ত করেন। ৪টি অনুষ্ঠানে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়া প্রধান-মন্ত্রী কল্যাণী কংগ্রেসের সূচনা করিয়া দিয়া কল্যাণী রেল ষ্টেশন হইতেই ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সে দিন হইতে কল্যাণীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল—প্রদর্শনীর প্রদর্শকগণ সে দিনের জনসমাগমে উৎসাহিত হইয়া নিজ নিজ স্থান অধিকতর সুন্দর ভাবে সাজাইতে আরম্ভ করেন। পর দিন রবিবার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে কল্যাণীর বিবরণ পাঠ করিয়া রবিবার লোক দলে দলে কল্যাণীতে আগমন করিতে থাকে। শনিবার বোধহয় ১০ হাজার লোক ও রবিবার কল্যাণীতে ৫০ হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল। সোমবার সর্বত্র কাজ চলিয়াছে—মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী বিকাল ৪টায় কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী জহরলাল নেহরু বিমানে কাঁচরাপাড়া বিমানঘাটিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বিমান-ক্ষেত্র হইতে কল্যাণী সহরে জহরলালের জন্য নির্দিষ্ট বাসগৃহ পর্য্যন্ত ৫ মাইল পথের দু'ধারে লোক কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইয়া জহরলালকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। ঐ পথে প্রায় ৫০টি বিরাট তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। প্রবেশ পথের প্রধানতমস্থানে—পথের মোড়ে সদ্য-পরলোকগত নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া জহরলালকে সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে বিপিনবিহারীর স্মৃতি-পূজা করা হইল। জহরলাল গাড়ীতে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলকে প্রতি-নমস্কার করিতে করিতে কল্যাণীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এত উৎসাহ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। সে দিনও কলিকাতা হইতে হাজার হাজার মোটর গাড়ী ও শত শত বাস আসিয়া কল্যাণীর পথ জনাকীর্ণ করিয়াছিল। জহরলাল ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম গ্রহণের পরই প্রদর্শনী দেখিতে গমন করিলেন ও কল্যাণী সহরের ব্যবস্থাদি দেখিয়া আসিলেন।
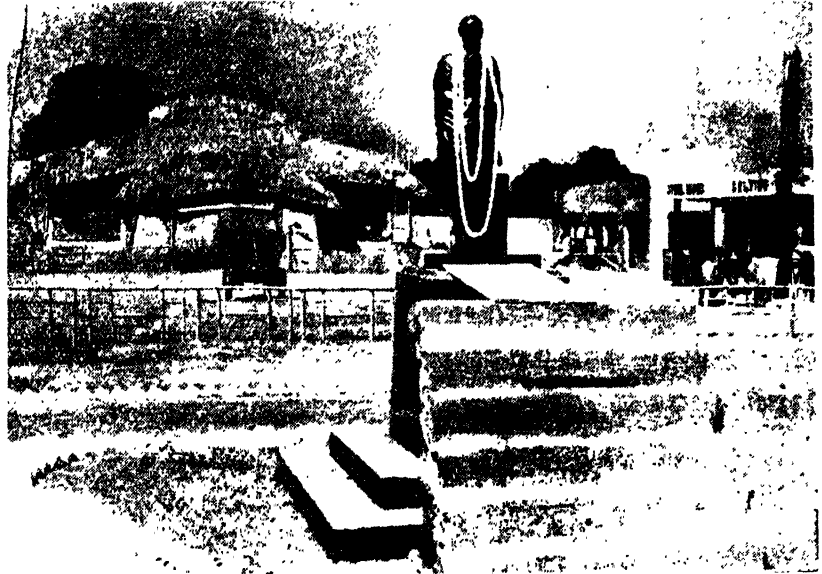
প্রদর্শনী অভ্যন্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি ফটো—সুজিৎ মিত্র

কাঁচড়াপাড়া বিমানপোটে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সংবর্ধনা ফটো—সুজিৎ মিত্র

পরদিন বুধবার সারাদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইয়াছিল। সমবেত জনতাকে দর্শন দানের জন্য জহরলালকে মধ্যে

অধিবেশন আরম্ভ হইয়া শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। ভারতের বহু রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রীসহ-মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সকল রাষ্ট্রের কংগ্রেস-সভাপতি প্রভৃতি খ্যাতনামা নেতায় কংগ্রেস নগর পূর্ণ হইয়া গেল। মাত্র কয়েকখানি পাকা বাড়ী পাওয়া গিয়াছিল—প্রায় সকল নেতাকেই টিনের ঘরে বা তাঁবুর মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। "এখানে আসিলে সকলেই সমান"—এই সাম্যবাদ কল্যাণী-নগরে দেখা গিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্য্যন্ত সকলের জন্যই প্রায় সমান ব্যবস্থা এবং সকলকেই একই পথে চলিতে হইয়াছে।

কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী সমিতির মঞ্চে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু, বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবলবন্ত রায় মেটা ফটো—সুজিৎ মিত্র

জহরলাল ১৯শে জানুয়ারী দিল্লী হইতে সকালে রওনা হইয়া সরাসরি কল্যাণীতে আসেন নাই—পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য এলাহাবাদে নামিয়া তিনি কুম্ভমেলার ব্যবস্থাদি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি হিন্দু ভারতবাসী—সে দিন পূর্ণিমায় কুম্ভস্নানের যোগ ছিল—তাই জহরলাল গঙ্গা-যমুনে সঙ্গমে যাইয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন। রাষ্ট্র-ধর্ম-নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু ধর্মহীন নহে—জহরলালের কুম্ভমেলায় গমনের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

বিষয়-নির্বাচন-সমিতিতে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল—বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হওয়ায় কোন কোন রাষ্ট্রের কর্মীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া শুধু অন্য রাষ্ট্রের নেতাদের প্রতি নহে—কংগ্রেস-সভাপতি জহরলালের প্রতি কটূক্তি করিতেও বিরত হয় নাই। কিন্তু জহরলালের মত দৃঢ়-চেতা, বলিষ্ঠ নেতার পক্ষে সে সকল কটূক্তি উপেক্ষা করা আদৌ কষ্টসাধ্য হয় নাই।
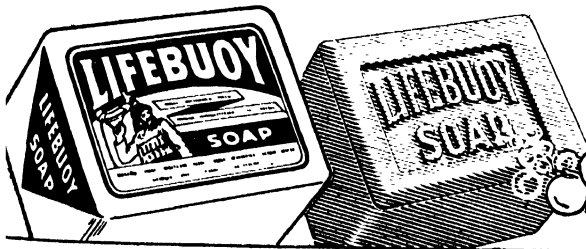
কল্যাণী কংগ্রেসে শিশুউৎসবে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু ফটো—সুজিৎ মিত্র

ধ্য.নিজ বাসগৃহের অলিন্দে বা বাহিরে আসিতে হইতেছিল। বৃহস্পতি-র বিষয় নির্বাচন সমিতি তথায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফ্‌বয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফ্‌বয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফ্‌বয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 244-X52 BG

২৩শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষে এক স্মরণীয় দিবস—ঐদিন বাঙ্গালার পরম-প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু বাঙ্গালী জাতিকে নহে, শুধু ভারতবাসীদিগকে নহে—সমগ্র জগতকে ত্যাগ, প্রেম, সেবা ও তাহার সহিত শৌর্য্যের এক মহান আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন। সেই দিনেই ২৫ বৎসর পরে কল্যাণীতে কংগ্রেস অধিবেশন—২৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতা পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে তরুণ সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতারূপে যে অদ্ভুত সংগঠন-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বর্তমান কল্যাণী কংগ্রেসে যাইয়া বার বার আমাদের সেই কথাই মনে হইতেছিল। সুভাষচন্দ্র আজ কোথায় আছেন জানি না—কিন্তু প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী কল্যাণীতে যাইয়া তাঁহার অভাব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই কংগ্রেস নগরের মধ্যস্থলে বিরাট

বিষয় নির্বাচনী সমিতির মঞ্চে কংগ্রেস সভাপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বক্সি গোলাম মহম্মদ ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফটো—সুজিৎ মিত্র

পার্কের মধ্যে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ২৩শে সকাল ৮টায় কংগ্রেস-সভাপতি জহরলাল নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে এক পসলা মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় শুক্রবার হইতে সর্বত্র শীতের আধিক্য দেখা গিয়াছিল। শনিবার সকালে কুয়াশা হইয়াছিল—তখনও রৌদ্র দেখা যায় নাই। সাড়ে ৭টার পূর্বে সভাস্থান জনাকীর্ণ হইয়া গেল—উচ্চ মঞ্চের উপর সুভাষচন্দ্রের মূর্তি, তাহার পাশে অস্থায়ী মঞ্চে জহরলাল দণ্ডায়মান—সমগ্র ভারতের সকল নেতা তাহার চারিধারে ভিজা মাটীর উপর উপবেশন করিয়াছেন—ভারতের নারী-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আসিয়াও সকলের সহিত সেই ভিজা ঘাসের উপর উপবেশন করিয়াছেন—জহরলাল ঠিক আটটায় কম্পিত কণ্ঠে, বাষ্পাকুল লোচনে, আবেগময়ী ভাষায় যখন সুভাষের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—তখন কুয়াশার জল টপ টপ করিয়া সকলের গায়ে পড়িতেছে—মনে হইতেছিল, প্রকৃতি দেবীও আমাদেরই মত আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বক্তৃতা করার সময় জহরলালের মত শক্তিমান নেতাকেও বার বার রুমাল দিয়া চক্ষু মার্জনা করিতে দেখা গিয়াছিল—সুভাষচন্দ্রকে "আমার ছোট ভাই" বলিয়া উল্লেখ করার সময় জহরলালের কণ্ঠ শুধু বাষ্পরুদ্ধ হয় নাই—মনে হইল তিনি ফুঁপাইয়া

২৩শে জানুয়ারী কল্যাণী নগরের টাওয়ার-পার্কে প্রতিষ্ঠিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরুর মাল্যদান ফটো—সুজিৎ মিত্র

ক্রন্দন করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের 'জয়হিন্দ' ধ্বনি করিতে সকলকে আহ্বান করিয়া জহরলাল বক্তৃতা শেষ করিলেন। সে-দিনের দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা সম্ভব নহে। ভারত যে সুভাষচন্দ্রের বীর্য্যের কথা কোনদিন বিস্মৃত হইবে না—তাহা সে দিনের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। মনে হইল—ধন্য সুভাষ, তুমি সত্যই অমর—তোমার দেশবাসীও অকৃতজ্ঞ নহে। ঐদিন কংগ্রেস নগরে মহিলা-সম্মিলন, যুবক-সম্মিলন, শিশু-সম্মিলন প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ভোর হইতেই হাজারে হাজারে লোক আসিয়া তাহার

সমবেত হইতেছিল। বেলা ৩টায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন। তৎপূর্বেই পথে লোক চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়িল। ভিড় দেখিয়া বহু লোক বিকালেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেলা ৩টায় বিরাট কংগ্রেস-মণ্ডপে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। চারিদিক টিনের বেড়া ঘেরা—উন্মুক্ত আকাশতলে প্রায় দেড় লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছেন—বিরাট ও সুসজ্জিত মঞ্চোপরি নেতৃবৃন্দ উপবিষ্ট—বাহিরে ৮।১০টি ফটকের প্রত্যেকটির সম্মুখে ৫।৭ হাজার করিয়া লোক সমবেত হইয়া বিনা টিকিটে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভাষণ শেষ হইল—মূল সভাপতি জহরলাল বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন—১৫।২০ মিনিট যাইতে না যাইতে ফটকের বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল—প্রাচীরের টিন খুলিয়া গেল—৫০।৬০ হাজার লোক ভিতরে প্রবেশ করিলেন—মণ্ডপের মধ্যে যেটুকু খালি ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া গেল।

সেদিন শুধু প্রদর্শনীর ফটকে ৬০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল—আড়াই লক্ষ লোক প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিল। কোথাও লোক গণনা করা সম্ভব ছিল না—তবে শনিবার যে কংগ্রেস নগরে ৪ লক্ষের অধিক লোক গমন করিয়াছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শনিবার বহুসংখ্যক মোটর গাড়ী ও বাস পথে অচল হইয়া যাওয়ায় সেদিন লোকের বাড়ী ফেরার সময় দারুণ দুরবস্থা হইয়াছিল। যেখানে ৪ লক্ষ লোক-সমাগম হয়, সেখানে ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ রাখা কত কঠিন তাহা যে কোন বিবেচক ব্যক্তি বুঝিতে পারেন। যে কয়খানি স্পেশাল ট্রেণ গিয়াছিল, সেগুলি জনপূর্ণ হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু যাইবার সময়—কি ফিরিবার সময় লোকজনকে ট্রেণের ছাদে চড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। শনিবার—সুভাষ দিবস উপলক্ষে সকল অফিস, কারখানা প্রভৃতি বন্ধ—ব্যারাকপুর মহকুমার শিল্পাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নরনারী—যে কোন উপায়েই হউক—আমরা খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম, বহু লোক ১০।১২ মাইল দূর হইতে পদব্রজে কল্যাণীতে গিয়াছিল—ফিরিবার সময় সকলেই ক্লান্ত হইয়া গাড়ী চড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। বিকাল ৫টার পর সকলে এক সঙ্গে যখন বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিল, তখন পথ জনাকীর্ণ—এক একখানি মোটর গাড়ীর কল্যাণী হইতে ৪ মাইল দূরস্থ কাঁচরাপাড়া রোডে যাইতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল—পর্য্যাপ্ত **পেট্রলের অভাবে বহু গাড়ী ও লরীকে পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে** দেখা গিয়াছিল! বহু লোককে রাত্রি ৩টা বা ৪টায় কলিকাতায় পৌঁছিতে হইয়াছিল। ষ্টেট বাস কর্তৃপক্ষ খবর পাইয়া রাত্রি ১০টার পর কলিকাতা হইতে শত শত বাস কল্যাণীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের মঞ্চসজ্জার একাংশ   ফটো—সুজিৎ মিত্র

যাহাই হউক না কেন, এ অবস্থার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। কল্যাণীতে কয়দিন পুলিসের ব্যবস্থা সত্যই ভাল ছিল। শুধু মফঃস্বলের পুলিস নহে, কলিকাতা-পুলিসেরও বহু লোক তথায় কাজ করিয়াছেন! স্বয়ং ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার বহুসংখ্যক উচ্চ-পদস্থ পুলিস কর্মচারী সঙ্গে লইয়া সর্বদা জনগণের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালের বৃষ্টিতে সর্বত্র অসুবিধা হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র বসুকে কয়েকটি বিভাগের কাজের ভার দেওয়া হয় এবং তিনি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কয়দিন অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে অবহিত ছিলেন। পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সকল নির্মাণ কাজের পরিচালক ছিলেন—অধিবেশনের প্রায় এক মাস পূর্ব হইতে তিনি সদলে তথায় গমন করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেবকগণও কয়দিন পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, কংগ্রেস নেতা শ্রীকালোবরণ ঘোষ, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু এম-এল-এ ও এম-এল-সি ১০।১৫ দিন কল্যাণীতে বাস করিয়া বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ৫।৭ দিন প্রত্যহ সাধারণ রন্ধন-শালা হইতে ২০।২৫ হাজার লোককে খাওয়ানো হইয়াছে—কংগ্রেসের ২দিন ঐ সংখ্যা ৫০ হাজারে উঠিয়াছিল। সে কাজের দায়িত্ব কত, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবেন না। কয়েক হাজার **স্বেচ্ছাসেবককে এক মাস ধরিয়া কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং সকল**

জেলা হইতে সেবক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহারা এক পক্ষেরও অধিক কাল কল্যাণীতে থাকিয়া সকল প্রকার কাজ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সেবাকার্য্যে আগ্রহ ও দক্ষতা দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এখন দেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাধীন রাজ্যে কংগ্রেসের কার্য্যের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। শ্রীজহরলাল নেহরু তাঁহার সভাপতির ভাষণে ও শেষ বক্তৃতায় দেশবাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন—সকলে যেন কংগ্রেসের তথা কংগ্রেস-গঠিত সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া দেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন—সত্বর আর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবে। এখন দেশবাসীকে ঐ কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন—তাহাতে জনগণের নিকট অর্দ্ধেক অর্থ লইয়া গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থার বাকী অর্দ্ধেক ব্যয় সরকার প্রদান করিতেছেন। যেখানে লোক টাকা দিতে অসমর্থ, সেখানে স্থানীয় লোকদিগের নিকট কায়িক শ্রম গ্রহণ করা হইতেছে। কংগ্রেস এ বিষয়ে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন লইয়াও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঐ ব্যাপার লইয়া বিহারের কয়েকজন সদস্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের গালিগালাজ করায় কংগ্রেস সভাপতিকে কঠোরভাবে তাহাদের দমন করিতে হইয়াছিল।

স্বাধীন ভারতে এত বড় কংগ্রেসের সভা, এত অধিক প্রতিনিধি ও জনসমাগম ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই।

কংগ্রেস নগর তথা কল্যাণীর এবারের সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের জিনিষ ছিল শিল্প ও সর্বোদয় প্রদর্শনী। ১৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াছে। প্রদর্শনীতে ভারতের সকল রাজ্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল। স্বাধীন রাজ্যগুলি গত কয় বৎসরে শিল্পোন্নতি ব্যাপারে কে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন রাজ্যের প্রদর্শনী দেখিয়া বুঝা গিয়াছে। মধ্যভারত ও রাজস্থানের বহু কুটীর-শিল্প সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া টাটা কোম্পানী প্রভৃতির বৃহৎ শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র শিল্প পর্য্যন্ত—এত অধিক প্রদর্শনীয় দ্রব্য তথায় আনা হইয়াছে যে তাহা এক বা দুই দিনে দেখিয়া শেষ করা যায় না। সর্বোদয় প্রদর্শনীটি সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক ছিল। গান্ধীজির আদর্শে মানুষ কি করিয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণ থাকিয়া শান্তিতে ও সুখে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহাই সর্বোদয় প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়াছে। 'হরিজন পত্রিকা'র সম্পাদক—কংগ্রেসী এম-এল-এ শ্রীযুত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক দল কর্মী ২ মাস কাল পরিশ্রম করিয়া ঐ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তথায় গ্রাম্য-কুটীরে মানুষ কি ভাবে থাকে তাহা দেখানো ছিল। কৃষি, গোপালন প্রভৃতির সঙ্গে কুটীর-শিল্প দ্বারা কি ভাবে সে অলস না থাকিয়া নিজেকে সর্বদা কাজে লাগাইতে পারে, সর্বোদয়ে তাহা দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছেন। যান্ত্রিক সভ্যতা হইতে দূরে থাকিয়া—কলের পরিবর্ত্তে ঢেঁকীতে চাল প্রস্তুত করিয়া—নিজের বাগানের তরকারী, নিজেদের পুকুরের মাছ, স্বহস্তে প্রস্তুত সুতায় কাপড় বুনিয়া তাহা পরিধান—প্রভৃতি অতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাবে মানুষকে জীবনধারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্বোদয় প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী-করা গুঁড়া দুধের বদলে গৃহস্থ গরু পুষিয়া কি করিয়া সহজে খাঁটি দুধ পায়—তাহাও দেখানো হইয়াছে। নানাপ্রকার মূল্যবান ঔষধ চাষ করিয়া এবং তাহা বিদেশে রপ্তানী করিয়া কি ভাবে ধন আহরণ করা যায়, তাহা আজ মানুষকে শিক্ষা করিতে হইবে। ভূদান-যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য প্রদর্শনীর একটি অংশ পৃথক করা ছিল এবং তথায় ভূদান-যজ্ঞ বিষয়ক গ্রন্থাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপর যাঁহারা মন দিয়া প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি দেখিয়া শুধু বিস্মিত হন নাই—নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া নিজ জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত 'ময়লা-কাগজ' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। কাহিনীটি চিত্রোপাখ্যান হিসাবে সম্পূর্ণ

রূপসজ্জার বাইরে ময়লা-কাগজের প্রধান অভিনেতা
শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

নূতন ও অভিনব। কাহিনীই যে বাংলা চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ একথা আর একবার বিশেষ করিয়া প্রমাণিত করিল—'ময়লা কাগজ।' সম্পূর্ণ অনাদৃত একটি জীবনকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যে মানুষ আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়া কাগজ কুড়ানো পেশা করিয়াছে—তাহাদের প্রত্যেকেরই জীবনের পশ্চাতে আছে সকরুণ ইতিহাস—যা কেবল পেটের ক্ষুধা ও পরণের কাপড়ের সমস্যায় ভরপুর। লেখক যে অনাদৃত কাহিনী চিত্রিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। কেননা জীবিকা যাহাই হোক—আত্ম-মর্য্যাদায় সে সচেতন। ময়লা কাগজের নায়কের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যার একদিন ছিল সোনার সংসার—স্ত্রী পুত্র পরিজন—বিপর্য্যয়ের মাঝে তাহাকে হইতে হইল সর্ব্বহারা। এই সর্ব্বহারার মাঝেও আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা গল্পের প্রাণবস্তু। বাংলাদেশের লেখক-দের মস্তিষ্ক-সম্ভূত শত শত ভালো গল্প আজ যাহাদের কাছে বোম্বাইয়া সস্তা যৌন-প্যাচের কবলে তলাইয়া গিয়াছে আলোচ্য চিত্র তাঁহাদের রুচি-বিগর্হিত পথে সচেতন করার সঙ্কেত-স্বরূপ বলিয়াই মনে করি। গল্প বলার মধ্যে যৎসামান্য ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিলেও—গল্প বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। সেলুলয়েডে গল্প বলার ইহাই হইল প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। টেক্‌নিক এর পরে। অবশ্য যান্ত্রিক ত্রুটী-বিচ্যুতি বা Technical defects বিশেষভাবে চোখে পড়ে। পাখার হাওয়ায় ঘর হইতে দলিল উড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। নায়কের আশা-উদ্যমহীন একটানা করুণ রস দর্শকদের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত। নায়কের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের অভিনয় এক কথায় অপূর্ব্ব। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় সংযত, স্বাভাবিক ও সুন্দর। সঙ্গীত পরিচালনার কাজ কিন্তু আমাদের নিরাশ করিয়াছে।

* * * *

সম্প্রতি শ্রীভারত লক্ষ্মী পিক্‌চার্স্‌-এর 'মা ও ছেলে' রূপবাণী, ভারতী ও অরুণায় একযোগে মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'মা ও ছেলের' কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। সুমথবাবু কথা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ছবির গল্প দেখিতে বসিয়া আমরা কিন্তু সুমথবাবুকে হারাইয়া ফেলি। ফরমাসের ইঙ্গিত আছে গল্পের মধ্যে প্রচুর। ফলে, স্থানে স্থানে অসঙ্গতি চোখে পড়ে। who's who ছবির গল্পে বা নাটকে যেটা একান্ত প্রয়োজন, সেটা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে

এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। কোথায় বন-বিভাগের কর্ম্মচারী, আর কোথায় গল্পের ঘটনা-কেন্দ্র কলকাতা। কিন্তু একটা কিছু দেখানর প্রয়োজনেই গল্পকে বনের মধ্যে লইয়া যাইতে হইয়াছে। লোকে কথায় বলে—গল্পের গরু গাছে ওঠে! —এও হইয়াছে, ঠিক তাই। কিন্তু সঙ্গতি-অসঙ্গতির কথা বাদ দিলে মোটামুটি গল্পটিকে বলা হইয়াছে ভাল। ঝাল-নোন্‌তা-টক্-মিষ্টি সব রসের সমন্বয়ে গল্পটিকে খাড়া করা হইয়াছে। একদিকে যেমন রসের সমষ্টি, অপর দিকে তেমনি

'মা ও ছেলে' কথাচিত্রের নায়িকা শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা
(সাধারণ বেশে) ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ। কাজেই দর্শকগণের নিকট ছবিটি দর্শনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরিচালনার কাজে শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। অভিনয়ের কথা বলিতে গেলে থিয়েটারের combination বা সম্মিলিত অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদের সমাবেশে যে ছবি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাকে combination screen play আখ্যা দেওয়াই ভাল।

* * * *

শ্রীকে, শ্রীনিবাসন্ সেণ্ট্রাল ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সম্প্রতি প্রধান-কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় রিজিওনাল অফিসার থাকাকালীন বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নূতন পদপ্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * * *

সম্প্রতি বোম্বাই-এর চিত্র-প্রদর্শক ও পরিবেশকদের মধ্যে ব্যবসার সমতা রক্ষার জন্য আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এতদ্-সম্পর্কে একটী পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যাইতেছে আগামী এপ্রিল মাস হইতে নূতন ব্যবসায়ী চুক্তি কার্য্যকরী হইবে। গত ২ই জানুয়ারী বোম্বাইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি ও ভারতীয় পরিবেশক সমিতির এক সম্মিলিত সভা হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শক ও পরিবেশকের মধ্যে অঙ্কের হার লইয়া যেরূপ দরকষাকষি চলে, তাহার সমন্বয় সাধনের ফলে প্রযোজকেরা বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইলে সুখের বিষয় হইবে।

* * * *

শব্দ-নিয়ন্ত্রক শ্রীশ্যাম নরীম্যান পোপাত সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল সুনামের সহিত শব্দ-নিয়ন্ত্রণের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি এস-এম-ইউসুফের 'গুজারা' চিত্রের শব্দ-নিয়ন্ত্রণের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন সুদক্ষ শব্দ-যন্ত্রীর তিরোভাব ঘটিল।

* * * *

ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশানের নবনির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, এস, ভাসান কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশানের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ছায়া-চিত্র-শিল্পকে প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। সংবিধানেও ইহাকে একটি আমোদ-প্রমোদের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারে ইহার যে বিরাট অবদান রহিয়াছে তাহাকে স্বীকার করা হয় নাই। অথচ যে শিল্পকে সরকারীভাবে চিত্ত-বিনোদনের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহার উপর করধার্য্য করা হইতেছে সেই শিল্পকেই আবার শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন জানান হইতেছে। উভয় প্রকার উক্তি

একদিকে যেমন সামঞ্জস্যহীন, অপর দিকে তেমনি হাস্যকর। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যেরূপ সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়—সেরূপ সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, উপরন্তু চিত্র-শিল্প সরকারী করভাবে প্রপীড়িত। সরকার জনশিক্ষার সাহায্যের জন্য এই শিল্পকে যে আহ্বান জানাইতেছেন—তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে সেই মত ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষামূলক 'অনুমোদিত' চিত্রগুলি দেখানর জন্য সরকার একদিকে যেমন প্রদর্শনে বাধ্য করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি ছবির জন্য ভাড়াও আদায় করিতেছেন।

* * * *

গত ২০শে জানুয়ারী, বুধবার রাত্রি ৩টা ৩৬ মিনিটে করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঐদিন তিনি কোন্নগরে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া যান এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অসুস্থবোধ করেন। সহসা অত্যধিক শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ায় তিনি নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের কাছে সংবাদ পাঠান। নাট্যাচার্য্য বহুক্ষণ প্রিয়তম বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন। নাট্যাচার্য্যের হাত দু'খানি ধরিয়া তিনি শেষ বিদায় চাহিয়া লন। তখন তাঁহার মুখর কণ্ঠ মৌন হইয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র চোখের ভাষায় মনের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

চির-নিদ্রায় নাট্য-মঞ্চের 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী তিনি ঢাকা জেলার কামারখাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজ হইতে আই-এস্-সি ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার সংবাদ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ঐ বছরের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়া-এ্যাক্টে কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘ চার বৎসরকাল পরে ১৯২০ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যালে ৬০৲ মাহিনায় কেমিষ্টের পদ গ্রহণ করেন। পরে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার নাট্যানুরাগ দেখা দেয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুরোধে ঢাকায় কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের সহিত তিনি সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রশেখর নাটকের নাম ভূমিকায় অবতরণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ১৯২৩ সালে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের সহিত যোগদান করেন ও সীতা নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার অভিনয় প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। ১৯৩১ সালে তিনি শিশির সম্প্রদায়ের সহিত আমেরিকা যান। তিনি একাধারে সু-অভিনেতা, নাট্যকার ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'চক্রব্যূহ' নাটকখানি নাট্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। চলচ্চিত্রেও তিনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। অভিনেতৃগোষ্ঠীর নিকট তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্য তিনি নাট্য-জগতে 'মহর্ষি' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনে একাধারে নাট্য-সাহিত্যের ও রঙ্গজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

*　　　*　　　*　　　*

বিনোদনের জন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় রচিত 'মহাভারতী' নাটকটি অভিনীত হয়। ইহা ছাড়া অপেশাদারী কয়েকটি সৌখীন সম্প্রদায়ও উক্ত প্রমোদ-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীমতী পিকচার্সে'র পঞ্চম নিবেদন 'নব-বিধানে'র নায়িকারূপে কানন দেবী

কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে কল্যাণীর কংগ্রেস নগরে বিভিন্ন দেশের অভ্যাগত নেতৃ ও কর্ম্মিবৃন্দের চিত্ত-

সভাপতিত্বে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এ বছর গিরীশ বক্তৃতা প্রদান করেন। গিরীশ

...কচারার হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ...তে এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শ্রীযুক্ত গুপ্ত বাংলা ...টক ও তাহার ক্রমবিকাশ এবং নাট্য-সাহিত্যের বিভিন্ন ...দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু যাঁহাদের ...নিকট কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ও শিশুসাহিত্যস্রষ্টা হিসাবেই পরিচিত, আলোচ্য বক্তৃতায় তাঁহাদের নিকট যোগেন্দ্রবাবুর নাটকীয় অনুরাগের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইবে।

* * * *

গত ১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ষ্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকের হীরক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পৌর-প্রধান শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীসলিল কুমার মিত্র—পরিচালক, নাট্যকার, শিল্পী ও নেপথ্য-কর্ম্মিগণকে এতদুপলক্ষে পুরস্কৃত করেন। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মন্মথমোহন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুধাংশু বসু, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, হেমেন্দ্র কুমার রায়, পঙ্কজ দত্ত, কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—অনেকের ধারণা সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতায় নাট-মঞ্চ পারিয়া উঠিতেছে না। শ্যামলীর সাফল্যে সে ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। বিশেষতঃ বোবা নায়িকাকে লইয়াও আজ নাট-মঞ্চ নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, জাতির কৃষ্টি সাধনার মূলে রঙ্গালয়ের দান অবিস্মরণীয়। দেশ ও জাতিকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে নাটমঞ্চের মাধ্যমেই তা সহজেই জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। রঙ্গালয়ের এই দুর্দ্দিনে শ্যামলীর সাফল্য রঙ্গালয়ের আশার সঞ্চার করিয়াছে। শ্যামলীর ন্যায় একটি সুমার্জ্জিত উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ ...য় বক্তা আনন্দ প্রকাশ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের নাট-মঞ্চ লইয়া সভাপতি মহাশয় আলোচনা করেন এবং নাট-মঞ্চের মধ্য দিয়া দেশ ও জাতির ... সেবা করিবার সুযোগ আছে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ... মালিকদের সতর্ক হইতে বলেন।

শ্রীশ্রীমা শতবার্ষিকী—

বর্তমান যুগের মহামানব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদামণির জন্মের শতবার্ষিক উপলক্ষে দেশের সর্বত্র সম্প্রতি উৎসব আরম্ভ হইয়াছে—উৎসবের প্রথম দিনে, বিশেষ করিয়া বেলুড় মঠে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন লেখক শ্রীমা'র জীবনকথা তথা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। বর্তমান যুগে নারীত্বের ও মাতৃত্বের আদর্শ প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও তথা রামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় শ্রীমা'র শতবার্ষিক উপলক্ষে সেই প্রচারের দ্বারা যদি দেশ উপকৃত হয় ও দেশের নারীশিক্ষার আদর্শ সুপথে পরিচালিত হয় তাহাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে, বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচিত হইলে ছাত্রীগণ উপকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীমার শত বাৎসরিক উৎসবে বেলুড় মঠে সাধারণ জনসভা — ফটো— পান্না সেন

এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা—

এলাহাবাদে (প্রয়াগে) এবার পূর্ণকুম্ভ যোগের স্নানের মেলা হইতেছে। গত ১৯শে জানুয়ারী পূর্ণিমায় স্নান আরম্ভ হইয়াছে ও আগামী শিবরাত্রিতে যোগ ও স্নান শেষ হইবে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অমাবস্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যপ্রদ স্নানের যোগ ছিল এবং সে দিন সারা ভারতের সকল স্থান হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়াছিল। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া বহু রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সেদিন এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকল সাবধানতা সত্ত্বেও জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে সেদিন প্রায় ৫ শত লোক ভিড়ের চাপে প্রাণ হারাইয়াছে ও কয়েক সহস্র লোক আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে। এই ঘটনার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না—ইহা দৈব-দুর্ঘটনাই বলা চলে। পুণ্যার্জন করিতে যাইয়া যাহারা মানুষের পদতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইল, আমরা তাঁহাদের

দিনে দিনে আরও
নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার
জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।
রোজ রেক্সোনা সাবান
ব্যবহার করুন। এর
ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপ-
নার গায়ের চামড়াকে দিনে
দিনে আরও কোমল,
আরও নির্ম্মল কোরে
তুলবে।

Rexona
Rexona

সকলের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। কর্তৃপক্ষের যে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আরও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, আমরা যেন কুম্ভমেলার দুর্ঘটনার ফলে সে শিক্ষা লাভ করি।

নিখিল-বঙ্গ সাময়িকপত্র সংঘ—

প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে গত মহাযুদ্ধের সময় যখন কাগজ দুর্মূল্য তথা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, সে সময়ে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্রিকাসমূহের সম্পাদক ও পরিচালকগণ এক বিশেষ প্রয়োজনে 'নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সংঘ' গঠন করিয়াছিলেন। প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রই সংঘে যোগদান করেন। মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি আকারে ছোট হইলেও তাহাদের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক—সেকথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ দৈনিকসংবাদপত্রসমূহের কর্মী লইয়া গঠিত 'ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি' সে সময়ে দৈনিক পত্রের স্বার্থ সংরক্ষণে অধিক ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা সাময়িক-পত্রগুলির স্বার্থরক্ষায় তেমন মনোযোগ না দেওয়াতেই নূতন সংঘ গঠনের প্রয়োজন হয়। তদবধি এই সংঘ বিভিন্ন কর্মীর পরিচালনায় সাময়িক-পত্রগুলিকে নানাভাবে সাহায্যদান করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ক্রমে সংঘের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রেস কমিশন কলিকাতায় আগমন করিলে সংঘের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাময়িক-পত্রসমূহের অসুবিধার কথা তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন এবং নিজেদের দাবী সেখানে পেশ করিয়াছেন। ঐ দলে সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ), সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (সংহতি), যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট), সদস্য শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ (যুগবাণী), সদস্য শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী (অর্চনা) ও সদস্য শ্রীরবিরঞ্জন সিংহ (কমার্স-এসিয়া) ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সংঘ যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা সংঘের সদস্যগণ ও দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী প্রচার বিভাগে বার বার নিবেদন জানাইয়াও সাময়িকপত্রসমূহ এখনও উপযুক্ত মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই—মধ্যে মধ্যে সামান্যমাত্র অধিকার বা মর্যাদা লাভে সংঘ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সেজন্য আমরা সংঘের সদস্যগণকে অধিকতর উৎসাহের সহিত এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

'বনফুল' সম্মানিত—

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক, ভাগলপুর-প্রবাসী ডাঃ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বনফুল' এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতামালা' প্রদানের জন্য আহুত হইয়াছেন। তিনি
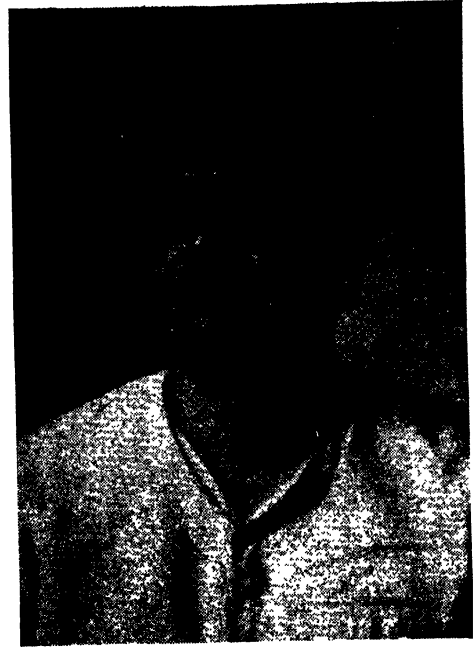
ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান করিবেন। বলাইবাবু কেবল বিখ্যাত সাহিত্যিকই নহেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও তাঁহার সকল লেখায় পরিস্ফুট। তাঁহার এই সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন অনুযায়ী চ্যান্সেলার মহোদয় অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষকে আগামী ৩ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের তদারক

॰রিবেন ও অর্থনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। তিনি ॰দাধিকার বলে সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য থাকিবেন। গুরুত্বের দিক হইতে কোষাধ্যক্ষের পদের গুরুত্ব ভাইস-চ্যান্সেলারের পদের পরই। অধ্যাপক ঘোষ সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপক ও শাসন-ব্যবস্থা-পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার এই নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

বিশাখাপত্তনে নিখিল ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন—

অন্ধ্র শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার সংস্কৃতি সংযোগ পরিষদ নামক সংস্থার উদ্যোগে গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর বিশাখাপত্তন টাউন হলে এক নিখিল ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বাংলাদেশ হইতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনী-কুমার ভদ্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন- প্রসঙ্গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে সেগুলির সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইতে হবে। শ্রীযুত নলিনীকুমার ভদ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে অন্ধ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক বীরেশলিঙ্গম পান্তলু বাংলা-দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে অন্ধ্রদেশে নবযুগের প্রবর্তন করেন। বস্তুতঃ বীরেশ-লিঙ্গমকেই বলা চলে বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক মিলনের প্রথম পথিকৃৎ।" এই সভার শেষে শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার নিখিল ভারত সংস্কৃতি সংযোগ পরিষদের (All India cultural contact Committee) নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ও শ্রীভি. কে. দত্ত-শর্মা ইহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিশাখাপত্তন, নিখিল ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান—ডানদিক হইতে (প্রথম) ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, (দ্বিতীয়) শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা, (তৃতীয়) শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, (পঞ্চম) শ্রী ভি. রামস্বামী (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

শিল্পী দেবীপ্রসাদের সম্মান—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী, সাহিত্যিক ও ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে পাটনায় যাইয়া তথায় সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ভারলাভ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের জন্য ৭জন দেশকর্মী পাটনার সরকারী দপ্তরখানা দখল করিবার উদ্দেশ্যে উহার সম্মুখে যে স্থানে প্রাণদান করেন, তথায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। স্মৃতিস্তম্ভ সাড়ে ৭ ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জ নির্মিত হইবে। উহার নির্মাণ করিতে ২ বৎসর সময় লাগিবে। ভাস্কর দেবীপ্রসাদ উহা নির্মাণ করিবেন। দেবীপ্রসাদ ঐ উপলক্ষে পাটনায় যাইলে স্থানীয় সুহৃদ পরিষদ লাইব্রেরী, শিল্পীকলা পরিষদ, শিল্পী শ্রীদামোদর অম্বষ্ঠ, পাটলীপুত্র ক্লাব, ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির প্রভৃতির

পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। শিল্পী দেবীপ্রসাদের এই সম্মান বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবে। শুধু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যে নহে, দেবীপ্রসাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অবদানের জন্য ও সর্বজনপরিচিত।

২৪পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালার দুর্গত ও শ্রমিকদের দুঃখে তিনি তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন—বারাকপুর মহকুমার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকগণ এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণকে তিনি দরদের

আড়িয়াদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্তা কৃষ্ণাহাতী সিং প্রভৃতি

পরলোকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম খ্যাতনামা বিপ্লবী-নেতা ও কংগ্রেস কর্মী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় গত ১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮টায় ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হালিসহরে এক সভায় বক্তৃতা করিয়া ট্রেণে প্রত্যাবর্তনকালে অসুস্থ হন ও শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে এম্বুলেন্সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নীত হইবার পর ১০ মিনিটের মধ্যেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে মৃত্যু সচরাচর দেখা যায় না। অতি অল্প বয়সে ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে তিনি বিপ্লববাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন এবং জীবনের প্রায় ২৪ বৎসরকাল তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি ২৪পরগণার হালিসহরের বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কর্মক্ষেত্র বঙ্গদেশ হইলেও বারাকপুর মহকুমার গ্রামগুলি তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। ১৯২০ সাল হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে আস্থাবান হইয়া কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন এবং মৃত্যুকালে তিনি

সহিত ভালবাসিতেন ও শেষ জীবনে অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মত নির্ভীক কর্মী, বলিষ্ঠ নেতা, চরিত্রবান জননায়ক বর্তমান যুগে অতি দুর্লভ। লোভ কোনদিন তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই—কোনরূপ মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। অভিমানশূন্য হইয়া তিনি আজীবন দেশসেবা ও জনসেবা করিয়া গিয়াছেন—কোনরূপ প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিশ্রামের জন্য হালিসহরে গঙ্গাতীরে এক আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন—কিন্তু তথায় তাঁহার স্থায়ীভাবে বাসের সুযোগ আসিল না। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার গুণগ্রাহী সুহৃদ, হালিসহরবাসী খ্যাতনামা বদান্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী তাঁহার স্মৃতিফলকে যে কবিতা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিপিনবিহারীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই—

ধরণীর ধন করেনি তাহারে জয়
আদর্শে কভু মানেনি যে পরাজয়

দেশের সেবায় জীবন করেছে ক্ষয়
ধন্য বিপিন, জয় বিপিনের জয়।

পরলোকে ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—

ভারতের খ্যাতনামা কৃষি-বিজ্ঞান-বিদ্, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে লণ্ডনে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং রাজকীয় কৃষি কমিশনের সদস্য ছিলেন। গত ২২ বৎসরকাল তিনি লণ্ডনে বাস করিয়া কৃষি ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা নন্দিতা কৃপালানী তাঁহার নিকট ছিলেন।

পরলোকে অজয়চন্দ্র দত্ত—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কোবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস'এর একমাত্র পুত্র অজয়চন্দ্র দত্ত (ব্যারিষ্টার) গত ২রা ফেব্রুয়ারী সকালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন কলিকাতায় করোনারের কাজ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও আইন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় সুধী ও পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৯৪১ সালে অবসর গ্রহণের পর পিতার কয়েকখানি বাংলা উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মানভূমে টুসু সত্যাগ্রহ—

টুসু বা তুষু পরব মানভূম জেলার একটি বিশিষ্ট পর্ব। গুণবান স্বামী বা ধন ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে কুমারীরা টুসু দেবীর পূজা করে ও এই ব্রত পালন করে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালনের কাল। কিন্তু টুসু পরবের জের সাধারণতঃ বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সিকান পর পর্যন্ত চলিয়া থাকে। বাংলা দেশে প্রচলিত 'তুঁষ্ তুষুলি বা তোষলা' ব্রতই মানভূমে 'টুসু পরব' নামে পরিচিত। এবার টুসু গানের মধ্য দিয়া মানভূম জেলায় বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী করা হইয়াছে—যে সব গান গাহিয়া সত্যাগ্রহ করা হয়, তাহা গ্রাম্য কবিদেরই লেখা।

বৈদ্যনাথ মাহাত রচিত গান—

আসছে কমিশন,
আমাদের ভাষার করতে নিরূপণ,
ভাষা নিয়ে প্রদেশ গঠন
গান্ধীজি করে মনন।
অনশনে জীবন দিয়ে
হয়েছে অন্ধ্র গঠন।
ভারতবাসীর দাবীর ফলে
নেহরুর মন্ত্রীগণ,
সীমা নিরূপণ হেতু, গঠন করল কমিশন।

ভজহরি মাহাত (এম-পি) রচিত গান—

পররাজা সব বসে আছে
হিন্দি রাজের বাগানে,
সবাই এরা যাবে চলে
গণ দাবীর এক টানে।
সবাই মোরা চাইরে যেন
বাংলা ভাষায় কাজ চলে,
কত সুখে দিন কাটাবো
মাতৃ ভাষায় গান বলে।

মানভূমে বাংলার দাবী বুঝাইবার জন্য লোক-সেবক-সংঘের কর্মীরা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নেতৃত্বে টুসু গান গাহিয়া কারাবরণ করিতেছেন। তাহার ফলে সত্যাগ্রহীদের নানাভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। টুসু গান এখন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রও গীত হওয়া প্রয়োজন। বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষ না পাইলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীদের বাসের স্থান হইবে না—ভাষা-ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য যে-কমিশন গঠিত হইয়াছে, তাহাকে একথা বুঝাইবার জন্য এখন কলিকাতায় টুসু গান গাহিয়া বাঙ্গালীর দাবী সকলকে জানানো দরকার।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪১৬ (পাঞ্জাবী ১০৭, উমরীগড় ৮৭, ফাদকার ৬৩ এবং মুস্তাকআলী ৫৮। আইভারসন ৯৬ রানে ৪ উইঃ) ও ১৬৮ (২ উইকেটে ডিক্লেঃ রায় ৫৮, মুস্তাকআলী নট আউট ৭০)

রজতজয়ন্তী দল ঃ ৩৪৫ (মিউলম্যান ১৩১। ভাণ্ডারী ৯০ রানে ৩ এবং ফাদকার ৮ রানে ৩ উইঃ) ও ৬৪ (৩ উইকেটে)

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম রজতজয়ন্তী দলের ৫ম অর্থাৎ শেষ বে-সরকারী টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ ২-১ টেষ্ট খেলায় জয়লাভ করে 'রাবার' সম্মানলাভ করেছে। এই টেষ্ট সিরিজে ২টি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, ভারতবর্ষ ২টি খেলায় জয়ী হয় এবং রজতজয়ন্তী দল জয়ী হয় ক'লকাতার ৩য় টেষ্ট খেলায়।

বৃষ্টির দরুণ নির্দ্ধারিত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে খেলা হয়নি, ফলে পাঁচদিনের একটা দিন বিফলে নষ্ট হয়। খেলাটা চারদিনে দাঁড়ায়; ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে খেলা আরম্ভ হয়, তাও নির্দ্ধারিত সময় থেকে এক ঘণ্টা পরে। ভারতবর্ষ ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মুস্তাকআলীর খেলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এদিনে তাঁর খেলার জৌলুষ বিগত দিনের মুস্তাকআলীর খেলার কথাই দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। যাঁরা মুস্তাকআলীকে অবসরপ্রাপ্ত টেষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে ধরেন এবং তাঁর খেলার পূর্ব্ব জৌলুষ নিষ্প্রভ হয়েছে মনে করেন তাঁরা ভুল বুঝতে পেরেছেন। এইদিন টেষ্ট খেলায় নবাগত খেলোয়াড় পাঞ্জাবীর নট আউট ৮৭ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ৪১৬ রানে ১ম ইনিংস শেষ হয়। পাঞ্জাবী সেঞ্চুরী করেন, রান ১০৭। উমরীগড় ৮৭ এবং ফাদকার ৬৩ রান করেন। রজতজয়ন্তী দল ২ উইকেটে ৬৫ রান করে। চতুর্থ দিনে রজতজয়ন্তী দলের ১ম ইনিংসের ৬ উইকেট পড়ে ৩১৫ রান ওঠে। মিউলম্যান সেঞ্চুরী করেন, ১৩১ রান। পঞ্চম দিনে রজতজয়ন্তী দলের প্রথম ইনিংস ৩৪৫ রানে শেষ হয়। আহত থাকায় আগেরদিন অধিনায়ক ফাদকার খেলতে নামেননি; আজ ৫ ওভার বল ক'রে ২টো মেডেন নিয়ে ৮ রানে ৩টে উইকেট পান। ভারতবর্ষ ৭১ রানে এগিয়ে থেকে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে এবং চা-পানের সময় ২ উইকেটে ১৬৮ রান ক'রলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। মুস্তাকআলী এবারও ভাল খেললেন, ৭০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। মুস্তাকআলী এবং রায়ের ২য় উইকেটের জুটিতে ৯৯ রান ওঠে ৮০ মিনিটের খেলায়। রজতজয়ন্তী দল যখন ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো তখন আর খেলার ১ঘণ্টা সময় আছে এবং রজতজয়ন্তী দলের পক্ষে জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ২৪০ রান। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব ব্যাপার বলেই খেলার আর কোন আকর্ষণ রইলো না। নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে রান উঠেছে ৬৪, উইকেট পড়েছে ৩টে। খেলাটি ড্র গেল। ৫ম টেষ্ট খেলায় ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচের বিজয়ী অধিনায়ক গোলাম আমেদ পারিবারিক কারণে যোগদান করতে না পারায় ভারতীয় দল যে একজন নিপুণ খেলোয়াড়ের

সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া অধিনায়ক ফাদকার এবং গুপ্তে আহত থাকার দরুণ খেলার ৪র্থ দিনে খেলতেই নামেননি।

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৪০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; রায় ১৪১, রামচাঁদ ৯৬ এবং কেনী ৬৫)

রজত জয়ন্তী দল ঃ ২২২ (মিউলম্যান ১২৪ ; গোলাম আমেদ ৫১ রানে ৫ এবং গুপ্তে ৯৬ রানে ৪ উইঃ) ও **১৬৮** (ওয়াটকিন্স ৪৪ ; গুলাম আমেদ ৪২ রানে ৭ এবং গুপ্তে ৯২ রানে ৩ উইঃ)

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম রজত জয়ন্তীদলের ৪র্থ বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস এবং ৫০ রানে জয়ী হয়েছে। এই ৪র্থ টেষ্ট খেলা ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

চতুর্থ টেষ্ট খেলায় এই কয়জন খেলোয়াড় প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে গোলাম আমেদ এবং সুভাষ গুপ্তে এবং ব্যাটিংয়ে পঙ্কজ রায় (১৪১), রামচাঁদ (৯৬) এবং কেনী (৬৫)। রজত জয়ন্তীদলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে মিউলম্যান (১২৪)। ফিল্ডিংয়ে দুই দলের মধ্যে মিউলম্যান শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বলের পেছনে দৌড়, বল ধরা, বল মাটি থেকে তোলা এবং ছোড়া—সব দিক থেকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন.। ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ৪ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২১৮ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিন ভারতবর্ষ ৯ উইকেটে ৪৪০ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। বাকি আধ ঘণ্টার খেলায় রজত জয়ন্তীদল ১ উইকেট হারিয়ে ২২ রান করে। তৃতীয় দিন ৮ উইকেট পড়ে রজত জয়ন্তীদলের ১৮৯ রান ওঠে। ১০০ রানে তাদের অর্দ্ধেক উইকেট পড়ে যায়। মিউলম্যান ৯৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। দলের পতনের মুখে মিউলম্যান এবং লক্সটোনের জুটিতে যে ৬৪ রান উঠে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ দিন মিউলম্যান শতরান পূর্ণ ক'রে নিজস্ব ১২৪ রানে গুপ্তের বলে বোল্ড হ'ন। তিনি ৩২২ মিনিট ব্যাট ক'রে মোট ৬টা বাউণ্ডারী করেন। ২২২ রানে ১ম ইনিংস শেষ হলে ২১৮ রান পিছনে পড়ে রজত জয়ন্তীদল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ২য় ইনিংসের সূচনাও ভাল হ'ল না। নির্দ্ধারিত সময়ে ৪ উইকেট পড়ে রান দাঁড়াল মাত্র ৯৪। পঞ্চম দিনের ২-১৫ মিনিট সময়ে রজত জয়ন্তীদলের ২য় ইনিংস ১৬৮ রানে শেষ হয়ে গেলে ভারতবর্ষ ১ম ইনিংস এবং ৫০ রানে জয়লাভ করে। পঞ্চম দিনের খেলায় বাকি ৬টা উইকেটে ৭৪ রান ওঠে। গোলাম আমেদ এ খেলাতে ৯৩ রানে ১২টা উইকেট পান। গুপ্তে পান ৭টা, ১৮৮ রানে।

অল্ ইণ্ডিয়া হার্ড কোর্ট টেনিস ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অল্ ইণ্ডিয়া হার্ড কোর্ট টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার আর্কিনস্টল ৩-১ সেটে (৬-৪, ৬-৩, ৪-৬, ৬-২ গেমে) জাতীয় লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ান আর কৃষ্ণণানকে হারিয়ে জাতীয় লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কুমারী রীতা দেভর মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে (আর কৃষ্ণণানের সহযোগিতায়) জয়লাভ ক'রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। আর কৃষ্ণণান পুরুষদের ডবলস (আর্কিনস্টলের সহযোগিতায় এবং মিক্সড ডবলস ফাইনালে জয়লাভ করেন।

জাতীয় বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

জাতীয় বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ খেলার ফাইনালে বোম্বাইয়ের উইলসন জোন্স, বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান সি হিরজীকে হারিয়ে চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি উপর্যুপরি ৩বার (১৯৫১-৫২) চ্যাম্পিয়ানসীপ পান।

জাতীয় লন টেনিস ঃ

১৯৫৩ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ষোল বছরের তরুণ খেলোয়াড় আর, কৃষ্ণাণ স্ট্রেট সেটে অষ্ট্রেলিয়ার জ্যাক আর্কিনষ্টলকে হারিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে জাতীয় প্রতিযোগিতায় এত কম বয়সে কেউ জয়ী হতে পারেন নি।

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ আর কৃষ্ণাণ ৬-২, ৬-৩, ৭-৫ গেমে জ্যাক আর্কিনষ্টলকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ঃ মিস আর দাভর ০-৬, ৬-২, ৬-২ গেমে মিস উর্ম্মিলা থাপরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে ঃ ইফতিকার আমেদ (পাকিস্তান)

এবং আর্কিনস্টল ৩-৬, ৫-৭, ৮-৬, ৭-৫, ৬-৩ গেমে নরেশকুমার এবং নরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস: ইফ্‌তিকার আমেদ এবং মিস সাইক (ওয়াকওভার)। নরেন্দ্রনাথ এবং উর্ম্মিলা থাপর খেলায় যোগদান করেননি।

জাতীয় টেবল টেনিস ঃ

১৯৫৩ সালের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৫-০ খেলায় বাংলাকে হারিয়ে পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে হায়দ্রাবাদ, বোম্বাইকে ৩-১ খেলায় হারিয়ে। ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন—পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলসে এস কে থ্যাকাসি (বোম্বাই), মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস সুলতানা (হায়দ্রাবাদ), পুরুষদের ডবলসে ইউ চন্দ্রণা এবং সোমান (বোম্বাই), মহিলাদের ডবলসে মিস সুলতানা এবং শ্রীমতী বিজয়া রাজগোপালন (দিল্লী) এবং মিক্সড ডবলসে মিস সুলতানা এবং রণবীর ভাণ্ডারী (বাংলা)।

জাতীয় ব্যাড্‌মিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

ইণ্টার-স্টেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৩-০ খেলায় দিল্লীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন—পুরুষদের সিঙ্গলসে নন্দু নাটেকার (বোম্বাই), পুরুষদের ডবলসে মনোজ গুহ এবং গজানন হেমাডী (বাংলা), মহিলাদের ডবলসে মিস রেগে এবং মিস ভাট (বোম্বাই) এবং মিক্সড ডবলসে নাটেকার এবং মিস ভাট (বোম্বাই)।

সাহিত্য-সংবাদ

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "গিরিচূড়ার বন্দী" (২য় সং)—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (৩য় পর্ব—১৪শ সং)—৩৲, "নিষ্কৃতি" (২৪শ সং)—১॥০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার পতন" (১৭শ সং)—২৲
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জ্জুন" (২৩শ সং)—২॥০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" (৩১শ সং)—২
নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কৌতুক-নাট্য "রাতকাণা" (১৩শ সং)—॥৵০
ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী প্রণীত "ক্ষয়রোগ কথা"—৩৲
অমলা দেবী প্রণীত উপন্যাস "ছায়াছবি"—২॥০
সন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পারাবত"—৩৲
শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নিখরচায় জলযোগ"—১॥০
সুমিত্রা প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "দীপিকা"—২৲
মালীবুড়ো প্রণীত "যে শিশু আনিল মুক্তি"—৸০
শ্রীবাস্তব প্রণীত নাটক "মহাযুদ্ধের একাঙ্ক"—১৲
নিরুপম ভট্টাচার্য্য, মৃণাল খাস্তগীর, শ্রীরেখা মজুমদার ও শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "আমি কেন কম্যুনিষ্ট নই?"—
ব্রজকিশোর শাস্ত্রী প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ—"চীন ঘুরে এলাম"—৵০
শ্রীঅরুণ বসু ও শ্রীঅম্লান দত্ত প্রণীত "সোভিয়েত অর্থনীতি বিষয়ে সত্যাসত্য"—
শ্রীসীতারাম গোয়েল প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ "নানা চোখে দেখা চীন—কাহাকে বিশ্বাস করিব?"—

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

Sulekha
PERMANENT
BLUE-BLACK
Sulekha
SULEKHA WO
CALCUTTA
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন কালি
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালির
সমকক্ষ
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক · কলিকাতা ৩২
ইহাতে সলভেন্ট 'এস-১০০' আছে

চৈত্র—১৩৬০

দ্বিতীয় খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

মহাভারতে গান্ধারী

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

মহাভারত অসংখ্য চরিত্রের চিত্রশালা। কিন্তু এই চিত্রশালার মধ্যে যে চিত্রের প্রতি মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করেছেন, সেটি হচ্ছে গান্ধারীর চিত্র। মহাভারতের ভূমিকায় মহাকবি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করছেন গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতার কথা—"গান্ধার্য্যাঃ ধর্ম্মশীলতাম্"। ধর্ম্মকে গান্ধারী সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন তাঁর জীবনে, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে তিনি রক্ষা করে গেছেন। সর্ব্বনাশের মধ্যেও তিনি বলতে পেরেছেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ", অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। গান্ধারীকে মহাভারতের মহাকবি নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন—দীর্ঘদর্শিনী, সত্যবাদিনী, তপস্বিনী ইত্যাদি। গান্ধারীর দীর্ঘ দৃষ্টি ছিল এবং তাঁর বাক্যও ছিল অমোঘ। তপস্যার প্রভাবে তিনি এই দীর্ঘদৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ধর্ম্মশীলতা বা ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু। দীর্ঘদৃষ্টি প্রভাবে গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে সমস্ত বিশ্বজগৎ, ধর্ম্মই ধারণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—"ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ"। সুতরাং ধারণাশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য। ধর্ম্ম লঙ্ঘিত হলে পৃথিবী কাউকে ক্ষমা করেনা। ধর্ম্ম রক্ষা পেলে মানুষ এবং সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা পায়। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে এই প্রত্যয় গান্ধারীর মনে সুদৃঢ় হয়েছিল বলেই ধর্ম্ম যেখানে পীড়িত হচ্ছে সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদে তিনি নিজের ব্যক্তিগত লোভ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। বরং সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েও একমাত্র ধর্ম্মকে জীবনের প্রত্যেক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আশ্রয় করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আবেদনে, পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি তিরস্কারে, এমন কি যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎর্সনায়, গান্ধারীর এই ধর্ম্মশীলতা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

গান্ধারী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার

দেশের রাজা. সুবলের কন্যা। এই জন্য তাঁর নাম গান্ধারী বা সুবলাত্মজা। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম কুরুরাজ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একটি সুন্দরী, শুদ্ধশীলা, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর খোঁজ করছিলেন। গান্ধার-রাজের কাছে তিনি দূত পাঠালেন, বিবাহের প্রস্তাব করে। প্রথমে গান্ধারীর পিতা সুবলের মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল যে যাঁর হাতে স্নেহের কন্যাকে সম্প্রদান করবেন তিনি জন্মান্ধ। "অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য বিচারণা।" কিন্তু পরক্ষণেই কুরুরাজবংশের কুল, খ্যাতি এবং সদাচারের কথা বিবেচনা করে ধর্ম্মচারিণী গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সম্প্রদান করতে মনস্থ করলেন। গান্ধারীও শুনলেন যে একজন জন্মান্ধ রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব এসেছে এবং তাঁর বাপ-মা সেই প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। তখনই তিনি একখণ্ড পট্টবস্ত্র নিয়ে, তাকে অনেক ভাঁজ করে, নিজের দুই চোখ বেঁধে ফেললেন, কেননা তাঁর মনে হল যে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্ম্মিণী চোখ খুলে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে পারে না।

> ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং শুভা।
> ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্! পতিব্রতপরায়ণা॥

গান্ধারীর বিবাহ হল, পরে হস্তিনাপুরে এসে। কিন্তু তিনি বাগদত্তা এই কথা শুনেই বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর মতো আচরণ আরম্ভ করেছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে গান্ধারী তাঁর শীল এবং সদাচারের দ্বারা সমস্ত কুরুকুলের তুষ্টিসাধন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধারীর সবচেয়ে দুঃখের কারণ ঘটেছিল যে দেবতার আশীর্ব্বাদে একশ' পুত্র লাভ করেও, একটিকেও তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্ররূপে পাননি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন অন্ধ বৃদ্ধ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। কেননা হস্তিনাপুরের নিকটেই ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁরই জ্ঞাতিভাই যুধিষ্ঠির খ্যাতি ও যশের সঙ্গে রাজত্ব করছেন, এ দৃশ্য দুর্য্যোধনের অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে দুর্য্যোধন সন্তাপগ্রস্ত হলেন। হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তিনি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে, বিষ খেয়ে বা অগ্নিতে প্রবেশ করে বা জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করবেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্যশ্রী তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। যারা ছোট তাদের স্পর্দ্ধা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা বড় ছিল তাদের প্রভুত্ব হ্রাস পাচ্ছে, "কনীয়াংসো বিবর্দ্ধন্তে জ্যেষ্ঠা হীয়ন্ত এব চ।"

পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে দুর্য্যোধনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র— পাণ্ডবদের যদি অতিক্রম করতে চাও তা হলে সদাচারের দ্বারা এবং চরিত্রবলের দ্বারা তাদের ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর। "শীলবান্ ভব পুত্রক।" কিন্তু অবশেষে পুত্রের কথাতেই রাজী হলেন এবং কপট দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রদের। হস্তিনাপুরের প্রকাশ্য রাজসভায় সর্ব্বজন.সমক্ষে অক্ষক্রীড়া চলছে, যুধিষ্ঠির বার বার তাঁর সম্পত্তি পণ রেখে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন। রাজসভায় সমাসীন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী বিদুরকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে এবং হর্ষের সঙ্গে বার বার প্রশ্ন করছেন, বিদুর এবার আমরা কী জিতলাম? ধৃতরাষ্ট্র এতদূর কর্ত্তব্যবুদ্ধিচ্যুত হয়েছিলেন যে রাজসভায় রাজাসনে বসে, তিনি নিজের রাজকীয় মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারছিলেন না। নিজের আকারে এবং ইঙ্গিতে বার বার ধরা দিচ্ছিলেন, যে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সর্ব্বনাশে জ্যেষ্ঠতাত আজ উল্লসিত।

> ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্ট পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
> কিং জিতং কি জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত॥

পিতা যখন এই অশোভন উল্লাসে মত্ত, ঠিক তখনই অন্তঃপুরে মাতা গান্ধারী "শোককর্ষিতা"। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে আবেদন জানালেন পুত্র দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য। গান্ধারী বললেন—

> তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।

গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন যে অধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত রাজবৈভব বেশী দিন টিকতে পারে না। সেইজন্য তিনি বার বার স্বামীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যে তিনি যেন মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণের মতের অনুমোদন না করেন। "মা বালা নাম শিষ্টানামনুমংস্থা মতিং প্রভো।" এ প্রত্যয় তাঁর হয়েছিল যে পাণ্ডবদের কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় কুরুকুলের ধ্বংসের কারণ হবে। তাই করযোড়ে স্বামীকে বলেছিলেন, "মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।" বলেছিলেন

নিজের দোষে যেন বিপদসমুদ্রে তিনি ডুবে না যান—"মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।" গান্ধারীর আবেদন, সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর প্রার্থনা দারুণ প্রার্থনা মনে করেই সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। গান্ধারীর দৃপ্ত ভাষণ "ত্যাগ করো দুর্য্যোধনে" নিষ্ফল হয়ে রইল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতচর্য্যার পর পাণ্ডবেরা ফিরে এসেছেন। মৎসরাজ্য সীমান্তে উপপ্লব্য নগরে শিবির সংস্থাপন করে হস্তিনাপুরে দূত পাঠিয়েছেন তাঁরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। কুরুসভায় আলোচনা হচ্ছে পাণ্ডবদের প্রস্তাব সম্বন্ধে। ধৃতরাষ্ট্র এবার ভীত এবং সন্ধিপ্রস্তাব সম্বন্ধে আগ্রহশীল। কিন্তু পুত্র দুর্য্যোধন কথা শুনছে না। পুত্রের অনমনীয় মনোভাব দেখে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনালেন—যদি মায়ের কথা শুনে অবাধ্য দুর্য্যোধন বশীভূত হয়। গান্ধারী সেদিন কিছু-মাত্র দ্বিধা না করে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ধর্ম্মবিহীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির চেষ্টা পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে। বলেছিলেন দুর্য্যোধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, জীবন কিছু থাকবে না। পিতামাতাকে শোকানলে দগ্ধ করে এবং শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করে জীবনের শেষ দিনে তুমি আমার এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করবে।

তারপর আবার যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শান্তি সংস্থানের জন্য শেষ চেষ্টা করতে হস্তিনাপুরে কুরুসভায় এলেন, তখনও মহাপ্রাজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর ডাক পড়ল প্রকাশ্য কুরুসভায়। তিনি অনেক অনুনয় করে পুত্র দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম্ম নেই, অর্থ নেই, সুখ নেই। সব সময় যুদ্ধে বিজয়ও ঘটে না, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও।

ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্ম্মার্থে কুতঃ সুখম্।
না চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ॥

বলেছিলেন—তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। লোভ সর্ব্বনাশের কারণ হয়, লোভকে পরিত্যাগ কর, পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তির সূত্রে আবদ্ধ হও।

দুর্য্যোধন মায়ের অর্থপূর্ণ বাক্য অবজ্ঞা করে রাজসভা থেকে চলে গেলেন। গান্ধারীর হিতকথা কোনও কাজেই লাগল না। "পৃথিবী ক্ষয়-কারক" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে পড়ল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে গান্ধারীর মনে কোনও সংশয় ছিল না। দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—অর্থাৎ ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পুত্র দুর্য্যোধন গান্ধারীর কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্য আসত, তখন গান্ধারী আশীর্ব্বাদা-কাঙ্ক্ষী পুত্রকে আর কোনও কথা না বলে কেবলমাত্র এই বাক্য উচ্চারণ করতেন যে, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। দুর্য্যোধন মায়ের কাছে অনেক অনুনয় করে বলত—মা, জ্ঞাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছি, শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তুমি আশীর্ব্বাদ করো, বলো আমার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। কিন্তু ধর্ম্মশীলা গান্ধারী পুত্রের কাতরোক্তিতে একটুও বিচলিত না হয়ে আঠারো দিন ধরেই অবিকম্পিত কণ্ঠে একই কথা বলেছেন—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

তারপর যখন সব শেষ হ'য়ে গেল এবং আঠারো দিনের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিশ্চিহ্ন হল, এবং দুর্য্যোধনও ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ভগ্নজানু হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ভয় হল। বিজয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদ উপস্থিত হল। যুধিষ্ঠিরের এখন চিন্তা হল—মহাভাগা তপসান্বিতা গান্ধারী তাঁর পুত্রবধের কথা শুনে কি ভাববেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না যে দুর্য্যোধন অন্যায়ভাবে গদাযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন—গান্ধারীর কাছে গিয়ে তাঁর ক্রোধের শান্তিবিধানের জন্য। যুধিষ্ঠিরের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে ক্রোধদীপ্তা গান্ধারী ত্রিলোক এবং পাণ্ডবদেরও ভস্মীভূত করতে পারেন তাঁর মানসাগ্নির দ্বারা। সেই জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ "পুত্রব্যসনকর্ষিতা" গান্ধারীর নিকট প্রেরিত হলেন তৎক্ষণাৎ। হস্তিনাপুরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে প্রণাম করলেন এবং শোককর্ষিতা গান্ধারীকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ গান্ধারীর "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—এই মহাবাক্যকেই সপ্রমাণ করেছে। সুতরাং গান্ধারীর শোক করা উচিত নয় এবং পাণ্ডবদের বিনাশকামনাও তাঁর পক্ষে বিধেয় নয়।

তপস্যার বলে এবং ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা গান্ধারী সমস্ত

পৃথিবীকে দগ্ধ করে ফেলতে পারেন—একথা শ্রীকৃষ্ণ বার বার উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে গান্ধারী স্বীকার করলেন যে শোকাগ্নি তাঁর চিত্তকে বিচলিত করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্যে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। কিন্তু তা হলেও তখনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা মুখ ঢেকে পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

গান্ধারীর বিলাপ মহাভারতে এই প্রথম। এ কথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে ধর্ম্মপ্রাণা যতব্রতা তপস্বিনী গান্ধারীও পুত্র শোকে বিহ্বল হয়ে রোদন করেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শোককর্ষিতা মাতাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে রওনা হলেন।

শতপুত্রবিয়োগ ব্যথায় কাতর গান্ধারী আবার কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য্য হারালেন। অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্র এবং শুক্লবস্ত্র পরিহিতা পুত্রবধূদের নিয়ে, বদ্ধনয়না গান্ধারী কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে এসেছেন পুত্রপৌত্রদের খোঁজ নেবার জন্য। এবার পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তাঁর মনের এই অভিপ্রায় জেনে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং উপস্থিত হলেন গান্ধারীর সম্মুখে এবং তাঁকে বললেন যে পাণ্ডবদের প্রতি কোপ প্রদর্শন বা শাপ-বাক্য উচ্চারণ গান্ধারীর পক্ষে বিধেয় হবে না, কেন না গান্ধারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনই পুত্র দুর্য্যোধনকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। এখন সত্যবাদিনী গান্ধারীর অসত্য-ভাষণ অসঙ্গত হবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গান্ধারীকে বললেন যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে, পুত্রপৌত্রদের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে আরেক বার ঘোষণা করতে হবে যে অধর্ম্ম পরাভূত হোক এবং ধর্ম্মের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠুক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গান্ধারীকে বলেছিলেন : "অধর্ম্মং জহি ধর্ম্মজ্ঞে যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যেমন, শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তেমনি আবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে গান্ধারী বললেন যে পুত্র-শোকে ক্ষণকালের জন্য তাঁর মন বিহ্বল হয়েছিল। পাণ্ডবেরা তাঁর স্নেহের পাত্র। কুন্তীর কাছে তারা যেমন প্রতিপাল্য, তেমনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কাছেও তারা রক্ষণীয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সান্ত্বনা লাভ করে গান্ধারী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু তা হলেও তখনি আবার প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ঠির কোথায়? গান্ধারীর প্রশ্ন শুনে যুধিষ্ঠির কম্পিত-পদে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, দেবী, আমিই তোমার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির। আমি শাপার্হ। আমার জন্য পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে। তোমার যত অভিশাপ আমাকে দাও। এই কথা বলে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পদযুগল ধারণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর পট্টবস্ত্রের ফাঁক দিয়ে গান্ধারীর চোখের দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙ্গুলের ওপর পতিত হল। তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরের সুন্দর অঙ্গুলিযুক্ত পা "কুনখী" বা কুৎসিত হয়ে গেল। বাসুদেব এবং অর্জ্জুন তখনই এগিয়ে এসে মাতা গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলেন। সমীপস্থ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারী বললেন—আমার পুত্র দুর্য্যোধন কতবার আমার কাছে প্রার্থনা করেছে—

অস্মিন্ জ্ঞাতি সমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে।

মা, এই জ্ঞাতি যুদ্ধে আমার জন্য জয়-বাক্য উচ্চারণ কর। কিন্তু নিজের সর্ব্বনাশ আসন্ন দেখেও আমি বারবার বলেছি—ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ইত্যুক্তে জানতী সর্ব্বমহং স্বব্যসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে শত শত পুত্রপৌত্র এবং জ্ঞাতিদের ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখে আজ গান্ধারী ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারছেন না। শোকমূর্চ্ছিতা হয়ে তিনি ভূমিতে পতিত হলেন এবং গাত্রোত্থান করে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে আরম্ভ করলেন, পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা পরস্পর আত্মহত্যা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল তোমার চোখের সামনে। জনার্দ্দন, কেন তুমি এই বিনাশকে উপেক্ষা করলে? এই উপেক্ষার ফল তোমাকে পেতে হবে। পতি-শুশ্রূষার দ্বারা আমি যদি কোনও তপস্যার বল লাভ করে থাকি, তা হলে সেই তপস্যার জোরে তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার হাতের চক্র এবং গদা আমার সেই অভিশাপকে পরাভূত করতে পারবে না। কুরুপাণ্ডবেরা জ্ঞাতি-যুদ্ধে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করেছে। সেই সর্ব্বনাশ তুমি দাঁড়িয়ে দেখেছ। এই উপেক্ষার ফলে তোমাকেও জ্ঞাতি-বধসংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। আজ যেমন ভারতবংশের নারীরা রোদন

করছে, তেমনি পুত্র হারিয়ে, স্বজন হারিয়ে, বন্ধু হারিয়ে, যদুবংশের রমণীদেরও ক্রন্দন করতে হবে। আর তুমিও মধুসূদন—আজ থেকে ঠিক ৩৫ বছর পরে, "হতজ্ঞাতির্হ-তামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ" হয়ে কুৎসিত ভাবে নিহত হবে।

> ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন।
> যস্মাত্ত্বয়া মহাবাহো ফলং তস্মাদবাপ্নুহি॥
> পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতম্।
> তেন ত্বাং দুরবাপেন শাপ্স্যে চক্রগদাধর॥
> যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
> উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি॥
> ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
> হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
> কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধিনং সমবাপ্স্যসি॥
> তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
> স্ত্রিয়ঃপরিতপিস্যন্তি যথৈতা ভরতস্ত্রিয়ঃ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৫ বছর পূর্ণ হয়েছে, গান্ধারীর শাপের "ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ" সমুপাগত। যদুবংশের পরস্পর নিধনযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাকুল। মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বে আমরা দেখছি যে তিনি মনে করছেন যে পুত্রশোকা-ভিসন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।

> বিমৃশন্নেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দ্দন।
> মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশং বর্ষং বৈ কেশিসূদন॥
> পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা
> যদন্বব্যাজহারার্ত্তা তদিদং সমুপাগমৎ॥

এ শাপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন। সেদিন কুরুক্ষেত্র শ্মশানভূমিতে একটু হেসেই শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেছিলেন—আমি জানি এরূপ ঘটবে, সুব্রতে গান্ধারী, তুমি সেই ঘটনাকেই প্রত্যক্ষ করছ।

> উবাচ দেবীং গান্ধারীমীষদভ্যুৎস্ময়ন্নিব।
> ... ...
> জানেঽহমেতদপ্যেব চীর্ণং চরসি সুব্রতে।

পুত্রশোকাতুরা জননীর সন্তানবিয়োগব্যথা বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই সেদিন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সর্ব্বজনসমক্ষে গান্ধারীর অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এই অভিশাপ গ্রহণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারী-চরিত্রকে আরও সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

আঠারো দিনের পৃথিবীক্ষয়কারক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মিটে যাবার পর, অন্ধ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ধর্ম্মপত্নী হতপুত্রা তপস্বিনী গান্ধারী পাণ্ডবদের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদেই কাটালেন পনের বছর। যুধিষ্ঠির খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারীর শুশ্রূষার জন্য। তিনি বলেছিলেন যে এঁদের কোনও অসম্মান বা অবহেলা যুধিষ্ঠিরকেই অপমানিত করবে। কিন্তু তাহলেও ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হয়ে (ভীম বাগ্বাণ-পীড়িতঃ), ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে নির্ব্বেদাপন্ন হলেন। গান্ধারী ও বিদুরকে ডেকে পরামর্শ করলেন যে হস্তিনাপুরের রাজভোগ পরিত্যাগ করে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, হিমালয়ের দিকে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হবেন। গান্ধারী স্বামীর এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ঠিক হল যে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় বেরিয়ে পড়বেন মহাপ্রস্থানের পথে। যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র শেষবার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যেতে চাইলেন। প্রকৃতি-সম্ভাষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মঞ্চের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে সেদিন "বদ্ধনেত্রা বৃদ্ধা হতপুত্রা" তপস্বিনী গান্ধারীও বিদ্যমান। ধৃতরাষ্ট্র নিজের ব্যক্তিগত কথা তো অনেক বললেনই, দুঃখ জানিয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণের হয়ে সর্ব্বশেষে বললেন—

> ইয়ং চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রো তপস্বিনী।
> গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈময়া।

শেষ বিদায় নেবার আগে মাতা গান্ধারীও তাঁর পুত্রদের পক্ষ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা দুজন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা, পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর, শোকে বিহ্বল। তোমরা সকলে মিলে আমাদের বনগমন অনুমোদন কর! তোমাদের কল্যাণ হোক। আমরা তোমাদের শরণাপন্ন হচ্ছি।

> হতপুত্রাবিমৌ বৃদ্ধৌ বিদিত্বা দুঃখিতৌ তদা।
> অনুজানীত ভদ্রং বো ব্রজাবঃ শরণঞ্চ বঃ॥

আমরা কেনই বা আর হস্তিনাপুরের রাজৈশ্বর্য্য আঁকড়ে থাকব। বনগমনই আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা বিধেয়।

মম চান্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কাগতিঃ।
ঋতে বনং মহাভাগাস্তন্মানুজ্ঞাতুমর্হথ॥

ধৃতরাষ্ট্রের এবং গান্ধারীর এই করুণ আবেদন শুনে পৌরজানপদ ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন সকলেই শোকপরায়ণ হয়ে বাষ্পসন্দিগ্ধকণ্ঠে রোদন করতে আরম্ভ করলেন। মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হচ্ছে না। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—

তেষামস্থিরবুদ্ধীনাং লুব্ধানাং কামচরিণাম্।
কৃতে যাচেঽদ্য বঃ সর্ব্বান্ গান্ধারীসহিতোঽনঘাঃ॥

বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মাতা পুত্রদের অস্থিরবুদ্ধি, লুব্ধ এবং কামচারী বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু স্বীকার করেও তাদের হয়ে মার্জ্জনা চাইছেন প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে। প্রজাবৃন্দ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছেনা। কোনও কথা তারা বলছেনা। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছে। কেবল তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে—

নোচুর্ব্বাষ্পকলাঃ কিঞ্চিদ্বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্।

অবশেষে বেদনার আবেগ আর বাধ মানল না। সমবেত জনগণ উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা এবং যাদের উত্তরীয় নেই তারা করের দ্বারা-মুখ আচ্ছাদন করে পিতামাতার বিরহে মানুষ যেমন কাঁদে তেমনি ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল।

যাত্রার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী পুত্র-পৌত্রদের জন্য যথাবিহিত শ্রাদ্ধ-করলেন। এই শ্রাদ্ধে দানের জন্য যুধিষ্ঠির প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠতাতকে। যাত্রার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। রাজমাতা কুন্তীও এসে যোগ দিলেন এই তীর্থযাত্রীদের দলে। যুধিষ্ঠির ও ভীম অনেক অনুরোধ জানালেন মাতা কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য। কিন্তু কুন্তী সেকথায় কর্ণপাত করলেন না। কেবল বললেন, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শুশ্রূষাই এখন আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। হস্তিনাপুরের রাজৈশ্বর্য্য আমাকে প্রলুব্ধ করে না।

পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসাবিভো।

তপস্যার দ্বারা আমি পুণ্য পতিলোক কামনা করি। তপস্যায় গান্ধারীর সাহচর্য্য লাভ করতে ইচ্ছা করি।

বিদায়ের পূর্ব্বে কুন্তী আশীর্ব্বাদ করছেন যুধিষ্ঠিরকে অর্থাৎ ধর্ম্মে তোমার বুদ্ধি বিকশিত হোক এবং মন মহৎ হোক, উদার হোক।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, বর্দ্ধমানদ্বার দিয়ে নির্গত হয়েছেন—ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়। এই তীর্থযাত্রায় সর্ব্বাগ্রে রয়েছেন কুন্তী! কুন্তীর কাঁধে হাত দিয়ে চলেছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী এবং গান্ধারীর কাঁধে হাত রেখেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ডান দিকে বিদুর, বাঁদিকে সঞ্জয়। চলেছেন সকলে শেষযাত্রায়—মহাপ্রস্থানের পথে।

পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা এলেন অবশেষে হিমালয়ে শতযূপ আশ্রমে। সেখানে কিছুদিন বাস করবার পর যুধিষ্ঠির সপরিবারে এলেন সেই আশ্রমে জ্যেষ্ঠতাত, গান্ধারী এবং মাতা কুন্তীর খোঁজ নেবার জন্য। এসে দেখেন যে তাঁরা আশ্রমে নেই, যমুনা নদীর দিকে গিয়েছেন অবগাহনের জন্য। তখনই যমুনার দিকে গিয়ে দেখলেন যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী ও কুন্তী জলপূর্ণ কলসী বহন করে আশ্রমের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে তাঁদের জলপূর্ণ কলসগুলো নিজেরা নিয়ে নিলেন—

সর্ব্বেষাং তোয়কলসান্ জগৃহুস্তে স্বয়ং তদা।

এদৃশ্য পাণ্ডবদের পক্ষে হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আশ্রমে ফিরে আসবার পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হলেন। সকলে সমুপবিষ্ট হয়েছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঘিরে। ব্যাসদেব একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন যে বনবাস তাদের পক্ষে প্রীতিজনক হচ্ছে তো। তপোবৃদ্ধি ঠিক মতো ঘটছে তো। ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করছেন, পুত্রবিনাশজ কোনও দুঃখ তাঁর মনে নেই তো? যখন মহাপ্রাজ্ঞা বুদ্ধিমতী ধর্ম্মার্থদর্শিনী গান্ধারীর দিকে ব্যাসদেব তাকালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মনে কোনও শোক আছে কিনা, তখন বদ্ধনয়না গান্ধারী আসন থেকে উত্থিত হয়ে জোড়হস্তে বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ষোল বছর কেটে গেছে। আমার স্বামী বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বা মনে কোনও রূপেই শান্তি লাভ করছেন না। পুত্রশোকে আকুল হয়ে ইনি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটান এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমার দুঃখ হয় আমার স্বামীর এই অবস্থা দেখে

পুত্রশোকসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ হেন ভূমিপ।
ন শোচতে বসতীঃ সর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রো মহামুনে॥

একশ' ছেলে হারিয়েছে যে মা—সে মৃতপুত্রগণের জন্য শোকাকুল নয়। পতিব্রতা নারী বৃদ্ধ ও অন্ধ অসহায় স্বামীর জন্য দুঃখিতা। ব্যাসদেব সেদিন তাঁর অলৌকিক তপস্যার প্রভাবে মাত্র একরাত্রির জন্য ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর মৃতপুত্রদের দর্শন ঘটিয়েছিলেন। এই সন্দর্শনে তাঁরা তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব এরপরে আদেশ দিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে আরও উত্তর দিকে গহন অরণ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং পাণ্ডবেরা আর কখনও এঁদের খোঁজ নিতে পারবেনা, বা খোঁজ নেবার জন্য কোনও ঔৎসুক্যও দেখাতে পারবে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই উপদেশ অনুসারে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় আরও অগ্রসর হলেন হিমালয়ে উত্তরের দিকে। একদিন সঞ্জয় দৌড়ে এসে খবর দিল যে অরণ্যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। শীঘ্র পালানোর ব্যবস্থা করা উচিত। জীবনের শেষ দিনে ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জয়কে বলেছিলেন, সঞ্জয় যেখানে তোমাকে অগ্নি দগ্ধ করবেনা তুমি সেখানে চলে যাও। আমরা তিনজন—আমি, গান্ধারী এবং কুন্তী এই স্থান পরিত্যাগ করবনা। আমরা এইখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরাগতি লাভ করব—

বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্।

সঞ্জয় তখনই চলে গেল হিমালয়ে আরও উত্তরের দিকে। সঞ্জয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা মহাভারতে। আমরা জানিনা যে এখনও সঞ্জয় হিমালয় পর্ব্বতে বিচরণ করছে কি না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী তখনই পূর্ব্ব দিকে মুখ করে অগ্নিকে সামনে রেখে যোগাসনে উপবেশন করলেন। ধীরে ধীরে হিমালয় পর্ব্বতের প্রজ্জ্বলিত দাবানল এগিয়ে এসে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে গ্রাস করে ফেলল এবং তাঁদের দেহ মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়ে গেল। সেদিনও গান্ধারী স্বামীর পাশে শান্ত চিত্তে উপবেশন করেছিলেন নিজের দুই চক্ষুকে তেমনি আবৃত করে, যেমন আবৃত রেখে ছিলেন তাঁর নয়ন সমস্ত জীবন ধরে। আমরা দেখেছি যে গান্ধারীর পিতা যে মুহূর্ত্তে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের সম্মতি দিলেন সেই মুহূর্ত্তেই বাগ্দত্তা গান্ধারী পট্টবস্ত্র নিয়ে এবং সেই পট্টবস্ত্র বহু ভাঁজ করে নিজের দুই চোখ বেঁধে ফেলেছিলেন। পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারীর যে চিত্র মহাভারতের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুপম বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। মহাকবি তাঁর নিজের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করে পরিস্ফুট করেছেন এই অনন্যসাধারণ মহিয়সী নারীর ছবি। তিনি তাঁর মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন এই চিত্রকে। মহাকবির বিরাট আদর্শে সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়েছিল গান্ধারীর চরিত্র। তাই তিনি মহাভারতের ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন গান্ধারীকে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতার প্রতি। গান্ধারী চিরজীবন' এমন কি তাঁর মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মকে রক্ষা করে গেছেন, তাঁর গভীর বিশ্বাসের দ্বারা এবং বিশ্বাসানুরূপ আচরণের দ্বারা। যখনই দেখেছেন যে ধর্ম্ম পীড়িত হচ্ছে, তখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠে কোনও রূপ দ্বিধা না করে ঘোষণা করেছেন যে ধর্ম্মের ব্যাঘাতে মানুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে সমাজবন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। ধর্ম্মের অপমানে রাষ্ট্র-সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদর্শিনী তপস্বিনী সত্যবাদিনী গান্ধারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য্য। বার বার এই ধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য তাঁর সাবধানবাণী তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র শোনেন নি, পুত্র দুর্য্যোধনও শোনে নি। এই জন্য তাঁর দুঃখ ছিল অনেক, কিন্তু সেই দুঃখ কখনও তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আবিল করে নি, বা এই দুঃখ তাঁর চিত্তকে অবসন্ন করেনি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে যখন তিনি সব হারিয়েছেন তখনও তিনি ধর্ম্মকে অবলম্বন করে আছেন এবং কুরুক্ষেত্র রণভূমিতে দাঁড়িয়েও ঘোষণা করেছেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যুদ্ধের পরে পনের বছর কাটালেন শতপুত্রহারা জননী হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে—যারা তাঁর শতপুত্রকে নিধন করেছিল। কিন্তু কোনও গ্লানি, দ্বেষ বা অশান্তি ছিলনা তাঁর মনে। নিজের পুত্রের মতোই স্নেহ করতে পেরেছিলেন পাণ্ডবদের। আবার যেদিন ঠিক হ'ল যে হস্তিনাপুরের রাজৈশ্বর্য্য পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়তে হবে মহাপ্রস্থানের পথে, সেদিনও পতিব্রতা গান্ধারী প্রশান্ত চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের পাশে। তাঁর প্রব্রজ্যা-গ্রহণ মহাভারতে স্বার্থত্যাগের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিমালয়ের প্রজ্জ্বলিত দাবানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন গান্ধারী স্বামীর পাশে যোগাসনে উপবেশন ক'রে, শান্ত সমাহিত চিত্তে। মৃত্যুর দিন গান্ধারীর মুখে একটি কথা নেই। ধৃতরাষ্ট্র কথা বলছেন, কিন্তু গান্ধারী নীরব। মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন ইচ্ছা করেই এই নীরবতার ছবি এঁকেছেন। সতিাই গান্ধারীর তো আর কিছু বলবার ছিলনা। ধৃতরাষ্ট্র হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করবার জন্য প্রস্তুত। পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে আলিঙ্গন ক'রে।

নূতন ছন্দ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পার্থসখা সসম্মানে বি, এস্-সি পাশ করিয়া, ন্যূনাধিক চার বৎসর চেনা-জানা লোকেদের দ্বারে দ্বারে, আফিস পাড়ার চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া—চষিয়া ফেলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তবু যে একটা দফতরীর চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিল না, সে দোষ কাহার? আর, সে ত একা নয়, শুনিতে পাই এমন পার্থসখা সহস্র সহস্র সহরের অলিতে গলিতে কেবলমাত্র বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাষ্পেই তাহাদের জীর্ণ অস্তিত্ব জীর্ণতর করিতেছে। কোথায় এত চাকরী? সারা জীবন যদি মাথা কুটিয়া মরে, শতাংশের একাংশেরও চাকরী-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিবে না;—কোনও দেশেই ঘটে না। ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ—মূলধনের প্রয়োজন। কি জানি কেন, ধনলক্ষ্মীর করুণা-কণা হইতে বাঙ্গালী বহুদিবসাবধি বঞ্চিত। সবাই বলে, চাষ-বাস করো। পরামর্শ ভালই; কিন্তু ভূমির সন্ধান কেহ দেয় না। কাজেই গৃহে গৃহে হতাশ্বাস; বক্ষে বক্ষে নীরব হাহাকার। প্রকৃতির নিয়মে বঙ্গভূমেও নিত্য প্রভাত হয়; কিন্তু সুপ্রভাত বড় হয় না। দুই সন্ধ্যা অন্ন যেদিন পাতে পরিবেশিত হইবে সেই দিনই বাঙ্গালীর সুপ্রভাত হইবে। প্রাচুর্য্যের বাঙ্গলা আজ চির দুর্ভিক্ষের লীলাস্থল। আর এই পরিবর্ত্তন আমাদের চোখের সামনেই ঘটিতে দেখিলাম।

এই অদ্ভুত, অভাবনীয় ও কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন সত্বেও জননীর অন্তরের নিভৃত কন্দরের চিরন্তন কামনা-বাসনা বোধ হয় অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে। যুক্তি তর্ক ন্যায় অনুনয় অনুশীলন সেখানে সূক্ষ্ম দাগটিও কাটিতে পারে নাই। তাহার একটিমাত্র কৈফিয়তই আছে, সে যে মা! তাহার মন যে মায়ের মন।

পার্থসখার মা ছেলের গায়ে মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আর যে হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধে খেতে পারি নে বাবা। সারাদিন তুই কাজে কর্মে বাইরে বাইরে থাকিস্, আমার তেষ্টার এক ঘটি জলের পিত্যেশ নেই। কোন্ দিন ফিরে এসে দেখবি তোর মা পুড়ে ঝুড়ে ম'রে পড়ে আছে। কথা শোন্ পার্থ, আমার একটি বৌ এনে দে বাবা, যে ক'টা দিন বাঁচি, রাঁধা ভাত খেয়ে মরি।

পার্থ হাসিয়া বলিয়াছিল, ঘোড়ার আগেই চাবুকের চিন্তা কেন করছো মা? তুমি রান্না ভাতের কথা বলছো, আমি কাঁচা চালের ভাবনায় অস্থির হচ্ছি। তুমি বিধবা মানুষ, এই তোমার শরীর, দু'খানা বাতাসার বেশী কোন সামগ্রী রাত্রে খেতে দিতে পারি নে মা, তাতেই আমার বুক ফেটে যায়; ঘুমুতে গিয়ে ঘুমুতে পারি নে, সারা রাত চোখ দিয়ে আমার জল ঝরে। পরের মেয়ে ঘরে এনে খোলা ঘরের আড়ায় টাঙিয়ে মারতে আর তুমি আমাকে ব'লো না।

তাহার বোন প্রসূন মাতার হইয়া বলিল, কার পয়ে কি হয় তা কি কেউ জানে রে বোকা? বৌয়ের পয়ে ভালও ত হ'তে পারে। কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন।

আর পুরুষের ভাগ্যে ধ্বংসই ধ্রুব, কেমন না দিদি, এই ত? দোহাই তোমার দিদি, তুমি পবন হয়ো না, পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। মা পুড়বে, অজানা সেই সে পুড়বে, আমি পুড়বো। তুমি দূরে আছ, স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করছো, তবু সে লঙ্কাকাণ্ডে তুমিই কি পার পাবে, দিদি?—অত্যন্ত করুণ কাতর কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া দীন নয়নে পার্থ প্রসূনের পানে চাহিল। প্রসূন ভায়ের কথা ফেলিতে পারিল না, যুক্তি খণ্ডন করিতেও পারিল না। প্রসূনের স্বামীর ঘর পল্লীগ্রামে। ক্ষেত খামার বাগান পুকুরে তাহার সচ্ছল সংসারও আজ কি দারুণ টানাটানির ভিতর দিয়া চালাইতে হইতেছে সে তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝে। কিন্তু, মা'র মানব জন্মের অন্তিম ও একমাত্র সাধটিকে সার্থক

দেখিবার আকাঙ্ক্ষাও ত কম নয়। তাই বলিল, পার্থ, তুই পুরুষ মানুষ, পুরুষ সিংহ। হতাশ হবি কেন ভাই?

পার্থ হাসিয়া বলিল, হতাশ আমি একটুও হইনি, দিদি; হবও না। তবে, আশা করবারও কিছু আর নেই।

প্রসূন বলিল, কেন থাকবে না? দুঃখ কষ্ট চিরস্থায়ী কখনই নয়, এ ত তুই জানিস্ ভাই।

পার্থ পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে —না কি বলে, সে সব 'মহাজন' পদাবলীর দিন আর নেই দিদি। নিষ্করুণ কঠোর জীবন-নদী এ, এতে জোয়ার ভাঁটা নেই, বান ডাকে না, এ উত্তরবাহিনী, শুধু অনাহারের একটানা স্রোত ব'য়ে যায়। মা'কে তুমি বুঝিয়ে বলো দিদি, অকারণে আর একটা প্রাণীহত্যা করতে দিয়ো না ভাই।—তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। পুরুষ মানুষ, চোখের জলটা দেখাইতে চাহে না বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, মা ডাকিলেন। পার্থ দাঁড়াইল। মা বলিলেন, কাছে আয় পার্থ, আমার কাছে এসে একটুখানি বোস্ বাবা

কাছে বসাইয়া, পুত্রের মস্তক বুকের উপরে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তুই ত আমার মাতৃভক্ত সন্তান বাবা, আমার কথা কখনও ত ঠেলিস্ নে বাপ—

পার্থ কি একটা বলিতে গেল, জননী পুত্রের মুখখানিকে বুকে চাপিয়া বলিলেন, আমি কবে আছি কবে নেই, তোকে, তিন বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলুম, জীবনের কোন সাধই পুরলো না। মরবার আগে এই একটি ইচ্ছা পূরণ ক'রে দে বাবা, তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাই।

মা—

আমার কথা শোন্ বাপ, ভগবান তোর মঙ্গল করবেন। —মাতার অশ্রুধারায় পুত্রের মুখমণ্ডল ভাসিতে লাগিল। স্রোতে যেমন কুটা ভাসিয়া যায়, পার্থের দৃঢ় সঙ্কল্পও তেমনই জননীর অশ্রুস্রোতে ভাসিয়া গেল।

তোর চিরদুঃখিনী বিধবা মায়ের একটি কথা রাখবি নে রে?—শুনিয়াই পার্থসখা উঠিয়া পড়িল। তাহারও চোখে জল পড়িতেছিল, দমন করিতে করিতে বলিল, তোমার দায়, মা, তুমি জানো—বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ তাহাকে কন্যাপক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। তাহার এক মামা ডাক্তার, তাঁহারই এক পুরাতন রোগীর ঘরে সম্বন্ধ; মাতুলের গৃহে সভা বসিয়াছে। যাঁহার কন্যা, তিনজন বন্ধু সমভিব্যাহারে সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন, মাতুলের সহিত, শঙ্কিত পদে, কম্পিত বক্ষে পার্থসখা সেইখানে আসিয়া যথারীতি নমস্কারাদি করিয়া বসিল। কন্যার পিতা পাত্রটিকে দেখিবামাত্র চমকিত হইলেন। এতক্ষণের হাস্য-পরিহাস গল্পগাছা তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শনেই যেন ভয় পাইয়া দেশান্তরিত হইয়া গেল।

মাতুল কহিলেন, দেবেন্দ্রবাবু, এটি আমার ভাগ্নে, পার্থসখা। বি-এস্-সি পাশ করেছে। নিজের ভাগ্নের হয়ে কথা বলা আমার পক্ষে উচিত নয় বটে তবে আপনার সঙ্গে বহুদিনের প্রণয়, তাই বলছি। বড় সৎ, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ ছেলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় চাকরী-বাকরী একটিও জোগাড় করতে পারলে না। অতি অল্প বয়সে, শৈশবে বললেই হয়, পিতৃহীন, মুরুব্বি টুরুব্বিও কেউ নেই, কাজ-কর্ম্মের সুবিধে করতে পারে নি। আপনার অপিসও বড়, শুনেছি, আপনার ক্ষমতাও অসীম, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে—

তাঁহার বক্তব্য সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং পাত্রকে প্রশ্ন করিলেন, নেতাজীতে কি তোমাকে দেখেছি?

পার্থ কহিল, আমাদের বাস নেতাজীতে।

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, নেতাজীতে আমার বাগান, আমি শনিবারে শনিবারে যাই সেখানে।

মাতুল বলিলেন, ঐ যে বললুম আপনাকে, আমার ভগিনীপতি অল্প বয়সে একটি মেয়ে একটি ছেলে ও স্ত্রী রেখে মারা যান্। ঈশ্বরেচ্ছায় মেয়েটির বিয়ের ঠিকঠাক তিনিই একরকম ক'রে গেছলেন, তাঁরা অতি ভদ্রলোক, শাঁখা-শাড়ীতেই মেয়েটিকে নিয়ে যান, বলতে নেই সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার করছে। আমার ভগ্নী দুঃখধান্দা ক'রে এই ছেলেটিকে বড় ক'রেছেন, ছেলে লেখাপড়াতেও ভাল ছিল, বৃত্তি টৃত্তি পেয়ে পাশটাশও ক'রেছে। এটা ওটা সেটা ক'রে নেতাজীতে পাঁচ কাঠা জমি কিনে একখানি ছোটখাট ঘর তুলে মা'কে নিয়ে সেইখানেই বাস করছে।

দেবেন্দ্রবাবু অল্পক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহযাত্রী সুহৃদত্রয়কে কহিলেন, চলো হে, ওঠা যাক্।

মাতুল বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, সে কি, একটু চা খাবেন না?

না। এ আমার চা'য়ের সময়,নয়। কৈ হে, ওঠো-না! বলিয়া নিজে সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

একটা নিঃশব্দ গুমোট্ বাতাস ঝড়ের ঘাড়ে চড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া সব যেন উলট পালট করিয়া দিল। আলো নিবিল, দরজা জানালা ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িতে লাগিল; মানুষগুলাও প্রাণভয়ে তালগোল্ পাকাইয়া হুড় হুড় শব্দে বাহির হইয়া গেল।

পথে পড়িয়া, অবিনাশ তস্য বন্ধুবর দেবেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি বল ত ভাই! চা-তেষ্টায় গলা টা-টা করছিলো বলছিলে, অথচ—

দেবেন্দ্র বোমা ফাটার মত ফাটিয়া পড়িয়া বলিলেন, বি-এস্-সি পাশ, না ঘোড়ার ডিম পাশ! আমি নিজের চোখে দেখেছি, নেতাজীতে আমার বাগানের ঠিক পাশে ছোকরাকে আমি রাজমিস্ত্রির মজুর খাট্‌তে দেখেছি। বি-এস্-সি পাশ করেছে, না হাতী করেছে।

অপর এক বন্ধু বলিলেন, সমুদ্দুর চুরি বলো? আহা, ভারি ভুল হয়ে গেছে হে! কোন্ বছরের গ্র্যাজুয়েট, সেই সালটা জেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-পঞ্জী মিলিয়ে দেখলেই জোচ্চুরি বেরিয়ে যেতো।

দেবেন্দ্র বলিলেন, তুমিও যেমন পাগল হয়েছ? পাশ না হাতী! পাশ-করা কায়েত বামুনের ছেলে না-খেয়ে ম'রে প'ড়ে থাকতো, তবু ঐ উঞ্ছবৃত্তি করতে যেতো না। নেতাজীতে আমার বাগান শুনেই ছোকরা কি-রকম ভ্যাবাগঙ্গারামের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল, সেটা তোমরা লক্ষ্য করো নি বুঝি! বাছাধনের মুখ একেবারে পাঙ্গাস্।

চতুর্থ বন্ধুটি কহিলেন, কলকাতা সহর, বাবা, কত রকম-বে-রকমের জোচ্চুরি-বাটপাড়ি যে চলে, তার আর সংখ্যা নেই, সীমা নেই। হরিহরের ব্যাপারটা মনে নেই? থিয়েটারের ডাকসাইটে নটীর মেয়েকে নৈকষ্য কুলীন শিবানন্দ চাটুয্যের কন্যা ব'লে হরিহরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে। বেচারী হরিহর কাশীতে প্রাচিত্তির ক'রে গরুর-তাই ভক্ষণ ক'রে তবে রক্ষা পায়। কলকাতায় সবই হয় হে, সবই হয়।

দেবেন্দ্রবাবু আত্মপ্রসাদে প্রসন্নভাবে বলিতে লাগিলেন, কলকাতা সহরটা কি জান, একটি মহাদেশ বিশেষ। এখানে কেউ কারও খবর রাখে না। মানুষ এত ব্যস্ত যে, খবরা-খবর করবার সময়ও পায় না। মাড়োয়ারীরা যেমন চাদরে হাত পুরে "কেয়া ভাউ, কেয়া ভাউ" ক'রে কোটী কোটী টাকার লেন্ দেন্ চালায়, আমরা, সাধারণ লোকেরা তেমনই জানাশোনা লোকের কথার ওপর বিশ্বাস ক'রেই ব'সে থাকি। ডাক্তারের.ভাগনে এই শুনেই আমি ত একরকম পাকাপাকি কথা কইতেই গেছলুম। আমার মহাগুরু-বল যে, ছোকরার চেহারাটা সময়মত মনে প'ড়ে গেছলো, নইলে আমার জয়া-মা ত মজুরণী হয়ে মাথায় চুণশুরকীর কড়া নিয়ে মই ব'য়ে উঠেই পড়েছিল হে!

অবিনাশ সর্ব্বপ্রথমে একবার একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন; চা-তৃষ্ণা প্রবল না হইলে তাহাও করিতেন কিনা সন্দেহ। তারপর হইতে নীরবে পথ চলিতেছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর ধিক্কার, বক্তৃতা ও হাস্যরোল থামিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাগানের পাশে কা'র বাড়ীতে ছোকরা মজুরী খাট্‌ছে বললে?

দেবেন্দ্র অবজ্ঞাভরে কহিলেন, বাড়ী নয়, বাড়ী নয়, ছোট্ট একতলা একখানা গোয়াল ঘরের মত ঘর। শুনেছি, ওদের নিজেরই ঘর সেটা।

নিজের ঘর!—অবিনাশ প্রকাশ্যে নিজের মনেই ঐ দু'টি কথা উচ্চারণ করিয়া পুনরায় নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রবাবুর অপর এক বন্ধু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, ওহে দেবেন, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সেই "নিজের ঘর নিজে করো" ধাপ্পা নয় ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যেন মনে হচ্ছে হে! সমবায় ডিপার্টমেণ্ট ইট চুণ শুরকী সিমেণ্ট ধার দেবে, বেকার ভদ্রঘরের ছেলেরা নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে ঘর তৈরী ক'রে বাস করবে—আর মাসে মাসে ভাড়ার মত কিছু টাকা শোধ দিতে থাকবে! হ্যাঁ, কাগজে কাগজে লেখা টেখা পড়েছি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক। ভদ্রলোকের ছেলেরা মাঠে গরুতে লাঙ্গলে কৃষিকর্ম্ম করলে সমবায় তাদেরও টাকা দেবে বলেছেন।

দেবেন্দ্রবাবু তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন, বলবেন বৈ কি! দেশের লোকের উপকার করতেই ক্ষণজন্মা পুরুষরা সিংহাসনে ব'সেছেন, তা না করলে চলবে কেন? "নিজেদের বিদ্যে ত কাস্তে কোদাল কুড়ুল পর্য্যন্ত, ভদ্রসন্তানদের চাষা মজুর কুলী মিস্ত্রি তৈরী করতে হবে বৈ কি! বিজনেস্ করতে বুদ্ধির দরকার, ট্রেড কমার্স করতে হলে পেটে বিদ্যে

ধরতে হয়, সে সবই অষ্টরম্ভা ত! কলকারখানা বৃদ্ধি করতে গেলে মূলধনের দরকার, ওঁদের কথায় টাকা বার করবে এমন গর্দ্দভ দেশে কে আছে? আর সে সব করতে শিল্প-কারিগরী জ্ঞানেরও দরকার। কাজ কি সে সকল হাঙ্গাম-ফৈজুতে! পরের ছেলে ত, নে, বেটারা লাঙ্গল কাঁধে কর, না হয় কর্ণিক থিস্‌কাপ্‌ ঘাড়ে নে, চল্‌! বাঃ বাঃ, বেড়ে বুদ্ধি করেছে ত! বাহবা কি বাহবা। দেশসুদ্ধ লোককে ছোটলোক বানাতে পারলে বিলকুল ল্যাঠা চুকে গেল। তখন নিজেদের রামরাজত্ব, টুঁ শব্দটি কেউ আর করবে না। ব'ড়ে টিপেছে মন্দ নয়, নির্ঘাৎ কিস্তিমাৎ।

অপর ব্যক্তি কহিলেন, ইংরেজ যে ইংরেজ, এ দুর্বুদ্ধি সে'ও করে নি; তার আগে মোগল পাঠান, তারাও রাজ্য ক'রে গেল, এ শয়তানী মতলব তাদের মাথাতেও ঢোকে নি।

দেবেন্দ্রবাবু বক্তাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি ত আচ্ছা ভোজা গাড়োল দেখি হে রমেশ! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি কলেজে মাস্টারী করো। ঘাস কাটো নাকি! এঁরা হলেন কল্কি অবতারের সহোদর ভায়রা-ভাই। শ্রীকৃষ্ণের ছিলো সুদর্শন চক্র; ঘুরিয়ে দেশটাকে নির্ম্মনুষ্য করেছিলেন; আর এই সব নবীন কল্কি ঠাকুরের হাতে উঠেছে অশোক চক্র, দেশটাকে একগাড়ে না গেড়ে ছাড়বেন ভেবেছো?

কিন্তু, ভাই, আমাদের "সম্মিলনী"তে স্কীমটা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল, যতদুর মনে আছে প্রশংসাই শুনেছিলুম। কেরাণী হয়ে কত সুখ, দু'পুরুষ ধ'রে আমরা ত সেটা হাড়ে হাড়েই দেখলুম। দেশে যত লোক, তত চাকরীই বা কোথায়? এখন ছেলেগুলো যদি নিজেরা গতর খাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, মন্দ কি? নিজের কায়িক শ্রমের বদলে মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকু যদি ক'রে নিতে পারে, বাজারে আলু পটোল বিক্রী ক'রেও স্বাধীনভাবে সংসার চালাতে পারবে।

দেখো জগন্নাথ, কথাটা কঠিন শোনাবে, কিন্তু রাগ করো না। কায়েত বামুনের ঘরে জন্মাতে যদি, বংশমর্য্যাদা যে কি বস্তু, তা বুঝতে পারতে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা গাধা ছিলেন না; মুনিঋষিদের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁরা সমাজ গঠন ক'রেছিলেন। যে যেমন বংশের লোক, তার ওপর তেমন কাজের ভার দিয়ে গেছলেন। চাষায় চাষের কাজ করবে, মজুর মজুরী করবে, রজক কাপড় কাচবে, জেলে মাছের চাষ করবে, কামার লোহার কাজ করবে, তেলীতে ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করবে—

আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত হইয়া পড়িতেছে—বিশেষতঃ শ্রীজগন্নাথ দে জাতিতে তেলী, খোঁচাটা প্রিয় বন্ধু জগন্নাথকে বিদ্ধ করিতেছে ভাবিয়া রমেশবাবু দেবেন্দ্রকে বাধা দিয়া কহিলেন, সেদিন আর রইলো কোথায় ভাই? তুমি বামুন কায়েত বলছো, কতো বামুন কায়েত জুতোর দোকান করছে, তার খবর রাখ কি? তাদের কি তবে তুমি মুচী বলবে?

দেবেন্দ্রবাবুর মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল। তাঁহার মধ্যম পুত্রটি চাঁদনীচকে মস্ত জুতার দোকান করিয়াছে এবং রমেশ সেই ইঙ্গিত করিতেছে ভাবিয়া একটি ভীম হুঙ্কার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে অবিনাশের করুণ কণ্ঠস্বর বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। অবিনাশ অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, ভাই দেবেন, তোমরা যাও, আমি এখান থেকেই ফিরি।

দেবেন্দ্র বলিলেন, কোথা যাবে? এসো না, চা-টা খেয়ে তখন—

না ভাই, আমি ঐ ওদের বাড়ীতেই যাবো। আমার নন্দরাণীকে যদি ঐ ছেলেটির হাতে দিতে পারি, বুঝবো এ জীবনে একটি তবু সৎকর্ম্ম করেছি।

নন্দরাণী? মানে তোমার বড় ছেলে সুব্রতর মেয়ে নন্দিতা? অ্যাঁ।

অবিনাশ কহিলেন, আমার নাতি-নাতনি বলতে ঐ ত একটিই। বাঙ্গালী জাতি জাগছে; শ্রমের মর্য্যাদা বুঝেছে আর ভয় নেই। জাগ্রত জাতির অগ্রদূত ঐ ছেলেটির হাতে আমার আদরিণী নন্দরাণীকে যতক্ষণ না দিতে পারছি আমি সুখী হ'তে পারবো না।

অবিনাশকে সকলেই পাগলাটে বলিয়া জানিত! যথেষ্ট রোজগার সত্ত্বেও অসহযোগের দিনে সে ওকালতী ছাড়িয়াছিল; ল' কলেজের প্রোফেসরীতেও ঐ রকমের কি একটা হাঙ্গামার ফলে ইস্তাফা দিয়াছিল; এক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে ঢুকিয়া খুব নাম করিয়াছিল, একবার একটা হরতালের বৈধতার প্রশ্নে মতের অমিল হওয়ায় সে দিক আর মাড়ায় নাই। এখন বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তাসপাশা খেলে, সঙ্গীতের আসরে তবলা বাজায়, সৌখীন নাট্যসমাজে

শিক্ষকতা করে; আর, সাময়িকপত্রাদির বিশিষ্ট সংখ্যায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সুধীসমাজের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করে। অবিনাশের চারটি ছেলেই বড় ও মানুষ হইয়াছে; বড়টি—সুব্রত সেন ব্যারিস্টার, মোটা টাকা উপার্জ্জন করে। বন্ধুরা বলে, তবে পাগলা বেশ আছে। দেবেন্দ্রবাবু ড্যাবডেবে চোখদু'টা কটমট করিয়া ক্রুর হাস্তে কহিলেন, রাজ-মিস্ত্রীর মজুরের সঙ্গে সুব্রত তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে? সে ত তোমার মত পাগল হয় নি!

না, তা হয় নি। তবে সুব্রত জানে তার বাপ আজও বেঁচে আছে, আর নন্দরাণী তার বাপের গলার হার।—এক মুহূর্ত থামিয়া, অপরকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই পুনশ্চ কহিলেন, সুব্রত স্বাধীন দেশ ইংলণ্ডে একসঙ্গে তিন বছর বাস ক'রে এসেছে, মানুষ বলতে, জাত বলতে কি বোঝায়, আমাদের চেযে ঢের বেশী ভাল বোঝে সে! আচ্ছা ভাই, আজ যাই; যথাসময়ে খবর দেবে, দাদা, চললুম।

পাগলা সত্য সত্যই চলিয়া গেল। তখন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেবেন্দ্রবাবু—তিনিই দলপতি—অবিনাশের উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রবল প্রকোপ প্রমাণিত করিয়া সকলকে লইয়া স্বগৃহে চা পানাদিতে পরিতুষ্ট করিলেন এবং সুব্রত ব্যারিস্টারের হস্তে তস্য পিতার লাঞ্ছনার একখানি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করতঃ নাটকের পরবর্ত্তী অঙ্কের জন্য তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া গড়গড়ার নলে মুখলগ্ন করিলেন। হাস্য-পরিহাস খুবই জমিল, কেবল রমেশচন্দ্রবাবুটি মুখখানা গোমড়া করিয়া একপাশে বসিয়া রহিলেন।

জগন্নাথ চা-ও পান করিলেন না, কথার পিঠে কথা, হাসির উপরে হাসি, গল্পের উত্তরে গল্পও যোগ করিলেন না। দেবেন্দ্রবাবু বিষম চটিয়াছিলেন, পাছে আবার কি বলিতে কি বলিয়া বসেন, তাইসর্ব্বাগ্রে রমেশবাবুই সর্ব্বান্তর্য্যামীস্বরূপ জানাইলেন, জগন্নাথের সেই কলিক্ পেনটা বুঝি—

অনেকক্ষণ পরে এবং অকস্মাৎ এক সময়ে দেবেন্দ্রবাবু হ্যামলেটের টু-বি অর্ নট্ টু-বি সলিলকীর মত আঁৎকাইয়া উঠিলেন, তাই ত! পাগলাটা সত্যিই গেল কোথায়?

২

'নেতাজী' নামক অর্দ্ধগ্রাম, সিকি সহরটি কলিকাতা হইতে বেশী দূর নহে; স্থলপথও আছে, জলপথে—কাটা খাল দিয়াও যাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে জননীর ক্লেশের আশঙ্কা করিয়া পার্থ নৌকার ব্যবস্থাই করিয়াছিল। ফলে অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছিল। পক্ষাঘাতে মাতার নিম্নাঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, দুই হাতে বুকে ধরিয়া পার্থ মা'কে নৌকায় তুলিয়াছিল।

গোলপাতায় ছাওয়া একখানি মাত্র ঘর, তাহারই রোয়াকের কোণে রান্নার যায়গা। উনানে বড় হাঁড়ী দেখিয়া প্রসূন বলিল, আ মলো মড়া মাগী, বড় হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়ে মরেছিস্ কেন?

তোমাদের ঘরে অতিথ আসছে যে!—মড়া মাগী এই বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, পার্থ ও প্রসূন, দু'জনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, অতিথ! কেরে! কেরে!

অতিথি। তাহাদের গৃহে!!

উত্তরে যাহা জানা গেল সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য। কাল সন্ধ্যার একটু আগে একজন বুড়া মানুষ ও একটি ফুটফুটে মেয়েছেলে মোটরে এসে এই চালা ঘর, ঐ নতুন ঘর, চূণ শুরকির তাগাড় সব দেখে দেখে বেড়ালে। বলছি গো বলছি—রসো না, হাঁড়ির মুখের সরাটা একটু খুলে দিয়ে আসি।

একজন বাউরীজাতীয়া বয়স্কা স্ত্রীলোক তাহাদের গৃহকর্ম্মও করিত, এখন গৃহনির্ম্মাণে সাহায্যও করিতেছে। বহুকাল হইতে এই পরিবারে আছে, পরিজনের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেবায়, স্নেহে, ভালবাসায়, জাতির পরিচয় সে-ও ভুলিয়াছে, ইহারাও কোনদিন ভ্রমেও তাহা স্মরণ করে নাই। ফিরিয়া আসিয়া সে প্রসূনকে দেখিয়া বলিল, দিদি, ভাত হয়ে গেছে, তুমি নামিয়ে ফেল গে। বুঝলে গো মা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমি একা, পরশুর তৈরী ঐ দরজা জানালা লাগাচ্ছি দেখেই লোকটি আমাকে বলে কি জানো? বলে, তুমি ত বাছা আমার নাতনী; তোমার নামটি কি দিদি? তারপর জিগ্যেস্ করলে ও জানালা দরজা তৈরী করেছে কে? আমি বল্লু, কেনে গা, আমার দাদাবাবুই করেছে। শুনেই বুড়ো মানুষটি আমাকে বলে, ও গো বাছা, তোমার সেই দাদাবাবুটির সেই হাত দু'খানি বেল ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারি কি ক'রে সেটা আমাকে ব'লে দিতে পার দিদি? ঐ যাঃ! আসছি গো, মা, আসছি, উনুনের ভারি কাঠ খাম

বের ক'রে দিয়ে এসে বলছি।—এইটুকু শুনিয়াই পার্থের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। কল্যের সম্বন্ধটা নিশ্চিত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে জানিয়া সে যখন মনে মনে নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছিল, তখন খবরটা দুঃস্বপ্নের মত তাহাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু, জননীর পানে চক্ষু পড়িতেই দেখিল তাঁহার দু'টি চক্ষুর শতধারা দিয়াই তিনি শিউল র অনুসরণ করিতেছেন। দেহে সামর্থ্য থাকিলে মা বোধ করি কথাটা শেষ না করিয়া শিউলীকে যাইতে দিতেন না।. এক লহমা বিলম্বও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কথাটা শুনিবার আশায় সমস্ত দেহখানি কানের কাছে হাঁ করিয়া রহিয়াছে, যত বিলম্ব হইতেছে ব্যাকুলতা অশ্রুর আকারে উৎসরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে। পার্থের পণ বুঝি সেই অশ্রুর স্রোতে আবার নিঃশেষে ভাসিয়া যায়! শিউলী গজেন্দ্রগমনে আসিয়া এক মুখে শত গাল হাসিয়া বলিল, আমার দু'টি হাত ধ'রে সে কি আদর গো! আমি ত লজ্জায় মরি। আবার, যাবার সময় বলে গেছেন---আমরা আবার আসবো, তোমার গিন্নীমা'কে বলো অতিথ নারায়ণ, সকালে বিমুখ না হ'তে হয়। মা'র প্রসাদ না পেয়ে ফিরবো না। বুঝলে গো, তাই ও বড় হাঁড়ি চাপানো গো, তিনজন বাড়তি লোক খাবে, তিজেল হাঁড়িতে হবে কেন? ঐ দেখ গো, বলতে না বলতে বুড়ো মানুষটি, ঐ—বলিয়া আঙুল দিয়া আগন্তককে দেখাইয়া দিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া যাইতেছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া বুড়ো মানুষটি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যেও না গো, শিউলী-দিদি, যেও না, এখানে তুমিই আমার একমাত্র চেনা লোক, আমাকে তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাবে, দাঁড়াও।

শিউলী-দিদি একগাল হাসিয়া প্রসূন দিদিমণির উদ্দেশে খাটো গলায় কহিল, ভারি রগুড়ে লোক দিদিমণি, কথা শুনলে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়।

পার্থ রেঁদা ঘষিয়া জানালার পাল্লা প্রস্তুত করিতেছিল, ভদ্রলোক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই উঠিয়া নমস্কার করিল; প্রসূন আগে ভাগেই প্রস্থান করিয়াছিল। ভদ্রলোক নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না; পরন্তু পার্থের একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কত ক'রে রোজ ধার্য্য হোল, ভাই?

ভাই!! পার্থ হাসিয়া বলিল, যে যা' দেন; আগাম দরদস্তুর আমরা করি নে, দাদু।

তুমি আমাকে দাদু বললে—বলিয়াই দুই প্রসারিত বাহু-বন্ধনে বুকে জড়াইয়া সবলে চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, তবে সত্যিকার দাদু হ'তে পারি যাতে, সেইটি করো, ভাই। আমার হাত ধ'রে মা-জননীর কাছে নিয়ে চলো।

ক্ষুদ্র গৃহ, পরিধিও যৎসামান্য। প্রসূন সবই দেখিতেছিল, সকল কথাই শুনিয়াছিল। নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পার্থকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার দিদিমণি, ওর কাজের ক্ষতি করিয়ে দরকার নেই দিদি, তুমিই চলো আমাকে নিয়ে।

আমার মা অসুস্থ—

বৃদ্ধ কহিলেন, জানি গো দিদি, জানি, তাই ত আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলছি। এই ঘর ত, বেশ, আমি নিজেই যাচ্ছি, তুমি একটি কাজ করো দিদি। গাড়ীতে আমার বড় ছেলে আর তার মেয়ে নন্দরাণী আছে, তুমি তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো দিদি। আমি আপনার লোক, কিন্তু তারা তোমাদের কুটুম্ব হতে আসছে, খাতির করা দরকার।

ভ্রাতা ভগ্নীতে একবার বিস্ময়ের মুখ চাঁওয়া-চাওয়ি করিল, কিন্তু রহস্য ভেদ করিতে পারিল না।

দেরী করো না দিদিমণি, কি জানি তাদের আবার যদি গোঁসা হয়। আচ্ছা, আমি ততক্ষণ ছুতোর ভায়ার শিল্প-কলা দেখি, ওদের আনো, এক সঙ্গেই অন্নপূর্ণার মন্দিরে হত্যা দোব।

কতটা জমি, কত টাকা কর্জ করা হইয়াছে, তাহারা কয়জন বন্ধু সমবায়ে বদ্ধ হইয়াছে—এইরূপ গুটীকয়েক কথা হইতে হইতেই প্রসূন গাড়ী হইতে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রীকে লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ আর কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশা না রাখিয়াই ঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, মা, স্বাধীন ভারতের নতুন ও স্বাবলম্বী বাঙলার অগ্রদূতের জননী তুমি। অনুমতি করো মা, আমার আদরের নাতনীটিকে তোমার ছেলেকে দান ক'রে পরমানন্দে পরপারের দিকে পা বাড়াই। দেখা দেখি, দেনা পাওনা, পছন্দ অপছন্দ, বুঝিনে মা, আমার নন্দকে সঙ্গে ক'রে

এনেছি, তোমার চরণে উৎসর্গ ক'রে তবে এখান থেকে যাবো।

আপনি বসুন, মা বলছেন—আসন পাতিতে পাতিতে প্রসূন কহিল।

মা নিজের মুখে বলুন "নিলুম," তবে আমি বসবো। এই দেখ মা, এটি আমার বড় ছেলে ব্যারিস্টার, আর এই শালীই আমার পরলোকের পথের একমাত্র বাধা—দেখতে খারাপ নয়, রংটিও ভাল, মুখশ্রী, তা'ও দুগ্‌গো প্রতিমার মত; আর নিজে গাছ পুঁতে তার তুলোয় সুতো কেটে কাপড় বোনে; আমার বাড়ীতে রাঁধুনী আজ তিন বচ্ছর নেই, ওই রাঁধে, মাইনে মাসে মাসে নেয় না, এইবারে, একটা শুভদিন দেখে সুদে আসলে ডেঁড়েমুসে আদায় ক'রে নেবে।

মা বলছেন, আপনারা না বসলে কথা বলবেন না।

এইবার?—বসিয়া, বৃদ্ধ সকৌতুকে কহিলেন, এই ত বসেছি দিদি, এইবার?

মা বলছেন, নন্দরাণীকে দেবতার নির্মাল্যের মত আমরা মাথায় ক'রে নিলুম। এস ভাই—নন্দরাণী মা'র কাছে এসো।

বৃদ্ধ এইবারে শিউলী দিদিকে লইয়া পড়িলেন; পরম স্নেহভরে তাহার কাছটিতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, ওরা ত, দিদি, বিচারের আগেই ডিগ্রী দিয়ে ফেললে, সে ত তুমি দেখলে। তাই ব'লে আমি কি তোমার ঘটকালিটে ফাঁকি দোব? দু'গাছি বালা আর এক ছড়া হার, কেমন মনে ধরবে ত?—শিউলী হাসে আর আড়ে আড়ে প্রসূনের পানে চায়; ভাবটা যেন, কেমন বলিনি ভারি মজার মানুষ। অবিনাশ বলিলেন, তা'হলে আর দেরী করো না শিউলী-দি, ছেলের আদালত আছে, ভাতে ভাত কি রেঁধেছ, আমাদের দিয়ে দাও। সময়ও ত আর বেশী নেই, মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা, সামনের রবিবারে খুব ভাল দিন, এরই মধ্যে যোগাড় যাগাড়, নেমন্তন্ন সব করতে হবে, চিঠি ছাপাতে হবে—দেবেনবাবুকে দিয়ে আসতে হবে—দেবেনবাবুকে জানো ত? খুব পায়া ভারি যে বাবুটি কাল মামার বাড়ীতে পাত্র দেখতে এসে নাকটা মনুমেণ্ট ক'রে চলে গেলেন, সেই তিনি। তাঁর চিঠিখানায় নিজের হাতে নাম সই করবো—পাগলা অবিনেশ।

প্রসূন আসিয়া বলিল, দাদু, একবার যে ঘরের ভেতর পায়ের ধুলো দিতে হবে।

বৃদ্ধ নিজের পা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ধুলো ত নেই, দিদিমণি, তবে ব'লো যদি, ভায়ার চূণশুরকীর গাদাটা ঘুরে যাই।

হাসিতে শিউলীর কোমরের কাপড় খসিয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল।

ফুলের বেদনা

শ্রীরমেন চৌধুরী

ফুলদলে তুমি দিয়েছ মাধুরী
সুরভি করেছ দান,
সে তো ভুল নয় সবারি মতন
তারেও দিয়েছ প্রাণ!
তারো আছে আশা মরমের কোণে
পাতার আড়ালে স্বপনও সে বোনে,
নিরজনে কোন্ ভ্রমরের লাগি
পেতে রাখে দুটি কান!

তোমার ভুবনে কতো সমারোহ
কতোই তো আয়োজন,
সেখানে তাহার হবে না কি আর
একটি নিমন্ত্রণ?
জল-ভরা চোখে কহিছে বকুল:
এর চেয়ে বড়ো নেই কোনো ভুল
পথে অজানায় ফুটেছি যেমন
সেখানেই অবসান!!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস্ রুশ-রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। রাশিয়ার 'জার্'-শাসকদের মধ্যে ইনিই হলেন সর্ব্বশেষ সম্রাট। এঁরই আমলে রুশদেশে সুপ্রাচীন রাজতন্ত্রের বিলোপ-সাধন এবং গণ-নেতা লেনিনের নেতৃত্বে নবীন প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সূচনা ঘটে।

শিক্ষা-দীক্ষা আর স্বভাবের দিক দিয়ে পরলোকগত পিতার মত উন্নত ও উদার-মতাবলম্বী হলেও সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্ ছিলেন রীতিমত দুর্ব্বলচিত্ত, অস্থিরমতি এবং স্ত্রৈণ। তিনি শুধু নামেই ছিলেন সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের সম্রাট, আসলে তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রোভা ফিওডোরোভনাই স্ত্রৈণ-স্বামীর সিংহাসনের পাশে থেকে রাজ-কার্য্যাদি পরিচালনা করতেন। রাণী আলেক্‌জান্দ্রোভার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিন্তু স্বামীর বিপরীত···তিনি ছিলেন দারুণ গণ-স্বাধীনতা-বিরোধী। তাঁরই প্ররোচনায় এবং কূট-রাজনীতিজ্ঞ অভিজাত-প্রধান মন্ত্রী আর্কাডিভিচ্ ষ্টোলিপিনের মন্ত্রণায়, সে-যুগের দেশ-প্লাবী ব্যক্তি-স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবল দাপটে ত্রস্ত-বিচলিত হয়ে নিজের উন্নত-উদার মতবাদ বদলে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্ ক্রমেই নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারী-শাসক এবং গণ-জাগরণ বিরোধী হয়ে ওঠেন। অভিজাত মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সম্রাজ্ঞীর স্বার্থান্ধ-পরামর্শানুসারে পরিচালিত হয়ে দুর্ব্বল সম্রাট নিকোলাস্ অত্যন্ত কঠোর হাতে দেশের ব্যক্তি-স্বাধীতাকামী সাধারণ প্রজাদের দাবী-প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ করেন। তাঁর এই নিদারুণ স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ ব্যঙ্গচ্ছলে 'জার্'-সম্রাটের' নাম দিয়েছিল—'Bloody Nicholas' বা 'রক্ত-পায়ী নিকোলাস্'। অসন্তুষ্ট প্রজাদের এই নামকরণের মূলে বিজড়িত রয়েছে সেকালের এক মর্ম্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি! ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ্যাভিষেকের সময় রুশ-রাজ্যের রাজকীয় প্রথানুযায়ী মস্কো-রাজধানীতে বিরাট এক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সে উৎসবের অন্যতম অঙ্গ-হিসাবে মস্কোর ক্রেম্‌লিন্-প্রাসাদ এবং রাজধানীর বিশিষ্ট সৌধ-ভবনগুলি বিচিত্র আলোক-মালায় সাজিয়ে তোলার বিপুল আয়োজন ছাড়া, দেশের দীন দরিদ্র সাধারণ প্রজাদের রঙ বেরঙের রুমাল, বিবিধ তৈজসপত্র, আর অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল সুপ্রচুর। রাজ-দরবারের এই সব উপহার কুড়োনোর আগ্রহে মস্কো-রাজধানীর উপকণ্ঠে 'হোডিন্‌কা' (Hodynka) অঞ্চলে তিন লক্ষের বেশী দুঃখী গরীব রুশ-প্রজা এসে জড় হয়েছিলেন সেদিন সন্ধ্যায়। পথে উপহার-সংগ্রহার্থী জনতার বিপুল বিশৃঙ্খল ভিড় জমলেও, সে ভিড় সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার মত শান্ত্রী-পাহারাদারের তেমন কোনো উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল না সেখানে। কারণ, দেশের

পোর্ট আর্থারের যুদ্ধের প্রাচীন প্রতিলিপি

অভিজাত অমাত্য-আম্‌লা-রাজকর্ম্মচারীরা সবাই ক্রেম্‌লিন্‌-প্রাসাদের আনন্দ-উৎসবে মেতে রাজদরবারে রাজার আশেপাশে ভিড় জমিয়ে এমন মশগুল ছিলেন তখন যে, বাইরে স্বল্পালোকিত রাজপথের উপর বিপুল জনতার সুবিধা-অসুবিধা কিম্বা বিশৃঙ্খলতা-নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর রাখার প্রয়োজন কতখানি, তার কোনো খেয়ালও করেন নি তাঁরা এতটুকু! রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যে এই অবহেলা আর শোচনীয় অব্যবস্থার ফলে, উৎসব-নিশীথে প্রায়ান্ধকার রাজপথের উপরে রাজদরবারের দেওয়া উপহার কুড়োবার সময় দীন-দরিদ্র প্রজাদের আগ্রহাতিশয্যের দরুণ
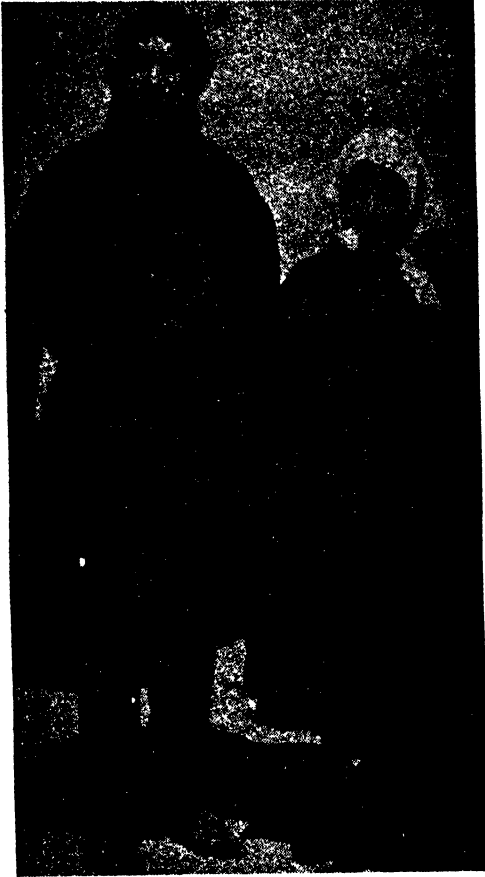
রুশিয়ার রহস্যময় ধর্মযাজক রাসপুটিন

তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়…বচসা, বাক্‌-বিতণ্ডা, কাড়াকাড়ি ছাড়া হাতাহাতি, মারামারি, ধাক্কাধাক্কি, এমন কি প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে! বহু লোক খুন-জখম হয়…বিক্ষুব্ধ জনস্রোতের মাঝে পড়ে অনেক অসহায় প্রজা ভিড়ের দুরন্ত চাপে নিষ্পেষিত, দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারায় নিতান্ত মর্ম্মান্তিকভাবে! রাজার রাজ্যাভিষেকের রাত্রে রাজধানীর পথপ্রান্তে দেশের দুঃখী-আতুর প্রজার দল যখন এমনি নিরুপায় অবস্থায় জীবনাহুতি দিতে থাকে, তখনও বিচিত্র আলোক-মালায় সজ্জিত ক্রেম্‌লিন্‌-প্রাসাদের রাজ-দরবারে নবীন-সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ আর সম্রাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রোভাকে ঘিরে উৎসব-আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছিল পূর্ণোচ্ছ্বাসে। আনন্দ-মুখর ক্রেম্‌লিন্‌ রাজপ্রাসাদের সুদৃঢ় পাথরের তৈরী বিরাট প্রাচীর বেষ্টনী ভেদ করে, বাইরে পথের প্রজাদের সকরুণ আর্ত্তরোল রাজদম্পতী বা রাজ-অনুচরবর্গের কাকেও এতটুকু বিচলিত কিম্বা বিব্রত করতে পারেনি সে রাত্রে…অভিষেক উৎসবের অনুষ্ঠানে মেতে এমন আত্মহারা হয়েছিলেন তাঁরা যে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকে দৃক্‌পাত করার বিন্দুমাত্র অবসর ঘটেনি তাঁদের!

এ-ব্যাপার ছাড়া এমনি ধরণের আরো অনেক শোচনীয় মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে, যার ফলে বিক্ষুব্ধ রুশ-প্রজাদের মনে ক্রমেই উগ্রতেজে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের দাবানল। সে আগুনের তীব্র ঝলকে কালক্রমে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সুপ্রতিষ্ঠিত রুশ-রাজসম্প্রদায়ের শ্রী-সম্পদ, প্রতাপ-প্রতিপত্তি যা-কিছু সবই। অতীতের
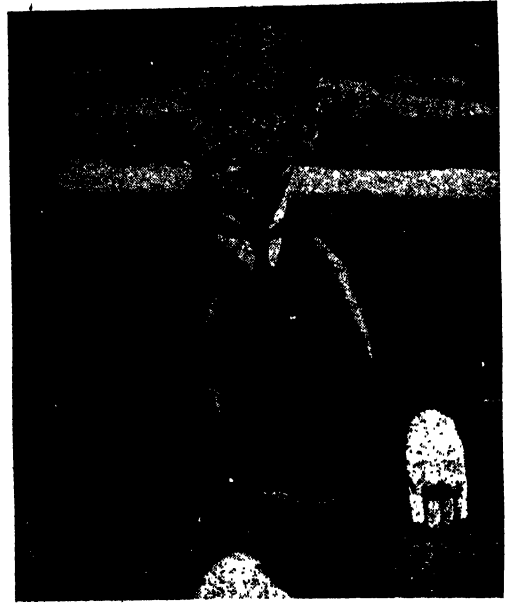
দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রণাদাতা কূটনীতিজ্ঞ রুশমন্ত্রী ষ্টোলিপিন

সেই সব মর্ম্মান্তিক-ঘটনার মধ্যে ১৯০৪-১৯০৫ সালের রুশ-জাপানের ঐতিহাসিক যুদ্ধও হলো অন্যতম। চীনদেশের মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়া অঞ্চলে সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্য-বিস্তারের স্বার্থ-প্রভুত্ব নিয়ে জাপানের সম্রাটের সঙ্গে রুশ-রাজ দ্বিতীয় নিকোলাসের বাধে তুমুল সংগ্রাম। স্বেচ্ছাচারী রুশ-সম্রাট এবং তাঁর অভিজাত-অনুচরবর্গের স্বার্থসিদ্ধি আর খেয়াল-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনসাধারণকে দেওয়ালী রাতের অগ্নিদগ্ধ পতঙ্গরাজির মতই নির্ম্মমভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়েছিল এ-যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ জাপানী-সেনাদের প্রচণ্ড গোলা বারুদে। কিসের যুদ্ধ, কার জন্য যুদ্ধ—সেটুকু জানবার বা বোঝবার কোনো সুযোগই জোটেনি তখন এই সব দুর্ভাগা রুশ-প্রজাদের কারো বরাতে। যুদ্ধের ফলাফলও রাশিয়ার পক্ষে নিতান্ত কলঙ্কময়

হয়ে ওঠে⋯প্রবল বিক্রমী জাপানী সেনাদলের হাতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পোর্ট-আর্থারের যুদ্ধে রুশ-রাজশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে অবশেষে। রুশ-জাপানের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের মূলে ছিল—দুর্নীতি-জর্জ্জরিত ওদেশের তৎকালীন সামরিক কর্ম্মচারীদের নিদারুণ বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা এবং হীন-স্বার্থান্ধ বিশ্বাসঘাতক আচরণ। জাপানের মত ক্ষুদ্র শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে আর্থার বন্দর হারিয়ে এঁরা যে শুধু রাশিয়ার বিরাট রাজশক্তির গর্ব্বিত ললাটে গ্লানি-অপমানের কালিমা মাখিয়ে সারা জগতের সামনে স্বদেশের ইজ্জৎ নষ্ট করেছিলেন তাই নয়, যুদ্ধ-প্রপীড়িত অসন্তুষ্ট রুশ-জনসাধারণের মনেও বিদ্রোহ বিপ্লব-আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন আরো তীব্রতর-তেজে। ফলে, রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত রুশ-জনগণের মধ্যে যে মুক্তিকামী-বিদ্রোহের বহ্নি প্রধূমিত হয়ে উঠছিল এতকাল ধরে, লেনিন, ষ্টালিন, ট্রট্স্কী প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ-নেতাদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী-বল্শেভিক্ এবং মেন্শেভিক্ দলের নেতৃত্বে যুগান্তকারী অন্তর্বিপ্লবের আকারে প্রবল তেজে আত্মপ্রকাশ করে, সে-দাবানল ছড়িয়ে পড়লো সারা রাশিয়ার বুকে। রাজদ্রোহী রুশ-প্রজাদের এই অসন্তোষ-বিপ্লবের বাষ্প প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায়—পেট্রোগ্রাড্ (আধুনিক লেনিন-গ্রাড্) সহরের প্যুটিলভ্ (Putilov Armament Works) অস্ত্রের কারখানায়। বিপ্লবী-নেতাদের নির্দ্দেশে সেখানকার শ্রমিকরা সবাই একজোটে ধর্ম্মঘট করে। এ-গণ্ডগোল মেটাবার উদ্দেশ্যে, ২২শে জানুয়ারী, রবিবার দিন, জর্জ্জ গেপন্ (George Gapon) নামে এক বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক প্যুটিলভ্ কারখানার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক এবং নিরীহ-জনগণের এক বিরাট শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে, 'জার' দ্বিতীয় নিকোলাসের দরবারে প্রপীড়িত-প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য দরখাস্ত লিখে 'উইণ্টার-প্যালেস' প্রাসাদের দিকে যাত্রা করেন। পথে শ্রমিকদের এই মিছিলকে রাজ-প্রাসাদের অভিমুখে এগিয়ে আসতে দেখে রাজার পার্শ্বচরবৃন্দ দ্বিতীয় নিকোলাস্কে খবর জানান যে বিপ্লবী-শ্রমিকরা দল বেঁধে 'উইণ্টার-প্যালেস্' আক্রমণ করতে আসছে! অনুগত অনুচরদের মুখে শ্রমিকদের প্রাসাদে আসার সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় নিকোলাস্ নিরস্ত্র-শান্ত জনতার মিছিলকে রাজদ্রোহী দল বলে ভুল বুঝে রাজ-সৈন্যদের আদেশ দেন—নিরীহ-প্রজাদের উপর গুলি চালাবার জন্য। সম্রাটের হুকুমে নির্দ্দয়-সেনাদলও ঘোড়ায় চড়ে 'উইণ্টার-প্যালেস্' প্রাসাদের সামনে 'লার্ভা ট্রায়াম্ফাল্ আর্ক' (Larva Triumphal Arch) বিজয়-তোরণের পদপ্রান্তে আচম্বিতে শান্ত-নিরস্ত্র শোভাযাত্রাকারীদের আক্রমণ করে, উদ্‌ভ্রান্ত-ছত্রভঙ্গ জনতার উপর বেপরোয়া ঘোড়া এবং গুলি চালায়। রাজ-সেনাদলের এই অতর্কিত-আক্রমণ, উন্মত্ত ঘোড়া ছোটানো, আর বেপরোয়া গুলি-বর্ষণের দাপটে নিরীহ অসহায় প্রজাদের অনেকেই নিতান্ত বিপর্য্যস্ত এবং খুন-জখম হয়ে পথের ধুলায় লুটিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়⋯মিছিলের নেতা ধর্ম্মাত্মা গোপনও গুরুতরভাবে আহত হন। সেদিনের এই মর্ম্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি আজো রুশবাসীর মনে জেগে আছে⋯রাশিয়ার ইতিহাসে বিগত-কালের এই রবিবার দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে—'Bloody Sunday' বা 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে!

পেট্রোগ্রাডের পথে 'রক্তাক্ত রবিবারের' হত্যালীলার দৃশ্য

দ্বিতীয় নিকোলাসের এই মারাত্মক-ভুলের ফলে, গণ-বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়ে সারা রাশিয়ার বুকে। স্বেচ্ছাচারী 'জার্-সম্রাটের পীড়ন-অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট রুশ কৃষক-শ্রমিকরা এবং দেশের জন-সাধারণ অতঃপর একজোট হয়ে সম্মিলিত-প্রচেষ্টায় বিপ্লব-ঘোষণা করে প্রকাশ্যে নিজেদের অভিযোগ জানায়। ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার 'ওডেসা' (Odessa) বন্দরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'পোটেম্‌কিন্' যুদ্ধ-জাহাজের নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তাদের দেখাদেখি 'সিবাস্তোপোলে'ও রাজ-সেনারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মস্কোতেও রেল-শ্রমিকরা একজোটে ধর্ম্মঘট বাধিয়ে বসে রাজধানীর বুকে!

এমনি সময়ে 'জার'-শাসনের উচ্ছেদ আর বিক্ষুব্ধ-বিপ্লবীদের সাহায্যকল্পে ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে 'জারের' অনুগত গোয়েন্দা-পুলিশদের চোখে ধুলো দিয়ে, গণ-নেতা লেনিন বিদেশের গুপ্ত-ঘাটি থেকে রাশিয়ায় ফিরে এসে দেশের বিপ্লবী-জনগণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে বিপ্লবকার্য্যের নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন। প্রজাদের মনোভাব আর বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপের তীব্রতার আভাস পেয়ে দ্বিতীয় নিকোলাস

তখন ছলে-কৌশলে বিক্ষুব্ধ-জনসাধারণকে ভুলিয়ে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা-দানের সিদ্ধান্ত করেন। এই মর্ম্মে ১৯০৫ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে সম্রাট নিকোলাস্ প্রকাশ্যে রুশ-প্রজাদের স্বায়ত্ব-শাসনাধিকার, সভা-সমিতি সংগঠন, বক্তৃতা-দান, ব্যক্তিগত মতামত-রক্ষার বিষয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদর্শে, রাশিয়াতেও জনগণের নির্ব্বাচিত-প্রতিনিধিদের সাদরে সম্মিলিত করে নূতনভাবে এক 'ডুমা' (Duma) বা 'গণ-পরিষদ' গড়ে তোলেন। রাজার বিধানে স্থির হয় যে এই 'ডুমা' বা 'লোক-সভার' নির্ব্বাচিত-সদস্যদের সম্মতি ছাড়া দেশে কোনো রকম আইন জারি করা চলবে না। নব-প্রবর্ত্তিত এই 'ডুমা' বা স্বয়ং সে-আইনের বিলোপ-সাধন করেন। অভিনব-নূতন এই সংস্কার বিধানের ফলে, আগেকার আমলে রুশদেশে ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের হাতে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জমা হয়ে উঠেছিল দিনে-দিনে, সে-সব সবিশেষ হ্রাস পেলো! 'জারের' প্রবর্ত্তিত 'লোক-সভা' প্রতিষ্ঠার পর দেশে এই রকম নানা উন্নত-উদার শাসন-সংস্কার ও স্বায়ত্ব-শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার দরুণ মুক্তিকামী রুশ জন্-সাধারণ গোড়ার দিকে খুবই উৎফুল্ল এবং আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের অবস্থার উন্নতির সম্বন্ধে—কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, প্রজারা ততই সন্দিহান হয়ে উঠতে লাগলো দ্বিতীয় নিকোলাস্ এবং তাঁর অভিজাত-অনুচরবর্গের লোকহিতকর কার্য্যকলাপ আর শুভ-ইচ্ছার ব্যাপারে! 'ডুমা' সংগঠনের অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশের জন-গণের মধ্যে রাজদ্রোহিতার উত্তাপ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের লোক-সেবার শুভ-চেষ্টাতেও উত্তরোত্তর ভাঁটা পড়তে সুরু হয়···সম্রাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রোভা এবং কূটনীতিজ্ঞ ষ্টোলি-পিন্ প্রমুখ মন্ত্রীদের কুমন্ত্রণায়-স্বার্থান্ধ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস পরম স্বেচ্ছাচারিভাবে 'লোক-সভার' স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারে! রাজার এই অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপের ফলে, রুশ-প্রজাদের মনে আবার জ্বলে উঠলো বিপ্লবের বহ্নিশিখা! বিদ্রোহী প্রজাদের নেতা লেনিনের নিপুণ-নির্দ্দেশে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে গণ-বিপ্লব ক্রমে আরো চরম আকার ধারণ করে। 'তবে,
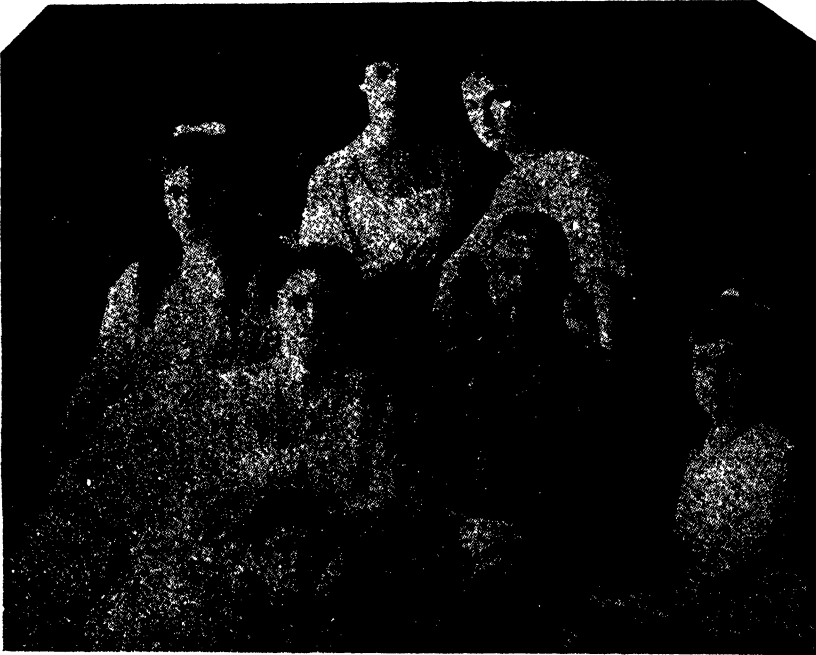
পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত সর্বশেষ রুশ-জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রোভা

'লোক-সভার' প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০৬ সালের মে মাসে—পেট্রোগ্রাডের সুপ্রসিদ্ধ 'উইণ্টার প্যালেস' রাজ-প্রাসাদের সুপরিসর দরবার-কক্ষে।

দ্বিতীয় নিকোলাসের এই শাসন-সংস্কারের বিধানে রাশিয়ার জন-সাধারণ মনে-মনে আশা করেছিলেন যে 'ডুমা' প্রতিষ্ঠার ফলে সত্যই দেশের কিছু উপকার-উন্নতি সম্ভব হবে এবার। ধারণাটা যে খুব অমূলক ছিল, তাও নয়···কারণ, লোক-সভা সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে রুশ-প্রজাদের সমান অধিকার দেবার আইন জারি করা হলো। উপরন্তু আগেকার আমলে রুশ 'অর্থোডক্স-চার্চ্চ' অর্থাৎ কাথ্‌লিক-ধর্ম্মমত অনুসরণ করা ছাড়া 'প্রোটেষ্টাণ্ট্' বা অন্য কোনো ধর্ম্মমতাবলম্বী হওয়া রাশিয়ার অধিবাসীদের পক্ষে বে-আইনী এবং দণ্ডার্হ ছিল, নব-প্রবর্ত্তিত 'ডুমা'র অধিবেশনে দ্বিতীয় নিকোলাস রুশীয় কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রীভাব আর সুশৃঙ্খলার অভাবে এবং রাজানুগৃহীত দেশের ধনী ও জমিদার শ্রেণীর বিপক্ষতার ফলে, দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ-সেনাদলের কাছে সেবারকার মত বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটে।

বিপ্লব-দমনের পর অভিজাত প্রধান মন্ত্রী ষ্টোলিপিনের মন্ত্রণানুসারে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্ বিপ্লবী-প্রজাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে নির্ম্মম-কঠোর চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। 'জার্'-সম্রাটের আদেশে হাজার হাজার বিদ্রোহী শ্রমিক, কৃষক আর প্রজাদের লোহার শিক দিয়ে ঘেরা খাঁচার মত 'ষ্টোলিপিন' বন্দী-বাহী ঠেলা-গাড়ীতে ঠেসে বোঝাই করে জনহীন সুদূর সাইবেরিয়ার হিম-শীতল প্রান্তে পাঠানো হলো নির্ব্বাসনে···কত লোক প্রাণ দিলে ফাঁশির দড়িতে···বহু অভাগার জীবনান্ত ঘটলো রাজ-সেনাদের বন্দুকের গুলিতে, উন্মুক্ত-

সঙ্গীন আর শাণিত-তলোয়ারের নির্ম্মম আঘাতে! শুধু তাই নয়, রাজাদেশে বিপ্লবী না-হওয়া সত্ত্বেও, সামান্য সন্দেহবশে বহু নিরীহ-নিরপরাধী অসহায় প্রজাদেরও প্রাণ-বিয়োগ ঘটেছে সে-সময়—হয় ফাঁশির মঞ্চে, বন্দুকের গুলিতে, কিম্বা শড়্‌কী-সঙ্গীনের খোঁচায়! এছাড়া রাজ-রোষে বন্দী-প্রজাদের উপর নৃশংস-অমানুষিক পীড়ন-অত্যাচার, আর কারাদণ্ড, নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাও হয়েছিল তখন রীতিমত কড়া এবং ভয়াবহ ধরণে!

এমনিভাবে বিপ্লব-দমনে সফল হয়ে 'জার্' দ্বিতীয় নিকোলাস প্রচণ্ড উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে বসলেন। সম্রাটের নির্ম্মম-স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিষ-বাষ্পে ইন্ধন জোগালেন গণ-স্বাধীনতা-বিরোধী সম্রাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রোভা এবং অত্যাচারী-মন্ত্রী ষ্টোলিপিন, আর দেশের রাজানুগৃহীত ধনী ও জমিদার-সম্প্রদায়! প্রজাদের উপর অবিরাম নৃশংস-বর্ব্বর পীড়ন-অত্যাচার চালিয়ে এঁরা দেশের বিক্ষুব্ধ-জনসাধারণকে দমিত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। প্রজারা কিন্তু দমবার পাত্র নয়…বিপ্লবী-নেতাদের সুনিপুণ নির্দ্দেশে রুশ কৃষক-শ্রমিক আর জন-সাধারণ আরো শক্তিশালী-ভাবে নিজেদের সংগঠিত করে তুলতে লাগলেন ক্রমশঃ! বিপ্লবী-প্রজাদের শক্তি-সঞ্চয় দেখে ত্রাস্ত-বিচলিত হয়ে ১৯০৭ সালে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস 'ডুমা' বা 'লোক-সভার' দ্বিতীয় অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন! এতেও কিন্তু বিক্ষুব্ধ-জনগণের বৈপ্লবিক-মনোভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটলো না…বরং রাজা যত বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন—বিপ্লবী-প্রজাদের আন্দোলনের তীব্রতা ততই বেশী বাড়তে লাগলো! সারা রুশ-রাজ্য জুড়ে দেখা দিল দারুণ দুর্য্যোগ। এমনি দুর্য্যোগের দিনেই নিয়তির বিধানে রাশিয়ার ভাগ্যাকাশে পরম কুগ্রহের মত এসে আবির্ভূত হলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রহস্যময় এক মানুষ…তাঁর নাম গ্রিগরী রাস্‌পুটিন্! রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই রাস্‌পুটিন্ চরিত্রটির স্মৃতি জড়িয়ে আছে রীতিমত অবিস্মরণীয়ভাবে…ভুবন-বিখ্যাত হলেও রাস্‌পুটিনের অভিনব-বিচিত্র জীবন-কাহিনী অনেকখানি রহস্যের কুয়াশায় আজো ছেয়ে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দুইটি দেশ মহাভারত ও মহাচীন; ইহাদিগকে মহাদেশের পর্য্যায়ে ধরিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিকে যেমন বিরাট তাহাদের আয়তন, বিপুল তাহাদের জনসংখ্যা, সুপ্রাচীন তাহাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় তাহাদের আব্‌হাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, আবার তেমনি অপর দিকে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং বহুবর্ষব্যাপী বিদেশীর শোষণে অতি কঠোর দারিদ্র্যের লীলানিকেতনও এই দুইটি দুর্ভাগা দেশ! কয়েক বৎসর আগেও চীন শুধু নামেই স্বাধীন ছিল; আর ভারতবর্ষের ত কথাই নাই, দুই শত বৎসরের ইংরেজের অধীনতা-পাশ তাহাকে অক্টোপাশের মত জড়াইয়া যতদূর সম্ভব হীনবীর্য করিয়া রাখিয়াছিল। আজ বিধাতার আশীর্বাদে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যে চিরতরে অস্তমিত এবং ভারতের ও মহাচীনের আকাশে দেখা দিয়াছে বিপুল সম্ভাবনাময় স্বাধীনতার অরুণালোক। সুতরাং কী ভাবে স্বাধীনতা আসিবে আজ সে প্রশ্ন অবান্তর; তাহার পরিবর্তে এই দুই দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কদের মনে দেখা দিয়াছে গভীর সমস্যা—যে কী ভাবে এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে শুধু রক্ষাই নয়, তাহাকে সর্বতোভাবে নিয়োগও করা যায়, নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণের জন্য। যদি কোন স্বাধীন দেশের লোক উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্র কিংবা শিক্ষা না পায়, যদি তাহাদের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা না থাকে, যদি দারিদ্র্যের লাঘব না হয়, যদি তাহাদের মধ্যে ধীমান ও বীর্যবান লোকের উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে শুধু নামেই যে স্বাধীনতা—তার মূল্য কতটুকু থাকে? যতদিন দেশ পরাধীন ছিল, কী দৈব-দুর্যোগে, কী মহামারীর ফলে, কী অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষায়, কী স্বাস্থ্যহীনতা কিংবা দারিদ্র্যের অভিসম্পাতে যখনই আমরা নিপীড়িত কিংবা জর্জরিত হইয়াছি, তখনই আমরা তাহার জন্য দায়ী করিয়াছি আমাদের পুরাতন প্রভু, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বিদেশী ইংরাজকে। আজ তাহারাই আমাদের এইরূপ ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ভাবে ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া দোষারোপ করিলে ত চলিবে না। অতীতে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে তাহার জের টানিয়া চলিলে ক্ষতি ছাড়া কিছুই লাভ হইবে না। সুতরাং বর্ষশেষে যেমন গত বৎসরের হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া হাল-খাতায় নূতন হিসাব আরম্ভ করিতে হয়, বর্তমানেও আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া সেইরূপই নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে হইবে। বর্তমানের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং আজ যে ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করিব তাহা হইতেই ঠিক সেইভাবে ফলিবে ভবিষ্যতের ফসল। গল্পের 'অনাগত বিধাতা'র মত না হইতে পারিলেও, যদি বা 'প্রত্যুৎপন্নমতি'র মতও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে আমাদের আফসোসের কারণ থাকিবে না।

চীনদেশ ও ভারতবর্ষের লোক স্বভাবতঃই ধর্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় এবং ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা আত্মার উন্নতির জন্য সচেষ্ট। এই সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারের

অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং ভাগ্যের উপর অতিনির্ভরশীল। ফলে উদ্ভাবনী শক্তিতে এবং যান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া প্রতীচ্যের দেশসমূহ, এমন কি নব-অভ্যুদিত আমেরিকা পর্যন্ত যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন এই দুইটি দেশ পুরাতন ঐতিহ্যের খোলস ও মান্ধাতার আমলের আচার-ব্যবহারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের ক্রীড়নকরূপে ভাগ্যদেবীর হাতে সমর্পণ করিয়াছে। শ্বেতকায় জাতিসমূহের শোষণের উপাদানরূপে তাহারা জোগান দিয়াছে, কাঁচা মাল আর তাহারই পরিবর্তে তাহাদেরই নিকট হইতে বহুগুণ মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছে যান্ত্রিক শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ। চীন তাহার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার একাংশকে পাঠাইয়াছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি ব্রিটিশ এবং ফিলিপাইন প্রভৃতি আমেরিকান উপনিবেশসমূহে, আর একই ভাবে ভারতও দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল, ফিজি, ব্রিটিশ গায়েনা প্রভৃতিতে শুধু 'কাঠ কাটা ও জল তোলা'র জন্য নিয়োগ করিয়াছে তাহার বহু শ্রমসহিষ্ণু সন্তানকে। বিদেশীর ঔপনিবেশিক স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা গভীর অরণ্যে জনপদের সৃষ্টি করিয়াছে, ঊষর ও অনুর্বর ভূমিখণ্ডকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিয়াছে এবং কলকারখানার উৎপাদন শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। আর তাহারই পরিবর্তে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহারা পাইয়াছে "কোণ-ঠাসা কাল-আইন," সিংহলে নাগরিকের অধিকার-বিলোপ এবং মালয় প্রভৃতি স্থানে বুকে গুলীর আঘাত কিংবা গলায় ফাঁসির রজ্জু। নিজের দেশেও তাহারা পরবাসীর মত কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা রোগজীর্ণ দেহে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এইভাবে জীবন্মৃত অবস্থা কিংবা অকাল মৃত্যুর প্রতীকার কি? ম্যাল্‌থাস্‌-নীতি অনুসারে প্রকৃতি নিজেই বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় খাদ্যের পরিমাণ ও লোক সংখ্যার মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। ধরিত্রীর বুকে উৎপন্ন সমগ্র খাদ্যভাণ্ডারের একটা সীমা আছে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, বুদ্ধি, পরিশ্রম কিংবা বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের প্রয়োগেও তাহার অপেক্ষা খুব বেশী খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং সেই অবস্থায় পৃথিবীর সমগ্র কিংবা কোনও দেশের লোকসংখ্যা যখন একটা বিশেষ মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ ও চীনে পূর্বে যুদ্ধবিগ্রহের অভাবে কেবল মহামারী ও মন্বন্তরে বহু লোকক্ষয়ের ইতিহাসের পৌনঃপুনিক আবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা সুদীর্ঘ দশ বৎসর ব্যাপিয়া চীন-জাপান যুদ্ধে চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে একই সঙ্গে অগণিত লোকের প্রাণহানি এই ম্যালথাস্‌ নীতিরই যাথার্থ্য প্রমাণ করে। আবার যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশ-সমূহে যে ভাবে জন্মের হার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও প্রকৃতির পক্ষে খাদ্যের পরিমাণ ও লোকসংখ্যার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য-বিধানের প্রচেষ্টা বলা চলে।

এই সকল গুরুতর ব্যাপার ছাড়াও আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু, গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবকালীন জননীর মৃত্যুর হারও অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে বেশি। তার উপর ঘন-বসতিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলসমূহে যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে মৃত্যুর সংখ্যাও অতিশয় ভয়াবহ। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টিহীনতার জন্য অকালমৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নহে। তাহা সত্ত্বেও প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে আদমশুমারি গৃহীত হয় তাহার ফলে দেখা যায় যে যমরাজ কিছুতেই মা-ষষ্ঠীর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না; অর্থাৎ লোকসংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, তারই অবশ্যম্ভাবী ফল—দেশে প্রচুর খাদ্যাভাব। সুদূর দেশ-দেশান্তর হইতে অত্যধিক মূল্যে গম, চাউল প্রভৃতি আমদানি করিয়াও দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বুভুক্ষা নিরসন কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার পরিমাণে ও গুণে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যের অভাবে বহু লোকের অকালে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে এবং তাহারা অকর্মণ্য ও জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছে। একই ভাবে পুষ্টিকর উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে লোকের ধীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না। ইহাদের প্রত্যেকটিই জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা—খাদ্যাভাব—দারিদ্র্য—স্বাস্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধির অবনতি—জন্মের হার বৃদ্ধি—আরও জনসংখ্যার বৃদ্ধি, এই পাপ-চক্র বারবার আবর্তিত হইতেছে, আর তাহারই ফলে সদ্যঃস্বাধীন ভারতীয় জাতি ধাপে ধাপে ক্রমশঃ সোপান বাহিয়া অবনতির দিকে নামিয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে পাপচক্রের কোন না কোন অংশে আঘাত করিয়া চক্রের পৌনঃপুনিক আবর্তনকে চিরতরে নষ্ট করা চাই। এই পাপচক্রের যতগুলি বিশিষ্ট অংশ আছে, তাহার মধ্যে জন্মের হার-বৃদ্ধিকে বন্ধ করা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণই সকলের অপেক্ষা সহজসাধ্য ব্যাপার। যে কোন ব্যক্তি অতি সামান্য প্রচেষ্টা ও সতর্কতার ফলে পাপচক্রের এই অংশকে নিজ ইচ্ছাশক্তি কিংবা উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রভাবে দাবাইয়া রাখিতে পারেন।

অভিব্যক্তির নিম্নস্তরীয় প্রাণী হইতে পশুপক্ষী পর্যন্ত প্রাণীরা প্রজনন-হিসাবে অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরীয় মানুষই বুদ্ধি ও বিবেক-সম্পন্ন বলিয়া এই হিসাবে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। পোকামাকড়, ব্যাঙ্‌, সাপ, মাছ প্রভৃতির একসঙ্গে অসংখ্য বাচ্চা হয় কিন্তু এই অসংখ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চাই স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল লাভ করে। ইঁদুর, খরগোশ, বিড়াল কিংবা কুকুরের এবং ছাগল কিংবা ভেড়ারও একসঙ্গে তিন-চারিটি করিয়া কিংবা ততোধিক বাচ্চা জন্মায়। আবার গরু, ঘোড়া, মহিষ, হাতী কিংবা সিংহের কদাচ একটির অধিক শাবক জন্মায়। অপর পক্ষে গরু, ঘোড়া কিংবা মহিষের তুলনায় অনেক অধিক ব্যবধানে হাতী কিংবা সিংহের বাচ্চা হয় এবং হস্তী ও সিংহ-শাবক অন্যান্য প্রাণীর শাবক অপেক্ষা অনেক বেশী বাঁচিয়া থাকে এবং শক্তিমান্‌ হয়। সুতরাং দুইটি গর্ভাধানের ব্যবধান-সময় যে প্রাণীর যত

বেশি হয়, তাহার সন্তান-সন্ততিও সেই অনুসারেই সাধারণতঃ শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু হয়।

জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আবার যখন-তখন গর্ভাধান সম্ভবপর নহে। একটি বিশেষ সময়ে উত্তাপ অবস্থায় (heat or œstrus) স্ত্রীজন্তু পুং-জন্তুর সঙ্গে মিলন কামনা করে; সুতরাং তাহাদের বংশবৃদ্ধি অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে সেই নিয়ম খাটে না। মানুষের কামেচ্ছা বা যৌন-ক্ষুধা প্রাকৃতিক বা দৈহিকও বিশেষ কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। যখন-তখন যে কোন অবস্থাতেই সে তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে এবং সেই চেষ্টায় রত হয়। এই জন্য যৌন ব্যাপারে মানুষ সাধারণতঃ পেটুকের পর্যায়েই পড়ে, বরং কোন কোন স্থলে তাহার অপেক্ষাও অনেক বেশিও অগ্রসর হইতে দেখা যায়। পেটের ক্ষুধা যদি বা উদর-পূর্তির দ্বারা নিরসন করা যায়, যৌন ক্ষুধা দৃষ্টি ক্ষুধার মত মানসিক ব্যাপার বলিয়া তাহার পরিতৃপ্তির শেষ নাই বলিলেও চলে। আবার সঙ্গতিপন্ন যাঁহারা—তাঁহারা অর্থের সাহায্যে নানাভাবে দেহ ও মনের সন্তুষ্টি-বিধানে সক্ষম এবং অতিধীমান্ যাঁহারা, দেহের অপেক্ষা মনের বিলাসেই তাঁহাদের সৃজন-প্রতিভা অধিকাংশ স্থলে সাফল্য লাভ করে, কিন্তু বিত্তহীন অতি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে যাহারা, তাহাদের পক্ষে অন্য কোন পথ উন্মুক্ত নাই বলিয়াই একমাত্র সম্ভাব্য বিলাস স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের সঙ্গসুখ। সুতরাং তাহারই অনিবার্য পরিণতিরূপে শেষোক্ত স্থলেই মা-ষষ্ঠীর অকৃপণ কৃপা দেখা যায়—অর্থাৎ বিত্তহীন কিংবা অস্বচ্ছল পরিবারেই সন্তান-সন্ততির সংখ্যা হয় বহু ও সাধ্যাতীত। তবে রক্ষা এই যে স্ত্রীর দুইটি মাসিক ঋতুর মাঝামাঝি প্রায় একসপ্তাহ কিংবা দশদিন—শুধু এরূপ সময়েই গর্ভাধান সম্ভবপর এবং এই সময়ে সাধারণতঃ স্ত্রীগ্রন্থির (ovary) দুইটির যে কোন একটি হইতে একটির বেশী ডিম্বাণু বা স্ত্রী-বীজ বাহির হয় না। প্রতিমাসে স্ত্রীদেহে বহির্গত ডিম্বাণুর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হইলে সংযমহীন অতি-কামুক দম্পতির পুত্রকন্যার সংখ্যা গণনায় শেষ করা যাইত না।

মা-ষষ্ঠীর বিশেষ কৃপার ফলে আমাদের দেশে কোন কোন স্থলে একই জননীর গর্ভজাত কুড়ি কি একুশটি সন্তানের জন্মদানের বিবরণও বিরল নয়। ভাগ্যে অতি-বিশ্বাসী দম্পতি এইরূপ অসাধারণ সৌভাগ্যের (?) জন্য নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করেন কিংবা নিয়তির অমোঘ বিধানের ফলেই তাহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া এরূপ দুঃসহ অবস্থাকে শিরোধার্য-রূপে গ্রহণ করেন। রুগ্ন, স্বাস্থ্যহীন কিংবা অপদার্থ বিংশ কিংবা একবিংশ সন্তানের জননীর ভাগ্য প্রায়শঃ মহাভারতের দুর্যোধন-প্রমুখ শত পুত্রের জননী গান্ধারীর মতই হয়। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' পরাজিত ও বিধ্বস্ত শতপুত্রের মতই বর্তমান যুগে চক্ষু থাকা সত্ত্বেও স্বামীদেবতা দৃষ্টিহীন বলিয়া স্বেচ্ছায় আবরিত চক্ষু বহু গান্ধারীর অগণিত পুত্রকন্যা কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরাজয় ও অকালমৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়। ধৃতরাষ্ট্র না হয় ভাগ্যদোষে জন্মান্ধ ছিলেন, কিন্তু বর্তমানকালে চক্ষুষ্মান্ হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জনক-জননী জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট [illegible] উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে অতি বৃহৎ পরিবারের গুরু দায়িত্বভারে সারাজীবন পিষ্ট হইতে থাকেন ও স্বপ্রাত সলিলে হাবুডুবু খাইতে থাকেন। অথচ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ-সংক্রমণ যেভাবে উপযুক্ত স্বাস্থ্যনীতিজ্ঞ লোকেরা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম, দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং বিশেষতঃ সুপ্রজনন-সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান যাঁহাদের আছে তাঁহারাও ঠিক সেইভাবেই উপযুক্ত ও সতর্ক ব্যবস্থার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্মদানে বিরত থাকিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তথাকথিত শিক্ষার বিভিন্নক্ষেত্রে এইরূপ অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নাই এবং বিবাহেচ্ছু উপযুক্ত বয়স্ক যুবক-যুবতীর কিংবা বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের এই বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত পুস্তকেরও একান্ত অভাব। আবার কেহ যদি এরূপ অত্যাবশ্যক বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের প্রসারের জন্য উদ্যোগী হন, তাহা হইলে ঘুণধরা সমাজের নীতি-বাগীশেরা "কী সর্বনাশ!" বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন এরূপ সুষ্ঠু জ্ঞানের প্রসারের ফলে সমাজে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, কিংবা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ যাহারা—তাহাদিগকেও যৌন-ব্যাপারে সচেতন ও আগ্রহশীল করিয়া তোলা হইবে। অথচ তাঁহারা একটুও ভাবিয়া দেখেন না যে উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী আজ কী কঠোর দারিদ্র্য ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে এবং এখনও সাবধান না হইলে অদূর ভবিষ্যতে আরও কঠিন জীবন-সংগ্রামে তাহাদের একেবারে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতে হইবে। অপরপক্ষে অজ্ঞান বলিয়া কত কোমলমতি কিশোর-কিশোরী দুষ্টলোকের খপ্পরে পড়িয়া সংসার-পারাবারে নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতেছে! অজ্ঞানতার মোহবশে একবার যদি কাহারো (বিশেষতঃ মেয়েদের) পদস্খলন হয় তাহা হইলেও যে সমাজ তাহাকে অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিয়া তাহার এইরূপ সর্বনাশ ঘটাইবার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, সে-ই বিচারকের আসনে বসিয়া তাহার কঠোর শাস্তির অর্থাৎ সমাজ হইতে চির নির্বাসনের ব্যবস্থা করে; ফলে তাহার ইহলোক ও পরলোক দুইই নষ্ট হয়। সুতরাং বিচারহীন আচার সর্বস্ব রক্ষণশীল সমাজের বহু কুসংস্কার ও ভ্রান্তধারণার মতই, এইরূপ ধারণাও আজ-কালকার যুগে একান্ত অচল।

কী ভাবে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কী ভাবে সেই জ্ঞানকে সুষ্ঠু কাজে লাগাইয়া দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও শান্তিময় এবং প্রত্যেক পরিবারকে উন্নততর এবং আরও সমৃদ্ধিশালী করা যায়, সমাজের এবং দেশের গবর্ণমেন্টেরও তাহাই কাম্য হওয়া উচিত। সুখের বিষয় এই যে সম্প্রতি আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কতকটা মনোযোগ দিয়াছেন এবং স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় পরিবার-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাও একটি বিশেষস্থান লাভ করিয়াছে। কোন কোন শহরে উপযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু প্রচারের অভাবে বহু লোকেই তাহাদের অস্তিত্বের কিংবা উপকারিতার কথা বিশেষ কিছুই জানে না কিংবা কতকটা জানিলেও হয় গোঁড়ামির জন্য, না হয় আলস্যের জন্য, না হয় কতকটা লোকলজ্জার জন্যও এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ

করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। আমেরিকার প্রখ্যাত যৌন-বিজ্ঞানী স্টোন-দম্পতী কিছুকাল আগে এ দেশে আসিয়া কী ভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাকে সাফল্যযুক্ত করা যায় তাহার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দান ও পথনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের দিক্ হইতে এইরূপ প্রচেষ্টার আরম্ভও কতকটা আশাজনক।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলিতে অনেকে মনে করেন যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে তাহাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা ভুল ধারণা। যে কোন দেহীর পক্ষে দেহের শক্তি ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য কতকগুলি প্রয়োজন মিটাইতে হয়। ক্ষুধার জন্য খাদ্য ও তৃষ্ণার জন্য পানীয় যেমন আবশ্যক তেমনি কতকটা মুখ্য না হইলেও গৌণ প্রয়োজনেই যৌন-বাসনার নিরসনও স্বাভাবিক ধর্ম। সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী যাঁহারা, কঠোর সাধনা ও সংযমের ফলে তাঁহাদের পক্ষে মানুষের অতিস্বাভাবিক যৌন-ইচ্ছা বা ক্ষুধাকে দমন করা হয়ত সম্ভবপর, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা শুধু দুঃসাধ্যই নহে, বরং অতি আয়াস-সাধ্য নিরুদ্ধ কামের ফলে তাহাদের দেহ ও মনের মধ্যে দারুণ বিপর্যয়ের সূত্রপাতও হইতে পারে। নিত্য যাঁহারা গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে আর তেমনটি যেমন থাকে না, ঠিক তেমনি অতিকামুক যাহারা, তাহাদের নিকটও যৌন-তৃপ্তির পুলকের মাত্রা আর সেইরূপ থাকে না। অথচ অসতর্কতা কিংবা অজ্ঞানতার ফলে সেই কাম-তৃপ্তির অবাঞ্ছিত ফলরূপে যখন অসংখ্য পুত্র-কন্যা আসিয়া দেখা দিতে থাকে, তখন সেই পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাদের সারাজীবন ভুগিতে হয়। সুতরাং অতিকামুকতাকে যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া কেবল সুনিয়ন্ত্রিত যৌন-বিলাসই দাম্পত্য-জীবনে সুখ ও শান্তি দিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত কতকটা সময়ের ব্যবধানে শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌন-জীবনও বহু স্থলেই অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্মরোধ করিতে পারে না। এই জন্যই বাস্তবক্ষেত্রে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনার সুষ্ঠুপ্রয়োগ অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বিবাহিত নর-নারীরই 'পুত্র-কন্যা' ইচ্ছা করা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া কেহই চায়না যে একটি সন্তানের জন্মের পর বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে আর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করুক। কী জননীর স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে, কী পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতির দিক হইতে, কী শারীরিক সামর্থ্যের দিক্ হইতে একটানা পুত্রকন্যার প্রবলবন্যা কখনই কাম্য হইতে পারে না। উপযুক্ত ব্যবধানে নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী গুটি-কয়েক উপযুক্ত সন্তানই সাধারণ যে কোন দম্পতী লাভ করিতে চায়। আবার শুধু পুত্র কিংবা শুধু কন্যাতেও কোন পিতামাতাই সন্তুষ্ট থাকে না—দুয়ের সমন্বয়ই সকলের আকাঙ্ক্ষিত। ছেলে ও মেয়ের মিলিত সংখ্যা চারের অনধিক হওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় এবং যে কোন দুইটি সন্তানের জন্মের ব্যবধান তিন হইতে চারি বৎসর হইলেই ভাল হয়। কী ভাবে স্বাভাবিক যৌনজীবন-সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত সন্তানের পরিবর্তে পিতা ও মাতা, দুইজনেরই সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষায় উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে নিজেদের ইচ্ছামত উপযুক্ত-সংখ্যক স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ সন্তান-উৎপাদনে নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও শান্তিময় এবং পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নত করিতে পারেন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য তাহাই। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে দাম্পত্য জীবনে সহবাসের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা, গর্ভাধান-প্রণালী ও ইচ্ছামত গর্ভাধান-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। আশা করি এই সকল বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ও জ্ঞানলাভের ফলে এবং নির্দেশিত ব্যবস্থার উপযুক্ত এবং সতর্ক প্রয়োগে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী পরিবার গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি একই সঙ্গে "করমেতে বীর", "ধরমেতে ধীর" এবং "উন্নত-শির না-হি ভয়" হইয়া পুনরায় সমগ্র ভারতে পুরোধারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীসারদামণি

শ্রীসুবোধ রায়

তোমার আত্মার শিখা জ্বলে অনির্ব্বাণ ;
শত শত প্রাণে তাহা নাশিল আঁধার,
দিল তাহা লোকোত্তর সত্যের সন্ধান,
ঘোষিল—"নিষ্ঠার জয়, জয় সাধনার।"
আপন জীবন দিয়ে তুমি যে দেখালে
শক্তিরূপা নারী সে যে তেজোদীপ্তিময়ী।

ভূমা লাগি' অতীন্দ্রিয় ভূমিতে দাঁড়ালে,
বুঝালে—তপস্যা সর্ব্বমোহবন্ধ জয়ী।
তব পরিশুদ্ধ প্রাণ-গঙ্গোত্রীর ধারা
আনে বহি' দেশমাঝে নবীন বারতা,
মুমূর্ষু নারীর বুকে জাগালো সে সাড়া,
দিল তারে কর্ম্মশক্তি, ধর্ম্ম সহায়তা।

"পরম পুরুষ" মাঝে দিব্যশক্তি তব
ধর্ম্মরাজ্যে আনি' দিল যুগান্তর নব।

কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা

মন্মথ রায়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন। রূপগোস্বামীর আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা।

রূপগোস্বামী মধ্যস্থলে ধ্যানরত। তাঁহার শিষ্যগণ সংকীর্তন করিতেছেন।

গান

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সই যমুনার কুলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥

রূপ॥ (শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) গোকুল ছেড়ে শ্রীহরি মথুরাপুরীতে এলেন। গোকুল শূন্য হলো—মথুরাপুরী পূর্ণ হলো। যেখানে শ্রীহরি, সেখানেই পূর্ণতা—সেখানেই জীবন—সেখানেই আনন্দ! সেই আনন্দের আভাস আমিও পাচ্ছি আজ এখানে—এই বৃন্দাবনে—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমে। কী এক সুগন্ধ সুবাসে আশ্রম পূর্ণ হয়েছে—কী যেন এক উদাসী বাঁশীর সুর শুনছি। কে যেন আসছেন—কে যেন আসছেন—কার যেন পদধ্বনি শুনছি। কে সেই মহাপুরুষ—কে সেই দেবতা—জানি না। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকো—আমিও হচ্ছি।

আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রস্থান

১ম শিষ্য॥ মহাপুরুষ আসছেন! এই রূপগোস্বামীর চেয়ে বড়ো মহাপুরুষ আজ এই বৃন্দাবনে কে আর আছেন—তাতো জানি না ভাই।

২য় শিষ্য॥ কিন্তু গুরুদেবের অনুমান কখনো ব্যর্থ হয়নি—ব্যর্থ হবে না। উনি যখন বললেন, কেউ আসছেন—নিশ্চয়ই কেউ আসছেন।

৩য় শিষ্য॥ তবে কী ভাই শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম থেকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসছেন?

৪র্থ শিষ্য॥ তা' যদি আসেন, তবে গুরুদেবের জীবনও ধন্য, আর—আমরা তাঁর শিষ্যরা—আমাদের জীবনও ধন্য।

১ম শিষ্য॥ তা' নয়তো কি! গুরু কৃপাহি কেবলম! গুরু কৃপাহি কেবলম্!! গুরু কৃপাহি কেবলম্!!!

রাজরাণী মীরার প্রবেশ
সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল

মীরা॥ এই কী শ্রীরূপগোস্বামীর আশ্রম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী?

১ম শিষ্য॥ হ্যাঁ দেবী।

মীরা॥ আমি তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

২য় শিষ্য॥ কিন্তু দেবী, গুরুদেব ব্রত নিয়েছেন, নারী মুখ দর্শন করেন না।

মীরা॥ বটে! নারীমুখ দর্শন করেন না!

২য় শিষ্য॥ হ্যাঁ দেবী।

মীরা॥ কিন্তু আমি যে তাঁর দর্শনলাভের জন্য সুদূর চিতোর থেকে পাগলের মতো ছুটে এসেছি—তাঁর দর্শন-সুধা লাভ করে মনের জ্বালা জুড়োতে—শ্রীহরির রহস্য জানতে—মোক্ষলাভের পথের সন্ধানে। না, না, আমি তাঁর দর্শন চাই। আপনারা দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন।

৩য় শিষ্য॥ না দেবী, তা' হয় না—তা' হবে না।

মীরা॥ শ্রীরূপগোস্বামী—শুনেছি, বড়ো দয়ালু—প্রেমের অবতার মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ শিষ্য তিনি। তাঁর দুয়ারে এসে আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবো? না, না, তাঁকে গিয়ে বলুন আমার কথা। তিনি দয়া করবেন—আমি জানি, তিনি দয়া করবেন।

৪র্থ শিষ্য ॥ বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কোনো ফল হবে না দেবী।

৪র্থ শিষ্যের প্রস্থান

মীরা ॥ তবে কি বুঝবো, এ আশ্রমে কোনো নারীরই প্রবেশ-অধিকার নেই?

১ম শিষ্য ॥ হ্যাঁ দেবী।

মীরা ॥ এই বৃন্দাবনেই ব্রজনারীরা কি শ্রীকৃষ্ণের দয়ালাভ করে উদ্ধার হয়নি? সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সেবক হয়ে শ্রীরূপগোস্বামীর এ কী বিপরীত বিধান! এ কী তাঁর নির্ম্মম ব্রত!

২য় শিষ্য ॥ জানিনা দেবী।

৩য় শিষ্য ॥ আমরা তাঁর শিষ্য। গুরুর কোনো কার্য্যের সমালোচনা করা শিষ্যের অধিকার নেই দেবী।

৪র্থ শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ

৪র্থ শিষ্য ॥ দেবী, আমি বললাম। কিন্তু গুরুদেব ব্রত ভঙ্গ করতে সম্মত নন। তিনি আপনাকে চলে যেতে বলেছেন।

মীরা ॥ (হতাশভাবে) চলে যেতে বলেছেন?

৪র্থ শিষ্য ॥ হ্যাঁ দেবী।

মীরা ॥ তবে এ আমি কোথায় এলাম? একী তবে বৃন্দাবন নয়? যাঁর কাছে এসেছিলাম, তিনি কী তবে কৃষ্ণ-সেবা করেন না?

রূপগোস্বামীর প্রবেশ

রূপ ॥ (আবেগে বিভোর হইয়া) আমার ধ্যান ভেঙে গেল। কে যেন এসেছেন। আমি তাঁর পদ্মগন্ধ পাচ্ছি—বাঁশী শুনছি। কে এলেন? কোন্ মহাপুরুষ এলেন? (হঠাৎ মীরাকে দেখিয়া) এ কী! কে তুমি?

৪র্থ শিষ্য ॥ আপনার দর্শনপ্রার্থিনী সেই নারী গুরুদেব।

রূপ ॥ তুমি এখনও যাওনি মা? আমার ব্রত ভঙ্গ করলে তুমি।

মীরা ॥ (প্রণামান্তে) কী আপনার ব্রত প্রভু?

রূপ ॥ আমি কৃষ্ণ-সাধনায় নিমগ্ন। প্রকৃতি-দর্শন আমার নিষেধ।

মীরা ॥ কেন প্রভু?

রূপ ॥ সাধনপথের বিঘ্ন।

মীরা ॥ কৃষ্ণ-সাধনায় প্রকৃতি হলো বিঘ্ন—এই বৃন্দাবনে! কিন্তু এতোদিনতো শুনিনি, এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিনা আর কোনো পুরুষ আছে প্রভু। এই বৃন্দাবনে—শুধু এই জানি, একমাত্র পুরুষ তিনি—পরম পুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণ। আর সবই কি শ্রীরাধা নয়? পুরুষত্বের এই অভিমান নিয়ে এ কেমন ধারা কৃষ্ণ সেবা!—আমায় বল—আমায় বল প্রভু।

রূপ ॥ কে তুমি মা? জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে—এই অন্ধের অন্ধত্ব দূর করে—আমার পুরুষত্বের সকল অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে—কৃষ্ণসেবার সত্য পথের সন্ধান দিলে তুমি। বল মা—কে তুমি—কে তুমি?

মীরা ॥ জানি না, কে আমি। শুধু এই জানি—এতো করেও তাঁকে পাইনি। বুকে করে রেখেছি আমার এই গিরিধারীলাল—তবু মনে হয়, আমি তাঁকে পাইনি—পাইনি।

রূপ ॥ গিরিধারীলাল! তোমার বুকে গিরিধারীলাল! বুঝেছি মা, তবে তুমি কে। রাজরাণী মীরা। এখন বুঝতে পারছি—যেখানে মীরা, সেখানেই কৃষ্ণ। আমার আকাশে-বাতাসে তাই আজ কৃষ্ণের সুবাস—কৃষ্ণের বাঁশী। তোমার কৃষ্ণ-প্রেমের কাহিনী—তোমার ভজন-সঙ্গীত লোকের মুখে মুখে চিতোর থেকে সুদূর এই বৃন্দাবনে এসে পৌচেছে মা। কী আশ্চর্য্য তুমি! রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে—

মীরা ॥ সে তো তুমিও ত্যাগ করেছো প্রভু। কে না জানে, তুমি ছিলে বাংলার নবাবের দবীর খাস্—রাজার চেয়েও বেশী ছিল তোমার প্রতাপ···তোমার ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে তুমি পালিয়ে এলে এক নিশীথে—যে পরমধনের সন্ধানে—তা কী তুমি পেয়েছো? আমায় বল—আমায় বল। শুধু এই উত্তরটির জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি প্রভু।

রূপ ॥ তাঁকে আমি চাই না মা।

মীরা ॥ চাও না।

রূপ ॥ না। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে—তাঁকে পাওয়ার সাধনায় বেশী আনন্দ মা। চিনি আমি হ'তে চাই না মা, আমি চিনি খেতে চাই।

মীরা ॥ কিন্তু আমি যে চিনিই হ'তে চাই প্রভু—আমি তাঁকেই চাই—আমি তাতে লীন হয়ে যেতে চাই। আমার

এই কৃষ্ণধন—এইতো বুকে নিয়েই আছি, কিন্তু তবু মনে হয় আমি ওঁকে পাইনি—ওঁকে পাইনি।

রূপ॥ দেখি মা তোমার কৃষ্ণধন—যার জন্য তুমি রাজ্য ছেড়েছো—ঐশ্বর্য্য ছেড়েছো—সোনার সংসার ছেড়েছো—স্বামী ছেড়েছো। তোমার সেই পরমার্থকে—তোমার সেই কৃষ্ণধনকে আমায় একটিবার দেখতে দাও।

মীরার কাছে আসিয়া বিগ্রহটি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন

রূপ॥ (হঠাৎ) আমি বুঝেছি মা, কেন তুমি ওঁকে বুকে রেখেও পাওনি। ব্যবধানতো তুমি দূর করোনি মা। তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ রচনা করেছে তোমার রাজরাণীর রূপসজ্জা। তোমার প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে তোমার প্রাণের মিলনের অন্তরায়—তোমার বক্ষের ওই চন্দন-প্রলেপ—তোমার কণ্ঠের ওই রত্নহার।

মীরা॥ (আর্ত্তনাদ করিয়া) য়্যাঁ! তাই তো। তুমি আমার গুরু—তুমি আমার মহাগুরু। তুমি আমায় সন্ন্যাস দাও—সন্ন্যাস দাও—সন্ন্যাস দাও—

মীরা নতজানু হইয়া রূপগোস্বামীর নিকট প্রার্থনা জানাইল

রূপ॥ (মীরাকে সস্নেহে উঠাইয়া) কিন্তু মা, আমিতো তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারবো না। বিবাহিতা নারীর প্রথম পরম গুরু—স্বামী। তাকে ছেড়ে তুমি চলে এসেছো বটে, কিন্তু তাতেইতো বন্ধন কাটে না মা। ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে, অগ্নি সাক্ষী রেখে সেই বন্ধন থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র তিনিই—তোমার স্বামী।

মীরা॥ কিন্তু সে-মুক্তি সে আমাকে দেবে না। সে আমাকে ভালবাসে—প্রাণের চেয়েও ভালবাসে আমাকে।

রূপ॥ কৃষ্ণপ্রেমের রহস্য তবে তুমি জানো না মা। কৃষ্ণপ্রেম—পরশ-পাথর। তোমার ওই পরশ-পাথরের প্রেমস্পর্শে তোমার স্বামীও তোমারই পথে কতোদূর এগিয়ে এসেছেন—সে সংবাদ তুমিও জানো না মা। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আবার তোমাদের মিলন হবে—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-লীলা-নিকেতন দ্বারকায়। তুমি সেই দ্বারকায় তোমার গিরিধারীলালের প্রতিষ্ঠা করে তোমার স্বামীর প্রতীক্ষা কর—সেখানেই তোমাদের পরামুক্তি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকায় মীরাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত রণছোড়জী গিরিধারীলালের মন্দির-অভ্যন্তরস্থ নাটমন্দির। বেদীর উপরে গিরিধারীলাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। কাল—রাত্রি।

নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত বসিয়াছিল। কেহ কেহ বাহির হইতে আসিয়া উহাদের মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিল। একজন বিদেশী যুবকও সেই সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সাধারণ বেশ পরিহিত চিতোর-সেনাপতি খড়্গসিংহ।

খড়্গ॥ দ্বারকায় মীরাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত রণছোড়জীর মন্দির কি এইটি?

১ম ভক্ত॥ হ্যাঁ, ভদ্র। আপনি বুঝি নবাগত কোন বিদেশী।

খড়্গ॥ হ্যাঁ, ভদ্র। আমি চিতোরবাসী। প্রাতঃ-স্মরণীয়া এই মীরাবাঈ একদিন আমাদেরই রাজলক্ষ্মী ছিলেন।

২য় ভক্ত॥ আপনি তাঁর দর্শনপ্রার্থী?

খড়্গ॥ হ্যাঁ, ভদ্র।

২য় ভক্ত॥ আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। তিনি এখনই এখানে আসবেন—ভজনের এই আসরে।

খড়্গসিংহ আসন পরিগ্রহ করিল। সাধিকার বেশধারিণী মীরা ভজন গাহিতে গাহিতে সেখানে আসিল। সেই সঙ্গে বন্দনা-নৃত্যের ছন্দে আসিল গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য সহচরীগণ। মীরা আসন পরিগ্রহ করিলে গঙ্গা, যমুনা ও সহচরীগণ রণছোড়জীর সম্মুখে বন্দনা-নৃত্য সুরু করিল। মীরার ভজনে ভক্তবৃন্দ যোগদান করিল।

গান

জগ মেঁ জীরণা থোড়া,
রাম ক্যণ কহরে জংজার।

ভজনশেষে সকলে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—গঙ্গা, যমুনা এবং সহচরীগণও। মীরাও সবার শেষে যাইবার জন্য উঠিয়াছে, এমন সময়ে খড়্গসিংহ ডাকিল—

খড়্গ॥ দেবী!

মীরা॥ কে আপনি ভদ্র?

খড়্গ॥ (মীরার নিকটে আসিয়া) আমায় তুমি চিনতে পারছো না মা? আমি খড়্গ সিংহ—যে তোমাকে বিষ দিয়েছিল।

মীরা॥ বিষ নয়—তুমি দিয়েছিলে আমায় অমৃত।

খড়্গা॥ আমি দিয়েছিলাম বিষই, তোমার স্পর্শে সেই বিষই হয়েছিল অমৃত। মূর্খ আমরা—এতোদিন তোমাকে চিনি নি। অনুতাপের বিষে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি দেবী। দয়া কর দেবী—আমায় ক্ষমা করে ভিক্ষা দাও—তোমার কৃপার অমৃত।

মীরা॥ তোমরা আমার পরম বন্ধু। কিন্তু তুমি কি একা এসেছো খড়্গাসিংহ? তোমার বন্ধু—তিনি কোথায়?

খড়্গা॥ তাঁর কথা কি তুমি এখনও মনে রেখেছো পাষাণী?

মীরা॥ কী করে তাকে ভুলি? কী বন্ধনে যে তিনি আমায় বেঁধেছেন—তা হয়তো তা তিনি নিজেও জানেন না। তাঁর সংবাদ বল খড়্গাসিংহ। তাঁর কুশল তো? চিতোরের সব কুশল তো?

খড়্গা॥ কুশল! কী করে বলি? চিতোরের লক্ষ্মী তুমি। তুমি চিতোর ছেড়ে এসেছো। চিতোরে আজ তাই বিপদের পর বিপদ।

মীরা॥ বিপদ! কী বিপদ খড়্গাসিংহ?

খড়্গা॥ চিতোরের স্বাধীনতা হরণের জন্য দিল্লীর পরাক্রান্ত মোগল-বাহিনী চিতোর আক্রমণ করে। যুবরাজ কুম্ভের নেতৃত্বে আমরা সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছি বটে, কিন্তু বহু সহস্র রাজপুতের জীবন বিনিময়ে। জয়োৎসবের সুযোগও আমরা পাইনি দেবী। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেই দেখি মহারাণা মহাকাল মৃত্যুশয্যায়।

মীরা॥ তিনি জীবিত আছেন তো? বহু অপরাধে আমি তাঁর কাছে অপরাধিনী।

খড়্গা॥ না দেবী। তিনি অন্তিমকালেও শান্তি পান নি—শেষ মুহূর্ত্তে তিনি আদেশ দিয়ে গেছেন যুবরাজ কুম্ভকে—তোমাকে চিতোরে যেমন করেই হোক্ ফিরিয়ে নিতে—রাজসিংহাসনে মহারাণীরূপে তোমার অভিষেক করতে।

মীরা॥ অভিষেক! আমার অভিষেক!—তাই তুমি এসেছো খড়্গাসিংহ? আমাকে ফিরে যেতে হবে চিতোরে?

খড়্গা॥ কেন তুমি যাবে না দেবী? শিশোদীয় রাজ-বংশের কুলবধূ তুমি। সেই রাজবংশের শেষ মহারাণার অন্তিম কামনা—সমগ্র প্রজাকুলের প্রার্থনা—শুধু তাই নয়, একদিন যাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করে, অগ্নি সাক্ষ্য রেখে স্বামী-রূপে বরণ করেছিলে, তারও ব্যাকুল অনুনয়—চল দেবী—চিতোর-লক্ষ্মী চিতোরে ফিরে চল।

মীরা॥ কোথায় তিনি—কোথায় তিনি খড়্গাসিংহ? আমিও যে তাঁরই প্রতীক্ষা করছি।

খড়্গা॥ তিনি তোমার দ্বারে।

মীরা॥ দ্বারে! কেন?

সাধারণ বেশ-পরিহিত কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ॥ প্রবেশ-অধিকার আমার আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল দেবী। স্বামী হয়েও নির্য্যাতিতা রাজলক্ষ্মীকে রাজগেহে আমি রক্ষা করতে পারিনি। তোমারই মতো লাঞ্ছিতা সীতা কুলপ্রথার অত্যাচারে অগ্নি-প্রবেশের অভিমানে পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন। আমার ছিল সেই ভয়—সেই ভয় মীরা।

মীরা॥ স্বামী!

কুম্ভ॥ ক্ষমা-সুন্দরের আরাধিকা তুমি! ক্ষমা কর দেবী—আমাদের সকল অপরাধ। মহারাণার অন্তিম অনুরোধ—প্রজাপুঞ্জের সকরুণ অনুনয়—আমার আর্ত্ত প্রার্থনা—ফিরে চল দেবী চিতোরে।

মীরা॥ কিন্তু প্রার্থনা যে আমারও আছে স্বামী—তোমার কাছে। আমার প্রার্থনা—প্রজাপুঞ্জের কাছে নয়—শুধু তোমার কাছে—আমার স্বামীর কাছে।

কুম্ভ॥ প্রার্থনা! আমার কাছে? কী সে প্রার্থনা দেবী?

মীরা॥ মুক্তি—আমায় তুমি মুক্তি দাও স্বামী।

কুম্ভ॥ মুক্তি!

মীরা॥ হ্যাঁ, মুক্তি। গিরিধারীলালের কৃপায় সংসারের সকল বন্ধন-পাশ আমি একে একে মোচন করে মোক্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। কতো মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু সে দ্বার আমার খুলছে না—খুলছে না।

কুম্ভ॥ মীরা!

মীরা॥ মোক্ষের দুয়ারে এসে আবার আমি ফিরে যাবো স্বামী—সেই সংসার-দুঃখ-গহনে? দয়া কর স্বামী—দয়া কর।

খড়্গা ॥ কিন্তু এই যে সংসার—এও কী সেই জগৎ-স্বামীর লীলা-নিকেতন নয় দেবী ?

মীরা ॥ এটা তাঁর মায়ার খেলা ঘর খড়্গাসিংহ—শুদ্ধির সোপান। এই সোপান অতিক্রম করে আজ আমি এসেছি বৈকুণ্ঠের দ্বারে। এসে দেখছি—সে দ্বারের দ্বারী তুমি—আমার স্বামী। তোমার অনন্ত প্রেমে তুমি আমাকে সংসারে বেঁধে রেখেছো। এ বন্ধন তুমি নিজহাতে ছিন্ন না করলে আমি আমার পরম দেবতার দেউলে প্রবেশ করতে পারছি না। চাবিকাঠি তোমার হাতে—তুমি খুলে দাও—খুলে দাও—দুয়ার আমার খুলে দাও।

কুম্ভ ॥ দেবী ! মুক্ত তুমি।

মীরা কুম্ভের চরণে প্রণতা হইল

কুম্ভ ॥ আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার পরমার্থ লাভ কর।

মীরা উঠিয়া গিরিধারীলালের ভজন গাহিতে গাহিতে বিগ্রহের সম্মুখে বসিলেন। কুম্ভ ও খড়্গাসিংহ সাশ্রুনেত্রে যুক্তকরে নতজানু হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিল।

—গান—

মৈঁতো ম্‌হারা রমৈয়া নে
দেখবো করূঁরী।

গীত শেষে মীরা সমাধিস্থা হইলেন। জনপ্রবাদ আছে, গিরিধারীলালের বিগ্রহে মীরা বিলীন হইয়াছিলেন।

কুম্ভ ॥ মীরা ! মীরা !!

খড়্গা ॥ দেবী ! দেবী !!

সমগ্র মন্দিরে ধ্বনি উঠিল,—
"দেবী ! দেবী !! দেবী !!!"
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

যবনিকা।

অসির ঝঞ্ঝনাস্থরে আজো যেন ডঙ্কা বাজে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রভাতের রবিরশ্মি ভেদ করি অভ্রভেদী পার্ব্বত্য শিখরে
দুর্ভেদ্য দুর্গের পথে সপ্ততোরণের দ্বার পার হয়ে শেষে,
প্রাকারের কোল ঘেঁষে ক্লান্ত সেনানীর সম ঘুরে ঘুরে এসে
হেরিতে হেরিতে মহা-বীরেন্দ্রবৃন্দের স্মৃতি বরেণ্য ভূমিতে
মৃত্যুর অতীত তীর্থে পাষাণের স্তরে স্তরে এ চিতোর গড়ে
বিস্তীর্ণ শ্মশান মাঝে মনে পড়ে রক্তপঙ্কে কীর্ত্তিস্তম্ভ কত
হয়েছে রচিত আর শোণিততরঙ্গভঙ্গে ভেসে গেছে সব !
শৌর্য্যেবীর্য্যে সর্ব্বোন্নত আদর্শের মহিমার অম্বর চুম্বিতে
কতনা বিজয়ধ্বজা উড়িয়াছে দিনে দিনে। আত্মা শতশত
যুগ হতে যুগান্তর চিতোর-ঈশ্বরীতরে করি ভীমরব
মৃত্যুরে মন্থন করি করেছে প্রস্থান। ভূমিগর্ভে অস্থিরাজে—
সংখ্যার অতীত। অসির ঝঞ্ঝনাস্থরে আজো যেন ডঙ্কা বাজে।

স্বৈরীমেঘে ঝঞ্ঝাবর্ত্তে ঘনায়েছে দুর্য্যোগের অমা অন্ধকার,
ভারতের ইতিবৃত্ত শোণিত অক্ষরে হেথা গৌরবে রচিত
পদ্মিনী জহরব্রত সতীত্বের তেজে দীপ্ত। পথে যেতে তার
হেরিনু আগ্নেয় চিহ্ন ভগ্নপুরী বক্ষঃস্থলে ভস্মেতে সঞ্চিত।
রক্তপায়ী সভ্যতার মদমত্ত অভিযানে প্রাণখণ্ড শিলা
চিতোর পড়েছে ভেঙ্গে অস্থির অশান্ত দিনে নির্দ্দয় আঘাতে,
তবুও উপল খণ্ডে আকীর্ণ আজিও রহে শত দৈবী লীলা
মৃত্যু দিয়ে সঞ্জীবিত মৃত্যুঞ্জয় শক্তিতীর্থে মহাশক্তি সাথে।

বাপ্পাদিত্য রাণা-কুম্ভ হাম্বীরের স্মরণীয় শুনি শৌর্য্যগীতি,
আরাবল্লী গিরিদরী মধ্যে মহা চিতোরের ধ্বংস স্তূপে বসি।
বাদলের মহিমার দিব্যজ্যোতি পান্থজনে ডাকিছে কি নিতি !
রাজসিংহ ভীমসিংহ প্রতাপের গৌরবের শোভে পূর্ণ শশী।
গোমুখী গঙ্গায় ওই গহ্বর প্রাঙ্গণ হোতে মীরার ভজন
ধ্বনিয়া উঠিছে যেন, সুড়ঙ্গের পথ বাহি সিনানের তরে
এসেছে কি মীরাবাঈ ! কাণে যেন আসে কার মধুর ভাষণ !
কৃষ্ণকুমারীর কথা, করুণাবতীর স্মৃতি জাগিল কি মনে ?
সপ্তসন্তানেরে বলি দিল কি লক্ষ্মণসিংহ দেবীর ক্রন্দনে !

কত রাজসিংহাসন কত রাজমুকুটের চিহ্ন লুপ্ত হোলো,
কালের কুটিলচক্রে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ গিয়েছে হারায়ে.
আজিকার শূদ্রযুগে যন্ত্রসভ্যতার দিনে আবরণ খোলো
হে চিতোর ! দাও মোরে হেরিবারে অতীতেরে তব
ছত্রচ্ছায়ে,
তুমিতো চলিয়া যাবে চিরদুঃখী জানকীর সম পৃথ্বীতলে
একদিন এ ধরণী ডুবে যাবে প্রলয়ের কাল সিন্ধুজলে।

শিল্পকলা ও কারুকৃৎ

হায়দরাবাদের রূপলোক

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

হায়দরাবাদের আফজলগঞ্জস্থ সালার জঙ্গ মিউজিয়মে প্রবেশ করেই দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের বিচিত্র শিল্পকর্ম্মের সংগ্রহ দেখে মনে হ'ল যেন এক নিরুপম রূপলোকে এসে উপনীত হয়েছি। সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পানুরাগী মীর ইউসুফ আলি খান সারা জীবন ধরে চারু ও কারুশিল্পের যে সকল অনুপম নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন, সত্তরটি কক্ষে সযত্নে বিন্যস্ত তৎসমুদয় দেখে দর্শকমাত্রেরই মন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

মীর ইউসুফ আলি খান হায়দরাবাদ রাজ্যের মন্ত্রী-পদে আরূঢ় হয়ে

নবাব সালার জঙ্‌ বাহাদুর

'নবাব তৃতীয় সালার জঙ্গ' এই নাম ধারণ করেছিলেন। পিতামহ প্রথম সালার জঙ্গের ন্যায় হায়দরাবাদের ইতিহাসে ইনিও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তবে দু'জনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র বিভিন্ন। প্রথম সালার জঙ্গ নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন হায়দরাবাদের শাসন-ব্যবস্থায়, আর তাঁর পৌত্র তৃতীয় সালার জঙ্গ জীবন উৎসর্গ করেন শিল্পকলার রসোপলব্ধির সাধনায়।

সালার জঙ্গ পরিবারের শেষ নবাব মীর ইউসুফ আলি খান ছিলেন অকৃতদার। পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, একক। পুত্রকলত্রহীন, অপরিমিত পিতৃবিত্তের অধিকারী এই মানুষটি শান্তি, সান্ত্বনা ও জীবনানন্দের সন্ধান করেছিলেন, মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের মত কলাসম্পদ সংগ্রহের মধ্যে।

শিল্পকলার অক্লান্ত সংগ্রাহক ছিলেন মীর ইউসুফ আলি খান। মহার্ঘ্য শিল্পসম্পদ থেকে সুরু করে কারুকার্য্যখচিত সাধারণ যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত সবকিছুর উপরেই ছিল তাঁর সমান অনুরাগ। পৃথিবীর যেখানে যা কিছু শিল্প-সম্পদের কথা তাঁর কানে এসেছে, তারই নিদর্শন তিনি
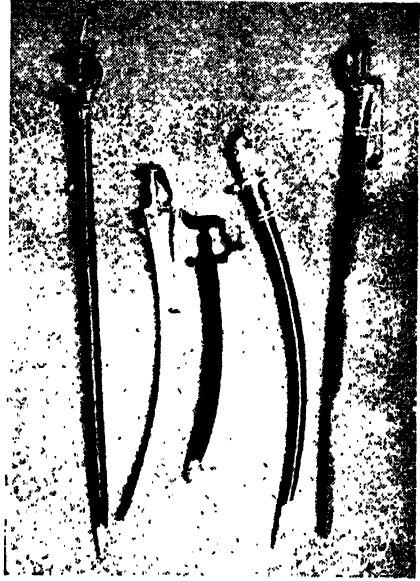
কয়েকটি অসি। বাম হইতে :—১ম, তানা শা'র অসি ; ২য়, বাহাদুর শা'র অসি ; ৩য়, টিপুর অসি ; ৪র্থ ঔরঙ্গজীবে অসি ও ৫ম, আসফ জা'র অসি

সযত্নে সঞ্চয় করেছেন। এটা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল একটা নেশার মত। তাঁর সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য সম্ভার উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর রুচি ছিল উন্নত এবং রসবোধ ছিল সহজাত।

মীর ইউসুফ আলি খান শুধু শিল্পদ্রব্যের সংগ্রাহকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কাব্য সঙ্গীত শিল্প ইত্যাদি যাবতীয় কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক

এবং শিল্পীদের উৎসাহদাতা।—শিল্পীর সমাদর করতেন তিনি তাঁর শিল্পকর্ম্মের রসবিচার করে—তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লেশ-মাত্রও ছিল না—তিনি জানতেন যে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই। সেই জন্য জাতিসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে শিল্পী ও কলাবিদ মাত্রেই তাঁর দ্বারা উপকৃত হতেন। কোনো গায়কের গান যদি তাঁর ভালো লাগল, তা হলে অযাচিত ভাবে তিনি তাঁকে অর্থসাহায্য করতেন, কোনো চিত্ররচনা যদি তাঁর রস-চেতনায় সাড়া জাগাত—তা হলে সেটি সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। কোনো দুঃস্থ কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে তিনি নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েক হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন।

মীর ইউসুফ আলি খান ছিলেন স্বপ্নদর্শী—সারা জীবন সুন্দরের স্বপ্নে তিনি ছিলেন বিভোর। নির্ব্বিচারে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না—এগুলোকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর পরি-কল্পনা ছিল একটি সুদৃশ্য ভবনে এগুলো সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করে, তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দেশের কাছে দায়স্বরূপ অর্পণ করবেন—কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে অকালে তাঁর জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিলে (১৯৪৯ খ্রীঃ); ফলে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠল না, কল্পনা হল না বাস্তবে রূপায়িত।

টিপু'র শিরস্ত্রাণ, তরবারি ও হস্তীদন্ত নির্মিত কেদারা

দীপসজ্জা (মোঘল শিল্পকলা)

মৃত্যুর পর আইনতঃ কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় ভারত-সরকারের এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স দ্বারা নিযুক্ত একটি ট্রাষ্টি কমিটির উপর মীর ইউসুফ আলি খানের সম্পত্তি পরিচালনার ভার ন্যস্ত হ'ল। তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির একটি বিশিষ্ট অংশ এই সমস্ত শিল্প-সম্পদ তাঁর আফজলগঞ্জস্থ প্রাসাদে এবং সুরুনগরস্থ পল্লীনিবাসে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে রাখা হ'ল। নিজের সংগৃহীত প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রকৃত শিল্প-মূল্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, সেগুলো কি ভাবে কোথায় রাখতে হবে সে সম্বন্ধে ছিল তাঁর সুষ্ঠু পরিকল্পনা—কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর সমগ্র জীবনের স্বপ্নের সমাধি রচনা করল।

নবাব মীর ইউসুফ আলী খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হায়দরাবাদের শিল্পানুরাগী প্রধান মন্ত্রী এম. কে. ভেল্লোডি প্রথমে দেখতে গেলেন তাঁর হায়দরাবাদস্থ প্রাসাদ, তারপর পরিদর্শন করলেন হায়দরাবাদ থেকে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী সুরুনগর নামক স্থানে অবস্থিত তাঁর পল্লীভবন। উভয়ত্রই তিনি দেখলেন, যেখানে সেখানে অনাদরে অবহেলায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে মীর ইউসুফ আলি খানের সারা জীবনের অমূল্য শিল্পসংগ্রহ। এতে তাঁর মনে একটা ধাক্কা লাগল এবং তাঁরই নির্দেশে

সরকার এবং সালার জঙ্গ এস্টেট কমিটি এই সমস্ত শিল্পসম্পদ সংরক্ষণ এবং সাধারণের অধিগম্য করার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে তৎপর হয়ে উঠলেন, এই কার্য্যে ভেল্লোডির প্রধান সহায়ক হলেন সালার জঙ্গ এস্টেট কমিটির চেয়ারম্যান পি, ডি, সুব্বারাও।

এখন সমস্যা দাঁড়াল দুটি। প্রথমতঃ—এই দ্রব্যসম্ভার কোথায় রাখা যায়, আর দ্বিতীয়তঃ—এগুলোকে যথাযোগ্যভাবে সুসজ্জিত করে রাখবার মত কলারসিক লোক কোথায় পাওয়া যায়।

স্থাননির্ব্বাচন করা কঠিন হল না—স্থিরীকৃত হ'ল যে সুরম্য প্রাসাদে অজস্র শিল্পসম্ভারপরিবৃত হয়ে মীর ইউসুফ আলি খান কাটিয়ে গেছেন তাঁর অনতিদীর্ঘ জীবন, সেইটেই হবে সেগুলো সংরক্ষণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত নিকেতন।

দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান কিন্তু তেমন সহজসাধ্য হ'ল না।

কর্তৃপক্ষের প্রথম মনে হ'ল ডক্টর জেমস কাজিন্সের কথা। মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্কুরের আর্ট গ্যালারি সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ করে তাঁরা প্রথমে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলেন, কিন্তু অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় ডক্টর কাজিন্সের পক্ষে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হ'ল না। ডক্টর কাজিন্সের পরামর্শক্রমে তাঁরা তখন চিত্র-নৃত্য ইত্যাদি বিভিন্ন কলাবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা জি, ভেঙ্কটাচলমের সাহায্য-প্রার্থনা করলেন।
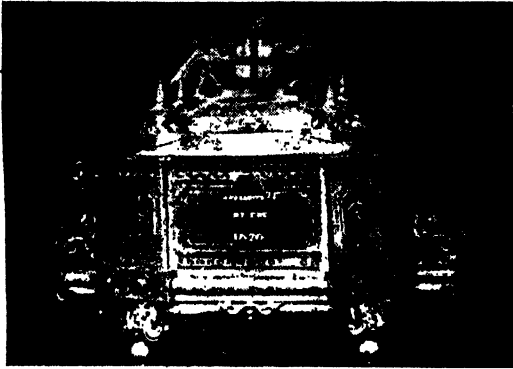
১৮৭৬ সালে লণ্ডন নগরীর করপোরেশন কর্তৃক সার সালার জঙ্‌কে এই স্বর্ণ সম্পুটকটি উপহার প্রদত্ত হয়

তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ এই কলারসিকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল এবং হায়দরাবাদে এসে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে, মীর ইউসুফ আলি খানের সংগৃহীত শিল্পসম্ভারকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে নিপুণ হস্তে সুবিন্যস্ত করলেন। ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে নবাবের প্রাসাদের ঘটল রূপান্তর, বিলাসের অলকাপুরীতে সৃষ্ট হ'ল এক নিরুপম রূপলোক। দুই শত বৎসরের পুরনো এই দিওয়ান দেউদি নামক প্রাসাদ আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আধুনিক পদ্ধতির 'নয়া মকান' গঠনকৌশলের বৈশিষ্ট্যে নবাগতের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই প্রাচীন প্রাসাদই পরিণত হয়েছে সালার জঙ্গ মিউজিয়মে। এর দুটি অংশ—প্রাচ্য বিভাগ আর পাশ্চাত্ত্য বিভাগ। প্রাচ্য বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে ভারতীয়, পারসীক, তুর্কী, ব্রহ্মদেশীয়, চীনা এবং জাপানী অজস্র চারু ও কারু শিল্প-সম্ভার। যে-কোনো কক্ষে প্রবেশ করলেই একটা স্নিগ্ধ রমণীয় প্রাচ্য পরিবেশ মনকে মুগ্ধ করে।

প্রাচ্য বিভাগে প্রদর্শিত শিল্পদ্রব্যসম্ভার পরিমাণে যেমন অজস্র, তেমনি মনোরম ও বিচিত্র—ত্রিশটি ছোট বড় কক্ষ এবং বারান্দায় সেগুলো
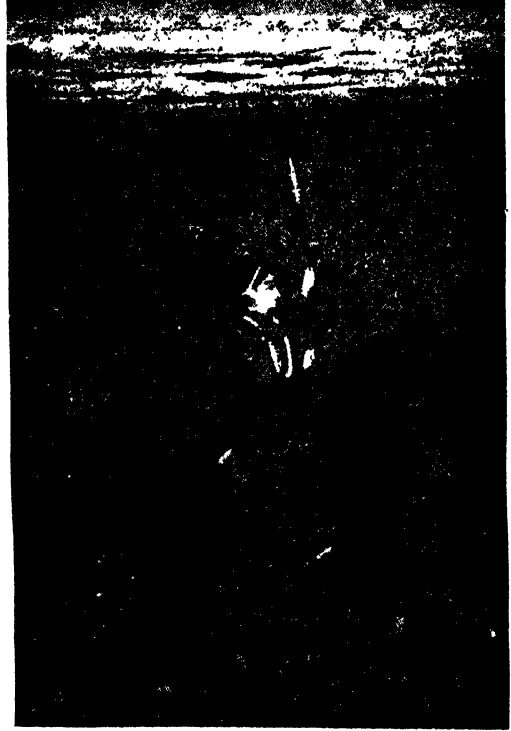
অশ্বপৃষ্ঠে এক মোঘল রাজকুমার (সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র)

সযত্নে সংস্থাপিত। এই কক্ষগুলোতে পারস্য-দেশীয় গালিচা, মোগল মিনিয়েচার, রাজপুত এবং দক্ষিণী চিত্রকলা, নব্য ভারতীয় চিত্রকলা, স্বর্ণসূত্রখচিত মসনদ, কাশ্মিরী শাল, দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি, মালাবার এবং মাদুরার কাঠ খোদাইয়ের কাজ, বিদরি এবং তিব্বতের ধাতব দ্রব্য, চীনা পোর্সেলিন ইত্যাদি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পসম্ভারের বিপুল সমাবেশ দর্শককে বিস্মিত এবং তার সৌন্দর্য্যবোধকে পরিতৃপ্ত করে।

ভারতীয় বিভাগে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে Jade room বা মণিকক্ষ। কক্ষটি নীচের তলায়, এবং এমন ভাবে নির্ম্মিত যে সেটি তস্করাদির পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য। আলাদা টিকিট করে এই কক্ষে ঢুকতে হয়—সমগ্র মিউজিয়মের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তরে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত দেরাজগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন সব দ্রব্য যা কারুশিল্পানুরাগী এবং ইতিহাসপাঠক উভয়েরই নিকট সমান আদরণীয়।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাশাপাশি সংস্থাপিত সুদৃশ্য আবরণী-

বিশিষ্ট চারিটি ছুরিকা আর কতকগুলি কোষবদ্ধ অসি। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, মরকত ও পান্নাখচিত ছুরিকাটির মালিক ছিলেন নুরজাহান। জাহাঙ্গীরের হীরক পান্না ও মরকতখচিত ছুরিকা, সম্রাট শাজাহানের এনামেল করা কাটারির গঠনকৌশল দেখে মুগ্ধ হতে হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মণিশোভিত ছুরিকা স্মরণ করিয়ে দেয় দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা। আওরঙ্গজেব যখন গোলকুণ্ডা দুর্গ দখল করেন তখন তাঁর হাতে ছিল বক্র বাঁটবিশিষ্ট এই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। এই ছুরিকার পাশেই রয়েছে গোলকুণ্ডার শাহীবংশের শেষ স্বাধীন নৃপতি টানা শাহের রত্নখচিত, কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি। রাজ-ধর্ম্ম

টৌরী রাগিনী

বিস্মৃত হয়ে বিলাস লীলায় মত্ত ছিলেন নৃপতি টানা শাহ, কিন্তু বাদশাহী সৈন্যদল যখন গোলকুণ্ডা-দুর্গ অবরোধ করল, তখন মোগল আক্রমণ প্রতিরোধপূর্ব্বক আওরঙ্গজেবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবের নিকট পরাস্ত হয়ে তিনি অন্তরায়িত হলেন দৌলতাবাদে—গোলকুণ্ডার পতন হ'ল। জীবিতাবস্থায় যে দু'জন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন পরস্পরের ঘোর শত্রু, আজ তাদের তরবারি দুটি একই জায়গায় সযত্নে রক্ষিত হয়ে দর্শকদের কৌতূহল চরিতার্থ করছে।

এ ছাড়া আছে বাহাদুর শাহ, টিপুসুলতান আর গোলকুণ্ডার আশফঝাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফ ঝা'র তরবারি। টিপুসুলতানের গজদন্তনির্ম্মিত চেয়ার দুটির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখে তারিফ না করে পারা যায় না। একধারে আছে সম্রাট শাজাহান আর জাহাঙ্গীরের হস্তাক্ষর-সম্বলিত কোরাণ। জাহাঙ্গীরের পানপাত্রটিতে সোনার উপর প্রবালের কাজ এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করেছে। এই কক্ষে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত মোগলযুগের মণিরত্ন-সংগ্রহের তীব্র দ্যুতি চোখ ঝলসে দেয়। দীর্ঘ সাত শতাব্দী হ'ল মোগল-রাজশক্তির পতন হয়েছে, কিন্তু এই কক্ষটিতে যে সমস্ত দুর্ল্লভ দ্রব্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তা দেখে মোগলযুগের ইতিহাস যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে—এই সমস্ত ছিটেফোটা থেকেই
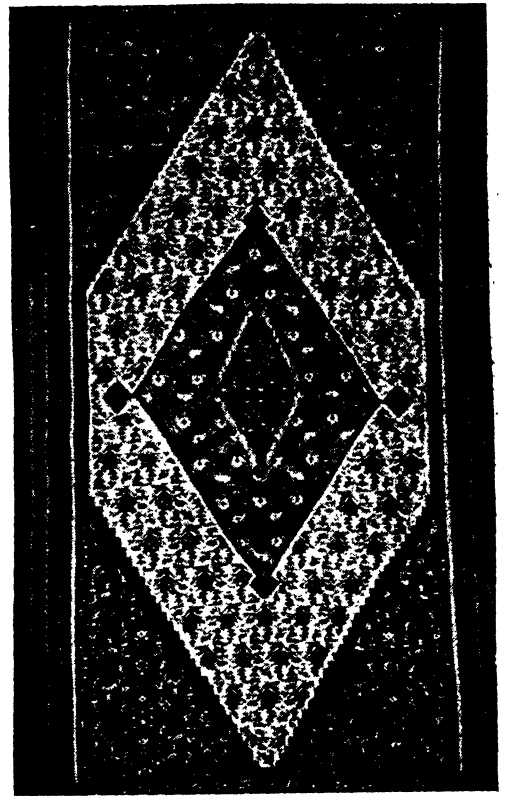
পার্শিয়ান কার্পেট

মোগল আমলের অপরিমেয় রাজৈশ্বর্য্যের কথা কতকটা আঁচ করতে পারা যায়।

কিন্তু হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটাই এই জেড রুমের একমাত্র আকর্ষণ নয়, এখানে সুবিন্যস্ত পারস্যদেশীয় গালিচাসমূহের সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শকের নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে—প্রথম সালার জঙ্গ কর্তৃক ব্যবহৃত এক শতাব্দী আগেকার স্বর্ণনির্ম্মিত মসনদটি সালার জঙ্গ পরিবারের বিপুল বৈভবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চব্বিশ ফুট দীর্ঘ একটি সোনার তৈরি বসন এবং একটি গজদন্তের কার্পেট দৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্রেমে আঁটা সিল্কের কার্পেটগুলো একটি স্বতন্ত্র কক্ষে সংস্থাপিত। এই সমস্ত মহার্ঘ্য মনোরম দ্রব্য দেখে বুঝতে পারা যায়—কি দরাজ মন ছিল মীর ইউসুফ আলি খানের। সৌন্দর্য্যের নেশায় পাগল না হলে শিল্পসম্ভার সংগ্রহের জন্যে কি কেউ এমন অকাতরে অজস্র অর্থ-ব্যয় করতে পারে!

এই প্রাসাদের চিত্রশালায় প্রবেশ করবার পর দর্শকের বিমুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সামনে যেন উদ্‌ঘাটিত হয় রূপলোকের সিংহদ্বার। মোগল কাংড়া দক্ষিণী ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ দেখে ভারতীয় চিত্রকলার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং সমৃদ্ধি সম্বন্ধে দর্শকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সম্রাট সাজাহানের ব্যক্তিগত এলবামে

দীপক রাগিনী

মোগল মিনিয়েচারদ্বয়, গজদন্তের উপর খোদিত বাদশাহ আওরঙ্গজেবের চমৎকার মিনিয়েচার-প্রতিকৃতি, সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল রাজকুমার এবং রাজকুমারীদের প্রতিকৃতি প্রভৃতি মোগল পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ রূপকর্ম্মের দুর্লভ নিদর্শন সংগ্রহ করতে কম বেগ পেতে হয়নি মীর ইউসুফ আলি খানকে।

প্রাচীরগাত্রে প্রলম্বিত আছে দু' সেট রাগরাগিণীর পূর্ণাঙ্গ বিরাট চিত্র। একটি সেট দক্ষিণী পদ্ধতিতে এবং অপরটি মোগল পদ্ধতিতে আঁকা। কাংড়া এবং অন্যান্য রাজপুত-পদ্ধতির চিত্রসংগ্রহ দুটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রদর্শিত। দক্ষিণী কক্ষে, নিজাম আলি খানের শিকার-শোভাযাত্রার দৃশ্যের দুটি বিরাট চিত্র ঐ কক্ষের শোভা বর্দ্ধিত করছে—নিজামের সভা-চিত্রকর কে. ভেঙ্কটাচলম-অঙ্কিত ঐ চিত্রদ্বয় এক দিকের প্রাচীরের প্রায় সবটা জুড়ে শোভমান।

দক্ষিণ ভারতের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কতকগুলি ব্রোঞ্জমূর্ত্তিতে। তন্মধ্যে সোমস্কন্দ এবং নটরাজের মূর্ত্তি অসামান্য রূপ-দক্ষতার পরিচায়ক। অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর এবং তিরুনবকরমু নামক তামিল সন্তদ্বয়, নৃত্যপর গণেশ, বালকৃষ্ণ, শিব-পার্ব্বতী এবং বিষ্ণু লক্ষ্মী উল্লেখযোগ্য। প্রধান ভারতীয় বিভাগে যাবার সোপান-পথের পাশে সুবিধাজনক স্থানে এগুলো সংস্থাপিত।

মেফিস্‌টোফেল্‌স্‌ এবং মারগারেটা (ইটালিয়ান কাষ্ঠ-নির্মিত মূর্তি)

নীচের তলাকার ভারতীয় কক্ষে কাঠ খোদাই শিল্পের সংগ্রহটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। বিশেষতঃ, মাদুরার মন্দিরের 'মণ্টপমে'র উপরকার কাঠ খোদাইয়ের কাজ, মাদুরা থেকেই সংগৃহীত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি-শোভিত, নিপুণ হস্তে খোদিত পাখা এবং পর্দা; কোচিন ও কালিকট থেকে যোগাড় করা, ওলন্দাজ আমলের আগাগোড়া খোদাই করা পুরনো চেয়ার প্রভৃতি ভারতীয় রূপকর্ম্মের আর একটি ধারার সঙ্গে দর্শককে পরিচিত করে।

মীর ইউসুফ খান শুধু যে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলারই অনুরাগী ছিলেন তেমন নয়, আধুনিক যুগের শিল্প-সাধনার বহুবিচিত্র ধারার সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথের সাধনায় ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের কথা তাঁর অজানা ছিল না,

তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে কুশলী শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছিল সে খবরও তিনি রাখতেন এবং তাঁদের শিল্পকর্মের মূল্য বুঝতেন। তাঁর এই চিত্রসংগ্রহশালায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পাশেই বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির সমাবেশ দেখে কলারসিক বাঙালীর মন একটা বিমল আত্ম-প্রসাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে অবনীন্দ্রনাথের "তোরা শুনিস নি কি তাঁর পায়ের ধ্বনি", নন্দলালের "যম সাবিত্রী", গগনেন্দ্রনাথের "শরতের ছোঁয়া" প্রভৃতি বিখ্যাত ছবি। তা ছাড়া আছে—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, আবদার রহমান চাঘতাই, প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের আঁকা ছবি। মনীষীদে'র আঁকা দুটি দীর্ঘ প্যানেল, বৌদ্ধযুগের বিষয়বস্তু অবলম্বনে সিল্কের উপর, সারদা উকিলের আঁকা একটি ছবি, শুকুমার দেউস্করের অঙ্কিত বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার রাজাদের প্রতিকৃতিও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সেরা শিল্পদ্রব্যসমূহের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে সালার-জঙ্গ মিউজিয়মে। পুরনো প্রাসাদের নীচের তলাকার দশটি কক্ষে আছে জাপান থেকে সংগৃহীত রকমারি দ্রব্যসম্ভার—বেশীর ভাগই জাপানের নিক্কো আসবাবপত্র, সিল্কের এম্‌ব্রয়ডারি করা পর্দা, আর সূচীশিল্পের নিদর্শন। চীনা কক্ষটি পোর্সেলিনের কেবিনেট আর গজদন্তের কাজে একেবারে ঠাসা। মিং আমলের ভাসগুলিতে কি অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য!

নীচের তলায়ই আছে দুটি 'আয়নাখানা' (দর্পণ-কক্ষ)—একটি ছোট, অপরটি বড়। এই কক্ষদ্বয়কে নূতন ভাবে সজ্জিত করা হয় বহু প্রযত্নে এবং বিপুল অর্থব্যয়ে। ক্ষুদ্র কক্ষটি অনেকগুলো বিচিত্র বর্ণের দীপাধার থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় এবং মুক্তার তৈরি আসবাবপত্রের শুভ্র দ্যুতিতে দৃষ্টির বিভ্রম উৎপাদন করে। এই দর্পণ-কক্ষেই আছে ভাস্কর্য্য-শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন—ভাস্কর বেঞ্জনি (১৮৭৬) কর্ত্তৃক গঠিত "Veiled Rachel" নামক মর্ম্মরমূর্ত্তি। সুঠাম ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তিটির আপাদমস্তক শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত বসনে আবৃত, কিন্তু এই অতিসূক্ষ্ম মর্ম্মরাবরণের ভেতর দিয়ে তার কমনীয় মুখশ্রী, সুডৌল স্তনচূড়াগ্র, নিটোল দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ উরু এবং পদযুগলের গঠন-সৌষ্ঠব সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। মূর্ত্তিটিকে প্রথম দৃষ্টিতে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়, মনে হয়—সূক্ষ্ম বসনের আবরণ ভেদ করে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তরুণীর প্রদীপ্ত যৌবন-শ্রী যেন ফুটে বেরুচ্ছে। কোনো কোনো শিল্পসমালোচকের মতে এটি হচ্ছে মীর ইউসুফ আলি খাঁনের সমগ্র শিল্পসংগ্রহের মধ্যমণি-স্বরূপ। এই শিল্পবস্তুটির উপর মীর ইউসুফ আলি খানের অনুরাগ ছিল অপরিসীম এবং তিনি নিজে এই দর্পণকক্ষে এটিকে যেভাবে রেখেছিলেন, এখনো অবিকল সেই ভাবেই আছে। বড় 'আয়নাখানা'তে চারদিকে সাজানো রয়েছে অজস্র ইতালীয় মর্ম্মর, আর তাদের ঘিরে রেখেছে শুভ্র দীপাধারের অরণ্য। মনে হয় যেন রূপকথার দেশে পৌঁছনো গেছে যেখানে হীরের গাছে ফলে রয়েছে অজস্র মুক্তোর ফল।

মণিকক্ষের পেছনদিককার একটি কক্ষে আছে মোগল-যুগের অস্ত্রশস্ত্রের বিচিত্র সংগ্রহ, কত যে তরবারি আর ছুরিকা তার লেখাজোখা নেই। মানুষের দুটি রূপ। এক দিকে সে সুন্দরের উপাসক, অন্তরের প্রেরণায় সে অবিরাম করে চলে রূপসৃষ্টি; অন্য দিকে হিংস্র প্রবৃত্তির তাড়নায় সে মেতে উঠে ধ্বংসলীলায়, তৈরি করে নূতন নূতন মারণাস্ত্র। এখানে এই রূপসৃষ্টির বিচিত্র নিদর্শন সব দেখে যখন সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হয়, তখন অস্ত্রশস্ত্রের বহর অত্যন্ত অশোভন ঠেকে।

এখান থেকে একটি সঙ্কীর্ণ উপসরণী দিয়ে পৌঁছতে হয় পাশ্চাত্ত্য বিভাগে। এই বিভাগে দুটি বৃহৎ হল, দুটি প্রশস্ত বারান্দা এবং দশটি প্রকাণ্ড কক্ষে ওয়েজউড পটারি, বিলিতী কাচের পাত্র এবং ইউরোপের সকল দেশের সেরা আসবাবপত্রাদির এরূপ বিরাট সমাবেশ করা হয়েছে যে, সেগুলোর বর্ণনা তো দূরের কথা—শুধু নামের তালিকা দিলেই প্রবন্ধের কলেবর অসম্ভবরকম বেড়ে যাবে। গুণ এবং পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই নবাব সালার জঙ্গের আসবাব-সংগ্রহের ন্যায় বিরাট এবং বিচিত্র সংগ্রহ বিরল। জনৈক ইটালীয়ান ভাস্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মেফিস্টোফিলিস এবং মার্গারেটার কাঠের মূর্ত্তিটী শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে শ্মশ্রুগুম্ফ-বিমণ্ডিত-আনন এক পুরুষমূর্ত্তি, আর পেছনদিককার প্রকাণ্ড দর্পণে ঐ মূর্ত্তিটির ছায়া প্রতিফলিত হয়ে ফুটে উঠেছে ঈষৎ অবনতদেহা এক রমণীর প্রতিমূর্ত্তি।

মোঘলদের ব্যবহৃত ছুরিকা। উপর হইতে নিচে:—১ম, জাহাঙ্গীরের; ২য়, শা জেহানের; ৩য়, ঔরঙ্গজীবের, ৪র্থ, নুরজাহানের ছুরিকা

পেছনদিককার বারান্দায় পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার প্রধান গ্যালারি। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা যে সমস্ত মূল ছবি এই মিউজিয়মে দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ল্যাণ্ডসিয়ারের আঁকা "দি ওয়াচফুল সেটিন্যাল," কপারের "ক্যাটল ইন্ রিপোজ" এবং কনষ্টেবল কর্ত্তৃক অঙ্কিত দুটিদৃশ্য চিত্র। এ ছাড়া ওলন্দাজ, ইংরেজ, ইটালীয়ান এবং আমেরিকান চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রচুর চিত্র আর্ট গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে।

ইন্দো-পারশিয়ান শিল্পকলা

পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলায় অনুরাগীর নিকট কিন্তু এই আর্ট গ্যালারির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে রুবেন্স, রাফেল, বটিচেলি, টিসিয়ান প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা কতকগুলি অমূল্য চিত্রের প্রতিলিপি। এই আর্ট গ্যালারিটি পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার অনুশীলনকারীর নিকট আনন্দময় স্বর্গলোক বলে প্রতীয়মান হবে।

এই মিউজিয়মে একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চারু এবং কারুশিল্পের অজস্র নিদর্শন দেখে এতদুভয়ের মূলগত পার্থক্যের কথা স্বতঃই মনে জাগে। ভারত এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে সমাহৃত দ্রব্যসম্ভারের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্য পাশ্চাত্ত্য দ্রব্যনিচয়ে বিরল। পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের আঁকা অনেক ছবি রূপের form দিক দিয়ে নিখুঁত, কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীদের ছবির ভাবের গভীরতা অপরিমেয়। পাশ্চাত্য-বিভাগে বহু ছবির স্থূল বাস্তবতা এবং অশোভন নগ্নতা সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করে।

পোর্সেলিন সংগ্রহের মধ্যে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'ভাস'—অধিকাংশ ভাসেই শিকার দৃশ্য চিত্রিত। এ ছাড়া আছে ঘন নীল, স্নিগ্ধ গোলাপী, ধূসরাভ ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট ভাস। 'ফ্যাক্টরি রেজিষ্টার-অব সেল্‌স' থেকে জানা যায় যে, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই মহীশূরের টিপু সুলতানকে যে বিপুল উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন, এই সমস্ত 'ভাস' তারই অন্যতম নিদর্শন।

'ওয়েজউড ওয়ার'-এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হচ্ছে পোর্টল্যাণ্ড ভাসের একটি অনুকৃতি। প্রাচীন শিল্পকলার অমূল্য সম্পদ, এই মূল বস্তুটি আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ম-এর থেকে—ওয়েজ-উড মাত্র পঁচিশটি অনুকৃতি তৈরি করেন। মূল বস্তুটি হচ্ছে সুপ্রাচীন কালের একটি ভস্মাধার। রোমান সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভারাস এবং তাঁর মাতার ভস্মসমেত এই ভস্মাধারটি ২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হয়। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ বারবারিনীর আদেশে মাটি খুঁড়ে এটিকে উদ্ধার করা হয়।

ওয়েজউডের তৈরি আর একটি জিনিষ বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে একটি হুঁকার আধার। নবাব প্রথম স্যার সালার জঙ্গ যখন ইংলণ্ডে যান (১৮৭৬ খ্রীঃ) তখন ওয়েজউড্ বহু প্রযত্নে তাঁর জন্যে এই নয়নানন্দকর আধারটি নির্ম্মাণ করেন। এই সময়েই সালার জঙ্গ লণ্ডন নগরীর কর্পোরেশন কর্ত্তৃক 'ফ্রিডম অব দি সিটি অব লণ্ডন' উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপলক্ষে তাঁকে করপোরেশনের তরফ থেকে একটি সুদৃশ্য সোনালী কাস্‌কেট উপহার প্রদান করা হয়।

এই সমস্ত দেখে পেছনদিককার বারান্দায় গেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্লাস্টারের তৈরি, জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক কবি, দার্শনিক এবং মনীষীদের আবক্ষ মূর্ত্তি সম্বলিত একটি গ্যালারি। মীর ইউসুফ আলি খাঁন শুধু শিল্প-রসচক্রের মধুকরই ছিলেন না, যাঁদের চিন্তা-সম্পদে বিশ্বের সংস্কৃতি-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তিকেও যথাস্থানে যোগ্য মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করেছিলেন।

শিল্প সম্ভারের এই স্বপ্নলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচরণ করতে করতে দর্শকের মনে যেন রং ও রূপের নেশা ধরে যায়—প্রতিটি কক্ষে নব নব বিস্ময়, নব নব রূপসৃষ্টির বিচিত্র সব নিদর্শন—জগতের সকল দেশের

শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষদের শিল্পকর্মের অফুরন্ত নিদর্শন যদি কোথাও একত্রে দেখতে হয় তো এই সেই স্থান। এই রূপলোকের রহস্য-কক্ষে প্রবেশ করলে ভুলে যেতে হয় বাস্তব সংসারের কথা, মনে লাগে সুন্দরের ছোঁয়া আর শ্রদ্ধায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে নবাব সালার জঙ্গের অসামান্য শিল্পানুরাগের কথা স্মরণ করে। তাঁর মত শিল্পদ্রব্যের অক্লান্ত সংগ্রাহক পৃথিবীতে আর জন্মেছেন কি না সন্দেহ—বস্তুত: সালার জঙ্গ মিউজিয়মের ন্যায় চারু এবং কারুশিল্পের এমন বিরাট ও বিচিত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু হায়দরাবাদের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই একটিবিশেষ গৌরবের জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মীর ইউসুফ আলি খানের সমাহৃত শিল্পসম্ভার থেকে তিল তিল করে বহু আয়াসে যে মধুচক্র রচিত হয়েছে, আজ তা পৃথিবীর সকল দেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং দেশবিদেশের রস-সন্ধানীরা আজ হায়দরাবাদে এসে এই মধুচক্রে সঞ্চিত সুধার আস্বাদ গ্রহণ করে নিজেদের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করছেন।

রাজার দান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তোমার দানের আশায় আমি
দাঁড়া'নু রাজপথে।
দেখিনু তুমি হে মহারাজ!
আসিলে স্বর্ণরথে।
করুণাভরা মুখের পানে
চাহিয়াছিনু কাতর প্রাণে;
মাগিয়াছিনু—"যোগ্য নহি, তবু—
তোমার দানের একটি কণা—
পাই যেন গো প্রভু।"
তখন তুমি নীরব থাকি
শুধুই চেয়েছিলে।
ক্ষণেক পরে চলিয়া গেলে—
কিছুই নাহি দিলে
শূন্যপথে পড়িয়া থাকি,
বেলা-শেষের নাইক বাকি।
আবার তুমি ফিরবে হেথা জানি।
আবার হেথা থামবে তোমার
স্বর্ণ-রথ খানি।
কিন্তু তুমি আসিলে নাকো—
রাত্রি হোল গাঢ়।
গহন রাতের নীরবতায়
জাগলো ভয় আরো।

কান পেতে রই দূরের পানে,
যদি তোমার বাঁশীর গানে—
হৃদয়-তন্ত্রী আবার আমার নাচে!
রইনু চাহি কখন আবার ফিরবে তুমি কাছে।
গভীর নিশা কাটিয়া গেল,
আসিলেনাকো তুমি।

ভোরের দিকে দেখিনু নাহি'—
উজলি' বন ভূমি,
চারিদিকের আঁধার নাশি'
দিব্যজ্যোতি আসচে ভাসি,
বাতাসে বয় তোমারি অঙ্গ বাস।
নিমেষে গেল সকল দুঃখ, ঘুচিল সব ত্রাস।

তোমাকে স্মরি আপন মনে
কহিনু—"মহারাজ।
তোমার—দানে ঠিকই আমার—
ভরবে ঝুলি আজ।"
চমকি' চাহি দেখিনু আমি।
দাঁড়া'য়ে পাশে তুমি গো স্বামী।

জানি না, কখন এসেছ দয়া ক'রে।
কখন তোমার গোপন দানে
ঝুলিটি গেছে ভ'রে।

১৩৬১ সাল

জ্যোতি বাচস্পতি

সূর্য বিষুবরেখার উপর আসছে ১৩৬০ সালের ৭ই চৈত্র রবিবার—ইংরাজি ২১শে মার্চ ১৯৫৪ ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় বেলা ৯টা ২৪ মিনিটে। জ্যোতিষের দিক দিয়ে এই সময়টির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই সময়ে রাশিচক্রে যেরকম গ্রহ-সংস্থান হবে তার প্রভাব এক বছর ধ'রে সারা পৃথিবীর উপর অভিব্যক্ত হ'বে।

আমাদের দেশের প্রচলিত পাঁজিগুলিতে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিকে মহাবিষুব সংক্রান্তি ব'লে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়, প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রমণ এই ৭ই চৈত্র এবং এই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত সমান হবে এবং দীর্ঘ নিশার পর সুমেরুর দিগন্তে সূর্যের প্রথম রশ্মি ফুঠে উঠবে।

এরপর সূর্য আর একবার বিষুব-রেখার উপর আসবে ৯ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—ইংরাজি ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ২৬ মিনিটে (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড)। এই বিষুব সংক্রমণকে জলবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়। এই দিনও পৃথিবীর সর্বত্র দিন আর রাত সমান হবে এবং সূর্য সুমেরু দিগন্তে নেমে গিয়ে কুমেরু দিগন্তে মাথা তুলবে। এই দিনের সংক্রমণ সময়ের সংস্থানেরও কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু তার যে গ্রহ—আগেকার গ্রহসংস্থানের মত অত গুরুত্ব নেই তা মহা-বিষুব ও জলবিষুব এই দুটি নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। অন্ততঃ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে জলবিষুব সংক্রান্তির প্রভাব কম—দক্ষিণ গোলার্ধে এর প্রভাব কিছু বেশী হওয়াই সম্ভব।

'এবার মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় গ্রহ সংস্থান হচ্ছে এই রকম—

এবারকার মহাবিষুব সংক্রমণের গ্রহসংস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রবি উচ্চস্থ শুক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এবং চন্দ্রের সঙ্গে পরস্পর—দৃষ্টি সম্বন্ধ করেছে। রবির উপর কোন গ্রহেরই ভাল মন্দ কোন রকম প্রেক্ষা নেই, কাজেই এবছর শুক্র ও চন্দ্রের প্রভাব প্রকট হ'বে। জ্যোতিষে চন্দ্র হচ্ছে জনতা বা সাধারণ প্রজার নির্দেশক। এছাড়া সাধারণের জীবন-মান, খাদ্য-উৎপাদন, সঞ্চিত অর্থ প্রভৃতি ও চন্দ্রের থেকে বিচার করা হয়। শুক্র নির্দেশ ক'রে স্ত্রীসম্প্রদায়, অর্থের বাজার, বাণিজ্য, সবরকম আমোদ-

প্রমোদের ব্যাপার ইত্যাদি। সুতরাং এই সকল ব্যাপারগুলি এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দুটি গ্রহই দ্বিস্বভাব রাশিতে থাকায় এই সকল ব্যাপারে একটা অনিশ্চিত ভাব লক্ষিত হ'বে। অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ পাবে এবং বিভিন্ন ধরণের ঘটনায় তা অভিব্যক্ত হ'বে।

এবং জলবিষুব সংক্রান্তির সময় গ্রহগুলি রাশিচক্রে এইভাবে থাকবে—

এবৎসর পৃথিবীর সর্বত্র জনতার শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং গণ-আন্দোলন প্রবল হ'য়ে উঠবে। ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ সব দেশের শাসকসম্প্রদায়কে প্রজা-সাধারণের স্বার্থের সম্বন্ধে বেশী সজাগ হ'তে হ'বে। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাসাধারণের চাপে শাসন পরিষদকে নতুন বিধি-বিধান রচনা করতে হবে। এবৎসর চন্দ্র মুখ্য সম্বন্ধ করেছে রুদ্রের সঙ্গে এবং তার প্রথম সংযোগী প্রেক্ষা হচ্ছে বুধের সঙ্গে সে-স্কোয়ার; কাজেই জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যেমন দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রকাশ পাবে তেমনি দেশ হিসাবে তাদের মতবাদ ও চাহিদার প্রকারভেদও লক্ষিত হবে বহু। যাতে ক'রে এক দেশের প্রজার সঙ্গে অপর দেশের প্রজার মনের মিল হওয়া সম্ভব হ'বে না। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধও হ'তে পারে। মোট কথা পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে এই দৃষ্টিকটু দলাদলি ও বিভেদ অনেক সময় প্রবলভাবে প্রকট হ'য়ে উঠবে। জাতি নিয়ে, বর্ণ নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, নীতি নিয়ে, তাদের মধ্যে মতভেদ ও আক্রমণাত্মক সমালোচনার অন্ত থাকবে না।

অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ব্যাপারেও এবৎসর পৃথিবীর সব দেশগুলিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার একটা প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা লক্ষিত হ'বে। এই উদ্দেশ্যে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যেমন সহযোগিতা-মূলক নানারকমের চুক্তি হবে, তেমনি আবার এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ প্রকট হ'বে। শান্তি-আলোচনা চললেও প্রত্যেক দেশেই ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের জন্য একটা প্রস্তুতি চলবে এবং যুদ্ধ-সজ্জার ব্যয়বাহুল্যের জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে একটা শঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দেখা দিতে পারে। যাতে করে অনেক প্রয়োজনীয় সংগঠন-মূলক কাজ বাধাপ্রাপ্ত হ'বে। বিশেষ ক'রে সংস্কার-মূলক সবরকম চেষ্টা কম বেশী ব্যাহত হবে।

এবৎসর সংক্রমণ চক্রে কতকগুলি প্রধান প্রধান দেশের যে লগ্ন হয়েছে তাতে একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশেরই লগ্নের সঙ্গে অষ্টমভাবে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। লগ্ন নির্দেশ ক'রে দেশের সাধারণের অবস্থা, দেশের জনসমষ্টি, সাধারণের জীবনধারা, লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি। অষ্টম নির্দেশ ক'রে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা, জাতীয় ঋণ, আন্তর্জাতিক বিনিময়ে লাভ লোকসান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গোপন মন্ত্রণা, গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি। সুতরাং এই বিচিত্র লগ্নসংস্থা জ্যোতির্বিদকে আশঙ্কিত না ক'রে পারে না; এ ব্যাপার পৃথিবীব্যাপী একটা সঙ্কটের সূচক। হয় পৃথিবীব্যাপী একটা যুদ্ধে (তা সে অস্ত্র-বিনিময়ই হোক বা স্নায়ু-সংগ্রামই হোক্), না হয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একটা অদৃষ্ট-পূর্ব বিপ্লবে সব দেশের সাধারণ জীবনধারা কমবেশী বিপর্যস্ত হ'বে, এই ধারণাই প্রথমে মনে আসে।

এবার ভারতের লগ্ন হয়েছে বৃষ এবং লগ্নে আছে বৃহস্পতি। এই বৃহস্পতি অষ্টম ও একাদশপতি। লগ্নপতি শুক্র এবং রবি উভয়েই আছে একাদশে। সুতরাং একাদশ ভাবের ব্যাপার এবৎসর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একাদশভাব থেকে পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক বিধানসভা, বিভিন্ন রাজনৈতিকদল, বিভিন্ন সভাসংসদ পরিষদ প্রভৃতি, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ও যৌথ কারবার সম্পর্কিত ব্যাপার,

অন্য দেশের সঙ্গে সংশ্রব ইত্যাদি বিচার করা হয়। কাজেই এই সকল ব্যাপার আশ্রয় ক'রে অনেক ঘটনা প্রকট হ'বে।

লগ্নে বৃহস্পতি একটি শুভযোগ। এর ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে অনেকদিনের পর একটা আশাবাদী মনোভাব প্রকট হওয়া সম্ভব। তাদের জীবনমানের কিছু না কিছু উন্নতি হ'বে এবং সমৃদ্ধির পথে দেশের অগ্রগতি স্পষ্টতর হবে। উৎপাদন শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কোন বিরাট পরিকল্পনা কাজে পরিণত হ'বে। এ ব্যাপারে কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সুবিধাজনক সর্তে চুক্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তেমনি আবার কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের প্রকাশ্য বা গুপ্ত প্রতিকূলতা ও বিরোধিতায় নানারকম বাধাবিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'তে পারে। তাছাড়া অপচয়, আড়ম্বরে বৃথা ব্যয়, দুর্ঘটনায় ক্ষতি, অবিবেচনার জন্য ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদির আশঙ্কাও আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু সংগঠনমূলক কাজে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষিত হ'বে।

দ্বিতীয়ে প্রজাপতি ও কেতু থাকায় দেশের আর্থিক অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তা লক্ষিত হ'বে। রাজস্বের ব্যাপারে সহসা ও অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হ'তে পারে। আর্থিক মহলে এবং কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির জন্য রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি বা বিঘ্ন হ'বে, রাজস্ববৃদ্ধির জন্য এমন কোন কোন নতুন কর স্থাপিত হ'তে পারে বা কোন কর এমন ভাবে বর্ধিত হ'তে পারে যা জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখবে না এবং তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, বাগ্‌বিতণ্ডা, আন্দোলন-আলোচনা হবে। অর্থের বাজারে শেয়ার ষ্টক্ ইত্যাদির সংশ্রবে একটা অভাবনীয় বিপর্যয় উপস্থিত হ'তে পারে। ব্যাঙ্ক, ইনশিওরেন্স কোম্পানী, যৌথ কোম্পানী, রেলওয়ে, যানবাহন ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা উদ্বেগের সঞ্চার করবে। এই সকল ব্যাপার নিয়ে বাইরে এবং পার্লামেণ্ট ও প্রদেশীয় বিধানসভা গুলিতে বাগ্‌বিতণ্ডা ও আন্দোলন আলোচনার অন্ত থাকবে না। বাজেট ঠিক্ রাখার জন্য অর্থনীতির আমূল সংস্কারের দাবী সর্বত্র প্রকট হ'বে। রাজস্বের আয়ব্যয়ের সংশ্রবে দুর্নীতি, অবিবেচনা ও কেলেঙ্কারি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হ'বে। মোটের উপর এ বৎসর সমৃদ্ধির পথে অগ্রগতি হ'লেও দেশের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না।

তৃতীয়ে আছে রুদ্র। এতে ক'রে একদিকে যেমন সারা ভারতের সংহতি ও সংঘবদ্ধতার আন্তরিক্ ইচ্ছা জনসাধারণের মনে জাগ্রত হবে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাদেশিকতার পরিপুষ্টির চেষ্টা প্রকট হ'বে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-ভেদের আন্দোলন এ বৎসরও প্রবল হবে। এ নিয়ে ভিতরে বাইরে আন্দোলন আলোচনা গেল বছরের মতই চলবে এবং এর সুষ্ঠু সমাধানে বিঘ্ন ঘটবে। প্রদেশে প্রদেশে মন-কষাকষি বাড়তে পারে এবং এ নিয়ে কোন কোন প্রদেশে নিন্দনীয় কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হ'তে পারে।

এই তৃতীয়স্থ রুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার পক্ষে সাহায্য করবে। সামরিক, বিমান ও নৌবল বৃদ্ধির এ একটি বিশেষ যোগ। তাছাড়া রেলপথ সংক্রান্ত এঞ্জিন প্রভৃতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেডিও ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের ব্যাপারে অগ্রগতি লক্ষিত হবে। এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গ, ব্যবসায়ী, ধনিক্ ও জনসাধারণ সকলেরই সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

গেল বৎসরের মত এ বৎসরও পঞ্চমে আছে চন্দ্র। সুতরাং শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে এ বৎসরও সরকারকে একটা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। প্রাথমিক্ শিক্ষা ও বুনিয়াদি বা ব্যবহারিক্ শিল্প শিক্ষার ব্যাপারে বিরাট কোন পরিকল্পনা হ'তে পারে, কিন্তু তা সহজে কাজে পরিণত করা সম্ভব হ'বে না। অর্থাভাব ও নানারকম বিভ্রাটে তা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু সামরিক শিক্ষা ও এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রসার হ'বে। এ বৎসরও কিন্তু সরকারের শিক্ষানীতি জনসাধারণ বা শিক্ষাব্রতীদের পূর্ণ সমর্থন পাবে না। বিশেষতঃ মধ্যশিক্ষার ব্যাপারে সংস্কারের দাবী এ বছরও প্রবল হ'বে। থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা হবে এবং আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থাও হ'বে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের বিধিব্যবস্থা অনেক সময় অস্থান-প্রযুক্ত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ নিয়েও অনেক লেখালেখি ও আন্দোলন আলোচনা হ'বে। এ বৎসর জন্মের হার বর্ধিত হ'তে পারে। কিন্তু অপুষ্টি-

জনিত রোগ, অস্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবং নানারকম দুর্ঘটনায় স্ত্রীলোক্ ও শিশুর মৃত্যুহারও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শনি ষষ্ঠে দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল যোগ নয়। দেশে অপুষ্টিজনিত রোগগুলি বৃদ্ধি পাবে। যদিও ঐ শনি দশমস্থ বুধের স্নেহপ্রেক্ষা পাওয়ায় সরকার এই সকল রোগ দূর করার সম্বন্ধে অবহিত হবেন, তবুও অনেক ক্ষেত্রে অর্থাভাবে তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়ে উঠবে না। এই যোগ কর্মহীনতার জন্য ও বেকার অবস্থার জন্য যথেষ্ট অশান্তির সৃষ্টি করবে। সে সম্বন্ধে কতক ব্যবস্থা হ'লেও, তা যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত হবে না। নিম্নশ্রেণীর ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এ বৎসরও কমবেশী অসন্তোষ লক্ষিত হ'বে এবং বরুণ ষষ্ঠে থাকায় তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও কদাচারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে। ঐ বরুণ রাহু ও কেতুর অশুভ প্রেক্ষা পাওয়ায় সংক্রামক রোগ দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

সপ্তমভাব থেকে সাধারণতঃ অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করতে হয়। এবার ভারতের সপ্তমে আছে বলবান মঙ্গল এবং তা ভারতের লগ্নস্থ বৃহস্পতিকে পীড়িত করছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ভারতের এ বৎসর একটা গুরুতর সঙ্কট দেখা দেবে। আন্তর্জাতিক বিরোধ, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মতান্তর ও মনোমালিন্য, বৈদেশিক্ ব্যাপারে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা এই সব সমস্যারই সমাধান ভারতকে করতে হবে। ভারতের লগ্নে বৃহস্পতি থাকায় ভারত শান্তির পক্ষপাতী হ'বে এবং শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির সমবায়ে শান্তিকামী জাতিসঙ্ঘ গঠনে সচেষ্ট হ'বে। কিন্তু সপ্তমে বলবান মঙ্গল হয়েছে যুদ্ধকামী জাতিদের প্রতীক, সুতরাং তাদের বিরোধিতায় ভারতের এই চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হ'বে। ভারতকে বাধ্য হ'য়ে যুদ্ধসজ্জার ব্যয়বৃদ্ধি করতে হবে। এ বৎসর পাকিস্তানের লগ্ন হয়েছে মেষ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃশ্চিক। উভয়েরই অধিপতি মঙ্গল। সুতরাং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতকে যে একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এর একটা ভাল দিকও আছে। ঐ মঙ্গল সুপ্রেক্ষিত হয়েছে চন্দ্র ও রুদ্রের দ্বারা কাজেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্যবুদ্ধি ও দেশাত্মবোধের জাগৃতি দেখা যাবে এবং এ বিষয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটা আন্তরিক সহযোগিতা লক্ষিত হ'বে।

এ বৎসর আর একটি বিরুদ্ধযোগ হয়েছে অষ্টমে নীচস্থ রাহু। শুধু নীচস্থ বলে নয়, তার ঘনিষ্ঠ অশুভপ্রেক্ষা হয়েছে দ্বিতীয়-পতি দশমস্থ বুধ, দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি ও পঞ্চমস্থ চন্দ্রের সঙ্গে। এতে বোঝা যায় যে, দেশে বিদেশী গুপ্তচরের ক্রিয়াকলাপ বর্ধিত হ'বে এবং তাদের দ্বারা দেশে একটা পঞ্চম-বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা হ'বে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী বিভাগের নিম্নতর কর্মচারীদের অবহেলা, অযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তারা সরকারী গুপ্ততথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দলীলপত্র হস্তগত করার সুযোগ পাবে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক না হলে সরকারকে নানারকমে বিব্রত হ'তে হবে। এ বৎসরও নানা দুর্ঘটনায় লোকক্ষয় হ'বে। বিশেষতঃ যানবাহনসংক্রান্ত দুর্ঘটনা নানারকমে বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংক্রামক্ ব্যাধি, খাদ্যের বিষক্রিয়া প্রভৃতিতেও বহুজনের মৃত্যু হতে পারে। অদ্ভুতভাবে কিম্বা আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা বর্ধিত হবে। উচ্চ রাজকর্মচারী, বক্তা, সংস্কারক, চিকিৎসক প্রভৃতি মহলে কারো কারো সহসা তিরোধানে দেশ ব্যথিত হ'তে পারে।

এই রাহু জাতীয় ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ব্যাপারেও একটা বিভ্রাট ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ত্রুটির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভুল, অবহেলা, শৈথিল্য বা অপটুতার জন্য অনেকক্ষেত্রে এই সকল ব্যাপারে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে।

দশমে বুধ থাকায় এ বৎসর সরকারী মহলে কর্মশীলতা প্রকট হবে, উচ্চ কর্মচারীদের খুব বেশী পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু তাঁদের নানারকম প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীনও হ'তে হবে। সাধারণতঃ তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ প্রকাশ পাবে বটে, কিন্তু নিম্নকর্মচারীদের প্রতিকূলতা বা গাফিলতির জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। এ বছরও সবশ্রেণীর নিম্নকর্মচারীদের জন্য সরকারকে বেশ একটু বিব্রত হ'তে হবে। তাদের মধ্যে একটা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকট হতে পারে এবং ধর্মঘট ইত্যাদিও হওয়া সম্ভব। এ বৎসরও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হ'য়ে উঠবে না এবং এ সম্বন্ধে শাসন কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। খবরের

কাগজে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা হবে। খবরের কাগজ বা সাংবাদিকদের সংশ্রবে এমন কোন বিধান বা ব্যবস্থা হতে পারে যা জনপ্রিয় হবে না এবং তা নিয়েও অনেক লেখালেখি ও আন্দোলন আলোচনা চলবে। এ ছাড়া সরকারী দপ্তরের উপরতলার এমন কোন তথ্য প্রকাশ পেতে পারে যা কেলেঙ্কারিজনক এবং যা সরকারের সম্ভ্রমহানিকর। মোট কথা, সরকারী সেরেস্তাকে একটা অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। লগ্নে বৃহস্পতি থাকায় আশা করা যায় তাঁরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন।

একাদশে রবি ও তুঙ্গী শুক্র থাকায় এবৎসর পার্লামেণ্টে দেশের হিতকর অনেকগুলি বিধানের দ্বারা ঘরে বাইরে ভারতের খ্যাতি ও গৌরব বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীলোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোন হিতজনক বিধান প্রবর্তিত হ'বে। এর বিপক্ষে অনেক আন্দোলন আলোচনা চলবে বটে, কিন্তু মোটের উপর তা জনতার সমর্থন লাভ করবে। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে মহিলা সভ্যদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে এ বৎসর পার্লামেণ্টে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিধান গৃহীত হওয়া সম্ভব, যা জনসাধারণের দ্বারা প্রশংসিত ও সমর্থিত হবে।

সোভিয়েট-তন্ত্রী রুশ দেশ ও চীনের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ়তর হবে। মস্কোর এবৎসর লগ্ন হয়েছে মীন এবং দিল্লীর বৃষ। এই দুই রাশির অধিপতির (বৃহস্পতি ও শুক্রের) স্থান-বিনিময় একটা লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার। এই প্রভাব বহুব্যাপী হওয়াই সম্ভব।

এবৎসরও ভারতকে নানা সমস্যা ও গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে বটে, কিন্তু তার লগ্নস্থ বৃহস্পতি শেষ রক্ষা ক'রে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এইটেই আশার কথা।
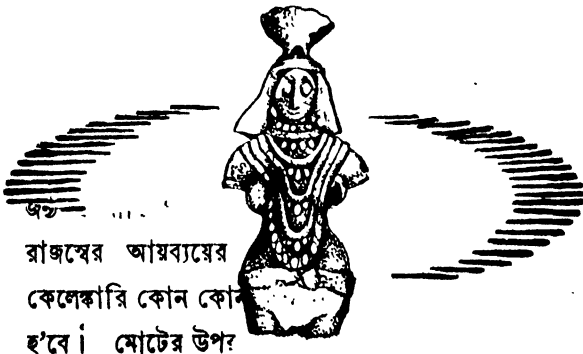
কবি দান্তে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে রণভেরী। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। অশ্বের হ্রেষা আর হস্তীর বৃংহতি শোনা যাচ্ছে। প্রান্তরের দু'দিকে দু'পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হয়েছে। লড়াই শুরু হবে এখনি। এ লড়াই দেশজয়ের অভিযান নয়, শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ নয়, এ হানাহানি আত্মকলহ, একই দেশের দুই সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশা বিরোধের পরিণাম। ১২৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন উত্তর-ইতালীর ফ্লোরেন্স আর আরেজো নামক দুই জনপদের যুবকসম্প্রদায় হাতিয়ার নিয়ে রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের বাসনায়। ফ্লোরেন্স-দলের অশ্বারোহী বাহিনীর পুরোভাগে দেখা গেল একটি ক্ষীণকায় যুবককে, তার নাম দান্তে আলেঘেরি, সে কবি এবং গবেষক, নিজের দেশের সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। যুবক-কবির মুখে গভীর নৈরাশ্য আর বিষাদের ছাপ, দুই চোখে অপরিসীম ভীতির ছায়া, কবি যেন আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে মৃত্যুবরণ করতেই যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

ফ্লোরেন্স শহরে দুটি দল ছিল। একদলের নাম গুয়েল্‌ফস্; অপর দলের নাম ঘিবেলিন্‌স্। ফ্লোরেন্সের উপর আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনায় এই দুই দল বছরের পর বছর কাটাকাটি আর হানাহানি ক'রে দেশের মধ্যে দারুণ অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লব আর আত্মবৈরিতার মধ্যে শিশু-দান্তে মানুষ হয়েছিলেন। "ডিভাইন কমেডি" নামক অমর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা রূপে যে-কবি আজ সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা আর স্বীকৃতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁর জীবন কিন্তু কবিত্ব-স্ফূর্ত্তির অনুকূল পরিবেশে বিকাশ লাভ করেনি। অন্তর্বিপ্লব, ষড়যন্ত্র আর আত্মঘাতী সংগ্রামের আবর্ত্তে প'ড়ে প্রতি পদক্ষেপে তিনি আঘাত পেয়েছেন, বিপন্ন হয়েছেন আত্মীয়জনের শত্রুতায়, বন্ধুজনের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ থেকে হয়েছেন বিতাড়িত।

* * * *

এই সব সাংসারিক বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনকে তত বেশী ভারাক্রান্ত করতে পারেনি। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল, তাঁর প্রেম, রূপকের মতো দুর্জ্ঞেয়, দুরবগাহ আর অপার্থিব! বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রণয় সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক, কবি আর শিল্পীদের যুগে যুগে প্রেরণা জুগিয়েছে।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দান্তের জন্ম। দরিদ্রের সন্তান ছিলেন তিনি, তা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় অল্প বয়সেই ভার্জিল, হোরেস এবং ওভিডের বই প'ড়ে শেষ করেছিলেন। জ্ঞান-স্পৃহা ছিল অদম্য। দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতি-বিজ্ঞান এবং গণিতেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

তাঁর যখন ন'বছর মাত্র বয়স, সেই সময় তিনি বিয়াত্রিচ-কে প্রথম দেখেন এবং প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। ফ্লোরেন্সের এক বিশেষ গণ্যমান্য নাগরিক ফোল্‌কো পর্টিনারির গৃহে অনুষ্ঠিত এক উৎসব-সভায় দু'জনের দেখা হয়। গৃহ-স্বামীর কন্যারূপে বিয়াত্রিচ সকলের সঙ্গেই আলাপ করছিলেন। দান্তের সামনে এসে তাঁকেও মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন। সেই মুহূর্তে আকাশে বুঝি হাজার শঙ্খ একসঙ্গে বেজে উঠ্‌ল, দান্তের চোখের সুমুখে বিশ্বসংসার অবলুপ্ত হল। তিনি দেখলেন, গাঢ় গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক অলৌকিক জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি, শরীরিণী কবিতা, মানস-প্রতিমা মূর্ত্তিমতী! চোখের পলক পড়ে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বিয়াত্রিচের অপস্রিয়মান দেহ-রেখা ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল, তবুও ধ্যান ভাঙ্‌ল না তাঁর। ভাঙেনি সারাজীবনে।

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
যুগে যুগে অনিবার।"—

সারাজীবন ধ'রে বিয়াত্রিচের সম্বন্ধে এই কথাটি বললেন তিনি নানা ছন্দে নানা ভাবে। সেই ছন্দ আর সেই ভাব আজ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ।
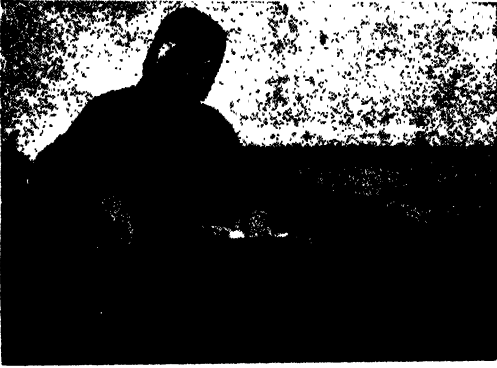
কবি দান্তে। নির্ব্বাসন-কালে তাঁর অমর কাব্য
"দি ডিভাইন কমেডি"-র রচনা শেষ করেন

দ্বিতীয়বার দান্তে বিয়াত্রিচকে দেখলেন ন' বছর পরে।—স্বপ্ন-বিহারিণী সজীব কল্পনা! অভিভূত হলেন দান্তে। ঘরে ফিরে বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে লিখলেন তাঁর প্রথম অপূর্ব্ব সনেট, তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রথম প্রকাশ!

সে-সময় দান্তের দেশে প্রণয়ীদের মধ্যে এক মজার রেওয়াজ ছিল। প্রেমিকার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা ক'রে তারা সেই কবিতা পাঠাতো বন্ধুস্থানীয় অন্য প্রণয়ীর কাছে। এমনি ধারা কবিতার আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে একদল কবি তখনকার দিনে অনেকেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। তারা প্রধানত লিখ্‌ত সনেট, তাই তাদের ইংরাজীতে বলা হত "সনেটিয়ার"। দান্তে তাঁর প্রথম সনেট পাঠালেন তাঁর কবি-বন্ধু গীডো কাভালকান্তির কাছে। কবি কাভালকান্তি সেই সনেট প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে দান্তেকে তাঁদের দলভুক্ত ক'রে নিলেন। অন্যান্য কবিরা বিভিন্ন নায়িকার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করতেন কিন্তু দান্তের জীবনের একমাত্র নারী ছিলেন বিয়াত্রিচ। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি একমাত্র বিয়াত্রিচের স্মরণেই তাঁর কবি-মানসকে নিমজ্জিত রেখেছিলেন।

বিয়াত্রিচকে দান্তে পুজা করতেন দেবীর মত, দূরে থেকে সসম্ভ্রমে তাঁর মানস-প্রতিমার প্রতি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতে চাইতেন না। বিয়াত্রিচকে সামনে দেখলে দান্তে এমন বিহ্বল হয়ে পড়্‌তেন যে তাঁর মুখে কোন কথা জোগাতো না; তিনি মূক এবং নিস্পন্দ হ'য়ে যেতেন। অথচ অন্য মেয়েদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে তিনি অসুবিধা বোধ করতেন না এবং তাদের

দান্তে ও বিয়াত্রিচ। শিল্পী সিজার ম্যাচাগির পরিকল্পিত ও
অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি

কাছে সুযোগ পেলেই বিয়াত্রিচের গুণগান ক'রে মনের ভার লাঘব করতেন। এর ফল কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক হল। দান্তেকে ভুল বুঝলেন বিয়াত্রিচ। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি মিশছেন, হেসে কথা বলছেন, রহস্য-রসিকতা করছেন—তাহলে বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর ভালবাসা আন্তরিক নয়—তিনি অন্তঃসারশূন্য, ছল ও কপট। বিয়াত্রিচ দান্তের প্রতি ঘোর অবিচার করলেন। একদিন স্পষ্টই তাঁর মুখের ওপর বলে দিলেন যে, দান্তেকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এই কথা শুনে কবি-দান্তে এমনই মুহ্যমান হয়েছিলেন যে দু' তিন দিন অনাহারে থেকে তিনি দারুণ অসুস্থ হোয়ে পড়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এক ধনী সওদাগরের সঙ্গে বিয়াত্রিচের বিবাহ

হ'য়ে গেল এবং মনের দুঃখ ভোলবার জন্তে দান্তে যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত তাঁর মনে হ'তে লাগল, বিয়াত্রিচ হয়ত সুখী হন নি, হয়ত তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। অস্থির চিত্তে রণক্ষেত্রে থেকে কবি ঘরে ফিরলেন। তাঁর মনের আশঙ্কা সত্যিই বাস্তবে পরিণত হল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচ মারা গেলেন।

যদিও এই ঘটনার দু' বছর পরে দান্তে বিবাহ করেছিলেন, তাহলেও বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর রূপক-কাব্যের মতো অনির্ব্বচনীয়-প্রেম তাঁর সারা জীবনের প্রেরণা স্বরূপ তাঁর কবিত্ব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি মনে করতেন পৃথিবীতে তাঁর জীবনযাপন একটি অবিচ্ছিন্ন তীর্থ-যাত্রা, তিনি নিজে একজন ভ্রান্ত-পথিক এবং প্রতিপদে তাঁর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন হচ্ছে একমাত্র বিয়াত্রিচের অনৈসর্গিক প্রভাবে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সৃষ্টি "দি ডিভাইন কমেডির" এই হল মূল সুর।

ফ্লোরেন্স নগরে দান্তে এই গৃহে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন

* * * *

দান্তের রণ-নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেশের শাসনব্যবস্থাকে সুপরিচালিত করবার জন্তে যে নূতন সংসদ গঠিত হল তার বিশিষ্ট সভ্যপদে তাঁকে মনোনীত করা হল এবং সেই থেকেই আরম্ভ হ'ল তাঁর জীবনের দুর্বিপাক। ঈর্ষাকাতর শত্রুর সৃষ্টি হল চারিদিকে। এমন কি, পোপ বনিফেস-ও একটা ব্যাপারে তাঁর প্রতি ভিতরে ভিতরে খড়্গহস্ত হলেন। পোপ বনিফেসের একদল শত্রু ছিল। তাদের জব্দ করবার জন্তে ফ্লোরেন্স-শাসন-সংসদের কাছে তিনি একশত অশ্বারোহী সেনা চাইলেন। অন্য কারুর আপত্তি ছিল না, একমাত্র দান্তে প্রবল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ওজোস্বিনী ভাষায় পোপ বনিফেসের দাবীকে অন্যায় ও অসঙ্গত প্রতিপন্ন করলেন। ফলে সাহায্য পেলেন না পোপ বনিফেস।

সেই ঘটনায় অপূর্ব্ব চরিত্রবল ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন দান্তে। পোপের বিরুদ্ধে কথা বলা বড় সহজ কথা ছিল না। অবশ্য তার ফলে দান্তেকে শীঘ্রই চরম বিপদের সম্মুখীন হ'তে হল। শত্রুদের ষড়যন্ত্রে নগরের নানাস্থানে রীতিমতো দাঙ্গাহাঙ্গামা আর অরাজকতার সৃষ্টি হল। নাগরিকদের মধ্যে দুটো দল গজিয়ে উঠ্‌ল। একদলের নাম "কালা-দল", অপরদলের নাম "ধলা-দল"। কালা আর ধলার মধ্যে প্রত্যেকদিন লাঠালাঠি আর মাথা-ফাটাফাটি চল্‌ল। প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। একদিন একদলের এক গুণ্ডা-ভাইপো বিপক্ষদলের খুড়োকে রাজরাস্তায় খুন ক'রে ফেললে! শহরের মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি হল।

শত্রুদের চক্রান্তে দান্তের ওপর ভার পড়ল সেই অরাজকতা বন্ধ করবার। অসাধ্য কাজ। যেখানে শাসন-বিভাগের সদস্যরাই গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যেখানে একপক্ষ গোপনে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাতে ব্যস্ত, সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব। তবুও দান্তে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না এবং তাঁর নির্ভীক আর সুদক্ষ ব্যবস্থায় অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধপক্ষও নিশ্চেষ্ট ছিল না। দান্তে শুনলেন যে, কর্মো ডোনাটি নামে তাঁর এক কুটুম্ব প্রকাশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং এক প্রতিনিধি-দল নিয়ে পোপ বনিফেসের কাছে গিয়ে দান্তের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পেশ করবার উদ্যোগ করছে। খবর শুনে চিন্তিত হলেন দান্তে। তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, এ-ক্ষেত্রে দান্তেরও একটি ছোট প্রতিনিধি-দল নিয়ে পোপের কাছে যাওয়া এবং প্রকৃত ঘটনার কথা জানানো কর্ত্তব্য। সেই পরামর্শ অনুসারে দান্তে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে ফ্লোরেন্স ত্যাগ ক'রে রোম অভিমুখে রওনা হলেন। তখন কি তিনি জানতেন যে, এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, নিজের ভিটায় আর কোনদিন তিনি ফিরতে পারবেন না?

তাঁর আগেই তাঁর শত্রুপক্ষ পোপের কাছে হাজির হয়েছিল এবং তাঁর সক্রিয় সহায়তায় তারা দল পাকিয়ে ফ্লোরেন্স এ ফিরে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে শত্রুদের বিতাড়িত ক'রেছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দান্তের অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে এক আদালত বসিয়ে অযোগ্যতা এবং অন্যান্য নানা দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত ক'রে এক অদ্ভুত বিচার-কার্য্য সমাধা করলে। বিচারে দান্তেকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এই আদালতের আদেশ অমান্য ক'রে তিনি যদি ফ্লোরেন্সে প্রবেশ করেন তাহলে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে, এই ঘোষণাপত্র নগরের তোরণ-দ্বারে লট্‌কিয়ে দেওয়া হল। পোপ বনিফেস ভাল করেই তাঁর পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন।

* * * *

নির্ব্বাসিত জীবনে দান্তে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর বন্ধুরা একবার তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্তে সমস্ত তোড়জোড়

করেছিল, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন নি, গভীর বিষাদ আর বৈরাগ্যে তাঁর সমস্ত মন আচ্ছন্ন অভিভূত হয়েছিল, মনের মধ্যে "ডিভাইন কমেডির" ছন্দগুলি গুঞ্জরণ করে ফিরছে, তাঁর কবি-মন সেই কাব্য-রসে মগ্ন হ'য়ে আছে, পৃথিবীর কোন আকর্ষণই তাঁর কাছে তখন আর মূল্যবান নয়।

কখনো বা কোন মঠে আশ্রয় নিচ্ছেন দু'চারদিন। আবার চলেছে পথ-পরিক্রমা। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছেন। কোন দিন আহার জুটছে। কোনদিন হয়ত জুটছে না।

তাঁর গুণমুগ্ধ ধনী পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না, তাঁদের কয়েক-জনের কাছেও আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তিনি। তবে নির্ব্বাসনের বেশী সময় পথে পথেই কেটেছে তাঁর।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স থেকে এক ঘোষণা-পত্র বার হল। তাতে জানা গেল, দান্তে যদি কিছু অর্থ দণ্ড দেন এবং অপমানসূচক কালো পোষাক পরিধান ক'রে নগর-পরিভ্রমণ করতে রাজী থাকেন তাহলে ফ্লোরেন্স শাসন-সংসদ তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসবার অনুমতি দিতে পারে।

এক অপরূপ শান্ত-রসাশ্রিত ভাষায় দান্তে সেই ঘোষণা-পত্রের উত্তর দিয়ে জানালেন যে, উন্মুক্ত পথেই তিনি বাসা বেঁধেছেন, দিনের বেলায় সূর্য্য আর রাতের বেলায় তারা, এরাই তাঁর সঙ্গী, ঘরের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে, অতএব তাঁকে অপমানের চেষ্টা করা বৃথা।

র‍্যাভেনা নামক স্থানের গীদো দ্য পোলেন্টা নামে এক ধনীর গৃহে দান্তে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর অতিবাহিত করেন এবং সেইখানে ব'সেই তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থটির রচনা শেষ করেন।

সেই সময় ভেনিস ও র‍্যাভেনার মধ্যে ভীষণ কলহ চলছিল। সেই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্যে গীদো পোলেনটা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে দান্তে একদিন ভেনিসের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হলেন। দান্তে ছিলেন জ্ঞানী, গুণী, বাগ্মী আর বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাই গীদো পোলেনটা আশা করেছিলেন যে দান্তের মধ্যস্থতায় এই বিরোধের একটা মিটমাট সহজেই হতে পারবে। দান্তেও তাঁর উপকারী বন্ধুর জন্যে খুব আগ্রহের সঙ্গেই এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিন্তু বিধি হল বাম। ভেনিসের লোকেরা মার মার শব্দে তেড়ে এসে তাঁকে ভেনিসের নগর-দ্বার থেকে খেদিয়ে দিলে। ভেঙে গেল মন। ভেঙে পড়ল শরীর। জলা-জঙ্গল আর কাদা-মাঠ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে যখন র‍্যাভেনায় ফিরলেন তখন প্রবল জ্বরে তিনি প্রায় বেহুঁস। ১৩২১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নশ্বর দেহ ছেড়ে তিনি অমরলোকে যাত্রা করলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনে পড়ছে। সে-কবিতা যেন দান্তের জীবনকে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছিল :

"তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মত
হে অমর কবি ! ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমান-ভার,
অনাদর অবিশ্বাস অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর ! নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি ?
তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য-কমল
আনন্দের সূর্য্যপানে। তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দিনের চিহ্ন মাত্র নাই।
জীবন-মন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল ক'রে গেছ দান॥"•

কৃত্তিবাস

শ্রীঅজিতকুমার কুণ্ডু

পুণ্যতীর্থ ফুলিয়ার গ্রাম প্রান্তে,
চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তমসার অন্তে
উঠেছিল আনন্দের হিল্লোল সেদিন ;
বসন্তে কুসুম বৃক্ষে প্রকট প্রসূন
সম। গৌড় জন তদা আনন্দ সংগীত
গেয়েছিল—মহাকবি ভাবি উপনীত।

মাতৃভাষা রত্নরাজি সাজাইতে আজ,
রত্নাকর এল বুঝি লুকাইয়া সাজ।
কৃত্তিবাস, কবি তুমি, কল্পনার পটে,
আঁকিয়াছ রামায়ণে সরযূর তটে,
সুন্দর সুন্দর রথে—ভরত লক্ষ্মণ,
রাম ; আদর্শ চরিত্র সহস্র অংকন।

কবিকুল মধুগন্ধে ঘুরিছে সতত।
তোমার কাব্যের কুঞ্জে মধুকর মত॥

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার মানপত্রটি কি শরৎচন্দ্রের রচিত ?

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকেরই প্রকাশক "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" থেকে "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁর আর যে সব রচনা, যেমন—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, এমন কি অসমাপ্ত গল্প উপন্যাসও বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে বা অন্যত্র ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে একত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রচনাগুলি সংকলন করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেনবাবু গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে কাজটি দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য হলেও পুণ্যসঞ্চয়ের অভিলাষেই তিনি এই সংকলন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

সত্যই গ্রন্থখানি যে বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ তাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং এই কাজের জন্য ব্রজেনবাবু ও তাঁর উৎসাহদাতা হরিদাসবাবু উভয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য।

বইখানি যখন এতটা মূল্যবান, তখন সংকলনের দিক থেকে এর মধ্যে কোথাও যদি কিছু ভুল থেকে থাকে, তাহলে সেই ভুলটিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হবে ব'লেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বইটির এক জায়গায় ব্রজেনবাবু এই ধরণের একটি ভুল করেছেন বলে আমার মনে হয়। এখানে সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

গ্রন্থের (২য় সংস্করণ) ৭১-২ পৃষ্ঠায় "রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা" নামে একটি রচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রচনাটির পরিচিতি হিসাবে পাদটীকায় ব্রজেনবাবু লিখেছেন —"১৯১৬ সনে জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। পরদিন স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তিনি সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নগরবাসীর পক্ষ হইতে কবিবর নবীনচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্মলচন্দ্র সেন একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র; তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।" গিরীন্দ্রনাথ সরকার: "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" (পৃঃ ২২২-৩৩ দ্রষ্টব্য)।

প্রথমেই গিরিনবাবুর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থটিতে কি আছে দেখা যাক্—

গিরিনবাবুর গ্রন্থে ২২২-৩৪ পৃষ্ঠায় "বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের অভ্যর্থনায় শরৎচন্দ্র" নামে একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে গিরিনবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া আমেরিকা যাইবার পথে রেঙ্গুনে আসিবেন এই সংবাদ আসিল। কবি-সম্রাটের বিশিষ্ট বন্ধু ব্রহ্মদেশের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেন মহাশয় কবিবরের টেলিগ্রামখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'গিরীন্দ্র, রবিবাবু আসছেন, তিনি আমার বাড়ীতে থাকবেন। এখন সহরবাসীর পক্ষ থেকে যাতে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয় তুমি তার বন্দোবস্ত কর।'

......মিঃ সেন আমাকে বলিলেন—'এবার রবিবাবুর জন্য ভাল করে দুখানি অভিনন্দন পত্র লিখতে হবে, একখানি বাঙ্গালায় ও আর একখানি ইংরেজীতে।......'

আমি বলিলাম—'বাঙ্গালার ভার আমি নিলাম, আপনি ইংরেজী লেখার ভার নিন।'...

আমি বলিলাম—'আমি নিজে লিখব না, একটি সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে লেখাব।'

মিঃ সেন বলিলেন—'কে তোমার সাহিত্যিক বন্ধু? তাঁর নাম কি?'

আমি বলিলাম—'তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে চাকরী করেন।'

* * * *

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুচিন্তিত অভিনন্দন-পত্র লিখিয়া দিলেন এবং উদ্বোধন সঙ্গীতখানি গাহিতে রাজী হইলেন।

... ..পরদিন নগরবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল উৎসাহ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তাঁহাকে সম্বর্ধিত করা হয়।……

এই সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত দৌর্বল্যবশতঃ তিনি শেষ মুহূর্তে আসিয়া গান করিতে অস্বীকার করিলেন।…

সৌভাগ্যক্রমে সভায় কলিকাতার ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশের পুত্র ডাঃ পি, দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি "বন্দেমাতরম্"সঙ্গীতটি গাহিয়া সভার মুখ রক্ষা করিলেন।…

সভায় অসম্ভব জনতা হইয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখিতে না পারায় লজ্জায় এ সভায় উপস্থিত হন নাই।

*   *   *   *

কবিসম্রাট কয়েক মাস পরে আমেরিকা হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলে আর একদিন আমি ও বৌমা মিঃ এস, এন, সেনের বাটীতে বসিয়া তাঁহার নিকট আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। ঐদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি সন্ধ্যার পর আমাদের বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে আসিয়া একটি প্রীতিভোজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্লাবের সভ্যদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র আমাদের ক্লাবের মেম্বার না হইলেও আমি তাঁহাকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করায় তিনি আসিয়া-যোগদান করিয়াছিলেন।"

এখানে গিরিনবাবুর লেখা থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখতে না পারায় লজ্জায় সভায় উপস্থিত হন নি। অথচ ব্রজেনবাবু লিখে গেলেন—শরৎচন্দ্র নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্রজেনবাবু তাঁর পাদটীকায় গিরীনবাবুর কথাই তুলছেন—বলেছেন, কিন্তু আশ্চর্য যে তিনি গিরিনবাবুর লেখাটি আদৌ মন দিয়ে পড়েন নি। যদি পড়তেন, তাহলে তিনি এরকম ভুল করতেন না।

গিরিনবাবু লিখেছেন, মে'র কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হয়ে আবার যখন রেঙ্গুনে ফিরে এলেন, শরৎচন্দ্র তখনও রেঙ্গুনে ছিলেন। এ দিকে ব্রজেনবাবু কিন্তু তাঁর এই সংকলন-গ্রন্থের শেষে শরৎচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বৎসরের ছুটি নিয়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেই শরৎচন্দ্র বর্মা ত্যাগ করেন। গিরিনবাবুর মতে শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করলেও মে মাসে তিনি আসেননি, মে'র কয়েক মাস পরে তিনি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেছিলেন। আর শরৎচন্দ্র যে স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বৎসরের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, এ কথাও গিরিনবাবু স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন—"একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুসাঘুসি করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।" (ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র : পৃঃ ৩২০)

এখন প্রথমে, শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যহানির জন্য ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, না সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্।

শরৎচন্দ্র যে অসুখের জন্যই এক বৎসরের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, এ কথাই সত্য। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা এই সময়কার চিঠিগুলিই তার অকাট্য প্রমাণ। শরৎচন্দ্র তাঁর পুস্তকের প্রকাশক ও বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন—…"আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না … আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।"

শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের আর এক প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে লিখেছিলেন—"শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে।…আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতেছি, এক বৎসর থাকিব।"

অতএব দেখা গেল যে, শরৎচন্দ্র অসুস্থতার জন্যই এক বৎসরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আর রেঙ্গুনে ফিরে যান নি। গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রের অফিসের সাহেবের সঙ্গে যে ঘুসাঘুসির কথা বলেছেন, এই ঝগড়ার কথাটা সত্য, তবে এ ঘটনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন ছাড়ার কোনও সংস্রব নাই। আর এ ঘটনা ঘটেছিল তাঁর রেঙ্গুন ছাড়ার অনেক আগেই।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ব্রজেনবাবু বলেছেন, শরৎচন্দ্র মে

মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ করেছিলেন, আবার গিরিনবাবু বলেছেন, মে'র কয়েক মাস পরে। এঁদের কার কথা ঠিক? আমার ত মনে হয় এঁরা উভয়েই ভুল করেছেন। শরৎচন্দ্র মে মাসেও আসেন নি, বা তার পরেও আসেন নি, তিনি এসেছিলেন এপ্রিল মাসে। এক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের চিঠিই তার প্রমাণ। শরৎচন্দ্র শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন —"কাল আপনার দেওয়া তিনশ' টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। আপনার দয়ায় আরোগ্য হইয়া যাইব আশা করিতেছি। আর বোধ করি ভয় নাই—কারণ ওদেশে কবিরাজ আছে—এখানে নাই। এ সব রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারে না।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকেও ঐ সময় ১৪ই মার্চ (১৯১৬) তারিখের পত্রে লিখেছিলেন—"১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোনমতেই গেল না।"

এখানে ব্রজেনবাবুর পক্ষ থেকে একটা কথা উঠতে পারে এই যে, শরৎচন্দ্র এপ্রিলে রওনা হবেন বলে লিখলেই যে, তিনি এপ্রিলে রওনা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পারে যে, এপ্রিলে আসবেন বলে, তখন টিকিট পেলেন না বা টিকিট পেয়েও তখন এলেন না! পরে মে মাসেই তিনি এসেছিলেন!

এ কথার উত্তরে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা শরৎচন্দ্রের আর একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯. ৯ ১৬ তারিখে বাজে শিবপুর থেকে শরৎচন্দ্র প্রমথ-বাবুকে লিখছেন—"প্রায় মাস পাঁচেক হতে চল্ল আমি এদেশে এসেচি।" শরৎচন্দ্র যদি এপ্রিলে আসেন, তবেই তিনি সেপ্টেম্বরে লিখতে পারেন যে, মাস পাঁচেক হ'ল এসেছি। মে'তে এলে মাস পাচেক লিখতে পারতেন না, লিখতেন মাস চারেক।

অতএব শরৎচন্দ্র যে এপ্রিলেই বর্মা ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্র যদি এপ্রিলেই বর্মা ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ৮ই মে'র রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় ছিলেন না এবং মানপত্রটিও তাঁর রচিত নয়।

তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়ত বলবেন, শরৎচন্দ্র এপ্রিলে বর্মা ত্যাগ করলেও, এমনও ত হতে পারে যে, তিনি বর্মা ত্যাগের আগেই ওটি লিখে দিয়ে এসেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে গিরিনবাবুর এত খুঁটিনাটি হিসাব দেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় শরৎ-চন্দ্রের উপস্থিতিই যখন সত্য নয়, তখন বর্মা ত্যাগের আগে শরৎচন্দ্র মানপত্রটি লিখে দিয়ে এসেছিলেন, এ কথা উঠতেই পারে না। তা ছাড়া গিরিনবাবু তাঁর গ্রন্থে এমন সব সঙ্গতিহীন ও অসত্য লিখেছেন যে, তাঁর কোন কথা বিশ্বাস করাই কষ্টকর। যেমন তিনি লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হয়ে রেঙ্গুনে আবার ফিরে এলে মিঃ এস এন. সেনের বাড়ীতে তিনি আরও কারো কারো সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন; আর ঐদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে বক্তৃতা দিলে, শরৎচন্দ্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গিরিনবাবু আবার বলেছেন, শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে হনলুলুতে পৌছে-ছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার ভ্রমণকাহিনীর কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল—

"নিউইয়র্ক হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি ১২ই ডিসেম্বর আমষ্টারডেম থিয়েটারে বক্তৃতা করিলেন—প্রায় সহস্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেল। (N. Y. Times 13 Dec. 16)

পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া ষ্টেটের প্রধান শহর Pittsburghএ ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল। সেখানে Shakespeare Garden-এ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে শিকাগোতে কয়েক দিন পুনরায় থাকিলেন।

…তিনি গেলেন সানফ্রান্সিস্কোতে। সেখান হইতে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ২১শে জানুয়ারী (১৯১৭) জাপান যাত্রা করিলেন।…প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত Hawii দ্বীপের হনলুলুতে তিনি একদিন ছিলেন ও

সেখানে বক্তৃতাও করেন। কারণ বেশিদিন থাকা হইল না, পিয়ার্সন জাপানে ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত।

জানুয়ারীর শেষে কবি জাপানে আসিয়া পৌছিলেন।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রবীন্দ্র-জীবনী" ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪২।)

এই উদ্ধৃতিটি থেকেই গিরিনবাবুর লেখার গুরুত্ব ও সত্যাসত্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

এখন গিরিনবাবুর লেখাকে সঙ্গতিহীন বলেছি বলে, তাঁর বইখানি সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলাও প্রয়োজন বোধ করি। গিরিনবাবু তাঁর বইয়ের নাম "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" দিলেও আসলে বইখানি কিন্তু তাঁরই আত্মকাহিনী। আর এই আত্মকাহিনী বলতে গিয়েই তিনি শরৎচন্দ্রকে জড়িয়ে বহু অসত্যের অবতারণা করেছেন। যে কোন লোক গিরিনবাবুর বইয়ের সামান্যমাত্র পড়লেই তা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই এত সব পরস্পর-বিরোধী উক্তি রয়েছে যে, তাতে করে তাঁর এই অসত্য আরও প্রকট হয়ে পড়েছে।

গিরিনবাবুর এই সব কথা বাদ দিলেও, যাঁরা শরৎ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত তাঁরা এই মানপত্রটি পড়লেই দেখবেন যে, এটি আদৌ শরৎচন্দ্রের রচনাই নয়। এর ভাষা শরৎচন্দ্রের ভাষা নয়। এখানে তুলনামূলকভাবে এই মানপত্রটির সঙ্গে সত্যিকার শরৎচন্দ্রের লেখা আর একটি রবীন্দ্র-সম্বর্ধনারই মানপত্র উদ্ধৃত করা গেল—

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট্, ডি-লিট,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভা বলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদিগাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন
২৫শে বৈশাখ
১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
রেঙ্গুনপ্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের লেখা মানপত্র

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি

জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন। আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দউল আজি, গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত দিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে আমরা নমস্কার করি, তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ ১৩৩৮।

এখানে উদ্ধৃত মানপত্র দুটির ভাষার মধ্যে যে বেশ পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে সহজবোধ্যতা, সরলতা ও মিষ্টতা রয়েছে, প্রথম মানপত্রটির মধ্যে তা নাই। তাছাড়া প্রথম মানপত্রটির ঐ অল্পমাত্র লেখার মধ্যেই অসংখ্য বার "নব নব", ৭ বার "আনন্দ", ৬ বার "হৃদয়" এবং একাধিকবার "নিখিল" "কাব্যবীণা", "আলোক" প্রভৃতি ব্যবহৃত হওয়াতেও বেশ বোঝা যায় যে এ শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেন না একটুমাত্র পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এতবেশি ব্যবহার শরৎচন্দ্র কোথাও কখন করেন নি। আর অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়ে টেনে টেনে অত বড় বড় বাক্যও তিনি লেখেন নি। এমন কি তাঁর বাল্য রচনার মধ্যেও এই সব দোষ চোখে পড়ে না। অবশ্য রেঙ্গুনের মানপত্রটির লেখা ভাল কি মন্দ সে আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। ভাষা এবং বিশেষ করে—গিরিনবাবু ও ব্রজেনবাবুর অভিমতের বিরুদ্ধে আমি আমার যুক্তি দেখিয়ে সেই কথাই এখানে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ

দর্শন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে প্রত্যাদেশ অথবা আপ্তবচনের স্থান নাই। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে আপ্তবচন প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। এই আপ্তবচনকে "শব্দও" বলা হইয়াছে।

আপ্তোপদেশ শব্দঃ। সাং সূ—১।১০১

ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদেশের নাম "শব্দ প্রমাণ"।

শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। অর্থ বাচ্য, তাহা ব্যক্ত হয় শব্দ দ্বারা, শব্দ বাচক।

বাচ্য-বাচক-ভাবঃ শব্দার্থয়োঃ। সাং সূ—৫।৩৭

তিন প্রকারে এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ। সাং সূ—৫।৩৮

প্রথমতঃ আপ্তোপদেশ। কোনও অভ্রান্ত পুরুষ একটি বস্তু দেখাইয়া বলিলেন "ইহার নাম ঘট"। তখন "ঘট" শব্দের বাচ্য যে ঐ বস্তু, তাহা বোঝা গেল। দ্বিতীয়তঃ—বৃদ্ধ ব্যবহার। যে ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতেও এই জ্ঞান হয়। যখন একজন বলিল—"গোরু আনয়ন কর" এবং অন্য একজন একটি চতুষ্পদ লাঙ্গুল বিশিষ্ট জন্তু আনিয়া উপস্থাপিত করিল, তখন ঐ চতুষ্পদ লাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তুটিই যে "গোরু", সেখানে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির সেই জ্ঞান জন্মে। তৃতীয়তঃ—প্রসিদ্ধ পদসামান্যাধিকরণ্য। একজন বলিল "বালকটি আম খাইতেছে।" উপস্থিত অন্য একটি বালক "বালক" শব্দের ও "খাইতেছে" শব্দের অর্থ জানিলেও আম কখনও দেখে নাই বলিয়া আম শব্দের অর্থ জানে না। না জানিলেও "বালকটি আম খাইতেছে" এই বাক্যের শব্দগুলির সমন্বয় করিয়া বুঝিল, বালকটি যাহা খাইতেছে, তাহারই নাম আম। এই ত্রিবিধ উপায়ে শব্দ ও অর্থের জ্ঞান জন্মে।

বেদ শব্দরাশির সমষ্টি। বৈদিক বাক্যসকল কেবল কর্ম্মে নিয়োগের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় নাই। বৈদিক সকল বাক্যেই

আদেশ নাই এবং বৈদিক বাক্য কেবল কার্য্যবোধক নহে। বৈদিক বাক্যে কার্য্য ও সিদ্ধ পদার্থ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

ন কার্যেনিয়মঃ উভয়থা দর্শনাৎ। সাং সূ—৫।৩৯

শব্দের লৌকিক ব্যবহারে ব্যুৎপন্ন লোকের লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই বেদার্থের প্রতীতিঃ হয়।

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থ-প্রতীতিঃ। সাং সূ—৫।৪০

কিন্তু বেদ যদি অপৌরুষেয় হয় অর্থাৎ কোনও পুরুষ-কর্তৃক রচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে লৌকিক শব্দের অর্থগ্রহণের যে ত্রিবিধ উপায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা কি বেদ-সম্বন্ধে খাটে? বেদে বর্ণিত দেবতা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকলই তো অতীন্দ্রিয়। এরূপ স্থলে লৌকিক ব্যবহার দ্বারা বেদার্থ জ্ঞান হইবে কিরূপে?

ন ত্রিভিরপুরুষেয়ত্বাদ্ বেদস্য বেদার্থ-প্রতীতিঃ।
সাং সূ—৫।৪১

ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিতেছেন, এ যুক্তি ঠিক নয়। কেননা বেদোক্ত বিষয় অতীন্দ্রিয় নহে। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগাদিরূপ যে যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম, তাহারা প্রকৃষ্ট ফল দান করে বলিয়াই তাহারা স্বরূপতঃ ধর্ম্ম। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অতীন্দ্রিয় বলা যায় না। দেবতা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও সামান্য রূপে প্রতীতি হইতে পারে।

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতঃ ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ।
সাং সূ—৫।৪২

যদিও বেদ অপৌরুষেয়, তথাপি অর্থ বিষয়ে বেদবাক্যের এক স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই বৃদ্ধ-পরম্পরাক্রমে তাহাদের অর্থ গৃহীত হয় এবং প্রত্যেক শব্দের অর্থ অন্য শব্দের অর্থ হইতে বিভিন্ন বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট হয়। বেদবাক্যের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি উপদেশ পরম্পরায় ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বরূপার্থ প্রকাশ করে।

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে। সাং সূ—৫।৪৩

বেদোক্ত বিষয়ের অতীন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ পদার্থের জ্ঞানই বাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয়। দেবতাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানগম্য হইতে পারেন।

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎ-সিদ্ধিঃ।
সাং সূ—৫।৪৪

বেদ নিত্য নহে। কেননা তাহার উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে। শ্রুতিতে আছে—"স তপঃ অতপ্যত, তস্মাৎ ত্রয়োবেদাঃ অ য়ত।"—(তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যা হইতে তিন বেদের জন্ম হইয়াছিল)।

ন নিত্যত্বং বেদানাং, কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।
সাং সূ—৫।৪৫

কিন্তু নিত্য না হইলেও বেদ পৌরুষেয় নহে। কেননা বেদের কর্ত্তা কোনও পুরুষ নাই ও হওয়া সম্ভবপর নহে।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য অভাবাৎ
সাং সূ—৫।৪৬

মুক্তই হউন আর অমুক্তই হউন, কোনও পুরুষই বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বটেন, কিন্তু তিনি বীতরাগ বলিয়া এই কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বেদ রচনা তো সম্ভবপরই নহে।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ। সাং সূ—৫।৪৭

বেদ অপৌরুষেয়, কিন্তু নিত্য নহে। অঙ্কুরাদি কোনও পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন না হইলেও, তাহারা যেমন নিত্য নহে, বেদও সেইরূপ নিত্য নহে।

না পৌরুষেয়ত্বাৎ নিত্যত্বং, অঙ্কুরাদিব। সাং সূ ৫।৪৮

অঙ্কুরাদিতে পুরুষত্বের আরোপ করিলেই অর্থাৎ তাহারা পুরুষকর্তৃক সৃষ্ট বলিলে তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা হয়, কেননা বীজ হইতে স্বভাবতঃই অঙ্কুরোদ্ভব হয় দেখা যায়। কোন পুরুষকে অঙ্কুরোৎপাদন করিতে দেখা যায় না।

তেষামপি তদযোগে দৃষ্ট বাধাদি প্রসক্তিঃ। সাং সূ ৫।৪৯

কোনও বস্তুর কর্ত্তা অদৃষ্ট হইলেও, সেই বস্তু কোনও কর্ত্তা

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, এই জ্ঞান যদি হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুকে পৌরুষেয় বলা যায়।

যস্মিন্ অদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিঃ উপজায়তে, তৎ পৌরুষেয়ম্।
সাং সূ ৫।৫০

সুতরাং কোনও বস্তুকে যদি পৌরুষেয় বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হওয়া চাই। সুতরাং কেবল কোনও পুরুষকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাকিলেই কোনও বস্তুকে পৌরুষেয় বলা যায় না। বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক উৎপন্ন নহে। ইহা নিঃশ্বাসের ন্যায় অদৃষ্টবশতঃ স্বয়ম্ভূ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বিক সুতরাং অপৌরুষেয়। শ্রুতিতে আছে "তস্যৈ এতস্য মহতো ভূতস্যনিঃসিতশ্বাসমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদ ইত্যাদি।"

বেদের এমন স্বাভাবিক শক্তি আছে, যাহাদ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তি মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই নিখিল বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য।

শব্দ অনিত্য

স্বয়ম্ভূ হইতে নির্গত হইলেও বেদ নিত্য নহে। শব্দও নিত্য নহে। কেননা শব্দ যে উৎপত্তিশীল, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। বর্ণও নিত্য নহে। 'গ'বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া ইহা 'গ'বর্ণ বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সত্য। কিন্তু এই প্রত্যভিজ্ঞা হইতে বর্ণের নিত্যত্ব অনুমান সঙ্গত হয় না। 'গ' ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সজাতীয়ত্বেরই উপলব্ধি হয়, অভিন্নতা উপলব্ধ হয় না। 'গ' ধ্বনি শুনিয়া পূর্ব্বে যে 'গ' ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, এই ধ্বনি তাহার সজাতীয়—এই মাত্র উপলব্ধি হয়। যদি বলা যায় পূর্ব্বশ্রুত 'গ' ধ্বনির সহিত বর্ত্তমানে শ্রুত 'গ' ধ্বনির অভিন্নতা উপলব্ধ হয় এবং ইহা দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে "এই সেই ঘট" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি পদার্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়।

ন শব্দ নিত্যত্বং কার্য্যতা-প্রতীতেঃ। সাং সূ ৫৯

স্ফোট

শব্দ স্ফোটাত্মক নহে। 'কলস' শব্দে তিনটি বর্ণ আছে। এই তিন বর্ণের সংযোগের দ্বারা অতিরিক্ত 'কলস' রূপ অখণ্ড একটি শব্দের অস্তিত্ব আছে, ইহা কেহ কেহ বলেন। এতাদৃশ অখণ্ড শব্দকে স্ফোট বলে। ক, ল, স এই তিন বর্ণের প্রত্যেকের অর্থোৎপাদিকা শক্তি নাই। ইহারা একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে পারে না, পৃথক পৃথক উচ্চারিত হয়। সুতরাং ইহাদের মিলনও অসম্ভব। সুতরাং যে "কলস" শব্দ অর্থবোধ জন্মায়, ঐ বর্ণদিগের হইতে তাহার পৃথক অস্তিত্ব আছে, ইহাই কাহারও কাহারও মত। কিন্তু শব্দের বর্ণদিগের অতিরিক্ত ও তাহা হইতে পৃথক এই রূপ "স্ফোটের" অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যেমন ঘটের বিভিন্ন অবয়ব হইতে পৃথক কোনও ঘটের অস্তিত্ব নাই। কারণ ক, ল ও স এই তিনটি বর্ণ অর্থব্যঞ্জক "কলস" শব্দের অঙ্গীভূত রূপে বর্ত্তমান বলিয়া কিন্তু প্রতীতি হয়, তেমনি প্রত্যেক বর্ণ হইতে পৃথক রূপে অস্তিত্ববান্ কোনও স্ফোটের প্রতীতি হয় না।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ। সাং সূ ৫।৫৭

স্ফোট-সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি বলেন পাণিনি তাঁহার শব্দানুশাসনে যে "শব্দে"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্রহ্ম। যে সনাতন 'শব্দ' স্ফোট নামে অভিহিত (পাণিনির ব্যাকরণে স্ফোট শব্দ পাওয়া যায় না), যাহা নিষ্কল (অংশ হীন), তাহাই জগতের কারণ, তাহাই ব্রহ্ম। ভর্ত্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ড হইতে মাধব নিম্নলিখিত শ্লোক স্বীয় মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দ-তত্ত্বম্ যদক্ষরং।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা।

আদিও অন্তহীন ব্রহ্মই সনাতন শব্দতত্ত্ব এবং এই শব্দতত্ত্বরূপী ব্রহ্মই বস্তুরূপে পরিণত হন, তাহা হইতেই জগতের অভিব্যক্তি হয়। মাধব বলেন, স্ফোটাখ্য নিরবয়ব নিত্য শব্দ ব্রহ্মই। নবপ্লেটনিক দর্শনের Logosএর সহিত স্ফোটের যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে, তাহা সুস্পষ্ট।

সাংখ্য স্ফোটের প্রতীতি হয় না বলিয়াছেন। কিন্তু মাধব বলেন স্ফোটের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়। "গো" শব্দ উচ্চারিত হইলে শ্রোতা এই শব্দকে তাহার মধ্যগত বর্ণদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়াই উপলব্ধি করেন। যদি বলা হয় যে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে এই সকল বর্ণ মিলিতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানোৎপাদন

করে ?' এই প্রশ্ন উঠে। বর্ণদিগের মিলন তো অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারিত হইবামাত্রই অন্তর্হিত হয়, পরে উচ্চারিত বর্ণ কাহার সঙ্গে মিলিত হইবে? স্বতন্ত্রভাবেও তাহারা জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারে না। কেননা কোনও শব্দের অন্তর্ভূক্ত কোনও বর্ণই সেই শব্দের অর্থবোধ জন্মাইতে সক্ষম নহে। বর্ণগুলি মিলিত অথবা পৃথক অবস্থায় যখন অর্থ-বোধ জন্মাইতে অক্ষম, তখন অর্থবোধ জন্মাইতে অন্য কিছুর অস্তিত্বের প্রয়োজন। ইহাই স্ফোট। যদিও বর্ণদিগের দ্বারাই স্ফোট প্রকাশিত হয়, তথাপি তাহা বর্ণদিগের হইতে ভিন্ন।

কিন্তু শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধ যে ব্যবহার হইতে উদ্‌ভূত (conventional), পাণিনি তাহা বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে একই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধে যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে বহু শব্দের সহিত প্রত্যেক অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ মানব-সৃষ্ট ও ব্যবহার-জাত।

শব্দের নিত্যত্ববাদিগণ বলেন, অন্ধকারে অবস্থিত ঘট যেমন দীপালোক দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, দীপালোক কর্তৃক ঘট উৎপন্ন হয় না, তেমনি শব্দ ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, তৎদ্বারা উৎপন্ন হয় না। শব্দ পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ও নিত্য।

পূর্ব্বসিদ্ধ-সত্বস্য অভিব্যক্তিঃ, দীপনেব
ঘটস্য। সাং সূ—৫।৫৯

ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন, সৎকার্য্যবাদ অনুসারে সকল কার্য্যই তো তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। এই অর্থে যাবতীয় কার্য্যবস্তুই নিত্য। অসতের উৎপাদন অসম্ভব। এই অর্থে শব্দের প্রকাশের পূর্ব্বেও শব্দ বর্ত্তমান। সকল বস্তুই এই অর্থে নিত্য। সুতরাং শব্দের নিত্যত্বের মধ্যে বিশেষত্ব নাই। যাহা অবিসংবাদিত তাহা সাধন করাকে "সিদ্ধসাধন" বলে। শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত সুতরাং সিদ্ধসাধন মাত্র।

সৎকার্য্য সিদ্ধান্তশ্চেৎ
সিদ্ধসাধনম্। সাং সূ—৫।৬০

সাংখ্যের আপ্তবচন শ্রুতি বা বেদ। ইহাই শব্দ প্রমাণ। বেদ অপৌরুষেয় হইলেও অনিত্য। সাংখ্য মতে শব্দ প্রমাণের স্থান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে—কেন না বেদ স্বতঃপ্রমাণ (সাং—সূ ৫।৫১), কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানে ভ্রম সম্ভবপর। সাংখ্যের দার্শনিক মত বিবেচনা করিলে তাহাতে বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে এই স্বীকৃতি আন্তরিক নহে। কিন্তু ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বহু স্থলে সাংখ্য সূত্রে শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়ও শ্রুতি উভয়েরই উল্লেখ আছে—(১।৩৮)। সূত্রকার যে শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, ১৪৭ সূত্রে তাহার প্রমাণ আছে। এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ কখনও দৃষ্ট হয় নাই (প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়)।

(শ্রুতি-সিদ্ধস্য নাপলাপঃ, তৎ প্রত্যক্ষ ৬।৪১২)। ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূত হইতে উদ্‌ভূত। এই মতের খণ্ডনের জন্যও সূত্রকার শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

আহংকারিকত্ব শ্রুতেঃ,
ন ভৌতিকানি। (২।২০)

১।৭৭, ১।৮৩, ১।১৫৪, ২।১২, ৩।১৪, ৩।৮০, ৩।২২ সূত্রের শ্রুতি প্রমাণ স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্য অবশ্য স্বীয় মতানুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মোক্ষমূলর বলিয়াছেন, যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও সাংখ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরোধী। সাংখ্যোক্ত ত্রিবিধ বন্ধের মধ্যে দাক্ষিণবন্ধ একটি। (সাং কাঃ ৪৪)। মোক্ষমূলর দক্ষিণা বন্ধের অর্থ বুঝিয়াছেন—ব্রাহ্মণ-দিগকে দান হইতে যে বন্ধের উদ্‌ভব হয়, সেই বন্ধ। এই অর্থ সঙ্গত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে "ইষ্টাপূর্ত্তেন দাক্ষিণকঃ। পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞঃ হি ইষ্টাপূর্ত্তচারী, কামোপহতমনা বধ্যতে-ইতি।" ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে দাক্ষিণ-বন্ধের উৎপত্তি হয়। যিনি পুরুষতত্ত্ব অবগত নহেন, তিনিই ইষ্টাপূর্ত্তচারী ও কামোপহত-মনা হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হন। বৈদিক যাগযজ্ঞের ফলকে বিনশ্বর বলিলেও, তাহার কোনও মূল্য নাই, তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত, একথা সাংখ্য বলেন নাই। ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধেও কোন কথা সাংখ্যদর্শনে নাই। দক্ষিণা বন্ধের অর্থ যদি যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রদত্ত দক্ষিণা হইতে উদ্‌ভূত বন্ধই হয়, তাহা হইলেও সে বন্ধ দক্ষিণা-গ্রাহক ব্রাহ্মণেরই। দক্ষিণাজীবী ব্রাহ্মণেরও বন্ধ হয়, ইহাই বলা সাংখ্যের উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিশেষ বিদ্বেষ সূচিত হয় না।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চার্ব্বাক অন্ধকারে একা বসিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সুরঙ্গমাকে যদি জীবনের মূল্যেই কিনিতে হয়, তাহাকে পাইবার পরেই যদি জীবনাবসান ঘটে তাহা হইলে মৃত্যু-নামক যে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাহাকে অচিরাৎ উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহার স্বরূপ কি। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের দেহ নির্ম্মিত—ইহা ছাড়া আর কিছু নাই, এতকাল ইহাই—সে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর দৈহিক পঞ্চভূতের সমন্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকৃতির বিরাট পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এই ধারণার স্বপক্ষেই সে এতকাল নানাযুক্তি আহরণ করিয়া আসিয়াছে, এই যুক্তিরই নির্দ্দেশে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করাই জীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম্ম। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই পুরুষকার, এই ধর্ম্ম আচরণই স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভের উপায়। এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গ নরক বর্ত্তমান। কামনার পরিতৃপ্তিই স্বর্গ। অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা-কামনার যন্ত্রণাই নরক। যেমন করিয়াই হোক ক্ষুধা ও কামনাকে তৃপ্ত করিতে হইবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা অবিধেয় নহে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া এতকাল সে চলিয়াছে। এই পথে চলিতে চলিতেই সে আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া আজ সাহসা যেন বলিতেছে, আমরা বিভিন্ন নহি, আমরা পরস্পরের পরিপূরক, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করিবার জন্য মৃত্যুকেই বরণ করিতে হয়, সুরঙ্গমা মায়াবিনী রাক্ষসী নহে, সে তোমার প্রেয়সীও নহে, সে তোমার গুরু। তুমি এতকাল জীবনকেই একমাত্র সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলে, সুরঙ্গমা আজ তোমার এই মহাভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছে, সে তোমাকে আজ অর্দ্ধ সত্য হইতে পূর্ণ সত্যে উত্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ জীবন ত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে হয়, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর। সুরঙ্গমা আনন্দ-স্বরূপ। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তাই সে তোমাকে মৃত্যুর অনির্দ্দিষ্ট বৃহত্ত্বে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহাকে বাধা দিও না।

চার্ব্বাক ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া ভাবিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। সুরঙ্গমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে তাহার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনে পড়িল। অদ্ভুত সুরা-পান করিয়া সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, গুণপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ, জালার ভিতর প্রবেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন, অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান, বন্দী সিংহ, অসংখ্য মশক···একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে জীবন সে যাপন করিয়াছে তাহাকে কোনমতেই সুস্থ জীবন বলা চলে না। তবে কি সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? প্রেমকে অনেক কবি ব্যাধি আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রেম-ব্যাধিই কি তাহার চিন্তাশক্তিকে হরণ করিয়া তাহার দুর্ব্বল কল্পনায় প্রলাপের মোহ সৃজন করিতেছে? সুরঙ্গমা বলিয়াছিল সে সুন্দরানন্দের কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাহার এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করিবার জন্য যে যুক্তি-জাল সে বিস্তার করিয়াছিল সে জালে সুরঙ্গমা ধরা পড়ে নাই, সে নিজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রিত চেতনা যে বিচিত্র স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রভাব সে যেন কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তাহার মনে হইতেছে সে যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছি, স্বপ্নে জাগরণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব যে একেবারে অসম্ভব একথা বলিবার মতো মনের জোর তাহার যেন আর নাই। সুরঙ্গমার মতো রূপসী রসিকা

প্রণয়ের প্রতিদানে তাহাকে যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলিদান দিতে চাহিতেছে—ইহার অপেক্ষা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব কি বেশী অসম্ভব? সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। যুক্তি, চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা সব যেন জট পাকাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। কেবল একটি কথাই মনের মধ্যে ধ্রুব-তারার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—যেমন করিয়া হোক, যে মূল্যেই হোক, সুরঙ্গমাকে পাইতেই হইবে।

চার্ব্বাক যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সেই বন্ধদ্বারের বাহিরে নিঃশব্দ চরণে একটি পরম রূপবান যুবক ও পরমরূপবতী যুবতী আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাহিরে তখন গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে।

যুবক বলিলেন—"বাণী সূক্ষ্মদেহ ধারণ কর। আমি তোমার মধ্যে ঢুকি"

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উভয়েই স্বচ্ছ আলোক-শিখায় রূপান্তরিত হইলেন। একটি আলোক-শিখা আর একটি আলোক-শিখায় মিশিয়া গেল। মিলিত আলোক শিখাটি পুনরায় মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

দ্বারে করাঘাত শুনিয়া চার্ব্বাক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কে—"

"কপাট খুলুন। আমি এসেছি"

"কে, সুরঙ্গমা?"

"কপাট খুললেই দেখতে পাবেন। দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি খুলুন"

চার্ব্বাকের মনে হইল সুরঙ্গমাই আসিয়াছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সেই রকমই মনে হইতেছে। তবু দ্বিধা হইল।

"সুন্দরানন্দ কি বললেন"

"তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে"

"কি সর্ত্ত"

"কপাট খুলুন, বলছি"

চার্ব্বাকের আর সন্দেহ রহিল না। সে কপাট খুলিয়া দিল। যে মানবী মূর্ত্তিটি প্রবেশ করিল সে যে সুরঙ্গমা নয় এ সংশয় তাহার মনে জাগিল না। জাগিলেও সংশয় নিরসনের উপায় ছিল না, কারণ ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্না-লোক প্রবেশ করে নাই। অন্য কোনও আলোও ছিল না।

"কি সর্ত্তে কুমার সুন্দরানন্দ আমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছেন?"

"আপনাকে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে হবে যে তাঁর কুলদেবতা চতুরানন ব্রহ্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন"

চার্ব্বাক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"শুধু মুখে ওই কথা বললেই হবে?"

"শুধু মুখে বললেই হবে না। চতুরানন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে আপনাকে বিশ্বাসও করতে হবে"

"কিন্তু আমি যদি মিছে কথা বলি তিনি তা টের পাবেন কি করে'? প্রাণভয়ে অনেকেই যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় একথা নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত নেই"

"নিশ্চয়ই নেই। আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেই কিন্তু তিনি জানতে পারবেন। একজন ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, তিনি এখানেই আছেন। তাঁর গণনাও অভ্রান্ত। তিনি বলে দিতে পারবেন আপনি সত্য কথা বলছেন কিনা। তিনি যদি বলেন আপনি মিথ্যা-কথা বলছেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভল্লের আঘাতে আপনার মস্তক বিদীর্ণ হবে। সুন্দরানন্দ এই আদেশ দিয়েছেন।"

চার্ব্বাক পুনরায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইয়া গেল। তাহার পর বলিল, "হঠাৎ কোন কিছুকে বিশ্বাস করবার শক্তি তো আমার নেই। যে দেবতাকে কখনও দেখিনি, যার অস্তিত্বের কল্পনা মনে হাস্যোদ্রেক ছাড়া আর কোনও ভাবের উদ্রেক করেনি, তাকে হঠাৎ সত্য বলে' মেনে নি কি করে'? আমাকে মানিয়ে সুন্দরানন্দের লাভই বা কি হবে তা বুঝতে পারছি না"

"আপনি কি জ্যোতিষ গণনায় বিশ্বাস করেন?"

"না—"

"তাহলে তো ওই ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর গণনাকে আপনি নির্ভয়ে তুচ্ছ করতে পারেন। আপনি মুখেই তাহলে বলুন—আপনি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, আমি সেই খবর নিয়ে যাই, ফলাফল কি হয় দেখা যাক"

"আমি যদি বলি ব্রহ্মার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, তাহলে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?"

"না। তাঁর মতে যারা নাস্তিক তারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই উচিত"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল।

"কি ঠিক করলেন"

"কিছু ঠিক করতে পারছি না"

"আপনি সত্যিই কি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না? ভাল করে' ভেবে দেখুন, চেয়ে দেখুন মনের গহনে"

"যা চোখে দেখিনি, যুক্তি দিয়ে যার অস্তিত্বের কল্পনাও করতে পারি না, তাকে বিশ্বাস করি বলব কি করে'"

"চোখে দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন?"

"করব। প্রত্যক্ষ দর্শনকেই বিশ্বাস করে' এসেছি চিরদিন"

"দেখুন তাহলে"

এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেই অন্ধকার ঘর এক দিব্য আলোকে আলোকিত হইল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে দেখিল তাহার সম্মুখে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে সত্যই চতুরানন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দ্যুতিময়, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের আভায় সমস্ত ঘর রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। চার্ব্বাক ভয় পাইয়া গেল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

"সুরঙ্গমা, তুমি কোথা গেলে? ইনি সত্যই কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, না তুমি আমাকে কোন ভোজবাজী দেখাচ্ছ?"

সুরঙ্গমার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অষ্ট-নয়নের হাস্যময় দৃষ্টি নীরবে যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—অবিশ্বাস করিও না আমি আছি। মানব মাত্রেই অসহায়, প্রেম ও বিশ্বাসই তাহার একমাত্র আশ্রয়। সুরঙ্গমার প্রেম যদি লাভ করিতে চাও, বিশ্বাস কর। একমুখ বিষ্ণু, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ মহেশ্বর কেহই অলীক নহে। তোমার অন্তরলোকে তাহারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তুমি কেবল বিশ্বাস কর।

চার্ব্বাক মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই জীবন্ত বিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহের মধুর হাস্য, স্নিগ্ধ প্রশান্তি, দিব্য জ্যোতি তাহাকে ক্রমশ যেন সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া হাত জোড় করিয়া এই বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সম্মুখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া পড়িল। পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন। চার্ব্বাক তথাপি বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীচিন্তামণি করের ভাস্কর্য্য

উসাব

প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে "ভারতবর্ষে" বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তরুণ উদীয়মান শিল্পী শ্রীচিন্তামণি করের চারুকলায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁহার উত্তর জীবনে সাফল্য কামনা করেন। ডাঃ সেনের ভবিষ্যৎবাণী কি পরিমাণ ফলবতী হয়েছে তাহা আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি।

শ্রীচিন্তামণি কর ১৯৩০ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, কলিকাতায় প্রথমে চারুকলা শিক্ষা করেন এবং ১৯৩৪-৩৬ সালে কয়েকটি প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। এই সময় তাঁহার নিপুণ শিল্পকলার দৃষ্টান্ত হতে অনেকে ভবিষ্যত-কৃতিত্বের আভাস পান। ১৯৩৭ সালে শ্রীকর প্যারির গ্রাণ্ড শ্যামুর একাডেমিতে (L' Academi de la Grand Cheumiere, Paris) ভাস্কর বিদ্যা এবং অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পরে ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত দিল্লী পলিটেকনিকের চারুকলা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তাঁহার ভাস্কর্য্য শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছু দিন পরে তিনি লণ্ডন যান এবং রয়াল সোসাইটি অব ব্রিটিস স্কালপ্‌টারের সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম ও একমাত্র ভারতীয়, যিনি এ সম্মানে ভূষিত হন। এখন তিনি লণ্ডনে নিজের ষ্টুডিওতে স্বাধীনভাবে শিল্পরচনায় ব্যস্ত। সম্প্রতি প্রায় ৭ বৎসর পরে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে এসেছেন।

তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বুঝা যায় যে এই সদালাপী মিষ্টভাষী শিল্পীর চারুকলা সম্বন্ধে জ্ঞান কত প্রগাঢ় ও গভীর। ভারতের পারম্পরিক ভাস্কর্য্যের ইতিহাস ও আঙ্গিক হইতে পাশ্চাত্যের অতি-আধুনিক 'ফবিজিমের' উপরে তিনি বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতা দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে তিনি বি. বি সিতে এবং শিল্প, বিদ্যায়তন ইত্যাদিতে আহুত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। আশ্চর্য্য হইবার কারণ এই যে বিলাতে থাকিয়াও সময় সময়, শ্রীকর বাংলা ও হিন্দি ভাষায় শিল্প সম্বন্ধীয় পরিভাষা রচনা করে থাকেন। তাঁহার প্রণীত বই "Classical Indian Sculpture" এবং "Indian Metal Sculpture" সুধীসমাজে সমাদৃত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তাঁহার শিল্প প্রতিভা আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বেই ইউরোপে খ্যাতিলাভ করে। এ সময় তাঁহার নিজস্ব শিল্পপ্রদর্শনী লণ্ডন ও প্যারিতে সেখানকার শিল্পরসিকমহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। শ্রীকরের ভাস্কর্য্য ভারতে, ইউরোপে,

ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, নিউজিলাণ্ড ইত্যাদি বহুদেশের সাধারণ শিল্প-রসিকের গৃহে বা সরকারি সংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

যদিও লণ্ডনের শিল্পাগার থেকে বৃহৎ মূর্ত্তিগুলি আনা সম্ভব হয় নাই, সম্প্রতি নিউদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফটস্ সোসাইটীর কক্ষে শ্রীকরের ২০টি ভাস্করখণ্ড দেখিয়া তাঁহার উচ্চস্তরের মূর্ত্তি-গঠনের আভাষ পাওয়া গেল। সাধারণতঃ যে কয়জন ভারতীয় শিল্পী ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুশীলন করে থাকেন তাহাদের আঙ্গিক প্রধানত দুই ধরণের দেখা যায়—যথা চাপ গঠনের (Compactness) বা ভাস্কর্য্যের সমস্ত রূপ রচনা করা হয় সমষ্টিগত একখণ্ড বস্তুর মাধ্যমে। আর কিছু শিল্পী নিজেদের ভাব প্রকাশে এত ব্যস্ত যে আঙ্গিকের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন কম; ইহারা অনেকে এপ্‌ষ্টাইনেরও আরো আধুনিক শিল্পীর ছাঁচে নিজেদের চিন্তাধারাকে বিমূর্ত্তরূপদ্বারা প্রকাশ করে থাকেন অথবা ভাস্কর্য্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত প্রসারিত করে থাকেন যে তাহাদের ভিতরে বিমূর্ত্ত শিল্পের প্রভাব পাওয়া যায়, অনন্য সুশ্রী দেহাবয়বের

তুষার ক্রীড়ায়—মুগ লক্ষন (মাধ্যম ব্রোঞ্জ)

ভাস্কর—চিন্তামণি কর
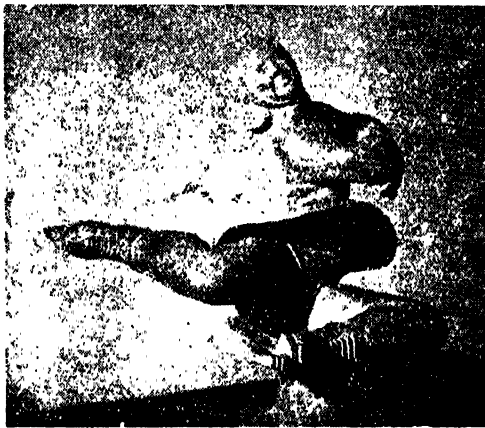
সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। শ্রীকর এই দুইটির কোন আঙ্গিকে প্রভাবান্বিত হন নাই। তাঁহার সৃষ্টি দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি সুগঠিত অবয়বযুক্ত মনোরম মূর্ত্তি গঠন করে থাকেন। তাঁহার শিল্পের মধ্যে ভাবের গুরুত্ব সুচারুরূপকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না। প্রধানত তাঁহার ভাস্কর্য্যের ভিতরে পাওয়া যায় কমনীয়তা ও হাত, পা ইত্যাদির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিস্তার। তাঁহার মূর্ত্তিগুলি টেরাকোটা (পোড়ামাটির) বা ব্রোঞ্জের বা প্ল্যাষ্টার অব প্যারিসের হউক, তিনি সর্বত্র নিজের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ লালিত্যময় হাত পা ছড়ান আঙ্গিকের সাহায্যে আনন্দদায়ক মূর্ত্তি গঠন করেছেন। ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির মধ্যে এ ধরণের সৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার, কারণ সামান্য সংযোগ রেখেও হাত পা ছড়ান ছন্দময় গঠন ধাতুর মাধ্যমে করা সম্ভব (যথা শিবতাণ্ডব নৃত্য), কিন্তু প্রস্তর বা টেরাকোটা অথবা প্ল্যাষ্টারে মনভাবের মূর্ত্তি গঠন স্বাভাবিক। শ্রীকরের রচনা দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁহার নিজস্ব ধারা সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে—মাধ্যম যাহাই হউক।

মোট ২০টি রচনা দেখে বুঝা যায় ১৯২৯ সাল হতে আজ পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁহার দৃষ্টি-কোণ বাস্তবধর্মী হলেও ক্ষমতাশালী শিল্পী হিসাবে তিনি মূর্ত্তি নির্মাণে নিজস্ব রূপলোক সৃষ্টি করেছেন। কোথাও ভারতীয় পৌরাণিক কল্পনাকে রূপায়িত করেছেন সুষ্ঠু, সাবলীল, ছন্দোময় গঠন দিয়ে—আবার কোথাও পাশ্চাত্য বিষয়ক মূর্ত্তি গঠন করেছেন গ্রীকদের রূপসজ্জার বিন্যাসে; এবং কিছু বাস্তবপন্থী—তাঁহার মারফৎ বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক রূপ মনে জেগে উঠে। বিভিন্ন রচনা থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে শ্রীকর যে

চাষী রমণী (মাধ্যম প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস)

ভাস্কর—চিন্তামণি কর

ধরণেরই মূর্ত্তি নির্মাণ করুন না কেন তাহার সহজাত রূপ প্রকাশ করিবার আঙ্গিক অবলম্বন করে থাকেন; তাই পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে সাবলীল ছন্দোময়রূপ দিয়েছেন, আবার মহাত্মা গান্ধীর মুখের অবয়বে সদাহাস্যময় বিরাট ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

"টরসো" (ব্রোঞ্জ নির্মিত—১৯৩৯) প্রায় এক হাত উঁচু মূর্ত্তি। দেখলে গ্রীক ভিনাসের রূপ চক্ষের সামনে ভেসে উঠে। ছোট খাট তামাটে সবুজ রঙ্গের জৌলুষ, মূর্ত্তির বাহু নাই, দেহের নধর গঠনভঙ্গিমা

স্বাভাবিক। রিলিফ ধরণের দ্রষ্টব্য—"কবি রবীন্দ্রনাথ"—ছোট সমতল একখণ্ড ব্রোঞ্জ পাতের উপরে গভীর রেখা সংযোগে করা হয়েছে। কাজটি ১৯৪৫ সালের, সুতরাং ইহা তাঁহার গোড়ার দিকের নির্মাণ বলিলে ভুল হবে না। কয়েকটি গভীর ও হাল্কা রেখায় কবির প্রশস্ত কপাল, গভীর ভাবালু ঋষিতুল্য দৃষ্টির আভাষ পাওয়া যায়।

এর পরের ভাস্কর্য্যের মধ্যে স্পষ্ট নিজস্ব বিশেষত্বের ছাপ দিয়েছেন শ্রীকর। "Skating—The Stag" (তুষার-ক্রীড়ায়—মৃগ-লম্ফন) তাঁহার ১৯৪৮ সালের ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্ত্তি। উচ্চে প্রায় দুই হাত, বিষয়-বস্তু এক নারী তুষার-ক্রীড়ার মৃগ লম্ফনে যেন শূন্যে অবস্থান করিতেছেন। শীতের ভাব প্রকাশ পায় মোটা মেয়েটার মাথার ঢাকায়। দেহ পরি-পূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। লম্ফের ভঙ্গিমা অতিশয় প্রাণবন্ত, কারণ ডান পা পিছনদিকে ছড়ান, বামপা বাঁকাভাবে সামনের দিকে গোটান, বাহুদ্বয় বুকের উপরে সজোরে ধরা, আর সমস্ত দেহ—কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত—সামান্য বাঁকাভাবে দেখান হয়েছে। ইহার গঠন প্রণালীতে অপূর্ব ভারসাম্যবোধ পাওয়া যায়। শুধু গঠন কেন, শিল্পীর ব্যঞ্জনার মধ্যে স্ত্রীলোকটির মুখের দৃঢ়তা ও আনন্দের ভাব যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। গ্রীবা সামান্য হেলান থাকায় মূর্ত্তির মধ্যে বেশ প্রাণশক্তির ইঙ্গিত পাই। সম্মুখগতির ধারণা হয় ছোট ফ্রকের ঘের হাওয়ায় উড়ছে দেখে। সবদিক থেকে মূর্ত্তিটির মধ্যে আছে সাবলীল গতি, দেহের স্বাভাবিক গঠনের সৌন্দর্য্য ও শক্তির ব্যঞ্জনা এবং প্রতিটি কলাকৌশল স্বতস্ফূর্ত্ত। ইহা ১৯৪৮ সালের লণ্ডনস্থ বিশ্ব অলিম্পিক খেলার প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক ও ডিপ্লোমা পায়।

১৯৪৮ সালের সৃষ্টির মধ্যে "মা ও সন্তান" চোখে পড়ে—তার ছন্দোময় অথচ চাপ গঠনের জন্য। এইটি প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি ত্রিভুজের আকারে ইটরঙ্গে পোড়া মাটির কাজ, বিষয়বস্তু মা সন্তানকে আদর করছে। মার পিঠের গোলাল শ্রী ও বাহুবেষ্টিত সন্তান মাতৃস্নেহের চমৎকার নিদর্শন বটে, তবে চারুকল্পের ছন্দোময় রূপজালই বেশী প্রকট।

১৯৪৬ সালের নির্মিত স্যার মরিস গাওয়ার প্ল্যাষ্টারে গঠিত পূর্ণাঙ্গ আবক্ষ মূর্ত্তি। স্যার মরিসের বিরাট ব্যক্তিত্ব এর ভিতর বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। প্রশস্ত কপাল চিন্তাশীল মুখাবয়ব সমস্ত পরিষ্কাররূপে দেখি মূর্ত্তিটির ভিতর।

এখন দেখা যাক তাঁহার সাম্প্রতিক রচনা। সাদা টেরাকোটা (পোড়া মাটি) দ্বারা ১৯৫৩ সালে শ্রীকর রচনা করেছেন "উষা ও সবিতার"। বিষয়টিকে রূপ দিয়েছেন অতি সুচারুরূপে ও স্নিগ্ধ আঙ্গিকের সংযোগে। পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে অতি লাবণ্যময় সৃষ্টি এবং নিঃসঙ্কোচে বলা চলে এত উৎকৃষ্ট নয়নমধুর শিল্পসৃষ্টি সমসাময়িক ভারতীয় ভাস্কর্য্যের মধ্যে দেখি নাই। দৃশ্যটি হল সবিতা তাঁহার স্ত্রী উষাকে পিঠের উপরে লয়ে খেলা করিতেছেন। সবিতার দেহের কিছুটা দেখা যায় যাহাতে সূর্য্যের অপরিমিত তেজ দেখান হয়েছে তাঁহার মুখে ও চোখে, দেহ পরিপূর্ণ সুগঠিত ও সবল। পিঠের উপরে বোঝা তোলার আকারে সবিতা কিছুটা কুঁজা হয়ে আছেন; পাশের দিকে একটি চওড়া ও অর্দ্ধগোলাকার বৃত্তাংশ, দেখে মনে হয় সূর্য্যের একাংশ। পিঠের উপরে শায়িতা উষা যেন অর্দ্ধ জাগ্রত, আলস্য ত্যাগ করে সবে ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে। মূর্ত্তিটি উঁচুতে ১½ হাত ও লম্বে ২ হাত হবে, কিন্তু প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বচ্ছন্দভঙ্গির পরিচায়ক এবং কোমল রূপশ্রীর আভাষ দেয়। পৌরাণিক কাহিনীকে প্রাণবন্ত রূপের মহিমায় শ্রীকর রূপ ও শক্তির মিশ্রণে এক স্বচ্ছন্দগতিময় অভূতপূর্ব রূপজাল সৃষ্টি করেছেন সংশয় নাই।

প্ল্যাষ্টারের মূর্ত্তি "চাষী রমণী" আর একটি ১৯৫৩ সালের রচনা। প্রায় দেড় হাত উঁচু ভাস্কর্য্য, শিল্পসৃষ্টির প্রতিটি ব্যঞ্জনা স্বাভাবিক ও নিখুঁত। সুস্থ, সবল, কর্মঠ দেহ, ঘাগরার প্রতিটি কোঁচকানি, হাতে পায়ে সামান্য অলঙ্কার, ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি এই উত্তর ভারতীয় চাষা রমণীর মূর্ত্তিতে যথাযথ পরিপ্রেক্ষণ সহযোগে দেখান হয়েছে। মাথায় জলের কলসী নিয়ে মনে হয় এগিয়ে চলেছে। একটা পা ঈষৎ সামনে থাকায় এবং গায়ের জামা কিছু দোল খাওয়ায় রচনাটির মধ্যে গতির সন্ধান পাওয়া যায়। অতি সাধারণ দৈনন্দিন দৃশ্যকে সুচারু শিল্প-কৌশলে ও পরিমিত ভার-সাম্যের প্রয়োগে শ্রীকর ইহাকে গতিসম্পন্ন প্রাণবন্ত শিল্পের আকার দিয়েছেন।

মোটকথা তাঁহার রচিত ভাস্কর্য্যগুলি দেখলে বুঝা যায় যে শ্রীচিন্তামণি কর কেবলমাত্র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ভাব নিয়েই ব্যস্ত নহে; তিনি নিজের শিল্পকলার মধ্যে শক্তি, লাবণ্য, সুগঠিত অবয়ব গঠন করেন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে বা দৈনন্দিন দৃশ্যকে কেন্দ্র করে। মনে হয় তিনি প্রাচ্য মনের ভিত্তির উপরে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায় কমনীয়, রুচিকর, ছন্দোময় মূর্ত্তি গঠনে ব্রতী। কত গভীর তাঁহার শিক্ষা যে কোথাও আঙ্গিকের মোহজালে নিজেকে হারান নাই বা বিব্রত বোধ করেন নাই। তাই তাঁহার শিল্পের মধ্যে পাই তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার সূক্ষ্ম ও সবল ছাপ। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীকর উত্তরোত্তর খ্যাতি লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

কার নিকোবর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কার নিকোবরের শোভা অপরূপ। আন্দামানের মত এ-দ্বীপ শৈল-সঙ্কুল নয়। যথেচ্ছ আয়াসে বঙ্গোপসাগর প্রদক্ষিণ করে দ্বীপকে। সফেন উর্মিমালা লীলা-গৌরবে স্পর্শ করে কার নিকোবারকে। তাই জোয়ারের সময় সমুদ্র পৌঁছে নারিকেল বন অবধি—ভাঁটার সময় কূলে বালি দেখা যায়। পাহাড়ে পোর্টব্লেয়ারে বালু-বেলা পরে তরঙ্গের খেলা দেখা সম্ভবপর নয়—কারণ সেথায় বেলায় বালি নাই। সেথা সমুদ্রের অংশটুকুও পাহাড়-ঘেরা বন্দী। কার নিকোবার নীল সাগরের মাঝে সবুজের হাট, সাগর দোলে নিজের ছন্দে চাঁদের টানে; দ্বীপ দোলে হাওয়ার-তালে। সারা দেশ ঘন বনে আচ্ছন্ন—তাই সূর্য্যালোক মানুষকে কিরণ দেয়, তাকে অনলে দগ্ধ করতে পারে না। বৃক্ষ নানা জাতীয়, নারিকেলের ছড়াছড়ি বেশী।

যে দেশে মানুষকে কঠোর প্রকৃতির সাথে সদাই যুঝতে হয়, সে দেশের মানুষের প্রকৃতি হয় কঠিন। কিন্তু যেথায় একটি নারিকেল ফলে দুখানা রুটি আর এক ঘটি জল অনায়াস-লব্ধ, সেথায় মানুষের স্বভাব হয় কোমল। একদিন বাঙালীর বীরত্ব হরণ করেছিল তার স্বভাব-কোমল সুহাসিনী বাঙলা মা তাকে আদর দিয়ে।

পর্যটকদের একমত কার-নিকোবরের অধিবাসী সম্বন্ধে। তারা কোঁদল করতে জানেনা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় সেথায় অবিদিত হলেও নিকোবারী জানে—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ। এরা বলিষ্ঠ, হাস্য-মুখ, পরিশ্রমী। কিন্তু সত্য যুগের মানুষ।

নিকোবারীর চেহারা বর্মীর অত—রং অত হরিদ্রাভ নয় —কিন্তু নাসিকা চেপটা, চক্ষুও পটোল-চেরা নয় বাদামী। প্রত্নতত্ত্ব বলে—নিকোবর শব্দ নগ্নবরম শব্দ হ'তে হয়েছে। পূর্বে ওরা একেবারে প্রায় উলঙ্গই থাকতো। ভগবানের কৃপায় আমি কিন্তু নগ্নবরী দেখলাম না কোথাও। পুরুষ আধা প্যাণ্টালুন-পরা, স্ত্রীলোক কোমর হ'তে পা অবধি লুঙ্গি ভূষিতা—উপর দেহ নগ্ন। কিন্তু সভ্যতার ছোঁয়াছ লাগায় সহরের নারীর মধ্যে অনেকের দেখলাম গায়ে জামা।

এদের কুটীর ভারী পরিষ্কার—কারণ এরা পরিশ্রমী। এর নির্মাণ-পদ্ধতিও ভালো। মাচার ওপর তোলা গোল কুটীর। অন্ধ্র দেশে ও মাদ্রাজে একরকম গোল কুটীর আছে সেগুলা ভূমি-ছোঁয়া! শ্যাম, মলয়, এমন কি কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরেও বহু কুটীর মাচার ওপর। কিন্তু তারা গম্বুজের মত গোল নয়—যেমন নিকোবারী বাস-গৃহ।

নিকোবারী মহিলা

সমুদ্রের হাওয়া যেথায় কুটীর-ধ্বংসী, সেথায় গোল বাড়ি ধাক্কা খায় কম। কাজেই মাদ্রাজ উপকূলের এবং নিকোবারের গোল-পাতার গোল ঘর নিজের অভিব্যক্তি এবং অধিবাসীর অভিজ্ঞতায় লাভ করেছে দৃষ্টি সুখকর রূপ। এরা মাচায় তোলা, কারণ বন্য বরাহ

বা অহিকুল, কুটীরবাসীর শান্তি হরণ করতে পারবে না, এই বিচারফলে।

নারিকেল গাছকে নিকোবর যেমন আশ্রয় দেয়, তেমন প্রশ্রয় দেয় সে কেয়া-ফুলের গাছকে—প্রকাণ্ড কেয়া গাছ—তার তথৈব ফুল। ফুলের রেণুকে শুকিয়ে তাকে পিশে ময়দা ক'রে তার রুটি খায় দ্বীপবাসী। আর খায় নারিকেল এবং তার টাটকা জল। তাকে পচিয়ে আসবরূপে চোলাই ক'রে পান ক'রে মৌজ করে—সে কথা শুনলাম না। এখন সভ্য ভারতবাসীর ওদেশে শুভাগমন সুরু হয়েছে এবং ওদেরও আন্দামানে এবং এদেশে গমনাগমন আরম্ভ হয়েছে, দেখা যাক কি হয়। কালিদাসের কথায় হয়তো শুনব—নারিকেলাসবং পপৌ।

নিকোবারের লোক সব খৃষ্টান। রেভারেণ্ড রবিনসন

বেলাভূমির প্রান্তে

নামক এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ওদের প্রতিনিধি দিল্লী পার্লামেণ্টে। আরও অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন দ্বীপে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, খৃষ্ট-ধর্ম পরিগ্রহ ক'রে এবং কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখে নিকোবরের লোকের মাথা এখনও খারাপ হয়নি। তারা নিকোবারীই আছে। সম্ভবতঃ তাদের আগের দিনের ধর্মের অংশ ছিল পিতৃ-পুরুষের পূজা। তাই এখনও গোরস্থানে বাতি দেওয়া এবং নিজের পূর্ব-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তাদের জীবন-স্রোতের একটা ধারা।

বহুদিন পূর্বে পেনাঙে একটা প্রকাণ্ড ডাবের জল দু'জন তৃষিত আমরা পান করে নিঃশেষ করতে পারিনি। নিকোবরের ডাব তেমন ভীম-দর্শন নয় অর্থাৎ ভীমের গদার মাথার মত নয়। আমি ও দ্বীপে নেমেছিলাম আন্দামানের প্রধান ডাক্তার-সঙ্গীও কয়েকজন কর্মচারীর সাথে। তথাকার এসিষ্টাণ্ট কমিশনরের অনুরোধে ডাবের জল পান করতে সম্মত হলাম। তাঁর ভৃত্য গ্লাসে নিয়ে এলো জল। আমি পান করে হেঁসে বল্লাম—কী সর্দার সাহেব, সরবত দিলেন? ভদ্রলোকেরা হেঁসে উঠ্‌লেন। স্থানীয় ডাক্তার বাঙ্গালীর মত চেহারা কন্নাটের লোক।

তিনি হেঁসে বল্লেন—এ কলকাতার নারিকেল নয়। আমাদের দ্বীপের ফল—এদেশের অধিবাসীর খাদ্য।

বিশ্বাস জন্মাবার জন্য একটি কাটা হ'ল সম্মুখে। বুঝলাম বঙ্গ আমার জননী আমার নারিকেল-সম্পদে শ্রেষ্ঠ নন। যেহেতু কেতকীর রুটি খেলাম না, একটা প্রকাণ্ড কেয়াফুল পেলাম উপহার।

গোল-ঘর

সেদিন আমাদের মেট্রোপলিটন, বিশপ শ্রীমুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল কলিকাতায়। ও দ্বীপটা ওঁর এলাকাধীন। তিনিও বল্লেন—ওদেশে পুলিশ বাহুল্য—কোনো মামলা মোকদ্দমা নাই। অবশ্য লোকের সম্বন্ধে ওঁরও ঐ মত।

অধিবাসীরা কিন্তু প্রকৃতির দান পূর্ণভাবে ভোগ করতে পায়না। কারণ এই দ্বীপের নারিকেল ছোবড়া, কাঠ প্রভৃতির ইজারাদার আকুজি বংশ। এরা বোম্বাই মুসলমান, আন্দামানের অধিবাসী। চমৎকার প্রাসাদ পোর্টব্লেয়ারে নব-নির্মিত। এঁদের মোটর বোট আছে, অনেক পাল-তোলা নৌকা আছে, লোক-লস্কর আছে। নিকোবারী শ্রমিকরূপে এঁদের তরী বাহে, কাঠ কাটে, নৌকা বোঝাই করে ছোবড়া এবং কাঠে। মহারাজা জাহাজ তাদের

মাদ্রাজ ও কলিকাতায় নিয়ে যায়। তাতে মা লক্ষ্মী তুষ্টির হাসি হাসেন আক্কুজির দিকে চেয়ে। বেচারা নিকোবারীর ভাগ্যে নগ্নদেহ ও কেয়াফুল!

এসব দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র—যদি মানুষ মন স্থির ক'রে পরিশ্রম করতে পারে। যতদিন বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী মন্ত্র বাঙ্গালীর মনে চেপে না বসবে, আমরা দেশে দলাদলি মারামারি ক'রে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হব—খুসী জব-অন্বেষী হিসাবে।

আর একটি ব্যাপার কর্তৃপক্ষ দেখেও দেখেন না। এখানে বন্ধু হিসাবে ইংরাজ এক বিমান-ঘাটি নির্মাণ করেছে তার সমর-বিভাগের আকাশ-জাহাজের। এখানেও যদি ভারত হতে চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহ'লে আন্দামান নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপ এ দেশের কতকটা তাজা খবর পেতে পারে—মহারাজার গৌণ গতির দয়ার উপর নিভর না করে। প্রথম পুরুষ উপ-নিবেশিক দেশের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করতে পেরেছে—এ-সমাচার কোনো ইতিহাস সরবরাহ করেনি। ওদেশকে ভারতের উপনিবেশ করতে হ'লে এ-দেশের সাথে ঘনিষ্ঠতা একান্ত প্রয়োজন।

বন্দী সাগর

নিকোবারীর নিজের কোনো লেখার লিপি ছিল না, এখনও নাই। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের চেষ্টায় ইংরাজি হরফে তাদের পাঠ্যপুস্তক লিখিত. হ'য়েছে। হিন্দী প্রচারকেরা বেচারা তেলেঙ্গী তামিলির পুষ্ট সাহিত্যকে দমন করবার প্রচেষ্টা কতকটা প্রশমিত করে নিকোবার প্রভৃতি দ্বীপে শুভদৃষ্টি দান করলে জগতের হিত হবে, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজে কষ্ট আছে, শ্রম আছে, পথান্বেষণের দ্বন্দ্ব আছে। অতএব বাঙ্গালীর প্রতি আমার নিবেদন—বাঙলা অক্ষর সেথায় চালাবার প্রয়াস হবে না অপকার্য। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

নিকোবারের আরো দক্ষিণে আছে নানকৌরী। সেথায় এক রাণী আছেন। তাঁর পরিবার শিক্ষিত এবং ভারত-বাসীর মতো তাঁর আত্মীয়ারা শাড়ীতে দেহ-সজ্জা করেন।

আরও নিচে দ্বীপ আছে, যেথায় মানুষ আপনাকে ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের বানর-বংশাবতংশ। এরা লেঙ্গট পরে পিছনে একটু লেজ ঝুলিয়ে রাখে—তাদের আভিজাত্য প্রমাণ করবার মানসে। এদের এতো প্রভাব যে নিকটবর্তী অন্য দ্বীপের লোকেরা তাদের গুরুস্থানীয় ভেবে নিজেদের কৃষি-বাগিচার উৎপন্ন ফসলের কতক অংশ দান করে সম্মান দেখায়। সুতরাং কর্ম-বিরতি এদের জাতীয় স্বভাব। তুলনা অন্যায়, তাই বিরত হলাম উপমা দিতে ভারতের সমাজ হতে।

মোট কথা আন্দামান নিকোবার দ্বীপ-পুঞ্জ দেখে যে পরিমাণে চিত্ত প্রফুল্ল হ'ল, সে পরিমাণে মন লাভ করলেনা তুষ্টি। বাংলা দেশের বৃদ্ধ। চিরকাল প্রকৃতির লীলা-মধুর তালে ও ছন্দে উদ্বেলিত হ'য়েছে প্রাণ—সংসারের দুঃখের কঠোরতার পটভূমিতে। নিরাশা-ব্যাকুল চিত্ত সাড়া দেয়নি দ্বীপ-মালার রঙের সুরে, একথা বলছিনা। কিন্তু জাহাজের দোলায় বসে যখন আন্দামান নিকোবার প্রভৃতির হরিতের সুরছন্দের রেশ প্রাণকে জিজ্ঞাসা করলে, এ সম্পদ আজ ফেলে রেখে ছন্দহীন, বেতালা সহরে কেন বাঙ্গালী গুঁতোগুঁতি, মারামারি, রেষারিষি, ঈর্ষাদ্বেষ এবং দারুণ অশান্তিকে নিজস্ব করে দুঃসহ বেদনা ভোগ করছে, তখন সুষ্ঠু উত্তর খুঁজে পেলাম না।

যুগসন্ধির সঙ্গীত-সাহিত্য

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ

রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার প্রায় শতবর্ষ আগে অর্থাৎ যুগ-সন্ধিকালে বাংলাসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীতের উপর নির্ভর করিত; গদ্য সাহিত্যের তখন সবেমাত্র সূত্রপাত ঘটিয়াছে। কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান গীতিকার কবিরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেদিন সাহিত্য বলিতে মূলতঃ গীতিসাহিত্যকেই বুঝাইত—রসগ্রাহী গোষ্ঠী তখন গীতি-শ্রাবকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইংরাজীশিক্ষা তখন সবেমাত্র প্রসার লাভ করিতেছে, প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তনের হাওয়া লাগিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জন-সাধারণের রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের যাহা কিছু সমস্তকেই, রঙ্ ও ঢঙ বদল করিয়া, নূতনরূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে। এই রকম Transitional Periodএ বাংলার সংস্কৃতিতে সাঙ্গীতিক 'রেনেসাঁ' আসিয়াছিল। প্রাচীন কীর্ত্তন গান ক্রমে ক্রমে তাহার রসানুভূতির আবেদন হারাইয়া ফেলিতেছিল, যাত্রাগান আর পাঁচালী গানে তাহার রূপ একাত্মক হইয়া গেল। আবার পশ্চিম হইতে নবাগত উচ্চাঙ্গের গানের আদর্শে কীর্ত্তন গানের ঢঙে নব নব রীতির সূচনা ঘটিল।

কবির গানের তখন বিশেষ আদর হইয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে আয়েসী সমঝদারদের মজলিস সহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সহরের ধনীদের আসরে তখন কবির গানের ভারি চলন।

কবিওয়ালারা সুকণ্ঠ গায়ক হইলেও সুকবি ছিলেন না, তাঁহাদের বলা চলে Versifier মাত্র। অনেক কবির দলে গানের বাঁধনদার থাকিত। তাঁহারাও ধীরে ধীরে জনসমাদর হারাইয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সহরের কবিদলের গান লিখিয়া দিতেন।

সাধারণ পাঁচালীকারেরা গীতিকাররূপে অথবা কবিরূপে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সে যুগের কৌশলী 'কাহিনী গায়ক' (Story teller) মাত্র। পূর্ব্বে যখন উপন্যাস-গল্প লিখিবার প্রথা ছিল না, তখন সাহিত্যিকেরা পদ্যাকারে আধা-পৌরাণিক উপন্যাস লিখিতেন 'মঙ্গল-কাব্য' নামে, আর পাঁচালীকারেরা পৌরাণিক ছোটগল্প গাহিয়া প্রচার করিতেন। অপৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া কাহিনীরচনার প্রথাই ছিল না। কীর্ত্তন গানে শ্রোতারা যেমন ধর্মতৃষ্ণা ও গীতিরস তৃষ্ণা একসঙ্গে মিটাইতেন, পাঁচালীতে শ্রোতারা তেমনি পাইত ধর্মকথার সঙ্গে সাহিত্য।

কিন্তু সঙ্গীতের প্রধানতম আবেদন যে প্রাকৃত প্রেমানুরাগ, তাহার জন্য সে সময়ে কোনো বিশিষ্ট গীতিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে ছিল না। আমরা সমস্ত সঙ্গীতকেই উর্দ্ধপানে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন ভোগে তাহা আসিত না।

রামনিধি গুপ্ত প্রথম সে অভাব দূর করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার রচিত প্রেমের গানে কথা থাকিত অল্প, মূল আবেদন প্রকাশ পাইত সুরে। সুরে না গাহিলে এ সকল গানের সাহিত্যিক মূল্য অল্প। সামান্য কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ কথাকে সুরের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের সাহায্যে আস্বাদ্যমান করিয়া তোলা হইত।

এ গানের বলিবার কথা অল্পই, কথা যেখানে পরিমিত, বাক্য যেখানে রসঘন অথচ সংক্ষিপ্ত, সুর তো সেখানেই নিজের অন্তরাত্মার গূঢ়তম ইঙ্গিতকে ব্যক্ত করে।

নিধুবাবুর গানগুলি এই ভাবেই বাংলা সাহিত্যে এক নবধারার সূত্রপাত করিল। তাঁহার গান 'টপ্পা' রীতিতে রচিত।

পশ্চিম পঞ্জাবে গোলাম নবী নামক এক সুরকার তাঁহার প্রণয়িনী শোরীর উদ্দেশে এ ভঙ্গীর গান প্রথম রচনা করেন। সেখান হইতে আগ্রা এবং অযোধ্যার নবাব দরবারে তাহার প্রভাব প্রসারিত হয়।

নিধুবাবু সে আমলের বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষায় প্রথম যাঁহারা হাতেখড়ি লইয়াছিলেন, নিধুবাবু ছিলেন তাঁহাদের একজন। তিনি ছাপ্রার কালেক্টরিতে কেরাণীর কাজ করিতেন।

বাল্যবয়স হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গানের কেন্দ্রে গিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এ দেশে নূতন ধারার গান পাইয়াছি।

শোরীমিঞার টপ্পার কেবল রীতিটিই নয়, পশ্চিমা ওস্তাদদের গীতের সমস্ত খুঁটিনাটি (Technicalities) তিনি বাংলাগানে প্রথম প্রবর্ত্তন করিলেন।

মনে হয় কীর্ত্তন-বাউলের সুরে পরিশ্রান্ত বাঙ্গালী শ্রোতাদের কর্ণদ্বয় আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কারণ, তাঁহার নবরীতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গানের আসর টপ্পাগানই সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইল।

তাহার পর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার রীতিই বাংলাগানের অনেকটা প্রধান উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য 'শোরীর টপ্পা'র হুবহু অনুকৃতি বাংলা গানে সম্ভব হয় নাই; কেবল নিধুবাবুই ন'ন, তাঁহার অনুসারক অন্যান্য কবিদের রচিত গানের মধ্যেও সুর-বিজ্ঞানের কলা-কৌশলের সঙ্গে কাব্যরসের কতকটা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

যে ভাবে মহাজন কীর্ত্তনের বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীর কারুকার্য্যকে লৌকিক ঢঙে সাবলীল করিয়া লওয়া হইয়াছে, পশ্চিমা টপ্পাকেও সে ভাবেই বাঙ্গালী গীতিকারেরা ক্রমে ক্রমে সাবলীল করিয়া লইলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়; প্রথমটি শোরীর মূল টপ্পা, পরেরটি নিধুবাবুর অনুকৃত গান, একটি যে অন্যটির হুবহু counter part নয় তাহা সঙ্গীত রসিকগণই বিবেচনা করিবেন—

(১) সিন্ধু ভৈরবী ; মধ্যমান

ও মিঞা বে জাঁনেওয়ালে (তানু)
আল্লা কি কসম ফিরিয়া নয়নুওয়ালে ॥ (শোরী)
—যে যাতনা, যতনে, মনে মনে মন জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে॥

অনেকে বলেন এ গানটির রচয়িতা শ্রীধর কথক।

(২) খাম্বাজ ; মধ্যমান

দেখো রি এক বালা যোগী
মেরে দুয়ার মে খাড়া হ্যায় ॥
— তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥

টপ্পাগান খেয়াল অঙ্গের গান. টপ্পার সঙ্গে খেয়াল মিশাইয়া রচিত হয় 'টপখেয়াল'—এ সকল গানের স্বল্পাক্ষর কথাকেই গমক গিটকিরির সঙ্গীত-মুচ্ছনায় খেলাইবার অংশটি নির্দিষ্ট থাকে গায়কদের জন্যই। সেকালে স্বরলিপির প্রথাও ছিল না, গ্রামাফোন রেকর্ডও ছিল না, কবির রচিত গান তাঁহার নির্দিষ্ট সুরে গাহিবার বাধ্যবাধকতাও ছিল না—সে কারণে নিধুবাবুর রচিত বিশেষ সুরটি হয়ত অবিকৃত অবস্থায় আজ আর পাই না। তবে রামপ্রসাদের গান যেমন দেড়শতাব্দী ধরিয়া ভক্তগায়কদের মুখে মুখে নিষ্ঠাভরে স্বাভাবিকভাবে বহিয়া আসিয়াছে—নিধুবাবুর গান একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহার সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

তাঁহার গীতের কাব্য সুষমার কথা এখানে বলিবার অবসর নাই, কিন্তু একটি কথা এখানে না বলিলে অন্যায় হইবে। তিনিই সর্বপ্রথম নর-নারীর প্রাকৃত প্রেমের বিশদ বর্ণনা করিয়া প্রথম গীত রচনা করেন। তাঁহার গানে রাধাকৃষ্ণের জবানী নাই, তত্ত্বকথা নাই, পরমার্থের উল্লেখ নাই, আছে প্রেমের সহজ বাস্তবতা।

'নিধুবাবুর অনুসারক কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করিতে হয় শ্রীধর কথকের। তাঁহার সাঙ্গীতিক প্রতিভা হয়ত নিধুবাবুর অপেক্ষা অনেকটা ন্যূনই হইবে, কিন্তু কাব্যপ্রতিভায় তিনি সমকক্ষ।

শ্রীধর কথক ছিলেন উপজীবিকায় যথার্থই কথক। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল সোজাসুজি এবং ঘনিষ্ঠ, সুতরাং নিধুবাবুর গান যেমন উচ্চাঙ্গের শ্রোতাদের আসরে আদর পাইত, শ্রীধর কথকের গানের যে সৌভাগ্য বিশেষ ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার গান জনগণের অন্তরের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করিয়াছিল।

নিধুবাবুর খ্যাতি শ্রীধর কথকের খ্যাতিকে অনেক জায়গায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহার কোন কোন সুন্দর সুরসজ্জিত গান নিধুবাবুর নামেই চলিয়া গিয়াছে। যেমন—

(১) ভালো বাসিবে বলে ভালো বাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি—দেখতে বড় ভালোবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

(২) ঐ যায়। যায়! চায় ফিরে সজল নয়নে!
ফিরাও গো! ফিরাও গো!' অরে অমিয় বচনে।
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান।
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে

নিধুবাবুর সুরকে সাগ্রহে সর্বপ্রথম সাদরের সহিত বরণ করিল যাত্রার 'বিদ্যাসুন্দরের' পালা। গোপাল উড়ে তাঁহার এ পালার সমস্ত গান টপ্পা-রীতিতে রচনা করিলেন।

কীর্ত্তনের আসর তখন যাত্রাই দখল করিয়াছে। যাত্রায় সঙ্গীতের সঙ্গে অভিনয় থাকিত, কিন্তু ভক্তিরস তেমন ছিল না। গোপালের যাত্রাগানের মধ্যে কবিত্ব যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসুন্দর গল্পটি স্বরচিত না হইলেও অভিনয়ে তাঁহার মৌলিকতাও ছিল। কিন্তু এ সকল কথা তুচ্ছ! নিধুবাবু যে রীতি বাংলা গানে Experiment করিতেছিলেন, গোপাল উড়ের যাত্রাগানে তাহা সাফল্য অর্জন করিল।

বাংলা দেশের আসরের গানে উচ্চাঙ্গের সুর শুনিবার শ্রোতাদের অভাব অনুভূত হইত—এ প্রাচীন অপবাদকে সগৌরবে খণ্ডন করিলেন গোপাল উড়ে। এতদিন কীর্ত্তন, পাঁচালী, যাত্রা—সুররস অপেক্ষা রসান্তরকে প্রাধান্য দিয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পালায় তাহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল। শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার কলা কৌশলাশ্রিত বৈঠকী গানই মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

অত্যন্ত হাল্কা-ভাবকে চলতিভাষার কাব্যবাণীর আশ্রয়ে গীতরসে সমৃদ্ধতর করিয়া উপহার দিলেন গোপাল উড়ে। নিধুবাবু, শ্রীধরের গান তবু আজও কোথাও কোথাও শোনা যায়—গোপাল অবজ্ঞাত-ভাবেই বাংলার সঙ্গীত জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

নিধুবাবুর আর কোনো গান স্থায়িত্ব লাভ করিবে কিনা জানি না, তবে তাঁহার ভাষাজননীর বন্দনাগীত বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরূপে অক্ষয় হইয়া থাকিবে—

নানান দেশে নানান ভাষা　বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?
হ্রদ নদে এত নীর　কিবা বল চাতকীর?
ধারা জল বিনে তার মিটে তিয়াসা?

আরও একজন উড়িয়া-কবির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার নাম রূপচাঁদ পক্ষী। তিনি রঙ্গব্যঙ্গের গান লিখিয়াই সুনাম অর্জন করেন, তবে সে গানগুলির সুরও রীতিমত উচ্চকলাশ্রিত। বাংলার শ্রোতাদের রুচি ভারতচন্দ্র ও কবির গানের কাল হইতে ক্রমেই নিম্নগামী হইতেছিল, তাহার উপর রূপচাঁদ যে রসকে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'ঢাক্ ঢাক্—গুড়্ গুড়্' কিছুই প্রায় ছিল না। ব্রাহ্মযুগে রুচির সংস্কারের ফলে তাঁহার রস-সঙ্গীতের সঙ্গে প্রেম-সঙ্গীতেরও দিন চলিয়া যায়।

রূপচাঁদ পক্ষীর অধিকাংশ গানের রচনার ভাষায় মৌলিকতা আছে; ইংরাজী বুক্নি ব্যবহার করিয়া তিনি হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন—

আমারে ফ্রড্ ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি স্যরি, গোল্ডন বডি হ'ল কালি॥

আবার সংস্কৃত শব্দচ্ছটায় ব্যঙ্গরস ছিটাইতেও তিনি কসুর করেন নাই—

শীতে নাহং কুঁকুড়ি সুকুড়ি মাঘ মাসস্য রাত্রেণ,
বস্ত্রাভাবে মরিরে বাপুরে সর্বগাত্রেষু কম্পঃ॥
তস্মাদ্রাজন! পাছুড়ী খানিহে দীয়তাং দীয়তাং মে,
দেশে দেশে নগরে নগরে তোর কীর্ত্তিং বদামি॥

মধুসূদন কিন্নরের গানও উচ্চাঙ্গের সুরমণ্ডিত। কীর্ত্তনরীতিতে টপ্পার বৈচিত্র্য আনিয়া তিনি 'ঢপকীর্ত্তন' নামে একটি সময়োপযোগী রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন; কীর্ত্তনের সৌন্দর্য্য আঁখরে, টপ্পার সৌন্দর্য্য তানে, মধুসূদনের ঢপকীর্ত্তনে উভয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের উভয় মধুসূদনই সামসাময়িক, উভয়ের জন্ম একই জেলা যশোহরে। মাইকেল জন্মগ্রহণ করেন ১২৩০ সালে, কিন্নর ১২২৫ সালে। মাইকেল ছিলেন ধনীর সন্তান, বিদ্যাচর্চার ও অভিজাত-সমাজে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্নর ছিলেন দরিদ্রের সন্তান, লেখাপড়ার বিশেষ কোনই সুযোগ তাঁহার জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া সেকথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

সুরচর্চায় তাঁহার হাতেখড়ি হইয়াছিল ঢাকার বিখ্যাত ওস্তাদ ছোটখাঁ-বড়খাঁ'র নিকটে। ধ্রুপদ চর্চার যেমন পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, খেয়াল অঙ্গের গানের ঘরোয়ানা তেমনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুকান ঢাকায় খেয়াল শিখিতে সুরু করেন। পরে যশোহরের রাধামোহন বাউলের কাছে তিনি পথনির্দেশ পাইলেন। হিন্দুস্থানী খেয়ালের সুরকে বাংলা গানে ব্যবহার করিয়া নবধারার গানের সূচনা করিতে রাধামোহন উদ্যোগী হ'ন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ছিল না, মধুকানের কবিত্বশক্তির সঙ্গে তাঁহার সুররচনা-শক্তির শুভ সম্মিলন ঘটিল। মধুসূদন শব্দচ্ছটার কবি, সেকালের প্রথানুযায়ী শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস, উপমা, অলঙ্কারে তাঁহার গানগুলি ভরপুর।

বৃন্দাবন লীলাই তাঁহার গানের উপজীব্য: রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ লইয়া সে সময়ে আর পদাবলী রচিত হইত না, এগুলিকেই উনবিংশ শতাব্দীর পদাবলী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, যমুনায় আর সে জল-কল্লোল নাই, শিখীদের নৃত্য নাই; বনে বনে আজ পাখীর কণ্ঠ নীরব; ফুল ফুটিয়া আজ আপনিই ঝরিয়া যাইতেছে। বিরহ শয়নে শ্রীমতী একা পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখে কথা সরিতেছে না—

এখন বনে বনে বনে, যে কুস্বরে পঞ্চম স্বরে,
পঞ্চ স্বরে আর পদ না সরে,
যেন মারে বনে বনে, মারে মারে সয় না প্রাণে,
প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে
বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে, কইতে কথা মুখ না সরে,
যদি সরে হাহাকার রবে॥

সর্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ মায়ের প্রাণে, তাঁহার আদরের কানাই আজ মথুরার রাজা, সেখান হইতে ক্ষীর ননী খাইবার জন্য সে তো আর কোনো দিন গোকুলে গোপালয়ে ছুটিয়া আসিবে না—মায়ের প্রাণ চিন্তায় ব্যাকুল—

যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে
জান্‌লে কিরে দিতেম ছেড়ে, গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিনই॥
'ওমা, যাই যাই' বলে, কারে বা শুধায় গো,
নেরে খারে ক্ষীর ননী, কে তারে বা কয় গো,
কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় ক্ষীর নবনী,
খায় কিরে সে ক্ষীর ননী॥

রাধাকে লইয়া সখীরা এলেন মথুরার রাজপুরে; যে কৃষ্ণ রাধার দাসানুদাস হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দ্বারীর পায়ে ধরিয়া খোসামোদ করিতে হইতেছে সখীদের—

তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে;
ত্রিজগৎ বাঞ্ছে যে তীর্থে, সেই তীর্থে এসেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে, তাইতো এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে, যদি যুগল দেখবে দ্বারি॥

সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর কথা নিবেদন করিতেছেন—'তোমার বিহনে তাহার কি দুর্দশা হইয়াছে দেখিবে চলো'—

রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ, কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ;
মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ, রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে॥

তাহারা অভিশাপ দিতেছে সেই ক্রূর অক্রূরকে, সে যদি না আসিত তবে সুখের বৃন্দাবনের লীলারঙ্গ এ ভাবে অকালে ভাঙ্গিয়া যাইত না; রথের অশ্বদের দেখিয়া ভয় লাগিতেছে বলিয়াই তাহারা রথ আট্‌কাইতে পারিল না। তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা না করিলে কি অক্রূর তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে?

একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়া তুরঙ্গরঙ্গ আতঙ্কেতে মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রূরচক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র, তুমি এত চক্র রাখ॥

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অক্রূরের রথ চলিয়া যাইতেছে, পশ্চাতে গোপীরা তাহাদের লীলার সাথীকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে কাঁদিয়া আকুল। আর তো কোনোদিন যমুনাপুলিনে বাঁশীর প্রাণমাতানো রব

উঠিবে না, আর তো কোনোদিন কদম কেশরে ফুলশয়ন রচিত হইবে না, আর তো কোনোদিন গোঠে ফিরিয়া আসা ধেনুদের ক্ষুরের ধুলার ফাগে গোঠপথ ভরিয়া যাইবে না। সখারা আজ বিবশ বেশে অলস হইয়া বসিয়া আছে। আজ আর ধেনুদের চরিবার আয়োজন নাই, আজ আর গুঞ্জাফুলের মালা গাঁথিবার উৎসাহ নাই।

সব রাখাল লয়ে পাল দেখলাম ভূমেতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায় গায় ;
কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর সয়না গায়, ত্যজিগে জীবন ॥

দেবকীর দুঃখও কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন নারীহৃদয়ের চিরন্তন ঈর্ষ্যার উল্লেখ করিয়া—

পেয়ে তুমি যশোদা মায়, ভুলে গেছ মায়,
মায় পাসরি আস্‌তে নার দেখিতে আমায় ;
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে, দিত নাই গোচারণে ;
ধেনুর সঙ্গে বনে বনে,
তাতে কত পেয়েছিস্ বেদন।
ডুবেছিলি কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে,
সুদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব বা কি,
যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

আবার যশোদাও আক্ষেপ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আজ নূতন মা পাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—

সে কি আমার থাকিবার ছেলে, ত্যজ্য করে মা, সবাই মিলে
বলেছে মা,
ঐ দেবকী মা মা :—মা পেয়ে ভুলেছে মায়ে,
আর কেন ডাকিবে আমায়ে,-বুঝ্‌ব এবার মায়ে মায়ে,
সেই হবে মা, গোপাল মা কবে যারে ॥

মধুকান তাঁহার সহযোগীদের মত সুরকে বাণীর উপর প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার গানে বাণীর সঙ্গে সুরের সুসমঞ্জস মিলন ঘটিয়াছিল।

মাদক-বর্জনের সমস্যা

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

দেশের যে অগণিত জনসাধারণ স্বাভাবিক নীতিবোধ ও মানবতার আহ্বানে জাতীয় উন্নতিমূলক বিভিন্ন সমাজকল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশকে ও জাতিকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত,—বিদেশী সুরা, দেশী মদ, তাড়ি, পচাই, আফিম, গাঁজা, চরস, ভাঙ, কোকেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্যগুলি ব্যবহারের ফলে তাহারাই নীতিভ্রষ্ট ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া দেশ ও জাতিকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে অবনতির চরমসীমায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। নীতিজ্ঞান মানুষকে স্বার্থপরতার উর্ধে উঠিয়া বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সক্রিয় সাহায্য করিতে উদ্বুদ্ধ করে। বিবেকবুদ্ধি ও হৃদয়বত্তা মানুষকে দেশ তথা বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রেরণা জোগায়। কিন্তু মাদক-দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানুষের নীতিজ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি ও হৃদয়বত্তা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ তখন দেশ, জাতি ও বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য দূরে থাক, আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণের কথাও ভাবিতে পারে না। নেশার ঘোরে বুদ্ধিবিবেচনাহীন হইয়া যেন পরচালিত ভৃত্যের মত যে কোনো কাজ করিয়া যায়। অদূর বা দূর ভবিষ্যতে তাহার কাজ নিজের সংসার বা সমাজের কতখানি অমঙ্গল সাধন করিবে, তাহা ভাবিতেও পারে না। এই বিষময় কুফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই মাদকদ্রব্য বর্জন সম্পর্কে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। এই চিন্তার জন্ম একদিনে হয় নাই ; সমাজের পরতে পরতে মাদক ব্যবহার যে গ্লানি মাখাইয়া দিয়াছে, তাহাই তাহাদের চিন্তাকে এই শুভঙ্কর পথে টানিয়া আনিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নূতন নহে। পাশ্চাত্য দেশে ইহাকে সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং বিজ্ঞানের সাহায্য নানা উপায়ে সহজ, সুন্দর ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য তাহাদের শীতপ্রধান আবহাওয়াই এই ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ভারতের জলবায়ু ও সভ্যতা ইহার অবাধ-ব্যবহারের বিরোধী। তবুও পাশ্চাত্য জগতের জড়বাদী সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইহাকেও আধুনিক সভ্যতার উপকরণ হিসাবে উপহার দিয়াছে। এ দেশেও মাদকদ্রব্য একেবারে অপরিচিত ছিল না। আর্যসভ্যতার প্রথম ধাপ হইতেই দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্যে সোমরস পানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাহা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু কতদিন হইতে সমাজ ও ধর্মের সকল নৈতিক আগল ভাঙিয়া ইহা নেশার আকারে সাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা ঠিক জানা নাই। তবে ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে, আমাদের সমাজে অনেক-রকমের গোঁজামিলের মত ব্রিটিশ সভ্যতা ইহাকেও একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছে।

সরকারের আবগারী বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিভাগ হইতে বৎসরে প্রায় নয় কোটী টাকা আয় করিয়া থাকেন। একদিনেই আইনের সাহায্যে মাদকদ্রব্য বর্জন কার্যকরী করিয়া এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব নষ্ট করিতে তাঁহারা সাহস করিতেছেন না। কিন্তু মাদকদ্রব্যবর্জন জাতীয় কংগ্রেসের বহু-বিঘোষিত নীতি; সমগ্রভাবে দেশের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য কংগ্রেস সরকারের এই নীতি আইনে পরিণত করা অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কারণ সরকারকে এই কয়েক কোটী টাকা রাজস্ব দিবার বিনিময়ে দেশের অগণিত জনসাধারণ চরম অধঃপতনের আশ্রয় লইতে চলিয়াছে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে শরীররক্ষামূলকভাবে মালদহ ও পশ্চিম-দিনাজপুরে মাদকবর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, চিরাচরিত শম্বুকগতি ত্যাগ করিয়া জনকল্যাণমূলক এই পরিকল্পনাটি সার্থক করিতে সরকারের প্রচেষ্টায় তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু শুধু আইন করিলেই হইবে না, আইন যাহাতে যথাযথভাবে কার্যকরী হয় সেদিকেও সরকারের কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মধ্য-প্রদেশ-মাদকদ্রব্য-নিবারণ অনুসন্ধান সমিতির অধিকাংশ সদস্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, সেই প্রদেশের যে অঞ্চলে মাদকদ্রব্য আইন করিয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই অঞ্চলে আইন মোটেই কার্যকরী হয় নাই এবং সে অঞ্চলের কাজও দিন দিন অধঃপতনের দিকে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের যাহাতে অনুরূপ ব্যাপার না ঘটে, সেজন্য আমরা সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহি।

মাদকদ্রব্য বিক্রয় সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। অসংখ্য লাইসেন্স-প্রাপ্ত ঠিকাদার মারফৎ ইহা বিক্রয় করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত তাল ও খেজুরগাছ হইতে তাড়ি তৈয়ারি হইয়া থাকে, তাহারা জন্য লাইসেন্স করিতে হয়। রাজস্ব বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে লাইসেন্স ও মাদকদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণ আইনকে ফাঁকি দিয়া গোপনে মাদক-দ্রব্য তৈয়ারের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে এবং আবগারী বিভাগের দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া এই পথে হাজার হাজার মানুষ প্রচুরভাবে নেশার গোরাক আহরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। গ্রামে গ্রামে এই পথে মাদকদ্রব্য অবাধ ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিতেছে। কত খেজুর ও তালগাছ হইতে যে বে-আইনীভাবে অথচ একরূপ প্রকাশ্যেই তাড়ি তৈয়ারি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পচা ভাত, গুড়, গুলি, নিশাদল ও কারবাইড সহযোগে গ্রামের ঘরে ঘরে চোলাই মদ তৈয়ারির কথাও আজ আর গোপন নাই। বর্তমানে ইহা গ্রামের অনেকেরই একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞ মহলে' অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তিন টাকা ব্যয় করিয়া যে পরিমাণ চোলাই মদ তৈয়ারি হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া বারো হইতে ষোল টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই অপরিমিত লাভের লোভে মানুষ পাগল হইয়া আইনলংঘনের 'প্রেরণা' পাইয়াছে এবং ঘরে ঘরে আজ বে-আইনী মদের ব্যবসা জমিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বহু শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও এই 'ব্যবসায়ে' মূলধন দিয়া সাহায্য করিতেছে এবং ট্রেনে, পথে, বাসে, রবারের নল ও দুধের পাত্রে করিয়া চালান দিতেছে। বড়া-কমলাপুর প্রভৃতি কুখ্যাত কম্যুনিষ্ট এলাকা হইতে মাঝে মাঝে কেরোসিনের ড্রামে ভর্তি হইয়া লরীযোগে চালান হইতেও দেখা গিয়াছে। সুতরাং নানা কারণে মাদকবর্জনের সিদ্ধান্তের উপর এক গুরুতর সংকট আসিয়া পড়িয়াছে।

মদ-তাড়ি-চোলাইয়ের স্রোতের পাশে পাশে সমাজের সর্বাংগ ভরিয়া যে নৈতিক অধঃপতন, নোংরামি ও পাশবিকতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নূতন গ্রামগঠনের পথকে পংকিল করিয়া তুলিতেছে। শহরের হোটেলে হোটেলে বিয়ার-হুইস্কির বোতলের সহিত রূপোপজীবিনী নারীদের লইয়া যে চূড়ান্ত নীতিহীনতার খেলা চলে, তাহারই গ্রাম্য সংস্করণ পল্লীর হাটে বাজারে গজাইয়া উঠিয়াছে। মাদক আজ যে-কোনো অসৎ কাজের প্রধান সহায়। মারামারি, খুন, ডাকাতি, চালের চোরাচালান, বেশ্যাগিরি, জুয়া—যে-কোনো অপরাধ মাদকদ্রব্যের তারল্যের স্রোতে অবাধগতিতে চলিতেছে। ইহার অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে আজও কোনো ব্যাপক আন্দোলন সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয় নাই। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সমাজের একাংশ ইহার শুধু সমর্থনই করেন না, সহযোগিতা করেন! বোম্বাই প্রদেশে যে কারণে মাদক-বর্জন আইন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহার অন্যতম কারণ ইহাই।

আজিকার পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই; কিন্তু আধুনিক প্রগতি ও গণতন্ত্রের যুগে হতাশারও কোন স্থান নাই। সমগ্র দেশের সর্বাংগীন প্রচেষ্টায় মাদক ব্যবহারের বিলুপ্তি ঘটাইতেই হইবে। দেশে আজ গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত। তাই সরকারী পরিকল্পনা সফল করিতেও প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা। তাহার পূর্বে সরকারকে জনকল্যাণে আপনার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিতেই হইবে। কল্যাণের পথে যদি কোনো বাধা আসে, তবে কঠোর হস্তে আইনের যথার্থ প্রয়োগে সে বাধা সরাইয়া দিতে হইবে। আবগারী বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী যদি সততার সহিত কর্তব্য করিতেন, যদি ঘুষের বিনিময়ে বে-আইনীভাবে মদতাড়ি তৈয়ারির প্রশ্রয় না দিতেন, তবে আজ ঘরে ঘরে ইহার প্রসার ঘটিত না। আদালতের নামমাত্র জরিমানাও এই কাযে শাস্তি না হইয়া প্রশ্রয় রূপেই গৃহীত হয়। তাই কর্মীসমাজ তথা দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ—যাঁহারা শত অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়াও মাদকবর্জনের সংকল্পে অটুট রহিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। এবিষয়ে সরকারের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নাহিলে জনসাধারণের সহযোগিতা চাহিলেও পাওয়া যাইবে না এবং করিলেও মাদকবর্জনের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এইদিকে গ্রামের কর্মীসমাজের একাংশ সরকার-নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই পথকে কর্মীদল বাছিয়া লইয়াছেন। বহু অনগ্রসর পল্লীর মাঝে তাঁহারা নৈশ-বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র মারফৎ পল্লীর মানুষদের মাদক ত্যাগ করিতেও অনুপ্রাণিত করিতেছেন। ইহাই সত্যকারের পথ। কয়েক কোটী টাকার রাজস্বই বড় কথা নহে—বিনিময়ে দেশ যে সুস্থমনা, আদর্শবাদী, রুচিবান নাগরিক লাভ করিবে, তাহার মূল্য টাকার অংক দিয়া মাপা যাইবে না। দেশের জাগ্রত তরুণ-সমাজের কাছে আমাদের গভীর আবেদন—তাঁহারা এই দিকে আগাইয়া আসুন, মাদকবর্জন আইন যাহাতে শীঘ্র ও সহজে সমগ্র রাজ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অনুকূল জনমত সৃষ্টির কাযে ব্রতী হউন। মহাত্মা গান্ধীর আজীবন সংগ্রামের উপসংহার রচনায় তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের প্রচেষ্টা দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া পড়ুক। অমৃতের সন্তান নূতন করিয়া জন্মলাভ করুক।

ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্রাম

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

আলোক ধারা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
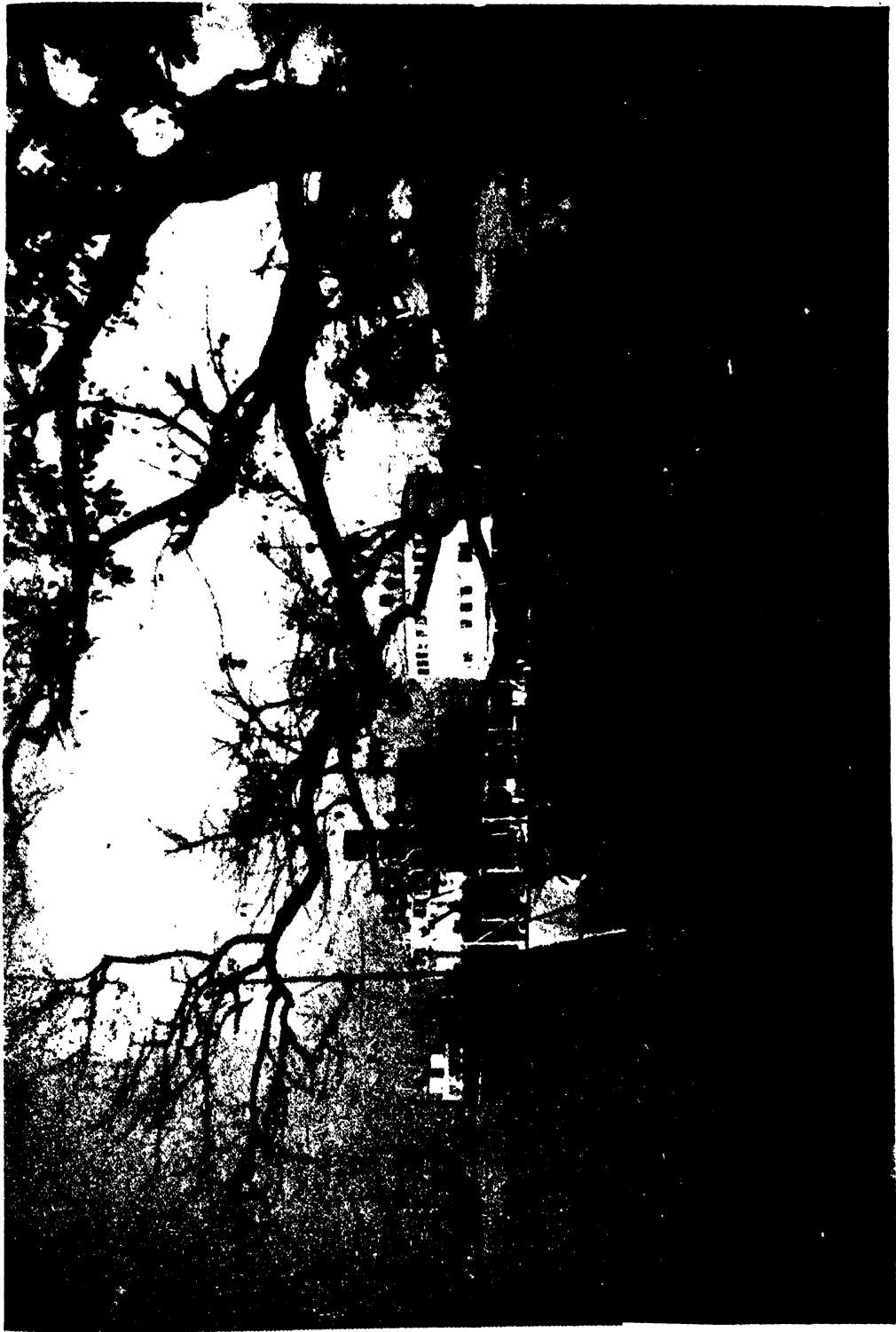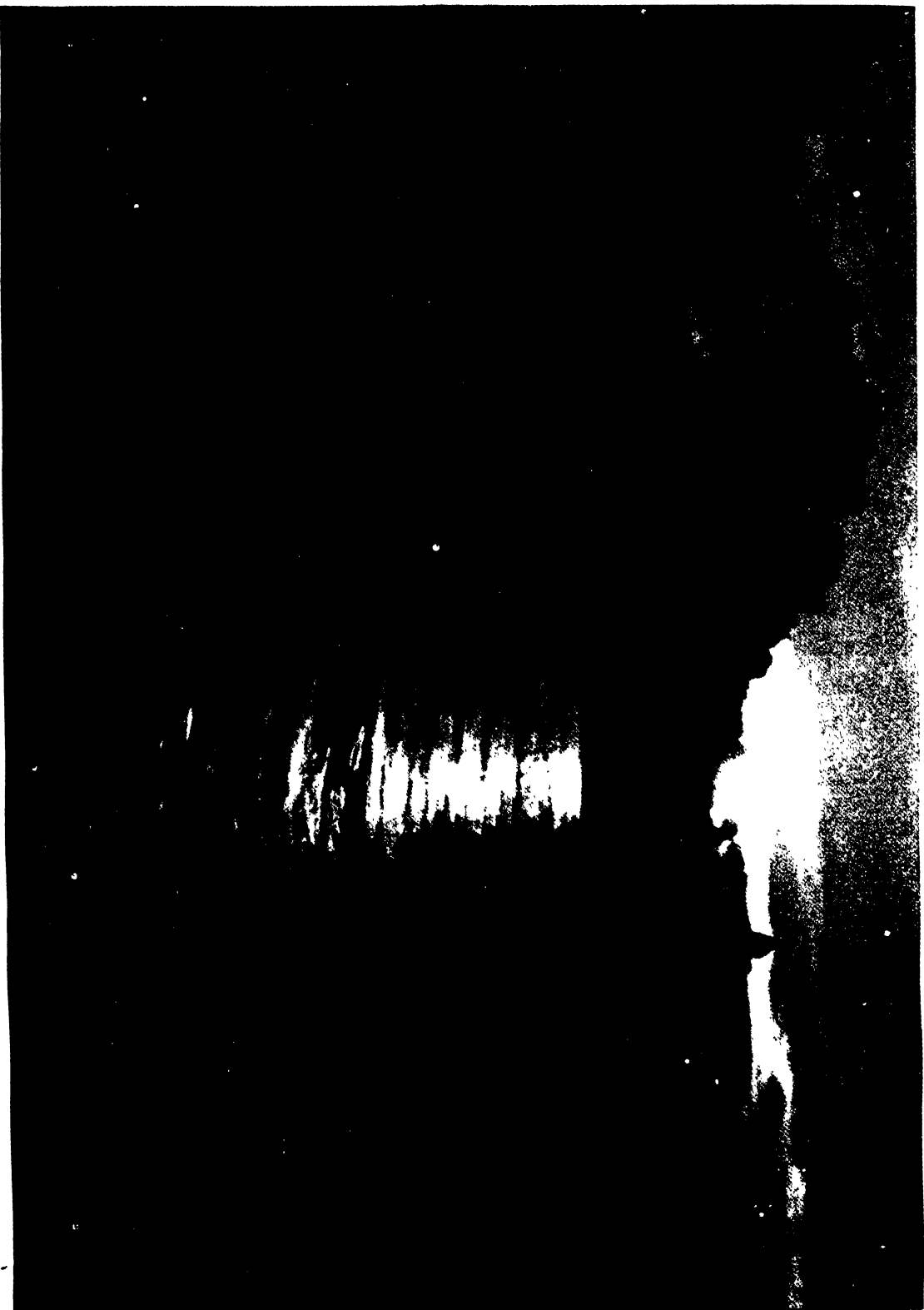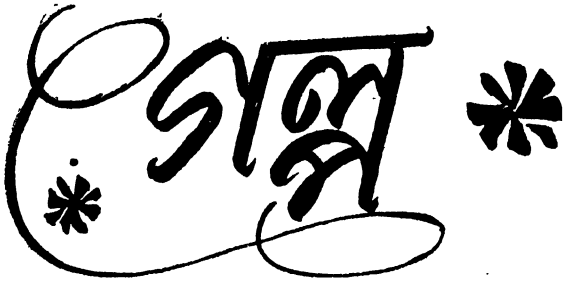
চিঠি

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

শঙ্করপুর।—

মেমারী থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে মন্তেশ্বর। মাঝখানে কালনা-বর্ধমান বাস-রুট। এদেরই সন্ধিস্থলে সাতগেছে। বাঁদিকে সাতগেছের হাট, ডানদিকে মেমারী স্টেশন। মাঝখানে পথের ধারে বিরাট বটগাছ—দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের কাছে যেন দিক-দর্শন-প্রহরী।

তারই কোল দিয়ে সরু এক ফালি রাস্তা—ধুলোয় ভরা—চলে গেছে শঙ্করপুরের অন্তঃপুরে।

বেলা বারোটায় ধুলো উড়িয়ে বাস এসে থামল বটতলায়।

কন্‌ডাক্টার হাঁকল—শঙ্করপুর! শঙ্করপুর! শঙ্করপুর! চোদ্দ পয়সার টিকিট।

যাত্রী নামল দুজন। টিকিট দেখে নিয়ে কন্‌ডাক্টার বাসের গায়ে চপেটাঘাত করল, আর বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারণ করল—চ্যালো—!

গাড়ি ছুটল সাতগেছের দিকে দ্রুততর গতিতে।

এগিয়ে চলল দুই বন্ধু রাঢ় অঞ্চলের ধু ধু ক্ষেত দুই পাশে রেখে। শক্ত কালো এঁটেল মাটি মাঘের বর্ষণে জমে শুকনো কাদা হয়ে রয়েছে। দুই বন্ধুর দেহে মনে অপূর্ব পুলক, অপূর্ব রোমাঞ্চ!

শেষ-ফাগুনের বাতাস বইছে শঙ্করপুরের আম গাছের পাতায় দোলা দিয়ে। নতুন বোলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কোন্ গাছের কোন্ ডালে বসে পাখি শিস্ দিচ্ছে—কোকিল ডাকছে কুহু কুহু।

এরা এগিয়ে চলে। বাঁশ গাছের ডগা নুয়ে পড়েছে কোথাও, কোথাও পুকুরের কালো জলে পড়েছে নিমের ঝরা পাতা। পলাশের শূন্য ডালে লক্ষ আগুনের শিখা হেসে উঠেছে। দুই বন্ধু চলে, আর বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে।

কিন্তু পথ যে আর ফুরোয় না!

প্রায় পঁচিশ মিনিট কেটে গেল। অমিয় এক দোকানদারকে জিগেস করলে ঠিকানা। সে বললে—সামনে ঐ যে টিনের চাল, ঐটেই।

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল দুজনেরই। তাহলে এসে পড়েছে। অথচ কী সূত্রে আসা? কিসের জন্য?

এর কোনো সদুত্তর নেই। শুধু একদিন কথায় কথায় বন্ধু নরেনের এই পল্লীবাসিনী শ্যালিকার উদ্দেশে অমিয় বলেছিল, যাব একদিন। দেখে আসব আপনার শ্বশুরবাড়ি, কেমন গাঁ!

ভদ্রমহিলা মাথার কাপড় অল্প একটু টেনে বিনীত কণ্ঠে বলেছিলেন—সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

বসন্ত বলেছিল—কিন্তু সত্যিই যদি আমরা একদিন গিয়ে পড়ি, সেদিন চিনতে পারবেন তো?

মাথার কাপড় সরে গেল! দুটি ভাসা ভাসা চোখ সেই অবগুণ্ঠনের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করল। কী স্থির সেই দৃষ্টি—এতটুকু সংকোচ নেই! মুহূর্ত কয়েক সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল বসন্তর চোখের ওপর। তারপর চোখ নামিয়ে বললেন—চিনতে আমার ভুল হয় না কখনো।

কলকাতার সেই স্বল্প পরিচয়ের দেড় বচ্ছর পর আজ দুই বন্ধু চলেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। আর সেই সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে লুঠে নেবে এরা ছায়ানিবিড় পল্লীর একান্ত গোপন মধুটুকু, কিশোরীর প্রথম প্রেম যেমন কেড়ে নেয় লুব্ধ তরুণ—প্রেমের অভিনয়ে।

বসন্ত বললে—ঐ তো বাড়ি আর ঐ তো যেন—হ্যাঁ, সেই ভদ্রমহিলাই বটে। কালো রঙ—কপাল পর্যন্ত ঢাকা ঘোমটা এক হাতে তুলে লক্ষ্য করছেন যেন তাঁদেরই।

কাছে আসতেই ভদ্রমহিলা দুহাত তুলে অনভ্যস্ত নমস্কার করলেন; হেসে বললেন নিচু গলায়—আসুন, আসুন।

ঘরে ঢুকে ঘোমটা কমিয়ে দিলেন। বললেন স্নিগ্ধ হেসে—কী ভাগ্য আমার!

তাড়াতাড়ি দাওয়ায় মাদুর পেতে দিলেন, আর নিজে বসলেন পাখা নিয়ে।

বললেন—উঃ এই গরমে কী কষ্টই না হল আপনাদের।

সত্যি, কষ্ট বড় কম হয় নি। কিন্তু মুখে বলতে হল, —না না, কষ্ট আর কি, বরঞ্চ এই অসময়ে আপনাকেই কষ্ট দেওয়া হল।

তিনি অন্যদিকে অকারণেই মুখ ফেরালেন। বললেন, এমনি কষ্ট যেন জন্ম জন্ম পাই।

বসন্ত বললে—কালীবাবু কোথায়?

—বর্ধমানে। এ সপ্তাহে আসবেন না খবর পাঠিয়েছেন।

—তাহলে বাড়িতে কে কে আছেন? আলাপ পরিচয়—

—থাকার মধ্যে আমার ঐ একমাত্র ছেলে গোপাল, এখন পাঠশালায় গেছে, আর আমার ঠাকুরপো।

কিন্তু কোথায় ঠাকুরপো?

ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন—এখুনি আসবে, আমি ওকে একটু গণ্‌তার পাঠিয়েছি।

ছেলেটাকে বললাম, আজ আর পড়তে যাসনে। তা শুনল না। নইলে ভেবেছিলাম, বটতলায় ওকেই পাঠাব আপনাদের জন্যে। কিন্তু ছেলের ঐ দোষ, কথা শুনবে না। পাঠশালা কামাই? জ্বরে কাঁপতে কাঁপতেও বই শেলেট বগলে করে একদিন পাঠশালা গেছে ভাই, কথা শোনে নি। বিকেলবেলায় পণ্ডিতমশাই নিজে কোলে করে ছেলেকে দিয়ে গেলেন একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। এমনি পাঠশালার নেশা!

কথা শেষ করে উনি বললেন—মুখ হাত ধুয়ে নিন। আমি একটু মিছরীর সরবত করে আনি।

দ্রুতপায়ে উনি রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নির্জন দ্বিপ্রহরে পাড়াগাঁয়ের এমনি এক বাড়িতে বসে লাগল। সামনে নতুন খড়ের বিড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন মরাই। নতুন বছরের ফসল সঞ্চিত রয়েছে আগামী বছরের জন্যে। তারই নীচে মাটির ওপর যত্নে-আঁকা আল্‌পনা—চৈত্র-লক্ষ্মীর অস্পষ্ট পদচিহ্ন।

দুটি একটি ছোটো মেয়ে কৌতূহল-ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল এই দুই নবাগতের পানে। পাশের বাড়ির বৌ একগলা ঘোমটা নামিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল পুকুরঘাটে।

দুই বন্ধুর সিগারেট পুড়তে লাগল নিঃশব্দে।

কতক্ষণ গেল এমনি করে। দুপুর গড়িয়ে গেল। অতিথি সৎকারের কোনো ত্রুটিই রাখলেন না ভদ্রমহিলা।

ছোট্ট একখানি ঘর। পুরনো কালের বিরাট এক খাট। তাতে পুরু তোষক পাতা বিছানা। ছোট্ট ছোট্ট দুটি জানলা মাটির দেওয়াল ফুঁড়ে। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বাতাস আসে। সমস্ত ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দেওয়ালে ঝুলছে বহুকালের একখানা গণেশের ছবি—প্রায় ষাট বছর আগে কালীকিংকরের বাবা ব্যবসায় প্রথম লাভের টাকায় কিনেছিলেন এই ছবি। আর রয়েছে কুলুঙ্গির ওপর রঙওঠা হাত-ভাঙ্গা এক কৃষ্ণমূর্তি। গোপালের ঠাকমা কবে ত্রিবেণী স্নানে গিয়ে কিনে এনেছিলেন। যেখানকার যেটি সেখানেই রয়েছে। শুধু এদেরই পাশে আর একখানা ছবি নতুন—নেতাজী সুভাষ বোসের।

ভদ্রমহিলা বললেন—কাণ্ড দেখুন গোপালের। ওকে কেউ কিছু বলে দেয় নি। নিজেই কোথা থেকে ক্যালেণ্ডারের এই ছবি কেটে এনে টাঙিয়েছে।

সত্যিই আশ্চর্য লাগে দুই দেব-মহিমার পাশে মানব-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা!

ভদ্রমহিলা বললেন আবার—কত কষ্ট দিলাম আপ-নাদের। শহরে থেকে অভ্যেস, আপনাদের সুখী করা কি আমাদের সাধ্য!

বসন্ত বললে—আপনি এত করে বলছেন, এতে আমরা অপ্রস্তুতে পড়ছি। আপনি যেন আমাদের পর বলে মনে করছেন।

—পর!

ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ থামলেন। আবার সেই দুই ভাসা ভাসা চোখ। এবার কেমন ভিজে-ভিজে মনে হল।

—আপনারা আমার পর? আমার মরেন এমনি

করেই দিদি বলে ছুটে আসে। সে তো শুধু আমাদের ছোটো জামাই নয়—আমাদের ঘরের ছেলে, আমার মায়ের পেটের ভাইএর মতো। সেই নরেনের বন্ধু আপনারা!

মুখ নিচু হয়ে গেল বসন্তর। অমিয় অন্যদিকে তাকালো। এখুনি আবার নরেনের প্রসঙ্গ উঠবে—তার জীবন-সংগ্রাম, —নিরাপত্তা-আইন-কবলিত তার দীর্ঘ অনিশ্চিত দুঃখ-বেদনার কাহিনী। আজকের পরিস্থিতি সে-অনুভূতির অনুকূল নয়। নতুন করে চাইছে না কেউ সেই ক্ষতটার ব্যথা আবার অনুভব করতে।

কিন্তু না—

ভদ্রমহিলা হুঁশিয়ার। চোখের জল মুছে ফেলেছেন। মাথার কাপড়টা সংযত করে নিয়েছেন। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকলেন—ঠাকুরপো!

ঠাকুরপো কখন বাইরের দাওয়ায় এসে বসেছেন লক্ষ্যে পড়ে নি কারও। ডাক শুনেই ঠাকুরপো এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। ঢলঢলে লালিত্য-মাখা মুখ। টানা টানা চোখ—তরতরে নাক। মাথার চুল অল্প কোঁকড়ানো। শুধু একবার তাকালো বৌদির পানে।

ভদ্রমহিলা বললেন—ঠাকুরপো, এঁদের নিয়ে একটু ঘুরিয়ে আনো তো।

একটু থেমে আবার বললেন—প্রথমে নিয়ে যেও কোলের পুকুর—এঁরা পুকুর দেখতে ভালোবাসেন। তারপর রামবাগান—তারপর ঐ দিক দিয়ে বেহুলার সোঁতাটাও দেখিয়ে এনো।

ঠাকুরপো তখনি চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল গায়ে গেঞ্জি চড়িয়ে। পায়ে ছেঁড়া তালিমারা স্যাণ্ডেল।

ভদ্রমহিলা বললেন—যাও ভাই, তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো। আমি চায়ের জল চড়াই।

ঠাকুরপোর পেছনে পেছনে বসন্ত আর অমিয় বেরিয়ে পড়ল নতুন সিগারেট ধরিয়ে।

সমস্ত পথটা ভদ্রলোক চুপচাপ। একটি কথাও নেই মুখে। শুধু যখন যে যা জিজ্ঞেস করেছে সেইটুকুরই উত্তর দিয়েছেন ভদ্রলোক।

বিকেলের শেষে বাড়ি ফিরে এল এরা। আজ আর কলকাতা ফেরা হবে না। মাথার দিব্যি দিয়েছেন ভদ্রমহিলা। বলছেন, গেরস্থর বাড়ি এসে পুরো একটা দিন আতিথ্য গ্রহণ না করলে গেরস্থর অমঙ্গল হয়।

—কিন্তু—ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল অমিয়।

—কিন্তুর কিছু নেই। অসুবিধে হবে না একথা বলবার সাহস আমার নেই। কিন্তু যতভাবে পারি আমি চেষ্টা করব, যাতে তোমাদের কষ্ট না হয়।

ভদ্রমহিলা কখন যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে সম্পর্কটাকে টেনে আপন করে নিয়েছেন এরা প্রথমে তা টের পায় নি।

একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললে—তাছাড়া আমারও একটা অনুরোধ আছে ভাই, তোমাদের কাছে।

—কী? আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করল বসন্ত।

—সন্ধ্যে হোক, বলব।

সন্ধ্যে নেমে এল শঙ্করপুরের বট অশ্বত্থের কোলে কোলে, বেহুলা নদীর দুই তীরের বাঁশবনের ঝাড়ে। শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য ডুবে গেল। লাজুক মেয়ের লজ্জা খোয়ানো গ্লানির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ল নীল আকাশের বক্ষপটে।

ওরা দুজনে বাড়ির পেছন দিয়ে ফিরছিল আমগাছ থেকে ছোটো ছোটো বোল পেড়ে নিয়ে। হঠাৎ কানে এল ভদ্রমহিলার গলা। নিচুস্বরে বলছেন রান্নাঘর থেকে—ঠাকুরপো, তুমি এখুনি একবার গণ্তার চলে যাও। একটা হিমানী কিনে আনো।

ঠাকুরপোর গলা শোনা গেল না।

ভদ্রমহিলা বললেন—দুটো টাকা রাখো, যা ভালো পাবে তাই নিয়ে এসো।

একটু পরেই ঠাকুরপোকে দেখা গেল। দীর্ঘ দোহারা চেহারার ওপর হাতকাটা গেঞ্জি—পায়ে ছেঁড়া তালিমারা স্যাণ্ডেল। হন্ হন্ করে চলেছে ঠাকুরপো শঙ্করপুর থেকে পাশের গাঁ গণ্তার দিকে।

বসন্ত একবার অমিয়র দিকে তাকালো। অমিয় হাসল একটু।

সন্ধ্যের পর ভদ্রমহিলা বললেন—একটা কথা বলব ভাই তোমাদের, যদি দয়া করে কানে নাও।

বসন্ত সোজা হয়ে বসল।

অমিয় বললে গম্ভীর হয়ে—কী বলুন?

—আমাদের বাড়ি একটি মেয়ে আছে। আমাদের মানে আমাদের পাড়ার—পাশের বাড়ির। জাতে কায়স্থ। সংসারের দায়িত্ব নেয় এমন কেউ নেই। বিধবা মা শুধু। মেয়েটি দেখতে সুন্দর। কিন্তু অবস্থা ভালো নয়। তাই বিয়ে হচ্ছে না।

বসন্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অমিয় বললে—কিন্তু—

মৃদু হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—ভয় নেই ভাই, তোমাদের ঘাড়েই চাপাব এমন স্বার্থপর আমি নই। সে ভাগ্য মেয়ের নয়। আমি বলছিলাম, তোমরা একবার দয়া করে দেখে যাও। পুরুষমানুষ, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও। কোনো ছেলে যদি অনুগ্রহ করে গরীবের এই মেয়েটিকে উদ্ধার করে—সেই চেষ্টা একটু কোরো।

ভদ্রমহিলা একটু থামলেন। তারপর বললেন—বড়ো লক্ষ্মী মেয়েটি। দাঁড়াও ডাকি।

কথা শেষ করেই ভদ্রমহিলা পাঁচীলের দিকে এগিয়ে গিয়ে উঁচু গলায় ডাকলেন—মাসীমা কৈ একবার অতসীকে নিয়ে আসুন।

অল্প কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

এই সময়টুকুর ভেতর ছোট্ট একটা ঝড় বয়ে গেল এই দুই তরুণ প্রাণে। মনে দুর্বশ্য কৌতূহল—তেমনি দারুণ চিত্তচাঞ্চল্য!—এখুনি যেন কে একজন আসবে, সে বসবে সামনে—হয়তো দুই চোখ মেলে দেখবেও তাদের দুজনকে। সে ফর্শা না কালো—দীর্ঘ না খর্ব—কণ্ঠস্বর মধুর না তীক্ষ্ণ জানা নেই। চোখের সামনে মুহূর্তে মুহূর্তে কত ধরণের শাড়ি-পরা চেহারা ভেসে উঠল কল্পনায়। কত হারানো মুখের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্যে ভেসে উঠল অপরিচিত এই শঙ্করপুরের মধুর গোধূলি লগ্নে।

বসন্ত ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে বহু মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে—সঙ্গও পেয়েছে কত সঙ্গিনীর —অন্নপূর্ণার খাবারের লাইনে কিম্বা সিনেমা-হাউসের প্রথম শ্রেণীর নিভৃত কোণে।

কিন্তু আজ এ কী কঠোর পরীক্ষা!

পরীক্ষাই তো!—মেয়ে দেখতে হবে, নিজের জন্যে নয়; পরের জন্যে—যে পরটির কোনো পরিচয় এখনো পায়নি তারা নিজেই।

আশ্চর্য সেই অনিশ্চিত পুরুষ!

অমিয় ভাবে—এ কী পরিহাস! যে মেয়েটি আসবে এখুনি, সে কী আশা নিয়ে আসবে এদের কাছে? সে-আশার সম্মান রাখার যোগ্যতা তার কতটুকু?

সে তো মেয়ে দেখতে আসে নি? এসেছে যা দেখতে তার সৌন্দর্যটুকু সঞ্চয় করে নিয়ে চলে যাবে চোরের মতো, প্রতারকের মতো—এই তো অভিলাষ!

কিন্তু—

ভদ্রমহিলা এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে নিয়ে বসালেন মেয়েটিকে সামনে।

ফর্শা ধবধবে চেহারা—পাতলা—একহারা গড়ন, সুন্দর। বয়েস ষোলো পেরিয়ে গেছে। সর্বাঙ্গে যৌবনের নিখুঁত আশীর্বাদ।

মেয়েটি নতমুখে আসনে বসে জোড় হাত মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

মাথার খোঁপাটা আঁট করে বাঁধা—মোটা মোটা দুটো কাঁটা উঁচু হয়ে রয়েছে দৃষ্টিকটুভাবে। কাঁধের কাছে পুরনো সিল্কের কাপড়খানায় লেগেছে মাথার তেল অযত্নে। আর মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উগ্র গন্ধ— সস্তা দিশি হিমানীর।

প্রণাম করে মেয়েটি বসে রইল মাথা নিচু করে।

বসন্ত কেমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। বারে বারে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছ্ছে।

অমিয় কতবার যে দেখল মেয়েটিকে তার ঠিক নেই। আর যতবারই তাকিয়েছে ভদ্রতা ততবারই কশাঘাত করে মুখ নিচু করে দিয়েছে।

তবু দেখতে হবে বৈকি। ভালো করে দেখতে হবে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কারণ, নিখুঁত মেয়ে না হলে বিনি পয়সায় চলবে কি করে?

অনিশ্চিত পাত্র মহাশয়ের সৌভাগ্যের উদ্দেশে অমিয় লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল।

এমনি করে আরও কতক্ষণ কেটে গেল।

ভদ্রমহিলা বললেন—তোমরা যে ভাই চুপ করে রইলে। কিছু জিজ্ঞাসা করো?

আবার দুজনে নড়ে বসল। কিন্তু কথা সরল না।

ভদ্রমহিলা বললেন—পরের জন্যে তো দেখছ, তোমাদের লজ্জা কি?

সত্যিই তো লজ্জা কি? সামান্য এক গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়ে—তারই সঙ্গে এত সংকোচ!

অমিয় বললে—কি নাম আপনার?

উত্তর এল মুখস্থ বলার মতো—কুমারী অতসীবালা—পদবীটা শোনা গেল না। কণ্ঠস্বর লজ্জায় মিয়িয়ে গেল।

বসন্ত বললে—কাজকর্ম—

—সে আর বলতে হবে না ভাই, ও একাই গোটা সংসারটা মাথায় করে রেখেছে। তবু মুখে 'রা' টি নেই।

আবার চুপচাপ।

ভদ্রমহিলা একবার বললেন—তা'হলে এখন ও যাক্।

বসন্ত নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

ভদ্রমহিলা ডাকলেন, ঠাকুরপো, দেশলাইটা একবার দাও তো, অতসীকে থুয়ে আসি।

কিন্তু কোথায় ঠাকুরপো?

বসন্ত আর অমিয় একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—কৈ তিনি তো আসেন নি এখানে।

—না না একবার এল যে! তা'হলে নিশ্চয় পুকুর পাড়ে বসে আছে। আশ্চর্য ঐ মানুষ! রোজ সন্ধ্যের সময় ঘরে বসে থাকবে, কিন্তু কাজের দিনে পুকুরপাড়ে।

এই সেদিন বাঘনাপাড়া থেকে মেয়ে দেখতে এল। ওঁদের একটু যত্নআত্তি করা, বসতে জায়গা দেওয়া, হাত-পা ধুতে জল দেওয়া—এ আমি একা কত করি! ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—করে চীৎকার করে মরি—ঠাকুরপোর আর দেখা মেলে না। ডাকতে ডাকতে বাইরে এসে দেখি ঐ পুকুরপাড়ে বসে ছেলেমানুষের মতো ঢিল ছুঁড়ছে জলে।

অতসীকে কেউ দেখতে এলে যত লজ্জা যেন আমার ঠাকুরপোটির ঘাড়ে চেপে বসে। ও আর সামনে দাঁড়াতে পারে না। পুরুষ মানুষের এত লজ্জা আমি কখনো দেখেনি বাপু।

ভদ্রমহিলা হাসলেন একটু।

—দেখি ভাই, তোমাদের কাছে দেশলাই আছে?

বসন্ত দেশলাই দিল। সেই অন্ধকার উঠোনে একটার পর একটা কাঠি জ্বেলে ভদ্রমহিলা অতসীর একটা হাত শক্ত করে ধরে পাশের বাড়ি ঢুকে পড়লেন।

ভোর রাত্রে বাড়ি থেকে বেরোতে হল। এখন বাস পাওয়া যাবে না। চার মাইল পথ হেঁটে তবে মেমারী স্টেশন। ছটা পনেরোয় ফার্স্ট লোকাল। সেই ট্রেণ ধরতে পারলে তবে ঠিক সময়ে অফিস করা চলবে।

আকাশের গায়ে তখনও শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। এই চৈত্রেও ভোরের বাতাসটায় যেন কেমন হিমের পরশ। সমস্ত পাড়া ঘুমে অচেতন।

বসন্ত আর অমিয় বাইরে এসে দাঁড়াল। পেছনে ভদ্রমহিলা। বললেন—অনেক কষ্ট দিলাম ভাই, কিছু মনে কোরো না। আবার এসো। তোমরা আমার ভাইএর মতো—আমার নরেন আর তোমরা অভিন্ন। তাই বলতে জোর পাচ্ছি—আবার এসো।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। স্বর পরিষ্কার করে আবার বললেন—আর, যে মেয়েটিকে দেখলে তাকে ভুলে যেও না। ওকে উদ্ধার কোরো ভাই—বড়ো ভালো মেয়ে। তোমাদের মতো অত লেখাপড়া-জানা ছেলে আশা করি না, বরং দেখো, চাকরিটা যেন একটু ভালো করে। যা বাজার! আর কলকাতায় গিয়ে একটা খবর দিও কিছু হল কি না।

—নিশ্চয়ই দেব। আচ্ছা চলি, নমস্কার। বসন্ত দুহাত তুলল।

ভদ্রমহিলা বললেন—একটু দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে ডেকে দিই। সঙ্গে যাক্ আলো নিয়ে।

—আবার কেন শুধু শুধু তাঁকে—

কথা চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা জানলায় দুটো টোকা দিয়ে ডাকলেন—ঠাকুরপো!

এক ডাকেই ঠাকুরপো উঠে এসে দাঁড়ালেন দরজা খুলে।

—একটু ভাই আলো নিয়ে এঁদের এগিয়ে দাওনা।

ঠাকুরপো তখনি গায়ে চড়িয়ে নিলেন সেই হাতকাটা গেঞ্জি—পা ঢুকিয়ে দিলেন সেই ছেঁড়া তালিমারা স্যাণ্ডেলের ফাঁকে।

ঘরের কোণ থেকে হ্যারিকেনটা তুলে দমটা বাড়িয়ে দিলে একটু। বেরিয়ে এল সেই দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগল পথ-প্রদর্শকের মতো—মৌন—ধীর—গম্ভীর!

পেছনে আর গ্রাম দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে তলিয়ে

গিয়েছে। সামনেও অন্ধকার। শুধু তারই ভেতর একটুকরো আলো দুলতে দুলতে চলেছে।

কেমন যেন হঠাৎ ভালো লাগল এই ঠাকুরপোটিকে। সাতাশের নীচে বয়েস—অথচ কী শান্ত যৌবনশ্রী! ওর চোখের মণি কথা কয়, কিন্তু ইশারা করে না।

এগিয়ে চলেছে, মুখে কথাটি নেই। যেন শুধু এ এক কর্তব্য-কর্ম। অথচ প্রতিদিনের এমনি অজস্র কর্তব্য-কর্মের মধ্যে কোথায় যে তার অবাধ্য প্রেরণা লুকিয়ে আছে, বোঝা গেল না।

বটতলায় এসে পৌছল এরা। অমিয় আর বসন্ত দু হাত তুলে নমস্কার করল—আর আসতে হবে না, এবার আমরা যেতে পারব।

ঠাকুরপো এগিয়ে এল কাছে। আলোটা ঝুলছে হাতে। মুখ দেখা যায় না। তবু মনে হল, যেন কিছু বলতে চায়।

জিজ্ঞেস করল বসন্ত—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ, বলব। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ভারী। বেদনা আর আবেগ যেন কণ্ঠের মাধুর্য হরণ করেছে।

ভদ্রলোক বললেন—আজ প্রায় দু বছর বেকার বসে আছি। ছাঁটাইয়ের পর থেকে আর চাকরির সুযোগ পাচ্ছি না। আপনারা কলকাতায় থাকেন, যদি দয়া করে আমার জন্যে একটু চেষ্টা করেন।

ভদ্রলোক দুটি হাত জোড় করলেন।—প্রার্থনায় কি বিদায়-জ্ঞাপনে বোঝা গেল না।

বসন্ত বুক পকেট থেকে নোটবই বের করে নাম-ঠিকানা লিখে রাখলে। তারপর বললে—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আপনার অনুরোধ, আপনার বৌদির আদেশ আমরা ভুলব না। কিছু যদি করতে পারি তাহলে আমরাও কম সুখী হব না। আচ্ছা আজ চলি।

—আসুন। ভদ্রলোক দুহাত তুলে নমস্কার করলেন!

চার মাইলের মধ্যে তিন মাইল পথ হেঁটে এসেছে এরা। আর এক মাইল। সামনে দীর্ঘ পিচ্ ঢালা পথ। তারই বুকে শ্লথ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে দুই তরুণ পথিক।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। আগমনের যে ক্ষণটি এক সময় মুখর হয়ে উঠেছিল দুই বন্ধুর কৌতূহলের আতিশয্যে, আজ ভোরের আলোয় পাখির ঘুমভাঙ্গা কাকলীর মধ্যে—দীর্ঘ পথ-রেখার দুই প্রান্তের নিঃশব্দ বনবীথির গাম্ভীর্যে সেই দুই তরুণ-চিত্ত মৌন—স্থির।

আজ আর কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। শুধু হাঁটছে। দুই আঙুলের ফাঁকে কখন যে জ্বলন্ত সিগারেটের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে সেদিকে হুঁস নেই কারও। ওরা যেন তলিয়ে গিয়েছে কোন্ ভাবরাজ্যের গভীরে।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে ভদ্রমহিলার মুখ—ভেসে উঠছে তরুণ ঠাকুরপো—ভেসে উঠছে অতসীর লজ্জানত দুটি আঁখি।

ভদ্রমহিলা অনুরোধ করেছেন—প্রার্থনা জানিয়েছে এক গ্রাম্য বেকার যুবক। এরা দুজনেই দিন গুণবে—পথ চেয়ে বসে থাকবে ডাক-পিওনের।

আরও একজন অন্তঃপুরের মধ্যে বসে হয় তো কান পেতে থাকবে—আর আশংকায় শিউরে উঠবে ডাক-পিওনের সাড়া পেলেই।

ভাববে হয় তো মনে, এবার বুঝি তাগিদ এল। বুঝি এবার ছেড়ে যেতে হবে এ শঙ্করপুরের মায়া—এর পথ ঘাট—এর আম-কাঁঠালের নিবিড় ঘন ছায়া আর এই বিলু দিদির মতো একান্ত আপন জনকয়েককে। বিশ্বাস নেই তার পোড়া রূপ আর সর্বনাশা যৌবনকে।

হায়রে গোপন সাধ! হায়রে মধুর কল্পনা!

গিরি নদীর কূলে কূলে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দেশের সাহিত্য জাতীয় জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ, সাহিত্যিক গোষ্ঠী জাতির শাসন পালন ও পরিচালনার পক্ষে একটা প্রবল শক্তি। এই শক্তির সহযোগিতা সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই স্পৃহণীয়—এমন কি অপরিহার্য্য। সাহিত্যিকরাই গণতন্ত্র রাষ্ট্রে জনমত গঠন করেন—কবিরা unacknowledged legislators of the state. শেলী অবশ্য বলিয়াছেন, 'of the world.'

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের অভিভাষণে আমি এই সত্যের দিকে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের জন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনা জানাই না। দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, তাহারাই আমাদের প্রতিপালক। আমি চাহিয়াছিলাম—রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যেন আমাদের সারস্বত সাধনা ও বিধিদত্ত শক্তি স্বীকার করেন, আমাদের সঙ্গে সহৃদয় ও অমুদ্ধত আচরণ করেন এবং আমাদের মৈত্রী ও সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন—ইহাতে জাতির মঙ্গলই হইবে। ইহার বেশী? মহর্ষি কণ্বের মত বলিতে হয়—"আমাদের বলিয়া দিবার কথা নয়।"

আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি—আমাদের রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-মন্ত্রী বিধানসভা ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের সঙ্গে আমাদের সাহিত্য গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রতিনিধিকে দামোদর উপত্যকার কর্ম্মপ্রবাহ, সিন্ধ্রি ও চিত্তরঞ্জনের কাণ্ডকারখানা দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

নরেন দেবকে বাদ দিলে সাহিত্যিকদের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সাহিত্যিকদের Big Five অর্থাৎ তারাশঙ্কর, প্রবোধ, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র ও প্রমথ, এ দলে ছিলেন না। সজনীকান্ত আগেই কাজ সারিয়াছেন। সাহিত্য-লক্ষ্মীদের মধ্যে ছিলেন—রাধারাণী, উমা, আশাপূর্ণা ও বাণী। সুরশিল্পী শান্তিদেব ও বর্ণশিল্পী সতীশও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ফণীন্দ্রনাথ, বিজন ও শ্রীকুমারবাবু দুই দলেরই প্রতিনিধি।

১লা জানুয়ারী রাত্রি ১০টার সময়ে হাওড়া ষ্টেসনে Special Trainএ অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সঙ্গে একটি কামরায় উঠিলাম। ভোর রাত্রে অজয়বাবুর প্রভাতী কণ্ঠের আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জানাইলেন—গরম জল ও চা প্রস্তুত, আমরা কোদরমা ষ্টেশনে পৌছিয়াছি। বুঝিলাম এক ঘুমে গঙ্গাতীরের সমতলভূমি হইতে অভ্রলোকে পৌছিয়াছি।

প্রভাতে প্রাতরাশের পর আমরা সরকারী বাসে চড়িয়া কয়েক মাইল দূরে তিলাইয়া বাঁধে পৌছিলাম। এই বাঁধ দামোদরের উপনদ বরাকরের উপরে। 'অশ্মলোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধকায়' এই বাঁধের উপরে উঠিয়া দেখিলাম বিশাল ২৬ বর্গমাইল বিস্তৃত হ্রদ আমাদের সম্মুখে। চারিদিকে পাহাড়ের চিরস্থায়ী বেষ্টনী। বুঝিলাম, বন্যবর্ব্বর বরাকরকে বন্দী করিবার ফন্দী খাটাইবার চমৎকার ঘাঁটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কারণ, জল আটকাইবার কাজ প্রধানতঃ সারি বাঁধা পাহাড়গুলিই করিতেছে।

যে জলতরঙ্গগুলি দামোদরকে কাঁপাইয়া ফাঁপাইয়া আমাদের দেশে বন্যারূপে ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং আমাদের বিন্দুমাত্র ইষ্টসাধন না করিয়া সমুদ্রের পাদ্যঅর্ঘ্য হইয়া অপচিত হইত, সেই অবাধ্য তরঙ্গগুলি বাঁধের বাঁধনে এখানে পোষ মানিয়া বশ মানিয়া বন্দী হইয়া আছে। যে জলরাশি পাইয়া সমুদ্রের অগাধ লোনা জল একটুও মিঠা হইত না সেই জলরাশি এখানে প্রতীক্ষা করিয়া আছে বৃষ্টিহীন ঋতুতে রাঢ়ের ক্রূর কর্কশ রূঢ় নীরস মাটিকে সরস ও উর্ব্বর করিবার জন্য।

এই জলরাশির পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলাম—

> অভ্রক্ষেতের তিলাইয়া,
> বঙ্গভূমিরে বাঁচাও তোমার সঞ্চিত বল বিলাইয়া।

এইবার তিলাইয়া বাঁধের একটু পরিচয় দিই। এই বাঁধের কাজ ৫০ সালে সুরু হইয়াছিল—দুই বৎসরের মধ্যে ইহার কাজ শেষ হইয়াছে। এই বাঁধটি নদীর বেলাভূমি হইতে ৯৯ ফুট উচ্চ এবং ১১৪৭ ফুট লম্বা—দুইটি পাহাড়ের মধ্যে ইহা সেতু রচনা করিয়াছে। বাঁধের গায়ে অনেকগুলি কপাট আছে—কয়েকটি কপাট খুলিয়া আমাদের সংহত জলরাশির সংযত প্রপতন দেখানো হইল। এখানে যে জলভাগ সঞ্চিত থাকিবে তাহাতে প্রায় এক লক্ষ একর জমিকে জলসিঞ্চিত হইতে পারিবে। বাঁধের নীচে জলদ-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে (একটা 'দ'এর অভাবে কেন জলদের সঙ্গে বিদ্যুতের বিচ্ছেদ ঘটে?)। হাজারিবাগ ও কোদরমা শহর এবং অভ্রখনি অঞ্চলে এই বিদ্যুতের প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছে। শুনিলাম পরে ইহা গয়ার হরিপাদপদ্মও আলোকিত করিবে। বিহার সরকার দয়া করিয়া ইহার গয়াপ্রাপ্তি ঘটাইবেন।

তিলাইয়া বাঁধ পরিদর্শন করিয়া আমরা পরিদর্শক-ভবনে আসিয়া স্নানাহার করিলাম। এরূপ চমৎকার পরিবেষ্টনীর মধ্যে সমস্ত বন্ধুগণের সঙ্গে প্রাকৃতিক মাধুর্য্য উপভোগ পূর্ব্বে কখনো ভাগ্যে ঘটে নাই। তার চেয়ে বড় কথা নয়নের ক্ষুধার তৃপ্তি হইলে উদরে যে ক্ষুধার উদয় হয়, তাহার তৃপ্তির জন্য উদার হস্তেরই প্রয়োজন। দেখিলাম সহযোগীরা উদার হস্তেই উদরের আজ্ঞা পালন করিলেন।

এই পরিবেষ্টনীতে সাহিত্যিকগণের ফোটো লওয়া হইল। সে ফোটো যুগান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বেলা দুটার পর বাসে চড়িয়া আমরা কোনারের দিকে যাত্রা করিলাম। হাজারিবাগ জেলার গ্রাম্য দৃশ্য ও পার্ব্বতী শ্রী দেখিতে

দেখিতে এবং অধ্যাপক সঙ্গীদের রঙ্গকলহ শুনিতে শুনিতে আমরা কোনারের বাঁধের রঙ্গভূমিতে পৌছিলাম। কোনার দামোদরের উপনদী।

এখানে অতিকায় যন্ত্রগুলির কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মানব দিন দিন যন্ত্রে পরিণত হইতেছে,—আর যন্ত্র দিন দিন মানব,—মানব কেন দানবে পরিণত হইতেছে। অবশ্য এ দানব সভ্য আলাদিনদের আজ্ঞাবহ।

একজন মাত্র লোকের সাহায্যে মাটিকাটা যন্ত্রগুলি এক এক মিনিটে এক একটি ওয়াগন মাটিতে ভর্ত্তি করিতেছে। আর একটি যন্ত্র এক এক মিনিটে এক একটা গাছ উপড়াইয়া দূরে সরাইয়া দিতেছে। যন্ত্র এখানে পাথরের গর্ব্ব গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া দিয়া পাথরে পাথরে সংহতি সাধন করিতেছে। কোন কোন যন্ত্র উচ্চনীচ ভেদ দূর করিয়া যেরূপ সহজে সাম্য স্থাপন করিতেছে সেরূপ এ যুগের মহামনুরা বা সমাজতন্ত্রী প্রজাপতিগণও পারেন নাই। এখানকার বাঁধের কাজ বর্ষার আগেই শেষ হইবে। জাগন্ত কোনারের ভয়েই কাজ চলিয়াছে দ্রুত গতিতে। এখানকার বাঁধটি ১৬০ ফুট উচ্চ, দৈর্ঘ্যে ১২৯৬৯ ফুট। এখানে যে জল আটকানো হইবে তাহাতে ১০৪০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া চলিবে। এখান হইতে ৪০০ ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত হইয়া বোকারোর উত্তপ্ত বিদ্যুন্ময় মস্তককে শীতল করে। তাহা ছাড়া, এখানে বিরাট জলদ-বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইতেছে। কোনারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—

কোনার ওগো কোনার,
কয়লা পাথর লোহায় ভরা দেশকে কর সোনার।

এখানে চা পান করিয়া আমরা বোকারোর দিকে গেলাম। বোকারোয় পৌছিলাম সন্ধ্যার সময়। এখানকার অতিথিশালাটি ধনীর প্রাসাদের মত। ইহাকে অতিথিশালা না বলিয়া অতিথি-শ্বশুর বলিতে হয়। এখানকার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র, অর্থাৎ বারুণী বিদ্যুৎ নয়, আগ্নেয়ী বিদ্যুতের জন্মভূমি এখানে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর অব্যবহার্য্য কয়লা হইতে এখানে 'অচল চলন মন্ত্রে' আগ্নেয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এখানকার অতি জটিল রহস্যময় যান্ত্রিক রূপ দেখিয়া ভীতিমিশ্র বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়।

দেব-বন্ধু বলিলেন— এসব ইউরোপে প্রত্যেক শহরেই অজস্র দেখে এসেছি? কিন্তু আমরা ত আর দেখি নাই। শুনিলাম এমনটি গোটা ভারতবর্ষেই আর নাই। বিস্ময়ের তলে তলে ভয়ও জন্মে। যেরূপ আগুনের কাণ্ডকারখানা তাহাতে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া অনেকটা জলও আটকাইয়া রাখিতে হইয়াছে। এখানে চিতারোহণ করিয়া বৈদ্যুতিক সদ্গতি লাভের জন্য কয়লা আসে লোহার দড়ায় ঝুলিয়া নাচিতে নাচিতে খনি হইতে।

আমরা মেঘদূতের যুগের মানুষ—এটা বিদ্যুৎ দূতের যুগ। এই বিদ্যুৎ শুধু বার্ত্তাবহ দূতের কাজ করে না—সকল মানুষের সকল কাজেই আজ্ঞাবহ। এখানে দাঁড়াইয়া মনে হইল বিদ্যুৎ পশুর দাসত্ব হরণ করিয়াছে—মানুষের দাসত্বও একদিন হরণ করিবে। কবে শুনিব কেরাণী, শিক্ষক ইত্যাদিরও কাজ বিদ্যুতই করিতেছে। তখন মানুষগুলো করিবে কি? সভ্যতা বলিবে, পৃথিবীতে এত মানুষের প্রয়োজন কি? সে বিদ্যুৎকেই বলিবে—ভীড় কমাও।

এই বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র জামসেদপুর ও হীরাপুরের লোহার কারখানা, ঘাটশিলার তামার খনি, এ অঞ্চলের কয়লা খনিগুলি, সিন্ধ্রীর সার বানাইবার কারখানা, আসানসোল অঞ্চলের পরিকল্পিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শক্তি সরবরাহ করিবে। এ অঞ্চলে আর অমাবস্যা রাত্রিতেও অন্ধকার থাকিবে না। নিদ্রা ছাড়া চোখ জুড়াইবার আর উপায় থাকিবে না।

রাত্রি দশটায় আমরা ট্রেনে চড়িয়া প্রথম দিনের পরিদর্শন শেষ করিলাম। ভোরবেলায় অজয়বাবুর টহলদারিতে ঘুম ভাঙ্গিল ধানবাদ ষ্টেশনে। এখানে প্রাতরাশের পর আমরা দ্রুত বাসে চড়িয়া সিন্ধ্রী চলিলাম অর্থাৎ আমি নিজে শ্বশুর-ভূমি ত্যাগ করিয়া জামাতৃ-ভূমিতে চলিলাম।

সিন্ধ্রী কারখানায় পৌঁছিয়া আমি দুই ঘণ্টার জন্য যূথভ্রষ্ট হইলাম। আমার জামাতা এখানকার একজন কর্ম্মী। সেই আমাকে তাহাদের কারখানার কাজ দেখাইল। এখানে ক্ষুধিত ভূমির খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্যের নাম Amonium Sulphate, কয়লা দেয় গ্যাসের মধ্য দিয়া এমোনিয়া, আর জিপসাম দেয় সালফার বা গন্ধক। এই দুইএর রাসায়নিক মিলন সাধনের জন্য এই বিরাট সমারোহ।

গ্যাস প্রস্তুতির জন্য কয়লা যেখানে কল-কবলিত হইতেছে সেখান হইতে ধাপে ধাপে কারখানার শেষপ্রান্তে গিয়া দেখিলাম,—মসীকৃষ্ণ কয়লা শশি-শুভ্র এমোনিয়াম সালফেটের চূর্ণরূপ ধরিয়া বস্তায় বন্দী হইতেছে। মাঝখানে একটির পর একটি দশান্তরের স্তরে স্তরে বিরাট ব্যবস্থা। মনে হইল—এখানেই ত শেষ নয়। এই নকল ময়দা কেমন করিয়া আসল ময়দায় পরিণত হয়, তাহাত দেখানো হইল না। কারখানা শেষের পরই থাকা উচিত ছিল গেঁধুম শস্যে ভরা একটি বৃহৎ ক্ষেত্র,—তাহার পর স্তরে স্তরে (লুচি রুটির পাকশালা না হউক) আসল ময়দা তৈরীর কল পর্য্যন্ত বসাইলে উদ্বর্ত্তনের ধারার চূড়ান্ত দেখানো হইত। যেদিন আমাদের দেশের রক্ষণশীল কৃষক সমাজ এই সারের সাহায্যে লোহার মত শক্ত মাটিতে সোনা ফলাইবে, সেদিন এই কারখানার তর্জ্জন গর্জ্জন সার্থক হইবে।

এমোনিয়ার গন্ধ নাসিকায় বহন করিয়া কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাসায় কন্যার (সঙ্গীতার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সেখানেই স্নানাহার সমাপ্ত করিলাম। ৮।১০ জন সাহিত্যিকও কবি সন্দর্শনে গিয়া কবির ফোটো তুলিয়া লইলেন।

বেলা ২টার পর আমরা সিন্ধ্রি হইতে পাঁচেট বাঁধ দেখিতে গেলাম। পাঁচেট পঞ্চকোটের অপভ্রংশ। এই পাহাড়িয়া বাঁধটি খাস দামোদরেরই উপরে। এখানে কাজ বেশী দূর আগায় নাই। কাজ শেষ হইবার আগে আগামী বর্ষায় পাহাড়ের দামাল ছেলে বেপরোয়া দামোদরকে

নামলানোর দরকার। সেজন্য নদীর গতিপথ ঘুরাইয়া দিবার জন্য খাল কাটিয়া রাখা হইতেছে। এখানে যে জল আটকানো হইবে তাহাতে যেমন বন্যা দমন হইবে—তেমনি ৬৮৩৮৫০ একর জমিতে জলসেচন চলিবে। এখানেও একটি জলদ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের নির্ম্মাণ হইতেছে।

এখানে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইল—রণোন্মত্ত প্রলয়ঙ্কর দামোদর এখন ত সুপ্ত, তাহার আয়ুধগুলি চারিপাশে বিকীর্ণ, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গের দলও গৈরিক প্রান্তরে নিদ্রিত। এই অবসরে কৌশলী মানুষ তাহার অস্ত্রশস্ত্র সরাইয়া রাখিয়া বিজ্ঞানের বলে তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে পাষাণ-কারায় বন্দী করিতেছে—এ দৃশ্য ত দেখিলাম। তারপর আষাঢ়ের ডমরুনিনাদে সে যখন জাগিয়া উঠিবে অনুচরগণের সঙ্গে, তখন সে ভৈরব গর্জ্জনে শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে কি প্রচণ্ড চেষ্টাই না করিবে! দংশনে দংশনে শৃঙ্খল কাটিবার জন্য কি ধ্বস্তাধ্বস্তিই না করিবে! লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে পাষাণপ্রাকার ভাঙ্গিতে সে চাহিবেই, মাথা ঠুকিবে পাষাণপ্রাচীরের গায়ে, অধীর বিদ্রোহে দরদর করিয়া রুধির ধারা ঝরিবে তাহার ললাট হইতে। দূর হইতে কৌশলী প্রহরীরা উঁকি দিয়া দেখিবে। কিন্তু তাহার সকল প্রচণ্ড বিক্রমপ্রকাশ ব্যর্থ হইবে। এ দৃশ্য ত দেখিলাম। সে দৃশ্যই দেখিতে সাধ যায়।

আবার আসিতে হবে দেখিবারে হেথা অবিশ্রাম
প্রকৃতির ব্যর্থ ক্ষুব্ধ মুক্তির সংগ্রাম।

অজয়বাবু অভয় দিয়া বিজ্ঞানের সেই বিজয়-গৌরব কি দেখাইবেন না?

চা পান করিয়া আমরা মাইথানে আসিলাম। মাইথান অর্থাৎ মায়ের স্থান। এই মা দেবী কল্যাণেশ্বরী। তাঁহার মন্দির এইখানে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির দর্শন করিলাম। মাইথান বাঙ্গালীর কল্যাণ-তীর্থই হইল। এখানকার বাঁধের কাজ খুব দ্রুতগতিতে চালানো হইতেছে—কারণ বর্ষার আগেই প্রধান অঙ্গ শেষ করিতে হইবে। ইহা বরাকরের উপর দ্বিতীয় বাঁধ। ইহার উচ্চতা ১৬২ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১১৪০ ফীট। প্রধানতঃ বন্যাদমনের জন্য ইহার নির্ম্মাণ। বাঁধে আটকানো জলের দ্বারা ২৭০০০০ একর জমিতে জল সেচন চলিতে পারিবে। এখানে একটি পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কাটিয়া সেই পথে বরাকরের জলধারাকে চালিত করিয়া নদীগর্ভের কাজ করিতে হইয়াছে। এখানে একটি গোত্রভিদ্‌ যন্ত্রকে "বস্ত্রবিম্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্তে" পাহাড় কাটিয়া ওয়াগন ভর্ত্তি করিতে দেখিলাম।

মাইথানে দেখিলাম পাহাড়িয়া বর্ব্বর বেপরোয়া বরাকরকে সংযত সভ্য বানাইবার অশেষ চেষ্টা হইতেছে। কেবল তাহাই নয় তাহাকে লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ শান্তিশৃঙ্খলাসহ সংসারের সংসারী বানানো হইতেছে। বরাকরকে আহ্বান করিয়া তাই বলিলাম—

পোষ মানাতে বশ মানাতে যে রূপসী জানে।
সংসারী আজ সাজতে হবে তারই প্রেমের টানে।
সে গৃহিণী করবে তোমায় শাসনে সংযত।
অন্নদা মার পাশে পাগল ভোলানাথের মত।

এখানে আহারান্তে আমরা আবার ট্রেনে চাপিলাম। ট্রেনে রাত্রিবাস করিয়া অমাবস্যার দিন প্রভাতে আমরা চিত্তরঞ্জনে পৌঁছিলাম। একটি মাত্র কারুশিল্পই যে এ যুগে একটি পূর্ণাঙ্গ নগরী গড়িতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ছিল এ অঞ্চলে টাটানগর ও বাটানগর। এখন সিন্দ্রী ও চিত্তরঞ্জন এই দুইটিকে তাহার জুড়ী পাইয়াছি। সিন্দ্রীর মত এখানেও অনেক কর্ম্মী আমার ছাত্র। আমি অমাবস্যার উপবাসী, কাজেই এখানে কেবল আহারের সময় যূথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। আহারের সময় ছাড়া আমি যূথভ্রষ্ট হইতাম না। শুনিয়াছি সর্ব্বত্রই গুরু-ওজনের ভুরি ভোজনের আয়োজন ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম এখানকার কারখানা বহন করিতেছে এবং ইহা বাংলার সীমান্তে অবস্থিত অতএব ইহা বাঙ্গালীর পুণ্য তীর্থ। এখানকার সহরটি ছবির মত সুন্দর, মিহিজাম পাহাড়ের উপর হইতে সমগ্র সহরের দৃশ্যটি উপভোগ্য। এখানকার কারখানা তন্ন তন্ন করিয়াই দেখিলাম, কারণ এখানকার কাজ বোঝা অপেক্ষাকৃত সোজা। সিন্দ্রিতে কেমিষ্ট্রি, বোকারোতে ফিজিক্স, আর এখানে প্র্যাক্টিকাল মেকানিক্স (Practical Machanics) বা ইনজিনিয়ারিঙের রাজ্য। এখানকার ক্রিয়াকাণ্ড স্থূল ধরণের। কাঁচামালের গুনাম হইতে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে রূপরূপান্তর দেখিতে দেখিতে একেবারে কারখানার শেষ প্রান্তে এখানকার তৈরী পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনে চড়িয়া, জড় লৌহের জঙ্গমতা লাভের ক্রম বিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া, পরিদর্শন সমাপ্ত করিলাম। লৌহ এবং কয়লা মানুষের বুদ্ধির সাহায্য লইয়া কেমন করিয়া নিজেরাই নিজেদের বাহন গড়িতেছে চিত্তরঞ্জনে তাহাই দেখিবার জিনিষ। এখানে এখন মুশকটবাহী ইঞ্জিন তৈরী হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠাভূমি তাহার কার্য্যকলাপের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। লৌহ ও কয়লা কাছেই, বিদ্যুৎ কেন্দ্র কাছেই, শ্রমিক সুলভ, স্থান স্বাস্থ্যকর, জলবায়ু স্বাচ্ছন্দ্যজনক, প্রধান রেললাইন ইহার পার্শ্বচারী।

চিত্তরঞ্জন নগরটির আয়তন ৭ বর্গ মাইল, ইহাতে পাঁচ হাজার গৃহ, ৭১ মাইল রাজপথ এবং ১২০ মাইল লম্বা জলসরবরাহের নল বসানো আছে। বর্ত্তমান যুগের আদর্শে নগরটি স্বপূর্ণাঙ্গ। কারখানাটি এখনও স্বপূর্ণাঙ্গ হয় নাই, এখনও কোনো কোনো অঙ্গ বা অংশ বহির্ভারত হইতে আমদানী করা হয়। অনতিবিলম্বেই ইহা স্বপূর্ণাঙ্গ হইবে।

এখানে দেশবন্ধুর উদ্দেশে বলিলাম—

লৌহের মত দৃঢ় চরিত্র হে দেশবন্ধু অমর কৃতী,
গর্জ্জন করি ঘোষিছে লৌহ হেথা দিবারাতি তোমার স্মৃতি।

আহারান্তে আমরা দুর্গাপুরের দিকে রওনা হইলাম। পথে রূপনারায়ণপুরের 'কেবল ফ্যাক্টারিতে' অযথা সঙ্গীরা দেরী করিলেন। এই ফ্যাক্টরির কাজ এখনো সুরু হয় নাই, সেজন্য অযথা বলিতেছি। দেরির জন্য দুর্গাপুরে সন্ধ্যা হইয়া গেল—ভালো করিয়া দেখা হইল না। আমরা সন্ধ্যায় দুর্গাপুরে আসিলাম। এখান হইতেই দামোদরের খালগুলি কাটাইয়া দেশময় তাহার জল ও বল বিকীর্ণ করা হইবে। এই

খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য হইবে ১৫৫২ মাইল। একটি ৮৫ মাইল দীর্ঘ নাব্যখালও এখান হইতে দামোদরের সঙ্গে ভাগীরথীর সংযোগ ঘটাইবে।

এখানে দামোদরের কাছে বিদায় লইবার সময় বলিলাম,—নাগপুরী রঘুজী ভোঁসলা বছর বছর চৌথ আদায় করিতে আসিয়া বাংলাকে নিঃস্ব নিঃসম্বল করিয়া যাইত। দামোদর, তুমি ছোট নাগপুরী রঘুজী ভোঁসলা, তুমি বর্গী রাজের মতই এতকাল উপদ্রব করিয়াছ। তোমার আদানের পালা শেষ হইয়াছে—এইবার তোমার প্রদানের পালা আসিয়াছে। তোমার শাসনের দিন ফুরাইল, এইবার তুমি পালন কর।

হে দামোদর, তুমি রুদ্রমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া এবার প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর। তোমার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাংলার গৃহে গৃহে মাঠে মাঠে, বাটে বাটে, হাটে হাটে নিনাদিত হউক, তোমার সুদর্শন চক্রের অবিরত ঘূর্ণনে জল বিজলীতে পরিণত হউক, তোমার গদা বন্যা ও অনাবৃষ্টিকে ধ্বংস করুক, তোমার পদ্ম লক্ষ্মী দেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া দেশময় বিকসিত হইয়া মধু ও সৌগন্ধ্য বিকীরণ করুক। হে দামোদর, রামানুজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয় হইয়াও আমরা তোমার পূজা করিব।

জটিল যন্ত্রপাতিগুলি দেখিয়া আমার মনে হইল—ঐ সব যন্ত্র ত' শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় করিয়া দিল—তাহারা এইবার কৃষীবলরূপে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করুক। নূতন ক্ষেত্রে তাহাদের কাজ সুরু হউক।

তিনদিন ধরিয়া বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সৃষ্টি অর্দ্ধ জীবন্ত যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ কাণ্ডকারখানা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের যন্ত্র-স্তবটি স্বভাবতই কণ্ঠে উদীরিত হইল—

নম—যন্ত্র নম, যন্ত্র নম' যন্ত্র নম' যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত, বজ্রবহ্নি বন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংস বিকটদন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী বিঘ্ন বিজয় পন্থ ॥
তব লৌহ গলন শৈল দলন অচল চলন মন্ত্র ॥
কভু কাষ্ঠ লোষ্ট্র ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া
কভু ভূতল জল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি খনিত্র নখ বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র।
তব পঞ্চভূত বন্ধনকর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

দামোদর উপত্যকার রূপান্তর সাধনে বন্যাদমন, জলসেচন, ও বিদ্যুৎশক্তিবণ্টন ছাড়া দেশের আনুষঙ্গিক ইষ্ট সাধনও যথেষ্ট হইতেছে এবং হইবে। এই প্রতিষ্ঠান দেশের দুর্গম অঞ্চলে ১০০ মাইল পথ ও ১১টি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৮০০ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া কয়েকটি নগর গড়িয়াছে—এইগুলি স্বাস্থ্যনিবাস হইতে পারিবে। স্বভাবতই এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ভাল, তদুপরি স্বাস্থ্যের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছে। হ্রদগুলিতে প্রচুর মৎস্য জন্মিবে। সবগুলি মিলিয়া এ বিষয়ে চিন্তাকে হারাইয়া দিবে। ছোটনাগপুরের অনুর্ব্বর ভূমিতে ফল ফসল ফলিবে। রাঢ় বাংলা আর রুক্ষ ধূসর শ্রীহীন থাকিবে না, গ্রামগুলি ছায়াচ্ছন্ন ও শ্যামশ্রীমণ্ডিত হইবে, ম্যালেরিয়ামুক্ত হইবে—কেবল শস্য নয়, ফলফুল সবজিতেও সমৃদ্ধ হইবে। রাঢ়ের লোক আমি—আমি A land flowing with milk and honey এই রূপের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, আসানসোলের চারি পাশে ম্যানচেষ্টার, নিউক্যাসল, বার্ম্মিংহামের একত্র সমাবেশের।

ময়ুরাক্ষী, বরাকর, দামোদরের রূপান্তর ঘটিল, কিন্তু অজয়ের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। কাজেই অজয়ের কথা বলিবার সুযোগ নাই। তবে সেচমন্ত্রী অজয়বাবুর কথা কিছু বলিতে হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে আশাতীত রূপ সহৃদয়, শিষ্ট ও মিষ্ট আচরণ করিয়াছেন। দামোদরও অত্যন্ত প্রসন্ন ও করুণাময় হইয়াছেন—অতএব আধা-সন্ন্যাসী অজয়ভায়ার নাম অনায়াসে দামোদরানন্দ স্বামী হইতে পারে।

এই সকল অভিযাত্রায় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং দেখা যায় রাশভারী পদস্থ লোকেরা আবেষ্টনীর গুণে রসিক ও মিশুক হইয়া পড়েন। আমাদের দলে এম, এল, সি ও এম, এল, এ-রা ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধনের কোন চেষ্টা হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতার উদ্দেশে একদিন বলিয়াছিলাম,—

ভাবিনাক যেন প্রসাদে তোমার যক্ষতা পাবে জাতি,
খাণ্ডববন ইন্দ্রপ্রস্থ হ'য়ে যাবে রাতারাতি।
অনশনকৃশা বৎসতরীটি হয়ে যাবে কামধেনু,
গঙ্গার যত বালুকণাগুলি হইবে স্বর্ণরেণু,
বহু শতাব্দী বঞ্চিত মোরা, মায়ামন্ত্রের বলে
ভাবিনাক যেন কল্পতরুটি পেয়ে যাব ধরাতলে।
ভুলিনাক যেন আসিয়াছ তুমি, শোণিতসিন্ধু পারে
কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানের ভগ্ন শিশির দ্বারে।

কিন্তু এই কথা ভুলিয়া গিয়া দেশের বহু লোকই যুক্তি বিষয়ে বধির ও উক্তি বিষয়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহারা রাতারাতি কামধেনু বা কল্পতরুই চাহিয়াছেন। আজ স্বাধীন কিন্তু দ্বিখণ্ডিত বাংলায় সমস্যার অন্ত নাই। অসংখ্য সমস্যার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আমাদের জাতীয় তরণীর কর্ণধারদের উজান পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি এই কথা স্মরণে রাখিয়া সিন্দ্রী, দামোদর উপত্যকা, চিত্তরঞ্জন দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া আশায় প্রফুল্লচিত্ত লইয়া ফিরিয়াছি। দেখিলাম, কর্ণধারগণ অনেকগুলি কঠিন সমস্যার সমাধানের পথে বহুদূর আগাইয়াছেন। আশা হয়, নমরক্লিষ্ট, খণ্ডাবশিষ্ট, সমস্যাপিষ্ট পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা অনতিবিলম্বেই অনেকটা বিদূরিত হইবে। রুদ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য, বামা প্রকৃতিকে দক্ষিণা করিবার জন্য সে মহাযজ্ঞের অনল সন্দীপিত হইয়াছে—তাহাতে মনে পড়ে আর্য্য ঋষির উক্তি—"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।" আশা হয়, রুদ্রদেব ক্ষেত্রপাল ও কেদারনাথের রূপ ধরিবেন, আর তাঁহার পার্শে অন্নদা আবার সিংহাসনে বসিয়া হেমদর্ব্বী হস্তে বুভুক্ষিতদের মুখে অন্ন বিতরণ করিবেন। আমরা নব যুগের অন্নদামঙ্গল রচনা করিব।

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাশ্মীরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে সুরু করার আগে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির অতীত ইতিহাস কিছু জেনে রাখা ভালো। সেই ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশটীকে ও দ্রষ্টব্যগুলিকে দেখলে দেখার ও বোঝার অনেক সুবিধা হয়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে কাশ্মীরকে জানতে হলে ঐতিহাসিক কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী থেকেই কাশ্মীরের রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস সুরু করা উচিত, কিন্তু তার আগেও কাশ্মীরের সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাকাল থেকে প্রচলিত আছে এক পৌরাণিক কাহিনী। চতুর্দ্দিকে হিমালয়ের বিভিন্ন শৈলশিখরের মাঝে সন্নিবেশিত এই সুরম্য স্থানে আগে ছিল এক বিরাট হ্রদ। এখানে শৈলসুতা দেবী পার্ব্বতী নৌকা বিহার কোরতেন। কিন্তু ক্রমে এখানে জলোদ্ভব নামে এক শক্তিশালী নাগের উদ্ভব হল। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাণীকুল তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠল। সপ্তক মনুর আধিপত্যকালে একদা মহামুনি মারিচীর-পুত্র প্রজাপতি কাশ্যপ এখানে এসে তাঁর পুত্র নীলের কাছে জলোদ্ভবের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনে তাকে ধ্বংস করার সংকল্প কোরলেন। কিন্তু জলোদ্ভব ও কম পাত্র নয়, সে ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র। অতএব কাশ্যপ তাকে ধ্বংস করার জন্য এক হাজার-বৎসর ধরে তপস্যা কোরে শক্তি সঞ্চয় কোরলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হোল, কিন্তু জলোদ্ভব প্রয়োজন মত হ্রদের জলে এমনিই গা ঢাকা দিতে লাগলো যে তাকে বধ করা দুঃসাধ্য হোয়ে উঠল। এই যুদ্ধে ক্রমে বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা কাশ্যপের ওপর প্রসন্ন হোয়ে তাঁকে সাহায্য কোরতে এলেন। অবশেষে বিষ্ণু বারামুল্লার কাছে পাহাড়ের নীচে তার হল দিয়ে এক ছিদ্র কোরে দিলেন। সেখান দিয়ে সমস্ত হ্রদের জল নীচে ভারতবর্ষের দিকে নেমে এল। (বলা বাহুল্য এখান থেকেই বিতস্তা নদী কাশ্মীরের সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ের কোলে কোলে ভারতবর্ষে ঠেলে এসেছে।) এর ফলে হ্রদ শুকিয়ে তলাকার সমতলভূমি বেরিয়ে পোড়ে কাশ্মীর উপত্যকার সৃষ্টি হোল। কিন্তু তবু চতুর জলোদ্ভবকে বধ করা গেল না, কারণ হ্রদের যে যে অংশ গভীরতর ছিল সেখানের জল থেকে গিয়ে যে ছোট হ্রদগুলি সৃষ্টি হোল (ডাগ, উলার, মানস, প্রভৃতি) তারই তলায় সে লুকিয়ে রইল। তখন দেবী পার্ব্বতী একটী সারিকার মূর্ত্তি ধরে চঞ্চুতে ছোট একটা পাথর নিয়ে উড়তে উড়তে জলোদ্ভব যেখানে লুকিয়ে ছিল সেইখানে ফেলে দিলেন। সেই পাথর

ডালের খালে

ক্রমে বড় হোয়ে পাহাড়ের আকার ধরে জলোদ্ভবকে জলেই বধ কোরলে, এই পাথরটী বর্ত্তমানের হরিপর্ব্বত, ডাল হ্রদের ওপরেই এই অনতি-উচ্চ

পাহাড়টার মাথায় আকবরের প্রতিষ্ঠিত দুর্গ আছে; মুসলমানের মসজিদ আছে, শিখদের গুরুদোয়ারা আছে, আবার হিন্দুর সারিকা দেবীরও মূর্ত্তি আছে। দেবী পার্ব্বতীর কাশ্মীরে তাই অন্য নাম "সারিকা" (ময়না) কাশ্যপের মীর অর্থাৎ ভূমি—এই থেকেই এখানের আদি নাম করন কাশ্যপ-মীর বা কাশ্মীর। কারো কারো মতে জাফরাণের জন্মভূমি বলে এদেশের নাম কাশ্মীর, কারণ জাফরাণ বা কুঙ্কুমের পুরাণো সংস্কৃত প্রতিশব্দ কাশ্মীরা অথবা কাশ্মীরাজা। কাশ্মীর যা ক্রমে দাঁড়িয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী ছেড়ে ইতিহাসের সময়ে দেখা যায় বিভিন্ন হিন্দু রাজা এখানে চার হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেন, কলহন তাঁর ইতিহাস আরম্ভ কোরেছেন খৃঃ পূর্ব্ব ১১৮৪ সাল থেকে, কিন্তু তাতে আরো ১২৬৬ বৎসর পূর্ব্বেকার ৫২ জন রাজার কথা তিনি বোলেছেন। আমাদের এ কাহিনীতে অতীতের সে দীর্ঘ ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন। খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০

ডালের একাংশ

শতকে মহারাজ অশোক কাশ্মীর জয় করেন এবং তার সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রসার লাভ করে। শ্রীনগর সহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ অশোক। বর্ত্তমান শ্রীনগর সহরের প্রায় ৪ মাইল দূরে পাণ্ড্রেথান, এখানে আজও কয়েকটা পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে—এখানেই অশোক প্রথম নগর স্থাপনা করেন। বলে রাখা ভাল—পাণ্ড্রেথানের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষগুলি মহারাজ অশোকের সময়কার নয়, অশোকের অনেক পর রাজা পার্থর (৯০৬—৯২১ খৃঃ অঃ) প্রধান মন্ত্রী মেরুবাহন নির্ম্মিত "মেরুবর্দ্ধন স্বামীর" মন্দিরের এগুলি ভগ্নাবশেষ। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে উৎসর্গীকৃত এই নবনির্ম্মিত নগরের নামকরণ হয় শ্রীনগরী, বৌদ্ধদের পর হিন্দু ও মুসলমান আমলে শ্রীনগরীর বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কেউ একে ভেঙ্গেছে কেউ বা নূতন কোরে গড়েছে। অশোকের পর জালুকা হুসকো, জুসকো, কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটরা এখানে রাজত্ব করেন। বর্ত্তমানের শঙ্করা নেরিয়ার পাহাড়ের শিখরের শিব মন্দির জালুকা তৈরী করান (খৃঃ পূর্ব্ব ২০০) বৌদ্ধস্তূপ হিসাবে। তখন এই পাহাড়ের নাম ছিল "গোপ পর্ব্বত"।

ধীরে ধীরে বৌদ্ধপ্রভাব ম্লান হোয়ে এলে, হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ কোরে শৈবমত আবার বিস্তার লাভ করে। বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক হুয়েনসাং যখন (৬৩১—৬৩৩ খৃঃ অব্দে) রাজা দুর্লভ বর্দ্ধণের সময় কাশ্মীরে আসেন তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। এখানে সেখানে যে দু'চারটী বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপ ছিল তা শুধু তাদের ধ্বংসাবশেষ থেকেই চেনা যেত। রাজা দুর্লভ বর্দ্ধণ অবশ্য এই চৈনিক পর্য্যটককে রাজসম্মানে আপ্যায়িত কোরে জয়েন্দ্র বিহারে বাসের ব্যবস্থা কোরে দেন এবং ২০ জন লেখক দেন এদেশের বৌদ্ধগ্রন্থের নকল কোরতে। তিনি ২ বছর এখানে থেকে এখানকার পণ্ডিতদের অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন। তাঁর সময় কাশ্মীরে মাত্র ৫০০০ বৌদ্ধ ও ১০০টী বৌদ্ধ মঠ ছিল। ৫২৮ খৃঃ অব্দে নিষ্ঠুরতার জীবন্ত প্রতীক কুখ্যাত হুণ মিহির-কুল কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন, হত্যা ও নিষ্ঠুরতার তাণ্ডবে এই সৌন্দর্য্যের লীলাভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেন। গুলমার্গ যেতে দূরে পীর পঞ্চল পাহাড়ের একটা শিখরকে আজও হস্তীভঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়, মিহির-কুল নাকি এখান থেকে একশ হাতীকে পাহাড়েরনীচে ফেলে দিয়ে-ছিলেন—শুধু তাদের মৃত্যুযন্ত্রণার চীৎকারে এবং বেদনায় আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। এই লোকটা নাকি জীবনে কখনও হাসেন নাই। পরবর্ত্তী রাজা পাপাদিত্য প্রজাবৎসল ও সুশাসক ছিলেন। তিনি আবার ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে আনেন এবং সংস্কৃত ভাষার—সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় প্রবর-সেনা। ইনি রাজত্ব করেন এবং তাঁর রাজধানী বর্ত্তমানের সপ্তম শতাব্দীতে শঙ্করাচিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ থেকে হরিপর্ব্বত অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (এ অংশ আজও বর্ত্তমান) কিন্তু তাঁর এই নূতন রাজধানীর নাম ছিল "প্রবরপুরা"। হুয়েনসাং যখন কাশ্মীরে আসেন তখন এই প্রবরপুরাই রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট ললিতাদিত্য, এবং অপর নাম মুক্তাপীড় (৬৯৯-৭৩৬ খ্রীঃ অব্দ)। ললিতাদিত্য নিজ শৌর্য্যবলে রাজ্যের সীমানা কাশ্মীরের বাইরে বহুদূর বিস্তৃত করেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগ তিনি জয় কোরে কনৌজ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, পশ্চিমে আফগানিস্থান দখল কোরে তারও পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার বহু অংশ এবং উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত

তিনি দখল করেন। তাঁর প্রতাপে বিরাট চীন রাজ্যের তদানীন্তন টাং বংশীয় সম্রাট তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সন্ধিস্থাপন করেন এবং মুক্তাপীড় চীন দরবারে নিজের দূত প্রেরণ করেন। চীনদরবারের ইতিহাসে মুক্তাপীড় মুটে-পী উল্লিখিত আছেন। মুক্তাপীড়ের জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাপীড় ও (৭১৩ খ্রীঃ অব্দ) চীন দরবারে দূত পাঠান। এঁর চৈনিক নাম ছিল চেন-ট্যো-লো-পি-লি। দীর্ঘ বার-বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন কোরে তিনি প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে তিব্বত দিয়ে কাশ্মীরে ফিরে এসে নূতন রাজধানী স্থাপন কোরলেন 'পরিহাসপুর' যা ক্রমে দাঁড়াল পরমপুরা এবং পরে আদি-পুরে—যা এখনও কাশ্মীরের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র। এই নূতন রাজধানীকে জাঁকিয়ে তোলবার জন্য তিনি পুরাতন রাজধানী প্রবর-পুরাকে ধ্বংস কোরলেন। পহল-গায়ের পথে মাটনের কাছে পাহাড়ের উপর বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির "মার্ত্তণ্ডের" মন্দির ললিতাদিত্যের নির্ম্মাণ করা বলে অনেকের বিশ্বাস। তার আজও যে ধ্বংসাবশেষ আছে তা থেকে অনুমান করাকঠিন নয় যে সে আমলে স্থপতি কলায়, কারু শিল্পে, নির্ম্মাণকৌশলে কাশ্মীরীরা কত অগ্রসর ছিল। মার্ত্তণ্ডের মন্দির অবশ্য নির্ম্মিত হয় ললিতাদিত্যের বহু পূর্ব্বে, তবে তিনি পরে এর অনেক সংস্কার সাধন করেন। ললিতাদিত্যের পর উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজা অবন্তীবর্ম্মণ, (৮৫৫-৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ) ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। অবন্তীপুরার দুটী বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও এর কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়ে দেয়। কালের কবলে এখানের গ্রাম মন্দির সমস্তই ভূগর্ভে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য পরবর্ত্তী মুসলমান আমলে এই সব মন্দিরকে যতদূর সম্ভব ধ্বংস করা হয়েছিল, তারপর অবহেলায় স্বাভাবিক ভাবেই কালক্রমে এগুলি ভূগর্ভে লীন হোয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে মাটী সরিয়ে এই মন্দিরের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করা হোয়েছে। এদের বিরাটত্ব ও স্থাপত্য কৌশল আজও দর্শকের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। অবন্তী বর্ম্মণের এক ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্য (হয়ত বা সূর্য্য)—বিতস্তার অতিরিক্ত জল বর্ত্তমান সোপুর সহরের পাশ দিয়ে নিকাশের ব্যবস্থা কোরে স্থানীয় অধিবাসীদের প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর নামেই এ গ্রামের নাম হয় সূর্য্যপুর—ক্রমে তা রূপান্তরিত হোয়েছে সোপুরে। (৮৮৩-৯৯২ সালে) কাশ্মীরে পড়ল এক খামখেয়ালী অত্যাচারী রাজার হাতে এঁর নাম শঙ্কর বর্ম্মণ। তিনি আবার এক নূতন রাজধানী স্থাপন কোরলেন বর্ত্তমান পত্তন বা পট্টনের কাছে এবং নূতন রাজধানীর সমৃদ্ধির জন্যে পূর্ব্বপুরুষ ললিতাদিত্যের অনুকরণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী পরিহাসপুরকে ধ্বংস কোরলেন। রাণী দিদ্দা (৯৫০-১০০৩ খ্রীঃ অব্দ) গজনীর মামুদের নিষ্ঠুর আক্রমণ

শালিমার বাগ

সন্ধ্যায় শালিমার বাগের একাংশ

সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। এর পরই ধীরে ধীরে দুর্ব্বল রাজাদের হাতে পড়ে কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হোয়ে পড়ল —দূরবর্ত্তী দেশগুলি ক্রমে ক্রমে স্বপ্রধান হোয়ে কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল, কাশ্মীরেও একের পর এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও পতন ঘটল, রাজা সিংহদেও—(১২৯৫—১৩২৪ খ্রীঃ অব্দ) এর রাজত্ব কাল তাঁর দরবারে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের তিনটী আশ্রয়প্রার্থী—তিব্বতের রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'রানচেল', দারদীস্থানের শাসক লঙ্কার চক্ এবং কোয়াটের বিখ্যাত পীর কুরশা'র পৌত্র, শাহমীর, এই তিন জন আশ্রয় প্রার্থীই পরে আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ কোরে কাশ্মীরে হিন্দু সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত করে এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করে। রাজা সিংহ দেও এর সময় (১৩২২ খৃঃ অব্দে) তুর্কীরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। দুর্ব্বল রাজা এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী রামচাঁদ (সম্ভবত রামচন্দ্র) রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান। তুর্কীরা লুঠতরাজ সেরে চোলে গেলে রামচাঁদ রাজ্যে ফিরে আসেন। তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থী বিশ্বাসভাজন রাণচেন এক গভীর রাত্রে প্রধান মন্ত্রী রামচাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে—তার এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার সহায় ছিল সোয়াটের সাহমীর এবং কয়েকজন লাদাকী। রামচাঁদকে হত্যা কোরে রাণচেন নিজেকে কাশ্মীরের রাজা বোলে ঘোষণা করেন এবং রামচাঁদের সুন্দরী কন্যা কুটরাণীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর রাণচেন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ কোরে রাণচেন সা' থেকে সদর উদ্দীন নাম নিলেন। এই ধর্ম্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হোলেন এবং যথাসম্ভব হিন্দুদের নির্য্যাতন সুরু করেন। ভাগ্যক্রমে তিনি মাত্র আড়াই বৎসর রাজত্ব কোরে ১৩২৭ খৃঃ অব্দে মারা যান। রাণচেনের মৃত্যুর পর পলাতক রাজা সিংহদেও এর ভাই উদ্যান দেও কিস্তওয়ার থেকে ফিরে এসে নিজেকে রাজা বোলে ঘোষণা করেন এবং বিধবা রাণী কুটরাণীকে বিবাহ করেন। প্রায় ১৫ বৎসর রাজত্ব কোরে উদ্যান দেও মারা গেলে রাণী কুটরাণী নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সাহমীর সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে রাণীকে সরিয়ে নিজেকে রাজা বোলে প্রচার কোরল এবং কুটরাণীকে বিবাহের প্রস্তাব কোরলে। কুটরাণী আত্মহত্যা কোরে এ গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা কোরলেন। এই ভাবে বিশ্বাসঘাতক সাহমীর ধর্ম্মত্যাগী রাণচেনের পর কাশ্মীরে মুসলমান সুলতানীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। রাজা হোয়ে সাহমীর নাম নিলেন সামসুদ্দীন। এই বংশের অন্যতম সুলতান সুলতান সেকেন্দার (১৩৯৪-১৪১৭ খৃ অঃ) হিন্দুবিদ্বেষ এবং সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য আজও স্মরণীয়। কাশ্মীরের কোন হিন্দু মন্দির এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নাই। কোরাণ বা তরবারি এই ছিল হিন্দুদের প্রতি তার নির্দেশ। ইসলাম গ্রহণ না কোরলে মৃত্যুকে বেছে নিতে হবে অথবা লঘু শাস্তি হিসাবে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হোতে হবে। এই অত্যাচারী ধর্ম্মোন্মাদ সুলতানের আমলে কাশ্মীরের হিন্দুদের অনেকেই বাধ্য হোয়ে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ও প্রজাদের মধ্যে এই ভাবে ঘটল ধর্ম্মান্তর! কালের চক্রে সুখ ও দুঃখ অবিরাম চলছে, একের পর এক যেমন তাব্যক্তির পক্ষে, তেমনি জাজাতি ও দেশের পক্ষে। ধর্ম্মোন্মাদ অত্যাচারী সিকান্দারের পর কাশ্মীরের সুলতান হোলেন উদার, মহৎ, ধার্ম্মিক, প্রজাবৎসল সুলতান জিন-উল-আবদান (১৪২০-১৪৭০)—এঁর মহত্ত্ব, সমদর্শিতা, শৌর্য্য এবং প্রজাবৎসলতা আজও কাশ্মীরে প্রবাদের মত চলে আসছে। জিজ্ঞাসু পাঠকদের বলে রাখা ভাল কলহনের রাজতরঙ্গিনীই কাশ্মীরের একমাত্র ইতিহাস নয়। তবে এইটাই প্রথম প্রামাণিক ইতিহাস। রাজা হর্ষের (১০৮৯-১১০১ খৃ অঃ) মন্ত্রী ব্রাহ্মণ চম্পকের পুত্র এই কলহন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক হেলারাজা (৮ম শতক) রত্নাকর (৮৭২-৯০০ খৃঃ অব্দে রাজা অবন্তীবর্ম্মার সমসাময়িক) এবং রাজা কলসের (১০৬৩-১০৮৯ খৃঃ অঃ) আমলের ক্ষেমেন্দ্রর (৯৯০-১০৬৫ খৃঃ অঃ) ইতিহাস থেকে প্রচুর উপকরণ নিয়ে রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। শুধু যথার্থ ইতিহাস হিসেবেই নয়, একখানি প্রাচীন কাশ্মীরী সংস্কৃত সাহিত্য হিসেবেও 'রাজতরঙ্গিনী' আজ আদৃত।

কলহনের দীর্ঘ চারশো বছর পর সুলতান জৈন-উল-আবদীন তাঁর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির চেষ্টায় পুনরায় ইতিহাসের এই বিচ্ছিন্ন ধারাকে তাঁর সময় পর্য্যন্ত যোগ করবার ভার দেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জোনা রাজাকে এবং ফার্সী ভাষায় মোল্লা আহমদকে। এর পর পণ্ডিত শ্রীধর সংস্কৃতে ফতেসাহার সিংহাসন লাভ পর্য্যন্ত (১৪৮৬ খৃঃ অঃ) ইতিহাস রচনা করেন। তার পর "রাজবলী পতাকা" ১৫৮৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় সম্রাট আকবর কাশ্মীর দখল করেন। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আকবর সংস্কৃতে তাঁর আমলের ইতিহাস লেখবার ভার দেন প্রিয় ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণকে, এর পরও হায়দার মালিক (১৬২০) নারায়ণ কাউল (১৭১০) মহম্মদ আজম (১৭৪৭) বীরবল কারু (১৮৫০) প্রভৃতি অনেকেই ইতিহাসের এই ধারাকে বহমান রেখে এসেছেন। কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের প্রথম থেকেই ফারসী রাজভাষা এবং সরকারী ভাষা, কিন্তু এখানের হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায় সংস্কৃতকে সযত্নে রক্ষা করায় ক্রমে দুই ভাষার কিছু সংমিশ্রণ হোয়েছে মাত্র—ভারতের অন্যান্য অংশের মত সংস্কৃত অবহেলিত হোয়ে লুপ্ত হয় নাই। কাশ্মীরের মুসলমান তাদের কথ্য ভাষার মধ্যে আজও স্বাভাবিক-ভাবেই ব্যবহার করে অপবিত্র, সাধু, লোভ, ত্যাগ, স্নান, সংকল্প, ধ্যান, নির্ম্মল, রাজহংস, কেশ, সুন্দরী, আশা, প্রভাত প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিবরূপে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভা ও বিধান পরিষদে ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট বা সরকারী আয় ব্যয় বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫২-৫৩ সালের আয় ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব ও ১৯৫৩-৫৪ সালের আয় ব্যয়ের সংশোধিত হিসাবও উপস্থাপিত করেন। বাজেট বক্তৃতায় বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবের সহিত তুলনামূলকভাবে ১৯৫৪-৫৫ সালের বরাদ্দ মিলাইয়া তিনি সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। এক নজরে বুঝিবার সুবিধার জন্য উপরোক্ত হিসাবগুলির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। চাষীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসায়নিক সারের কেনাবেচা বাড়িয়াছে, আয়করের দরুণ কেন্দ্রীয়সরকারের নিকট হইতে ২৮ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে, সামান্য আয় বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ। তবে এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাসায়নিক সার অধিকাংশক্ষেত্রেই ধারে দেওয়া হইয়াছে, ইহার ফলে কাগজে কলমে কিছু আয় বাড়িলেও কৃষিখাতে খরচও বাড়িয়াছে প্রচুর। রাজস্বখাতের উল্লিখিত ব্যয় বৃদ্ধি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বাজেটাতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির জন্যই হইয়াছে :—কৃষিখাতে—২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ; অভাবগ্রস্ত কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত—১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ;

হাজার টাকার হিসাবে

	১৯৫২-৫৩ (চূড়ান্ত হিসাব)	১৯৫৩-৫৪ (বাজেট)	১৯৫৩-৫৪ (সংশোধিত হিসাব)	১৯৫৪-৫৫ (বাজেট)
আয়—				
পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জের	৭,২৭,৬৩	২,০২,১৮	৭,৫৯,২৫	১১,৪৮
রাজস্ব আদায়	৩৭,৪৫,৮৮	৩৮,১৫,৮৭	৩৮,৮১,৯৬	৩৯,৭৩,২২
ঋণ, আকস্মিক তহবিল ও সরকারী হিসাবের আয়	১,১১,১৫,০১	১,৬২,১৬,৩০	১,৪২,৪৭,৫৮	১,২০,৪০,৭৯
মোট—	১,৫৫,৮৮,৫২	২,০২,৩৪,৩৫	১,৮৮,৮৮,৭৯	১,৬১,৪৫,৪৯
ব্যয়—				
রাজস্বখাতে ব্যয়	৩৮,৯৪,১২	৪৩,২৬,৬৩	৫০,৫৭,১৩	৫৩,৩০,৭৬
মূলধনখাতে ব্যয়	১৩,০৪,২১	২১,০১,৫৮	১৮,৬৬,৩০	২০৮২,১১
ঋণ, আকস্মিক তহবিল ও সরকারী হিসাবের ব্যয়	৯৬,৩০,৯৪	১,৪২,১৭,৫৬	১,১৯,৫৩,৮৮	৯৯,৬৩,৯৯
পরবর্ত্তী বৎসরের জের	৭,৫৯,২৫	—৪১১,৪২	১১.৪৮	—১২,৩১,৩৭
মোট—	১,৫৫,৮৮,৫২	২,০২,৩৪,৩৫	১,৮৮,৮৮,৭৯	১,৬১,৪৫,৪৯
প্রকৃত ফলাফল * :—				
রাজস্বখাতে	—১,৪৮,২৪	—৫,১০,৭৬	—১১,৭৫,১৭	—১৩,৩৭,৫৪
রাজস্ব বহির্ভূত খাতে	+১,৭৯,৮৬	—১,০২,৮৪	+৪,২৭,৪০	+৯৪.৬৯
পরবর্ত্তী বৎসরের জের ব্যতীত ফলাফল	+৩১,৬২	—৬,১৩,৬০	—৭,৪৭,৭৭	—১২,৪২,৮৫

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৩-৫৪ সালের যে বাজেট পেশ হইয়াছিল, এবার সংশোধিত হিসাবে তাহার রাজস্বখাতে আয়ের অঙ্কে মাত্র ৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইলেও ব্যয়ের অঙ্কে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। ইহার ফলেই বাজেটের ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতির স্থলে সংশোধিত হিসাবে এই খাতে প্রায় ১২ কোটি

সরকারী কর্ম্মচারীদের কম দামে খাদ্যশস্য বণ্টনের হিসাব নিকাশ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য—৭৬ লক্ষ টাকা ; সোনারপুর—আরাপাঁচ পরিকল্পনায় দ্বিতীয় দফা ও বাগজলা পরিকল্পনায়—৪৮ লক্ষ টাকা ; শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থান খাতে—৪২ লক্ষ টাকা ; সুন্দরবন অঞ্চলে নলকূপ খনন—১৫ লক্ষ টাকা।

রাজস্বখাতে প্রভূত ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিলেও রাজস্ববহির্ভূত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে কমিয়াছে বলিয়া ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত

* উদ্বৃত্ত + চিহ্নে এবং ঘাটতি — চিহ্নে বুঝিতে হইবে।

হিসাবে নিট ঘাটতি তবু কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। মূলধনখাতে বাজেটের ২১ কোটি ২ লক্ষ টাকার স্থলে সংশোধিত হিসাবে ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে। এই হ্রাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শরণার্থী পুনর্ব্বাসন খাতে জমি সংগ্রহের ব্যাপারে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা; বহুমুখী নদনদী পরিকল্পনা সমূহে, বিশেষতঃ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায়—৭১ লক্ষ টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৪৩ লক্ষ টাকা; কাঁচড়াপাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৩৭ লক্ষ টাকা; রাজপথ উন্নয়নে—২৮ লক্ষ টাকা।

১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণের নিকট হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাজেটে ২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব ছিল। ব্যয়বৃদ্ধির জন্য এই ঋণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গ্রহণীয় বাজেটের ২২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ঋণ সংশোধিত হিসাবে প্রায় দেড় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। ইহাতেও ব্যয়সঙ্কুলান হয় নাই বলিয়া নিট ঘাটতি ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা রাজ্যসরকার শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাবের জের বা উদ্বৃত্ত হইতে মিটাইতেছেন এবং ফলে ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা হাতে লইয়া কার্য্য সুরু করিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য মাত্র ১১ লক্ষ টাকা জের রাখিয়া ১৯৫৩-৫৪ সালের আর্থিক বৎসর শেষ করিতেছেন।

১৯৫৩-৫৪ সালের এই আর্থিক দুরবস্থা ১৯৫৪-৫৫ সালেও অবসিত হইবে না। ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে রাজস্বখাতে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে ১৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, রাজস্ব-বহির্ভূত খাতের ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ধরিলেও নিটঘাটতির পরিমাণ ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার বেশি। এবৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪ কোটি টাকা সাধারণের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন।

১৯৫৪-৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বখাতে ৩৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ইহা ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বেশি। অন্যান্য হিসাবে অল্পবিস্তর হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব ছাড়িয়া দিলেও এবার শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থান খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন। রাজস্বখাতের আয়ের প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপঃ—ভূমিরাজস্ব—২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা; আবগারী—৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা; ষ্ট্যাম্প—২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা; বিদ্যুৎ কর—১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা; প্রমোদ ও জুয়া—১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; বিক্রয়কর—৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা (পেট্রোল বিক্রয় কর—১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সমেত); কেন্দ্রীয় সরকার সংগৃহীত আয় কর, পাটশুল্ক প্রভৃতি রাজস্বের অংশবাবদ—৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা; কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খাতে সাহায্য বাবদ—৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।

১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে ব্যয় দেখানো হইয়াছে, ৫০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রধান কারণ কয়েকটি দফায় ব্যয়বৃদ্ধি। ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সাহায্য খাতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা; নূতন বাড়ী ও রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; ভূমি-ব্যবস্থা পুনঃনির্দ্ধারণে—১ কোটি টাকা; সেচ খাতে (সোনারপুর আরা-পাঁচ পরিকল্পনার ২য় দফা ও বাগজলা পরিকল্পনা)—৮০ লক্ষ টাকা; সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬১ লক্ষ টাকা; ঋণের সুদ—৫৪ লক্ষ টাকা; জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে—৪৫ লক্ষ টাকা ইত্যাদি। পুলিসখাতেও ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে রাজস্বখাতের কয়েকটি দফায় ব্যয় হ্রাসেরও প্রস্তাব হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষিখাতে (সারবণ্টন) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা; দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত সাহায্যখাতে ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের সস্তায় খাদ্যসরবরাহের হিসাবে ৬৫ টাকা উল্লেখযোগ্য।

এবারের বাজেটে রাজস্বখাতে ব্যয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফার হিসাব নিম্নরূপ:—ভূমি রাজস্ব আদায়—১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা; সেচ (বহুমুখী নদ-নদী পরিকল্পনার অংশ সহ)—২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা; শাসন-বিভাগ—৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; বিচার বিভাগ—১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা; কারাবিভাগ—১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা; পুলিস—৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা; শিক্ষা—৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা; চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য—৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা; কৃষি—২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা; দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত সাহায্য—৮৫ লক্ষ টাকা; আশ্রয়প্রার্থী—৫৭ লক্ষ টাকা; সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা; শিল্প (কুটিরশিল্প সমেত)—৭০ লক্ষ টাকা; খাদ্যসরবরাহ—৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা; দেশবিভাগের পূর্ব্ববর্তী হিসাব নিকাশ—৫০ লক্ষ ৭২০ হাজার টাকা; সমবায়—২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

মূলধন খাতে ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটের তুলনায় সংশোধিত হিসাবে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাসের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবের ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে মূলধনখাতে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ২০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এই মূলধন খাতের হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসর দামোদর পরিকল্পনায় ১১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ৩ কোটি টাকা, রাজপথ উন্নয়নে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, কাঁচড়াপাড়া উন্নয়নে ৯০ লক্ষ টাকা, শরণার্থী পুনর্বাসনে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, সমাজ উন্নয়নাদিতে ১ কোটি ৩১ লক্ষ লক্ষ টাকা, যানবাহনখাতে ৩০ লক্ষ টাকা ও কলিকাতার উত্তরদিকের গ্রামাঞ্চলে ও কুচবিহারে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ ধরা হইয়াছে ২৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, এবৎসর বাজেটে এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া ২৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই ২৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে দামোদর পরিকল্পনায় ১১ কোটি ৩৮

লক্ষ টাকা, ময়ূরাক্ষী ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৪ কোটি টাকা, আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে অগ্রিম বাবদ মূলধন খাতে ৫ কোটি ৩ লক্ষ টাকা; খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৭০ লক্ষ টাকা ও সুন্দরবন এলাকায় স্থায়ী উন্নয়নে ৫২ লক্ষ টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিম্নলিখিত দফায় অর্থ বণ্টন করিবেন বলিয়া বাজেটে প্রস্তাব করা হইয়াছে:—কৃষিজীবীদের ৮৫ লক্ষ টাকা (গরু কিনিবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সমেত), আশ্রয়প্রার্থীদের কৃষিকর্ম ও গৃহাদির জন্য—৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ—৬২ লক্ষ টাকা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে—১১ লক্ষ টাকা, শিল্পীদের ৫ লক্ষ টাকা, সরকারী কর্ম্মচারীদের গৃহনির্ম্মাণ বাবদ—৪ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৮৩ কোটি ২৬ লক্ষ (নিজ দায়িত্বে সংগৃহীত ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ ৭৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা)। আগামী বৎসরের বা ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা (নিজদায়িত্বে সংগ্রহ ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ৯৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা)।*

বর্ত্তমানে এদেশে আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপক প্রয়াস চলিতেছে। তাছাড়া স্বাধীন দেশে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ-বৃদ্ধি স্বাভাবিক। সেদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি সহানুভূতির সহিতই দেখিতে হইবে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইবে এবং শিল্পপ্রসারের অনুপূরক বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে প্রচুর। এইরূপ বিরাট পরিকল্পনায় অর্থব্যয়ও হইবে বিপুল পরিমাণ। পশ্চিমবঙ্গের আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী এইখাতে ব্যয়ের ন্যায্য অংশ তাহাকে বহন করিতে হইতেছে এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ব্যয়ের তথা ঘাটতির অঙ্কও স্ফীত হইতেছে। এদেশে শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি কিরূপ শোচনীয়, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত বিধিব্যবস্থায় যে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন বিজড়িত, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ সন্ধান করা ছাড়া উপায় নাই। সেদিক হইতে যে সব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা সবদিক বজায় রাখিয়া আর কিরূপে কতখানি বাড়ানো চলে, তাহাই চিন্তার বিষয়। সীমাবদ্ধ সম্পদসম্পন্ন ও আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসনের ব্যয়বাহুল্যে বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গের সরকারী অর্থনীতি রাজনৈতিক সুবিধাবাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া অর্থনীতিবিদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষাখাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, ১৯৫১-৫২ সালে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫২-৫৩ সালে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে (সংশোধিত হিসাব) ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে (বাজেট) ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর মনোযোগের পরিচায়ক। ১৯৫৪-৫৫ সালে রাজস্বখাতে মোট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে ধরা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সদর ও মহকুমা হাঁসপাতালের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪১টি ও ১৯৫০টি, দুই বৎসর পরে ১৯৫৫ সালের প্রথমে এই সংখ্যা ২৭১টি ও ২৪৬৯টিতে উঠিলে উন্নতি স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্যের লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯৫০ সালে এই রাজ্যে বিভিন্ন রোগে ৩,৫৮,৮৭৮জন মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৫৩ সালে এই সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেকে নামিয়া আসিয়াছে (সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসের হিসাব ১,৬৩,৫৬১জন)। সুন্দরবনের মত সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকায় উন্নয়ন অথবা জলপ্লাবিত সোনারপুর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা অর্থব্যয় বর্ত্তমানে অসুবিধাজনক হইলেও স্থায়ী জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে এই অর্থব্যয় অপচয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট-ঘাটতি প্রধানতঃ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য। ১৯৫৪-৫৫ সালে উন্নয়নের হিসাবে বাজেটে ১৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, এই বৎসর রাজস্বখাতে মোট ঘাটতি ১৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের একটি বড় অংশ উৎপাদনমূলক ব্যয় হওয়ায় (স্বাধীনতার পর উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে উৎপাদনমূলক ব্যয় ১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা) পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে এই ব্যয় সহায়তা করিবে বলিয়াই আশা করা যায়।

প্রচণ্ড আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও সাহসের সহিত দেশের স্থায়ী উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু তবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃতকর্ম্ম এমন অনেক আছে যাহার জন্য শুধু পরিষদের বিরোধীদল নয়, সাধারণ অনবধানী ব্যক্তিও তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার এবং কলিকাতা ও কুচবিহারে বাস ব্যবসার কথা ধরা যাক। প্রথম খাতে ১৯৫২-৫৩ সালে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে, ১৯৫৩-৫৪ সালে (সংশোধিত হিসাবে) ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ক্ষতি ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। বাজারে গভীর সমুদ্রের মাছের মণকরা দর অন্ততঃ ৫০ টাকা, অথচ সরকার এই মাছ ১৭॥০ মণ দরে বেচিয়া পাইকারের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স

---

* কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যে ঋণ ধরা হইয়াছে, তাহার দফাগুলি নিম্নরূপ:—রিজার্ভব্যাঙ্কের অখণ্ড বাংলার দেনা পরিশোধ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (পূর্ববঙ্গ সরকারের ভাগেও সমপরিমাণ টাকা পড়িয়াছে), শরণার্থী পুনর্বাসন—২৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, দামোদর পরিকল্পনা—৪২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, ময়ূরাক্ষী ও অন্যান্য পরিকল্পনা—১৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, খাদ্যশস্য সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা—৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, কলিকাতায় ছাত্রদের ভীড় কমাইতে কলেজ স্থাপন—৮০ লক্ষ টাকা; সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, সুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা—৫২ লক্ষ টাকা ও শিল্পশ্রমিকদের বাসগৃহ পরিকল্পনা—৩ লক্ষ টাকা।

বাড়াইতেছেন। এই ক্ষতিস্বীকার কাহার স্বার্থে? বেসরকারী একখানি বাসের মালিকানা যে বাজারে মানুষকে বড়লোক করিয়া দেয়, সে বাজারে কলিকাতায় যথাক্রমে ৩১১ খানি, ৩০২ খানি ও ৩৫২ খানি সরকারী বাস চালাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫২-৫৩ সালে ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে (সংশোধিত হিসাবে) ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ১৯৫৪-৫৫ সালে (বাজেট) ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ক্ষতিস্বীকারের কি যুক্তি থাকিতে পারে? উড়িষ্যা সরকারও তো বাসের ব্যবসা করেন, তাঁহারা কি করিয়া ১৯৫২-৫৩ সালে মাত্র ৯৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা আয় হইতে এই ব্যবসায়ে ১৩ লক্ষ টাকা নিট লাভ করিলেন?* প্রাক্‌যুদ্ধকালে হিসাবে চতুর্গুণ দরে খাদ্যশস্য বেচিয়াও একচেটিয়া বাজারের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে (সংশোধিত হিসাব) ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৫৪-৫৫ সালে (বাজেট) ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা লোকসান দিতেছেন। এই ক্ষতি জনসাধারণই যখন পূরণ করিবে, তখন জনসাধারণকে খোলাবাজারে প্রতিযোগিতামূলক দলের সুযোগ লইয়া যথাসত্বর খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে দেওয়াই দরকার? খাদ্যবিভাগ উঠিয়া গেলে যে মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানেরা বিপন্ন হইবে, তাহাদের অপরাপর সরকারী বিভাগে চাকুরী দেওয়ার চেষ্টাতো করিতেই হইবে (৩০,০০০ শিক্ষক নিয়োগের প্রয়াস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য), প্রয়োজন হইলে তাহাদের বেকার-ভাতা দিয়াও সাম্প্রতিক খাদ্য স্বচ্ছলতার সুযোগে খাদ্যবিভাগ তুলিয়া দেওয়া উচিত। কলিকাতার জনবাহুল্য কমাইবার জন্য কল্যাণীর মত নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু কল্যাণীর সাফল্য সম্ভাবনার নিম্নতম হিসাব ধরিয়াই ইহার জন্য অর্থব্যয় বাঞ্ছনীয়। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্ব্বসমেত ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০৯ কোটি টাকা অর্থাৎ রাজ্যের রাজস্বখাতের মোট বার্ষিক আয়ের আড়াই গুণেরও বেশি। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাফল্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়া এই পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ ভার পরিশোধের প্রশ্ন কোন সময়ই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। জনকল্যাণকর যে সব পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী, সেগুলিতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ সাহসের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু যে তরীতে ফাটল উঠিয়াছে, তাহাতে নূতন ভার চাপাইবার আগে যথেষ্ট সাবধানতা আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয়কর-খাতে ক্রমিক আয় হ্রাসই তাহার প্রমাণ। কাজেই ঋণ পরিশোধের সমস্যা এখন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ সময় নূতন কর সংস্থাপন নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক।

মোটের উপর আর্থিক অসুবিধার দিনে সরকারের সহিত জনসাধারণের প্রীতিমূলক সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়াই দরকার। এজন্য সরকারকে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। রাজনৈতিক বিরোধিতা সরকারের জনপ্রিয়তার অন্তরায়, এছাড়া যে কোন ছোটখাট কাজে সরকার অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলে দুর্নাম বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাহুল্য সত্যই চোখে লাগে। নূতন ব্যয়বহুল কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে চিন্তা ভাবনার যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনি আবশ্যকতা আছে সরকারী ব্যয়-সঙ্কোচের। বলা বাহুল্য নানা বিভাগে সরকারের মিতব্যয়িতা সপ্রমাণ হইলে তবেই শিক্ষা সম্প্রসারণের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অর্থাভাবের অজুহাত লোকে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবে।

* কুচবিহারেও সরকারী বাস চালাইয়া ১৯৫২-৫৩ সালে (গাড়ী ৩২ খানি) ৭২ হাজার টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে (সংশোধিত হিসাব) (গাড়ী ৩৫ খানি) ৩২ হাজার টাকা এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে (বাজেট) (গাড়ী ৩৫ খানি) ৩৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইতেছে।

শঙ্খ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ঊর্ম্মি-মালা-উদ্বেলিত সমুদ্র সৈকতে
ফেন-শুভ্র স্বর্ণ-কান্তি বালু শয্যা পরে
একান্তে কেটেছে কাল। আগ্রহে—আদরে
তরঙ্গ চুম্বিত মোরে। দূর কক্ষ-পথে
সূর্য্য—শশী যেতে যেতে নীলাম্বর হ'তে
মোর শুভ্র দেহ-তটে আনন্দ শিহরে
গুঁড়া গুঁড়া আলো-ফাগ আবেগের ভরে
ছড়াত সতত। এবে হায়, কোনমতে
শঙ্খ বণিকের বিপণিতে—পণ্য-হাটে
লূতা-তন্তু সমাচ্ছন্ন পাথুরে বেদীতে—
পাষাণ বিগ্রহ পাশে বাকী দিন কাটে
মৃতায়িত। তবু সত্য পরিচয় নিতে
চাও যদি কোনদিন, বাজাও আমায় ;-
সমুদ্র-তাণ্ডব মোর বক্ষে তন্দ্রা যায়।

গভীর নৈরাশ্য

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এস্‌সি

যখনই আমি কোন কাজের জন্য এভিগনন্‌ে যেতাম সেখানকার একটী ছোট হোটেলেই সকল সময় থাকিতাম। পিরোত্যু সেখানকার সমস্ত কাজই করিত এবং আমার মনে হয় সেই হোটেলের একমাত্র পরিচারক ছিল সেই। হোটেলের গাড়ী লইয়া সে ষ্টেশনে যাইত, নীচ হইতে উপরে সমস্ত জিনিষ সে বহিয়া লইয়া যাইত— যেন সেগুলি শোলার তৈরী, দিনে দুইবার করিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া মেঝেটা ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিত, এমন কি কফি খাইবার ঘরে সে বয়ের কাজ করিত। লোকটা এত ভদ্র এবং প্রফুল্ল যে সব সময়ে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। যখন সে হাসিত তখন কেবল তাহার ঠোঁটেই হাসি থাকিত না, তাহার গভীর কালো চোখ, বাঁশীর মত নাক, কঁাপাল চুল, এমন কি তাহার গোঁফও যেন হাসিতে উদ্ভাসিত হইতে থাকিত। সকল সময় অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক এরূপ পরিচারক আর দু'টি দেখি নাই। সে যে কেবল হোটেলের আগন্তুকদের নিকট প্রিয় ছিল তাহা নহে, আশ পাশের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সে যখন ষ্টেশন ও হোটেলের মধ্যে গাড়ী লইয়া যাতায়াত করিত তখন রাস্তায় প্রায় প্রত্যেক লোককে মাথা নাড়িয়া অভিবাদন জানাইত। পৃথিবীর সকলের সহিতই যেন তাহার সদ্ভাব ছিল এবং প্রত্যেকেই তাহাকে ভালবাসিত। কিন্তু এত জনপ্রিয় হওয়ায় কিছু কিছু অসুবিধাও ছিল। সে নিজের গলার স্বর শুনিতে ভালবাসিত এবং পরিচারকের নিকট হইতে লোকে যতটা আশা করে তাহা অপেক্ষা অধিক আত্মীয়তা তাহার নিকট হইতে পাইত; কিন্তু তাহার ব্যবহার এতই সরল ও স্বাভাবিক ছিল যে কেহ দোষ ধরিত না।

খাবারের থালাগুলি যখন ঘর হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইত, তখন ঘরে যে কেহই থাকুক না কেন পিরোত্যু তাহার সহিত কথা বলিত। কিন্তু কথাবার্তা বেশী হইতে পারিত না কারণ হয় হোটেলের কর্তা নয়ত কোন হোটেল-বাসী তাহাকে কোন না কোন কাজের জন্য ডাকিত। যাহা হউক প্রথম দিনেই সে আমাকে অনেক কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে বলিল—"ভেবে দেখুন একবার, আমার ছোট ভাই সৈন্যবিভাগের একজন অফিসার। খুবই আশ্চর্যের কথা, নয় কি? এক ভাই অফিসার, আর এক ভাই পরিচারক। তবুও এটা সত্যি। আমার ভাই—

"পিরোত্যু, দশ নম্বরের মহিলাটি তাঁহার লগেজ চাইছেন" "পিরোত্যু, পাচ নম্বর ঘরে কফি নিয়ে যাও" "পিরোত্যু, শীঘ্র গাড়ী বাহির কর।" এই অদ্ভুত-কর্মা লোকটি তীরের মত ঘরের বাইরে চলিয়া গেল এবং স্থির-মস্তিষ্কে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজগুলিই করিল। কিছুকাল পরে আবিষ্কার করিলাম যে তাঁহার ভাই-ই একমাত্র গল্পের বিষয়। যদিও সে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিত না তবুও তাহার জন্য গর্বিত ছিল, এমন কি একথাও বলা চলে যে সে তাহাকে পূজা করিত। একজন কৃষক যেমন আবহাওয়া ও সূর্যকিরণ ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলিতে পারে না, সেইরূপ সেও সর্বদা ভাই এর কথাই বলিত। ভাই এর ছায়া যেন তাহার জীবনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। আর এটা খুবই আশ্চর্যের কথা পূর্বদিন সে যেখানে কথাবার্তা থামাইত অন্য দিন ঠিক সেইখান হইতেই আরম্ভ করিত, যেন আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় নাই।

একদিন হঠাৎ আমাকে বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই জানিতে ইচ্ছা করেন কি করিয়া তাহা সম্ভব হইল?" আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না সে কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতেছে এবং তাহাকে তাহা জানাইলে উত্তর

দিল, "আমার ভাই কি করিয়া সৈন্য বিভাগে অফিসার হইল তাহা বলিতেছি। আমাদের গ্রামের নিকটে একজন বৃদ্ধা মহিলা থাকিতেন। তিনি অতিশয় ধনী কিন্তু তাহার একমাত্র পুত্র মরিয়া গিয়াছিল। আমার ভাই ও আমি অনাথ ছিলাম। আমার ভাইএর সুন্দর চেহারা দেখিয়া এবং তাঁহার পুত্রের সমবয়সী থাকায় তিনি তাহার সমস্ত ভার বহন করিতে লাগিলেন। স্কুলের শিক্ষার পর তাহাকে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। কিছুদিন পূর্বে মহিলাটি মারা গিয়াছেন এবং শুনিয়া আমি খুবই দুঃখিত কারণ আমার ভাই—"

"পিরোত্যু,তুমি কোথায়? দেখ কে ঘণ্টা বাজাইতেছে।"

পরের দিন আবার পিরোত্যুর গল্প চলিতে লাগিল। সে বলিল, "সেই বৃদ্ধা মহিলাটি—" আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ মহিলা?" সে বলিল, "যে বৃদ্ধা মহিলাটি আমার ভাইকে সাহায্য করিত, তিনি মরিবার সময় তাহাকে অনেক টাকা দিয়া গেছেন। তাহার এখন বেশ ভালই আয় হইতেছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে সে তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী আয় করিতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহিলাটি তোমায় কি দিয়া গিয়াছে?" সে আশ্চর্য হইয়া উত্তর দিল, "আমাকে? ' আমাকে কিছুই দেয় নাই, মহাশয়। সবই আমার ভাইকে দিয়া গিয়াছে, সে যে তাহার ছেলের সমবয়সী।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমায় ভাই কি তোমার নিকট আসে?"

"হাঁ, পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে লম্বা ছুটী পাইয়া সে বাড়ী আসিয়াছিল। আমার কর্তা আমাকে চার দিনের ছুটী দিয়াছিলেন। তাহার সহিত থাকিবার পক্ষে চারদিন খুবই অল্প, আর তা' ছাড়া চারদিনও তাহার সহিত থাকিতে পারি নাই। তৃতীয় দিন রাত্রেই আমি এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার ভায়ের আরও দুই তিন জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল সেজন্য দুইদিনের বেশী আমার সঙ্গে থাকা সম্ভব হইল না। যদিও সে একথা বলে নাই তবুও আমার মনে হইল যে গ্রাম তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এটা আশা করাই সঙ্গত, কারণ হাজার হোক সে একজন সৈন্য-বিভাগের অফিসার তা।"

"সে কি তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করে?"

মনে হইল এই প্রশ্নে পিরোত্যু প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

"মহাশয়, আমাকে সাহায্য? কেন, না মহাশয়? আমি যে কাজ করি সে কাজ করিতে সে তো অভ্যস্ত নহে।

আমি বলিলাম, "না, সে কথা বলি নাই! তাহার তো টাকার অভাব নাই তোমায় কিছু পাঠায় কি না?

"না, আর যদি সে পাঠাইত আমি লইতাম না। আমি বেশ ভাল মাহিনাই পাই, তা ছাড়া ভদ্রলোকেরা দয়া করিয়া ভাল রকম বখশিস আমাকে দেন। আমার তো তাহার মত খরচ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা যদি মনে রাখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমার ও তাহার অবস্থা সমান।"

"সে কি তোমার নিকট আর আসে নাই?"

এই প্রশ্নে পিরোত্যু কিছুটা বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল "সে আমার বিবাহের সময় আসিবে বলিয়াছে। আমি শীঘ্রই বিবাহ করিতেছি।"

"তাই নাকি? আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

"ধন্যবাদ, মহাশয়। হাঁ, এইবার আমাদের বিবাহ করা উচিত। শীঘ্রই আমার চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইবে। মেয়েটি নিকটেই থাকে। তাহার সহিত তিন বৎসর হইল আমার আলাপ হইয়াছে। অবশ্য এই সময়ের ভিতর তাহার সহিত খুব বেশী দেখাশুনা হয় নাই, কারণ যে পরিবারে সে পরিচারিকার কাজ করে তাঁহারা প্যারিসে থাকেন এবং গরমকালের তিন মাস এখানে কাটাইয়া যান। বিবাহ হইলে আমরা দুইজনেই সুখী হইব।"

"তুমি কি তাহা হইলে অন্য চাকরী লইবে?

"না, ব্যবসা করিবার মত যথেষ্ট টাকা এখনও জমাইতে পারি নাই। ভগবান সদয় হইলে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিব। তবে আমাদের বিবাহ হইলে লুসেটি (হাঁ, তাহার নাম লুসেটি) যেখানে কাজ করে সেই বাড়ীতেই একটী কাজ পাইব। আমার বিবাহে ভাই আসিবে। সবই নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে, কারণ সে সৈন্য-বিভাগের একজন অফিসার।"

"পিরোত্যু, কোথায় তুমি ? পঞ্চাশ নম্বরের চাবিটা নিয়ে এস।"

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, পুনরায় এভিগননে আসিয়াছি। কিন্তু পিরোত্যুর অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল। একটা নিরানন্দ ও অনাসক্ত ভাব তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যাহা দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা জানাইল তাহাকে মৃদুহাস্যও বলা যায় কিনা সন্দেহ। আমার সহিত গল্প করিবার তাহার ইচ্ছা করিতেছিল কিন্তু মালিক চিৎকার করিতেছিল, "পিরোত্যু, শীগগির এস।"

ডাক শুনিয়া সে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু পুরানো দিনের মত নহে। আমার মনে আছে আগে সে ভারী ভারী বাক্স লইয়া কিরূপ আনন্দেই উপরে উঠিয়া আসিত। যেন সেগুলি খালি, কিন্তু এখন সেগুলি তাহার নিকট সীসা দিয়া ভর্তি বলিয়া মনে হয়। যখন সকলে চলিয়া গেল তখনও আমি খাবার ঘরে বসিয়াছিলাম। পিরোত্যুর বিবাহ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য আমাকেই আশ্চর্য্য করিয়া দিতেছিল। ছাড়া পাইয়া সে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পুরানো দিনে যেরূপ অন্তরঙ্গতার সহিত পাশে আসিয়া দাঁড়াইত সেরূপ নহে। সে বিষণ্ণমুখে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আমি ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভাই কি বিবাহে আসিতে পারে নাই ?

"হাঁ মহাশয়, সে আসিয়াছিল। সমস্ত ঘটনাই আপনাকে বলিতেছি। প্রথম দিনেই আমি আশা করিয়াছিলাম সে আমাদের হোটেলে ঘর লইবে যাহাতে আমি তাহার সহিত অধিক সময় থাকিতে পারি। খুবই দুঃখিত হইলাম—যখন জানিতে পারিলাম যে সে এই সহরেরই আর এক প্রান্তে অন্য হোটেলে আশ্রয় লইয়াছে। তা-হইলেও সে আমার সহিত দেখা করিতে আসে নাই, তাহার হোটেলে দেখা করিবার জন্য আমায় একটি চিঠি পাঠাইল। তাহাতে ইহাও লেখা ছিল যে আমি যেন হোটেলের পোষাক ছাড়িয়া কোট ও টুপী পরিয়া আসি। অবশ্য পরিষ্কার হইয়া আসিবার কথা বলিয়া ভালই করিয়াছিল। নচেৎ তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য যেরূপ উদ্বিগ্ন ছিলাম তাহাতে যে অবস্থায় ছিলাম সেইরূপ ভাবেই হয়ত তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতাম। যখন তাহার নিকট গেলাম তাহার সামরিক পোষাকে তাহাকে এতই সুন্দর দেখাইতেছিল যে তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু সে শুধু হাত বাড়াইয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোন জাতীয় পান আমি ইচ্ছা করি। তারপর খুব সহৃদয়তার সহিত সমস্ত ব্যাপারটি আমাকে বলিল। সে বলিল, হোটেলে সে আমার সহিত দেখা করিতে যাইতে পারে না কিন্তু যখনই ইচ্ছা হইবে আমি যেন তাহার সহিত এখানে দেখা করি। তাহার ইচ্ছা সে যে এই সহরে আছে লোকে যেন জানিতে না পারে, কারণ বোকার মত আমি তাহার বিষয় অনেক কথাই বলিয়াছি এবং সেজন্য সে একটা দর্শনীয় বস্তু হইতে ইচ্ছুক নহে। এটা অবশ্য ঠিকই—কারণ সে একজন অফিসার। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি আমার মালিকের সহিতও একবার দেখা করিবে না। সে উত্তর দিল—তাহাতেও যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইবে। সে ঠিকই বলিয়াছে আমি ভাবিয়া দেখিলাম। কিন্তু ইহা আমাকে একটু চিন্তায় ফেলিয়াছিল; কারণ আমার অন্যান্য সহকর্মীরা ভাবিতেছিল আমার ভাইকে আমি এখানে আসিতে বারণ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ইহা অস্বস্তির বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার বিবাহের কি হইল ?"

উত্তর দিল, "বলিতেছি মহাশয়। অবশ্য বিবাহের বিষয় বেশী কিছু বলিবার নাই। তাহাকে লুসেটির কথা বলায়, সে লুসেটিকে দেখিতে চাহিল। আমি বলিলাম, সে ও তাহার মনিব—যখন পরের দিন গীর্জ্জায় আসিবে তখন দেখা হইবে, ভাই সেখানে মিলিত হইবে বলিল। সেখানে ভাই আসিয়াছিল এবং যখন মাডাম ডলবার্ট ও তাহার পিছনে লুসেটি আসিতেছিল আমি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জানাইয়া দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খুবই সুন্দরী, নয় ?' এবং সে মাথা নাড়িল। সকল সময়েই তাহার চোখ মাডাম ডলবার্টের দিকে ছিল ইহা লক্ষ্য করিলাম—এমনকি যখন গীর্জার বাহিরে আসিলাম তখনও সে তাঁহাকে দেখিতেছিল। তারপর তাহারা আমাকে লুসেটির সহিত পরিচয় করাইবার সুযোগ না দিয়াই চলিয়া গেল। পরের দিন হোটেলে তাহার সহিত দেখা করিলাম। এদিন তাহার কয়েকজন অফিসার-বন্ধু হঠাৎ তাহার নিকট আসিয়াছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসিল

কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার বন্ধুরা নিকটে থাকিলে আমার অস্বস্তি হইবে।"

"সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লুসেটি যেখানে থাকে সেই মহিলাটির নাম কি বলিয়াছিলে ম্যডাম ডলর্বাট ?' আমি হাঁ বলাতে সে বলিল, "এটা একটা অদ্ভুত যে তুমি তাহার পরিচারিকার সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ। কি যে করিব ? আমার এই বন্ধুরা মাডাম ডলবার্টের বাড়ীতে শিকার করিতে আসিয়াছেন এবং আমাকেও তাহাদের সহিত লইয়া যাইতে চান। গেলে তুমি কি কিছু মনে করিবে ?" আমি কেন মনে করিব তাহা বুঝিতে না পারায় আমার হাসি পাইল। লুসেটিকে একটি চিঠি দিলাম এবং ভাইকে বলিলাম তাহাকে দিয়া দিবার জন্য।"

"দুই দিন পরে আমাদের আবার দেখা হইল, কিন্তু তখন তাহার ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম লুসেটিকে চিঠি দিয়াছে কিনা। সে বলিল সেখানে সে বন্ধুদের সহিত গিয়াছে অতএব পরিচারিকার সহিত কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে আরও বলিল, "তোমার বিষয় আমি কিছুই সেখানে বলি নাই, অবশ্য তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না—" এই সব কথায় আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই বলি নাই। গোঁফের কোন পাকাইতে পাকাইতে সে বলিয়া চলিল 'মাডাম ডলবার্ট বেশ সুন্দরী স্ত্রীলোক,' আমি কোন উত্তর দিলাম না কারণ তাঁহাকে কখনও লক্ষ্য করি নাই, সকল সময়েই আমার চোখ লুসেটির দিকেই থাকিত। সে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—'যদি তোমাদের এই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় তবে কি এটাকে তুমি একটা বড় আত্মোৎসর্গ বলিয়া ধরিবে ?' আমি উত্তরে কেবল জানাইলাম যে তিন বছর আমরা অপেক্ষা করিয়াছি এবং আমাদের দুইজনের নিকট এখন পৃথিবীতে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। সেভুরু কোঁচকাইয়া রহিল এবং আমিও আমার কাজে চলিয়া আসিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার সহিত আর দেখা হয় নাই। যেদিন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম—দেখিলাম সে খুবই উত্তেজিত ও অধৈর্যভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছে। তারপর হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি কি তোমায় বিশ্বাস করিতে পারি ? তোমার কি সহ্য করিবার শক্তি আছে ?' আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম— 'কি ?' সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল— 'ব্যপারটা এই যে মাডাম ডলবার্টকে ভালবাসিয়াছি এবং তিনিও বলিলেন আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু তোমার জন্য আমার খুবই দুঃখ বোধ হইতেছে।"

"কেন আমার জন্য দুঃখ ?"

"হা ভগবান! তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ ? যেহেতু আমরা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ, তখন তুমি তাহার পরিচারিকাকে বিবাহ করিতে পার না। এটা একেবারেই অসম্ভব, খুবই অবমাননার কথা যে, যে বাড়ীতে আমি বিবাহ করিব সেই বাড়ীতে তুমি চাকর হইয়া থাকিবে।"

"আমি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিলাম, মুখ আমার বোধহয় ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। সে তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাইবে কি করা যায়, নিশ্চয়ই একটা কিছু উপায় ঠিক করা যাইবে।"

"পিরোত্যু থামিল, তাহার চোখ দিয়া দুইটি বড় বড় ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিবাহের কি হইল ?'

সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বিবাহ হয় নাই, বোধহয় কখনও হইবে না। আমি ধৈর্য ধরিবার চেষ্টা করি কিন্তু আমার ভাই একখানা চিঠিও দেয় নাই, লুসেটিও অনেকদিন লেখে নাই। বোধহয় তাহারা লুসেটিকে কিছু বুঝাইয়াছে—বোধহয় আমাকে পরিত্যাগ করিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। কিছুই জানি না—শুধু খবর পাইয়াছি তাহারা প্যারিসে আছে। আমার পক্ষে এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, আমরা এতদিন ধরিয়া ভালবাসিয়াছি, এতদিন অপেক্ষা করিয়াছি; কিন্তু আমার ভাইএর পক্ষে এটা শুধু সুন্দর মুখের আকর্ষণ। তবুও আমার ভাইকে অবমাননার মধ্যে টানিয়া আনিতে পারি না, এটা তো আপনি জানেন। পৃথিবীতে সে ছাড়া আর আমার কেহ নাই। আর তা ছাড়া মনে করুন সে একজন অফিসার! তবুও এটা খুবই দুঃসহ।" এই কথা বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়াতে সে দূরে জানলার কাছে সরিয়া গেল।*

* ফরাসী গল্প।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা

স্বামী বিজয়ানন্দ

সুদীর্ঘ বার বৎসর পর প্রয়াগধামে এইবার কুম্ভমেলার অধিবেশন শেষ হইল। অগণিত নরনারী, সাধুসন্ন্যাসী—দর্শনার্থী তথা পুণ্যার্থীর আগমনে প্রয়াগ এবং কুম্ভমহানগরী বিপুল জনারণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কুম্ভমেলা ভারতের সুপ্রাচীন ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান, অতীতের কোন শুভ-লগ্নে এই পুত পবিত্র মহান উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের হিন্দু-সমাজ যে কুম্ভমেলাউপলক্ষে চারিটি তীর্থে সমবেত হইয়া স্নান দান দর্শনাদি পুণ্য কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিত, তাহার প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে জগতে দুইটি পারস্পরিক বিবদমান সংস্কারের সহিত সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে, আর্য্য-হিন্দুগণের ধার্ম্মিক পরিভাষায় এই দুইটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে—দেবতা ও অসুর। যুগ যুগ ধরিয়া এই দেবাসুর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে।

উদাসীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসাদের কুম্ভ-স্নান-যাত্রা

পুরাণের আখ্যায়িকায় আমরা দেখি এই দেবতা ও অসুরগণ অমৃত-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় একবার সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হন। সেই মন্থন কার্য্যের ফলে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মী, ঐরাবত, পারিজাত, চন্দ্র ও হলাহল প্রভৃতি স্বর্গীয় বস্তু সামগ্রী সমুত্থিত হয়। পরিশেষে ধন্বন্তরি অমৃত কুম্ভ লইয়া আবির্ভূত হন। দেবতাগণের হস্তে সেই অমৃতকুম্ভ প্রদান করিলে অমৃতের অধিকার লইয়া—দেবাসুরে পুনরায় সংগ্রাম বাধে।

“পুরা প্রবৃত্তে দেবনাম দৈত্যঃ সহ মহারণে সমুদ্রমন্থনাৎ প্রাপ্তং সুধাকুম্ভ তদাসুরৈঃ তস্মাৎ কুম্ভাৎ সমুৎক্ষিপ্ত সুধাবিন্দু মহীতলে যত্রযত্রাৎপতত্রে কুম্ভপর্ব্ব প্রকল্পিতম্।

পৃথিব্যাং কুম্ভ পর্ব্বস্য চতুর্থা ভেদ উচ্যতে
চতুস্থলে ন যতনাৎ সুধাকুম্ভস্য ভূতলে
হরদ্বারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরীতটে
কলশাখ্যোহি যোগায়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ

শ্রীভগবান বিষ্ণু তখন মোহিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই সুধাকুম্ভ লইয়া ইন্দ্রনন্দন জয়ন্তের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাহা সংগোপন

সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

করিবার পরামর্শ দান করেন। জয়ন্ত অন্যান্য দেবতাগণের সহায়তায় সেই অমৃতপূর্ণ কলস পৃথিবীর চারিটি স্থানে লুক্কায়িত রাখেন। এই সময় এই অমৃত রক্ষার ভার সূর্য্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি এবং শনির উপর পড়ে। অমৃতের পাত্র যাহাতে ছিদ্রযুক্ত না হয় তাহার দায়িত্ব ছিল সূর্য্যের,

সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার অপর এক দৃশ্য

যাহাতে অমৃত পাত্র হইতে পড়িয়া না যায়—তাহা দর্শনের ভার ছিল চন্দ্রের, অসুরগণ যাহাতে এই অমৃত লইতে না পারে সেই জন্য প্রহরার

নিযুক্ত ছিলেন বৃহস্পতি এবং কোন দেবতা একাকী যাহাতে এই অমৃত পান না করেন তাহা দেখিবার দায়িত্ব দেওয়া হয় শনির উপর।

"চন্দ্র প্রস্রবনাদ্রক্ষাং স্পার্য্যা বিস্ফোটনাত্তথা দৈত্যেভ্যশ্চ গুরুঃ রক্ষাং সৌরি দেবেন্দ্রজাত ভয়াৎ,—"

পৃথিবীর যে চারিটি স্থানে অমৃত কুম্ভ যে যে তিথিতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল সেই সেই তিথিতে তৎ তৎ স্থানে কুম্ভযোগ ঘটে ও পুণ্য-লোভাতুর হিন্দুনরনারী উক্ত তীর্থসমুহে সমবেত হইয়া স্নান, দান ও সাধু সঙ্গের প্রয়াস পান। যুগযুগান্তরের ইতিহাস ইহা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। চারিটি কুম্ভযোগের তিথি সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পাই :—

হরিদ্বারে—পক্ষিণী নায়কো মেষে কুম্ভ রাশি গতেগুরু গঙ্গাদ্বারে ভবেদ্যোগঃ কুম্ভ নামাঃ তদোত্তমঃ

প্রয়াগে—মকরে চ দিযানাত্রে বৃষ্যাগে চ বৃহস্পতৌ কুম্ভযোগঃ ভবেত্তত্র প্রয়াগে ভবতি দুর্লভঃ। মাঘে বৃষগতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ অমাবস্যাং তদাযোগঃ কুম্ভারকস্তীর্থ নায়কে।

নাসিকে—সিংহে গুরুস্তথা ভানুঃ চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা গোদাবর্য্যা তদাকুম্ভো জায়াতহবনি মণ্ডলে।

উজ্জয়িনী—বৃশ্চিকে চ যদা গুরি ; তথৈব শশী ভাস্করৌ অমা তথা চ বরায়াং কুম্ভো ভবতি মুক্তিদঃ।

দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধানে উক্ত তীর্থসমুহে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়। পুরাণে কুম্ভ স্নানের মাহাত্ম্য ও ফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

সহস্রং কার্ত্তিকে স্নানং মাঘে স্নানে শতানিচ বৈশাখে নর্মদা স্থানং স্নানেন তৎফলম্। অশ্বমেধ সহস্রানি বাজপেয় শতানিচ লক্ষং প্রাং'পৃথিব্যাং কুম্ভ স্নানেন তৎফলম্।"

কুম্ভমেলার পুণ্যার্থী নর-নারীর বিশাল জনতার একাংশ

কিন্তু সমস্ত কুম্ভমেলার মধ্যে প্রয়াগের মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময়েও প্রয়াগধামে কুম্ভমেলার—অধিবেশন হইত তাহার প্রমাণ আমরা চীন-পরিব্রাজক হিউয়েঙ সাঙের বিবরণ পাঠে অবগত হই।

এইবার যে ভাবে রাশি ও তিথির সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহা নাকি সুদীর্ঘ ১১২ বৎসরের মধ্যে কুম্ভযোগের ইতিহাসে ঘটে নাই। ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল, সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যাও এইবার অন্যান্য বার অপেক্ষা অনেক বেশী। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সমগ্র মেলা-ক্ষেত্রটি এক অভিনব জীবন্ত আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। দশনামী সন্ন্যাসী, বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব ও উদাসীন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধু, লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এই পুণ্য যোগউপলক্ষে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। মকর সংক্রান্তিতে এই মেলার শুভ উদ্বোধন ঘটে।

২০শে মাঘ। যে মহাতিথির প্রতীক্ষায় শুধু ভারতের কোটি কোটি নরনারীই নহে, সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন গণনা করিতেছিল—আজ সেই শুভ কুম্ভতিথি, প্রাদেশিক সরকার হইতে কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক বাধ্যতামূলক যে টিকা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে প্রাচীন অশিক্ষিত নরনারীর মধ্যে বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার করে—ফলে গত মকর সংক্রান্তি তথা পৌষী পূর্ণিমা এবং চূড়ামণি যোগে তীর্থ যাত্রীর নূণ্যতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই কুম্ভ তিথির কয়েক-দিন পূর্ব্বে ভারতসরকার হইতে এই বাধ্যতামূলক টিকাদানের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইল। তাই বিগত কয়েক দিবসের মধ্যেই প্রায় ৪৫ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটিয়াছে—এই তীর্থরাজ প্রয়াগধামে। মাত্র তিনচারিদিনের মধ্যে যে এত অধিক সংখ্যায় যাত্রীর আগমন ঘটিবে—ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

রাত্রি তখন প্রায় ২টা। আমরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান শিবির হইতে প্রায় ৫ শত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আমাদের—কর্ত্তব্য স্থল সঙ্গম অভিমুখে নিয়ন্ত্রণের জন্য পথাভিমুখে রওনা হইলাম। মেলা কর্ত্তৃপক্ষ ভারতসেবাশ্রমের উপর যাত্রীদের স্নানের ব্যবস্থা, শোভাযাত্রা-নিয়ন্ত্রণ, সঙ্গমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছেন। সঙ্ঘ হইতে ১৫শত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া এই কর্ত্তব্য পালন করা হয়।

আমাদের প্রধান ক্যাম্প হইতে নির্গত হইয়া আমরা স্নান সঙ্গমের

দিকে অগ্রসর হইতেই সমর্থ হইতেছিলাম না। সমগ্র মেলাক্ষেত্রটি এই গভীর রাত্রেই জনারণ্যে পরিণত হইয়াছে। কোনপ্রকারে ভিড়ের চাপে গা ভাসাইয়া দিয়া সকলের সঙ্গে সঙ্গমের ঘাটে পৌঁছিলাম। স্বেচ্ছাসেবকগণ কার্য্যে রত হইল। ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্নান চলিতেছিল। ভারত ধর্ম্মের দেশ, ভারতের নরনারীর ধমনীতে ধমনীতে ধর্ম্মভাবের স্রোত প্রবাহিত। ভেদ বিবাদ, ঈর্ষা দ্বেষ, দ্বন্দ কলহের গণ্ডী পার হইয়া জাতিভেদের সুকঠিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই ধর্ম্মের নামে সকল শ্রেণীর—সকল ধর্মের, সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিত হইতে পারে—তাহার প্রমাণ এই বিরাট মেলাক্ষেত্র। তাই বর্ত্তমান ভেদবিবাদের ভারতে—অস্পৃশ্য অনাচরণীয়তার মোহজালে বিজড়িত ভারতে, সাড়ে তিন হাজার জাতি উপজাতি অধ্যুষিত ভারতে, যদি জাতিগঠন তথা সুসংবদ্ধ অখণ্ড সমাজ গঠন করিতে হয় তবে তাহা ধর্ম্মভিত্তিতেই সম্ভব, বিদেশ হইতে "ইজম্"এর আমদানী করিয়া ভারতকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা সহজ হইতে পারে—কিন্তু তাহাকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভুলাইয়া অন্য পথে পরিচালিত করা সহজ নহে।

প্রাতঃ সাড়ে ছয়টায় সন্ন্যাসীদের স্নান আরম্ভ হইল। সমবেত ভাবে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, শোভাযাত্রা সহকারে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী আনন্দে বিহ্বল হইয়া 'ওঁ হর হর মহাদেব—কাশী বিশ্বনাথগঙ্গে' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মথিত করিয়া স্নানে আগমন করিতেছেন—পুণ্য সঙ্গমতীর্থ, প্রথমে আসিলেন—মহানির্ব্বাণী দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ। শোভাযাত্রার প্রথমে কয়েক শত নাগা সন্ন্যাসী, পরে সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার স্বর্ণ-শিবিকা, তৎপরে বর্ত্তমান আচার্য্যগণের মহামূল্য শিবিকাসমূহ মধ্যে চতুর্দ্দশ হস্তী পৃষ্ঠে স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট মোহন্ত, মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি চতুর্দ্দশ প্রবীণ সন্ন্যাসী!

শোভাযাত্রা সঙ্গমের ঘাটে পৌঁছিলে শিবিকা বা করী পৃষ্ঠে সমারূঢ় সন্ন্যাসীবৃন্দ সকলেই অবতরণ করিয়া পদব্রজে স্নানার্থে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্নান সমাপন করিয়া ঘাট ছাড়িয়া দিতে হইবে, অপরাপর সন্ন্যাসীগণের জন্য। তাই নির্ব্বাণী সম্প্রদায় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্নান শেষ করিয়া ঘাট পরিত্যাগ করিয়া অপর পথে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ক্রমশই জনতার ভিড় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ভিড়ের চাপে আর এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। শোভাযাত্রা আগমনের জন্য দড়ি দিয়া ঘিরিয়া

জনতার অপর এক অংশ

কুম্ভযোগে আকস্মিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক দৃশ্য—জনতার চাপে নিষ্পিষ্ট নরনারী

যে পৃথক রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল জনতার চাপে সেই পৃথক রাস্তাও তিরোহিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ, অসমর্থ, এমনকি পরিশেষে সবল, সতেজ ব্যক্তিগণও ভিড়ের চাপে "মুমূর্ষু" হইয়া পড়িতে লাগিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার জীবন বাঁচায়। সকলেই স্বীয় জীবন সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। "আরে মর গিয়া"—'ভাগ হিয়াসে' 'স্বয়ং সেবকোঁ মুঝে বাঁচাও' ইত্যাদির চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। আমাদের সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫শত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরূপে এখানে কাজ করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এমনকি অনেক সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও কতশত নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনকি দুই একজন স্বেচ্ছাসেবকের জীবন সংশয় হওয়ায় অচৈতন্য অবস্থায় সঙ্ঘের বিশ্রামকেন্দ্রে অপসারিত করিতে হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়দল সন্ন্যাসীর আগমনের সময় হইয়া আসিয়াছে। আমরা প্রাণপণে তাঁহাদের আগমনের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছি। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে অথচ শোভাযাত্রা আসিল না—কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সহসা কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক ব্যস্তসমস্তভাবে দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল—বাঁধ এবং ২নং পুলের নীচে ভীড়ের চাপে শত শত যাত্রী নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিয়া গিয়াছে এবং বহু সহস্র আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের রিলিফ্ ক্যাম্প ও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র

গঙ্গা এবং যমুনার মিলনস্থল অর্থাৎ স্নানের ঘাট হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে একটি উচ্চ বাঁধ আছে। এইবার নদীর উভয় তীরেই মেলাক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ৫টি সেতু দ্বারা এই উভয় মেলাক্ষেত্রকে সংযোজিত করা হয়। যে সেতু দিয়া নদীর অপর তীর হইতে সন্ন্যাসী তথা যাত্রীগণ এপারে স্নানের জন্য আসিবেন ঠিক তার সামনাসামনি স্থানে এপারেও বাঁধের উপর হইতে সঙ্গমে যাওয়ার জন্য অবতরণের রাস্তা, ফলে সমস্ত দিক হইতেই এই স্থানটিতে জনতার চাপ পড়ে বেশী এবং স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকারীগণেরও এই একই রাস্তা। এই স্থানটির এক পার্শ্বে বাঁধ হইতে অবতরণের রাস্তার বামদিকে একটি কর্দ্দমাক্ত জলে পূর্ণ ডোবা ছিল। চারিদিকে ভিড়ের চাপে শত শত যাত্রী যখন প্রাণের দায়ে পলায়মান হয়—তখন এই ডোবায় পড়িয়াই প্রায় দুইশত তীর্থযাত্রী মারা যায়। সে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য! শিশুসন্তানকে বুকে জড়াইয়া মাতাপুত্রের শোচনীয় মৃত্যু!! বৃদ্ধমাতাকে মধ্যে একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া পুত্র তদীয় পত্নীসহ তীর্থস্থানে যাইতেছেন—বিধাতার নিদারুণ অভিশাপে তিনজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। একটি পরিবারের নয়জন আসিয়াছিলেন—তন্মধ্যে দুইজন ভিড়ের চাপে পড়িয়া অর্দ্ধমৃত হইয়া কোন প্রকারে দুঃসহ শোকানলে হৃদয় দাহনের নিমিত্ত বাঁচিয়া রহিলেন, বাকী সাতজনেই অতি অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিলেন। প্রিয়জনবিরহীর কাতর আর্ত্তনাদে পবিত্র কুম্ভমেলাক্ষেত্র সত্বর মহাশ্মশানের রূপ পরিগ্রহ করিল। মহাশ্মশানের বুকে শত শত শবদেহের মাঝখানে জনৈকা বাঙ্গালী রমণী তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া কী ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে! ওঃ সে

নৌকাযোগে কুম্ভের অভিমুখে শ্রীনেহরু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

আর্ত্তনাদ আজও যেন কুম্ভমেলাক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পাষাণও দ্রবীভূত হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে—মাত্র সামান্য এতটুকু বিভ্রান্তির জন্য এত অর্থব্যয়—এত সাধনা, এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা—সবই ব্যর্থ হইল।

স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্রুত আহতব্যক্তিগণকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে পুলিশের লোকজনও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারাও আহত ও নিহত ব্যক্তিদের স্থানান্তরিত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে স্নান চলিতে লাগিল, একের পর এক শোভাযাত্রা আসিতে লাগিল—স্নান সমাপন করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ নরনারীর স্নানও চলিতেছে। নির্ব্বাণীর পর 'নিরঞ্জনী' ও 'জুনা' দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ স্নান করিলেন, পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'নির্ব্বাণী' 'দিগম্বরী' ও নির্ম্মোহী, তৎপর উদাসী

সম্প্রদায়ের নয়া পঞ্চায়েতী, বড়া পঞ্চায়েতী ও শেষে নির্ম্মলা আখড়ার সন্ন্যাসীগণ স্নান করিলেন। অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত এই সন্ন্যাসীগণের স্নান চলিল। পরদিন প্রাতে পুনরায় আমাদের ডাক আসিল—শব সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য। সরকারের ইচ্ছা পূর্ণার্থে আগত যাত্রীদের সৎকারের ব্যবস্থা সন্ন্যাসীর দ্বারাই হউক। তাই অন্য কাহাকেও এই সব স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। বেলা ১০টা হইতে মেলাক্ষেত্রের এক পার্শ্বে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক শ্মশানে এই শব নীত হইতে লাগিল। প্রথমে এক একটি শবের জন্য এক একটি করিয়া চিতা সজ্জিত হইল। কিন্তু এতগুলি শব এই ভাবে সৎকার করা কী ভাবে সম্ভব! পূর্ব্বোক্ত একই পরিবারের ৭টি শব পৃথক পৃথক চিতায় সজ্জিত করা হইল। তাহারা স্থানীয়, তাই তাঁহাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারের অবশিষ্ট দুইজনও শ্মশানে সমবেত হইয়াছেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। একই সঙ্গে ৭টি চিতার লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরিবারের অবশিষ্ট দুই ব্যক্তি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একই সঙ্গে তো আসিয়াছিলেন এই পুণ্য কুম্ভ স্নানে—কেনই বা তাঁহারা আর এই শোক তাপে সন্তপিত হৃদয় লইয়া এই পৃথিবীতে দুর্ভাগা হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। অন্তরে এই চিন্তার আলোড়ন জাগার পরমুহূর্ত্তেই দুর্ব্বার গতিতে তাঁহারা জলন্ত চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। চোখের সামনে অতীতের সতীদাহের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। কি মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! মানবতার অজুহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মীবাহিনী তাঁহাদের উদ্ধারার্থে। কোন ক্রমে টানিয়া উপরে লইয়া গিয়া কড়া পুলিস প্রহরায় শবদাহ চলিল। হে যুগের রুষ্ট দেবতা, কেন তোমার এই বিচিত্র লীলা প্রহসন! কেহ বা মরিল নৌকাডুবিতে

শ্রীনেহরু কুম্ভযোগে পুণ্য গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেছেন

গঙ্গাবক্ষে, কেহ বা মরিল জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মাত্র ২ দিন পূর্ব্বে এখানের অগ্নিকাণ্ডে, কেহ বা মরিল সেতুভগ্নে নদীগর্ভে পতিত হইয়া, আর প্রায় ৫ শত মরিল এই শোচনীয়ভাবে ভিড়ের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া! মর্ত্ত্যের মানুষ আমরা, বুঝি না তোমার এই নিষ্ঠুর লীলা-রহস্য!

ধ্যানের ভারত মোর

আনন্দ বাগ্‌চী

আরণ্যক অন্ধকারে বিশ্ব যবে বিষাক্ত নখরে
শ্বাপদ-সংঘর্ষে রত, নরপশু বর্বর বন্যায়—
অসংযত প্রাণধারা মিশায়েছে। জৈবিক কবরে
আত্মার ক্রন্দন-ধ্বনি ভীতত্রস্ত হ'য়ে থেমে যায়।

পাশবিক সেই রাত্রে আসুরিক রিরাংসার মত
নীল হয়ে গেল বিশ্ব। বিবমিষা কান্নায় কান্নায়
আকাশ মলিন হলো।
　　　　কুৎসিত রজনীর ক্ষত
দুর্গন্ধ ছড়ায় সেই যান্ত্রণিক মুহূর্তের ঘায়।

* * * *

ধ্যানের ভারত মোর সেইদিন অরণ্য-পবনে
সুললিত সুর তব ভেসে এলো।
　　　　কখন সহসা
মানব মুক্তির মন্ত্রে তিতীর্ষু এ তীর্থ-তিথি ক্ষণে
হিংসার হুঙ্কার স্তব্ধ। নিভে গেল চন্দ্র তন্দ্রালসা
উষার উল্লাস শুনি'।
　　　　—উপবনে প্রশান্ত শিখায়
জীবনেরে জ্বেলে দিলে ব্রহ্মজ্ঞানে।
　　　　রাত্রি নিভে যায়!

রামপ্রসাদের রূপক-হেঁয়ালি

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

রামপ্রসাদের রচনাবলীর পর্য্যালোচনায় বিশেষভাবে দৃষ্টিতে পড়ে তাঁহার রূপকগুলি। ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল ইষ্টদেবী এলোকেশীকে বুঝিবার জন্য। তিনি 'স্বয়ং হেঁয়ালি': মহত্তম, বৃহত্তম হেঁয়ালি সেই মহাশক্তি, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কখন, কোথায়, কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি লীলা করিতেছেন, কেমন করিয়া যুগপৎ তিনি নটবিগলিতকেশা ঘোরদংষ্ট্রা বিশালা কালী তারা অথবা স্বীয় ছিন্নশিরোৎপাতরক্তপানরতা অস্থিমালিনী ছিন্নমস্তা—আবার স্নেহময়ী পুত্রবৎসলা জননী অন্নপূর্ণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া বিরাজমানা, সকল দ্বন্দ্ব-ঐক্যে বাদ-প্রতিবাদে তিনি প্রতিভাসিত, তাহা অবধারণ করিবার জন্যই প্রসাদের রূপক সৃষ্টি, সেই কথাই কহিয়াছেন প্রসাদ রূপকের মধ্য দিয়া। রামপ্রসাদ বাস্তবকে অধ্যাত্মরূপ দিয়া স্থাবর জঙ্গম নির্ব্বিশেষে তন্মধ্যে অভেদরূপে বিজড়িত বিশ্বজননী ঈশ্বরীকে দেখিয়াছেন, তজ্জাত ঘটনাবলী হইতে শিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং

রামপ্রসাদ (কল্পিত মূর্তি)

চিত্রটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত চিত্র হইতে

তৎসমুদায় গানে ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—"শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ী।" আকাশে ঘুড়ী উড়িতেছে দৃষ্টিগোচর হইতেই এ গানটি গাহিলেন। উহার পরের পংক্তি হইল—"ভবসংসারে বাজারের মাঝে। ঐ যে মন ঘুড়ী, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।" আবার গানটি শেষ করিবার সময় বলিতেছেন—যদি দক্ষিণা বাতাস পায় ঘুড়ী তাড়াতাড়ি উড়ে যাবে। এখানে 'দক্ষিণা' শব্দর দুই অর্থ, রামপ্রসাদের পক্ষে যোগাভ্যাসের কথা। 'দক্ষিণা' বাতাস পেলে "ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥" পুনরায়, "মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি। আমি তোমা বিনে নাহি খেলি।" এ গানটি সাংসারিক জীবনের চিত্র এবং প্রসাদের স্ত্রীবিয়োগের পর রচিত—তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে গানটির শেষ পদে—"রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি।" স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি তরুতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। খেলা, সংসার খেলা। আর একটি, তিনি নিজ সম্মুখে দেখিতেছেন 'সাপুড়ে' সাপ ধরিতে পারিল না। তিনি গাহিলেন—"মনরে তোর বুদ্ধি একি।...মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে গোসাপে তায় কাটে না কি।" ইহা শেষ করিলেন—"সময় থাকতে শিখে রাখি।" রামপ্রসাদের পক্ষে সাপ অর্থে কুণ্ডলিনী বুঝিতে হইবে। "ওঝা" বলিয়া স্বীয় পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও 'গরু' শব্দে নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া বলিলেন—'সময় থাকতে শিখে রাখি।' সাপধরা শিক্ষা, যোগ শিক্ষা, কুণ্ডলিনী যোগ। নদী, তরী, কৃষি প্রভৃতি যাহা তাঁহার দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি হইতেই তিনি সার-কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। অপর দিকে ঝড় তুফান দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির মাঝে তিনি অষ্টনায়িকা পঞ্চদশযোগিনী পরিবেষ্টিতা নৃত্যপরায়ণা কালীকে দেখিয়াছেন, আবার প্রেমে পাগল হইয়া শিব ঠাকুরকে দিয়া হরি গুণ গান গাওয়াইয়াছেন—"ধরত তাল দ্রিমকি দ্রিমকি, হরি গুণে হর নাচিয়া।" পুনরায় কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন করিয়া গিরীশগৃহিণীকে গোপবধূবেশে দেখিয়া বলিতেছেন—"ভনে-রামপ্রসাদ মার এই এক ধ্যান।" প্রসাদের জীবন চরিত আলোচনা করিবার সময় এমন অনেক বিষয়ও পাওয়া যায় যাহা আপাত-দৃষ্টিতে ইতিহাসবিদের নিকট অতি-রঞ্জিতরূপে প্রতীয়মান হইবে—যেমন, রামপ্রসাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর* দিক্ পরিবর্ত্তন

চিৎপুরে (চিত্রপুরে) সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে। মুকুন্দ রামের কাব্যের সহিত ইং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে একযোগে পাঠ করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে পুরাকালে এই একই মন্দিরে (ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৬০) দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সর্ব্বমঙ্গলা ও চিত্তেশ্বরী কালী। এন. এল. ঘোষ মহাশয়ও তাঁহার পুস্তকে ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে ইহা তিনি জানিয়াছিলেন তাহা বলেন নাই। ঐ প্রাচীন মন্দির বিধ্বস্ত হইলে পর সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বমঙ্গলাদেবী মূর্ত্তি পুনপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু আতঙ্কবিজড়িত চিত্তেশ্বরী কালীর নামমাত্র প্রবাদ স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। ইহাও একটি কারণ যে জন্য ইংরাজরা ঐ মন্দিরকে কালী মন্দির আখ্যা দেন এবং ১৮৪৫ অব্দের প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যাবতীয় ক্রিয়া পদ অতীত কালে ব্যবহার করিয়াছেন। এই মন্দির সম্পর্কে রামপ্রসাদেরও দুইটি বিশেষ গান প্রচলিত আছে—১ জননি পদপঙ্কজং দেহি ইত্যাদি। ২ মুক্ত কর মা মুক্তকেশী ইত্যাদি।

(দক্ষিণ হইতে পশ্চিমমুখী হওয়া)। কিন্তু ইতিহাসবিদ্ ইহাও জানেন যে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল মাদ্রাজে ও তঞ্জোরে এবং প্রসাদের প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যশোরে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরীপুরের দেবীও প্রতাপাদিত্যর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া মন্দিরসহ দক্ষিণ হইতে পশ্চিমমুখী হইয়াছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' লিখিয়া গিয়াছেন—

'শিলাময়ী নামে, ছিল তাঁর ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি।

* * * * *

বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে॥"

নিখিল নাথ রায় এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন—

নকুল বাটী (শিবের গলি)

("প্রতাপাদিত্য") প্রবাদ আছে, বসন্ত রায়ের হত্যায় দেবী রাজার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া মন্দিরসহ পশ্চিমাস্য হইয়া যান। মেজর র‍্যাল্‌ফ স্মিথ (১৮৫৭ খৃঃ) ২৪ পরগণার ভৌগোলিক বিবরণীর মধ্যেও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—"She (the goddess) caused the temple he (Pratapaditya) had built towards the west to be changed from its original position on the south * * *; an old ruin of a gate leading into the temple facing the south which is shown as the original entrance previous to the Goddess changing it to the west which is its present entrance." বাংলা দেশ বহুকাল অবধি যেমন একদিকে ভীষণাকে আপন করিয়া লইয়াছে অপর দিকে প্রেমের তুফানও বহাইয়াছে; গোস্বামী গৃহে শক্তিপূজা এবং শাক্তের গৃহে শালগ্রামশিলা পূর্ব্বরীতির নিদর্শন, রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে এ সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে। পরন্ত যে সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সকল রকম বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। তাঁহার 'শিশুকাল' হইতেই দুর্দ্দৈব কারণে নানা রকমে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

প্রকৃতির লীলা কে বুঝিতে পারে! বাংলাদেশের এ অঞ্চলের গঙ্গানদীর দুকূল বিধ্বস্ত করিয়া কয়েকঘণ্টাব্যাপী যুগপৎ ভূমিকম্প ঝড় বৃষ্টি তুফান ঘটিয়া একদিন যে কি করুণ অশ্রুতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। সেই ঘোর অন্ধকারভরা কুজ্ঝটিকাময় নিশায় অশনিপাতের অগ্নিবৃষ্টি ও নির্ঘোষে ভয়বিহ্বল প্রজা গৃহকোণে আত্মগোপন করিয়াছিল ভূমিকম্পে পতনোন্মুখ প্রাচীরের নিম্নে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য। বাত্যাবিক্ষোভে তাড়িত প্রবল গঙ্গাধারা ৪০।৪৫

পঞ্চবটী

ফুট স্ফীত হইয়া প্রায় নদীয়া পর্য্যন্ত দুইকূল বিধ্বস্ত করিয়াছিল, নদীবক্ষ হইতে সমুদ্রপোত ছয়শত হস্ত দূরে তীর ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, দেশীয় ভড় প্রভৃতি বড় আকারের অনেক নৌকা বৃক্ষশিরে উত্তোলিত হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় কি পরিমাণ গৃহ অট্টালিকাদি বিনষ্ট হয় তাহা ইয়ত্তা করা যায় না। অসংখ্য নর-নারী ও গ্রাম্য বন্য পশুর মৃতদেহে নদী ভরিয়া উঠিয়াছিল, রামপ্রসাদের ভ্রমণ পথ দুরতিক্রম্য হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। ইহা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১।১২ অক্টোবর তারিখের ঘটনা, তখন হালিশহরের রামপ্রসাদ সেনের বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। তাঁহাকে ইহার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ইহাতে যে তিনি কোন আঘাত পান নাই তাহা কে বলিল? সত্য না হইবে কেন—প্রবাদের কথা যে এই দুর্য্যোগকালে রামপ্রসাদের পৈতৃক ভূসম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। নিম্নোক্ত পদ কয়টি দেখিতে হইবে—

"আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে।
স্রোতের সেহালার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেউ নাবেনা অগাধ জলে॥"

সায়র শব্দ সাগর হইতে উদ্ভূত, 'জলরাশি'। এই জলরাশিতে তিনি ভাসিয়া ফিরিতেছেন। কি রকম ভাবে ভাসিতেছেন তাহাও বলিলেন 'সেহালার মত'। ঐ অগাধ জল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ জলে নামে নাই, দুঃস্থ সন্তানের প্রতি মাতৃপ্রেমের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গেল এই সময়ে অলক্ষিতে।

প্রসাদও গাহিলেন—আর হব না গঙ্গাবাসী।
গঙ্গার সতীনপো সম্বন্ধে আসি।
বিমাতার চরিত্র যেমন, কত আর বলিব প্রকাশি
তার সাক্ষী দেখ কৈকেয়ী কল্লে রামকে বনবাসী॥*

অন্য গানে "গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে লইল এই ভূমি" একটি রূপক, দুই রকম অর্থই হইতে পারে।

সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির ফটো—শ্রীতড়িৎ সাহা

উক্ত দুর্ঘটনার পর আসিল বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪০।৪২ খৃঃ), সঙ্গে আনিয়াছিল দেশবাসীর জন্য মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। দহ্যমান গ্রামসমূহের লেলিহান অগ্নিজিহ্বার উজ্জ্বল আলোকে সাধিত হইয়াছিল অবাধে রক্ষাবিহীন নর-নারীর উপর কল্পনাতীত আচরণ ও নৃশংস অত্যাচার তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে ক্রন্দন উঠিয়াছিল তাহার কাহিনী মহারাষ্ট্র পুরাণ (বাংলা ভাষা) জাগরূক রাখিয়াছে, ছেলে ঘুমানোর ছড়ায় আজিও ছেলে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে কলাই মটর মুসুর চাউল আটা ময়দা চিনি লবণ প্রভৃতি সবেরই মূল্য হইয়াছিল প্রতিসের একটাকা। রামপ্রসাদ দুঃখিত অন্তঃকরণেই বলিয়াছিলেন—

"ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
ওমা আমি কত অপরাধী লুণ মেলেনা আমার শাকে॥"

প্রসাদের দৃষ্টিতে এ হাঙ্গামাও জগদীশ্বরীরই লীলাবিশেষ।

অতঃপর দেখা যায় (১৭৫৬-৫৮ খৃঃ) অরাজকতাক্লিষ্ট দৈন্যদারিদ্র্যে পীড়িত প্রজানিচয় অর্দ্ধমৃত, ক্লাইব-ওয়াটসন-মীরজাফর-মীরকাসেমের গোপনীয় 'কূটনীতির পরিণামে উপর্য্যুপরি দৈত্য-দানবের সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-হাহাকার (দৈত্য—ইংরাজ, দানব—মুসলমান পক্ষ)। দীন রামপ্রসাদ তাহা হইতেও অব্যাহতি পান নাই, শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা), আমার এম্নি দশা শাকে অন্ন মেলে কৈ॥" অন্যত্র, "এক হাটে দুই দর করেছ, এই কি মা তোমার বিবেচনা। কারু শাকে দেও বালি, কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা॥" এখানেও বিরতি নাই। পুনরায় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল বেলা ৫ ঘটিকার সময় খণ্ডপ্রলয়ের মত দেখা দিল "গলিত চিকুর ঘটা, নবজলধর ছটা, ঝাপল দশ দিশি তিমিরে। গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥" ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলে পূর্ণ দশ মিনিটকালস্থায়ী ভীষণ ভূমিকম্প, যাহাতে আবার গৃহ অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রাণনাশ ঘটিল বহু নর-নারীর, গ্রাম্য ও বন্য জীব-জন্তুর; নদ-নদী পুষ্করিণীর জল স্থানে স্থানে ঋজুভাবে ছয় ফুট খাড়া হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছিল (গবর্ণমেণ্টের বিবরণী—In the year 1762 A.D. on April 2. at 5 p.m. ** In Calcutta water rose in tanks upto 6 ft. * At Ghirotty, 18 miles from Calcutta the river rose more than 6 ft. perpendicularly.)। ঘিরোটি ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত। এই ভূকম্পনের জের মৃদুভাবে অনুভূত হইয়াছিল ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত। এক্ষেত্রেও নদীর পূর্ব্বতীরে নৈহাটি ও পশ্চিমে চন্দননগর ঘিরোটি প্রভৃতি স্থানের তীরভূমি ভীষণভাবে প্লাবিত হয়। প্রসাদের কৃষিক্ষেত্রও কি এই সময় ভাসিয়া গিয়াছিল যে জন্য তিনি বলিয়াছেন—"মাগো আমার কপালদোষী। অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি। আমার কৃষি সকল নিল জলে কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি॥" এই ঘটনার প্রায় সমকালেই প্রজাকুলের দুরদৃষ্টে ইন্ধন জোগাইয়াছিল মীরকাসেমের দুরভিসন্ধিজাত রাজস্ববৃদ্ধি, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মহামারী। এই সমস্ত যাহা কিছু ঘটিতেছে রামপ্রসাদ দেখিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেবীকে আর তাঁহার ইষ্টদেবীর-কৌতুকলীলা। গান করিয়া বলিলেন—

---

* তিনি পুনরায় গঙ্গাতীর বাসী হইবেন না। অন্যত্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নাই—"চাহিনা মাগো রাজা হ'তে। মাটির দেয়াল বাঁশের খুঁটি তায় পারি না খড় জোটাতে। দ্বিজ রামপ্রসাদের এই মিনতি দুই বেলা পাই আঁচাতে॥" এ সময়ে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন কাচের বাসন "কাচের বাটী॥" এবং এই কুটীরাশ্রয়ে বসিয়াই গাহিয়াছিলেন—"আর কেন গঙ্গাবাসী হব। আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব। পাদোদক থাকিতে কেন গঙ্গাজলে স্নান করিব॥ আমি ঘরে বসে মন করে মুক্ত কেশীর নাম করিব॥"

"দ্রুত চলে আশু টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ-দীন ভাগ্যহীন, দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে শুনাইলেন—

আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা ডাকিতেছে শিবা
শিব উরে শিবা আপনি।
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিষাদ।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ-নাশিনী॥

ঐ বৎসরেই ১৩ই জুলাই তারিখে বেলা ২॥০টার সময় পুনরায় ভূমিকম্প হয়, উহাতে মাত্র তিনবার মৃদু কম্পন অনভূত হইয়াছিল। এ ঘটনাও রামপ্রসাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী সভীতা কম্পিতা অতি, তাই দেখে পশুপতি
পতিত চরণে রণে॥"

(দানব—মীরকাসেমের ফৌজ ও কর্ম্মচারীবৃন্দ)।

পুনরায় ভূমিকম্প হইল ৪ঠা জুন ১৭৬৪ খৃঃ। এই কম্পনে এতদঞ্চলের বিশেষতঃ গঙ্গানদীর দুই কূল সকল রকমে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ইহা লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন—

"নিরখ হে ভূপ। * *
মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত সতত ত্রাসিত প্রলয়ের এই কি কারণ।
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্ত যে মত্ত বারণ॥"

(ইংরাজী কোম্পানী মীরজাফরকে বাধ্য করিয়া তাঁহার সহিত মীরকাসেমের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন, 'মগনা রণমদে' বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য)। ইষ্টদেবীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—"পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী॥" এই সমুদয় আপদ-বিপদ কাটাইয়া যতগুলি প্রজা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাদের জন্য রাজনৈতিক ভাণ্ডারে গচ্ছিত ছিল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে যখন শস্যাদি নষ্ট হইতেছিল রেজা খাঁ সেই সুযোগ লইয়া চূড়ান্ত ব্যবসায় সুরু করিলেন, তাঁহার পরিচালিত চোরা-কারবারের ফলে (১৭৭০ খৃঃ) এবং ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবহেলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উদ্ভব। সাধারণ দুর্ভিক্ষ ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিয়া এ দেশে অন্যূন এক কোটি মানবের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। তৎকালীন স্বল্পপরিসর কলিকাতায় ৭৬০০০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে এবং ঐ মৃতদেহগুলির সৎকার করা অসম্ভব হওয়ায় নদী খাল-বিল পুষ্করিণীতে পরিত্যক্ত হয় ও শহরের ভূমিতলে প্রোথিত হয়। এমন দিনেও প্রসাদ অচল অটল ছিলেন "অভয় চরণের জোরে"। তথাপি হতাশের সুরে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল—

"যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে পেয়ে নানা ভয়।
ওমা তুমি তঁ অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥"

এই গানের 'প্রসাদ পাওয়া দায়' পরিস্ফুট হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত কয়টি পদে—

"অ-সকালে যাব কোথা। আমি ঘুরে এলাম যথা তথা।
দিবা হ'ল অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে স্থান দাও গো জগন্মাতা॥"

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে, এই লীলা পর্ব্বর মাঝে কোন্ অজানা দেশের কে এক কুলকামিনী সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একাকিনী কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদের কুটীর দ্বারে তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিল, সে রমণীটি কে? এই অশুভকালে বিপদ-সঙ্কুল দেশে সকল রকমের সকল প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়া আবার কে আসিয়া রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধায় সাহায্য করিয়া অন্তর্হিত হইল—তাহাই বা কে জানে? রামপ্রসাদ জানিতেন—গভীর শীতের রাতে ঘোর অমানিশার তৃতীয় প্রহরে তমসাচ্ছন্ন হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহরাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় না। তিনি জানিতেন,—প্রদীপ নিজ জ্যোতি বিকীরণ করিবার জন্য সে অপর প্রদীপের অপেক্ষা করে না। তিনি বেড়া বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, বেড়ার অপরদিকে বালিকাকে দেখিয়া নিজ তনয়া মনে করিয়া-ছিলেন। কিন্তু পর নিমেষেই ভ্রান্তি আপনা হইতেই অপসৃত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি কে? ছলমূর্ত্তিধারিণীর ছলনায় আমি ভুলিব না—"মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।" প্রসাদ গাহিলেন—

"মন কেন মার চরণ ছাড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।
* * * * *
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকাতারা,
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥"

এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—"বাঁশ বাঁকারি দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন" (সংবাদ প্রভাকর ১লা পৌষ ১২৬০)। ইনি সেই রামপ্রসাদ সেন যাঁহাকে আমরা জানি তাঁহার গানের ভিতর দিয়া,—গুপ্তকবি লিখিয়াছেন—"কাকের ন্যায় অতি নিরস কর্কশ কণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল মান রাগ সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে, অকস্মাৎ অমৃতবৃষ্টি হইতেছে।"

ভাষাই ভাবের বাহন, ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে ভাষা—রামপ্রসাদের গান। গ্রাম্য কথ্য ভাষা প্রাকৃতের সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং আমরা যাহা সাধু ভাষারূপে ব্যবহার করি তাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত, প্রভান্বিত। ভাষাগত শব্দাদি বিচারে এ বিষয়ে দৃষ্টিরাখার বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা অনেক ক্ষেত্রে অনেক শব্দ-বাক্যাদি বিচারে ভুল অনিবার্য্য, ইহাতে পূর্ব্ব-পশ্চিমের বিচার গৌণ। এতদ্ভিন্ন শব্দাদির রূপান্তর ঘটে, বিশেষত চলিত কথায় ও গানে। দৃষ্টান্ত :—হিল্লোল, ইল্লোল, ইলোল, ইয়ল, হিল্লোলে=ইয়লে। হালিশহর পরগণার পদ্মনাভপুর বর্ত্তমানে পদ্মাপুর; অন্তত্র, চিত্রেশ্বরী=চিত্তেশ্বরী। গানের তাল মাত্রা সোম প্রভৃতির নিয়ম পালন করিবার সময় এরূপ হইয়া পড়ে এবং চলিত কথায় মূল শব্দের উচ্চারণ (বিশেষত রূঢ়, যুক্তাক্ষর প্রভৃতি) সরল হইয়া পড়ে, রূপান্তর ঘটে।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গোপাল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন—

অশোকের কানে 'কথাটা গিয়াছিল—তিনু কথাটা বলিয়া থাকিবে। পিতার দেহ গঙ্গাতীরস্থ করিতে যদি তিরিশ জন লোকও লইয়া যাইতে হয় তবে পাঁচশত টাকা খরচ। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে, গঙ্গাস্নানকে কুসংস্কার বলিয়া জানে, গঙ্গাতীর ও হিঙ্গলবাঁধের মধ্যে তাহার কাছে কোন পার্থক্য নাই। অকারণে একটা কুসংস্কারের বশে পাঁচশত টাকা ব্যয় করাটা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা একথা সে জানিত, তাই কহিল—কি হল ঠাকুর মশায় ?

গোপাল ম্লানমুখে কহিলেন—টাকা না হ'লে গঙ্গাতীরে কেউ যাবে না। তবে হিঙ্গলবাঁধে যেতে সকলেই প্রস্তুত।

অশোক কথা কহিতে জানিত, সে কহিল—বাবা আজ তিরিশ বৎসর ক'লকাতা বাস করেছেন কিন্তু একদিনের জন্যেও গঙ্গার স্নান করেন নি। তিনি বলতেন—জন্মস্থানের চেয়ে বড় তীর্থ নেই। গোপালপুরের পাঁকপুকুরে স্নান ক'রলে সেই আমার ত্রিবেণী স্নান। তাই বার বার এখানে ছুটে আসতেন, আমরা বারণ ক'রলেও শুনতেন না—মাঝে মাঝে বলতেন, গোপালপুরের মাটির সঙ্গেই যেন আমি মিশে যাই। তাই মনে হয় বাবার কাছে এই গ্রামেরই সব ছিল তীর্থক্ষেত্র—তার দেহ এখানে ভস্মে পরিণত হ'য়ে গোপালপুরের মাটির সঙ্গে মিশে গেলেই তাঁর আত্মার বড় তৃপ্তি হবে—

গোপাল অশ্রুপ্লাবিত চোখ মুছিয়া কহিলেন—চাঁদু তাই বলতো !—আগ হা—গ্রামকে সে এত ভালবাসতো ! সত্যিই ত জন্মভূমিই সর্ব্বতীর্থের সার—ভগবতীর ছেলে এমনি কথা বলবেই ত—ভগবতী গ্রামের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে—এর একটা গাছের ডাল ছিল যেন তার প্রাণ—

গোপাল আত্মবিস্মৃত ভাবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বনলতা কহিলেন—গঙ্গাতীর পাবে না ঠাকুরমশায় ?

অশোক জানিত সরিকের টাকা খরচ করাইয়া দিবার একটা অস্ত্ররূপে জেঠাইমা এই হীন প্রস্তাব করিয়াছেন। অশোক তাই তাড়াতাড়ি কহিল—আমি তাই স্থির ক'রলাম ঠাকুরমশায়। বাবাকে আমি জানি—এই গোপালপুরই তার গঙ্গাতীর, বারাণসী, এখানেই তাঁর চিতাভস্ম, এই মাটির সঙ্গে মিশে গেলেই তাঁর বড় তৃপ্তি হবে—

গোপাল কহিলেন—তাই হোক ভাই, তাই হোক্। সার কথা তুমি বুঝেছ, জন্মপল্লীর চেয়ে বড় তীর্থ আর কি ?

অতএব হিঙ্গলবাঁধেই চাঁদমোহনের শবদাহ করিবার ব্যবস্থা হইল এবং অনতি বিলম্বে পাঁচ ছয়জনের একটি কীর্ত্তনসহ দশ বারজন লোক চাঁদমোহনের দেহ লইয়া গ্রামপ্রান্ত ত্যাগ করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—

গোপাল অত্যন্ত ক্লান্তদেহে চণ্ডীতলায় বসিয়াছিলেন—দূরে হিঙ্গল বনের নীচের বাঁধে চিতা জ্বলিয়াছে—তাহার লেলিহান জিহ্বা বনের শালগাছগুলিকে রক্ত লাল করিয়া তুলিয়াছে। ওখানে ওই গ্রাম-প্রান্তের পরিত্যক্ত জলাশয়ের কর্দ্দমাক্ত তীরে চাঁদমোহনের নশ্বরদেহ ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইতেছিল—

গোপাল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—সেদিনের চাঁদু চলিয়া গেল। তাঁহারও যাইবার সময় আগতপ্রায়—এমনি করিয়া ভালবাসার এই পৃথিবী, এই প্রতিবেশী, এই নিকটতম গ্রাম পরিজনকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে—পিছনে রহিবে এই পৃথিবী, ভগবানের রচিত পঞ্চভূতের দেহ আবার পঞ্চভূতে লয় পাইবে—

পিছনে রহিয়াছে—চিরপরিচিত কত শত স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রাম—কি সুন্দর প্রেমপ্রীতিময় ছিল এই গ্রাম, মানুষ মানুষকে ভালবাসিত। প্রতিবেশীকে করিয়া লইয়া ছিল পরমাত্মীয়, মানুষ ছিল সকলের জন্যে, সে ছিল সমাজের একজন, গ্রামের একজন—আজ তাহারা শুধু নিজেই আছে, চারিপাশের সকলে দূর হইতে সুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

কোথা হইতে কেমন করিয়া এক দানবীয় শক্তি আসিয়া অন্নবস্ত্র ঘুচাইল, মনের প্রেমপ্রীতি কর্ত্তব্য ভুলাইল—মানুষকে চিনাইল শুধু পশুর মত আহার ও বিহার—মানুষের পৃথিবীকে করিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য··· মানুষ হইয়া যদি মানুষকেই আপনার করিতে না পারিল—মানুষকে খাওয়াইয়া, ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া যদি তৃপ্তি না পাইল তবে সে মানব জীবনের মূল্য কি? এই সমাজ এই জনশ্রেণী চলিয়াছে কোথায়? কি চাহে তারা জীবনে···

মনে পড়ে ভগবতীর কথা—গ্রামের সকলে ছিল তার বৃহৎ পরিবারভুক্ত, কাহারও দুঃখ দূর করিতে সে পশ্চাদপদ হয় নাই। সে ছিল শাসক, পালক—তার মৃত্যুর দিনটি আজও মনে পড়ে,পাড়ায় পাড়ায় উঠিয়াছিল ক্রন্দনের রোল, গ্রাম যেন সেদিন পিতৃহীন হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে দিগন্ত পর্য্যন্ত বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। যেদিন ছোটলোক পাড়ায় আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া গেল সেদিন ভগবতীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি অপরিসীম বেদনা! সে আপনার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে বিলাইয়া দিল বসন্তসায়রের গৃহহীন লোকগুলির জন্য—তার মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল সহস্র লোক, অনুরোধ করিয়াও কাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় নাই—আর আজ তাহারই পুত্রের মৃতদেহ দগ্ধ হইতেছে হিঙ্গলবাঁধের পাড়ে। ভাড়াটিয়া লোকে কীর্ত্তন করিতেছে—লোকে চাহিয়াছে টাকা—ওর মৃত্যুর সুযোগে তারা উপার্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। কি নির্ম্মম মানুষ—কি স্বার্থপর হইয়াছে ওদের অন্তর—অথচ দেখিতে দেখিতে এতবড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সমগ্র দেশটা যেন নতুন শিক্ষার উগ্র নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মদ্যপায়ীর মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছে নেশার উন্মাদনায়—

ভাবিতে ভাবিতে গোপাল ব্যাকুলভাবে মনে মনে কহিলেন—মা—মা চণ্ডী, আমাকে ত যথেষ্টই দেখালে, আর কেন? এইবার কোলে নাও—সাথী সকলে চলিয়া গেল, এই পশুর রাজ্যে আমাকে কেন ফেলিয়া রাখিলে? করুণাময়ী মা—তোমার চরণে স্থান দাও মা—

গোপাল অশ্রুচোখে চাহিয়া দেখিলেন—হিঙ্গলবাঁধের নীচে, চিতার আগুন তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বাউরীপাড়া হইতে মাদল ও বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে—নিত্য যেমন আসে—আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সন্ধ্যায় মদ্যপানান্তে নৃত্য ও গীত চলিতেছে—আপনার আনন্দে।

গোপাল কহিলেন—মা জগদম্বা—মা—তোমার পায়ে স্থান দাও মা—দেখবার সাধ আমার মিটেছে—

বহুদিন পরের কথা—

দুইটি মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে পৃথিবীর মানচিত্রের বহু রং ও রেখার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়াছে। পুরাতন দেশ মিলাইয়া গিয়াছে, নতুনদেশ সৃষ্টি হইয়াছে—দেশ বিভক্ত হইয়াছে, প্রবল ভূকম্পনে যেমন দেশের মৃত্তিকা বদলাইয়া যায়, পর্ব্বত উঠে, দেশ জলে ডুবিয়া যায়, তেমনি মহাযুদ্ধের প্রকম্পনে-পৃথিবী বদলাইয়াছে—

সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়াছে মানুষের চেহারা, মানুষের মনের চেহারা, চিন্তাধারা, আদর্শ, চলিবার, বলিবার ভঙ্গি, শীল, আচার, তাহার সঙ্গে জীবনের দৃষ্টি ভঙ্গি। মানুষের সম্পদেই দেশের সম্পদ, দেশের সম্পদ বাণিজ্য—বাণিজ্যক্ষেত্র লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি। কে কাহার রক্ত শোষণ করিবে তাহা লইয়া চলিতেছে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা, বাকচাতুর্য্যে অনিষ্টকে ইষ্ট করিয়া তুলিয়াছে তীক্ষ্ণধী লোকজন। একদিন ছিল, যেদিন মানুষের পরিমাপ ছিল সততায়, চরিত্রে, উদারতায়, প্রেমে, শীলআচারে—আজ তাহার পরিমাপের যন্ত্র অর্থ—দেশের পরিমাপের যন্ত্র তার সম্পদ। শোষণেই তাহার সৌম্য, মঙ্গলের-শক্তিহীনতাই আধুনিকতার সংস্কৃতি। পিতামাতা ছিল দেবতা, আজ তাহারা হইয়াছে দুর্ব্বহ বোঝা—পুত্র লালন তাহার কর্ত্তব্য, যেহেতু নেহাত কামনা-প্রসূত তার পুত্র, তাই পুত্রের কোন কর্ত্তব্য নাই পিতার প্রতি। টাকার অঙ্কে টাকার মূল্যের বাঁধাধরা প্রাচীরের মাঝে রুদ্ধ হইয়াছে মানব জীবন। তাহার উর্দ্ধে, তাহার বাহিরে আর কিছুই নাই—সততা আজ উপহাসের বস্তু, বোকামীর নামান্তর, চরিত্র ভীরুতার পরিচায়ক। নিজে ছাড়া পৃথিবীতে কেহই নাই, কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যও নাই। প্রেম-প্রীতি-ত্যাগহীন নিরস বুভুক্ষু পৃথিবীর পানে চাহিয়া যাহারা অশ্রুমোচন করে তাহারা সেকেলে, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী।

পৃথিবীর রং বদলাইয়াছে—বদলাইয়াছে মানুষের চেহারা, তাহার মনের রং—

আমাদের গোপালপুরের রং ও বদলাইয়াছে, মানুষের চেহারা পাল্টাইয়াছে—মনেরও রং বদলাইয়াছে—

গোপালপুরের অদূরে একটা এরোড্রোম তৈয়ারী হইয়াছিল যুদ্ধের সময়—তখন আসিল দুর্ভিক্ষ। বাউরী মেয়েরা দলে দলে সেখানে গিয়াছিল কাজ করিতে—তাহারা মাটি কাটিত—কাঁকর কুড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। আমেরিকান সাহেবেরা যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে তাহাদিগকে অর্থ ও খাদ্য দিয়াছিল—তাহার সঙ্গে দিয়াছিল সুন্দর ফুটফুটে ছেলে মেয়ে—তাই তাদের অনেককে আজ আর বাউরী বলিয়া চেনা যায় না। তাহাদের দেহের রংও বদলাইয়াছে—এমনি করিয়া আরও অনেক রং ও বদলাইয়াছে—

ভগবতী চাটুয্যের কাছারী ও মণ্ডপের উপর জন্মিয়াছে অশ্বত্থবৃক্ষ—একপাশের প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, কিন্তু বৃক্ষের মূলের আকর্ষণে দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে বাস করে শত শত বন্য পারাবত—তাহাদের ত্যক্ত মলমূত্রে স্থানটা দুর্গন্ধময়। চণ্ডীমণ্ডপের কিয়দংশ ঘিরিয়া হইয়াছে কাছারীবাড়ী—সেখানে সরকার ও পেয়াদা থাকে। চাঁদমোহনের পরে অশোক বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়াছিল, অশোকও গত হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এখনও জীবিত। ব্লাডপ্রেসারের রোগিণী, জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যবসায় দেখে, দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছে, কন্যা নীলা কলেজে পড়ে—ছোট ভাই কাঞ্চনও কলেজে পড়ে—

শশধরের দুই পুত্র বিদেশে চাকুরী করিত, তাহাদের মধ্যে এক ভাই শহরে উকিল হইয়া সেখানে বাড়ী করিয়াছিল তাহার বংশধররা সেখানেই থাকে। অন্য ভাই বাড়ীটা রক্ষা করিবার একটা দুরূহ আশা লইয়া জীবনে অশেষ দুর্গতি বরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যথেষ্ট শিক্ষা না পাইয়া গোপালপুরের ভগ্নজীর্ণ বাড়ীতে এখনও বাস করে। ভগবতী চাটুয্যের জমিদারীর দুই আনা অংশের মালিক সে এবং জীর্ণ গোপালপুরের তথাকথিত জমিদার তিনিই—অর্থাৎ শিবশঙ্করবাবু।

গোপালপুর গ্রাম আজ ছিন্ন ভিন্ন—

মাঝে মাঝে পোড়ো বাড়ী, সর্প শ্বাপদসঙ্কুল। ব্রাহ্মণপাড়ায় বহু বাড়ী তালাবন্ধ এবং পরিত্যক্ত—যাহারা শিক্ষিত ও কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন তাহারা বিদেশে থাকিয়া চাকুরী করে, একান্তই অশিক্ষিত ও অক্ষম যাহারা তাহারা বাড়ীতে বসিয়া, জমির ধান দেখাশোনা করে—এবং কোন মতে দিন গুজরাণ করে। তিলি তাম্বুলী পাড়ার বহু অংশ পরিত্যক্ত, কেহ চাষ করে, কেহ চাকর বা সরকারের চাকুরী করে। তাঁতিকলুদের যে অংশ এখনও গ্রামে আছে তাহারা নানারূপ ভাবে উপার্জ্জন করিয়া দিন গুজরাণ করে। বাগদী বাউরী পাড়ায় অনেকে কাজে চলিয়া গিয়াছে—যেমন করিয়া বলাই গিয়াছিল।

গ্রামে ইউনিয়নবোর্ড হইয়াছে, সারদা মল্লিকের একবংশধর এখন প্রেসিডেণ্ট, তাহাতেই যাহা হয় তাহাতে সংসার চলে। সরকারী লোক আসিলে তাহার আদর আপ্যায়নের খরচাটাও হয়। সম্প্রতি রমেশ মল্লিক অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টবাবুর নিকটে কতকগুলি গাছ আসিয়াছে সেগুলি লাগাইতে হইবে। সরকারী হুকুম, বন-মহোৎসব করিতে হইবে—গাছ বড় হইলে দেশে আর অনাবৃষ্টি হইবে না।

তিনি সেক্রেটারী ওরফে কেরাণীবাবুকে কহিলেন—গাছগুলো যেখানে হয় পুঁতে ফেলুন। খাঁচা হিসাব করে ধরে দাও—সরকারের মাথা খারাপ, গাছ পুঁতলে বৃষ্টি হবে?

দুই চার দিন পরে গাছ লাগান হইল কিন্তু খাঁচা দেওয়া হইল না। গাছ গরুতে খাইয়া বন-মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া দিল। মতি ঠাকুরের আমলে লোকে বৃক্ষরোপণ করিত পুণ্যের মোহে, দুরন্ত বৈশাখে বনস্পতির মূলে জল সেচন করিত গ্রাম্য বধূগণ—সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবে। মতি ঠাকুর বিধান দিতেন—বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণ করিতে হইবে।

গ্রামের বনস্পতিগুলির ডাল কাটিয়া তাহাকে বহুপূর্ব্বেই নির্মূল করা হইয়াছে—সমগ্র গ্রাম খাঁ খাঁ করে, ছায়াহীন নিরস প্রস্তরময় ভূখণ্ড।

কেবলমাত্র চণ্ডীতলায় বৃহৎ বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার শাখাপ্রশাখা সবই অটুট আছে এমন নয়—তবুও এখনও আছে—বাগদীপাড়ায় নটবরের এক বংশধর সেখানে বসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়াছে, গরুগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া খাইতেছে। পরণে তাহার একটা হাফ্‌প্যাণ্ট হাতে পাচনী—চণ্ডীতলায় বসিয়া সে বাঁশী বাজাইতেছিল। বনমহোৎসবের

কয়েকটি গাছ তখনও বাঁচিয়াছিল এবং নূতন বর্ষণে নতুন পাতা গজাইয়াছিল। কয়েকটি গরু সেগুলি নির্ম্মূল করিয়া খাইল, ছেলেটা বসিয়া দেখিল কিন্তু কিছুই বলিল না। গরুগুলি ধীরে ধীরে সামনের ধানের জমিতে নামিল, ছেলেটা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল—কেহ আসিতেছে কিনা তাহার পর আবার বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

বোর্ডের কেরাণীবাবুকে দেখিয়া সে ছুটিয়া গেল গরু তাড়াইতে। কেরাণীবাবু কহিলেন—হ্যাঁরে, বসে বসে সরকারী গাছগুলি গরু দিয়ে খাওয়ালি ?

—না বাবু, মোর গরুতে খাবেক কেনে—ও ত বহুদিন আগে সব গরুতে মিলে খাওয়া করলেক—

কেরাণীবাবু কহিলেন—হাঁা, আমি দেখিনি ভাবছিস্, আচ্ছা।

উভয়েরই কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া গেল—এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আর কেহই মাথা ঘামাইল না।

গোপাল ঠাকুরের পুত্র ভোলানাথ আজ বৃদ্ধ—তিনিই পূজাপার্ব্বণ যজমান রক্ষা করেন। একটি পুত্র ইংরাজি শিখিয়া খাদে কাজ করে, আর একটি উকিল হইয়াছে। তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইয়াছে এমন নয়, তবে দুই পুত্রই সস্ত্রীক বিদেশে থাকে ভোলাঠাকুর সস্ত্রীক গ্রামেই থাকেন।

পলাশডাঙ্গার রাধামোহন চক্রবর্ত্তীর মাতৃশ্রাদ্ধ। রাধামোহন সকালে আসিয়া ভোলাঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাধামোহন বিদেশে ভাল চাকরী করেন—শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাহার মা ও বিধবা ভগ্নী বাড়ীতেই থাকিতেন। রাধামোহন শুষ্ক নমস্কার করিয়া কহিলেন—ঠাকুরমশায়, শুনেছেন বোধ হয়, আমার দাদার কথা—

ভোলা কহিলেন—না কি ?

—তিনি আস্‌তে পারবেন না, বাসাবাড়ীতেই তিনি তাঁর মত শ্রাদ্ধ-শান্তি করবেন। এখন মাতৃদায়টা এসে পড়েছে আমারই ঘাড়ে—

ভোলা ঠাকুর এ সকল কথাই জানেন, কথা না বাড়াইয়া কহিলেন—যেমন পারবে তেমনি ক'রবে তার আবার কি আছে ?

—তাই করবো, কিন্তু লোকে কিছু ব'লবে শেষে—

—তাতে তোমার কি ? সে সব শুন্‌তে গেলে চল্‌বে কেন ? বাসায় চলে যাবে, তখন আর কানে ওসব কথা প্রবেশই করবে না। আর তুমিও বাসায় কাজটা করলেই চুকে যেত—তুমিই বা বোকার মত ছুটি পেতে গেলে কেন ?

রাধামোহন হাসিলেন, কহিলেন—ঠিকই বলেছেন। ফর্দ্দটা ধরুন তা হ'লে—

—পাঁজিটা খোলো ধরাই আছে। ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ সবই আছে। যা ক'রবে দেখে নাও—

—আমার ত বেশী সাধ্য নেই, সংক্ষেপে যা হয়—

—গরীব বড়লোক সকলেই সংক্ষেপে করে। তাতে মনে করবার কি আছে ?

যাহা হউক সংক্ষেপ একটা ফর্দ্দ ধরা হইল। রাধামোহন কহিলেন—এত কাপড়, বাসনপত্র কিন্‌বো কি করে ? এ ত সাধ্যাতীত—

ভোলা কহিলেন—তারও সংক্ষেপ আছে, অর্দ্ধেক মূল্য দিলে সবই ভাড়া দিতে পারি।

রাধামোহন কহিলেন—অর্দ্ধেক ?

—হাঁা, সেদিন ত নেই যে লোকে এমনি দেবে। শুনেছি বাবার আমলে ছিল। এখন কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়ে না ঠেকলে কেউ কিছু দেয় না। কাজেই আমরা ঠেকলেই তবে পাই—বুঝলে ত ?

—তবুও অর্দ্ধেক ?

—কারণ, দায়টা মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয়, ক্বচিৎ কদাচিৎ ঘটে কিন্তু পুরোহিতের পেটটা নিত্য-নৈমিত্তিক। দক্ষিণাটাও তাই দশটি টাকা দিতে হবে—কারণ আর ত দেবে না। এক যদি ছেলেমেয়ের বিয়েতে হয়—তা ও ত বাসায় হবে।

—ঠাকুরমশায় কেবল নিজের দিকেই চেয়ে বললেন, আমার দিকে একটু চাইলেন না ?

ভোলাঠাকুর বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, তুমিত বৌমাকে নিয়ে বাসায় থেকে সিনেমা থিয়েটার দেখেছ, গয়না শাড়ীতে বাক্স বোঝাই করেছ, এদিকে তোমার মা বোন অশেষ দুর্গতিতে দিন কাটিয়েছে—তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়েছ ? মরার পরে না হয় একটু তাকাও, আর এ

জগতে এখন কে আর কার দিকে তাকায় বল? সে অবশ্য ছিল সেকালে—শুনেছি বাবার মুখে—

রাধামোহন মুখগোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং স্বার্থপর এই বুড়া বামুনঠাকুরটির প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁপাইতে লাগিলেন।

একদিন নূতন সভ্যতার আকর্ষণে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল আজ তাহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। মনের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তিই ছিল সভ্যতার মাপকাঠি—আজ অর্থ ও সম্পদই হইয়াছে সভ্যতার পরিমাপ - মানুষ কেবল চিনিয়াছে নিজের স্বার্থ। বড় হইবার নামে, শক্তি অর্জ্জনের নামে সে হইয়া উঠিয়াছে আত্মকেন্দ্রিক—নিজে সে চায় বড় হইতে, কিন্তু বড় করিতে চায় না, সে বড় হয় অন্যকে হত্যা করিয়া, অন্যকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া। তাহার শক্তি গড়িয়া উঠে শোষণের জন্য—মঙ্গলের জন্য নয়।

গ্রামে গ্রামে তাই ইউনিয়নবোর্ড ও কথনও কথনও স্কুল লইয়া চলে গ্রাম্য রাজনীতি, বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জনগণ সামগ্রিক কল্যাণকে ভুলিয়া হানাহানি করে। দুইজনের মধ্যে মামলা বাধাইয়া দিয়া একজন তদ্বির করিবার নামে উপার্জ্জন করে—সেবার পরিবর্ত্তে স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র শোষণের প্রতীক মাত্র। রমেশ মল্লিক ও শিবশঙ্কর তাই আজ গ্রামের মধ্যে নেতা—বিভক্ত জনশ্রেণীকে লইয়া তাহারা ছিনিমিনি খেলেন।

গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল—ছেলেরা বৈকালে মাঠ হইতে ফুটবল খেলিয়া ফিরিবার পথে গ্রামের তেমাথায় অবস্থিত ইন্দারার পাড়ে বসিয়া আড্ডা দেয়। আড্ডার প্রধান অঙ্গ শিক্ষকদিগের সমালোচনা—তামুলীদের বিনোদ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের নাকি সুর ও অঙ্কের শিক্ষক কমলবাবুর পড়ান দেখায়, ছেলেরা হাসিয়া গড়াগড়ি দেয়—পরীক্ষার পরে আজ সভা হইতেছিল—বিনোদ নকল করিবার সময় ধরা পড়িয়াছে তাই সে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিতভাবে বলিল—হরিবাবুর বকের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। বকের মত এসে খপ্ করে ধরলে—কেন বড়বাবুর ছেলেও ত নকল ক'রলে তাকে ধরলে না?

আর একজন বুদ্ধিমান ছেলে কহিল—তাকে ধরবে কেন। বড়বাবু মাসে মাসে পনর টাকা দেন—সব কোশ্চেন বলে দিয়েছে ঐ বকটা, নইলে শিবু ফার্ষ্ট হ'তে পারে?

ছাত্রগণের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকগণের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা যখন ভাষার মাধ্যমে প্রায় গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে তখন আকস্মিকভাবে ভোলাঠাকুর মশায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলোচনার কিয়দংশ তাহার কানে যাইতেই তিনি কহিলেন—হ্যাঁরে বিনোদ, শিক্ষক গুরু, তার সম্বন্ধে অমনি সব কথা উচ্চারণ করতে আছে। ছি ছি, তোমরা ছাত্র, লেখাপড়া শিখছ—

ছাত্রগণ হাসিয়া উঠিল—যেন ভোলাঠাকুরের এই কথাটা সত্যই হাস্যকর।

ভোলাঠাকুর কহিলেন—গুরুর সমালোচনা করতে নেই, শাস্ত্রে আছে এক অক্ষর যিনি শেখান, তার ঋণ জীবনে শোধ করা যায় না—

বিনোদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে কহিল—শিক্ষক গুরু আবার কে? টাকা নিচ্ছে, পড়াচ্ছে, তার আবার ঋণ কি! পেটের দায়ে পড়াচ্ছে—আমরাও পেটের দায়ের জন্য পড়ছি।—

—তবুও ন্যায় অন্যায় আছে ত। শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষা হয় না। সেটা তোমাদের স্বার্থেই দরকার।

—লেখাপড়া করে কি হবে? কোনমতে পাশ করতে পারলেই চাকুরী হয়। সতীশবাবুও ত নকল করে পাশ করেছিল—কত টাকা রোজগার করছে। আর ফার্ষ্ট হ'য়েছিল সেবার নরেনবাবু—উপোস করছে।

—তবুও নকল করাটা অন্যায় ত?

বিনোদ হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল—যার দ্বারা টাকা হয়, সেইটেই ন্যায়। নকল ত সকলেই করে—আর আমরা করলেই দোষ বুঝি। মাষ্টাররা প্রাইভেট ছাত্রকে কোশ্চেন বলে দেয় যে! মরতে মরণ গরীবদের—টাকা থাকলে সব হয়—

ভোলাঠাকুর কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না—পৃথিবীর এতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই, তাই নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেরা আর একবার সমবেত হাসিতে তাহাকে পরাজিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভোলাঠাকুর দাঁড়াইয়া ভাবিলেন তাহার পিতার কথা। তিনি পৃথিবী

পানে. চাহিয়া নীরবে কেবল অশ্রু মোচন করিতেন এবং নিষ্ফল ক্রোধে তাহাদিগকে কটুবাক্য বলিতেন।

কিঙ্কর বাগদী শীতের সন্ধ্যায়, আগুনের হাঁড়ি ও কাঁথা লইয়া মাঠে যাইতেছিল। কুঁড়েতে থাকিয়া রাত্রিতে কাটা ধান পাহারা দিতে হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বেও মাঠের ধান চুরি যাইত না কিন্তু আজ কয়েক বৎসর রাতারাতি মাঠের কাটা ধান কাহারা চুরি করিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক মাঠেই দুই চারিখানি কুঁড়ে রাখা হইয়াছে এবং রাত্রিতে তাহারা ধান পাহারা দেয়।

কিঙ্কর যাইবার সময় একটা বস্তা কাঁথার মাঝে জড়াইয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিল—তু দেড় পহর পরে যাবি, চরণ সঙ্গে যাবেক, বুঝলি—

—মু যাবেক কেনে, তু লিয়ে আস্‌বি।

—না, বাবু চৌকীদার রাখা করালেক, জানছিস্ না—

কিঙ্কর মাঠের কুঁড়েয় চলিয়া গেল। সেখানে আশ-পাশের কুঁড়ের দুই একজন সমবেত হইয়া পঁচুই পান ও আগুন পোহান শেষ হইলে যে যাহার কুঁড়েয় ফিরিয়া গেল। কিঙ্কর ধীরে ধীরে মাঠে নামিল—

কাঁদোড়ের ওপারে একটু দূরে একটা অর্জ্জুন গাছ, তাহার তলায় বসিয়া পা দিয়া ধান মাড়াইয়া বস্তাবন্দী করিল অত্যন্ত নিঃশব্দে। ধানের আঁটি কয়েকটা ইতস্তত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। কার্য্য সমাপনান্তে একবার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল—

অন্যান্য কুঁড়ে হইতে সকলে হাঁকিয়া জানাইল তাহারা জাগিয়া আছে। গভীর নিশীথের অন্ধকারে কিঙ্করের স্ত্রী-পুত্র চরণকে সঙ্গে লইয়া আসিল এবং ধান লইয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে চৌকীদার যাইয়া প্রেসিডেণ্ট রমেশবাবুকে হাঁকিল—বাবু বাবু—

রমেশ মল্লিক বাহির হইয়া আসিলেন—এ ডাকের অর্থ তিনি জানেন। তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কিরে পঞ্চা—

পঞ্চানন চৌকিদার কহিল—বাবু, এই ধান চোর নিয়ে এসেছি। একেবারে হাতে নাতে ধরা, মাঠ থেকে নিয়ে যাচ্ছে কাটা ধানের আঁটি—

রমেশ লণ্ঠন আনিয়া কহিলেন—বোঝাটা ফেল দেখি—কে তুই।

চোর বোঝাটা ধপাস্ করিয়া ফেলিল। রমেশ কহিলেন—ও তুই, সুন্দর—এ কাজ ক'র্‌ছিস্—

—আজ্ঞে পেটের দায়, কি ক'রবেক। আপনি হুজুর মা বাপ,—এইবারটি ছেড়ে দেন—আর ক'রবেক নাই—

—আর বছরেও ত তাই বলেছিলি, তা ছেড়েছিস কই—

—এজ্ঞে হুজুর—কপাল মোর মন্দ বটেক—সকলেই করলেক হুজুর ধরা পড়লেক সুন্দর—কপাল হুজুর—ছাড় করবে হুজুর—

—যা পনর টাকা নিয়ে আয়, ছেড়ে দিচ্ছি—নইলে গ্রামের মানুষ ডেকে দেখিয়ে দেব—হাল বন্ধ হয়ে যাবে—

—পনর টাকা কোথা পাবেক হুজুর—

—ধান বেচে কত পেয়েছ সেদিন বাপু, কথা বল্‌বিনি, নিয়ে আয়।

—কাল দেবেক হুজুর, রাতারাতি ধানমাড়া করাবেক ত? ভোর হ'লে ত ধরা পড়বেক হুজুর—

—তা ত, ধরা পড়বিই, শিগগির টাকা নিয়ে আয়।

—পনর টাকা।

—হ্যাঁ, ধান ত আমার মাঠেও চুরি যাচ্ছে, সেটা পুষিয়ে নিতে হবে ত? ওদিকে গেল, এদিকে আসুক—যা শিগগির—

সুন্দর বাউরী দ্রুত বাড়ী চলিয়া গেল এবং পনর টাকা আনিয়া দিল। রমেশ কহিলেন—পঞ্চা বোঝাটা তুলে দে।

পঞ্চা ধানের বোঝাটা তুলিয়া দিল—সুন্দর চলিয়া গেল। রমেশবাবু ঘরে ঢুকিতেছেন দেখিয়া পঞ্চা মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—বাবু—বাবু—

রমেশ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া কহিলেন—এই নে। কাল সকালে নিলে আর হ'ত না। আমি খেয়ে ফেলতুম—

পঞ্চা সাগ্রহে আগাইয়া আসিয়া পাঁচ টাকার নোটখানি হাতে করিয়া কহিল—কাজ নগদানগদিই ভাল বটেক—রাতের পাওনা রাতেই ঘরে ঢোকা করাই ভাল বাবু—

রমেশ কহিলেন—যা ব্যাটা, ভাল করে পাহারা দে, তুই একটা না ধরলে চল্‌বে না। কাল আবার মামলাটা রয়েছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া শিবশঙ্কর রমেশকে ডাকিয়া কহিলেন—ওহে প্রেসিডেন্ট, একটু দেখাশোনা কর, মাঠের ধান যে সব চোরেই নিলে। চৌকীদাররা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে—

রমেশ কহিল—কি করবো বড়বাবু! মাঠে যত পাহারা বাড়ছে ততই চুরি বাড়ছে। এ চুরি কে ঠেকাবে—

—তাইত চিরদিন হয়, কুঁড়ে করা মানেই আর এক ঘর চোর পত্তন করা। কিন্তু এত চুরি ত হয় না কোন বছর—

রমেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল—আপনার ধান চুরি গিয়েছে নাকি? আপনার ধান চুরি গেলে ত বড় কঠিন কথা—

—এখনও যায় নি, তবে যাওয়ার বিচিত্র কি? যে কোনদিনই যাবে—

রমেশ একটু হাসিয়া কহিলেন—কিষাণদের আর পাহারা দিতে পাঠাবেন না—ও বেটারাই চোর। আলাদা লোক একজন রাখুন—আর চৌকীদারকে বলে দেব, দক্ষিণ মাঠটা যাতে দেখে ভাল করে।

শিবশঙ্কর কহিলেন—লোক রেখে আর কি হবে বল রমেশ। ভগবানের হাতেই ছেড়ে দি—তবে আমার ধান চুরি গেলে আমি কিন্তু ছাড়বো না—

রমেশ কহিলেন—আচ্ছা, আমি ভাল করে পাহারার ব্যবস্থা করছি, যাতে চুরি না যায়—একটা চৌকীদার যাতে ওদিকে থাকে।

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন—কিষাণরা অর্দ্ধেক ভাগের জন্য সব জোট পাকিয়েছিল, সেটা ত ভেঙ্গে দেওয়া গেল—কিন্তু ভাগ ত শেষ পর্য্যন্ত আধাআধিই করে ফেললে দেখছি—

—তাইত দেখছি। রাতারাতিই সব ভাগ সমান সমান করে নিলে দেখছি।

—যাক্, এখন যার যার ভাগটা সাম্‌লে রাখতে পারলেই হয়, সেদিকে একটু চোখ দিও—

—হ্যাঁ, আখেরের ভাগ কি যাবার বড়বাবু। সকলের ভাগ সকলেই যদি চুরি করে তবে গড়পড়তা ভাগটা সমানই থেকে যায়—বুঝলেন ত? রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চাষা ও বাউরীদের একটা ফৌজদারী চলিতেছিল—রমেশবাবুকে তাহার তদ্বির করিতে কাল সদরে যাইতে হইবে তাই রাত্রিতে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তিনি চাষাদের পক্ষের—অতএব তাহাদেরই কাগজ দেখিতেছিলেন এমন সময় পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল—বাবা, হেডমাষ্টার আমাকে ফেল করিয়ে দিয়েছে!

রমেশ কহিলেন—কেন?

—নকল করেছিলাম বলে, নইলে সব বিষয়ে পাশ করেছি—

নকল করতে গেলি কেন?

পুত্র পাড়ার আরও পাঁচ ছয়টি ছেলের নাম করিয়া কহিল,—ওরাও ত নকল করেছে—

—তারা ফেল করেছে—

—না তারা ত ধরা পড়ে নি—

—তুই ধরা পড়তে গেলি কেন?

—মাষ্টার তাদের ধরলে না—তার আমি কি ক'রবো—

—তা এখন আমি কি করবো?

স্ত্রী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন—তাই বলে ছেলে ফেল ক'রবে? ছেলেমানুষ তাই ধরা পড়েছে, ওরা পাকা, ধরা পড়েনি—

রমেশ হাসিয়া কহিলেন—চোরের ত সাজা হয় না, ধরা পড়ারই ত সাজা হয়।

—তুমি একবার হেড মাষ্টারকে বল, ছেলে মানুষ ক'রে ফেলেছে—

—তুমি জানো না, এ হেড মাষ্টারটা ভারি পাজি, কারও কথা শোনে না। ভদ্রলোকের অনুরোধ শোনে না—

—তবে আর তুমি কি করলে? কথাই যদি না শুন্‌লে সকলে—

—আচ্ছা দেখবো বলে। কিন্তু ও বেকুবটা কি করে খাবে, লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে ওর—আমার ছেলে

হয়ে কিনা বল্‌ছে এসে ধরা পড়েছি—কুলাঙ্গার একটা জম্মেছে এসে—

পুত্র কহিল—তুমি গেলে প্রমোশন দেবে বলেছে—

স্ত্রী কহিলেন—একবার যাও, ছেলেটা কাঁদছে—

—আচ্ছা যাবো'খন, তবে কথা রাখবে মনে হয় না।

পুত্র কহিল—হরির বাবা ব'লতেই তার প্রমোশন হ'য়েছে ত, সেও ত ধরা পড়েছিল।

— বড়বাবু গিয়েছিলেন ?

স্ত্রী কহিলেন—সকলেই যায়, গেলেই প্রমোশন হয়। মাষ্টার আবার কথা শুন্‌বে না তাও কি হয় কখনও ? ছেলে মানুষ—করে ফেলেছে—

ওরাই ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক।

আদুরীর কন্যা সরোজের একটি সুন্দরী মেয়ে হইয়াছিল, —পাড়েজির মত টুক্‌টুকে ছিল তার গায়ের রং। তাহার, একটি কন্যা হইয়াছিল আরও সুন্দরী, মিস্ত্রী কৃপাল সিংএর মত নাক মুখ তার, রং ও উজ্জ্বল গৌর। মেয়েটির নাম ছিল সুন্দরী—কুলির ধাওড়ায় সে লালিতপালিত হইয়াছিল, কিন্তু যে যাইত সেই একবার অবিশ্বাসের সহিত চাহিয়া দেখিত—এমন সুন্দরী মেয়ে কুলির ধাওড়ায় আসিল কি করিয়া ? সুন্দরী যখন যোড়শী হইল তখন ম্যানেজারবাবুও কুলির গৃহে পদধূলি দিয়াছেন—এমন কি ফিরিঙ্গি ইলেকট্রীক-বাবুও আসিয়াছেন। সুন্দরীর অঙ্গে ছিল সোনার গহনা, দামী তাঁতের শাড়ী, বৃদ্ধা মাতারও কোন কষ্ট হয় নাই—কিন্তু হঠাৎ উত্তর প্রদেশের একটি যুবক ফিটার-মিস্ত্রী ও সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—তাহা আর কেহ জানিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুন্দরী ও বদ্রী মিস্ত্রি আসিয়া উঠিয়াছিল এক চটকলে। এখানে বদ্রীর দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় থাকিত, কিন্তু মজুত অর্থ চিরদিন থাকে না—রঙীন নেশা ও সঞ্চিত অর্থের থলি উবিয়া যাইতেই প্রয়োজন হইল চাকুরীর—চটকলের এলেকা, অতএব চাকুরী করিতে হইলে এখানেই চাকুরী করিতে হইবে। বদ্রী খোঁজ লইয়া জানিল —পুরুষের চাকুরী হওয়া এখানে কঠিন তবে সুন্দরীর স্পিনিং সেক্‌সনে যদি কাজ জোগাড় করিয়া দেওয়া যায়, তবে বদ্রীর পরে চাকুরী হইতে পারে এবং স্পিনিংএর কর্ত্তা মহিমবাবু দয়ালু ব্যক্তি, সুন্দরী তাহার নিকট গেলে তিনি ফিরাইবেন নাই মনে হয়। অতএব সুন্দরী একদিন ভাল শাড়ী এবং গালে স্নো-পাউডার লেপিয়া মহিমবাবুর শরণাপন্ন হইবে স্থির করিল।

গলির মোড়ের দোকানে তিনি নিত্য পান খান, সেখানে তাহাকে ধরাই সুবিধা, একথাও জানা গেল—

(ক্রমশঃ)

তব দান

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

কত গান, কত নয়ন দীপ্তি,
কত কথা, কত প্রাণ !
কত মিলনের মধুর তৃপ্তি,
চুম্বন অবিরাম।
কত হাসি আর কত ভালবাসা,
প্রীতি প্রেমে ভরা কত মধু ভাষা,
নিমেশে মিলায়, কোন সাহারায়,
ভাঙে হিয়া শতখান।
সকলিতো জানি, হে পিতম্ তব দান।

কত ক্ষুধা কত নিদারুণ তৃষা
কত মান অভিমান
কত না আঁধারে ভরে দশদিশা
কত বহে আঁখি বান।
কত বেদনার লেলিহান জ্বালা,
কত হৃদয়ের হলাহল ঢালা,
কাহার পরশে নিমেষে হরষে
চলে প্রীতি অভিযান,
সকলি তো জানি, হে পিতম্ তব দান।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কুম্ভমেলায় শোচনীয় দুর্ঘটনা—

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ২০শে মাঘ দুর্ঘটনায় কত লোক যে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব। কারণ, হতাহতের সংখ্যা নির্ণয়ের আবশ্যক ব্যবস্থা হয় নাই; অসত্যপ্রচারও হইয়াছে। সরকারের কার্য্যে অব্যবস্থাই সেই ব্যবস্থার অভাবের কারণ। এই ব্যবস্থার অভাব মেলা সম্বন্ধে সরকারের কাছে নানা দিকেই অপ্রকাশ হইয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—যে দিন সকাল সাড়ে ৯টায় পুলিস ভীড়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়ায় ও লাঠি চালনা করায় অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক পিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল সেই দিন অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টায় প্রদেশপাল রাজভবনে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রসিদ্ধা ভগিনী ও তাঁহার কন্যা, প্রদেশের প্রধান সচিব প্রভৃতিকে সম্মিলিত করিয়া কল্পবাসের পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঐ মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনায়ও তাঁহাদিগের এই সম্বর্দ্ধনা-সম্মিলনে লজ্জানুভব হয় নাই। যে কোন সভ্য দেশে ইহা নির্ম্মমতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কথিত আছে, রোম যখন পুড়িতেছিল, তখন রোমের সম্রাট নীরো বেহালা বাজাইয়া আনন্দানুভব করিতেছিলেন। যখন যাত্রীদিগের আর্ত্তনাদে প্রয়াগের আকাশ-বাতাস মুখরিত, চিতার ধূমে গগন কলুষিত, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আতঙ্ক সেই সময় প্রয়াগে রাজভবনে—জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সম্বর্দ্ধনা-সম্মিলনে অনেকের নীরোর সেই কথা মনে পড়ায় ৪ দিন পরে—"অনেক চিন্তার পর"—প্রধান সচিব গোবিন্দবল্লভ পন্থ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—সম্মিলনে ভোজে আসিবার পূর্ব্বে তিনি (প্রয়াগে থাকিয়াও) দুর্ঘটনার বিষয় জানিতে পারেন নাই!—

"Incredible as it may sound, yet no information of the Kumbh tragedy he got until fifteen minutes of his reaching Government House where the Governor was holding an 'At Home' in honour of the President."

গোবিন্দবল্লভ স্বীকার করিয়াছেন, সংবাদ প্রদানের সকল উপায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কে বন্ধ করিয়াছিল?

স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হইতে প্রধানসচিব গোবিন্দবল্লভ পন্থ পর্য্যন্ত কেন তখন প্রয়াগে ছিলেন? কাশিমবাজারে ফরাসী চাকরীয়া ল সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—বর্ষাকালে নদীতে যখন খর স্রোত, তখন সিরাজদ্দৌলা যাত্রিপূর্ণ খেয়ানৌকা ডুবাইয়া দেওয়াইয়া বিপন্ন নরনারীর অবস্থা দেখিতেন—"in order to have the cruel pleasure of watching the terrified confusion of a hundred people at a time, men, women, and children, of whom, many, not being able to swim, were sure to perish." স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর ভগিনী, প্রদেশের রাজ্যপাল ও প্রধান সচিব নিশ্চয়ই সেরূপ কোন মনোভাব লইয়া প্রয়াগে ছিলেন না—they are all honourable men. তবে কি তাঁহারা তামাসা দেখিতে অথবা মেলায় সরকারের লাভের পরিমাণ অনুমান চেষ্টায় তথায় ছিলেন? তাঁহাদিগের মেলায় উপস্থিতি যে ভাবে পূর্ব্ব হইতে বিঘোষিত হইতেছিল, তাহা কি সরকারের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করার মতই বলা যায় না?

প্রচার কার্য্যের জন্য কলম ও ক্যামেরা—বিবৃতি ও চিত্র অকাতরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রেল বিভাগ হইতে হিন্দুদিগকে "ডাক দিয়া" বলা হইয়াছিল,—প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভে সরকারী সুব্যবস্থায় (?) স্নান করিয়া মোক্ষলাভ করুন। "মৌনী অমাবস্যা" কি তাহা না বুঝিয়াও লোককে ঐ দিন স্নান করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে প্রলোভন দেখান হইয়াছিল। চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, তিনি শিক্ষায় ইংরেজ, দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলমান—ঘটনাচক্রে হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনিও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে পুণ্যোদক স্পর্শ করিতেছেন। (নিশ্চয়ই শ্যামাপ্রসাদের কথা স্মরণ করিয়া নহে।)

(২) রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের পত্নী স্নানার্থ প্রয়াগে উপস্থিত। তাঁহার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনও তাঁহাকে প্রদেশপালের শ্রদ্ধানিবেদন হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং অদূরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দবল্লভ পন্থ সেই দৃশ্য দেখিয়া হয়ত ভাবিতেছেন, শ্রদ্ধানিবেদনের অধিকার কেন প্রধানসচিবের নাই?

রেলের আয় বৃদ্ধির জন্যই কি প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল? এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য, কলিকাতা হইতে যে হাজার হাজার টেলিগ্রাম বিমানে পাঠান হইয়াছিল, ডাক ও তার বিভাগ তাহার জন্য গৃহীত মাশুল (বিমান ডাকের মাশুল ২ আনা বাদ দিয়া) ফিরাইয়া দিতেছেন কি?

পণ্ডিত জওহরলাল কবুল "সার্টিফিকেট" দিয়াছিলেন, বন্দোবস্তে কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। আর সেই বন্দোবস্তেই দারুণ দুর্ঘটনা! পুলিস রাষ্ট্রপতি হইতে পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্ম প্রধানসচিব পর্য্যন্ত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যস্ত থাকা যদি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইয়া থাকে, তবে কি তাহা দেশের দারুণ দুর্ভাগ্যদ্যোতকই নহে? উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে V. I. P.

(very important person) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রদেশের প্রধানসচিব ও যে—প্রয়াগে থাকিয়াও—৭ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ পান নাই, তাহাতে কি মনে করা যায় না—মেলার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা V. I. P. দিগের উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন—

"Like the deaf adder (or viper?) that stoppeth her ear, and will not hearken to the charmers, charming never so wisely."

'অমৃতবাজার পত্রিকায়' কোন লেখক লিখিয়াছেন, "কল্যাণীর" অভিজ্ঞতার পরে ভীড়ের ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বনের জন্য উপদেশ দান জওহরলালের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আরও কর্ত্তব্য ছিল—হরিদ্বারে অর্দ্ধ-কুম্ভের সময় দুর্ঘটনার কথা। তাহা স্মরণ করিয়া কাজ করিলে নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা ঘটিত না—প্রচার কার্য্যের পরিণতি অগণিত মৃতের শবদাহের চিত্রে হইত না।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাইবার পরে কি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল, প্রদেশের প্রধানসচিব গোবিন্দবল্লভ, প্রদেশপাল শ্রীমুন্সী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ব্যবস্থা দেখিতে ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন? কোন কোন হাসপাতালে যে দুগ্ধের স্থলে জল ব্যবহৃত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তাড়াতাড়ি লাশ জ্বালাইয়া দেওয়া কি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার উদ্দেশ্য কি? এ কথা কি সত্য যে, পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের পরে যেমন সংবাদদানপথ বন্ধ করা হইয়াছিল, তেমনই প্রয়াগে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পত্র, এমন কি যান-চলাচলও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল?

প্রদেশের প্রধানসচিবের স্বীকৃতি কি তাঁহার অযোগ্যতার নিদর্শন নহে? আর সেদিনও যে প্রয়াগের রাজভবনে সম্মিলন হইয়াছিল, তাহা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? সেই সম্মিলনে রাষ্ট্রপতি প্রমুখ ব্যক্তিদিগের (তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন মহিলাও ছিলেন) মুখে খাদ্য রুচিকর বোধ হইয়াছিল কি?

কুম্ভমেলা—সন্ন্যাসীদিগের। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারে যে পূর্ণকুম্ভ হয়, সেই সময় হইতে রেলের প্রচারকার্য্য ইহাতে লোক আকৃষ্ট করিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষ স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতে প্রধান মন্ত্রীর "সব ঠিক আছে" ঘোষণা লোককে নিঃশঙ্ক করিয়াছিল; অথচ সব যে ঠিক ছিল না দুর্ঘটনায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে—ঘোষণার মুখে চূণকালী লেপ দিয়াছে।

হাসপাতালেও যে প্রাদেশিকতার প্রভাব ছিল, তাহা এক জন আহত বাঙ্গালী মহিলা যে সঙ্গম হাসপাতালে ডাক্তারকে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—সে ব্যবহার যুক্তপ্রদেশের লজ্জার বিষয়, তাহা কি রাজ্যপাল বা প্রধানসচিব শুনিয়াছেন?

জওহরলাল, গোবিন্দবল্লভ প্রভৃতি কুম্ভমেলা "কল্যাণী" কংগ্রেসের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে পরিণত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, আমরা বলিতে পারি না। তবে সন্ন্যাসীদিগের—আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের চুক্তির নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণে সেইরূপ সন্দেহের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে।

১৯৩৩ বঙ্গাব্দ হইতে ভারতে রেল বিভাগ কুম্ভমেলার জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। এ বার প্রচারকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল। অথচ যে সরকার প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, তাঁহারাই আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই দুর্ঘটনার দায়িত্ব হইতে কি যুক্তপ্রদেশের সরকার, ভারত সরকার—বিশেষ রেল বিভাগ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন?

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য কি সরকারী ব্যয়ে স্নানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছিল? যাঁহারা সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদিগের জন্য কি স্বতন্ত্র পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল? জওহরলাল যাহাই কেন বলুন না, কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী ও কর্ম্মী তাঁহার, রাষ্ট্রপতির, প্রদেশপালের, প্রদেশের প্রধানসচিবের ও সেই জাতীয় লোকের নির্ব্বিঘ্নতা ও সুবিধা দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল? জিজ্ঞাস্য—কত পুলিস মেলায় জনগণের কাজ না করিয়া তাঁহাদিগের জন্য নিযুক্ত ছিল?

জওহরলাল যে সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতির কোন দোষ নাই বলিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই মনে হইবে তিনি—protests too much. কেবল তাহাই নহে। তাঁহার সেই কথা কি তদন্ত-কারীদিগকে প্রভাবিত করিতে পারে না, বা তাঁহাদিগের দ্বারা পরোক্ষ নির্দ্দেশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না?

মোট কথা—প্রয়াগেও বহু বার কুম্ভমেলা হইয়াছে. কিন্তু পূর্ব্বে কখন সরকার যাত্রি-সংগ্রহের জন্য এ বারের মত চেষ্টা করেন নাই এবং পূর্ব্বে কখন এ বারের মত দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে যাঁহারা কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সচিব-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সে জন্য কোনরূপ সহানুভূতি ব্যক্ত হয় নাই।

গত ২৮শে মাঘ যুক্তপ্রদেশের বাজেট বিচারকালীন আহূত ব্যবস্থা-পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার যুক্ত অধিবেশনে ২২জন সদস্য—যে রাজ্যপাল প্রয়াগে দারুণ দুর্ঘটনার দিন গীতবাদ্যসহ রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন সেই—হৃদয়হীনের বক্তৃতা শুনিবেন না বলিয়া রাজ্যপাল মুন্সী অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিলে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য তাহাতে রাজ্যপাল লজ্জানুভব করিয়া বক্তৃতা বন্ধ করেন নাই।

সদস্যগণ বলেন, দুর্ঘটনার জন্য সরকারই দায়ী—অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য অসঙ্গতরূপ অধিক জমী স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মোটর-যানের জন্য সেতু হইতে লোক সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—ঐ সকল লোকের সুবিধার জন্য বহুসংখ্যক পুলিস নিযুক্ত থাকায় জনতার সুবিধার জন্য আবশ্যকসংখ্যক পুলিসের অভাব ঘটিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, যে নিম্নস্থানে বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল তাহা দেখিয়াও সরকার তাহা সমভূমি করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। সদস্যরা বলিয়াছিলেন—দুর্ঘটনা আকস্মিক নহে—মানুষের কৃত।

আমরা আশা করি, রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রীর ভগিনী ও দুহিতা প্রভৃতি রাজভবনে—আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ও গীতবাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজ্যপাল মুন্সী—কুম্ভস্নানে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হইবে।

শিক্ষক-ধর্ম্মঘট—

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মতানুসারে গত ২৭শে মাঘ হইতে বেসরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের কর্ম্মবিরতি আরম্ভ হয়। এই ধর্ম্মঘটের কারণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগেরই সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের—বেতন ও মহার্ঘভাতা সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ গ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎ সরকারই সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দ্ধারণের বিরোধিতা করিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিবার বিষয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-সচিব সাম্যের পুরুষের মত ব্যবহার করিয়াছেন—প্রধান-সচিব "দাঙ্গা ফুরাইয়া লইয়াছেন।"

শিক্ষকগণ ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত করার পরে (পূর্ব্বে নহে) পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগের দাবীর কতকাংশ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষকগণ তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। নিম্নে প্রদত্ত হিসাবে শিক্ষকদিগের—সেকণ্ডারী বোর্ডের সিদ্ধান্তানুরূপ দাবী, সরকারের স্বীকৃতি ও শিক্ষকদিগের বেতন বুঝা যাইবে—

শিক্ষা	বর্ত্তমান বেতন	বোর্ডের সিদ্ধান্ত	সরকারের মত
এম, এ, বি টি, বা বি, এ (অনার্স) বি, টি	৯০ টাকা	১২৫ টাকা	১২৫ টাকা
বি, এ ; বি, টি	৭৫ "	১০০ "	১০০ "
এম, এ, (প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ)	৭৫ "	১২৫ "	১০৫ "
এম, এ, (তৃতীয় বিভাগ) বা বি, এ, (অনার্স)	৭৫ "	১২৫ "	১০৫ "
বি, এ, (ডিসটিংশন)	৬০ "	৮০ "	৮০ "
বি, এ, (পাশ)		৮০ "	৭০ "
ইণ্টারমিডিয়েট (শিক্ষিত)	৬০ "	৮০ "	৭০ "

অন্যান্য বিষয়ে সরকার শিক্ষক সমিতির দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

তাহার পরে মহার্ঘ্যতা-ভাতার কথা। এ বিষয়ে বোর্ড যদিও প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ৩৫ টাকা দিতে বলিয়াছেন, তথাপি সরকার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককে ঐ বাবদে ১০ টাকার উপরে আরও ৫ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সরকার যে ১০ টাকা দেন, তাহাও এই সর্ত্তে যে বিদ্যালয়কেও ১০ টাকা দিতে হইবে। তাহাতেও মাসিক প্রাপ্য ২৫ টাকা হয়।

আবার যে সকল সেকেণ্ডারী ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় বোর্ডের সর্ত্ত পূরণ করিতে অক্ষমতাহেতু সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করিতে পারে নাই সে সকলে শিক্ষক-সংখ্যা ১১ হাজার। ইঁহারা কোনরূপ সাহায্য লাভ করেন না।

শিক্ষক সমিতি, অনুসন্ধান ফলে, শিক্ষকদিগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে শোচনীয় তাহা, অবশ্যস্বীকার্য্য। যাঁহারা দেশের ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারা যাহাতে অভাবের তাড়নামুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য। নহিলে সমগ্র দেশবাসীর উন্নতি ক্ষুণ্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া কেবল ইংরেজের আমলের ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা বাবদে ব্যয় কত বাড়াইয়াছেন, তাহাই বলিয়া মূল কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজের আমলের পরে তাঁহারা শাসন বিভাগে কত চাকরী বাড়াইয়াছেন, তাহা কলিকাতায় বহু নূতন আফিস-গৃহ নির্ম্মাণেই বুঝা যায়। সচিব ও উপসচিবের সংখ্যাও বিস্ময়করভাবে অধিক। আর পুলিসের ব্যয় কিরূপ হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গভীর জলে মাছ ধরা প্রভৃতিতে যে টাকা অপব্যয়িত হয়, তাহার কথা না হয় না-ই বলিলাম।

যত দিন সরকার লোককে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না পারেন, তত দিন—যদি দেশে শিক্ষা-বিস্তার সত্যই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হয় তবে—সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের মধ্যে সাহায্যদানে তারতম্য করা সমর্থনযোগ্য বলা যায় না। সরকারী স্কুলে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় তাঁহাদিগের তুলনায় হীন নহেন। অথচ সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ যে স্থানে মহার্ঘ্য ভাতা ৪০ টাকা পাইতে পারেন, সে স্থলে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা কেন তাহা পাইবেন না—তাহাই জিজ্ঞাস্য। সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা কি কলিকাতায় অতিরিক্ত ১০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন?

শিক্ষকদিগের ধর্ম্মঘট ক্রমে ছাত্র-ধর্ম্মঘটেও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং পুলিস ছাত্র ও শিক্ষকদিগের দলবদ্ধ অভিযান—১৪৪ ধারার কাঁটা-তারে বেড়া—দপ্তর অঞ্চলে যাইতে দেয় নাই। সচিবরা তথায় নিরাপদ—

"সাঁতালী পর্ব্বতে রচে লোহার বাসর
তা'র মধ্যে রেখে দিল সোনার লখিন্দর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা-সচিব আছেন। কিন্তু শিক্ষা-সচিব কি করিতেছেন? এককালে আয়ার্লণ্ডের ডাবলিন কাসল হইতে যেমন ভাবে ঘোষণা বাহির হইত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তর হইতে তেমনই বিবৃতি বাহির হইতেছে। কিন্তু সে সকলে—অভাব—সহানুভূতির, অবস্থাজ্ঞানের ও আন্তরিকতার। সেই জন্যই সে সকল বিবৃতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি মাত্র করে।

বিদেশী মূলধনে শিল্প-প্রতিষ্ঠা—

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যখন দেশ ইংরেজের অধীন, তখন বিদেশ হইতে মূলধন লইয়া এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা সমীচীন কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার অভিমত—যত শীঘ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল এবং ভারতের দারিদ্র্য ও বিশেষজ্ঞের অভাব বিবেচনায় আবশ্যক সর্ত্তে বিদেশী মূলধন গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। আজ দেশ আর ইংরেজের অধীন নহে—স্বায়ত্ত-শাসনশীল। এখনও কি দেশ সেই মতানুবর্ত্তী থাকিবে? গত বৎসর মিষ্টার বার্ণষ্টিনের নেতৃত্বে যে আন্তর্জ্জাতিক "মনিটারী ফাণ্ড মিশন" ভারতের অবস্থা-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া যাইয়া রিপোর্ট প্রচার করিয়াছেন—

(১) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, ভারতের তাহা নাই;

(২) অথচ ভারতে নানা শিল্প—বিশেষ গ্রামাঞ্চলে মধ্যবর্ত্তী ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক;

(৩) ভারত রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে;

(৪) সুতরাং "মনিটারী ফাণ্ড" হইতে ভারতকে ঋণদান করা হউক।

ঐ যে বলা হইয়াছে, ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা পরিশোধ করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা ভারতের আছে, তাহাতে ভারত সরকার বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন,—নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা আছে—ফতোয়া দিয়াছেন।

কিন্তু বিদেশী মূলধন—ঋণ লইয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠা যে "ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন" হইতে পারে, তাহা ভুলিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই বিপদ মিশর ভোগ করিয়াছে। বিদেশী মূলধনে ও বিদেশী বিশেষজ্ঞে নির্ভর করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠার আরও বিপদ :—

(১) সাহায্যের অনেকাংশ যন্ত্রপাতিতে কলকারখানায় লইতে হয় এবং দেশে সে সকল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা শিথিল হয়।

(২) আন্তর্জ্জাতিক বা অন্য কারণে যদি মধ্যপথে উভয়বিধ সাহায্য বন্ধ হয়, তবে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব থাকিয়া যায়, কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বারা ঋণ-শোধের পথ রুদ্ধ হয়।

(৩) মহাজনের মনস্তুষ্টির প্রয়োজনে জাতির ক্ষতি হইতে পারে।

এই সকল কারণে, সহসা বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার আশায় বা দুরাশায় বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণের বিপদ বুঝিয়া কাজ করা সঙ্গত। অল্পদিন পূর্ব্বে আফগানিস্থান হইতে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও নানা প্রকারে দেশের উন্নতিসাধন চেষ্টা করিতেছেন—পরিকল্পনা প্রস্তুতও করিয়াছেন—কিন্তু সেজন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রাশিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে ও জার্ম্মানীর আক্রমণে দুর্ব্বল হইয়াও অন্য দেশের সাহায্য-যখন—ইংরেজ-মার্কিনী ও ভারতীয় পৃষ্ঠপোষিত বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইসেকের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া নবভাবে অগ্রসর হইয়াছিল, কখন সে নিঃস্ব, তাহার সমরসজ্জার একান্ত অভাব, সে দীর্ঘকালের কুসংস্কার ও কুশাসনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সে বাধ্য হইয়া রাশিয়ার নিকট যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দ্রুত পরিশোধিত হইতেছে। আর সে ভারতের মত পরিকল্পনার উপর পরিকল্পনা স্তূপীকৃত করে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্ম্মানী ঋণ পরিশোধ করে নাই—অথচ মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিয়াছিল।

মিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে বটে, ভারতের ঋণ-পরিশোধ-ক্ষমতা আছে, কিন্তু কি ভাবে—কতদিনে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব তাহা বলা হয় নাই। সুতরাং ভারতকে আরও ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করায় সন্দেহের কারণ যে থাকিতে পারে না, এমন বলা যায় কি?

কমিশনের মত এই যে, আগামী দুই বৎসরে ভারতের পক্ষে বিদেশী অর্থের প্রয়োজন-পরিমাণ=২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সাহায্য ভারতের পক্ষে প্রয়োজন এবং সাহায্যদাতা মহাজনের পক্ষেও লাভজনক হইবে। আবার এই সাহায্যে বঞ্চিত হইলে ভারতের পক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য হইতে পারে। অথচ এই পরিকল্পনা ভারতের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে—"it should be possible to find an agreed basis for additional foreign aid to India."

এই সকল সিদ্ধান্তে একটি বিষয় হিসাবে ধরা হয় নাই—যুদ্ধ। যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে সাহায্যের পথ বন্ধ হইতে পারে এবং কাশ্মীর-সমস্যা বা অন্য কোন কারণে ভারত রাষ্ট্র যদি যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে তবে তাহার আত্মরক্ষার প্রয়োজন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রয়োজন অপেক্ষাও প্রবল হইবে। দ্বিতীয় কারণে ভারতের ঋণ-পরিশোধ-ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

বিদেশী সাহায্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা সত্য হইলেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও বর্ণবিভেদ বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছে। ভারতরাষ্ট্র, যাহাই কেন হউক না, কৃষ্ণকায়ের দেশ। আর শ্বেতাঙ্গগণ তখনও সেই কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে পারে নাই—

> "Oh, East is East, and West is West,
> and never the twin shall met,
> Till Earth and Sky stand presently
> at God's great Judgment seat!"

যে কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে, সে—শক্তি। সেই শক্তি যদি পরমুখাপেক্ষী হয়, তবে তাহা কখনই তাহার ঈপ্সিত সাধন করিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বৎসরের বাজেট প্রদেশবাসীর পক্ষে ভয়াবহ। ইহাতে ঘাটতী—১৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতী পূর্ণ করিবার কোন উপায়ের আভাস পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই; কেবল বলা হইয়াছে—কর সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, হয়ত তাহার দ্বারা—কর বিভাগ-পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে! যেরূপ বেপরোয়াভাবে ব্যয়-বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং সরকার নানা দিকে লোকসান করিয়াছেন, তাহাতে ঘাটতী বৃদ্ধিতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সরকার-পরিচালিত ১০টি পরিকল্পনায় আনুমানিক লোকসান—১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; যথা—

(১) কলিকাতায় পরিবহন কার্য্যে—৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা
(২) হরিণঘাটায় গোশালায়—এক লক্ষ ৬১ হাজার টাকা
(৩) গভীর জলে মৎস্য আহরণে—২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা
(৪) কলিকাতায় (ইটালী অঞ্চলে) সরকারী গৃহনির্ম্মাণে—৫৬ হাজার টাকা
(৫) বরফ প্রস্তুতে ও ঠাণ্ডাঘরে—এক লক্ষ ৬ হাজার টাকা
(৬) কলিকাতায় উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে—এক লক্ষ ৬১ হাজার টাকা
ইত্যাদি

পরিবহন বিভাগ, গোশালায় ও গভীর জলে মৎস্য আহরণে বৎসরের পর বৎসর লোকসান হইতেছে। সে সকল কি প্রয়োজনে ও কাহার হিতার্থ রাখা হইতেছে?

কয়টি বিভাগে ব্যয়ের হিসাব এইরূপ:—

পুলিস…৫ কোটি ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
শিক্ষা…৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা
চিকিৎসা…৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা
জনস্বাস্থ্য…এক কোটি ১৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা
কৃষি…২ কোটি ২২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা
শাসন…২ কোটি ৫৮ হাজার ৬২ হাজার টাকা

প্রচার বিভাগের ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যে পুলিসের ব্যয় গত বৎসরের তুলনায় বাড়ান হইয়াছে, সে পুলিসের যোগ্যতার পরিচয়—শিক্ষক ধর্ম্মঘট উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় যে হাঙ্গামা হয়, তাহাতে পুলিসের অক্ষমতা হেতু সৈনিক ডাকিয়া কলিকাতায় শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ঋণ আগামী বর্ষে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে।

বর্ত্তমান বৎসরের শেষে কেন্দ্রী সরকারের নিকট পশ্চিমবঙ্গের ঋণ—৭৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা—পরবৎসর দাঁড়াইবে—৯৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকায়। এই প্রায় একশত কোটি টাকার সুদ দিতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রাণান্ত হইবে—আসল কি ভাবে শোধ করা সম্ভব হইবে? তাহাতে তাহার উন্নতি কতকালের মত ক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহা ভাবিয়া দেশের লোক ভীত হইতেছে। ইংরেজীতে যাহাকে Rake's progress বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি তাহাই দেখাইতেছেন না? এই অপব্যয়ের শেষ কোথায়?

"কল্যাণী"তে কংগ্রেসের অধিবেশন জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন?

অন্যান্য প্রদেশে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বর্জ্জিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে তাহা হইল না। সে দিকেও সরকার ব্যবসায়ী হইয়া লোকসান দিতেছেন!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৃহ নির্ম্মাণে, বহু সচিবপোষণে, নানা পরিকল্পনায় অবাধে যেরূপে অর্থ ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়—এই রাজ্যে প্রাচুর্য্যের দৃশ্যের পার্শ্বে অভাবই অনুভূত হইতেছে। সেই অভাব গত ৫ বৎসরে—স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের পরে বর্দ্ধিত হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণ জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহু টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য করা হইতেছে; অথচ ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া গঙ্গার জল সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ-সমস্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না—অর্থাভাবে তাহা করা যাইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহ্যাড়ম্বরপটুত্বের পরিচয় দিয়া দিল্লীতে গৃহের মালিক হইয়াছেন—তাহাতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও বন্ধু-বান্ধবীসহ বাস করিতে পা'ন। অথচ কলিকাতার রাজপথে বহু বাঙ্গালী নরনারী অনাহারে ও বিনাচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিতেছে! পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য আবশ্যক উপায় উদ্ভাবনে ও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে অক্ষমতার পরিচয়ই দিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে "Something is rotten in the state"। সেজন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন?

কেন্দ্রী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ—

পশ্চিমবঙ্গ (সরকার ও কংগ্রেস) যে ভাবে "কল্যাণী"তে অতিথি-সৎকার করিয়াছে, তাহাতে সে নিশ্চয়ই কেন্দ্রী সরকারকে (কংগ্রেস ও সরকার এখন অভিন্ন) বলিতে পারে—

> "আমি আমার বুকের বসন খুলিয়া
> তোমারে পরা'নু বাস,
> আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি,
> পুরাতে তোমার আশ।"

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট যে ব্যবহার লাভ করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিম্নে আমরা সে ব্যবহারের কয়টি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু সাধ্য-সাধনায়ও ফরাক্কায় গঙ্গার জল-নিয়ন্ত্রণের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধানবাদ ও টাটানগর বাদ দিয়া বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিতে বলিলেও এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি সে জন্য ঐ অঞ্চলে অভিযান করিবার ভয় দেখাইলেও প্রার্থনা ও ভীতিপ্রদর্শন কেন্দ্রী সরকারের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

(৩) কেন্দ্রী সরকারের দয়া লাভের আশায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষিত বেকার-সমস্যার সামান্য সমাধান কল্পে যে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে মঞ্জুর করা হয় নাই।

(৪) দুর্গাপুরে ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের যে প্রস্তাব পেশ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন—তাহাতেও কেন্দ্রী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বড় আশায় হতাশ করিয়া হাস্যাস্পদ করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে বিদেশের ও এ দেশের কথা—

ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সংবাদপত্রে ভারতের কথা ও ভারতের সংবাদপত্রে ঐ দুই দেশের কথা কিরূপ গুরুত্বলাভ করে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছে। যে সকল রিপোর্টে আলোচনা-ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকলের মন্তব্য এই যে, ভারতের সংবাদপত্রে ঐ সকল দেশের বিষয় যেরূপ স্থান লাভ করে ঐ দেশদ্বয়ের সংবাদপত্রে ভারতীয় সংবাদ সেরূপ স্থানলাভ করে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল না—এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও আমেরিকার সংবাদপত্রে ভারতের উদ্ভট সংবাদই অধিক আদর লাভ করে। আমেরিকার মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের ভারতে প্রতিনিধি-সংবাদদাতা আছেন এবং সেই পত্রদ্বয়েই ভারত সম্বন্ধে সুচিন্তিত সংবাদ ও মত প্রকাশিত হয়। আমেরিকার সংবাদপত্রের বক্তব্য—অস্থায়ীভাবে সেদেশের সংবাদপত্রে ভারতীয় সংবাদ ও ভারতের বিষয় অধিক প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বৃটেনের সহিত ভারতের আর পূর্ব্বের সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু ভারত এখনও "কমনওয়েলথ"-ভুক্ত—"শুকাইলে তরু তবু ছাড়ে কি জড়িতা লতা ?" তথাপি ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে ভারতের বিষয় অধিক আলোচিত হয় না।

কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের—বিশেষ বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিষয় অধিক আলোচিত হয়। অর্থাৎ ভারতীয় সংবাদপত্র আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারের—অবস্থা-ব্যবস্থার—অধিক আলোচনা করিয়া থাকে!

পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার চুক্তির-ফলে ভারত সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্রের মনোযোগ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকা যে ভারত রাষ্ট্রকে অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দিয়া সাহায্য করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানের ও আলোচনার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপস্থিত অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন আইনে পুনর্গঠিত হইল। বেতনভুক ভাইস-চ্যান্সেলারকে অতঃপর অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং সিণ্ডিকেটে অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইলেও নিয়মানুসারে চ্যান্সেলারের নিকট যে ৩ জনের নাম নিয়োগজন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। আমরা একটি বিষয়ে তাঁহার ও সিণ্ডিকেটের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।—বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পার্লামেণ্টের সদস্য; সুতরাং তাঁহাদিগকে বৎসরে কয় মাস দিল্লীতে থাকিতে হয়—

বিজ্ঞানে—
ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু
" মেঘনাদ সাহা
সাহিত্যে ডক্টর কালিদাস নাগ
" নলিনাক্ষ দত্ত

ইঁহারা চারিটি বিভাগের কর্ত্তৃস্থানীয়। ইঁহারা যে কয় মাস "দেশের কাজে" দিল্লীতে অবস্থান করেন ও সেজন্য নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক ও ভাতা পাইয়া থাকেন, সেই কয় মাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ না করিয়াও বেতন গ্রহণ করেন কি না, তাহা—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতার সময়েও—তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু সেই কয় মাস ছাত্ররা যে তাঁহাদিগের মত অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভের আশায় হতাশ হয়, তাহা কখনই—বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক হইতে বিবেচনা করিলে—উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

এই কয়জনের মধ্যে ডক্টর কালিদাস নাগ সরকারের মনোনীত সদস্য হইলেও পার্লামেণ্টে (সরকারের অনুমোদিত ?) একটি স্বতন্ত্র রাজনীতিক দলের নেতা! তাহার কার্য্যেও তাঁহাকে সময় দিতে হয়, সন্দেহ নাই।

ইহা ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক সময় দীর্ঘকালের জন্য (বিনাবেতনে ?) ছুটী লইয়া বিদেশে অধ্যাপনা বা শিক্ষাসংক্রান্ত অন্য কাজ করিতে গমন করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ডক্টর কালিদাস নাগ অল্পদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় অধ্যাপনা করিয়া আসিয়া দিল্লীতে গিয়াছিলেন এবং তাহার পরেই জাপানে গিয়াছেন। গত ৫ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অনুপস্থিতিকাল কিরূপ? সেই অনুপস্থিতিকালে ছাত্ররা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছে।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এক বৎসরের জন্য চাকরী লইয়া ব্রহ্মে গিয়াছেন। পরলোকগত সিণ্ডিকেট তাঁহার ছুটী মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালেও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলিয়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি বিদেশে অধ্যাপক বা অন্য চাকরীয়া সরবরাহ করিবার জন্য ডিপো হইয়াছে ?

ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানই যদি অধ্যাপকদিগের কাজ হয়, তবে তাঁহারা বিদেশে অর্থার্জ্জন করিলে, ছাত্রদিগের কখনই তাহাতে তাঁহাদিগের উপদেশে অধ্যয়ন হইতে পারে না। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বিদেশে যাইয়া অর্থার্জ্জন বোধ হয় গত ১০।১৫ বৎসর কাল প্রথায়-পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিদ্যাক্ষেত্রে গৌরবহানির ইহা কি অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপ প্রথার পরিবর্ত্তন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ-জন্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।

ভারত সরকারের বাজেট—

ভারত সরকারের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটেরই মত, বৈশিষ্ট্য—বিরাট ঘাটতী। ঘাটতীর সমর্থনে কেন্দ্রী মন্ত্রী দেশমুখ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব বিধানচন্দ্র যেরূপ যুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে কবি গোল্ডস্মিথের বর্ণনা মনে পড়ে :—

"When time advances, and when loves fail,
She then shines forth solicitous to bless
In all the glaring impotance of dress."

এ বার কেন্দ্রী সরকারের বাজেটে ঘাটতী অর্থাৎ "জমা কম খরচ বেশী" প্রায় ২৬ কোটি টাকা—নূতন নূতন কর বসাইয়াও অবশিষ্ট—১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

এই সব নূতন কর দরিদ্রকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আদায় হইবে এবং সেজন্য ভারত সরকারকে করদাতৃগণের জুতা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হইয়াছে—

(১) আমদানী সুপারীর উপর সের প্রতি কর ১৩ আনা। জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য সুপারীতেও কর বসাইয়া আয়ের সম্ভাবনা—৩ কোটি টাকা—

(২) প্লাষ্টিক, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্কে সম্ভাবিত আয়—এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

(৩) মিহি কাপড়ের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রতি গজে ৬ পাই ও অন্যান্য কাপড়ের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রতি গজে ৩ পাই বৃদ্ধি। আয়ের সম্ভাবনা—৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

(৪) সিমেণ্টে শুল্ক ৫ টাকা টন; কাপড় কাচা সাবানে প্রতি হন্দরে ৫ টাকা ৪ আনা ও ৬ টাকা ২ আনা; গায়ে মাখা সাবান প্রভৃতিতে শুল্ক হন্দরে ১৪ টাকা।

(৫) জুতার উপর শুল্ক শতকরা ১০ টাকা।

ইত্যাদি।

যে দেশে লোককে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যেমন সাবানের ব্যবহার-বৃদ্ধি তেমনই লোকের জুতা-ব্যবহার-বৃদ্ধি প্রয়োজন, সে দেশে সাবানের ও জুতার উপর এইরূপ শুল্ক আদায় করিবার একমাত্র কারণ—সরকারের প্রয়োজন—"State necessity that imperial tyrant."

অথচ ব্যয়সঙ্কোচের কোন উপায় লক্ষিত হইতেছে না! দেশকে দ্রুত দেউলিয়া করিবার উপায়ই কি অবলম্বিত হইতেছে না? এই ঘাটতী পূর্ণ করিবার কোন আন্তরিক চেষ্টা বাজেটে লক্ষিত হয় না। পরন্তু অর্থ-সচিব যেন "বেপরোয়া" হইয়া খাটতী বাজেটের বিলাসে ব্যস্ত হইয়াছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবে ঘাটতী পড়িয়াছে।

গতবার বাজেটে পাকিস্তানের নিকট প্রাপ্য ১৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে—হিসাবে ধরা হইয়াছিল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্ররোচনায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পাকিস্তান কায়েম করিবার জন্য যে টাকা ঋণ হিসাবে না দিলে প্রায়োপবেশন করিবেন বলিয়া টাকা দেওয়াইয়াছিলেন—তাহারই কিস্তি হিসাবে ঐ ১৮ কোটি টাকা ভারত সরকারের প্রাপ্য ছিল। পাকিস্তান এক কপর্দ্দকও দেয় নাই। দিবে কি?

পাকিস্তানের নিকট প্রাপ্য আদায়ের সম্ভাবনা কিরূপ, ব্রহ্ম সরকারের নিকট প্রাপ্যের অবস্থাই বা কিরূপ, তাহা "প্রকাশ করিয়া" বলা হয় নাই। এই "গাক! গাক!"—নীতি কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

উন্নয়নের কার্য্যের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ঘাটতী হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন করা হয়, তখন বলা হইয়াছিল, তাহার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ—২০৬৯ কোটি টাকা হইবে। তাহার পরে বেকার-সমস্যার সমাধানের অজুহতে তাহা আরও ১৭৫ কোটি টাকা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এইরূপ অসঙ্গত ব্যয়বৃদ্ধি নানা কাজেই দেখা দিয়াছে। সিঁদরীর সারের কারখানা প্রতিষ্ঠা হইতে দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সকল কাজেই ব্যয়ের পরিমাণ যে ভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, তাহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন—সরকার লোককে প্রথমে প্রকৃত ব্যয় জানান না—কাজ আরম্ভ করিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সংবাদ দেন—ক্রমে লোককে সহ্য করান হয়।

আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের চুক্তি, কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের উক্তি, তুরস্কের সহিত পাকিস্তানের চুক্তি, মিশরে ও সিরিয়ায় বিশৃঙ্খলা এ সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়—অন্ততঃ দেশরক্ষার জন্য বর্দ্ধিত হইবে, এমন মনে করা গিয়াছিল। তাহাতে যে বেকার-সমস্যার সমাধানেও সাহায্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে বিষয়ে ভারত সরকারের বাজেটে কোনরূপ উদ্বেগ লক্ষিত হইতেছে না। শান্তি সকলেরই কাম্য; কিন্তু শান্তি যদি সম্মানজনক হয়, যে কোন মূল্যে কিনিতে না হয়, তবেই তাহা কাম্য। আমেরিকার কবি লাওয়েলের কথা—

"God give us peace, not such
as lulls to sleep;
But woord on thigh and brow
with purpose knit."

কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তান আজ যাহা বলিতেছে, তাহাতে কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নীতির পঙ্গুত্ব বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। তিনি—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—ইংরেজের প্ররোচনায় বা নিজের অদূরদর্শিতায়—যে ভুল করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া প্রতীকার-তৎপর হইবার মত সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারিবেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য যে সমর-সজ্জা প্রয়োজন তাহা "শিরে সংক্রান্তি" লইয়াও যদি তিনি না করেন, তবে দেশের লোক তাঁহার কার্য্য ক্ষমা করিতে পারিবে না।

পাকিস্তানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তির ফল ভারতের পক্ষে কিরূপ হয়, তাহা না দেখিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, বাজেট বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, ভারত সরকার সে বিষয়ে অনবহিত নহেন। কিন্তু আমরা সে আশায় নিরাশ হইয়াছি।

বাজেটের মোটামুটি হিসাব—

প্রস্তাবিত আয়	৪৫২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা
সম্ভাবিত ব্যয়	৪৬৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা
ঘাটতী	১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা

অর্থ কমিশনের নির্দ্দেশ—কেন্দ্রী সরকারকে প্রতি বৎসর প্রদেশ সরকারসমূহকে ৮০ কোটি টাকারও অধিক দিতে হইবে (ইহাতে কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে। অথচ দেখা যাইতেছে :—

(১). কয় বৎসর রেলে যে অভাবনীয় আয় হইয়াছে, তাহা—বন্যার জলের মত—হ্রাস পাইয়াছে। অথচ রেলের বিস্তার ও উন্নতিসাধনের প্রভূত অর্থ প্রয়োজন। সামরিক ও অর্থনীতিক কারণে রেলপথ বিস্তার করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জনে এঞ্জিন নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যত প্রচার কার্য্যই পরিচালিত করা হউক না, বিপুল ব্যয়ে বিদেশ হইতে এঞ্জিন আনিতে হইতেছে ও হইবে। রেলে যাত্রীর ভীড় কমাইবার জন্য ট্রেণের ও গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেই হইবে !

(২) গত বৎসর সরকার এক শত কোটি টাকা ঋণ পাইবার আশা করিলেও ৮৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ পা'ন নাই।

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে যে ৪৫ কোটি পাইবার আশা গতবার করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই—৪০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রদেশসমূহে যে টাকা "ক্যাপিটাল" ব্যয় হইবে সে সকলেরও প্রধান ভাগ কেন্দ্রী সরকারকে দিতে হইবে।

এই অবস্থায় ব্যয়সঙ্কোচ করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। বিশেষ যদি সামরিক প্রয়োজন হয়, তবে তখন কত কোটি টাকা দিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। সামরিক প্রয়োজন-সম্ভাবনা যে নাই, এমনও নহে। যদি সে সম্ভাবনা থাকে, তবে সৈন্য ও সমরসজ্জার মতই দেশের লোকের সন্তোষ অত্যাবশ্যক হইবে। অথচ বাজেটে জনসাধারণের অসন্তোষ দূর করিবার—তাহাদিগের প্রত্যক্ষ উন্নতিকর কার্য্য দেখাইবার কিছুই নাই।

কেন্দ্রী সরকারের বাজেট দরিদ্রের জন্য নহে এবং তাহাতে ব্যয়-বৃদ্ধির ছায়া ঘনীভূতই হইয়াছে। এ বাজেটে দেশের লোক কোনমতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

বিহারে বাঙ্গালী সত্যাগ্রহী—

বিহারে গান্ধী-পন্থী পরিণতবয়স্ক শ্রীঅতুল ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালা ভাষাভাষীদিগের যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বিহার সরকারও হিংসা আরোপ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই সত্যাগ্রহ দলিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কেহ যদি হিংসার পরিচয় অনুভব বা অনুমান করে, তবে কি তাহা অসঙ্গত হইবে? দলে দলে সত্যাগ্রহী নরনারীকে পুলিস ধরিতেছে—এবং বিচারে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ দণ্ডাদেশ হইতেছে, তাহা অকারণ কঠোরতার পরিচায়ক। কারাদণ্ডে দণ্ডিত অতুলবাবুকে অসুস্থ অবস্থায় যেভাবে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহাতে কাশ্মীরে—জওহরলালের প্রীতিভাজন বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লার সরকার যেভাবে অসুস্থ শ্যামা-প্রসাদকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অনেকের মনে পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্য তাহাতে বিচলিত ও অতুলবাবুর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার প্রতিবাদ ও তাঁহার মুক্তির দাবী করিয়াছেন। কিন্তু বিহার সরকার যে সে কথায় কর্ণপাত করিবেন, এমন মনে করা যায় না; তাঁহারা হয়ত বলিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের কার্য্যে কেবল বিহারীদিগের দ্বারাই সমর্থিত নহেন; পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরাও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কলিকাতায় যে লক্ষ লক্ষ বিহারী জীবিকার্জ্জন করেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে বাঙ্গালীদিগের প্রতিবাদে ও দাবীতে যোগ দেন নাই। ইহাতে যদি বাঙ্গালী ও বিহারীদিগের মধ্যে তিক্ত মনোভাবের উদ্ভব হয়, তবে সেজন্য কে দায়ী হইবে? বিহারে সত্যাগ্রহীদিগের অপরাধ কি, তাহাই কিন্তু অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন না। বিহারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ রাষ্ট্রপতি। তাঁহার পদলাভের পূর্ব্বের ব্যবহার কাহারও অজ্ঞাত নাই। সীমা-নির্দ্ধারণ সমিতির সভাপতিও বিহারী।

কলিকাতায় অশান্তির উপদ্রব—

শিক্ষকদিগের ধর্ম্মঘটের সময় কলিকাতায় যে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে কয়খানি সরকারী "বাস" ও ট্রামগাড়ী পুড়িয়াছে, গুলীতে কয় জন পথচারীর মৃত্যু হইয়াছে। পুলিস শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিল এবং সৈনিক ডাকিতে হইয়াছিল। এই অশান্তির উপদ্রবও যে শান্ত শিষ্ট শিক্ষকদিগকে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারে প্ররোচিত করিয়াছিল, এমন মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘটে ও যে বারবার অশান্তির উপদ্রব দেখা গিয়াছে, ইহার কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। এইরূপ উপদ্রবের একাধিক কারণ থাকিতে পারে :—

(১) কলিকাতায় যে গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আছে, তাহা পুলিসের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। পুলিস যে তাহাদিগকে দমিত করিতে পারে নাই, তাহা পুলিসের যোগ্যতার ও সরকারের গৌরবের কথা নহে। তাহারা যে কোন আন্দোলনের সুযোগ লইয়া অশান্তি সৃষ্টি করে এবং সেই অশান্তির সুযোগে আপনারা লাভবান হয়। ইহাদিগকে কি পুলিস—এমন কি কোন কোন সচিবও জানেন না ?

(২) আন্দোলনের সুযোগে যাহাদিগের স্বার্থ কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। পুলিসের সে সম্বন্ধে সময় থাকিতে সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য।

যাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা থাকে, তাহারাই যে সময় সময় উপদ্রব ঘটাইয়া তাহার জন্য অপরকে দায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন প্রমাণও ইতিহাসে আছে। বিশেষ আয়ার্লণ্ডে ইংরেজের শাসনে পুলিস ও সৈনিক প্রভৃতির সেরূপ কার্য্য প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সেরূপ দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি ?—

(১) মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী যখন ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন ব্রিগেডিয়ার-জেনারল ক্রোজিয়ার তাঁহার উদ্দেশ্যে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—A World to Gandhi, তাহাতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কর্ক নগরে অগ্নিযোগ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"Infuriated with rage and blinded by strong drink, men wearing the King's uniform obtained petrol, with which they saturated houses and various premises belonging to private individuals and Government departments in Cork and set fire to the various places."

অর্থাৎ সরকারী চাকরীয়ারাই পেট্রল সংগ্রহ করিয়া লোকের ও সরকারের বাড়ীতে অগ্নিযোগ করিয়াছিল।

(২) ড্যালটন তাঁহার ইতিহাসে একটি ঘটনা সম্বন্ধে শ্রমিক কমিশনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"The forces of the Crown in Ireland have been guilty of arson and incendiarism is part of the policy..."

তখনও আয়ার্লণ্ডের পুলিসের অধিকাংশ আইরিশ।

আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয়ে এমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিব যে, কলিকাতায় পুনঃ পুনঃ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া যে অশান্তির উপদ্রব লক্ষিত হয়, সে সম্বন্ধে যাহাতে লোক আয়ার্লণ্ডের ঘটনার কথা মনে করিতে না পারে, সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় যখন অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন কি যাঁহারা ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনকালে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন—তাঁহারা সহরের শান্তিরক্ষার ভার লইলেন,—তাঁহারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন ?

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নির্ব্বাচন—

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। মোট ১১৭টি আসনে—মোট ৪৪,১০,৯৫৮জন ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ৩৯,০৬,৪১৫ জন ভোটদাতা ভোট দিয়াছিলেন। আর—

(১) কংগ্রেস ১১৫টি আসনের জন্য প্রার্থী দিয়া মোট ১৫,৬২,৯৯টি ভোট পাইয়াছেন ও ৪৫টি আসন পাইয়াছেন।

(২) প্রজা-সোস্যালিষ্ট দলের মোট ৩৮জন প্রার্থী মোট ৬,৩১,৬৬২টি ভোটে ১৯টি আসন লাভ করিয়াছেন।

(৩) কম্যুনিষ্ট দল ৩৬টি আসনের জন্য প্রার্থী দিয়া ২৩টি আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—৬,৫২,৬১৩।

(৪) আর এস পি দল ১৯টি আসনের জন্য প্রার্থী দিয়া ৯টি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ২,১২,৩৫৪।

(৫) টি-টি এন সি দল ১২টি আসন লাভ করিয়াছেন।

(৬) স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৯জন জয়ী হইয়াছেন। এই দলের প্রার্থীদিগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—৩,৯১,১১৫।

দল হিসাবে কংগ্রেস প্রধান হইলেও ভোট ও নির্ব্বাচনের তালিকা বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়—কংগ্রেসের তুলনায় অন্যান্য রাজনীতিক দল লোকের অধিক সমর্থন লাভ করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট, আর এস পি ও কে এস পি দল একযোগে কাজ করিয়াছেন। এই ৩ দলের লব্ধ আসন যথাক্রমে ২৩, ১৯ ও ৩৮।

কোন্ কোন্ দল সংযুক্ত ভাবে কাজ করিবেন, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

বৈদেশিকী

পাকিস্তান—

আমেরিকার সহিত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পাকিস্তান যেন "উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।" পাকিস্তানের সৃষ্টি বৃটিশের চক্রান্ত ও সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হইত না। সত্য বটে কোন কোন মুসলমান "প্যান-ইসলামিক" প্রভাবে সমগ্র এশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অবস্থায় সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিতেছিলেন, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের প্রথম প্রকাশ—তুরস্কে। তথায় কামাল প্রভুত্ব লাভ করিয়া প্রথমেই ধর্ম্মগুরু (খলিফা) সুলতানকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাহার পরে রাশিয়া ও চীন নবভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে—সেই দুই রাষ্ট্রে মুসলমানরা যে আর সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবিত হইবে—এমন সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু কামালের দ্বারা বিতাড়ি

সুলতানের দুর্দ্দশার সুযোগে ভারতে কেহ কেহ সুযোগ সন্ধান করেন—হায়দ্রাবাদের নিজামের দুই পুত্রের সহিত সুলতানের দুই কন্যার বিবাহ হয়; তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার পুত্র ভবিষ্যতে মুসলমানদিগের ধর্ম্মগুরু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন। ইংরেজ ভারতে বহুদিন মুসলমানদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সিপাহী বিদ্রোহে সেই অবিশ্বাস দৃঢ় এবং ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের পত্নী মুসলমান আমীরের অঙ্কশায়িনী হওয়ায় তাহা দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু রাজনীতিক কারণে—"গরজ বড় বালাই" বলিয়া এ দেশে ইংরেজ হিন্দুদিগকে নমিত করিবার জন্য, মুসলমানদিগকে আদর দিয়াছিল। সেই আদরের স্বরূপ স্বল্পায়ু পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে ছোট লাট ব্যামফাইল্ড ফুলারের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। এ দেশে ইংরেজের সেই ভেদনীতিই প্রথমে মসলেম লীগের প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ পাইয়া মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান পরিকল্পনায় পরিণতি লাভ করে। একদিকে মুসলমানদিগের পাকিস্তান লোভ, আর একদিকে জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির দেশ বিভক্ত করিয়াও ক্ষমতা সম্ভোগের লোভ—লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভেদনীতিতে দেশ বিভক্ত করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রাপ্তিতে মুসলমানরা বিব্রত হইয়াছিল। সেই জন্য মাউণ্টব্যাটেনের চক্রান্তে, গান্ধীজীর প্ররোচনায় ভারত পাকিস্তানকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়া কায়েম করে।

পাকিস্তানের ভাগ্য—যে জিন্না তাহার স্রষ্টা তিনি অযত্নে ও অনাদরে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পরে পাকিস্তান কাহার সাহায্য লইয়া শক্তিশালী হইবে, তাহাই বিবেচ্য হয়। লিয়াকৎ আলী আমেরিকার সাহায্য লাভে আগ্রহশীল ছিলেন। রহস্যজনকভাবে তিনি নিহত হ'ন। তাহার পরে খাজা নাজিমুদ্দীন। তাঁহার ইংরেজ-প্রীতি কাহারও অবিদিত ছিল না। তিনি—"উঠিল ধধূপ বেগে—পড়িল পাকাটি" হইলেন। তাহার পরে মহম্মদ আলী। তিনি আমেরিকার সাহায্য কেবল প্রার্থনাই করেন নাই, লাভও করিয়াছেন।

সেই সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তান কাশ্মীর সম্বন্ধে দাবী দৃঢ় করিতেছে। পাক-আমেরিকার চুক্তিতে জওহরলাল যে ভয় পাইয়াছেন, তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রম বলা যায় না। তিনি কাশ্মীরে অস্ত্র-ত্যাগ ঘোষণা করিয়া মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, এখন, বোধ হয়, তাহার ফল দেখিয়া তিনি ভীত হইতেছেন। শ্যামাপ্রসাদ যে জন্য জীবন দিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রয়োজনও, বোধ হয়, তিনি আজ উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু—

"বিদায় করেছ যা'রে নয়ন জলে—
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে?"

বিশেষ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় ও গণভোটে স্বীকৃত হইয়া আজ সে মত ত্যাগ করিলে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে! পাকিস্তান সে সুযোগ ত্যাগ করিবে না—"কমলী নেহি ছোড়তা।"

কাশ্মীর লইয়াই বিবাদ বাধিতে পারে। মুক্তিলাভ পাইয়া আবদুল গফুর খান বলিতেছেন—যুদ্ধ তিনি সমর্থন করেন না। যুদ্ধ কেহই চাহে না। কিন্তু যে স্থানে যুদ্ধ ব্যতীত জাতির ও দেশের আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষা অসম্ভব, সে স্থানে যুদ্ধ অনভিপ্রেত হইলেও অনিবার্য্য। যুদ্ধ চাহি না বলিয়া কি কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর, জম্মু ও লাডক ব্যতীত অবশিষ্ট যে অংশ জওহরলালের অবিমৃষ্যকারিতায় বা ইংরেজের প্রভাবে পাকিস্তান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, তাহা ভারত-ত্যাগ করিবে?

আমেরিকার সহিত চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা হইতেই পঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তানের উদ্যোগ ও আয়োজন সম্বন্ধে আকালী নেতা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অবজ্ঞা করা যায়? আর এ কথাও কি সত্য নহে যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে—হয়ত এখনও করিতেছে, ত্যক্ত সম্পত্তি পুনরাধিকার চেষ্টা করিতেছে, যাহাকে "ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন" বলে হয়ত তাহাই করিতেছে।

আজ আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিবার চুক্তি করায় জওহরলাল যে আশঙ্কা করিতেছেন, সেই আশঙ্কা করিয়াই শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু জওহরলাল তখন বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লার পৃষ্ঠপোষক এবং অস্ত্রত্যাগের ভুল ঢাকিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সচেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে যে পাকিস্তানী মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে এবং তাহারা পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিলেও ভারত রাষ্ট্রের প্রজার ব্যবসা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অধিকারে বঞ্চিত নহে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। যদি পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ হয়, তবে তাহারা কি করিবে?

পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, আমেরিকার নিকট হইতে যে সামরিক সাহায্য লব্ধ হইতে তাহা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না। কিন্তু সে কথায় কতটুকু নির্ভর করা যায় এবং নির্ভর করিয়া কতদূর নিশ্চিন্ত থাকা ভারতের পক্ষে সম্ভব, তাহাও বিবেচ্য। পাকিস্তান কোন্ প্রয়োজনে আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তি করিয়াছে? কেবল শোভার্থ যে সে তাহা করে নাই; তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

পাকিস্তানে ও যে অসন্তোষ ও অশান্তি নাই, এমন বলা যায় না। লিয়াকৎ আলীর হত্যা ও নাজিমুদ্দিনের পতন—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাষা লইয়া—অর্থাৎ পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালার স্থানে উর্দ্দু কায়েম করিবার চেষ্টায় তথায় যে আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা হয় তাহাতে কয়জন মুসলমান যুবক প্রাণ দিয়াছে এবং অল্পদিন পূর্ব্বে তাহাদিগের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা বাঙ্গালী। তাহারা মাতৃভাষা ত্যাগ করিতে যেমন সম্মত নয়—বিহারী ও পঞ্জাবী মুসলমানদিগের প্রভুত্বাধীন হইতে তেমনই অসম্মত। তাহারা "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" উক্তিতে উত্তেজিত হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কিরূপ লাভবান হইয়াছে, তাহাই আজ তাঁহাদিগের বিবেচ্য হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে নির্ব্বাচনের দিন পিছাইয়া দিতে হইয়াছে, নির্ব্বাচনের আয়োজনেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে, বহুলোককে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইতেছে—ইত্যাদি।

পাকিস্তানের অবস্থা কি, তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। পাকিস্তানের অধিবাসীরাই সে আলোচনা করিবেন। কিন্তু রাশিয়ার মতবাদ রোধ করিবার জন্য পাকিস্তান যদি আমেরিকার শরণাগত হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না—হইতে পারে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ আছে। তাহা হইলে পাকিস্তানের কাজ "আপনার নাক-কান কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের" চেষ্টার মতই হইবে।

আমেরিকার অভিপ্রায়—

আমেরিকা যে চীনে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই প্রভাব-বিস্তার-চেষ্টায় সে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল—স্বীয় প্রভাব বিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার মতবাদ প্রসার নিবৃত্তি। পাকিস্তানকে তাহার সাহায্য প্রদানে ও পাকিস্তানের সহিত তুরস্কের মিলন সংঘটনেও সেই অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের অর্থাৎ ইরাণের ব্যাপারেরও উল্লেখ করিতে হয়। ইরাণ তথা হইতে বৃটিশকে দূর করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার প্রভাবে তথায় দলগত চক্রান্তে ডক্টর মোসাদ্দেকের পতন ঘটিয়াছে এবং শাহ আবার সিংহাসন লাভ করায় রাজতন্ত্রের পুনরাগমন ঘটিয়াছে। আমেরিকা অবশ্যই সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের আর এক রূপ আছে—লর্ড কার্জ্জেন তাহাকে Sphere of Influence বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের সরকারের পরিবর্ত্তন সাধন করা হয় না, পরন্তু সে সরকারের প্রভুত্বই স্বীকার করা হয়, কিন্তু তথায় "Commercial exploitation and political influence are regard-as the peculiar right of the interested Power" অর্থাৎ অন্য দেশ তথায় অর্থ-নৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক প্রভাব পরিচালনের অধিকারী হয়। যে পেট্রল-সমস্যা লইয়া ইংলণ্ডের সহিত ইরাণের বিরোধ আমেরিকা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই ক্ষেত্রে আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরোধিতা করিয়াছে, কি পরোক্ষভাবে সহায় হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ষ্টালিনের বিশ্বাস ছিল, স্বার্থসংঘাতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিবাদ ঘটিবে। তিনি সেই বিবাদের আয়োজনে সহায়তারও পক্ষপাতীছিলেন।

মিশরে যে বিশৃঙ্খলা "কাল বৈশাখীর" মেঘের মত দেখা দিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে যে ইংলণ্ডের বা আমেরিকার বা উভয়েরই প্রভাব ছিল, এমন সন্দেহও কেহ কেহ যে করিতেছেন না, এমন বলা যায় না।

স্পেনে টিটোর নীতি আমেরিকার দ্বারা কতদূর প্রভাবিত, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে নীতিতে ফ্রান্সের অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য।

আমেরিকা যে ইরাকেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বলিত, সে সভ্যতার বিস্তার সাধন করিতেছে। এখন আমেরিকা তাহার প্রভাব বিস্তারের সমর্থনে বলিতেছে, সে অনুন্নত দেশ সমূহের উন্নতিসাধন করিতেছে। ধনিকবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর হইয়াছে। উভয়ক্ষেত্রেই সেই এক কথা—শ্বেত জাতিরা ভূ-ভারবহন করিতেছে—"Take up the topileman's burden." কিন্তু শ্বেতাতিরিক্ত জাতিরা সেই সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই তাহারা ভয় পাইতেছে—সেই ভয়ই অজ্ঞতার লক্ষণ।

টিটোর ব্যবহারে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, ফ্রান্সেরও ভয়ের কারণ নাই, এমন বলা যায় না।

মুসলমানপ্রধান দেশসমূহকে লইয়া কোন সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা হইতেছে, এমন সন্দেহও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। যদি তাহা হয়, তবে তাহার পশ্চাতে কাহার বা কাহাদিগের প্রভাব ও প্ররোচনা রহিয়াছে? কিন্তু সেরূপ কোন সঙ্ঘ যদি সত্য সত্যই গঠিত হয়, তবে তাহা কি ভবিষ্যতে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বিবাদের কারণ হইতে পারে না? রাশিয়া নিশ্চয়ই অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে। কিন্তু যদি বিপদ আসে, তবে তাহার শেষ কোথায় তাহা পূর্ব্বে নিশ্চয় বুঝিতে পারা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়—"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"

মিশরে ভাঙ্গাগড়া—

মিশরের রাজা ফারুককে রাজ্যচ্যুত করিবার পরে নাজিব একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান পরিচালক হইয়া মিশরের কার্য্য পরিচালিত করিতেছিলেন। যেমন অতর্কিতভাবে ফারুককে বিতাড়িত করা হয়, তেমনই অতর্কিতভাবে সহসা নাজিবকে পদচ্যুত ও বন্দী করা হয়। লোক মনে করিতে থাকে, বিপ্লব কখন সহজে শেষ হয় না। কেহ কেহ এই ব্যাপারে ফারুকের সমর্থকদিগের, কেহ কেহ বা আমেরিকার বা ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ অনুমান করিতেছিলেন। কিন্তু সকল অনুমান ব্যর্থ করিয়া কয় দিনের মধ্যেই দুই পক্ষ বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া নাজিবকে রাষ্ট্রপতি ও নাসের প্রধান মন্ত্রী হইয়া একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। যে দল নাজিবকে পদচ্যুত করিবার সময় তাঁহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই দলই তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি রাখিয়া কার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করায় অনেকে যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তেমনই আবার অনেকের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। নাজিব ঘোষণা করিয়াছিলেন—মিশরে সকল দল একযোগে কাজ না করিলে মিশরের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী—তাহা বুঝিয়াই তাঁহারা একযোগে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে হয়ত যুধিষ্ঠিরের উপদেশ মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন, যখন জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি মহিলারা শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইল, তখন জ্ঞাতিবিরোধ ভুলিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধনই সকলের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—

"মহিষের শিং বাঁকা
যুঝবার সময় একা।"

এখন প্রকাশ পাইতেছে, ফারুককে রাজ্যচ্যুত করার গৌরব নাজিবের নহে। বিপ্লবী কাউন্সিলই সে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই নাজিবের
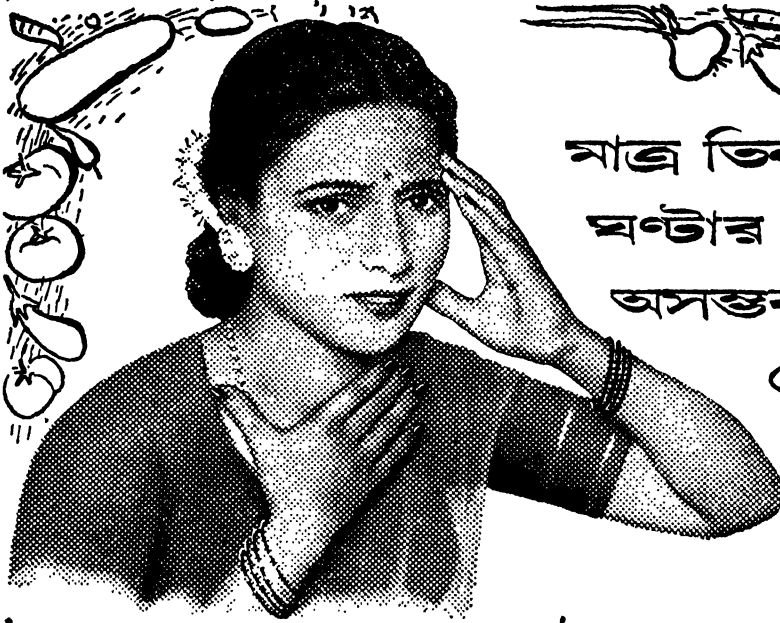
মাত্র তিন
ঘণ্টার মধ্যে
অসম্ভব সম্ভব
হোলো !

প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে কৃতিত্ব ও তাঁহার সহিত ফারুকের বিরোধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন—ক্ষমতা মানুষকে দুষ্ট করে। নাজিবের তাহাই হইয়াছিল এবং তিনি—যাহাকে একাধিশ্বর বা "এবসোলিউট ডিক্টেটার" বলে, তাহাই হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী।

নাজিব যে আমেরিকার বেড়াজালে ধরা দেয় নাই, তাহাতে কেহ কেহ তাঁহার পদচ্যুতিতে আমেরিকার "চাল" মনে করিয়াছিলেন। তাহা সত্য কি না, পরে, ঘটনায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, সন্দেহ নাই।

যদি মিশরের বিপদ-সম্ভাবনা মিশরের বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে সম্মিলিত করিয়া থাকে, তবে যে মিশরে জাতীয় দলে ত্যাগী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন মনে করা যায় এবং তাহা হইলে মিশর সত্য সত্যই স্বাধীনতা লাভের পরে গণতান্ত্রিক পথে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

নাসের যে ক্ষমতাশালী তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু সাধুতার জন্য নাজিব লোকপ্রিয়। যদি এই দুই দল সত্য সত্যই একযোগে মিশরের কল্যাণকল্পে কাজ করেন, তবে মিশর উন্নতি লাভ ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। মিশর দীর্ঘকাল পরবশ্যতার দুঃখ ভোগ করিয়াছিল। তাহার পরে য়ুরোপীয়রা—মিশরের প্রভুত্বের জন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিরোধান্তে—মিশরের শাসক খাদিবকে স্বাধীন রাজা করিয়া তাঁহাদিগের প্রভাবাধীন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আরবী পাশার বিপ্লবচেষ্টা বহুদিন পূর্ব্বের বিষয়—জগলুলের বিদ্রোহ পরবর্ত্তীকালের ঘটনা এবং তাহার গুরুত্বও অসাধারণ। সেই বিদ্রোহই মিশরের নারীদিগকে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি কার্য্যে যোগদান করায়—জগলুলপত্নী সে আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

তাহার পরে মিশর রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা ইরাণের অবস্থার মত হয় নাই। মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই যে নাজিবের সহিত নাসের একযোগে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা যে প্রকৃত দেশপ্রেমের প্ররোচনায় সম্ভব হইয়াছে, তাহা মনে করিলে সকলেই মিশরকে অভিনন্দিত করিবেন। এখন সুয়েজখালের সমস্যা কিরূপে সমাধান হয়, তাহা দেখিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সংবাদ অস্বস্তিকর—নাজিব আবার একনেতৃত্ব পাইয়াছেন।

কোরিয়ার শিক্ষা—

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একাধারে theatrical personality ও নিপুণ অভিনেতা। তিনি নাকি "কল্যাণী"তে সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ করিতে যেন ফোঁপাইয়া কান্দিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইবার জন্য কোরিয়ায় অভিভাবক বাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। সেই বাহিনী যে তথায় কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে নাই, সেজন্য বাহিনীর ও বাহিনীর জেনারল থামিয়ার কোন দোষ বা ত্রুটি নাই। তাঁহারা যে কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজসাধ্য নহে, পরন্তু দুঃসাধ্য। তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ভারতের কর্ত্তব্য ছিল কি না, সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু বিবেচ্য। যদি বলা হয়, ভারত এই ব্যাপারে অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তবে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করাই ভাল। এ ক্ষেত্রে কয় মাস ভারতের লোককে অস্বস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে; কারণ, উক্ত বান্দীরা ও তাহাদিগের পক্ষাবলম্বীরা এই অভিভাবক বাহিনীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতার পরেও ভারত সরকার কোন কোন লোকের খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য বিদেশে বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে জড়িত হইবেন কি? "ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরিয়াছে"—ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বাস্তবিক কোরিয়ার ব্যাপারে কোন্ পক্ষ দোষী, তাহাও ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোরিয়ার ব্যাপারে যুদ্ধবন্দীদিগের সম্বন্ধে চিরাচরিত সামরিক রীতি ভঙ্গ করা হইয়াছে। ভারত সরকার সে বিষয়ে কি করিবেন?

অশান্তির অভিযান—

দিকে দিকে অশান্তির অভিযান লক্ষিত হইতেছে। সিরিয়ায় বিগ্রে-ডিয়ার সিসাকলীর পতনের কারণ কি, তাহা নানা দিকে—বিশেষ মিশরে বিবেচনা করিবার বিষয় হইয়াছে। ইরাক—তুর্কীর সহিত পাকিস্তানের চুক্তিতে কি ভাবে প্রভাবিত হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে ইরাক ঐ চুক্তিতে তুরস্ক ও পাকিস্তানের মিতালী এক সঙ্গে লাভ করিতে চাহে, এমনও কেহ কেহ মনে করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, কাদি এল জামালীর সরকার সিরিয়াকে বাগদাদের (অর্থাৎ ইরাকের) প্রভাবাধীন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। যদি তাহা হয়, তবে ইসরেল কখনই সে ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারিবে না এবং তাহা হইলেই নূতন বিশৃঙ্খলার উদ্ভব অনিবার্য্য হইবে। মিশরে বিশৃঙ্খলার সময়ে সুদানেও তাহা হইয়াছে। আরব লীগ নূতন প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনা, তাহার উদ্দেশ্য কাহারও নিকট গোপন নাই বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না এবং সিদ্ধ হইলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা বলা দুষ্কর। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কোন দেশে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার প্রভাব অন্যান্য দেশেও অনুভূত হয়। সিরিয়ায় ব্যাপারের পরিণতি কোথায় তাহা এখনও বলা যায় না।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৬০

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে

কুমারী অনামিকা রায় সাহিত্যভারতী

গতবারে উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী মেয়েদের জীবন-সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি। যে তেজস্বিনী, বা কারো কারো মতে প্রগল্‌ভা মেয়েটির কথা বলেছি, সৌভাগ্যবশতঃ সে তার জীবনে যে সুযোগ ও সার্থকতা লাভ করেছিল, পনেরো আনা মেয়ের পক্ষে কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটে না। আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। বিশেষ অবস্থা ছাড়া পিতৃধনে আমাদের অধিকার নেই। স্বামীর সম্পত্তিতেও আমরা পূর্ণ অধিকার পাইনি। স্ত্রী-ধনই আমাদের একমাত্র সম্বল। তা'ও, বর্তমানের অনটন সংসারে আমরা ক'জন তা' রক্ষা করতে পারি? একটা ভারি অসুখ বিসুখে, ছেলের পড়ার খরচে বা মেয়ের বিয়েতে আমাদের গহনা টাকা নিঃশেষে বার ক'রে দিতে হয়।

ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দিন দিন যে হারে বেড়ে চলেচে তাতে গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে ক্রমেই তা' দুর্বহ হ'য়ে পড়চে। সময়ে মেয়েদের বিবাহ দিতে পারিনি। ঘরে 'বসিয়ে রাখার চেয়ে যাঁদের সাধ্যে কুলায় তাঁরা মেয়েদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা পারেন না, তাঁদের ঘরের মেয়েরা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পৌছে লেখাপড়া ইতি করতে বাধ্য হন। ঘর-সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করেন। পাত্র পাওয়া দুর্লভ। মেয়ের বয়স বেড়ে চলে। বাপ মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কিন্তু তাঁরা কোন উপায় খুঁজে পান না। আর, যাঁরা মেয়েকে পড়াতে পারেন তাঁরা পড়িয়েই চলেচেন। মেয়ে বি-এ পাশ করলে, বা এম-এ পাশ করলে, বিবাহ দেওয়া আরও দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ এম-এ, বি-এ পাশ করা মেয়েদের এম-এ, বি-এ পাশ করা পাত্র চাই। সে পাত্রের যা বাজার দর তা দেওয়া সকল অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে, গ্র্যাজুয়েট মেয়ের অনূঢ় অবস্থা অনেক পরিবারেই স্থায়ী হ'য়ে ওঠে।

কেউ কেউ সুপারিশের জোরে সরকারি ও বে-সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়েন বটে, কিন্তু যেখানে অধিকাংশ শিক্ষিত ছেলেই বেকার হয়ে বসে আছে সেখানে মেয়েদের কাজের সুযোগ কোথা? অল্প শিক্ষিত মেয়েরা দেখি টেলিফোন গার্ল, নার্স, কম্পাউণ্ডার, দোকানের পসারিণী, টাইপিস্ট, এমন কি ক্যানভাসারের কাজও করেন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজেও কেউ কেউ লেগেচেন। সিনেমায় যাওয়া আজও তাঁরা অমর্যাদাকর বলে মনে করেন। তাছাড়া রূপালি পর্দায় দেখা দেবার মতো তাদের রূপ গুণই বা কই? গ্র্যাজুয়েটের মানদণ্ড সেখানে অচল! তাহলে গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা কি করবে? বি-এ, বি-টিরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ খোঁজেন, কিন্তু, কটি মেয়ে-স্কুল আছে এ দেশে যে তাঁদের সকলের কাজ হতে পারে। কেউ কেউ গৃহ-শিক্ষিকার কাজ করেন। এম-এ পাশ করে বসে আছেন যাঁরা তাঁরা আবার স্কুল-মিস্ট্রেসের কাজটাকে অসম্মানজনক মনে করেন। তাঁরা গার্লস কলেজে অধ্যাপিকার কাজ চান। কিন্তু, এখানেও সেই প্রশ্ন—কটি বালিকা মহাবিদ্যালয় আছে এদেশে? যে কটি আছে, সেগুলির একাধিক বিভাগ পরিচালনার জন্য পুরুষ অধ্যাপকের সাহায্য নিতে তাঁরা বাধ্য হন, কারণ সেই সকল বিভাগে উপযুক্ত অধ্যাপিকার একান্ত অভাব। যেমন ধরুন উচ্চগণিত, বিজ্ঞান, রসায়ন, ভাষাতত্ত্ব, প্রাণী-বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেবার উপযোগী মহিলা অধ্যাপিকা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। আমার পরিচিত একাধিক এম-এ পাশ করা মেয়ে যাঁরা বাংলা সাহিত্য বা দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সুহজ বিষয় খুঁজে নিয়েছিলেন সহজে পাশ করবার সুবিধা হবে বলে, তাঁরা পাশ হয়েছেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কাজেই একপাশে পড়ে আছেন। অধ্যাপিকার কাজ তাঁরা পাচ্ছেন না। স্কুল-মিসট্রেস্ হবার লজ্জাও বরণ করতে পারছেন না। একেবারে ট্র্যাজিক অবস্থা!

সময়ে একটা বিবাহ হ'লে, অর্থাৎ সম্যকরূপে বহন করবার যোগ্য স্বামী একটি পেলে এঁরা হয়ত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, কিন্তু কেবলমাত্র এম-এ বা বি-এ ডিগ্রী তো পাত্র লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে রূপ চাই এবং রূপাও চাই। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েট মেয়ের মধ্যে এ দুটো বস্তুরই অভাব দেখা যায়। ফলে, তাঁরা অনেকেই দেশ-সেবিকা বা সমাজ-সেবিকা হ'য়ে পড়েচেন। কেউ কংগ্রেসের দলে, কেউ কমিউনিষ্ট পার্টিতে, কেউ বা ফরওয়ার্ড ব্লকে। যাঁর যে দলের সঙ্গে মতের মিল

হয়েছে তিনি সেই দলে ভিড়ে গেছেন। কিছু তো করা চাই! মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হ'ল অলস জীবন যাপন করা। কেউ স্কুল খোলেন। কেউ নারী-কল্যাণ আশ্রম খোলেন। চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়ান। লোকে সন্দেহ করে। বিরক্তও হয়।

আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী বলেই একথা লিখছি। যখন বি-এ পড়ি বাপ মা পাত্র স্থির করলেন বিবাহ দেবেন বলে। কিন্তু আমার তখন গ্র্যাজুয়েট হবার ঝোঁক প্রবল! তাই, প্রবলভাবেই বিবাহ ক'রতে অসম্মত হলুম। মা তখন বাবাকে বললেন, ওর কথা শুনো না, তুমি জোর করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। বাবা বললেন, 'না, মেয়ে বড় হয়েছে, ওর অমতে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। পড়তে চাইচে পড়ুক না।' বি-এ পাশ করলুম ইংলিশে অনার্স নিয়ে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চললো এম-এ পড়া। বিপুল উৎসাহ। পরীক্ষার রেজাল্ট—একেবারে 'ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট'।' আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমার জয়-জয়কার! কিন্তু, তারপর?

তারপর এল পাঠ্য জীবনে অবসাদ! হ'ল—সংসারী হবার সাধ! একজনের স্ত্রী হবো, সন্তানের মা হবো, গৃহের কর্ত্রী হবো। এ ইচ্ছা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাই, প্রফেসারী পেয়েও নিলাম না। প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, আমার পিতা ধনী, বড়ভাই একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার। কিন্তু, এর কোনটাই আমাকে বিবাহের ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলে না। কারণ, কেবল পড়ে পড়ে আমার চেহারার মধ্যে নাকি আর কোনও লালিত্য অবশিষ্ট ছিল না। লোকে বলতো—মেয়েটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে যেন পুরানো আমচুরের মতো। একেই আমার রূপ ছিল না, তার উপর যৌবনের লালিত্যটুকুও যখন হারালাম পাণিপ্রার্থী বিরল হ'য়ে উঠলো। কাণা-ঘুষোয় কাণে এল, ছেলেরা নাকি আমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবেই বলে বেড়াচ্ছে—'অমুকের চেহারা দেখলে মনে হয় উনি একজন 'Born-স্কুল-মিসট্রেস!' হাসপাতালের 'নার্স'দের মতো স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদেরও নাকি বিশেষ একটি রূপ আছে। দেখলেই চেনা যায় কার কি পেশা! শুষ্ক, নীরস, কর্কশ মানুষ। খিটখিটে মেজাজ, কৃপণ স্বভাব। বেশভূষা ও প্রসাধনে অমনোযোগী। স্কুলের কাজের মধ্যেই তাঁরা ডুবে আছেন। তার বাইরে যেন আর কিছু নেই। স্কুলই তাঁদের ত্রিভুবন!

শুনে পর্যন্ত মনে এমন একটা ধিক্কার এলো, যে, জীবনে আর বিবাহই করা হ'ল না। মাঝে মাঝে আফশোষ হয়, বি-এ পড়বার সময় মায়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহটা করে রাখলে মন্দ হ'ত না। গ্র্যাজুয়েট হয়েছি বটে, কিন্তু এর জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে এবং হ'চ্ছে নারীর জীবনে বোধ করি তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। এখন মনে হয় গ্র্যাজুয়েট 'ওল্ড মেইড' হয়ে থাকার চেয়ে কোনও পরিবারে নন্-গ্র্যাজুয়েট বধূ হয়ে থাকা ঢের ভাল!

স্ত্রী-স্বাধীনতা

শ্রীমতী লীলা বিশ্বাস

'স্ত্রী-স্বাধীনতা' কথাটা শুনলেই আমার মনে হয় ও একটা বিরাট পরিহাস! নারী জাতিকে এত বড় বিদ্রূপ বোধ করি আর কোথাও কোনও দেশে করা হয়নি। স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তুলনা করা চলে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েও যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি, ভারত ও পাকিস্থান দুই দেশই যেমন বিদেশীর কাছে অর্থ সাহায্য নিচ্ছে, সামরিক সাহায্য নিচ্ছে, যন্ত্রপাতির সাহায্য নিচ্ছে, অভিজ্ঞ কারিগর ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছে, এখনও আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারে নি; ভারতের মেয়েরা তেমনি আজও পুরুষের সাহায্য ব্যতীত একপাও চলতে অক্ষম। তা' সে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভানেত্রী বিশ্ববন্দিত ভাইয়ের ভুবনবিদিতা ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মীই বলুন আর ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বহু খ্যাতা অমৃত কাউরই বলুন; বাংলার পুনর্বাসন মন্ত্রী রেণুকা রায় বা উপমন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়ই বলুন, এঁরা কি স্বাধীনভাবে কেউ কোনও কাজ করতে পারেন? এঁদের পাশ থেকে 'রাজ-কার্যে অভিজ্ঞ আই-এ-এস সচিবদের সরিয়ে নিলে এঁদের অবস্থা হবে খঞ্জের হাতের যষ্ঠি কেড়ে নেওয়ার মতো। অন্ধের সঙ্গে তুলনা করলুম না, কারণ, এঁরা চক্ষুষ্মান। কোথায় পা' দিচ্ছি, কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এঁরা দেখতে পান, এঁদের যোগ্যতার হয়ত অভাব নেই, কিন্তু 'ওদিকে যাবো না' বলবার সাহস ও দৃঢ়তাও এঁদের নেই। এঁদের কাজের দায়িত্ব এত বেশি যে শাসনকার্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা না-থাকায় এঁরা নূতন কিছু করতে বা নূতন পথে পা বাড়াতে ভয় পান?

একটা অতি পুরাতন উপমার উল্লেখ করি এখানে। সুদীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে কাটিয়েছে যে পাখী তাকে খাঁচার দুয়ার খুলে বাইরে ছেড়ে দিলে সে যেমন উন্মুক্ত উদার অসীম আকাশ দেখে ভয় পায়; তার বহুদিনের জড়তাপ্রাপ্ত পক্ষ-দ্বয়কে একবার বেগে সঞ্চালিত করে মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত করে, শঙ্কিত উদ্বেগে প্রাঙ্গণে একটু বিচরণ করে, কাক চিলের ও কুকুর বিড়ালের উৎপাতের আশংকায় আবার পিঞ্জরে এসে প্রবেশ করে বেশ একটা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা বোধ করে, আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থাও তাই। ভারত-

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY
SOAP
ভারতে প্রস্তুত.
L. 245-X52 BG
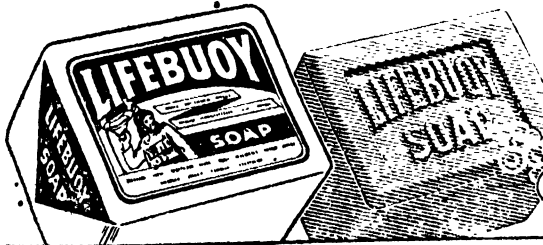
বর্ষকে পরাধীন ক'রে রাখবার মতো ইংরেজের আর যথেষ্ট শক্তি সামর্থ ছিল না ব'লেই তারা এই দু'শো বছরের উপসত্ত্ব ভোগ করা জমিদারিটি যেমন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি এদেশের পুরুষদের আর্থিক সঙ্গতি এমন একটা নিম্নস্তরে নেমে এসেছে যে মেয়েদের আর অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখবার তাদের সামর্থ নেই। আর্থিক অভাবের চাপে স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদের সমাজে আজ স্বতঃই এসে পড়েছে।

কেমন করে এলো একটু বলি। পৃথক একখানি বাড়ী ভাড়া ক'রে শুদ্ধান্তঃপুরের মর্যাদা রক্ষা করে, মেয়েদের আবরু বাঁচিয়ে চলা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো—অল্প ভাড়ায় ফ্ল্যাটবাড়ীর দু'তিনখানি ঘরওয়ালা কোয়ার্টারএ বাস করতে বাধ্য হওয়ার ফলে। একই সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে চারতলার ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা দিনে দশবার যাতায়াত করছেন। আলাপ পরিচয়, মেলা-মেশা, ঘনিষ্ঠতা-অনিবার্য। দেখা গেল চাটুর্যে পরিবার নিজেরাই রান্নাবান্না ক'রে নেন। কেবল বাসন মেজে দিয়ে যায় একজন ঠিকে ঝি এসে; কারণ, কর্তা ও কর্তার দুইছেলে চাকরি করে। উপার্জন বেশি। মুখুজ্জেপরিবার রাঁধতেন আবার বাসনও মাজতেন নিজেরাই কারণ তাঁদের পরিবারে গুটিকয়েক বিবাহযোগ্যা, বড় বড় মেয়ে ছিল। তাদের স্কুলের তাড়া। ঠিকা ঝির অপেক্ষায় বেলা পর্যন্ত বসে থাকা চলবে না। কর্তার ৯টায় অফিসের ভাত চাই। ফেরেন রাত্রে। কোনও রকমে সকালে কাঁচা বাজারটা ক'রে এনে দেন। বাকি দোকান পাঠ যাকিছু করে মেয়েরাই। এঁরই একার আয়ের দিকে সবক'টি ক্ষুধার্ত মুখ চেয়ে আছে। কাজেই যতটা সম্ভব তাঁকে আরামে রাখবার চেষ্টা হয়। মেয়েরা স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে ট্রামে বাসে। এঁরা থাকেন টালিগঞ্জে। বড় মেয়ের বিবাহ হয়েছে—কাশীপুর বরাহনগর। খবর এল মেয়ের অসুখ। দেখতে যেতে হবে। কিন্তু গাড়ী ভাড়াই যাতায়াত করতে লেগে যাবে দশ বারো টাকা। কোথা পাওয়া যাবে অত টাকা? আধ মাসের বাজার খরচ চলে যাবে ওতে। কাজেই আভিজাত্যের সব মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অল্প ভাড়ায় বাসে যাতায়াতই ঠিক হ'ল। দেখা গেল এতে পথকষ্ট একটু হয় বটে, কিন্তু খরচ বাঁচে অনেক। শুনে বাড়ুয্যে গিন্নীও একদিন ট্রামে চড়ে তাঁর বাপের বাড়ী হাতীবাগানে ঘুরে এলেন। এমনি ক'রে ক্রমে আজ ট্রাম বাসে মেয়ের ভীড়ে নাকি পুরুষ মানুষরাও উঠতে পারেন না। দোকানে দোকানে মেয়েদের ভীড়ে ঢোকা যায় না। কাঁচা বাজারেও আমাদের মতো অনেক ভদ্র মেয়েরা আসতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি নিউমার্কেট বা চাঁদনীর কথা তুলতে চাইনি। সিনেমা, থিয়েটারের কথাও বলবো না। এখানে মোটরে চড়া মেয়েও যত আসেন, ট্রাম বাসের যাত্রী মেয়েরাও তত আসেন। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, একজন পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে থাকা চাই!

প্রবল আর্থিক চাপে পড়ে অভাবের তাড়নায় যেখানে মেয়েরা হাটে বাজারে যাতয়াত করতে বাধ্য হয়েছেন, ট্রাম বাসের যাত্রী হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন, অফিসে, দোকানে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছেন তাকে যদি 'আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতা দিয়েছি' বলে এ দেশের অক্ষম অলস ও নিবীর্য পুরুষেরা দাবি করেন, তাহ'লে বলবো এর চেয়ে নির্লজ্জতা আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য, একথা স্বীকার করছি যে অনেক মেয়েই এখনও কোনও পুরুষ 'এস্কর্ট' ছাড়া একলা পথে বেরুতে সাহস করেন না। বিশেষতঃ সন্ধ্যার মুখে। এর কারণ হ'ল এদেশের অসভ্য যুব সম্প্রদায়। এঁরা কলেজের মেয়েদের পিছু নেন। একলা কোনো তরুণীকে নির্জন পথে যেতে দেখলে আলাপের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেন। কাজেই, লোক সঙ্গে না-নিয়ে সময় বিশেষে ও পাড়া বিশেষে অতি আধুনিক স্বাধীন জেনানারাও একলা যেতে সাহস করেন না। অবশ্য বয়োবৃদ্ধারা বাদ।

এক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার গর্ব বোধ হয় আমাদের না করাই ভালো। নারী যে দেশে তার ভরণপোষণের জন্য আজও পরমুখাপেক্ষী—তার আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের শক্তির উপর নির্ভরশীল, তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য পুরুষের সাহায্য যখন অনিবার্য, এমন স্ত্রী-স্বাধীনতার দর্প এদেশের মেয়েদের মুখে কি শোভা পায়? যাঁরা উপার্জন করতে বাইরে বেরিয়েচেন তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করচেন পুরুষের মনস্তুষ্টি ও তোষামোদ ছাড়া তাঁদের উন্নতির আশা নেই। এ অবস্থাকে আর যাই বলা হোক না কেন স্ত্রী-স্বাধীনতা বলা চলে না।

নার্জীপাতা প্যাটার্ন*

সুরাইয়া বানু

কিছুটা সাদা উল নিয়ে ১১টি ঘর তুলুন।

১ম' কাঁটা :—১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা (সবুজ উলের), ১ উল্টা, ১ সোজা, ১ উল্টা (সবুজ উলের), ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা।

যে সমস্ত ঘরে সবুজ উলের উল্লেখ আছে কেবলমাত্র সে সমস্ত ঘরই সবুজ উল দিয়ে বুনতে হবে এবং এই নিয়ম পরবর্তী কাঁটাগুলোতেও চল্‌তে থাকবে।

২য়' কাঁটা :—১ সোজা, ২ উল্টা, পিছনে উল নিয়ে ২য়' ঘরটি পিছন দিকে সবুজ উল দিয়ে সোজা বুনতে হবে এবং ঘরটি ফেলে না দিয়ে ১ম' ঘরটি সাদা উল দিয়ে সোজা বুনে—এবারে

---

* গাঁদা ফুলকে অসমীয়া ভাষায় নার্জীফুল বলে।

ছুটি ঘরই ফেলে দিন। ১ উল্টা, পিছন দিকে উল নিয়ে ২য়' ঘরটি পিছন দিকে সবুজ উল দিয়ে সোজা বুনতে হবে এবং ঘরটি ফেলে না দিয়ে ১ম' ঘরটি সাদা উল দিয়ে সোজা বুনে—এবারে ছুটি ঘরই ফেলে দিন। ২ উল্টা, ২ সোজা।

৩য়' কাঁটা :—১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ১ উল্টা (সবুজ উলের), ১ সোজা, ১ উল্টা, ১ উল্টা (সবুজ উলের), ২ সোজা, ১ উল্টা।

৪র্থ' কাঁটা :—১ সোজা, ২ উল্টা, পিছন দিকে উল নিয়ে ২য়' ঘরটি পিছন দিকে সাদা উল দিয়ে সোজা বুনতে হবে এবং ঘরটা ফেলে না দিয়ে ১ম' ঘরটি সবুজ উল দিয়ে সোজা বুনে—এবারে ছুটি ঘরই ফেলে দিন। ১ উল্টা, পিছন দিকে উল নিয়ে ২য়' ঘরটি পিছন দিকে সাদা উল দিয়ে সোজা বুনতে হবে এবং ঘরটি ফেলে না দিয়ে ১ম' ঘরটি সবুজ উল দিয়ে সোজা বুনে এবারে ছুটি ঘরই ফেলে দিয়ে, ২ উল্টা, ১ সোজা।

৫ম' কাঁটা :—১ম' কাঁটার ন্যায়। এখানেই প্যাটার্ণটি শেষ হবে। এই প্যাটার্ণটি ব্লাউজে কিম্বা ছোট ছেলেমেয়েদের পুলোভারে ভালো হয়।

বসন্ত-উৎসবের বিবর্ত্তন

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বসন্তকালের উৎসব সম্বন্ধে কোন ইতিহাস-বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা, কিম্বা, প্রাক-আর্য্যযুগে যে সকল জাতি এদেশে বাস করত, আর্য্যেরা এসে তাদের কাছ থেকে এই উৎসবের ধারা গ্রহণ করেছিলেন কি না এবং উৎসবটির সহিত ধর্ম্মাচরণের কোন সম্পর্ক আছে, না এটি ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি সামাজিক বা জাতীয় উৎসব, অথবা প্রাচীনেরা পরোক্ষভাবে এই উৎসব পালনকারীদের স্বাস্থ্যোন্নতির কি চমৎকার বিধান সুকৌশলে সংগুপ্ত করে রেখেছেন ইত্যাদি আলোচনার পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বসন্ত-উৎসব-অনুষ্ঠানের যে সকল ছোট ছোট চিত্র আছে, সাধারণ দর্শকের চোখে তাদের ভিতর যে বিভিন্নতা ধরা পড়ে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রয়াসে এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

ঐ সকল চিত্র দৃষ্টে সহজেই মনে হয় বসন্তকালীন উৎসবটির অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যের নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায় এর তিনটি উল্লেখযোগ্য পর্য্যায়—যথা, বসন্ত বা ফুল-উৎসব, দোল-লীলা এবং হোলি-খেলা; এবং, এই তিনটি, সমগোত্রীয় হলেও একই জিনিষ নয়।

প্রথম আমলে এটি ছিল একেবারে খাঁটি বসন্ত ঋতুর সম্বর্দ্ধনা-উৎসব। নব বসন্তে যে নবীন আশার চেতনায় হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ও চঞ্চল বাসন্তিকাকে সাদরে আহ্বান ও বরণ করবার যে প্রবৃত্তি জাগে এবং প্রকৃতির অভিনব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের অন্তরেও যে পরিবর্ত্তনের অনুভূতি—তা'রই সহজাত বহিপ্রকাশ।

আওল ঋতুপতি রাজা বসন্ত,
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ,
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গন্ত
কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড···
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়,
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়,···
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ !

—বিদ্যাপতি।

ঋতুপতি রাজা বসন্ত এসেছে। অলিকুল মাধবীলতার দিকে ছুটেছে। বসন্তের মাথায় আম্রমুকুলের কিরীট—সামনে পঞ্চমস্বরে কোকিল গান করছে! মলয় পবনের সাহায্যে কুসুম-পরাগ নির্ম্মিত চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হয়েছে!—

আর এই বসন্তকালে ফোটে নানাপ্রকারের সুগন্ধি ফুল, সুতরাং অনুষ্ঠানটি প্রধানতঃ ফুল-উৎসবের। এই উৎসব-অনুষ্ঠানের স্থানও লোকালয় বা শহরের রাজপথ নয়—শহর থেকে দূরে একেবারে প্রকৃতির রম্য-ক্রোড়ে :

জন-হীন পুরী—পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে, ফুল-উৎসবে ;

মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের এই সম্মিলিত বা বিচ্ছিন্ন আনন্দ-অনুষ্ঠানটির জন্য শহরের বাহিরে বিবিধ পুষ্প-বৃক্ষ ও কুঞ্জ সমন্বিত রাজকীয় সংরক্ষিত প্রমোদ-উদ্যান ছিল—যে স্থান এই উৎসবের সময় সরস আলাপ, বাঁশীর সুমিষ্ট তানের সহিত দ্রুততালের নৃত্যে ও সঙ্গীতে আনন্দমুখর হয়ে উঠত। উৎসবে উদ্দামতা হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু সারল্যও ছিল!

ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ বয় ॥
বিচিত্র যে অলকার বিচিত্র ভূষণে,
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে।
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ,
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানী চরণ সেবিএ।···

—সঞ্জয়কৃত মহাভারত।

এর পরে দেখা যায় দোল-খেলা বা ফুল-দোল। দোল-উৎসবও প্রাচীন ফুল-উৎসবের মত, তবে সামান্য একটু প্রকার-ভেদ আছে। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে অবস্থানকালীন নানাবিধ লীলার মধ্যে একটি লীলাভুক্ত হওয়ায় এ'তে যেন একটু স্মৃতি-জড়িত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের ভাব এসে পড়েছে—অবশ্য সে অতি সামান্যই—আসলে এ-ও একটি আনন্দ উৎসব,—সেই বসন্ত-পূর্ণিমায় ফুল-সজ্জা—পুষ্প-বিলাস! ফুলেরই উৎসব—তবে বৈচিত্র্য এই যে, এই উৎসবের জন্য পুষ্প-রচিত সুদৃশ্য দোলা এবং মঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হ'ত আর সেগুলি উদ্যানে বৃক্ষশাখায় স্থাপ

ক'রে নায়ক নায়িকারা উল্লাস-ভরা মন নিয়ে তাতে দোল খেত! উৎসবটির নামেরও পরিবর্ত্তন হ'ল। বসন্ত-উৎসব বা ফুল-উৎসবের বদলে, পুষ্প-দোলায় দোল খাওয়ার জন্য নাম হল দোলোৎসব অথবা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়, দোল-লীলা!

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সিংহল-রাজকন্যা সুশীলা তাঁর বারমাসীতে ফাল্গুন মাসের আনন্দ-উৎসবের কল্পনায় বলছেন—

ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে,
তথি দোল-মঞ্চ আমি করিব রচনে,…
আগু দোল করিয়া গাওয়াব নিত নিত
সখি মেলি গাব গীত সখি মেলি গাব গীত
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥

কবি শঙ্করদাস তাঁর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দোল-লীলা প্রসঙ্গে নিম্নরূপভাবে দোলায় আরোহণের পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন—

শুভক্ষণে দোলে চড়েন দামোদর,
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর।
দেব-দেবেশ্বর কৈল দোলে আরোহণ,
সকল দেবতা কৈল চরণ বন্দন।
রুদ্র পিতামহ শক্র আর দিবাকর
দোলের পীড়িত তারা উঠিল সত্বর,
চারি কোণে চারি দেব আসন ধরিয়া
কৃষ্ণকে দোলান তাঁরা আনন্দিত হৈয়া।
লক্ষ্মী সরস্বতী দুহে চামর দোলায়।
গন্ধর্ব্বেরে সুররাজা ডাকিয়া আনায়॥

চৈতন্য মঙ্গল-প্রণেতা লোচন দাস রাধার বারমাসীতে বলেচেন—

ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে,
বসন্ত বিনা অভাগী দুলিবে কোন ছ'লে।

কবি নরসিংহ দাসও তাঁর ভাগবতে গোপিকাদের বিরহ-দুঃখ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—

'সেই সে ফাগুন মাসে সখী সব সঙ্গে
দিবানিশি নাহি জানি থাকি নানা রঙ্গে।…
দোলনীতে বসাইয়া দোলায় শ্যামরায়।
কোন কোন গোপী অঙ্গে চামর ঢুলায়॥
বীণা আদি নানা যন্ত্র করিয়া সুতান,
আনন্দে মাতিয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গান॥

তৃতীয় পর্য্যায় হোলি-খেলা অর্থাৎ আবীর ও রং-মাখামাখির ব্যাপারটা ঠিক কোন সময় থেকে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত হ'ল তা ধরা যায় না, তবে সেটা যে একটু পরবর্ত্তীকালে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বসন্ত-কালের রঙীন পুষ্প, নরনারীর মনের রঙীন রাগ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাল রং নিক্ষেপের পরিকল্পনা হয়ত স্বাভাবিক হ'য়েছে—কিন্তু এ-ও মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের জোয়ারে যখন টান প'ড়েছে—অন্তরের রঞ্জিত-রাগের সহজ প্রকাশে যখন সাবলীলতার অভাব ঘটেছে, সেই যুগেই কৃত্রিম রঙের সাহায্যে ভাব-সমন্বয় করবার প্রচেষ্টায় হোলি-উৎসবের সূত্রপাত।

সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তার রচিত এই তৃতীয় পরিবর্ত্তিতরূপের অর্থাৎ হোলিখেলার একটি চিত্র—

শ্যাম-গরবিণী ওই ফাগু খেলত রঙ্গে
চুয়া চন্দন আবীর গোলাপ
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে। ধ্রু॥
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি
ফিরি ফিরি বোলত রাই।
ঘুমট উঠায়ে বয়ান ছাপায়ত
বেরি বেরি থৈছে মেঘ সে চাঁদ লুকাই॥
আয়ত ললিতা সখী ফাগু হাতে করি
দেয়ত কানু নয়ান।
বৃকভানু-কিশোরী দুহু বাহু ধরি
মারত শ্যাম-বয়ান॥
আওর এক সখী জীউ জীউ করি
কাঁহা লাগাও আবীর।
কানুরি ফাগু লেই কানু বেশ মারত
হা হা করত কবীর॥

বসন্ত-উৎসবের তিনটি বিভিন্ন রূপেরই অর্থাৎ ফুল, দোল ও হোলি-উৎসবের উপরোক্ত প্রকার অসংখ্য চিত্র বাংলার প্রাচীন কবিরা তাঁদের কাব্যে অঙ্কিত করেছেন এবং সাবধানে লক্ষ্য করলে উৎসবটির অনুষ্ঠানভঙ্গীর পরিবর্ত্তন অনায়াসেই প্রতীয়মান হবে।

হোলি-খেলার অর্থাৎ রং-মাখামাখির কোন বিবর্ত্তন হ'য়েছে কিনা, কাব্যে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে কোন কোন অঞ্চলের উৎসব-পালন-কারীদের উন্মত্ত-উল্লাসের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত রাজপুত-যুগের একটি ভীষণ-মধুর হোলি-খেলার উল্লেখ করা যেতে পারে—যে খেলাটা হ'য়েছিল কেতুনপুরে—রাজ-অন্তঃপুর-উদ্যানে—ভুনাগ রাজার রাণীর সঙ্গে কেশর খাঁ পাঠানের। বকুল বনে মত্ত দক্ষিণ হাওয়া ব'হেছিল, যথাক্রমে মুলতান, ইমন-ভূপালী, কানাড়া প্রভৃতি তানে বাঁশীও বেজেছিল আর সময়ও ছিল রাত্রির প্রথম যাম! তবে খেলাটা হ'য়েছিল লাল রঙের নয়, তাজা লাল রক্তের—আর খেলার শেষে—

ফাগুন-রাতে কুঞ্জ-বিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে
কেতুন পুরে বকুল বাগানে
কেশর খাঁয়ের খেলা হ'ল সারা,—
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল না আর তা'রা!

— চৌদ্দ —

"Estou Cansado!—Estou Cansado!"

চার বছর পরে।

আবার একটি প্রসন্ন সকালে যখন কর্ণফুলীর জল সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে, তখন পাঁচখানা পর্তুগীজ জাহাজ এসে ভিড়ল চট্টগ্রামের বন্দরে।

সকলের মাঝখানে সমুন্নত শির রাফাএল্। বিশাল গম্ভীর মূর্তিতে যেন ঘোষণা করছে লিস্‌বোঁয়ায় গৌরব—মুনো ডি-কুন্‌হার রাজপ্রতাপ। আর তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো—ক্যাপিতান! এই বহরের তিনি নেতা।

এবার সত্যিই চট্টগ্রামের বন্দর। স্বপ্নে নয়—কল্পনায় নয়। সেই বিশ্বাসঘাতক আরাকানীটার মতো পথ ভুলিয়ে কেউ তাঁকে পৌঁছে দেয় নি চাকারিয়ার ঘাটে। নবাব খোদাবক্স খাঁ নেই—সেই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তিও আর ঘটবে না। এ যাত্রায় তিনি চট্টগ্রামের প্রত্যাশিত আর সম্মানিত অতিথি।

খাজা সাহেব উদ্দিন ধুরন্ধর লোক। শুধু তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তিনি যে ডি-মেলোকে উদ্ধার করেছেন তাই নয়। তাঁর চেষ্টাতেই এতদিনে স্বপ্ন সফল হতে চলেছে মুনো ডি-কুন্‌হার। যে 'ভারতের স্বর্গ' 'বেঙ্গালা'র কথা রূপকাহিনীর মতো শুনেছিলেন ডা-গামা, যাঁর জন্যে ধ্যান করেছেন আল্‌মীডা—আল্‌বুকার্ক, সেই স্বর্ণপুরী এখন প্রায় হাতের কাছেই চলে এসেছে। আর তা সম্ভব করেছেন খাজা সাহেব উদ্দিন।

তার জন্যে সাহেব উদ্দিন প্রতিদান নেন্ নি তা নয়। যথেষ্টই নিয়েছেন। তবু—তবু সাহেব উদ্দিনের কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই ডি-কুন্‌হার। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পর্তুগীজেরা আজকের এই শুভ-মুহূর্তটির জন্যেই তো অপেক্ষা করেছে। ঘুমের মধ্যে তারা শুনেছে সারা ভারতবর্ষের রত্নখনি এই বেঙ্গালার আহ্বান। যেখানে পথের ধুলোয় মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে রয়েছে—যেখানে আকাশে নীলার রঙ, নদীর জলে যেখানে মুক্তো ঝলমল করে—ঘাসের বুকে যেখানে পান্নার শ্যামশ্রী সেই অপরূপ দেশ সমুদ্রের ওপার থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে বারে বারে। যেন সামুদ্রিক মরীচিকা—তৃষ্ণা জাগিয়েছে, অথচ মেটানোর কোনো উপায়ই নেই! আজ সাহেব উদ্দিন সেই দেশে তাঁদের বাস্তবে পৌঁছে দিয়েছেন!

বাণিজ্যের সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। কুঠি তৈরী করার অনুমতি পাওয়া যাবে। চট্টগ্রামের সুলতানের অনুমোদন পেলে গৌড়ের বাদশাও আপত্তি করবেন না। সোনা আর মস্‌লিনের দেশ পোর্টো গ্র্যাণ্ডি থেকে পোর্টো পেকেনো পর্যন্ত ময়ুরের পেখমের মতো পাল তুলে দেবে পর্তুগীজ বাণিজ্য-বহর।

সেই সৌভাগ্য-সূচনায় আজো নেতৃত্ব করতে এসেছেন অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো। এত বড় সম্মান যেচে তাঁকে দিয়েছেন ডি-কুন্‌হা—দিয়েছেন ঐতিহাসিক গৌরব।

তবু খুশি হতে পারছেন না ডি-মেলো। তাঁর দেহ-মন আর্ত হয়ে বলতে চাইছে: "Estou Cansado! ক্লান্ত—আমি ক্লান্ত!"

মা মেরী জানেন—ঈশ্বর জানেন: মনে প্রাণে কখনোই এ গৌরব ডি-মেলো চান নি। যে-যাই বলুক: এই স্বপ্নের বেঙ্গালা তাঁর কাছে অভিশপ্ত, একটা দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরী। এর সমস্ত শ্যাম-সৌন্দর্যের নেপথ্যে যেন তিনি একটা রাক্ষসের কালো মুখ দেখতে পান; এখানকার সবুজ ঘাসের আঙিনা তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতক চোরাবালি!

গঞ্জালো! সেই আশ্চর্য সুন্দর কিশোর। দু চোখভরা আকাশের স্বপ্ন। কোথায় সে?

পরে জেনেছিলেন সবই। কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিল না। শুধু রাতের পর রাত অসহায় জ্বালায় কাল

গুটিয়েছেন—শুধু ঘরময় পায়চারী করেছেন তীর-বেঁধা বাঘের মতো; প্রতিশোধের উপায় ছিল না তা নয়—এই বঙ্গালাকে সমুদ্রের জলে এক মুঠো ধুলোর মতো উড়িয়ে দেওয়াই ছিল তার চরম জবাব।

কিন্তু সে-জবাব দেওয়া যায় নি। বিরোধ চান না নুনো ডি-কুন্‌হা। বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে এই দেশে, বন্ধুত্ব করতে হবে মুরদের সঙ্গে!

রাজভক্তি। রাজার আদেশ! বেশ, তাই হোক। ডি-মেলো নিচের ঠোঁটটাকে শক্ত করে কামড়ে ধরলেন।

পাশে এসে দাঁড়ালেন খাজা সাহেব উদ্দিন। ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালেন ডি-মেলো। Estou Cansado।

সাহেব উদ্দিন ডাকলেন: ক্যাপিতান!

—বলুন।

—এইবারে নামতে হবে।

—বেশ, চলুন।

আবার দরবার। চট্টগ্রামের সুলতানের দরবার। সেই বাঁধা সৌজন্যের পুনরাবৃত্তি—সেই উপহারের পালা।

শাদা দাড়ি, শাদা চুল—প্রসন্ন মুখে সুলতান হাসলেন।

—আমাদের এই দেশ হচ্ছে এতিমখানা। যেখান থেকে, যতদূর থেকেই যে আসুক, সকলের জন্যেই খোলা আছে এর দরজা। যার খুশি দু হাত ভরে নিয়ে যাক। কিন্তু আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে যেমন কেউ সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে পারে না—তেম্‌নি এই দেশকেও শূন্য করবার ক্ষমতা নেই কারো।

ডি-মেলো একবার চোখ তুলে তাকালেন—কোনো জবাব দিলেন না। ঐশ্বর্য আছে, তাঁরও সন্দেহ নেই তাতে। সমুদ্রের মতোই অসীম এ দেশের রত্নভাণ্ডার—সে-কথাও তিনি মানেন। কিন্তু সে-ঐশ্বর্যের দ্বার খুলে দেওয়ার মতো মানসিক দাক্ষিণ্য এতদিন তিনি তো দেখতে পান নি। বরং এর উলটোটাই চোখে পড়েছে তাঁর—মনে হয়েছে এ বুঝি নিষিদ্ধ পুরী!

সুলতান বললেন, অনুমতি আমি দেব—আনন্দের সঙ্গেই দেব। কিন্তু মহামান্য ক্যাপিতান এবং সেই সঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী রাজপ্রতিনিধি নুনো ডি-কুন্‌হাকে আমি জানাতে চাই যে বাংলা দেশে বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার তাঁদের দেওয়া আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। একমাত্র সর্বশক্তিমান গৌড়ের সুলতানই সে হুকুম দিতে পারেন। আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ।

ভ্রূ কুঁচকে এল ডি-মেলোর।

—তা হলে কি আমাদের এখন গৌড়ে যেতে হবে দরবার করতে?

সুলতান বললেন, না, তার দরকার নেই। একজন দূত গেলেই যথেষ্ট।

—কিন্তু—

—চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই!—সুলতান বললেন, এ নিয়মরক্ষা মাত্র। গৌড়ের সুলতান নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর ফরমান না এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ ক্যাপিতান এই বন্দরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। গুয়াজিল আলী হোসেন তাঁদের দেখাশোনা করবেন।

—তবে তাই হোক।—ডি-মেলো জবাব দিলেন। তাঁর চোখে মুখে অপ্রসন্নতার কালো ছায়া ঘনিয়ে এল।

—আপনারা গৌড়ে ভেট পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—সুলতান বললেন, কখনো কোনো কথা আমাকে জানাবার থাকলে খাজা সাহেব উদ্দিন কিংবা আলী হোসেনকে দিয়ে জানাবেন।

সুলতান উঠলেন। সভা ভঙ্গ হল।

* * * *

সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়।

বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-গঙ্গার মায়া দিয়ে মাখানো। তাল-নারকেল-সুপুরীর জয়ধ্বজা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়। রৌদ্রের ঝিলিক ঝলে নীলকণ্ঠ পাখির পাখায়। জ্যোৎস্নার দুধ সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে যায় হংস-বলাকা। পলি-মাটির চন্দন ডাঙায় শ্বেত পদ্মের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে বকের দল।

আটচালা শিবমন্দির থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ওঠে। সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তের আহ্বান ওঠে শাহী মস্‌জিদ থেকে। গ্রামের বিষহরি তলা থেকে নূপুর আর খঞ্জনীর তালে তালে ছড়িয়ে পড়ে মনসার গান—তার রেশ এসে মিলে যায় দূরের নদীতে মাঝির ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে। দীপকে-মল্লারে-বসন্ত পঞ্চমে সুর বাজে আকাশে বাতাসে, পাহাড়-নদী-অরণ্য-পাখি-মেঘ এক একটি বাদ্যযন্ত্রের মতো ঐকতান তোলে তার সঙ্গে সঙ্গে।

স্বপ্নের বাংলা—গানের বাংলা—বাঁশির বাংলা—রূপ-কথার বাংলা। পর্তুগীজ দূত দুরাতে আজেভেদো যেন নেশার ঘোরে পথ চলেছেন। বহু সমুদ্র ঘুরেছেন আজেভেদো—নোঙর ফেলেছেন অসংখ্য সামুদ্রিক দ্বীপে—কত প্রবাল-বলয়িত বন্দী সমুদ্রের শান্ত জলে দেখেছেন নক্ষত্রের ছায়া। কত ঝর্ণা-নামা পাহাড়—কত ফুল-ফোটা অরণ্য—কত বর্ণবিচিত্র আকাশ। কিন্তু এর তুলনা কোথাও নেই। হাতে করে মুঠো মাটি তুলে নিলে মনে হয় তার মধ্যে ঝিক্‌মিক করছে স্বর্ণরেণু; ভোরের শিশিরে ঘাসে ঘাসে এক একটি নিটোল মুক্তো; এক একটি সবুজ পাতা যেন কান্না দিয়ে গড়া।

এই দেশ—এই মাটিতে এবার পর্তুগীজের আসন পড়বে। খুলে যাবে এক আশ্চর্য মণিভাণ্ডারের স্বর্ণদ্বার। ইগ্রেঝার উঁচু চূড়োর ওপর ঝরবে প্রসন্ন সূর্য-চন্দ্রের আলো; এমন

সুন্দর দেশের ধর্মহীন মানুষগুলো উদ্ধার হবে জননী দেবীর আশীর্বাদে—প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চার উঠবে—ঘণ্টার ধ্বনিতে ধ্বনিতে ঘোষিত হবে সদা প্রভুর উদার মহিমা!

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে গৌড়ের তোরণে এসে দাঁড়ালেন আজেভেদো। সঙ্গে বারোজন সেনানী, নুনো ডি-কুনহা আর সুলতানের চিঠি, আর প্রচুর উপঢৌকন। সে উপঢৌকনে আছে তেজী আরবী ঘোড়া, সোনার কাজকরা বহুমূল্য রেশমী কাপড়, সুগন্ধি গোলাপজল আর কয়েকটি দুর্লভ মুক্তো।

পথের দুধারে জনতা সার দিয়ে দাঁড়ালো এই আশ্চর্য মানুষগুলোকে দেখবার জন্যে। এমন বিচিত্র মানুষ এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। তামাটে বড় বড় চুল আর দাড়ি, তীক্ষ্ণধার পিঙ্গল চোখ—জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া গায়ের রঙ। কতগুলো পাথরের মূর্তি যেন ঘোড়ার পিঠে বসে চলেছে—চাপা কঠিন ঠোঁটে একটা অটল সঙ্কল্প।

দূত আগেই খবর দিয়েছিল। গৌড়াধিপ মামুদ সা দরবারে বসে অভিবাদন গ্রহণ করলেন আজেভেদোর।

—মহামান্য গৌড়েশ্বরের জন্যে সামান্য কিছু পাঠিয়েছেন মাননীয় নুনো ডি-কুন্‌হা। অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করলে পর্তুগীজেরা অত্যন্ত বাধিত হবে।

—তার বিনিময়ে?—মামুদ শা জানতে চাইলেন।

—গৌড় বাংলার সঙ্গে বন্ধুত্ব। এবং—

—এবং?—মাঝখান থেকেই মামুদ শা তুলে নিলেন প্রশ্নটা।

—বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার। কুঠি বসানোর অনুমতি। পণ্যের আদান-প্রদান।

—বাণিজ্য? কুঠি?—হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন মামুদ শা। হাসিটা অত্যন্ত আকস্মিক বলে মনে হল—চমকে উঠলেন আজেভেদো, দরবারের সমস্ত লোক ফিরে তাকালো এক সঙ্গে।

—বাণিজ্য? পর্তুগীজদের সঙ্গে? অতি চমৎকার প্রস্তাব।—হাসি থামিয়ে মামুদ শা বললেন। কিন্তু চমৎকার প্রস্তাব? ঠিক তাই কি মনে করেন মামুদ শা? কথার সঙ্গে গলার সুর যেন ঠিক মিলছে না—হাসিটাকে অত্যন্ত অশুভ বলে সন্দেহ হচ্ছে। আজেভেদো ভেতরে ভেতরে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

—তা হলে কি ধরে নিতে পারি গৌড়ের অধিপতি আমাদের অনুমতি দিয়েছেন?

—এত ব্যস্ত কেন?—মামুদ শা এবারে আর হাসলেন না। শুধু ভ্রু রেখা দুটো সংকীর্ণ হয়ে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এল: প্রস্তাব অত্যন্ত সাধু, তাতে সন্দেহ নেই। তবু একবার ভেবে দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে সর্তগুলো সম্পর্কে। এত বড় একটা গুরুতর কাজ মাত্র দুকথায় নিষ্পত্তি করা যায় না।

—মহামান্য বাদশাহ যদি অপরাধ না নেন—অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে আজেভেদো বললেন, তা হলে সবিনয়ে জানাচ্ছি আমাদের নেতা অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে চট্টগ্রামে অপেক্ষা করছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা সেখানে পাঠাতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন—আমরাও দায়মুক্ত হতে পারব।

মামুদ শা এবার নিজে জবাব দিলেন না। তাঁর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন উজীর।—

—সুলতানের সিদ্ধান্ত কালকের দরবারে পেশ করা হবে। আজ পর্তুগীজ দূত সদলবলে বিশ্রাম করুন। তাঁদের যথাযোগ্য পরিচর্যা করা হবে।

—আদেশ শিরোধার্য।—সবিনয়ে মাথা নত করলেন আজেভেদো।

কিন্তু মামুদ শার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। আজেভেদো তার বিন্দুমাত্র আভাস পেলে সেই মুহূর্তেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে গৌড় থেকে পালিয়ে যেতেন ডি-মেলোর কাছে! বলতেন—

একঘণ্টা পরে নিজের খাস কামরায় মামুদ শা ডেকে পাঠালেন উজীরকে, সেই সঙ্গে বাগদাদের বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানীকে।

কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন দুজনে। মামুদ শা গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন আপনারা। অত্যন্ত জরুরি পরামর্শ আছে আপনাদের সঙ্গে।

দু জনে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও বলতে পারলেন না মামুদ শা। যেন একটা তীব্র অশান্তি আর অন্তর্জ্বালায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

নীরবতা ভাঙলেন উজীর।

—কী আদেশ আমাদের প্রতি?

—আদেশ?—হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা—যেন প্রতিরুদ্ধ বন্যার জল হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল।

—আদেশ?—মামুদ শা গর্জন করে উঠলেন: এখনি কোতল করা হোক ওই খ্রীষ্টানগুলোকে। আর চট্টগ্রামে খবর পাঠানো হোক বাকী সবগুলোর যাতে গর্দান নেওয়া হয় অথবা মাটিতে পুঁতে খাইয়ে দেওয়া হয় ডালকুত্তার মুখে!

—খোদাবন্দ্‌!—তীরের মতো এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন উজীর আর আল্‌ফা হাসানী।

—এই হচ্ছে আমার হুকুম।—বিকৃত গলায় বললেন মামুদ শা।

—হুকুম নিশ্চয় তামিল করা হবে—উজীর ঢোঁক গিললেন। তারপর বিবর্ণ মুখে বললেন, কিন্তু কারণটা যদি জানা যেত—

—কারণ?—তেমনি বিকৃত গলায় মামুদ শা বললেন, কারণ এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি! এই—

প্রহরী ছুটে এল।

—আজকের যে গোলাপ জলের ভেট এসেছে, নিয়ে আয়—

প্রহরী চলে গেল সন্ত্রস্ত হয়ে। চঞ্চল ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন মামুদ শা। উজীর আর আল্‌ফা হাসানী কয়েকবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন নির্বাক জিজ্ঞাসায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোলাপ জলের পাত্রগুলো এসে হাজির হল। ছোঁ মেরে তাদের একটা তুলে মামুদ শা এগিয়ে দিলেন উজীরের দিকে।

—চিনতে পারেন?

উজীর যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন।

—ইরাণী গোলাপজল। তা হলে—

—হাঁ, বুঝেছেন এতক্ষণে!—বিজয়ীর মতো মামুদ শা বললেন, এ সেই গোলাপজল যা মক্কা থেকে নিয়ে আসছিল আরবী বণিকেরা আর জাহাজ লুঠ করে যা কেড়ে নিয়েছিল ওই খ্রীষ্টান শয়তানের দল!—হিংস্র ক্রোধে ঠোঁটের ওপর দাঁত চাপলেন মামুদ শা: স্পর্ধার শেষ নেই! সেই লুঠের মাল আমাকে ভেট দিতে এসেছে! অপমান করতে চায়! কাফের—কুত্তার দল! ওদের আম-কতল্ করাই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব।

—কিন্তু এ ঠিক হবে না।—শান্ত গলায় বললেন আলফা হাসানী।

—কেন ঠিক হবে না?—মামুদ শা দুচোখে আগুন বৃষ্টি করলেন: আমি কি ওই খ্রীষ্টান লুটেরাদের ভয় করি? আমি কি ডরপোক?

তেমনি প্রশান্ত ভাবেই হাসানী বললেন, ভয়ের কথা নয়। ওরা দূত; ওদের গায়ে হাত দিলে গুনাহ্ হবে জনাব!

—গুনাহ্?—মামুদ শা নিষ্ঠুর গলায় বললেন, কিসের দূত? কার দূত? ওরা ডাকাত আর লুটেরার চর। ওদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি এই ভাবেই দেওয়া উচিত!

—কিন্তু খোদাবন্দ—এতে আপনারই ক্ষতি হবে। আপনি ওদের শক্তিটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। এই খ্রীষ্টানরা সোজা লোক নয়। আগুন নিয়ে খেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

—তোমার ওপরে আমার শ্রদ্ধা ছিল হাসানী, কিন্তু সে বিশ্বাস তুমি নষ্ট করলে!—মামুদ শার মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল: এরা যদি গৌড়কে কালিকট ভেবে থাকে, তা হলে ভুল করেছে। গৌড়ের শক্তি যে কতখানি, তা ওরাও বুঝতে পারে নি। উজীর সাহেব, এখুনি হুকুম তামিল করুন। আমি ওদের শির দেখতে চাই!

—না মামুদ, না!

একটা গম্ভীর অশরীরী কণ্ঠ যেন বজ্রের আওয়াজের মতো ঘরময় ভেঙে পড়ল। তিনজন এক সঙ্গে ফিরে তাকালেন, তার পরে তিন জনেই এক সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

একটি আশ্চর্য মানুষ ঢুকেছেন ঘরের মধ্যে। বিশাল দীর্ঘ তাঁর দেহ। তুষারশুভ্র চুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে—শাদা দাড়ির গোছা নেমে এসেছে বুক ছাপিয়ে। একটি কালো আল্‌খাল্লায় তাঁর পা পর্যন্ত ঢাকা, গলায় দু তিন ছড়া বিচিত্র বর্ণের মালা—আর একটি জপমালা তাঁর ডান হাতে দুলছে।

—না মামুদ, না!—সেই মূর্তি আবার বললেন, ফিরোজের রক্তমাখা সিংহাসনে বসে প্রতি মুহূর্তে তুমি ছটফট করে জ্বলে মরছ। মূর্খ, আরো রক্ত ঝরাতে চাও?

(ক্রমশঃ)
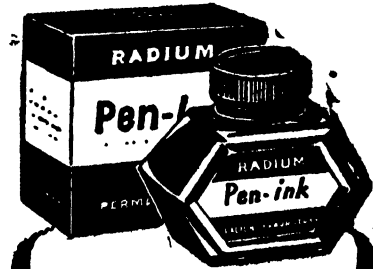
—

প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

এস্‌, এম্‌, প্রোডাকসনের ‘ওরা থাকে ওধারে’ একটি বর্ত্তমান কালের অতি সামান্য ব্যাপার, যাহা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে হাটে-বাজারে অনেক সময় বৃহত্তর রূপ ধারণ করে, তারই পট-ভূমিকায় রচিত ছবি। ঘটি-বাঙ্গাল অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের ঝগড়া। একই ফ্ল্যাট বাড়ীতে দু’টী পরিবার বাস করেন। একটি ঘটি অপরটি বাঙ্গাল। এই দুই পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি যত, মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষও তত। এঁদের একজনের বাড়ীতে আছে সেলাই-এর কল। আর একজনের বাড়ীতে আছে ইস্ত্রি। ঝগড়া বাধিলেই মূলতঃ এই দুইটী বস্তুকে নিয়ে টানাটানি সুরু হয়। কিন্তু ঝগড়ার অবসান হয় তখনই, যখন একজনের বাড়ীর মেয়ের কপাল কাটিলে অপরজন ছুটিয়া আসেন টিঞ্চার আইডিন লইয়া। বাঙ্গালের প্রয়োজনে, সম্মান বজায় রাখিতে, ঘটি কাবুলিয়ালার কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া দিতেও যেমন অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করেন না অপরদিকে তেমনি ঘটির নিঃস্ব অবস্থায় বাঙ্গালের মর্ম্মান্তিক সহানুভূতি মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু এর মাঝেও ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল খেলায় বিভেদের আশঙ্কায় দুই পরিবারকে শঙ্কাকুল দেখা যায়। বাঙ্গালের মেয়ের সঙ্গে ঘটির ছেলের প্রেমের চিত্রটি ইহারই মাঝে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ সাধারণতঃ ছবিতে দেখা যায় আলোচ্য চিত্রে কেবলমাত্র তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই, উপরন্তু অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে দুটীর মধ্যে টেলিফোন সঙ্গীতটি একদিকে যেমন সামঞ্জস্যহীন অপরদিকে তেমনি অকালপক্বতা-দোষে দুষ্ট। ঘটনা সামান্য, কাহিনী অতিসাধারণ, নাটকীয় সংঘাত অল্প, কিন্তু বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে এবং কাহিনী বিবৃত করার মধ্যে চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচয়িতা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র যে বৈশিষ্ট্য ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। একমাত্র ঘটনা বিবৃত করার কৌশলেই ছবিটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। হাসির ছবির নামে বর্ত্তমানে সচরাচর যে রুচিবির্গহিত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়—বর্ত্তমান চিত্রটি তাহাদের নিকট আদর্শ স্বরূপ। অনাবিল আনন্দ ও অপূর্ব্বরস-সৃষ্টিতে ‘ওরা থাকে ওধারে’ একখানি সার্থক কথা-চিত্র। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নেপাল’ এককথায় অপূর্ব্ব। আলোচ্য চিত্রে তাঁহার মুখে সর্ব্বপ্রথম একটি গান দেওয়া হইয়াছে। মলিনা দেবীর বাঙ্গাল-ভাষা যথারীতি বলা না হইলেও অভিনয় স্বাভাবিক। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় অত্যন্ত সংযত। ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালের কথায় বহু ত্রুটী বিচ্যুতি আছে। অভিনয় নিখুঁত; বাণী গাঙ্গুলীর সামান্য বাঙ্গাল কথাটুকু পীড়াদায়ক। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন,

‘ওরা থাকে ওধারে’ চিত্রের ‘নেপাল’ হাস্যরসাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যা

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

এবং অর্পণা দেবীর অভিনয় মুগ্ধ করে। ছবির যান্ত্রিকদিক অত্যন্ত নিম্নস্তরের। শব্দ ও চিত্রগ্রহণের কাজ বহুলাংশে উন্নত হওয়া উচিত ছিল। পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত সস্তা বাহাদুরীর রাস্তা ত্যাগ করিয়া সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

* * * * *

রমা-ছায়ার ‘মনের ময়ূর’ সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রতিভা বসু লিখিত ‘মনের ময়ূরে’র চিত্ররূপদান ও পরিচালনা করিয়াছেন সুশীল মজুমদার। অসবর্ণ বিবাহ উচিত কিনা, ইহাই কাহিনীর মূলতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়। আজিকার দিনে বিবাহের প্রশ্ন, বিশেষতঃ অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্ন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে অসামঞ্জস্যভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে কাহিনীতে সমাজের অব্যবস্থার প্রতি যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে

পর দিকে তেমনি পরিণতির একটা ইঙ্গিত দেওয়ার ষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ পরিণতি সুস্থ সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পরিচালক কৃতিত্বের সঙ্গে 'ফ্লাশব্যাকের' মধ্য দিয়া গল্পের বহু ঘটনা চিত্রিত করিয়াছেন এবং সুপরিচালনার কৌশলে কাহিনী চলার-পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন রকমে তাল সাম্‌লাইয়া নেওয়া সম্ভব হইয়াছে। বিকাশ রায় উকিল কাকার যে ভূমিকাটি অভিনয় করিয়াছেন তাহা অভিনয় ভাল হইলেও আদৌ মনে রেখাপাত করে নাই। কেন না চরিত্রটি আগাগোড়াই অবাস্তব। কোন মেয়ের উপর কাকার এই নির্দ্দয় নির্য্যাতন বাপের পক্ষে মুখ বুঁজে সহ্য করা সম্ভব নয়। ভারতী দেবীর ষোড়শী অনুসূয়া অপেক্ষা অধিক বয়স্কা অনুসূয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতাংশ অনুল্লেখ্য। যান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণ।

* * *

একটা ছেঁড়া জামায় অসংখ্য তালি দেওয়ার ফলে জামার চেয়ে তখন তালির প্রাধান্য যেমন বেশী চোখে পড়ে তেমনি সামান্য মামুলী কাহিনীর সহিত সস্তা হাসির খোরাক জোগাইতে গিয়া বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা ঠিক ঐ তালি দেওয়া জামার মতই চোখে পড়ে।—'আজ সন্ধ্যায়' কথাচিত্রের কাহিনী ঠিক ঐই জোড়াতালি দেওয়া। না আছে গল্পের গতি, না আছে নাটকীয় পরিস্থিতি। পর পর কয়েকটি অদল-বদল অর্থাৎ এর জিনিষ ওর কাছে, ওরজিনিষ এর কাছে এই প্রকার ব্যাপার দেখাইয়া খানিকটা হাসাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে গেলে যেমন ভাল জমি দেখিয়া বাড়ী করিতে হয়, তেমনি ছবি নির্ম্মাণ করিতে গেলে ভাল গল্প নির্ব্বাচন করিয়া ছবি নির্ম্মাণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া এই দূরদর্শীতার অভাবেই বাংলা ছবির পরমায়ুকাল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ছবির জন্য যে গল্পই নির্ব্বাচন করা হউক না কেন, এ কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার যে, সেই গল্পের মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা কতখানি আছে?—গল্পের মধ্যে অমুক থাকায় দর্শকেরা বেশ উপভোগ করিয়াছিল সুতরাং সেই রকম কিছু গল্পের মধ্যে জড়িয়া দেওয়া হউক—এই মনোবৃত্তি সর্ব্বাগ্রে পরিহার করা দরকার নচেৎ বাংলা ছবির 'মানদণ্ড' উন্নত করা সম্ভব নয়।

* * * *

বোম্বাই-এর কতিপয় চিত্র-গৃহের মালিক হিন্দী ও ছবির প্রদর্শনীর হার দুই টাকা দশ আনা ও দুই টাকা চার আনার স্থলে এক টাকা দশ আনা, এক টাকা আনা এবং পরবর্ত্তী আসনগুলি এক টাকা এক আনা, দশ আনা ও পাঁচ আনা করার জন্য বিবেচনা করিতেছেন। দেখা গিয়াছে শনি ও রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে অধিক দামের আসন প্রায় শূন্য থাকে। এমন কি লইয়া যাঁহারা ছবি দেখিতে আসেন তাঁহারাও অনেক অধিক মূল্যের আসন অত্যধিক ট্যাক্স দানের জন্য করেন না। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আসনের যেরূপ ছিল তাহা করিলে বর্ত্তমানে দর্শকের প্রতি সুবিধা করা হইবে। কিন্তু তাহা করিতে গেলে সরকারকে ট্যাক্সের হার কমানর প্রয়োজন। আশাকরি বোম্বাই-এর চিত্রগৃহের মালিকরা যাহা বিবেচনা করিতেছেন, বাংলাদেশের চিত্রগৃহের মালিকেরাও সে বিষয়ে অবহিত হইবেন।

* * * *

চিত্ত বসু পরিচালিত মুভি টেকনিকের আগতপ্রায় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের চিত্ররূপে যোগেশের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও যাদবের ভূমিকায় শ্রীমান বিভূ

শানা যাইতেছে বার্লিনে যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত ভারত সরকার ভারতীয় ছবি হিসাবে দেবকীকুমার পরিচালিত 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' চিত্রটি প্রেরণ ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জার্মান ভাষায় উহার াইটেল গ্রহণ ও চিত্রখানির পূর্ণ সম্পাদন কয়েক হের মধ্যেই হইয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

* * * * *

বিমল রায় প্রোডাকসনের শ্রীসুবোধ বসুর 'জয়যাত্রা' উপন্যাস অবলম্বনে 'নোক্‌রি' এবং হিতেন চৌধুরী প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ'-এর হিন্দী চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সম্প্রতি সদলবলে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 'নোক্‌রি' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত রায়ের সহিত যে সকল শিল্পীরা আসিয়াছিলেন

বিমল রায় পরিচালিত 'নোক্‌রি' চিত্রের নায়ক কিশোরকুমার ও তাঁহার পত্নী রুমা দেবী (সমর চিত্রের নায়িকা)

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

তন্মধ্যে কিশোর কুমার, শীলা রামানি, কৃষ্ণকান্ত সুরাজ দাশগুপ্ত অন্যতম। এবং 'বিরাজ-বৌ'-এর দৃশ্য গ্রহণে অভি ভট্টাচার্য্য অংশ গ্রহণ করেন। উভয় চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন সলিল চৌধুরী। শ্রীযুক্ত রায়ের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তন্মধ্যে 'রূপ-মঞ্চ' কার্য্যালয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এক নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করেন। এই অনুষ্ঠানে 'যুগান্তর' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সস্ত্রীক কিশোর কুমার, শীলা রামানি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিচালক বিমল রায় কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশন পার্কে তাঁহার 'নোকরি' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণে রত। আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণের কাজ একযোগে চলিতেছে

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

* * * * *

লাহোরের চিত্র পরিবেশক মিঞা মহম্মদ রফিক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যদিও ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাকিস্থানের কাষ্টমসে অদ্যাবধি বহু ভারতীয় ছবি আটকাইয়া আছে তথাপি ভারত সরকার এই বিষয়ে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয় কাষ্টমস্ 'গুল্‌নার' ছবিটি অতিরিক্ত কোনরূপ শুল্ক আদায় না করিয়া ছাড়পত্র দিয়াছেন। 'গুল্‌নার' ছবি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৫০ জায়গায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। অপর একটি পাকিস্থানী ছবি 'ন্যারে' শীঘ্রই ভারতে যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এ প্রসঙ্গে মিঃ রফিক পাকিস্থান সরকারকে উদার মনোভাব অবলম্বন করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

* * * *

সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে জেফ্রি কেণ্ডাল ও সম্প্রদায় সেক্সপীয়ারের কয়েকটি নাটক অভিনয় করিয়াছেন। 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্' নাটকে জেফ্রি কেণ্ডাল হাবকের ভূমিকায় অবতরণ করেন। ওয়েণ্ডি ডেভিসের 'পোর্সিয়া' ও উৎপল দত্তের গ্রামিয়ানো আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সহরের নাটমঞ্চের দিক হইতে ইহা একটি সাম্প্রতিক আকর্ষণ। দৃশ্য, আলোক-সম্পাত ও সুষ্ঠু অভিনয়ে জেফ্রি কেণ্ডাল ও তাঁহার সম্প্রদায় সত্যই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্' ব্যতীত ম্যাকবেথ, ওথেলো, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটকগুলিও অভিনীত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—

গত ৬ই মার্চ শনিবার পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অনুরাগী ও ভক্তগণের উদ্যোগে তাঁহার ১৯তম জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ঐদিন হাজার হাজার নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সভায় তাঁহার আদর্শের কথা প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এই কলিযুগেও তাঁহাদের অসংখ্য সন্ন্যাসী কর্মীদের মধ্য দিয়া যে প্রেম, সেবা ও ত্যাগের ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা হইতে রামকৃষ্ণদেবের আদর্শের কথা বুঝা যায়। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্তমান স্বার্থসর্বস্ব যুগেও পরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদর্শ আরও অধিক পরিমাণে ও অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞানী আচার্য্য মেঘনাদ সাহা—

১লা মার্চ কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য্য মেঘনাদ সাহার ৬০তম জন্মদিবস পালন করা হইয়াছে। ডাক্তার সাহার ছাত্র ডাঃ ডি-এস-কোঠারী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ঐ উপলক্ষে ডাঃ সাহার ছাত্রগণ তাঁহাকে এক মানপত্র দান করেন। ভারতে বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠায় ডাঃ সাহা একজন অগ্রণী। তাঁহার জীবন ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সংগঠন ও উন্নতির সহিত সর্বাঙ্গীণভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের উর্দ্ধে থাকিয়া তিনি বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন। আচার্য্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উৎসবে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা খিদিরপুরে মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন উৎসব ও তাহাতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার মূর্তির আবরণ উন্মোচনকালে মহাকবি মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার কথা বিবৃত করেন। তাঁহার পরলোক গমনের এতকাল পরে তাঁহার স্বদেশ দেশবাসী তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার কথা শ্রদ্ধার সহিত যে স্মরণ করিয়াছেন, তাহাতেই দেশের ভাব-প্রবাহ বুঝিতে পারা যায়। কবির পৌত্র শ্রীএন্-সি দত্ত ঐ মূর্তিটি পাঠাগারকে দান করিয়াছেন। পাঠাগারের সভাপতি ভূতপূর্ব-মন্ত্রী শ্রীসন্তোষকুমার বসু পাঠাগারের নূতন গৃহের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

খ্যাতনামা কোবিদ আচার্য্য শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া দেশবাসী সকলেই আনন্দলাভ করিবেন। ছাত্রাবস্থা হইতে অসাধারণ মেধাবী বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন এবং সারা জীবন যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা ও বিজ্ঞান-আলোচনায় অতিবাহিত করেন। গত কয়েক বৎসর তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করিয়াছেন। কাজ ও কর্মশক্তি উভয়ই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত শিক্ষাদানের কেন্দ্র হইবে।

পরলোকে ডাক্তার সত্যচরণ—

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক সুপণ্ডিত ডাক্তার বাবু বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) পিতা ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় গত ২৯শে মাঘ (১৩৬০) পুণ্য বিষুপদী সংক্রান্তি তিথিতে তাঁহার মণিহারী-ভবনে ৮৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন ও মৃত্যুকালে ৬ পুত্র, ২ কন্যা ও বহু পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পরোপকারী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ঐ অঞ্চলের বাঙ্গালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। যৌবনে মাত্র ১২ আনা সম্বল করিয়া ডাক্তারবাবু মণিহারীতে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে যান এবং নিজ অসাধারণ সততা ও নিষ্ঠা দ্বারা জীবনে সাফল্য-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী জেলার শিয়াখালার অধিবাসী হইলেও মাতুলালয়ে হালিসহর ও সাহেবগঞ্জে লালিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ৩রা মার্চ দিল্লী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বিধান সভা ও পরিষদের কংগ্রেস-দলের সদস্যদের এক সভায় ঘোষণা করেন যে গঙ্গার উপর ফরক্কার বাঁধ নির্মাণ ও আসানসোলের নিকট দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার অংশ স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার

মঞ্জুর করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও চাকরীর সংস্থান কল্পে ছোট ছোট কারখানা স্থাপনের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। উহাতে তিন কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। প্রত্যেক কারখানার জন্য এক লক্ষ টাকা করিয়া দিয়া ৩ শত কারখানা খোলা হইবে। বেসরকারী চেষ্টায় যাহাতে ঐ সকল কারখানা হয়, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া হইবে। দার্জিলিংয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। সে জন্য একজন পদস্থ সামরিক অফিসারের উপর ভার দেওয়া হইবে। ডাক্তার রায় ৩ দিন দিল্লীতে থাকিয়া এ সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি কলেজ—

পশ্চিমবঙ্গে একটি কৃষি কলেজ ও তাহার সহিত একটি ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য শ্রীঘনশ্যামদাস বিরলা প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে ১৪ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ, কলেজটি হরিণঘাটায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই—সেজন্য যত অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

এ বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৯টি রাজ্য খেলাধুলার ৯টি বিষয়ে যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় ৩৩টি নতুন রেকর্ড হয়েছে—এথেলেটিকসে ১৪টি, সাঁতারে ৯টি, ভারোত্তোলনে ৮টি এবং সাইকেলে ২টি। পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দল সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে এই নিয়ে উপর্যুপরি চারবার দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বোম্বাই প্রদেশ। প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

বাস্কেট বল ঃ মহীশূর (গত বৎসরের বিজয়ী) ১৮ পয়েন্টে পেপসু দলকে পরাজিত করে। ফলাফল—মহীশূর ৪৯ পয়েন্ট এবং পেপসু ৩১।

ভলি বল ঃ পাঞ্জাব ৩-২ খেলায় দিল্লী দলকে পরাজিত করে। ফলাফল—১২-১৫, ১৫-১৩, ১৫-১০, ১১-১৫ ও ১৬-১৪ পয়েন্ট।

মহিলাদের ভলি বল ফাইনালে উত্তর প্রদেশ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

...ি ঃ বাঙ্গলা দল ৫১ পয়েন্টে বোম্বাই দলকে ... করে। ফলাফল—বাঙ্গলা ১৮ ও ৪৮ পয়েন্ট; ... ও ১১ পয়েন্ট।

...র পোলো ঃ বাঙ্গলা দল ৯-৬ গোলে পরাজিত করে।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

... ঃ বোম্বাই দল

...লা ঃ বাঙ্গলা দল

...ট সাইকেল ঃ বোম্বাই দল

... ঃ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ (যুগ্মভাবে

... বাঙ্গলা দল

... ঃ সার্ভিসের দল

শ্রেষ্ঠ দেহী প্রতিযোগিতা ঃ 'ভারতশ্রী' খেতাব—কমল ভাণ্ডারী (বাঙ্গলা)

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলের

পয়েন্ট ও স্থান

(ট্রাক এণ্ড ফিল্ড ইভেন্টস)

পুরুষ বিভাগ

১ম সার্ভিসেস ১২৯ পয়েন্ট; ২য় পাঞ্জাব ২৮ পয়েন্ট; ৩য় দিল্লী ২৩ পয়েন্ট; ৪র্থ পেপসু ১১ পয়েন্ট; ৫ম উত্তর প্রদেশ ১০ পয়েন্ট; ৬ষ্ঠ বোম্বাই ৭ পয়েন্ট; ৭ম বাঙ্গলা ৬ পয়েন্ট; ৮ম মাদ্রাজ ৫ পয়েন্ট; ৯ম মহীশূর ৩ পয়েন্ট; ১০ম মধ্যভারত ১ পয়েন্ট; ১০ম ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ১ পয়েন্ট।

অন্ধ, গুজরাট, রাজপুতানা, বিহার, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ এবং মধ্য প্রদেশ দল যোগদান করে কিন্তু কোন ... লাভ করেনি।

এ বছরে জাতীয় লন টেনিসের সিঙ্গলস বিজয়ী ১৯ বছরের তরুণ খেলোয়াড় আর কৃষ্ণাণ ফটো—জে কে সান্যাল

মহিলা বিভাগ

১ম বোম্বাই ৫৫ পয়েন্ট; ২য় বাঙ্গলা ৮ পয়েন্ট; ২য় বিহার ৮ পয়েন্ট; ৩য় মধ্য ভারত ৬ পয়েন্ট; ৪র্থ উত্তর

প্রদেশ ৪ পয়েণ্ট; ৫ম মহীশূর ৩ পয়েণ্ট; ৫ম উড়িষ্যা পয়েণ্ট; ৬ষ্ঠ পেপ্সু ১ পয়েণ্ট; ৬ষ্ঠ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন পয়েণ্ট।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

৭ই মার্চ্চ নিউ ইয়র্কে ব্রুকলিনের প্যাডি ডেমার্কো ওয়েট জিমী কার্টারকে হারিয়ে লাইটওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। কার্টার গত তিনবছর এই খেতাব লাভ করে এসেছিলেন।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

জর্জ টাউনে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৪৩৫ (হাটন ১৬৯, কম্পটন ৬৪, বেলী ৪৯। রামাধীন ১১৩ রানে ৬ উইঃ) ও ৭৫ (১ উইকেটে)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৫১ (উইকস ৯৪, ম্যাকওয়াট ৫৪, হোল্ট নট আউট ৪৮। স্টাথাম ৬৫ রানে ৪ উইঃ) ও ২৫৬ (হোল্ট ৬৪, স্টলমেয়ার ৪৪)

প্রথম দুই দলের প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যথাক্রমে ১৪০ এবং ১৮০ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। সুতরাং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বর্ত্তমানে ২-১ টেষ্ট খেলায় অগ্রগামী আছে। দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় উভয় দলের মধ্যে ওয়ালকটের ২২০ রান এবং হোল্টের ১৬৬ রান উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় হকি দল ঃ

ভারতীয় হকি ফেডারেশন দল মালয় সফরে ১৬টি খেলার খেলাতেই জয়লাভ করে। এই সফরে দু'টি টেষ্ট খেলা হয় সর্ব্ব মালয় দলের সঙ্গে। প্রথম টেষ্টে ... গোলে এবং ২য় টেষ্টে ৬-০ গোলে ভারতীয় দল জয়ী হয়। মালয় সফরে ভারতীয় দল মোট ১২১টি গোল দেয়—অধিনায়ক বলবীর সিং একাই ৪৩টি গোল করেন; ভারতীয় দলের বিপক্ষে গোল হয় মাত্র ৭টি।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

গত বছরের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হোলকার দল এক ইনিংস ও ৩১৫ রানে বাঙ্গলা দলকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে। তারা ফাইনালে বোম্বাই দলের সঙ্গে খেলবে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

বাঙ্গলা—১৪৯ ও ১১১। হোলকার—৫৭৫ (অর্জুন নাইডু ৯৫)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অপর সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ৩৭৯ রানে মাদ্রাজকে পরাজিত করে:

সংক্ষিপ্ত ফলাফল: ৫০৪ (মানকাদ ১১১, কেনী ১১৪, রামচাঁদ ১১৮, রামচন্দ্রণ ১০৯ রানে ৭ উঃ) ও ৩৪২। মাদ্রাজ: ৩১৮ ও ১৪৯।

ক্রিকেট লীগ ঃ

ক'লকাতার প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা স্থগিত আছে। ফাইনাল খেলা হবে 'এ' বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারী মোহনবাগান দলের সঙ্গে 'বি' বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারী কালীঘাট দলের।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (৩য় পর্ব—৩য় সং)—২॥০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ষোড়শী" (৯ম সং)—২৲, "ছবি" (১১শ সং)—১৷০, "দেনা-পাওনা" (১১শ সং)—৪৲, "স্বামী" (২৭শ সং)—১৷০, "বিরাজ-বৌ" (উপন্যাস—২৪শ সং)—২৲

শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "অভিনব"—৩৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "ডায়মণ্ড মাইন্‌স্"—১৷৷০

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "ছোটদের বিবেকানন্দ"—৷৷৵০, "ছোটদের সারদামণি"—৷৷৵০

অতন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "অবাক"—...

শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী প্রণীত "তীর্থদর্শন"—২৷০, "মে... বা জী"

বিনয় চৌধুরী-সম্পাদিত সাহিত্য-সঙ্কলন "মহুয়া"—৷৷০

অশোক মেহতা প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"—১৷০

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "নতুন কবিতা"—২৲

শ্রীমতিলাল রায়-সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" (১ম খণ্ড)—৫৲

শ্রীসত্যেন সিংহ প্রণীত নাটক "মনোবৈজ্ঞানিক"—১৷৷০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত "গীতার আলো"—১৷৷

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত